অমৃত

ত্রৈমাসিক সূচীপত্র

১১শ বর্ষ : ৩য় খণ্ড

শুক্রবার, ২৫শে কার্তিক, ১৩৭৮ : শুক্রবার, ১৪ই মাঘ, ১৩৭৮

Friday: 12th. November 1971 Friday: 28th. January 1972

অমৃত

॥ ত ॥

॥ দ ॥

॥ ধ ॥

॥ ন ॥

অমৃত

নিয়মাবলী

বিজ্ঞপ্তি বিভাগ

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানানো হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরত পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫·০০	টাকা ৩০·০০
ষান্মাসিক	টাকা ১২·৫০	টাকা ১৫·৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬·২৫	টাকা ৮·০০

ভিঃ দ্রঃ—উৎপাদন শুল্কের হার (চাঁদার সহিত অবশ্য প্রেরণীয়)

বার্ষিক	টাকা	১·০২
ষান্মাসিক	টাকা	০·৫২
ত্রৈমাসিক	টাকা	০·২৬

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১২শ বর্ষ
৩য় খণ্ড

২৭ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক—২ পয়সা
মোট ৫২ পয়সা

Friday, 10th November, 1972 শুক্রবার, ২৪ কার্তিক, ১৩৭৯ .52 Paise

পৃষ্ঠা বিষয় লেখক

প্রচ্ছদ : প্রদীপ দাস

এক নজরে

একটি সংবাদ : মদ খেয়ে রাস্তায় মাতলামো করার অভিযোগে দশজন বাঙালী যুবককে আদালতে হাজির করানো হয়েছে। ইন্‌সপেক্‌টর ঘোষ দশজন যুবকের বিরুদ্ধেই প্রমত্ত অবস্থায় রাস্তায় অশালীন আচরণ করার অভিযোগ এনেছেন। তাদের মধ্যে ছয়জনের বিরুদ্ধে আবার ধৃতদের ছাড়িয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে পুলিশকে মারধর করারও অভিযোগ আনা হয়েছে। যুবকদের নাম—বিহারীলাল সাহা, গণেন্দ্রনাথ মৈত্র, শৈলেশ্বর মুখার্জি, ক্ষেত্রমোহন ঘোষ, অনাথবন্ধু মাধব, ব্রজেন্দ্রকুমার দে, তিনকড়ি ব্যানার্জি, অমূল্যকৃষ্ণ ব্যানার্জি, নবকৃষ্ণ সেন ও হরিশচন্দ্র ভাদুড়ি।

ঐ অবিস্মরণীয় যুবকদের উল্লেখিত কীর্তি কোন সাম্প্রতিক কালের ঘটনা নয়। 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার 'সেভেন্টি-ফাইভ ইয়ার্স এগো' সংবাদস্তম্ভ থেকে সংবাদটি তুলে নিয়ে 'অমৃত'র পাঠকদের কাছে পরিবেশন করা হল। ঘটনাটি ঘটে ১৮৯৭ সালের ২৭ অক্‌টোবর। দেখা যাচ্ছে যে, পঁচাত্তর বছরের ব্যবধানে আমরা খুব একটা এগিয়ে যাইনি বা পিছিয়েও পড়িনি।

পাশবিক প্রস্তাব : দীর্ঘ মেয়াদে আটক বন্দীদের মানসিক সুস্থিরতার জন্য ও পারিবারিক জীবনের প্রতি আকর্ষণ বজায় রাখার জন্য মাঝে মাঝে তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাসের সুযোগ দেওয়া উচিত—এমন একটা মত কোন কোন সমাজতত্ত্ববিদ পোষণ করে থাকেন। কিন্তু বৃটেনের জেল-কর্তৃপক্ষ ও ব্যাপারে কয়েদিদের মধ্যে সমীক্ষাকার্য চালিয়ে খুবই হতাশ হয়েছেন। মাত্র একজন বাদে সব কয়েদি সমস্বরে ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেছে, ঐ প্রস্তাব অসম্মানজনক, ঘৃণ্য, পাশবিক। তারা অন্যায় করেছে তার জন্য জেল খাটছে, কিন্তু তারা পশু নয় যে তাদের যৌন পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করে শান্ত রাখতে হবে। আর তাদের নিরপরাধ স্ত্রীদের যে একটা সামাজিক মর্যাদা আছে এটা যেন কর্তৃপক্ষ ভুলে না যান।

এক যৌন অপরাধে কারাদণ্ডভোগী অবশ্য একগাল হেসে প্রস্তাবটিকে স্বাগত জানিয়ে বলেছে মন্দ কি, সপ্তাহে অন্তত একবার ব্যবস্থা হলে ত ভালই হয়।

পানোন্মত্ততা ও দুর্ঘটনা : যুক্তরাষ্ট্রে গত বছর পথ দুর্ঘটনায় যে ৫৫ হাজার লোকের মৃত্যু হয় তার অন্তত অর্ধেক মৃত্যুর কারণ পানোন্মত্ততা, যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী রিপোর্টে একথা বলা হয়েছে। ঐ রিপোর্টেই বলা হয়েছে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়ী চালানোটা অন্যান্য দেশে বড় গুরুদ অপরাধ বলে বিবেচিত হয়, যুক্তরাষ্ট্রে তা হয় না বলেই এখানে নেশার ঘোরে দুর্ঘটনার সংখ্যা এত বেশী। আর যুক্তরাষ্ট্রের এই শৈথিল্যের জন্য ভাল গাড়ী, ভাল পথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রভৃতি ব্যাপারগুলি সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়ছে।

চোরের শাস্তি : চৌর্যাপরাধে চরম নিষ্ঠুর শাস্তির বিধান করে সম্প্রতি অজ্ঞাত অখ্যাত মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের তত্তোধিক অজ্ঞাত প্রেসিডেন্ট বোকাসা প্রায় রাতারাতি আন্তর্জাতিক পরিচিতি লাভ করেছেন। বোকাসার প্রাগৈতিহাসিক দণ্ডবিধি রাষ্ট্রসঙ্ঘের কর্মকর্তাদের পর্যন্ত বিচলিত করে তোলে। বোকাসার ঐ অকস্মাৎ খ্যাতিই (আসলে কুখ্যাতি) বোধহয় লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট কর্নেল গদ্দাফির [illegible] প্ররোচিত করেছে। টাকা ও ক্ষমতার গরমে লিবিয়ার, ধর্মোন্মাদ ঐ তরুণ সৈনিক রাষ্ট্রপ্রধানটি ইতিমধ্যে নানা নরম-গরম কথা বলে ও বেপরোয়া কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন। তিনি লিবিয়া থেকে সব ইতালীয়কে বিতাড়িত করেছেন, লিবিয়ার প্রতিটি গীর্জাকে মসজিদে রূপান্তরিত করেছেন, ইজরায়েলকে খতম করতে লিবিয়ার সর্বস্ব পণ করেছেন। কিন্তু এ সবেও তাঁর জীবনাদর্শের সম্পূর্ণ সফল রূপায়ণ হয়েছে বলে তিনি মনে করতে পারেন নি। তাই কদিন আগে ঘোষণা করেছেন, ১৮ বছরের বেশী বয়সের কোন লোক যদি চুরি বা ডাকাতির দায়ে ধরা পড়ে তবে ঐশ্লামিক আইন অনুসারে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে। সে শাস্তি হল চুরির অপরাধে ডান হাত কাটা ও ডাকাতির অপরাধে একসঙ্গে ডান হাত ও বাঁ পা কাটা। এই ভয়ঙ্কর, অমানুষিক শাস্তির বিধান এতদিন শুধু সৌদি আরবে প্রচলিত ছিল। গদ্দাফির উৎসাহে এবার লিবিয়াতেও তা প্রবর্তিত হল।

দেশকে চোরমুক্ত করার সঙ্কল্প নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়, কিন্তু যে প্রশ্নের উত্তর সৌদি আরবের সর্বশক্তিমান বাদশাহ্ কোনদিন দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নি বা লিবিয়ার 'লৌহ মানব' গদ্দাফিও দিলেন না তা হল, পৃথিবীর অতি সমৃদ্ধ ঐ দুটি দেশের মানুষ হাত-পা কাটার ঝুঁকি নিয়েও চুরি করতে যায় কেন? লিবিয়া আয়তনে ভারতের প্রায় অর্ধেক একটি দেশ, অথচ তার লোকসংখ্যা মাত্র পনের লক্ষ যা বৃহত্তর কলকাতার লোকসংখ্যারও এক-চতুর্থাংশ নয়। তারপর সেদেশে যে তৈল সম্পদের সন্ধান মিলেছে তা দিয়ে ঐ রাজ্যের প্রতিটি মানুষকেই কুয়েটের অধিবাসীদের মতো সকল দিক থেকে সুখী করে তোলা যায়। কিন্তু সে পথে না গিয়ে গদ্দাফি নিরুপায় হয়ে বিপথগামী অসহায় দরিদ্র মানুষগুলির হাত-পা কাটাকে ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করলেন কেন? শাসিতের সেবাই শাসকের প্রধান ধর্মীয় কর্তব্য একথা যদি গদ্দাফি মনে রাখতেন ও সবার আগে সে কর্তব্য পালনে তৎপর হতেন তাহলে মানুষের হাত-পা কাটার পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা আজ তাঁকে করতে হত না।

অগ্নিজনকদের স্মরণে : সভ্যতার আদিকালে, দশ লক্ষ বছর আগে যারা প্রথম আগুন জ্বালিয়ে অসভ্যতার অন্ধকার দূর করেছিল, সেই পিকিংম্যানদের গুহাগুলি চীন সরকার এতদিনে পর্যটকদের সম্মুখে উন্মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পিকিং শহর থেকে আটচল্লিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ড্রাগন হিলস-এর ঐ গুহাগুলিতে দশ লক্ষ বছর আগে, যারা বাস করত তারা সাধারণভাবে পিকিংম্যান নামে পরিচিত, তবে নৃতত্ত্বে তাদের নাম 'সিনানথ্রোপাস'। পিকিংম্যানরাই প্রথম আগুন আয়ত্তে আনে। হয়ত দাবানল থেকে তারা সে আগুন সংগ্রহ করেছিল। কিন্তু আগুনের সার্থকতা তারা উপলব্ধি করলেও বা আগুন আয়ত্তে আনলেও আগুন জ্বালানোর বিদ্যা তাদের জানা ছিল না। সেটা বোঝা যায় ঐ গুহাগুলিতে স্তূপীকৃত ছাই থেকে। যে আগুন তারা সংগ্রহ করে তা অনির্বাণ রাখত তারা সর্বদা সেই অগ্নিকুণ্ডে কাঠের যোগান দিয়ে। তার ফলে গুহাগুলির অভ্যন্তরে প্রায় বিশ ফুট উঁচু কাঠের ছাই জমে যায় আর গুহাগুলিতে সঞ্চিত কালিমা দশ লক্ষ বছরের ব্যবধানেও দূর হয়নি।

বিশ্ব মানবসভ্যতার আদি জনকদের স্মৃতিবাহী ঐ গুহাগুলি যে আধুনিককালের জ্ঞানপিপাসু পর্যটকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

—প্রত্যক্ষদর্শী

নয়াদিল্লীতে এশীয় বাণিজ্য মেলার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। উদ্বোধন দিবসে অংশ গ্রহণ-কারী দেশসমূহের পতাকা মেলা এলাকায় উড়তে দেখা যাচ্ছে।
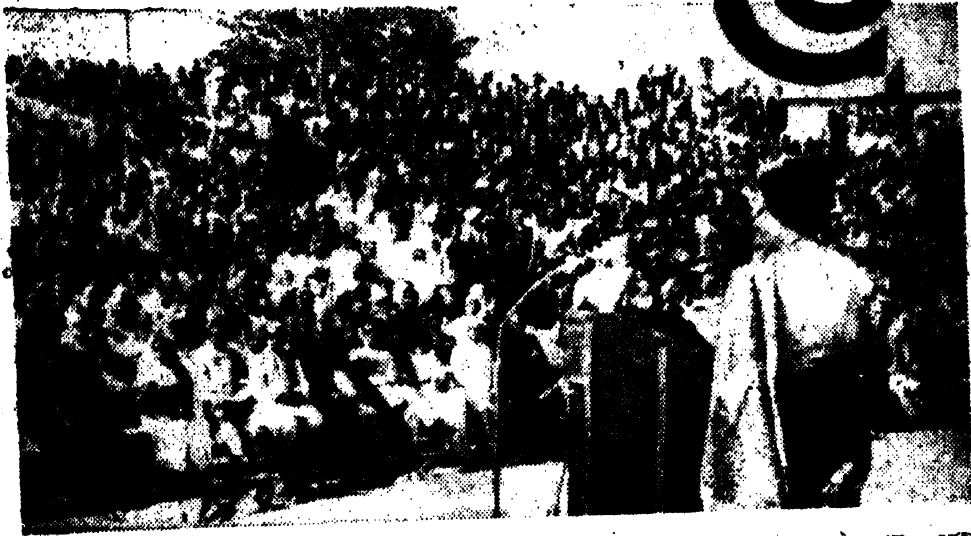
দেশে বিদেশে

চতুর্থ পাঁচসালা যোজনার কাজ সুরু হওয়ার কথা ছিল সেই ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে, কিন্তু আসলে হল ১৯৬৯ সালের এপ্রিলে। মাঝের তিন বছর গেল যোজনা পর্বের "ছুটি," বার্ষিক যোজনা দিয়ে কাজ চলতে লাগল কোনোরকমে। কিন্তু চতুর্থ যোজনা ১৯৬৯ সালে সরকারিভাবে চালু হলে কী হবে, গোটা যোজনার চেহারাটা তখনও পাকাপাকিভাবে ঠিক হয় নি। সেটা ঠিক হল আরো এক বছর পরে। সেই তুলনায় পঞ্চম পাঁচসালা যোজনার বরাত অনেক ভালো বলতে হবে। এই যোজনার কাজ সুরু হওয়ার কথা ১৯৭৪ সালের এপ্রিলে। কিন্তু ইতিমধ্যেই এই যোজনা রচনার কাজ সুরু হয়ে গেছে।

গত মে মাসের শেষে পঞ্চম যোজনা সম্পর্কে প্রথম অ্যাপ্রোচ পেপার তৈরি হয়। তখন যোজনা দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন সি সুব্রাণ্যম। তারপর হাত বদল হয়ে ঐ দপ্তর গেল দুর্গাপ্রসাদ ধরের হাতে। নতুন

মন্ত্রীর উদ্যোগে যোজনা কমিশনের বিশেষজ্ঞরা নতুন করে পঞ্চম যোজনার রণকৌশল নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করলেন। পঞ্চম যোজনা সম্পর্কে সুব্রহ্মণ্যমের সঙ্গে সুর্যোপ্রকাশ ধারের মত-বিরোধের কথা হাওয়ায় ভাসতে শুরু করল। শ্রীধার অবশ্য জোর গলায় বললেন যে, তাঁর পূর্বসূরীর সঙ্গে তাঁর কোনো মতবিরোধই নেই। ইতিমধ্যে এল গান্ধী-নগরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন। সেখানে দেখা গেল মতোমত হটে তার কিছুটা ঘটে। শ্রীধার ঐ অধিবেশনে জানালেন, ১৯৫৬ সালে জওহরলাল নেহরুর আমলে গৃহীত শিল্প নীতিই অটুট থাকবে। কিন্তু শ্রীসুব্রহ্মণ্যম বললেন, ঐ শিল্প নীতি মহাভারত বা বেদ নয় যে কোনো অবস্থাতেই তা বদল করা যাবে না। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ঐ অধিবেশনে পঞ্চম যোজনায় যে মূল নীতি অনুমোদিত হল তার ওপর শ্রীধারের চিন্তাধারারই ছাপ পড়ল বেশি। কারণ আবার নতুন করে মূল ও ভারি শিল্পের ওপর জোর দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা শ্রীধার যোজনা দপ্তর হাতে পাওয়ার পর থেকেই বলতে শুরু করেন।

৩০ অক্টোবর যোজনা কমিশনের পূর্ণাঙ্গ বৈঠকে পঞ্চম যোজনার মূল নীতি অনুমোদিত হল। অনিবার্যভাবেই এই নীতির ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে শ্রীধারের চিন্তাধারা এবং গান্ধীনগরের প্রস্তাব। শ্রীসুব্রহ্মণ্যমের আমলে তৈরি "অ্যাপ্রোচ পেপার" আর এই "অ্যাপ্রোচ পেপারের" অ্যাপ্রোচের মধ্যে তফাৎ আছে। প্রথমোক্ত দলিলে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছিল যে, এতদিন আমরা যে রীতিতে যোজনা তৈরি করে এসেছি তার মধ্যে গলদ থেকে গেছে। আমরা ধরে নিয়েছি যে, মোট উৎপাদন বাড়লেই দেশের সব মানুষের উপকার হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয় নি। দেশের বাইশ কোটি লোক এখনও চরম দারিদ্র্যের সীমারেখার নিচে কোনোরকমে টিঁকে আছে। সুতরাং পঞ্চম যোজনায় মোট উৎপাদন বৃদ্ধির চেয়ে গুরুত্ব পাবে সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সেই জন্যেই গরিবির বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণের উদ্দেশ্য নিয়েই পঞ্চম যোজনা তৈরি হবে।

যোজনা কমিশনের বৈঠকে শেষ পর্যন্ত যে মূলনীতি অনুমোদিত হল তার মধ্যে যে গরিবি হটানো বা সামাজিক ন্যায়-বিচারের কথা নেই তা নয়। কিন্তু সেখানে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন বা উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর যথোচিত জোর দেওয়া হয়েছে। -অ-ধ্যক্ষ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

(তিনি যোজনা কমিশনের সভাপতি) নিজেই বলেছেন যে, আমাদের আগের যোজনাগুলির মধ্যে কোনো মৌলিক গলদ ছিল না। আর এই যে মূল ও ভারি শিল্পের ওপর জোর দেওয়ার নীতির কথা বলা হচ্ছে, এটাও কিছু নতুন নয়। স্বর্গত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের ওপর যখন দ্বিতীয় পাঁচসালা যোজনার মডেল তৈরির ভার দেওয়া হয়েছিল তখন তিনিই এই নীতি সুপারিশ করেছিলেন এবং সেই নীতিই এতদিন অনুসৃত হয়ে এসেছে।

পঞ্চম যোজনার মোট লগ্নীর পরিমাণ ৫১,১৬৫ কোটি টাকা দাঁড়াবে বলে স্থির করা হয়েছে। বেশ কিছুদিন আগেই জানানো হয়েছিল যে পঞ্চম যোজনার আকার হবে চতুর্থ যোজনার দু গুণ। কাগজে-কলমে অবশ্য ব্যাপারটা তাই-ই দাঁড়াচ্ছে। কারণ চতুর্থ যোজনায় লগ্নীর নির্দিষ্ট পরিমাণ হল ২৪,৮৮২ কোটি টাকা। কিন্তু আসলে লগ্নীর পরিমাণ সত্যিই দু গুণ দাঁড়াবে না। কারণ প্রথমত, ৫১,১৬৫ কোটি টাকার মধ্যে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সম্পদের ক্ষয়পূরণ বাবদ (ডেপ্রিসিয়েশন) যে-টাকা লাগবে সেই অঙ্কটাও ধরা হয়েছে। সেই অঙ্কটাকে উন্নয়নের জন্যে প্রকৃত লগ্নী হিসেবে গণ্য করা যায় না। দ্বিতীয় কথা হল, ১৯৬৯ সালের তুলনায় ১৯৭২ সালে টাকার দাম বেশ কমে গেছে এবং ১৯৭৯ সালে (অর্থাৎ পঞ্চম যোজনার শেষে) আরো কিছুটা কমে যাবে। সুতরাং লগ্নীর পরিমাণ কাগজে-কলমে যতো বেশিই দেখাক, আসলে হবে তার চেয়ে কম। সেই কারণেই পঞ্চম যোজনার লগ্নীর লক্ষ্যকে অস্বাভাবিক বা খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষাপূর্ণ বলা ঠিক নয়।

এই যোজনার অন্যান্য লক্ষ্য সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা চলে। এই যোজনায় বার্ষিক সামগ্রিক উন্নয়নের হার নির্দিষ্ট হয়েছে শতকরা সাড়ে পাঁচ ভাগ। এই হার চতুর্থ যোজনারই সমান। চতুর্থ যোজনার মতোই শিল্প এবং রপ্তানির প্রসারের হার ধরা হয়েছে যথাক্রমে শতকরা আট থেকে নয় এবং সাত ভাগ। এই সব লক্ষ্য অবাস্তব নয় ঠিকই, কিন্তু এগুলিও যে সহজে পূরণ করা যাবে এমন কথা ধরে নেওয়াও ঠিক নয়। কারণ চতুর্থ যোজনার এর কোনোটিই পূরণ হচ্ছে না। মোট উন্নয়নের হার এপর্যন্ত শতকরা সাড়ে পাঁচ ভাগে পৌঁছয় নি, শিল্পের প্রসার হয়েছে শতকরা আট ভাগের চেয়ে অনেক কম, রপ্তানির প্রসারও নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছুঁতে পারে নি। সুতরাং যে-লক্ষ্যই নির্দিষ্ট হোক না কেন তা পূরণের ওপর বিশেষ জোর দিতে হবে। পঞ্চম যোজনার অন্যতম উদ্দেশ্য হল স্বয়ম্ভরতা অর্জন। যোজনা রচয়িতারা আশা করছেন যে, পঞ্চম যোজনার শেষে অবস্থা এমন দাঁড়াবে যে এদেশে লগ্নীর জন্যে আর বিদেশী মুদ্রা ধার

করতে হবে না। যেটুকু ধার করা হবে সেটা শুধু অতীতের ধার মেটাবার জন্যে। এটা নীতি হিসেবে শুধু যে প্রশংসনীয় তাই নয়, এটা বাস্তব অবস্থার স্বীকৃতিও বটে। কারণ নিষ্ঠুর সত্যটা এই যে, বিদেশী অর্থসাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনাও খুব উজ্জ্বল নয়। কিন্তু বিদেশী সাহায্য পরিহার করতে গেলে চাই রপ্তানির দ্রুত প্রসার। রপ্তানির প্রসারও আবার বিচ্ছিন্নভাবে ঘটতে পারে না। তার জন্যে চাই শিল্প, তথা গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উপযুক্ত বিকাশ। সেটা হওয়া নিতান্ত অসম্ভবও নয়। চতুর্থ যোজনা রচনার প্রাক্কালে যে-ধরনের অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল তার কথা গোড়াতেই বলেছি। তার মূলে ছিল রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা। এখন শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে সেই অনিশ্চয়তার অবসান ঘটেছে। এই সুপ্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে পঞ্চম যোজনার লক্ষ্য পূরণ একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ এবং বিরাট সুযোগ।

•

এলাকার নাম ঠাকুর চক, আয়তন মাত্র দেড় বর্গমাইল। গোটা জম্মু ও কাশ্মীরে ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে যে-নিয়ন্ত্রণ রেখা চিহ্নিত হবে তার দৈর্ঘ্য প্রায় পাঁচ শ মাইল। সুতরাং ঠাকুর চক নিয়ে যদি কেনো মতবিরোধ দেখা দেয় তবে তা সমগ্র প্রশ্নের তুলনায় নিতান্তই সামান্য। তবু এই দেড় বর্গমাইল এলাকাই কি ভারত-পাক আলোচনাকে স্তব্ধ করে রেখে দেবে অনির্দিষ্টকাল? তা নিশ্চয়ই হতে দেওয়া যায় না। এই সামান্য কারণে নিয়ন্ত্রণ রেখা চিহ্নিতকরণের কাজ আটকে থাকলে সিমলা চুক্তির প্রথম শর্ত, অর্থাৎ সৈন্য অপসারণই সুরু হতে পারবে না।

শেষ পর্যন্ত তাই ভারতের স্থলবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল ম্যানেকশ এই অচলাবস্থা ভাঙবার জন্যে পয়লা নভেম্বর একটা

বলিষ্ঠ উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। পাকিস্তানী সেনাধ্যক্ষ জেনারেল টিক্কা খানের কাছে তিনি প্রস্তাব করলেন, ঐ ঠাকুর চক এলাকা নিয়ে পরে আবার বৈঠকে বলা যাবে, এখন আসুন আমরা বাকি ব্যাপারটা পাকাপাকি করে ফেলে সৈন্য অপসারণের পথ প্রশস্ত করি। কিন্তু এখন পর্যন্ত যে খবর এসেছে তাতে দেখা যায় পাকিস্তান এই প্রস্তাবে রাজী নয়। পাক বেতারের বক্তব্য, ঠাকুর চকের সমস্যার ফয়সালা না হলে নিয়ন্ত্রণ রেখা চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা পাকা হতে পারে না।

জেনারেল ম্যানেকশ'র সর্বশেষ প্রস্তাব শুধু এই কথাই আর একবার প্রমাণ করে যে এই উপমহাদেশে দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে ভারত কতো আগ্রহী। পাকিস্তানের সর্বশেষ মনোভাবও তেমনই চোখে আঙুল দিয়ে আরো একবার দেখিয়ে দিল যে, পাকিস্তানের মধ্যে সেই আগ্রহের রীতিমতো অভাব রয়েছে। জেনারেল ম্যানেকশ যে নতুন প্রস্তাব দিয়েছেন তাতে যে শুধু পাকিস্তানকে একটা বড় সুবিধে দেওয়া হচ্ছে তাই নয়, এযাবৎ ভারত যে-কথা বলে এসেছে শান্তি প্রতিষ্ঠার খাতিরে সেই বক্তব্যেরও পরিবর্তন করা হয়েছে। এমন কি ৩০ অকটোবর তারিখেও জেনারেল ম্যানেকশ জেনারেল টিক্কা খানকে যে-চিঠি লেখেন তাতেও বলা হয়েছিল যে, নতুন করে ঠাকুর চক নিয়ে আর কোনো আলোচনা হবে না। ১৮ অকটোবর দু'দেশের সামরিক প্রতিনিধিদের বৈঠকে যে ১৯টি মানচিত্র অনুমোদিত হয়েছিল তার ভিত্তিতেই নিয়ন্ত্রণ রেখা চিহ্নিত করতে হবে। ভারতের পক্ষে লেঃ জেনারেল ভগৎ এবং পাকিস্তানের তরফে লেঃ জেনারেল হামিদ খান যখন ২২ অকটোবর তারিখে অষ্টম দফা বৈঠকে মিলিত হন তখন ঐ ১৯টি মানচিত্রই তাঁদের সামনে ছিল। মুন্নাওয়ার তাওয়াই থেকে সুরু করে পর্তাপুর এলাকা পর্যন্ত গোটা জম্মু ও কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ রেখাই ঐ মানচিত্রগুলির আওতায় আসছে। ভারত এবং পাকিস্তানের স্টাফ অফিসরেরা ১১ সেপ্টেম্বর ঐ সব মানচিত্রে অনুমোদনের স্বাক্ষর দিয়েছিলেন। ২৫ অকটোবরের আগে পাকিস্তান নতুন আর কোনো প্রশ্ন তোলে নি। তারপর হঠাৎ ঐ দিন তারা ঠাকুর চকের অধিকার নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি করল।

ভারত তাই বলে আসছিল যে এই নতুন বিরোধ সে বিবেচনা করতেও রাজী নয়। কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠার আগ্রহে শেষ পর্যন্ত ভারত মত বদলে ঠাকুর চকের প্রশ্নটি পৃথকভাবে বিবেচনার প্রস্তাব করল এবং সেই সঙ্গে জানাল বাকি নিয়ন্ত্রণ রেখাটা পাকাপাকি করে ফেলা হোক। কিন্তু পাকিস্তান সে প্রস্তাবে রাজী নয়। শ্রীমতী গান্ধী সম্প্রতি এই মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছেন যে, সিমলা চুক্তি পাকিস্তানে যে মনোভাব সৃষ্টি করবে বলে আশা করা গিয়েছিল তা করতে পারে নি। জেনারেল ম্যানেকশ'র প্রস্তাবের উত্তরে পাকিস্তানের যে মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা গেল প্রধানমন্ত্রীর মূল্যায়নে ভুল নেই। কয়েকদিন আগে প্রেসিডেন্ট ভুট্টো শ্রীমতী গান্ধীর কাছে যে-চিঠি লেখেন তাতে তিনি বলেছিলেন যে অধিকৃত এলাকা থেকে সৈন্য অপসারণ দ্রুত শেষ হওয়া দরকার, কারণ দশ লাখ বাস্তুচ্যুত মানুষ তাদের ঘরে ফিরে শীতের ফসল বোনার কাজ সুরু করতে চায়। উত্তরে শ্রীমতী গান্ধী লিখেছিলেন যে, সামরিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সঙ্গে যে মানবিক প্রশ্ন জড়িত থাকে তা তিনি কখনোই উপেক্ষা করেন নি। কিন্তু এখন জেনারেল ম্যানেকশ'র প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে পাকিস্তানই কি সেই মানবিক সমস্যাকে উপেক্ষা করতে চাইছে না? কারণ ঠাকুর চকের প্রশ্ন বাদ দিয়ে বাকি নিয়ন্ত্রণ রেখা পাকা করে অন্যান্য এলাকায় সৈন্য অপসারণের কাজ সুরু হলে অনেক বাস্তুচ্যুত মানুষই ঘরে ফিরতে পারতেন।

সিমলা চুক্তি সই হওয়ার পর পুরো চার মাস পার হয়ে গেল, অথচ ঐ চুক্তি রূপায়ণে কোনো অগ্রগতিই এখনও পর্যন্ত হল না। তাই এই চুক্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে দেখা দিয়েছে শঙ্কা। গত বছর ১৭ ডিসেম্বর জম্মু ও কাশ্মীরে যে-সব এলাকা দু'পক্ষের সৈন্যের দখলে ছিল তার ভিত্তিতেই নিয়ন্ত্রণ রেখা চিহ্নিত হওয়ার কথা। কোন্ এলাকা কার দখলে ছিল তা প্রতিষ্ঠা করা তেমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। তবু তিন মাসের মধ্যে সামরিক প্রতিনিধিরা সেই কাজ শেষ করতে পারলেন না। ইতিমধ্যে আগস্টের শেষে দু'দেশের অফিসারদের এক দফা বৈঠক দিল্লিতে হয়ে গেছে। তবু কোনো ফল হয় নি। অতঃ কিম্? আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার স্বরণ সিং বলেছেন যে, সামরিক প্রতিনিধিরা যদি ব্যর্থ হন তবে রাজনৈতিক স্তরে বৈঠকের দরকার হতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক স্তরে বৈঠক মানে কি ইন্দিরা-ভুট্টো শীর্ষ বৈঠক? নাকি পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক?

৩-১১-৭২ —[illegible]

অতসী, বাতাসী আর রেখা। তিন বোন নয়, তিন সখীও নয়, তিন যুবতী মেয়ে ঘুরতে ঘুরতে এক ঘাটে এসে ভিড়েছে। প্রথম বাতাসী, তারপর অতসী, তারও পরে রেখা। ওরা সহকর্মিণী এক চোরাই চাল-চালানের। ভিক্ষের নাম করে ভেক নিয়ে কোঁচড় ভর্তি চাল এনে শহর এলাকায় পৌঁছে দেয়।...

একদিন বাতাসীকে সঙ্গে করে চোরাই-চালান কারবারীর সামনে আনতে সুচাঁদ চোখ মুচকে বললে, এ আবার কাকে আনলে হে পালান? পারবে তো? চেহারাটা বড় জপলকা দেকচি ঃ

পালান বললে, আজ্ঞা খুব পারবে! তা'পর আমি শিখকে দুবো!

সুচাঁদ চোখ দুটোকে যেন চাড্ডা দিয়ে বললে, তা নয় শেখালে, কিন্তু শরীর-গতিক তেমন যুৎসই নয়। পুলিশ তাড়া করলে ছুটতে পারবে তো?

এক কথা পালানের বললে, আজ্ঞা খুব পারবেন! ওর শরীলের জন্যে আজ্ঞা ভাবনা করবেন না, খাই-দাই তেমন আজ-কাল পাচ্ছেন না তাই চুপষে আছেন!

সুচাঁদ চোখ বুজিয়ে মুখে আক্ষেপের শব্দ করে বললে, খাবো কোত্থেকে—খাদ্য আছেন দেশে!

বাবুর কথায় সায় দিয়ে পালান বললে, তা'পর দেকুন না, আড়াই টাকা তিন টাকা চালের কেজি হয়েছেন! কজনা পারে?

আড়াই টাকা তাই মিলছে! দেশে চাল আছে তাই—মুখেই ফুটানি সব! সুচাঁদ চোখ খুলেই কেমন যেন চমকে উঠলো—বাতাসীর চোখ দুটো যেন ফোকাশ লাইটের মত জ্বলছে, কচা বাঁশ-পাতার মত পিত্ পিত্ করছে মেয়েছেলেটা!

সুচাঁদ বললে, তুমি ঐদিকখানে বোস তো মেয়ে! দাঁইড়ে কেন? বাতাসী ইতস্তত করলে। পালান বললে, তা'লে কাল থেকে নাগুক গিয়ে?

সুচাঁদ আবার কিন্তু করে বললে পারবে তো? বড় মেহনতের কাজ! অনেক পরিশ্রম বুঝলে না!

আজ্ঞা পরিশ্রম না করলে চলবে কেন? আমি ওকে বলে দেইচি—এক দানা চাল এদিক-ওদিক হলে কিন্তুক অন্ন থাকবে না! পারবেন না মানে, খুব পারবে! চেরকাল মাঠে-মাঠে ধান ছিঁড়ে পেট চালানে ছোঁড়ি সব! পুরুষে কখনো ওদের সঙ্গে ছুটে পারে! কি রে বাতাসী, বল এখনো পারবি তো? বাবু বলছে—

বাতাসী মাথা নাড়লে। সুচাঁদ চেয়ে দেখলে, মনে হলো মেয়েটা হাসছে।

পালান গম্ভীর হয়ে বললে, না না হাসি মস্করা না, খুব দায়িত্বপূর্ণ কাজ, বুজকে দেক! চাল বলে কথা কেমন কিনা!

বাতাসী তেমনি সম্মতিসূচক মাথা নাড়লে। মানে সে পারবে।

সুচাঁদ বললে, তাহলে ওকে বুঝিয়ে পড়িয়ে দাও—কি করাতে হবে না হবে, কোথা কোথা যেতে হবে!

বশম্বদ পালান বললে, সে আমি ওকে সব বলিচি—চাল-ধরা পুলিশ দেকলে কি করবে, আর চাল-কেনা শহুরে বাবু দেকলে কি করবে, সব পাকি পড়ে দিইচি।

সুচাঁদ বললে, এখন তা হলে তোমার দায়িত্ব!

সে আর বলতে আজ্ঞা! পালান মাথা দুলিয়ে মেনে নিলে।

—পুলিশ যদি চাল ধরে কেড়ে নেয়?

তাতেও, সই, দারিদ্র যখন নেইচ অ্যাখুনে আর বলতে আজ্ঞা!

বেশ ঃ সুচাঁদ চোখ বোজালে। ঘরের অস্পষ্ট আলোয় একটু থমথমে ভাব। মাটির দেওয়ালে কটা ক্যালেন্ডারের বিবর্ণ ছবিতে অনেক কালের ছাপ, গলায় দড়ির মস্ত একটা চটের পর্দা অন্দরের দিকে ঝুলছে, কড়িকাঠে যেন একটা টিকটিকি ডেকে উঠলো, ঠিক! ঠিক! ঠিক!

পালান ইতস্তত করে বললে, তালে রই কথা অইল!

সুচাঁদ সাড়া করলে না। চোখ খুলতে যেন ভয় হয়, মেয়েছেলেটা তেমনি চেয়ে আছে নাকি?

মানে আজ্ঞা—উসখুস করে মাথা চুলকে পালান বললে, পরণের একখান বস্তর না'লে—

না'লে কার, কি? সুচাঁদ চোখ খুললে। মেয়েটি কেমন জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, একটু আড় হয়ে দেওয়াল ঘেঁষে আছে।

কার আবার? ঐ বাতাসীর। শক্ত কাপড় না হলে চাল সে বাবে কিসে করে? কাঁদিয়ে কোঁচড় করতে হবেন না?

এতক্ষণে যেন চালব্যাপারীর খেয়াল হল, মেয়েছেলেটার পরনের কাপড়টা শতছিন্ন। দেহটা স্বাভাবিক রূপে পরিপূর্ণ হলে বলা চলতো লজ্জা নিবারণ হয়েছে না আচ্ছাদিত বস্ত্রে।

হঠাৎ সুচাঁদ খেঁকিয়ে উঠলো, বস্ত্র কোথা? আমার ঘরে কি পরিবার আছে, না মেয়েমানুষ রেকেচি?

আজ্ঞা মেয়েছেলটা একেবারে নেংটা হয়ে এয়েচেন কিনা—

কে আসতে বলেছিল? সুচাঁদ চেঁচিয়ে উঠলো, শালা এখন অন্নবস্ত্র যোগাও। কি আমার কোসের মাগুরে!

বেগতিক দেখে পালান বললে, চল চল, তোদের অভ্যেস বড় খারাপ। কাজ হলো না, এরি মধ্যে আহিংকে।...

চাল-চালানের সেই বাতাসীই এখন সুচাঁদের প্রধান সহায়। পনের-বিশ দিনে বাতাসীর যেমন চেহারার উন্নতি হয়েছে, তেমনি কাজের সুখ্যাতিও বেরিয়েছে। দিনে চল্লিশ-পঞ্চাশ কেজি চাল পাচার করে তিন গুণ দামে বিক্রী করে সুচাঁদের সিন্দুক ভর্তি করছে। যেমন হরিণীর মত ক্ষিপ্র গতি তেমনি বায়সের মত ধূর্ত সজাগ দৃষ্টি। বলে ছুঁচ গলে না হাতী গলে যাচ্ছে চেক-পোস্ট দিয়ে। চাল-ধরা অমনি মুখের কথা নয়!

প্রথম দিন খবরটা দিতে এসে পালান হেসে গড়িয়ে পড়েছিল। শালার পুলিশের যেমন বুদ্ধি—পোয়াতি মেয়েমানুষে কখনো অত থরথর হাঁটতে পারেন? শালাদের মেয়েমানষের পেট হয় না? ভরাভর্তি ইস্তিরিকে হাঁটতে দেখে নি কখনো?

সুচাঁদ টাকাগুলো হিসেব করে বাক্সে তুলতে তুলতে বললে, আঃ অত হাসচো কেন? যা বলবার বল না।

সেই কথাই তো বলচি আজ্ঞা! বাতাসী যা কাণ্ড একখানা করছে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবেন না। একেকবারে বিশ কেজি চাল পেট-কাপড়ে—আর নিয়েছে এমনি গুছিয়ে যেন দশ মাস গভ্ভো হয়েছেন! পুলিশ ওখানে কি করে সামলাবে, অবাক লোক!

সুচাঁদ মনে মনে বাতাসীকে তারিফ করলে। কাটা কাপড়ের দোকান থেকে শাড়ি-কাপড় কেনা তাহলে সার্থক হয়েছে! চোখ বুজিয়ে সুচাঁদ অন্তঃসত্ত্বা মেয়েমানুষের চেহারাটা কল্পনা করতে চেষ্টা করে। গা-টা যেন শিরশির করে ওঠে। কড়ি-কাঠের টিকটিকিটা নড়ে-চড়ে খুব কষ্টে, ডাকেও না বোধহয় আজকাল।

বাতাসী এখন শাপে-জলে হয়েছে। পুলিশকে ফাঁকি দেবার অনেক রকম ভেক শিখেছে।

চেক-পোস্টের এধারে একটা অশ্বত্থ গাছ আছে, ঝুরি নেমে যেন অরণ্য হয়ে আছে। ওইখানে এসে গাছের ঝুরির সঙ্গে যেন মিশে থাকে বাতাসী। সকাল থেকে দুপুর কখন গড়িয়ে যায় বাস-আর লরীর ঝাপটায়! মাঝে মাঝে বড় নির্জন হয়ে পড়ে জায়গাটা। কোঁচড়ের চালগুলো পেটের ছেলের মত নাড়াচাড়া করে। বাতাসী চোখ বুজিয়ে ধাঁ করে ওপারে চলে যায়। আর একটু হলে হয়েছিল আর কি! ভাগ্যে চেক-পোস্টের চোখগুলো তখনো সজাগ থাকে না। উঃ কম ভয় করতো প্রথম-প্রথম, যেন অবৈধ গর্ভের ভয়ে পালিয়ে এসেছে নদীতে ঝাঁপ দিতে! এপারে এলে আর ভয় নেই, আর নেই চাল ধরার। তবু কত ভয় হতো বাতাসীর, চালধরা ফাঁড়ির লোকগুলো পিছন পিছন আসছে বুঝি! মাথা ঘোরে, পা টলে, গা বমি-বমি করে।

সন্ধ্যেবেলায় হিসেব নিতে এসে পালান বলে, ও কিছু না সারাদিন খাই-দাই নেই তো—তা'পর একটা দায়িত্ব। হবেই তো। পরস্ব পর-দণ্ড!

দণ্ড বলে দণ্ড! বাতাসীর মনে হয় ঝকমারি। ভাত-কাপড়ের দেখা নেই, কেবল চোরের মত ভোগ, পরের কড়ি বয়ে বেড়ান!

পালান বোঝায়, দুদিন তো অমন হবেই, নতুন লাইন তো। একটা ভাবনা! সব কাজই শিখতে, বুঝতে সময় লাগে, ভাগ্যবাগ আছে! অধৈর্য হলে কখনো চলে, তা'পর চাল বলে কত্তা, সোনার চেয়েও দামী!

রোজ তার ঠিক হয়, প্রথম আট আনা, তারপর বার আনা, তারও পর এক টাকা! তাতেও যেন পোষায় না চাল পারাপার করা! বাতাসী কাজ ছেড়ে দিতে চায়—ইঁটের খাড়ি পিচের রাস্তা, কলের জল কেমন ধারা যেন!

বাতাসী একদিন কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললে, আর যেখানকে বল যাব, শহরে আর নয়—

কেন, শহরের দোষটা কি হয়েছেন?

যাই হোক সুচাঁদকে বলে টাকার ওপর খোরাকির ব্যবস্থা করে দিয়েছে পালান। তাই কি সুচাঁদ রাজী হয়, শুনেই বলেছিল, তা'পর কোনদিন বলবে শুতে দাও। এক টাকায় না পোষায় চলে যাক। আর একটা দেখ!

পালান বুঝিয়ে বললে, দেখুন আপনারও অনেক সুবিধে! অত রান্না-বান্না করবে, আপনার পেরসাদ পাবে! হাতের-পাতের আর খোরাকি কি?

বিপরীত সুচাঁদের অসুবিধাও ছিল। রান্না-বাড়ার হাঙ্গামা কম নয়। মেয়েটা ছিল সেও কবে শ্বশুর ঘর করতে চলে গেছে।

ফিসফিস করে পালান বললে, তা'পর মেয়েমানুষটা বিশ্বাসী আছে, এখন ওকে ছাড়া উচিত নয়। এতো কাজ করেছে, জানা-জানি হলে মুশকিল হবে!

সুচাঁদ হেসে উঠল, কি মুশকিল? কি জামাজোড় হবে? কোন্ শালা বলবে বলুক দিকি—আমার ঘরে চাল আছে!

তা নয়! আরো খোশামোদ করে পালান বললে, আপনারও বিয়ে ইস্তিরির—

কথাটা সুচাঁদ শেষ করতে দিলে না, মুখ ঝামটা দিয়ে বললে, দ্যাও গে পাঠিয়ে!

সেই থেকে বাতাসী সুচাঁদের ঘর করছে। রান্না-বাড়া করে, এঁটো বাসন মাজে, আবার দু কোশ পথ হেঁটে গিয়ে সুচাঁদের চাল পাচার করে দিয়ে আসে।

শহরের বাবুরা চিনেছে, দূরে থেকে দেখলেই ইশারা করে। তারপর সরসর করে চলে, কি গো কি দর আজ চালের?

দু টাকা আশি! একটু যেন আস্তে বলে বাতাসী।

সে কি! আবার চার আনা বাড়ালে? করবো কি—

আজ্ঞে পাওয়াই যায় না! বাতাসী অনেক কথা শিখেছে চাল-মারা!

পাওয়া যায় না তো তোমরা আনছ কোত্থেকে? খোলা বাজারে শহরের বাবুটি মশকরা করেন।

একথার কি উত্তর দেবে বাতাসী? সেই বলেই তো সুচাঁদের ব্যবসা চলছে, দেশের বাড়-বাড়ন্ত হচ্ছে!

মশকরা করে বাবুটি বললেন, তোমরা খাও কি?

কোঁচড় থেকে চাল খালাস করতে করতে বাতাসী বাবুটির মুখের দিকে চেয়ে চোখ নামিয়ে নিলে। বড় যেন আজ অন্তরঙ্গ বাবুটি চাল খুঁজতে এসে!

তারপরের কথার আর কোন উত্তর দেয় নি বাতাসী। বাঁশ-পাতা এখন লাউ-পাতা, সজীব, সতেজ সবুজ!

বাতাসী নিজের চেহারাটা আয়নায় দেখলে। সুচাঁদের ঘরে তাকের হাঁড়িতে কাটি দিয়ে উনুনের আড় কাঁধরে নিয়ে একটা আয়না নিয়ে বসল। মুখটা অনেক পুরন হয়েছে, তেল পড়ে চুল চিকন হয়েছে, নাক-ছাবির কাঁচটা চিকচিক করছে।

মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিজেকে অনেক-ক্ষণ দেখলে, আয়নাটা বড় ছোট—তার ঘরের মধ্যে আলো কম, ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে ঘাড়ে ব্যথা ধরে যায়। হঠাৎ দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা চেপে ধরতেই যেন কথাটা বাতাসীর মনে পড়ল। তাদের ঘরে একটা ভাঙা পরকলা ছিল, তারা ক'বোনে কাড়া-

যক্ষের মত কি যে করে কে জানে। সেই লোক আজ আবার কি যা-তা বলছে!

চালের দর যখন তিন টাকা ছুঁয়েছে, রুগ্নতাল যখন ভালই হচ্ছে, তখন একদিন পালান এসে জিজ্ঞেস করলে, কি ব্যাপার রে? আবার নোক দেখতে বলে মহাজন। কি হলো তোর?

নির্লিপ্ত কণ্ঠে বাতাসী বললে, কি জানি!

তাহলে তোর কি হবে? একলা পারচিস্ না বুঝি?

বাতাসী উত্তর দিলে না, তেল চকচকে চুলে নতুন চিরুণী চালাতে থাকে। লক্ষ্য করে পালান বলে, তা'লে কিছু করে নেইচিস্ বল! কাঁচা মালের কারবার—

সত্যি কিছু না। না পোষায় না রাখবে—তার জন্যে অত ভাবনা কি! চালের পরে কি আর কিছু নেই চোরাকারবারের?

পালান স্বীকার করে, বাতাসীকে এখন চেনাই যায় না। ছিরি-ছাঁদ বদলে গেছে। সুচাঁদের ভাতের গুণ আছে!

তা-না-না করে কথাটা কাটিয়ে দিলে পালান। আর [illegible] পাওয়া যায়! [illegible] পাঁজরা খসে [illegible], আবার [illegible]—শখ কম নয়। বড় [illegible] শখ হয়েছে মহাজনের!

তা নয়। একজনা কত পারবে? দুজনা হলে কাজ অনেক এগোবে। সুচাঁদ বললে।

এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে পালান বললে, যা ধড়িবাজ হয়েছেন কি বলবো! সিঁদিন তো মেয়েমানুষের পেট ছাঁটকে চাল বার করলে পুলুশে!

করুক! তোমার আমার কি! চাল হজম করে ফেলবে আমাদের মেয়েমানুষে—

পালান বললে, রিস্কে আছে! আমা ভাত নয় তো—

যে পারবে তাকে আনবে! তাতই হোক আর চালই হোক, কারবার তো চালাতে হবে।

শেষে দুই-ই না যায়? পালান বললে।

যায় যাবে—তুমি দেখাদিনি! সুচাঁদের এক কথা।

পালানের ছোটবেলায় ফাঁদ পেতে পায়রা ধরার কথা মনে পড়ল। এক থাবলা ধান ছড়িয়ে দিয়েছিল পায়রা ধরবে বলে। তারপর ধরা-পড়া পায়রাটার পেট টিপে দেখেছিল আস্ত ধান, তখনও গজ-গজ করছে। এক কণাও হজম হয়নি।

অতসী আরো রোগা, আরো দুর্বল, আরো পলকা যেন! সেদিনও যেমন আজও তেমনি, প্রশ্ন সুচাঁদের, অরে এ আবার কাকে আনলে! পারবে তো?

পালানেরও সেই এক কথা, পারবেনে তো কি—দেখে নেবেন।

দেখো, শেষে চাকি-চুলি দুই-ই না যায়!

পালানের মুখ সাফাই আছে, যাবেন বললেই যাবে! দেখবেন বাতাসীর চেয়েও—

চটের ওপার থেকে বাতাসী শুনেছে, ঠোঁট বাঁকালে। বাতাসী এখন দুরে-ছা হবেই তো!

তবু সুচাঁদ খুঁতখুঁত করে বললে, চেহারাটা বড্ড হীন কিনা—

আজ্ঞা খেতে পায় না তো সব দিন, একটা পাতা চেটে খেলে কখনো গায়ে গত্তি লাগে? ঐ দেখেই তো আনলুম গিয়ে—

সুচাঁদ লাভালাভের কথা ভাবতে লাগল।

পালান বকতে লাগল, ওদের দেখেই না বোঝা যায় আকাল! দেখে আসুন আজ্ঞা দেশে ধান-চাল নেই—সব ঘুঘোও!

নেই? বোধহয় তার দুপেটা ঐ মেয়েমানুষটার মত। বয়সকালেও বাড় নেই, উঁচিকপালী, রোমহীন পথ কুকুরীর মত, একটুকু খণ্ডা!

বকবকানি থামিয়ে গলা খাটো করে পালান বললে, সাধে ওদের পাওয়া যায়? কি দাম উঠবে বলুন চালের। একটা পাতা না চাটলে ওরা আবার উঠতো গিয়ে আপনকার।

সুচাঁদ উত্তর দিলে না, নিজের মনে বিড় বিড় করলে, দাঁড়াও সবুর কর, আরো বাড়বে।

...চালের চোরা-কারবারে অতঃপর অতসীর চাকরি হলো। দুই যুবতী একত্রিত হলো।

এবার আর পালানকে সুপারিশ করতে হলো না। সুচাঁদ নিজে থেকেই বললে, কোথায় আর থাকবে, দুটিতে একখানে একত্রে থাকুক, কাজের সুবিধে হবে।

সে তো উত্তম কথা! কে না খেতে পেলে শুতে চায়! তবে কিনা—পালান সম্পূর্ণ করলে না, টান দিলে কথাটার।

তবে আবার কি হে? সুচাঁদ জিজ্ঞেস করলে, কিছু আছে-টাছে নাকি?

আজ্ঞা সেসব কিছু না। ইদিকে সব ভাল, স্বভাব-চরিত্তির—

তাহলে?

ঐ আপনার যাকে বলে মুলোয় আর কি! অনাথা তো! ঘরে দশ কথা রক্ষেস নেই—

সুচাঁদ আর কোন কথা বললে না।

চটের আড়ালে বাতাসী [illegible] কান খাড়া করেছিল। এগিয়ে এসে অতসীকে ভেতরে টেনে নিয়ে বললে, এবার তাগে পড় কাজ তো পেলে!

মেয়েটা নড়েচড়ে উঠলো। কিন্তু কিসে লাগতে হবে তাতো কেউ তাকে এখনো বলেনি।

কেন শোনোনি চাল যে চ্যাক্ পোস্টের ওধার যে যাবে। ভাল কথা কি নাম তোমার গো?

অ-ত-সী! দাঁতের মধ্যে কথাগুলো যেন আটকে যায়। তোমার বাড়ী? পালান তোমার কে?

অত জানে না অতসী। লোকটা দুদিন ঘুরেছে তার পিছন পিছন, নানা কথা বলেছে, খাবার খাইয়েছে, কাজের কথা বলেছে। সব শেষে এ'টো শালপাতাও তো নিশ্চিত হয়!

চেক-পোস্টের এপারে এসে ওরা তকে তকে থাকে। ফাঁক পেলেই ছুটে করে গলে যায়। অতসী বেশ খর, বাতাসী আজকাল যেন মাঠো, মহাজনের ডেরা থেকে আসতে আজকাল তার যেন হাঁফ ধরে যায়।

ফিরে আসতে বাতাসীর আজকাল দেরী হয়। একবারের বেশি দুবার ক্ষেপ করতে পারে না। কষ্ট হয়। দেখেশুনে দালাল পালান বললে, ঘরের কাজই তুই কর, আমি মহাজনকে বলচি তোর চাল বেচে আর কাজ নেই।

বাতাসীর রাগ হয়, কিন্তু মুখের ওপর কিছু বলতে ইচ্ছে করে না। এখন তো তার খোরাক হবে। এক-একদিন অতসীও বলে তুমি ঘরে থাক দিদি, আমি একাই পঞ্চাশ কেজি নে যাব। জোর করেই অতসী ওকে বুড়ি-মামা অশ্বত্থের তলায় বসিয়ে রাখে। ওর পেট-কাপড়ের চাল নিজের পেট-কাপড়ে নিয়ে নেয়। না, মেয়েটা তার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, মতিগতিও কিছু খারাপ নয়।...

কতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছিল খেয়াল নেই, চোখ চাইতে বাতাসীর মনে হল, অনেক যুগ কেটে গেছে যেন! রোদ পড়ে গেছে, ছায়া মুছে গেছে, চারিদিকে কেমন একটা ছম-ছমে ভাব যেন। মনে পড়ে এমনি এক গাছতলায় বাবাঠাকুরের থান ছিল, শনি-মঙ্গলবারে জায়গাটা জেগে উঠতো ঢোলের বাদ্যি আর মানতকারীদের সমাগমে।

হঠাৎ চোখে যেন বড় আঁধার বোধ হল। বাবাঠাকুরের রুদ্র মুখটা চোখের ওপর ভেসে উঠলো। বাবাঠাকুর যেন কট-মট করে তার দিকে চেয়ে চেয়ে আছেন, বাবা খুব রেগেছেন!

বাতাসী চোখ বুজিয়ে বললে, অপরাধ মার্জনা কর বাবা। অজ্ঞানে যদি দোষ করি—

কিন্তু বড় আশ্চর্য, বাবাঠাকুর তাকে জাগরণে দেখা দিলেন। নিশ্চয়ই কোন গুরুতর পাপ সে করেছে, মনে মনে মানত করলে।

তারপর যেন খেয়াল হলো, অতসী কই এখনো ফিরলো না? চেক-পোস্টের গুমটি ঘরে চোর-ধরা আলো জ্বলে উঠেছে। খানিকটা এগিয়ে এসে বাতাসী এদিক-ওদিক দৃষ্টি করে দেখলে। মেয়েটা ধরা পড়ল না তো? একসঙ্গে দুজনের চাল নিয়ে বাহাদুরী করা। চোরের বার-বার, কামারের একবার।

কিন্তু অতসী অত বোকা নয়, অনেক চতুর, এক্সপার্ট। সুচাঁদের কারবারে ভেড়বার আগে রেলের ইঞ্জিন-ঝাড়া কয়লা সংগ্রহ করতো কাঁটাপুকুরে, পুলিশ কম তাড়া করতো না। অনেক নাড়াচাড়া খেয়ে না এখানে এসেছে।

অতসী বোধহয় ফিরতে পারেনি শহর থেকে। ক'দিন যে ধরপাকড় হচ্ছে—খদ্দের চমকে গেছে, কারবারটা একেবারে ঘেঁটে-ঘন্ট করে দিয়েছে। কোথায় মতার খাটিয়া, গড়ের নাগরী, বাকস-পেটরা গোলাগুলি নেই! চাল পাচারের ফন্দী-ফিকির সব জেনে ফেলেছে পুলিশ। ক'দিন কারবার চলবে কে জানে।

পালান একদিন বাজারের অবস্থা বলতে এসেছিল, সুচাঁদ তেমনি চোখ বুজিয়ে বললে, ও তুমি ভেবো না। চলুক না, কত আটকাবে।

পালান বললে, তবে যে সব বলছিল রগাধ বাণিজ্য হবেন।

বোজান চোখে মুখের হাসিটা ব্যঙ্গের মত যেন, নির্বিকার মহাজ্যোতির ঠাকুর যেন। সুচাঁদ বললে, বাণিজ্য চিরকালই অবাধ।

না, মানে এই ধরাধরি আর থাকবেন না। অভাব বড্ড বাড়বেন কিনা।

তেমনি মুখে সুচাঁদ বললে, বেড়েছে নাকি? তালে আর এক দিকে চালের দাম বাড়িয়ে দাও।

পালান অবাক হয়ে মহাজনের মুখের দিকে চাইলে। দেবতা প্রসন্ন হয়ে যেন চোখের পলক ফেললেন।

আরে অভাবের জন্যেই তো কারবার চলচে, নেই বলেই না লোকে খাচ্ছে।

পালানের পক্ষে একটা ধাঁধাই বটে। শালা অভাবের কথাটা শুধু তাদেরই মুখে—শহরের বাবুরা যাঁরা আছেন। অমন বড় পুজোয় তারাই কেবল উপোস করলে, শহরে 'ফ্রি-কিচেন' স্রোত বয়ে গেল। সুচাঁদকে শহরে এনে একবার রগড়টা দেখালে হয়।

না, অতসী ঠিক একটা কাণ্ড বাধিয়েছে। বড্ড চালাক কিনা। মনে মনে একটা কৈফিয়ৎ ঠিক করে বাতাসী বাড়ি ফিরলে। সুচাঁদের বাড়ির কাছাকাছি এসে হঠাৎ মাথাটা কেমন যেন ঘুরে গেল। সামনে একটা জিওল গাছে ভর দিয়ে সামলে নিলে বাতাসী। কেমন যেন মাটি পোড়া-পোড়া গন্ধ নাকে এল।

আর তক্ষুনি সুচাঁদের ঘর থেকে বেরিয়েই বাতাসীর সামনে পড়ে গেল অতসী। বাতাসী একশ কাটাবার আগেই বেশ সপ্রতিভ স্বরে অতসী বললে, কখন ফিরলে দিদি?

বাতাসী জবাব দিলে না। একটা সন্দেহ সরীসৃপ স্পর্শের মত তার মনকে অসাড় করে দিলে।

অতসীই কৈফিয়ৎ দিলে, বসে বসেই চলে এলুম। ভাবলুম লাভ হয়েছে, মহাজন খুশী হবে—

তারপর কাগজের নোটটা নেড়ে যেন হাওয়া খেয়ে অতসী বললে, মহাজন দিলে।

গম্ভীর হয়ে বাতাসী বললে, শুধু টাকা। আর কিছু না?

আবার কি? অতসী মুখ ঝামটা দিয়ে সামনে থেকে সরে গেল।

অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে যেতে বাতাসী দেখলে, বিছানায় অতসী নেই। খানিক চোখ বুজিয়ে মটকা মেরে পড়ে রইল, বাইরে কোথাও যায় যদি এখুনি ফিরে আসবে। রগড়টা দেখবে।

অনেকক্ষণ সময় কেটে গেল, অতসীর দেখা নেই। বাতাসী বিছানা থেকে উঠে পড়ল। চোখ মেলে যেন দেখলে আশ-পাশ। ঘুরঘুট্টি করছে অন্ধকার, একটা দুটো জোনাকি বাতার ওপর জ্বলছে। হঠাৎ বাতাসীর গা-টা ছমছম করে উঠল। একদিন এমনি অন্ধকারে ভূত দেখেছিল, ভয়ে বাতাসী মরে গিয়েছিল।

ঘর থেকে বাইরে দাওয়ায় এসে বাতাসী দেখলে, মহাজনের ঘরে আলো জ্বলছে। পা-পা করে এগোতে আলোটা যেন নিবে গেল। অন্ধকার সূচীভেদ্য। অশরীরী ভূতটা যেন ত্রিভুবন ছেয়ে ফেলেছে। ঝি-ঝি শব্দ হচ্ছে।

তিনদিন পরে ঠাকুরপুকুরের পাড়ে গাছতলায় এসে অতসী অজ্ঞান হয়ে পড়ল। চোখেমুখে জল ঝাপটা দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে বাতাসী বললে, মরেছিস তো? তাখন পৈ-পৈ করে বললুম—

অতসী বোবার মত চেয়ে রইল। কোচড়ের চালগুলো সামলালে।

বাতাসী বললে, আমাকে দেখেও কাজ হলুনি?

তেমনি চুপ অতসী। যা হয়েছে তার আর চারা নেই। মহাজন অনেক লোভ দেখিয়েছে, এ'টো পাত চেটে আর জীবন-যৌবন বরবাদ হবে না। সুখে থাকবি ইত্যাদি।

কিন্তু বিশ্বাস কি?

একদিন সন্ধ্যেবেলায় শহরে চাল-চালান করে বাড়ী ফিরে অতসী-বাতাসী দুজনেই অবাক হয়ে দোরগোড়ায় থমকে দাঁড়াল। মহাজনের ঘরে এ আবার কাকে আমদানি করলে পালান?

পালান এসে বললে, তোদের দুজনার কষ্ট হচ্ছে, তাই মহাজন বললে—একটা সঙ্গী জুটিয়ে দিলুম রে।

বাতাসী জবাব দিলে না। অতসী ঠোঁট উল্টে বললে, আহা আমার দরদী রে। সবার দরদে দেখতে পাচ্ছে না।

পালান খ্যাক্ খ্যাক্ করে হেসে সামনে থেকে সরে গেল। খুব কথা ফুটেছে মেয়েমানুষটার। সুচাঁদের ভাত পেটে পড়েছে যে।

নাম রেবা। নিবাস?

আর কোন উত্তর দিলে না অতসীর মত শুটকো মেয়েটা। চার চোখের সামনে কেমন জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আহা ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না। বাড়ি কোথাকে?

এখন অতসীর রাগটাই বেশি। বাতাসীর সয়েছে।

বাড়ী-ঘর থাকলে তো বলবে। তেমনি জুলজুল করে ওদের মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল রেবা।

মরতে এখানে এলি কেন? বাতাসী জিজ্ঞেস করলে।

রেবা বললে, বাঁচতে কোথা যাব তালে? মরণের পথ যখন পেলুম—

বেশ কথা জানে তো নতুন মেয়েটি। এখন দুজনের দৃষ্টি সর্বক্ষণ রেবার ওপর। যে কাজে এসেছে, সেই কাজই যেন করে কেবল। মেছো কুমীরে না গ্রাস করে।

এক ঘরে তিনজনের বিছানা হয়। অতসী ঘুমে কাতর, বাতাসী জেগে জেগে ওঠে। কখন শ্যাল ডাকে, কখন কুটুরে পেঁচা ডাকে মাঝরাতে চাঁদ দেখে। না, অতসীর পাশে নতুন মেয়েটাও অকাতরে ঘুমচ্ছে। বাতাসী এক ঠেলা দিয়ে বললে, আ মরণ! শোবার ছিরি দেক—কাপড়-চোপড় ঠিক করে শো!

ঘুমের ঘোরে চোখ চেয়ে রেবা পাশ ফিরলে।

তিনজনে একসঙ্গে চাল নিয়ে আসে না। খুব ধরপাকড় হচ্ছে, চেক-পোস্টে ডবল গার্ড বসেছে। পেট হাতড়ে দেখে, এক কেজি আধ কেজিতেও ছাড়ান নেই; তেমনি দামও হয়েছে চালের। চোরা-চালানের পোয়াবারো।

দুপুরের দিকে চেক-পোস্টের ওপারে গিয়ে রেবা খানিক থমকে দাঁড়াল, পিছন ফিরে দেখল। এমনি রোজ চড়ুই বা বুল-বুলির মত পালান ভাল লাগে না। কি কাজ মনে করে এসেছিল, আর কি কাজ করছে, ঠিক-ঠিকানা নেই। এক এক সময় মনে হয় চলে যাবে আর কোথাও। পালানকে বলবে—

তার ওপর ঐ দুজন সব সময় কৈফিয়ৎ করছে, যেন মহাজনের বিয়ে-করা মাগ সব।—জানতে আর বাকি নেই। কেন ওরা কি তার জিম্মাদার? বেশ করবে মহা-জনের ঘরে যখন খুশী যাবে: মহাজনের সঙ্গে তার যদি—হিংসে, হিংসে—

রেবার মনে পড়ল, আর একটু হলে কাল ধরা পড়েছিল। মহাজন রাতের বেলা আপন ডেরা থেকে বেরিয়েছিল, দৈত্যের মত চোখ মেলে এদিক-ওদিক কি যেন সন্ধান করছিল। রেবা বাইরে এসেছিল, ঘরের মধ্যে বাতাসী বা অতসীর সাড়া ছিল না। রেবা পা-পা করে এগোচ্ছিল, হঠাৎ আঁচলে টান পড়তে ফিরে তাকাতে সব যেন অন্ধকার মনে হল। মহাজনের ঘরের বাইরে রুদ্ধ কণ্ঠে কে যেন বলছে, মরবি! মরবি!

মহাজনকে দিনের আলোয় দেখা যায় না। কোথায় কোন পাতালপুরীতে লুকিয়ে থাকে। যেমন মহাজন, তেমনি তার চাল খুঁজে কোথাও পাবে না।

কাজে লাগাবার আগে অনেক লোভ দেখিয়ে পালান বলেছিল, রোজ চাড্ডিখানি করে চাল লুকিয়ে রাখবি, একটা দোকান ঠিক করে দেবো, সেখানকে জমা দে আসবি —দু' পয়সা হবে। হেঙ্গামা কিচ্ছু নেই। মহাজনের কাছে থাকতে পাবি, খেতে পাবি। ওগুলো তো তোর উপরি লাভ! আর ভাতের কাঙাল হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে না।

রেবা একদিনে রাজী হয়নি। দু-তিন সন্তা ঘুরে তবে পালান তাকে মহাজনের কাছে এনেছিল। উঃ, কি চেহারা মহাজনের! এই জালার মত পেট, বুকভর্তি চুল, গোল-গাল ভাঁটার মত চোখ, ভুরুদুটো যেন কাঁটাঝোপ। দেখে রেবা আঁৎকে উঠেছিল।

রেবা দেখলে তারা তিনজনেই ধরা পড়ে গেছে। অতসী বাতাসী চেক-পোস্টের ছাউনির মধ্যে মাটিতে চুপ করে বসে আছে। চেক-পোস্টের দারোগা এক মনে কি যেন লিখছে।

'আর একজন স্যার।'

'ভাল করে সার্চ করে দেখেছো?'

'আজ্ঞে পেট-কাপড়ে চাল ছিল!'

'আর কিছু নয় তো?' দারোগা অতসী বাতাসীর দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন।

সহকারী হেসে বললে, 'দেখে তো মনে হয় না। আর হলেও তেমন এ্যাডভান্সড নয়।'

দারোগা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তা হোক, সব কটাকে একসঙ্গে মেডিকেলের জন্যে পাঠাও।'

আক্ষেপ করে সহকারী বললে, 'মাগীগুলোও হয়েছে তেমনি, কিছুতে কবুল করছে না, কার চাল, কোত্থেকে আনছে।'

পেট-কাপড় খালি হলেও শারীরিক অবস্থা ঢাকা যায় নি। সহকারী বললে, 'এদের পুরুষগুলোও কি এ অবস্থায় বউগুলোকে ছেড়ে দিয়েছে। গরু নাকি?'

দারোগা গোঁফে চাড়া দিয়ে জানান দাই করে হাসলেন।

একটু রাত করে পালান খবর নিতে এল। মুখ কাঁচু-মাচু, যে কাঁদ-খাওয়া মেয়েকে।

শুনে মহাজন বললে, থাক, থাক খুব বাহাদুরী দেখিয়েছ! খুব মেয়েমানুষ জুটিয়েছিলে কারবারটাই লাটে!

পালান বললে, আজ্ঞা, ওরা নেমকহারামি করে নি, অনেক জেরাতেও মহাজনের নাম করে নি, বিশ্বাস একেবারে সব। তা'পর গে—

বলতে বলতে পালান হেসে উঠলো, একটা অগাড়ের কথা শুনেছেন গুরুদেব ওদের মেডিকেল করবে—বলে কিনা পেট চিরে মাল বার করবে।

চোখ বুজিয়ে বুকে হাত বুলাতে বুলাতে সুচাঁদ বললে, করুগে! তোমারআমার কি? বিশ্বাসী আর কোন মেয়েছেলে পাও কিনা দেখ!

টোকিওর ডায়েরী

অজিতকুমার দত্ত

প্রাসাদ উদ্যানে প্রবেশমুখে সেতু

গাড়ী ছুটে চলেছে পীচ-ঢালা ঝকঝকে অর্ধ-বৃত্তাকার রাস্তাটা ধরে। পাশে ঘাসে-ঢাকা পাড়টা শেষ হয়েছে পরিখার পাড়ে। ওপারেও সবুজের সমারোহ। জায়গায় জায়গায় বাঁকিয়ে গাছের জটলা। মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছে বাড়ীঘরের মাথা। ওই উদ্যানেই সম্রাট হিরোহিতোর প্রাসাদ। গাড়ীর কাঁচের ভেতর দিয়ে সামনে নজরে আসছে অসংখ্য সব স্কাই-স্ক্র্যাপার। লাল রঙের উঁচু টাওয়ারটা বিচিত্র চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দুপুর হলেও গাড়ী-ঘোড়ার কমতি নেই। লাঞ্চের সময় এগিয়ে আসছে। ভিড়টা তখন আরও বাড়বে। প্রায় গায়ে গায়ে ঠেকবে গাড়ী। তবুও সব যেন কেমন সুশৃঙ্খল ব্যাপার।

অথচ কল্পনায় ভেবে যেন একটু অন্য-রকম মনে হয়েছিল সব, এতটা ছিমছাম চকচকে নয়, যেন কোথাও খানিকটা ভাঙা-চোরাও রয়েছে। মনে পড়ল সেদিন রাত্তিরে প্লেনের ঘোষকের কণ্ঠস্বর: ঠিক সময় পৌঁছেছি এবার আমরা জাপানের ওপর দিয়ে চলেছি। নীচেই একদা আণবিক বোমায় বিধ্বস্ত নাগাসাকি শহর। নীচে অবশ্য তখন দু-চারটে আলোর বিন্দু ছাড়া কিছুই নজরে আসেনি। তবে মনশ্চক্ষে ভেসে উঠেছিল এখনও জীর্ণ, এখনও ভগ্ন-স্তূপ-সমাকুল এক মহানগরীর ছবি। আর টোকিও সম্পর্কে ঠিক ততখানি ভগ্নদশার কথা মনে না এলেও বোধ হয়েছিল যে সে-শহরও হয়ত বা পুরোপুরি স্বাভাবিক নয়। কিন্তু কার্যত দেখা গেল অন্যরকম। এই, অর্ধবৃত্তাকার, প্রাণ-চঞ্চল কর্ম-মুখরতার ছবি চোখে [illegible] সত্যিই একেবারে নতুন রূপে।

[illegible] জাপানীরাই অনর্গল বলে চলেছেন, এই যে [illegible] এই বাড়ীটাই [illegible] ও-পাশের [illegible] রাস্তা দিয়ে গিয়েছে শহরের সদাচঞ্চল অফিসপাড়ায়। পথেই পড়বে জাতীয় কলাবীথি আর বিখ্যাত পত্রিকা মাইনিচীর বাড়ী।

সব কথা অবশ্য কানে ঠিক পৌঁছচ্ছিল না। দর্শনেন্দ্রিয় এমনভাবেই জায়গায় জায়গায় গিয়ে আটকে যাচ্ছিল যে অন্য ইন্দ্রিয় আর তৎপর হবার মতো অবসরই পাচ্ছিল না। এটা যেন কেবল অবাক হয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবারই পালা।

হঠাৎ একসময় কাউন্সালির কিছু কথা কানে এল: লক্ষ্য করে দেখুন, এখানে কিন্তু কোনও ভুখা বা নাঙ্গা আদমী আপনার চোখে পড়বে না।

•

আজকের জাপান নিঃসন্দেহে তাকিয়ে অবাক হবার মতোই ব্যাপার। এমনিতেই জাপানীদের কর্মোদ্যমী সুশৃঙ্খল ও সৌন্দর্যপ্রিয় বলে সুনাম আছে। কাজেই এদেশের অগ্রগমন আশ্চর্যজনক কিছু নয়। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জড়িয়ে গিয়ে বাধা পড়েছিল তাতে। আর শুধু বাধা পাওয়া নয়, বলা চলে যুদ্ধের ধাক্কায় গোটা জাতটাই যেন মুখ থুবড়ে পড়েছিল। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হল যে মাত্র বছর পঁচিশের মাথায় কেবল উঠে দাঁড়ানো নয়, অনেক কিছুতেই জাপান আজ জগৎসভায় প্রথম পংক্তিতে গিয়ে স্থান নিয়েছে।

যুদ্ধোত্তর পুনর্বাসন আর শিল্পোন্নয়ন একই সঙ্গে [illegible] চরিত্রগত দৃঢ়তা। ফলে স্বল্পকালের মধ্যে সব মালিন্য সব জীর্ণতার অপসারণ ঘটেছে বড় বড় বাড়ীঘর, কলকারখানা, হাইওয়ে এক্স-প্রেস হাইওয়ে কেবল তৈরী হয়নি, কতগুলি শিল্প-বাণিজ্যের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক বাজারে জাপানের প্রায় একচেটিয়া অধিকার কায়েম হয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে ইলেকট্রনিকস অথবা পোত-নির্মাণ শিল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে। সুদৃঢ় এই অর্থনৈতিক বনিয়াদেরই সফল ও সমুজ্জ্বল প্রতিফলন এক কোটি অধিবাসী-অধ্যুষিত ও পৃথিবীর বৃহত্তম নগরী আজকের এই টোকিওতে।

•

নিত্যবহমান জনস্রোতে আজ যেন ভাঁটা পড়েছে। হোটেলের ন'তলার এই অলিন্দ থেকে দূরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে অন্তত তাই মনে হচ্ছে। পাশের উঁচু বাড়ীটার ছাদও খালি। রাস্তায় স্থানাভাবের কারণেই সেটা পার্কিং এরিয়া। একসময় হঠাৎ খেয়াল হল কি যেন একটা জাতীয় ছুটির দিন আজ। এদেশে ছুটির রেওয়াজটা কম। আর জাতীয় ছুটির দিনের তালিকাও খুব গোনাগুন্তি।

বেশ মজা হল বিকেলে। হাতে অঢেলই কিছু করণীয় না থাকায় সাধ জাগল একটু পায়ে হেঁটে ঘোরার। একটা জায়গায় মনে হল আলো আর লোকজনের ভিড়টা বেশী। কিছু পোস্টার বিজ্ঞাপনও নজরে এল। হয়ত বা একটা সিনেমা হলই হবে। ওপাশে দেখা গেল কটা স্লট মেশিন। পয়সা ফেলে দিতেই টিকিট বেরিয়ে আসছে। কাছে গিয়ে দেখি না সেখানে মেশিনের গায়ে ম্যাপও রয়েছে। তাতে ইংরেজীতেও কিছু লেখা নজরে এল। শেষ অবধি মালুম হল যে পাশেই ওঠা-নামার রাস্তা। টিউব-রেলের একটা স্টেশন এটা। মন্দ নয় একটা প্রোগ্রাম হতে পারে। যা ভাবা তাই কাজ। শহরের ম্যাপখানা সঙ্গেই ছিল। এখানেই আবার সেটা মিলিয়ে নিয়ে কাছাকাছির একটা টিকিট নিয়ে নেমে এলাম নীচে। ছুটির দিন হলে কি হবে, যথেষ্ট ভিড়। জায়গায় জায়গায় নিশানা দেওয়া আছে কোন্ দিককার জন্য কোন্ প্ল্যাটফর্ম। তাছাড়া গাড়ীতে-বসা যাত্রীদের চোখে পড়ার মতো করে একটু বাদে বাদেই বড় হরফে ইংরেজী ও জাপানীতে আপ ও ডাউনের পরবর্তী স্টেশনগুলোর নাম লেখা রয়েছে। অর্থাৎ রাস্তার হদিশ জানা থাকলে যাত্রী খেয়াল করে সময়ে নেমে পড়তে পারে। কাজেই রাস্তা গুলিয়ে ফেলার তেমনও সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না।

এত ভিড় হৈ-হট্টগোল সত্ত্বেও যথা-নিয়মে যারা নামার তারা আগে নামছে, পরে ওঠার দল উঠছে। আবার স্বল্প অবসরেই ড্রাইভারের কামরা থেকে দরজাও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অথচ ধাক্কা ধাক্কি বা পড়ে যাওয়া নেই। সবাই যাচ্ছে, পড়ে কেউ থাকছে না। সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল দিল্লীর বাসযাত্রার কথা। সেখানে বোধহয় এ ধরনের ব্যাপার কেউ কখনও ভাবতেই পারবে না।

মজাটা হল নামবার পর। দেওয়ালের গায়ে লেখা পড়ে গন্তব্যস্থলে নামতে কোনও অসুবিধা হয়নি। তীর আঁকা নির্দেশ নানা জায়গায়। সঙ্গে ভাষা অবশ্য সর্বত্র ইংরেজী নয়। এমনি এক নির্দেশ দেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম এসকেলেটারের ওপর। এ কি, তাকিয়ে দেখি উঠে এসেছি এক দোকানে। অবশ্য দোকান বলতে ছোট কিছু নয়। এটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের বিরাট এক হল। ঘুরতে ঘুরতে অবশ্য বেরুবার পথের হদিশ শেষ পর্যন্ত মিলল। তা ছাড়াও পাওয়া গেল কিছু। এখানকার বহুতল বিশালাকায় বিভাগীয় বিপণির সঙ্গে পরিচয় ঘটে গেল।

বাইরে এসে আরেক আলোকোজ্জ্বল মেলা। শহরের এই গিঞ্জা অঞ্চলটা দোকান-পাটের জন্য সুবিখ্যাত। টোকিও তথা জাপানের যাকে বলে 'শো-উইনডো', তা আখ্যা দেওয়া যেতে পারে এই গিঞ্জাকে। বাড়ীঘরের শ্রেণীর ভাগেই নানা ধরনের পণ্য-বিপণি। সাজানো-গোছানোরই বা বাহার কত। বড় বড় নিয়ন আর টিউব লাইটের খেলা ত রয়েছেই, আরও নজরে এল বিরাট বিরাট শো-কেস। একটিতে ত নানা জিনিসের সঙ্গে মায় এক জ্বলন্ত মোটরগাড়ীও শোভা পাচ্ছে।

প্রথম টিউবে চড়া বা আণ্ডারগ্রাউণ্ডে বেড়ানোর সঙ্গে আরও একটা অভিজ্ঞতা অর্জন হল ফেরার মুখে। টিউব স্টেশন থেকে বাইরে এসে মনে হল রাস্তায় যেন বেশ ভিড়। শিরস্ত্রাণধারী পুলিশের দলও দেখা গেল। মুস্কিল হল রাস্তা পেরুতে গিয়ে। পথ আটকে রেখেছে পুলিশ। অবশ্য বিদেশী দেখে ও হোটেলটা রাস্তার ওপারে জেনে আসতে দিল। ওভারব্রিজ পেরিয়ে আসতে গিয়ে অনেক দূর অবধি সব দেখা গেল। ওদিকে এক শোভাযাত্রা এগিয়ে চলেছে। পাশে পাশে চলেছে ছোট ছোট ল্যাণ্ড রোভার জাতীয় গাড়ী অনেকগুলো। ওপর থেকে চোঙা দিয়ে শ্লোগান দেওয়া হচ্ছে। পাশের জনতা তাতে সাড়া জানাচ্ছে। শোভাযাত্রাটাও কিন্তু এলোপাথাড়ী নয়। পাশাপাশি জনা অষ্টেক পরস্পরের কোমর ধরে স্নেকড্যান্সের কায়দায় এগুচ্ছে। মাথায় প্রায় সকলেরই টুপি। কিছু দূরে দূরে ঝাণ্ডা সব একত্র করা। সেই রঙিন মাথাগুলোও ক্রমে একত্রিতাকারে এগিয়ে যাচ্ছে। সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে কোথায় একটা যেন সুসামঞ্জস্য, ছন্দোবোধ খুঁজে পাওয়া যায়। জানা গেল যে অংশগ্রহণ-কারীরা অধিকাংশই ছাত্র আর প্রতিবাদটা নাকি মার্কিনী কি একটা নীতির বিরুদ্ধে।

প্রসঙ্গত সেদিনকার রাত্রিরের একটা শোভাযাত্রাও ছিল বিশেষ লক্ষ্যণীয়। মশাল নিয়ে দল বেঁধে সব যাচ্ছে। শোনা গেল এরা ডিউটি সেরে সবাই এসেছে। কাজে ফাঁকি নেই তবে প্রতিবাদটাও প্রয়োজন। এসবই সম্ভবত জাপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের নানাবিধ প্রকাশ।

•

বেশ খানিকটা জমে উঠেছিল আজ কথাবার্তা। হয়ত বা আবহাওয়াটা অনেক-খানি ঘরোয়া ছিল বলেই। ভারতীয় দূতা-বাসের তরফে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল ক'জনকে দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের জন্য। আর দূতাবাসের আমন্ত্রণ বলেই সম্ভবত একটা ভারতীয় রেস্তোরাতেই ব্যবস্থাটা করা হয়েছিল। তবে নামে বা অঙ্গসজ্জায় একটা চেষ্টা থাকলেও সব মিলিয়ে পরিবেশটা যেন ফুটে উঠেছিল মধ্যবর্গীয় বাগদাদের কোনও ভোজনশালার। বলা বাহুল্য, আহার্য-তালিকায় নান, তন্দুর, আলু-মটর আর মোরগ-মশল্লামেরই ছড়াছড়ি।

উপস্থিতদের মধ্যে ভারতীয় দূতাবাসের ক'জনা ছাড়া, কতিপয় জাপানী সাংবাদিক ও শিল্পসমালোচক ছিলেন। যেহেতু উদ্দেশ্য নবাগতের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। তাই গোড়ায় সংক্ষিপ্তভাবে ভারত-শিল্প তথা আজকের আন্দোলন ও সমস্যা সম্পর্কে কিছু মুখবন্ধ আমি সারবার চেষ্টা করলাম। জানতে চাইলাম জাপানেই বা বিষয়টা কত-দূর কিভাবে চিন্তা বা সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। স্বভাবতই কথার পিঠে কথা এল। নানাভাবে নানা মত ব্যক্ত হল। শিল্পের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সাহিত্য নাটক ইত্যাদিও এসে গেল। কথা চলল সত্যজিৎ রায় কুরোসোয়া তথা সৃষ্টি-ধর্মী নানাজনের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রসঙ্গে।

আমাদের [illegible] যে প্রখ্যাত জাপানী-সাহিত্যিক [illegible] আমন্ত্রিত হয়েছেন এবং [illegible]। [illegible]দের কোনও কথা হল তাঁকে। [illegible] বাড়ীতে নেই, রওনা হয়ে এসেছেন। [illegible] খবর পাওয়া গেল যে, [illegible] দফতর বা ওদিকেই [illegible] তিনি [illegible]। তখনও সবাই অপেক্ষায় [illegible] হয়ত আর কিছুক্ষণের মধ্যেই উনি এসে পৌঁছবেন। কিন্তু শেষ খবর এল যে এ-বছর [illegible] তিনি বিদায় নিয়েছেন। [illegible] সেই সরকারী দফতর [illegible]

সাহিত্যিক হিসেবে [illegible] বিশিষ্টতা ও স্বীকৃতি অর্জন [illegible] ছিলেন মিশিমা। [illegible] ঘুরে গিয়েছিলেন। তাঁর [illegible] যোগ গড়ে উঠেছিল এদেশের সঙ্গে। [illegible] জানা গিয়েছিল [illegible] মন তাঁর বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছিল [illegible] আধুনিক কোনও কোনও চিন্তা ও জীবন-বোধের বিরুদ্ধে। তবে হঠাৎ এভাবে যে একটা পরিণতি ঘনিয়ে আসবে, তা [illegible] কেউই কল্পনা করেনি।

অপ্রত্যাশিত এই খবরটা আসার পর ধুব সঙ্গত কারণেই আলোচনা আর তেমন জমল না। মাঝপথেই তার ছেদ পড়ল।

•

'মাপ করবেন। আপনি কি ভারতবর্ষ থেকে আসছেন?'

পাশ ফিরে দেখি টিকিট কাউন্টারের ধারে একটি তরুণ সহাস্যমুখে তাকিয়ে রয়েছে।

বললাম, 'হ্যাঁ, তাই বটে। আপাতত হাতে কিছুটা সময় থাকায় ভাবছি এই ইম্পিরিয়াল প্যালেস গার্ডেনটা একটু ঘুরে দেখি।'

'আপত্তি না থাকলে আমিও আপনার সঙ্গে ঘুরতে পারি। আর আমিও আজ এই বাগানটা দেখতেই এসেছি।'

আমার পক্ষে ভালই হল। নিতান্ত একা হেঁটে বেড়ানোর চেয়ে একটু কথাও বলা যাবে। তাছাড়া সরকারী সফর-সূচী অনু-যায়ী ধরা-বাঁধা লোকের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার চেয়ে এভাবে বিশেষত যুব-সম্প্র-দায়ের একজন প্রতিনিধির সঙ্গে [illegible] কথা বলার সুযোগ একটু [illegible] বৈ-কি।

সিগেরী ইয়োকামা [illegible] থেকে শ'খানেক কিলোমিটার দূরে একটা ছোট শহরে থাকে। সে [illegible] দিন হওয়ায় বেড়াতে এসেছে [illegible]। ও-বেলাই নিজের জায়গায় ফিরে যাবে। [illegible] পোস্টাফিসে কাজ করেন। বড় একটি [illegible] পাঠাতে চাকরী [illegible] এখানে। যতদূর [illegible] সেকেণ্ডারী বা ইন্টারমিডিয়েট [illegible] তার এই বর্তমান [illegible]। [illegible]

অর্থনীতিতে উচ্চতর পাঠ নেবার অভিলাষ তার রয়েছে।

জিগ্যেস করলাম ভারত সম্পর্কে কতদূর কি তার জানা আছে। ভূগোলের জ্ঞান-অনুযায়ী গোটা-তিনেক শহর-বন্দরের নাম পর্যন্তই দেখলাম তার দৌড়। অবশ্য বেচারারই বা দোষ কি? 'আর কিছু জানা আছে?'

'হ্যাঁ, সে দেশে মেয়েরা কপালে একরকম রঙ লাগায়। দেখুন, ও-দেশ সম্পর্কে জানার ত বেশী সুযোগ হয়নি, তবে জীবনে যদি কখনও কোনওভাবে সম্ভব হয়, দেখবেন নিশ্চয়ই গিয়ে একবার হাজির হব ভারতবর্ষে। খুব আকাঙ্ক্ষা রয়েছে আমার।'

'কি ব্যাপার, মনে হচ্ছে ঠিক হঠাৎ আমায় দেখে নয়, ইচ্ছাটা বেশ যেন দীর্ঘ দিনের।'

'ঠিকই ধরেছেন। সমুদ্রের ধারে আমাদের শহরটার গা ঘেঁষে জাহাজ যাতায়াত করে। পাশেই রয়েছে লোহার কারখানা, প্রায়ই দেখি লৌহ-আকর বোঝাই হয়ে সব জাহাজ আসছে ভারতবর্ষ থেকে। সেই থেকেই আমার মনে সে দেশ দেখার আকাঙ্ক্ষাটা জেগে উঠেছে।'

বাগান ঘুরতে ঘুরতে ছাড়া-ছাড়া নানা ধরণের কথাবার্তা হল। গান সে খুব ভালবাসে। তবে পছন্দটা বলা বাহুল্য, পশ্চিমী ধাঁচের। কার্যকারণে দেশজ ধারা-পরম্পরা থেকে সে দূরে সরে গেছে বটে তবে সে সম্বন্ধে তার মনে কোনও অশ্রদ্ধার ভাবও নেই। শুধু এছেলেটি বলে কেন যুব সম্প্রদায়ের অধিকাংশের আজ এদেশে এই অবস্থা।

বাইরের ধরণ-ধারণ বা মনন-চিন্তায় নবীনের দল প্রাচীন পথ থেকে সরে এলেও জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ভাল গুণগুলো ঠিকই আঁকড়ে রেখেছে—ওরা সৌন্দর্য-প্রিয়, বিনয় জানে, উদ্ধত নয়। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে শিবুয়ার সেই ঘটনাটা।

শিবুয়ার একটা এক্জিবিশন হচ্ছে জেনোজিয়ায় শিবুয়া মহল্লায় একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে। টিউবে গিয়ে ত পেঁছুলাম। যেমনটি ম্যাপে দেখেছিলাম। তেমনি স্টেশনে নেমে সেই স্টোরের বোর্ড ঠিকই নজরে এল। প্রবেশপথে খোঁজ করলাম এক্জিবিসনটা কোন তলায়। দোকানের মেয়েটি হাত নেড়ে বোঝাতে চাইল যে এখানে নয়। না পারে সে আমায় পরিষ্কার কিছু বোঝাতে, না পারি আমি তাকে [illegible] হোটেলের [illegible] দু-চারজন [illegible] জলে [illegible] চেষ্টা করল কেউ কেউ। কিন্তু [illegible] বিভ্রাট। ইংরেজী ভাষা [illegible] কেউই। হঠাৎ বছর [illegible] এল। যোড়াতাড়ি [illegible] বিষয়টা বুঝে নিয়ে ওপাশে সেই মেয়েটিকে কি বলল। পরে নিজের [illegible] থেকে একটা কাগজ ছিঁড়ে [illegible] আঁকল। আমার [illegible] অনুসরণ করার জন্য। বেরিয়ে [illegible] স্টেশনের বাইরে। একটা [illegible] সামনে। হিসেব করে পার হয়ে একটা [illegible] বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। আমায় বলল, এই দোকান-ওয়ালাদের দুটো দোকান আছে এ-অঞ্চলে। এক্জিবিসন এই বাড়ীটাতে হচ্ছে। মনে হল বলি, চল তুমিও দেখবে। এক কাপ কফিও খাওয়া যাবে। কিন্তু কিছু বলার আগেই সে বলল 'আমি তোমার সঙ্গে আরেকটু যেতে পারলে ভাল হত। কিন্তু দুঃখিত, আমার ক্লাশের সময় হয়ে এসেছে। আমায় এক্ষুনি যেতে হবে।' আপাতত মৌখিক ধন্যবাদেই সারতে হল।

কিন্তু পরে মনে মনে ঘটনাটা ভেবেছি অনেকবার। কজন এভাবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পথচারীকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে? খুব বেশী হলে ওদিকেই বাড়ীটা বলে দায় সারে। মোড়ের মাথায় যাতে রাস্তার গোলমাল না হয় সে ভেবে নিজে শুধু মোড় অবধি নয়, গোটা দুই রাস্তা পার হয়ে একেবারে বিশেষ বাড়ীটার সামনে পেঁছে দেওয়া তাও নিজের ক্লাশের দেরী হওয়াটা উপেক্ষা করে—এটা নিঃসন্দেহে একটা দুর্লভ অভিজ্ঞতা, অন্তত আমাদের দেশে ত নিশ্চয়ই। সন্দেহ নেই বহু ভাল গুণও নবীনেরা এদেশে আত্মস্থ করেছে।

সকাল থেকেই মেঘলা হয়ে আছে আকাশটা। গোড়ায় একসময় মনে হয়েছিল যে শীতের ভোরের কুয়াশা। পরে দেখা গেল যে না মেঘই বটে আর থেকে থেকে টিপটিপ গুঁড়ি বৃষ্টিও হচ্ছে। [illegible] দমে গেল। প্রোগ্রাম আজ বেশ একটানা অনেকগুলো। আর দিন বুঝেই এ অবস্থা।

জলকাদা সত্ত্বেও আজ জাতীয় সংগ্রহশালায় মনে হল লোকের খুব ভিড়। পুরনো বিরাটাকার বাড়ীটার পাশেই নতুন কেতার ছোট আরেকটি বাড়ী উঠেছে। জাপানী পরম্পরাগত মূর্তি, মৃৎশিল্প, ক্যালিগ্রাফি ও স্কীন পেন্টিং, নানা মন্দিরাদির মডেল ইত্যাদিতে গ্যালারীর পর গ্যালারী বোঝাই। কিন্তু সেসব ছাড়াও বিশেষ একটা প্রদর্শন চলছিল [illegible] মিউজিয়ামের নিজের সংগ্রহ ছাড়াও [illegible]ভাবে চেয়ে আনা হয়েছে কোরিয়া [illegible] এমন [illegible] থেকে কিছু জিনিস। [illegible] এই [illegible] কারণেই [illegible] গেল ভিড়টা আরও বেশী। সুন্দরভাবে সব সাজানো। [illegible] বা [illegible] ঘটি নেই। আর সারি দিয়ে [illegible] এক হল পেরিয়ে আরেক হলে দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছে দর্শককুল—বাচ্চা বুড়ো সবাই। কিন্তু কোথাও কোনও ধাক্কাধাক্কি বা গণ্ডগোল নেই। এও একটা দর্শনীয় ব্যাপার অন্তত আমার মত অন্য দেশ দেখতেই অভ্যস্ত [illegible] কাছে।

[illegible] কিন্তু সাজানো-গোছানো [illegible] পানীয় স্ন্যাক বা গরম মাংস-ভাত সবই মেলে। আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কত। কেউ জায়গা আটকে অনর্থক বসে নেই, তাই অপেক্ষমানের ভিড়ও নেই এদিক-ওদিক জুড়ে। ভেতরে লোক যথেষ্ট, তবুও যেন কাঁচের ওপাশে বাইরের গাছ-পালা মাঠের সঙ্গে মিলিয়ে মনে হচ্ছিল জায়গাটা বেশ নিরালা।

সঙ্গের জাপানী ভদ্রলোকটিকেও যেন একটু কাছে পাওয়া গেল। কথা শুরু হয়েছিল ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে যে এমন দুর্যোগে তাঁকে বেরুতে হল। তারপর অজ্ঞাতে কখন নানা আলোচনা শুরু হয়ে গেছে খেয়াল নেই। যুদ্ধোত্তর জাপানের পুনর্বাসন প্রসঙ্গে উনি জানালেন যে কেবল শিল্পে নয়, কৃষিতেও জাপান আজ পর-নির্ভরতা কাটিয়ে ওঠার জন্য বদ্ধপরিকর। উন্নত প্রথায় চাষ ও কৃষিদ্রব্য বিজ্ঞানসম্মতভাবে গুদামজাত করার কারণে আজ বিদেশেও চাল রপ্তানি হচ্ছে এদেশ থেকে। ক্ষোভ প্রকাশ করলেন, তবুও সব আর হচ্ছে কোথায়? এরোপ্লেন তৈরী বা আণবিক শক্তির ব্যাপারে এখনও সেভাবে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হচ্ছে না এদেশের। হঠাৎ হয়ত তাঁর ভদ্রতাবোধ জেগে উঠল, খেয়াল হল তাঁরও কিছু বলা প্রয়োজন আমাদের সব প্রচেষ্টা সম্পর্কে। তাই প্রশংসাসূচকভাবে বললেন, বয়ন-শিল্পে ভারতও কত এগিয়ে যাচ্ছে, স্থান করে নিয়েছে বিশ্ব প্রতিযোগিতায়। কথাবার্তায় ভদ্রলোক খুব অমায়িক। তবে বিষয় নির্বাচন দেখে মনে হল অর্থনীতির স্নাতক এবং পররাষ্ট্র দপ্তরে কর্মরত মিঃ কায়ুসার অধিকাংশ পঠন বা চিন্তা অর্থনৈতিক নানা সমস্যা ও বিষয়কে ঘিরেই।

•

শহর টোকিও আপাতদৃষ্টিতে ইটকাঠ কংক্রীটের ঠাস-বুনানিতে বোঝাই মনে হলেও

[illegible] সন্ধ্যার গির্জা

ইতস্ততঃ ছড়ানো বড় বড় বাগান বা পার্কও এদিক-ওদিক বহু রয়েছে। তেমনি এক বিরাট পার্কের চৌহদ্দীতে এই মিউজিয়ম। কাছেই শিল্প-বিদ্যায়তন। সেখানেও নতুন বাড়ী উঠেছে। তবুও বড় বড় মাথা উঁচু করা গাছ আর পুরানো কিছু কিছু কাঠের বাড়ী আশেপাশে থাকায় সমস্ত এলাকাটাতেই এখনও যেন একটা প্রাচ্য-দেশীয় বিশেষ পরিবেশ খুঁজে পাওয়া যায়।

হয়ত বা একটু দেরীতে যাওয়ার দরুণ কিংবা সজল বাদল দিন বলেই বিদ্যায়তন ফাঁকা দেখা গেল। মাস্টারমশাইদের সংগে বিশেষ দেখা হল না। ছাত্র-ছাত্রী কজনও দিনের মতো সব গুছিয়ে রওয়ানা হবার মুখে।...এরই মধ্যে একটি ছাত্রী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তার কাজ-কর্ম দেখাতে ও আলাপ-চারীতে রত হল। ছোট স্কেচ ও বড় ক্যানভাস সবই দেখাল। জানা গেল এখানে শিক্ষাক্রমে সব ধরণের কাজ শেখারই সুযোগ মেলে। এর ঝোঁকটা 'আধুনিকের' প্রতি। আপাতত শিক্ষা-পর্ব এর সমাপ্তির মুখে। ভবিষ্যৎ ভাবনায় খুব বিচলিত বলে কিন্তু মনে হল না। সুবিধামতো কোনও স্কলারশিপ বা পার্ট টাইম কিছু কাজ করে ঘোরাঘুরি ও সম্ভব হলে ভারতবর্ষে যাওয়া বা কয়েক মাস কাটানোর ইচ্ছাও প্রকাশ করল মেয়েটি। বেশ ভাল লাগল এর সপ্রতিভ ভাবটা।

* * *

হঠাৎ জেড়ে নামল বৃষ্টিটা। গাছতলায় কুলোল না, দৌড়ে গিয়ে ওদিকে দোকানটায় উঠতে হল। বড় নয়, নেহাৎই কাগজ, খাতা রং, পেন্সিল আর বিস্কুট লজেন্সের কারবার। তবুও দেখে মনে হয় কত কিছুতে বোঝাই। সব মোড়কেরই বা কত বাহার! দস্তা প্যাকিংও যে একটা আর্ট, সেটা যেন এদেশের সব দোকান-পাট দেখার আগে এখনও মনেই হয়নি।

চমক ভাঙাল মিঃ কামুদার ডাকে। 'দুঃখিত ট্যাকসি পাওয়া গেল না। দু কদম হেঁটে মোড় অবধি যেতে হবে।' তা মন্দ নয়, বৃষ্টির বেগটাও ততক্ষণে ধরে এসেছে।

আধো-আলো আধো-ছায়া পথটা পেরিয়ে আসতেই আবার আলোর মালা আর রোশনাই। মাঝে মাঝে রাস্তায় জমা জলে ছায়া পড়ে সে চকমকি যেন আরও বেড়েছে। তবুও ত এ নাকি শহরের অভিজাত অঞ্চল নয়, একরকম উপকণ্ঠ—চলতি ভাষায় ডাউন-টাউন।

* * *

প্রথাসিদ্ধ জাপানী আতিথ্যের সুযোগ মিলে গেল। নৈশ-আহারের আমন্ত্রণ ছিল জাপ-পররাষ্ট্র দফতরের ডিরেক্টর জেনারেলের তরফে। তিনি ও তাঁর দফতরের দুয়েকজন থাকলেও, মুখ্যত মিউজিয়ম গ্যালারী ও শিল্প-জগতের কজনকে নিয়েই ছিল এই ডিনার-প্রোগ্রামটা। ব্যবস্থা করা হয়েছিল একটা সাবেকী ধরণের জাপানী রেস্তোরায়। নদীর ধার ঘেঁষে এই পুরানো চেহারার বাড়ীটার ভেতর ঢুকলেই যেন অন্য জগতে চলে যাওয়া যায়। দোর গোড়ায় জুতো খুলে রবারের চটি পায়ে গলিয়ে নিতে হয়। ভেতরে মাদুর-পাতা মেঝে। এপাশে ওপাশে কাঠ বাঁশের দেওয়াল ও ছবি আঁকা স্ক্রীণ। দোতালায় গিয়ে বসা হল। ওপর থেকে নদীটাও ভাল দেখা যায়। কিন্তু এমুখো হয়ে বসতে হল। কারণ, এদিকে ছিল নাচ-গানের আয়োজন। প্রাচীন ঢঙে বিন্যস্ত কেশপাশ ও কিমোনো-জড়ানো কজন গাইয়েৎসা গার্ল, কেউ গান কেউ গীতিনাট্যের টুকরো আবৃত্তি, নাচ, কেউবা প্রাচীন বাদ্য-যন্ত্র বাজিয়ে একটা না একটা কিছু শোনালো বা দেখালো। এক ফাঁকে শুরু হল আহার্য ও পানীয় পরিবেশন। এই মেয়েরা শুধু নৃত্য-গীত বিদ্যা নয়, দেখা গেল, গাল-গল্পেও পটিয়সী। প্রয়োজনে দু-চার কথা ইংরেজীতে, এমনকি ফরাসী ভাষায়ও প্রকাশ করে বোঝাল। দেখাল দেশলাইয়ের বাক্সের ম্যাজিক। গল্পই শোনা ছিল এতকাল, এবারে সামনাসামনি প্রত্যক্ষ হল স-গাইয়েৎসা জাপানী আতিথেয়তা।

চারুভাষিণী এই নিপুণিকা চতুরিকার দল তথা পরম্পরাগত আহার্য-পানীয় পরিবেশনের দ্বারা স্বতই একটা বিশেষ আবহাওয়া আনার চেষ্টায় ছিল। তবুও রেস্তোরা ছেড়ে বেরুতে না বেরুতেই মনের ওপর থেকে সে-ছাপটা কেমন চট্ করে যেন মিলিয়ে গেল।

উদ্ধত স্কাই-স্ক্রেপারের গা-ঘেঁষে নদী-টাকে দেখাল কেমন যেন নেহাৎই একটা নালা। ঘন্টা-দুয়েকের জন্য গড়ে-ওঠা পরিবেশটা মনে হল নিতান্তই একটা অপসৃয়মান অতীতের ছায়া। আজকের দিনের সঙ্গে তার যোগটা যেন কিরকম ক্ষীণ পারম্পর্য-হীন ব্যাপার। কারণ, ছোট রেস্তোরা-বাড়ীটার চেয়ে পাশের বিরাট অট্টালিকা আর কিমোনোর চেয়ে মিনি-স্কার্ট-ই আজ বোধহয় অধিকতর সত্য।

কাঁটা ॥

হরপ্রসাদ মিত্র

প্রতিদিন যে-জুতোয় পা গলিয়ে চলার অভ্যেস
তাতে কাঁটা ওঠে, কাঁটা ফোটে;
এবং সিঁপড়ির মোড়ে, ঝি-টি রোডে হাঁটতে হাঁটতে
সফেন সমুদ্র মনে পড়ে।
জানলার পাল্লায় লেগে ও-বাড়ির মালতীলতাটা
ঘুমের মধ্যে ঘরে ঢোকে।

কখন প্রথম ফুল ফুটেছিল নজরে পড়েনি,
শুক্নো হঠাৎ দেখলুম।
সে যে কী যন্ত্রণা তা যে কাকে বলি কাকে বলি আজ?
কেউ তো তেমন কাছে নেই।
কুকুর মানুষ পাখি তরুলতা সকলেই মরে,
শিশুর মুখের গন্ধে তবু
মধু লালা কৌতূহল আরো কী কী উপাদান মিশে
অবাক জীবন বেঁচে থাকে।

জননী-জঠরে আছি বার বার বোধের বদলে
নতুন জন্মের ঘটনারা
আমাকে কোথায় যেন নিয়ে যায়, বুঝি অন্তত
যখনি জুতোয় ফোটে কাঁটা।

হাড়ের খেলা ॥

অমিত বসু

বাজিকর তোমার হাড়ের খেলা দেখলাম
পঁয়ষট্টি বছর ধ'রে,
তুমি সেই বিনুনীতে ফুল
কিশোরীর কল্পনায় আঁকা
রঙিন ছবির প্রদর্শনী
সলাজ বধূর সেই আলতাপরা পা
শীত গ্রীষ্ম বর্ষায় শরতে
ছড়ায় ছবিতে সঙ্গীতে
অপরাহ্নে ফিরে এলে সুখ
অথবা প্রতীক্ষা
দরজায় পরিচিত পদশব্দ খুঁজে
কতবে অপ্রাসঙ্গিক পরিহাস বিলিয়ে হঠাৎ
পঁয়তাল্লিশ মিনিটে তুমি
মুছে দিলে একটি নগরী
তার সকালের সারগম
হেঁসেলের ভাঁড়ারের চাবি
গয়নার বাক্সে রাখা স্মৃতির সিঁদুর কৌটো, সব
কাঁথায় কাঁথায় বোনা শ্রাবণের দুপুরের সুখ
পাকাটি হাড়ের খেলা পঁয়ষট্টি বছর ধরে
বাজিকর তুমিই দেখালে।

আশ্চর্য : নিজের ভিতরে ॥

অনীতা গুপ্ত

প্রতিদিন প্রতীক্ষা করি,
পরম আশ্চর্য এসে কড়া নেড়ে
জানাবে আমাকে......

গভীর রহস্যে ঘেরা
টুপিপরা চিঠির বাক্সে,
থাকে না প্রতীক্ষা করে,
অজানা অচেনা কোন লিপি।

টেলিফোন তুলে নিয়ে প্রত্যাশায় থাকি,
আসবে বুঝি দুরভাষ......

অকস্মাৎ একদিন
ছুবো সব অনুভূতিগুলি
টুক্‌টুক্ কড়া নাড়ে বুকের দরোজায়।
টেলিফোন বেজে ওঠে মনে
'হ্যালো আমি বলছি, হাঁ, আমি বেঁচে আছি।'

রাতের গভীরে,
নিজেই হাতড়ে পাই নিজের ভিতরে
একটি আশ্চর্য চিঠি।

[উপন্যাস]

ফুল ফোটার আগে

শৈলেন রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হঠাৎ ইচ্ছে হল করবীর একটা হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে নিয়ে বলি, 'কেন ইচ্ছে করে না করবী, কীসের দুঃখ তোমার।'

করবী যেন আমার কথার উত্তর দিল, 'অথচ আমার কোন দুঃখ নেই, থাকার কথাও না। জানেন, গত মাসে ও এক লাখ টাকার ইন্সিওরেন্স করিয়েছে, আর আমাকে নমিনি করেছে। আমার নামে মোটা টাকা ব্যাঙ্কে জমা রয়েছে। আমাদের বাড়িতে তিনজন চাকর, দুজন ঝি, একজন মালী, একজন ড্রাইভার, দুটো গাড়ি--একটা আমার একটা ওর। এই সব মানুষ দুঃখী হয় কখনও।'

করবী বড় বড় চোখ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। উত্তর দিলাম না। বাইরের হাওয়া ভেতরে আসছিল। ঠাণ্ডা ভেজা-ভেজা হাওয়া। কাছেপিঠে কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে নিশ্চয়। সেই হাওয়া এসে আমাদের শরীরকে স্পর্শ করছে। মনে হল এখন যদি আকাশ ছাপিয়ে ঝম ঝম করে বৃষ্টি নামে, বেশ হয়। আরও বেশ হয়, যদি বুক সমান জল দাঁড়িয়ে যায় রাস্তায়, গাড়ির চাকা ডুবে যাক, একটু একটু করে জল বাড়তে থাকুক, আমরা ক্রমশ ডুবে যেতে থাকি। করবী সাঁতার জানে কিনা জানি না। আমি জানি। করবী দুই হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরবে, করবীর নরম বুকের স্পর্শ আমার শরীরে ছড়িয়ে পড়বে, আমি প্রাণপণ শক্তিতে করবীকে শক্ত মাটির দিকে নিয়ে যাব।

সাধারণত আমি সিগারেট খাই না। আজ একটা প্যাকেট কিনেছিলাম। প্যাকেটটা পকেটেই ছিল। শব্দ করে হঠাৎ দেশলাই জ্বেলে একটা সিগারেট ধরালাম।

আমার মুখের ওপর আলো; করবী অন্ধকারের মধ্যে ডুবে গেল।

করবীর কথা শুনতে পেলাম, 'দেশলাইয়ের আলোতে হঠাৎ আপনাকে কী রকম দেখাল!'

দেশলাইয়ের আগুন ততক্ষণে নিভে গেছে। বললাম, 'কী রকম?'

'কী জানি, অন্য রকম। সেই আপনাকে আমি কোনদিন দেখিনি।'

'এক এক সময় মানুষ অন্যরকম হয়ে যায়। তখন অপরে কেন নিজে সে নিজেকেই চিনতে পারে না।'

'আপনি তো বেশ দার্শনিকের মত কথা বলতে পারেন।'

'প্রত্যেক মানুষই ভেতরে ভেতরে এক-একজন দার্শনিক।'

গড়েরমাঠের পাশ দিয়ে গাড়ি যাচ্ছিল। ঠাণ্ডা হাওয়াটা আরও বেশী করে গাড়ির মধ্যে ঢুকছে। করবী মাঠের দিকে বসেছিল। ওকে ডিঙিয়ে আমার দৃষ্টি মাঠের ওপর দিয়ে চলে গিয়েছে। অন্ধকার মাঠ। দূরে কতকগুলো আলো জ্বলছে। ইচ্ছে হল করবীকে নিয়ে মাঠের মধ্যে নেমে পড়ি। অন্ধকারের মধ্যে ডুবে যাই। দুজনে হাঁটতে থাকি। হাঁটতে হাঁটতে গঙ্গার ধারে চলে আসি। বাঁদিকে ফোর্ট উইলিয়মের উঁচু জমি। সেই জমির ওপর একদিন আমি একজনের জন্য অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করেছিলাম। ইচ্ছে হল করবীকে সেই জায়গায় নিয়ে যাই। সেখানে গিয়ে বলি, জানো করবী, সুপ্রিয়া জোর করে একদিন আমাকে দিয়ে একটা প্রতিবাদপত্র ছিঁড়িয়ে ফেলেছিল। পাটনায় যাওয়ার ব্যাপার নিয়ে সামান্য একটা প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে দিল না ও। এমন নিষ্ঠুর মানুষ দেখেছো কোনদিন!

করবীর কথা কানে আসছিল, 'বিয়ে করে ফেলুন, মানুষ একা একা চিরদিন থাকতে পারে না।' হেসে উঠতে গিয়েও চুপ করে গেলাম। ওর কথার মধ্যে কী যেন ছিল, নাকি বাইরের অন্ধকার, দূরের টিমটিমে আলো, শিরশিরে বাতাস, আমাকে মৌন করে রাখল। 'এখন বয়সের জোর আছে, এখন কিছু মনে হবে না। আরও যখন বয়স বাড়বে, তখন ভীষণ একলা লাগবে।'

হঠাৎ বলে ফেললাম, 'তখন তোমার কাছে যাব।'

করবী যেন ভয় পেয়ে দূরে সরে গেল, 'আমার কাছে? আমার কাছে কেন? আমার তো দেবার মত কিছু নেই। কী আমি দিতে পারি?' ওর গলা কাঁপছিল। ও যে দারুণ ভয় পেয়েছে, বুঝলাম।

ওর একটা হাত সীটের ওপর ছড়ানো ছিল। সেই হাতের ওপর চাপ দিতে দিতে হেসে ফেললাম, 'তোমার কোন ভয় নেই, তোমাকে বিরক্ত করবো না তখন। তাছাড়া বিয়ে প্রায় ঠিকই হয়ে আছে আমার। সুষমা ভাল মেয়ে। তুমি তো বলেছো, নিতুদার বোনেরা খুব ভাল হয়।' শব্দ করে হেসে উঠলাম। করবী হাসল না। বাইরের দিকে একটু ঘুরে বসল। ওর মুখ দেখা যাচ্ছে না। আমার চোখের খুব নিকটে ছায়া-ছায়া একটা মূর্তি, যাকে আমি কোনদিন দেখেছি বলে মনে হল না। করবী বলেছিল, দেশলাইয়ের আলোতে আমাকে ও চিনতে পারেনি। অন্ধকারে তলিয়ে—যাওয়া করবীও নিমেষের জন্য আমার কাছ থেকে হারিয়ে গেল।

রেড লাইটের সামনে এসে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল। দশটা বাজে। চারিদিকে আলো, লোকজন, গাড়ি, কাতারে কাতারে মানুষ কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে, এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। এসপ্ল্যানেডের বিশেষ এই জায়গাটা চিরদিনই আমার মনে কুহেলীর সৃষ্টি করে। চারদিকে চারটে রাস্তা, মাঝে ট্রামলাইন, অনবরত গাড়ি চলছে, অগণিত মানুষ, বিরাট ডবল-ডেকার শব্দ করতে করতে এগিয়ে আসছে—মনে হয়, যে-কোন মুহূর্তে বিরাট দৈত্যটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানুষগুলোকে দলে পিষে পিণ্ড করে ফেলবে। কিন্তু মানুষ কী নিশ্চিন্তভাবে সুযোগ সুবিধা বুঝে নিয়ে যন্ত্রদানবের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়ে নিজের পথ খুঁজে নিচ্ছে।

সুপ্রিয়ার সঙ্গে বহুদিন এই জায়গা পায়ে হেঁটে পার হয়েছি। অদ্ভুত ধরনের মেয়ে সুপ্রিয়া। এই গড্ডলিকার মধ্যে ভেসে বেড়াতে ওর নাকি ভাল লাগে। বলে, কেউ কাউকে চিনছে না, অথচ পাশাপাশি চলেছি। সবাই ছুটছে কিন্তু একদিকে নয়। কেউ পুবে, কেউ বা পশ্চিমে, কেউ উত্তরে

কেউ বা দক্ষিণে। অথচ সবারই কিছু না কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে। কী থ্রিলিং, তাই না। ওর কথা শুনে মাঝে মাঝে অবাক লাগে। ও যে অফিস সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে চিন্তা করে, ভাবতেও বিস্মিত হই।

গাড়ি আবার চলতে শুরু করেছে। চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ ঝিমিয়ে পড়ছে ক্রমশ। বাধা কম, তাই দ্রুতগতিতে গাড়ি এগিয়ে চলেছে। এখানে আর ভেজা হাওয়া গায়ে লাগছে না। আজ আর বৃষ্টি হল না।

'বাড়িতে কে কে আছে তোমার?' করবী তখনও বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল, ইচ্ছে হল, ও আমার দিকে ফিরে বসুক, কথা বলুক।

করবী ফিরলও না, কথাও বলল না। হঠাৎ দারুণ জোরে ব্রেক কষল ড্রাইভার। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত-পা ছুঁড়ে চীৎকার করছে একটা লোক। ড্রাইভারকে প্রশ্ন করলাম, 'লোকটা কি পাগল?'

শিখ ড্রাইভারটি নির্ঘাৎ নতুন আমদানী। ওর নিজস্ব ভাষায় যা বলল তার অর্থ উদ্ধার হল না। করবী হঠাৎ বলে উঠল, 'সত্যি সত্যি বুঝতে পারছেন না?'

করবীর কথায় বিষম বিভ্রান্ত বোধ করলাম, 'সত্যি মিথ্যে কোনটাই বুঝতে পারছি না। লোকটা কী, ওভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন?'

'ও মাতাল।'

'তাই বলো।' এমনভাবে বললাম যেন মস্ত বড় একটা সমস্যার হঠাৎ সমাধান হয়ে গেল।

'আপনি কোনদিন মাতাল দেখেন নি?' করবী পুরোপুরিভাবে এবার আমার দিকে ঘুরে বসল।

'দেখবো না কেন? হরদম দেখছি। আমাদের বাড়ির রাস্তায় ঢোকার মুখে একটা ছোট্ট বস্তি আছে। বস্তিতে কয়েক ঘর ধাঙড় থাকে, ওরা মাসের মাইনে পেলে খুব মদ খায়, হৈ-হল্লা করে। ওদের মধ্যে একজন আছে যার মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, ও রাস্তায় দাঁড়িয়ে গাড়ি আটকায়, আর পয়সা চায়। আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। অথচ একটুও বুঝতে পারিনি।'

'আপনি কোনদিন মদ খাননি?'

করবীর প্রশ্নটা খুব অতর্কিত। হঠাৎ বলে ফেললাম, 'কেন খাবো?'

'কেন খাবেন জানি না, মানুষ কেন খায়, তাও জানি না। আপনি কোনদিন মদ খেয়েছেন কিনা জিজ্ঞেস করছি।'

'না।'

'খেতে ইচ্ছে করে না?'

'ইচ্ছে করলে খেতাম। একদিন ইচ্ছে করেছিল বলে শুয়োরের মাংস খেয়েছিলাম। ভাল লাগল না।'

'আপনি কোনদিন হাই—সোসাইটিতে মিশতে পারবেন না।'

'তা পারবো না।'

'হাসি মুখে কথাটা মেনে নিলেন?'

'কি করবো, তোমরা হাই সোসাইটির মানুষ; তুমি যখন বললে আমি সেই সোসাইটির অযোগ্য, মেনে নেওয়া ছাড়া কি উপায়।'

'আর একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করবো। আপনি কী চাকরি করেন, কী চাকরি বলতে কী পজিশনে আছেন এখন? কোম্পানী গাড়িটাড়ি যে দেয় না, সে তো বুঝতেই পারছি।'

'যদিও প্রশ্নটা খুবই ব্যক্তিগত, তবুও তোমাকে বলবো, তোমাকে সব কথাই বলবো করবী। আমি খুব মুস্কিলে পড়েছি। যা মাইনে পেতাম আমাদের সংসার ভালভাবেই চলতো। মা সংসারের কাজকর্ম করে, একজন ঠিকে ঝি আছে। কিন্তু হঠাৎ ওরা আমাকে পাটনায় বদলি করে বসল। ওরাই বা বলছি কেন, আমাদের লোকাল ডিরেক্টর একজনের হাতের পুতুল। আড়ালে থেকে সে-ই সব কিছু করাল।'

করবী শান্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বলল, 'আড়ালে থাকাটি মানব না মানবী?'

'তুমি ঠাট্টা করছো, কিন্তু আমার যে কী ভয়ানক মুস্কিল। ও সুপ্রিয়া, সুপ্রিয়া মিত্র, বড়কর্তার পি-এ।'

করবী বলল, 'সুপ্রিয়াকে বুঝিয়ে বললেই পারেন।'

'অনেকবার বলেছি, শোনে না। ও আমাকে সরিয়ে দিতে চায়। আমি থাকলে ওর চোখে লজ্জা লাগে কিনা।'

'কেন?'

'আগে আগে আমরা এক সঙ্গে বাস-স্টপ পর্যন্ত হেঁটে আসতাম। একটা বন্ধুত্বমতো হয়ে উঠেছিল, তাই।'

'তাই কি?'

'তাই ওপুরুষের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে মিশতে ওর সঙ্কোচ হয়।'

'এ কথা কে বলেছে, সুপ্রিয়া?'

'না, মজুমদার, আমার কলিগ।'

'মজুমদার জানে না। পাটনায় গেলে আপনার উন্নতি হবে।'

'জানি না, তবে অফিসের অনেকেই এই ট্রান্সফার নিয়ে চেঁচামেচি করছে। ওয়াল-পোস্টারও পড়েছে। ওরা এটাকে পক্ষ-পাতিত্ব বলে ধরে নিয়েছে। অথচ—'

'আপনি নিতান্তই ছেলেমানুষ।' বলে কী রকম ঘাড় বাঁকিয়ে করবী আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তখন উল্টো দিক থেকে একটা গাড়ি হেডলাইট জেলে আসছিল। সেই আলো এসে আমাদের গাড়ির মধ্যে পড়েছে। নিমেষের জন্য করবীকে দেখে নিয়ে চোখ সরিয়ে নিলাম। করবী আবার বলল, 'শুধু ছেলেমানুষ না। আজকালকার অনেক ছেলেমানুষই আপনার চেয়ে বুদ্ধি-মান। কী বলবো আপনাকে, সত্যি করে বলতে গেলে বলতে হয়—'

হঠাৎ বিষম রাগ ধরে গেল, 'তোমার যা ইচ্ছে তাই বলছো। আমি বোকা না। বোকা হলে কোম্পানী কাউকে গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দেয় না, বড়সাহেব খাতির করে কথা বলে না।'

'তাই তো আপনি ভীষণ বোকা।' বলে করবী দমকা হাসিতে ভেঙে পড়ল।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। গাড়ী চলতে লাগল। করবী হঠাৎ কথা বলে উঠল, 'পুরুষ মানুষ গাল ভারী করে বসে থাকলে মেয়ে-মেয়ে মনে হয়।'

তীব্র বিদ্রূপ করে বললাম, 'পুরুষ মানুষ সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতা তো খুব—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে করবী বলল, 'খুব ঠিকঠাক।'

'কজন পুরুষ দেখেছো জীবনে?'

'দেখেছি অনেক। কিন্তু ভাল করে দেখেছি দুজনকে। তার মধ্যে একজন আমার খুব কাছে বসে আছে।'

'আর একজন?'

'শ তিনেক মাইল দূরে।'

'তোমার স্বামী?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার স্বামী বুঝি সত্যিকারের পুরুষ মানুষ?'

করবী হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠল। হাসি চাপতে চাপতে বলল, 'আপনি যেভাবে তাকিয়ে আছেন, ঠিক হিন্দি ছবির ভিলেনের মত দেখাচ্ছে।'

এর পর আর কথা বলা চলে না। একবার মনে হল, করবীর কথার প্রতিবাদ জানিয়ে বলি, আমাকে ভাল করে দেখার সুযোগ তুমি পাও নি; সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, কি হবে ওর সঙ্গে তর্ক করে। হয়ত অপমানজনক কোন কথা বলে বসবে। মেয়েদের সম্বন্ধে আমার ধারণা ক্রমশই নীচের দিকে নামতে শুরু করেছে। সুপ্রিয়াকে বন্ধু বলে মনে করতাম। হঠাৎ আততায়ীর ছুরি এসে আমার বুকে বিঁধল। আমাদের ছোট্ট সংসারটা তছনছ হয়ে গেল। আমি তো জানি, বাবা কত কষ্ট করে বাড়ীটা তৈরী করেছিলেন। মা বুকের প্রতিটি পাঁজর দিয়ে সেই বাড়ী রক্ষা করে আসছিল, গভীর অনিচ্ছায় মাকে সেই বাড়ী ছাড়তে হবে। বাড়ীর চারপাশে আগাছা জন্মাবে। দেখতে দেখতে বাড়ীটা পোড়ো-বাড়ী হয়ে উঠবে। এই সবের মূলে যে রয়েছে সে একজন মেয়ে। আর একজন মেয়েও আমাকে অকারণে আঘাত করে বসল। এই যে এতটা পথ ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এলাম, একটুও কৃতজ্ঞতা জানাল না, বরং আমার পৌরুষকে উপহাস করল করবী।

'বইয়ে পড়েছি, মেয়েদের নাকি রাগলে সুন্দর দেখায়, কিন্তু কোথাও দেখি নি যে পুরুষদের সে রকম কিছু দেখায়।'

'আমি সুন্দর দেখাবার জন্যে রাগি নি।'

'আপনি কিন্তু আগে এত রাগতেন না।'

'আমাকে তুমি আগে খুব বেশী দিন দেখ নি।'

'যে কদিনই দেখেছি, কাছ থেকেই দেখেছি।' বলে করবী জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে নিল।

আবার ঠাণ্ডা হাওয়া গাড়ীতে ঢুকছে। নিশ্চয় খুব কাছে কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে।

মুখ বার করে দেখলাম, আকাশ মেঘে ছেয়ে রয়েছে। এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি, এখন দেখলাম. মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। হয়ত খুব শিগগীর বৃষ্টি নামবে। ড্রাইভারকে বললাম, 'জলদি চালিয়ে।'

করবী আমাকে ধমক দিল, 'তাড়াতাড়ি যেতে গিয়ে অ্যাকসিডেন্ট করুক আর কি।'

বললাম, 'আমার তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার। মা একা রয়েছে।'

'মাকে একা না রেখে দোকার ব্যবস্থা করলেই তো হয়।'

চুপ করে রইলাম। করবী বলল, 'এবার ডাইনে।' গাড়ি ডাইনে ঘুরল।

করবীকে একটু আঘাত করার ইচ্ছে হল। বললাম, 'দোকার ব্যবস্থা করলেই যে মাকে একা থাকতে হবে না, তার কী মানে আছে। যিনি আসবেন, তিনি হয়তো মডার্ণ হবেন, এবং সেটা হওয়াই স্বাভাবিক; তিনি যে সন্ধ্যা রাত্তির থেকে মাকে আগলে রাখবেন তার স্থিরতা কি।'

'আপনার আউটলুক খুব সেকেলে।'

বললাম, 'আমি পুরনো পন্থায় বিশ্বাস করি।'

'সে নিজের বউয়ের বেলায়। সে সতী-লক্ষ্মী সেজে বসে থাকুক. আর নিজেরা মডার্ন সেজে বাইরে ফুর্তি করে বেড়ান। মুখে বলবেন, আমরা আধুনিক, কিন্তু বিয়ের সময় কপ-মার দোহাই দিয়ে পণ নিতে আপনাদের বাধে না। নিজেদের কাজ হাসিল করার জন্য সাজিয়ে-গুছিয়ে বউকে পার্টিতে নিয়ে যান। নিজেরা হাতে করে মদের গ্লাস তার মুখে তুলে ধরেন. অপর পুরুষের সঙ্গে জড়াজড়ি করে নাচতে শেখান, তারপর—' করবী হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল, ওর গলা কাঁপতে শুরু করল।

'তুমি সংযম হারিয়ে ফেলছো করবী।'

করবী হয়ত আমার কথা শুনতেই পেল না। ও বলেই চলল, 'তারপর যখন দেখলেন তাকে দিয়ে আর কাজ হচ্ছে না, তখন একটা পুরনো গাড়ির মত দূরে ঠেলে দেন। এই তো আপনারা, আপনাদের চিনতে আর বাকি নেই।' অন্ধকারের মধ্যেও করবীর চোখ যেন জ্বলতে লাগল।

এতক্ষণ একটা চাপা রাগ আমার অন্তর ছেয়ে ফেলেছিল। সহসা সেই রাগটা যেন গলে গেল। খুব শান্ত গলায় ডাকলাম, 'করবী।'

করবী উত্তর দিল না। একটা হাত করবীর হাঁটুর ওপর রেখে বললাম, 'এক সময় তুমি আমাকে তুমি বলতে করবী।' মনে হল করবী যেন কেঁপে উঠল, নাকি আমার ভুল; গর্তে পড়ে গাড়িটাও লাফিয়ে উঠেছিল সেই সময়। 'তুমি যে বলেছিলে, তুমি কী ভীষণ রকমের ভাল অংশুদা, দুল-কথা আমি ভুলিনি করবী। কোনদিন ভুলবো না।'

হঠাৎ করবী বলে উঠল, 'সর্দারজী রোখিয়ে। জী অংশুবাবু। আবার দেখা হবে।'

একটা বাড়ির সামনে গাড়ি থেমে গেল। দরজা খুলে নেমে পড়ল করবী। কয়েক পা গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। আবার গাড়ির কাছে ফিরে এল। মুখ ভেতরে নিয়ে এসে নীচু গলায় বলল, 'তুমি বোকা না, তুমি ভীষণ ছেলেমানুষ। আজীবন এরকম ছেলেমানুষ থেকো।' বলে গেট খুলে দ্রুত-পায়ে ভেতরে ঢুকে গল করবী।

— ছয় —

কোন কোন ক্লান্ত অবসর মুহূর্তে জীবনের পিছনের কোন অংশের দিকে ফিরে তাকাতে ইচ্ছে যায়। যদিও এই তাকানোর মধ্যে কোন সার্থকতা নেই, কোন আশা কিম্বা আনন্দ নেই, বরং সময় সময় গভীর বেদনা, হতাশা, ক্ষোভ আর দুঃখ অন্তর ভরিয়ে তোলে, তবু পিছনে তাকাবার তো বিরাম নেই। আমি নৈরাশ্যবাদী মানুষ না। বিকলাঙ্গ অতীত নিয়ে নাড়া-চাড়া করতে আমার ভাল লাগে না। কিন্তু এক এক সময় কী দারুণ অসহায় মনে হয় নিজেকে। মনে হয়, আমার হাত, পা, মাথা, মুখ, নাক, চোখ কিছুই আমার ইচ্ছাধীন না। এমনকি আমার সমস্ত সত্ত্বাটাই যেন অপর কোন শক্তির ক্রীতদাস, এবং সেই অদৃশ্য শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসার সহজ পথটা আমি হারিয়ে ফেলেছি। এ যে কী ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা, তা আমি কেমন করে বোঝাব!

এখন রাত্রি শেষ প্রহরে এসে ঠেকেছে। অথচ আমি ঘুমোতে পারছি না। পাশাপাশি দুটো খাট। একটাতে হাত-পা ছড়িয়ে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে আমি শুয়ে আছি। পাশের খাটে আমার মা। মা ঘুমোচ্ছে। মা ঘুমোলে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ভারী হয়ে ওঠে।

করবীর কথা আমি চিন্তা করতে চাইছিলাম না। অথচ করবীকে মনে পড়ে গেল। মনে পড়ল, এই কিছুক্ষণ আগেই আমি করবীর হাঁটুতে হাত রেখেছিলাম, করবী যাবার সময় বলে গেল, আমি বোকা না, ভীষণ ছেলেমানুষ।...খুবই সাধারণ ঘটনা। অথচ সেই ঘটনার সূত্র ধরে অনেক কথাই মনে পড়তে লাগল। মনে পড়ল, একদিন নিস্তব্ধ এক জগতের মাঝে আমরা দুইজন উন্মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমি করবীর ঠোঁটে চুমু খেয়ে-ছিলাম। করবী ওর শরীর আমার গায়ের ওপর ছেড়ে দিয়েছিল। করবীর গায়ের সেই মৃদু গন্ধ যেন বহু যোজন পথ অতিক্রম করে আমার নাকে আসতে লাগল। আমি স্থিরত্ব ঘ্রাণ করছি। অতীতের শৃঙ্খল ছিঁড়ে আমি বর্তমানের মধ্যে আসতে চাইছি।

সামনের রাস্তা দিয়ে বড় বড় শব্দে একটা গাড়ি যাচ্ছে। ওর এই মন্থর গতি আমার অজানা না। আমি জানি আবর্জনার স্তূপ সরিয়ে দিয়ে ও পরিচ্ছন্ন একটি সকালকে বয়ে নিয়ে আসছে।

করবী ওর স্বামীর কথা বলল না। ইচ্ছে করলে বলতে পারত। আমি কখনো পেতাম না, যা কোন হিংসা বা বিদ্বেষের জ্বালা আমার মনে বাসা বাঁধতে পারত না। একদিন করবীকে আমার ভাল লেগেছিল বা প্রথম যৌবনের উন্মাদনায় ওকে কাছে পেতে চেয়েছিলাম, তার মানে এই না যে করবীকে আমি ভালবাসি। আমি কারও ব্যর্থ প্রণয়ী হতে চাই না। প্রেম ব্যর্থতা নিয়ে আসে। ব্যর্থতাকে আমি ঘৃণা করি।

গাড়িটা চলে গেল। নিস্তব্ধ জগৎ। শুধু মার নিঃশ্বাসের ভারী শব্দ। এক সময় সেই শব্দটাও যেন বন্ধ হয়ে গেল। শুধু একটা ক্ষীণ কান্নার শব্দ বহুদূরে থেকে ভেসে আসতে লাগল। আমি কান পেতে সেই কান্না শুনতে চাইলাম। কে কাঁদে, কেন কাঁদে, কোথায় কাঁদে? কান্নাটা তো বাইরে থেকে আসছে না। ঘোতনের মা আমার মনের মধ্যে বসে ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছে, ঘোতন, ঘোতন রে—'

এখন ঘুমিয়ে পড়া আমার একান্ত কর্তব্য, যেহেতু খুব ভোরেই আমাকে অফিসে যাবার জন্য বাস ধরতে হয়। আর মাত্র দিনকয়েক বাকী রয়েছে পাটনায় যেতে। তার আগে শুভেন্দুকে সমস্ত কাজ বুঝিয়ে দিতে হবে। আমার দায়িত্ব সম্পর্কে আমি উদাসীন হতে পারি না। সেরকম কোন ইচ্ছা আমার মনের মধ্যে নেইও। তবু পিছনের একটা অংশ বারবার আমাকে আকর্ষণ করছিল। ঘোতনের মা ক্রমাগত আমার বুকের মধ্যে আছড়ে পড়ে চীৎকার করে কাঁদছিল, 'ঘোতন, ঘোতন রে—।' ঘোতনের মা যে অতর্কিতে এই সময় বুকের মধ্যে জেগে উঠবে কে ভেবে-ছিল!

ঘোতন আমার সঙ্গে কলেজে পড়ত। রোগা রোগা মতন দেখতে ছিল ও। বড় বড় দুটো চোখ। উদাসভাবে তাকিয়ে থাকতো। ওর মুখে ক্ষীণ হাসি সব সময়ই লেগে থাকতো। এক এক সময় মনে হতো, ও যদি কোনদিন কাঁদে, তবুও মনে হবে ঘোতন হাসছে। ঘোতনকে কোনদিন কাঁদতে দেখিনি।

সেই ঘোতন একদিন বাড়ি থেকে পালাল। পালাল ঠিক না, সন্ন্যেসী হয়ে চলে গেল। যাবার আগে নিজের বালিশের নীচে একটা চিঠি রেখে গেল। সেই চিঠিতে লেখা ছিল, ওর এই সন্ন্যেসী হবার জন্যে কেউ দায়ী না। সংসার ভাল লাগল না বলেই, সংসার ত্যাগ করল ও। শেষ একটা লাইন আমাকে উদ্দেশ করে লেখা। আমি যেন ওর মাকে দেখি। মনে মনে সেদিন ঘোতনকে স্বার্থপর আর কাপুরুষ বলে গাল দিয়েছিলাম। ঘোতনের মা বুক চাপড়ে চাপড়ে কাঁদছিল, ঘোতন ঘোতন রে—। বারকয়েক ওর মাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছিলাম, মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ঘোতন সংসার ত্যাগ করেছে, ও একদিন মহা-পুরুষ হয়ে ফিরে আসবে; কিন্তু ঘোতনের মা কোন কথাই শোনেনি, ঘোতনের নাম ধরে অনবরত আর্তস্বরে চীৎকার করছিল।

অনেকদিন কেটে গেল, ঘোতন আর ফিরল না। শেষ পর্যন্ত একদিন ঘোতনের

কথা প্রায় ভুলেই গেলাম। যোতনের এক মামা ছিল, সে এসে একদিন যোতনের মাকে নিয়ে গেল।

বহুদিন পর, এই কিছুদিন আগে যোতনকে হঠাৎ আবিষ্কার করলাম গোল-দীঘির ধারে। ওর মুখ-ভর্তি দাড়ি-গোঁফ। সেই জঙ্গলে ওর ফর্সা রং ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওর টানা টানা চোখের উদাস দৃষ্টি আমি চিনতে পারলাম। কাছে গিয়ে বললাম, 'যোতন না?' যোতন আমাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল, বলল, 'আমি যোতন না।' ততক্ষণে আমি ওর একটা হাত চেপে ধরেছি। যোতনের ডান হাতে বড় একটা জড়ুল ছিল। সেই দিকে দৃষ্টি রেখে বললাম, যাদের ডান হাতে বড় জড়ুল থাকে, তারা যোতন হয়।' যোতন হেসে ফেলল। হাসলে যোতনকে সুন্দর দেখাত। এখনও দেখাল। বললাম। 'পালিয়ে বেড়াচ্ছিস কেন?' যোতন শান্ত কণ্ঠে বলল, 'পালিয়ে তো বেড়াচ্ছি না। শুধু নিজেকে চিনবার চেষ্টা করছি।' আমি বিস্মিত হলাম। বললাম, 'নিজেকে চিনতে হলে দাড়ি-গোঁফ রেখে সং সাজার যে কী দরকার।' যোতন মিষ্টি করে হেসে বলল,

শুধু তো সবাই দেখে বেড়াচ্ছিস। তুই যে দাড়ি-গোঁফ কামাচ্ছিস, শার্ট-প্যান্ট পরেছিস, এই সাজা নয় এখন? তোকে যখন দেখেছিলাম, তুই উঁচু করে ধুতি পরতিস, ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল, হাতগোটানো ফুল-শার্ট। আমার তো মনে হচ্ছে আমার চেয়ে তুইও কিছু পেছিয়ে নেই। আসল কথাটা কি জানিস—' খোকন আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে গোপন কথা বলার ভঙ্গীতে বলল, 'আসল কথা হচ্ছে, আমরা প্রতি মুহূর্তে নতুন করে নিজেদের উপলব্ধি করার চেষ্টা করছি। তাই তো আমাদের এই ছুটোছুটি: কিন্তু সাধু-সন্ন্যাসীদের দিকে তাকিয়ে দ্যাখ, তারা কী রকম তন্ময় হয়ে আছে অন্য একটা জগৎ নিয়ে। সেখানে সাজ-পোষাক নেই, ভদ্রতা-অভদ্রতা নেই, লৌকিকতা নেই, আদর-আপ্যায়ন নেই, বলতে গেলে একটা অদ্ভুত জগৎ যা সাধারণ মানুষের কাছে প্রচণ্ড এক বিস্ময়।'

...খোকনকে ছোট্ট একটা আঘাত করার লোভ সামলাতে পারলাম না। বললাম, 'কিন্তু সেই বিস্ময়কর জগৎ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলি কেন?' খোকন হাসল, উত্তর দিল না। আবার বললাম, 'কিছু একটা বল।' খোকন আরও কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'শুনবি?' বললাম, 'হ্যাঁ।' খোকন বলতে লাগল, 'আমি যখন সন্ন্যাসী হয়ে যাই, সেই সময়কার কথা মনে আছে তোর? আমাদের পাশের বাড়িতে যোগেশ উকীল থাকতেন। মনে পড়েছে? গুড। উকীলবাবুর চার মেয়ে ছিল। মেজ মেয়ের নাম ছিল চারু। সেই চারুর সঙ্গে আমার ভালবাসা হয়েছিল। অনেক চিঠি-পত্র চালাচালি হতো। তারপর চারুর বিয়ে হয়ে গেল। ওর বর সাব-ডেপুটি ছিল। মনে বড় কষ্ট হল। শেষ পর্যন্ত চারু ল্যাং মারলো! ধুত্তোর নিকুচি করেছে সংসারের। সব কিছুর ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়লাম। এমনকি মার ওপরও। সন্ন্যাসী হয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে খুব ঘুরলাম। মনে শান্তি এল কিনা জানি না, দেহ পরিশ্রান্ত হল। কয়েকদিন হল ফিরে এসেছি, আর যাব না। একটা চাকরি-বাকরি দে না।'

বললাম, 'তুই কি চাকরি করতে পারবি? কোনদিন আবার বীতশ্রদ্ধ হয়ে পালাবি।' খোকন একটুও অপ্রস্তুত হল না। হাসতে হাসতে বলল, 'দুটোই কিন্তু সমান সত্য। চাকরি করা, এবং চাকরি ছেড়ে পালান। আমি বুঝতে পারি না, মূর্খ মানুষগুলো কেন জোর করে নিজেদের এক-একটা খাঁচায় বন্দী করে রাখে। যে খাঁচার দরজা খোলা বা ইচ্ছে করলেই খুলে নেওয়া যেতে পারে, মানুষ কেন সেই খাঁচায় মাথা খুঁড়ে মরে। ইচ্ছে করলেই তো—' দু হাত হাওয়ায় দুলিয়ে খোকন পাখি ওড়ার ভঙ্গী করল।

খোকনকে সেইদিন জোর করে বাড়ি ধরে নিয়ে এলাম। মা খোকনকে চিনত। কলেজে পড়তে অনেকদিন খোকন আমাদের বাড়িতে খেয়ে গেছে। মা তখন বলত, 'বাড়িতে বলে এসেছো তো?' খোকন বেমালুম ঘাড় কাত করত। অথচ আমি জানি, খোকন বাড়িতে কোন কথা বলে আসেনি। কলেজের নাম করে বেরিয়ে পড়েছে, তারপর আমাদের বাড়িতে এসে উঠেছে। খোকনকে যখন জিজ্ঞেস করতাম, 'তোর মা চিন্তা করবে। একটা খবর দিলেই হয়।' খোকন হেসে হেসে বলত, 'এক এক সময় নিজের দাম যাচাই করে দেখতে বেশ লাগে, তাই না। এই যে আমার জন্যে সবাই ভাববে, মা কাঁদবে, তোরা খোঁজাখুঁজি করবি—' বলতে বলতে ছেলেমানুষের মত হেসে উঠত খোকন।

মা খোকনকে চিনতে পারেনি। ওকে দেখে তাড়াতাড়ি বাড়ির মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিল; বললাম, 'আমাদের খোকন, চিনতে পারছো না,' মা তবু চিনতে পারল না। বললাম, 'সেই যে সন্ন্যাসী হয়ে চলে গিয়েছিল।' মা চিনতে পেরে তাড়াতাড়ি কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'কত অন্যরকম হয়ে গেছো তুমি, এসো বাবা, এসো। তুমি বসো, আমি তোমার জন্যে জল নিয়ে আসি।' খোকন চীৎকার করে বলতে লাগল, 'জলটল খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি মাসীমা। ডিম বা মাছ-মাংস যদি কিছু থাকে, দিন। অনেক দিন খাই না।' খোকনের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মার মুখ-চোখের কী অবস্থা! প্রথমটা মাকে বিষম বিভ্রান্ত দেখাল, পরক্ষণেই মার মুখে হতাশা, ঘৃণা, অবহেলা ফুটে উঠল। মাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বলে উঠলাম, 'খোকন তো আর সত্যি সত্যি সন্ন্যাসী হয়ে যায়নি। মাঝের ক'টা দিন মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তাই শান্তির জন্যে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরল। সেখানে তো আর সেফটি-রেজার নিয়ে যাওয়া চলে না, তাই মুখে দাড়ি-গোঁফ গজিয়েছে। তাই না রে খোকন!' খোকন খুব শান্ত ছেলের মত ঘাড় দোলাল।

দিনচারেক পর খোকন আবার উধাও হল। আমার টেবিলের ওপর ছোট্ট একটা চিঠি চাপা দিয়ে গেল।' আবার পালালাম, পালাতে ভাল লাগে। মনে আছে, ছেলেবেলায় লুকোচুরি খেলতাম। শরিকদের পড়ো বাড়িটার এঘর-ওঘর ঘুরতে কী যে ভাল লাগত। খেলার নাম করে ঘুরতাম। এও তাই। যে-পথে মানুষ খুব কম যাতায়াত করে, সেই পথ আমাকে টানে। আবার একদিন দেখা হয়ে যাবে, হঠাৎ যখন তোদের পথে এসে পড়বো।'

তারপর খোকনের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। এখনও হয়ত নির্জন মনের আনাচে কানাচে লুকোচুরি খেলে বেড়াচ্ছে ও।

মা হঠাৎ বলে উঠল, 'কিরে, তুই ঘুমোসনি?'

মা কি করে জানল যে আমি ঘুমোই নি। উত্তর দিলাম না। মা আবার ঘুমিয়ে পড়ল। সমস্ত দিন কাজকর্ম করে মা ক্লান্ত হয়ে পড়ে, শুলেই ঘুম এসে যায়। আমিও তো কাজ করি, ক্লান্ত হই, কিন্তু আমার চোখে ঘুম আসে না কেন। মাঝে মধ্যে না-ঘুমের একটা নেশা আমার মাথার মধ্যে কিলবিল করতে থাকে কেন?

সমস্ত রাত না ঘুমিয়েও আমার শরীরে কিংবা মনে কোন জড়তা নেই। বরং সকালটাকে খুব ভাল লাগল। বাড়ির একটু দূরেই প্রকাণ্ড একটা মাঠ। ভোর না হতেই সেই মাঠে গিয়ে দাঁড়ালাম। কতদিন এই মাঠে আসি না। মাঠের ওদিকটায় কতগুলো বাড়ি হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে সমস্ত মাঠটাই ভরে উঠবে। তখন আর এখানে এসে দাঁড়ান চলবে না। আজ যে সকালে উঠলাম, এখানে এসে দাঁড়ালাম, তার জন্যে প্রথমে করবী, তারপর খোকনকে কৃতজ্ঞতা জানালাম। ওরা আমার পেছনের দুটো জানালা খুলে দিয়েছিল বলেই তো ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় শরীর জুড়োল।

...কিছুক্ষণ ধরে মাঠের মধ্যে ঘুরে বেড়ালাম। জুতো পরে আসিনি, নরম ঘাসের ওপর শিশির পড়ে রয়েছে। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মতন লাগছে, শরীর শিরশির করছে। রোঁয়ায় কাঁপুনী ধরছে। পূর্বদিক লাল করে সূর্য উঠছে। ডানা ঝাপটে পাখিরা উড়ে যাচ্ছে। বাতাসে শন-শন শব্দ। এক-এক সময় ভারী ইচ্ছে হয় জানতে, পাখিরা কোথায় যায়। নাকি কোথাও যায় না। শুধুই ওড়ে। অনেকক্ষণ ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আজকের আকাশটা নীল, নীচের মাঠও সবুজ। কিন্তু সেরকম গাঢ় নীল না, যেরকম মাঝে মাঝে দেখি, বা মাঠের রং টিয়া টিয়া না, শুধু সবুজ, সেই বিরাট পাখিটা আকাশে ভাসছে না, অগণিত পাখি উড়ছে। সাদা, কালো, ধূসর, কিন্তু সেই পাখিটা নেই। সেই যে বিরাট সাদা পাখিটা যে নীল আকাশের নীচে উড়ছে না শুধুই ভাসছে।

ক্রমশই চারদিক পরিষ্কার হয়ে আসছে। মানুষের ঘুম ভাঙতে থাকবে এখন। কল-কোলাহল বাড়বে। সেই কোলাহলের মধ্যে পরিচ্ছন্ন এই সকালটা হারিয়ে যাবে। হঠাৎ বুকের মধ্যে টন টন করে উঠল। মনে হল নিজের করে পাওয়া একটা মূল্যবান সম্পদ হারিয়ে গেল।

মা এত ভোরেই কাজে লেগে গেছে। ঝাঁটা দিয়ে সামনের বারান্দা ঝাঁট দিচ্ছে। মা আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'কি হয়েছে রে তোর? আপিসে গোলমাল? আমার জন্যে চিন্তা নেই। দাদার বাড়িতে ভালই থাকবো।'

ঘাড় নেড়ে ভেতরে চলে এলাম। না মা, আমার কিছু হয়নি। অফিসে কোন গোলমাল নেই। সব ঠিকঠাক আছে। কিন্তু কাল সমস্ত রাত আমি ঘুমোতে পারিনি। সকালে দেরী করে আমার ঘুম ভাঙে। আজ ব্রাহ্মমুহূর্তে জেগে উঠলাম। ভাল লাগল। খুব ভাল লাগল। ...মা যে বাড়ি ছেড়ে যেতে চায় না, মার যে খুব কষ্ট হবে বড়মামার কিন্তু কোন উপায় দেখতে পাচ্ছি না। একা বাড়িতে থাকতে—সব বুঝতে পারছিলাম। একা মাকে এভাবে রাখা যায় না। আর তেমন মা যদি কষ্টও পায়, পাক।

দুদিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে। বাড়ির কথা ভুলে যাবে মা।

দাড়ি কামাতে কামাতে আবার পুরনো প্রশ্নটা মনে জেগে উঠল, মানুষ বাঁচে কেন? শুধু কি নিজের জন্য? এই যে আমি বেঁচে রয়েছি, নিজের সুখ ছাড়া তো কোন কথা চিন্তা করছি না। কিন্তু সত্যিই কি চিন্তা করছি না? পাটনায় গেলে যে চাকরির দিক থেকে আমার ভাল হবে, সেকথা কি আমি বুঝতে পারি না? পারি। তবে যেতে চাই না কেন? মার কথা ভেবে। একা একা মার কষ্ট হবে। সঙ্গে সঙ্গে কোন দুষ্টু ছেলে যেন চোখের ইসারা করে হেসে উঠল। না, না। তুমি সেকথা ভাবছো না মোটেই। আসলে তুমি গতানুগতিকভাবে জীবন কাটাতে চাও। তার ব্যতিক্রম দেখলেই তোমার আতঙ্ক হয়। তুমি যোতনের ঠিক বিপরীত। যোতন খোঁজে নতুনত্ব, আর তুমি পুরনো জিনিষ আঁকড়ে ধরে থাকতে ভালবাস।

তাড়াতাড়ি দাড়ি কামিয়ে স্নান সারতে চলে গেলাম। মা বলল, 'ফেরার সময় কালী-ঘাট হয়ে আসিস। কতদিন বলেছি আমাকে নিয়ে চল। বাবুর সময়ই হয় না। ভুলিস না কিন্তু।'

হুড় হুড় করে গায়ে জল ঢালতে লাগলাম। যত সব হিজিবিজি চিন্তা করে সময় কেটে গেল। এখুনি খাওয়া সেরে বাস ধরতে হবে। না হলে অফিসে পৌঁছতে দেরী হয়ে যাবে।

কাপুর এবং তার পি-এ দুজনেই খুব পাংচুয়াল। মুখে কিছু বলবে না, কিন্তু চোখের ফাঁক দিয়ে ঠিক নজর করে রাখবে। কাপুর না রাখুক, সুপ্রিয়ার নজরে কিছুই এড়ায় না। দাঁতে দাঁত পিষে বললাম, 'মানুষ তো না একটা রস-কষহীন যন্ত্র।'

অফিসে যেতেই মজুমদার হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল। কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বলল, 'ব্যাপার শুনেছেন?'

বললাম, 'না।'

'শুধু ফাইলের ওপর মুখ গুঁজে পড়ে থাকবেন, এদিক-ওদিক কিছুই দেখবেন না?'

'ব্যাপারটা সংক্ষেপে বলুন। আমার হাতে অনেক কাজ।'

মজুমদার মুখ বেজার করে বলল, 'আমাকে দেখলেই আপনি অ্যাভয়েড করতে চান কেন বলুন তো। আমার দোষ আছে, স্বীকার করি। প্রত্যেক মানুষেরই তো দোষ থাকে। বিশেষ করে যারা চিরকুমার, তারা একটু একসেন্ট্রিক হয়।'

'চিরকুমার থাকার জন্যে কেউ তো আপনাকে মাথার দিব্যি দেয়নি বিয়ে করলেই তো হয়।'

মজুমদার করুণ মুখ করে বলল, 'হয় আর বলবেন না, হতো বরং। সে সুযোগ আমার জীবনে আর আসবে না।'

মজুমদারকে দেখে হঠাৎ মায়া লাগল। বললাম, 'আজকাল মানুষ বেশী বয়সে বিয়ে করে। আমার মতে পঁয়ত্রিশের আগে কারও বিয়ে করা উচিত না। ম্যাচুরিটি আসে না তার আগে।'

'আপনি আমার বয়স জানেন?' মজুমদার উৎসুক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

মজুমদারের বয়স সম্বন্ধে কোন কৌতূহল ছিল না। কিন্তু কিছু না বললে খারাপ দেখায়, তাই বললাম, 'কত আর হবে। বছর চল্লিশেক।'

'আরও দশ বছর যোগ করুন।' বলে মজুমদার সরল মনে হাসতে লাগল।

সত্যি সত্যি অবাক হলাম, 'একটুও কিন্তু বোঝা যায় না।'

মজুমদার বুক উঁচিয়ে বলল, 'আমি নিয়মিত যোগ করি। দেখছেন না স্কীনটা কী রকম স্মুদ।' বলে একটা হাত আমার চোখের সামনে প্রসারিত করল।

ঘড়ির দিকে নজর যেতেই চঞ্চল হয়ে উঠলাম। অযথা নষ্ট করার মত সময় আমার হাতে নেই। জরুরী কাগজগুলো দু-চারদিনের মধ্যেই শেষ করে ফেলতে হবে। তারপর টিকিট পেলেই পাটনায় চলে যাব। বললাম, 'কী যেন বলছিলেন?'

মজুমদার পুরনো রাস্তায় উঠে এল, 'আজ লাঞ্চের পর কাপুর সাহেব ঘেরাও হবে। সঙ্গে পি-এটিও।

'কেন?'

'মনে মনে একটা আক্রোশ অনেকদিন ধরেই ছিল। তাছাড়া দিনকাল যা পড়েছে, এই টাকায় আর চলে না। বহু রিপ্রেজেন-টেশন, বহু মিটিং হয়ে গেছে। এবার ডাইরেক্ট অ্যাকশন চাই। কাপুরকে ভাল করে রগড়াতে হবে এবার। মেয়ে নিয়ে ফূর্তি করা বার করছি হারামজাদার।'

মজুমদারের চোখ অঙ্গারের মত জ্বলতে লাগল।

দেখতে দেখতে আরও জনা কয়েক লোক আমাদের ঘিরে দাঁড়াল। এদের সবার মুখই চেনা। কিন্তু অনেকের সঙ্গেই মৌখিক আলাপ পরিচয় নেই। এর মধ্যে একজন ইউনিয়নের সেক্রেটারী। লোকটা উদ্ধত ধরনের আর গলার স্বর ভয়ানক কর্কশ। কথা বলে অসম্ভব চেঁচিয়ে। ওর চোখ দুটো কুঁচের মত লাল, যার ফলে মনে হয় চব্বিশ ঘণ্টাই রেগে আছে মানুষটা। ওর নাম মুকুন্দ মল্লিক। মুকুন্দ বলল। 'আমরা ফাইট করবো আর আপনারা কল থাকবেন, তা হচ্ছে না। সকলকেই আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে হবে।'

আমি মজুমদারের দিকে তাকালাম। মজুমদার চোখ সরিয়ে নিল। কিন্তু আর সবাই আমার দিকে তাকিয়ে আছে, ওরা যেন উত্তরের প্রতীক্ষা করছে। বাধ্য হয়ে বলতে হল, 'একসঙ্গে কাজ করাই তো উচিত।'

'আসুন তাহলে আজই বড় সাহেবকে ঘেরাও করি।'

'আমি তো দুদিন বাদেই চলে যাচ্ছি।'

মুকুন্দ ছাড়ার পাত্র না। 'যেখানেই থাকুন কোম্পানী আপনার পুজো বোনাস ঠিক পৌঁছে দেবে। এবং দেবে বাড়িত হারেই।'

সংগ্রামের আগেই ওরা যেন ধরে নিয়েছে, সংগ্রামে ওরা জয়লাভ করবেই। মনের ভাব গোপন রেখে বললাম, 'আপনা-দের দাবী জানতে পারি?'

মুকুন্দ ধমকে উঠল। 'আপনাদের বলবেন না, বলুন আমাদের। দাবী আমাদের বহু। তার মধ্যে মেইন ডিমাণ্ডগুলো হচ্ছে, প্রমোশন হবে অ্যাকরডিং টু সিনিয়রিটি। ইউনিয়নের সঙ্গে পরামর্শ না করে বাইরে থেকে লোক অ্যাপয়েন্ট করা চলবে না। তারপর তো ইনক্রিমেন্ট, বোনাস ইত্যাদি ইস্যু আছেই।'

ক্রমশই লোকের ভীড় বাড়ছে। এর মধ্যে কে যেন চিৎকার করে উঠল, 'ইনক্লাব'—জিন্দাবাদ। সঙ্গে সঙ্গে সবাই গলা মিলিয়ে চিৎকার করল 'জিন্দাবাদ'। আরও লোক এসে জমা হচ্ছে। লোকের চাপে আমার দম বন্ধ হবার যোগাড়। বললাম, 'লাঞ্চের পর যা হয় হবে এখন কাজ করতে দিন।'

ডেসপ্যাচের বায়দটি মুখের সামনে বুড়ো আঙুল নেড়ে বলল, 'সরে পড়ার তালে আছেন স্যার? সে গুড়ে বালি। দরকার হয় সেই সময় পর্যন্ত আপনাকেও ঘেরাও করে রাখা হবে। আজকের সংগ্রামে প্রধান সেনাপতি হিসেবে আপনাকেই দেখতে চাই আমরা।' সঙ্গে সঙ্গে সবাই চিৎকার করে উঠল, 'দেখতে চাই। দেখতে চাই।'

মজুমদারের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আমি কেন, আরও তো লোক রয়েছে।'

ভীড়ের মধ্যে মজুমদার গা ঢাকা দিল। বুঝলাম, সমস্ত ব্যাপারটাই পূর্ব পরিকল্পিত। মুকুন্দ মল্লিক তীব্র কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, 'কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে চাই। ভেবেছেন ব্যাকডোর দিয়ে নিজের স্বার্থ গোছাবেন? তা হতে দেব না। আপনি থাকবেন সামনে, আমরা সবাই থাকবো পিছনে।'

'কিন্তু এতে আমার যদি কোন ক্ষতি হয়?' এতক্ষণে বলার মত কথা পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

'আমরা সবাই আপনার হয়ে লড়বো।' তারপর জনতাকে উদ্দেশ করে মুকুন্দ গলা ছেড়ে চিৎকার করে উঠল, 'আমাদের সংগ্রাম।' সবাই সমস্বরে বলে উঠল 'ন্যায়ের সংগ্রাম।' মুকুন্দ আবার হাঁক ছাড়ল, 'আমাদের লড়াই।' সমবেত কণ্ঠ, 'রুটির লড়াই।' মুকুন্দ, 'মোহমতী মানুষের ওপর জুলুমবাজী।' সবাই—'চলবে না, চলবে না।'

কথাগুলোর মধ্যে আকর্ষণ ছিল। ঝোঁক এসে গেল। হঠাৎ লাফিয়ে চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে পড়লাম। চিৎকার করে বলতে লাগলাম, 'আমাদের দাবী।' সবাই বলে উঠল 'মানতে হবে।' অনেকক্ষণ ধরে স্লোগান দিলাম। তারপর বললাম, 'আপনাদের ইচ্ছা

অনুযায়ী আমিই আপনাদের সামনে থেকে বড়সাহেবের সংগে আলোচনা করবো আজ।'

সবাই চিৎকার করে উঠল, 'শুভেন্দুবাবু জিন্দাবাদ।'

লাঞ্চ পর্যন্ত আমার ছুটি। যে যার জায়গায় চলে গেল। ক্লান্তি এসে বসলাম। কাজে মন বসছে না। ভেতরে একটা আক্রোশ ফুঁসতে লাগল। অথচ এই ক্ষোভ সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত সচেতন ছিলাম না। জীবন যেভাবে চলছিল, তিনটি চলছিল। জীবনের গতি পাল্টাবার ক্ষমতা বা দায়িত্ব আমার নেই। স্রোতের মুখে গা ভাসিয়ে দেওয়া ছাড়া মানুষের যে আর করণীয় কাজ কিছু আছে আজই প্রথম উপলব্ধি করলাম। একটা প্রচণ্ড শক্তি নিজের মধ্যে আলোড়ন তুলতে লাগল। মনে হতে লাগল, এই মুহূর্তে আমি অনেক কিছু করতে পারি। কাপুরের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলতে পারি, তোমাদের ঘৃণিত প্রস্তাব আমি প্রত্যাখ্যান করলাম। শুধু প্রত্যাখ্যান না, এই আমার পদত্যাগ পত্র। আমি আর চাকরি করবো না। কথাটা মনে হতেই মুহূর্তের জন্য কয়েকটা বছর পেরিয়ে পিছনের একটা অংশ আমার চোখের খুব সামনে এসে দাঁড়াল।

বি এস-সি পরীক্ষা হয়ে গেছে। শরীর অসুস্থ। মার সংগে ছাদে বসে গল্প করছিলাম। মা বলছিল, 'জমানো টাকা তো শেষ হতে চলল। এবার তোর একটা চাকরি হলে হয়।'

আমি বললাম, 'চাকরি অত সোজা না। চারদিকে অজস্র বেকার।'

মা দু হাত জড়ো করে বলল, 'ঠাকুরকে কত ডাকছি। তিনি কি আর মুখ ফিরিয়ে থাকবেন চিরদিন?' মার গলার আওয়াজে খুব বিশ্বাস ছিল।

সত্যি সত্যি কিছুদিনের মধ্যেই চাকরিটা হয়ে গেল। বালিগঞ্জ প্লেসের মেসোর থ্রু দিয়ে অ্যাপ্লিকেশন দিলাম। একদিন ইণ্টারভিউ হল। তারপর এই চাকরি। শুনেছিলাম, মেসো নাকি কী করে কাপুরকে ইনফ্লুয়েন্স করেছিলেন। যদি চাকরিটা না হতো, বিষম বিপদে পড়তে হতো।

কিছুটা দূরে আলাদা টেবিলে বসে কাজ করছিল শুভেন্দু। রাগটা গিয়ে পড়ল ওর ওপর। অফিসের পুরনো কোন লোককে যদি ওর জায়গায় আনা হতো, গোলমালটা হয়ত এড়ান যেত। [illegible] গিয়ে বসলাম। শুভেন্দু [illegible] চেয়ে বসল। আর একটু হলে উঠেই দাঁড়িয়ে পড়ত। [illegible] ওর চোখের সামনে ঘটে গেছে। ওর চোখে মুখে আতংক। শুভেন্দুর [illegible] বেশী নয় না। [illegible] দেখাচ্ছিল ওকে। হঠাৎ বলে ফেললাম, 'ভয় লাগছে?'

'হ্যাঁ। এখনও তো [illegible] পারমানেণ্ট হইনি। যে কোন সময় চলে যেতে বলতে পারে। চাকরিটা গেলে আর কি পাব?'

[illegible] একটা [illegible] আমার জন্য [illegible] যেন [illegible] উঠল, [illegible]

থাকলে নিশ্চয়ই পাবেন। আপনি তো মিস মিত্রর আত্মীয়, তাই না?'

শুভেন্দু ঘাড় নীচু করে রইল কিছুক্ষণ, তারপর খুব ধীরে ধীরে বলল, 'আমি ওর সং-ভাই।'

'সং-ভাই? সুপ্রিয়ার বাবা দুবার বিয়ে করেছেন?'

চকিতের জন্য চোখ তুলে তাকাল শুভেন্দু। তারপর ঘাড় নীচু করে বলল, 'হ্যাঁ, আমাদের বাবা দুবার বিয়ে করেছিলেন। বাবা মা কেউ বেঁচে নেই। অনেক ভাই বোন, দিদিই সবার বড়। আমি মেজ। ছোটরা স্কুল কলেজে পড়ে। দিদির একার ঘাড়ে সংসার। এই সব কথা আপনি কাউকে বলবেন না। দিদি যেন জানতে না পারে। বারণ করেছিল বলতে। হঠাৎ বলে ফেললাম।' শুভেন্দু যেন বসে বসে কাঁপতে লাগল।

বললাম, 'না বলবো না। দারিদ্র্য মানুষকে বড় নোংরা পথে টানে।'

শুভেন্দু কী বুঝল কে জানে, ঘাড় দুলিয়ে শুধু বলল, 'হ্যাঁ।'

ও ঘন ঘন শুকনো ঠোঁট জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নিচ্ছিল।

'আপনার দিদি কি জানতো আপনাকে চাকরি দিলে অফিসে হৈ চৈ হবে?'

'কী জানি।'

'এ বিষয়ে অফিসের কারও সংগে অন্তত পরামর্শ করে দেখা উচিত ছিল ওর।'

'হ্যাঁ বিশেষ করে আপনার পরামর্শ নেয়া উচিত ছিল।'

'আমার কেন?'

শুভেন্দু নিমেষের জন্য আমার মুখের দিকে তাকিয়েই চোখ নীচু করল। 'দিদি বলে আপনি খুব সংলোক। সংলোকেরা কখনও খারাপ পরামর্শ দেয় না।'

হঠাৎ আমি বিব্রত বোধ করতে লাগলাম। শুভেন্দু নেহাৎ ছেলেমানুষ। ওর দিদি যে কথা আড়ালে বলেছে, সেই কথা আমাকে বলে ফেলল। বললাম, 'তুমি খুব ছেলেমানুষ।'

শুভেন্দু হাসল। 'না, আমি আর ছেলেমানুষ নেই। দু বছর আগে এম-এ পাস করেছি।'

মজুমদার এসে সামনে দাঁড়াল। 'বলুন, ঠিক লাঞ্চের পর, কাপুর যখন চেম্বারে আসবে তখন মনে আছে তো।'

দারুণ বিরক্তিতে মন বিষাক্ত হয়ে উঠল। বললাম, 'লাঞ্চের পরে কেন? আগে ঝগড়া করলেই তো ভাল হতো, খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হয়ে যেত।'

মজুমদার চোখ ঘুরিয়ে বুদ্ধিমান মানুষের ভঙ্গী করে বলল, 'খেয়েদেয়ে এলে সাধারণত মানুষের মন-মেজাজ খোলসা থাকে। তখন কথায় যদি কার্যোদ্ধার হলে যায়, শুধু শুধু ঝামেলা [illegible]।'

'কিন্তু কিছুক্ষণ আগে [illegible] কাপুরকে [illegible]?'

[illegible] সবাই, [illegible] যেতে দিয়ে—বলে হঠাৎ শুভেন্দুর দিকে নজর যেতেই চুপ করে গেল। তারপর চলে যেতে যেতে বলল, 'ইউনিয়নের ইজ্জত কম্প্রোমাইজ করা। আমি একা কী করতে পারি। যা হচ্ছে হোক।' বলে মজুমদার ওপরের দিকে ঘাড় তুলে ছেড়ে দিল।

মজুমদার চলে যেতেই শুভেন্দুকে বললাম, 'এ লোকটিকে সাবধান। অত্যন্ত শয়তান ধরণের মানুষ। কখন যে কী করে বসবে নিজেও জানে না। এক এক সময় ওর মাথা ফাটিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে, সত্যি সত্যি শয়তান সেখানে কারখানা খুলে বসেছে কিনা।'

শুভেন্দু বলল, 'আপনি ছিলেন, তবু একটা প্রটেকশন ছিল।'

ইচ্ছে হল বলি, 'আজ তোমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ হবে, তার উদ্যোক্তা হব আমি।' বললাম না। কী হবে শুধু শুধু এখন ওর মনে কষ্ট দিয়ে। পরে তো সব জানতেই পারবে।

অনেকক্ষণ ধরেই মনে হচ্ছিল শুভেন্দু যেন আমাকে কী বলতে চায়। বললাম, 'আমাকে কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ, আমাকে পাটনায় নিয়ে যাবেন?'

'তোমার দিদিকে বললেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

'দিদি বলল, আপনাকে কিছু বলতে ওর নাকি ভয় করে। আপনি নাকি ভীষণ জেদী মানুষ।'

অট্টহাসিতে ভেঙে পড়তে ইচ্ছে হল। সুপ্রিয়ার রূপ আরও কত কী দেখবো, শুনবো।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম। শুভেন্দু আবার বলল, 'আপনি কিন্তু বলবেন না যে আমি সুপ্রিয়া মিত্রর ভাই, তাহলে ওরা আরও ক্ষেপে যাবে।'

'কথাটা আমাকে বলাও উচিত হয়নি তোমার।'

'কেন?'

'আমি যে তোমার সপক্ষে কাজ করবো এমন ধারণা হল কেন?'

শুভেন্দুর মুখে পরিচ্ছন্ন হাসি। ও বলল, 'কিন্তু আপনি তো আমার বিপক্ষতা করতে যাবেন না। দিদির মুখে শুনেছি, সমস্ত অফিসে আপনিই নাকি দিদির একমাত্র বন্ধু।'

যেতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়লাম, 'তোমার দিদি সত্যি কথা বলেনি। দিদির একমাত্র বন্ধু যতীনবাবু।'

শুভেন্দু ভ্রু কুঁচকে কিছুক্ষণ কী ভাবল। তারপর বলল, 'আপনি যতীন কাকার কথা বলছেন? যতীনকাকা আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। ছোটবেলায় দিদিকে খুব কোলে নিয়ে বেড়াতেন, দিদিকে খুব ভালবাসতেন। তাঁকে তো বন্ধু বলা যায় না।'

আর দাঁড়ালাম না। [illegible] হয়েছে। এখনও লাঞ্চের [illegible] খরচ করে ফেলা [illegible] আর কাজ হবেই না।

(ক্রমশঃ)

উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি মহল বৈচিত্র্য

নারায়ণ সেনগুপ্ত

ময়ূরমহল (উদয়পুর)

অতীতের রাজা-বাদশাদের কীর্তিকাহিনী এই শতকের জন-জীবনে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছে। সে প্রভাব কোন ঐশ্বর্যের বা জনহিতকর কার্যের প্রভাব নয়। সে প্রভাব হলো শিল্প ও শিল্পীর মানসলোকের প্রভাব...আন্তরিকতা আর হৃদয়াবেগের প্রভাব...কিছুটা উপলব্ধির প্রভাব। সেদিনের রাজা-বাদশারা অন্যান্য কীর্তি-কলাপের মাঝে নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিশ্রাম, প্রতাপ ও প্রভাব জাহির করবার জন্য দুর্গ বা প্রাসাদ নির্মাণের দিকে সুতীক্ষ্ম নজর দিতেন। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাও কোথায় হারিয়ে গেলেন. ক্ষেত্র-বিশেষে অক্ষত বা প্রায়বিলুপ্ত অবস্থায় এইসব প্রাসাদগুলি এখন হৃতগৌরবের সাক্ষীরূপে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিরাজ করছে। যুগ পালটেছে সেই সঙ্গে লোকের রুচিও। অতএব শিল্প বা শিল্পীমানসে যে পরিবর্তন দেখা দেবে তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে? এই শতকের মানুষ তাই আর প্রাসাদ বা দুর্গ নির্মাণের কথা ভাবেন না। ভাবেন, অধিকতর আধুনিক ডিজাইনের সর্বসুখসমন্বিত গগনচুম্বী অট্টালিকার কথা। শুধু ইতিহাসকে আমরা কেটেছেঁটে বাদ দিতে পারি না...ঐতিহাসিক জিনিসগুলো তাই আজো আমাদের কাছে বিস্ময়ের সামগ্রী রূপে ধরা দেয়...আর সেজন্যই আমরা অতীতের জিনিষগুলি সংরক্ষণ করে রেখেছি.....। মিউজিয়মের দরজায় তাই এত ভীড়। কিন্তু প্রাসাদ বা দুর্গকেও আর মিউজিয়মের মধ্যে ধরে রাখা যায় না। তাই ক্ষেত্রবিশেষে এই দুর্গ বা প্রাসাদগুলি নিজেরাই এক-একটি মিউজিয়মরূপে আমাদের কাছে ধরা দিয়েছে। আরো আশ্চর্যের কথা—এই শতকের শিক্ষিত জনসমাজ অতীতের এইসব কীর্তিকলাপ-গুলি সাগ্রহে দেখে থাকেন—আর সেজন্য দিন-দিন দেশী-বিদেশী পর্যটকের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এইসব প্রাসাদ অভ্যন্তরের 'মহল'গুলি এক বিস্ময়ের বস্তু। মহলের নির্মাণ-বৈচিত্র্য, পরিকল্পনা, শিল্পমাধুর্য আমাদের মন হরণ করে। উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি 'মহল'-বৈচিত্র্যের কথা নিয়েই এই নিবন্ধ।

ক্ষেত্রবিশেষে এই মহলগুলি নির্মাণের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল—কোথাও বা নিজেদের ব্যবহারিক প্রয়োজনে কোথাও বা সামাজিক বিবর্তনে, শোষণে, শাসনে বা শিল্পের সমঝদারের পরিকল্পিত রূপে। তাই বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখতে পাই 'মহল'গুলি সাধারণতঃ কয়েকটি শ্রেণীভুক্ত। গ্রীষ্মের প্রবল উত্তাপে যখন মানুষের মন-প্রাণ জর্জরিত তখন চাই একটি সুশীতল আশ্রয়। রাজপরিবারের এই প্রয়োজনের খাতিরে তৈরী হয়েছিল 'জলমহল'। চারি-দিকে জল মাঝখানে মহল। গরম হাওয়ার প্রবেশ নিষেধ ছিল সেখানে। এরই আরেকটি রূপ 'হাওয়া মহল'। অর্থাৎ সাধ্যায়াসের পর ঝিরঝিরে হাওয়া উপভোগের রমণীয় স্থান। শিশমহল, রঙমহল, ময়ূরমহল প্রভৃতি শিল্প-চাতুর্যের অবিস্মরণীয় কীর্তি। সুখমহল—সুখ ভোগ করবার, রাণীমহল রাণীদের, খাবারমহল খানাপিনার, বাঁদিমহল বাঁদিদের জন্য একান্তভাবে সংরক্ষিত। এরূপ একাধিক মহলের পরিচয় ঘটে পর্যটকদের সঙ্গে। প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে কয়েকটি মহল-বৈচিত্র্যের সরজমিন পরিচয় দেওয়া এক্ষেত্রে বোধকরি অন্যায় হবে না।
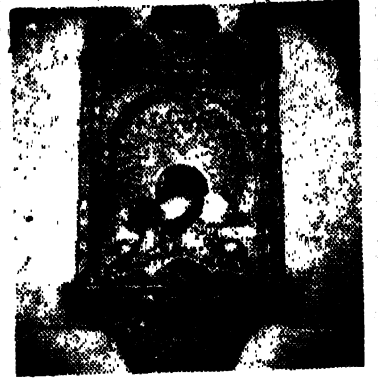
প্রায় প্রতিটি রাজপ্রাসাদে একটি করে 'খাসমহল' নজরে পড়ে। আগ্রা দুর্গের মাঝে শ্বেতপাথরের খাসমহলটি সম্রাট শাহজাহান নির্মাণ করেন। এই মহলে বাদশা বিশ্রাম করতেন ও রাজপুর-অন্তঃপুরিকাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন।

এরূপ আর একটি খাসমহল নজরে পড়ে দিল্লীতে—লালকিল্লার ভেতরে—এই খাসমহলকে কেউ কেউ দেওয়ানী খাস বলে থাকেন। এটি সম্রাট শাহজাহানের কীর্তি। এই মহলে সম্রাট আত্মীয় ও ওমরাহদের সঙ্গে দরবারে বসতেন—সম্রাট বসতেন বিখ্যাত ময়ূর-সিংহাসনে। মণিমাণিক্যখচিত বিখ্যাত ময়ূর-সিংহাসনের কথা সর্বজন-বিদিত। যার আর্থিক মূল্য ছিল পনেরো কোটী টাকা। পারস্যের নাদির শাহ এটি

জাহানারা মহল (আগ্রা)

শীশমহলের একটি পাথরের কাজ (অম্বর)

লুঠ করে নিয়ে গেছেন। বর্তমানে শূন্যস্থান পূরণ করে একটি সাদা পাথরের সিংহাসন বিরাজ করছে।

ফতেপুর সিক্রিতে আরেকটি খাসমহল ভ্রমণার্থীদের অবিশ্রান্ত আনন্দ দান করছে। এটিও সম্রাটের খাস দরবার। এই মহলের নতুনত্ব সকলকে চমৎকৃত করে। দোতলাসমান উঁচু—চারদিকে বারান্দা। মধ্যভাগে একটি মাত্র কক্ষ। এর মাঝে একটি স্তম্ভ আছে—সেখানে সম্রাট নিজে বসতেন এবং চারদিকে মন্ত্রী ও পরামর্শদাতারা। শোনা যায় এই মহলে আকবরের নবরত্ন সভা বসতো। রত্নদের মধ্যে ছিলেন—আবুলফজল, আবুল ফৈজী, রাজা বীরবল, রাজা টোডরমল, রাজা মানসিংহ, আবদুল রহিম খান-খানান, তানসেন, হাকিম হুকুম ও মোল্লা দো পেঁয়াজা।

বিজ্ঞানের অবদানের ফলে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত গৃহের সঙ্গে এ শতকের মানুষেরা সমধিক পরিচিত। কিন্তু কয়েকশত বছর আগে শীতাতপের কল্পনাও কেউ করতে পারতেন না। তাই সেই সময়কার স্থপত্য শিল্পীরা রাজা-বাদশাদের অসহনীয় গ্রীষ্মের জ্বালা দূরীকরণে প্রতিভার বাস্তব স্বাক্ষর রাখলেন 'জলমহল'-এ। এখানেই তাঁরা ক্ষান্ত হলেন না। জলমহলের সমতা রক্ষা করে তৈরী হলো—'হাওয়া মহল'। ফতেপুর সিক্রিতে যাঁরা গেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই যোধাবাঈ প্যালেসে ঢুকেছেন। আর এই যোধাবাঈ প্যালেসের ভিতর দিয়ে হাওয়া-মহলে যাবার রাস্তা ছিল। জলবেষ্টিত কারুকার্যময় একটি খোলা চত্বর। বাইরের লোকেদের সামনে উপস্থিত না হয়ে অন্তঃপুরিকারা শীতল বায়ু সেবন করতেন।

উত্তরাঞ্চলে যতগুলি 'হাওয়ামহল' আছে তার মধ্যে সবচেয়ে সেরা হলো জয়পুরের হাওয়ামহল। গোলাপী রঙের ন'তলা বাড়ি। শুধু জানালা আর জানালা। রাস্তার পাশেই তৈরী হয়েছে। গ্রীষ্মকালে রাণীদের শীতল বায়ু সেবন করার জন্যে। পরিকল্পনা অভিনব। পারসীয়ান স্টাইলে তৈরী। মহারাণা প্রতাপ সিংহ ১৮ শতকে এটি নির্মাণ করেন। ডিজাইন করেন—লালচাঁদ উস্তা।

শীশমহল—মহল-জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। আগ্রা দুর্গের শীশমহল তাই পর্যটকদের কাছে এত আকর্ষণীয়। কিন্তু সত্যিই কি এখনও গর্ব করবার মত কিছু আছে? সর্ব করে নিয়েছে লুটেরা। দামী দামী কাচ, মণি-মাণিক্য সব তুলে নিয়ে গেছে। তবে অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না যে, শীশমহল এক সময় রুচি আর ঐশ্বর্যের জীবন্ত নিদর্শন। পরিকল্পনাও অপূর্ব। গোলাকৃতি কাচের ঘর। দেওয়ালে, ছাদে, চতুর্দিকে প্লাস্টারের উপর অসংখ্য ছোট কাচের অপূর্ব সমাবেশ। কথিত আছে—মহলের মাঝে অবস্থিত (এখন অকেজো) ফোয়ারা দিয়ে অবিরত সুবাসিত গোলাপজল নির্গত হতো। বেগমরা সেখানে কটিবস্ত্র বিবর্জিতা অবস্থায় পুলকিত আবেশে স্নান করতেন—নিজেদের অপরূপ অঙ্গসৌষ্ঠব পরখ করতেন চারদিকের দেওয়ালের কাচের মাঝে প্রতিবিম্ব। রূপের সমঝদারও চাই। তাই মাঝে মাঝে নবাবরা শীশমহলের অভ্যন্তরে উপবিষ্ট হয়ে নির্ভেজাল রূপসাগরে ডুব দিতেন।

আগ্রার শীশমহলের সেই অতীত সৌন্দর্য আজ ভগ্নস্তূপে পরিণত হতে চলেছে। কিন্তু যে শীশমহল এখনও অনেকটা অক্ষত এবং শিল্পপ্রধান—সেটি হলো অম্বরে। এককথায় কাচের ঘর। এমনভাবে কাচগুলিকে বসানো হয়েছে যে আপনা থেকে জ্যোতিঃ বেরিয়ে আসছে। কাচের উপর কারুকার্য...অপূর্ব শিল্প...সুন্দর মনোরম। শিল্পীর তারিফ না করে উপায় নেই। আছে গাছ, প্রজাপতি, ফুলদানি, বিভিন্ন শ্রেণীর আলপনা, মদ্যপানের সরঞ্জাম—ঠিক তার পাশেই রয়েছে আবার রাধাকৃষ্ণের মূর্তি।

বিচিত্র গঠনউৎকর্ষের জন্য সকলের দৃষ্টি সহজেই আকৃষ্ট করে পাঁচমহল। এটি আছে ফতেপুর সিক্রীতে। গৃহটি পাঁচতলা বলে নামকরণ হয়েছে পাঁচমহল। দেখতে অনেকটা বৌদ্ধ-বিহারের মত। প্রতিটি তলার স্তম্ভের সংখ্যা এইরকম: প্রথমতলায় ৮৪টি, দ্বিতীয় তলায় ৬৫টি, ৩য় তলায় ২০, চতুর্থ তলায় ১২ ও পঞ্চম তলায় ৪টি।

স্তম্ভগুলির গায়ে বিচিত্র কারুকার্য নজরে পড়ে।

মহল-জগতের অন্যতম আকর্ষণ হলো রঙমহল। ফতেপুর সিক্রীর রংমহলটি নির্মাণ করেন সম্রাট আকবর। এখানে জাহাঙ্গীরের জন্ম হয়। মহলের কারুকার্য হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সংমিশ্রণ। এই মহলে যোধাবাঈ চিশ্তি ফকির উপাসনা করতেন।

সিক্রীর লালকিল্লার ভিতরে আরেকটি মহল আছে। কারুকার্য অতীব সুন্দর। খিলানে, দেওয়ালে নানা রঙের শিল্পসুষমা সকলকে মুগ্ধ করে।

অম্বর প্রাসাদের ভিতরে একটি মহল সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নাম সুখমহল; হল অব প্লেজার। সারা ঘরময় প্লাস্টারের উপর কারুকার্য। মুঘল স্থাপত্যের নমুনা। মহলের মাঝখান দিয়ে জলের নালা চলে গেছে। গ্রীষ্মকালে বিশ্রামাগার হিসাবে ব্যবহার হতো।

এই অম্বরে আরেকটি মহল আছে—নাম তার খাবারমহল। এই মহলের দেওয়ালে আকীর্ণ রয়েছে তীর্থস্থানের ছবি। মানসিংহ খেতে বসার আগে তীর্থস্থানের দেব-দেবীকে স্মরণ করে খেতে বসতেন।

এখানেই আছে রাণীমহল। বারোজন রাণীর বারোটি মহল। রাণীদের ভাগ্য দেখে ঈর্ষান্বিত হবার কোন কারণ নেই। কারণ উদয়পুরে প্রাসাদে আছে বাঁদীমহল। রাজবাড়ীর বাঁদীদের থাকবার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। বাঁদীদের সৌভাগ্য দেখে বরং ঈর্ষা হওয়া স্বাভাবিক।

এই উদয়পুরে প্রাসাদের ভেতরকার আরো কয়েকটি মহল ভ্রমণকারীদের নজরে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে, যেমন—দিলখুসা-মহল, সার্থকনামা। সত্যিই দিল খুশ হয়ে যায়—কারুকার্যের কী মুগ্ধময় দক্ষতা। এখানেই আছে মতিমহল, মাণিকমহল, ময়ূরমহল—স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে গরীয়ান। অর্থ, ঐশ্বর্য, বুদ্ধি, দীপ্তির এক সামগ্রিক সমন্বয়। কি অপূর্ব শিল্পপ্রতিভা, কি অপূর্ব কারুকাজ, কি অপূর্ব শিল্প নিদর্শন। একবার দেখলে আর ফিরে আসতে মন চায় না। দেওয়াল গাত্রে, ছাদের সিলিং-এ স্তম্ভের ছত্রে ছত্রে জড়িয়ে আছে শিল্পীর মনমাতানো ঐশ্বর্য—ভেনিস সিটি উদয়পুর...

স্বনামে কতকগুলি 'মহল' পরিচিতি লাভ করেছে। যেমন আগ্রার জাহাঙ্গীর-মহল, রোশেনারামহল, জাহানারামহল, ফতেপুর সিক্রীর যোধাবাঈ মহল, চিতোরের রাণাকুম্ভ মহল, পদ্মিনী মহল ইত্যাদি।

জাহাঙ্গীর মহল দৈর্ঘ ও প্রস্থে ২৮০ ও ২৬০ ফুট। মহলের চারদিকে রয়েছে এক হিন্দু স্থাপত্যের অপূর্ব নমুনা। ভিতরে এমন স্থান নেই—যেখানে চিত্রের বৈচিত্র্য নেই।

সম্রাট তাঁর কন্যাদ্বয় রোশেনারা ও জাহানারার জন্য তৈরী করেন দুটি মহল—একই ঢঙের। এগুলোকে বলা হতো স্বর্ণ-শিবির। রোশেনারা ও জাহানারা স্ব স্ব মহলে বাস করতেন। মহল দুটির কারুকাজ চেয়ে চেয়ে দেখবার মতো। জাহাঙ্গীর ইসলামধর্মী হলে কি হবে—তাঁর জননী কিন্তু ছিলেন হিন্দু—নাম যোধাবাঈ। তাঁর নামে একটি মহল আছে ফতেপুর সিক্রীতে। নাম যোধাবাঈ মহল। লাল বেলে পাথরের তৈরী বিরাট অট্টালিকা। সে যুগে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে সম্ভাব ছিল তার বহু নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় এই ফতেপুর সিক্রীতে। ভ্রমণ দেখুন—পাশেই রয়েছে বীরবল মহল, তানসেন মহল। আকবরের বন্ধু, উপদেষ্টা ও ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বীরব-

বসের জন্য তৈরী হয়েছিল। বেলেপাথরের তৈরী। আয়তন ৭০ ফুট ও ৫৫ ফুট দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে। মহলের কারুকাজ আশ্চর্য-সুন্দর।

অম্বরের প্রাসাদসংহ মহল—মহল হিসাবে তেমন প্রাধান্য না পেলেও এখানে দুটি জিনিস দেখবার মত। ফটকের কাজ। মহলের হাতীর দাঁতের কাজ ও পাথরের উপর পেন্সিলের কাজ নতুনত্বের দাবী রাখে। এমন শিল্পসুষমা আর কোথাও দেখা যায় না। উল্লেখ্য—রাধাকৃষ্ণ, বংশীবাদনরত কৃষ্ণ ইত্যাদি। চিতোরের দুটি মহল সম্পর্কে দু'এক কথা। কথা রাণাকুম্ভ মহল ও পদ্মিনী মহল।

সম্ভবত ১৩২৫ খৃঃ রাণাকুম্ভ মহল তৈরী হয়। দেওয়ালের রঙ নীল তার উপর সোনালী রঙের কারুকাজ। হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শন। এই মহলের নীচ দিয়ে যে সুড়ঙ্গপথ চলে গেছে—সেখানে যান প্রথম জহর ব্রতের আগুন সেখানে জ্বলেছিল। এই সুড়ঙ্গ পথই চলে গেছে গোমুখ কুণ্ডে।

এবার পদ্মিনী মহলের কথা। পদ্মিনী মহলে দেখবার মত কিছু নেই, তবে আয়না আছে। আসলে দুটি ঘর দু পাশে। মাঝে জলাশয়। মহলের দেওয়ালে একটি আয়না টাঙানো আছে — এই আয়নায় দিকে তাকিয়ে গাইড বন্ধু বললেন—এই সেই বিখ্যাত আয়না—যে আয়নার মাধ্যমে দিয়ে পদ্মিনীর রূপ দেখে বিমোহিত হয়ে পড়েছিলেন আলাউদ্দিন খিলজী। চোখের সামনে ইতিহাসের বিচিত্র ধারা যেন ঝিলিক দিয়ে উঠল।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

মনীষার তীর্থক্ষেত্রে

১৮১৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুরের মিশনারীরা বাংলাদেশে বাংলাভাষায় প্রথম সাময়িক পত্র 'দিগ্‌দর্শন' প্রকাশ করেন। 'দিগদর্শন—অর্থাৎ যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ' মাসিক পত্রিকাটির ছাব্বিশটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় চব্বিশখানি পৃষ্ঠা ছিল এবং দাম ছিল মাত্র আট আনা। এই বছর মে মাসে 'সমাচার দর্পণ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। মার্শম্যান সাহেব ছিলেন এই সাপ্তাহিকের সম্পাদক। সমাচার দর্পণকে রেভারেন্ড লঙ সাহেব বাংলার আদি সংবাদপত্র বলে উল্লেখ করেছেন।

এই 'দিগ্‌দর্শন' পত্রিকায় লিখিত হয়েছিল—

'শহর ক্ষুদ্র কিন্তু প্রাচীন, পূর্বে অতি বড় ছিল, এখন তাহার প্রায় কিছুই নাই, পূর্বে সে একটা বড় বন্দর ছিল এবং ইউরোপীয় বাণিজ্যের তাবৎ হাঁসিল সেখানে দাখিল হইত এবং ইংলণ্ডীয়দিগের বাণিজ্যের স্থান সেই ছিল পরে পরে—সেখান হইতে কলিকাতা হইল।'

উপরোক্ত তথ্যাদি সুধীরকুমার মিত্র লিখিত মহাগ্রন্থ 'হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ' থেকে গৃহীত। সুধীরকুমার মিত্র অনন্যসাধারণ শ্রম ও অধ্যবসায়সহকারে তিনটি পৃথক খণ্ডে 'হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ' রচনা করেছেন। এমন একখানি তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ কদাচিৎ হাতে আসে। যে হুগলী জেলায় প্রথম ছাপাখানা, প্রথম কাগজ-কল, বরফকল বসেছিল, যেখানে বাংলা হরফ ঢালাই করা হয় সর্বপ্রথম, যেখান থেকে 'দিগ্‌দর্শন' ও 'সমাচার দর্পণ' প্রভৃতি প্রকাশিত হয়, যে জেলায় রামরাম বসু, রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহাত্মাগণ জন্মগ্রহণ করেছেন, সেই দেশ 'মনীষার তীর্থক্ষেত্র' একথা অত্যুক্তি নয়। সুধীরকুমার যেভাবে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পর্যটন করে তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং যে সুললিত ভঙ্গীতে তা বর্ণনা করেছেন, তা সাধারণতঃ এই জাতীয় গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে ১৯৪৮-এ এবং সর্বশেষ তৃতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে। অর্থাৎ প্রায় কুড়ি বছর ধরে তিনি এই গ্রন্থ প্রকাশনার ব্যাপারে ব্রতী ছিলেন কিন্তু তথ্যাদি সংকলনে তাঁর কতদিন যে লেগেছে তা এই গ্রন্থ থেকে জানা যায়নি। সুধীরকুমার মিত্রকে তাঁর স্বদেশবাসী এই বিশাল দায়িত্ব পালনের জন্য যথাযোগ্যভাবে সম্মানিত করবেন এই বিশ্বাস আমাদের আছে।

১৩৫০ সালে দৌলতপুরে বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলনের একটি অধিবেশন হয়। সেই সময় 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' প্রণেতা যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সুধীরকুমারকে হুগলী জেলার ইতিহাস রচনার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেন। সেই সময় থেকে ধীরে ধীরে এই জাতীয় একটি ইতিহাস রচনার চিন্তা তাঁর মনে জাগে এবং তিনি বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় মাঝে মাঝে কিছু কিছু ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ১৩৫০ থেকে ১৩৫৪ সাল—এই চার বছরকাল ধরে হুগলী জেলার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ভ্রমণ করে ইতিহাস সংগ্রহ করেছেন। শুধু প্রাচীন স্থানগুলি দর্শন করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, অজস্র প্রাচীন গ্রন্থ এবং তথ্যাদি সংগ্রহ করে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেছেন। হুগলী জেলার ইতিহাস রচনা করতে বসে অপরিহার্যভাবেই সমসাময়িক বাংলাদেশের ইতিহাস ও সমাজচিত্র তাঁকে বর্ণনা করতে হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে ইংরাজ আমল পর্যন্ত হুগলী জেলায় যেসব ঐতিহাসিক এবং উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে তার প্রাসঙ্গিক ইতিহাস করেছেন তিনি লিপিবদ্ধ।

ইতিহাস রচনায় তিনি নীরস সাল তারিখের বোঝা পাঠকের ঘাড়ে চাপিয়ে দেননি। সমকালীন সাহিত্য, সমাজ ও ধর্ম, ভাষা, শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রভৃতি সকল প্রকার উত্তথ্য ব্যাপার তিনি অশেষ যত্নসহকারে পরিবেশন করেছেন। যে সমস্ত গ্রন্থ ও পত্রিকা থেকে তিনি তথ্যাদি আহরণ করেছেন, প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে তার সংকেতসূত্র দান করেছেন যা অবলম্বন করে ভবিষ্যৎ গবেষকগণ অগ্রসর হতে পারবেন। সুধীরকুমার পেশায় ঐতিহাসিক নন, তিনি সাহিত্যকার, এবং সেই কারণে এই সুবৃহৎ গ্রন্থটি পাঠ করতে একটুকু ক্লান্তি আসে না পাঠকচিত্তে। ইতিহাস রচনা করতে বসে সুধীরকুমার এটা ভেবে গর্ব অনুভব করেছেন যে, 'হুগলীর গৌরব বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রঙ্গলাল, বিহারীলাল চক্রবর্তী, টেকচাঁদ ঠাকুর, ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ, গিরীশচন্দ্র, শরৎচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যস্রষ্টার বাণীচর্চা বাংলা সাহিত্যকে বিশ্ব-সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছে।'

সুধীরকুমার প্রথম খণ্ডে প্রাচীন রাঢ় দেশ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। উত্তর প্রান্তে গঙ্গা ও পদ্মা, পূর্বদিকে গঙ্গাবেষ্টিত এই রাঢ় দেশে কর্ণসুবর্ণ রাজ্য, পাণ্ডুয়া, সপ্তগ্রাম, বিষ্ণুপুর, ভূরিশ্রেষ্ঠ এবং নিম্নপ্রান্তে দক্ষিণে তাম্রলিপ্ত রাজ্য—সুবর্ণরেখায় স্পর্শলাভ করেছে। এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অঞ্চলগুলির ঐতিহাসিক কাহিনী থেকে শুরু করে একালের মেট্রোপলিটান কলিকাতা, পথ-পরিচয় কিছুই লেখকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি।

প্রকৃতি পরিচয় পর্যায়ে সেকালের জলবায়ু থেকে শুরু করে প্রাচীনকালে চাউলের দর, আইন-ই-আকবরী থেকে বিদেশী পর্যটকদের বৃত্তান্ত, নীল চাষ, পাট চাষ, তুলার চাষ থেকে আলু, আম, কাঁঠাল প্রভৃতি যাবতীয় ফল ও ফসলের [illegible] বিবরণ পাওয়া যায়।

লেখক সেকালের সামাজিক বিবরণ, যাতায়াত ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, সাহিত্য-প্রসঙ্গ ও ব্যবসা-বাণিজ্য এই কয়েকটি অংশে বিভিন্ন বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হয়েছে ৫৭৬ পৃষ্ঠায়। শেষাংশে মুদ্রার কথা নামক অংশটুকু বিশেষ মূল্যবান তথ্যসম্ভারে পরিপূর্ণ।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ অংশটুকুও বিশেষ সমৃদ্ধ। বঙ্গভাষার উৎপত্তি, কাশীরাম, ভারতচন্দ্র, হালহেডের ব্যাকরণ, বাংলা অক্ষরের প্রথম প্রতিলিপি, উইলিয়াম কেরী, রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র, কেরীর বাংলা ব্যাকরণ, গঙ্গাধর ভট্টাচার্য, রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর (পূর্বে বীরসিংহ গ্রাম হুগলী জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল), ঈশ্বর গুপ্ত, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা; রঙ্গলাল, টেকচাঁদ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ-[illegible] অক্ষয়চন্দ্র সরকার, [illegible] বসু, শরৎচন্দ্র, চারু বন্দ্যো, অনুরূপা দেবী,

বিহারীলাল চক্রবর্তী, ও একালের অন্নদাশঙ্কর রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), আশাপূর্ণা দেবী প্রমুখ স্বনামধন্য বাঙালী মনীষীবৃন্দ কোনো-না-কোনো সূত্রে হুগলী জেলার সঙ্গে জড়িত। সুধীরকুমার এঁদের সকলের বিবরণ সংগ্রহ করেছেন এবং যথাযোগ্যভাবে তা পরিবেশন করেছেন। এছাড়া সেকালের অজানা প্রসিদ্ধ সাময়িকপত্র বিষয়ক বিবরণ সুধীরকুমার এই অংশে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর কৃতিত্ব এই যে, হুগলী জেলাকে উপলক্ষ করে প্রাসঙ্গিক বোধে তিনি সমকালীন বঙ্গদেশের যাবতীয় বিবরণ এক সূত্রে গেঁথেছেন।

দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে চুঁচুড়া, কামারপুকুর, ... ত্রিবেণী), ধনিয়াখালি, পোলবা, পাণ্ডুয়া, মগরা ও বলাগড় অঞ্চলের যাবতীয় বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। এই সূত্রে স্থানীয় দেবদেউল, প্রাচীন মূর্তি, শিলালিপি, পোর্তুগীজ জলদস্যু, ওলন্দাজ বণিকদের বাণিজ্য-রীতি, ধনিয়াখালির খইচুর, আদিবাসীদের মেলা, টুসু উৎসব, ফকিরের সমাধি, শ্রীপুরের নৌশিল্প প্রভৃতি কোনো উল্লেখযোগ্য বিষয় সম্পর্কে বিবরণ দিতে ত্রুটি রাখেননি।

তৃতীয় খণ্ডে আছে চন্দননগর, ভদ্রেশ্বর, সিঙ্গুর, হরিপাল, তারকেশ্বর, শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটি রিষড়া, কোন্নগর, উত্তরপাড়া-কোতরং, চণ্ডীতলা, জাঙ্গীপাড়া, আঁটপুর, আরামবাগ, গোঘাট, খানাকুল—কৃষ্ণনগর ও পুরশুড়া—আরামবাগ প্রভৃতি অঞ্চলের বিবরণ। লাইনো অক্ষরে মুদ্রিত সমগ্র গ্রন্থকটি প্রায় দেড় হাজার পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এবং প্রায় পাঁচশত আর্ট-প্লেটে সজ্জিত। চন্দননগর পর্বটি রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীদের কথায় সমৃদ্ধ।

সরকারী গেজেটিয়ার ইদানীং কিছু কিছু প্রকাশিত হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে তা সুযোগ্যভাবেই সম্পাদিত হয়েছে। এই গ্রন্থের লেখক সুধীরকুমার মিত্র স্বেচ্ছা-নিযুক্ত হয়ে যেভাবে দীর্ঘকাল পরিশ্রম করে এই সব তথ্যসম্ভার সংগ্রহ করেছেন এবং তার উপযুক্ত ব্যবহার করেছেন তা বিস্ময়কর।

সমগ্র গ্রন্থটির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দান করা এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে সম্ভব নয়, নতুবা বাংলাদেশের প্রাচীন সমাজ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে এমন সব কৌতুহলোদ্দীপক প্রসঙ্গ এই গ্রন্থে আছে যা উদ্ধৃত করা গেলে পাঠক আনন্দিত হতেন।

—[illegible]

হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ (ইতিহাস ও সমাজচিত্র) সুধীরকুমার মিত্র। মূল্য ঃ প্রথম খণ্ড—দশ টাকা, দ্বিতীয় খণ্ড—সাত টাকা ও তৃতীয় খণ্ড—দশ টাকা মাত্র। প্রকাশক—মিত্রাণী প্রকাশন।। ৫, কাশী ঘোষ লেন।। কলিকাতা-২৬।

সাহিত্যের খবর ঃ

নিঃসঙ্গ নায়কের জীবনাবসান

এজরা পাউণ্ড আর নেই। আধুনিক কবিতার নিঃসঙ্গ সেই উদ্‌ভ্রান্ত নায়ক মারা যান ইতালির হাসপাতালে। গত ১ নভেম্বর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর।

এর আগে মারা গেছেন তাঁর সমসাময়িক প্রায় সব সহযোদ্ধাই। এমনকি বয়সে কম সেই 'পড়ো জমি'র স্রষ্টা টমাস স্টার্নস এলিয়টও বিদায় নিয়েছেন কয়েক বছর আগেই।

একথা ঠিক, ইদানীং হয়তো অনেকেই ভুলতে বসেছিলেন তাঁকে। কিন্তু না, আধুনিক কবিতার পাঠক, একালের সাহিত্যের সমালোচক কারো পক্ষে কোনোদিনই বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয় এজরা পাউণ্ডকে। সম্ভব নয় যিনি সব সময়েই তুলতেন কাব্যসাহিত্যে ঝোড়ো হাওয়া, বন্ধুবান্ধবদের রচনা নিয়ে করতেন ভাঙাগড়া, তরুণতর কবিদের প্রতি বাড়িয়ে দিতেন ভালোবাসার হাত, তাঁকে ভুলে যাওয়া। কেমন করে একালের মানুষ ভুলবেন তাঁর অবিস্মরণীয় ক্যাণ্টোসগুলি? তাঁর জীবনের সম্ভবত সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা পিসান ক্যাণ্টোসগুলি?

বহু বিচিত্র জীবনের অধিকারী এজরা পাউণ্ড কি দেশদ্রোহী ছিলেন? অন্তত কবি বলতেন যে তিনি দেশদ্রোহী নন। এই মার্কিনী কবি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইতালি থেকে চালিয়েছিলেন ফ্যাসিস্তদের পক্ষে প্রচারকার্য। ইহুদিদের বিরুদ্ধে করেছেন বিষোদ্গার। ফলে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে হন অভিযুক্ত। কিন্তু বিচার হল না। বরং তাঁকে পাঠানো হল ওয়াশিংটনের মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসার জন্যে। দীর্ঘ বারো বছর সেখানে। তারপর ওখান থেকে মুক্তির পর চলে যান ইতালিতে। ১৯৫৮ সাল থেকেই বসবাস করেন সেখানে।

অনেকের মতে তাঁর প্রথম দিককার কবিতায় নাকি শোনা যায় ল্যাটিন, গ্রীক, ইতালিয়ান ও চীনা সাহিত্যের দূরাগত ধ্বনি। রবীন্দ্রনাথের প্রতিও ছিল এককালে তাঁর আকর্ষণ।

শেষ দিকটায় এই নিঃসঙ্গ উদ্‌ভ্রান্ত নায়ক এজরা পাউণ্ড নিজের জীবন সম্পর্কেই হয়ে উঠেছিলেন সন্দিগ্ধ। প্রায়ই বলতেন, 'চিরদিনই ভুল করে এলাম। আমার জীবনের সংস্পর্শে যা এসেছে তা সবই ব্যর্থ হয়ে গেছে।' বলতেন আরো, 'এখন যেন বুঝতে পারছি আমি কিছুই জানি না। অনিশ্চিত ভাবাবেগই যেন পেয়ে বসেছে। না, আমার আর চিন্তা করার ক্ষমতা নেই।'

নির্মলকুমার বসুর স্মরণে।।

সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু। আরো অনেক সংগঠনের মতোই তিনি যুক্ত ছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে। এখানে ছিলেন তিনি সভাপতি।

গত ১১ কার্তিক শনিবার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ব্যবস্থা করেন অধ্যাপক বসুর স্মরণে এক শোকসভা। পৌরোহিত্য করেন শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত। পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত এই স্মৃতিসভায় শ্রীশৈবাল গুপ্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় তুলে ধরেন মনীষী নির্মলকুমার বসুর অন্তরঙ্গ জীবনকথা। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য স্মরণ করেন জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় তাঁর অবদান। শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন পরিষদ সম্পাদক অধ্যাপক মদনমোহন কুমার। এছাড়াও শ্রদ্ধা জানান কালীপদ ভট্টাচার্য, হরিপ্রসাদ সেনগুপ্ত প্রমুখ।

বাংলাদেশের হৃদয় হতে।।

এ বছরেই বাংলা নাট্যশালার শতবর্ষ উৎসব উদযাপিত হচ্ছে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, বাংলাদেশেও। বেশ কিছুদিন ধরেই চলে আলাপ-আলোচনা, জল্পনা-কল্পনা।

হালে ঢাকায় নানান নাট্যগোষ্ঠী, নাট্যামোদী ও নাট্যকর্মীদের উদ্যোগে দু-দুটো কমিটি তৈরি হয়। বাংলা জাতীয় রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ-স্মৃতিকে যথার্থভাবে পালন করার উদ্যোগেই এই কমিটি। কিন্তু যাতে নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি না হয় তার জন্যে পরস্পর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখেই চালাচ্ছেন কাজ-কর্ম। ফলে ডঃ নীলিমা ইব্রাহিমের সভানেত্রীত্বে তৈরি 'বাংলাদেশ স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ আন্দোলন সংসদ' এবং ডঃ মযহারুল ইসলামের সভাপতিত্বে গঠিত 'বাংলা নাট্যশালার শতবর্ষ উদযাপনী পরিষদ' এসে গেছে পরস্পরের কাছাকাছি। উভয় কমিটিতেই রয়েছেন বাংলাদেশের বহু খ্যাতনামা কবি, সাহিত্যিক, অধ্যাপক, গবেষক। এমন একই ব্যক্তি রয়েছেন দুটো কমিটিতেই।

জি ডি আরে বিদেশী সাহিত্য।।

জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে নিয়মিতভাবেই অনূদিত হয় মূল্যবান বিদেশী সাহিত্য সম্ভার। এ বছর গোড়ার দিকে অনুসন্ধান কার্য চালিয়ে জানা গেছে ব্রিটিশ লেখকদের ২৩টি গল্পের সংকলন গ্রন্থ 'এরফনডুনগেন' এবং লী ককতোর দু-খণ্ডে প্রকাশিত কবিতা-নাটক-গদ্যের সম্পাদিত সংকলনই এ পর্যন্ত লাভ করেছে 'সেরা-বিক্রি'র মর্যাদা। ১৯৭০-এ গোটা জি ডি আরে অনূদিত হয় ৩৪৮টি গ্রন্থ। মোট কপির সংখ্যা ৬৫ লক্ষ।

একটি খবরে জানা যায়, বিদেশী সাহিত্যিকদের মধ্যে দস্তয়েভস্কি, লুই আরাগঁ, আলেকজান্ডার জর্জ আমাডো পাবলো নেরুদা, বালজাক আলবার্তো মোরাভিয়া হালিক্স লক্সনীয়র বার্নার্ড শ', গ্রাহাম গ্রীন, টলস্টয়, গর্কি, মায়াকভস্কি টেনেসি উইলিয়মস, সালভাতোর কোয়াসিমোদো, ইলিয়া এরেনবুর্গ, আঁদ্রে জিদ, জাঁ পল সার্ত্রে, রাফায়েল আলবার্তি, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বিশেষভাবে জনপ্রিয়। ভারতীয় 'পঞ্চতন্ত্র'-এর জার্মান অনুবাদও আলোড়ন তুলেছে জি ডি আরে।

পাণ্ডুলিপির প্রত্যাবর্তন।।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানির গ্রন্থাগারের সহযোগিতায় শেষ পর্যন্ত দুটো মূল্যবান পাণ্ডুলিপি ফিরে এসেছে গণতান্ত্রিক জার্মানির ঘরে। ভোলফ্রাম ফন এসেনবাখ-এর কবিতার পাণ্ডুলিপি দুটি সাহিত্যের জগতে মূল্যবান দলিল হিসেবেই বিবেচিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সেই বারুদে ঢাকা দিনগুলোর কোন এক ফাঁকতালে চুরি গিয়েছিল কবির সৃষ্টির মূল্যবান স্বাক্ষর।

ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানির ওয়াশিংটনস্থ রাষ্ট্রদূতাবাসের সাংস্কৃতিক বিভাগের উপদেষ্টার অসাধারণ কাজই হল হারিয়ে-যাওয়া দলিলপত্রের পুনরুদ্ধার অভিযান। সে অভিযানেরই ফসল হল পাণ্ডুলিপির ঘরে-ফেরা।

বিনোদ কানুনগো

উৎকল ভূমি থেকে

পঁচাত্তর খণ্ডের এনসাইক্লোপিডিয়া একার পক্ষে দুঃসাধ্য কাজ। এবং সেই কাজে সাফল্য অর্জনের কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন ওড়িশার শ্রীবিনোদ কানুনগো। গান্ধীবাদী লেখক হিসেবে পরিচিত এই মানুষটি জন্মেছিলেন ১৯১২ সালে, কটক থেকে প্রায় ১৭ মাইল দূরে মল্লিপুর গাঁয়। তাঁর ধারণা, অজস্র সমস্যাকণ্টকিত দেশে, ব্যাপক অশিক্ষা ও নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে—সমস্যা সমাধানের এই রকম উপায়ের একান্ত দরকার। শ্রীকানুনগো এককালে কারাগারে কাটিয়েছেন দীর্ঘকাল। তখনই তিনি নানা রকম লেখালেখি, পড়াশোনা করতেন। সহযোগী অন্যান্য বন্দীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তাঁর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, এই যুবকদের, এই দেশবাসীর মানসিকতা উন্নয়নের জন্যে একটা কিছু করা দরকার। ১৯৫৪ সালে যখন 'জ্ঞানমণ্ডল' নামে ওড়িশী ভাষায় বিশ্বকোষ রচনার পরিকল্পনা নেন, বলা যায়, তখনই তাঁর বহু দিনের লালিত ইচ্ছা বাস্তব চেহারা পায়।

পঁচাত্তর খণ্ডে সমাপ্ত এই এনসাইক্লোপিডিয়ার মোট পৃষ্ঠা-সংখ্যা হবে সতেরো হাজার। এনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকা বা আমেরিকানার মতোই সাজানো হচ্ছে বর্ণানুক্রমে। বিশ্বকোষটিতে থাকবে সাতাত্তর লক্ষ শব্দ এবং দশ হাজার ছবি কিংবা রেখাচিত্র।

এরই মধ্যে 'জ্ঞানমণ্ডলের' চোদ্দটি খণ্ড বেরিয়ে গেছে।

দুঃখিনী বর্ণমালা মা আমার (উপন্যাস)—অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। অক্ষয় প্রকাশন, ৬৬, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। ছয় টাকা।

'বাংলাদেশে'র জন্ম বেশী দিনের নয়। পূর্ব পাকিস্থানকে 'বাংলাদেশে' রূপান্তরিত করতে গিয়ে সেখানকার বহু নরনারী, শিশু, বৃদ্ধ অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু সকলেই এই অসহায়তাকে বাধ্যতাবে স্বীকৃতি দিয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায় নি বা পাকিস্থানীদের অত্যাচারকে মেনে নেয় নি। যারা নেয় নি, সেই রকম কয়েকটি যুবক-যুবতী মুক্তিযোদ্ধাদের অসাধারণ দুঃসাহসিক অভিযান কাহিনী ও উজ্জ্বল দেশপ্রেমের কথা লিখেছেন প্রতিষ্ঠিত ঔপন্যাসিক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'দুঃখিনী বর্ণমালা মা আমার' উপন্যাসে। সমসের, সমসেরের স্ত্রী ইমিনু, পুত্র আবদুল, সমসেরের বন্ধু দিলীপ, কামাল—এই সব চরিত্র তাদেরই প্রতিনিধিত্ব করেছে। একটি গোপন বাক্স আর একদল মুক্তিযোদ্ধার হাতে দিতে হবে গোপনে, সেই অভিযানের সময় নৌকার বুলেট-বিদ্ধ মায়ের কোলে একটি অসহায় শিশুকে দেখতে পায় সমসের সঙ্গে নেয় তাকেও। উপন্যাসের শেষ দিকে দিলীপ মৃত্যুবরণ করে। অত্যাচারীদের হাতে অসহায় ভাবে নিহত হয় ময়নার স্বামী। ধর্ষিতা ময়না সেবাব্রতী হয়ে এদের দলে আসে, এই সংঘবদ্ধ প্রয়াস ও কার্যসিদ্ধির চিত্রকে দেশপ্রেমের মানবিক বোধে উজ্জ্বল করে লেখক চিত্রিত করেছেন। উপন্যাসটি লেখকের কৃতিত্ব নতুন করে চিহ্নিত করে।

রূপকথা নয় (শিশুসাহিত্য)। আশিস সান্যাল। মধুপর্ণ প্রকাশন, ৫৯, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯। তিন টাকা।

আশিস সান্যাল এপার বাংলার একজন প্রতিষ্ঠিত তরুণ কবি। তাছাড়া কয়েকটি সংকলনের সম্পাদক হিসেবেও রয়েছে তার পরিচিতি। কিন্তু শিশুসাহিত্যেও যে তিনি সম-পরিমাণ দক্ষ, 'রূপকথা নয়' গ্রন্থটি আশ্চর্যভাবে তা প্রমাণ করে। গ্রন্থটিতে শিশুদের উপযোগী ছড়া, গল্প ও ছবি সংকলিত হয়েছে। গ্রন্থটির কবিতা গল্প ও ছবি নিশ্চয়ই যথাযথ অর্থে রূপকথা নয়, কিন্তু অনায়াসে রূপকথা শোনার মত কল্পনার ভান্ডার উজাড় করে দেয় এ গ্রন্থ। এখানেই এর অনন্যতা। 'রূপকথা নয়' গল্পটির ময়না-টুনটুনির কথা, 'ভয়ের নাম মধুগড়' গল্পের চড়ুই পাখিটির নিষ্ফল গর্ব, স্বজনের একনায়কত্বের করুণ অভিজ্ঞতার চিত্র, কাঠবেড়ালির জন্যে স্বপ্নের হলে চল?', 'টিয়ের বিয়ে', 'কি যে হল টেপুদার' ইত্যাদি শিশুমনকে ভালভাবেই অভিনিবিষ্ট রাখতে সক্ষম। মনোরম চিত্র, পদ্যগুলির ছন্দের মেজাজ, গল্পগুলির রঙিন স্বপ্নময় কাহিনী বিন্যাস ও পরিমিত শিশুদের কখনো হাসির, কুয়াশা মুহূর্তের, কখনো বা উজ্জ্বল কলরবের জগতে নিয়ে যেতে পারে। কবির শিশু-মনস্তত্ত্ববোধ নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ।

নৈঃশব্দ্য, সম্মোহন এবং বিষাদ (কাব্য সংকলন)—অজিত বাইরী। সিন্ধুসারস প্রকাশন, ৫০, কাটাপুকুর থার্ড বাই লেন, হাওড়া—১। আড়াই টাকা।

মোট চৌত্রিশটি ছোট-বড় লিরিক কবিতার সংকলন অজিত বাইরীর রচিত 'নৈঃশব্দ্য, সম্মোহন এবং বিষাদ' কাব্যগ্রন্থটি। প্রায় সবগুলোই গদ্যকবিতার ছন্দে রচিত। রোমান্টিক কবিপ্রাণে যে বৈশিষ্ট্যগুলি সহজে দেখা দেয়, আলোচ্য কবির রচনায় সেগুলি স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ। তাঁর কাছে কবিতা, শব্দ আত্মার আত্মীয়, তাই বলতে পেরেছেন—'শব্দই আমার জন্ম, আমার মৃত্যু/আমার সমগ্র জীবনে শব্দই উত্থান।' ভালবাসা কবিকে চির-অপরাজেয় করে তোলে—'ঐ বুকের চাতালে মুখ রেখে ভালবাসা/শুয়ে থাকবো জ্বলন্ত চিতায় কিংবা কবরে।' কবির চিত্রকল্প, শব্দপ্রয়োগ, ছন্দজ্ঞান এঁকে আধুনিক কবিদের সগোত্র করে তোলে।

তারাপীঠ বামাচরণ (আলোচনা)—শম্ভুকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। শরৎ বুক হাউস, ১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিঃ-১২। ছয় টাকা।

ভঙ্গীটি নতুন। উদ্যমটিও প্রশংসনীয়। শম্ভুকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায় এই গ্রন্থে তারাপীঠ ও বামাক্ষ্যাপার কাহিনী বর্ণনা করেছেন, লৌকিক ও অলৌকিক উপাদানের সমন্বয়ে। জনশ্রুতি ও প্রবাদের বাস্তবমূলকে তিনি যাচাই করেননি, একথা সত্য। তবু স্বচক্ষে দেখে, স্বকর্ণে শুনে ও পড়াশোনা করে যা জেনেছেন, তাকে প্রকাশ করতে আদৌ কুণ্ঠাবোধ করেননি। এটাই এ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। তান্ত্রিকদের গতিশীলতা ও সাধকের নিষ্ঠার সুখপাঠ্য।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

গঙ্গোত্রী : সম্পাদক শান্তনু দাস। ত্রৈমাসিক কবিতা পত্রিকা। ৪।১, অক্রুর মসজিদ লেন। কলকাতা-২৭। দাম এক টাকা।

কবিতা ত্রৈমাসিক গঙ্গোত্রী ইতিমধ্যেই বিশিষ্ট এবং পরিচ্ছন্ন পত্রিকা হিসেবে নাম করেছে যথেষ্ট। বর্তমান সংখ্যায় কবি বিষ্ণু দে প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন ভবানী মুখোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গের কবি ও কবিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন হরেন ঘোষ। কবিতা লিখেছেন বিষ্ণু দে, দিনেশ দাস, মণীন্দ্র রায়, [illegible] সুশীল রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কায়সুল হক, সুনীলকুমার নন্দী, [illegible] শম্ভু পাল, অমিতাভ দাশগুপ্ত, [illegible] সেনগুপ্ত, অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, [illegible] দাশগুপ্ত, শিশির ভট্টাচার্য, [illegible], শৈলেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, মহাদেব সাহা, [illegible] মিত্র, সমর বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিরুল ইসলাম, প্রতিমা সেনগুপ্ত, মৃণাল বসুচৌধুরী এবং আরো অনেকে। অন্য বহুজনের আরো কয়েকটি আলোচনা আছে। কবি ও লেখক পরিচিতি অংশটি কৌতূহলোদ্দীপক। এই সুসম্পাদিত কবিতা-পত্রিকাটি মূল্য কারণে সংগ্রহযোগ্য মনে হবে অনেকের, তাতে সন্দেহ নেই।

বিচিন্তা-ভারতী। সম্পাদক— মদনমোহন চক্রবর্তী। ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্র। ৭১।এ নেতাজী সুভাষ রোড (রুম নং ডি ২৭), কলকাতা—১। দাম দেড় টাকা।

মুদ্রিত রচনাগুলির মধ্যে কয়েকটি প্রবন্ধ উল্লেখ করবার মত।

সংলাপ : সম্পাদক—সত্যেন সাহা। নাট্য-বিষয়ক দ্বিমাসিক। ৭৪ সারপেনটাইন লেন, কলকাতা—১৪। দাম— দু টাকা।

সংলাপের শারদীয় সংখ্যায় ছটি নাটক লিখেছেন শ্যামলতনু দাশগুপ্ত, অমল রায়, গিরিশঙ্কর, সাগর চক্রবর্তী, জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শান্তি বর্ধন। কয়েকজন একাঙ্ক নাট্যকার প্রসঙ্গে লিখেছেন দিলীপ মিত্র।

নির্ঝর : সম্পাদক—মণীন্দ্র আচার্য ও অরুণকুমার ঘোষ। দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি। সত্তর পয়সা।

সবুজ কালিতে ছাপা বিশাখার জার্নালটির ভাবা তুখোড়। কবিতা, গল্পও আছে। লিখেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সমীর রক্ষিত, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, রত্নেশ্বর হাজরা, আশিস সান্যাল, কিরণশঙ্কর মৈত্র, হরেন ঘোষ, তাপস গঙ্গোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজন।

মুকুল : সম্পাদক—জয়দেব রায়। মাসিক সাহিত্য পত্রিকা। বাওয়ালী (মথতলা), ২৪ পরগণা। দাম—এক টাকা পঁচিশ পয়সা।

শারদীয় সংখ্যায় লিখেছেন বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ, ইন্দিরা দেবী, বেলা দে এবং আরো কয়েকজন।

দা পয়েন্ট : সম্পাদক—পার্থিব রায়। বেলগাছিয়া ভিলা, এম, আই, জি স্কীম, ব্লক বি-১, ফ্ল্যাট ৫, কলকাতা—৩৭। দু টাকা।

এত কবিতা? রীতিমত সংকলনের মত মনে হয়। এই পত্রিকাটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য

ফরগনা উপত্যকা থেকে কিরঘিজিয়ায়

মধ্য এশিয়ার সুবিখ্যাত ফরগনা উপত্যকা। চারদিকে পাহাড় ঘেরা, মরুভূমির অঞ্চলে যেন এক সমৃদ্ধ মরূদ্যান। একদা বাবর পাড়ি দিয়েছিলেন এখান থেকে ভারতে।

উজবেকিস্তানের রাজধানী তাশখন্দের দক্ষিণ-পূবে এই ফরগনা, সেখান থেকে যাওয়া যায় সন্নিহিত আর একটি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র কিরঘিজিয়ায়।

সোভিয়েত মধ্য এশিয়ার পূর্ব পার্বত্যভাগ জুড়ে আছে কিরঘিজ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। ভূভাগ—১৯৮·৫০০ বর্গ কিলোমিটার, জনসংখ্যা—২৯৩০০০০।

কিরঘিজিয়া পার্বত্য প্রকৃতির এক সমৃদ্ধ উদ্যান বিশেষ। আকাশ-ছোঁয়া তিয়েনশান পর্বতমালা, যা চিরতুষারাবৃত। খরস্রোতা [illegible] এখান থেকে নেমে আসছে পার্বত্য নদীগুলি, যার ধারা থেকে আজ জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদিত হচ্ছে। সবুজ ঘাসে মোড়া অজস্র পশুচারণ ক্ষেত্র। আঙ্গুর, বীট-চিনি, তুলা ও মেইজের ক্ষেত ছড়িয়ে রয়েছে। খনিজ সম্পদেও কিরঘিজিয়া সমৃদ্ধ। আজ সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পারদ উৎপাদক কিরঘিজিয়া। তেল, গ্যাস ও অন্যান্য ভূগর্ভস্থ সম্পদে কিরঘিজিয়া ধনী।

তবু, এত প্রাকৃতিক সম্পদশালী দেশ হওয়া সত্ত্বেও, কিরঘিজ জনগণ যুগ যুগ ধরে ছিল অবহেলিত, অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। মধ্যযুগে আমীরশাহী ও জার আমলে জার সাম্রাজ্যের উপনিবেশরূপে এখানকার জনসাধারণের ভাগ্যে ছিল একটানা দারিদ্র্য, শোষণ ও বঞ্চনা। বঞ্চনা। প্রাক-বিপ্লব যুগের একটি হিসাবে বলা হয়েছিল যে, এখানকার

[illegible] প্রতিনিধি

পশ্চাৎপদতা কাটাতে কয়েক শতাব্দী লাগবে। সে সময় মোট জনসংখ্যার মাত্র ০·৫ শতাংশ ছিল সাক্ষর। যেমন, ১৯০৫ সালে পিসপেক (বর্তমান ফ্রুঞ্জ) শহরে মাত্র ৯৭ জন নাম সই করতে পারত।

কিন্তু, এই সমস্ত অবস্থা বদলে গেল অকটোবর মহাবিপ্লবের পর। বিপ্লবের আগে যাদের নিজস্ব লিপি ও বর্ণমালা বলে কিছু ছিল না, বিপ্লবোত্তর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত তা শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, গ্রামশিল্প ও কৃষিতে এক অন্যতম প্রাগসর প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত। কিরঘিজিয়ার নিজস্ব বিজ্ঞান আকাদমিও রয়েছে। উচ্চ শিক্ষা সর্বজনীন।

কিরঘিজিয়ার প্রথম সংবাদপত্র 'এরকিন তু' (মুক্ত পর্বতমালা) প্রকাশিত হয় ১৯২৪ সালের ৭ নভেম্বর। এখন এখানে সংবাদপত্র ও সাময়িকীর সংখ্যা ১০০।

রূপান্তরের কাহিনী

প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগে মধ্য এশিয়ার এই একদা যাযাবর কিরঘিজ জাতির এমন অভূতপূর্ব রূপান্তরের কাহিনী আজ সোভিয়েত সমাজ-ব্যবস্থার সাফল্যের এক উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। কিরঘিজদের লিখিত সাহিত্য না থাকলেও, ছিল দীর্ঘ কথ্য মহাকাব্য 'মানাস', যুগ যুগ ধরে তা চারণ কবিদের কণ্ঠে পাহাড়িয়া সুরে গীত হয়ে আসছিল। সোভিয়েত যুগে সেগুলি লিপিবদ্ধ করে গীতসহ রেকর্ডিং করা হয়। আজ এই মহাকাব্য সংরক্ষিত।

১৯১৭ সালে রুশ দেশের সংঘটিত অকটোবর মহাবিপ্লব কিরঘিজিয়ার মতই রুশদেশ ও সমগ্র মধ্য এশিয়ার জাতি-অধিজাতিগুলির সামনে এক মুক্ত, স্বাধীন, সুখী সমাজতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ উন্মুক্ত করে দেয়।

বিশের দশক থেকে সোভিয়েত যুগের কিরঘিজ লেখকদের প্রথম ধারাটি আত্মপ্রকাশ করে। এঁদের মধ্যে সুখ্যাত হলেন আলি তোকোসবাইয়েভ, কাসিমালি বোইয়ালিনভ, মুকাই এলিবাইয়েভ প্রমুখ। কিরঘিজিয়ার কোন লিখিত সাহিত্যের ধারা না থাকায় নব্য কিরঘিজ লেখকদের লিখিত সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস যথেষ্ট দীর্ঘস্থায়ী হবার সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু, সে বাধা অতিক্রম করা যায় রুশ ও ভ্রাতৃপ্রতিম অন্যান্য সোভিয়েত ভাষার সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সক্রিয় সহযোগিতায়। অবশ্য,

চিঙ্গিজ আইতমাতোভ

এ ক্ষেত্রে সব রকমে [illegible] সহায়ক হয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শিল্প সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করার নীতি ও সর্বাত্মক প্রয়াস। একটি রাষ্ট্রীয় 'লোক-গাথা' সংস্থা স্থাপন করে কথা কাব্যকে সংরক্ষিত করা হয়। তারপর, দেশজোড়া নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও সাংস্কৃতিক অভিযানে নব্য কিরঘিজ লেখকরা সক্রিয়ভাবে নামেন। তাই এ যুগের কিরঘিজ সাহিত্যের একটি অবশ্যম্ভাবী বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে পুরাতনের সঙ্গে নতুনের দ্বান্দ্বিক সংঘাত ও অগ্রগতির রূপায়ন। কিরঘিজ নাট্যকলা তিরিশের যুগ থেকে বিপ্লবী-ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু নিয়ে বিকশিত হয়ে ওঠে। রাজধানী ফ্রুঞ্জ শহরে জাতীয় নাট্যশালায় কিরঘিজ অপেরা আই চুরেকের সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রিয় হয় পুশকিনের চিরায়ত কাহিনীর কিরঘিজ অনুবাদে চাইকোভস্কির 'ইউজিন ওনিগিন।'

পঞ্চাশের দশকের শেষপাদ থেকে কিরঘিজ সাহিত্য এক নতুন স্তরে প্রবেশ করে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী এই সাহিত্য জাতীয় ঐতিহ্যবোধ ও আন্তর্জাতিকতাবাদী জাতিগত মৈত্রীর ধ্যান-ধারণায় উদ্বুদ্ধ। সারা সোভিয়েতে কিরঘিজ সাহিত্য আজ তার বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিয়েছে। খ্যাতনামা কিরঘিজ ঔপন্যাসিক চিঙ্গিজ আইতমাতোভ আজ শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নেই নয়, লেনিন-পুরস্কার-বিজয়ী এই ঔপন্যাসিকের নাম আমাদের দেশ ও অন্যান্য দেশেও সুপরিচিত। তাঁর লেখা 'জামিলিয়া' বা 'বিদায় গুলসারি'র মত উপন্যাস শুধু জনপ্রিয় নয় [illegible] বহু দর্শকের প্রশংসাধন্য হয়েছে। এঁরই সমসাময়িক তোলগোন কাসিমবেকোভ প্রমুখরাও খ্যাতিমান।

—বিশেষ প্রতিনিধি

'পিপাসা' / সুনীল গুহ

দরজার দিকে চোখ ফেরাতেই গৃহকর্ত্রীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল শিবনাথ। তাড়াতাড়ি নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে সম্ভ্রমের সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, --'আমাকে বলবেন কিছু?'

—'আপনার হয়ে গেছে?' দরজার সামনে তেমনি দাঁড়িয়েই শুধোলেন তিনি।

ও মনে মনে যা ভেবেছিল, তবে কি তাই? হয়ত তাই। সে কারণে সভয়ে ধীরে ধীরে বলল, ঘণ্টাখানেকের কথা থাকলে কী হবে, ঘণ্টাদেড়েকের আগে আর শেষ হয়ে ওঠে না।'

এবারে গৃহকর্ত্রী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠলেন। এবং চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরের ভিতরে এক পা এগিয়ে বললেন, 'সেটা আমিও লক্ষ্য করেছি অবশ্য, এই নিন।' বলেই ওর দিকে কয়েকখানা দশ টাকার নোট এগিয়ে দিলেন।

নোট ক'খানা হাতে নিতে নিতে বিস্মিত হল ও। এক নজরেই দেখতে পেলো তিনখানা দশ টাকার নোটের বদলে পাঁচখানা। এবং এই অতিরিক্ত দুটির জন্য এই মুহূর্তে আনন্দ বা দুঃখ কোনটি যে ওর অনুভব করা উচিত সেটা ভেবে স্থির করতে না পেরে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে রইল।

গৃহকর্ত্রী স্মিতহাস্যে ঘরের ভিতরে আরো এগিয়ে গেলেন। এবং পাখার স্পীডটা আরো বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনার গরম লাগে না?'

শিবনাথ তেমনি অবাক হয়েই তাকিয়ে ছিল তার দিকে। যেন ও কোন কথাই শুনতে পায়নি। তাই বলল, 'টাকা গুনে আনতে বোধ হয় ভুল করেছেন আপনি।'

অকস্মাৎ জেগে-ওঠা গৃহকর্ত্রীর মুখের হাসিটি মিলিয়ে গেল। বলল, 'কী বলছেন মাস্টারমশাই, ভুল হয়েছে আমার।'

—'না, মানে দশ টাকার নোট পাঁচখানা দিলেন কি না আমাকে।' বলে তেমনি অবাক হয়েই তার দিকে তাকিয়ে রইল শিবনাথ।

ওর সেই দৃষ্টি বরাবর চোখ রেখে গাম্ভীর্যতা হারিয়ে সুকুর মা অর্থাৎ গৃহকর্ত্রী আবার হেসে ফেললেন। বললেন, 'না, আপনি অমন অবাক হবেন না। এ বাড়িতে হিসেবের ভুল হয় না, আপনাকে গুনে গুনেই পাঁচখানা নোট দিয়েছি।'

এতক্ষণে ওর আশঙ্কাটা পুরোপুরি কেটে গেল। ওর ধারণা ছিল যে, বাড়ির লোকের বোধ হয় ওর [illegible] সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল না হওয়ায় মনে ভেবেছে যে, ও আরো বেশী সময় ধরে পড়ানো উচিত। হয়ত বা তারা সৈকতকেও কিছু [illegible] করে থাকবে। এবং একটু আগে যখন গৃহকর্ত্রীকে গম্ভীর মুখাবয়বে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল তখন মনে হয়েছিল, হয়ত বা এবারে ওর বিরুদ্ধে অভিযোগটা উঠবে। তাই ও প্রথম থেকেই আত্মপক্ষ সমর্থনে বক্তব্য সুরু করেছিল। এমন একটা মধুর সমাপ্তির কথা ও কল্পনাও করতে পারে নি।

একটু আগে সৈকত বাইরে গেছে। পড়াশুনা শেষ করেই গেছে। যাবার সময় বলে গেছে, 'মা আপনাকে একটু বসতে বলেছে, কী যেন দরকার আছে।'

ব্যাপারটা আন্দাজ করতে অবশ্য কষ্ট হয়নি ওর। কেননা, মাস শেষ হয়ে গেছে দুদিন আগেই। কোন কষ্ট নেই। স্বচ্ছল পরিবার। স্বামী স্ত্রী আর ওই একটিমাত্র ছেলে সৈকতকে নিয়েই এদের সংসার। সৈকতের বাবা মনে হয় ভালো একটা কিছু চাকরি-বাকরি করেন। অথবা হয়ত ব্যবসা করেন। এসব অবশ্য ও কখনো কাউকে জিজ্ঞেস করেনি। কারণ, এটা ধৃষ্টতার সামিল। গৃহশিক্ষকের এ নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না। যথাসময়ে নির্ধারিত পারিশ্রমিকটা পেলেই যথেষ্ট। অতএব মনে মনে এ ব্যাপারে কিছু আলোচনা করলেও, কাউকে কোন প্রশ্নাদি করেনি।

এমন অপ্রত্যাশিত পাঁচখানা [illegible] টাকার নোট [illegible] রাখতে যথেষ্ট আনন্দবোধ [illegible] একসঙ্গে পঞ্চাশ টাকা রোজগার জীবনে এই প্রথম। কয়েকটা টুইশানীর উপর নির্ভর করেই ও

জীবনে বেঁচে আছে। কোথাও পঁচিশ কোথাও ত্রিশ। তার বেশী নয়। আর এখানে পেলো পঞ্চাশ। সবচেয়ে বেশী। মনটা বেশ ভালো লাগছে।

বাইরে বেরিয়ে এসে সমস্ত ব্যাপারটা আবার পুরোপুরি পর্যালোচনা করতে লাগল। মহিলা কী অদ্ভুত মানুষ। যা ভেবেছিল ঠিক তার বিপরীত। আসলে এ'দের মনের গতিবিধি সম্বন্ধে কিছুই আন্দাজ করা যায় না। টাকা পয়সার কোন অভাব নেই, ফলে একটু খেয়ালী, একটু মেজাজ, একটু অসাধারণত্ব প্রকাশ, কোনটা ওর মধ্যে কিছুই নেই, সেগুলি এ'দের মধ্যে আছে। নইলে বলা নেই, কওয়া নেই, খেয়াল-খুসীর পথ ধরে ত্রিশের পরিবর্তে পঞ্চাশ টাকা ওর হাতে এসে গেল। এ অজানা সম্ভ্রমের সঙ্গে ব্যাপারটাকে গ্রহণ করতে লাগল। কেননা, ত্রিশের পরিবর্তে পঞ্চাশ যেহেতু এসেছে, সেইহেতু সুকুর প্রতি ওর আরো বেশী মনোযোগ দেওয়া উচিত। হয়ত এই ভদ্রমহিলা, এই টাকার পরিবর্তে সেইটেই চান। কারণ, ওঁর এই একটিমাত্র ছেলে, অবস্থা সংসার, শান্ত পরিবেশ, এর

মতো মেয়েকে পড়ানোর একজন করে পড়ে তোলার ইচ্ছেটা ত স্বাভাবিক।

পরদিন আরো তাড়াতাড়ি এসে হাজির হল ও। এসে ঘরে ঢুকে অবাক। এ কি, সন্টু ঘরে নেই কেন? হয়ত খেলা থেকে ফেরেনি এখনো। কিন্তু এটা ত ঠিক নয়। ও না হয় মিনিট পনেরো আগেই এসেছে। কিন্তু সন্টুকে ও যেভাবে নির্দেশ দিয়ে গেছে, সেটা পালন করলে ত ওর এখন ঘরে থাকা উচিত। এত সময় ধরে খেলাধুলো করা উচিত নয়। পড়াশুনোরও একটা রীতিনীতি আছে। তা হলে কী ছেলেটা আসলে অবাধ্য হয়ে গেছে। রোজ আরো পরে আসে বলে কী ও ব্যাপারটা টের পায়নি? না না এটা মোটেই ভালো কথা নয়। ফিরলে ছেলেকে নিশ্চয় শাসন করতে হবে আজ। কারণ, শুধু লেখাপড়াই নয়, স্বভাব চরিত্র গঠনও ওর কাজের আওতায় পড়ে।... এবং যেহেতু এই পরিবার সমর্থ্য অনুযায়ী আপনা থেকেই কাঞ্চনমূল্য করতে রাজি থাকে, সেইহেতু এসব ব্যাপারেও সন্টুর প্রতি ওর নজর দেওয়া উচিত।

আশ্চর্য এখনো ফিরল না ছেলেটা। ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে এসে মনে মনে হিসেব করে দেখল পুরো পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেছে। ও বসে আছে সেই থেকে। ভয়-ডর বলে ছেলেটার কি কিছু নেই? বাড়ির পরিবেশ এবং নৈঃশব্দ ওকে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে ছেলেটা বাড়িতে নেই। খুবই দুশ্চিন্তার কথা। হয়ত বাপ-মার শাসনকেও কোন পরোয়া করে না ছেলেটা। ঘরে অন্ধকার ঘনীভূত হল। এখনো ফিরছে না। ঘরের সুইচটা টিপল না। একদিন অন্ধকারে মন্দ লাগছে না ওর।

—'আপনি একা একা বসে আছেন?' গৃহকর্ত্রীর কণ্ঠস্বর। অবাক হল না শিবনাথ। এতক্ষণে অবশ্য সন্টুর আসা উচিত ছিল। আসেনি কেন, সেটাও বুঝতে পারছে না ও। এত রাত অবধি এইটুকুন ছেলে খেলাধুলোর নাম করে বাইরে থাকে নাকি? হয়ত তিনি এখন সেই অভিযোগটাই তুলবেন। ও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বিনীত ভঙ্গিতে বলল, 'বসে আছি, সন্টু ত আসেনি এখনো।'

—'ও পড়বে না আজ।'

পড়বে না। পড়ার সময় ছেলে পড়বে না। অথচ এইটুকুন ছেলের লেখাপড়ার জন্য এত খরচ করা হয়। মনে মনে শঙ্কিত হল ও। বলল, 'ওর শরীরটা কি...।'

—'না তা নয়, ও একটু বেড়াতে গেছে।'

—'বেশ বেশ, মাঝে মাঝে এক-আধটুকু বেড়ানো মন্দ নয়।' ও আশ্বস্ত হল। অনেকক্ষণ থেকে বসে বসে মনটা সামান দুশ্চিন্তায় ভরে উঠেছিল। তাছাড়া কৃতজ্ঞতা বলেও একটা কথা আছে। কাল এমনি সময়েই ইনি ওর হাতে ত্রিশের পরিবর্তে পঞ্চাশ গুঁজে দিয়েছেন। এই মনটুকু ওর মনে রাখা উচিত। ও তাড়াতাড়ি সুইচ টিপে দিল। বাতি এবং পাখায়। ভদ্রমহিলা হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠলেন। ও বিব্রত বোধ করল। কোন কথা যোগালো না মুখ থেকে। এমন কি সহজ দৃষ্টি নিয়ে যে তাঁর দিকে তাকাবে সে সাহসও হারিয়ে ফেলেছে।

হাসি থামিয়ে রমাদেবী বললেন, 'এই অন্ধকার ঘরে চুপচাপ বসে আছেন?'

—'না। কোন অসুবিধে হচ্ছিল না আমার।'

—'কিন্তু আমার হচ্ছিল।' রমাদেবীর কণ্ঠস্বর সংযত ও গম্ভীর।

অসুবিধে হচ্ছিল গৃহকর্ত্রীর। হতে পারে। কারণ, এভাবে সৈকতহীন নির্জন বাড়িতে বসে থাকাটা ওর উচিত হয়নি। হাজার হোক ইনি মেয়েছেলে ত। হয়ত আর কেউ নেই বাড়িতে। অন্তত নির্জনতার ধরনে তাই মনে হয়। এ কারণে ওর এভাবে বসে থাকাটা নির্লজ্জতার নামান্তর। তাই যাওয়ার ভঙ্গীতে নিজেকে উপস্থাপিত করে মেঝের দিকে চোখ রেখে বলল, 'সন্টু কি কাল ফিরে আসবে?'

—'এ কি আপনি বলছেন যে, অন্ততঃ এক-দেড় ঘন্টা তো আপনাকে থাকতে হয় এখানে।' রমাদেবীর কণ্ঠস্বর তেমনি কঠিন কঠোর।

ওর মুখে আর কোন কথা যোগালো না। ফিরে গিয়ে আবার চেয়ারে বসল। সত্যি বোধ হয় ভুল হয়ে গেছে। মাথার উপর থেকে পাখাটা যথেষ্ট হাওয়া দিচ্ছিল। তবু কেমন যেন গরম বোধ হচ্ছিল ওর। মহিলাকে বেশ অদ্ভুত মনে হল। কাজ নেই, তবু বসে থাকতে হবে। হ্যাঁ, কাল ইনি বলছিলেন বটে যে, এঁদের হিসেবে ভুল হয় না।

ভুল হয়নি। পঞ্চাশ টাকার পরিবর্তে কম করেও ওকে দেড় ঘন্টা বসে থাকতে হবে। এঁরা বড়লোক, এঁরা ওর মত একজন গরীব গৃহশিক্ষককে টাকা দেয়। এমন কি খেয়ালের বশে ত্রিশের পরিবর্তে পঞ্চাশ দিতেও কোন অসুবিধে বোধ করেন না। অবশ্য এতে ওর কোন অসুবিধে বোধ করা উচিত নয়। কিন্তু কেমন যেন এক অস্বস্তিবোধ গোপনে ওকে দংশন করছে। একেবারে নির্জন একটা বাড়ি। মনে হয় ইনি ছাড়া এ বাড়িতে আর কেউ নেই। সৈকত থাকলে তবু বাড়িটার মধ্যে কিছু একটা সজীবতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আজ যেন এক বিরাট নৈঃশব্দ বাড়িটার ভেতর ছড়িয়ে পড়েছে। যে অস্বস্তিকর যন্ত্রণাটা এখন ও অনুভব করতে পারছে।

ভদ্রমহিলা আবার বললেন, 'আপনি বসুন, আমি আপনার চা নিয়ে আসছি।'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ও। কিন্তু তার আগেই রমাদেবী দ্রুত পায়ে বাড়ির ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সৈকত যখন নেই, তখন বসে থাকার কোন দরকার আছে কী। শুধু শুধু ইনি আবার চা বানাতে গেলেন। কষ্ট হবে নিশ্চয়। কিন্তু এ ব্যাপারে ওর ত করণীয় কিছু নেই। এই এতবড় বাড়ি, ঐশ্বর্য বিলাসের ত কোন অভাব নেই, অথচ মনে হয় বাড়িতে মানুষ নেই। সৈকতের বাবাকে ও দেখেনি কখনো। টুইশানীটা নেবার সময় রমাদেবীর সঙ্গেই কথাবার্তা হয়েছে। ভদ্রমহিলাকে প্রথম থেকেই কেমন যেন একটা উদাস উদাস ভাব মনে হয়েছিল। প্রায়ই এলোমেলো কথাবার্তা বলেন। বড়লোকদের এসব রোগ অবশ্য থাকে। অথচ জামাকাপড়ে খুবই ফিটফাট থাকেন। মাঝে মাঝেই ওর নজরে পড়ে। এই ঘরেরই আশপাশ দিয়ে এদিক-ওদিক যেতে ওর লক্ষ্য পড়েছে।

সৈকত এ বাড়ির একমাত্র ছেলে। ছেলেকে মানুষ করার প্রচেষ্টা রমাদেবীর আছে। প্রথম দিনে বলেছিলেন, 'আমার সব আশা-ভরসা কিন্তু এর উপর, আপনার হাতে দিলুম, লেখাপড়া শিখে যাতে মানুষ হয় সেইটে দেখবেন।'

—'আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব।' ও বলেছিল।

—'মানুষের চেষ্টায় সবকিছু হয়।'

ওর তখনি মনে হয়েছিল মহিলা বুঝি বা কিছু বেশী কথা বলেন। মানুষের চেষ্টায় সব হয় এটা কোন কাজের কথা নয়। ও আজ কয়েক বছর ধরে একটা চাকরির চেষ্টা করছে। কিন্তু পাচ্ছে কী? পাচ্ছে না। অথচ এটা ওর জীবন-মরণ সমস্যা। মানুষের সমাজে মানুষের মত বাঁচবার জন্য একটা চাকরি। সে-ও জোটাতে পারছে না। দিনের পর দিন শুধু দরখাস্ত করে চলেছে। দুপুরের দিকে প্রায় রোজই এ আপিসে, ও-আপিসে ধর্ণা দিয়ে বেড়াচ্ছে। কেউ কি কোন রকম একটু আশা দিচ্ছে ওকে? সবই বৃথা।

আর এঁরা কী আনন্দে দিন কাটাচ্ছে। অর্থ, সুখ শান্তির অভাব নেই এ বাড়িতে। এই এতবড় বাড়িটার প্রায় তিনজন মানুষ
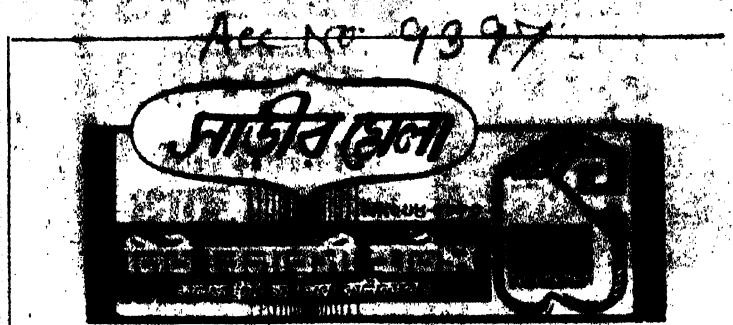
বাস করে। নিঝ‌ঞ্ঝাট সংসার। স্বামী-স্ত্রী আর ও'দের একমাত্র সন্তান সৈকত। বাড়ি যেমন আছে। গাড়িও আছে তেমন। ত্রিশ টাকার জায়গায় পঞ্চাশ টাকা ছুঁড়ে দিতে এ'রা কোন দ্বিধা বোধ করেন না। অথচ ও এই কুড়িটা টাকাকে কী অভাবনীয় পরম সম্পদ বলেই না মনে করে। দেশে বিবাহ-যোগ্যা একটি ছোট বোন আর মা কী কষ্টেই না দিনযাপন করছে। এই কয়েকটা টাইশানীর টাকা থেকে নিজের খরচ চালিয়ে ওখানেও কিছু টাকা পাঠাতে হয়। তাতে মা-র যে কী কষ্ট হয় সেটা বোঝে।

রমাদেবী চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। ওকে এক কাপ দিয়ে নিজেও এক কাপ নিয়ে ওর মুখোমুখি বসলেন। ও কুণ্ঠিত হল। এতটা আশা করেনি। এমন কি কাপটা নিয়ে ও'র সামনে বসে যে খাবে তাতেও সঙ্কোচ বোধ করছিল। রমাদেবী দেখে বললেন, 'একি আপনার চা যে জল হয়ে যাচ্ছে, খান।'

কথা শুনে ও যেন চমকে উঠল। বলল, 'ওঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ।' বলে চায়ের কাপটা টেনে নিয়ে উপর্যুপরি চুমুক দিতে লাগল। আবার পরক্ষণেই ভাবল না এটা ঠিক হচ্ছে না। যদিও ওর তেমন চায়ের অভ্যাস নেই, শুধু কোন কোন সময় ও খায় বটে। তবে এভাবে একজন ভদ্রমহিলার সামনে বসে ঠিক অভদ্রের মত খাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না।

হয়ত ইনি কিছু মনে ভাবলেন। অতঃপর চায়ের কাপটা রেখে আবার বলল, 'এখন যাই তাহলে?'

—'কেন খুব কি কাজের তাড়া আছে?'

—'না তেমন কিছু নেই, তবে...।'

—'আপনার কি খুব খিদে পেয়েছে?'

—'না, মানে চা-টা আমি ওভাবেই খাই।' মনে মনে লজ্জিত হল শিবনাথ। নিশ্চয় ওর চা খাওয়াটা দেখে ইনি নিশ্চয় কিছু ভেবেছেন। সেটা লজ্জাকর ব্যাপার।

রমাদেবী হাসলেন। বললেন, 'তবে আর এত যাই-যাই করছেন কেন?'

—'না মানে আপনারও ত অনেক কাজ রয়েছে' আমি থাকলে হয়ত...।'

এবারে শিথিল করে হেসে উঠলেন রমাদেবী। তাঁর দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হল শিবনাথ। এ কি, এমন করে একজন বিশিষ্ট মহিলা হাসতে পারেন নাকি? আরো আশ্চর্যের ব্যাপারটা ওর এতক্ষণ বাদে লক্ষ্য পড়ল। এ'র বেশভূষা ঠিক মার্জিত বলা চলে না। হাজার হোক ওর নিজেরও ত বয়স হয়েছে।

ওর সামনে ঠিক এমন করে আসাটা তাঁর উচিত হয় নি। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল শিবনাথ। বাইরে জানালা দিয়ে দৃষ্টিটা রাখতে পাশের বাড়ীর দেয়ালে ঠেকল তা। এ ছাড়া অন্ধকার ত আছেই। তবু সেখান থেকে দৃষ্টিটা ফিরিয়ে আনল না। রমা দেবী আবার শুধালেন, 'আপনার কি ভাল লাগছে না?'

—'হ্যাঁ, খুব ভাল লাগছে।' মুখ ঘুরিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টিটা রেখেই উত্তর দিল ও।

—'জানেন, এখনো আমাকে মাঝ রাত অবধি এ বাড়ীতে একা একা বসে থাকতে হবে।'

—'তাই বুঝি।' এখনো শিবনাথের দৃষ্টি তেমনি অন্ধকারে ঢাকা দেয়ালে আটকানো।

—'সুকুর বাবা ফিরবেন সেই রাত বারোটা কি একটা অথবা দুটোও হতে পারে।'

—'রাতের রূপ খুব বেশী রকম হয়?'

—'আশ্চর্য!' রমা দেবী শুষ্ক হাসি হাসলেন। বললেন, 'কাজ ছাড়াও যে বাইরে পুরুষমানুষ আরো অনেক কারণে বেশী রাত অবধি থাকতে পারে, সেটা বোধ হয় আপনার ধারণার অতীত।'

কী একটা ব্যাপার যেন বুঝতে পেরেও ঠিক বুঝতে পারছে না শিবনাথ। বাইরে থেকে দৃষ্টিটা ফিরিয়ে এনে আরেকবার তাকালো রমা দেবীর দিকে। কোন এক অদৃশ্য অন্তরালে যেন এক ভয়ঙ্কর ঝড়-ঝঞ্ঝা বয়ে চলেছে। যার-ঠিক-ঠিকানা ওর কাছে নেই। অথচ রমা দেবীর জানা আছে। যার ফলে মহিলার চোখ দুটো যে পরিমাণ ভয়ার্ত, সে পরিমাণ উদভ্রান্ত। না, সেই চোখ জোড়ার দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না। দৃষ্টিটা আবার সরে গেল ওর।

ওর মনে হল এক নির্জন নৈঃশব্দ নিয়ে বাড়ীটা যেন এখন কাঁপছে। ওর এখন এখান থেকে যাওয়া উচিত। এই মহিলার সঙ্গে এমনি নির্জনে মুখোমুখি বসে থাকাটা খুব শোভনীয় নয়। বরং কেউ যদি একে অ-শোভনীয় বলে অভিহিত করে তা হলে তাকে কোন দোষ দেওয়া যাবে না। সৈকত নেই। বেড়াতে গেছে। একথা শোনার পরেই ওর চলে যাওয়া উচিত ছিল। এই মহিলার জন্য যাওয়া হয় নি। এখনো বসে আছে। সে-ও এই মহিলার জন্যই। মনে মনে ক্ষুব্ধ হতে থাকল শিবনাথ।

—'কাল কি সৈকত ফিরবে?' শিবনাথের প্রশ্ন।

—'কি জানি, হয়ত ফিরবে।' রমা দেবীর উত্তর।

—'কাল কি আমি আসব?'

—'রোজই ত আপনার আসা উচিত।'

শিবনাথ যেন নিজের ভিতরে নিজেই একটি ধাক্কা খেলো। ওর জানাই ছিল, এবং যেহেতু ইনি আগেই বলেছেন যে, এ'দের হিসেবের ভুল হয় না। অতএব ত্রিশ দিনের আসা-যাওয়ার হিসেবটা নিশ্চয় মিলিয়ে নিতে চান। আর তাই রোজই ওর আসা উচিত। সৈকত আসুক বা না আসুক, ওকে অন্তত একবার এসে হাজিরা দিয়ে যেতে হবে।

বাইরে বেরিয়ে এসে ওর মনে হল কোন এক প্রাচীন অন্ধকার গুহায় বুঝি ও আটকা পড়ে গিয়েছিল। বাইরের আলোতে আকাশের নীচে বেরিয়ে আসবার জন্য মনটা ছটফট করছিল। পারছিল না। কেন? না, সৈকতের মা রমা দেবী একটা [illegible] পাথরের উপর ওর বেরিয়ে আসার পথটা আগলে দাঁড়িয়েছিলেন। [illegible] হাঁটতে হাঁটতে নিজেকে [illegible] চারিদিকে তাকিয়ে দেখল [illegible] সজীব ও সচেতন। অনেক রাত অবধি অনেক কারণে মানুষ বাইরে থাকতে পারে। কথাটা মনে হতেই কেমন যেন ভদ্রমহিলার

পার্লে গ্লুকো—
আরো বেশী
ভাল স্বাদ—
অনেক বেশী
পুষ্টিকর

সবসময়েই
ভিটামিন, প্রোটিন ও
ক্যালসিয়ামে ভরপুর—
দুধ, গম, চিনি ও
গ্লুকোজের পুষ্টিগুণে
সমৃদ্ধ।

PARLE
BISCUITS
Gluco

পার্লে গ্লুকো বাচ্চাদের হেসে-
খেলে বেড়ে ওঠার মজার সাথী

বিস্কুট পার্লে গ্লুকো

সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল

কলকাতার কয়েকটি চার্চ

সন্তোষ চক্রবর্তী

জনকল্লোলে মুখরিত কলকাতার এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে খৃষ্টীয় ভজনালয়গুলি—দাঁড়িয়ে আছে হাজার ঘটনার নির্বাক সাক্ষী হয়ে, মুনির মৌনতা নিয়ে, ধ্যানমগ্ন তপস্বীর গুরু-গাম্ভীর্যে তাদের আকাশচুম্বী চূড়াগুলি ঈশ্বরের কাছে মানুষের প্রার্থনা প্রেরণের ব্যাকুলতার প্রতীক।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলকাতাকে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের কেন্দ্র হিসাবে বেছে নেওয়ার কিছুদিন পর থেকেই কলকাতায় গীর্জা নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৭০৭ খৃঃ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলকাতাকে একটি পৃথক প্রেসিডেন্সী বলে ঘোষণা করেন। ততদিনে পুরোন কেল্লা (যার স্থানে দাঁড়িয়ে আছে আজকের জেনারেল পোস্ট অফিস) ও তার আশপাশের অঞ্চল ঔপনিবেশিকদের কল্যাণে বেশ জমজমাট। তাই ইংরেজের প্রথম গীর্জাগৃহ নির্মিত হয় বর্তমান রাইটার্স বিল্ডিংসের পশ্চিম পার্শ্বে। ১৭০৯ খৃঃ ৫ জুন এই চার্চটি সেন্ট অ্যানের নামে উৎসর্গীকৃত হয়। এই গীর্জাগৃহ নির্মিত হয়েছিল ঐ স্থানে বসবাসকারী বণিকদের বদান্যতার এবং নাবিকদের খৃষ্টীয় হিতৈষণায় (ক্যাপ্টেন হ্যামিল্টন)। প্রায় বত্রিশ বছর ধরে এই চার্চটি ছিল 'ক্যাথিড্রাল অব ডায়োসিস'।

এই চার্চটিকে কিন্তু বিবিধ দুর্বিপাকের শিকার হতে হয়েছিল। ১৭৩৭ খৃঃ প্রচণ্ড ঝড়ে গীর্জার চূড়াটি ভেঙে পড়ে। তারপর শেষ আঘাত আসে ১৭৫৬ খৃঃ সিরাজ-উদ্দৌলার কলকাতা আক্রমণের সময়ে। সিরাজের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল ইংরেজের দুর্গ। ইংরেজ সেনারা এই গীর্জার উপরে কামান বসিয়েছিল মুসলমান সৈন্যদের আক্রমণের জন্য। কিন্তু শীঘ্রই সিরাজের সৈন্যদের প্রচণ্ড আক্রমণে মুহ্যমান পড়তে হয়। ১৮ জুন, গীর্জাটি ছিল ইংরেজের আক্রমণ রচনার প্রধান কেন্দ্র, ১৯ জুন সিরাজ-সৈন্য দুর্গ আক্রমণ করে গীর্জাগৃহ থেকে। কলকাতার পতনের সঙ্গে সঙ্গে গীর্জাগৃহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

কলকাতায় প্রথম অ্যাংলিকান চার্চ প্রতিষ্ঠার পূর্বে ভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক আরও দুটি খৃষ্টীয় ভজনালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সেগুলি হল, আর্মেনীয় সম্প্রদায়ের 'আর্মেনীয়ান চার্চ অব সেন্ট ন্যাজারেথ' এবং পর্তুগীজ সম্প্রদায়ের মুর্গীহাটা চার্চ। কলকাতা আক্রমণের সময়ে এ দুটি চার্চের বিশেষ কোনও ক্ষতি হয়নি। ১৭৫৭ খৃঃ কলকাতা পুনরুদ্ধারের পর ইংরেজ রোমান ক্যাথলিকদের সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে এবং পর্তুগীজ চার্চটি বেদখল করে নেয়। ১৭৬০ খৃঃ কোর্টের আদেশানুসারে পর্তুগীজদের পুনরায় চার্চটি ফিরিয়ে দেওয়া হলে এ্যাংলিকানদের ঈশ্বর আরাধনার জন্য খুব অসুবিধায় পড়তে হয়। ফলে, কাজ চালাগোছের একটি চ্যাপেল, যার নাম দেওয়া হয়েছিল 'সেন্ট জনস চ্যাপেল', ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্গের অভ্যন্তরেই প্রতিষ্ঠা করা হল। সেণ্ট জনস চার্চ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই চ্যাপেলই ছিল কলকাতার প্রেসিডেন্সী চার্চ।

সাত বছর কেটে গেল, চার্চ প্রতিষ্ঠার কোনও উদ্যোগই ইংরেজের মধ্যে দেখা গেল না। ইতিমধ্যে ১৭৫৮ খৃঃ মাদ্রাজ থেকে ক্লাইভের আমন্ত্রণে রেভাঃ জন জ্যাকারিয়াস কিয়েরনাণ্ডার নামে একজন সুইডিশ মিশনারী এসেছেন কলকাতায়। তখন রেভাঃ হেনরী বাটলার এবং রেভাঃ জন [illegible] মুর্গীহাটার রোমান ক্যাথলিক চার্চে ইংরেজদের ধর্মীয় উপাসনা পরিচালনা করতেন। তাঁদের অনুমতি নিয়ে কিয়েরন্যাণ্ডার রোমান [illegible] ভাষায় রবিবার [illegible] করেন। প্রায় দু মাস [illegible] পর তিনি মুর্গীহাটায় একটি [illegible] প্রতিষ্ঠা করেন, যার ছাত্রসংখ্যা এক [illegible] হয়ে যায়। ১৭৬১ খৃঃ তাঁর স্ত্রী [illegible] কলেরা মহামারীতে মৃত্যু কিয়েরন্যাণ্ডারের পক্ষে শাপে বর হয়েছিল। কারণ, [illegible] তিনি মিসেস অ্যান উলি নামে এক ধনাঢ্য বিধবাকে বিবাহ করেন। এই দ্বিতীয় স্ত্রীর আর্থিক আনুকূল্যে কিয়েরন্যাণ্ডারের চার্চ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সার্থক হয়।

অনু ১৭৬৭ খৃঃ আগে তিনি চার্চ তৈরীর কাজে উদ্যোগী হন নি। বর্তমান মিশন রোতে নিজ অর্থে তিনি চার্চ নির্মাণোপযোগী স্থান ক্রয় করেন। ঐ মাসে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয় কলকাতার প্রথম প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চের। খরচ হয়েছিল প্রায় ৬৮,০০০ টাকা, তার মধ্যে কিয়েরন্যাণ্ডার নিজে দিয়েছিলেন ৬৫,০০০ টাকা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এর স্থপতি গীর্জাসহ নির্মিত হওয়ার পূর্বেই মারা যান, ফলে অসম্পূর্ণ এই গীর্জাটি কোনও অলঙ্করণই লাভ করতে পারেনি। কিয়েরন্যাণ্ডার এর নাম দেন 'বেথ টেফিল্যা' (এই হিব্রু কথাটির অর্থ হল প্রার্থনাগৃহ), কিন্তু সাধারণ্যে এটি তখন 'ওল্ড চার্চ' নামে পরিচিত হয়। ১৭৭০ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে যখন এটি উৎসর্গীকৃত হয়, তখন এর অভ্যন্তরে বসার উপযোগী কয়েকটি অমসৃণ বেঞ্চ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সেজন্য এই চার্চটি ইউরোপীয়দের খুব মনঃপূত হয়নি। কথিত আছে, এর সামনের দিকের পাথর লাল ছিল বলে একে বলা হত 'লাল গীর্জা'। এই লাল গীর্জার লাল পাথরের ছায়া এসে পড়ত সামনের পুষ্করিণীতে (এই থেকে তার নাম হয়েছে 'লাল দীঘি'—তখন নাকি এই চার্চের সামনে কোনও ইমারত নির্মিত হয়নি)।

১৭৭৩ খৃঃ জুন মাসে কিয়েরন্যাণ্ডারের দ্বিতীয় স্ত্রীও মারা যান। অন্যহস্তে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ কিয়েরন্যাণ্ডার তাঁর মৃত স্ত্রীর অলঙ্কারাদি বিক্রয় করে যে ৬,০০০ টাকা পান, তাতে লাল গীর্জার পিছনের দিকে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু, তার পরেই তাঁর উপরে নেমে আসে দুর্ভাগ্যের ছায়া। তাঁর পুত্র রবার্টের এক ব্যবসায়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে গিয়ে তিনি একটি বন্ধকী খত লিখে দেন। ব্যবসা কিছুদিনের মধ্যেই উঠে যায়, ফলে [illegible] শেরিফের নির্দেশানুসারে চার্চ [illegible] হুকুমনামা জারী করেন। তাঁর [illegible] চার্চটিকে এই দুর্দশার হাত [illegible] করেন মালদহের চার্লস গ্রাণ্ট নামে [illegible] ব্যক্তি। ১৭৮৭ খৃঃ ৩১ [illegible] মিশন চার্চ তিনজন ট্রাস্টির উপরে [illegible] হয়, এঁরা [illegible] রেভাঃ ডেভিড ব্রাউন, [illegible] চেম্বার্স [illegible] চার্লস গ্রাণ্ট।

[illegible] খৃঃ [illegible] হয়। একটি [illegible] নির্মিত [illegible] ১৮৬৭ খৃঃ [illegible] এই [illegible] হয় যে, চূড়াটি নামিয়ে ফেলতে হয়। গীর্জা—

তেরো

প্ল্যাটফর্মে মুক্ত স্টলের পাশে রীতাবরী ঠায় দাঁড়িয়ে। পা দুটো স্থির...কিন্তু চঞ্চল চাউনি। এদিকে-সেদিকে কখনও বা পথের পানে সাগ্রহে তাকাচ্ছে।

দূর থেকে ওকে দেখতে পেয়ে কিরণ একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল। কবে রীতাবরী বলেছিল, ঠোঁটের কোণে সিগারেট চেপে ধরে কিরণ যখন কথা বলে, কিম্বা পথ হাঁটে তখন ওকে বেশ স্মার্ট, আরো সুন্দর দেখায়। সেই থেকে কিরণ দারুণ সচেতন। রীতাবরীর সামনে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন সিগারেট খায়, ...বেশ নিপুণভাবে ছোট-বড় ধোঁয়ার রিং ছাড়ে। রীতাবরী ফের তারিফ করবে এই আশায় ওর মুখের দিকে বার বার তাকায়।

জ্বলন্ত সিগারেটটা হাতে নিয়ে কিরণ ধীরে ধীরে পা ফেলতে লাগল। মাঝে মাঝে সেটা ঠোঁটের ফাঁকে চেপে ধরে মৃদু টান দিচ্ছিল। আসলে তার মন-মর্জি ভালো নয়। মেজাজটা কেমন খিঁচড়ে আছে। গতকাল রাত থেকেই তাদের বাড়ির আবহাওয়াটা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। হাসি-তামাশা নেই। সকলেই কেমন গম্ভীর। তার ছোট বোন স্মিতি দিন রাত বক বক করে। সব ব্যাপারেই কথা বলে। কারণে-অকারণে হি-হি করে হাসে। কিন্তু সকাল থেকে সে-ও ঠিক পেঁচার মত চুপ। মুখ শুকনো করে বাড়ির এককোণে বসে আছে।

রবিবার সকালে তাদের বাড়িতে চায়ের জমাটি আড্ডা বসে। বারান্দায় মেঝের উপর মা চায়ের সরঞ্জাম পাতে। কেটলিতে জল গরম হ'লে স্মিতি সকলকে ডাকে। টেবিলের চারপাশে তার বাবা, দাদা, এমন কি ছিরুও এসে বসে। টি-পটে চায়ের পাতা ভিজতে দিয়ে মনোরমা পাঁউরুটি সেঁকতে শুরু করে। পাতলা করে রুটিতে মাখনের প্রলেপ লাগায়। তারপর ধীরে ধীরে কাপে চা ঢালে, স্মিতি চায়ের পেয়ালা-গুলো তার বাবা, দাদাদের কাছে এগিয়ে দেয়।

কিরণ অবশ্য লেট-রাইজারদের দলে। সাড়ে সাতটার আগে কদাচিৎ শয্যা ত্যাগ করে। ছুটির দিনে আরো দেরী,—আটটা-নটা অব্দি বিছানায় শুয়ে থাকে। তবু মনোরমা তাকে খুঁজে নিতে চেষ্টা করে। চায়ের জল হ'লে নিজে গিয়ে ছেলেকে ডাকে। বলে,—'ও কিরণ, ওঠ বাবা। আর কত ঘুমোবি? অনেক বেলা হয়েছে, এক-বার তাকিয়ে দেখেছিস?'

তার বাবা ঠাট্টা করে বলেন,—'মিছিমিছি ওকে ডাকছ। তোমার মেজছেলের কুম্ভ-কর্ণের নিদ্রা। আরো এক ঘণ্টা আগে বিছানা ছেড়ে উঠবে বলে মনে হয় না।'

সবটা ঘুম নয়,...কিছুটা আলসেমী। আসলে বেলা একটু না হলে কিরণের বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করে না। মা বেশী ডাকাডাকি করলে সে মিট-মিট করে তাকায়। ফের চোখ বুজে বলে,—'আমাকে এক কাপ চা এখানেই পাঠিয়ে দাও না।'

মনোরমা বিরক্ত হয়, অপ্রসন্ন মুখে গজ-গজ করে,—'কি ছাই অভ্যাস হয়েছিস, তুই জানিস। বাসি মুখে আবার চা খেতে আছে নাকি?'

মুখে আপত্তি জানালেও মনোরমা চা পাঠাতে দেরী করে না। মিনিট দুই-তিন পরেই স্মিতি এসে ঘরে ঢোকে। [illegible] চায়ের পেয়ালাটা টেবিলের উপর [illegible] রাখে। একটু মজা করে দাদাকে [illegible] বলে,—'ও মেজদা, তোমার [illegible]টি মুখে দেবার। তাড়াতাড়ি খেও। [illegible] কিন্তু ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

[illegible] আটটা। বিছানায় শুয়ে চোখ [illegible] কিরণ তার বাবাকে সামনে দেখল। [illegible] স্যুট। তবু আগাগোড়া ঠিক তার [illegible] নি। বাবা তো কোনোদিন তাকে [illegible] ডেকে তোলেন না। তাহলে কি সে [illegible] দেখছে? কিম্বা কাল রাত্তিরে [illegible] ব্যথাটা ফের বেড়েছিল। তাই সকাল হতেই

অসুস্থ শরীরের সংবাদ বাণীব্রত ছেলেকে জানাতে এসেছেন।

কোনো রকম ভনিতা না করে বাণীব্রত বললেন,—'একটু তাড়াতাড়ি ওঠ কিরণ। তোর মার বোধহয় শরীরটা ভালো নয়। এখনও বিছানা ছেড়ে ওঠে নি। মনে হয় জ্বর-টর এসেছে।'

মার শরীর ভালো নয়? কি হয়েছে মায়ের? কিরণ মুহূর্তে বিছানার উপর উঠে বসল। তার কপালে চিন্তার রেখা দেখা দিল। মায়ের জ্বর এল কখন? কাল রাত্তিরে? সে ভুরু কুঁচকে শুধোল,—'তুমি টেম্পারেচার দেখেছ বাবা?'

—'টেম্পারেচার দেখি নি কিরণ।' বাণী-ব্রত মাথা নেড়ে বললেন। 'কিন্তু আমার যেন গা-টা গরম মনে হচ্ছে। তুই [illegible] না একবার তোর মাকে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখবি।'

ঘড়িতে প্রায় আটটা বাজে। এত বেলা পর্যন্ত তার মা কোনোদিন বিছানায় শুয়ে থাকে না। শরীর খারাপ তো নিশ্চয়। এবং কিঞ্চিৎ বেশী রকমের [illegible], নইলে মনোরমা বিছানায় পড়ে থাকবার পাত্রী নয়।

চোখ দুটি বোজা। শুকনো ঠোঁট। মনোরমা নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। কিরণ মায়ের মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে [illegible] যেন মনোরমার [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

কিন্তু মনোরমা ততক্ষণে চোখ মেলেছে। চারদিকে এত আলো, আর রোদ্দুর। [illegible] সে লজ্জিত মুখে বলল,—ইস, ছি! কত

কেন হয়েছে। তোরা আমাকে কেউ ডাকিস নি কেন?'

মা উঠে বসবার চেষ্টা করতেই কিরণ তাড়াতাড়ি বলল,—'এখন উঠো না মা। আগে তোমার টেম্পারেচারটা নিই। মনে হয় এখনও কাছাকাছি জ্বর আছে।'

ছেলের চিন্তাভাবনা দেখে মনোরমার ভালো লাগল। কাল শেষ রাত্তিরে তার কেমন শীত-শীত করছিল। গলাটা শুকনো মনে হল। উঠে খেয়েছিল এক গ্লাস ঠান্ডা জল। জ্বরটা বোধহয় তখনই এসেছে। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল মনোরমা, কি সব স্বপ্ন দেখেছে অর্থহীন, দুঃস্বপ্ন দেখেছে। তার এখন বিছানা ছেড়ে উঠতে গিয়ে মাথাটা ভারী, পায়ে-হাতে প্রচণ্ড ব্যথা মনে হচ্ছে।

কিরণ থার্মোমিটার বের করে পারদের অবস্থান লক্ষ্য করছিল। কিন্তু মনোরমা তার অপেক্ষা না করে বিছানার উপর উঠে বসল। অবাধ্য মেয়ের মত বলল,—'কি হবে জ্বর দেখে আমার? তারচেয়ে একটা বড়ি-টড়ি এনে দে। খেয়ে মাথার যন্ত্রণাটা কমলে আমি রান্নাঘরে ঢুকি।'

'রান্নাঘরে ঢুকবে মানে?' কিরণ ভুরু কোঁচকাল। 'উনুনের আঁচে এখন কাজ করলে আর দেখতে হবে না। তোমার মাথার যন্ত্রণা আর টেম্পারেচার দুই বেড়ে যাবে।'

—'তুই খুব ঠিক কিরণ।' মনোরমা ছেলের আশঙ্কা প্রায় অস্বীকার করতে চাইল। 'আমি রান্নাঘরে না ঢুকলে তোরা দুপুরবেলায় খাবি কি?' ফের মৃদু হেসে ছেলেকে শুধোল,—'হ্যাঁরে, আজ সকালে তুই, মিলু, হিরু, বিন্তি, তোর বাবা সবাই চা-টা খেয়েছিস তো?'

মায়ের কথার উত্তর দিতে গিয়ে কিরণ বার-দুই ঢোক গিলল। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মনোরমা আর একটি মুহূর্তও অপেক্ষা করল না। বিছানা থেকে নেমে সোজা বাথরুমে গিয়ে ঢুকল।

বারান্দার চেয়ারে বসে মিলন খবরের কাগজের পাতা উল্টোচ্ছিল। কিরণ ঘর থেকে বেরোতেই সে প্রশ্ন করল,—'কি রে, মাকে কেমন দেখলি?'

—'কি দেখব বল?' কিরণকে একটু দুঃখিত মনে হল। সে অভিযোগ করে বলল,—'মা কি কারো কথা শুনবে দাদা? গায়ে একশ'র মত জ্বর। একটু বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু রোগ-অসুখকে মা গ্রাহ্যই করে না। এখন রান্নাঘরে গিয়ে উনুনে আঁচ দেবে বলছে।'

মিলনকে ঈষৎ চিন্তিত দেখাল। সে জিজ্ঞাসা করল,—'মায়ের হঠাৎ জ্বর হল কেন? ঠান্ডা লেগেছে নাকি?'

—'ঠান্ডা লেগে জ্বর হতে পারে। কিছু অসম্ভব নয়।' কিরণ অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মত রায় দিল। পরে সে মন্তব্য করল,—'কিন্তু মনের উত্তেজনা বেশী হলেও অনেক সময় শরীর খারাপ হতে পারে।'

—'মনের উত্তেজনা?'

—'উত্তেজনা বৈকি।' কিরণ এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাছাকাছি কেউ আছে কিনা চট করে দেখে নিল। ফের গলা খাটো করে বলল,—'কাল রাত্তিরে হিরুর ব্যবহারে মা আর বাবা দুজনেই খুব আঘাত পেয়েছে দাদা। আমার তো মনে হল বিছানায় শুয়ে মা অনেকক্ষণ কেঁদেছে। চোখ দুটো এক-বার দেখ' না। কেঁদে কেঁদে কেমন ফুলে উঠেছে বুঝতে পারবে।'

মিলন চুপ করে শুনছিল। তাদের বাড়ীতে এত সমস্যা আগে ছিল না। বর্ষার শুরুতে কাঁটা গাছের মত সেগুলি এখন গজাচ্ছে। চলতে-ফিরতে গেলে সেই কাঁটা হাতে-পায়ে বিঁধছে। মিলন ভাবল বিন্তি আর সেই সুন্দর মতন ছেলেটার টুইস্ট নাচের ব্যাপারটা কিরণকে বলবে কিনা। বাবা আর মা কি শুধু হিরুর ব্যবহারে দুঃখ পেয়েছে? বিন্তিও নিশ্চয় গভীর মনঃকষ্টের কারণ। তার বিশ্রী বেহায়াপনার কথা শুনে মা বোধহয় কাল সারা রাত ঘুমোতে পারে নি। বিছানায় শুয়ে মাথার বালিশে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলেছে।

তবু কি ভেবে মিলন চুপ করে রইল। ছোট বোনের কেচ্ছাকাহিনী আর ভাইয়ের কাছে ভাঙল না। আজ সকাল থেকে বিন্তির সাড়াশব্দ নেই। অথচ অন্য দিন মেয়েটা কত আব্দার করে। এঘরে ওঘরে যেন নেচে বেড়ায়। পাখির মত কলরব করে ফিরতো। নিশ্চয় কাল রাত্তিরে মা ওকে আচ্ছা রকম শাসন করেছে। তাই লজ্জা পেয়ে বিন্তি এখন লুকিয়েছে। কারো সামনে আসতে চাইছে না।

কিন্তু মিলনের কেবলি মায়ের রোগ-ক্লিষ্ট মুখখানি মনে পড়ছিল। তার মা... ভারি সুন্দর ছোটখাট মানুষটি। স্নেহে আর মমতায় ভরা মন। কি সুন্দর মুখের হাসি আর শান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টি। এই অসুস্থ দেহে কর্তব্যে এতটুকু অবহেলা নেই। শরীরে অত জ্বর নিয়ে সে আজও উনুনের আঁচে বসে রান্না করল। কারো নিষেধ শোনে নি। খাইয়ে-দাইয়ে তাদের সকলকে তৃপ্ত করে, তবে তার তৃপ্তি। খেটেখুটে অবসন্ন ক্লান্ত দেহে ফের বিছানায় গিয়ে শুয়েছে।

বাড়ী থেকে বেরোবার কিছুক্ষণ আগে কিরণ থার্মোমিটার হাতে নিয়ে মনোরমার জ্বর দেখছিল। প্রায় একশ' এক ডিগ্রী। সন্ধ্যের পর নিশ্চয় আরো বাড়বে। জ্বরের আর দোষ কি? অসুস্থ শরীরে এত পরিশ্রম, অত্যাচার করলে কখনও রোগ সারে?

ছেলের উদ্বেগ লক্ষ্য করে মনোরমা ম্লান হাসল। বলল,—'মিছিমিছি ভাবছিস তুই। রান্নাঘরে কাজ করলে এমনিই গা গরম হয়। জ্বর থাকলে টেম্পারেচার বাড়বেই। তুই সন্ধ্যের সময় ফিরে এসে দেখবি আমি ভালো হয়ে তোদের জন্য খাবার-দাবার তৈরি করছি।'

—'খবর্দার মা।' কিরণ প্রায় শাসনের ভঙ্গিতে ডান হাতের তর্জনী তুলে নিষেধ করল। 'ফের যদি তুমি রান্নাঘরে গিয়েছ, তাহলে কিন্তু আমি কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করব।'

—'পাগল ছেলে। আমার জন্যে তোর খুব ভাবনা, তাই না রে?' মনোরমা হাত বাড়িয়ে কিরণের মাথাটা একবার স্পর্শ করল। ফের গলা নামিয়ে ধীরে ধীরে বলল,—'হিরুর উপর একটু নজর রাখিস বাবা। দেখলি তো, অমন বুদ্ধিমান ছেলে দিন দিন কেমন গোঁয়ার-গোবিন্দ জেদী হয়ে যাচ্ছে। দিনকাল সুবিধের নয় কিরণ। কিসে কি হয়, কিছুই বলা যায় না।'

* * *

রীতাবরীর মুখ ভার। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছে বেচারী। ভিড়ের মধ্যে দশ-জনের চোখের সামনে এমনি পাগলের মতন দাঁড়িয়ে থাকতে কোনো মেয়ের বুঝি ভালো লাগে?

দেখা হতে রীতাবরী ক্লান্তির সুরে বলল,—'উঃ! আচ্ছা মানুষ যা হোক। কত-ক্ষণ ধরে এমনি দাঁড়িয়ে আছি জানো?'

—'একটু দেরি হয়ে গেল আমার।' কিরণ কৌতুকের দেখায়। ঠোঁট অবাক দিল। মুচকি হেসে বলল,—'কতক্ষণ এসেছ? আধঘণ্টা?'

—'হুঁ। আধঘণ্টা আমি বললেই হলো। আমি যখন ট্রেন থেকে নামলাম, তখন একটা বাজতে মিনিট-দশ বাকি। আর এখন ক'টা বাজছে বলো? স্টেশনের ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে দেখ না।'

ঘড়িটা সামনে। কাঁটায় কাঁটায় দুটো বাজছে। ইচ্ছে করলে সেদিকে তাকান যায়। কিন্তু কিরণের কোনো আগ্রহ নেই। সে দেখছিল রীতাবরীকে। সাজে-পোশাকে কি অপূর্ব লাগছে ওকে। ঠিক সদ্য-ফোটা সুন্দর ফুলের মত। একটা গোলাপী রঙের বুটিদার শাড়ি আর ম্যাচ-করা ব্লাউজ গায়ে। গলায় ছোট ছোট মটরদানার মত পাথরের মালা। গোলাপী পাথরগুলি দেখতে ভারী সুন্দর। হাতে তেমনি প্লাস্টিকের চুড়ি। কানে পাথর-বসানো সুদৃশ্য দুল। হাল-ফ্যাশানের জামা বলে ঘাড় এবং পিঠের খানিকটা ঢাকা পড়েনি। কিন্তু নরম অনাবৃত অংশটুকু ওর সুন্দর দেহশ্রীর ইঙ্গিত দিচ্ছে। পরিতোষ সেদিন মিথ্যে বলেনি, শুধু নাম কেন, তোর গার্ল-ফ্রেণ্ডের চেহারাও চমৎকার।

বুক-স্টলটা পিছনে রেখে ওরা স্টেশনের চত্বরে পা দিল। রবিবার হলে কি হয়? ভিড়ের কামাই নেই। প্ল্যাটফর্ম থেকে একদল লোক বেরিয়ে এল, ফের কিছু লোক সেখানে ঢুকল। ছুটির দিনে অফিস বন্ধ। তাই বলে মানুষজন তো আর ঘরে বন্দী নেই। তারা বেরোচ্ছে। স্বামী-স্ত্রী, সঙ্গে ছেলে-মেয়ে। কেউ বা একা,—নির্বান্ধব। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুর বাড়ি, কিম্বা সিনেমা-থিয়েটার অথবা জলসায়। যাবার ঠাঁই একটা আছে। নইলে শুধু দুজনে নিরিবিলি কোথাও বসে দুটো মনের কথা কইবে।

রোদের তেজ এবার হ্রাস পাচ্ছে। এখনই বেশ নরম মনে হয়। ক'দিন পরে উত্তুরে হাওয়া বইবে। তখন রোদ আরো নিস্তেজ, ...একটা ঢোঁড়া সাপের মত নির্বিষ হয়ে উঠবে।

বোবাজারের মোড়ে এসে কিরণ ট্যাক্সি নিল। রীতাবরী ভুরু কুঁচকে একবার তাকাল। ভাবটা, কি দরকার ছিল বাপু? মিছি মিছি খরচ। গাড়িতে উঠে সে ফিস ফিস করে বলল,—'হঠাৎ ট্যাক্সি নিলে যে? আজ তো ছুটির দিন। হাইকোর্টের ট্রাম নিশ্চয় ফাঁকা ছিল?'

—'এমনিতে দেরি হয়ে গেছে।' কিরণ মৃদু হেসে বলল। ছুটির দিনে এ লাইনের ট্রাম কম। কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হত কে জানে?'

আসলে রীতাবরীর আপত্তির কারণ ভিন্ন। কিরণ তা জানে। ট্যাক্সিতে ওঠা মানেই কাঁচা খরচ। মিছি মিছি অপব্যয়। আর সঞ্চয়ী মানুষের সিকিগুলি তো হাত ফসকে পালিয়ে যাবে না। তাছাড়া কিরণ এখন হাউস-সার্জন। শুধু আলাউন্স পাচ্ছে। তারপর সে নিশ্চয় একটা

ভালো চাকরি কিম্বা প্র্যাকটিস জমিয়ে ফেলবে। তখন ট্যাক্সি কেন, হয়তো নিজে-দের গাড়িতে করেই তারা বেড়াবে। কিরণ ড্রাইভ করবে আর রীতাবরী বসবে তার পাশে। দুজনে এই গঙ্গার ধারে গাড়ি রেখে ঘুরে বেড়াবে।

ছুটির দিন অফিসপাড়া জনহীন। দুপুর বেলায় ডালহৌসী স্কোয়ার ঠিক অতীতের কোনো পরিত্যক্ত নগরীর মত। মাঝে মাঝে দু-একজন পথচারী কৌতূহলী টুরিস্টের মত ভঙ্গিতে আকাশচুম্বী অট্টালিকাগুলির দিকে তাকিয়ে হাঁটছে। মাথার উপর কার্তিকের আকাশ নীল,... শুধু নীল। কোন মহাশিল্পী আকাশটা ধরে যত্নে পরিষ্কার করে গাঢ় নীল রঙের তুলি বুলিয়ে দিয়েছে। সর্বত্র উজ্জ্বল রোদ্দুর,...বড় একটা ... বাড়ির কার্নিসের উপর বসে এক জোড়া কবুতর-কবুতরী নিশ্চিন্তে প্রেমে মশগুল।

লেকের কাছে একটা ট্যাক্সি থেকে নামল। দুপুর, বিকেল-বিকেল হতে সামান্য দেরি। তাই ভিড় নেই। অন্য এদিকটায় লোকজন এখন আসে। বিকেলে মেয়েমানুষেরা কিম্বা ময়দানের মত ভ্রমণেচ্ছুর সংখ্যা অধিক হয় না।

ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে কিরণ খুশি মনে বলল,—দশ মিনিটও লাগেনি পৌঁছতে। ট্রামে এলে ঠিক বিকেল হয়ে যেত?'

—'কথা রাখ।' রীতাবরী সুন্দর ভ্রূভঙ্গি করল। বিকেল হত, বয়ে গেছে। আসলে খালি ট্যাক্সি দেখলে তুমি আর স্থির থাকতে পার না। তাকবার জন্যে, হাতের আঙুলগুলি নিশপিশ করে।' কয়েক মুহূর্ত পরে সে বেশ চোখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে বলল,—'তাছাড়া আমাকে নিয়ে তুমি মোটেই ট্রাম-বাসে উঠতে চাও না, ঠিক কি না বল?'

—'কি জানি।' কিরণ মুচকি হাসল।

বলল,—ট্যাকসির উপর তোমার এত রাগ কেন রীতাবরী? আমাদের প্রথম আলাপ কেমন করে হয়েছিল মনে কর তো—'

সে কথা ভেবে রীতাবরী ঈষৎ আরক্ত হয়ে উঠল। কিরণ সত্যি কথা বলেছে। ট্যাকসি ধরতে গিয়ে তার জীবনে প্রথম অনুরাগের সূত্রপাত। সুতরাং সেই ট্যাকসির উপর কি বিরাগ হলে চলে? সেদিন ঝিন্টি-বাগলায় ফাঁকা ট্যাকসি দেখে দুজনে যদি দুদিক থেকে ছুটে না আসত, তাহলে কি কিরণের সঙ্গে আর কোনোদিন তার দেখা হত?

গঙ্গার ধারে মখমলের মত নরম সবুজ ঘাসের উপর ওরা বসল। কিরণের মনটা ক্রমেই অবসন্নতা কাটিয়ে বেশ প্রফুল্ল হয়ে উঠছিল। নদীর বুক থেকে ঝিরঝিরে বাতাস গায়ে এসে লাগছে। আবার রোদটাও বেশ নরম। জলের উপর কয়েকটা গাংচিল বিচিত্র ভঙ্গিতে কেবলি পাক খেয়ে ফিরছে। একটা ছোট মোটর লঞ্চ কেমন রাজহাঁসের মত দিব্যি তরতর করে জল কেটে চলেছে।

সকাল থেকেই মনটা কেমন বিক্ষিপ্ত, ভার ভার লাগছিল। থার্মোমিটারে মায়ের জ্বর দেখে বেরোবার সময় সে কেবলি ইতস্ততঃ করেছে। অতখানি জ্বরে মাকে ফেলে যাওয়া কি ঠিক? সে শুধু ডাক্তার নয়। বাড়ির ছেলে। মা হয়তো আশা করে যে জ্বর বাড়লে কিরণ নিশ্চয় ঘরে থাকবে। তার বিছানার পাশ ছেড়ে কোথাও নড়বে না।

কিরণের হঠাৎ হিরুর কথা মনে হল। মার চিন্তা এখন ছোট ছেলেকে নিয়ে। মনোরমা তাকে হিরুর উপর নজর রাখতে বলেছে। সত্যি, দিন দিন হিরু যেন অসম্ভব গোঁয়ার এবং জেদী হয়ে উঠছে। আবার তেমনি চাপা। কিছুতেই মুখ খুলবে না। কিরণের সন্দেহ হয়, তলে তলে হিরু এমন একটা গুরুতর কাণ্ড করছে যা কোনোমতেই প্রকাশ করা যায় না।

তার অন্যমনস্ক ভাব লক্ষ্য করে রীতাবরী বলে উঠল,—'এই, কি হয়েছে বল তো? অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছি তুমি কিছু ভাবছ।'

—'ও কিছু নয়।' কিরণ হাসবার চেষ্টা করল।

—'কিছু নয় অমনি বললেই হল? আমি তখন থেকে দেখছি তুমি ভীষণ অন্যমনস্ক। নিজের মনে কি যেন চিন্তা করছ।' একটু থেমে সে অভিমান করে শোনাল,—'তবে ভাবনার কারণ যদি আমার কাছে বলতে না চাও, তাহলে আলাদা কথা।'

—'বারে! কেন বলব না?' কিরণ ওর মুখের উপর স্থির দৃষ্টি রেখে যেন কোন একজন সমব্যথীকে খুঁজে পেতে চাইল। গলার স্বর ঈষৎ গাঢ় করে ধীরে ধীরে বলল,—'তোমার কাছে গোপন করব না রীতাবরী। আমাদের বাড়িতে এখন অনেক সমস্যা। প্রায় একসঙ্গে সবকটা গজিয়ে উঠেছে।'

—'সমস্যা?'

—'হ্যাঁ, সমস্যা আমাদের বাড়ি নিয়ে। সমস্যা আমার ভাইবোনকে নিয়ে। সমস্যা আমার মা-বাবাকে নিয়ে। কিন্তু সবচেয়ে চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছে আমার ছোটভাই হিরু—'

—'তোমার ছোটভাই হিরু?' রীতাবরী অস্ফুটে শুধোল।

—'হ্যাঁ, তার কথা ভেবে আমার মার চোখে ঘুম নেই। বাবার মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে। তাকে আমরা ঠিক বুঝতে পারি না। দিন দিন ছেলেটা যেন আরো অচেনা, রহস্যময় হয়ে উঠছে।—'

—'তোমার ছোটভাই তো স্কুলে পড়ে? বয়স কত তার?—'

—'বয়স কম। আমার চেয়ে অনেক ছোট। ষোল-সতেরর বেশী নয়। এ-বছর সে হায়ার-সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দেবে।'

—'তাকে নিয়ে এত চিন্তা-ভাবনা কেন?' রীতাবরী ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল। 'সে বোধহয় পড়াশুনো করে না। পাড়ার বাজে-বখাটে ছেলেদের সঙ্গে মিলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে?—'

—'উঁহু', কিরণ মাথা নাড়ল, 'বরং তার উল্টোটাই ধরতে পার। আমার ছোটভাই ভালো ছেলে। বাজে-বখাটে ছোঁড়াদের সঙ্গে কখনও মেশে না। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে পড়াশুনো করে। ক্লাসের সে ফার্স্ট-বয়। এমন কি হায়ার-সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় প্রথম দশজনের মধ্যে ওর নাম দেখলে আমি একটুও আশ্চর্য হব না।'

—'তাহলে এত ভাবনা কিসের?' রীতাবরী প্রশংসার সুরে বলে উঠল, 'তোমার ভাই তো রীতিমত ভালো ছেলে।'

—'হ্যাঁ, ভালো ছেলে বলেই তো এত বেশী ভাবনা। জানো রীতাবরী, হিরু যদি পড়াশুনোয় খারাপ হত, বাজে-বখাটে ছেলেদের সঙ্গে মিশে ক্লাস পালিয়ে সিনেমায় লাইন দিত, বাড়িতে এসে হৈ-চৈ চেঁচামেচি করত তাহলে আমি ওকে বকে-ধমকে শাসন করে শোধরানোর চেষ্টা করতে পারতাম। কিন্তু মুশকিল হ'ল এই যে হিরু ভীষণ চুপচাপ। বাড়িতে সে একটি কথাও বলে না। হিরু কি করে, কোথায় যায়। কাদের সঙ্গে মেশে জানবার কোনো উপায় নেই।'

রীতাবরী মৃদু গলায় বলল,—'তুমি ওকে বুঝিয়ে দিলেই পার—'

—'মিথ্যে চেষ্টা।' কিরণ ম্লান হাসল। 'তোমাকে বলেছি না? আমার ছোটভাই ভালো ছেলে। সমস্যা তো সেখানেই। ভালো ছেলেরা সব ব্যাপারেই সিরিয়াস। হাল্কাভাবে কিছু নেয় না। শুধু পড়াশুনো নয়, অন্য যে পথেই যাক না কেন। তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফিরিয়ে আনা বড় কঠিন। প্রায় অসাধ্য ব্যাপার।'

বিকেল প্রায় গড়িয়ে এল। সূর্য পশ্চিম গগনে ঢলে পড়েছে। মনোরম অপরাহ্ন। আকাশ উজ্জ্বল নীল,...পৃথিবী এত স্নিগ্ধ, শান্ত মনে হয়।

সেদিকে তাকিয়ে কিরণ আবার বলল, —'আমার ভয় হয় রীতাবরী, হিরু কি করছে আমি কিছুটা আন্দাজ করতে পারি। তবে সে কথা মা-বাবা কাউকে বলা যায় না। কিন্তু আগ্নেয়গিরি তো লুকিয়ে থাকে না। একদিন জেগে উঠবেই। তখন সেই হঠাৎ বিস্ফোরণের ধাক্কা কি আমার বাড়ির লোকে সামলাতে পারবে?'

কলকাতায়

ফিরোজা বেগম

শারদিন্দু দত্ত

শ্রীকমল দাশগুপ্ত এবং ফিরোজা বেগম

এবার দুর্গাপুজায় বিসর্জনের দিনে ওপার বাংলার এক বিমানে এপার বাংলার মাটিতে পা দিলেন এক গানের শিল্পী আর তাঁর স্বামী। এই শিল্পী কণ্ঠে নিয়ে এলেন সুরের কল্লোল। ও'রা দুজন পাঁচ বছর পরে পা দিলেন এপার বাংলার মাটিতে। বলছিলাম ফিরোজা বেগমের কথা। মাফ করবেন, ফিরোজা দাশগুপ্তের কথা।

খবর পেয়ে কমলবাবু আর ফিরোজার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম পার্ক সার্কাসের এক ফ্ল্যাটে। কলিং বেল টিপতেই যে মহিলা দরজা খুলে হাত জোড় করে দাঁড়ালেন, তিনিই ফিরোজা। ফিরোজা বেগম। ১৯৩০ সালের ২৮শে জুলাই ওপার বাংলার ফরিদপুরে জন্ম ফিরোজার। এক বনেদী মুসলমান পরিবারে, (ফিরোজার কথায় 'এক সেকেলে গোঁড়া' মুস্লিম পরিবারে) ও'র জন্ম। বাবা নামকরা অ্যাডভোকেট খান বাহাদুর মহম্মদ ইসমাইল আর মা কওকাবন্নেসা। ছেলেবেলা থেকেই ফিরোজার গানে ঝোঁক। কিন্তু উপায় নেই বাইরে গিয়ে গান শেখার বা গান গাওয়ার। বাড়ীর কড়া 'পর্দা'র আড়ালে থেকে মানা। তবুও আমি গান গাইতাম। গান গাইবার জন্যই যে আমার জন্ম। গান গাইবো না! বাড়ীর মধ্যেই নিজে নিজে গান গাইতাম। নিজেই নিজের গান শুনতাম। সব কিছু পর্দার আড়ালে...', বললেন ফিরোজা।

—কবে থেকে গান গাইতে শুরু করলেন?

ফিরোজা জবাব দিলেন 'যেদিন আমার মুখে বোল ফুটলো। যেদিন আমি কথা বলতে শিখলাম, ঠিক সেই দিন থেকেই। মা বলেন, আমি নাকি প্রথম কথা বলতে শুরু করেছিলাম একটি গানের কয়েকটি কথা দিয়ে। আমার বয়স যখন আট বছর, তখনই আমি অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে গান গেয়েছিলাম। আমিই হলাম প্রথম মুসলমান মেয়ে, যে অল ইণ্ডিয়া রেডিও কলকাতা' থেকে গান গেয়ে শুনিয়েছিলাম শ্রোতাদের।

শুধু মুসলমান মেয়েদের মধ্যে প্রথম নয়, মুসলমান মেয়েদের মধ্যে এত অল্প বয়সে গানও বোধহয় আমিই গেয়েছি...।'

আপনার মা-বাবা এ ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছিলেন?

'হ্যাঁ। অবশ্য পরে। আমার আম্মা কওকাবন্নেসা খুব ভাল গান গাইতে পারতেন। তবে তিনি কোনদিন বাড়ীর 'কড়া পর্দা' ঠেলে বাইরে গিয়ে কোনও অনুষ্ঠানে বা জলসায় গান গাইতে পারেন নি। সুন্দর গান গাইতে পারলেও 'পর্দা'র বাইরে গিয়ে গান রেকর্ড করারও সাহস হয় নি তাঁর। আম্মার কাছ থেকে আমি গান গাওয়ার উৎসাহ পেয়েছি অনেক। সুর, তাল এ সবে হাতেখড়ি আমার তাঁরই কাছে। আমার কড়া 'আব্বা' অবশ্য পরে মায়ের দেখাদেখি আমাকে গানে উৎসাহ দিতেন। আমি যখন রেডিওতে গান গাইবার কথা বললাম, তখন 'আব্বা' আমায় প্রচণ্ড বকুনি দিয়েছিলেন। কিছুকাল পরে তিনি অবশ্য মত দেন...।'

কবে গান প্রথম রেকর্ড করেছিলেন?

'বারো বছর বয়সে। তখন আমাকে গান শেখাবার কেউ ছিল না। যে গানখানি আমি প্রথম রেকর্ড করেছিলাম, সেটি 'বাংলা নট'। গান রেকর্ড করার আগে বাড়ীতে অনেক বাধা পেয়েছিলাম। অনেক কান্নাকাটি, অনেক হাতে-পায়ে ধরে 'আব্বাজান'কে রাজি করিয়ে 'আম্মার' আশীর্বাদ নিয়ে সেই প্রথম বাড়ীর পর্দা ঠেলে আমি গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানীর বাড়ীতে উঠলাম। সে আমার জীবনের চরম ও পরম আনন্দের দিন। সেই গান রেকর্ডিংয়ের পর আমি আরও দুখানি উর্দু গান গাই রেকর্ডে। সেই দুখানি [illegible] ...। 'মোরা আয়া ও মোরে রহি যাই ভি চলু [illegible] [illegible] ...।'

ছেলেবেলা থেকে শুধু গান গাইতে-গাইতেই বেড়ে উঠতে লাগলো ফিরোজা। অনেক বাধা, অনেক বিপত্তি ঠেলে রেডিও আর রেকর্ড কোম্পানীর দরজায় দরজায় সুরের কল্লোল তুলে সুর-কল্লোলিনী ফিরোজা শৈশব থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে যৌবনের দিকে এগোলেন।

—কবে? কোথায়? কেমন করে দেখা পেলেন আপনার স্বামীর?

লজ্জায় একটু মুখ নীচু করে ফিরোজা বললেন, 'কোনও গানের মাস্টার ছাড়াই গান নিজে নিজে শিখে দুখানি উর্দু গান রেকর্ড করার পরেই আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলাম আরও উচ্চাঙ্গের গান শেখার জন্য। কিন্তু বাড়ীর সকলে মাস্টারের কাছে গান শিখতে দিতে নারাজ। অনেক চেষ্টা করে নজরুল ইসলামের 'পার্সোনাল সেক্রেটারী' চিত্ত রায়ের কাছে গান শেখার অনুমতি পেলাম। তিনিই আমাকে নজরুল-গীতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। সেই থেকে নজরুল গানে মনপ্রাণ সঁপে দিলাম...।'

অতীত স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে ফিরোজার চোখ চিক্‌ চিক্‌ করে উঠলো। উনি বলে চললেন, 'তারপর আমি হিজ মাস্টার্স ভয়েসের স্টুডিওতে গেলাম আমার তৃতীয় উর্দু গান রেকর্ড করতে। —স্টুডিওতে গিয়ে শুনলাম, সেই উর্দু গানে সুর-সংযোজনা করবেন রেকর্ড কোম্পানীর সংগীত পরিচালক কমল দাশগুপ্ত। কমল সাহেবের সঙ্গে সেই আমার পরিচয়। ও'র হাত ধরেই স্টুডিওতে ঢুকলাম। গাইলাম গান, 'প্রেম ভরে প্রীত ভরে প্রীত শুনায়...'। গান রেকর্ডিংয়ের পর আমি উৎসাহ পেয়ে কমলবাবুকে বললাম, 'আমায় আপনি গান শেখাবেন?' কিন্তু দাশগুপ্ত সাহেব আমার মুখের উপর ছুঁড়ে দিলেন শুধু একটি 'না'। এমন আঘাত পেলাম যে, স্টুডিও থেকে বাড়ী ফিরে বিছানায় ভেঙে পড়লাম। কিন্তু হাল

হাড়িনি। তার পর দিনের পর দিন অনুরোধ-উপরোধ করে ওঁকে রাজি করালাম একদিন। উনি বললেন, 'কি গান শিখবে? জানাম ঠুংরি'। সেই ছোট্ট আমি ঠুংরি শিখবো শুনে অবাক হলেন। তারপর শুরু হল শেখানোর পালা...'।

—'কবে বিয়ে করলেন?'

জবাব দিলেন শ্রীমতী ফিরোজা দাশগুপ্ত, দেশ-বিভাগের পর আমার বাবা-মা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকায় চলে গেলেন। কিন্তু আমি কলকাতায় থেকে গেলাম। ১৯৪৯ সালে একবার তালাত মামুদের সঙ্গে ঢাকায় গিয়েছিলাম গান রেকর্ড করতে। তালাত ও আমি দ্বৈতকণ্ঠে কয়েকখানি গান 'রেকর্ড' করলাম। তালাত ভারতে চলে এলো। আমি রয়ে গেলাম ঢাকায়। ঢাকায় থাকাকালে আমি নিয়মিত কমল সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতাম। ১৯৫৪ সালে আবার কলকাতায় এসে দেখলাম কমল সাহেব চরম বিপর্যয়ে পড়েছেন। তিনি যে ব্যাঙ্কে জীবনের সব উপার্জিত টাকা জমা রেখেছিলেন, সেই ব্যাঙ্ক 'ফেল' করেছে। সেই বিপদের দিনে উনি আমার হাতে হাত দিলেন। বললেন, 'আমায় তোমার জীবন-সাথী করে নিতে পারো...?' কষ্টে আর আনন্দে আমি কেঁদে ফেললাম। বললাম, 'আমাকে ভাবতে দাও...।' আবার গেলাম ঢাকায়। সেখানে বাবা আর মায়ের কাছে গেল কমলের চিঠি, 'ফিরোজাকে আমি বিয়ে করতে চাই।' আমাদের সারা পরিবার ক্ষেপে উঠলো। 'না' বলে সবাই ক্ষেপে উঠলেন। বাবা, মা, ভাই, বোন, আত্মীয়-স্বজন, সমাজ, সংস্কার সব কিছু সেই বিয়ের প্রস্তাবের জবাবে বলে উঠলো 'না।' কিন্তু কমলের তখনকার অবস্থার কথা ভেবে সবকিছু ঠেলে ফেলে একদিন ফোনে বললাম কলকাতায় আসার এক বিমানে। ১৯৫৬ সালের ২৮শে মার্চে মালা দিলাম আমি কমলের গলায়...'। হিন্দু-মুসলমানের মিলন-সেতু রচিত হল সেদিন। সেই সেতু হাতে হাত মিলিয়ে পার হলেন হিন্দু সুরকার ও শিল্পী কমল আর মুসলমান সঙ্গীতশিল্পী ফিরোজা। '১৯১২ সালের ২৮শে জুলাই কমলের জন্ম আর আমার জন্মদিন ১৯৩৫ সালের ২৮শে জুলাই। বিয়েও করলাম আমরা ২৮শে মার্চে। '২৮' আমাদের জীবনে বিশেষ স্মরণীয়', বললেন ফিরোজা।

তারপর চললো ওঁদের গানের সাধনা। সুরের সাধনা। জীবনের সাধনা। এখন ওঁদের তিন ছেলে—বাপি, টুকুন আর মুনমুন। ১৯৬৭ সালের এই জানুয়ারী কমলবাবু আর ফিরোজা ভারত থেকে ঢাকায় পাড়ি দিয়ে আর ফেরেননি।

তারপর দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর ওঁরা এই ১৯৭২ সালে আবার এসেছেন কলকাতায়।—এখন কোথায় থাকবেন? আমার প্রশ্ন ওঁদের দুজনের কাছে।

'বাংলাদেশেই থাকবো। ওপার বাংলায় অনেক কষ্ট স্বীকার করেছি এই ক'বছর সুতরাং ওপার বাংলাতেই বাস করবো...', ওঁদের জবাব।

আমার শেষ প্রশ্ন ওঁদের কাছে—কেমন দেখছেন কলকাতাকে? ওঁরা দুজনেই একসঙ্গে জবাব দিলেন, 'অনেক বদলেছে। অনেক 'মডার্ণ' আর অনেক সুন্দর হয়েছে কলকাতা। কলকাতার মানুষ আরও সুন্দর হয়েছে। গান-বাজনার সুর আর তালের কল্লোল শুনছি আগের চেয়ে অনেক বেশী এই শহরে...।'

একটু বেড়িয়ে আসা

পুজোর পর আর শীতের মুখে বুলাদির প্রতিবার কিছুদিনের জন্য বাইরে যাওয়া চাই। এ অভ্যাস তাঁর বহুদিনের। তবে খুব দূরে কোথাও নয়। এই কাছেপিঠে আর কি। বুলাদির নিজের ভাষায়, সংসারের একঘেয়ে জোয়াল টানা থেকে ক'দিন একটু জিরিয়ে নেওয়া। এর বেশি কিছু নয়। তাই ধারেকাছেই যেতে হয়। একে অল্পদিনের ছুটি (বুলাদি ঠাট্টা করে বলেন, এ হলো গিয়ে সরকারি আপিসের ক্যাজুয়াল লিভ, আর্নড লিভ নয় যে বেশিদিন কাটিয়ে আসব) তার সামর্থ্যও তেমন নয়। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাই। দূরের কথা ভাবি। যাই কাছে। না হলে যে বাজেট শর্ট হয়ে যাবে। তা যা বলো আর তাই বলো, ফিরে আসার পর মনটা বেশ চাঙ্গা হয়। আর এজন্যই তো প্রতিবছর আমার হাওয়া বদলের দরকার।'

বেশ গুছিয়ে আর রসিয়ে বলতে পারেন বুলাদি।

বুলাদি বলেন, কলেজে পড়ার সময় আমরা হেড অব দি ডিপার্টমেন্টকে ধরলাম যে, আমাদের নিয়ে কোথাও বেড়াতে যেতে হবে। সে বছর কলেজের সব ডিপার্টমেন্টের ছেলেমেয়েরাই এক্সকারশনে যাচ্ছিল। এবং নামে সবই শিক্ষামূলক ভ্রমণ। তাই আমাদেরও সাধ চাপলো। আমরাই বা পিছিয়ে থাকব কেন! আমাদের কথায় অধ্যাপক রাজি হলেন। শুরু হলো কোথায় যাওয়া হবে সেই নিয়ে গবেষণা। এক একজন এক এক জায়গার কথা বলে। অধ্যাপক শোনেন আর মুচকি মুচকি হাসেন। আমরাও সে হাসিতে যোগ দিই। কিছু না বুঝেই। সারাটা পিরিয়ডই প্রায় এভাবে গেল। কিন্তু জায়গা সম্বন্ধে আমরা কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারলাম না।

পরদিন আমরা সবাই অধ্যাপককে অনুরোধ করলাম যে, জায়গাটা আপনাকেই ঠিক করে দিতে হবে স্যার। তিনি হাসতে হাসতে বললেন, আমার পছন্দ বোধ হয় তোমাদের মনোমত হবে না। তোমরা সবাই উত্তর-দক্ষিণ আর পূর্ব পশ্চিমের কথা বললে। কিন্তু অতদূর যেতে রাজি নই। তোমাদের নিয়ে আমি আরো কাছাকাছি যেতে চাই। সে জায়গার নাম হলো পুরুলিয়া। খুব একটা কাছে না হলেও বাংলাদেশের মধ্যেই। সেখানকার ছৌ নাচ দেখেও আসা যাবে। এই অনবদ্য লোক-নৃত্যের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় থাকা প্রয়োজন। বিশেষ যারা বাংলা সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করছে। দিল্লী-বোম্বাই-দক্ষিণ ভারত দেখার অনেক সময় পাওয়া যাবে। তার আগে ঘরের পরিচয় নিতে হবে।

এর পর অধ্যাপক একটি গল্প শোনালেন। তাঁর এক বন্ধু বিলেতে যাবেন। বিলেতে যাওয়া তাঁর অনেক দিনের সখ। তাই তিনি খুব খুশি। হঠাৎ সেই বন্ধু কার কাছ থেকে শুনলো যে, বিলেতে সাহেবরা ভারতীয় কাউকে পেলেই বেদ-বেদান্ত সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞেস করে। গীতার শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনতে চায়। তখন তো তিনি মহা ভাবনায় পড়ে গেলেন। বেদের নামের সঙ্গেই তাঁর পরিচয়। তার বেশি আর এগোয়নি। আর শখ করে এক আধবার গীতার পাতা উল্টে দেখেছেন মাত্র। এ বিদ্যের তো আর কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। ভদ্রলোক বিষম চিন্তায় পড়লেন। দু'একজনের কাছে কাঁদ কাঁদ স্বরে প্রতিকার জানতে চাইলেন। কিন্তু কেউ পথ বাতলাতে পারলো না। অবশেষে ভদ্রলোক শরণাপন্ন হলেন আমাদের অধ্যাপকের। তিনি ভদ্রলোককে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যে, বিদেশ সম্বন্ধে ভয় ধরিয়ে দেওয়ার জন্য এটা তাঁর সঙ্গে রসিকতা করা হয়েছে। ভদ্রলোক তবু ছাড়বেন না। অনন্যোপায় অধ্যাপক তখন বেদ আর গীতা সম্বন্ধে সাধারণভাবে যতটুকু জানলে চলে ততটুকুর ব্যবস্থা করে দিলেন।

গল্পটি বলে অধ্যাপক আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। জিজ্ঞেস করলেন, পুরুলিয়া যাওয়ার প্রস্তাব মঞ্জুর তো! আমরা সবাই তখন রাজি। আর কেউ উচ্চবাচ্য করলো না। এটা যে গল্পের প্রতিক্রিয়া সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু অধ্যাপকের একটি কথা আমার আজো কানে বাজে, আগে ঘরকে চেন তারপর বাইরে যাবে। আমি

তাই আতিপাতি করে ধারেকাছের জায়গায় ঘুরে বেড়াই। [illegible] যে [illegible] তা নয়। তবে [illegible] থেকে দু'পা ফেলে কোন [illegible] জিনিস না দেখার জন্য আমি আফসোস করছে [illegible] নই। ভাগিয়স সেদিন [illegible] ছো নাচ দেখে [illegible]। আজ সেই মুখোশ পরা নাচ [illegible] করে ফিরে এলো। ভাবতে ভালো লাগে যে, এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেছে এবং পুরুলিয়াতেই। সেদিন যদি আমরা অধ্যাপকের কথায় গররাজি হয়ে অন্য কোথাও যেতাম তাহলে আজ হাত কামড়াতে হতো যে সুযোগ পেয়েও ছেড়ে দিয়েছি।

আর একবার আমার সুন্দর অভিজ্ঞতা হয়েছিল বোলপুরে। শান্তিনিকেতনে তো অনেকেই যান। বিশেষ পৌষ মেলায়। বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে যাব। যার অন্য নাম হনিমুন। সবাই এ সময় দূরে দূরে পাড়ি জমায় বেশি নিরিবিলির জন্য। আর যদি কোথাও না হয় সমুদ্র তো আছেই। আমি স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করে বোলপুরে যাওয়াই ঠিক করলাম। উদ্দেশ্য বোলপুরকে কেন্দ্র করে জয়দেব-চণ্ডীদাস ঘুরে আসা। শান্তিনিকেতন তো বটেই। সে ছিল ভরা বর্ষাকাল সবাই দু'হাত তুলে নিষেধ করছেন, এমন বর্ষায় ওখানে খুব দুর্গতি হবে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে একটা একজাকিউজ খুঁজে পেলাম। দুজনে প্রায় একই সঙ্গে বলে ফেললাম, বর্ষায় কলকাতায় কি এমন সুগতি। সেই তো রাস্তাঘাট জলে জলময়। তারপর পথ চলতে কখন গাড়িঘোড়ার দয়া হবে তারও কোন ঠিক নেই। তাহলে তো সারা গায়ে আলকাতরার আবরণ পড়ে গেল। তার চেয়ে বরং দেখা যাক না গাঁয়ের বর্ষা কেমন। নতুন অভিজ্ঞতাও হবে।

আমরা বোলপুরে পৌঁছুলাম। আর সেদিন রাত্রি থেকেই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামলো। আমরা যেখানে ছিলাম তার আশেপাশেই চাষের জমি। সকালেও বৃষ্টি। এরই মধ্যে দেখলাম হাল-বলদ নিয়ে সবাই মাঠে নেমে পড়েছে। মনের আনন্দে চাষ করছে। গোটা দিন বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে কাটলো। মনে মনে ভাবলাম, আমার আগেই বাধা পড়েছিল। জোর করে এসে ভাল বিপদে পড়া গেল। এতো ঘর থেকে বেরোনোর জো নেই। পরদিন বৃষ্টি আর নেই। ঝকঝকে রোদ্দুর। মাঠে জল দাঁড়িয়ে গিয়েছে। আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। এমন সময় এক সাঁওতাল এসে নমস্কার করলো। আমরা চুপচাপ। সে আমাদের জিগ্যেস করলো, তুরা ই বাড়িতে আছিস, কলকাতা থেকে আসছিস। তুরা খুব ভাল বটেক। তুদের জন্যই বিষ্টি হলো। আমরা তো অবাক। পরে শুনলাম যে, এবার বর্ষায় এ অঞ্চলে এমন জমিয়ে আর বৃষ্টি হয়নি। তাই চাষবাসেও [illegible] হচ্ছিল না। এই বৃষ্টিতে সবদিক রক্ষা হলো। আমরা [illegible] তখন খুব খুশি।

চণ্ডীদাসে গিয়ে আর এক অভিজ্ঞতা হলো। [illegible] দুজনে চণ্ডীদাসের ভিটে দেখছি। পাশেই বিশালাক্ষী মন্দির আর [illegible] মন্দির। একটু দূরে এক বিরাট পুকুর। আর তার পাশেই ছোট্ট যত্ন করে একটি কাপড় কাচার পাট রাখা। রামী ধোবানীর পাট এটি। আমরা ঘুরে ঘুরে দেখছি। এমন সময় পরিচয় হলো এক মুসলমান ভদ্রলোকের সঙ্গে। এরপর আমাদের আর কোন অসুবিধা হলো না। তিনি সব ঘুরিয়ে দেখালেন। আর সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডীদাসের পদ আবৃত্তি করে যাচ্ছেন। আমরা একেবারে বিস্মিত। চণ্ডীদাস থেকে ফেরার পর কতদিন কেটে গেছে কিন্তু সেই ভদ্রলোককে আমরা আজো ভুলতে পারিনি।

যাব যাব করে আর যাওয়া হয় না, বুলাদি বললেন। কলকাতা থেকে বেশি দূরের পথ নয়। কয়েক ঘণ্টার রাস্তা এই নবদ্বীপ। তীর্থ মাহাত্ম্য তো আছেই। চৈতন্যদেবের লীলাক্ষেত্র নবদ্বীপ। পুণ্যার্থীরা পুণ্য সঞ্চয়ে যান। দর্শন করেন সোনার গৌরাঙ্গ। তারা বলেন, পাপ চোখ সার্থক হলো। পুণ্যার্জন আমার উদ্দেশ্য নয়। রাসমেলা দেখতে একবার নবদ্বীপ যেতে হবে। এতো সুন্দর মেলা নাকি খুব কমই দেখা যায়। কেউ কেউ বলেন, এখন আর নাকি সেরকম হয় না। তা আমাদের সময় যেরকম হয় সেটাই দেখে আসি না হলে যদি এটাও মিস হয়ে যায়। ছোটখাট ট্রিপ। দিব্যি তিন চার দিন কাটিয়ে আসা যাবে।

এই তো সেবার গিয়েছিলাম ওড়িশায়। নানা জায়গা ঘুরতে ঘুরতে হাজির হলাম চিল্কা হ্রদে। সেদিন ছিল পূর্ণিমা। সে এক অপরূপ দৃশ্য। হ্রদের জলে চাঁদ যেন নেমে এসেছিল। আলো আর জলে মাখামাখি। না দেখলে ঠিক বোঝা যায় না। শুনেছি কোজাগরী পূর্ণিমায় সবাই তাজমহল দেখতে যায়। তা দেখুক ক্ষতি নেই। কিন্তু ঘরের কাছে এমন জিনিস উপেক্ষা করার কোন যুক্তি নেই। আমার তো সেদিন মনে হয়েছিল জন্ম সার্থক হয়ে গেল।

বৎসরান্তিক এই বেড়াতে যাওয়ার ব্যাপারে বুলাদির যুক্তি আমার খুব মনঃপূত। লটবহর বেশি সঙ্গে থাকবে না। তেমন ঝক্কিঝামেলা পোয়াতে হবে না। খরচ কম হবে অথচ খুব একটা হাত টেনে চলতে হবে না। তবেই বেড়ানোর সুখ। বিরাট ধুমধাড়াক্কা করে বেড়াতে বেরোলাম যেন দিগ্বিজয়ে যাচ্ছি। আর ফিরে এলাম বিরস মুখে নীরস হয়ে। এসেই ইকনমিক্স করতে শুরু করলাম অনেক খরচ আর অত্যধিক দেনার। এ রকম বেড়ানোর সুখ নেই। বরং গোড়া থেকেই সতর্ক থাকলে অর্থাৎ এ বছর অমুক জায়গায় যাবো মনস্থির করতে পারলে একটা ফাণ্ডও গড়ে তোলা যায় এবং অর্থকষ্টও লাঘব হয়। এরপর বেড়ানো তো হবেই। তা না করে আমরা ভাবি, বেড়াতেই যখন হবে একটু দূরে যাওয়াই ভাল। গ্রীষ্মে উটকামণ্ড অথবা সিমলা আর শীতে বোম্বাই অথবা ওয়ালটেয়ার।

বুলাদি বলেন, বোম্বের সী-বীচে যে কি এমন সৌন্দর্য তা ঠিক আমার বুদ্ধিতে আসে না। সেখানে সমুদ্র দেখা যায় না শুধু মানুষ দেখা যায়। তার চেয়ে বেঁচে থাক আমার পুরীর সমুদ্র। দেখেও সুখ আর ঘুরেও আনন্দ। দীঘায় সমুদ্রের আর এক রূপ। ঝাউগাছের ভিতর দিয়ে সমুদ্রের শান্তরূপ নিরীক্ষণ করা যায়। আর আমাদের সমুদ্র দেখার সুযোগ তো আরো কাছাকাছি হয়ে গেল। এবার সুযোগ পেলেই বকখালি থেকে ঘুরে আসবো। বেড়ানোর বেড়ানোও হবে আর সমুদ্র দেখাও হবে। আমি কর্তাকে একদিন গিয়ে জায়গাটা দেখে আসতে বলেছি। আর যদি জম্বুদ্বীপে টুরিস্ট সেন্টার গড়ে ওঠে তাহলে তো কথাই নেই। তবে এ জায়গা দুটো হবে উইক-এন্ডে বেড়ানোর মতো।

কয়েকদিন আগে আমার এক বন্ধু এসেছিল আমেরিকা থেকে। স্বামীর সঙ্গে সেদেশেই থাকে। ওরা নাকি প্রতি উইক-এন্ডে বেড়াতে যায়। কখনো সমুদ্রতীর আবার কখনো অন্য কোথাও। কিন্তু সে-রকম সুবিধে আমাদের নেই। আর তেমন ভ্রমণ-অভ্যাসও আমাদের গড়ে ওঠেনি। বকখালি আর জম্বুদ্বীপ আমাদের সে অভাব অনেকখানি পূরণ করবে। কাছাকাছি সমুদ্র দেখার সুযোগ অনেকেই ছাড়বে না। ভ্রমণে আগ্রহও বাড়বে।

সেবার মাসখানেক রাজগীরে কাটিয়ে ফেরার পর বুলাদিকে আমার খুব ভাল লেগেছিল। মাঘের হাড় কাঁপানো শীতে ওরা রাজগীর গিয়েছিল। ফিরে এলো ঝলমলে স্বাস্থ্য নিয়ে। আর সেই সঙ্গে একরাশ উচ্ছ্বাস। বুলাদিকে জিগ্যেস করেছিলাম, এবার যে ভরা শীতে। বুলাদি উত্তর দিয়েছিলেন, নিরন্তর ব্যতিক্রম বলতে চাইছ তো। স্বাস্থ্যের কথা ভেবেই এবার বেরিয়েছিলাম। কর্তার শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না। রাতের বেলা হট স্প্রিংয়ে উনি খুব ঝাঁপাঝাঁপি করে চান করতেন। তাই শরীরটা একটু ফিরেছে। এবার একসঙ্গে অনেক কিছু হলো। বেড়ানো হলো, স্বাস্থ্য ফিরলো আর নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষও দেখে এলাম। বেড়ানো মানে তো শুধুই হৈ চৈ করা নয়। সবদিকেই নজর রাখতে হয়। আর আমাদের মতো মধ্যবিত্ত পরিবারে স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখতে হবে সব থেকে আগে। সামনের বার ভাবছি বক্রেশ্বর-ম্যাসানজোর ঘুরে আসব। পথে শান্তিনিকেতন তো আছেই।

আমি বলি, কিন্তু বুলাদি এবার যে রীতিমতো লম্বা পাড়ি, একেবারে আগুন্ড লঙ। বুলাদি হেসে জবাব দেন, সব সময় কমিয়ে কমিয়ে ছুটি নিই। এবার তাই একটু বেশি নিয়ে নিলাম। এরপর যদি পটে যায়।

—[illegible]

পুরূরবা ও উর্বশী

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

নিবিড়নীল সুমেরু পর্বতের শিখরদেশে অমলধবল একটি সুরম্য সৌধভবন। স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রের রাজধানী অমরাবতীর রাজপ্রাসাদ: মন্দার, পারিজাত, সন্তানক, কল্পতরু আর হরিচন্দন—এই পাঁচটি বিদ্রুমবীথিকার সুবাসিত ছায়ায় সতত শ্যামল নন্দনকানন আয়তবিশাল এক হরিদবর্ণ মেখলার মত চির-বেষ্টিত করে রেখেছে এই প্রাসাদের কটিদেশটিকে। কানন উপান্তের একটি কুসুমাস্তীর্ণ ভূভাগকে বিধৌত করে বয়ে চলেছে বিমল-সলিলা অলকানন্দার স্নিগ্ধধারাসেবিত স্রোতোধারা।

দিব্যগন্ধে মন্দার ও পারিজাতের অপ্রাকৃত সৌরভে আমোদিত প্রাসাদ অন্তর্বর্তী এক সুবিস্তীর্ণ চত্বরে ইন্দ্রসভা বসেছে। মুরজ, রবাব, সপ্তস্বরা বীণা বিপঞ্চী স্বরমণ্ডল আর মৃদঙ্গ, দুন্দুভি ও মন্দিরা, সহযোগে চলেছে অপ্সরা গন্ধর্বাদের নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান। কিন্তু এ অনুষ্ঠানে অপ্সরাশ্রেষ্ঠা রূপসীপ্রবরা উর্বশীর ভূমিকাই সবচেয়ে বেশী। উর্বশীর একক নৃত্যের ছন্দঝঙ্কারে অনুরণিত না হলে কেমন যেন অপূর্ণ রয়ে যায় স্বর্গলোকের এই ইন্দ্রসভা। উর্বশী কোনদিন অনুপস্থিত থাকলে অতৃপ্ত থেকে যান ইন্দ্রপ্রমুখ পঞ্চদেবতা। উর্বশীর অনুপম নৃত্যছন্দ ধীরে ধীরে যখন লাস্যবিলোল উচ্ছ্বাসে চরমোৎকর্ষের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে, তখন সেই দ্রুতলয়ান্বিত তালের অভিঘাতে ক্ষণে ক্ষণে স্খলিত হয়ে পড়ে তার গুরুনিতম্ববতী স্বর্ণমেখলা; বারবার অনাবৃত হয়ে পড়ে তার চন্দ্রহারশোভিত ত্রিবলীরেখাঙ্কিত মধ্য নাভিকুণ্ডলী; কনককাঞ্চীদামপীড়িত তার বিশাল বর্তুল স্তনযুগল এক উন্মুক্ত ইঙ্গিতে আহ্বান করে যেন সুরতচঞ্চল দেবতাদের দিগ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিবলাকাগুলিকে।

অন্যান্য অপ্সরাদের মত উর্বশীর নৃত্য যেন শুধুমাত্র নৃত্য নয়। সে নৃত্য এক বিরাট শিল্পসাধনা। সে যখন নাচতে থাকে, তখন তার অন্তর্মুখী দৃষ্টি অন্য কোন দিকে ধাবিত হয় না। তার নিরাসক্তিতে স্ব জীবন্মুক্ত চেতনায় অন্যকোন কথা প্রতিফলিত হয় না। শুধু তার শিল্পসাধনাটিকে পরিপূর্ণভাবে সার্থক করে তোলবার একটি ঈষদুষ্ণ এষণা বাষ্পীভূত শীকরকণার মত পুঞ্জিত হয়ে উঠতে থাকে তার শূন্যনীল চিত্তাকাশে। তার রূপলাবণ্যের চপল লাস্যে দেবতাদের মোহমুগ্ধ করতে চায় না যেন উর্বশী। বিচিত্র নৈপুণ্যের উপচারে স্পন্দিত এক নৈবেদ্যরূপে তার সমগ্র শিল্পকর্মটিকে দেবতাদের চরণে অর্পণ করতে চায় শুধু।

সেই দেবসভাস্থলে নৃত্যকালে প্রতিদিন তার সমস্ত ইন্দ্রিয়চেতনাকে সব কিছু থেকে আশ্চর্যভাবে বিমুক্ত করে তার শিল্পধারায় নিয়োজিত করে তাদের উর্বশী। কিন্তু সেদিন তা পারল না। অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি আয়ত্তাধীনে এলেও তার অবাধ্য দর্শনেন্দ্রিয় বারবার ছুটে যেতে লাগল এক বিশেষ দৃশ্যের দিকে। ফলে শিথিল হয়ে যেতে লাগল তার কেন্দ্রীভূত একাগ্রতার ভিত্তি।

এ দৃশ্য তার সারা অপ্সরাজীবনের মধ্যে কখনও দেখেনি উর্বশী। সুদূর স্বর্গলোকে এ দৃশ্য অপ্রত্যাশিত। কারণ উর্বশী জানে, স্বর্গের রাজসভায় কেবল দেবতারাই উপস্থিত থাকেন, সেখানে নৃত্য, গীত ও বাদ্যাদির যে অনুষ্ঠান করে থাকে অপ্সরা গন্ধর্বীরা, তা শুধু দেবতাদেরই উপভোগ্য; সে অনুষ্ঠানে কোন মর্ত্যমানবের কোন প্রবেশাধিকার নেই। তাই আজ বুঝে উঠতে পারল না উর্বশী কেন এক মর্ত্যবাসী, রাজপুরুষ পরম সমাদরে আহূত হয়েছে স্বর্গলোকের এই দেবসভায়। তাই আজ সেই অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্যসঞ্জাত এক বিপুল বিস্ময়ের আবেগে প্রতিক্ষণে শিহরিত হতে লাগল উর্বশীর বিহ্বল চেতনা।

কিন্তু শুধু কি বিস্ময়। উর্বশী অনুভব করল, বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে একটি গোপন বাসনার মৃদুল উচ্ছ্বাস অচিরোদ্গত কুসুমকোরকের মত আজ প্রথম আমোদিত করে তুলছে তার চিরকৌমার্যমার্জিত নারীসত্তাটিকে। তার এই ভাববিকারের কারণ নিজেই বুঝে উঠতে পারল না উর্বশী। যে দেবতা অখিল বিশ্বমানবের চির আরাধ্য, যে স্বর্গ সকল মর্ত্যবাসীর সারাজীবনের স্বপ্ন ও সাধনা, সেই স্বর্গলোকে দেবতাদের সান্নিধ্যে বাস করেও কেন এক মর্ত্যমানবের প্রতি এক দুরন্ত কামনা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে তার মনের মধ্যে, তার কারণ নিজেই খুঁজে পেল না উর্বশী। কী এমন দেখবার আছে সেই মানুষটির মধ্যে। মর্ত্যবাসী [illegible]। দীর্ঘ দেহ,

গৌরবর্ণ, বিস্তৃত বক্ষপট, বলিষ্ঠ বাহুতে স্বর্ণবলয়। কিন্তু কোন অংশে তিনি দেবতাগণ অপেক্ষা শ্রেয়? উর্বশী তা জানে না, জানতে চায় না। শুধু তাঁর মুখে কজ্জলিত দুটি নয়নের অব্যর্থ, অব্যাহত দৃষ্টি পুষ্পধনুর্বাণপরাসুতী অনঙ্গের মত এক কামনাসিক্ত ঔৎসুক্যে বারবার প্রদক্ষিণ করতে লাগল সেই পুরুষকে।

পদমঞ্জীরে অপরূপ ক্বণধ্বনি সৃষ্টি করে প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে ছন্দায়িত করে উর্বশী যখন নৃত্য করতে থাকে, তখন নৃত্যগীতের মিলিত শব্দঝংকারের বক্ষ হতে উৎসারিত তাললয়সমন্বিত এক সুরমাধুরীতে পরিপ্লাবিত হতে থাকে সমগ্র সভাস্থল। উর্বশীর নৃত্যায়িত দেহসৌন্দর্যসুধা পান করতে থাকে যেন দেবতা ও গন্ধর্ব মদচঞ্চলিত দৃষ্টি।

স্বর্গধামের সেই বিশাল নৃত্যসভার পুষ্পপল্লবকবেষ্টিত মণ্ডপের চারিদিকে হেমদণ্ডশীর্ষে রত্নদীপ শোভা পায়। মধুনিষ্যন্দী মন্দারের দিব্যগন্ধে ঝরে পড়ে অমরতার আনন্দ। অম্লানকুসুম পারিজাতের পত্রপুষ্পে ফুটে ওঠে জরামৃত্যুহীন দিব্যজীবনের দ্যোতনান্বিত এক চিরশুভ্র হাস্যচ্ছটা।

সহসা দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্রনির্ঘোষে এক ভয়ংকর আদেশবাক্য ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যায় উর্বশীর নৃত্যপ্রমত্ত দ্রুত আন্দোলিত দেহলতা। প্রস্তরপুত্তলীবৎ দাঁড়িয়ে পড়ে কেলিমঞ্জুল উর্বশী। চিরদিনের মত নীরব হয়ে যায় যেন তার নৃত্যায়িত চরণের স্বর্ণমঞ্জীর আর করধৃত সুতন্ত্রীবীণার সুললিত স্বরঝংকার। শরবিদ্ধা হরিণীর মত এক ভীতিবিহ্বল উৎকণ্ঠায় অপলক নেত্রে চেয়ে থাকে দেবরাজের দিকে।

এদিকে তখন রত্নবেদী ছেড়ে রোষারুণ নয়নে উঠে দাঁড়িয়েছেন সহস্রাক্ষ ইন্দ্র। ইন্দ্রের বরতনু প্রকাণ্ড। নিরত সোমরসপানে স্ফীত তাঁর উদর। তাঁর গাত্রবর্ণ, কেশপাশ, শ্মশ্রু পিঙ্গলাভ। তিনি সহস্রাক্ষ, কারণ সহস্র সহস্র গ্রহনক্ষত্রসমন্বিত সমগ্র আকাশ তাঁর অক্ষিগোলকের মধ্যে সীমায়িত। তিনি বজ্রবাহু, তাঁর বজ্রধৃত হস্তদ্বয় দীর্ঘ ও লৌহকঠিন। শত্রু নিধনের জন্য প্রস্তর ও লৌহসহযোগে তীক্ষ্ম বহুসূচীমুখ হিরণ্যবর্ণ এই বজ্ররূপ অস্ত্রখানি নির্মাণ করে দেন তাঁর পিতা দেবকারুশিল্পী ত্বষ্টা। উর্বশী নিজের চোখে কত বার লক্ষ্য করেছে, এই বজ্র দ্বারা ইন্দ্র অনাবৃষ্টি হতে জলকে প্রমত্ত ও আলোককে অন্ধকারের কবল হতে উদ্ধার করেন। তিনি যখন সোমরস-পানোন্মত্ত ও মরুদ্গণের সাহায্যে বজ্র দ্বারা অনাবৃষ্টি ও অন্ধকাররূপে অসুরদের সংহার করেন আর বৃত্ররূপ জলরোধকারী ব্যাপক মেঘকে বিদীর্ণ করেন, তখন আকাশ ও পৃথিবী মুহুর্মুহু প্রকম্পিত হয়।

এবার বজ্রগর্জনে ঘোষণা করলেন দেবরাজ ইন্দ্র, শোন উর্বশী, আজ হতে তুমি স্বর্গবাসের অযোগ্যা, কারণ আজ এক মর্ত্যমানবের প্রতি আত্মলিপ্সায় অমার্জনীয় অপরাধে সজাত হয়েছে তোমার মধ্যে। এই মুহূর্তে তুমি এই চিরপবিত্র স্বর্গলোক ত্যাগ করে সুদূর মর্ত্যভূমিতে গিয়ে অভিশপ্ত জীবন যাপন কর।

হ্যাঁ, সত্যিই এ এক আশ্চর্য আসক্তি। অকস্মাৎ রূপমুগ্ধ উদ্ভ্রান্তিজনিত এই আসক্তির প্রগলভতায় লজ্জা বোধ না করে পারে না উর্বশী। মনে মনে স্বীকার করে, গন্ধনিধুর বনকুরঙ্গীর মত স্বপ্নরাণির একটি তীব্র চঞ্চলতা এক অস্বাভাবিক উত্তাপ সৃষ্টি করেছে তার মননীধারায়, প্রগল্ভ করেছে তার মনের ভারসাম্যকে। সত্যই সে স্বর্গবাসের অযোগ্যা।

অপরাহ্নের অরুণার্ক রাগে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে নন্দনকাননের বনস্থলী। সান্ধ্যপ্রসূনের উচ্ছসিত সৌরভে বিহ্বল হয়েছে মন্দমন্থর মলয়ানিল। ব্রীড়াবনত আননে কুণ্ঠিত পদক্ষেপে স্বর্গসভা হতে নিষ্ক্রান্ত হয় উর্বশী। সুমেরু পর্বত হতে অবতরণ করে মর্ত্যভূমির দিকে এগিয়ে যায়। মনে মনে স্থির করে স্বাধিকারপ্রমত্তা ছলবিলাসিনী নারীর মত রূপমুগ্ধকের চঞ্চলতায় যে ভুল সে করেছে, নির্জন অরণ্যবাসের মধ্য দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করবে তার।

সহসা শুনতে পায় উর্বশী, তার পশ্চাতে অনতিদূরে মৃদুকুণ্ঠিত কণ্ঠস্বরে কে যেন তাকে ডাকছে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পশ্চাতে অবলোকন করে উর্বশী দেখে, দেবসভায় আহূত মর্ত্যবাসী সেই রাজপুরুষ। তবু প্রশ্ন করে উর্বশী, কে আপনি? কি হেতু আগমন এখানে?

সমস্ত কুণ্ঠা অপহৃত করে স্থির নেত্রদ্বয় উর্বশীর মুখমণ্ডলের উপর নিবদ্ধ করে উত্তর করেন রাজপুরুষ আমি বুধতনয়, রাজা পুরূরবা। আমিই তোমার অভিশাপের কারণ, একথা জানার পর হতে এক নিদারুণ মর্মজ্বালায় অনুক্ষণ প্রপীড়িত হচ্ছি বরাঙ্গনা। তোমার সারাজীবনব্যাপী এই ভয়ংকর অভিশাপের সমপরিমাণ অংশ গ্রহণ করে আমার এই মর্মজ্বালাকে শান্ত ও শীতল করতে চাই।

ভয়ভরে মৃদুচঞ্চলিত কদলীমদেহের মত এক বিপুল লজ্জাভরে বিকম্পিত হয়ে ওঠে উর্বশীর পুষ্পল দেহবল্লরী। স্বচ্ছ সরসীসলিলোত্থিত রক্তকোকনদের মত তার অশ্রুবিধৌত অক্ষিতারকার স্বচ্ছতায় প্রতিফলিত হয়ে ওঠে হৃদয়ের এক আরক্তনিবিড় অনুতাপ। শান্তমধুর কণ্ঠে উত্তর করে উর্বশী, আপনি বৃথা মনোকষ্টে পীড়িত হচ্ছেন নরবর। যে কর্মের মধ্যে কর্মীর কোন সক্রিয় ইচ্ছা বা সজ্ঞান প্রচেষ্টা নেই, সে কর্মের জন্য কর্মীকে দোষী করা কোন নীতিশাস্ত্রেরই বিধেয় নয়। আপনার নিষ্কলুষ দেহাবরণ আমার মধ্যে যে কলচাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে এবং যে আসক্তির ঔৎসুক্য উদ্দীপিত করেছে তা আমার অসংযতচিত্ততারই অভ্রান্ত পরিচায়ক। নৃত্যকলাপটিয়সী কেলিমঞ্জুল উর্বশীর পক্ষে নৃত্যের তালভঙ্গ ও শিল্পকর্মে শৈথিল্য সত্যই এক অমার্জনীয় অপরাধ, সেই অপরাধের যথোচিত শাস্তিই আমি লাভ করেছি নৃপবর। আমায় যেতে দিন।

কিন্তু আসন্ন রাত্রির এই নির্জন অন্ধকারে কোথায় যাবে শুচিস্মিতা?

ভূধর সমীপবর্তী কোন এক নির্জন কান্তারপ্রদেশে মর্ত্যবাসীদের অলক্ষ্যে অগোচরে আমরণ অভিশপ্ত জীবনযাপন করে চলবে এই স্বর্গভ্রষ্টা অপ্সরা।

সমস্ত দ্বিধা অপহৃত করে গ্রীবা উন্নত করে দাঁড়াল পুরূরবা। কোরকান্তরালবর্তিনী স্ফুটমান কুসুমের মত নিভৃতগভীর একটি প্রণয়াভিলাষ সোচ্চার হয়ে ওঠে প্রগলভ উচ্ছ্বাসে। আমি যে তোমায় আমার জীবনের চিরসঙ্গিনী করে তুলতে চাই সুযৌবনা। আমার এই রূপাকর্ষ মদিরাসক্তির কলচাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল তোমার চিত্তে, কিন্তু তোমার অমানবীয় রূপলাবণ্য আমার মধ্যে জেলে দিয়েছে অনির্বাণ কামনার বহ্নিজ্বালা। আমার এই কামনাগ্নিকে অনির্বাপিত রেখে ত্রিভুবনের কোথাও গিয়ে শান্তিতে থাকতে পাবে না সুন্দরী। আমার এই ধরতপ্ত বক্ষের জ্বালাময়ী তৃষ্ণা তোমার সারাজীবনের শান্তি ও স্বস্তির উপর এক বিশাল বহ্নিচ্ছায়া ব্যাপ্ত করে রাখবে সব সময়। আমার আসঙ্গমুগ্ধ এই দৃষ্টির শব্দভেদী বানের মত অভ্রান্তভাবে অনুসরণ করবে তোমার ওই লাবণ্যললিত মৃদুলাঙ্গকে।

বিস্মিত হয় উর্বশী। প্রভাতের হীনপ্রভ চন্দ্রলেখার প্রতি কখনো প্রধাবিত হয় না কোন চকোর। ভূলুণ্ঠিত হৃতম্লান কোন কুসুমকলিকার কণ্ঠলগ্ন হবার জন্য ছুটে আসে না উদ্‌ভ্রান্ত কোন ভৃঙ্গ। কিন্তু কক্ষচ্যুত নক্ষত্রনিকরের মত হতোজ্জ্বল এক স্বর্গচ্যুত অপ্সরার জন্য কেন এক অপরিসীম আগ্রহে আত্মহারা হয়ে উঠেছেন প্রমদাতনুবিলাসী এই নৃপতি? রূপরম্য কেলিকপাটিনী নারীর কি কোন অভাব আছে তাঁর প্রমোদশালায়? উর্বশী অনুভব করে এই সব প্রশ্নের মূলে রয়েছে সলজ্জ অপমানের এক তীব্র জ্বালা। নিজের আকস্মিক ভাগ্য পরিবর্তনে বিহ্বল ও বিমূঢ় উর্বশী পথভ্রান্ত পথিকের মত এক নিশ্চুপ নিশ্চলতায় স্থির হয়ে থাকে। নিজের ম্লান অঙ্গশোভা দেখে নিজেই চমকিত হয়ে ওঠে। কেমন যেন শিথিলিত হয়ে পড়েছে তার সন্তানকমালিকাগ্রথিত মেঘচিকুরস্তবকিত কবরীভার। অনিবারিত অশ্রুপাতে বিগলিত হয়ে পড়েছে তার নয়নের কজ্জলরেখা ও কপোলফলকের লোধ্ররেণু। ম্লান হয়ে গিয়েছে তার কুঙ্কুমাক্ত বিপুল স্তনযুগলের উদ্ভিন্ন মদশোভা।

উর্বশীকে নীরব দেখে আবার প্রশ্ন করেন রাজা পুরূরবা, স্বর্গের মায়া হতে মনকে কি এখনও মুক্ত করতে পারনি অমিতনয়না? কী এমন দুর্লভ বস্তু

আছে সন্দেহ? স্বর্গে লাস্যবিলোল কেলি-কলাই অপ্সরাবৃত্তি যাপন অপেক্ষা স্বাধীন মর্ত্যজীবনই কোন নারীর পক্ষে একান্ত কাম্য নয় কি?

রাজা পুরুরবার সুস্মিত নয়নের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয় উর্বশী। শান্তকণ্ঠে বলে, স্বর্গবাসের প্রতি আমার আর কোন বিশেষ ব্যাকুলতা না থাকলেও মর্ত্যজীবনের প্রতি এক অনিবার্য তৃষ্ণা ক্রমশঃ প্রকট হয়ে উঠছে আমার মনে। স্বর্গজীবনের সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্য কি জানেন মহীপতি পুরুরবা, অস্থায়ী সুখদুঃখের যে কম্পমান ছায়াকুটিলতার দ্বারা মর্ত্যজীবন অনুক্ষণ আন্দোলিত হয়, আশা-নিরাশার যে স্পন্দনে অবিরাম মথিত হয়, স্বর্গে তা কখনো প্রবেশ করতে পারে না। স্বর্গ যে বড় এক অদ্ভুত রাজ্য মহারাজ পুরুরবা। সেখানে কোন দৈহিক চেতনা নেই, কোন ভেদজ্ঞান নেই, কোন মানসিক বেদনা বা দৈহিক ক্লেশ নেই, সেখানে আছে শুধু অখণ্ড অবিমিশ্র একটি মাত্র অনুভূতি। আর সে অনুভূতি হচ্ছে আনন্দ। সেখানে যেমন কামনা-বাসনার অন্ত নেই, তেমনি সেই কামনা-বাসনা পূরণের উপযুক্ত উপকরণেরও কোন অভাব নেই, সুতরাং বিন্দুমাত্র অতৃপ্তির দ্বারাও কখনও ক্ষণিকের জন্য স্পন্দিত বা চঞ্চলিত হয় না কোন স্বর্গবাসীর মন। অতনুতাপিতা রজনীগন্ধার শুভ্রস্নিগ্ধ সুষমার মত ম্লান হয় না কখনও সে মনের সুষমা। জীবনের যে চির-আকাঙ্ক্ষিত পূর্ণতা মর্ত্যভূমিতে দুর্লভ, স্বর্গলোকে তা একান্তভাবে সহজলভ্য বলেই স্বর্গ প্রতিটি মর্ত্য-বাসীরই সারাজীবনের একান্তপ্রার্থিত বস্তু।

এতক্ষণে উর্বশীর মনের প্রকৃত কথা বুঝতে পারেন রাজা পুরুরবা। সঙ্গে সঙ্গে আপন প্রণয়লুব্ধ হৃদয়ের এই উদ্ধত আত্মনিবেদনের মূঢ়তায় নিজেই লজ্জিত হন। তার অবাঞ্ছিত মর্ত্যজীবনযাপনের অনতিক্রম্য অভিশাপের বোঝাটাকে কেমন করে বয়ে চলবে অনন্তকাল ধরে, স্বর্গ-বঞ্চিতা উর্বশী হয়ত এখন সেই কথাই ভাবছে বেদনাভিভূত চিত্তে। ভাবছে, শেষ হবে কবে তার এই অভিশপ্ত জীবনের।

তবু দেবচিত্তচঞ্চলকারিণী ছদ্মপ্রণয়-কলাশীলা উর্বশীর স্বর্গপ্রীতির অসারতা-টিকে তার সামনে শাণিত যুক্তিদ্বারা প্রকটিত করে তোলবার জন্য মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন রাজা পুরুরবা। বলেন, আমার প্রণয়তপ্ত আবেদনে এখনও সাড়া দাওনি সুলোচনা। আমি তোমায় এই মুহূর্তে আমার রাজভবনে নিয়ে যেতে চাই। আমার জীবনের চিরসঙ্গিনীরূপে প্রণয়দানে ধন্য কর আমায় [illegible] তুমি শুধু আমার বিশাল রাজ্যের রানী হবে না, তুমি হবে আমার অখণ্ড হৃদয়ের একমাত্র অধীশ্বরী।

শঙ্কাতিমির কুন্দধবল কৌমুদীজালে পরিপ্লাবিত হয় সম্মুখস্থ-প্রান্তরে কুটজ-গন্ধে বিবশ মুখাগত অনিলবায়ুর স্পর্শে শিহরিত হয় রাজা পুরুরবার হৃদে বাসনা। আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলেন, আজ আকাশে উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্র উজ্জ্বলরূপে কিরণদান করছে। প্রিয়মিলনের এই হচ্ছে প্রশস্ত সময়। এই উজ্জ্বল সমীরিত সান্ধ্য মুহূর্তে দ্বিধাপগত চিত্তে একবার বল সুন্দরী, আমি স্বর্গ চাই না, দেবতা চাই না আমি শুধু এক মর্ত্যমানবের প্রণয়াকুল হৃদয়ের অনাবৃত আকাশে স্বর্গের সমস্ত সুষমা ও মর্ত্যের সমস্ত মাধুর্যকে খুঁজে পেতে চাই।

কজ্জলাবিলম্বনা উর্বশীর নীলকমল-প্রভ দুনয়নে ক্ষণবেদুরিত এক প্রসন্নতা দীপ্ত হয়ে ওঠে। কিঙ্কিণীক্কণ-লাঞ্ছিত চরণে রাজা পুরুরবার কাছে এগিয়ে এসে [illegible] বলে উর্বশী, আপনার আবেদনে আমার কোন আপত্তি নেই মহারাজ। আমি এই মুহূর্ত হতেই আপনার জীবনসঙ্গিনী হতে পারি, তবে অঙ্গীকার করুন, তিনটি শর্ত আপনি পালন করে চলবেন সারাজীবন ধরে। কোনদিন ব্যতিক্রম হবে না সেই শর্ত পালনের?

কুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গে এক তরলিত বিস্ময়কে মূর্ত করে প্রশ্ন করেন রাজা পুরুরবা, কী সেই শর্ত সুন্দরী? তোমার এই রূপরম্য দেহের অঙ্গসুধা পান করবার জন্য কোন শর্ত পালনে কোনদিন পরাঙ্মুখ হব না আমি।

তবে অঙ্গীকার করুন মহারাজ, এক-মাত্র কামবিমোহিত হয়ে আমি আপনার সান্নিধ্য প্রার্থনা করলেই তবে আপনি আমায় স্পর্শ করবেন। অঙ্গীকার করুন, নিরন্ধ্রনিবিড় অন্ধকারময় কোন প্রকোষ্ঠেই আমাদের সমস্ত মিলনকার্য হবে সম্পন্ন। যেকোনো অবস্থা হোক, মর্ত্যমানবের বিবস্ত্র মূর্তি আমায় কোনদিন যেন প্রত্যক্ষ করতে না হয়। আরও অঙ্গীকার করুন মহারাজ, প্রতিদিন মাত্র তিনবার আমায় আপনি আলিঙ্গন করতে পারবেন। যেদিন যে মুহূর্তে এই তিনটি শর্তের কোনটি আপনি [illegible] জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ভঙ্গ করবেন, সেই দিন সেই মুহূর্তে আমি আপনার প্রাসাদ ত্যাগ করে চলে যাব চিরদিনের মত।

উর্বশীকে আলিঙ্গন করে প্রণয়ার্দ্র কণ্ঠে ঘোষণা করেন রাজা পুরুরবা, আমি অঙ্গীকার করছি প্রিয়তমা, আমি আমার সারাজীবনের নিষ্ঠা ও একাগ্রতা দিয়ে পালন করে চলব তোমার সমস্ত শর্ত। তবে তোমাকেও স্বীকার করতে হবে অকপটে, প্রেমের নিষ্ঠা ও নির্বিকারতার দিক থেকে স্বর্গের দেবতা ও গন্ধর্ব হতে কোন অংশে হীন নয় এই মর্ত্যমানব। স্বীকার করতে হবে, প্রেমহীন, প্রীতিহীন কেলি-কপটতাসর্বস্ব স্বর্গজীবন অপেক্ষা প্রেম-প্রীতিপূর্ণ আনন্দময় মর্ত্যজীবন অনেক গুণে শ্রেয় সুন্দরী। তুমি দেখো শুচিস্মিতা, আমি আমার সাধ্যমত অনুরাগের অগ্নি-শিখা দিয়ে মর্ত্যজীবনের সমস্ত অপূর্ণতাকে দগ্ধ ও অপসারিত করে সমস্ত অভিশাপকে উপহাস করে এক নতুন স্বর্গ রচনা করব এই মর্ত্যমৃত্তিকার বুকে।

আপন প্রণয়াভিলাষের তৃপ্তির অনির্বচ-নীয় সুখস্বপ্ন আপন অন্তরের নিভৃতে আস্বাদন করতে করতে উর্বশীকে সঙ্গে নিয়ে রাজপ্রাসাদে ফিরে আসেন রাজা পুরুরবা। বিশাল প্রমোদভবনের নিভৃতে মণিদীপিত রতিমন্দির মাঝে একটি স্বর্ণপর্যঙ্কের উপর উপবেশন করেন দুজনে। সেই মুহূর্তেই মাণ্ডলিকবর্গকে ডেকে আদেশ করেন, এই মুহূর্তে পশু-শালা হতে দুটি নবজাত শুভ্রকোমল মেষ-শিশুকে এনে এই পর্যঙ্কের সঙ্গে আবদ্ধ করে দাও। আর এই প্রাসাদদ্বারের সকল প্রহরীকে সতর্ক করে দাও, এই মেষ যেন কখনও কারও দ্বারা কোনক্রমে অপহৃত না হয়।

রাজা পুরুরবার আদেশে সেই রতি-মন্দিরের এক ধারে আর একটি শয়নপর্যঙ্ক স্থাপিত হয়। গৃহকোণে দারুবেদিকায় মাধ্বীবারিতে পরিপূর্ণ স্বর্ণপাত্র শোভা পায়। হেমদণ্ডবিশিষ্ট দীপাধারে মৃদু-শিখায়িত রত্নদীপ জ্বলে। কিন্তু এ-দীপ আর বেশীক্ষণ জ্বলবে না। কারণ, এক নিরন্ধ্রনিবিড় অন্ধকারে এই সমগ্র প্রকোষ্ঠখানি নিমজ্জিত না হলে শয়ন করবেন না রাজা পুরুরবা। শিথিলিত অঙ্গবস্ত্রের জন্য সহসা যদি অনাবৃত হয়ে পড়ে তাঁর নিদ্রাভিভূত দেহ আর সেই অনাবৃত দেহের উলঙ্গ মূর্তি যদি দীপা-লোকে দৃশ্যগোচর হয় উর্বশীর, তাহলে শর্তানুসারে তাকে চিরদিনের মত ত্যাগ করে চলে যাবে উর্বশী।

যথাযথ শর্ত পালনের এই নিষ্ঠাসিক্ত তৎপরতায় প্রীত হয় উর্বশী। নব অনু-রাগের যে পুষ্পপরাগপুঞ্জ ফুটে উঠেছে রাজা পুরুরবার হৃদয়বৃন্তে তার গন্ধামোদে বিহ্বল হয়। রাজা পুরুরবাও [illegible] উর্বশীর চম্পককলিকাসদৃশ হরিচন্দন-চর্চিত চিবুকটিকে হস্তদ্বারা মৃদু আন্দোলিত করে তার রক্তকমলোপম অধরোষ্ঠদুটিকে চুম্বনরসে সিক্ত করে দেন। সঙ্গে সঙ্গে রতিমন্দিরের সেই মৃদু শিখায়িত রত্নদীপ নির্বাপিত হয়।

রাত্রি মধ্যযামের দিকে অকস্মাৎ নিদ্রা-ভঙ্গ হওয়ায় সেই দীপ আবার নিজের হাতে জ্বালে উর্বশী। স্বপ্নমায়ালীন সুখনিদ্রার সমস্ত আবেশ দেহমন হতে অপসারিত করে রতিমন্দির হতে বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়। অন্ধকার দিগ্বলয়রেখার ঊর্ধ্বে নক্ষত্রখচিত মধ্যগগনে [illegible] উদ্ভাসিত করে স্থিরভাবে ভাবতে থাকে স্বর্গলোকের কথা। রাজা পুরুরবার প্রণয়োচ্ছ্বাসে স্থির থাকতে না পেরে সাড়া দিয়েছে উর্বশী একথা সত্য, কিন্তু তবু অনুরক্ত অতীতকে সে ভুলতে পারেনি, একথাও তেমনি সত্য। অনুরাগের বিহ্বলতার অন্তরালে লুকিয়ে [illegible] [illegible] একটি [illegible]

বাসনা এখনও আচ্ছন্ন করে রেখেছে তার মানসভূমিটিকে। বেদনাক্লিষ্ট বক্ষের নিভৃতে সূক্ষ্ম অতৃপ্তির এক বহ্নিজ্বালায় হয়ত সারাজীবন ধরে তাকে লালিত করে যেতে হবে সে-বাসনাকে।

স্বর্গের প্রতি কোন লালসা না থাকলেও জরাহীন মৃত্যুহীন এক চিরযৌবনান্বিত জীবনের প্রতি লালসা আছে উর্বশীর। যৌবনাভিমানী উর্বশী ভাবে, রাজা পুরূরবার প্রণয় যত নৃত বা নিবিড় হোক না কেন, তা কখনই পারিজাত কুসুমের মত চিরঅম্লান রাখতে পারবে না তার এই রূপকান্তির উজ্জ্বলতাকে। পুরূরবার রাজকীয় প্রতাপ ও বাহুবল যত প্রবলই হোক না কেন, তা কখনও জরা-মৃত্যুর নিশ্চিত অভিশাপ হতে রক্ষা করতে পারবে না উর্বশীকে। তাছাড়া প্রতিটি মর্ত্যমানবের দেহে যেমন আছে জরা-মৃত্যুর অনিবার্য তাড়না, তেমনি তার অনুরাগের মধ্যেও আছে মান-অভিমানের ঘাত-প্রতিঘাতে তৃপ্তি-অতৃপ্তির [illegible]।

রাত্রি শেষযামের দিকে আবার আপন শয়নপর্যঙ্কে ফিরে আসে উর্বশী। এসে রত্নদীপটি হাতে নিয়ে দেখে এখনও সুখ-সুপ্তি ভঙ্গ হয়নি রাজা পুরূরবার। তাঁর সুস্মিতকান্ত মুখমণ্ডলে ফুটে উঠেছে এক তরল তৃপ্তির ব্যঞ্জনা। প্রস্ফুটিত নীল-পদ্মের মত আয়তলোচন দুটি প্রতিক্ষণে অনুলিপ্ত হয়ে উঠেছে [illegible]

অনুরাগের এক মায়াজাল। উর্বশী ভাবে, হয়ত ঠিকই বলেছেন রাজা পুরুরবা, সর্ব-বিস্মরণীশক্তি এই অনুরাগের মায়াজাল দিয়ে সত্যসত্যই হয়ত নতুন স্বর্গ রচনা করা যায় মর্ত্যভূমির বুকে। প্রেমসিক্ত একটি মর্ত্যমানবের অখণ্ড অন্তরের আকাশের আনন্দতন্ময় গভীরেই হয়ত নিহিত আছে স্বর্গলোকের সমস্ত সুষমা। সহকার-সমালম্বা নবাপুষ্পিতা ব্রততীর মত এক অপূর্ব আশ্লেষে রাজা পুরুরবার নিদ্রাভিভূত দেহকে আলিঙ্গন করে উর্বশী। স্বর্গের অমরাবতীতে অমরতা আছে, প্রেম নেই। মর্ত্যে প্রেম আছে, অমরতা নেই। সহসা উর্বশীর মনে হয়, এই প্রেমই অমৃত। এই প্রেমের জন্যই হয়ত জরা-মৃত্যুগ্রস্ত মর্ত্যমানব মৃত্যুকে অস্বীকার করে অবিস্মরণীয় করে রাখে মানুষের আত্মাকে। নিঃশেষিত নিশ্চিহ্ন দেহাবসানের পরও এই আত্মাকে এক অব্যয় অবিনশ্বর-তায় সঞ্জীবিত করে রাখে মানুষ। প্রেম-হীন নীরস অমরতার তৃপ্ত অপ্সরা-জীবনকে এবার সত্য সত্যই ঘৃণা করে উর্বশী। এক নবদয়িত মনোবাঞ্ছিত মর্ত-পুরুষের মরজীবনের সঙ্গে নিজের জীবনকে এক অক্ষয় প্রণয়বন্ধনে বন্ধ করে ধন্য মনে করে নিজেকে।

রাজা পুরুরবাও উর্বশীকে লাভ করে পুষ্পলতানুবন্ধ মন্দারিততনু মহীরুহের মত ধন্য মনে করেন নিজেকে। এই বিশাল মর্ত্যভূমিতে যত রকমের সুরম্য বস্তু আছে তাই দিয়ে প্রীত করতে থাকলেন আকাঙ্ক্ষিতা উর্বশীকে। যত সব দুর্লভ অলংকারে ভূষিত করেন তার সুচারু-অঙ্গী তনুলতাকে।

প্রতিদিন রাজকার্য শেষে অপরাহ্নে মনোরঞ্জিনী প্রিয়তমাকে নিয়ে পুরুরবা চলে যান উদ্যানবাটিকার লতাকুঞ্জে। রক্তাশোকের ছায়াতলে নীলাঞ্চিত তৃণভূমিতে বসেন দুজনে। পরম সোহাগভরে উর্বশীর কণ্ঠে মালিকার ও ঘনকৃষ্ণ কেশস্তবকে কিংশুক-মঞ্জরী গ্রথিত করে দেন। পুরুরবার নিবিড় আলিঙ্গনে স্পর্শসুখবিহ্বল উর্বশীর সমস্ত সত্তা নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করে। স্তব্ধ হয়ে পড়ে তার স্বর্গসুখবাসনার গোপন চঞ্চলতা।

অম্ভোবিহারাচনিতা উর্বশীকে নিয়ে কল্লোলনাদিত সরোবরসলিলে জলকেলি করতে থাকেন রাজা পুরুরবা। দেখতে দেখতে যখন উন্মুক্তকেশশিথিলতা উর্বশীর দেহগাত্র হতে চিত্রকীচিত পত্রলেখাদি বিগলিত হয়ে যায়, স্খলিত হয়ে পড়ে তার মুক্তাখচিত তাড়ঙ্ক, তখন দুজনে সোপানাবলী অতিক্রম করে সরোবরতটে উঠে আসেন। [illegible] মাধবীবারি পরিপূর্ণ [illegible] দুটি খুলে দেন।

রাজা পুরুরবা বলেন, এখানে পারি-জাতের বিরত্র হানি নেই, অমৃতমধু-নিস্যন্দী মন্দারের নির্যাস নেই; এখানকার আকাশে বাতাসে অমরীর আনন্দে কোন উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি নেই, তবু এই মর্ত্যভূমি বড় সুন্দর প্রিয়তমা। এ জীবনে মৃত্যু আছে জন্ম আছে স্বীকার করি; তবু জীবন বড় উপভোগ্য। এই জীবনের পথে একদিকে যেমন আছে সংশয়ের কুহেলিকা, অবিশ্বাসের অন্ধকার, সংকটের কণ্টক; তেমনি অন্যদিকে আছে উজ্জ্বল বিশ্বাসের সূর্যালোক আর ভালবাসার মমতামেদুরিত চন্দ্রালোক। এ জীবনে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের রং হচ্ছে ভালবাসা। এই ভালবাসাই মর্ত্যভুবন মর্ত্য-জীবনকে বড় মধুর ও রমণীয় করে রেখেছে। তোমাকে লাভ করার পর এই প্রেমের শক্তি ও মাধুর্যকে নতুন করে চিনেছি প্রিয়তমা।

উর্বশী কোন কথা বলে না। শুধু শান্ত নিরুচ্চার এক আবেগের নিবিড়তা দিয়ে উপভোগ করে যায় রাজা পুরুরবার এই সব সোহাগসিক্ত প্রণয়ালাপগুলিকে।

রাজা পুরুরবা আরও বলেন, তোমার কুবলয়সদৃশ নীল নয়নের দ্যুতির কাছে স্বর্গের আলোকসুধাকেও তুচ্ছ মনে হয় আমার; তোমার অনিন্দ্যসুন্দর মুখচ্ছবির কাছে ম্লান মনে হয় ত্রিভুবনের সকল রমণীয় বস্তু। তোমার অধরসুধা পান করে স্বর্গ মর্ত্যের সকল মাধুর্যের আস্বাদন লাভ করি প্রিয়দর্শিনী।

আর শুনতে পারে না উর্বশী। এক বিপুল পুলকাবেশে অবশ হয়ে আসে তার রোমাঞ্চিত তনুশ্রী। নিমীলিত হয়ে আসে তার নেত্রদ্বয়। আর্তকাতর কণ্ঠে বলে, ক্ষান্ত হন মহারাজ আর একথা বলে লজ্জা দেবেন না। আমি নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করছি। আপনার এই প্রেমালাপ শ্রবণে মধুমত্ত ভ্রমরের মত এক অদ্ভুত আবেগে ও উচ্ছ্বাসে মদমত্ত হয়ে উঠেছে আমার দেহের প্রতিটি শোণিতকণিকা। এক উদ্দাম নৃত্য-মোহে চঞ্চল হয়ে উঠেছে আমার বুকের প্রতিটি পঞ্জর। আমার প্রেমবিহ্বল অন্তরের কোনখানে বিন্দুমাত্র অবশেষ আর নেই।

সেদিন নিশাকালে ঘনকৃষ্ণকুটিল নীরদ-মালায় আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে সমগ্র গগনতল। প্রবর্তিতমিরের বিশাল ছায়াবিস্তারে নিশ্চিহ্নী-কৃত হয়ে ওঠে কৃষ্ণপক্ষের নিরন্ধ্র অন্ধকার। রাজা পুরুরবা ও উর্বশী তাঁদের প্রাসাদ-ভবনের সেই দীপালোকহীন রতিমন্দিরে দুটি পৃথক পালঙ্কে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়েন দুজনে। ঝিল্লিসম্বলিত পবনমর্মর ভেসে আসে অন্তরবর্তী উদ্যানবাটিকা হতে।

সহসা এক তীক্ষ্ম নারীকণ্ঠের চীৎকারে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে পড়েন বীতনিদ্র রাজা পুরুরবা। নিবিড় অন্ধকারে প্রকোষ্ঠ মধ্যে কিছু দেখা না গেলেও পুরুরবা বুঝতে পারলেন, শয্যার উপর উঠে বসে উর্বশী আকুলভাবে খুঁজছে তার মেষ দুটিকে।

কোনক্রমেই বুঝে উঠতে পারলেন না বিস্ময়স্তব্ধ রাজা পুরুরবা, চারিদিকে সতর্ক প্রহরীবেষ্টিত এই প্রাসাদভবন হতে কোন দুর্বৃত্ত কীভাবে অপহরণ করল মেষ দুটিকে। কিন্তু ভাববার আর সময় নেই। ওদিকে স্নেহ ব্যাকুলিত কণ্ঠে উর্বশী কাতরভাবে অনুনয় করে, তুমি অত নীরবে বসে থেকো না রাজা। আমি তাদের সন্তানস্নেহে পালন করেছি। যেখান থেকে হোক, খুঁজে নিয়ে এসো তাদের।

কালবিলম্ব না করে সেই রাজা মুহূর্তেই আপন পালঙ্ক হতে অবতরণ করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন ঘর হতে। কিন্তু দ্বারপ্রান্তে উপনীত হবার সঙ্গে সঙ্গেই চকিতস্ফুরিত ক্ষণপ্রভার উদ্ভাসে নিজের বিবস্ত্র দেহটি দেখতে পেয়ে নিজেই চমকে ওঠেন রাজা পুরুরবা। মুহূর্তে স্মৃতিপথে উদিত হয় সেই শর্ত পালনের কথা। কিন্তু বস্ত্রগ্রহণের জন্য শয্যার দিকে অগ্রসর হতে পুরুরবা দেখলেন, বিদ্যুদ্দামস্ফুরিত চকিতালোকে উর্বশীও দেখে ফেলেছে তাঁর উলঙ্গ মূর্তিটিকে।

শরবিদ্ধ পক্ষীর মত যন্ত্রণার্ত কণ্ঠে চীৎকার করে ওঠেন রাজা পুরুরবা, আমায় ক্ষমা কর উর্বশী, তোমাকে বিচলিত দেখে আমি নিজেও অতিশয় ব্যস্ত ও বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। বিশ্বাস কর প্রিয়তমা, স্বেচ্ছায় নয় ক্ষণচঞ্চলিত আত্মবিস্মৃতির ফলেই শর্তভঙ্গ করে বসেছি আমি।

শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায় উর্বশী। শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলে, ক্ষমা করার কোন প্রশ্ন ওঠে না মহারাজ। যে কোন কারণেই হোক, শর্তভঙ্গ যখন হয়েছে তখন এ প্রাসাদে আর আমার এক মুহূর্তও থাকা চলে না। শর্ত হচ্ছে এক কঠিনতর সত্যের প্রতীক! এই সত্যের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল আমাদের প্রেমসম্পর্ক। মনে রাখবেন মহারাজা, সত্য হচ্ছে সব কিছুর থেকে বড়, প্রেমের থেকে বড় জীবনের থেকে বড়, সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা সব কিছুর থেকে বড়। সুতরাং এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোন কিছুর অজুহাতেই সত্যকে ভঙ্গ করা চলে না এবং সত্য ভঙ্গ সহ্য করাও চলে না।

মেঘোর্মিমন্দ্রিত ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সেই নিশান্ধকারে মায়াতনুধারিণী এক অমর্ত্য মানবীর মত কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায় উর্বশী। উর্বশীর নাম ধরে যতই ডাকেন রাজা পুরুরবা, ততই শূন্য প্রান্তরবাহী নিদাঘতপ্ত বাতাসের মত তাঁর বেদনাতপ্ত কণ্ঠস্বর ঝঞ্ঝাহত হয়ে ফিরে ফিরে আসে। বারবার ব্যাকুল কণ্ঠে বলতে থাকেন, আমার প্রেম যদি সত্য হয় তাহলে যেখানেই যাও সেখান থেকে ফিরিয়ে আনব তোমায় উর্বশী। আমার অতৃপ্ত প্রেম তোমায় স্বর্গেও অনুধাবন করবে এবং সেখানেও তোমায় সুখে থাকতে দেবে না।

বেশ বুঝতে পারেন রাজা পুরুরবা, অনেক দূরে চলে গেছে উর্বশী। শুধু প্রমত্তসংক্ষুব্ধ ঝটিকার অট্টহাসি ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হলো না তাঁর।

তবু তাঁর প্রাসাদভবনের অন্তঃপুরে আর ফিরে আসেন না অকুলোদ্বিগ্ন রাজা পুরুরবা। অস্থির হয়ে সেই মুহূর্তেই প্রাসাদ ত্যাগ করে শঙ্কাকণ্টকসমাকীর্ণ সপ্ত-পর্ণ বন অতিক্রম করে ঝটিকাবিমথিত বেলা ছুটে যান তাঁর জীবনবাঞ্ছিতার উদ্দেশে। এক মধুর মোহবিভ্রমে অভিভূত হন রাজা পুরুরবা। তাঁর কেবলই মনে হয়,

তাম্বরদেহিনী সেই নারীর রক্তাধরস্ফুরিত অপূর্ব হাস্যের ছটা আলিম্পিত হয়ে আছে যেন প্রতিটি অন্ধকার দিগন্তে। তার সাহচর্যের মধুস্মৃতির শর্তাক্ত এক নক্ষত্রোপম উজ্জ্বলতায় দীপ্যমান হয়ে ওঠে বিরহাকীর্ণ আকাশের শূন্য অন্ধকারে। বনপথ প্রান্তস্থ বৃক্ষশাখায় ক্ষতবিক্ষত হয় রাজা পুরূরবার সুকোমল অঙ্গ, তাঁর নিশ্বাসবায়ু দ্রুত হয়। প্রান্তরবর্তী উপলখণ্ডের আঘাতে বারংবার প্রতিহত হয় অশ্বের গতি, স্বেদাক্ত হয়ে ওঠে তার ক্লান্ত দেহগাত্রচর্ম। তবু ক্লান্ত হন না রাজা পুরূরবা। তাঁর গতিবেগচঞ্চলিত দেহের নিভৃত অন্তরস্থলে প্রত্যয়ঘন একটি প্রতীক্ষা এক বিষন্ন নিবিড় স্তব্ধতায় নিশ্চল হয়ে থাকে। কবে শেষ হবে এই অমিতসহিষ্ণু প্রতীক্ষার জীবনায়ু তা নিজেই বুঝে উঠতে পারেন না পুরূরবা।

ক্রমে নিশাবসানে অন্ধকার অপসৃতা হয়। নবারুণরাগে রঞ্জিত হয় পূর্বাচলের আলো। ক্ষণকালের জন্য শান্ত হয়ে সেইদিকে স্তব্ধনেত্রে তাকিয়ে থাকেন রাজা পুরূরবা। সহসা তাঁর মনে হয়, তিনি যেমন উর্বশীর সন্ধানে ধাবমান, তেমনি সূর্যদেবও সপ্তবর্ণাশ্বযোজিত আলোকরথে আরোহণ করে ছলবিনাশিনী ঊষার ক্রমাপসরণশীল মূর্তিটিকে করায়ত্ত করবার জন্য ছুটে চলেছেন অনন্তকাল ধরে। দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন আসে। প্রতিদিন রাত্রিশেষে চীনাম্বরা ছলপ্রণয়িনী ঊষা উদয়াচলে দ্বারপ্রান্তে আবির্ভূতা হয়ে কপট ইশারায় আহ্বান করে তরুণ সূর্যদেবকে। কিন্তু সূর্যদেব উদয়াচলে আসতে না আসতেই অন্তর্হিতা হয়ে যায় ঊষা। শুধু তার ছলনালাঞ্ছিত রক্তাম্বরের বিলীয়মান একটি অঞ্চলপ্রান্ত চিরদিন আশামুগ্ধ করে রাখে নবীন অরুণার্কদেবকে।

মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন রাজা পুরূরবা। উর্বশীকে ফিরে না পেলে এই বিরহতাপিত অন্তর নিয়ে আর ফিরে যাবেন না তাঁর রাজপ্রাসাদে। প্রাণবল্লভার পুনর্দর্শন লাভের আশাপ্রণোদিত প্রচেষ্টায় ব্যয়িত করবেন তিনি তাঁর জীবনের অবশিষ্টাংশকে।

দিনের পর দিন যায়। মাসের পর মাস। ঋতুর পর ঋতু আসে। নব নব বর্ণানুলিপ্ত রূপে সজ্জিত হয় প্রকৃতি, নবোদ্ভিন্ন কত কুঞ্জকুসুমগন্ধে আমোদিত হয় বায়ুস্তর। বিচিত্র বিহগকাকলিতে আকীর্ণ হয় শান্ত বনস্থলী। কিন্তু কোন বর্ণ গন্ধ বা শব্দের অভিঘাতে অভিভূত হন না রাজা পুরূরবা। তিনি এক লক্ষ্যাভিমুখী হয়ে ছুটে চলেন উর্বশীর সন্ধানে। দিনের শেষে মাত্র একবার বৃক্ষচ্যুত কিছু বনফল আহার করেন পুরূরবা। পর্বতসংলগ্ন কোন নির্ঝরজলে অথবা কোন আশ্রমতড়াগের শীতল প্রক্ষালিকায় তাপিত দেহ শীতল ও পথক্লান্তকে তৃপ্ত করেন। তারপর পত্রশয্যায় আশ্রয় নিয়ে শুরু করেন তাঁর অন্তহীন [illegible] স্বপ্নলালিত জাগরণ।

প্রতিদিন ঊষাকালে একবার স্থির হয়ে দাঁড়ান অশ্বারূঢ় পুরূরবা। ঊর্ধ্বনেত্রে করজোড়ে সূর্যপ্রণাম করেন। উদ্যানসন্ধানরত শ্রান্তাকুল অশ্বপদের নিকট হতে কাম্যহীন প্রেমসাধনার এক অবকাশ প্রেরণা লাভ করে তাঁর বিরহবিদীর্ণ অন্তর। এক অনমনীয় দৃঢ়তায় প্রস্তরীভূত হয় তাঁর প্রত্যয়ঘন প্রতীক্ষা।

অনাহারে অনিদ্রায় কান্তিহীন প্রতীক্ষার সুকঠিন রুক্ষতায় দিনে দিনে কৃশ হতে কৃশতর হয়ে পড়ে রাজা পুরূরবার অঙ্গ। ম্লান হয়ে যায় রূপপ্রভাসমন্বিত কান্তিদ্যুতি। আর্ত ক্রন্দনাকীর্ণ কোন তৃষিত কলবিঙ্কের মত তৃষ্ণাতপ্ত কামনায় অশান্ত অবিরত পক্ষাঘাতে বিদীর্ণ হতে থাকে তাঁর প্রতিটি বক্ষপঞ্জর। সমস্ত অতীত আজ বিস্মৃত ও নিশ্চিহ্ন রাজা পুরূরবার কাছে। তবু একটি দিনের একটি বিশেষ ক্ষণের স্মৃতি আজও মাঝে মাঝে জেগে ওঠে তাঁর মনে। নিদাঘতপ্ত নীপবনবক্ষের উপর নিবিড় আবেশে ঢলে পড়া নীলাঞ্জন ছায়ার মত সে স্মৃতি সুখশীতলিত এক মধুর আবেশ রচনা করে তাঁর মনেপ্রাণে। রক্তরাগরঞ্জিত পুষ্পরেণুমেদুর এক উতল সান্ধ্য মুহূর্তে উর্বশীর সঙ্গে প্রথম প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধ হন রাজা পুরূরবা। সে মুহূর্তের কথা কোন দিন বিস্মৃত হবেন না তিনি।

এইভাবে একটি বৎসর পূর্ণ হয়। নানা স্থান পরিভ্রমণ করতে করতে অবশেষে একদিন অপরাহ্নে কুরুক্ষেত্রের বিশাল প্রান্তরপ্রান্তে কাননসমাকুল একটি নির্জন প্রদেশে উপনীত হন রাজা পুরূরবা। তৃষ্ণাকুলিত হয়ে স্নিগ্ধ সরোবরসলিলের সন্ধান করতে করতে ক্রমশঃ অগ্রসর হন। কিন্তু যখনি কোন স্নিগ্ধ শান্ত সরসীসলিলে তৃষ্ণা নিবারণ করেন রাজা পুরূরবা তখনি তাঁর মনে হয়, স্বচ্ছ স্নিগ্ধ সলিলপানে তাঁর দেহগত তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় সত্য, কিন্তু অতৃপ্তিতাপিতা প্রতীক্ষার যে পাষাণপ্রতিমা অবিচল স্তব্ধতায় বসে রয়েছে তাঁর অন্তরের নিভৃতে তার তৃষ্ণা কি তৃপ্ত হবে না কোন দিন।

সহসা অদ্ভুত একটি দৃশ্য দেখে অশ্বের গতিরোধ করে অশ্ব হতে অবতরণ করেন রাজা পুরূরবা। নিজের চক্ষুরেন্দ্রিয়কে নিজেই বিশ্বাস করতে পারেন না যেন। স্পষ্ট দেখলেন পুরূরবা, অদূরে একটি সরোবরে বায়ুহিল্লোলিত রক্ত কোকনদের মৃণালগুলির সঙ্গে কেলি করছে কলহংসরূপিণী চারজন অপ্সরা আর কুঞ্চিতালকা সেই সরোবরের শৈবালাচ্ছন্ন সোপানে বসে রয়েছে তাঁর সেই স্বপ্নচারিণী নারী। পুরূরবা ভাবলেন, না, না, স্বপ্ন কখনো অকস্মাৎ সত্যের মূর্তি ধরে আসতে পারে না। এ শুধু তাঁর স্বপ্নসর্বস্ব প্রেমাতুর চিত্তের এক মধুর বিভ্রম এক অলীক ছায়াশরীর পরিগ্রহ করে ছলনা করছে তাঁর সঙ্গে।

তবু এগিয়ে যান রাজা পুরূরবা। দেখেন, ছায়াশরীর নয়, তাঁর স্বপ্নচারিণী উর্বশী আনন্দ ও কৌতুক স্মিতহাস্যে সত্য-সত্যই আবির্ভূতা তাঁর সামনে। বিস্ময়াকুল দুই চক্ষুতারকা নিশ্চল করে নির্নিমেষে দাঁড়িয়ে থাকেন রাজা পুরূরবা। তারপর অভিমানসিক্ত কণ্ঠে অভিযোগের আর্তনাদের সুরে বলেন রাজা পুরূরবা, আমার অভিশাপকৃত মর্তজনের সেই শাস্তির আজও কি শেষ হয় নি সুনন্দা? অপরাধের পাপের পরিমাপ যত অধিকই হোক না সুন্দরি, তার শাস্তি লঘু হওয়াই উচিত নয় কি?

কজ্জলাক্তি পক্ষ্মরেখার প্রান্ত দীপ্তিতে মৃদু দীপালোকের মত মধুর হাস্যে উজ্জ্বল করে উর্বশী বলে, আমি জানি, মর্তজনের সত্যই আপনার কোন দোষ নেই আর্য। মায়াবী গন্ধর্বজনের কৌশলের জন্যই মর্তজন করতে বাধ্য হন আপনি। স্বর্গের দেবতারা আমার প্রত্যাখ্যান করলেও বিপন্নপ্রাণ গন্ধর্বরা আকুল হয়ে ওঠে আমার জন্য। নৃত্যগীতময় আমার শিল্পকলার স্মৃতিসৌরভে ক্রমশঃ আকুল হয়েই তারা বিচ্ছিন্ন করে এনেছে আমাকে আপনার কাছ হতে।

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে অনুযোগ করলেন রাজা পুরূরবা, একথা জানায় শুধু কেন তুমি আমার কাছে আবার ফিরে এলে না প্রেমধর্মদ্রোহিনী? তুমি কি জান না নির্দয়া, আমার মণিদীপ্তিত রত্নখচিত রাজভবনের সকল ঐশ্বর্য ম্লান করে দিয়ে যেদিন তুমি চলে এসেছ সেইদিন হতেই সে ভবনে আর ফিরে যাইনি আমি? সেইদিন হতেই তোমার অন্বেষণে সারা মর্তভূমি পরিক্রমা করে চলেছি আমি। যে [illegible] প্রেমের [illegible] আবদ্ধ করেছিলাম [illegible] সে বন্ধন অকারণ ছিন্ন করে কোন [illegible] আমায় গন্ধর্বলোকের [illegible] ফিরে গেছ তুমি? তোমার [illegible] অনিন্দ্যসুন্দরা, স্বর্গে [illegible] সকল সুখের সামগ্রী আছে, [illegible] আছে, কিন্তু প্রেম নেই। যে প্রেম স্বর্গে মর্তের সকল মাধুর্যনির্যাসসম্ভূত এক অপূর্ব অপার্থিব বস্তু, [illegible] সারসত্য সে প্রেমকে অবহেলা করে প্রেমধর্ম হতে বিচ্যুত হয়েছ তুমি। ধিক তোমার নারীজীবনে।

অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে [illegible] উর্বশীর দুটি নয়ন। [illegible] বৃথাই আমায় গঞ্জনা দিয়ে [illegible] করছেন নৃপবর। [illegible] গন্ধর্বরা আমার সকল স্বাধীন ইচ্ছাকে হরণ করেছে। আমি তাদের অনুমতি ব্যতীত কোথাও যেতে পারি না। তবে বৎসরে এই একটি দিন আমি স্বাধীন। প্রতি বৎসর এই দিন আমি এই সরোবরসলিলে স্নান করতে আসব স্বর্গ হতে। ইচ্ছামত জলকেলি করে প্রাণভরে মর্ত্যশোভা উপভোগ করব। তারপর আবার ফিরে যাব স্বর্গলোকের গন্ধর্ব [illegible] একটি বিশেষ স্থানে। নৃত্যগীত ছাড়া আমি শুধু গন্ধর্বদেরই প্রীতি করি, স্বর্গের দেবসভায় আমার প্রবেশাধিকার নেই।

[illegible] স্বর্ণাভ [illegible], পত্রপল্লব শয্যা অন্তরে [illegible]

করে স্নানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল উর্বশী। মুক্তবেণী উর্বশীর কুঙ্কুমগন্ধবাসিত স্বচ্ছধবল গ্রীবাদেশ, কুঙ্কুমাঙ্কিত কঞ্চুকপ্রান্তস্থিত কাঞ্চীদামযুক্ত বিশাল স্তনযুগল, সংকীর্ণমেখলাশোভিত কৃশকটিতট, কদলী-বৃক্ষসদৃশ সুবর্তুল উরুদ্বয় ও নাভিকুহর আশ্চর্যভাবে তৃষাতুর করে তোলে রাজা পুরূরবার দেহমনের প্রতিটি অণুপরমাণুকে। তাঁর মনে হয় উর্বশীর স্পর্শলোলুপ তাঁর প্রতিটি অঙ্গের আবেগোদ্দীপ্ত অণুপরমাণুগুলি বিশৃঙ্খলিত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এখনই।

অপরাহ্ণমিহিরের রক্তরশ্মিরঞ্জিত সরোবর তট হতে উর্বশীকে সঙ্গে নিয়ে অসংখ্য তরুপল্লবের ছায়াখণ্ডিত অন্তরালে বনবিতানের নিভৃতে চলে যান পুরূরবা। তারপর দুই বাহু প্রসারিত করে উর্বশীর কণ্ঠ আলিঙ্গন করে তার মদবিহ্বল অঙ্গলতিকাটিকে কামনাতপ্ত বক্ষে ধারণ করেন, যেন কোন খরতপ্ত ক্লিন্নদেহ ছায়াস্নিগ্ধ লীলায়িত একটি কুঞ্জলতিকাকে সর্বাঙ্গে ধারণ করে বক্ষের সকল জ্বালা শান্ত করবার প্রয়াস পাচ্ছে।

পিককণ্ঠস্বরধ্বনিত বনান্তরাল হতে বেরিয়ে এসে রাজা পুরূরবা বলেন, তবু ভাল, সুন্দরি আমার একটি বছরের অতৃপ্তিতাপিত আসঙ্গবাসনা, কয়েকটি মুহূর্তের জন্যও তৃপ্ত হলো।

উর্বশী বলে, আমিও কম কৃতার্থ হইনি মহারাজ। সুদূর স্বর্গলোকে গন্ধর্বপরিবৃত নৃত্যগীতান্বিত এক অপ্সরা-জীবন যাপন করলেও আপনার এই প্রণয়-মেদুরিত স্মৃতি মেঘমেদুর শ্রাবণাকাশের মত আমার সকল সুখানুভূতিকে ম্লান করে দিয়ে আচ্ছন্ন করে রাখবে আমার মানসভূমিকে। একটি বছর পর আবার আপনার সঙ্গে মিলন হবে আবার এই দিনে এই ক্ষণে সরোবরতটের এই নিভৃত লতা-বিতানে। একটি বছর ধরে স্বর্গবাসী মায়াবী গন্ধর্বদের প্রেমহীন প্রয়োজনকে তৃপ্ত করার পর এক মর্ত্যমানবের প্রেম-তৃষ্ণাকে তৃপ্ত করবার জন্য একটি দিন নেমে আসব আমি এইখানে। দেবগন্ধর্ব-সেবিকা এক অপ্সরার ছলাবিলাসিত জীবন ধন্য হয়ে উঠবে এক মর্ত্যপুরুষের প্রণয়-নিবিড় আলিঙ্গনে।

মুহূর্তের মধ্যে অন্যান্য অপ্সরাদের সঙ্গে স্বর্গপথে অদৃশ্য হয়ে যায় উর্বশী।

ক্ষণপ্রণয়িত তৃপ্তির এক মধুর সুখস্মৃতি বুকে নিয়ে আপন রাজভবনে ফিরে আসেন রাজা পুরূরবা। কিন্তু স্থায়ী শান্তি পান না মনে। বিচ্ছেদবেদনার মহাসমুদ্রে জলবুদ্বুদের মতই বিলীন হয়ে যায় সেই ক্ষণমিলনতৃপ্তির সুখস্মৃতি। আবার শুরু হয় প্রতীক্ষা। দিনে দিনে সঞ্চিত হতে থাকে আবার তৃষ্ণার জ্বালা আর অতৃপ্তির দহন। কোন এক ছায়া-সুনিবিড় অপরাহ্ণের তরুছায়াবিচ্ছিন্ন সরোবরের সেই শৈবালাচ্ছন্ন সোপান, মৃদুসমীরিত, পিককূজিত সেই নিভৃত বনবিতান, উর্বশীর অঙ্গরাগচর্চিত দেহ-সৌরভ, তার স্বর্ণকলসসদৃশ কাঞ্চীদামযুক্ত বিশাল স্তনকুম্ভ ও মোহমেদুরিত মধুর নাভিকুহরের অতলান্তিক রহস্য রাজা পুরূরবার মনে সঞ্চারিত করে দেয় সর্বগ্রাসী এক স্বপ্নের আবেগ।

বৎসরান্তে সেই দিনটিতে ছায়ামেদুর অপরাহ্ণে সেই সরোবরতটের নিভৃতে বনবিতানে উর্বশীর সঙ্গে মিলিত হন রাজা পুরূরবা। উর্বশী বলে, আমাদের এই মিলন এবার হতে আর ব্যর্থ হবে না মহারাজ। আমাদের ক্ষণচঞ্চলিত এই প্রণয়াবেগের তরল তৃপ্তি চিরকালের জন্য মূর্ত হয়ে উঠবে এক সন্তানের মধ্যে।

এমনি করে বৎসরের একটি বিশেষ দিনে একটি বিশেষ মুহূর্তে একটি নিভৃত-নিবিড় বনকুঞ্জে পত্রপুষ্পপল্লবের বর্ণগন্ধময় সমারোহের মাঝে ক্ষণপ্রণয়ের আবেগে চঞ্চল হয়ে ওঠে দুটি প্রেমাস্পদের বাহুবন্ধ দুটি দেহ। তাদের মিলনতানাদের প্রবল উত্তাপে ধর্ষিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে নিস্তব্ধ বনস্থলী। এই দেহমিলনের ফলস্বরূপ প্রতিবারই রাজা পুরূরবা পান নবকিশলয়দেহ কুসুমপ্রাণ এক একটি শিশুসন্তান।

অবশেষে একবার রাজা পুরূরবাকে সানন্দে জানান উর্বশী, আমার অনুরোধে গন্ধর্বরা আপনাকে এক বরদান করতে সম্মত হয়েছে মহারাজ। আপনি এই মুহূর্তে যে কোন প্রার্থনা করুন।

মুহূর্তে দীপ্ত হয়ে ওঠে রাজা পুরূরবার সুস্মিত আনন। উল্লসিত কণ্ঠে বলেন, তোমার আমার মাঝে বিচ্ছেদের সকল ব্যবধানকে চিরতরে লুপ্ত করে দিয়ে চিরন্তন হয়ে উঠুক আমাদের মিলন, অক্ষয় হয়ে উঠুক আমাদের প্রেম, অবিরাম হয়ে উঠুক আমাদের সাহচর্য। এ ছাড়া আমার আর কোন বর নেই।

শঙ্কাকাতর কণ্ঠে উর্বশী বলে, মায়াবী গন্ধর্বরা অবশ্যই আপনার অভীষ্ট পূর্ণ করবেন। কিন্তু একটা শর্ত—এই মর্ত্যভূমি চিরকালের জন্য ত্যাগ করে আমার সঙ্গে গন্ধর্বলোকে গিয়ে বাস করতে হবে।

এখানেও শর্ত কেন সুন্দরি! অবশ্য তোমার অবিরাম সাহচর্য সংলাভে ধন্য ত্রিভুবনের যে কোন স্থানে গিয়ে বাস করতে পারি।

উর্বশী বলে, কারণ অবাধ অনন্ত মিলন মর্ত্যে সম্ভব নয় নরবর। মর্ত্যে কোন কিছুই অবাধ, অনন্ত বা অখণ্ড নয়। মর্ত্যে সকল জীবনেরই মৃত্যু আছে, সকল সুখেরই শেষ আছে, সকল তৃপ্তিরই অন্ত আছে।

উর্বশীর কথায় রাজা পুরূরবা স্বীকৃত হলে এক বয়োঃপ্রবীণ গন্ধর্ব একটি অগ্নি-পাত্র হাতে সেই স্থানে উপস্থিত হল সহসা। রাজা পুরূরবার সামনে সেই অগ্নিপাত্রটি রেখে বলেন, বেদের বিধান অনুসারে এই অগ্নিকে তিন ভাগে বিভক্ত করুন। তবেই আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

তাই করেন রাজা পুরূরবা। তারপর উর্বশীকে বাহুবন্ধন করে মন্দারাগরঞ্জিত বনপথ দিয়ে গন্ধর্বলোকের দিকে অগ্রসর হন।

কৌতুকতরল কণ্ঠে রাজা পুরূরবা একবার বলেন, তোমার ভালবাসার জন্য আমি মর্ত্যজীবনের সমস্ত মাধুরী ত্যাগ করেছি মানসী।

উর্বশী হেসে বলে, আপনার ভাল-বাসার জন্য আমি স্বেচ্ছায় স্বর্গসুখ হতে বঞ্চিত হয়েছি প্রাণকান্ত।

দশ, এগার, বার : শিক্ষার সংকট

শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

মানদণ্ড :

আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রথম দিকে কর্তৃপক্ষ পরিকল্পনার ফলাফল বিচারের একটা সোজা মাপকাঠি বেছে নিয়েছিলেন : বিশেষ খাতে বা প্রকল্পে বরাদ্দের কত পরিমাণ ব্যয় হল (এখনও এই মানদণ্ডের মোহ সম্পূর্ণ দূর হয়নি)। ব্যয় যদি বরাদ্দ মত হয়ে থাকে তবে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পরিকল্পনা নিশ্চয়ই সফল হয়েছে, আর ব্যয় বরাদ্দের চেয়ে কম হয়ে থাকলে পরিকল্পনা হয়েছে ব্যর্থ। যেমন, সমষ্টি-উন্নয়ন ক্ষেত্রে ব্যয় যদি বরাদ্দের কাছাকাছি গিয়ে থাকে তবে ঐ কার্যক্রম নিশ্চয়ই সার্থক হয়েছে, তা গ্রামীণ জীবনের উন্নয়নমূলক গতি অনুভব করা যাক আর না যাক। অন্যান্যের মত এই অর্থব্যয়ের মাপকাঠিই বিশেষভাবে প্রযুক্ত হয়েছিল শিক্ষা-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে। এবং তার ফলে পূর্বতন 'দশ-ক্লাস' বিদ্যালয়ের জায়গায় প্রবর্তন করা হয়েছিল এগার ক্লাসের উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার। সম্প্রতি আবার দেখা যাচ্ছে, সে ব্যবস্থা থেকে বিদায় নিয়ে সেই দশ-ক্লাসের কোর্সে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত করা হয়েছে।

পশ্চাদপট :

ব্যাপারটা ছিল এই রকম : প্রাক পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৫১-৫৬) শেষের দিকে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় সজাগ হলেন যে বরাদ্দমত অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হচ্ছে না। কি দুর্দৈব! অন্যান্য মন্ত্রণালয় বাহবা নেবে, আর শিক্ষা মন্ত্রণালয় হবে বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন। তাঁরা ভাবতে লাগলেন কি করা যায়। অবশেষে তাঁদের মনে পড়ল বাক্সবন্দী মুদালিয়র কমিশনের (১৯৫২) রিপোর্টের কথা। তাই ত, ঐ রিপোর্টের অন্তত কিছুটা গ্রহণ করে প্রথম পরিকল্পনা শেষ হবার আগেই বরাদ্দ অর্থের মোটা অংশ ব্যয় করে কেরা-মতি দেখান যেতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত হয়ে গেল : পুরানো মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার জায়গায় নতুন মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা — অর্থাৎ দশ-ক্লাস স্কুলের স্থলে এগার ক্লাসের স্কুল এবং এর স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে ত্রি-বার্ষিকী ডিগ্রী কোর্স।

স্কুলের 'মান-উন্নয়ন' ব্যাপারে বিভিন্ন রাজ্য সরকার এবং তাঁদের অধীনস্থ নামে স্বায়ত্তশাসিত মধ্যশিক্ষা পর্ষৎগুলি সানন্দে রাজী হল। কর্তৃত্ব ও প্রভাব বৃদ্ধি ছাড়াও কেন্দ্র থেকে অর্থাগমের সম্ভাবনা তাদের [illegible] করে [illegible] পারে। স্কুলগুলোও [illegible] [illegible] [illegible]। কিন্তু [illegible] [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে নিয়ে। তারা যে স্যার আশুতোষের সেই [illegible] কার্টে [illegible] সেকেণ্ড [illegible] [illegible] নীতিকে আঁকড়ে ধরে আছে। সুতরাং তাদের জন্যও টোপ ফেলা হল। এবং অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় সেই টোপ গিলল। কিন্তু অধিকাংশই,—সকলে নয়। কারণ সকলকে সকল সময় টাকা দিয়ে বশ করা যায় না। বোম্বাই প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় এই সত্যই প্রমাণ করল ত্রি-বার্ষিকী ডিগ্রী কোর্সের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় :

আমাদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু এই শেষের দলে নয়। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, কলেজ কর্তৃপক্ষের ঘোর সংশয় এবং তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও স্যার আশুতোষের হাতে-গড়া এই বিশ্ববিদ্যালয় 'স্কীম' অভিহিত নৈর্ব্যক্তিক ভাবের চেয়ে সরাসরি কমলার উপাসনাই পছন্দ করেন। এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ও কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অনুবর্তী হল। ফলে পশ্চিম-বঙ্গেও প্রবর্তিত হল এগার-ক্লাসের স্কুলের পরবর্তী স্তর ত্রি-বার্ষিকী ডিগ্রী কোর্স। ছাত্রদের ওপর শিক্ষা-ব্যবস্থার এই গুরুত্ব-পূর্ণ পরিবর্তনের ফল কি হবে তা মোটেই ভেবে দেখা হল না। কেন্দ্র থেকে টাকা আসবে—এইটেই ছিল একমাত্র নির্ণায়ক।

রূপান্তর :

সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গেই রূপান্তরের কাজ শুরু হল। তড়িঘড়ি করে ১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাস থেকে (তখন কয়েক বছরের জন্যে স্কুল সেসন ছিল এপ্রিল থেকে মার্চ, জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর নয়) কয়েকটি স্কুলকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত করা হল। কি মাপকাঠিতে ঐ সব স্কুলকে বাছাই করা হয়েছিল জানা যায় না। যেমন, হিন্দু স্কুলকে প্রথমেই 'উচ্চ মাধ্যমিক' মর্যাদায় ভূষিত করা হয়, কিন্তু হেয়ার স্কুলকে জাতে তোলা হয় পরে।

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্যক্রমও রচিত হয়। মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্টের মধ্যেই এই পাঠ্যক্রমের কাঠামো বর্ণিত ছিল। সুতরাং বিশেষ অসুবিধা হয়নি। অসুবিধা হয়েছিল পাঠ্যপুস্তক নিয়ে—পাঠ্যপুস্তক কোথায়? পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে যে সময় লাগে। কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে একটা টেবিলে বসিয়ে দিলেই ত হয় না। নির্দেশ দেওয়া হল : সিলেবাসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়গণ যে কোন পুস্তক পড়াতে আরম্ভ করতে পারেন, এবং প্রয়োজন হলে একই বিষয়ের জন্য একাধিক পুস্তক পড়াবার ব্যবস্থাও করতে পারেন। সুন্দর ব্যবস্থা! রাতারাতি ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষিত করে তোলবার জন্যে এর চেয়ে ভাল পন্থার আর কি কল্পনা করা যেতে পারে?

পরীক্ষানিরীক্ষা :

তারপর এই রাজ্যে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে চলল পাঠ্যক্রম ও সিলেবাস নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা। উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 'পাঠ্যপুস্তকে' বাজার ছেয়ে গেল। প্রথম বছর দশেক অনুমোদন বা বাছাই করার প্রশ্ন না থাকায় পাঠ্যবই, নোট, সহায়ক, প্রশ্নোত্তর,—সব রকমের বইই স্কুলের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হতে লাগল।

উচ্চ মাধ্যমিক কোর্স চালু হবার বছর চারেক পরে কয়েকজন প্রখ্যাত ব্যক্তি সজাগ হলেন যে দেশে সংস্কৃত শিক্ষা অবহেলিত হচ্ছে। ফলে তাঁদের সুপারিশে হিউম্যানিটিজ কোর্স বা সাহিত্য-কলা ধারার জন্যে সংস্কৃত আবশ্যিক করা হল। এর ফলে বিশেষ করে ছাত্রদের মধ্যে সাহিত্য-কলার ধারার জন্যে ঝোঁক বিশেষ কমে গেল—অধিকাংশ ছাত্রই বিজ্ঞান ধারা বা অভাবে বাণিজ্য ধারার প্রতি পক্ষপাত দেখাতে লাগল।

প্রথমে ইংরেজী দুইপত্রের জন্যে [illegible] পাঠ্যপুস্তক ছিল না পরে কর্তৃপক্ষের [illegible] হল যে পাঠ্যপুস্তক থাকা [illegible] সুতরাং গদ্য ও পদ্যের [illegible] সংকলন করে এবং পাঠ্যবিষয় থেকে [illegible] বা 'ডায়ালগ' বাদ দিয়ে ইংরেজী সিলে-বাসের সংস্কার করা হল।

তারপর, নানা মহল থেকে সিলেবাস [illegible] বিশেষ ভারী—এই অভিযোগ [illegible] বছর পরে অর্থনীতি ইতিহাস [illegible] সিলেবাসেরও কিছু কিছু কাটাকাটি করা হল। কিন্তু তর্কবিদ্যা পদার্থবিদ্যা [illegible] প্রভৃতির ক্ষেত্রে সেই ভারী সিলেবাসই [illegible] হল।

শৈত ব্যবস্থা :

উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি সত্ত্বেও পুরনো দশ-ক্লাস স্কুলের সংখ্যা কিন্তু হ্রাস পেল না। যত সংখ্যক দশ-ক্লাসের স্কুলকে 'উচ্চ মাধ্যমিক' মর্যাদায় ভূষিত করা হতে লাগল, তত বা ততোধিক সংখ্যক 'জুনিয়র' হাই স্কুলকে দশ-ক্লাস স্কুলে উন্নীত করায় ফলে শেষোক্ত শ্রেণীর স্কুলের সংখ্যা অপরিবর্তিতই রয়ে গেল। এই সব স্কুল থেকে এবং প্রাইভেট বা স্কুলের বাইরে প্রায় সমান সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীই স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় বসতে লাগল। স্কুল ফাইনালের পরবর্তী স্তর প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবে-শিকা (প্রেসিডেন্সিয়াল [illegible]), যে স্কুলে...

তিন মাসে কোর্স শেষ করে পরীক্ষায় বসতে হয়।

ত্রুটি-দুর্বলতা :

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা এক দশকের বেশী দিন ধরে চলবার পর এর ত্রুটি সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ মহল থেকেই গুঞ্জন উঠতে লাগল : না, এ ব্যবস্থা চলা উচিত নয়। এর দরুনই উচ্চশিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে। অবশেষে দীর্ঘ ষোল বছর পরে সিদ্ধান্ত হল যে, আবার সেই পুরনো দশ-ক্লাস স্কুল, ইন্টারমিডিয়েট এবং তারপর ডিগ্রী কোর্সের ব্যবস্থাতেই ফিরে যেতে হবে, এবং তা ছ'মাস পরেই—অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের জানুয়ারী মাস থেকে।

কয়েকটি প্রশ্ন :

কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তকে অনেকেই স্বাগত জানিয়েছেন। কোন কোন মহল থেকে অবশ্য আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে যে 'এগুলো আপ গ্রেডেড স্কুলকে আবার ক্লাস টেন স্কুলে নামিয়ে আনলে শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হবে।

এই বিতর্কের প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই মনে আসে। সত্যিই কি মাত্র উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থাই শিক্ষা-জগতে যত নৈরাজ্য এবং শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত যত কিছু নৈরাশ্যের জন্যে দায়ী? সত্যিই কি এই শিক্ষা-ব্যবস্থা অন্তর্নিহিত ত্রুটির জন্যেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, যে ব্যর্থতা আবার সমগ্র উচ্চশিক্ষাকে সর্বনাশের পথে নিয়ে গেছে? অপর পক্ষে আবার সেই পুরনো দশ-ক্লাসের স্কুল, দু বছরের ইন্টারমিডিয়েট এবং তারপর ডিগ্রী কোর্সে ফিরে গেলেই কি সকল ত্রুটি দূর হবে—সকল সমস্যার সমাধান ঘটবে? তাই যদি আশা করা হয়, তবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে দীর্ঘ ষোল বছর সময় লাগল কেন? এই সময়ের শিক্ষায় যে অবনতি ঘটেছে জাতীয় জীবনের যে মান হ্রাস ঘটেছে তার জন্যে দায়ী কে? ১৯৭৩ সাল থেকে আবার যে পুনরাবৃত্তির পরীক্ষা সুরু করা হবে তা বিফল হলেও তার জন্যেই বা দায়ী হবে কে?

সমস্যার বিশ্লেষণ :

১৯৫৭ সাল থেকে এই রাজ্যে প্রবর্তিত উচ্চ মাধ্যমিক ব্যবস্থার মূল্যায়নের আলোচনায় প্রথমেই বলা যেতে পারে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিষ্ঠার সঙ্গে পাঠ্যক্রমকে অনুসরণ করা হয়নি। নবম ও দশম শ্রেণীতে অংক, সমাজবিদ্যা, 'সাধারণ বিজ্ঞান' প্রভৃতি মূল বিষয়গুলি স্কুলেই পড়িয়ে পরীক্ষা নেবার কথা। পড়ান ও পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সততার সঙ্গে নয়। আর যে একটা কারিগরী শিক্ষা দেবার কথা, তা মানার চেয়ে পরিহার করাই হয়েছে বেশী। অর্থাৎ যে যে বিষয়ে বোর্ডের পরীক্ষায় বসতে হয় না, সেগুলোকে মোটামুটি উপেক্ষাই করা হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছিল এই ধারণা নিয়ে যে, সকল ছাত্রই উচ্চ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার যোগ্য নয়। সুতরাং সকলেই কিছুটা অংক, কিছুটা ভাষা-সাহিত্য, কিছুটা অন্যান্য বিষয় এবং কিছুটা কারিগরী বিদ্যা শিখুক। ওদের মধ্যে যারা উৎকর্ষ দেখাতে পারবে মাত্র তাদেরই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় সুযোগ দেওয়া হবে। এই মোল ধারণার বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু বলবার নেই—সমাজ বা অর্থ-ব্যবস্থা লক্ষ লক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী চায় না। উচ্চশিক্ষা লাভের যোগ্য ছাত্রছাত্রীরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হক, আর বাকিরা কিছুটা সাধারণ শিল্প এবং কিছুটা কারিগরী শিক্ষা লাভ করে অর্থোপার্জনের সামর্থ্য লাভ করুক। এতে তাদেরও মঙ্গল এবং দেশেরও অর্থনৈতিক মুক্তির সম্ভাবনা। অপরদিকে তার ফলে তথাকথিত শিক্ষিত বেকাররা—যারা শুধু নিয়োগহীনই নয়, নিয়োগ-যোগ্যতাহীনও বটে—প্রবল জলতরঙ্গের মত বিপুল সমস্যারও সৃষ্টি করবে না।

এই ধারণা কার্যে রূপায়ণের অন্যতম অনুসিদ্ধান্ত হল যোগ্যতা প্রদর্শনে অসমর্থ—যেমন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের জন্য ডিগ্রী কোর্সের দ্বার উন্মুক্ত না রাখা। কিন্তু এই ঘোষণার জন্য যে সাহসের প্রয়োজন তা কর্তৃপক্ষের ছিল না। তাই সবাই কলেজে ঢুকতে লাগল—যোগ্য-অযোগ্যের কোন প্রশ্ন নেই, সবাই বিশ্ববিদ্যালয় অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় বসতে লাগল, সদাসদ উপায়ে উত্তীর্ণ হয়ে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে লাগল। ইতিমধ্যে আইনশৃংখলায় অবনতি ঘটায় অসদুপায় অবলম্বনের পরিমাণ বেড়ে গেল এবং সকল দিক দিয়ে এই রাজ্যের শিক্ষা-জগৎ অধিকার করল নৈরাজ্য।

ভবিষ্যৎ :

এই নৈরাজ্যের অবসান ঘটিয়ে সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থাকে আবার দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে সুষ্ঠু রূপদানের প্রচেষ্টায় সেই দশ-ক্লাসের স্কুল এবং তারপর দু-বছরের ইণ্টারমিডিয়েট—অর্থাৎ বার ক্লাসের প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় কোর্সে ফিরে যাবার ব্যবস্থা হয়েছে। এই ব্যবস্থা কিন্তু কতটা কার্যকর হবে, সন্দেহের বিষয়। প্রথমত, ব্যবস্থাকে রূপায়িত করতেই দেখা দেবে নানা অসুবিধা। ইন্টারমিডিয়েট কোর্স কোথায় পড়ান হবে—স্কুলে, না বর্তমানের ডিগ্রী কলেজগুলোতে, না কতকগুলো ইন্টারমিডিয়েট কলেজ প্রতিষ্ঠা করে? যদি ইণ্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রী কলেজগুলোর সঙ্গে কয়েকটি স্কুলকেও ঐ সুযোগ দেওয়া হয় তবে স্কুল বাছাই-এর ব্যাপারে পক্ষপাতের অভিযোগ উঠতে বাধ্য। আবার দেখা যায়, স্কুল ও কলেজে একই কোর্স পড়ান হলে ছাত্রছাত্রীরা কলেজেই পড়তে চায়। কারণ কলেজে পড়া অধিক মর্যাদার পরিচায়ক। এর দরুন কলেজের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি নির্বাচিত স্কুলে ইন্টারমিডিয়েট পড়াবার ব্যবস্থা করলে ঐ খাতে অর্থব্যয় সম্পূর্ণ অপব্যয়ই হবে। আবার পর্যাপ্ত সংখ্যায় ইন্টারমিডিয়েট কলেজ স্থাপন করে শুধু এই শ্রেণীর কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পড়াবার ব্যবস্থা করলে বিপুল অর্থব্যয় হবে, অপরদিকে বর্তমান উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলগুলোর শিক্ষক, ল্যাবরেটরী, লাইব্রেরী প্রভৃতির মোটেই উপযুক্ত ব্যবহার হবে না—অথচ এইসব খাতে অতীতে বিপুল অর্থব্যয় করা হয়েছে। ইন্টারমিডিয়েট বোর্ড প্রতিষ্ঠা করলে নিয়োগের পরিমাণ সামান্য কিছুটা বাড়বে সত্যি, কিন্তু ব্যয়ভারের তুলনায় তা কতটা? পরিশেষে, প্রতিষ্ঠিত ডিগ্রী কলেজগুলি যদি পর্যাপ্ত সংখ্যক না ছাত্রছাত্রী পায় তবে তারা কি আরও বেশী সরকারী সাহায্যের দাবি করে আন্দোলন সুরু করবে না?

অগ্রাধিকারের প্রশ্ন :

মোট কথা, সেই দশ-ক্লাসের স্কুল, তারপর ইন্টারমিডিয়েট এবং তারপর ডিগ্রী কোর্সে প্রত্যাবর্তন বিপুল ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। এর দরুন আমাদের রাজ্য কেন্দ্র থেকে ১০ কোটি টাকা সাহায্যের আশা করছে। ফলে এই রাজ্যে বাজেট-ঘাটতির পরিমাণ হয়ত কম হবে। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই বিপুল ব্যয়ে পুনরাবৃত্তির পরীক্ষা অগ্রাধিকার পেতে পারে কিনা? যখন সংবিধান প্রবর্তনের ২২ বছর পরেও সংবিধানের অন্যতম নির্দেশ যে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্যে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে (৪৫ অনুচ্ছেদ) পালন সম্ভব হয়নি, এবং এ রাজ্যে এখনও শতকরা ২৮ ভাগ শিশু কোন রকম বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ পায় না, তখন বিশেষ বিচার-বিবেচনা না করে আবার এই রকম একটা পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা কি উচিত?

উপসংহার :

আমাদের বক্তব্য হল, উচ্চ মাধ্যমিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের ন্যায় আবার হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে কার্যকর করলে হয়ত ভুল হবে। এ বিষয়ে আরও খানিকটা চিন্তা করা উচিত—সকল দিক ভেবে দেখা উচিত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের একদিনের এক সভার প্রস্তাব, বা মন্ত্রিসভার কিছুক্ষণ আলোচনার ফলে সিদ্ধান্তকে প্রকৃত পথনির্দেশ বলে মনে করলে সুদূরে নয়, অদূর ভবিষ্যতেই হয়ত অনুশোচনা করতে হবে। তাই বলি, বিষয়টি যখন এত গুরুত্বপূর্ণ—এর সঙ্গে যখন ভবিষ্যৎ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত তখন এ নিয়ে আরও কিছুটা ভাবা উচিত, আলাপ-আলোচনা বিচার-বিবেচনা করা দরকার। তারপর যে সিদ্ধান্তে আসা যাবে তা নিষ্ঠা, সততা ও সাহসের সঙ্গে কার্যকর করতে হবে। তখন ভবিষ্যৎকাল ভ্রান্ত বলে দোষারোপ করলেও আমরা অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পাবো।

সেলিমপুর

নবশংকর রায়চৌধুরী

বহুদিন পর বিলেত থেকে ফিরে এসে রহিম বক্স হারিয়ে ফেললো তার জন্মস্থান সেলিমপুরকে। সেখানেই সে বড় হয়েছে। তার খুব দেখতে ইচ্ছে হলো তার জন্মস্থান। ছোটবেলায় রেল লাইন পেরিয়ে তাকে যেতে হতো খানিকটা। তারপর বাঁ-দিকে ঘুরে সে হারিয়ে যেতো তাদের গোলকধাঁধায়। ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে এসে আজও তার মনে পড়ে কলাবাগান বস্তির কথা।

কিছুই খুঁজে পেলো না রহিম বক্স। সে আবার হেঁটে পিছিয়ে গেলো রেল লাইনের ধারে। মাথার ওপর মস্তবড় ফ্লাই-ওভার নেমে গিয়েছে ঢালু হয়ে আস্তে আস্তে অনেকদূরে।

হাঁ, ঠিক আছে তাল পাশের বটগাছের নিচে ছোট্ট এক [illegible]। আজও উড়ছে এক [illegible] নিশান সেখানে। হেঁটে হেঁটে সে এগিয়ে চললো। তাকে খুঁজে পেতেই হবে তার [illegible] কলাবাগান বস্তি, সেলিমপুর।

ওপাশে বড় বড় বাড়ী উঠেছে, [illegible] পাঁচিলে ঘেরা [illegible]। পাঁচিলে ঘেরা সে গলফ ক্লাব আর নেই ; তবুও নাকি ওটাই যোধপুর পার্ক। সব হারিয়ে নামটা ঠিকই আছে। নইলে ইতিহাসের পাতায় হারিয়ে যাবে হয়তো।

হাঁটিতে হাঁটিতে ঘেমে গিয়েছিল রহিম বক্স। মস্তবড় এক বাড়ীর নীচে বিলেতী ব্যাঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে সে অবাক বিস্ময়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলো। ভেবেই পেলো না কি সে করবে এখন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামা ছাড়া আর অন্য কোন উপায় আছে বলে মনে হলো না তার।

ওদিকের নালা ডিঙিয়ে একটা লোক রাস্তার [illegible] ফুটপাতে এসে দাঁড়ালো। রহিম বক্স আস্তে আস্তে তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আপনি এখানে থাকেন? হ্যাঁ—হ্যাঁ এখানেই বাড়ি—কেন? রহিম বকসের মনে হলো ভুল হলো না তো তার জিজ্ঞেস করায়। মনে হলো হয়তো সন্দেহ করছে লোকটা তাকে।

আবার তাকালো সে লোকটার দিকে, আরো বিনীত ভাবে বললো, আমি সেলিম-পুর খুঁজছি।

হ্যাঁ-হ্যাঁ ঐ সামনের নালা ডিঙিয়ে ওদিকে চলে যান। ওদিকেই সেলিমপুর। বেশ ভেতরে যেতে হবে। রেল লাইন পেলে তবেই থামবেন। ঐখানেই সেলিমপুর। একদমে কথাগুলো বলে হাঁপাতে লাগলো লোকটা। ওয়াক করে একগাদা কফ ফেললো লোকটা পায়ের কাছে।

রহিম বকস আবার তাকালো লোকটার দিকে। হাঁপানিতে নিশ্চয়ই ভুগছে লোকটা। হাঁপাচ্ছে লোকটা। দয়া হলো তার লোকটার শরীরের অবস্থা দেখে।

রাস্তার ওপাশে চলে গেলো রহিম বকস। তারপর পাশের সরু রাস্তায় ঢুকে পড়লো সে। একবার পেছনের দিকে তাকায়। লোকটা হাত নেড়ে তাকে দেখাচ্ছে। বলছে আরো ভেতরে যেতে।

দুপাশের কাঁচা ড্রেনের মধ্যে ইঁটের এবড়োখেবড়ো রাস্তা দিয়ে অতি সন্তর্পণে হেঁটে চললো রহিম। কাঁচা ড্রেনের গন্ধ নাকে আসছে। রুমাল দিয়ে নাকটা মুছে একটা সিগারেট ধরালো সে। হেঁটে চললো আরো ভেতরে।

নতুন দিনের আলো/দেবরাজ এবং বিদা রাও

বহুরূপীর 'টেরাডাক্টিল'

প্রাগৈতিহাসিক জীব টেরাডাক্টিল আজ কিংবদন্তীতে পরিণত। কিন্তু এই রকম বাঁকা [illegible] আমাদের [illegible] অধিকাংশ [illegible] রেখে আছে। তাদের [illegible] তাদের পরিচিত জগতে বিচরণ করে, তার বাইরে গিয়ে [illegible] দেখবার, অপরের সঙ্গে মিতালী পাতাবার [illegible] তাদের নেই। ব্যতিক্রম আছে বৈকি। যারা মানবপ্রেমিক, যারা বিশ্বপ্রকৃতির মর্ম-কেন্দ্রের খবর রাখে, তারা সবাইকেই সহ্য করে, সকলকেই ভালোবাসে। ওদের কেউ কেউ কখনও কখনও রহস্য করে কথা বলে বটে, কিন্তু কাউকে খোঁচা দেয় না—ভালোবাসে।

—এই [illegible] মেসেজটি, রূপদে ফুটেছেন ইন্দ্র উপাধ্যায় তাঁর একাঙ্ক নাটক 'টেরাডাক্টিল'-এর কাহিনীর মাধ্যমে। চিত্রশিল্পী বিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মীনা পরস্পরকে ভালোবাসে, মনেপ্রাণে ভালো-বাসে। কিন্তু বিনোদের একটি চিত্র-প্রদর্শনীতে ওরই আঁকা একটি টেরাডাক-টিল-এর মুখের সঙ্গে নিজের মুখের সাদৃশ্য আছে, এই কথা শুনে (এবং হয়তো অনুমান করে) মীনা বিনোদের ভালোবাসায় সন্দেহ করে বসল, বিনোদের দিক থেকে কোনোরকম ব্যাখ্যা সে শুনতে চাইল না। কারণ সে অতিমাত্রায় আবেগপ্রবণ বা ইমোশনাল। বিনোদেরই বসবার ঘরে একে একে আবির্ভূত হন পৃথিবীর সব কিছুকেই ইন্টারেস্টিং মনে করেন, এমন লোক বুজীবাবু, দার্শনিক ডঃ চঞ্চল সরকার, পদার্থবিজ্ঞানী ডঃ সাধন বসু, স্মার্ট সুন্দরী রবট-গার্ল সম্প্রা, রাজনৈতিক কর্মী লালবিহারী কর ও তার অনুচর 'কেলেটা'। এবং নাটকের প্রথম থেকেই মাঝে মাঝে আসেন হিরণকুমার সরকার ওরফে ম্যাজিশিয়ান।

বিনোদ শিল্পী, বিনোদ প্রেমিক। প্রেমকে প্রসারিত করতে পারছে না বলে সে যন্ত্রণাকাতর। কিন্তু তাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখছেন বুজীবাবু (যিনি তথ্যের মধ্যেই জট পাকিয়ে গেছেন), ডঃ চঞ্চল সরকার (দর্শনশাস্ত্র যাঁর মনকে চোখ চাইতে দিচ্ছে না), ডঃ সাধন বসু (সমস্ত সমস্যাকে যিনি পদার্থবিজ্ঞানের ফর্মুলায় ফেলে সমাধান করতে চান) এবং লাল-বিহারী কর (পার্টি রাজনীতিতেই যিনি মোক্ষলাভের আশা করেন)।—কেবল ম্যাজিশিয়ান নানারকম কৌতুককর কাহিনী বলে ওর মনকে খুশী রাখতে চান এবং ওর সমস্যা মাত্র ক্ষণিকের, এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান।

হাল্কা সুরে বাঁধা সমস্ত নাটকটি। প্রায় প্রতিটি পরিস্থিতিই হাসির প্রস্রবণে দর্শককে অবগাহন করাতে চায়। তবু কৃত্রিম নারী সম্প্রার বিনোদের প্রতি প্রেম-নিবেদনের দৃশ্য এবং পরে বিনোদ তাকে ঠেলে ফেলে দেওয়ায় তার কলকব্জা বিগড়ে যাওয়ার ফল প্রভৃতি প্রেক্ষাগৃহে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি করে। মীনার আবেগ-ধর্মিতাও প্রচুর উপভোগ্য।

বিভিন্ন ভূমিকায় শম্ভু মিত্র (ম্যাজি-শিয়ান), কালীপ্রসাদ ঘোষ (বুজীবাবু), শান্তি দাস (ডঃ সাধন বসু), সুনীল সরকার (লালবিহারী কর), উদয় সিংহ (বিনোদ), শুক্লা মুখোপাধ্যায় (সম্প্রা) এবং শাঁওলী মিত্র (মীনা) চরিত্রগুলিকে উপভোগ্যভাবে জীবন্ত করে তুলেছেন। দেবতোষ ঘোষের দার্শনিক ডঃ সরকাররূপে মেয়েলিপনা এই নাটকের উপযোগী নয়। এই ভঙ্গীর পরিবর্তন প্রয়োজন।

সুবিন্যস্ত, সুষ্ঠু মঞ্চসজ্জা এবং আলোকনিয়ন্ত্রণ নাটকটিকে পূর্ণতা দিয়েছে।

'নট নাট্যমের' নিয়মিত অভিনয়—'ভুলছি না ভুলবো না'-র অভাবিত সাফল্যের পর, তাদের বহু প্রশংসিত নাটক 'পাখীর বাসা'য় নিয়মিত অভিনয়ের আয়োজন করে-ছেন, এই মাসের ২য় ও ৪র্থ শুক্রবার পরেজ ও[illegible] লাইব্রেরী' হলে। রচনা ও নির্দেশনায় জগমোহন মজুমদার এবং আলোক সম্পাতে বাবুলাল ঘোষ।

নৈহাটির যান্ত্রিক সম্প্রদায়ের আয়োজনায় দশম বার্ষিক সারা বাংলা একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা শুরু হবে ১০ জানুয়ারী থেকে। যোগাযোগের শেষ তারিখ ২৫ ডিসেম্বর। সাময়িক প্রয়োজনায় সাধারণ পুরস্কারের সঙ্গে এবারের প্রতিযোগিতার [illegible] বিশেষ-পুরস্কার দেওয়া হবে। ঠিকানা—[illegible] রোড [illegible], ২৪-পরগণা।

অনিবার্য কারণে স্থগিত বিগত বছরের পুরস্কার বিতরণী উৎসব, এ বছরের উদ্বো-ধন অনুষ্ঠানে পালিত হবে।

[illegible]/মাধবী চক্রবর্তী, [illegible] ও [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়

খেলাধূলা

দর্শক

ইরানী কাপ

পুণার নেহরু স্টেডিয়ামে আয়োজিত ১১শ জাল ইরানী কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় গত ১৪ বারের (উপর্যুপরি) রঞ্জি ট্রফি বিজয়ী বোম্বাই দল ২২০ রানে ভারতীয় অবশিষ্ট দলকে পরাজিত করে মোট ৭ বার ইরানী কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের ভূতপূর্ব কোষাধ্যক্ষ, ভাইস-প্রেসিডেণ্ট এবং প্রেসিডেণ্ট জাল ইরানীর নামে উৎসর্গীত এই বাৎসরিক মৈত্রী ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সূচনা ১৯৬০ সালে। কিন্তু এ পর্যন্ত ১১ বার প্রতিযোগিতার আসর বসেছে, তিনবার বসেনি (১৯৬১, ১৯৬২ ও ১৯৬৫ সালে)। মাত্র দুটি দল নিয়ে এই প্রতিযোগিতা—রঞ্জী ট্রফি বিজয়ী বনাম ভারতীয় অবশিষ্ট দল। গত ১১ বারের প্রতিযোগিতায় রঞ্জী ট্রফি বিজয়ী বোম্বাই দল ৭ বার এবং ভারতীয় অবশিষ্ট দল ৩ বার ইরানী কাপ জয়ী হয়েছে। ১৯৬৬ সালের প্রতিযোগিতায় দুই দলকে যুগ্ম বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। একটা লক্ষ্য করার বিষয়, ইরানী কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সূচনা থেকে এ পর্যন্ত ভারতীয় অবশিষ্ট দলের বিপক্ষে রঞ্জি ট্রফি বিজয়ী হিসাবে একমাত্র বোম্বাই দলই খেলেছে যেহেতু বোম্বাই একনাগাড়ে ১৪ বার রঞ্জি ট্রফি পেয়েছে।

ভারতীয় অবশিষ্ট দলের অধিনায়ক এস ভেংকটরাঘবন টসে জিতে বোম্বাই দলকে প্রথম ব্যাট করতে পাঠান। প্রথম দিনের খেলায় বোম্বাই দল ৯টা উইকেট খুইয়ে ২৩১ রান তুলেছিল। বোম্বাই দলের খেলার সূচনা খুব সুবিধার হয়নি। দলের ৯৩ রানের মাথায় ৪র্থ উইকেট পড়ে যায়। এই ৯৩ রানের মধ্যে ৭০ রান করেছিলেন। পার্কার। দিলীপ সরদেশাই আউট হওয়ার থেকে দুবার খুব বেঁচে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ৬৫ রান করেন। সুনীল গাভাসকার দর্শকদের খুবই হতাশ করেন মাত্র ৬ রান করে। ভারতীয় অবশিষ্ট দলের পক্ষে বোলিংয়ে সাফল্যের পরিচয় দেন—সালগাঁওকার (৫১ রানে ৪টে) এবং বেদী (৩১ রানে ৩টে)। এই সালগাঁওকারের পেস এবং বেদীর স্পিন বোলিংয়ের চাপে বোম্বাইয়ের বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় কোণঠাসা হয়েছিলেন। বীর বিক্রমে খেলেছিলেন একমাত্র রামনাথ পার্কার। তাঁর ড্রাইভ এবং হুক খুবই উপভোগ্য হয়েছিল।

দ্বিতীয় দিনে বোম্বাইয়ের ১ম ইনিংস ২৩৬ রানের মাথায় শেষ হয়। এই দিন তারা তিনটি বল খেলে ৫ রান সংগ্রহ করেছিল। দ্বিতীয় দিনেই ৩ ঘণ্টায় ৪৯-৩ ওভারের খেলায় অবশিষ্ট ভারতীয় দলের ১ম ইনিংস ১১০ রানের মাথায় শেষ হলে বোম্বাই ১২৬ রানের ব্যবধানে এগিয়ে যায়। অবশিষ্ট দলকে ঘায়েল করেছিলেন ইসমাইল (৩২ রানে ৩ উইকেট) এবং শিভালকার (৩৪ রানে ৬ উইকেট)। খেলার এক সময় শিভালকারের বোলিং পরিসংখ্যান ছিল: ওভার ১৩, মেডেন ৮, রান ১২ এবং উইকেট ৩। অবশিষ্ট দলের টেস্ট খেলোয়াড় বিশ্বনাথ ১২ রান এবং প্রাক্তন টেস্ট অধিনায়ক মনসুর আলী ৭ রান করে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেন।
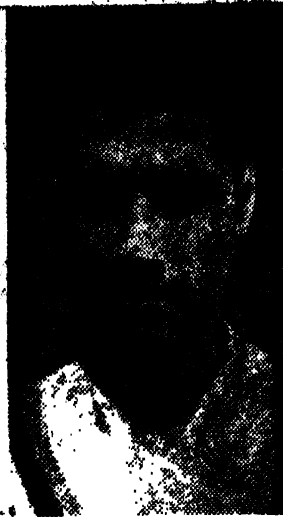
রামনাথ পার্কার
৭০ ও ১৯৫ রান

বোম্বাই ১২৬ রানে এগিয়ে ২য় ইনিংস খেলতে নামে। কিন্তু তাদের সূচনা খুবই খারাপ হয়। স্কোর বোর্ডে কোন রান জমা পড়ার আগেই ১ম উইকেট এবং ৬ রানের মাথায় ২য় উইকেট পড়ে যায়। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে মানকড় (৬৪ রান) এবং পার্কার ১০৭ মিনিটের খেলায় দলের ১৩৫ রান তুলে দিয়ে অবস্থার পরিবর্তন করেন। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে বোম্বাইয়ের ২য় ইনিংসের রান

দিলীপ সরদেশাই
১২১ রান

জি আর বিশ্বনাথ
নট আউট ১২৯ রান
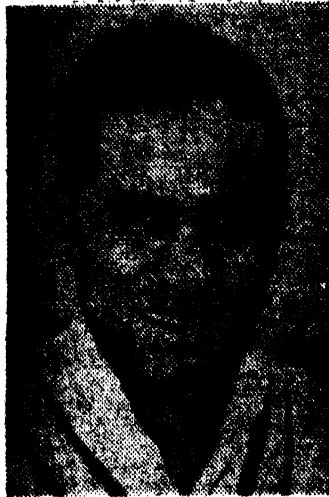
দাঁড়ায় ১৫৩ (৩ উইকেটে)। পার্কার ৭১ রান (১৪টা বাউণ্ডারীসহ) করে অপরাজিত থাকেন।

তৃতীয় দিনে বোম্বাই ২য় ইনিংসের ৪৪৩ রানের মাথায় (৯ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। এইদিন তারা পূর্ব দিনের ১৫৩ রানের (৩ উইকেটে) সঙ্গে আরও ৬টা উইকেট খুইয়ে ২৯০ রান যোগ করে। রামনাথ পার্কার ১৯৫ রান করে আউট হন। দুর্ভাগ্য যে, মাত্র ৫ রানের জন্যে তিনি ডাবল সেঞ্চুরী করার গৌরব থেকে বঞ্চিত হন। তিনি ৩৪৯ মিনিট খেলে যে ১৯৫ রান করেছিলেন তার মধ্যে বাউণ্ডারী ছিল ২৭টা। পার্কার এই ১৯৫ রান করার সঙ্গে ইরানী ট্রফি প্রতিযোগিতার এক ইনিংসের খেলায় সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানের নতুন রেকর্ড করেছেন। পূর্বের রেকর্ড বোম্বাই দলেরই এম জি অধিকারীর—১৭৪ রান, ১৯৬৩ সালে। এখানে উল্লেখ্য, প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় এই নিয়ে পার্কার পাঁচটি সেঞ্চুরী করলেন—রঞ্জী ট্রফির খেলায় ৩টে, দলীপ ট্রফির খেলায় ১টা এবং ইরানী ট্রফির খেলায় ১টা।

টেস্ট খেলোয়াড় দিলীপ সরদেশাই বোম্বাইয়ের ২য় ইনিংসে সেঞ্চুরী (১২১) করেন। তাঁর ১২১ রানে ছিল ১৭টা বাউণ্ডারী এবং [illegible] ৭ম [illegible] উইকেটের জুটিতে [illegible] এবং [illegible] ১১১ মিনিটে দলের [illegible] রান তুলে দিয়েছিলেন।

ভারতীয় অবশিষ্ট দল [illegible] রানের পিছনে পড়ে ২য় ইনিংস খেলতে নামে। জয়লাভের জন্যে তাদের ৫৭০ রানের প্রয়োজন ছিল এবং হাতে ছিল ৪৩৫ মিনিট সময়। সুতরাং এই সময়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৫৭০ রান সংগ্রহ

প্রকৃতপক্ষে খুবই অসম্ভব কাজ। ভারতীয় অবশিষ্ট দল ৩য় দিনের বাকি ১০৫ মিনিটের খেলায় দুটো উইকেট খুইয়ে মাত্র ৯১ রান তুলেছিল। খেলার এই অবস্থায় তাদের জয়লাভের জন্যে আরও ৪৭৯ রানের দরকার ছিল। হাতে ছিল চতুর্থ দিনের খেলা এবং ২য় ইনিংসের ৮টা উইকেট।

চতুর্থ অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে ভারতীয় অবশিষ্ট দলের ২য় ইনিংস ৩৪৯ রানের মাথায় শেষ হলে বোম্বাই ২২০ রানে জিতে যায়। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময় থেকে ৫৫ মিনিট আগেই জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়। টেস্ট খেলোয়াড় জি আর বিশ্বনাথ ১৬১ রান করে অপরাজিত থেকে যান। হেমন্ত কানিতকার ৯৩ রান (১৪টা বাউণ্ডারীসহ) করেন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

বোম্বাই : ২৩৬ রান (পার্কার ৭০ এবং সরদেশাই ৬৫ রান। সালগাঁওকার ৫১ রানে ৪ এবং বেদী ৩১ রানে ৩ উইকেট)

ও ৪৪৩ রান (৯ উইকেটে ডিক্লে:। পার্কার ১৯৫, সরদেশাই ১২১ এবং মানকাদ ৬৪ রান। সালগাঁওকার ৯৯ রানে ২, মদনলাল ৯২ রানে ২, ভেঙ্কটরাঘবন ৮৭ রানে ২ এবং বেদী ৯৮ রানে ২ উইকেট)

ভারতীয় অবশিষ্ট দল : ১১০ রান (সালগাঁওকার ২৪ রান। শিভালকার ৩৪ রানে ৬ এবং ইসমাইল ৩২ রানে ৩ উইকেট)

ও ৩৪৯ (কানিতকার ৯৩ এবং বিশ্বনাথ নট আউট, ১৬১ রান। ইসমাইল ৮৪ রানে ২, নায়েক ৫৯ রানে ৩, শিভালকার ৯১ রানে ২ এবং রেগে ৮৫ রানে ২ উইকেট)

খেলোয়াড়বৃন্দ

বোম্বাই : অজিত ওয়াদেকার (অধিনায়ক), এল এস রাজ্যাসকার, আর ডি পার্কার, এ ভি মানকাদ, ই ডি সোলকার, ডি এন সরদেশাই, এস ডি রেগে, এ ভি নায়েক, এস কে হাজারে, পি কে শিভালকার এবং এ ইসমাইল।

ভারতীয় অবশিষ্ট দল : এস ভেঙ্কটরাঘবন (অধিনায়ক), ভি বিজয়কুমার, এইচ এস কানিতকার, পি শর্মা, জি আর বিশ্বনাথ, মনসুর আলী, মদনলাল, পি কৃষ্ণমূর্তি, ই এ এস প্রসন্ন, বি এস বেদী এবং পি এস সালগাঁওকার।

ইরানী ট্রফিতে সেঞ্চুরী

বোম্বাই (৭টি) :

১৯৫	রামনাথ পার্কার
১৭৪*	এস. জি অধিকারী
১৬৪	অজিত ওয়াদেকার
১২৪*	পলি উমরীগড়
১২১	দিলীপ সরদেশাই
১১৩	এ ভি মানকাদ
১০২	পলি উমরীগড়

ভারতীয় অবশিষ্ট দল (৬টি) :

১৬১*	জি আর বিশ্বনাথ
১৩২	পংকজ রায়
১০৯*	জি আর বিশ্বনাথ
১০৮	নরী কন্ট্রাক্টর
১০৫	এম এল জয়সীমা
১০৫	সেলিম দুরাণী

আসন্ন শীতের মরশুমে ইংল্যান্ড থেকে এম সি সি ভারতে ক্রিকেট সফরে আসছে। এই সফরে তারা ইংল্যান্ডের প্রতিভূ হিসাবে ভারতবর্ষের সঙ্গে টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলবে। এই উপলক্ষে শক্তিশালী ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেট দল গঠনের তোড়জোড় আরম্ভ হয়ে গেছে। সদ্য সমাপ্ত ইরানী ট্রফির খেলাটি সেই প্রস্তুতিরই একটি অংশ। ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেট দল গঠনের কর্মকর্তারা এই ইরানী ট্রফি প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী খেলোয়াড়দের খেলার ওপর দৃষ্টি রেখেছিলেন। ভারতবর্ষের টেস্ট দলে আজ বিশেষ প্রয়োজন প্রকৃত ফাস্ট বোলার এবং সুনীল গাভাস্কারের সঙ্গে প্রথম উইকেটের জুটিতে খেলতে পারেন এমন একজন দক্ষ খেলোয়াড়ের। সদ্য সমাপ্ত ইরানী ট্রফির খেলায় বোম্বাইয়ের প্রথম জুটির খেলোয়াড় রমানাথ পার্কার ১ম ইনিংসে ৭৯ রান এবং ২য় ইনিংসে ১৯৫ রান করে টেস্ট ক্রিকেটে সুনীল গাভাস্কারের সঙ্গে প্রথম উইকেট জুটিতে খেলবার যোগ্য অংশীদার প্রমাণ করেছেন। ভারতবর্ষের টেস্ট ক্রিকেট দলে দীর্ঘকালের অপেক্ষাতেও প্রকৃত ফাস্ট বোলার পাওয়া গেল না। বোম্বাইয়ের আব্দুল ইসমাইল আক্রমণাত্মক বল করলেও মিডিয়াম-পেসের উপরে উঠতে পারেন নি। ইরানী ট্রফির এই খেলায় তিনি ১১৬ রানে ৫টা উইকেট পেয়েছেন। বর্তমানে ভারতবর্ষে প্রকৃত ফাস্ট বোলার বলতে একমাত্র মহারাষ্ট্রের পি সালগাঁওকার। তবে তিনি বর্তমান কালের বিশ্ব ফাস্ট বোলারদের লম্বা তালিকায় স্থান পাওয়ার মত নন। এবারের ইরাণী ট্রফির খেলায় সালগাঁওকার ১৫৫ রানে ৬টা উইকেট পেয়েছেন (৫৬ রানে ৪ ও ৯৯ রানে ২ উইকেট)। ফাস্ট বোলারের ব্যাপারে আমাদের আগের সমস্যা থেকেই গেছে। ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়রা বিদেশের ফাস্ট বোলারদের আক্রমণে চোখে সর্ষে ফুল দেখে কোণঠাসা হয়ে পড়েন। ভারতবর্ষের প্রকৃত ফাস্ট বোলার না থাকার কারণেই বিদেশের ফাস্ট বোলারদের বলে আমাদের খেলোয়াড়দের এই শোচনীয় ব্যর্থতা। ভারতীয় টেস্ট দলে স্থান পাওয়ার ব্যাপারে ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের আদর্শ পরীক্ষা নেওয়া হবে আগামী দলীপ ট্রফির খেলায়।

আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন

কোয়ালালামপুরে মালয়েশিয়া ৩—২ খেলায় ভারতীয় টমাস কাপ ব্যাডমিণ্টন দলকে পরাজিত করে। উভয় দেশই একটি করে ডাবলসে জয়ী হয়। ভারতবর্ষের জাতীয় চ্যাম্পিয়ান ১৭ বছরের প্রকাশ পাদুকোন মালয়েশিয়ার ১৯ বছর বয়সের ইয়ুথ চ্যাম্পিয়াম হুংচংকে পরাজিত করেন। পাদুকোনের ক্রীড়াচাতুর্যে স্টেডিয়ামের ৭০০০ দর্শক মুগ্ধ হয়ে করতালি ও হর্ষধ্বনিতে স্টেডিয়াম মুখরিত করে তোলেন।

মালয়েশিয়ার ক্রীড়া-সমালোচকরা বলেছেন, পাদুকোন বর্তমান বিশ্বের একজন অন্যতম ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড়।

এখানে উল্লেখ্য, মালয়েশিয়া ৪ বার টমাস কাপ জয়ী হয়েছে।

ব্যাংককে আয়োজিত অপর এক আন্তর্জাতিক খেলায় তাইল্যান্ড শোচনীয়ভাবে ৪—১ খেলায় ভারতবর্ষকে হারিয়ে হারিয়ে দিয়েছে। ভারতবর্ষের পক্ষে একমাত্র আসিফ পারপিয়া একটি সিঙ্গলসে জিতেছিলেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত এবং ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

"হ্যাঁ, সুচিত্রা দেবী।
আমার পরিচিত সবচেয়ে সুস্থসবল পরিবারের সকলেই খান 'হরলিক্‌স'—এই হলো পুষ্টির মূল উৎস।"

—বলেন সুচিত্রা দেবীর ডাক্তার।

'হরলিক্‌স'—রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক

'হরলিক্‌স'-এর বিশুদ্ধ খাদ্যগুণের বিষয় তিনি জানেন। জীবনীশক্তিতে ভরপুর ও সরে পরিপূর্ণ খাঁটি দুধ, গম আর মল্টেড যব; এই সব প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী 'হরলিক্‌স' সত্যিই অদ্বিতীয়। উদাহরণস্বরূপ, 'হরলিক্‌স' দুধের পুষ্টিগুণ দ্বিগুণ ক'রে তোলে।

সুচিত্রা দেবী প্রত্যেকদিন তাঁর পরিবারের সকলকে 'হরলিক্‌স' খেতে দেন, আর তাতে তিনি খুব ভালো ফলও পান। 'হরলিক্‌স'-এর পুষ্টিগুণের কল্যাণে তাঁর পরিবারের সকলেই প্রাণপ্রাচুর্য ও শক্তিতে ভরপুর।

পরিবারের পুষ্টির ক্ষেত্রে 'হরলিক্‌স'-এর তুলনায় আর কি হতে পারে?

'হরলিক্‌স'—
পুষ্টি যোগাতে অতুলনীয়

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানানো হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা		মফঃস্বল	
বার্ষিক	টাকা	২৫.০০	টাকা	৩০.০০
ষান্মাসিক	টাকা	১২.৫০	টাকা	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৬.২৫	টাকা	৮.০০

বিঃ দ্রঃ—উৎপাদন শুল্কের হার
(চাঁদার সহিত অবশ্য প্রেরণীয়)

বার্ষিক	টাকা	১.০২
ষান্মাসিক	টাকা	০.৫২
ত্রৈমাসিক	টাকা	০.২৬

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১২শ বর্ষ
৩য় খণ্ড

২৮ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক—২ পয়সা
মোট ৫২ পয়সা

Friday, 17th November 1972 শুক্রবার, ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯ .52 Paise

প্রচ্ছদ ফটো : শ্রীপ্রফুল্ল মিত্র

এক নজরে

পৃথিবী স্ফীত হচ্ছে : অতি পরিজ্জন্ন বাড়িতে, হয়ত বেশ কয়েকতলা উপরে বাস করেও স্বস্তি নেই। একদিন ঝাড়া-মোছা না চললেই সব ধুলোর আবরণে ঢেকে যায়, আর বিরক্তির সংগে সেই ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে কেবলই মনে হয়, এত ধুলো আসে কোথা থেকে। বিজ্ঞানীরা এর জবাবে বলছেন, এ ধুলোর সবটাই এই মর্ত্যের নয়। পৃথিবী যে প্রচন্ডগতিতে মহাকাশের কক্ষপথে কোন অনাদি অতীত থেকে পরিক্রমারত, সেই পরিক্রমা-কালে মহাকাশের লক্ষ কোটি আলোকবর্ষের ব্যবধানে অবস্থিত অগণিত গ্রহ উপগ্রহ থেকে উড়ে আসা ধূলিকণা ও ভস্ম সে সংগ্রহ করে আনে। এবং মানুষের হিসাবমতে সে সংগ্রহ খুব সামান্য নয়। সম্প্রতি লন্ডনের 'সানডে এক্সপ্রেস' পত্রিকায় এক নিবন্ধে বৈজ্ঞানিকদের অভিমত উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে প্রতিদিন প্রায় তিন হাজার টন ধুলো ও ছাই পৃথিবী সূর্য-পরিক্রমাকালে সংগ্রহ করে আনে। আর সেই তিন হাজার টন ধূলিকণা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে ছড়িয়ে পড়ে সারা পৃথিবীর বুকে। তবে তিন হাজার টন মানুষের হিসাবে একটা বিরাট ভারি বোঝা হলেও পৃথিবীর কাছে তা তুচ্ছ। বৈজ্ঞানিকদের মতে, গত ৫০ কোটি বছরে মহাকাশ থেকে যত ধূলিকণা পৃথিবীতে এসে পড়েছে তাতে পৃথিবীর ওজন বেড়েছে শতকরা এক ভাগের এক শতাংশ ভাগ।

পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ধূলিকণা ও ভস্ম আসে চাঁদ থেকে। প্রতি সপ্তাহে শত শত টন ধূলিকণা ও ভস্ম ঐ উপগ্রহ থেকে পৃথিবীতে চলে আসে। অন্যান্য গ্রহ থেকে চাঁদের বুকে সমানেই বড় বড় উল্কাপিন্ড এসে আছড়ে পড়ে, আর তার ফলে চাঁদের বুক থেকে যেসব চাঙর ছিটকে ওপরে উঠে আসে তাদের ফিরিয়ে আনার সামর্থ্য চাঁদের ক্ষীণ মাধ্যাকর্ষণ শক্তির নেই। ফলে অন্যান্য গ্রহ থেকে চাঁদ যা পায় তার প্রায় চারগুণ তাকে হারাতে হয়। ঐসব চাঁদের টুকরো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ে, ফলে পৃথিবী যেমন দিনে দিনে স্ফীত হচ্ছে, চাঁদ তেমনই হয়ে যাচ্ছে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর। তবে এর জন্য চাঁদের অদূর ভবিষ্যতে অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা বিজ্ঞানীদের মনে নেই। তাঁরা হিসাব করে দেখেছেন যে, চাঁদের ক্ষয় যদি বর্তমান হারেই চলে তবে তার এখনকার আকৃতি এক-দশমাংশ হ্রাস পেতে কয়েক লক্ষ বছর সময় লাগবে।

এই প্রসঙ্গে অবশ্য আর একটা কথা আমরা ভাবতে পারি। চাঁদের মৃত্তিকাকণা যদি এতই সহজলভ্য হয় তবে কয়েক কোদাল চাঁদের কণার জন্য আড়াই লক্ষ মাইল ছুটে যাওয়ার দরকার কি?

পূর্বজন্মের কথা : বিজ্ঞানে এর কোন ব্যাখ্যা মেলে না, কিন্তু অতি কঠোর বাস্তববাদী বিজ্ঞানীর পক্ষেও ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি। কেন সব মানুষ জন্মসূত্রে সমান নয় অন্যান্য পশুপ্রাণীর মতো? কেন একজন জন্মায় সুকণ্ঠ নিয়ে, একজন জন্মায় শিল্পচেতনা নিয়ে, একজন হয় অসাধারণ বাগ্মী এবং অপর একজন হয় বিশ্বজয়ী বীর অথবা বিজ্ঞানী? এই প্রসঙ্গেই আসে জন্মসূত্র ও তার পরে পূর্বজন্মের কথা।

আমেরিকার ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক ডঃ ইয়ান স্টিভেনসন দীর্ঘদিন ধরে পূর্বজন্মের রহস্য উদ্ঘাটনের কাজে আত্মনিযুক্ত আছেন। তাঁর এই গবেষণার জন্য তিনি ভারতকে বেছে নিয়েছেন এবং সেকারণে তিনি যে কতবার ভারতে এসেছেন ও ফিরে গিয়ে আবার নিজের গবেষণাগারে লব্ধ অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করতে বসেছেন তার হিসাব তাঁর নিজেরই জানা নেই। তিনি বারবার ভারতে এসে এপর্যন্ত ১৭০টি শিশু ও বালকের সংস্পর্শে এসেছেন যারা নানাভাবে তাদের পূর্বজন্মের কথা বলতে চেয়েছে। অধ্যাপক স্টিভেনসন বলেছেন, কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে তিনি আজও উপনীত হতে পারেননি। যা তিনি জেনেছেন তার জোরে এমন কথা তিনি কিছুতেই জোর দিয়ে বলতে পারেন না যে, পূর্বজন্ম আছে। কিন্তু একটি মানুষের জীবন যে তার জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যেই সীমিত নয়, এবং মানুষ যে তার ভাগ্যের একমাত্র নিয়ন্ত্রক নয়—একথা ভাবার মতো যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ তিনি খুঁজে পেয়েছেন।

ডঃ স্টিভেনসন যে ১৭০টি জাতিস্মরের সংস্পর্শে এসেছেন তাদের সকলেরই বয়স তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে। তারা সকলেই অল্প বিস্তর তাদের পূর্বজন্মের কথা বলতে পারে। কেউ সে ব্যাপারে মুখর, কেউ তার পূর্বজীবনের রহস্য উদ্ঘাটন করে অতি সংকোচে ও সংগোপনে, কেউ বা সম্পূর্ণ আভাসে ইঙ্গিতে। আর বয়স বাড়ার সংগে সংগে ঐ সব স্মৃতি চলে যায় বিস্মৃতির অতলে, সাধারণত ছয় সাত বছর বয়সের পর পূর্ব-জন্মের কথা কারও প্রায় মনে থাকে না। তাদের অনেকেই পূর্ব-জন্মের আত্মীয়দের কাছে চলে যেতে চায়। অনেকে এ জন্মের বাসকে পরবাস বলে মনে করে, অনেকে বর্তমান জীবনের সঙ্গে অতীত জীবনের তুলনা করে হাসে কাঁদে নয়ত স্মৃতির রোমন্থনে বিভোর হয়ে থাকে। প্রায় সকলেই বলে যে, পূর্বজন্মে কোন দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়েছিল। কেউ জন্মেছিল ধনীর ঘরে, কেউ ছিল অতি দরিদ্র। ডঃ স্টিভেনসন বলেন যে, জাতিস্মর পৃথিবীর সবদেশেই থাকার কথা, কিন্তু ভারতে যে তারা সর্বাধিক মুখর তার প্রধান কারণ হিন্দুধর্মের প্রভাব। হিন্দু ধর্ম ও দর্শন এমন এক পরিবেশ সৃষ্টিতে সমর্থ যা জাতিস্মরের স্মৃতিকে উজ্জীবিত করে। তিনি অবশ্য এদেশে কয়েকজন মুশলিম জাতিস্মরকেও দেখেছেন। একটি হিন্দু ছেলের সংস্পর্শে তিনি এসেছেন যে পূর্বজন্মে মুশলিম ছিল। বহু ছেলের পূর্বজন্মের কথা বলতে গিয়ে এমনই কালভ্রম ঘটে যে সে পূর্বজন্মের কথা বলার সময় বর্তমানকাল ব্যবহার করে।

উচ্চশীর্ষ স্টেট এম্পায়ার : নিউ ইয়র্ক শহরের উচ্চশির স্টেট এম্পায়ার ভবন তার হৃতমর্যাদা পুনরুদ্ধারকল্পে আরও এগারতলা উন্নীত হবে। ১০২ তলবিশিষ্ট ১২৫০ ফুট উঁচু ঐ ভবনটির সর্বোচ্চতার মর্যাদা কিছুকাল আগে শিকাগোর সিয়ার্স টাওয়ার খর্ব করে ১৪৫০ ফুট উঁচুতে মাথা তুলে। তারপর নিউ ইয়র্ক শহরেই ১৩৫০ ফুট উঁচু ওয়ার্লড ট্রেড সেন্টার ভবনটি নির্মিত হওয়ায় স্টেট এম্পায়ার ভবন উচ্চতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃতীয় স্থানে চলে যায়। কিন্তু স্টেট এম্পায়ার ভবন তার হৃতমর্যাদা ফিরে পেতে চায় আর তার জন্য স্থির হয়েছে যে, ঐ ভবনের উপর আরও ১১ তলা তুলে মোট ১১৩ তলা করা হবে এবং তখন তার উচ্চতা হবে ১৪৯৪ ফুট। তারজন্য অবশ্য ১৯৩১ সালে নির্মিত ঐ ভবনটির কিছু ভাঙাচোরা দরকার হবে। যেমন তার শীর্ষে যে ১৫ তলা মিনারটি আছে সেটি সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলা হবে এবং শেষের ছয় তলা হবে কাচ নির্মিত। ১১৩ তলা ভবনটির সর্বোচ্চ তলে থাকবে একটি রেস্টুরেন্ট। কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য জানানো হচ্ছে যে, স্টেট এম্পায়ার ভবন ১৪৯৪ ফুট উঁচু হলে সেটা হবে কলকাতার মনুমেন্টের (১৫১ ফুট) তুলনায় প্রায় দশগুণ উঁচু। ১৯৬১ সালে ৬৫ কোটি টাকা মূল্যে ভবনটি হস্তান্তর হয়।

—প্রত্যক্ষদর্শী

পূর্বাঞ্চলে প্রধানমন্ত্রী

গত সপ্তাহে মেঘালয়-আসামের রাজধানী শিলং-এ উত্তর-পূর্বাঞ্চল পরিষদের উদ্বোধন করে গেলেন প্রধানমন্ত্রী। দীর্ঘপ্রতীক্ষিত এই পরিষদের উদ্বোধন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বিশেষ করে আসামে যে ভয়াবহ কাণ্ডকারখানা চলছে ভাষা নিয়ে তার পরিপ্রেক্ষিতে গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পারস্পরিক নির্ভরতা ও সহযোগিতার প্রতীক হিসেবে উত্তর-পূর্বাঞ্চল পরিষদ গঠন নতুন করে প্রাদেশিকতাবাদীদের মনে করিয়ে দিল তাদের সংকীর্ণতা কত অকেজো এবং অসার। আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও মণিপুর এই চারটি রাজ্য এবং অরুণাচল ও মিজোরাম এই দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল স্বেচ্ছাসহযোগিতায় আবদ্ধ হল পরিষদের মাধ্যমে। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে এই অঞ্চল গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৬২ সালে চীনের আক্রমণ এবং পূর্ব পাকিস্তান থাকার সময়ে পাকিস্তানী নষ্টামিই এর গুরুত্ব বিষয়ে দেশবাসীকে সজাগ করে দেয়। বার্মা, চীন ও বাংলাদেশ এই তিনটি রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সীমানাও চলে গেছে এই অঞ্চল দিয়েই। তাই শুধুমাত্র রাজ্য সরকারগুলোর ওপর ভরসা করে এই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের নিরাপত্তা বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না।

তবে একথা মনে করলে ভুল হবে যে রাজ্য সরকারগুলোর তদারকী করার জন্য এই পরিষদের সৃষ্টি। প্রধানমন্ত্রী তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেছেন, তদারকী নয় পরামর্শ দেবার জন্যই গঠন করা হল উত্তর-পূর্বাঞ্চল পরিষদ। এই অঞ্চলে গত পঁচিশ বছরে অনেক ভাঙচুর হয়েছে। আসাম ভেঙে সৃষ্টি হয়েছে মেঘালয়, নাগাল্যাণ্ড ও অরুণাচল। মণিপুর ও ত্রিপুরা পেয়েছে স্বতন্ত্র রাজ্যের স্বীকৃতি। বৃটিশ আমলে যেখানে ছিল আংশিক প্রশাসন সেই পার্বত্য মিজো জেলা হয়েছে একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। এতগুলো রাজ্য ও অঞ্চল তার পৃথক সত্তা নিয়ে থাকলেও একথা স্বীকার করতেই হবে যে, এ অঞ্চলে প্রশাসনিক দক্ষতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে হলে চাই পারস্পরিক সহযোগিতা। এই সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েই শুরু হয়েছে উত্তর-পূর্বাঞ্চল পরিষদ।

পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাবে আসাম আজ এক ঘূর্ণিঝড়ের আবর্তে পাক খাচ্ছে। আসামের একশ্রেণীর লোকের উগ্র জাত্যাভিমান প্রকট হয়ে উঠেছে ভাষামত্ততায়। আসাম কোনো সময়েই একভাষী রাজ্য নয়। বহুভাষার সমন্বয়ে গঠিত এই রাজ্য ক্রমশ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙেছে। খাসি ও জয়ন্তিয়া পার্বত্য এলাকা গেছে আলাদা হয়ে। নাগাল্যাণ্ড হয়েছে পৃথক। অরুণাচল পেয়েছে তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। বাকী রয়েছে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, কাছাড় ও মিকির পার্বত্য জেলা। উগ্র অসমীয়াপ্রেমীরা চায় এই গোটা এলাকায় অসমীয়াকেই একমাত্র শিক্ষার মাধ্যম করতে। অসমীয়া সেখানকার সরকারী ভাষা। ওতে ভাষাগত সংখ্যালঘুরা আপত্তি জানায়নি। কিন্তু এতদিন মাতৃভাষায় শিক্ষার যে অধিকার তাঁরা পেয়ে আসছিলেন গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের এক প্রস্তাবে সে অধিকার হরণ করে নেওয়া হয়েছে। আসাম বিধানসভা প্রস্তাব পাশ করে এই ভাষা-বিরোধে জুগিয়েছে ইন্ধন। আসাম আজ এক জ্বলন্ত জতুগৃহ। মাসাধিককাল ধরে সেখানে চলছে এক চরম অরাজকতা। আসাম সরকার এই অরাজকতা দমনে ব্যর্থ হয়েছেন একথা বলতে দ্বিধা নেই। কেন্দ্রীয় সরকার আসামে শান্তি ও শৃংখলা আনবার জন্য ফৌজী সাহায্য পাঠিয়েছেন। তা সত্ত্বেও দিনের পর দিন চলছে সংখ্যালঘু নিগ্রহ। এখানে সংখ্যালঘু মানে বাংলাভাষী। দলে দলে গৃহহারা হয়ে বাঙালীরা এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে পশ্চিমবাংলায়, কাছাড়ে, ডিমাপুরে, লামডিং-এ। একই ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি রাজ্য থেকে ভারতেরই নাগরিকরা এভাবে প্রাণভয়ে পালাচ্ছে। এ দৃশ্য সহ্য করা কঠিন। একথা বিশ্বাস করা কঠিন যে, আসাম সরকার ইচ্ছা করলে এই হত্যাকাণ্ড ও অরাজকতা থামাতে পারেন না। সবই তাঁরা পারেন। কিন্তু হতভাগ্য সংখ্যালঘুরা রাষ্ট্রের কাছ থেকে এই ন্যূনতম রক্ষাব্যবস্থা পায়নি।

প্রধানমন্ত্রী কঠোরভাবেই বলেছেন, আসামে আইনশৃংখলা ফিরিয়ে আনতেই হবে। অসমীয়া ছাত্ররা প্রধানমন্ত্রীর শান্তির আবেদন উপেক্ষা করে ভাষার প্রশ্নে সেখানে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেছে। যেভাবে এই আন্দোলন করা হচ্ছে এবং যে উদ্দেশ্যে এর অবতারণা তা সত্যাগ্রহ নামের অমর্যাদা। অসহায় সংখ্যালঘুদের হত্যা করে, তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়ে উগ্র ভাষাপ্রেমীরা আসামের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। এর ফলে যদি আসামের আবার অঙ্গচ্ছেদ ঘটে তাহলেও আশ্চর্যের কিছু থাকবে না। এবং তার দায়িত্ব বহন করতে হবে এই লক্ষ্যভ্রষ্ট তথাকথিত সত্যাগ্রহীদের।

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতি কেন্দ্রের সতর্ক সজাগ মনোযোগের পরিচয় পাওয়া গেছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদ গঠনে। এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা-বহির্ভূত বাড়তি ৫০ কোটি টাকা মঞ্জুরের কথা প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং ঘোষণা করে গেছেন। কিন্তু আসাম যদি এই আত্মঘাতী নীতি অনুসরণ করে চলে তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত প্রচেষ্টাই কি বানচাল হয়ে যাবে না? এই কথা মনে রেখে কেন্দ্রীয় সরকার এ সম্পর্কে আরও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

স্মরণীয় জওহরলাল নেহরু

দেশে বিদেশে

এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মার্কিন ভোটদাতার সংখ্যা ছিল ১৪ কোটির মতো — মোট লোকসংখ্যার প্রায় তিন ভাগের দু ভাগ। এবারই প্রথম ১৮ বছরের ছেলে-মেয়েরা ভোট দিতে পেলেন, কারণ ভোট দেওয়ার সর্বনিম্ন বয়স একুশ থেকে কমিয়ে এখন আঠারো করা হয়েছে। এর আগে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট দিতে হলে কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় একটা নির্দিষ্ট সময় বসবাস করতে হত। এবার সেই বিধিনিষেধ প্রত্যাহৃত হওয়াতেও ভোটদাতার সংখ্যা বেড়ে যায়। তা ছাড়া নিরক্ষরেরাও এবার ভোট দেওয়ার অধিকার পেয়েছেন। সব মিলিয়ে তাই ১৯৬৮ সালের তুলনায় ভোটদাতার সংখ্যা বেড়ে যায় প্রায় সাড়ে তিন কোটি। কিন্তু ভোটদাতার সংখ্যা এত বাড়লে কী হবে, নভেম্বরের প্রথম মঙ্গলবারে, অর্থাৎ সাত তারিখে ভোট দিতে এলেন ভোটদাতাদের মধ্যে অর্ধেকে।

অন্তত এর আগের তিনটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে (১৯৬৮, '৬৪ আর '৬০) প্রতিবারই শতকরা ষাটজনের বেশি ভোটদাতা ভোট দেওয়ার কষ্ট স্বীকার করেছেন। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী গণতন্ত্রের ভোটদাতাদের নির্বাচন সম্পর্কে এই আপেক্ষিক অনীহার কারণ কী, তা নিয়ে নিশ্চয়ই যথাসময়ে অনেক রাজনৈতিক-সমাজনৈতিক বিশ্লেষণ হবে। আপাতত এইটুকু অনুমান করতে বাধা নেই যে, এবারের নির্বাচনের ফলাফল কী হবে তা আগেভাগেই এক রকম জানা হয়ে গিয়েছিল বলেই অনেক ভোটদাতা আর কষ্ট স্বীকার করে ভোট দিতে যাননি। প্রেসিডেন্ট নিকসনই যে আরো চার বছর হোয়াইট হাউস দখল করে থাকবেন, এ সম্বন্ধে কী সাধারণ ভোটদাতা আর কী নির্বাচন-বিশেষজ্ঞ কারুরই তেমন কোনো সন্দেহ ছিল না। আসলে রিচার্ড মিলহাউস নিকসন কতো ব্যবধানে সাউথ ডাকোটার সেনেটর জর্জ স্ট্যানলি ম্যাকগভর্ণকে হারাবেন সেটাই শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল জল্পনার বিষয়।

নিকসনের জয় যে বিপুল সে-বিষয়ে অবশ্য কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। সেটা আরো স্পষ্ট হয় যখন চার বছর আগে তাঁর জয়ের সঙ্গে এবারের জয়ের তুলনা করা যায়। হিউবার্ট হোরেশিও হামফ্রিকে সেবার তিনি হারিয়েছিলেন কোনো রকমে। ১৯৬০ সালে নিকসন নিজে যেমন কেনেডির কাছে স্বল্প ব্যবধানে হেরেছিলেন, হামফ্রিকেও তিনি হারিয়েছিলেন সেই রকম সামান্য ব্যবধানেই। আর এবারে তিনি ভোট পাওয়ায় এমন রেকর্ড করে বসলেন যে, সেই ১০৮ বছর আগে আব্রাহাম লিংকনের পর রিপাবলিকান দলের আর কোনো প্রার্থীই তেমন কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। তবু কিন্তু নিকসনকে মার্কিন রাজনীতির ইতিহাসে অনন্য কীর্তির অধিকারী বলা যাবে না, কারণ ১৮২০ সালে জেমস মনরো তো বটেই, এমন কি ১৯৩৬ সালে ফ্র্যাঙ্কলিন ডি রুজভেল্টের সাফল্য ছিল আরো বিরাট।

মার্কিন নির্বাচনে ভোটদাতারা তো সরাসরি প্রেসিডেন্টকে নির্বাচিত করেন না, প্রতি রাজ্যে তাঁরা নির্বাচন করেন কয়েকজন নির্বাচককে (ইলেকটর)। সেই নির্বাচকেরা আবার ভোট দিয়ে নির্বাচন করেন প্রেসিডেন্টকে। সেটা তাঁরা করবেন ডিসেম্বরের দ্বিতীয় বুধবারের পর প্রথম সোমবারে (এবারে ক্যালেন্ডারে ঐ তারিখটা হল ১৮ ডিসেম্বর)। সেই ভোট গোনা হবে জানুয়ারি মাসে ৬ তারিখে। তারপরেই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সম্পন্ন হবে। কিন্তু তবু ৭ নভেম্বরের ভোটের পরই কে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন তা জেনে যেতে কোনো অসুবিধে নেই। কারণ নির্বাচক পদে যাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তাঁরাও রাজনৈতিক দলেরই প্রার্থী। সুতরাং অধিকাংশ নির্বাচক পদে যদি রিপাবলিকান প্রার্থীরা জয়ী হন তবে শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট পদেও রিপাবলিকান প্রার্থী জয়ী হবেন, কারণ নির্বাচকেরা তাঁদের নিজের দলের প্রার্থীকেই ভোট দিয়ে থাকেন। তবে এর যে ব্যতিক্রমও হয় না তা নয়। ১৯৬৮ সালের নির্বাচনেই তো একজন নির্বাচক রিপাবলিকান হিসেবে নির্বাচিত হয়ে শেষ পর্যন্ত নিকসনকে তাঁর ভোটটি দেননি। অবশ্য এরকমটা বিশেষ ঘটে না। মার্কিন নির্বাচনে আসল গুরুত্ব এই নির্বাচকদের ভোটের। এবারের নির্বাচনে গোটা দেশে মোট ৫৩৮ জন নির্বাচকের পদের মধ্যে ৫২১টিই গেছে রিপাবলিকান দলের হাতে। এঁরা সকলেই প্রেসিডেন্ট পদে রিপাবলিকান প্রার্থী নিকসনকে ভোট দেবেন, একথা ধরে নিয়েই নিকসনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। চার বছর আগে নিকসন পেয়েছিলেন মাত্র ৩০১ জন নির্বাচকের ভোট। সত্যি কথা বলতে কি, ১৯১৬ সালে উড্রু উইলসনের পর এত কম নির্বাচকের ভোট আর কেউ পাননি। আর এবার সে জায়গায় তিনি পাচ্ছেন ৫২১টি ভোট। ১৯৩৬ সালে রুজভেল্ট ছাড়া আর কোনো প্রার্থী এত সংখ্যক নির্বাচকদের ভোট পাননি। রুজভেল্ট পেয়েছিলেন ৫২৩টি আর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মাত্র আটটি। এবারে নিকসনের প্রতিদ্বন্দ্বী ম্যাকগভর্ণ অবশ্য

পেয়েছেন ১৭টি। কিন্তু মার্কিন ইতিহাসে বৃহত্তম জয়ের কৃতিত্ব জেমস মনরোর। ১৮২০ সালে তিনি নির্বাচকদের ২৩২টি ভোটের মধ্যে পেয়েছিলেন ২৩১টি।

* * *

কিন্তু নিকসনের এই জয় যে নিতান্তই ব্যক্তিগত জয় এবং রিপাবলিকান দলের জয় নয়, সে-বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই। নভেম্বরের সাত তারিখে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন মুলুক জুড়ে আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্যে নির্বাচন হয়ে গেল। মার্কিন প্রতিনিধি সভার ৪৩৫ জন সদস্য, সেনেটের ১০০ জনের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ সদস্য, ৫০টি রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশের গভর্ণর এবং সব রাজ্যের আইনসভার সদস্যেরাও এইদিন নির্বাচিত হলেন। মার্কিন নির্বাচনী পরিভাষায় 'কোটটেলস এফেক্ট' বলে একটা কথা আছে। যে-দলের প্রার্থী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন সেই দলের অন্যান্য প্রার্থীও নাকি প্রেসিডেন্টের কোট ধরে নির্বাচনী পরীক্ষা পার হয়ে যান। সেই হিসেবে এবার তো অন্যান্য নির্বাচনেও রিপাবলিকান দলের জয়জয়কার হওয়ার কথা। কিন্তু তা মোটেই হয়নি। কী গভর্ণর, কী সেনেটের সদস্য, কী হাউস ও রিপ্রেজেন্টেটিভের সদস্য, সর্বত্রই দেখা গেল ডেমোক্র্যাট দলের প্রাধান্য। ১৯৬৮ সালের নির্বাচনের পরও যেমন এবারও তেমনি মার্কিন কংগ্রেসে ডেমোক্র্যাট দলেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় থাকবে। আর মার্কিন সংবিধানের ব্যবস্থা অনুযায়ী সরকার চালাতে তাতে কোনো অসুবিধে হবে না।

নিজের দলের অসাফল্যের মাঝখানে প্রেসিডেন্ট নিকসনের পুনর্নির্বাচন কি তবে এই কথা প্রমাণ করে যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে খুবই জনপ্রিয়, অথবা গত চার বছরে তাঁর সব নীতিই জনসাধারণের অকুণ্ঠ প্রশংসা কুড়িয়েছে? এর কোনো দাবিকেই পুরোপুরি সত্যি বলা চলে না। রুজভেল্ট বা কেনেডি, এমন কি আইজেনহাওয়ারের মতোও ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা নিকসনের কোনোদিন ছিল না। বরং 'ধূর্ত ডিকি' বলে সাধারণের মধ্যে তাঁর যে একটা পরিচয় চালু আছে তার মধ্যে আর যাই থাক অন্তত ভালোবাসার পরিচয় নেই। তাঁর প্রশাসন সম্পর্কে দুর্নীতির অভিযোগ ছিল বিস্তর। নির্বাচনের আগে ওয়াটারগেটে ডেমোক্র্যাটদের সদর দপ্তরে গোপন বেতার যন্ত্র বসিয়ে খবরাখবর জোগাড় করার যে-কেলেঙ্কারি ফাঁস হয়ে যায় তার সঙ্গে নিকসন মন্ত্রিসভার দুজন সদস্যের তো বটেই, এমন কি পরোক্ষে খোদ প্রেসিডেন্টের নামও জড়িয়ে যায়। নিকসনের চার বছরের রাজত্বের মধ্যেই তো দেশে জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বাড়তে থাকে, বেকারি তীব্র হয়ে ওঠে, আর্থিক সংকট এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছয় যে শেষ পর্যন্ত গত বছর মহিমান্বিত মার্কিন ডলারের আন্তর্জাতিক দামও কমাতে হয়।

কিন্তু এই সব 'অপকর্ম' সত্ত্বেও নিকসন আবার হোয়াইট হাউসের দখল পেলেন কী করে? তার একটা কারণ অবশ্যই পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য সাফল্য। এই বছরেই তিনি দুই অভিযানে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র চীন আর সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে ফেলেছেন। তার ফলে প্রেসিডেন্ট নিকসনের সামনে সবচেয়ে যে বড় সমস্যা সেই ভিয়েৎনামের ব্যাপারে অনেক সুবিধে হয়েছে। কারণ এখন উত্তর ভিয়েৎনামের এই প্রধান দুটি সমর্থক রাষ্ট্রকে তিনি অনেকটা নিরপেক্ষ করে তুলতে পেরেছেন। নিকসন যে 'শান্তির প্রজন্ম' সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাকেও তিনি অনেকটা হাতের কাছে নিয়ে আসতে পেরেছেন বলে মার্কিন ভোটদাতাদের মধ্যে একটা ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। নির্বাচনের মুখেই উত্তর ভিয়েৎনামের সঙ্গে একটা ন-দফা শান্তি চুক্তির খসড়া অনেকটা পাকা হয়ে যায় (যদিও এখনও পর্যন্ত তা সই হয় নি)। ভিয়েৎনামের লড়াই নিয়ে ক্লান্ত মার্কিনদের কাছে এটা বড় একটা কম ব্যাপার নয়।

কিন্তু প্রেসিডেন্ট নিকসনের এই সব কীর্তি তাঁর জয়লাভে যতোই সাহায্য করুক না কেন, সেনেটর ম্যাকগভর্নের দুর্বলতাও তাঁকে কম সাহায্য করে নি। এবারে প্রার্থী মনোনয়নের আগে থেকেই ডেমোক্র্যাটিক দলের নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি চরমে ওঠে। ম্যাকগভর্ণ যে শেষ পর্যন্ত প্রার্থী মনোনীত হন তা এক রকম দলের বড় কর্তাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই। ফলে ডেমোক্র্যাট প্রার্থীরা সাধারণত যে-সব গোষ্ঠীর সমর্থন পেয়ে থাকেন তা তাঁর কপালে জোটে নি। তার পরে তিনি আরো গোলমাল বাধিয়ে বসেন ভাইস প্রেসিডেন্ট পদের জন্যে প্রার্থী বাছাই করতে গিয়ে। সেনেটর টমাস ইগলটনকে তিনি প্রথমে তাঁর সহযোগী হিসেবে বেছে নেন, কিন্তু পরে খবর পাওয়া যায় যে অতীতে ইগলটন মানসিক রোগে ভুগেছেন এবং সে জন্যে তাঁর বৈদ্যুতিক শক থেরাপির দরকার হয়েছিল। চার বছরের কার্যকালের মধ্যে প্রেসিডেন্টের যদি মৃত্যু হয় তবে ভাইস প্রেসিডেন্টই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। সুতরাং মানসিক রোগে ভুগেছেন এমন একজন লোক একদিন

ভারত-হাঙ্গেরিয়ান ট্রেড গ্রুপের আলোচনা-চক্রে পশ্চিমবাংলার শিল্প-বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ বক্তৃতা করছেন। শ্রীঘোষের ডানদিকে ভারত-হাঙ্গেরিয়ান ট্রেড গ্রুপের চেয়্যারম্যান ডঃ জর্জ অবজাদ উপবিষ্ট।

প্রেসিডেন্ট হতে পারেন, এমন সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই ইগলটনের মনোনয়ন নিয়ে তখন বিতর্কের সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত ইগলটনকে বাতিল করেন ম্যাকগভর্ণ আর তার জায়গায় বেছে নেন কেনেডির ভগ্নি-পতি সার্জেণ্ট শ্রাইভারকে। কিন্তু তারপরেই ম্যাকগভর্ণ সম্পর্কে অনেক ভোটদাতার মনে সংশয় দেখা দেয়। যিনি একজন ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদের প্রার্থী ঠিকমতো নির্বাচন করতে পারেন না তাঁর হাতে কি চার বছরের জন্যে দেশের শাসনভার ছেড়ে দেওয়া যায়?

ম্যাকগভর্ণ তবু হাল ছাড়েন নি। মাসের পর মাস দেশের এ-কূল থেকে ও-কূল পর্যন্ত তিনি ছুটে বেড়িয়েছেন নির্বাচনী প্রচারের কাজে। সে তুলনায় নিকসন কোনো প্রচার অভিযান চালান নি বললেই হয়। এমন কি ম্যাকগভর্ণ যে-সব অভিযোগ তুলেছেন তার জবাব দেওয়ারও তিনি তেমন দরকার মনে করেন নি। সে ভার তিনি দিয়েছিলেন ভাইস প্রেসিডেণ্ট স্পাইরো অ্যাগানিউয়ের ওপর। তবু মার্কিন ভোটদাতারা নিকসনের গলায় জয়ের মালা পরিয়ে দিয়েছেন। কোনো প্রেসিডেন্ট যখন দ্বিতীয়বার নির্বাচন প্রার্থী হন তখন সাধারণত মার্কিন ভোটদাতারা তাঁকে বিমুখ করেন না। এবারও করেন নি। তাঁরা দেখেছেন, যে-লোকটা কিছুটা চেনাজানা তাঁকেই বরং আবার সুযোগ দেওয়া ভালো। তাতে অবস্থা আরো ভালো না হোক অন্তত আরো খারাপ হয়ত হবে না।

শিলংয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী উত্তর-পূর্ব পরিষদের উদ্বোধন করলেন। এই ধরনের একটা পরিষদ গড়ার কথা প্রথম ওঠে সেই ১৯৬৮ সালে। তারপর প্রয়োজনীয় আইন তৈরি করতে লেগে যায় তিন বছর। কথা ছিল এ বছর আগস্ট মাসেই পরিষদের উদ্বোধন হবে। কিন্তু হল নভেম্বরের সাত তারিখে।

এই দেরির কারণ অবশ্যই যে সব রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় শাসনাধীন এলাকা নিয়ে এই পরিষদ গঠিত হয়েছে তাদের নানা সংশয় আর আপত্তি। আসাম, নাগাভূমি, মণিপুর মেঘালয় ও ত্রিপুরা, এই ক'টি রাজ্য এবং মিজোরাম ও অরুণাচল, এই দুটি কেন্দ্রীয় শাসনাধীন এলাকার এই পরিষদের সদস্য হওয়ার কথা। এই সব রাজ্য আর কেন্দ্রীয় এলাকার মোট আয়তন প্রায় আড়াই লাখ বর্গ কিলোমিটার, লোকসংখ্যা দু কোটির কাছাকাছি। আসামকে বাদ দিলে আর সব এলাকাই ছোট, তাদের লোকসংখ্যাও কম।

পরিষদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিন্তু রাজ্যগুলিতে সন্দেহ দেখা দেয়। তাদের ভয় হয় উন্নয়নের কাজে তদারকের নামে দিল্লি তাদের সকলের ঘাড়ে একটা আরো শক্তিশালী সরকার চাপিয়ে দিচ্ছে, যা দিল্লির হয়ে খবরদারি চালাবে। প্রথম দিকে, এই পরিষদের হাতে যে-সব ক্ষমতা দেওয়ার কথা ওঠে তাতে এই সন্দেহ আরো দৃঢ় হয়। সংশ্লিষ্ট সব রাজ্যে কাজ করার জন্যে ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের একটি বিশেষ 'কাডার' তৈরির কথা ওঠে। সব কটি রাজ্যেরই এখন একজন সাধারণ রাজ্যপাল রয়েছেন (বি কে নেহরু)। তাঁর হাতে আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়ার প্রস্তাব ওঠে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এইসব প্রস্তাব বাতিল হয়েছে। তবু অন্তত এখনও পর্যন্ত নাগাভূমি এই পরিষদে যোগ দেয়নি। আসামের সঙ্গে নাগাভূমির সীমান্ত নিয়ে বিরোধ রয়েছে। নাগাভূমির আশঙ্কা, আসামের সঙ্গে একই পরিষদের সদস্য থাকলে এই বিরোধ মীমাংসায় অসুবিধে হবে।

প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন, এই পরিষদ গড়ার ফলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের অধিকার কোনোভাবেই ক্ষুণ্ণ হবে না। পরিষদের কাজ হবে উপদেশ দেওয়া, খবরদারি করা নয়। উন্নয়নের ব্যাপারটার ওপর জোর দেওয়ার জন্যে তিনি ঘোষণা করেছেন যে, চতুর্থ যোজনার বাকি দু বছরে এই এলাকার উন্নয়নের জন্যে বাড়তি ৫০ কোটি টাকা দেওয়া হবে। পঞ্চম যোজনাতেও এই ধরনের বিশেষ বরাদ্দের ব্যবস্থা থাকবে। প্রধানমন্ত্রীর মতে আসামে সাম্প্রতিক ভাষাবিরোধের মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা। তাই উন্নয়নের কাজকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীরা অবশ্য পরিষদ গঠনকে স্বাগত জানিয়েছেন। কিন্তু পরিষদ ঐ এলাকার মানুষের কাছে কতোটা গ্রহণযোগ্য হবে তা নির্ভর করবে পরিষদ কীভাবে কাজ করে তার ওপর।

১০।১১।৭২ —দ্রষ্টব্য

ইন্দিরাজী একক এক ইতিহাস। প্রতিদিন, প্রতিটি কাজে তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করছেন; প্রতিটি চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় তিনি বিজয়িনী। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে সাহায্য করে তিনি মুক্তিদাত্রীর মর্যাদায় উজ্জ্বল। এখন স্বদেশে তিনি দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সৃজনধর্মী বিপ্লবীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। সর্বত্র তাঁর মহৎ জীবনের স্বাক্ষর। তাঁর বিস্ময়কর নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্ব সারা বিশ্বনন্দিত।

তাঁর এই অনন্যসাধারণ নেতৃত্ব, ব্যক্তিত্ব এবং অভূতপূর্ব সাফল্যের শক্তি কোথায়? বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির লোক বিভিন্ন কথা বলবেন। কেউ বলবেন, তিনি প্রধানমন্ত্রী বলেই তাঁর এতো শক্তি। কেউ বলবেন, তিনি দেশনেত্রী, কংগ্রেস নেত্রী হিসাবেই এত বিরাট শক্তির অধিকারী। কেউ বলবেন তাঁর বংশগত উজ্জ্বল মর্যাদা ও নেতৃত্ব: সুনামের কথা। কিন্তু আমি বলবো, ইন্দিরাজী নিজেই এই শক্তি সৃষ্টি করেছেন। নিজের বিশ্লেষণী বুদ্ধি, কর্মশক্তি, ত্যাগ, সাহস, নিষ্ঠা এবং দেশবাসীর প্রতি অপূর্ব মমত্ববোধের মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে গড়ে তুলেছেন। দেশের অসহায় মানুষের মধ্যেই তাঁর শক্তি নিহিত। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা তার মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু-মতিলাল, জওহরলাল-সুভাষচন্দ্র, প্যাটেল- শাস্ত্রী, —পন্থজী প্রমুখ মনীষী, দেশনায়কের মানবিক দোষগুণ সমস্ত মিশিয়ে তেজে বীর্যে কর্মে কল্পনায় সাধ্যে সাধনায় যে এক অত্যাশ্চর্য মানুষের সৃষ্টি হতে পারে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সেই মানুষ। তার বিশ্বকর্মার শক্তি, বিশ্বজনীন মন, প্রশাসনিক দক্ষতা, দেশবাসীর প্রতি কর্তব্যবোধ, সর্বোপরি নতুন ভারত সৃষ্টির বৈপ্লবিক কর্মসাধনার মূলে এ'দের প্রভাব স্পষ্ট। তবুও তিনি অনন্যা, অদ্বিতীয়া। নিজের চারিত্রিক গুণে তিনি অতীতের শিক্ষা, অভিজ্ঞতাকে নিখুঁতভাবে কার্যকর করে ইতিহাস সৃষ্টি করছেন। দেশের দুঃসময়ের যুগে, শ্রীমতী গান্ধী যে দৃঢ়তা ও আত্মপ্রত্যয়ের সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা আমাদের দেশে নেই।

ইন্দিরাজীর কর্মজীবন, ব্যক্তিজীবন, রাজনৈতিক জীবনধারার মূল্যায়নের সময় এখন নয়। তিনি দুর্বার গতিতে চলেছেন কাজ করে। তাঁর সাফল্যের রশ্মি বিশ্বে প্রসারিত। তিনি আরও কাজ করবেন। কাজেই তাঁর জীবনের পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন এখন সমীচীন নয়। তবুও বলবো তিনি মানুষের মতো মানুষ, তাঁর অনন্যসাধারণ নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব ভারতের প্রতিটি কাজে প্রতিফলিত, প্রতিটি প্রস্তাবে কোটি কোটি ভারতবাসীর অন্তরে। তিনি সকলের শ্রদ্ধেয়া, সকলের আদরণীয়া। সকলের নেত্রী। তবুও তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনা চলে এবং চলবে। কারণ, গণতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিপক্ষ দলের সমালোচনা অবশ্যম্ভাবী।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে তিনি দোষেগুণে আমাদের মতই একজন। অথচ তিনি আমাদের থেকে আলাদাও। এখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্যে আছে নানা উপাদান—জন্মগত, কর্মগত। কিন্তু সবার ওপরে তাঁর অসাধারণ ইচ্ছাশক্তি। ইচ্ছাশক্তি হোল মনের সামগ্রিক ক্রিয়া। এরই জোরে তিনি করছেন বিরাট কর্ম।

শ্রীমতী গান্ধীর চরিত্রের বড় গুণ তিনি যা ভাবেন, যা বলেন তা করেন। যে প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন তা পালনে কঠিন পণ গ্রহণ করেন। তিনি গতানুগতিক, ঝিমানো পলিটিকস পছন্দ করেন না। পিতার মতো তিনিও দুঃসাহসিক অভিযাত্রী। তাই তিনি সব সময়েই যুব সম্প্রদায়কে দুঃসাহসিক অভিযানে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু সব ব্যাপারেই বাস্তব ও যুক্তিসম্মত পন্থায় বিশ্বাসী। তিনি পোশাকী পলিটিকসে বিশ্বাসী নন; অন্যায়ের সঙ্গে আপসের তিনি বিরোধী। তাই পুরাতন পন্থী নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর গরমিল, বিরোধ এবং কংগ্রেসকে ভেঙে নতুন করে গড়ে তোলার তিনি সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছেন। ঐতিহাসিক প্রয়োজনে নতুন কংগ্রেসের জন্ম। নতুন ভারতের প্রয়োজনেই তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব।

জননেত্রী ইন্দিরা

১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭২ সাল এই ছটি বছরের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে, ঘটনার গতি-প্রকৃতি বিচার করলে আমরা দেখতে পাই ইন্দিরাজীর দুঃসাহসিক অভিযান। নিজের প্রতি, দেশের মানুষের প্রতি তাঁর গভীর বিশ্বাস। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারীতে কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচনের ব্যাপারে শ্রীমতী গান্ধী এক বিরাট পরীক্ষা, বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ ও পিতার সাথীদের সংগে তাঁর এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা। লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর আকস্মিক পরলোকগমনে এই পদটি শূন্য হয়। শ্রীমোরারজী দেশাইকে পরাজিত করে শ্রীমতী গান্ধী নির্বাচিত হলেন। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শুধু কংগ্রেস দল, দেশের জনমত দুটো স্পষ্ট ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো। বিজয়িনী শ্রীমতী গান্ধী নতুন উৎসাহে, সাহস ও ধৈর্যের সংগে প্রতিটি কাজ করতে লাগলেন।

কংগ্রেসে ভাঙন সৃষ্টি তাঁর ইচ্ছা ছিল না। তিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। তাই তাঁর মুখর সমালোচকের প্রতিও তিনি অনুদার হননি। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান রূপে তিনি শক্ত হাতে রাষ্ট্রতরণীর হাল ধরলেন। কিন্তু কার্যধারা নিয়ে কংগ্রেসের পুরাতনপন্থী ও প্রগতিপন্থীদের মধ্যে মন কষাকষি প্রবল আকার ধারণ করলো। তবুও কংগ্রেসের স্বার্থে ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের স্বার্থে বিশেষ কেউ মুখ খুললেননি। কিন্তু নির্বাচনে বড় বড় মহারথীর হলো পরাজয়, কতগুলো রাজ্যে অকংগ্রেসীরা গেলেন সরকারী কর্তৃত্বে। এদিকে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভয়ানক। অশান্তির আগুন ছড়িয়ে পড়লো। রাজনৈতিক এই দুঃসময়ে ইন্দিরাজী বিদ্যুৎ গতিতে জনকল্যাণের কাজে হাত দিতে চাইলেন। কিন্তু পুরান কংগ্রেস নেতৃত্ব ইন্দিরাজীর একরোখা কাজকর্ম দেখে বিচলিত। ইন্দিরাজী দলের কাছে তাঁর সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী পেশ করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো কংগ্রেসকে পুনরায় সঞ্জীবিত করা এবং যুবশক্তিকে কংগ্রেসের ভেতরে টেনে আনা। কিন্তু কংগ্রেসের কর্ণধাররা সবাই ইন্দিরাজীর কার্যধারা ও মত ও পথ নিতে রাজী হলেন না। কিন্তু ইন্দিরাজী তাঁর লক্ষ্য অনুযায়ী কাজ করে যান। রাষ্ট্রপতির নির্বাচন, ব্যাংক জাতীয়করণ, ও অন্যান্য প্রোগ্রামের ব্যাপারে আভ্যন্তরীণ বিরোধ শেষ পর্যন্ত অনিবার্য ভাঙন আনলো। জন্ম নিলো নতুন কংগ্রেসের। ইন্দিরাজীর প্রগতিশীল মত ও পথে বিশ্বাসী সবাই মিলিত হলেন এই দলে। ইন্দিরাজী দাবী করলেন তাঁরাই খাঁটি কংগ্রেসী। দেশবাসীও তাই মেনে নিলো। ১৯৭১ সালের সাধারণ নির্বাচনে ইন্দিরাজীর কংগ্রেস সারা রাজ্যে, লোকসভার নির্বাচনে বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করলো। নির্বাচনে এই অভূতপূর্ব জয়যাত্রা নতুন ভারতের জন্ম দিলো। কারণ, একের পর এক নতুন কার্যক্রম চালু হোল। রাজন্যবর্গের ভাতা বিলুপ্ত হোল; অপরদিকে উগ্রপন্থী, বামপন্থী এবং দক্ষিণপন্থী রাজনীতি কোণঠাসা হয়ে পড়লো। সোভিয়েট-ভারত মৈত্রী চুক্তি নতুন বৈদেশিক সম্পর্কের সূচনা করলো।

ইন্দিরাজী শুধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে যা করেছেন তার জন্যে ইতিহাসে তাঁর নাম সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। কারণ, পৃথিবীতে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। আজ পর্যন্ত কোন রাষ্ট্রনেতা, রাজনীতিক যা ভাবতে পারেননি, সেই অসাধ্য সাধন করলেন তিনি। কোন আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে নয়, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বাংলাদেশের মানুষকে পাকিস্থানী বর্বরতা, নিষ্ঠুর নির্যাতন থেকে উদ্ধার করার জন্যই গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী ইন্দিরা গান্ধী সংকটিন কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করে ইতিহাসে নতুন নজির স্থাপন করেছেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে, এক কোটি শরণার্থীর আশ্রয়ে ও প্রত্যাবর্তনে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তির ব্যাপারে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করেছেন।

ভারতীয় সেনাধ্যক্ষদের দ্বারা পরিচালিত বাংলাদেশের মুক্তি অভিযান সমস্ত দিক থেকেই একটি বিরাট সাফল্য। রাজনৈতিক দিক থেকে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্ব দৃঢ়তা, সাহস, প্রত্যয়ের সংগে মিলিত হয়েছিলো ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা। বিদ্যুৎ গতিতে

বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত করার অভিযান সামরিক ইতিহাসে এক নতুন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

তিনি জানতেন, ভারতকে বাংলাদেশ নীতির জন্য কোন সামরিক শক্তির সাহায্য নিতে হলে তার একটা ব্যাপক যুদ্ধের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

এই জন্যে আগে থেকেই ইন্দিরাজী কূটনৈতিক কাজের মধ্য দিয়ে চীনা আক্রমণের আশংকা অপসারণ, ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সম্প্রসারণ ও পুনর্বিন্যাসের সমাপ্তি এবং বাংলাদেশের মুক্তি বাহিনীকে প্রস্তুত করার শিক্ষাদানের কর্মপন্থা নিয়েছিলেন। প্রথম আক্রমণ করার ব্যাপারে ভারতের দ্বিধা ছিলো; তবু শ্রীমতী গান্ধী পূর্ব সীমান্তে সামরিক কার্যকলাপের জন্য দৃঢ় প্রস্তুতি গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সংঘর্ষ ও নিয়ন্ত্রণ এই নীতিকে সুকৌশলে প্রয়োগ করে বাংলাদেশ সীমান্তে অভিযানের পথ প্রশস্ততর করে রেখেছিলেন ইন্দিরাজী। পাকিস্থান ভারতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে এমন আশংকা প্রবলতর হয়ে উঠলে শ্রীমতী গান্ধী যে সামরিক কৌশলের আভাষ দিলেন তা হলো: নির্দেশ পাওয়া মাত্র দ্রুত বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করতে হবে। পশ্চিম এবং উত্তরে রক্ষাত্মক সংগ্রাম চালান হবে। যদি অতর্কিতে আক্রমণের ফলে পাকিস্থান ভারতীয় অঞ্চলের কোন অংশ দখল করে তাহলে দর কষাকষির সুবিধার জন্য পশ্চিমে কিছুটা পাকিস্থানী অংশ দখল করার মতো প্রস্তুতি চাই। শ্রীমতী গান্ধী পশ্চিম পাকিস্থানের ভেতরে প্রবেশ করতে চাননি। কোন অঞ্চল দখলে রাখতে চাননি। সিমলা চুক্তি সেই নীতিরই ফল। তেমনি বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করে বঙ্গবন্ধুর সরকারের হাতে স্বাধীন মুক্ত বাংলাদেশের ভার ছেড়ে দিয়ে স্বদেশে ফিরে আসাই ছিলো ভারতের লক্ষ্য। ইন্দিরাজী তাই করলেন। এখানেই তাঁর নেতৃত্বের সাফল্য।

বাংলাদেশের মানুষ বহুদিন ভালবাসায় কৃতজ্ঞতায় ভারতীয় নেত্রী শ্রীইন্দিরা গান্ধী, ভারতীয় জনগণ, ভারতীয় সৈন্যদের বীরত্ব, মানবতা, সাহস এবং ত্যাগের গাথা গাইবেন। তাঁরা স্মরণ করবেন, ভারত ও বাংলাদেশের মৈত্রীর বন্ধনের কথা। দুই জাতির মৈত্রী ও ঐক্য অক্ষয় হবে—এই দৃঢ় আশা শ্রীমতী গান্ধীর এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের।

পিতার সঙ্গে

অনেকে শ্রীমতী গান্ধীকে সফল স্টেটসম্যান বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁর জীবনের কার্যধারা, নেত্রীত্বের মূল্যায়ন করলে দেখতে পাবেন তিনি ভয়ানক প্রাকটিক্যাল স্টেটসম্যান। যা ভাল বুঝেন তাই তিনি করেন—এই তেজস্বিতার মূলেও রয়েছে বাস্তববাদী বুদ্ধিসম্মত কর্মকৌশলের লক্ষণ। তিনি যে পরিমাণে আদর্শবাদী, ঠিক সেই পরিমাণে কর্মকুশল। সমস্যাকে বুঝতে, বিশ্লেষণে তিনি অদ্বিতীয়া। সঠিক সময়ে ঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি বিচক্ষণ। সিদ্ধান্তকে উপযুক্তভাবে প্রয়োগে তিনি নিপুণ। প্রতিটি কাজে মানসিক দৃঢ়তায় ফুটে উঠেছে ইচ্ছাশক্তির বিকাশ। এ তাঁর চরিত্রকে করেছে অসাধারণ। জনবলের সঙ্গে মনোবলের মিশ্রণ ঘটলে যে অপ্রতিরোধ্য শক্তির সৃষ্টি হয় তারই অপূর্ব দৃষ্টান্ত হোল ইন্দিরা গান্ধী।

প্রধানমন্ত্রীর আলোকচিত্র : তারক দাস
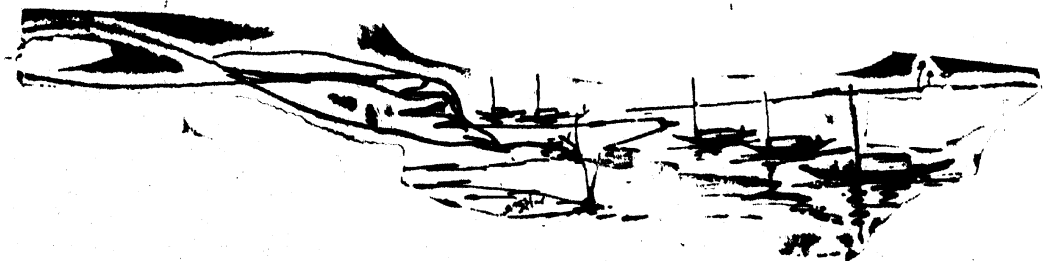
বাবা আর মা মেয়ের নাম রাখতে চাইলেন 'প্রিয়দর্শিনী'। পুতুলের মতো ফুটফুটে মেয়ে। বড় বড় দুটি কালো চোখ। মাথায় একরাশ কালো চুল। ছিমছাম গড়ন। টুকটুকে মুখ। সুচোল নাক। ধব-ধবে শাদা রঙ। দেখলেই কোলে তুলে আদর করতে ইচ্ছে করে। জওহরলালের প্রথম সন্তান।

কিন্তু মতিলাল প্রিয় নাতনীর নাম রাখলেন ইন্দু। ইন্দিরা। ইন্দিরা মানে লক্ষ্মী। ইন্দিরা তাঁর আপন মায়ের নাম। তাঁর মা ছিলেন ছোটখাটো কাশ্মীরী মেয়ে। খুব জেদী, দৃঢ়চেতা মেয়ে। যেটা একবার করবেন ঠিক করেছেন, সেটা ঠিক করবেনই। অন্যথা হবার উপায় নেই। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করার সাহস হতো না বাড়ীর কারও। এমনকি জাঁদরেল পুত্র মতিলালেরও না।

ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনীও পেয়েছেন প্রপিতামহীর স্বভাব। শুধু রূপলাবণ্য নয়। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও।

ঠাকুরদার কোলে বসে রাজনৈতিক জীবনের প্রথম হাতেখড়ি লাভ করে ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনী। কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর সদস্য বলে পুলিশ মতিলালকে গ্রেপ্তার করে। ইংরেজ আদালতের একতরফা রায় তিনি মানতে রাজী হলেন না। তবু তাঁকে ছ' মাস কারাদণ্ড ও পাঁচশো টাকা অর্থ-দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ঠাকুরদার কোলে বসেই ছোট্ট মেয়ে ইন্দিরা আদালতের হাল-চাল সব দেখলে। দেখেছিল বাবা আর ঠাকুরদাকে কারাবরণ করতে হাসিমুখে। কিই বা তখন তার বয়স? চার কি পাঁচ বছর মাত্র (৬ই ডিসেম্বর, ১৯২১)। শৈশবে ঠাকুরদাই তাকে বিশেষ করে প্রভাবান্বিত করেন।

এমনি নেহরু পরিবারের পরিবেশে গড়ে উঠেছিলেন ইন্দিরা। দলনেত্রীর যোগ্যতা নিহিত তাঁর রক্তে। 'বানর-সেনা' সংগঠনের মধ্যে তার স্বাক্ষর পাওয়া যায়।

পুণার বোর্ডিং স্কুলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যেও রয়েছে তার পরিচয়। এছাড়া স্কুলের খেলাধুলোতেও ইন্দিরা সক্রিয় অংশ নিতেন। ঐ বয়সে রাজনীতি ও লেখাপড়ায় ইন্দিরা বেশ এগিয়েছিলেন। রাজনীতির অ-আ-ক-খতে অনেকখানি অগ্রসর। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাতেও। সুতরাং স্কুলের বিতর্কসভায় তাঁর ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। 'নকল সংসদ' বা মক্ পার্লা-মেণ্টে কুমারী ইন্দিরা নেহরু প্রিয়দর্শিনী প্রতিবারই হতেন দলনেত্রী। দলীয় অধি-নেত্রী। 'নকল সংসদের' প্রাইম মিনিস্টার।

ভাবী ভারতের প্রধানমন্ত্রী!

১৯৫৯ সালের ইন্দিরা কংগ্রেস সভা-পতি নির্বাচিত হলে পিতা জওহরলাল যা বলেছিলেন, তা এখানে উল্লেখযোগ্য। পণ্ডিতজীর কথায় :

'আমি ওকে এত নিকট থেকে জানি যে, আমার পক্ষে কিছু বলা আজ কঠিন। আমি জানি না, সে আমার কাছ থেকে কি পেয়েছে। কিন্তু সে তার মায়ের কাছ থেকে পেয়েছে তার সুন্দর স্বভাব, অতি প্রচুর কার্যক্ষমতা এবং অন্তরের সততা। সে আমার কন্যা বলে আমি আজ গর্বিত। আমি গর্বিত, সে আমার 'কমরেড'। আমি গর্বিত সে আজ আমার নেতা বলে।'

নেহরুকে তাঁর উত্তরাধিকারী নিয়োগ করে যেতে কেউ কেউ বুঝি পরামর্শ দিয়েছিলেন। জওহরলাল কিন্তু তাতে ঘোরতর আপত্তি তুলেছিলেন। বলতেন : দেশের জনগণই তাদের নেতা বেছে নেবে। গণতন্ত্রে তাই হয়। ইন্দিরাকে তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যেতে চান কিনা জানতে চাইলে তিনি প্রতিবাদ করে উঠতেন। বলতেন : তিনি বংশানুক্রমিক উত্তরাধি-কারের পক্ষপাতী নন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তা নয়। বললেন :

কন্যা ইন্দিরাকে তিনি অমন ধারায় মানুষ করেননি। তাই বলে কোন দায়িত্ব-শীল পদের যোগ্য সে নয়, এমন কথা বলা চলে না। কংগ্রেস সভাপতির পদের জন্য আমি তাকে কোনরূপ সহায়তা করিনি। দেশের মানুষই তাকে বেছে নিয়েছে।'

নেহরু বলে চললেন : 'এবং আমাকে যাঁরা পছন্দ করেন না, আমার নীতির যাঁরা বিরোধী তাঁরাও বলেছেন, কংগ্রেস সভা-পতি হিসেবে সে ভালো কাজই করেছে।'

তিনি তারপর মেয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেন। বল্লেন :

'ইন্দিরা খুব স্বাধীনচেতা মেয়ে। নিজের পথ ধরে সে চলে। কারও নির্দেশ মেনে নেয় না। আমার তো মনে হয়, ঠিকই সে করে।'

সত্যি, মেয়েকে জওহরলাল আপন ভাবমূর্তির আদলে গড়ে তুলেছেন। ঠিক গড়ে তোলেননি। গড়ে উঠতে সহায়তা করেছেন। ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে নানা উপাদান সংগ্রহ করে তিনি তুলে ধরেছেন মেয়ের সামনে। তাই দিয়ে ইন্দিরা গড়ে তুলেছেন নিজেকে নিজে।

শ্রীমতী গান্ধী যখন প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন, তখন তাঁকে তাঁর প্রাক্তন আর দুজন প্রধানমন্ত্রীর তুলনায় অধিকতর গুরুদায়িত্বের সম্মুখীন হতে হয়। যে পরিস্থিতির মোকাবিলা তাঁকে তখন করতে হয়, তা

কলকাতার ময়দানে ভাষণরত

জওহরলাল কি লালবাহাদুর কাউকেও করতে হয়নি। দেশে খাদ্যাভাব, মুদ্রাস্ফীতি, জীবনযাত্রার ব্যয় যেভাবে ফেঁপে ওঠে তা ইতিপূর্বে তেমন দেখা দেয়নি। প্রতিপক্ষও আইন-শৃঙ্খলা ব্যাহত করে সরকারকে কোণঠাসা, বিপর্যস্ত করতে ছাড়েনি। স্বাধীন ভারতে যে স্থিতি ও সংহতি গত আঠারো বছরে অটুট ছিল, এবার তাতে ফাটল ধরল।

শ্রীমতী গান্ধী জওহরলালের মত অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য বে-সরকারী সংস্থাগুলিকেও সমান অগ্রাধিকার দানে বিশ্বাসী। সংসদীয় গণতন্ত্রের ভিত্তিতে সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা—জাতীয় কংগ্রেসের এ-লক্ষ্য ইন্দিরাজীরও ছিল আদর্শ। দেশের মধ্যে গান্ধীজীর আদর্শগত 'গরিবী হটাও' নীতি তিনি অনুসরণ করতে চাইলেন। আর বৈদেশিক ব্যাপারে পিতা জওহরলালের মত স্বাধীন জোট-নিরপেক্ষ নীতির পুনরানুবৃত্তি।

১৯৬৬ সালের অকটোবরে শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে তিন জোট-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র—যুগোস্লাভিয়া, সংযুক্ত আরব গণতন্ত্র ও ভারতের শীর্ষ নেতৃ-সম্মেলন বসে নয়াদিল্লীতে। এ সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট টিটো, প্রেসিডেন্ট নাসের ও ইন্দিরাজী নেহরু-অনসৃত জোট-নিরপেক্ষ নীতিতে অবিচল আস্থা স্থাপন করেন। এবং জোট-নিরপেক্ষ দেশসমূহের বৈষয়িক উন্নয়নে পারস্পরিক সহযোগিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

শ্রীমতী গান্ধীর বৈদেশিক নীতির ফলে ভারতের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের বহু দেশের সম্পর্কের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হোল। রোডেশিয়ায় শ্বেতাঙ্গ শাসন কায়েম হওয়ার বিরুদ্ধে ভারত আফ্রিকার দেশগুলির মতই প্রতিবাদ জানাল তীব্র ভাষায়। এবং রোডেশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক করল ছিন্ন। উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিন বোমাবর্ষণের প্রতিবাদ জানাল। ভিয়েতনামে মার্কিন কার্যকলাপ সমর্থনের জন্য মার্কিন সরকারের সমস্ত রকম চাপ করল অগ্রাহ্য। মার্কিন সরকার ভারতে প্রতিশ্রুত খাদ্য আসা বন্ধ করে দিলেও ভারত তার নীতিগত আদর্শ থেকে হলো না বিচ্যুত।

নানা দুর্যোগ ও দুর্ঘটনার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার কার্যক্রম শুরু। দীর্ঘ বিশ বছর ধরে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ক্ষমতাসীন। কোন কোন নেতা [illegible] ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ দেখা দিল নিজেদের মধ্যে। ১৯৬৭-এর নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী হয়ে অনেকেই নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে উৎসুক হয়ে উঠলেন। মনোনয়ন লাভে বঞ্চিত যাঁরা তাঁদের অনেকে আবার ক্ষুব্ধ হয়ে কংগ্রেস ত্যাগ করলেন বা গড়ে তুললেন ভিন্ন দল। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী মহলেও অসন্তোষ ক্রমশঃ ধূমায়িত হতে থাকে।

দেশের এ-পটভূমিকায় ১৯৬৭-এর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলল। স্বাধীন ভারতের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন। দলনেত্রী হিসেবে নির্বাচনের প্রধান দায়িত্ব ইন্দিরাজীকে নিতে হোল। প্রধানমন্ত্রীর প্রচারের মুখে প্রতিপক্ষের বক্তব্য খানচাল হয়ে গেল। তখন ওরা কোন কোন ক্ষেত্রে গুণ্ডামি আর হিংসাত্মক পন্থার আশ্রয় নিলে। কংগ্রেসের নির্বাচনী সভা পণ্ড করার জন্য ভাড়াটে লোক লেলিয়ে দিতে সচেষ্ট হলো। কোন কোন কংগ্রেসী মন্ত্রীর উপরও চড়াও হোল। গাড়ী পুড়িয়ে দিতে ছাড়ল না।

ওড়িশায় এমনি এক নির্বাচনী সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী একদিন স্বতন্ত্র প্রতিপক্ষ দলের বিরোধিতার সম্মুখীন হন। বিরোধীদল কিছু ভাড়াটে

লোকও বুঝি আমদানি করেছিল। শ্রীমতী গান্ধীর বক্তৃতা শুরু হলে ওরা আরম্ভ করে দিলে বিক্ষোভ। হৈ-চৈ। একটুকরো ইঁট বুঝি কে বা কারা ভিড় থেকে ছুঁড়ে মারলে প্রধানমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে।

ইঁটখানি এসে লাগল প্রধানমন্ত্রীর নাকের ওপর।

উঃ বলে রুমালখানা বার করে চেপে ধরলেন ক্ষতস্থানে। ছোট্ট রুমালখানা রক্তে রাঙা হয়ে উঠল। দু-এক ফোঁটা রক্ত শাড়ীর উপরও বুঝি ঝরে পড়ল। সিকিউরিটি পুলিশ দল ছুটে এল। উপস্থিত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রীকে বক্তৃতা বন্ধ করে সভাস্থল ত্যাগ করতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সে অনুরোধ কানে তুললেন না। বক্তৃতার খেই হারালেন না। বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ

'আজকে আমাকে যে অপমান করা হোল সে অপমান আমার প্রতি নয়। সে অপমান সারা দেশের প্রতি। কেননা, ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমি দেশেরই প্রতিনিধিত্ব করে থাকি।'

শ্রীমতী ইন্দিরা রক্তেরাঙা রুমালখানা দিয়ে নাকটা আবার মুছে নিলেন। তারপর বক্তৃতার পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে গেলেন।

প্রধানমন্ত্রীর উপর এ ভীরু কাপুরুষোচিত আক্রমণের জন্য সমগ্র দেশ ধিক্কারে সোচ্চার হয়ে উঠল। ভোটদাতারা হীন আক্রমণকারীদের চিনে নিতে ভুল করলেন না। নির্বাচনে রায় দিলেন তাদের বিরুদ্ধে।

১৯৬৭-এর নির্বাচনে কংগ্রেসের উপর জনগণের আস্থা হ্রাস পেলেও কংগ্রেস লোকসভায় শতকরা ৫৫ ভাগ ভোট লাভ করে। যদিও শ্রীমতী গান্ধী তাঁর বেরিলি (উত্তরপ্রদেশ) কেন্দ্র থেকে বিপুল ভোটাধিক্যে নির্বাচিত হলেন, তবুও তাঁর বুঝতে দেরী হোল না যে পার্টি হিসেবে কংগ্রেসের লোকপ্রিয়তা সাধারণের মধ্যে ক্রমশ উবে আসছে। পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছে কংগ্রেসের। জনসাধারণের কাছ থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে কংগ্রেস। কংগ্রেসকে পুনরায় সঞ্জীবিত করতে হলে তার নতুন দাওয়াই দরকার। ঢেলে তাকে নতুন করে সাজাতে হবে। যুব শক্তিতে আনতে হবে কংগ্রেসের পক্ষছায়ায়। ঝাড়াই করে বাদ দিতে হবে অবাঞ্ছিতদের। সমাজতন্ত্রের পথে, প্রগতির স্রোতে হাল ধরতে হবে কংগ্রেস তরণীর। ভুবনেশ্বরের জনসভায় ইঁট ছোঁড়ার ঘটনাটি বুঝি তারই ইঙ্গিত। ছায়া পূর্বগামী।

তাই বুঝি ব্যাঙ্গালোর কংগ্রেসের অধিবেশনে শ্রীমতী গান্ধী তাঁর সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীর খসড়া পেশ করলেন। কিন্তু কংগ্রেসের সিণ্ডিকেট গোষ্ঠীর নেতারা এর করলেন তীব্র বিরোধিতা। এ নিয়ে যে মতবিরোধ দেখা দিল তার পরিসমাপ্তি ঘটল কংগ্রেস বিভাগের মধ্যে। ইন্দিরাজী তাঁর অনুগামীদের নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হলেন তাঁর কর্মপন্থার সার্থক রূপায়ণের উদ্দেশ্যে।

কিন্তু কংগ্রেস বিভক্ত হয়ে যাবার পর লোকসভায় প্রধানমন্ত্রীর দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রশ্ন দেখা দিল। তিনি অবশ্য সংসদে তাঁর প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্যের সমর্থন পাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর কর্মসূচীর সফল বাস্তব রূপায়ণের জন্য তা যথেষ্ট নয়। বিশেষ করে যখন তাঁকে কোন কোন ক্ষেত্রে বামপন্থী দলগুলির সমর্থনের উপরও নির্ভর করতে হচ্ছিল।

শ্রীমতী গান্ধী এবার লোকসভা ভেঙে নতুন করে গড়ার কাজে অগ্রসর হলেন। তিনি লোকসভা বাতিলের সুপারিশ করলেন। রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ মত লোকসভা বাতিলের নির্দেশ দেন (ডিসেম্বর ২৭, ১৯৬৯)। ১৯৭১, মার্চ-এর লোকসভা উপনির্বাচনে শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস দল বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী হোল। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের লোকসভা সদস্যের সংখ্যা ছিল ২৮৩। আর ৭১-এর উপনির্বাচনে শ্রীমতী গান্ধীর অনুগামীরা দখল করলেন ৫১৫টি আসনের মধ্যে ৩৫০টি। এবং বিরোধী কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা ৬৫ থেকে হ্রাস পেয়ে গিয়ে দাঁড়াল মাত্র ১৬টিতে।

এ জয় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর। তাঁর প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীর। লোকসভায় শ্রীমতী গান্ধী সুপ্রতিষ্ঠিত করেন নিজেকে, এবং নিজের পার্টিকে।

১৯৭২-এর বিধানসভাগুলির সাধারণ নির্বাচনে যে প্রশ্ন বড়ো হয়ে দেখা দিল তা হোল ১৯৭১ সালের মত এবারও কি শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস জয়-গৌরবের শীর্ষে আরোহণ করতে সমর্থ হবে? ১৯৭২-এর নির্বাচনের উল্লেখযোগ্য দিক ছিল দুটি। এক, বাংলাদেশের স্বাধীনতা। আর দুই, সমাজতন্ত্রের পথে দেশের অগ্রগতি।

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে ইন্দিরাজীর সফল ভূমিকা তাঁকে মহান করে তুলেছিল দেশবাসীর কাছে। বাংলাদেশের প্রশ্নে ইন্দিরাজীর প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল সার্থক। মুক্তিসংগ্রামে সমস্ত রকমের সাহায্য ছাড়াও বন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জন্য তিনি যে অভিযান চালিয়েছিলেন এবং সফলও হয়েছিলেন তাতে শুধু ভারতের বা বাংলাদেশের কাছে নয়, বিশ্বের জনসাধারণের নিকটও অভিনন্দিত হলেন।

কেবল নির্বাচন যুদ্ধ নয় কিংবা নয় পাক-ভারত যুদ্ধে বিজয়িনী ইন্দিরার জয়যাত্রা। অনন্যা ইন্দিরার জীবনের আর একটি সার্থক পদক্ষেপ সিমলা চুক্তির। জুন ২৮ থেকে ২রা জুলাই, ১৯৭২ একনাগাড়ে পাঁচদিনের আলাপ আলোচনার পর ভারত ও পাকিস্থানের দুই প্রধান সিমলা পাহাড়ের শীর্ষ বৈঠকে ঐতিহাসিক এই চুক্তি স্বাক্ষরিত করেন। ভারতীয় গণতন্ত্রের পক্ষে সই করেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আর ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তানের পক্ষে প্রেসিডেন্ট মিঃ জুলফিকর আলি ভুট্টো। সিমলা চুক্তির পাদপীঠে দুদেশের দুইপ্রধান প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন ঃ ভারতীয় উপমহাদেশে আর যুদ্ধবিগ্রহ নয়। শান্তির অমোঘ বাণী এবার হোক অনুরণিত। পঁচিশ বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতার তিক্ত সম্পর্কের যেন হয় অবসান। সিমলা চুক্তি এই মিলনের রাখী বন্ধন। কেননা, গত পঁচিশ বছরে প্রতিবেশী দুই রাষ্ট্র চার চারবার সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। ভারতকে বিদেশী হানাদারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়েছে রুখে। ফলে দুদেশের কম-সে-কম পঁচিশ হাজার তাজা জওয়ান প্রাণ হারিয়েছে। সাড়ে চার কোটি মানুষ হয়েছে ছিন্নমূল উদ্বাস্তু। যুদ্ধের রসদ যোগাতে গিয়ে ব্যয় হয়েছে কোটি কোটি টাকা--অনগ্রসর জাতির মুখের গ্রাস। পাশাপাশি দুদেশের মানুষকে করেছে বিচ্ছিন্ন। আলাদা করে দিয়েছে দু দেশের মানুষকে সীমান্ত বরাবর হাজার হাজার মাইল কাঁটা তারের বেড়া। সঙীন উঁচিয়ে শিরস্ত্রাণ-পরা অতন্দ্র প্রহরীর টহল। চেকপোস্ট আর পিলকক্সের বাধানিষেধ।

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত লড়াইয়ের পর থেকে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য, যোগাযোগ, সাংস্কৃতিক সম্পর্ক প্রভৃতি সব কিছুরই ঘটেছিল অবসান। এমন কি কূটনৈতিক সম্পর্কও হয়েছে বিচ্ছিন্ন। পারস্পরিক সন্দেহ, সংশয় দানা বেঁধে উঠেছিল জগদ্দল পাথরের মত। দু দেশের মধ্যে যুদ্ধের আশংকা যদি দূরীভূত হয়, শান্তির পরিবেশ যদি ফিরে আসে, তাহলে ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সব বিরোধ মেটানো সম্ভব। তৃতীয় পক্ষের মোড়লিরও আর কোন প্রয়োজন হবে না। তৃতীয়পক্ষের মধ্যস্থতার অর্থই হোল দুদেশের বিরোধকে অকারণ দীর্ঘায়ু করে তোলা বিদেশী শক্তির কায়েমী স্বার্থে। কেননা, কাশ্মীরে পাক হানাদারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসঙ্ঘে ধরনা দিয়েও ভারত সুবিচার পায়নি। সমস্যার সমাধান হয়নি। তাশখন্দে শাস্ত্রী-আয়ুব চুক্তিতেও হয়নি কোন সুরাহা। শান্তির স্বপক্ষে প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুরের মহাপ্রয়াণেও না। তাশখন্ড চুক্তির কালি শুকাতে না শুকাতেই পাকিস্তানী সামরিক চক্রের রণ-দামামা বেজে উঠেছে আবার। এবং একাত্তরের সত্তেরোই ডিসেম্বর তার ঘটে পরিসমাপ্তি।

এক হাজার শব্দসম্বলিত এ চুক্তিতে বলপ্রয়োগের করা হয়েছে নিন্দা। এবং ভারত-পাক বিরোধের মীমাংসা দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমেই করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বস্তুত, সিমলা চুক্তি একটা পরিণতি নয়। একটি সূচনা মাত্র। এবং তা শুভ। একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এ কোনো হারজিতের প্রশ্ন নয়। ২রা জুলাই সিমলায় যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হোল তা কেবল বিচক্ষণতা ও বাস্তব দূরদর্শিতার পরিচায়ক নয়, এশিয়ায় সূচনা করেছে এক নতুন যুগের। এই চুক্তি ভারত ও পাকিস্তানের মৈত্রীর নিশানা দেয়। আফ্রো-এশীয় মহাদেশে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এক নতুন দিগন্তও দিয়েছে খুলে। এখানেই ইন্দিরা নীতির জয়যাত্রা।

রাস্তা, সিটি, ভিড়ের কোলাহল, মানুষদের যাতায়াত, দল বাঁধা সাওতালী মেয়ে, দর কষাকষি, কাদা প্যাচপেচে পথে হাটাহাটি মেলা জুড়ে সন্ধ্যায় আগের মুহূর্তে জন-জোয়ার নদীর বন্যা।

ফটিকের দোকানের সামনেও ভিড়। বেগুনী, ফুলুরী, পেঁয়াজী, চপ ভেজে আর পড়ে থাকে না। পয়সা বাজে ঝনঝন। গা ঘামছে। তেলের ঝাঁজে নাকে জল। তবে পয়সার ঝনঝনানি তাকে একটুও ক্লান্ত করে না। ছেলে চাঁদ আসতে সে শুধু ক্ষণকাল বিরক্ত হয়। ছোট ছেলে। স্কুলে পড়ে। সে বারণ করে এসেছে মাকে মেলায় পাঠাবে না। তবু ঠিক পাঠান চাই। কে জানে মা না ছেলেরই বদমাইসী। মেলা দেখতে আসে পাঁচ মাইল পথ ঠেঙিয়ে। আসলে মা মরা ছেলে বলে ঠাকুমার এমন দরদ। কোন কিছুতে না বলে না। ফটিক বাপ হয়েও বকাঝকা করতে পারে না। আসল কথা মাকে অসুখী করতে বুকে বড় কষ্ট হয়। রাগ হয় তবু সহ্য করে। যেমন কিনা মা—'ও বাবা ফটিক একটা বিয়ে কর' বললে ; সে শুধু বলে, 'মা উসব কথা থাকুক।' মায়ের শেষ বয়সের সন্তান। আগের দু' দাদা ও দু' দিদিই মৃত। মা প্রায় বলে, 'তুকে সুখে মরতে পারলে শান্তি পাই।' ফটিকের বুকের মধ্যে শুনে কেমন যেন শব্দ হয়।

চাঁদ তক্তার কাছে আসতে সাপের কথা মনে পড়ে তার। ব্যস্ত স্বরে বলে, 'সর সর, এদিকে দাঁড়া।' চাঁদ 'কেনে বাবা' বলে অবাক হয়। ফটিক সাপের কথা বলে না। বলে, 'এলি কেনে আজ আবার। ঘর যেতে রাত হয়ে যাবে।' পয়সা থেকে গুনে চার আনা তুলে দেয়, বলে, 'দুটো মিষ্টি খেয়ে সোজা ঘর যাবি।' চাঁদ পয়সা পেয়ে আর দাঁড়ায় না। আহা ছেলের মুখ দেখলেই লক্ষ্মীর কথা মনে পড়ে। বুকে এখনও একখানা ঘর জুড়ে আছে লক্ষ্মী।

খদ্দের ফাঁকা হতেই আবার সাপের কথা মনে পড়ে। সকালই আজ বেয়াড়া দিন এনেছে। রোজগার মন্দ নয়, তবু কি যেন জড়ান মনের বুকে। ঘুম ভাঙ্গার পর খাবারের দোকান থেকে একটা রঙ্গীন শাড়ী মোড়া মেয়েমানুষ বেরুতে দেখে চমক লেগেছিল। পরে সহদেবকে, খাবারের দোকানের মালিক, বলতে সে ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হেসে যা জানাল তাতে মুখে রক্ত দু কানে শোঁ শোঁ উকতো তার। বাজারের মেয়েমানুষ। দোকানে রাত কাটাবে দশ টাকা রেট। সহদেব তার শরীরের বর্ণনা, গত রজনীর স্মৃতির কথা এবং আজ রাতে তার দোকানেই হোক বলে সে তার বুকের মধ্যে একটা পোকার শুড়শুড়ি খেলা শুরু করে দিল। 'টাকা বিশেক খরচা, মদও তো চাই। আরে, বাবাজীবন কি দেখ. শহুরে মেয়ে জীবনে জুটবে না, এমন মওকা পাচ্ছ, স্ফূর্তি করে নাও', বলে সে 'কি রাজী তো' ফটিককে যেন এক ঘোরে ফেলে দিল।

তখন থেকেই চিন্তাটা পাক খাচ্ছে। মেলার লাভের টাকায় সে গাঁয়ে একটা ছোট দোকান দেবে। বড় কষ্ট। রোজ অন্ন জোটে না মা একটা ছেলে এবং নিজেকে প্রতিপালন করতে সে হিমসিম খায়। কুড়ি টাকা জমেছে। এখনও কয়েকদিন মেলা, আয় পঞ্চাশ ষাট হবে না। তবু, সহদেবের কাছ থেকে রঙীন ফানুষের ওড়াওড়ি যোগ দেবার চিন্তাটা সে ছাড়তে পারে না। হঠাৎ সাপটা ঢুকে কিছুটা গোলমাল করে দিল। ভয় ছাড়ছে না। একবার তক্তাপোষের নীচেটা সে দেখে নেয়। সহদেব এসে আর কিছু বলল না। কিছুটা নিশ্চিত হয় সে।

সন্ধ্যার চারিদিকে আলোর আলোময়। ভিড়ও বাড়ল। মেলা সরগরম। খরিদ্দার, দোকানদার, ওদিকে সার্কাস, মরণকূপ, ম্যাজিক চোঙার হাঁকডাক বাঁশি যেন অন্ধকার গাঢ় হওয়ার মত উচ্চগ্রামে উঠতে থাকল ক্রমশঃ।

হঠাৎ আকাশের দেবতার কি যে মতলব, এমন উদ্দাম আলোময় খেলায় কি যে ক্ষোভ, দুরন্ত ঝড় কোথায় যেন তীক্ষ্ণ চঞ্চু নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য ওৎ পেতে ছিল। মুহূর্তের মধ্যে ওলোটপালট খেলা। চমক খেয়ে মানুষগুলো ছোটাছুটি, দোকানের আলো নিবে যাওয়া, টিন আর দরমার শব্দ। ঝড়ের তাণ্ডবতায় সঙ্গে আবার বৃষ্টিপাত মুহূর্তের মধ্যে মানুষের আর্তনাদ, হাঁক-ডাককে চাপা দিয়ে বিদ্যুতের ঝলক, বৃষ্টির জোড়ালো ফোঁটা মেঘের গর্জন যেন উদ্দাম মানুষগুলিকে মূক বিমূঢ় করে নিজের কর্তৃত্ব সোচ্চার করে তুলল।

ফটিক দ্রুত হাতে সামনের দরজা টেনে মুখ এঁটে দিল। তেলের কড়াই নামাল। জিনিসপত্র সরাল তক্তপোষের ওপাশে। উনুনটাকে খুঁচে খুঁচে কয়লা নামাল, জল ঢালল কয়লায়। তারপর হ্যারিকেনটা তক্তপোষের উপর তুলে উবু হয়ে বসল। আকাশের দেবতা আরও উন্মাদ। উন্মাদ কাটলেও মেলা আর নয়। একটা বিঁতি হ্যারিকেনের কাঁচ তুলে সে ধরাল। তারপর পয়সা গুনতে বসতেই দরজায় মেয়েমানুষ গলা, ধাক্কা, খুল গো খুল।

মুহূর্তকাল ভাবনা। তারপরই পয়সার গুলো বস্তা চাপা দিয়ে ফটিক দরমা সরায়। মেয়েমানুষ ত্রস্তে ঢুকে পড়ে ভেতরে। হ্যারিকেনের আলোয় দেখা যায় মাথার চুল ভেজা, এলো, কপালের লাল টিপ গলেছে, বড় বড় চোখ ; সবুজ ব্লাউস দুরন্ত বন্য শরীরে আঁট হয়ে, শ্যামলা রঙ, তবে রঙ্গীন শাড়ীতে ঘেরা যুবতী শরীর, হাতে কাঁচের চুড়ির রাশ। ফটিক বুঝে উঠতে পারে না সহদেবের কথার সেই মেয়েমানুষ, না-কি আশ্রয় নিল এই তাণ্ডবে। কোন ঘরের মেয়ে। সে বস্তার পয়সাগুলোর দিকে চোখ ফেলে। এবং কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই মেয়েমানুষ বলে কিছু খাবার নাই? আমার কাছে কিন্তু একটিও পয়সা নাই। পেট জ্বলে যাচ্ছে। খিদে একদম সইতে পারি না।' ফটিক কোন কথা বলে না। টিনের মুড়ি, পড়ে থাকা বেগুনি শালপাতায় বাড়িয়ে দেয়। তক্তাপোষের উপর উঠে মেয়েমানুষ যেন ঘরে খাবার খাচ্ছে, এমনভাবে মুঠো মুঠো মুড়ি খায়। তারপর চপ বেগুনি মাখিয়ে গ্রাসে গ্রাসে তোলে। একবার মাত্র চোখ ঘুরিয়ে বলে, 'জল নাই?' এলুমিনিয়ামের গ্লাস বাড়িয়ে দেয় ফটিক। এ মুহূর্তে সে ভাবার অবসর পাচ্ছে না এ কে। শরীরের ভঙ্গীমায় চোখের দৃষ্টিতে কোন কামনা, কোন আমন্ত্রণ কোন লাস্য কোন ইঙ্গিত নেই। ভয়ংকর ক্ষুধায় মেয়েমানুষ যেন সব কিছু গ্রাস করার জন্যে হাঁ-মুখ করে এসেছে। চকিতে তার মনে হয় সহদেবের দোকান থেকে শাড়ীমোড়া সকালের সেই মেয়েমানুষ এমনই না লাল রঙা ফুল তোলা শাড়ী পরেছিল। মুখখানা দেখা হয়নি। লম্বাটে চেহারা। সেই কি! মনে হতেই ফটিক সহদেবের চকচকে মুখে মেয়েমানুষের শরীরের বর্ণনা এবং রজনীর স্ফূর্তি কথা শুনতে পায় ; আর তখনই সে টের পায়, সাপটা তার পায়ে জড়াচ্ছে। ভয় পেয়ে চিৎকার করে ওঠে সে. সাপ, সাপ। এবং তক্তাপোষের উপর উঠতে যেতেই হ্যারিকেনটা ধাক্কা খেয়ে উল্টে যায়। দপ-দপ করে পর-মুহূর্তেই নিবে যায়, তারপর। সারা ঘর অন্ধকার। বাইরে প্রকৃতির তাণ্ডবতা। ক্ষুধার্ত মেয়েমানুষ, 'বাঃ' বলে শব্দ করে ওঠে। ফটিক টের পায় সাপটা হিম-শরীর নিয়ে তাকে বেষ্টন করছে। শ্বাস নিতে অসম্ভব কষ্ট হয় অন্ধকারে।

এজরা পাউন্ড

এজরা পাউন্ড একদা যুক্তরাষ্ট্র প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন 'দি বিগেস্ট ল্যুনাটিক অ্যাসাইলাম ইন দি ওয়ার্ল্ড', সেই যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। সাতাশী বছর বয়সের অনেকটা কাল যে ইতালিতে অতিবাহিত হয়েছে সেই ইতালিতেই এজরা পাউন্ড চোখ বুজেছেন। তিনি ফ্যাসিস্তদের স্তুতিবাদ করেছিলেন। যেভাবে ডিক্টেটরী শাসনব্যবস্থার তিনি বন্দনা শুরু করলেন তা অনেকের কাছে বিস্ময় ও বেদনার কারণ হয়ে উঠল। তিনি রোম রেডিয়োতে পার্ল হারবার বিপর্যয়ের পর ভাষণ দিতে শুরু করলেন, বলে দিলেন, বিবেকবহির্ভূত কোনো কিছু বাণী তিনি দেবেন না এবং মার্কিন নাগরিক হিসাবে তাঁর কর্তব্য থেকে তিনি কিছুতেই বিচ্যুত হবেন না। ইতালির ফ্যাসিস্ত সরকার এই দাবী মেনে নিলেও এজরা পাউন্ড কিন্তু স্বেচ্ছায় মার্কিনদের পক্ষে ক্ষতিকর অনেক কথা বলতে লাগলেন। যুদ্ধান্তে বিচারের জন্য ধরে নিয়ে যাওয়া হল তাঁকে, বারোটি বছর তাঁকে মানসিক ব্যাধির হাসপাতালে আটক রাখা হল। পাউন্ড প্রচন্ড ইহুদী-বিদ্বেষী ছিলেন, কে জানে সেই কারণেই তিনি ফ্যাসিস্তদের স্বার্থে কাজ করেছিলেন কিনা! পৃথিবীর বহু খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিকরা আবেদন করলেন পাউন্ডের মুক্তির জন্য। দেশদ্রোহিতার অপরাধে বিচার না করে তাঁকে মানসিক চিকিৎসাগারে আটক রাখা হয়েছিল। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হল। কবি বিশ্বের 'বিগেস্ট ল্যুনাটিক অ্যাসাইলাম' পরিত্যাগ করে ভেনিসে এসে বাস করতে লাগলেন এবং শেষপর্যন্ত সেখানেই তাঁর ঘটনাবহুল জীবনের যবনিকা পতন ঘটেছে।

মার্কিন কর্তৃপক্ষ পাউন্ডকে ক্ষমা করতে পারেন নি, অধিকাংশ মার্কিন 'কাব্য-সংগ্রহ' বা অ্যানথোলজীতে পাউন্ডের কবিতা অনুপস্থিত। মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস পূর্বে এজরা পাউন্ডকে কেন্দ্র করে একটা তুমুল বিতর্কের ঝড় বয়ে গেল। আমেরিকান একাডেমি অ্যান্ড দি ন্যাশনাল ইনস্টি-ট্যুট অব আর্টস অ্যান্ড লেটারস 'ইমার্সন-থোরো' পুরস্কার প্রতি বৎসর একজন সুযোগ্য ব্যক্তিকে দান করে সম্মানিত করেন, এই বছর বিশিষ্ট সাহিত্যিক-সমালোচকদের দ্বারা সংগঠিত এক বিচারকমন্ডলী পাউন্ডের নাম পুর-স্কারের জন্য সুপারিশ করেছিলেন, কিন্তু একাডেমির পরিচালকমন্ডলী সেই সুপারিশ নাকচ করে দিলেন, তাঁদের মতে পাউন্ড

এই পত্রকারের অবদান, তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিকগুলির জন্যই এই পত্রকারের মূল্য তাঁকে কেবল বিবেচনা করা যায় না।

তেত্রিশ বছর পূর্বে পত্রকারী ... এখনই ... বিতর্ক শুরু হয়েছিল।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে এজরা লুমিস পাউন্ড ইডাহোর হেলী শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পনের বছর বয়সে ভর্তি হয়েছিলেন পাউন্ড। আস্তে-আস্তে বিষয় বাছ নিয়ে 'স্পেশ্যাল স্টুডেন্ট' হিসাবে পড়াশোনা করার জন্য। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে স্নাতক হলেন। তারপর ১৯০৫ থেকে ১৯০৭ পর্যন্ত 'রোমান্স ল্যাংগুয়েজেস'-এ 'পলাদার নির্দেশক' হিসাবে পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হিসাবে কাজ করলেন। এই সময় লোপে দ্য ভেগা'র উপর গবেষণা করছিলেন পাউন্ড। কিন্তু মাল-মশলা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে য়ুরোপে পাড়ি দিলেন। স্পেন, ইতালী ও প্রভেন্সের বিভিন্ন অঞ্চলে বছরখানেক ঘুরে বেড়ালেন। আর এই সময়েই প্রকাশিত হল তাঁর প্রথমতম কাব্যগ্রন্থ—'এ ল্যুমে স্পেনটো'। ১৯০৮-এ এই কবিতাগ্রন্থ প্রকাশের পর তেইশ বছর বয়সের তরুণ কবি ইংলন্ডে এসে হাজির হলেন।

তখনকার ইংলন্ড একেবারে জমজমাট। ইএটস, মে সিনক্লেয়ার, ফকস ম্যাডক্স হিউয়েফার, ইভিলিন আন্ডারহিল, উইলিয়াম রথেনস্টাইন, হেনরী নেভেনসন, আরনেস্ট রিস, চার্লস ট্রেভেলিয়ান প্রভৃতি শিল্পী ও সাহিত্যিকদের বিরাট সমাবেশ। এজরা পাউন্ডও সহজেই এই দলের শরিক হয়ে পড়লেন। প্রায় দশ বছর কাল এজরা পাউন্ড বক্তৃতা দিয়ে, কবিতা লিখে এবং নিয়মিতভাবে ইংলন্ডের 'ফর্টনাইটলি রিভ্যু' ও আমেরিকার 'পোয়েট্রি' ও 'ডায়াল' পত্রিকায় বিভিন্ন রচনাদি লিখেছেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে 'পার্সনি' নামক কবিতা গ্রন্থ প্রকাশিত হল। এজরা পাউন্ডের কবি-প্রতিভা যথাযোগ্য স্বীকৃতিলাভ করল। প্রভেন্সীয় গায়ক ও ত্রুবাদুর চারণদের গানের ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যের প্রভাব তাঁর কাব্যে পরিলক্ষিত হল। কবিতার ক্ষেত্রে পাউন্ড একটা নতুন ভাবনা ও নতুন রীতির প্রবর্তন করলেন।

ইংলন্ডের এই দশটি বছর পাউন্ডের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাল। তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে 'ইমেজিস্ট' সম্প্রদায় গড়ে উঠল। 'ইমাজিসমে' কথাটির সৃষ্টি করেছেন পাউন্ড। পাউন্ড শুধু যে একটা 'ইমেজিস্ট' গোষ্ঠী গঠন করে ক্ষান্ত হলেন তা নয় তিনি 'ইমেজিস্ট' গোষ্ঠীর কবিতা সংগ্রহ করে 'দেস ইমাজিস্তস' নামক কবিতা সংগ্রহ বা এ্যানথোলজী প্রকাশ করলেন এবং এই ১৯১৪ খৃষ্টাব্দেই ডরোথী শেকসপীয়ারের পাণিগ্রহণ করলেন। ইমেজিস্ট আন্দোলনে পাউন্ডের অন্যতম সহচর ছিলেন রিচার্ড এ্যালডিংটন, ম্যাডক্স ফোর্ড প্রমুখ। 'ইংলিশ রিভিয়্যু' পত্রিকার ফোর্ড প্রমুখ। ম্যাডক্স ফোর্ডের সমালোচনা সে যুগের কবিদের কাছে আদর্শ প্রেরণা এনেছিল। ইমেজিস্ট আন্দোলনের বক্তব্য কি এই প্রশ্নের একটি মাত্র জবাব ছিল এই যে কাব্যে নতুন রীতির এ'রা প্রবর্তক। আগের যুগের ছকবাঁধা কবিতার রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করে কাব্যের অবয়বে বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটানো হল।

অন্যান্যদের পাউন্ড এই বছরই উইনডহ্যাম লুইয়ের সহযোগিতায় ভোরটিসিস্টদের মুখপত্র 'ব্লাস্ট' প্রকাশ করলেন। এই প্রচার পত্রিকার আয়ু স্বল্পস্থায়ী হলেও তার মধ্যে যথেষ্ট বলিষ্ঠতার পরিচয় ছিল।

এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার কালটিতে পাউন্ডের উৎসাহ আর উদ্দীপনার অন্ত ছিল না। নতুন কবিকে আবিষ্কার করার প্রতি তাঁর একটা স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে 'ফর্টনাইটলি রিভ্যু' নামক সুবিখ্যাত পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রসঙ্গে এজরা পাউন্ড যা লিখেছিলেন তা স্মরণযোগ্য—কারণ কবি তখন সবেমাত্র ইংলন্ডের কবি ও সাহিত্যিক সমাজে তাঁর ইংরাজী কাব্যের পাণ্ডুলিপি পাঠ করেছেন ও গীতাঞ্জলির ইংরাজী সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু নোবেল প্রাইজে সম্মানিত হন নি। পাউন্ড লিখলেন :

"মিঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতাগুচ্ছের প্রকাশ (গীতাঞ্জলি) আমার কাছে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। পাঠক হয়ত আমার বক্তব্য ঠিক বুঝবেন না, আমার বক্তব্য কবির কাব্যে প্রমাণিত। এই কবিতা অতি ধীরে, শান্ত পরিবেশে ও উচ্চস্বরে পাঠ করতে হবে। এই কবিতাগুলির অনুবাদক স্বয়ং সুরকার, তাই সেই মহৎ শিল্পীর অভিব্যক্তি সূক্ষ্ম সংগীতের মাধ্যমে।

মাসাধিককাল পূর্বে কবি ইএটসের বাসভবনে গিয়ে দেখেছিলাম এই মহাকবির আগমনে তিনি চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। এই কবি আমাদের চেয়ে মহৎ ও বিরাট। ঠিক কোথায় যে আমার বক্তব্য শুরু করব তাই ভাবছি। বাংলাদেশের জনসংখ্যা পাঁচ কোটি। প্রথম নজরে মনে হবে রেলগাড়ি এবং গ্রামোফোন দেশটাকে আচ্ছন্ন করেছে। কিন্তু, এই বাহ্য, এই দেশের অন্তঃসলিলা সংস্কৃতি আধুনিক প্রভেন্সের সঙ্গে তুলনীয়। এই বাংলাদেশের মহাকবি ও গীতিকার মিঃ ঠাকুর। তিনি জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা, সেই সংগীতের সুর দা মাসাই-এর সংগে তুলনীয়। তাঁর 'সোনার বাংলা' গানটি শুনলাম। সম্পূর্ণ প্রাচ্য সুর, অপূর্ব তার মাদকতা, জনতাকে স্পর্শ করার শক্তি তার আছে। হালকা চালের গান, চটুল অন্তরঙ্গ এবং উদ্দীপনাময়। এই কথা উল্লেখের হেতু এই যে এতদ্ব্যতীত সহজেই বোঝা যাবে যে দান্তে বর্ণিত মহাকাব্যের ত্রিবিধ গুণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যেও, যথা প্রেম, দেশাত্মবোধ ও আত্মার মুক্তি।"

এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধে এজরা পাউন্ড রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ এবং তাঁর মধ্যে মহৎ কবির যে লক্ষণ প্রকাশিত তার বিশদ আলোচনা করে বলেছেন—রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রদূত। রবীন্দ্রনাথ যখন কবিতা পাঠ করছিলেন তখন ঘরে গৃহকর্ত্রীর ছোট্ট মেয়েটি এসে হৈ-চৈ শুরু করে দেয়। কবিও তৎক্ষণাৎ কবিতা পাঠ থামিয়ে হেসে উঠলেন। এই দৃশ্যটুকুও পাউন্ডের ভালো লেগেছে—তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছে নান্দনিক আলোচনা আর শিশুর হাসি কি একই সুরে বাঁধা?

এরপর রবীন্দ্রনাথের কবিতার গুণাগুণ বিচার প্রসঙ্গে এজরা পাউন্ড মন্তব্য করেছেন :

"এই কবিতার মধ্যে আছে এক নিস্তরঙ্গ স্তব্ধতা, যেন অকস্মাৎ নবীন গ্রীসকে আবিষ্কার করলাম। য়ুরোপে রেনেসাঁসের কালে যেমন ভারসাম্য ফিরে এসেছিল তেমনই একালের যান্ত্রিক ঘূর্ণি হাওয়ার মধ্যে এক সংস্কৃত, শান্ত মধুরতার পরিবেশ আবির্ভূত হল। অভিডসের নীতি শরীর সুস্থ থাকলেই মনও সুস্থ থাকে, মধ্যযুগীয় অস্পষ্ট মানসিকতা এই নীতিকে কিন্তু বেশীদূর নিয়ে যেতে পারেনি। বিভ্রান্ত চিন্তাকে মুক্তি দিতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ এনেছেন সুস্থিরতা—এ আমার আকস্মিক উচ্ছ্বাস মাত্র নয়, অত্যুক্তি নয়। প্রায় মাসাধিককাল এই বিষয়ে চিন্তা করেছি। মিঃ ঠাকুরের সমগ্র রচনা আজো অনূদিত হয়নি। সে বিষয়ে বলার সময় আসেনি তবে যে কাব্যগ্রন্থ আমার হাতে আছে তার সংগে তুলনা করার জন্য যে গ্রন্থ আমার মনে পড়ছে তার নাম দান্তের 'পা র দি সো।'

এই উচ্ছ্বাসভরা প্রবন্ধটি অনেকদিক থেকে স্মরণযোগ্য কারণ পরে পাউন্ড রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছেন এবং যে কোনও কারণেই হোক তিনিও ইএটসের মত রবীন্দ্র-বিরোধী হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু একথা কেমন করে উপেক্ষা করব যেতে পারে যে এই সুবৃহৎ প্রবন্ধটিরই একাংশে এজরা পাউন্ড লিখেছিলেন—'রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে নিজেকে অতিশয় বন্য বর্বর বলে মনে হয়—যেন আমি এক বর্বর যুগের মানুষ।'

কবি ভেরনন ওয়াটকিনসের কাছে উইলিয়াম বাটলার ইএটস একবার কথা প্রসংগে বলেছিলেন :

"Wisdom is like a butterfly; it is no gloomy bird of prey."

এই উক্তিটি স্মরণযোগ্য।

॥ দুই ॥

পাউন্ড ১৯২০ খৃস্টাব্দে প্যারিসে গিয়ে সেখানেই বসবাস করবেন স্থির করলেন। চার বছর প্যারিসে ছিলেন এবং ১৯২২-এ আমেরিকার প্রখ্যাত সাহিত্য-পত্র 'দি ডায়ালের' প্যারিসস্থ সংবাদদাতার কাজ করেছেন। প্যারিসের পর ইতালি, ইতালির রিভিয়েরার র‍্যাপালো নামক অঞ্চলে বাস করতে গেলেন পাউন্ড এবং এখানেই তাঁর 'ক্যানটো' রচনার সূত্রপাত। এদিকে নতুন লেখক আবিষ্কারে পাউন্ডের অসীম উৎসাহ। প্যারিসে হেমিংওয়ে ও এলিঅটকে নিয়ে পাউন্ড কিভাবে মেতেছিলেন তার কিছু বিবরণ পাওয়া যাবে আরনেস্ট হেমিংওয়ের 'এ মুভেবল ফিসট' নামক স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থে। মৃত্যুর পর প্রকাশিত এই গ্রন্থে হেমিংওয়ে ১৯২১-২৬ খৃস্টাব্দের প্যারিসের রোমাঞ্চকর দিনগুলির বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। হেমিংওয়ের কাছে, তরুণ বয়সে যে প্যারিসে বাস করেছে তার কাছে, প্যারিস এক চলমান ভোজ্যবস্তু। ব্যাঙ্ক-কেরানী তরুণ এলিঅটের কবিতার বই ছাপানোর জন্য পাউন্ড চাঁদা তুলেছেন পরম উৎসাহভরে। এলিঅট তাঁর 'ওয়েস্ট ল্যান্ড' কাব্যগ্রন্থটি পাউন্ডকে উৎসর্গ করেছেন। কুশলী শিল্পীকে তিনি শ্রদ্ধায় স্মরণ করেছেন।

অজ্ঞাত অখ্যাত লেখক ও শিল্পীদের পাদপীঠের সামনে টেনে আনা পাউন্ডের ব্রত ছিল। একদা তিনি ইমপ্রেসারিওর কাজ করেছিলেন, সাহিত্যিকদেরও তিনি ইমপ্রেসারিও। তাই জেমস জয়েস, রবীন্দ্রনাথ, সুরকার এনথেল, ভাস্কর ব্রংসেকো প্রমুখ মনীষীদের জন্য পাউন্ড যখন যথাযোগ্য আসন করে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তখন তাঁরা সবাই ছিলেন অজ্ঞাতকুলশীল খ্যাতিহীন। সেই কারণে এই কুশলী কারিগরকে ওয়েস্টল্যান্ড উৎসর্গ করতে গিয়ে এলিঅট লিখেছেন : 'Il migilor fabbro' সর্বোত্তম কারুশিল্পী এজরা পাউন্ড সেদিনের য়ুরোপের সাহিত্য সংসারে এক অপরিহার্য ব্যক্তিত্ব। 'দেস ইমাজিসটেস' নামক অ্যানথোলজী প্রকাশ করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। তিনি প্যাসকাল কর্ভিচির সহযোগিতায় 'দি একসাইল' নামক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করলেন। এই পত্রিকা অবশ্য বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। ১৯২৮-এ স্থাপিত এই পত্রিকাটি ন্যু ইয়র্ক, লন্ডন ও প্যারিস থেকে একযোগে কয়েকমাস প্রকাশিত হয়।

১৯২৪ থেকে ক্যানটোস রচনা শুরু করেন পাউন্ড এবং সেইগুলি মাঝে মাঝে অংশতঃ সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত হয়। পাউন্ডের সর্বাধিক পরিচিত কাব্যসম্ভার হল এই পিসান ক্যানটোস। এই কাব্যের মধ্যে আছে বিলাপ আর দুঃখবাদের অভিব্যক্তি। পাউন্ডের মানসিতাই ছিল বিলাপ আর দুঃখবাদে পরিপূর্ণ। পাউন্ড কিঞ্চিৎ বাতিকগ্রস্ত বা 'একসেনট্রিক' ছিলেন একথা তাঁর বন্ধুরা বলেন। মাতৃকুলের দিক থেকে তিনি কবি লংফেলোর সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। এজরা পাউন্ড কবিতার ক্ষেত্রে একটা অদ্ভুত রূপান্তর ঘটালেও তিনি লাতিন ঐতিহ্যের আশ্রয় পরিত্যাগ করেন নি।

পিসান ক্যানটোগুলির সংখ্যা শতাধিক—তবে অসম্পূর্ণ। এই ক্যানটোগুলির মধ্যে ৭৪ থেকে ৮৪ সংখ্যক ক্যানটো পিসার বন্দী অবস্থায় রচিত, তাই নামকরণ করা হয় 'পিসান ক্যানটোস'। এই কাব্যে আছে পুরাণ, ইতিহাস আর আত্মকথা—পরিশোধিতভাবে সর্বশেষ ক্যানটোগুলি (সংখ্যায় ষোলো) ১৯৬৮তে প্রকাশিত হয়। সমালোচকদের মতে এই ক্যানটোগুলির ১, ২, ১৩ ৪৫ এবং ৪৯ সংখ্যক কবিতাগুলির মধ্যে পাউন্ডের প্রতিভার অনন্যতার পরিচয় আছে। অনুবাদক হিসাবে পাউন্ড অতুলনীয়। নিজে জানতেন ফ্রেঞ্চ, ইতালিয়ান এবং চীনাভাষা—এছাড়া আরো অর্ধ-ডজন ভাষায় তিনি সুদক্ষ ছিলেন। পাউন্ড চীনা ও জাপানী ভাষার কবিতা অনুবাদ করেছেন। জাপানী নো-নাটকও তিনি অনুবাদ করেন। আরনেস্ট ফেনোলোসার তিনি ছিলেন সাহিত্যিক অছি। তাঁর লিখিত নোট থেকে পাউন্ড ক্যাথে-র ভাষান্তরণ করেছেন, এছাড়া মধ্যযুগীয় প্রভেনসাল কবিতাও অনুবাদ করেছেন।

অনুবাদক হিসাবে পাউন্ড এক অনন্য দৃষ্টান্ত। অ্যাংলো-স্যাকসন চীনা ভাষা, প্রভেনসাল এবং অন্যান্য বহু অচলিত ভাষা থেকে তিনি অনুবাদ করেছেন। পন্ডিত এবং বিশেষজ্ঞগণ অন্ততঃ কুড়িবার তাঁর বিরুদ্ধে অনুযোগ করেছেন। ভুল অনুবাদ এবং বিকৃত অর্থকরণের জন্যই তিনি অভিযুক্ত হয়েছেন। সংকীর্ণ বিচারে তাহলে পাউন্ড অনুবাদক হিসাবে অযোগ্য। কিন্তু তা নয় বর্তমান শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদক হিসাবে তিনি স্বীকৃতি লাভ করেছেন। সমালোচক ডেভিড রাইটের মতে—

> "Yet, he remains unquestionably the greatest living translator of this century, which by the way, has been by no means, short of good practioners of this Art. What is the answer to this paradox? It is, I believe, that Pound does more than translate—he revives, he recreates, he recasts."

পাউন্ড প্রকৃত শিল্পীর মত নিছক অনুবাদ করে ক্ষান্ত হননি, তিনি নতুন করে একটি বিশেষ অংশের পুনর্জন্ম ঘটিয়েছেন—পরিবর্তন ও পরিবর্জনের ফলে নতুন সৃষ্টি হয়েছে তাঁর হাতে। তাঁর অধিকাংশ 'হাউলার' বা বিভ্রান্তি ইচ্ছাকৃত। 'দি সি ফেয়ারার' একমাত্র এ্যাংলো-স্যাকসন কবিতা যার মধ্যে প্রাচীন ইংরেজী ভাষার কিছু আমেজ পাওয়া যায়। এই কবিতায় Eorthan rices কথাটির অনুবাদ করেছেন Earthen riches, এখানে শব্দার্থ না দিয়ে পাউন্ড ধ্বনিতগত ব্যঞ্জনা প্রকাশ করেছেন। এইভাবে অনূদিত কবিতাকে প্রাণবন্ত করে পরিবেশন করেছেন পাউন্ড। তিনি শুধু কবিতার অনুবাদ করে ক্ষান্ত হননি তার প্রতিক্রিয়াটুকুও অনুবাদের মাধ্যমে ধরেছেন। এইভাবে পাউন্ডের 'সি ফেয়ারার' মূল কবিতাটির মতই জীবন্ত হয়ে উঠেছে। পাউন্ডের মতে অনুবাদ কর্ম আর মাদাম তুসো-র মোমের ছাঁচ এক বস্তু নয়।

সফোক্লেসের Trachinae পাউন্ড শেষজীবনে অনুবাদ করেছিলেন। ডেভিড রাইট বলেছেন যে আমি গ্রীক ভাষায় যথেষ্ট অধিকারী নই, তবে আমি প্রফেসর এস দ্য জনসোসকীর বিবৃতিতে বিশ্বাস রাখি। জনকোসকী স্বয়ং গ্রীক ভাষায় সুপন্ডিত, পাউন্ডের অনুবাদ বিষয়ে তিনি বলেছেন যে 'সফোক্লেসের উক্তি সুভদ্র এবং মর্যাদামন্ডিত, তাঁর রচনাশৈলী সরল এবং মার্জিত।' ডেভিড রাইট বলেছেন এইদিক থেকে পাউন্ড গ্রীক কবির সুযোগ্য অনুবাদক। রবার্ট ফিটজিরালডও 'সফোক্লেসের' অনুবাদ করেছিলেন কিন্তু রাইটের মতে তা 'হরিবল ওভারডোজ অফ সোব্রাইটি অ্যান্ড রিফাইনমেন্ট' মাত্র।

পাউন্ড রাজনীতিবিদ ছিলেন না, কিন্তু কবি হিসাবে তিনি ছিলেন মহৎ এবং মহাবিপ্লবী আর সেই কারণেই কাব্যের ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

—ভবানী মুখোপাধ্যায়

নিয়োগ ॥ এজরা পাউন্ড

যাও আমার গান নিঃসঙ্গ অপূর্ণসাধ মানুষের পাশে।
প্রথার দাসত্ব আর স্নায়ুনিপীড়নে যারা বাঁচে।
জানাও আমার ঘৃণা শোষণকারীকে।
যাও গান তুঙ্গ ঢেউ-এর রূপে শীতল ধারায়
জানাও আমারো কণ্ঠ অন্যায়ের বিরুদ্ধে চিহ্নিত।

তুমি প্রতিবাদ করো গান পীড়নের গোপন অন্যায়ে
মূঢ় স্বেচ্ছাচারে
যে কোন বন্ধনে,
যাও শহরতলীর যত মধ্যবিত্ত ঘরণীর কাছে, যারা
অবসাদে মৃতকল্প
বিবাহ যাদের কাছে এক স্থায়ী বীভৎসতা,
তাদের ব্যর্থতা আজো প্রকাশিত নয়,
তারা ভুল ভাগ্যে আসঙ্গে মিলিত
যেন ক্রীতদাসী, মাংসল পণ্যের মতো ব্যবহার্য শুধু।

তাদেরও সন্ধান করো গান, লালসা যাদের কাছে উপাদেয় ক্ষুধা
নরম বাসনা নিয়ে যারা ব্যর্থ হয়ে আছে। গান
তুমি একঘেয়েমির প্রতিবাদে বাজো
সূক্ষ্ম প্রাণতন্ত্রীতে আনো অধিক রণন।
যাও তুমি বন্ধুর সমান, প্রাণের শ্যামল মূলে
আনো বিশ্বাসের সফল সলিল।
সুস্পষ্ট ভাষণে
খোঁজো সমস্ত নবীন পাপ, নতুন সুন্দর
করো প্রতিবাদ তুমি শেষ অন্যায়ের।
গান তুমি চলে যাও যারা
মধ্যবয়সের ভারে হয়ে আছে ভারী
যাদের জীবন আজও পরিণামভীরু।

শ্বাসরোধী যৌথপরিবারে যারা বেড়ে উঠছে
ভিন্ন ভিন্ন বয়সে বয়সী
—হায় কী কুৎসিত দৃশ্য সেই
তিন পুরুষের, তিন সময়ের মানুষের সহঅবস্থান—
এ যেন সমাপ্তপ্রায় প্রাচীন অটবী
যার বহু শাখা নষ্ট হয়ে পচে যাচ্ছে ঝরে,
যাও গান, যাও তুমি কবির একান্ত বিভা
সমস্ত মতবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াও
এই সজীভূক শরীরের রক্তের সমস্ত ঋণ ভেঙে
যা কিছু বাতিল মৃত
গান তুমি হয়ে ওঠো তাদের অন্তিম প্রতিবাদ।

অনুবাদ : সময়েন্দ্র সেনগুপ্ত

জার্মাণ ভাষায় সচিত্র রবীন্দ্র জীবনী

কলকাতায় ডঃ মোডে ও শিল্পী ম্যুলার

শিল্পী ম্যুলার

এই নিয়ে যাঁর বারোবার বঙ্গদর্শন তথা ভারতদর্শন হল, কখনও একাদিক্রমে, কখনও দফায় দফায়, বছরের পর বছর যিনি কাটিয়ে গেছেন সিংহল থেকে শুরু করে কবিগুরুর শান্তিনিকেতনে এবং কলকাতায়, স্বভাবতই তিনি ভালবেসে ফেলেছেন ভারত তথা বাংলাকে, বিশেষ করে কলকাতাকে। পূর্ব জার্মানি তথা ইউরোপের অন্যতম প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় হাল্লের সেণ্ট মার্টিন লুথার বিশ্ববিদ্যালয়-এর অধ্যাপক, জগৎ-খ্যাত ভারততত্ত্ববিদ সেই ডক্টর হাইনস মোডে এখন আবার কলকাতায়। এবারে ওঁর সঙ্গী হয়ে এসেছেন সমাজতান্ত্রিক জার্মানির ললিতকলা একাডেমির সম্মানিত সদস্য প্রখ্যাত শিল্পী কার্ল এরিখ ম্যুলার। ম্যুলারেরও এই নিয়ে চারবার ভারত-দর্শন হল। ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির ২৫তম বার্ষিকী উপলক্ষে সমাজতান্ত্রিক জার্মানিতে যেসব চিত্র-প্রদর্শনী হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম আকর্ষণীয় প্রদর্শনীটি ছিল ম্যুলার-এর আঁকা সমকালীন ভারতের জনজীবননির্ভর চিত্রাবলী। তাছাড়া ভারতীয় কাজ নিয়ে এমন অনেক প্রদর্শনীর আয়োজন করে জার্মান জনসাধারণকে ভারত সম্বন্ধে অনেকটাই আগ্রহী করতে পেরেছেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেশিকোত্তম গবেষণা-পত্রের অন্যতম পরীক্ষক, সমাজ-তান্ত্রিক জার্মানির হাল্লে-র বৌদ্ধ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পরিচালক ডঃ মোডে রচিত বহু ভারততাত্ত্বিক রচনার অন্তত একটি প্রকাশিত হয়েছে কলকাতা সংস্কৃত কলেজের গবেষণা-গ্রন্থমালায়। ডঃ মোডের সম্পাদিত জার্মান ভাষায় 'বাংলার রূপকথা' ওদেশে এখন পর্যন্ত প্রায় নব্বই হাজার কপি বিক্রি হয়ে জনপ্রিয়তার এক নিরিখ সৃষ্টি করেছে। কলকাতাপ্রেমী ডঃ মোডের প্রকাশিতব্য অন্য-তম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি হচ্ছে 'কলানগরী কলকাতা'। পূর্ব জার্মানী থেকে জার্মান, ইংরেজি ও ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কলাসমৃদ্ধ নগরীগুলির বিশদ গ্রন্থমালার এটি অন্যতম। গ্রন্থটির আলোচ্য বিষয় হল কলকাতার সরকারী, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক সংস্থা পরিচালিত সংগ্রহশালাগুলির বিশদ বিবরণ। গ্রন্থটিতে কলকাতার কলাবস্তু সংগ্রহ বিষয়ে বিশদ আলোচনা ও সম্পাদনা করেছেন ডঃ মোডে এবং সংগ্রহশালাগুলির বিশদ পরিচিতি লিখেছেন সংশ্লিষ্ট অধ্যক্ষ-বৃন্দ। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কলাসমৃদ্ধ নগরী-গুলির মানচিত্রে কলকাতা তথা ভারতের স্থানকে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য কলকাতা তথা ভারতবাসী তাঁর কাছে ঋণী।

ডঃ মোডের এবারকার কলকাতা আগ-মনের প্রধান উদ্দেশ্য হল জার্মান ভাষায় 'রবীন্দ্র জীবনী' রচনা। এই গ্রন্থটি চিত্রা-

ডক্টর মোডে

লংকরণের দায়িত্ব নিয়েছেন শিল্পী কার্ল এরিখ ম্যুলার।

মূল জার্মান ভাষায় রবীন্দ্রজীবনী শেষ প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালে, স্বভাবতই তাতে কবিজীবনের সামগ্রিক মূল্যায়ন সম্ভব হয়নি। তাছাড়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউরোপের যুবমানসে মানবপ্রেমী রবীন্দ্রচেতনা প্রায় অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উপলক্ষে বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে পূর্ব-জার্মানিও যথাযথ অংশ নিয়েছিল। তখন থেকেই ওদেশের যুব-চেতনা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এবং রবীন্দ্রজীবনীর সামগ্রিক আলোচনার প্রয়োজন সেই সময় থেকেই অনুভূত হয়। বিষয়ান্তর ডিসি-প্লিনের লোক হলেও ডঃ মোডে এ ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন তাঁর গুরু-দক্ষিণা রূপে। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে তিনি ছিলেন শান্তিনিকেতনের ছাত্র ও অন্যতম আশ্রমিক। স্বভাবতই রবীন্দ্র-সান্নিধ্যেই তাঁর সাংস্কৃতিক চেতনা লালিত হয়। কাজেই রবীন্দ্রনাথের মত বিরল বহু-মুখী প্রতিভার সঠিক মূল্যায়নের জন্য যে বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠা ও প্রস্তুতি একান্তই প্রয়োজন ডঃ মোডের ব্যক্তিত্ব ও পাণ্ডিত্যের মধ্যে আমরা তার বিকাশ দেখেছি। তাই প্রকাশিতব্য 'রবীন্দ্রজীবনী'র এই সামগ্রিক প্রচেষ্টা সাফল্যসম্ভাবনায় উজ্জ্বল।

ভারত - পূর্ব - জার্মানির সাংস্কৃতিক বিনিময়ের সূত্র অনুসরণে এঁরা এসেছেন এবার ভারত সরকারের অতিথি হয়ে। এঁদের এবারকার কার্যক্রমে আছে ভুবনেশ্বরে ভারত-জাপান শান্তি-স্তূপ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগদান, কলকাতার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগে বিশ্ব-ভারতীতে কয়েকটি কর্মরত দিনযাপন এবং বাংলাদেশের কুষ্ঠিয়ায় শিলাইদহতে রবীন্দ্র-ভবন পরিদর্শন এবং বারাণসী ও দিল্লি হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।

দিনের অন্ধকারে (গল্প সংকলন)—রজত রায়চৌধুরী। কবিপত্র প্রকাশ ভবন, ২২বি, প্রতাপাদিত্য রোড, কলকাতা—২৬। তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

মোট এগারোটি উল্লেখযোগ্য ছোট গল্পের সংকলন গ্রন্থ হল রজত রায়চৌধুরীর 'দিনের অন্ধকারে।' শ্রীরায়চৌধুরী ইতিপূর্বে বিভিন্ন সাময়িকপত্রে গল্প লিখে একটি সাধারণ পরিচিতির জগৎ তৈরী করেছেন। বর্তমান গ্রন্থটি তাঁকে বিশেষ একজন গল্পকার হিসেবে চিহ্নিত করবে বলে আমরা মনে করি। নাম গল্পটি সুলিখিত। প্রেমিকা কণিকার পাশে নায়ক অর্ঘ্যকুসুমের শুধু অর্থনৈতিক চাওয়া-পাওয়ার বৈষম্য নয়, মানসিক সম্পর্কেও কোথায় যেন সূক্ষ্ম ফাঁকি থেকে গেছে। তাই অনায়াসে কণিকা নিষ্ফল ঈর্ষা থেকে অপমান করে অর্ঘ্যকুসুমকে অস্বীকার করতে পারে। নায়কও আর সমস্ত যুবকের মতই অসম অর্থ-ব্যবস্থার বলি হয়ে এক তীব্র হতাশার শিকার হয়ে ওঠে। অর্ঘ্যকুসুম আজকের নায়ক। 'বৃষ্টি' গল্পে লেখক তিন জোড়া যুবক-যুবতীর মানসিকতার বৈপরীত্য দেখিয়ে বৃষ্টির মুহূর্তে তাদের অপরিচয়ের মধ্যে একটি আশ্রয়ের নীচে এনেছেন এবং সুতপার কাছে সন্দীপের গভীর উপলব্ধির কথাগুলি দিয়ে গল্প শেষ করেছেন। কিন্তু গল্পের প্রতিটি নায়ক-নায়িকার কথায় 'বলিনে', 'করিনে' জাতীয় শব্দ প্রয়োগ কি বাস্তবসম্মত? আমরা কি এই শব্দ ব্যবহার করি? 'সমুদ্র' গল্পটি মোটেই জোরালো নয়। নববিবাহিতা স্ত্রী সাথীর প্রতি তপনের সন্দেহের মূলে এবং সাথীর গোপনতার ভিত্তিতে বৃহত্তর কোন জিজ্ঞাসা বা বক্তব্য নেই বলে গল্পটি নিতান্তই দুর্বল। লেখকের গদ্যভঙ্গী স্বচ্ছ, সাবলীল ও সহজ। বিষয় কোথাও কোথাও দুর্বল হলেও অন্য গল্পগুলির সেই সব চরিত্র মমতা-সমীর, দাশগুপ্ত-সুরেখা, হরেন-দীপক, হরিপদ-মায়া, মণ্টি-মনাই ইত্যাদিকে সদাশয় পাঠকের মনের অনেক কাছাকাছি আনা যায়।

কবির্মনীষী (প্রবন্ধ)—নলিনীকান্ত গুপ্ত। শ্রাবস্তু, ৬৩, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

'কবির্মনীষী' প্রবন্ধ সংকলনটি নলিনীকান্ত গুপ্তের উক্ত নামের তৃতীয় পর্যায়ের গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে মোট এগারোটি ছোট-বড় প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। 'প্রকাশকের নিবেদন' অংশে জানা যায় গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলির মধ্যে বেশ কিছু ইতিপূর্বে 'বর্তিকা', 'বিশ্ব-ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কিছু প্রবন্ধ একেবারেই নূতন। শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত একজন প্রতিষ্ঠিত প্রবন্ধকার। তাঁর প্রতিটি প্রবন্ধেই অসাধারণ মনীষা, পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি ও যুক্তিনিষ্ঠার চিন্তার ছাপ থেকে যায়। আলোচ্য গ্রন্থের প্রত্যেকটি প্রবন্ধে তার পরিচয় বর্তমান। শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা-কে নিয়ে গ্রন্থের প্রথম তিনটি প্রবন্ধ অরবিন্দের দর্শন, আধ্যাত্মিকতার পরিচায়ক শুধু নয়, প্রবন্ধকারের নিজস্ব অধ্যাত্মভাবনা ও গূঢ় দর্শন জিজ্ঞাসাকেও স্পষ্ট করে। খৃষ্টীয় ও ভারতীয় সাধনাদৃষ্টির সূনিপুণ তুলনার দিকগুলি লেখক সুন্দরভাবে স্বতন্ত্র একটি প্রবন্ধে উপস্থাপিত করেছেন। 'চর্যাপদে'র ওপর ইতিপূর্বে বহু আলোচনা হয়েছে। শ্রীগুপ্ত চর্যাপদের যে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, তা তাঁর মৌলিক চিন্তাকে প্রত্যক্ষ করায়। প্রবন্ধকারের ছন্দভাবনায় আধুনিক ছন্দকে স্বাগত জানানোর মানসিকতাটি তাঁর গতিশীল মনেরই পরিচয় বহন করে। লরেন্সের একটি কবিতাকে অনুবাদ করে তাঁর জীবনভাবনার সম্যক পরিচয় দিয়েছেন একটি বিশিষ্ট কবিতার ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে। ইংরেজ কবি ফ্রান্সিস টমসন, 'পার্নাসিয়ান' গোষ্ঠীর কবি 'তেয়োদর দ বাঁভিল', 'আরাগ' 'এলুয়ার' ইত্যাদির সংযত, সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও এঁদের কোন কোন কবিতার অনুবাদ দিয়ে কবিদের পরিচয় তুলে ধরার প্রয়াসটি প্রবন্ধকারের আন্তরিকতা ও পরিশ্রমী সত্তার প্রমাণ হয়ে উঠেছে। বস্তুত 'কবির্মনীষী' গ্রন্থটি শ্রীযুক্ত গুপ্তের পরিণত জীবনভাবনার স্বাক্ষর।

ভূত চতুর্দশী (গল্প সংকলন)। উজ্জ্বল ঘোষ। শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, ৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-১২। পাঁচ টাকা।

মোট পনেরোটি ভূত বিষয়ক ছোট গল্পের সংকলন গ্রন্থ হল 'ভূত চতুর্দশী' গ্রন্থটি। বৈজ্ঞানিক যুগে ভূতের প্রতি বিশ্বাস মানুষ তার যুক্তি-তর্কের মধ্য দিয়ে সরাবার চেষ্টা করেছে। তবু আজও কিছু কিছু লোকে ভূত বিশ্বাস করে। ভূতের ভয়ে আতঙ্কিত হয় এবং সমস্ত যুক্তি-তর্ক সরিয়ে মানুষকে 'ভূতে ধরতে' দেখা যায়। ওঝা ডাকা হয় ভূত ছাড়াবার জন্যে। গ্রামের মধ্যে এসব আছে। লেখক শ্রীউজ্জ্বল ঘোষ সেই রকম শোনা ভূতের কাহিনী নিয়ে কয়েকটি ভাল ভাল ভূতের গল্প লিখেছেন। শোনার অভিজ্ঞতায় গল্পগুলি রচিত। তিব্বতী কিউরিওতে যে ভূতের ফাঁদের কথা রয়েছে তা আপাতদৃষ্টিতে হাসাকর মনে হতে পারে। কিন্তু লেখক তার একটা যুক্তি-সম্মত ব্যাখ্যা গল্পে ধরতে সচেষ্ট। 'ক্ষতি-পূরণ' গল্পের সেই ইঞ্জিনীয়ার, 'অভিযান' গল্পের বিজিত সুজয় ও সঞ্জয়ের মা প্রসঙ্গ, 'সংস্কারের বাসনা' গল্পের নায়কের মাসতুতো বোনের বিয়েতে সিরাজগঞ্জ যাত্রা ও শ্মশান প্রসঙ্গ—এ সমস্ত এমন এক ভৌতিক পরিবেশ রচনা করে যা বিশ্বাস করতে ভাল লাগে। এক অলৌকিক রসের আস্বাদ দেয়। প্রত্যেকটি গল্প সুলিখিত, শ্বাস-রোধকারী।

মহারাজ, আমি সমুদ্রের জলে ডুব দিয়ে (কাব্য সংকলন—রমা ঘোষ। সন্ধ্য সারস প্রকাশন, ৫০, কাটাপুকুর থার্ড বাই লেন, হাওড়া—১। এক টাকা।

রমা ঘোষ যে নতুন কবি, গ্রন্থটির কবিতাগুলি তা প্রমাণ করে। সব কবিতাই গদ্য ছন্দে রচিত। কিন্তু গদ্যছন্দে রচিত হলেও সর্বত্র সেই ছন্দের মাধুর্য কবি রক্ষা করতে পারেন নি। বহু চরণ শুধুই গদ্য হয়ে গেছে, কবিতার লেশমাত্র সেখানে নেই। স্মৃতি, দুঃখ, ভালবাসা জীবন মৃত্যু—এসব কথা কবিতায় বলতে গেলে যে সুগভীর অভিজ্ঞতাকে কবিকল্পনায় বিমূর্ত করে কবিতায় মূর্তি দিতে হয়, আলোচ্য কবির পক্ষে তা এখনো অনুশীলন-সাপেক্ষ হয়ে আছে। কোন কোন চরণে ও ভাবনায় আকস্মিকভাবে উক্ত কবিকল্পনার পরিচয় থেকে গেছে। এ থেকে বোঝা যায়, শ্রীরমা ঘোষের কবিমন আছে। কিন্তু অকারণ আবেগ-উচ্ছ্বাস কমিয়ে সূক্ষ্ম শব্দ, চিত্রকল্প ও ছন্দজ্ঞানে তা প্রয়োগ করার শিক্ষা থাকা প্রয়োজন।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

সত্তর দশক : সম্পাদক জিতেন গঙ্গোপাধ্যায় ও সিজন সেন। ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা। ৭৮।২ বীরেন রায় রোড। কলকাতা-৬১। দাম দু টাকা।

বর্তমান সময়ের সাহিত্য চিন্তাধারার প্রতিচ্ছবি 'সত্তর দশক'। সমকালীন লেখকদের পরীক্ষানিরীক্ষামূলক রচনার সমাবেশে এর প্রতিটি সংখ্যাই মূল্যবান। যুগসচেতন সম্পাদকদ্বয় যে কৃতিত্বের পরিচয় রাখছেন তা সুধীসমাজে স্বীকৃতি পাবে। বর্তমান সংখ্যায় কয়েকটি আকর্ষণীয় গল্প লিখেছেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সমীর রক্ষিত, প্রলয় সুর, অমল মুখোপাধ্যায়, তুলসী সেনগুপ্ত, অসিত ঘোষ, বলরাম বসাক, বেলাল চৌধুরী, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিজন সেন। তাছাড়া আছে প্রতিষ্ঠিত ও তরুণ কবিদের কবিতা এবং কয়েকটি আলোচনা।

গণবার্তা : সম্পাদক সুখময় চক্রবর্তী। ৩৭ রিপন স্ট্রীট। কলকাতা-১৬। দাম দু টাকা।

মূলত রাজনীতি ও অর্থনীতি নির্ভর প্রবন্ধ পত্রিকা হলেও গণবার্তার শারদীয় সংখ্যাগুলিতে সুনির্বাচিত কবিতাও ছাপা হয়ে থাকে। বর্তমান সংখ্যায় প্রবন্ধগুলি লিখেছেন অরবিন্দ পোদ্দার, সত্যপ্রিয় ঘোষ, দুর্গা বাগচী, এ আর দেশাই, অরুণা চৌধুরী, ত্রিদিব চৌধুরী, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। কয়েকটি কবিতা আছে।

বাড়ী

দেবল দেববর্মা

উপন্যাস

(চৌদ্দ)

সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে কিরণ একরাশ ধোঁয়া ছাড়ল। তাকে বেশ গম্ভীর এবং ঈষৎ দুঃখিত মনে হল। কপালে কুঞ্চিত রেখা, চোখ দুটি চিন্তার ভারে ছোট। কিরণ স্থির দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে গভীরভাবে কিছু ভাবছিল।

রীতাবরী বলল,—'সত্যি, তোমার ছোটভাইকে নিয়ে খুব দুর্ভাবনায় পড়েছ দেখছি। অবশ্য এরকম চিন্তা তোমার একার নয়, আরো অনেকের। কলকাতায় এখন অল্পবয়সী ছেলেদের নিয়ে নানা সমস্যা। আর দিন দিন দেশের যা হাল হচ্ছে। স্কুল-কলেজে পড়াশুনোর বালাই নেই, নামে পরীক্ষা হয়,—কিন্তু আকছার টোকাটুকি। যারা পাশ করে বেরোয়, তারা বেকার। যেমন হোক একটা চাকরির জন্যে সবাই মাথা ঠুকে বেড়াচ্ছে। তারপর পাড়ায় পাড়ায় বোমবাজি, দুই দলে মারামারি, খুনোখুনি। এরকম একটা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ছেলেমেয়েরা মানুষ হবে কেমন করে? তাদের সামনে কি কোনো আদর্শ আছে?'

কিরণ মনোযোগী ছাত্রের মত ওর কথাগুলি শুনছিল। কোনো বিষয়েই চুপ করে থাকা তার স্বভাব নয়। তবু, আজ সে কোনো কথা বলল না।

কয়েক মুহূর্ত দুজনে চুপ করে রইল। রীতাবরী ফের বলল,—'অবশ্য একটা কাজ করলে পার। হিরুকে যদি কলকাতার বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দাও, এবং সেখানেই রাখার ব্যবস্থা করতে পার তাহলে হয়তো সমস্যার একটা সমাধান হবে। এখানকার পরিবেশ, পরিচিত বন্ধু-বান্ধব, আড্ডা আর সঙ্গ থেকে ওকে এখনই সরিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। দূরে গেলেই হিরুর স্বভাব পাল্টাবে। ফের স্বাভাবিক হতে দেরি হবে না।'

কিরণ মাথা নেড়ে বলল,—'আমার তা মনে হয় না রীতাবরী। হিরুকে আমি ছোটবেলা থেকে দেখছি। একধরনের ছেলে আছে যাদের ফার্ম কনভিকশন বা দৃঢ় প্রত্যয়, একবার মনে জন্মালে তার মূলোচ্ছেদ করা কঠিন। হিরু সেই দলের। সে যা বলে, তা শুধু মুখে উচ্চারণ করে না। মন প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করে। সমস্যা তো সেখানেই। তাছাড়া হিরুর সঙ্গে এসব ব্যাপারে কোনো কথা বলাও বিপত্তিকর। সে ভীষণ চুপচাপ এবং বাড়িতে একা থাকতে পছন্দ করে। কথা কইতে গেলেও হিরু পারতপক্ষে মুখ খোলে না। পাশমতো এড়িয়ে যেতে চায়। যদি বা কখনো দু-একটা উত্তর দেয়, তাহলেও মুস্কিল। আলোচনাটা ক্রমেই অপ্রীতিকর এবং চরমে উঠতে বাধ্য। আসলে হিরু যা বিশ্বাস করে তা মনের মধ্যে কঠিন ইস্পাতের রূপ নিয়েছে। সেখানে আঘাত পড়লে স্বভাবতই হিরু চঞ্চল হয়। প্রতিবাদ করে, কখনো বা ক্ষেপে ওঠে।'

কথা শেষ করে কিরণ ফের ভুরু কোঁচকাল। বার দুই-তিন সিগারেটে টানল। ঠিক ইঞ্জিনের মত নাক মুখ দিয়ে প্রচুর ধোঁয়া ছেড়ে সে আবার বলল,—'অবশ্য তুমি যা বলছ, সে ব্যবস্থা এমনিতেই হচ্ছে। জানুয়ারী মাসের প্রথমেই বাবা চন্দনপুরে চলে যাবেন। এবার সেখানেই থাকবেন। কলকাতায় আর ফিরবেন না। আমির আলি লেনের বাড়িটা তাই আমরা ছেড়ে দিচ্ছি।'

—'হঠাৎ বাড়িটা ছেড়ে দিচ্ছ যে?' রীতাবরী অবাক হয়ে শুধোল, 'বাবা চন্দনপুরে যাবেন কেন? সে জায়গাটা কোথায়?'

—'বাংলাদেশের মানচিত্রে চন্দনপুর নিশ্চয় একটা ছোট্ট বিন্দুও নয়। বড় জোর একটা পাখি-ডাকা গ্রাম বলতে পার।' ফের গলার স্বর কিঞ্চিৎ গাঢ় করে সে বলল, —'কিন্তু আমার বাবার কাছে সেই গ্রাম একটা স্বপ্নের মত। জানো রীতাবরী, বাবা সেদিনও বলছিলেন আমাদের চন্দনপুরের বাড়ির উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা গন্ধরাজ গাছ আছে। ডালপালায় এখন প্রকাণ্ড হয়েছে সেটা, রোজ ভোরে গন্ধরাজ গাছটার ডালে বসে একটা পাখি নাকি সুন্দর শীস দেয়।'

—'ও, বুঝতে পেরেছি।' রীতাবরী মিষ্টি হাসল। 'চন্দনপুরে তোমাদের দেশ তাই না?'

—'হ্যাঁ, চন্দনপুরে পৈতৃক আমলের ঘরদোর সারিয়ে বাবা প্রায় নতুন বাড়ি করে ফেলেছেন। দোতলায় দুখানা ঘর উঠেছে। এই তো সেদিন ভিতরে চুনকাম, বাইরেটা রঙ হল। বাবার ইচ্ছে রিটায়ার করে তিনি এবার চন্দনপুরেই বাস করবেন।'

—'তাই নাকি? সব ঠিকঠাক?'

—'হ্যাঁ, প্রায় ঠিক।' কিরণ একটু ধরা গলায় বলল, 'ডিসেম্বর মাসে বাবা রিটায়ার করছেন। আর জানুয়ারী মাসের প্রথমেই উনি চন্দনপুরে চলে যাবেন। কলকাতার বাসাটা আমরা তাই ছেড়ে দেব। ততদিনে বিনিতর পরীক্ষা, হিরুর টেস্ট সব চুকে যাবে। চন্দনপুরে গিয়ে বিনিত ওখানকার স্কুলে ভর্তি হবে। আর পাশ-টাশ করে হিরু পড়বে বাঁকুড়ার কলেজে।'

—'ভালো ব্যবস্থা।' রীতাবরী চোখ তুলে তাকাল। 'কিন্তু তোমার মা, ভাই-বোন এরা সবাই কলকাতা ছেড়ে চন্দনপুরে গিয়ে থাকতে রাজি তো?'

—'কেউ রাজি নয়। অবশ্য হিরু ছাড়া। তার মত বা অমত কিছুই বলে না। তবে চন্দনপুরে যেতে মায়ের ভীষণ আপত্তি। আর বিনিত? ওর জন্যেই আমার কষ্ট হয়। বেচারী! কলকাতা ছেড়ে কখনও তে-রাত্তির কাটায় নি।'

—'তাহলে?' রীতাবরী রাজহংসীর মত গ্রীবা বাড়িয়ে কথা কইল। 'বিনিত কেমন করে গ্রামে গিয়ে থাকবে?'

—'কি জানি!' সিগারেটের মুখের ছাইটুকু ঝেড়ে নিয়ে কিরণ স্বগতোক্তির মত বলল, 'আমার বোনকে তুমি দেখনি। বিনিতর চেহারা ভারী সুন্দর। চমৎকার নাচতে পারে। ইতিমধ্যে ওর এক-আধটু নামও হয়েছে। ফাংশনে ছোটখাটো থিয়েটারে, নাচের জন্য ওকে সাধাসাধি করে নিয়ে যায়। মা তাই বলে, চন্দনপুরে যাওয়ার আগে বিনিতর একটা কিছু ব্যবস্থা করিস। ওই শহুরে মেয়ে চন্দনপুরের মত গ্রামে গিয়ে কিছুতেই থাকতে পারবে না।'

—'যা ঠিকই বলেন।' রীতাবরী চোখ ঘুরিয়ে বিচিত্র হাসল। পরে মন্তব্য করল,—'কলকাতায় একবার বাস করে কোনো মেয়ে কখনও গ্রামে গিয়ে থাকতে পারে?'

কিরণ ম্লান মুখ করে বলল,—'সেকথা আমি ভেবেছি রীতাবরী। চন্দনপুরে গিয়ে আমার মায়ের খুব কষ্ট হবে। আর বিন্তির অবস্থা ভাবতেও পারি না। বনের পাখিকে খাঁচায় পুরে দিলে যেমন মন-মরা হয়ে ঝিমিয়ে পড়ে, ওর ঠিক তেমনি দশা হবে। তবু উপায় নেই। প্রথম দিকে আমি আর দাদা দুজনে মিলে বাবাকে অনেক বুঝিয়েছি। চন্দনপুরের বাড়ির পিছনে এত টাকা অপব্যয় হচ্ছে। মা কত ঝগড়াঝাঁটি করেছে। এমন মহানগরী ছেড়ে কেউ কখনও গ্রামে বাস করতে যায়? কি আছে সেখানে? সন্ধ্যের পর ঘন অন্ধকার, রাত বাড়লেই ভূতুড়ে বাতাস। অসুখ-বিসুখ করলে ডাক্তার-বদ্যি নেই। বিনা চিকিৎসায় ভুগে মর। তবু বাবা অটল। আমাদের কথা শুনে মৃদু হেসেছেন। মাঝে মাঝে দু-একটা উত্তর দিয়েছেন, এই পর্যন্ত। কিন্তু চন্দনপুরের দোতলার ঘর উঠেছে। ভিতরে চুনকাম, বাইরেটা রঙ। কিছুই বাদ যায় নি।'

—'কিন্তু সকলের এত অসুবিধে হবে জেনেও উনি চন্দনপুরে যাবেন?'

—'হ্যাঁ, যাবেন। কারণ কি জানো রীতাবরী? চন্দনপুরের বাড়িটা তো শুধু বাড়ি নয়। ওটা আমার বাবার মনের স্বপ্ন।'

—'স্বপ্ন?'

—'হ্যাঁ। স্বপ্ন ছাড়া আর কি বলব? আমাদের প্রত্যেকের মনের ভিতরেই এমনি স্বপ্ন লুকিয়ে আছে। তিল তিল করে আমরা সেই স্বপ্নের বাড়িটাকে গড়তে চাইছি। এতদিন বাবা তাই করেছেন। মা ব্যাপারটা বোঝে না। রাগ করে বলে,—'চন্দনপুরের বাড়ি নয়,—ও তোমার নেশা। এক হিসেবে মা হয়তো ঠিক কথাই বলে। স্বপ্ন মানে কিছুটা নেশা বৈকি।' একটু থেমে সে ধীরে ধীরে বলল,—'মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, হিরুর উপর বোধহয় আমরা মিছিমিছি রাগ করছি। ওর মনের ভিতরেও নিশ্চয় একটা স্বপ্ন লুকিয়ে আছে। একা একা হিরু বোধহয় সেই স্বপ্নের বাড়িটার কথাই ভাবে।'

রীতাবরী একটু চিন্তা করে বলল,—'কিন্তু ফ্ল্যাটবাড়িটা ছেড়ে দিলে তোমরা থাকবে কোথায়? তুমি? তোমার দাদা?'

—'দাদার জন্যে চিন্তা নেই। সে বোধহয় আর এ দেশেই থাকছে না। ইউনাইটেড স্টেটস্ মানে আমেরিকায় একটা চাকরি পাচ্ছে।'

—'ওমা! তাই নাকি?' রীতাবরী খুশির সঙ্গে বলল, 'কি সুখবর! একটা প্লেজেন্ট সারপ্রাইজও বলতে পার।'

—'সত্যি। সারপ্রাইজ নিশ্চয়। অন্তত দাদার জীবনে। জানো রীতাবরী, আমি পাশ করে ডাক্তার হয়েছি। ঘরসংসারের ফিজিশিয়ানের কাজ করি। কিন্তু দাদা আমার চেয়ে অনেক ব্রিলিয়্যান্ট ছাত্র ছিল। পরীক্ষার ভালো রেজাল্ট মানে স্কলারশিপ পেয়েছে। তবু ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে দাদা দু-বছর বেকার হয়ে রইল। অনেক চেষ্টা করেও কিছু জুটল না। শেষে একটা চাকরি পেল বটে, কিন্তু সেটা ইঞ্জিনিয়ারিং নয়—অতি সাধারণ কেরানীগিরি।'

—'তা হোক গে। ওসব কথা এখন আর কেউ মনে রাখবে না। সবাই বলবে, উনি ফরেনে আছেন। বড় ইনজিনিয়ারের পোস্টে।' রীতাবরী চোখ নাচিয়ে মনোরম একটি ভঙ্গি করল। ফের মৃদু হেসে জানতে চাইল,—'কিন্তু তুমি কোথায় থাকবে বললে না তো?'

—'তার জন্যে ভাবনা নেই। আমাদের ডিপার্টমেন্টের তিন-চারজন হাউস-স্টাফ একটা কোয়ার্টার নিয়ে মেস করে আছে। আপাততঃ কিছুদিন ওদের সঙ্গেই থেকে যাব। তারপর চাকরি-বাকরি পেলে কিম্বা প্র্যাকটিশে নামলে আমি নিজে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করব।'

—'ফ্ল্যাট?'

—'হ্যাঁ, খুব সুন্দর সাজানো-গোছানো ছোট্ট একটা ফ্ল্যাট। জানো রীতাবরী, আমার বারিক লেনের বাড়িটা আমার একটুও পছন্দ নয়। সেই নবাবী আমলে তৈরি হয়েছিল বলে মনে হয়। কেমন বুক-চাপা ঘর। লোহার শিক লাগানো ছোট ছোট জানালা, সিঁড়িটা বিকক্ষম স্যাঁতসেঁতে আর অন্ধকার। তাই বাড়িটা ছেড়ে দেওয়া হবে শুনে আমি খুব একটা আপত্তি করিনি।'

—'সত্যি।' রীতাবরী কেমন আবদেরে গলায় কথা কইল। 'ছোট হোক, তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু নিজের পছন্দমত ফ্ল্যাট না হলে কেমন মন ভরে না।' মুখ টিপে হেসে সে ফের শুধোল,—'তোমার কোথায় ফ্ল্যাট নেবার ইচ্ছে আমাকে বলবে না?'

এই অপরাহ্নের পড়ন্ত আলোয় রীতাবরীর মুখখানি ভারী উজ্জ্বল অপূর্ব মনে হয়। যেন কোনো দক্ষ শিল্পীর তুলিতে আঁকা একখানি ছবি। ওর দুই চোখের তারায় কুয়াশার মত নরম স্বপ্নের ইশারা। রীতাবরীর শাড়ির আঁচলে, মউচাকের মত মস্ত খোঁপায় গায়ে-পায়ে সর্বত্র মিষ্টি নিস্তেজ রোদ্দুর।

কিরণ ওর মুখের উপর চোখ রেখে বলল,—'আমি চেষ্টা করব সাউথের দিকে একটা ফ্ল্যাট জোগাড় করতে।'

—'সত্যি?' রীতাবরী প্রায় ফিসফিস করে কথা কইল। 'জানো, আমারও মনে মনে তাই ইচ্ছে। তুমি ফ্ল্যাট নাও আগে, তারপর একদিন নিয়ে যেও। আমি নিজের হাতে তোমার ঘর-দোর সাজিয়ে-গুছিয়ে দিয়ে আসব।—'

—'বারে! এ কিরকম কথা?' কিরণ ভুরু কুঁচকে তাকাল। 'সেই ফ্ল্যাটটা আমার একার বাড়ি হবে নাকি? যে সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়ে তুমি ফের চলে আসবে।'

কিরণের কথায় রীতাবরী ঈষৎ আরক্ত হয়ে উঠল। মুখ না তুলে সে ধীরে ধীরে বলল,—'কি জানি, আজকাল আমার কেমন ভয়-ভয় লাগে। রাত্তিরবেলায় হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে কিছুতেই আর দু-চোখের পাতা এক হয় না। তখন চুপচাপ শুয়ে নানা কথা চিন্তা করি। তোমার কথা, এমনি একটা ফ্ল্যাটের কথা, মাথা-মুন্ডু কত কি ভাবি। মাঝে মাঝে মনে হয় হিরুর মত আমিও বোধহয় বাড়িতে একটা সমস্যার প্রাচীর সৃষ্টি করছি।'

—'সমস্যা?'

—'হ্যাঁ, কথাটা তোমাকে বলব ভাবছিলাম। কিন্তু তোমার নিজের যা দুর্ভাবনা।' রীতাবরী এক মুহূর্ত থামল। ফের মুখ নীচু করে সলজ্জভাবে বলল,—'জানো বাবা আমার বিয়ের জন্য পাত্র খুজছেন।'

'তাই নাকি?' কিরণ সোৎসাহে সোজা হয়ে বসল। 'এর জন্যে আবার চিন্তা কিসের? দিস ইজ এ গুড নিউজ।' সে গলা বাড়িয়ে পরামর্শ দেবার ভঙ্গিতে বলল,—'তুমি এবার বাবাকে কথাটা জানিয়ে দাও।'

—'কি জানাব?' রীতাবরী ভুরু কুঁচকে মুচকি হাসল।

—'আহা! ন্যাকা মেয়ে।' কিরণের ইচ্ছে করছিল আদর করে ওর নরম গাল দুটো টিপে দেয়। কিন্তু কোনোদিন তা করেনি। হঠাৎ রীতাবরী যদি ফুঁসে উঠে। তাছাড়া কাছাকাছি এখানে ওখানে লোকজন। এমন একটা দৃশ্য দেখলে তারা কি মনে করবে? কিরণ তাই গলা খাটো করে বলল, 'যা সত্যি, তাই জানাবে। বাবার কাছে কিছু গোপন রেখ না। বলবে, ছেলে ডাক্তার, নাম কিরণ রায়। থাকে সাতাশ নম্বর অমিয় বারিক লেনে। তুমি ওর সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যবস্থা কর বাবা।'

—'পাগল।' রীতাবরী একটা কটাক্ষ করে তাকাল। 'এই সব কথা আমি কখনও বলতে পারি? আমার বুঝি লজ্জা করে না?'

—'তাহলে আমাকে গিয়ে কথাটা নিবেদন করতে হয়।' কিরণ থিয়েটারী ঢঙে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আর তো দেরি করা যায় না।'

—'ছি, ছি! তুমি যাবে কেন? সে আরো বিশ্রী কেলেঙ্কারী ব্যাপার হবে।' রীতাবরী আপত্তির ঝড় তুলল। 'তুমি অমন বেহায়ার মত আমাদের বাড়িতে গিয়ে দাঁড়ালে আমি লজ্জায় মরে যাব।'

—'তাহলে উপায় কি?' কিরণ অসহায় দৃষ্টিতে তাকাল। 'তোমার বাবা-মা আমাদের দুজনের কথা জানবেন কেমন করে?'

ঘাসের একটা লম্বা শীষ ছিঁড়ে রীতাবরী দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল,—'দিনরাত্তির তাই ভাবি কিরণ। তোমার কথা

মা-বাবাকে কেমন করে জানাব? ভয়ে-ভাবনায় আমার বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করে। অথচ না বলে আর উপায় নেই। ব্যাপারটা এখন গোপন রাখার কোনো অর্থ হয় না।'

—'তাহলে আর দেরি ক'র না। সুযোগ পেলেই কথাটা বাড়িতে জানিও।'

—'হ্যাঁ, জানাব বৈকি। নিশ্চয় জানাব।' রীতাবরী প্রায় বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল। কয়েক সেকেন্ড পরে সে গাঢ়স্বরে বলল,—'একটু আগে তুমি স্বপ্নের বাড়ির কথা বলছিলে না? আমাদের প্রত্যেকের মনের ভিতরে একটা স্বপ্ন লুকিয়ে আছে। তিল তিল করে আমরা সেই স্বপ্নের বাড়িটাকে গড়ছি। জানো কিরণ, আমার চিন্তা-ভাবনা শুধু সেই বাড়িটাকে নিয়ে। তোমার কাছে স্বীকার করতে লজ্জা নেই। মনে মনে আমিও একটা স্বপ্নের বাড়ি তৈরি করে রেখেছি। ভয় হয়, বাবার কাছে তোমার কথা বলবার পর সেই স্বপ্ন না আবার মেঘের প্রাসাদের মত অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যায়।'

—'অন্ধকারে ঢাকা পড়বে কেন? এত ভয় কিসের তোমার?' কিরণ চিন্তিতভাবে শুধোল।

—'ঠিক ভয় নয় কিরণ। বরং দুর্ভাবনা বলতে পার।' রীতাবরী ম্লান হাসল। 'আমার বাবাকে তুমি দেখনি। ভীষণ গম্ভীর আর তেমনি জেদী মানুষ। ওঁর স্বভাব ঠিক পাহাড়-পর্বতের মত। পাহাড়ের মতই তাকে নড়ানো যায় না। কোনো ব্যাপারে একবার না বললে বাবাকে ফের রাজি করানো প্রায় অসম্ভব।'

—'আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে উনি আপত্তি করবেন? মানে রাজি হবেন না বলে মনে হয়?'

—'কি জানি।' রীতাবরী ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। 'রাজি হবেন তাই বা কোন ভরসায় বলি? বংশগৌরবের কথা বলতে বাবা এখনও অজ্ঞান। তাঁর কাছেই শুনেছি যে আমরা নিমতার বিখ্যাত গোস্বামী বংশ। ঠাকুর্দা ভারতচন্দ্র গোস্বামী স্মৃতি-জ্যোতির্বিশারদ তখনকার দিনে পণ্ডিত ব্যক্তি বলে সম্মান পেয়েছেন। বাবা নিজে কলেজের অধ্যাপক,—সংস্কৃতে এম, এ.। তাছাড়া কাব্য-ন্যায়-স্মৃতিতীর্থ। নিজের মেয়ের অসবর্ণ বিয়ে দিতে উনি রাজি হবেন, এমন কথা কি জোর করে বলতে পারি?'

বংশ-গৌরবের কথা শুনতে কিরণের ভালো লাগছিল না। এই যুগে আবার কেউ ওসব কথা বলে? না তাই নিয়ে বড়াই করে? অথচ রীতাবরীর কণ্ঠস্বরে প্রচ্ছন্ন গর্বের সুর। তার বাবার মত সে নিজেও বংশগৌরবে বিশ্বাস করে নাকি?

কিরণের ইচ্ছে করছিল রীতাবরীকে তার স্বপ্নের বাড়িটার কথা জিজ্ঞাসা করে। তার বাবা যদি অসবর্ণ বিয়েতে রাজি না হন? শেষ পর্যন্ত বংশগৌরব দুজনের মধ্যে প্রাচীর প্রমাণ বাধা সৃষ্টি করে? তাহলে রীতাবরী কি করবে? স্বপ্নের বাড়িটা কি অন্ধকারের আড়ালে ঢাকা পড়বে? আর রীতাবরী সেই অবস্থা মেনে নিতে রাজি? জলে নেমে সে কি ভয় পেয়ে ডাঙায় উঠতে চাইবে?

গঙ্গার ওপারে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। নদীর জলে রক্তমেঘস্তূপের ঘন ছায়া। একটা সমুদ্রগামী বিদেশী জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে চার-পাঁচজন লোক বোধহয় নদী-তীরের শোভা লক্ষ্য করছে। তাদের মত আর একজোড়া যুবক-যুবতী হাসি-হাসি মুখে খানিকটা দূরে ঘাসের উপর পাশাপাশি বসল।

রীতাবরী উঠে দাঁড়িয়ে বলল,—'চল, আর দেরি করব না, বাড়ি পৌঁছতে নিশ্চয় সন্ধ্যে পেরিয়ে যাবে।'

দুজনে পাশাপাশি হাঁটছিল। প্রায় নিঃশব্দে। অন্যদিন রীতাবরী কত কথা বলে। সমস্ত পথ অনর্গল বকবক করে। ওর কথা শুনতে কিরণের এত ভালো লাগে। হাল্কা পালকের মত শব্দগুলি ওর মুখ থেকে নিঃসৃত হয়ে হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়। অথচ আজ কোথায় একটা ছন্দপতন। গান গাইতে বারবার তাল কেটে যাচ্ছে। আর এই মুহূর্তে রীতাবরী কি অসম্ভব গম্ভীর। পাকা ফোঁড়ার মত আড়ষ্ট মুখ। ওর মনের চেহারাটা একনজর তাকিয়েই কিরণ আন্দাজ করতে পারে।

বাস স্টপে এসে কিরণ বলল,—'আমার একটু ধর্মতলায় কাজ আছে। তোমাকে শেয়ালদ'র বাসে তুলে দিয়ে যাই, কেমন?'

—'ধর্মতলায় এখন কি দরকার?'

—'কয়েকটা ওষুধ নেব। সকাল থেকে মায়ের জ্বর। বেরোবার সময় এক'শ এক ডিগ্রির মত দেখেছি। তাছাড়া বাবার জন্যেও একটা সিডেটিভ্ দরকার।'

—'কি হয়েছে মায়ের?' রীতাবরী চিন্তিতভাবে শুধোল। 'তুমি তো এতক্ষণ বল নি।'

—'তেমন কিছু নয়।' কিরণ ঈষৎ হাসল। 'ঠান্ডা লেগে জ্বর হয়েছে বলে মনে হয়। অনিয়ম, অত্যাচারে একটু বেড়েছে। দু-একদিনের মধ্যে ভালো হয়ে যাবে।'

রীতাবরীকে বাসে তুলে দেওয়ার আগে কিরণ জানতে চাইল,—'তোমার সঙ্গে আবার কবে দেখা হচ্ছে?'

—'কবে দেখা হলে তুমি খুশি হও বল।'

—'বারে, আমি কি বলব? তোমার যেমন সুবিধে।'

রীতাবরী একটু ভেবে বলল,—'সামনের শনিবার এস না।'

—'সামনের শনিবার? সে তো অনেক দেরি।' কিরণ ম্লান হাসল। ফের বলল, —'বেশ কোথায় দেখা হবে বল।'

—'ওয়াই এম সি এ-র সামনে থেক। বেলা আড়াইটের সময়।' রীতাবরী চোখ নাচিয়ে বাকিটুকু ইঙ্গিতে বোঝাল।

বাসটা চলতে শুরু করলে কিরণ শূন্য দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। আজ সমস্ত দিনটা কেমন বেসুরো কাটছে তার। এক একটা দিন এমনি হয়. ...সব কাজেই ব্যর্থতা। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সে এক কাপ চা পায় নি। তখনই বোঝা উচিত ছিল তার. ঝট-ঝামেলা আরো আছে। রাতের সারবন্দী গরুরগাড়ির মত ওরা এগিয়ে আসবে। মায়ের জ্বর, হিরুর গোঁয়ার্তুমি, বিলম্বিত প্যাঁচার মত মুখ, রীতাবরীর বংশগৌরব, —আজ বাড়ি ফিরে আবার কি শুনবে কে জানে!

কিরণ হাঁটছিল। মাঠে-ময়দানে পাতলা ছায়ার মতো অন্ধকার ঘন হচ্ছে। শীতের বেলা কখন • নিঃশেষ। আলোকমালায় চৌরঙ্গীর এখন মোহিনী বেশ। উঁচু বাড়ির মাথায় বৈদ্যুতিক আলোর কৌশলে ঝলমলে বিজ্ঞাপন। সেলাই-মেশিন, একটা সিগারেট কোম্পানীর প্রতীক ছবি, অথবা গরম কেৎলি থেকে নিপুণভাবে কাপে চা ঢালা হচ্ছে। ফুটপাতে, রাজপথে, নানা রকম সামগ্রীর বেচাকেনা। একধরনের রঙীন কার্ডের উপর প্রায় নগ্ন যুবতীর ছবি। তুমি যে কোনো দিক থেকেই দেখ না কেন, সেটা চোখ মিটমিট করে নির্লজ্জভাবে তোমার দিকে তাকিয়ে হাসবে। তিন-চারজন অল্পবয়সী ছোকরা একটা ছবি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা ভঙ্গিমায় লক্ষ্য করছে।

ধর্মতলায় ঢুকতেই কে একজন তার কানের কাছে ফিসফিস করে বলল,—'কলেজ গার্ল সার। ভেরি বিউটিফুল। ওনলি সিক্সটিন। খুব কাছেই। যদি চান তো ফটো দেখাতে পারি।'

কিরণ মুখ তুলে তাকাল। লোকটার পরনে ফুলপ্যান্ট, গায়ে বুশসার্ট, মুখে বসন্তের কুৎসিত ক্ষতচিহ্ন। একটা চোখ ঈষৎ ছোট করে সে তার দিকে তাকিয়ে বিশ্রীভাবে হাসছে।

কিরণের ইচ্ছে করছিল ওই দালালটার গালে সপাটে একটি চড় কষিয়ে দেয়। কিন্তু এদেশে তার অর্থই ফ্যাসাদ। বরং ওর সঙ্গে একটিও কথা না বলে নিঃশব্দে সরে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ। নইলে এখানে একটা হৈ-চৈ কাণ্ড। রাস্তার উপর ভিড় জমবে।

এমন কি কেউ সস্তা রসিকতা করতে পারে। তাই নিয়ে কিছু বলতে গেলেও বিপত্তি।

চাঁদনীর কাছে একটা ওষুধের দোকান। পরিতোষ সেখানে সন্ধ্যের দিকে আসে। দোকানের সংগে একটা ছোট চেম্বার আছে। সকাল-সন্ধ্যে তিন-চারজন ছোকরা ডাক্তার পালা করে বসে। রোগ পরীক্ষা করে ওষুধের প্রেসক্রিপশন লেখা হয়। ডাক্তারের ফিজ্ নামমাত্র। কিন্তু ওষুধের কাটতি বাড়ছে। সুতরাং দোকানের আয় বৃদ্ধির দিকে।

চেম্বারে লোক ছিল না। তাকে দেখে পরিতোষ মহাখুশি। ড্রয়ার থেকে দামী বিলিতী সিগারেটের প্যাকেট বের করে বন্ধুকে আপ্যায়িত করল। 'তারপর, তোর সেই গার্ল-ফ্রেন্ডের খবর কি বল? কবে বিয়ে করছিস ওকে?'

—'বাজে কথা রাখ।' কিরণ আঙুল বাড়িয়ে একটা সিগারেট টেনে নিয়ে বলল: 'গোটা দুই ঘুমের বড়ি দিতে পারিস।'

—'ঘুমের বড়ি?' পরিতোষ মুচকি হাসল। 'তোর অবস্থা কাহিল দেখছি। প্রেমে এমন হাবুডুবু খাচ্ছিস যে রাত্তিরে ঘুম হয় না?'

—'ঘুমের বড়ি আমার লাগবে না। ওটা বাবার জন্য।' কিরণ সিগারেটে মৃদু টান দিয়ে বলল। "কাল রাত্তিরে বাবার ভালো ঘুম হয় নি। নিশ্চয় প্রেসার বেড়েছে। ডকটর সিন্‌হা বলেছেন অসুবিধে মনে হলে ট্র্যাংকুলাইজার ব্যবহার করতে। তাছাড়া উপায় নেই।—'

ব্যাগ হাতড়ে পরিতোষ একটা শিশি খুঁজে বের করল। আনকোরা নতুন। এখনও সীল খোলা হয় নি। বলল,—'এটা নিয়ে যা। বাড়িতে রেখে দিবি।' ফের মুচকি হেসে মন্তব্য করল,—'প্রেমে যা মজেছিস, এর পর তোর নিজেরই প্রয়োজনে লাগবে।'

শুধু ঘুমের বড়ি নয়। কিরণ তার মায়ের জন্যও কয়েকটা ট্যাবলেট নিল। ঠাণ্ডা লেগে জ্বর বলে মনে হয়। এখনই কিছু দেবার প্রয়োজন নেই। তবু এক-আধটু ওষুধ খেলে রোগ আর বাড়বে না। গায়ের ব্যথা, মাথা-ধরা এবং অন্যান্য উপসর্গগুলি কমবে।

দরজার কাছে কে একজন উঁকি দিতেই পরিতোষ ব্যস্ত হয়ে বলল,—'আরে, আসুন আসুন। আপনার জন্যেই অপেক্ষা করে আছি।'

কিরণ মাথা তুলে দেখল। তাদের মতই অল্পবয়সী এক ভদ্রলোক। পরনে পাতলুন, পাঞ্জাবি। চোখে চশমা। মাথার চুল অবিন্যস্ত। চিন্তিত মুখ।

কিরণের দিকে একবার অপাঙ্গে তাকিয়ে ভদ্রলোক একটু ইতস্তত করে বলল,—'রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। কিছুতেই আসতে চায় না, বুঝলেন?'

—'না, না। ওকে নিয়ে আসুন। দু-একটা প্রশ্ন করা নিতান্ত দরকার। এত লজ্জা করলে চলবে কেন?' পরিতোষ স্পষ্ট জানাল।......

সে এসে চেম্বারে ঢুকতেই কিরণ উঠে দাঁড়াল। তার খুব কৌতূহল হচ্ছিল। মেয়েটির বয়স বেশী নয়। আঠার-উনিশ কিম্বা আরো কম। দিব্যি সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী, এখনও বিয়ে হয় নি। কি ব্যাধি ওর? কি এমন অসুখ যার জন্য পরিতোষের কাছে আসতে হয়েছে?

মিনিট পাঁচ-সাত পরেই ওরা চেম্বার থেকে বেরোল। কিরণ বাইরে কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়েছিল। পরিতোষ ফের তাকে ভিতরে ডেকে নিয়ে গেল। পুনরায় সিগারেট অফার করে বলল,—'দাঁড়া, দু-কাপ চা আনতে বলি।'

—'ওই মেয়েটির কি হয়েছে পরিতোষ? কি অসুখ?' কিরণ কৌতূহলের সংগে কথা কইল।

—'কি অসুখ বুঝতে পারলিনে?' পরিতোষ ভুরু কুঁচকে রহস্যের সৃষ্টি করল। ফের মুচকি হেসে বলল,—'মেয়েটির একটা অপারেশন করতে হবে।'

—'অপারেশন?'

—'হ্যাঁ, আমরা যাকে বলি ডি, এন, সি অর্থাৎ ডাইলেটেশন অ্যান্ড কিউরেটিং।' পরিতোষ অনায়াসে জবাব দিল। 'পেটের কাঁটা পরিষ্কার করতে হলে এ ছাড়া আর উপায় কি বল?'

(ক্রমশঃ)

দেবীতীর্থ বোড়াল

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

উপকূল বঙ্গের ভৌগোলিক তথ্যবহুল প্রাচীনতম মানচিত্র সংযোজিত হয়েছে আনুমানিক খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতকে আলেকজান্দ্রিয়ায় লিপিবদ্ধ টলেমীর ভৌগোলিক পরিলেখনে। টলেমীর আন্ত-গাঙ্গেয় ভারতবর্ষের এ মানচিত্রে সমতল প্রবাহে গঙ্গার পঞ্চনদীমুখের উল্লেখ দেখা যায়। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত সময় কালের গ্রেকো-রোমান লেখক—দিয়োদোরাস্, প্লুতার্ক, স্ত্রাবো, প্লিনি, এ্যারিয়ান, পেরিপ্লাস গ্রন্থের অজ্ঞাত রচয়িতা ও মেগাস্থিনিস্—প্রভৃতির রচনায় নিম্ন-বঙ্গের প্রাচীন নদীসংস্থানের কিছু কিছু নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়।

এই সব বিবরণে সহজে অনুমিত হয় প্রাচীনকাল থেকেই গঙ্গার সমতল শত-মুখী প্রবাহে এ অঞ্চলে অসংখ্য ব-দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছিল। এ ব-দ্বীপমালা 'উপবঙ্গ' বলে পরবর্তীকালের দেশীয় প্রাচীন গ্রন্থ-সমূহে উল্লিখিত হয়েছে। 'দিগ্বিজয় প্রকাশ' নামক প্রাচীন গ্রন্থে উপবঙ্গের বিবরণ আছে—

> 'ভাগীরথ্যঃ পূর্বভাগে দ্বিযোজনতঃ পরে।
> পঞ্চযোজন পরিমিতো হ্যপ বঙ্গোহি ভূমিপ।।'

'ঘটককারিকা' ও বিবিধ বৈষ্ণব গ্রন্থ-সমূহে দ্বীপমালাশোভিত উপবঙ্গের বিভিন্ন দ্বীপের সীমা ও বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। সেন রাজত্ব কালেও নবদ্বীপ রাজ্য যে বহু দ্বীপ বিভক্ত ছিল তার উল্লেখ এড়ু মিশ্রের কারিকায় পাওয়া যায়—

> 'গঙ্গা গর্ভোত্থিতা দ্বীপো দ্বীপপুঞ্জৈ বহিধৃতঃ।
> প্রতীচ্যাং যস্য দেশস্য গঙ্গা ভাতি নিরন্তরম্।।'

অসংখ্য দ্বীপশোভিত নদীমাতৃক এ উপবঙ্গে দ্বাদশটি দ্বীপ বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছিল। এ দ্বাদশটি দ্বীপের অন্যতম 'প্রবাল দ্বীপ' বর্তমানের কালিঘাট থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণে গঙ্গার সমুদ্রসঙ্গম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তথা-কথিত এ প্রবাল দ্বীপের মধ্য দিয়েই প্রবাহিত ছিল অধুনা লুপ্ত 'আদি গঙ্গা'।

পরবর্তী সময়কাল ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে বঙ্গভাষায় রচিত কাব্যসমূহে—বৃন্দাবনদাসকৃত 'চৈতন্য ভাগবত', কবি-কঙ্কণ মুকুন্দরাম বিরচিত 'চণ্ডীমঙ্গল' ও কৃষ্ণরাম সৃষ্ট 'রায়মঙ্গল'—ইত্যাদিতে আদি-গঙ্গা বিধৌত অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায়।

হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে গঙ্গা তিনটি শাখায় বিভক্ত হয়ে মোহনার দিকে প্রবাহিত হত। পশ্চিমের শাখাটি সরস্বতী, মধ্যের মূল শাখাটি গঙ্গা বা হুগলী ও পূর্বদিকের শাখাটি বিদ্যাধরী বা পদ্মাবতী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। প্রাচীন সরস্বতী নদী ত্রিবেণীতে ভাগীরথী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দক্ষিণে বর্তমান হুগলী নদীর খাত দিয়ে হাওড়া সাঁকরাইলের পথে দামোদর ও রূপনারায়ণের জল বহন করে সাগর পর্যন্ত প্রবাহিত হত। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতক পর্যন্ত এ নদীপথে সমুদ্রগামী জাহাজ চলাচল করত। বিখ্যাত সপ্তগ্রাম বন্দর এ নদীখাতের উপরই অবস্থিত ছিল। সপ্তদশ শতকে সরস্বতী বিভিন্ন কারণে মজে যাওয়ার ফলে সাঁকরাইল হতে সমুদ্র পর্যন্ত বিশাল নদীখাত বালুকাময় শুষ্ক হয়ে পড়ে। ফলে সপ্তগ্রাম বন্দরের পতন ঘটে ও ভাগীরথীতে হুগলী বন্দরের উন্নয়ন হয়। পরবর্তী সময়ে বারুইপুর, জয়নগর, ছত্রভোগ, খাড়ি দিয়ে প্রবাহিত আদিগঙ্গার নিম্নপ্রবাহে হুগলী বন্দর পর্যন্ত সমুদ্র-গামী জাহাজের যাতায়াতের অসুবিধার সৃষ্টি হলে নবাব, আলীবর্দীর আমলে দক্ষিণে খিদিরপুর থেকে হাওড়া-সাঁকরাইল পর্যন্ত একটি খাল খনন করে ভাগীরথীর জলপ্রবাহকে প্রাচীন সরস্বতী নদীখাত দিয়ে অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত পথে সমুদ্রাভি-মুখে প্রবাহিত করা হয়। কালক্রমে এ প্রবাহই বিশাল আকার ধারণ করে বর্তমান হুগলী মোহনার সৃষ্টি করে। আর খিদির-পুর থেকে আদিগঙ্গার পরিত্যক্ত শাখাটি ধীরে ধীরে মজে নিশ্চিহ্নপ্রায় হয়ে পড়ে।

প্রাক্-খৃষ্টীয় বঙ্গের গ্রেকো-রোমান লেখকদের রচনাকাল থেকে ষোড়শ-সপ্তদশ

প্রসন্নবদন যক্ষমূর্তি

বাসুদেব বিষ্ণুমূর্তি

শতকের বঙ্গভাষায় রচিত কাব্যসমূহের রচনাকাল পর্যন্ত আদিগঙ্গার প্রাচীনত্ব ও গৌরবময় ইতিহাসের যে বিবরণ পুরা সাহিত্যে পাওয়া যায়, সম্প্রতি আদিগঙ্গার লুপ্ত প্রবাহের বিভিন্ন স্থানে বিস্ময়কর প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলি সে কাহিনীকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও নতুন তথ্যে সমৃদ্ধ করেছে।

আদিগঙ্গার লুপ্ত প্রবাহে আবিষ্কৃত প্রত্নস্থলগুলির অন্যতম বোড়াল, খৃষ্ট-পূর্ব তৃতীয় বা চতুর্থ শতক থেকে খৃষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত যে এক বর্ধিষ্ণু তীর্থক্ষেত্র ছিল তার নির্ভর-যোগ্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। পরবর্তীকালে, ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে, শেষ পর্যায়ের বসতি সুরু হলে, বোড়াল নিম্ন-বঙ্গের অন্যতম দেবীতীর্থ ও জনপদে পরিণত হয়।

কলকাতার দক্ষিণ প্রান্তে, গড়িয়ার চৌরাস্তার মোড় থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে, আদিগঙ্গার মজা গর্ভ অতিক্রম করে, ভগ্ন দেউল, ধ্বংসপ্রাপ্ত নদীঘাট, আদি মহা-শ্মশানের উদাস মৃত শূন্যতাময় পথে বোড়ালের দূরত্ব প্রায় এক কিলোমিটার। মহানগরীর উপকণ্ঠে, কসমোপলিটন কাল-চারের প্রান্তে কয়েক সহস্র বৎসর অতীতের বিলুণ্ঠিত স্মৃতি চিহ্নের এমন নীরব নিভৃত আত্মগোপন সত্যিই বিস্ময়কর।

বোড়ালে আজ পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে কোনো বিজ্ঞানভিত্তিক খননকার্য পরি-চালিত হয় নি। তবে এ অঞ্চলে বিস্তৃত এলাকায় ইটখোলার কাজে অত্যন্ত গভীর স্তর পর্যন্ত মৃত্তিকা খনন ও উৎসরণের যে কাজ চলেছে তাতে সুদীর্ঘদিন ধৈর্য-সহকারে অপেক্ষা করে ও অনুসন্ধান চালিয়ে বোড়ালের প্রাচীন সভ্যতার স্তর-ভেদের কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করা গেছে।

ভূমিপৃষ্ঠ থেকে মৃত্তিকাগর্ভে প্রায় বারো মিটার খনন ফলে দুটি প্রধান আবাসিক স্তরের চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে। এ দুটি আবাসিক স্তরের মধ্যে প্রায় দুই মিটার একটি মৃত্তিকা স্তর রয়েছে। নিম্ন-তম আবাসিক স্তরের মধ্যে সুঙ্গ-কুষাণ যুগ থেকে আরম্ভ করে পাল সেন আমল পর্যন্ত বিভিন্ন কালের বিচিত্র সব পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে। এ স্তরের কোথাও কোথাও পানীয় জলের কূপ বা আবর্জনা সঞ্চিত করার জন্য কূপের চিহ্ন পাওয়া গেছে। দু'একটি জায়গায় এ স্তরের অপেক্ষাকৃত উপরের অংশে প্রাচীন দালানের ভিত্তিভূমির সামান্য চিহ্ন, পয়ঃপ্রণালীর চিহ্ন ইত্যাদি পাওয়া গেছে। নিম্নতম আবাসিক স্তরের ঊর্ধ্বে ও দ্বিতীয় আবাসিক স্তরের মধ্যে প্রায় দুই মিটার মৃত্তিকা স্তরের মধ্যে প্রাচীন মানব বসতির খুব সামান্য চিহ্নই পাওয়া গেছে। দ্বিতীয় আবাসিক স্তরটি ভূমিপৃষ্ঠ থেকে প্রায় দুই মিটার মাটির গভীরে বিস্তৃত। এ স্তরের নিম্নতম পর্যায় থেকে বর্তমান ভূমিপৃষ্ঠে আবাসিক স্তর পর্যন্ত কোথাও স্তরভেদের বিশেষ কোনো চিহ্ন নেই। এ স্তরে প্রাপ্ত বিভিন্ন বস্তুগুলি পরীক্ষা করে মনে হয়েছে এ আবাসিক স্তরের প্রাচীনত্ব আনুমানিক পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত বিস্তৃত। সর্বনিম্ন আবাসিক স্তরের নিম্নে মাটির যে স্তর রয়েছে, তাতে অঙ্গারিভূত বৃক্ষের বড় বড় কান্ড, মৃত জীবজন্তুর ফসিল প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এ স্তরে অবশ্য দু'একটি প্রাগৈতিহাসিক পুরাবস্তুরও সন্ধান পাওয়া গেছে।

বোড়ালের ভূমিগর্ভে প্রাচীন সভ্যতার এ স্তর বিন্যাসে অনুসন্ধান করে ও প্রাপ্ত বিভিন্ন পুরাবস্তুগুলি নিরীক্ষা করে মনে হয়েছে, নিম্নবঙ্গের অন্যান্য প্রত্নস্থল, হরিনারায়ণপুর, আটঘরা, চন্দ্রকেতুগড় বা দেউলপোতার মত বোড়ালেও যে প্রাচীন-কালে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে জনপদ গড়ে উঠেছিল, এমন কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নি। মাটির গভীরে, নিম্নতম আবাসিক স্তরে, প্রাচীন বসতির যে সকল চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে তার বিস্তার খুব সামান্য অঞ্চল নিয়েই। মনে হয় নিম্নতম আবাসিক স্তরের সময়কালে, অর্থাৎ সুঙ্গ-কুষাণ যুগ থেকে আরম্ভ করে পাল সেন আমল পর্যন্ত, বোড়াল আদিগঙ্গার তীরে প্রধানতঃ তীর্থক্ষেত্র রূপেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। যে সামান্য অঞ্চল জুড়ে মাটির গভীরে বসতির চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে তা মূলতঃ তীর্থক্ষেত্র কেন্দ্রিক ছিল। এ স্তরের প্রাথমিক পর্যায়ে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে, বোড়ালে যে অন্ততঃ একটি প্রস্তরনির্মিত মন্দির ছিল, তার কিছু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এ মন্দিরের অবশিষ্ট দ্বার-বাজু, কৌনিকপগ বা এলজম্বের নিদর্শনের সঙ্গে, সম্প্রতি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় আবিষ্কৃত সরবেরিয়ার প্রাচীন মন্দিরের প্রাপ্ত অংশগুলির বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এ স্তরের শেষ পর্যায়ে কিছু কিছু খণ্ডিত বিখণ্ডিত দেব-বিগ্রহের অংশ আবিষ্কৃত হয়েছে। আর দু'একটি অভঙ্গ দেবমূর্তি দীঘির তলদেশ বা মাটির গভীরে পাওয়া গেছে—মনে হয় বিধর্মীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য এগুলি অপসারিত করা হয়েছিল। আলোচিত প্রথম আবাসিক স্তর ও দ্বিতীয় আবাসিক স্তরের মধ্যে প্রায় দু মিটার মৃত্তিকার যে স্তর পাওয়া গেছে সাধারণতঃ তার মধ্যে বিস্তৃত ও বর্ধিষ্ণু মানব বসতির কোনো নির্ভরযোগ্য নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় নি। মধ্যবর্তী এ স্তরে, বৃক্ষের কান্ড, জালের কাঠি, নৌকার গলুই, জাহাজের মাস্তুলের অংশ, জীবজন্তুর কঙ্কাল ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে। অনুমান করা যায় এ সময়ে বোড়াল প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়েছিল। বোড়ালের প্রাচীন দেবস্থানগুলি হয়ত ধীরে ধীরে জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়ে এবং নিম্নবঙ্গের নদীপ্লাবনে মাটির গভীরে আত্মগোপন করে। জনবসতির যে সামান্য নিদর্শন আছে তা হয়ত নদীপাড়ের ধীবর শ্রেণী বা বনের কাঠুরে ইত্যাদি বনচারী মানুষের। মৃত্তিকার সর্বোচ্চ স্তরে মানব বসতির যে নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে দেখা যায় এ বসতির ধারা বর্তমান কাল পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে চলেছে। এ পর্যায়ের

চীজলিং! হরদম খান! চিবিয়ে যান!
চীজের গন্ধে ভরপুর, অনন্য স্বাদে টৈটম্বুর!
চীজলিং! কুড়মুড়ে তাজা, খেয়ে পাবেন মজা!

সেই সঙ্গে পার্লে থেকে পাবেন আরো ৪টি সুস্বাদু বিস্কুট

জেকস্—স্বাদগন্ধে মন মাতে,
একদম পাতলা দেখতে।
ওর্লে—খাস্তা মুখে দিলে,
মসলায় মন ভোলে!
কালিয়ান্—পেঁয়াজের স্বাদ তাজা,
খেয়ে দেখুন বড় মজা!
শিম-এহ্—মেথি দিয়ে তৈরী,
সকলেরই প্রিয় ভারী!
চীজলিং—খেয়ে তৃপ্তি, দিয়ে আনন্দ—
আসরেবাসরে খুশীর স্রোত!

আপনার জন্য ভারতে সেভারী
স্ন্যাকের সর্বপ্রথম নির্মাতা

everest/277d/PP ben

বসতির প্রাচীনত্ব সপ্তদশ শতকের প্রথম বা ষোড়শ শতকের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত। এ সময়েই হয়ত বোড়ালের বর্তমান অধিবাসীদের আদিপুরুষেরা জঙ্গলাকীর্ণ প্রাচীন তীর্থের সংস্কার করে নবপর্যায়ের বসতি শুরু করেন এবং এ সময় কাল থেকে বোড়াল প্রকৃতপক্ষে একটি বিস্তৃত সাধারণ জনপদে পরিণত হয়।

শাক্ত তীর্থ বোড়ালের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ত্রিপুরসুন্দরীর ধ্যানরূপ তন্ত্রোক্ত দশ মহাবিদ্যার অন্তর্গত তৃতীয়া মহাবিদ্যা ষোড়শীর রূপসদৃশ্য। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সদাশিব ও রুদ্র এই পঞ্চদেবতার মস্তকের উপরের উপর রচিত বেদীতে শায়িত মহাকাল ভুবনেশ্বরের নাভিদেশ থেকে উত্থিত মৃণালে প্রস্ফুটিত মহাপদ্মে সংস্থাসীনা দেবী সত্য বিরাজমানা। পাশ, অঙ্কুশ, শর ও চাপ ধৃত চতুর্বাহু, ত্রিলোচনা ও শিবার্থী দেবীর অঙ্গবর্ণ উদীয়মান সূর্যের ন্যায়—

'বালার্ক মণ্ডলাভাসং চতুর্বাহুং
ত্রিলোচনাম্।
পাশাঙ্কুশ শরাংশ্চাপং ধারয়ন্তীং
শিবাংশ্রয়ে।।'

জনশ্রুতির আধিক্যে দেবী ত্রিপুরসুন্দরীর কাহিনীর ঐতিহাসিক ভিত্তিটুকু দুর্বল হয়ে পড়েছে। দেবী ত্রিপুরসুন্দরীর প্রতিষ্ঠা বোড়ালে অতি প্রাচীনকালে হয়েছিল এমন প্রত্নতাত্ত্বিক বা তথ্যগত প্রমাণ এখনও মেলেনি। প্রাপ্ত বিভিন্ন নিদর্শনগুলি থেকে অনুমান করা যেতে পারে, বোড়ালে শেষ পর্যায়ের বসতি শুরু হবার আগে তথাকথিত কালা পাহাড়ী তাণ্ডব লীলার পূর্বে, নিম্ন আবাসিক স্তরের সর্বোচ্চ পর্যায়ে, দ্বাদশ শতকের শেষে বা ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে সেনদীঘির প্রতিষ্ঠাতা কর্তৃকই খুব সম্ভবতঃ ত্রিপুরসুন্দরীর বিগ্রহ ও মন্দির প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর কালা পাহাড়ী তাণ্ডব লীলায় নিম্ন গাঙ্গেয় অঞ্চলের অসংখ্য মন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংসপ্রাপ্ত ও নিশ্চিহ্ন হয়। বোড়ালও এ ধর্ম ও সংস্কৃতি নাশক প্লাবনে শ্রীহীন ও জনশূন্য হয়ে পড়ে। সেন আমলের শেষের দিকে সপ্তটী মণ্ডলের জলপ্লাবন হয়ত প্রাচীন বর্তমান ভূমির অন্তর্গত বোড়ালকেও প্লাবিত করে। তারপর দীর্ঘদিন বোড়ালের ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। রেনেল ও ফানডেনব্রুকের নকশায়, আবুল ফজলের আইনী আকবরীতে সিয়াবন্দিন তালিস বা মির্জানাথনের বিবরণীতে, ত্রিপুরার রাজমালায়, চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবঘাটা, মাহিনগর, বারুইপুর, ছত্রভোগ হয়ে নীলাচলে গমন কাহিনীর কোথাও বোড়ালের নাম উল্লেখ নেই। জগদীশ ঘোষ নবাব সুবেদারের কাছ থেকে 'জঙ্গলবাড়ী পত্তনি' নিয়ে বোড়ালে বসতি স্থাপন করার আমলে দেবীসেবা শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে দেবীসেবায় বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরী পরিবার ও ভূকৈলাশের রাজপরিবার যে সহায়তা করেছেন এমন প্রমাণ নথিপত্রে পাওয়া গেছে। কিন্তু আরো পরবর্তীকালে দেবীর সেবাকার্যে শৈথিল্য দেখা দেয় এবং সংস্কারের অভাবে মন্দিরটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। বর্তমান শতকের মধ্যভাগে দেবীমন্দির সংস্কার করা হয় ও প্রাচীন মন্দিরের স্তূপটিকে খনন করে মূল্যবান প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সহ দারু-নির্মিত বিকলাঙ্গ প্রাচীন দেবীমূর্তি উদ্ধার করা হয়। এধরনের দারুনির্মিত দেবীমূর্তি নিম্ন গাঙ্গেয় বঙ্গের বহুস্থানে দেখা যায়; মহাকালতলার মহামায়া বিগ্রহ, ছত্রভোগের ত্রিপুরসুন্দরী বিগ্রহ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

দেবী ত্রিপুরসুন্দরীর বর্তমান মন্দির নির্মাণের পূর্বে প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ বা ঢিবি খননের কালে অন্যান্য পুরাবস্তুর মধ্যে নাকি দেবীর ধ্যানমূর্তি উৎকীর্ণ অষ্টধাতুর বাম করতালু পাওয়া গিয়েছিল। পরবর্তীকালে এটি পুরোহিতের গৃহ থেকে অপহৃত হয় বলে জনশ্রুতি আছে। আবার কেউ কেউ এপ্রসঙ্গে বোড়ালে সতীর অঙ্গুলিবিহীন বাম করতালু পতনের কাহিনী উল্লেখ করে এটিকে পীঠস্থান বলে দাবী করেন। তবে এবিষয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। সতীর দেহাংশের উপর প্রতিষ্ঠিত একান্ন পীঠের কথা সর্বজনবিদিত। কিন্তু তার মধ্যে বোড়ালের উল্লেখ নেই। কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী ও পুরোহিতের মতে অপহৃত করতালুটি চকচকে পিতল নির্মিত ছিল। বোড়ালের হালআমলের একজন বাসিন্দা দাবী করেছেন, তার কাছে নাকি পিতলের করতালুতে উৎকীর্ণ লিপির পূর্ণ নকসা আছে। তা হল দেবীর বীজ মন্ত্র—'হ', ক্লীং, হ্রীং, শ্রীং, ঐং।' প্রাচীন মন্দিরের স্তূপ খনন করে যে ইমারত পাওয়া গিয়েছিল, দু'একজন প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিকের মতে তা সেন আমলের। বর্তমানের অষ্টধাতু নির্মিত দেবীবিগ্রহ কলকাতার এক ধনাঢ্য পরিবারের জনৈক নিরঞ্জেন্দ্র দেবের ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠিত। পরবর্তী সময়ে মন্দিরের সকল দায়িত্ব একটি রেজিস্টার্ড সমিতির উপর ন্যস্ত হয়।

দেবী ত্রিপুরসুন্দরীর মন্দিরের সংলগ্ন বিরাট দীঘিটি 'সেনদীঘি' নামে পরিচিত। প্রচলিত কিংবদন্তীর ঘনঘটায় সেনদীঘির ঐতিহাসিক পটভূমিকা যেন আত্মগোপন করেছে। পুরানো সেটেলমেণ্ট মানচিত্রে সেনদীঘির আয়তন প্রায় সাড়ে বেয়াল্লিশ বিঘা। বর্তমানে দীঘিটি জমাট ঘাসের দামে আবৃত। কিন্তু এককালে দীঘিটি মনোরম ছিল। ঋষি রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'গ্রাম্য উপাখ্যানে' দীঘিটির বর্ণনা দিয়েছেন—"দীঘির উত্তরে একটি নীলকুঠি ছিল......... আমরা বাল্যকালে এ নীলকুঠির ছাদে বসিয়া দীঘিতে প্রস্ফুটিত শত শত পদ্মের সুরভি সংযুক্ত সন্ধ্যার মনোরম দক্ষিণ বায়ু সেবন করিতাম। ঐ পুষ্করিণীতে বিভিন্ন ধরনের হাঁস সন্তরণ করিয়া বেড়াইত, কি মনোরম দৃশ্য! ঐ দীঘির মধ্যস্থলে এক ছোট মন্দির ছিল।"

সেনদীঘির নামাকরণের কিছু ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে বলে মনে হয়। সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগে বোড়ালে যে তৃতীয় পর্যায়ের বসতি শুরু হয়েছে সেসব আদি বাসিন্দাদের মধ্যে সেন উপাধিধারী কোন বর্ধিষ্ণু পরিবারের সন্ধান পাওয়া যায়নি। তাই মনে হয় এ বিশাল সেনদীঘি কি সেনরাজবংশের স্মৃতিবিজড়িত। এ অনুমানের অনুসরণে কিছু সম্ভাব্য ইতিহাসগত যুক্তি আলোচনা করা যেতে পারে। সেনরাজাদের আমলে নিম্নবঙ্গের এ অংশটি যে সেনরাজাদের অধীনে ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে বোড়ালের কয়েক মাইল দক্ষিণে গোবিন্দপুর গ্রামে প্রাপ্ত লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনে। দক্ষিণ গোবিন্দপুরে একটি প্রাচীন দীঘি রয়েছে নাম 'হে'দুয়ার পুকুর'। দীঘির মধ্যে এককালে একটি মন্দির ছিল। দীঘিটির পূর্বে খানিকটা উঁচু জায়গা জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। লোকে বলে 'রাজবাড়ীর ভিটে'। ঐ পোড়ো ভিটের কিছু নকসা কাটা ইঁট পাওয়া গেছে। অনেক বছর হে'দুয়ার পুকুর সংস্কারকালে কিছু কালো পাথরের ভগ্ন-বিগ্রহ পাওয়া যায়। গোবিন্দপুরের এ দীঘির পরিকল্পনা, রাজবাড়ী ভিটেয় প্রাপ্ত কতগুলি ইঁট ও পোড়ামাটির ফলকের সঙ্গে বোড়ালের সেনদীঘির পরিকল্পনা ও অনুরূপ প্রাপ্ত দ্রব্যের গভীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করে বিস্মিত হতে হয়। কয়েকক্ষেত্রে মনে হয়েছে পোড়ামাটির দ্রব্যগুলি একই ছাঁচে তৈরী। তা হলে কি বোড়াল আর দক্ষিণ গোবিন্দপুর সেন আমলে একই রাজপুরুষের কৃপালাভে ধন্য হয়েছিল! প্রাচীন পুঁথি ও তথ্য পুস্তকে সেনদীঘি প্রায় সাড়ে সাতশ' বছর আগে সেন রাজবংশের জনৈক সুযোগ্য সেন বা মতান্তরে সূর্যসেন প্রতিষ্ঠিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ সংবাদের মূল উৎসটুকু উদ্ধারের চেষ্টা চলেছে, এখনও পাওয়া যায়নি। তবে কুমার সূর্যসেনের নাম সেনরাজ বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনলিপিতে পাওয়া গেছে। বিশ্বরূপ সেনের যে তিনটি তাম্রশাসনলিপি পাওয়া গেছে (একটি মতান্তরে কেশব সেনের), তার মধ্যে দুটি তাম্রশাসনলিপিতে মূল পত্তনিদাতার নাম পরিবর্তন করে বিশ্বরূপ সেনের নাম উৎকীর্ণ করা হয়েছে বলে জনৈক পুরাতত্ত্ববিদ্ বর্তমানে মত দিয়েছেন। তাঁর মতে বিশ্বরূপ সেন হয়ত শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ বা সূর্যসেনের বিদ্রোহবশতঃ অথবা সাময়িকভাবে বন্দীদশার জন্য সিংহাসন

চ্যুত হয়েছিলেন এবং সে সময় সূর্যসেন কিছুদিনের জন্য রাজত্ব করেন। এ তাম্রশাসনলিপিগুলি হয়ত সে সময় খোদিত হয়। পরে বিশ্বরূপ সেন পুনরায় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হলে সূর্যসেন সিংহাসনচ্যুত হন ও তাম্র পত্রলিপিতে দাতার নামের পরিবর্তন করা হয়।

মহম্মদ ই বক্তিয়ার খিলজীর নদীয়া জয়ের পর সেন রাজত্ব পূর্ববঙ্গে ও দক্ষিণবঙ্গে সীমাবদ্ধ হয়। তাই হয়ত বোড়ালের ও দক্ষিণ গোবিন্দপুরের পুরাবৃত্তের সঙ্গে সেন রাজাদের ইতিহাসের এ শেষ অধ্যায়ের সম্পর্ক থাকা বিচিত্র নয়। সূর্যসেন বিরাট দীঘি ও দেবালয় নির্মাণ করে ব্রাহ্মণদের দান করেছিলেন এ যুক্তি নিছক কল্পনাপ্রসূত বলে মনে হয় না। বিশ্বরূপ সেনের মধ্যপাড়ায় প্রাপ্ত তাম্রশাসনলিপিতে কুমার সূর্যসেনকে ব্রাহ্মণের ভূমিদাতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

বিভিন্ন সময়ে বোড়ালে প্রাপ্ত বিচিত্র প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহশালা, বোড়াল রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার, দেবী ত্রিপুরসুন্দরীর মঠ, মাজিলপুর কালিদাস দত্ত সংগ্রহ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব গ্যালারি, বোড়ালের স্থানীয় কয়েকজন অধিবাসীর গৃহে ও অন্যত্র কয়েকজন পুরাতত্ত্ব অনুরাগীর ব্যক্তিগত সংগ্রহে আছে। বিদেশের দু'তিনটি সংগ্রহশালার প্রাচ্যকলা বিভাগে বোড়ালে প্রাপ্ত ও সযত্নে রক্ষিত পুরাবস্তুর সন্ধান ও বিবরণ পাওয়া গেছে। বিভিন্ন স্থানে সংরক্ষিত বোড়ালে প্রাপ্ত এ সকল পুরাবস্তুগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল কয়েকটি টেরাকোটা মূর্তিপুতুল ও ফলক, বিভিন্ন সময়কালের শিল্পশৈলীর অনুগত কিছু প্রস্তর ভাস্কর্য, কিছু বিচিত্র রূপ ও বর্ণের মৃৎদগ্ধপাত্র ইত্যাদি। বর্তমান আলোচনার ক্ষুদ্র পরিসরে এগুলির বিস্তৃত বিবরণ ও সামগ্রিক আলোচনা সম্ভব নয়। তবে দু'একটির উল্লেখ করা যেতে পারে।

টেরাকোটা মূর্তিপুতুল ও ফলকের মধ্যে আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মাথায় ফিতে বাঁধা যক্ষিণীমূর্তি, খৃষ্টীয় প্রথম শতকের ক্রৌঞ্চলাঞ্ছিত যক্ষিণী, প্রসন্নবদন যক্ষমূর্তি, আলিঙ্গনাবদ্ধ দম্পতি, বিকটাকৃতি দৈত্য মুখ, গণদেবতা মোটিফ শোভিত ক্রীড়নক, জাতক কাহিনীর আলেখ্য ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রস্তর ভাস্কর্যের মধ্যে রয়েছে কারুকার্যযুক্ত মূর্তি খোদিত বেলে পাথরের প্রাচীন মন্দিরের কৌনিকপগ, দ্বারবাজু, তলজঙ্ঘ ও প্রবেশ তোরণের স্তম্ভমূল; সর্পবেষ্টিত জটাজুটধারী সূক্ষ্ম কারুকার্যমণ্ডিত পাল ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন একটি মহাদেব মূর্তির মুখমণ্ডল, অনন্ত শয়ান বিষ্ণুমূর্তির ভগ্নাংশ, সূক্ষ্ম কারুকার্যখচিত নবগ্রহ ফলক, বোড়ালে পদ্মদীঘিতে প্রাপ্ত বর্তমানে মাঝেরপাড়া বসু পরিবারের ভদ্রাসনে প্রতিষ্ঠিত কষ্টিপাথরের বাসুদেব বিষ্ণুমূর্তি, পদ্মাসনা বীণাপাণি মূর্তি, ক্ষুদ্রকায় নৃত্যরত গণেশ মূর্তি, একটি বেলে পাথরের কুবের মূর্তি, কালো পাথরের কালীমূর্তি ও দেবীমঠে রক্ষিত তারা মূর্তি। শেষোক্ত তিনটি মূর্তি অত্যন্ত অনিপুণ কারিগরি দক্ষতার নিদর্শন। অনেকে মনে করেন এককালে বোধহয় বোড়ালে দশ মহাবিদ্যার সকল বিদ্যারই অধিষ্ঠান ছিল। তাই দশ মহাবিদ্যার অন্তর্গত কয়েকটি বিদ্যার মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। টেরাকোটা মূর্তি পুতুল ও প্রস্তর ভাস্কর্য ছাড়া বিভিন্ন ধরনের ও বিচিত্র বর্ণের পোড়ামাটির পাত্র, খোলাকুচি, বীডস্ ইত্যাদি পাওয়া গেছে। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন পাত্রগুলি সাধারণতঃ বৃহদাকারের ছিল। মনে হয় এগুলি তীর্থস্থানের অধিক জনসমাবেশে বা অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হত। এগুলির মধ্যে কতগুলি গ্রেকো-রোমাক রেখাঙ্কিত জলাধার বলে অনেকে মনে করেন।

বোড়ালে প্রাপ্ত যক্ষিণী মূর্তি

বোড়ালের প্রাচীন মানব বসতির ইতিহাস আজও মূলতঃ প্রত্নতাত্ত্বিকদের খনন মুখাপেক্ষী। তবুও প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য ও নিদর্শনগুলি থেকে শেষ পর্যায়ের আদি বাসিন্দাদের কিছু কিছু বিবরণ আলোচনা করা যেতে পারে। এ সকল বিবরণ সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ থাকাও কিছু বিচিত্র নয়। বিভিন্ন কুলকারিকার তুলনামূলক পাঠ ও বিবিধ তথ্য সকল বিচার করে সাধারণতঃ মনে হয় বোড়ালের ঘোষ পরিবারের বর্তমানের সর্বকনিষ্ঠ পুরুষ ধরে দ্বাদশ পুরুষ চলছে। পরিবারের জগদীশ ঘোষই আনুমানিক সতের শতকের মধ্যভাগে বর্ণহিন্দুদের মধ্যে প্রথম বোড়ালে বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তী কালে ঘোষ পরিবার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিবরণে দেখা যায় জগদীশ ঘোষ পূর্ববঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু সাগর তীর্থ দর্শনের পর ছত্রভোগের ত্রিপুরসুন্দরী, হাতিয়াগড়ের অম্বুলিঙ্গে শিব ও চক্রতীর্থ প্রদক্ষিণ করে আদিগঙ্গা ধরে উজানে তিনি বোড়ালে এসে কোন কারণে বাস করার সিদ্ধান্ত করেন। বোড়ালের পূর্ব দিকে গঙ্গার বিপরীত পাড়ে ফরতাবাদের নিকট কালিদাস কর বলে এক ব্যক্তির বাস ছিল। জগদীশ ঘোষ কালিদাস করের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাই বোড়ালের আদি ঘোষ পরিবারকে বলা হত 'করবাড়ে ঘোষ'। কালিদাস করের জনৈক বংশধর দুর্গারাম কর সপ্তদশ শতকের শেষে বা অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় আদিগঙ্গার পূর্ব পাড়ে দেবী মহামায়ার মন্দির নির্মাণ করেন। বর্তমানে গড়িয়া—নরেন্দ্রপুর বাস রাস্তার পাশে মহামায়াতলার বহু সংস্কৃত মন্দিরটিতে করদের বর্তমান বংশধরেরা আজও নিত্য দেবী সেবার ব্যবস্থা করে চলেছেন। ফরতাবাদ যে এককালে বর্ধিষ্ণু স্থান ছিল ও বৌদ্ধ তন্ত্রসাধনার কেন্দ্র ছিল তারও কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। নিদর্শনগুলির মধ্যে শূন্যগর্ভ একটি মহাকাল ভৈরব মূর্তি, ধাতু নির্মিত একটি মহাপ্রতিসরা মূর্তি ও কুলকুণ্ডলিনী চক্র অঙ্কিত ও বীজমন্ত্র ক্ষোদিত ক্ষুদ্র প্রস্তর ফলক। ঘোষ পরিবারের পরবর্তী প্রতিষ্ঠাবান পুরুষদের মধ্যে ছিলেন নরনারায়ণ ঘোষ ও তস্য পৌত্র টিকারাম ঘোষ। ঘোষদের ভদ্রাসনে বর্তমান দুটি ইষ্টক নির্মিত আটচালা বাংলা মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল ১৬৯৮ শকাব্দ—মন্দিরদ্বয়ের প্রতিষ্ঠাতা টিকারাম ঘোষ। বোড়ালের প্রাচীন বসু পরিবারের আদি বাস ছিল গড় গোবিন্দপুরে। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্মাণের সময় পরিবারটি তৎকালীন কলকাতার সন্নিকটে সিমলা অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে বসু পরিবারের শুকদেব বসু কোন কারণে বোড়ালে এসে বসবাস করেন। ঋষি রাজনারায়ণ বসু শুকদেব বসুর প্রপৌত্র। আনুমানিক ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বসু পরিবার আবার বোড়াল ত্যাগ করেন। এ সময়কালে বোড়ালে আরেকটি বর্ধিষ্ণু পরিবার ছিল মিত্র বংশ। বোড়ালের মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, ভট্টাচার্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণ পরিবারগুলি অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে এখানে বসতি স্থাপন করেন।

তথাকথিত নিম্নবর্ণের কিছু কিছু বনচারী হিন্দু পরিবারও হিন্দু যুগের শেষে যে বোড়ালে বসতি স্থাপন করেছিলেন, তারও কিছু কিছু ধর্মীয় নিদর্শন আবিস্কৃত হয়েছে। সরলদীঘির পাড়ে মাকাল ঠাকুর জ্ঞানে পূজিত মোচাকৃতি প্রস্তরখন্ড; কঙ্কাই চন্ডী, শীতলা ও ওলাবিবি জ্ঞানে পূজিত মূর্তি খোদিত প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নপ্রস্তরখন্ডসমূহ তারই নিদর্শন। বোড়ালে আরেক শক্তিশালী লৌকিক জাগ্রত দেবতা সেনদীঘির পশ্চিম পাড়ে অধিষ্ঠিত গোমুত বাহন পঞ্চানন্দ। ইনি দেবী ত্রিপুরসুন্দরীর ভৈরব বলেও খ্যাত। সাধারণের কাছে তিনি মানৎঠাকুর ও সর্বব্যাধিহরণকারী।

আঠারো শতকের শেষ ও উনিশ শতকের গোড়ায় বোড়ালে কিছু বিদেশীও বাস করেছিলেন। এ'রা ছিলেন নীলকর সাহেব। সেনদীঘির পাড়ে আজও মাটির গভীরে নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ আছে। ঋষি রাজনারায়ণ বসুর 'গ্রাম্য উপাখ্যানে এক নীলকর সাহেবের হয়রানির গল্প আছে......'দীঘির উত্তরে এক নীল কুঠি ছিল। তৎকালীন নীলকুঠির মালিক হেনসন নামক এক সাহেবের সহিত ত্রিপুরসুন্দরী দেবীর পীঠস্থানের ভক্তদের সঙ্গে বিবাদ হয় ও তাহাতে উক্ত সাহেব অশ্বারূঢ় হইয়া উক্ত দেবালয় আক্রমণ করেন। তাহাতে বোড়াল গ্রামের লোকেরা সাহেবকে উত্তম মধ্যম প্রহার দেয়। সাহেব ঠান্ডা হইয়া যান ও নীল কুঠি পরিত্যাগ করেন।'

বিগত উনিশ শ' সাতাম খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বোড়ালে চব্বিশ পরগণা ইতিহাস সংকলন সমিতির এক বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন করা হয়েছিল। এ সভায় বোড়ালের প্রাচীন ইতিহাসের বিভিন্ন তথ্যসমূহ বিবেচিত হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে বোড়াল সম্পর্কিত কিছু কিছু আলোচনায় বোড়ালের তথাকথিত কিম্বদন্তীগুলি এত স্ফীত ও রসঘন করে পরিবেশিত হয়েছে যে মনে হয় বোড়াল শুধু মাত্র শিশুপাঠ্য কাহিনীর রোমাঞ্চকর এক কিম্বদন্তীর দেশ। অধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রাণময়ী চপল কুমারীর রূপ ধরে শাঁখারির কাছে শাঁখা পরে, মূল্য পূজারীর কাছ থেকে সংগ্রহ করার নির্দেশ দেয়া; দেবত্ত-দীঘির ঘাটে পালা পার্বন উপলক্ষে বছরের বিশেষ সময়ে বৃহদাকৃতি তৈজসপত্রাদি ভেসে ওঠা ও অনুষ্ঠান সমাপ্তির পর প্রথাগতভাবে উক্ত দ্রব্যসমূহ ফেরৎ দেবার সময়ে কোন তৈজসপত্র কোন লোভী ব্যক্তি আত্মসাৎ করলে দীঘির এ-মাহাত্ম্য নাশ, জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীতে শতদল প্রস্ফুটিত দীঘির সান বাঁধানো ঘাটে বা মন্দিরের চত্বরে মহাদেবের জটাজুট ও রুদ্রাক্ষ মালাধারী সাধকের রূপ ধারণ করে খড়ম পায়ে রাত্রের স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে পদচারণা করা, দেবী মন্দিরের তৈজস-পত্রাদি বা অলংকার চুরি করার চেষ্টা করলে দেবী কৃপায় মন্দির মধ্যে চোরের আটক, প্রাচীন মন্দিরের ঢিবি খুঁড়তে গেলে ধূম কুয়াশার আবরণ ভেদ করে দিব্যজ্যোতি বিচ্ছুরিত করে দেবীর আবির্ভাব ও খনন-কারীকে কার্যে বিরত হওয়ার নির্দেশ দিয়ে দেবীর অন্তর্ধান—এ ধরনের কিম্ব-দন্তীগুলি শুধু বোড়ালেই প্রচলিত নয়। এপার বাংলা ওপার বাংলার বিভিন্ন দেবী তীর্থে বা শৈব তীর্থে একই ধরনের কাহিনী শোনা যায়। পূর্ব বাংলার মাঐসারের কালীবাড়ী, ঢাকার রমনার ডাকাতের কালীবাড়ী, সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির, ঢাকেশ্বরীর মন্দির, রাজারবাগ কালীবাড়ী, পশ্চিম বাংলায় ধন্বন্তরী কালীবাড়ী, ময়দা কালীবাড়ী, হালিশহরের রাম-প্রসাদের ভিটের কালীবাড়ী প্রভৃতি অসংখ্য তীর্থে দেব-দেবী মাহাত্ম্যের একই ধরনের কিম্বদন্তীর প্রচলন আছে। তবে বোড়ালের প্রবেশপথে আদিগঙ্গার মজা-গর্ভের ধারে আদি মহাশ্মশানের কাহিনীটি একটু ভিন্ন ধরনের। আদি মহাশ্মশানের দুটি পাশাপাশি ইঁটের প্রাচীন আটচালা শিবের মন্দিরের উপর গজানো কিছু বট অশত্থ গাছ কাটার সময় একটি সর্প বার-বারই কুড়ুলের নিচে পঞ্চফণা বিস্তার করে বৃক্ষশাখা রক্ষার চেষ্টা করে। এতে শ্রমিকটি ভয়ে অজ্ঞান হয়ে ভূপাতিত হন। পরে নাকি শ্মশানেশ্বর মহাদেব স্বপ্নাদেশে শ্মশানে মনসার বেদী স্থাপনের নির্দেশ দেন। মনসার বেদী প্রতিষ্ঠিত হলে মন্দির শীর্ষে আগাছা নির্মূলের কাজে আর কোন বিঘ্নের সৃষ্টি হয় নি।

প্রায় তেইশ বছর আগে বর্তমান লেখক যখন বোড়ালের এ মহাশ্মশানে প্রথম উপস্থিত হন তখন শ্মশানের পরি-বেশটি বেশ নির্জন ও জঙ্গলাকীর্ণ বলে বোধ হয়েছিল। মন্দিরের কিছু কিছু অংশ তখন নকসা কাটা ইঁটে অলংকৃত ছিল। পরবর্তীকালে মন্দিরদ্বয়ের গাত্র শ্রীহীন হয়েছে। মহাশ্মশানের এ মন্দির-দ্বয়ের গায়ে একটি মর্মর ফলকে মন্দির-দ্বয় শ্রীমন্ত সওদাগর প্রতিষ্ঠিত বলে উল্লেখ আছে। অনেকে মনে করেন শ্রীমন্ত সওদাগর নিজেই কিম্বদন্তীর চরিত্র। তাঁর মন্দির প্রতিষ্ঠার কাহিনী কল্পনাবিলাসী মানব মনের সৃষ্টি।

কবি কঙ্কনের চন্ডীতে বিবৃত উজানি নগরের চাঁদ সওদাগর, ধনপতি দত্ত, শ্রীমন্ত সওদাগর প্রভৃতি বণিকদের কিম্বদন্তীর মানুষ, আর নিম্নবঙ্গের বিভিন্ন নদীপথে তাঁদের সিংহল বা অন্যান্য দেশে যাত্রার কাহিনীকে কিম্বদন্তী বলে চরম সিদ্ধান্ত নিলে, এ-বিষয়ে ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় সামান্য সম্ভাবনাটুকুও অঙ্কুরে বিনষ্ট হবে। কবিকঙ্কণ চন্ডীতে বিবৃত কাহিনীর অধিকাংশই হয়ত কাল্পনিক, কিন্তু আলোচিত প্রধান চরিত্রগুলিও সম্পূর্ণ কাল্পনিক কিনা, আজ পর্যন্ত তার প্রকৃত ঐতিহাসিক মূল্যায়নের চেষ্টা খুবই সামান্য হয়েছে। এ-বিষয়ে দু' একটি তথ্যের আলোচনা করা যেতে পারে। আদি-গঙ্গার মজাগর্ভের পাড় ধরে বৈষ্ণবঘাটা, রাজপুর, মাহেনগর, দক্ষিণ গোবিন্দপুর, আটিসারা, সূর্যপুর, দক্ষিণ বারাসত, সরিষাদহ, মজিলপুর, জলঘাটা, ছত্রভোগ, হাতিয়াগড়, খাঁড়ি প্রভৃতি প্রাচীন গ্রামগুলি পরিক্রমার সময় আদিগঙ্গার বিভিন্ন ঘাটের কাহিনীর সঙ্গে শ্রীমন্ত সওদাগরের নাম যেভাবে জড়িত তা জেনে বিস্মিত হতে হয়। এমন অনেক কাহিনী রয়েছে যা কবিকঙ্কণ চন্ডীতেও লিপিবদ্ধ হয় নি। তাই মনে সংশয় উপস্থিত হয়—শ্রীমন্ত কি কিম্বদন্তীর মানুষ না ঐতিহাসিক কোন চরিত্র, অথবা খালিফাতাবাদের মুসলমান চাঁদ সওদাগরের মত এ শ্রীমন্ত সওদাগরও একজন পৃথক ব্যক্তি! শ্রীমন্তের পরমাত্মীয় ধনপতি দত্ত ও ধনপতির দুই স্ত্রী লহনা ও খুল্লনা যে সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক চরিত্র নাও হতে পারে সে বিষয়ে কিছু তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে তথ্যসমূহের গুরুত্ব আরও অনুসন্ধান ও গবেষণাসাপেক্ষ। খুলনা জেলায় লহনা ও খুল্লনার বিল, কপিলেশ্বরী মন্দিরের জরাজীর্ণ পুঁথি, নয়াবাদের প্রান্তে ধন-পতি প্রতিষ্ঠিত ভৈরবকূলে খুল্লনেশ্বরীর ও ভৈরবের চড়ায় লহনেশ্বরীর ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরদ্বয়, হরিণঘাটা নদীর বাঁকে টাইগার পয়েন্টে তথাকথিত ধনপতি প্রতিষ্ঠিত গঞ্জের ধ্বংসস্তূপ প্রভৃতি এ অনুমানকে অনেকটা সত্যাভিত্তিক করে তুলেছে। স্বর্গত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় এ বিষয়ে দীর্ঘদিন দুর্গম অরণ্য অঞ্চলে কষ্টসাধ্য অনুসন্ধান করে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর কিছু কিছু আলোচনায় তিনি এ-বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

দেশ বা জাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনায় কিম্বদন্তী-গুলির হয়ত উপাদান হিসাবে কোন নির্দিষ্ট গুরুত্ব আছে। কিন্তু কিম্বদন্তী-গুলিকে অপ্রয়োজনীয় গুরুত্ব দিয়ে অথবা কোন কাহিনীর ঐতিহাসিক পটভূমিকা-টুকু বিচার বা বিশ্লেষণ না করেই কিম্বদন্তী বলে আখ্যা দিলে ইতিহাসের মূল ধারাটির বিকৃত ব্যাখ্যার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। সম্প্রতিকালে বঙ্গভূমির ইতিহাস বা সংস্কৃতি বিষয়ক কিছু কিছু আলোচনায় পন্ডিত ও প্রত্নতাত্ত্বিকরা ঐতি-হাসিক উপাদান রক্ষায় সংশ্লিষ্ট মহলের ঔদাসীন্য দেখে বড়ই শংকা হয়। না জানি, একদিন গোটা বঙ্গভূমির ইতিহাসই না কিম্বদন্তীকে পরিণত হয়!

(আলোকচিত্র : 'নিম্ন গাঙ্গেয় উপ-ত্যকা ইতিহাস অনুসন্ধান প্রকল্প' এর সৌজন্যে প্রাপ্ত ও দেবী বিগ্রহের রেখাচিত্র শ্রীশোভন গুপ্ত অঙ্কিত)।

অফিস থেকে বেরিয়ে সোমনাথ দেখল ট্রাম-বাসে বাদুড়ের মত লোকজন ঝুলছে। রাস্তায় জনতার সমুদ্র। অফিস ছুটির সময়। সবাই এখন ঘরে ফেরায় ব্যস্ত। সোমনাথকেও ঘরে ফিরতে হবে। যদিও তার ঘরে ফিরতে ইচ্ছা করে না। ছেলে-মেয়ের অবজ্ঞা, স্ত্রীর শীর্ণ, বিমর্ষ চেহারা, ঘরের আনাচে-কানাচে চরম দারিদ্র্যের কালোছায়া। কিন্তু উপায় নেই। বিকেলে রেশন তোলা, সন্ধ্যের টিউশানি—অনেক কাজ। সোমনাথ সমুদ্রের তরঙ্গে সাঁতার দিতে দিতে এগোতে লাগল। হেঁটে যাবার কথা মনে হলে ছেঁড়া জুতোর পেরেকটা পায়ে বেঁধে। এ-সময়ে ট্রামে-বাসে চড়ার সাধ্য তার নেই। তাছাড়া আসার সময় বাসে ওর ধুতি ও পাঞ্জাবীর ঘাড়ের কাছে কিছুটা ফেঁসে গেছে। আর একটু হলে চশমাটা পড়ে ভেঙে যেত। পেটের ভেতর ক্ষুধার পোকামাকড় ভীষণ লাফালাফি করছে। ইদানীং সুরমা আর টিফিন বেঁধে দিতে পারে না। টিফিন মানে রুটি আর গুড়। তাও আজকাল আর জোটে না। বাইরে কিছু কিনে খাবার কথা সে ভাবতে পারে না। শরীর নেদাং অচল হলে সে দশ পয়সার ছোলা ভিজে কিনে খায়। সিগারেট ছেড়ে বিড়িতেই কাজ চালাচ্ছে ইদানীং।

সারাজীবন কেরানীগিরি করে কিছুই সঞ্চয় করতে পারেনি সোমনাথ। বাড়ি ভাড়া, ইলেকট্রিক বিল, দুধ আর পাঁচটি পোষ্যের দু'বেলা খাবার জোটাতেই সে প্রাণান্ত। তার উপরে কয়েক বছর ধরে তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে বিধবা বোন এসে জুটেছে ওর ঘাড়ে। ফলে ওর নাকালের একশেষ। টিফিন, সিগারেট, ভাল জামা-কাপড় সবই ওকে ছেড়ে দিতে হয়েছে। জিনিসপত্রের হু-হু বাড়তি দামের সঙ্গে আয়ের সমতা বজায় রাখতে গিয়ে ওকে সুরমার গহনা কিছু বন্ধক, কিছু ঝড়াই-বাছাই করে ফেলতে হয়েছে।

জনতার সমুদ্রে সাঁতার কেটে যেতে যেতে সোমনাথ দেখল একটা ঢাউস গাড়ি ফুটপাথ ঘেঁসে ওর সামনে এসে দাঁড়াল। গাড়ির ভেতর থেকে একটা চকচকে মুখ বাইরে বেরিয়ে এল।

—হ্যালো সোমনাথ, কেমন আছিস?

সোমনাথ দেখল শুভ্রাংশু। পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই বয়স, কিন্তু এখনও যুবকের মত দেখতে। রং-করা কালো চুল, প্যান্ট-টাই-পরা উৎসাহী মানুষ। এক সময়ে ওরা একই কলেজে পড়াশুনা করেছে। অথচ সোমনাথ চুলের অর্ধেক পাকিয়ে ফেল বুড়িয়ে যাচ্ছে দিন দিন। ছেঁড়া-ময়লা ধুতি-পাঞ্জাবীতে শুভ্রাংশুর পাশে ওকে ঠিক মানায় না। বলল, দেখ না মনে হয়?

সোমনাথের কাছে এইরকম বাঁকা প্রশ্ন শুনতে চায়নি শুভ্রাংশু। কলেজ-জীবন থেকে এ-ধরনের কথা শুনতে অভ্যস্ত ছিল বলেই সে অসন্তুষ্ট না [illegible] হেসে বলল, তুই একই রকম থেকে গেলি সোমনাথ। গাড়ির দরজা খুলে বলল, উঠে আয়। কত-দিন পর তোর সঙ্গে দেখা হল, প্রাণ খুলে দুটো কথা বলব—

সোমনাথ স্বভাব অনুযায়ী 'না' বলতে গিয়ে কোথায় যেন বাধা পেল এবং নিঃশব্দে গাড়ির ভেতর শুভ্রাংশুর পাশে বসল। গাড়ির ভেতরে রেকর্ড-প্লেয়ারে মৃদু স্বরে গান বাজছে : মুঝে কোই জংলী কহে ...

সোমনাথের মাথাটা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। শুভ্রাংশুর বিকৃত রুচি ও আচরণকে সে বরাবর ঘৃণা করে। বুড়ো হতে চলল, তবু এখনও নোংরামি গেল না। শুধু জংলী নয়, শুভ্রাংশুকে পাঁড় খচ্চর বলেই সে জানে। কলেজে শুভ্রাংশু নিজেই এসে ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ জমাত। কানের কাছে মুখ এনে একদিন ফিসফিসিয়ে বলেছিল, কী হবে পড়া মুখস্থ করে? স্রেফ টুকলি করে দিবি, ডিগ্রির কাগজ আসবে হাতের মুঠোয়, বুঝেছিস? তার চেয়ে চল একটু ঢ়্যালা মেরে আসি...' আপত্তি সত্ত্বেও সোম-নাথকে সেদিন জোর করে সে নিয়ে গিয়ে-ছিল বেশ্যাপল্লীতে। শুভ্রাংশু মৃদু হেসে

বলেছিল, 'লুটেপুটে নে, জীবনটা আর ক'দিনের!'

সোমনাথ সেদিন সেখান থেকে সেই মুহূর্তে চলে এসেছিল। কিছুদিন ঘৃণায় ওর সঙ্গে কথাও সে বলতে পারেনি। কলেজ থেকে বেরিয়ে যাবার পরে সোমনাথ যখন বেকার ছিল, সেই সময় শুভ্রাংশু নতুন ব্যবসার পরামর্শদাতা হিসেবেও ওকে পেতে চেয়েছিল। ঘৃণাটা সোমনাথের মনে তখনও টাটকা ছিল বলেই শুভ্রাংশুর সব কথাই পাপ ও অধঃপতনের পথ ভেবে দূরে সরে এসেছিল। সোমনাথ দেখল শুভ্রাংশুর স্বভাব ও রুচি আগের মতোই রয়েছে। এই বয়সেও তার কোন রূপান্তর ঘটেনি। 'মুঝে কোই জংলী কহে' রেকর্ড-প্লেয়ারের বাজনায় ওর কানদুটো ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল।

—ওটা বন্ধ করে দে শুভ্রাংশু।

গাড়ি তখন জোরে ছুটে চলেছে। 'কোন্‌টা? ওহো'......হো হো করে গাড়ির গতিবেগের সঙ্গে তাল রেখে হেসে উঠল শুভ্রাংশু—'তুই এখনো সেই আগের মতো রয়ে গেছিস, সেইরকম শুচিবায়ুগ্রস্ত, নিষ্ঠাবান সৎ ব্রাহ্মণ। যুগের সঙ্গে তাল রেখে জীবনটা ভোগ করলিনে। কী লাভ হল বলতো? আমাকে দেখ আর নিজের চেহারাটা নিজে একবার আয়নায় দেখ...'

—তোর কী লাভ হয়েছে?

—অনেক কিছু। ব্যবসায় প্রচুর লাভ, বাড়ি, গাড়ি বড় ঘরের মেয়েকে বিয়ে করেছি, ছেলেকে সামনের বছরে বিলেত পাঠাচ্ছি, মেয়েও প্রত্যেক বছর পরীক্ষায়, গানে-নাচে স্ট্যাণ্ড করছে, সামাজিক মর্যাদা পাচ্ছি প্রচুর, দু' হাতে দান করে সকলকে তুষ্ট করছি, আর কী চাই বল?

সোমনাথের চোখের সামনে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে নামছে। না, এসব ওর কিছুই হয়নি। অনেক কষ্টে কেরানীর জীবন শুরু করে কোনপ্রকারে এতগুলো পোষ্য নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে। সোমনাথ যে বেঁচে আছে এইটুকু বলাই তার একমাত্র সাক্ষী। এছাড়া বেঁচে থাকার আর কোন প্রমাণ নেই। তিনমাস ধরে ছেলের স্কুলের মাইনা দিতে পারেনি। ছেলেটা বাপ ও এই বিদ্যার অন্তঃসারশূন্যতা বুঝে ফেলে পাড়ায় পাড়ায় টো টো কোম্পানি করছে।

—ছুটির দিন দেখে একবার আয় আমার বাড়িতে। আমার ওখানেই বেশ জম্পেস করে খেয়ে-দেয়ে গল্পগুজব করা যাবে। কতবার তো তোকে বললুম। শুভ্রাংশু বলল।

—ছুটির দিনেও ঠিক সময় হয়ে ওঠে না।

—একটু সময় করে একদিনের জন্য আয়।

সোমনাথের মনে হল শুভ্রাংশু নিজের সমৃদ্ধির চিত্র তুলে ধরে ওকে একদিনের জন্য বিদ্রূপ করতে চায়। সে বারবার শুভ্রাংশুর কদর্য মনোভাবকে বিদ্রূপ ও ঘৃণা করে এসেছে বলেই বোধহয় ও এমন হিংস্র হয়ে উঠেছে। এখন সে বুঝি প্রতিশোধ নিতে চাইছে। সোমনাথ শুভ্রাংশুর মুখের দিকে একবার তাকাল। শুভ্রাংশু মৃদু হাসছে। গানটা তখনও বেজে চলেছে—'মুঝে কোই জংলী কহে।' সোমনাথের আপত্তি সত্ত্বেও শুভ্রাংশু ওটা বন্ধ করে দেয়নি। সোমনাথের চোখেমুখে হয়ত বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠেছে দেখে শুভ্রাংশু ভেতরে ভেতরে উল্লাস বোধ করছে। শুভ্রাংশু ওর উপরে কতখানি প্রতিশোধ নিতে চায় সে তা দেখবে স্থির করল। বলল, আচ্ছা, আগামী রবিবার তোর বাড়ি যাবার চেষ্টা করব।

শুভ্রাংশু খুশীতে মাথা দোলাল। সোমনাথের চোখেমুখে ঈষৎ রুঢ়তা। শুভ্রাংশু বলল, তুই বড্ড ডিস্টার্ব ফিল করছিস তো, আচ্ছা আমি ওটা বন্ধ করে দিচ্ছি। শুভ্রাংশু গানটা বন্ধ করে দিতে দিতে বলল, শ্যামাসঙ্গীত, না কীর্তন কোন্‌টা পছন্দ করিস্‌?

—আপাতত কোন গান নয়।

—তুই কী একটা বল্‌তো? আমার মেয়ে খুব ভাল পপ্‌-গান গাইতে পারে, যে-কোন বিদেশী নাচে এক্‌সপার্ট। সেদিন তো একটা পার্টিতে নাচতে নাচতে প্রায় সব পোশাকই খুলে ফেলতে গিয়েছিল......

—শুভ্রাংশু।

—তোদের এসব পছন্দ হবে না তা জানি সোমনাথ। তোরা আজও সেকেলে মনোভাব আঁকড়ে ধরে ধুঁকছিস। এ-যুগের ছেলেমেয়েরা কত এগিয়ে যাচ্ছে তা তোরা জানিস না। ওদের এগিয়ে চলাকে তোরা স্বীকার না করে বাধা দিতে যাস বলেই আজ সমাজের এই দুর্গতি, দেশের যুবক-যুবতীরা বিদ্রোহী হয়ে উঠছে।

সোমনাথ ভীষণ বিরক্ত বোধ করছিল। শুভ্রাংশু কথাগুলো বলে পরিতৃপ্তির সঙ্গে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, সেই সঙ্গে লেখাপড়াতেও ওরা ব্রিলিয়াণ্ট রেজাল্ট করছে। আমার ছেলেটি সায়ান্সে রেকর্ড মার্কস্‌ পেয়েছে। সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে শুভ্রাংশু বলল, মডার্ন আউটলুক নিয়ে ছেলেমেয়েদের স্বাধীনতা দিয়ে গড়ে তুলতে হয়। তুই আর সোমনাথ, ওদের দেখলেই বুঝতে পারবি বর্তমান দুনিয়ার সঙ্গে তাল রেখে ওরা কেমন প্রগ্রেসিভ হয়ে উঠেছে।

চৌরঙ্গী রোড ধরে গাড়ি ছুটে চলেছে। লাল নীল হরেক রংয়ের আলোয় দিগন্তিক চৌরঙ্গী ঝলমল করছে। চতুর্দিকে মানুষের মিছিল। ফুটপাত আর ময়দান জুড়ে চোরাই আর চোরাপথে নিয়ে আসা ঘড়ি, রেডিও, টেরিলিন কাপড়, কলম আর নানা জিনিসপত্রের মেলা বসে গেছে। সোমনাথের মনে হচ্ছে এই দশক মানুষের চরম অভাব ও নৈতিক অধঃপতনের কাল। সারাজীবন ধরে সে যে নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সততার সাধনা করে এসেছে, তা সব ভেঙে গেছে। সোমনাথ নিজের ছেলেমেয়ের মধ্যে কণামাত্র আদর্শবোধ সঞ্চারিত করতে পারেনি। ওরাও দিন দিন সময়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজেদের গড়ে তুলছে। ইচ্ছামত ছেলেমেয়েদের গড়ে তোলার সাধ্য যেমন ওর নেই, ঠিক তেমনি ওদের চলাফেরার বিরুদ্ধে কোন শাসন করার অধিকারও সে হারিয়ে ফেলেছে।

গতকাল রাত্রে সোমনাথ বাড়ি ফেরার সময় দেখেছে গুটিকয় ছোকরা একটি মেয়েকে ঘিরে গলির একটা অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়ে গুলতানি করছে। নির্জন গলি। গলির আলোটা কিছুদিন যাবৎ নেই। দূরবর্তী আলোর অস্পষ্টতায় সোমনাথ পরিষ্কার দেখতে পেয়েছে একটি ছেলে মেয়েটির বুকের ব্লাউজের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে। ব্লাউজের বোতামগুলো পট্‌পট্‌ শব্দে ছিঁড়ে গেছে। আর একটি ছেলে মেয়েটির মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসে ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলছে। সোমনাথের ইচ্ছা হয়েছে কয়েকটা চড় মেরে ছোকরাগুলোকে ভাগিয়ে দিয়ে মেয়েটির চুলের মুঠি ধরে ওর বাপ-মায়ের কাছে পৌঁছে দেবে। রাস্তায় এসব বেলেল্লাপনামির শাস্তি না দিলে ওরা জব্দ হবে না। কিন্তু পরমুহূর্তে সে ভয় পেয়েছে অন্য কথা ভেবে। অন্ধকারে সে ওদের কাউকে চিনতে পারেনি। ওরা কোন্‌ পাড়ার ছেলেমেয়ে তাও সে জানে না। আজকাল আবার ছোকরাদের পকেটে হরদম ধারাল ছুরি থাকে বলেই শুনেছে। প্রাণের ভয় তো বটেই। তবে সোমনাথের কাছে মর্যাদা তার চেয়েও বড়। সে নিঃশব্দে পিছু হটেছে। অন্য পথ ধরে বাড়ি ফেরার সময় ওর বারবার মনে হয়েছে মেয়েটি সুস্মিতা নয়তো! তাহলে সে মেয়েকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। ক্রোধ ও আশংকায় দুলতে দুলতে বাড়ি ফিরে সে সুস্মিতাকে দেখতে পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে। না, সুস্মিতা নয়। সুস্মিতা তখন আপনমনে ঘরে বসে ছেঁড়া ব্লাউজটা সেলাই করছিল।

সোমনাথ লক্ষ্য করেছে সমরটাও দিন দিন বেয়াদপ হয়ে উঠছে। কিছুদিন যাবৎ সে শুধু সরোমাকেই নয়, ওকে পর্যন্ত অবজ্ঞা করতে শুরু করেছে। সেই রকম ভাবভঙ্গি নিয়ে সমর ওর দিকে তাকায়, কখন বাড়ি আসে, কখন বেরিয়ে যায় কোন ঠিক নেই, কাউকে তোয়াক্কা করে না।

কয়েকদিন আগে সমরকে ডেকে সামনাসামনি প্রশ্ন করেছিল সোমনাথ,—শুনলাম তুই স্কুল যাচ্ছিস না, সামনের বছর তোর ফাইনাল পরীক্ষা—

সমর বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছে, তিন মাসের মাইনে বাকি, নাম কাটা গেছে, তাই—

—বেশ তো মাইনা দিয়ে দেব, কিন্তু স্কুল যাবি তো।

—কী হবে গিয়ে?

—হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করতে হবে না?

—কী লাভ? ডবল এম-এ, ইঞ্জিনীয়ার হলেই বা কী হবে? চাকরি পাচ্ছে কেউ? এসব শিক্ষার কোন দাম নেই।

সোমনাথ অবাক হয়ে যায় এইটুকু ছেলের দূরপ্রসারী চিন্তার জ্যেঠামি দেখে। বলে, লাভ বা দামের কথা তাকে ভাবতে হবে না, তুই স্কুলে যাবি। আমি তোর মাইনে দু'একদিনের মধ্যেই দিয়ে দেব।

—না, যাব না।

—কী? ফের মুখের উপর কথা?

—পিছনে বলার অভ্যাস শিখিনি, সামনেই বলি—

—স্কুল না গেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে।

—কেন বেরুবো? যখন জন্ম দিয়েছেন, এখানেই থাকবো। আর স্কুলে নিশ্চয় যাব, চাকরি পাবার গ্যারাণ্টি দেবেন? ফালতু এনার্জি লস্ করতে রাজী নই।

সোমনাথ আর কথা বলতে পারে নি, নিঃশব্দে সে নিজেই বাড়ির বাইরে চলে গেছে। ওর মনে হয়েছে দেহের ভেতরে ঘুণ লেগেছে। ঘুণের কুরকুর শব্দ সে কান পেতে শুনতে পাচ্ছে। অল্প দিনেই গোটা শরীরটা ঘুণে ঝাঁঝরা করে ফেলবে বলে ভয় হচ্ছে। এরপর সমর কখন বাড়ি আসে, কখন বাইরে যায়, কী বা করে কোন খবর রাখার আগ্রহ হয় নি সোমনাথের। সোমনাথ বুঝতে পারছে সে ভেতরে ভেতরে ভয়ানক পংগু হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। সমস্ত শক্তি, সাহস কর্মক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলছে।

আজ খুব ভোরে ঘুম ভেঙে যায় সোমনাথের। ভোরের দিকে ওর দম নিতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। পাশের বাড়ির মোটা ভদ্রমহিলাটি ওর জানালার পাশে কয়লার উনুন রেখে গেছে। ধোঁয়ায় সারা ঘর ভর্তি। বলার কিছু নেই। নিচের তলার ঘর, এ-সব সইতেই হবে। ভদ্রমহিলা উনুনটা রেখে থলথলে চর্বির শরীর নিয়ে হেলে-দুলে বাড়িতে ঢুকে ভোরবেলাতেই চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে।

—বলি ও সুরমা, তোমার ছোট ছেলেকে বেঁধে রেখো বাপু, গতকাল দুপুরে আমাদের রান্নাঘরে ঢুকে সব ভাত মাছ তরকারী খেয়ে গেছে, আমাদের ছোট খোকাকে ভয় দেখিয়ে পয়সা নিয়ে পালিয়েছে। আমরা তখন ঘুমুচ্ছিলুম, নচেৎ অমন ছেলেকে ধরতে পারলে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতুম।

সুরমা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। ওর সারা মুখে ছোপ ছোপ বিষণ্ণতা, বলেছে, ছি, ছি, এ-সব কী বলছেন দিদি আমার পল্টু তো তেমন বদমাস নয়, হয়তো কারুর পাল্লায় পড়ে—

—পাল্লায় পড়ে? বদমাস নয়? আমি তাহলে মিথ্যে কথা বলচি? ছেলেকে এখন থেকেই চুরির অভ্যেস শেকাচ্চো? খেতে দিতে পার না, বছরে বছরে জন্ম দিতে লজ্জা করে না। ছিঃ ছিঃ ছিঃ অমন বাপ মায়ের মুখে সাত ঝ্যাটা, চুনকালি। আবার নাক উঁচু করে কথা—

সুরমা কাঁদতে কাঁদতে ঘরে চলে এসেছে। কষ্ট হলেও চোখ বন্ধ করে সোমনাথ কিছুক্ষণ শুয়ে থেকেছে। কিন্তু বেশিক্ষণ সেও চুপ করে থাকতে পারে নি, বলেছে, ওকে আর বাড়ির বাইরে যেতে দিও না সুরমা।

—আমার আর এসব সহ্য হচ্ছে না, আমি কি ওকে বেঁধে রাখব? এইটুকু বলেই সুরমা ঘুমন্ত পল্টুর চুলের মুঠি ধরে জাগিয়ে তুলে বেদম পেটাতে শুরু করেছে:—"তোর জন্যে হারামজাদা মান ইজ্জত সব গেল......"

—আহা-হা, ও কি করছ বলতো, ওকে ছাড়ো, সোমনাথ বিছানা ছেড়ে উঠে সুরমাকে বাধা দিতে গেছে।

—তুমি কি চাও, আমি আত্মহত্যা করি? খেতে দিতে পারো না জন্ম দিয়েছিলে কেন? খিদের জ্বালায় ছেলেটা যখন কাঁদে, তুমি কোথায় থাক? টাকার অভাবে মেয়েটার কলেজে পড়া হল না, বিয়েও দিতে পারবে না, কী করে চলবে ওর? বড় ছেলেটার প্যান্ট-জামা নেই, মেয়ের শাড়ি নেই এসব কিছু কি দেখতে পাও না তুমি? সুরমা বলতে বলতে হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেলেছে।

সোমনাথ মিথ্যা সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে বাজারের থলে নিয়ে বেরিয়ে গেছে। এসব দৈনন্দিন ঘটনায় ওর মন-মেজাজ আর খারাপ হয় না।

গাড়ী পার্ক স্ট্রীটের দিকে বাঁক নিতেই সোমনাথের চোখ দুটো প্রশ্নে সজাগ হয়ে উঠল। শুভ্রাংশু বলল, তোর মেয়েটির কি বিয়ের ব্যবস্থা করছিস? না, কলেজে ভর্তি করে দিবি?

—কোনটাই হবে না। বরং আপাতত ওর একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে পারলে ভাল হয়।

—আর ছেলেটি? পড়াশুনা করছে তো? এসব স্কুল-কলেজের হাঙ্গামা এড়াতে হলে ওকে বাইরে কোন রেসিডেন্শিয়াল স্কুলে পাঠিয়ে দে।

সোমনাথের মনে হল শুভ্রাংশু ওকে বিদ্রূপ করার জন্যই বুঝি এতদূরে টেনে এনেছে। সে কী ওর অবস্থা জানে না? সোমনাথ দেখবে কতখানি প্রতিহিংসা ওর ভেতরে এতদিনে জমে উঠেছে।

শুভ্রাংশু রাস্তার একপাশে গাড়ি রেখে বলল, তোকে কতবার বলেছি আমার সঙ্গে ব্যবসা করবি আয়, কিন্তু তোর সততা......আচ্ছা, এখন কি সেই আদর্শ তোর ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছিস? চেষ্টা করলেও নিজের মত ওদের গড়তে পারবি না, বুঝেছিস সোমনাথ, মানি ফাস্ট—

—তুই কি এখনো স্মাগলিং আর চোরাই কারবারই চালাচ্ছিস?

—তা কেন চালাব? প্রথমে ওসব স্টার্ট করে কিছুটা ক্যাপিটাল তৈরী করে নিয়েছি, এখন ব্যবসা সৎ পথেই করি। মেসিনারি পার্টসের কারবার করছি এখন। ভাবছি আগামীবারে একটা ছোটখাটো কারখানা খুলব, কিছু বেকার ছেলেকে তখন চাকরিও দিতে পারব। তোর ছেলেটাকেও তখন ওখানে ঢুকিয়ে দিতে পারিস, টেক্‌নিক্যাল কিছু শিখে নিতে পারবে।

সোমনাথের চোখ দুটো জ্বলে উঠল। সমর চাকরির গ্যারাণ্টি পেলে স্কুল যাবে বলছিল। এই তো সেই সুযোগ। এই তো শুভ্রাংশুর করুণা ওর মাথায় ঝরে পড়ছে। কিন্তু সারাজীবন একি খেলা খেলছে ওকে নিয়ে শুভ্রাংশু! সে কি সত্যিই ওর শুভার্থী? না, এও প্রতিহিংসার চরম প্রকাশ?

—কোথায় যাচ্ছিস, সোমনাথ জানতে চাইল।

—এই তো সামনের রেস্তোরাঁয়। আয়না আমার সঙ্গে, কিছু খেয়ে নই। শুভ্রাংশু এগিয়ে যেতে যেতে বলল, আমার পছন্দমত ছেলেমেয়েদের এখন গড়ে তুলতে পারছি, কিন্তু তুই—

যন্ত্রচালিতের মত শুভ্রাংশুর সঙ্গে এগিয়ে চলল সোমনাথ। সোমনাথের পোশাক, চেহারা, সাংসারিক ও মানসিক অবস্থা—সব মিলিয়ে সে ব্যক্তিত্বের অপমানে নিজেকে কেমন সঙ্কুচিত বোধ করতে লাগল। প্রতিমুহূর্তেই ওর মনে হতে লাগল শুভ্রাংশুই একালের সার্থক নায়ক, আর সোমনাথ ওর চাটুকার, শুভ্রাংশু যেতে যেতে বহু সেলাম পেল। সোমনাথ দেখল শুভ্রাংশুর চোখ ও ঠোঁট দুটো এখন হাসিতে ঝলমল করছে।

ভেতরে ঢুকে ওরা এক জায়গায় বসল। কিছুক্ষণের মধ্যেই টেবিলে মাংস, জিন ও টুকিটাকি খাবার চলে এল। একটা মেয়ে বাজনার তালে তালে কী এক দুর্বোধ্য ভাষায় গান গেয়ে নেচে চলেছে। মেয়েটির চেহারা, বয়স ও মুখের আদল পর্যন্ত ঠিক সুপ্তির মত। সোমনাথ মেয়েটিকে দেখে প্রথমটায় চমকে উঠেছিল। সুপ্তি! না, সুপ্তি নয়, অনেকটা সুপ্তির মত।

—নে খেয়ে নে। মাংস ছিঁড়ে চিবোতে চিবোতে শুভ্রাংশু বলল, জিনে চুমুক দিল, সিগারেট ধরাল, তারপর চোখের পাতা দুটো ঈষৎ বন্ধ করে বোধ হয় গান ও বাজনার শব্দ দেহের প্রতিটি লোমকূপ দিয়ে শুষে নিতে লাগল।

এই সুযোগে সোমনাথের মাথায় এক অদ্ভুত বুদ্ধি খেলে গেল। সোমনাথ এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল সবাই আপন রসে মশগুল, শুভ্রাংশুর চোখ দুটোও বন্ধ। সে চতুর্দিক দেখে নিয়ে মাংস ও খাবারগুলো একটা কাগজে মুড়ে রুমালে বেঁধে পকেটে পুরে নিল। হাতের আঙুলগুলো থরথর করে কাঁপছে দেখে একটু জিন খেয়ে একটা সিগারেট ধরাল। আহা! বেচারা পল্টু খিদের জ্বালায় থলথলে চর্বিওয়ালীর রান্নাঘরে ঢুকে সব ভাত মাছ খেয়ে ফেলেছে বলে সুরমাকে আজ লজ্জায় অপমানে চোখের জল ফেলতে হয়েছে। সুরমা দিনদিন কেমন রক্তশূন্য হয়ে যাচ্ছে। মুরগীর মাংস খেলে কয়েক ফোঁটা রক্ত বাড়বে নিশ্চয়। সুরমার ফর্সা হাতপাগুলো কেমন ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। একটুকরো খেলে নিশ্চয় একটু লালচে আভা দেখা দেবে। সুরমার ছেঁড়া শাড়ি, শুকনো মুখ, সমরের গ্যারান্টির অভাবে স্কুল-পালানো পল্টুর ক্ষুধার্ত কান্না, সুপ্তির ছেঁড়া ব্লাউজ, ধোঁয়াটে ঘর, শূন্য প্রভিডেন্ট ফান্ড নিজের খোঁচাখোঁচা দাড়ি, টিফিনের অভাবে ছোলা ভিজে, তিন মাসের বাড়িভাড়া বাকি, দুধ বন্ধ, বিধবা বোন ও তার ক্ষুধার্ত তিনটি মনুষ্য ছানা এই মুহূর্তে ওর ঘাড়ের ঠিক পিছনে, পিঠের দিকে, বাহুতে দাপাদাপি করতে লাগল। চোখের সামনে মেয়েটির পাছা-দোলানো নাচ, পরনে নাভির অনেক নিচে ঈষৎ নীলাভ সূক্ষ্ম ঢাকনা, মেয়েটির চোখ-মুখের নানা ভঙ্গিমা, হাত-পায়ের অস্থির আলোড়ন, সুরেলা কণ্ঠ, বাজনার ছন্দ সব মিলিয়ে এইসব কাণ্ডকারখানা ওর কাছে বড়ই যন্ত্রণাদায়ক বলে মনে হতে লাগল। সুপ্তিও আজকাল এইরকম নাভির নীচে কাপড় পরতে শিখেছে, নামমাত্র ন্যাকড়ার ব্লাউজ, এমনি করে কোমর দুলিয়ে চলতে শিখেছে। বাড়িতে কাঁচি দিয়ে চুল ছেঁটে মুখে রং মেখে রাস্তায় ঘুরতে শিখেছে। এরাই ওর মেয়েকে নষ্ট করে দিচ্ছে, এরাই সমরকে প্রলোভিত করে নিয়ে যাবে জাহান্নামে। কেন এরা এসব করে? কী সুখ, কী আনন্দ! সোমনাথ ঢক ঢক করে বাকি জিনটুকু গলায় ঢেলে দিল। এই বয়সেও মেয়েটির কোমর-দোলানো নাচ দেখে সোমনাথের শরীরের শিরাগুলো চন্‌মন্‌ করে উঠছে কেন? সোমনাথ দেখল শুভ্রাংশু খুশীতে ডগমগ হয়ে চোখ বন্ধ করে কুশনে হেলান দিয়ে বসে রয়েছে। সোমনাথের মনে হল এরাই পল্টুর মুখের খাবার কেড়ে এনে এখানে বসে খেয়েদেয়ে আরামের ঢেকুর তুলে এখন ঝিমোচ্ছে। সোমনাথের ইচ্ছা হল শুভ্রাংশুর নাকের উপর একটা ঘুষি মেরে থেঁতলে দিতে। কিন্তু না, শুভ্রাংশু নাকের ডগায় সমরের চাকরির গ্যারান্টি বিন্দু বিন্দু ঘাম হয়ে জমে আছে দেখা যাচ্ছে। শুভ্রাংশু এখানে আসে কেন? সে তো বাড়িতে অনায়াসে এসব খাবার বানিয়ে খেতে পারে। তাহলে কিসের ক্ষুধা? সোমনাথের মাথাটা ঈষৎ টলতে লাগল। চোখ দুটো লাল টকটকে হয়ে উঠতে লাগল। হাতের মুঠোয় ক্রোধ ও আক্রোশ নিসপিস করতে লাগল। ঘুষি মেরে মেয়েটির মুখের চোয়াল উড়িয়ে দেবার ইচ্ছা হল। সে অকস্মাৎ নিজের অজ্ঞাতে টেবিলের উপর সজোরে একটা ঘুষি মারল।

সারা ঘর মুহূর্তে চমকে উঠল। ঝনঝন করে কেঁপে উঠল টেবিল, কাঁচের প্লেট। কয়েকটা কাঁচের গ্লাস পড়ে ভেঙে গেল। সমস্ত লোকজন ভীত ও সচকিত হয়ে সোমনাথকে পাগল ভেবে ছোটাছুটি করতে লাগল। সোমনাথের ছেঁড়া ও ময়লা পোশাক, গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি দেখে নাচ ও গান থামিয়ে মেয়েটি হয়ত ওকে জংলী ভেবে ভয়ে কাঁদতে লাগল। এমনভাবে কান্না জুড়ে দিল যেন ঘুষিটা ওর মুখের উপরেই পড়েছে। সোমনাথের আচরণই যে মেয়েটির কান্নার কারণ তা বুঝতে পেরে কয়েকজন সাহসী যুবক ওকে তেড়ে মারতে এল। সোমনাথকে কয়েকজন বয় ও যুবকের দল ধাক্কা দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে ঘরের বাইরে বার করে দিল। সোমনাথ একজন বয়কে মারতে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু সেই মুহূর্তে ছোকরাদের ধাক্কা খেয়ে দরজায় মাথা ঠুকে কপালটা ঈষৎ কেটে গেছে। এখন কপাল গড়িয়ে রক্ত পড়ছে। আশ্চর্য! শুভ্রাংশু যেমন চোখ বুজে বসেছিল, শেষ পর্যন্ত সে ঠিক সেইভাবেই বসে রইল। এত কাণ্ড-কারখানা ঘটে গেল, সে কি তবে টের পেল না? না, নিজের মর্যাদা রক্ষার দায়ে চুপ মেরে গেছে। অথবা এটাই তার প্রতিহিংসার চরম প্রকাশ?

ভাবতে ভাবতে এবং ঈষৎ দুলতে দুলতে কপালের রক্ত মুছে অগত্যা সে পথে নেমে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল।

বাড়ির গলি-রাস্তায় ঢোকার সময় একটি ছেলে ছুটতে ছুটতে এসে সোমনাথকে বলল, কাকাবাবু সমরকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে।

সোমনাথ ছেলেটির মুখের দিকে তাকাল কয়েক মুহূর্ত, কোন জবাব দিল না। তারপর নির্বিকারভাবে এগিয়ে চলল।

ছেলেটি ফের বলল, ওর কোন দোষ নেই, ও রাস্তায় চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল—

সোমনাথ ছেলেটির আর কোন কথায় কান দিল না। হন্‌ হন্‌ করে বাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

বাড়িতে ঢুকতেই কান্নার শব্দ শুনতে পেল। সুরমা কাঁদছে। সোমনাথের মনে হল সমরকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে বলে সুরমার কান্নার কোন মানেই হয় না। সমর দিন দিন বড্ড বেয়াদপ হয়ে উঠছিল। অবশ্য মায়ের মন তো। না কেঁদে পারে না। ছেলেটির কথামত সমর নির্দোষ হলে নিশ্চয় কালই সে ছাড়া পেয়ে যাবে।

কিন্তু ঘরের ভেতরে ঢুকে সে অবাক হয়ে যায়। ডাক্তার আর লোকজনে ঘর থই-থই করছে। দুপুর থেকেই পল্টুকে নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। সুরমা লুটিয়ে কেঁদে যাচ্ছে। পল্টু বিছানায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে। ডাক্তার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় সোমনাথকে লক্ষ্য করে বললেন, কলেরা। প্রায় সব শেষ করেই তো আমাকে ডাকতে গেছে। দুপুরে সঙ্গে সঙ্গে ডেকে পাঠালে হয়ত—

ডাক্তার আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন না, চলে গেলেন। সোমনাথ পাথরের মূর্তির মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর খুব ধীরে ধীরে পকেট থেকে রুমালে বাঁধা মাংস ও খাবার বার করে ঘুমন্ত পল্টুর মাথার কাছে সে নিঃশব্দে বসল। মুরগীর মাংস খেলে বেচারার দেহে একটু রক্ত হবে, হয়ত ক্ষুধার্ত পল্টুটার কান্না থেমে যাবে।

শীতের দার্জিলিঙ

বিমল ঘোষ

একখানা বাংলা রম্যরচনা জাতীয় গ্রন্থ পড়ে চমৎকৃত হয়েছিলাম। শীতের দার্জিলিং সম্পর্কিত গ্রন্থ। দার্জিলিং-বাসিনী জনৈকা বান্ধবীকে চিঠি দিয়ে জানতে চেয়েছিলাম শীতের দার্জিলিং সম্পর্কে। বান্ধবী লিখেছিলেন, কলকাতার সুসজ্জিত ঘরে বসে কিংবা শহর কলকাতার ধোঁয়াশা দেখে শীতের দার্জিলিং সম্পর্কে কিছু বোঝা যায় না। শীতের দার্জিলিং দেখে যদি বিমোহিত হতে চান, তবে চলে আসুন এই শীতেই।

শীতের দার্জিলিং-এর রূপ কেমন?

এ প্রশ্নের জবাব কে কেমনভাবে দেবেন তা জানি না। কেননা শীতের দার্জিলিং দেখে মুগ্ধ হওয়া আর দার্জিলিং-এর শীত দেখে মুগ্ধ হওয়া দুটো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। অবশ্য দুই শ্রেণীর মুগ্ধ ব্যক্তিদের কাছ থেকে বর্ণনা নিয়ে দার্জিলিং সম্পর্কেই একটা মোটামুটি ধারণা করা যায়। কিন্তু তাতে শীতের দার্জিলিং-এর কিছুই বোঝা যাবে না। যদি কুয়াশা না থাকে—আকাশে জমে না থাকে মেঘ, তবে, শীতের দার্জিলিং আপনাকে উপহার দেবে একটি স্বর্ণাভ দিন, কাঞ্চনজংঘার চূড়ার ত্রিভুজে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে আপনার স্মরণ রাখার মত এক অনৈসর্গিক দৃশ্য—যা ঠিক শীতের সময়ে না হলে আপনি কোনদিনই দেখতে পাবেন না। ম্যালের পরিচ্ছন্ন অংগন কিংবা ল্যাডেন লা রোডের প্রশস্ত পথ ধরে যে শীতের দার্জিলিং-এর কাতর প্রাণস্পন্দন আপনি টের পান—তার সংগে কোনও সাদৃশ্য থাকবে না এমনি একটি শীতের সকালের। যেন হঠাৎ দেখা কোন রূপসী তার ঘোমটা ফেলে আপনার দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে আবার ঘোমটা টেনে দিল। ওইটুকুই আপনার শীতের দার্জিলিং-এর স্মৃতিসঞ্চয়।

শীতের দার্জিলিং আপনাকে একেবারেই বিমুখ করবে না। এমনি এক একটি দুর্লভ দিন আপনাকে উপহার দেবে শৈলরাণী দার্জিলিং।

দার্জিলিং শহরের পুরনো ঘড়ি মেরামতওয়ালা হানিফ মিয়া। বয়স নব্বই ছুঁই ছুঁই। হানিফ মিয়া বলে—সাগরপারের সাহেব মেমদের দার্জিলিং এবং দেশী সাহেব মেমদের দার্জিলিং, দুটো চেহারাই তার নখদর্পণে। সাহেব মেমরা চলে গেল—তা সে দার্জিলিং-এর শীতও যেন চলে গেল সাহেব মেমদের সংগে। হানিফ মিয়া তার মাথার 'পরের ফারের টুপি পিছনে সরিয়ে দেয়। বেরিয়ে পড়ে একটি সুস্পষ্ট এবং মসৃণ কাঁচা রঙ-এর টাক। এদিকে ভুরুর লোম পর্যন্ত সাদা।

হানিফ মিয়া তার নিষ্কলঙ্ক শুভ্র দাড়ির গোছা মুঠো করে চোখের সামনে তুলে ধরবে।

বলবে—এই যে আমার পাকা দাড়ি দেখছেন, এমনি ধবধবে সাদা বরফ দেখতে হলে আপনাকে এখন দৌড়তে হবে জলা পাহাড় কিংবা সন্দক-ফো তে। তাও কালে কস্মিনে। কিন্তু এমন একদিন ছিল—যে শীতে দার্জিলিং-এ বরফ না পড়ত—তা হলে সে শীতই নয়। সেই সাহেব মেমদের আমলে। দার্জিলিং-এ বরফ পড়লে সাহেব মেমদের সে কি আনন্দ হত। বরফ পড়ার খবর গেজেট হত। সে এক এলাহি ব্যাপার!

হানিফ মিয়া বলে—জীবন ভোর অনেক বিকল ঘড়িকে সচল করলাম বাবু, কত-লোকের হারিয়ে যাওয়া সময়কে ঘড়িতে ফিরিয়ে এনে দিলাম, কিন্তু দার্জিলিং-এর শীতকে আর ফেরানো যাবে না।

—কেন ফেরানো যাবে না, সাহেব মেমরা নেই বলে?

—না তা নয়।

নব্বই বছরের পোড় খাওয়া, বহুদর্শী হানিফ মিয়া বলে—অন্য কারণে দার্জিলিং-এ আর সেই শীত পড়বে না। কারণটা বৈজ্ঞানিক। দার্জিলিং শহরে বিজলী ব্যবস্থার, লোক বসতি বৃদ্ধিতে এখানকার আবহাওয়া আগের চেয়ে উষ্ণ হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া পাহাড়ের বনাঞ্চল অনেক পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে—যে জন্য জলকণা আর বরফে পরিণত হয় না।

হানিফ মিয়ার দারুণ আপসোস।

সে একদিন ছিল। সাহেব মেমদের দেশে একসময়ে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল শীতের দার্জিলিঙ। একবার যারা দার্জিলিঙ-এর শীত ঘুরে আবার বিলাতে ফিরে যেত, সেইসব মেমরা দার্জিলিঙ-এর শীতের পোষাক কেটে স্বামীর কোট তৈরী করে দিত আর লন্ডনের শীতের পোষাক কেটে টাই।

ইন্ডিয়ার ফকির, বাঘ আর দার্জিলিঙ-এর শীত তখন সাহেব মেমদের ভাবনায় একাকার। আর যেসব সাহেব মেম এদেশেই থাকতে বাধ্য হত—বিশেষ করে দার্জিলিঙ শহর আর তার আশেপাশে, তাদের তখন তুরীয় অবস্থা। ম্যালেরিয়া আর কালা-জ্বরের পোড় খাওয়া, সাপ আর বাঘের ভয়-ভাঙা সেইসব সাহেব মেমরা হোম থেকে বেড়াতে আসা সাহেব মেমদের চোখে বিস্ময়ের

মারুনী নাচ

জন্তু। এইসব সাহেব মেমরা থাকত টি প্লান্টেশনে, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে কিংবা ধর্মপ্রচারের কাজে। যে যেখানেই থাক —চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা মাত্র একটি। দার্জিলিঙ ইউরোপীয়ান ক্লাব। চা-কর সাহেবরা দূর-দূরান্তের চা-বাগান থেকে মেমসাহেবদের নিয়ে আসত পনিতে চেপে দার্জিলিঙ শহরের ইউরোপীয়ান ক্লাবে নাচ আর গানের আসরে। বেহালা, বরানগর, চিৎপুর, [illegible]নীচকের গুদাম থেকে পাঠানো হত দেশী আর বিলিতী মদ। শীতের দার্জিলিঙ-এ মাঝরাত পর্যন্ত নেচে গেয়ে সাহেব মেমরা চলে যেত আপন ডেরায়। ক্লাবঘরের দারোয়ান যখন পেটা ঘড়িতে দুটোর ঘণ্টা বাজাত—তখন ঘরে ফেরার পালা।

কোন কোনদিন ফেরা সম্ভব হত না। কেননা সময়ের গোলমাল করে ফেলত সাহেব মেমরা। কাঞ্চনজংঘার চূড়া রক্তাক্ত হয়ে উঠলে হুঁস হত সাহেব মেমদের।

ডাক পড়ত ক্লাবঘরের দারোয়ানের।

—রাত্রে ঘণ্টা বাজাওনি কেন? ডিউটি নেগলেক্ট করেছ কেন?

দারোয়ান গরীব মানুষ।

হাত জোড় করে বলে—হুজুর মা বাপ। আমি আমার ডিউটি ঠিকই করেছি। হুজুরের বোধহয় খেয়াল নেই যে কাল রাতে স্কটল্যান্ড থেকে সদ্যচালান আসা মদ পরিবেশন করা হয়েছিল। আর সেইজন্যই বোধ হয় হুজুর দুটোর ঘণ্টা শুনতে পাননি।

সাহেব শিস দিয়ে ফেলে কৈফিয়ৎ শুনে। এবং দারোয়ানকে বকশিশ। কিন্তু সাহেবরা নিয়ম চালু করল শীতের রাতে খালি গায়ে নাচতে হবে। লেডীরা যতদূর সম্ভব পোষাক আসাক ঢিলেঢালা করে নাচবে। কেননা শীতের চাবুক গায়ে পড়তে থাকলে স্বদেশের মদ খেয়েও আর সময়ের ভুল হবে না।

হানিফ মিয়া দুঃখ করে বলে—সেসব সাহেব মেমরাও ক্লাবঘরের চাবি দেশী সাহেব মেমদের হাতে তুলে দিয়ে সাগর পাড়ি দিল। দেশী সাহেব মেমরাও নাচেন, মদ খান আর সে মদও বিলাত থেকে আমদানী। কিন্তু হলে কি হবে, রাত বারোটা না বাজতেই দেশী সাহেব মেমদের পা আপনা থেকেই নাচে। শীতের কাঁপুনিতে পায়ে পায়ে ঠোকাঠুকি।

ক্লাবঘরের দারোয়ান সত্যি সত্যি ডিউটি নেগলেক্ট করে।

শীতের দার্জিলিঙ কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে ঝিমিয়ে পড়ে। শহরের আশেপাশে চলে যান। এ অঞ্চলের যারা সাধারণ মানুষ—তাদের কিবা শীত কিবা গ্রীষ্ম কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। ট্যুরিস্ট নেই, ব্যবসা বাণিজ্য অচল কাজেই তাদের দৈনন্দিন জীবনেও কোনও ব্যস্ততা নেই। কেমন যেন ঢিলেঢালা ভাল। কিন্তু শীতের রাত তাদের কাছে অন্যদিক দিয়ে প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে। নেপালী গ্রাম্য এবং বস্তী মানুষদের ঘরে ঘরে এই সময়ে নাচ গানের মহড়া। হয়তো উৎসাহী যুবকরা নাটকেরও মহড়া দেয়। আর মেয়ে ও পুরুষ রঙ-বেরঙে সেজে এই শীতের সন্ধ্যায় যদি ঘরে ঘরে গিয়ে 'মারুনী' নাচ না নাচে—তবে শীত পড়েছে বলে মনেই হবে না।

হানিফ মিয়া বলে—প্রত্যেকটি ঋতুতেই দার্জিলিঙ-এর পৃথক চেহারা। বর্ষার শেষে, শীতের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত যারা দার্জিলিঙ-এ বেড়াতে আসে তাদের তো চেনেন। ট্যুরিস্ট। ওরা আর দার্জিলিঙ-এর কতটুকু দেখে। এধার ওধার ঘুরে ম্যালে গিয়ে

ঘোড়ার পিঠে চেপে ফটো খিচে, আর জহুর পাহাড়ে গিয়ে মুণ্ড সাহেবদের দেওয়া [illegible] বাঘ দেখেই ফিরে যান। বর্ষার ভিক্টোরিয়া, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের [illegible], বসন্ত কালের লেবং বাদামতলায় দেখেছেন বাবু?

হানিফ মিয়ার দুঃখ, সেই দার্জিলিঙ আর নেই। সাহেব মেমদের দার্জিলিঙ এখনও আছে, তাই বা চোখ মেলে দেখবার মানুষ কই?

এখনও দেখবেন, শীতের মরশুম শুরু হতেই [illegible] চাসিতে। সেই দূর দূরান্তের কমলা বাগান থেকে পাকিয়ে ঝাঁপিতে নিয়ে আসে শহরে। দার্জিলিঙ-এর মানুষ কমলা খায় না। দিনরাত দার্জিলিঙ-এ কমলা বাক্সবন্দী হচ্ছে বিদেশে চালান দেওয়ার জন্য। রাস্তার ধারে [illegible] নেপালী যুবতী, পাকা কমলালেবুর মতই যাদের মুখের রঙ আর হাসি, টুকরি সাজিয়ে বসে থাকে লেবু নিয়ে তারা বিক্রী করে আপনাদের মত বিদেশীদের কাছে। আর যদি কমলালেবু কিনতে বসে হাসিঠাট্টায় মশগুল হয়ে যান—তবে দুটো লেবু আপনাকে মুফতে দিয়ে দেবে। আপনার সঙ্গে খোস-গল্পও জুড়ে দিতে পারে সেই নেপালী যুবতী।

—বাবু যে শীতের সময়ে দার্জিলিঙ এলেন বড়?

—কি করব, সিজন টাইমে ফুরসৎ হল না।

নেপালী যুবতী বলবে—শীতের সময়েই যখন এলেন, তখন ট্যাক্সি ভাড়া করে নামচেবাজার ঘুরে আসুন। নামচে বাজার জানেন তো? সেই যে এভারেস্ট ওঠার প্রথম ধাপ। আজকাল ট্যাক্সি চলার রাস্তা হয়েছে।

কি আছে ওখানে? বেড়াবার কি ভাল জায়গা?

—দেখেই আসুন গিয়ে।

নামচে বাজার যাবেন, না টাইগারে সূর্যোদয় দেখবেন? ম্যাল-এ দাঁড়িয়ে পাতাঝরা পাইন বনের ফটো নেবেন না ঘোড়ায় চেপে মহাকাল পর্যন্ত চক্কর দেবেন? তাই তো। শীতের দার্জিলিঙ তাহলে একেবারেই খালি হাতে ফেরায় না ট্যুরিস্টদের। চলে যান লেবং-এর পথ ধরে। বাঁদিকে তাকিয়ে দেখুন, দিগন্তব্যাপী পাহাড়ের কি বৈরাগী চেহারা। সেই বর্ষার সময়ে ধস নেমে গিয়েছে কিন্তু বসুধারার মত এখনও তার চিহ্ন রয়ে গিয়েছে পাহাড়ের গায়ে গায়ে।

তবে হানিফ মিয়া দুঃখ করলেও এখনও কিন্তু কদাচিৎ শীতের দার্জিলিঙ-এ বরফ পড়ে। সকালে উঠে কলের জল ধরতে গিয়ে দেখলেন কলে জল নেই। হয়তো ওয়াটার সাপ্লাই-এর যান্ত্রিক গোলযোগ ভেবে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন, আর তখনই কাঁচের শার্সী দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আপনি থ’। সারারাত ধরে বরফ পড়েছে শহরের উপর। কলকাতায় আপনি [illegible] আপনি কিছুই টের পাননি। আপনার কল থেকে জল ধরার চেষ্টা দেখে আপনার নেপালী চাকরটি মুখ টিপে হাসছে। আপনি যত বড়ই বিজ্ঞ হোন না কেন, এই মুহূর্তে আপনার কিছুতেই বোধগম্য হচ্ছে না, [illegible] পাইপের মধ্যে জল জমে বরফ হয়ে রয়েছে। রোদ উঠুক আবহাওয়া উত্তপ্ত হোক—তখন আবার জল [illegible] জল। তার আগে নয়।

দরজা খুলে বাইরে মুখ বাড়ান। আপনার ঘরের সামনে রাস্তার পারে যে ডাকবাক্সটি ছিল তার উপরে একটি আবক্ষ মনুষ্যমূর্তি। বরফ দিয়ে তৈরী। ছোট ছোট নেপালী ছেলে মেয়েরা বরফ পড়ার আনন্দে সকালেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছে। আর ডাকবাক্সের উপর জমা বরফ দেখে নিখুঁত শিল্পকর্ম করে গিয়েছে।

আজকের এই দার্জিলিঙ—বিশ্বের চোখে শৈলরানী হয়ে ওঠার পিছনেও কিন্তু শীতেরই অবদান। সে এক ইতিহাস। কম-বেশী দ’ দেড়েক বছর আগেও কিন্তু দার্জিলিঙ সাধারণ মানুষের কাছে দুর্গম জায়গা ছিল। মাত্র কয়েকঘর সিকিমী আর বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের ‘গুম্ফা’ এই নিয়েই দার্জিলিঙ।

একদিকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সিভিলিয়ানরা বেশীদিন টিঁকতে পারত না এসব অঞ্চলে। পাহাড়ী জ্বর মানে ‘ইয়েলো ফিভার’ ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, পেটভর্তি ‘পিলাও’ এইসব নিয়েই বাস করতে হত। ফলে দু চার মাস যেতে না যেতেই ছুটির দরখাস্ত, হোমে ফেরার আবেদন, অন্ততঃ-পক্ষে ক্যালকাটায় ট্রান্সফার। অথচ পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে যে সম্পদ লুকানো আছে তা উদ্ধার করতে হবে। [illegible] দার্জিলিঙ পাহাড় তখনও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হস্ত-গত করতে পারেনি। এ অঞ্চল তখনও সিকিমরাজের [illegible]। [illegible] ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী [illegible] সিকিমের মহারাজা [illegible] হিসাবে দার্জিলিঙ পাহাড় দান করলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে। [illegible] দার্জিলিঙ পাহাড় [illegible] মহারাজার কাছে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর [illegible]। [illegible]।

যুদ্ধের সময়েই লেফটেন্যান্ট নেপিয়ার দার্জিলিঙ পাহাড় ঘুরে ঘুরে অনুমান করে-ছিলেন, যে যদি এখানে বসতি গাড়া [illegible] হোমের আবহাওয়ার সমতুল্য আবহাওয়া পাওয়া যাবে আর তাহলে ইউ-রোপীয়ানরা ম্যালেরিয়া কালাজ্বরে ভুগে ভুগে হোমে ফেরার জন্য ছটফট করবে না।

সেই শুরু হল রানীর সাজ পরানো। সেটা আঠারোশ’ পঁয়ত্রিশ সাল।

তারপর দার্জিলিঙ, ঘুম, জলাপাহাড়, মহাকালে অনেক বরফ পড়েছে, অনেক বরফ গলে জল হয়ে গিয়েছে; দার্জিলিঙ রানীর সাজে ঝলমল করেছে দিনের পর দিন—উজ্জ্বলতা বেড়েই চলেছে—কমেনি। এমন অপূর্ব সৌন্দর্যময়ী রানীকে দেখবার জন্য খাস বিলাত থেকেই ছুটে ছুটে এসেছে সাহেব মেমরা। এসেছে অন্য দেশ থেকেও।

তারপর দিন বদল হয়েছে। ভারতের বুক থেকে রাজারানীর পালা শেষ হলেও—দার্জিলিঙ এখন ভারতীয়দের চোখে রানীর মতই মহিমান্বিতা।

স্বয়ংবরা ॥

কবিরুল ইসলাম

আমার সময় ভ্রষ্ট অপ্রেমে অস্থির,
স্বয়ংবরে এসো হে অর্জুন
ছিলা টান তোমার সবল পেশি তুলে ধরো
ধীর লক্ষ্যভেদে।

হে আমার তৃতীয় পাণ্ডব
এসো, অদ্বিতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী
এই নষ্ট ফসলের বাড়বাড়ন্ত
দুঃসময়ে
তুমি মাত্র পারঙ্গম।
অব্যর্থ পরাও গুণ
বাসর জাগানি লক্ষ্যভেদে।

হে অর্জুন
এসো
দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে এসো

দ্যাখো সেই মাছ ঝুলে আছে।

তুমি নাও আমার বালিশ ॥

সাধনা মুখোপাধ্যায়

ফুটপাথে জুতোপালিশের বাক্সে
মাথা রেখে বালিশ প্রতিম
ঘুমেতে স্বপ্ন দেখলো তাকে
আমারও ইচ্ছে যায়
সে ঘুমের স্বাদ নিই
ছেঁকে ওই শান্ত মুখাকৃতি
নিরুদ্বেগ নিশ্চেতনাকে
হাজার লোকের ভীড়ে
পদে সে দলিত হতে পারে
তবু তার ভয় নেই
কারণ জীবন তার কাছে
তাৎক্ষণিকের সমরূপ
আহা সে বাঁচার মানে
জেনেছে যে অহরহ
নিজেকে জ্বালানো
যেমন ইন্ধনে পোড়ে ধূপ
জীবনের আরোপিত এবং
দুরূহ কোন মানে
করেনি উচ্চারণ
কেউ সেই ভাগ্যবন্ত কানে
আহা সে আদিম ঘুম
আদিম শ্রমের পরই নামে
তুচ্ছ করে ফোম্ বালিশের গদি
শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ
স্বোপার্জিত অন্নের ঘামে
আমি ওই ঘুম চাই
অন্তত একদিন
বেওয়ারিশ অচেতন আর নিঃসাড়
তার বিনিময়ে আমি হে পালিশওয়ালা
দিয়ে দেব এ যত্নের
ফুলতোলা বালিশ আমার

চল্লিশ পেরোলো ॥

কৃতী সোম

এখনো রক্তের মধ্যে ছোট-বড় অনুভূতিগুলি
মৌরলা মাছের মত অবিরল খালি খেলা করে
মনে হয় আমি যেন মেঘজমা বৈশাখী বিকেল
মুহূর্তেই ভেঙে পড়ে তছনছ করে দেব সব।

কিছুই করিনা তবু অনর্থক রোদের আগুন
ঝরে যায় জ্বলে যায় রক্ত জমে কৃষ্ণচূড়া-বুকে
আমার অজস্র দাবী বহুকাল বেকারের মত
ঘোরে ফেরে দিনেরাতে কী ভীষণ অবহেলা পেয়ে।

আকাশ বাতাস আর ভাঙাচোরা সমাজসংসার
বন্ধুদের গল্প-আড্ডা রমণীর আশ্চর্য উক্তা
কর্মগত মাথাব্যথা, সুখস্মৃতি, আত্মীয়বিয়োগ
বয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন নিতান্তই বেমোজন বেম।

তাইচং মাঠের মত বুক জুড়ে দারুণ পিপাসা—
হঠাৎ কখন দেখি চলে গেল অমোঘ চল্লিশ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

চেয়ারে এসে বসতে না বসতেই টেলি-ফোন বেজে উঠল। বড়মামার গলা। 'তোদের ডাক্তার যে প্রেসক্রিপশন দিয়ে গেল, ওষুধটা কেনা হয়নি। কেনা হয়নি মানে বুঝতেই তো পারছিস, হাতে টাকা পয়সা নেই, মাসের শেষ কিনা। তোদের আপিস ওষুধ টষুধ দেয় না?'

মনে মনে বললাম, 'দেয়, কিন্তু মামাকে দেয় না।' মুখে বললাম, 'দেবে না কেন, নির্ঘাৎ দেবে। আমি ওষুধের কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম।'

বড়মামা সমবেদনা জানালেন, 'ভুলের আর দোষ কি। কচি ঘাড়ে কি কম বোঝা চাপানো হয়েছে। তারপর যাচ্ছিস কবে?'

'দেখি, যেদিন ওরা টিকিট দেয়।'

'যাবার আগে জানাস কিন্তু। খুকীকে গিয়ে নিয়ে আসতে হবে।'

'নিশ্চয়। আজই আপনার ওষুধ পাঠিয়ে দেব।'

বড়মামার হাসি কানে এল। 'তুই বেজায় ছেলেমানুষ। প্রেসক্রিপশন রইলো আমার হাতে, আর তুই পাঠাবি ওষুধ।' বড়মামার হাসি অনেকক্ষণ ধরে চলল।

অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, 'ওটা বরং পাঠিয়ে দিন। এক্ষুনি। হাতের কাছে লোক-জন আছে কেউ?'

'এক্ষুনি পাঠাচ্ছি। ও না হয় কিছুক্ষণ বসে থাকবে, একেবারে ওষুধ সংগে করে নিয়ে আসবে।'

'দেরী হবে। আমি বরং অফিসের পর দিয়ে আসবো।' কথা বলতে বলতে ঠিক করে নিলাম, ছুটির পর কোন দোকান থেকে ওষুধগুলো কিনে নিয়ে আজই বড়মামার বাড়ি যাব।

বড়মামা বললেন, 'নিতু কাল এসেছিল। আমি পরিষ্কার বলে দিয়েছি, এখন তোর বিয়ের কথা ভাববার সময় নেই। আগে টাকা পয়সার স্বচ্ছলতা আসুক, তারপর বিয়ের প্রশ্ন।'

'খুব ভাল করেছেন বড়মামা।' মনটা হঠাৎ খুশীতে ভরে গেল।

'আরও একটা কথা বলেছি, চেনাজানা ঘরের মধ্যে দেয়া-নেয়ার প্রশ্ন ওঠে না, কিন্তু খরচাপাতির জন্যে কিছু টাকা চাই।'

আঁৎকে উঠলাম, 'আপনি নিতুদার কাছে টাকা চাইলেন?'

বড়মামা সংগে সংগে উত্তর দিলেন, 'আমি চাইবো কেন, ওরাই দেবে দেবে করছিল, পরিষ্কার করে নিলাম। খুকীর মুখে তো শুনেছি, জমানো টাকা বিশেষ কিছু নেই তোর।'

'না থাক। টাকা না থাকলে লোকে ধুমধাম করে না, লোক খাওয়ায় না। তাই বলে পণ নেওয়া, এ কী করলেন বড়মামা!'

'তুই বড্ড সেন্টিমেন্টাল। কাজের সময় কাজ কর। বিয়ের কথা পরে ভাবা যাবে। যাওয়ার দিন ঠিক হলে জানাস কিন্তু, আমি গিয়ে খুকীকে নিয়ে আসবো।'

বড়মামা ফোন রেখে দিলেন।

বড়মামা ফোন রেখে দেওয়ার সংগে সংগে চারদিক হঠাৎ নিস্তব্ধ মনে হতে লাগল। বড়মামা ফোনে খুব চেঁচিয়ে কথা বলেন। এত চেঁচান যে সময় সময় রিসি-ভার কান থেকে দূরে সরিয়ে ধরতে হয়। চোখের সামনে এতগুলো লোক বসে রয়েছে, কিন্তু কারও মুখে কোন কথা নেই। ওরা সবাই ঘাড় গুঁজে রয়েছে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল, ওরা কেউ কিছু করছে না, সবাই আমাকেই লক্ষ্য করছে। একটা অসম্ভব শক্ত পরীক্ষায় আমাকে পাশ হতে হবে আজ। কিছুক্ষণ আগে মনের ভেতর একটা ক্ষোভ অনুভব করছিলাম। আমার সত্তা ন্যায় বিচার প্রত্যাশা করছিল। এই নিস্তব্ধ মুহূর্তে অতর্কিতে মনে হতে লাগল, আমি দারুণ অসহায় একজন মানুষ। নিজেকে এত অসহায় মনে হচ্ছিল যে বসে থাকতেও আমার কষ্ট হচ্ছিল। উঠে দাঁড়ালাম, এদিক ওদিক তাকাতে লাগলাম। হঠাৎ কে যেন ডেকে উঠল, হরবিলাস বলে। হরিবিলাস পিওনের নাম। ওর নামটা যে এত মধুর আগে কোন দিন বুঝতে পারি নি। ওর নামের সংগে সংগে নিস্তব্ধ জগৎ আবার চলতে সুরু করল। খুট খুট করে টাইপ করার শব্দ কানে আসছে। রাস্তা দিয়ে বিকট শব্দ করতে করতে একটা ভারী গাড়ি চলে গেল। গোটা কয়েক টেবিলে এক সংগে টেলিফোন বেজে উঠল। সব আওয়াজই আমার কাছে মধুর বলে মনে হল। জীবনে এই প্রথম অনুভব করলাম, অখণ্ড নৈঃশব্দ্যের মাঝে মানুষ সুস্থভাবে বাঁচতে পারে না। অন্তত আমাদের মত মানুষ, যারা জন্মাবার সংগে সংগেই শব্দমুখর জগতে প্রবেশ করে।

শুভেন্দু যে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে, জানতে পারি নি। ও একটা ফাইল নিয়ে এসেছে। কিছু একটা বিষয় জানতে চায়। বললাম, 'আমি এখন একটু ব্যস্ত রয়েছি।' অথচ আমার সামনে ছোট একটা কাগজ পর্যন্ত নেই। অপ্রস্তুতভাবে আবার বললাম, 'ঠিক যে কোন কাজে ব্যস্ত হয়ে রয়েছি, তা না। আমি খুব গম্ভীরভাবে একটা বিষয় নিয়ে চিন্তা করছি।' ভাগ্য ভাল, শুভেন্দু সেই বিষয় সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করল না। ফাইল হাতে নিজের সীটে ফিরে গেল।

যতীনবাবু অনেকক্ষণ ধরে আমাকে যে লক্ষ্য করছেন বুঝতে পারলাম। চোখ তুলতেই ভদ্রলোকের সংগে চোখাচোখি হয়ে গেল। হঠাৎ কী জানি কেন, যতীনবাবুর কাছে গিয়ে বসলাম। বললাম, 'খবর কি?'

যতীনবাবু চশমার ফাঁক দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। উত্তর দিলেন না। আবার বললাম, 'গোপন খবর কিছু পেলেন?'

যতীনবাবু এবার মুখ খুললেন, 'সঠিক খবর এখন পর্যন্ত পাইনি। তবে আঁচ করছি। একটা গোলমাল পাকাবার মতলবে আছে ওরা।'

'অদ্ভুত আপনার ক্ষমতা মশাই, ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে গেলে এতদিনে ডেপুটি কমিশনার হয়ে যেতেন নির্ঘাৎ।' ভেবেছিলাম, যতীনবাবু রাগবেন। ফল হল উল্টো।

'কিন্তু আপনারা—আপনাদের তো ওরা ছাড়বে না।' সুপ্রিয়ার নাম মুখে আটকে গেল।

'সুপ্রিয়া বুদ্ধিমতী মেয়ে। তাছাড়া মিস্টার কাপুর ওকে খুব স্নেহ করেন। সবচেয়ে বড় কথা, ও মেয়েছেলে। শুনেছেন কোনদিন, মেয়েদের কেউ ছোরা মেরেছে, কিম্বা বন্দুক ছুঁড়েছে?'

'এসব ছাড়াও তো মানুষকে অপমান করা যায়।'

যতীনবাবু মুখ বিকৃত করলেন। 'অপমান! আজকাল মানুষের মান আছে কোথায় যে অপমান। সুপ্রিয়া নয় ভেবে, মান-অপমান সম্বন্ধে ওর কোন নিজস্ব ধারণা নেই। এই যে লোকে কাপুর সাহেবকে নিয়ে এত কথা বলে, কী এসে যায় তাতে।'

'অনেক কিছুই এসে যাওয়া উচিত। ভদ্রঘরের মেয়েদের মান-অপমান সম্বন্ধে আর একটু সচেতন—'

'আমরা নিজ নিজ সম্বন্ধে সমালোচনা করতে এখানে বসিনি মিস্টার চ্যাটার্জি। একটা কথা আপনাকে জানিয়ে রাখি, উনি খুব উচ্চ ধরনের মানুষ... কারুর উপদেশ বা সাহায্য ... দরকার হয় না।'

হঠাৎ কানের দুটো পাশ গরম হয়ে উঠল। বললাম, 'কিন্তু অপরকে উপদেশ দিতে খুব পটু উনি। আর সাহায্যের জন্য করে মানুষকে অপমান করতে। উঃ। অনেক

কাজ পড়ে আছে।' বলে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম।

ক্রমশই লাঞ্চ টাইম এগিয়ে আসছে। কী রকম অস্বস্তি শুরু হয়ে গেল। আমি লোভী না। পেছনের দুয়ার দিয়ে চাকরির উন্নতি করতে আমার ঘৃণা হয়। দু-মুঠো টাকার বিনিময়ে যারা আত্মবিক্রয় করে, সেই সব পিশাচদের কাছ থেকে আমি হাজার মাইল দূরে থাকতে চাই। কিন্তু চাইলেই কি পারা যায়।

মজুমদার এই দিকে আসছে। লোকটা সারাক্ষণ আমাকে নজরে নজরে রেখেছে। এই যে ঘন ঘন জল খাচ্ছি, আর রুমাল দিয়ে মুখ মুছছি, ওর নজর নিশ্চয় এড়ায় নি। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত মজুমদার সম্বন্ধে একটা ভয় ছিল, যতীনবাবুর কথার পর ভয়টা আর নেই। মনে হচ্ছিল যে কোন মুহূর্তে ওর মুখে জমিয়ে একটা ঘুষি বসিয়ে দিতে পারি। স্কাউন্ড্রেল, শেষ পর্যন্ত মদের বোতল ঘুষ দিতে গেল একটা লোচ্চা লম্পটকে? অবিশ্যি লোচ্চা লম্পট বলেই মদের বোতল নিয়ে গেল, ভাল মানুষ হলে ধর্মপুস্তক, কিম্বা দই-মিষ্টি নিয়ে যেত।

'কি মশাই, একা একা হাসছেন যে!'

হাসতে হাসতে বললাম, 'এক এক সময় অকারণে হাসি পায়।'

'বেশ আছেন, মনে সুখ থাকলে সবাই হাসে।'

'যা বলেছেন।'

ভেবেছিলাম মজুমদার চলে যাবে, কিন্তু গেল না। 'এই কাগজটা দিতে এলাম। আপনার লাইন অফ অ্যাকশন লেখা আছে এতে।' মজুমদার কাগজটা বাড়িয়ে ধরল।

হাত না বাড়িয়েই বললাম, 'কারও আদেশ মানতে আমি বাধ্য না।'

'ব্যক্তিগত কোন মানুষের আদেশ নয়। এ পার্টির নির্দেশ।'

'আমি কোন পার্টির মেম্বার না। আমি মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী। আমি ইউনিয়নের মেম্বার। একজোটে কাজ করতে চাই, এই পর্যন্ত।'

মজুমদার অধৈর্য গলায় বলে উঠল, 'আপনি যা খুশী হন, তাতে কারও কিছু যায় আসে না। কাপুরের সামনে গিয়ে প্রথম কথা বলবেন আপনি। কী বলবেন তারই খসড়া।'

'আমি জানি, কী বলতে হবে।'

'সেই বলাটার সঙ্গে আমাদের বলা না-ও মিলতে পারে।'

'আমি কারও হুকুমের গোলাম হব না।' বলে সোজা হয়ে বসলাম।

মজুমদার চোখ ছোট করে কিছুক্ষণ আমাকে দেখল। তারপর শান্ত গলায় বলল, 'যতীনবাবু লোকটা শয়তান। কী সব মিথ্যেকথা আপনার মাথায় ঢুকিয়েছে।'

'যতীনবাবুর কথা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।'

মজুমদার ধীরে ধীরে সামনের চেয়ারে বসল। পেপার ওয়েট নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, 'আপনার যদি উন্নতি হয়, আমরা সবাই, বিশেষ করে আমি খুব খুসী হব,—একথা আপনি বিশ্বাস করতে পারেন। কিন্তু অফিসে ডিসিপ্লিন বলে একটা পদার্থ থাকা উচিত। কিছু মনে করবেন না, ব্যাপারটা যা দাঁড়াচ্ছে, আপনি হলে কী ভাবতেন? এই সেকশনে আপনার চেয়ে সিনিয়র বেশ কয়েকজন আছেন। হারুদা, মুখার্জি, সরকার, এমনকি আমিও আপনার থেকে বহু বছরের সিনিয়র অথচ প্রমোশনের বেলায় আপনি—'

'কিন্তু এটা যে প্রমোশন তাই বা ধরতে গেলেন কেন?'

'শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না বলে একটা প্রবাদ আছে। আমি প্রবাদ-ট্রবাদ খুব বিশ্বাস করি। আরও আছে। কোম্পানী মনে করছে, আপনি দারুণ কাজের লোক। তাই সবাইকে ল্যাং মেরে আপনাকে উঁচুতে ঠেলে দেওয়া হল; ভাল কথা। কিন্তু হোয়াট অ্যাবাউট দিস বয়?' বলে শুভেন্দুর দিকে চোখের ইসারা করল। যাকে তাকে বাইরে থেকে ধরে নিয়ে এসে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে, অথচ ডিপার্টমেন্টে উপযুক্ত লোকের অভাব নেই। শুনছি শিগগির নাকি কয়েকজনকে সারপ্লাস বলে ডিক্লেয়ারও করা হবে।'

'এ ছাড়া আপনাদের আর কোনও পয়েন্ট আছে?'

'আরও আছে। আমাদের মস্ত বড় দাবী, এ বছর পুজো বোনাস টোয়েন্টি পার্সেন্টের কমে চলবে না।'

'কিন্তু কোম্পানী কি অত লাভ করেছে?'

মজুমদারের চোখ আরও ছোট হয়ে এল। চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে লাগল, 'আপনি কোম্পানীর তরফের লোক, এমন একটা সন্দেহ অনেকেই করছে। খোলাখুলি-ভাবে বলতে গেলে, মুকুন্দ প্রথম থেকেই আপনাকে সন্দেহ করে এবং ঠিক সেই কারণেই আপনাকে আজ দলপতি নির্বাচিত করা হয়েছে।'

'আর ঠিক সেই কারণেই আমি দলপতির পদে ইস্তফা দিলাম।'

'হোয়াট?' মজুমদার চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিল।

হাত দিয়ে ওকে থামিয়ে বললাম, 'অত উত্তেজিত হবেন না মজুমদার মশাই। এর চেয়েও উত্তেজনাপূর্ণ খবর আমার ঝুলিতে রয়েছে। সেই খবর যদি বাইরে বার করি, দেখবেন কী হুলুস্থুলু কাণ্ড বেধে যায়।'

মজুমদারের গলা নরম হয়ে এল। 'কি খবর?'

'খবর ঠিক না, একটা ছবি।' নিমেষের মধ্যে মাথার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বুদ্ধি খেলে যেতে লাগল।

'ছবি?' মজুমদার চেয়ারে বসেই উসখুস করতে লাগল।

'ক্লিয়ারিটি কিন্তু দারুণ সার্প হয়েছে। চিনতে একটুও ভুল হবে না। মনে করে দেখুন তো, আপনি যেদিন মিস্টার কাপুরের বাড়িতে গেলেন, সেদিন আপনার হাতে একটা স্কচ হুইস্কির বোতল ছিল কিনা?'

মজুমদার তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'কিন্তু বোতলটা তো কাগজে মোড়া ছিল।' পরমুহূর্তেই আবার ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল মজুমদার। কিছুক্ষণ দুই হাতের আড়ালে মুখ চেপে ধরে বসে রইল। এক-সময় মুখ তুলে অবসন্ন গলায় বলল 'ছবিটা কে তুলেছিল?'

'আমি। কাপুরের বাড়ি আলীপুরে। আমি ক্যামেরা নিয়ে জুতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ আপনাকে দেখলাম। লোভ সামলাতে না পেরে প্রথমে আপনার ছবিই তুলে ফেললাম।'

মজুমদার আরও কিছুক্ষণ বসে রইল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি বলে একটা প্রবাদ আছে।'

সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম, 'এবং প্রবাদ-ট্রবাদ আপনি খুব বিশ্বাস করেন।'

মজুমদার আমার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আজ থেকে সন্ধি।'

হাসতে হাসতে বললাম, 'আমেন।' দুজনে গম্ভীরভাবে করমর্দন করলাম।

এদিক ওদিক দেখে নিয়ে গলা নীচু করে মজুমদার বলল, 'মুকুন্দ মল্লিক কিন্তু সাচ্চা লোক। পয়সা-টয়সার ওপর লোভ নেই। পার্টির জন্যে দরকার হলে জান দিয়ে দেবে। ওর সঙ্গে মাথায় মাথায় সংঘর্ষ এড়িয়ে যাবেন।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

'আর একটা কথা। সুপ্রিয়া মিত্র সত্যি সত্যি আপনার শুভাকাঙ্ক্ষিণী না। ওর গোটা কয়েক উদ্দেশ্য আছে, আপনাকে দিয়ে তা হাসিল করতে চায়। এর মধ্যে কোন ফুল-টুল বা চাঁদের আলো-ফালো নেই মশাই। নেহাৎ কুৎসিত আর কালো বাস্তব, যেটা হল গিয়ে, আপনাকে শিখণ্ডী দাঁড় করিয়ে আড়াল থেকে কার্যোদ্ধার করবে সে-ই। আপনি জানেন কিনা জানি না, আপনার জায়গায় যে ছোকরাটি কাজ করছে, সে ওরই ভাই। যতীনবাবু ওর কাকা। আরও শুনতে চান? ওর এক বোনকে কাপুরের রেকমেনডেশনে একটা অফিসের টাইপিস্ট করে ঢোকানো হয়েছে অথচ মেয়েটি টাইপ শিখতে শুরু করেছে মাত্র তিন মাস আগে। স্পীড থার্টিও হয়নি।'

'এত খবর আপনি পেলেন কি করে?'

মজুমদারের গোমরা মুখে হাসি ফুটে উঠল, 'একটা কথা জেনে রাখুন, বয়স হয়ে গেলে প্রত্যেক ব্যাচিলারের মাথায় একটু না একটু ছিট হবেই। আমার ছিট হচ্ছে, অহেতুক কৌতূহল। এই কৌতূহল নিয়ে কম কষ্ট পাই না। এদিক-ওদিক ছুটো-ছুটি করতে হয়, সময় মত নাওয়া-খাওয়া হয় না, অথচ একটা ভূত যেন ক্রমাগত ঘাড়ে চেপে কাজ করিয়ে নিচ্ছে। গত রোববার কত টাকা ট্যাকসির পেছনে খরচা

করেছি জানেন? বাহান্ন টাকা দশ নয়া। তাই না এতগুলো টাটকা খবর পরিবেশন করা গেল।'

মজুমদারের কথায় হেসে ফেললাম, 'খবরগুলো মোটেই টাটকা না, বরং দারুণ বাসি। শুভেন্দু যে সুপ্রিয়ার ভাই, একথা আমি জানি, যতীনবাবু ওদের আপন কাকা নন, খুব দূরে সম্পর্কের। তৃতীয় খবরটা অবিশ্যি নতুন। কিন্তু ইনটারেস্টিং না, কারণ ওর বোন আমাদের অফিসে কাজ করে না।'

'কিন্তু শেষের খবরটা দারুণ মারাত্মক রকমের নতুন। যদি বলেন, এ খবরটাও আপনার জানা, আমি আপনার সত্যবাদিতায় সন্দেহ প্রকাশ করবো। আপনি পাটনায় যাচ্ছেন দেশপাণ্ডের পিছনে স্পাইং করতে। দেশপাণ্ডে হেড অফিসের লোক। সেন্ট্রালের মিনিস্টার অফ ইন্ডাস্ট্রিজ ওর সাক্ষাৎ কাকা। বুঝতেই পারছেন, সহজ ব্যক্তি নয় লোকটা। কাপুর বম্বের অফিসে যেতে চাইছে, দেশপাণ্ডেও চাইছে, অথচ দুজনার ঠাঁই নেই সেই তরীতে। আসল কথা, আপনাকে দিয়ে দেশপাণ্ডেকে ল্যাং মারাবে। দেশপাণ্ডে লোকটা অসম্ভব চোর আর চরিত্রহীন।'

নতুন একটা জগৎ চোখের সামনে খুলে গেল। প্রথমেই রাগ হল সুপ্রিয়ার ওপর। ধীরে ধীরে সেই রাগ ঘৃণায় পরিণত হতে লাগল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার মুখে রঙের খেলা দেখতে লাগল মজুমদার।

'আমি এই জঘন্য চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেব।' বলতে বলতে আমার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল।

'ইউনিয়ন এ বিষয়ে আপনার পক্ষ নেবে। যদি চান মুকুন্দ মল্লিকের সঙ্গে কথা বলিয়ে দিতে পারি।'

'এখন থাক, দরকার হলে বলবো।'

মজুমদার চলে গেল।

সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে আবার ভাল করে চিন্তা করতে বসলাম। কতক্ষণ চিন্তা করছিলাম জানি না, হঠাৎ খেয়াল হল কাপুরের চাপরাশী আমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চোখে চোখ পড়তেই লোকটা বলল, 'মিত্র মেমসাহেব সেলাম দিয়েছেন।'

'আমার এখন অনেক কাজ।'

'উনি বলেছেন, কাজটা খুব জরুরী।'

'আমি তার চেয়েও জরুরী কাজ করছি।' বলে একটা ফাইল টেনে নিলাম।

লোকটা তবু দাঁড়িয়ে রইল। বিরক্ত হয়ে বললাম, 'বলো গিয়ে আমি এখন ব্যস্ত রয়েছি।'

'উনি রাগ করবেন, আপনি যদি একটু ফোন করে দেন—'

ফোন তুলেই বললাম, 'আমি এখন খুব ব্যস্ত।'

'আজ আধেকদিন তুমি একটুও কাজ করো নি। শুধু আড্ডাই মেরেছো।' সুপ্রিয়া খুব লঘুভাবে বলল।

'ধরে নেওয়া যাক আড্ডা মারাটাই আমার কাজ।' শক্তভাবে বললাম।

'বেশ, তাই ধরে নেওয়া যাক। একবার এসো, আড্ডা মারা যাবে।'

'আমি এখন কাজ করবো।'

'তোমার কী হয়েছে বলো তো।'

'কিছু না।'

'তবে এভাবে কথা বলছো কেন?' সুপ্রিয়ার গলায় যেন একটু আকুলতা ফুটে উঠল। শোনার ভুলও হতে পারে অবশ্য।

'মিষ্টি করে কথা বলার জায়গা এটা না।'

'অংশু!'

'আমাকে ভয় দেখাচ্ছো?'

'আমার কথা শোনো, প্লীজ।'

'তোমার কথা শোনার অনেক লোক আছে। আমাকে রেহাই দাও। দোহাই তোমার।' বলে ফোন রেখে দিলাম।

—সাত—

মিস্টার কাপুর ডিকটেশন দিচ্ছিলেন। নোট নিচ্ছিল সুপ্রিয়া। দরজা খুলে প্রথমে মুখ বাড়াল মুকুন্দ মল্লিক, 'মে উই কাম ইন?'

'আফটার ফাইভ মিনিটস প্লীজ।' বলে কাপুর ডিকটেশন দিতে লাগলেন।

মুকুন্দ মল্লিক দরজা বন্ধ করে বলল, 'আমরা পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে পারি।'

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কথাটা আমি ভুলবো, কিন্তু সেই পর্যন্তই, আপনি প্রসিড করবেন।'

কী জানি কেন আমার মন ক্রমশই বিদ্রোহ ঘোষণা করছিল। বললাম, 'নিজের বিরুদ্ধে নিজের লড়াই, ইতিহাসের পাতায় দুর্লভ, সেই দুর্লভ কাজটা কি না করলেই নয়?'

মুকুন্দ বলল, 'কথাটা ঠিক বোঝা গেল না।'

'না বোঝার মত শক্ত কিছু কথা না। আপনাদের প্রথম পয়েন্ট, এই অফিসে অবিচার অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। আমার ওপর পক্ষপাতিত্ব নিয়ে আপনাদের বিক্ষোভ। আর সেই বিক্ষোভটা আমার মুখ থেকেই প্রথমে বলানো হবে—একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে না কি?'

হঠাৎ মুকুন্দ মল্লিক ওর রোগা একটা হাত আমার চোখের সামনে নাড়াতে নাড়াতে বলল, 'আপনি কি সরে পড়ার তালে আছেন?'

'তালে থাকলে সরে পড়তাম, আটকাতে পারতেন না।'

'আটকাতে কি করে হয় আমরা জানি।'

'মানে?'

মজুমদার এসে দুজনের মাঝখানে পড়ল, 'আঃ কী হচ্ছে আপনাদের। ছেলে-মানুষের মত ঝগড়া করতে বসে গেলেন! আমাদের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মালিক পক্ষ আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। মনে রাখতে হবে, আমরা এতগুলো লোক এক নৌকায় নদী পার হবো। কেউ বেসামাল হয়ে গেলেই নৌকা ভরাডুবি হবে।'

পিছন থেকে কে চীৎকার করে উঠল, 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ।' অনেকে এক সঙ্গে চীৎকার করে উঠল, 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ।' আবার শ্লোগান দিল সেই ছেলেটি, 'আমাদের লড়াই—' সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, 'চলছে, চলবে।'

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল, দরজার মুখে দাঁড়িয়ে কাপুর। কাপুর হাসছেন। সেইভাবেই বললেন, হ্যান্ড ফাইভ মিনিটস পাসড।' বলে হাত-ঘড়ি আমাদের দিকে তুলে ধরলেন, সেইদিকে তাকিয়ে প্রথমেই মনে হল, কাপুরের রিস্ট যেমন চওড়া, ঘড়িটাও সেই অনুপাতে বিরাট। এ ধরনের বিরাট ঘড়ি সচরাচর বড় একটা দেখা যায় না। কাপুর আবার বললেন, 'আপনারা আসুন। সবাইকে হয়তো আমার এই ছোট ঘর অ্যাকোমোডেট করতে পারবে না, তাই, আপনারা তিন-চারজনে এলে সুবিধা হয়। আপনাদের বলতেও সুবিধা, আমার শুনতেও। আশা করি এতে আপনাদের আপত্তি হবে না।' কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে কাপুরের চোখের তারা এক এক জন করে সবার মুখের ওপর দিয়ে ঘুরতে লাগল। কাপুরের লম্বা চওড়া চেহারা, পিঙ্গল চোখ, কথা বলার মিষ্টি ভঙ্গী—সব কিছু মিলিয়ে ও'কে একজন সাহসী আর কৃতী পুরুষ বলেই আমার মনে হতে লাগল।

নিমেষের জন্য একটা কথা মনে করে বিষম হাসি পেয়ে গেল। সেইদিন কাপুর যদি ও'র এই শক্তিশালী হাত দিয়ে মজুমদারের মাথায় মদের বোতলটা ঠেসে মারতেন, মজুমদারের অমন নিটোল মাথাটা নির্ঘাৎ গুঁড়িয়ে ছোট ছোট অনুপরমাণুতে পরিণত হয়ে যেত।

মজুমদার আমাকে কনুই দিয়ে গুঁতো দিয়ে বলল, 'চলুন।'

যন্ত্রচালিতের মত সামনের দিকে পা বাড়ালাম। আমার সঙ্গে আরও তিনজন ঘরের মধ্যে ঢুকল। মুকুন্দ মল্লিক, মজুমদার আর রিসিভিং সেকশনের তিনকড়ি হালদার। হালদার লোকটি সত্যি সত্যি ভাল। যা বলেন, বিশ্বাস করেন, শুধু শুধু ভড়ং দেখান না।

মনে হল, কাপুরের চোখের দৃষ্টি বার বার আমার ওপর দিয়ে পিছলে পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে। কাপুর নড়েচড়ে ঠিক হয়ে বসলেন, ভাবটা অনেকটা এই রকম, এবার বলো বাপুরা, কী বলতে এসেছো। তোমাদের মুরোদ আমার জানা আছে, তবু আজ তোমাদের সব কথাই আমি শুনবো।

মুকুন্দ মল্লিক ইংরেজীতে শুরু করতে যাচ্ছিল, কাপুর পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'বাংলায় বলুন। বহুদিন বাংলাদেশে আছি, ভাষাটা আমি জানি। শুধু জানি না, এই ভাষার ওপর আমার একটা বিশেষ আকর্ষণও আছে, কারণ ভাষাটা ভয়ানক মিষ্ট।'

মুকুন্দ মল্লিক শক্ত বাদাম, কথার চাপে ভাঙ্গা গেল না। শান্ত গলায় বলল, 'মাতৃ-ভাষার প্রশংসার জন্য প্রথমেই আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা আজ গোটা কয়েক দাবী নিয়ে আপনার কাছে এসেছি।'

'বলুন' বলে কাপুর টেবিলের ওপর বাঁ হাতের কনুই রাখলেন। সেই হাতের আঙুলের ওপর চিবুক রেখে মনোযোগী ছাত্রের মত বসে রইলেন।

'আমাদের প্রথম দাবী, সিনিয়রিটি হিসেবে প্রমোশন দিতে হবে।'

'দ্বিতীয়?' পেন্সিল দিয়ে কাগজে নোট নিতে নিতে কাপুর বললেন।

'দ্বিতীয়, বাইরে থেকে লোক নেওয়া চলবে না।'

কাপুর লেখা শেষ করে মুকুন্দ মল্লিকের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'তৃতীয় দাবী, এবার টুয়েন্টি পার্সেন্ট বোনাস দিতে হবে, চতুর্থ, ক্যান্টিনের খাওয়া ক্রমশই—'

মাঝ পথেই কাপুর মুকুন্দকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই সব সিলি পয়েন্টস নিয়ে আমাদের সময় নষ্ট করা উচিত হবে না, কারণ ক্যান্টিন ম্যানেজমেন্টের ভার সম্পূর্ণ আপনাদেরই ওপর। কোম্পানী একটা সাবসিডি দেয়, কিন্তু কর্তৃত্ব নেয় না। নেকস্ট?'

মজুমদার বলল, 'প্রথমে এই তিনটি পয়েন্টের মীমাংসা হোক।'

আমি হঠাৎ বলে উঠলাম, 'সবার আগে একটি মাত্র বিষয়ের মীমাংসা হওয়া দরকার।'

সবাই একসঙ্গে আমার মুখের দিকে তাকাল। এতক্ষণ সুপ্রিয়া মুখ নীচু করে বসেছিল। চকিতের জন্য সেও যেন চোখ তুলল। 'বিষয়টি হচ্ছে, আমরা কারা? আমরা যে এই রোজ আসছি, কাজ করছি, বাড়ি চলে যাচ্ছি, এই উদ্দেশ্যবিহীনভাবে আসা-যাওয়ার কী মূল্য আছে?'

মজুমদার হেসে উঠল। বলল, 'তার বিনিময়ে আমরা মাইনে পাচ্ছি।'

কাপুর হাত দিয়ে মজুমদারকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'ইউ প্রসিড চ্যাটার্জি। হোয়াট ডু ইউ একসপেকট ইন একসচেঞ্জ?'

'আমাদের এই পরিশ্রমের বিনিময়ে আমরা চাই স্বীকৃতি। আমাদের মূল্য আমরা পেতে চাই। যেমন, কোম্পানী যদি বেশী লাভ করে, আমরা বেশী বোনাস পাই। কিন্তু কোম্পানী যদি লোকসান করে, প্রশ্নটা দাঁড়ায়, কেন লোকসান করছে? পরামর্শ করার জন্যে আমাদের ডাকা হয় না কেন? আমাদের নিজের লোক বলে ধরা হয় না কেন? কোম্পানীর লাভ ক্ষতির অংশী-দার বলে আমাদের ভাবা হয় না কেন? ঘরে থেকেও আমরা বাইরের লোক হয়ে থাকবো কেন?' উত্তেজিত হয়ে আমার গলা ক্রমশই উঁচু পর্দায় উঠছিল।

মুকুন্দ মল্লিক হঠাৎ কাপুরের সামনে ওর রোগা হাত নাড়াতে নাড়াতে চীৎকার করে উঠল, 'এই সব প্রশ্নের জবাব এতদিন দিতে হয়নি, আজ হবে, সত্যিই তো, আমরা কারা? এই যে শরীরের রক্ত জল করা পরিশ্রম, এর সার্থকতা কোথায়। কয়েকটা টাকা মাত্র? আপনাদের দয়ার দান?' বলতে বলতে মল্লিক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল।

মজুমদার মল্লিকের সার্টের কোণা টেনে ধরে বলল 'কী হচ্ছে মল্লিক। আফটার অল আমাদের ভদ্র ব্যবহার করতে হবে।'

এতক্ষণে হালদার মশাই কথা বললেন, 'বেসিক প্রশ্নটা অবিশ্যি তাই। আমরা আমাদের কাজের স্বীকৃতি পাচ্ছি না কেন ম্যানেজমেন্ট কখনও আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারছে না। ফলে দাঁড়াচ্ছে কি। একটা প্যাঁচ কষাকষি সব সময়েই চলছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কে বা কারা? তারাও তো কোম্পানীর কর্মচারী।'

কাপুর উৎসাহভরে বলে উঠলেন, নিশ্চয়ই। আমরা সবাই কোম্পানীর বিশ্বস্ত কর্মচারী।'

'তবে গুরুত্বপূর্ণ কোন সিদ্ধান্ত নেবার আগে আমাদের পরামর্শ নেওয়া হয় না কেন। শুনছি ফ্যাকটরী লক আউট হবে। এ বিষয়ে আমরা সবাই অন্ধকারে আছি। কিন্তু আপনি আলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে সব কিছুই খুব পরিষ্কার দেখছেন। অথচ আপনিও নাকি আমাদের মত বিশ্বস্ত একজন কর্মচারী।' হালদার ধীরে ধীরে কথাগুলো বললেন।

বিস্মিত হয়ে কাপুরের দিকে তাকিয়ে রইলাম, যখন কাপুর হাসি মুখে বলতে লাগলেন 'আওয়ার মিস্টার চ্যাটার্জি আজ সত্যি সত্যি অদ্ভুত সুন্দর একটা পয়েন্ট

তুলেছেন। যদিও প্রশ্নটা আমার পক্ষে খুবই অ্যামব্যারাসিং, তবুও আই টেক মাই হ্যাটস অফ।' কাপুর টুপি খোলার ভঙ্গী করলেন। একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন, 'খুব সরলভাবে বলতে হলে আমি সত্যি সত্যি এ প্রশ্নের জবাব জানি না, স্থূলভাবে দেখলে আপনারা সবাই কোম্পানীর বিশ্বস্ত কর্মচারী। আমার বিদ্যা কিংবা বুদ্ধি এর চেয়ে বেশী দূরে আমাকে অগ্রসর হতে সাহায্য করছে না। তবে আপনারা যদি ইচ্ছা করেন আপনাদের বক্তব্য আমি মোটামুটি যা বুঝলাম, হেড অফিসে জানাবো। শুধু জানাবোই না। কথা দিচ্ছি আমি রেকমেনড করবো, কোন হাই-পাওয়ার কমিটি গঠন করে প্রত্যেক কর্মচারীর সংগে আলোচনা করা হোক এবং ভবিষ্যতে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পূর্বে সকলে না হোক, আপনাদের মনোনীত সদস্য যেন সেই মিটিং-এ উপস্থিত থাকেন। অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করবো। আজ সত্যি সত্যি আমি খুব ব্যস্ত। শিগগিরই জাপান থেকে ট্রেড ডেলিগেটস আসছে, আপনারা সবাই জানেন, আমরা ক্রমশই ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পেছিয়ে পড়ছি। অথচ একদিন বাংলাদেশ সবার আগে থাকতো। আর একটা কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলার লোভ সামলাতে পারছি না। আপনারা হয়ত কেউই জানেন না, আমার মা বাঙ্গালী ছিলেন।' সবাই একসংগে কাপুরের মুখের দিকে তাকালাম। এমনকি সন্দীপ্রমাও মুখ নীচু করতে ভুলে গেল।

মজুমদার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমরা তা হলে যেতে পারি।'

হালদার মশাই বললেন, 'কেনই বা এলাম, কেনই বা যাচ্ছি বুঝতে পারলাম না।'

কাপুর বললেন, 'আপনাদের প্রথম দুটো দাবী আমি এখনই মিটিয়ে দিচ্ছি। ভবিষ্যতে সিনিয়রিটি হিসেবে প্রমোশন হবে। বাইরের থেকে লোক নেওয়ার দরকার হলে ইউনিয়নের সংগে কথা না বলে সেই কাজ করা হবে না। তৃতীয় বিষয়ে, অর্থাৎ কিনা বোনাস সম্বন্ধে হেড অফিসে আজই চিঠি পাঠাবো।'

'কাপুর হেসে হেসে বলতে লাগলেন, 'আপনাদের তিনটি দাবীই ছিল এবং তিনটিই মিটলো, ইউ সুড বি হ্যাপী।'

সবাই বেরিয়ে এলাম, হালদার বললেন, 'এদের সংগে কথা বলায় এই মুস্কিল, ঘরের ভেতরে থাকলে মনে হয়, জিতলাম। কিন্তু বাইরে এসে দেখি, জল যেখানে ছিল, সেখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। তবে চাটুজ্জে পয়েন্টটা তুলেছিল ভাল।'

দরজার বাইরে সবাই অপেক্ষা করছিল। অনেকেই একসংগে প্রশ্ন করল, 'কি হল?'

মজুমদার বলল, 'একটা মিটমাট হল। মিটমাট আর কি, আমরাই জিতলাম।'

অ্যাকাউন্টসের অসীম তালুকদার হালে বিয়ে করেছে। সে জিজ্ঞেস করল, 'ঘেরাও হবে না?'

ওর কলিগ সঞ্জয় দত্ত টিপ্পনী কাটল, 'বউকে নিয়ে ম্যাটিনীতে যাবেন বুঝি? টিকিট কাটা হয়ে গেছে?'

অসীম চীৎকার করে উঠল, 'পার্সোনাল ব্যাপার নিয়ে পাবলিকলি আলোচনা করা আইন বিরুদ্ধ।'

সঞ্জয়ও হটবার পাত্র না। সেও পাল্টা জবাব দিল, 'ঘেরাওয়ের নাম করে কেটে পড়া খুব আইনসম্মত, না? বউ বউ করেই মরবে লোকটা।' সঞ্জয় মুখ বিকৃত করল।

অসীম কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই মজুমদার চীৎকার করে উঠল, সায়লেন্স। ব্যক্তিগত ঝগড়া মারামারি কিছুক্ষণ বন্ধ থাক। হলঘরে আজ মিটিং হবে।' তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'অসীমবাবুর যদি সত্যি সত্যি টিকিট কাটা থাকে, আপনি যেতে পারেন। আফটার অল নতুন বিয়ে করা বউ, একটু অ্যালাওয়েন্স দেয়া যেতে পারে।' বলে চোখ নাচাল। মুকুন্দ মল্লিক মুখ ঘুরিয়ে নিল। সেইভাবেই জিজ্ঞেস করল। 'মিটিং কখন?'

মজুমদার নকল অভিমান দেখাল, 'ইউনিয়নের সেক্রেটারী আপনি আর সময় বলে দেবো আমি।'

মল্লিক একটুক্ষণ কী ভাবল, তারপর বলল, 'এক্ষুনি হতে পারে।'

সবাই সোরগোল তুলে হলঘরের দিকে ছুটল। আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। ক্রমশঃই কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ছিলাম। কী যে মনে হচ্ছিল বলতে পারব না। হয়ত কিছুই মনে হচ্ছিল না। মনটা শুধু দারুণ ফাঁকা হয়ে যাচ্ছিল। এক রকম আছে না, কোথাও কিছু নেই হঠাৎ বড় একটা মাঠের দিকে তাকিয়ে আকাশ দেখতে দেখতে কিংবা সমুদ্রের পাড়ে বসে মনটা খুব হালকা হয়ে যেতে লাগল; এত হালকা যে শেষ পর্যন্ত একসময় মনে হতে লাগল আমার মন বলে কিছু হয়ত নেই। তখন নিজেকে আর নিজ বলে মনে হয় না—কিছুকেই কিছু মনে হয় না। শুধু মনে হয় একটা বিরাট শূন্যতার মাঝে অনাদিকাল ধরে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি, আমার সৃষ্টি স্থিতি লয় কিছুই নেই। শুধু একটা অনুভূতি, আমি আছি। অথচ এই থাকার মধ্যে কোন প্রেরণা নেই। আমি যেন না থাকলেও চলত।

তিনকড়ি হালদার যে পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন খেয়াল করিনি। আমার একটা হাত ধরে উনি বললেন, 'আপনার কাপোরকে নিশ ইঙ্গিত করা হল বলে মনে হচ্ছে?'

ঘাড় নেড়ে বললাম, 'না হালদারমশাই। বিশ্বাস করুন, সেকথা ভাবছি না। কিছুই ভাবছি না। শুধু দাঁড়িয়ে আছি। মনে হচ্ছে কতদিন ধরে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছি।'

হালদার প্রবীণ মানুষ। হঠাৎ ছেলে-মানুষের মত খিল খিল করে হেসে উঠলেন। 'বয়সের কালে, বিশেষ করে বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত পুরুষমানুষের মাথায় দারুণ দারুণ আইডিয়া আসে। আমিও তখন খুব ভাবতাম। তখন বয়স কত আর হবে বড় জোর বাইশ-তেইশ। সবে বিয়ের কথাবার্তা চলছে। মাথায় সে কী সব আইডিয়া! কোন কোন সময় মস্ত বড় জিজ্ঞাসা মনে আসছে, এই পৃথিবীতে আমি এলাম কেন? কী আমার কর্তব্য সে কথাটাই যদি না জানলাম, কাজ কী করবো। আবার কোন সময় মনে হতো—ঠিক আপনার মনে হওয়ার মত, নদীর পাড়ে বসে আছি নৌকা তো এল না। শেষ পর্যন্ত একদিন ময়ূরপঙ্খী এল। তারপর থেকে সব ঠিকঠাক। এখন আর ওসব মনে হয় না। এই সব আর কিছু না, বিয়ে না করার রোগ। বিয়ে করে ফেলুন, তখন মনে হবে যার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম সেতো এসে গেল, আর কেন। চলুন, ওরা চলে গেছে। দেখি কী বলে ওরা।'

(ক্রমশঃ)

জগদ্ধাত্রীপুজো আগের গল্প পরের কাহিনী

শুভংকর পাঠক

জগদ্ধাত্রী পুজোর কথা উঠলে, এখন সবাই চন্দননগরের নাম করেন। চন্দননগরই বিখ্যাত। সকলকে টেক্কা দেয়। তুলনায় কৃষ্ণনগর তুচ্ছ। নিষ্প্রভ। তাই বলে চন্দননগরে এ পুজোর সূত্রপাত নয়। সে অন্য গল্প। অন্য কাহিনী। ইতিহাসের রাজপথে তার বিস্তার নেই। অন্তত কেউ তার প্রমাণ চাইলে, প্রমাণ দেওয়া যাবে না। লোকশ্রুতির গলিপথে সে কাহিনীর শেকড় প্রসারিত।

শোনা যায়, তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণই নাকি বাংলাদেশের মানুষকে চমকে দিয়েছিলেন, প্রথম দুর্গা পুজো করে। দেশের লোক ধন্য ধন্য করেছিল। হ্যাঁ, রাজার মতো রাজা বটে। পুজোর আয়োজনও রাজকীয়।

সেদিন, কংসনারায়ণের সুখ্যাতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মনে কি জ্বালা ধরিয়েছিল, কে জানে। শুয়ে-বসে স্বস্তি নেই। খবর এল, দেশের লোক যাচ্ছে তাহেরপুরের পুজো দেখতে। মানুষের সে কি উৎসাহ। সে কি উত্তেজনা! কেউ যাচ্ছে পায়ে হেঁটে। কেউবা নৌকোয় চড়ে। যাওয়ার আর বিরাম নেই।

কংসনারায়ণ কীর্তি রাখলেন, বাংলাদেশে জাতীয় উৎসবের সূচনা করে।

তাহলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কি হেরে যাবেন? নদীর স্রোতের মতো এই জনতার স্রোতকে কি করে ফেরানো যায় তাহেরপুর থেকে কৃষ্ণনগরের দিকে? কংসনারায়ণের মতো তিনিও নদীয়ার মানুষ। জমিদার হলেও তাঁর প্রতিপত্তি কম নয়। স্বাধীন রাজার মতোই তাঁর রাজসভার খ্যাতি। বিশেষ করে, দান-ধ্যান করে তিনি দেশের মানুষের হৃদয় জয় করে রেখেছেন। এবারে বুঝি কংসনারায়ণ তারই শোধ নিলেন।

ফন্দি আঁটলেন কৃষ্ণচন্দ্র। যে-কাজ রাজা কংসনারায়ণ একবার করে ফেলেছেন, সেই কাজ আর নয়। পণ্ডিতদের সঙ্গে অনেক শলা-পরামর্শ হল। নিজেও অনেক ভাবলেন। অনেক চিন্তা-ভাবনা করলেন। অবশেষে উপায় বেরুলো। ডাকো, ডাকো, কুমোরদের, প্রতিমাশিল্পীদের।

তাঁরা সব শুনলেন। বুঝলেন। এতকাল ধরে পুতুল বানিয়েছেন, আর সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রীর একটা মূর্তি বানাতে পারবেন না? মহারাজের ইচ্ছে, আর শিল্পীদের নৈপুণ্য সম্মিলিত হল, সিংহবাহিনীর মূর্তিতে।

তাহেরপুরের জনতা দুর্গাপুজোর উৎসব আর মেলা দেখে বাড়ী ফিরে গেল না। কৃষ্ণনগরমুখী হল।

কিন্তু এই কাহিনীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা নেই। জনশ্রুতি অন্য রকম রূপ নিল। তাও বেশ মজার।

সেবার কৃষ্ণচন্দ্রের রাজকোষে অর্থের বেশ ঘাটতি দেখা দিয়েছে। মুর্শিদাবাদের নবাব তখন আলিবর্দী খাঁ। বার বার তাঁকে খবর পাঠানো হল। কৃষ্ণচন্দ্রের খেয়াল সেদিকে নেই। কিংবা থাকলেও টাকা কোথায় যে খাজনা দেবেন!

নবাব আলিবর্দী খাঁ দারুণ অসন্তুষ্ট। তাহলে কৃষ্ণচন্দ্র কি স্বাধীনতা ঘোষণা করতে চায়? সন্দিগ্ধ আলিবর্দী খাঁ তাঁকে ডেকে পাঠালেন। আর কোন কথা নয়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে পাঠিয়ে দিলেন হাজতবাসে।

তখন আশ্বিন মাস। শরৎকাল। আকাশে উড়ছে হালকা মেঘ। উৎসবের বাদ্যি বাজছে কোথাও-না-কোথাও। কৃষ্ণচন্দ্র

হাজতে বসে মেঘও দেখেন নি। বাদ্যিও শোনেন নি। কিন্তু হৃদয়ে বুঝি মায়ের ডাক এসে পৌঁছেছিল। তাই তিনি আকুল হয়ে দেবীকে জানালেন [illegible]?

সেই সময়ে মহারাজের মনেও পরিবর্তন এল অলৌকিক উপায়ে। তিনি তাঁর ভুল বুঝলেন। কৃষ্ণচন্দ্রকে মুক্তি দিলেন পরের দিনই। গঙ্গার ধারে ছিপ বাঁধা ছিল। সেই ছিপ নৌকায় করে মহারাজ দ্রুত ছুটলেন কৃষ্ণনগরের দিকে। ছিপ যত জোরে যায়, মহারাজের মন চলে তার চেয়েও অনেক বেশী জোরে। নদীর ধারে তিনি দেখতে পান অজস্র কাশফুল। তাঁর মন হাহাকার করে ওঠে। তাহলে কি মায়ের পায়ে অঞ্জলি দেওয়া যাবে না?

সপ্তমী গেছে। অষ্টমী গেছে। নবমীর দিন তিনি কৃষ্ণনগরে এসে পৌঁছলেন। ঢাকের বাদ্যি শুনেই তাঁর জ্ঞান লুপ্ত হল। সব শেষ। সব চেষ্টা ব্যর্থ। সেই অবস্থাতেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বপ্ন দেখলেন, দেবী তাঁর সামনে উপস্থিত।

কিন্তু এ কে? তাহেরপুরের রাজা যাঁর পুজো করেন, অনেকটা দেখতে তাঁরই মতো। তবু তিনি হুবহু তা নন। দেবী তাঁকে বললেন, দুঃখ করো না, কৃষ্ণচন্দ্র। আশ্বিনের শুক্লপক্ষ গেছে। পরের শুক্লপক্ষে তুমি আমার পুজো করো। তাতেই তোমার দুঃখ ঘুচবে।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র চোখ খুললেন। দেবী অন্তর্হিতা। রাজপুরীতে ফিরে এসে তিনি সেই স্বপ্নের কথা সকলকে বললেন। দেবীর বর্ণনা দিলেন। সকলে শুনে বললেন, এই দেবী নিঃসন্দেহে দুর্গা। তবে, দক্ষিণ ভারতে হাজার দু হাজার বছর আগে, দ্রাবিড়রা এক দেবীর পুজো করতেন। তার সঙ্গে এর মিল আছে। তিনি অসুরনাশিনী নন, জগদ্ধাত্রী।

এই কাহিনীর পাঠভেদ নয়, প্রভৃতিভেদ আছে।

কেউ কেউ বলেন, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে নবাব আলিবর্দী খাঁ বন্দী করেন নি। বন্দী করেছিলেন দিল্লীর বাদশাহ। এবং জায়গাটা মুর্শিদাবাদ নয়, মুঙ্গের।

কাহিনী আর যাই থাক, ঘটনা এই যে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রই প্রথম বাংলাদেশে জগদ্ধাত্রী পুজো করেছিলেন। তারপরে করেছিলেন গুপ্তিপাড়ার জমিদারেরা। এবং যেহেতু, দুর্গা পুজোর মতো জগদ্ধাত্রীর পুজোও রাজকীয় কায়দায় হত, সেইহেতু রাজারাজড়াদের বাড়ী ছাড়া অন্য কোথাও এরকম পুজোর প্রচলন ছিলই না। বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষ ছোটখাট দেবদেবীর কাছে সুখ-দুঃখের প্রার্থনা জানাত।

কথায় আছে, রাজার ধর্ম বড় ধর্ম। ইংল্যাণ্ডে যখন যে-রাজা যে-ধর্ম নিয়ে মাতামাতি করেছেন, প্রজারাও তাই মেনে নিয়েছে। বাংলাদেশেও আর্য-দেবীর পুজো প্রচলনে তেমনি জমিদারদের একটা ভূমিকা ছিল। দুর্গা পুজোর প্রবর্তনে যেমন, জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রচলনে তেমনি, তাই প্রমাণিত হয়।

এর আরেকটা কারণও ছিল।

দেশের রাজনীতির মোড় ফেরাবার, সমাজ-শাসনের, তাঁরাই ছিলেন মূল শক্তি। এখনকার মতো তখনকার দিনে জমিদারদের কোনো দুর্ভাবনা ছিল না। একের সঙ্গে অন্যের যোগাযোগও ছিল সামান্যই। কিন্তু যখনই তাঁরা সম্মিলিত হয়েছেন, তখনই দেশের আবহাওয়া গেছে পাল্টে। কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা তাঁদের হাতে ক্রীড়নক হয়ে গেছে।

এই জাতীয় পুজো-উৎসবগুলিই তাঁদের রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সের মত পারস্পরিক যোগাযোগের সুযোগ এনে দিত। রাজারাজড়ারা এক সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন। বাঈজীর নাচ এবং কবির লড়াই দেখতেন। ইংরেজ সাহেবরা তো হামেশাই খানাপিনা করতেন জমিদার বাড়ীতে। এইভাবে দেশের শাসনকেও পাকাপোক্ত করার উপায় আবিষ্কার করতেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জগদ্ধাত্রী পুজোয় কারা কারা নিমন্ত্রিত হতেন, তার কোনো সঠিক বিবরণ এখন পাওয়া যায় না। তবে, সিরাজদ্দৌল্লার পতনের আগে, মীরজাফরের মতো অনেকের সঙ্গেই যে, ইংরেজ বেনেদের যোগাযোগ হয়েছিল, তা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়। কেননা, সিরাজের দুর্বলতার সুযোগ নিতে কেউ কার্পণ্য করে নি। এটা ঐতিহাসিক সত্য।

যাই হোক, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নিজের প্রবর্তিত জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রচারে একেবারে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না।

তখন চন্দননগর ফরাসীদের অধীন। ছোট্ট শহর। দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ছিলেন বিখ্যাত ধনী ও সমাজপতি। তাঁর কত টাকা ছিল তা কেউ বলতে পারে না। কেউ বলেন, লক্ষ লক্ষ। কেউ বলেন, কোটি কোটি টাকার মালিক। কেউবা বলেন, তার চেয়েও বেশী। লর্ড ক্লাইভ নাকি একবার তাঁর বাড়ীতে হানা দিয়ে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা লুঠ করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

এবং সে টাকা কাগজের ছিল না। ছিল রুপোর। বস্তা ভর্তি করে, ঘোড়ার গাড়ীতে চাপিয়ে ক্লাইভ যখন টাকা নিয়ে যান, তখন দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ সামান্য কথাটি পর্যন্ত বলেন নি। যেন কি আর গেছে, এমনি ভাব।

সেজন্যে ফরাসীরা তাঁর ওপরে নির্ভর করতেন। তাঁর হাতেই ছিল চন্দননগরের রাজস্ব আদায়ের ভার। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রেরও তিনি ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

কৃষ্ণচন্দ্র বুঝলেন, জগদ্ধাত্রী পুজো করতে হলে, দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণের সাহায্য দরকার। সেজন্যেই বোধহয় তিনি তাঁকে নিমন্ত্রণ করে বসলেন, কৃষ্ণনগরে। ইন্দ্রনারায়ণ পুজোর কদিন মহারাজার অতিথিশালায় কাটালেন। শলাপরামর্শ, শলা-পরামর্শ করলেন। তার বিষয় এখন অজ্ঞাত।

তবে, কৃষ্ণনগর থেকে ফেরার আগেই, ইন্দ্রনারায়ণ প্রস্তাব করলেন, চন্দননগরে আমিও জগদ্ধাত্রী পুজো করতে চাই। কি বলেন?

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তো খুশীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। সে কি কথা! মা কি কারো একলার! এতে আবার পারমিশন নেবার কি আছে? আপনি জগদ্ধাত্রীর পুজো করলে তো ভালোই। দেশের মঙ্গল।

চন্দননগরে দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী জগদ্ধাত্রী পুজো করলেন, তার পরের বছরেই। বুঝি তাঁর জাঁকজমক মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের চেয়ে এতটুকু কম হয় নি। কে প্রতিমা তৈরী করেছিলেন? নিবারণ কারিগর? হতে পারে। আবার নাও হতে পারে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রই হয়তো কোনো প্রতিমা শিল্পীকে পাঠিয়ে ছিলেন কৃষ্ণনগর থেকে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসে লেখা-লেখির নজীর কম।

তবে অনুমান করা যায়, দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণের প্রকাণ্ড বাড়ীতে ঝাড়লণ্ঠনের আলোগুলি জ্বলেছিল সারা রাত। জলসা ঘরের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছিল। ফরাসী রাজপুরুষেরা যথেষ্ট পরিমাণে মদ্য পান ও বাঈজী নাচ দেখার সুযোগ পেয়েছিল।

তখন কলকাতার বাড়বাড়ন্ত ছিল না। কলকাতা ছিল সামান্য জনপদ মাত্র। তার আগেই ফরাসডাঙায় ফরাসীরা বেশ গুছিয়ে বসেছেন। দিল্লীর বাদশা আলমগীর এ নিয়ে মাথা ঘামান নি। তাছাড়া ইংরেজদের মতো তাঁরা দুর্বিনীত ছিলেন না। অ্যাবিশাসও নন।

ফলে, স্বদেশের লোক ফরাসীদের অস্তিত্ব নিয়ে মাথা ঘামায় নি। পুজোর সময় লোক যেত কাতারে কাতারে। রেল লাইন ছিল না বলে পায়ে হাঁটা পথেই সকলের যাতায়াত ছিল। গঙ্গা ধরে কেউবা যেতেন পিনিসে কিংবা ডিঙি নৌকোয়।

ইন্দ্রনারায়ণের পুজো সফল হয়েছিল।

সেকালে বাংলাদেশের মানুষকে দু ভাগে ভাগ করে, উৎসবের ডাক দিতেন কৃষ্ণচন্দ্র আর ইন্দ্রনারায়ণ। হুগলী, বর্ধমান,
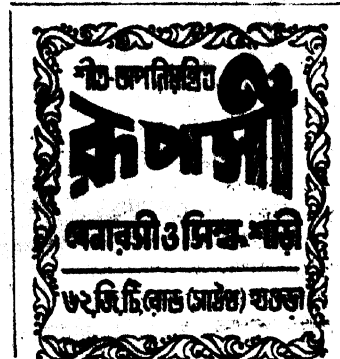
হাওড়া, চব্বিশ পরগণার মানুষ আসতেন ফরাসডাঙ্গার পুজো দেখতে। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়ায় লোক যেতেন কৃষ্ণনগরের পুজোয়।

তাই নিয়ে, ফরাসডাঙ্গার সঙ্গে কৃষ্ণনগরের কখনো বিরোধ বাধে নি। আরলির দুর্গ থেকে ফরাসী সেপাইরা এসে উৎসবে যোগ দিতেন ইন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে। তাঁরা দেশী শ্রোতার সঙ্গে বসে শুনতেন কবিগান।

সে ছিল জমাটি ব্যাপার।

কবিয়াল এন্টনী ফিরিঙ্গী, রাসু-নৃসিংহ ছিলেন ওখানকার লোক। কেবল পুজোর চার দিন নয়, তারও পরে বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে চলত উৎসব, আর উৎসব। নীমণি পাটনী, নবীন গুঁই, বৌমাস্টার, মদন মাস্টারের মতো কবিওয়ালারা তো আসর মাত করতেনই। তার ওপরে ঘুঘুডাঙ্গার দল থিয়েটার করে খুব নাম কিনেছিল এই উপলক্ষে। ছিল পাঁচালী, তর্জার আসর। সব মিলিয়ে চন্দননগর এক আকর্ষণীয় জায়গা।

তখন ফরাসডাঙ্গায় খুব কলার চাষ হত। এখনও হয়। এবং সেই কলার তৈরী মদের আকর্ষণটাও ছিল কম না। সরকারী ভাঁটিখানা চালু থাকত অনেকগুলি। ছিল ১৮১টি মদের দোকান। তবু মাত্র চার ডজন নীল টুপি-পরা দেশী পুলিশ শান্তিরক্ষার কাজ চালাত। লুঠতরাজও বেশী হত না।
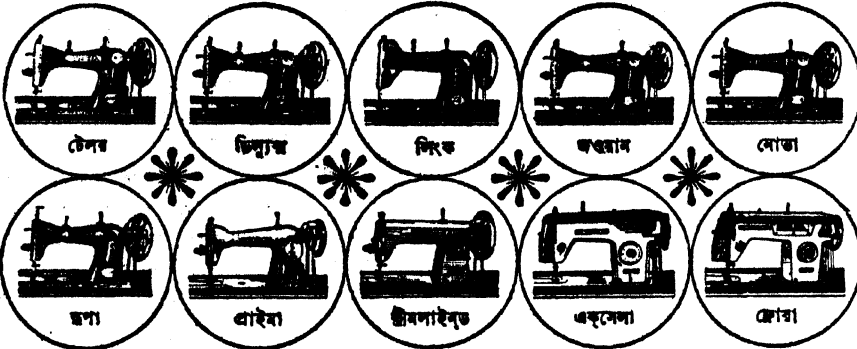
এখনো ওখানকার দু-চারজন বুড়ো-

সেকথা স্মরণ করে দীর্ঘশ্বাস ন। কি সুখের দিনই না ছিল!

ক্রমে চন্দননগরের গৌরব হ্রাস পায়, তার গৌরব বাড়ার ক্ষমতা সঙ্গে। ান ইন্দ্রনারায়ণের কালও একদিন শেষ গেল। লক্ষ্মীগঞ্জের বাজারে এলেন র ব্যবসায়ীরা। তাঁদের উদ্যোগে প্রথম া হল, মহাধুমধাম করে। জমিদারদের থেকে জগদ্ধাত্রী পুজো বারোয়ারী নিল ক্রমশ। একটা, দুটো, বাড়তে : এখন বারোয়ারী পুজোর সংখ্যা য়েছে প্রায় একশ।

কটা ছোট শহরের পক্ষে এ সংখ্যাটা কম নয়।

র্গা পুজোর পর, সেজন্যেই ওখানে পুজোর বারোয়ারী উদ্যোগে তেমন সঞ্চারিত হয় না। কলকাতা যখন ীন, সারা পশ্চিম বাংলা যখন ত, তখন চন্দননগরে ঢাকের বাদ্যি সরবে। প্যান্ডেলের সজ্জায় তাঁরা টাকা খরচা করেন না। কিন্তু সজ্জায় দু-একটি মণ্ডপ কলকাতাকে দেয়।

লেক্ট্রিক লাইট আসার আগে অবশ্য ট করা সম্ভব ছিল না।

ালোর কারসাজিতে ওরা দেখান, কোন দৃশ্য, উড়ো জাহাজের চলাচল, াসার খেলা, কিংবা সমকালীন কোন নীয় ঘটনার ছবি।

তিমা আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে, আয়তনে লংকার সমৃদ্ধ সাজসজ্জায় বৈচিত্র্যে। ীর মুখ এখনো মানবীয় হয়ে ওঠে াখ টানাটানা। অব্যয়ে গর্জন তেলের । মূর্তির উচ্চতা প্রায়শ ১৫ থেকে ২৬ ফুটের মত। কোথাও বা দেবীর ভজহলা সমান।

জন্যেই বিসর্জনের দিন সারা চন্দন- অন্ধকার করে দিয়ে ইলেকট্রিকের তার ফলাতে হয়। লরীর ওপরে প্রতিমা বেরোয় মিছিল। সেই মিছিলের থবে। সামনে-পিছনে অজস্র লরী না বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে। কোনো থাকে দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরে রামকৃষ্ণের ইমেজ, কোনটিতে-বা ার কাছ থেকে শিবের ভিক্ষা- দৃশ্য।

া, এখন যে বাজী পোড়ানো হয়, তু অতীতের তুলনায় কিছুই নয়। ং-বেরংয়ের হাউই উড়ত আকাশে। সাহায্যে ফুলের মালা, প্রদীপের তরী হত মাথার ওপর। বেলুনের থনো ওড়ে। ফানুসও ওড়ানো হয়।

তু বিগত শতাব্দীর আয়োজন নাকি াপক ছিল। তার সাক্ষী এখন কেউ বে পারিবারিক স্মৃতিশ উত্তরাধি-

কারে, এখনো কেউ কেউ সেই গৌরবের কথাই স্মরণ করেন। কেউবা বিরক্ত হন, রাইকে হিন্দী সিনেমার গান শুনে, তারা নাচ দেখে। এসব কি ভাল? জগৎ কি জাহান্নামে যাচ্ছে?

তাঁরা সময়ের সঙ্গে তালমিল রাখতে গিয়ে বেসামাল বোধ করেন। এর তো কোনো প্রতিকার নেই! জলসা, পাঁচালী, যাত্রা গানের পুরনো ঐতিহ্য তো ইচ্ছে করলেই ফিরিয়ে আনা যায় না। অতএব, মাইক তরজা।

তবে ঢাকের বাদ্যি তো কম বাজে না।

উৎসবের দিনগুলিতে সারা রাত রাস্তাঘাটে লোক চলাচলের বিরাম থাকে না। সেই সব দেশ-দর্শকের অধিকাংশই চন্দননগরের লোক নয়। কলকাতা কিংবা পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত। অট্টালিকা-আদালতের পর, অনেকে ট্রেনে চড়ে আসেন। ভদ্রেশ্বর কিংবা মানকুণ্ডু কিংবা চন্দননগর স্টেশনে গিয়ে নামেন।

যেমনা, এই তিনটি স্টেশনের যে-কোনো একটিতে নামলেই প্রতিমা দেখার সুযোগ মেলে। উত্তর চন্দননগরে হয়, অন্তত ষোলটি পুজো। যথাক্রমে তালডাঙ্গা, হরিদ্রা-ডাঙ্গা, বিবিরহাট, চাঁপাতলা, গোরিবাপাড়া, লক্ষ্মীগঞ্জ, বিদ্যালংকা, পালপাড়া ও বড়-বাজার।

মধ্য চন্দননগরে যে-কটি পুজো হয়, তার মধ্যে কয়েকটি বেশ প্রাচীন। একটি স্থানে পুজো হচ্ছে ১২৪২ সন থেকে প্রায় ১৩৮ বছর ধরে। এই এলাকার মধ্যে খলিসানী, ফটকগোড়া, স্টেশন রোড, বাগ-বাজার, হাটখোলা, রথের সড়ক, লালবাগান, বৈদ্যপোতা, রাসবিহারী এভিনিউ এবং ডুপ্লেপটির পুজোগুলি বিখ্যাত। বিশেষ করে, হালদারপাড়া পুজোর চালচিত্রের কাজ খুব ভালো হয়।

ভদ্রেশ্বরে পুজো হয়, তাও প্রায় চৌদ্দ-পনেরোটি। এখানকার সবচেয়ে প্রাচীন পুজোটি অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে ১২০০ সন থেকে। তেঁতুলতলায়।

এবং দক্ষিণ চন্দননগরে পুজো হয় আঠারো-কুড়িটি। তাদের মধ্যে গোপালবাগ, লিচুতলা, বেশোহাটা, তেলিঘাট, চার মন্দির-তলা, বটতলা (স্নাত ঘাট), সরান রোড, বাগবাজার বিবিরহাট রোড, কলুপুকুর ধার, মুচিপাড়া, বোড়াই, বাগাসাড় দুর্গোত্তরপাড়া, গড়ের ধার, ব্যানার্জিপাড়া, মানকুণ্ডু, সার্কাস মাঠ এবং সাহেববাগানের নাম উল্লেখযোগ্য।

কেউ যদি পুরোনো দিনের স্মৃতি নিয়ে ফরাসডাঙায় যান, তাহলে দুঃখ পেয়ে ফিরে আসতে হবে। দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণের সময়ের আমরা কেউ নেই। কিন্তু কেউ যদি নতুন কিছু দেখব বলে চন্দননগরে যান, তাহলে অনেক কিছু নতুন দেখার আছে।

মহামান্য ডুপ্লেকে এখন কোনো জলসা-ঘরে দেখা যাবে না। রাজা-কমিশনের আসরে উপস্থিত থাকবেন না কোনো সেনা-সেনাপতি। আসলে ওসব কিছুই নেই।

দেখতে হবে, প্রতিমার মুখ, গায়ের রংপোলি অলংকার, শোলার গয়না, ডাকের সাজ, চোখের ভ্রূ এবং অসম্ভব ঐশ্বর্যময়ী মূর্তির বিশাল শরীর। হয়তো পথ চলতে চলতে কেউ আঁতকে উঠবেন, কোনো নামের ফলক দেখে, বিদেশী স্মৃতির উপনামেশে বিস্ময় হয়ে।

এককালে ফরাসডাঙায় ছিল দিনেমার-দের কুঠি। গোন্দলপাড়ার দক্ষিণ দিকের খানিকটা অংশ তো এখনো 'দিনেমারডাঙা' নামে পরিচিত। জার্মানরাও চন্দননগরের প্রেমে ছিলেন মুগ্ধ। সম্রাট ফ্রেডারিক দি গ্রেট একবালে চেয়েছিলেন, 'বেঙ্গালিশে হ্যাণ্ডেলস গেসেল শাফট' নামে একটা কোম্পানী পত্তন করতে।

তাঁরা কেউ নেই। চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো আছে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আর দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর স্মৃতিবাহী হয়ে। যেমন, তাহেরপুরের গৌরব অস্তমিত, তেমনি কৃষ্ণনগরও ম্রিয়মান। তবু চন্দন-নগরের জগদ্ধাত্রী পুজো আছে, ঐতিহ্যের সূত্র ধরে, বারোয়ারীরূপে। শারদীয়ার পর এও তো এক বড় আকর্ষণ! একসময়ে ঢাকায় জন্মাষ্টমী উপলক্ষে যে-মিছিল বেরোতো এবং এখনো দলেরা উপলক্ষে উত্তর-ভারতে যে-মিছিল বেরোয়, চন্দন-নগরের জগদ্ধাত্রী পুজো-উৎসব কিন্তু তার তুলনায় নিস্তেজ হয়ে পড়ে নি।

সাহিত্যালোচনায় মুহম্মদ আবদুল হাই

আজহারউদ্দীন খান

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন মধ্য ও আধুনিক যুগ সম্পর্কে মুহম্মদ আবদুল হাই সাহেবের সমান আগ্রহ ছিল। তাঁর 'চর্যা-গীতিকা' (১৯৬৮), আনোয়ার পাশার সহযোগে 'কালকেতু উপাখ্যান' (১৯৬৭), আহমদ শরীফের সংগে 'মধ্যযুগের গীতি-কবিতা' (১৯৬৩), আনোয়ার পাশার সংগে 'মানসিংহ - ভবানন্দ উপাখ্যান' (১৯৬৭), ঈশ্বর গুপ্তের 'কবিতা সংগ্রহ' (১৯৬৯), আনিসুজ্জামানের সংগে 'বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ' (১৯৬৮), 'দীনবন্ধু রচনা সংগ্রহ' (১৯৬৮) সম্পাদনা তার অন্যতর দৃষ্টান্ত। সাহিত্যের ধারাবাহিক আলোচনা তিনি করেননি। সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় ও সাহিত্যিক সম্পর্কে পড়াশুনা করতে করতে তিনি যা ভেবেছেন, তাকেই তিনি মাঝে-মধ্যে প্রবন্ধের রূপ দিয়েছেন। ছাত্রদের পড়াতে গিয়ে নিজেকেও পড়তে হয়েছে। এই পড়াশুনার ফসলই বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধের সমষ্ঠি—কাজেই ধারাবাহিকতা আশা করা বৃথা। ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করার আগে সরকারী কলেজে অধ্যাপনা করার সময় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সাহিত্যবিষয়ক প্রচুর প্রবন্ধ লিখেছেন; পরে ভাষাবিজ্ঞান চর্চার ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্য-বিষয়ক কিছু কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর বিভিন্ন বিষয়ের প্রবন্ধ পাঠ করে সাহিত্য-পাঠকরূপেই তাঁর পরিচয় আবিষ্কার করি। তাঁর বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধগুলিই কয়েকটি গ্রন্থের সংলগ্ন হয়েছে।

তাঁর প্রথম যে প্রবন্ধটি পশ্চিমবাংলা থেকে বেরিয়েছিল, সেটি ছিল অনুবাদ (মানবেন্দ্রনাথ রায় রচিত দি হিস্টোরিক্যাল রোল অফ ইসলাম গ্রন্থের অনুবাদ—ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান, (ফেব্রুয়ারী ১৯৪৯) আর পূর্ববাংলা থেকে তাঁর প্রথম আলোচনামূলক প্রবন্ধের বই 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' ১৯৫৪ সালে বেরোয়। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন, 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনাব্যপদেশে বিগত বারো বৎসরের চিন্তা ও সাধনা বিভিন্ন সময়ে প্রবন্ধাকারে নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করি। রেণুলোকে বিস্মৃতির হাত থেকে উদ্ধার করে এ-গ্রন্থে একত্রিত করে দিলাম। প্রবন্ধগুলো আপাত-বিচ্ছিন্ন বলে মনে হলেও বিশেষ সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে বিভিন্ন সময়ে ভাষা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের যে বিকাশ হয়েছে, মূলত তারই আলোচনা বলে প্রবন্ধগুলোর মধ্যে চিন্তাধারার একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাবে।' (আগস্ট ১৯৫৪)। তাঁর এই গ্রন্থ প্রধানত ১৯৪৩ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত লিখিত প্রবন্ধের সংকলন—মোট সতেরটি প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধগুলো হল এই—

> ভাষা ও সমাজজীবন। আমাদের ভাষা ও সাহিত্য। হিন্দু বাংলার ধর্মান্দোলন ও উনবিংশ শতাব্দী। বাংলাদেশে মুসলিম অধিকারের যুগ ও বাংলা সাহিত্য। কবি সৈয়দ সুলতান। কবি-গুরু আলাওল। মানুষের প্রেম ও কবি আলাওল। রবীন্দ্র-কাব্যে মানবতা। নজরুল-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। বাংলা কাব্যের নতুন ধারা ও নজরুল। কবি শাহাদৎ হোসেন। বাংলা সনেটের পট-ভূমি। ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইসলামের কৈপ্লবিক ভূমিকা। ইসলামে শাসন-সংহতি। মুসলিম ভারতে শিক্ষা-ব্যবস্থা। মুসলিম ভারতে স্ত্রী-শিক্ষা।।

সাহিত্য সংক্রান্ত আলোচনায় তাঁর আর একটি প্রবন্ধ-গ্রন্থ রয়েছে—তার নাম 'ভাষা ও সাহিত্য' (১৩৬৬ ফাল্গুন, মার্চ ১৯৬০)। এই গ্রন্থটি দু' খন্ডে বিভক্ত—প্রথম খন্ডে ভাষা সংক্রান্ত বিষয়ের আটটি প্রবন্ধ, দ্বিতীয় খন্ডে সাহিত্য সংক্রান্ত বিষয়ের একুশটি আলোচনা আছে। তিনি এই গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, 'আমার লেখা ভাষা-সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলো পাঠকেরা যাতে এক জায়গায় পেতে পারেন, সেজন্য [illegible] প্রকাশিত 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' গ্রন্থের 'ভাষা ও সমাজজীবন' শীর্ষক প্রবন্ধটি এখানে পুনর্মুদ্রিত হলো।' গ্রন্থের সূচী নিম্নরূপ—

> ভাষা : ভাষা ও সমাজজীবন। আমাদের সাহিত্যের ভাষা। পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যে ভাষার অনুশীলন। বাংলা ভাষা ও তার পঠন-পাঠন। আমাদের বাংলা উচ্চারণ। রোমান বনাম বাংলা হরফ। বাংলা সাহিত্যে পুরোনো ধারার লেখক ও আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহার। সীমান্তের ভাষা ও সাহিত্য।
>
> সাহিত্য : পূর্ব পাকিস্তানের তামদ্দুনিক সংগঠন। পুঁথি ও পুঁথির ভাষা। পুঁথি সাহিত্য ও কাসাসোল আম্বিয়া। পুঁথি সাহিত্য ও আলেফ লায়লা। ভারতচন্দ্রের মানসিংহ। মৈমনসিংহ গীতিকা। নদীবক্ষে। জমিদার দর্পণ। গিরিশ ঘোষ, ডি এল রায় ও ক্ষীরোদপ্রসাদ। যুগচিত্ত ও গিরিশ-প্রতিভা। কবি কায়কোবাদ। কবি নজরুল। ঔপন্যাসিক নজরুল। কবি জসীমউদ্দীন। আমাদের নাট্য-সাহিত্য। বৈষ্ণব কাব্যে প্রেম। বাংলা কাব্যে নৈরাশ্যবাদ। উর্দু কবিতার জন্মকথা ও কবি হালী। পাকিস্তানের জাতীয় কবি ইকবাল। ইকবালের মোমেন। ইকবালের বাণী।।

তাঁর উপরোক্ত গ্রন্থদুটির সূচীপত্র থেকে দেখতে পাচ্ছি যে, তিনি যেমন ইসলামের কৈপ্লবিক ভূমিকার কথা ভেবেছেন, তেমনি তার শাসন-সংহতি শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। মুসলমান যুগে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ সম্পর্কে যেমন ভেবেছেন, তেমনি মধ্যযুগের পুঁথি সাহিত্য উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণের ওপর তাঁর আলোচনা আছে। আবার বিদ্যাপতি আলাওল সৈয়দ সুলতান যেমন আছে তেমনি গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, কায়কোবাদ, জসীমউদ্দীন সম্পর্কে রচনা আছে। 'কাসাসোল আম্বিয়া', 'আলেফ লায়লা' পুঁথির পরিচয় যেমন দিয়েছেন, তেমনি মীর মশাররফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ' নাটক, দীনেশচন্দ্র সেনের 'মৈমনসিংহ গীতিকা', কাজী আবদুল ওদুদের 'নদীবক্ষে' উপন্যাসের আলোচনা করেছেন। মোট কথা এইসব আলোচনায় তাঁর পঠনস্পৃহার পরিচয় দেয় যাকে ডঃ এনামুল হক 'ভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের সমালোচনা সম্পর্কে 'বিশাল সাহিত্য রাজ্যের বৈমানিক জরীপ' বলে বর্ণনা করেছেন (সাহিত্য পত্রিকা, ১৩৬৭ শীত সংখ্যা)। এই কথা তাঁর যাবতীয় সাহিত্য সংক্রান্ত

াচনা সম্পর্কে প্রযোজ্য। আলোচনা ্রশতিক, তবে মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু ার স্ফুলিঙ্গ আছে যা পাঠককে ্রে তোলে।

ইসলামীয় ঐতিহ্য ও সাহিত্য সম্পর্কে চিন্তা করেছেন। সেই ঐতিহ্যের স 'ইসলামের বৈপ্লবিক ভূমিকা' (১০), 'ইসলামে শাসন সংহতি' (৮ পৃষ্ঠা) ঃ দুটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে অত্যন্ত ৌশলে ব্যক্ত করেছেন যার মধ্যে মূল ইসলাম সম্পর্কে একটি ধারণা পাঠকরা করে নিতে পারবেন। 'ইসলামের বৈপ্লবিক ভূমিকা' প্রবন্ধে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের দৃষ্টি-ভঙ্গীর আদল পাওয়া যায় কিন্তু মুসল-মান হিসেবে যা বিশ্বাস করা শাস্ত্রসম্মত তারই আলোকে তিনি ইসলামের অন্তর্নিহিত শক্তিকে বিশ্লেষণ করেছেন। এই প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে এবং কোন আত্মিক বলে ইসলাম অল্প সময়ের মধ্যে পিকিং থেকে গ্রাণাডা পর্যন্ত নিজের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। শুধু তলোয়ারের দ্বারাই এই বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে ওঠেনি; ইসলামের সার্বজনীন মনুষ্যত্বের অন্তর্নিহিত শক্তির জোরে এই বৈপ্লবিক [illegible] সম্ভবপর হয়েছিল। [illegible] বৈপ্লবিকতার মূলে ছিল সুস্থ মানবতাবোধ, মুক্তবুদ্ধি, নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারহীনতা, আত্মজিজ্ঞাসার তাগিদ, বিচারসহ মান, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ও

পরীক্ষা-পদ্ধতি এবং যুক্তিবাদের অবতারণা। সর্বোপরি মানুষকে মানুষ হিসেবেই তার সর্বনিম্ন অধিকার সম্বন্ধে যেভাবে সচেতন করে দিয়ে গেল, তারই মধ্যে নিহিত রয়েছে ইসলামের বৈপ্লবিক বীজ।' (সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ১৩৮ পৃ)। ইসলাম নিজস্ব সুস্থ সমাজ-চেতনার জোরে ভারতবর্ষে এসে অন্য সভ্যতার মত হারিয়ে যায়নি—সাম্য-মৈত্রী ও জাতিধর্মনির্বিশেষে মানুষের মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠাদানের মধ্যে সে ভারতবর্ষের জীবনযাত্রার ওপর আঘাত হেনেছে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতাপ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল—বিপুল সংখ্যক লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল। পারস্পরিক লেনদেনের ভিত্তিতে ভারতীয় সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। 'অথচ ভারতবর্ষের শিক্ষিত হিন্দু শ্রেণী ইসলামিক সংস্কৃতির পূর্ণ মর্যাদা দেননি। হাই সাহেব এসম্পর্কে বলেছেন, 'ভারতবর্ষ তার অজ্ঞাতসারে ইসলামিক সংস্কৃতির বহু কিছু আত্মসাৎ করেছে এবং পারস্পরিক সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণও নানাদিকে নানাভাবে ঘটেছে। একথা সত্য যে, ইসলামের সভ্যতার গৌরব বুকে ধারণ করেই ইয়োরোপ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পৃথিবীর দিশারী হয়ে উঠল'... (ঐ পৃ ১৪০-৪১)। উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু-মুসলমান মিলিত সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে রাজা রামমোহন রায় যে আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন, পরে সেটি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন আন্দোলন পর্যবসিত হয়েছিল। তিনি বলছেন, 'উনবিংশ শতাব্দীতে খৃষ্টধর্ম ও পাশ্চাত্য প্রভাবের দুর্জয় প্রতিঘাতে এদেশের জাতীয় জীবন যেভাবে বিপন্ন ও মোহমুগ্ধ হইয়াছিল, তাহারই প্রতিক্রিয়ায় রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কয়েকজন ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা মহাপ্রাণ বাঙালীর সাধনায় শুধু হিন্দুধর্মের আনুষ্ঠানিক রূপের নয়, অধিকন্তু তাহার আধ্যাত্মিক ও আদি বৈদিক ভাবের নবতর প্রচারের ভিতরে এদেশের লোক আত্মসম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়াছিল। ইহাকেই যুগসংকটে সনাতন হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন বলা হইয়াছে।' (হিন্দু বাংলার ধর্মান্দোলন ও উনবিংশ শতাব্দী : সাহিত্য ও সংস্কৃতি পৃ ৩৬)। ইংরেজ অধিকারের পরেই হিন্দুরা যেমন ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করে নতুন রাজশক্তির স্নেহচ্ছায়ায় প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল মুসলমানরা ইংরেজী শিক্ষা বর্জন করে বেঁচে থাকার সংকল্প নিল। ফলে প্রতিযোগিতায় তারা অনেক পিছিয়ে গেল আর উনবিংশ শতকে বাংলাদেশে যে আন্দোলন হল তা প্রধানত হিন্দু আন্দোলন ফলে মুসলমানরা একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ধর্মে ও কর্মে হিন্দু-মুসলমান দুটো পৃথক সংস্কৃতি গড়ে উঠতে লাগল, তার ফলে দেশ ভাগ হয়ে গেল। ভারতবর্ষে হিন্দু-সংস্কৃতির প্রাধান্য দেখে মুসলমানরা ভারতভূমিতেই ইসলামকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত করেছে। ধর্মের গোঁড়ামিকে হাই সাহেব প্রশ্রয় দেননি। ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলেও ধর্মের উদার ভিত্তিভূমিতে পাকিস্তান সঞ্জীবিত হোক, যেমন একদিন বৈপ্লবিক উদারতার দ্বারা ইসলাম মানবসভ্যতার ইতিহাসে অমর কীর্তি রেখে গেছে তারই প্রাণস্পর্শে পাকিস্তান অবগাহন করে উঠুক এই কামনা ছিল তাঁর। তিনি বলেছেন, 'যে শক্তিতে ইসলাম একদিন পৃথিবীতে বিদ্যুৎগতিতে বিস্তারিত হয়েছিল, পাকিস্তানের মুসলমানেরা সেই শক্তিতেই পাকিস্তানের সত্যকার দারুল ইসলামে পরিণত করুক। ...পাকিস্তানে খাঁটি ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হোক। তার বৈপ্লবিক রূপ ফিরে আসুক।...পাকিস্তান থেকে ইসলামের বিলম্বিত রেনেসাঁর শুরু হোক। দ্বন্দ্ব-জর্জরিত পৃথিবীতে মজলুম মানবতা ইসলামের আদি স্বরূপে অবগাহন করে শান্ত হয়ে উঠুক।' (ইসলামের বৈপ্লবিক ভূমিকা : সাহিত্য ও সংস্কৃতি, পৃ ১৫১)। একটা জাত জেগে ওঠে নিজস্ব ধর্মীয় ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক চেতনার মাধ্যমে—নিজস্ব ঐতিহ্যের কর্ষণা না করলে তার অতীত কেমন ছিল তা না জানলে জাতি পুনরুজ্জীবিত হয় না। ঊনিশ শতকের নবজাগরণের আন্দোলনে হিন্দু জাতির উত্থান তার বড়ো প্রমাণ। হাই সাহেবও চেয়েছেন অতীতের মহান ঐতিহ্যচেতনায় মুসলমানও জেগে উঠুক। তিনি বলেছেন, 'প্রত্যেক জাতির জীবনই নিয়ন্ত্রিত হয় তার ধর্মের দার্শনিক ভিত্তি, আনুষ্ঠানিক রূপ এবং ঐতিহ্যের সাহায্যে। পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলমানদের সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, সাহিত্যেও তেমনি ইসলামই হবে জীবনপথের দিশারী।' (পূর্ব পাকিস্তানের তামদ্দুনিক সংগঠন : ভাষা ও সাহিত্য, পৃ ১৩৭)। কেন তিনি ইসলামীয় ঐতিহ্য চান, তার কারণ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'পাকিস্তান ইসলামিক রাষ্ট্র হোক বা না হোক, পাকিস্তানের অধিকাংশ অধিবাসীই যেখানে মুসলমান তখন তার জীবনে এবং সাহিত্যেও ইসলামের সুস্পষ্ট ছাপ থাকতে বাধ্য। ইসলাম শুধু ধর্ম নয়, দুনিয়াতে মানুষের সুস্থ, সবল, স্বাভাবিক ও সহজভাবে বেঁচে থাকবার ব্যবহারবিধি। উক্ত নীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত থেকে যে জাত বাঁচতে চায় তার উপযোগী সাহিত্য তাকে তৈরী করতে হবে। কেননা সাহিত্যই জাতির সংস্কৃতি গড়ে তোলে এবং সেই সংস্কৃতির দুগ্ধধারে সংপুষ্ট করে সে জাতিকেও বাঁচায়। পৃথিবীতে শারীরিক শক্তির আস্ফালনের দ্বারা কোন জাতি বাঁচেনি, কুওতে ইসলাম জাহির করে আমরাও তেমন বাঁচতে পারবো না। জাতীয় জীবনের উত্থান ও পতন আছে স্বীকার করি কিন্তু এও মানতে হবে যে পতন থেকে অভ্যুদয়ের পথে এগুতে তার সাহিত্যই তাকে প্রেরণা দেয়; সাহিত্য জাতীয় জীবনের আরসি; সুতরাং যে জাতির সাহিত্য নাই তার আর রয়েছে কি?' (আমাদের ভাষা ও সাহিত্য : সাহিত্য ও সংস্কৃতি পৃ ২৫)। এখানেই তাঁর ভুল বোঝার সম্ভাবনা থাকতে পারে, মনে হতে পারে তিনি সাহিত্যকেও ইসলামের কলমা পড়িয়ে নিতে ইচ্ছুক। তা নয়। যুগ যুগ ধরে যে আদর্শে সাহিত্য বেঁচে আছে তার পরাদর্শ তিনি বিস্মৃত হননি। তিনি বলতে চেয়েছেন, 'হিন্দুর রামায়ণ মহাভারতাদি পুরাণ ও গীতা উপনিষদ যেমন তার সাহিত্যের অফুরন্ত উৎস হয়ে রয়েছে এবং হিন্দু যেমন অকাতরে সেখান থেকে ভাবসম্পদ আহরণ করে তার নবযুগের সাহিত্যকে একটা বিরাট মহনীয়তা দান করেছে। আমাদের সাহিত্যসৌধও তেমনি কোরাণ ও মুসলমানী উপকথার বিরাট চত্বরের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হবে। আমাদের সাহিত্যের দেহ ও মন হবে মুসলমানের কিন্তু আত্মা হবে সকল কালের সকল দেশের মানুষের, এক কথায় সার্বজনীন, সুতরাং বিশ্বের।' (ঐ পৃ ২২-২৩) 'যা-ই রচিত হোক না কেন প্রথমে তাকে সাহিত্যের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে হবে। শুধু আবেগাতিশয্যে ভরপুর এবং অতীতাশ্রয়ী মনোবৃত্তির রোমন্থন হলেই তা সাহিত্য হবে না। সাহিত্যের পথ বড়ো দুর্গম, বড়ো কণ্টকাকীর্ণ। এ-পথের যাঁরা ব্রতী তাঁদের চাই দুরূহ সাধনায় শক্তি, দেশী ও বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়, যথেষ্ট পড়াশুনো, নানামত ও নানা দেশের মানুষের সঙ্গে মেলামেশার সৎসাহস, ভিন্ন মতাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধা, প্রীতিস্নিগ্ধ দৃষ্টি এবং উদার সহনশীলতা।' (পূর্ব পাকিস্তানের তামদ্দুনিক সংগঠন : ভাষা ও সাহিত্য, পৃ ১৩৭)। মুসলমান রচিত বিরাট পুঁথি-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় রাখার কথাও তিনি বলেছেন, 'ইসলামী দর্শন-সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করতে হলে কোরআন এবং মুসলিম জীবনাদর্শের মর্মানুধাবনের যেমন বিশেষ প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন মুসলিম ঐতিহ্য এবং তার পুরাণ উপকথাগুলোর সঙ্গেও গভীর পরিচয়ের, নইলে জাতীয় সৃষ্টির মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হবে বলে ভরসা হয় না। সে কারণেই আমাদের সাহিত্যিক ও ছাত্র সমাজের এ বিরাট পুঁথি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় একান্ত বাঞ্ছনীয় এবং পুঁথি পাঠের সার্থকতা বোধ হয় সেখানেই।' (পুঁথি সাহিত্য ও কাসাসোল আম্বিয়া : ভাষা ও সাহিত্য পৃ ১৫০)। ইসলামীয় ঐতিহ্যের কথা বললেও পূর্ববঙ্গের প্রকৃতি ও পরিবেশের কথাও তিনি মনে রেখেছেন। 'পূর্ব বাংলার সাহিত্য সৃষ্টিতে পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের চালচলন রীতি-নীতি, আদব-কায়দারও রূপ দিতে হবে। ইসলামী সাহিত্য মানে এ নয় যে, সেটি পূর্ব বাংলা ও বাংলা সাহিত্য থেকে বিচ্ছিন্ন সাহিত্য সৃষ্টি। তিনি বলছেন, 'এখানকার মুসলমানের চেহারায় এদেশের প্রকৃতিগত ছাপ আমৃত্যু সংরক্ষিত। সুতরাং আমাদের অন্তর ও বাহিজীবনের উপর রাষ্ট্রগত প্রভাব

আনতে হলে এদেশের মানুষগুলোর দিকে চেয়েই তা আনতে হবে, নইলে শেষটায় আমরা মুসলমান তথা মানুষ গড়তে গিয়ে বানর না গড়ে ফেলি সে আশঙ্কাও আছে।...এই বৈশিষ্ট্যের উপরে যদি আমাদের সাহিত্য গড়ে ওঠে, তবে আশা হয় আমরা মরবো না।" (আমাদের ভাষা ও সাহিত্য : সাহিত্য ও সংস্কৃতি, পৃ ২৩)। উনিশ শতকের বাংলাদেশের নবজাগরণে হিন্দু সাহিত্যিকদের সাহিত্যসৃষ্টির উন্মাদনা থেকে অনুপ্রেরণা নেবার কথা তিনি বলেছেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের নব্য মুসলিম বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করতে গিয়ে আমাদের মনে রাখতে হবে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী হিন্দুদের কথা। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও মানবতার আদর্শে দীক্ষিত হয়ে অফুরন্ত সৃষ্টি প্রেরণা নিয়ে বাঙালী হিন্দু সেদিন যে বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি করেছে, হিন্দু পটভূমিকায় রচিত হলেও তা হয়েছে বাংলা ও বাঙালীর সাহিত্য।...যে মত্ত জীবনকল্পনা মুসলমানকে পাকিস্তান রচনায় দুরন্ত উন্মত্ত করে তুলেছিল প্রতীচীর নবতম আলোকে সৃষ্টি-পাগল উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী হিন্দুর মতোই মুক্তিপাগল আজকের এই বাঙালী মুসলমান জাতিও তেমনি তার বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করবে।" (ঐ পৃঃ ২৪)। পূর্ববঙ্গে এইভাবে সাহিত্যসৃষ্টির বান ডেকেছিল—সাহিত্যের মধ্যে সে জাতীয় ঐতিহ্যকে খুঁজে পেয়েছিল বলে পূর্ব পাকিস্থান আজ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশে পরিণত হয়েছে।

অখণ্ড বাংলাদেশে মুসলমান রচিত সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সম্পর্কে যথোচিত আলোচনা হয়নি। পাকিস্থান সৃষ্টির পর বাঙালী মুসলমানরা বাংলা সাহিত্যে তার অবদানের কথা বিস্তৃতভাবে জানার জন্য উন্মাদ হয়ে ওঠে। তাই পূর্বে বাংলায় সাহিত্য সৃষ্টিতে মুসলমানী বিষয় ও মুসলমান সাহিত্যিকদের আলোচনা মুখ্য হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের ভূমিকা কি ছিল সেই অতীত ইতিহাস তাদের সামনে তুলে ধরেছেন হাই সাহেব 'বাঙলা দেশে মুসলিম অধিকারের যুগ ও বাঙলা সাহিত্য' নামক প্রবন্ধে। বাংলাদেশ মুসলমানদের অধীন হয় ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে কিন্তু ইসলাম ধর্ম প্রচার হয় তারও অনেক আগে থেকে। হিন্দুযুগে রাজভাষা ছিল সংস্কৃত—দেশীয় ভাষারূপে বাংলাভাষা ছিল অবহেলিত। দেশীয় ভাষায় সাহিত্যরচনার প্রবণতা দেখা দিলেও বর্ণ-হিন্দুরা তাকে ভালভাবে গ্রহন করেনি। মুসলমান রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষায় রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ ইত্যাদির অনুবাদ হয়। মুসলমান রাজারা দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। সাধারণ মানবের ভাষা সেদিন তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজস্বীকৃতি পেয়েছিল এবং তাঁদেরই প্রচেষ্টায় রক্ষণশীল ব্রাহ্মণদের দেব-ভাষা সংস্কৃত সাধারণ মানবের নাগালের মধ্যে এসেছিল। সেদিন যেমন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানরা যুগান্তর এনেছিলেন সেই ঐতিহ্যের ধারকরূপে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের অকথ্য নির্যাতন ও রক্তপাতের ভেতর দিয়ে তাঁদের উত্তরসূরীরা বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিয়েছেন। সাহিত্যের ইতিহাসে এ দুটি যুগান্তকারী ঘটনারূপে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মুসলমান যুগের বাংলা সাহিত্যের এই অভাবনীয় উন্নতিকে গ্রীসের পেরিক্লিস ও ইংলন্ডের এলিজাবেথীয় যুগের সঙ্গে হাই সাহেব তুলনা করে বলেছেন, 'বাঙলাদেশে মুসলমান শাসনের প্রতিক্রিয়া ও বিস্তারের যুগে মুসলমান নবাব বাদশাহদের সুস্থ রাজনৈতিক ও ধর্মবুদ্ধি এদেশের জনসাধারণের জন্য যেমন প্রভূত কল্যাণের হয়েছিল তেমনি জনসাধারণের ভাষায় রচিত বাঙলা সাহিত্যের নানাদিকে বৈপ্লবিক বিকাশ সম্ভবপর করে তুলেছিল। ইংরেজ বিজয়ের কালেই যেমন উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর একালের বাঙলা সাহিত্যের বিভিন্নমুখী বিকাশ দেখি তেমনি মুসলমানদের দ্বারা এদেশ জয়ও মধ্যযুগে বাঙলা সাহিত্যের উন্মেষ ও অভ্যুদয়ের জন্য অশেষ কল্যাণের হয়ে আছে। তাদের মধ্যে বাঙলা সাহিত্যে দরদী হোসেন শাহের স্থান সকলের উপরে। এই নরপতি বাঙলা সাহিত্যের অগ্রগতির জন্য রাজপথ নির্মাণ করে দিয়ে গেছেন। সুতরাং আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁকে ইংলন্ডের এলিজাবেথ কি গ্রীসের পেরিক্লিসের সঙ্গে তুলনা করলেও অন্যায় হয় না।' (সাহিত্য ও সংস্কৃতি পৃঃ ৪২)। আধুনিক সাহিত্যে মুসলমানদের অবদানের কাহিনী 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে বিবৃত করেছেন।

প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আলোচনা হচ্ছে 'বিদ্যাপতি কাব্যপাঠ'। প্রবন্ধটি 'সাহিত্য পত্রিকায় ১৩৬৭ শীত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। বিদ্যাপতি কাব্যের রসবিশ্লেষণ করার আগে তিনি তিনটি অধ্যায়ে বিদ্যাপতি ও বৈষ্ণবতত্ত্ব, ইসলাম ও শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম, বৈষ্ণব অনুভূতি ও সুফী মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই আলোচনার মধ্যে তিনি দেখিয়েছেন দেহজীবী প্রেমের কবি হিসেবে বিদ্যাপতি কালিদাস ও জয়দেবের সগোত্র এবং মধ্যযুগের কবিদের মধ্যে অদ্বিতীয় অথচ ধর্মমতের দিক দিয়ে তিনি বৈষ্ণব ছিলেন না শাক্ত ছিলেন। বৈষ্ণব পদাবলীকে দুভাগে ভাগ করা যায়—চৈতন্য-পূর্ববর্তী ও চৈতন্যপরবর্তী। চৈতন্যদেব বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক কিন্তু তাঁর পূর্বে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা নিয়ে জয়দেব বিদ্যাপতি ও বড়ু চন্ডীদাস কাব্য রচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে বিদ্যাপতিই শ্রেষ্ঠ কেননা চৈতন্যপরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলী যে ধারায় চালিত হয়েছে বিদ্যাপতির পদাবলী তার সূচনা করেছিল। হাই সাহেবের প্রবন্ধে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই আলোচনায় মধ্যে সুফীসাধক কবি আমীর খসরু, গীতিকবি শেলী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিদ্যাপতির মানসিক আত্মীয়তার সূত্রটি পাঠকদের তিনি ধরিয়ে দিয়েছেন। তিন প্রবন্ধের শেষে বলেছেন, 'হিন্দু যেমন আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে সাকার সাধনমার্গ অবলম্বন করিয়া নিরাকার সাধনমার্গে উত্তীর্ণ হইবার দাবী রাখেন, বিদ্যাপতিও তেমনি বিগ্রহ অবলম্বন করিয়া তাহার সাধনার দ্বারা ভাবলোকে বাধাহীন অভিসার করিয়াছেন। দেহের বাঁধনে দেহাতীতকে বাঁধিয়া সর্বশেষে তাহারই চরণতলে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছেন। বিদ্যাপতি ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনায় দেখি উভয় কবির জীবন ও কাব্যাদর্শে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে, এমনকি তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে তুলনাও চলে না; তথাপি দেখিতে পাওয়া যায় কাব্যসাধনার প্রান্তসীমায় পৌঁছিয়া উভয় কবির বীণা যেন একইভাবে একই সুরে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে।"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাকারে বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রকাশ করার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনানুযায়ী সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগ সম্পর্কে ইতিহাস লেখার ভার পড়ে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের ওপর আর আধুনিক যুগ অর্থাৎ বৃটিশ আমল থেকে হাল পর্যন্ত ইতিহাস রচনার দায়িত্ব হাই সাহেব ও সৈয়দ আলী আহসানের ওপর অর্পিত হয়। ১৯৫৬ সালের জুন মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। বইটির প্রথম সংস্করণে এগারটি পরিচ্ছেদ ছিল—পরে বইটি বহুল পরিমাণে পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হয়, বর্তমানে বইটির তৃতীয় সংস্করণ (১৯৬৮) চলছে, প্রকাশকও বদল হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত সংস্করণে নিম্নোক্ত পরিচ্ছেদগুলি হাই সাহেব লিখেছিলেন—

প্রথম পরিচ্ছেদ—বৃটিশ আমলে বাংলা সাহিত্যের রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমি (পৃ ৩—১৮)।
তৃতীয় পরিচ্ছেদ—বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (পৃ ৪১—৬০)
চতুর্থ পরিচ্ছেদ—বাংলা গদ্যের পরিণতি (পৃ ৬১—১২২)
পঞ্চম পরিচ্ছেদ—ইসলামী সাহিত্য (পৃ ১২৫—১৬০)
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—বাংলা গদ্যের সমৃদ্ধি (পৃ ১৬৩—২১০)

গ্রন্থের ভূমিকায় হাই সাহেব বলেছেন, 'বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের ইতিবৃত্ত রচনা করতে গিয়ে মুসলিম লেখকদেরকে নিয়ে আমাদের নানা অসুবিধার সম্মুখীন হ'তে হয়েছে। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার সবচেয়ে বড়ো অসুবিধা হলো এই যে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু করে একাল পর্যন্ত যে সব মুসলিম লেখককে আমরা আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছি তাঁদের সমস্ত লেখাও আমরা পাইনি। এ কাজ হাতে নিয়ে পদে পদে আমরা উপাদানের অভাব বোধ করেছি।" (জুন ১৯৫৬)। মুসলমান রচিত সাহিত্য ও সাহিত্যিকের রচনা যথাযোগ্য মর্যাদা বাজার চলতি সাহিত্যের ঐতিহাসিকরা দেন নি—যথাযথভাবে উদ্ধারও করেন নি। মুসলমান

রচিত সাহিত্যকে অবলুপ্তির হাত থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করেন নি তাঁরা। ডঃ অমলেন্দু বসুর জবানীতে বলা যায় "এই বিষয় সম্বন্ধে অনেক তথ্যই ছিল অস্পষ্ট, কিছু ছিল সম্পূর্ণ অনুদ্ঘাটিত এবং সর্বোপরি এই শ্রেণীর রচনাকে সমগ্র বাঙালী জাতির সাহিত্য সাধনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা হত না।" (কম্পাস, ২৮শে জুন ১৯৬৯, পৃ ৫১৬)। সাহিত্যের ইতিহাস যা লেখা তা প্রধানত একতরফা—সুকৌশলে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের রচিত সাহিত্যের পরিচয় ইতিহাসের সব কটি পৃষ্ঠা জুড়ে রয়েছে। ইতিহাসকাররা মুসলিম রচিত সাহিত্যকে অনুদাসীন নির্লিপ্ততা দিয়ে উপেক্ষা করেছেন। প্রধানত এই প্রয়োজনেই পূর্বে বাঙলার ঐতিহাসিকরা মুসলিম রচিত সাহিত্যের পরিচয় বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। বইটির ভূমিকায় হাই সাহেব বলেছেন, "ইতিহাস পর্যালোচনা বাঙালী মুসলিম জাতির কাছে তাদের পূর্ব পুরুষদের সাহিত্যিক সাধনার ধারাবাহিকতার একটা মোটামুটি ছবি আমরা দাঁড় করিয়েছি মাত্র। এতে বাংলা সাহিত্যের ছাত্রছাত্রী ও ভবিষ্যৎ গবেষকদের কিছুটা সুবিধা হবে, আমাদের এটুকুই ভরসা।" এই ইতিবৃত্তে মুসলমান রচিত সাহিত্যের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়ার কৈফিয়ৎ হল এই। এধারের বাঙলায় সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়নে চলতি দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনে ওধারে প্রকাশিত ইতিহাস প্রভাবিত করেছে। ইতিহাস রচনার সার্থকতা নিহিত রয়েছে এখানে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আরম্ভ করার আগে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমি জানা দরকার। বৃটিশ আমলে দেশের অবস্থা কেমন ছিল আর লেখকরা সেই অবস্থার মধ্যে নিজেদের দায়িত্ব কিভাবে পালন করেছিলেন তা না জানলে জানার মধ্যে অনেক ফাঁক থেকে যাবার সম্ভাবনা আছে। হাই সাহেব এই প্রয়োজনেই ইতিহাস বলার আগে রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমি বলে নিয়েছেন। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ বাঙলাদেশ অধিকার করে—রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজী হল রাষ্ট্রভাষা। ইংরেজদের সঙ্গে হিন্দুরা সহযোগিতা করে কিন্তু মুসলমানদের পক্ষে অত সহজে বাস্তব পরিস্থিতি মেনে নেওয়া সম্ভবপর ছিল না। একদিকে যেমন নতুন হিন্দু জমিদার শ্রেণী তৈরী হয়েছে অপর দিকে ভূমিসংস্কার রাজস্ব আদায়ের নতুন নতুন নিয়মকানুনে মুসলমান জমিদার শ্রেণী লোপ পেতে শুরু করেছে। ফলে উনিশ শতকের রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমির দোলা চলে মুসলমান সমাজ মধ্যেও উন্নত সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে নি। অপরদিকে হিন্দু সমাজ ইংরেজী শিক্ষাকে গ্রহণ করে সরকারের সব কটি উচ্চপদ যেমন দখল করে নিয়েছে তেমনি শিক্ষাদীক্ষায় সাহিত্য সৃষ্টিতে তারা আশাতীত উন্নতি করেছে। উনিশ শতকে সাহিত্যে যুগসৃষ্টি প্রধানত হিন্দু সাহিত্যিকদেরই কৃতিত্ব। হাই সাহেব বলেছেন, "ইংরেজ ও ইংরেজী ভাষার প্রতি শতাব্দীকালের বিরূপতায় আর তাদের সঙ্গে নানা সংঘর্ষে মুসলমানেরা হলো বিপর্যস্ত কিন্তু ইংরেজী শিক্ষিত ও ইংরেজের অনুগ্রহকামী হিন্দুদের মধ্যেই আধুনিক ইউরোপের মানবতাবাদে দীক্ষিত নব মানবতার বার্তাবাহী এমন কতকগুলো সৃষ্টিধর্মী মানুষের জন্ম হলো যাদের কাছে দেশ কালে কালে পেলো ইংরেজ আমলের শ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনজাত সংকর সৃষ্টি মহত্তম বাংলা সাহিত্য। মীর মশাররফ এবং নজরুল ইসলামকে বাদ দিলে দেখা যাবে বাংলা সাহিত্যের উৎকৃষ্ট অংশটুকু, মানুষের চিন্ময় কল্পনায় যা অপরূপ বাঙ্ময় প্রকাশ তার সবটুকুই তাই বাঙালী হিন্দুর সৃষ্টি।" (পৃ ১৮)।

মুসলমান সমাজ ইংরেজ রাজত্বে নিজেদের অসহায় বলে মনে করেছে, সাম্রাজ্য উদ্ধারের জন্য খণ্ড-বিখণ্ড যুদ্ধবিগ্রহে পরাজিত হয়ে ধর্মভাব তাদের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছে। ইসলামের মধ্যে অশরীয়তী কার্যকলাপের প্রবেশকেই তারা তাদের দুর্ভাগ্যের কারণ বলে মনে করেছে। ভারতবর্ষে এসে ইসলাম মূল থেকে অনেক দূরে সরে যায়। মহরমের জাঁকজমক, তাজিয়া নির্মাণ, হিন্দুদের গুরু পূজার মত পীরপূজো, পীরের দরগা জিয়ারৎ বাতি দেওয়া, তীর্থস্থানের মত করে তোলা, সমুদ্র দেবতার মতো খোয়াজ-খিজির সৃষ্টি করা, তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য নদী সমুদ্রে পয়সা ফেলা, সিন্নী দেওয়া, হিংস্র পশুদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে বাঘের দেবতাকে কালু গাজী তৈরী করা, মহামারীর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে শীতলার পূজা করা, মানত করা ইত্যাদি নানাবিধ উদাহরণ পেশ করা যায়। হাই সাহেব ইসলামের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে হিন্দুয়ানী প্রবেশের বহু উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, "ভারতবর্ষের মাটিতে ইসলাম নাম-নিশানা না হারালেও বিজিত জাতির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ভারতীয় মুসলমানদের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে ইসলামের উপর তার প্রতিশোধ নিয়েছে। উত্তর পশ্চিম মধ্য ভারতে এর ঐতিহাসিক কারণ মোগল বাদশাহদের সহিষ্ণুতা এবং উদারতা এবং বাংলাদেশে এর কারণ তার অধিকাংশ অধিবাসীরই অসম্পূর্ণভাবে ইসলাম গ্রহণ।" (পৃ ৭)। ইসলাম থেকে এই জাতীয় হিন্দুপ্রভাব মুছে ফেলার জন্য ফারাজী ও ওহাবী আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের পটভূমিতেই বাংলাদেশে ইসলামী সাহিত্য গড়ে ওঠে। সমগ্র অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত দোভাষী পুঁথি সাহিত্য রচিত হয়েছে। সমগ্র মুসলমান সমাজের মধ্যে এই সাহিত্য ব্যাপক গণস্বীকৃতি পেয়েছিল কেন না এই রীতিতে ইসলামের পীর পয়গাম্বরদের কাহিনী, মুসলিম গৌরব ও ঐতিহ্য সমন্বিত কাহিনী রচিত হয়েছে। ধর্মশাস্ত্র, উপদেশ, ইতিহাস, জীবনী, রোমান্টিক উপাখ্যান ইত্যাদি বিষয়ের ওপর হাজার দশেক পুঁথি রচিত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর অপরার্ধ থেকে ইংরেজী শিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও ইসলামী সাহিত্য রচনায় বান ডাকে। এই ইসলামী সাহিত্যের বিস্তৃত তথ্য হাই সাহেব দিয়েছেন যা এতাবৎকাল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অজ্ঞাত ছিল। আলোচনার সুবিধার্থে ইসলামী সাহিত্যকে তিনি পাঁচভাগে ভাগ করেছেন—

ক। ইসলামী ইতিহাস ও তামাদ্দুন-মূলক রচনা।

খ। ইসলামের মর্মব্যাখ্যা, তাসাওউফ, ইসলামী নীতি ও সমাজজীবন সংক্রান্ত রচনা।

গ। পবিত্র কোরানের অনুবাদ ও মর্মবাণী সংকলন।

ঘ। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সাহাবী এবং অন্যান্য পীর পয়গাম্বরদের জীবনী ও বাণী।

ঙ। কারবালা সংক্রান্ত সাহিত্য।

প্রতিটি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত রচনা ও রচয়িতার পূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন। শুধু মুসলিম সাহিত্যিক নন হিন্দু সাহিত্যিক যাঁরা ইসলামের ধর্মশাস্ত্রের অনুবাদ ইতিহাস ইত্যাদি রচনা করেছেন তাঁদেরও পরিচয় আছে। ইসলামী সাহিত্যের পরিচয় হাই সাহেব হাল আমল পর্যন্ত দিয়েছেন। বস্তুতঃপক্ষে সাহিত্যের এই অধ্যায়টি সবিশেষ তথ্যপূর্ণ ও সুলিখিত।

বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ বলতে গিয়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখক রামমোহন রায়, অক্ষয় দত্ত, বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ এবং খোন্দকার শামসুদ্দীন মুহম্মদ সিদ্দিকী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বাংলা গদ্যের পরিণতি অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র, মীর মশাররফ হোসেন, আর্জমন্দ আলী চৌধুরী, মুন্সী গোলাম কিবরিয়া, মোজাম্মেল হক, মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আমেদ, পণ্ডিত রিয়াজুদ্দিন আমেদ মাশহাদী সম্পর্কে আলোচনা আছে। তবে স্বাভাবিক কারণে মুসলিম লেখকদের সম্পর্কে আলোচনা বেশী করা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে মীর মশাররফ হোসেন জায়গা নিয়েছেন বেশী! বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে প্রচুর বলা হয়েছে কাজেই সাধারণ পাঠক তাঁর সম্পর্কে পরিচিত কিন্তু মশাররফ হোসেন সম্পর্কে দু-এক পংক্তি উল্লেখ করা হয়েছে যা দিয়ে মীর-মানসের প্রতি প্রকৃত বিচার করা হয় নি।

রবীন্দ্রযুগে মুসলমান লেখকরা বাংলা গদ্যের সমৃদ্ধি সাধনে কিভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন সে অংশটিও হাই সাহেবের রচনা। রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আলোচনার সঙ্গে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, বেগম রোকেয়া, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন

ী, কাজী ইমদাদুল হক, মুহম্মদ । রহমান, নরুন্নেসা খাতুন, এস দ আলী, শাহাদৎ হোসেন, শেখ ন করিম, মোহাম্মদ নজিবর রহমান লেখক সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। ংশের আলোচনাও আধুনিককাল বিস্তৃত। তথ্য সমাবেশের সঙ্গে চনার ভঙ্গী ও ভাষা সরল ও ল।

ই তিনটি বইয়ের মাঝখানে তাঁর লঘু ও হালকা মেজাজের বই "তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা" বেরোয় (ডিসেম্বর ১৯৫৯)। এই বইয়ের সূচী নিম্নরূপ—

সামনের মাস। ওরা ও আমরা। যুগ-স্রষ্টা জিন্নাহ্। রস। এই জিন্দেগীর ঈদ। সুন্দরের নিমন্ত্রণ। সুন্দর লোকে। মহাভয় ও মহৎগুণ। কৈফিয়ৎ। সাহিত্যিকের জবানবন্দী। ওস্তাদজী। বেসুর। ভেলুয়া সুন্দরী ও আবু সওদাগর। তিস্তা। সুরমা। শিলংএ মে মাস। ভাষার কথা। কথা লেখা। ধ্বনির ব্যবহার। ভাষা ও ব্যক্তিত্ব। সম্ভাষণ। তোষামোদের ভাষা। রাজনীতির ভাষা।

ধর্ম, রাজনীতি, সমাজ, সাহিত্য, ভাষা ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গের ওপর অন্তরঙ্গ আলাপে রসসিক্ত আলোচনা করেছেন, লঘু-ভঙ্গীর চালে গুরু কথা বলেছেন অথচ লেখার গুণে পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করে না। এগুলির মধ্যে অনেকগুলির প্রবন্ধ

যেমন 'ওরা ও আমরা' 'মহাভক্ত ও মহৎগুণ' 'বেসুর' যথাক্রমে 'অধ্যাপক' ছদ্মনামে মাসিক মোহাম্মদীর চৈত্র ১৩৫৩, শ্রাবণ ১৩৫৪, আশ্বিন ১৩৫৪ সংখ্যায় বেরোয়। 'ওরা ও আমরা' রচনাটি ভারতে হিন্দু-মুসলমান [illegible] ঘাত-প্রতিঘাত মিলন-অমিলনের [illegible] প্রমথ চৌধুরীর 'আমরা ও তোমরা'র অনুকরণে রচিত। এই রচনাটি যখন মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় বেরোয় তখন তার জবাবস্বরূপে শনিবারের চিঠি ১৩৫৩ চৈত্র সংখ্যার সংবাদ সাহিত্য বিভাগে বেতালভট্ট 'তোমরা ও আমরা' নামে একটি রচনা প্রকাশ করে। 'ওরা ও আমরা' রচনায় হাই সাহেব ভারতে হিন্দু মুসলমানের সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের চিত্র যেমন দেখিয়েছেন তেমনি পাশাপাশি তার ধর্ম ও সংস্কৃতির বিভিন্নতার কথা তার জীবনাদর্শের কথাও বলেছেন কিন্তু বিচ্ছিন্নতার কথা তিনি বলেন নি। রচনাটির শেষে তিনি বলেছেন, "ওরা ও আমরা একই বাসভূমির দুই অধিবাসী। পার্থক্যের চূড়া নিয়েই সে বাসভূমিকে করবো উভয়ে সমৃদ্ধ। এ উপমহাদেশের পরিচয় হবে ওকে আর আমাকে দিয়ে। কাউকে অস্বীকার করার হীন প্রচেষ্টা আমাদের থাকবে না। ওর আর আমার বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য নিয়েই গড়ে উঠেছে আমাদের অতীত, তাই নিয়েই হবে আমাদের উভয়ের ভবিষ্যৎ। অস্তিত্বের বিলোপ আমাদের অবাঞ্ছিত। পার্থক্য ও মিলন আমাদের কাম্য।" (পৃ, ১৬)। জাতি হিসেবে নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে স্নাত হয়ে পরস্পর বেঁচে থাকবে এটাই হাই সাহেবের প্রধান বলার কথা ছিল। 'সামনের মাস' 'এই জিন্দগীর ঈদ' রচনা দুটিতে মধ্যবিত্ত জীবনের দুঃখ-ব্যথা-বেদনা, আশা-আনন্দ-নিরাশার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। 'তিস্তা' 'সুরমা' রচনায় নদী তার আত্মকাহিনী বলেছে। গঙ্গা মেঘনা যমুনা পদ্মা ইছামতী শীতলক্ষা নদীর ওপর অনেক সাহিত্য রচিত হয়েছে কিন্তু উপেক্ষিত রয়েছে তিস্তা ও সুরমা। উপেক্ষিতাকে সাহিত্যে স্থান করে দিলেন হাই সাহেব। 'তিস্তা' 'সুরমা' 'শিলং-এ সে মাস' 'ওস্তাদজী' 'বেসুর' ইত্যাদির নিবন্ধে প্রাবন্ধিক হাই রসিক হাইয়ে রূপান্তরিত হয়েছেন। কথাশিল্পীসুলভ চিত্রলতা বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী তাঁকে অনন্য করে তুলেছে। 'রূপ' 'সুন্দরের নিমন্ত্রণ' 'সুন্দর লোকে' নিবন্ধে অননুকরণীয় ভাষায় রসসৌন্দর্যের হৃদয়গ্রাহী বিশ্লেষণ করেছেন। ভাষা সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলোতে দুরূহ তত্ত্বকে তিনি সরস ভঙ্গীতে পরিবেশন করেছেন। 'সমকাল' পত্রিকায় ডঃ আনিসুজ্জামান মন্তব্য করেছেন, "বক্তব্যের স্বচ্ছতায় এবং ভাষার সরল সৌন্দর্যে তাঁর ভাষাবিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলো সবচেয়ে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। পারিভাষিক শব্দকণ্টকিত অতি গুরুভার ভাষাতত্ত্বমূলক প্রবন্ধের যে গাম্ভীর্যমণ্ডিত মূর্তি সাধারণ পাঠক-শ্রেণীকে দূরে থেকে সচকিত করে এখানে তারই হাস্যোজ্জ্বল ও পরিহাসপ্রিয় রূপ সহজ আন্তরিকতায় প্রকাশলাভ করেছে।" (৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা)। বাংলা সাহিত্যে পরম রমণীয় গ্রন্থরূপে 'তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা" স্মরণীয় হয়ে থাকবে। শুধু রমণীয়তার জন্য নয় রমণীয়তার সঙ্গে কমনীয় সাহিত্যতত্ত্বের সংমিশ্রণ তাঁর গ্রন্থকে স্নিগ্ধ ঔজ্জ্বল্য দান করেছে।

ইতিবৃত্ত লেখার মালমশলা সংগ্রহ করতে করতে কিছু কিছু পুঁথি ও বৈষ্ণব পদ সংগ্রহ করেছিলেন। "মধ্যযুগের গীতি কবিতা" সম্পাদিত গ্রন্থে তার নিদর্শন রয়েছে। মুসলমান গীতিকার ফকিরদের চৈতন্য ও শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক পদ বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর নিদর্শন উক্ত গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের সংগৃহীত পুঁথি সম্ভার তিনি দেখেছেন পরে সেটি ডঃ আহমদ শরীফের সম্পাদনায় "পুঁথি পরিচিতি" নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরোয়। এই পুঁথি থেকেই লোক সাহিত্যের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। তাছাড়া তিনি ছিলেন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের ছাত্র যিনি লোক সাহিত্য সংগ্রহ মানসে ১৯৩৯ সালে Eastern Bengal Folk lore Collection Society' নামে এক সংস্থা গঠন করেছিলেন। তাঁর অনুপ্রেরণায় পূর্ব বাংলায় লোক সংস্কৃতি আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। তিনি পূর্ব ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মিলনীতে (১০—১১ই আষাঢ় ১৩৪৫) সভাপতির ভাষণে গ্রাম্য খেলাধুলার বিবরণ ছড়া ইত্যাদি সংগ্রহ করার বিষয়ে বলেছিলেন, "আজকাল বিদেশী খেলার চাপে দেশের সাবেক খেলাধুলা একরূপে বিদায় লইয়াছে। বাংগলার নানা স্থানে নানারূপে দেশী খেলা প্রচলিত আছে। কতক খেলার সংগে নানা ছড়া ব্যবহৃত হয়।...খেলার বিবরণের সহিত এ সকল ছড়াও সংগ্রহ করা আবশ্যক। অবশেষে এগুলি ডোডো পক্ষীর দশা পাইবে বলিয়া আশংকা হয়।" হাই সাহেব তাঁর আচার্য নির্দেশিত পথে গ্রাম্য খেলাধুলার বিবরণ ছড়াসহ সংগ্রহ করেছেন। লুপ্তপ্রায় গ্রাম্য খেলাধুলা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক আলোচনা তাঁর আগে আর কেউ করেন নি। শহরে সারাজীবন অতিবাহিত করেও গ্রামজীবনের সঙ্গে তাঁর যে যোগ ছিন্ন হয় নি তা উপলব্ধি করা যায় 'Indigeneous Games and Sports' নামক প্রবন্ধে এবং ফজলুল হক হল বার্ষিকী ১৩৬৫ সংখ্যায় প্রকাশিত "বাড়ির প্রবাদ" নামক প্রবন্ধে। অধ্যাপক মনসুরউদ্দীনের সঙ্গে "হারামণি" ৫ম খণ্ড তিনি সম্পাদনা করেন। ঐ খণ্ডের ভূমিকায় তিনি যে আলোচনাটি লেখেন সেটির মধ্যে লোক সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর ঐতিহাসিক বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। ইউনেস্কোর সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শহীদুল্লাহ সাহেবের সহযোগে তাঁর 'Traditional Culture in East Pakistan'. নামে লোক সংস্কৃতির আলোচনা গ্রন্থ বেরোয় (১৯৬৩)। এই গ্রন্থে তিনি দুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন—'Folk Songs and Folk Literature' এবং 'Indigeneous Games and Sports' লোক-সংগীত ও লোক সাহিত্য প্রবন্ধে তিনি শুধু তথ্যের সমাবেশ করেন নি তার রসসমৃদ্ধ আলোচনাও করেছেন। বাংলাদেশের সর্বত্র প্রচলিত লোক-সংগীতের প্রতিটি ধারার উদাহরণ দিয়েছেন সে সংগে গীতিকা (Ballad) আখ্যায়িকা যা প্রচলিত আছে তারও রসসিক্ত আলোচনা করেছেন।

বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞান আলোচনায় হাই সাহেবের মৌলিক অবদান রয়েছে—বর্তমান প্রবন্ধে তাঁর এদিককার পরিচয় আলোচনা করা হয় নি, পরে কোন এক সময় এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করার ইচ্ছে আছে। এই প্রবন্ধে তাঁর শুধু সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহের আলোচনা করা হল। সাহিত্য বিষয়ক প্রচুর প্রবন্ধ পত্র পত্রিকার পৃষ্ঠায় রয়েছে। 'Pakistan Observer' 'Pakistan Quarterly', 'New values' 'আজাদ' 'মিল্লাত' 'সওগাত' প্রভৃতি পত্রিকায় সেগুলি ছড়িয়ে আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে তিনি 'সাহিত্য পত্রিকা' প্রকাশ করেন—ঐ পত্রিকাতেও তাঁর কিছু প্রবন্ধ রয়েছে যা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত লোকদের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে একশত প্রবন্ধ লেখার পরিকল্পনা ছিল তাঁর—মোটাকয়েক তিনি লেখেছিলেন, ৪।৫টি প্রবন্ধ পত্রস্থও হয়েছিল কিন্তু আকস্মিক মৃত্যু তাঁর পরিকল্পনাকে অপূর্ণ রেখেছে। অকালবিয়োগের জন্য সমস্ত উপভাষা সমেত বাংলা ভাষা বিজ্ঞানের বর্ণনাত্মক ভঙ্গীতে আলোচনা সমাপ্ত করতে পারেন নি।

খুবই পরিতাপের কথা এইরূপ অনলস অতুলনীয় জ্ঞানতপস্বী সাধকের দোয়াতের কালি ফুরোবার আগেই জ্ঞানের সমৃদ্ধ উপকরণের মধ্যে বহু পরিকল্পনা অসমাপ্ত রেখেই তাঁর প্রাণপ্রদীপের সলতে নিভে গেল। আয়ুর্বিধাতা তাঁকে বেশী কিছু করার অবকাশ দেন নি—মাত্র পঞ্চাশটি বসন্তের আয়ু নিয়ে তিনি এসেছিলেন। অসীম বেদনার মধ্যে এটুকুই অমিত আনন্দের কথা যে তিনি বিধাতা-প্রদত্ত আয়ুর পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন। স্বল্পায়ু জীবনে সাধনার দ্বারা নিষ্ঠার দ্বারা শ্রমের দ্বারা ভাষা ও সাহিত্যের যে অতীব মূল্যবান স্বল্পসংখ্যক গ্রন্থ তিনি রেখে গেলেন মনে হয় সেগুলিই তাঁকে দীর্ঘায়ু দান করবে। সাহিত্যের চিন্তাশীল জিজ্ঞাসু পাঠকের চিত্তে শ্রদ্ধার স্বর্ণবেদীতে তাঁর আসন প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

শহর কলকাতার রাজপথ। গাড়ীবারান্দা-ওয়ালা মস্ত বড় বাড়ি। গাড়ীবারান্দার আশ্রয়ে কয়েকটি মানুষের আশ্রয়। তার মধ্যে মা-মেয়ের ছোট একটি সংসার।

এক কোণে মা-মেয়ে থাকে। ভাঙ্গাচোরা চায়ের পেটি, টিনের কৌটো, কুড়িয়ে পাওয়া এলুমিনিয়মের হাঁড়ি, কলাই-চটা বাটি, আরশি, ছেঁড়া চট, জরাজীর্ণ কাঁথা, মাদুর—সংসারের অস্থাবর সম্পত্তি। এ ছাড়াও আছে, একটি পুরনো আরশি, দাঁড়াভাঙ্গা চিরুনি, আলপাকার পুরনো শাড়ি আর বাঁধানো পট। পটের ছবিটা শিবঠাকুরের।

আরশি, আলপাকার শাড়ি আর শিব-ঠাকুরের পটের সংগে জড়িয়ে আছে একজন মানুষের স্মৃতি। যে মানুষটা ছিল ময়নার স্বামী।

আর পাঁচ বছরের মেয়ে সুখী! সে শুধু স্মৃতি নয়—সত্যি। সুখীকে নিয়েই ময়নার যা কিছু। সুখীকে অবলম্বন করেই তার বেঁচে থাকা। নয়তো ময়নার কাছে মরে যাওয়াটা এমন কিছু শক্ত ছিল না। অনায়াসে মরতে পারতো। অনেক সময় ভেবেছেও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মরতে পারে নি। সে শুধু সুখীর জন্যে। সে যদি মরবে, তা হলে সুখীর কি হবে।

সুতরাং মরা হয়নি ময়নার। বাঁচার ইচ্ছে নিয়েই এক বছরের মেয়েটাকে নিয়ে কলকাতায় চলে আসে ময়না। শুনেছিল কলকাতা শহরে রাস্তায় হাত পেতে বসে থাকলেও কিছু না কিছু মেলে। তাই তো গ্রামের দেড় কাঠা জমির মাটি কামড়ে পড়ে না থেকে ট্রেনে চেপে কলকাতায় চলে এসেছিল।

কলকাতায় সেই প্রথম আসার দিন। ময়নার চোখে কেমন ধাঁধা লেগেছিল। এত আলো, এত বাড়ি-ঘর, লোক-জন, এত গাড়ী ঘোড়া—এর মধ্যে তার মেয়েটা হারিয়ে যাবে না তো?

প্রথম রাতটা শিয়ালদা স্টেশনেই কাটিয়েছিল সে। আঁচলে বাঁধা সামান্য কিছু খুচরো পয়সা ছিল, তাই দিয়ে পাউরুটি খেয়ে একটা রাতের খিদে মিটিয়েছিল।

তারপর সকাল হতে সুখীকে কোলে নিয়ে পথ চলতে আরম্ভ করেছিল।

এ রাস্তা সে রাস্তা খানিক ঘুরে বেড়িয়ে শেষটা একটা কালীমন্দির দেখতে পেল ময়না। হাতের পুঁটুলি নামিয়ে রেখে সে ঠাকুর প্রণাম করলে। আর বাঁচার পথটা সহজেই সে খুঁজে পেল। মন্দিরের বাইরে এক দল ভিখারী হাত পেতে বসে আছে। বাঁচার সহজ পথটা খুঁজে পেয়ে ময়না আরো একবার প্রণাম করলে জাগ্রতা কালীকে।

সেই থেকে ঠনঠনে কালীবাড়ির কাছেই গাড়ীবারান্দার নীচে সংসার

নামের খেলাঘর পেতেছে ময়না। প্রথম প্রথম ভিক্ষে করতে বসেও কাঁদতো, সুর করে 'বাবা গো, মাগো' বলে পয়সা চাইতে পারতো না। না চাইতেও কিছু পেতো। তাতে পুরো পেটের খিদে না মিটলেও যা হোক করে বেঁচে থাকতে পারতো।

তারপর চোখে জল ঝরা বন্ধ হলো। স্পষ্ট উচ্চারণ করতে শিখলো, 'বাবা গো, মা গো—দুটো পয়সা দাও।'

একদিন এলো, যেদিন সুখীর মুখেও বুলি ফুটলো। মায়ের সঙ্গে সে-ও আধো আধো স্বরে বলতে লাগলো, বাবা গো—মা গো দুটো পয়সা দাও।

দেখতে দেখতে চার-চারটে বছর কেটে গেল। ময়না সেই একই বিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে। আর সুখীর মধ্যে লক্ষ্য করেছে পরিবর্তনের জোয়ার। কোল জড়িয়ে থাকতো দুধের মেয়েটা। এখন সে দস্তুরমত পাকা-পোক্ত হয়েছে। ছুটে বেড়ায়, খেলা করে, পথচারীদের পিছু ধাওয়া করে পয়সা চায়। না নিয়ে ছাড়ে না। ময়না যা পারে না সুখী তা পারে।

তবু ময়নার মনে সুখ নেই। তার ভাবনা, নিজে ভিক্ষে করছে ক্ষতি নেই, কিন্তু মেয়েটার জীবন কি ভিক্ষে করেই কাটবে!

যদিও মুহূর্তের ভাবনা মুহূর্তেই হারিয়ে যায়। জীবনের বাস্তব রূপটাই তখন সত্যি হয়ে ওঠে। আর চলতি জীবনের মধ্যে কোন স্বপ্নের অবকাশ নেই।

স্বপ্নের অবকাশ থাক না থাক, তবু স্বপ্ন দেখে ময়না। যে স্বপ্নের মধ্যে ফেলে আসা দিনের সত্যি রূপটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বসিরহাট লাইনে চাঁপাপুকুর স্টেশনের কাছে একটি গ্রামে ছিল ময়নার ঠিকানা। স্বামী জীবন দাস ছিল দিন মজুর। জীর্ণ কুঁড়ে ছিল তাদের আশ্রয়। মেহনত করতে পারতো জীবন, শক্ত-সমর্থ দেহ ছিল তার। কোন কাজেই পিছ-পা হতো না। কাজ চললে দিন গেলে দুটো টাকা পেত। না চললে কিছু নেই। কষ্ট থাকলেও দিন চলে যেত। দুবেলা

দু মুঠো জুটতো। তার মধ্যেও সুখ ছিল। শান্তি ছিল।

জীবন মানুষটা ছিল আমুদে স্বভাবের। দিন যেমন চলছে চলুক, তবু তার মধ্যেও তার যাত্রা করার নেশা। গ্রামে যাত্রার দল ছিল বৈকুণ্ঠ সা'র। সেই দলে জীবনও ছিল। প্রতি বছর শীতের মরসুমে, দু' তিনবার পালা গান হতো। তাতে জীবনও থাকতো। জীবনই সাজতো রাজা। অমন দশাসই মানুষ—রাজা সাজলে চমৎকার মানাতো।

রাজার সাজে জীবনকে দেখেই তো পছন্দ করেছিল ময়না। আর জীবনও ময়নাকে দেখে পাগল হয়েছিল।

ময়নার কাছে জীবন ছিল রাজা। রাজা বলে ডাকতো। আর জীবনও ছিল তেমনি। ময়নাকে আদর করে ডাকতো রাণী বলে।

রাজা রাণীর দিন ফুরোলো। হঠাৎ। গ্রামের বাবুদের বাড়িতে কাজে গিয়েছিল জীবন। পুরনো ছাদ ভাঙার কাজ। ছাদ ভাঙতে কড়িকাঠ চাপা পড়লো জীবন। মাথাটা গুঁড়ো হয়ে গেল। লোকজন ছুটে এলো। কড়িকাঠ সরালো। কিন্তু চাপা পড়া মানুষটা তখন শেষ।

ময়নার কানে খবরটা উড়ে এলো। ছুটে গেল সে। স্বামীর দেহটা জড়িয়ে কাঁদলো। কিন্তু বাবুদের বাড়িতে মরা কান্না—বাবুরা সহ্য করবে কেন! ময়নাকে একরকম জোর করে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সেই সঙ্গে জীবনের মৃতদেহও একদল লোক এসে বাড়ির উঠোনে নামিয়ে দিয়ে গেল। একজন লোক নগদ পঁচিশটি টাকা দিল ময়নার হাতে। একজন মজুরের জীবনের দাম। টাকা ছুঁড়ে ফেলে দিলে ময়না। পাগলার মতো মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলো সে। আর সেই সঙ্গে নানা কথা মিশিয়ে কাঁদিতে লাগলো। সে কান্না সহজে থামার নয়।

তবু কান্না থামলো। ময়না আবার স্থির হলো। তার তো তখন অজানা নয়—সে মা হতে চলেছে।

মা হলো ময়না। মেয়ের মা। পড়শী-বৌ টগর, সেই মেয়ের নাম রাখলো। সুখী। নাম শুনে ময়না হেসে ছিল। এত দুঃখ যার, তার মেয়ের নাম সুখী। যদিও মেয়েটাকে সে-ও ওই নামে ডাকতো।

সেই জীর্ণ কুঁড়ে, সেই ভিটে—অথচ আসল মানুষটা নেই। যে মানুষটাকে নিয়ে ময়না।

তবু ময়না আছে। সুখী আছে। কিন্তু বাঁচার ইচ্ছে নেই ময়নার। মরতে চায় সে। মরাটা এমন কিছু কঠিন নয়। গলায় দড়ি দিয়ে মরা যায়, কলকে ফুলের বিচি খেলেও মরা যায়। তার চেয়ে মরা যায় ফসলে পোকা-মারার তেল যদি একটু খাওয়া যায়।

এক রকম ঠিকই করেছিল ময়না—এ-জীবন সে রাখবে না। কিন্তু সুখী বাদ সাধলো। সুখীর জন্যে তার মরা হলো না। সে যদি মরে, তাহলে কি হবে সুখীর।

মরা হলো না ময়নার। সুখীর জন্যেই তাকে বাঁচতে হবে। আর সেই ইচ্ছেটাই তার বড় হলো।

কিন্তু গ্রামে বাঁচবে কি নিয়ে? বরং বাঁচার চিন্তাটাই এখানে মিথ্যে। তারপর সবচেয়ে মুশকিল নিজের রূপ-যৌবন নিয়ে। অনেক লোভী দৃষ্টি তার ওপর। তার রূপ-যৌবনের জন্যে আসে। আকারে ইঙ্গিতে অনেক কথা বলে। যে কথার মানে বোঝে ময়না। আর এ কথাও সে জানে, সুযোগ পেলেই ওই লোভী মানুষেরা তাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খাবে। ওরা পাগলা কুকুরের চেয়েও ভয়ংকর।

গ্রামে লোকের বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করতো ময়না। কেউ দিত, কেউ দিত না। যা হোক করে চলতো। কিন্তু যখনই বুঝলো তার ওপর অনেক মানুষের চোখ পড়েছে, তখনই সে ঘর থেকে বেরোনো বন্ধ করে দিলে। পড়সী টগর মাঝে মাঝে সাহায্য করতো। কিন্তু সে একা কত পারবে। সুতরাং বাঁচার জন্যে পথ তাকে খুঁজে বার করতে হলো।

বাঁচার তাগিদেই ট্রেনে চেপে কলকাতায় আসা। আবার বাঁচার জন্যেই এখানে থাকা। এবং আছেও।

দুপুরের পর। এদিকটা ছায়া পড়ে যায়। গাড়ীবারান্দার নীচের মানুষগুলো সকাল থেকে অপেক্ষা করে এই ছায়ার। নয়তো সকাল থেকে রোদে পুড়ে পুড়ে মানুষগুলো খাক হয়ে যায়। আর ময়না যে কোণটায় থাকে, সে দিকটা রোদ থাকে বেশী সময়। তবুও তো একটা ছেঁড়া চট আড়াল দিয়ে রেখেছে। প্রথম থেকেই এই জায়গাটার স্বত্ব বজায় রেখেছে ময়না।

গাড়ীবারান্দায় আরো কয়েকটি মানুষের আশ্রয়। তবে সংসার কারো নেই। সবাই একা। প্রায় অন্ধ মদনবাউরি, পঙ্গু সীতারাম, লোটন ঋষি, মানিক—এরা ক'জন অনেক দিনই আছে। এখন আবার নতুন জুটেছে আধ-পাগলী আঙুর। এছাড়া দু' চার জন ভবঘুরে মেয়ে-পুরুষও মাঝে মাঝে এখানে রাত কাটিয়ে যায়।

লোটন ঋষি মানুষটা ভালো। একটা পা নেই। বাঁশের ক্রাচ নিয়ে চলাফেরা করে। বয়েস হলেও এমনিতে শক্ত-সমর্থ। ময়নাকে ডাকে মেয়ে বলে। ময়না তাকে মেসো বলে ডাকে। এই ক' বছর লোটন ঋষিই ময়নাকে নানা বিপদ থেকে রক্ষে করে এসেছে। নয়তো বাউণ্ডুলে শয়তানগুলো এত দিনে শেষ করে দিত ময়নাকে। এখনো মাঝে মাঝে ছাঁচড়ের মতো কেউ কেউ এসে ময়নার কাছে ঘুর-ঘুর করে। ময়না নিজে ফোঁস

করতে ছাড়ে না। নিজে যখন না পারে মেসোকে ডাকে। ময়নার ডাক শুনতে পেলেই ক্র্যাচ নিয়ে ছুটে আসে লোটন। এক পায়ে দাঁড়িয়ে বাঁশের ক্র্যাচ উঁচিয়ে উচ্চিংড়েগুলোকে তাড়া দেয়। বলে, ফের যদি মেয়ের কাছে আসবি দেবো মাথা গুঁড়িয়ে। মাংস খেতে ইচ্ছে হয় বাজারে টেংরি কুড়িয়ে খে গে।

লোভী উচ্চিংড়েগুলো পালিয়ে যায়। দু-দশ দিন আর আসে না। তারপর হয়তো আবার এসে ঘুরঘুর করে।

ময়না জানে ওরা কিসের লোভে আসে। আসে ওর রূপ-যৌবনের জন্যে। সব গেছে তার, কিন্তু ওটুকু হারায়নি। কত সময়ে ভেবেছে ময়না, সে যদি রোগা হয়ে যেত, যদি কুৎসিত হয়ে যেত—তাহলে এমন করে ওই লোভী মানুষগুলো তার কাছে ঘুরঘুর করতো না। কিন্তু তা হবার নয়। এত দুঃখ কষ্টের মধ্যে সে যেমন ছিল তেমনি আছে। বরং কলকাতায় থেকে তার দেহের রঙটা আগের চেয়ে চকচকে হয়েছে।

প্রতিদিন দুপুরে সুখীকে নিয়ে গোলদীঘিতে স্নান করতে যায় ময়না। কখনো কখনো রাস্তার কলে। আর স্নান করে এসে ভিজে চুল শুকিয়ে পুরনো আরশি সামনে রেখে চুল আঁচড়াতে বসে ময়না। এক-একবার মনে করেছে চুল আঁচড়াবে না, চুলে জট পড়ে যাক, উকুনের বাসা হোক--হয়তো দু-চার দিন চুল আঁচড়ানো বন্ধ রেখেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবার আরশি সামনে নিয়ে বসেছে।

আরশির সামনে বসলে কি যেন হয় ময়নার। সব হিসেব গোলমাল হয়ে যায়। পুরনো আরশির ঘসা কাচে নিজের মুখের ছবি—সেই ছবির দিকে অবাক চোখে চেয়ে থাকে সে। আর তখনই ওর মনের মধ্যে নানা স্মৃতির তরঙ্গ ওঠে। যে তরঙ্গে ওর মনের বাঁধ ভেঙে যায়। আরশি সামনে রেখে বসে বসে কাঁদে। কখনো চুল বাঁধা অসমাপ্ত থেকে যায়।

ঠনঠনের পথে বসা একজন বুড়ি একদিন বলেছিল, ভিকিরি মেয়ের অমন চুল বাঁধার সখ কেন? ও চুল কেটে ফ্যাল।

ময়না সে কথায় সায় দেয় নি।

আবার কত সময় ময়নাকে আরো কথা শুনতে হয়েছে।—অমন রূপ থাকতে মেয়েমানুষ ভিক্ষে করবে কেন? একবার চোখ নাচিয়ে দাঁড়ালে রূপের ডালায় অনেক পয়সা প্যালা পড়বে।

ময়নার সর্বাঙ্গ রি রি করে উঠেছে এসব কথায়। তবু সে কোন কথা বলে নি। ও জানে, যে যা খুশি বলুক, কেউ কিছু বললে তো তার গায়ে ফোস্কা পড়বে না। তাছাড়া এসব কথা ওর গা-সওয়া হয়ে গেছে। এই তো সেদিন ঠনঠনে বাজারের মাতালটা নোংরা কথা শুনিয়ে গেল—চুপ করে শোনা ছাড়া উপায়ই বা কি। এ সব পুরনো হয়ে গেছে ময়নার কাছে।

দুপুর গড়িয়ে গেছে। ময়না নাওয়া-খাওয়া সেরে একটু শুয়েছিল। একটু ঘুমিয়েও পড়েছিল। ঘুম ভাঙতে [illegible] বেলা পড়ে গেছে। সুখীকে দেখতে পেল না। চারদিকে চেয়ে দেখলো। রাস্তার এপারে নয়, ওপারে লোটন মেসোর সঙ্গে দাঁড়িয়ে বরফ খাচ্ছে। মেয়েকে দেখতে পেয়ে ময়না নিশ্চিন্ত।

পেটির ভিতর থেকে আরশিটা বার করলো ময়না। দাঁড়াভাঙা চিরুনিটাও।

আরশির কাঁচটা কেমন ঝাপসা হয়ে গেছে। তাহোক—তবু এই আরশির মধ্যে অনেক কিছু দেখতে পায় ময়না।

বিয়ের পর পীর গোরাচাঁদের মেলা থেকে এই আরশিটা পছন্দ করে কিনেছিল ময়না। কাঁচের ওপর লেখা ছিল 'সতীর দেবতা পতি'। পড়তে পারতো না ময়না। দোকানদারই পড়ে শুনিয়ে ছিল। লেখাটা নেই। রঙ চটে উঠে গেছে। কিন্তু মন থেকে মুছে যায় নি। মুছে যাবার নয়।

চুল বাঁধতে বসলে যা হয়, তাই হলো। যত রাজ্যের পুরনো কথা মনে পড়লো। সেই গ্রাম, গ্রামের পরিবেশ, স্বামী—তারপর আরো কত কথা। যেসব কথা মনে এলেই মনের মধ্যে একটা কান্না পাক দিয়ে ওঠে, আর বুকটা কেমন ব্যথায় টনটন করে।

আজ বুকের মধ্যে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করলো। আর আরশির কাঁচে ভেসে ওঠা নিজের মুখের দিকে চেয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদেও উঠলো। সেই মুহূর্তে স্বামীর সেই থেঁতলানো মাথাটা চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল।

—কি রে কাঁদিস কেনে মেয়ে?

ক্র্যাচে ভর দিয়ে লোটন ঋষি এসে দাঁড়িয়েছে পিছনে। সুখীও সঙ্গে আছে। দাঁড়িয়ে বরফ কাঠি চুষছে।

—বরফ খাবা মা। সুখী বলে উঠলো, খুব ঠান্ডা। খাবা?

আঁচলে চোখ মুছে ময়না তাকালো মেয়ের মুখের দিকে।

ক্র্যাচ নামিয়ে লোটন মেসো ময়নার পাশে বসলো। বললে, আজ ইলিশ মাছ আনবো মেয়ে, জুৎ করে রান্না করিস তো।

ময়না একটু বিস্ময়ের সঙ্গে লোটনের মুখের দিকে তাকায়। লোটন ট্যাঁক থেকে দশ টাকার নোট বার করে বলে, কুড়িয়ে পেইচ। কুড়িয়ে পাওয়া পয়সা রাখতে নেই। সন্ধ্যেবেলা বাজার যাবো—ইলিশ মাছ আনবো।

সুখী আনন্দে লাফাতে লাগলো। বাজার কুড়ানো তরকারি, আর ছাইপাঁশ খেয়ে খেয়ে মুখটা পচে গেছে। আজ ইলিশ মাছ হবে—একথা ভাবতেও তার আনন্দের শেষ নেই।

ময়নার চোখে তখন পুরনো আরশিটাই সত্যি। তাছাড়া আর কিছু নয়।

সেই একই দৃশ্যপট। রাজপথ। গাড়ী-বারান্দা। আর কটি সর্বহারা মানুষের ঠিকানা সেখানে।

নতুন মানুষ এলো গাড়ীবারান্দায়। আশ্রয় চায়—কিন্তু পুরনো বাসিন্দারা বাধা দিলে। এখানে আর জায়গা হবে না।

ছোকরা বয়সের মানুষ। কিন্তু দুটো হাত নেই। এদিকে শক্ত-সমর্থ জোয়ানগোছের।

লোকটা যখন এলো তখন রাত হয়েছে। গাড়ীবারান্দার মানুষগুলো ভিক্ষের কড়ি নিয়ে ফিরে এসেছে। কেউ রাঁধছে, কেউ বসে আছে। মানিক ছাড়া সবাই এসেছে। মানিকের ফিরতে অনেক রাত হয়। গঙ্গার ধারে গাঁজার আড্ডায় না গেলে তার মৌতাত হয় না। ফিরে আসে ব্যোম ভোলানাথ হয়ে। এসেই শুয়ে পড়ে। গাঁজা খেয়ে খেয়ে মানিক আর মানুষ নেই।

ময়না রান্না করছিল। ভাত হয়ে গেছে। উনুনে চাপিয়েছে বাজার কুড়ানো তরকারির চচ্চড়ি। দশ পয়সার পচা চিংড়ি মাছ এনেছে ময়না— ও কটা চচ্চড়িতেই দিয়ে দেবে।

লোটন ঋষি চুপচাপ বসে ক্র্যাচের কাটা জায়গায় দড়ি জড়াচ্ছিল। নতুন ছোকরাকে নিয়ে যখন সবাই হৈ-চৈ করছিল, তখন সে কিছু বলে নি। কিন্তু ছোকরা যখন চলে যাবে বলে পা বাড়িয়েছে তখনই লোটন তাকে ডাকলো। ডাক শুনে ছোকরা কাছে এলো।

লোটন কোন ভূমিকা না করেই বলে, অরে থেকে যাও এখানে? এখন আর যাবা কোথায়?

ছোকরা ভরসা পেয়ে লোটনের কাছে এলো।

লোটন বলে, বোসো। তারপর হাত দুটো গেল কেমনে?

ছোকরা বলে গেল তার কথা। ট্রেনে ফেরি করতো সে। চলন্ত ট্রেনে ওঠা নামা করতো। একদিন স্টেশনে ঢোকার মুখে ট্রেন থেকে পড়ে যায় নীচে। প্রাণে বাঁচে কিন্তু হাত দুটো চলে যায়। তারপর থেকে এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতো। বেশী থাকতো লালগোলা লাইনে। ওদিকে আর তেমন সুবিধে হচ্ছে না। তাই চলে এসেছে কলকাতায়।

—কিছু জানা আছে, না কাটা হাতই ভরসা? লোটন জিজ্ঞাসা করলো।

—একটু-আধটু গাইতে পারি। ছোকরা বললে।

গানের কথায় উৎসাহিত হলো লোটন। বলে, তবে হয়ে যাক না একটা।

ছোকরা এদিক-ওদিক তাকালো। তার চোখ পড়লো ময়নার দিকে। শুকনো কাঠ-কুটো জেলে রান্না করছে ময়না। আগুনের আভা পড়েছে তার চোখে-মুখে।

ছোকরার কণ্ঠে গান এলো। 'ও ললিতে ভাবের ঘোরে চুরি করিস নে' বলে গাইতে আরম্ভ করলো।

গানে মুগ্ধ লোটন। জিজ্ঞাসা করলে, তোমার নাম কি?

—রতন।

রতনের চোখটা আবার ময়নাকে স্পর্শ করলো। আধ-পাগলী আঙুর কোথায় যেন ছিল, আচমকা খ্যানখেনে গলায় হেসে উঠে রতনের গাওয়া গানের কলি গাইতে শুরু করে দেয়। 'ও ললিতে ভাবের ঘোরে চুরি করিস নে'।

নুলো রতন এখন গাড়ীবারান্দার একজন। লোটন ঋষি কি খেয়ালে একটা সংসার সাজালো। ময়না-সুখী, রতন আর সে নিজে। ময়নাকে আর ভিক্ষের জন্যে বসতে দেয় না লোটন। রতন আর সে যা পায়, তাই তুলে দেয় ময়নার হাতে। ময়না সংসার নামের খেলাঘর নিয়ে আছে।

আর ময়না এই খেলাঘরের সংসারকে কখন যেন ভালোবেসে ফেললো। এটা চাই, ওটা চাই—সংসারের জন্যে অনেক কিছু চাই। আর সেই অনেক কিছু চাওয়ার মধ্যে সে যে সবকিছু হারিয়ে ফেলে। যেটা হারায়নি, এখনো আছে সেই ভাঙা আরশি-টাতেও আর নিজের মুখ ভালো করে দেখতে পায় না সে। সেদিন পরিপাটি করে চুল বাঁধতে বসে ময়না ভাবলো, রতনকে বলবে একটা ভালো আরশির জন্যে। আর এই ভাবনার মুহূর্তেই তার সর্বাংগ কেমন শিউরে উঠলো। সে শিহরণ তার মনেও।

চুল বাঁধতে বসেও চুপচাপ বসে রইলো ময়না। দাঁড়াভাঙা চিরুনিটা হাতের মুঠোয় ধরা—অথচ চুল বাঁধায় মন নেই।

পাগলী আঙুর কোথায় ছিল, ছুটে এলো। এসেই ময়নার হাত থেকে চিরুনি কেড়ে নিয়ে ময়নার চুল বাঁধতে বসলো।

ময়না কিছু বলতে গেল, কিন্তু বলতে পারলো না। তার আগেই আঙুর সহজ মানুষের মত বলতে আরম্ভ করেছে, মাথা ঘষিস না কেন— ময়লা জমেছে। রতনকে বলতে পারিসনে সাবান আনতে, ফুলের তেল আনতে।

আঙুরের কথায় ময়না চমকে উঠলো।

পরিপাটি করে চুল বেঁধে দিল আঙুর। তারপর ময়নার গালে 'ঠোনা' মেরে বললে তোকে দেখতে খুব ভালো।

এত সময় সহজ ছিল আঙুর। হঠাৎ আবার পাগলামি আরম্ভ করে দিলে। কেষ্ট-যাত্রার দলের সখীদের মত নেচে নেচে গাইতে আরম্ভ করলে, ও ললিতে ভাবের ঘোরে চুরি করিস নে।

গাইতে গাইতে রাস্তা পেরিয়ে চলে গেল পাগলী আঙুর।

কলকাতায় চৈত্র মাস। বাতাস পাগল হলো। রাস্তার ধুলো উড়লো। ছোট ছোট ঘূর্ণিতে টুকরো কাগজ খড়-কুটো উড়লো।

রতন আজ দূরে কোথায় গিয়েছিল, একরাশ ঝরা গুলমোহর কুড়িয়ে এনেছে।

সন্ধ্যার পর। গুলমোহরগুলো কেমন কালো-কালো দেখায়। কিন্তু আলোর সামনে তার স্পষ্ট রংটাই চোখে পড়ে।

ময়না সন্ধ্যের পর থেকেই চুপচাপ বসেছিল। রান্নাবান্না হয়ে গেছে তার। এখন খাওয়া-দাওয়া চুকতে যা বাকি। রতনও যেমন, লোটন মেসোও তেমন। রাত না হলে কেউ খেতে চাইবে না। সুখী সন্ধ্যে হতেই খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়েছে। একটু আগেও জেগেছিল, কথা বলছিল, এখন আর সাড়া নেই। ঘুমিয়েছে হয়তো।

রতন বসেছে ময়নার কাছে। ফুলগুলো ঢেলে দিয়েছে ছেঁড়া মাদুরের ওপর। বলেছে, দ্যাখো—হাত নেই তবু ফুল কুড়িয়েছি।

ফুলগুলো হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করলো ময়না। কতকটা আপন মনেই বললে, সোন্দর। তারপর রতনের মুখের দিকে তাকালো।

এরই ক্র্যাচের শব্দ। লোটন ঋষি আসছে। ময়না, রতন দুজনেই সচকিত হলো। পাশাপাশি বসেছিল, লোটনকে দেখেই সরে যেতে চাইলো। কিন্তু সরে গেলেই বা কি হবে, লোটনের চোখে তখন সব কিছু পরিষ্কার।

রতন আর ময়না দুজনেই একটু ভয়ও পেল। পাছে লোটন কিছু বলে। আশ্চর্য মানুষ লোটন। ক্র্যাচ নামিয়ে দুজনের সামনে বসলো। বললে, মেয়ে, তুই সুখীকে বলে দিস, এতদিন তুই মিথ্যে বলেছিলি, তার বাপ মরে যায়নি।

ময়না আর রতন দুজনেই মাথা নীচু করে।

পরদিন।

নতুন আরশিতে মুখ দেখলো ময়না।

উৎসবের সমাপ্তিতে

এখন সব কেমন ফাঁকা ফাঁকা। অথচ দু'দিন আগেও কি দারুণ জমজমাট ছিল। যেন আনন্দের স্রোত বইছিল। আর আমরা পুলকিত হচ্ছিলাম। শরৎকাল শুরু হয়ে আকাশের মেঘ পাল তোলা ভেলার মতো যখন ভাসতে আরম্ভ করে তখনই এই আনন্দের সূত্রপাত। আর তা চলে অনেকদিন। দুর্গাপূজো থেকে ভাইফোঁটা পর্যন্ত। একটানা উৎসব। অফুরান আনন্দ। আমার মা বলেন, প্রতিদিন আমরা তোলা জলে স্নান করি। তাতে ঠিক স্নানের আনন্দ পাওয়া যায় না। অনেকটা দায়সারা নিত্য-নৈমিত্তিক কর্তব্য সম্পাদন আর কি। কিন্তু যেদিন গঙ্গায় গিয়ে অবগাহন স্নান করি সেদিন মনটা তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের গতানুগতিকতার মধ্যে উৎসবও সেই অবগাহন স্নানের আনন্দ বয়ে আনে। আর উৎসবের সেরা শারদোৎসব। কিন্তু সেই উৎসবও ফুরিয়ে গেল। দীপাবলীর উজ্জ্বল আলোকমালার মধ্য দিয়ে ভাইফোঁটায় এসে উৎসবের রথ থেমে গেল। চোখের সামনে সব আলো যেন দপ করে নিভে গেল। শুরু হলো আবার দিন গোনার পালা

এমনি দিন গুনতে গুনতেই আমরা শারদোৎসবে পৌঁছে যাই। সেখান থেকে আবার আমরা ভাইফোঁটার দিন গুনতে থাকি। এই দিনটির দিকে তাকিয়ে বোনেদের সাগ্রহ প্রতীক্ষা। জল্পনা-কল্পনার অবধি থাকে না। আমার মনে পড়ে মীরার কথা। চার ভায়ের এক বোন মীরা। দুই দাদা প্রবাসী। মা-বাবার সঙ্গে সে থাকে বাড়িতে। আছে আরো ছোট দুই ভাই। প্রতিবার দুর্গাপুজোর সময় পথ চেয়ে থাকে দাদাদের। ওরা আসবে। বছরে একবারই আসে। মীরার কিন্তু লক্ষ্য ভাইফোঁটার দিকে। সে বারবার দাদাদের মনে করিয়ে দেয়, ভাইফোঁটার আগে তোমাদের যাওয়া হবে না। দাদারাও বোনের মন বুঝে চলে। তবে তাকে রাগাতে ছাড়ে না। কপট ব্যস্ততার ভাব দেখিয়ে ওরা বলে, অফিসে কাজের চাপ খুব। তাই এবার আর বেশী-দিন থাকা যাবে না। এবার বরং ভাইফোঁটা আমাদের তোলা থাক। আসছেবার এক-সঙ্গে দু'বছরের ফোঁটা নেব। সঙ্গে সঙ্গে মীরার মুখ ভার হয়ে যায়। আর কান্না সঙ্গে সঙ্গে [illegible] না। চুপি চুপি মায়ের [illegible] জানতে চায় সত্যি দাদারা ভাইফোঁটার আগেই চলে যাচ্ছে কিনা। মা হেসে বললেন, [illegible] না। ওরা তোকে এমনি খেপাচ্ছে। তখন মীরার মুখে আবার হাসি খেলে।

একবার কিন্তু দুই দাদাকে সত্যি সত্যি ভাইফোঁটার আগেই চলে যেতে হয়েছিল। এবং অফিসের প্রয়োজনেই। মীরা আগে থেকেই সব শুনেছে। তবে বিশ্বাস করেনি। ভেবেছে যে, দাদারা এবারও ঠাট্টা করছে। তারপর যখন জানতে পারলো যে, দুই দাদাই চলে যাচ্ছে এবং ভাইফোঁটার আগেই তখন সে কান্নায় ভেঙে পড়ে। তার কান্না আর থামে না। যতই তাকে বোঝানো হয় ততই সে ফুলে ফুলে কাঁদে। দাদারা চলে গেল। আর মীরা কাঁদতে কাঁদতে বিছানা নিল। পরদিন দেখা গেল তার বেশ জ্বর উঠেছে। জ্বরের ঘোরে সে সমানে প্রলাপ বকে। সেই একই কথা, প্রতিবার আমি চারজনকে ফোঁটা দিই। এবার ওরা চলে গেল কেন? আমি আর কোনদিন ওদের ফোঁটা দেব না। অনেক ডাক্তার-বদ্যি করে মীরার অসুখ সারে। কিন্তু ততদিনে ফোঁটা চলে গেছে। সেবার মীরা ছোট দুই ভাইকেও ফোঁটা দিতে পারে নি। এজন্য সে অনেক আপসোস করেছে তবে তার প্রবাসী দুই দাদা এরপর আর কখনো ফোঁটার দিনে গরহাজির থাকেনি। এটাই মীরার নীট লাভ।

ভাইফোঁটা ভায়েদের উৎসব। আর বোনেরা হলো সে উৎসবের আসল প্রাণ-সম্পদ। যুগে যুগে বোনেরা এগিয়ে এসেছে এমনিভাবে ভায়েদের বরণ করতে। একদিন দেশের ডাকে সাড়া দিয়ে ভায়েরা যখন যুদ্ধযাত্রা করতো তখন বোনেরাই এগিয়ে তাদের অঙ্গে তুলে দিত রণসাজ। আর কামনা করতো তাদের ভায়েরা যেন বিজয়ী হয়ে ফিরে আসে। যুদ্ধশেষে রণক্লান্ত সৈনিকের দল যখন দেশে ফিরে আসতো তখন বোনেরাই বরণডালা সাজিয়ে তাদের অভ্যর্থনা করতো। সেই ঐতিহ্য যে আজো ম্লান হয়ে যায়নি তার প্রমাণ পাওয়া গেল প্রথমবার পাক-ভারত সংঘর্ষের সময়। ভাইয়ের বীরত্বে গর্বিত বোনেরা সেদিন উৎসবের আনন্দ থেকে তাদের বঞ্চিত রাখে নি। শিবিরে শিবিরে পৌঁছে দিয়েছে প্রাণের অঞ্জলি—দেওয়ালীর মিষ্টি দিয়ে তাদের করেছে আপ্যায়িত।

বাংলাদেশে ভাইফোঁটা ভাই-বোনের মিলিত উৎসব। ভাইয়ের কপালে ফোঁটা আর যমদুয়ারে কাঁটা দেওয়ায় বোনেদের যত উৎসাহ ভায়েদেরও তত। এই উৎসবে তাই দূর দূরান্ত থেকে ভায়েরা ছুটে আসে বোনের ডাকে সাড়া দিয়ে। ভাই না এলে বোনের মুখ ভারি হয়, আবার ভায়েরও মন খারাপ হয় কম না। এমন এক ভাইকে আমি জানি যে কিনা শুধু বোনের হাতে ফোঁটা নেবার জন্য বিরাট ব্যবধান তুচ্ছ করে সেদিন এসে হাজির হয়। এসেই সে বলে, দেখলি তো ঠিক এলাম। এ দিনে যেখানেই থাকি না কেন তোর হাতে ফোঁটা নিতে আসবোই। হাসিতে উচ্ছল বোন সানন্দে ভাইকে ফোঁটা পরায়।

আমার একটা ছেলেমানুষীর কথা মনে পড়ে। সেবার কালিপুজোয় মাইকের বাড়া-বাড়িতে খুব বিরক্ত হয়েছিলাম। স্কুল খুললেই টেস্ট পরীক্ষা। এদিকে একনাগাড়ে কদিন মাইক বেজে চলেছে। বই নিয়ে একদম বসতে পারছি না। এমন রাগ হচ্ছিল যে, সে আর বলার নয়। রাগের বশে সেদিন স্থির করে ফেললাম যে, এমন উৎসবের সঙ্গে আমি আর কোন সম্পর্ক রাখবো না। সেদিনের কথা মনে পড়লে এখন হাসি পায়। থালার উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়ার মতো বোকামি বুঝি একেই বলে। কয়েকজনের উপর রাগ করে তো আর উৎসবের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করা যায় না। তাহলে যে জীবনের সব আলোই নিভে যাবে। ভাগ্যিস, সেদিনের প্রতিজ্ঞার কথা কয়েকদিনের মধ্যেই ভুলে গিয়েছিলাম না হলে ভায়ের কপালে ফোঁটা আর যম-দুয়ারে কাঁটা দেওয়ার মতো মেয়েদের জীবনের পরম আকাঙ্ক্ষিত উৎসব থেকেও আমাকে বঞ্চিত হতে হতো।

উৎসবের সঙ্গে কারো আড়ি চলে না। পশ্চিমী দুনিয়ার দিকে তাকালেই একথার সত্যতা উপলব্ধি করা যায়। বড়দিনের উৎসব। যীশুখৃষ্টের জন্মদিন। সারা ইউ-রোপ এই উৎসব পালন করে অভূতপূর্ব সমারোহে। একাধিক নিরীশ্বরবাদী দেশও এই উৎসবের সামিল হয়। ঈশ্বরের অবিশ্বাস নিয়ে তারা উৎসবের আনন্দ থেকে নিজে-দের বঞ্চিত করে না। এমনি ঘটনা ঘটে আমাদের দেশেও। বড়দিনের উৎসবে আমরাও কম জাঁক করি না। রাস্তাঘাট আলোকমালায় সাজাই। ঘরে ঘরে সেদিন কেক খাওয়ার ধুম পড়ে যায়। আর সেই সঙ্গে সাজানো। আমরা যদিও নিরীশ্বর-বাদী নই। তবুও কোথাকার উৎসব কোন পর্যন্ত গড়ায়। এটাই বোধহয় উৎসবের আসল মহিমা।

আমাদের ভারতীয় খৃষ্টপন্থীরাও শারদোৎসব থেকে কখনো নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখেন না। দুর্গাপুজো থেকে ভাই-ফোঁটা—সব উৎসবই তাঁরা পালন করেন। দেওয়ালীর দিন ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়ে আর ভাইফোঁটায় ভায়ের কপালে ফোঁটা

দিয়ে বোনেরা তাদের অক্ষয় পরমায়ু কামনা করেন। এ থেকে মনে হয় উৎসবের কোন জাতিভেদ নেই যদি তা সকলের প্রাণে আনন্দের পরশ বুলিয়ে দিতে পারে তবে সবাই যেকোন উৎসবকে আপনার করে নেবে। দূরে যত ঘরের কাছাকাছি আসবে আর পর আপন হবে ততই উৎসবে ভেদাভেদের সীমারেখা হ্রাস পাবে। মানবজাতির পক্ষে সে হবে এক পরম শুভদিন।

একটু প্রসঙ্গান্তরে সরে গিয়েছিলাম। আবার আমাদের মূল বিষয়ে ফিরে আসা যাক। আমাদের দেশে শুধু ভায়েদের উৎসব আছে। যদিও এতে বোনেদের ভূমিকা প্রায় সমান গুরুত্বপূর্ণ। তবুও একান্তভাবে বোনেদের জন্য কোন উৎসব আমাদের নেই। পৃথিবীর ভাইবোনের সমান অগ্রগতি। আমরাও নেই অগ্রগতির পথে পিছিয়ে নেই। একদিন অবশ্য বোনেরা গৃহান্তরাল থেকেই ভায়েদের গর্বে আনন্দ অনুভব করতো। কিন্তু সেই শাস্ত্রবিধান আজ পুরোন অধ্যায়। এখন ইতিহাস বদলে গেছে। যদিও আমাদের ধর্মশাস্ত্রে দেবতার তুলনায় দেবীর মাহাত্ম্যই বেশি তবুও বাংলাদেশের বোনেদের তরফ থেকে একটা অনুরোধ এই সুযোগে জানিয়ে রাখছি, ভাইফোঁটার মত বোনেদের উৎসবের জন্যও একটা দিন নির্দিষ্ট হোক। তাহলে শুধু বোনেদেরই আনন্দ হবে না ভায়েরাও নতুন তৃপ্তিসুখে নতুন উৎসবের সুযোগ পাবে।

—প্রমীলা

সুন্দরবনে একদিন

আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়

জলাশয়ের কালো জল আরও কালো
এল। চারিদিকে নিবিড় অরণ্য। সূর্য
চম আকাশে হেলে পড়েছে। গাঢ় অন্ধ-
র গাছের আড়ালে নিজেদের প্রায় মিশিয়ে
। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছি আমরা গুটি-
ক প্রাণী অধীর অপেক্ষায়। প্রতীক্ষা
হোল।

পুকুরের অপর পাড়ে জল খেতে এগিয়ে
একপাল হরিণ। সেই স্বল্প আলোকেও
দের বিচিত্র গাত্রবর্ণ দেখে আমরা মুগ্ধ।
র্পাতর শিশুর কি বাহার! অকস্মাৎ এক
না বিপদের সংকেতে সারা দলটি চকিত
উঠল। তাদের উত্তেজনা আমাদেরও
র্শ করল। জোর আওয়াজে কেঁপে উঠল
া বনভূমি।

এত কাছে বাঘ! চমকে উঠে দেখি
মাঝ রাস্তায় ব্রেক করেছে। তাহলে
ন দেখছিলাম দেখাটা অস্বাভাবিক
। অত ঝাঁকুনিতেও সহযাত্রীদের কারও
র ব্যাঘাত ঘটেনি— সবাই ত ক্লান্ত।
-ঘড়িতে দেখি রাত সাড়ে এগারটা।
কাতা তাহলে আর বেশী দূর হবে না—
রাটার মধ্যেই ত পৌঁছে যাব বলেছিল।

বন ভ্রমণের কথা বলব ভেবেছিলাম—
তু এ যে দেখছি হয়ে গেল শেষ থেকে
। শুরু করিই বা কোথা থেকে? অনেক
পনা-কল্পনার পর এই যে একটা রবিবারে
ই মিলে দল বেঁধে হাউই-এর মত হুস্
র সুন্দরবন ঘুরে কেন জোয়ার ফিরে
এলাম, এর গোড়া খুঁজে বার করা সহজ
নয়।

সুন্দরবন দেখার বাসনা আমাদের বহু-
দিনের—অনেকের মুখে গল্প শুনেছি, প্রচুর
বইও পড়েছি। একদিকে যেমন শিকারীদের
লোমহর্ষক কাহিনীতে বিভীষিকার ছবি
ফুটে ওঠে—যেখানে ডাঙায় বাঘ, জলে
কুমির আর গাছের ডালে সাপ, প্রতি পদ-
ক্ষেপেই বিপদ লুকিয়ে আছে। তেমনই
আবার অপরদিকে সাবেক কালের ডেস্‌প্যাচ
স্টীমারে পূর্ববঙ্গে যাবার বিবরণীতে পাই
রহস্যময়ী সুন্দরীদেবীর অনন্য সৌন্দর্যের
ইঙ্গিত। বুঝি সে রূপের যেটুকু দেখে তাঁরা
মজেছেন তার বাইরে অনেকটাই না-দেখা
রয়ে গেছে। কিন্তু কলকাতার এত কাছে
হলেও, বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সুন্দরবন যাওয়া
ঘটে ওঠেনি। সে আশা প্রায় ছেড়ে দিয়ে-
ছিলাম এমন সময় অভাবনীয়ভাবে সুযোগ
পাওয়া যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ট্যুরিস্ট
ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত সুন্দরবন ভ্রমণের
প্রোগ্রামে।

ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি অর্থাৎ ফাল্গুনের
শুরু। কলকাতায় স্বল্পায়ু শীত যাই যাই
করছে। রবিবার সকাল ছ'টায় ডালহৌসি
স্কোয়ারে ট্যুরিস্ট ব্যুরোর সামনে থেকে
বাস ছাড়ার কথা। একজনের দু-দুটো ঘড়ির
যান্ত্রিক গোলযোগে আমাদের পৌঁছতে
একটু দেরী হয়ে গেল। বাস ছেড়ে যায়নি
দেখে আশ্বস্ত হলাম। দলের অন্য বন্ধুরাও
আমাদের দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। দেরী
করার জন্য যে বকুনি খেতে হবে ভেবে-
ছিলাম তা মকুব হোল, যাত্রার আনন্দে
সকলেই উৎফুল্ল। আমরা উঠতেই বাস ছেড়ে
দিল। বড় ডি-লুক্স বাস, দূর যাত্রার
উপযোগী করে তৈরী। নিজের মর্জিমত
সীট হেলাবার ব্যবস্থা আছে, আর আছে
পিছন দিকে ছোট বাথরুম। প্রায় সব আসনই
ভর্তি। যাত্রীরা ছাড়া সঙ্গে আছেন ট্যুরিস্ট
ব্যুরোর কয়েকজন কর্মী। সকলের জন্য
খাবারও নেওয়া হয়েছে।

বাস চলল ভোরের কলকাতা ছাড়িয়ে,
যাদবপুর, গড়িয়া পার হয়ে জয়নগরের পথে।
রাস্তার নাম কুলপী রোড। বারুইপুর
পর্যন্ত বসতি বেশ ঘন, তারপর ক্ষেত-
খামারই বেশী। শীতশেষের বাংলার
পাড়াগাঁর জীবনযাত্রা জানলার নীল কাচের
মধ্য দিয়ে ছবির মত দেখে যাচ্ছি। চারি-
দিকে কেমন যেন একটা অলস ঢিমেতালের
ভাব ফুটে ওঠে। সকলের হাতেই যেন অঢেল
অবসর। নববর্ষার চাষের মরশুমে আর
[illegible] কলকাতার দিনে যে কর্মব্যস্ত
রূপ চোখে পড়ে তার সঙ্গে এই দৃশ্যপটের
কোনো মিল নেই। যেহেতু তাড়া নেই—কেমন
যেন অলস, মন্থর ভাব। কেবল পুষ্পিত শিমুল
[illegible] ফুলের ডালি মাথায় নিয়ে
জানান দেয়—আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।

যাত্রীদের সকলেরই মনে খুশীর [illegible]
হাসি-গল্পের বেশ কাজে [illegible]

রবিবাসরীয় খবরের কাগজ খুলে পড়ছেন, কেউ বা একদৃষ্টে বাইরের দৃশ্য দেখতে মগ্ন। বাসের আওয়াজ ছাপিয়ে মাঝিকণ্ঠধ্বনি শুনে বোঝা যায় কোন যাত্রী ছুটির দিনে জোরে ওঠা পুষিয়ে নিচ্ছেন সেকেণ্ড ক্লাসের ঘুমিয়ে নিয়ে।

মাঝপথে এক জায়গায় বাস দাঁড় করিয়ে প্রাতরাশ সারা গেল। গোটা দুই [illegible] হলাম—প্রধানতঃ চালই [illegible]। [illegible] শহর বলতে [illegible] মজিলপুর। [illegible] নগরের পর কুলপী রোড পশ্চিম [illegible] গংগার ধারে কুলপীর দিকে [illegible] আমরা সে পথ ছেড়ে [illegible] রেল লাইন পার হয়ে দক্ষিণ [illegible] রাস্তা ধরে চললাম। রায়দীঘি [illegible] ঘণ্টার পর। বাস রাস্তার এখানেই [illegible] নেমে দেখি ছোট গঞ্জ শহর [illegible] ঘরই বেশী। নদীর ধারে বাঁধ। সরু লম্বা জেটিতে বাঁধা রয়েছে আমাদের [illegible] এম ভি স্বীজপদ। চেহারা দেখে খটকা লাগে, তার স্থিরত্বে সন্দেহ জাগে। সংগের ট্যুরিস্ট ব্যুরোর কর্মচারীরা ভরসা দিলেন—এটাই নাকি এ অঞ্চলে সবচেয়ে ভাল লঞ্চ, যথার্থই কুলীন, অনেক কষ্টে যোগাড় করা গেছে ইত্যাদি। মাঝারি আকারের লঞ্চ। নীচে সাধারণ ফেরি লঞ্চের মত বসবার ব্যবস্থা। উপরে সারেঙের ঘরের পিছনে আর একটি ছোট ঘর, তাতে আট-দশজন বসতে পারে। ঘরের বাইরেও দুদিকে দুটো বেঞ্চ আছে। কেউ নীচে, কেউবা উপরে সে যার মর্জি ও সংগীমত জায়গা দখল করে বসলেন। যাত্রীদের রসদ, খাদ্য ও পানীয়, আর লঞ্চের রসদ তেল উঠান হলে সারেঙ ঘণ্টী বাজিয়ে লঞ্চ ছেড়ে দিলেন। ডিজেল ইঞ্জিনের একঘেয়ে ঝক্-ঝক্ শব্দ ক্রমে গা সহা হয়ে গেল।

রায়দীঘি নদীর স্থির শান্ত বুক চিরে লঞ্চ দক্ষিণ মুখে মোহানার দিকে এগিয়ে চলল। নদী চওড়ায় বেশী নয়, গতি সর্পিল। দুই তীরে উঁচু বাঁধ রয়েছে, নদীর নোনা জল থেকে আবাদী জমিকে রক্ষা করার জন্যে। বাঁধের তলায় নদীর কিনারায় ছোট ছোট গাছ। আগের দিন পূর্ণিমা গেছে, ভরা কোটালের জোয়ারে গাছগুলির নীচের অংশ জলে ডুবে রয়েছে। লঞ্চের ছাদ থেকে বাঁধের উপর দিয়ে অনেকদূর অবধি দেখা যায়—সবই চাষের জমি, তবে বসতি বিরল। ছোট-বড় নানা আকারের খাল দুদিকে বেরিয়ে গেছে। যাত্রী ও মাল বোঝাই করে সুন্দরবনের দিক থেকে একটি লঞ্চ আসছে। মালের মধ্যে নজরে পড়ে কয়েকটি বিরাটকায় মাছ আর বাজিবাড়ীতে রাত্রে খাবার জল রাখা হয় সেইরূপ কয়েকটি ড্রাম। সারেঙ বললেন ড্রামগুলি এখন খালি, সুন্দরবনে যাবার সময় ভরে নিয়ে যেতে হয়। পানীয় জলের চাহিদা ঐ অঞ্চলে খুব বেশী।

সুন্দরবনের ভিতর যেতে হলে বন বিভাগের ছাড়পত্র লাগে। ট্যুরিস্ট ব্যুরো যদিও বন-বিভাগের উপর-মহলের অনুমতি নিয়ে রেখেছেন, তবু এখানকার বন-দপ্তরে একবার লঞ্চ চেক করিয়ে নেওয়া নিয়ম।

ঐ কারণে কৈমুরিতে বন-বিভাগের সামনে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। বাঁশের সরু পাটাতনের ওপর দিয়ে সাবধানে ডাঙায় নামলাম। ঝাউ আর আকাশমণি গাছে জায়গাটি ছবির মত সাজান। গাছের ছায়ায় বেশ ঠাণ্ডা। পাতায় উত্তরে হাওয়া লেগে একটানা সোঁ-সোঁ করে আওয়াজ হচ্ছে। [illegible] সুন্দর কাঠের দুটিমাত্র ঘর। আদের [illegible] লাল শাড়ি পরা একটি মেয়ে [illegible] করছে। বন বিভাগের অনুমতি [illegible] লঞ্চ ছাড়ল—এখান থেকে [illegible] সংগে চলল একজন বন্দুকধারী [illegible] গার্ড।

[illegible] ছাড়িয়েই রায়দীঘি নদী গিয়ে [illegible] ঠাকুরাণের বুকে। ঠাকুরাণের অপর [illegible]। ঠাকুরাণে পড়তেই লঞ্চ [illegible] পেল স্পষ্টে। বিশাল নদী, দুই তীরের গাছপালা স্পষ্ট দেখা যায় না। নোনা জল, স্রোত আছে তবে নিস্তরঙ্গ। [illegible] এই নদীর কি রূপ হয় ভাবতে চেষ্টা করি। ভাটার জোর টানে লঞ্চ বেগে চলেছে। নদী আরও, আরও চওড়া হয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণ দিকচক্রবালে জল ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। তবে ঐ কি বঙ্গোপসাগর ?

ট্যুরিস্ট ব্যুরোর লোকেরা সকলকে খাবার দিয়ে গেল—কাগজের প্যাকেটে শুকনো খাবার। তবে খেতে মন্দ লাগে না, পেটও ভরে। রোদ্দুরের তেজ আছে কিন্তু বাতাসে ঠাণ্ডার আমেজ থাকায় কষ্ট হয় না। ডেকের উপরে বসে থাকতেই ভাল লাগে—চারিদিকে 'জল শুধু জল'।

খানিক বাদে ঠাহর হয় লঞ্চ তীরের দিকে এগোচ্ছে—দিগন্তের সবুজ রেখা ক্রমে গাঢ়তর হল। মত কূলে আজি সুন্দরবনের শ্যামশ্রী তত পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠে। গাছে গাছে জড়াজড়ি করে উঠেছে একদম জলের গা থেকে, এতটুকু জায়গা কোথাও বাদ যায়নি। কিছুদূর গিয়ে লঞ্চ একটা ছোট খালের মধ্যে ঢুকে পড়ল। এঁকে-বেঁকে খাল গিয়েছে, দুদিকে তার শাখা-প্রশাখা বেরিয়ে গেছে। কি দেখে যে সারেঙ পথ চিনছেন তা তিনিই জানেন—আমাদের কাছে ত' সব জলপথগুলিই একরকম মনে হয়। উভয় তীরেই গভীর জংগল। দুই পাশের অরণ্যের ঘন শ্যামলিমা যেন সরু জলপথকে চেপে ধরে আছে; দিন-দুপুরে লঞ্চে করে যেতেও গা ছম-ছম করে।

সবই নতুন লাগে। লঞ্চের বাইরে তাকিয়ে মানব-সভ্যতার কোন চিহ্ন কোথাও খুঁজে পাই না। চোখে পড়ে শুধু ঘোলা জল, পাড়ে কাদার ওপর খঞ্জন আর কাদা-খোঁচা নেচে বেড়াচ্ছে, তীরে গভীর বন, উপরে নীল আকাশে ডানা মেলে গাংচিল উড়ে যায়।

আদিম প্রকৃতির অকৃত্রিম রূপ। বসুন্ধরার যে স্নিগ্ধ মাতৃরূপ দেখতে আমরা অভ্যস্ত এ তা নয়। এ যেন তাঁর উদ্ধত যৌবনের ছবি, মানব সন্তানের তখনও জন্ম হয় নি। সন্তান যেমন মায়ের অল্পবয়সের ফোটো প্রথম দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়; পুরানো অ্যালবামের মা আর ঘরের মাকে এক করে ভাবতে দিশাহারা হয়ে পড়ে, এও তেমনই। ধরিত্রী যেন তাঁর নবযৌবনের ছবি লোকচক্ষুর অন্তরালে একান্তে লুকিয়ে রেখেছেন। অনেক কষ্টে বহু চেষ্টায় তার সন্ধান পাওয়া যায়। ভাবতে ভাল লাগে বসুন্ধরার এই রূপই একদিন সহজ ছিল। সেই সংগে আবার এও মনে হয়, তবু ত আমরা অল্পকণের জন্যও এ রূপ দেখতে পাচ্ছি। আমাদের উত্তরসূরীরা দু'শোএক বছর পরে কোথাও কি এর সন্ধান পাবেন ? তাঁরা হয়ত পূজার ছুটিতে চাঁদে বেড়াতে যাবার কথা ভাববেন, কিন্তু জননী বসুন্ধরার যৌবনোজ্জ্বল এ প্রতিকৃতি ততদিন আর কোথাও অটুট থাকবে না। মিউজিয়ামে গিয়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগের জন্তুর কংকালের সংগে বন্যজন্তুর বাসস্থলও দেখতে হবে।

অন্য অরণ্যের তুলনায় সুন্দরবনের যে বৈশিষ্ট্য প্রথমে চোখে পড়ে তা হচ্ছে শ্বাস-গ্রহণকারী শিকড়। পাড়ের প্রতিটি গাছ ঘিরে খুঁটির মত কি সব ছড়ান। সবগুলি শিকড়ই প্রায় এক উচ্চতার হওয়ায় আরও মজা লাগে। মনে হয় কেউ মাপ করে কেটে পুঁতে দিয়েছে। সারেঙ আর ফরেস্টগার্ডকে জিজ্ঞাসা করে গাছগুলির নাম জানবার চেষ্টা করি। অধিকাংশই বাইন, কেওড়া, গরাণ, হেন্তাল আর গাব। যে সুন্দরীর নামে বনের নামকরণ হয়েছে তাঁর দর্শন পাওয়া গেল না। শুনলাম খুলনার বনে গেলে দেখা যায়, চব্বিশ পরগণায় নেই বললেই হয়। বুঝলাম বিটপীকুলেও সুন্দর মুখ দুর্লভ। তবে হাতের নাগালে আলিপুরে ন্যাশনাল লাইব্রেরীর খাতায় যে এক 'সুন্দরী' রয়েছেন তা হয়তো অনেকের জানা নেই। পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে বাংলাদেশের প্রতি সুন্দরীদের পক্ষপাতিত্বের কারণ অনুসন্ধান করে জানতে পারি, যে নোনা জল তাঁদের সহ্য হয় না (রঙ কালো হয়ে যাবার ভয়ে ?)—গঙ্গার তথা পদ্মার মিঠে জল ত প্রায় সব পূর্ব-দিকের শাখা-প্রশাখাগুলি দিয়ে বয়ে যায়—তাই ঐ দিকেই তাদের বাস। খুলনায় জলেও শুনেছি অপেক্ষাকৃত উত্তরাংশে—যেখানে সমুদ্রের নোনা জল বেশী পৌঁছায় না—সুন্দরীদের ভীড় বেশী সেখানে।

কিছুদূর যেতেই জলপথগুলি আবার চওড়া হতে শুরু করল—স্রোতের গতিও মন্দা হয়ে এল। বুঝলাম সাগরের কাছে এসে গেছি। তিনটের সময় পৌঁছে গেলাম আমাদের গন্তব্যস্থলে—কলসে। 'সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে' ছোট্ট ছবির মত জায়গাটি—তবে সুন্দরবনের সাধারণ দৃশ্যপটের সংগে বিশেষ মিল নেই। সামনে মাতলা নদীর মোহানা এত চওড়া যে অপর পার দেখা যায় না। এধারে বালির চড়া—কিছু দূরে থেকে বন শুরু হয়েছে। ঝাউ গাছই বেশী চোখে পড়ে। মনে হয় বেলা-ভূমির বালুরাশির হাত থেকে ভিতরের বনভূমিকে রক্ষা করার জন্য বিশেষ করে এগুলি রোপিত হয়েছে। একেবারে সামনেই মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে এক বিশাল নিঃসঙ্গ গাছ, লাল মখমলের আবরণে নিজেকে সুশোভিত করে আমাদের সাদর অভ্যর্থনা

রায়দীঘি নদীর ধার

বাস দাঁড় করিয়ে প্রাতঃরাশ

জানায়। কিনারায় একটি নৌকা বাঁধা ছিল, তারই সাহায্যে সকলে তীরে নামলাম।

কলসে বেড়াতে আসার একটি প্রধান আকর্ষণ হল অভ্যন্তরস্থ একটি সুপেয় মিষ্ট জলের দীঘি। এ অঞ্চলের যাবতীয় নদী ও অধিকাংশ জলাশয়ের জল নোনা হওয়ায় বহু দূর থেকে বন্য জন্তুরা এখানে জল খেতে আসে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে তাদের দেখাও মিলতে পারে। স্থানীয় বন বিভাগের কর্মচারীর নির্দেশে সকলে সেই জলাশয়ের উদ্দেশে রওনা হলাম। বনের ভিতর দিয়ে সব পায়ে-চলা পথ। বন ক্রমশঃ ঘন হয়ে উঠল—অধিকাংশ ঝাউ তবে অন্য গাছও আছে। বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে কাজু বাদামের বন—সরকারী প্রচেষ্টায় চাষ করা হচ্ছে। মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গায় এক বুক উঁচু ঘাস—যথার্থই টাইগার গ্রাস—বাঘ কেন, জিরাফ ও হাতী ছাড়া যে কোন জন্তু স্বচ্ছন্দে লুকিয়ে থাকতে পারে। গাইডের উপদেশমত যতদূর সম্ভব কথা কম বলে ও আওয়াজ না করে এগুতে লাগলাম। যাতে গোলমালে বন্য জন্তুরা পালিয়ে না যায়।

প্রায় মিনিট পনের হাঁটার পর দীঘির উঁচু পাড় চোখে পড়ল। অতি সন্তর্পণে, পা টিপে টিপে উপরে উঠে দেখি—নাঃ, কয়েকটি পাখী ছাড়া আর কিছুই নেই। অনেকেই হতাশ হয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। 'এত কষ্ট করে এসে বাঘ না হোক্ অন্ততঃ একটা হরিণ না দেখতে পেলে আর কি হোল''—এ রকম মন্তব্য কানে গেল।

বেশ বড় আকারের চতুঃষ্কোণ দীঘি, চারিদিকে গভীর বন। স্বচ্ছ নীল আকাশ, সূর্য পশ্চিমদিকে হেলেছে তাই গাছের ছায়া পড়ে দীঘির শান্ত জল কালো, কেমন যেন রহস্যাবৃত দেখাচ্ছে। বন্য জন্তু না দেখতে পাওয়ার হতাশ ভাব দূর হয়ে মন আনন্দে ভরে ওঠে। কি সুন্দর শান্ত পরিবেশ—সঙ্গীদের গলার স্বরও এখানে কেমন অস্বাভাবিক শোনায়। গাইড জলের ধারে নিয়ে গিয়ে বন্য জন্তুদের পায়ের ছাপ দেখান, হরিণ ও বরাহের পদচিহ্নই বেশী। কিছুদিন আগে এর কাছেই নাকি দিন-দুপুরে একটি বড় বাঘ দেখা গিয়েছিল, গাইড আমাদের সেখানে নিয়ে যান। উপরে গাছের পাতায় চাঁদোয়া টাঙান, নিচে পায়ের তলায় চিকন সবুজ ঘাসের কার্পেট—দরবার বসানর উপযুক্ত স্থান বটে। রয়েল বেঙ্গলের রাজকীয় পছন্দের তারিফ করতে হয়।

চারিদিকের নিবিড় অরণ্যের শ্যাম শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই। এর ভিতর জঙ্গলের ত কোন লক্ষণ পাই না। তবু ছেলেবেলায় শোনা সুন্দরবনের বাঘের গল্প মনে পড়ে যায়। গরীব গ্রামবাসী যারা পেটের দায়ে বনে ঢোকে কাঠ কাটতে মাছ ধরতে আর মধু সংগ্রহ করতে—তাদের ভিতর কতজনই আর ঘরে ফিরে যায় নি। আবার কত বীর শিকারীদের সব দর্প এখানে চূর্ণ হয়েছে—কেউ দৈবাৎ প্রাণে বেঁচে ফিরেছেন, কেউবা অকালে প্রাণ হারিয়েছেন। মনে পড়ে যায় ফরাসী পর্যটক বার্ণিয়ারের কথা, ষোড়শ শতাব্দীতে, মোগল আমলে সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে যাবার সময় সদাই সতর্ক থাকতেন। ডাঙ্গায় নামা দূরের কথা রাত্রে অতি সাবধানে গাঙের ঠিক মাঝখানে নৌকা বাঁধতেন। মাঝিদের কাছে তিনি শুনেছিলেন যে রাত্রে বাঘ একবার নৌকায় উঠলে সবচেয়ে মোটা চেহারার লোকটিকেই খাবার জন্য বেছে নেয়। জানি না বার্ণিয়ার আয়তনে কি রকম ছিলেন! সে যুগে অবশ্য সুন্দরবন আরও বিস্তীর্ণ ছিল, বন্য জন্তুও অনেক বেশী ছিল। শ'খানেক বছর আগেও বুনো মোষ আর গন্ডার হামেসা দেখা যেত, এখন তারা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর গেজেটিয়ারে (১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ) পাই সেকালে কাঠ আর মধু ছাড়া সুন্দরবন অঞ্চল থেকে আসত বাংলার যাবতীয় নুন আর কলকাতার প্রধান জ্বালানী হিসাবে কাঠকয়লা। ত সত্ত্বেও "কোম্পানী" রাজধানীর ঠিক নাকের ডগায় এই দুষ্ট জঙ্গলের উপস্থিতি বরদাস্ত করতে পারছিলেন না। সেই থেকে শুরু হয় বন কেটে আবাদের সৃষ্টি। এখন অবশ্য কালের চাকা ঘুরে গেছে, বন কাটার চেয়ে নতুন বন তোলার দিকে নজর পড়েছে। তবে বনীকরণ যথাযথভাবে হচ্ছে কি না সেটা বিবেচ্য।

বেলা পড়ে আসছিল—তাই অপর একটি পথ ধরে সোজা সমুদ্রের তীরে গিয়ে পড়লাম। আশ্চর্য হয়ে দেখি সারা বেলাভূমি কে যেন লাল ফুলে সাজিয়ে রেখেছে। এখানে এত ফুল এল কোথা থেকে? কাছে গিয়ে দেখি ফুল নয়, লাল লাল কাঁকড়া—নিমেষে গর্তে লুকিয়ে পড়ে। হাতের নাগালে সমুদ্র আর কাঁকড়া পেয়ে ছেলের দল আনন্দে মেতে ওঠে। তারা দৌড়ে কখনও হাটু জল অবধি চলে যায় আবার ফিরে এসে কাঁকড়া ধরতে ছোটে। তাদের মায়েরাও বকতে ভুলে গিয়ে তাদেরই অনুসরণ করেন। পুরীর তুলনায় সমুদ্র অনেক শান্ত, জলের রঙও গাঢ় নীল নয়, একটু ঘোলাটে। ছেলেবেলায় ভূগোলে পড়া পলিমাটি দিয়ে ব-দ্বীপ গড়ে ওঠার কথা মনে পড়ে যায়। যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এও ত ঐ ঘোলা জলের পলিমাটি থিতিয়ে গড়ে উঠেছে।

সমুদ্রতীরের ভিজে বালির উপর দিয়ে হেঁটে নদীর মোহানায় ফিরে আসা গেল। জোয়ার এসে গেছে। লঞ্চ তাই কিনারায় ভিড়েছে, লঞ্চে চড়তে আর ছিপ নৌকার সাহায্য নিতে হয় না

লঞ্চ ছেড়ে দিল—বিদায়, কলসে, বিদায়।

এবার প্রায় সবাই ছাদের উপর বসেছেন। বৈকালিক চা ও কেক দিয়ে গেল। গরম চা ও ঠান্ডা বাতাসে ক্লান্ত শরীর ফের চাংগা হয়ে ওঠে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গানের আসর জমে ওঠে। নামকরা গাইয়ে হয়ত কেউ ছিলেন না, হারমোনিয়াম বা তবলার কোন ব্যবস্থাই ছিল না; কিন্তু সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে, নীল আকাশের নীচে ঠাকুরাণের অবাধ জলরাশির দিকে চোখ মেলে, দিয়ে, বহু-পরিচিত গানও নতুন করে মনকে নাড়া দেয়। অন্ধকার নেমে আসে—পশ্চিম দিগন্তের লাল জল ধীরে ধীরে কালো হয়ে আসে—পূব আকাশে একটি দুটি করে তারা ফুটে ওঠে।

পূব আকাশে প্রকান্ড থালার মত প্রতিপদের চাঁদ উঠল। চারিদিক জ্যোৎস্না-লোকে ঝলমল করতে থাকে, নদীর জল তরলিত রূপায় রূপান্তরিত। কৈমুরিতে ফরেস্ট গার্ডকে নামিয়ে লঞ্চ যখন রায়দীঘির জেটিতে এসে ভিড়ল তখন নটা বাজে।

এশিয়া মেলা—৭২

বহু শতাব্দী ধরে বাইরের শক্তিগুলি এশিয়াকে শোষণ করে এসেছে। এখনও এশিয়ার দেশগুলির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তারা নাক গলাচ্ছে। এশিয়া একদিন ছিল বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্মভূমি, যেখানে বিশ্বের সকল ধর্মের বাণী একদিন উচ্চারিত হয়েছিল, সেই এশিয়ার বুকে আজ বহু আদর্শ ও বিরোধের পরীক্ষা চলছে। তাই এশিয়ার দেশগুলিকে অতি ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এর উদ্দেশ্য, অতি অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এর উদ্দেশ্য অপর দেশগুলির বিরোধিতা করা নয়। এর উদ্দেশ্য তাদের নিজেদের মানুষের তথা সারা বিশ্বের মানুষের কল্যাণসাধন। এজন্য চাই শান্তি। এশিয়ার মানুষ আজ নিশ্চিতভাবে এই শান্তি চায়। কারণ তাদের সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী
উদ্বোধনী ভাষণ

বাণিজ্য মেলা এশিয়া বাহাত্তর রাষ্ট্রসংঘের অর্থনৈতিক কমিশন আয়োজিত তৃতীয় মেলা। এর আগের দুবার হয়েছে ব্যাঙ্কক এবং তেহরাণে। পাঁচটি মহাদেশ থেকে ৪৭টি দেশ এই মেলায় অংশগ্রহণ করেছে। এর মধ্যে এশিয়া থেকে ১৭টি, আফ্রিকা থেকে ৮টি এবং ইউরোপের ১৬টি দেশ যোগ দিয়েছে। তাছাড়া যোগ দিয়েছে বাংলাদেশ, ভুটান ও পূর্ব জার্মানি। যেসব দেশ যোগ দেয়নি, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, আমেরিকা এবং চীন।

ভারতের চোদ্দটি রাজ্যের সরকারী ও বেসরকারী বড় বড় শিল্প সংস্থা যোগ দিয়েছে। এতবড় বাণিজ্য মেলা ভারতে আগে আর কখনও হয়নি। ৪৫ দিন ধরে চলবে মেলা। সে সময়ের মধ্যে কয়েকটি সম্মেলনও হবে। মেলার লক্ষ্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলা। তাছাড়া নতুন বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টিও অন্যতম লক্ষ্য।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, এই বৃহৎ মেলায় প্রগতিপথে উন্নয়নশীল দেশগুলির দৃঢ় পদক্ষেপে যাত্রার শব্দ ধ্বনিত হবে শুধু নয়, তারা যে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে চায় এবং তারা যে মানব জাতির অগ্রগতির ক্ষেত্রে আপন আপন অবদান রেখে যেতে চায়—এই প্রতিচ্ছবিও যেন প্রতিফলিত হয়ে ওঠে।

শ্রীমতী গান্ধী আরও বলেন, কোন কোন বৃহৎ শক্তি অর্থনৈতিক সাহায্যদানের সঙ্গে রাজনৈতিক মতলব জুড়ে দেয়। এইজন্যই আজ উন্নয়নশীল দেশগুলির পক্ষে আত্মনির্ভরতার প্রয়োজনীয়তা বেশি করে দেখা দিয়েছে। ভারতের কথাই ধরা যাক। অনেকে ভেবেছিল এই দেশ তার ক্ষুধিত জনসাধারণের মুখে অন্ন তুলে দিতে পারবে না। কিন্তু ভারতবর্ষ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। তাঁর ধারণা কারিগরি জ্ঞান পেলে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলি অনতিবিলম্বে তাদের সমস্যাবলীর সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারবে।

মেলার তোরণদ্বারগুলির নামকরণ করেছেন শ্রীমতী গান্ধী। তোরণ তিনটি হল মৈত্রী তোরণ, প্রত্যাশা তোরণ এবং মানবতা তোরণ।

হরিয়ানা রাজ্য মণ্ডপের প্রধান আকর্ষণ শ্রীসঞ্জয় গান্ধীর ছোট মোটরগাড়ী 'মারুতি'। এই মোটর গাড়ীর দুটি দরজা। আসন সংখ্যা পাঁচ। গাড়ীটির সর্বোচ্চ গতি ঘন্টায় ১১০ কিলোমিটার এবং এক লিটার তেলে গাড়ীটি ১৬ কিলোমিটার চলে।

বাণিজ্য মেলার দিল্লী প্যাভেলিয়নে মাত্র ১৫ টাকা মূল্যে অত্যাধুনিক ক্যামেরা বিক্রীর ব্যবস্থা হয়েছে। দিল্লীর জনৈক শিল্পপতি এর নির্মাতা। এর সমস্ত যন্ত্রপাতি, লেন্স পর্যন্ত ভারতে তৈরি। এই ক্যামেরার ফটো তোলার ব্যবস্থাও আধুনিক। ক্যামেরার নাম এশিয়া-৭২। সংবাদে প্রকাশ পশ্চিম জার্মানীতে রপ্তানীর জন্য এক লক্ষ টাকা মূল্যের এই ক্যামেরার অর্ডারও পাওয়া গেছে।

মেলার মণ্ডপে ডাক ও তার বিভাগের অফিসও খোলা হয়েছে। বেলা একটা থেকে রাত্রি আটটা পর্যন্ত ডাকঘর খোলা থাকে। রবিবার বা ছুটির দিনে বেলা দশটা থেকে রাত্রি সাড়ে আটটা পর্যন্ত কাজ হয়। টেলিগ্রাফ অফিস খোলা দিনরাত। টেলিগ্রাফ অফিসের ভিতরে হল সাংবাদিকদের ঘর। শুল্ক বিভাগের অফিসও পাশাপাশি।

বিশেষ প্রতিনিধি

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় এবং মাধবী চক্রবর্তী

'আঁধার পেরিয়ে'র আউটডোরে

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় এবং সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়

বাংলা ছবির শ্যুটিং হলো বরফের রাজ্যে। এই সর্বপ্রথম। তপন সিংহ এদিক থেকে বাংলা ছবিতে এক নতুন নৈসর্গিক পটভূমিকা সংযোজনা করলেন। তাঁর 'আঁধার পেরিয়ে' ছবির শ্যুটিং-এর আসর বসেছিল মানালি উপত্যকায়। এক বিস্ময়কর প্রাকৃতিক সমারোহ। সবুজ ঘাসের গালিচাশোভিত উপত্যকার মাথায় শুভ্র-তুষারকীরিট। অভূতপূর্ব পাইন আর দেবদারুর সমারোহ। কাকচক্ষু হ্রদের জলে তার ছায়া। যেন দর্পণে প্রতিবিম্বিত। দুরন্ত বিপাশা পর্বতের বুক চিরে ছুটে আসছে।

যুগে যুগে মানুষ ছুটে গেছে এই নিরুচ্চার অথচ বৈভবমণ্ডিত প্রকৃতির কোলে। ক্ষণিক শান্তির সন্ধানে। হিমালয় কোনদিন তাকে নিরাশ করেনি। ঝর্ণার কল আর তৃষ্ণার জল দিয়ে তার সব ক্লান্তি অপনোদন করেছে। আর সেই সঙ্গে অন্তরের সৌন্দর্যরাশিতে তাকে করেছে বিভূষিত। চতুর্দিকে পর্বতঘেরা সুসমাহিত রূপ মানালির। নীল আকাশের সঙ্গে পর্বতের মেশামেশি। যেন আকাশের গা বেয়েই ওরা নেমে আসছে। আর নিচে অজস্র বিচিত্র বর্ণের ফুলের মেলা।

সন্তু মজুমদার, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, অলোক রায়চৌধুরী, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, শিবশঙ্কর ব্যানার্জি এবং চিন্ময় রায়।

এই পরিবেশে শ্যুটিং হলো তপনবাবুর 'আঁধার পেরিয়ে' ছবির। ইণ্টারভ্যালের পর মানালির পটভূমিকায় ছবি শুরু হবে। শান্তনু (শুভেন্দু) আর তার স্ত্রী কাজল (মাধবী) এখানে বেড়াতে এসেছে। বাসে ওদের সংগে স্বাতীর (সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়) আলাপ।

স্বাতী : মানালি তো? আমিও ঐ একই পথের যাত্রী।

কাজল : ভালই হোল ভাই। একটা কথা বলার লোক পাওয়া গেল।

বাস এগিয়ে চলে। ওরা সবাই প্রাকৃতিক শোভায় ডুবে যায়। হঠাৎ এক পাল ভেড়া এসে পথরোধ করে। ছোট্ট রাস্তা, বাস আটকে যায়। শান্তনু জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ক্যামেরা বাগিয়ে একটি ছবি তোলে।

কাজল : কিসের ছবি তুললে গো?

শান্তনু : একপাল ভেড়ার।

স্বাতী : আচ্ছা পাহাড়ের পাশ দিয়ে যখন ভেড়াগুলো চলে, মনে হয় না যে পেঁজা তুলোর মত ফেনা তুলে একটার পর একটা ঢেউ এগিয়ে চলেছে।

কাজল : আমার পক্ষে ভাই বলা মুশকিল—আপনাদের পৃথিবীর যে একটা সাঁকো ছিল তা আজ ভেঙে গেছে—আমি অন্ধ।

এই বাসে আরো চারজন তরুণ যাত্রীর সংগে ওদের আলাপ হয়। বিভাস (সন্তু মজুমদার) বাবলু (চিন্ময় রায়) গোরা (অলোক রায়চৌধুরী) টুনু (শিবশঙ্কর ব্যানার্জি) পর্বতে চড়ার ভীষণ আগ্রহে ওরা মানালিতে এসেছে। লক্ষ্য ওদের ভৃগু লেক।

শান্তনু, কাজল আর স্বাতী এসে উঠলো হিলটপ গেস্ট হাউসে। একদিন সকালে ওরা বেড়াতে বেরোয়। ক্যাফেটেরিয়ার সামনে শান্তনু ফটো তোলে কাজল এবং স্বাতীর। এমন সময় দূর থেকে দেখা যায় বিভাস বাবলু, গোরা আর টুনুকে। ওরা এদিকেই আসছে। বাবলু চেঁচিয়ে বলে ওঠে, এই যে দাদা, এখানে কি ফুল পাতার ছবি তুলছেন। ছবি তুলবেন তো চলুন বরফের দেশে রোটাং।

ফটো তোলার আগ্রহে শান্তনু রাজি হয়। স্বাতীও। কাজলের উৎসাহে শান্তনু আর স্বাতী বেরিয়ে পড়ে রোটাং এর পথে। সংগী সেই চার তরুণ।

বাসে বাবলু গান ধরে 'উদাসী বন্ধু জাগো'......

তপনবাবুর সুরবৈশিষ্ট্যে এবং তরুণ শিল্পী মন্মথ ঘোষের গাওয়া এই গানটি জনপ্রিয় হবে সে কথা এখনই বলে রাখছি।

রোটাং-এ প্রকৃতির এক অনিন্দ্যসুন্দর অধিষ্ঠান। শুধু বরফ আর বরফ। কোথাও কোথাও হাঁটু ডুবে যায়। এই অপরূপ পরিবেশে স্বাতী যৌবনচাঞ্চল্যে ছুটোছুটি করে বেড়ায়।

রোটাং থেকেই বিপাশার উৎপত্তি। সেই উৎস মুখে দাঁড়িয়ে স্বাতী অবাক হয়ে বলে ওঠে—ভাবতে আশ্চর্য লাগে এখান থেকেই বিপাশা নদীর উৎপত্তি। কি সুন্দর তাই না। শান্তনু হেসে সায় দেয়। ফটো তোলায় বিরাম নেই। এমন সময় বাসের হর্ন বেজে ওঠে।

স্বাতী : বাস হর্ন দিচ্ছে চলুন

শান্তনু : হ্যাঁ চলুন।

রোটাং প্রায় সাড়ে তের হাজার [illegible] উঁচুতে। এই বরফের রাজ্যে আমরা গ[illegible] জামা কাপড় ছাড়াও উইণ্ডপ্রুফ জ্যা[illegible] হাণ্টিং সু, টুপি, হাই অলটিচুড গগ[illegible] প্রভৃতিতে সুসজ্জিত হয়ে গিয়েছিলাম। [illegible] অসম্ভব ঠাণ্ডায় এসে ফটোগ্রাফার হিসে[illegible] আমাকে এক বিশেষ বিপদে পড়[illegible] হয়েছিল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় ক্যামেরার শাট[illegible] গোলমাল দেখা দেয়। সেই মুহূর্তে [illegible] প্রচণ্ড শীতেও আমার ঘাম দেবার উপক্র[illegible] এরকমটা যে ঘটবে কলকাতা থেকে র[illegible] হবার আগে তা জানা ছিল না। ক্যামে[illegible] অয়েলফ্রি করে নিলে এরকম ঘটতো ন[illegible] এদিকে আবার ভাবনা যে তপনবাবুর স[illegible] আমিই একমাত্র ফটোগ্রাফার এই আউটডো[illegible] এসেছি আর আমিই না ডুবিয়ে বসি[illegible] প্রচুর ফিল্ম নষ্ট হলেও কিছু কিছু ছ[illegible] ক্যামেরায় ধরতে পেরেছিলাম।

শ্যুটিং হলো একটানা প্রায় চোদ্দ দি[illegible] মানালির বিভিন্ন স্পটে। পাইন ফরে[illegible] হিলটপ গেস্ট হাউস, ক্যাফেটেরিয়া থে[illegible] শুরু করে বাজার এবং বিপাশা নদী[illegible] বুকে। প্রতিটি সুন্দর দৃশ্য অতি নিপু[illegible] ভাবে ধরে রেখেছেন ক্যামেরাম্যান বিম[illegible] মুখোপাধ্যায় এবং সহকারী ঝিণ্টু দত্ত [illegible] বীরেন মুখোপাধ্যায়। আর সারাক্ষণ তপ[illegible] বাবুর পাশাপাশি অসীম নিষ্ঠাভরে কা[illegible] করে গেছেন প্রধান সহকারী বলাই [illegible] এবং বিবেক বক্সি ও অমিতাভ দাশগুপ্ত।

—সনৎকুমার।

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা

শাশ্বত প্রেমকথা—নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রথম দর্শনেই প্রেম কেমন করে জন্মায়, বিজ্ঞান আজও তার কোনো হদিশ করতে পারেনি। মানব-কিশোরের সহজাত প্রবৃত্তি-বশেই নাকি এটা হয়ে থাকে—ইটস এ বায়োলজিক্যাল আর্জ। এবং মজা এই যে, এই প্রথম দর্শনজাত প্রেম ঘটে অধিকাংশ স্থলেই নিষিদ্ধ ক্ষেত্রে। অথচ এই নিষিদ্ধ প্রেমের জয়গানেই বিশ্বসাহিত্য মুখর। রোমিও-জুলিয়েটের কথা কে না জানে? আমাদের ভারতে লয়লা-মজনু, শিরী-ফরহাদ, চণ্ডীদাস-রামী প্রভৃতির প্রেমকথা বহু কীর্তিত। এদেরই সমগোত্রীয় হচ্ছে আমাদের অমর প্রেমকাহিনী হীর-রাঞ্জা। পাঞ্জাবের শ্রেষ্ঠ কবি ওয়ারিশ শাহ তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গীতে হীর এবং রাঞ্জার প্রেমকে অমরত্ব দান করেছেন।

চলচ্চিত্রাকারেও হীর-রাঞ্জার প্রেমকাহিনী নির্বাক যুগে অন্তত একবার এবং সবাক যুগের প্রথম পর্যায়ে একবার রূপায়িত হয়েছিল। কিন্তু তাদের স্মৃতি আমাদের মানসপট থেকে একেবারেই মুছে গেছে। বর্তমানে হিমালয় ফিল্মস নিবেদিত এবং চেতন আনন্দ প্রযোজিত ও পরিচালিত 'হীর রাঞ্জা' যে পরিকল্পনায়, পটভূমিকায় ও সামগ্রিকতায় আগের দুটি থেকে ঢের বেশী বিরাট ও শিল্পসম্মত, এ-কথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে। এবং আরও বলা যায় যে, ভারতীয় চলচ্চিত্রেতিহাসে ছন্দোবদ্ধ সংলাপে, নাচে, গানে, অভিনয়ে দৃশ্যপট ও সাজসজ্জার জাঁকজমকে এবং কাহিনীগত চরিত্র মাধুর্যে চেতন আনন্দের 'হীর রাঞ্জা' একটি অবিস্মরণীয় চিত্রনিবেদন বলে কীর্তিত হবে।

হাজারার জমিদারপুত্র রাঞ্জার সঙ্গে ঝঙের জমিদারকন্যা হীরের প্রণয় মন্টেগু ও ক্যাপুলেটস পরিবারভুক্ত রোমিও ও জুলিয়েটের প্রণয়েরই অনুরূপ। দুই বংশের মধ্যে ছিল পুরুষানুক্রমিক শত্রুতা। কিন্তু এই শত্রুতা ওদের উভয়ের উজ্জ্বল প্রেমকে বাধা দিতে পারেনি। এমন কি, কন্যা হীরের আকুতিতে চৌধুরী শত্রুতা ভুলে গিয়ে রাঞ্জার সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। হলে হবে কি? গোল বাধালো মেয়ের খোঁড়া মামা কাইদো। সে হীর ও রাঞ্জার মধ্যে এই প্রেমকে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারল না। —সরল চৌধুরীর সম্মতিক্রমে হাজারা থেকে বিবাহের ব্যবস্থা পাকা করবার জন্যে নদী পেরিয়ে লোক এসে হাজির হল যৌতুক নিয়ে, কাইদোর গুণ্ডারা তাদের মেরে তাড়াল। তারপর তার কাছ থেকে উইলের দোহাই দিয়ে রাঞ্জাকে করল বন্দী। এ সবের কিছুই না জেনে চৌধুরী রাঞ্জার প্রতি বিরূপ হল এবং কাইদোর প্রস্তাবমত অপর এক গ্রামের বিত্তশালী ঘরের যুবক সৈদার সঙ্গে হীরের বিবাহ দিতে স্বীকৃত হল। কিন্তু হীর তার সিদ্ধান্তে অটল। মুসলমানদের প্রথায় কন্যা যতক্ষণ না সম্মতি দেয়, ততক্ষণ তার বিবাহ দেওয়া যায় না। ভয় দেখিয়ে অনুনয়-বিনয় করে—কিছুতেই হীরের কাছ থেকে যখন সম্মতি আদায় করা গেল না, তখন কাইদোর অর্থসাহায্যে বশীভূত কাজি মৌলভীদের সামনে ঘোষণা করলেন, হীরের সম্মতি পাওয়া গেছে। অতএব কন্যা চলল পালকী চড়ে শ্বশুরবাড়ী। সেখানে কিন্তু সে সৈদাকে স্বামী বলে স্বীকার করল না—এবং সেই কারণেই তার সঙ্গে শয্যা-গ্রহণে জানাল আপত্তি।

এদিকে রাঞ্জা কোনোক্রমে ছাড়া পেয়ে যখন ছুটে এল হীরের বাড়ী, তখন সে শুনল তার হীর অন্য কারো ঘর আলো করবার জন্যে রওনা হয়েছে। দুঃখে মন গেল তার ভেঙে। সে দেশে দেশে, তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতে লাগল শান্তি পাবার আশায়; সে পরিধান করল ফকিরের বেশ। কিন্তু কৈ? হীরকে সে ভুলতে পারল কৈ? ঘুরতে ঘুরতে সে এসে পৌঁছুল হীরেরই বাড়ীতে। সাধুর কাছে মানসিক শান্তি লাভের আশায় এসে হীর দেখে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে রাঞ্জা। দুজনেরই হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠল। ওরা পালিয়ে যেতে চেয়ে ধরা পড়ে গেল। দেশের রাজা ওদের বিচার করলেন। বিচারে ওরা ছাড়া পেল। হীরের বিবাহ অসিদ্ধ প্রতিপন্ন হল। এখন আর ওদের বিবাহে কোনো বাধা নেই। উল্লসিত দেশের লোক, কত যুবক-যুবতী নেচে গেয়ে ওদের বিবাহে যোগ দিল। কিন্তু খল কাইদোর মনে শান্তি নেই। তাই হীর যখন শ্বশুরবাড়ী অভিমুখে যাত্রা করছে, সে তাকে ভালোবেসে একটি সন্দেশ খাওয়াল, যার মধ্যে পোরা আছে বিষ। পাল্কী যখন রাঞ্জার বাড়ীর সামনে পৌঁছুল, তখন হীর মৃত। তাকে কোলে জড়িয়ে ধরে রাঞ্জাও নিজের বুকে ছুরি বসাল।—

প্রতিটি চরিত্র সু-অভিনীত। নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় রাজকুমার ও প্রিয়ার অভিনয় রীতিমত প্রাণোন্মাদকারী, এমনই দরদে ভরা তাদের প্রতিটি বাচন। খল খঞ্জ কাইদো বেশে প্রাণ সাবলীল জীবন্ত অভিনয়ে যেন মূর্তিমান খলতা। হীরের পিতামাতার চরিত্রে যথাক্রমে জয়ন্ত ও বীণা চরিত্রোচিত সু-অভিনয় করেছেন। দেশের রাজার বেশে পৃথ্বিরাজ বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্বের প্রতীক। অপরাপর অগণন চরিত্রে অজিত, জীবন, সপ্রু, উল্লাস, নিরঞ্জন শর্মা, জগদীশরাজ, সোনিয়া সাহনী, কামিনী কৌশল, দুলারী, টুনটুন, লতা বসু, লতা অরোরা, সজ্জা সিংহ প্রভৃতি সকলেই প্রাণ দিয়ে সু-অভিনয় করে প্রতিটি চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। বহিঃ এবং অন্তর্দৃশ্য গ্রহণে জাল মিস্ত্রী যে বিস্ময়কর পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, তার তুলনা নেই। বিশেষ করে হীর ও রাঞ্জার বিবাহোৎসবে নাচগানের দৃশ্যগ্রহণে তাঁর দক্ষতা চূড়ান্তের পর্যায়ভুক্ত। অনুরূপভাবে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন সম্পাদক যাদব রাও এম-ভি। ছবির শিল্পনির্দেশনায় সুধেন্দু রায় আর একবার তাঁর শিল্প চাতুর্যের পরিচয় দিলেন। ছবির সংলাপ সম্পূর্ণভাবে উর্দু এবং তার রেকর্ডিং করেছেন চমৎকার প্রবীণ শব্দযন্ত্রী মুকুল বসু।

ক্রেমারের সান্তা ভিত্তোরিয়া

ইটালীর সান্তা ভিত্তোরিয়া শহরটির সুনাম ওর তৈরী মদের দরুন। আঙুরলতা থেকে থোলো থোলো সুস্বাদু আঙুরকে আহরণ করে ঐ শহরের অধিবাসীরা যে মদ প্রস্তুত করে, তার নাকি তুলনা নেই। শহরের মদ-গুদামে অন্তত সাড়ে দশ লাখ বোতল মদ থাকে সব সময়েই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষদিকে বেনিটো মুসোলিনীর মৃত্যুসংবাদ ঘোষিত হবার পরক্ষণেই দুঃসংবাদ এসে পৌঁছোয়, দিন চার-পাঁচের মধ্যেই জার্মান সৈন্য শহরটি দখল করতে আসছে। সৈন্যদল শহরে পৌঁছেই যে মদ তলব করবে এই ভাবনা শহরবাসী মাত্রকেই ভাবিত করে তুলল। জনতা কর্তৃক নবনিযুক্ত মেয়র বম্বোলিনী নিজে একজন দুর্ধর্ষ মাতাল। কাজেই সবচেয়ে বেশী মাথাব্যথা তাঁরই। বম্বোলিনী তার বুদ্ধিদাতা ফেবিয়োর সঙ্গে পরামর্শ করে তিরিশ হাজার বোতল গুদামে রেখে বাকী দশ লক্ষ বোতল শহরের প্রান্তে অবস্থিত এক পুরোনো গুহায় সরিয়ে ফেলল। জার্মানরা এসে পৌঁছে যখন মদের বোতলের সন্ধান চাইল, বম্বোলিনী গুদাম দেখিয়ে দিল। কিন্তু শহরবাসীর চালচলনে সন্দিগ্ধ হয়ে জার্মান সেনানায়ক ভন প্রুম আরও মদ কোথায় লুকোনো আছে, জানতে চাইল। কিন্তু বম্বোলিনী সমেত শহরের কারুর মুখ থেকেই এ সম্পর্কে একটিও কথা বার করা সম্ভব হোলো না। ওদের সন্ত্রাসবাদ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কার্যকরী হল না। মদের ব্যাপারে মন্ত্রগুপ্তি—শহরবাসীর ঐক্যবদ্ধ প্রতিজ্ঞা। আমেরিকার সৈন্যবাহিনী এসে পড়ল বলে—এই অবস্থায় জার্মানরা, যখন প্রস্থানোদ্যত, তখন জেনারেলকে একটি বোতল উপহার দিলেন মেয়র বম্বোলিনী এবং বললেন, এটি হচ্ছে লুকোনো দশ লাখের একটি।

আশ্চর্যভাবে সু-অভিনীত ও সু-পরিচালিত ছবি হচ্ছে স্ট্যানলি ক্রেমার প্রদর্শিত 'দি সিক্রেট অব সান্তা ভিত্তোরিয়া'। অ্যান্টনী কুইন (বম্বোলিনী), অ্যানা ম্যাগনানি (বম্বোলিনীর স্ত্রী রোজা), ভার্না লিসি (মালা টেস্টা), হার্ডি ক্রুগার (ভন প্রুম) প্রভৃতির অভিনয়সহ, সমগ্র ছবিটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক।

স্টুডিও সংবাদ

উত্তমকুমার এখন 'বনপলাশীর পদাবলী'র স্যুটিং শেষ করবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আশা করা যাচ্ছে এই মাসের মধ্যেই তিনি ছবির স্যুটিং পর্ব শেষ করবেন এবং যার ফলে তিনি এখন কোন প্রযোজককে ডেট দিচ্ছেন না। ফলে উত্তমকুমার অভিনীত সব ছবি-গুলোর স্যুটিং পেছিয়ে গেছে।

উত্তমকুমার অভিনীত যে কয়টি ছবি শেষ হয়ে গেছে তার মধ্যে অন্যতম অগ্রদূত পরিচালিত 'সোনার খাঁচা', অজিত গাঙ্গুলী পরিচালিত 'রাতের রজনীগন্ধা', অজয় কর পরিচালিত 'কায়াহীনের কাহিনী' ও সলিল সেন পরিচালিত 'হার মানা হার।'

তাছাড়া যে ছবিগুলোতে উত্তমকুমার কাজ করছেন তার মধ্যে পীযূষ বসু পরিচালিত 'বিকেলে ভোরের ফুল', শচীন অধিকারী পরিচালিত 'রৌদ্রছায়া', বিকাশ রায় পরিচালিত 'কাজললতা', অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ;অগ্নিশ্বর' প্রভৃতি। আর যে ছবিগুলো করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার মধ্যে—অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'অলীক', অগ্রদূত পরিচালিত -'একদা কুয়াশায়', দেবেশ ঘোষ প্রযোজিত 'আমি সে ও সখা' পীযূষ বসু পরিচালিত 'সব্যসাচী', সুশীল মজুমদার পরিচালিত 'কালো হরিণ চোখ', যাত্রিক পরিচালিত 'নাগচম্পা' এবং বিজয় বসু পরিচালিত একটি ছবি।

কিন্তু খবরে প্রকাশ উত্তমকুমার এখনও সঠিক সিদ্ধান্তে আসেননি কোন কোন নতুন ছবিতে আগে ডেট দেবেন। শোনা যাচ্ছে তিনি বছরে ৩।৪ খানার বেশী ছবি করবেন না—পছন্দসই গল্প এবং চরিত্র ছাড়া তিনি ভবিষ্যতে আর কোন ছবি করবেন না বলে মনস্থ করেছেন।

জনপ্রিয় চিত্র পরিচালক তরুণ মজুমদার পর পর ছবি করে যাচ্ছেন। তাঁর পরিচালনাধীনে 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ' ছবিটি শেষ হয়ে মুক্তির অপেক্ষায় আছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর পরবর্তী ছবি 'ঠগিনী'র চিত্রগ্রহণও প্রায় শেষ করে এনেছেন। গত সপ্তাহে স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ স্টুডিওতে এই ছবির দুদিনের স্যুটিং শেষ করেছেন। সুবোধ ঘোষের কাহিনী অবলম্বনে এই ছবির বিভিন্ন চরিত্রে আছেন সন্ধ্যা রায়, উৎপল দত্ত, রবি ঘোষ, জুঁই ব্যানার্জী, মোম মুখার্জী প্রভৃতি। ছবিতে সুরারোপের দায়িত্বে আছেন—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। 'ঠগিনী'-র কাজ শেষ করেই তাঁর 'মৌ-চোর' ছবিটি শুরু করার কথা ছিল কিন্তু এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন এই বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে আপাততঃ 'মৌ-চোর' করা সম্ভবপর হচ্ছে না। কেননা কিছুদিন আগে তিনি তাঁর ইউনিট সমেত সুন্দরবন অঞ্চলে লোকেশান দেখতে গিয়েছিলেন কিন্তু ওখানকার বর্তমান প্রতিকূল পরিস্থিতি ও পরিবেশের কথা বিবেচনা করে 'মৌ-চোর' চিত্রায়িত করার বাসনা আপাতত ত্যাগ করেছেন। এখন তিনি তাঁর বহুদিন পূর্বের স্থিরীকৃত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'ফুলেশ্বরী'র চিত্ররূপ দানের কথা ভাবছেন। এ ছবি প্রযোজক ডি এস. সুলতানিয়ার প্রযোজনায় নির্মিত হবে।

*

পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা নবজাত প্রোডাকসন্স-এর পতাকাতলে নির্মিত 'নকল সোনা'র কাজ প্রায় শেষ। ছবির বিষয়বস্তু হল আজকের যেসব তরুণ-তরুণী স্বপ্ন দেখছে তারা একদিন অভিনয়ে সুযোগ পেলে উত্তম, সুচিত্রা, সৌমিত্র, অপর্ণার মত হবে—স্টুডিওতে ঢুকে তাদের চোখে এ শিল্পের সংগে জড়িত শিল্পী ও কলাকুশলীদের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের ঘটনাপঞ্জী দেখে নবাগত ও নবাগতাদের স্বপ্নবিলাসের মোহ নিমেষে মুছে যাওয়ার কাহিনী বিধৃত হয়েছে নকল সোনায়। ছবিতে অধিকাংশ শিল্পীই নতুন। তাছাড়া অন্যান্য স্বনামধন্য শিল্পী ও কলাকুশলীরা নিজ নিজ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন অতিথি শিল্পী হিসেবে।

ছবিতে সুরারোপের দায়িত্বে আছেন ডাঃ নচিকেতা ঘোষ।

এই ছবির পর পরিচালক শ্রীমুখার্জী আবার নতুন করে শুরু করছেন—'অগ্নিশ্বর' ছবিটি। অনিবার্য কারণবশতঃ ছবিটির স্যুটিং বন্ধ ছিল। পরিচালক শ্রীমুখার্জী আগামী ডিসেম্বর থেকে নিয়মিত চিত্রগ্রহণ শুরু করছেন। বনফুলের কাহিনী অবলম্বনে ছবির প্রধান চরিত্রে আছেন উত্তমকুমার। সুর-সংযোজনা করবেন—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

• • •

বাংলার চিত্ররসিকের জন্য সু-সংবাদ স্বল্পদিন বাদে আবার শর্মিলা ঠাকুরকে বাংলা ছবিতে দেখতে পাবেন। গত মাসে পরিচালক [illegible] চৌধুরী ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায় ও শর্মিলা ঠাকুরকে নিয়ে বিমল কর রচিত 'যদুবংশ' ছবির জন্য বম্বেতে প্রায় দশদিনের স্যুটিং শেষ করে কোলকাতায় ফিরে এসেছেন।

মমতাজ ফিল্মস নিবেদিত সঞ্জয় সেন ও পার্থপ্রতিম চৌধুরী প্রযোজিত এ ছবির বিভিন্ন চরিত্রে আছেন—উত্তমকুমার, শর্মিলা ঠাকুর, অপর্ণা সেন, ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়, অশোক চট্টোপাধ্যায়, বাপী বন্দ্যোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ দত্ত প্রভৃতি। ছবির পরিচালনা ছাড়া এ ছবির চিত্রনাট্য রচনা ও সুর সংযোজনার দায়িত্ব বহন করছেন পরিচালক শ্রীচৌধুরী। ইতিমধ্যে ছবির বারো আনা কাজ শেষ। আগামী ডিসেম্বর মাসে উত্তমকুমারকে নিয়ে ১০।১২ দিনের স্যুটিং শেষ হলেই ছবির চিত্রগ্রহণ পর্ব শেষ হয়ে যাবে। দাওয়ার পিকচার্স এন্ড ডিস্ট্রিবিউটার্সের পরিবেশনাধীনে ছবিটি মুক্তিলাভ করবে।

●

মেমসাহেব-এর পর নিমাই ভট্টাচার্যের 'ওয়ান আপ-টু ডাউন' চলচ্চিত্রে রূপায়িত হতে চলেছে। ছবিটি পরিচালনা করবেন দীনেন গুপ্ত।

বিবিধ সংবাদ

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন : বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশন প্রধানত একটি মিলন মেলাকে কেন্দ্র করেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মানুষে মানুষে প্রকৃত মিলন হতে পারে তার মননক্রিয়া, শিল্পকর্ম এবং সংস্কৃতির আদান-প্রদানে। কেবল শিল্পীরাই পারেন সুস্থ মানব সম্বন্ধ স্থাপন করতে।

বঙ্গ সংস্কৃতি ভারত সংস্কৃতিরই একটি বিশিষ্ট রূপ। বিভিন্ন প্রদেশে, বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন নামে পরিচিত হলেও বস্তুত ভারত সংস্কৃতি এক এবং অবিভাজ্য। বঙ্গ সংস্কৃতির সঙ্গে আরও পাঁচটা প্রদেশের সাংস্কৃতিক ঐক্য যে কত নিবিড় তা পরিস্ফুট করে তোলার জন্য এবং সংস্কৃতির শক্ত বুনিয়াদের উপর ভারতের মৌল ঐক্যকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনে এবার বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে পূর্বাঞ্চল মিলন মেলার আয়োজন করা হয়েছে। এই মিলন মেলায়, বিহার, উড়িষ্যা, ত্রিপুরা, মণিপুর, নাগাভূমি ও অরুণাচল প্রদেশের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিরা যোগদান করছেন। কলকাতাবাসীরা সম্ভবত এই প্রথম বিহারের সেরাইকেল্লার ছো-নৃত্য, উড়িষ্যার ওড়িসি, ধুমরা, রণপা, ঢাওয়া ও ময়ূরভঞ্জের ছো-নৃত্য, ত্রিপুরা, অরুণাচল ও নাগাভূমির পার্বত্য নৃত্য এবং মণিপুরী নৃত্য ও সঙ্গীতের অবিকৃত বিশুদ্ধ রূপটি উপভোগ করার সুযোগ পাবেন। বলা দরকার, অরুণাচল এবং নাগাভূমির শিল্পীরা এই প্রথম কলকাতার মাটিতে পা দিচ্ছেন।

পূর্বাঞ্চলীয় মিলন মেলাকে কেন্দ্র করে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশন আগামী ১৫ নভেম্বর
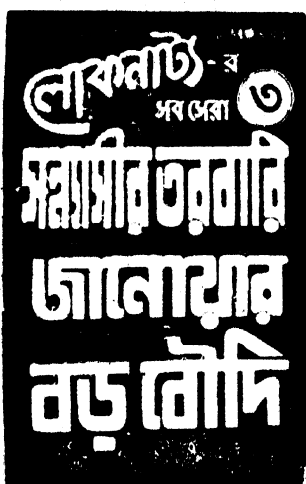
থেকে শুরু হচ্ছে। সম্মেলনের অনুষ্ঠান চলবে দীর্ঘ কুড়ি দিন ধরে, শেষ হবে ৪ ডিসেম্বর। সম্মেলনের সংগে যে বিরাট মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে, পুরো দেড় মাস তা খোলা থাকবে। এই বছরের শেষ দিন পর্যন্ত মেলা প্রাঙ্গণে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিপ্রেমিকেরা পূর্বাঞ্চলের শিল্পীদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা ও ভাব বিনিময়ের সুযোগ পাবেন। নানা বিতর্কমুখর সন্ধ্যায় এই মেলা পরস্পরকে কাছে টেনে আনবে। মেলা প্রাঙ্গণের অন্যতম আকর্ষণ পশ্চিমবঙ্গ, অরুণাচল, উড়িষ্যা ও ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের শিল্প সামগ্রীর প্রদর্শনী। এবার সম্মেলনের স্থান নির্বাচন করা হয়েছে কলকাতা ময়দানের এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। কলকাতা শহরে এত বড় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ও পরিকল্পনা আর কখনও করা হয়েছে বলে মনে হয় না।

সম্মেলনের অনুষ্ঠানসূচীতে বঙ্গ সংস্কৃতির সামগ্রিক রূপটিকে তুলে ধরা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, নজরুলের সঙ্গে দার্জিলিং, পুরুলিয়া, উত্তরবাংলা, বাঁকুড়া ও বীরভূমের গ্রামীণ সংস্কৃতিও প্রাধান্য পেয়েছে এখানে। প্রাচীন, আধুনিক ও লোকসংগীতের পাশে এদেশের উচ্চাঙ্গ সংগীতও স্থান পেয়েছে। যাত্রা, কীর্তন, ঢোল, শ্রীখোল বাদ দেওয়া হয়নি কিছুই। ফলত, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত খ্যাতনামা শিল্পীদের একজোট করার চেষ্টা হয়েছে বঙ্গ সংস্কৃতির মঞ্চে।

মেলা প্রাঙ্গণে কবি, শিল্পী, সাহিত্যিকদের ঘরোয়া আড্ডা আলোচনা ছাড়াও অনুষ্ঠানমঞ্চে পঁচিশ বছরের খেলাধুলো নিয়ে একটি অভিনব আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়েছে। সভাটি খুব আকর্ষণীয় হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

মূকাভিনেতার বিদেশ যাত্রা : ভারতে মূকাভিনয়ের পথিকৃৎ শ্রীযোগেশ দত্ত বিদেশী সংস্কৃতি-সংস্থার আমন্ত্রণে পশ্চিম জার্মানী যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সে একক মূকাভিনয় প্রদর্শন করবেন।

এই উদ্দেশ্যে তিনি ১০ নভেম্বর বিদেশ যাত্রা করেছেন। শ্রীদত্তের এবারের মূকাভিনয়ের বিষয়বস্তু মুখ্যত ভারতীয় ভাবধারায় রচিত।

বিচিত্রানুষ্ঠান : গত ২৮ অকটোবর ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট হলে কর্মকার মহাসভা একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল বিশ্বশ্রী মনতোষ রায় কর্তৃক দেহসৌষ্ঠব প্রদর্শন, গীটার শিল্পী জগন্নাথ ধর কর্তৃক যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন এবং যাদুজগতের আলোড়নসৃষ্টিকারী যাদুকর মদন কুণ্ডুর ইন্দ্রজাল প্রদর্শনী। শ্রীকুণ্ডু শূন্যে ভাসমান বালিকা, স্পুটনিক ও নাইট্রিক এসিড খাওয়া প্রভৃতি খেলা দেখিয়ে দর্শকদের বিস্মিত করেন। ঐ অনুষ্ঠানে উক্ত তিন বিশিষ্ট শিল্পীকে মহাসভার পক্ষ থেকে আরতি কর্মকার মাল্যদান করেন।

সি এল টি ফেস্টিভ্যাল : সি এল টি-র ২২ শিশু-উৎসব শুরু হবে ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে। চলবে ৭ জানুয়ারী পর্যন্ত। কলকাতার এখন একটি নতুন ও বিশিষ্ট রঙ্গমঞ্চ — 'অবনমহলে' অনুষ্ঠিত হবে শিশু রংমহলের অতিজনপ্রিয় শিশু নৃত্যনাট্য, নাটক ও গীতিনাট্য—যা শুধু শিশুরাই নয়, বড়দেরও মন ভরিয়ে তোলে। এবারের অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে সি এল টির নবতম জীবনালেখ্য—'শ্রীঅরবিন্দ'। তাছাড়া আছে ম্যাজিক আর পুতুল নাচের আসর।

যথারীতি শিশু-চিত্রকলা প্রদর্শনী চলবে সেই সংগে। প্রতি বারের মত এবারেও কলকাতার বাইরে থেকে কয়েকটি শিশু-প্রতিষ্ঠান ফেস্টিভ্যালের অনুষ্ঠানে অংশ নেবে।

শিশুদের মনমাতানো ছোটখাট একটা মেলাও চলবে অবনমহল সংলগ্ন মাঠে। দক্ষিণ কলকাতায় অবনমহলে এই বাৎসরিক ফেস্টিভ্যাল ছাড়াও অন্যান্য অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের দেখার সুযোগ দিতে, সি এল টির কর্তৃপক্ষ উত্তর ও মধ্য কলকাতায় অনুরূপ অনুষ্ঠানসূচী পরিবেশনের চেষ্টা করছেন।

মহেন্দ্র সরকারের পরলোকগমনে

বি এফ জে এ-র শোকসভা : বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সহ-সভাপতি ও কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য এবং যুগান্তর পত্রিকার চিত্র-সম্পাদক মহেন্দ্র সরকারের আকস্মিক মৃত্যুতে (১৯ অকটোবর) শোকপ্রকাশের জন্যে সংস্থার সভ্যবৃন্দ ২৬ অকটোবর আনন্দবাজার পত্রিকা ভবনের প্রশস্ত হলঘরে মিলিত হয়ে দু মিনিটের জন্য নীরবতা পালন করেন ও একটি শোক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সভায় সভাপতি নির্মলকুমার ঘোষ, মনুজেন্দ্র ভঞ্জ, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন মল্লিক, রণজিৎ দত্ত ও প্রেমনাথ উপাধ্যায় সময়োচিত বক্তৃতা দেন।

মহাজাতি সদনে আবার শংকরস্কোপ : বিশ্ববরেণ্য নৃত্যশিল্পী উদয়শংকরের যে অনুপম সৃষ্টি 'শংকরস্কোপ' ১৯৭০ সাল থেকে দেশবাসীকে মুগ্ধ বিস্মিত এবং আনন্দিত করে আসছে, বহুদিন বন্ধ থাকবার পরে আবার তা নবরূপে দেখানো হচ্ছে মহাজাতি সদনে ৩ নভেম্বর থেকে। পর্দা থেকে মঞ্চ এবং মঞ্চ থেকে পর্দায় শিল্পীদের অবলীলাক্রমে গমনাগমনের বিস্ময়ের সঙ্গে আছে নৃত্য, গীত, কৌতুক ও ম্যাজিকের চাতুর্যপূর্ণ সংমিশ্রণ। কোনো কোনো বিষয় মাত্র সাদা-কালোয় উপস্থাপিত কিন্তু বেশীর ভাগই রঙীন। শংকরস্কোপের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সূচীর আগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'সামান্য ক্ষতি' অবলম্বনে উদয়শংকর দ্বারা সৃষ্ট নৃত্যনাট্যটি অভিনীত হচ্ছে। এই নৃত্যনাট্যটির দৃশ্য পরিবর্তনে মাত্র আলোক-নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে যে চাতুর্য অবলম্বিত হয় তা রীতিমত বিস্ময়কর। নৃত্যনাট্যটি সর্বাংশে উপভোগ্য।

উদয়ন স্পোর্টিং ক্লাবের বার্ষিক অনুষ্ঠান : উদয়ন স্পোর্টিং ক্লাবের চতুর্থ বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ৩১ অকটোবর রঙমহল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণারঞ্জন বসু ও শ্যাম লাহা। যাদুকর ও পি আগরওয়ালাকে সম্বর্ধনা জানানোর পরে আবৃত্তি ও রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন যথাক্রমে সমীর দে ও ইস্টার্ন যুব শিল্পীগোষ্ঠী।

সভাশেষে সংঘের সভ্যরা অভিনয় করেন অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের 'চেনামুখ অচেনা মানুষ'। বিশু চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় নাটকটি দর্শকদের ভীষণভাবে ভাবিয়ে

তোলে। নাটকে যাঁরা ভাল অভিনয় করেন তাঁরা হলেন, সুধাংশু রায়, কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃপ্তি দাস, মালা দাস, তাপস দাশগুপ্ত, অশোক ঘোষ, রঞ্জিত মণ্ডল, জয়ন্ত চৌধুরী, শিবনাথ মিত্র, পাঁচুগোপাল সিংহরায় ও সৌমেন মল্লিক।

যাত্রাভিনয়

নিহত গোলাপ : নিউ আর্য অপেরার এ বছরের শ্রেষ্ঠ পালা আগন্তুক রচিত 'নিহত গোলাপ'। বড়লোকের ছেলের যৌবনের উন্মাদনায়, ভালবাসার মোহে মধ্যবিত্ত মেয়েরা নিজের সর্বনাশ ডেকে আনে, তার ফলে কোন কোন মেয়েকে শেষ পর্যন্ত পতিতালয়ে আশ্রয় নিতে হয়। এমনই এক মেয়ে জয়া। সেই গ্রামের জমিদারের ছেলে অনিমেষকে ভালবেসে নিজেকে সঁপে দিয়েছিল। উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য অনিমেষ চলে যায় বিলাতে। যাওয়ার আগে জয়াকে মালার বাঁধনে বাগদত্তা করে যায়। গভীর মেলামেশার ফলে জয়া হয় অন্তঃসত্ত্বা। বাবার কাছে তিরস্কৃত হয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায় জয়া। ভাগ্য বিড়ম্বনায় জয়া আশ্রয় পায় কলকাতার নামকরা পতিতালয়ে। কিছু দিন পরে একটি পুত্র সন্তান হয়। পতিতালয়ের বাড়ীওয়ালী তারিণীবালার সাহচর্যে জয়ার ছেলে হয়ে উঠল শিক্ষিত অ্যাডভোকেট। কিন্তু কি তার বংশ পরিচয়? অবশেষে সে জানতে পারে অনিমেষ তার বাবা, জয়া মা এবং তারিণীবালা তার পালিতা মাতা এবং জয়ার আশ্রয়দাত্রী। এই হল পালার মূল কাহিনী।

পালার সূত্রপাত থেকেই দর্শক মনকে আকৃষ্ট করে রাখে। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাওয়া ও সংলাপ রচনায় নাট্যকার প্রতিভার চমৎকার রাখতে পেরেছেন। নাটকের বক্তব্যকে তুলে ধরার জন্য শিল্পী দলের সংঘবদ্ধ অভিনয় অনস্বীকার্য। দ্রুতগতিসম্পন্ন এ নাটক দর্শকদের অভিভূত করে রাখে। প্রতি মুহূর্তে দর্শক চোখকে অশ্রুসিক্ত করে তোলে। 'অনিমেষ' চরিত্রে দিলীপকুমার ও 'জয়া'র ভূমিকায় মধুশ্রী দেবীর অভিনয় চরিত্রদ্বয়কে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। সমগ্র অভিনয়ে কখনো দর্শককে আনন্দে উদ্বেলিত করেছে। আবার কখনো বা অশ্রুর জোয়ার বইয়ে দিয়েছে দর্শকদের চোখে। এমন অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর খুব কম দেখা যায়। এছাড়া অন্যান্য চরিত্রে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন কল্যাণী ভট্টাচার্য (কণিকা), নিতাই দাস (গোকুল), মদনকুমার (সুকান্ত), চপলারাণী (তারিণী), অমল বোস (ব্যোমকেশ), মণ্টু বোস (শশীভূষণ), বীথিকা বাগচী (লতিকা) ও দুর্গাদাস (পীতাম্বর)। একটি বিশেষ দৃশ্যে নৃত্য পরিবেশনে দর্শকমন জয় করে নেবে মানিক ও মণিকা। নাট্য-নির্দেশনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন দিলীপকুমার।

বাঁচতে চাই : অধিকাংশ যাত্রাপালা ঐতিহাসিক ঘটনা আশ্রিত। এই পালাভিনয় দেখে গ্রামের অশিক্ষিত মানুষ শিক্ষালাভ করে। তাই যাত্রা হলো বাংলার শ্রেষ্ঠ লোক-শিক্ষা। গত বছর বহু রক্তক্ষয়ের পর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে। কিন্তু এই আন্দোলনের সূত্রপাত কত দিন পূর্বে ঘটেছিল তা কজন জানে? বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন কবে কোন সময় কে শুরু করেছিলেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে হারু রায় রচনা করেছেন 'বাঁচতে চাই' পালা। এ পালাটি ইতিমধ্যে অভিনয় করে নিউ প্রভাস অপেরা জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

বাংলাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের শুরু হয় জাহাঙ্গীর শাহের আমল থেকে, তখন আন্দোলনের উদ্যোক্তা ছিলেন ওসমান। সেই ওসমানের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করে, ঘোষণা করলেন মুজিবর রহমান। তাই এ পালার শুরুতে প্রস্তাবনায় দেখতে পাই মুক্তিফৌজের পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম-এর মাধ্যমে মোকাবিলায় শপথ গ্রহণ। পরিণতিতে দেখা যায় মুজিবর রহমানের প্রত্যাবর্তন ও দেশ গড়ার কাজে শপথবাণী।

নিউ প্রভাস অপেরার শিল্পীরা অভিনয়ে পূর্ব সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছেন। তাই কয়েকটি ঘটনা মুহূর্তে করতালিতে আসর মুখর হয়ে ওঠে। অভিনয় প্রসঙ্গে বলা যায় জয়ন্তকুমারের 'ওসমান' চরিত্র সৃষ্টি দর্শক মনকে বোধ হয় সব থেকে বেশী নাড়া দিয়েছিল। বাবুল ভট্টাচার্যের 'জহর' সুচিত্রিত। তার অসহায় ভাবটি মনে রাখার মতো। প্রণবকুমারের 'শেখর' সুচিত্রিত। 'আতর' চরিত্রে সেজেছেন জয়শ্রী মুখার্জি। প্রতিটি দৃশ্য পর্যায়ে তাঁর উপস্থিতি এবং অভিব্যক্তি সুন্দর ও সপ্রশংস। শিবদাস মুখার্জির 'জাহাঙ্গীর' সুন্দর। রাধারমণ পালের 'মাধব সরকার' প্রতি মুহূর্তে দর্শককে হাসিয়েছেন। শেষ দৃশ্যে অনুশোচনার মুহূর্তটি যেন ভোলা যায় না। ওসমানের মা 'মমতাজ'-এর ভূমিকায় রীতা সেন তীক্ষ্ণ জীবনধর্মী সংলাপের সঙ্গে নিজস্ব ব্যক্তিত্ব মিশিয়ে এক অপূর্ব অভিনয়ের উদাহরণ সৃষ্টি করলেন। এ দিনের অভিনয়ে আর যাঁরা দর্শকদের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন লাভ করেন অমূল্য ভট্টাচার্য, বাবুল ভট্টাচার্য, সাধন দাশগুপ্ত, মুকুন্দ ঘোষ, হীরালাল গাঙ্গুলী, ধনঞ্জয় নস্কর, মুকুন্দ মালি, মীরা রায়চৌধুরী ও শ্যামলী ভট্টাচার্য। মহেন্দ্র দত্ত সুরারোপিত গানগুলি প্রশংসা পাবে।

কোহিনুর যাত্রাভিনয় : কলকাতার প্রখ্যাত নাট্য সংস্থা গিরিশ নাট্য সংসদ কর্তৃক গত ৭ নভেম্বর মসজিদবাড়ী স্ট্রীটস্থ নেতাজী ব্রিগেড 'শ্যামাপূজা' প্রাঙ্গণে শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত কোহিনুর নাটক সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। মোগল সাম্রাজ্যের পতন চরম বিলাসিতার জন্য হয়েছিল এবং এর ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে যেভাবে নিজেদের প্রভুত্ববিস্তার করেছিল এবং এরই সঙ্গে রোহিলখণ্ডের নবাব গোলাম কাদেরের দেশপ্রীতি ও মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ ইত্যাদি ঘটনা এ নাটকে তুলে ধরা হয়েছে। নাটকটি পরিচালনা করেন শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

অভিনয় সম্বন্ধে একথা বলা যায় যে প্রতিটি চরিত্র সুঅভিনীত ও গোড়া থেকে শেষ অবধি অভিনয়ের একটা বিশেষ গতি ছিল যা দর্শক চিত্তকে মুগ্ধ করেছে। সৌখিন দলের এমন সুন্দর অভিনয় বিরল-দৃষ্ট। ধীরেন্দ্র চক্রবর্তী, কার্তিক বাগচী, বটা ভট্টাচার্য, দেবু বাগচী, শশাঙ্ক চ্যাটার্জি, গৌরচন্দ্র পাল, সমীর ব্যানার্জি, প্রদীপ ব্যানার্জি, পূর্ণেন্দু মুখার্জি, তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, কুমারী ইতু মুখার্জি, সত্য রায়চৌধুরী, অমিতা দেবী, সুধা সরকার, রঞ্জনা, সুলেখা ব্যানার্জি অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন। সঙ্গীতে ছিলেন তারক দাস-রায়। সমগ্র নাটকটির ব্যবস্থাপনায় ছিলেন শ্রীমতী সুলেখা ব্যানার্জি।

মঞ্চাভিনয়

গঠনী' প্রযোজিত 'লালবাঈ' ঃ দের আন্তরিক নিষ্ঠাজড়ানো চরিত্র-দি একটি বলিষ্ঠ ও প্রাণবন্ত নাট্য-ার মানদণ্ড হয়, তাহলে বলতে নই বারাসতের প্রখ্যাত নাট্যগোষ্ঠী ীর সাম্প্রতিক প্রযোজনা 'লালবাঈ' আলোড়ন তুলেছে দর্শকমনে। নাট্যামোদীদের এই ধারণাই সর্বত্র হয়ে উঠেছে যে এমন স্বচ্ছ, সুন্দর, অভিনয় অনেকদিনই চোখে। একথা ঠিকই যে 'একটি পয়সা'র বারাসত থানা রিক্রিয়েশন ক্লাব ত 'লালবাঈ' একটি অসাধারণ নার মর্যাদা পেয়েছে।

ক্ষপুরের সুরসাধক রাজা রঘুনাথ ও বাঈজী 'লালবাঈ'এর অনেক গথিত অনুরাগ, সংঘর্ষকে ঘিরেই ঈ' নাটকের মুখরতা ভাষা পেয়েছে। রই অগ্রগতির সুরে সুর মেলাতে তাতার ইসমাইল, শোভা সিংহ, ধীমান, ভবানী, বৃন্দাবন এবং অনেকে।

াটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গতি ও স্তিমিত হয়ে যায়নি। প্রায় ট মুহূর্তে হয়েছে সংঘাতে মুখর। না কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন লক শ্রীবরুণ চ্যাটার্জি। শ্রীচ্যাটার্জির ীন নিষ্ঠা ও গভীর শিল্পবোধ য়ের প্রায় প্রতিটি পটেই ধরা পড়েছে। সঙ্গীত পরিকল্পনায় নৈপুণ্যের ব রেখেছেন শ্রীসাধন ঘোষাল।

অভিনয়ের ব্যাপারে যাঁর নাম প্রথমেই আসবে তিনি হোলেন পরিচালক চ্যাটার্জি। তাঁর তাতার 'ইসমাইলে'র চিত্রণ সমগ্র প্রযোজনার একটি সম্পদ পেরেছে। তাঁর সংলাপ উচ্চারণের ও বিশেষ কয়েকটি মুহূর্তে ব্যক্তি প্রকাশ সত্যিই প্রশংসার দাবী। 'লালবাঈ' চরিত্রের গভীরে ডুব দিয়ে ট নিটোল প্রাণ তুলে এনেছেন ছন্দা র্জি। তাঁর কণ্ঠে গান দর্শকমনকে ত করেছে রামধনুর নানা রঙে। ীপ মৌলিকের 'রঘুনাথ' সিংহ'ও ছে একটি আবেগদীপ্ত চরিত্রচিত্রণ। প্রভা'র প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব ও মানসিক র্যয়কে অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে তুলে ছেন অঞ্জলি ভট্টাচার্য। তাঁর বাচন-গতে দৃপ্ত সুর অটুট থেকেছে। বনাথ দের 'শোভাসিংহ'ও দর্শকমনকে স্পট করেছে। সমরজিৎ দের 'রহিম খাঁ' কিরণ চ্যাটার্জির 'সোমেশ্বর' দুটি ক চরিত্রসৃষ্টি হোতে পেরেছে।

অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন রামপদ র্জি (বৃন্দাবন), শিশির চ্যাটার্জি বানী), মৃত্যুঞ্জয় চ্যাটার্জি (ধীমান), কুমার দাস (কুট্টি), অরুণ দে (আজিম-ান) মঞ্জু গাঙ্গুলী (মোরিয়া), প্রতিমা স (অনুলেখা), নীলিমা দাস (নর্তকী), শুক্লা গাঙ্গুলী (গোপাল), বারীন চ্যাটার্জি (গদাধর)।

অঞ্জনা সেনগুপ্তার কণ্ঠসঙ্গীত মাধুর্যে ও লালিত্যে সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সার্থক প্রযোজনার নেপথ্যে যাঁদের সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য তাঁরা হোলেন সুনীল চ্যাটার্জি, হীরেন চ্যাটার্জি, বিশ্বনাথ সিংহ, দেবী সিং, চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি ও অমর ঘোষাল।

একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা ঃ হালিশহর স্টুডেন্টস থিয়েটার গ্রুপের আয়োজনায় নবম বার্ষিক সারা বাংলা একাঙ্ক নাট্য প্রতি-যোগিতা শুরু হবে ১৪ ডিসেম্বর থেকে। ৩০ নভেম্বরের মধ্যে যোগাযোগের ঠিকানা ঃ শিবের গলি, পোঃ হালিশহর, ২৪ পরগণা।

নাট্য প্রতিযোগিতা

পাটনা শিল্পী সমিতির পরিচালনায় এবারও পূর্ণাঙ্গ বাংলা নাটকের অভিনয় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ সম্পাদক, শিল্পী সমিতি, ইয়ারপুর হাউস, ইয়ারপুর, পাটনা—১।

প্রতিরূপ সংস্থার পরিচালনায় একাঙ্ক ও পূর্ণাঙ্গ নাট্য প্রতিযোগিতা শুরু হবে আগামী জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে। আবেদনের শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর। ঠিকানা ঃ বেঙ্গল এনামেল, পলতা, ২৪-পরগণা।

কেল ইনস্টিটিউটের একাঙ্ক অভিনয় প্রতিযোগিতা শুরু হবে আগামী ৯ ডিসেম্বর। যোগদানের শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর। ঠিকানা ঃ কাঁচরাপাড়া, ২৪-পরগণা।

ইছাপুর অনুশীলনীর ৫ম বার্ষিক একাঙ্ক অভিনয় প্রতিযোগিতা হবে ২৪ ডিসেম্বর। যোগদানের শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর। ঠিকানা ঃ ২২ যতীন দাস রোড, মাঝেরপাড়া, ইছাপুর, ২৪-পরগণা।

বিদেশে বাংলা নাটক ঃ নিউইয়র্ক শহরে সম্প্রতি দুটি বাংলা নাটক সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে। থিয়েটার ওয়ার্কশপ গোষ্ঠী হোরেসমান হলে এই অভিনয়ের আয়োজন করেন। নাটক দুটির নাম হোল 'চলচিত্তচঞ্চরী' ও 'একটি নাটকের জন্ম'।

নাটক দুটির বিভিন্ন ভূমিকায় স্বচ্ছন্দ অভিনয় করেন আশীষ সেনগুপ্ত, তন্ময় বসু, প্রভাত ঘোষ হাজরা, অরুণ পাল, সত্যব্রত চৌধুরী, প্রদীপ রায়, মনোজ ভৌমিক, সরোজ ভোল। প্রতীকী মঞ্চসজ্জা নাট্যপ্রযোজনার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। আলোকসম্পাতে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন দীপঙ্কর দত্তগুপ্ত ও দিলীপ গুহরায়। সঙ্গীতে ছিলেন ফারুক ইসলাম, অরুন্ধতী ভৌমিক, সুচিত্রা রায়, অনুপ রায়চৌধুরী, সুনির্মল ব্যানার্জি।

সাজাহান ঃ এমসনস্ এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের প্রযোজনায় 'সাজাহান' নাটকটি সম্প্রতি পরিবেশিত হল 'বিশ্বরূপা'র মঞ্চে। নাটকটি পরিচালনা করেন বিজলীমোহন মুখার্জি। নামকটি ভূমিকায় সার্থক অভিনয় করেন রবীন ঘোষ (ঔরংজীব), নকুল চন্দ (দারা), নরেশ দাশগুপ্ত (দিলদার), হিমানী গাঙ্গুলী (জাহানারা)।

ভাঙন ঃ ষরুইপুর নাবিক সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীরা ডাঃ অরুণ দের 'ভাঙন' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশন করেন। আজকের সমাজজীবনের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি আছে এ নাটকে।

নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেন প্রদীপ ভট্টাচার্য, সঞ্জীব ভট্টাচার্য, সুব্রত সরকার, নিতাই ভট্টাচার্য, গৌর ভট্টাচার্য, কেনারাম মান্না, মানব মিত্র, চন্দন মজুমদার, সবিতা দেবী, শীলা দেবী।

কেরাণীর জীবন ঃ ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহু অভিনীত 'কেরাণীর জীবন' নাটকটি সম্প্রতি রঙমহলে রঙ্গমঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশন করেছেন ঢাকা ঔষধালয় রিক্রিয়ে-শন ক্লাবের সভ্যবৃন্দ। তাঁদের প্রথম প্রচেষ্টা দলগত সংহতির ফলে বেশ আকর্ষণীয় হয়েছিল। বিভিন্ন চরিত্র-চিত্রণে দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন রমেন্দ্রনাথ দাস, রণজিত দাস, প্রীতম সিংহ, মণি বিশ্বাস, সুব্রত দাস, রাজনারায়ণ দাস ও রামকুমার সাধুখাঁ। এছাড়া কৌতুক দৃশ্যে সুঅভিনয় করেছেন স্বপনকুমার, গুরুপ্রসাদ শী, সুবল চৌধুরী ও মানব দাস। এঁদের মধ্যে মানব দাসের অভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর এবং মনমাতানো হয়েছে। বাণী ব্যানার্জি এবং দীপালি চৌধুরীর অভিনয়ও চরিত্রানুগ।

'পানকৌড়ি'র নাট্যাভিনয় ঃ গত ১২ অকটোবর হুগলীর বলরামবাটীতে স্থানীয় নাট্য সংস্থা পানকৌড়ি নাট্য সঙ্ঘ 'রাধার নিয়তি' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। অভিনয় করেন রাজকুমার মাল, অশোক দাস, সুশান্ত হাজরা, উৎপল পাত্র প্রমুখ শিল্পি-বৃন্দ। পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় ছিলেন নিধিরাম কর্মকার, হৃদয়রঞ্জন দাস ও তপন ভট্টাচার্য।

জলসা

'লাবনী' প্রযোজিত দু'টি নৃত্যনাট্য : গত সপ্তাহে 'লাবনী' সংস্থার পক্ষ থেকে রবীন্দ্রসদনে শ্রীবালকৃষ্ণ মেনন পরিচালিত দু'টি নৃত্যনাট্য 'পরমলগ্ন' ও 'রূপমতী রাজবাহাদুর' একাধারে কাহিনী, নাট্য ও নৃত্যের এক চিত্তগ্রাহী সমন্বয়।

প্রথমটি যিশুর জন্মকাহিনী অবলম্বিত নৃত্যনাট্য। যুগে যুগে পৃথিবীতে সকল মলিনতা, ক্রূরতা ও অমঙ্গলের চরম মুহূর্তে পরমপুরুষের আবির্ভাব অন্ধকারের চক্রান্তকে বারবার ব্যর্থ করেছে।

এমনই এক লগ্নে মহাত্রাতা যিশুখৃষ্টের আবির্ভাব। এই কাহিনীবর্ণনে একাধারে বাইবেলের উপাখ্যানের বিশ্বস্ত অনুসরণ এবং প্রতীকী ব্যঞ্জনা উভয় দিকটির প্রতিই যথাযথ নজর দিয়েছেন নৃত্যপরিচালক বালকৃষ্ণ মেনন ও নাট্যরূপায়ক শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়।

আকাশে একটি তারার নির্দেশে তিনজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তির বেথেলহামে যাত্রা, প্রধান সৈনিকের রাজার আদেশে শিশু-হত্যার প্রতিক্রিয়া, রাজার শঙ্কা ও নিষ্ঠুরতার স্থূল ও সূক্ষ্মের ভূমিকা—যে মুন্সিয়ানায় প্রদর্শিত হয়েছে তা মেননের মত সুদক্ষ ও কল্পনাসমৃদ্ধ নৃত্যরচয়িতার পক্ষেই সম্ভব।

নৃত্যরচনায় কথাকলির পৌরুষ ও মণিপুরীর লালিত্যে আলম্বন-বিভাবকে বিশ্বাসযোগ্য রূপ দেওয়া হয়েছে।

নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে একাধারে দেবদূত ও প্রধান সৈনিকের যুগ্ম ভূমিকায় সাধন গুহ, রাজা হ্যারডের ভূমিকায় বটু পাল এবং মেরীর ভূমিকায় মায়া ঘোষ অনবদ্য। দানবী নিষ্ঠুরতা ও নারী হৃদয়ের লজ্জা, বেদনা ও উদ্বেগকে মর্মগ্রাহী করে তুলেছিলেন। স্বল্প অভিনয়ের সীমিত পরিসরে নৃত্যদক্ষতা দ্বারা দর্শককে ছবিটি সম্পূর্ণ করে তুলেছেন কৃষ্ণা গঙ্গোপাধ্যায়।

দরবার নৃত্যে মান্দোরিনের ছন্দের সঙ্গে নৃত্যানুপরের বোলের মিলনে সারা প্রেক্ষাগৃহকে যেন আনন্দমুখর করে তোলে।

আবহসঙ্গীত রচনার কৃতিত্ব প্রাপ্য তরুণ শাণ্ডিল্যর। সকালের নানা রাগের জোয়ার ভক্তির ভাব—আবার চাঞ্চল্য ও নিষ্ঠুর প্রবৃত্তিকে অভিব্যক্তি করা অর্কেস্ট্রার সঙ্গীতে তাঁর কল্পনাপ্রবণ মনটির স্পর্শ পাওয়া যায়।

মায়া সেন পরিচালিত রবীন্দ্রসঙ্গীত-গুলির নির্বাচন সুন্দর। কিন্তু আশানুরূপ রসসৃষ্টি করতে না পারার কারণ কি টেপরেকর্ডের ত্রুটি? 'রূপমতী-রাজ-রাজবাহাদুর' আমাদের পূর্ব-আলোচিত নৃত্যনাট্য। এবারেও এই কাহিনী রূপায়ণে পূর্বের উচ্চমান অনাহত ছিল।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে ডঃ রমা চৌধুরী তাঁর পৌরোহিত্য ভাষণে প্রতিষ্ঠানের 'লাবনী' নামটির ব্যঞ্জনা বিশ্লেষণে সত্যম, শিবম ও সুন্দরম' বাণীর সার্থকতা নির্দেশ করে বলেন, পবিত্র ঈদের দিন, কালীপূজার

সুরদাস সংগীত সম্মেলনে নৃত্যরত গোপীকিষণ

আসান পর্ব ও মহাপুরুষ যিশুর জন্ম-কাহিনী রূপায়ণ এই তিনটি পুণ্যলগ্নের সম্মিলন মুহূর্তে পরিবেশিত 'পরমলগ্ন' —সত্যিই পরমলগ্নের সৃষ্টি করেছে। উৎসব উদ্বোধন করেন হীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

নটরাজের দু'টি স্মরণীয় অনুষ্ঠান : রবীন্দ্রসদন মঞ্চে নটরাজের দু'টি নৃত্য-গীতানুষ্ঠান 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা' ও 'রথের রশি' আলোকপাত করেছে মানুষের জন্মগত স্বাধীনতা পিপাসার অপরাজেয় আর্তির প্রতি। প্রথমটিতে ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির আনন্দোচ্ছ্বাসের পর আকস্মিক বিষণ্ণতা—যখন বোঝা গেল স্বাধীনতা বাইরের। সমাজে নানা অবিচারের আঘাত, নির্দয়ের অত্যাচার সৌন্দর্যলক্ষ্মী আজও শৃঙ্খলিত প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে বিচারে বাণী আজও নিভৃতে, নীরবে কাঁদছে।

কিন্তু এই হতাশাই জীবন ও জগতের শেষ কথা নয়। নানান প্রতিকূলতার আঘাত, অবিশ্বাসের ভ্রূকুটি ও পরাজয়ের লাঞ্ছনার ওপরও অনাহত স্বাধীনতার অ[illegible] আশ্বাস। পতন ও অভ্যুদয়ের চড়াই উতরাই বেয়েই সেখানে পৌঁছতে হয়।

বিশ্বজিৎ রায়ের পরিচালনায় এ[illegible] ভাবকল্পনা নৃত্য ও সঙ্গীতের পথ বে[illegible] এক অভিনব রূপলোকে পৌঁছেছে।

শিবশঙ্কর, সোমেন ঘোষ, শ[illegible] বসু, চন্দ্রোদয় ঘোষ, দেবাশী[illegible] চক্রবর্তী নৃত্যের মান উন্নত রেখেছেন আর এ নৃত্যকে লাবণ্যমণ্ডিত করেছে[illegible] কাজরী চক্রবর্তী, বনশ্রী চক্রবর্তী, পিয়াল[illegible] ঘোষ, সোগতা রায়, মঞ্জুশ্রী মুখোপাধ্যায় সুতপা দাসগুপ্তা ও বিপাশা বন্দ্যো-পাধ্যায়। কণ্ঠসঙ্গীতে ছিলেন প্রতিমা রা[illegible] জয়শ্রী রায়, মনীষা বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর্ণা মিত্র, অঞ্জনা মিত্র, পূর্ণিমা বসু, অমি[illegible] ঘোষ, প্রমীলা দাসগুপ্তা, জনজিৎ রা[illegible] তপন মল্লিক, দ্বিজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, প্রসূন চৌধুরী, সুস্থির রায়চৌধুরী, পূর্ণেন্দু সিংহ, মনোজিৎ দে। পরিচালনার দায়িত্ব ছাড়াও সুবীর মিত্রর সাথী শিল্পী-রূপে আবৃত্তিতে এবং একক ও সমবেত কণ্ঠসঙ্গীতে বিশ্বজিৎ রায়ের যোগ্যতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর মেলে।

সঙ্গতে ছিলেন রবীন গঙ্গোপাধ্যায় ধীরেন্দ্র চন্দ্র ও সলিল চট্টোপাধ্যায়। টিম-ওয়ার্ককে সার্থক করেছেন কনিষ্ক সেন (আলোক), জয়শ্রী সেন ও মোনা দত্ত (মঞ্চ), ভারতী দত্ত, ছন্দা বসু, কল্যাণী রায় (সজ্জাপরিকল্পনা)। 'রথের রশি'র বক্তব্য হোল সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বর পৃথিবীর

দীনতম মানুষেরই বেশী কাছের—বিশ্ব-পরিক্রমায় ছন্দের ভারসাম্য বজায় রাখার তাগিদেই।

এখানেও বিশ্বজিৎ রায়কে দেখা গেল একাধারে পরিচালক, আবৃত্তিকার ও গায়ক-রূপে। এই নাট্যেও সঙ্গীতপরিবেশনা, অভিনয়, আলোকপাত, মঞ্চ ও সজ্জা-পরিকল্পনায় রাবীন্দ্রিক ধারা সুরক্ষিত।

রক্ষণশীল পুরোহিতের ভূমিকায় সুস্থির রায়চৌধুরী, সন্ন্যাসীর চরিত্রায়নে তপন মল্লিক, ধনিকনেতারূপী জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়, মন্ত্রী ও দূতের রূপায়ণে দ্বিজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী ও শম্ভু চক্রবর্তী—নাট্যরূপের গোষ্ঠীগত সাফল্যের সহায়ক। সজ্জায় ভারতী দত্ত, ছন্দা বসু, কল্যাণী রায় পরিকল্পিত বর্ণসমন্বয় চিত্রকল্প সৌন্দর্যসৃষ্টি করে।

সুরদাস সঙ্গীত সম্মেলন : কুমারী ভাস্বতী সান্যালের কথক নৃত্য দিয়ে কলা-মন্দিরে শুরু হয় সুরদাস সঙ্গীত সম্মেলনের সঙ্গীতোৎসব। নটরাজ গোপীকৃষ্ণর শিষ্যা এই তরুণ শিল্পীর নৃত্যপ্রতিভারই প্রতিশ্রুতিবাহী।

ওস্তাদ বিসমিল্লা খানের সানাইএ 'শ্যামকল্যাণ' রাগের কল্যাণভাব পরিবেশকে মর্যাদা-গাম্ভীর্যে ভূষিত করলেও মনে দোলা দিয়েছে বেশী তাঁর কাজরী, চৈতী ও ধুন।

আলি আকবর কলেজের শিষ্য সত্য বিশ্বাসও সরোদ শোনান 'শ্যামকল্যাণ' রাগে। রাগশুদ্ধতা, ক্রমবিন্যাস ও আঙ্গিক বিচারে শ্রীবিশ্বাস ঘরাণার ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন। খুব সম্ভব প্রথম মঞ্চে উপস্থিতির সংকোচকে কাটিয়ে উঠতে পারেননি বলেই তিনি আলাপের অঙ্গে হয়ত কিছু ইতস্ততঃ, কিন্তু এ বাধা কাটিয়ে স্বচ্ছ, সাবলীল হয়ে উঠেছেন গতের অঙ্গে। সঙ্গতে ছিলেন পণ্ডিত শান্তাপ্রসাদের কিশোর পুত্র কুমার মিশ্র।

'সন্তুর' যন্ত্রে দুলাল বিশ্বাসের 'কলাবতী' রাগ-বিশ্লেষণে শুদ্ধ রাগরূপ ছাড়াও সুশিক্ষিত হাতের দক্ষতা লক্ষণীয়।

বেহালায় পণ্ডিত ভি, জি, যোগের 'বাগেশ্রী'তে মহারাষ্ট্রীয় শৈলীর তানের ক্ষিপ্রতা ও লয়বাহার শ্রোতাদের যথোচিত আনন্দ দিয়েছে।

ওস্তাদ আবদুল হালিম জাফর খানের সেতারে 'ললিত' রাগ বেজেছে তাঁর অসাধারণ যন্ত্রদক্ষতা, আঙ্গিকশৈলী ও মীড়ের কারুকৃতিতে। কিন্তু দ্রুতলয়ী তানে রেওয়াজী হাতের উজ্জ্বল নিদর্শন থাকলেও 'ললিত' রাগের শান্ত কমনীয়তা অনেকখানিই ক্ষুন্ন হয়েছে। সঙ্গে পণ্ডিত শান্তাপ্রসাদের তবল্যসঙ্গত অবশ্যই অন্যতম আকর্ষণ।

কণ্ঠসঙ্গীতে অনিমা রায় ও রুক্মাবাঈ সেনগুপ্ত দুই তরুণ শিল্পী। অনিমা রায় ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণধন বন্দ্যো-পাধ্যায়ের শিষ্যা। এ'র গানে রাগের স্বচ্ছতা ও সুরেলা বিস্তার প্রশংসনীয়।

রুক্মাবাঈ সেনগুপ্তার 'মারুবেহাগ'এ শিল্পীর কণ্ঠমাধুর্য্য ছাড়াও উল্লেখযোগ্য বস্তু হোল কাননদম্পতির সম্প্রতিকালের শিক্ষার সঙ্গে তারাপদ চক্রবর্তীর তানের ধাঁচের শিল্পসম্মত মিলন। মাধুর্যের সঙ্গে আরও একটু ওজস আনলে আকাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছতে এ'র দেরী হবে না।

পণ্ডিত শান্তাপ্রসাদ ও ভি, জি. যোগের তবলা ও বেহালা সঙ্গতে কুমার মুখোপাধ্যায় গেয়েছিলেন 'বেহাগ' ও 'সুরমল্লার'। সঙ্গীতপরিবেশনা নিন্দনীয় না হলেও জমে উঠেছিল বেশী বেহালা ছড়ের সঙ্গে তবলার বোলের কথা বলাবলি। শ্রোতাদের হাততালির উচ্ছ্বাসটা ছিল সেই কারণেই।

দিল্লীর য়ুনুস হোসেন খাঁ কণ্ঠসঙ্গীত পরিবেশন করেন 'হোসেনী কানাড়া' ও 'নটভৈরব' রাগে। এ'র কণ্ঠ সুন্দর, রাগ-বিশ্লেষণও নির্ভুল কিন্তু একই ধাঁচের তানের পুনরাবৃত্তির কারণে এ অনুষ্ঠান যথাযোগ্যরূপে জমে উঠতে পারেনি। তবলা সঙ্গতে সাথসঙ্গতের অঙ্গ উপভোগ্য করে তুলেছিলেন শঙ্খ চট্টোপাধ্যায়।

সম্মেলনের সেরা আকর্ষণ ছিল নটরাজ গোপীকিষণের কথক নৃত্য। দুদিনের অনুষ্ঠানে এ'র ব্যাপক নৃত্যে কথকের বিভিন্ন অঙ্গের সঙ্গে সৃষ্টিধর্মী শিল্পী-মনের কল্পনার মিলনে যে রসসৃষ্টি হয় তা উচ্চাঙ্গের শিল্পপর্যায়ে পড়ে। অনন্য শিল্পীর দেহলাবণ্যও তাঁর শিল্পকৃতিকে সার্থক করে তোলার অনেকখানিই সহায়ক হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এক বিশেষ সম্বর্ধনায় সংঘসচিব স্বদেশ সান্যাল শিল্পীকে 'নৃত্যাচার্য' উপাধি-ভূষিত করেন।

গীতালীর বার্ষিক উৎসব : সম্প্রতি প্রখ্যাত সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গীতালীর (৩বি, ললিত মিত্র লেন, শ্যামবাজার, কলিকাতা) ষোড়শ বার্ষিক সভা এবং পঞ্চম বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সূচনায় পংকজ সাহার নেতৃত্বে ধ্রুপদ চৌতাল বাংলা সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। গীতালীর ছাত্র-ছাত্রীদের সহযোগিতায় রবীন্দ্রসঙ্গীত, অতুলপ্রসাদী, আধুনিক, লোকসঙ্গীত, উপস্থিত শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করে। শ্রীশিবনাথ সাহার পরিচালনায় গীটার বাদন সকলের প্রশংসা অর্জন করে। শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র কর্তৃক গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত-গুলি বিশেষ আকর্ষণীয় হয়েছিল। সর্বশ্রী রাজীব দে, জয়দেব ব্যানার্জি, অনিল লাইন, অসিত গাঙ্গুলী, স্বপন গুহ, মলয় মুখার্জি, স্বপন মুখার্জি, দুলাল সাহা, অমিয় দাঁ, দেবকুমার পাইন, কল্যাণ সেন বরাট, অশোক দত্ত, রণজিত সিংহ, সেবাব্রত কুণ্ডু অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সহায়তা করেন।

—চিত্রাঙ্গদা

খেলাধূলা

দর্শক

দলীপ ট্রফি

দিল্লীর ফিরোজশা কোটলা মাঠে আয়োজিত দলীপ ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় পূর্বাঞ্চল প্রথম ইনিংসে ৬৩ রান বেশী করার সুবাদে উত্তরাঞ্চলকে পরাজিত করে সেমি-ফাইনালে উঠেছে। খেলার শেষে দেখা গেল পূর্বাঞ্চল দলের ২য় ইনিংসে ১৩৮ রান (২ উইকেটে) উঠেছে—খেলায় সরাসরি জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৭১ রানের থেকে মাত্র ৩৩ রান কম।

পূর্বাঞ্চল বনাম মধ্যাঞ্চল দলের সেমি-ফাইনাল খেলাটি আগামী ১৮ই নভেম্বর কলকাতার ইডেন উদ্যানের রঞ্জি স্টেডিয়ামে শুরু হবে।

উত্তরাঞ্চল দলের অধিনায়ক বিষেণসিং বেদী টসে জয়ী হন। তিনি সকলকে অবাক করে শিশিরভেজা উইকেটে প্রথম ব্যাট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তের কুফল দলকে হাতেনাতে পেতে হয়েছিল। উত্তরাঞ্চল দলের ১ম ইনিংস মাত্র ১৬৫ রানের মাথায় শেষ হয়। তাদের অবস্থা আরও কাহিল হত অমরনাথ ভ্রাতৃদ্বয় দলের অতি সংকটকালে শক্তহাতে ব্যাট যদি না ধরতেন। লাঞ্চের সময় উত্তরাঞ্চল দলের রানের অবস্থা খুবই কাহিল ছিল—৫টা উইকেট পড়ে স্কোর বোর্ডে মাত্র ৮০ রান। লাঞ্চের মুখে তাদের ৫ম উইকেট পড়ে যায়। সুরীন্দার অমরনাথ ২২ রান করে অপরাজিত ছিলেন। লাঞ্চের পর দলের ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটি দুই ভাই—সুরীন্দার এবং মহীন্দার অমরনাথ দৃঢ়তার সঙ্গে খেলতে থাকেন। তাঁদের এই ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে দলের অতি মূল্যবান ৬৪ রান উঠেছিল। ন্যাটা খেলোয়াড় সুরীন্দার দু ঘণ্টারও বেশী সময় খেলে ব্যক্তিগত ৬৪ রান করেন। তাঁর এই ৬৪ রানে বাউন্ডারী ছিল ১০টা। অপরদিকে ছোট ভাই মহীন্দার ১১৫ মিনিটের খেলায় নিজস্ব ৩৮ রান তুলে শেষপর্যন্ত অপরাজিত থেকে যান। তাঁর রানে ছিল তিনটি বাউন্ডারী। দলের মধ্যে এই দু ভাই-ই দোশীর ভেল্কি লাগা বলকে ঠিকমত খেলেছিলেন। ন্যাটা স্পিনার দিলীপ দোশী ৬০ রানে ৪, লেগ স্পিনার আনন্দ শুক্লা ৫১ রানে ২ এবং মিডিয়াম পেস বোলার সুব্রত গুহ ৩০ রানে ২ উইকেট পান। খেলার এক সময় দোশীর বোলিং পরিসংখ্যান ছিল—ওভার ১০·১, মেডেন ৭, রান ২১ এবং উইকেট ৩। প্রথম দিনের বাকি সময়ের খেলায় পূর্বাঞ্চল ১ উইকেটের বিনিময়ে ৪৯ রান সংগ্রহ করেছিল। প্রথম দিনের খেলা ভাঙ্গার আধ ঘণ্টা আগে ফিল্ডিং করার সময় অধিনায়ক বেদী

অম্বর রায়
অধিনায়ক—পূর্বাঞ্চল
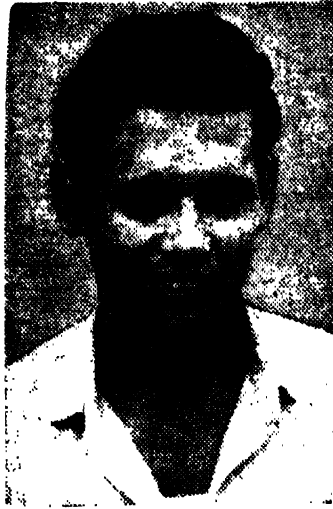
আংগুলে দারুণ আঘাত পেয়ে মাঠ ছেড়ে যেতে বাধ্য হন।

দ্বিতীয় দিনে চা-পানের ১০ মিনিট পর পূর্বাঞ্চলের ১ম ইনিংস ২২৮ রানের মাথায় শেষ হলে তারা প্রথম ইনিংসের রানের ভিত্তিতে উত্তরাঞ্চল দলের থেকে ৬৩ রানের ব্যবধানে এগিয়ে যায়। এই দিনের খেলায় পূর্বাঞ্চল দলকে এক সময় দারুণ সংকটের মধ্যে পড়তে হয়েছিল। খেলার এক সময় যেখানে স্কোর বোর্ডে পূর্বাঞ্চল দলের ১ উইকেটের বিনিময়ে ৮৫ রান ছিল সেখানে লাঞ্চের সময় দেখা গেল ১১০ রান, ৫ উইকেটে। দলের ৮৫ রানের মাথাতেই এই তিনটে উইকেট পড়ে যায়—২য়, ৩য় ও ৪র্থ। লাঞ্চের পরই ১২৪ রানের মাথায় ৬ষ্ঠ উইকেট পড়ে। এই সময় উত্তরাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংসের ১৬৫ রানের থেকে পূর্বাঞ্চল ৪১ রানের ব্যবধানে পেছিয়ে ছিল এবং হাতে জমা ছিল ৪টে উইকেট। দলের এই দারুণ সংকটকালে পরিত্রাতার ভূমিকা নিয়েছিলেন ৭ম উইকেটের জুটি অধিনায়ক অম্বর রায় এবং রাজু মুখার্জি। তাঁরা ৭ম উইকেটের জুটিতে ৪১ মিনিট খেলে দলের অতি মূল্যবান ৫৪ রান তুলে দেন। রাজু ২৭ রান করে আউট হন। খেলার এক সময় রাজুর রানেতেই পূর্বাঞ্চল ১ রানে এগিয়ে যায়। স্কোর বোর্ডে তখন পূর্বাঞ্চলের রান ১৬৬ (৬ উইকেটে)। অম্বর রায় অধিনায়কের পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে খেলেছিলেন। তিনি ১৩৫ মিনিটের খেলায় তাঁর ৫১ রানে ৮টা বাউন্ডারী করেন। শেষ ১০ম উইকেট জুটিতে জিজ্ঞিবয় এবং দিলীপ দোশী যে ৭০ রান তুলেছিলেন তার মূল্যও কম নয়। উত্তরাঞ্চল দলের অধিনায়ক বিষেণসিং বেদী তাঁর আংগুলে আঘাতের দরুণ খেলায় অংশ গ্রহণ করেন নি।

পূর্বাঞ্চল দলের ১ম ইনিংস ২২৮ রানের মাথায় শেষ হলে খেলার বাকি সময়ে উত্তরাঞ্চল ২য় ইনিংসের কোন উইকেট না খুইয়ে ৫২ রান তুলেছিল। খেলার এই অবস্থায় তারা পূর্বাঞ্চলের প্রথম ইনিংসের ২২৮ রানের থেকে ১১ রানের পেছনে ছিল।

তৃতীয় অর্থাৎ শেষ দিনে উত্তরাঞ্চল নাটকীয়ভাবে সংকটের মধ্যে পড়ে শেষ পর্যন্ত কিছুটা উদ্ধার পেয়েছিল। দ্বিতীয় দিনে উত্তরাঞ্চল ২য় ইনিংসের কোন উইকেট না খুইয়ে ৫২ রান সংগ্রহ করেছিল। তৃতীয় দিনে তাদের ২য় ইনিংসের ১ম উইকেট পড়ে ১৬৩ রানের মাথায়। প্রথম উইকেটের জুটিতে বিনয় লাম্বা এবং ভেংকট সুন্দরম ১৬৪ মিনিটে দলের ১৬৩ রান তুলে খেলার ভিত খুবই শক্ত করেছিলেন। কিন্তু লাঞ্চের সময় দেখা গেল উত্তরাঞ্চলের ৬টা উইকেট পড়ে ১৯৭ রান দাঁড়িয়েছে। লাঞ্চের আগে মাত্র ১৫ মিনিটের খেলায় তাদের ৫টা উইকেট পড়ে যায়। তার বিনিময়ে জমা পড়ে মাত্র ৫ রান। বিনয় লাম্বা ১৮২ মিনিট খেলে তাঁর ১১৬ রান (বাউন্ডারী ১৪ ও ওভারবাউন্ডারী ১) সংগ্রহ করেন। দলীপ ট্রফির খেলায় তাঁর এই প্রথম সেঞ্চুরী। অপরদিকে ভেংকট সুন্দরমের ৬৪ রানে ছিল ৬টা বাউন্ডারী।

লাঞ্চের আধ ঘণ্টা পর উত্তরাঞ্চল তাদের ২৩৩ রানের (৭ উইকেটে) মাথায় ২য় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। খেলায় সরাসরি জয়লাভের জন্যে বাকি ১৭০ মিনিটে পূর্বাঞ্চলের ১৭১ রানের প্রয়োজন ছিল এবং তারা লক্ষ্যের নিকট দূরত্বেও হাজির হয়েছিল। পূর্বাঞ্চলের ২য় ইনিংসের ১৩৮ রানের (২ উইকেটে) মাথায় খেলাটি শেষ হয়—সরাসরি জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৭১ রানের থেকে মাত্র ৩৩ কম।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

উত্তরাঞ্চল : ১৬৫ রান (এস অমরনাথ ৬৪ এবং এম অমরনাথ নট আউট ৩৮ রান। দোশী ৬০ রানে ৪, সুব্রত গুহ ৩০ রানে ২ এবং শুক্লা ৫১ রানে ২ উইকেট)

ও ২৩৩ রান (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। বিনয় লাম্বা ১১৬ এবং ভেংকট সুন্দরম ৬৪ রান। অম্বর রায় ৫৪ রানে ৩ এবং দিলীপ দোশী ৮৫ রানে ৩ উইকেট)

পূর্বাঞ্চল : ২২৮ রান (অম্বর রায় ৫১, রবীন মুখার্জি ৩২ এবং রাজা মুখার্জি ৩০ রান। মদনলাল ৫৪ রানে ২ এবং গোকুল দেব ৫৮ রানে ২ উইকেট)

ও ১৩৮ রান (২ উইকেটে। রবীন মুখার্জি নট আউট ৬৮ এবং রাজা মুখার্জি ৫৪ রান)

ভারত বনাম রাশিয়ার দ্বৈত কুস্তি প্রতিযোগিতার একটি দৃশ্য : ৯০ কেজি বিভাগের কুস্তিতে মিউনিখ অলিম্পিক রৌপ্যপদক বিজয়ী রাশিয়ার স্মীকোভ গানাডি বনাম ভারতের মাখন সিংয়ের লড়াই। গানাডি শেষ পর্যন্ত পয়েন্টে জয়ী হন।

আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা

বোম্বাইয়ে মহারাষ্ট্র ইন্টারন্যাশনাল ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় ডেনমার্ক, ...ল্যান্ড, সুইডেন, হল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া ...ং মালয়েশিয়ার মোট ১৬ জন খেলোয়াড় (...ুরুষ ১২ ও মহিলা ৪) যোগদানের ...মন্ত্রণ পেয়ে ভারতে এসেছিলেন। কিন্তু ...ম্বাইয়ের প্রতিকূল আবহাওয়ার দরুণ ...দেশ এবং স্বদেশের কয়েকজন খ্যাতনামা ...লোয়াড় শেষপর্যন্ত প্রতিযোগিতায় অংশ...ণ করেন নি। প্রতিযোগিতার পাঁচটি ...ভাগের ফাইনালে ইউরোপের খেলো...য়াড় খেতাব জয়ী হন। তাছাড়া পুরুষ...দের ডাবলসে ইন্দোনেশিয়া এবং মিক্সড ...বলসে ভারতবর্ষ ছাড়া বাকি তিনটি ...ভাগের রানার্স-আপ খেতাবও পেয়েছেন ...উরোপের খেলোয়াড়রা। প্রতিযোগিতায় ...টি খেতাব জয়ের সূত্রে 'ত্রিমুকুট' সম্মান ...ভ করেন একমাত্র সুইডেনের শ্রীমতী ...া টোয়েডবার্গ। সুতরাং প্রতিযোগিতায় ...উরোপের জয়জয়কার বলা যায়।

ফাইনাল খেলার ফলাফল

...ষদের সিঙ্গলস : এল প্রি (ডেনমার্ক) ১৫-৮ ও ১৫-১ পয়েন্টে ফ্লেমিং ডেলফসকে (ডেনমার্ক) পরাজিত করেন।

...লাদের সিঙ্গলস : ইভা টোয়েডবার্গ (সুইডেন) ১-১১, ১২-১০ ও ১১-৬ পয়েন্টে এল কোপেনকে (ডেনমার্ক) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : ডি টালবট এবং ই সি স্টুয়ার্ট (ইংল্যান্ড) ১৫-৭ ও ১৫-১১ পয়েন্টে আই গুণায়ন এবং নারাকে (ইন্দোনেশিয়া) পরাজিত করেন।

> **পরলোকে শীতেশ দাস**
>
> পশ্চিম বাংলার প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় শ্রীসীতেশ দাস এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় অকাল মৃত্যু বরণ করেছেন। আগামী সংখ্যায় তাঁর জীবনী প্রকাশিত হবে।

মহিলাদের ডাবলস : ইভা টোয়েডবার্গ (সুইডেন) এবং জে ভি বুসেকম (হল্যান্ড) ১৫-৬ ও ১১-৭ পয়েন্টে এল কোপেন এবং এ বার্গলুন্ডকে (ডেনমার্ক) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : ইভা টোয়েডবার্গ (সুইডেন) এবং ই সি স্টুয়ার্ট (ইংল্যান্ড) ১৫-৫ ও ১৫-১০ পয়েন্টে এল ভাটিয়া এবং রফিয়া লতিফকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করেন।

প্রদর্শনী টেনিস খেলা

ফিলিপস ইন্ডিয়া লিমিটেড আয়োজিত অর্ডনান্স ক্লাবের হার্ডকোর্টে মার্কারী ভেপর ল্যাম্পের আলোকসজ্জায় দুদিন ধরে নৈশ প্রদর্শনী টেনিস খেলার আসর বসেছিল। এই প্রদর্শনী টেনিস খেলায় ভারতবর্ষের খ্যাতনামা টেনিস খেলোয়াড় রমানাথন-কৃষ্ণান, প্রেমজিৎলাল, জয়দীপ মুখার্জি, আনন্দ অমৃতরাজ, বিজয় অমৃতরাজ, শ্যাম মিনোত্রা, গৌরব মিশ্র, চিরদীপ মুখার্জি এবং আখতার আলি অংশ গ্রহণ করে প্রদর্শনী খেলার গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন।

চিঠিপত্র

কলকাতা ৭১ প্রসঙ্গে

শ্রীমৃণাল সেনের 'কলকাতা ৭১' চাঞ্চল্য এনেছে, সমাজের সব শ্রেণীর মানুষকেই আলোড়িত করেছে। বলাই বাহুল্য, চলচ্চিত্র রসিকদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন সিনেমা কী করতে পারে, আর না পারে। এই ছায়াছবিটিকে ঘিরে বিতর্ক উঠেছে কম নয়। সোজা কথায় মৃণাল সেন প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করেছেন পুরনো বিধিব্যবস্থাকে। ঋত্বিক ঘটক, সত্যজিৎ রায়ের কথা মনে রেখেই বলছি এ-ছবি একান্তই মৃণাল সেনের ছবি।

না, ঠিক মৃণাল সেনেরও নয়। এ চিত্রটি আসলে কলকাতা কাঁপান সেই সব দিনেরই অন্তঃসার নিয়ে তৈরি। ভবিষ্যতের কথা হয়তো নেই। কেউ কেউ এর জন্য বলতে পারেন। তা বলুন। কিন্তু মৃণালবাবু আমাদের সব কিছুর দায়-দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন দর্শকদের উপরেই। আগামী বংশধরদের কাছে।

নান্দীকার মশাই 'কলকাতা ৭১'কে বাঙলা ভাষার প্রথম বেগবান সক্রিয় ছবি বলেছেন। কিন্তু ঠিক তার আগেই বলেছেন, 'ছবির বক্তব্য প্রকাশে বড্ড বেশি লিখিত বাক্য ও শব্দের ভূমিকা আছে, আধুনিক চলচ্চিত্রে ওদের ব্যবহার যত কম হয়, ততই ভালো।' বিষয়টা একটু খোলসা করে বলবেন কি তিনি? এটাও কি আমরা ভাবতে পারিনা, মহৎ স্রষ্টার হাতে অনেক কিছু ধ্যানধারণা, কিংবা ডিকশনই বদলে যেতে পারে। পরিশেষে বিনয়ের সঙ্গেই বলতে চাই, রোমের যে কাগজটি দুঃসাহসিক মৃণাল সেনের এই অপূর্ব শিল্পসৃষ্টি দেখে লিখেছিলেন 'রিমার্কেবল নট ফ্রম দা পয়েন্ট অব ভিউ অব স্পেকটাকুলার সাইটস বাট অব কালচারাল অ্যান্ড সিনেমাটোগ্রাফিক রিসার্চ', নান্দীকার মশাই সে ব্যাপারে কি বলেন?

দিলীপ বসুমজুমদার
বনগাঁ, ২৪ পরগণা।

(২)

'কলকাতা ৭১' সিনেমাটি অনেক আশা নিয়ে দেখতে গিয়েছিলাম। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি ছবিটি আমার প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। হতে পারে ওটা আমারই মনের সংকীর্ণ শিল্পবোধের ব্যর্থতা। প্রথমত চলচ্চিত্রটির নাম 'কলকাতা ৭১' অথচ তার কাহিনী সুরু হয়েছে পঞ্চাশের মন্বন্তরের ও বহু বছর আগে থেকে—কলকাতা ৭১ দেখতে গিয়ে দর্শক (অন্তত সাধারণ দর্শক) কলকাতা ৭১-এর রাজনৈতিক অস্থিরতার পটভূমি এবং তার ব্যাখ্যাই প্রত্যাশা করবেন এটাই স্বাভাবিক নয় কি? কিন্তু সে কাহিনী এখানে উপেক্ষিত।

দ্বিতীয়ত বারবার পর্দায় লিখিতভাবে হাজার হাজার বছর ধরে কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু কলকাতার ইতিহাস বা সমস্যা কি হাজার হাজার বছরের পুরোনো? যতদূর জানা আছে কলকাতার বয়েস তিনশো সাড়ে তিনশো বছরের বেশী নয়—তাহলে বারবার হাজার হাজার বছর শব্দের ব্যবহার অকারণ চক্ষুকে পীড়িত করে নাকি?

সব শেষে বলব গল্পগুলি ঠিক মিশ খায়নি—ভুনি খিচুড়ির চাল ডাল সব আধসেদ্ধ থাকলে যেমন হয় তেমনই সব মিলিয়ে আধসেদ্ধ—অর্ধ পরিপক্ক অবস্থা। পরিচালকের মূল বক্তব্য যে কি তা ধরা পড়ল না আমার চোখে। হয়তো এটা আমারই অক্ষমতা।

সাধনা মুখোপাধ্যায়, কল-১।

ভাষা নিয়ে বজ্জাতি

প্রায় থেকে থেকেই ভারতবর্ষে নানান সময়ে ভাষা নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড ঘটছে। আসামে আবার যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হচ্ছে ভাষার নামে তা জাতীয় সংহতির ভিত্তিতে মস্ত বড় একটা আঘাত দিচ্ছে নাকি? ব্যাপক অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন, বহু হত্যা-কাণ্ড ও বলপূর্বক উচ্ছেদের ঘটনা ঘটেছে এই সময়ে। কিন্তু গণতন্ত্রবিরোধীরা ভুলে যান সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে গায়ের জোরে ভাষা সমস্যার নিষ্পত্তি করা যায় না।

একথা ঠিক, আসামের গরিষ্ঠ অংশের ন্যায্য আশাআকাঙ্ক্ষার অবশ্যই মর্যাদা দিতে হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্য ভাষাভাষী সংখ্যালঘুদের ভাষাগত অধিকারকেও সম্ভাব্য সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। এবং যারা ভাষা নিয়ে বারেবারে ধুয়ো তুলে অশান্তি সৃষ্টি করছে, দেশটাকে টুকরো টুকরো করে দেবার ফন্দিফিকির আঁটছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা কি করা যায় না? সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাষা-নীতির দুর্বলতাগুলি দূর করার জন্যে নতুন চিন্তা নিয়ে কি এগোনো একেবারেই অসম্ভব?

রামকান্ত বড়ুয়া
গৌহাটি

একটি দেশকে জানতে চাই

রাষ্ট্রসংঘ সচিবের বিশেষ প্রতি
হিসেবে ডঃ আলফ্রেড এশচার সফরে
দক্ষিণ আফ্রিকায়। সেখানে এক সাং
সম্মেলনে ডঃ এশচার বলেন যে, দক্ষিণ আ
কান নেতাদের সঙ্গে সেখানকার রাষ্ট্রনায়
চিন্তায় রয়েছে আসমান জমিন ফা
প্রধানমন্ত্রী জন ভোর্স্টারও কিছুদিন
দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার কোণে অব
রাষ্ট্র নামিবিয়া সম্পর্কে মহারাষ্ট্র স
প্রস্তাবাদির সঙ্গে তার মতপার্থক্যের
ঘোষণা করেন।

কিন্তু আমরা, নামিবিয়ার
সম্পর্কে প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুই জানি
কোথাও কোনো আলোচনা নিবা
বেরিয়েছে বলেও আমার জানা
এ বিষয়ে আপনার পত্রিকা মারফত কেউ
কোনো আলোকপাত করতে পারেন

ছায়া বন্দ্যোপাধ
কলকাতা

অথ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কথা

বাক্ স্বাধীনতা যেমন ঠিক তে
অবাধ মতামত প্রকাশের অধিকার আমা
সংবিধান স্বীকৃত। অবশ্যই সব সময়
দরকার এই স্বাধীনতার অপব্যবহার যা
না হয়। যদি আমাদের সংবিধান, রা
মর্যাদা, জনসাধারণের মৌলিক অধি
বা জাতীয় সংহতির বিরুদ্ধে কোনো ক
না যায় তাহলে তা প্রকাশে যে কোনো ব
থাকতে পারে না তা সকলেই মানবেন।
বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারত
তা পালন করা হয় অক্ষরে অক্ষরে। এ
ভারতের ভাবমূর্তি বিশ্বব্যাপীই উজ্জ্ব

অথচ সম্প্রতি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যাল
ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য নাকি একটি সার্কু
জারি করেছেন। যার নির্গলিতার্থ হ
কোনো পরিস্থিতিতেই বর্ধমান বি
বিদ্যালয়ের কোনো কর্মচারীই (
শিক্ষকই হোন বা অশিক্ষক কর্মী হো
বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত কোনো বিষ
কলকাতা বা বর্ধমানের কাগজের
প্রকাশ্য বিবৃতি দিতে পারবেন না।

ঘটনা সত্য হলে নিশ্চয়ই উ
সার্কুলার। সংবিধান প্রদত্ত মৌলি
অধিকার (১৯-১/ক) রক্ষার এই প্র
সম্পর্কে সাধারণ মানুষ তো বটেই, বিশে
ভাবে শিক্ষা জগতের প্রতিক্রিয়া জান
অপেক্ষায় থাকছি!

কিশোরীলাল সেনগ
হরিশ মুখার্জি রোড, কলকা

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

না কখনো ছিল, না পাবেন—এমন
সাদা
সাবানের তুলনায়
১½ গুণ
বেশী কাপড় ধোয়
সাবানের তুলনায় অর্ধেক
মেহনত—দু'গুণ পরিষ্কার—
তা সে জল যে ধরণেরই হোক।
NEW!
det
detergent washing cake
ডেট কেক

১২শ বর্ষ
৩য় খণ্ড

২৯ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক—২ পয়সা
মোট ৫২ পয়সা

Friday, 24th November, 1972 শুক্রবার, ৮ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯ .52 Paise

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
১৬৪	একনজরে		—শ্রীপ্রত্যক্ষদর্শী
১৬৫	সম্পাদকীয়		
১৬৬	দেশেবিদেশে		—শ্রীপুণ্ডরীক
১৬৯	রূপনারায়ণ	(গল্প)	—শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মাইতি
১৭৯	জাতির নাম চাই		—শ্রীসুনীলকুমার ওঝা
১৮৪	পর্দার আড়ালে তুমি	(কবিতা)	—শ্রীরাজলক্ষ্মী দেবী
১৮৪	সে, যেন বাউল	(কবিতা)	—শ্রীকালীকৃষ্ণ গুহ
১৮৪	হাইওয়ে থেকে	(কবিতা)	—শ্রীভাস্কর দাশগুপ্ত
১৮৫	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		—শ্রীঅভয়ঙ্কর
১৮৯	বাড়ী	(উপন্যাস)	—শ্রীদেবল দেববর্মা
১৯৩	বর্তমান শিল্পকলা		—শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত
১৯৭	ফুলফোটার আগে	(উপন্যাস)	—শ্রীশৈলেন রায়
২০৪	সোভিয়েট দেশে পরিভ্রমণ নাইট ক্লাব		—শ্রীদিলীপ মালাকার
২০৬	বিজ্ঞানের কথা		—শ্রীঅয়স্কান্ত
২১০	স্রোত	(গল্প)	—শ্রীসমর মুখোপাধ্যায়
২১৪	প্রবাদ, প্রবচন ও বাংলার জাতি সম্প্রদায়		—শ্রীক্ষিতীশ চক্রবর্তী
২১৬	চিঠিপত্র		
২১৭	নিশীথ রাতের আগন্তুক	(গল্প)	—শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ
২২০	অর্থনীতিতে নতুন দিগন্ত : নোবেল পুরস্কার		—শ্রীশান্তিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসম্পৎ মুখোপাধ্যায়
২২২	অঙ্গনা		—শ্রীপ্রমীলা
২২৩	প্রদর্শনী		—শ্রীপ্রণবরঞ্জন রায়
২২৫	বিশেষ বিবাহ বিধি		—শ্রীকারিদবরণ ঘোষ
২৩০	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকার
২৩৬	জলসা		—শ্রীচিত্রাঙ্গদা
২৩৯	খেলাধুলা		—শ্রীদর্শক

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। রচনার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য অমৃত কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে অমৃত কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে অমৃত কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা		মফঃস্বল	
বার্ষিক	টাকা	২৫.০০	টাকা	৩০.০০
ষান্মাসিক	টাকা	১২.৫০	টাকা	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৬.২৫	টাকা	৮.০০

বিঃ দ্রঃ—উৎপাদন শুল্কের হার
(চাঁদার সহিত অবশ্য প্রেরণীয়)

বার্ষিক	টাকা	১.০৪
ষান্মাসিক	টাকা	০.৫২
ত্রৈমাসিক	টাকা	০.২৬

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

কেন্দ্রীয় জাহাজ ও পরিবহণ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীরাজ বাহাদুর রবিবার বাংলাদেশ হয়ে গৌহাটির উদ্দেশ্যে প্রথম স্টীমার সার্ভিস উদ্বোধন করেন। ছবিতে আউট্রাম ঘাটে 'রিধার ঘোতানা' স্টীমারটিকে শ্রীরাজ বাহাদুর হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছেন।

দেশে বিদেশে

আবার উৎখাতের রাজনীতি শুরু হয়েছে। একই সঙ্গে তামিলনাড়ুতে ও ওড়িশায়। এই রাজনীতির নায়ক তামিলনাড়ুতে চিত্রাভিনেতা-তথা-রাজনৈতিক-নেতা এম জি রামচন্দ্রন এবং ওড়িশায় বিমানের-পাইলট-তথা-রাজনৈতিক-নেতা বিজু পট্টনায়ক। শ্রীরামচন্দ্রন ডি এম কে থেকে বেরিয়ে এসেছেন আর শ্রীপট্টনায়কের জন্য কংগ্রেস দলের দরজা বন্ধ। দুজনেই তাদের নিজের নিজের রাজ্যে শাসক দলকে কতকটা বেকায়দায় ফেলেছেন এবং কি তামিলনাড়ুতে শ্রীকরুণানিধি সরকার কি ওড়িশায় শ্রীমতী নন্দিনী শতপথীর সরকার, কেউই খুব নিশ্চিন্ত বোধ করতে পারছেন না।

শ্রীরামচন্দ্রন তাঁর নবগঠিত আন্না ডি-এম-কে দল নিয়ে এবং সি পি আইয়ের সহায়তায় করুণানিধি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমে পড়েছেন। রাষ্ট্রপতির কাছে দুটি পৃথক পৃথক স্মারকলিপি পাঠিয়ে এ-ডি-এম-কে ও সি পি আই করুণানিধি সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করেছে এবং এই সব অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য কমিটি গঠনের দাবী জানিয়েছে। তাদের আরও অভিযোগ, এই সরকার বিরোধীদের স্তব্ধ করার জন্য দমননীতি চালিয়ে যাচ্ছেন, সর্বপ্রকার স্বাধীনতা হরণ করছেন। করুণানিধি সরকারের অপসারণের দাবীতে ও দমন-নীতির প্রতিবাদে গত ১০ নভেম্বর মাদ্রাজ শহরে শ্রীরামচন্দ্রন তাঁর সমর্থকদের দীর্ঘ মিছিল বার করেছিলেন এবং ১৫ নভেম্বর রাজ্যব্যাপী হরতালের ডাক দেওয়া হয়েছিল। দুয়েরই সাফল্য শ্রীরামচন্দ্রনের পিছনে জন-মতের একটি বৃহৎ অংশের সমর্থন প্রমাণ করেছে।

এই সাফল্য অবশ্য এখনও বিধানসভার ভিতর প্রতিফলিত হয়নি। এখন পর্যন্ত বিধানসভার মাত্র নয়জন ডি-এম-কে সদস্য এ-ডি-এম-কে দলে যোগ দিয়েছেন। বিধান-সভায় শক্তিপরীক্ষার যে সুযোগ এসেছিল সেই সুযোগও স্পীকার কে এ মাতিয়া-লগনের একটি নাটকীয় রুলিংয়ের ফলে গ্রহণ করা যায়নি। ডি-এম-কে নেতৃত্বের বিরুদ্ধে শ্রীরামচন্দ্রন যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন

বারাসতে নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়। পাশে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ, সংসদ সদস্যা শ্রীমতী মায়া রায়।

তাতে তিনি শ্রীমাতিয়ালগনের সমর্থন লাভ করছেন। এই কারণে ডি-এম-কে সদস্যরা শ্রীমাতিয়ালগনকে স্পীকারের পদ থেকে সরাবার চেষ্টা করছিলেন। এই উদ্দেশ্যে স্পীকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। ঐ প্রস্তাবের উপর যদি ভোট নেওয়া হত তাহলেই বিধানসভায় করুণানিধি সরকারের শক্তিপরীক্ষা হয়ে যেত। কিন্তু স্পীকার তাঁর রুলিংয়ের দ্বারা বিধানসভার অধিবেশন তিন সপ্তাহের জন্য মূলতুবী করে দেওয়ায় এবং পরে রাজ্যপালের আদেশে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষিত হওয়ায় উভয় পক্ষের শক্তির যাচাই হয় নি।

বিধানসভার ঐ অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীরামচন্দ্রন করুণানিধি সরকারের পদত্যাগ দাবী করে বলেন যে, ডি-এম-কে দল কংগ্রেস, সি-পি-আই ও পি-এস-পির সমর্থনে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে জয়ী হয়েছিল। কিন্তু অন্য দলগুলি তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছে। ডি-এম-কের অধিকাংশ সদস্যও এখন দল থেকে বেরিয়ে এসেছেন। অতএব শ্রীরামচন্দ্রনের মতে, ডি-এম-কের এখন আর শাসন করার অধিকার নেই। তিনি আরও বলেন, বিধানসভা ভেঙ্গে দিয়ে করুণানিধি সরকারের নতুন নির্বাচনের সম্মুখীন হওয়া উচিত। শ্রীরামচন্দ্রনের সঙ্গে সায় দিয়ে স্পীকার মাতিয়ালগন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পীকার বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক রুলিংয়ের অনুরূপ একটি রুলিং দিলেন। ডি-এম-কে নেতাদের 'একজন পুরান বন্ধু' হিসাবে তিনি উপদেশ দিলেন, তাঁরা নতুন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আবার জনমত যাচাই করুন। সরকার যতক্ষণ বিষয়টি বিবেচনা করে দেখছেন সেজন্য তিনি বিধানসভার অধিবেশন তিন সপ্তাহের জন্য মূলতুবী করে দিলেন।

স্পীকার মাতিয়ালগনের এই রুলিং আইন ও সংবিধানের জটিল সমস্যা ডেকে এনেছে এবং তামিলনাড়ুতে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা বাড়িয়ে তুলেছে। স্পীকারের নির্দেশের পর রাজ্যপাল বিধানসভার অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন। রাজ্যপালের এই ঘোষণার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে স্পীকার মাতিয়ালগন ও বিরোধী নেতা রামচন্দ্রন হাইকোর্টে দুটি রিট আবেদন করেছেন। ইতিমধ্যে বিধানসভা কার্যত অচল হয়েই রইল। কারণ, যতবারই বিধানসভা ডাকা হবে ততবারই স্পীকার, যদি সেই অধিবেশন বন্ধ করে দেন, তাহলে তাঁকে বাধা দেওয়ার কোন উপায় নেই। আবার বিধানসভার অধিবেশন না বসিয়ে স্পীকারকে তাঁর আসন থেকে সরানও যায় না। ডি-এম-কে, তামিল আরাস, কাড়াগম ও মুস্লিম লীগ, ও ফরওয়ার্ড ব্লক দলের ১৮২ জন সভ্য একটি স্বাক্ষরিত পত্র পাঠিয়ে স্পীকার মাতিয়ালগনের পদত্যাগ দাবী করেছেন। কিন্তু বিধানসভায় ভোটাধিক্যে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত স্পীকার

কলকাতায় বিধান সরণি দিয়ে পরেশনাথের মিছিল এগিয়ে চলেছে।

এই ধরনের কোন দাবী মেনে নিতে বাধ্য নন।

দলছুট ডি-এম-কে নেতারা ও সি-পি-আই করুণানিধি সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্তের জন্য নয়াদিল্লীর উপর ক্রমাগত চাপ দিয়ে চলেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এখনও এ বিষয়ে মুখ খুলছেন না। তবে তাঁরা এই তদন্তের দাবী প্রত্যাখ্যান না করে এই রকম একটা ধারণা ঝুলিয়েই রেখেছেন যে, ডি-এম-কে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগুলি সম্পর্কে তদন্ত করা হতে পারে। যদি তা হয় তাহলে ডি-এম-কে দলে ভাঙ্গন যে আরও বাড়বে এবং করুণানিধি সরকারের অস্তিত্ব যে আরও বেশি বিপন্ন হয়ে পড়বে তাতে সন্দেহ নেই।

* * *

তামিলনাড়ুর করুণানিধি সরকারের তুলনায় ওড়িশার শতপথী সরকারের অস্তিত্বের সংকট এই মুহূর্তে সম্ভবত অনেক গভীরতর।

ওড়িশা মন্ত্রিসভার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কংগ্রেস নেতারা যে রীতিমত উদ্বিগ্ন সেটা তাঁদের আচরণে প্রকাশ পেয়েছে। যে বিজু পট্টনায়ককে নিয়ে এই গোলযোগের সূত্রপাত তাঁকে তুষ্ট করার জন্য শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের নেতারা অনেক চেষ্টা করেছিলেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রজিৎ যাদব ও কমিটির পর্যবেক্ষক মথুরাদাস মাথুর এমন ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, শ্রীপট্টনায়ক ও তাঁর অনুগামীদের জন্য কংগ্রেসের দরজা খুলে দেওয়া হতে পারে। এই দরজা বন্ধ বলেই ওড়িশার রাজনীতিতে এতখানি জল ঘোলা হয়েছে। গত বছর জুন মাসে শ্রীবিজু পট্টনায়কের উৎকল কংগ্রেসের সঙ্গে কংগ্রেসের সংযুক্তি সাধনের প্রস্তাব যখন গৃহীত হয় তখন প্রধানত শ্রীমতী শতপথীর আপত্তিতে উৎকল কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীপট্টনায়ক ও আরও চারজন উৎকল কংগ্রেসের এম-এল-একে কংগ্রেসে নেওয়া হয়নি। আজ গুরুত্বপূর্ণ উপনির্বাচনের ঠিক মুখে শ্রীপট্টনায়ক এর শোধ নিচ্ছেন।

গত ১২ তারিখে শ্রীপট্টনায়ক উৎকল কংগ্রেসের একটি সাধারণ সভা ডেকে গত ৯ জুন তারিখের সংযুক্তি প্রস্তাব নাকচ করিয়ে দিলেন। সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হল যে, ওড়িশার কংগ্রেস সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থসাহায্য আনতে পারেন নি এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সঠিকভাবে তার মোকাবেলা করতে পারেন নি। প্রস্তাবটি পাশ হয়ে যাওয়ার পর শ্রীপট্টনায়ক তাঁর দলের সদস্যদের বলেছেন, 'শ্রীমতী শতপথীর নেতৃত্বে গঠিত ওড়িশা সরকার ভেঙ্গে দেওয়ার লড়াই এখন থেকে শুরু হল।' নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ যাদবকে তিনি বলেছেন, শ্রীমতী শতপথী ওড়িশার পক্ষে সঠিক দাওয়াই নন।

উৎকল কংগ্রেসের সাধারণ সভার প্রস্তাব মেনে নিয়ে দলের পুরোনো সদস্যদের মধ্যে কেউ কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসেছেন বলে এখনও খবর নেই। তবে উৎকল কংগ্রেসের ঐ সভায় এমন সাতজন এম-এল-এ ছিলেন যাঁরা জুন মাসের সংযুক্তি প্রস্তাবের পর কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে পট্টনায়ক প্রস্তাব দিয়েছেন যে, হয় উৎকল কংগ্রেস ও কংগ্রেসের কোয়ালিশন সরকার গঠন করা হোক অথবা বিধানসভা ভেঙ্গে দিয়ে নতুন নির্বাচন করা হোক। কংগ্রেস এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেছে যে ওড়িশার কংগ্রেস সরকারের শক্তি হ্রাস পায়নি। যাঁরা এই সরকারকে উৎখাত করার চেষ্টা করছেন তাঁরা ব্যর্থ হবেন।

আগামী ২৬ নভেম্বরের উপনির্বাচনের ফল বেরোবার পর বোঝা যাবে। ওড়িশার রাজনীতি কি চেহারা নেবে।

১৭।১১।৭২ —পুণ্ডরীক

রূপনারায়ণ

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

চিকিৎসক জীবনে বহু মানুষের সংগেই পরিচয় ঘটে। সে পরিচয় ঠিক আর পাঁচটা পরিচয়ের মত নয়। তার চেয়ে কিছু ঘনিষ্ঠ, কিছু স্বতন্ত্র, কিছু গোপন।

এমনি পরিচিত মানুষের ভিড়ে আজো একজনকে আমার খুব মনে পড়ে। এবং মনে পড়লেই একটা গভীর দুঃখে ভরে ওঠে আমার বুক। এই প্রায় সত্তর বছর বয়সে, আমি যখন সংসারের সবকিছু থেকে সরে এসে সূর্যাস্তের জন্যই অপেক্ষা করে আছি, যখন স্ত্রী পুত্র কন্যা, আমার কাছে একটা দূরত্বের পরিচয় হয়ে উঠেছে, তখন সেই একটিমাত্র লোকের স্মৃতি আমাকে আজো কেমন করুণ করে তোলে। আজো উপলব্ধি করি, মানুষের জীবনে এই প্রৌঢ় বেলা তখনই সুন্দর, যখনি সে সংসারের সব কোলাহলের মধ্যে থেকেও নির্জনতার স্বাদ অনুভব করে। আমি যে সে স্বাদ অনুভব করতে পারি না, ঠিক তা নয়। তবু কিছু কিছু দুঃখ থেকে আজও আমি উত্তীর্ণ হতে পারিনি। আমার সেই অনুত্তীর্ণতার মধ্যে এই একটি মানুষ বার বার তার ছায়া ফেলে যায়।

আজ এই মুহূর্তে তাঁকে বড়ো মনে পড়ছে। একটু আগে পি থার্টি নাইন আপ পাঁশকুড়া লোকাল, ফার্টি থ্রি ওয়ান মেচেদা লোকাল, তারও পরে ফার্টি থ্রি পাঁশকুড়া লোকাল কোলাঘাট স্টেশনে এসে থামল, অফিস-ফেরা যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে আবার চলে গেল। ট্রেনের শব্দটা শেষ হতে, হতে, একসময় রূপনারায়ণের জলের ওপর, তীরের লোনা মাটির ওপর, গ্রামের ওপর মিলিয়ে গেল। আমি শুধু তাঁর কথা ভাবছি। এই তিনটে ট্রেনের একটা থেকে তিনি নামতেন। তখন অবশ্য ইলেকট্রিক ট্রেন ছিল না। স্টিম ইঞ্জিনটা রূপনারায়ণের পূর্বতীরে ব্রীজের ওপর ওঠার সময় একটানা হুইশিল দিত। তারপর ধীরে ধীরে কোলাঘাট স্টেশনে এসে দাঁড়াত। ক্লান্ত যাত্রীরা নামত, গেট পেরিয়ে, সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে স্টেশনটাকে ডানদিকে, কেউবা বাঁদিকে রেখে নদীতীর ধরে যে যার দূরের গ্রামের দিকে চলে যেত।

কিন্তু তিনি আসতেন একটু পরে। ঘরে ফেরার তাড়া নেই তাঁর। আমি জানতাম, ও'র সংসারজীবন সুখের নয়। ঘরে ফেরাটাই ও'র কাছে একটা যন্ত্রণার ব্যাপার। ঘরে ফিরলেই ও'র স্ত্রী একখানি একঝুড়ি অভি-যোগ আর বিরক্তির আবর্জনা ও'র মুখে ছুঁড়ে মারবে।

ক্লান্ত পা টেনে টেনে আমার ঘরের সামনের উঠোনে এসে উনি গমগমে গলায় ডাক দিতেন—ও কবরেজ? কবরেজ আছো নাকি হে?

আমি নিজেও জানতাম না, ওই ডাক শোনার জন্য আমি উৎসুক হয়ে থাকতাম। সুপ্রকাশদা আমার চেয়ে কয়েক বছরের বড়। দরজা খুলে বলতাম—আসুন, আসুন সুপ্রকাশদা। বসুন।

বসতে বলার অপেক্ষা করতেন না তিনি। ততক্ষণে টিফিনের কৌটো আর কাগজ ভর্তি হাতের ছোট্ট চটের থলিটা মাটির দাওয়ায় রেখে বেঞ্চে বসে পড়তেন। বলতেন—না, আর পারিনে। তোমরা বেশ আছ, হরপ্রসাদ। দশটা-পাঁচটা দৌড়-ঝাঁপ করতে হয় না। অফিসের গ্লানি টানতে হয় না। ঘরে বসে নাড়ী টিপেই খালাস।

আমি হেসে বলতাম—আজও পি রুরটি র লোকালটা লেট নাকি?

এবার সুপ্রকাশদা পা তুলে বসতেন। করাশ হতাশা নিয়ে বলতেন—কি জানি াই 'লেটফেট' কিনা। আমার কাছে 'লেট'ও া 'রাইট'ও তা। কই, বাবাজীবন কোথায়? াচটাচ ধরিয়েছে?

বাবাজীবন অর্থাৎ আমার ভৃত্য বলরাম ামন্ত। বলরামই তখন ভরসা, বলতে গেলে সেই সংসারের কর্তা। সুপ্রকাশদাকে া, মুড়ি, তেলেভাজা এসব সেই মাঝে মাঝে াওয়ায়। গল্প করতে করতে রাত হয়ে গেলে দ্বিতীয়বারও চা দিয়ে যায়। তাই লরাম কবে থেকে যে বাবাজীবনে রূপান্ত- রত হয়ে গেছে সে খেয়াল আমার নেই। বাবাজীবন ভেতর থেকে চেঁচিয়ে লত—আঁচ দিচ্ছি প্রকাশদা: এই হয়ে াবে।

সুপ্রকাশদা মনে মনে খুশি হয়ে লতেন—বেটার কাণ্ড দ্যাখো, হরপ্রসাদ, বেও বলে দাদা, সেও বলে দাদা।

আমি হ্যারিকেনের অনুজ্জ্বল আলোর সুপ্রকাশদাকে নতুন করে দেখতাম। কোথায় একটা করুণ সারল্য, সৌন্দর্য, পবিত্রতা এতো দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যেও ওঁর মুখে ছড়ানো। দীর্ঘ চেহারা। না, এত বলা সত্ত্বেও চুল মাস তিনেক কাটা হয়নি। দাড়িও অন্তত দিন পনের। দেখলেই মনে হবে চুল দাড়ি দুটোই ইচ্ছে করেই রেখেছেন বোধহয়। আসলে ওটা আলসেমি। প্রশস্ত কপালের তিনটি দীর্ঘ বলিরেখার ওপর একরাশ ধুলো, ঘামমাখা লম্বা লম্বা কাঁচা পাকা চুল এসে পড়েছে। সোজা নাক, উজ্জ্বল ধারালো মুখ, গেরুয়া রঙের ছেঁড়া জীর্ণ খদ্দরের পাঞ্জাবির বোতাম কয়েকটা খোলা। তার ভেতর দিয়ে চওড়া রোমশ বুকের একটা আদল পাওয়া যায়। দীর্ঘ বাহু, দীর্ঘ শীর্ণ সুন্দর আঙুল। বাম হাতের একটা আঙুলের নখটা আবার কালো। পুলিশ হবে জোর করে পেপার- ওয়েট দিয়ে মেরে মেরে ওই নখে পিন ঢুকিয়ে জেলার এক স্বদেশী নেতার হদিশ জানতে চেষ্টা করেছিল। সুপ্রকাশদা হদিশটা জানতেন। তবে দারোগা সাহেবই শুধু জানত না, নখে পিন ফুটানো তো দূরের কথা, গলাটা রামদা দিয়ে ঘষে ঘষে কেটে ফেললেও সুপ্রকাশ মামার কাছ থেকে একটা শব্দও বেরোবে না। সম্ভবতঃ লবণ সত্যাগ্রহের কিছুকাল পরে: সুপ্রকাশদা প্রথমবার জেল থেকে বেরিয়ে এসে সবে একটা হাইস্কুলে মাস্টারি শুরু করেছেন তখন।

কিন্তু এই মাস্টারিতে টিকে থাকলে সুপ্রকাশদার জীবনে কি হোতো জানি না। তবে ইস্টার্ণ রেলওয়ের এল ডি ক্লার্ক হয়ে রিটায়ার হওয়ার মুখে এসেও যে কিছু হয়নি—তা আমি জানি। কিছু হওয়া-- অর্থাৎ সমাজের পাঁচজনে যাকে 'হওয়া' বলে। যেমন বাড়ী, জমিজমা, বৌয়ের গয়না, মেয়ের ভালো চাকুরে জামাই, ছেলের চাকরী, ব্যাঙ্কে চার অঙ্কের মোটা টাকা—এসব কিছুই সুপ্রকাশদার হয়নি। আসলে সুপ্রকাশদা আর পাঁচজনের মত নন, যারা অনায়াস ভঙ্গিতে তর তর করে প্রমোশনের সিঁড়ি বেয়ে উন্নতির ছাদে উঠে যায়। সেগুন কাঠের রঙ চটে-যাওয়া দুটো ছোট ছোট ড্রয়ারওয়ালা আড়াই হাত লম্বা টেবিলটার মতই সুপ্রকাশদা এক চিরন্তন জীর্ণ, বিবর্ণ বস্তুজগতের প্রতিনিধি।

সুপ্রকাশদা ময়লা রুমালটা বের করে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে সেদিন বললেন-- আজ একটা কাণ্ড হয়ে গেল হরপ্রসাদ।

আমি অবাক হয়ে বললাম—কি কাণ্ড?

—আরে সে আর বল কেন? বেটারা ভট্চায—

আমি বললাম—সেই গণেশ ভট্চায? তার সঙ্গে তো সেদিন ঝগড়া করলেন।

পূর্ব ঘটনাটা এই। গণেশের ডিউটি ছিল হাওড়া স্টেশানের আট নম্বর গেটে। সন্ধ্যেবেলা অফিস শেষ করে সুপ্রকাশদা এক থার্ড সেটেল প্রেসেন্ট লোকালটা ধরবেন বলে আসছেন। তখন ভেণ্ডাররাও যাচ্ছিল আগের ট্রেন থেকে নেমে। গেটে সবাইকে সবদিনই গণেশের হাতে কিছু গুঁজে দিতে হয়। সেদিনও দিচ্ছিল। লোকটা দেখতে যেমন কুৎসিত, মনটাও তেমনি। সমস্ত স্টাফের মধ্যে এমন জঘন্য কেউ নেই। ডেলি প্যাসেঞ্জার আর ভেণ্ডাররা বলে খচ্চর ভট্চায। একবার পয়সা না পেয়ে এক ভেণ্ডারের মাথার বোঝা থেকে একটা কাঁচ- কলার ছড়া নিয়েছিল। তাই কেউ কেউ আবার বলে 'কাঁচকলা ভট্চায'।

তা সেদিনও পয়সা নিচ্ছিল গণেশ ভট্চায। সুপ্রকাশদা শুনেছিলেন, তবে দ্যাখেননি কখনো। আজ চোখে পড়তে বড়ো খারাপ লাগছিল। গণেশ ভট্চায এবার একজনের ডিমের ঝুড়ি থেকে দুটো ডিম তুলে নিতে সুপ্রকাশদার রক্ত গরম হয়ে উঠল। থাকতে না পেরে বললেন—ওটা কি হচ্ছে গণেশ?

গণেশ ভট্চায সুপ্রকাশ মামাকে চিনত। জামত কমার্শিয়াল সেকশানের এল ডি ক্লার্ক। আর নিজে যেহেতু ঘুষের পিপে, সেই হেতু সে ধরে নিয়েছিল সুপ্রকাশ মামাও ঘুষ নেয়। তবে অমন বাহাদুরি কেন?

গণেশ ভট্চায ভেরিয়া হয়ে উঠল। হাতের পাঞ্চারটা বাগিয়ে ধরে দাঁত--মুখ খিঁচিয়ে উঠল—যা চলছে, চলছে। নিজের চরকায় তেল দিন গে যান।

সুপ্রকাশদা নিজে চরকা কাটতেন, আর তাতে তেলও দিতেন। তাই উপদেশটা গ্রাহ্য না করে বললেন—ঘুষ নিচ্ছ, আবার দুটো ডিমও তুলে নিলে?

গণেশ এবার হুঙ্কার দিয়ে উঠল—যান যান কেটে পড়ুন। বাজে ঝামেলা করবেন না।

—কোথায় কেটে পড়ব?

—যে চুলোয় যাচ্ছিলেন। আবার কোথায়?

সুপ্রকাশদা রাগ দেখালেন না। বললেন—গণেশ, তোমাদের মত ডিজনেস্ট স্টাফের জন্যই রেলের এত দুর্নাম। তোমরা সব সময় ভেণ্ডারদের কাছ থেকে ঘুষ নাও, জিনিস নাও, বিনা টিকিটের প্যাসেঞ্জারদের কাছ থেকে চার-ছ আনা নিয়ে তাদের ছেড়ে দাও। এতে রেলের বদনাম, রেভিনুর ক্ষতি।

গণেশ হয়ত ভাবছিল, আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল তো লোকটাকে নিয়ে। বেশিক্ষণ কথা বললে পয়সারও ক্ষতি। তাই আর বাক্য ব্যয় না করে বাঁ-হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিল সুপ্রকাশদাকে। —যান, যান, গেট আউট।

ততক্ষণে সুপ্রকাশদার এক [illegible] সেভেন [illegible] লোকাল ছেড়ে গেছে। এরপর পাঁশকুড়া লোকাল। [illegible] হলেও আধ ঘন্টা দেরি। [illegible] হয়ে গেছে।

সুপ্রকাশদা করুণ গলায় বললেন—কি বললে গণেশ? গেট আউট? উঁ? গেটে

গা বাঁচিয়ে চলে, কেউ যদি অন্যায়ের 'প্রটেস্ট' না করে তবে দেশটা গোল্লায় যাবে।

আমি ততক্ষণে সামলে নিয়েছি। সুপ্রকাশদাকে বোঝাবার চেষ্টা বৃথা, এই সমাজের প্রতিটি স্তরে যেখানে গণেশ ভট্চাযের মত লোকেরা জাঁকিয়ে কিলবিল করছে, সেখানে একা নিঃসঙ্গভাবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা বৃথা। তবু বললাম—কি করবেন তা হলে?

—আমি কালই ডিভিসনাল সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কাছে রিপোর্ট করব।

—বেশ।

ততক্ষণে বলরাম মুড়ি আর তেলেভাজার বাটিটা বেঞ্চে রেখে গেছে। অন্যদিন হলে সুপ্রকাশদাকে তেলেভাজা খেতে আমি হয়ত বারণ করতাম। আজ আর করলাম না।

সুপ্রকাশদা মুড়ি শেষ করে চা খেয়ে ধীরে ধীরে উঠে চলে গেলেন। একটাও কথা বললেন না আর।

তারপর একদিন শুনলাম। গণেশ ভট্চায সুপ্রকাশদাকে দুটো বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মুখ ভেংচে বলেছে—এই কচু, দরখাস্ত দিয়ে এই [illegible]

এই [illegible] কথা হচ্ছিল।

সুপ্রকা[illegible] মুখ মুছতে মু[illegible] একটা কান্ড হয়ে গেল [illegible]

আমি বললাম—কি কান্ড দাদা?

—গণেশ ভট্চাযকে সাসপেণ্ড করে দিয়েছে।

আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম!—এ্যাঁ বলেন কি? সাসপেণ্ড?

সুপ্রকাশদা শান্ত গলায় বললেন—হ্যাঁ। কইরে বাবাজীবন, চা দে।

চা খেতে খেতেই সুপ্রকাশদা ব্যাপারটা খুলে বললেন।—বুঝলে হরপ্রসাদ, ডিভিশনাল সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কাছে কিছু হল না দেখে 'রূপনারায়ণ'-এ দিলাম এক রিপোর্ট ছাপিয়ে।

আমি [illegible] পত্রিকায় সে [illegible] সংখ্যার [illegible]

সুপ্রকাশদা [illegible]—ঐ ছাপাটুকুই দেখেছ। [illegible] আর জান না?

—[illegible] কি?

—[illegible] মিনি-স্টারের কাছে। যত যোক এককালে একসঙ্গে জেলে ছিলাম তো। আজ না হয়, যাইটাই না কোথাও।

—তারপর?

—তারপর চীফ মিনিস্টার রেফার করল একেবারে রেলওয়ে মিনিস্টারকে।

—ওরে বাপ।

—[illegible] ব্যাপার অ্যান্টি-করাপশান। গণেশ ভট্চাযের সাধের শুণ্ডটি এখন কেটে রক্তারক্তি। মামলা চলবে। চাকরি থাকে কিনা সন্দেহ। ঘরে [illegible] বন্ধ, ডিম তুলে নেওয়া বন্ধ, কাঁচকলা তুলে নেওয়া বন্ধ।

আমার ইচ্ছে করছিল সুপ্রকাশদার দুটো হাত জড়িয়ে ধরি। কিন্তু তার আগেই চটের থলি থেকে সুপ্রকাশদা একগাদা 'প্রুফ' বের করেছেন।

আমি ক্রমে ক্রমে 'রূপনারায়ণ' পত্রিকার কেরেয়ারী [illegible] করছিলাম। বাজে প্রেসে, বিচ্ছিরি প্রিন্টে বাজে ছাপা একটা পাঁচ ছ' ফর্মার ডাবল ডিমাই সাইজের মাসিক পত্রিকা। কাঠের ব্লকে কভার ছাপা। ফোর্থ কভারের নিচে ছোট ছোট অক্ষরে সম্পাদকের নাম—সুপ্রকাশ [illegible]। ভেতরে কবিতাই বেশি। দু একটা কাঁচা হাতের গল্প, দু একটা আধা পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ। একটা অখ্যাত লেখকের ধারাবাহিক উপন্যাস। এই নিয়ে 'রূপনারায়ণ' পত্রিকা বছর দশেক টিম-টিম করে চলে আসছে। তাও বৈশাখ সংখ্যা বেরোয় শ্রাবণ মাসের শেষে। বিজ্ঞাপন নেই বললেই হয়। যে ক'টি আছে তা এই কোলাঘাট বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের হাট-বাজারের দোকানদারের। কোনটি [illegible] ছাপলে [illegible] টাকা। তাও আদায় করতে [illegible]। কোনটি বা আদৌ আদায় হয় না। এই মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'রূপনারায়ণ'-এর একোবক্ত প্রতাপ—আমার [illegible] সম্পাদক [illegible]।

সুপ্রকাশদা কিন্তু এতটুকুও অহংকার দেখালেন না। বা বললেন না যে, পত্রিকায় রিপোর্ট ছাপিয়ে দিয়েছিলেন বলে [illegible] গণেশ উলটালো। এই ঘটনার পরে [illegible] তিনি আর গেলেন না। বললেন—তোমার ঐ বিজ্ঞাপনটার কি হল হরপ্রসাদ?

আমি অবশ্য এক আয়ুর্বেদ ঔষধ তৈরীর কোম্পানির একটা বিজ্ঞাপন এনে দেব বলেছিলাম। কলকাতা গিয়ে প্রথমদিন দেখা পাইনি। দ্বিতীয়দিন দেখা পেয়েছিলাম, কিন্তু বিজ্ঞাপন পাইনি। 'রূপনারায়ণ'-এর চেহারা দেখেই বিজ্ঞাপনদাতা বেঁকে বসলেন। আমি অনেকক্ষণ ধরে বোঝালাম, কী কষ্টে একটি আদর্শে এই কাগজ চালাচ্ছেন। তাঁর কী আদর্শ, কী গভীর নিষ্ঠা, কী অধ্যবসায়। বললাম—তাঁর আয়ের প্রায় অর্ধেকটা এর পেছনেই চলে যায়। অথচ বাড়ীতে স্ত্রী, ছেলেমেয়ে। জমিজমা দুচার বিঘে আছে ঠিকই। কিন্তু তা নিজে চাষ না করার জন্য কি-ই বা পান!

মালিক ভদ্রলোক বললেন—কাগজটা তাহলে চালান কেন মশায়?

আমি বললাম—দেখুন, এক একজন মানুষের সাধনা এক একরকম। এই যেমন আপনার সাধনা, এই ঔষধালয়।

মালিক বললেন—আমি তো মশায় স্রেফ ব্যবসা করি। উনি কি করেন? ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান?

সুপ্রকাশদাকে কেউ ছোট ভাবলে আমার বড় খারাপ লাগে। নাই বা হলেন নামকরা কাগজের নামকরা সম্পাদক। কিন্তু আমি অন্তত জানি, সুপ্রকাশদা ভালো লেখাপড়া জানা মানুষ। [illegible] আছে, লেখা বুঝতে পারেন, লেখা চিনতে পারেন। বাংলা ইংরেজী, সংস্কৃত বেশ ভালো জানেন। এক একদিন এক একটা ব্যাপার নিয়ে এমনসব কথা বলেন, যাতে আমি ঘাবড়ে যাই। সংস্কৃত আমাকে পড়তে হয়েছিল। বোধহয় ভালোই পড়েছিলাম। ব্যাকরণটা আমি জানতাম। তবু শর্বাধিপ হর্ষাবাধির এত কূট বিষয়ও আমি জানতাম না।

লেখায় কি হল, কাইমোজ প্রুফ দেখতে গিয়েই জানলাম, সুপ্রকাশদার কাছে আমি ণত্বের ব্যাপারে শিশু। বললেন—প্র পরা পরি নি-র উপসর্গের পরে 'ণ' হয়। কিন্তু তাই বলে 'নির্নিমেষ' শব্দে 'ণ' নয় হরপ্রসাদ। তুমি দেখেছ প্রুফে ওটা কাটোনি।

আমার ভুল আমি বুঝতে পারছিলাম। আর শুধু ব্যাকরণই বা কেন। কবিতার রস, ছন্দ, অলংকার প্রভৃতি এসব ব্যাপারে সুপ্রকাশদাকে আমার রীতিমত একজন পণ্ডিত বলে মনে হোত।

একদিন ভুলে বলে ফেলেছিলাম—কি হয় ওসব কাগজ বের করে সুপ্রকাশদা?

সুপ্রকাশদা বললেন—রোগী ভালো চলে তোমার কি আনন্দ হয় না হরপ্রসাদ?

আমি বললাম—[illegible] পাই ঠিকই। তবে তার [illegible] একটা আনন্দ হয়।

সুপ্রকাশদা বললেন—এই, ঠিক আমার ওই আনন্দ হয়। অর্থাৎ একটা আনন্দ, প্রাণে

সুপ্রকাশদা একটু থেমে গেলেন। তারপর সেই গমগমে গলায় ধমক দিয়ে উঠলেন—চালাকি পেয়েছ?—হরপ্রসাদ, না-না, এখন যেও না। আমি তো ওষুধ দিচ্ছি। যেতে হলে, পরে যেও।

সুপ্রকাশদার গলাটা কেমন ভারি ভারি লাগল।

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম—বুঝছেন না কেন, ওটা টাইফয়েড বলে মনে হচ্ছে। আপনার বিদ্যেয় কুলোবে না। আমি একবার দেখি। নইলে অ্যালোপ্যাথিক করাবেন। ভালো 'ক্যাপসুল' বেরিয়েছে টাইফয়েডের।

সুপ্রকাশদা উঠোনের অন্ধকারে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। একটু পরে বললেন—হরপ্রসাদ, তুমি কত টাকা পাবে আমার কাছে জানো?

—জানি।

—কতো?

আমি হ্যারিকেন নিয়ে উঠোন পেরিয়ে এগোলাম। যেতে যেতে বললাম—এক টাকাও নয়।

সুপ্রকাশদা বললেন—বেশ চল। তবে রাতে আর এসো না। চাট্টি খেয়ে শুয়ে থাকবে।

অন্ধকার তখন রূপনারায়ণের জল, তীরভূমির ওপর ঘন হয়ে বিছিয়ে পড়েছে। পথে লোকজন নেই বললেই হয়। শুধু দুজন হাঁটছি। সামনে সুপ্রকাশদা, পেছনে আমি। যেতে যেতে দু-একটা ছাড়া-ছাড়া কথা হচ্ছিল।

সুপ্রকাশদা বললেন—এবার হরিদ্বারটা ঘুরে আসি। কবে বলতে কবে মরে যাব! তুমি যাবে নাকি হরপ্রসাদ?

সুপ্রকাশদার দেশ ভ্রমণের নেশা আছে, তা আমি জানতাম। কিন্তু একা একা। কোন সঙ্গী পছন্দ করতেন না। ক্যানভাসের একটা বড় ব্যাগ, তাতে জামা-কাপড়, কয়েকটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ, এমনি টুকিটাকি আর কম্বলে বাঁধা ছোট্ট একটি বিছানা। গেরুয়া রঙের খদ্দরের পাঞ্জাবী। ধুতিটি গেরুয়া রঙের হলে আর লুঙ্গির মত করে পরলে সন্ন্যাসী মনে হত। মাথায় লম্বা লম্বা কাঁচা-পাকা চুল, দাড়ি তো ছিলই। সত্যি কথা বলতে কি, সুপ্রকাশদাকে আমার কেমন যেন সন্ন্যাসী বলেই মনে হত। ওর কপালে, মুখে বৈরাগ্যের ছাপ।

একবার তো মাস খানেক দেখা নেই। তারপর একদিন বিকেল বেলা লোমো প্যাসেঞ্জার থেকে কোলাঘাটে নামলেন। সারা মুখে গায় ধুলো ময়লা, জামা-কাপড় অপরিচ্ছন্ন। শরীরে ক্লান্তি, অবসাদ। বোঝা গেল, তীর্থযাত্রা থেকে ফিরলেন।

তবু বাড়ী গেলেন না। আমার উঠোনে এসে ডাকলেন—কবরেজ, কবরেজ আছো নাকি হে?

আমাকে না জানিয়ে তীর্থে যাওয়ার জন্য মনে মনে অভিমান হয় নি যে তা নয়। কিন্তু যে লোকটি বহুদূরে থেকে আসছেন, আর এই এক মাস পরেও বাড়ী না গিয়ে আমার বাড়ীতে আগে এসে উঠলেন, তাঁর ওপর অভিমান করে থাকা কষ্টকর।

বাইরের বেঞ্চটায় বসে পড়লেন সুপ্রকাশদা। আমি বেরিয়ে এলাম। দেখি রূপনারায়ণের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে আছেন। যেন ধ্যান করছেন।

আমি বললাম—কি হলো? কোথায় ডুব দিয়েছিলেন?

সুপ্রকাশদা ক্লান্ত গলায় বললেন—আর বল কেন ভাই। গেছলাম তীর্থ দর্শনে। ভাবছিলাম নর্দার্ন ইণ্ডিয়াটা সেরে আসব এবার। কিন্তু বৃন্দাবনে গিয়ে সব গোলমাল হয়ে গেল।

আমি বললাম—কি রকম?

—বৃন্দাবনেই থেকে গেলাম। আর গেলাম না কোথাও।

—আশ্চর্য! এই প্রায় এক মাস বৃন্দাবনে কাটালেন?

সুপ্রকাশদা হেসে বললেন—এক মাস কি বলছ হরপ্রসাদ? একটা জীবন কাটাতে পারলে বেঁচে যেতাম। বলেই ক্যানভাসের ব্যাগ খুলে ফেললেন। বের করলেন, একটা কেটে কাপড়ের উত্তরীয়, কিছু প্যাঁড়া, এমনি টুকিটাকি তীর্থের স্মৃতিচিহ্ন। বললেন—নাও, তোমার জন্য নিয়ে এলাম। তা—আর যা এনেছি, সেটা দেখলে তুমি পাগল ভাববে।

আমি হেসে বললাম—আপনি কি ভাবছেন, আপনাকে আমি পাগল ভাবি না?

—না, না, সে পাগল নয়।

—মরুকগে, দেখি কি এনেছেন?

—না, না, তা দেখানো যায় না। খুব সাধারণ জিনিস।

আমি বললাম—মনের রসে সাধারণ জিনিসই তো কখনো কখনো অসাধারণ হয়, সুপ্রকাশদা?

সুপ্রকাশদা খুশী হলেন। বললেন—বাঃ বেশ বলেছো। তা হলে দেখাই। কি বল? হাসবে না কিন্তু।

বলেই সুপ্রকাশদা ক্যানভাসের ব্যাগটা আবার খুললেন। এক কোণের দিকে হাত ঢোকালেন। খুঁজে খুঁজে বের করলেন, সুতোয় জড়ানো একটা পুরনো পোস্ট অফিসের খাম। হিন্দীতে ঠিকানা লেখা। ধীরে ধীরে খুললেন খামটা। তারপর বললেন—নাও, এসো, মাথায় ছুঁইয়ে দিই।

আমি অবাক হয়ে বললাম—কি ওটা? আবির? প্রসাদ?

সুপ্রকাশদা ধীরে ধীরে অনুচ্চ গলায় বললেন—হরপ্রসাদ, বৃন্দাবনে বেড়াতে বেড়াতে একদিন সন্ধ্যাবেলা একটা জায়গায় এসে বড় ভালো লেগে গেল। বসে পড়লাম। লোকজন নেই। শান্ত, নির্জন। জানো, মনে কেমন একটা ভাব হলো। ভাবলাম আর বাড়ী ফিরে যাব না। কি হবে গিয়ে? কে আছে আমার? বলতে পারো এটা বৈরাগ্য। তা কতক্ষণ সেখানে চুপ করে বসেছিলাম মনে নেই। বোধ হয় কিছু সময় আমার চেতনা ছিল না। মনে হলো, আমি যেন একটা বিস্মৃতির জগতেই পার হয়ে এলাম। ধীরে ধীরে মনে পড়তে লাগল, এই নদীর কথা, 'রূপনারায়ণ' পত্রিকার কথা, তোমার কথা, ছেলেমেয়ের কথা। হরপ্রসাদ আমার চোখ ছল ছল করে উঠল। জীবন কী যন্ত্রণার! একদিকে একটা অজানা জগৎ আমাকে ডাকছে। কে জানে, হয়ত সেইটাই আমার নিজের প্রকৃত জগৎ। আর একদিকে আমার কাগজ, এই নদী, গ্রাম ঘর, ছেলেমেয়ে, বন্ধু! শেষ পর্যন্ত আমি ফিরে এলাম, হরপ্রসাদ।

সুপ্রকাশদা চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন—তা, সেই তীর্থের জায়গাটার কিছুটা ধুলি আমি এই খামটায় ভরে নিয়েছিলাম।

আমি কপালটা এগিয়ে দিলাম।—দিন, আমার মাথায় ছুঁইয়ে দিন।

—তুমি বলছ, হরপ্রসাদ। নেবে? নাও। বড় ভালো লাগল, ভাই। আমি ভেবেছিলাম তুমি হাসবে।

আমি সেদিনই মনে করেছিলাম, সুপ্রকাশদা সাধনার পথে অনেকটা এগিয়ে গেছেন। ওটা সমাধির আগের স্তর বলে মনে হয়। এখন একজন গুরু দরকার শুধু। কিন্তু তবু কোথায় একটা বেদনার আভাস আমি পাচ্ছিলাম। যদিও তার কোন কারণ জানতাম না।

উঠোনের সামনের বাঁশের গেটটা খোলার জন্য একটা শব্দ হলো।

সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী থেকে একটা কর্কশ মেয়েলী গলার বীভৎস চিৎকার অন্ধকারটাকে মুহূর্তের মধ্যে খান খান করে দিল।—ঐ এলো, এতক্ষণে এলো। বাড়ী আসার দরকারটা কি? মদ গাঁজা টেনে ইস্টিশানের গাছতলায় পড়ে থাকলেই তো হতো। দুনিয়ায় আর তো কেউ চাকরী করে না! এদিকে বাড়ীতে মেয়েটাকে নিয়ে আমি হিমসিম খাচ্ছি।—কি হল? মুখে বাক্যি নাই যে! বোবা, বোবা হয়ে গেলে নাকি? ও, বুঝেছি, কাগজের জন্য দেরী হয়ে গেল! মরি, মরি, ইডিটার! ইনি আবার এডিটার! এমন এডিটার মরলে হাড় জুড়োয় আমার। আমি মা গঙ্গায় ডুব দিয়ে আসি। কাগজপত্রে আগুন জেলে দিয়ে শান্তি পাই একটু।

ঘরের ভেতর থেকে একটি ক্ষীণ গলা ভেসে এল—চুপ কর মা, চুপ কর। বাবা সারাদিন খেটেখুটে এল। তুমি কি মা!

—খেটেখুটে এসে আমার চৌদ্দ পুরুষে উদ্ধার করে দিল একেবারে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! বাড়ীতে মেয়েটা জ্বরে মর মর। ওদিকে কোত্থেকে কে ছাপাখানার লোক আসছে টাকা চাইতে। দোকানদার আসছে কাগজের দাম চাইতে। আমি কি মরে টাঁকশাল খুলেছি!

তারপর মুখ বেঁকিয়ে আবার বলা—উনি কাগজের সম্পাদক! ছোট ভাই এসেছিল, বলে গেল সব কথা। কাগজে ছাই-পাঁশ কি সব লিখে সেবার কার চাকরী খেয়েছে! একটা লোক লেখাপড়া জানে না। ফুটপাতে চায়ের দোকান করে কলকাতায় তিরিশ হাজার টাকা দিয়ে বাড়ী করতে পারে, আর উনি বি-এ পাশ করে বৌয়ের কোমরে শাড়ী জোটাতে পারেন না। বলি কি—এমন পুরুষের মুখে—

সেই ক্ষীণ স্বরটা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছিল। দেয়াল ধরে ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল অনীতা। থেমে থেমে করুণ গলায় বলল—মা, তোমার পায়ে পড়ি মা, বাবাকে একটু শান্তি দাও। সারাদিন পরে বাড়ী এলো—

এতক্ষণে সুপ্রকাশদা কথা বললেন। গলার স্বর শান্ত। —অনীতার মা, তুমি এক কাজ কর। ঐ তো দাওয়ায় আমার চটি জোড়া পড়ে আছে। ঐটা দিয়ে ঘা কতক বসিয়ে দাও আমার মুখে। তোমার রাগ শান্ত হবে। আমি তো গরীব। তোমার ভাইয়ের কলকাতায় নিজের বাড়ী, তোমার মেজো বোনের স্বামী টিকিট কালেকটারী করেও পাকা বাড়ী, জমিজমা, হাজার হাজার টাকার মালিক। তা আমি, আমি কি করব?

অনীতা দূরে তাকিয়ে ক্ষীণ গলায় বলল—ওখানে কে দাঁড়িয়ে আছে বাবা?

সুপ্রকাশদা দাওয়ার দিকে এগোতে এগোতে বললেন—তোর কবরেজ কাকা। কৈ এসো, হরপ্রসাদ। না, ওতে আমার লজ্জা করে না। 'দিজ ইজ লাইফ অব এ্যান এডিটার — অবকোর্স আনসাকসেসফুল এডিটার'। —অনীতা তোকে দেখতে এল হরপ্রসাদ। তা মা ও রাত্রে থাকবে এখানে। কই এসো। হ্যাঁ, ঐ ইজি চেয়ারটায় বসে পড়।

আমি লজ্জায় নীরব হয়ে গেলাম।

যা আশঙ্কা করেছিলাম, তাই। অনীতার টাইফয়েড হয়েছে। ওষুধ সঙ্গে এনেছিলাম। বললাম—মধু আছে বাড়ীতে?

সুপ্রকাশদা হাসতে হাসতে বললেন—তোমার বৌদির মুখ দিয়ে তো সব সময় মধু ঝরছে, ভাই। ওতে হবে না?

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম—ঠাট্টা রাখুন।

মধু পাওয়া গেল। ওষুধও খাওয়ানো হলো। বুঝতে পারছিলাম, অনীতার অসুখটা খুব খারাপের দিকে যাচ্ছে। ভোরের দিকে একটু জ্বরটা না কমলে, কাল অন্য ডাক্তার ডাকতে বলব।

ঝড় থেমে যাওয়ার পরে আকাশ যেমন শান্ত হয়, তেমনি একটা রুগ্ন শান্তি এখন এ-ঘরের মধ্যে বিরাজ করছে। মুড়ি নারকেল আর চা খেলাম। রান্নার দেরী বোঝা যাচ্ছে। সুপ্রকাশদা একটা ফাইল নিয়ে একমনে লেখা দেখছেন। মন চাচ্ছে, এখন একেবারে অন্য মানুষ। কিছুক্ষণ আগে যে ঘটনা ঘটে গেল, তার কোন চিহ্ন নেই।

'রূপনারায়ণ'-এর পরের সংখ্যার জন্য উনি লেখা বাছছিলেন। এই সংখ্যাটা সপ্তাহ খানেকের মধ্যে বের হয়ে যাবে।

উঠোনের বাইরে অন্ধকার। গাছপালা কিছু চোখে পড়ে না। এই অন্ধকারে রূপনারায়ণের কালো জলের বিস্তৃতির ওপর এক অপার্থিব স্তব্ধতা। ওখানে যেন সুখ-দুঃখের অতীত কোন অনুদ্বিগ্ন আত্মার ধ্যানের আসন বিছানো!

একটা ভীষণ দামী জিনিস পথে কুড়িয়ে পাওয়ার মত সুপ্রকাশদা হঠাৎ উচ্ছল হয়ে বললেন ছেলেটি বড়ো ভালো কবিতাটা লিখেছে হে। আঃ অপূর্ব! 'বিউটিফুল'।

আমি বললাম—কে? নাম কি?

সুপ্রকাশদা বললেন—পড়ে দ্যাখো।

আমি পড়ছিলাম। সুপ্রকাশদা বললেন—না না, হচ্ছে না। ছন্দটা ঠিক করে পড়। ওটা দীর্ঘ পয়ার। আট, আট, ছয়। আট মাত্রার কাছে থামো একটু। দাও, আমাকে দাও, শোনো আমি পড়ছি—'শেষের খেয়ার মতো সে কখন চলে গেছে নদীর ওপারে / যে নদীর অন্য নাম ভালোবাসা।'

আমি বুঝতে পারছিলাম, কবিতা পড়তে জানতে হয়। শিখতে হয়। কান তৈরি না হলে কবিতা পড়া যায় না।

সুপ্রকাশদা শেষ করলেন—'জীবনসমুদ্র নেই, জীবন বিস্ময় নেই; ভালোবাসা শুধু/ নির্জন পবিত্র নদী; দুপারে অচেনা শস্য, ওরে এ আকাশ!'

—বাঃ 'এক্সেলেণ্ট'। দ্যাখো হরপ্রসাদ, ভালো কবিতা পড়লে আমার বড়ো আনন্দ হয়। কেমন একটা করুণ, সুন্দর, আনন্দ।

তারপর কি ভাবতে ভাবতে নদীটার দিকে চেয়ে থেকে থেকে বললেন—হরপ্রসাদ, আর কয়েকটা যদি বিজ্ঞাপন পেতাম; তবে কাগজটা দাঁড়িয়ে যেত। আহা, গ্রামের কতো ছেলে ভালো লেখে। ওদের যদি পাঁচটা টাকাও দিতে পারতাম! বড় ইচ্ছে হয়, হরপ্রসাদ, ওদের শুধু লেখা ছাপি না। কিছু টাকা দিই। তা আমার যা অবস্থা। এই তো আজ প্রেসের লোক এসেছিল, টাকা চাইতে।

আমি বললাম—কত টাকা বাকি?

—না, তা বেশি নয়। বড়জোর পঞ্চাশ ষাট টাকা হবে।

—এর জন্য এতো তাড়া?

সুপ্রকাশদা হাসলেন। বললেন—আমি যে গরীব হরপ্রসাদ! তাই ওদের এতো তাগাদা। বড়লোক হলে আদৌ তাগাদা করত না।

সুপ্রকাশদা আবার লেখা পড়তে লাগলেন। পা দুটো সোজা করে ছড়ানো। লুঙ্গি পরেছেন। আমি চুপ করে দেখছিলাম। হঠাৎ চোখে পড়ল, ওঁর পা দুটো ফুলো ফুলো। বললাম—কবে থেকে পা ফুলেছে?

সুপ্রকাশদা ঝট করে পা দুটো গুটিয়ে নিলেন। বললেন—ওঃ কবরেজের চোখ বটে।

আমি কিন্তু ছাড়লাম না। বললাম—কবে থেকে?

সুপ্রকাশদা বললেন—আরে দূর! ও কিছু না।

—কিছু হোক না হোক, সে পরের কথা। ফুলেছে কবে থেকে?

—তা মাস তিনেক হবে।

আমি অবাক হলাম। তিন মাস! এর মধ্যে আমার চোখে পড়ল না! না পড়াই স্বাভাবিক। এর মধ্যে দেখা হয়েছে বড় জোর চার পাঁচবার। তাও অফিস ছুটির শেষে বাড়ী আসার পথে, জুতো পরা অবস্থায়। বললাম দেখি পা-টা?

সুপ্রকাশদা বিরক্ত হলেন। —তুমি আবার এতো রাতে কি শুরু করলে বলতো?

—কবরেজি। দেখি পা-টা?

শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে সুপ্রকাশদা পা দুটো জড়ো করে লুঙ্গিটা সরালেন।

আমি টিপে টিপে দেখলাম। —জ্বর হয়?

—হয় একটু, ঘুষঘুষে।

—আমাকে বলেন নি কেন?

সুপ্রকাশদা বললেন—এর আবার বলাবলি কি? আমি তো ওষুধ খাচ্ছি।

—কি ওষুধ?

—হোমিওপ্যাথি। ও ভালো হয়ে যাবে।

আমি বললাম—হাতটা দেখি?

—তোমার জ্বালায় দেখছি, আর বাকি লেখাগুলো পড়া শেষ করা যাবে না। দ্যাখো!

আমি নাড়িতে আঙুল রাখলাম। অনেকক্ষণ ধরে সেই স্পন্দন শুনলাম। আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল।

বললাম—চোখটা দেখি?

হ্যারিকেনের আলোয় ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। তবু যেটুকু পেলাম, তাতে মনে হোল রিউম্যাটিক আর্থারাইটিস, খুব এ্যানিমিয়াও আছে। বললাম—অফিসে টিফিনে কি খান?

সুপ্রকাশদা হাসতে হাসতে বললেন—আর খাওয়া! এক কাপ চা, দু' একটা সিঙ্গাড়া কোনদিন—।

আমি ভাবছিলাম, সুপ্রকাশদা আটটা পঁচিশের পাঁশকুড়া লোকাল ধরে যান। মানে এতো সকালে ভাত খাওয়া হয় না। ফেরেন রাত্রে। মাঝে ঐ একটা কি দুটো বাজে তেলেভাজা সিঙ্গাড়া। এতে একগাদা অসুখ না হলে আর কিসে হবে!

বললাম—ওসব খাবেন না।

—কি খাব তবে?

—দুটো করে কলা, পেঁপে। আর ছানা। ছানা খেতেই হবে অন্তত আধসের দুধের। ভাতের সঙ্গে টাটকা মাছের ঝোল সপ্তাহে তিনদিন মাংসের স্টু। আমি একটা ডায়েট চার্ট করে দিয়ে যাব। আর দুধের সঙ্গে, অর্জুন ছাল গুঁড়ো করে খাবেন।

সুপ্রকাশদা হতাশ গলায় বললেন—হরপ্রসাদ, আমার অবস্থা তুমি তো জানো, দেখছো। মেয়েটার বিয়ে দিতে হবে। টাকা নেই। ছেলেটার কলেজের বইপত্তর সব কেনা হয়নি। প্রেসের দেনা, দোকানের দেনা। অসুখ বিসুখ তো লেগেই আছে। মাসের শেষের দিকে বাজারের পয়সা জোটে না। সত্যি বলছি ভাই। এর ওপর তুমি আমাকে যদি রাজকীয় খাদ্যের চার্ট দাও, তবে আমি কি করব?

আমি বললাম—যে করে হোক করতে হবে।

সুপ্রকাশদা রূপনারায়ণের দিকে অনেকক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন—না, তুমি আমায় কাজ করতে দিলে না। অনেকগুলো চিঠি লিখতে হবে। লেখকরা কিভাবে চিঠি লেখে দ্যাখো। কত আশা নিয়ে লেখা পাঠায়। আমি যদি জবাব না দিই, তা বড্ড নিষ্ঠুর কাজ হয়। তুমি দাঁড়াও, আমি বরং তাড়াতাড়ি কয়েকটা চিঠির জবাব দিই।

আমি বললাম—কাগজের জন্য পকেট থেকে যা যায়, তাই দিয়ে ভালো খান কয়েক মাস। কাগজ বন্ধ থাক তদ্দিন।

সুপ্রকাশদা অবাক হয়ে বললেন—কি বললে হরপ্রসাদ, কাগজ বন্ধ রাখব? তুমি কাগজ বন্ধ রাখতে বলছ? —ওটি আমি পারব না। তুমি জানো না, কাগজ আমার প্রাণ, আমার আত্মা! ছেলেমেয়েও অত প্রিয় নয়! দেশের কত ছেলে লেখে! ওরা একদিন বড় লেখক হবে, ওরা বলবে, আমাদের প্রথম লেখা 'রূপনারায়ণ'-এ বেরিয়েছিল। ওরা বলবে, আমাদের প্রথম গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ সুপ্রকাশদা সংশোধন করে ছেপেছিলেন। কি করে কবিতা লিখতে হয়, গল্প লিখতে হয় শিখিয়েছিলেন। না, না, হরপ্রসাদ আর যা বলবে বল, কাগজ বন্ধ রাখার কথা বলবে না।

আমি বললাম—ডায়েট চার্ট করে দিচ্ছি, যতোটা পারেন খান। তবে আমি একটা ওষুধ তৈরি করে দেব। অবশ্য একটু দেরি হবে। কারণ ও ওষুধ তৈরি করতে সময় লাগে।

আমি ভাবছিলাম 'সহস্রপুটিত অভ্র' দেব। অভ্র দিয়েই ওষুধটা তৈরি করতে হয়। সময় অবশ্য কিছু লাগে। তা হোক।

সুপ্রকাশদা খুশি হলেন। বললেন—অন্য কেউ ওষুধ দিলে আমি খেতাম না, হরপ্রসাদ। ওই হোমিওপ্যাথিতে ভাল হতাম। তবে তোমার হাতের ওষুধ আমি তৃপ্তি নিয়ে খাব। তুমি দিও। বলেই সুপ্রকাশদা বেশ কষ্টে উঠে, ভেতরে গেলেন।

আমি চেয়ারে চুপ করে বসে রইলাম। শুনছিলাম, সুপ্রকাশদা তখন নিজের হাতে আমার বিছানা করছেন।

প্রায় দিন পনের পরে একদিন অফিস ফেরত সুপ্রকাশদা বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকলেন --কবরেজ? কবরেজ আছো নাকি হে?

আমি বেরিয়ে এলাম। দেখলাম—হাতে এক বোঝা 'রূপনারায়ণ'। বোঝা গেল সম্পাদকমশায় এবার নিজেই বিতরণ করতে বেরিয়েছেন।

বললাম—বসুন, বসুন।

সুপ্রকাশদা বেঞ্চে বসলেন। বড় ক্লান্ত অসুস্থ বলে মনে হচ্ছিল। বললেন—কাগজটা বেরোতে সত্যি বড্ড দেরি হয়ে গেল।

—কেন?

—শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। ঐ প্রেসটাও বন্ধ ছিল। মালিকের ছেলের বিয়ে। তা শুধু একটা ছোট্ট প্রেস করেই লোকটা বড়লোক হয়ে গেল, হরপ্রসাদ। বিরাট পাকা বাড়ী। বিয়েতে নেমন্তন্ন করেছিল আমাকে।

—গেছলেন?

—না যাইনি। ওই বড়লোক, টাকার অহঙ্কার, ওসব দেখতে ভাল লাগে না ভাই। হ্যাঁ, তোমার প্রবন্ধটা দ্যাখো, ভুলটুল আছে কিনা। তোমার প্রুফ দেখবার পর আবার আমিও দেখলাম একবার। বেশ লিখেছ। আরো লেখ—দেশের সাধারণ গাছগাছড়া শাকপাতা খেয়ে গরীব মানুষের অসুখ ভালো হয় যাতে এমন প্রবন্ধ আরও লেখ। তবে একটু সোজা করে, ভাই। ওই পণ্ডিতী ভাষাগুলো বাদ দাও। যেমন করে আমরা কথা বলি, তেমনি করেই লেখ।

আমি সুপ্রকাশদার পায়ের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। দেখলাম ফোলাটা বেড়েছে। মুখের দিকে তাকাতেও দেখলাম, মুখটাও বেশ ফোলা!

চা করতে বলে, আমি কিছু খাবার আনতে পাঠালাম বলরামকে। বললাম—সুপ্রকাশদা আজকাল কি জ্বর বেশি হয়?

সুপ্রকাশদা হাসলেন। কিন্তু বড় করুণ সেই হাসি। বললেন—বোধ হয়। অত খেয়াল করিনি। তা তোমার ওষুধ কৈ? তৈরি হয়নি?

আমার খেয়াল হল। মাঝখানে ভুলে গেছলাম। ইস্, বড্ড অন্যায় হয়ে গেল।

বললাম—ওষুধটা আমি তৈরি করে দেব। একটু সময় লাগবে। ওর নানা 'প্রসেস' আছে। তা 'ডায়েট'টা ঠিকমত খাচ্ছেন ত?

সুপ্রকাশদা হাতের ইঙ্গিতে কি যেন বলতে চাইলেন। তার অর্থ, 'হ্যাঁ'ও হয়, 'না'ও হয়।

—অনীতার শরীর ফিরেছে?

—খুব একটা নয়। হরপ্রসাদ, ভাই একটি পাত্র দেখে দাও না। মেয়েটি বড় লক্ষ্মী আমার। দেখতেও সুন্দর, সে তো জানো। লেখাপড়ায়ও ভালো। ওকে ভালো একটি ছেলের হাতে দিয়ে যেতে পারলে, আমি নিশ্চিন্ত হই। না, না, বড়লোক, বড় ডিগ্রী এসব চাইনে। শুধু যেন সৎ হয়। অনেস্টি, লাইফে অনেস্টি বড় কথা, হরপ্রসাদ! আজ উঠি।।

আমি বললাম—বসুন। ওকি! বিশ্রাম নিন, চা খান।

বলরাম খাবার দিয়ে গেল। আমি দেখলাম—খাব না খাব না করেও সুপ্রকাশদা খাবারগুলো খুব তৃপ্তির সঙ্গে আজ

খাচ্ছিলেন। সন্দেশ, রসগোল্লা, বিস্কিট আর কলা দিয়েছিলাম। চামচে দিয়ে ভেঙে ভেঙে রসগোল্লাটা খাচ্ছিলেন, যেন তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেলে বড় দুঃখ হবে।

আমার সেই রাত্রির কথা মনে পড়ছিল। সুপ্রকাশদা পাশে বসে খেতে খেতে কেবল বলছিলেন—ওটা খাও। ওটা চেখে দেখ একটু। বড়ি ভাজাটা খেয়ে দেখ। অনীতা নিজে ঐ বড়িগুলো দিয়েছিল। ওকি, মাছের ঝোলটা ফেলে রাখলে কেন? বুঝতেই পারছ, কলকাতার সেই বড়লোক ছোট শালা এসেছিল। আমরা তারি সুযোগে খেলাম। ওগো, হরপ্রসাদকে আর একটু ঝোল দিয়ে যাও তো!

আমার আশ্চর্য লাগছিল, সুপ্রকাশদার এই খাওয়ানো দেখে। আজ এখানে কেমন করুণ লাগছে ওঁর এই খাওয়া দেখতে। ইস্, চোখের পাতার নিচটা বড্ড ফুলেছে। না, ওষুধটা তৈরি করার কাজে আরো আগে আমার হাত দেওয়া উচিত ছিল। আশ্চর্য! সুপ্রকাশদার ওষুধের কথা ভুলে গেলাম আমি! কেন এমন হোলো?

খাওয়া শেষ করে সুপ্রকাশদা উঠলেন। খুব আস্তে আস্তে উঠোন পেরিয়ে রূপনারায়ণের পাড় ধরে ধীরে ধীরে চলতে লাগলেন। কিছু দূরে যাবার পর অন্ধকারে আর তাকে দেখা গেল না। অজান্তে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল আমার।

সুপ্রকাশদার সঙ্গে বেশ কয়েকদিন দেখা নেই। আমি কয়েকদিনের জন্য গ্রামের বাড়ীতে গেছলাম। ফিরে এসে লক্ষ্য করতাম পৌনে সাতটার পাঁশকুড়া লোকাল বা সোয়া সাতটার মেচেদা লোকালে সুপ্রকাশদা নামছেন কিনা। কিন্তু দেখতাম না। কতলোক নেমে স্টেশনটাকে ডান দিকে কেউ বা বাঁ দিকে রেখে দূরের গ্রামের দিকে চলে যেত। আমি বারান্দায় বসে বসে চেয়ে দেখতাম। তবে কি সুপ্রকাশদা অসুস্থ! না, আবার তীর্থ দর্শনে' হঠাৎ বেরিয়ে পড়লেন? অসুস্থ শরীরে তা সম্ভব কি? আমার ওষুধটা তৈরি হচ্ছে। আর সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই নামাব। নামিয়ে দিয়ে আসব।

সেদিন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বারান্দায় বসে আছি। হঠাৎ দেখলাম, অনীতা রিক্সা থেকে নেমে দ্রুত আসছে। আমি ভয় পাচ্ছিলাম। সুপ্রকাশদার কিছু হয়নি ত? কিন্তু অত শিগগির কিছু হওয়ার কথা নয়। হ্যাঁ, এক যদি 'হার্ট' বিট্রে করে!

অনীতা উঠোনের গেট ঠেলে হাঁপাতে হাঁপাতে ঢুকল। বলল—কাকা এক্ষুনি একবার যেতে হবে। বাবা কেমন করছে।

আমি অবাক হয়ে বললাম—সে কি! কেমন করছে মানে?

অনীতা মাথা নিচু করে বলল—আজ দু সপ্তাহ অফিস যায় নি। সারা শরীর ফুলে গেছে। বলছে, চোখেও ভালো দেখতে পাচ্ছে না। বিকেল থেকে 'রেস্টলেস' হচ্ছে। বলছে, বড় কষ্ট হচ্ছে নিঃশ্বাস নিতে।

আমি অবাক হয়ে বললাম—সে কি? ডাক্তার ডাকলে না কেন?

না, বাবা আর কারুর ওষুধ খাবে না। হোমিওপ্যাথির বই দেখছে, আর বলছে, ভালো হয়ে যাবে।

আমার ওষুধের জন্য এখনও আর কয়েকদিন সময় দিতে হবে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললাম—চল যাচ্ছি। আমি তাড়াতাড়ি জামা পরে তৈরি হয়ে বেরোলাম।

বারান্দায় তক্তপোষের ওপর পাতা বিছানায় সুপ্রকাশদা রূপনারায়ণের দিকে চেয়ে শুয়ে আছেন, যেন সমাহিত, যেন ধ্যান করছেন। গেটের শব্দ হতে অনেক কষ্টে ফিরে তাকালেন। আমি মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। ফোলায় চোখদুটো একেবারে ঢেকে গেছে!

আমি পাশের ইজিচেয়ারে বসলাম।

সুপ্রকাশদা শান্ত গলায় ধীরে ধীরে বললেন—আজ তিথি কি, হরপ্রসাদ?

আমি বললাম—চতুর্দশী। বোধ হয়, পূর্ণিমা পেয়ে যাবে।

সুপ্রকাশদা বললেন—জ্যোৎস্না দেখে তাই মনে হচ্ছে। আঃ কী বিরাট নদী! আর কী শান্ত এখন! তাই না?

সুপ্রকাশদা চুপ করলেন।

—দেখি, হাতটা দেখি একটু?

সুপ্রকাশদা হেসে বললেন—দূর, ওসব কি? নাড়ী দেখে কি আর হবে? কেন ডেকেছি শোনো। অনীতা, লেখার ফাইলটা দিয়ে যাতো মা!

অনীতা একটা ফাইল নিয়ে এলো।

—না, মা, যেটার ওপর 'মনোনীত' লেখা আছে। পত্রিকা বেরোতে বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে, হরপ্রসাদ। এ সংখ্যাটা ডবল করে একেবারে 'শ্রাবণ-ভাদ্র' দুমাসের করে দেব। তারপর আশ্বিন থেকে রেগুলার হবে। তুমি কিন্তু দু' একটা বিজ্ঞাপন যোগাড় করে দিও, হরপ্রসাদ! আমি আর পারছিনে। প্রেসের দেনা, কাগজের দোকানের দেনা—সব শোধ করে দিয়েছি। একজন লেখককে কবিতার জন্য দশটা টাকাও পাঠালাম। না না, চায়নি সে। তবে জানতে পারলাম বড্ড টানাটানিতে পড়েছে। এবার সব ঋণ শোধ!

সুপ্রকাশদা আবার তেমনি চুপ করে নদীর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

অনীতা 'মনোনীত' ফাইলটা দিয়ে গেল। সুপ্রকাশদা অনেক কষ্টে পাশ ফিরলেন। বললেন—যাবার সময় তুমি ফাইলটা নিয়ে যেও। সব 'ডিরেকশন' লেখা আছে ভেতরে। পড়লেই বুঝতে পারবে। এ সংখ্যাটা একটু কষ্ট করে তুমি বের করে দাও। পরের সংখ্যা থেকে আমি সব করব। হঠাৎ বড্ড অসুস্থ হয়ে পড়লাম।

আমি বললাম—আচ্ছা মানুষ তো আপনি! এমন অসুস্থ, অথচ ভাবছেন পত্রিকার কথা! আমি যাচ্ছি, ডাক্তার ডেকে আনছি।

সুপ্রকাশদা হাতের ইশারায় থামতে বললেন। একটু পরে বললেন—আর কোন কষ্ট তো নেই, শুধু নিঃশ্বাস নিতে মাঝে মাঝে যা কষ্ট হয়। তা একটা হাজার শক্তির ওষুধ খেয়েছি। দেখি না কি হয়। তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন?

অনীতা কাছে এসে বসল। বাবার মাথায় হাত রাখল। বলল—কাকা, জ্বর এলো মনে হচ্ছে!

সুপ্রকাশদা বললেন—তোদের যত ভয়। কোথায় জ্বর?

আমি উঠলাম। একজন চেনা ডাক্তারকে নিয়ে আসব এক্ষুনি। আর অপেক্ষা করা ঠিক হবে না।

সুপ্রকাশদা ক্ষীণ গলায় বললেন—ফাইলটা নিয়ে যাও হরপ্রসাদ! মাঝে মাঝে এসো। বলে যেও, কেমন কাজ এগোচ্ছে। আশ্বিন সংখ্যা থেকে রেগুলার করব। তুমি কিন্তু দু' একটা বিজ্ঞাপনের জন্য ভালো করে চেষ্টা করবে হরপ্রসাদ।

আমি চলে এলাম। কিন্তু উঠোন পেরোতে গিয়ে মনটা যেন হাহাকার করে উঠল। ফিরে তাকালাম। সুপ্রকাশদা রূপনারায়ণের দিকে চেয়ে শুয়ে আছেন। নদীতে এখন বিস্তীর্ণ জ্যোৎস্না। দূরে, বহু দূরে, যেখানে আকাশ আর নদী এক সঙ্গে মিশে গেছে সেখানে যেন এক অপূর্ব শান্তির মহাদেশ! যেন কোন মানবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মহামিলনের স্তব্ধ ছবি আঁকা হয়েছে!

ডাক্তার 'কল'-এ বেরিয়ে গেছে। অতএব পরদিন সকালের জন্য অপেক্ষা করতে হোলো।

ভোরবেলা অনীতা এসে কাঁদতে কাঁদতে আছড়ে পড়ল উঠোনে।

অপ্রত্যাশিত। তবু আমি যেন জানতাম, আমি যেন প্রস্তুত ছিলাম, আমি যেন মনকে তৈরি করেছিলাম।

সুপ্রকাশদা ভোর রাতে মারা গেছেন।

বিকেলবেলা আমি ফাইলটা খুলে শুধু দেখছিলাম। সুপ্রকাশদার হাতে সেই কবিতাটার ওপরে 'মনোনীত' লেখা। তখন তাঁর সেই রাত্রির কথা মনে আসছিল—হরপ্রসাদ, আমি যদি দেখতে না পারি, তবে এ কবিতাটা কিন্তু প্রথমে দিও। ঐ পাতায় আর কিছু দিও না। ওটাই আমার এই সংখ্যার 'বেস্ট' লেখা!

'রূপনারায়ণ' পত্রিকার সেইটিই ছিল শেষ সংখ্যা।

জাতির নাম চাঁই

সুনীলকুমার ওঝা

চাঁই জাতির পূর্ব ইতিহাস সম্পর্কে ঐতিহাসিক কোন তথ্য নেই। এমন কি ভারতীয় জাতিগুলির ইতিহাসে কোথাও এদের নাম তেমন দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে কয়েকটি ডিস্ট্রিক্ট হ্যান্ডবুক ও গেজেটিয়ার থেকে এদের অস্তিত্বের কথা ছাড়া সামান্য কিছু তথ্য যা পাওয়া যায়, তা নির্ভুলভাবে গ্রহণ করাও যায় না।

ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারগুলি থেকে বিহারের সাঁওতাল পরগণা বাংলাদেশের রাজশাহী এবং পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলায় এদের অবস্থিতির কথা জানা যায়। কিন্তু এরা প্রকৃত কোন অঞ্চলের আদিবাসী এবং এই জাতির উৎপত্তি কোন শাখা থেকে তা আজও জানা সম্ভব হয়নি। অশোক মিত্রের ডিস্ট্রিক্ট হ্যান্ডবুক মালদা (সেনসাস ১৯৫১ খৃঃ) থেকে এদের সম্পর্কে যা-কিছু জানতে পারা যায় সেটা হচ্ছে ঃ

> Another interesting Mandal Caste are the chain Mandals who are found in the west of the district. In the census of 1872 their number was given as 30,000, and they are still a fairly numerous and well-known caste. They are most remarkable Peonliarity is that they will never touch a chain (This has of course, no connection with the name of the caste). No one could say what was the origin of this custom, but it probably goes back to Totemistic days. A chain Mandal would not even draw water from a well if a chain is attached to the bucket.'

এই রিপোর্ট অনুযায়ী ওদের অস্তিত্ব ও সংখ্যার কথা জানা যায় বটে কিন্তু উৎপত্তি সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তবে চাঁই অঞ্চলে ঘুরে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, চাঁই মণ্ডলদের জল তোলার ব্যাপারে এই শিকল সম্পর্কিত বক্তব্যটি ঠিক নয়।

চাঁই জাতির বসবাস সাধারণতঃ গঙ্গার দুই পাড় জুড়ে। পশ্চিমে রাজমহল থেকে পূর্বে লালগোলা ও বাংলা দেশের অভ্যন্তরে আরও কিছু অংশ পর্যন্ত এদের বাস। তবে পশ্চিমবঙ্গের মালদহ ও মুর্শিদাবাদেই এরা সংখ্যায় অধিক।

অশোক মিত্রের মালদা সেনসাস হ্যান্ডবুকে তুলে দেওয়া ১৮৭২ খৃঃ রিপোর্ট অনুযায়ী সে সময়ে এদের সংখ্যা এই জেলায় ছিল ত্রিশ হাজারের মত। বলা হয়েছে, বর্তমানে এই জাতির লোকসংখ্যা মালদহ ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে লক্ষাধিক হবে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় বহু আগেই মালদহে এদের সংখ্যাধিক্য সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, 'নাগর, ধানুক চাঁই, এছাড়া মালদহ নাই।' নাগর ও ধানুক সম্প্রদায়ও চাঁই সম্প্রদায়ের মতই। কোথাও কোথাও ভাষা ও ব্যবহারে নাগর ধানুক ও চাঁইদের মধ্যে সামান্য অমিল দেখা যায় মাত্র। এরা নিজেদের অন্যান্যদের চেয়ে বড় প্রতিপন্ন করার জন্য বলে, 'নাগর ধানুক চাঁই একার বড়া জাত নাই।' এই ভাষাটি নাগরদের। ১৩২২ সালে মালদহ থেকে প্রকাশিত গম্ভীরা পত্রিকায় নাগরদের আলোচনা প্রসঙ্গে এই প্রবাদটি উদ্ধৃত করা হয়েছে।

এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে এ জেলায় চাঁই জাতিরই বাস বেশী। মালদহের কালিয়াচক, মানিকচক রতুয়া ও হরিশচন্দ্রপুর থানার বিস্তৃত এলাকায় এই জাতির বাস। তাছাড়া মালদহের অন্যান্য অঞ্চলেও এরা ছড়িয়ে আছে। তাছাড়া মুর্শিদাবাদ জেলার ফারাক্কা, সমসেরগঞ্জ থানা, সুতী থানা, জঙ্গীপুর, লালগোলা, ভগবানগোলা প্রভৃতি অঞ্চলেও চাঁই জাতির বহু লোক বাস করে।

শিক্ষাদীক্ষায় অন্যান্য জাতি থেকে পশ্চাদপদ হলেও চাঁই জাতির রয়েছে নিজস্ব ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি। যখন গৌড়নগরের উপকণ্ঠ-বাহিনী গঙ্গানদী ক্রমে পশ্চিমে সরে গিয়ে কয়েকটি চর বা দিয়াড়ার সৃষ্টি করেছিল তখন এই চাঁই জাতি বিহারের ভাগলপুর, মুঙ্গের, পূর্ণিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন এলাকা থেকে উক্ত দিয়াড়া অঞ্চলে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করে। এদের প্রধান উপজীবিকা কৃষিকাজ, তাই গঙ্গার ন্যায় সুবৃহৎ নদীর পাশেই এদের আধিক্য। অবশ্য এসব অঞ্চলে এসে বসবাসের কারণ হচ্ছে সে সময়ে ঐ জমিগুলি নিষ্করভাবে ভোগের সুযোগ এবং নদী সন্নিকটস্থ জমির উর্বরতাজনিত ফসলাদির প্রাচুর্যের আশা। তবে, তাদের থেকে জানা যায়, তারা নাকি বিহারে অবস্থিত তাদের বনোয়ালী রাজের নির্দেশ অনুযায়ীই এইসব অঞ্চলে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করে এবং নদীতীরস্থ চরগুলিকে চাষোপযোগী করে তোলে। মালদহের কালিয়াচক, মানিকচক, রতুয়া প্রভৃতি থানা সে সময়ে বিহারের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মালদহের পঞ্চানন্দপুর খাসমহল গ্রামে চাঁই জাতির এক বিরাট সম্মেলন হয় ১৩৩০-৪০এর দশকে। এই সম্মেলনে বিহারের বিভিন্ন জেলা মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী, যশোহর প্রভৃতি জেলা থেকে মণ্ডল মাতব্বররা চাঁই জাতির প্রতিনিধি হয়ে যোগদান করেন এবং চাঁই জাতির উদ্ভব প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কেও আলোচনা করেন। তাদের বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের বিধান অনুযায়ী একদল বলেন চাঁই জাতি 'ক্ষত্রিয়', অপর দল বলেন যেহেতু চাঁই জাতির প্রধান পেশা কৃষিকার্য ও উৎপন্ন দ্রব্যাদি সহযোগে ব্যবসায় বাণিজ্য অতএব চাঁই জাতি বৈশ্য শ্রেণীভুক্ত। ঐ সম্মেলনে এর বেশি কোন মীমাংসা হয় নি। শূদ্রের পর্যায় থেকে নিজেদেরকে উন্নত পর্যায়ে উন্নীত করার মনোভাব নিয়ে এই ধরনের যুক্তিগুলি খাড়া করেছিলেন বলে অনুমান করা যেতে পারে।

চাঁই জাতি যে বাংলার আদিবাসী নয় তার প্রমাণ মেলে এদের ভাষা, মেয়েদের শাড়ী পড়ার ভঙ্গী ও অলঙ্কারের গড়ন। চাঁই জাতির ভাষাকে বিকৃত হিন্দী বলা যায়। প্রাকৃত হিন্দী ও বাংলা ভাষার সংমিশ্রণে এই ভাষা রূপ পেয়েছে। চাঁই জাতির ভাষা বৈশিষ্ট্য বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষা রাখে। চাঁই মেয়েরা শ্বশুরকে মাহাতো (ম' এ আকারের 'আ'কে 'অ' ও 'আ'এর মাঝামাঝি উচ্চারণ করতে হবে), শাশুড়ীকে 'মাজী', ভাসুরকে 'বড়জন', দেওর বা ঠাকুরপোকে 'ছোটজন' ছেলেকে 'বেটা' ও মেয়েকে 'বেটী' বলে। বাবাকে 'বাপু', কাকাকে 'কাক্কা', শোটকুকাকে 'নানুহাবাপু', মেসোকে 'মৌসা', মাসীকে 'মৌসী', পিসিকে 'ফুফু' পিসেমশায়কে 'ফুফা' সম্বোধন করে। এছাড়া এদের কতকগুলো শব্দও বেশ মজার। যেমন জাবুরা। এই জাবুরা ওদের এ'টো হাঁড়ীকুঁড়ি সমেত ভাত ডাল, তরকারী রাখার একটি বড়পাত্র বিশেষের নাম। এই পাত্রটি মাটির তৈরী। একে সাধারণ ভাষায় ওরা কুঠী বলে। কিন্তু যে কুঠীটিতে শুধুমাত্র ভাতের হাঁড়ী ও রান্না করার পাত্রাদি রাখা হয় তাকেই একমাত্র 'জাবরা' বলে। বড় কুঠীগুলো তারা শস্যাদি রাখার কাজে লাগায়। আর একটি মজার শব্দ 'হাড়ুয়া'। হাড়ুয়া শব্দটির অর্থ এ'টো নিকানো, বা এ'টো দেওয়া। ওদের ভাষায় একটি লাইন তুলে দিলে ওদের ভাষা ও শব্দগুলো সম্পর্কে ব্যাপারটা কিছুটা পরিষ্কার হবে। যেমন মা তার মেয়েকে বলছে 'ভাত খেয়ে হাঁড়ী জাবরাতে রেখে দিও। পরে এ'টো দিয়ে দিও। আমি ছাগল নিয়ে ঐদিকটাতে গেলাম তুমি বাড়ীতে থেকো' এই কথাগুলো চাঁই ভাষায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায়—'ভাত খাকে হ্যাঁড়িয়া জাবরামে' র‍্যাখখি দিইহ্যান, বাদমে হাড়ুয়া দে দিইহ্যান। হামিম্যা ব্যাকরি লেকে উধ্‌ধার গেলিয়াউ তাই ঘরমে র‍্যাইহ্যান।' এদের ভাষা বা শব্দগুলো শুনতে মজাই লাগে। কিন্তু শব্দের উৎপত্তিস্থল খুঁজতে মাথা ধরিয়ে দেয় একথা স্বীকার না করে পারা যায় না। তারপর যেমন এরা ছায়ামণ্ডপকে বলে 'মাড়ুয়া' থালাকে বলে 'থ্যারিয়া' অর্থাৎ প্রভৃতি শব্দ শুনলেই যেন বিদঘুটে মনে হয়।

এবারে আগের কথায় আসা যাক। অর্থাৎ চাঁই মেয়েদের মধ্যে পশ্চিমা ঢঙের প্রভাব। যেমন চাঁই মেয়েরা শাড়ীর অর্ধেক ডবল করে নিম্নাঙ্গে পরিধান করে এবং বাকী অর্ধেক পিঠ ও মাথার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে আঁচল বুকের উপর দিয়ে নিয়ে প্রান্তস্থর

পিছনে গুঁজে নেয়। ভঙ্গীটি ঠিক পশ্চিমা মেয়েদের মত অবশ্য বর্তমানে যুগের হাওয়ায় ও কিছুটা শিক্ষা বিস্তারের প্রভাবে ওদের মধ্যে আধুনিকারা বাঙ্গালী মেয়েদের মতো শাড়ী ও সাজসজ্জা করা কিছু কিছু আরম্ভ করেছে। চাই জাতির মেয়েদের অলঙ্কারও কতকটা পশ্চিমা মেয়েদের মত। চাই মেয়েরা পায়ে বাঁক, আটবাঁকী মল, আদিবাসীদের ন্যায় গলায় রুপোর মোটা হাঁসুলী, কাঠি, হাতে ও বাহুতে খাসিয়া বাহুটী লজ্জাদানা, তাড়বাজ, প্রভৃতি নানান ধরনের অলঙ্কার ব্যবহার করত, অধুনা রুচির পরিবর্তনের সংগে অলঙ্কারের ব্যবহারও পরিবর্তিত হতে চলেছে।

যদিও চাইয়েরা হিন্দুদের সমস্ত দেবতাকে মানে ও পূজা করে তবুও এদের নিজস্ব বাস্তু দেবতা বা কুলোদেবতা আছে। প্রত্যেক বাড়ীতে পশ্চিম ভিটার ঘরের পশ্চিম দিকের দেওয়াল বা টাটীর উত্তর পশ্চিম কোণে কিছুটা জায়গা লেপে বাস্তু দেবতার থান করা হয়। দেবতার প্রতীক হিসাবে প্রায় তিন ইঞ্চি লম্বা ও পোনে এক ইঞ্চি চওড়া তিনটি কাজলের ও দুটি সিঁদুরের রেখা দেওয়া হয়। এই রেখার মাথায় একটি করে কাজল ও সিঁদুরের ফোঁটা দেওয়া হয়, কারও শুধু রেখা থাকে, ফোঁটা থাকে না। এইসব দেবতার বিভিন্ন নাম আছে। যেমন হনুমানি, গোরাইয়া, পাঁচপীরিয়া, নাড়া নরসিং, দুর্গা প্রভৃতি। কারও এই থানের নীচে মাটিতে বেদী থাকে কারও থাকে না। এই সকল দেবতার পূজা হিন্দুর বিভিন্ন পর্ব উপলক্ষে বিভিন্ন উপাচারে বাড়ীর বর্ষীয়সী মহিলারাই করে থাকেন। বাস্তু পূজায় ওদের কোন ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না, সমস্ত চাইই কাশ্যপ গোত্রসম্ভূত। এদের বিবাহ, শ্রাদ্ধ পূজো প্রভৃতিতে পৌরহিত্য করেন ব্রাহ্মণেরা। শ্রাদ্ধ কাজে শবদাহের পর দশ দিনে যে কাজ হয় তাকে ওদের ভাষায় বলা হয় 'ঘাট কিরিয়া', এগার দিনের কাজকে বলে 'বাহির কিরিয়া' এবং বার দিনের দিন অর্থাৎ যেদিন ওদের অশৌচ শেষ হয় সে দিনের কাজকে বলে 'কিরিয়া'। কিরিয়া শব্দটিকে ওরা শ্রাদ্ধ অর্থে ব্যবহার করে।

চাই জাতির উপাধি মূলতঃ মণ্ডল। তবে পূর্বে যারা কিছু লেখাপড়া শিখত তারা সরকার উপাধি গ্রহণ করত। এছাড়া চৌধুরী, দাস প্রভৃতি উপাধিও ইদানিংকালে কেউ কেউ গ্রহণ করেছে। তবে তাদের উপাধি বলতে মণ্ডলই আসল। চাই শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রধান, মণ্ডল শব্দের অর্থও প্রধান। এদের বাস্তু দেবতাও কোন শাস্ত্রীয় দেবতা নয়, তবে কি অনার্য কোন আদিবাসী শ্রেণীর কোনও প্রধান অংশই চাই নামে পরিচিত? এ বিষয়ে বিশেষভাবে অনুসন্ধান ও গবেষণার দরকার। চাইদের বিবাহের মধ্যে একটি বিধি লক্ষণীয়। বিধিটিতে বিবাহকর্তাকে ছায়ামণ্ডপ বা তাদের কথায় মাড়ুয়ার ভিতরে গিয়ে মাড়ুয়ার পাতলা ছাউনির মধ্য দিয়ে ধনুকে একটি তীর জুড়ে ঐ তীরটি আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিতে হয় এবং ধনুকটি মাড়ুয়ার এক কোণে টাঙ্গিয়ে রাখতে হয়। একে ওদের ভাষায় 'মাড়ুয়া বিহানো' বলে। এ অনুষ্ঠানটি বিবাহের দিন সকালে অনুষ্ঠিত হয় অবশ্য এর আগে ও পরে আরও অনেক বিধি আছে। এই তীর ছোঁড়ার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের অনেকে দাবী করেন যে এই চাই জাতি ক্ষত্রিয় জাতিরই কোন শাখাবিশেষ। কারণ ওদের মতে এই তীর ছোঁড়া অর্জুনের লক্ষ্যভেদের সময় থেকে চলে আসছে। যুক্তিটি যদিও বিচার করে দেখার মত তবুও এখানে একটা লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, এই বিধিতে পাত্রকে দিয়ে তীর ছোঁড়ানো হয় না, তীর ছোঁড়ে পাত্রপক্ষীয় পাত্রের ভগ্নিপতি বা ঐ স্থানীয় ব্যক্তি। অতএব অর্জুনের লক্ষ্যভেদের সংগে এর কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না সে কথা আমরা অনায়াসেই বলতে পারি। মনে হয় বহু পূর্বের সংস্কার ও প্রথানুযায়ীই এই বিধিটি পুরুষানুক্রমে ওদের মধ্যে দিয়ে চলে আসছে। এবং এই তীর ধনুকের ব্যবহার তো আদিবাসীদেরই একমাত্র জীবিকা নির্ধারণের অস্ত্রস্বরূপ ছিল। ধীরে ধীরে ওরা আধুনিক যুগের আবহাওয়ায় এসে শুধুমাত্র শিকারের পেশা ছাড়া চাষবাসও কিছু কিছু করতে আরম্ভ করে। আবার সেই সম্প্রদায়েরই কিছু কিছু অংশ শিকারকে বর্জন করে কৃষি কাজকেই প্রধান জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করে কিন্তু তাদের সংস্কারকে একেবারে ছাড়া হয়তো তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই বিবাহের মধ্যে তীর ধনুকের ব্যবহার আমাদের সে কথাকেই বিশেষভাবে হয়তো স্মরণ করিয়ে দেয়।

এ প্রসংগে একটি কথা বলা যেতে পারে ভারতে আর্য ও অনার্যদের খণ্ডযুদ্ধের সময় যেসব অনার্য যুদ্ধে হেরে গিয়ে বনে জঙ্গলে লুকিয়ে বসবাস করতে থাকে তারাই এখন আদিবাসী হিসাবে পরিচিত কিন্তু বাকী যারা আর্যদের বশ্যতা স্বীকার করে তাদের অধীনে বসবাস ও চাষবাস করতে আরম্ভ করে তাদেরই একটা প্রধান অংশ মনে হয় এই 'চাইমণ্ডল' সম্প্রদায়। কারণ এদেরকে নিখুঁতভাবে বিচার করলে এখনও এদের মধ্যে আর্য ও অনার্যদের সংমিশ্রণের ধারা সুস্পষ্ট বলে মনে হয়।

চাই জাতির স্ত্রীলোকদের মধ্যে চিবুকে, বুকে ও হাতে উলকী আঁকার প্রথা বর্তমান। অবশ্য সম্প্রতি এই উলকী গ্রহণ অনেকটা কমে এসেছে। চাই মণ্ডলদের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমকক্ষতা দেখা যায়। মেয়েরা পুরুষদের মতই জমির ফসল নিড়ানো, ফসল কাটা প্রভৃতি কাজ করে থাকে। মেয়েরা স্বাধীনভাবেই শাকসব্জী ও অন্যান্য পণ্যসামগ্রী ক্রয় বিক্রয়ের জন্য হাটবাজারে এমন কি এইসব ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্য দূর-দূরান্তরেও যাতায়াত করে। অর্থাৎ ওদের সমাজের মধ্যে নারী স্বাধীনতা বরাবরই বর্তমান আছে। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রথা প্রথম থেকে প্রচলিত। আজকাল এক স্বামী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও বনাবনি না হলে স্ত্রীলোকদের মধ্যে পত্যান্তর গ্রহণ প্রথা চালু হতে চলেছে। তবে এই ধরনের বিবাহকে বলে 'নিকা'। প্রথম বিবাহের ন্যায় এই বিবাহে কোন আড়ম্বর অনুষ্ঠান এমন কি পুরোহিতেরও দরকার হয় না। দুই পক্ষের দুইজন গ্রামপ্রধান (যদি পাত্র ও পাত্রী দুই গ্রামের হয়) ও কয়েকজন লোকের মতের সমর্থনে এই বিবাহ সিদ্ধ হয়। পাত্র তার ভগ্নিপতি ও দু-একজন লোকসহ পাত্রীর বাড়ী যায় এবং ভবিষ্যতে ঐ পাত্রীর ভরণপোষণ চালাতে রাজী এই প্রতিশ্রুতি গ্রামপ্রধানদের দিয়ে পাত্রীর কপালে সিঁদুর দেয় ও নিজের বাড়ীতে নিয়ে আসে এবং নতুনভাবে সংসার করতে আরম্ভ করে।

বিধবা বা স্বামীত্যাগী মেয়েটির যদি কোন সন্তান থাকে তাহলে সন্তানেরা তাদের পূর্বপিতা বা তার বংশধরদের কাছেই থাকে কিন্তু যদি তাদের আর কেউ না থাকে এবং স্ত্রীলোকটির নতুন স্বামীরও আপত্তি না থাকে তাহলে নতুন স্বামীর সংসারে তাদেরকেও নিয়ে আসে। অবশ্য সন্তানদের অসহায় পরিস্থিতিতে স্ত্রীলোকটি নতুন স্বামীকে তার আগের সন্তানদের ভরণপোষণে বাধ্য করায় এবং নতুন স্বামীর কাছ থেকে এ ধরনের প্রতিশ্রুতি না পেলে সাধারণতঃ 'নিকা' করতে রাজী হয় না। চাই সমাজে স্বামীর মৃত্যুতে মেয়েদের দেবর বা

তাদেরকেও নিকা করতে কোন বাধা থাকে না। চাঁই জাতির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয় প্রাচীন 'মিতাক্ষরা' আইন অনুযায়ীই চলে আসছে। পিতার সম্পত্তিতে কন্যার কোন অধিকার নেই। পিতা বর্তমান থাকতেও পিতার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিতে পুত্রের অধিকার স্বীকৃত।

চাঁইদের বিবাহ, শ্রাদ্ধ, আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতি বিহারী মতেই হয়, বাঙালী মতে হয় না। তবে বিবাহের বিধি ও পদ্ধতিতে অনেক কিছু নতুনত্ব দেখা যায়। এদের বিবাহের বিধিগুলিকে তিনটি দিনে ব্য ভাগে ভাগ করা হয়। মূল ভাগগুলি প্রথম দিনে 'দৈ মাছ', দ্বিতীয় দিনে 'লগন চুমানো ও লগন বাঁধা' তারপর দিন বিবাহ। প্রতিদিনই এই বিধির সঙ্গে আগে ও পরে নানান ধরনের আচার অনুষ্ঠান ও ছোট-খাট বিধি আছে। বিবাহের অন্য বৈশিষ্ট্য সঙ্গীতানুষ্ঠান। গীতগুলিকে যথাক্রমে বলা হয় 'দৈমাছের গীত' 'লগন চুমানোর গীত', 'বিহার গীত' 'সাতপাকের গীত', 'সিঁদুর দানের গীত' ইত্যাদি। বিবাহের দিন ধার্যের পূর্বে বর-পক্ষকে কয়েকটি কাজ অবশ্য করতে হয়। যেমন বিবাহের সম্বন্ধ পাকাপাকি হলে কন্যাপক্ষীয় গ্রামের অন্য কোন ব্যক্তিকে মধ্যস্থ রেখে দু-এক টাকা জমা দিতে হয়। একে 'আগুয়া' দেওয়া বলে। বিবাহ সম্বন্ধ পাকা হল বলে বায়নাস্বরূপ বোধ হয় এই টাকা দেওয়া। এছাড়া কন্যাপক্ষীয় গ্রামের জাতি-

কুটুম্বের খাওয়ানোর জন্য চিনি প্রভৃতির মূল্য বাবদ বরপক্ষকে কিছু টাকা নগদ দিতে হয়। একে বলে 'পণ্ডাতী' চুকানো। তদুপরি দৈ-মাছের দিন বরপক্ষের কন্যাপক্ষকে মাছ ও দৈ দেওয়ার বিধান আছে। দৈ-মাছের দিনের বেলা বরপক্ষ দধিপাত্রের ঢাকনী হিসাবে পাঁচটি বা সাতটি মাটির ঢাকুন এবং সেই সঙ্গে পাঁচ সাতটি পুঁটিমাছ পাঠিয়ে দেয়। কন্যাপক্ষ এই মাছসহ 'ঢাকুন' উঠোনে আলপনা দেওয়া জায়গায় রেখে ধান দূর্বা ছিটিয়ে 'চুমিয়ে' ঘরে তুলে রাখে। ঐ দিন রাত্রে বরপক্ষীয় লোকেরা কন্যার বাড়ী আসে ও খাওয়া দাওয়া করে। এই ভোজে বরপক্ষ প্রদত্ত মৎস্য ও দধি অবশ্য পরিবেশন কর্তব্য। ঐদিন সকালে পাত্র ও পাত্রীকে নিজ নিজ বাড়ীতে 'থুবড়া' দেওয়া বা ক্ষীর খাওয়ানো হয়। রাত্রের ভোজের পর ওদের দৈ-মাছ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। তারপর দিন 'লগন'। লগনের দিন বরপক্ষ ডোমের বাড়ী থেকে আনা বাঁশের তৈরী রঙ্গীন ফুল পাখী দিয়ে সাজানো একটি চাঙ্গারীতে লগনের জন্য প্রয়োজনীয় নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি সাজিয়ে কন্যাপক্ষের বাড়ীতে যায়। লগনের অবশ্যই প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যথা— সের আড়াই গুড়, সাত বা পাঁচ থোকা পাকা কলা, পাঁচটা পান, পাঁচটা সুপারি, গোটা হলুদ সাতটা, সিঁদুর সাত পুরিয়া, লাল সরু ফিতা, কাঠের কাঁকই, সাতটা কাঠিতে পেঁচানো সাদা সুতা, একটি বেলের উপরে আতপ চালের গুড়া ও গুড় দ্বারা মাখানো নাড়ু একটা, হরিতকী, সুপারি, মুখামুখি দুটি মাটির কৌটা, লাল পাড় শাড়ী দুখানা। ঐ সঙ্গে আনা হয় পৃথকভাবে একটা নূতন গামছায় বাঁধা পোয়া তিনেক ধান। এই অনুষ্ঠানে পাত্রীর বাড়ীর উঠানে পাত্রীকে একখানা আলপনা দেওয়া পিঁড়িতে বসানো হয় এবং পাত্রপক্ষের লোকেরা তাকে পাঁচ বা সাতজন মিলে ধান-দূর্বা দিয়ে একে একে চুমায় (আশীর্বাদ দেয় বা করে)।

মেয়েরা ধান-দূর্বা দিয়ে চুমায় এবং লগনের সঙ্গে আসা আতপ চাল, গুড়, কলা মেয়েরা নিজেদের মধ্যে কিছুটা ভাগ করে নেয়। অন্যদিকে নতুন গামছায় আনা ধানসহ পাত্রের পিতা বা পিতৃস্থানীয় কোন ব্যক্তি উঠানে একটি আসনে পশ্চিমদিকে মুখ করে বসেন, ঠিক তার সামনেটাই হাত তিনেক দূরে পাত্রীর পিতা বা পিতৃস্থানীয় কেউ পাত্র পক্ষের দিকে অর্থাৎ পূর্ব দিকে মুখ রেখে একটি নতুন গামছায় ঐ পরিমাণ ধান নিয়ে আর একটি আসনে বসেন। একটু দূরে উভয়ের মাঝখানে বসেন পুরোহিত।

অতঃপর একটি 'কুলায়' দুই পক্ষের ধান একত্র করা হয়, একাজটি করে প্রামাণিক। এখন দু-পক্ষের মিশ্রিত ধানের মধ্য থেকে প্রামাণিক কিছু পরিমাণ ধান তুলে প্রথমে পাত্রের পিতার আঁজলায় ও পরে পাত্রীর পিতার আঁজলায় দেয়। পাত্রের পিতা আঁজলার ধান পাত্রীর পিতার আঁজলায় দেয় এবং সেই ধান পাত্রীর পিতা নিজের গামছায় রাখে। অনুরূপভাবে পাত্রীর পিতা পাত্রের পিতাকে ধান দেয় এবং পাত্রের পিতাও নিজের গামছায় রাখে। এইভাবে মোট সাত-বার দেওয়া হলে নাপিত গামছার ধান দুটি পুঁটলি করে আলগা ভাবে গিঁট দেয় ও দুই গামছারই প্রান্তভাগ পাত্রের পিতা ও পাত্রীর পিতার দুই হাতে ধরিয়ে দেয়। এই সময় পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করেন। মন্ত্রপাঠ শেষ হলে তাঁর নির্দেশে পাত্র ও পাত্রীর পিতা উভয়ে টেনে পুঁটলি দুটিতে গিঁট দেয়। এ অনুষ্ঠানকে বলে 'লগন বাঁধা'। ঐ বাঁধা ধানকে পাত্রীর হাতে একথোকা কলার উপরে রেখে চুমানো হয় এবং দৈয়ের টিপ দেওয়া হয়। তাই এর আর এক নাম 'লগন টিপানো'।

তার পরদিনই বিবাহের ধুম। বিবাহের বেশীর ভাগ আচার অনুষ্ঠানের দায় দায়িত্বই 'লোকানিয়া'র উপর। ওরা লোকানিয়া বলে পাত্র বা পাত্রীর ভগ্নীপতিকে তথা বিবাহের বিধিকর্তাকে। বিবাহের দিন এদের বিধির অন্ত নেই। এখানে কয়েকটি বিশেষ বিধির উল্লেখ করছি। সংক্ষিপ্ত ভাবে বলতে গেলে ওরা লগনের দিন রাত্রি শেষে বাস্তুদেবতার পুজো আরম্ভ করে। ওদের ভাষায় একে বলে 'দেবাশী পুজো'। এই পুজোতে দেবতাকে বিভিন্ন গীত সহযোগে আহ্বান ও পুজো নিবেদন করা হয়। এই গীতগুলি বিশেষ অর্থবহ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এ পুজোগুলিতে ব্রাহ্মণের দরকার হয় না। তারপর হয় ছাট্টী পুজো, এইসব পুজো পুরোপুরি মহিলা মহলের অধিকারে। পুজো শেষে 'মাড়ুয়া-গাড়া' অর্থাৎ ছায়ামণ্ডপ তৈরী করা হয়। ছায়ামণ্ডপ তৈরীতেও এদের বিশেষ স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। তারপর যথাক্রমে 'পুয়েল' আনা 'উপটন ভাজা', 'মাটখোঁড়ওয়া' 'মাড়ুয়াবিহা', 'পানিকাটা' 'লাবাভুজা' প্রভৃতি চলতে থাকে একে একে। পরে সন্ধ্যার দিকে বাড়ীতে পালকী বা গরুরগাড়ীযোগে 'বর' পৌঁছালে চলে 'বর-বরণ' ও অন্দরমহলে কনের ল্যাছায়। 'ল্যাছায় শেষ হলে বরকে বাড়ীতে আনা হয় এবং কনের ভাই সম্পর্কদের দিয়ে মাড়ুয়ার চার পাশে ঘুরানো হয়। এসব বিধির শেষে পুরোহিত বিবাহ কার্য সমাধা করেন। বিবাহ শেষে মেয়েরা 'দুয়ার-ছ্যাকানী' নামক বিধিতে পাত্রপক্ষের কাছ থেকে বেশ কিছু পয়সা আদায় করে। পরদিন নতুন কুটুম্বদেরকে খাওয়ানোর পর দিনশেষে পাত্রীকে শ্বশুরালয়ে যাওয়ার জন্য পাঠানো হয়। এই সময় ওদের 'সমুধি-মিলন' এবং পাত্রর সঙ্গে বাড়ীর অন্যান্য ব্যক্তিদের মিলন অনুষ্ঠিত হয়। এই মিলন দৃশ্যটি বড় করুণ। উপরোক্ত বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানগুলো ছাড়াও ছোটখাটো নানান ধরনের অনুষ্ঠান এই তিনদিন ধরে তাদের মধ্যে লেগেই থাকে এবং মেয়েদের মধ্যে নাচ ও গীত এই কটা দিন রাতদিন ধরে চলতে থাকে। এক-একটি বিবাহ অনুষ্ঠানে কমপক্ষে এরা সবশুদ্ধ শ'খানেক বিভিন্ন রকমের গীত গায়, এই গীতগুলি সবই কিন্তু চাঁই ভাষায় রচিত। যদিও চাঁই মেয়েরা লেখাপড়া জানে না, তবুও তাদের মুখে মুখে এই গীত দীর্ঘ-কাল ধরে বংশপরম্পরায় টিকে আছে। অতি কষ্টে এই গীতগুলির প্রায় সম্পূর্ণই আমি সংগ্রহ করে রেখেছি এবং বিশ্লেষণ করে যতটুকু বোঝা গেছে তাতে লোক-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এগুলোর গুরুত্ব ও প্রয়োজন যে নেহাত কম নয়, সেকথা স্বীকার করা চলে।

এদের মধ্যে শিক্ষার প্রভাব খুবই কম। প্রায় প্রত্যেকেই কৃষিজীবী। চাষবাস নিজেরাই করে। এরা প্রত্যেকেই পরিশ্রমী। ধান গম, পাটের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজী, আলু, পটল, কপি প্রভৃতি নানান ধরনের তরি-তরকারী উৎপাদনেও এরা খুব পটু। এই তরি-তরকারী বিক্রী করে এরা প্রচুর পয়সা রোজগার করে। বর্তমানে রেশমের চাষও করে এবং রোজগার মন্দ হয় না। এখন অনেকে নানান ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্যও করে যেমন হাটে-বাজারে বা গ্রামে গ্রামে শস্যাদি ও পাট বা ঐ জাতীয় কাঁচামাল কিনে শহর ও নগরের দিকে চালান দেয়। চাঁই জাতি ইদানীং ধীরে ধীরে উন্নত হতে থাকলেও এদের মধ্যে শিক্ষার হার মোটেই সন্তোষজনক নয়। এদের শিক্ষা-দীক্ষার উন্নতি বিধানের জন্য অবশ্য সরকারের হস্তক্ষেপের বিশেষ প্রয়োজন। কৃষিভিত্তিক রোজগার ছাড়া এদের মধ্যে অন্য কোন উপায়ে রোজগারের পন্থা বা মনোবৃত্তি তেমন দেখা যায় না। চাকুরিয়ার সংখ্যা খুবই কম, শতকরা পূর্ণ একজনও নয়। এদের মধ্যে চাকুরীজীবীরা প্রায়ই গ্রামের প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক। কদাচিৎ দু-একজন হাই স্কুলে কাজ করে। এছাড়া চাকরির প্রয়োজনে ঘর ছেড়ে বাইরে খুব একটা এরা যেতে চায় না বা বাইরে যাওয়া এদের স্বভাববিরুদ্ধ বলে মনে হয়।

প্রকৃতিতে এরা রুক্ষ। চালচলন, আচার-ব্যবহার ও নৈতিক মানের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিলে, এদের প্রকৃতির মধ্যে রুক্ষতার প্রকাশ বেশ সুস্পষ্ট ভাবেই বোঝা যায়। এদের প্রকৃতি দেখে মনে হয় যেন আদিম-তার রক্তের প্রবাহ এখনও এদের শিরায় প্রবাহিত। তাই এরে মধ্যে বাদ-বিসম্বাদ মারামারি এমনকি খুন-জখমও হতে দেখা যায়। সামান্য বাদ-বিসম্বাদে এদের মনো-মালিন্য চরম পর্যায়ে ওঠে, অবশেষে মারা-মারি রক্তপাত ও মামলা-মোকদ্দমা পর্যন্ত পৌঁছায় এবং এদের বেশীর ভাগ রোজগারই মামলা মোকর্দমা ও জরিমানার পিছনে খরচ হয়। তবে ইদানীংকালে অনেকটা সংযম তাদের মধ্যে এসেছে, এর ফলে আগের তুলনায় মারামারির হারও অনেকটা কমে

রয়েছে। এদের বাদ-বিসম্বাদের প্রধান কারণগুলি জমিজমা বিষয়ক। তাছাড়া গ্রামীন কলহ ও নিজেদের মধ্যে সৌহার্দ্যের অভাবে এরা একান্নভুক্ত পরিবারে খুব কমদিনই থাকতে পারে। এদের মনের প্রসারতার অভাব খুব বেশী থাকায় বাইরের আবহাওয়াকে সহজে মেনে নিতে পারে না বা চায় না এবং নিজেদের মনের গণ্ডীর মধ্যেই সীমায়িত থাকতে চায়। তাই এদের সমাজের ও মনের যে চরম ক্ষতিসাধন হয় তা হয়তো এরা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

এদের আকৃতি মাঝারি ধরনের। রং বেশীর ভাগই কাল ও শ্যামবর্ণ। নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালীর ইতিহাস' আদিপর্বের নৃতাত্ত্বিক আলোচনা অনুযায়ী এদের আকৃতিকে বিচার করলে 'অস্ট্রিক' গোষ্ঠীর পর্যায়ভুক্ত বলে দাবী করা যায়। আগেই বলা হয়েছে এরা নিজেদের গণ্ডীর মধ্যেই বেশী থাকতে ভালবাসে তাই বহির্জগতের প্রভাব এখনও এদের মধ্যে খুব একটা বেশী প্রবেশাধিকার পায়নি। তবে এদের সমাজ-ব্যবস্থায় কয়েকটি দিক উল্লেখযোগ্য। যেমন এদের বিচার পদ্ধতি। কিছুকাল পূর্বেও এদের বিচার-পদ্ধতি ছিল অদ্ভুত ধরনের। যদিও সেই পদ্ধতি এখন লুপ্তপ্রায়। চাঁই মণ্ডলদের গ্রামের কেউ কোন অপরাধ করলে সেই গ্রামের লোকসহ গ্রামপ্রধান বা 'মোড়ল' তার বিচার করে। যদি অপরাধী সে বিচার না মানে তাহলে পার্শ্ববর্তী পাঁচ গ্রামের মোড়ল-মাতব্বরসহ বিচার হয়। সেই বিচারের রায়ও যদি অপরাধী অস্বীকার করে তা হলে এইভাবে 'বাইশী' অর্থাৎ বাইশ গ্রামের লোকসহ বিচার 'ছত্রিশী' এমনকি 'চৌরাশী' পর্যন্ত হয়ে থাকে। চৌরাশীতে ভিন্ন ভিন্ন জেলার গ্রাম থেকে চাঁই মণ্ডলেরা আসে এবং যেখানে বিচার সভা অনুষ্ঠিত হয় সেখানে খাওয়া থাকার ব্যবস্থাও করা হয়। 'চৌরাশী' বিচারের রায়ই হয় চূড়ান্ত রায়। অপরাধী শেষ পর্যন্ত অপরাধ স্বীকার না করলে বা বিচার না মানলে তাকে যে কোন উপায়ে এই শেষ বিচার মানতে রাজী করান হয় এবং প্রয়োজন বিশেষে যে কোন ধরনের শাস্তি প্রদানে অপরাধীকে শায়েস্তা করা হয়। গ্রামের যে সব লোক এই ধরনের অপরাধীর পক্ষ অবলম্বন করে অপরাধী সহ তাদেরকে এই বিচারে সমাজচ্যুত করা হয়। এধরনের বিচার-সভা একমাত্র সামাজিকতা ভংগ ও মারাত্মক সামাজিক অপরাধে অপরাধীদের ক্ষেত্রেই অনুষ্ঠিত হয়। কারণ সাধারণ অপরাধে যখন তখন এ ধরনের বিচার সভার আয়োজন করা যে সম্ভবপর নয় তা সহজেই অনুমেয়। বর্তমান সমাজে এই ব্যবস্থা পরিচালনা অসম্ভব হওয়ায় ঐ পদ্ধতি এখন প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে।

চাঁই সমাজে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রত্যেকের জন্যই ভিন্ন ভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান ও আনন্দের ব্যবস্থা আছে। এই আনন্দানুষ্ঠানগুলোও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। যেমন ছোট ও মাঝারি ধরনের ছেলেরা পৌষ মাসে সারা মাস বড় বড় লাঠি হাতে প্রতি রাতে বাড়ী বাড়ী 'ভালভুল' ওদের কথায় 'সাঁকোল' গান গায় ও দান নেয়। এবং পৌষ সংক্রান্তিতে সারা মাসের সঞ্চয় দ্বারা 'সোনরায় ঠাকুরের' পূজা করে, পূজা শেষে প্রত্যেকে পূজার প্রসাদ হিসেবে চিড়া-মুড়ি মুড়কি খই প্রভৃতি মিষ্টান্ন সহযোগে একত্রে খায় ও আনন্দ করে। তেমনি ছোট মেয়েরা বন্যার সময় একটি নির্দিষ্ট দিনে তাদের 'কানিয়া-ভাসা পর্ব' পালন করে। এখানেও ছোট ও মাঝারি বয়সের মেয়েরা গান গাইতে গাইতে কলাগাছের বাকলের নৌকা তৈরী করে ফুল ফল দিয়ে সাজিয়ে এবং তার ভেতর হলুদ রঙা একটি কাপড়ের পুঁটলির কাল্পনিক কন্যা তৈরী করে বন্যার জলে ভাসাতে যায়। যেতে যেতে সুর করে গান গায়, গানটি বেশ মজার এবং শ্রুতিমধুর। একটি গানের কিছুটা অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি—কানিয়া গে...গুড়িয়া গে, মাট্টিকে তলতল যাইহ্যান গে ওথরি দেবাও সামান্ট দেবাও চূড়া কুট-কুট খ্যাইয়্যান গে'...ইত্যাদি। এই গানগুলোকে ওরা বলে কানিয়া ভাসানের গীত'। হাঁটু জলে গিয়ে স্রোতের দিকে মুখ রেখে ওরা ঠেলে দেয় নৌকাটি এবং ভাসানান্তে প্রসাদ খেয়ে বাড়ী আসে।

আবার বড় মেয়েরা পৌষের প্রারম্ভে রাত্রে ঘুমানোর আগে রোজ নিজেদের গ্রামের মধ্যে গীত গেয়ে গেয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে এবং গ্রামের বাইরে নির্দিষ্ট একটি জায়গায় কিছুটা জংলী ঘাস সবাই মিলে পায়ে মাড়িয়ে দেয়। এইরকম পাঁচ বা সাতদিন করার পর তারা একদিন রাতে মাঠের মধ্যে গিয়ে পিঠে তৈরী করে এবং পূজা শেষে ঐ পিঠে সবাই মিলে খেয়ে বাড়ী আসে। মেয়েদের এই পর্বের নাম জংগল-থাঁসা। তাছাড়া মেয়েদের আরও পর্ব আছে যেমন—'ঘ্যাড়ী' পরব, 'করমা-ধরমা পরব', 'জিতিয়া পরব' ইত্যাদি। মেয়েদের মত ছেলেদেরও ছোটখাট অনেক অনুষ্ঠান আছে। এদিকে বড় পুরুষরাও বাদ যায় না। ওদের আনন্দ অনুষ্ঠান হয় গোটা ফাল্গুন ও চৈত্র মাস ধরে। ফাল্গুন হোলি গান ও পরব। চৈত্র মাসে সারা চৈত্র মাস তারা ঢাক ও নানাবিধ বাদ্য সহযোগে শিবের ভক্ত হয়ে গ্রামে গ্রামে নেচে বেড়ায় ও ভিক্ষা সংগ্রহ করে এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের পূজা দেয়। নানান রকম নিয়মকানুনের মাধ্যমে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই পূজাকে বলে গম্ভীরা পূজা। এই পূজাতে শিবকে উদ্দেশ্য করে যেসব গান গাওয়া হয় তাকে বলে গম্ভীরা গান। গম্ভীরাতেই চাঁই পুরুষদের আনন্দ বেশী এবং এই আনন্দের প্রকাশ ঘটায় গম্ভীরা গানের সঙ্গে সঙ্গে তাদের স্বরচিত আলকাপ গানের মাধ্যমে। চাঁই সমাজের হোলি গান বিশেষ করে মালদহের গম্ভীরা ও আলকাপ গান লোকসংগীত হিসাবে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মালদহের যেসব অঞ্চলের এই উৎসব ও গান জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হত সেই অঞ্চলগুলি দেশবিভাগের পরে রাজশাহী জেলার অন্তভুক্ত হওয়ায় ওদিকটাতে এই উৎসবের ভাটা পড়েছে তবে এখনও মালদহের নানান অঞ্চলে গম্ভীরা পূজা বেশ জাঁক-জমকের সংগেই অনুষ্ঠিত হয় এবং গম্ভীরা পূজা তথা অন্যান্য দেব-দেবীর পূজাতেও আলকাপ গান হয়ে থাকে। গম্ভীরা ও আলকাপ গানকে চাঁই সম্প্রদায়ের অনেকেই আবার নিজেদের সমাজের সম্পদ বলে দাবী করে। যদিও তাদের এ দাবি এক বাক্যে মেনে নেওয়া যায় না তবে ওদের এই উক্তি সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা ও গবেষণার কিছুটা অপেক্ষা রাখে।

শুধু পৃথকভাবেই নয় একত্রে আবাল-বৃদ্ধবনিতার ও আনন্দ উপভোগ করার পর্বও এদের মধ্যে আছে যেমন 'মুঠ লওয়া'। এই পর্বটিতে ওরা প্রত্যেকেই আনন্দ করে এবং ভাল ভাল খাবার তৈরী করে একত্রে সবাই মিলে খায়। এই পর্বটি গৃহস্থ বছরের প্রথমদিন ধান বোনা উপলক্ষে পালন করে। তাছাড়া এদের মধ্যে এই ধরনের অনেক ছোটখাট পর্ব লক্ষ্য করা যায় যা অন্যান্য জাতি থেকে স্বতন্ত্র।

পর্দার আড়ালে তুমি ।।

রাজলক্ষ্মী দেবী

যেমন মন্ত্রিরা যান গট্‌গট্‌ শব্দে,—পাথরের
প্রতিমূর্তি, পর্দা-ঢাকা, নিশ্চুপ আকৃতি নিয়ে থাকে
তাঁদের হস্তের স্পর্শ-প্রত্যাশায়,—আমি সেইভাবে
তোমাকে জানতে চেয়ে, তোমাকে বুঝতে চেয়ে, শব্দের বোতাম
টিপছি। হ্যাঁচকা টানে চেয়েছি প্রত্যক্ষ উদ্‌ঘাটন।

পর্দার আড়ালে তুমি। বিবস্ত্র, সজীব, স্পন্দমান।
আমাকে ভীষণ চেষ্টা করতে হবে। এমন সম্মান
দিতে হবে যুদ্ধের মাধ্যমে। যে-তুমি আড়ালে,
তাকে জানা, তাকে বোঝা যায় না ইচ্ছার মৃদু আঙুল বাড়ালে।
সর্বাঙ্গে ইচ্ছারা যদি মাংসপেশী হ'য়ে যুদ্ধ করে,
শুধু তবেই পর্দা সরে।

সে, যেন বাউল ।। কালীকৃষ্ণ গুহ

সে এই পথ দিয়ে হেঁটে গেছে, শীতের ভোরে, যেন
বাউল।

অসংখ্য আকন্দফুল ফুটেছিলো, কাশফুলে ছেয়ে গিয়েছিলো
মাঠ, যেন

মুমূর্ষুর কাছে প্রার্থনা

ছড়িয়ে পড়েছে।

আর কোনো ভয় নেই আমার, আর কোনো ব্যর্থতা
নেই, শুধু
মাঠের মধ্যে বাউল শুয়ে রয়েছে, এই আনন্দ
লুটিয়ে থাকতে থাকতে বলবো :

হে জবাকুসুম সূর্য, তাকে আর ফিরে পাবো না কোনোদিন।

হাইওয়ে থেকে ।। ভাস্কর দাশগুপ্ত

বসে আছি একা সমাগত সন্ধ্যায়
কাক্‌টাস ভরা টেক্‌সাস পদতলে,
শহর মিনারে হাজার তারার মালা
শিথিল ছন্দে দোলে মিসিসিপি জলে।

দেবি! তুমি বল আর কতকাল রবে
গ্রানাইট ঘেরা সুকঠিন ব্যূহমাঝে,
ভেদ করে সীমা অর্জুন গাণ্ডীব
অমল রক্তে টঙ্কার তার বাজে।

অজ্ঞাতবাস শেষ হ'ল তবে বুঝি
লেসার রশ্মি হৃদপিণ্ডের কানে,
কি কথা বলেছে ফোটনের সংলাপে
ডিভানে ছায়ারা বিস্তৃত অভিমানে।

এপ্রিল আনে মিয়ামীর আহ্বান
উত্তুরে হিমে বার্চের পাতা ঝরে,
হাইওয়ে থেকে মোটরের হর্ণ বাজে
দেবি! তুমি কবে আসছ বুকের পরে?

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

নভোচারী দার্শনিক

উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে আকাশচারী এরোপ্লেনের আবির্ভাব ঘটে। আর প্রায় সেই সঙ্গে জন্ম হয় ফরাসী উপন্যাস-লেখক, প্রবন্ধকার এবং বৈমানিক আঁতোআন দ্য-সাঁ-জ্যুপেরীর। ১৯৪০-এর মধ্যে এরোপ্লেনের সম্পর্ক আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। আধুনিককালের অঙ্গ এরোপ্লেন, আর সেই বিচিত্র কালের প্রবক্তা হলেন সাঁ-জ্যুপেরী।

এই পথিকৃৎ পাইলট তাঁর প্রথম মনোপ্লেন চালনা করেন যখন তাঁর বয়স মাত্র এগারো, এবং প্রথম কবিতা লিখেছেন সাত বছর বয়সে। তারপর তাঁর জীবনে দুটি মাত্র জিনিস ভালোবাসার বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। একদিকে বিমান-বিহার, অন্য দিকে সুকুমার-সাহিত্য বা 'বেলে-লেতারস'। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে সাঁ-জ্যুপেরীকে 'গ্রাণ্ড প্রিক্স ফেমিনা' পুরস্কারে সম্মানিত করা হয় তাঁর উপন্যাস 'নাইট ফ্লাইটে'র জন্য এবং ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর 'উইনড-স্যাণ্ড-অ্যাণ্ড স্টারস' নামক গ্রন্থটি ফ্রেঞ্চ একাডেমীর 'গ্রাণ্ড প্রিক্স' পুরস্কার লাভ করে। এই সঙ্গে সারা বিশ্বজগতে সাঁ-জ্যুপেরীর সাহিত্যিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেল।

এই সব সাহিত্যিক ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যেই সাঁ-জ্যুপেরী সর্বপ্রথম ফ্রেঞ্চ এয়ার মেল সার্ভিস সাউথ-আমেরিকা, আফ্রিকা ও ইন্দো-চীনে নিয়ে গেলেন, ফরাসী ফ্লাইং-বোট 'লেফটেন্যান্ট দ্য ভাইসো প্যারিস'-এর প্রথম যাত্রায় তিনি ছিলেন সহ-পাইলট। এই যাত্রায় ফ্রান্স থেকে আমেরিকায় গিয়েছিল ফ্লাইং বোটটি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি একজন এয়ার-রেকোনাইসান্স অফিসর হিসাবে কাজ করেন। যখন ফ্রান্সের পতন ঘটল তখন তিনি যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। আমেরিক্যানরা যখন নর্থ আফ্রিকায় পদার্পণ করল তখন সাঁ-জ্যুপেরী আবার ফ্রান্সের জন্য এয়ার-মিশনের কাজে যোগ দিলেন।

১৯৪৪-এর জুলাই মাসে বিশ্বের মানুষ গভীর দুঃখের সঙ্গে সংবাদ পেল যে বিমান যুগের এই দার্শনিক কবি আঁতোআন-দ্য-সাঁ-জ্যুপেরী ভূমধ্যসাগরের বুকে বিমান চালনার সময় অদৃশ্য হয়েছেন।

'উন সেন্স আ-লা ভাই' নামক তাঁর মরণোত্তর গ্রন্থটি 'এ সেন্স অব লাইফ' নামে কিছুকাল পূর্বে ইংরাজী ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। এই পাঁচ মিশেলী রচনার মধ্যে সাঁ-জ্যুপেরী চরিত্র ও চিত্র পরিস্ফুট। মানুষ ও দার্শনিক লেখক সাঁ-জ্যুপেরীর মূর্তি প্রকাশিত। এই গ্রন্থটি ইংরাজীতে অনুবাদ করেছেন আদ্রিয়েন ফ্যুলকে।

চিন্তাশীল ও সুলিখিত যে সব প্রবন্ধ মরণোত্তর কালে সঙ্কলিত ও প্রকাশিত হয়েছে তা লেখকের সমগ্র জীবনের সাহিত্য-সাধনার ফসল। এই সব রচনার মধ্যে ছড়ানো আছে প্রখ্যাত বৈমানিক-দার্শনিক লেখকের জীবনের পরিচয়। ব্যক্তি হিসাবে প্রতিটি মানুষের মধ্যে যে প্রচণ্ড শক্তি বর্তমান, তার প্রতি বিশ্বাস এবং মনুষ্যত্বের ব্যক্তিত্ব সেখানে অন্তর্দর্শনের মধ্যে প্রকাশিত।

সাঁ-জ্যুপেরী রাশিয়া, কিম্বা স্পেন বা য়ুরোপের আসন্ন সমরসম্ভাবনা প্রসঙ্গে অথবা বিমান চালনা বিষয়ে যত কিছু লিখেছেন তার মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তি সুস্পষ্ট। বিভিন্ন ব্যক্তিমানসের প্রভাবেও তাঁর চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গী প্রভাবিত। সমাজ ও ব্যক্তির প্রেক্ষাপটে তিনি মন্তব্যও করেছেন কম নয়। তাঁর বিশ্বাস, মানবসমাজের সহজাত প্রবণতা হল উন্নয়ন অভিমুখী, সবাই চায় প্রকাশিত হতে প্রস্ফুটিত হতে।

যুদ্ধ এবং প্রচণ্ডভাবে শিল্পোন্নত বিশ্বসমাজ মানবসমাজের সর্বপ্রধান শত্রু। তার শক্তি প্রচণ্ড। এই হল সাঁ-জ্যুপেরীর একক জেহাদ প্রচেষ্টা। মানুষ তার জীবনের যথাযথ মানে বুঝে নিক, এই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য।

এই গ্রন্থের প্রথমেই আছে 'অ্যাভিয়েটার'। সাঁ-জ্যুপেরীর প্রথম জীবনের রচনার নিদর্শন। 'লা ইভেসান দ্য জ্যাকোস বেরানিস' নামক তাঁর প্রথম জীবনের এক উপন্যাসের অংশবিশেষ। সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে গেছে। যা পাওয়া গেছে তা হল জাঁ-প্রেভোস্ট কর্তৃক নির্বাচিত সামান্য কিছু অংশ। 'লে নাভিরে দ্য আরজে' নামক পত্রিকায় ১৯২৬-এর এপ্রিলে এইটুকু প্রকাশিত হয়।

জাঁ প্রেভোস্ট ভেরকোরসে যুদ্ধের সময় নিহত হয়েছেন। ভেরকোরস পর্বতমালা ফরাসী প্রতিরোধ বাহিনীর কাছে এক প্রাকৃতিক কেল্লার মত ছিল। সাঁ-জ্যুপেরীর নিরুদ্দেশের ঠিক পরদিনই মিত্র বাহিনীর পরিবেক্ষণের কালে এক বিমান দুর্ঘটনায় প্রেভোস্টের মৃত্যু হয়।

'দি এভিয়েটার' যখন অংশত প্রকাশিত হয় ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে তখন সেই প্রসঙ্গে প্রেভোস্ট নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন :

'সাঁ-জ্যুপেরী বিমান চালনা ও মেক্যানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ বিশেষজ্ঞ। তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে বন্ধুদের বাড়িতে, এবং বিমানচালক হিসাবে তাঁর অভিজ্ঞতা প্রকাশের মধ্যে যে বলিষ্ঠতা এবং সূক্ষ্মতা প্রকাশ পেয়েছে তা আমার কাছে প্রশংসাযোগ্য মনে হয়েছে। যখন শুনলাম যে তাঁর অভিজ্ঞতা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তখন তা পড়বার জন্য বিশেষ উদগ্রীব হয়ে উঠলাম। তিনি তাঁর প্রথম খসড়াটি হারিয়ে ফেলেছেন। স্মৃতিনির্ভর করে তিনি লিখেছেন মনে হয় (কোন কিছু কাগজপত্রে লেখার আগে তিনি মাথায় সমস্ত ব্যাপারটি চিন্তা করে নেন) এবং পরে তা কাহিনীতে রূপায়িত করেছেন। তারই কিছু অংশবিশেষ এখানে প্রকাশিত হল। উদীয়মান লেখক হিসাবে তাঁর মধ্যে যে স্পষ্টতা এবং সত্যনিষ্ঠা লক্ষ্য করেছি আমার কাছে তা বিস্ময়কর মনে হয়েছে...'

জ্যাকোস বেরনিস নামক এক বৈমানিকের বিমান চালনার অভিজ্ঞতাব কাহিনী এই উপন্যাসের উপজীব্য। এই কাহিনীর শেষ অংশের অনুবাদ :

'বেরনিস মাতাল হয়েছে।

আর এক আসন-বিশিষ্ট সন্ধানী বিমানটি বিদ্যুতের চেয়েও দ্রুতগতিতে উড়ে চলেছে। নীচে পৃথিবী অতি কুশ্রী মনে হচ্ছে। জীর্ণ, ছিন্ন, যেন জোড়াতালি দেওয়া সেলাই করা—যত দূরে দৃষ্টি যায় অজস্র ন্যাশজলের মত ছড়ানো আছে।

তের হাজার ফিট...বেরনিস একা। সে নীচের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছে। যেন য়ুরোপের মানচিত্র। গমের ক্ষেতের হরিদ্রাভ রঙ, ক্লোভার নামক ত্রিপত্র উদ্ভিদের লাল রঙ—মানুষের গর্ব আর কামনা সব ঘেঁষাঘেঁষি-পাশাপাশি। কঠিন এবং বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন। হাজার হাজার বছরের কলহ, ঈর্ষা আর মামলা-মোকদ্দমার ফলে সীমানার বেড়া দেওয়া হয়েছে, মানুষের আনন্দ বৃদ্ধি পেয়েছে।

নিজের এই নেশাগ্রস্ত আচ্ছন্ন অবস্থাকে আর যে সব চিন্তা লালন করলে স্ফূর্তি বাড়ে সেই সব অর্থহীন চিন্তায় মনকে আচ্ছন্ন করে নেশার আবেশ আর বাড়াবে না। এখন নিজের শক্তি থেকে জ্বালানি সংগ্রহ করতে হবে। সেই শক্তির সে পরিমাপ করে।

এবার বিমানের গতি বৃদ্ধি করে সে। এই তার শক্তির আধার। বিমানের থ্রটলটাকে খুলে দেয় আর জয়স্টিক'টা ঠেলে দেয়। দিগন্ত টলটলায়মান। মাটি সাগরতরঙ্গের মত মিলিয়ে যাচ্ছে—বিমান গর্জন করে এগিয়ে চলেছে আকাশের দিকে। অধি-বৃত্তের চূড়ায় পৌঁছে সে ধাক্কা পায়—তারপর মরা মাছের মত পেটটা ওপর দিকে ভাসিয়ে শূন্যে ভেসে বেড়ায়।

আকাশের গভীরে ডুব দিয়ে বিমান-চালক দেখে তার ওপরকার পৃথিবী যেন সমুদ্রবলয়ের মত মিলিয়ে যাচ্ছে। হোঁচট খাচ্ছে, পাক দিচ্ছে।...ইঞ্জিনটা ছেড়ে দেয়, পৃথিবীটা স্থির হয়ে আছে, নিশ্চল। যেন একটা প্রাচীরের মত ঋজুভাবে প্রলম্বিত। বিমানটি ওলন দড়ির মত ঝুলছে—কিন্তু বেরনিস মৃদুভাবে তাকে টেনে ধরে। তার সামনে দিগন্তের শান্ত হ্রদ প্রসারিত।

...চিরবাধ্য ইঞ্জিনটা গর্জন করে, ঝিমিয়ে পড়ে আবার জ্বলে ওঠে। বাঁদিকের ডানা নীরস আঘাতে অচল। বিমানচালক এক বিশ্বাসঘাতক কৌশলের শিকারে পরিণত। তার ভিতর থেকে সমস্ত বাতাসটুকু যেন টেনে নেওয়া হয়েছে। কম্পিত ও ঘূর্ণিত বিমানটি এখন ঘূরপাক খেয়ে নীচে পড়ছে।

দিগন্ত ওর ওপর একটা ওড়নার মত ছড়িয়ে পড়ছে। ঘূর্ণমান পৃথিবী যেন ওর দিকে এগিয়ে আসছে। সমস্ত বনভূমি প্রকাশিত। কত ঘণ্টাঘর, কত তোরণ, কত মাঠ সব একটা আচ্ছন্ন ও আবিষ্ট নৃত্যের ভঙ্গীতে এগিয়ে আসছে।

বিমানচালক একটা শাদা বাড়ি দেখতে পায়। গাছ-পালার পত্র-পল্লবের ফাঁকে ধরা পড়েছে। ডুবুরিকে সাগর যেমন ঘিরে ধরে—এই নিহত বিমানচালকের দিকে মাটি তেমনই বায়ু কলোচ্ছ্বাসে এগিয়ে আসছে।'

এই গোড়ার দিকের রচনায় মধ্যে লেখকের স্বকীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়, কল্পনার মধ্যে যে বৈচিত্র্য আছে তা সহজেই নজরে পড়ে।

আগামী বারে সাঁ-জুপেরীর এই গ্রন্থ-ভুক্ত অন্য কিছু রচনার পরিচয় দেওয়া হবে।

—অভয়ংকর

A SENSE OF LIFE—By ANTOINE DE SAINT-EXUPERY Translated from the French by ADRIENNE FOULKE Published by by FUNK & WAGNALLS COMPANY: INC NEW YORK.

বাংলাদেশের হৃদয় হতে ।। এতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে নিয়মিতভাবে কোন নাট্য পত্রিকা বেরুতো না। সম্প্রতি সে অভাব দূর হয়েছে কিছুটা। বেরিয়েছে নতুন নাট্য সম্পর্কিত কাগজ। নাম তার 'থিয়েটার'। প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছে কয়েক দিন আগেই 'মুনীর চৌধুরী' স্মারক সংখ্যা হিসেবে। আন্তরিকতায় প্রাণবন্ত এই সংখ্যাটিতে লিখেছেন বাংলাদেশের কয়েক-জন খ্যাতনামা কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার ও অধ্যাপক। মূল্যবান এ সঙ্কলনে বিশেষ-ভাবে নীলিমা ইব্রাহিম, শামসুর রহমান, কবীর চৌধুরীর রচনা বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বিশেষ।

আফ্রিকার কণ্ঠস্বর ।। বছর নয়েক ইংরেজিতে বেরিয়েছিল একটি সঙ্কলন-গ্রন্থ। পোয়েমস ফ্রম আফ্রিকা। সম্পাদনায় ছিলেন কৃষ্ণকায় মার্কিনী লেখক ল্যাংস্টন হিউজ। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এই বইটির চাহিদা হয়েছিল অসম্ভব। ইংরেজ ভাষা-ভাষীদের কাছে পেয়েছিল অসামান্য জন-প্রিয়তা। তথ্যমূল্যও ছিল অসাধারণ। সম্প্রতি সেটি আবার বেরিয়েছে তবে নতুন চেহারায়, নতুন ভাষায়। 'গেডিশটে আউস আফ্রিকা' প্রকাশিত হয় জি ডি আর থেকে, জার্মান ভাষায়। ১৫টি আফ্রিকান ভাষার লোকগীতি এবং ২০টি দেশের নিগ্রো কবি-দের রচনায় পুষ্ট এই সংকরণে পাওয়া যাবে আফ্রিকার মানুষের নানান উত্থান-পতন, ক্ষোভ-ক্রোধ, শোক-দুঃখ-ভালোবাসা এবং সংগ্রামী চেতনার পরিচয়। এক কথায় কালো হীরের টুকরো সব আফ্রিকান জনগণের কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত 'গেডিশটে আউস আফ্রিকা'য়।

খ্যাতনামা সেই মানুষটি ।। আমে-রিকার খ্যাতনামা সাংবাদিক ও লেখক নরম্যান কাজিনস হলেন সেই সব মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীর অন্যতম যাঁরা মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রে সব সময়েই ছিলেন ভারতের বন্ধু। এবং আজো আছেন। এ পর্যন্ত চার-চারবার ঘুরে গেছেন তিনি ভারতবর্ষ। প্রথম ভ্রমণের ফসল 'নেহরুর সঙ্গে কথাবার্তা'। মহাত্মা গান্ধীর জন্মশতবর্ষে প্রকাশিত তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ 'প্রোফাইল অব গান্ধী : আমেরিকা রিমেমবার্স এ ওয়ার্ল্ড লিডার' আর একটি মূল্যবান সঙ্কলন। ২৩৬ পৃষ্ঠা-ব্যাপী এই বইখানা সাজানো-গোছানো হয় গান্ধীজীর কর্মবহুল জীবনের বহু নাটকীয় ঘটনার ছবি দিয়ে। দীর্ঘ ৩১ বছর ধরে তিনি ছিলেন 'স্যাটারডে রিভ্যু' সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক। বছর খানেক হলো সব সম্পর্কই চুকিয়ে-বুকিয়ে দেন তিনি পত্রিকাটির সঙ্গে। এ বছরের ৪ জুলাই বের করেন নতুন কাগজ। নাম তার 'ওয়ার্ল্ড'।

নেহরু জীবনী ।। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর একটি তথ্যপূর্ণ ঐতিহাসিক জীবনীগ্রন্থ রচনার ভার নিয়েছেন ডঃ এস গোপাল। দিল্লীর নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের তিনি অধ্যাপক। দায়িত্ব অর্পণ করেছেন জওহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল ফাণ্ড। এই গ্রন্থে একদিকে যেমন থাকবে ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামের অন্তঃসার অন্যদিকে থাকছে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের প্রথম সতেরো বছরের কাহিনী। বলা বাহুল্য, কয়েক খণ্ডে প্রকাশিতব্য ঐতিহাসিক জীবনী-কাহিনীর প্রথম অংশ বেরুবে ১৯৭৪-এর মধ্যেই।

কলকাতা নিয়ে ।। কলকাতার সে সময় ঝোড়ো হাওয়া। তবু তারই মধ্যে অন্যতম প্রাণবন্ত শহরে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মাঝে মধ্যে হোঁচট খেলেও কলকাতার জীবনযাত্রা কখনোই অচল হয় নি শত ঝড়-ঝাপ্টার মধ্যে। এ রকম হাজার অনুষ্ঠানের ভেতরই এক সময় হয়েছিল এক আলোচনাচক্র অর্থাৎ সেমিনার। উপলক্ষ অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর ৭০তম জন্মজয়ন্তী পালন। পাঠ করা হয় অনেকগুলি রচনা। শেষ পর্যন্ত সেই সব মূল্যবান রচনাকেই একসূত্রে গেঁথে ফেললেন ডঃ সুরজিৎ সিংহ। সম্পাদিত এই গ্রন্থেরই নাম হল 'কালচারাল প্রোফাইল অব ক্যালকাটা'। বলাই বাহুল্য, কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবন থেকে শুরু করে প্রায় সবরকম সমস্যার উপরেই লেখা বিচিত্র সব প্রবন্ধ রয়েছে এই সঙ্কলনে। নানান চোখের আলোয় ফুটে উঠেছে আজকের কলকাতার চালচিত্র, যে কলকাতা নিজেই নিজের কাছে অনেক সময় বিস্ময়।

লাতিন আমেরিকার কণ্ঠস্বর ।।

দক্ষিণ আমেরিকার উপন্যাসে চলছে নাকি পুনর্জাগরণের পালা। অথচ তার ঢেউ আমাদের দেশে এখনো এসে ঠিক পৌঁছয়নি। যদিও ধ্রুপদীরীতির বা পরীক্ষাপন্থী লেখকদের নাম সাহিত্য-রসিকদের কাছে আদৌ অপরিচিত নয়।

তবু চমকে উঠতে হয় মাঝে মাঝে। কেবল গত বছরের মধ্যেই পাঁচ-পাঁচটি অসাধারণ উপন্যাস লিখেছেন ওখানকার কথা-সাহিত্যিকেরা। প্রথম দুটোর লেখক যথাক্রমে লুই বোর্হেস (আর্জেন্টিনা) ও মিগুয়েল এঞ্জেল অস্তুরিয়াস (গুয়াতেমালা)। এঁরা বয়সে প্রবীণ। কিন্তু গুইলার্মো কাব্রেরা ইনফান্টে (কিউবা) ও ম্যানুয়েল পুইগ (আর্জেন্টিনা) বয়সের চমক দিয়ে সবে ছুঁয়েছেন মাত্র চল্লিশ। পঞ্চম ঔপন্যাসিক গ্যাব্রিয়েল গার্থিয়া মারকুয়েজ (কলম্বিয়া) শেষোক্তদের সমবয়সী হলেও ইতিমধ্যে লিখে ফেলেছেন একটি আলোড়নকারী উপন্যাস। তাঁর 'ওয়ান হাণ্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিচুড' মাস্টারপিস বলেই পেয়েছে স্বীকৃতি।

গুয়াতেমালার অস্তুরিয়াসের আবির্ভাবের ইতিহাসও চমকপ্রদ। ১৯৬৪ সালে, তিনি তাঁর আত্মপ্রকাশের প্রায় তিরিশ বছর বাদে, পুনরায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন 'এল সেনর প্রেসিডেন্ট' উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে। তখন তাঁর 'মুলাতা দ্য টল' প্রকাশকের অভাবে ছাপা হয়নি তিন বছর। এবং এই উপন্যাসই তাঁকে দিয়েছে বিপুল জনপ্রিয়তা। অস্তুরিয়াস নোবেল পুরস্কার পান গ্রন্থ প্রকাশের বছরেই। বর্তমানে তিনি গুয়াতেমালার রাষ্ট্রদূত হিসেবে রয়েছেন ফ্রান্সে। তাঁর সাম্প্রতিক বই 'দি-গ্রীন পোপ' লেখা হয়েছে রেড ইণ্ডিয়ান মিথ আর ডাইনিদের কাহিনীকে আশ্রয় করে।

নতুন পথের যাত্রী (উপন্যাস)—দেবব্রত ভট্টাচার্য। দীপায়ন, টেমার লেন, কলকাতা ৯। দাম ঃ ছয় টাকা।

বিষয় ঃ জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ। এবং স্বাধীনতা-উত্তর কালের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন। বর্ধমান জেলার বসুগ্রামের জমিদার কীর্তিধর বসুর পরিবারকে কেন্দ্র করে কাহিনীর সূত্রপাত। কিন্তু কাহিনী এগিয়েছে, জমিদারী ঐতিহ্যের রাজপথে নয়, শ্রমিক-আন্দোলন, প্রেমের উত্থান-পতন, মানবিক মূল্যবোধ ইত্যাদির জটিলতর ঘটনাকে অবলম্বন করে। তার নায়ক বিপ্লব, এবং নায়িকা এমন একটি তরুণী, যার মেজাজমর্জি এই সময়কেই বিশদ করেছে সর্বাধিক। তার নাম সর্বাণী। লেখক বিভিন্ন ঘটনার সমাবেশে একটা বিষয় স্পষ্ট করতে পেরেছেন যে, দীর্ঘকাল-পোষিত সংস্কারে ও বিশ্বাসে, আমরা এখনো আগের মতই। পরিবর্তন এসেছে উপরিস্তরে। এটাই এ-উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য-নির্ধারক। নাহলে ঘটনার উপস্থাপনে, কাঠামো নির্মাণে, সংলাপের বিশ্বাসযোগ্যতায়, লেখকের কৃতিত্ব সামান্য।

সংক্ষিপ্ত কৃষিবিজ্ঞান (আলোচনা)—মুরারিপ্রসাদ গুহ অনূদিত ও শ্রীমতী শান্তি ঘোষ সম্পাদিত। ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ, নতুন দিল্লী। দাম ঃ ১৪·৭০ টাকা।

আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান। কৃষকেরা এখনো অনেকেই সাক্ষর নন। প্রকৃতির মেজাজমর্জির ওপর অসহায়ভাবে নির্ভরশীল হয়েই তাঁরা চাষবাস করে আসছেন আজীবন। এর যে অন্য কোনো তাৎপর্য থাকতে পারে, তাও যেন তাঁদের কাছে অজ্ঞাত। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টির নিত্যনৈমিত্তিক উৎপাতও তাঁদের কাছে দেবতার অভিশাপ বলেই মনে হয়।

'সংক্ষিপ্ত কৃষিবিজ্ঞান' বেরিয়েছে, ঠিক এই পটভূমিকাকে স্মরণ করে। চাষীরা যদি বৈজ্ঞানিক ধারণায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে যে-জল, মাটি এবং আবহাওয়ার ওপরে চাষবাস নির্ভরশীল, তাকে বুঝতেও তাঁদের সুবিধা হবে—এই কথা ভেবে।

এদিক থেকে বইটির প্রয়াস সার্থক।

এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে 'আবহাওয়া ও ফসলের' পারস্পরিক সম্পর্ক। এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য-বিষয় 'মাটি'। বুঝতে অসুবিধা হয় না, কতটা সূর্যালোক, কিরকম আবহাওয়া এবং কোন্ মাটির কোন্ গুণে কি ফসল ফলানো সম্ভব। এমনকি নিস্তেজ মাটিকে সক্ষম ও শক্তিশালী করে তুলতে হলে, যখন যে-রকম সারের ব্যবহার দরকার, তারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে। অন্যান্য অধ্যায়গুলিতে আলোচিত হয়েছে, ফসলের চাষ, সংরক্ষণ, বাগানের উন্নতি, সেচ ব্যবস্থা প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে।

বইটি কৃষক ও কৃষিবিজ্ঞানী, সকলের কাছেই অপরিহার্য বলে মনে হবে। ভাষা সহজ, সরল। তত্ত্ব ও তথ্যে সমৃদ্ধ।

নজরুল কাব্য-সমীক্ষা (প্রবন্ধ)—আতাউর রহমান। মুক্তধারা, ৯ এ্যাণ্টনি বাগান লেন, কলিকাতা ৯। মূল্য ঃ নয় টাকা

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় তাঁর কাব্য ও জীবন সম্পর্কে যে পরিমাণ গ্রন্থ লিখিত হয়েছিল, বিদ্রোহী কবি নজরুলের উপর সে-পরিমাণ গ্রন্থ লিখিত না হলেও সংখ্যায় সেগুলি স্বল্প নয়। বিশেষ ক নজরুলের উপর মুজফ্ফর আহ সাহেবের তথ্যবহুল গ্রন্থ ও ডঃ সুশী গুপ্তের গ্রন্থ কবির জীবন ও কাব্যের দিগ দর্শনে বিশেষ সাফল্যের প্রকাশ।

আলোচ্য গ্রন্থ 'নজরুল কাব্য-সমীক আতাউর রহমান সাহেবের নজরুলের কা সম্ভারের উপর একটি মূল্যবান আলো পাত। এই গ্রন্থের ভূমিকায় রাজসা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যা মযহারুল ইসলাম যে-কথা বলেছেন, আ এই গ্রন্থ সম্পর্কে সর্বতোভাবে তাঁর স একমত। তিনি বলেছেন, 'এ-গ্রন্থ নজর জীবনের ঘটনাপঞ্জীতে আচ্ছন্ন নয়, ত পরিবেশনের চেয়ে বিচার-বিশ্লেষণের প্র লেখকের সজাগ দৃষ্টি গ্রন্থের প্রথম থে শেষ অবধি বিদ্যমান।' অবশ্য কেবল জীবনের ঘটনাপঞ্জীই যে এই গ্রন্থের বি বস্তু নয়, তা গ্রন্থের নামকরণের ম ব্যক্ত হয়েছে।

কিন্তু তাহলেও, নজরুলের জন্ম থেকে বর্ষানুক্রমিক জীবনের বৈশিষ্ট্যপ ঘটনাসমূহ দিয়েই এই গ্রন্থের সূচনা হ এবং পরিশিষ্ট ও নির্ঘণ্টসহ কুড়িটি ম খান পরিচ্ছেদের মধ্যে গ্রন্থকার সম করেছেন তাঁর বক্তব্য। এর মধ্যে নজরু সাম্যবাদ, নজরুল-কাব্যে প্রকৃতি নজ সাহিত্যে রোমান্টিকতা ও প্রেম, নজরু আধ্যাত্মিকতা, সাম্প্রদায়িক সমস্যা নজরুল, নজরুল একজন নৈরাজ্য নজরুল-কাব্যের ভাব-প্রবাহ প্রভৃতি বি

মধ্যেয় পরিচ্ছেদগুলি আছে বটে, কিন্তু তদ্‌সহ গ্রন্থকার নজরুলের স্বাদেশিকতা, থবা বিপ্লববাদী নজরুল নামাঙ্কিত কটি পরিচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট করলে সম্ভবত জরুল চরিত্রের সর্বজনসমাদৃত একটি শেষ দিককে স্বতন্ত্রভাবে ব্যক্ত করার যোগ ঘটত। নজরুলের একটি চিত্রের ভাবও পরিলক্ষিত হয় গ্রন্থের মধ্যে।

ন্দ্য রাজধানী (কাব্যগ্রন্থ)—সাধনা মুখোপাধ্যায়। পরিবেশক ঃ দে বুক স্টোর, কলকাতা ১২। দাম ঃ তিন টাকা।

এই কাব্যগ্রন্থের মধ্যেও লেখিকার চিত্র মেজাজ কখনো ঘটনা-তাড়িত, খনো স্মৃতি-তাড়িত হয়ে অভিব্যক্ত য়েছে, একেকটি কবিতায়। হয়তো অনুন্ধিৎসু পাঠক এইসব বিচ্ছিন্ন অভিব্যক্তির ধ্যও একটা যোগসূত্র খুঁজে পাবেন, ন্তান্ত ভেতর থেকে। যথা তিনি জোড়াকো থেকে নিমতলার দূরত্বকে বিরাশি ছরের কাল-সীমায় পরিমাপ করেন, তখন বীন্দ্রনাথের অনুচ্চারিত নামটিই যেন সুস্পষ্টভাবে মনে পড়ে যায়। আবার যখন তনি 'রাস্তার চরিত্র' নিয়ে কবিতা লেখেন, খন 'সাবিত্রী লেনেতে' কোনো পণ্যারণীর খোঁজ না করে লক্ষ্য করেন, 'দেহের তানে গাছে ভনভন করে বহু মাছি।/ খন স্বর্ণমধু পুষ্পিত হয়, সেই 'ভয়ে' তনি শরীরের নাম রাখেন, সোনাগাছি।'

আসলে, সমকালীন মহিলা-কবিদের ধ্যে সাধনা মুখোপাধ্যায় বেশ রোম্যান্টিক। বং দুঃসাহসী। তাঁর পর্যবেক্ষণ নির্মোহ লছি না, অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ। শব্দের র্বাচনে, ঘটনার উন্ঘাটনে, কবিতার শরীর র্মাণে তাঁর দক্ষতা স্বীকৃতি পাওয়ার াগ্য। কবিতাগুলি পরিপূর্ণ গদ্যে রচিত য়। তবে গদ্যধর্মী।

কটি পড়লে, লেখিকা তাঁর নাগরিক রিবেশ সম্বন্ধে যে কতোটা সজাগ তা ষ্ট বোঝা যায়।

রাত্রির ছায়া। বরুণ মজুমদার। সাত্বিক সাহিত্য সংস্থা ১২০।১, রামকৃষ্ণপুর লেন, হাওড়া-২। দু টাকা।

তরুণ কবি বরুণ মজুমদার তাঁর াত্রির ছায়া' কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতায় লেছেন, 'আলোর গভীরে যাবো এ আমার াজীবন সাধ', আর একটি কবিতায় লেছেন—'আলোয় আলোয় আজ ভরে যাক াঁধার ভুবন' এবং আরো কয়েকটি কবিতায় বি তাঁর আলোর পিপাসার কথা বলেছেন। ই আলোক সন্ধানী কবি নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি পন্ন তাঁর আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে। 'হিরন্ময় বিন', 'অতৃপ্ত কামনা', 'স্মৃতির বেদনার', প্রেম ইত্যাদি বিষয় তাঁর কাব্যে ঞ্জলীলায় স্পষ্ট হয়। কিন্তু কবি-আত্মার লোর আর্তি প্রায় সব কবিতাতেই 'আলো' প্রয়োগে বড় ক্লান্তিকর। কবি-ব্যবহৃত , 'ইমেজ' গভীর অভিজ্ঞতার পরিচয় দেয় না। কবির কল্পনাক্ষমতা আছে। কিন্তু কাব্যের 'চিত্রকল্প' সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জনে যথেষ্ট যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন।

ব্রজবিদেহী সন্তদাস বাবাজী (জীবনী)—অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ। কলিকাতা পুস্তকালয়, ৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতাঃ ১২। দশ টাকা।

নিম্বার্ক প্রচারিত ধর্ম নিম্বার্ক সম্প্রদায় গঠন করেছে উত্তরকালে। নিম্বার্কের আবির্ভাবকাল সম্পর্কে মতবিরোধ থাকলেও সাধারণভাবে তিনি যে শংকর-রামানুজের পরবর্তী ও খৃষ্টীয় এগারো শতকে বর্তমান ছিলেন—একথা সকলেই মানেন। কথিত আছে, নিম্বার্ক ছিলেন বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রের অবতার। এই নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মতবাদ উত্তরকালে বৈষ্ণব ধর্মমতে গৃহীত হয়। নিম্বার্ক সম্প্রদায় বৈষ্ণব ধর্মমতের অন্যতম একটি শাখা। এই শাখার অন্যতম আচার্য হলেন সন্তদাস বাবাজী: এঁরই কথা আলোচ্য গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে। কিন্তু লেখক নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মতবাদ, অন্য মতের সঙ্গে এঁদের পার্থক্য ও পরিণতি—এসব প্রসঙ্গ আলোচ্য গ্রন্থে রাখেন নি। সন্তদাস বাবাজীর আদ্যোপান্ত জীবনবর্ণনা ও তাঁর ব্রজধাম ভ্রমণ ও কিছু অংশে ধর্মপ্রচার প্রয়াসই আলোচ্য গ্রন্থের মূল কথা। গল্পচ্ছলে লেখক সন্তদাস বাবাজীর জীবন-চিত্র এঁকেছেন। বিমাতার আশীর্বাদ নিয়ে সম্ভ্রান্ত তারাকিশোর, যিনি পরবর্তীকালে সন্তদাস বাবাজী হন, একদিন বৃন্দাবন যাত্রা করেন। সেখানে নতুন নিম্বার্ক আশ্রমের অধিকর্তা হন। এই বাবাজী একেবারে অর্বাচীন কালের সাধু। কিন্তু আধ্যাত্মিক ক্ষমতায় বলীয়ান। লেখক যেভাবে এঁর জীবনচিত্র এঁকেছেন, সর্বশ্রেণীর পাঠকের কাছে তা উপভোগ্য নিঃসন্দেহে।

শিলালেখ ঃ মিহির চৌধুরী (কামিল্যা) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বর্ধমান শাখা, বর্ধমান ১-৫০।

ষোলোটি কবিতার গুচ্ছ। শ্রীহরপ্রসাদ মিত্রের সংক্ষিপ্ত ভূমিকাটিতে এই নবীন কবির অনুভূতি ও প্রকাশক্ষমতার বিশিষ্টতা দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। কয়েকটি রচনায় যথার্থ প্রতিশ্রুতির লক্ষণ আছে।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

গ্রন্থজগৎ ঃ সম্পাদক অনিলকুমার ভৌমিক। বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা। ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৭। দাম দু টাকা।

লেখকদের কথা তবু কিছুটা জানা যায়, কিন্তু যাঁরা লেখা ছাপেন? তাঁদের কাহিনী থাকে নেপথ্যে। এই সংখ্যায় কয়েকজন প্রকাশক ও কয়েকটি প্রকাশনী সংস্থার পরিচয় ছেপে, ঐ উপেক্ষিত দিকটিতে, পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সম্পাদক। বেশ তথ্যসমৃদ্ধ রচনাও আছে কয়েকটি। লিখেছেন বিনয় ঘোষ (বটতলার প্রকাশক), নারায়ণ চৌধুরী, সুরেশপ্রসাদ নিয়োগী, মনোজ রায় (গ্রামবাংলায় বইয়ের বাজার), রানা বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র (ফুটপাথের বই), সাধন চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। বিভিন্ন রচনা পড়ার পর, পশ্চিমবাংলার প্রকাশন শিল্পের অতীত-বর্তমানের একটা সুস্পষ্ট চিত্র পাবেন বলে আমাদের ধারণা। এদিক থেকে সংখ্যাটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

দেয়ালা ঃ সম্পাদক শুদ্ধেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়। ১৯।৪ ঈশ্বর গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ২৬। এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

ছোটদের কাগজ। লিখেছেন বড়রা। এ সংখ্যায় ছবি আছে, কার্টুন আছে, ফিচার আছে। এঁকেছেন এবং লিখেছেন সুবীর রায়, কাফী খাঁ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শিবরাম চক্রবর্তী, অন্নদাশঙ্কর রায়, লীলা মজুমদার, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সত্যজিৎ রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আশিস সান্যাল, অজয় বসু, চন্দন সেন, সৌমেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় এবং অনেকে। বাচ্চাদের কাছে পত্রিকাটিকে আকর্ষণীয় করে তোলার ব্যাপারে সম্পাদক কার্পণ্য করেন নি। ভ্রমণকাহিনী, খেলাধুলোর গল্প, ছড়া ও কবিতা ছেপেছেন বিস্তর। আকারটাও ছোট। পৃষ্ঠাসংখ্যা কম নয়। রীতিমত দুশো পৃষ্ঠার পত্রিকা।

অঙ্গনা ঃ সম্পাদক অরুণা চৌধুরী। নিখিল বঙ্গ মহিলা সংঘ। ১২৪ সি, লেনিন সরনী। কলকাতা-১৩। দাম এক টাকা।

গল্প কবিতা প্রবন্ধসমৃদ্ধ পত্রিকাটি আকর্ষণীয়।

প্রগতি (দশম বর্ষ। ঈদ সংখ্যা)। সম্পাদক—মহম্মদ আলি। আকড়া মাদ্রাসা বাজার, বাটানগর, ২৪ পরগণা। এক টাকা।

অন্যান্য বছরের মত এ-বছরেও 'প্রগতি'র বার্ষিক ঈদ সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। মুসলমানদের এতবড় একটি পরবকে উপলক্ষ্য করে তেমন কোন পত্রিকা প্রকাশিত হয় না। সেদিক থেকে এই সংকলনটি স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী। বর্তমান সংকলনে উল্লেখযোগ্য ও সুচিন্তিত তিনটি প্রবন্ধ লিখেছেন সর্বশ্রী অন্নদাশঙ্কর রায়, মৈত্রেয়ী দেবী ও গৌরী আইয়ুব। অন্যান্য প্রবন্ধকারদের মধ্যে আছেন কামারুন্নেসা বেগম, মহম্মদ আলী ইত্যাদি। কয়েকটি সার্থক ও বিতর্কিত গল্প-রচয়িতাদের মধ্যে আছেন সর্বশ্রী বীরেন্দ্র দত্ত, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, অগ্নিমিত্র, বুলবুল ইসলাম, এম ইয়াসিন ইত্যাদি। কবিদের মধ্যে বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, কুমার রায়, বন্দে আলি মিয়া ইত্যাদির রচনা উল্লেখ্য।

পনের

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে পরিতোষ বলল—'ব্যাপারটা কিন্তু টপ সিক্রেট। তোর কাছে আবার ফাঁস করে ফেললাম।'

—'সিক্রেট বুঝি?' কিরণ মুখ তুলে তাকাল। 'কিন্তু অপারেশন কোথায় হবে? মৃণালিনী নার্সিং হোমে?'

—'যেখানে হোক একটা ব্যবস্থা করতে হবে।' পরিতোষ ভুরু কোঁচকাল। 'মৃণালিনী নার্সিং হোমেও করা যায়। তবে ওখানে চার্জ একটু বেশী। কিন্তু পার্টি যদি রাজী থাকে, তাহলে অসুবিধে নেই। মৃণালিনী নার্সিং হোমেও অপারেশন হতে পারে।'

কিরণ একটু চিন্তা করে বলল,— 'কিন্তু নার্সিং হোমে কত লোকজন। নানা ধরনের কেস। এই সব ঝামেলায় কাজ গেলে জানাজানির ভয় নেই? মানে শেষপর্যন্ত ব্যাপারটা সিক্রেট থাকবে তো?'

'ঝামেলা কিসের?' পরিতোষ হাসল। 'মোটে দু-একদিনের ব্যাপার। কোথায় কি হয়ে গেল কাকপক্ষীতে টের পাবে না।' একটু থেমে সে আবার বলল,—'অবশ্য তোর দুশ্চিন্তার কারণ বুঝতে পারছি। একটা অবিবাহিত মেয়েকে হুট করে নার্সিং হোমে ভর্তি করলে পাঁচজনে নানা রকম ভাবে। তেমন মনে হলে দুদিনের জন্য মাথায় একটু সিঁদুর ছুঁইয়ে আসতে বলি। বাস্, আর সন্দেহ-টন্দেহের বালাই থাকে না।'

কিরণ চুপ করে বন্ধুর কথা শুনছিল। পরিতোষ ফের বলল,—'তাছাড়া শহরে কার জন্যে কার মাথাব্যথা? এত মানুষ, এত মুখ। শহর তো নয়, যেন একটা মহাসাগর। কার গোপন কথা কে মনে রাখছে বল?'

সিগারেটে একটা জোর টান দিয়ে কিরণ মন্তব্য করল—'এসব কেসে তুই বেশ রপ্ত হয়ে গেছিস বলে মনে হচ্ছে।'

—'কিছুটা হয়েছি।' পরিতোষ ঈষৎ গর্বের সুরে কথা কইল। বন্ধুকে বলল,— 'দেশের হালচাল তো দেখছিস, মেয়েদের কোমরের নীচে শাড়ি, গায়ে আধ-গজ কাপড়ের ছোট্ট জামা। ছেলেদের মুখে হিন্দি সিনেমার চটুল গান। তাছাড়া নানা ধরনের থিয়েটার, ফাংশন। আজকাল মেলামেশা, ঘনিষ্ঠতা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ফলে এরকম কেস প্রায়ই আসে। তাছাড়া শুধু কুমারী মেয়ে নয়। অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের দায় এড়াতে সত্যিকার স্বামী-স্ত্রীও এসে হাজির হচ্ছে।

—'বলিস কি? তারাও আসে নাকি?'— কিরণ একটু অবাক হল।

—'আসবে না কেন?' পরিতোষ মুচকি হাসল। 'ডাক্তার হয়েছিস। ব্যাপারটা নিশ্চয় তোর অজানা নয়। সবই অ্যাকসিডেন্ট মানে জাস্ট একটা দুর্ঘটনার ফল। অথচ ছেলে আর মেয়ে যাই বল কেউ বেশী চায় না। আসলে বাড়তি ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট কার ভালো লাগে? তাছাড়া এই আক্রার দিনে একটি সন্তানকে খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করে তোলা চাট্টিখানি কথা নয়? কিন্তু একবার ফেঁসে গেলে তো আর উপায় নেই। তখন আমাদের মত ডাক্তারের স্বারস্থ হতে হবে।'

পরিতোষের গায়ে বেশ দামী একটা টেরিকটনের শার্ট। সে পকেট থেকে রুমাল বের করে গলার কাছে এবং ঘাড়ের নীচে বুলিয়ে নিয়ে বলল,—'তুই নিশ্চয় ভাবছিস কাজটা খুব নোংরা,—একটা মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েট হয়ে পরিতোষ শেষপর্যন্ত এই সব করে পয়সা কামাচ্ছে। তোর কাছে স্বীকার করছি, এক-একটা কেসে টাকা-কড়ি মন্দ আসে না। তবু বিশ্বাস কর প্রথম প্রথম আমারও খুব খারাপ লাগত। এই ফিসফাস আলোচনা, গোপনে অপারেশন, চুপিচুপি টাকা নেওয়া। তাছাড়া এসব কাজে একটা রিস্কও আছে। তবু আজকাল আমার মনে হয় কাজটার মধ্যে সবটাই বোধহয় অন্যায় নয়। কিছুটা ভালো মানে অন্যকে সাহায্য করবার একটা সৎ উদ্দেশ্যও রয়েছে।'

—'সাহায্য?' কিরণ ভুরু কুঁচকে তাকাল।

—'সাহায্য নয়? একটু আগে ওই মেয়েটিকে তো দেখলি। দিব্যি স্বাস্থ্যবতী, নীরোগ দেহ। রূপসী না হলেও ওকে মোটামুটি সুন্দরী বলা যায়। বেচারী! ভুল করে একবার আঘাটায় পা দিয়েছে বলেই কি ও চিরকাল পতিত হয়ে থাকবে? অথচ মেয়েটি কলেজে পড়ে। সামনের বছর বি-এ পরীক্ষা দেবে। বুঝতে না পেরে একটা ঝামেলায় ফেঁসে গিয়েছে। এই রাহুগ্রাস থেকে মুক্তি পেলেই ওর সামনে নতুন জীবন। আবার ওর বিয়ে-থা, ঘর-সংসার, ছেলেপুলে মানে একটা মেয়েমানুষ যা চায়, কল্পনা করে সব হতে পারে।'

কিরণ হেসে বলল,—'তুই কথা দিয়ে বেশ সুন্দর ছবি আঁকতে পারিস তো!'—

—'ছবি মানে কল্পনা নয়। আমি এমন কয়েকটা কেস জানি। এখন বিয়ে-থা করে তারা দিব্যি সুখে-শান্তিতে ছেলেপুলে নিয়ে দিন কাটাচ্ছে। আর এতে দোষের কি আছে? ইউরোপ-আমেরিকায় একটি মেয়ের সাতবার বিয়ে হয়। একগণ্ডা ছেলেমেয়ে নিয়ে এক স্বামীর ঘর ছেড়ে ফের অন্য স্বামীর ঘরে ঢোকে। তাদের লজ্জা-সরম, চোখের চামড়ার বালাই নেই। আর এ তো মুহূর্তের ভুল। মেয়েটির মুখের দিকে তুই তাকিয়েছিলি? ওর দুই চোখে কি করুণ মিনতি। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেলে এমন ভুল আর কোনোদিন করবে না।'

সিগারেটের মুখের ছাইটুকু ঝেড়ে নিয়ে পরিতোষ আবার বলল,—'আমাদের দেশের মেয়েরা পানকৌড়ি নয়। ওরা হাঁসের মত, ডাঙায় উঠলেই পালক থেকে জল ঝরে পড়ে। তখন আর অন্যায়ের ছিটে-ফোঁটাটি গায়ে লেগে থাকে না।'

হাতঘড়ির দিকে এক নজর তাকিয়ে কিরণ ঈষৎ দুশ্চিন্তার সুরে বলল,— 'দেরি হয়ে গেল আজ উঠি। দুপুর-বেলায় মায়ের একজন এক ভিজিট

দখে বেরিয়েছিলাম।' সন্ধ্যের পর বোধহয় বড়েছে। এখন বাড়ি ফিরে কেমন দেখব কে জানে।'

—'এতক্ষণ কোথায় ছিলি?' পরিতোষ জিজ্ঞাসা করল। 'নিশ্চয় তোর গার্ল ফ্রেন্ডের সঙ্গে? সারাটা দুপুর জমাট আইসক্রিমের মত দুজনে বেশ মৌজে কাটালি, কি বল?'

কিরণ ঠোঁট ফাঁক করে অল্প একটু হাসল। 'তুই কি থটরিডিং জানিস, যে মুখ দেখেই মনের কথা টের পাবি?'

—'কারো কারো পাই।' পরিতোষ চোখ ঘুরিয়ে বেশ মজা করে বলল। 'তারপর তোর গার্ল-ফ্রেন্ড মানে সেই মেয়েটিকে বিয়ে করছিস কবে?'

—'বিয়ে হবে একথা তোকে কে বলল?' কিরণ যেন পাল্টা প্রশ্ন করল। ফের সহজ স্বাভাবিক গলায় বলল,—'বাজে কথা রাখ। বরং তুই বল কবে বিলেত যাচ্ছিস।'

পরিতোষ মনে মনে একটা হিসেব খাড়া করে নিয়ে উত্তর দিল—'নেকস্‌ট এপ্রিলের আগে হবে না। তার মানে আরো চার-পাঁচ মাস দেরি আছে।' কি ভেবে সে আবার বন্ধুকে শুধোল,—'কিন্তু তুই এরপর কি করতে চাস,—প্র্যাকটিস, না চাকরি?' বরং তার আগে একবার এম-আর-সি-পিটা করে আসবি চল। মনে রাখিস বিলিতী ডিগ্রী না থাকলে এদেশে ডাক্তারের কদর হয় না। এই একটি ব্যাপারে অন্তত তোর দেশের মানুষ বিলেতের দারুণ ভক্ত।'

ওষুধপত্রগুলো হাতে নিয়ে কিরণ উঠে দাঁড়াল। বলল,—'আচ্ছা তোর সঙ্গে আর একদিন এই নিয়ে কথা বলা যাবে। এখন চলি, কেমন?' সে আলোচনায় পূর্ণচ্ছেদ টানার উদ্দেশ্যে চেম্বার থেকে বেরিয়ে পড়ল।

রাস্তায় লোকজন। আলোর মালা। ক্রেতাবিক্রেতার ভিড়। সন্ধ্যে হলেই ধর্মতলা-চৌরঙ্গী অঞ্চলের শিকারী নায়িকার বেশ। বিচিত্র সাজ-পোষাকের কত মেয়ে-পুরুষ। আঁটো-সাঁটো স্কার্ট-ফ্রকপরা দুটো অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছুঁড়ি চটুল হাসিতে সমস্ত পথটা ভরিয়ে গ্রাণ্ট স্ট্রীট ধরে জানবাজারের দিকে গেল।

কিরণ দ্রুত হাঁটছিল। চৌরঙ্গীর মুখে সে বাসে উঠবে। রবিবার বলে রক্ষে। নইলে ছুটির পর সন্ধ্যের সময় বাসে যা ভিড়। একটা মাছি গলবে না,—তার মত একজন মানুষ কোথায় ঢুকবে?

সামনে দিয়ে একটা খালি ট্যাক্‌সি ধীরগতিতে বেরিয়ে গেল। ড্রাইভারটা তার দিকে বারবার তাকাচ্ছিল। কিরণের একবার ইচ্ছে হল ট্যাক্‌সিটা নেয়। কখন সেই বেলা দেড়টার সময় বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। আর এখন ঘড়িতে প্রায় সাতটার মত হবে। অনেক আগেই তার বাড়ি ফেরা উচিত ছিল। অন্তত মায়ের কথা ভেবে। এতক্ষণ মা কেমন আছে কে জানে? তার দাদা অর্থাৎ মিলন কি বাড়িতে থাকবে? হিরু নিশ্চয় কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে উধাও। আর বিনিতর আশা না করাই ভালো। মা মন্দ বলে না। ধিঙ্গি, নাচুনী মেয়ে। থিয়েটারের রিহার্সাল দিতে সে কথারীতি বিকেল বেলাতেই বেরিয়ে পড়েছে।

অমিয় বারিক লেনে ঢুকতেই কিরণের খুব খারাপ লাগল। মনের মধ্যে অপরাধী বিবেক তস্করের মত ভয়ে জড়সড়। এতক্ষণ পরে বাড়িতে ঢুকে সে কেমন করে মুখ দেখাবে? তার বাবা এমনিতে ভালোমানুষ। সামনে কিছু বলে না। কিন্তু মনে মনে নিশ্চয় ভাবে। সে ঘরে পা দিতেই তার মা শীর্ণ হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলবে,—'কিরণ, এতক্ষণে আমার কথা মনে পড়ল বাবা?'

কিন্তু বাড়িতে ঢুকে সে প্রায় হতভম্ব। সকালবেলার সেই অস্বাভাবিক গুমোট আবহাওয়া গেল কোথায়? একটানা বিষ্টি-বাদলার পর হঠাৎ যেন আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার। মেঘ সরে গিয়ে ঝলমলে রোদ্দুর উঠেছে। বারান্দায় তার মা, বাবা, বিনিত এমনকি হিরু পর্যন্ত বসে। কি একটা মজার কথা হচ্ছিল বলে মা মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসি আড়াল করবার চেষ্টা করছে। টেবিলের উপর অনেকগুলি প্লেট, চায়ের কাপ। দেখে মনে হয়, কিছুক্ষণ আগে কারা এই বাড়িতে এসেছিলেন, আতিথি-সৎকরের নিদর্শনগুলি এখনও টেবিলে পড়ে।

ছেলেকে দেখে মনোরমা একগাল হেসে বলল—'তুই যদি আর একটু আগে আসতিস বাবা, তাহলেই ওদের সঙ্গে দেখা হত।'

কিরণ সে-প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল,—'তোমার শরীর কেমন আছে মা? জ্বর আর বাড়েনি?'

—'জ্বর বোধহয় নেই এখন।' মনোরমা কপালে করতল চেপে দেহের উত্তাপ পরীক্ষা করল। ফের বলল,—'এতক্ষণ তো ওদের সঙ্গেই আলাপ করছিলাম। বেশ ভালো লোক সব। দুটো কথা বলেও মনের সুখ।'

কিরণ ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল,—'কাদের কথা বলছিলে মা? কারা বেড়াতে এসেছিল?'

—'ওই যে বিনিত যাদের বাড়িতে থিয়েটার করবে, সেই তারা।' মনোরমা চোখ ঘুরিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করল। ফের মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল,—'তুই বল না বিনিত। কারা সব এসেছিল। সামনের শনিবার তোর সেই থিয়েটার দেখতে যাওয়ার জন্য নেমন্তন্ন করে গেল।'

—'আহা! কারা এসেছিল, তাও তোমাকে এখন বলে দিতে হবে?' বিনিত ছদ্ম বিরক্তির সঙ্গে সুন্দর একটি ভ্রূভঙ্গি করল। তারপর ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—'ওরা তিনজন এসেছিল মেজদা। মিলি মানে আমার সেই বন্ধু। তার সঙ্গে রতীশবাবু আর ওর দিদি।'

—'রতীশবাবু? সে ভদ্রলোক কে আবার?' কিরণ জানতে চাইল।

—'বারে! ওদের বাড়িতেই তো থিয়েটার হবে। তাই রতীশবাবু আর তার দিদি দুজনেই এসেছিলেন বাবাকে আর মাকে নেমন্তন্ন করতে। তোমাদের তিনজনকেও অবশ্য করে যেতে বলেছেন মেজদা।'

—'হ্যাঁরে, মেয়েটি খুব ভালো।' মনোরমা হাসল। 'যাবার সময় কতবার করে বলে গেল। মেসোমশাইকে নিয়ে আপনি নিশ্চয় যাবেন মাসীমা। না গেলে আমরা সবাই ভীষণ দুঃখ পাবো। আর বিনিতর নাচের কি প্রশংসা। ভালো করে শিখলে আপনার মেয়ে একদিন মস্ত বড় শিল্পী হবে দেখবেন। আরো কত কি বলছিল—' খুশিতে মনোরমার চোখ দুটি উজ্জ্বল দেখাল।

হিরু টিপ্পনী কেটে বলল—'হ্যাঁ ভালো করে নাচ শিখে আমেরিকায় বড়দার কাছে চলে যাবি। সেখানে আমেরিকনারা আবার তোকে নিয়ে নাচানাচি শুরু করবে।'

বিনিত মুখখানা ঈষৎ বিকৃত করে ভেংচি কেটে বলল—'বেশ করবে। তাতে তোর কি?'

বাণীব্রত দুজনকে উদ্দেশ করে বললেন—'তোরা চুপ কর দিকি। অকারণে এখুনি একটা খিটিমিটি বাধিয়ে বসবি। ওরা বড়লোক মানুষ, নিজেদের মত আর পাঁচজনকে ভাবে।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি আবার বললেন—'কলকাতায় আমরা আর কটা দিন আছি? মাস দেড় কি বড় জোর দুটো মাস হবে। তারপর চন্দনপুরের বাড়িতে গিয়ে বাস করব। বিনিতকে বরং সেই ভেবে মনে মনে তৈরি হতে হবে।'

কথাটা সত্যি। তবু নিদারুণ। বিনিতর বুকে গিয়ে বাজল। সে আর বসল না। মুখ ভার করে সেখান থেকে উঠে গেল।

কিরণ বলল—'তুমি জ্বর নেই ভাবছ। কিন্তু তোমার চোখ দুটো ছলছল করছে

মা। থার্মোমিটার এনে দেখব একবার?'

'জ্বর কোথায়?' মনোরমা ছেলের মুখের দিকে সস্নেহে তাকাল। 'ও তোর মনের ভুল। চোখ আবার ছলছল করবে কেন? আমি দিব্যি আছি।'

কিন্তু কিরণ নাছোড়বান্দা। সে তার ব্যাগ থেকে থার্মোমিটার বের করে এনে মায়ের জ্বর দেখতে বসল। জিভের নীচে থার্মোমিটার দিতে মনোরমার দারুণ অস্বস্তি। কেমন সুড়সুড়ি লাগে। তবু কিরণ কোনো কথা শুনবে না। এমন জেদী একরোখা সব ছেলে হয়েছে তার।—

■

বাথরুমে ঢুকে বিন্তি তার জামার ভিতর থেকে চিঠিখানা বের করল। সত্যি, রতীশের দারুণ সাহস। চিঠিটা কখন বাড়ি থেকে লিখে এনেছে। মা অসুস্থ বলে অতিথিদের রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে পারেনি। তাই বিন্তি সিঁড়ি বেয়ে ওদের সঙ্গে দরজা পর্যন্ত গিয়েছিল। কতটুকু বা সময়? ওরই মধ্যে রতীশ কৌশল করে কখন একটু পিছিয়ে পড়ল। তারপর এক ফাঁকে প্রায় চোরের মত নিঃশব্দে বিন্তির মুঠোর মধ্যে চিঠিখানা গুঁজে দিয়েছে। রতীশের দিদি এমন কি মিলি পর্যন্ত তা টের পায়নি।

সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে বিন্তি চিঠিখানা পড়তে শুরু করল। বাথরুমে কম পাওয়ারের লাইট। পড়তে একটু কষ্ট হয়—চোখে লাগে। কিন্তু তাতে কি? ছোট্ট চিঠি।

মোটে সাতআটটা লাইন। কতটুকু সময় যাবে?

প্রিয়তমাসু,

কাল মিলি স্কুলে যাবে না। আমি এগারোটার সময় গাড়ি নিয়ে আসছি! মোড়ের কাছে তুমি নিশ্চয় এস। বেলা তিনটের ক্লাসগুলি মনে আছে তো? তার আগে কিছুক্ষণের জন্য বেড়িয়ে এলে কেমন হয়? চিন্তার কারণ নেই। আমাদের ড্রাইভার ছুটি নিয়েছে। স্কুল থেকে তোমাকে আনতে আমাকেই যেতে হত। সুতরাং ব্যাপারটা অন্য কেউ মানে মিলিও সন্দেহের চোখে দেখবে না, বুঝলে?— ইতি

তোমার
রতীশ

চিঠি পড়তে শুরু করেই বিদিশার সমস্ত শরীর শিরশির করে উঠল। কেমন একটা অনাস্বাদিত রোমাঞ্চ। চিঠিটা একবার নয়, দুবার নয়। অনেকবার পড়ল বিদিশা। প্রতিটি শব্দ, লাইন প্রায় মুখস্থের মত হয়ে গেল তার। রতীশের এই প্রথম চিঠি বলেই কি বিদিশার এত ভাল লাগছে? শুরুতেই কি সুন্দর একটা কথা লিখেছে রতীশ। প্রিয়তমাসু। শব্দটা ঠোঁটের ডগায় উচ্চারিত হতেই বিদিশার কেমন গলা বুজে আসছে। আচ্ছা, কবে থেকে রতীশ তাকে প্রিয়তমা বলে ভাবল? কবে থেকে সে তাকে ভালবেসেছে? একথা রতীশকেই বিদিশা জিজ্ঞাসা করবে নাকি?

*

মোড়ের কাছে চকোলেট রঙের ফিয়াট গাড়িটা অপেক্ষা করছিল। রতীশ খানিকটা দূরে একটা পানের দোকানের সামনে সিগারেট হাতে দাঁড়িয়ে। তার পরনে একটা শাদা রঙের প্যান্ট, গায়ে কাচ কলাপাতা রঙের বুশসার্ট। চোখে কালো, সান-গ্লাস। বিদিশাকে দেখে সে তাড়াতাড়ি গাড়ির কাছে ফিরে এল।

ঘড়ির দিকে এক নজর তাকিয়ে রতীশ বলল,—'তুমি কিন্তু ঠিক সময়ে এসেছ—মানে জাস্ট ইন টাইম।'

—'না এসে উপায় আছে?' বিদিশা চোখ ঘুরিয়ে হাসল। 'যা চিঠি তোমার। ঠিক এগারোটার সময়েই আসতে হবে।' ঠোঁট কামড়ে এক মুহূর্ত ভাবল বিদিশা। ফের বলল—'তোমার কিন্তু আজকাল ভীষণ সাহস বেড়ে যাচ্ছে। অমনি করে হাতের মুঠোয় চিঠি গুঁজে দিতে আছে? যদি মিলি কিম্বা তোমার দিদি দেখতে পেত?'—

—'কেমন করে দেখতে পাবে?' রতীশ সহাস্যে জবাব দিল। 'ওরা তো সামনের দিকে তাকিয়ে হাঁটছিল।'

—'বারে, হঠাৎ পিছন ফিরে মিলি তাকাতেও পারত। তাহলে?' বিদিশা ভুরু তুলে রতীশের মুখের উপরে দৃষ্টির সুতো ঝুলোল। ফের মুচকি হেসে বলল—'আর চিঠিতে যা সব কথা লিখেছ তুমি।'

—'কি লিখেছি?' রতীশ কণ্ঠস্বর ঈষৎ গাঢ় করল।

—'যাও সে আমি বলতে পারব না—'

—'বেশ, আমি বলি। চিঠিতে লিখেছি,—প্রিয়তমাসু। এই তো? এতে তোমার আপত্তি আছে নাকি?'

বিদিশা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠছিল। রতীশ এমন অকপটে সব ব্যক্ত করতে পারে। কিন্তু সে মেয়ে—তার বুঝি সংকোচ হয় না? বিদিশার কর্ণমূল আরক্ত। সে মুখ নীচু করে অনেকক্ষণ পরে বলল—'আপত্তি কেন থাকবে? কিন্তু আমার কেমন ভয় করে রতীশ। আমি ভাবি ওরা সব কথা যদি টের পেয়ে যায়।'

রতীশ বাঁ হাতটা বাড়িয়ে ওর পিঠের উপর রাখল। কি নরম শরীর বিদিশার। তুলো কিম্বা মাখনের মত। একটু চাপ দিলেই হাত বসে যায়। সে আদর করে বলল,—'আজ না হোক একদিন তো আমাদের সম্পর্কের কথা সবাই জানতে পারবে। তার জন্য এত ভয়ডর পেলে চলবে কেন?'

মাঝেরহাট ব্রীজ পেরিয়ে গাড়ি বেহালার দিকে ছুটছিল। চারপাশে উজ্জ্বল রোদ্দুর—একটা দামাল শিশুর মত হুটোপাটি খেলছে। নীল আকাশ বিচিত্র, স্বপ্নময়। ডানা মেলে পাখি উড়ছে কোথাও। পথে-ঘাটে ট্রাম-বাসে এখনও কিছু অফিসযাত্রীর ভিড়। পাশেই একটা ছোট মাঠ। একদল ছেলে সেখানে ব্যাট-বলে সোরগোল তুলেছে।'

বিদিশা বলল—'এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

—'খুব সুন্দর একটা জায়গায়। অবশ্য কলকাতার বাইরে। কিন্তু আমি জানি সেখানে তোমার খুব ভালো লাগবে।'

—'কলকাতার বাইরেই ভালো। চেনা-জানা লোকের সঙ্গে দেখা হওয়ার ভয় নেই।' একটু থেমে সে আবার বলল—'তোমার ওই হোটেল, রেস্তোরাঁয় আমি আর কোনোদিন যাচ্ছি নে।'

—'কেন, সেদিন ওখানে বুঝি তোমার ভালো লাগেনি?'

—'দূর! ভালো লাগবে না কেন? অমন সুন্দর জায়গা। কত হৈ-হুল্লোড়, নাচ-গান। কিন্তু আমি কেমন করে জানব সেদিন ওখানে বড়দা গিয়েছিল।'

—'তাই নাকি?' রতীশ ঘাড় কাত করে তাকাল।

বিদিশা মুখ শুকনো করে বলল—'হ্যাঁ, তাই নিয়ে বাড়িতে একটা বিশ্রী ব্যাপার। আর বড়দাও তেমনি ছেলে। পেটে একটুও কথা রাখতে পারে না। বাড়ি ফিরে মার কাছে আদ্যোপান্ত গল্প করেছে। সিনেমা শেষ হবার পর আমি একটা বিলিতী মদের দোকানে গিয়েছিলাম। সেখানে তোমার সঙ্গে ধেই ধেই করে নেচেছি। একটি বর্ণও বলতে বাকি রাখেনি।'

রতীশ হেসে বলল—'কিন্তু তোমার মা আমাকে দেখে একটুও রাগ করেননি। বরং কত গল্প করলেন।'

—'তা সত্যি। আসলে মার তোমাকে খুব পছন্দ হয়েছে।' বিদিশা ঠোঁট ফাঁক করে একটু হাসল। বলল—'জানো, রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে তোমার কথা দু-তিনবার আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল।'

একটা ছোটখাটো বাগানবাড়ির সামনে গাড়ি থামল। জায়গাটা সত্যি সুন্দর। চারপাশে অনেকখানি সমতল জমি। নরম সবুজ ঘাসের উপর রোদ্দুর পিছলে যাচ্ছে। বাড়ির খুব কাছেই গঙ্গা। সামনে একটুখানি ফুলের বাগান। দরজার কাছে একটা শিউলি ফুলের গাছে এখনও অনেক কুঁড়ি। জাঁকিয়ে শীত পড়তে আর বড় বেশী দেরি নেই। ফুলগুলো বোধহয় আরো কটা দিন ফুটবে।

মোটরগাড়ি দেখে একটা লোক এগিয়ে এল। বিদিশা জানত না গাড়িতে করে রতীশ আরো জিনিস এনেছে। মাঝারি সাইজের একটা থার্মোফ্লাস্ক, টিফিন-ক্যারিয়ারে খাবার, একটা প্ল্যাস্টিক ব্যাগের মধ্যে রঙীন পানীয় ভরা ছোট বোতল। কয়েকটা আপেল, কমলালেবু আর একগুচ্ছ আঙুর। বাক্সের মত আরো একটা কি বস্তু। অনেকক্ষণ তাকিয়ে বিদিশার সেটাকে রেকর্ড প্লেয়ার বলে মনে হল।

—'ব্যাপার কি?' বিদিশা অবাক হয়ে শুধোল। 'এখানে পিকনিক টিকনিক করবে নাকি?'

রতীশ চারপাশে একবার চোখ ঘুরিয়ে বলল—'পিকনিক করবারই জায়গা। কিন্তু হাতে সময় কই? আড়াইটে বাজলেই গাড়িতে স্টার্ট দিতে হবে। তবু কিছুক্ষণ তো আছি। খিদে পেলে কি করব? তাই এগুলো সঙ্গে আনলাম। পরে একদিন সবাই মিলে পিকনিক করতে আসা যাবে।'

পাশাপাশি দুখানি ঘর। একটি শোবার অন্যটি বসবার। ঘরের ভিতরটা আরো সুন্দর। দেওয়ালে হাল্কা গোলাপী রঙ। ডবল বেডের হাল-ফ্যাশানের পালঙ্কের উপর নরম বিছানা। পাশেই একটা ড্রেসিং-টেবিল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বিদিশা নিজেকে দেখছিল। মাথার খোঁপাটা একটু সরে এসেছে। কপালের কাছে, চিবুকের নীচে অল্প অল্প ঘাম। বিদিশা কোমরে গোঁজা রুমালটা বের করে খুব আলতোভাবে মুখ মুছল। ঘাড়ের উপর করতল রেখে ঠেলে-ঠুলে খোঁপাটাকে ফের স্বস্থানে আনল।

হঠাৎ দর্পণে রতীশকে দেখে বিদিশা অবাক হল। খাটের উপর পা ঝুলিয়ে বসে সে এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। ছি, ছি! অমন আদেখলের মত কি দেখছে রতীশ? তাও সংগোপনে লুকিয়ে চুরিয়ে। আশ্চর্য! তার নাচের উপযোগী ফিগারটা এতদিন খুব কাছাকাছি দেখেও রতীশের আশ মেটেনি?

দর্পণে রতীশের ছায়াটা বিদিশা আবার দেখল। এখনও সে তেমনি তাকিয়ে। মধু-পিয়াসী লুব্ধ ভ্রমরের মত রতীশের দৃষ্টিটা তার দেহের প্রতিটি রেখায় ফিরে ফিরে বসছে।

(ক্রমশঃ)
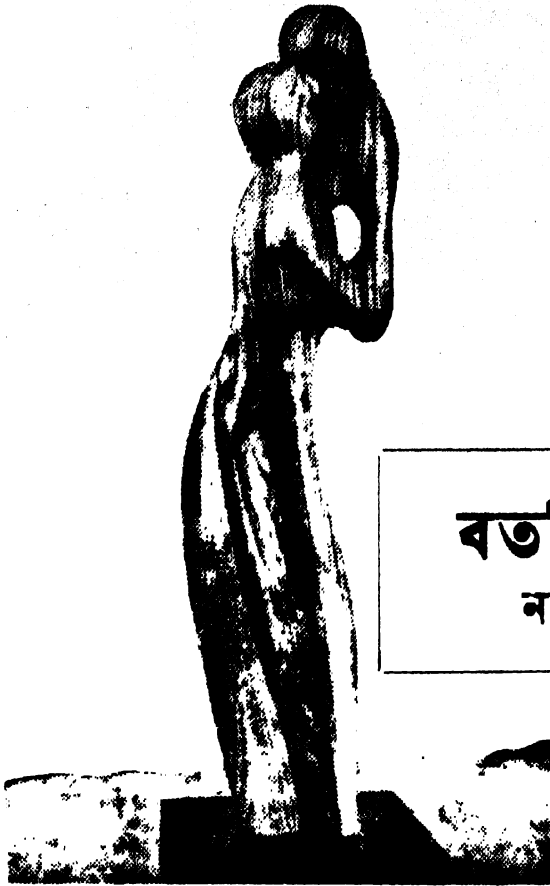
বর্তমান শিল্পকলা

নীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

কাঠের ভাস্কর্য নিদর্শন
শিল্পী: আম্রাকুটম

অনেকদিন পর আচার্য নন্দলাল বসু লিখিত 'শিল্পকথা' বইটি পড়ছিলাম।

তিনি এক জায়গায় চীনা চিত্রশিল্পী ওকাকুরার জবানীতে লিখেছেন: 'স্বভাব' পরম্পরা ও স্বকীয়তা এই তিনে নিয়ে হয় সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ আর্ট। স্বভাবজ্ঞান না থাকলে আর্ট হয় দুর্বল ও কৃত্রিম। ঐতিহ্যে অধিকার না থাকলে হয় অস্থানু ও কাঁচা। আর শিল্পীর নিজস্ব দান যদি কিছু না থাকে, তবে অন্য সব থাকলেও শিল্প ঠিক প্রাণ পায় না। অপর পক্ষে, শুধু স্বভাব-সম্মত হলে হয় নকল: শুধু পরম্পরার দখল থাকলে হয় কারিগরি আর শুধু মৌলিকতাটুকু সম্বল করে মানুষ উন্মত্তের মত আচরণ করে।', (শিল্পকথা—৫২ পৃষ্ঠা)

বর্তমানকালের সমকালীন চিত্রকরদের শিল্প সত্তার পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত ওকাকুরার ভাবকথাই চিন্তা করছিলাম একমনা হয়ে।

এককালে চিত্রশিল্পী ও সমালোচক ওকাকুরা যে উক্তি করেছেন, তা তার নিজস্ব জীবনাদর্শের কথাই নয়, বিশ্বের সকল কলা ও কলাকারদের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য বলে ধরা যেতে পারে।

আর্টের মূল সূত্র বা গোড়ার কথা 'স্বভাব'।

আর্ট বা কলা করায়ত্ত ও শিক্ষানবিশের পর্যায়ে নেচার স্টাডি অপরিহার্য।

প্রথমে প্রকৃতিকে জানতে হয় এবং তারপর নিজের সত্তাকে বিলিয়ে দিতে হয়। শেষে কোন 'স্কেচিং বুক' বা সাদা ড্রয়িং পেপারে সেই প্রকৃতি-গত বস্তুকে হুবহু অনুকরণের মধ্য দিয়ে নিয়ে আসতে হয় এক অপরিহার্য দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে।

চিত্রাংকনবিদ্যা শিক্ষার অপর আরেক মাধ্যম এই দৃষ্টিভঙ্গি। নেচার স্টাডি যত গভীর ও সহজমুক্ত হবে এই দৃষ্টিভঙ্গির সুদূর প্রসারতা ঘটবে ততবেশী। প্রকৃতিগত নৈসর্গিক দৃশ্যকে বাদ দিয়ে যেমন চিত্র হয় না, তেমনি জীবজগতকে অবহেলা করলেও চলে না। কারণ, এই দুয়ে মিশিয়েই সেই পূর্ণাঙ্গ চিত্র।

নেচার স্টাডির পরে আসে 'পরম্পরা' বা যাকে বলে ট্রাডিশন। প্রকৃতিগত শিল্প-সত্তার সঙ্গে এই পরম্পরাকে সংযোগ ঘটালে জাতীয়তাবাদের পর্যায়ভুক্ত বলে সনাক্ত করার অধিকার জন্মে এই অঙ্কিত চিত্র-লিখনের। চিত্রকে বোঝা যায় জাতিগতভাবে। তবে চিত্রের সঙ্গে এই 'পরম্পরাকে অঙ্গাঙ্গিভূত করতে যাওয়া একেবারে সহজ নয়।

শিল্পীকে আগে জানতে হয় 'পরম্পরা' কাকে বলে। কারণ, পরম্পরা বস্তুটি দেশগত ব্যাপার: একেক দেশ বা রাষ্ট্রে তার একেক সত্তা বা প্রকাশ। জাপানী 'পরম্পরা' চিত্রের প্রকাশের সঙ্গে ভারতীয় পরম্পরা চিত্রের মিল খুব কমই। ইতালির পরম্পরা চিত্রের সঙ্গে নেই চৈনিক 'পরম্পরা' চিত্রের মিল। এই মিল নেই বলেই তাদের দেশগত বৈশিষ্ট্য। এমনি বৈশিষ্ট্য একদিন হারালে কিংবা ক্ষুণ্ন হলে জাতিতত্ত্বের পরম্পরা বলে কিছু থাকে না। তখন বিশেষ জাতি বলে চেনা বা সনাক্ত করতে কষ্ট হয়।'

কাজেই কোন বিশেষ দেশের শিল্পীর পরম্পরাবোধের জ্ঞানলাভের পর নিজের শিল্প প্রণয়ন ক্ষেত্রে তার সুনিপুণ সংযোজন ঘটালে চিত্রের সেই দেশগত বৈশিষ্ট্য জেগে ওঠে। তাতে শিল্পীর সঙ্গে শিল্পকে চেনবার সুবিধা ঘটে।

এরপরই স্বকীয়তা বা অরিজিন্যালিটি।

প্রকৃতি থেকে হুবহু যা তুলে ধরা হয়, বা বিশেষ বস্তু দেখে অবিকল যা রং বা পেন্সিলে প্রকাশ করা হয়ে থাকে ক্যানভাসে কিংবা সাদা ড্রয়িং পেপারে তাই হচ্ছে অনুকরণ। অনুকরণেও আর্ট আছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও শিল্পীকে জানতে হয় চিত্র কিভাবে প্রকাশ অথবা রূপদান সম্ভব।

তবে নিজস্বতার স্বরূপ অনুভবের এখানে নেই। নিজস্ব চিত্রের ক্ষেত্র অপর

শিল্পীঃ এস এস ব্রাক

থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন রূপদানের প্রাণবন্ত প্রকাশই স্বকীয় চিত্র।

এটি বড় কম কথা নয়: নমুনাস্বরূপ ধরা যাক পশ্চিমবাংলা। এখানে বহু চিত্র-শিল্পীর জন্ম হয়েছে, এবং তাদের রচনা-শৈলীও বিস্তর। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এদের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যক চিত্র আছে, যা মনে দাগ রেখে যাবার মত। অর্থাৎ যেখানে স্বকীয়তার অভাব ঘটেছে, সেখানে চিত্র অতিশয় সাধারণ পর্যায়ে দাঁড়িয়ে গেছে এবং স্মরণ রাখার যোগ্যও হয়নি।

কাজেই বলা প্রয়োজন, একদিন এদেশের যারা 'স্বভাব', 'পরম্পরা' ও স্বকীয়তায় বিশ্বাস রেখে চিত্রশৈলী রচনায় আত্মনিয়োগ করে গেছেন, তারা শুধু সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ আর্টই সৃষ্টি করেননি, ভাবীকাল ও সমাজের কাছেও রেখে গেছেন শিল্পকলা সংস্কৃতির যুগান্তকারী স্বাক্ষর।...

কিন্তু যা বলছিলাম।...

বলছিলাম, সমকালীন চিত্রকারদের শিল্পসত্তার কথা।

বর্তমানকালের চিত্রকলার মাধ্যমে এদের কি বক্তব্য, বুঝে নিয়ে, উপরোক্ত চৈনিক চিত্রশিল্পী ওকাকুরার মতবাদের পরি-প্রেক্ষিতে তাদের বিশেষভাবে যাচাই করার বা সুযোগ গ্রহণের আবশ্যকতা আছে বলেই মনে করি।

সমকালীন চিত্রকলার সৃষ্টিকর্তা কে বা কারা এ সম্পর্কে মতবাদের অবকাশ থাকলেও তবে পথপ্রদর্শক হিসেবে পাশ্চাত্য দেশের বিশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কয়েকজন চিত্র-শিল্পী, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এখন যদি বলা যায়, ঐসব তথাকথিত সম-কালীন কলাকারদের শিল্পচর্চার বুনিয়াদ প্রাচীন 'বাইজানটাইন', 'রোমান' বা ভিক্টোরিয়ান পন্থীদের পরম্পরা থেকে এক-সূত্রে গ্রথিত, তবে হয়তো অন্যায় হয় না।

রাফায়েল, মাইকেল এ্যাঞ্জালো, লিয়া-নর্দ-দা-ভিঞ্চি, বাতিচেলি কারিগা, গিঁও-গিঁনি, টিসিয়ান, আলবার্ট ডুবার, হোলবেইন রুবেন্স, ভ্যানদাইক থেকে বর্তমানকালীন মানেট, রেনোয়, ডেগাস, পলাসিজা ভানগগ গগাঁ, মাঁতিসে, পিকাসো প্রভৃতির জীবন চরিত আলোচনা করলে দেখা যাবে এঁরা প্রত্যেকেই স্ব-স্ব আর্টের স্বকীয়তায় উজ্জ্বল ছিলেন অর্থাৎ কিনা যাকে বলে 'সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ আর্টিস্ট!'...

তারপর নতুন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সৃষ্টির উন্মাদনায় শেষোক্ত কয়েকজন শিল্পী চিরা-চরিত রীতি অংকিত চিত্রকলার বাইরে নিও রিয়ালিজম, সুর রিয়ালিজম, কিউবিজম পেসিমিজম বা অ্যাবস্ট্র্যাক্টইজম-এর ছকে বাঁধা ফর্মুলার এমনসব চিত্রশৈলীর উদ্ভাবন করতে থাকেন, যাতে অনেক বুদ্ধিজীবীদের মনে এক বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি জাগে। এবং এঁরাও বক্তব্যের নতুন কিছু উপাদান হাতের কাছে পেয়ে,...মতবাদ ফর্মুলায় বাঁধা আর্টই যে ভাবীকালের এক যুগান্ত-কারী চিত্রশৈলী...স্বভাবজাত চিত্র কেবলমাত্র ফটোগ্রাফিক আর্ট' ছাড়া আর কিছু নয়... যা ভাববার সুযোগ দেয়, মননজগতের প্রতীতি জন্মায়, এমন আর্টই যে প্রকৃত আর্ট...এমন সব 'প্রোপাগান্ডা' নামা যাদু-করী ভাবমাধুর্যে বুদ্ধিজীবীদের ম্যাগা-জিনে এবং নানা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে শিল্পরসিক তথা জনসাধারণের মনকে চমকে দিতে থাকে। সারা ইউরোপ তথা আমেরিকায় যে তরঙ্গ এঁরা সৃষ্টি করেন, তারই আঘাত একদিন ভারতীয় শিল্পীগোষ্ঠীর অবচেতন মনে ধীরে ধীরে সংক্রামিত হয়ে যায়।

মতের বাদের বালাই নেই, অনুকরণেও তাদের বাধা নেই। তা বাদে বহুদিন বৃটিশ শাসনের তাঁবেতে থাকায় অদ্যাবধি ভারতীয় মনোভাব পাশ্চাত্য ভাবধারার অধীনতা থেকে মুক্তি পায়নি।

ফলে এই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ভারতীয় শিল্পীগোষ্ঠি প্রথম যেমন একদিন পাশ্চাত্যের রোমান ও ভিকটোরিয়ান যুগে প্রবর্তিত শিল্প-সংস্কৃতিতে অন্ধ-অনুকরণ করেছে, তেমনি মতবাদের ফর্মুলায় বাঁধা হয়ে যে-চিত্রশৈলী এলো সাতসাগর জলে পাড়ি দিয়ে, তাকেও কোনক্রমে অবহেলা করতে পারলো না। অন্ধ-আবেগে সাগ্রহে তুলে নিয়ে নকলো করতে সুরু করে দিলে।...

মাঁতিসে বা পিকাসো যে একদা 'সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ আর্টিস্ট' ছিলেন,...প্রকৃতপক্ষে একথা যেন ভুলে যায় ভারতীয় সমকালীন শিল্পীগোষ্ঠী। পিকাসো অংকিত চিত্রের ওপরের কোন এক বিশেষ মতবাদের কাঠামো দেখে ভুলে গেছে ভারতীয় মডার্ন গ্রুপ, অথচ ভিতরে খোঁজ নিয়ে জেনে নিলে না পিকাসো আদতে একদিন সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ কলাকাররূপেই নিজেকে প্রকাশ করেছেন নিজের দেশে।...

বস্তুতঃ মাঁতিসে কিম্বা পিকাসো নিজের দেশে বসেই সব এঁকেছেন—তা এঁরা যে রীতি পদ্ধতিতে বা ফর্মুলাতেই আঁকুন... দেশ পরম্পরাকে অবহেলা করেননি কদাপি— যা কোন বৈদেশিক পরম্পরাকে স্বাচিত্রে স্থান দিতে হবে, এমন কখনো চিন্তাও করেননি মনে।

কিন্তু ভারতীয় সমকালীন গুরুদেবা করছেন বিচিত্রী ব্যাপার। দেশগত পরম্পরাগত সংরক্ষণ ত দূরের কথা, সামান্য মৌলিক চিত্রাংকনবিদ্যাজ্ঞান ব্যাপারেও এদের সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ ঘটে, যখন এদের অংকিত কোন চিত্র প্রদর্শনী কোথাও দেখা যায়। জ্যামিতিক লাইন, ছককাটা ফর্মুলা বা স্প্যানিজ স্টাইলে যাবতীয় কলার টিউবের 'ভিবজিও' ব্লেন্ড ঘটিয়ে জড়োপম (বা একস্ট্রাক্ট) একটা কিছু হতে বাধা থাকে না নানা ক্যানভাসে। কিন্তু তাই বলে তাকে

'মাস্টার আর্টপিস' বলে আখ্যা দিলে লজ্জা পাবার কারণ হয় বৈকি!

কিন্তু কেন এমন মিথ্যার বেসাতি বা অপপ্রচেষ্টা!... হঠাৎ কিছু একটা করে সমকালীন শিল্পীসমাজগোষ্ঠিতে রাতারাতি নাম কেনার বাসনা? নাকি ধোঁকাবাজি করে কিছু পয়সা কামানোর ফন্দি?

ভারতের এক মহাপুরুষ বলেছেন: 'চালাকির দ্বারা কোন মহৎকার্য সম্পন্ন হয় না'...। এমনি নীতি উপদেশ আজ ভারতীয় অ-স্থায়িত্ব শিল্পীগোষ্ঠির সামনে ধরলে কি অন্যায় হবে?

তারপর জিজ্ঞাস্য, পাশ্চাত্যদেশীয় সমকালীন কলাশিল্পের অনুকরণ বৃত্তির মধ্যে যেটুকু উত্তম সংজ্ঞা বিদ্যমান তাকে গ্রহণান্তর সর্বভারতীয় পরম্পরা মতে এই সমকালীন চিত্রকলার বিকাশ কি একেবারেই অসম্ভব বর্তমানকালীন ভারতীয় মডার্ণ গ্রুপদের পক্ষে? সর্বসম্মতভাবে ভারতীয় চিত্রকলাকে কি একান্তভাবেই ভারতীয় করে তোলা সম্ভব নয়?

অবশ্য কিছু আধুনিক শিল্প সমালোচকেরা বলে থাকেন সমকালীন চিত্রশিল্পের কোন জাতগুষ্টি নেই ত কোন পরম্পরায় বাঁধবে তাকে? বস্তুটি ত আন্তর্জাতিকতার সংজ্ঞায় বাঁধা। এক্ষেত্রে আমার ধারণা পিউরিটানের মত। আন্তর্জাতিকতার বিরাট নিরাকারবাদে আমার বিশ্বাস কম। জাতীয়তাবাদের সাকার তত্ত্ব বলে যদি কিছু থাকে তবে আমার সহানুভূতি সেখানে। অর্থাৎ কিনা চিত্রের সৃষ্টি হবে জাতীয়তাবাদে। যে-চিত্র আঁকা হবে, তাকে যেন একান্তভাবেই ভারতীয় বলে চেনা যায়। যেমন চৈনিক চিত্র, চৈনিক জাতীয়তাবাদের প্রতীকরূপে চেনা যায়, যাতে প্রযুক্ত ঘটেছে পরম্পরা সম্পর্ক। জাপানের শিল্পীগোষ্ঠি নিশ্চয় এখনো পাশ্চাত্যের সমকালীন চিত্রশিল্পের মোহে জাতীয়তাবাদী পরম্পরাকে ত্যাগ করেনি। মধ্যপ্রাচ্যের পারস্য, ইরাণ বা ইরাকের শিল্পীগোষ্ঠি পারশীয় চিত্রকলার পরম্পরাতন্ত্রের মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রেখে সময়োপযোগী নিরীক্ষা-পরীক্ষায় ভারতীয় পরম্পরা শিল্পীদের মতই পথ খুঁজে পাওয়ার জন্যে আজ সচেষ্ট। এখনো এরা স্বীকার করেনি পাশ্চাত্যের সমকালীন চিত্রকলার তত্ত্ব সমীক্ষাকে। এসব হচ্ছে স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধা বা ভালবাসার গোড়া বা অপূর্ব নিদর্শনের কথা।

তারপর মনে রাখা প্রয়োজন, আসমুদ্রহিমাচল ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি যেমন প্রাচীন তেমন গভীর। কাজেই এ দুটি বস্তুর অংগীভূত কাব্য, সাহিত্য, শিল্পকলা সংগীত বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রাক ইতিহাস পর্ব থেকে ভারতীয় সামাজিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে এক উজ্জ্বল উৎকর্ষে ভাস্বর। এমনি ভাস্বরতা এসেছে দেশগত বহু রাষ্ট্র বিপ্লবের রক্তাক্ত সংগ্রামের পথে।

ক্রমিক ভারতীয় ইতিহাসের বিলীপর্বের ধারা পথে বহিরাগত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জাতির সমাবেশ ঘটেছে এ প্রয়োজনের

শিল্পী: নীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

সাগরতীরে।' কেউ মুগ্ধ হয়েছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে কেউ ধনৈশ্বর্যে'। গভীর আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যে কেউ ধর্মান্তর গ্রহণে বাধ্য হয়েছে, কেউ বা প্রাণবন্ত ভারতীয় সাংস্কৃতিক উৎকর্ষে বিচলিত হয়ে আজীবন গ্রহণ করেছে সংগীত বা শিল্পকলার সাধনা। ভারতীয় অতি প্রাচীন বিজ্ঞান ও দর্শনের গভীরতায় কেউ আত্মবিস্মৃত হয়ে ভারতীয় জীবনে একাত্ম হয়ে গেছেন, কেউ বা সমাজবাদ বা চাণক্যনীতিতে বিশ্বাসী হয়ে আমৃত্যু ভারতীয় কূটনীতি ক্ষেত্রে গভীর চতুরতায় যশস্বী হয়ে রয়েছেন।

ঐতিহাসিক হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মীয় পর্বগুলো সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পর পর একসূত্রে বাঁধা হলেও ঐস্লামিক ভারতে বৈপ্লবিক রদবদল বা পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য হয়।

গ্রীক বীর অ্যালেকজান্দারের ভারত আক্রমণের পরিণতিতে এমনি বিবর্তন ঘটেছিল হিন্দু সংস্কৃতিতে। জন্ম নিয়েছিল ইন্দোগ্রীক বা গান্ধার শিল্প-ভাস্কর্যের অনুশীলন। তাতে ভারতীয় পরম্পরাকেও লাভবানই হয়েছে—যেমন হয়েছে পারশিয়ান আর্টের অনুপ্রবেশে পারস্য দেশ আগত মুগল-পাঠান সম্রাটদের রাজত্বে। দক্ষিণাবর্তে হয়েছে চোল, পল্লব, আর হয়শালা রাজত্বে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে।

শিল্পকলা ও ভাস্কর্যের এরকম ঐতিহাসিক বংশের ধারা পর্বের পরিণতিতে জন্ম নিয়েছে এরকম কালোপযোগী শিল্পশৈলী।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রাবল্যে জন্ম নেয় মথুরা, ভরহুত আর সাঁচীর স্তূপ, কানহারী, অজন্তার অবিস্মরণীয় গুহাচিত্র, হিন্দুধর্মের প্রচার মাধ্যমে উত্তর ও অন্য ভারতে স্থাপিত হয় এলিফ্যান্টা, ইলোরা, খাজুরাহো, ভুবনেশ্বর আর কোনার্কের দেবশক্তির অপূর্ব শিল্পময় মূর্তিসমূহ—আর দক্ষিণ ভারতে, বাদামী, বেলুর, হলাবিদ মহাবলীপুরম প্রভৃতি স্থানে। বৈষ্ণব তন্ত্রের প্রচারে রাধাকৃষ্ণের বিরহ মিলনের সুমধুর রসসৃষ্টি করেন, পাহাড়ী গাড়োয়াল আর কাংড়ার বংশ পরম্পরাগত শিল্পী গোষ্ঠি।... জয়পুর বুন্দী, কিষাণগড় আর নাথদ্বারার পরম্পরাগত ঘরোয়ানায় সৃষ্ট হয় রাজপুত জীবন আলেখ্য। শাক্ত ও বৈষ্ণব মন্ত্রের উপাসক হিসাবে দক্ষিণাবর্তের মহীশূর রাজগোষ্ঠির বংশপরম্পরাগত পৃষ্ঠপোষকতায় জন্মগ্রহণ করে 'মাইশোর ট্রাডিশনাল আর্ট'।'

কিন্তু আশ্চর্যভাবে ভারতের পরম্পরাগত ভারতীয় চিত্রকলার অপমৃত্যু ঘটে দূরসাগরপারের বৈদেশিক শক্তির আগমনের ফলে।

পাশ্চাত্য দেশীয় চিত্রকলার দুর্বারগতিপ্রবাহের ফলে এমনি শোচনীয় অবস্থা ঘটতে বাধ্য হয়। ছোট-ছোট বিভিন্ন রাজ্যের পরম্পরাগত চিত্রগুণে বৈদেশিক চিত্রের এমনি প্রভাব প্রাবল্যে ঘরকুনো হয়ে যাবার দরুণ তথাকথিত ভারতীয় কলাকারদের জীবনে এক চরম বিপর্যয় ঘনিয়ে ওঠে।
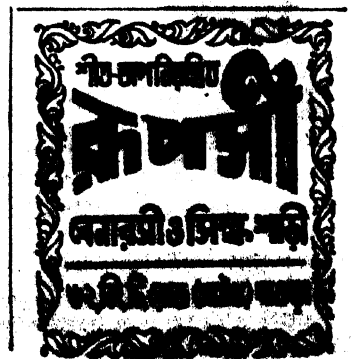
কেবলমাত্র কিছু সংখ্যক স্বাধীন রাজন্য-বর্গের অর্থানুকূল্যে মুষ্টিমেয় দেশীয় শিল্পী কোনপ্রকার জীবনধারণ করে পরম্পরাকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াসী হয়।

ঠিক এমনি অবস্থায় দেশের কয়েকজন শিল্পী পাশ্চাত্য শিল্পের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে সম্পূর্ণ রিয়ালিস্টিক অনুশীলনে চিত্রাঙ্কন করে ভারতীয় চিত্ররসিক গোষ্ঠিকে চমক দিলেন। এ'রাই হচ্ছেন রাজা রবিবর্মা, ধুরন্ধর, বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি রামায়ণ ও মহাভারতের 'ইলাস্ট্রেশনে' রাজা রবিবর্মা, রাম-লক্ষ্মণ, সীতা, রাবণ, শ্রীকৃষ্ণ, দুর্যোধন, যুধিষ্ঠির, পাণ্ডালী প্রভৃতির রূপ দিলেন প্রকৃত বাস্তবানুগ প্রাণী ও জীবজগত থেকে। অর্থাৎ একদা রবিবর্মা অংকিত রাম অধুনা নাটকাভিনীত রামাপেক্ষা কোন অংশেই বিভেদ্য নয়। কিংবা বর্তমানে চলচ্চিত্র কৃত শ্রীকৃষ্ণের চাইতে ধুরন্ধর অংকিত শ্রীকৃষ্ণের কোন তারতম্যই খুঁজে পাওয়া যায় না। অংকিত চিত্রে প্রকৃতির যে বাস্তবরূপ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিদ্যমান, বর্তমান নাটক ও চলচ্চিত্রেও তারই প্রতিচ্ছায়া যেন।...তবু জনসাধারণের চোখে এসব চিত্র অনন্যসাধারণ হয়ে ধরা দিয়েছে।

কিন্তু চিত্রকলার সম্পূর্ণ নতুন আংগিকের সৃষ্টি হয় আরো কয়েক বছর পর।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবংশের অবনীন্দ্রনাথ হলেন এর স্রষ্টা।

নতুন আংগিকের রূপ গ্রহণের পূর্বে অবনীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য রিয়ালিস্টিক অনুশীলনপন্থী ছিলেন। ইনি দুজন ইউরোপীয় চিত্রকরের কাছে পাঠ গ্রহণ করেন আন্তরিকতার সঙ্গে। এই সময় তিনি ভারতীয় চিত্র সমালোচক ও বাস্তুশিল্প বিশেষজ্ঞ পারসি ব্রাউন সাহেবের সংস্পর্শে আসেন,—যার বিরাট পাণ্ডিত্য থেকে তিনি ভারতীয় পরম্পরাগত চিত্রকলার ইতিহাস সম্যকভাবে অবগত হবার পর বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েন নতুন কিছু সৃষ্টির নিরীক্ষা-পরীক্ষায়। ভারতীয় সুপ্রাচীন কলাশিল্পের শাস্ত্রোক্ত ভাষ্য ও ষড়ঙ্গের সংজ্ঞা লাভ করেন তিনি। তারপর কলাশিল্প সম্পর্কীয় বহু দেশগত বিভিন্নধারা ও মননশীলতার অনুজ্ঞা বিশেষভাবে অনুধাবন করার পর তিনি এক আঙ্গিকের সন্ধান লাভ করেন—যার নাম দিলেন 'নব্য ভারতীয় চিত্রকলা।'

এমনি চিত্রকলায় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রইলো 'স্বভাব', 'পরম্পরা' আর 'স্বকীয়তা'।

নিরীক্ষা-পরীক্ষা ক্ষেত্রে আরো চারিটি উত্তম বস্তুর সংমিশ্রণ ঘটালেন তিনি। এক, 'নিপ্পোনী', 'ওয়াসসিস্টেম', দ্বিতীয় 'অজান্তিক অনুশীলন', তৃতীয় রাজস্থানীয় মিনিয়েচার, এবং চতুর্থত, মুগলাই 'টেম্পারা।'

আচার্য নন্দলাল এই নব্য ভারতীয় চিত্রকলার অন্যতম পথিকৃত।

এই পথের দিশারী হয়েছেন আরো অনেক ভারতীয় শিল্পী। এবং যারা লব্ধপ্রতিষ্ঠ তারা হচ্ছেনঃ অসিত হালদার, মুকুল দে, ক্ষিতীন মজুমদার, সমরেন্দ্র গুপ্ত, ভেঙ্কটাপ্পা, রমেন্দ্র চক্রবর্তী, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মন, পুলিনবিহারী দত্ত, রবি দত্ত, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, সারদা উকিল, বরদা উকিল, সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, জে এম আহিবাসী, সুধীর খাস্তগীর, বিনায়করাও মাসোজী, কনু দেশাই, মনীষা দে, কৃপালসিং সিখাওত প্রভৃতি।

নতুন সৃষ্টি হিসেবে উপরোক্ত শিল্পীগণ করেছেন আজীবন সাধনা।

পঞ্চাশ-ষাট বছরের এ'দের সম্মিলিত সাধনার পরিণতি স্বরূপ এ'দের উত্তরাধিকারীরা আজ বিপর্যয়ের সম্মুখে।

এমনি বিপর্যয় যতটা বাহির থেকে না এসেছে, তার দ্বিগুণিত হয়েছে নিজের দেশের অভ্যন্তর থেকে।

পাশ্চাত্যের ভিকটোরিয়ান যুগ প্রভাবিত স্বভাবশিল্পী হয়ে চিত্র আঁকছিলেন যারা এদেশে (অতুল বসু, হেমেন মজুমদার, এস এল হাল্দেনকার, এল এম সেন, সতীশ সিংহ, জে পি গাঙ্গুলী প্রভৃতি প্রাচীনপন্থীদের বাদ দিয়ে) তাদের মধ্যে সহসা বাহিরাগত একটা আন্দোলনের ঢেউ এসে বিভ্রান্ত করে দেয়। এই আন্দোলনই সমকালীন শিল্পসত্তার আন্দোলন, যার আলোচনা করা হয়েছে।

ভারতীয় পরম্পরাগত চিত্রাঙ্কন শিল্পধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানকালের এই সমকালীন চিত্রকলা বিশেষ একশ্রেণীর সুবিধাবাদী ও স্বার্থান্ধ কলাকারদের হাতে ভ্রান্ত ও ত্রুটিপূর্ণ হয়ে শুধু কলারসিক বা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করছে না, অনাগত দেশকাল ও ভাবী সমাজগোষ্ঠির সামনে রেখে যাচ্ছে বিভ্রান্তিকর সংস্কৃতির স্বাক্ষর।

যে বস্তু দেশ পরম্পরাগত যাকে বলা হয়ে থাকে 'ক্লাসিক' যাকে জীবনের অনেক শ্রমসাধ্য নিরীক্ষা-পরীক্ষায় আয়ত্বভূত করতে হয়, তার ভাবীকাল বা সমাজজীবনে মৃত্যু নেই—এই কথা আজ বর্তমানকালে যারা সমকালীন চিত্রশিল্প নিয়ে বিভ্রান্তিকর মাতামাতি করছেন, তাদের কাছে বিশেষভাবে উপস্থাপিত করার প্রয়োজন আছে।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রথম বক্তা মজুমদার হাত-পা নেড়ে অনেক কিছু বলে গেল। বিশেষ কিছুই শুনলাম না। শুনবার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু মাঝে মাঝে ওর কথা যেন কোথায় হারিয়ে যাচ্ছিল। বিরাট মিটিং-এর মাঝে হঠাৎ মাইক বন্ধ হয়ে যাওয়ার মত। অথচ সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, আর মজুমদার যে রকম তারস্বরে চীৎকার করছিল, কথা হারিয়ে যাবার কথা না। বার বার কাপুরের চেহারা মনে পড়ছিল। ওঁর সুন্দর চেহারা, পিঙ্গল চোখ, চওড়া রিস্ট, বিরাট ঘড়িটা—সবকিছু। কাপুরের বউ কাপুরকে ছেড়ে গেছে বলে মনে হয় না। এই পুরুষকে কোন মেয়ের পক্ষে ছেড়ে যাওয়া সম্ভব না। কাপুরই নির্ঘাৎ ওর বউকে মেরে রেখেছেন। কাপুর যখন কথা বলছিলেন, একটু একটু হাসছিলেন। হেসে হেসে যারা কথা বলে, তাদের বেশ দেখায়। এই যে মজুমদার চীৎকার করে যাচ্ছে, ওর মুখটা কী রকম বীভৎস একটা গহ্বর সৃষ্টি করে চলেছে। কাপুরকে মানুষ হিসাবে আমি মজুমদারের চেয়ে অনেক বেশী শ্রদ্ধা করি। কিন্তু সত্যিই কি শ্রদ্ধা করি, না হিংসা করি? ভেতরে ভেতরে চমকে উঠলাম। ভাগ্যিস কিছুক্ষণ আগে হালদার আমার হাত ছেড়ে দিয়েছিলেন, না হলে এই শিহরণটা নির্ঘাৎ তাঁর হাতে ধরা পড়ত। এক-একজন মানুষ ভীষণ হাত ধরে কথা বলে। বস্তু বাজে অভ্যেস, আমার ভাল লাগে না।

হঠাৎ মজুমদারের কথা কানে আসতে লাগল, 'আমাদের সহকর্মী শ্রীঅংশু চট্টোপাধ্যায় আজ যে প্রশ্নটা কাপুরের সামনে তুলে ধরল, সেটাই আমাদের আসল প্রশ্ন। আমরা কারা? কী আমাদের পরিচয়, কী আমাদের সার্থকতা, কোথায় আমাদের স্বীকৃতি। যে-কোন অপিসে যান, দেখবেন, আমরাই সব, আমরা অর্থে এই কেরাণীরা, অথচ আমরা [illegible] না, আমাদের বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, কার্যক্ষমতা আছে, তবু আমরা কেন উপেক্ষিত হয়ে থাকবো?'

মজুমদার আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ আমি ওর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে চীৎকার করে বলতে লাগলাম, 'আমরা উপেক্ষিত কারণ আমাদের মধ্যে একটা মারাত্মক জিনিসের অভাব রয়েছে। আমরা সহিষ্ণু না। অসহিষ্ণু মানুষ বাঁচতে পারে না। আমরা ক্রমশই ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছি, অথচ আজ মিস্টার কাপুরকে দেখে এলাম। কত ধৈর্য ধরে তিনি আমাদের কথা শুনলেন, অথচ শুনবার মত কথা সেখানে কিছুই ছিল না, ছিল কতকগুলো দাবী-দাওয়া। প্রশ্নটা তা না। প্রশ্ন হলো, মুখে বড় বড় কথা না বলে, আমাদের অন্তর তন্ন তন্ন করে খোঁজার দিন আজ এসেছে। আমাদের বাবা কিম্বা ঠাকুর্দাদের সে-প্রশ্ন ছিল না। তাঁরা এমন একটা যুগে জন্মেছিলেন, যখন ব্যক্তিগত সমস্যা ছিল, কিন্তু সমষ্টিগত সমস্যা ছিল না। আজ সমষ্টিগত সমস্যার সামনে দাঁড়িয়ে আমরা যদি ব্যক্তিগত সমস্যার কথা চিন্তা করি, একে অপরকে অগ্রাহ্য কিম্বা অস্বীকার করি, আমার মনে হয়, আমাদের সমস্যা কিছুতেই মিটবে না। চুপ করতে যাচ্ছিলাম, হালদার মশাই বলে উঠলেন, 'থামলেন কেন, বলুন। খুব ভাল লাগছে।'

এক সঙ্গে অনেকে বলে উঠল, 'বলুন, বলুন!'

হাত জোড় করে বললাম, 'কলেজে কিম্বা অফিসে কোথাও বক্তৃতা দিইনি। পেশাটাকে মনে মনে ঘৃণা করি। হঠাৎ যা মনে এল বলে ফেললাম। যদি অনিচ্ছাকৃত-ভাবে কারও মনে আঘাত দিয়ে থাকি, মার্জনা করবেন।' বলতে বলতে মনটা কী রকম হয়ে গেল। খুব ছোট মনে হতে লাগল, আমি একজন সামান্য মানুষ। আমার একজন বিধবা মা আছে। সে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কবে আমার মাইনে বাড়বে, কবে সুষমা বউ হয়ে আসবে। একটু সুখ, একটা জীর্ণ সংসার আবার আলোয় ঝলমল করবে, মার এই সামান্য চাওয়াটা কি খুব অন্যায়। মোটেই না। আরও একটা প্রশ্ন মনে এল। সেই পুরনো প্রশ্নটা, মানুষ বাঁচে কেন। বাঁচে কি শুধু নিজের জন্য। যার নিজের বলতে কিছু নেই। আমি সুখে থাকবো, আমার অভাব-অনটন থাকবে না, আমার বউ আসবে, ছেলেপুলে হবে—এটা কি নিজের জন্যে বাঁচা? মার মত করে বাঁচতে পারি না আমি?

এই কিছুক্ষণ আগে যে অফিসের এতগুলো লোকের জন্য কিছু বলেছিলাম, সে-কথা ভুলে গেলাম। চিন্তাটা শুধু নিজেকে কেন্দ্র করেই ঘুরতে লাগল। শুধু নিজে না, মাকেও।

এক এক সময় কী রকম অদ্ভুত লাগে, যখন হঠাৎ আমার চিন্তাধারার সঙ্গে আর একজনের চিন্তা মিশে যায়। হালদার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বললেন, 'সংসারী মানুষের অসুবিধা কি জানেন, ইচ্ছা থাকলেও নানা বাধা এসে সামনে পড়ে, তাই বাধা হয়ে আবার নিজের মধ্যে গুটিয়ে যেতে হয়। এই যে সবাই বড় বড় কথা বলছে, শেষ পর্যন্ত বেশী দূর এগোতে পারছে না, এটা কিন্তু মিথ্যে না। ওরা সত্যি সত্যি এই মুহূর্তে সবার জন্যে চিন্তা করছে। কিন্তু সংসারের যে বিরাট চাকাটা দিবারাত্র [illegible] পিষছে, সেটা ভয়ানক নির্দয়, ক্ষমাহীন। সে শুধু পিষেই চলেছে, এটাই হয়ত এ-যুগের যন্ত্রণা।

বিস্মিত হয়ে [illegible] মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। তিন[illegible] বয়স হয়েছে, কিন্তু হাসিটা খুব সরল। উনি যখন হাসেন, [illegible] [illegible] মনে হয়।

আমার নিজের [illegible] [illegible] বাধা এসেছিল। প্রথম [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। ভেবেছিলাম, দেশের [illegible] [illegible]

করবো। শেষ পর্যন্ত কিছুই হল না। বিয়ে টিয়ে করে ঘোর সংসারী হয়ে বসলাম।' বলে উনি হাসতে লাগলেন।

'কিন্তু আপনি তো ইউনিয়নের একজন হোমরা-চোমরা ব্যক্তি।'

'সে শুধু নামে। কিন্তু ছাত্রজীবনের মত সেই একাগ্রতা কোথায়। সেই প্রেরণা কি আর খুঁজে পাই নিজের মধ্যে? পাই না।' তিনকড়িদাকে হঠাৎ বিষণ্ণ দেখাল।

বললাম, 'মানুষ তো বদলায়। শুধু মানুষ কেন, সবাই বদলায়। ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতির রং বদলায়। আমরা তো প্রকৃতি ছাড়া না, তিনকড়িদা।'

'তুমি কিন্তু বেশ কথা বলো, ভাল লাগে শুনতে, হঠাৎ তুমি বলে ফেললাম বলে মনে কিছু করো না। আমি তোমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়।'

উত্তর দিলাম না। হাসলাম। তিনকড়িদা আবার বললেন, 'তোমার পাটনায় বদলির কথা শুনে আমি খুশী হয়েছি। খুশী হয়েছি এই কারণে যে অন্তত একটা কাঁচা তাজা প্রাণ এই গুমোট আবহাওয়া থেকে মুক্তি পেয়ে গেল। যে মুক্তি পেল, সেই তো বেঁচে গেল।'

'আমার ছেলেবেলায় দেখেছি, মা একটা টিয়া পুষতো। টিয়াটা সব সময় খাঁচায় থাকতো, শুধু বিকেলের দিকে মা ওকে ছেড়ে দিত। ও ফুর ফুর করে উড়ে বাড়ির সামনে বড় বড় যে গোটাকয়েক তালগাছ ছিল, তাদের মাথায় গিয়ে বসতো, আমাদের ওদিকটা তখন আরও নির্জন ছিল। অনেক টিয়া এসে তালগাছের মাথায় বাসা বেঁধেছিল। কোন কোন দিন দেখেছি একা একা ও আকাশের অনেক উঁচুতে উড়ে চলে গিয়েছে, মনে হতো ও আর ফিরল না। মা কিন্তু ওর ওপর বিশ্বাস হারাতো না। বলতো, ও ঠিক আসবে। যে একবার খাঁচার স্বাদ পেয়েছে, সে আর পালাতে পারবে না। সত্যি তাই। সন্ধ্যে সন্ধ্যে সময় ও ঠিক এসে খাঁচার মধ্যে বসতো। যতক্ষণ না খাঁচার দরজা বন্ধ হয়, আমি যেন ওর চোখে একটা আতংক দেখতাম, ওর নিরাপত্তা সম্বন্ধে ও নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। এমনও তো হতে পারে পাটনায় গিয়ে আমি কোলকাতার এই খাঁচাটারই স্বপ্ন দেখবো, কবে আবার ফিরে আসতে পারবো, তাই ভেবে ছটফট করবো।'

তিনকড়িদা আমার কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন, 'কী জানি ভাই, আমাকে যদি কেউ মুক্তি দিত, আমি আর ফিরতাম না, সংসার বড় হয়ে গিয়েছে, না হলে রিটায়ার করে একটা নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে চাষাবাদ করতাম।'

'সেখানেও তো কৃষক আন্দোলন। যাবেন কোথায়?'

'হোক আন্দোলন, একদিন নিজে আন্দোলন করে এসেছি, আজ না হয় ওদের আন্দোলন দেখতাম।'

হঠাৎ সবাই সমস্বরে চীৎকার করে উঠল, 'আমাদের লড়াই, চলছে, চলবে।' ঘন ঘন ইনক্লাব জিন্দাবাদ ধ্বনি হলের চার দেওয়াল কাঁপিয়ে দিতে লাগল। জানি না, কাপুর এখনও ডিক্‌টেশন দিচ্ছেন কিনা, আর গভীর মনোযোগ নিয়ে সুপ্রিয়া নোট নিয়ে চলেছে কিনা। সবাইকে দেখতে পাচ্ছিলাম শুধু যতীনবাবু আর শুভেন্দু অনুপস্থিত। ওদের অনুপস্থিতি কারও চোখে পড়েছে কিনা বোঝা গেল না।

মিটিং ভেঙে গেল পাঁচটায়। এখন আর নিজের সীটে ফিরে যাওয়ার অর্থ হয় না। অথচ অনেক কাজ জমা হয়ে রয়েছে। যতীনবাবু জানিয়েছেন, রিজার্ভেশন পেলেই আমাকে চলে যেতে হবে। যাওয়ার আগে নিয়ম অনুযায়ী সমস্ত কাজ শুভেন্দুকে বুঝিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য। কাল সকাল সকাল অফিসে এসে শুধু কাজই করবো, এমন একটা প্রতিজ্ঞা করে রাস্তায় পা দিলাম।

রাস্তায় পা দিয়েই মনে পড়ল, করবীদের বাড়িতে যাব। একটা ট্যাক্সিও পেয়ে গেলাম। মাসের মাঝামাঝি সময় ট্যাক্সি চড়ার বিলাসিতা শোভা পায় কিনা এ-ধরনের একটা প্রশ্ন যে মনে জাগে না তা না। আঁতুড় ঘরেই প্রশ্নটাকে মেরে ফেলা হোল। আজ বাদে কাল আমার মাইনে বাড়বে, অ্যালাউন্স হিসেবে বেশ কিছুটা টাকা আসবে, অত শত হিসাব না করলেও আমার চলবে।

কলিং-বেল টিপতেই একটি বছর পাঁচেকের ছেলে এসে দরজা খুলে দিল। বললাম, 'করবী আছে?'

'করবী কে?'

মহামুস্কিল। করবীর বাবা কিম্বা স্বামীর নাম আমি জানি না। প্রথমে মনে হল, বাড়িটা ভুল হয়নি তো। দু-পা পেছিয়ে এসে গেট দেখলাম। এই তো সেই গেটটা, যেটা খুলে করবী বাড়ির মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল, শ্যামবাজারের এই অঞ্চলে সব বাড়ির সামনে একটু জায়গা, আর সৌখিন গেট থাকে না। গেটের মাথায় সেদিন একটা লতানো ঝাড় দেখেছিলাম, সেদিন অন্ধকারে ঝাড়টা চিনতে পারিনি। দিনান্তের আলোয় আজ গাছটা চেনা গেল। বোগেন ভেলিয়ার ঝাড়ে গাঢ় লাল ফুলগুলো আশ্চর্য রকমের সুন্দর দেখাচ্ছিল।

ছেলেটি প্রশ্ন করলো, 'কি দেখছো?'

বললাম, 'ফুল।'

ও আবার প্রশ্ন করল, 'কোথায় ফুল?'

দুহাত দিয়ে ওকে কোলে তুলে নিয়ে চুমু খেয়ে বললাম, 'এই তো।' এক-একটি ছেলেকে দেখলে আদর করতে ইচ্ছে করে।

ছেলেটি ছটফটিয়ে উঠল, 'আমি কোলে চড়ি না। হেঁটে হেঁটে দাদুর সঙ্গে বেড়াতে যাই।'

ওকে নামিয়ে দিয়ে বললাম, 'তোমার দাদুর নাম কি?'

ও এদিক-ওদিক তাকিয়ে কিছুক্ষণ কী খুঁজল তারপর হেসে ফেলে বলল, 'জানি না, তুমি দাদুর সঙ্গে দেখা করবে?'

'না, আমি করবীর সঙ্গে দেখা করবো। সে-ই করবী, যে জামসেদপুরে থাকে, আগে বালীগঞ্জ প্লেসে থাকতো।'

ছেলেটি কিছুতেই বুঝতে পারছিল না। ও ঘন ঘন চোখ পিটপিট করছিল। ওর অবস্থা দেখে বিষম হাসি পাচ্ছিল, এক সময় হেসে ফেলে বললাম, 'তোমাকে আর কষ্ট দেবো না, দাদুকে ডাকো তো।'

ছেলেটি দাদু দাদু বলে ডাকতেই এক বৃদ্ধ বেরিয়ে এলেন, বললাম, 'করবী আছে? আমার বোন বেবী ওর খবর নিতে পাঠিয়েছে।'

'কোন বেবী?'

'বালীগঞ্জ প্লেসে থাকতো, এখন বিয়ে হয়ে ভবানীপুরে গেছে।'

'ও তুমি বেবীর ভাই আর কিনা বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছো। এসো, এসো, ভেতরে এসো।'

ভেতরে এসে বসতে হল, বৃদ্ধ বললেন, 'করবী তো কাল জামসেদপুরে চলে গেল। আরও কদিন থাকার কথা ছিল,

হঠাৎ ট্রাঙ্ক কল এসে হাজির, জামাইয়ের কী নাকি পার্টি আছে।' মনে হল ভদ্রলোক একটু যেন মুখ কুঞ্চিত করলেন। নাকি দেখার ভুল।

বৃদ্ধকে প্রণাম করে বললাম, 'আপনি করবীর বাবা? আপনারা তো আগে বালীগঞ্জে থাকতেন?'

'হ্যাঁ, মেয়ে দুটির বিয়ে হয়ে গেল, ছেলেটিও আমেরিকায় রয়েছে, বড় বাড়িটা ভাড়া দিয়ে এই ছোট বাড়িটায় এসে উঠেছি। এটাও নিজেদের। দুই বুড়ো-বুড়ি একা একা থাকি, সময় কাটে না, তাই এই দাদুটিকে এনে রেখেছি।' বলে বৃদ্ধ দুই হাত দিয়ে ছেলেটিকে কাছে টেনে নিলেন।

বললাম, 'কার ছেলে, করবীর?'

'হ্যাঁ, ও এখন আমাদের সঙ্গেই থাকে, করবী মাঝে মাঝে এসে দেখে যায়।'

'ওকে জামসেদপুরে পাঠান না?'

'না।' এবারও মনে হল ভদ্রলোকের মুখে কয়েকটা কুঞ্চনরেখা ফুটে উঠল। নাকি দেখার ভুল।

ছেলেটির দিকে ঝুঁকে পড়ে বললাম, 'তোমার নাম কি?'

'দেবাশীষ।'

'সত্যিই তুমি দেবাশীষ।'

আরও কিছুক্ষণ বসে থেকে উঠে পড়লাম। বৃদ্ধ বললেন, 'বেবীকে একবার আসতে বলো, অনেকদিন ওকে দেখি না। ওর ছেলে পুলে কটি।'

হঠাৎ বলে ফেললাম, 'একটি ছেলে একটি মেয়ে।' বেবীর ছেলেপুলে সম্বন্ধে আমার সঠিক ধারণা নেই, আদৌ ছেলে-মেয়ে আছে কিনা তা-ই বা কে জানে! কেন যে শুধু শুধু মিথ্যে কথাটা বলে ফেললাম!

গেট খুলে বেরিয়ে আসতে যাব, পেছনে টান পড়ল। দেখলাম, দেবাশীষ। বললাম, 'তুমি একা একা বাইরে বেরিয়েছো, দাদু বকবেন।'

ছেলেটি হেসে ফেলল, 'দাদু বকে না, কেউ আমাকে বকে না। শুধু একজন বকে। একদিন মেরেওছিল।'

'কে সেই নরাধম তার নাম বলো, আমি তাকে এমন মার মারবো না!'

'সত্যি তুমি তাকে মারবে?' কথা বলে ও হাতের ইসারায় আমাকে নীচু হতে বলে কানে কানে বলল, 'বাবা বাবা আমাকে মেরেছিল, এক-একদিন মাকেও মারে। সেদিন বাবা খুব চেঁচায়, একথা তুমি কিন্তু কাউকে বলো না। তারপর থেকেই তো মা আমাকে দাদুর এখানে পাঠিয়েছে।'

হঠাৎ বুকের মধ্যে কী রকম করে উঠল। ওকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে বললাম, 'তুমি খুব ভালো ছেলে, কেউ তোমাকে মারবে না, কেউ তোমার মার গায়ে হাত দিতে পারবে না।'

ও আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'তুমি আবার এসো, মা এলে কী বলবো, তোমার নাম কি?'

'আমার নাম, আমার নাম কী বলবে, বলো, সেই বোকা মানুষটা এসেছিল। তাহলেই তোমার মা বুঝতে পারবে।'

গেট খুলে বেরিয়ে এলাম। দেবাশীষ তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে, আবার ফিরে এলাম। ও বলল, 'কি, আবার এলে যে?'

'দেবশিশুকে দেখে গেলাম।'

দেবাশীষ খিল খিল করে হেসে উঠল, 'আমার নাম তো দেবাশীষ।'

বাইরে এসে বাসে উঠতে ইচ্ছা করল না। তখন সন্ধ্যা হয়-হয়, সূর্য অস্ত গেছে, না কোন উঁচু বাড়ির আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে বোঝা গেল না। এই ধরনের একটা সময় আমি রাজভবনের পাশ দিয়ে হাটতাম। অনেকটা ফাঁকা জায়গা চোখে পড়ত। কোন কোনদিন সূর্য অস্ত যাওয়া দেখেছি যেতে যেতে। সঙ্গে সুপ্রিয়া আসিত। আজ কেউ নেই। ফাঁকা জায়গাও নেই। আছে অগণিত মানুষ, মানুষের বিরাট মিছিলের মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দিলাম। আলাদাভাবে আমি এখন আর কেউ না, আমার নাম অংশু চট্টোপাধ্যায় না। আমার বাবা কিম্বা ঠাকুর্দা কিম্বা ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ আমার বংশপরিচয় বহন করে নিয়ে আসেনি—আমি শুধু একটি বিরাট মিছিলের ক্ষুদ্র অংশ। হাটতে হাটতে আজকের সমস্ত দিনের ঘটনার কথা মনে পড়তে লাগল। সমস্তটাই বিচিত্র বলে মনে হল। প্রথমে কাপুরের সামনে গিয়ে হঠাৎ যে প্রশ্ন করে বললাম, আমরা কারা, কথাটা সেই মুহূর্ত ছাড়া আমার আর কোনদিন মনে হয়নি। তারপর ছোটখাটো একজন ইউনিয়ন লীডার হতে গিয়েও হতে পারলাম না। কোথায় যেন একটা বাধা আমার সামনে এসে দাঁড়াল। দূরের দৃষ্টি কাছে সীমিত হল। একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে অতর্কিতে করবীদের বাড়িতে চলে আসাটাও বিচিত্র না। ইচ্ছে করলে করবীর সঙ্গে আগেই দেখা করতে পারতাম। কিন্তু সেই ইচ্ছা হয়নি, আজই হল। বিশেষ এক একটা মুহূর্ত জীবনে কেমন যেন এলো-মেলো বাতাস বয়ে আনে, গুছনো জিনিস-গুলো তছনছ হয়ে যায়। আমি যখন কাপুরকে প্রশ্ন করেছিলাম, আমরা কারা, সুপ্রিয়া নিমেষের জন্য নোটের পাতা থেকে চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। ওর চোখের ভাষা আমি পড়তে পারিনি। হয়ত ক্ষোভ, গঞ্জনা, ধিক্কার কিম্বা শুধুমাত্র কৌতূহল ছাড়া সেখানে আর কিছুই ছিল না। সুপ্রিয়ার চোখ দুটো এখন খুব পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম। এত পরিষ্কার যে কী বলবো! আমার সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে যে মানুষজন চলছিল, তাদের মুখের চেয়েও অনেক বেশী স্পষ্ট। অথচ ওর চোখের ভাষা বোঝা যাচ্ছিল না। সুপ্রিয়া কি ক্ষুব্ধ হয়েছিল, কাপুরকে প্রশ্ন করেছিলাম বলে। মুখে যাই বলুক না কেন, কাপুর আমার কথায় খুশী হননি। হতে পারেন না। লোকটি অসম্ভব বুদ্ধিমান, বুদ্ধির আড়ালে রাগটা ঢেকে রেখেছিলেন। কিন্তু সুপ্রিয়ার চোখে কি ছিল! ক্ষোভ, দুঃখ, হতাশা, ক্রোধ, না কিছুই না, শুধু কৌতূহল? কাল অফিসে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কাপুরের চাপরাশী এসে সামনে দাঁড়িয়ে নির্ঘাৎ বলবে, 'মিস্টার-মেমসাব সেলাম দিয়া।' আমি যাব না। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, পালিয়ে বেড়াবার প্রয়োজন আমার নেই। কোথাও না হোক, অফিস ইউনিয়নের চোখে আমি আজ সাধারণ দশটা মানুষের চেয়ে উঁচুতে, ওরা আমার কথা শুনেছে, আরও কথা শুনতে চেয়েছিল। আমি চাইলে ওরা আমাকে ওদের গন্ডীর মধ্যে টেনে নেবে। তখন কাপুরের ঠাকুর্দারও সাধ্য নেই আমার কেশাগ্র স্পর্শ করে। সুপ্রিয়া তো—মনে মনে দুই আঙ্গুলের মাথায় তুড়ি বাজালাম।

অনেকটা পথ হেঁটে এসেছি, সমস্ত শরীরে ঘাম। এক এক সময় ঘাম-ঝরা শরীর নিয়ে হাটতে আরাম হয়, নিজেকে মেহনতী মানুষ বলে ভাবতে ভাল লাগে। করবীর স্বামী লোকটা যে ভাল না, সে ধরনের একটা ধারণা আমার আগেই হওয়া উচিত ছিল। ট্যাক্সিতে আসতে আসতে করবী সেদিন যা বলেছিল, তা থেকেই এমন একটা ধারণা হতে পারতো। কিন্তু সেরকম কোন ধারণা হয়নি, যে হেতু আমার মনে করবী সম্পর্কে কোন বিশেষ কোমল অনুভূতি ছিল না। আজও নেই। আজ যে কেন হঠাৎ করবীর বাড়িতে যেতে গেলাম। মন যখন খুব অশান্ত থাকে, তখনই কি করবীদের কথা মনে পড়ে। একদিন করবী আমার বুকে মুখ ঘষেছিল, ওর ঠোঁটে চুমু খেয়েছিলাম, তাই কি ওর বাড়িতে এলাম? নাকি ট্যাক্সিতে সেই যে বলল, তুমি বোকা না, তুমি ভীষণ ছেলেমানুষ তাই। মানুষ হয়তো অশান্ত মন নিয়ে যে যার করবীর কাছে যায়, দুটো মিষ্টি কথা শোনার আশায়, কিম্বা ওদের নরম বুকে একটুক্ষণের জন্যে নিজেকে বিলিয়ে দেবার প্রত্যাশায়, সাধারণত হাটতে আমার দারুণ আলস্য। বাড়ি থেকে বাজার খুব দূরে না। ছুটি-ছাটার দিনে মা'র তাগাদায় বাজারে যেতে হয়। মনে হয় কতটা দূর পাল্লার পথ।

অথচ আজ অনেকটা পথ হেঁটে এলাম। জামা ভিজে উঠেছে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। একটুও ক্লান্তি আসে নি তো। বরং মনে হচ্ছে আমি আরও বহু বহু দূরে হেঁটে যেতে পারবো। যশোর রোড যেখানে লোকালয় ছাড়িয়ে নির্জন হয়ে এসেছে, দু পাশে ধান ক্ষেত, কিম্বা বড় গাছ, কিম্বা ধু ধু মাঠ, তার মধ্য দিয়ে আমি হাঁটতে থাকব। শুধু হাঁটা, হাঁটতে হাঁটতে এক সময় হারিয়ে যাব।

আমি কল্পনাবিলাসী মানুষ না। আমার কল্পনা যদি কিছু থাকে, সেটা একটা পরিচ্ছন্ন সংসার, যে সংসারে অভাব-অনটন নেই, চাওয়া-পাওয়ার প্রশ্নটা যেখানে দৈনন্দিন শান্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না, সে রকম কিছু। আজ নানা কথা ভাবতে ভাল লাগছিল। হঠাৎ মনে পড়ল, বড়-মামাকে ওষুধ পেঁছে দেওয়ার কথা লিখে-ছিলাম সকালে, একটা লোক এসে প্রেস-ক্রিপশন দিয়ে গিয়েছিল। বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম। যা ব্যস্তবাগীশ মানুষ, গভীর রাত্রে ঠিক বাড়ীতে এসে হাজির হবেন। সামনেই একটা ডিসপেন্সারী ছিল। ভাগ্য ভাল ওষুধটা পাওয়া গেল, উল্টো দিকের একটা বাসে উঠে পড়লাম। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হবে। মা নিশ্চয় খুব চিন্তা করবে। করুক। একসঙ্গে সবার দিকে তাকানো যায় না।

বড়মামা আমার জন্যেই বসে ছিলেন। বললেন, 'এত দেরী যে!'

'আর বলেন কেন। যাওয়ার ব্যাপার নিয়ে কি কম ঝামেলা।'

'যাওয়ার দিন ঠিক হলো?' নিতুদার প্রশ্নে তাকিয়ে দেখলাম, অন্ধকার মতন একটা কোণে নিতুদা বসে রয়েছে। প্রথমটা দেখতেই পাই নি।

বললাম, 'নাঃ। সেই তো হয়েছে মুস্কিল। কবে টিকিট হাতে গুঁজে দিয়ে বলবে, স্টার্ট। এরা যে মানুষকে কি ভাবে!'

নিতুদা মুখ দিয়ে সমর্থনসূচক শব্দ করলো। বড়মামার দিকে ওষুধের প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'এই নিন।'

ওষুধ নিয়ে বড়মামা নিতুদার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অনেকগুলো টাকা বেঁচে গেল। বড় আপিসে কাজ করার সুখ আছে, বুঝলে নিতু। কোথায় কে মামা, যাও তাকে বিনে ভিজিটে দেখে এসো, তার ওষুধ সাপ্লাই দাও, আর আমাদের আপিস হয়েছে যত সব ঘোড়ার আস্তাবল। কোন নিয়ম নেই, সুখ-সুবিধা নেই। চুরি করো, সুখ আছে। কিন্তু যারা চুরি করবে না, তাদের দিকে একটু তাকিয়ে দ্যাখ বাপু, এই যে ত্রিশ বছর সমানে কলম পিষে এলাম। কি পেলাম বলো তো!

নিতুদা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'কম তো পেলেন না। সমস্ত আপিসের যে বড়-বাবু হয়ে আছেন, সেটা ক'জনের ভাগ্যে হয় বলুন তো। অনেষ্টির একটা দাম চির-দিনই ছিল, চিরদিন থাকবেও।' যদিও নিতুদা বড়মামাকে নিয়েই কথাগুলো বলছিল, তাকিয়েছিল আমার দিকে।

এসব ক্ষেত্রে মানুষ চুপ করে থাকতে পারে না, বললাম, 'তাতো বটেই! অনেষ্টি পেজ ইন লং রান।'

বড়মামা কথা বললেন না। একজন পরিতৃপ্ত মানুষের মত মুখ করে বসে রইলেন।

বললাম, 'বাড়ির আর সবাই কোথায়?'

'ওরা সব সিনেমায় গেছে। নিতু একটা পাশ নিয়ে এসেছিল,' বলে বড়মামা উঠে ভেতরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ফিরে এসে একটা বড় শিশি আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'নিয়ে যা। তোর জন্যে সুষমা তৈরী করেছে।'

'কী আছে এতে?' বলে নিতুদার দিকে তাকালাম।

নিতুদা উত্তর দিল না। বড়মামা বললেন, 'কুলের আচার। তুই নাকি ভালবাসিস।'

'কি দরকার ছিল এত কষ্ট করে—'

আমার কথা শেষ হবার আগেই নিতুদা বলে উঠল, 'কষ্ট কি! সুষমা খুব কাজের মেয়ে। ঘরের কাজকর্ম বলো, সেলাই বলো, রান্নাবান্না বলো সবই জানে। অবস্থা বিপাকে বেশী দূর পর্যন্ত পড়াতে পারি নি। ছেলে-বেলায় বাবা মারা গেলেন। সংসারের দায়িত্ব এসে ঘাড়ে পড়ল। না হলে সুষমার ব্রেন খুব শার্প, ও নিশ্চয় ভাল রেজাল্ট করতো। যদিও পাশ করে নি, অনেক মেয়ের চেয়ে ওর আউট নলেজ বেশী। সেদিন বলে কি জানেন, লালবাহাদুর শাস্ত্রী যদি আরও কয়েকটা বছর বাঁচতেন, দেশের চেহারা ফিরে যেতো।' শেষের কথাটা বড়মামাকে লক্ষ্য করে বলল নিতুদা।

বড়মামা ঘাড় দোলাতে দোলাতে বললেন, 'বেশ দামী কথা বলেছে তো।'

অন্ধকার অনেকটা চোখ-সওয়া হয়ে গিয়েছিল, দেখলাম, নিতুদা সতৃষ্ণ নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। হঠাৎ নিতুদার জন্য দারুণ মায়া হতে লাগল। বলে উঠলাম, 'সত্যি সত্যি হয়তো দেশের অবস্থা এতটা খারাপ হতো না। মানুষ ক্রমশই ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে পড়ছে।'

বড়মামা বলতে লাগলেন, 'দিনকে দিন যে কি অবস্থা হচ্ছে! রোজ গণ্ডায় গণ্ডায় ছেলেরা আসছে, কেউ বি-এ, কেউ এম-এ, কি বলে জানো! বলে পিওনের চাকরি হলেও দিন। কিন্তু দিন বললেই তো দেওয়া যায় না। চাকরি কোথায় বলো। চার দিকে যে রকম ডিপ্রেশন চলছে, এই দেশের কিছু হবে ভেবেছো। কিসসু হবে না। শুধু দিন গত পাপ ক্ষয়।' হঠাৎ বড়মামার কি খেয়াল হতে চিৎকার করে বড় মেয়েকে ডাকতে লাগলেন।

নিতুদা বলল, 'ওরা তো সব সিনেমায় গেছে।'

'ও তাই তো। আমার আবার ওষুধ খাবার সময় হলো। তোমরা বসো, আমি ওষুধটা খেয়ে আসছি,' বলে বড়মামা উঠে গেলেন।

নিতু আর আমি মুখোমুখি বসে রইলাম।

নিতুদাই প্রথমে কথা বলল, 'পাটনায় কত দিন থাকতে হবে?'

'বলে নি কিছু। দেখা যাক।'

'পুজোর সময় আসবে নিশ্চয়।'

'দেখি। চেষ্টা তো কোরবই আসতে।'

'তোমার মতামত কবে নাগাদ জানা যাবে?'

'কি ব্যাপারে?'

নিতুদা ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত বলে ফেলল, 'তোমার বড়মামার মুখে শুনেছি, তুমি নাকি ওয়েল এসটাব্লিসড না হয়ে বিয়ে করতে চাও না। অপেক্ষা করতে আমাদের তরফ থেকে কোন আপত্তি নেই, যদি তোমার দিক থেকে আশা পাই।'

কী যে বলবো বুঝতে পারছিলাম না। নিতুদার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকা দস্তুর মতো কষ্টকর হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। এক-জন মানুষ যে আর একজন মানুষের দিকে এমন আকুলভাবে তাকিয়ে থাকতে পারে, জানতাম না। চোখ সরিয়ে নিয়ে ভেতরের দরজার দিকে তাকালাম। মনে মনে বড়-মামাকে কামনা করতে লাগলাম। মনের ডাক বড়মামা হয়ত শুনলেন। দরজার ভেতর দিয়ে বড়মামাকে দেখা গেল। বড়মামা এদিকে আসছেন।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। আটটা বেজে গেছে। বাড়ি পেঁছতে অনেক রাত হয়ে যাবে। শুধু শুধু রাজনীতি নিয়ে তর্ক না তুলে আগেই উঠে পড়া উচিত ছিল।

বড়মামা বললেন, 'চললি? তাড়াতাড়ি চলে যা। খুকী আবার চিন্তা করতে বসবে। দিনকাল তো ভাল না।'

উঠে পড়লাম। নিতুদার কাছে গিয়ে বললাম, 'চলি।' নিতুদা অস্ফুট স্বরে কি একটা বলল, বোঝা গেল না। হয়ত বলল, এসো। নিতুদা নিশ্চয়ই বলতে চেয়েছিল, তোমার মতামতটা কবে জানতে পারবো? তোমার কথা পেলে আমাদের অপেক্ষা করতে আপত্তি নেই।

এক রকম নিতুদার ভয়েই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম। পিছন ফিরে দেখলাম, নিতুদা আসছে কিনা। না, নিতুদা আসছে না। কিছুটা পথ হেঁটে এসে বাস ধরতে হয়। হাঁটতে হাঁটতে বার বার মনে হতে লাগল, নিতুদা খুব দুঃখী একজন মানুষ। ইচ্ছে করলে ওকে কিছুটা সুখ আমি দিতে পারতাম। আমার কথা পেলে নিতুদা খুশী হত। নিজের অক্ষমতার কথা চিন্তা করে কষ্ট পেলাম, কিন্তু নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারলাম না।

মা যখন শুনল বড়মামাকে অষুধ দিয়ে এসেছি, মা খুশী হল বলল বেশ করেছিস। বড়দি বলেছিলো, ওদের এখন খুব টানাটানি যাচ্ছে। এ সময় যদি পয়সা দিয়ে ওষুধ কিনতে হতো, দাদার কষ্ট আরও বাড়তো। চিরদিন সৎ পথে চলেছে। অথচ শুনি, সৎ পথে থাকলে নাকি মানুষের কষ্ট থাকে না।'

'বড়মামা তো মানসিক সুখেই আছেন বলে মনে হলো। খুব রাজনীতি নিয়ে কথা বললেন।'

'এক সময়ে রাজনীতি নিয়ে খুব মেতেও উঠেছিলেন। চরকা কাটতেন, খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী ছাড়া পরতেন না। দেখিস না, দাদা আজকালও খদ্দর ছাড়া পরেন না।'

মাকে খুশী করতে ইচ্ছে হল হঠাৎ। বললাম, 'একজন আদর্শবাদী মানুষ বড়-মামা।'

'অথচ সেই লোক কষ্টে আছে বললে কত কষ্ট হয়। আমাকে যদি শেষ পর্যন্ত দাদার কাছে আসতেই হয়, মাসে মাসে টাকা পাঠাতে পারবি তো। একজন বাড়তি মানুষের খাওয়া, আজকালকার দিনে তো কম কথা না।'

'টাকা পাঠাতে আমার কষ্ট হবে না, তবে বড়মামা নেবেন তো। তুমি বরং মামীমার হাতে দিও। বলো, মিষ্টি খেতে দিয়েছি।'

মা নকল রাগ দেখিয়ে বলল, 'তোর যেমন কথা! প্রত্যেক মাসে কেউ মিষ্টি খেতে টাকা দেয় নাকি। তাছাড়া যে সংসারে পেট ভরে ভাত খাওয়াটাই একটা সমস্যা, সেখানে মিষ্টির কথাটা অবান্তর না!'

'তোমার যা ইচ্ছে হয় বলো। আমি মাসে মাসে একশো করে টাকা পাঠাবো।'

মা আঁৎকে উঠল, 'না, না, অত টাকা দিয়ে কী হবে? বিদেশ-বিভুঁই, তুই বরং টাকা জমাস। ঠেকা-অঠেকা আছে। তাছাড়া—' মা মিষ্টি হাসল। 'বিয়ের সময় টাকা লাগবে। নিতু আপনজন, ওর কাছে তো হাত পেতে পণ নিতে পারবো না।'

ইচ্ছে হল মাকে প্রণাম করে বলি, 'তোমার আদর্শবাদী দাদাটির চেয়ে তোমার আদর্শ অনেক বেশী সাবলীল আর স্বাভাবিক।' মনের কথা চেপে গিয়ে বললাম, 'সে পরের কথা। কোম্পানী অ্যালাওয়েন্স যা দেবে, তাতেই আমার চলে যাবে। তারপর বাড়ি করে তোমাকে নিয়ে যাবো। তখন কিন্তু সব সময়ের জন্য একজন লোক রাখতে হবে। শুনেছি ওখানে লোক সস্তায় পাওয়া যায়।'

মা খুশী মনে বলল, 'সে দেখা যাবে-খন। আগে তো তুই বাড়ি কর। বাড়িটা একটু দেখে-শুনে নিস। দেখিস, যদি এরকম একটা বাড়ি পাওয়া যায়। সামনে

ছোট্ট একটু জায়গা, একতলা বাড়ি, পিছনে পুকুর—'

'ওসব দেশে পুকুরটুকুর বড় একটা হয় না।'

'তা না হয়, না হোক। সামনে যদি একটু জায়গা থাকে, যদি পাওয়া যায় সে রকম, না হলেও ক্ষতি নেই, একটা বাড়ি হলেই হোল। তবে দুখানা অন্তত ঘর চাই। তোরা একটায় থাকবি, আমি একটায়।'

হেসে ফেললাম, 'তিনটে হলে আরও ভাল। বাইরের ঘরে লোকজন এসে বসবে।'

'ওখানে বাড়ি ভাড়া কি রকম রে?'

'কি জানি। কোলকাতার চেয়ে সস্তা নিশ্চয়।'

'তুই যেন আবার হুট করে এক কথারই রাজী হয়ে যাস না। একটু দরদাম করিস।'

'তুমি যে কি ভাবো আমাকে।'

'কী আর ভাববো, তুই মস্ত বড় হয়েছিস, খুব বুদ্ধি হয়েছে তোর—' মা মিষ্টি করে হাসল।

খাওয়া-দাওয়া সারতে বেশ রাত হয়ে গেল।

শুয়ে পড়ে বললাম, 'অনেক রাত হোল, এবার ঘুমোও।'

'ঘুম তো বারো মাস আছেই। তুই চলে গেলে কাজকর্মও থাকবে না। কি করে যে সময় কাটবে?'

'বড়মামীর সঙ্গে গল্প করবে।'

'বউদির যেন কাজ থাকবে না! শুধু আমার সঙ্গে গল্প করলে সংসার চলবে?'

'তুমি তবে কি করবে? শুধু শুয়েবসে তো সময় কাটানো যায় না।'

'তাই তো ভাবছি। তুই কিন্তু যত তাড়াতাড়ি হয় বাড়ি দেখিস। অপরের সংসারে তো বারো মাস থাকা যায় না।'

'দাদা কি পর?'

'বিয়ের পরে সবাই পর। নিজের স্বামী আর সন্তান ছাড়া। তুই কিন্তু গিয়ে বিন্তির ওদের সঙ্গে দেখা করিস। ওরা বহু দিন ধরে ওখানে আছে। ঠিকানা নিয়েছিস তো।'

বিন্তি মাসীমার নাম—যে মাসীমা ...লীগঞ্জ প্লেসে থাকেন। মাসীমার কথা ...ন হতেই করবীর কথা মনে পড়ল। ...রবীর ছেলেটি ভারী সুন্দর হয়েছে। অমন ...ন্দর শিশু সচরাচর দেখা যায় না। দেব-শিশু বলে মনে হয়। নিশ্চয় করবীর স্বামী ...ব সুন্দর। সুন্দর কোন মানুষ যদি ...সিত কাজ করে ক্ষমা করা যায় না। ঐ ...শুর গায়ে হাত তোলে কোন মানুষ!

মা বলল, 'ঘুমোলি?'

'না। কেন?'

'সুষমাকে কেমন লাগল রে?'

'মন্দ কি।'

'এড়িয়ে যাস নি। সত্যি করে বল... পত্তি নেই তো তোর।'

'যদি থাকে, কি করবে?'

'আপত্তি থাকবে কেন। ...পাত্তর ...ম তো না সে।'

'তবে জিজ্ঞেস করছো কেন?'

'বল না রে, কেমন লেগেছে তোর?'

...জালও...

'তবে কথা দি-ই?'

'না।'

'না কেন?'

'আগে টাকা পয়সার সচ্ছলতা আসুক। টাকা পয়সা না থাকলে সংসারে বড় নোংরামো আসে। দেখো নি হাজরাবাবুদের!'

হাজরাবাবুরা আগে আমাদের পাড়ার থাকতো। চব্বিশ ঘন্টা শাশুড়ী বউয়ে ঝগড়া করতো। একজন আর একজনের খাওয়া-পরা নিয়ে খোঁটা দিত।

মা বলল, 'সবাই মেয়েই তো হাজরাবাবুর বউয়ের মতো হয় না।'

'অভাব অনটনে সবাই হাজরাবাবুর বৌ কিম্বা মা হয়ে যায়। সুষমাও যে হবে না, তার কী ঠিক আছে।'

মা উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, 'বেশ, টাকা পয়সা জমিয়ে না হয় বিয়ে করিস। নিতু যদি আসে, আমি কিন্তু কথা দিয়ে দেবো। শুধু ওদের অনিশ্চয়তায় পেছনে ছুটিয়ে লাভ কি।' কিছুক্ষণের মধ্যেই মা ঘুমিয়ে পড়ল।

নিতুদা একজন দুঃখী মানুষ। আমি তাকে সুখী করে আসতে পারি নি। মা যদি নিতুদাকে সুখী করতে পারে, আমার কি আপত্তি। মানুষ তো শুধুমাত্র নিজের জন্যেই বাঁচে না। বিয়ে যদি করতে হয়, সুষমাকে বিয়ে করলে মা সুখী হবে, নিতুদা সুখী হবে এবং যতদূর মনে হয় সুষমাও সুখী হবে।

সুষমা যে আমার জন্য আচার করেছে মাকে বলা হয় নি। শিশিটা টেবিলের ওপর রেখেছিলাম। কাল সকালে উঠেই মাকে কথাটা বলতে হবে। মা নিশ্চয় খুব সুখী হবে। এই সব ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে ঘুম ভাঙ্গল। ভাঙ্গল ঠিক না, ঘুম ভাঙ্গানো হল। মা কী রকম চঞ্চল হয়ে পড়েছে। মা বলল, 'ওঠ তো। তোদের আপিস থেকে কে যেন এসেছে। বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কিছুতেই ভেতরে এসে বসলো না।'

'কী রকম দেখতে? চাপরাশী চাপরাশী মতন? বাবো শুনে বখশিস নিতে এসেছে নিশ্চয় হরবিলাসটা।'

মার গলায় অস্থিরতা ফুটে উঠল। 'সে তো আপিসেই চাইতে পারতো। তাছাড়া দেখতে ...দের মত না। চোখে চশমা, ...।'

তাড়া... লাফিয়ে উঠলাম। প্রথমেই ... মনে পড়ল সে যতীনবাবু। ...বাড়ি ... খাওয়া ... কেন। নিশ্চয় কোন কু-মতলব আছে। আজ এলপার ... হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এলাম। হাত দিয়ে যতটা সম্ভব চুল ঠিক করে নিলাম। মুখ ধোবার সময় নেই। কোন লোক দাঁড়িয়ে থাকলে অস্বস্তি হয়।

সত্যি সত্যি যতীনবাবু, গেটের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কাছে গিয়ে বললাম, 'কি ব্যাপার, ভেতরে আসুন।' যতীনবাবু ইতস্তত করতে লাগলেন। আবার বললাম, 'কোন ভদ্রলোকের বাড়িতে এসে না বসে গেলে তাকে অপমান করা হয়।'

যতীনবাবু একবার পিছন দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমি একা আসিনি।'

'সঙ্গে কে আছে?' বলে গেটের বাইরে এসে তাকাতেই দেখলাম, গাড়ির জানালা থেকে মুখ বার করে আছে সুপ্রিয়া। সুপ্রিয়া হাসিমুখে বলল 'সুপ্রভাত।'

আমার মুখ দিয়ে যে আওয়াজ বেরোল তাকে কোন ক্রমেই সুপ্রভাত বলা যায় না। অর্ধ কিংবা সিকি উচ্চারিত অস্ফুট একটা শব্দ মাত্র। সুপ্রিয়া গাড়ি থেকে নেমে এল। কাছে এসে বলল, 'বেড়াতে বেড়াতে এদিকে চলে এলাম।'

'বেড়াতে বেড়াতে?' বিড় বিড় করে ওর কথা উচ্চারণ করা ছাড়া আমি আর কোন কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

'চলুন কাকা, ভেতরে গিয়ে বসি। বাড়ির মালিক তো আর বসতে বলবে না।'

এতক্ষণে যেন জ্ঞান ফিরে এল। তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'যতীনবাবুকে ভেতরে এসে বসতে বলেছিলাম।'

সুপ্রিয়া খুব নীচু গলায় বলল, 'কিন্তু আমাকে ভেতরে যেতে বলোনি। আমিই সেধে যাচ্ছি।' যতীনবাবু ততক্ষণ বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছেন।

নিজের দিকে দৃষ্টি গেল। পরনে রং-ওঠা নীল লুঙ্গি। গায়ে গেঞ্জি, চুল উসখোখুসকো, এ অবস্থায় কোন ভদ্রমহিলার সামনে দাঁড়ানো রীতিমত অস্বস্তিকর। সুপ্রিয়া এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে যাচ্ছিল। ওবে প্রতি মুহূর্তে আমাদের আর্থিক অবস্থা মেপে নিচ্ছে আমি সেকথা বুঝতে পারছিলাম। উঠোনের ঐদিকটায় শুকনো পাতার একটা স্তূপ পড়েছিল, সেইদিকে আঙুল বাড়িয়ে সুপ্রিয়া বলল, 'পুড়িয়ে ফেলা উচিত। সাপখোপ থাকতে পারে। এদিকে সাপ কেমন?'

'এত বিষয় থাকতে প্রথমে সাপের কথাই মনে পড়লো?' আমি ক্রমশই স্বাভাবিক হয়ে আসছিলাম।

সুপ্রিয়া হাসল। সুপ্রিয়ার দাঁত খুব ঝকঝকে। হাসলে ওকে সুন্দর দেখায়। আমার ধারণা একথা ও জানে, তাই কারণে-অকারণে হাসে। 'সাপকে ভয়ও লাগে, আবার ভয়ানক ইন্টারেস্টিংও মনে হয়। জন্তু-জানোয়ারদের মধ্যে এত মারাত্মক আর কোন প্রাণী মানুষের এত কাছাকাছি থাকে না।'

'সাপ জন্তু-জানোয়ারের পর্যায়ে পড়ে না।'

সুপ্রিয়া খিল-খিল করে হেসে উঠল, 'সত্যি ইউ আর এ জিনিয়াস। কী দারুণ আবিষ্কার।'

যতীনবাবু সামনের বারান্দায় উঠে গিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। সুপ্রিয়া বারান্দার দিকে না গিয়ে ডানদিকে গেল। বাধ্য হয়ে আমাকেও পিছন পিছন যেতে হল। একটা পেয়ারা গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। হঠাৎ সুপ্রিয়া চীৎকার করে উঠল, 'ওমা, কী বড় বড় পেয়ারা। আমি পেয়ারা খাবো।' বলে এমন করে আমার মুখের দিকে তাকাল কে বলবে এই সেই সুপ্রিয়া মিত্র, যার একটু কথায় কিম্বা চোখের ইঙ্গিতে এক একজনের ভাগ্য-তারকা জ্বলজ্বলে হয়ে ওঠে, কিম্বা একেবারে নিভে যায়। সুপ্রিয়া আমাকে মিনতি করে বলল, 'আমাকে পেয়ারা পেড়ে দাও অংশু, প্লীজ।'

'কিন্তু আমি গাছে চড়তে জানি না, বিশ্বাস করো।'

'একটু চেষ্টা করলেই পারবে। কী এমন শক্ত কাজ যে তুমি পারবে না।'

'সব কাজই কি আমি পারি?'

'তর্ক থাক। পেয়ারা খাবো।'

'বাড়িতে পেয়ারা আছে, তাই দিচ্ছি।'

'গাছের পেয়ারা খাবো। তুমি পেড়ে দেবে, আমি খাবো।'

'বাঃ, ভারী রোমাণ্টিক তো। কিন্তু আমি গাছে চড়তে পারবো না।'

সুপ্রিয়া গাল ভার করে বলল, 'বেশ খাবো না। ভাববো একদিন তোমার কাছে সামান্য দুটো পেয়ারা খেতে চেয়েছিলাম, তুমি দাওনি। মানুষকে কিছু দেওয়ার মধ্যে তৃপ্তি আছে কিন্তু প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে একটা জ্বালা ছাড়া আর কিছুই থাকে না।' বলতে বলতে সুপ্রিয়ার লঘুভাবটাও চলে গেল।

'সত্যি সত্যি তুমি পেয়ারা ভালোবাসো?'

'বিশ্বাস করো। স্কুলে পড়তে একটা বাগানে ঢুকে চুরি করে রোজ পেয়ারা খেতাম।'

'সে তো চুরি করার আনন্দে। ছোট বয়সে অনেকে পেয়ারা খায়। ফল তুলে নিয়ে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তবু চুরি করে।'

সুপ্রিয়া কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু ও আমাকে দেখছিল না। আমাকে ছাড়িয়ে অনেক—অনেক দূরে ওর দৃষ্টি চলে গিয়েছিল। হয়তো সেই বাগানের অন্ধকার অন্ধকার মতন গাছগুলো ওর দৃষ্টির ওপর ছায়া ফেলছিল। ওর এই বিষণ্ণ চেহারা আমার মনেও ছায়া ফেলল। বললাম, 'বেশ তুমি দাঁড়াও, আমি তোমাকে পেয়ারা পেড়ে দিচ্ছি।'

সুপ্রিয়া হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠল, 'সত্যি দেবে। আমি যুগ যুগ ধরে অপেক্ষা করে থাকবো। তুমি পেয়ারা নীচে ফেলছো আর আমি কচকচ করে তাই খাচ্ছি—হাউ থ্রিলিং!'

কিছুদিন আগে পর্যন্ত ফুটবল খেলতাম। খেলার সেই হাফ প্যান্টটা পরে এলাম। ইচ্ছে করেই অন্য দরজা দিয়ে বাইরে এলাম। যতীনবাবু তা দেখে কী সব ভাবলেন। মা এখন রান্নাঘরে, সহসা এদিকে আসবে না। আসলে বিষম অবাক হবে। কয়েক বছরের মধ্যে আমাকে পেয়ারা গাছে উঠতে দেখেনি মা।

আমার দিকে তাকিয়ে সুপ্রিয়া বলল, 'মনে হচ্ছে ব্যায়ামট্যায়াম করো, ভাল।'

'আগে করতাম।' বলে গাছে চড়তে শুরু করলাম।

এক-একটা করে পেয়ারা ফেলছি আর সুপ্রিয়া তাই কুড়িয়ে নিয়ে কাপড়ের মধ্যে ফেলেছে। ও শাড়ির আঁচল খুলে কোমরে জড়িয়েছে, তাই দিয়ে কোঁচড় সৃষ্টি করে নিয়েছে। ওকে খুব মেছোমানুষের মত দেখাচ্ছিল। সুপ্রিয়া এক-একটা করে পেয়ারায় দাঁত বসাচ্ছে আর আনন্দে চীৎকার করে উঠছে, 'কী নরম, আর যা মিষ্টি।'

ওর চীৎকার চেঁচামেচিতে যতীনবাবু এসে গাছের নীচে দাঁড়ালেন। সুপ্রিয়া বলতে লাগল, 'খেয়ে দেখুন কাকাবাবু, কী দারুণ ভাল, বাজারে এইরকম জিনিস পাওয়া যায় না।' সুপ্রিয়া যতীনবাবুকে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। যতীনবাবুও খাবেন না সুপ্রিয়াও ছাড়বে না। শেষপর্যন্ত যতীনবাবুকে বাধ্য হয়ে নকল দাঁত খুলে দেখাতে হল। সুপ্রিয়া মুখ কাঁচুমাচু করে যখন বলল, 'আপনার কী কষ্ট কাকা, পেয়ারা খেতে পারলেন না' তখন হঠাৎ আমি হাসিতে ফেটে পড়লাম। গোড়া থেকেই যতীনবাবুকে পেয়ারা খাওয়াবার ব্যাপারটা হাস্যকর মনে হচ্ছিল। যতীনবাবু রোগা বেঁটে মানুষ, সুপ্রিয়া লম্বা স্বাস্থ্যবতী। যতীনবাবুর হাত ধরে সুপ্রিয়া যখন টানাটানি করছিল, একটা পলকা কাগজের মত হাওয়ায় উড়ে উড়ে যাচ্ছিল যতীনবাবু।

আমার হাসিতে ওপরে মুখ তুলে তাকালেন যতীনবাবু। ভদ্রলোক হয়ত আমার সামনে দাঁতের পাটি খুলতে চান নি। তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে চলে গেলেন। সুপ্রিয়ার কোঁচড় যে খুব ভারী হয়ে উঠেছে ওপর থেকেও বোঝা যাচ্ছিল। ও ক্রমাগত আঙুল দিয়ে পেয়ারা দেখিয়ে বলে চলেছে 'সবচেয়ে বড় পেয়ারাটাই তো গাছে রয়ে গেল।'

শেষপর্যন্ত একসময় আমাকে বলতে হল, 'গাছটাকেই না হয় উপড়ে দিচ্ছি।'

সুপ্রিয়া মুখ ভার করে বলল, 'তোমাদের সবারই এই দোষ, একটু কাজের কথা শুনলেই ভয় পাও।'

আরও গোটাকতক পেয়ারা নীচে ছুঁড়ে দিয়ে গাছ থেকে নেমে পড়লাম।

সুপ্রিয়া আমার দিকে খিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল, তারপর দমকা হাসিতে ফেটে পড়ে বলল, 'তোমাকে ঠিক রামথোকার মত দেখাচ্ছে। যাও গেঞ্জি প্যান্ট ছেড়ে ভদ্রলোক হয়ে এসো। কথা আছে।'

তাড়াতাড়ি বাড়ির ভেতরে চলে গেলাম। রান্নাঘরে মা রাঁধছিল। মাকে চা করতে বললাম। মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কে এল এই সাতসকালে?'

'আমাদের অফিসের হবু সেক্রেটারী।' কয়েকদিন ধরে কানাঘুষো শুনছিলাম, সুপ্রিয়া নাকি শিগগিরই সেক্রেটারী হয়ে যাচ্ছে। ও যে সেক্রেটারীশিপ প্লাণ করেছে নিজে সে কথা আমাকে না বললেও, জানতাম।

'তুই বাইরে গিয়ে বোস, আমি বন্দনাকে দিয়ে চা পাঠিয়ে দিচ্ছি। ক' কাপ চা পাঠাবো?'

'তিন কাপ। সঙ্গে খানকতক বিস্কুটও দিতে ভুলোনা।' মা আচ্ছা বলে জলের কেটলী উনুনে চাপিয়ে দিল। আমি হাত মুখ ধুতে চলে গেলাম।

বাইরে এসে দেখি পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসে যতীনবাবু আর সুপ্রিয়া খুব নীচুস্বরে কথা বলছে। আমাকে আসতে দেখেই ওদের কথা বন্ধ হয়ে গেল। সুপ্রিয়া সামনের খালি চেয়ার আমাকে দেখিয়ে বলল, 'বসো।' ও এমনভাবে বলল যেন আমি ওর বাড়িতেই অতিথি। সুপ্রিয়ার এই সপ্রতিভ ভাব আমার ভাল লাগে।

চেয়ারে বসে বললাম, 'হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই এভাবে আসা হলো?'

'এভাবে আসা বলতে কি বোঝাতে চাও বোঝা গেল না। আমরা গাড়ি করে ঠিকানা মিলিয়ে মিলিয়ে এলাম। এভাবে না এসে আর কীভাবে আসা চলতো?'

'আগে জানা থাকলে সঙ্গে করে নিয়ে আসা যেত, অনর্থক ঘুরতে হতো না।'

'আমরা তো ঘুরি নি, সোজা চলে এসেছি, তাই না কাকা?'

যতীনবাবু সমর্থনসূচক ঘাড় দোলালেন।

(ক্রমশঃ

মস্কোর নাইট ক্লাবে
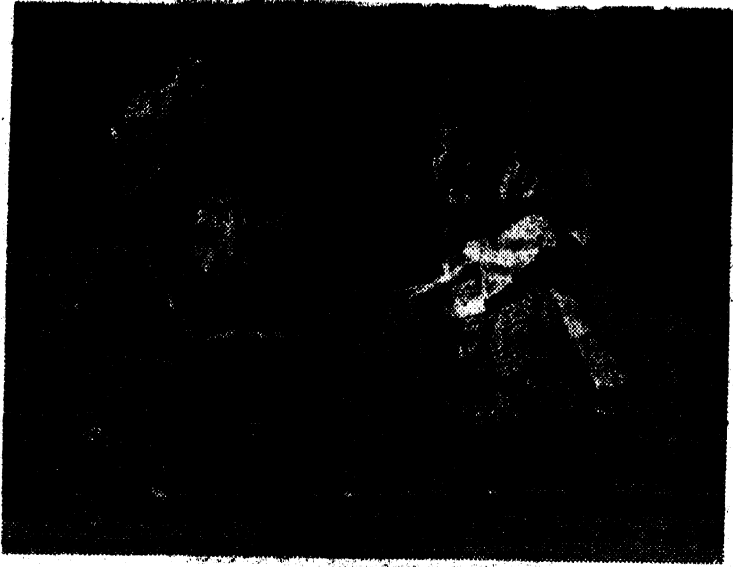
সোভিয়েত দেশে পরিচ্ছন্ন নাইট ক্লাব

দিলীপ মালাকার

সম্প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিভ্রমণ করে এসে বন্ধু-বান্ধবদের প্রশ্নবাণে যখন ক্লান্ত তখন একটি কথায় সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলাম। সোভিয়েত ইউনিয়নে রাজনীতি ও অর্থনীতির হালচাল নিয়ে বহু লোক বহু প্রশ্ন করেছেন কিন্তু কেউ আজ পর্যন্ত আমায় নৈশ জীবন সম্বন্ধে প্রশ্ন করেনি। তার কারণ সবাই ধরে নেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নে সব কাঠ-খোট্টার বাস। ওখানে আমোদ-প্রমোদের বালাই নেই। তাঁদের ধারণা কেবলমাত্র লণ্ডন-প্যারিস-বার্লিন-রোমে নৈশ জীবন বলতে নাইট ক্লাব ও ক্যাবারে সেখানে সুন্দর। সোস্যালিস্ট দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নে যে নাইট ক্লাব ও ক্যাবারে থাকতে পারে সে ধারণা অনেকের কল্পনায়ই আসে না।

পাঁচ বছর বা দশ বছর আগে যখন সোভিয়েত ইউনিয়নে বেড়াতে গেছি তখন অবশ্য সে প্রশ্ন ওঠে নি। নাইট ক্লাব ও ক্যাবারের কথা কেউ সেখানে ভাবতেনও না। এখন দিনকাল পাল্টেছে। গোঁড়ামী দূর হয়েছে। স্তালিন আমলের গোঁড়ামী এখন আর নেই। সোভিয়েত দেশ ভ্রমণ এখন আর অসম্ভব ব্যাপার নয়। সোভিয়েত দেশ সম্বন্ধে পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার গণতান্ত্রিক দেশগুলো এতদিন [illegible] ও না প্রচার [illegible] ধারণা পোষণ করে চলে বিদেশের বহু শিক্ষিত ব্যক্তিরা। অল্পশিক্ষিতদের তো কথাই নেই।

পশ্চিম ইউরোপ এবং আমেরিকার বড় শহরে রাত্রির অন্ধকারে যেসব নোংরামি চলে তারই প্রতীক অধিকাংশ নাইট ক্লাব ও ক্যাবারে। এককালে এ বিষয়ে প্যারিসের বহু দুর্নাম ছিল। এই রোগ এখন পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার প্রায় সব শহরেই প্রবেশ করেছে। কিন্তু প্যারিসের দুর্নাম ঘুচল না।

আমার প্যারিস প্রবাসকালে বহু দেশীয় ও বিদেশী বন্ধুরা প্যারিস বেড়াতে এসেই নাইট ক্লাব ও ক্যাবারে দেখার বায়না ধরত। আমি তাদের যতই বলতাম যে নাইট ক্লাব ও ক্যাবারেতে যা যা দেখতে চাও অর্থাৎ নারীর নগ্ন দেহ সে তো তোমাদের দেশের নাইট ক্লাব ও ক্যাবারেতেও দেখেছ এতে নতুনত্ব কোথায়। বরং প্যারিসের সাংস্কৃতিক দিকটা দেখে যাও না। কার কথা কে শোনে। বহু বিদেশী টুরিস্ট প্যারিসে হয়ত তিন চার দিন কাটিয়েছেন, নাইট ক্লাব ও ক্যাবারেতে গেছেন প্রত্যেক রাতে কিন্তু একদিনের জন্যও প্যারিসের কোনো আর্ট মিউজিয়াম বা ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো দেখেন নি। এমন বহু ব্যক্তিকে আমি চিনি। ইউরোপ-আমেরিকায় এই ধরনের লোকের সংখ্যা কম নয়। আমাদের দেশেও এ ধরনের লোকেদের মধ্যেই আমি বিদেশে বেশী দেখেছি। এই ধরনের মানুষেরা যখন সোভিয়েত দেশে বেড়াতে যান তখন স্বভাবতই বিস্মিত হন নৈশ জীবনে নোংরামি নেই দেখে। তারা মনে করেন সোভিয়েত ইউনিয়ন পিছিয়ে পড়া দেশ। যারা মনে করেন নাইট ক্লাব-ক্যাবারের নোংরামি না থাকলে একটা দেশ পিছিয়ে তাদের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। এই ধরনের বহু টুরিস্ট আজকাল সোভিয়েত ইউনিয়নে বেড়াতে যাচ্ছেন।

ইউরোপ আমেরিকার টুরিস্টের ভীড় এত বেড়েছে যে, হোটেলে থাকার জায়গা দিতে না পেরে সোভিয়েত সরকার এখন প্রত্যেক বড় শহরে একটি করে ইন্টুরিস্ট হোটেল নির্মাণ করেছেন। ইন্টুরিস্ট হোটেলগুলো দেশলাই বাক্সের মতন। বিশ থেকে পঁচিশ তলা। এক মস্কো শহরে এই ধরনের বিশালকার হোটেল গজিয়েছে গত তিন বছরে গোটা তিনেক আরও গোটা চারেক নির্মিত হচ্ছে দেখলাম। ইউরোপ-আমেরিকার অতি আধুনিক হোটেলে যে ধরনের ব্যবস্থা, আরাম ও বিলাসিতার ব্যবস্থা আছে ইন্টুরিস্ট হোটেলগুলোতেও একই ধরনের ব্যবস্থা পাওয়া যায় আজকাল সোভিয়েত ইউনিয়নে।

মস্কোয় আগেও দুটো ছোট নাইট ক্লাব ছিল। কিন্তু সেগুলো নোংরা ছিল না। এবার দেখলাম এক বিরাটকার রেস্তোরাঁ। আরবাট রেস্তোরাঁর দৈর্ঘ্য আধ কিলোমিটার। এই আরবাট রেস্তোরাঁয় তিন হাজার লোক একসঙ্গে বসে খেতে পারে। তারই একটি ঘরে বসে নাইট ক্লাব। সেখানে নাচও চলে। রাত দশটার পর ক্যাবারের নাচ-গান শুরু হয়। লণ্ডন-প্যারিসের ক্যাবারের নোংরামি বাদ দিয়ে এরাও সুন্দর নাচ গানের ব্যবস্থা করেছে। নারীর নগ্ন দেহ—স্ট্রিপটিজ বাদ দিয়ে আর সব রকমের দৃশ্য সেখানে দেখান হচ্ছে। নানা ধরনের খেলাও দেখান হয়। দর্শকরা দেখে খুশী হন। বিদেশী টুরিস্টদের আমি নাক সিঁটকাতে দেখিনি। বরং একটি আমেরিকান টুরিস্ট ওই ক্যাবারের সুখ্যাতিই করলেন। তিনি নাচ-গান উপভোগ করেছেন।

মস্কোর [illegible] রেস্তোরাঁয়, [illegible] নাচ-গান [illegible] তার বৈশিষ্ট্য অন্যরকমের। [illegible] লোক-সংগীত ও নৃত্য তাতে দেখান হয়। বিদেশী দর্শকরা দেখে আনন্দিত হবেন সে বিষয়ে কারুর সন্দেহ নেই। আমার তো ভালই লেগেছে।

মস্কোয় হোটেল বা [illegible] নাইট ক্লাব বা ক্যাবারে নেই বটে কিন্তু তার নাচঘরে যে গানের [illegible] সেগুলো

কোনোমতেই নিকৃষ্ট নয়। হোটেল বুদা-পেস্তের রেস্তোরাঁয় রাত্রিবেলা নাচ-গানের আসর বসে সেখানেও বিদেশীদের ভীড়।

সবচেয়ে বেশী আশ্চর্য করেছে এস্তোনিয়ার রাজধানী তালিন শহরের নবতম হোটেল ভীরুর নাইট ক্লাবটি। তালিনের হোটেল ভীরুর নাইট ক্লাবে সবকটি নাচ ও গান পরিচ্ছন্ন। প্রত্যেকটি দিয়েছে রুচির পরিচয়। ভীড় সেখানেও। বিদেশীর সংখ্যাই বেশী। গ্রীষ্মের ছুটিতে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান-দেশের প্রচুর ট্যুরিস্ট বেড়াতে এসেছিল তালিনে। তাদের অনেকেই ভীরু হোটেলে। রাত্রে দেখলাম তাদের অনেকেই নাইট ক্লাবে ভীড় করেছে। সবার কৌতূহল সোভিয়েত দেশে নাইট ক্লাবে কি হয় তাই দেখতে। অনেকে ভেবেছিল সোভিয়েত দেশের নাইট ক্লাবে সম্ভবতঃ কম্যুনিজম সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনবে। কম্যুনিজম সম্বন্ধে বক্তৃতা দূরে থাক, কম্যুনিস্ট নাচও দেখতে পেলাম না। অন্যসব দেশের নাইট ক্লাবে যে ধরনের নাচ-গান হয় তাই হল। তবে স্ট্রিপটিজ বা নারীকে বিবস্ত্র করার দৃশ্য দেখান হয়নি। নারীদেহের সুডোল অংশগুলো নগ্ন করে না দেখালেও অন্যভাবে দেখান যায় তাই দেখান হয়েছে তালিনের নাইট ক্লাবে। এক গায়িকা এলেন সিঁড়ি বেয়ে গান করতে করতে তার জামাটা সুন্দরভাবে সাজান। চোখকে মুগ্ধ করে। তেমনি গোটা পনের মেয়ে এস্তোনিয়ার লোকনৃত্য প্রদর্শনের পর দেখাল অতি-আধুনিক নাচ। পোশাকে রয়েছে শালীনতা। কিন্তু প্রতিটি মেয়ের দেহের সৌষ্ঠবের প্রতি দৃষ্টি রেখেছেন কর্মকর্তারা। একটি নাচের দৃশ্যে দেখলাম মেয়েরা স্নানের পোশাকে নাচছেন। স্ট্রিপটিজ না করেও যে নাচা যায় এটি তারই দৃষ্টান্ত। মেয়েদের সঙ্গে যেসব ছেলে নেচেছেন তারা প্রত্যেকেই ব্যালে নাচে পাকা-পোক্ত। যে কজন গান গাইল তারাও পেশাদার গায়ক। এদের রোজগার অন্যদের চেয়ে অনেক বেশী। সোভিয়েত ইউনিয়নে শিল্পীদের কদরও যেমন বেশী তেমনি বেশী তাদের রোজগার।

এক সকালে তালিনের এক ছোট্ট কাফেতে বসে কফি ও কেক খাচ্ছিলাম। আমাদের পাশের টেবিলে একটি ছেলে ও মেয়েকে দেখে আমরা অবাক। মেয়েটি সুন্দরী কিন্তু গায়ের রং একটু তামাটে। শাড়ী পরলে মনে হবে যেন বাঙালী মেয়ে। বেশ লম্বা। বয়স হয়ত বাইশ তেইশ।

তালিনের নাইট ক্লাবের নাচের মেয়েদের মধ্যে সেই মেয়েটাকে দেখে আমরা আরও আশ্চর্য হয়ে গেলাম। পরের দিন যথারীতি সকালে সেই কাফেতে কফি খেতে গিয়ে সেই মেয়েটির সঙ্গে আলাপ হল। নাম তার টিনা। আগের দিনের সেই ছেলেটাও তার সঙ্গে ছিল। আলাপ পরিচয়ে জানতে পেলাম যে টিনা তালিন শহরের মেয়ে। অপেরায় নাচ শিখেছে পাঁচ বছর ধরে। নাচের স্কুলে পাশ করা। অন্য যেসব মেয়েরা নেচেছে অদের অধিকাংশই নাচের স্কুলে পাশ করা। নাচই তাদের পেশা। এই জন্য তারা মাস গেলে

তালিনের নাইট ক্লাবে

মাইনে পায় ভালই। রাত্রে এক ঘন্টা নাচে বটে কিন্তু তার জন্যে নিয়মিত রেওয়াজ করতে হয়। এখন নাইট ক্লাবে নাচছে পরে অন্য জায়গায় ডাক এলে সেখানে নাচবে। তবে টিনার ছেলে বন্ধুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সে পাশ করে বেরুলেই তাদের বিয়ে হবে। লণ্ডন-প্যারিসের নাইট ক্লাবের নাচিয়ে মেয়েদের মতন তাদের কোনো নোংরা জীবন যাপন করতে হয় না। নোংরামীতে পয়সা রোজগারও করতে হয় না।

টিনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তুমি তো ব্যালে শিল্পী, তোমার খারাপ লাগে না নাইট ক্লাবে নাচতে? একটি দৃশ্যে তো তুমি স্যুইমিং কস্টুম পরে নাচছিলে। তোমার লজ্জা করেনি?

উত্তরে টিনা বলেছিল—লজ্জার কি আছে। আর তাছাড়া নাচতে আমার মোটেই খারাপ লাগে না। আমি পরিশ্রম করে রোজগার করছি। রোজ আমাকে ঘন্টা তিনেক তালিম নিতে হয়। পুঁজিবাদী দেশের নাইট ক্লাবে যে নোংরামি চলে এখানে সে ভয় নেই। যে কোনো এক শ্রমিকের মতন আমিও শ্রমিক। তবে শিল্পের শ্রমিক এই যা তফাত।

কথায় কথায় টিনা বলেছিল তার বাড়ীতে রয়েছে বাবা-মা আর ছোটভাই। বাবা এঞ্জিনিয়ার। ভাই স্কুলে পড়ে।

প্যারিসের নাইট ক্লাবের নর্তকীদের সঙ্গেও আমার আলাপ হয়েছিল। তাদের মুখে শুনেছিলাম কত দুঃখের কাহিনী। তারাও সংসার করতে চায়। কিন্তু বাধা নাইট ক্লাবের নোংরা জীবন। টিনার বেলায় সে বাধা নেই। আমার মনে হয় পুঁজিবাদী দেশের নাইট ক্লাবের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক দেশের নাইট ক্লাবের শিল্পীদের জীবন এখানেই তফাত। সমাজতান্ত্রিক দেশের দোষ-গুণ বিচার করতে হলে এইসব ছোটখাট জিনিস দিয়ে বিচার করলে অনেক জটিল প্রশ্নের জবাব মিলবে এইভাবে।

টিনার বন্ধু ইয়ানকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তোমার ভবিষ্যত উজ্জ্বল। তুমি কদিন পরে টিনাকে বিয়ে করবে, টিনা নাইট ক্লাবের নাচিয়ে বলে তোমার মন খারাপ হয় না?

আমার প্রশ্ন শুনে ইয়ান অবাক হয়েছিল। সে বলেছিল বারে! খারাপ লাগবে কেন? আমাদের দেশে প্রায় সব স্বামী-স্ত্রীই চাকরী করে। স্ত্রী চাকরী করবে বলে খারাপ লাগবে কেন। বরং আমার গর্ব হয় যে, আমার স্ত্রী হবে নামকরা নাচিয়ে। নাইট ক্লাবে নোংরামী নেই। সুতরাং নোংরামী সম্বন্ধে মোটেই চিন্তিত নই।

আমি তাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুলেছিলাম। বলেছিলাম, ধর বিয়ের পর প্রত্যেক রাত্রে তোমার স্ত্রী যদি রাত বারটায় ফেরে তবে তোমার মন নিশ্চয়ই খারাপ হবে। হবে না?

উত্তরে ইয়ান বলেছিল, মোটেই হবে না। তাছাড়া টিনাকে তো সারা রাত নাচতে হয় না। রাত দশটা থেকে সাড়ে এগারটা পর্যন্ত তো কাজ। তারপরই ছুটি। এখন যেমন প্রায় রাত্তিরে যাই টিনাকে নিতে তেমনি তখনও সময় পেলে নিশ্চয়ই তাকে বাড়ী নিয়ে আসব।

ওদের দুজনের মুখে-চোখে সেদিন দেখেছিলাম ওদের দৃঢ় প্রত্যয়। অনুমান করেছিলাম তাদের ভালবাসা দৃঢ়।

রুশ সার্কাস যেমন দেখবার মতন। সব দেশেই তার সুখ্যাতি। তেমনি হয়ত সোভিয়েতদের নাইট ক্লাবের প্রশংসাও একদিন আমরা শুনতে পাব বিদেশীদের মুখে। আর যাদের অগাধ কৌতূহল তারা নিজেরাই একদিন সোভিয়েত নাইট ক্লাব দেখে সে কৌতূহল মেটাবেন।
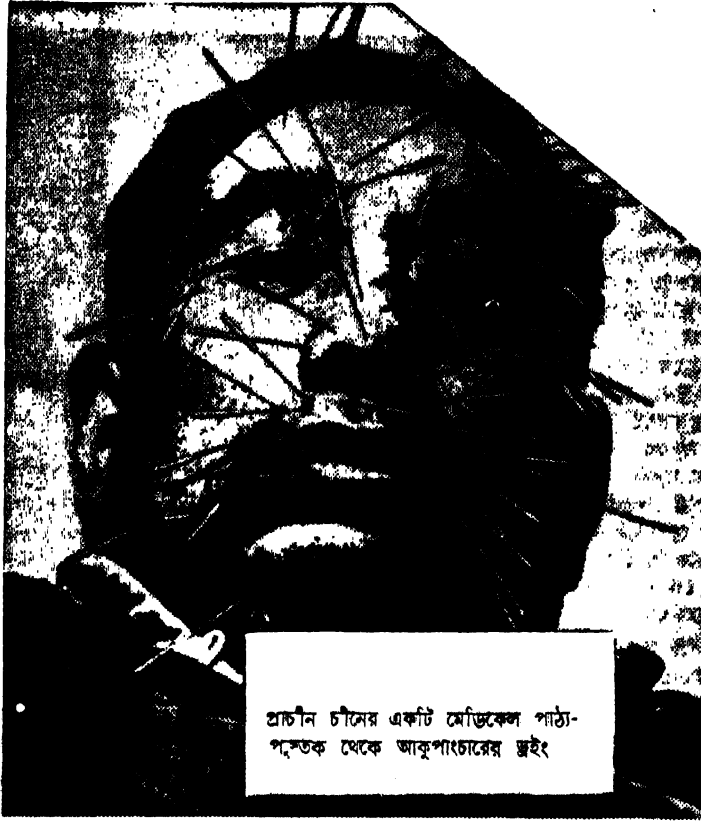
প্রাচীন চীনের একটি মেডিকেল পাঠ্য-পুস্তক থেকে আকুপাংচারের ড্রইং

বিজ্ঞানের কথা

চীনের দেশজ চিকিৎসা পদ্ধতি: আকুপাংচার

চীনদেশে গত দু-হাজার বছর ধরে বিশেষ এক চিকিৎসা-পদ্ধতি চলে আসছে, যাকে বলা হয় আকুপাংচার। এই চিকিৎসায় রোগী বা রোগিনীকে কোনো রকম ওষুধ খেতে দেওয়া হয় না, কোনো রকম ইনজেকশনও নয়, নির্দিষ্ট সময় পরে পরে তার শরীরের বিশেষ বিশেষ জায়গায় কিছুক্ষণের জন্য কতকগুলো ছুঁচ ফুটিয়ে রাখা হয় মাত্র। দাবি করা হয়ে থাকে, বহু প্রকারের ব্যাধি—এমনকি মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের দরুন মুখমণ্ডলের প্যারালিসিস পর্যন্ত এই পদ্ধতির চিকিৎসায় নিরাময় হয়। [illegible] এই দাবি যে অন্যায় নয়, অন্তত পক্ষে আশা লক্ষণ দেখে ধুরন্ধর চিকিৎসকরাও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। ফলে আকুপাংচার চিকিৎসা-পদ্ধতি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক মহলে সহসা রীতিমতো একটা মর্যাদার আসন লাভ করেছে বলা চলে। পশ্চিমের যে-সব বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক চীনে গিয়েছেন ও নিজেদের চোখে আকুপাংচারের ফলাফল দেখে এসেছেন, তাঁরা কেউ-ই এই পদ্ধতিকে সরাসরি নাকচ করতে পারেন নি। কলকাতার একজন ডাক্তার, যিনি কংগ্রেস চিকিৎসক মিশনের সঙ্গে, চীনে গিয়েছিলেন ও এই বিদ্যাটি শিখে এসেছেন, তিনি খাস কলকাতাতেই দুই দশক ধরে এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং রীতিমতো পসারও করেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, চিকিৎসার পদ্ধতি হিসেবে আকুপাংচার অকার্যকর নয়, অন্তত পক্ষে লক্ষণগত বিচারে। চিকিৎসা-জগতের খবরাখবর যাঁরা রাখেন তাঁদের কাছে আকুপাংচার এখন একটি পরিচিত নাম। সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন ওঠে, এই বিশেষ পদ্ধতি কি-ভাবে কাজ করে? তার ব্যাখ্যাটা কী? সম্প্রতি 'নিউ সায়েন্টিস্ট' পত্রিকায় লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজের অধ্যাপক প্যাট ওয়াল বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। অধ্যাপক প্যাট

ওয়াল হচ্ছেন একজন শীর্ষস্থানীয় নিউরোফিজিওলজিস্ট, মানবশরীরে যন্ত্রণার উদ্ভব ও নিরসন প্রক্রিয়া বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। তাঁর মতে, সম্ভাব্য ব্যাখ্যাটি হচ্ছে হিপ্‌নোসিস বা সম্মোহন। কোন যুক্তির ওপরে দাঁড়িয়ে তিনি এই ব্যাখ্যা দিচ্ছেন তা নিচে সংক্ষেপে উপস্থিত করছি। এই লেখার সঙ্গের ছবিও তাঁর প্রবন্ধ থেকে নেওয়া।

মানুষের শরীরে যন্ত্রণার উদ্ভব হয় কখন? বিশেষভাবে সুনির্দিষ্ট নার্ভ-সড়কে তৎপরতা শুরু হলে। তৎপরতা কখন? যদি, একমাত্র টিশু ক্ষতি-গ্রস্ত হয়। মেডিকেল ছাত্রদের একথা শেখানো হয়। যন্ত্রণার এই ব্যাখ্যা স্বীকার করে নিলে কোনো জটিলতা থাকে না। ব্যাপারটা এই রকম ঃ আঘাত পাওয়ার দরুন বা অন্য কোনো কারণে শরীরের কোনো একটা টিশুর চোট পাওয়া, সঙ্গে সঙ্গে নার্ভের সড়ক বরাবর তৎপরতা শুরু হওয়া, মস্তিষ্কে বার্তা পৌঁছে যাওয়া, এবং যন্ত্রণা-বোধ হওয়া। কিন্তু পরীক্ষাগারে দেখা গিয়েছে, ব্যাপারটা অত সরল নয়। যন্ত্রণা-বোধ হওয়ার আদিতে রয়েছে যে নার্ভ-সড়কের তৎপরতা সেখানে যেমন থাকতে পারে নিষেধ (যার দরুন যন্ত্রণা-বোধ কমে) তেমনি উত্তেজনা (যার দরুন বাড়ে)। নিষেধ যদি একেবারেই না থাকে তাহলে সামান্য তৎপরতার দরুনই প্রচণ্ড যন্ত্রণা হওয়া সম্ভব। পরীক্ষাগারে আরও দেখা গিয়েছে, টিশুর চোট পাওয়ার যে বার্তা মস্তিষ্কে পৌঁছচ্ছে তার তীব্রতা কমানো বা বাড়ানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ থেকে যন্ত্রণা-উপশমের নতুন এক চিকিৎসা-পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ, এমন একটি ব্যবস্থা করা যাতে যন্ত্রণার বার্তা কেন্দ্রীয় নার্ভব্যবস্থায় প্রবেশে বাধা পায়। স্পষ্টতই মনে হতে পারে, আকুপাংচার নামক প্রাচীন পদ্ধতিটির মূল কথা একই ঃ নার্ভ-সড়কে উত্তেজনার পর উত্তেজনা সৃষ্টি করে এমন এক বাধ খাড়া করা যাতে যন্ত্রণা প্রতিহত হয়।

চীনের এই সাবেকী চিকিৎসা-পদ্ধতি গত দু-হাজার বছর ধরে চলে আসছে এবং জাপান ইত্যাদি দেশেও ছড়িয়েছে। বহু আগে থেকেই এই পদ্ধতি চীনের ভেষজ-বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। সেই ২৫৬ খ্রীষ্টাব্দেই লংলাও ফু মি এই পদ্ধতির বাস্তব দিকটি ব্যাখ্যা করে একটি পাঠ্যপুস্তক লিখে-ছিলেন, যার নাম 'আকুপাংচার প্রবেশিকা'। পদ্ধতির সমর্থনে যে তত্ত্ব উপস্থিত করা হয়েছে তা এই ঃ শরীরের প্রধান প্রধান অঙ্গগুলোকে যুক্ত করছে এক নালিকা-ব্যবস্থা এবং এই নালিকাগুলো চামড়ার নিচে দিয়ে সারা শরীরে ছড়িয়েছে। শরীরের গভীর অঙ্গে পৌঁছবার পথ হচ্ছে এই নালিকাগুলো। আমরা জানি, এ-রকমের একটি নালিকা-ব্যবস্থার অস্তিত্ব কল্পনা করে নেওয়াটা একেবারেই ভুল। তবে তত্ত্বগত ভিত্তিটি ভুল বলেই পদ্ধতিটি বাতিল হয়ে যায় না। দেখতে হবে পদ্ধতিতে কাজ হচ্ছে কিনা। যদি হয় তাহলে ভূত তাড়াবার জন্যে হলেও হবে, জীবাণু ধ্বংস করার জন্যে হলেও হবে।

ছুঁচ ফোটাবার স্থান নির্বাচন

আকুপাংচারের চিকিৎসককে গোড়াতেই স্থির করতে হয় গণ্ডগোলটা রোগীর কোন অঙ্গে। তারপরে সেই বিশেষ অঙ্গকে নাড়া দেবার জন্যে শরীরের চামড়ার ওপরে নির্বাচন করতে হয় সঠিক রেখা ও কাছা-কাছি বিন্দু। বিন্দুগুলোতে ছুঁচ ফোটানো হয়—নানা মাপের, নানা ধাতুর, নানা আকারের। চামড়ার নিচে ঢুকিয়ে অল্প বা বেশি সময়ের জন্যে রেখে দেওয়া হয় ছুঁচগুলো, কখনো কখনো সামনে-পিছনে নড়ানো হয়, বা বাঁকানো, বা ফেরানো, বা কাঁপানো। নির্দিষ্ট অঙ্গকে আরো উত্তেজিত করতে হবে, না, আরো শান্ত—তারই দ্বারা নির্ধারিত হয় ছুঁচগুলো কোন দিকে ও কি-ভাবে ফোটানো হবে।

ছুঁচ-ফোটানোর স্থানগুলো সঠিক-ভাবে নির্বাচন করতে পারাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার — আকুপাংচার শিক্ষার্থীকে এটাই সবচেয়ে বেশি সময় নিয়ে শিখতে হয়। এই শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত পরীক্ষা নেওয়া হয়ে থাকে এইভাবে ঃ ব্রোঞ্জের তৈরী প্রমাণ সাইজের একটি মনুষ্যমূর্তির সামনে তাকে উপস্থিত হতে হয়, মূর্তিটির সর্বাঙ্গে ঠিক-ঠিক বিন্দুতে ফুটো আর পাতলা প্লাস্টারের আবরণে তার সর্বাঙ্গ ঢাকা। প্রশ্ন অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে ঠিক-ঠিক বিন্দুতে ছুঁচ ফোটাতে হয়, নির্বাচন সঠিক হলে ছুঁচ ফুটোতে ঢোকে, নির্বাচন সঠিক না হলে ছুঁচ ব্রোঞ্জের গায়ে লাগে ও বেঁকে যায়।

দাবি করা হয়ে থাকে যে আকুপাংচার চিকিৎসার একমাত্র স্ক্লেরোসিস ছাড়া নার্ভব্যবস্থার সকল পীড়ার উপশম হয়। দাবির মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা নেই, কিন্তু এই দাবির যথার্থতা পরীক্ষা করার উপায় কী?

মুশকিল এখানেই। কোনো চিকিৎসা-পদ্ধতি কতখানি কাজের তা পরীক্ষা করে দেখাটা শক্ত। আর যেখানে পদ্ধতিটাই এমন যে অনেকখানি তোড়জোড় করে এবং রোগীকে রীতিমতো দেখিয়ে-শুনিয়ে সবটা করা হচ্ছে এবং অনুরূপ পাল্টা কোনো পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া যাচ্ছে না—সেখানে আরো শক্ত। একটা দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা স্পষ্ট হবে। শল্য-চিকিৎসার পরে যন্ত্রণার উপশমের জন্য মরফিন ইনজেকশন দেওয়া হয়ে থাকে। এখন যদি এমন একটি ব্যবস্থা করা হয় যে ইনজেকশন যেটি দেওয়া হচ্ছে তা মরফিনও হতে পারে বা নুনজল, যিনি ইনজেকশন দিচ্ছেন তিনিও জানেন না কী দিচ্ছেন—তাহলে? দেখা গিয়েছে, নুনজলের ইনজেকশন নিয়েও শতকরা ৬০ জন ঘোষণা করেন যে তাঁদের যন্ত্রণার উপশম হয়েছে। এ ব্যাপারটাকে বলা হয় 'প্ল্যাসেবো প্রতিক্রিয়া'। এ কারণেই কোনো একটা ওষুধের কার্যকারিতা কতখানি তা পরখ করতে হলে প্ল্যাসেবো প্রতিক্রিয়া থেকে তাকে পৃথক করে দেখা দরকার। মরফিনের মতো যন্ত্রণা-উপশমকারী ওষুধের বেলাতেও কথাটা সত্য। আকুপাংচারের বেলাতেও তাই। আকুপাংচার চালানো হয় বড়ো রকমের একটি তোড়জোড়ের মধ্যে দিয়ে, রোগী সেখানে উপস্থিত হয় অনড় বিশ্বাস নিয়ে—কাজেই আকুপাংচারকে বিচার করে দেখা দরকার অনুরূপ কোনো পদ্ধতির সঙ্গে তুলনা করে।

আরও কথা আছে। কোনো কোনো অসুখ (যেমন, মুখমণ্ডলের প্যারালিসিস) নিজের থেকেই সারতে শুরু করে। সেজন্যে রোগীর অসুখ সারাটা চিকিৎসার জন্যে না নিজের থেকেই তা ভালোভাবে জানা দরকার।

এমনিভাবে আকুপাংচারের কার্যকারিতা আজ পর্যন্ত পরখ করে দেখা হয়নি। পরখ করে দেখার কথা বললে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে যিনি আকুপাংচার

পদ্ধতিতে চিকিৎসা করেন, তাঁর ধারণা হয় যে তাঁকে মিথ্যাবাদী বলা হচ্ছে। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়। অধিকাংশ ডাক্তার ও সার্জন-ই নিজস্ব চিকিৎসা-পদ্ধতির প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হয়ে থাকেন এবং অনেক সময়ে পুরুতের শালগ্রামশিলার মতো তা আঁকড়ে থাকেন। তবুও প্রত্যেকটি পদ্ধতিকে পরখ করে দেখতেই হয়।

সম্ভবত আকুপাংচারকে পরখ করলে দেখা যাবে, যন্ত্রণা-প্রতিরোধী যে বাঁধের কথা বলা হয়েছে তা সৃষ্টি করার ক্ষমতা এই পদ্ধতির নেই। কেননা আকুপাংচারে ছুঁচ ফোটাবার স্থানগুলো নির্বাচন করা হয়েছে যে তত্ত্বের ভিত্তিতে (নালিকা-ব্যবস্থা) সেটাই ভুল। আজকের শারীরতত্ত্বে তার কোনো সমর্থন নেই।

সম্মোহনের সাহায্যে অসাড়তা

সাধারণ অসুখের চিকিৎসায় আকুপাংচার ফলপ্রদ হয়েছে, এমন কোনো প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। কিন্তু শল্য-চিকিৎসায় অসাড়তা সৃষ্টির জন্যে আকুপাংচার ব্যবহার করা হচ্ছে, এ ব্যাপারটার দিকে একবার তাকানো যেতে পারে। আকুপাংচার হচ্ছে সম্মোহনের (মেসমেরিজম) এক ফলপ্রদ ব্যবহার। আকুপাংচারের মূল্য বাতিল করা বা কমানোর উদ্দেশ্য নিয়ে কথাটা বলা হচ্ছে না। সম্মোহনের সাহায্যে অসাড়তা সৃষ্টির ঐতিহাসিক নজির আছে। লণ্ডনের হাসপাতালগুলিতে একশো বছর আগেও সম্মোহনের সাহায্যে অসাড়তা সৃষ্টি করে বড়ো বড়ো অপারেশন করা হত। ইথারের প্রচলন হবার পরে সম্মোহনের সাহায্য নেওয়া বন্ধ হয়। ইথারের পরে আসে ক্লোরোফর্ম। কিন্তু সেই আগেকার কালে সম্মোহনের সাহায্যে যেসব রোগীকে অসাড় করা হত তারা কিন্তু জ্ঞান হারাত না। অপারেশন চলার সময়েও কথা বলতে পারত এবং চারপাশে কী ঘটছে সে সম্পর্কে সজাগ থাকত। কিন্তু যন্ত্রণা টের পেত না, কাটাকুটি চলার সময়েও যন্ত্রণার কোনো লক্ষণ প্রকাশ করত না। আকুপাংচারও হচ্ছে এমনি এক সম্মোহনের মতো ব্যাপার।
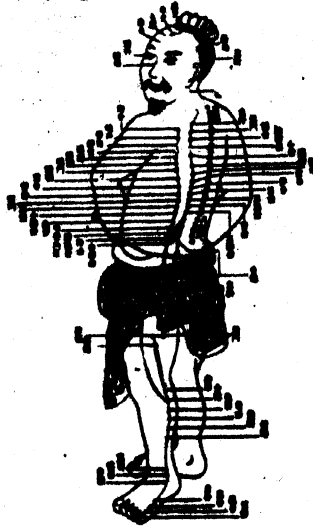
গত একশো বছর ধরে চীনে সাবেকী ও পশ্চিমী ভেষজের মধ্যে একটা লড়াই চলে আসছিল। এই লড়াইয়ের সঙ্গে জড়িত ছিল অনেক কিছু—ধর্ম, জাতীয় মর্যাদা, আধুনিকীকরণের প্রয়াস ও দেশের ওপরে পশ্চিমীদের আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াস। কনফুসীয় চিন্তাধারা ও সংগঠনে পিষ্ট চীনারা চেয়েছিল দেশকে পরিচ্ছন্ন করতে, দুর্নীতি থেকে মুক্ত করতে।

কমিউনিস্টদের বিজয়ের পরে এই লড়াইয়ের অবসান ঘটে। তাঁদের সামনে তখন প্রশ্ন ছিল শুধু তত্ত্বের নয়, প্রচণ্ড একটা অভাবের অবস্থার মধ্যে কিছু একটা মেডিক্যাল ব্যবস্থা খাড়া করারও। পশ্চিমী ভেষজের ব্যাপক প্রবর্তন সেই মুহূর্তে সম্ভব ছিল না। প্রয়োজনের তাগিদে প্রচলিত চিকিৎসা-পদ্ধতিগুলিকেই চালু রাখতে হয়েছিল এবং সংক্ষিপ্ত পাঠক্রমের ব্যবস্থা করে বহুসংখ্যক চিকিৎসক তৈরি করতে হয়েছিল। এই অবস্থায় চিকিৎসকরা পরস্পরের সঙ্গে লড়াই না করে সহযোগিতা করতে শুরু করেছিলেন।

এই সহযোগিতারই ফল হচ্ছে অসাড়তা সৃষ্টির উপায় হিসেবে আকুপাংচারের ব্যবহার। এর আগে পর্যন্ত আকুপাংচার ব্যবহার করা হত শুধু রোগের লক্ষণ দূর করার জন্যে, শল্য-চিকিৎসার সঙ্গে আকুপাংচারের কোনো সম্পর্ক ছিল না। শল্য-চিকিৎসকদের সঙ্গে আকুপাংচারীদের বরং ছিল ঘোরতর বিরোধের সম্পর্ক—যেমন ইউরোপে এক সময়ে ছিল চিকিৎসকদের সঙ্গে নাপিতদের। পশ্চিমের সঙ্গে যোগাযোগের ফল উভয় দিকেই লক্ষ্য করা গেল। আকুপাংচারীরা বললেন, তাঁরা প্রভাবিত করতে চান প্রান্তীয় নার্ভকে (নালিকা নয়)। পশ্চিমী ভেষজবিদরা বললেন, প্রান্তীয় নার্ভকে প্রভাবিত করার একমাত্র পথ হচ্ছে বিদ্যুৎ। তখন আকুপাংচারের ছুঁচের সঙ্গে বিদ্যুৎ যুক্ত হল।

আকুপাংচারের সাহায্যে অসাড়তা সৃষ্টি করার জন্যে কী করা দরকার? দুই বা তিনটি উপায়ে রোগীর শরীরে অসাড়তা সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। প্রথমত রোগীকে বলা হয় তিনি নিজেই ঠিক করুন তিনি আকুপাংচারের সাহায্যে অসাড়তা সৃষ্টি করবেন, না, ক্লোরোফর্ম জাতীয় ওষুধের সাহায্যে হতচেতন হবেন। মনে রাখা দরকার এই রোগী এমন এক দেশের মানুষ যাঁর মনে দেশজ জিনিসের প্রতি অপরিসীম মমতা এবং যে-দেশে হাজার হাজার বছর ধরে আকুপাংচারের মহিমা কীর্তিত হয়ে আসছে, তদুপরি বিদেশীদের নজর পড়ার দরুন হালআমলেও আকুপাংচার নিয়ে প্রচারের অন্ত নেই। ফলে তিনি যখন আকুপাংচারকেই বেছে নেন তখন অখণ্ড বিশ্বাস নিয়েই তা করেন। বলা বাহুল্য, এমনি একজন মানুষ সহজেই সম্মোহিত হতে পারেন।

অর্থাৎ আকুপাংচারের জন্যে যিনি আসছেন তিনি যেন সম্মোহিত হবার জন্যে তৈরি হয়েই আসছেন। কথাটা আরো জোর পায় এই ঘটনা থেকে যে আকুপাংচার কখনো শিশুদের ওপরে প্রয়োগ করা হয় না। অথচ সকলেই জানেন, শিশুর বয়স পাঁচ হলেই তার মস্তিষ্কে প্রধান প্রধান ক্রিয়াগুলো একইভাবে ঘটে থাকে। সম্মোহন হচ্ছে এমন একটি অবস্থা যেখানে সম্মোহিত ব্যক্তি সম্মোহনকারীর হাতে নিজেকে সঁপে দিচ্ছেন—এক্ষেত্রে প্রথম ব্যক্তি কি ধরনের আচরণ করবেন তা নির্ভর করে দ্বিতীয় ব্যক্তির ইচ্ছার ওপরে। যন্ত্রণাবোধও এক-ধরনের আচরণ বৈকি, এ-কারণে গভীরভাবে সম্মোহিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে যন্ত্রণাবোধ না থাকাটা অসম্ভব নয়। কিন্তু একটি শিশুকে এই অবস্থায় আনা শক্ত। শিশুরা প্ল্যাসেবো প্রতিক্রিয়ার আওতায় পড়ে না।

অপারেশনের আগে অসাড়তা সৃষ্টির জন্যে আকুপাংচারের সাহায্য নেওয়া পছন্দ করছেন, চীনদেশে এমন রোগীর সংখ্যা প্রচুর। আকুপাংচারে অখণ্ড বিশ্বাস নিয়েই তাঁরা আসেন। এমন ঘটনাও শোনা গেছে আকুপাংচারের আওতাধীন প্রসূতি সজ্ঞানে নিজের পেটে সীজারিয়ান অপারেশন হতে দেখেছেন অথচ বিন্দুমাত্র যন্ত্রণাবোধ করেন নি। কিন্তু তবুও এই চীনদেশেই আকুপাংচার পদ্ধতি সর্বক্ষেত্রে সফল নয়। এমন চীনা রোগীও পাওয়া গেছে আকুপাংচারের সাহায্যে যাদের শরীরে অসাড়তা সৃষ্টি করা যায় নি। অথচ ক্লোরোফর্ম-জাতীয় ওষুধের সাহায্যে অজ্ঞান করা যাবে না, পৃথিবীতে এমন মানুষ একজনও নেই। তার কারণ, দ্বিতীয়টি হচ্ছে একটি ভেষজ,

যার প্রতিক্রিয়া পরীক্ষিত ও সুনির্দিষ্ট। অন্য প্রথাটি, সিদ্ধান্ত করতে বাধা নেই, সম্মোহনের অবস্থায় নিয়ে আসার একটা উপায় মাত্র।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আকুপাংচার-মত্ততা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাই ঘটুক না কেন তা একটা মত্ততার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছয়। এ-বছরে মত্ততা শুরু হয়েছে চীনের আকুপাচংার নিয়ে। স্বয়ং প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত চিকিৎসক চীনে গিয়েছিলেন ও স্বচক্ষে আকুপাংচার দেখে এসেছেন। তিনি পর্যন্ত অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন কবে ছুঁচ ফোটানোর সুযোগ পাওয়া যাবে। সারা দেশ জুড়ে শল্যচিকিৎসার অসংখ্য রোগী উদগ্রীব হয়ে রয়েছেন যে আকুপাংচারের সাহায্যে অসাড়তা সৃষ্টি করে অপারেশন করাবেন। ছুঁচ পেতে আর কত দেরি—এটাই এখন প্রশ্ন।

আমেরিকার জীবনে আকুপাংচার অবশ্য নতুন কোনো ব্যাপার নয়। বড়ো বড়ো শহরের চায়না টাউনে গত কয়েক বছর ধরেই আকুপাংচারীরা ফলাও ব্যবসা চালাচ্ছেন। যে ব্যাপারটা নতুন তা হচ্ছে চিকিৎসক-মহলে আকুপাংচার সম্পর্কে আগ্রহ। এক সময়ে যাঁরা মনে করতেন যে আকুপাংচারীরা হচ্ছে হাতুড়ে তাঁরাই এখন আকুপাংচার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবার জন্য চীনে পাড়ি জমাবার চেষ্টায় ব্যাপৃত। আমেরিকান মেডিকেল সমিতি কোনো সময়েই নতুন কিছু নিয়ে মাথা ঘামান না, তাঁরাও স্বীকার করছেন যে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে আকুপাংচার একেবারে ফেলনা নাও হতে পারে। ব্যাপারটা এতদূর গড়িয়েছে যে বাড়াবাড়ি হতে পারে ভেবে অনেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। মিসৌরি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রোভোস্ট (সম্প্রতি তিনি চীনের মেডিকেল ব্যবস্থা দেখে এসেছেন) ডাঃ ই গ্রে ডিমণ্ড বলেছেন, 'আকুপাংচার নিয়ে এই মত্ততা বন্ধ হওয়া দরকার। আমার আশঙ্কা হচ্ছে ব্যাপারটা চলতে দিলে মানুষের মূর্তিতে প্রচুর পিনকুশন দেখতে হতে পারে। হিড়িকে মেতে উঠতে আমেরিকানদের জুড়ি নেই।'

আকুপাংচার নিয়ে যতো উদ্যোগ আমেরিকায় সম্প্রতি গড়ে উঠেছে তার সব-গুলোর উদ্দেশ্য মানবকল্যাণ নয় বা চিকিৎসাপদ্ধতিতে জ্ঞানবৃদ্ধিও নয়। যেমন, নিউইয়র্কের আকুপাংচার কেন্দ্র। এখানে তিনজন আকুপাংচারী নিয়োগ করা হয়েছে, কিন্তু তাঁরা কেউ-ই এম-ডি নন—অর্থাৎ, রোগীর চিকিৎসা করার বৈধ অধিকার তাঁদের নেই। এ-কারণে চিকিৎসা চলে অন্য
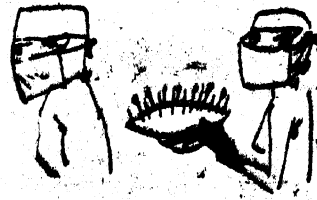
একজন এম-ডি ডাক্তারের নামে, তিনি কিন্তু আকুপাংচারের কিছুই জানেন না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আকুপাংচারীর অভাব ঘটেছে বলে আকুপাংচারের কলেজ যত্রতত্র গজিয়ে উঠেছে। ডাকের মাধ্যমেও এই বিদ্যাটি শেখানো হয়ে থাকে। অনেক সময়ে দেখা যায় আকুপাংচারে ট্রেনিং নেবার পরেও এমনকি এম-ডি ডাক্তারও ভালো আকুপাংচারী হতে পারেন না। কিন্তু দেশটি আমেরিকা, তাই এক্ষেত্রে ইলেক-ট্রনিক কম্পিউটারেরও সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। ছুঁচ ফোটাবার সঠিক জায়গাটির হদিশ দিয়ে কম্পিউটার বীপ-বীপ আওয়াজ ছাড়ে।

তবে যাঁরা বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে নিতে চান তাঁরা আকুপাংচারকে অ্যানীস্-থেসিয়া হিসেবে ব্যবহার করার পক্ষপাতী। ছোটখাটো কয়েকটি অপারেশনে ইতিমধ্যে আকুপাংচারের সাহায্যে শরীরে অসাড়ত্ব সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে একটি হার্নিয়া অপারেশন শুরু হয়েছিল আকুপাংচারের সাহায্যে, কিন্তু মাঝপথে ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করতে হয়েছে।

ব্যাপারটা ভাবতেই চাঞ্চল্যকর। রোগীর শরীরে কাটাচেরা চলছে অথচ রোগীকে অজ্ঞান করা হয়নি, তার শরীরের কয়েকটা জায়গায় কয়েকটা ছুঁচ ফুটিয়ে রাখা হয়েছে মাত্র, টনটনে জ্ঞান নিয়ে দুই চক্ষু মেলে রোগী নিজের শরীরের কাটাচেরা দেখছে!

যাই হোক, ব্যাপারটা যে অনুসন্ধানের বিষয় তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। আমেরিকার জাতীয় বিজ্ঞান আকাদেমি তাই চেষ্টা করছেন কোনো প্রকারে চীনদেশে আমন্ত্রিত হতে। স্বচক্ষে তাঁরা আকুপাংচারের প্রয়োগ দেখে আসতে চান। তাঁদের ধারণা, অন্তত বছর পাঁচেক ধরে তথ্য সংগ্রহ করতে পারলে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে আকুপাংচারকে অ্যানীসথেসিয়া হিসেবে গ্রহণ করা চলে কিনা।

বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার ১৯৭২

১৯৭২ সালে শারীরবৃত্তে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন দুজন : নিউইয়র্ক রকফেলার বিশ্ববিদ্যালয়ের জীব-রসায়ন বিজ্ঞানের ডঃ জেরাল্ড মরিস এডেলম্যান (৪৩) ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবরসায়ন-বিজ্ঞানী অধ্যাপক রোডনি পোর্টার (৫৫)। প্রাণীদেহে রোগ-প্রতিরোধের ক্ষমতা কিভাবে তৈরি হয় তাই নিয়ে ওঁদের গবেষণা, পৃথক পৃথক ভাবে।

পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনজন : জন বার্ডিন (৬৪), লিয় এন কুপার (৪২) ও জন আর শ্রিফার। এঁদের গবেষণা যুগ্মভাবে। বিষয়—পদার্থের সুপারকনডাকটিভিটি বা অতি-পরি-বাহিতা। প্রথমোক্তজন ১৯৫৭ সালেও পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়ে-ছিলেন। এই তিনজন বিজ্ঞানী দেখিয়েছেন যে পদার্থের তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রী ফারেন-হাইটের চেয়েও প্রায় ৪৬০ ডিগ্রী কম হলে সেই পদার্থের বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা প্রায় বাধাশূন্য হয়ে ওঠে। এই আবিষ্কারের ফলে থার্মোনিউক্লিয়ার শক্তি-উৎপাদন আরো অনেক সহজ হয়ে উঠবে আশা করা চলে।

রসায়নবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ ও রকফেলার বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিশ্চিয়ান অ্যানফিনসেন (৫৬), স্ট্যানফোর্ড মুর (৫৯) ও উইলিয়াম এইচ স্টাইন (৬১)। এঁদের গবেষণা এনজাইম নিয়ে। এনজাইম হচ্ছে এক ধরনের জৈব পদার্থ, জীবন্ত কোষের দ্বারা সৃষ্ট। রাসায়নিক পরিবর্তনে এই জৈব পদার্থ সহায়কের ভূমিকা নিয়ে থাকে। শরীরের বিপাকক্রিয়ায় এনজাইমের ভূমিকা অতি প্রধান। এই তিনজনের আবিষ্কারে উপকৃত হবে শুধু চিকিৎসাবিজ্ঞান নয়, শিল্পক্ষেত্রও।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান
বিজ্ঞানবিষয়ক মাসিক পত্রিকার
রজত-জয়ন্তী বর্ষ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকাটি ১৯৪৮ সালের গোড়া থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। ১৯৭২ সালের আগস্ট সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছে প্রতিষ্ঠা দিবস সংখ্যা হিসেবে। এই সংখ্যায় আছে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের চতুর্বিংশতিতম প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ ও বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে সুলিখিত প্রবন্ধ। বাংলাভাষায় বিজ্ঞান-প্রচারে এই পত্রিকাটি গৌরবমণ্ডিত ভূমিকা পালন করছে। বর্তমান প্রচার সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। আশা করা চলে, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের সুযোগ্য সম্পা-দনায় পত্রিকাটির উত্তরোত্তর উন্নতি হবে।

—অয়স্কান্ত

বুড়ো আঙুলে টিপ দিয়ে লেঙচিয়েও কিছু হল না। এবার গোটা দুই ইটের টুকরো। লাগা তো দূরের কথা, ধারকাছও মাড়াল না। কিন্তু চোখের ওপর অতগুলো পেয়ারা সমানে দোল খেয়ে চলেছে গাছের ডালে ডালে।

অথচ সারাটা দিন কি না করেছে তনু। ভাত খাওয়ার পর নিজেই গিয়ে শুয়েছে বিছানায়। তারপর সবাই কখন ঘুমিয়ে পড়ে চোখ বুজে তার অপেক্ষা। রাস্তা দিয়ে আইসক্রীমওলা হেঁকে হেঁকে ফিরে গেল, ডুগডুগি বাজিয়ে 'বাঁদর খেলাও' চলে গেল। ধরমড়িয়ে ওঠা ছেড়ে চোখ পিটপিট পর্যন্ত করে নি একবারও। কম কথা! শেষে বাড়ীর সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ল—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মা পাশ ফিরল কয়েক বার। তখনও অপেক্ষা। তারপর চিমটি কেটে যখন দেখল মা সত্যিই ঘুমিয়েছে, তখনই পা-টিপে গুটি গুটি বেরিয়ে আসা। কিন্তু যার জন্যে এত কৃচ্ছ্রসাধন, এত অপেক্ষা, সেই একটি পেয়ারাই হাতে এল না এখনও।

—এই তনু!

চট করে ঘুরে দাঁড়াল।

'ওমা! দেবুদা! কোথায় যাচ্ছিস রে?'

'সেই অনেক দূরে...'

'অনেকটা' দেবু খুব টেনে টেনে উচ্চারণ করেছিল।

'সেই অনেক দূরে? কত দূর রে?'

'সেই কল...'

কলকাতাটা জিভের ডগায় এসেও এল না দেবুর। তনু তো আবার সেখানকারই মেয়ে। এই মাসখানেক হল, মায়ের সঙ্গে মামার বাড়ী এসেছে বেড়াতে। প্রথম প্রথম কত গল্পই না শুনেছে দেবু ওদের নিয়ে। ঘোষেদের মেয়ে কতদিন পরে এসেছে কলকাতা থেকে, জামাই নাকি পুলিশে খুব বড় কাজ করে; এত এত পয়সা কামায় রোজ; ঘোষবাবুর নাতনী মেমসাহেবদের ইস্কুলে পড়ে; উঠতে বসতে ইংরেজী বলে... শুনতে শুনতে কানে পোকা পড়ে গিয়েছে দেবুর। রাগে হাড় পর্যন্ত জ্বলতে থাকত। দেখা হলেই ভেঙচাত কেবল—গুড গাড। গাড গাড! গুড গুড!

আর তনুটা কি আশ্চর্য! রাগত না একটুও। মাথা ভর্তি একরাশ চুল ঝাঁকিয়ে হাসত আর হাসত। বলত, তুই অমন করে কথা বলিস কেন রে, দেবুদা?

আমি ইংরিজী বলি রে। ইংরিজী। হে হে হে!'

গড! তুই এত জানিস!—তনুর ডগার চোখ দুটো ঠেলে ওঠে।

তোর এমন করে ইংরিজী বলিস কি?—দেবু তখনও হাসে।

আমরা অত পারি না—মিসরা পারে। যখন নিজেরা নিজেরা কথা বলবে তখন ঠিক তোর মত করে বলবে। মিসরা তো অনেক বড়। আমরা যখন বড় হব, মিস হব, তখন আমরাও পারব...

দেবুর কেমন যেন গুলিয়ে যায় সব। তবু ও হাসে। হাসতে হাসতে শুনতে থাকে—'তুই যদি আমাদের স্কুলে পড়িস মিসরা তোকে কত ভালবাসবে দেখিস।'

হাসতে হাসতে দেবুর হাসিটা কখন ওর চোয়ালের ধারে জমে বরফ হোয়ে যায়। আলজীভ সুদ্ধ হাঁ-করা মুখে দেখে, ওর সামনে দাঁড়িয়ে আর এক নোতুন দেবু, যে ইস্তিরি করা জামা পরে, মোটা মোটা বই পড়ে, ইংরেজীতে কথা বলে। মফস্বল শহরের এক প্রান্তে কন্তীপাড়ার ছেলেটা হঠাৎ কিসের খবর পায় মনে। আর সেই খবরের আশ্চর্য অনুভব এ'টেল মাটির মত ওর পা দুটো জড়িয়ে ধরে।

দেবু বলছিল—

সেই লন্ডন বিলেত—আরও কত সব জায়গা। সেই মোটা মোটা বইতে সব লেখা আছে। তুই তাদের নামও শুনিস নি কখনও। দেখছিস না আমার গাড়ী। এই গাড়ীতে...দেবু একটা লোহার শিকে চাকা চালিয়ে চালিয়ে আসছিল। কথার ফাঁকে চাকাটাকে রাখল পেয়ারা গাছের গুঁড়িতে। তারপর শিক হাতে কর্তাব্যক্তির মত এমন বুক চিতিয়ে দাঁড়াল যেন দূরে পাল্লার বোয়িং জেটের ককপিট থেকে পাইলট সাহেব নেমে এলেন। সব শুনে তনু একটা জোড়াল মন্তব্য করে বসল, তুই খুব বড় হোয়ে গেছিস, না রে দেবুদা। উত্তরে কিন্তু দেবু ঠোঁট উল্টোল। বলল, বড় না তো ছোট! জানিস বাবার জন্যে বন্দর থেকে সওদা কিনে আনি। এ ব্যাপারে তনুও পেছপা নয়। ঠোঁট উল্টোনর জবাবে সেও জানে হাতের বুড়ো আঙুল উঁচিয়ে ধরতে। বলল, তুই কলা বড় হয়েছিস। জান না তো আমি এখন পায়খানার ফ্লাশ টানতে পারি, নিজে নিজে মিঠুদের ফ্ল্যাটে যেতে পারি। একটুও ভয় করে না। তুই পারবি?

এসব দেবু মুখের তুড়িতেই উড়িয়ে দিতে পারত, কিন্তু তনুটা যে আবার কোত্থেকে পায়খানার সঙ্গে ফ্লাশ, মিঠুর সঙ্গে ফ্ল্যাট জুড়ে দিয়ে বলল।

পায়খানা অবশ্য দেবুদেরও একটা আছে। দশ-বার ঘর সারে সেটায়। গন্ধে নোংরায়—ভাবতে গেলে দেবুর গা গুলিয়ে ওঠে। কিন্তু ফ্লাশটা কি? সেটা আবার টানতে হয় নাকি? টানলে কি হয়? তাও নয় যাহোক বলে পাশ কাটান গেল। কিন্তু তনু যে আবার মিঠুদের ফ্ল্যাটে যায়।

মিঠু তাহলে তনুর বন্ধু। অমন বন্ধু দেবুরও আছে অনেক। বিশে, নেতাই, গোপলে, রেমো—আরও কত। দেবুদের ঘরের মত ওদের ঘরগুলো। টিনের চাল আর মাটির দেওয়াল। পাশাপাশি, গায়ে-গায়ে লাগান সব। হামেশাই দেবু যায় ওদের ঘরে। এই তো সেদিনের কথা। জয়তাদের বাড়ী গুলি খেলতে গিয়ে একটা লাটাই আর একটা পেট-কাটা ঘুড়ি নিয়ে পালিয়ে এসেছে। এ আর এমন কি। উঠুক না একবার ও-সব কথা! দেবুকে হারায় কার বাপের সাধ্যি। কিন্তু তনুটা যে আবার কোত্থেকে—নিজের মনে বার কয়েক 'ফেলাশ-ফেলাট' করে থেমে গেল দেবু। উচ্চারণটা ঠিক-ঠিক হচ্ছে না দেখে সব রাগ গিয়ে পড়ল তনুর ওপর। ইচ্ছে হল এক ঘুষিতে—

আমি জানলায় উঠতে পারি। তুই পারিস?

তনু তার কীর্তিকথার এক জায়গায় থামল একটু। দেবুর রাগটাও সেই সুযোগে হাতের চেটো থেকে উঠে এল জীভের ডগায়—

হোঃ।

একটু থেমেই আবার—

'তুই তো শুধু জানলায়। আমি! আমি গাছে উঠতে পারি, জানিস!'

দেবু হাতটাকে টান টান করে ওর উচ্চারোহণের একটা ধারণা দেবার চেষ্টা করছিল তনুকে।

'সেই অনেক বড় বড় গাছ? সেই ট্রামের তারের চেয়েও বড়?'

ট্রামের তার! বেচারা দেবু! মুখ দিয়ে রা'টি বেরুল না আর। গোল গোল চোখ দুটোকে কপালে তুলে ঢোক গিলতে লাগল শুধু। কবে যেন—মার অসুখের সময় বোধহয়—বাবার সঙ্গে কলকাতা গিয়েছিল। রাস্তার ধারে ধারে কী সব লম্বা লম্বা রক। সেই সব রকের ওপর দিয়ে বাবার হাত ধরে হাঁটছিল দেবু। হাঁটতে হাঁটতে, মনে আছে, হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠেছিল আনন্দে—রেল গাড়ী। বাবা রেল গাড়ী দেখ!

ধুৎ তেরি! ও আবার রেল গাড়ী নাকি। ওকে বলে—

সেই যা একবারই ট্রাম দেখেছিল দেবু। তারপর কলকাতাও যায় নি, ট্রামও দেখে নি। তনু কিন্তু রোজই দেখে।

আচ্ছা, দেবু ভাবল, ট্রাম গাড়ীর মাথায় তো লোহার শিকের মত কী একটা থাকে। কই তার তো থাকে না। অন্তত তেমন কিছু তো দেবুর চোখে পড়ে নি। তাহলে...সব গুল। শালা। আমি বুঝি কিছু জানি না। আমি বুঝি বোকা—এমন প্যাঁদাব না মেয়েটাকে একদিন।

এসব অবশ্য মনে মনেই বলেছে দেবু। আসলে মুখে যা বলল, তা হল—

'ওই যে তেঁতুল গাছটা দেখছিস না?'

তনু দেখল। দেখতে দেখতে সারা শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। তারপর চোখ পিট পিট করে, ফিস-ফিসিয়ে বলল, তুই ওই গাছেও উঠতে পারিস?

দেবু এতক্ষণে কোমরে হাত দিয়ে ফেলেছে। ঘাড় বেঁকিয়ে, চোখ ঘুরিয়ে বললে, তুই কি ভাবিস?

তনু কি ভাবে তা সে-ই জানে। কিন্তু দৃষ্টিটাকে নামিয়ে তেঁতুল গাছ থেকে পেয়ারা গাছে রাখল আপাতত—

'তুই এই গাছে পারবি?'

পারব না কি রে। দেখবি—

দেবু ঝট করে গেঞ্জিটা খুলে তনুর কাঁধে আর শিকটা ওর হাতে দিয়ে বলল, খুব দরকারি জিনিস। ফেলবিনি! বুঝলি!'

এবার দড়ি-খোলা ইজেরটার শক্ত করে একটা গিঁট দিয়েই গাছের একটা ডাল ধরে ঝুলে পড়ল তারপর বার কয়েক দুলে নিয়েই পা দুটো চালিয়ে দিল আর এক ডালে। রুদ্ধশ্বাসে সেই আশ্চর্য কৃতিত্ব দেখছিল তনু। ভয়-বিস্ময়-শ্রদ্ধার প্রচণ্ড আবেগের বাণ ডেকে যাচ্ছিল ওর বুকে, হঠাৎ নেচে উঠল সে :

তুই কী বড় হয়েছিস রে দেবুদা! তুই বাবার মত বড় হোয়ে গেছিস!

এতবড় একটা সম্মানের জন্যে দেবু তৈরী ছিল না। কি বলবে ঠিক করতে না পেরে গাছের ডাল ধরেই ঝুলে নিল কয়েক পাক।

'আমায় একটা পেয়ারা দিবি, দেবুদা।'

দেখ রে দেখ। আমি এখান থেকে ছুড়ে দিচ্ছি, তুই শুধু কুড়িয়ে নে। কুড়োতে আর হল না। তনুর উচ্ছ্বাসেই ওর মা-মাসীকে ডেকে আনল।

'এই ভর দুপুরে তুই আবার বেরিয়ে এসেছিস?'

'আমি তো এখানেই......'

'এই তোমার এখান! আর ওই ন্যাকড়াটা কি করতে কাঁধে তুলেছিস শুনি।'

'ওমা! এটা আবার ন্যাকড়া নাকি! এটা দেবুদার গেঞ্জি আর এটা দেবুদার গাড়ীর সেই খুব দরকারি জিনিস!'

'নিকুচি করেছে তোমার দেবুদা আর তার দরকারি জিনিসের!' দেবুর মূল্যবান আসবাব মুহূর্তে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। তারপর—দেবুদা! ওই বস্তী-পাড়ার ছেলেটা আবার এসেছে বুঝি। আবার দেবুদা! তোর কোন জন্মের দাদা শুনি। কে তোকে দাদা ডাকতে শিখিয়েছে?'

'কেন, মাইমা বলেছে তনু, ওকে তুই দেবুদা......'

'কে গো ছেলেটা, বউদি?'

'ওই আমাদের দেবুর মা দেবু গো! দেবুর মা! আমাদের বাড়ী কাজ করত। ওই যে গো সেই...ওমা তুমি ভুলে গেলে!'

'থাক সে কথা! এখন তো আর কাজ করে না। তবে ছেলেটা অত আসে কেন?'

'ছি ছি। অমন করে বল না। অত আর আসে কই। ওই মাঝে-সাঝে...ওরা বড় ভাল লোক গো। কাজেকর্মে......'

'তাই বলে...ইস! না! এখানে আর বেশি দিন... তনু চলে এস ঘরে। কেন যদি......'

তনুকে প্রায় টানতে টানতেই ঘরে নিয়ে গেল ওরা। দুম করে দরজা বন্ধ করে দিল।

ডালে বসে নিঃশব্দে ওদের কথাগুলো শুনে যাচ্ছিল দেবু। সুড় সুড় করে গাছ থেকে নেমে এল এখন। ওর গেঞ্জি আর লোহার শিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে মাটিতে। খানিক তাকিয়ে থেকে একটা একটা করে দেবু সেগুলো কুড়িয়ে নিল। তারপর পেয়ারা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল খানিক।

রাস্তায় একটা লোক নেই। মানুষের গলা পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না কোথাও। দেবুর মনে হল দুপুরটা কুমীর হয়ে গিয়ে হাঁ হাঁ করে গিলতে আসছে। ওর কেমন ভয়-ভয় পাচ্ছিল। হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়।

ভাবল খুব মজা হবে যদি 'আগুন।' 'আগুন!' করে চেঁচাতে শুরু করে দেয়। চিৎকার শুনে পাড়ার লোক বেশ ছুটে আসবে হৈ-হৈ করে। বলবে, কোথায় আগুন? কোথায় আগুন রে ছোঁড়া? আর দেবু? দেবু ততক্ষণে গাছের সবচেয়ে উঁচু ডালটায়! দোল খেতে খেতে সুর করে করে বলতে থাকবে সেই ছড়াটা—

হেরে গিয়ে বাড়ী যায়

ব্যাং পুড়িয়ে ভাত খায়।'

লোকগুলোর কথা ভেবে দেবু নিজেই হি-হি করে হাসতে থাকল। কিন্তু ওই পর্যন্তই? হাতের চেটোকে চোঙা বানিয়ে সবে ডাকতে যাবে, ঠিক তখনই দূরের সেই পাখিটা ডেকে উঠল। কান খাড়া করে ডাক-গুলো শুনল দেবু। তারপর কি ভেবে পাখিটার মত ডাকতে লাগল—হুপ! হুপ! একবার, দুবার—অনেকবার! ডাকতে ডাকতে হেসে লুটিয়ে পড়ছিল সে। এমনই মজা!

কিন্তু কখন এক সময় মনে হল ওর, আর একটা ডাক যেন থেমে গিয়েছে। নিজের ডাক থামিয়ে পাখিটার ডাকের জন্যে অপেক্ষা করল দেবু। না। কোন ডাক নেই। শব্দ নেই। বৈশাখের দুপুর মাঝ রাতের ঘুম নিয়ে ঝিমোচ্ছে শুধু।

পাখিটা কি তাহলে...পাখির কথা মনে হওয়ার সঙ্গে তনুর কথা মনে পড়ে গেল ওর। পাখি—তনু—দুপুর! মাথার ভেতর সব কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। অস্বস্তিতে সারা শরীর গনগন করতে লাগল। দেবু ঝুম মেরে দাঁড়িয়ে রইল খানিক। তারপর খাল ধারে ব্যাঁকড়া মারতে ছুটল।

খালের ধারে সারি সারি পিটুলি গাছ। ঘন সবুজ পাতায় ছাওয়া। জলে গোল গোল পিটুলি পড়ছে। ছোট-বড় বৃত্ত সৃষ্টি হচ্ছে। একটা ছোট বৃত্ত আর একটা বড় বৃত্তে মিশে যাচ্ছে—মিশে মিশে হারিয়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে একটা খেলার কথা মনে পড়ে গেল দেবুর। ওর আর তনুর সেই চোর-চোর খেলা। ধরা পড়া আর ধরে ফেলার খেলা! দেবু জানতই না, এত মজা, এত আনন্দ আছে এর মধ্যে!

দেবুর সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে তনু গেল স্টেশন ধারে ট্রেন দেখতে। রোদের তেজ ছিল না। সারাটা বেলাই প্রায় কেটেছে মেঘলায় মেঘলায়। অপরাহ্নের সূর্য মুঠো মুঠো সোনা ছড়াচ্ছিল তখন। ওরা ফিরছিল। স্টেশনের রাস্তাটা চলতে চলতে যেখানে একটা পাক খেয়ে উত্তর দিকে মুখ ঘুরিয়েছে, ঠিক তার বাঁকেই মুদির মাঠ। তনু থমকে দাঁড়াল—

'কি গাছ রে দেবুদা?'

'শিমুল গাছ রে। শিমুল ফুল জানিস নি?'

বিস্তীর্ণ আকাশের নীচে অজস্র ফুলের আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছে গাছটা। চোখ-উপচান বিস্ময় নিয়ে তনু শুধোল, কি বললি? শিমু ফুল?'

শিমু নয় রে, শিমু নয়। শিমুল ফুল।

শেষের কথাগুলো দেবু কেটে কেটে, থেমে-থেমে, উচ্চারণ করছিল। তারপর—

'তুই কি বোকারে তনু। হি হি হি...'

হাসির চোটে ইজেরটাই খুলে যাচ্ছিল ওর। সামলিয়ে নিয়ে বলল, নিবি একটা?

'তুই এই গাছেও উঠতে পারবি?'

'হোঃ। পারব না মানে? ক-ত উঠি! এ মাঠের সব গাছে উঠতে পারি জানিস?'

'সেই অনেক দূরের গাছগুলোতেও পারবি?'

'পারব না তো গুল মারছি?'

'তুই হারিয়ে যাবি না দেবুদা?'

'হারাব কিরে! হা হা...'

দেবু হাসছিল। হাসতে হাসতে বলে চলল, দেখবি, চোখ বুজে সেই সেথা চলে যাব?

তনু খপ করে হাতটা চেপে ধরল দেবুর—

'না। তুই যাবি না।'

'কেন যাই না রে। এখুনি আবার আসব। দেখ—'

তনু ধমক দিয়ে উঠল—

না না। তা হবে না। কিছুতেই না। যদি যাস—

তারপর খুব আস্তে আস্তে—প্রায় নিজেকে শোনাবার মত করে বলল, আমার যে ভয় করবে।

'ভয়?' — দেবু সুখী লোকের মত হাসতে লাগল। বলল তবে ঘর চ।

তুই যে বললি, ফুল দিবি? হ্যাঁ বাবা, তুমি খুব চালাক হোয়েছ!'

'চালাক নয় রে চালাক নয়। আমি ভুলে গেছিনু। আচ্ছা, তুই এ ধার দাঁড়া। আমি—'

'ওমা, আমি একলা একলা দাঁড়িয়ে থাকব! যদি ভয় পায়?'

'কিচ্ছু ভয় নেই রে। আমি তো আছি। এখানে না আমায় সব্বাই ভয় পায়। চলা! গাছ থেকে ইঁটের বাড়ি এমন ঝাড়ব না! তোর কোন ভয় নেই রে তনু।'

তনু নিশ্চিন্ত হল। বলল, তাহলে তুই উঠে পড় দেবুদা। খুব বড় বড় ফুল চাই কিন্তু। একটা নয়। চারটে-পাঁচটা—অনেকগুলো! বুঝলি!

'আচ্ছা রে আচ্ছা।'

ফুল নিয়ে ফেরার পথে আকাশ ভিজিয়ে এল। তারপরই ঝড় আর বৃষ্টি। রা ছুটতে ছুটতে গিয়ে আশ্রয় নিল কটা টিনের ছাউনিতে।

'ইস!'

তনু হাঁপাচ্ছিল। হাঁপাতে হাঁপাতে লল, মা কিন্তু বকবে, ভাই। জাননা তো—

'বকবে কেন রে বোকা জল থামলে করে ঘরে গিয়ে ঢুকবি। কেউ কিছু লে বলবি তক্তপোষের তলায় লুকিয়েছিলুম। বাস। দেখবি কেমন মজা হবে।'

কথা শুনে তনু খিল খিল করে হেসে। বলল, তোর মা বকলে বুঝি এসব স?

'আমায় বকেই না।'

'বাইরে গেলেও না? ভিজলেও না?'

'আমরা তো চৌপরদিন ফাঁকে ফাঁকেই ক রে। ঘরে তো জায়গা নেই। মা বলে যা ফাঁকে গিয়ে খেলগে যা। বৃষ্টির দিনে াদের কত কাজ জানিস?'

'কি করিস তোরা?'

আমরা গামছা নিয়ে পগারে মাছ ধরতে। মা সেই মাছ বৈকালে সেদ্ধ করে। তারপর লঙ্কা দিয়ে নুন দিয়ে ভাত পাতে...আঃ! যা খেতে না!

ঠোঁটের কষ বেয়ে জল গড়িয়ে আসছিল র। জিভ দিয়ে সশব্দে টেনে নিয়ে স, খেয়েছিস কখনও?

তনু বিষণ্ণ মুখে ঘাড় নাড়ল। বলল, দর কি মজারে দেবুদা। আর আমার দখ না। কেবল বলবে, ঘরে থাক, ঘরে আর ঘরে থাক।

আলোকচিত্র : রামকিঙ্কর সিংহ

উত্তেজনায় হাত নাড়তে নাড়তে বলল, বৃষ্টি হলে রাস্তায় কত জল হয় বল! লোকেরা বাস থেকে, ট্রাম থেকে নেমে জল দেখতে বেরোয়। আমারও তো ইচ্ছে করে। মাকে যদি বলি, অমনি বলবে, তনু জানলা দিয়ে জল দেখ। কান্না পায় না, রাগ হয় না? তুই বল!

পিলসুজের মত মুখ করে দেবু এসব সুখ-দুঃখের কথা শুনে যাচ্ছিল। শেষ হতে নিচু গলায় আস্তে আস্তে বললে, তোর মা-টা খচরা।

খচরা মানে কিরে দেবুদা?

খচরা মানে! খচরা মানে—তোর মা যেরম'...

এত করেও তনুর প্রশ্নের একটা মনের মত জবাব পাওয়া গেল না। অতএব—

খুব শক্ত মানে। মোটামোটা বইতে সব লেখা আছে। তোকে একদিন—

'আমাকে তোদের পগারে নিয়ে যাবি দেবুদা। তোরা মাছ ধরবি আর আমি দেখব.....'

দেবু রাজী হয়ে গেল। তনু বলল, কবে নিয়ে যাবি।

'সেই একদিন।'

'সেই একদিন! সেই একদিন তো আমরা আবার চলে যাব রে।'

'কি বললি?'

'আমরা চলে যাব রে। কলকাতা! আমাদের বাসা রে?'

সত্যি বলছিস?

ভিজে খোলে কাঠি মারলে আগুন না বেরিয়ে যেমন ভবভবে শব্দ হয়, দেবুর গলাটা ঠিক তেমন শোনাচ্ছিল।

'হ্যাঁ রে। মা স্যুটকেশ গোচাচ্ছে। বাবা, না, মাকে মামাকে চিঠি লিখেছে। বলেছে...'

বৃষ্টির তোড় নিঃসাড়ে বেড়ে চলেছে। ঘন ঘন বাজ পড়ছে, বিদ্যুতের আলোয় আকাশটা জ্বলছে, নিবছে — নিবছে, জ্বলছে! জলের ছাট হা-হা করে ছুটে আসছে টিনের ছাউনিতে। তনুকে আড়াল করে দাঁড়াল দেবু।

আকাশ ফাটিয়ে বাজ পড়ল কোথায়। তনুর হাত থেকে ফুলগুলো পড়ে গেল ঝর ঝর করে। দেবুর বুকে মুখ লুকিয়ে বলতে লাগল, বড্ড ভয় করছে রে দেবুদা।

ভয় কিরে! আমি তো আছি!—

এত বড় একটা সাহসের কথা বলতে গিয়েও পারল না দেবু। নিজের শার্টখানা তনুর মাথায় ঢেকে দিতে দিতে দেখল, এত যত্নে চয়ন করা সেই ফুলগুলো জলের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে।

প্রবাদ, প্রবচন ও বাঙলার জাতি সম্প্রদায়

মিনতি চক্রবর্তী

ভাষা ও সাহিত্য কোনও জাতির সভ্যতার মাপকাঠির নির্দেশক এবং প্রবাদ-প্রবচন এই ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে। লোককথার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তথ্য হল প্রবাদ-বাক্য। প্রবাদ হল মানুষের পর্যবেক্ষণ ও প্রকাশের এক সংক্ষিপ্ত কিন্তু অর্থপূর্ণ অভিব্যক্তি যা মানব-জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গঠিত। মানব-মনের পুঞ্জীভূত চিন্তাধারার সহজ বিকাশ, জ্ঞানের এক বৃহৎ আধার ও মানব-সংস্কৃতির খণ্ডিত মূর্ছনা হিসাবে প্রবাদ-বাক্য মানব-জীবনের বিভিন্ন ভাবধারা সহজেই ব্যক্ত করে।

প্রবাদ-বাক্যের প্রচলন সর্বদেশে সর্বকালের ও সর্ব জাতিতে। প্রাচীন লোকের জীবন ও ধর্মের উপর প্রবাদবাক্যের এক অসামান্য আধিপত্য, ক্ষমতা ও বিশিষ্ট স্থান আছে। পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্য, যেমন মিশরীয় চৈনিক ও ভারতীয় সাহিত্য প্রবাদবাক্যে পরিপূর্ণ। মিশরীয় গ্রন্থ 'বুক অব দি ডেড' ও (৩৭০০ খৃঃ পূর্বাব্দ। প্রবাদ-বাক্যে পরিপূর্ণ। চৈনিক গ্রন্থ 'শু-চাং' প্রবাদ-প্রবচনের এক মূল্যবান ভাণ্ডার। (৭৭০—২,০০০ বি, সি) চীন-দেশীয় সাধু-দার্শনিক কনফ্যুশিয়াস (৫৫৭—৪৭৮ বি, সি) প্রবাদের এত ভক্ত ছিলেন যে তিনি তাঁর কর্মপদ্ধতি ও কর্মধারা প্রবাদের উপর নির্ভর করে তৈরী করেছিলেন এবং পরবর্তী যুগে তাঁর অনুসরণকারীরা 'লুন য়্যু' নামে এক পুস্তকে তা সংগ্রহ করে রেখেছিলেন।

প্রাচীন 'টেস্টামেন্ট'-এর মধ্যে অনেক প্রবাদ-প্রবচন পাওয়া যায়। এই পুস্তকের এক খণ্ড (বুক অব প্রোভার্ব) প্রবাদ-প্রবচনে সমন্বিত। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও অ্যারিস্টটল প্রবাদ-প্রবচনের খুব অনুরাগী ছিলেন ও তা সংগ্রহ করে রেখেছিলেন।

প্রাচীনতম ভারতীয় সাহিত্য প্রবাদ-প্রবচনে পূর্ণ। বেদের মধ্যে অনেক মূল্যবান কথা পাওয়া যায় যা ভাবে সংক্ষিপ্ত ও গভীর অর্থবহ। নীতিশাস্ত্রসমূহ, যেমন 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'হিতোপদেশ', প্রবাদ-প্রবচনে পরিপূর্ণ। জৈন ও বৌদ্ধধর্মের পবিত্র কাহিনীসমূহ লোককথার জনপ্রিয় প্রবাদে পূর্ণ। বৌদ্ধধর্মের পবিত্র পুস্তক 'ধম্মপদে' অনেক প্রবাদ-বাক্য পাওয়া যায়। এইভাবে প্রবাদ-প্রবচন এক অসাধারণ আধিপত্য বিস্তার করে এসেছে ভারত ও অন্যান্য দেশসমূহে।

ভারতে প্রবাদের ঐতিহ্য অতি সুপ্রাচীন। আর্যদের প্রাচীনতম প্রবাদ-বাক্য পাওয়া যায় ঋক-বেদ ও অন্যান্য বেদ-গ্রন্থে। এইসব প্রবাদগুলির অর্থ একদিকে যেমন জাতিগত ও গভীর চিন্তাশক্তিসমন্বিত অন্যদিকে তেমনই মনোরম। যে কেউ অতি সহজেই এই প্রবাদগুলি থেকে ভারতের ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক ধারা কল্পনা করতে পারেন। নীতিশাস্ত্রসমূহ ভারতীয় ভাষা-সমূহের উপর এক অসামান্য আধিপত্য বিস্তার করেছে। নীতিশাস্ত্রের প্রকৃতি ও কার্যধারা ঐসব প্রবাদ-প্রবচনের সংগে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। নীতিশাস্ত্রের মধ্যে এক হাজারেরও বেশী শ্লেষাত্মক কথা ও প্রবাদ-প্রবচন পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে অধিকাংশেরই উদ্ভব প্রাচীন লোকের সামাজিক চেতনা হতে। এই প্রবাদগুলির অর্থ মূলত জাতিগত এবং এদের ভাষা অত্যন্ত হৃদয়-বিদারক, চাঁছাছোলা, তীব্রতা ও কটুতায় পরিপূর্ণ।

আমাদের বাংলাদেশে প্রবাদের অভাব নেই। পুরাকাল থেকেই আমরা বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মুখে নানারকম প্রবাদ ও ছড়া শুনতে পাই। আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয়বস্তু হল বিভিন্ন জাতি সম্বন্ধে আমাদের দেশে কিরকম প্রবাদের প্রচলন আছে তাই দেখা। বাংলাদেশে জাতি সম্বন্ধে যে প্রবাদগুলি প্রচলিত আছে সেগুলির উৎপত্তির সময় এখনও সঠিক জানা যায় নি। তবে জাতি সম্বন্ধে এই প্রবাদগুলি নিঃসন্দেহে আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রবাদগুলি যে শুধু জাতির জীবনের সমুদয় স্তরই আমাদের কাছে ব্যক্ত করে তাই নয়, এক জাতি সম্বন্ধে অপর জাতির মনস্তাত্ত্বিক ভাব-ধারার ইঙ্গিতও এর মধ্যে সুস্পষ্ট। ব্যক্তিগত কিছু নেই বলে এই প্রবাদগুলি জাতি[illegible]। এবং অনেক সময় এগুলি ব্যক্তির মুখে জাতির সমষ্টি জ্ঞানের অভিব্যক্তি। সামান্য কয়েকটি কথার মধ্য হতে কোনও জাতি সম্পর্কে তার আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ও জাতির সামগ্রিক চরিত্র সহজেই কল্পনা করা যেতে পারে। সেইজন্য কোনও বিশেষ জাতির মনস্তত্ত্ব, আচার-ব্যবহার হিসেবে, প্রবাদের যথেষ্ট মূল্য রয়েছে। কিন্তু নীতিবাক্য বা তত্ত্বকথা হিসেবে এই মূল্য চিরন্তন বা সার্বজনীন নয়। নীতিবাক্যের সংগে প্রবাদের পার্থক্য এইখানে যে উচ্চ-আদর্শ, তত্ত্বজ্ঞান বা লোকশিক্ষা প্রবাদের মূল কথা নয়। তত্ত্বকথা ও নীতি প্রচার এইসব প্রবাদের মূল উদ্দেশ্য না হলেও লোক-স্মৃতিতে এইসব প্রবাদ আবহমানকাল প্রবাহিত হয়ে এসেছে।

এখন দেখা যাক বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জাতি সম্পর্কে কি ধরনের প্রবাদ-বাক্য আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে সমাজে যে চার রকমের বর্ণ ছিল তার মধ্যে ব্রাহ্মণের স্থান ও মর্যাদা ছিল সবার উপরে। ব্রাহ্মণকে ভগবানের প্রতিনিধি হিসেবে কল্পনা করা হত এবং বেদচর্চা ও পৌরোহিত্যই তাদের প্রধান কাজ ছিল। এছাড়া, তাদের আরও যে কটি কাজ ছিল তা হল বিদ্যাভ্যাস, শিক্ষকতা ও ত্যাগ। বেদচর্চা করার দরুন সংস্কৃতে তাদের বেশ দখল থাকত এবং শিক্ষিতের সংখ্যা তাদের মধ্যে খুব বেশী ছিল। ব্রাহ্মণের এই শিক্ষা সম্বন্ধে যে প্রবাদ-বাক্যের প্রচলন পাওয়া যায় তা হল :—

'বামুন ঘরের মূর্খ হলে
ক্রিয়া পণ্ড করে
রোজার ঘরের মূর্খ হলে
রোগীর দফা সারে।'

'কাণা ব্রাহ্মণ শূদ্রের দুনা',

ব্রাহ্মণের মধ্যে যে আঞ্চলিক গোষ্ঠী-সমূহ আছে সে সম্পর্কেও বলা হয়েছে :—

'রাঢ়ী ও বারেন্দ্রে বিয়ে
না ভাবিয়া আন।
রাঢ়ী ও বারেন্দ্র হয় একের সন্তান।'

'এক বাপের দুই বেটা দুই দেশে বাস।
যুদ্ধ পাইয়া জাত খাইয়া
করল সর্বনাশ।
পৈতা ছিঁড়িয়া পৈতা চায়
বৌদিকে দেয় পাতি।
কর্ম খাইয়া ধর্ম পাইল
বারেন্দ্র অখ্যাতি।'

ব্রাহ্মণকে লোভী ও পরভোজী বলে অনেক জায়গায় প্রচুর নিন্দা করা হয়েছে তার কয়েকটি নমুনা হল :—

'বামুনে দক্ষিণা পেলে
ঢেঁকির নামেও চণ্ডী পড়ে'

'বামুন গণক কাওয়া'
এ তিন পরের খাওয়া'।

'বামুন-চোষা কলুকে
আর কায়েত-চোষা গ[illegible]'

বামুন, বাদল, বান—
দক্ষিণা পেলেই যান

'বামুন মরে আশে,
চোর মরে কাশে।'

'বামুনের মড়া জলে ভাসে,
ফলারের নামে উঠে বসে।'

'কলিকালের ব্রাহ্মণ যেচে লয় দান,
আপনি ত' মজে আর মজায় যজমান
কানা গরু বামুনকে দান,
বামুন বলে আনু আনু।'

'যজমানে বামুনের হাজাশুকা নাই।
আর নারিকেলে তেল বামুনের
ঝাড় ভাগে'

'বামুনকে কন্যাদান আলগা তার টানা।
বামুনকে তণ্ডুলদান ভাঙা কণা দানা।
বামুনকে তৈজসদান মধ্যে তার ছেঁদা।
বামুনকে গরুদান সার তার নেদা।
বামুনকে হরিনাম, ওজন তার কম।
এল রে পুরুত ওই যজমানের যম।'

ব্রাহ্মণকে কৃপণ বলেও অনেক জায়গায় গালাগালি দেওয়া হয়েছে :—

'বামনের ঝাড়ীর ভাত,
কপালে দিও হাত।'

'লাখ টাকায় বামুন ভিখারী।'

ব্রাহ্মণ জাতির সামাজিক মর্যাদা যে কত উঁচুতে ছিল তা নিম্নোক্ত প্রবাদগুলির মধ্যে পরিস্ফুট :—

'বামুন গেল ঘর
তো লাঙল তুলে ধর।'

'বামুন ঘরে খাবে ভাত,
গোবর দেবে আড়াই হাত।'

'বামুন শূদ্র তফাৎ।'

'কানা ব্রাহ্মণ শূদ্রের দুনা।'

ব্রাহ্মণ যদি তার ব্রাহ্মণত্ব অর্থাৎ সংস্কৃত শিক্ষায় অজ্ঞ হয় তবে তার আর ব্রাহ্মণত্ব থাকে না বা সামাজিক মর্যাদারও যথেষ্ট হ্রাস হয়। সেই সম্পর্কেও ব্রাহ্মণকে অনেক বিদ্রূপ করা হয়েছে :—

'কালকালের ব্রাহ্মণ যেচে লয় দান,
আপনি ত' মজে আর মজায় যজমান।'

'কলির বামুন ঢোঁড়া সাপ,
যে না মারে তার পাপ।'

'ভট্টাচার্য খুটের খুট,
স্বস্ত্যয়নে সবংশের ভুট।'

'ভট্টাচার্যের চানা।'

'মুখচোরা বামুন, কেসোরোগী চোর।'

ব্রাহ্মণ জাতিকে 'দ্বিজ' নামে অভিহিত করা হয় এবং বলা হয় উপনয়নের সময় ব্রাহ্মণেরা দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণ করে। এই উপনয়নের সময় ব্রাহ্মণকে উপবীত ধারণ করতে হয়। এই উপবীত সম্পর্কে প্রবাদে অনেকরকম মন্তব্য করা হয়েছে :—

'চেনা বামুনের পৈতায় কাজ কি?'

'পইতে কালো, বামুন ভালো,
পইতে সাদা, বামুন গাধা।'

'পইতে থাকলেই বামুন হয় না।'

'বামুন, গরু, ছাগল,
তিনই দড়ির পাগল।'

ব্রাহ্মণকে অনেক সময় অভক্তি করে ঘৃণা করা হয়েছে যেমন :—

'তিন বামুন এক শূদ্র,
কোথা যাও নির্বংশের পুত্র'।

'বাজাতি বামুন'।

'অরাজ্যে বামুন বেগার'।

'বামুনে চাষ'।

'বামুনে কপাল'।

উপবীতের ন্যায় টিকি ধারণ করা ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে আরও একটি প্রয়োজনীয় জিনিষ ছিল। প্রবাদের মধ্যে তারও প্রমাণ আছে :—

'ঋষ্যা চিনি মোছে,
বামুন চিনি পোছে'।

এছাড়া ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে পাঁচমিশালী আরও বিভিন্ন ধরণের উক্তি শোনা যায় অর্থও বিভিন্ন রকমের। যেমন :—

'বামুন মুচ্ছুদ্দি ধোপা গোমস্তা
এদের নেই বুঝে ব্যবস্থা'।

'পঞ্চ গোত্র, ছাপান্ন পাঁই,
ইহা ছাড়া ব্রাহ্মণ নাই'।

'নেয়ের গরু বামুনের না'।

'কার শ্রাদ্ধ কে বা করে
খোলা কেটে বামন মরে'।

'বামুনের ভাতে আছে'।

'বামুনে মন্ত্র পড়ে
পাঁঠার কলায় শুনে'।

'বামুনের রাগ খড়ের আগুন'।

'বামুন না হই, দক্ষিণা না দিলে
মারতে কইল কে'।

'বামুনের পাতে লবণ নাই
ধোপার পাতে চিনি'।

'নাড়ীটেপা বামুন'।

'বামুনের ঘরের চাঁড়াল'।

'বামুনের ঘরের গরু'।

পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে কায়স্থ জাতিকে লেখক বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে লেখনী ছিল তাদের একমাত্র পেশা। এজন্য কায়স্থ জাতিকে 'scribe' বা 'Writer Caste' বলা হয়েছে। এসম্পর্কে খুব সুন্দর প্রবাদ-বাক্য পাওয়া যায় :—

'কলমে কায়স্থ চিনি গোঁফে রাজপুত।
বৈদ্য চিনি তারে
যাঁর ওষুধ মজবুত'।

'কায়েতের ছেলের কলমের
আগায় ভাত'।

'কায়েতের ঘরের বেড়ালটাও
আড়াই অক্ষর পড়ে'।

'কায়েতের ঘরের মুখ''।

'কায়েতের মূর্খ কলুর বলদ'।

কায়স্থ জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধেও সুন্দরভাবে বলা হয়েছে। যেমন :—

'যমের বচনে সুচিন্তিত প্রজাপতি
সেইকালে কায় হইতে হইল উৎপত্তি,
লেখনী দক্ষিণ করে তালপত্র বামে,
জাতিতে কায়স্থ হইল
চিত্রগুপ্ত নামে'।

কুলীন কায়স্থদের সম্বন্ধেও সুন্দরভাবে উক্তি করা হয়েছে :—

'ঘোষ, বোস, মিত্র এরা কুলের
অধিকারী,
অভিমানে বালীর দত্ত যান
গড়াগড়ি'।

কায়স্থ জাতিকে বুদ্ধিমান জাতি বলে অনেক জায়গায় অভিহিত করা হয়েছে :—

'কাক ধূর্ত আর কায়েত ধূর্ত'।

'কায়েত মরে জলে ভাসে,
কাক বলে—মিত্তির আসে'।

'কায়েত মরে সেয়ানে, বেনে মরে
দেয়ানে
জোলা মরে তাঁতে
কাঙালী বাঙালী মরে
মাছে আর ভাতে'।

'কায়েতের বুড়া হাঁরার শায়।
নাপিতের বুড়া ছায়ের ছায়,
বাদিয়ার বুড়া না বহে ভার,
ভাটের বুড়া কথায় সার'।

'কায়েতের বুদ্ধি আঁতে
বাঁদরের বুদ্ধি দাঁতে'।

কায়স্থ জাতির বিভিন্ন আঞ্চলিক গোষ্ঠী সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের মন্তব্য করা হয়েছে :—

'ঘোষ বংশ বড় বংশ
বোস বংশ দাতা,
মিত্তির কুটিল বংশ দত্ত হারামজাদা'।

কায়স্থ জাতিকে অনেক জায়গায় নিন্দা করে অনেক রকম কটূক্তি করা হয়েছে :—

'কায়েতের ঘরের ঢেঁকি'।

'কায়েত, কালসাপ, বেদো নারী,
তিনজনকে পরিহরি'।

'কায়েতের মড়া কাকেও ঠোকরায় না'।

'কায়েতের বুদ্ধি মা ঘণ্টার বাদ্য'।

'কায়েতের হাড়া,
বেগুনের খাড়া'।

কায়স্থ জাতি যে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা সামাজিক মর্যাদায় বড় সে সম্পর্কেও বলা হয়েছে :—

'কায়েতের ছোট, বেদের বড়'।

'জাত হারায়ে কায়েত'।

সাধারণতঃ প্রবাদ-প্রবচনের মাধ্যমে সমাজের একটা বিশেষ দিকে আলোকপাত করা যায়। প্রথমতঃ আঞ্চলিকতা—বিভিন্ন অঞ্চলের একই জাতি বা গোষ্ঠী তাদের আচার-ব্যবহার, ধর্মীয় ও সামাজিক আচারানুষ্ঠানের মাধ্যমে যে বৈচিত্র্য ও বৈষম্য আনে তার ফলে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব হয়। এছাড়া কোনও বিশেষ জাতি সম্পর্কে কটু বা শ্লেষাত্মক প্রবাদের মধ্যে সেই গোষ্ঠী বা জাতির জনপ্রিয়তা যে নেই তা পরিষ্কার-ভাবে বোঝা যায়। মোট কথা, প্রবাদ-প্রবচনের আলোচনায় যেমন গোষ্ঠী বৈচিত্র্য বা কোনও বিশেষ জাতির চারিত্রিক ভাবমূর্তি বোঝা যায় তেমনি অন্যদিকে গোষ্ঠী বা সমাজের মধ্যে এক অনাত্মীয়ের আলগা বন্ধন সহজেই নজরে পড়ে।

চিঠিপত্র

কে বাঁচাবে লোকশিল্প ?

আজকে শোনা প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিল্পকলার কিছু কিছু নিদর্শন যাদুঘরে দেখতে পাওয়া যায়। হয়তো তারই পাশাপাশি একদিন সেখানে গিয়ে আগামী দিনের মানুষকে দূরবীন বা অনুবীক্ষণ যন্ত্র লাগিয়েই গোয়েন্দার মতো খুঁজতে হবে আমাদের লোকশিল্পের কিছু কিছু নিদর্শন। মাঝে মধ্যে নানান পত্র-পত্রিকায় দুয়োরাণীর মতো জায়গা দিয়ে লোকশিল্প বা সাহিত্য সম্পর্কে দু-চারটে আলোচনা বেরোয়। কিন্তু তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে কোনো ব্যাপক উদ্যোগ হচ্ছে কি।

নকশীকাঁথা আজ ঢাকাই মসলিনের মতোই কাব্যের উপমা হতে চলেছে। কারু-কাজ করা সুতোর তৈরি হাল্কা মিহি পাখা পশ্চিমবঙ্গের কোনো বাজারেই হয়তো আঁতি-পাঁতি খুঁজেও মিলবে না। আগেকার সেই শীতল পাটি কিংবা নকসা কাটা মাদুর একেবারে বেপাত্তা। এমনকি বছর পঞ্চাশেক আগে বাঙালী মৃৎশিল্পীরা যেসব বিচিত্র ধরনের সরা, পট, ঘট আঁকতেন বা বানাতেন তাও দুর্লক্ষ্য। অবশ্য এসব জিনিস যে একেবারে বাজারে দেখতে পাওয়া যায় না তা নয়। তবে আজকের জিনিস গুণগতভাবেই আগেকার লোকশিল্পকলার তুলনায় কিছুটা ভিন্নতর।

একথা ঠিক বেশ কয়েকজন নামী-দামী ব্যক্তির গৃহে এর কিছু কিছু নিদর্শন এখনো মিলবে। এর বেশির ভাগই সেই সব গবেষকদের ব্যক্তিগত পরিশ্রমলব্ধ ফল। তবু মনে রাখা দরকার এগুলো আগামীকালেরও সম্পদ। সুতরাং সেই সব মূল্যবান লোক-শিল্পের নিদর্শন কোন 'ফোক মিউজিয়ম' তৈরি করে সেখানে রাখা একেবারেই কি অসম্ভব ?

আসলে আমাদের লোকশিল্প ঐতিহ্য সংরক্ষণাবেক্ষণ এবং তা প্রসারের জন্য সরকারী উদ্যোগে একটি 'ফোক মিউজিয়াম' থাকা উচিত এবং যা কোনক্রমেই বেতো ঘোড়া হবে না। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ব্যক্তি-গতভাবে বিভিন্ন গবেষকগণ সরকারকে সাহায্য করতে যাতে এগিয়ে আসেন তার জন্যেও চিন্তার দরকার আছে।

সিরাজুল ইসলাম
বর্ধমান।

গল্পের শব্দ আর প্রক্রিয়া নিয়ে

অমৃতের ১২শ বর্ষ, ২৫ সংখ্যায় প্রকাশিত গৌতম গুহর গল্প 'রঙীন মাছের শব' পড়লাম। তিনি এক জায়গায় (পৃষ্ঠা ৯২৮) লিখেছেন 'বিসমিল্লা আজানের ধ্বনি কানে ভেসে এল।' অথচ আমি তো জানি আজানের মধ্যে 'বিসমিল্লা' ধ্বনি কখনো উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত হয় না। এর পরেই আবার লিখেছেন 'মসজিদের ভিতর সেখানে আজান দিচ্ছে এক মুসলমান ফকির। দু চোখ বন্ধ, নতজানু, দুই হাত কৃপা প্রার্থীর মতো শূন্যে উত্থিত।' কিন্তু লেখক বোধহয় ভুলে গেছেন আজান কখনো নতজানু হয়ে পাঠ করা হয় না। সম্পূর্ণ দণ্ডায়মান অবস্থায় দুই হাতের তর্জনী দুই কান স্পর্শ করে উচ্চৈঃস্বরে আজানের শব্দ-সমূহ উচ্চারণ করতে হয়।

আজানের অর্থ—প্রার্থনা (নমাজ) করবার জন্য জনগণকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং সমবেত হবার জন্য আহ্বান জানানো।

আলী হোসেন তরফদার
সম্পাদক, হাওড়া আর্ট প্লেয়ার্স

হায় শিক্ষা আমাদের !

বেশ কিছুকাল আগেই পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থার নাভিশ্বাস উঠেছিল। গণ-টোকাটুকির মোচ্ছব, অধ্যাপকদের শাসানি, স্কুল-কলেজের ভেতরে বোমা পটকার ছররা। অবশ্য বছরখানেক হল কিছুটা হাওয়া বদল হয়েছে যদিও পুরোপুরি নয়।

পত্রান্তরে কয়েকদিন আগে পড়ছিলাম এই আবহাওয়ার ঢেউ পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও বেশ লেগেছে। আলিগড়ে এক উপাচার্যকে একদল ছাত্র তাড়া করে প্রায় মেরেই ফেলে-ছিল আর কি। পাঞ্জাবে কৃপাণধারী পরীক্ষার্থীরা যাতে ইনভিজিলেটরদের বুকে উদ্যত কৃপাণ আস্ফালন করতে না পারে তার জন্যে তাদের জীবনবীমার ব্যবস্থা হয়েছে। মেদিনীপুরে ড্রেন পাইপ আর বেল-বটম প্যান্ট পরার দাবিতে ছাত্র-ছাত্রীরা ক্ষিপ্ত। ইন্দোরে ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের জনাকয়েক আত্মীয়স্বজন পরীক্ষা দিচ্ছে বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্বাভাবিক কারণেই তাঁকে পরীক্ষার খাতা দেখাতে না দিলে ছাত্ররা দল বেঁধে জুতোর মালা পরিয়ে যথোচিত সম্মান নাকি দেখিয়েছেন রেজিস্ট্রার মহাশয়কে। বিহারে সিনেটের বৈঠকে প্রায়ই ঝগড়া-ঝাঁটি, এমন কি হাতা-হাতিরও উপক্রম হয় মাঝে মধ্যে। আসামে তো একশ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীই মারদাঙ্গা সুরু করে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিল।

এই কি আমাদের উচ্চশিক্ষার বহর। হায় শিক্ষা!

শান্তনু রায়
কলকাতা-২৭

'অমৃতের' উপন্যাস প্রসঙ্গে

সম্প্রতি বর্ণালী প্রকাশনী (৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯) 'অমৃতের' নামে একটি উপন্যাস প্রকাশ করেছেন। লেখকের নাম নিমাই ভট্টাচার্য। বইটি কিনে ও পড়ে অনেকেই আমাকে অনেক কথা বলেছেন বলে সবার জ্ঞাতার্থে জানাতে চাই যে আমি এই বই লিখিনি। ইনি অন্য নিমাই ভট্টাচার্য। ইতিপূর্বে অন্য কোন নিমাই ভট্টাচার্য গল্প-উপন্যাস লেখেন বলে শুনিনি। সে কারণে মনে হয় এই বই প্রকাশের পিছনে কোন উদ্দেশ্য আছে।

যাই হোক সহৃদয় পাঠক সমাজের কাছে জানাতে চাই (১) রাজধানীর নেপথ্যে, (২) ভি-আই-পি, (৩) পার্লামেন্ট স্ট্রীট, (৪) আকাশভরা সূর্য-তারা, (৫) মেমসাহেব, (৬) রিপোর্টার (৭) এ-ডি-সি, (৮) ডিপ্লোম্যাট (৯), ডিফেন্স কলোনী, (১০) উইং কমান্ডার, (১১) যৌবন নিকুঞ্জে, (১২) ওয়ান আপ-টু ডাউন, (১৩) ককটেল, (১৪) তোমাকে ও (১৫) হরেকৃষ্ণ জুয়েলার্স আমার লেখা। এরপর আমার প্রত্যেকটি বইতে আমার অন্যান্য বইয়ের নাম ও আমার নিজের হাতে লেখা নাম ছাপা থাকবে। আশা করি অতীতের মত ভবিষ্যতেও বাংলা সাহিত্যের সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকদের ভালবাসা পেয়ে নিজেকে ধন্য করার সুযোগ পাব।

নিমাই ভট্টাচার্য
নিউ দিল্লী-১৪

তথ্যগত ভুল

তেসরা নভেম্বরের 'অমৃতে'র সম্পা-দকীয় নিবন্ধে এক জায়গায় বলা হয়েছে 'এতকাল বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে অসমীয়ার পাশাপাশি ইংরেজিও ছিল শিক্ষার মাধ্যম।' ঘটনা কিন্তু তা নয়। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার মাধ্যম ছিল শুধুমাত্র ইংরেজি। অসমীয়া পাশাপাশিও ছিল না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় গত ১২ জুন গৌহাটি ও ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল যুক্ত বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যেসব কলেজ রয়েছে সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হবে শুধু অসমীয়া তবে ইংরেজিকে রাখা চলবে বছর দশেক পর্যন্ত।

রামরঞ্জন চক্রবর্তী
হাইলাকান্দি, কাছাড়।

আই-সি-এস'দের পেনসন

রাজন্য ভাতা বিলোপের সময়েই আই সি এসদের পেনসন কমানোর কথাটা বেশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। আর এ খবর পৌঁছনোর পরই অবসরপ্রাপ্ত আই সি এস-গণ বেশ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন বলে শোনা যায়। কিন্তু একটা কথা আজো ভেবে পাই না ভারতবর্ষের স্বাধীনতার রজত-জয়ন্তী বর্ষ প্রায় হতে চললেও অবসরপ্রাপ্ত আই সি এসদের পেনসন ব্রিটিশ পাউণ্ডে দেওয়া হয় কেন?

[illegible] সেনগুপ্ত
কলিকাতা-৪।

নিশীথ রাতের আগন্তুক

অরবিন্দ ঘোষ

তখন প্রায় শেষ রাত। নির্জনতার শেষ সীমায় পেঁছে গেছে গোটা পাড়াটা। নীরবতাকে সাহায্য করতে বুঝি বাতাসও থমকে দাঁড়িয়েছে এ পাড়ার বাইরে কোথাও। রাত-জাগা পাড়ার ক্লান্ত কুকুরগুলো শেষ রাতের আবেশ-মাখানো শীতল পরিবেশে কুণ্ডলী পাকিয়ে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে কোন আড়ালে।

ঠিক সেই সময় ডান পায়ের গোড়ালি অবধি কাটা মাঝবয়সী একজন রোগা লোককে অদ্ভুত কায়দায় হাঁটতে হাঁটতে সন্তর্পণে পাড়ায় ঢুকতে দেখা গেল। ওর পরনে খাঁকি চোঙা ফুলপ্যান্ট, হাফ বুস-শার্ট, বাঁ পায়ে লাল কেডস, দাড়িকামানো পরিষ্কার মুখ। নাকের নীচে সৌখিন গোঁফ এক জোড়া। দেখেই মনে হয় গত বিকেলেই সে কোন সেলুনে বসেছিল।

নীরবতার মাঝখানে যাতে কোন ফাটল না ধরে সেইভাবে সন্তর্পণে হাঁটছে লোকটা। কয়েকটা বাড়ী পেছনে ফেলে আসার পর রাস্তা ছেড়ে সে একটা গলিতে ঢুকে পড়ল এবং গলির প্রথম বাড়ীটার সামনে একটু অন্ধকার মত জায়গায় দাঁড়িয়ে সিনেমার কোন নামজাদা নায়কের মত একটুখানি মুখ তুলে অক্ষিগোলক ঘুরিয়ে বাড়ীটার রেলিংঘেরা দোতলার দিকে তাকালো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। এ বাড়ীর ঐ ওপরতলায় অভিযান চালাবার প্রোগ্রাম সে গত সকালেই করেছে।

হিমানী কুটির তখন আবছা আঁধারে দাঁড়িয়েছিল ফসিল হয়ে যাওয়া কোন বিরাটকায় প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মত। ওপরতলা নীচেরতলা অন্ধকার। কেবল স্ট্রীট-লাইটের ক্ষীণ আলোয় বাড়ীর এক পাশটা মাখামাখি হয়ে যাওয়ায় বাড়ীটা যেন আরো রহস্যময় হয়ে উঠেছে।

লোকটা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে চারদিকে পেচকের মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে শ্রবণেন্দ্রিয় সজাগ করে দমবন্ধ করে রাখল বেশ কয়েক মুহূর্ত। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে অতিমাত্রায় তৎপরতার সঙ্গে দ্রুত বাড়ীটার একপাশে, যেখানে স্ট্রীটলাইটের আলো পৌঁছুতে পারেনি, পাণ্ডুর চাঁদের দাক্ষিণ্য যেখানে ব্যর্থ হয়েছে সেই জায়গাটায় পেঁছে গেল। রেইন পাইপটা বার কয়েক টানাটানি করে শিকারী বেড়ালের মত ঐ দেড়খানা পায়ের সাহায্যেই পাইপটা বেয়ে অদ্ভুত দক্ষতায় উঠে এলো ওপরে। উঠে আসার পর কিছুক্ষণ দম নিয়ে একটা বন্ধ দরজার কাছে গিয়ে পাল্লায় কান রাখল।

অন্ধকারেই বত্রিশপাটি দাঁত বার করে নীরবে হেসে উঠল লোকটা। এরপর পকেট থেকে সরু একটা ইস্পাতের শলাকা বার করে একটু চেষ্টার পরই দরজাটা খুলে গেল হাট করে। বেইমান দরজাটা প্রতিবাদ করল না একটুও।

লোকটা ভাবছিল, কাল কিংবা পরশুর কাগজেই হেড লাইন নিয়ে বেরুবে—আসানসোলে লোমহর্ষক চুরি। অমুক তারিখ রাত প্রায় দুটোয় কে বা কাহারা স্থানীয় আপকার গার্ডেনের 'হিমানী কুটিরের' দ্বিতল হইতে মূল্যবান জিনিসপত্র লইয়া নির্বিঘ্নে প্রস্থান করিয়াছে। পুলিশ এ পর্যন্ত এই চুরির কোন কিনারা করিতে পারে নাই। লোকটা অন্ধকারেই হাসছিল।

পকেট থেকে পেন্সিল-টর্চটা বার করে টিপতেই একটা ছোট গোল আলো ছিটকে পড়ল মেঝেতে। এদিক-ওদিক ঘুরল আলোটা। নিমকখাওয়া কৃতজ্ঞতায় আলোটা লাফিয়ে লাফিয়ে ঘরের সবকিছুই তাকে দেখিয়ে দিল। ও দেখিয়ে দিল বড় কাঠের আলমারিটা, যেটার বাইরে ছোট একটা তালা সগর্বে আলমারির সিকিউরিটি রক্ষা করছে।

—এটুকু তালা আর আমাকে কতটুকু বাধা দেবে? লোকটা মনে মনে বলল।—

এক মোচড়েই ভেঙ্গে ফেলব ওটাকে। তবে তার আগে দেখা যাক ঐ তালাহীন ট্রাঙ্কটার কি আছে।

ঘরের কোণে এগিয়ে যাবার আগে আলোটা ঘরে ছিটকে পড়ল বিছানায়, যেখানে একটা মানুষ শুয়ে আছে আপাদ-মস্তক সাদা পাতলা চাদর ঢেকে। নিঃশ্বাসের তালে তালে তার মোটা পেটটা বড় সুন্দর ভাবে ওঠা নামা করছিল।

—ঘুমো ব্যাটা, নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমো। তোকে আমি এতটুকু বিরক্ত করব না। তোর ঘুমের যাতে এতটুকু ব্যাঘাত না হয় তার জন্য আমি অতি মাত্রায় সচেতন থাকব এ জেনে রাখিস। তবে হঠাৎ জেগে উঠে আমাকেও যেন বিরক্ত করিস না, আমি কিন্তু রেগে যাবো তাহলে।

ট্রাঙ্কটা খুলতেই অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে উঠল ডালাটা।

—কী আপদ। লোকটা বিরক্ত হল। একটু মুখ বুজে থাকতে পারিস না? তোর আর্তনাদে বিছানায় শুয়ে থাকা ভালো মানুষটির ঘুম যদি ভেঙে যেতো কি হতো তাহলে? অসময়ে কারো ঘুম ভাঙানো আমি কিন্তু পছন্দ করি না একদম।

হাসি-হাসি মুখে টেরিলিন টেরিকটের সার্ট প্যান্টগুলো মেঝেতে যত্ন করে গুছিয়ে রাখতে রাখতে সে মনে মনে বলল।—

—বাঃ বাঃ, আমার জন্য দক্ষিণাও রাখা আছে। ট্রাঙ্কের পকেট থেকে এক টাকার ছোট বাণ্ডিলটা বার বারে নাকমুখ কুঁচকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একবার দেখে পকেটে পুরে ফেলল সে। ঠিক সেই মুহূর্তেই বাইরে একটা কুকুর বেরসিকের মত প্রচন্ড চিৎকার করে উঠল। একটানা, তার সেই চিৎকারের যেন বিরাম নেই।

—কি জ্বালারে বাবা লোকটা চমকে উঠে ডালাটা বন্ধ করতে যেতেই বেশ জোরে আবার একটা শব্দ হলো, যে শব্দে জেগে উঠলো বিছানায় ঘুমিয়ে থাকা মানুষটা।

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের ইঙ্গিতে লোকটা খাটের নীচে চলে গেল। সে ভাবল অর্ধেক কাজ সেরে পালিয়ে যাওয়া কাজের কথা নয়। তাছাড়া নো রিস্ক নো গেইন। আর ও তো এখুনি আবার ঘুমিয়ে পড়ল বলে। ও ঘুমিয়ে পড়লেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাত চালিয়ে এ বাড়ীটাকে টা-টা করে রাস্তায় নেবে পড়তে হবে।

স্বপ্ন দেখেছে কিংবা নিজের ভুল মনে করে ঘুম-ভেঙে-যাওয়া মানুষটা হয়ত আবার ঘুমিয়েই পড়তো। কিন্তু খোলা দরজা দিয়ে বাইরের আকাশটা চোখে পড়তেই ও কেমন যেন অবাক হয়ে গেল। —যার জন্য ঘুম ওর মাথায় উঠলো প্রায়।

রাত্তিরে শোবার আগে দরজাটা বন্ধ করিনি নাকি আমি? বিছানায় উঠে বসতে বসতে সে ভাবল। কি ভুলো মন! সে খিঁচিয়ে উঠল। এই ভুলো মনের জন্য ওর ওর কাছে এত গালমন্দ খাই তবুও আমার শিক্ষা হয় না। নিজের ওপরই দারুণ একটা অভিমানে মনে মনে কথা কটি বলতে বলতে বিছানা ছেড়ে সে নীচে নেবে দাঁড়ালো। আর নীচে নেবে দাঁড়াতেই শেষ রাতের পান্ডুর চাঁদ ঘরের পরিস্থিতি সম্পর্কে তাকে ওয়াকিবহাল করতে যথেষ্ট যত্নবান হলো।

—আরে তাইতো! চট করে দেয়ালের কাছে গিয়ে সে আলোর সুইচটা টিপে দিল। আর তারপরই সে ষাঁড়ের মত গাঁক-গাঁক চিৎকার করে উঠলো। —বাবা মা গিন্নীরা ওঠো, দেখে যাও কি হয়েছে এদিকে।

—কিরে খোকা কি হয়েছে? পাশের ঘর থেকে একসঙ্গে একাধিক শঙ্কাতুরা আর্ত-নাদে ঘুমন্ত বাড়ীটা অসময়েই গাঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

—আঃ কি মুস্কিল, চৌকির তলায় লোকটা প্রচন্ড বিরক্তিতে বিড়বিড় করে উঠলো। —এরকম রামপাঁঠার মত চিৎকার করবার কি হয়েছে এ্যাঁ? এখনো তো আমি কিছুই নিইনি, কেবলমাত্র ময়লা বিচ্ছিরি এক টাকার নোটের রোগা বাণ্ডিলটা ছাড়া। আর ওটা গেলে তোমরা যে মরে যাবে না এও আমি খুব জানি।—

তার ভাবনায় ছেদ পড়ল। কারণ ততক্ষণে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে বিতি-কিচ্ছিরি রকমের মোটা বেঁটে চেহারার এক মহিলা। পেছনে লম্বা তালগাছের মত স্লিপিং স্যুট পরা ভীতগ্রস্ত একজন রোগা মানুষ। ঘরের ভেতর দৃষ্টি ফেলেই চোখ বড় বড় করে কোরাসে ওরা চিৎকার করে উঠলো—চুরি, এ্যাঁ চুরি?

কি ন্যাকা দেখো দিকিনি! চৌকির তলার লোকটা এবার বোধহয় বিরক্তিতে চিৎকারই করে উঠতে যাচ্ছিল। —কি ন্যাকা, চুরি যেন একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার, যেন চুরি নামে কথাটা ওরা কিতাবেই পড়েছে, এর সঙ্গে কোনদিন যেন চাক্ষুষ পরিচয় হয়নি ওদের।

রোগা মোটা দুজনই ঘরের ভেতর ছুটে এসে ভারত নাট্যম শুরু করে দিয়েছে ততক্ষণে। —দ্যাখ দ্যাখ কি কি চুরি গেছে দ্যাখ। জগাই-মাধাইয়ের মত দুহাত তুলে নাচতে নাচতে ওরা বলল ছেলেটাকে।—

কিছুই চুরি যায়নি। চৌকির তলায় লুকিয়ে থাকা লোকটাই মনে মনে বলল। কেবলমাত্র বিচ্ছিরি ময়লা এক টাকার নোটের বাণ্ডিলটি ছাড়া। সেটাও তো ঘর থেকেই বার হয়নি এখনো।

—না কিছুই বোধহয় চুরি যায়নি। গোবর গণেশ টাইপের ছেলেটা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভের মত বেশ কিছুক্ষণ তদন্ত করার পর বলল। —তবে সর্বস্ব যেতো, সময়মত আমি জেগে না উঠলে। চেয়ে দেখো, আমার ট্রাঙ্ক খুলে আমার জামা-কাপড়গুলো নিয়ে যাবার জন্য কিভাবে গুছিয়ে ফেলেছিল। আমি জেগে উঠতেই বোধহয় পালিয়েছে। কিছুই নিয়ে যেতে পারেনি বেচারা। কিন্তু আমার টাকা? হঠাৎ ট্রাঙ্কের পকেটের দিকে নজর পড়তেই আর্তনাদ করে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই বোধহয় ছেলেটা মাটিতে বসে পড়ল। আর এমনভাবে ট্রাঙ্কটাকে নিয়ে পড়ল যা দেখে চৌকির তলায় লুকিয়ে থাকা নিশীথ রাতের আগন্তুকের রুদ্ধশ্বাস বেরিয়ে আসতে ধরে গেল।

—আ গেল যা! ওরকম করছে কেন দিনের পর দিন ঘি-দুধ খাওয়া নাড়ুগোপাল ছেলেটা? বিড়বিড়িয়ে উঠলো সে। ইচ্ছে হচ্ছে পকেট থেকে বাণ্ডিলটা বার করে ছুঁড়ে মারি মুখে। ঝ্যাটা মার ঝ্যাটা মার অমন ছেলের মুখে। লক্ষ্মী ছেলের মত কোথায় শেষ রাতের ঠান্ডা ঠান্ডা ক্লাইমেটে ঘুমিয়ে পড়বি, বাবা মাকে শুতে যেতে বলবি তা নয়, ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে পাড়াশুদ্ধ জাগিয়ে দিল রে!

—আমার সতেরো টাকা, আমার সতেরো টাকা! পুত্র-শোকাতুর জননীর মত বুক চাপড়ে গোঁফদাড়ি বেরিয়ে যাওয়া বুড়োধাড়ী ছেলেটা বিলাপ করে কাঁদছিল। —পাড়ার সরস্বতী পুজোর চাঁদা থেকে আমি নগদ রোজগার করেছিলাম।

—কিন্তু চোরটা গেল কোথায় বল দেখি? ছেলের বুকফাটা কান্নাতে এতটুকু আমল না দিয়ে রোগা লম্বা ভদ্রলোকটি ইন্টারভিউ বোর্ডের চেয়ারম্যানের মত স্ত্রীকে প্রশ্ন করলেন।

—আ মোলো যা! আমি কি করে জানব? চোরটা কি যাবার সময় আমায় বলে গেছে যে কোথায় যাচ্ছে সে? যত বুড়ো হচ্ছে ততই মিনসের বুদ্ধি বাড়ছে দেখছি!

মহিলার খান্ডারনী কন্ঠস্বরে এতক্ষণ পর নিজের প্রতি মমতায় লুকিয়ে থাকা আগন্তুকের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এই প্রথম নিজের নিরাপত্তা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দিহান হল সে। একমাত্র মরিয়া হওয়া ছাড়া তার পক্ষে যে এ স্থান ত্যাগ করা বেশ শক্ত এ সে আপন সত্ত্বা দিয়ে, আপন অনুভব দিয়ে বুঝতে পারল বেশ। ঐ ভদ্রলোক এবং গবেট ছেলেটার চোখে ধুলো দেওয়া খুবই সহজ, কিন্তু মহিলাটি? নাঃ অত্যান্ত অত্যান্ত কঠিন ব্যাপার। —জটিল অঙ্কের মত ঐ জ্যান্ত মৈনাকসদৃশ ভদ্র মহিলা।

কি করব, হঠাৎ ছুটে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ব নাকি রেলিং টপকে নীচে? হ্যাঁ ঝাঁপ দেওয়া তো খুবই সহজ, কিন্তু ঐ পর্যন্তই, ভূমিশয্যা ছেড়ে সুস্থদেহে তারপর আর পালাবার ক্ষমতা থাকবে কিনা সেটাই ভাববার বিষয়। এখান থেকে পনের কুড়ি ফুটের কম হবে না মাটি। ইঃ, কার মুখ দেখে যে আজ রাতের কাজে নেবেছে সে।

—মা, কি করব থানায় ফোন করে দেব একটা? নিজেকে সামলে নিয়ে নেকু-নেকু ছেলেটা বলল। —ডায়েরী করে দেওয়া উচিত। জানিয়ে দেওয়া উচিত যে আমাদের যথাসর্বস্ব চুরি হয়ে গেছে।

—যথাসর্বস্ব, মামদোবাজী নাকি? চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল চৌকির তলার লোকটার। —পকেটের ময়লা এক টাকার পাতলা বাণ্ডিলটা ওর মানসচক্ষে নেচে উঠল।

—উচিত, হ্যাঁ পুলিশে একটা খবর

দেওয়া উচিত। বিজ্ঞ ম্যানেজারের মত লম্বা লোকটা বলল।—

—তাহলে তাই যাও, দেরী করছ কেন শুধু শুধু? বড্ডো ভয় হচ্ছে...

মহিলার কাংস্যনিনাদে চৌকির তলায় আগন্তুকের আবার হৃৎকম্প উপস্থিত হল।

—তুমিও চলো না।

—আমি আবার কেন? কথাটা বলেই ভদ্রমহিলা সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালেন ভদ্রলোকটির দিকে। —তোমার ভয় করছে নাকি?

—না ভয় কেন? ভয় নয়, মানে ইয়ে আর কি...ভদ্রলোকটিকে তোতলাতে দেখে নিজের সম্বন্ধে প্রচণ্ড দুর্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কেমন একটা হাসিতে লুকিয়ে থাকা লোকটার পেট গুড়গুড় করে উঠেছিল।—

—ওঃ, কী বীরপুরুষেরই সঙ্গেই না ঘর করছি আমি! স্বগতোক্তির মত বিরক্তিতে উচ্চারণ করলেন মহিলাটি। আর তারপরই এগিয়ে গেলেন। তাঁর পেছনে গৃহস্বামী।

এদিকে ওরা নিষ্ক্রান্ত হবার সংগে সংগেই ছেলেটা উঠে দাঁড়াল এবং কেমন একটা ভয়ের প্রলেপ মুখে লাগিয়ে এদিক-ওদিক একবার তাকিয়ে দ্রুতপায়ে ওদের অনুসরণ করল।—

—এই তো সুযোগ, এই তো আমার সুযোগ এসেছে। এখন যঃ পলায়তি...

চৌকির তলা থেকে বেরিয়ে রেলিং টপকে পাইপ ধরে ঝুলে পড়তে লোকটার এতটুকু দেরী লাগল না। ওঃ আজ বড় বাঁচা বেঁচে গেছি ঐ জাঁদরেল মহিলাটির হাত থেকে। ধরা পড়লে হার্ট ফেল হয়ে যেতো আমার। বাঁচার আনন্দে একটা খুশির সুর গুণগুনিয়ে উঠছিল ওর গলায়। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে প্রাণের মায়া ত্যাগ করেই মাঝপথে সে নীচে ঝাঁপ দিল। আর সঙ্গে সংগে কি বিপদ, একপাল আটটা কুকুর ডেকে উঠলো চারিদিক থেকে।

প্রায় আলো ফুটে উঠেছে। তাছাড়া ঐ কুকুরগুলো ব্যূহ ভেদ করে পালানো অসম্ভব। এখন আপাততঃ এই গাছ বেয়ে ঐ ভাঙা বাড়ীটার ছাতের ওপর উঠে চুপচাপ চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা যাক। শারীরিক ও মানসিক বিশ্রাম নেওয়া যাক কিছুক্ষণ। তারপর ধীরেসুস্থে ভদ্রলোকের মত একসময় গেলেই চলবে।

গাছ বেয়ে ভাঙা বাড়ীটার ছাতে উঠে গেল লোকটা। কেউই দেখল না, তবে এক পা কাটা তিন-পেয়ে একটা কুকুর ওকে দেখেছে ঠিক। ছাতে উঠে লোকটা তখনো ঠিক শোয়নি তবে শোবার উদ্যোগ করছে মাত্র, চিৎকার করে পাড়া মাতিয়ে তুলল ঐ তিন-পেয়ে পাজী কুকুরটা। ঊর্ধ্বমুখী হয়ে ওর সে কী তড়পানি।

ততক্ষণে চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেছে হিমানী কুটিরের দোতলায় গত রাত্রে এক লোমহর্ষক চুরি হয়ে গেছে। আশপাশের কৌতূহলী সদ্য ঘুম থেকে উঠে আসা মানুষের কিছু অংশ কুকুরটার ওরকম বেয়াড়া চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে এগিয়ে এসে ঊর্ধ্বমুখী কুকুরটার সঙ্গে ওরাও ঊর্ধ্বমুখী হয়ে দাঁড়াল।

—ছাতে নিশ্চয় কিছু একটা আছে। কৌতূহলী দর্শকের ভেতর থেকে সন্দেহ-প্রবণ কিছু লোক মন্তব্য করল।—নইলে তখন থেকে কুকুরটা ওরকম চিৎকার করছে কেন?

—চল তো দেখি। দুঃসাহসী দুজন লোক এগিয়ে গেল। গাছ বেয়ে উঠেও গেল একজন। একটু বাদেই চিৎকার শোনা গেল—এই এখানে কে একজন মক্কেল পায়ের ওপর পা তুলে শুয়ে আছে রে!

—তাই নাকি? এরপরই বুড়ো ছোঁড়াদের গাছে ওঠার ছোটখাটো একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল যেন। অনেক কষ্টে অনেক দুঃখে নেকু-নেকু ছেলেটাও উঠে এসেছে ওপরে।

—আপনি কে মশাই? এই ভাঙা বাড়ীর ছাতে কি করছেন? আপনাকে তো এর আগে এ পাড়ায় দেখেছি বলে মনে হয় না? দেখা গেল ছাতের ওপর আধ ডজন মানুষের মধ্যে এমন একজনকেও পাওয়া গেল না যে কিনা এক পায়ের গোড়ালি কাটা এই লোকটাকে চেনে।

—এ্যাই, কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন? বদমেজাজী গাঁট্টাগোট্টা চেহারার একজন মানুষ এক লাফে ওর সামনে এসে কলার চেপে ওকে দাঁড় করিয়ে দিল। —দেখি পকেটে কি আছে দেখি। বলতে গেলে প্রায় জোর করে নিজেই পকেট হাতড়ে গোটা দুয়েক বিড়ি, দিয়াশলাই পেন্সিল টর্চ এবং নোটের বাণ্ডিলটা বার করে আনল।

—দেখি দেখি টাকাটা দেখি। ভোম্বল-মার্কা ছেলেটা ছুটে এলো কাছে। ভালো করে বাণ্ডিলটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখার পর ও বলল—ও, তাহলে আপনিই সেই নিশীথ রাতের আগন্তুক এ্যাঁ?

—মানে? তোরিয়া হয়ে বলে উঠতে যাচ্ছিল লোকটা। কিন্তু তার আগেই ছেলেটা বদমেজাজী মানুষটাকে বলল—তুষারদা, এটা গুনে দেখুন তো, এতে যদি সতেরোটা টাকা থাকে তাহলে এই টাকাটার মালিক এই হতভাগ্য আমি ছাড়া আর কেউ নয় এ জেনে রাখবেন। আর এই মহাশয়টিই সে. উনি, যার জন্য আমাদের বাড়ীর প্রত্যেকেই মাঝরাত থেকে জেগে আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

গুনে দেখা গেল সত্যিই সতেরোটা টাকাই আছে বাণ্ডিলে।

—তবে রে, মামদোবাজী পেয়েছ? লোকটার চোয়ালে প্রচণ্ড একটা ঘুষি পড়তেই সে নিশ্চিধর্যায় জমি নিল।

—আরে কর কি, এখানে নয় এখানে নয়, মিহি গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন কন্যাপুর পলিটেকনিকের রণেশ্ব ভটচায। —নীচে নাবিয়ে নিয়ে চলো ওকে।

এরপর আর কি? নীচে নাবিয়ে আনার পর জনতার হাতে গ্রেপ্তার হওয়া চোরদের কপালে যা জুটে থাকে প্রায় সবই জুটল ওর কপালে। মুখ বুজেই প্রচণ্ড মার হজম করল লোকটা। বাড়ীর কর্তা যদিও হাতের সদ্ব্যবহার করবার সুযোগ পাননি, তবুও উনি ড্রেসিং গাউন পরনে পাইপ মুখে জনতার আদালতে উপস্থিত ছিলেন। কপাল দোষে ধরা পড়ে যাওয়া লোকটার একবার বাসনা হয়েছিল তার পায়ে বাড় ফেলে বলে ওঠে—সুদে-আসলে সবই তো তোলা হয়ে গেল বাবু বাকী যেটুকু আছে সেটা তোলবার জন্য পুলিশের হাতেই দিন আমাকে। পয়গলা কুকুরে কামড়ানো মানুষগুলো আমাকে মারে কোন অধিকারে এ্যাঁ? আমি কি ওদের বাড়ীর চোর? কিন্তু বলল না।

এক সময় প্রত্যেকটা লোকই বোধহয় ক্লান্ত হয়ে পড়ল যার জন্য কিছুক্ষণ দম নিয়ে ওকে টানতে টানতে রাস্তায় নিয়ে এল একসময়। দড়িও একটা জোগাড় হয়ে গেল কোথা থেকে যেন। লাইট পোস্টে বেঁধে ফেলা হল ওকে। চুরি জিনিষ যদ যে ভালো নয় তারই জীবন্ত বিজ্ঞাপন দেওয়া হলো আপকার গার্ডেনের লাইট-পোস্টে।

তখন দুপুর, লোকটার আশপাশ থেকে ভিড় পাতলা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। সমাজ-হিতৈষীরা অন্যায়ের শাস্তি বিধান করে একে একে চলে গেছে। মাঝে মাঝে কিছু নতুন পথচারী চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী • দৃষ্টিতে লাঞ্ছিত মানুষটাকে দেখে যাচ্ছে মাত্র। ইলেকট্রিক সাব স্টেশনের সুশান্তবাবু ও রায়বাবু, সামনের চায়ের দোকানের পটলবাবু ও দয়াময় অলস দৃষ্টিতে তখনো তাকিয়েছিল লোকটার দিকে।

লোকটার চোখে মুখে রাজ্যের শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি। বাঁধা অবস্থায় লাইট-পোস্টে শিম্পাঞ্জীর মত হেলান দিয়ে বসে সে তখন তার কপালের কথাই ভাবছিল। বলা যায় না, যে কোন মুহূর্তে তার ওপর বেদরদী মানুষের দ্বিতীয় রাউণ্ড বিচার শুরু হয়ে যেতে পারে। আধমরা না হওয়া পর্যন্ত ওরা বোধহয় পুলিশের হাতে ওকে তুলে দেবে না।

ঠিক সেই সময়ই বি বি সি দাস গ্যারেজের ভেতর থেকে এক পা কাটা তিন-পেয়ে কুকুরটা বেরিয়ে এগিয়ে এলো কাছে। নাক দিয়ে ঘ্রাণ নিয়ে বোধহয় সে বুঝতে চেষ্টা করল লোকটা বেঁচে আছে না মরে গেছে। তারপর একরকম নিশ্চিন্ত হয়ে আদর করবার ভঙ্গীতে লোকটার গায়ে গা ঘসল।

একটুখানি হাঁ করে ফুলে যাওয়া চোখ তুলে লোকটা ওর দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। কান খাড়া করে কুকুরটার কুঁই-কুঁই অস্ফুট আহ্লাদের স্বর শুনল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠল—ব্যাটা, তুই-ই আমাকে ধরিয়ে দিলি, তোর জন্যই আমার এই হেনস্থা, এখন আমাকে ভালো-বাসতে এসেছিস এ্যাঁ? শালা আদর করতে এসেছিস আমাকে?

জবাবে কুকুরটা এবার তার পা ঘেঁষে শুয়ে পড়ল চোখ বুজে।

অর্থনীতিতে নতুন দিগন্ত

নোবেল পুরস্কার
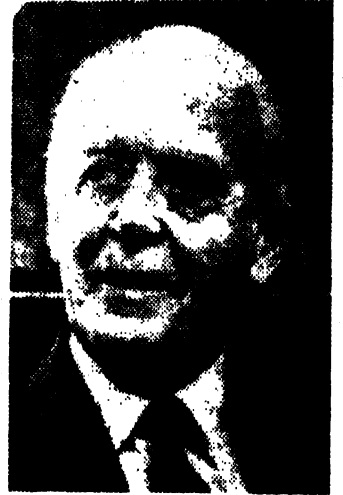
'গত সপ্তাহে একজন প্রখ্যাত অর্থনীতি-বিদ সস্ত্রীক কলকাতায় এসেছিলেন যাঁদের সম্মানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বর্ধনার আয়োজন করেছিল। এই অর্থনীতিবিদদের নাম হল স্যর জন হিকস্ এবং শ্রীমতী হিকস্। শ্রীমতী হিকস্ শুধু তাঁর সহধর্মিণী নন, চিন্তাসঙ্গিনীও বটেন। অর্থনীতিতে শ্রীমতী উরসুলা হিকসেরও উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এঁদের সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করেছিল একটি বিশেষ কারণে—অধ্যাপক হিকস্ ১৯৭২ সালের অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বলে।

অর্থনীতিতে যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া শুরু হয়েছে এটা এখনও অনেকেরই জানা নেই। তাই একটু ইতিবৃত্তের অবতারণা করা প্রয়োজন।

ইতিবৃত্ত :

উনিশ শতকের শেষের দিকে ডিনামাইট সহ বিভিন্ন বিস্ফোরক দ্রব্যের আবিষ্কর্তা প্রখ্যাত সুইডিস রসায়নবিদ এ্যালফ্রেড নোবেল (১৮৩৩-৯৬) পাঁচটি বিষয়ের জন্য বাৎসরিক পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছিলেন : পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শারীরবিদ্যা অথবা চিকিৎসাশাস্ত্র, সাহিত্য এবং শান্তি। এই পুরস্কারগুলোই হল বিশ্ববিশ্রুত নোবেল পুরস্কার যা লাভ করে যে কোন প্রখ্যাত ব্যক্তি নিজেকে সম্মানিত মনে করেন। সবাই জানেন যে আজ পর্যন্ত তিনজন ভারতীয় এই পুরস্কার লাভ করে ধন্য হয়েছেন: রবীন্দ্রনাথ (১৯১৩), চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমন (১৯৩০) এবং ডক্টর হরগোবিন্দ খোরানা (১৯৬৮)। এর মধ্যে আবার খোরানা এক অর্থে ভারতীয় নন—তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। আর তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন আর দুজন বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে সংযুক্তভাবে। আলফ্রেড নোবেল যখন নোবেল পুরস্কার প্রতিষ্ঠাকল্পে ২০ লক্ষ পাউন্ডের কিছু বেশী টাকা রেখে যান তখন তিনি বা আর কেউ কল্পনাও করতে পারেন নি যে একদিন পুরস্কার কর্তৃত্ব করার ভারপ্রাপ্ত সুইডিস একাডেমী অর্থ-নীতির জন্য নোবেল পুরস্কারের ব্যবস্থা করবে। কারণ অর্থনীতির তখন শৈশবকাল আর বিদ্যার বাজারে অর্থনীতির নাম, বা স্থান কোনটাই বিশেষ ছিল না। বস্তুত, অর্থনীতি শাস্ত্রের জীবনকাল এখনও দশ বছরের বেশী হয় নি। অর্থনীতির জনক এ্যাডাম স্মিথ তাঁর বিখ্যাত বই 'এ্যান এনকোয়ারি ইনটু দি নেচার এন্ড কজেস অব ওয়েলথ অব নেশানস' প্রকাশ করেন ১৭৭৬ সালে। এর কিছুদিন পরে কার্লাইল, রাসকিন প্রভৃতির সমালোচনার দরুন অর্থনীতি সুধীজনে আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত বলেই গণ্য হত। এরপর নয়া-ক্ল্যাসিকাল চিন্তাবীর এ্যালফ্রেড মার্শাল অর্থনীতিকে এই হীন অবস্থা থেকে কতকটা উদ্ধার করে আনলেও এই শাস্ত্রকে ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন জন মেনার্ড কেইনস, পরে যিনি লর্ড উপাধিতে ভূষিত হন।

তারপর থেকেই শুরু হল অর্থনীতির বিজয়াভিযান এবং এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগের শুরুতেই এই শাস্ত্র সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করল।

বলা যায় বর্তমান যুগ যেমন রাজনীতির যুগ তেমনি অর্থনীতিরও যুগ। রাষ্ট্রনেতা এবং রাজনীতিজ্ঞরা অর্থনৈতিক চিন্তাবিদদের ধ্যানধারণা ও সিদ্ধান্তকে অনেকাংশে গ্রহণ করেই নিজেদের কার্যপদ্ধতি ঠিক করে চলেছেন, বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতার বিভিন্ন প্রয়াস চলেছে এবং প্রত্যেক জাতি অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের সচেতন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কারের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত হয়েছে বলেই অভিমত প্রকাশ করা যায়।

অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার

অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়েছে মাত্র চার বছর—১৯৬৯ সাল থেকে। এবং এ পর্যন্ত মাত্র ছজন—একজন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদের ভাষায় মাত্র

কেনিথ জে অ্যারো

স্যর জন হিকস্

আধ ডজন অর্থনীতিবিদ এই বিশ্বসম্মানের অধিকারী হয়েছেন। এঁরা হলেন রেগনার ফ্রিস, জন টিমবারজেন, পল এন্টনি স্যামুয়েলসন, সাইমন কুজনেটস, স্যর জন হিকস্ এবং কেনিথ জে আরো। এই ছজনের মধ্যে তিনজন: স্যামুয়েলসন কুজনেটস এবং আরো হলেন মার্কিন; একজন: টিমবারজেন হলেন হল্যান্ডের লোক; একজন: ফ্রিস হলেন নরওয়েজিয়ন এবং এই বাহাত্তর সালে আরোর সঙ্গে যুগ্ম সম্মানাধিকারী হিকস হলেন ব্রিটিশ। এই ছয়জন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদদের অবদান-সহ সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল।

রেগনার ফ্রিস :

প্রতিষ্ঠার বছরই অর্থাৎ ১৯৬৯ সালে টিমবারজেনের সঙ্গে যুগ্ম নোবেল পুরস্কার বিজয়ী হলেন নরওয়েব অর্থনীতিবিদ রেগনার ফ্রিস। ইনি অর্থনীতি আলোচনায় স্থিতিবিদ্যা এবং গতিবিদ্যার প্রয়োগবৈশিষ্ট্য ও প্রয়োগ-ব্যাপকতা দেখিয়ে আলোচনার জন্য নতুন দ্বার উন্মুক্ত করেছেন। তাঁকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয় পরিসংখ্যানমূলক ব্যবহারিক অর্থবিদ্যা আলোচনার নতুন পথ খুলে দেবার জন্য।

জন টিমবারজেন :

টিমবারজেনও পরিসংখ্যানমূলক ব্যবহারিক অর্থবিদ্যার কার্যের জন্য বিখ্যাত। এবং এই একই কার্যের জন্য তাঁকে নোবেল পুরস্কারের মাধ্যমে বিশ্বজনীন সম্মান দেওয়া হয়। বর্তমান যুগ যেমন অর্থনীতির যুগ, তেমনি পরিসংখ্যানের যুগও বটে। ফলে অর্থনীতি ও সংখ্যাবিজ্ঞান পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে। কোন কিছু তত্ত্বের অবতারণা করতে হলে তা তথ্য ও পরিসংখ্যান দিয়েই প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। কিভাবে এই কাজ সহজ কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে করা যায়, তারই পথপ্রদর্শন করা হল টিমবারজেনের অবদান। অর্থনৈতিক নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রেও তাঁর দান অসামান্য। তাঁর বিখ্যাত

গ্রন্থের নাম হল ঃ 'ইকনমিক পলিসি (১৯৫৬)'। এর উদ্দেশ্য হল সম্প্রসারণশীল [illegible] নীতির পর্যালোচনা করা।

[illegible] এ্যান্টনী স্যামুয়েলসন

স্যামুয়েলসন অর্থনীতির ওপর রচনায় সিদ্ধহস্ত পুরুষ—অতি প্রাথমিক বিষয় [illegible] গুরুত্বপূর্ণ রচনায় সমান [illegible] বর্তমান দিনের অর্থনীতির উপর পাঠ্যপুস্তকের সর্বাধিক জনপ্রিয় লেখক হলেন স্যামুয়েলসন। কিন্তু তাঁর অবদান হল ভোক্তার আচরণের ওপর নতুন আলোকসম্পাতে। তাঁর উপযোগের [illegible] বিশ্লেষণ ও পছন্দতত্ত্বের আবিষ্কার [illegible] উল্লেখযোগ্য। যে গ্রন্থখানিতে এই বিশ্লেষণ করা হয়েছে তা হল 'ফাউন্ডেশন অব ইকনমিক অ্যানালিসিস'। তাছাড়া অর্থনীতির প্রত্যেক বিষয়ে তাঁর যুগান্তকারী রচনাসমূহ রয়েছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, মূলধন তত্ত্বের বিশ্লেষণে, অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের পর্যালোচনায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। সাধারণ ভারসাম্যের আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিশ্লেষণ তাঁর এক যুগান্তকারী কৃতিত্ব। তাছাড়া তিনিই প্রথম সার্থকভাবে অর্থনীতির বিশ্লেষণকে অংকের ছাঁচে নিয়ে যান।

আমাদের জানাশোনার মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার অধ্যাপক প্রবুদ্ধনারায়ন রায় স্যামুয়েলসনের অধীনে গবেষণা করেছিলেন।

সাইমন কুজনেটস

সম্প্রসারণের সমস্যাকে বর্তমান দিনের প্রধানতম অর্থনৈতিক সমস্যা বলে অভিহিত করা যায়। এই সমস্যার সমাধানকল্পে এবং উপযুক্ত পথনির্দেশে যে-সকল অর্থনীতিবিদ কাজ করে চলেছেন তাঁদের পুরোভাগে আছেন সাইমন কুজনেটস। বাস্তব জীবন থেকে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে, এবং তাদের যথাযোগ্য ব্যবহার করে অধ্যাপক কুজনেটস সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক চিন্তাদিগন্তকে বিশেষ প্রসারিত করেছেন। বাস্তবজীবনের সঙ্গে ভাব বা তত্ত্বের পূর্ণ সঙ্গতি না থাকলে তত্ত্বকে যে কার্যকর করা শক্ত, আর সঙ্গতি থাকলে যে তত্ত্বকে রূপায়িত করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য—অধ্যাপক কুজনেটস তাই সুস্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন। এর সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত আছে সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিশ্লেষণ এবং এর তাৎপর্য নির্দেশ। অর্থনৈতিক পরিবর্তন এবং সম্প্রসারণ যাঁরাই আগ্রহী কুজনেটসের চিন্তাপদ্ধতি এবং সংগৃহীত মালমশলার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় থাকা অপরিহার্য বললেও অত্যুক্তি হয় না।

সাইমন কুজনেটসের সঙ্গে কাজ করেছিলেন একমাত্র ভারতীয় অধ্যাপক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অম্লান দত্ত।

কেনিথ জে অ্যারো

হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অ্যারো ১৯৭২ সালে নোবেল পুরস্কার বিজয়ীদ্বয়ের অন্যতম। অর্থনীতি-চিন্তায় তাঁর অবদান হল মূল্যায়নের প্রশ্ন নিয়ে। ফলে তাঁর আলোচনা একদিকে নীতিশাস্ত্র এবং অপরদিকে সমাজবিদ্যার কাছাকাছি গিয়ে পড়েছে। যেহেতু সামাজিক বিজ্ঞানসমূহ পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এবং যেহেতু তাদের প্রত্যেকেরই কাজকারবার হল মানুষের কল্যাণ নিয়ে, সেই হেতু অ্যারোর চিন্তাধারা বিশেষ মূল্যবান সন্দেহ নেই। ওয়েল ফেয়ার ইকনমিকস বা কল্যাণভিত্তিক অর্থনীতি বর্তমানদিনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই কল্যাণের বিচারে বিভিন্ন মাপকাঠি ব্যবহার করতে হয়। মাঝে মাঝে আমরা একথা ভুলে গেলেও যুগে যুগে চিন্তাবিদগণ আবির্ভূত হয়ে তা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন। কল্যাণভিত্তিক অর্থনীতির অনুসরণেই তাই করতে হবে। অর্থনীতিবিদ অ্যারো তাই মনে করিয়ে দিয়েছেন। শুধু তাই নয় কিভাবে করতে হবে তারও পর্যাপ্ত নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ বিখ্যাত হল 'সোশ্যাল চয়েস এ্যান্ড ইনডিভিজুয়াল ভ্যালুজ'। গ্রন্থখানির নাম থেকেই বোঝা যায় কি এর প্রতিপাদ্য বিষয় ঃ ব্যক্তিগত মূল্যবোধকে বাদ দিয়ে সমাজ পদ্ধতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে পারে না। যদি হয় তবে অর্থনৈতিক কল্যাণের পরিমাণ হ্রাস পেতে বাধ্য।

অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও অ্যারোর উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। ১৯৬২ সালে প্রকাশিত নিবন্ধটিতে অ্যারো দেখিয়েছেন অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের অর্থনৈতিক তাৎপর্য। তাঁর মতে, একজন শ্রমিক অভিজ্ঞতা থেকে যতই শেখে ততই সে সমপরিমাণ উৎপাদনের উপাদান দ্বারা আরও বেশী উৎপাদন করতে পারে। ফলে উৎপাদন ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান নীতির কার্যকারিতা দেখা যায়। তাই কলাকৌশলের অগ্রগতির উৎস হল অভিজ্ঞতা, এবং ভেতর থেকেই এর উৎপত্তি। সত্যই অভিজ্ঞতা থেকে শেখা বস্তুজীবনের একটা চিরন্তন সত্য। আমরা আশা করব ভবিষ্যতে এই ধারণাটিকে অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রে আরও কাজে লাগান হবে।

অ্যারো তাঁর 'ইনভেন্টরী অ্যানালিসিস'-এর জন্যও বিখ্যাত।

জন হিকস

পরিশেষে আছেন ১৯৭২ সালে অপর নোবেল পুরস্কার বিজয়ী স্যার জন হিকস। সাধারণ ভারসাম্য তত্ত্বের ওপর নতুন আলোকসম্পাত এবং নতুন গুরুত্ব আরোপই হল অর্থনীতিতে অধ্যাপক হিকসের সবচেয়ে বড় অবদান। তাঁর বক্তব্য হল দাম-নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভোক্তা ও উৎপাদক উভয়ের আচরণকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে সমভাবে আলোচনা করতে হবে। তা না হলে আলোচনা একদেশদর্শী বা পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে ভ্রান্ত হবে, এবং সকলকে বিভ্রান্ত করবে।

অর্থনীতির ছাত্র মাত্রেই জানেন যে [illegible] কথা নয়, তার [illegible] সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই ব্যাপারে অধ্যাপক হিকসের পর্যালোচনা [illegible] মূল্যায়ন।

হিকসের মূলধন-তত্ত্ব ও অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ তত্ত্বেও যথেষ্ট অবদান আছে। তাঁর সর্বশেষ প্রবন্ধটিতে তিনি এই দুটি তত্ত্বকে একসূত্রে বাঁধার এক সার্থক চেষ্টা করেছেন। সেটি হয়ে দাঁড়িয়েছে 'অস্ট্রিয়ান থিওরি অব গ্রোথ বেসড অন অস্ট্রিয়ান থিওরি অব ক্যাপিটাল'। এক কথায় তাঁর অবদান হল মূল্যায়ন তত্ত্ব, সম্প্রসারণ তত্ত্ব ও মূলধন তত্ত্বের সংমিশ্রণ ও সংযুক্তিকরণ।

হিকসের রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'ভ্যালু এন্ড ক্যাপিটাল' সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। বাণিজ্যচক্রের ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল 'এ কনট্রিবিউশন টু দি থিওরি অব ট্রেড সাইকেলস', যাতে তিনি বাণিজ্যচক্রের ওপর নিজস্ব একটি মডেল তৈরী করেন। এছাড়া আছে তাঁর 'ক্যাপিটাল এন্ড গ্রোথ' নামে সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থটি। সুযোগ্যা স্ত্রীকে চিন্তাসঙ্গিনী হিসাবে পেয়ে অধ্যাপক জন হিকস অর্থনীতি চিন্তার দিগন্ত সম্প্রসারণের কাজে আজ প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে ব্যাপৃত আছেন। তিনি যে জীবিত ইংরাজ অর্থনীতিবিদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে রয়েছেন এটা বিতর্কের ঊর্ধ্বে। স্মরণ করা যেতে পারে যে, আধুনিক অর্থনীতি চিন্তার সূত্রপাত হয় ব্রিটেনে। অ্যাডাম স্মিথ ডেভিড রিকার্ডো টমাস রবার্ট ম্যালথাস যে চিন্তাধারার সূত্রপাত করেছিলেন তারই উত্তরাধিকার বহন করে চলেছেন জন হিকস।

উপসংহার

অর্থনীতিতে যে ছজন নোবেল পুরস্কার বিজয়ীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল তাঁদের প্রত্যেকেই অর্থনীতি- চিন্তার ধারক এবং বাহক এবং নূতন চিন্তা-দিগন্তের স্রষ্টা। কিন্তু তালিকা এই কজনকে নিয়েই সমাপ্ত হয় নি। আরও বেশ কয়েকজন চিন্তাবীর আছেন যাঁদের অবদান পুরস্কার বিজয়ীদের অবদানের সঙ্গে নিশ্চয়ই তুলনীয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ মার্কিন চিন্তাবীর লিওনটিয়েভ, রবার্ট সোলো, জাপানী অর্থনীতিবিদ মোরিসিমা, হল্যান্ডের অর্থনীতিবিদ কুপম্যানস এবং স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গুনার মিরডালের নাম করা যেতে পারে। এর মধ্যে বিশ্ববিখ্যাত অবদান হল লিওনটিয়েভের। তাঁর 'ইন্টার ইন্ডাস্ট্রি ইকনমিকস' অর্থনৈতিক চিন্তায় এক বিপ্লব এনেছে বললেও ভুল হবে না। হয়ত আগামী বছর এঁদের মধ্যে এক বা একাধিক জন নোবেল পুরস্কার বিজয়ীর সম্মান তালিকায় স্থান পাবেন। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষ [illegible] পাবেন।

—[illegible] মুখোপাধ্যায়
—[illegible] মুখোপাধ্যায়

বাজে খরচের বহর

টুকিটাকি দু'একটা জিনিস কেনার ছিল। বিকালে তাই মার্কেটের দিকে যাচ্ছিলাম। পথে রুণুদির সঙ্গে দেখা। তাঁর হাতেও সপিং-ব্যাগ। বুঝলাম যে, রুণুদি এবং আমার উদ্দেশ্য একই। কেনাকাটায় পরামর্শ করার মতো একজন সঙ্গী পাওয়া গেল ভেবে খুশি হলাম। একে দু'জন মহিলা তার যাচ্ছি কেনাকাটা করতে। স্বাভাবিক ভাবেই জিনিসপত্রের দাম নিয়ে নানা কথা এসে পড়ে। রুণুদি বলেন। আমি শুনি। মাঝে মাঝে এক-আধটু কথার জোগান দিই। জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক দাম নিয়ে তিনি অভিযোগ করেন। এ অভিযোগ তো আমার আপনার সকলের। তবুও রুণুদির মুখে শুনতে মন্দ লাগে না। তাঁর মূল বক্তব্য হলো, খরচের বহর এতো বেড়ে চলেছে যে, আয়ের সঙ্গে ঠিক তাল মিলিয়ে চলা যাচ্ছে না। জমানোর চিন্তা শিকেয় তুলে রেখে এখন মাস চালানোই দায় হয়ে উঠেছে।

ইতিমধ্যে আমরা মার্কেটে পৌঁছে গেছি। দোকানে ঢুকে একটা নতুন ডিজাইনের ফ্রক দেখিয়ে তিনি দাম জানতে চাইলেন। দাম শুনে প্রথমে একটু ইতস্তত করলেন। তারপর নিয়ে নিলেন। দোকান থেকে বেরিয়ে তিনি বললেন এত দাম দিয়ে এই ফ্রকটা কিনতে হলো আমার ছোট মেয়ের জন্য। পাশের বাড়ির মেয়েটিকে এই ফ্রক পরতে দেখে কাল থেকে সে বায়না ধরেছে তাকেও এই ডিজাইনের ফ্রক কিনে দিতে হবে। বাড়িতে এদিকে এক গুচ্ছের জামা। সে সবই ফেলা-ছড়া করে পরে। তবু এই নতুন ফ্রক তার চাই-ই। অনেক বুঝিয়েও বাগ মানাতে না পেরে বাধ্য হয়েই কিনতে হলো। এটা আবার কদিন চলে কে জানে।

কেনাকাটা সেরে আমরা বাড়ির পথ ধরি। কিছুক্ষণ চুপচাপ ছিলাম। রুণুদি আবার বলতে শুরু করেন, একে তো সংসারের খরচের চাপে হিমশিম খেতে হচ্ছে তার আবার এই বাজে খরচে নাজেহাল হওয়ার উপক্রম। অথচ কোন বাড়িতে দেখবে তারা দিব্যি এদিকটা ম্যানেজ করে চলছেন। বেশি দূর যাওয়ার দরকার নেই! এই আমার পাশের বাড়ির কথাই ধর না। জামা-কাপড়ে ওরা সব সময় টিপটাপ। বাজারে নতুন কোন ফ্যাশান উঠলে আমরা বুঝতে পারি ওদের জামা-কাপড় দেখে। কর্তা-গিন্নি আর ছেলে-পুলে পর্যন্ত পোশাকের বিজ্ঞাপন এঁটে রাস্তায় বেরোন। ওদের সবকিছু ম্যাচিং— শাড়ি থেকে শুরু করে পায়ের চটি পর্যন্ত! আর থাকেও ওরা খোশ মেজাজে। আজকে সিনেমা, কালকে থিয়েটার আর তার পরদিন বেড়াতে যাওয়া। এই মাগ্‌গিগণ্ডার দিনে সংসারের খরচ চালিয়ে ওরা যে কোত্থেকে এতো খরচ করেন বুঝতে পারি না। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে আর কারণে-অকারণে সে বাড়ির গিন্নি মার্কেটে ছোটেন আর নতুন ডিজাইনের বাক্সভর্তি জামা-কাপড় কিনে বাড়ি ফেরেন।

কথা বলতে বলতে আমরা বাড়ির কাছা-কাছি এসে পড়ি। এতক্ষণ মন দিয়ে রুণুদির কথা শুনছিলাম। সব কথা তখনো শেষ হয়নি। অথচ ব্যাপারটা মনে হয় ইন্টা-রেস্টিং। তাই রুণুদিকে বলি আমার বাড়িতে একটু চা খেয়ে যাও। সেই সঙ্গে দু-দণ্ড বসে কথাও বলা যাবে।

রুণুদিকে বসিয়ে আমি চায়ের জল চাপাই। একটু পরেই চা নিয়ে এসে আমি তাঁর পাশে বসি। রুণুদি আবার সেই পুরনো কথার সুতো জুড়ে দেন, তা ওরা জামা-কাপড় কিনুক আমার আপত্তি নেই। কিন্তু বাচ্চাদের নিত্য-নতুন জামাকাপড় কিনে দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। ওদের বয়স বাড়ছে। আজকের কেনা জামা দু-মাস পরে আর গায়ে দিতে পারবে না। তখন আবার নতুন জামা কিনতে হবে। এসবই হলো বাজে খরচ। সে তৈরি জামাই কেন, আর কাপড় কিনে নিজে সেলাই করে দাও। এ-ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকলে এই বাজে খরচের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়। জামার মার্জিনে একটু বাড়তি কাপড় জুড়ে রাখলে বাচ্চা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লম্বা বাড়িয়ে নেওয়া যায়। এভাবে চলেও অনেক দিন। জামা ছোট হয়ে যাওয়া মাত্রই বাতিল করে দিতে হয় না। আমি এক বাড়ির কথায় উদাহরণ দিলাম। কিন্তু আমরা প্রায় অনেকেই এটুকু ভেবে চলি না। তাই বাজে খরচের হাত থেকেও রেহাই পাই না। খরচের উপর বাড়তি খরচে আমাদের দম বন্ধ হয়ে আসে।

এই বাজে খরচ শুধু বাচ্চাদের বেলায়ই যে আমরা করি তা নয়। আমরা নিজেরাও কম বাজে খরচ করি না। সে বাড়ির কর্তা-গিন্নির কথাই ভাব না কেন। ওরা সব সময় ফ্যাশানে সেজেগুজে থাকে। এদিকে ওদের সংসারের হাল একেবারে বেহাল। এই তা সেদিন বিকালে ওদের বাড়ির চাকর আমার কাছে এসে খানিকটা চায়ের পাতা চাইলো। অফিস-ফেরত বাবুর জন্য চায়ের জল চাপিয়ে দেখে চা-পাতা নেই। আবার একদিন সকালবেলা ছোট ছেলেটা এসে দেশলাই চাইলো। আর শেখানো তোতাপাখির মতো এক নিঃশ্বাসে বলে গেল বাবা সব দেশলাই ফুরিয়ে ফেলেছে সিগারেট খেয়ে। এমনি শুধু দু-একদিন নয়। মাসের মধ্যে পনের দিনই এমনিতরো ঘটে। কোনদিন চা, কোন-দিন দুধ আবার কোনদিন অন্য কিছু।

কয়দিন আগে ওবাড়ির গিন্নি এসেছিল আমার কাছে। গল্প করতে। একথা সেকথার পর বললেন, যত জিনিসই আনি না কেন কুলোতে চায় না। মাস শেষ না হতেই সব ফুরিয়ে যায়। মনে হয় চাকর কোন গোলমাল

করে। জিনিসপত্রের চড়া দামেই কর্তার মাইনের সব ক'টা টাকা খরচ হয়ে যায়। তারপর তো আরো কত খরচ আছে। সেদিন ভেবেছিলাম যে, এই আরো কত খরচটা একটু কমাতে বলি, তাহলে অন্তত সংসারটা ভালভাবে চলবে। কিন্তু বলতে গিয়েও বলতে পারলাম না। কথাটা মুখে আটকে গেল।

বাজে খরচ কেবলমাত্র জামা-কাপড়ের বাহুল্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এই দেখনা তোমার বাড়িতে এসেছি, তুমি চায়ের সঙ্গে দিলে নিজে হাতে তৈরি করা নিমকি। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ বাড়িতে রেওয়াজ হলো অতিথি-অভ্যাগত আসার সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে হবে দোকানে। অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য। সে মাসের প্রথমে বা শেষে যখনই হোক না কেন। পারি আর না পারি দোকানের মিষ্টি দিয়ে তাঁদের পরিতুষ্ট করতে হবে। এতো সংসারের উপর বাড়তি চাপ নিঃসন্দেহে। কিন্তু সমাজে বাস করতে গেলে এ জিনিস এড়ানো সম্ভব নয়। তাই এসম্বন্ধেও আমাদের ভাববার দরকার আছে। এই যেমন তুমি নিজের হাতের তৈরি নোনতা খাবার দিলে চায়ের সঙ্গে তেমনি আমরা সবাই অনায়াসে করতে পারি। এতে যেমন খরচ বাঁচে তেমনি অতিথিরও তৃপ্তি হয়। কিন্তু সামান্য পরিশ্রমের ভয়ে আমরা এ জিনিসটা এড়িয়ে যাই। অথচ সংসারের দু' পয়সা সাশ্রয় করে কত সহজে অতিথির মনোরঞ্জন করা সম্ভব। আর এমনিতে পাল-পার্বণে আমাদের খরচ তো কম নয়। তখনো আমরা এভাবেই অতিথি আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে পারি।

বাজে খরচের আসল রহস্য হলো ঠাট বজায় রাখা। আগেকার দিনে রাজা-জমিদাররা যেমন একজন আরেকজনকে টেক্কা দিয়ে চলার চেষ্টা করতেন আমরাও সেই একই মনোভাবের বশবর্তী হয়ে বাজে খরচের শিকার হই। এই দেখনা এখন ঘরে ঘরে ছেলেপুলেদের জন্মদিন পালনের ছড়াছড়ি। এ আর কিছুই নয়, একজনের দেখাদেখি আরেকজনের পাল্লা দিতে এগিয়ে আসা। ছেলেপুলেদের জন্মদিন প্রথম প্রথম বাড়ির লোকজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো। কিন্তু অধিকাংশ জন্মদিন এখন বেশ ধুমধাম সহকারে করা হয়। নিছক আত্মমর্যাদার খাতিরেই আমরা এ ধরনের আত্মপ্রচারে নামি। সাধ্যে না কুলোলেও অনেকটা সাধ করেই এতো বড় খরচের ঝুঁকি নিতে হয়। অথচ এটা পুরোপুরি বাজে খরচ।

আমার এক বন্ধুর খুব দুঃখ যে, সে তার বড় মেয়ের বিয়েতে খুব ঘটা করতে পারেনি। তাই সে তার দুঃখ মিটিয়ে নিতে চায় ছোট মেয়ের বিয়েতে। বাড়িতে রসুন-চৌকি বসাবে আর আলোর রোশনাইয়ে দিনকে রাত করে দেবে ঠিক যেমনটি হয়েছিল অমুক বাড়ির মেজো মেয়ের বিয়েতে, অনেকদিন সে আমাকে একথা শুনিয়েছে। এবং ছোট মেয়ের বিয়েতে সে তাই করলো। ফলে একটা বিরাট ঋণের বোঝা চাপল তার কাঁধে। অথচ এত ঘটা করার তার কোন দরকার ছিল না। শুধু যদি একবার ভেবে দেখতো ... তার অবস্থার ... তাহলে হয়তো তার বাঁচার পথ ছিল। কিন্তু অত ভাববার তার অবসর ছিল না। তার লক্ষ্য শুধু পাল্লা দেওয়া। আর কিছু নয়। এরকম ভাবে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে অনেক বাজে খরচই আমরা করি। তাই যেমন আয় তেমন ব্যয়ের কথা উঠলেই বলি, বাজার দরের সঙ্গে তাল রাখতে পারছি না, তো কি করবো? বাজার দর বাড়ছে সত্যি কথা। সেই সঙ্গে বাজে খরচ যদি আরো বাড়াই তাহলে কোনদিনই তাল রাখতে পারিবো না। আরো বেশি বেতালা হবে।

আমাদের দেশে একটি চলতি কথা আছে যে, বাজে কথায় আয়ু ক্ষয় হয়। এ থেকে যে কেউ ইচ্ছে করলে সাবধান হতে পারেন। কিন্তু বাজে খরচ সম্পর্কে তেমন জোরালো সতর্কবাণী সেই বললেই চলে। বরং শাস্ত্রোক্ত নির্দেশ ঋণ করেও ঘি খাওয়া উচিত। প্রতিটি সাধ্যাতিরিক্ত খরচই বাজে খরচ। তাই এই ঘি খাওয়ার নির্দেশও নিঃসন্দেহে বাজে খরচের তালিকাভুক্ত। কিন্তু আমরা এই নির্দেশের ঘানিই টেনে চলেছি কলুর চোখ বাঁধা বলদের মতো, বুলুদি একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

—প্রমীলা

পাবলো নেরুদার কবিতা ও ভিভান সুন্দরমের ড্রইং

প্রতিটি শিল্প-মাধ্যমের শিল্পীরা যখন স্বীয়-মাধ্যমের অনন্যতা চর্চায় অন্য-মাধ্যম নিরপেক্ষ হওয়াকে পরম জ্ঞান করছেন, যখন শিল্পকে অন্য-নিরপেক্ষ স্বয়ং-সম্পূর্ণ বলে মনে করে শিল্প তথা মানুষের সকল কর্মের উৎস জীবনকে, শিল্পীরা তাদের বিশুদ্ধ 'শিল্প' থেকে নির্বাসন দিচ্ছেন অথবা ব্যক্তি-জীবনের কোন একটি বিশিষ্ট অভিজ্ঞতাকে রূপ দিতে গিয়ে তার সাধারণীকরণের দায়িত্ব নিতে অপারগ হচ্ছেন বা বিষয়হীন অলঙ্কার সৃষ্টিতে কালাতিপাত করছেন তখন যদি এমন কোন এক শিল্পীর সন্ধান পাই যিনি বৃহত্তর জীবনের অথবা জীবনের বৃহত্তর পরিচয় লাভ করার জন্য অন্য এক মাধ্যমের জীবনমুখী শিল্পীর দ্বারস্থ হয়েছেন, তখন স্বভাবতই আমরা তাঁর শিল্পকর্মের দিকে আকৃষ্ট হই।

দিল্লীর তরুণ চিত্রকর ভিভান সুন্দরম মানুষের শ্রম-শোষণ, বঞ্চনা, দারিদ্র্য, যন্ত্রণা, মৃত্যু ও শিল্পের উত্থান ও পতনের ইতিহাসকে শিল্পের শর্তে সাধারণ্যে গ্রহণযোগ্য করতে, শ্রমজীবী মানুষের স্বপক্ষে যুযুধান কবি পাবলো নেরুদার কবিতার শরণাপন্ন হয়েছেন। চিলির এই নোবেল পুরস্কার বিজয়ী হিস্পানীভাষী কবি পেরুভিয় আন্দিজ পর্বতমালার মধ্যে ইনকা সভ্যতার অন্যতম স্থাপত্য নিদর্শন দেখে, ইতিহাসের গতিপথে মানুষের শ্রম-শোষণ এবং তার ফলে সৃষ্ট দুঃখ, দুর্দশা এবং শিল্প সম্বন্ধে চিত্রকল্পের উপর চিত্রকল্প সাজিয়ে 'হাইটস অফ মাচু পিচু' নামে যে দীর্ঘ কবিতাটি রচনা করেন, তার শেষাংশের উপর ভিত্তি করে ভিভান কালি-কলমের সাহায্যে ২৩টি সাদা-কালো ড্রইং রচনা করেন। এই ড্রইংগুলোর একটি প্রদর্শনী সম্প্রতি পার্ক স্ট্রীটের গ্যালারী কেমোল্ড-এ হয়ে গেল। (প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং এই উপলক্ষে তিনি নেরুদার একটি কবিতা অনুবাদ করেন)।

কবিতাটি মূলত চিত্রধর্মী হওয়াতে ড্রইংগুলিকে অনুবাদের ... একটা ... করেনি। অবশ্য ড্রইংগুলিকে কবিতার ...

পাবলো নেরুদার হাইটস অফ মাচুচু পাচুচু থেকে ড্রইং— ভিভান সুন্দরম
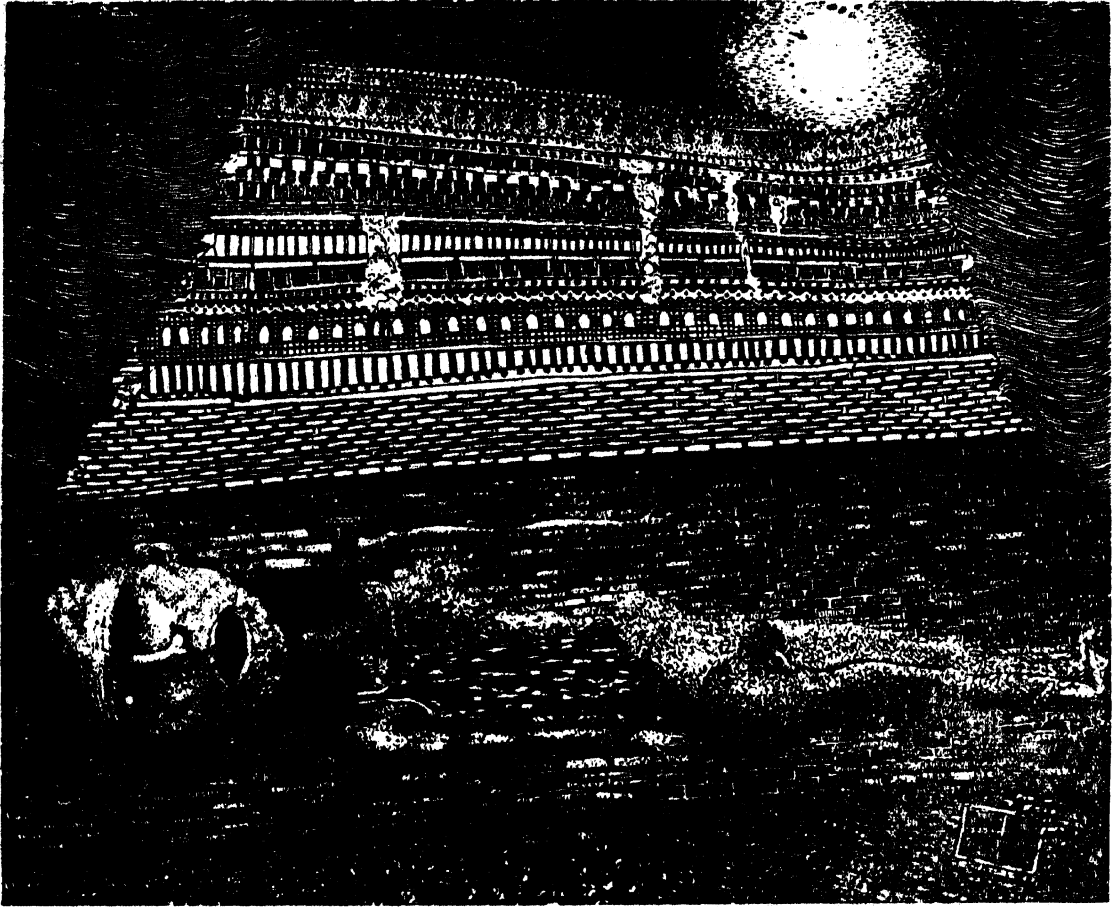
সংস্করণ মাত্র বললে ড্রইংগুলি সম্বন্ধে অবিচার করা হবে। ভিভান বস্তুত তাঁর ছবিতে কবিতাটির আত্মস্বরূপ সুরটির দৃশ্যমান রূপ দিতে চেয়েছেন। শব্দের পর শব্দ দিয়ে, ছবির পর ছবি সাজিয়ে, ছন্দের হেরফের করে নেরুদা যেমন তাঁর কবিতার কাব্যশরীর গড়ে তুলেছেন, ভিভানও তেমনই সরু, মোটা, বক্র, বর্তুলাকার, কৌণিক ইত্যাদি নানা চারিত্র্যের খোঁচা (স্ট্রোক) ও রেখাচ্ছায়ার (শেড) সাহায্যে তাঁর ছবির রূপবন্ধগুলিকে সমমূর্ত করে তুলেছেন। তুলির টানে তৈরী রেখার ব্যবহার তাঁর ছবিতে অপেক্ষাকৃত কম। সমমূর্ত শব্দটির ব্যবহার করা হল এ কারণে যে, ভিভানের ছবির রূপবন্ধগুলি বা মোটিফগুলি বহির্জাগতিক বস্তুর সর্বতোভদ্র-রূপ নয়, রূপাভাস মাত্র এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আংশিক আভাস। আর এখানেই ভিভানের ছবির শক্তি। এই সব আংশিক ও বিচ্ছিন্ন রূপবন্ধের সাহায্যে এবং রূপবন্ধ নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত খোঁচা ও রেখাচ্ছায়ার সাহায্যে ভিভান গড়ে তোলেন অনেক অনেক বহুতা রূপকল্প (ইমেজ)। ভিভানের কৃতিত্ব এই যে, তাঁর এই গড়ে-তোলা রূপকল্পগুলি অনন্য, একক এবং নির্দিষ্ট। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রূপকল্পগুলি একাধিক রূপাভাস বহন করে। মানুষের শ্রম-শোষণ, তজ্জনিত বঞ্চনা, মৃত্যু, মানুষের হাড়ের উপর গড়ে ওঠা শিল্প-সৌধ, সেই শ্বাসরোধকারী পাথরের শোষণ-সৌধজয়ী অরণ্যক প্রকৃতি ইতিহাসের প্রবাহমানতায় যে বহুতারূপ লাভ করে, তারই রূপাভাস বহন করে ভিভানের ড্রইং-এর রূপকল্পগুলি। খোঁচা এবং রেখাচ্ছায়ায় গড়ে ওঠা পরস্পর-সন্নিবিষ্ট (ইন্টার-পেনিট্রেটিং) রূপকল্প সমাহারে সৃষ্ট ড্রইংগুলি বহুতা বুনটের মতন।

বহমানতা ভিভানের ছবির অন্যতম দুর্বলতা। নেরুদা ক্রিয়াপদ এবং বিশেষ করে ঘটমানকাল বাচক ক্রিয়াপদের ব্যবহার সীমায়িত করে বিশেষ্যবাচক শব্দের পরে শব্দের পাথর সাজিয়ে যে সৌধ নির্মাণ করেছেন, তার ভার এবং ঘনত্ব সহজেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। যেখানে তিনি ইতিহাসের ধারার কথা এনেছেন সেখানে শব্দ বা ছবি নদীর বহমানতা না পেয়ে, পেয়েছে গলিত লাভার শ্লথ-স্রোত। অন্যদিকে ভিভানের ছবিতে দেখি হাল্কা খোঁচার উজ্জ্বল স্রোত, স্রোতস্বিনীর বহমানতা। অন্যতম কারণ বোধহয় সূক্ষ্ম হাল্কা খোঁচার অতিরিক্ত এবং পৌনঃপুনিক ব্যবহার। ভিভান যেখানে পাথরের পর পাথরের সমাহারে গঠিত সৌধও এঁকেছেন, সে সৌধ হয়েছে ভার-ঘনত্বহীন তাসের প্রাসাদ। উচ্চতা ও ভার-ব্যঞ্জক সামানুপাত (স্কেল) সৃষ্টিতেও তাঁর দুর্বলতা লক্ষ্যণীয়। ভিভান তাঁর অধিকাংশ ড্রইং-এ চিত্রক্ষেত্রকে ভরে দিয়েছেন, ছেড়ে দেওয়া ক্ষেত্রের বিশেষ কোন ভূমিকা তাঁর অধিকাংশ ছবিতে নেই। ভালই করেছেন। কবিতার শ্বাসরোধকারী পরিমণ্ডলটি তাতে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। কিন্তু ছেড়ে দেওয়া চিত্রক্ষেত্র তাঁর ছবিতে চিত্রক্ষেত্রই থেকেছে, কখনও তা ক্ষেত্রাধিক দেশ (স্পেস) হয়ে উঠতে পারেনি, তার কারণ অঙ্কিত অংশে ঘনত্বের অভাব। অথচ তার প্রয়োজন ছিল।

ভিভানের ড্রইং-এর দুর্বলতার দিকগুলিকে অতিরিক্ত যত্নসহকারে তুলে ধরে লাভ নেই। বরং তাঁর প্রচেষ্টার সমর্থক দিকটির দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করা কর্তব্য মনে করি। ব্যক্তিমানুষের একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যেখানে শিল্পে সম্ভাব্য সার্বিক মানবিক অভিজ্ঞতাজ্ঞাপক হিসাবে উপস্থিত, সেখানে সে-শিল্পকে অভিনন্দন জানানোই কর্তব্য।

প্রণবরঞ্জন রায়

বিশেষ বিবাহ বিধি

বারিদবরণ ঘোষ

বিবাহ সমগ্র বিশ্বসমাজের মত হিন্দু-সমাজেরও একটা প্রাচীন সংস্কার। উচ্ছৃংখলতায় রাশকে টেনে ধরে রাখার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমাজে নানা রীতি-নীতি শাসন-নিয়ম প্রবর্তিত হয়ে এসেছে। হিন্দুসমাজে এই বিবাহের রীতি-নীতির পরিবর্তন বিচিত্র এবং কৌতূহলোদ্দীপক।

শাস্ত্রের নিয়মেও তাই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিধির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন লক্ষ্য করে এসেছি। আট প্রকারের বিয়ের নিয়ম (ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ) শাস্ত্রসিদ্ধ হলেও ব্রাহ্ম-বিবাহ (ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের বিবাহ নয়, ব্রাহ্মণ্য-আচার-নির্দিষ্ট বিবাহ) এবং গান্ধর্ব-বিবাহের রীতিই বর্তমান কালে চলছে। অন্য কয়েক ধরনের বিয়ের ব্যাপারে ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের ৪৯৪ নং ধারা খাঁড়া উঁচিয়ে আছে।

প্রাচীন হিন্দুসমাজে সবর্ণে বিবাহ রীতি-শুদ্ধ হলেও অসবর্ণ বিবাহ একেবারে অচল ছিল না। মহাভারতের উদ্দালক ঋষির পুত্র শ্বেতকেতু এ-ব্যাপারে যতই কড়াকড়ি করুন না কেন, 'ভালবাসা' শব্দটিকে অনাভিধানিক তিনিও করতে পারেননি। কাজেই নিন্দনীয় হলেও অসবর্ণ বিবাহ সমাজে সংঘটিত হয়েছিল। প্রথম বন্ধন যখন শিথিল হয়, তখন দ্বিতীয়বার বন্ধন দেওয়ার প্রয়োজন হয়। সেজন্য স্মৃতিকারেরা (সে-যুগের এম-এল-এ) অসবর্ণ বিয়ের মধ্যেও ইতরবিশেষ দেখাতে চাইলেন। বললেন, উচ্চতর বর্ণের পাত্র যদি নিম্নতর বর্ণের পাত্রীকে বিয়ে করেন, তাতে খুব একটা দোষের হবে না। এ-বিয়ের তাঁরা নাম দিলেন অনুলোম বিবাহ। কিন্তু প্রতিলোম বিবাহ—নৈব নৈব চ। অর্থাৎ কায়স্থ পাত্র ব্রাহ্মণ-কন্যার দিকে একটুও নজর দেবে না।

এতো গেল আইনুভোলের কথা। বিয়ে হয়ে গেছে এমন স্ত্রী-পুরুষের পুনর্বিবাহের ব্যাপারেও স্মৃতিকারেরা যথেষ্ট মনোযোগ দিয়েছেন। পুরুষজাতি, তারা সোনার আংটি—বাঁকা হলেও মূল্য কমে না। সুতরাং এক সময়ে কৌলীন্য-কল্যাণে পুরুষ মানুষে শ'য়ে শ'য়ে বিয়ে করেছেন। শরৎচন্দ্রের বামুনের মেয়ে যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা এই বিয়ের দুর্গন্ধময় পরিণতির কথা জানেন। কিন্তু স্ত্রীলোকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করবে—তা সে কী সধবা কী বিধবা যে অবস্থাতেই হোক না কেন—বসুন্ধরা একেবারে রসাতলে যাবে। এমন অবস্থা অবশ্য ঘটেছিল মধ্য যুগে। বৈদিক আমলেও বিধবার বিয়ের নজির ছিল। নইলে দেবরেরা আছেন কি জন্য—'মৃতে তু দেবরে, দেয়াৎ তদভাবে যথেচ্ছয়া' (অগ্নিপুরাণ, ১৫৪ অধ্যায় ৬ শ্লোক)—স্পষ্টতঃ অবস্থাবিশেষে বিধবাদের বিয়ের সপক্ষে রায় দিয়েছে। পরাশর এবং নারদও এই মতে মত দিয়েছিলেন অবস্থা বিবেচনা করে। 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ...' ইত্যাকার শ্লোকের সঙ্গে আধুনিক পাঠকের স্বল্পবিস্তর পরিচয় আছে। কারণ, অনেক খুঁজেপেতে এই শ্লোকটি বের করেই তো বিদ্যাসাগর-মশায় বিধবার বিয়ের ব্যাপারে উদ্যোগী হতে পেরেছিলেন। মনু অবশ্য এ-ব্যাপারে বড্ড উন্নাসিক ছিলেন।

আর এক দ্রৌপদী ছাড়া সধবা অবস্থায় আর কেউ একাধিক স্বামী গ্রহণ করেছিলেন কিনা, এমন নজির প্রাচীন শাস্ত্রে পাই না। কিন্তু বর্তমানে ডিভোর্স নামে একটা চুক্তির ফলে ব্যাপারটা আকছার ঘটছে।

আসলে মানুষ যত 'সভ্য' হচ্ছে, ততই সমাজের শাসনে বার বার বাঁধন দিতে হচ্ছে। আর সবাই জানেন, দ্বিতীয়বার বন্ধন করলে পূর্বের বন্ধন শিথিল হয়ে যায়। আসলে পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক, জাত-বেজাত এসব সংস্কার মানুষকে আর বেশি-দিন ধোঁকা দিতে পারছে না। মানুষের প্রবৃত্তি—তাকে র‍্যাশন্যালই বলুন আর অ্যানিম্যালই বলুন—সর্বকিছুর ঊর্ধ্বে ধ্বজা উড়িয়ে যাচ্ছে। স্বর্গপ্রাপ্তির লোভ তো মৃত্যুর পরের ব্যাপার। ইহজগতে একটা স্বর্গ রচনা করা আশু প্রয়োজন। ঈভ আর আদম মর্তে এসে যৌথ-জীবনযাপনে খুব

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

কেশবচন্দ্র সেন

একটা অসুবিধের পড়েছিলেন বলে মনে হয় না। বরং দেখা গেছে, দেবতা, মুনি-ঋষিরা মাঝে মাঝে স্বরূপ পাল্টে মনুষ্য বা মনুষ্যেতর দেহ ধারণ করে মাটির পৃথিবীতে দাম্পত্যজীবনের বিচিত্র সুখস্বর্গ রচনা করেছেন।

স্মৃতিকারদের মূল ভরসা কোথায় ছিল জানেন?—বর্ণব্যবস্থায়। কিন্তু সাদা আর কালো এই দুয়ে মিলে যখন ছাই রং হয়ে গেল তখন তাদের আশা-ভরসায়, বিধি-ব্যবস্থায় পড়লো ছাই। অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রিক কারণে যখন এক সমাজের সঙ্গে অন্য সমাজের মিলন ঘটলো, তখন তার মধ্যে একটা মানসিক ব্যাপারও নেহাৎ উদ্দেশ্যবিহীন হয়ে রইল না। মোদ্দা কথাটা এই যে, যে জাতিভেদকে অবলম্বন করে এক সময়ে সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল, তার ভিত ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়লো। ফলে স্মৃতিকারদেরও বিধান বদলাতে হল। এখন আর বিয়ের দিন ছাড়া বিয়ের অন্যান্য ব্যাপারে কেউ পাঁজি দেখেন বলে মনে হয় না। যাঁরা দেখেন, স্মৃতিকারেরা অদৃশ্যে থেকে তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

এ তো গেল হিন্দুসমাজের কথা। মুসলমান সমাজে এত্তোটা কড়াকড়ি ছিল না। এঁদের সমাজ এবং আইন যথেষ্ট উদার। ফলে নিকট-আত্মীয়াদের বিয়ে করা নিন্দাই নয়। খৃষ্টানেরাও অনেকটা মুসলমানদের মতই। তবে সাম্প্রতিক এক আইন পাশ হওয়ার আগে শ্যালিকাকে বিবাহ করা তাঁদের সমাজেও একটা গর্হিত কর্ম বলে বিবেচিত হত।১

২

প্রাচীন কাল থেকে আমরা এবারে গত শতকের মাঝামাঝি কালে এসে পড়ছি। এই কাল-ব্যবধানে প্রাচীন বিবাহ-বিধির সঙ্গে অর্বাচীন বিবাহ-রীতির একটা তুলনামূলক বিচারের অবকাশ থাকে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহের যে রীতি প্রবর্তন করতে চাইলেন, তা' সমাজে বিবাহ-ব্যাপারে একটা সাংঘাতিক আঘাত হানলো সন্দেহ নেই। সমাজসংস্কার-প্রবৃত্তি এই বিধবা-বিবাহ আইন প্রচলনের পশ্চাতে সক্রিয় ছিল। বিদ্যাসাগরমশায় কিন্তু যতখানি নারীজাতির মঙ্গলকামনায় এই আইন প্রণয়নে সুবর্ণমুক্তি ব্যয়ের সংকল্প নিয়েছিলেন, ততখানি জাতিভেদ প্রথা রহিত সম্পর্কে নয়, এমন কথা বলায় কোনো অসঙ্গতি আছে মনে করি না। বিধবার বিয়ে হবে, একথা ভেবে বিদ্যাসাগর এবং তাঁর অন্তরঙ্গ কর্মীজনের অন্তর আনন্দে পূর্ণ হলেও, বিধবারা কতখানি নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনে উদ্যোগী হয়েছিলেন, সে-ব্যাপারে সংশয় প্রকাশের অবকাশ আছে। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে আইন পাশ হয়ে গেলেও যতগুলি বিধবা বিয়ে করলেন তার সংখ্যা অঙ্গুলিপর্বগণ্য। লোকে কতটা লোকাচার বা যুগবাহিত সংস্কারে আস্থা স্থাপন করে, ততখানি শাস্ত্রে করে না। কাজেই পরাশর বললেও বিধবারা খুব একটা উৎসাহিত হলেন না। সংস্কারের লজ্জা বড় বাধা হয়ে উঠলো। আর অপর কারণ, 'বিদ্যাসাগরী আইনে কোনো বিধবা পুনর্বার বিবাহ করলে পূর্বস্বামীর সম্পত্তির উপর দাবি-দাওয়া ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। স্বামীকে পরিত্যাগ অথবা স্বামীর পিছনে ছোটো যুক্তির কাজ নয় বলেই তো শাস্ত্রে উপদেশ দেওয়া আছে।'১ অর্থাৎ সামাজিক আচার আর শাস্ত্রের, প্রতিষ্ঠিত বর্তমান আর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সুরমোটা দুটো তার জড়িয়ে গিয়ে বিধবা-বিবাহের রাগিণীকে ঠিক সুরে বাজতে দিল না।

৩

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, শাস্ত্রকে মানায় অর্থ পাল্টানো সমাজ-ব্যবস্থাকে মান্যতা দান করা। কিন্তু সমাজ একটা পরিবর্তনশীল ব্যবস্থা। দিনক্ষয়ের সঙ্গে সমাজেও ধীর পরিবর্তন ঘটে। মাঝে মাঝে অবশ্য জলোচ্ছ্বাসের ফলে নদীতে যেমন জলস্ফীতি ঘটে, সেই রকম সমাজেও একটা আপাত-হঠাৎ পরিবর্তনেরও সূচনা দেখা দেয়। যেমনটি ঘটেছিল উনিশ শতকের ষষ্ঠ দশকে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে। আর বিবাহ সম্পর্কে ব্রাহ্মসমাজে প্রথম আন্দোলন উপস্থিত হল ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ নাগাদ। একটা প্যারাগ্রাফে আমরা সংক্ষেপে এই প্রায় ৪০ বছরের ইতিহাস স্মরণ করে নিই। ব্রাহ্মসমাজকে কেন্দ্র করে রামমোহন নারীমুক্তির যে আন্দোলনটিকে রূপদান করতে চেয়েছিলেন, সেটিও নর-নারীর দাম্পত্যজীবন-সম্পর্কিত। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর কি কর্তব্য—হিন্দুশাস্ত্রে তার বিধান আছে। মৃত পতি স্ত্রীকে হয় সহমরণে যেতে হবে, অথবা আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে। যে নারীহিতৈষণা, বিদ্যাসাগরকে বিধবা-বিবাহ আইন প্রণয়নে উৎসাহিত করেছিলো, সেই নারী-হিতৈষণাই রামমোহনকে সহমরণ প্রথা রহিত করার ব্যাপারে উদ্যোগী করেছিল। বলা বাহুল্য, এই কথা সামাজিক এবং শাস্ত্রীয়—উভয় কারণেই সক্রিয় ছিল। রামমোহনের আত্মিক উত্তরসাধক দেবেন্দ্রনাথের মনও সংস্কারমুখী ছিল। সেজন্য তিনি শূদ্রসমাজকে বেদপাঠের ব্যবস্থা করে ব্রাহ্মসমাজে একটি বিপ্লব সংঘটিত করলেন। দেখাতে চাইলেন, তাতে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্বও যায় না, শূদ্রও চিরকালের জন্য নরকভোগ করে না। একথা স্মরণ করলে মনে হয়, জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে দেবেন্দ্রনাথই প্রত্যক্ষ আঘাত হানলেন। অবশ্য জাতিভেদ প্রথা কিভাবে আমাদের স্বাতন্ত্র্যকে বিনষ্ট করছে, সে-চিন্তা রামমোহনকেও কম পীড়িত করেনি। রামমোহন স্পষ্টতঃই বলেছেন,

"The distinction of castes introducing innumerable divisions and sub-divisions among them (Indians) has entirely deprived them of patriotic feeling and the laws of purification have totally disqualified them from undertaking any difficult enterprise.

(বন্ধুকে লেখা ১৮ই জানুয়ারি ১৮২৮ তারিখের একটি পত্রের অংশবিশেষ)।' আর রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজে ফিরিঙ্গি মুসলমান ও হিন্দুর একত্র সমাবেশ তাঁর সংস্কারমুক্তির অন্যতম লক্ষণ বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। দেবেন্দ্রনাথ জাতিভেদ প্রথাকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করতেন। তবে সামাজিক পরিবর্তনে তিনি ধীরগতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। সেজন্যেই কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য উপস্থিত হল।

বিদ্যাসাগরের পর হিন্দুসমাজ-ব্যবস্থায় যিনি মারাত্মক আঘাত হানলেন, তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। তাঁর মতে,

'In Hindoostan there was the system of caste which created pariers between man and man and woman and woman'. 1.

সেজন্য তিনি জাতিভেদ প্রথাকে নির্মূল করার সংকল্প নিলেন। বললেন,

'The great object we have in views is of course to deliver out country from idolatry and caste'. 8.

আর এই ব্যাপারে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলন যে সর্বাধিক সহায়তা দান করবে, এ-সত্য কেশবচন্দ্র অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। সেজন্য তিনি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ-প্রথা চালু করতে উদ্যোগী হলেন। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে যে বিবাহ-পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন, তার মূল ভিত্তি ছিল হিন্দু-বিবাহ সংস্কার। ১৮৬১, (৩) ও ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে দেবেন্দ্রনাথ এবং রাজনারায়ণ বসুর কন্যাদের বিবাহ এই মতে অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় বিবাহে কেশবচন্দ্র প্রধান আচার্যের কাজ করেন। উভয় অনুষ্ঠানই হিন্দুসমাজ-বিচ্ছিন্ন কোনো

১। উপেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, হিন্দু আইনে বিবাহ (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ)।

১। তদেব (১৩৬২ সংস্করণ) পৃ ৫৭।

1. Keshub Chunder Sen in England : Diary, Sermons, Addresses and Epistles, Third Edition, (1938), pp 272-73.

2. Ibid, pp 370.

৩। ২২ই এপ্রিল ১৮৬১, ব্রাহ্মমতে প্রথম বিবাহানুষ্ঠান।

অনুগামী ছিলো না। কারণ আদি-সমাজের অনুরাগেরা বিশ্বাস করতেন, যাঁহারা ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচার করিবেন, তাঁহারা যেন হিন্দু-সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইতে না চাহেন এবং আপনাদের ধর্মকে সাম্প্রদায়িক ধর্মে পরিণত করিতে যত্নশীল না হয়েন।'৪

৪

কেশবচন্দ্র বিবাহের ব্যাপারে আদি-ব্রাহ্মসমাজের এই হিন্দু-নির্ভরতায় সংশয় প্রকাশ করলেন। তিনি অসবর্ণ বিবাহকে আইনসিদ্ধ করার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২০ অক্টোবর তারিখে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের (ইতি-মধ্যে কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের সমাজ পরিত্যাগ করে এসে ১৮৬৬ খৃস্টাব্দের ১১ নভেম্বর তারিখে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নামে স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করেন) এক অধিবেশনে 'হিন্দুবিবাহ সম্বন্ধে যে সকল রাজনিয়ম প্রচলিত আছে, তাহা ব্রাহ্মবিবাহে বর্তিতে পারে কিনা? যদি না পারে, তবে ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার উৎকৃষ্ট উপায় অবধারণ করিবার ভার' সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং যে কয়েকজন ব্যক্তিকে এই ভার অর্পণ করা হয়, তাদের নামের তালিকায় সর্বোচ্চে দেবেন্দ্রনাথের নাম লক্ষ্য করি।

এই প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্র আরও প্রশ্ন তুললেন, (১) ব্রাহ্মরা কি হিন্দু? এবং (২) ব্রাহ্মের উত্তরাধিকার কোন্ আইনবলে সিদ্ধ? প্রথম প্রশ্নটিতে কেশবচন্দ্র যে অধিক গুরুত্ব দেননি, তা পরে তাঁর 'আমি হিন্দু নই' ঘোষণায় স্পষ্ট হয়ে উঠবে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্নটি সঙ্গত এবং জাগতিক। কারণ সম্পত্তির দায়াধিকার সমাজে একটা মুখ্য প্রশ্ন। ব্রাহ্মবিবাহমতে জাত পুত্রকন্যার সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট আইন থাকার প্রয়োজন। রাজনারায়ণ বসু অবশ্য কালক্রমে ব্রাহ্মবিবাহ-পদ্ধতি বৈষ্ণবদের কণ্ঠীবদলের১ মত সামাজিক আইন-সিদ্ধ হয়ে উঠবে, এমন আশা পোষণ করে-ছিলেন। কেশবচন্দ্র কিন্তু দ্রুত ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি করতে উঠেপড়ে লাগলেন।

প্রথম প্রশ্নটি সম্পর্কে কেশবচন্দ্রের মূল বক্তব্য ছিল—ব্রাহ্মবিবাহ থেকে যেখানে নান্দীশ্রাদ্ধ বা কুশণ্ডিকা দুই-ই বাদ দেওয়া হয়, সেখানে তাকে হিন্দু বিবাহ বলি কেমন করে? আর অনুলোমই বলি আর প্রতিলোমই বলি, অসবর্ণ বিবাহকে ব্রাহ্ম-বিবাহবিধি যথেষ্ট সম্মানের চোখে দেখে। কাজেই মুখ্যতঃ কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে ১৮৬৮ খৃস্টাব্দের প্রথমে সরকার একটি সিভিল ম্যারেজ বিল পাশ করাতে চাইলেন। এই বিলের একটা ত্রুটি ছিল—যদি কোন ব্যক্তি হিন্দু অথবা মুসলমান অথবা ভারত-বর্ষে প্রচলিত অন্য কোন ধর্মে জন্মিয়া সেই ধর্মে অবিশ্বাস করে এবং সেই ব্যক্তি ঐ ধর্ম প্রকাশ্যরূপে পরিত্যাগ না করিয়া ঐ ধর্মের বিবাহ-পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করে, তাহা হইলেও সেই বিবাহ বৈধ বলিয়া আদালতে গণ্য হইবে।'১ ভারতবর্ষ ধর্ম-ভিত্তিক দেশ। সেখানে এমন ধর্মচ্যুতির আশঙ্কায় হিন্দু-মুসলমানেরা একেবারে খাপ্পা হয়ে উঠলেন। প্রচলিত ধর্ম-অমান্যকে তাঁরা প্রশ্রয় দিতে একেবারেই রাজী হলেন না। আপত্তি শুনে ব্যবস্থাপক সভার সচিব স্টিফেন সাহেব মত জানালেন। আইন পাশ আপাততঃ স্থগিত রইল। তখন ১৮৬৮ খৃস্টাব্দের ৫ জুলাই-এর অপর এক অধি-বেশনে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের এক সভায় সভাস্থ সকলে প্রস্তাব দিলেন—এ-ব্যাপারে পুনরায় 'গভর্নমেণ্টের কাছে আবেদন করা হোক।' এবারে কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ এই কমিটির মধ্যে থাকতে রাজী হলেন না। রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন,

> 'Babu Devendranath declined to act on such committee thinking the meeting as not properly representing the committee.'

কিন্তু শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার অনুবর্তী ব্রাহ্মেরা ব্রাহ্মবিবাহ আদালতে অবৈধ গণ্য হইবার আশঙ্কায় যাহাতে এই বিবাহ বৈধ বলিয়া গণ্য হয় এই প্রকার আইন প্রণয়নের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন করেন।'২ কারণ অ্যাডভোকেট জেনারেল কাউই সাহেবকে প্রশ্ন করে কেশবচন্দ্র জেনেছিলেন ব্রাহ্মবিবাহ বৈধ নয়।

পূর্বের বিলটি পাশ হল না। পর্যা-লোচনা কমিটি দু বছর ধরে নানা পর্যা-লোচনা করে এই বিলের বিপক্ষে মত দিলেন। তবে কেবলমাত্র ব্রাহ্মদের জন্য 'ব্রাহ্ম ম্যারেজ অ্যাক্ট' নামে একটি আইন প্রণয়নের ব্যাপারে সরকারের সম্মতি পাওয়া গেল। এর শর্তাদি হল—এক, তিনজন সাক্ষী বলবেন যে, পাত্র-পাত্রী (বিধবা বা বিপত্নীক হলেও) অবিবাহিত; এবং দুই, পাত্র ও পাত্রীর বয়ঃক্রম যথাক্রমে আঠারো ও চৌদ্দ বছরের নীচে নয়। ১৮৭২ খৃঃ ৩০ মার্চ তারিখে এই বিবাহ-সংস্কারের সমর্থনে কলকাতার টাউনহলে যে সভা হয়েছিল, তাতে কেশবচন্দ্র সভাপতি রূপে বলেন,—

> "The Brahmo Marraige Bill contemplates a more radical and more comprehensive reformation than it is possible for the present generation of educated Natives to imagine or concieve It seeks to overthrow caste and not merely idol.try. It contemplates inter-marra'ges between Sikhs and Bengalees, the inhabitants of Bombay and Madras, between the Tamil and Telegoo races in Southern India and people of North-Western provinces. The Bill contemplates a union and fusion of the many discordant Social elements which lie scattered in the amplitude of the Indian continent — and which when gathered together and blended into one harmonious unity, will be called by no other name in future than the Reformed Indian Brotherhood".

যাই হোক, এই বিল পাশ হবার পূর্বেই 'এক অলক্ষিত প্রদেশ হইতে আপত্তি উত্থাপিত হইল। সেই অলক্ষিত প্রদেশ ব্রাহ্মসমাজ।'২ তাঁরা স্টিফেন সাহেবকে তাঁদের আপত্তির কথা জানালেন। আপত্তি-পত্রে প্রায় দু' হাজার ব্রাহ্মের (যদিও ভারত-বর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মতে স্বাক্ষরকারীদের অনেকে পৌত্তলিকও ছিলেন) স্বাক্ষর ছিল।

আদি-সমাজের আপত্তি মোটামুটি চারটি প্রধান বক্তব্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল—

প্রথমতঃ, এই বিল সকল ব্রাহ্মের গোচরীভূত করা হয়নি। তাছাড়া কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরিত হননি। আর ব্রাহ্মসমাজ কখনই হিন্দু-সমাজ বহির্ভূত নয়। তাঁরা হিন্দুসমাজ থেকে কপালে 'ব্রাহ্ম মার্কা টিকিট আঁটা' পছন্দ করেন না।

দ্বিতীয়তঃ এই বিল সামাজিক প্রথার ওপর হস্তক্ষেপ করছে। রেজিস্টারি বিবাহ একটা চুক্তি ছাড়া কিছু নয়। আর এদেশের মেয়েদের বিয়ে চৌদ্দ বছরের আগেই সম্পন্ন হয়ে যায়—

> (that the marraaigeable age of native girls in India is considered to be below fourteen years.)

তৃতীয়তঃ মেইন সাহেব যে ধারণা করেছেন ব্রাহ্মের কোনো সংজ্ঞা নেই, তা ঠিক নয়। ব্রাহ্মদের একটা সংজ্ঞা আছে, বিশিষ্ট পরিচয় আছে। জাতি-ধর্ম দেশ-কাল নির্বিশেষে যাঁহারা এক অদ্বিতীয় নিরাকার সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনা করে এবং তাঁহাকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য সাধন করে তাঁহারাই ব্রাহ্ম।' তবে যে দেশীয় সমাজের তাঁরা অন্তর্ভুক্ত, সে সমাজের আচারানুষ্ঠান একেবারে ছাড়তেই হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তবে সব অবস্থাতেই পৌত্তলিক অংশটুকু সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে।

চতুর্থতঃ, অসবর্ণ-বিবাহজাত সন্তান তার মাতাপিতার সম্পত্তির অধিকার কোন্ আইন বলে অর্জন করবে, বিলে তার উল্লেখ নেই। (অথচ কেশবচন্দ্র এই ব্যাপার-

৪। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ধর্মপ্রচার প্রবন্ধ, মাঘ ১৭৯৫ শক।

১। রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত (চতুর্থ সং ১৯৬১), পৃ ১৩৮।

১। তদেব, পৃ ১৩৯।

২। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, পৌষ ১৭৯৮ শক, ৪০১ সংখ্যা।

1 Keshab Chunder Sen, National Marraaige Reform. (2nu Ed. 1951), pp. 12-13.

২। রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত, পৃঃ ১৩৯।

টিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দান করতে চেয়েছিলেন)।

আদি ব্রাহ্ম সমাজের এই আপত্তি সম্পর্কে কেশবচন্দ্রের জীবনীকার উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় দুটি ভৌতিক অভিযোগ এনেছিলেন এই বলে যে, রাজনারায়ণ বসু নাকি বলেছেন যে, 'বিশেষতঃ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইলে এই দোষ উপস্থিত হইবে যে, কাহারো পত্নী চিররোগ বা বন্ধ্যাত্যাদি দোষদুষ্ট হইলে অপর নারীর পাণিগ্রহণ ব্রাহ্মগণ করিতে পারিবেন না।' অভিযোগ হাস্যকর ও ভিত্তিহীন। দ্বিতীয় অভিযোগ, রাজনারায়ণ বসু নাকি লিখেছেন যে, মেয়েদের বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স 'চতুর্দশ বর্ষ নহে, দ্বাদশ বর্ষ'। এটি আসলে রাজনারায়ণবাবুর বক্তব্য

'That the marriageable age of native girls in India is considered to be below fourteen years'

এর দুর্বল অনুবাদ মাত্র। তবে কেশবচন্দ্র তৎকালীন প্রখ্যাত চিকিৎসকগণের কাছে ভারতীয় নারীদের বিবাহের উপযুক্ত কাল সম্পর্কে জানতে চেয়ে চৌদ্দ থেকে একুশ বছর বয়স পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন মত জানতে পেরেছিলেন। যেখানে চিকিৎসকদের একাংশের মতে সর্বনিম্ন বয়স হিসাবে চৌদ্দ বছর বয়সের উল্লেখ রয়েছে, সেখানে রাজনারায়ণ বসুর 'বিলো ফরটিন ইয়ার্স' মতটি চিকিৎসকদের মতের পরিপন্থী মত সন্দেহ নেই।

এই বিল পাশ হতে পারলো না। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এই নিয়ে বহু লেখা বাহির হতে লাগল। আদি ব্রাহ্ম সমাজ নবদ্বীপ, কাশী, ত্রিবেণী, কলকাতা প্রভৃতি স্থানের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের দিয়ে ব্রাহ্মবিবাহের বৈধতা বিষয়ে ব্যবস্থাপত্র প্রচার করতে লাগলেন। কেশবচন্দ্রের কাছে ব্যাপারটি একটা প্রচণ্ড ফাঁকি বলে মনে হতে লাগল।

শুধুমাত্র সরকারের কাছে আপত্তি জানিয়ে বা বিল পাশ হতে বাধা দিয়ে আদি সমাজ নিশ্চিন্ত থাকেনি। কারণ, কেশবচন্দ্রের ডাইনামিক পারসোন্যালিটি সম্পর্কে তাঁরা সর্বদা সন্ত্রস্ত ছিলেন। রাজনারায়ণ বসুকে লেখা দেবেন্দ্রনাথের দুটি চিঠি[১] থেকে আমরা তার প্রমাণ পাই।

বক্রোটা শেখর,

২৭ কার্তিক, ১৭৯০ শক

ব্রাহ্ম বিবাহ বিধিবদ্ধ হইবার বিষয়ে একটা শেষ হইলে তাহার পরে এই প্রস্তাব দেখিয়া দিব মনে করিতেছি।...বিবাহের জন্য একটা নিয়ম গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপক সভা হইতে হইবেই হইবে। ব্রাহ্মদিগের বিবাহের জন্য সে নিয়ম না হইয়া যদি সাধারণের জন্য হয়, তাহাতে ক্ষতি কি? কেবল কেশবদিগের জন্যে বিবাহের আইন করার যে প্রস্তাব নবগোপাল করিয়াছেন, তাহা আমার ভাল বোধ হয় না।'

পরের চিঠি—

অমৃতসর

৮ পৌষ, ১৭৯০ শক

'...ব্রাহ্ম বিবাহ বিল সিভিল বিবাহ বিলে পরিণত হইবে, তাহাতে এই সংবাদ অবগত হইয়া আহ্লাদিত হইলাম। এখন একপ্রকার গোল মিটিয়া গেল, দেখি, আর একপ্রকার গোল কি ওঠে। কেশব নিশ্চিন্ত থাকিবার নহে।'

চিঠি দুটি থেকে বুঝতে পারছি যে, কেশবচন্দ্রকে একেবারে একঘরে করে কেবল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের জন্য ('কেশবদিগের জন্য') একটি বিবাহ বিল আনার প্রস্তাবও আদি সমাজের সভ্য নবগোপাল মিত্র করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম-বিবাহ আইন পাশের স্বপক্ষে ছিলেন না। তবুও গভর্ণমেন্ট যখন এইপ্রকার আইন পাশের ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছেন, তখন তিনি চাইছিলেন, সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সর্বসাধারণের জন্য একটা সিভিল ম্যারেজ বিল পাশ হোক। দেবেন্দ্রনাথের সর্বভারতীয় প্রশংসনীয়। এবং লক্ষ করছি যে, তৎকালীন সরকার দেবেন্দ্রনাথের মতের যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে দেবেন্দ্রনাথ ও হিন্দু-সমাজের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের মতাবলম্বীদের একটা কলহ এই আইন পাশের ব্যাপারে ঘনীভূত হয়েছিল এবং এ-বিষয়ে ইংরেজ সরকারের বুঝি কোনো দায়িত্ব ছিল না। কারণ তাঁরা ভারতবর্ষের ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপে আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু ব্যাপারটি এতোখানি সাদা চোখে দেখার মত নয়। কারণ, জাতিভেদ প্রথাকে ইংরেজ সরকার শাপেবর হিসেবে গণ্য করতো। জাতিভেদ-প্রথা একতার বিনাশ সাধন করে। ভারতীয়দের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথে জাতিভেদ প্রথা একটা বড় বাধা। তাই সুচতুর ইংরেজ সরকার এই প্রথাকে আরও জুলন্ধাসে জিইয়ে দিয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার চেষ্টা করতে লাগল। স্পেশাল ম্যারেজ এ্যাক্টের সঙ্গে তাঁরা একটা ফ্যাকড়া জুড়ে দিলেন। বরং বলা ভাল সরলবিশ্বাসী কেশবচন্দ্রের হাত দিয়ে তারা তামাক খেয়ে নিলেন। তাঁরা কেশবচন্দ্রকে বললেন, তিনি যদি ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষ থেকে 'হিন্দু নই' একথা বলেন তো বিলটি সর্বভারতীয় রূপ পায়। আমি পূর্বাপর চিন্তা না করে কেশবচন্দ্র (দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ জামাতা সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ও নবগোপাল মিত্রকে) বলে বললেন, আমি হিন্দু নয় বলিতে প্রস্তুত আছি।[১] একথা শোনা মাত্র সেদিন দুই ভাই-এ আড়াআড়ি হইল।[২] অর্থাৎ এই একটি মাত্র গ্রন্থের জন্যেই (দি ট্রায়াল ছিলনা কাউন্ট ইনস্টেড রায়) দুটি সমাজ সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে গেল এবং ব্রাহ্মধর্ম রামমোহন ও মহর্ষি থেকে সরে সরে এসে একটি পৃথক ধর্মরূপে পরিগণিত হয়ে গেল। বলা বাহুল্য বিষয়, এই সময় থেকেই 'চৈত্রমেলা' 'হিন্দুমেলা' নামে পরিচিত হতে থাকলো এবং এর প্রতিষ্ঠাতা নবগোপাল মিত্র সর্বপ্রকারে কেশবচন্দ্রকে বাধা দিতে থাকলেন।

বিবাদ ভুল্পাম্পদ করলো। কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে 'খাঁটি হিন্দু' আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। ইংরেজ সরকার এই 'অহিন্দু'-বিলটি সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথের মতামত আহ্বান করে সার্কুলার পাঠালেন। দেবেন্দ্রনাথ ৪ঠা মার্চ ১৮৭২ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সচিব এইচ এল ড্যাম্পিয়ারকে সেই সার্কুলারের দীর্ঘ উত্তর পাঠিয়ে লিখলেন এই ধরনের বিল পাশের প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন না—

'For my own part I do not see any such necessity, for having regard to the spirit of modern legislation and the rules of justice, equity and good conscience which the Court of this country are bound to observe there can, I think, be little, if any, room for doubt as to the validity of marriages that might be celebrated under forms and ceremonies differing from those already existing in India'.

তবে সরকার যদি এমন একটা বিল পাশ করা অপরিহার্য মনে করেন, তবে বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের জন্য যেন সেটি না করা হয়।

দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখের আন্দোলনে বিবাহ-আইনের বিশেষ পরিবর্তন ঘটলো। অর্থাৎ 'ব্রাহ্ম ম্যারেজ অ্যাক্ট' 'স্পেশ্যাল সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট' নামে সর্বভারতীয় রূপ পেল। আদি ব্রাহ্মসমাজের বিবাহ হিন্দু-বিবাহ বলেই গণ্য হতে থাকলো। কিন্তু নতুন বিলে 'হিন্দু' শব্দটিকে বাদ দিয়েই কেশবচন্দ্রকে সমর্থন জানাতে হল। যেদিন আইনটি বিধিবদ্ধ হয়, সেদিন রাজনারায়ণ বসু কাউন্সিল গৃহে দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন। সভাগৃহের একটি চমৎকার বর্ণনা রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'আত্মচরিতে' দিয়েছেন।[২] যাই হোক, উনিশে মার্চ ১৮৭২ সালে আইনটি ১৮৭২ সালের তিন আইন নামে (Act III of 1872) পাশ হয়ে গেল। সমস্ত হিন্দু সমাজ প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা তীব্র প্রতিবাদ

১। দ্রষ্টব্য, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী, ৭৩ ও ৭৪ সংখ্যক পত্র, পৃঃ ১০২-৩।

১। রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত, পৃঃ ১৪০।

১। দ্রষ্টব্য, যোগেশচন্দ্র বাগল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যসাধক চরিতমালা, তৃতীয় খণ্ড পৃঃ ৭৬-৭৭।

২। রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত, পৃঃ ১৪০-৪১।

জিন্দেগী জিন্দেগী।। ওয়াহিদা রহমান এবং সুনীল দত্ত।। পরিচালনা তপন সিংহ।

প্রেক্ষাগৃহ

পঁচিশ লাখের পাঁচালী

পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্রশিল্পকে ব্যাধিমুক্ত করে তাকে শুধু সুস্থ করে তোলাই নয়, তাকে রীতিমত পুষ্ট, বলবান ও তেজীয়ান করে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এই বছরের ৫ মে তারিখে রবীন্দ্রসদনে বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের ৩৫তম বার্ষিক শংসাপত্র বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে ভাষণদান প্রসঙ্গে। সেই প্রথম! তিনি সেদিন এও ঘোষণা করেছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে সিনেমা-টিকিটের ওপর তিনি (তাঁর সরকার) 'সেস' ধার্য করবার কথা চিন্তা করছেন এবং তার থেকে আদায়ীকৃত টাকা এ-রাজ্যের চলচ্চিত্রশিল্পের উন্নতির জন্যে ব্যয় করা হবে। সেই সময়ে আমাদের মনে শঙ্কা জেগেছিল, অর্থমন্ত্রকের কারসাজিতে 'সেস' শো-ট্যাকসে পরিণত হয়ে সাধারণ তহবিলে প্রবেশ করবে না তো? (অমৃত, ১২শ বর্ষ, ১ খণ্ড, ২ সংখ্যা, ১২ মে, ১৯৭২) দুঃখের বিষয়, আমাদের শঙ্কা সত্যে পরিণত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যেই প্রমোদ-কর ও 'শো'-ট্যাকসের হার বৃদ্ধি করার ফলে টিকিটের মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে এবং এই বাবদ রাজ্য সরকারের অর্থ-ভাণ্ডারে প্রতি মাসে অতিরিক্ত আমদানী হচ্ছে অন্তত আট-ন লক্ষ টাকা অর্থাৎ বছরে প্রায় এক কোটি টাকা। এই বছরেই ৪ জুলাই তারিখে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ১৯তম রাষ্ট্রীয় চলচ্চিত্র বিতরণী উৎসবে আবার প্রধান অতিথিরূপে শ্রীরায় ঘোষণা করেন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের চলচ্চিত্রশিল্পের উন্নয়নকল্পে রাজ্য সরকার ওই জুলাই মাসের মধ্যেই একটি ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট বোর্ড বা চলচ্চিত্র উন্নয়ন পর্ষদ স্থাপন করবেন এবং উন্নয়ন কার্যের জন্যে প্রাথমিক পর্যায়ে ২৫ লক্ষ টাকা সংরক্ষিত রাখছেন, অর্থাৎ অতিরিক্ত আমদানীকৃত টাকার মাত্র এক-চতুর্থাংশ অর্থ তাঁর সরকার নিয়োগ করবেন চলচ্চিত্রশিল্পের উন্নতিবিধানে।

কিন্তু শ্রীরায়ের প্রস্তাবিত ফিল ডেভেলপমেন্ট বোর্ড জুলাই মাসের মধে দূরের কথা, নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ পা হতে চলল, আজও গঠিত হওয়া সম্ভ হয় নি। ৩০ অকটোবর তারিখে মুখ্যমন্ত্ শ্রীরায় সাংবাদিকদের জানান, তাঁর সরকা এই রাজ্যের চলচ্চিত্রশিল্পের উন্নয়নের জন ২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রেখেছেন, কিন্ যাঁদের জন্যে এই ব্যবস্থা, সেই রথী মহারথীদের মধ্যে কোনো রকম তৎপরত না থাকার দরুনই এ-ব্যাপারে কিছু কর যাচ্ছে না। তিনি আরও বলেন, তিনি নাকি ঐ দিনই (৩০ অকটোবর) একজন খ্যাতিমা প্রযোজক-পরিচালকের সঙ্গে টেলিফো মারফৎ কথাবার্তা বলে অনুরোধ জানিয়ে ছেন, পর্ষদ গঠনের ব্যাপারে তৎপর হবার জন্যে।

পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্রশিল্পের বহু সমস্যার মধ্যে প্রধানতমটি হচ্ছে বাংলা ছবির বাজারের সমস্যা। যেখানে বাংলা ছবি মুক্তি হয়, সেই কলকাতার চিত্রগৃহগুলির দিকে নজর দিলেই দেখা যাবে যে, বর্তমানে একমাত্র মিনার, বিজলী, ছবিঘর, পূর্ণ, প্রাচী, ইন্দিরা ও রাধা—এই সাতটি সিনেমা

হারজানা হার।। উত্তম-সুচিত্রা।। পরিচালনা : সুজিল সেন

। ছাড়া এমন আর একটিও হাউসের করতে পারা যাবে না, যেখানে হিন্দী । মুক্তি হয় না। অথচ খাস শহর-গতায় চলচ্চিত্রগৃহের সংখ্যা সত্তরেরও ।

সারা পশ্চিমবংগে চিত্রগৃহের সংখ্যা বা তারও কিছু বেশী। এদের মধ্যে ানা অঞ্চলে যে-ছবিঘরগুলি অবস্থিত, র সংখ্যা ৩৫ থেকে ৪০-এর বেশী অথচ এই রাজ্যে মাত্র ৭০টির বেশী রে বাংলা ছবি দেখান হয় না এবং হিন্দী ছবির সংগে ভাগাভাগি করে—ভাবে নয়। কলকাতার লাগোয়া দক্ষিণে া, যাদবপুর, সোনারপুর, বারুইপুর, ীকান্তপুর প্রভৃতি এবং উত্তরে বরাহ-দমদম, আড়িয়াদহ, খড়দা, সোদপুর, কপুর, বারাসত প্রভৃতি বাঙালী ষিত অঞ্চলের চিত্রগৃহগুলি যখন বাংলা দেখায়, তখন দিনের তিনটি প্রদর্শনীর হয় একটি বা বড়জোর দুটিতে দেখায় । এবং বাকী দুটি বা একটিতে দেখায় ী ছবি। বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুরের মত ারে খাস বাঙালীর জায়গাতেও ঐ অবস্থা, বছরের ৫২ হপ্তার মধ্যে বেশী হয় তো ১৬ থেকে ২০ হপ্তা । ছবি দেখান হয়ে থাকে। বাঙালী কানার ছবিঘরগুলিতেও ঐ একই ধারা ম্বিত। মনে হয়, যেন মাত্র চক্ষুলজ্জার রই তাঁরা বাংলা ছবির প্রতি এমন মনার ভাব অবলম্বন করেছেন। খোদ তার ছবিঘরগুলির বাঙালী মালিকদের । চক্ষুলজ্জাও নেই, তাঁরা বাঙালী-র বসে বুক ফুলিয়ে হিন্দী ছবি া চলেছেন বছরের ৫২টি হপ্তাতেই। তাঁদের সাফ কথা হচ্ছে : মশাই, ছবিঘর করেছি ব্যবসা করবার জন্যে, এখানে সেন্টি-মেন্টের কোন স্থান নেই। অথচ খোঁজ নিয়ে দেখুন, তিরিশ ও চল্লিশ দশকে অবস্থা অন্য রকম ছিল। তখন বালী, উত্তরপাড়া থেকে শুরু করে বর্ধমান, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, নৈহাটি, রানাঘাট, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ প্রভৃতি বাংলার প্রতিটি মফঃস্বল শহরে বছরের বেশীর ভাগ সময়েই বাংলা ছবিই দেখান হত। খোদ কলকাতার উত্তরাঞ্চলে—চিত্রা, রূপবাণী, শ্রী, উত্তরা ও মিনার চিত্রগৃহে হিন্দী ছবি একটি দিনের জন্যেও দেখান হত না। দক্ষিণ কলকাতার পূর্ণ, বিজলী, ভারতীর কথা ছেড়েই দিন, রূপালীতে পর্যন্ত এক নাগাড়ে বাংলা ছবিরই একচ্ছত্র রাজত্ব ছিল। —এর কারণ অনুসন্ধান করলে জানা যায় সে-যুগে কলকাতার চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে বাঙালীর একটা বড় রকম প্রাধান্য ছিল। তখন একমাত্র ইন্দ্রপুরী বাদে অপর সকল স্টুডিওর মালিকেরা নিজেরাই ছবির প্রযোজনায় ব্রতী ছিলেন। নিউ থিয়েটার্সের দুটি স্টুডিও, কালী ফিল্মস, ইস্ট ইন্ডিয়া, রাধা ফিল্মস, শ্রীভারতলক্ষ্মী এবং অরোরা স্টুডিও—প্রতিটি স্টুডিওই নিজের নিজের ছবি তৈরী করত। নিউ থিয়েটার্সের ত সে সময়ে জয়জয়কার। বাংলা ও হিন্দী—দু ভাষারই ছবিতে নিউ থিয়েটার্সের ভারত-জোড়া নাম। অবাঙালী মালিকানার স্টুডিওগুলোতেও বেশীর ভাগই বাংলা ছবিই তৈরী করা হত। বাঙালী পরি-বেশকরাও ছিলেন সুপ্রতিষ্ঠিত। অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন, স্কাইশ কর্পোরেশন, রীডেন অ্যান্ড কোং, প্রাইমা ফিল্মস, অ্যাসোসিয়েটেড ডিস্ট্রিবিউটার্স প্রভৃতি পরিবেশক-প্রতিষ্ঠান তখন বাংলা ছবির পরিবেশনা করে যথেষ্ট সুনাম ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। কাপুরচাঁদ লিমিটেড, দোসানী ফিল্ম কর্পোরেশন, এম্পায়ার টকী ডিস্ট্রিবিউটার্স, মানসাটা ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স প্রভৃতি সে-যুগের অবাঙালী প্রতিষ্ঠানগুলিও বাংলা ছবির পরিবেশন-স্বত্ব লাভের জন্য অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন এবং এর জন্যে প্রায়ই এদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা হত। হিন্দী ছবি সম্পর্কে কলকাতাবাসী বাঙালীদের সাধারণত আদৌ কোন আগ্রহ ছিল না। হিন্দী চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হত মধ্য-কলিকাতার প্যারাডাইস, রকসী, ম্যাজেস্টিক, সেন্ট্রাল, সিটি সিনেমা, গণেশ টকী প্রভৃতি চিত্রগৃহে।

কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু হল পঞ্চাশের দশক থেকে ভারত স্বাধীনতা লাভের পরে। রাজনৈতিক পটভূমিকা পরি-বর্তনের সংগে সংগে আমাদের বাংলা শুধু খণ্ডিতই হল না, আমাদের চলচ্চিত্র ব্যবসায় আরও অন্য বহু ব্যবসায়ের মতো (যার মধ্যে বাঙালীর একান্ত নিজস্ব মিষ্টান্ন ব্যবসায়ও একটি) ধীরে ধীরে অবাঙালীদের কুক্ষিগত হল। ফলে আজ স্টুডিও-মালিকেরা আর নিজেরা ছবি তৈরী করেন না, চিত্র পরিবেশন ও প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে বাঙালীরা আজ পিছনের সারিতে স্থান নিয়েছে এবং যে-অবস্থার ভিতর দিয়ে বর্তমানের বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্প চলেছে অনুমান করা যেতে পারে যে, আর বছর পনেরো-কুড়ির মধ্যে বাংলা ছবি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে এবং তাতে অনেকেই দুঃখিত হবে না। কারণ 'পেদা-পয়জামিং'

যাকে বলে, ঠিক সেইভাবেই আমাদের বাঙালী দর্শকদের মনে হিন্দী ছবির প্রীতি প্রীতি গড়ে তোলা হয়েছে গেল দুই দশক ধরে। 'হে ক্ষণিকের অতিথি'—এই রবীন্দ্র-সঙ্গীত থেকে 'দম্ মারো দম্' বা 'ইয়ে দুনিয়া ইয়ে মহফিল' প্রভৃতি—'কাণ্ডা রে, কাণ্ডা রে', গান গাইতে বেশী উল্লসিত বোধ করে আমাদের ঘরের তিন-চার বছরের বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা। বাঙালীর সংস্কৃতিকে মুছে ফেলবার এর চেয়ে বড় অপচেষ্টা আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের অপর কোনও ক্ষেত্রে হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

মুখ্যমন্ত্রী প্রস্তাবিত পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র উন্নয়ন পর্ষদ (ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট বোর্ড) নিকট-ভবিষ্যতে গঠিত হবে, এটা জেনেই আমরা তাঁদের সামনে পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্রজগতের অতীত থেকে বর্তমানের পরিবর্তিত চিত্রটি তুলে ধরছি। আশা এই যে, তাঁরা আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমাদের চলচ্চিত্রশিল্পটিকে স্বমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে যথাকর্তব্য করবেন। অবশ্য এই সঙ্গেই আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়ে দিতে চাই যে, প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যয় করবার জন্যে তাঁর সরকার সংরক্ষিত পঁচিশ (২৫) লক্ষ টাকা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। কারণ আজকের দিনে একটি চিত্রগৃহ নির্মাণের ব্যয় ঐ পঁচিশ লক্ষেরই কাছাকাছি। একটি সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতিসমন্বিত স্টুডিও নির্মাণ করবার জন্যে কম করে এক কোটি টাকার প্রয়োজন। আমাদের স্টুডিওগুলি যাতে রঙীন ছবি তৈরী করতে পারে এবং আমাদের তৈরী রঙীন ছবির প্রোসেসিংয়ের জন্যে এখানেই যাতে কলার ল্যাবোরেটারী স্থাপিত হয়, সেজন্যেও অর্থের প্রয়োজন অন্ততঃ এককোটি টাকা। কলকাতা শহরে বছর চার-পাঁচের মধ্যে টেলিভিশন চালু হয়ে যাচ্ছে এবং তার জন্যে বহু শিল্পী ও কলাকুশলীর প্রয়োজন। অথচ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি চারুকলা সম্পর্কীয় বিশ্ববিদ্যালয় এই রাজ্যে চালু থাকা সত্ত্বেও এখানে চলচ্চিত্র-বিদ্যা ও টেলিভিশন-বিদ্যার কোর্স প্রবর্তন করা হয় নি। ফলে পুণা ফিল্ম ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের ছাত্রছাত্রীরা পশ্চিমবঙ্গের টেলিভিশন প্রতিষ্ঠানের কর্মগুলিকে দখল করবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখের প্রয়োজন এই যে, নাটকে এম-এ কোর্সের অন্তর্ভুক্ত করে একটি পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র-বিদ্যা বিষয়ক কোর্স রবীন্দ্র-ভারতীর অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল দ্বারা অনুমোদিত হবার পরে মাত্র অর্থের অভাবে চালু করা সম্ভব হয় নি। পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্রশিল্পের উন্নতিবিধানের জন্যে একটি উপযুক্ত পরিকল্পনার মধ্যে চলচ্চিত্র ও টেলিভিশান বিষয়ক শিক্ষাদানের ব্যবস্থাকেও অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এবং যে-কোনও উন্নয়নমূলক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করবার সময়ে মনে রাখতে হবে যে, একই সঙ্গে অনেকগুলি কাজ শুরু করতে না পারলে যথার্থ কোন কাজ করা সম্ভব নয়। মাত্র দু-পাঁচখানি ছবির নির্মাণে দু-পাঁচ লাখ টাকা করে সাহায্য করলেই পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্রশিল্পের বিন্দুমাত্রও উন্নতি করা হবে না, এই কঠিন সত্য কথাটি সব সময়েই স্মরণ রাখা কর্তব্য। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী,

রূপ তেরা মস্তানা।। মমতাজ ও প্রাণ

...ঙালী — সকল বাসিন্দাকেই বাংলা চলচ্চিত্রের স্থায়ী দর্শকে পরিণত করতে হবে প্রথমেই, এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে চলচ্চিত্র শিল্পকে গঠনমূলক পর্যায়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে অগ্রসর হতে হবে এবং তার জন্যে কম করে প্রয়োজন পঁচিশ লাখ টাকার, তার কম নয়। এবং এই টাকার সংস্থান যেখান থেকে হোক, যেমন করে হোক এখনই করতে হবে, যদি আমরা সত্যি সত্যিই আন্তরিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্রশিল্পের উন্নয়ন কামনা করি। পঁচিশ লাখ টাকা প্রয়োজনের তুলনায় নেহাৎই অকিঞ্চিৎকর, ওর দ্বারা কোনও কিছু করাই সম্ভব নয়।

প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা এখানে উত্থাপন করতে চাই। জুলাই মাসের প্রথমে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রক থেকে শ্রীদত্ত প্রমুখ সমীক্ষা দল (স্টাডি টীম) এসেছিলেন, তাঁরা এই রাজ্যের চলচ্চিত্রশিল্পের উন্নতির জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আনাবার যে-আমদানী লাইসেন্সটি মঞ্জুর করেছেন, অর্থের অভাবে সেই লাইসেন্সটিকে নাকি এখনও কাজে লাগান হয় নি। অথচ আর কিছু দিন (বোধ করি ৩১ মার্চ, ১৯৭৩) বাদেই লাইসেন্সটির সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। এ-ব্যাপারে আমরা মুখ্যমন্ত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কিছু করণীয় আছে বলে মনে করি।

স্টুডিও সংবাদ

আজ শুক্রবার তপন সিংহের 'জিন্দেগী জিন্দেগী'

তপন সিংহের প্রথম হিন্দী ছবি 'জিন্দেগী-জিন্দেগী' আজ শুক্রবার (২৪-১১-৭২) থেকে ওরিয়েন্ট, মিত্রা, পূরবী, মেনকা এবং আরও ১৪টি ছবিঘরে দেখান শুরু হবে। জন পিকচার্সের পতাকাতলে ছবিখানি নির্মিত হয়েছে। 'জিন্দেগী-জিন্দেগী' কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন তপন সিংহ স্বয়ং। সংগীত এ ছবির অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। সংগীত-পরিচালনা করেছেন শচীনদেব বর্মণ। নেপথ্য কণ্ঠসংগীতে আছেন শচীন দেববর্মণ, লতা মঙ্গেশকর, মান্না দে ও কিশোরকুমার। বিভিন্ন ভূমিকায় রূপদান করেছেন অশোক-কুমার, ওয়াহিদা রেহমান, সুনীল দত্ত, দেব মুখোপাধ্যায়, ফরিদা জালাল, রমেশ দেও, আনোয়ার হোসেন, ছায়া দেবী, শ্যামা, মঙ্গল মুখোপাধ্যায়, জালাল, আগা, ইফতিকার, রাজকুমার, চাঁদ উসানী এবং আরও অনেকে। ছবিখানি ইস্টম্যানকলারে তোলা হয়েছে। শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স প্রাঃ লিঃ ছবিখানির স্থানীয় পরিবেশক।

বারো বছর পরে
জনপ্রিয় অভিনেতা বিকাশ রায়
আবার চিত্র-পরিচালকের ভূমিকায়

'মরুতীর্থ হিংলাজ', 'কেরী সাহেবের মুন্সী', 'অর্ধাঙ্গিনী', 'বসন্তবাহার' প্রভৃতি বহু সফল ছবির পরিচালক প্রখ্যাত অভিনেতা বিকাশ রায় প্রায় সুদীর্ঘ বারো বছর পরে আবার চিত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। দীর্ঘ বিরতির পর সর্ব-প্রথম তিনি যে ছবিটি পরিচালনা করছেন, তার নাম হলো—'কাজললতা'। অসীম পাল প্রযোজিত বিবেক প্রোডাকসন্সের এই ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক শ্রীরায় স্বয়ং, ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে। সুরসৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীমতী অসীমা ভট্টাচার্য। চিত্রগ্রহণ করছেন অনিল গুপ্ত ও জ্যোতি লাহা। প্রধান চরিত্রগুলিতে অভিনয় করছেন—উত্তমকুমার, অপর্ণা সেন, ছায়া দেবী, শর্মিতা বিশ্বাস, জহর রায় এবং বিকাশ রায়। টেকনিসিয়ান স্টুডিওতে 'কাজললতা' ছবির চিত্রগ্রহণ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। গেল ১৫ নভেম্বর থেকে একটানা দশ দিনের চিত্রগ্রহণ হয়ে যাবার পরে, ছবিটির কাজ প্রায় শেষ হয়ে আসবে।

'চিঠি' আসছে!

ডাঃ আর এন গুপ্ত প্রযোজিত মনীষা আর্ট ইন্টারন্যাশনালের চাসির ছবি 'চিঠি' খুব শিগগির শহর ও শহরতলীর জনপ্রিয় চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে। স্বরচিত কাহিনী অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা ও পরি-চালনা করেছেন — নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়। সুরসৃষ্টি করেছেন—[illegible]। নেপথ্য কণ্ঠসংগীতে আছেন—সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, [illegible] ও সুরকার [illegible]মল মিত্র স্বয়ং। [illegible] অমিয় [illegible] মুখোপাধ্যায় ছবিটির সম্পাদক।

চরিত্রচিত্রণে আছেন—[illegible], সন্ধ্যা রায়, রবি ঘোষ, [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম চক্রবর্তী, [illegible] চট্টোপাধ্যায়, শিবানী বসু, লোলিতা চট্টোপাধ্যায়, মিঠুন মুখোপাধ্যায়, নিভাননী দেবী, 'অনুভা ঘোষ, জহর রায়, নীলোৎপল দে প্রভৃতি।

ফিল্ম ফাইনান্সিং কর্পোরেশন ছবিটির পরিবেশক।

পরছাইয়া মুক্তিপথে

নূরজাহান ফিল্মসের ফজি রঙে রঙীন, নৃত্য-গীত বহুল নতুন ধরনের কাহিনী 'পরছাইয়া' শীগ্‌গীর মুক্তি পাবে বলে জানা গেছে। পরিচালনা : শরণকুমার চাঁদ, সুর : আর ডি বর্মণ। প্রধান চরিত্র-লিপিতে আছেন—বিনোদ খান্না, রেশমা, বিন্দু, সঞ্জিতকুমার, ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়, মুরাদ প্রভৃতি। নেপথ্য কণ্ঠে আছেন—লতা মঙ্গেশকর, কিশোরকুমার, আশা ভোঁসলে ও মহম্মদ রফি।

সংশোধন

গত সংখ্যার প্রকাশিত 'হীরা রাঞ্ঝা'র সমালোচনা থেকে নিম্নোক্ত অংশটি বাদ গিয়েছিল।

'ছবিটির অন্যতম সম্পদ হচ্ছে এর গানগুলি। কৈফী আজমির রচনাকে পরিস্থিতি ও ভাব-অনুযায়ী সুরসমৃদ্ধ করেছেন মদনমোহন। 'ইয়ে দুনিয়া, ইয়ে মহফিল', 'মেরি দুনিয়ামে তুম আয়ি' প্রভৃতি আটখানি গানই ইতিমধ্যেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। আবহসংগীতও তাৎপর্যপূর্ণ এবং অভিনবত্বে ভরা।

চেতন আনন্দ প্রযোজিত ও পরিচালিত 'হীর রাঞ্ঝা' যে ভারতীয় চলচ্চিত্রজগতে কাব্যসুষমাময় প্রণয়-বেদনা চিত্ররূপে অভিনন্দিত হবে একথা অনস্বীকার্য।'

মঞ্চাভিনয়

সুহৃদ সংঘের 'অন্ধকারের নীচে সূর্য' নাটকাভিনয়

গত ১রা নভেম্বর গাঙ্গুলীপুরে সুহৃদ সংঘের উদ্যোগে রাজপুর বিদ্যানিধি স্কুলে রবীন চন্দের (হীরুদা) পরিচালনায় "অন্ধকারের নীচে সূর্য" নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। নাটকে অংশ গ্রহণকারিদের মধ্যে রাধাগোবিন্দ দেবনাথ, রথীন মৈত্র, পিনাকী চক্রবর্তী, স্বপন ভট্টাচার্য (ঘটু), দিলীপ ঘোষ, সুশীল ঘোষ, কৃষ্ণপদ পাল, স্বপন ভট্টাচার্য (কড়ি) অরূপ চক্রবর্তী, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য, সবিতা ব্যানার্জি ও কল্যাণী দেবনাথ সুঅভিনয় করেন।

পূর্ব রেলওয়ে শিয়ালদহ ক্রেমস রিক্রিয়েশন ক্লাবের 'শাজাহান'

গত ৩ নভেম্বর অগণিত ও পরিপূর্ণ জনসমাগমে কলিকাতাস্থ রবীন্দ্র সদনে পূর্ব রেলওয়ে শিয়ালদহ ক্রেমস রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যবৃন্দের উদ্যোগে ডি এল রায়ের 'শাহজাহান' নাটক সুফলমণ্ডিতভাবে মঞ্চস্থ হয়।

নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন—সর্বশ্রী শিবতোষ ভৌমিক, নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, গুরুদাস লস্কর, পাঁচগোপাল সান্যাল, অজয়কুমার ঘোষাল, নরেন্দ্রচন্দ্র রায়, তারাপদ বিশ্বাস, কানন মণ্ডল, সুকুমার মুখোপাধ্যায়, সব্যসাচী ঘটক, বিভূতি ভৌমিক, বিজয় সরকার, মাস্টার রজত রায়, জগন্নাথ ঘোষাল, ভবানী রায়, মনোহর মণ্ডল, রজগোপাল নন্দী, কেদার দে, সুধীর ঠাকুর তারাপদ চক্রবর্তী, প্রতিমা দাশগুপ্তা, জোছনা নিয়োগী, মেনকা দাস, মেনকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও জয়শ্রী সরকার।

বিচ্ছু বাঘ : থিয়েটার কমিউন-এর 'বিচ্ছু বাঘ' আগামী তিন ডিসেম্বর রবিবার সকাল দশটায় অভিনীত হবে রঙ্গনায়। প্রয়োজনের বিভিন্ন বিভাগে আছেন সংস্থার সদস্যরা। নাটক ও নির্দেশনায় আছেন নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত।

কানাডায় বাংলা নাটক : টরোন্টোর বেঙ্গলী ড্রামা গ্রুপ সম্প্রতি বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন জোছন দস্তিদারের 'দুই মহল'। শতবার্ষিকী স্মরণে উত্তর আমেরিকায় এটি প্রথম নাট্যানুষ্ঠান। কিছু দিন পূর্বে এঁরাই কানাডায় প্রথম 'বাঙালী' মঞ্চাভিনয় করেন। বহির্ভারতে বঙ্গ সংস্কৃতি প্রচারে টরোন্টোর বেঙ্গলী ড্রামা গ্রুপের নিষ্ঠা প্রশংসনীয়।

পুণাতে বাংলা নাটক : পুণার এন সি এল কলোনীর সভ্যরা সম্প্রতি মঞ্চস্থ করেন নকুল মুখার্জির হাসির নাটক 'যমালয় ১৯৯৭'। সুকৃতি রায়চৌধুরীর দক্ষ পরিচালনায় নাটকটি উপভোগ্য হয়ে ওঠে। অভিনয়ে পারদর্শিতা দেখান যমরাজ (জ্ঞানানন্দ পাল), চিত্রগুপ্ত (অমিত গোস্বামী), রাঘবেন্দ্র (রণজিত সেন), পলাশকুমার (রবীন চ্যাটার্জি), কাদম্বরী (ঊষা সেন) ও অনামিকা (অরুণা হাজরা)। কালেরা, বসন্ত ও করোনারীর ভূমিকায় পল্লব রায়, শোভন ঘোষ ও আশামুকুল বসু যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখান। শংকর ঘোষের মঞ্চসজ্জা, সুধাকৃষ্ণ হাজরার আলোকসম্পাত ও দীনেশ চক্রবর্তীর শব্দ-পরিস্ফুটন প্রশংসনীয়।
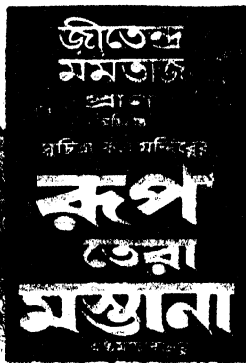
বিবিধ সংবাদ

সংস্কৃতি মেলা ও উৎসব : গত ৯ থেকে ১১ নভেম্বর সেণ্ট পলস ক্যাথিড্রেল প্রাঙ্গণ ও প্যারিস হলে সংস্কৃতি মেলা ও উৎসব হয়ে গেল ইকুমেনাল ক্রিশ্চিয়ান সেণ্টারের উদ্যোগে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং প্রথম দিনের সভাপতি ছিলেন শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়। এঁরা দুজনেই ভাবগত সংহতি বিষয়ক মনোজ্ঞ আলোচনার সূত্রপাত ঘটান। এখানেই একটি বিশেষ মণ্ডপে যে চিত্র-প্রদর্শনীটি হয়ে গেল তার শিল্পী ছিলেন উৎপল চক্রবর্তী, রাম বসু ও নিখিল চক্রবর্তী। তিন দিনই তিনটি নাটক মঞ্চস্থ করেন 'নাটকীয়' 'রূপশ্রী' এবং 'পাভলভ ইনস্টিটিউট'। 'নাটকীয়', 'এলেম নতুন দেশে' ও 'কালনগরী' নাটক তিনটির পরিচালকদের মধ্যে ছিলেন যথাক্রমে সন্দীপ্ত চক্রবর্তী, রমেন লাহিড়ী ও মমতাজ আহমেদ। এছাড়া একটি আলোচনাসভাও আয়োজিত হয়েছিল নতুন সংস্কৃতি বিষয়ে। দিলীপ সেনগুপ্ত, রঞ্জিৎ রায়চৌধুরী প্রমুখ তরুণ লেখকরা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। তিন দিনের এই উৎসব ও মেলায় পশ্চিম বাংলার বয়স্ক ও তরুণ লেখক, শিল্পী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রীসুধীর সরকার।

নিশিপদ্ম ।। মিঠু মুখোপাধ্যায় ।। পরিচালনা : আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়।
ফটো : অমৃত

তরুণ সংসদের বিজয়া সম্মিলনী : গত ১২ নভেম্বর সন্ধ্যায় তরুণ সংসদের বিজয়া সম্মিলনী উপলক্ষে কুমারটুলিতে শ্রীমদন কুণ্ডুর ইন্দ্রজাল প্রদর্শনী সবাইকে মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংসদ সভাপতি হরিদাস ঘোষ জেনি। যাদুকর কুণ্ডুর খেলাগুলির মধ্যে স্পুটনিক, ইলিউসান, নাইট্রিক এসিড খাওয়ানো এবং জীবন্ত মেয়েকে শূন্যে ভাসমান অবস্থায় রাখা খেলাগুলি দর্শকদের মনে প্রচণ্ড বিস্ময় সৃষ্টি করে।

প্রেস ফটোগ্রাফার্স এসোসিয়েশনের বিজয়া সম্মিলনী : সম্প্রতি কলকাতা তথ্য-কেন্দ্রে প্রেস ফটোগ্রাফার্স এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়ার সভ্যরা বিজয়া সম্মেলনে মিলিত হন। ঘরোয়া এই অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন পান্না সেন, বীথিকা ঘোষ ও সঞ্জীব মিত্র।

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'পথের পাঁচালী' ছবিটি এই অনুষ্ঠানে দেখাবার ব্যবস্থা করা হয়।

উপস্থিত সদস্য এবং অভ্যাগতদের বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানান এসোসিয়েশনের সভাপতি তারক দাস ও সম্পাদক দেবব্রত ঘোষ এবং কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্যাবৃন্দ।

চাকুরিয়া জনকল্যাণ পরিষদের স্বাধীনতার রজত-জয়ন্তী বর্ষপূর্তি উৎসব : গত ৭ ও ৮ নভেম্বর চাকুরিয়া জনকল্যাণ পরিষদ বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা ও অভূতপূর্ব দর্শক সমাগমের মধ্যে স্বাধীনতার রজত-জয়ন্তী বর্ষপূর্তি উৎসব পালন করেন নগেন ঘোষ [illegible] ময়দানে। ৭ নভেম্বর আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন যাত্রা দল অরুণ অপেরা '[illegible]' যাত্রাভিনয় করে সমবেত দর্শকমণ্ডলীর অকুণ্ঠ প্রশংসালাভ করেন।

দ্বিতীয় দিন ৮ নভেম্বর [illegible] ও নাটকের মধ্যে অনুষ্ঠানটি [illegible]। বিচিত্রানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন [illegible] ভট্টাচার্য, নবনীতা লাহিড়ী, অমিতা [illegible], সুপর্ণা চট্টোপাধ্যায়, দেবাশীষ ঘোষ [illegible] ভট্টাচার্য (হরবোলা) ও নবনীতা [illegible] অনুষ্ঠান সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করে।

অনুষ্ঠানটির অন্যতম আকর্ষণ ছিল সঞ্জীব ট্রেণিং কোরের শৈলেশ গুহনিয়োগীর 'প্রাইভেট এমপ্লয়মেন্ট একসচেঞ্জ' অভিনয়। শ্রীঅজয় কররায়ের দক্ষ পরিচালনায় কোরের শিল্পীরা একক ও দলগত অভিনয় চাতুর্যে নাট্যানুষ্ঠানটি বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হয়।

অভিনয়ে ছিলেন সর্বশ্রী অজয় কররায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ভোলা ঘোষ, গৌর ঘোষ, [illegible] ঘোষাল ও তরুণ ঘোষ।

পরে অভিযান নাট্য গোষ্ঠী অজয় গঙ্গোপাধ্যায়ের 'জীবন যৌবন' নাটকটি অভিনয় করেন।

অভিনয়ে ছিলেন সর্বশ্রী তপন বিশ্বাস, সুশীল দত্ত, শ্যামল সাহা, তুহিন ঘোষ, মৃন্ময় চক্রবর্তী ও বিপুল চক্রবর্তী।

হাজারিবাগ শিশু রংমহলের উৎসব

সম্প্রতি কিছুদিনের মধ্যে হাজারিবাগ শিশু রংমহল বিহার বাংলা মিলিয়ে প্রায় ষোলটি অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছে। এরা রবীন্দ্র-সদনে অভিনয় করবে ২৬ নভেম্বর 'ঘোড়সওয়ার' নাটক। নাট্যকার সজল গুহ-ঠাকুরতার এ নাটকটিতে সামাজিক [illegible] দর্শনের কথা বলা হয়েছে একটি মার-খাওয়া সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে। পুরুলিয়ার ছৌ-নাচ নিয়ে যতদূর মনে হয় আজ পর্যন্ত কোন নাটক নেই, কেবল স্বনামধন্য পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের একটি ডকুমেন্টারি ছবি ছাড়া। কেন ছৌ সম্প্রদায় আজ ধ্বংসের

[illegible] বিলাপ।। অপর্ণা সেন ও রাজন গুপ্ত।। পরিচালনা : দীনেন গুপ্ত।।

মানুষ, সেই কথাই বলা হয়েছে এ নাটকে। অনবদ্য অভিনয়ের গুণে এ নাটক ইতি-মধ্যেই গুণীজনের কাছে জনপ্রিয় হয়েছে। এ নাটকে ঘোড়সওয়ার মলয় রায়, নায়ক মৃণাল সেন, নেতা মনোজ সেন, পুরোহিত প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাপস গুপ্ত, এবং সন্ন্যাসীর অভিনয়ে প্রেমাংশু চক্রবর্তী যে মাধুর্য ফুটিয়ে তুলেছে, তার তুলনা হয় না। এ নাটকে ফ্লাসব্যাক রূপায় ছো নাচের দৃশ্যটি এবং নাটকের শেষ সময়ে ক্যানেস্তারার আশ্রয় নিয়ে পরিচালক মৃণালকান্তি পরিচয় দিয়েছেন। এখন ঘোড়সওয়ার ও নাটকের সংলাপগুলো লোকের মুখে মুখে ফিরছে—'এ যে অশ্বমেধের ঘোড়া' 'এ অর্জুনেরই ঘোড়া'।

আনন্দ মন্দিরের বিজয়া সম্মেলন : মনোরম পরিবেশে আনন্দ মন্দিরের সভ্যারা বিজয়া সম্মেলনের আয়োজন করেন গত ৮ নভেম্বর স্বর্গত ডাক্তার যতীন্দ্র মিত্রের বাসভবনে। মন্দিরের সম্পাদিকা কল্পনা দে অভ্যাগতদের স্বাগত জানান। তারপর সংগীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন প্রসাদ সেন, মঞ্জুলা মুখোপাধ্যায়, কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়, অজিত মিত্র ও সুশীল রাহা। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন সুধীর বসু।

রাজধানী-তে সপ্তডিঙ্গার নৃত্যনাট্য : কলকাতার সুপরিচিত সাংস্কৃতিক সংস্থা সপ্তডিঙ্গা গত কয়েক বছরের মত এবারও সদলবলে রাজধানী দিল্লীতে শ্যামা ও আলিবাবা নৃত্যনাট্য পরিবেশন করে প্রবাসী বাঙালীদের খ্যাতি অর্জন করে ফিরে এসেছে। বেঙ্গল ক্লাব, কালকাজী পুজো সমিতি ও মিন্টোরোড পুজো মণ্ডপে শ্যামা ও মর্জিনার ভূমিকায় সুতপা মুখার্জি অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করেন। নৃত্য-নির্দেশনা পণ্ডিত মধুশঙ্করের এবং সংগীত-পরিচালনা করেন শ্যামল বিশ্বাস ও কানাই দাস। আলোক-সম্পাত করেন প্রভাস সেন ও প্রযোজনায় অশোক দেবনাথ। কণ্ঠ ও নৃত্যাংশে ছিলেন মীনা নাগ, পূর্ণিমা চক্রবর্তী, [illegible] চক্রবর্তী, সাগরিকা রায়, মানসী রায়, রুমা চ্যাটার্জি, গোপা চ্যাটার্জি, দুর্গা দে, চিত্রা শর্মা, [illegible], শুভেন্দু চক্রবর্তী, শ্রীদেবনাথ।

[illegible] সমিতির আসর : [illegible] সমিতির বিজয়া [illegible] সমিতির সভ্যবৃন্দ পরি-[illegible] রচিত 'অনাহারা' [illegible] পূজামণ্ডপে [illegible] হয়। [illegible] পরিচালনা করেন [illegible]। প্রতিটি শিল্পীর [illegible] দর্শকদের আনন্দ দেয়।

[illegible] সমিতির বিজয়া সম্মেলন : ১৮ নভেম্বর [illegible] সমিতির সভ্যগণ বিজয়া সম্মেলনে মিলিত হয়ে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জন্মবার্ষিকী [illegible] আয়োজন করেন। সেই উপলক্ষে [illegible] একদা কথাশিল্পী মিত্র [illegible] সঙ্গে [illegible] হয়ে তামাকু সেবন করতে করতে আত্মীয় অভ্যাগতদের সংগে মিলিত হতেন। সভায় বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়), মনোজ বসু, প্রমেশচন্দ্র মজুমদার, সন্তোষকুমার ঘোষ প্রভৃতি শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বহু স্মৃতিচারণ করে তাদের লিপিবদ্ধ করবার প্রয়োজনীয়তার বিষয় বলেন।

সদারং সংগীত সম্মেলন : কলামন্দিরে উচ্চাঙ্গ সংগীত সম্মেলনের প্রথম আকর্ষণ সদারং সংগীত সম্মেলনের উদ্বোধক শ্রীসুকুমারকান্তি ঘোষ বলেন, আমরা দৈনন্দিন জীবনের প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই নিজেদের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে অজান্তেই পাশ্চাত্য জীবনধারার ছন্দে পা ফেলতে সুরু করেছি। একমাত্র ভারতীয় উচ্চাঙ্গ-সংগীতের ঐতিহ্য-বেষ্টিত জগতের কাছে বিদেশী প্রভাবের মায়ায় কুহকজাল পরাস্ত। এখানে ভারতীয় শিল্পীরা তাঁদের ভাব-ভাবনা, সাধনা ও ধ্যানে প্রাচ্যের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনাহত রেখেছেন। এইখানেই ভারতীয় সংগীতের জয়।

সংঘসচিব শ্রীকালিদাস সান্যাল তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে জানান অন্যান্যবারের মত এবারেও খ্যাতিপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ ও পরিণত শিল্পীদের সংগে সংগে উদীয়মান নবীন শিল্পীদের সংগীতরসিক সমাজের সংগে পরিচয় ঘটিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন সদারং সংগীত সম্মেলনের উদ্যোক্তারা।

উচ্চাংগ সংগীতের নানান ঘরানার উল্লেখ করে শ্রীসান্যাল বলেন বাংলার প্রতিভাবান শিল্পীবৃন্দ শাস্ত্রীয় সংগীতের সকল রীতি অনুসরণ করেও বাংলাদেশের [illegible] গায়ন-শৈলীর প্রয়োগে এমন একটি রূপে আংগিক সৃষ্টি করেছেন, যাকে [illegible]ভাবেই

শুনে মনটা বারবার অতীতমুখী হয়ে যাচ্ছিলো—যখন এইসব গানগুলি গেয়ে তাঁর স্বর্গত পিতা নিমেষের মধ্যে শ্রোতাদের চিত্ত জয় করে নিতেন।

শরাফৎ হোসেনের গান আনন্দ দিয়েছে তাঁদের—গানে যাঁরা চান উত্তেজনা, দাপট ও আওয়াজের গাম্ভীর্য। কিন্তু গভীরতা-পিয়াসী শ্রোতারা ক্ষুণ্ণ হয়েছেন শ্রী-প্রশান্তির অভাবে।

ওস্তাদ নাসীর আমেদ খাঁর [illegible] পরিশ্রম।

যে কোনো কারণেই হোক ওস্তাদ আমীর খাঁ সেদিন [illegible] ছিলেন না। [illegible] সকল বৈশিষ্ট্য—[illegible] লাগানোর [illegible] ভঙ্গী ও [illegible] ভাবে [illegible] পারে?

[illegible] আসরে যে দুজন শিল্পী [illegible] করে রেখেছিলেন, তাঁরা [illegible] পণ্ডিত ভীমসেন যোশী ও [illegible] সুনন্দা পট্টনায়ক। বেশ [illegible] বছর বাদে ভীমসেন যোশীকে মঞ্চে [illegible] আশঙ্কা জেগেছিলো এবারের অনুষ্ঠান শ্রোতাদের চিত্তপটে আঁকা আগের সেই উজ্জ্বল ছবি অম্লান রাখতে পারবে ত?—গান শুনে আশ্বস্ত হলাম যোশীজী পূর্বনামে শুধু প্রতিষ্ঠিতই নয়—সুপ্রতিষ্ঠিতই আছেন। দুদিনের অনুষ্ঠানে ইনি গাইলেন যথাক্রমে গুর্জরী টোড়ি, ললিত, যোগিয়া ও ঠুংরী। স্বরস্থানে মনোহর স্থিতি, তান-সৌকর্য ও নাটকীয় স্বরসমন্বয়ে ইনি অনুরাগীবৃন্দকে ঠিক আগের মতই মুগ্ধ রাখবার শক্তির অধিকারী।

সুনন্দা পট্টনায়ক বাঁধা সড়কের নিশ্চিত নিরাপত্তার পথের মায়া ছেড়ে পাড়ি দিলেন অজানার অভিসারে। ইনি ধরলেন এক অপ্রচলিত রাগ 'মালতী-বসন্ত'।—আর এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় আশ্চর্য দক্ষতায় উত্তীর্ণ হয়ে একটি নতুন রাগের বারতা পৌঁছে দেবার দায়িত্বই শুধু সুষ্ঠুভাবে পালন করেননি—রাগ-সৌন্দর্যকে তিনি রসোত্তীর্ণ করেছেন স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠ শক্তির দীপ্তিতে। অসাধারণ কণ্ঠের তেজ ও মাধুর্যের সমন্বয়, উচ্চগ্রামে অবিকৃত কণ্ঠে স্বচ্ছন্দ বিহার, আবেগের উষ্ণতার মুগ্ধকরী শক্তি দিয়ে প্রতি মুহূর্তে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করেছেন 'মারবাহ' 'সোহিনী', 'ললিত-পঞ্চম'র রাজত্বের প্রান্তসীমা ছুঁয়েও রাগবৈশিষ্ট্য বজায় রেখে ফিরে আসা ও শুদ্ধ রূপবিস্তারে বিহারের অপরূপ সৌন্দর্য কি রসিক শ্রোতারা কোনোদিন ভুলতে পারবেন?, ভক্তবৃন্দের আশা ইনি অকৃপণভাবে পূর্ণ করেছেন। তবলায় জনাব কেরামৎউল্লা খাঁকে সেলাম না জানিয়ে উপায় নেই। মহাপুরুষ মিশ্র, শ্যামল বসুর উন্নত মান ত আজ প্রশ্নের অতীত।

আফাক হোসেন খাঁ, অনিল পালিত, অমর দে ও গোবিন্দ বসুর বাজনা বাংলার তরুণ তবলিয়া গোষ্ঠীর দৃপ্ত অগ্রগতিকে ধ্বনিত করেছে।

সারেঙ্গীবাদকরা কেউ যে হতাশ করেছেন তা নয়—তবে সগীরুদ্দিনের অভাবে

কলকাতায় ভারত চেকোশ্লোভাক সংস্কৃতি সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত ভারত ও চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কে রজত-জয়ন্তী অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করছেন শ্রীমতী জয়ন্তী ভট্টাচার্য।

কণ্ঠসঙ্গীতের আসরের মর্যাদা যে ক্ষুণ্ণ হয়েছে একথা অস্বীকার করবারই বা পথ কই?

'নবরস' ও মঞ্জুশ্রী : নৃত্যে 'নবরস' পরিবেশনা 'নব'-অভিজ্ঞতা নয়। কলকাতার রসগ্রাহী আসরে শাস্ত্রীয় নৃত্যের একাধিক পুরোধাস্থানীয় শিল্পীদের নৃত্যে এ রসের ছন্দিত রূপ দেখার সুযোগ ঘটেছে। কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিচিত্রধারার পথ বেয়ে নবরসের বর্ণসমৃদ্ধ রূপসৃষ্টি — রবীন্দ্রসঙ্গীতের নৃত্য এবং উচ্চাঙ্গ নৃত্যের ক্ষেত্রেও এক উল্লেখযোগ্য পটপরিবর্তন নিশ্চয়ই। গত ১২ নভেম্বর কলামন্দিরে নীতিশ চাকী পরিবেশিত মঞ্জুশ্রী চাকী (সরকার) 'নবরস' নৃত্য এই অভিনব প্রয়াসকে তার শিল্পভাবনাকে অসাধারণ নৃত্যনৈপুণ্যে রূপায়িত করে—অনেক ঘণ্টার জন্য যেন রূপ ও রসের আশ্চর্য মায়ালোক রচনা করেছিলেন।

'ভারতনাট্যম' অঙ্গে মঞ্জুশ্রীর 'নবরস' রূপায়ণ সমগ্র অনুষ্ঠানটির কাব্যসুন্দর পটভূমিকা রচনা করে। নৃত্য শুরু করার আগে পশ্চাৎপটের পর্দায় প্রতিফলিত নৃত্যরাজের আরাধনায় ভারতীয় শিল্পকলার অন্তরলীন তপস্যারত রূপটিকেই শুধু মঞ্জুশ্রী নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিলেন না, আসন্ন রুদ্র-মধুর লীলানৃত্যের উৎসবকে বরণ করে নেবার জন্য অন্তরের প্রস্তুতিও রচিত হল।

শাস্ত্রীয় নৃত্যানুসারী 'নবরস' বিশ্লেষণী নৃত্যে দক্ষতা দেখালেও শিল্পী আপন শিল্পীসত্তায় বিকশিত হয়েছেন রবীন্দ্রসঙ্গীত ও কাব্যাঙ্গনে বিভিন্ন রস-

সৃষ্টির নাট্যনৃত্যে। ছন্দের সঙ্গে ভাবের, কল্পনার সঙ্গে নৃত্যকুশলতার, লালিত্যের সঙ্গে কঠোরতার মিতালীতে যে রসঘন মুহূর্তগুলির সৃষ্টি হয়েছিল তা দুর্লভ [illegible]।

বিভিন্ন রসরূপের গভীরে প্রবেশ করতে পেরেছেন বলেই শিল্পী তাঁর রূপায়িত প্রতিটি রসের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাকে সহৃদয় হৃদয়-সঞ্চারী করে তুলেছেন। আর সমান্তরালে রসপ্রবাহে বয়ে চলেছিল দেবব্রত বিশ্বাসের অতুলনীয় কণ্ঠের সুনির্বাচিত গানের ধারা।

দুই কল্পনাসমৃদ্ধ শিল্পীর বিস্ময়কর নৃত্য ও গীত সেদিনের উৎসব-সভায় উপস্থিত রসিকদের দৃষ্টি ও শ্রবণকে যে ভরিয়ে দিয়েছে একথা নিঃসংশয়েই বলা যায়।

মধুর রসবিশ্লেষণে 'কার চোখের চাওয়ার মায়া' 'সে আসে ধীরে'র মন্থর পথ অতিক্রম করে, 'চিত্র রেখা ডোরে'র বন্ধন মেনে 'ওহে সুন্দরতে' সৌন্দর্যমাধুর্যের নিটোল পূর্ণতায় যখন পৌঁছল সে মুহূর্তের চিত্তপ্লাবী আবেগ ভোলার নয়। 'অন্তরা' অংশে উচ্ছ্বাসের অন্দমাতানোর তালে লয়ের দ্রুতগতিতে রূপান্তরের পরই প্রারম্ভ লয়ের সমে ফিরে আসার অবর্ণনীয় রসলাবণ্য সৃষ্টির পর্যায়ে পড়ে। অবশ্যই এ সৃষ্টিতে সমান অবদান ছিল দেবব্রত বিশ্বাসের ব্যক্তিত্বসমৃদ্ধ গায়কীর।

বীভৎস রস-বর্ণনায় নৃত্যরূপ অনিন্দনীয় কিন্তু মধুরের পরই বীভৎসের অবতারণায় নৃত্যের ভাবসংহতি কিছুটা ক্ষুণ্ণ।

'ভয়ানক' রসে চণ্ডালিকার অংশ বিশেষের প্রয়োগ-পরিকল্পনা সুন্দর। তবে উদয়শঙ্করের 'প্রকৃতি আনন্দে' ঠিক ঐ দৃশ্যের নৃত্যরূপ স্মরণপটে উজ্জ্বল থাকার কারণেই হয়ত এ অংশ ম্লান মনে হয়েছে। 'রুদ্রবেশে কেমন খেলা' (বীররস), 'যেদিন চৈতন্য মোর' (রৌদ্ররস) শিল্পীর অনুভব-গভীরতা ও নৃত্যনৈপুণ্যের সমৃদ্ধ পূর্ণতায় চিত্তগ্রাহী। সংশয় থেকে স্থায়ী প্রত্যয়, অস্বীকার থেকে অটল ভঙ্গিতে চকিত রূপান্তর কখনও ভ্রূকুটিকুটিল কখনও আয়ত চোখের দৃপ্ত দৃষ্টিতে অভিব্যক্তির ব্যঞ্জনা মনকে অভিভূত না করে পারে?

নৃত্য ও গীতের অন্যান্য সহশিল্পীদের অনুষ্ঠান নিন্দনীয় নয়। কিন্তু প্রধান দুই শিল্পীর পাশে ম্লান এবং সেই কারণেই টিমওয়ার্ক দুর্বল। গীতা দত্তর আবৃত্তি ভালই। তবে পুরুষ কণ্ঠের বক্তব্য নারী কণ্ঠে যদি যথার্থ অনুরণন সৃষ্টিতে অসমর্থ হয় সে দোষ তাঁর নয়। কিন্তু এসবকে ছাপিয়েও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল নবরস পরিকল্পনার অভিনবত্ব।

—চিত্রাঙ্গদা

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যায় প্রকাশিত 'কলকাতার ডং মোডে ও শিল্পী মাল্লার' (পৃষ্ঠা ১০১) রচনাটির লেখক হচ্ছেন শিপ্রা আদিত্য।

নিউদিল্লীর বিজ্ঞান ভবনে কৃতী খেলোয়াড়দের ১৯৭০ ও ১৯৭১ সালের 'অর্জুন' পুরস্কার বিতরণের একটি দৃশ্য ! ভারতবর্ষের প্রেসিডেন্ট শ্রী ভি ভি গিরির হাত থেকে জাতীয় ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ান কুমারী শোভা মূর্তি 'অর্জুন' পুরস্কার গ্রহণ করছেন।

খেলাধুলা

দর্শক

দলীপ ট্রফি

সেমি-ফাইনাল খেলা

পশ্চিমাঞ্চল বনাম দক্ষিণাঞ্চল

মাদ্রাজের চিপক মাঠে পশ্চিমাঞ্চল বনাম দক্ষিণাঞ্চল দলের সেমি-ফাইনাল খেলায় পশ্চিমাঞ্চল ১০ উইকেটে জিতে দলীপ ট্রফির ফাইনালে উঠেছে। ফাইনালে তাদের সংগে খেলবে মধ্যাঞ্চল।

দক্ষিণাঞ্চল দলের অধিনায়ক ভেঙ্কট-রাঘবন টসে জিতে প্রথমেই ব্যাট করার দান নিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের খেলার সূচনা মোটেই ভাল হয়নি। লাঞ্চের সময় দক্ষিণাঞ্চল দলের রান দাঁড়ায় মাত্র ৭৯ (৩ উইকেটে)। ভারতবর্ষের প্রাক্তন টেস্ট অধিনায়ক মনসুর আলী মাত্র ৬ রান করে আউট হন। দলের রান তখন দাঁড়ায় ৮২ (৪ উইকেটে)। দলের এই সংকটকালে ৫ম উইকেট জুটি বিশ্বনাথ এবং মাইকেল দালভী ৫৭ রান তুলে দলের কাহিল অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন করেন। প্রথমদিনের খেলায় দক্ষিণাঞ্চল দলের ২১৩ রান দাঁড়ায় ৮ উইকেট পড়ে।

দ্বিতীয়দিনে ৪০ মিনিটের মধ্যে দক্ষিণাঞ্চলের ১ম ইনিংস ২৩৯ রানের মাথায় শেষ হলে খেলার বাকি সময়ে পশ্চিমাঞ্চল তাদের ১ম ইনিংসের চার উইকেটের বিনিময়ে ২৫৪ রান তুলে ১৫ রানে এগিয়ে যায়। খুবই অশুভক্ষণে পশ্চিমাঞ্চলের ১ম ইনিংসের খেলার সূচনা হয়েছিল। আবিদ আলি খেলার সূচনা করেন। তাঁর প্রথম ওভারের ৫ম বলে পশ্চিমাঞ্চলের নির্ভরশীল খেলোয়াড় রামনাথ পার্কার গোল্লা হাতে খেলা থেকে বিদায় নেন। এই সময় দলের রান ছিল মাত্র ১। সুনীল গাভাস্কারের সঙ্গে দলের অধিনায়ক ন্যাটা খেলোয়াড় অজিত ওয়াদেকার ২য় উইকেটের জুটি বেঁধে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন। দলের ১৭১ রানের মাথায় গাভাস্কার নিজস্ব ৫৫ রান করে আউট হন। ২য় উইকেটের জুটিতে গাভাস্কার এবং ওয়াদেকার ১৭২ মিনিটে দলের ১৬২ রান তুলে নড়বড়ে ভিত এমন পাকাপোক্ত করে দেন যে চন্দ্রশেখর, প্রসন্ন এবং ভেংকটরাঘবনের স্পিন বোলিং সহজে দাঁত বসাতে পারেনি।

দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে পশ্চিমাঞ্চলের ১ম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ২৫৪ (৪ উইকেটে)। খেলায় অপরাজিত থাকেন অজিত ওয়াদেকার (১৫৩ রান) এবং ফারুক ইঞ্জিনিয়ার (৪ রান)। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে হেমন্ত কানিতকার এবং ওয়াদেকার ৭৩ মিনিটে দলের ৭২ রান যোগ করেন।

তৃতীয় অর্থাৎ শেষ দিনে লাঞ্চের আগে পশ্চিমাঞ্চলের ১ম ইনিংস ৩২২ রানের মাথায় শেষ হলে তারা দক্ষিণাঞ্চলের ১ম ইনিংসের ২৩৯ রানের থেকে ৮৩ রানে এগিয়ে যায়। এরপর দক্ষিণাঞ্চল দলের ২য় ইনিংস মাত্র ৯৭ রানের মাথায় শেষ হলে খেলায় পশ্চিমাঞ্চলের সরাসরি জয়লাভের পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। পশ্চিমাঞ্চল সমস্ত উইকেট হাতে জমা রেখে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৫ রান তুলে দক্ষিণাঞ্চলকে ১০ উইকেটে হারিয়ে দেয়। পশ্চিমাঞ্চলের পি এস সালগাঁওকার এই খেলায় ১১১ রানে ১০টা উইকেট নিয়েছেন। ফলে তাঁর টেস্ট খেলার সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল হয়েছে। ভারতবর্ষের প্রাক্তন টেস্ট অধিনায়ক মনসুর আলির ৬ ও ১৬ রান টেস্ট দলে তাঁর ফিরে আসার পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়।

মধ্যাঞ্চল বনাম পূর্বাঞ্চল

ইডেন উদ্যানের রঞ্জি স্টেডিয়ামে আয়োজিত দলীপ ট্রফির দ্বিতীয় সেমি-ফাইনাল খেলায় গতবারের দলীপ ট্রফি বিজয়ী মধ্যাঞ্চল ১ম ইনিংসের খেলায় পূর্বাঞ্চলের ১ম ইনিংসের ২৫৯ রানের থেকে ১৮৭ রান বেশী করার সুবাদে ফাইনালে খেলার যোগ্যতা লাভ করেছে। এই খেলায় ফলাফল অমীমাংসিত ছিল। এখানে উল্লেখ্য, দলীপ ট্রফির খেলায় এই নিয়ে মধ্যাঞ্চলের সঙ্গে পূর্বাঞ্চল যে ৫-বার খেলেছে তার ফলাফল : মধ্যাঞ্চলের জয় ৪-বার এবং পূর্বাঞ্চলের জয় ১-বার। মধ্যাঞ্চলের ৪-বারের জয়ের মধ্যে তারা দুবার টসে জয়ী হয়েছে।

মধ্যাঞ্চল দলের অধিনায়ক হনুমন্ত সিং টসে জিতেও প্রথমে ব্যাট করার দান নেননি। অপরদিকে পূর্বাঞ্চল দল প্রথম ব্যাট করার সুযোগ পেয়েও তা ভাল করে কাজে লাগাতে পারেনি। স্কোর বোর্ডে কোন রান জমা পড়ার আগেই পূর্বাঞ্চল দলের ১ম উইকেট পড়ে যায়। ২য় উইকেটের জুটিতে রবিন মুখার্জি এবং রাজা মুখার্জি দলের ৬২ রান তুলে প্রথম ধাক্কাটা সামলে দেন। লাঞ্চের সময় পূর্বাঞ্চল দলের ৮৪ রান দাঁড়ায়, ৩ উইকেটে। উইকেটে অপরাজিত ছিলেন রবিন মুখার্জি (৪৭ রান) এবং অধিনায়ক অম্বর রায় (১০ রান)। লাঞ্চের পরের এক ঘন্টার খেলায় পূর্বাঞ্চলের তিনজন খেলোয়াড় রবিন মুখার্জি, অম্বর রায় এবং আনন্দ শুক্লা আউট হয়ে যান। এই সময় দলের রান দাঁড়ায় ১৪০ (৫

ইডেন উদ্যানের রঞ্জি স্টেডিয়ামে মধ্যাঞ্চল বনাম পূর্বাঞ্চলের দলীপ ট্রফির সেমি-ফাইনাল খেলায় পূর্বাঞ্চলের রমেশ সাকসেনার একটি দর্শনীয় মারের দৃশ্য।

উইকেটে)। সেলিম দুরানীর এক ওভারেই অম্বর রায় এবং শুক্লা বিদায় নেন—দলের ১৪০ রানের মাথায় ৪র্থ এবং ৫ম উইকেটের পতন। খেলার গতি মধ্যাঞ্চল দলের অনুকূলে ঘুরে যাওয়াতে তারা দ্বিগুণ উৎসাহে খেলতে থাকে। পূর্বাঞ্চল দলের এই সঙ্গীন অবস্থায় ষষ্ঠ উইকেটের জুটি বাঁধেন বিহারের অধিনায়ক রমেশ সাকসেনা এবং রাজু মুখার্জি। রাজুকে আউট করার জন্যে উইকেটের চারদিকে সপ্তরথী দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়। কিন্তু রাজু সপ্তরথীর এই ব্যূহতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে খেলতে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে রমেশ সাকসেনা সমস্ত দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে ধীরে ধীরে খেলার গতি দলের অনুকূলে টেনে আনেন। তাঁর চটকদার খেলায় দর্শকরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। দলের ২৪১ রানের মাথায় রাজু নিজস্ব ৪৫ রান করে আউট হন। ষষ্ঠ উইকেটের জুটিতে রাজু মুখার্জি এবং রমেশ সাকসেনা দলের অতি মূল্যবান ১০১ রান তুলে দিয়েছিলেন। এই জুটি ভাঙ্গার পর দলের যে ভাঙ্গন ধরে তা প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়নি। দলের ২৫৮ রানের মাথায় ৮ম ও ৯ম এবং ২৫৯ রানের মাথায় শেষ ১০ম উইকেট পড়ে যায়। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের ৯ মিনিট আগে ২৫৯ রানের মাথায় পূর্বাঞ্চল দলের ১ম ইনিংস শেষ হওয়াতে মধ্যাঞ্চলের পক্ষে ১ম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি।

দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে মধ্যাঞ্চল দলের ১ম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ২৭১, ৫ উইকেটে। খেলার এই অবস্থায় তারা পূর্বাঞ্চলের ১ম ইনিংসের ২৫৯ রানের থেকে ১২ রানে এগিয়ে যায়; তাছাড়া হাতে ১ম ইনিংসের আরও ৫টা উইকেট জমা থাকে। পূর্বাঞ্চলের খারাপ ফিল্ডিংয়ের সুযোগ নিয়ে মধ্যাঞ্চলের কয়েকজন খেলোয়াড় যথেষ্ট লাভবান হন। মধ্যাঞ্চলের ৮৯ রানের মাথায় তৃতীয় উইকেট পড়ে যায়। লাঞ্চের সময় মধ্যাঞ্চলের রান দাঁড়ায় ১০১ (৩ উইকেটে)। উইকেটে তখন খেলছিলেন ৪র্থ উইকেট জুটি পার্থসারথী শর্মা এবং অনিল দেশপাণ্ডে। চা-পানের সময় পর্যন্ত এই জুটিই অপরাজিত ছিল। চা-পানের সময় রান দাঁড়ায় ১৭৮ (৩ উইকেটে), পূর্বাঞ্চলের ১ম ইনিংসের ২৫৯ রানের থেকে ৮১ রান কম। সন্দীপ রায়ের নতুন বলে শর্মা (৪৫ রান) এবং দেশপাণ্ডে (৭৬ রান) যথাক্রমে ১৮৮ ও ২০৫ রানের মাথায় আউট হলে খেলার গতি পূর্বাঞ্চলের অনুকূলে ঘুরে যায়। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে শর্মা এবং দেশপাণ্ডে ১৪৮ মিনিটের খেলায় মূল্যবান ৯৯ রান যোগ করেছিলেন। শর্মার ৪৫ রানে ৭টা বাউণ্ডারী ছিল। দেশপাণ্ডে তাঁর ২০১ মিনিটের খেলায় ৭৬ রান সংগ্রহ করেছিলেন; বাউণ্ডারীতে বল ছুটিয়েছিলেন ১২ বার।

তৃতীয় অর্থাৎ শেষ দিনে লাঞ্চের ৫৫ মিনিট পর মধ্যাঞ্চল দলের ১ম ইনিংস ৪৪৬ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ১৮৭ রানে এগিয়ে যায়। তাদের ৮ম উইকেটের জুটি সুনীল বেঞ্জামিন এবং মবন্দলো ঝড়ের গতিতে ৯৬ মিনিটের খেলায় ১০০ রান তুলে দিয়েছিল। এই জুটি পূর্বাঞ্চলের বোলারদের বল নির্দয়ভাবে পিটিয়ে খেলে খেলা খুবই উপভোগ্য করেছিলেন। তবে পূর্বাঞ্চলের দুর্বল ফিল্ডিংয়ে মধ্যাঞ্চল দলের খেলোয়াড়রা যথেষ্ট লাভবান হন। সুনীল বেঞ্জামিন ৯৯ রান করে শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থেকে যান। মাত্র ১ রানের জন্যে দলীপ ট্রফির খেলায় তাঁর প্রথম আবির্ভাব লগ্নে তিনি সেঞ্চুরী পূর্ণ করতে পারলেন না। একদিক থেকে তিনি খুবই ভাগ্যবান যে, তাঁর তিনটে সহজ 'ক্যাচ' ধরা না পড়ায় তিনি খুব জোর বেঁচে যান।

তৃতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলাটা ছিল নিছক নিয়মরক্ষার ব্যাপার। এই সময় পূর্বাঞ্চল ২য় ইনিংসের ৫-টা উইকেট খুইয়ে ১৪৬ রান সংগ্রহ করেছিল।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

প্রতিযোগিতার তারিখ ২৮-২-১৯৭৩ পর্যন্ত বর্ধিত করা হ'ল।

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানানো হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য অমৃত কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে অমৃত কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে অমৃত কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

		কলিকাতা		মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা	২৫.০০	টাকা	৩০.০০
ষাণ্মাসিক	টাকা	১২.৫০	টাকা	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৬.২৫	টাকা	৮.০০

বিঃ দ্রঃ—উৎপাদন শুল্কের হার
(চাঁদার সহিত অবশ্য প্রেরণীয়)

বার্ষিক	টাকা	১.০২
ষাণ্মাসিক	টাকা	০.৫২
ত্রৈমাসিক	টাকা	০.২৬

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১২শ বর্ষ
৩য় খণ্ড

৩০ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক— ২ পয়সা
মোট ৫২ পয়সা

Friday 1st December, 1972 শুক্রবার, ১৫ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯ .52 Paise

'এক নজরে'

কূটনীতির ঝুলি : গাঁজা চরস থেকে শুরু করে সন্ত্রাসবাদীদের আগ্নেয়াস্ত্র ও নানাবিধ বিস্ফোরক পদার্থ চোরাচালানের আন্তর্জাতিক পথ নিয়ে বহু গবেষণা ও পরীক্ষানিরীক্ষার পর 'ইন্টারপোল' নিঃসন্দেহ হয়েছে যে কূটনীতিকদের ঝুলিই ঐসব নিষিদ্ধ পণ্যের সবচেয়ে বড় বাহন। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে কূটনীতিকদের ঝুলি (ডিপ্লোমেটিক ব্যাগ) শুল্ক বিভাগের এক্তিয়ারবহির্ভূত বিষয়। রাষ্ট্র প্রতিনিধি তাঁর নিজ রাষ্ট্রের সঙ্গে যেসব গোপন বিষয়ে শলাপরামর্শ করবেন তার গোপনীয়তা রক্ষার জন্যই রাষ্ট্র প্রতিনিধির নামাঙ্কিত যাবতীয় মেলব্যাগ, পার্শেল ইত্যাদি শুল্ক দপ্তরের পরীক্ষামুক্ত রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে ঐ 'কূটনৈতিক ছাড়'-এর (ডিপ্লমেটিক ইমিউনিটি) সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল কর্মচারী বলে বিবেচিত কূটনৈতিক প্রতিনিধিরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নানা নিষিদ্ধ আন্তর্জাতিক চোরাচালানের সঙ্গে নিজেদের জড়িত করে ফেলছেন। কিছুদিন আগে অস্ট্রেলিয়ায় নিযুক্ত ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনারের পুত্রের ব্যাগ থেকে কয়েক হাজার টাকা মূল্যের নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্য আবিষ্কৃত হওয়ার ঘটনা নিশ্চয়ই সকলের মনে আছে।

কয়েকটি সাম্প্রতিক ঘটনায় প্রমাণ হয়েছে যে, বিমান ছিনতাই, চিঠি বোমা চালান, বিমানঘাঁটিতে সশস্ত্র হামলা ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের ঘটনাগুলিও মুখ্যত দূতাবাস প্রতিনিধিদের মাধ্যমেই পরিচালিত হচ্ছে। কদিন আগে হল্যান্ডের পুলিশ আগে থেকে খবর পেয়ে আমস্টার্ডাম বিমানবন্দরে সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাস থেকে দক্ষিণ আমেরিকা ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে চলমান আলজেরিয়ার কূটনৈতিক পাসপোর্টধারী এক প্যালেস্তিন যাত্রীর সুটকেস অতর্কিতে তল্লাস করে এবং দেখা যায় যে সুটকেসটিতে শুধু গাদা করা রিভলবার ছাড়া আর কিছুই নেই। ঐ আমস্টার্ডাম বিমানবন্দরেই আর একদিন আর একজন আলজেরিয় পাসপোর্টধারীর ব্যাগ তল্লাসকালে একগাদা চিঠিবোমা ধরা পড়ে। দুটি ঘটনায় প্রতিই ডাচ সরকার আলজেরিয়া সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কূটনৈতিক ব্যাগের বিশেষ সুবিধার সুযোগ নিয়ে নিষিদ্ধ পণ্যের চোরাচালান এখন এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে যে এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক আইন সংশোধনের প্রস্তাবও কোন কোন মহল থেকে উঠেছে।

কড়া শাসনে শিশু মিথ্যাবাদী হয় : কড়া শাসনে না থাকলে শিশু 'মানুষ' হয় না, এবং আদরে শিশু নষ্ট হয় একথাই মোটামুটিভাবে আমরা মানতে অভ্যস্ত। শিশু মনস্তত্ত্ববিদরা অবশ্য বারবার এ তত্ত্বের অসারতায় সোচ্চার হয়েছেন কিন্তু তঁাদের কথাকে নিহাতই 'কথার কথা' বলে আমরা ধরে নিই। সম্প্রতি এক শিক্ষক সম্মেলনে বৃটেনের বিরোধী দলের সহকারী নেতা এডওয়ার্ড শর্ট ভাষণদানকালে বলেন যে, অতি কঠোর অভিভাবক বা শিক্ষকের রক্তচক্ষুর সম্মুখে সদাসন্ত্রস্ত শিশু অস্বাভাবিক আচরণ করে এবং প্রায় ক্ষেত্রেই আত্মরক্ষার্থে সে মিথ্যাবাদী হয়। আর শৈশবেই তার ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক স্ফুরণে যে ব্যাঘাত ঘটে তা তার ভবিষ্যৎ জীবনেরও ক্ষতি করে। তিনি বলেন, 'আমরা ব্যাঙ গড়তে চাইছি, ব্যাঙাচিকে স্বাভাবিক বৃদ্ধির সুযোগ না দিয়ে'। অভিভাবক অথবা শিক্ষকের নির্দেশ ও পরিচালনার প্রয়োজন শিশুর জীবনে অবশ্যই আছে, কিন্তু শিশুর মনের কথা শিশুর চেয়ে শিশুর পিতা, অভিভাবক, পুলিশ অথবা যাজকের বেশি জানা আছে এ ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল। আর ঐ ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে শিশুর উল্লেখিত চার গুরু শৃংখলার নামে শিশুকে যে একের পর এক বিধিনিষেধের শৃংখল পরাতে চান তা স্মরণাতীতকাল থেকে তারুণ্য ও যৌবনের পথে অগ্রসরমান শিশু মেনে এলেও আজ আর মানতে চাইছে না এবং তা থেকেই শুরু হয়েছে আজকের দিনের তথাকথিত ছাত্র অশান্তি ও যুব উচ্ছৃংখলতা। শৃংখলা ও বিধিনিষেধের শৃংখল যে এক নয় এটা কর্তৃপক্ষের যথাযথ উপলব্ধির উপরেই আজকের সমাজের সবচেয়ে বড় সমস্যার সমাধান সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল।

মায়ের প্রবঞ্চনা : ঘরে বেবিকটে ১৩ মাসের শিশু পাঁচ মাস মরে পড়েছিল, আর তাকে কম্বল চাপা দিয়ে রেখে তার মা সেই ঘরেই নেশায় বিভোর হয়ে ব্যভিচারী জীবনযাপন করছিল। ইংলণ্ডের, লীডস ক্রাউন কোর্টে ছাব্বিশ বছর বয়স্কা মেরী এন্ডারটনের বিরুদ্ধে যখন শিশুসন্তানকে অবহেলা করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার ও শিশুর মৃত্যুর পরেও রাষ্ট্রকে প্রবঞ্চিত করে শিশুকল্যাণ বাবদ দেয় অর্থ আদায়ের অভিযোগ আনা হয় তখন সে উভয় অভিযোগই সত্য বলে মেনে নেয় এবং তার জন্য যে দু বছর কারাদণ্ড হয় তা নিয়েও সে কোন কথা বলে না।

রাণীর উকিল ভিভিয়ান হারুইজ মেরীকে অভিযুক্ত করার সময় বলে, ১৮ বছর বয়স থেকে মেরী ঘর ছাড়া এবং তারপর থেকে সে স্রোতের শ্যাওলার মত ভেসে বেড়াচ্ছে। সবরকমের মারাত্মক নেশাতেই সে অভ্যস্ত এবং তারই মত নেশাগ্রস্তদের নিয়ে সে সর্বদা বিভোর হয়ে থাকে। তের মাস আগে তার যে পুত্রসন্তানটি ভূমিষ্ঠ হয় তার প্রতি কোন যত্ন সে নেয়নি যদিও সে ঐ সন্তানের জন্য বরাবর সরকারের কাছ থেকে মাসোহারা পেয়ে এসেছে। এমনকি শিশুটি মারা যাওয়ার পরেও তার মৃত্যুর কথা গোপন রেখে সে গত পাঁচ মাসে পঁচিশ ছাব্বিশ পাউন্ড সরকারের কাছে আদায় করেছে। গত আগস্ট মাসে পুলিশ তার বাড়িতে গেলেও সে বলে যে তার ছেলে কটে ঘুমোচ্ছে, আর সে এত রুগ্ন যে তাকে সে তুলে আনতে পারবে না।

রাণীর উকিলের অবশ্য অমন জোরালো লেকচারটা একেবারেই মাঠে মারা গেছে। কারণ অপরাধিনীকে প্রশ্ন করা মাত্রই সে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নতমস্তকে, সাশ্রুনয়নে ও রুদ্ধকণ্ঠে স্বীকার করে নেয় যে, শিশুর উপযুক্ত যত্ন নেওয়ার সামর্থ্য তার ছিল না বলে চোখের সম্মুখে দিনে দিনে শিশুটি রুগ্ন হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সে তার প্রতিকার করতে পারেনি। জেসন প্রায় সব কিছুই খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল এবং একদিন কট থেকে জেসনকে তুলতে গিয়ে দেখতে পায় যে তার দেহ অসাড়, প্রাণহীন। তখনই সে তাকে কম্বল আর পালকে চাপা দিয়ে রেখে আসে, তারপর পাঁচ মাস আর সে তার দেহ স্পর্শ করেনি। কিন্তু সহায়সম্বলহীন সে, কোন নিয়মিত উপার্জন তার ছিল না। তাই সন্তানবাবদ সে যে মাসে পাঁচ পাউন্ড করে পেত সেটার প্রলোভন ত্যাগ করতে পারেনি।

যে অভিযুক্তা নারীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে মোটা ফী পাওয়া রাণীর উকিল তাঁর জোরালো ভাষণটি দিয়েছিলেন সে নারী যে একটি লাঞ্ছিত পরিত্যক্ত সমাজের প্রতীক এবং সেই ক্রমসম্প্রসারণশীল সমাজ যে তার তৃষ্ণার্ত রসনা মেলে দুর্নিবারগতিতে এগিয়ে আসছে পরিবেষ্টিত সমৃদ্ধ সমাজের সবটুকু সরসতা লেহন করে নিতে, একথা জোর গলায় ঘোষণা করার বলিষ্ঠ কণ্ঠ আজ কোথায়? মেরীর ধিক্কৃত নারীত্ব ও ভর্ৎসিত মাতৃত্ব যে এই অভিশপ্ত সমাজেরই বিষফল, সেকথা আদালতের উকিল না বুঝলেও আদালতের বাইরেও কি বোঝার কেউ নেই?

—[illegible]

জনতার প্রতিরোধ ও আত্মদান

গত সপ্তাহে কলকাতার রাজপথে এক নতুন দৃশ্য দেখলেন নাগরিকগণ। কর্তব্যরত দুজন পুলিশ কনস্টেবল আক্রান্ত হলেন দুষ্কৃতদের দ্বারা। তাদের সাংঘাতিকভাবে আহত করে পালিয়ে যাবার সময় বাধা দিতে গিয়ে আততায়ীর গুলীতে আত্মদান করলেন এক নাগরিক শ্রীপ্রফুল্লকুমার আড্ডি। আততায়ীরা তবু পালিয়ে যেতে পারেনি। জনতা তাদের তাড়া করে দুজনকে ধরে ফেলে। তাদের ধরতে গিয়ে আরও দুজন নাগরিক আহত হন। এই ঘটনা কলকাতায় সচরাচর চোখে পড়ে না। এই দুঃস্বপ্নের নগরীতে জেগেছিল রাত্রির ছায়া। জল্লাদরাই রিভলবার ও ছুরি দেখিয়ে শুষে নিয়েছিল নাগরিকদের সব সাহস। চোখের সামনে নিরপরাধ পুলিশ নিহত হয়েছে। পথচারীরা বাধা দেয়নি। দিনে দুপুরে বাস থেকে নামিয়ে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। যাত্রীভর্তি বাস নির্বিকার। মাতাপিতার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে পুত্রকে। পাড়াপড়শীরা মুখ খোলেনি। কেন এমন হয়েছিল? সবাই কি জল্লাদদের সমর্থন করত? নিষ্পাপের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হোক, এটাই কি ছিল তাদের কাম্য? না, তা নয়।

আসলে শান্তিকামী মানুষ আতঙ্কে নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। আইন ও শৃংখলার রক্ষকরাও গিয়েছিল দিশেহারা হয়ে। অথচ এদেশের অধিকাংশ মানুষ শান্তিপ্রিয়। সমাজের শান্তি ও স্থিতিই তাদের কাম্য। তারা আলো খুঁজে পাচ্ছিল না। কীভাবে এই ধ্বংস-শক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করা যাবে তা ছিল এদের অজানা। বাহাত্তরের গোড়া থেকে এই অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। মানুষ তার হারানো বিবেক এবং তন্দ্রাচ্ছন্ন শক্তির জাগরণ দেখতে পাচ্ছে। গত সপ্তাহের ঘটনা তারই ইঙ্গিত। দুষ্কৃতরা শ্রীআড্ডির গাড়ির ওপর চড়াও হয়ে তাকে নেমে যেতে বলে। এই গাড়ি করে পলায়ন ও আইনের চোখকে ধুলো দেওয়াই ছিল তাদের মতলব। শ্রীআড্ডি তা দেননি। রিভলবার দেখে ভয় পাননি তিনি। বাধা দিতে গিয়ে তিনি নিজের প্রাণ বিসর্জন দিলেন। এই আত্মদান সমস্ত দেশের বিবেককে জাগ্রত করবে। আতঙ্কিত, ভীতিগ্রস্তদের মনে এনে দেবে সাহস। জনসাধারণ যদি ঐক্যবদ্ধভাবে দুবৃত্তদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, তাদের ক্ষমতা থাকবে না সমাজের বুকে এভাবে রক্ত ঝরাবার। কর্তব্যরত পুলিশের ওপর এরূপ কাপুরুষোচিত আক্রমণের আগে তারা ভাববে যে, জনতা আর নিষ্ক্রিয় নয়, নিস্পৃহ নয়। তাদের মনে এসেছে সাহস এবং প্রতিরোধের দুর্জয় বাসনা। শ্রীআড্ডি যে পথ দেখিয়ে গেছেন এবং দুজন যুবক যে অমিত সাহসে জল্লাদের মোকাবিলা করেছে তা সমগ্র দেশের আন্তরিক অভিনন্দনের যোগ্য।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় অকপটচিত্তে অভিনন্দন জানিয়েছেন জনসাধারণের এই অসমসাহসিকতাকে। আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন আততায়ীর হাতে নিহত শ্রীআড্ডির পরিবারবর্গকে। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায় মৃতের পরিবারের প্রতি সরকারের দায়িত্বের কথা উল্লেখ করে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কর্মসংস্থানের। মুখ্যমন্ত্রী দশ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছেন মৃতের পরিবারকে। সরকারের এই কাজ অকুণ্ঠ প্রশংসার যোগ্য জনসাধারণ ও সরকারের মধ্যে এই সহযোগিতা ও সহমর্মিতাই কাম্য। সমাজের শান্তি ও স্থিতি, তার ন্যায় ও সুবিচার সুস্থিত করতে হলে এরকম সহযোগিতা ছাড়া উপায় নেই। বাংলার বুকে অনেক প্রেতের নৃত্য হয়েছে। দুঃস্বপ্নের কালো রাত্রি নেমে এসেছিল আমাদের সোনার বাংলায়। জনতার নিষ্ক্রিয়তায় কত নিরপরাধের প্রাণ বিনষ্ট হয়েছে। কত আদর্শবান যুবক অযথা বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছে। জনসাধারণ যদি সজাগ থাকত, তাদের মনে যদি অবসাদ না বাসা বাঁধত তাহলে এমন করুণ ও মর্মান্তিক দৃশ্য দেখতে হত না আমাদের। বাংলার এই দুর্দিনে একমাত্র আশার আলোক দেখাতে পারে তার জনগণের সুদৃঢ় সংকল্প, আদর্শনিষ্ঠা এবং সাহসিকতা। গত সপ্তাহের ঘটনায় আমাদের মনে হয়েছে নিরাশ হবার কিছু নেই। বাংলার মানুষ তাদের বিবেক ও মনুষ্যত্ব বিসর্জন দেয়নি। সাময়িক তন্দ্রায় তা আচ্ছন্ন হয়েছিল মাত্র। আবার তার জাগরণ ঘটছে। শান্তিকামী জনগণ যখন একসঙ্গে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, রক্তপাতের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ায় তখন সেই অন্যায়কারী পালাতে বাধ্য হয়। যে হাত হত্যার জন্য উদ্যত তাকে ভেঙে দেবার সাহস ও তেজ একমাত্র সংকল্পবদ্ধ জনতারই আছে। সরকারও উপলব্ধি করেছেন এই জনতার শক্তি কতটা। সাধারণ মানুষ চায় শান্তি। শোষণমুক্ত, অন্যায়মুক্ত সমাজ তার স্বপ্ন। সেই স্বপ্নকে সার্থক করার জন্যই গণতান্ত্রিক সরকার ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী জনগণের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা প্রয়োজন। জনতাই সরকারের শক্তি, জনগণের ঐক্যই গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ। দুষ্কৃত, দুর্বৃত্তরা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়। জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালে তাদের পর্যুদস্ত করা কঠিন নয়। এর জন্য প্রয়োজন হলে আত্মদান করতে হবে। যেমন করে গেছেন শ্রীপ্রফুল্লকুমার আড্ডি। এই আত্মদান মহৎ। জনসাধারণের সামনে তা উজ্জ্বল আলোকশিখার মতো দীপ্যমান হয়ে নিরাশার অন্ধকারে দেখাবে পথ। বাংলার মানুষ ফিরে পাবে তাদের হৃতগৌরব। শান্তির শক্তি চূর্ণ করে দেবে সব অশুভ অপচেষ্টা। বাংলার বুকে মনুষ্যত্বের মহিমা হবে সুপ্রতিষ্ঠিত।

ভারতবর্ষের প্রথম ভাষাভিত্তিক রাজ্য অন্ধ্র। সেই অন্ধ্রই আজ রক্তপাত, হিংসাত্মক কার্যকলাপ, দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্য দিয়ে দেখাচ্ছে, ভাষার বন্ধন সব সময়ে মানুষকে এক করে বেঁধে রাখতে পারে না।

দ্বিভাষিক মাদ্রাজ রাজ্যকে ভাগ করে যে তেলেগুভাষী পৃথক অন্ধ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেটাও শান্তিপূর্ণভাবে হয়নি, দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্য দিয়েই হয়েছিল। এর জন্য পট্টি শ্রীরামালুকে অনশনে আত্মদান করতে হয়েছিল। ঐ আত্মদানের পর তেলেগুভাষীরা যে প্রচন্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিলেন তার সামনে নতিস্বীকার করে ভারত সরকার দ্বিভাষিক মাদ্রাজ রাজ্যের তামিলভাষী অঞ্চল থেকে পৃথক করে তেলেগুভাষী অন্ধ্র রাজ্য গঠনের সিদ্ধান্ত করেন। এখন আবার অন্ধ্র রাজ্যে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলছে তাতে প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে, রাজ্যটি কি আর এক থাকতে পারবে? অথবা এক অন্ধ্রের দেহ থেকে দুটি পৃথক তেলেগুভাষী রাজ্য গঠন করতে হবে?

১৯৫৩ সালে যে অন্ধ্র রাজ্য গঠিত হয়েছিল, সেই অন্ধ্র অবশ্য এখন আর নেই। এককালে যে অঞ্চলটি নিজাম বাহাদুরের শাসনাধীন হায়দরাবাদ রাজ্য নামে পরিচিত ছিল, সেই তেলেগুভাষী তেলেঙ্গানা অঞ্চল অন্ধ্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তেলেগুভাষীদের 'বিশাল অন্ধ্র'-এর স্বপ্ন সার্থক করে তুলেছে। এই সংযুক্তি হয়েছিল রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের মতের বিরুদ্ধে। কমিশন তাঁদের রিপোর্টে বলেছিলেন, 'তেলেঙ্গানার অধিবাসীরা শিক্ষার ক্ষেত্রে অনগ্রসর। তাঁদের আশঙ্কা, উপকূলবর্তী অঞ্চলের অধিকতর অগ্রসর অধিবাসীরা তাঁদের ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে ও শোষণ করতে পারে। তেলেঙ্গানাবাসীদের যথার্থ আশঙ্কা হল, তাঁরা যদি অন্ধ্রের সঙ্গে যোগ দেন, তাহলে অন্ধ্রের অধিবাসীদের তুলনায় তাঁরা অসুবিধাজনক অবস্থার মধ্যে পড়বেন এবং এই শরিকানায় বড় শরিকই সব সুবিধা পেয়ে যাবেন আর তেলেঙ্গানা হয়ে যাবে অধিকতর উদ্যোগশীল উপকূলবর্তী অঞ্চলের উপনিবেশ।' তেলেঙ্গানাবাসীদের এই আশঙ্কার কথা মনে রেখেই রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন সুপারিশ করেছিলেন, তেলেঙ্গানা আপাতত একটি পৃথক রাজ্য হোক। তবে পাঁচ বছর পরে সেখানকার এম এল এ-দের দুই-তৃতীয়াংশ যদি সায় দেন, তাহলে তেলেঙ্গানাকে অন্ধ্রের সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে।

কিন্তু কমিশনের এই সুপারিশ গ্রহণ করা হয়নি। তেলেঙ্গানা অন্ধ্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই সংযুক্তির আগে অন্ধ্র ও তেলেঙ্গানার কংগ্রেস নেতারা একটি চুক্তি করে তেলেঙ্গানার অধিবাসীদের স্বার্থ-সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দেন। সেদিনকার ঐ প্রতিশ্রুতির বিষয়গুলিই আজ অন্ধ্র ও তেলেঙ্গানার অধিবাসীদের মধ্যে প্রচন্ড বিরোধের বিষয়ে পরিণত হয়েছে এবং একটি অখন্ড রাজ্য হিসাবে অন্ধ্রের ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব সংশয়াপন্ন হয়ে উঠেছে।

১৯৫৬ সালের সেই 'ভদ্রলোকের চুক্তি'তে তেলেঙ্গানাবাসীদের যেসব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সেগুলির মূলে ছিল তথাকথিত 'মুলকি বিধি'। ১৯১৮ সালে তৎকালীন নিজামের দ্বারা প্রবর্তিত এই মুলকি বিধির মূল কথা ছিল, অন্তত ১৫ বছর হায়দরাবাদ রাজ্যে বাস না করলে কেউ অধস্তন পর্যায়ের সরকারি কর্মচারীর পদ পাবেন না। যদিও আসলে হায়দরাবাদের শাসক নিজের সামন্ততান্ত্রিক স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখার উদ্দেশ্যেই এই বিধি প্রবর্তন করেছিলেন তাহলেও তেলেঙ্গানাবাসীরা এই বিধিকেই অন্ধ্রবাসীদের অসম প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে তাঁদের কবচকুণ্ডল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এই 'মুলকি বিধি' সংবিধান-সম্মত কিনা সেই প্রশ্নটি অন্ধ্র হাইকোর্টে দুবার বিচার করা হয়েছে। হাইকোর্টের প্রথমবারের রায়ে এই বিধি সংবিধানসম্মত বলে মেনে নেওয়া হয়। পরে হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চে ঐ রায় উল্টে দিয়ে 'মুলকি বিধি' সংবিধানবিরোধী বলে ঘোষণা করেন। ফুলবেঞ্চের ঐ রায় অন্ধ্রবাসীদের উল্লসিত করে। অন্ধ্র সরকার ঐ রায় মেনে নেবেন বলেও কথা হয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে তেলেঙ্গানা থেকে অন্ধ্রের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন শ্রী পি ভি নরসিংহ রাও। তাঁর নেতৃত্বে অন্ধ্র সরকার হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপীল করার সিদ্ধান্ত করেন। সুপ্রিম কোর্টের রায় বেরিয়েছে গত অক্টোবর মাসে। মৌচাকে ঢিল পড়েছে তখনই। হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চের রায় অন্ধ্রদের উল্লসিত করেছিল আর তেলেঙ্গানাবাসীদের হতাশ করেছিল, আর সুপ্রিম কোর্টের রায়ে তার ঠিক বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয়েছে ঃ তেলেঙ্গানার মানুষ খুশি আর অন্ধ্ররা বিক্ষুব্ধ।

সুপ্রিম কোর্টের রায় বেরিয়েছে মাসদেড়েক আগে। এই সময়ের মধ্যে মুলকি বিধি নিয়ে অন্ধ্রের জনমত দুটি পরস্পর-বিরুদ্ধ শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেছে। এমনকি অন্ধ্র মন্ত্রিসভাও 'এই প্রশ্নে আর যৌথ দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছেন না। অন্ধ্র থেকে নির্বাচিত মন্ত্রীরা আর তেলেঙ্গানা থেকে নির্বাচিত মন্ত্রীরা প্রকাশ্যেই দুই বিরুদ্ধ শিবিরে জড় হয়েছেন।

এই বিরোধের অবসান করে যাতে একটা সর্বসম্মত সমাধান খুঁজে বার করা যায়, সেজন্য অন্ধ্র ও তেলেঙ্গানার নেতারা দিল্লিতে গিয়ে একপক্ষকালের মধ্যে দু-দফা বৈঠক করেছেন। তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে, অর্থমন্ত্রী চ্যবনের সঙ্গে, কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ শঙ্করদয়াল শর্মার সঙ্গে অনেক কথাবার্তা বলেছেন। কিন্তু সমাধানের কোন সূত্র পাওয়া যায়নি। যে-প্রশ্নে মতবিরোধের কোনরকম সামঞ্জস্য করা যাচ্ছে না, সেটা হল তেলেঙ্গানাবাসীদের সম্পর্কে রক্ষাকবচ হায়দরাবাদ শহরেও প্রযোজ্য হবে কিনা। অন্ধ্র নেতাদের বক্তব্য হল, যদিও হায়দরাবাদ তেলেঙ্গানায় অবস্থিত, তাহলেও যেহেতু এটি রাজ্যের রাজধানী সেহেতু এখানে অন্ধ্র ও তেলেঙ্গানার মানুষদের সমান সুযোগ থাকা উচিত। তেলেঙ্গানার নেতারা এটা মানতে প্রস্তুত নন, যদিও তাঁরা হায়দরাবাদ শহরে অবস্থিত শিক্ষালয়গুলিতে ভর্তির ব্যাপারে ও ঐ শহরের কিছু কিছু অফিসে চাকরি পাওয়ার ব্যাপারে তেলেঙ্গানাবাসীদের বিশেষ সুযোগসুবিধা কতকটা ছাড়তে রাজি হয়েছেন।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, তেলেঙ্গানা অন্ধ্রের সঙ্গে যুক্ত হলেও গত ১৬ বছরে এই দুই অঞ্চলের ভাবগত সংযুক্তি হয়নি। তেলেঙ্গানাবাসীরা বঞ্চিত বোধ করছেন। তাঁদের অভিযোগ, তেলেঙ্গানাবাসীদের স্বার্থরক্ষার জন্য ১৯৫৬ সালে যে 'ভদ্রলোকের চুক্তি' -করা হয়েছিল সেই চুক্তি সঠিকভাবে পালন করা হয় নি, তেলেঙ্গানার টাকা অন্ধ্রের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হয়েছে ইত্যাদি। এইসব অভিযোগের উপর ভিত্তি করে তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতি গড়ে তোলা হয়েছিল এবং সেই সমিতির নেতৃত্বে ১৯৬৯ সাল থেকে তেলেঙ্গানায় জোরদার আন্দোলন হয়েছে। গত বছরের নির্বাচনের প্রাক্কালে সমিতির সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার ফলে সমিতি নিজেকে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত করেছিল। কিন্তু মুলকি বিধি সংক্রান্ত বিতর্ককে কেন্দ্র করে অন্ধ্র-তেলেঙ্গানা বিরোধ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

এই বিরোধের অবসান কিভাবে হবে তার কোন হদিশই এখন পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। নয়াদিল্লী প্রথমে এই ব্যাপারে হাত গুটিয়ে ছিল। কেন্দ্রীয় নেতারা বলছিলেন, যে সমাধানই হোক না কেন সেটা খুঁজে বের করতে হবে দুই অংশের নেতাদের নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার দ্বারা, উপর থেকে কোন সমাধান তাঁরা চাপিয়ে দেবেন না। ইতিমধ্যে একদিকে অন্ধ্রের আইন ও শৃংখলা পরিস্থিতির সঙ্কট তীব্রতর হচ্ছে ও অন্যদিকে সেখানে রাজনৈতিক সঙ্কট ঘনীভূত হচ্ছে। মুলকি বিধির বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীরা রেলওয়ে স্টেশনগুলির উপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। গত ২১ নভেম্বর অন্ধ্রের সরকারি কর্মচারীরা ও ছাত্ররা মুলকি বিধি নাকচ করার দাবিতে যে 'অন্ধ্র বন্ধ' আহ্বান করেছিলেন সেটা সফল হলেও শান্তিপূর্ণ হয় নি। ঐদিন অন্ধ্রের তিনটি শহরে পুলিশের গুলিবর্ষণে ১৪ জন মারা গেছেন। এভাবে আইন ও

শৃঙ্খলার পরিস্থিতি যখন খারাপ হচ্ছে তখন অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শ্রী পি ভি নরসিংহ রাওয়ের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে উঠছে। দলের মধ্যে তাঁর প্রভাব এমনিতেই খুব বেশি নয়। শ্রীমতী গান্ধী চেয়েছিলেন বলেই তাঁকে নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছিল। এখন তাঁর প্রতিপক্ষ সামান্য সুযোগ পেলেই তাঁকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেবেন।

এই পরিস্থিতির অবসান কিভাবে হবে সেটা এখন নির্ভর করছে কেন্দ্রীয় নেতাদের উপর। অন্ধ্রের দুই অংশের নেতারা সমাধানের সূত্র বের করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এখন কেন্দ্রীয় নেতারা চান বা না চান, তাঁদেরই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে হবে। শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন, দুচারদিনের মধ্যেই এবিষয়ে কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবে। সেই সিদ্ধান্ত সকলের পক্ষেই সন্তোষজনক না হোক, অন্তত সকলের পক্ষেই সবচেয়ে কম আপত্তিকর হবে বলে শ্রীমতী গান্ধী আশা প্রকাশ করেছেন।

শ্রীমতী গান্ধী সঙ্গে সঙ্গে একথাও পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তেলেঙ্গানা সমস্যার যে সমাধান করা হোক না কেন সেটা করা হবে অবিভক্ত অন্ধ্র রাজ্যের ভিত্তিতে, তেলেঙ্গানাকে পৃথক করে দিয়ে তেলেঙ্গানা সমস্যার সমাধান কখনই করা হবে না।

এই তেলেঙ্গানা সমস্যার সমাধান কিভাবে হয় তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। এক ভাষা এক রাজ্য নীতি গ্রহণ করার পরও অনেক আঞ্চলিকতার সমস্যা রয়ে গেছে এবং সেটা কেবল অন্ধ্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। অন্ধ্রে আজ যা করা হবে আগামীকাল তার প্রভাব অন্যান্য অনেক রাজ্যেই পড়বে।

*   *   *

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জন্মদিনে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিকসন যে বার্তা পাঠিয়েছেন তাতে নয়াদিল্লির সরকারি পর্যবেক্ষকরা ভারত-মার্কিন সম্পর্কের দিক থেকে সুলক্ষণ দেখতে পেয়েছেন।

যে পরিস্থিতিতে ও যে ভাষায় বার্তাটি লেখা হয়েছে তাতে উৎসাহ বোধ করার কারণ আছে সন্দেহ নেই। প্রেসিডেন্ট নিকসনের এই বার্তা প্রেরণ কূটনৈতিক শিষ্টাচার মাত্র নয়, তার অতিরিক্ত আর একটু কিছু। নির্বাচনে নিকসনের বিজয়-লাভের পর তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে শ্রীমতী গান্ধী যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন তারই জবাবে নিকসনের এই বার্তা। কিন্তু এই উত্তর পাঠাবার জন্য তিনি কয়েকদিন অপেক্ষা করে শ্রীমতী গান্ধীর জন্মদিনটি বেছে নিয়েছেন যাতে শীতল শিষ্টাচারের অতিরিক্ত কিছু উষ্ণতার সঞ্চার করা যায়। তাঁর বার্তার এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, 'আগামী দিনের সেই সম্ভাবনার দিকে আমি তাকিয়ে আছি যখন আমি সেই মহৎ লক্ষ্য (অর্থাৎ স্থায়ী বিশ্বশান্তি) সিদ্ধির জন্য আমি আপনার সঙ্গে ও বিশ্বের অন্যান্য নেতার সঙ্গে কাজ করব। ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক উন্নত করার জন্য আপনি যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তাতে আমার সায় আছে এবং আমি আশা করি, বোঝাপড়া ও পারস্পরিক স্বার্থের স্বীকৃতির ভিত্তিতে দুই দেশের ভিতর অধিকতর সুষ্ঠু সম্পর্ক গড়ে উঠবে।' এই কথাগুলির মধ্যে এমন একটা সুর রয়েছে যা ইদানীংকালে কোন মার্কিন রাষ্ট্রনায়ককে ভারতের প্রতি ব্যবহার করতে দেখা যায় নি। বিশ্ব রাজনীতিতে ভারতকে উপেক্ষা করাই যেন আমেরিকার নেতাদের অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ নিকসন শ্রীমতী গান্ধীকে বিশ্বের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে গণ্য করছেন এবং তাঁর সহযোগিতা প্রার্থনা করছেন, এটা একটা [illegible] ব্যতিক্রম।

অবশ্য, প্রেসিডেন্ট নিকসনের এই বার্তা ভারত-মার্কিন সম্পর্কের উন্নতির খুব সামান্য একটা সূচনা মাত্র, এর বেশি আর কিছু এখন পর্যন্ত বলা যায় না। এই সূচনাকে পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার পথে অনেক দুস্তর বাধা রয়েছে। এমনি কয়েকটি বাধা হল :—উপমহাদেশে সব

প্রভৃতি পাকিস্তানের দিকে মার্কিন পক্ষপাতের পাল্লা ঝুলিয়ে রাখার নীতি, এই উপমহাদেশে ভারতের স্বাভাবিক ভূমিকাকে অস্বীকার করার মার্কিন প্রবণতা, ভারত-সোভিয়েট সম্পর্কের বিষয়ে আমেরিকার সংশয়, ভারতে সি আই এ-র ভূমিকা সম্পর্কে ভারতীয় নেতাদের অভিযোগ ইত্যাদি। শুধু সাময়িক সদিচ্ছার দ্বারা এইসব বাধা দূর করা যাবে না।

২২-১১-৭২ —পুণ্ডরীক

মন্ত্রী ওয়ালটার সিলের ফ্রি ডেমোক্রাটিক পার্টি শতকরা ৭ ভাগ ভোট লাভে সক্ষম হয়েছে। সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি এবার সর্বপ্রথম ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টির বিরুদ্ধে সব থেকে বেশী ভোটে জয়লাভ করল। বুন্ডেসট্যাগে কোয়ালিশনের সদস্য সংখ্যা বিরোধী ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টি থেকে ২২টি বেশী। চ্যান্সেলার ব্রান্টের জয়লাভে ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা বাস্তবায়িত করবে। দুই জার্মানীর বহু রোপীয় শান্তির পথকে প্রশস্ত করবেন। এবারের নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য নতুন ভোটদাতাদের সংখ্যাবৃদ্ধি। ১৯৬৯ খৃঃ থেকে এবারে তাদের সংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণ। ৪০-৬ মিলিয়ন ভোটদাতার মধ্যে নতুনের সংখ্যা ৪-৮ মিলিয়ন। অবশ্য ১৯৬৯ খৃঃ নির্বাচনে ভোটাধিকার লাভের নিম্নতম বয়সসীমা ছিল ২১। এবার হয়েছে ১৮। যার ফলে বাড়তি ভোটদাতার সংখ্যা শতকরা ১২ ভাগ বেড়ে যায়।

১৯৪৯ খৃঃ থেকে পশ্চিম জার্মানীর নির্বাচন

বৎসর	ভোটার সংখ্যা	ভোট পরিমাণ	সি ডি ইউ/ সি এস ইউ	এস পি ডি	এফ ডি পি	কে পি ডি	এন পি ডি	অন্য দল
১৯৪৯	৩১,২০৭,৬২০	৭৮·৫%	৭,৩৫৯,০৮৪ ৩১·০% মোটঃ ১৩৯	৬,৯৩৪,৯৭৫ ২৯·২% মোট ১৩১	২,৮২৯,৯২০ ১১·৯% মোট ৫২	১,৩৬১,৭০৬ ৫·৭% মোট ১৫	৪২৯,০৩১ ১·৮% মোট ৫	৫,২৪৬,৭১৩ ২০·৩% মোট ৬০
১৯৫৩	৩৩,১২০,৯০০	৮৬·৮%	১২,৪৪৪,০৫৫ ৪৫·২% মোট ২৪৩	৭,৯৪৪,৯৫৩ ২৮·৮% মোট ১৫১	২,৬২৯,১৬৯ ৯·৫% মোট ৪৮	১,৬০৭,৭৬১ ২·৩% মোট—	২৯৫,৭৪৬ ১·১% মোট—	৩,৬২৯,৬৭৮ ১৩·১% মোট ৪৫
১৯৫৭	৩৫,২২৬,২১২	৮৭·৮%	১৫,০০৮,৩৯৯ ৫০·২% মোট ২৭০	৯,৪৯৫,৫৭১ ৩১·৮% মোট ১৬৯	২,৩০৭,১৩৫ ৭·৭% মোট ৪১	— মোট—	৩০৮,৫৬৪ ১·০% মোট—	৩,০৯৪,৩২৩ ১০·৩% মোট ১৭
১৯৬১	৩৭,৪৪০,৭১৫	৮৭·৭%	১৪,২৯৮,৩৭২ ৪৫·৩% মোট ২৪২	১১,৪২৭,৩৫৫ ৩৬·২% মোট ১৯০	৪,০২৮,৭৬৬ ১২·৮% মোট ৬৭	— মোট—	২৬২,৯৭৭ ০·৮% মোট—	১,৭৯৬,৪০৮ ৫·৭% মোট—
১৯৬৫	৩৮,৫১০,৩৯৫	৮৬·৪%	১৫,৫২৪,০৬৮ ৪৭·৬% মোট ২৪৫	১২,৮১৩,১৮৬ ৩৯·৩% মোট ২০২	৩,০৯৬,৭৩৯ ৯·৫% মোট ৪৯	— মোট—	৬৬৪,১৯৩ ২·০% মোট—	১,১৮৬,৪৪৯ ৩·৬% মোট—
১৯৬৯	৩৮,৬৭৭,২৩৫	৮৬·৭%	১৫,১৯৫,১৮৭ ৪৬·১% মোট ২৪২	১৪,০৬৫,৭১৬ ৪২·৭% মোট ২২৪	১,৯০৩,৪২২ ৫·৮% মোট ৩০	১৯৭,৩৩১ ০·৬% মোট—	১,৪২২,০১০ ৪·৩% মোট—	২১,৬৮০ ০% মোট—

পশ্চিম জার্মাণীর নির্বাচন

পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলার ভিলি ব্রান্ট পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রাইনার বারজেল পরাজিত হয়েছেন। মিঃ ব্রান্ট হলেন সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির চেয়ারম্যান। মিঃ বারজেল হলেন ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রেটিক ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। তিনি ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক ইউনিয়ন এবং ক্রিশ্চিয়ান সোস্যালিস্ট ইউনিয়নের পার্লামেন্টারী গ্রুপেরও নেতা। মিঃ ব্রান্টের এই সাফল্য ১৯৫৭ খৃঃ ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাট দলের কনরাড আদেনুয়েরের সাফল্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

এবারের নির্বাচনে চ্যান্সেলার ব্রান্টের সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি এবং ফ্রি ডেমোক্রাটিক পার্টি কোয়ালিশন সর্বাধিক আসন এবং শতকরা ৫৪ ভাগেরও বেশী ভোট পেয়েছে। সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি শতকরা ৪৬-৪, বারজেলের ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টি শতকরা ৪৪-৭ এবং পররাষ্ট্র মানুষের আকাঙ্ক্ষা দু-দেশের মধ্যে অবাধ চলাচল হোক। তারই প্রাথমিক সূত্রপাত ঘটে কিছুকাল আগে দু-দেশের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিতে। চ্যান্সেলার ব্রান্ট মনে করেন আজ দু জার্মানী স্বতন্ত্রভাবে রাষ্ট্রসংঘে প্রতিনিধিত্বে সক্ষম। নির্বাচনে জয়লাভের পর মিঃ ব্রান্ট ঘোষণা করেছেন যে পূর্ব জার্মানীর সঙ্গে সৎ প্রতিবেশীর মত বাস করতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে এক চুক্তি সম্পাদন করতে এবছরের শেষে তিনি যাবেন পূর্ব বার্লিন। কেউ কারো কাজে বাধা দেবে না। সম্ভবত জার্মানীর ভোটদাতাদের বাসনার সঙ্গে এর মিল ঘটেছে। যে কারণে কোয়ালিশন নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি চ্যান্সেলার ব্রান্টের নির্বাচনে জয়লাভের পথকে সহজ করে। তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে মুদ্রাস্ফীতির অভিযোগ তুলেও বিরোধীরা সুবিধা করতে পারেন নি। জার্মান পার্লামেন্টের নিম্ন পরিষদ বুন্ডেসট্যাগে এবার কোয়ালিশন সদস্যরা সম্ভবত ইউ-

সি ডি ইউ—ক্রিশ্চয়ান ডেমোক্রাটিক ইউনিয়ন। ব্যাভেরিয়া বাদ দিয়ে অন্য সকল অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৫ খৃঃ

সি এস ইউ—ক্রিশ্চিয়ান সোস্যাল ইউনিয়ন। ১৯৪৫ খৃঃ ব্যাভেরিয়ায় প্রতিষ্ঠা হয়। সেখানেই মাত্র নির্বাচনে প্রার্থী দেয়। সি ডি ইউ এবং সি এস ইউ নির্বাচনী ক্ষেত্রে একসঙ্গে কাজ করে।

এস পি ডি—সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি অফ জার্মানী।

এফ ডি পি—ফ্রি ডেমোক্রাটিক পার্টি অফ জার্মানী।

কে পি ডি—কমিউনিস্ট পার্টি অফ জার্মানী। ১৯৪৯ খৃঃ ১৯৫৩ খৃঃ নির্বাচনে অংশ নেয়। ১৯৫৬ খৃঃ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি নতুন করে গড়ে ওঠে। অন্য দলের সঙ্গে মিলে ১৯৬৯ খৃঃ নির্বাচনে অংশ নেয়।

এন পি ডি—ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক পার্টি অফ জার্মানী। সম্পূর্ণ দক্ষিণপন্থী দল।

চোখে-মুখে প্রথম সকালের আলোর ঝলক লাগতেই অস্ফুটে বিরক্তির শব্দ করে উঠল অমল।

—আবার পাশ ফিরে শুচ্ছ যে, সুজাতার শান্ত প্রশ্ন শোনা গেল।

—জানালাটা খুললে কেন চোখের সামনে, গলা পর্যন্ত লেপ টেনে নিয়ে অমল উত্তর দিল।

সুজাতা আর কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করল না। রোজ সকালে অমলকে এরকম ঘুম থেকে তোলা তার একটা গুরু দায়িত্ব। তা প্রায় পাঁচ বছর ধরে।

—একটু আগে সদরে ডাকাডাকি করছিল কে? অমল ওপাশে ফিরে থেকেই জিজ্ঞেস করল।

—জানোই তো। চাঁদা। ঘুরে আসতে বলেছি।

—কিছু দিয়ে বিদায় করে দিলে না কেন একেবারে। অর্থাৎ অমল নিজে নির্ঝঞ্ঝাট থাকবে সব সময়। শুনে ঈষৎ উষ্ণ বোধ করল সুজাতা। অধৈর্যের গলায় বলল,—

—সকলকেই যে দিতে হবে তার কি মানে আছে। দলে-দলে অফুরন্ত আসছে যখন, কাউকে কাউকে তো ভাগিয়ে দিতেই পারো। এসব তোমারই কর্তব্য।

—নিক না, কত নেবে। উদার মানুষের মতন মহান গলা করল অমল, ওদের সকলের গ্রহণ ক্ষমতাও তো সমান নয়। বড়-দের দাবী খুব জোর পাঁচ পর্যন্ত ওঠে, মাঝারীদের দুই আর ছোটদের তো ধর্তব্য নয়, আট আনাতেই দাবী মিটে যায়।

—ঢঙ। শব্দটা সম্ভবত মনে-মনে উচ্চারণ করল সুজাতা। তারপর অমলের ঘুম-চোখে-খাওয়া চায়ের শূন্য কাপ-ডিশ নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ওর ঝঙ্কৃত চলে যাওয়া টের পেয়ে এদিকে ফিরল অমল। শব্দ করে হাই তুলল। বাঁ পাশের খোলা জানালাটার দিকে তাকাতে এবার ভালই লাগল তার। বস্তুত শীতের সকালগুলোতে কি রকম একটা পবিত্রতার আমেজ যেন উপলব্ধি হয়। বাইরে নরম হাল্কা হলুদ রোদ। ভাড়াটে ঘরের রঙচটা কেঠো জানালা, ঝুল-মজা কালচে কার্ণিশ আর শ্রীহীন গরাদেও সকালের আলো ঝলমল করছে। পরিষ্কার আকাশ জানালার ফ্রেমে ছবি হয়ে আছে। অনেক দূরে কটা কাক চিলের অবাধ পক্ষবিস্তার।

চুপচাপ শুয়ে থাকতে এবার বিরক্তি ধরল অমলের। আলস্য ছাড়িয়ে উঠে পড়ল। এলোমেলো চুল আঙুল দিয়ে সিধে করতে করতে আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল। এবং এতক্ষণে ঝুমার কথা মনে এল তার। ঘুমোবার আগে কাল রাত্রে মাথার চুল-গুলোতে আদর করে হাত বুলোতে বুলোতে কি রকম জট পাকিয়ে দিয়েছে। ধারে-কাছে আপাতত ঝুমার সাড়া-শব্দ নেই। অর্থাৎ ভোরবেলা স্কুলে গেছে সে। প্রায় মাস দুয়েক হল স্কুলে যাচ্ছে ঝুমা। অথচ ভোরবেলা কখন তাকে বিছানা থেকে তুলে নিয়ে যায় সুজাতা. খাইয়ে সাজিয়ে পাশের বাড়ীর মেয়ের সঙ্গে স্কুলে পাঠিয়ে দেয়, সেসব একেবারেই জানতে পারে না অমল। বস্তুত অমল যেন তার সংসারের মধ্যে প্রায় বিনা দায়-দায়িত্বেই গায়ে ফুঁ লাগিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছে। একথা ভেবে ঠোঁটের কোণে হাসি চিড় খেল অমলের। সুজাতার রাগী মুখটা একবার মনে করল তারপর বাথরুমের দিকে চলে গেল।

রান্নঘরে ব্যস্ত হাতে কাজ সারছে সুজাতা, টুকিটাকি শব্দ ভেসে আসছে। বাইরের ঘরে টেবিলের ওপর অমলের জন্য দ্বিতীয় কাপটা ঢাকা পাশে বিস্কুট ভরা স্ন্যাকস্-এর টিনটা। অমল মুখ-হাত মুছে চেয়ারে বসে খবরের কাগজ খুলল।

কিছু পরে রান্নাঘর থেকে উঠে এল সুজাতা। আলনায় ঝোলানো গামছায় হাত মুছল। তারপর কি ভেবে শোবার ঘরে ঢুকে গেল। ওর ভঙ্গীতে এখন বেশ একটা শিথিল নিশ্চিন্ত ভাব। অর্থাৎ তার সকালের কাজকর্ম আপাতত শেষ। এখন অমল স্নানটান সেরে এলেই সে অমলের খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবে। টিফিনের কৌটো গুছিয়ে দিয়ে দেবে সঙ্গে। অমল মাঝে মাঝে আশ্চর্য হয়ে ভাবে কত ভোরবেলা নিজে থেকেই ঘুম ভেঙে উঠে পড়ে সুজাতা আর কি দারুণ ক্ষিপ্রতায় সাংসারিক সব কাজ সেরে ফেলে চটপট। বস্তুত সুজাতা যেন সংসারের প্রতি একটা নিবিড় ভাল-বাসায় জড়িত।

সকালের হাওয়ায় বেশ খানিকটা

শীতের আমেজ। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোদ ঘন হচ্ছে। দালানের দক্ষিণ জানালার কোণের কাছে ছোট্ট চৌকোণা দুটো টবে শখ করে নিজে কিনে এনে বাহারী গাছ পুঁতেছে সুজাতা। ক্ষুদ্র পাতাগুলি নিঃশব্দ হাওয়ায় উজ্জ্বল আলোয় থিরথির করে কাঁপছে। সেদিকে চেয়ে চেয়ে শরীর জড়িয়ে একটা আলস্য বোধ করল অমল। এখন ঠাণ্ডা জলে স্নান করে খেয়ে অফিস যাবার কথা ভাবতে ভাল লাগছিল না তার। অথচ সময় তার জন্য বসে থাকে না। এখনি তাড়াহুড়ো করে তৈরী হয়ে না নিলে দেরী হয়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা।

—বাবার চিঠিটা পড়লে কাল? বলতে বলতে সুজাতা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, হাতে একটা উলের বোনা, সম্ভবত ঝুমার কার্ডিগান। রঙিন উলের বলটা পাঁজরের সঙ্গে কনুই দিয়ে চেপে ধরা। শ্বশুরের অর্থাৎ অমলের বাবার চিঠির কথা উল্লেখ করছিল সুজাতা।

—হুঁ। অমল ওর প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল। তার চোখ তখনো খোলা খবরের কাগজের পাতায়।

—কিছু ঠিক করলে নাকি ও'র ব্যাপারে? সুজাতা ওর মুখোমুখি একটা টুলে বসে বোনা শুরু করে দিল।

—হুঁ। আবারো অন্যমনস্ক গলায় ছোট করে সায় দিল অমল ওর কথায়।

—কি হুঁ-হুঁ করছ তখন থেকে, অসহিষ্ণু গলায় বলে উঠল সুজাতা, ভাল করে কথার জবাব দেবে তো একটা।

যথাসম্ভব দ্রুত চোখ বুলিয়ে কাগজের সমস্ত খবর গলাধঃকরণ করতে চাইছিল অমল। না হলে সারা দিনটা তার কেমন যেন খুঁত-খুঁতে লাগে। সুজাতার প্রশ্নের ঝাপটায় তার মনোযোগ বিঘ্নিত হল। সামান্য অধৈর্যের সঙ্গে উত্তর দিল,

—বলছি তো, বাবা যা চেয়েছেন পাঠিয়ে দেব।

—কিন্তু ঘরে তো তোমার বাড়তি পঞ্চাশ টাকা নেই। উলের বোনায় চোখ রেখে বলল সুজাতা।

—অফিস যাবার সময় ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নেবখন কিছু, নির্লিপ্ত স্বরে বলল অমল। দু হাত ছেড়ে আড়মোড়া ভেঙে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল।

এ সময় বাইরে থেকে চিৎকার করে ফ্ল্যাটের দরজা ঠেলল ঝুমা! অমল খুলে দিয়ে বলল,

—আজ এত সকাল সকাল যে, ঝুমা?

—কি জানি কেন তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেল, ঝুমকো চুল দুলিয়ে খুশীর হাসি হাসল ঝুমা। তারপর লাফিয়ে সুজাতার কোলের কাছে গিয়ে বোনা দেখতে লাগল।

—টাকাটা যেভাবে হোক পাঠাতেই তো হবে, অমল এক মুহূর্ত থমকে নিজের থেকেই বলল, বিশেষ করে চিকিৎসার জন্যে চেয়েছেন যখন।

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই, ঝুমার কাছ থেকে উল কাটা সামলাতে সামলাতে উত্তর দিল সুজাতা।

অমলকে খেতে বসিয়ে সুজাতা আবার পাড়ল কথাটা।

—বাবাকে তাহলে আজ একটা পোস্ট-কার্ড দিয়ে দিই, টাকা পাঠাচ্ছি লিখে?

—তাই দাও। অমল অন্যমনস্ক গলায় বলল। তার মনে হল সুজাতা অতিরিক্ত সংসারপ্রবণ। সংসারের কর্তব্য দায়দায়িত্ব সম্বন্ধে ভীষণ সচেতন। হয়ত এটা ভালো, খুবই ভালো। সব মেয়ের মধ্যে হয়তো এ রকম দায়িত্বপ্রবণতা থাকে না।

—আজ ফিরতে তোমার দেরী হবে? তেমনি টুলে বসে বোনায় নিমগ্ন থেকে জিজ্ঞাসা করল সুজাতা। ওর পাশে ঝুমা।

—কেন? মুখের গ্রাস গলাধঃকরণ করে বলল অমল, সুজাতার দিকে তাকাল, ঝুমা ওর কাছ থেকে রঙিন উলের বলটা নিয়ে খেলা শুরু করেছে। সুজাতা সেটা কাড়তে ব্যস্ত। ঝুমা দারুণ ছটফটে মেয়ে।

—কি হল? অমল আবার খাওয়ায় মন দিল।

—ভীষণ দুষ্টু হয়ে উঠেছে আজকাল, ওর সঙ্গে আমি পেরে উঠি না বুঝলে। সুজাতা উত্যক্ত গলায় বলল। ঝুমা এতক্ষণে উলের বলটা গড়িয়ে দিয়েছে মাটিতে। খুলতে খুলতে সেটা চলে যাচ্ছে বাথরুমের দরজার দিকে। দেখে হৈ-হৈ করে উৎকণ্ঠায় আক্ষেপে ক্ষিপ্রবেগে উঠে দাঁড়াল সুজাতা। ঝুমা লাফিয়ে লাফিয়ে ধরতে ছুটল বলটাকে। দৃশ্যটা দেখে হাসি পেয়ে গেল অমলের, কৌতুকে শব্দ করে হেসে উঠল এবং ওকে হাসতে দেখে আবার টুলে বসে পড়ল সুজাতা। ঝুমাকে বলটা কুড়িয়ে আনতে দেখে অমল আবার জিজ্ঞাসা করল সুজাতার দিকে তাকিয়ে,—

—ফেরার কথা জানতে চাইলে কেন বললে না।

বলের মধ্যে খোলা উল দ্রুত হাতে গুটিয়ে নিচ্ছিল সুজাতা। সামান্য দ্বিধায় ইতস্তত করে বলে উঠল,

—ঝুমাকে পাশের ফ্ল্যাটে রেখে আজ একটা সিনেমা দেখতে যাব ভাবছিলাম। বহুদিন যাইনি।

—বেশ তো, আইডিয়াটা খারাপ নয়। অমল উৎসাহ দেখাবার চেষ্টা করল। হাত-ঘড়িতে সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। অমল তাড়া-তাড়ি খাওয়া শেষ করছিল।

খেলাটা ঝুমার দারুণ লেগেছে, বলটাকে আবার ঠেলে দিয়েছে মেঝেয়, খুলতে-খুলতে সেটা চলে যাচ্ছে ঢালুর দিকে। আবার লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ধরতে যাচ্ছে। সুজাতা অত্যন্ত রাগত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওর দিকে। এখনি হয়তো দু-চার ঘা পিঠে বসিয়ে দেবে। অমলের কিন্তু খেলাটা মন্দ লাগছে না দেখতে, ঝুমার মতন সেও যেন একটা বেশ থ্রিল উপভোগ করছে। ক সেকেন্ড সে দিকে তাকিয়ে অমল বলল,

আমি আসবার চেষ্টা করব। তারপর কলঘরের দিকে চলে গেল।

শীতের বেলায় এখনো কিছু উজ্জ্বলতা অবশিষ্ট আছে। হাল্কা পরাগ রঙের রোদ অনেক দূরে দূরে মেঘের খাঁজে খাঁজে ছড়িয়ে, ছিটিয়ে থাকায় বেশ একটা মেজাজী আবহাওয়া যেন বিছিয়ে রয়েছে। অফিস থেকে আজ বেশ তাড়াতাড়িই বেরিয়ে এসেছে অমল। সুজাতা তার সাধ-ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা এমন কিছু সব সময় মুখ ফুটে বলে না। অতএব তার এক-একদিনের সখের দাবীকে পূরণ করে দেওয়াই ভালো। স্বামীত্বের দায়, মনে মনে কথাটা উচ্চারণ করল অমল, আপন মনেই মুখ টিপে হাসল। পড়ন্ত বেলার ফুরফুরে হাওয়ায় ক্রমশ রঙ বদলানো আকাশ দেখতে-দেখতে বাস স্টপে পৌঁছল অমল, কবজি তুলে ঘড়ি দেখল প্রায় চারটে পনেরো। পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ভেতর বাড়ী পৌঁছে মুখ-হাত ধুয়ে নিলে ঠিক সময়ে সিনেমায় হাজির হতে পারবে। সিনেমা হলগুলো তার বাড়ী থেকে এমন কিছু দূরে নয়। প্যান্টের লুকোন পকেটে বাবার জন্যে ব্যাঙ্ক থেকে তোলা টাকাগুলো রয়েছে। মনে পড়তে শরীরে একবার টাকাগুলোর স্পর্শবোধ করল অমল। এবং সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা আত্ম-প্রসাদ। বাবা চাওয়ামাত্রই দিতে পারছে বলে। সময়ে সময়ে এমন পরিস্থিতি আসে, দূর-মনস্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সিদ্ধান্ত করল অমল, যখন নিজের লোকসানেও আত্মতৃপ্তি আসে। লোকসান তো অবশ্যই! পুঁজি ভেঙে বার করা মানেই সেটা লোক-সান। অমল ভাবল, ঐ তো কটা টাকা মাত্র আছে ব্যাঙ্কে! চারশো চল্লিশ টাকা, বহু মাসের উদ্বৃত্তে জমানো। বাবার চাহিদার পঞ্চাশ টাকা তুলবে ভেবেছিল, অনেক ইতস্তত করে শেষে ঐ চল্লিশ টাকাই লিখেছে চেকে। খুচরোটা উঠে আসুক, তবু শয়ের অঙ্কটা থাক অভগ্ন অবস্থায়। মা-বাবা বোঝেন, একমাত্র ছেলে যখন, এবং সে ছেলে ভাল আয় করে স্ত্রী-কন্যা নিয়ে কলকাতার ফ্ল্যাটে বসবাস করে তখন তার খরচ করারও অসীম ক্ষমতা। মাসের প্রথমে আয়ের একটা ছোট অংশ যথাসম্ভব দেশের বাড়ীর ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং সেখানকার টুকরো জমি, কটা আম পেয়ারা নারকেল প্রভৃতি গাছ থেকে আয়ের কোন হিসাবই নেয় না অমল। তবুও মাঝে-মধ্যে ফরমাস আসে, প্রয়োজনের দাবী, কখনো অনুযোগ অভিযোগ। যেহেতু অমল শিক্ষিত উপার্জনশীল এবং ইত্যাদি ইত্যাদি —যাক-গে গুলি মারো। কটা টাকা ফেলে দিলে যদি নিশ্চিন্ত থাকা যায়, তাহলে নিঃস্ব হয়েও সুখ। মোটমাট অমল শান্তি-প্রিয়, নির্ঝঞ্ঝাট বিলাসী মানুষ।

সামনে দিয়ে অনবরত গাড়ীগুলির সরব যাতায়াত তবু অমলের উদ্দিষ্ট বাস আসতে দেরী করছে। বড় বড় বাড়ীর জানালা কার্নিশ থেকে, জল থেকে গাছের মাথা থেকে রোদের রঙ ক্রমশ মুছে গিয়ে একটা শান্ত, নরম আলো চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। ঘড়ি তুলে আর একবার দেখল অমল, এত তাড়া-তাড়ি করেও দেরী হয়ে যাবে, আর নির্বোধের মত অসন্তুষ্ট হবে সুজাতা। এবং এটা অবধারিত বলেই অমল জানে যে, কদাচিৎ যখনই সে সুজাতার মন রাখতে

সাম্রাজ্যতন্ত্র প্রয়াসী হয়, তখনই সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

এসব ভাবতে ভাবতে সিগারেট ধরাচ্ছিল অমল, এসময় পাশ থেকে কে ভারী গলায় হেঁকে উঠল,

—অমল যে।

অমল পাশ ফিরে দেখল নিরঞ্জন, তার পাশে তনুশ্রী। তার মুখ হাসিতে বিস্তৃত:

—এসময়ে বাসের জন্যে হন্যে হয়ে দাঁড়িয়ে আছিস যে? যাচ্ছিস কোথায়, বাড়ী? এমন-ভাবে বাড়ী কথাটা উচ্চারণ করল নিরঞ্জন, মনে হল এমন সময় বাড়ী ফেরাটা কারুর পক্ষে যথেষ্ট হীনতাব্যঞ্জক কাজ। ওর প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় সূক্ষ্ম দ্বিধা এল অমলের গলায়,

—হ্যাঁ, বাড়ী ফেরারই চেষ্টা করছি।

—বউয়ের অর্ডার আছে বুঝি। বলে নিরঞ্জন রাস্তা কাঁপিয়ে হে-হে করে হেসে উঠল, ওর হাসির প্রাবল্যে হেসে উঠল তনুশ্রীও।

নিরঞ্জনের স্বভাবই এই। কাউকে খোঁচাবার সুযোগ পেলে চট করে ছাড়ে না। ওর ঠাট্টায় যদিও অপ্রস্তুত বোধ করল, না অমল তবু প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বলল,

—তোরা যাচ্ছিলি কোথায় এদিক দিয়ে।

—আমাকে তো জানিস, সবসময় বিজনেস ম্যাটার, বিজনেসের তাগিদে সর্বক্ষণ
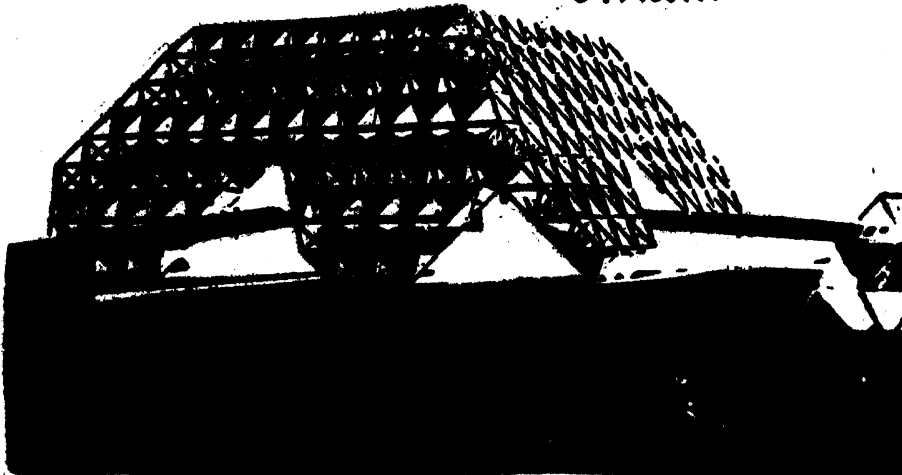
উড়ন্ত চাকির মতন ঘুরে যাচ্ছে বনবন করে।

কথাটা বাহুল্য নয়। নিরঞ্জনের পৈতৃক সূত্রে পাওয়া একটা মাঝারি প্রেস আছে। তদুপরি ইদানীং পাবলিশার হয়েছে নিরঞ্জন। একটা নাকি মাসিক পত্রিকাও বার করে নিজের বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে থেকে। অতএব নিরঞ্জন অবশ্যই ব্যস্ত মানুষ।

—তা তোর কক্ষপথে এই উপগ্রহটিকে সংগ্রহ করলি কি করে। কুঞ্চিত কটাক্ষ-দৃষ্টিতে তনুশ্রীর দিকে তাকিয়ে অমলও ঠাট্টা করল এবার।

—আহা আমি উপগ্রহ হতে যাব কোন দুঃখে। চোখ বড় বড় করে আপত্তি জানাল তনুশ্রী। আমারও নিজের বিজনেস ম্যাটার তো থাকতে পারে।

—ওর কথা আর বলিস না, নিরঞ্জন অমলকে সিগারেট দিল, নিজেও ধরিয়ে বলল, এই অরণ্যসংকুল রাজপথে অরক্ষিতা একাকিনী ঘুরছিল, আমি ট্যাক্সি ছুটিয়ে যেতে যেতে ওকে পিক-আপ করে নিলাম। সেই থেকে আমার কবলিত হয়েই বেড়াচ্ছে।

—এই বাজে বকবক করলে ভাল হবে না কিন্তু। তনুশ্রী এবার নিরঞ্জনকে শাসন করলো।

ওদের আলাপ শুনে হাসছিল অমল, এসময় দেখলো তার বাস কাছাকাছি এসে পড়েছে।

—এই আমি চলি, আমার বাস এসে গেছে। ওদের দুজনের দিকে বিদায়সম্ভাষণ সূচক দৃষ্টি ফেলে এগোল অমল, এবং তৎক্ষণাৎ নিরঞ্জন পেছন থেকে তার জামার কলার ধরে টান দিল।

—ধ্যাৎ, এক্ষুনি বাড়ী ফেরার জন্যে ব্যস্ততা কিসের তোর? তুই কি অসুস্থ, না বুড়ো হয়ে গেছিস?

কথাগুলো সামান্য জোরেই বলেছিল নিরঞ্জন, আশপাশের কজন ফিরে তাকাল ওদের দিকে। নিরঞ্জন ওর ছোটবেলার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এরকম কলার টানাটানি বা রাস্তার মাঝখানে অপ্রস্তুতে ফেলা এসব পারস্পরিক ভাবেই অনেক করেছে ওরা। অতএব নিরঞ্জনের ওপর রাগ দেখাতে পারল না অমল। সামনে দিয়ে বাসটা বেরিয়ে যেতে একবার নিরঞ্জনের চওড়া বুকে শক্ত কবজির উৎফুল্ল মুখ দেখল তারপর তনুশ্রীরও হাসিখুশী মুখের দিকে তাকাল অমল। তারপর ভিতরের সব দ্বিধা ইতস্ততভাব ঝেড়ে ফেলে সহজ করে নিল নিজেকে। এবং এতক্ষণে যেন বেশ একটা স্বচ্ছন্দ প্রফুল্ল ভাব তার নিজের মধ্যেও অনুভব করতে পারল সে।

—এই, তোমার বাড়ীতে সত্যি কোন কাজ ছিল না-তো? তনুশ্রী মৃদুকণ্ঠে উদ্বেগ জানালো। নিরঞ্জনটা সত্যি এমন অবুঝ না!

অমল কয়মুহূর্ত চেয়ে তনুশ্রীর ছিমছাম অথচ নিখুঁত সাজ, বাটিকে ছাপা শাড়ী, দাঁড়াবার ভঙ্গি এমনকি হালকা চটিটা পর্যন্ত লক্ষ্য করল। এই স্বল্প সময়েই বিকেলের পান্ডুর আলো যথাসম্ভব ক্ষীণ হয়ে এসেছে। এমনি অপরাহ্ণের মত রঙ এবং বিছিয়ে আসা ধূসরতার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা তনুশ্রীকে অদ্ভুত উজ্জ্বল একটা প্রতিমার মতন মনে হ'ল অমলের। ওর কথার উত্তরে অমল বলল—

—কাজ ভোলাবার জন্যেই তো তোমরা হঠাৎ এসে উদয় হলে।

—আরে রাখ নিরঞ্জন তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে অমলের কাঁধে চাপড় দিল, ওরকম কনভেনশনাল হওয়াটা ইদানীংকালে কোন কাজের কথা নয় বুঝলি। হপ্তাভোর বিকেল পাঁচটা থেকে বউয়ের আঁচলের ছায়ায় বসে রইলাম, আর রবিবার বেলা দুটোয় মাংস-ভাত খেয়ে তিনটের শোয়ে সিনেমা দেখে ঘুরে বেরিয়ে এসে রাত পর্যন্ত সেই রিলাক্সেসনের জের।

—থামো তো এবার, তনুশ্রী ধমকে উঠল ওকে, কী ভীষণ বকতে পারো তুমি নিরঞ্জন। তারপর অমলের দিকে ফিরে বলল, এরকম এক জায়গায় দাঁড়িয়েই কি গল্প করে যাব আমরা? চল না হাঁটি খানিকটা।

—গুড আইডিয়া, প্রস্তাবের জন্য সুক্রিয়া ম্যাডাম, আয় অমল, বলে নিরঞ্জন ছটফট করে পথ চলতে শুরু করল।

নিরঞ্জনের আর যাই থাক, প্রাণশক্তিটা দারুণ, অমল ওর সংগী হতে হতে ভাবল, এ প্রাচুর্যটা কোথা থেকে ও পায়, স্বাস্থ্য স্বচ্ছলতা অথবা পারিবারিক শান্তি, প্রশ্ন করে জেনে নিতে ইচ্ছে হল অমলের।

সন্ধ্যের আবছায়া খুব সূক্ষ্মভাবে আশেপাশে ছড়িয়ে যাচ্ছে। দেয়াল পাঁচিলের আনাচে-কানাচে, গাছের নীচে ঘাসের গভীরে কালচে ছোপ জমা হচ্ছে, রাস্তার সদা-জ্বলা আলোগুলো, বিজ্ঞাপনের জৌলুস, সবকিছুই একটা হালকা মৃত আলোয় কেমন যেন বিমর্ষ লাগছে। হাওয়ায় রুক্ষ শীতের স্পর্শ। বুকের কাছে জ্যাকেটের বোতামটা লাগাতে লাগাতে হঠাৎ করে সুজাতার কথা মনে এল অমলের। সামান্য অন্যমনস্ক হয়ে স্ত্রীর চেহারাটা কল্পনায় আনতে চেষ্টা করল সে, সুজাতার জানালায় দাঁড়িয়ে-থাকা ভ্রূ-কোঁচকানো মুখটা। পাশাপাশি তিনজোড়া পা একছন্দে পথ মাড়িয়ে চলছিল। এরকম চলায়, শুধু চলাতেই, কেমন একটা থ্রিল আছে, অমল ভাবল, বস্তুত বন্ধুত্ব জিনিসটা এমনই যার স্বাদ অন্যসব সম্পর্ক থেকে স্বতন্ত্র, কেমন এক ধরনের মাদকতা আছে যেন অন্যকিছুর সঙ্গে তার তুলনা হয় না এবং এই অনন্য বস্তুটিকে মূল্য দেবার জন্য মাঝে মাঝে অন্যান্য দিকে কিছু স্বার্থ ত্যাগ করতে হয় বৈকি। এ ধরনের যুক্তি মাঝে মনে খাড়া করে খানিকটা আত্ম-তৃপ্তি বোধ করছিল অমল, এসময় নিরঞ্জন বলে উঠল,

—কি ভাবছিস বলতো?

—কই কিছু না, অমল আত্মস্থ হল।

—তুই চিরকালই ভাবে গদ-গদ। ভাবতে ভাবতেই মারা যাবি, দেখিস।

ভাবতে ভাবতে মারা যাব—কথাটা বেশ উপভোগ করল অমল। করে হেসে ফেলল। বলল,

—বেশ বলেছিস।

—আচ্ছা আমরা এরকম হাঁটতে হাঁটতে কোথায় চলেছি বলত?

তনুশ্রী ক্রীম-রঙা কার্ডিগানের ওপর গলায় আঁচলটা জড়িয়ে নিল ভাল করে।

—কোথাও না, এমনি উদ্দেশ্যহীন হাঁটা শুধু। ভাল লাগছে না?

অমল বেশ খুশী খুশী গলায় ওর দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল।

—তার চেয়ে চল কোথাও চা-খাওয়া যাক, শীতের সন্ধ্যে শুধু ঘুরে বেড়িয়ে জমে না।

—বেশ তো, অমল সায় দিল, অনেকদিন পরে আমাদের দেখা। একটু সেলিব্রেট করা যাক। অমলের ভিতরটা বেশ খোলামেলা লাগছিল। ঘনিয়ে আসা ধূসর সন্ধ্যা, হাওয়ায় শীতের আমেজ, আশপাশে জন-স্রোত গাড়ীর মিছিল, এসবের মাঝখান দিয়ে তিনটি উদ্দেশ্যহীন মানুষের অনির্দিষ্ট চলা, প্রায় ভেসে যাওয়ার মতন, অমলের মনে বেশ এক ধরনের মোহ সঞ্চারিত হচ্ছিল। অমল মুখ তুলে বর্ণহীন কালচে আকাশ, সদ্য ফোটা দু-একটি নক্ষত্র দেখল, এবং পর-মুহূর্তেই দেখল একটা ছিমছাম রেস্তোঁরার সামনে তারা পৌঁছে গেছে।

—আমার ব্যাপারটা কি জানিস, নিরঞ্জন স্বাভাবিক অধৈর্যে শ্বেত পাথরের টেবিলে আঙুল ঘষছিল, সংসার বস্তুটিকে একেবারে বন্ধন করে তুলতে পারি না। সুনন্দা, আই মীন আমার স্ত্রীকে তোরা জানিস তো, লরেটোয় পড়া মেয়ে, চাকরী করে, সোস্যাল ওয়ার্ক করে ইট মে বী পার্টি ফার্টিও করে। আমরা কেউ কারো ব্যাপারে নাক গলাই না। অফিস ফেরত আমার চা তৈরী করার জন্যও বসে থাকে না। অবশ্যই অসুস্থ না হলে আমি অফিস ফেরত বাড়ী যাই না, যাই হোক ইচ্ছে হলে ও যে কোন ভদ্র সঙ্গীর সঙ্গে বেড়াতে অথবা সিনেমায় অথবা মার্কেটিংয়ে যেতে পারে, তেমনি আমিও। আমাদের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এইটুকু, আমি যথাসাধ্য ওর ভরণপোষণ সখ-সাধের রসদ সরবরাহ করব এবং ও আমার ঘরদোর পরিচ্ছন্ন রাখার দিকে দৃষ্টি রাখবে, গেস্টদের আপ্যায়ন করবে এবং আমার অসুস্থতার সময় দায়-দায়িত্ব নেবে। ব্যাস এইটুকু, এটা আমাদের বিয়ের মন্ত্রও বলতে পারিস। আর বাচ্চাটি, তাকে দেখাশোনার জানা লোক আছে আর একটু বড় হলেই বোর্ডিং-এ দিয়ে দেব।

এক একজনের জীবনচর্যা এক-একরকম, নিরঞ্জনের দীর্ঘ-বক্তব্যের মাঝখানে ভাবল অমল। [illegible] কি অমলের কাছেও [illegible] তাহলে নিজে [illegible] ফ্ল্যাট, [illegible] জানালার ছাপা পরদা, [illegible] সামনে ভাসল ওর। সুজাতা আজ বিশেষ

করে চুল বেঁধে শাড়ী ব্লাউজ বাইরে রেখে নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছে। এবং শেষ পর্যন্ত কপাল কুঁচকে মুখ কালো করে চুপচাপ বসে থেকেছে চেয়ারে, হয়ত বা আত্মীয়দের বকাবকি করেছে অমুককে। তার জন্যে কি বিশেষ কিছু এসে গেছে অমলের? বিশেষ কোন উদ্বেগ, ইতস্তত ভাব? নিজের মধ্যে বিষয়টা হাতড়ে দেখতে চাইল অমল,

এ সময় নিরঞ্জন তনুশ্রীকে হেঁকে উঠল,

—এই নাও, আমাদের লাইট রিফ্রেশমেন্ট হাজির।

অমল দূরমনস্ক দৃষ্টিতে একবার ছোট্ট কেবিনের কাঠের দেয়াল, আধ ময়লা পর্দা ও উর্দিপরা নির্লিপ্ত মুখ বেয়ারাকে দেখল তারপর আত্মস্থ হয়ে তনুশ্রীর দিকে চেয়ে হাসল,

— নাও, সুরু কর।

—সুরু করার আগে আমার একটা প্রস্তাব আছে, তনুশ্রী গোলাপী ঠোঁটে মিষ্টি করে হাসল।

—বলুন, শুনে কৃতার্থ হই। নিরঞ্জন বিনয়ের ভঙ্গি করল।

ক্ষিপ্রহাতে ব্যাগ হাতড়ে দুটো কার্ড বার করল তনুশ্রী, দুজনের দিকে বাড়িয়ে ধরল।

—আগামী রবিবারে আমাদের একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রয়েছে রবীন্দ্র সদনে, চ্যারিটি প্রোগ্রাম, আশা করি তোমরা দুটো কার্ড নেবে।

—দেখি, নিরঞ্জন নিল ওর হাত থেকে, ও তোমাদের সেই ক্লাবটা থেকে। এখনো বেশ জমিয়ে রেখেচ তো দেখি। নিরঞ্জনের সিগারেটে ধোঁয়া সমস্ত কেবিনটার গন্ধ ছড়াচ্ছিল।

—এই বিজনেস ম্যাটারেই অমন বনবন করে রাস্তায় ঘুরছিল বুঝি, নিরঞ্জন ঠাট্টার গলায় হেসে অমলের দিকে তাকাল।

অমলও ততক্ষণে কার্ডটা নিয়ে পড়ছিল, কৌতুক করে বলে উঠল,

—ও রকম বলিস না, এতবড় একটা ক্লাবের সেক্রেটারি যখন।

—এই ভাল হবে না কিন্তু, তনুশ্রী রাগ দেখাল। বরাবর আমার ক্লাবকে তোমরা টীজ করে আসছ, যাক গে, টাকা ছাড় তো এবার।

—বিশেষ কিছু নেই পকেটে, যা আছে নাও দেবী, উনিশ টাকা পাঁচ আনা গুনে গুনে টেবিলের ওপর রাখল নিরঞ্জন, তনুশ্রী আলতো ভঙ্গিতে দশ টাকার নোটখানা তুলে নিল তার মধ্যে থেকে, মধুর করে সৌজন্যের হাসি হাসল।

অমল প্রথমে প্যান্টের প্যাশের পকেটে হাত রাখল তারপর কি ভেবে লুকোন পকেট থেকে চল্লিশ টাকা বের করে আনল এবং অবলীলায় একটা নোট বাড়িয়ে ধরল তনুশ্রীর সামনে।

শান্দন জ্যোৎস্নায় ক্রমশ ঘনিয়ে আসা রাত কেমন নির্জন লাগে। পায়ে পায়ে নিঃসঙ্গ পথ মাড়িয়ে চলতে এখন বেশ শীত-বোধ করছিল অমল। মানুষের সঙ্গের একটা উষ্ণ স্বাদ আছে, ভাবল ও। এই তো এতক্ষণ একটি কমনীয় যৌবন মধুর লালিত্য পায়ের পাশে পা হাতের পাশে হাত কথার উত্তরে কথা এবং কানের পাশে মিষ্টি হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে একটি অনির্বচনীয় পরিবেশ তৈরী করে রেখেছিল, তারও আগে সেই পুরুষটি ছিল, পরিহাসে তীক্ষ্ণ বক্তব্যে দৃপ্ত এবং পৌরুষে সবল সোচ্চার। এখন কুয়াশার পর্দায় রাস্তার আলোগুলি ম্রিয়মাণ, বিষণ্ণ। স্লেটরঙা আকাশে খর চোখের মতন ইতস্তত ছড়ানো ছিটোন কতগুলি জ্বল-জ্বলে তারা, এসবের মাঝখানে নিজেকে কেমন পরিত্যক্ত বিমর্ষ মনে করল অমল। এইমাত্র তনুশ্রীকে তার বাসে তুলে দিল সে। কিছুক্ষণ আগে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়েই নিরঞ্জন বিদায় নিয়েছে। আপাতত ওর গন্তব্য তনুশ্রীর পথের বিপরীত দিকে। অতএব তনুশ্রীর নিরাপত্তার ভার সম্পূর্ণ-ভাবে অমলের ওপর ছেড়ে দিয়ে রাস্তা কুঁপিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেছে নিরঞ্জন।

—আচ্ছা অমল, তনুশ্রী ওর পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলেছিল, পড়াশুনোর দিনগুলোতে আমরা বেশ ছিলাম, তাই না?

—হয়তো ছিলাম, অমল মিহি গলায় উত্তর দিয়েছিল, তবু সময় কখনো এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকে না।

—সেই অস্থির সময়ের দৌরাত্ম্যে মানুষও বদলে যায় ক্রমশ, তনুশ্রী হাওয়ার স্বরে শ্বাস মিলিয়ে কথা বলছিল।

এবং সেই হাওয়ার আবর্তে অনেক দূরের একটা পুরনো ছবি মনে এসেছিল অমলের। য়ুনিভার্সিটির বারান্দায় একদা প্রেমের চিঠি গুঁজে রাখা বাঁধানো খাতাটা আচমকা তনুশ্রীর হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল অমল। তনুশ্রী বুঝেছিল ব্যাপারটা, সেজন্য তা নিয়ে রাগ বিস্ময় বা অনুরাগ কোন-কিছুই প্রকাশ করেনি। শুধু একটা অহংকৃত নির্লিপ্তিতে হজম করে নিয়েছিল ঘটনাটাকে। হয়তো নতুনত্ব নেই দেখে। সেদিনের সেই তনুশ্রীকে আজ একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখল অমল, সময় কিছু পরি-বর্তনের চিহ্ন রেখেছে বৈকি তার শরীরে মুখে আচরণে। উজ্জ্বলতা গাম্ভীর্যে পরিণত হয়েছে, অহংকার কমনীয়তায়। এখনো বিয়ে করেনি কেন কে জানে? হয়ত অনেক প্রেম করেছে জীবনে তবু কোনটাতেই সম্পৃক্ত হতে পারেনি শেষপর্যন্ত। হয়তবা জীবনে বন্ধন স্বীকার করবার ভয়ে।

এবং কখন কথাটা ভাবতে গিয়েই এতক্ষণে পুনরায় নিজের সংসারের চিন্তাটা মাথায় ঘনিয়ে এল তার। সুজাতা জানতে চাইবে টাকার কথাটা। ওর আবার দায়িত্বজ্ঞান অতিরিক্ত কিনা। অবশ্য শ্বশুর শাশুড়ী কাছে থাকলে অমন ভক্তি ভালবাসা টিকে থাকত না নিশ্চয়ই। অমল যেন বাতাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধি খাড়া করল, দূর থেকে অমন কর্তব্য-বোধ সবাই দেখাতে পারে।

কিছু রাস্তা এগিয়ে অমলের বাস স্টপ। এখানে দুএকটি মানুষ অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। অমল কাঁধ ঝাঁকিয়ে শরীর গরম করবার চেষ্টা করল। মুর্গীর মাংসেও আজ-কাল উত্তাপ নেই, ভাবল অমল, পৃথিবীটা ক্রমশ ঠাণ্ডা শীতল হয়ে প্রাণহীন হয়ে যাচ্ছে সম্ভবত। রাস্তার মলিন আলোয় কবজি তুলে ঘড়ি দেখল অমল, আটটা বাইশ। মুর্গীর মাংসে উত্তাপ না থাক, ভার আছে অবশ্যই। সুতরাং সুজাতার সযত্ন রচিত রান্না আজ অনাদৃতই পড়ে থাকবে। এর জন্যে কি কৈফিয়ত দেবে অমল? মনে মনে একটা কিছু খাড়া করতে চাইল সে। ভাবতে গিয়ে সুজাতার ভাবলেশহীন মুখ নির্বিকার চোখের কথা কল্পনায় এলে অমল বিরক্ত হয়ে উঠল।

'আমরা কেউ কারো ব্যাপারে নাক গলাই না'—ফাইন। নিরঞ্জনটা সত্যিই বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমান এবং সুন্দর জীবনের অধিকারী। ওর পকেটের উনিশ টাকা থেকে উনিশ টাকা চলে গেলেও কেউ খবরদারী করবে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেমন যেন একটা ক্লান্তি, ঘুমের ভাব শরীরে উপলব্ধি করল অমল। পথের দূর প্রান্তে একটা ট্রামের পেছনে একটা প্রাইভেট বাস আসতে দেখা যাচ্ছে। নিশ্চয় এটা তার বাস। দেখতে দেখতে অমল হাই তুলে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

—দশ টাকা না হয় চ্যারিটি করেছ, বাকী পনেরো ষোলটা টাকা গেল কোথায় বলত? সুজাতার নীরব মুখের কাঠিন্য শরীরের ভঙ্গি সব একসঙ্গে প্রশ্ন করে উঠবে হয়ত।

—রেস্তোরাঁয় বিলটা আমিই মিটিয়ে দিলাম কিনা।

ধ্যুস, কি সব আজে-বাজে ভাবছি, সুজাতা জানলে তো। অমল হঠাৎই বাসে জায়গা পেয়ে গেল বসার, ভাবল, কাল সকালে আবার টাকাটা তুলে নিলেই হবে ব্যাংক থেকে। আমার বাইরের জীবন নিয়ে সুজাতার সঙ্গে বোঝাপড়ায় কাজ কি?

ভেবে শরীর জুড়ে একটা স্বস্তি ও আরামের ভাব বোধ করল অমল, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে শ্লথ ক্লান্তি। এরকম ঘুমের আমেজটা বাড়ী পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যেতে হবে, সচেতনভাবে সুজাতার মুখোমুখি হতে আজ এখন ইচ্ছে করছে না। শুধু খিদে নেই বলে শুয়ে পড়া। সুজাতা নিশ্চয়ই বিরক্ত করবে না তাকে, কৈফিয়ত চাইবে না, অবশ্যই সুজাতা সুগৃহিণী। তার প্রাত্যহিক অভ্যাসে, খাওয়া-দাওয়ায় অফিস যাওয়ায় সাজসজ্জায় এমন কি শয়নসুখে সুজাতা অঙ্গাঙ্গী জড়িত। অতএব সুজাতা ভালো, সুজাতার সান্নিধ্যে অমলের সুখী থাকা উচিত। বস্তুত, অমল কি অসুখী? কোন অভাববোধে বিশীর্ণ। কে জানে, বোঝে না অমল। এই বোঝা না বোঝার দ্বন্দ্বটাই যেন অমলের সামনে একটা রঙিন উলের বলের মতো ক্রমাগত সুতো খুলে খুলে ঢালুর দিকে গড়িয়ে যেতে থাকল, সেটাকে অমল কোনদিন হয়ত চেষ্টা করেও নিজের আয়ত্তে আনতে পারবে না।

বাঙলার মন্দির

কালনার দেবমন্দির ও পুরাকীর্তি

পঞ্চানন রায়

দেউল মন্দির

কালনার বহুচূড় মন্দিরগুলির রত্ন ইসলামীয় পদ্ধতিতে নির্মিত—দেউলের কতকটা ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি। বিশেষ করে কৃষ্ণচন্দ্র ও লালজীর মন্দিরের চূড়াগুলি দেখলে সেকথাই মনে হয়। আঠারো শতকের মাঝামাঝি বা তার আগে থেকেই এই বহুচূড় মন্দিরগুলি ও বাঙলার নিজস্ব রীতির চালামন্দিরগুলি তৈরী হলেও এ-শতকের মধ্যে নির্মিত কোন দেউলমন্দির এখানে দেখা যায় না। মহারাজা তেজশ্চন্দ্র (১৭৭০--১৮৩২ খৃষ্টাব্দ) আঠারো শতকের শেষের দিকে শিবের যেসব মন্দির তৈরী করিয়েছিলেন সেগুলি সবই আটচালা শ্রেণীর। কোন রেখদেউল তখনও পর্যন্ত তৈরী হতে দেখা যায় নি। যদিও কালনার বহুচূড় মন্দিরগুলির প্রবেশপথের খিলানের ওপরে উৎকীর্ণ শিবের বহু প্রতীক দেউল লক্ষ্য করা যায়। এসব প্রতীক দেউল থেকে একথা মনে হয় বর্ধমানরাজাদের বিশেষ প্রিয় ছিল এ ধরনের দেউল, কিন্তু তা' সত্ত্বেও পূপক কোন দেউল মন্দির তাঁরা কেন তৈরী করান নি, তার কিন্তু কারণ খুঁজে বের করা বেশ কঠিন। সম্ভবত চালা ও বহুচূড়-মন্দির নির্মাণে বহু সময় ব্যয় করতে গিয়ে তাঁরা এ-জাতীয় দেউল-মন্দিরের কথা হয়তো বিস্মৃত হয়েছিলেন বা এর প্রতি দৃষ্টি দিতে পারেন নি। হয়তো বা সে সময়ে এ-ধরনের মন্দির গড়ার সুদক্ষ কোন শিল্পীর অভাবও এর একটা অন্যতম কারণ হতে পারে। অবশ্য এ-সবই কষ্ট-কল্পনা। সে যাই হ'ক না কেন উনিশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি সময়ের আগে ছাড়া কালনায় গম্বুজাকৃতি ইসলামীয় রীতির কোন দেউল চোখে পড়ে না। রাজবাড়ী এলাকার মধ্যে দক্ষিণদিকে বহির্দ্বারের কাছাকাছি গম্বুজাকৃতি ইসলামীয় রীতির একটি সুদৃশ্য দেউল আজ থেকে মাত্র একশ' চব্বিশ বছর আগে বর্ধমানের তদানীন্তন রাজমহিষী প্যারীকুমারী তৈরী করিয়েছিলেন। রাজবাড়ী এলাকা তথা সমগ্র কালনা শহরের মধ্যে এটিই একমাত্র দেউল যাতে উন্নত ধরনের পোড়ামাটির কাজের নমুনা পাওয়া যায়। ভিত্তিবেদীর কাছ থেকে আরম্ভ করে গম্বুজের নিম্নভাগ পর্যন্ত সামনে, পাশে ও পিছনের সর্বত্র পোড়ামাটির ভাস্কর্যের প্রাচুর্য ও সুন্দর সুন্দর খোদাই কাজ বাঙলায় খুব বেশী একটা মন্দিরে লক্ষ্য করা যায় না। উনিশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে এটি তৈরী হলেও উন্নত ধরনের পোড়ামাটির কাজের জন্যে এই মন্দিরটি কোনমতেই উপেক্ষনীয় নয়।

উঁচু ভিত্তিভূমির ওপরে অবস্থিত এ মন্দিরটির উচ্চতা খুব একটা না হলেও এর গম্বুজাকৃতি শীর্ষদেশ সুন্দর ও সুঠাম। সমান্তরাল খাঁজগুলি সমদূরত্বের মধ্যে ও শীর্ষভাগ ঈষৎ সূক্ষ্ম। বাঙলাদেশে ইসলামীয় রীতির এ-ধরনের দেউল যে এককালে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, তার বহু নজির দেখা যায়। মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার অন্তর্গত চেতুয়া-বাসুদেবপুর গ্রামে আঠারো শতকের শেষভাগে গুলাব দত্ত প্রতিষ্ঠিত ঠিক এই রীতির একটি দেউল আজও আছে। উৎকলীয় রেখ দেউলের অনুকরণে এ-ধরনের মন্দির তৈরী হলেও এটি যে উৎকলীয় রীতি থেকে স্বতন্ত্র তাতে সন্দেহ নেই। উপরিভাগ তাজমহলের ন্যায় গম্বুজাকৃতি। মন্দিরের ভিত্তিভূমির নীচে সিঁড়ির ঠিক বাঁদিকে প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ শিলালিপিটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সংস্কৃত ও বাঙলা উভয় ভাষায় লিপিটি দেখা যায় এবং সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হ'ল মন্দির-শিল্পী সোনামুখী নিবাসী শ্রীরামহরি মিস্ত্রীর নামের উল্লেখ। বাঙলাদেশের প্রতিটি মন্দিরেই মন্দিরশিল্পীর নামের উল্লেখ আছে একথা ভুল। খুব কম মন্দিরেই এসব শিল্পীদের নাম পাওয়া যায়। (কেউ কেউ এসব শিল্পীদের নাম-ধাম সংগ্রহ করে একটি তালিকাও প্রণয়ন করেছেন বলে জানি) কালনার এ মন্দিরটি সেই অল্প-সংখ্যক মন্দিরের অন্যতম। এ মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ লিপিটি উদ্ধৃত করার প্রয়োজন বোধ করছি এজন্যেই। লিপিটি কোন পোড়ামাটির অক্ষরে উৎকীর্ণ নয়। কারণ উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এ পদ্ধতিটির অবসান হয়েছে। তার বদলে মার্বেল বা অন্য পাথরে অক্ষর খোদাই-এর কাজটি বেশ চালু হয়েছে। এ মন্দিরে সে ধরনের একটি পাথরে খোদিত লিপি দেখা যায়। সংস্কৃত ও বাংলা এই দু' ভাষাতেই লিপিটি রচিত হয়েছিল। লিপিটি হ'ল :

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ : সংসারার্ণবতারনৈকতটিনীতীরে
মুরারে মুদে
শাকে ভেশন গাগভেলবিমিতে
তারেশকারালদং ।।

শ্রীরাধেশ সুবেশরাসরসিকানন্দস্য
দাসী মহা—
রাজাধীশ প্রতাপচন্দ্র মহিষী
প্যারীকুমারী মঠং
শাকে সপ্তদশ শত একাত্র প্রমাণে
অম্বিকার অমরবাহিনী সন্নিধানে
শ্রীরাধাবল্লভরাসরসিকসুন্দর শ্যামাঙ্গ
ত্রিভঙ্গ অঙ্গ
বিশ্বমনোহর তাঁহার কুমারী
প্যারীকুমারী প্রধানা
মহেন্দ্র প্রতাপচন্দ্র নরেন্দ্র অঙ্গনা
মহাস্থানে করি মহামন্দির নির্মাণ
হরিপ্রীতিহরষিতে হয়ে দিলা দান।

শকাব্দা : ১৭৭১ সন ১২৫৬ এই দেফুল সোনামুখী নিবাসী শ্রীরামহরি মিস্ত্রির নির্মিত।"

মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের পুত্র প্রতাপচন্দ্রের মহিষী প্যারীকুমারীর নাম মন্দির প্রতিষ্ঠাত্রীরূপে জানা যায়। কুমার প্রতাপচন্দ্র সম্ভবত সে সময়ে জীবিত ছিলেন না মনে হয়। সংস্কৃতলিপিতে সাঙ্কেতিক অঙ্কের

প্রতাপেশ্বর দেউলের সম্মুখদিকে পোড়ামাটির কয়েকটি সুন্দর কাজ

মাধ্যমে যে শকাব্দকাল উল্লেখ করা হয়েছে তা স্পষ্ট নয়, কিন্তু বাঙলায় স্পষ্ট করেই ১৭৭১ শকাব্দের ও বাঙলা ১২৫৬ সালের উল্লেখ আছে।

মন্দিরটির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, এর সুন্দর সুন্দর পোড়ামাটির কাজ তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সোনামুখী নিবাসী শ্রীরামহরি মিস্ত্রী যে এক উঁচুস্তরের শিল্পী ছিলেন এর থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মন্দিরের সম্মুখ-দিকের প্রবেশদ্বারের ওপরে খিলানের চারপাশে বহু সুন্দর সুন্দর পোড়ামাটির মূর্তি মন্দিরের সৌন্দর্য অধিক বাড়িয়ে তুলেছে। খোদাই করা সুন্দর নক্সাও এ মন্দিরটির বিশেষত্ব। প্রবেশদ্বারের খিলানের ওপরে ক্ষুদ্র অর্ধচতুষ্কোণ অংশে যে দুটি পূর্ণ চিত্রসারি আছে তার মধ্যে ওপরের প্রথম সারিতে সিংহাসনে উপবিষ্ট রামসীতার মূর্তি, বামে হনুমান। এ সারির একেবারে বাঁয়ে ও ডানে অট্টালিকার বাতায়নবর্তী অঙ্গনার দৃশ্য বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। এ মন্দিরের উত্তর পাশে আবৃতদ্বারের ওপরের অংশে রাম-রাবণের যুদ্ধদৃশ্য ও মধ্যে দশভুজা মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার মূর্তি রামচন্দ্রের অকালবোধন ও মহামায়ার বরে তাঁর দশানন বিজয় সূচিত করছে। দক্ষিণ পার্শ্বে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি বিদ্যমান। মন্দিরের সম্মুখভাগের ডানদিকে শিববক্ষে চতুর্ভুজা কালীমূর্তি ও মালাজপরত ধ্যানমগ্ন এক সন্ন্যাসীর মূর্তিটি প্রশংসার দাবী রাখে। মন্দিরটির গায়ে পোড়ামাটির অসংখ্য কাজের মধ্যে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল মাটির মসৃণতা ও খোদাই কাজের সূক্ষ্ম শিল্পে অপূর্ব দক্ষতা। শিল্পী রামহরি মিস্ত্রী এধরনের আর কতগুলি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন তা জানা যায় নি, কিন্তু সুদৃশ্য টেরাকোটাগুলি অশেষ নিষ্ঠার সঙ্গে নির্মাণ করে শিল্পী অমর হয়ে রয়েছেন। মন্দির শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেও তিনি তাঁর নামটিও উপহার দিয়ে গেছেন ভাবী-শিল্পরসিকদের কাছে। বহুক্ষেত্রে এসব শিল্পীদের নাম-ধাম অনেক কাল আগেই বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে, কিন্তু তাঁদের শিল্পকর্ম বেঁচে আছে আজও শিল্প-প্রেমীদের আনন্দ দেবার জন্যে। রামহরির মতো আরও কিছু কিছু শিল্পী বাঙলার অন্যান্য স্থানের মন্দিরগাত্রে নিজেদের নাম-ধামের উল্লেখ করে গেছেন, আর তার থেকেই এসব শিল্পীদের পরিচয়গোত্র জানা সম্ভবপর হয়েছে। কালনার এই দেউলটিতে যে শিবলিঙ্গ স্থাপিত তার নাম কি লিপিটিতে সঠিক উল্লেখ না থাকলেও এই শিবলিঙ্গটি প্রতাপেশ্বর বলে পরিচিত। অবশ্য সংস্কৃত লিপিতে 'তারেশকায়' শব্দের উল্লেখ আছে।

রাজবাড়ী এলাকার বাইরে রাস্তার ঠিক পাশেই যেখানে শিবের একশ আটটি মন্দির স্থাপিত তার দুপাশে পশ্চিম ও পূর্বে দুটি পঞ্চরত্ন স্থাপিত। পূর্বটি অপেক্ষা পশ্চিমটির অবস্থা অনেক ভালো। পশ্চিমটিতে শিব-লিঙ্গ স্থাপিত।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর স্মৃতিপূত অম্বিকা-কালনার মহাপ্রভুর মন্দিরের কথা এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। রাজবাড়ীর কিছু দূরে পূবে শ্রীচৈতন্যের লীলাসহচর গৌরীদাস পণ্ডিতের আবাসস্থানে মহাপ্রভুর চাঁদনী মন্দিরটি কতো পুরানো তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। মন্দিরটির কোন শিলালিপি চোখে পড়ে না। মন্দিরে গৌরনিতাইয়ের দারুময়ী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। এছাড়া গৌরীদাসেরও একটি মূর্তি আছে। এ মন্দিরটির ঠিক পাশে একটু পশ্চিমে গৌরীদাসের দাদার প্রতিষ্ঠিত গৌরনিতাইয়ের মূর্তি দুটি আর একটি মন্দিরে দেখা যায়। কালনা শহরে এ পাড়াটির প্রাচীন আর একটি নিদর্শনের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের স্মৃতিপূত বলে কথিত একটি বিরাট তেঁতুল গাছ ও তার নীচে প্রস্তরে চিহ্নিত পদচিহ্ন। তেঁতুলতলায় একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষও লক্ষ্য করা যায়।
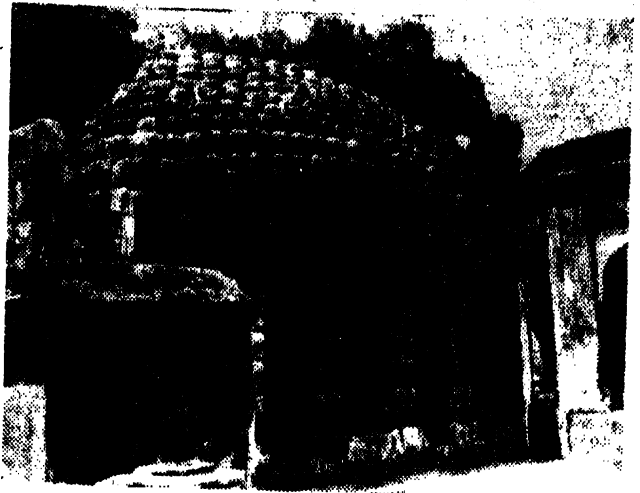
লালজীর মন্দির বাড়ীর ভিতরে গিরিগোবর্ধন

অম্বিকা-কালনার এইসব প্রাচীন মন্দির-গুলির সংরক্ষণের নির্দেশনামা পুরাতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক স্থাপিত হয়েছে। এসব মন্দিরের অবস্থা অন্যান্য অনেক স্থানের মন্দিরের চেয়ে অনেক ভালো। এদের সব-গুলিরই মধ্যে এখন বিগ্রহ রোজ পূজিত হচ্ছেন। কিন্তু ভগ্নমন্দির মেরামতির কোন ব্যবস্থা আছে বলে মনে হয় না। তবে বেশ কিছুদিন আগে মন্দিরগাত্রে রঙের প্রলেপ দেখে এসব মন্দির যে আগে মেরামতি করা হতো তা বুঝতে পারা যায়। কিন্তু পোড়া-মাটির শিল্প ও ফুল লতাপাতা নক্সার ওপর রঙের প্রলেপ বুলিয়ে প্রাচীন শিল্পসৌন্দর্যের বিশেষ হানি করা হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। যেখানে তা হয় নি যেমন প্রতাপেশ্বরের মন্দিরে সেখানে শিল্পসুষমা অবিকৃত আছে। মন্দিরসংস্কর্তাদের কিন্তু এবিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন দরকার।

বহুচূড় মন্দির

বাঙলার বহুচূড় ও বৃহৎ মন্দিরগুলি সম্পর্কে ভবিষ্যতে যদি কোন বিস্তৃত বিবরণী লিখতে হয় তাহলে বর্ধমান জেলার অম্বিকা - কালনায় বর্ধমানরাজপ্রতিষ্ঠিত তিনটি বৃহৎ পঁচিশ চূড়ার মন্দিরের কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। একাধারে উচ্চতা ও শিল্পসুষমার যুগপৎ সমাবেশ বাঙলার খুব কম মন্দিরেই দেখা যায়। বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী গ্রামের একটি পঁচিশ চূড়ো মন্দিরের কথা জানি, পোড়া-মাটির অলংকরণও তাতে বেশ পাওয়া যায়, কিন্তু সে মন্দিরটি উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে (বাঙলা ১২৫২ সালে) তৈরী, পোড়ামাটি সজ্জার সূক্ষ্মত্বও তাতে খুব

প্রতাপেশ্বর দেউলের প্রবেশদ্বারের ওপরে পোড়ামাটির কাজের নমুনা
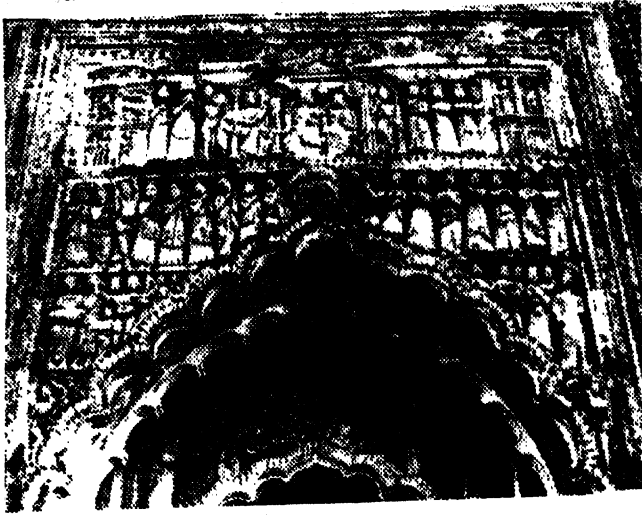
একটা নেই। কিন্তু বর্ধমান জেলার কালনায় পঁচিশ চূড়োর যে তিনটি বৃহৎ মন্দির আছে সেগুলি আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে তৈরী, আর টেরাকোটা প্রাচুর্যে বিষ্ণুপুরী মন্দিরের থেকে কোন অংশে কম নয়। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা মন্দিরের উচ্চতার থেকে পোড়ামাটির কাজকে অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। সেখানে তাই একরত্ন মন্দিরের সংখ্যা যত বেশী পঞ্চরত্ন বা নবরত্ন মন্দিরের সংখ্যা সে তুলনায় নগণ্যমাত্র। মল্লরাজ প্রতিষ্ঠিত নবরত্ন বিষ্ণুপুরে একটিও নেই।

কিন্তু বর্ধমান জেলার কালনা এদিক থেকে অসাধারণত্ব দাবী করতে পারে, গৌরব করতে পারে পোড়ামাটির কাজের প্রাচুর্যের জন্যেও। কালনার বিশালকায় বহুচূড় মন্দিরগুলির কাছে পোড়ামাটির প্রচুর অলংকরণযুক্ত বিষ্ণুপুরের একরত্ন ও পঞ্চরত্ন মন্দিরগুলিকে অনেক সময় তাই নিষ্প্রভ মনে হয়! উচ্চতা ও অলংকরণ এই দুদিকেই বর্ধমানের রাজাদের যে সজাগ দৃষ্টি ছিল এঁদের প্রতিষ্ঠিত কালনায় তিনটি পঁচিশ চূড় মন্দির তার প্রমাণ। এগুলি হল কৃষ্ণচন্দ্র, লালজী ও গোপালবাড়ীর মন্দির। কৃষ্ণচন্দ্র ও লালজীর মন্দির রাজবাড়ী এলাকার মধ্যে আর গোপালবাড়ীর মন্দিরটি হল বিখ্যাত সিদ্ধেশ্বরী (অম্বিকা) মন্দিরের কাছেই। কালনায় পোড়ামাটি শিল্পের যে প্রভূত উৎকর্ষ হয়েছিল এসব মন্দিরে উৎকীর্ণ পোড়ামাটির সজ্জা থেকে তা প্রমাণিত হয়। কালনা অঞ্চলে এককালে যে বহু শিল্পী বাস করতেন আজও ঐ শহরে কয়েক ঘর শিল্পীর বাস তার প্রমাণ। বর্ধমানের রাজা ও রাণীরা এ শিল্পের প্রতি যে কতটা আগ্রহশীল ছিলেন তার আরেকটি নিদর্শন হল রাজবাড়ী এলাকার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ইসলামীয় রীতির শিবালয়টি। প্রতাপচন্দ্রমহিষী প্যারীকুমারী এটি স্থাপন করেছিলেন বাঙলা ১২৫৬ সালে অর্থাৎ ১৮৪৯ খৃস্টাব্দে। মন্দিরটির সুন্দর অলংকরণ ও পোড়ামাটির ভাস্কর্য যে কোন শিল্পপ্রেমিককে মুগ্ধ করবে বলে বিশ্বাস করি।

কৃষ্ণচন্দ্রের পঁচিশ চূড় মন্দিরটি বিজয়াদি বৈদ্যনাথ শিবলিঙ্গের আটচালা মন্দিরের পাশাপাশি, একটু দক্ষিণে অবস্থিত। এটিও মহারাজা তিলকচন্দ্রের মায়ের তৈরী। প্রতিষ্ঠাকাল হল ১৬৭৩ শকাব্দ বা ১৭৫১ খৃস্টাব্দ। মূল মন্দিরটির বারান্দায় থাম ও খিলানের বেশ কিছু ওপরে লিপিটি আছে। লিপির প্রথম সারিটি অস্পষ্ট, অতএব এ সারিটি বাদে বাকী অংশটি হল :

"ত্রিসপ্তত্যাধিক (?) ষোড়শ সংখ্যকে শকাব্দে
মন্দিরমর্পিতমেতদ্রাজা শ্রীতিলকচন্দ্র-মাত্রা ।। ১৬৭৩ ।। সন ১১৫৯ সাল"।

বিজয়াদি বৈদ্যনাথ শিবলিঙ্গের মন্দিরটি এর অন্তত কুড়ি পঁচিশ বছর আগের বলে অনুমান করি। কৃষ্ণচন্দ্রের এই পঁচিশ চূড় মন্দিরটি যখন তিলকচন্দ্রের মা তৈরী করান তখন তিলকচন্দ্র রাজা, আর বৈদ্যনাথ শিবলিঙ্গটি তিনি তৈরী করিয়েছিলেন তিলকচন্দ্রের জন্মের কিছু পরে সেকথা ঐ মন্দিরটির গায়ে স্পষ্ট করেই উল্লেখ আছে (অবশ্য ঐ লিপিটি মার্বেল পাথরে কালো হরফে পুনঃসংস্থাপিত)।

কৃষ্ণচন্দ্রের এই মন্দিরটির চূড়াগুলির অবস্থান ও মন্দিরটির সংস্থান হল এইরকম : মন্দিরটি দক্ষিণমুখী, সামনে চারচালা জগমোহন। চালার শীর্ষে খোড়ো চালার মতো মটকাবাঁধা ও তার ওপর পাঁচটি পৃথক পৃথক আমলক, কলস ও চক্র বিদ্যমান। চালার বাঁকানো কার্ণিসের নীচে থাম ও খিলানের ওপরের অংশের তিন প্রস্থে প্রচুর টেরাকোটা লক্ষ্য করা যায়। জগমোহনটি বেশ প্রশস্ত। তারপর মন্দিরের দালান ও ভেতরে গর্ভগৃহ। জগমোহনের দুটি পূর্ণস্তম্ভ ও দুটি অর্ধস্তম্ভ। গর্ভগৃহের প্রবেশপথের ঠিক ওপরে বাঁয়ে ও ডানে দশটি করে মোট কুড়িটি শিবের প্রতীক দেউল। গর্ভগৃহের সামনের অংশে প্রতীক দেউল ও কয়েকটি ফুল ছাড়া বিশেষ কোন টেরাকোটা নেই। লতাপাতার নক্সাগুলি অবশ্য সুন্দর। মূলমন্দির ও তার সামনের দুপাশ এবং জগমোহনের সম্মুখদিক ছাড়া মন্দিরের অন্য কোথাও কোন টেরাকোটা নেই ফুল ও লতাপাতার নক্সা ছাড়া। পেছনের দুদিকের দুকোণে অবশ্য ওপর থেকে নীচে লম্বায়মান সুদৃশ্য টেরাকোটাসজ্জা মন্দিরকে যেন রাজবেশে সজ্জিত করেছে। এধরনের উর্ধ্বাধ লম্বায়মান টেরাকোটাসজ্জা মূলমন্দিরের সামনের দুদিকের দুকোণেও আছে। লালজীর ও গোপালবাড়ীর মন্দিরেও ঠিক এমনি ধরনের টেরাকোটাসজ্জা লক্ষ্য করা যায়। মনে হয় এ তিনটি মন্দির একই শিল্পীর দ্বারা তৈরী হয়েছিল। গোপালবাড়ীর মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাকাল ১৬৮৮ শকাব্দ বা ১৭৬৬ খৃস্টাব্দ। লালজীর মন্দিরের লিপি অনেকটা উঁচুতে থাকায় এটি উদ্ধার করা সম্ভবপর হয় নি। কিন্তু আকার ও গঠনে এর সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র ও গোপালবাড়ীর অনেকটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করে এটিকে ঐ দুটি মন্দিরের কাছাকাছি সময়ে তৈরী বলে অনুমান করা চলে। তাছাড়া এই তিনটি মন্দিরের চতুষ্কোণে লম্বায়মান টেরাকোটাগুলি প্রায় সবই যুদ্ধ বা শিকার দৃশ্যের। হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি বাহন ও বাঘ-সিংহের সঙ্গে লড়াই এর দৃশ্য প্রায় একই রকমের। তাই লালজীর মন্দিরের লিপিটি উদ্ধার করা না গেলেও এ মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাকাল বুঝতে বিশেষ অসুবিধে হয় না। জগমোহন, মূল মন্দিরের বারান্দা ও মন্দিরের একেবারে পেছন ও দুপাশের থামের সবকটি খিলানের ওপরে ধাঁয়ে ডানে করে শিবের প্রতীক দেউল বর্তমান। কোথাও সাতটি সাতটি করে, কোথাও বা আটটি আটটি করে, আবার কোথাও বা নটি করে প্রতীক দেউল অঙ্কিত। দুপাশের সমসংখ্যক দেউলের মধ্যবর্তী ওপরে ওপরে স্থাপিত কলস ও সকলের ওপরে পতাকা, কলসের দুপাশে পাখী। গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বারের ওপরেই একমাত্র প্রতীক দেউলের সংখ্যা বেশী। গর্ভগৃহের পরে আবৃত দালান ও জগমোহন। এবারে মন্দিরের চূড়াগুলি বিন্যাসের বিষয়ে আসা যাক। কৃষ্ণচন্দ্রের এ মন্দিরটি ভূমি নিয়ে চতুস্তলবিশিষ্ট। পঞ্চরত্ন মন্দির যদি দ্বিতল হয় (অবশ্য ভূমিকে একতল ধরে) তাহলে পঁচিশ চূড়োর মন্দির ভূমিকে নিয়ে সাততল হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের দেশে তল অনুসারে রত্নের সমাবেশ নেই, তাই এক্ষেত্রেও সে নিয়ম পালিত হয় নি। কৃষ্ণচন্দ্র লালজী ও গোপালবাড়ীর মন্দিরের রত্নগুলির সমাবেশ হল দ্বিতলের প্রতি কোণে তিনটি করে বারোটি, ত্রিতলের প্রতি কোণে দুটি করে আটটি এবং চতুস্তলের প্রতি কোণে একটি করে চারটি ও শীর্ষকেন্দ্রে একটি (এই চূড়াটি বড়) এই নিয়ে মোট পঁচিশটি। রত্নগুলি রেখদেউল হলেও ইসলামীয় প্যাটার্নে কতকটা গম্বুজাকৃতি। রাজবাড়ীর এলাকায় পরবর্তীকালে নির্মিত শিবের ইসলামীয় রীতির

দেউলটিতে কৃষ্ণচন্দ্র, লালজী ও গোপালবাড়ীর রত্নগুলির ধাঁচটিই যেন ঠিক ঠিক অনুকৃত হয়েছে দেখতে পাই। মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ প্রতীক দেউলগুলিও এ রীতির বুঝতে অসুবিধে হয় না। বর্ধমান রাজাদের কাছে উৎকলীয় রেখদেউলের থেকে এই ইসলামীয় রীতিটি যে অধিক প্রিয় ছিল তা সহজেই বোঝা যায়। কারণ এ মন্দিরগুলি তৈরী হবার প্রায় একশ বছর পরে রাণী প্যারীকুমারী ইসলামীয় রীতির শিবের দেউলটি সুন্দর কারুকার্যমণ্ডিত করে তৈরী করান। বহুচূড় মন্দিরগুলির ওপরে স্থাপিত এ রীতির ক্ষুদ্র দেউলগুলির সার্থক অনুকৃতি এ দেউলটিতে লক্ষ্য করা যায়।

কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দিরে পোড়ামাটির সজ্জাগুলি সবই সামনের দিকে একথা বলা হয়েছে। পৌরাণিক কাহিনী ভাস্কর্যকলার মুখ্য উপজীব্য হলেও সেকালের সামাজিক চিত্রকে অবলম্বন করে কিছু কিছু শিল্পও এ মন্দিরে চোখে পড়বে। অবশ্য এর মধ্যে ধর্মীয় সুরটাই বেশী। দালানের পূব দিকের অর্ধস্তম্ভে চতুর্ভুজা কালীমূর্তি শিবের বুকে ডান পা রেখে দণ্ডায়মানা। এই কালীর কাছে পুজোর নানা সামগ্রী ও বলিদানের জন্য একটি হৃষ্টপুষ্ট মেষ নিয়ে কয়েকজনের যাত্রা, দেবীর কাছে শঙ্খবাদন ও প্রার্থনা সে যুগের ঘোর তান্ত্রিক পুজো-পদ্ধতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এ ভাস্কর্যটি অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরেও লক্ষ্য করা যায়। লালজীর মন্দিরেও এ দৃশ্যটি পাওয়া যায়। দেবী কালীর পরেই এর পরের থামে উৎকীর্ণ রয়েছে দশভুজা মহিষাসুর-মর্দিনীর মূর্তি, বামে কার্তিক ও সরস্বতী এবং ডাইনে গণেশ ও লক্ষ্মী, দেবীর দুপাশে জয়া-বিজয়া। আবার এরই ঠিক নীচে ভিত্তি-গাত্রের কিছু ওপরে কৃষ্ণলীলার চিত্রের মধ্যে আছে কৃষ্ণ কর্তৃক গোপীদের বস্ত্রহরণ, বৃক্ষশীর্ষে কৃষ্ণের অবস্থিতি, যমুনাজলে গোপীদের নগ্নদেহ, কদম্ববৃক্ষে উপবিষ্ট কৃষ্ণের দুপাশে দুটি ময়ূর। সম্পূর্ণ চিত্রটি একটি বড় টালিতে উৎকীর্ণ ও বড়ই জীবন্ত। এই স্তম্ভটির ঠিক বামদিকের স্তম্ভে (দ্বিতীয় পূর্ণস্তম্ভে) ভিত্তিগাত্রের ঠিক ওপরে লতাপাতার নক্সা, তারই ঠিক ওপরের প্যানেলে কালীয়দমনের চিত্রটিও সুন্দর। কালনাগের ওপর শ্রীকৃষ্ণের অবস্থিতি ও তাঁর দুপাশে তিনটি করে কাল-নাগিনী চিত্রটিকে সম্পূর্ণ করেছে। দালানের বাইরে মূল মন্দিরের বাম কোণে অসংখ্য ভাস্কর্যকলার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম একটি সার্থক চিত্রে পরিণত হয়েছে। কংসের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে মুনিদের বিষ্ণু-স্তব, বসুদেবকে নিদ্রাকালীন অবস্থায় বিষ্ণুর স্বপ্নদান, দেবকী ক্রোড়ে কৃষ্ণের জন্ম, বসুদেব-ক্রোড়ে শ্রীকৃষ্ণ ও নন্দ ক্রোড়ে একটি কন্যা। বসুদেবের যমুনাতরণ, যমুনাতরঙ্গ, তরঙ্গমধ্যে বৃক্ষের (এখানে সর্প নেই) বৃষ্টিধারা থেকে শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা, শৃগালের পথপ্রদর্শন, বসুদেবের কোল থেকে কৃষ্ণের

রাজবাড়ী এলাকায় প্রতাপেশ্বরের সুদৃশ্য দেউল

যমুনাজলে পতন কৃষ্ণজন্ম কাহিনীকে সম্পূর্ণ করেছে। এ মূর্তিগুলি ভিত্তিবেদির ওপরের চিত্রসারির ঠিক ওপরে বিন্যস্ত রয়েছে। এই সারির অন্যতম আরেকটি দৃশ্য পুতনাবধ। এছাড়া মূল মন্দিরের সামনের পূব দিকে বকাসুর বধ, কৃষ্ণের নৌকাবিলাস প্রভৃতি কাহিনীর চিত্ররূপও আছে। সামাজিক চিত্রের মধ্যে আছে হুঁকো খাওয়া, বেহালাবাদন ও বাঈজী-নাচ প্রভৃতি। ভিত্তি-গাত্রের প্রথম প্যানেলগুলিতে লতাপাতার নক্সা এবং তার ওপরের প্যানেলগুলিতে মূর্তি। ঠিক এই রীতি লালজীর মন্দিরেও দেখা যায়।

কালনার বিখ্যাত লালজীর মন্দিরের রত্নগুলির সন্নিবেশ কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দিরের মতো। তবে বৈশিষ্ট্য হল এটির সামনে জোড়বাংলা রীতির জগমোহন স্থাপিত। মন্দিরটির পূর্বদিকে দরজা আছে যা কৃষ্ণচন্দ্রের বা গোপালবাড়ীর মন্দিরে নেই। মন্দিরটির চার পাশে প্রশস্ত বহির্বারান্দা বর্তমান। জোড়বাংলা শ্রেণীর জগমোহনটি মন্দিরের দালানকে আবৃত করে সামনের নাটমন্দিরের কাজও সম্পূর্ণ করেছে এবং এরই সামনে বৃত্তাকার প্রস্তরে তৈরী গিরি-গোবর্ধনটি সুদৃশ্য। লালজীর মন্দিরের চারপাশে প্রাচীর পরিবৃত। মন্দির চত্বরের প্রবেশমুখে নহবৎখানা ও ভেতরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। এ-ছাড়া মন্দিরটি সম্পর্কে আর বেশী কিছু বলার নেই। মন্দিরের ভেতরে রাধাকৃষ্ণের বহু বিগ্রহ ও লালজীর একটি ক্ষুদ্র শিলা দেখা যায়। গিরি-গোবর্ধনের ভেতরে কোন বিগ্রহ নেই, তবে দেওয়ালের গায়ে ক্ষোদিত কিছু কিছু মূর্তি আছে। এটির ওপরে একটি শিলালিপি থাকলেও অক্ষরের ক্ষুদ্রতাবশত তার পাঠ-উদ্ধার করা বেশ কঠিন।

গোপালবাড়ীর পঁচিশচূড়ো মন্দিরটির চূড়াগুলির সন্নিবেশ রাজবাড়ী এলাকায় কৃষ্ণচন্দ্র ও লালজীর মন্দিরের মতো। রত্ন-গুলিও কতকটা ইসলামীয় রীতির। জগ-মোহনটি চারচালা, পেছনের চালাটি মন্দির-সংলগ্ন ও শীর্ষদেশ চালাবাড়ীর মতো মটকাবাঁধা। মূল মন্দিরের সামনের দালানে পোড়ামাটির সজ্জা ও লিপি দেখতে পাওয়া যায়। পোড়ামাটির অক্ষরে তৈরী মূল লিপিটির ওপর বেশ কয়েক বছর আগে রঙ ও উৎকীর্ণ অক্ষরের ওপর কালী দিয়ে হরফগুলি স্পষ্ট চিহ্নিত করতে গিয়ে আসল লিপিটিকে বিকৃত করা হয়েছে। তাই শুধুমাত্র শকাব্দ ১৬৮৮ ছাড়া আর বাকী অংশটুকু একেবারে দুর্বোধ্য। মন্দিরটির পূব ও পশ্চিমে বারান্দা দেখা যায়। পোড়া-মাটির ভাস্কর্যগুলির সূক্ষ্মত্ব তেমন চোখে পড়ে না। উল্লেখযোগ্য একটি ভাস্কর্য হল, ইউরোপীয় নারী-পুরুষের মিথুন-দৃশ্য যা এখানের আর কোন মন্দিরে চোখে পড়ে না। এর থেকে সে যুগের সমাজে ইউরোপীয়দের আধিপত্য ও তাদের আচার-আচরণের চিত্রটি ধরা পড়ে। কৃষ্ণচন্দ্র ও লালজীর মন্দিরের ন্যায় গোপালবাড়ীর মন্দিরেরও চার কোণে চারটি ঊর্ধ্বাধ লম্বায়মান পোড়ামাটির উৎকৃষ্ট অলঙ্করণ দেখা যায়। এগুলির বেশীর ভাগই শিকার ও যুদ্ধদৃশ্য। হাতী, ঘোড়া, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি বন্যজন্তু শিকারী ও বীর যোদ্ধার সুন্দর সুন্দর মূর্তিগুলি একটি পর একটি স্থাপিত। বাঙলার অন্য কোথাও মন্দির চতুষ্কোণে এ-ধরনের ঊর্ধ্বাধ লম্বায়মান টেরাকোটাসজ্জা আছে কিনা আমার জানা নেই।

এপর্যন্ত কালনার বহুচূড় মন্দিরের কথা বললাম। এ তিনটি মন্দিরের টেরা-কোটা সম্পর্কে এক বিরাট আলোচনা হতে পারে যা সম্পূর্ণ করতে গেলে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধের দরকার হবে। বর্তমান আলোচনায় তা আদৌ সম্ভবপর নয়। কালনা অঞ্চলের স্থানীয় কেউ কেউ এ মন্দিরগুলি সম্পর্কে বেশ অগ্রহী আছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত এগুলি সম্পর্কে বিস্তৃত কোন আলোচনা চোখে পড়েনি (অবশ্য কিছুদিন আগে লালজীর মন্দিরটির আলোচনা শ্রীমহীতোষ বিশ্বাস মহাশয় 'অমৃতে' প্রকাশ করে-ছিলেন)। এর মধ্যে অবশ্য কেউ কেউ এই মন্দিরগুলি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন বলে আশা করি।

[প্রবন্ধে ব্যবহৃত আলোকচিত্রগুলি কালনার [illegible]]

রাজত্বকাল ॥ রত্নেশ্বর হাজরা

মুদ্রিত নিয়মে দিন চলে যায় আমার রাজত্বে। পথেঘাটে
নক্‌শা জুড়ে ঘুরে বেড়ায় রাজপথ—রেখার মধ্যে নদনদী
ছয়-বাই-চার ইঞ্চির দীর্ঘতম পর্বতমালা
তীর চিহ্নে ছুটে যাচ্ছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু।
ছবির মধ্যে যুদ্ধ হলো শত্রু জয়ের
ছায়াপথের দিকে হাঁটছে সুখী প্রজাবৃন্দ—লক্ষ লক্ষ মানুষ
টুপিতে শ্বেত ঈগলের পালক
সমুখে প্রজার গানের শব্দ ঘুরে বেড়ায় অ আ ক খ গ-ঘ......

আমার যে বাড়ি তার দিঘির জলে ছবির মতো ব্রাহ্মণী হাঁস
ঢেউ উঠে আর নামে না—।
গল্পের ভাষায় প্রেম—গাছতলায়
১ জন কিশোর দু'জন যুবক ৩ জন বৃদ্ধের মৃতদেহ—
পাশাপাশি ভিড়। ভিড়ের মধ্যে
'ভালো আছি' 'ভালো আছি' শব্দ......

দূরে তখন মাঠের মধ্যে ধুলো ওড়ে—
ধুলোর সঙ্গে টুকরো টুকরো ঘাস
পর্বতমালায় গলে গেছে বরফ। পাথরস্ফূর্তি তৃষ্ণা—
দেখতে-দেখতে বইয়ে আঁকা মেঘের মতো মেঘ করে
আমার রাজত্বে
তীর চিহ্নে আটকে যায় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু......

তোমার হৃদয় ॥ জয়তী রায়

তোমার হৃদয় কোথায় রেখেছ—
আমি একা
অন্ধকারের কপাট হাতড়ে রুদ্ধশ্বাসে ঃ
সোনালী রোদ সবুজ শীষে মিলিয়ে গেল,
দেখতে পেলাম মাঠের শেষে
সূর্য স্নাত পথের রেখা।
পথের বাঁকে অনেক কথা, অনেক ভিড়
অনেক হিসাব খাতায় লেখা
সারা বছর,
আমার পথ ফুরিয়ে যায় প্রতীক্ষায়,
অন্বেষণে কাটলো শুধু রাতের প্রহর।
কোথায় আলো—সবুজ দিন সময়োচিত,
বাসি হাওয়ায় রাতের স্বপ্ন নির্বাসিত—
রক্তে লেখা পাপড়িগুলো ছড়িয়ে আছে,
কোথায় হৃদয় ফুল ফোটাবার অন্ধকারে।

জঠর ॥ গণেশ সেন

আঁচলের গেরো খুলে দেখালে মৃত শিশুর তাবিজ
রুপালী বুক উদোম করে দেখালে আদিম নখরাঘাত।
বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলে সমস্ত রাত
যেন বৃষ্টিতেই সর্বসুখ ও শুশ্রূষা আছে।
আদিগন্ত সূর্যের পেছনে ঘুরঘুর করছ ব্রতচারী পায়ে
যেন সূর্যের বরদ আঙুল সিঁথির বৈধব্যে দেবে
মোহিনী সিঁদুর।

ভালবেসে কিনে নিলে গান্ধর্ব নরক অস্থিমজ্জাময়।
খৈ ফোটা জ্যোৎস্নায় চড়ুইভাতির চর চুঁড়ে খাচ্ছে
উন্মত্ত বাঘিনী।
মৃত্তিকার ক্ষার জিব চেটে খায় ফোঁটা ফোঁটা পবিত্র রক্ত
জননীর।
সমস্ত শরীর ভেঙে যে আসে তার অনুভবে কম্পমান
ক্ষুধার্ত জঠর।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

'কিন্তু আসার উদ্দেশ্যটা কি?'

'উদ্দেশ্য না থাকলে মানুষ মানুষের বাড়িতে আসে না?' কথা বলতে বলতে সুপ্রিয়া চোখ দিয়ে হাসছিল। ওর এই হাসি আমার চেনা।

'অফিসে কিন্তু এই সময় আসে না।'

'এই সময় বলতে! এতো চমৎকার সময়। রোদ প্রখর হয় নি, কি সুন্দর শিরশিরে হাওয়া দিচ্ছে, সময়টা ভাল না কাকা?'

যতীনবাবু চশমার ফাঁক দিয়ে আমার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ঘাড় দোলালেন। ইচ্ছে হচ্ছিল মাছ কাটা বঁটি দিয়ে দি-ই লোকটার ঘাড় খচাৎ করে কেটে। এর পরে আসা নিয়ে আর প্রশ্ন করা চলে না। চুপ করে বসে রইলাম। সুপ্রিয়া ক্রমাগত পেয়ারা খেতে লাগল। এক সময় মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল, 'এত পেয়ারা খাওয়া ভাল না।'

'কি হয় পেয়ারা খেলে। পেয়ারায় খুব ভিটামিন থাকে। তাই না কা—'

'না, কিছু থাকে না। যদিও থাকে সে খুব সামান্য।' ইচ্ছে করেই যতীনবাবুর ঘাড় দোলানো বন্ধ করে দিলাম। কেন যেন বুড়ো লোকটির ঘাড় দোলানো ক্রমশই অসহ্য হয়ে উঠছিল।

'তুমি জানো না, পেয়ারায় যে শুধু ভিটামিন থাকে তা না। আরও অনেক কিছু থাকে। যেমন কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন—'

'তোমার মুণ্ডু। ফলে প্রোটিন থাকে না।' বলে উঠে দাঁড়ালাম। সামান্য তিন কাপ চা করতে মা কত দেরী করছে। চা না খাইয়ে বিদায় করা যায় না। ওরা বিদায় না হলে আমার অফিস যেতে আজ ভয়ানক দেরী হয়ে যাবে। অথচ হাতের কাজ এখনও শেষ হল না।

'তুমি বড্ড বেশী ছটফট করছো। তোমার কি শারীরিক অসুস্থতা হচ্ছে?'

'না।'

'তবে বসো।'

'তোমাদের চা আসছে না কেন, তাই দেখছি।'

'চা সময় মত ঠিক আসবে, এত তাড়া কিসের।'

'আমার তাড়া আছে। অফিসে পৌঁছতে দেরী হয়ে যাবে।'

'আজ তোমাকে আর অফিসে যেতে হবে না। শুধু আজ কেন, কোন দিনই আর যেতে হবে না।'

'মানে?'

'মানে, তোমার রিজার্ভেসন হয়ে গেছে। কাল রাত্রের ট্রেনে তুমি পাটনায় যাচ্ছো। টিকিটটা ওকে দিয়ে দিন কাকা।'

ছোট্ট পোর্টফোলিও খুলে টিকিট আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন যতীনবাবু। হাত বাড়ানো কী, আমি তখন গভীর বিস্ময়ে সুপ্রিয়াকে দেখছিলাম।

আদরের সুরে সুপ্রিয়া বলল, 'নাও, ধরো।'

'না।'

'না মানে?'

'মানে, আমি যাবো না।'

'যাবে না?'

'না।'

'অংশু।'

হেসে ফেললাম, 'একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না! আমার বাড়িতে বসে আমাকেই চোখ রাঙানো।'

যতীনবাবু কি বলতে যাচ্ছিলেন, সুপ্রিয়া বলে উঠল, 'টিকিট আমাকে দিয়ে আপনি গাড়িতে গিয়ে বসুন কাকা, আমি একটু পরে যাচ্ছি।'

যতীনবাবু উঠে বেরিয়ে গেলেন। যতীনবাবু যে চা না খেয়ে উঠে গেলেন, সে কথাও মনে পড়ল না আমার।

যতীনবাবু উঠে যেতে সুপ্রিয়া চেয়ার টেনে আমার কাছে এসে বলল, কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে বলল, 'আমাকে অপমান করে খুব সুখ পাও, না?'

'অপমান আমি করি নি, তুমিই করবার চেষ্টা করছো।'

'তোমার টিকিট কাটা মানে তোমাকে অপমান করা?'

'আমার সুবিধা-অসুবিধা না জেনে সেই ব্যবস্থা করা অপমান ছাড়া কি?'

'এতে তোমার মঙ্গল হবে।'

'আমার মঙ্গল ছাড়া চিন্তা করার অনেক কিছু তোমার থাকা উচিত।'

'সব উচিতই কি মানুষ করতে পারে। অবাধ্যতা করো না অংশু, প্লীজ।' সুপ্রিয়া যেন চোখ দিয়ে আমার পা স্পর্শ করল।

সোজা হয়ে চেয়ারে বসতে বসতে বললাম, 'একটা কথা কিছুতেই ভেবে পাই না, অফিসে এত লোক থাকতে তুমি শেষ পর্যন্ত আমাকে নিয়ে পড়লে কেন?'

অধৈর্যভাবে সুপ্রিয়া বলে উঠল, 'সেকথা বুঝবার মতো বুদ্ধি তোমার নেই। থাক সেকথা। অফিসে আজ প্রচণ্ড গোলমাল হবে। ওরা তোমার ট্রান্সফার নিয়ে মিস্টার কাপুরের কাছে মেমোরেন্ডাম পাঠাবে। ওরা বলছে এটা বে-আইনী। সমস্ত চক্রান্তের মূলে রয়েছে মজুমদার, যাকে তুমি বন্ধু বলে মনে করো।'

শান্ত কণ্ঠে বললাম, 'আমার প্রশ্নের উত্তর এখনও পাই নি।'

সুপ্রিয়া যেন আকাশ থেকে পড়ল, 'তোমার আবার কি প্রশ্ন?'

'এত লোক থাকতে আমাকে নিয়ে পড়লে কেন?'

সুপ্রিয়া এদিক-ওদিক তাকিয়ে যেন লোক খুঁজলো, 'কোথায় লোক?'

'ইচ্ছে করে বোকা সাজতে চেষ্টা করো না। তুমি বুদ্ধিমতী একথা জানি। কিন্তু তার মানে এই না যে, আর সবাই বুদ্ধিহীন।'

সুপ্রিয়া জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করে বলল, 'কে তোমাকে নির্বোধ বলে। দেখি তো কার এত সাহস।'

'হাসি ঠাট্টা করার সময় আমার নেই। অফিসের সময় হয়ে যাচ্ছে।'

সুপ্রিয়া উঠে পথ আটকে দাঁড়াল। 'না, তা তুমি পারবে না।'

'পথ ছাড়ো। অফিস তোমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি না। একটা মেরুদণ্ডহীন মানুষকে নিয়ে যা ইচ্ছে করো, আপত্তি জানাবো না।

কিন্তু সবাই যে তোমার কাপুরে না, সেকথা তোমাকে বুঝতে হবে।'

সুপ্রিয়া উত্তর দিল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বললাম, 'পথ ছাড়ো।'

সুপ্রিয়া সরলো না। ধীরে ধীরে বলল, 'বিশ্বাস করো, পাটনায় বদলী করার মধ্যে আমার কোন স্বার্থ নেই। তুমি বড় হবে—'

'আমি বড় হবো, শুধু এইটুকু তোমার স্বার্থ?' বলে হঠাৎ অট্টহাসিতে ভেঙে পড়লাম।

সুপ্রিয়া আমার খুব কাছে সরে এসে হঠাৎ একটা হাত ধরে ফেলে বলল, 'আমি তোমার অতিথি। আমাকে অপমান করার কোন অধিকার তোমার নেই।'

হাসি থামিয়ে দূরে সরে যেতে যেতে বললাম, 'আমি তোমাকে অপমান করতে চাই না। শুধু একটা ষড়যন্ত্র থেকে নিজেকে বাঁচাতে চাই, সে অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে।'

সুপ্রিয়া উত্তর দিল না। চেয়ারে বসে রুমাল দিয়ে ঘাম মুছতে লাগল। ওর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছিল। মনে মনে একটা উল্লাস অনুভব করছিলাম। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল সুপ্রিয়া। এভাবে চুপ করে থাকা অস্বস্তিকর। অথচ বলার মত কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। সুপ্রিয়া সামনের দিকে তাকিয়ে বসেছিল, আমি ওর মুখোমুখি বসলাম। ও একটা গাঢ় বাদামী রঙের শাড়ি পরে এসেছে। পায়ে হাল্কা চটি। মাথায় সাধারণ খোঁপা। ও হাতাকাটা ব্লাউজ পরেছে। নগ্ন বাহু চেয়ারের হাতলে এলানো। ওর এই বসার ভঙ্গী কেমন যেন একজন অসহায় মানুষের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। অথচ সুপ্রিয়াকে অসহায় বলে ভাববার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। মনে হল, সুপ্রিয়া একটু মোটা হয়েছে। মোটা হয়ে ওর গায়ের রঙও খুলেছে। আগে একটু চাপা চাপা রঙ ছিল, এখন বেশ ফর্সা দেখাচ্ছে। গালে মাংস লেগে চিবুক আর লম্বা লাগছে না। যার জন্যে ওকে একজন জেদী মানুষ বলে মনে হচ্ছিল না। বরং ওকে খুব শান্ত আর ভালোমানুষ বলে মনে হচ্ছিল।

অনেকক্ষণ হয়ে গেল, মার চা পাঠাবার নাম নেই। তিন কাপ চা করতে যে মানুষের কত সময় লাগে। ভাবতে ভাবতেই ঘরে ঢুকল যমুনা। ওর দুই হাতে দুটো বড় বড় থালা, থালা ভর্তি লুচি, তার পাশে গোটা কয়েক বেগুন ভাজা। যমুনা থালা দুটো নামিয়ে রেখে চলে যাচ্ছিল, বললাম, 'মাকে একবার আসতে বল। তিন কাপ চাও নিয়ে এসো।'

'আর এক থালা লুচি। এর চেয়েও বড় থালা। আর এর চেয়েও অনেক-অনেক বেশী লুচি। তোমার বাবুর জন্য।' হাসতে হাসতে বলল সুপ্রিয়া। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালাম।

কি আশ্চর্য! কয়েক মুহূর্ত আগেই ওকে একজন অসহায় মানুষ বলে ভ্রম হয়েছিল।

যমুনা আর একজন মানুষের আশায় এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। বললাম, 'বাইরে একজন ভদ্রলোক আছেন, তাঁকে ডেকে নিয়ে এসো।'

সুপ্রিয়া হাত নেড়ে বারণ করল।

যমুনা বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে একবার আমার দিকে একবার সুপ্রিয়ার দিকে তাকাতে লাগল। সুপ্রিয়া বলল, 'কাউকে এখন ডাকতে হবে না, তুমি বরং ভেতরে গিয়ে মাকে পাঠিয়ে দাও। আর একটা খালি থালা নিয়ে এসো।'

'খালি থালা দিয়ে কি হবে?' যমুনা প্রশ্ন করল।

'এখান থেকে কিছু লুচি তুলে দেবো। এত লুচি মানুষে খেতে পারে না।'

যমুনা চলে গেল। বললাম, 'খাও।'

'তবু ভাল।' বলে কতগুলো লুচি অন্য থালায় তুলে দিয়ে সুপ্রিয়া আবার বলল, 'তোমার ইনফিরিওরিটি কমপ্লেকসের যথার্থ কারণ আমি খুঁজে পাই না।'

ধমক দেবার মত করে বললাম, 'আমার কোন কমপ্লেকস নেই।'

সুপ্রিয়া যেন আমার কথা শুনতেই পেল না। বলে চলল, 'কি হবে নিজেকে নিয়ে এই লুকোচুরি খেলে। এতে যে অশান্তি বাড়ে কেউ তা বোঝে না। কতগুলো স্বার্থপর লোক বোঝাল, আর উনি নাচতে নাচতে বললেন, আমরা কারা? শুনবে, তোমরা কারা? তোমরা মানুষ। প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী যে মানুষ, তোমরাও সেই মানুষের গোষ্ঠী। অথচ নিজেরা সে কথাটা বুঝতে পার না, তাই যেখানে সেখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে থাক, বলতে পারেন, আমরা কারা?'

সুপ্রিয়ার কথায় গা জ্বলে উঠল। 'সে ভাবে বলা হয় নি মোটেই।'

'যেভাবেই বলা হোক, কথাটা আর যার মুখে শোভা পায়, অন্তত তোমার মুখে যে পায় না, সে কথা বোঝার বুদ্ধিটুকুও তুমি হারিয়ে ফেলেছো।'

'সব কথাই সবার মুখে শোভা পায়।'

'না পায় না। আমি যদি এখন রাস্তায় রাস্তায় চিৎকার করে বেড়াই, মানুষে মানুষে প্রভেদ নেই, একজনের উন্নতি হলে সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে ওপরে তুলে দিতে হবে—তা হলে কথাটা শুধু যে অর্থহীন হবে তা-ই না, নেহাৎ মূর্খের মত শোনাবে।'

'কেন?'

'কারণ আমি সেই মানুষ যে নিজের চেষ্টায় পরিশ্রমে উঁচুতে উঠছি। অধিকাংশ মানুষেরই চেষ্টা নেই এবং তারা অত্যন্ত অলস।'

'আমিও সেই অধিকাংশ মানুষের দলে। অথচ আমি উঁচুতে উঠছি। আর সেখানেই আমার আপত্তি।'

সুপ্রিয়া নড়ে চড়ে বসল। আমার দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে বলতে লাগল, 'দারিদ্র্য নিয়ে বড়াই করার মধ্যে বাহাদুরী নেই। ভারতবর্ষের শতকরা নিরানব্বই জন লোকই দরিদ্র। প্রত্যেক মানুষ চায় সে যেন এক ভাগ মানুষের মধ্যে পড়তে পারে। অথচ, ভাবতেও অবাক লাগে, কেউ কেউ ইচ্ছে করে নীচে পড়ে থাকতে চায়।'

'যদি পারি নিজের চেষ্টায় উঠবো। দয়া যে করে সে আনন্দ পায়। কিন্তু দান নিতে কষ্ট হয়, অনেক সময় পারা যায় না।'

'এটা দয়াও না, দানও না, পরিশ্রমের ফল।'

'আমার মত আরও অনেকেই পরিশ্রম করেছে বা করছে।'

'সে বিচারের ভার অফিসের কর্তাদের ওপর, তোমার ওপর না। তোমাকে পাটনায় বদলী করা হয়েছে, তোমাকে খুশী করতে না। কোম্পানী তোমাকে দিয়ে আরও কাজ আদায় করে নিতে চায়। তুমি যদি তাদের এক টাকা পাইয়ে দাও, তারা তোমাকে দু পয়সা দিতে কার্পণ্য করবে না। এখানে দেওয়া-নেওয়ার প্রশ্নটাই বড়, দয়া-দাক্ষিণ্যের কথা ওঠে না। অথচ সেই মেয়েলী কান্নাটা সমানে কেঁদে চলেছো। মেয়ে হয়ে যে কথা ভাবতে সংকোচ হয়, পুরুষ হয়ে কত সুন্দরভাবে সেই কথা ভেবে চলেছো। শুধু যে ভাবছো তা না। ভেবে গর্বিত বোধ করছো।' এক নাগাড়ে এত কথা সুপ্রিয়া সাধারণত বলে না। ওর বাচনভঙ্গী সুন্দর। গলার আওয়াজে মাদকতা আছে। শুনতে শুনতে নেশা লাগে।

হঠাৎ মার গলা শুনে পিছন ফিরে তাকালাম। মা একটা পরিষ্কার কাপড় পরে এসেছে, চুলটাও আঁচড়ানো। মা বলল, 'চা করতে একটু দেরী হয়ে গেল।' মার পিছন পিছন ট্রেতে তিন কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকল যমুনা। সুপ্রিয়া উঠে এসে মাকে প্রণাম করতে যাচ্ছিল, মা দুহাত পিছনে সরে গেল। বলল 'আর থাক মা। সুখে থাকো। ও বলল, অফিসের লোক এসেছে। ভাবলাম, কে না কে। তারপর যমুনা বলতেই চলে এলাম।'

একটা চেয়ার দেখিয়ে মাকে বসতে বলল সুপ্রিয়া। মা বসল না, দাঁড়িয়েই রইল। মা বলল, 'কিছুই যে খেলে না।'

'সকালে আমি বিশেষ কিছু খাই না।'

'ওরা অফিসে দুপুরের খাওয়া পায়। আমাদের মতন তো না।' আমি বললাম।

'তাতো পাবেই।' মা যে কি ভেবে কথাটা বলল কে জানে।

'সব মেয়েরাই পায় না। যারা বেশী মাইনে পায়, যাদের ভাল ভাল খাওয়া জোটে, তারাই শুধু কিনে পয়সায় মাছ মাংস খেতে পায়।' আমি আবার বললাম।

ভেবেছিলাম, মা হয়ত কারণ জানতে চাইবে। মা অন্য পথ ধরল। 'তোমার কে কে আছেন বাড়িতে। বাবা, মা—'

'মা খুব ছোটবেলায় মারা গেছেন। বাবাও মারা গেছেন। আমরা তিন বোন, চার ভাই। আমিই বড়।'

মা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোদের সেক্রেটারী না কে এসেছেন বলছিলি, তিনি কোথায়?'

সুপ্রিয়ার দিকে হাত দেখিয়ে বললাম, 'এই তো তিনি।'

মা বড় বড় চোখ করে সুপ্রিয়াকে দেখল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, 'মেয়েরা সেক্রেটারী হয়?'

আমি হেসে ফেললাম। 'তোমাদের মত মেয়েরা হয় না।'

মা গম্ভীর হয়ে বলল, 'সুযোগ পেলে আমিও হতে পারতাম। জানিস, বৃত্তি পরীক্ষায় আর একটু হলে—'

'কিন্তু সেই হওয়াটা আর হল না।' বলে শব্দ করে হেসে উঠলাম। মার সংগে সংগে সুপ্রিয়াও হাসিতে যোগ দিল। কিছুক্ষণ আগে ঘরের আবহাওয়া ভারী হয়ে উঠেছিল, তিনজনের হাসিতে সেই ভাবটা কেটে গেল।

সুপ্রিয়া এক সময় বলল, 'জানেন মাসীমা, আপনার ছেলেকে বোঝাচ্ছিলাম, মানুষ মুখে যে যাই বলুক না কেন, আসলে যে যার কাজ গুছিয়ে যাচ্ছে। ওদের কথায় নেচে ওঠা মানে, নিজের সর্বনাশ ডেকে আনা। অফিসে খুব গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেছে। আর দুদিন পর মারপিট আরম্ভ হয়ে যাবে, অথচ এই সময় ওর পাটনায় চলে যাওয়া দরকার। আমাদের বড় সাহেবেরও সেই ইচ্ছে। টিকিট পর্যন্ত কাটা হয়ে গেছে। অথচ শেষ মুহূর্তে উনি বেঁকে বসলেন। কি বিশ্রী ব্যাপার বলুন তো।'

মার মুখ চোখ দেখে বুঝতে পারলাম, মা ক্রমশই বিভ্রান্ত বোধ করছে। সুপ্রিয়াকে ধমক দিয়ে বললাম, 'অফিসের ব্যাপারে মা'কে কেন?'

মা আমার দিকে না তাকিয়ে সুপ্রিয়াকে দেখতে লাগল। একটুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বলল, 'ও খুব দুঃখী। ওরও ছেলে বয়সে বাবা মারা গেছে। ওর বাবা, আমার শ্বশুর মশায়ের একমাত্র সন্তান ছিলেন। তবু যা হোক, আমার দাদা আর দুজন ছোট ভাই রয়েছে, না হলে ওর তিন কুলে কেউ থাকতো না।'

মাকে এক এক সময় আমার দারুণ অদ্ভুত লাগে। কোথাও কিছু নেই হঠাৎ বাইরের লোকের সামনে কাঁদুনী গাইতে বসে গেল। কিংবা এমনও হতে পারে, এবং সেটাই খুব স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে এখন, মা সুপ্রিয়াকে বাইরের লোক বলে ভাবছে না, বরং কোন হিতৈষী বন্ধু বলে ভাবতে শুরু করেছে। মার কথাগুলো এখনও আমার কানে বাজছে। মা যেন খুব করুণ সুরে আমার জন্যে ভিক্ষে চেয়ে বেড়াচ্ছে।

আহত কণ্ঠে বললাম, 'দুঃখী মানুষই যে লোভী হবে তার কোন মানে নেই।'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সুপ্রিয়া বলে উঠল, 'কিন্তু স্বাভাবিক মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকবে না কেন।'

'স্বাভাবিক কথাটা এত বেশী হেঁয়ালী যে, সময় সময় সন্দেহ জাগে, কথাটার আসল মানেটা হয়ত আমাদের কারও জানা নেই।'

মা আমাকে বাধা দিয়ে বলল, 'সত্যি কথাই তো, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকবে না। তুই বড় হবি, বেশী টাকা-পয়সা রোজগার করবি, তোর বিয়ে হবে, সংসার হবে—এই সব আশা-আকাঙ্ক্ষা তোর থাকবে না। যদি না থাকে, তাহলে তো মানুষ আর মানুষ থাকতো না, পাথর, কিম্বা গাছপালা নদীনালা কিম্বা আর কিছু হয়ে যেতো।'

মার কথায় মুগ্ধ হওয়া চলে, কিন্তু মেনে নেওয়া যায় না। চুপ করে রইলাম।

মাও চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু সুপ্রিয়া মাকে চুপ করে থাকতে দিল না। ও বলতে লাগল, 'আর একটা কথাও ভেবে দেখতে হবে, মানুষ চাকরির জীবনে কি চায়। চায়, অর্থ, প্রতিপত্তি, স্বাধীনতা। প্রথমে ধরা যাক অর্থ। আপাতত আপনার ছেলে যা পাচ্ছে, পাটনায় গেলে সব মিলিয়ে, আমি হিসেব করে দেখেছি, অন্তত আড়াই গুণ বেশী পাবে। প্রতিপত্তি আর স্বাধীনতা এখানকার চেয়ে অনেক বেশী। আর ভাগ্য যদি সাহায্য করে কিছু দিনের মধ্যেই সেখানকার ম্যানেজার হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অসম্ভব না।'

'যেহেতু দেশপাণ্ডে কাপুরের শত্রু, এবং কাপুর কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে চায়।'

সুপ্রিয়ার চেরা চোখে হঠাৎ আলো ঝলকে উঠলো। 'মিথ্যে কথা!'

আমার মাথায় যেন খুনের নেশা চেপে গেল। একটা হাত মুঠি পাকিয়ে বাতাসে ছুঁড়তে ছুঁড়তে বলতে লাগলাম, 'দেশপাণ্ডে আর কাপুর দুজনেই হেড অফিসে যেতে চায়। দেশপাণ্ডের মুরুব্বির জোর আছে, তাই কাপুর ওকে ওপরে ওপরে ঘাঁটাতে ভয় পায়। তলে তলে আমাকে দিয়ে দেশপাণ্ডেকে নক আউট করাবার তালে আছে।'

সুপ্রিয়া চেয়ারের গায়ে নিজেকে ছেড়ে দিল। ওকে খুব অক্ষম দেখাচ্ছিল। প্রচণ্ড একটা উল্লাস আমার বুকের মধ্যে নেচে বেড়াচ্ছিল, আমি তা অনুভব করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সুপ্রিয়া, তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'হয়ত সবই সত্যি, হয়ত কিছুটা মিথ্যা। কিন্তু আমাদের কি যায় আসে! আমরা অফিসে কাজ করি কেন। কারণটা মুখ্যত টাকা-পয়সা রোজগার করবো, সংসারের দুঃখ-দারিদ্র্য ঘোচাব। কে কোথায় কি করলো না করলো তা নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলে আমাদের চলে না। কথাটা যদি সত্যি বলে ধরেও নেওয়া হয়, যে মিস্টার কাপুর দেশপাণ্ডেকে সরাতে চান, অন্যায়টা কোথায়। দেশপাণ্ডে যে অনেস্ট না, এবং লোকটার যে চরিত্রগত দোষ রয়েছে একথা তো অস্বীকার করা যায় না।'

'চরিত্রগত দোষটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং বুকে হাত দিয়ে অনেক বড় কর্তাই বলতে পারবে না, সে দোষ থেকে সে নিজেও মুক্ত কিনা।'

'কথাটা মানলাম, দেশপাণ্ডেকে সরাতে পারলে মিস্টার কাপুরের স্বার্থ সিদ্ধি হবে। কিন্তু কাপুর তো একথা বলেন নি, যে পাটনায় গিয়ে তোমাকে দেশপাণ্ডের বিরুদ্ধে লাগতে হবে, তার চুরি ধরা কিম্বা তার চরিত্রগত ব্যাপার নিয়ে স্পাইং করাটাই তোমার একমাত্র কর্তব্য। কাপুর কি বলেছেন সেই কথা?' সুপ্রিয়া সূঁচের দৃষ্টি দিয়ে আমাকে বিঁধতে লাগল। চুপ করে আছি দেখে সুপ্রিয়া জোর পেয়ে গেল। দ্রুত পায়ে মার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'দেখলেন মাসীমা, ও জবাব দিতে পারছে না। যদি পারতো ও অসম্ভব চেঁচাতো। ওর সব চেয়ে বড় মুস্কিল কি জানেন, ও নিজের ভাল-মন্দ বুঝতে পারে না। আমরা যারা ওর শুভাকাঙ্ক্ষী রয়েছি, ও তাদের ছেড়ে মজুমদার, মুকুন্দ মল্লিক এদের পিছনে গিয়ে দাঁড়াবে। ও জানে না, নিজের কি ভীষণ ক্ষতি করতে চলেছে ও। তাই তো তাড়াতাড়ি ওকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ওর ভালর জন্যেই—'

মা আক্ষেপের সুরে বলে উঠল, 'একথা যদি বুঝতে পারতো, এই অবস্থা হয় আমাদের। দেশে বেশী না, বিঘা পাঁচেক জমি ছিল, জ্ঞাতি-গুষ্টিরা সব লুটে-পুটে খেল। দাদা কতবার বলেছেন, যা, গিয়ে মামলা কর, শক্ত পায়ে দাঁড়া, দেখবি লোকেরা ভয় পেয়ে যাবে। তাতে দাদার ওপর চটে লাল। একদিন তো মুখের ওপর যাচ্ছেতাই বলে দিল। অথচ—'

চিৎকার করে উঠলাম, 'মা! তুমি চুপ করবে কিনা!'

মা রুখে দাঁড়াল, 'চুপ কেন করবো। তোর যা ইচ্ছে করে যাবি। এই যে পাটনায় বদলী হচ্ছে, কতবার বললাম, নিতুকে কথা দি-ই। বলে, না। কেন, সুষমা কি ফেলনা। দেখতে-শুনতে ভাল, ঘরের কাজকর্ম, লেখাপড়াও মোটামুটি জানে। তবে ও কেন সুষমাকে বিয়ে করবে না। কেন? মার বুক ঘন-ঘন ওঠা-নামা করতে লাগল। নিশ্বাস নিতে মার কষ্ট হচ্ছিল। মা সুপ্রিয়ার দিকে তাকিয়েছিল, সুপ্রিয়া তাকিয়েছিল আমার দিকে। দম নিয়ে মা আবার বলতে শুরু করল, 'তোর যদি কোন মেয়েকে পছন্দ, আমাকে বল। চামার, মেথর না হলে নিশ্চয় বিয়ে দেবো তার সঙ্গে, বউ বলে আদর করে ঘরে তুলে নেবো। তা না, শুধু বলবে, না। না, মানে কি, অ্যাঁ, বল্ না মানে কি?' বলতে বলতে মা এত উত্তেজিত হয়ে উঠল, যে মনে হতে লাগল মা যেন কোন মুহূর্তে অসুস্থ হয়ে পড়বে। মা কি করে ভুলে গেল, আমাদের সামনে তৃতীয় যে একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে, সে আমাদের পরিবারের কেউ না। অফিসের কারও সামনে পারিবারিক সমস্যার কথা তোলা যায় না, মা এই কথাটা যে আজ ভুলে গেল, ভেবে আমার প্রচণ্ড অস্বস্তি হতে লাগল। শুধু যে অস্বস্তি তা না, বিস্মিত হলাম এই ভেবে যে, মার মনের ভেতরে যে এমন একটা ক্ষোভ লুকোনো ছিল, কই, আমি তো এক মুহূর্তের জন্যেও জানতে পারি নি। মা যে এমন ধরনের চাপা মানুষ আমি জানতাম না। বরাবর ভেবে আসছিলাম, মুখে যাই বলুক, মনে মনে মা আমার বিয়ে চায় না। না চাওয়াই তো স্বাভাবিক। এক রান্নাঘরে দুই মহিলা চিরদিনই কলহের সৃষ্টি করে।

অসহায় হয়ে যখন মাকে দেখছিলাম, সুপ্রিয়া আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। মার একটা হাত নিজের দু হাতের মধ্যে নিতে নিতে বলল, 'আপনি এত চিন্তা করবেন না মাসীমা। ওর বিয়ের ব্যবস্থা আমরা করবো। অংশু বয়সের তুলনায় খুব ছেলেমানুষ। ছেলেমানুষেরা নিজেদের ভাল-মন্দ বুঝতে পারে না।' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে হুকুম করার ভঙ্গীতে বলল, 'তুমি যাবার জন্যে তৈরী হও, কাল রাত্রের গাড়িতেই তোমাকে যেতে হবে—বড় সাহেবের নির্দেশ বলে মনে করতে পারো।'

'আমি যদি সে নির্দেশ না মানি?'

'ভুল করবে। চার দিকে ছাঁটাই চলছে, ভেবেছো তোমার এই অবাধ্যতা কোম্পানী সহ্য করবে। তোমার নামে চার্জশীট দেবে।'

মনে মনে উচ্চারণ করলাম, 'ঠিক।' কিন্তু মুখে উচ্চারণ করবার আগেই মার পাংশু মুখের ওপর এসে দৃষ্টি আটকে গেল। কে যেন মার মুখের সমস্তটা রক্ত শুষে নিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মনটা কি রকম হয়ে গেল। মনে হল, আমি যে সব সময় শুধু নিজের দিকটাই দেখছি, নিজের স্বার্থ ছাড়া অন্য কিছু ভাবছি না, এতে মাকে দারুণ অবহেলা করা হচ্ছে। বলতে গেলে এটা প্রচণ্ড একটা নিষ্ঠুরতা ছাড়া আর কিছু না।

যখন নিজেকে নিষ্ঠুর মানুষ বলে মনে মনে ধিক্কার দিচ্ছিলাম, সেই মুহূর্তে সুপ্রিয়া আবার বলে উঠল, 'বাজারের অবস্থা খুব খারাপ। প্রচণ্ড ডিপ্রেসন। চাকরি-চাকরি করে মানুষ পাগল হয়ে উঠেছে। ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যা তা করছে। এখন বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে কলকাতা থেকে সরে পড়া।'

'কিন্তু অফিসে আমার অনেক কাজ বাকী পড়ে আছে।' নিজের গলার আওয়াজ নিজের কানেই বিশ্রী শোনাল। কি রকম একটা আপোষ মীমাংসার সুর যেন বেজে উঠল।

'থাক পড়ে। একজনের অভাবে যদি এত বড় কোম্পানী বন্ধ হয়ে যায়, যাক। তুমি যাবার যোগাড় করো।' সুপ্রিয়া সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওর হাত দুটো দু পাশ দিয়ে ঝুলে রয়েছে। ওর ঋজু দেহ, স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকা, লম্বাটে ধরনের চিবুক—সব কিছু মিলিয়ে মনে হতে লাগল, এই সব মানুষ চিরদিন অপর মানুষের ওপর প্রভুত্ব করার জন্যই জন্মায়!

মা হঠাৎ আমার পক্ষ নিয়ে বলল, 'একদিনের মধ্যে কি সব গুছিয়ে নিতে পারবে?'

অসহিষ্ণু গলায় সুপ্রিয়া বলে উঠল, 'নিশ্চয় পারবে। একদিন না মাসীমা, বলতে গেলে দুদিন। কাল রাত্রে তো ট্রেন, এখন সবে সকাল সাড়ে ন'টা। আমি আর দেরী করবো না, কতগুলো জরুরী কাজ পড়ে আছে। আর একটা কথা—'বলে সুপ্রিয়া আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'অফিস ইউ-নিয়ন থেকে কেউ যদি আসে, দেখা করো না।'

'বাড়িতে পালিয়ে বসে থাকতে পারবো না আমি।'

'তা হলে বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাও।'

'যাবার জায়গা আমার নেই।'

মা বলল, 'কেন নেই। দাদার কিম্বা আর ভাইদের বাড়িতে যেতে পারিস না তুই। কত আদর করেন দাদা, কত খুশী হয় তুই গেলে।'

'তুমি চুপ করবে!' বলে মার দিকে কট-মট করে তাকাতেই সুপ্রিয়া বলে উঠল,

'কেন চুপ করবেন উনি। তোমাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতেই হবে, এবং এক্ষুনি। আপনার ভয় নেই মাসীমা, আমি এক ভদ্রলোককে রেখে যাবো, খুব আপনার লোক, আপনার কোন সঙ্কোচ নেই, উনিই সব গোছগাছ করে দেবেন। আপনি শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখুন।'

'আমি চলে গেলে মা একা একা থাকবে নাকি?'

সুপ্রিয়া মার দিকে তাকিয়ে রইল। ও যেন মনে মনে পথ খুঁজছিল, মা বলল, 'আমি দাদার বাড়ি চলে যাব।'

'তা হলে আপনিও আজ চলে যান, মাসীমা। আমি অফিসে গিয়ে লরীর ব্যবস্থা করছি। লরী এলেই মালপত্র পাঠিয়ে দেবেন।' আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি আমার সঙ্গে গাড়িতেই চলো। ওরা তোমাকে অফিসে দেখতে না পেলেই ছুটে আসবে।'

মা ভয়ে ভয়ে বলল, 'তুই চলে যা। আমি জিনিষপত্র নিয়ে আসছি। যাবার পথে বরং বলাইকে খবর দিয়ে যা। ওকে সব বুঝিয়ে বলে যাব।'

সুপ্রিয়ার সঙ্গে এক গাড়িতে পাশাপাশি আগেও চড়েছি, আজ কি রকম সংকুচিত হয়ে বসলাম। মনে হচ্ছিল, গায়ে গা ছোঁয়া লাগাটা বিশ্রন অস্বস্তিকর। সুপ্রিয়া যেন একটু বেশী মাত্রায় আমার দিকে সরে বসল। এক এক সময় মানুষকে ঘৃণা করতে ভাল লাগে। সেই মুহূর্তে মনে হয়, আমি যদি এই পৃথিবীর অধীশ্বর হতাম, কতগুলো মানুষকে চিরজীবনের মত একটা নির্জন দ্বীপে বনবাস দিতাম। দিতাম এই কারণে যে সুস্থ সবল মানুষদের সঙ্গে পাশাপাশি বাস করার অধিকার এরা হারিয়ে ফেলেছে।

একটা খাম আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সুপ্রিয়া বলল, 'তোমার পথের খরচা এবং ওখানে গিয়ে যদি কিছু দরকার হয়, তার জন্যে আরও কিছু টাকা। হোটেলের খরচা অফিস দেবে। সেই সম্বন্ধে পাটনায় চিঠি দেওয়া হয়েছে।'

সুপ্রিয়া অল্প একটু হাসল। বলল, 'আমি জানতাম তুমি যাবে।' মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছিলাম, তার আগেই সুপ্রিয়া বলল, 'যারা ভালমানুষ হয়, তারা মানুষকে কষ্ট দিতে চায় না।'

'আমি না গেলে কার কষ্ট?' বিষম অবাক হয়ে সুপ্রিয়ার দিকে তাকালাম।

সুপ্রিয়া জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। বলল, 'আমার। তোমার হয়ে আমি কাপুরকে কথা দিয়েছিলাম।'

'আমার হয়ে কথা দিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। আমি বিশ্বাস করি, একজন সৎ মানুষ কর্তব্যপরায়ণ হয়। আর কর্তব্যপরায়ণ মানুষ তার কর্তব্য কখনই অবহেলা করে না।'

ধীরে ধীরে বিপন্ন বোধ করতে লাগলাম। কেউ যেন আমাকে ঠেলতে ঠেলতে এক গভীর অন্ধকারের দিকে নিয়ে চলেছে। এই অন্ধকার পার হলে আলো, না গভীরতর অন্ধকার, সেকথা আমার জানা নেই, অথচ থামা চলবে না, শুধু চলা। চলতে চলতে কোথায় শেষ হয়ে যাব কে জানে। না কি শেষ হব না। শুধুই চলবো।

'এই চিঠিটা রাখো। পাটনা অফিসে দেখিও', বলে আর একটা খাম আমার হাতে গুঁজে দিল সুপ্রিয়া। একটুক্ষণ চুপ থেকে বলল, 'মান-অভিমানের প্রশ্ন এখানে বড় না। প্রশ্ন হচ্ছে প্রত্যেককে নিজের নিজের কর্তব্য করে যেতে হবে। তোমার প্রথম কর্তব্য হবে, পেঁছে বিস্তারিতভাবে অফিসের অবস্থার কথা জানানো। কোথায় কি গলদ এই সব। যদি কিছু সাজেশন থাকে, তাও। দ্বিতীয় কর্তব্য, সেল্স বাড়ানো। শুনে খুশী হবে, ওখানে পেঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই তোমাকে সেল্স ইনচার্জ করে দেওয়া হবে। মিস্টার কাপুর প্রথম ধাপেই সেল্স ম্যানেজার কথাটা ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, আমি বারণ করেছি। একটু-আধটু রয়ে-সয়ে করা ভাল। তাড়াহুড়ো করে কিছু করতে গেলে তুমি সন্দেহ করবে, হয়তো ভাববে আমার কোন স্বার্থ সেখানে জড়িত রয়েছে। তৃতীয় কর্তব্য হচ্ছে, অন্যায় বা দুর্নীতি যদি কিছু নজরে পড়ে, কোলকাতার অফিসে তা জানানো। একে স্পাইং বলে না। দুর্নীতি দূর করা, আর যাই হোক, স্পাইং-এর পর্যায়ে পড়ে না।' সুপ্রিয়া থামল। ওকে একজন প্রবীণ ধর্মযাজকের মত মনে হচ্ছিল। মানুষের কর্তব্য সম্বন্ধে এমন সারগর্ভ বক্তৃতা বহুদিন শুনি নি। অন্য দিন হলে এ সম্বন্ধে লঘু দু-একটা কথা হয়তো বলতাম। কিন্তু আজ মন ভাল ছিল না। চুপ করে রইলাম।

সুপ্রিয়া বলল, 'রাস্তা দেখাবার দায়িত্ব তোমার, মামা-বাড়ি আমার অচেনা।'

ড্রাইভারকে রাস্তার নির্দেশ দিয়ে বাইরের দিকে মুখ করে বসে রইলাম। এক এক সময় শুধু যে কথা বলতে আলস্য ধরে তা না, মনে মনে কোন বিষয় নিয়ে চিন্তা করতেও ক্লান্তি আসে। মনের মধ্যে এক বিরাট শূন্যতা নিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কাতারে-কাতারে মানুষ বাসে-ট্রামে ঝুলতে-ঝুলতে যাচ্ছে। আমি একটা ফাঁকা গাড়িতে আরাম করে চলেছি। ওরা যেদিকে যাচ্ছে, আমি তার বিপরীত দিকে চলেছি। ওরা সবাই কাজ করতে যাচ্ছে, আমি কাজ ফাঁকি দিয়ে নিজের কর্তব্য করছি।

গাড়িতে আর কথা হল না। সুপ্রিয়া চুপ করে বসে আছে। ওকে খুব পরিতৃপ্ত দেখাচ্ছে। বড়মামার লাল রংচটা বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। বহুদিনের ভাড়াটে বড়মামা। সেই কবে, বোধকরি কোলকাতার গোড়াপত্তনের সময়, এই বাড়িতে ঢুকেছেন, তারপর কত কি হয়ে গেল, বাড়ি বদলান নি। ঘরগুলো স্যাঁত-স্যাঁতে আর অন্ধকার মতন। দিনের বেলায়ও বড় বড় ছুঁচো আর ইঁদুর দৌড়া-দৌড়ি করে। ওরা ভয় পায় না। মা নির্ঘাৎ ভয় পাবে। একটু ঠাণ্ডা লাগলেই মার জ্বর

হয়। কে জানে এই ঠান্ডা ঠান্ডা বাড়িটায় ম কদিন ভালো থাকবে।

বড়মামা অফিসে চলে গেছেন। মামীমা রান্নাঘরে ছিলেন। সুপ্রিয়াকে এই বাড়ির দৈন্য-দুর্দশা দেখাবার ইচ্ছে ছিল না। বললাম, 'চল।'

সুপ্রিয়া আমার পিছন পিছন ভেতরে চলে এল। বড়মামীমাকে প্রণাম করে বলল, 'আপনাদের ভাগ্নে ভেতরে ডাকলো না, নিজে থেকেই এলাম। আমরা এক অফিসে চাকরি করি। অফিসে, ওর পাটনায় বদলী নিয়ে খুব গন্ডগোল, তাই এ বাড়িতে দিয়ে গেলাম। ও কালই পাটনায় যাচ্ছে। মাসীমা বিকেলে আসবেন। আমিই গাড়ি করে নিয়ে আসবো। দুপুরের দিকে লরী করে মালপত্র আসবে। আর দেরী করবো না। অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। চললাম।' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে সুপ্রিয়া গিয়ে গাড়িতে উঠল।

মামীমা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, 'কে রে মেয়েটি? বেশ দেখতে তো।' গাড়ি ততক্ষণে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে।

বিকেলে সুপ্রিয়া মাকে নিয়ে এল। যতীনবাবুও সঙ্গে এলেন। শুনলাম যতীনবাবু নাকি সমস্তক্ষণ মার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, জিনিসপত্র গুছোতে খুব সাহায্য করেছেন মাকে। মা তো যতীনবাবুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মা বলছিল, 'পুরুষ মানুষ যে এত গুছোনো হয় জানতাম না। কি সুন্দর করে কাঁচের জিনিসপত্র কাগজে মুড়ে মুড়ে বাকসে ভরে রাখলেন, ফ্যান দুটো পুরনো কাপড় দিয়ে এমন সুন্দরভাবে ঢেকে দিলেন যে একটুও ধুলো বালি পড়বে না।'

বড়মামা কিছুক্ষণ আগেই ফিরেছেন। বড়মামীমার মুখে সুপ্রিয়ার কথা আগেই শুনেছিলেন। বড়মামা হাতল ভাঙা চেয়ারে বসে তামাক টানছিলেন। বড়মামা নাকি এই সময় সিগারেট খাওয়ার চেয়ে তামাক খেতেই ভালবাসেন। ভদ্রলোক সম্ভবত সিগারেট খান। আমি পাশে একটা চেয়ারে বসেছিলাম। মাকে ছেড়ে দিয়ে সুপ্রিয়া চলে গেল।

বড়মামা জিজ্ঞেস করলেন, 'সেক্রেটারী মহাশয়া ঢুকলেন না?'

তার আগেই বড়মামাকে সুপ্রিয়া সম্বন্ধে বলেছিলাম।

মা বলল, 'কি নাকি জরুরী কাজ আছে বলে চলে গেল।'

মনে মনে বললাম, 'কাজ না ছাই। বস-এর মনোরঞ্জন করতে গেল নির্ঘাৎ।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই মেজমামা আর ছোট-মামা সপরিবারে এসে হাজির। দুই মামাই টালীগঞ্জের পৈত্রিক বাড়ির বাসিন্দা। বাড়িটা ছোট, সবার স্থান সংকুলান হয় না। বড়মামা তাই ভিন্ন বাসা নিয়েছেন কালী-গঞ্জের দিকে।

ছোটমামা জজকোর্টের উকিল। সাধারণ কথা বাঁকাভাবে দেখা স্বভাব। সব শুনে-টুনে বললেন, 'হঠাৎ দুম্ করে বাইরে বদলী করার মূলে নিশ্চয়ই কোন গূঢ় কারণ আছে, না হলে এত লোক থাকতে ওকে যে ভালবেসে পাঠাচ্ছে না সেকথা তো বোঝাই যাচ্ছে।'

প্রত্যেক কথায় প্রতিবাদ করা ছোট-মামীমার অভ্যেস। 'কেউ যে কাউকে ভাল-বাসবে না এমন কথা কি তোমার আইনের বইয়ে লেখা আছে!'

ছোটমামীর কথার প্রত্যক্ষ উত্তর এড়িয়ে যাওয়াই ছোটমামার স্বভাব। 'ভালবাসা রাস্তায় ছড়াছড়ি যায় না।'

মেজমামা নির্বিবাদী মানুষ। নিজের স্ত্রী, ছেলেমেয়ে ছাড়া বাইরের জগৎ সম্বন্ধে অসম্ভব উদাসীন। সন্ধ্যা রাত্রেই প্রকান্ড একটা হাই তুলে বললেন, 'ছেড়ে দাও, যত আজে-বাজে কথা নিয়ে মাথা ফাটাফাটি করে লাভ নেই। যেতে যখন হবেই, তখন যত সহজভাবে যাওয়া যায়, তার চেষ্টাই করা উচিত।'

বড়মামা হাত দিয়ে হুঁকোর গা পালিশ করতে করতে বললেন, 'মেয়েটিকে দেখার ইচ্ছে ছিল। মেয়েদের মধ্যে যে এমন ধুরন্ধর কেউ থাকতে পারে ভাবার বাইরে ছিল।'

মা ভ্রূ কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ধুরন্ধর মানে?'

বললাম, 'ধুরন্দর মানে, কি বলবো, ওস্তাদ বা অতিচালাক বা—'

মা ধমকে উঠল, 'চুপ কর।'

বড়মামা আমার পক্ষ নিলেন, 'চুপ কেন করবে। ওর মুখে যা শুনলাম সত্যি ভাবনার কথা। পাটনায় নিয়ে গিয়ে কোন ফ্যাসাদে না ফেলে।'

মা নিশ্চিতভাবে বলল, 'না, না। সে রকম কিছু না। ওরা তোমাদের ভাগ্নেকে স্নেহ করে, ভালবাসে, তাই ওর উন্নতি চায়। ওর কথাতেই সে রকম বুঝলাম কিনা। তা ছাড়া মেয়েটির যে গুণটা সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ল, তা হচ্ছে ও পেছন থেকে কারও ক্ষতি করতে পারে না; যা করবে সামনা-সামনি করবে।'

মাকে এতদিন পর্যন্ত ভালমানুষ, এমন কি সময় সময় বোকা বলেও মনে হত। এই মুহূর্তে মাকে অত্যন্ত বিচক্ষণ মানুষ বলে মনে হতে লাগল। মা যে সুপ্রিয়ার আসল রূপটা আবিষ্কার করে ফেলেছে সে কথা বলছি না, দেখছিলাম মার বলার ভঙ্গি, এক সঙ্গে এমন সুন্দর ভাবে গুছিয়ে কথা বলতে মাকে কোনদিন শুনি নি।

বড়মামা আর মার কথার প্রতিবাদ করলেন না। শুধু বললেন, 'এখন সব দিক দিয়ে ভাল হলেই ভাল।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই দু মামা পরিবার নিয়ে চলে গেলেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর বড়মামা আমাকে নিয়ে পড়লেন। একথা সেকথার পর হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আমাদের যুগে কো-এডুকেশন ছিল না। স্কুল-কলেজে ছেলেমেয়ে এক সঙ্গে পড়বে ভাবাই যেতো না। ধীরে ধীরে দিনকাল পাল্টে গেল। ছেলেমেয়ে এক সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আজকাল কাজ করে, হাসে, খেলে, সিনেমায় যায়। কিন্তু বেসিক প্রশ্নটা কিন্তু থেকেই গেল। যে পুরুষ সে পুরুষই রয়ে গেল, মেয়ে মেয়েই। তোদের সায়েন্সে একটা কথা আছে, আনলাইক পোলস্ অ্যাট্রাক্টস্। কথাটা খুব দামী। মানুষের বেলায় ভীষণ প্রযোজ্য।'

বড়মামার কথার আরম্ভেই শেষ সম্বন্ধে আঁচ করে নিয়েছিলাম। ইচ্ছে করেই চুপ করে রইলাম। দেখা যাক ভদ্রলোক আরও কতটা বাড়তে পারেন। ভদ্রলোক যে ঘন ঘন চোখ দিয়ে আমাকে মেপে মেপে দেখছিলেন, বোঝা যাচ্ছিল। উনি আবার বলতে শুরু করলেন, 'বুদ্ধিমান যারা তারা আগে থেকেই সাবধান হয়, বোকারা পুড়ে মরে।'

হঠাৎ আমার ভীষণ রাগ ধরে গেল। বললাম, 'পুড়ে মরবার কি দেখলেন এখানে?'

বড়মামা নকল গাম্ভীর্য দেখিয়ে বললেন, 'দেখি নি এখনও, তবে দেখতে কতক্ষণ?' বলে হঠাৎ দমকা হাসিতে ফেটে পড়লেন। ভদ্রলোকের মুড অনেকটা বর্ষাকালের বৃষ্টির মত। কোথাও কিছু নেই হঠাৎ ঝম ঝম করে বৃষ্টি নেমে পড়ল, ভদ্রলোক শুধু শুধু এমন হাসতে পারেন!

মা কিছুক্ষণ বসে থেকে উঠে যাচ্ছিল। বড়মামা বললেন, 'কোথায় চললি?'

মা ঘুম ঘুম চোখে জবাব দিল, 'শুতে।'

'এগারোটাও তো বাজে নি এখন।'

মা ক্লান্তভাবে হেসে বলল, 'আমরা একটু সকাল সকাল ঘুমোই।'

'আমরা বলো না। আমার ঘুমোতে দেরী হয়।'

আমার কথার উত্তরে মা শান্ত মেয়ের মত ঘাড় হেলিয়ে বলল, 'তা হয়। ও অনেক রাত পর্যন্ত বই পড়ে।'

বড়মামা বললেন, 'এটা একটা খারাপ অভ্যেস। যে যে লোকেরা রাত জেগে বই পড়ে, দেখিস, তাদের প্রত্যেকেরই স্বাস্থ্য খারাপ।' বড়মামা এমনভাবে বললেন, যেন বই না পড়ার দরুনই তিনি অটুট স্বাস্থ্যের অধীশ্বর।

মা শুতে যাবার আগে আমাকে মনে করিয়ে দিয়ে গেল, 'কাল সকালে তোদের সেক্রেটারী একবার ফোন করতে বলেছে। কি নাকি দরকারী কথা আছে।'

'কথাটা তো এখানে সেরে গেলেই পারতো।'

ঘুমে মার চোখ বুজে বুজে আসছিল। সেইভাবেই বলল, 'কথাটা ওকেই না হয় কাল জিজ্ঞেস করিস।' বলে মা ভেতরে চলে গেল। বড়মামা আপন মনে শব্দ করে তামাক টানছেন। শব্দের সঙ্গে একটা মিষ্টি গন্ধ ঘর ভরিয়ে তুলছে।

চুপচাপ দুজনে বৈঠকখানায় বসে রইলাম। মনে হল, বড়মামা কিছু চিন্তা করছেন। বড়মামার চিন্তা নিয়ে যে আমার একটা বিরাট কৌতূহল তা না, তবু কোন কোন অলস অবসর মুহূর্তে মানুষের চিন্তাধারার সঙ্গে নিজের চিন্তাধারা মিলিয়ে নিতে ইচ্ছে করে। এই মুহূর্তে

আমার মনে হচ্ছিল, পেয়ারা গাছে অনেকগুলো পেয়ারা এখনও অবশিষ্ট রয়েছে, কাল সকালেই পেড়ে নিয়ে আসতে হবে। গাছে থাকলে শুধু শুধু বাইরের লোকেরা খেয়ে যাবে। এখানে নিয়ে এলে তবু তো ভাইবোনদের পেটে যাবে। বড়মামাও কি এই জাতীয় কোন কথা ভাবছেন, না আমার সম্বন্ধে ভাবছেন, যদিও এমন কোন ধারণা আমার অন্তরে নেই, যে উনি আমার সুখ, দুঃখ, ভাল-মন্দ সম্বন্ধে অতিশয় মাত্রায় উদ্বিগ্ন। মামা হিসেবে যেটুকু হওয়া উচিত তার বেশী কিছু হওয়াটা অস্বাভাবিক বলেই মনে হয়।

হঠাৎ প্রশ্ন করে ফেললাম, 'কিছু ভাবছেন?'

বড়মামা অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'আমাকে বলছিস?'

বুঝলাম, বড়মামা সত্যি সত্যি গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। বললাম, হ্যাঁ, অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ রয়েছেন, তাই জিজ্ঞেস করলাম, কিছু ভাবছেন কিনা।'

'হ্যাঁ। ভাবছিলাম তো বটেই। তবে গভীর কোন সমস্যার কথা না। এই সাধারণ সাংসারিক টুকিটাকি—' বড়মামা যেন লজ্জা পেলেন। চুরি করে খেতে গিয়ে ধরা পড়লে বাচ্চা ছেলেমেয়েরা যেমন অপ্রস্তুত মুখ করে, বড়মামার মুখ সেরকম দেখাচ্ছিল।

বড়মামাকে নিয়ে খেলা করতে আমার ভাল লাগছিল। জিজ্ঞেস করলাম, 'সংসারে কি নতুন করে কোন সমস্যা দেখা দিয়েছে?'

বড়মামা চেয়ারের ওপর নড়ে-চড়ে বসে বললেন, 'নাঃ, তেমন কিছু না। তুই তো ঘরের লোক। তোকে বলতে আর দোষ কি। ভাবছিলাম পরের পয়সায় তো বেশ ওষুধ খেয়ে চলেছি। ওষুধ খেয়ে আছিও ভাল, কিন্তু ওষুধ যখন বন্ধ হয়ে যাবে?'

'বন্ধ হবে কেন বড়মামা?'

'তুই বাইরে চলে যাচ্ছিস, কে আর আমাকে ওষুধ যোগাবে।'

'পাটনা থেকে বাই পোস্টে পাঠিয়ে দেবো। তাছাড়া লোকজন নিশ্চয় যাতায়াত করবে, তাদের কারও সঙ্গে দিয়ে দেওয়া যাবে। সেটা কোন সমস্যাই না।'

বড়মামার মুখটা হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'তোর অসুবিধা হবে না?'

'না, না। আমার কি অসুবিধা।'

'তোদের ডাক্তারটি ভাল বলে মনে হচ্ছে। এক দিনেই তো বেশ উপকার বোধ করছি।'

'ওষুধ হঠাৎ বন্ধ করবেন না। আবার খারাপ হয়ে যাবে। ফুরোবার আগেই আমাকে লিখে জানাবেন। আমি পাঠিয়ে দেবো। আর একটা কথা বড়মামা, যদি কিছু মনে না করেন, এবং মনে করবার কোন কারণ আছে বলে যদিও আমি মনে করি না, তবু যদি মনে না করেন, তবে বলি।'

বড়মামা বিস্মিত হলেন। বললেন, 'তুই এত কিন্তু-কিন্তু করছিস কেন? বল না!'

'আজকাল দিনকাল যে কি ভয়ানক খারাপ, তাই বাধ্য হয়ে বলতে হচ্ছে, আমি মাসে মাসে একশো করে টাকা পাঠাবো।'

বড়মামা স্প্রীং-দেওয়া পুতুলের মত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন, 'খুকীর খাইখরচা হাত পেতে নিতে হবে আমাকে?'

'আপনি সেভাবে ধরছেন কেন। আজ যদি তাপস চাকরি করতো, সে সংসারকে সাহায্য করতো না? আমার মাইনে বাড়বে, বেশী টাকা-পয়সা হাতে পাবো, তার থেকে কিছুটা যদি এই সংসারের কাজে লাগে, সেটা কি খুব অন্যায়।' নিজেই বুঝতে পারলাম, বলার মধ্যে আন্তরিকতার সুর ছিল। মনে হল বড়মামাকে সেই সুর স্পর্শ করল।

দারিদ্র্যের একটা অহঙ্কার আছে। বড়মামা এখনও সেই অহঙ্কারের আবরণ ভেদ করে বাইরে আসতে পারছেন না। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, 'অনেকের সংসার, একজন মানুষ বাড়লো কি কমলো কিছু এসে যায় না। তাছাড়া ধর, যদি আমাদের কোন অবিবাহিত বোন থাকতো—'

হেসে ব্যাপারটাকে লঘু করে দেবার চেষ্টা করলাম, 'যা নেই তা নিয়ে ভেবে তো লাভ নেই। কথাটা হচ্ছে, একজনের প্রয়োজনের অতিরিক্ত আছে, সে যদি তার কিছুটা ভার অন্যের ঘাড়ে দিতে চায়—'

বড়মামার চোখে কৌতুক ঝিলিক দিয়ে উঠল। কিন্তু মুখে সেই ভাব না দেখিয়ে বললেন, 'সোনা বয়ে বেড়াবার গর্দভ তো বহু আছে। বহু কেন, যাকে বলবি, সেই মাথায় করে নাচবে তোকে।'

'কিন্তু আমি তো আর বার তার কাছে ভারটা চাপিয়ে দিতে পারি না।' বলে শব্দ করে হেসে উঠলাম।

বড়মামা আর কথা বাড়ালেন না। চুপ করে তামাক টানতে লাগলেন।

আরও কিছুক্ষণ বসে থেকে উঠে পড়লাম। আমার শোবার ব্যবস্থা মামাতো ভাই তাপসের সঙ্গে এক খাটে করা হয়েছে। শুতে গিয়ে দেখলাম, তাপস হাত-পা ছড়িয়ে এমনভাবে শুয়ে রয়েছে, যেখানে আমার শোয়া খুব মুস্কিল। অথচ রাত জেগে কাটানোও তো যায় না। সামনের ঘরে একটা ডেক চেয়ার দেখে এসেছি। সেটা নিয়ে আসতে গেলাম। বড়মামা যে অন্ধকারের মধ্যে তখনও বসে আছেন বুঝতে পারি নি। বড়মামার প্রশ্নে চমকে উঠলাম।

'চেয়ার দিয়ে কি হবে?'

'একটুক্ষণ বসে থেকে শোবো।'

অন্ধকারের মধ্যে বড়মামার হাসি শোনা গেল। 'আমার মত অভ্যেস তোর। কিছুক্ষণ অন্ধকারের মধ্যে বসে না থেকে আমি শুতে পারি না। কেন যে এই অভ্যেসটা হল, কে জানে।'

ঘরের মধ্যে এনে চেয়ার পেতে বসলাম। জানালা দিয়ে রাস্তার এক টুকরো আলো ঘরে আসছিল। সেই আলোতে ঘরটা আর অন্ধকার নেই। বসে বসে সামনের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। সমস্ত

দিনটাই চমকপ্রদ ঘটনার সমাবেশ। সুপ্রিয়া এলো, ছেলেমানুষের মত পেয়ারা খেলো, আমাকে বালক সাজালো, তারপর নিজের কাজ গুছিয়ে নিয়ে সুন্দরভাবে সরে পড়ল। ও যেন এক পাকা অভিনেত্রী। জীবনের রঙ্গমঞ্চে ওর পার্টটুকু কি সুষ্ঠুভাবে অভিনয় করে গেলো। কিন্তু আমি? পার্ট ভুলে গিয়ে জায়গায় জায়গায় কত হোঁচট খেলাম। ক্ষতবিক্ষত হলো, যা করতে কিম্বা বলতে চাইলাম, পারলাম না। আর এই না পারার ব্যথাটা শুধু আমার মধ্যেই সীমিত হয়ে রইল। মাকে বললে মা বুঝবে না, মামারা বুঝবেন না, কেউ বুঝবে না। হঠাৎ করবীর কথা মনে পড়ে গেল। করবী কি আমার দুঃখ বুঝতো? সঙ্গে সঙ্গে হাসি পেয়ে গেল। সংসারে এত লোক থাকতে করবী কেন আমার দুঃখ বুঝতে যাবে।

ভোর হতে-না-হতেই বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে নিজেদের বাড়ি যেতে হবে। বলাইকে দিয়ে গাছের সব পেয়ারা পাড়িয়ে নিয়ে আসবো। বড়মামা, মামীমা, ছেলে-মেয়ে সবাই খুশী হবে। আগে তাদের খুশী করার কথা কোনদিন চিন্তা করি নি। মাকে রেখে যাবো, তাই ওদের খুশী করা আমার কর্তব্য। এক এক সময় নিজেকে বিষম স্বার্থপর বলে মনে হয়। মনে হয়, পৃথিবীর অনেক মানুষই আমার চেয়ে বেশী উদার। বড়মামা যে ইচ্ছে করে মাকে রাখতে রাজী হলেন, সংসারের অভাব-অনটনের কথা বুঝেও আমার কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিতে রাজী নন, এই কথা মনে করে মামাকে উদার বলে মনে হল। সুপ্রিয়ার কথাও মনে পড়ল। যে যাই বলুক, সুপ্রিয়া খুব যে স্বার্থপর তা না। আমাকে পাটনায় বদলী করে ওর এমন কিছু স্বার্থসিদ্ধি হবে বলে মনে হয় না। সুপ্রিয়ার যে জিনিসটা আমার খারাপ লাগে, সেটা ওর অন্যায় জিদ, এবং মেয়ে হয়ে এই বেপরোয়া ভাবটা। ও যেন পৃথিবীর মানুষকে মানুষ জ্ঞান করতে ভুলে গিয়েছে। ওর এই দম্ভ সময় সময় অসহ্য হয়ে ওঠে, তখন ওর কাছ থেকে দূরে সরে আসতে ইচ্ছে করে।

পেয়ারা নিয়ে আসতে অনেক বেলা হয়ে গেল। বড়মামা অফিসে চলে গেছেন। মামাতো ভাই-বোনেরাও স্কুল-কলেজে গেছে। মা আর বড়মামীমা সামনের ঘরে বসে আছেন।
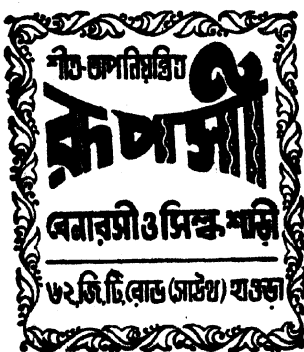
ঘরে ঢুকেই দুজনকে দেখতে পেলাম। দরজার পাশে যে আর একজন বসে আছে প্রথমে বুঝতে পারি নি। ঘরে ঢুকেই চীৎকার করে উঠলাম। 'শিগগীর ভাত দাও, পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি হজম হবার যোগাড়।'

বড়মামীমা বললেন, 'এত দেরী হলো?'

'আর বল কেন, বলাইটা ভাল গাছে চড়তেই জানে না, অথচ কথা শুনে মনে হয় সুপারী গাছে পর্যন্ত চড়তে পারেও। আর একটু হলে ডাল ভেঙে পড়ত। শেষ পর্যন্ত আমাকেই উঠতে হলো। এই কত পেয়ারা এনেছি।' বলে বড় থলিটা বড়মামীমার চোখের সামনে মেলে ধরলাম।

'ওমা সত্যিই তো। গাছ ভেঙে পেয়ারা নিয়ে এসেছিস যে।'

গর্বিতভাবে তখন মার মুখের দিকে তাকাতে যাব, দরজার পাশের অন্ধকার মতন জায়গা থেকে কে যেন বলে উঠল, 'পেয়ারা গাছে সবাই চড়তে পারে মামীমা। সত্যি-কারের প্রশংসার কাজ হচ্ছে এত বড় থলিটা বয়ে আনা।'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই সুপ্রিয়ার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। ওর চোখ স্পষ্ট দেখা গেল না। যদি যেতো সেখানে দারুণ হাসি দেখতে পেতাম নির্ঘাৎ। সুপ্রিয়ার কথার উত্তর না দিয়ে বড়মামীকে বললাম, 'খেতে দেবেন চলুন।'

মা বলল, 'আমি যাচ্ছি, চল।'

বড়মামীমা মাকে বাধা দিয়ে আমার পিছন পিছন বাড়ির মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছিলেন, সুপ্রিয়া বলে উঠল, 'আমি খুব পেয়ারা ভালবাসি।'

মা তাড়াতাড়ি উঠে গোটা কয়েক পেয়ারা ধুয়ে নিয়ে এল।

খাওয়া-দাওয়ার পর বাইরের ঘরে এসে বসলাম। সুপ্রিয়া তখনও পেয়ারা চিবোচ্ছে। একজন মানুষ যে এত পেয়ারা খেতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হতো না। সুপ্রিয়া মার সঙ্গে নীচু গলায় গল্প করছিল। আমি যেতেই ও'রা চুপ করে গেল। আমার খাওয়ার পর বড়মামী এ'টো বাসনপত্র নিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

মা জিজ্ঞেস করল, 'বৌদি এলো না?'

বললাম, 'হয়তো বাসন মাজতে বসেছেন।'

মা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। 'বৌদি শুধু কী করে। আর কিছুক্ষণ পরই তো ঠিকা ঝি আসবে।'

মা বেরিয়ে যেতেই সুপ্রিয়াকে বললাম, 'কথা যখন দিয়েছি, আমি আজই যাব। সেজন্যে গুপ্তচরবৃত্তি করার দরকার ছিল না।'

সুপ্রিয়া উত্তর দিল না। আপনমনে পেয়ারা চিবোতে লাগল। এই চিবোনোর মধ্য দিয়ে ও যেন আমাকে অগ্রাহ্য করছিল। বললাম, 'ইচ্ছে করলে এই কাজটা যতীনবাবুকে দিয়েও করান যেতো।'

সুপ্রিয়া আমার কথায় বলল, 'যতীনবাবু আহত অবস্থায় হাসপাতালে আছেন।'

'হাসপাতালে কেন?'

'ওকে ছুরি মারা হয়েছে।'

'কেন?'

সুপ্রিয়া কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'উনি একটু বেশী বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলেন। অফিসের বাইরে ওরা যখন গোপন মিটিং করছিল উনি তখন তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করছিলেন। সেই অবস্থায়ই ও'র পেটে ছুরি মারা হয়েছে।'

'কে মেরেছে ধরা গেলো?'

'না। কাল রাত্রে ব্যাপারটা ঘটেছে। অন্ধকারে উনি লোক চিনতে পারেন নি।'

'কেমন আছেন যতীনবাবু?'

'প্রাণের আশঙ্কা নেই। তবে সম্পূর্ণ সুস্থ হতে সময় লাগবে।' এতটুক্ষণ থেমে থেকে সুপ্রিয়া আবার বলল, 'ব্যাপারটা যে এতদূর গড়াবে বুঝতে পারিনি। যাই হোক, তুমি আজকের দিনটা একটু সাবধানে থেকো, বাইরে-টাইরে আর বেরিও না। সন্ধ্যের সময় অফিসের গাড়ি আসবে দুজন দারওয়ানও থাকবে সঙ্গে। একটু সতর্ক দৃষ্টি রেখো। যতীনবাবু সুস্থ থাকলে খুব ভালো হতো। ভদ্রলোকের দৃষ্টি খুব শার্প। আর দেরী করবো না। মিষ্টার কাপুর যদিও খুব ধীর-স্থির মানুষ, এক এক সময় উত্তেজিত হয়ে পড়েন। এই সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখাটাই খুব বড় কাজ। যদি পার হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে ফোন করো।' এ বলে ও একটা ফোন নম্বর লিখে দিল।

'ওরা কি খুব গোলমাল করছে?'

'হ্যাঁ, তবে ভরসা ওদের মধ্যে ভাঙন দেখা দিয়েছে। একদল স্ট্রাইক চাইছে, এক-দল বিপক্ষতা করছে।'

'স্ট্রাইক? সে রকম তো কিছু শুনে আসিনি।'

'দাবাগ্নি খুব তাড়াতাড়ি ছড়ায়। কাল রাত্রের মিটিং-এ ওরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওদের আরও অনেক দাবী বেড়েছে।'

হঠাৎ আমার মধ্যে যে কী হলো। উঠে এসে সুপ্রিয়ার একটা হাত চেপে ধরে বললাম, 'তুমি খুব সাবধানে থেকো।'

সুপ্রিয়া উত্তর দিল না। হেসে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। একটুক্ষণ আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থেকে বলল, 'সব সময় যে মানুষ শুধুমাত্র নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যেই সব কাজ করে তার মানে নেই। চলি। পৌঁছে অফিসিয়াল চিঠি দিও।' বলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল সুপ্রিয়া।

তখনও দাঁড়িয়েছিলাম। মা একটা প্লেটে গোটা কয়েক মিষ্টি নিয়ে এসেছে। মা বলল, 'কোথায় গেল? চলে গেল, অথচ বলে গেল না? কী অদ্ভুত মেয়ে!'

সত্যি সুপ্রিয়াকে আমারও ভীষণ অদ্ভুত বলে মনে হতে লাগল।

(ক্রমশঃ)

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

নভোচারী দার্শনিক (২)

আন্তোআন স্য-সাঁ-জ্যুপেরী মুখ্যত বৈমানিক। হয়ত সে কারণে মরিস বর্দে কৃত 'আনদিওর এং সারভিচুড দ্য এভিয়েশন' নামক গ্রন্থের ভূমিকা রচনার ভার পড়ে সাঁ-জ্যুপেরীর ওপর। তিনি এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় 'গ্রানজার' এবং 'ড্রাজারি' প্রসঙ্গে অতি সুন্দর মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে বৈমানিকের কাজে 'গ্রানজার' বা মহিমা নিশ্চয়ই আছে তবে তার সঙ্গে আছে 'ড্রাজারি' বা কঠোর শ্রম। তিনি বলছেন—'একটা বিরাট ঝড়ের পর নিরাপদে ফেরার মধ্যে নিশ্চয়ই গৌরব আছে, অন্ধকার ভরা আকাশ থেকে সূর্যালোকিত ভূমিতে নেমে আসার মধ্যে আনন্দ আছে, নিজের জীবনকে আবার নতুন করে অধিকার করার মধ্যে একটা উন্মাদনা আছে, পৃথিবীর ইন্দ্রজালভরা কাননে নেমে আসায় আছে এক পরম উত্তেজনা, গাছপালা, রমণী থেকে সুরু করে মিত্রতার আসর সবকিছুই চমকপ্রদ। ইনজিনটার কণ্ঠরোধ করে তাকে বিমানপোতে গচ্ছিত রেখে যখন মেঘমেদুর আকাশকে পিছনে ফেলে আসা যায় তখন এমন কোন বৈমানিক আছেন যিনি গান গেয়ে না ওঠেন!'

আবার সেই সঙ্গে আছে কঠোর পরিশ্রম, আর সাঁ-জ্যুপেরীর মতে হয়ত সেই কারণেই বৈমানিকের এত ভালো লাগে তাঁর কাজ। জলাভূমির ওপর যখন ইনজিন বিকল হয় বা বালুর সমুদ্রে বা তুষারের বুকে বাধ্যতামূলকভাবে চলতে হয় তখনকার অবস্থা চিন্তা করা যাক...

সমগ্র রচনাটির মধ্যে এক কবি-হৃদয়ের পরিচয় ছড়ানো আছে। সাঁ-জ্যুপেরী 'প্যারিস-সয়ের' নামক পত্রিকার বিশেষ পত্রকার হিসাবে ১৯৩৫-এর এপ্রিল-মে মাসে রাশিয়া গমন করেন। এরপর 'এয়ার ফ্রাঁসের' প্রতিনিধি হিসাবে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে বক্তৃতা-ভ্রমণে গিয়েছিলেন এবং এরপর 'প্যারিস-সাইগন' বিমানযাত্রার সময় নির্ধারণে যাত্রা করেন। এই যাত্রায় তাঁর বিমান লিবিয়ার মরুভূমিতে ভেঙে পড়ে।

মস্কো শহরে অবস্থানকালে 'ম্যাকসিম গোর্কী' নামক প্রচার-বিমানটির দুর্ঘটনা ঘটে। এই বিমানটিতে শুধু লাউড স্পীকার বসানো ছিল তা নয়, এর মধ্যে ফিল্ম প্রজেকসনের জন্যেও আলাদা কক্ষ ছিল। দুই পৃষ্ঠার সংবাদপত্র ছাপার উপযোগী প্রেস ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বত্র বিমানটি ঘুরে বেড়িয়েছে, নতুন জাতির কারিগরিগত কৌশলে কি ধরনের অধিকার ঘটছে তার পরিচয় সোভিয়েত ইউনিয়নের সুদূরতম অঞ্চলেও এই বিমানের সাহায্যে ছড়ানো হত। সেই বিমানটি অবশেষে একদিন ভেঙে পড়ল। সাঁ-জ্যুপেরী লিখছেন—

'মস্কো, মে ২০শে—পৃথিবীর বৃহত্তম বিমান ম্যাকসিম গোর্কী ধ্বংস হল। বিমানটি যে সময় অবতরণ করছিল সেই সময় একটি অনুসরণকারী বিমান তার ওপর এসে পড়ে। সেই বিমানটির ঘণ্টায় আড়াই-শো মাইল গতিবেগ ছিল।...

এই দুর্ঘটনা ঘটবার মাত্র আগের দিন সন্ধ্যায় আমি ম্যাকসিম গোর্কীতে চড়ার সুযোগ পেয়েছি। এই প্রথম আর এই শেষ। একজন বিদেশী এই সুবিধার অধিকারী হয়েছিলেন অনুমতিক্রমে। প্রয়োজনীয় অনুমতির জন্য আমি দীর্ঘকাল অপেক্ষা করেছি, মাত্র কাল অপরাহ্নে যখন সব আশা ছেড়ে দিয়েছি তখন এসেছিল অনুমতি।...

বিয়াল্লিশ টনের এই দানবীয় অতিকায় বিমান এক বিস্ময়কর সহজ ভঙ্গীতে আকাশে উড়েছিল।...

আর পরদিনই 'ম্যাকসিম গোর্কী' আর নেই। এই ক্ষতি এমনই নিদারুণ যে আজ এখানে জাতীয় শোক পালিত হচ্ছে। পাইলট জুরোফ এবং বাছাই-করা সহকর্মীদল ও প'য়ত্রিশ জন যাত্রী সবই ধ্বংস হল। ...এক অনুসরণকারী বিমানের অন্ধ অভিযানে এ বিমান ধ্বংস হল......'

প্যারিস-সাইগন যাত্রা এক বিমান দুর্ঘটনায় অবসান হওয়ার পর মিশর থেকে ফিরলেন সাঁ-জ্যুপেরী ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এবং প্রচণ্ড ঋণগ্রস্ত অবস্থায়। স্প্যানিস 'সিভিল ওয়ার' সুরু হওয়ার পর 'লা ইনট্রানজিয়ানট' নামক পত্রিকায় বিশেষ পত্রকার হিসাবে তাঁকে স্পেনে পাঠানোর প্রস্তাব করা হল। তিনি রাজী হলেন। ১৯৩৬-এর আগস্ট মাসের গোড়ার দিকে স্পেনে গেলেন। সাঁ-জ্যুপেরী যেসব ডেসপ্যাচ পাঠিয়েছিলেন তা 'বার্সিলোনা' প্রসঙ্গেই লিখিত। তাঁর প্রচণ্ড অভিজ্ঞতা লাভের

বার্সিলোনা প্রসঙ্গে লিখতে বসে সর্বাগ্রে যে কথাটি সাঁ-জুপেরীর মনে হয়েছে, তা হল 'ইন এ সিভিল ওয়ার, দি ফায়ারিং লাইন ইজ ইনভিসিবল'—গৃহযুদ্ধের কালে গুলি করার সীমারেখা অদৃশ্য। এই কথাগুলি গভীর অর্থব্যঞ্জক। হানাহানি এবং শয়তানি নরহত্যা তাঁকে উৎপীড়িত করেছে। তিনি অন্য অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন 'ট্রিগার-হ্যাপি ফাইটার্স' আর ইনডিফারেন্ট টু হিউম্যান লাইফ'। জীবন নিয়ে এইভাবে ছিনিমিনি খেলার প্রবণতা তাঁকে আকুল করেছে। মৃত্যুর রকম-ফের দেখে লেখক বিভ্রান্ত হয়েছেন। মৃত্যুর নানা মূর্তি তিনি দেখেছেন। মানুষের সহৃদয়তা ও সহানুভূতির সীমা নেই। সেই মানুষ আবার শিশু, যুবা, বৃদ্ধ এমন কি সন্ন্যাসীকে হত্যা করতে দ্বিধা করে না। যিনি সোস্যালিস্ট চার্চ-বিরোধী, সাধু সন্ন্যাসী যাঁর চোখের বিষ, তিনি আবার নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে কার্থুসিয়ান মনক্‌কে বাঁচিয়ে দিলেন। সবই বিস্ময়। একজন খনি-শ্রমিক যখন খনির অভ্যন্তরে আটক পড়েন, খনির ধস্‌ নামছে, যে কোনো মুহূর্তে তাঁর মৃত্যু হতে পারে, তখন আরো দশজন খনি-শ্রমিক জীবন বিপন্ন করে তাঁকে উদ্ধার করতে উদ্যোগী হন। সেই মানুষই আবার দশ জনকে হটিয়ে একজন নিরস্ত্র ক্ষীণদেহ মানুষকে অকাতরে হত্যা করে। তিনি লিখছেন—

> 'Man's gestures are eternal spring. Though we die for it, we shall bring up that miner from its shaft. Solitary he may be, universal he surely is'.

মুনিক-পর্বের পর 'প্যারিস-সয়ের' পত্রিকার তিনজন বিশেষ প্রবন্ধকারের অন্যতম হিসাবে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন তা ১৯৩৮-এর ৪ঠা অকটোবর সেই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধের শিরোনাম 'যুদ্ধ না শান্তি' এবং তার অনু-শিরোনাম —'মানুষের জীবনের অর্থ আমাদের দিতে হবে'। তিনি বলেছেন—'আমরা যেসব কথা ব্যবহার করি তা পরস্পর-বিরোধী। আমাদের অভীপ্সা কিন্তু এক। মানুষের মর্যাদা দান, আমাদের ভায়েদের মুখে ক্ষুধার অন্ন জোগানো। আমাদের উদ্দেশ্যে মতভেদ নেই, আমাদের মতপার্থক্য পথ এবং উপায় সম্পর্কে। আমাদের বিভিন্ন ধরনের যুক্তির তা ফসল।'

এর পর সাঁ-জুপেরী বলেছেন যে 'ভালো করে তলিয়ে দেখলে আমরা বুঝব যে আমরা নিজেদের সঙ্গেই লড়াই করছি। আমাদের কলহ, বিবাদ, সংঘর্ষ একই দেহের অভিব্যক্তি—ভূমিষ্ঠ হওয়ার কালে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে প্রসব যন্ত্রণার কালে।'

সাঁ-জুপেরীর সমগ্র বক্তব্যটুকু তুলে দিলে তার যথার্থ পরিচয় দেওয়া সহজ হত। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধের দর্শন তিনি যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন আজ ১৯৭২-এর শেষ প্রান্তে পৌঁছে তার সারমর্ম অনুধাবন করা কারো পক্ষে অসুবিধা হবে না।

সাঁ-জুপেরী এরোপোস্টাল আর্জেন্টিনার বিমানপথের শেষ ভাগের দায়িত্ব ভার পেয়েছিলেন। কোলোরাডো রিভাডেভিয়া থেকে পুনটা এরেনায় তাঁকে যোগাযোগরক্ষাকারী বিমানবহরে কাজ করতে হয়। সাঁ-জুপেরী যোগাযোগ বিমানের চালক হিসাবে কাজ করে ত্রিলিউ এবং বাহিয়া ব্লানকায় দুটি ঘাঁটি সংগঠন করেন। পাচেকোর এয়ারপোর্ট-এর কাজ পরিদর্শন করে তিনি সুদূর দক্ষিণ অঞ্চলে আবিষ্কারমূলক বিমান যাত্রায় গিয়েছিলেন। এই সময় পাটাগোনিয়ার ওপর কেপ হর্ন থেকে যে প্রবল ঘূর্ণী ঝড়ের মুখে তিনি পড়েছিলেন তার বিবরণ তিনি 'দি পাইলট অ্যান্ড দি এলিমেন্টস' নামক একটি প্রবন্ধে দিয়েছিলেন। এই প্রবন্ধটিকে কনরাডের বিখ্যাত রচনা 'টাইফুনে'র সঙ্গে তুলনা করা যায়। প্রকৃতির সঙ্গে বিমানচালকদের কিভাবে সংগ্রাম করতে হয় তার অনন্যসাধারণ বর্ণনা করেছেন সাঁ-জুপেরী।

ফ্রান্সের পতনের কাল পর্যন্ত, ১৯৪৩-এর গোড়ার কি পর্যন্ত, গ্রুপ ২/৩৩ এয়ার-কমবার্টের—ইউনিটের সঙ্গে সাঁ-জুপেরী যুক্ত ছিলেন। মিত্র-বাহিনীর যুক্ত নির্দেশনায় এই গ্রুপ উত্তর আফ্রিকায় নতুন করে তোড়জোড় করছিল। সাঁ-জুপেরী এদের সঙ্গে আবার যোগ দিতে দৃঢ়-সংকল্প হলেন। বেসামরিক সত্তার জন্য তাঁর এই গোষ্ঠীতে যোগদানে এবার বাধা ছিল। কিন্তু তিনি সব রকমভাবে চেষ্টা করে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কনভয়ের সাহায্যে ১৯৪৩-এর ৪ঠা মে তারিখ এলজিয়ার্সে পৌঁছলেন।

এলজিয়ার্স-এর দুশো মাইল দক্ষিণে এক মরুভূমির ডিপোতে ফ্রেঞ্চ স্কোয়াড্রোনে তাঁকে নিযুক্ত করা হল। সেখানে প্রশিক্ষণের জন্য ছিল পুরাতন ধরনের মেশিন। অন্য একটি স্কোয়াড্রোন ছিল আলজেরীয়-মরক্কো সীমান্তে, তারা পি-৩৮ বিমানে কাজ করছিল। এই পি—৩৮ বিমান বা লকহীড-লাইটিং ছিল অতিশয় আধুনিক ও দ্রুততর বিমান। এই বিমানের পাইলটদের বয়সসীমা ছিল কুড়ি থেকে পঁচিশ, সর্বনিম্ন বয়স এবং সর্বোচ্চ বয়সসীমা ছিল পঁয়ত্রিশ। সাঁ-জুপেরীর তখন তেতাল্লিশ বছর এবং স্বাস্থ্যও ছিল খারাপ। কিন্তু তিনি ফ্রান্সের ওপর যোগাযোগ বিমান-চালনার ভার পেলেন অনেক তদ্বির করে। পি-৩৮এ গোড়ার দিকে ট্রেনিং-এর কালে তিনি লিখেছিলেন তাঁর বিখ্যাত পত্র "লেটার টু জেনারেল এক্স"—।এই পত্রের মধ্যে তিনি যে সুগভীর স্নায়বিক উত্তেজনার মধ্যে কাজ করেন তার পরিচয় পাওয়া যায়। মানসিক হতাশার চিহ্নও আছে। এরই দুমাস পরে তিনি আরেক অভিযাত্রায় বেরিয়েছিলেন। তার থেকে আর ফিরে আসতে পারেন নি। জেনারেল এক্সকে লিখিত এই পত্র ১৯৪৮-এর ১০ই এপ্রিল তারিখে প্রকাশিত হয় "লা-ফিগারো লিত্তারেইয়ের" পত্রিকায়। তাঁর মৃত্যুর পর নানাবিধ কাগজপত্রের মধ্যে এই চিঠিখানি আবিষ্কৃত হয়। এই চিঠির শেষাংশে আছে—

> The possibility that I may be killed in this war is not important. It is not important that I fly into a rage over these new airborne torpedos. .. But if I do come back alive from the thankless job that must be done, it will be to face only one challenge : What can one, what must one, say to men?'

বোধকরি সময় প্রত্যাগত সব সৈনিকের মনেই এই প্রশ্ন সর্বপ্রধান হয়ে ওঠে।

—অভয়ংকর

A SENSE OF LIFE · By ANTOINE DE SAINT— EXUPERY : Translated by ADRIENNE FOULKE. Published by FUNK & WAGNALLS Coy WC New York

সাহিত্যের খবর

কলকাতায় রুমানিয়ার কবি

রুমানিয়ার দুই বিশিষ্ট লেখক মাটেই কালিনেস্কু ও লুসিয়ান রাইকু, সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন। গত ২২ নভেম্বর ১০ হিন্দুস্থান রোডে সর্বভারতীয় কবি সম্মেলন কর্তৃক আয়োজিত এক সভায় তাঁরা কলকাতার বিশিষ্ট কবি লেখকদের সঙ্গে মিলিত হন। সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীসতীকান্ত গুহ। অতিথি লেখকদের সঙ্গে তিনি পরিচয় করিয়ে দেন উপস্থিত কবি-লেখকদের।

মাটেই কালিনেস্কু এখন বুখারেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য পড়ান। তাছাড়া রুমানিয়ান লেখক সঙ্ঘের তিনি একজন কার্যকরী সমিতির সদস্য। তাঁর রচিত বহু সমালোচনা গ্রন্থ ও সাহিত্যের ইতিহাস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দুটি কাব্যগ্রন্থ ও একটি উপন্যাস রচনা করেও তিনি স্বদেশে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। লুসিয়ান রাইকু রচিত গল্পের সংখ্যাও নিতান্ত স্বল্প নয়। তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ পুরস্কৃতও হয়েছে। যাই হোক, সেদিনের আলোচনা সভায় রুমানিয়ান সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা গেল। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, লীলা রায়; শিশির চ্যাটার্জী, শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ; বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল কবিতা পাঠ। মূল রুমানিয়ান ভাষায় কবিতা পড়েন মাটেই কালিনেস্কু। বাঙালী কবিদের মধ্যে কবিতা পড়ে শোনান প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, সতীকান্ত গুহ; কবিতা

সিংহ, জ্যোতির্ময় ঘোষ, শম্ভু মুখোপাধ্যায় ও আশিস সান্যাল। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শিশির চট্টোপাধ্যায়।

আমেরিকাকে জানতে ।। কালে-ভদ্রে দু-চারটে প্রবন্ধ গ্রন্থ হাতে আসে যা পড়তে পড়তে সমগ্র সত্তাকেই নাড়া দিয়ে যায়। এ জাতের সংকলনগ্রন্থ ঠিক চলতি অর্থে পড়ে শেষ করা নয়, পড়তে তা হয়-ই, বরং ভাবতে হয় আরো অনেক বেশি। সেই জাতেরই প্রবন্ধ সংকলন হল রবার্ট বি ডিসম্যান সম্পাদিত দ্য স্টেট অব দ্য ইউ-নিয়ন গ্রন্থটি। লেখকদের মধ্যে রয়েছেন বিশ্বজোড়া খ্যাতির অধিকারী সাংবাদিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, আইনজ্ঞ, বিচারক, অর্থনীতি-বিদ, লেখক, যন্ত্রশিল্প বিজ্ঞানী, শিল্পপতি, মনস্তাত্ত্বিক, শিল্পী প্রমুখ। আর বিষয়: প্রথম প্রবন্ধটির শিরোনাম, 'আমরা, জনগণ, নিজেদেরই সন্ধানে'র মধ্য দিয়েই প্রতি-ফলিত হয় এই গ্রন্থের বিষয়বৈচিত্র্য। আসলে আমেরিকার গণতান্ত্রিক চেহারা, মার্কিনী জনগণের ক্ষোভ-ক্রোধ-আশা-হতাশা-রাজনৈতিক মতের দোদুল্যমানতা, সামাজিক-আর্থিক সমস্যা সব কিছুই ধরা পড়েছে এই গ্রন্থে। সত্যি কথা বলতে, সব মতের পাঠকের কাছেই বইটি মূল্যবান। কেননা, এ সংকলন গ্রন্থের মূলেই রয়েছে আর দশটার চেয়ে প্রভেদ।

এরিশ কাস্টনার প্রসঙ্গে

এরিশ কাস্টনার হলেন ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানির এখন অন্যতম জনপ্রিয় লেখক। শুধু যৌবরাজ্যেই যে তাঁর অধিষ্ঠান তা নয়, শিশুসাহিত্যেও তিনি স্বতন্ত্র সম্রাট। যখন ছিলাম ছোট্ট বালক অর্থাৎ 'আলে ইশ্ আয়ুন ক্লাইনার উঙে ভার' বেরোয় তখনই লাভ করেন অসামান্য জনপ্রিয়তা। হৈ-চৈও কম হয়নি সে সময়। অনেকগুলো বই-ই হয়েছে তাঁর চলচ্চিত্রে রূপায়িত। তার মধ্যে 'এমিল উন্ড ডি ডিটেকটিভ, প্যুনকটশেন উন্ড আন্তোন, ড্রাই মানার ইম স্নি এবং ডেজা ক্লাইনে গ্রেনৎসফেরকার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবি হিসেবেও এরিশ কাস্টনার আজ খ্যাতির চূড়ায়।

কাস্টনার জন্মেছিলেন এলবের তীরে, ভ্রমণকারীদের স্বর্গ ড্রেসডেনে। সেটা ১৮৯৯ সাল।

নতুন বই

চার্লস ফ্রিয়ার এণ্ডরুজ (জীবনালোচনা)— মলিনা রায়। বিশ্বভারতী, ৫, দ্বারকা-নাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৫। মূল্য : দশ টাকা।

বিদেশীয় হয়েও চার্লস ফ্রিয়ার এ-দেশীয় মনীষীদের অন্তর্গত স্বনামধন্য নমস্য পুরুষ। মহাত্মা গান্ধী, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ থেকে ভারতের বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তাঁকে যেমন তাঁদের সুহৃদ ও আপনজন বলে মনে করতেন, তেমনি তিনিও পরাধীন ভারতের দুঃখী আপামর-সাধারণকে তো বটেই, এমনকি গলিত কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের পর্যন্ত আপনজন মনে করে, সেবা-শুশ্রূষা ও ভাল-বাসায় বুকে করে নিয়েছিলেন। বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের প্রতীক ছিলেন এণ্ডরুজ। দীর্ঘ জীবন ধরে ভারতে তিনি এমন সব মহৎ কাজ করে গেছেন, এমন আদর্শ স্থাপন করে গেছেন, যা তুলনায় ভারতপ্রেমিক অন্যান্য বিদেশীয়দের মধ্যে তাঁকে শীর্ষ-স্থানীয় করে রেখেছে বললেও অতিশয়োক্তি হয় না।

উপর্যুক্ত উক্তির সমর্থনসপক্ষে বক্ষ্যমান গ্রন্থখানি এণ্ডরুজ জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ আলেখ্য। অধ্যায়সূচীর মধ্যে গ্রন্থকর্ত্রী শ্রীমতী রায় অত্যন্ত যৌক্তিকতা বিচক্ষণতার সঙ্গে ইংলণ্ডে ও ভারতে তাঁর জীবনের ঘটনাসমূহ, শান্তিনিকেতনে ও জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায়, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সেতুবন্ধনে তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও বিচিত্র কর্মযোগের সাধনায় আত্মনিয়োগ প্রভৃতি আন্তরিকতার সঙ্গে পরিচ্ছন্ন ভাষায় বিবৃত করেছেন।

পরিশিষ্ট অংশটি এই জীবনী-গ্রন্থের একটি বিশেষ মূল্যবান পর্যায়। এই অংশে দীনবন্ধু এণ্ডরুজের মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত মর্মস্পর্শী রচনাটি ও মহাত্মা গান্ধী রচিত 'এণ্ডরুজ-স্মরণে' মুদ্রিত হয়েছে। চিত্রসম্পদগুলিও আলোচ্য গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য অংশ হিসাবে গণ্য করা যায়। প্রচ্ছদপটে আছে মুকুল দে অঙ্কিত রেখা-চিত্র, আখ্যাপত্রে আছে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত এণ্ডরুজের বহুবর্ণের চিত্র। অন্তর্ভাগে আছে এণ্ডরুজ অঙ্কিত রবীন্দ্র-নাথের রঙিন চিত্র এবং শান্তিনিকেতনে এণ্ডরুজের অভ্যর্থনা উপলক্ষে রবীন্দ্র-নাথের হস্তাক্ষরের এবং রবীন্দ্রনাথের জন্ম-দিনে এণ্ডরুজ-লিখিত কবিতার প্রতিলিপি।

বিশ্বভারতীর মুদ্রণ-পারিপাট্য ও প্রকাশন-বৈশিষ্ট্য গ্রন্থখানিকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে।

ঢেউয়ের তালে তালে (উপন্যাস)। রূপময় পাল। লীলা প্রকাশনী, ৬-এস পি। সি ব্লক, কাজীপাড়া, যাদবপুর, কলিকাতা-৩২। সাত টাকা।

শ্রীরূপময় পাল রচিত 'ঢেউয়ের তালে তালে' উপন্যাসটি আজকের বাংলাদেশের পারিবারিক জীবনের একটি আলেখ্য। পরিবারটি মধ্যবিত্ত সমস্যায় জর্জরিত। লেখক নতুন হলেও সার্থক শিল্পের কৌশলে বহু চরিত্র ও ঘটনা এনে কাহিনীকে সুসমৃদ্ধ করেছেন। স্বর্ণকমল এ কাহিনীর নায়ক। বাবা মারা যাবার পর পরিবার ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। কাকা তাদের মানুষ করতে থাকে। স্বর্ণকমলকে ব্যবসা উপলক্ষে বর্মায় চলে যেতে হয়। উপন্যাসের শেষে আবার স্বর্ণকমল ফেরে কলকাতায়। এরই মধ্যে তাদের সংসারে নানা উত্থান-পতন। সবশেষে পূর্ববঙ্গে মুজিবের গণ-আন্দোলনের পট-ভূমিতে স্বর্ণকমল আবার সংসারকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়। এই বিরাট কাহিনীতে প্রকাশ, রাণীপ্রভা, রেণুকা, সুবাসিনী, অনুরাধা, সুশোভন, শৈলবালা শুভ্রা, বলেন্দ্রবাবু ইত্যাদি ছোট-বড় বাস্তব চরিত্র সার্থকতার সঙ্গে এঁকেছেন।

এ কি সত্য (প্রবন্ধ)। উজ্জ্বল ঘোষ। শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, ৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—১২। পাঁচ টাকা।

মানুষের 'আত্মা' কি? কোথায় তার অবস্থান। মৃত্যুর পর মানুষের এই আত্মার অস্তিত্ব থাকে কিনা, থাকলে কিভাবে থাকে—এই সব জটিল তাত্ত্বিক প্রশ্নকে লেখক শ্রীউজ্জ্বল ঘোষ চমৎকারভাবে তাঁর 'এ কি সত্যি' গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছেন। পুনর্জন্ম, মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও জীবনে প্রত্যাবর্তন, সম্মোহন বিদ্যা, স্থূল শরীর ও সূক্ষ্ম শরীর, বাইলোকেশন, মিডিয়াম প্রয়োগ, প্ল্যানচেট ইত্যাদি বিবিধ বিতর্কমূলক বিষয়কে লেখক সহজ করে, সুন্দর যুক্তিনিষ্ঠ গল্পকথা ও তথ্যের যুগপৎ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। ভূত প্রেতের অলৌকিকত্ব এ গ্রন্থের অন্যতম দিক। লেখকের আলোচনার ভঙ্গি অত্যন্ত ঘরোয়া অন্তরঙ্গ।

নেপালী সাহিত্যের আদিকবি ভানুভক্ত

কিরণশঙ্কর মৈত্র

ভানুভক্ত বিজন অরণ্যে একদা একখানি শিলাখণ্ডের উপর বসেছিলেন। শিলাখণ্ডের উপর বসে পাখীর কাকলি শুনতে শুনতে তাঁর চোখে তন্দ্রার আবেশ এসে গিয়েছিল। খানিকক্ষণ পরে তন্দ্রার আমেজ কেটে গেলে দেখতে পেলেন—কাছের তৃণভূমিতে একজন লোক ঘাস কেটে চলেছে। ভানুভক্ত তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলে সে ব্যক্তি উত্তর দিলে—ব্রাহ্মণঠাকুর, আমি একজন গরীব চাষী। আপনার গ্রামের গাঁয়েই থাকি। সারাদিন ঘাস কাটি, দিনের শেষে বাজারে গিয়ে বিক্রি করি। এইভাবে জীবন কাটাই। মাঝে মাঝে সংসারের খরচ দিয়েও কিছু বেঁচে যায়। সেই টাকা দিয়ে একটা কুয়ো কাটাচ্ছি। ভাবি—টাকা-পয়সা জমিয়ে কি হবে? মরার সময় তো কিছুই সঙ্গে যাবে না। বরং একটা কুয়ো বানিয়ে দিলে লোকের উপকার হবে এবং মরার পরেও গ্রামবাসীরা অনেকদিন আমার নাম করবে।

দরিদ্র চাষীর এই কথা শুনে ভানুভক্তের চিত্তে এক গভীর আলোড়নের সৃষ্টি হলো। আবিষ্ট অবস্থায় বেশ খানিকটা সময় থাকার পরে একসময় স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হলো—

ঘাসী দরিদ্রী ঘরকো তর বুদ্ধি কস্‌তো।
মো ভানুভক্ত ধনী ভইকন আজ ইস্‌তো।।
মেরা ইনার নত সত্তল পাটি কেইছুন।
যে ধনর চীজ হরুছুন্ ঘর ভিতর নইছুন্।।
এস্ ঘাসী লে আজ কছরী দিয়েছ আর্তি।
ধিক্কার ছ মোক ন বস্‌নু রাখি কীর্তি।।'

(মর্মার্থ : ঐ ঘাসী দরিদ্র, কিন্তু তার হৃদয় কতো উদার! সারা জীবন ঘাস কেটে কেটে তার থেকে অর্জিত অর্থের সামান্য উদ্বৃত্ত সঞ্চয় করে সে কূপ খনন করানোর মতো দীর্ঘস্থায়ী পুণ্য-কাজের বাসনা করছে। আর আমি ভানুভক্ত ধনীসন্তান হয়েও মানুষের উপকারের জন্য কূপ খনন বা পান্থ-শালা স্থাপনের মতো কোনো সংচিন্তা করছি না। আমার সব কিছু আমার নিজের ঘরের মধ্যেই। এই ঘাসী আমাকে এক মহৎ শিক্ষা দিল। ধিক্ আমার এই সৎকর্মহীন জীবনকে!)

আত্মগ্লানির অগ্নিদহনে শুদ্ধ হয়ে তাঁর [illegible] এইভাবে প্রথম কবি-

প্রতিভার উন্মেষ হলো তখন তাঁর বয়স বাইশ বছর। ভানুভক্তের জীবনের এই ঘটনাটির সঙ্গে কেউ কেউ তমসাতীরে অব-গাহন করতে যাবার সময় ক্রৌঞ্চের বিয়োগ-ব্যথায় ক্রৌঞ্চীর বিরহার্তি-কাতর বাল্মীকির সেই অমর শ্লোক রচনার সাদৃশ্য খুঁজে পেতে পারেন—

'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চ-মিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।।'

ক্রৌঞ্চীর গভীর বেদনা যেমন বাল্মীকির হৃদয় আলোড়িত করে কাব্য-প্রতিভাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল—দরিদ্র ঘাসীর কথাও সেই ভাবে ভানুভক্তকে কাব্য-রচনায় প্রথমে জন্ম দেবার প্রেরণা দিল। আর নেপালী ভাষায় রামায়ণ রচনাকেই তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠ সৎকর্ম হিসেবে গ্রহণ করে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে রামায়ণের প্রথম অধ্যায় বালকাণ্ড সমাপ্ত করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য—ভানুভক্ত নেপালী রামায়ণ রচনায় মূল ভাবটি গ্রহণ করেছিলেন অধ্যাত্ম রামায়ণ থেকে।

আদিকবি ভানুভক্তের কাব্য-প্রতিভার পরিচয় দেবার আগে তাঁর জীবন-কাহিনী সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

কবি ২৯শে আষাঢ়, ১৮৭১ বিক্রম সম্বৎ (ইংরেজী ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই) কাটমান্ডু থেকে প্রায় একশ মাইল পশ্চিমে তানাহু উপত্যকার রামঘা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ধনী ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম-গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিকদের কাছে তানাহু প্রাচীন সেনবংশীয় রাজাদের উপজনপদ হিসেবে পরিচিত। এখানে বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থ 'বাসুদেব রসানন্দ'-প্রণেতা পণ্ডিত

শিবশর্মা এবং দেশপ্রেমিক নেপালী রাজনীতিবিদ ভীমসেন থাপা জন্মগ্রহণ করেন।

কবির প্রারম্ভিক জীবন সম্বন্ধে তাঁর জীবনীকারদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও মোটামুটিভাবে বলা যায়—পিতামহ শ্রীকৃষ্ণ আচার্যের কাছে বাল্যে তিনি সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ ও জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষালাভ করেন। পরে সংস্কৃত সাহিত্য-শাস্ত্রে উচ্চতর শিক্ষালাভ করেন কাশীধামে গিয়ে। বাল্যকাল থেকেই ভানুভক্তের বুদ্ধিমত্তা ও ধীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। পিতামহের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করে মাত্র বারো বৎসর বয়সেই তিনি জন্মকোষ্ঠীর কঠিন বিষয়গুলি আয়ত্ত করেছিলেন।

ভানুভক্ত নেপালের রাজধানী কাটমান্ডু পরিদর্শন করেন সর্বপ্রথম ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে। প্রতিবেশীর সঙ্গে জমিজমাসংক্রান্ত মামলার ব্যাপারে তাঁকে কাটমান্ডু আসতে হয়েছিল। বালাজী নদী ও কাটমান্ডু শহরের সৌন্দর্য বর্ণনা করে এই সময় দুটি দেশাত্মবোধক কবিতা রচনা করেন—যা আজ পর্যন্ত খ্যাতির আলোকে উজ্জ্বল। এই সময় ভানুভক্তের জীবনে সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য দুইই যুগপৎ ছায়া ফেলেছিল। মামলায় তাঁর জয় হয়।

ভানুভক্তের পিতা পন্ডিত ধনঞ্জয় রাজকর্মচারী ছিলেন। কবিও কাটমান্ডু আসবার কিছুদিন পরে নেপালের প্রধানমন্ত্রী জঙ্গবাহাদুরের অধীনে হিসাব রক্ষকের কাজ পেলেন। দু' বছর তিনি এই কাজ করেন। কিন্তু অঙ্কের নীরস একক-দশক-শতকের রাজ্যে ভানুভক্তের কবিমন খাপ খাইয়ে নিতে পারল না, তাঁর হৃদয় উধাও হয়ে যেতে চাইল ভাব-কল্পনার অবাধ জগতে। কল্পনা এবং বাস্তবের এই বৈষম্যের অনিবার্য ফল কবিকে ভুগতে হলো। হিসাবের গরমিল ও ভুলের জন্যে পাঁচ মাসের মেয়াদে তিনি কুমারীচোকের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। এই কারাবাসের অভিশাপ ভানুভক্তের জীবনে কিন্তু আশীর্বাদ হয়েই দেখা দিল। কারণ এই সময়েই তিনি তাঁর রামায়ণের চারটি অধ্যায়—অযোধ্যাকান্ড, অরণ্যকান্ড, কিষ্কিন্ধাকান্ড ও সুন্দরকান্ড রচনা করেন (১৮৫২ খৃষ্টাব্দে)। পরের বছর—১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে বাকী অধ্যায়—যুদ্ধকান্ড ও উত্তরকান্ড রচিত হলো। এইভাবে কবির সাতাশ বছর বয়সে, ১৮৪১ সালে যে-রামায়ণের সূচনা হয়েছিল 'বালকান্ড' লিখে, এগারো বছর পরে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে তা সমাপ্ত হলো। বিশ্বের অনেক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মতো নেপালী সাহিত্যের অমর সম্পদ ভানুভক্তের রামায়ণেরও অধিকাংশ লেখা হলো কারাপ্রাচীরের অন্তরালে। ভানুভক্তের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা হলো 'বধূশিক্ষা' (১৮৬২ খৃঃ), 'রামগীতা' (১৮৬৮ খৃঃ), 'প্রশ্নোত্তরী' (১৮৫৩) ও 'ভক্তমালা' (১৮৫৩)। এছাড়াও তিনি অনেক খণ্ডকাব্য ও গীতিকবিতা রচনা করেছেন।

ভানুভক্তের সাহিত্যকৃতীর মূল্যায়নের আগে কবির সমসাময়িক নেপালের ঐতিহাসিক পটভূমির উপর কিছু আলোকপাত অপ্রাসঙ্গিক নয়। কবির জন্ম হয়েছিল এ্যাংলো-নেপাল যুদ্ধের কয়েক মাস আগে। তাঁর সমকালে নেপালের রাজনৈতিক জীবনে চরম বিশৃঙ্খলা। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে নেপালের রাজশক্তি পর্যুদস্ত। আবার ১৮১৬ সালের যুদ্ধে পরাজয়ের পরে ইংরেজ সেনাপতি অকটোরলনির সঙ্গে অপমানজনক 'সগৌলির চুক্তি' অনুযায়ী নেপাল সরকার গাড়ওয়াল, কুমায়ুন এবং তরাইয়ের অধিকাংশ অঞ্চল ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। সিকিম থেকে নেপালী সৈন্য অপসারণ এবং কাটমান্ডুতে একজন বৃটিশ রেসিডেন্ট রাখাও ছিল চুক্তির অন্যতম শর্ত। যুদ্ধে পরাজয় এবং অপমানজনক বাধ্যতামূলক সন্ধি—সামরিক-গৌরব ভাবাপন্ন নেপালীদের আত্মাভিমানকে প্রচন্ড আঘাত হানল। এই দুর্যোগের দিনে যখন বাইরের দিক দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শক্তির হাতে গ্লানিময় পরাজয়ের অপমানে নেপালের জাতীয় জীবন আর্ত—ঠিক তখনই অন্তরঙ্গে নেপালের রাজপ্রাসাদে বিস্তৃত হচ্ছিল ষড়যন্ত্রের লূতাতন্তুজাল। এর ফলে সেনাপতি ভীমসেনকে আত্মহত্যা করতে হলো। প্রখর রাজনৈতিক দূরদর্শী ও বিবেচক ভীমসেন থাপা চেষ্টা করেছিলেন ভারতীয় ও অন্যান্য এশীয় রাজশক্তিসমূহকে একতাবদ্ধ করে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের প্রতিরোধ ও পরাভূত করতে। পাঞ্জাবকেশরী রঞ্জিৎ সিং, মারাঠা ও বর্মার শাসকদের সঙ্গে চিঠিপত্রের যোগাযোগ তাঁর এই প্রচেষ্টার পরিচয়বাহী। দেশপ্রেমিক ভীমসেন থাপার আত্মহত্যা স্বাধীনতাকামী স্বজাতিদের মনে এক প্রবল আঘাত। জাতীয় জীবনের এই দুর্যোগ-আবর্ত আরও শোচনীয় হলো যখন রাণা জঙ্গবাহাদুর সবলে রাজশক্তি অধিকার করে নেপালে অত্যাচারী রাণা-শাসনের সূচনা করেন। শতবর্ষব্যাপী এই শাসনের অবসান ঘটে আজ থেকে প্রায় দু' দশক আগে, ১৯৫০ সালে, অন্য এক বিপ্লবের মাধ্যমে।

এই সমস্ত দুর্ভাগ্যজনক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ফলে নেপালের জনসাধারণের মনে দেখা দিয়েছিল চরম হতাশা। দেখা দিয়েছিল বিপর্যস্ত রাজনৈতিক জীবনের সমস্ত লক্ষণগুলি—নৈতিক অবনমন, মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, আদর্শবর্জিত মেরুদন্ডহীনতা।

ভানুভক্ত অনুভব করলেন যে, বিভ্রান্ত জাতির বিপর্যস্ত সত্তাকে সুস্থ ও সবল করে তুলতে এবং জনসাধারণকে আত্মিক শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করার একমাত্র উপায় হলো তাদের অন্তরে আধ্যাত্মিক শক্তির উদ্‌বোধন। ফলত, নেপালের জাতীয় জীবনের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবনমনের বেদনা ভানুভক্তকে রামায়ণ রচনার প্রেরণা দিয়েছে। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানবিক গুণের সমাবেশ উপলব্ধি করেছিলেন। তাই নরদেহে বিষ্ণু-অবতার রাম-গুণমণির জীবন-কাহিনী রচনা করে তাঁর পুণ্য দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন সমগ্র জাতিকে।

বস্তুত, ব্যক্তিসত্তার মধ্যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির উন্মেষ কবির কাম্য ছিল। তাঁর রচনা ঈশ্বর-চেতনার আলোকে উজ্জ্বল। আবার এই অলৌকিক ঈশ্বর-অনুভূতির মধ্যে একটি হতাশার সুরও গুঞ্জিত। নেপালের তৎকালের রাজনৈতিক ও সামাজিক দুরবস্থা দর্শনে কবিচিত্তের বেদনাই এই হতাশার মূলে। মানুষের নৈতিক অবক্ষয় ভানুভক্তকে যে কি গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল—অধ্যাত্ম রামায়ণের 'বালখন্ডে' তার প্রকৃষ্ট পরিচয় দেওয়া আছে—

'সাঁচো বাত গরইন কোহি
অরুকোই গরনন্ ত নিন্দা গর্নী।
আরুকাকো ধনখানালাই অভিলাশ
গরনন্ আসল হো জনী।।
কোহি জনত পরস্ত্রী মা রত

जगन्मात्रे नमोनमः॥ १८॥ प्रसीद देवदेवेशि
कृपया परया सदा॥ अभीष्ट फलसिद्ध्यर्थं कु
रुष्मे माधवप्रिये॥ ॥इति तुलसी पूजा समाप्ता॥
शुभं भूयात्लेखक पाठकयोः श्री भानुभक्ताचा
र्या पठितेन सम्वत्॥ १९१४ आश्विन
पौर्णमास्याम्॥ राधा दामोदरः प्रीयताम्॥ ॥

।॥ ভানুভক্তের হস্তলিপি ॥।

হুনন্‌ কোহী‌ত হিংসা মহী।
দেহই লাইত আত্মজানি রহনন্‌
নাস্তিক পশু ঝই ত্যহী।।'
—বালখন্ড ।। শ্লোক ৩ ।।

(মর্মার্থ : (কলিযুগে) সত্যি কথা কেউ বলবে না, অন্যদের নিন্দা করবে। কেউ চাইবে অন্যের ধন আত্মসাৎ করতে এবং সেটাকেই মনে করবে উত্তম কাজ। আবার কেউ হবে পরস্ত্রীরত, কেউ হিংসায় উন্মত্ত। তারা সবাই পশুর মতো নাস্তিক হবে, শরীরটাকেই মনে করবে আত্মা।)

আবার—
'কামকা চাকর ঝই ভয়ের রহনন্‌
স্ত্রী লাই দেউতা সরী।
মান্‌নেন্‌ পীতৃর মাতৃলাই বুঝি
খুপ শত্রু সরীকা গরী।।
ধন আরজন গরউন লা ভনী।।'
—বালখন্ড ।। শ্লোক ৪ ।।
ব্রাহ্মণ ভইকনা বেদ বেঁচ রহনন্‌
কোহি পড়ন্তা পনী।
ধন ঠুলো ছ পনী ভন্যা সহজ

(মর্মার্থ : লোক কামুক হয়ে স্ত্রীকে দেবতা বলে মনে করবে। মাতাপিতাকে দেখবে শত্রুর মতো। ব্রাহ্মণ হয়ে বেদ ব্যবসায় করবে। যদি কেউ বেদ পাঠ করে—তা' অর্থোপার্জনের জন্যেই এবং ধন-সম্পদকেই মনে করবে শ্রেষ্ঠ পার্থিব বস্তু।)

•

ভানুভক্তকে বলা হয় নেপালী ভাষার 'আদিকবি'। স্বভাবতই আখ্যাটি বিতর্ক-অতীত নয়। বিষয়টি আলোচনা করে দেখা যেতে পারে।

নেপালী ভাষা ছয় শত বছরের প্রাচীন। ১৩৫৬ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ পৃথ্বীরাজ মল্লের জুমলা-তাম্রলিপিতে নেপালী ভাষার প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায়।

ভানুভক্তের আবির্ভাবের আগেও অনেক প্রতিভাবান কবি নেপালে জন্মগ্রহণ করেছেন। নেপালী ভাষা-সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। উদয়ানন্দ, সুবদানন্দ দাস, শক্তিবল্লভ আর্যাল, গুমানী পন্ত, বিদ্যারণ্য কেশরী, বসন্ত শর্মা, যদুনাথ পোখরেল, রঘুনাথ পোখরেল, ইন্দিরস, বীরশালী পন্ত, রঘুনাথ ভট্ট প্রভৃতির নাম প্রাক-ভানুভক্ত কবিকুলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন ব্রাহ্মণ। তাঁদের শিক্ষা কাশীধামে, সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে। স্বভাবতই শিক্ষা সমাপনান্তে এঁরা হতেন সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত। সংস্কৃত দেবভাষা। পূজাপার্বণ, ক্রিয়াকর্ম, উৎসব-অনুষ্ঠান—সর্বত্রই ছিল সংস্কৃতের ব্যাপক ব্যবহার। বিস্ময়কর নয় যে,—কাব্যের অঙ্গনেও ছিল সংস্কৃতের আধিপত্য। কেউ কেউ নেপালী ভাষায় সাহিত্য চর্চা করতেন বটে, কিন্তু শব্দ-চয়ন ও বাক্য-গঠনের দিক দিয়ে সংস্কৃত, আরবী, মৈথিলী ও ভোজপুরী ভাষার মিশ্রণ ও প্রবল প্রভাবে তা হয়ে উঠত জটিল। বিশেষত, অভিজাত-সম্প্রদায় ও পন্ডিত-বর্গের সংস্কৃত ভাষার প্রতিই ছিল গভীর মমত্ববোধ আর নেপালী ভাষার প্রতি আত্যন্তিক অবজ্ঞা ও অনীহা। তাঁরা নেপালীকে ভাবতেন—সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষের ব্যবহৃত ভাষা। স্বভাবতই এই সব সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিতদের সৃষ্ট সাহিত্য শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর সমাজেই সীমাবদ্ধ ছিল। নেপালের সাধারণ মানুষ এই সমস্ত রচনার রসাস্বাদনে সমর্থ হতো না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে—সরকার নেপালী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিলেও এই ভাষা সে যুগে যথার্থ রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদাও লাভ করেনি। এই স্থলে নেপাল-ইতিহাসের অতীতের দুয়েকটি পাতার উপর দৃষ্টিপাত প্রয়োজন।

আধুনিক নেপাল রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেন পৃথ্বীনারায়ণ সাহ। পৃথ্বীনারায়ণ নেপাল জয় করার আগে এ রাজ্য অসংখ্য ক্ষুদ্র উপ-রাজ্যে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক রাজ্যের ভাষা পৃথক থাকায় একে অন্যের ভাষা বুঝত না। তাদের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার প্রভৃতিতে অনেকাংশেই ছিল বিভিন্নতা। পৃথ্বীনারায়ণ ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে কীর্তিপুর রাজ্যটিও জয় করে নেপালকে এক অখন্ড রাষ্ট্রের রূপ দিলেন। আর আপন ভাষা নেপালীকেই ঘোষণা করলেন নেপালের রাজভাষা বলে।

এই ঐতিহাসিক পটভূমিকায় ভানুভক্তের রামায়ণের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। বিজয়ী নেতা নেপালী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করলেও নেপালের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ভাষা-ভাষী তাদের দীর্ঘদিনের নিজস্ব ভাষা ত্যাগ করে নতুন একটি ভাষা শিখতে তেমন আগ্রহ বোধ করত না। কিন্তু ভানুভক্ত চিরন্তন মানবিক আবেগ-সম্পৃক্ত একটি ধর্ম-কাব্য—রামায়ণ রচনা করায়, যারা এই ভাষা অল্প-স্বল্প বুঝত তারা ভানুভক্তের রামায়ণ পাঠের মাধ্যমে অজান্তে স্বেচ্ছায় এই সহজবোধ্য ভাষা আয়ত্ত করে ফেলল, আর যারা এই ভাষায় একেবারেই অনভিজ্ঞ ছিল ভানুভক্তের রামায়ণের আকর্ষণে অন্যের সংসর্গে ধীরে ধীরে তারাও সহজ সরল নেপালী ভাষার মর্মে প্রবেশ করতে শুরু করল। বহুজনের ব্যবহারের ফলে একটি সহজবোধ্য সার্বজনীন রূপ পেতে শুরু করল নেপালী ভাষা। বর্তমান লেখকের ধারণায় ভানুভক্তের রামায়ণের এটি সর্বাপেক্ষা মূল্যবান অবদান।

ভানুভক্তের আগে কবি রঘুনাথ উপাধ্যায়ও রামায়ণ লিখেছিলেন। কিন্তু সেই রামায়ণে সংস্কৃত শব্দের বহুল ব্যবহার ঘটায় তা সর্বজনবোধ্য হয়ে ওঠেনি। ভানুভক্ত সংস্কৃতের আনুগত্য অস্বীকার করে, প্রাচীন রীতির অচলায়তন ভেঙে সহজ-বোধ্য নেপালী ভাষায় কাব্য রচনা করেন। ইন্দ্রবজ্রা, উপজাতি, দ্রুতবিলম্বিত, বসন্ত-তিলক, মালিনী, মন্দাক্রান্তা, শিখরিনী, শার্দুলবিক্রীড়িত, স্রগ্ধরা প্রভৃতি সংস্কৃত ছন্দ অত্যন্ত সরল ও সুললিত করে ভানুভক্ত তাঁর রামায়ণে ব্যবহার করেছেন। চার পঙ্‌ক্তির সহস্রাধিক শ্লোকের কোথাও সংস্কৃতের কঠিন ও ক্লিষ্ট শব্দ ব্যবহার করেন নি। পূর্বাপর তাঁর ভাষা প্রাঞ্জল ও মধুর। মূলত অধ্যাত্ম রামায়ণকে অনুসরণ করলেও নেপালী জনমানসের অনুগামী করে আপন মনের মাধুরীও মিশিয়েছেন রাম-কাব্যে। তাই পড়বার সময় তাঁর রামায়ণকে মৌলিক রচনা বলে মনে হয়। আর এই জন্যেই রঘুনাথ উপাধ্যায়ের রামায়ণের তুলনায় ভানুভক্তের রামায়ণ অনেক বেশী জনপ্রিয়, এই জন্যেই সার্থক ভানুভক্তের 'আদি কবি' বিশেষণ।

রামায়ণ প্রধানত ধর্মগ্রন্থ। লোকের বিশ্বাস—এই গ্রন্থ পাঠ করলে ইহলোকে পুণ্য ও পরলোকে মুক্তি। তাই কেবল সাহিত্য-আস্বাদনের জন্যে নয়, আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যে রামায়ণের পাঠ ব্যাপক। ভানুভক্তের রামায়ণ সরল-সাবলীল হওয়ায় সাক্ষর ব্যক্তিরাও তাঁর রামায়ণকে আত্মস্থ করলেন। এই গ্রন্থ

সমানভাবে আদৃত হলো ধনীর অভ্রংলিহ প্রাসাদে আবার দরিদ্রের পর্ণকুটিরে। বাংলার যেমন কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করে তার সুললিত প্রসাদগুণ, কাব্য-গরিমা ও ব্যাপক ব্যবহারে 'আদিকবি' আখ্যা পেয়েছেন, হিন্দী ভাষাভাষীদের ক্ষেত্রে যেমন তুলসী-দাস সহজ সাবলীল কাব্যসৌন্দর্যে রামায়ণ লিখে বিপুল বিশাল জনমানসে রামায়ণের রসাস্বাদন ঘটিয়েছেন, তেমনি ভানুভক্তও সহজ সরল মাধুর্যময় ভাষায় রামায়ণ রচনা করে এক ভাষার প্রভাবে নেপালের রাষ্ট্রীয় ভিত্তির বনিয়াদকেই করেছেন দৃঢ়তর। এই কৃতিত্বের জন্যেই বিশ্বের প্রায় দেড় কোটি নেপালী ভাষাভাষী মানুষের মনের মণি-কোঠায় পরম শ্রদ্ধা আর ভক্তিতে ভানু-ভক্তের মূর্তি অম্লান ও ভাস্বর।

'বধূশিক্ষা' ভানুভক্তের একখানি জনপ্রিয় বিখ্যাত গ্রন্থ। এই পুস্তক রচনার পশ্চাতেও একটি কাহিনী বিদ্যমান। ১৮৪৯ খৃস্টাব্দের পরে ভানুভক্ত প্রায়ই কাটমান্ডু যাতায়াত করতেন। এখন যে-অঞ্চলে 'বীর হাসপাতাল' সেখানে ছিল তাঁর আবাসভূমি। যা হোক, ১৮৬২ খৃস্টাব্দে কাটমান্ডু যাবার পথে একদা তিনি তাঁর বন্ধু তারাপতির গৃহে অবস্থান করেন। রাতে বন্ধুপত্নী ও তার পুত্রবধূর কলহ-কোলাহলে কবির ঘুম ভেঙে গেল। সেই দিন রাতেই কবি চার পঙক্তিবিশিষ্ট ত্রিশটি কবিতা রচনা করেন এবং পরদিন প্রাতে বন্ধুপত্নীর হাতে দেন। এই কবিতাগুচ্ছে পরিবারের কর্ত্রী গৃহলক্ষ্মী কল্যাণী বধূর কর্তব্য নির্দেশ করা হয়েছে।

কবির অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থদ্বয় 'ভক্তমালা' ও 'প্রশ্নোত্তরী'। দুটি গ্রন্থই ধর্ম-বিষয়ক। 'প্রশ্নোত্তরী' গ্রন্থে প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসার বিভিন্ন দিকে আলোকপাত। যেমন—

'কুনহো সহজ মোক্ষ গরায়ি দিনন্যা।
জ্ঞানহো অরুকো কিন নাম লিনন্যা।।'
(মর্মার্থ।।

(প্রশ্ন) মোক্ষ সহজে কেমন প্রাপ্তব্য হয়?
(উত্তর) জ্ঞানের অনুসরণেই মোক্ষ লভ্য হয়।
অথবা—

"দরিদ্র নাউ নরমা ছ বসুকো।
বিশাল তৃষ্ণা ঘরমা ছ বসুকো।।"
(মর্মার্থ।।

(প্রশ্ন) মানুষের মধ্যে দরিদ্র কে বিশেষ?
(উত্তর) সেই লোক যার তৃষ্ণার নেই শেষ।)

মৃত্যুর পূর্বে কবি ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে তানাহুনে বসে 'রামগীতা' রচনা করেন। শয্যাশায়ী অবস্থায় তিনি 'রামগীতা'র শ্লোকগুলি মুখে মুখে রচনা করতেন এবং তাঁর একমাত্র পুত্র রামনাথ তা লিখে নিতেন। এখানিও ধর্মপুস্তক।

কবির মৃত্যু তারিখ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকলেও তাঁর জীবনীকার মোতিরাম ভট্টের মতে ১৯২৫ বিক্রম সম্বৎ (ইংরেজী ১৮৬৮ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর) তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

•

যে-কোন দেশের রাষ্ট্রীয় ঐক্যের মূলে ভাষার ভূমিকা অবিসংবাদিত। পৃথ্বী-নারায়ণ সাহ যদি সমগ্র নেপাল জয় করে ভৌগোলিক ও প্রশাসনিক অখণ্ডতা আনয়ন করে থাকেন, উনিশ শতকে নেপালের উজ্জ্বল নক্ষত্র ভানুভক্ত যথার্থ রাষ্ট্রীয় বোধের ঐক্য স্থাপন করেছেন বিভিন্ন ভাষাভাষীর লোকেদের মাত্র একটি ভাষার সূত্রে গেঁথে। নেপালী ভাষাকে উপভাষার স্তর থেকে উন্নীত করে যথার্থ রাষ্ট্রভাষার যোগ্যতা ও গৌরব দানের কৃতিত্ব আচার্য ভানুভক্তের।

অধ্যাত্মবোধের সঙ্গে সমাজ সচেতনতার বেণীবন্ধন ঘটেছিল ভানুভক্তের সাহিত্যে। সমসাময়িক সামাজিক দুর্নীতির ও রাণা-তন্ত্রের সমালোচনা—যা তাঁর পূর্বের লেখক-দের রচনায় অনুপস্থিত, ভানুভক্তের সাহিত্যকে প্রাণবন্ত ও তীক্ষ্ণ করে তুলেছে। কবির রচনায় লঘু কৌতুকের মধ্যে কোথাও কোথাও ঝলসে উঠেছে ব্যঙ্গের শাণিত তরবারি। তাঁর রচনার এই বৈশিষ্ট্যকে তুলনা করা যেতে পারে বেদনা-ভারাক্রান্ত মেঘের অন্তরালে অকস্মাৎ সূর্য-রশ্মির ব্যঙ্গ-তীক্ষ্ণ তির্যক আলোকপাত। হিসাবের গরমিল ঘটায় কবি যখন কুমারী-চোকের কারাগৃহে বন্দী (১৮৫২ খৃঃ)—তখন বিচারককে উদ্দেশ্য করে কবিতা রচনা করেছিলেন—

রোজ রোজ দর্শন পাউছু,
চরণকো তাপ ছইনা মনসা কছু।
রাতভর নাচগানি হেরছু খরচ না গরি
ধুলো চরন মা মছু।।
লামখুট্টে ওপিস্না উড়ুস ই
সঙ্গীছন ইনকাই লহড় মা বসী।
লামখুট্টে হারু গাউছন ই
ওপিস্না নাচছন ম হেরছু বসী।।
(মর্মার্থ।। (হে মহামান্য বিচারক মহোদয়,)
রোজ রোজ আপনার দর্শন পাচ্ছি,
আমার হৃদয়ে কোনো চিন্তা নেই।
সারা রাত পয়সা খরচ না-করে
নাচ-গান শুনছি, বেশ মজায় আছি।।
মশা, উচ্চিংড়ে, ছারপোকা—
এরাই আমার সঙ্গী, এদের সঙ্গে
বাস করি।
মশা গান গায়, উচ্চিংড়ে নাচে—
আমি বসে বসে দেখি।।)

বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য ছাড়াও সাবলীল বাগ্‌ধারার সঙ্গে রসাত্মক ব্যঞ্জনা, বিশ্লেষণ-মূলক ও কল্পনাশ্রয়ী বর্ণনা, বিষয়বস্তুর শৈল্পিক রূপায়ণ, রস-মধুর দৃষ্টিভঙ্গী—ভানুভক্তের রচনাকে অনন্য অগ্রগামী সাহিত্যিকের সম্মান দিয়েছে — যে-সম্মান ইংরেজী সাহিত্যে জিওফ্রে চসারের, ফরাসীতে রেবেলার, সারভান্তেস-এর স্প্যানিশে, গিয়োভানি বোক্কাচিয়ো-র ইটালীয়তে এবং মার্টিন লুথারের জর্মন ভাষা ও সাহিত্যে।

এ-সঙ্গে এ-কথাও বলা যেতে পারে যে—পারিপার্শ্বিক প্রথাসিদ্ধ আবেষ্টনীর মধ্যে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও আত্মজিজ্ঞাসা যদি রেনেসাঁসের অন্যতম লক্ষণ হয়—তবে ভানু-ভক্তের মধ্যে সে-বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। ভানু-ভক্ত নেপালে রেনেসাঁসের পথিকৃৎ এবং আধুনিক নেপালী সাহিত্যের জনক।

পৃথ্বীনারায়ণ সাহু সমগ্র নেপাল জয় করার আগে এই খণ্ড-বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডে অনেকগুলি উপভাষা প্রচলিত ছিল। এর মধ্যে নেওয়ারী, তামাং রাই, লিম্বু, থারু, চেপাং, গুরুং, মংগর, সুনওয়ার, হাইউ, দনওয়ার, শেরপা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। নেপালী ভাষার গঠনে এই উপভাষাগুলির অল্প-বিস্তর অবদান অবশ্য স্মর্তব্য।

ইতি ভয় পায়। দুপুরে সে একা। বাড়িটা ছোট নয়। ওপরে-নীচে চারখানা ঘর। রাস্তার ওপর বাড়ি। আশে-পাশে ঘন লোকবসতি। ঘরে ঘরে কণ্ঠস্বর। দুপুরে পাড়া ঝিমিয়ে পড়ে ঠিক তবু একেবারে ডুবে যায় না অসীম নির্জনতার নীল সাগরে। বাড়িতে ইতি একা। বামুন-চাকর চলে যায় দেশোয়ালী লোকের সঙ্গে আড্ডা দিতে। সে ইচ্ছে করলে ওদের আটকাতে পারে, কানে না নিতে পারে ওদের আপত্তি। কিন্তু ওরা যদি জিজ্ঞেস করে, কেন ইতি ওদের আটকাচ্ছে, সে জবাব দিতে পারবে না। হয়তো তাকাতে পারবে না ওদের সন্দেহে কুঁচকে-আসা চোখের দিকে। কিংবা এমনও হতে পারে, এসব তার নিছক সন্দেহ, ওরা কিছু ভাববে না। তবু যেন ইতি জোর পায় না। ওদের কিছু বলতে।

সদর দরজা বন্ধ করে সে ওপরে আসে। রেডিও চালিয়ে দিয়ে গড়িয়ে পড়ে বিছানায়। সিনেমা পত্রিকার পাতা ওলটাতে ওলটাতে ভারি হয় চোখের পাতা। রেডিওর গানের সুর ক্রমে সরে যায় দূর থেকে দূরে। দিব্যেন্দুর মুখটা যেন একবার দেখতে পায়। ঠোঁটে হাসি ফোটে। বেজায়, বেজায় দুষ্টু। রাতে যদি ভালো করে ঘুমুতে দেয়। সে সুখী। সত্যি সে সুখী। দিব্যেন্দু তাকে নোতুন জীবনের সন্ধান দিয়েছে। এ চেনা দেহটা যে এত আনন্দ দিতে পারে এবং নিতে পারে, সে জানতো না। যা ধারণা ছিল, সব গোলমাল হয়ে গেছে। ঘুমের বানে তলিয়ে যেতে যেতে সে আঁকুপাঁকু করে শিউরে ওঠে। ভয়, ভীষণ ভয়—তলিয়ে যাবার, হারিয়ে যাবার!

ঘুম আসে না ইতির। ঘুমের ভারে চোখের পাতা এক হয়ে আসে। নির্ঘুম রাতের ক্লান্তি-অবসাদ জড়িয়ে থাকে সারা শরীরে। বিছানায় শুয়ে পড়ে, রেডিও চালিয়ে দেয়, চোখের সামনে মেলে ধরে মাসিক পত্রিকা। তন্দ্রা নামে। চমকি ওঠে পরমুহূর্তে—কে যেন কড়া নাড়া দেয়। অধীর হাত জোরে জোরে ঝাঁকুনি দেয় লোহার বালায়। চমকে ওঠে সে। উঠে বসে ঝটিতি। রেডিওতে সুরেলা গানের ধারা, কাঁসারিরা কাঁসি বাজিয়ে যায়। উৎকর্ণ ইতি বসে থাকে ধাতব শব্দের প্রতীক্ষায়।

কোন শব্দ নেই। ধীরে ধীরে জানলার কাছে দাঁড়ায়। এখান থেকে সদর দরজা দেখা যায়। সন্তর্পণে পর্দা সরিয়ে উঁকি মারে। বেবাক ফাঁকা। ভয়ের কোন কালোছায়া দাঁড়িয়ে নেই দরজার সামনে। সে ফিরে আসে। বিছানার ওপর বসে। এ কি মানসিক শংকার কাছে সে নিজেকে বিকি করেছে। সে স্বীকার করে, অপরাধ বোধ তাকে

কুরে কুরে খাচ্ছে। সে তো ভুলে যেতে চায়। অতীতের আঁধারে কি সব কিছু ঢাকা পড়ে না? সেই মূর্তিটা কি এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছে তার চারপাশে? একটা মরা মানুষ ছায়া ফেলে নিয়ত পরিক্রমণ করছে তাকে। যুক্তি-তর্ক দিয়ে মানুষকে এ অনুভূতি বোঝান যাবে না। লোক বিশ্বাস করবে না।

ইতির দুপুর সুখের নয়। সে জানে, তার জীবনে ব্যথা-বেদনার ঠাঁই থাকা উচিত নয়। রবারের সাপ কোনদিন ফণা তুলে কামড়াতে আসে না। এটা সত্যি—জাগতিক সত্য। কিন্তু ইতির বেলা কি সব নিয়ম বদলে গেল?

দিব্যেন্দুকে যদি সে সব খুলে বলতে পারত, হয়তো শান্তি পেত। কয়েকবার সে ভেবেছে, দিব্যেন্দুকে বলবে। না বললে সে কিছুতেই ছায়ামূর্তির হাত থেকে রেহাই পাবে না। তবু শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে এসেছে। হারিয়ে ফেলেছে মনের ভারসাম্য। ছটফট করেছে অসহ্য ব্যথায়। কি করবে, কি করতে পারে সে? গলায় দড়ি-বাঁধা জলে-ডোবা বেড়ালের মত সে বার বার পাড়ের দিকে সাঁতরে আসে মাটির আশায় কিন্তু আবার সে উৎক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে গভীর জলে।

যতক্ষণ দিব্যেন্দু থাকে ইতির কোন ভাবনা থাকে না। সন্ধ্যের পর দিব্যেন্দু ফিরে আসে। ইতি দেখে, দিব্যেন্দু যেন প্রাণ-চঞ্চলতায় ভরপুর। তার নিভাঁজ কামানো গালের ওপর খুশী ঝলমল করে। ভরাট গলার দরাজ হাসি ঘরের ক্লান্ত ঝিমিয়ে-পড়া বাতাসকে উড়িয়ে দেয়। সারা ঘর যেন হাসতে থাকে। সে কাঁপতে থাকে মনের গভীরে। কেন কাঁপে বুঝতে পারে না, তবু কাঁপে।

দিব্যেন্দু বলে—তোমার কি হয়েছে বল তো?

ইতি তাকায় তার দিকে। কি যেন খুঁজে ফেরে দুটো ভীরু চোখ। দিব্যেন্দুর উজ্জ্বল মুখের ছায়ায় নেই শংকার প্রতিভাস। বড় বড় চোখের ভাষায় দৃঢ়তার প্রত্যয়। যেন ইতির বুকের পাঁজর সরিয়ে মনটা দেখে নিতে পারে। বড় চোখা চাহনি। অনেকক্ষণ ঐ চোখের ওপর চোখ রাখা যায় না।

ইতি বলে—কি আবার হবে!

—দ্যাখ, আমার চোখকে তুমি ফাঁকি দিতে পারবে না।

—ফাঁকি দেবার কি দেখলে?

—ঠিক কি হয়েছে, বলতে পারব না। তবে তোমার মুখের রেখা বলছে, কিছু একটা হয়েছে। তুমি অস্বীকার করতে পার কিন্তু আমার চোখ আমাকে প্রতারণা করে না।

ইতি হেসে ওঠে আগের মত। সে হাসিতে চমকে উঠত ট্যাক্সির দুরন্ত গতিবেগ, ভীরু মেয়ের মত কেঁপে কেঁপে উঠত গোধূলির স্তব্ধ আকাশ। সে প'গলা-ঝোরা যেন হঠাৎ থেমে যায়। সূর্যের রোদ ডানায় মেখে নেবার জন্যে পাখিটা উড়ন্ত উঠতে উঠতে সহসা তীর খেয়ে লুটিয়ে পড়ে ধুলোর ওপর।

ইতি বলে—এত বোঝ, আর এটা বোঝ না, রাত্তিরে ভাল ঘুম না হলে শরীর খারাপ হবেই। আজ থেকে তুমি পাশের ঘরে শোবে। দেখবে, দুদিনে আমার শরীর তাজা হয়ে উঠবে।

দুপুরে ঘুমোও না?

—না।

—আগে ঘুমোতে?

—হ্যাঁ?

—তাহলে এখন শোও না কেন?

—শুই, ঘুম আসে না।

—কেন?

ইতি আবার দিব্যেন্দুর দিকে তাকায়। বলার ইচ্ছে করে, দিব্যেন্দু, তুমি বুঝতে পারবে না আমার মনের অবস্থা। আমি খুন করে তোমার ঘরে এসেছি। তুমি শাদা চোখে তাকাও পৃথিবীর দিকে, তোমার চোখের তারায় ভালবাসার প্রজাপতিরা উড়ে বেড়ায়। আমার চোখের হাসি নিভে গেছে রক্তের ঝাপটায়। কি করে তোমাকে বোঝাব, কেন নীরব দুপুরে ঘুমের পাখিরা আমার চোখের পাতায় ভর করে না।

দিব্যেন্দুর জিজ্ঞাসার কোন জবাব দিতে পারে না ইতি। সে বলে— কেন আসে না, তার আমি কি জানি। আমি কি ডাক্তার?

—তাহলে চলো ডকটর বোসের চেম্বারে একদিন যাই।

—শুধু শুধু...

শরীরটা চেক্-আপ করালে কোন ক্ষতি নেই তো।

ইতির হাসি পায়। সংগে সংগে ভাল-বাসা-মমতার বন্যায় ভাসিয়ে দিতে ইচ্ছে করে দিব্যেন্দুকে। বেজায় বোকা। ছোট-ছেলের মত অবুঝ। যে কালো পোকাটা পাঁজরের হাড় কেটে দিচ্ছে তার হদিশ পাবে কি করে ডকটর বোস? কিছুদিন আগে পর্যন্ত ইতি কি জানত, তার ঘরের রঙিন লণ্ঠন এমন করে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে? দিব্যেন্দু বুঝতে পারছে না, দোমড়ান সিগারেটের প্যাকেটের মত ইতি তার আসল রূপ হারিয়ে ফেলেছে। দিব্যেন্দুকে ভুলিয়ে রাখতে হবে, প্রবঞ্চনা করতে হবে, প্রবঞ্চিত হতে হবে।

ইতি যেন দেখতে পায়, সেই ছায়াটা তার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। ঝাপসা, ছায়া-ছায়া, ফটোর নেগেটিভের মত অবয়বহীন একটা ছবি।

ইতি বলে—তুমি কি আমার বিচার করতে এসেছ?

—না।

তবে কেন এলে?

—তোমাকে দেখতে।

—কি দেখবে আমার? আমি তো পুরোনো।

—না, তুমি নোতুন। তুমি খুন করেছ।

—কাকে?

—আমাকে, আমার বিশ্বাসকে।

—কি পাগলামি করছ। যাও।

—যাব, ফুলের মত নিষ্পাপ আমার বিশ্বাস ফিরিয়ে দাও।

কণ্ঠস্বর মিলিয়ে যায়। ফাঁকা ঘরে একা দাঁড়িয়ে থাকে ইতি। কবরের পাথর নড়বড় করে নড়ে উঠেছিল। সে আশা করেনি, হ্যাঁ, সে আশা করেনি। সে ফাঁকি দিতে চেয়েছিল এবং তার ধারণা দৃঢ়মূল হয়েছিল, সে পালিয়ে আসতে পেরেছিল নিরাপদে। নাগিনীর লেজের ঝাপটার টানে মুছে দিয়ে-ছিল পায়ের ছাপ। কোন ইঙ্গিত, কোন সংকেত, কোন চিহ্ন ছিল না পেছনে।

আপন মনে বলে ইতি, কিছুই ফিরিয়ে দেওয়া যায় না, অনিরুদ্ধ। যা একবার হাত পেতে নেওয়া যায় তা কি কখনো ফিরিয়ে দেওয়া যায়? যায় না। যে প্রয়োজনের মুহূর্তে টাকা ধার করা হয় সে টাকা ফেরত দেওয়া সম্ভব, কিন্তু সে প্রয়োজনের মুহূর্ত ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। তুমি বুঝতে চেষ্টা কর, অনিরুদ্ধ, অবিবেচক হয়ো না। তোমার নিহত বিশ্বাসের শব আর বয়ে বেড়িও না।

স্বগত সংলাপের মধ্যে ইতি শান্তি পায় না। অনিরুদ্ধ যেন আরো কাছে এগিয়ে আসে। যাযাবর পাখিরা যেন নোতুন ঋতুতে ফিরে আসে পুরোনো দিনের কাকলির স্বর-বিতান ভাসিয়ে। ইতি শুনতে পায় অনেক গান, দেখতে পায় অনেক বসন্ত-বিলসিত দিনের চারুচিত্র।

কলেজের গেটের পাশে দাঁড়িয়ে থাকত অনিরুদ্ধ। দূর থেকে ইতি দেখত, সে অপেক্ষা করছে। তাকে দেখতে পেলে, হাসি ফুটত ঠোঁটের কোণে। তারপর তারা হাঁটত রাস্তা ধরে। কথা হত দু-চারটে। আজ সে সব কথা মনে পড়ে না ইতির। বাজে কাগজের টুকরো সব, ফেলে দিয়েছে ওয়েস্ট পেপার বাসকেটে। তারা হেদুয়ায় যেত। বেঞ্চে বসে কথা বলত অনিরুদ্ধ। তার সব কথা

ছবি আঁকার বিষয়কে কেন্দ্র করে। সে তখন আর্ট কলেজের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। ইতির শুনতে ভালো লাগত। নেশা হত, রোমাঞ্চ জাগত। অনিরুদ্ধের জ্বলজ্বলে চোখের দিকে তাকিয়ে ভাবত, সে অনেক বড় হবে, যশস্বী শিল্পী বলে সুনাম পাবে।

এখন ইতির হাসি পায়। করুণা হয় নিজের ওপর। কি ছেলেমানুষ না ছিল সেদিন। সে বয়েসটাই ছিল নেশা ধরার, রোমাঞ্চ জাগার, রোমাঞ্চ জাগাবার। অনিরুদ্ধকে নিয়ে সে-ই কি কম ভেবেছে। রাতের স্বপ্নে জ্বালিয়েছে কত না সুখের ফুলঝুরি! অবাক বিস্ময়ে অপার আনন্দে কুমারী মনের মাটি থেকে কুড়িয়েছে শরতের শিউলি, বসন্তের স্বর্ণচাঁপা, বর্ষার বর্ণালী লোপাটি। সেদিন অনিরুদ্ধকে সে অস্বীকার করতে পারেনি। মনের গির্জায় সে জ্বালিয়েছিল পবিত্র বাতি, আরতি করেছিল কিউপিড মূর্তির।

একদিন ওরা মার্টিনের রেলে চড়ে চলে গিয়েছিল অজানা এক গাঁয়ে। শহরের মেয়ে ইতির ভালো লেগেছিল খোলা আকাশ, দিগন্ত-ছোঁয়া মাঠ। হলুদ রঙের সরষে ফুলের সমারোহ দেখে সে স্থির থাকতে পারেনি। খোঁপায় দিয়েছিল হলুদ ফুল। বালি-মাটির বাঁধ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পায়ের পাতা ডুবে গিয়েছিল ধুলোয়। চিরিমিরি রোদ ছায়ার আঁকিবুকি নকসা কেটেছিল রাস্তার বুকে। ছই-ঢাকা গোরুর গাড়ি গিয়েছিল পাশ কাটিয়ে। পর্দা সরিয়ে বালিকা-বধূ তাদের দিকে তাকিয়েছিল দু চোখ জোড়া বিস্ময় নিয়ে।

অনিরুদ্ধ বলেছিল—ইতি, মানুষের জীবনে প্রেম আসে কেন বলতে পার?

—প্রেম না থাকলে মানুষ কি নিয়ে বাঁচবে? প্রেম মানুষকে বাঁচতে শেখায়, বাঁচাতে শেখায় অপরকে।

—তুমি একথা বিশ্বাস কর?

—হ্যাঁ।

—চিরকাল বিশ্বাস করবে?

—হ্যাঁ।

—বিশ্বাস কোনদিন ভাঙবে না?

—না। তুমি একথা বলছ কেন?

অনিরুদ্ধ বসেছিল গাছের ছায়ায়। ধানকাটা মাঠে নাড়াগুলো কদিন না কামান দাড়ির মত খোঁচা খোঁচা হয়ে জেগেছিল। সবুজ কড়াই ক্ষেতে ফুটেছিল ছোট ছোট বেগুনি ফুল। নয়ানজুলিতে চিক দিচ্ছিল পুঁটিমাছ। চন্দ্রবোড়া জালার ভয়ে শামুকের খোল কুড়োচ্ছিল মাঠ থেকে।

ইতি বলেছিল—চুপ করে আছ যে?

—আমি ক্লান্ত ইতি। পৃথিবী যে এত নিষ্করুণ জানা ছিল না। এ দেশে শিল্পের চর্চা করে খেতে পাওয়া যাবে না। তুমি বল, আমি কি করব? আমি বাঁচতে চাই। বাঁচতে চাই তোমাকে ঘিরে, তবু পারছি না কেন?

সেই দুপুরে, শহর থেকে অনেক দূরে স্নিগ্ধ ছায়াঘেরা গ্রামের প্রান্তে বসে সে দেখেছিল, একটা বাতি জ্বলতে চাইছিল দুরন্ত ঝড়কে স্পর্ধা জানিয়ে। থরথর করে কাঁপছিল হলুদে চিলতে আলোর শিখা।

—পারবে অনিরুদ্ধ, পারবে।

—তোমাকে যে আর ছুঁতে পারি না, ইতি। তুমি যেন চলে যাচ্ছ, সরে যাচ্ছ আমার নাগালের বাইরে।

—আমি চিরকাল তোমার পাশে থাকব।

—ভয় হয়, তুমি হারিয়ে যাবে। মনে হয়, আমি ডুবে যাব এক সাগর কালো অন্ধকারে। কেউ আমার পাশে নেই, কেউ আমার পাশে থাকবে না, ভাবতে পারি না।

—তুমি আমার ওপর বিশ্বাস রাখ।

ইতি আজো দেখতে পায়, একটা ভয়-পাওয়া মানুষ চেপে ধরেছিল তার হাত। ডুবন্ত লোক নাগালের মধ্যে পেয়েছিল খড়কুটো। প্রাণপনে আঁকড়ে ধরেছিল বাঁচার তাড়নায়।

সে জানে, অনিরুদ্ধ বাঁচার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। শিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার প্রাণান্তকর প্রয়াস। দিনের পর দিন ফুটপাথে রাস্তায় রেলিংয়ে ছবির প্রদর্শনী করেছে। মাঝে মাঝে কাগজে চিত্র-সমালোচনা বেরিয়েছে। খুশিতে সে ছুটে এসেছে ইতির কাছে। কিন্তু সে আনন্দ স্থায়ী হবার আগে আবার এসেছে নৈরাশ্য।

অনিরুদ্ধ বলেছে—আর পারছি না ইতি, এবার বোধহয় ভেঙে চুরমার হয়ে যাব।

ইতি বুঝতে পারত, অনিরুদ্ধ তার কাছে সান্ত্বনা চাইছে, চাইছে আশ্বাস। সে অনিরুদ্ধের দাড়ি-গোঁফ ঢাকা মুখের দিকে তাকাত। তার চোখের চাহনি দিনান্তের মরা আলোর মত ম্লান, ছায়া-মেদুর। কি বলবে, কি আশার বাণী শোনাবে তাকে? সেও বুঝত, বাস্তবের মাটি অত্যন্ত কঠিন, বাঁচার কিনারা করা খুব সহজ কাজ নয়।

সে বলত—চেষ্টা কর, একটা কিছু হবেই।

—তুমি আমাকে স্তোক দিচ্ছ, বুঝতে পারছি। তবে এটা ঠিক, শিল্প করে এদেশে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

—তুমি বড় দুর্বল।

—দুর্বল কি না জানি না, তবে আঘাত খেয়ে খেয়ে সাহস হারিয়ে ফেলছি। জানো ইতি, কত আশা করেছি ভালোভাবে বাঁচব, তুমি আমার পাশে থাকবে, কিন্তু দেখছি, সব ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। যেন নিজের ছেলের গলা টিপে ধরছি। এতে মানুষ দুর্বল না হয়ে পারে?

ইতি কোন জবাব দিতে পারেনি। কি-ই বা সে বলতে বা করতে পারে? আজ সে নিজের কাছে স্বীকার করে, অনিরুদ্ধের প্রতি তার ভালবাসায় চিড় ধরেছিল। অনিরুদ্ধের ব্যর্থতা তার ভালবাসার ভিতকে নাড়া দিয়েছিল প্রচণ্ডভাবে। তার ক্লান্ত-শ্রান্ত মূর্তি ইতির কল্পনাকে আঘাত করত। সে জানে, সে খুব সাধারণ মেয়ে। জীবন-সংগ্রাম ইত্যাদি ব্যাপারে তার আগ্রহ ছিল না। তাছাড়া তার মনের দৃঢ়তা প্রবল ছিল না। অনিরুদ্ধকে সে ভালবেসেছিল, যৌবনের স্বাভাবিক আকর্ষণে। কুমারী মনের কাছে অনিরুদ্ধের ভালবাসার আবেদন স্বপ্নের জাল বিস্তার করেছিল। সেদিন অনিরুদ্ধ ছাড়া যদি অন্য কেউ হত তাকেও হয়ত একইভাবে ভালবাসত ইতি। সদ্য ডিম-ফোটা পাখির বাচ্চার মত সব কিছুর মধ্যে সে নোতুনের সন্ধান পেয়েছিল। এই স্বাভাবিক এবং ইতি নিজেকে দোষ দিতে পারে না।

একদিন অনিরুদ্ধ বলেছিল—ইতি, আমি একটা চাকরি পেয়েছি।

—কি চাকরি?

—স্কুলের ড্রয়িং টীচার। বাংলার বাইরে। কাল যাব।

অনিরুদ্ধের যাবার কথায় চমকে উঠেছিল ইতি। তার ভালবাসা আগের মত ইতিকে আকর্ষণ করত না ঠিক, তবু অনিরুদ্ধ থাকবে না, এ চিন্তা সে কোনদিন করতে পারেনি। মুহূর্তের মধ্যে সে হারিয়ে গিয়েছিল অসীম শূন্যতার মাঝে। বলেছিল, —কবে আসবে আবার?

—শিগগির আসার চেষ্টা করব।

অনিরুদ্ধ চুপ করেছিল। ইতি দেখেছিল, কি একটা বলার চেষ্টা সে করছিল। তার চঞ্চল চোখের ছায়ায় ছিল ইতির প্রতিবিম্বের কম্পন। অনিরুদ্ধ শীর্ণ হাতে তুলে নিয়েছিল ইতির একটা হাত। বলেছিল—তুমি কি অপেক্ষা করবে, ইতি?

সে তাকাতে পারেনি অনিরুদ্ধের চোখের দিকে। মাথা নীচু করেছিল। অনিরুদ্ধের হাত কাঁপছিল উত্তেজনায়। মনের মধ্যে একটা শূন্যতা থাবা পেতে বসেছিল। ব্যথা না, বেদনা না, না নিরাশা—সম্পূর্ণ বোধহীন, চেতনাহীন এক সত্তা যেন। তবু সে মাথা নেড়েছিল,—হ্যাঁ, করবে।

আজ সে ভাবে, বিচার-বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে, কেন সে সেদিন অনিরুদ্ধের কথায় সম্মতি জানিয়েছিল। সে ভালভাবে

বুঝতে পেরেছিল, অনিরুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কের অবশিষ্ট বোধশক্তি আর ছিল না। যা ছিল তা শুধু পরিচিতি। ভালবাসার অনুভূতি মরে এসেছিল।

দিব্যেন্দু এসেছিল পরে। অনিরুদ্ধ ছিল শান্ত, সমাহিত—স্থির জল যেন। তার বুকে প্রতিবিম্বের প্রতিভাস নজরে পড়ে। মনে হয়, যেন খুব চেনা—স্বচ্ছ কাঁচে-গড়া মূর্তি। কিন্তু দিব্যেন্দু ঝড়ো বাতাস। তাকে বোঝার, জানার আগেই সে উড়িয়ে নিয়ে যায়। নিজেকে যখন দেখার সুযোগ মেলে তখন বিপর্যস্ত অবস্থা। ঝড় সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে নিয়ে গেছে। কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে নিজেকে সমর্পণ করেছে ঝড়ের হাতে, বুঝতে পারে না।

ইতি ভুলে গিয়েছিল অনিরুদ্ধকে। কটা চিঠি লিখেছিল—সেই এক কথা, জীবন-সংগ্রামে সে ক্রমেই হেরে যাচ্ছে। এত বড় পৃথিবী, তার ও ইতির জন্যে কি একটা ঠাঁই জোটাতে পারবে না? ইতি কি অপেক্ষা করবে? সে দু-একটা চিঠির জবাব দিয়েছিল। সংক্ষিপ্ত ও মামুলি। লেখার মধ্যে প্রাণের উত্তাপ ছিল না। অনিরুদ্ধকে সে ভুলে যেতে চেয়েছিল। স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশে সে বুঝেছিল, রুদ্ধশ্বাস ঘরে নিজেকে আটক রাখা আত্মহত্যার সামিল।

দিব্যেন্দুকে পেয়ে সে বাঁচার মানে খুঁজে পেয়েছিল। দিব্যেন্দু তার জীবনের অনুর্বর জমি কর্ষণ করেছিল, এনেছিল সবুজ ফসলের ইশারা।

দশটায় দিব্যেন্দু কাজে চলে যেত। সংসারের টুকিটাকি কাজ সেরে উঠে আসত দোতলায়। ঠাকুর-চাকর বেরোত আড্ডা দিতে। বিছানায় গা ঢেলে দিয়ে ইতি সিনেমা পত্রিকার পাতা ওলটাত। রেডিওর গানের সুরে জুড়ে আসত দু-চোখের পাতা। ঘুমের গভীরে হারিয়ে যাবার আগে ভাবত, জীবনে এত সুখ ছিল, ছিল এত শান্তি।

সেদিন ঠিক এমনি ঝিম-ধরা দুপুরে কড়া নড়ে উঠল। ইতি ভেবেছিল, ঠাকুর-চাকর কিংবা দিব্যেন্দু ফিরে এসেছে। দরজা খুলে চমকে উঠেছিল—অনিরুদ্ধ। শান্ত-স্নিগ্ধ অনিরুদ্ধ নয়। একটা গোটা মানুষ জ্বলছিল। দাবানলের আগুন সে দেখেনি, কিন্তু তার মনে হয়েছিল, গাছটা জ্বলছিল সমস্ত ডাল-পালায় আগুনের মালা পরে। বিস্ময়ে-ভয়ে সে পিছিয়ে এসেছিল।

অনিরুদ্ধ ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়েছিল চুপ করে। দাড়ি-গোঁফ নেই। সারা শরীর ইস্পাতের মত কঠিন ও ঋজু। ইতি ভয় পেয়েছিল—অনিরুদ্ধ কি তাকে আঘাত করবে? সে ছুটে পালাতে চেয়েছিল, আর্ত চীৎকারে সজাগ করতে চেয়েছিল পড়শীদের। কিন্তু কিছু করতে পারেনি। সম্মোহিতের মত বলেছিল—তুমি কি আমার বিচার করতে এসেছ?

—না।

—তবে কেন এলে?

—তোমাকে দেখতে।

—কি দেখবে আমার? আমি তো পুরোনো।

—না, তুমি নোতুন। তুমি খুন করেছ।

—কাকে?

—আমাকে—আমার বিশ্বাসকে।

—কি পাগলামি করছ। যাও।

—যাব, ফুলের মত নিষ্পাপ আমার ভালবাসা ফিরিয়ে দাও।

ভয়ের ভাব কেটে গিয়েছিল ইতির। অনিরুদ্ধ কথা বলছিল খুব ধীরে ধীরে। ইতি আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছিল। তার সন্দেহ হয়েছিল, অনিরুদ্ধের মাথার গোলমাল হয়নি তো? চেহারা দেখলে ভয় লাগে, কথা শুনলে সন্দেহ হয়।

সে বলেছিল—কি যা-তা বকছ?

—আমার বিশ্বাসকে হত্যা করলে কেন?

—কি হচ্ছে! যাবে কি না বল? আমার স্বামী এসে পড়লে কি হবে বলত?

—কি আবার হবে! তাকে জিজ্ঞেস করব, সে তোমাকে বিশ্বাস করে কি না? যে একজনকে হত্যা করতে পারে, আরো একজনকে হত্যা করতে তার হাত কাঁপবে না?

—আমি এবার চীৎকার করব।

—পারবে না। তোমার হাতে রক্তের দাগ, সে হাত অপরকে দেখাবে কি করে?

—বেরিয়ে যাও।

—যাব। আমার প্রশ্নের জবাব দাও।

—পাগলামির জবাব নেই।

—জবাব আমার চাই। আবার আসব। আমি কলকাতার একটা কমার্শিয়াল ফার্মে চাকরি পেয়েছি।

অনিরুদ্ধ চলে গিয়েছিল। ইতি দরজা বন্ধ করতে পারেনি। ফিরে এসেছিল মরা অতীত। অনিরুদ্ধের প্রশ্নের কি রকম জবাব হয়? না, না, না—সে আপন মনে নীরবে চীৎকার করে উঠেছিল। পাগলামি। অনিরুদ্ধ ব্যর্থ দেবদাস সাজতে চায়। উপন্যাসের দেবদাস পারুলের কপালে কলংকের চিহ্ন এঁকে দিয়েছিল, অনিরুদ্ধও কি তাকে কলংকিত করতে চায়?

সে সহজ স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করেছিল। অনিরুদ্ধ তার জীবনে মৃত নক্ষত্র। সে আর আলো দিতে পারবে না। সে কারো কোন ক্ষতি করেনি। পথ চলতে গেলে ধাক্কা লাগে, কেউ-কিছু মনে রাখে না। সব মনে রাখা যায় না, রাখা উচিত নয়। ভুলতে হয়, ভুলে যেতে হয়। সেও ভুলে যাবে। অ্যাকসিডেন্টে তার কোন ক্ষতি করেনি।

পর পর দুদিন অনিরুদ্ধ এসেছিল। সেই এক প্রশ্ন—আমার বিশ্বাসকে খুন করলে কেন?

এবার অনিরুদ্ধ পাগল হয়েছে, পাগলের মত চীৎকার করেছিল ইতি—তুমি বেরিয়ে যাও। আমার স্বামীকে আমি সব বলব।

—সে তোমাকে বিশ্বাস করবে না।

—আমি তাকে ভালবাসি।

—তুমি আমাকেও ভালবাসতে।

সে দিব্যেন্দুকে সব কিছু বলবার চেষ্টা করেছে। পারেনি। বারবার মনস্থির করেছে। দিব্যেন্দুর দিকে তাকিয়ে ফিরে এসেছে। সে কি সত্যি ভালবাসতে পেরেছে দিব্যেন্দুকে? সে আশ্রয় চেয়েছিল, অবলম্বন চেয়েছিল, চেয়েছিল যৌবনের চাহিদা মেটাতে—সেখানে ভালবাসা কোথায়? যতদূর দৃষ্টি যায়, ধু ধু করে চারদিক। শুকনো পাতা-ঝরা গাছের মত সে একা দাঁড়িয়ে আছে।

এ-দোপারে সে ভয় পায়। ছটফট করে। অনিরুদ্ধের কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি ঢেকে ফেলে সারা ঘর। নিজের হাতের দিকে তাকায়—না, কোন রক্তের দাগ নেই। না, না, সে খুনী নয়। সে ভয় পায়, কেন পায় জানে না। দিব্যেন্দুকে সে ভালবাসে। গভীরভাবে ভালবাসে। হ্যাঁ তার অসুখ করেছে, ভীষণ অসুখ। ডাক্তার দেখালেই সেরে যাবে। তবু সে বার বার জানলার পর্দা সরিয়ে সন্তর্পণে দেখে, দরজার কাছে তারই হাতে নিহত ছায়াটা দাঁড়িয়ে আছে কি না!

কলকাতার আদিপর্বে লটারীর অবদান

সৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

লটারি। সর্তি খেলা। ভাগ্য পরিবর্তনের একমাত্র আয়াসহীন অভিনব পন্থা। সহজ পথে বিনা আয়াসে ভাগ্য নিয়ে জুয়াখেলা সেকালে সর্তি খেলা নামে পরিচিত ছিল। সর্তি কথাটা বিদেশী আরবী শব্দ, যার মানে ভাগ্যপরীক্ষা। ইংরেজ এল বিলিতি নাম হল লটারি।

এখন শহরে শহরে পথ চলতে-চলতে আকর্ষিত হয় পথচারীরা উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা আধুনিকতম লটারির বিজ্ঞাপন দেখে। শুধু পশ্চিম বাংলায় কেন সারা ভারতের নানা রাজ্যে আজ লটারির ছড়াছড়ি। রাজ্যের উন্নতির ক্ষেত্রে, জনকল্যাণের ক্ষেত্রে লটারির অবদান সীমিত। কিন্তু এমন এক দিন ছিল যখন এই কলকাতা শহরেই ভারতের প্রথম লটারি খেলার সূত্রপাত হয় জনকল্যাণ মানসে। কলকাতার স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি, সৌন্দর্য বৃদ্ধির সহায়ক হয় এই লটারি। ভাল কাজের জন্য লটারি করে টাকা তুলতে তখনকার সরকারই জনসাধারণকে উৎসাহ দিতেন। সে যুগে বহু রাস্তাঘাট, বাড়ী, পুকুর তৈরী হয় লটারির মাধ্যমে।

লটারি বা সর্তি খেলার সূত্রপাত হয় কোম্পানীর আমলে। তার আগেও যে হতো না তা বলা যায় না। তবে ঠিক এ ধরনের নয়। কোম্পানীর আমলে এটা একটা সাধারণ প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নীলাম করার মত বড় বড় বাড়ী, বাগানবাড়ী, জমি প্রভৃতি বিক্রী হত অনেক সময় লটারি প্রথায়। শোনা যায় একটা বড় বাড়ী, যার মাসিক ভাড়া ছিল হাজার টাকা, সেই বাড়ীর নামে লটারির টিকিট প্রতিটি ৬০০ টাকা করে বিক্রী করা হয়। তাতে মালিক বহু টাকা পায় ও পুরস্কার বিজেতাও লাভবান হয়।

১৭৮০ খৃঃ। সে সময় 'হার্মোনিক হাউস' নামে এক বিখ্যাত হোটেল বিক্রী হয় লটারি প্রথায় নির্দিষ্ট হারে নির্দিষ্ট সংখ্যক টিকিটে। এই ভাগ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন জাস্টিস হাইড, তৎকালীন সুপ্রীম কোর্টের বিচারক, যিনি মহারাজ নন্দকুমারের অন্যতম বিচারকর্তা ছিলেন।

১৭৮১ খৃঃ এণ্টালীর কাছে এক বাগানবাড়ী ৭৫ টাকা হারে টিকিট ধরে ৬ হাজার টাকায় বিক্রী হয়।

১৭৮৮ খৃঃ ১১ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার কলকাতা গেজেটে 'টিরেটি লটারি' নামে এক লটারির বিজ্ঞাপন সাধারণ্যে প্রচার করা হয়। তাতে ৬টি বহুমূল্য পুরস্কারের কথা ঘোষণা করা হয়। টিরেটি সাহেব ছিলেন প্রথম সিটি আর্কিটেক্ট বা নগর স্থপতি। তাঁর বাসস্থান ছিল চিৎপুরে, ঐখানেই তাঁর নামে বাজার ছিল। টিরেটি সাহেব এই লটারির প্রত্যেক টিকিটের ওপর তাঁর নিজ নাম সই করে দেন ও বেঙ্গল ব্যাঙ্ক প্রতি টিকিটের ওপর তার প্রতিস্বাক্ষর করে। বেঙ্গল ব্যাঙ্ক থেকে এই টিকিটের বিক্রীর ব্যবস্থা করা হয়।

উপরোক্ত ৬টি পুরস্কারের বিবরণ নীচে দেওয়া হল—

১ম পুরস্কার—কলকাতা শহরের মাঝখানে স্থাপিত টিরেটি সাহেবের বড় এবং সুপ্রশস্ত পাকা বাজার, ৯ বিঘে ৮ কাঠা জমি, ১২টি চতুষ্কোণ আকারের খোলা জমি সমেত থামবিশিষ্ট বারান্দা দিয়ে ঘেরা দোকানঘর। খোলা জমির মাঝখানে সুপ্রশস্ত পাকা রাস্তা, তাতে পাকা দোকানঘর। দাম...১,৯৬,০০০ সিক্কা টাকা।

২য় পুরস্কার—হারিং বেরী নামে এক খণ্ড জমি, বাজারের ঠিক উত্তর ধারে, চিৎপুরে যাবার সাধারণ রাস্তার ঠিক সামনে ৪ বিঘা ১৩ কাঠা জমি, তাতে ৩০টি পাকা গুদামঘর সাধারণ সব্জি বাজারের পূব দিকে অবস্থিত।

দাম ৩৬,০০০ সিক্কা টাকা।

৩য় পুরস্কার—বাজারের দক্ষিণ দিকে আগে যেখানে লে ব্র্যাংক সাহেব বাস করতেন, তার ঠিক বিপরীত দিকে ১ বিঘা জমির ওপর দোতলা বাড়ী, তার সংলগ্ন পূব দিকে ৪ বিঘা ৬ কাঠা জমি, তার উত্তর দিকে বাজারের পাকা পাঁচিল ঘেরা, সেই জমির ওপর ২০০ লম্বা ও ৪ ফুট চওড়া চালা।

দাম ৩৬,০০ সিক্কা টাকা।

৪র্থ পুরস্কার—১ বিঘা জমির ওপর লে ব্র্যাঙ্কের পূর্ব বাসগৃহ। এক তলায় ৬টি ঘর, ৪টি ভেতরের কামরা, ১টি হলঘর, ২ সারি লম্বা বারান্দা, ১টি পিছনের খিলানযুক্ত বারান্দা এবং ওপরতলায় ২টি ঘর, ১টা বারান্দা, ঘোরান সিঁড়ি, ১টি অফিস ঘর।

দাম ২৫,০০ সিক্কা টাকা।

৫ম পুরস্কার—মাছের বাজারের দক্ষিণ দিকে ৪ বিঘা জমি, ৩য় পুরস্কারে উল্লিখিত পাকা চালাঘরের কাছেই

দাম...১৬,০০০ সিক্কা টাকা।

৬ষ্ঠ পুরস্কার—১০ কাঠা জমির ওপর ১-তলা বাড়ী, ৪টি ঘর, ১টি হলঘর, অফিসের কাজ চালান যেতে পারে এমন ১টি ঢাকা বারান্দা, এটি ৩য় পুরস্কারের উল্লিখিত দোতলা বাড়ীর দক্ষিণ দিকে অবস্থিত

দাম ২৫,০০০ সিক্কা টাকা।

মোট দাম : ৩,২০,০০০ টাকা।

১ম পুরস্কারের সম্পত্তির মধ্যে যেসব দোকানঘর ও স্টল টিরেটি সাহেব মাসিক ভাড়ায় বিলি করেছিলেন, তার আয় মাসে ৩,৫০০ টাকা। উপযুক্ত ব্যবস্থা করলে মাসিক আয় আরও বেশি হতে পারে।

এই লটারির টিকিটের সংখ্যা ছিল ৩২,০০০। প্রতি টিকিটের হার ১০০ টাকা, মোট ৩,২০,০০০ টাকা।

টাকা বেঙ্গল ব্যাঙ্কে জমা দিতে হবে। যখন টিকিট বিক্রি শেষ হবে, তখন কলকাতাবাসী গ্রাহকরা নিজেদের মধ্যে একটা সভা করে লটারি পরিচালনা করবার জন্য এক কমিটি গঠন করবেন।

যদি কোন কারণে আকস্মিকভাবে লটারির খেলা বন্ধ হয়, তবে উক্ত ব্যাঙ্ক টাকার জন্য দায়ী থাকবে।

এই বিজ্ঞাপন প্রচারের ফলে সমস্ত টিকিট বিক্রি হয়ে যায় এবং খেলায় চুঁচুড়ার ওয়েন্টম সাহেব ১ম পুরস্কার অর্থাৎ টিয়েটি বাজার লাভ করেন। অন্যান্য লোকেরা পরবর্তী পুরস্কার পান। ওয়েন্টম সাহেব বাজার লাভ করে বহু টাকা দান করেন। তিনি প্রতি মাসে তাঁর চুঁচুড়ার বাড়ীতে দীন-দরিদ্রকে ১ শত মোহর দান করতেন।

[এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে—সিক্কা কথাটি আরবী। এটি বাদশাহী আমলের রৌপ্য মুদ্রা, কোম্পানীর আমলের ১৭ আনা। ১০০ সিক্কা=১০৬ টাকা।]

এগুলো তো গেল নিজস্ব লাভালাভের ব্যাপার। এর পর শহরের উন্নতির জন্য, রাস্তাঘাট প্রভৃতির সংস্কার ও বিস্তারের জন্য, নগরের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য শহরের গণ্যমান্য ও পদস্থ ব্যক্তিরা ১৭৯৩ খৃঃ এক লটারি কমিটি গঠন করেন। এর নাম হয় 'বঙ্গীয় লটারি কমিটি' (বেঙ্গল লটারি কমিটি)। এই কমিটির সভ্যদের কমিশনার বলা হত।

১৭৯৩ খৃঃ লটারি কমিটি প্রথমবার প্রতি টিকিট ৩২্ দরে ১০০০ টিকিট বিক্রি করে। তার মূল্য ৩২,০০০ টাকা। লটারির ব্যয় হিসেবে শতকরা ২্ ও দাতব্য কাজে শতকরা ১০্ কেটে বাকী টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়।

কমিশনাররা এতে যে টাকা সংগ্রহ করেন, তা প্রথমে দেশীয় হাসপাতাল কমিটির হাতে দিতে চান কিন্তু হাসপাতালের কমিটি ঐ টাকা নিতে অস্বীকার করে। তখন ঐ টাকা দিয়ে যাঁরা ঋণের দায়ে দেউলিয়া হয়েছেন, তাঁদের দেনা পরিশোধ করা হয়।

১৮০৪ খৃঃ ওয়েলেসলীর শাসনকালে প্রথম লটারি কমিটির পৃষ্ঠপোষকতা করেন তৎকালীন সরকার। কল্যাণকর কাজের জন্য লটারি করে টাকা তুলতে সরকারই জনসাধারণকে উৎসাহ দিতেন। সুতরাং লটারি পরিচালনার জন্য নতুন লটারি কমিটি হয়।

১৮০৩ খৃঃ ২১ ফেব্রুয়ারি কলকাতার দেশী ও বিদেশী নগরবাসীরা স্থায়ীভাবে সভা-সমিতি ও চিত্তবিনোদনের অভিপ্রায়ে একটা টাউন হল তৈরি করার জন্য এক সভায় মিলিত হন। টাউন হল তৈরি সাব্যস্ত হয়, কিন্তু অত টাকা সংগ্রহ করা হবে কি উপায়ে? তাই তাঁরা স্থির করেন লটারি করে টাকা তুলতে হবে। সরকারও এতে কোন আপত্তি জানালেন না। বরং উৎসাহিত করেন।

১৮০৪ খৃঃ 'লটারি কমিটি' তৈরি হয়।

১৮০৫ খৃঃ ১০০০ টাকা করে ৫ হাজার টিকিট বিক্রি হয়। ঐ লটারিতে যত টাকা উঠেছিল তার শতকরা ১০্ টাউন হল তৈরির জন্য, শতকরা ২্ ব্যয় নির্বাহের জন্য আর বাকীটা পুরস্কার দেওয়া হল।

১৮০৯ খৃঃ সাড়ে সাত লক্ষ টাকার লটারি খেলা হয়। পর পর কয়েক বছর লটারি করে টাকা তোলা হয়। ওয়েলেসলির শাসনকালে টাউন হল তৈরি শুরু হয় আর শেষ হয় মিণ্টোর শাসনকালে ১৮১৩ খৃঃ শেষে। এতে খরচ হয়েছিল ৭ লক্ষ টাকা।

১৮১৭ খৃঃ—এই সময় কাউন্সিলের ভাইস প্রেসিডেণ্ট সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় প্রসিদ্ধ লটারি কমিটি স্থাপন করেন। লটারি কমিটি আগেকার ১৭টি খেলার উদ্বৃত্ত সাড়ে চার লক্ষ টাকা স্বহস্তে গ্রহণ করে। এই কমিটির কল্যাণে রাস্তায় জল দেওয়ার প্রথা প্রথম প্রচলিত হয়। চাঁদপাল ঘাটের কাছে একটা কলও তৈরি হয়। একটা জল সরবরাহের কেন্দ্র ওয়েলিংটন স্কোয়ারে স্থাপিত হয়।

১৮১৮ খৃঃ—কলকাতা গেজেট ১৮১৮ খৃঃ ১৭ ফেব্রুয়ারি—'ধর্মতলার কোণ থেকে চৌরঙ্গী থিয়েটার পর্যন্ত রাস্তায় জল দেওয়ার ব্যবস্থা হওয়ায় চৌরঙ্গীবাসীদের সুখ-স্বচ্ছন্দতা বর্ধনের জন্য যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। ইহাতে আমরা যথেষ্ট আনন্দলাভ করিতেছি।'

সেকালের সংবাদপত্রে কয়েকটি লটারি খেলার উল্লেখ আছে। ইতিহাসবিদ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' থেকে কয়েকটি উল্লেখ করা হল।

'সমাচার দর্পণ

(১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮২২। ৬ ফাল্গুন ১২২৮) কলিকাতার ২৬ লটারি।—৮০৯ নম্বর টিকিটে ১০০০০০ এক লক্ষ টাকা চুঁচুড়ার শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ লাহা ও শ্রীযুত লালমোহন পালের নামে উঠিয়াছে। ঐ টাকা তাহারা তুল্যাংশক্রমে লইয়াছে, এতদ্ভিন্ন অন্য ২ যে ২ টিকিট উঠিয়াছে তাহা নীচের তপশীলে জানা যাইবে...'

'(২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮২২। ১৩ ফাল্গুন ১২২৮) ইস্তাহার।—মোকাম কলিকাতার ২৭ বারের লাটরি যে হইবেক তাহাতে যে লাভ হইবেক তদ্দ্বারা কলিকাতা শহরের পরিপাটী হয় এমত শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুর নির্দ্ধার্য্য করিয়াছেন। লটারিতে ৬০০০ ছয় হাজার টিকিট হইবেক ইহার মধ্যে ১৪৫৭ চৌদ্দ শত সাতান্ন টিকিট মাল তদ্ভিন্ন ৪৫৪৩ চারি হাজার পাঁচশত তেতাল্লিশ টিকিট ফরসা। এই টিকিট কলিকাতা টৌনহালে ১৫ মার্চ মঙ্গলবারে দুই প্রহর বেলায় নিলামে বিক্রয় হইবেক তাহাতে ৬০০০০০ ছয় লক্ষ টাকার ন্যূন ডাকিলে পাইবেক না ইহার অধিক যিনি ডাকিবেন তিনি পাইবেন। ...'

'(১ জানুয়ারি ১৮২৫। ১৯ পৌষ ১২৩১) কলিকাতা লাটরি খেলা।—গত বৃহস্পতিবারের গবর্ণমেন্ট গেজেট দ্বারা অবগত হইয়া লাটরি খেলা সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি। কলিকাতা নগরের শোভা করিবার নিমিত্তে সন ১৮২৫ শালের প্রথম লাটরি গবর্ণমেন্ট দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে তাহার ব্যাপার লাটরি কমিটির আজ্ঞানুসারে সুপ্রিটেণ্ডেণ্ট করিলেন তাহার ধারা গতবারের ন্যায় প্রাইজ হইবেক এবং টিকিট বাঙ্গাল বেঙ্কে বিক্রয় করা হইবেক প্রত্যেক টিকিটের মূল্য ১০০ এক শত টাকা।'

লর্ড ওয়েলেসলির আমলে শহরের উন্নতির জন্য এক কমিটি গঠিত হয়েছিল। যতদিন এই কমিটি ছিল ততদিন লটারি দ্বারা লব্ধ অর্থ সেই কমিটির হাতে দেওয়া হত।

১৮০৫ খৃঃ থেকে ১৮১৭ খৃঃ পর্যন্ত লটারি খেলার উদ্বৃত্ত অর্থে বহু প্রয়োজনীয় ও হিতকর কার্য করা হয়। গভর্ণর জেনারেল সাহেব স্বয়ং এই সব লটারির পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

১৮১৭ খৃঃ আর এক নতুন লটারি কমিটির সংগৃহীত অর্থে গঠিত কয়েকটি জনহিতকর কাজের কথা উল্লেখ করছি।

কাঁচা রাস্তা পাকাভাবে তৈরি—কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, স্ট্র্যাণ্ড রোড (স্ট্র্যাণ্ড রোড তৈরির সময় জনৈক ব্যক্তির ১ লক্ষ টাকা দান আছে), কলেজ স্ট্রীট, ওয়েলিংটন স্ট্রীট, উড স্ট্রীট।

নতুন রাস্তা—ফ্রী স্কুল স্ট্রীট, কীড স্ট্রীট, হেস্টিংস স্ট্রীট ক্রীক রো, ম্যাঙ্গো লেন, বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট ইত্যাদি।

পুষ্করিণী ও প্রমোদ উদ্যান—কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ার (হেদো), কলেজ স্কোয়ার (গোলদীঘি), ওয়েলিংটন স্কোয়ার, সুতিবাগান ট্যাঙ্ক ইত্যাদি।

জরীপ ও স্থান নির্ণয়াদি—কলুটোলা স্ট্রীট, আমহার্স্ট স্ট্রীট, মির্জাপুর স্ট্রীট। কয়েকটি রাস্তা পাকা করে বাঁধান হয়, কয়েকটি রাস্তায় ফুটপাথ, কয়েকটি বাগানে ইঁট দিয়ে তৈরি স্তম্ভ হয়। ধর্মতলার উত্তর দিকে একটা খাল। চাঁদপাল থেকে বেলেঘাটা লবণ হ্রদ পর্যন্ত একটা খাল ছিল, কলকাতা লটারি কমিটির টাকায় এই খাল বুজিয়ে জমি ভরাট করা হয়।

লটারির টাকায় অনেক জায়গায় গ্যাসের আলো দেওয়া হয়। সমাচার দর্পণের সংবাদ '১৮২২ ৩০ মার্চ। ১৮ চৈত্র ১২২৮ কলিকাতা।—ইংলণ্ড দেশে কল দ্বারা এক কল সৃষ্টি হইয়াছে তাহার দ্বারা বায়ু নির্গত হইয়া অন্ধকার রাত্রিতে আলো হয়। সংপ্রতি শুনা যায় যে মোকাম কলিকাতায় ধর্মতলাতে শ্রীযুত ডাক্তার টৌল্মিন সাহেব আপন দোকানে ঐ কল সৃষ্টি করিয়াছেন অনুমান হয় যে লাটরির অধ্যক্ষরাও উপস্বত্ব হইতে কলিকাতার রাস্তাতে ঐরূপ আলো করিবেন।'

লটারির সংগৃহীত অর্থে নালা-নর্দমা তৈরি, গ্যাসের আলোর ব্যবস্থা, পথঘাট বিস্তার ও সংস্কার, পুষ্করিণী খনন, রাস্তায় জলের ব্যবস্থা প্রভৃতিতে কলকাতার কিছু অংশ বেশ স্বাস্থ্যকর ও সৌন্দর্যপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। লটারির টাকায় কলকাতা শহরের উন্নতি হচ্ছে দেখে বিলেতের শাসক সম্প্রদায় মনে করেন তাঁদের সম্মান হানি হচ্ছে। তাই তাঁরা মাঝে মাঝে তীব্র নিন্দা করতে থাকেন।

ক্রমে সরকার ১৮৩৬ খৃঃ ঐ প্রথায় লটারি খেলা বন্ধ করে দেন। কলকাতার আদি পর্বে তখনকার মত লটারি খেলা শেষ হয়ে যায়।

চিঠিপত্র

'সমাজ, সতীদাহ ও রামমোহন' প্রসঙ্গে

গত ১০ইএ কার্তিক প্রকাশিত হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়-এর লেখা 'সমাজ, সতীদাহ ও রামমোহন' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়লাম।

প্রবন্ধটির শেষভাগে লেখক বাংলা গদ্য-সাহিত্যে রামমোহনের দান সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে 'সংবাদ-কৌমুদী' পত্রিকার কথা উল্লেখ করেছেন। এই পত্রিকার প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি বলেছেন 'বাংলা ভাষার প্রচার ও প্রসারের জন্য তিনি সংবাদ-কৌমুদী' পত্রিকা প্রকাশ করেন।' একথা ঠিক যে, রামমোহন এই পত্রিকা বাংলা ভাষায় বের করেন। কিন্তু এই পত্রিকা প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক জ্ঞান প্রচার করা। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় স্পষ্ট করেই জানানো হয় 'ধর্ম নীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক আলোচনা, আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী, দেশ-বিদেশের সংবাদ ও জ্ঞাতব্য তথ্য-সম্বলিত প্রেরিত পত্রাবলী প্রকাশ—এককথায় লোকহিতসাধনই এই সংবাদপত্র প্রচারের প্রধান লক্ষ্য।' (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িকপত্র)। শুধু এ পত্রিকা কেন, এই একই উদ্দেশ্যে তিনি পারসী ভাষায়ও 'মীরাৎ-উল-আখবার' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন।

'সংবাদ-কৌমুদী' পত্রিকার উত্থাপন প্রসঙ্গে লেখকের রামমোহনের রাজনৈতিক চিন্তাধারা সম্বন্ধে কিছু বললে ভালো হত। একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, যে-রাজনৈতিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উত্তরসূরী আমরা আজ আমাদের পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করেছি, সেই ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তাধারার তিনিই হলেন জনক।

> 'As the history of western political thought practically begins with the name of Aristotle, the history of political thought in modern India begins with the revered name of Raja Rammohan Roy.' (History of Political thought, vol I, — Bimanbehari Mazumdar. Cal. Univ.)

'সংবাদ-কৌমুদী' পত্রিকার প্রকাশ প্রসঙ্গে বিমানবিহারী মজুমদার বলেছেন—

> 'The people of Bengal enjoyed a limited measure of civil liberty under the aegis of the British Government for nearly half a century (1772-1821), when Rammohan started the Vernacular Journal, 'Sambad Kaumudi' in 1821. to rouse the political consciousness of the people of Bengal'. (History of political thought Vol I — Cal. Univ.)

এই পত্রিকার প্রকাশনা সম্পর্কে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন 'সমাচার-দর্পণ' খৃষ্টান পাদরিদের পত্রিকা। তাঁরা ভারতীয় ধর্ম এবং সমাজ সম্বন্ধে আপনাদের মত তাতে ব্যক্ত করতে পারতেন। কিন্তু হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির সপক্ষে মত ব্যক্ত করার মতো কোনো মাধ্যম ছিল না। সেই অভাব দূরীকরণের জন্যে 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রকাশের আয়োজন হয়। হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার আশায় সর্বশ্রেণীর শিক্ষিত হিন্দু এতে যোগদান করেন। বলতে পারা যায়, বাঙালীর স্বাদেশিক জাতীয়তার প্রথম বিকাশ হয় এই পত্রিকা প্রকাশে।' (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য)

বারিদবরণ ঘোষ।
চুঁচুড়া, হুগলী।

।।২।।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিত প্রবন্ধ 'সমাজ সতীদাহ ও রামমোহন' সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করতে চাই। কারণ, প্রবন্ধটি পড়লে, কার কার মনে হতে পারে, ভারত উপমহাদেশে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত হয়েছিল বুঝিবা মুসলমানদের হাত থেকে অল্পবয়সী হিন্দু বিধবাদের রক্ষা করবার জন্যে। বিশেষ করে বাংলাদেশে সতীদাহের এইটাই ছিল যেন প্রধান কারণ। আমার মনে হয়, এধরনের মত ইতিহাসভিত্তিক নয়।

সতীদাহ প্রথার ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায় এই প্রথা মধ্য এশিয়া থেকে মুসলমান ধর্মী তুর্ক, তাজিক, উজবেক তাতার প্রভৃতি জাতির লোক তলোয়ার হাতে ভারত-উপমহাদেশে আসবার আগে থেকেই ব্যাপকভাবে এদেশে প্রচলিত ছিল। অন্যদিক থেকে বলা যায়, বাংলাদেশে হিন্দুদের (বিশেষ করে উচ্চবর্ণের) মধ্যে সতীদাহ প্রথা বিশেষভাবে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু (যতদূর জানি) বৌদ্ধদের মধ্যে ছিল না। বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমান প্রাচীন বৌদ্ধবংশোদ্ভব। আর এই কারণেই সম্ভবত বাঙালী হিন্দুরা বাঙালী মুসলমানদের এক সময় বলতেন (সম্ভবত এখনো অনেকে বলেন) 'নেড়ে'। তাই হিন্দু বিধবারা দেহের তাড়নায় কুলত্যাগ করে মুসলমান হয়ে বাঙালী মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিয়েছিল, এমন নয়।

একথা সকলেরই জানা : রামমোহন ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করবার আগে মুসলমান ও খৃষ্টধর্ম সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী গভীর অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেন। এ থেকেই তিনি লাভ করেন পরম-ব্রহ্মবাদ প্রচারের প্রেরণা। তা ছাড়া তাঁর মনে কাজ করেছিল আধুনিক ইউরোপীয় যুক্তিবাদ। রামমোহন যুক্তিবাদী ইউরোপকে বাঙালী মনের কাছে আসতে সাহায্য করেছেন এবং বাংলা গদ্যের তিনি অন্যতম পথিকৃৎ। বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে জন্ম নিয়েছে আজকের বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীন বাংলাদেশ। বাংলা-ভাষা মরবে না, কারণ আজ তা একটি স্বাধীন জাতির রাষ্ট্র ভাষা। হিন্দী ভাষার চাপে রামমোহনের ভাষা, ভারতে একদিন বিলুপ্ত হলেও হতে পারে, কিন্তু বাংলাদেশে হবে না। ভাষার মাধ্যমে রামমোহন বেঁচে থাকবেন বাংলাদেশের সব বাঙালীর মধ্যে।

এবনে গোলাম সামাদ,
রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

মূল্যমানের পাগলা ঘোড়া

যাঁরাই হাট-বাজার করেন তাঁরা সকলেই হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন ব্যাপারটা। সংসারের হাল ধরতে গিয়ে নাকাল হতে হচ্ছে নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত সকলকেই। হয় জিনিসপত্তর উধাও, নয়তো দামের ঠেলায় অন্ধকার। চারদিকে শুধু সর্ষে ফুল।

এই অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পূর্ণ বৈঠক হয়ে গেল যোজনা কমিশনের। পরিকল্পনার খসড়াটি অনুমোদিত হয়েছে। স্বিমুখী ঐ পঞ্চম পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য দারিদ্র্য উচ্ছেদ ও স্বয়ম্ভরতা লাভ। আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বখ্যাত শ্লোগানটির বাস্তব রূপায়ণের অন্যতম দৃঢ় পদক্ষেপ পঞ্চম পরিকল্পনায় যে ছায়া ফেলেছে সে ব্যাপারে অতিবড় নিন্দুকও একমত হবেন।

কিন্তু প্রশ্নটা অন্যত্র। ১৯৬১-৬২ সালকে ১০০ ধরে পাইকারী মূল্যসূচকের সাহায্যে সাধারণ মূল্যমান হিসেব করে জানা গেছে যে গত জানুয়ারি মাস থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গত বছর এই সময়ের তুলনায় শতকরা ৬-৫ মূল্যমান বেড়েছে। ১৯৭০-এর তুলনায় '৭১-এর মধ্যে মূল্যমান বেড়েছিল শতকরা ৩-৯ ভাগ।

এবছরের হিসেবে কি? চলতি বছরের গোড়া থেকে মে-র শেষ পর্যন্ত মূল্যসূচক বৃদ্ধি নিঃসন্দেহেই বিস্ময় সৃষ্টি করবে। পরিসংখ্যানে জানা যায়, এ সময়ের মধ্যে ঐ মূল্যসূচক বৃদ্ধি পায় ১৯৩-২। ঠিক পরের মাসে অর্থাৎ জুনেই আগের মাসের তুলনায় গড়ে ২-৩ ভাগ। জুলাইতে ২০৭-৫ এবং আগস্টে এর উপর শতকরা ২-৫ ভাগ আরো বৃদ্ধি পায়।

এক কথায় আগস্ট পর্যন্ত মূল্যসূচক লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে থাকে। এ-যেন সেই পাগলাঘোড়া। ভারতবর্ষের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাকিয়ে রয়েছেন তাঁদের প্রিয় নেতার দিকে, 'গরীব' নয়, 'গরীবি' হঠানোর জন্যেই মূল্যমান বৃদ্ধির পাগলা ঘোড়াটাকে কবে সত্যি সত্যিই তিনি বাগে আনতে পারবেন তা দেখার জন্য।

আনোয়ার হাশেম
কলকাতা-২৩

ষোল

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তার খুব অস্বস্তি লাগছিল। তাছাড়া এই চার দেওয়ালের মধ্যে সে বন্দী থাকবে নাকি? কোনো কথা না বলে বিন্তি হঠাৎ বাইরে বেরিয়ে এল।

পিছন থেকে রতীশ বলল,—'আরে, আরে। যাচ্ছ কোথায়?'

বাইরে মাঠময় রোদ্দুরের হাসি। পায়ের নীচে নরম মখমলের মত বিস্তীর্ণ তৃণদল। কলকাতার এত কাছে এমন একটা সবুজের রাজ্য আছে, তা যেন কল্পনাও করা যায় না।

ততক্ষণে বাগান পেরিয়ে বিন্তি মাঠে পা দিয়েছে। রতীশ বারান্দায়। পিছন ফিরে সে প্রায় চেঁচিয়ে বলল,—'ওখানে হাবার মত দাঁড়িয়ে আছ কেন? এস না গঙ্গার ধার থেকে একটু বেড়িয়ে আসি।'

জায়গাটা অদ্ভুত নির্জন, কাছাকাছি লোকালয় নেই। এদিকে ওদিকে তাকিয়ে বিন্তি একজন মানুষের মুখ দেখতে পেল না। সেই চৌকিদার গোছের লোকটা গাড়ি থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে কোথায় গেছে কে জানে। তার মর্জিমত ফিরবে মনে হয়। যাবার সময় রতীশকে কিছু বলেও যায় নি।

গাছগাছালির আড়ালে বসে একটা পাখি শিস দিচ্ছে। কি সুন্দর মিষ্টি সুর। বিন্তি চেষ্টা করল পাখিটাকে খুঁজে বের করতে। কিন্তু পারল না। কাছাকাছি চার-পাঁচটা বড় গাছ। প্রত্যেকটিরই ঘন পত্রসজ্জা। ওরই মধ্যে কোথায় সেটা মুখ লুকিয়ে বসে। অতটুকু পাখি, খুঁজে বের করা দুঃসাধ্য।

রতীশ কাছে এলে দুজনে ফের হাঁটতে শুরু করল। বিন্তির ইচ্ছে করছিল মাঠের উপর খানিকটা বেশ ছুটে বেড়ায়। এই রোদ্দুরে গা ভাসিয়ে পাখিরা যেমন ডানা মেলে ওড়ে, কিম্বা হরিণী যেমন ত্রস্ত পা ফেলে দৌড়ায়, সে তেমনি ঘাসের উপর ছুটবে, বেড়াবে। অথবা ওই বড় গাছগুলোর মোটা গুঁড়ির আড়ালে সে রতীশের সঙ্গে অনায়াসে লুকোচুরি খেলতে পারে। এখানে তার মা নেই যে শাসন করবে। মিলি নেই যে তাকে দেখে মুখ টিপে হাসবে। এমন একটা বাধাবন্ধহীন আনন্দের স্বাদ বিন্তি বহুদিন পায়নি।

রতীশ জিজ্ঞাসা করল,—'জায়গাটা তোমার খুব ভাল লেগেছে, তাই না?'

—'খুউব।' বিন্তি ঠোঁট টিপে হাসল। 'সে কথা আবার বলতে হয়। কত বড় মাঠ আর কি সুন্দর পাখির ডাক। বাগানে নানা রঙের ফুল। তাছাড়া জায়গাটা এমন নির্জন যে এলেই ভালো লাগে।'

রতীশ বলল,—'এই বাগানবাড়িটা আমার এক বন্ধুর। বছরে এক-আধবার ওরা বেড়াতে আসে। খেয়াল-খুশি মত দু-চারদিন বাস করে, এই পর্যন্ত। বাকি সময়টা এমনি পড়ে থাকে। ওই মালিটাই দেখাশুনো করে।' পকেট থেকে ওর সেই সুদৃশ্য কেসটা বের করে রতীশ একটা সিগারেট ধরাল। কালো চশমাটা চোখ থেকে নামিয়ে বলল,—'এরপর একদিন দল বেঁধে এলেই হবে। তুমি, আমি, মিলি, আমার দিদি আরো যারা আসতে চায়, —সবাই। বেশ মজা করে চড়ুইভাতি করা যাবে।' রতীশ এবার ইচ্ছে করেই বাংলা কথাটা ব্যবহার করল। আজকাল পিকনিক শব্দটা বড় বেশী আটপৌরে। রাম · শ্যাম সকলেই বলে।

—'চড়ুইভাতি?' বিন্তি ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল।

—'হ্যাঁ', রতীশ ঈষৎ ভুরু কোঁচকাল। 'কেন, তোমার আপত্তি আছে নাকি?'

—'দূর! আপত্তি থাকবে কেন?' বিন্তি হেসে জবাব দিল। 'আমি জিজ্ঞেস করছিলাম চড়ুইভাতি হবে কখন?'

—'জানুয়ারীর প্রথম দিকে হলে অনেকের সুবিধে।' রতীশ একটু ভেবে বলল। 'অবশ্য ইচ্ছে করলে ডিসেম্বরের শেষ দিকেও করা যায়।'

—'কি জানি! তখন হয়তো আমি কলকাতাতেই থাকব না।' বিন্তি বিষণ্ণ দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকাল।

—'থাকবে না মানে? কোথায় যাবে?'

—'কেন, চন্দনপুরে। আমাদের দেশের বাড়িতে।' বিন্তি ধীরে ধীরে বলল। 'তোমাকে আগে একদিন বলেছিলাম না? রিটায়ার করে বাবা গ্রামের বাড়িতে গিয়ে থাকবেন।'

—'কিন্তু তুমি যে বলেছিলে এখনও কিছু পাকাপাকি হয়নি।'

—'তখন হয়নি। এখন সব ঠিক।' বিন্তি ব্যাপারটা খুলে বলতে চাইল। 'সামনের মাসে বাবা রিটায়ার করবেন। তারপর উনি আর একটি দিনও কলকাতায় কাটাতে চান না। জানো রতীশ, আজকাল প্রায়ই বাবা দেশের কথা বলেন। আমি বুঝতে পারি চন্দনপুরের বাড়িঘর বাবাকে ভীষণ আকর্ষণ করছে। অনেক সময় অবাক হয়ে ভাবি, এতদিন ধরে বাবা কেমন করে কলকাতায় কাটালেন।—'

রতীশ বলল,—'কিন্তু গ্রামে গেলে তোমার কি হবে বিন্তি? তুমি এত ভালো নাচতে পার। সবাই কত প্রশংসা করে। তাছাড়া কি সুন্দর ফিগার তোমার! আমি ঠিক জানি, একদিন তোমার খুব নাম হবে। সবাই তোমাকে খুব বড় শিল্পী বলে জানবে।' একটু থেমে সে আবার যোগ করল,—'তুমি বাবাকে বুঝিয়ে বল। এখানে তোমাকে থাকতেই হবে। কলকাতায় না থাকলে তোমার প্রতিভার বিকাশ হবে না।'

বিন্তি অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। সত্যি, রতীশ তাকে ভীষণ ভালবাসে। তার জন্য কত চিন্তা করে। আর কেমন সুন্দর সব কথা বলে রতীশ।

একদিন নাচে তার নিশ্চয় নাম হবে। কলকাতার লোকে তাকে বড় শিল্পী বলে জানবে। বাড়িতে মা, বাবা, দাদারা কেউ তার জন্য একটুও ভাবে না। এমন সহানুভূতির কথা সে কার কাছে শুনেছে?

মুখ তুলে বিন্তি বলল,—'বাবাকে আর কি বোঝাব? আমাদের চন্দনপুরে যাওয়ার সব ঠিক। কাল বাজিয়ে তোমরা চলে আসবার পর বাবা স্পষ্ট বললেন,—কলকাতায় আমরা আর কটা দিন আছি। মাস দেড় কি বড় জোর দুটো মাস হবে। তারপর চন্দনপুরের বাড়িতে গিয়ে বাস করব। বিন্তিকে বরং সেই ভেবে মনে মনে তৈরি হতে হবে।'

—'আর তোমার মা?' রতীশ ভুরু কুঁচকে শুধোল।

—মায়ের জন্য খুব কষ্ট হয় আমার। এতদিন পরে কলকাতা ছেড়ে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে বাস করতে কার ইচ্ছে করে? তাই চন্দনপুরে যেতে মায়ের ভীষণ আপত্তি। আর এই নিয়ে বাবার সঙ্গে কত ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে। কিন্তু আমার বাবা অদ্ভুত মানুষ। মা হাজার কথা বললেও বাবা একটুও রাগে না। কখনও মৃদু হাসে। খুব বেশী হলে গম্ভীর মুখে কি সব ভাবে। কিন্তু তাই বলে বাবা তার মত বদলাবে না। একবার যখন চন্দনপুরে যাওয়ার ঠিক হয়েছে, তখন তার আর নড়চড় নেই।'

'আশ্চর্য মানুষ।'

—'হ্যাঁ, আমার মা ঠিক তাই বলে। বাবার নাকি ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। সিদ্ধান্তে তিনি স্থির। কেউ তাকে টলাতে পারে না। দুঃখ করে মা তাই বলছিল,—এই নাচ-গান, হৈ-চৈ, ফাংশন, তুই এবার ছেড়ে দে বিন্তি। চন্দনপুরে গিয়ে গ্রামের মেয়ের মত থাকবি চল।'

বিন্তির চোখ দুটি বেদনায় ভারী হয়ে এল। ম্লান হেসে সে ফের বলল,—'আর মা ঠিক কথাই বলে। চন্দনপুরে গিয়ে যখন থাকতেই হবে, তখন আর নাচ শেখার কোনো মানে হয় না। গ্রামের মেয়েরা কি নাচ-গান করে? তারা যেমনভাবে দিন কাটায়, আমাকেও তেমনিভাবে থাকতে হবে।'

—'আমি তোমাকে চন্দনপুরে যেতে দেব না বিন্তি।' একটা চাপা আবেগ এবং উত্তেজনায় রতীশের ঠোঁট দুটি থরথর করে কাঁপল। একটু থেমে সে আবার বলল,—'বাড়ির লোকেরা তোমার ভবিষ্যতের কথা একটুও ভাবে না। নইলে তোমার মত মেয়েকে কেউ গ্রামে বাস করতে বলে? চন্দনপুরে গেলে তোমার কি হবে একবার ভেবে দেখেছ? সব সম্ভাবনা, ভবিষ্যতের আশা জ্বলেপুড়ে নিঃশেষ হবে। নিজেকে এমনভাবে ধ্বংস করে লাভ কি?'

—'কিন্তু আমার কি উপায় আছে বল?' বিন্তি বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

রতীশ গালে হাত রেখে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করল। বলল,—'উপায় একটা খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু তুমি কি আমার উপর নির্ভর করতে পারবে বিন্তি? মানে আমাকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে পারো?'

—'এতদিন পরে বুঝি তোমার তাই মনে হল?' বিন্তি ভুরু কুঁচকে তাকাল। অভিমান করে বলল,—'তুমি ঠিকই বলেছ। আমার ভবিষ্যত নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। তোমার মত এত চিন্তা-ভাবনা কেউ করে না। তুমি ছাড়া আমি কার উপর নির্ভর করি বল? আমাদের দুজনের কথা মিলির কাছে ভাঁড়িনি, মাকে জানাইনি; সম্পূর্ণভাবে তোমাকে বিশ্বাস করি বলেই তো, তোমার সঙ্গে এতদূর এগোতে পারলাম।'

গঙ্গার ধারে জায়গাটা আরো সুন্দর। এখন ভরা জোয়ার। দুপুরের উজ্জ্বল রোদ্দুরে নদীর জল ঝিকমিক করছে। খানিক দূরে একটা ছোট নৌকো এতক্ষণ চড়ায় আটকে ছিল। জোয়ারের জলে হঠাৎ খুশির আনন্দে সেটা দস্যি ছেলের মত নাচানাচি শুরু করেছে।

কথাবার্তা ক্রমেই ভারী এবং মন্থর হয়ে উঠছিল। রতীশ তাই হাওয়া বদলাবার চেষ্টা করল। হঠাৎ সে সামনে এসে বিন্তির কাঁধের উপর হাত রাখল মৃদু হেসে বলল, 'প্রায় একটা বাজে। সে খেয়াল আছে? সঙ্গে অত খাবার আনলাম। সেগুলোর কথা এবার ভাবতে হবে না?'

—'যাও!' কাঁধের উপর থেকে রতীশের হাত সরিয়ে বিন্তি একটা কটাক্ষ করল। 'পেটুক কোথাকার। এরই মধ্যে তোমার খিদে পেয়ে গেল?'

ঘরের ভিতরে এসে রতীশ রেকর্ড-প্লেয়ারে হাল্কা গান বাজিয়ে দিল। টিফিন ক্যারিয়ার খুলতেই নানা রকমের সন্দেশ আরো কি সব খাবার উঁকি দিল। প্ল্যাস-টিকের ব্যাগের ভিতর থেকে আপেল, কমলা-লেবু আর আঙুর বের করে সে বিন্তির সামনে রাখল।

—'কি সর্বনাশ! এত খাবার কেন সঙ্গে এনেছ? কে খাবে বলতে পারো?'—

একটা আপেল তুলে নিয়ে রতীশ স্বচ্ছন্দে কামড় দিল। বলল,—'যা পারি, আমরা দুজনে খাবো, বাকিগুলো ওই মালিটা নেবে।' কথা শেষ করে সে প্রায় অতর্কিতে একটা সন্দেশ তুলে নিয়ে বিন্তির মুখের মধ্যে গুঁজে দিল।

চার-পাঁচ জনের খাবার। সবই পড়ে রইল। রতীশ অবশিষ্ট আহার্য সরিয়ে রেখে প্ল্যাসটিকের ব্যাগের ভিতর থেকে রঙীন পানীয়ের সেই বোতল এবং আরো একটা ছোট শিশি বের করল। অদ্ভুত এক ধরনের গ্লাসে দুটি তরল পদার্থ অল্প-বেশী ঢেলে সে নিঃশব্দে চুমুক দিতে লাগল।

বিন্তি অবাক হয়ে শুধোল, 'ওটা কি খাচ্ছ?'

—'ওষুধ', রতীশ মুচকি হেসে জবাব দিল। বিন্তির চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, —'তুমি খাবে একটু?'

—'ধ্যেৎ! আমি কেন ওষুধ খেতে যাব? আমার কি অসুখ করেছে?' বিন্তি সুন্দর ভ্রূভঙ্গি করল। বলল,—'তাছাড়া ওটা মোটেই ওষুধ নয় মশায়। আমি জানি, তুমি কি খাচ্ছ।'

—'কি?'

—'মদ', বিন্তি মৃদু গলায় জবাব দিল। ঈষৎ ভর্ৎসনার সুরে বলল,—'ছিঃ! তুমি মদ খাচ্ছ রতীশ?'

—'কেন, মদ খাওয়া কি নিতান্ত দোষের?' রতীশ পাল্টা প্রশ্ন করল। 'আজ-কাল ড্রিংক করা তো রেওয়াজ। অনেকে খায়। তাছাড়া এক-আধটু খেলে কিছু খারাপ হয় না। বরং শরীর বেশ চাঙ্গা থাকে। তুমি জান না বিন্তি, ইদানীং মেয়েরাও কিছু কম যায় না। পিকনিক, চড়ুইভাতি কিম্বা ককটেল পার্টিতে তারা রীতিমত পাল্লা দিয়ে মদ গিলছে।'

বাঁ চোখটা ঈষৎ ছোট করে সে আবার বলল,—'তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম। এক ঢোক চলবে নাকি?'

—'উহুঁ। ওসব ছাইভস্ম গিলতে বয়ে গেছে আমার।'

—'বেশ, তাহলে তুমি একটু নাচো—'

—'পাগল নাকি? এই কি নাচবার সময়? তোমার কি মাথা খারাপ হল?'

কিন্তু রতীশ অবুঝ। বিন্তি মেজের উপর পা গুটিয়ে বসেছিল। রতীশ কাছে এসে তাকে জোর করে উঠিয়ে দিল। বলল, —'এই ঘরের মধ্যে একা একা তোমার নাচ দেখতে আমার ভীষণ ইচ্ছে করছে। প্লীজ বিন্তি,—আমার কথা রাখো। ডান্স এ লিটল।'

অগত্যা নাচতেই হল। রেকর্ড প্লেয়ারে খুব সুন্দর একটা বাজনার সুর হচ্ছিল। বিন্তি তারই সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাচতে শুরু করল। দেহের প্রতিটি রেখায়, চোখের ভঙ্গিমায়, মুখের নানারূপ অভিব্যক্তিতে ছন্দোময় নৃত্য ফুটে উঠল। পালঙ্কের উপর আধশোয়া অবস্থায় রতীশ দেখছিল ওকে। হাতে পানপাত্র। তারিয়ে তারিয়ে একটু করে রঙীন পানীয় সে গলায় ঢালছিল। এখন বেশ খুশি-খুশি স্বচ্ছন্দ লাগছে তার। শরীরটা ঈষৎ গরম। নাক দিয়ে ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে। পালংকে তাকিয়ার উপর হেলান দিয়ে নিজেকে বাদশাহী আমলের কোনো নবাবজাদা বলে ভ্রম হচ্ছে। দেহের শিরায় উপশিরায় প্রতিটি রক্তকণিকার মধ্যে এক ধরনের পোকা অনবরত কামড় দিচ্ছে। তার সামনে দাঁড়িয়ে বিন্তি হেলছে, দুলছে। তাকে একজন নর্তকী, কিম্বা পাথমায়েলা
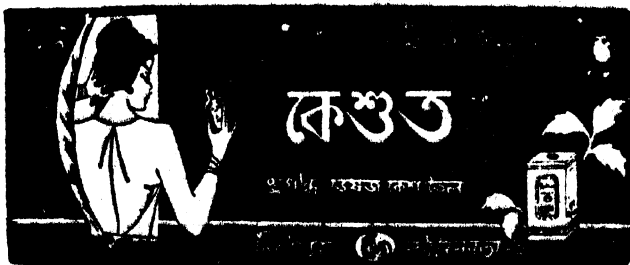
প্রজাপতির মত মনে হয়। ছেলেবেলায় রংচংয়ে প্রজাপতি দেখলেই রতীশের হাত নিসপিস করত। যতক্ষণ না সেটাকে ধরছে, ততক্ষণ শান্তি নেই।

পিছনের জানালা দিয়ে এক চটকা রোদ্দুর বাঁকাভাবে পালঙ্কের উপর এসে পড়েছে। বিছানা থেকে উঠে রতীশ জানালাটা বন্ধ করে দিল। এখন ঘরের মধ্যে প্রায় অন্ধকার। ধীরে ধীরে পা ফেলে সে বিন্তির কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ হাত বাড়িয়ে তাকে আকর্ষণ করবার চেষ্টা করল।

বিন্তি ভেবেছিল রতীশ বোধহয় তার সঙ্গে টুইস্ট নাচতে চায়। কিন্তু ওর ভাবভঙ্গি কি সে রকম? রতীশ তাকে দেহের সঙ্গে চেপে ধরছে কেন? তার নাচ বন্ধ হবার জোগাড়। সে ভালো করে পা ফেলতে পারছে না। বিন্তি নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করল। বলল,—'এই কি হচ্ছে? ছেড়ে দাও আমাকে। নইলে পড়ে যাব।' কিন্তু রতীশের হাত দুটো প্রায় সাঁড়াশীর মতো তাকে বন্দী করে রেখেছে। বিন্তির সাধ্য কি নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়?

তার কানের কাছে ফিসফিস করে রতীশ ভালবাসার সব অলৌকিক কথা বলছিল। বর্ণময় গাঢ় প্রেম। রতীশের ঘন সান্নিধ্যে বিন্তি যেন ক্রমেই অবশ হয়ে পড়ছে। তার সাড় নেই। বেপথুমতী দেহটাকে রতীশ নৌকোর মত ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কতক্ষণ পরে ঠিক খেয়াল নেই, বিন্তি হঠাৎ টের পেল তার মাথাটা বালিশের উপর স্থান পেয়েছে।

ঘরের মধ্যে বেশ অন্ধকার। দরজাটা বন্ধ। রতীশ বিছানায় নেই। কখন নেমে গেছে। ঘাড় ফিরিয়ে বিন্তি এদিক ওদিক তাকাল। রতীশ আয়নার সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে। দর্পণে কি দেখছে সে? নিজের ছায়া? অমন স্থিরভঙ্গিতে কি চিন্তা করছে?

নিজেকে বেশ ক্লান্ত এবং নির্জীব লাগছিল তার। একটা অদ্ভুত, অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতা। বিন্তি কি ভাবতে পেরেছিল তার জীবনের খাতার পাতায় আজ একটি নতুন আঁচড় পড়বে?

বিছানায় বসে বিন্তি বলল,—'একটু জল খাব।'

—'হ্যাঁ, নিশ্চয়।' রতীশ তাড়াতাড়ি থার্মোফ্লাস্ক থেকে গ্লাসে জল ঢেলে তার হাতে দিল।

জল খেয়ে বিন্তি বিছানার উপর চুপ করে বসে রইল। রতীশ অপরাধীর মত শুধোল,—'তোমার কি খুব খারাপ লাগছে?'

বিন্তি সে কথার কোনো জবাব দিল না। তেমনি মুখ নীচু করে কি ভাবতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে বলল,—'তুমি একটু বাইরে যাও।'

রতীশ বেরিয়ে যেতে বিন্তি বিছানা থেকে নামল। দর্পণে নিজের ছায়া দেখে কান্না পাচ্ছিল তার। শাড়িখানার যা দশা। সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বহুক্ষণ ধরে বেশবাস ঠিক করল।

দরজা খুলে বেরিয়ে বিন্তি দেখল রতীশ গাড়িতে বসে। সে যাবার জন্য তৈরি। আর আশ্চর্য ব্যাপার। এই বাগানবাড়ির মালি অথবা কেয়ার-টেকার গোছের লোকটা কখন ফিরে এসেছে। দরজা খুলতেই সে নিঃশব্দে ঘরের ভিতরে ঢুকল। দুই হাতে খালি টিফিন ক্যারিয়ার, প্লাস্টিকের ব্যাগ, থার্মোফ্লাস্ক এবং রেকর্ড-প্লেয়ারটা এনে গাড়িতে তুলে দিল।

তার দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে লোকটা। ওর সামনে একটুও ভালো লাগছিল না বিন্তির। সর্বাঙ্গে অস্বস্তির সুড়সুড়ি। বিন্তির মনে হল লোকটা মুখ ফিরিয়ে মুচকি হাসল। আসলে ও সব জানে, সব বোঝে। এতক্ষণ ঘরের দরজা বন্ধ ছিল, তা কি সে লক্ষ্য করেনি? অথচ নিপাট ভালোমানুষটির মত হাঁটছে, ফিরছে। যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না।

যাবার আগে রতীশ ওকে পাঁচটা টাকা বকশিস দিল। সে নমস্কার করে একগাল হেসে বলল,—'আবার আসবেন বাবু।'

বিন্তি অন্যমনস্কের মত আকাশের নীলিমা, পাখি-টাখি দেখার ভান করছিল। ওই লোকটার সঙ্গে কথা বলতে তার একটুও ইচ্ছে নেই। কিন্তু আশ্চর্য! সে অনায়াসে গাড়ির এঞ্জিনের পাশ দিয়ে তার কাছে এসে দাঁড়াল। বলল,—'যখন খুশি আসবেন দিদিমণি। আমি সব সময় থাকি। আপনাদের কোনো অসুবিধে হবে না।' কথা শেষ হতেই সে আবার দাঁত বের করে হাসল।

পাঁচের রাস্তার উপর দিয়ে গাড়ি জোরে ছুটতে শুরু করল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রতীশ বলল,—'তিনটের সময় রিহার্সাল। মনে হয় তার আগেই পৌঁছে যাব।'

—'আজ রিহার্সালে যেতে ইচ্ছে করছে না।' বিন্তি স্পষ্ট জানাল।

—'কেন? তোমার মন ভাল নেই?'

ইংগিতে নিজের বেশবাসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে বলল,—'তোমরা পুরুষ-মানুষ। কিছু বোঝ না। এই অবস্থায় কি পাঁচজনের সামনে যাওয়া চলে?' ফের সলজ্জ হেসে জানাল,—'জামা-কাপড়ের দশা দেখলে মিলির কি আর কিছু বুঝতে বাকি থাকবে?'

ব্যাপারটা উপলব্ধি করে রতীশ চুপ করে রইল। কয়েক মুহূর্ত পরে সে কিছুটা স্বগতোক্তির মত বলল,—'সামনের শনিবার ফাংশন। আজকের দিনটা রিহার্সাল নষ্ট হল। শেষ পর্যন্ত বইটা কেমন দাঁড়াবে কে জানে!—'

—'তার জন্যে তুমি দায়ী?' বিন্তি পরিষ্কার বলল। 'কি দরকার ছিল এখানে আসবার? আমার একটুও ইচ্ছে হয়নি। শুধু তোমার পাল্লায় পড়ে—'

—রতীশ ঘাড় ফিরিয়ে ওর মুখের দিকে তাকাল। বলল,—'তোমার কি মন খারাপ বিন্তি? সন্দেহ হচ্ছে, খুব রেগে গিয়েছ?—'

—'রাগব কেন?' বিন্তি নরম গলায় কথা কইল। 'বরং আমার খুব ভয় করছে রতীশ।'

—'ভয়?'

—'হ্যাঁ, ভয়। তখন থেকে বুকের ভিতরটা কেবল ঢিপ-ঢিপ করছে। আমার মন বলছে তোমার সংগে এতদূর এগিয়ে যাওয়া বোধহয় ঠিক হয়নি। প্রথমে হাঁটুজল পর্যন্ত নেমেছিলাম। আর এখন তো ডুব-জলে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। আমার কি ফেরার পথ রইল রতীশ? তলিয়ে যাব কিম্বা আবার উঠতে পারব, কিছুই বুঝতে পারছি না।'

বিন্তির পিঠের উপর আলগোছে একটা হাত রাখল রতীশ। আদর করে বলল,—'তোমার সব ভার আমি নিলাম বিন্তি। চিন্তা-ভাবনাগুলো এবার আমাকে দাও। তোমার সমস্যার কথা আমি ভাবব। সে চিন্তা আমার। তুমি শুধু নাচের কথা ভাব। কেমন করে আরো বড় শিল্পী হবে। অনেক নাম, খ্যাতি হবে তোমার। এই কলকাতার তুমি নাচবে শুনলে লোকে লাইন দিয়ে ভিড় করবে।' একটু থেমে সে পুনরায় যোগ করল,—'অবশ্য আমি জানি একদিন তুমি মস্ত বড় শিল্পী হবে। শুধু কলকাতা কেন, বোম্বাই, দিল্লী লখনউ, মাদ্রাজ, এলাহাবাদ আরো কত শহর থেকে তোমার নিমন্ত্রণ আসবে। তখন সব জায়গায় যাওয়ার মত ফুরসৎ পাবে না।'

রতীশ এমন সুন্দর সব কথা বলে, ঠিক স্বপ্নের মত মনে হয়। শহরগুলোর নাম কেমন সুর করে উচ্চারণ করল। বিন্তি ওর কাঁধের কাছে মাথা রেখে প্রায় ফিসফিস করে বলল,—'তুমি সত্যি বলছ তো রতীশ? আমার সব ভার তুমি নিলে? সব ভাবনা তোমার?—'

রতীশ তাকে নিজের কাছে আরো একটু টেনে নিল, কানের কাছে মুখ নামিয়ে খাটো গলায় বলল,—'সত্যি, সত্যি। তিন সত্যি। হল তো?'

গলিতে ঢোকার আগে বিন্তি এদিক-ওদিক তাকাল। চায়ের দোকানে সেই লক্কড় ছোঁড়াগুলো বসে নেই দেখে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। ছেলেগুলোর জ্বালায় বিন্তি অস্থির। দিন দিন ওদের উৎপাত অসহ্য মনে হয়। তাকে দেখলেই ওরা বিশ্রী অংগভংগ করে। চটুল সুরে গান ধরে,—'নাচো, নাচো প্যারী, মনকে মোর'। এক একসময় বিন্তির ইচ্ছে হয়, একজনকে কাছে ডেকে ঠাস করে ওর গালে একটি চড় কষিয়ে দেয়। কিন্তু তাই কি সম্ভব? যা অসভ্য ছেলে। শেষে তার হাত ধরে টানাটানি করলে কেউ কি সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে;

রোদ এখন গলিতে নেই, বাড়ির মাথায়, ছাদের উপর উঠেছে। তাকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে ওই তিনতলা বাড়ির একটি মেয়ে কার্নিশে হাত রেখে দাঁড়াল। মেয়েটিকে চেনে বিন্তি। তারই বয়সী, স্কুলে পড়ে। তবে আলাপ-পরিচয় নেই। রতীশের মত একটি ছেলের সংগে ওকে প্রায়ই সে ঘুরতে দেখেছে। এই তো কদিন আগে ওদের দুজনকে প্রাচী সিনেমা থেকে একসংগে বেরোতে দেখল। নিশ্চয় বাড়ির লোকে এর বিন্দু-বিসর্গ জানে না। কেমন করে জানবে? আজকের বাগানবাড়ির বৃত্তান্ত কি তার মা কোনোদিন টের পাবে?

বাড়ির দরজা হাট করে খোলা। তাই দেখে বিন্তির মনে একটু খটকা লাগল। কিন্তু ঘরে ঢুকে তার প্রায় তাজ্জব হবার জোগাড়। এই অসময়ে বারান্দায় যেন মজলিশ বসেছে। তার মা-বাবা, বড়দা, মেজদা সকলেই উপস্থিত। শুধু ছোড়দা নেই। সে নিশ্চয় কাউকে কিছু না বলেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার। এত বেলাবেলি তার বাবা কিম্বা বড়দা কেমন করে বাড়িতে ফিরল?

মেয়েকে দেখে মনোরমা হেসে বলল,—'ওমা! খবর পেয়ে তুইও চলে এলি? আজ আর থিয়েটার করতে গেলি না?—'

—'কি খবর মা?' বিন্তি ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। একটু চিন্তা করে সে অম্লান বদনে বলল,—'আজ রিহার্সাল হল না। তাই স্কুল ছুটি হতে চলে এলাম।'

—'তা আমি কেমন করে জানব? আমি ভাবছিলাম মিলু বুঝি স্কুলে গিয়ে তোকে খবরটা দিয়েছে।'

—'তুমি হাসালে মা।' মিলন সকৌতুকে বলল। 'এই সামান্য খবরটা জানাতে আমি ওর স্কুলে ছুটব?'

মেয়ের ছটফটানি দেখে মনোরমার হাসি পেল। তার মনটা আজ ভারী খুশি। ঠিক জোয়ারের মুখে ভরা নৌকোর মত। মজা করে সে বলল,—'তোর দাদার চাকরির খবর এসেছে বিন্তি। মস্ত চাকরি। মাস গেলে কত মাইনে জানিস?'

—'কেমন করে জানব? তুমি কি আমাকে কিছু বলেছ?' বিন্তি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল। 'সেই আমেরিকার চাকরিটা নিশ্চয়?'

—'হ্যাঁরে, আজই চিঠি এসেছে।' মনোরমা পরিষ্কার করে জানাল। 'মাস গেলে হাজার ডেলা মাইনে পাবে মিলু।'

—'ডেলা নয় মা। ওটা ডলার।' কিরণ মাকে শুধরে দিল। বলল,—'ও দেশে টাকার তাই নাম। আমাদের এখানের হিসেবে দাদার মাইনে প্রায় আট হাজার টাকার মত দাঁড়াবে।'

—'আ-ট হা-জা-র।' বিন্তির চোখ দুটো বিস্ময়ে প্রায় গোল হয়ে উঠল।

—'আট হাজার টাকা মাইনে শুনে তোমাকে আহ্লাদে আর আটখানা হতে হবে না। ছোট বোনের উৎসাহে কিরণ জল ঢেলে দিল। বলল,—'তেমনি খরচও অনেক। একবার চুল কাটতে হলে কিম্বা সিনেমা দেখতে গেলে কত ডলার বেরিয়ে যায়, তা শুনলে চমকে যাবি।'

বাণীব্রত একপাশে চুপচাপ বসে। ভারী, গম্ভীর মুখ। দেখলেই বোঝা যায় মানুষটা কি যেন চিন্তা করছে। স্বামীর দিকে বাঁর দুই তাকিয়ে মনোরমা বলল,—'তখন থেকে কি ভাবছ বল দিকি? ছেলেটা এত বড় চাকরি পেল। কোথায় তাই নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ, হৈ-চৈ করবে। তা নয়, মন-মরা হয়ে তখন থেকে মুখ বুজে বসে। অথচ টেলিফোনে খবরটা পেয়ে তো আর তর সয়নি তোমার। অফিস থেকে ছুটি নিয়ে সোজা বাড়ি চলে এলে।'

(ক্রমশঃ)

সর্প উৎসব ঝাঁপান

অবনীভূষণ ঘোষ

জীবন্ত সাপ নিয়ে কসরত... ক্রীড়া প্রদর্শনই ঝাঁপান। ঝাঁপান সাপুড়েদের উৎসব। সাপুড়ে কথাটি একটু ব্যাপকতর অর্থেই ব্যবহার করেছি। যারা সাপ ধরে ও বিক্রি করে, যারা সাপ নিয়ে খেলা দেখায়, যারা তন্ত্রমন্ত্রবলে সাপের বিষ নামায়—যাদের সংগেই সরীসৃপ সর্পের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক রয়েছে, তাদের সকলেরই কথা বুঝছি। প্রধানত কৈবর্ত, বাউরি, মাল ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মানুষ ঝাঁপান উৎসব পালন করে থাকে। ইসলাম ও খৃস্ট-ধর্মাবলম্বীদেরও কেউ কেউ ঝাঁপানিয়া হয়। ঝাঁপান বিশেষ করে রাঢ়দেশ ও তার আশপাশ অঞ্চলে পালিত হয়। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের ঝাঁপানের খুব খ্যাতি—অন্তত একদিন ছিল। রাজবাড়ির সামনে শ্রাবণ সংক্রান্তিতে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে রাজার পদ আর নেই। রাজার আনুকূল্য হারিয়ে ঝাঁপানের পূর্বেকার জাঁকজমক আর নেই। এই ঝাঁপান দেখতে গিয়েছিলাম। সন্ধ্যার কিছু আগে ঝাঁপানিয়ার দল আশপাশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসতে লাগলেন রাজ-বাড়ির সামনের মাঠে চতুর্দোলায় চেপে—সদম্ভে প্রতিদ্বন্দ্বীকে আহ্বান জানিয়ে চতুর্দোলার মাথায় রঙিন চাঁদোয়া, আর চারপাশ বিচিত্র পতাকায় সজ্জিত। এ যেন মনসা-মঙ্গলে উল্লিখিত অগণিত শিষ্যসমেত শংকর গারুড়ির সদম্ভ জয়যাত্রা। এক-একটি চতুর্দোলায় বসে আছেন চারপাঁচজন ঝাঁপানিয়া। ঝাঁপানিয়ারা হলেন সর্পওঝা—সর্পবিদ্যার মন্ত্রগুরু, আর তাঁদের চেলারা হয়েছে চতুর্দোলার বাহক। ঝাঁপানিয়াদের আর্থিক অবস্থা সাধারণত তত সচ্ছল না হলেও উৎসব উপলক্ষে তারা সাধ্যমত ভাল জামাকাপড় পরে থাকেন। চতুর্দোলায় থরে থরে সাজান সাপের ঝাঁপি। তাতে রয়েছে বিচিত্র সব সাপ—চন্দ্রধর অর্থাৎ গোখরো-কেউটেই বেশি। ঝাঁপি খুলে কোন ঝাঁপানিয়া একটা গোখরো নিয়ে গলায় পরছেন মালা করে। কোন ঝাঁপানিয়ার হাত জড়িয়ে ধরে আছে একটি কেউটে। বিচিত্র সব গোখরো আর কেউটে সাপ। সর্দার ঝাঁপানিয়া একটি বড় গোখরো বের করে নিলেন দূরের একটি ঝাঁপি থেকে। তার মাজাটা আলগাভাবে বাঁ-হাতে ধরে ডান হাত তার সামনে নাড়িয়ে যতদূর সম্ভব ফণা উঁচু করে উঠতে সাহায্য করছেন তাকে। কোন্ ঝাঁপানিয়া তার সাপকে কত উঁচুতে ফণা মেলে ধরে ওঠাতে পারেন, এই হল প্রতিযোগিতা। বিভিন্ন চতুর্দোলায় এই কসরতই দেখান হচ্ছে। একই চতুর্দোলায় বিভিন্ন ঝাঁপানিয়াও এই খেলা দেখাচ্ছেন। কখনও কখনও এক সর্দার ঝাঁপানিয়া অপর এক সর্দার ঝাঁপানিয়ার সাপ হাতে তুলে নিয়ে খেলা দেখাচ্ছেন। ভাবটা এই, দেখ, কেবল আমার সাপ নয়, তোমার সাপকেও আমি বশ করতে পারি। সংগে সংগে চলেছে গান। পরিচিত করুণ বেহুলা-লখিন্দর কাহিনী। দেবী মনসার মাহাত্ম্য তাতে প্রস্ফুটিত। সর্দার ঝাঁপানিয়া সুর করে একটি পদ গাইছেন। সংগে সংগে তার সংগীরা সে পদের ধুয়া দিচ্ছেন। বিষম-ঢাকও বেজে চলেছে গানের তালে তালে। ধুয়ার কলি—'কলার মান্দাসে ভাসে বেহুলা সুন্দরী গো' অথবা 'বিষ উড়ে উড়ে রে মনসার বরে' অথবা 'বন্দ মা পদ্মাবতী আস্তিক জননী সতী, নাগমাতা সুরূপা নাগিনী গো' ইত্যাদি। গানের পদগুলি ঝাঁপানিয়ারা সাধারণত নিজেরাই বাঁধেন, সুরও তাঁদের নিজেদের। সে সুরে এমন মধুর অথচ করুণ ভাব থাকে যা হৃদয়কে নাড়া দেয়।

কখনও কখনও দুই দল ঝাঁপানিয়া বিভিন্ন দিক থেকে এসে পথে পরস্পরের সম্মুখীন হয়। আহ্বান ও প্রতি-আহ্বান —তারপর দু দলে কৃতিত্বের প্রতিযোগিতা। বিষধর সাপ নিয়ে কসরত দেখানোর প্রতিযোগিতা। কখনও কখনও তাদের মধ্যে প্রশ্নোত্তরের লড়াই চলে। এক-পক্ষ প্রশ্ন করে, অপরপক্ষ উত্তর দেয়। এই প্রশ্নোত্তর কবিতায় হয়। বিষয়বস্তু বেহুলা-লখিন্দরের গল্প, অন্যান্য পৌরাণিক গল্পও। অতীতে অনেক সময় এই কবিতার লড়াই খেউড়ে পরিণত হত। চতুর্দোলার অভাবে গরুর গাড়িতে চেপেও ঝাঁপানিয়া দলকে যেতে দেখা যায়। সর্প-মাল্যভূষিত পদচারী ঝাঁপানিয়া দলেরও অভাব নেই। অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা আর কি। তবে আবহমানকাল থেকে চতুর্দোলায় চেপেই ঝাঁপানিয়া দলের যাওয়াই রীতি। ঝাঁপান কথাটা এসেছে সম্ভবত 'ঝাম্প্যযান' থেকে যার অর্থ পালকি বা চতুর্দোলা।

বিষ্ণুপুরে যেসব সর্পওঝা তথা গুণিনের সংগে আলাপ হল, তাদের অধিকাংশই গৃহস্থ। সাপ ধরা বা সাপের খেলা দেখান তাদের পেশাও নয়। অনেকেই কৃষিজীবী। কেউ কেউ শাঁখারি। জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারলাম, সারা বছর সাপের সংগে তাদের কোন সংস্রব থাকে না। প্রত্যেক গুণিনের কয়েকজন করে চেলা আছে। গুরুর কাছে সর্পবিদ্যা শিখে তার অনুমতি নিয়ে তারা সাপখেলা দেখিয়ে বেড়ায়। তবে বছরভর তারা যেখানে খুশি থাকুক, শ্রাবণ সংক্রান্তিতে গুরু গুণিনের কাছে এসে শ্রদ্ধা জানিয়ে

যেতে হবে তাদের। এটা তাদের অবশ্যকর্তব্য। দেখলাম সে-রকম অনেক শিষ্য এসেছে নিত্য নিত্য ঝাঁপি নিয়ে। গুণিনরা সেদিনই সাপে হাত দেন। বিষধর সাপ নিয়ে নানা কসরত দেখান। এদিক দিয়ে ঝাঁপানকে সর্পবিদ্যায় মন্ত্রগুরু আর তাদের চেলাদের সম্মেলন বলা চলে। যমের দূত সর্পকুলের ওপর গুণিনদের যে রহস্যময় প্রভাব রয়েছে, জনসাধারণের কাছে তা প্রদর্শনের ক্ষেত্রও বটে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোন চেলার বাহুতে কোন বিষধর সর্পকে দংশন করতে দেওয়া হয়; মন্ত্রবলে তার গুণিন তাকে বাঁচিয়ে তোলেন। বছরের অন্য সময় সাপের সঙ্গে গুণিনের কোন সংস্রব না থাকলেও সর্পদষ্ট কোন ব্যক্তির সংবাদ কানে এলেই ছুটে যেতে হবে তাঁদের —মন্ত্রবলে বিষ নামাতে। এ তাঁদের গুরুর আদেশ।

বলা বাহুল্য, ঝাঁপানিয়ারা যেসব সাপ নিয়ে খেলা দেখান, তারা বিষধর হলেও তাদের বিষদাঁত ভাঙা। সাপুড়েদের ভাষায় 'কামান' বা 'পাট-করা' সাপ। এ আমি পরীক্ষা করে দেখেছি। তবে কোন কোন ঝাঁপিতে বিষদাঁতওয়ালা সাপও দেখলাম। সাপুড়েদের ভাষায় 'আন্দা' সাপ। এ ঝাঁপিগুলিকে একটু দূরে আলাদা করে রাখা হয়। এগুলি খেলায় জন্যে নির্দিষ্ট নয়। বিষদাঁত ভাঙা থাকায় বিষধর হলেও সাপগুলি বিষহীন সাপের মতই আচরণ করে। জনসাধারণ কিন্তু একথা ঠিক বোঝে না। তারা মনে করে, গুণিনরা বুঝি কোন রহস্যময় শক্তির অধিকারী।

ঝাঁপানিয়াদের অধিকাংশই নিরক্ষর। পরবের দিনে তাঁদের কেউ কেউ একটু-আধটু উত্তেজক পানীয় পান করে থাকেন। এমত অবস্থায় প্রতিপক্ষকে জব্দ করার উদ্দেশে অতীতে তাঁরা বিসদৃশ সব উপায় গ্রহণ করতেন। যেমন, একটি বিষধর সাপের বিষদাঁত না ভেঙে চিহ্নিত এক ঝাঁপিতে রেখে দিতেন। প্রতিপক্ষ খেলা দেখানর জন্যে সাপ চাইলে চিহ্নিত ঝাঁপিটা তার কাছে এগিয়ে দিতেন। এর ফল কি হত, তা বোধ হয় বলে দিতে হবে না। প্রতিপক্ষ ব্যক্তি কোনরকম সন্দেহ না করে ঝাঁপি থেকে সাপটা বের করে নিতেন—আর তার দংশনে প্রাণত্যাগ করতেন। এ ধরনের বহু ঘটনা জানা যায়। আজকাল সেজন্যে ঝাঁপান দেখাতে হলে আগে থেকে পুলিশের অনুমতি নিতে হয়।

অনেকের আবার অত্যধিক আত্মম্ভরিতা আছে। এই অহংকারের বশে তাঁরা বলেন—গুণিনের বংশে জন্মে...বেদের বেটা হয়ে মা মনসার আটনে কামান সাপ নিয়ে ঝাঁপান দেখাব! তারা আন্দা সাপ নিয়ে ঝাঁপান দেখান। বলা বাহুল্য, দুর্ঘটনাও ঘটে।

ঝাঁপান আজ আমরা যেমন দেখি, প্রচলনের আরম্ভে তেমনটি ছিল না। ঝাঁপান সূচনাতে ছিল নিছক অনুষ্ঠান—রহস্যময় আভিচারিক অনুষ্ঠান। পরবর্তীকালে ধর্মীয় পরবের রূপ পরিগ্রহ করে। অতীতে আরণ্য ও কঙ্করময় রাঢ় অঞ্চলের আদি-অস্ট্রেলীয় গোষ্ঠীর কোন জাতির মধ্যে ঝাঁপান প্রথার প্রথম সূত্রপাত হয় বলে মনে করি। সাপ ছিল এই জাতির টোটেম। আদিম অরণ্যচারী মানুষ নানাভাবে জন্তু-জানোয়ারের সংস্পর্শে এসেছিল। কারও সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছিল আত্মরক্ষার্থে, কারও উপর বা নির্ভর করতে হয়েছিল জীবনধারণার্থে; কারও বা কোন অদ্ভুত সহজাত বৈশিষ্ট্যে সে আকৃষ্ট হয়েছিল। বস্তুত আদিম মানুষের কাছে মনুষ্যেতর প্রাণীরা ইতর বলে প্রতীয়মান হত না। তারা রহস্যময় ক্ষমতার অধিকারী বলেই মনে হত। বিভিন্ন জাতি বিচিত্র প্রাণীকে তাদের নিজ নিজ টোটেম বলে গ্রহণ করেছিল। টোটেম প্রাণী যে জাতির টোটেম তার সঙ্গে রহস্যময় ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত, সেই জাতির পরিচায়ক চিহ্ন...অভিজ্ঞান—সেই জাতির আদিপুরুষও বটে।

আদিম মানসিকতায় জলের সঙ্গে সাপের অনুষঙ্গ স্থাপিত হয়েছিল নানা কারণে। সাপের পার্শ্বিক তরঙ্গায়িত গতি প্রবহমান জলধারার সমতুল্য। নদী, পুকুর, হ্রদ ও প্রস্রবণ—সাপের বিচরণ স্থান। বর্ষণের সময় আকাশে যে বিদ্যুৎ বিচ্ছুরিত হয়, তা অনেকাংশে সর্পাকৃতি। সাপের তৎপরতা সর্বাপেক্ষা বেশি বর্ষাকালেই। তাই আদিম মানুষ ভেবে নিয়েছিল, সাপ বুঝি বারিবর্ষণের নিয়ামক। এই সূত্রেই ঝাঁপান বর্ষা আহবানের আভিচারিক অনুষ্ঠান বলে মনে হয়। বাংলার ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে জ্যৈষ্ঠ মাসের দশহরা থেকে আরম্ভ করে ভাদ্র মাসের সংক্রান্তি—কদাচিৎ আশ্বিন সংক্রান্তিতেও ঝাঁপান অনুষ্ঠিত হয়। এ সময়টা বর্ষারম্ভ বা বর্ষাকাল। যে সর্প-টোটেম জাতির মধ্যে ঝাঁপানের সূচনা হয়, তারা ছিল যাযাবর। পরবর্তীকালে তারা কৃষিকার্যে লিপ্ত হয়। কৃষিকার্যে জলের প্রয়োজন; তাই আভিচারিক অনুষ্ঠান ঝাঁপান। রাঢ়দেশে কৃষিকার্যের পক্ষে বর্ষা তো একান্তভাবেই আবশ্যক।

আমরা আরও অনুমান করে নিতে পারি, কালক্রমে ধর্মোন্মেষে যে সাপ ছিল টোটেম, তা সর্পিণীরূপে পূজা পেল এই মাতৃতন্ত্রী জাতির কাছে। আভিচারিক অনুষ্ঠান ঝাঁপান ধর্মীয় পরবের রূপ নিল। আরও পরে এই সর্পিণীকে দেখি আমরা দেবী জাঙ্গুলীরূপে। জাঙ্গুলী অর্থাৎ জঙ্গলের অধিবাসিনী। জাঙ্গুলী এই জাতির নিজস্ব সৃষ্টি হতে পারে, অন্য কোন আরণ্য জাতির কাছ থেকে গৃহীতও হতে পারে। মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রসারে জাঙ্গুলী ঐ মতের অন্যতম দেবীরূপে পরিচিত হলেন। আরও পরবর্তীকালে দক্ষিণ ভারত থেকে আগত দ্রাবিড়গোষ্ঠীর কোন কোন জাতির সর্পদেবী বলে গণ্য মনচাম্মার (বা মনে মনচাম্মার) প্রভাবে জাঙ্গুলী মনসা নামে পরিচিত হন। এর আরও পরে 'কশ্যপেন মনসা সৃষ্টা' এই ব্যাখ্যায় মনসা নামকে সুসংস্কৃত করে নেওয়া হয়। আজ সর্পাভরণভূষিতা যে মনসাদেবী পূজিত হন, আর সেই উপলক্ষে যে ঝাঁপান অনুষ্ঠিত হয়, তা সর্পপূজার দুটি ধারার ফল, আদি-অস্ট্রেলীয় ও দ্রাবিড়—এই দুই স্বতন্ত্র সর্পপূজার ধারার মিলিত রূপ। অবশ্য উত্তর-পশ্চিম ভারতে পরাক্রমশালী মানুষ নাগজাতির প্রভাবে যে অষ্টনাগ পূজার প্রচলন হয়, কালক্রমে তাও মনসা পূজায় অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। মনসার মস্তকে অথবা ঘটে বা পটে তাই অষ্টনাগের উপস্থিতি।

আমাদের দেশের ঝাঁপানের কথায় উত্তর আমেরিকার রেডইণ্ডিয়ানের অন্তর্ভুক্ত হোপি জাতির বহুল-প্রচারিত সর্পনৃত্যের কথা স্মরণ হয়। ঐ মহাদেশে চক্রধর (কোবরা) সাপ নেই; তবে ফণাহীন মারাত্মক বিষধর ঝুমঝুমি সাপ আছে, তা সেখানকার মানুষের কাছে সবচেয়ে ভীতিপ্রদ। জ্যান্ত ঝুমঝুমি সাপের মাথা মুখে চেপে ধরে হোপি পুরোহিতরা নৃত্য করে—অগাস্ট মাসের শেষাশেষি। বলা বাহুল্য, এই ঝুমঝুমি সাপের বিষদাঁত লোকচক্ষুর অন্তরালে আগেই ভেঙে দেওয়া হয়। হোপিদের এই সর্পনৃত্যও বর্ষা আহবানের অনুষ্ঠান।

পুত্রার্থে
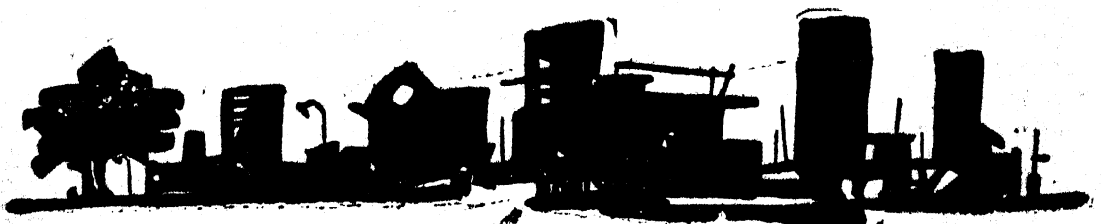
শীলা রায়

সরকারী হাসপাতালের ছাপ মারা ছোট্ট চিরকুটটা হাতে করে পাথরের প্রতিমার মতই স্তব্ধ হয়ে বসে আছে সায়ন্তনী, সকাল থেকে কতবার যে পড়েছে, আবারো পড়তে বসেছে নিস্তব্ধ নিশুতি রাত্রের এই নিরালা নির্জন অবকাশটুকুতে। পড়ে পড়ে পড়া শেষ যেন আর হয় না। প্রতিটি অক্ষর ওর কণ্ঠস্থ হয়ে গেছে তবুও যতবার পড়ছে নতুন করে মন ভরে উঠছে। যত কিছু প্রতীক্ষা, এতদিনের যত চাওয়া-পাওয়া যা কিছু কামনা বাসনা প্রার্থনার সব কিছুর যেন নিবৃত্তি হয়েছে ঐ ছোট্ট একরত্তি কাগজটার মধ্যে। ওরই মধ্যে খুঁজে পেয়েছে সায়ন্তনী জীবনের অর্থ, ফেলেআসা জীবনের যা কিছু গ্লানি মুছে ফেলে নতুন করে জীবন শুরু করার আশ্বাস।

গত ক'দিন ধরেই সন্দেহ করছিল, কিন্তু বিশ্বাস তো দূরের কথা আশা করার পর্যন্ত সাহস হয়নি ওর পাছে আশাভঙ্গের মনস্তাপ তার অভ্যস্ত নিরাশার বেদনাকেও অতিক্রম করে যায়। তবুও কি জানি কি মনে করে আজ সকাল হতে না হতেই বেরিয়ে পড়েছিল সায়ন্তনী স্থানীয় হাসপাতালের উদ্দেশ্যে আর তারই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ এই কাগজ। রিপোর্টটা হাতে নিয়েও সংশয় ওর মেটেনি, বিশ্বাসও হয়নি এতবড় অভাবিত সৌভাগ্যে, স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়েছিল সায়ন্তনী ডাঃ মিত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে। শেষ পর্যন্ত সত্যই কি বিধাতার আসন টললো তার আকুল নিবেদনে না কি ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্নই দেখছে যে বাতুলের মত। ঘুম ভাঙালে তার এ অসম্ভব সুখস্বপ্নও ভেঙে খান খান হয়ে যাবে সুকঠিন বাস্তবের রূঢ় আঘাতে?

ওর বিভ্রান্ত ভাব দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন ডাঃ মিত্র ভুল বুঝেছিলেন ওকে। সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, 'কনগ্র্যাচুলেসান মিসেস মুখার্জী, আপনি সন্তানের মা হতে চলেছেন, ভাবনার কোন কারণ নেই। এই তো সন্তানধারণের উপযুক্ত সময়। আনন্দ করুন, খুশী হয়ে যে আসছে তার অভ্যর্থনার জন্যে উদ্যোগ করুন'...ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এসেছিল সায়ন্তনী। বেরিয়ে এসেছিল বটে কিন্তু বাড়ী ফেরেনি। পার্কে বসে নিজেকে উপলব্ধি করতে চেয়েছিল নিজের এই নতুন সৌভাগ্যকে। জন্মমৃত্যু জীবনে অতি সাধারণ এবং স্বাভাবিক ঘটনা। প্রতি নিয়তই ঘটছে এবং ঘটছে অতি বিশেষত্ববর্জিতভাবেই। হাসপাতালের বড় বড় জন্ম নিয়ন্ত্রণ বিভাগগুলোই তার প্রমাণ। প্রতি বছরে সরকারী বাজেটের একটা মোটা অঙ্ক খরচ হয় শুধুমাত্র জন্মের হার কমানোর উদ্দেশ্যেই অথচ ব্যক্তিবিশেষের জীবনকে কেন্দ্র করে এই অতি তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা কতই না গুরুত্ব নিয়ে দেখা দেয়। একথা সায়ন্তনীর চেয়ে ভালো করে কেউ জানেনি কেউ বোঝেনি। কিন্তু দুঃখের অগ্নিপরীক্ষায় অবশেষে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে আসতে পেরেছে সায়ন্তনী। যারা একদিন বিনা অপরাধে এতবড় অপবাদের লাঞ্ছনা তার মাথায় তুলে দিতে দ্বিধা করেনি আজ না হোক কাল না হোক তার পরের দিন, অদূর ভবিষ্যতে কোন না কোনদিন তারা জানবে অরিন্দমও শুনবে সায়ন্তনী বিফলা অনুর্বর পতিতভূমি নয়, তার মধ্যেও আছে সৃষ্টির মহৎ সম্ভাবনা। বিশ্বের কাছে যে শুধু ঋণী রয়ে যায়নি সেও পারে সেও পেরেছে পৃথিবীকে কিছু দিতে, সে যে এসেছিল তারই কিছু জীবন্ত নিদর্শন রেখে যেতে পিছনে।

কাগজটা বহু যত্নে বহু সন্তর্পণে টেবিলের টানার মধ্যে রেখে এবারে সায়ন্তনী এসে দাঁড়ালো রাস্তার ধারের জানলাটার কাছে। প্রাপ্তির আনন্দে হৃদয় আজ পরিপূর্ণ ওর, এত সহজে আজ আর ঘুম আসবে না ওর চোখে। বন্ধ জানলাটা খুলে দিতেই একটা দমকা ঠাণ্ডা বাতাস এসে [illegible] অভিনন্দন জানিয়ে গেল ওকে। দেহ-মন জুড়িয়ে গেল।

জন্ত বিনিদ্র রাত্রেই তো এর আগে ওর কেটেছে ছটফট করে এমনই জানলার ধারে দাঁড়িয়ে মাথা রেখে। চোখের জলের মধ্য দিয়েই শেষ পর্যন্ত অবসান ঘটেছে তাদের। কই এর আগে তো এমন করে কোনদিন শীতল বাতাস এসে তার স্নেহস্পর্শ দিয়ে মুছে দেয়নি ওর দেহের ক্লান্তি মনের বিক্ষোভ? তবে কি আকাশ-বাতাস এরাও টের পেয়েছে এ গোপন বার্তা যা নাকি সে ছাড়া আজও জানে না দ্বিতীয় প্রাণী। আজও জানে না কিন্তু একদিন সবাই জানবে, সবাই শুনবে, অরিন্দমও জানবে, তখন? তখনও কি অনুতপ্ত হবে না অরিন্দম নিজের কৃতকর্মের জন্য? মুহূর্তের জন্যেও কি মনে হবে না নিতান্ত অকারণেই অবিচার করেছে ও সায়ন্তানীর প্রতি, ওরই ঔরসজাত সন্তানের জননীর প্রতি।

অরিন্দমের কথা মনে হতেই অভিমানে ওর দুচোখ জলে ভরে এল। এই একটা নামের মধ্যেই এত মোহ এত আকর্ষণ এত জ্বালা! কত কাছের মানুষটা আজ কত সুদূর! আজকের এই খবরে সব চাইতে গৌরবের কথা কার—সায়ন্তানীর চাইতে আর বেশী কে জানে সেকথা, মাত্র কটা দিনেরই বা ব্যবধান, আজ আর এতে তার অংশমাত্র নেই। যে পরিপূর্ণতার আনন্দ আজ সায়ন্তানীর হৃদয়কে প্লাবিত করে দিয়ে সহস্রধারে উচ্ছ্বলিত হয়ে উঠতে চাইছে, তার অংশ নিতে আজ আর কেউ নেই তার পাশে। এতবড় জগতে একা, একেবারেই একা সে। অথচ এমন তো হবার কথা ছিল না। সবই তো দিয়েছিলেন ভগবান তাকে, অমন সর্বগুণসমন্বিত স্বামী কজন মেয়ে পায় জীবনে? সে পেয়েছিল, না চাইতেই পেয়েছিল. তবু সব দিয়েও কেন যে সব কেড়ে নিলেন ভগবান—সে কথা তিনিই জানেন! এমনি একান্তভাবে যা চেয়েছিল সায়ন্তানী নারীজীবনের চরম এবং পরম সার্থকতা যে মাতৃত্ব সেই মাতৃত্বের মত অমূল্য সম্পদও অবশেষে তিনি দিলেন তাকে কিন্ত বিনিময়ে যে মূল্য তাকে দিতে হোল নারীজীবনে তাও বড় কম অকিঞ্চিৎকর নয়। তাকে নিঃস্ব সর্বহারা করে তবেই কৃপা হোল ভাগ্যলক্ষ্মীর তার প্রতি। তবেই তাঁর বরহস্তের অকৃপণ আশীর্বাদ অজস্রধারে বর্ষিত হোল তার হতভাগা মস্তকে।

হতভাগ্য! হ্যাঁ হতভাগাই বটে। হতভাগ্য ছাড়া আর কিই বা বলা যায় তাকে? বিদ্রূপাত্মক তিক্ত হাসির একটা তির্যক রেখা খেলে গেল সায়ন্তানীর ওষ্ঠপ্রান্তে। নিজের দুরদৃষ্টের প্রতিই এই বিদ্রূপ। জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত এই একটা বিশেষণই প্রযুক্ত হতে শুনেছে যে নিজের সম্বন্ধে অসংখ্য বার, কতবার যে শুনেছে একমাত্র শুভানুধ্যায়ী আত্মীয়া মাতামহী স্বর্ণময়ীর মুখের সখেদ আক্ষেপোক্তি 'তোর মত হতভাগীর কপালে এমনটা হবে না তো কার বরাতে হবে বল তো।' তার আর আদিঅন্ত নেই, আর দেখেছে আত্মীয় বন্ধু প্রতিবেশী পরিচিত অর্ধ পরিচিত এমন কি সমবয়স্ক বান্ধবীদেরও চোখের সহানুভূতিমাখা দৃষ্টিতে, তারও ঐ একই অর্থ 'আহা বেচারী'। একটু বড় হবার পর এর কারণও অজ্ঞাত ছিল না তার। একে একে সমস্তই শুনেছিল ও, জেনেছিল বিধাতা তার জীবনটাকে নিয়ে কি নিষ্ঠুর প্রহসনই না সৃষ্টি করেছেন তার পৃথিবীতে আসার আগে থাকতেই। নবম গর্ভের সন্তান সায়ন্তানী, সাত মেয়ের পর যখন বহু যাগ-যজ্ঞ ক্রিয়াকলাপ করে একটি পুত্র সন্তান এল কোলে তখন যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছিলেন সায়ন্তানীর পিতা সুবিমলবাবু ও তাঁর স্ত্রী সুকৃতি দেবী। কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর অনুশাসনে এ সুখ স্থায়ী হতে পেল না তাঁদের অদৃষ্টে, মাত্র পাঁচ বছর বয়সে মারা গেল ছেলেটি। এতদিনের এত সাধনার ধন একমাত্র পুত্র সন্তানের এই অকাল মৃত্যুতে যে আঘাত পেলেন সুবিমলবাবু সে আঘাত মর্মান্তিক হোল তাঁর হৃদযন্ত্রের পক্ষে। মাত্র ক'মাসের ব্যবধানে তিনিও পুত্রেরই অনুগমন করলেন সায়ন্তানী তখন মাতৃগর্ভে সাত মাসের। উপর্যুপরি এতবড় দুটো শোক সহ্য করা কষ্টসাধ্য হলেও সুকৃতি দেবীর ভঙ্গুর স্বাস্থ্যের পক্ষে, এবারেও যদি ছেলে হয় এই একটি মাত্র আশাতেই যেন প্রাণটা কোনক্রমে দেহপিঞ্জরে আটকে ছিল সুকৃতি দেবীর, তাই সূতিকা-গৃহে যে মুহূর্তে তিনি ধাত্রীমুখে অবগত হলেন যে নবজাতা সন্তান তাঁর মেয়ে—ছেলে নয়, সেই মুহূর্তেই জীবনের আর কোন অর্থই রইলো না তাঁর কাছে এবং যে আত্মা তাঁর শুধুমাত্র একটা আশার ওপরেই দেহ ধারণ করেছিল আশা ভেঙ্গে যাওয়া মাত্রই সেও এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করে চলে গেল সেখানে যেখানে নাকি তাঁর স্বামীপুত্র তাঁরই জন্য প্রতীক্ষা করে আছেন।

আর সায়ন্তানী—বিনা অপরাধে বিধির নির্বন্ধে জন্মমুহূর্তেই সে হোল মাতৃ-পিতৃহীন অনাথ শিশু, জগতের দুর্ভাগ্যতম জীব। ছেলেবেলাটা কেটেছিল সায়ন্তানীর মাতামহী স্বর্ণময়ীর সযত্ন তত্ত্বাবধানে। যদিচ দৌহিত্রীর ওপর স্নেহের অভাব ছিল না তাঁর তবুও একথা তিনি কিছুতেই ভুলতে পারেন নি যে এই দুর্ভাগা মেয়েটাই তাঁর আপন সন্তানের মৃত্যুর কারণ না হোক উপলক্ষ্য তো বটেই। সামান্য কোন কারণ ঘটলেই তিনি বিলাপ করে বলতেন, 'কি লক্ষ্মীছাড়ী মেয়ে রে বাবা। জন্মের আগেই বাপকে নিলে, এসেই মাকে খেলে, এবারে আমার মরণ হলে ওর হাড় জুড়োয়।'

এমনই আহা ছিঃ ছিঃ-এর মধ্য দিয়েই কৈশোরটা কেটেছিল সায়ন্তানীর। অবশ্য তার জন্য দুঃখও বিশেষ ছিল না তার, অভাববোধ তো নয়ই। সে যে বাংলাদেশের মেয়ে—সাত মেয়ের পরে তার জন্ম, তার জন্মমুহূর্তে যে শাঁখ তো বাজেইনি উঠেছিল আর্ত ক্রন্দনরোল, এসবের জন্যে কোনদিন ধিক্কারও জাগেনি ওর মনে। সর্বকিছু বিরূপতা অগ্রাহ্য করে নিজের প্রয়োজনে যেন বনফুলের মতই বিকশিত হয়ে উঠেছিল এই নির্লজ্জ বেপরোয়া মেয়েটা। যৌবনে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে রূপ তার বাঁধভাঙা বন্যার জলের মত দেহের কূলকূল ছাপিয়ে উছলে পড়েছিল। বিধাতা যেমন তার অদৃষ্টে একদিকে বিড়ম্বনা লিখেছিলেন, তেমনই তার সে ক্ষতি পূরণ করতে এই একটা বিষয়ে কোন কার্পণ্য করেননি। সেই অসামান্য রূপের জোরেই এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে এলাহাবাদের স্বনামখ্যাত বিত্তবান ব্যবসায়ী স্বর্গত সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জীর একমাত্র সুযোগ্য বংশধর অরিন্দমের স্ত্রী হবার সৌভাগ্যও তার ঘটেছিল। অরিন্দমের বিধবা জননী অনুসূয়া দেবী কোন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের বিয়ে উপলক্ষে কলকাতায় এসে পুজোবাড়ীতে সায়ন্তানীকে দেখেই মুগ্ধ হলেন। দিন কয় ঘন ঘন ঘটকের আনাগোনা চললো এবাড়ীতে, তারপর এক শুভলগ্নে চার হাত এক করে ছেলে বৌ নিয়ে বাড়ী ফিরলেন অনুসূয়া দেবী। এই একবার মাত্রই স্বর্ণময়ীর মুখে আক্ষেপের পরিবর্তে আনন্দের বিকাশ দেখেছিল সায়ন্তানী জীবনে। অশেষ স্নেহের পাত্রীর এই অভাবিত সৌভাগ্যে আনন্দোদ্ভাসিত মুখে বলতে শুনেছিল তাঁকে 'এমন ভাগ্য ওর হবে না তো কার হবে? যেমন পার্বতীর মত রূপ দিয়ে পাঠিয়েছেন ভগবান তেমনই জুটি মেলাতে মহাদেবের মত স্বামীভাগ্য দিতেও ভোলেন নি। এসবই তাঁর লীলা, তা নাহলে আমার না আছে সহায় না আছে সম্বল, আমার সাধ্য কি এমনটা যোগাড় করি।' প্রণতা দৌহিত্রীকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে চোখের জলের মধ্য দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন 'রাজরাণী হও দিদি, স্বামী সোহাগিনী হও।'

বিয়ের পরের প্রথম পাঁচটা বছর আনন্দেই কেটেছিল সায়ন্তানীর। শুধু আনন্দে বললে কিছুই বলা হয় না, সুখের অমরাবতীতে পেঁাচেছিল সে। জীবনে অভাব-অভিযোগ অতৃপ্তি কিছুই ছিল না। ছিল শুধুই পরিপূর্ণতা আর স্বাধীনতা।

স্বামীর প্রতিটি তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রয়োজনে নিজেকে অপরিহার্য করে তুলেছিল সায়ন্তানী, পরিবর্তে তাঁর স্নেহ অর্জন করতে পেরেছে বলে বিশ্বাসও করেছিল। সৎ চরিত্রবান পত্নীবৎসল স্বামী তার। ধনী সন্তান হয়েও কোন প্রকার কদভ্যাস বা নেশা কিছুই ছিল না অরিন্দমের। অরিন্দমের বিধবা জননী অনুসূয়া দেবীও ছিলেন অত্যন্ত নিরীহ নির্বিরোধ মানুষ, স্বামীর মৃত্যুর পর থেকেই সংসার সম্বন্ধে বৈরাগ্য এসেছিল তাঁর। ছেলের বিয়ের পর পুত্রবধূর হাতে সংসারের সর্বময় কর্তৃত্ব ছেড়ে দিয়ে নিজের ঠাকুরঘরটিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সংসারের মধ্যে থেকেও তিনি ছিলেন সন্ন্যাসিনী। সায়ন্তানী যে সংসারের দুরূহ গুরুভার অনায়াসে বহন করতে পেরেছে, শুধু এইটুকুতেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন, অন্য কোন প্রত্যাশা তাঁর ছিল না। কাজেই সুখ স্বাধীনতা অর্থ

সম্পদ যা কিছু আশা করে যে কোন মেয়ে বিবাহিত জীবনে তা না চাইতেই অপর্যাপ্ত পরিমাণে পেয়েছিল সারন্তনী। এ প্রাচুর্যেও যে কোনদিন টান পড়তে পারে, সৌভাগ্যের ভরা নদীতেও আসতে পারে ভাটার সঙ্কীর্ণতা, একথা সেদিন ঘূণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি। কিন্তু সারন্তানী ভাবতে না পারলে কি হবে যা অবশ্যম্ভাবী তাকে রোধ করে এমন সাধ্য কার। যে অদৃষ্ট দেবতা এতদিন ভুলেছিলেন সারন্তানীকে তিনি হঠাৎ দ্বিগুণ উৎসাহে তাঁর এই ত্রুটি শোধে নিতে উঠে-পড়ে লাগলেন।

পাঁচ বছর কেটে গেল সারন্তনী মা হোল না। অভাববোধ ছিলই, বর্তমান যেতে লাগলো অসহিষ্ণুতা তার জায়গা নিতে লাগলো। প্রথমে ইঙ্গিতে পরে প্রকাশ্যেই আক্ষেপ প্রকাশ করতে লাগলো অরিন্দম সারন্তানীর কাছে। এমনটা তো হওয়া উচিত নয়। তার সম-সাময়িক বিবাহিত বন্ধুরা ইতিমধ্যে কেউ একটি কেউ বা একাধিক সন্তানের পিতা, শুধু তার বেলাতেই এর ব্যতিক্রম অথচ অরিন্দম তার পূর্বপুরুষদের একমাত্র বংশধর, তার সন্তান না হলে তার পিতৃবংশ লুপ্ত হবে। তাছাড়া এত যে বিষয়সম্পত্তি সেই বা ভোগ করবে কে, ইত্যাদি প্রত্যহই শুনতে শুনতে সারন্তানীর জীবনও ক্রমশঃ দুর্বহ হয়ে উঠতে লাগলো। অথচ সেই বা কি করতে পারে. সেই কি মা হতে চায় না? কিন্তু জন্ম-মৃত্যুর দেবতা যিনি তিনি নির্বিকার। অরিন্দমের বাধা যে

সায়ন্তানী বোঝে না তা নয় কিন্তু তার নিবৃত্তি তো ওর হাতে নয়। অরিন্দমকে ভালবেসে ও নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করতে পারে, ওকে সুখী করতে জীবন বিসর্জনও হয়তো দিতে পারে একটু চেষ্টা করলেই। কিন্তু হাজার চেষ্টা করলেও একটা নতুন প্রাণ আনতে পারে না পৃথিবীতে, পারে না নতুন জীবন সৃষ্টি করতে যতক্ষণ না বিধাতার দয়া হয় তার ওপর।

কিন্তু অরিন্দম একথা বুঝতে চায় না। বৈষয়িক ব্যাপারে যার এত বুদ্ধি এত ধৈর্য এত সহিষ্ণুতা এত অন্তর্দৃষ্টি, এই সামান্য বিষয়ে কেন যে সে শিশুর মত অবুঝ একথাটাই বুঝিতে আসে না সায়ন্তানীর। আর স্বামী হয়েও এতদিন এত অন্তরঙ্গভাবে তার সান্নিধ্যে থেকেও এতটুকু সহানুভূতি যদি অরিন্দমের কাছ থেকে আশা করতে না পারে তবে নির্ভর করার মত কিই বা থেকে যাবে সায়ন্তানীর জীবনে? একদিন বুঝি পরিহাসছলে বলেও ছিল সায়ন্তানী অরিন্দমের কাছে একথা। বলেছিল 'শাস্ত্রে আছে পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা, তোমার দেখছি তাই হয়েছে। স্ত্রীর উপযোগিতা তোমার কাছে শুধু সন্তানের জন্ম দেবার জন্য, আর কোন মূল্যই যেন তার নেই...'নেই-ই তো' একটুও লজ্জিত না হয়ে কাষ্ঠহাসি হেসে উত্তর দিয়েছিল অরিন্দম। 'সন্তানের জন্যই বংশরক্ষার জন্যই বিশেষ করে বিয়ে করা। নারীর অন্য প্রয়োজন যে নেই জীবনে একথা বলি না। কিন্তু সে প্রয়োজন তো মেটাতে পারে যে কোন মেয়েই, এমন কি ভাড়াকরা মেয়ে হলেও আটকাবে না। অগ্নি আর শালগ্রাম শিলা সাক্ষী রেখে সাতপাক ঘুরে এত কষ্ট করে বিয়ে করার দরকার কি?'

বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তাকিয়েছিল সায়ন্তানী অরিন্দমের দিকে। ঐ স্থূল লোকটাই ওর স্বামী, ওর দেহ মনের প্রভু, ওর নারী জীবনের পরম আরাধ্য দেবতা! একথা ভাবতে সর্বাঙ্গ ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় শিউরে শিউরে উঠেছিল ওর, অথচ আশ্চর্য এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত মানুষটা এমন স্বার্থপর ছিল না বা হয়তো ছিলই—সায়ন্তানীরই ভুল সেই বুঝতে পারেনি। কল্পনায় অনেক উঁচুতে ওর আসন গড়ে ওকে দেবত্ব আরোপ করতে গিয়েছিল। এ স্বর্গ থেকে পতন তারই প্রায়শ্চিত্ত।

এরপরে শুরু হয়েছিল সায়ন্তানীর নারীত্বের অগ্নিপরীক্ষা। অরিন্দমই করেছিল প্রস্তাবটা। হঠাৎ একদিন বলেছিল, 'চল হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে তোমায় বিশেষজ্ঞ দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে আনি।'

'কেন?' আন্তরিক বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করেছিল সায়ন্তানী।

'কেন ছেলেপুলে হচ্ছে না, কি ত্রুটি আছে শরীরে এই সব পরীক্ষা করে নিই। আজকাল তো ডাক্তারীশাস্ত্রে কত কি সব উপায় আবিষ্কার হয়েছে। দেখাই যাক না যদি কিছু সুবিধে হয়।' উত্তর দিয়েছিল অরিন্দম।

'আমি কক্ষনো যাব না' রুদ্ধ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছিল সায়ন্তানী। নারীত্বের এই অবমাননায় ক্ষোভে অভিমানে দুচোখ জলে ভরে এসেছিল সায়ন্তানীর।

অরিন্দম নিজেও বুঝতে পেরেছিল সায়ন্তানীর সমস্যা। কাছে সরে এসে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বড় স্নিগ্ধ কোমল কণ্ঠে জবাব দিয়েছিল, 'তোমার ব্যথা আমি যে বুঝি না তা নয় সানু। কিন্তু আমিই বা কি করি বল। আমিও যে নিরুপায়। আমার যদি একটা ভাইও থাকতো বংশ রাখবার ভার তার ওপর দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যেতুম, তোমায় অযথা পীড়ন করতুম না। কিন্তু এমন সব দায়-দায়িত্বই যে আমাদের দুজনের, আমার জন্যে এত করছো আর এটুকু কষ্ট আরো করতে অর্থহীন জীবন তার। লজ্জায় অপমানে ধিক্কারে বসুমতীর গহ্বরে প্রবেশের কামনা করেছে সায়ন্তানী স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে আত্মসম্মানবোধ বিসর্জন দিয়েছিল। পরের দুটো বছরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। ডাক্তারের পর ডাক্তার বদল হয়েছে। ছোট অপারেশান বড় অপারেশান কিছুই বাদ যায়নি। অকাতরে অর্থ ব্যয় করেছে অরিন্দম কিন্তু ফল হয়নি। স্বামী শাশুড়ী ও শ্বশুরবাড়ী সম্বন্ধীয় আত্মীয়-বন্ধুদের চোখের দৃষ্টি বদলে গেছে। সে চোখে দেখেছে সায়ন্তানী অনুকম্পা, দেখেছে অনুযোগ। সকলের দৃষ্টিতেই সেই একই কথা লেখা যার মধ্যে মাতৃত্ব নেই, পতিত অনুর্বর জমির মতই নিস্ফল অর্থহীন জীবন

তার। লজ্জায় অপমানে ধিক্কারে বসুমতীর গহ্বরে প্রবেশের কামনা করেছে সায়ন্তানী মনে মনে কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে তার সে প্রার্থনাও পূর্ণ হয় নি। মা বসুমতীরও আসন টলে নি। নিরুপায় সায়ন্তানী সব অবহেলা সব অনুযোগ সহ্য করেছে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর'

বাঙালীর মেয়ে মুখ বুজে নিজের দুর্ভাগ্যকে মেনে নিতেই শিখেছে, প্রতিবাদ করতে শেখে নি, তবুও মানুষ মানুষই। তার ধৈর্যও অপরিমেয় নয়। সহিষ্ণুতার প্রতীক ত্রেতাযুগের যে সীতাদেবী তাঁরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল অন্তিম মুহূর্তে। সায়ন্তানী তো দোষে-গুণে জড়ানো সাধারণ পাঁচজনের একজন মাত্র। সেদিন সকালে স্নানঘর থেকে বেরিয়ে দালানে পা দিয়েই পাশে অনুসূয়া দেবীর ঘর থেকে তাঁর ও অপর কোন মহিলার মৃদু কণ্ঠের আলাপ-আলোচনার মধ্যে একাধিকবার নিজের নামটাই শুনতে পেয়ে কৌতূহলপরবশ হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল দরজার পাশে।

অপারাকে উদ্দেশ্য করে বলছিলেন তখন অনুসূয়া দেবী, 'তুমি তো বহু দিনের লোক বাছা, সবই জান, সবই বোঝ। এ তো আর আনন্দের কথা নয় কেন্ তাই এখন গোপনেই রাখতে চাই। আর বিশেষ করে সেই জন্যে তোমাকেই ডেকে পাঠিয়েছি এত লোক থাকতে। রূপে-গুণে অমন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপ্রতিমা বৌমা আমার কত সাধ করেই তো ঘরে এনেছিলাম। তা বিধি বাম। তা না হলে আজ এমনটা হবে কেন। আট বছর হয়ে গেল এত দিনে তো ঘর ভরে যাবার কথা, তা না হয়ে কিনা না ছেলে, না মেয়ে কোনো বাচ্চাই এল না কোলে। ডাক্তার ওষুধ, ঠাকুরদেবতার কাছে মানত ধর্ণা দেওয়া মানুষের যা কিছু সাধ্যের মধ্যে, তার কিছুই বাদ রাখি নি বাছা কিন্তু কিছুতেই কিছু না। অথচ আমারও তো ঐ একটিই ছেলে। নিজের সাধ-আহ্লাদের কথা ছেড়েই দিলাম কিন্তু পূর্বপুরুষদের প্রতি কর্তব্য আছে। ছেলে না হলে পিতৃলোকে জল পাবে না, চোদ্দপুরুষ নরকস্থ হবে। তা কি করে হতে দিই বল তো বাছা। কর্তব্য আছে তো তাঁদের প্রতি। আর এত যে টাকাকড়ি, বিষয়-সম্পত্তি তাঁরা রেখে গেছেন, তাই বা ভোগ করবে কে? রক্ত জলকরা বিষয় কোথাকার কে না কে সাতভূতে এসে লুটে নেবে, তাতে স্বর্গে গিয়েও তাঁদের আত্মার সদ্গতি হবে না। তাই অনেক ভেবে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে তবেই তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি। তুমি এতদিনকার লোক, যদি দেখেশুনে একটি ভালো মেয়ে যোগাড় করে দিতে পার। টাকাকড়ি রূপ কিছুই চাই না, শুধু ভালো ভদ্রবংশের গরীব-গৃহস্থের মেয়ে হবে, শরীর স্বাস্থ্য ভালো হবে। এতটাই সুশ্রী হবে যে, কাছে যেতে অশ্রদ্ধা না হয় ব্যস, শুধু এইটুকু চাই। আছে নাকি সন্ধানে এমন কোন মেয়ে? যদি গোপনে একটু খবর নিয়ে আমায় জানাতে পার, বড় ভালো হয়। কথাটা এখন থেকে লোক জানাজানি করতে চাই না। সম্মানজনক তো নয় কড় একটা, বড়বৌমার কানে গেলে তিনিও মনে আঘাত পাবেন...'

'আপনার ছেলের মত আছে?'

'ছেলের আর আলাদা মতামত কি। আমার মতেই ওর মত। ও তো আর অবুঝও নয়, আর ছেলেমানুষটিও নেই যে, বুঝবে না কত বড় দায়িত্ব ওর মাথার ওপর। আগে কর্তব্য তবে সব। তাই স্থির করেছি সব ব্যবস্থা পাকা হলে তবে ওকে জানাবো।'

'তা আপনার বড়বৌমাও কি বিয়ের পর এখানেই থাকবেন?'

'নিশ্চয়ই,' কণ্ঠে অস্বাভাবিক জোর দিয়ে উত্তর দিয়েছিলেন অনুসূয়া দেবী! হয়তো বা নিজের বিবেকের কাছেই জবাবদিহি করতে চেয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, 'সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই বাছা, দায়ে পড়ে একটা অপকর্ম করতে হচ্ছে বলেই এমন অধর্ম তো করতে পারি না, তাহলে পরকালে জবাব দেব কি। বৌমা আমার

সোনার প্রতিমা। এ প্রতিমা একবার ঘরে এনে এভাবে বিসর্জন দিলে আমার গৃহলক্ষ্মীও বিমুখ হবেন। বাছার মুখখানি মনে হলেই আমার আর এ পাপকর্ম করতে প্রবৃত্তি হয় না বাছা। যেমন লক্ষ্মীশ্রী তেমনই কি স্বামীঅন্ত প্রাণ। কিন্তু কি করি। যে কপাল নিয়ে এসেছিল আর আমারও হাত-পা বাঁধা।' তাই শুধু বংশ রাখার জন্যই যাহোক একটা বিয়ে দেওয়া—তা না হলে এ বৌমাই আমার সব।'

'কিন্তু' একটু যেন দ্বিধান্বিত স্বরে উত্তর দিয়েছিল ঘটক ঠাকুরাণী,' 'এসব কথা শুনে এখানে সতীনের ওপর কে মেয়ের বিয়ে দেবে বলুন মা-ঠাকুরুন। যতই গরীব-দুঃখী হোক, সতীনের সঙ্গে ঘর করতে হবে শুনলে আজকের দিনে কোন মেয়ের বাপ-মা রাজী হবে বলুন তো?'

তবে কি হবে বল তো বাছা' ব্যগ্রকণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন অনুসূয়া দেবী। বলেছিলেন, 'তুমি হলে পাকা মাথার লোক। তুমিই যদি পার এর কোন উপায় বলে দিতে। আমার তো বাপু বুদ্ধিতে কিছু আসছে না।'

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে এক সময়ে উত্তর দিয়েছিল ঘটকিনী, 'একটাই মাত্র উপায় হতে পারে এর। এখন আপনি বুঝিয়ে সুঝিয়ে হোক বা লুকিয়েই হোক আপনার বড়বৌকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিন। কন্যাপক্ষকে বলা যাবে আপনি বড়বৌকে ত্যাগ করে ছেলের আবার বিয়ে দিচ্ছেন। তারপর ভালয় ভালয় একবার কাজটা হয়ে-বয়ে যাক, তখন যা হোক কিছু ব্যবস্থা করলেই হবে। বিয়ে হয়ে গেলে তখন হিন্দু ঘরের মেয়ে এত সামান্য কারণে ঝট করে স্বামী ত্যাগ করে চলে যেতে কিছু আর পারবে না।'

'বেশ তবে তাই হোক। যেমন আমার অদৃষ্ট' দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে কপালে করাঘাত করে জবাব দিয়েছিলেন অনুসূয়া।

আর দাঁড়ায় নি সায়ন্তনী, দাঁড়াবার প্রয়োজনও বিশেষ ছিল না। স্বকর্ণে যতখানি শুনেছিল ততখানিই যথেষ্ট। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এই প্রগতির যুগেও যে মান্ধাতা আমলের এমন পচা মনোভাব সম্ভবপর একথা নিজের কানে এভাবে না শুনলে হয়তো বিশ্বাসই করতো না সায়ন্তনী। সমগ্র বিশ্ব যখন সভ্যতার আলোয় জ্ঞানের আলোয় পরিপ্লাবিত হয়ে গিয়েছে এমন কি যে যুগে নাকি টেস্টটিউব বেবিও আর বাতুলের আজব কল্পনা নয়, কে জানতো তখনও এলাহাবাদের লুকারগঞ্জের এই সাত নম্বরের বাড়ীটার বন্ধ জানলা দিয়ে সেই আলো প্রবেশের পথ পায় নি, তাই তো আজও তার আকাশে-বাতাসে হাজার বছরের পুরোনো স্যাঁতসেঁতে অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া। সোজা নিজের শোবার ঘরে এসে দরজা বন্ধ করেছিল সায়ন্তনী, আরশীতে না দেখেও নিজের মুখের রোগাক্রান্ত ভাবের আয়নায় স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিল সে। সে মুখে সর্বস্ব হারানোর চিহ্ন সুস্পষ্ট। এ মুখ নিয়ে বিশেষ মনের এই বর্তমান অবস্থায় কারো সামনে যে উপস্থিত হওয়া চলবে না এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই।

খাটের ওপর নিশ্চুপ হয়ে কতক্ষণ যে বসেছিল, সে তার কোন পরিমাপ নেই। চোখে একবিন্দুও অশ্রু ছিল না তার, যা ঝরছিল তা আগুন, অপমানের আগুন। জীবনের কারবারে ভরাডুবি হয়ে গেছে তার। এত দিনের প্রাণঢালা পরিশ্রম রক্তজলকরা সাধনা তার ব্যর্থ হয়েছে। জলের আল্পনা তার শূন্যে মিলিয়ে গেছে কোথাও এতটুকু চিহ্নও না রেখে না সংসারের না মানুষের হৃদয়ে। এই যে ঘর যাকে সে সযত্নে নিজের রুচি দিয়ে নিজের কল্পনা আর কামনা-বাসনা দিয়ে তিলে-তিলে, পলে-পলে গড়ে তুলেছে এতদিন ধরে, সে ঘরে তার সত্যকার অধিকার এক বিন্দুও নেই। এ সংসার বড় অনুদার, বড় কৃপণ। মূল্য কড়ায়-গণ্ডায় শোধ না করে দিয়ে ফাঁকি দিয়ে তিল প্রমাণ প্রশ্রয়ও এখানে কেনার উপায় নেই। যে মুহূর্তে প্রমাণ হয়ে গেল সংসারের প্রত্যাশা মেটানোর ক্ষমতা নেই তার, সেই মুহূর্তেই তার আর স্থান রইলো না, আদর রইলো না এ সংসারে। সন্তানের মূল্যেই আজও নারীর মূল্য আমাদের সমাজে। এর অন্যথা ঘটবে না সায়ন্তনীর অদৃষ্টেও।

'ঝি এসে ডেকেছিল।' বৌদিমণি, চলু মা খেতে ডাকছেন।'

'বল গে আমার শরীর ভালো নেই—খাব না কিছু আজ।' রুদ্ধ ঘরের ভেতর থেকে জবাব দিয়েছিল সায়ন্তনী। না, খেতে সে আজ আর কিছু পারবে না। এ অসম্মানের অন্ন গলা দিয়ে নামবে না তার কিছুতেই। অরিন্দম আসুক, তার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হওয়ার আগে ওর মুখ থেকে সঠিক জবাব না পাওয়া পর্যন্ত জলস্পর্শ করার পর্যন্ত রুচি হবে না তার। কিন্তু এইটুকুতেই ত্রাণ পায় নি সায়ন্তনী। অসুস্থতার খবর ঝি-এর মুখে অবগত হয়ে শাশুড়ি নিজে এলেন তত্ত্ব নিতে। দরজা খুলতে হোল সায়ন্তনীকে, কথা বলতে হোল, নিঃশব্দে সহ্য করতে হোল অনেক স্নেহের অভিনয়। কাঠের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো সায়ন্তনী শুধু, একটিবারও চোখ তুলে তাকাতে পারে নি শাশুড়ির মুখের দিকে। মাতৃস্নেহকাতর হৃদয় তার যাঁকে প্রথম মুহূর্ত থেকেই মনে-মনে মায়ের আসনে বসিয়েছিল, তাঁরই কাছে এত বড় স্নেহের অপমানে তার হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে অভিমানের দাবানল জ্বলে উঠেছিল তার মধ্যে আপোষের কোন সম্ভাবনা ছিল না।

অরিন্দম এসেছিল সন্ধ্যার পরে। কোন ভূমিকা না করেই প্রশ্ন করেছিল সায়ন্তনী, 'তুমি নাকি আবার বিয়েতে সম্মতি দিয়েছ?'

'এ খবর তোমায় দিলে কে?' থতমত খেয়ে পাল্টা প্রশ্ন করেছিল অরিন্দম।

'যেই দিক না কেন' দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিয়েছিল সায়ন্তনী। 'খবরটা সত্যি কিনা জানতে চাই তোমার কাছে।' মর্মভেদী জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে যেন বিদ্ধ করে ফেলতে চেয়েছিল সায়ন্তনী অরিন্দমকে।

'মা সেদিন ঐ ধরনের কিছু একটা বলছিলেন বটে।' গত্যন্তর না দেখে মাঝামাঝি একটা পথে আপোষ করতে চেয়েছিল অরিন্দম।

'মায়ের কথা জিজ্ঞেস করি নি আমি। তোমার নিজের কথাই জানতে চাইছি। তুমি নিজে মত দিয়েছ কিনা সেইটেই শুধু জানতে চাই।' ধৈর্য হারিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রায় চিৎকার করে উঠেছিল সায়ন্তনী।

চোখে চোখ মিলেছিল। দৃষ্টিতে দৃষ্টিতে নিঃশব্দ সঙ্ঘর্ষ চলেছিল প্রায় মিনিট খানেক। তারপরে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল অরিন্দম স্ত্রীর মুখের ওপর থেকে। ক্ষুব্ধ পৌরুষের অভিমানে জবাব দিয়েছিল যতদূর সম্ভব ঠাণ্ডা নিরুত্তাপ গলায়, 'হ্যাঁ দিয়েছি।'

এ জবাবটা বোধহয় প্রত্যাশা করে নি সায়ন্তনী। ক্ষীণ আশার রেশটুকু বোধহয় তার এখনও বাসা বেঁধেছিল মনের সঙ্গোপনে, তার নিজেরও অজ্ঞাতে। তাই আঘাতটা একটু বেশীই বাজলো। কিন্তু

এত দূর এগিয়ে আর লাগাম টেনে সংযতও করতে পারলো না নিজের উদ্যত রসনাকে। নিজের সমূহ বিপদ উপলব্ধি করেও উত্তর দিল নেশাগ্রস্তের মতই দৃঢ় একগুঁয়েমির স্বরে, 'বেশ তবে তাই। এ এক রকম ভালই হোল যে তুমি নিজের মুখেই স্বীকার করলে। এই যদি তোমার মনের কথা তবে আমারও শেষ সিদ্ধান্ত শুনে নাও, তোমার সার্থকতার পথের প্রতিবন্ধক হতে আমিও চাই না। আমি নিজেই সরে যাব তোমার জীবন থেকে। কাল সকালেই প্রথম যে ট্রেন সেই ট্রেনেই আমি জীবনের মত ফিরে যাব সেখানেই, যেখান থেকে আমি এসেছি। ম্যানেজার মশাই আমার সঙ্গে যাবেন। একাও যেতে পারতুম কিন্তু সেটা দৃষ্টিকটু দেখাতে পারে তাই এ সতর্কতা। যাবার সময়টা অন্তত সসম্মানে যেতে চাই। দৃশ্য তৈরী করে লোক হাসাতে চাই না।'

একটা ঝাঁকুনি খেয়ে ততক্ষণে যেন সমতলে নেমে এল অরিন্দম। সায়ন্তানী যে মিথ্যে দম্ভ করছে না সেটা ওর মুখের ভাবে ও কণ্ঠের দৃঢ়তাতেই সুস্পষ্ট। সভয়ে কাছে সরে এসে সায়ন্তানীর কাঁধে হাত রেখে বলে, 'পাগল হয়েছ সানু, কোথায় কি না কি, এখন থেকে কেন মিছিমিছি অশান্তি করতে চাইছো? যা কিছুই হোক না কেন তোমার অমতে তো কিছুই হতে পারবে না। তুমি হলে বড়। তাছাড়া যার যখন একটা খেয়াল হয়েছে, আর নিতান্ত অসঙ্গত খেয়ালও কিছু নয়, তুমি নিজেও তো সবই বোঝ। তখন মনে জোর করে একবার হ্যাঁ বলে দাও না। তুমি তো সর্বে-সর্বা পাটরাণী রইলেই। সে আসন তোমার তো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। মানুষের হৃদয়ে কত জায়গা সেখানে দুই বোনের যদি জায়গা হতে পারে তো দুই বৌ-এরই বা হবে না কেন?'

বিস্ফারিত চোখে তাকিয়েছিল সায়ন্তানী অরিন্দমের মুখের পানে। কত সহজেই না উচ্চারণ করলো অরিন্দম কথাটা। এতই কি তুচ্ছ কথাটা মানুষের জীবনে? সায়ন্তানীর জায়গায় অন্য কোন স্ত্রীলোককে বসাতে সত্যই কি মনের কোথাও বাধবে না অরিন্দমের? আর সায়ন্তানী? যেখানে তার ছিল অপ্রতিহত আধিপত্য, সেখানে নিজের হাতেই অংশীদার বসানোর হেয়তা সেই বা সহ্য করবে কেমন করে। একই আকাশে একসঙ্গে চাঁদ-সূর্য থাকতে পারে না। আজ যাই অঙ্গীকার করুক না কেন অরিন্দম, এমন ভাবে যে তার সর্বদিনই থাকবে, কোন অজানা ভবিষ্যতে সে তার সন্তানের জননীর প্রতিই যে ঝুঁকে পড়বে না তারই বা নিশ্চয়তা কি। উপস্থিত থেকে সেদিন চোখে দেখার চাইতে স-মানে আগে থাকতে সরে যাওয়াই কি অধিকতর বাঞ্ছনীয় নয় সায়ন্তানীর পক্ষে?

চিত্তের দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিল না সায়ন্তানী। জবাব দিল পূর্ববৎ দৃঢ় অবিচলিত কণ্ঠে, 'সে হবার নয়। অনেক ভেবে আমি যা স্থির করেছি তার আর অন্যথা নেই। মিছিমিছি এ নিয়ে কথা বাড়িয়ে কোন পক্ষেরই লাভ নেই।' কথার শেষে আর দাঁড়ায়নি সায়ন্তানী। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল অরিন্দমকে বাক্য ব্যয়ের সুযোগ মাত্র না দিয়ে।

নিজের কথামত পরের দিনই বাড়ী চলে এসেছিল সায়ন্তানী। বধূর আচরণ থেকে সবটা না হোক অনেকখানিই বোধ করি অনুমান করতে পেরেছিলেন অরিন্দমের জননী। বোধ করি সেইজন্যই গাড়ী পর্যন্ত নেমে এসে অশ্রুসজল চোখে বিদায় জানিয়েছিলেন বধূকে কিন্তু ফিরে আসতে অনুরোধ জানাননি। না জানাবার সম্ভাব্য কারণটাও অবশ্য অনুমান করে নিতে কষ্ট হয়নি সায়ন্তানীর। কোনপ্রকার অপ্রিয়তা না করেও এমনই অযাচিতভাবে এই দুরূহ সমস্যার সমাধান হয়ে যাওয়ায় হয়তো বা মুক্তির নিঃশ্বাসই ফেলেছিলেন তিনি মনে মনে, ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন বিপদভঞ্জন মধুসূদনের উদ্দেশে। অরিন্দম বাড়ীতে ছিল না। খুব সকালেই জরুরী কাজের অছিলায় বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছিল খুব সম্ভব চক্ষুলজ্জার দায় এড়াতেই। তবুও গাড়ীতে ওঠার আগের মুহূর্ত অবধি একটা সুপরিচিত পদধ্বনি একটা অতি প্রিয় কণ্ঠস্বর শোনার আশায় উৎকর্ণ হয়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত হতাশ হতে হয়েছিল সায়ন্তানীকে। অরিন্দম যে এত সহজে সম্মত হবে চিরদিনের মত ওকে নিজের জীবন থেকে বিদায় নিতে দিতে সেটা বিশ্বাস করা সত্যই কঠিন সায়ন্তানীর পক্ষে অসম্মানজনক তো বটেই। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশা ওর মরেও মরেনি—অরিন্দম হয়তো আসবে ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। বলবে সেই তার জীবনের ধ্রুবতারা। তাকে ফেলে আকাশের চাঁদেও রুচি হবে না তার। কাল থেকে আজ পর্যন্ত যা-কিছু ঘটেছে, সে সমস্তই দুঃস্বপ্নের মত অলীক, বাস্তবে তাদের কোন অস্তিত্বই নেই। সায়ন্তানী অবশ্য ফিরতো না তবুও। ওর মতে মানুষের মনই আসল, বাকি সবকিছুই অপ্রধান। যে মুহূর্তে অরিন্দম মনে মনে আর একজনকে সায়ন্তানীর সঙ্গে সমান আসনে বসাতে চেয়েছে, সেই মুহূর্ত থেকেই ওদের সম্পর্কের মধ্যে ভাঙ্গন ধরেছে যা রোধ করার সাধ্য স্বয়ং বিধাতাপুরুষেরও নেই। কাঁচের বাসন ভাঙ্গলে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তা জোড়ার উপায় আছে কিন্তু হৃদয়ের সম্বন্ধে একবার চিড় ধরলে শত চেষ্টা করলেও সে ভাঙ্গন জোড়া যায় না। তবুও মানুষের মন দুর্বল। তার গতিবিধি তার নিজেরও আয়ত্তের বাইরে। তাই কোন এক দুর্বল অসতর্ক মুহূর্তে সায়ন্তানীর মনও বুঝি উন্মুখ হয়ে উঠেছিল অরিন্দমকে ক্ষমা করার জন্য কিন্তু সে-লগ্ন বৃথায় বয়ে গেল, অরিন্দম এল না। ট্রেনের চাকার তালে তালে সায়ন্তানীর নশ্বর দেহটার সঙ্গে সঙ্গে ওর অভিমান-জর্জর মনটাও অরিন্দমকে ছেড়ে ছুটে চললো দূর থেকে দূরান্তরে।

সায়ন্তানীর স্বামীত্যাগের কথা অপ্রকাশ রইলো না বেশী দিন, অবশ্য গোপন করার চেষ্টাও যে বিশেষ করেছিল ও তা নয়। যা সত্য তা প্রকাশ পাবেই কোন না কোনদিন, তবে তা গোপন করার অসম্ভব চেষ্টায় হাজারো মিথ্যের অবতারণা করে লাভই বা কি। খবর পেয়ে সায়ন্তানীর সাত দিদি এলো, সঙ্গে এলেন সাত-সাত-জন ভগ্নিপতি। বয়সে সামাজিক প্রতিষ্ঠায় স্বামী-পুত্র-পরিবার নিয়ে হোমরা-চোমরা এক-একজন। গোল টেবিল বৈঠক বসলো। কারণ অনুসন্ধান থেকে শুরু করে কর্তব্য নির্ধারণ পর্যন্ত সমস্তকিছু একাই করলেন তাঁরা। যাকে কেন্দ্র করে আজকের এই চাঞ্চল্য, এই আন্দোলন, সেই শুধু নির্বাক হয়ে রইলো। একটি কথাতেও যোগ দিল না সায়ন্তানী। প্রশ্রয়ের অভাবে শুভা-কাঙ্ক্ষীদের উৎসাহের নদীতেও এল ভাঁটা। তাছাড়া তাঁদের সকলেরই বাড়ী ঘরসংসার আছে। সেসব ফেলে অনির্দিষ্টকালের জন্য থাকাও সম্ভবপর নয়। অগত্যা এক এক করে সরে পড়লেন তাঁরা সকলেই।

একলা বাড়ীতে আবার নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো সায়ন্তানী। ভাবলো একটা ঝামেলা চুকলো। কিন্তু তার সে-ধারণা যে ভুল, তলে তলে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র যে এখনও

সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায়নি সেটা কিছুদিনেই আবিষ্কার করে ফেললো সায়ন্তানী। সকলে হাল ছাড়লেও মাতামহী স্বর্ণময়ীই শুধু নিরাশ হননি। দৌহিত্রীর কাছে কোন-রকম সদুত্তর পাওয়ার আশা দুরাশা জেনেই কারণ অনুসন্ধান করে এবং সায়ন্তানীর অজানা অপরাধের জন্যে ক্ষমাভিক্ষা করে যে চিঠিখানা তিনি লেখেন অরিন্দমের মায়ের কাছে, দৈবক্রমে ডাকে দেওয়ার আগেই ঝি-এর হাত থেকে সেখানা হস্তগত করলো সায়ন্তানী। ইন্ধন প্রস্তুতই ছিল, এই বিনয়নম্র চিঠিখানা তাতে অগ্নিসংযোগ করলো যেন। রাগে অভিমানে ফেটে পড়লো সায়ন্তানী। 'কেন, কেন একাজ করলে তুমি আমায় না জানিয়ে? লজ্জা করে না তোমার যারা এতবড় অপমান করেছে, তাদেরই পায়ে ধরে সাধতে যেতে? বুড়ো হয়ে তোমার ভীমরতি হয়েছে, মান-সম্মান জলাঞ্জলি দিতে বসেছ, কিন্তু আমি যে লজ্জায় মরে যাই।' নিরুপায় ক্রোধে চোখে প্রায় জল এল সায়ন্তানীর, কণ্ঠ হোল রুদ্ধ।

একটুও লজ্জিত হ'ন নি স্বর্ণময়ী, বলেছিলেন। 'আমার আবার লজ্জা কিসের লা? লজ্জা যদি থাকতো তবে যেদিন এক-সঙ্গে অমন জলজ্যান্ত মেয়ে জামাই গেল সেদিনই আমার এই বুড়ো প্রাণটাকেও বের করে দিতুম, এতদিন এমন বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকতুম না। আমায় বৃথাই লজ্জার

খোঁটা দেওয়া। যা করতে চাইছি তোর কথা ভেবেই, তোরই ভালর জন্যে। সেখানে কি হয়েছে জানি না কিন্তু যাই হয়ে থাক না কেন সে যখন তোর স্বামী তখন তার কাছেই তোকে যেতে হবে শেষ পর্যন্ত। আজ না হয় আমি বেঁচে আছি কিন্তু চিরদিন কিছু আর তা থাকবো না। তখন একলাটি সংসারে সহায় নেই সম্বল নেই অভিভাবক নেই, সোমত্ত মেয়ে—এই ভরা-যৌবন নিয়ে কোন ভরসায় থাকবি, সে কথা ভেবেছিস কি একটিবারও।'

'থাকতে চাইও না আমি', উত্তর দিয়েছিল সায়ন্তনী। তেমনই রুদ্ধ কণ্ঠে, বলেছিল 'আমিও তোমাকে বলে দিচ্ছি যদি আর কখনও আমাকে এভাবে অপদস্থ করতে চেষ্টা কর তার ফল ভালো হবে না। মনে কোর না তোমার কাছে এসেছি বলেই আমি নিরুপায়, তুমি যা ইচ্ছে তাই করবে আমার সঙ্গে, আর আমি তা নিঃশব্দে সহ্য করবো। যদি বেশী কিছু কর তবে এখানেও থাকবো না আমি। যেখানে খুশী চলে যাব।'

'কোথায় যাবি শুনি?' প্রশ্ন করেছিলেন স্বর্ণময়ী ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে।

'ভয় নেই, তোমায় জানিয়ে যাব।' আর এক ঝলক দৃষ্টির আগুন ছড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল সায়ন্তনী দৃপ্ত গর্বের সঙ্গে।

'ওমা মেয়ের রকমখানা দেখ। মেজাজ তো নয় যেন বিলিতি পল্টন, কি সব দিনকাল,' অবাক বিস্ময়ে গালে হাত দিয়েছিলেন স্বর্ণময়ী।

দৌহিত্রীর মেজাজ ভালো জানতেন বলেই আর বেশী ঘাঁটাবার সাহস হয়নি স্বর্ণময়ীর। অগত্যা নিরস্ত হতে হয়েছিল তাঁকে। তিনি নিরস্ত হয়েছিলেন বটে কিন্তু সায়ন্তনী নিরস্ত হয়নি। পরদিন থেকেই সে উঠেপড়ে লেগে গিয়েছিল চাকরীর চেষ্টায়, অবশ্য গোপনে। ডিগ্রীর জোর তো ছিলই সুপারিশেরও অভাব ছিল না। সায়ন্তনীর সঙ্গেকার সহপাঠিনীদের মধ্যে অনেকেই এখন স্কুল টিচার, লেকচারার এমন কি কেউ কেউ প্রিন্সিপ্যালও। তাদেরই একজনের সুপারিশে বারাকপুরে একটা বেসরকারী কলেজে অধ্যাপিকার পদ পেয়ে গেল সায়ন্তনী। খবর পেয়ে স্বর্ণময়ী একেবারে তাজ্জব। মেয়েটা বলে কি, শেষে ঐ কটা টাকার জন্য ও কিনা চাকরী করবে গরীব দুঃখী উদ্বাস্তু মেয়েদের মত? অরিন্দমের অপমান হবে না কি এতে? আর তিনিই বা বেঁচে আছেন তাহলে কি জন্যে? চাকরী না করেও তাঁর গ্রাসাচ্ছাদনের যদি কোন অভাব না হয়ে থাকে তবে সায়ন্তনীরই বা হবে কেন? কিন্তু যাবতীয় যুক্তি তর্ক, অনুনয়, চোখের জলের আবেদন কোনই কাজে লাগলো না, সায়ন্তনী অটল। তাকে যখন কোনক্রমেই নিবৃত্ত করতে পারলেন না তখন অগত্যা তাঁকেও চলতে হোল ওর সঙ্গে নতুন করে সংসার পাততে হোল কলেজ সংলগ্ন স্টাফ কোয়ার্টারে।'

নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করলো সায়ন্তনী, কাজের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে ডুবিয়ে দিয়ে ব্যর্থ অতীতের গ্লানি ভুলতে চাইলো ও কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সে নিষ্ঠায় ছেদ পড়লো ওর। বুঝতে পারলো সায়ন্তনী ভেতরে ভেতরে বড় ক্লান্ত সে। আর শুধুই কি ক্লান্তি, দেহের অন্তঃস্তলে যেন এক আমূল ভাঙাগড়ার বিপ্লব চলেছে ওর। যা নাকি একেবারেই নতুন যার সঙ্গে ওর পূর্বপরিচয় নেই। প্রথমে গ্রাহ্য করেনি সায়ন্তনী। ভেবেছিল শরীরের ওপর মনের এক একটা প্রতিক্রিয়া মাত্র। সময়ে ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু যা সত্য যা বাস্তব তাকে বেশীদিন অস্বীকার করা চলে না। যত দিন যেতে লাগলো সন্দেহ ক্রমশঃ নিশ্চয়তায় পর্যবসিত হতে লাগলো তবুও সায়ন্তনী আশা করতে পারেনি অবশ্য ওর দোষও বিশেষ ছিল না। একে তো বারবার আশা ভঙ্গের ফলে ওর আশার পরিধিটাই সঙ্কীর্ণ হয়ে গিয়েছে তার এমন অভাবনীয় যোগাযোগ, আশা করাই যা যায় কেমন করে? অবশেষে যখন আর কোনমতেই ঠেকিয়ে রাখা গেল না আশার ইঙ্গিতকে, তখনই আজ সকালে একরকম মরীয়া হয়েই গোপনে সরকারী হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে পড়েছিল সায়ন্তনী আর তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম বিজয় বার্তার নিদর্শনস্বরূপ এই চিরকুট। আর একবার কাগজখানা তুলে ধরলো সায়ন্তনী চোখের সামনে। অনুভব করতে চাইলো নিজের আশাতীত সৌভাগ্যকে। তবু যে আনন্দের বন্যায় আজ তার প্লাবিত হয়ে যাওয়ার কথা তার কিছুই তো হোল না। অনুভূতির স্থানটা তার অসাড় হয়ে গেছে যেন এমনই একটা শূন্য অনুভূতি মনের মধ্যে। এমনই বুঝি হয়। পৃথিবীটা যে গোল, তাই তো যে কোন দুটো চরম প্রান্ত বারবার এসে মিলে এক হয়ে যায়। তাই তো পরম সুখ আর চরম দুঃখ দুটোই এমন অননুভবনীয়। চরম শীত আর চরম গ্রীষ্ম দুটোই এমন দুঃসহ, চরম ধনী আর পরম নিঃস্ব দুজনেই এমন নিঃশঙ্ক।

'এই ঠাণ্ডায় কার্তিক মাসের হিমে রাতভোর কি ঐ জানলাটার সামনেই দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দিবি ভাই। ঠাণ্ডা লেগে গেলে জ্বর এসে যাবে যে।' সচকিত হয়ে ফিরে তাকালো সায়ন্তনী। বড় নরম স্নেহস্পর্শের মত লাগলো মাতামহীর নির্দশন্ত মুখের এই স্নেহের অনুযোগ, সায়ন্তনীর অশান্ত হৃদয়ে।

'ওমা ঠাণ্ডা আবার কোথায়?' আঁচলটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে উত্তর দেয় সায়ন্তনী স্মিত হাসিমুখে। পাল্টা অনুযোগ করে বলে, 'এই এত রাত্রে তুমিই বা উঠে আসতে গেলে কেন। সারাদিন সংসারের ঘানি টেনে আবার রাত্রে জাগলে তোমার ঐ বুড়ো হাড়ে সহ্য হবে কেন?'

'খুব হবে, তোর এই যুব বয়সে যদি রাত ভোর জেগেই কাটিয়ে দিতে পারিস তবে আমার এই বুড়ো বয়সে ঘুম না হওয়ার আর অপরাধ কি বল বাছা। কিন্তু তুই ওখান থেকে সরে আয় দিকিনি। জানলাটাও ভেজিয়ে দে অমনি। ঘরে হিম ঢুকছে। তোর জন্যে ভাবছি নে, ভাবছি তার জন্যে যেটা তোর পেটে আছে। ভালয় ভালয় একবার হয়ে যাক তারপর যা খুশী করিস, আমি কিছু আর মানা করতে যাব না।'

'তুমি কি করে জানলে?' চমকে ফিরে তাকালো সায়ন্তনী।

বৃদ্ধার বলিকুঞ্চিত দন্তহীন মুখে পরিতৃপ্তির অজস্র হাসি, জানি বইকি, সবই জানি। আমার চোখে কি ধুলো দিবি বল। তোর জানার আগে থাকতেই আমি টের পেয়েছি। একথা বলি নি কিছু সে শুধু পাছে তুই বিরক্ত হোস, তাই' যাবার জন্য দরজার দিকে পা বাড়িয়েও কি মনে পড়ায় আবার ফিরে দাঁড়ালেন স্বর্ণময়ী। বললেন, যেন কিছুই হয়নি এমনই সহজ স্বাভাবিক সুরে, 'হ্যাঁ আর একটা কথা তোকে বলি বলি করেও এখনও বলা হয়নি। তোর শাশুড়ীকে আমি খবর পাঠিয়ে দিয়েছি। তাদের জিনিস তারা নিয়ে যাক আমি নিশ্চিন্ত হই। আমার না আছে সহায়-সম্পদ না আছে অর্থবল। সব দায়িত্ব যে নিজের ঘাড়ে নেব, কোন ভরসায় এতবড় সাহস করি বল? '

'কেন কেন তুমি আমায় না জানিয়ে একাজ করলে?' অনেকটা চাপা কান্নার মত করুণ শোনালো সায়ন্তনীর রুদ্ধ কণ্ঠের অভিযোগ, অনেক চেষ্টা করেও পূর্বের মত সে জোর যেন সে খুঁজে পেল না নিজেরই মনের মধ্যে।

এবার অন্যপক্ষে বিরক্ত হবার পালা, 'বাজে বকিস নে সান্তু', পুরুষ কণ্ঠে অনেকটা ধমকানি দেওয়ার মত করেই উত্তর দিলেন স্বর্ণময়ী, 'তুই সেদিনের একফোঁটা মেয়ে কি করা উচিত আর কি উচিত নয় তুই তার কি জানিস বল, তো যে তোর

অনুমতি নিয়ে তবে আমার কাজ করতে হবে? আমার যা উচিত মনে হয়েছে করেছি। এখন সে যদি নিতে আসে তো ভাগ্য বলে মানিস। জানি না তোদের মধ্যে কি হয়েছে, কি তার অপরাধ কিন্তু অপরাধ যত বড়ই হোক অনুতপ্ত হয়ে ফেরত এলে ক্ষমা করা যায় না এমন অপরাধ স্ত্রীর কাছে স্বামীর খুব কমই হয়। আজ না হোক একদিন না একদিন আমার একথাটা তুই নিজেও বুঝতে পারবি।' একটু থেমে বললেন আবারো এবার অপেক্ষাকৃত মোলায়েম কণ্ঠে, 'তা ছাড়া বেপরোয়া হয়ে তুই নিজের সম্বন্ধে যা খুশী তাই করতে পারিস কিন্তু আজ বাদে কাল যাকে জন্ম দিতে চলেছিস, তাকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে, তার প্রাপ্য আদরযত্ন থেকে বঞ্চিত করার অধিকারই কি তোর আছে নাকি?' একটা হাই তুলে তুড়ি দিয়ে নিজেই বললেন আবার 'কথায় কথায় মেলাই রাত হয়ে গেল। যাই এবার শুতে যাই। তুইও মোদ্দা আর দেরী করিস নে, বেশী রাত জাগলে শরীর খারাপ হবে।' সায়ন্তানীকে নিজের মনের সঙ্গে বোঝা-পড়ার অবকাশ দিতেই বোধহয় স্বর্ণময়ী বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে দরজার পাল্লা-দুটো সন্তর্পণে ভেজিয়ে দিয়ে।

অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত সায়ন্তানী বোধহয় অল্প সময়ের জন্যে ঘুমিয়ে পড়ে-ছিল সকালের দিকে। দরজায় উপর্যুপরি বার কয়েক করাঘাতের শব্দেই ঘুম ভেঙ্গে চকিত হয়ে উঠে বসলো সে শয্যার ওপরে। 'ওরে ও সান্ত আর কত ঘুমোবি দিদি। ওঠ, উঠে দরজা খুলে দ্যাখ কে এসেছেন', স্বর্ণ-ময়ীর হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠের আহ্বানে এবারে ধড়মড়িয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো সায়ন্তানী। দরজা খুলেই সামনে স্বর্ণময়ীর পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে যাঁকে দেখলো সায়ন্তানী তাঁকে অন্ততপক্ষে কোনমতেই আশা করেনি সে এই মুহূর্তে। স্রস্ত আঁচলটা ত্রস্তে মাথার ওপর টেনে দিয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালো সায়ন্তানী।

'এস আমার মা লক্ষ্মী। এস। চিরায়ু-ষ্মতী হও মা। অভিমান করে চলে এসে নিজেও কত কষ্ট পেলে মা, আমাদেরও দিলে। কিন্তু সে যা হবার হয়েছে আর তো রাগ করে মুখ ফিরিয়ে থাকলে চলবে না মা। আমি যে তোমায় নিতে এসেছি। আজই বলছি না কিন্তু দু একদিনের মধ্যেই আমরা ফিরবো, তুমি সব গোছগাছ করে নাও মা লক্ষ্মী।' আদর করে ওকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে সোচ্ছ্বাসে বললেন অরি-ন্দমের জননী।

পলকের জন্যে একবার স্বর্ণময়ীর মুখের পানে না তাকিয়ে পারলো না সায়-ন্তানী। সে মুখের হাসিতে আত্মপ্রসাদ আর সফলতার আনন্দ পাশাপাশি খেলা করছে দেখলো সে। সব বিপত্তির মূল কারণ যিনি তাঁর প্রতি জ্বলে ওঠার কথা সায়ন্তানীর কিন্তু আজ আর রাগ তো হোলই না বরং সকালের এই স্নিগ্ধ আলোয় বড় পবিত্র মধুর মনে হোল সে মুখ। সে চলে গেলে তাঁর নিঃসঙ্গ বৈচিত্র্যহীন একলা থাকার দিনগুলো মনে করে চোখের পাতাদুটো ভারী হয়ে এল ওর।

বধূর ভাবান্তর লক্ষ্য করেই বোধ করি এবার স্বর্ণময়ীর দিকে তাকালেন অনু-সূয়া, বললেন, 'আপনিও কেন চলুন না মাসীমা আমাদের সঙ্গে? নাতনীর কাছে যত্নে থাকবেন। এতদিনের অনভ্যাসের পর একলাটি আপনার কিন্তু খুব কষ্ট হবে...'

'তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক বাছা। নাতনী আমার জন্ম এয়োস্ত্রী হয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে স্বামীর ঘর করুক সেই দেখে একলা মরি সেও আমার ভালো কিন্তু সঙ্গে থাকার এমন অভ্যাস আমার চাই না মা। ভগবান করুন বাকি জীবনটা যেন আমার নিঃসঙ্গই কাটে।' উত্তর দিলেন স্বর্ণময়ী হাসিমুখেই কিন্তু তবুও শেষের দিকে ভাবাতিশয্যে চোখ দুটো ছলছল করে এল তাঁর। হাসিকান্নার সংমিশ্রণে অনির্বচনীয় দেখালো অশীতিপর বৃদ্ধার বলিকুঞ্চিত শীর্ণ অসুন্দর মুখশ্রী, উপস্থিত দুজনেই শ্রদ্ধাপ্লুত অন্তঃকরণে তাকিয়ে রইলেন সেই দিকে।

'মা রেলে আপনার কোন কষ্ট হয়নি তো?' আবহাওয়াটাকে সহজ করে তোলার প্রেরণাতেই এতক্ষণে প্রশ্ন করলো সায়ন্তানী অনুসূয়া দেবীর প্রতি তাকিয়ে।

'না মা, কষ্ট কিছু হয়নি তবে রেলের নোংরা কাপড়চোপড়ে ভারী বিশ্রী লাগছে। স্নান করে এগুলো ছাড়তে পারলে বাঁচি।' উত্তর দেন অনুসূয়া, স্বর্ণময়ীর প্রতি তাকিয়ে বলেন 'মাসীমা চলুন এবারে আমরা যাই। আপনাদের কলঘরটা আমায় দেখিয়ে দেবেন চলুন তো। স্নানাহ্নিকগুলো সেরে ফেলে তারপর ধীরে সুস্থে কথাবার্তা হবে।'

'আপনার বাক্সটা কোথায় রাখলো, আমায় চাবিটা দিন মা আমি আপনার কাপড়চোপড় বার করে দিচ্ছি।'

ব্যস্তভাবে সায়ন্তানী বাইরের দিকে পা বাড়াতেই বাধা দিয়ে বলে উঠলেন অনু-সূয়াদেবী সস্নেহ কণ্ঠে, 'থাক মা, তোমায় আর যেতে হবে না। আমি মাসীমার সঙ্গেই যাচ্ছি। অমনই ঘরসংসারের দুটো সুখ-দুঃখের কথাও বলা যাবে। কি বলেন মাসীমা?'

'নিশ্চয়ই, সে তো আমার মস্ত সৌভাগ্য। এস মেয়ে আমরা যাই।' হাত ধরাধরি করে অন্তরঙ্গভাবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন দুই বর্ষীয়সী রমণী।

এদিকে শূন্যদৃষ্টিতে খানিক তাকিয়ে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো সায়ন্তানী। তাকিয়ে রইলো বাইরের নীল আকাশের দিকে অপলক দৃষ্টিতে। কিছুই ভাবতে পারছে না ও এই মুহূর্তে। অনুতপ্ত হয়ে অরিন্দমের জননী নিজে এসেছেন ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে, এটা সুখের কি দুঃখের সম্মানের কি অনুকম্পার তাও যেন উপ-লব্ধি হচ্ছে না ঠিকমত। আজ তাঁদের সন্তান ওর গর্ভে তাই এ সুজন তা না হলেও কি শুধু ওরই জন্য এভাবে আসতেন তিনি ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে? খুব সম্ভব নয়। তবে তো সন্তানের জন্যেই আজ ওর এই আদর তার মূল্যেই ওর মূল্য কিন্তু ও যেমন ভেবে এসেছে প্রতিদিন সত্যিই কি এটা এতই অগৌরবজনক সন্তানের গর্ভধারিণীর পক্ষেও? প্রকারান্তরে এ সম্মান তাকেও নয় কি? ফলফুলের জন্যে বৃক্ষের সমাদর ফসলের জন্যে উদ্ভিদের কিন্তু ফুলফল ফসল সে তো পৃথক কিছু নয় সে তো গাছের সে তো উদ্ভিদেরই অনুবৃত্তি—একই রূপের ভিন্ন রূপান্তর। তেমনই সন্তানও কি মায়েরই দেহের একটা অংশ নয়? তবে কি এত-দিন যা কিছু ভেবে এসেছে সায়ন্তানী যে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে এসেছে জগৎকে তা কি ভুল না কি নিষ্ফলতার কালো চশমার মাধ্যমে সবকিছুকেই অন্ধকার দেখে এসেছে সে এতদিন! আজ তার চশমার কালো কাঁচ খসে গেছে তাই সবকিছুই নতুন লাগছে উজ্জ্বল লাগছে। একটা কালো যবনিকা যেন সরে গেছে চোখের সামনে থেকে, কঠোর বিচার হয়ে এসেছে হাল্কা।

এমনই আকাশপাতাল আরো কত কি ভাবতো হয়তো সায়ন্তানী, ওর চিন্তা-ধারায় ছেদ পড়ল। বাইরে বারান্দায় জুতোর শব্দ ক্রমশঃ সন্নিকটবর্তী হতে হতে ঠিক দরজার বাইরে এসে থামলো। সচকিত হয়ে সায়ন্তানী মুখ ফিরিয়েই সামনে অরিন্দমকে দেখে মুখ নামিয়ে নিল। দেহের সমস্ত রক্ত ওর এসে জড় হোল মুখে, উত্তাল হয়ে উঠলো বুকের স্পন্দন, মুখ তুলে না তাকিয়েও অনুভব করতে পারছিল সায়ন্তানী অরিন্দমের দুই চোখের অচপল দৃষ্টি ওরই আনত মুখের প্রতি সংবদ্ধ। সেই দুটি চোখের নীরব অথচ একাগ্র দৃষ্টিতে সর্বস্ব উজাড় করে দেও-য়ার প্রতিশ্রুতি। প্লাবনের মুখে কুটোর মত এতদিনকার তিল তিল করে গড়ে তোলা ক্ষমাহীন সংকল্প সায়ন্তানীর ভেসে যেতে পথ পেল না। নীড় প্রত্যাগত পাখীর মত নিঃশব্দ ব্যগ্রতায় অরিন্দমের প্রসারিত বাহু-বন্ধনে আশ্রয় নিল ও। নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করে দিল প্রিয়তমের নিবিড় আলি-ঙ্গনের মধ্যে। সে বন্ধনের মধ্যে কি অপূর্ব মুক্তির আস্বাদন। যুগ যুগান্তর যেন শুধুমাত্র এইটুকুর জন্যই তৃষিত চাতকীর মত পথ চেয়ে ছিল সায়ন্তানী। সব দুঃখ ব্যথা নিষ্ফলতার পরিসমাপ্তি হোল। দুটি বিচ্ছিন্নপ্রায় বিরহজর্জর আত্মা আবার এসে মিলিত হোল দেহের তটপ্রান্তে। প্রত্যুষের শিশুরবি খোলা জানালা পথে এসে উঁকি মেরে দেখে গেলেন এই স্বর্গীয় দৃশ্য। এক ঝলক স্নিগ্ধ সূর্যকিরণ এসে আশীর্বাদের মত ছড়িয়ে পড়লো ওদের মাথার ওপর। সেই সঙ্গে রাঙ্গা আলো যেন আবীর ছড়িয়ে দিল সায়ন্তানীর স্বভাব সুন্দর মুখে। সহস্র তৃষ্ণায় দ্বিগুণ আবেগে আরো কাছে টেনে নিল অরিন্দম সায়ন্তানীকে।

সুন্দরী মেলা

শরদিন্দু দত্ত

সবিতা মল্লিক

সব সুন্দরীর মুখে প্রায় একই কথা, 'মিস বেঙ্গল বা বঙ্গ-সুন্দরী হওয়ার পর 'মিস ইণ্ডিয়া' বা ভারত-সুন্দরী হতে চাই। তারপর হতে চাই 'বিশ্বসুন্দরী'। হ্যাঁ, কলকাতা তথা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ সুন্দরী বিশেষ করে বঙ্গ-সুন্দরী প্রতিযোগিতায় যারা অংশ গ্রহণ করলো, তারা প্রায় সকলেই এই একই কথা বললো। বললো মিতা। বললো ইয়োনা। বললো মঞ্জু, সংঘমিত্রা, তাপসী, মণিকা, শুভ্রা, সোনা, শৈবলিনী, সুমিত্রা, শুচিতা, জয়শ্রী, লোরেন, রুপা এবং আরও অনেক সুন্দরী।

সুন্দরীদের মেলা সেদিন বসেছিল গত ১৫ নভেম্বরে সন্ধ্যা ছ'টা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত মহানগরী কলকাতার শেকসপিয়ার সরণির কলা-মন্দিরে। ১৯৭২-৭৩ সালের 'মিস বেঙ্গল' বা বঙ্গ-সুন্দরী প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হল সেই সন্ধ্যায়।

বিকেল চারটে থেকেই একের পর এক সুন্দরী আসতে শুরু করলো, কেউ ট্যাকসিতে, কেউ প্রাইভেট মোটরগাড়ীতে। কেউ রিকসায়। আবার কোনও কোনও সুন্দরী পায়ে হেঁটে এসে ঢুকলো কলা-মন্দিরে। গেট থেকে সোজা ওরা একে একে এসে ভীড় জমালো গ্রীনরুমে। অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী সুন্দরীকে শেকসপিয়ার সরণি ও তার আশপাশের কবরী সাজানোর দোকানগুলোতে গিয়ে চুল বেঁধে আসতেও দেখলাম।

গ্রীনরুমে গিয়ে দেখি, গোলাপি, নীল, বেগুনি, হলুদ নানা রংয়ের শাড়ীতে ঢাকা একরাশ সুন্দরী। কেউ দিচ্ছে কপালে 'টিপ', কেউ টানছে কাজল চোখে। আবার দেখলাম, কেউ কেউ তার দেহ-বল্লরীতে লাগিয়ে নিচ্ছে 'ফিনিশিং টাচ'! এক কথায় সব সুন্দরীই নিজেদের রূপের ডালি পরিপূর্ণভাবে সাজিয়ে নিলো মঞ্চে যাওয়ার আগে।

গ্রীনরুমেই দেখলাম, সুন্দরীদের প্রত্যেককে দেওয়া হল 'নম্বর-কার্ড'। নামগুলো ওদের হারিয়ে গেল। ওরা প্রত্যেকে তখন নম্বর। কারও আট, কারও দশ, কারও পাঁচ এইরকম আর কি! ওরই মধ্যে গ্রীনরুমে প্রত্যেক সুন্দরীর বক্ষদেশ, কটিদেশ ও নিতম্বদেশের মাপ নিয়ে নিলেন মহিলা বিচারক শ্রীমতী অলকা উকিল। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি প্রতিদ্বন্দ্বী সুন্দরীর সংখ্যা শেষে উনিশ দাঁড়ালেও তাদের সঙ্গে দেখলাম তাদের মোট প্রায় শ'খানেক সুন্দরী বান্ধবী। ওদের মধ্যে অনেকের নাম ছিল প্রতিযোগী তালিকায়; কিন্তু লজ্জায় হোক বা ভয়েই হোক, ওরা মঞ্চে নামেনি।

মঞ্চে এলো সুন্দরীরা। মঞ্চে অবতীর্ণ হওয়ার আগেই একের পর এক সুন্দরীদের সঙ্গে সেরে নিলাম সাক্ষাতকার। মিতা কর (১৯)। ওর বাড়ী ফকিরচাঁদ মিত্র স্ট্রীটে। এবার বি-এ (পার্ট-২)। ও নাচে। 'মিস-ইণ্ডিয়া' হতে চায়। এর আগে ও 'মিস্ ক্যালকাটা'য় নেমেছিল। ইয়োনো পোপ (১৮)। সেণ্ট টমাসে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে। 'এয়ারহোস্টেস' হতে চায়। এক রং কোম্পানীতে ও 'স্টেনোগ্রাফার'। বাসা ইলিয়ট রোডে। মঞ্জুরাণী সাহা (১৬)।

বাসা শোভাবাজারে। মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে দশম শ্রেণীর ছাত্রী। ঘর সাজানোই ওর 'হবি'। জয়শ্রী ব্যানার্জি (২২), বাসা বিডন স্ট্রীটে, এক প্রাইভেট ফার্মে টাইপিস্ট-অপারেটর। পড়ছে 'প্রি-ইউ'। সংঘমিত্রা ভট্টাচার্য (১৮)। বাড়ী ভি, আই, পি, রোডের ধারে নারায়ণতলায়। প্যারীচাঁদ গার্লস স্কুলে দশম শ্রেণীর ছাত্রী। তাপসী ঘোষ (১৮)। বি-কম পড়ছে। বাসা গড়পারে। মণিকা নন্দী (১৫)। বাসা গড়পারে প্যারীচরণ গার্লস্ স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। শুভ্রা লাহা (১৫) আর সোমা লাহা (১৩)। দুই বোন। একজন সরস্বতী বালিকা বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণী আর একজন বীণাপানি পর্দা গার্লস স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে। এইরকম ওরা সবাই। প্রায় সকলেই ওরা পড়াশুনো করছে বা করেছে।

মঞ্চে একে একে উনিশজন সুন্দরী এসে দাঁড়ালো। 'অডিটোরিয়ামে' সামনের সারিতে তিন মহিলা বিচারক সমেত দশজন বিচারকের দল বসে। 'হিট' বা প্রাথমিক প্রতিযোগিতা হল। তারপর হল 'ফাইন্যাল' বা চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা। চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার শেষে ষষ্ঠ থেকে শুরু করে একে একে প্রথম স্থান অধিকারিণী পর্যন্ত সুন্দরীদের নাম ঘোষণা করলেন বিচারক বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীমতী এ, জে, পেস এবং তার স্বামী মিঃ পেস। ষষ্ঠ স্থান লাভ করলো মিতা কেংক্রে (২১)। বাড়ী নিউ আলিপুরে। আগে ও ছিল মিতা ঘোষ। পরে এক মহারাষ্ট্রিয়ান ভদ্রলোককে বিয়ে করে কেংক্রে হয়েছে। শ্রীশিক্ষায়তনে বি-এ। পঞ্চম স্থান লাভ করলো মঞ্জু চ্যাটার্জি। ও ওর নিজের সম্পর্কে কিছু বলতে নারাজ। চতুর্থ হল রুপা চৌধুরী (২২)। বাড়ী বিধান সরণিতে। বিদ্যার্থীমণ্ডল বালিকা বিদ্যালয়ের 'এস-এফ'। ওর জীবনের সবচেয়ে বড় সাধ অভিনেত্রী হওয়া। তৃতীয়া হল সুমিত্রা চ্যাটার্জি (২৪)। বাড়ী পার্ক স্ট্রীটে। লরেটো হাউসে বি-এ পার্ট-১। ওর জীবনের সাধ 'এয়ারহোস্টেস' হওয়া। ইতিমধ্যে ও কিছুকাল এক বিমান সার্ভিসে 'গ্রাউণ্ড-হোস্টেসে'র কাজ করেছে। দ্বিতীয় স্থান লাভ করলো শৈবলিনী রায় (২০)।
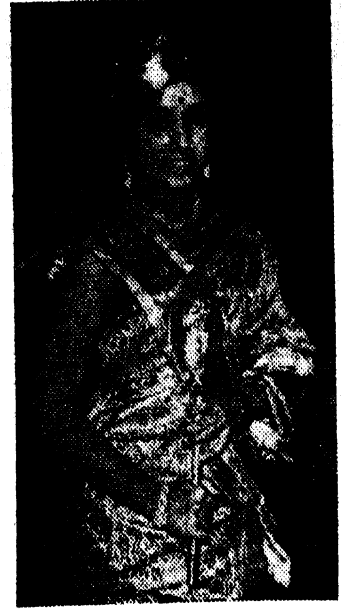
ও নিজেকে শৈবালী রায় বলেই পরিচিত করতে চায়। কিন্তু যে মুহূর্তে ওর কানে গেলো, শৈবাল মানে শেওলা আর শৈবলিনী হল নদী সেই মুহূর্তেই ও চীৎকার করে উঠলো, 'আমি শৈবলিনী......!' ওরও বাড়ী পার্ক স্ট্রীটে। চন্দননগরে সেণ্ট জোসেফে 'সিনিয়র কেম্ব্রিজ' শেষ করে এখন ও 'মডেলিং' আর অভিনেত্রী হওয়ার স্বপ্নে বিভোর। শৈবলিনীর দেহের মাপ ৩৪/২৬½/৩৬½।

'অডিটোরিয়ামে' গুঞ্জন উঠলো এবার। প্রথম কে? শ্রী ও শ্রীমতী পেস ঘোষণা করলেন প্রথম হয়েছে সবিতা মল্লিক। ষোড়শী সবিতার বাড়ী বিপ্রদাস স্ট্রীটে। নাচতে জানে, গাইতে জানে। জানে সাঁতার, যোগব্যায়াম, জিমনাস্টিকস ও অভিনয় করতে। 'পিওর সায়েন্স' নিয়ে একার 'হায়ার সেকেণ্ডারী' পরীক্ষা দেবে সবিতা। জিজ্ঞাসা করলাম, জীবনের সবচেয়ে বড় সাধ কি? সবিতা জবাব দিলো, 'ডাক্তার হবো!' কেন জানি না ওর 'ডাক্তার' হওয়ার কথা শুনে হঠাৎ মনে পড়ে গেলো বিশ্বসুন্দরী রীতা ফারিয়ার কথা। ওর মা ওকে যোগব্যায়ামে উৎসাহিত করেন। ওর বোন অনীতাও দিদির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যোগব্যায়াম করে। বঙ্গসুন্দরী মুকুটপরা সবিতাকে নিয়ে যখন সবাই ব্যস্ত, সেই ব্যস্ততার ভীড় ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসার পথেই পিছন থেকে ডাক শুনলাম—'শুনছেন!' পিছনে তাকাতেই যে সুন্দরীকে দেখলাম, তার নাম পারমিতা চ্যাটার্জি। এই একরাশ সুন্দরীর মধ্যে একমাত্র পঞ্চদশী পারমিতাই বললো, 'প্রতিযোগিতায় জিততে পারিনি, তাতে কি হয়েছে! আমি ঘর সাজাতে চাই। ঘর বাঁধতে চাই! সুন্দর বৌ হতে চাই...!'

সামনে পরীক্ষা

যাব যাব করে আর যাওয়া হয়ে ওঠে না। রোজই ভাবি বিকেলের দিকে দীপুদির ওখান থেকে একবার বেড়িয়ে আসব। কিন্তু বিকেল গড়িয়ে কখন সন্ধ্যা হয়ে যায় টের পাই না। সংসারের কাজের চাপে দম ফেলবার ফুরসৎ পাচ্ছি না। অথচ এই না যাওয়াটাও ভাল দেখাচ্ছে না। দীপুদি সেই কবে যেতে বলে গেছেন। তখন থেকে আজ যাব কাল যাব করে এতদিন ঠেকিয়েছি। আরো দেরি করলে দীপুদি হয়তো নিজেই একদিন এসে হাজির হবেন আর গালমন্দ করে একসা করবেন! তাই সেদিন সংসারের কাজকর্ম তাড়াতাড়ি মিটিয়ে দুপুরের একটু পরেই বেরিয়ে পড়ি। এতদিন দেরি করায় দীপুদি কতখানি রাগ করেছেন সারাপথ শুধু সেকথাই ভেবেছি। ভাবতে ভাবতে যখন তাঁর বাড়ির দরজায় এসে পৌঁছেছি তখনও আমার ভয় কাটেনি। অন্তত একটা জোর ধমক তো খেতেই হবে। দরজায় কড়া নাড়তেই দীপুদি দরজা খুলে দিলেন। সামান্য অনুযোগের স্বরে বললেন, এতদিনে যাহোক তবু তোর আসার সময় হলো। বাস, আর কিছু নয়। অথচ আমি কত আকাশ-পাতাল ভাবছিলুম।

দীপুদির সঙ্গে ঘরে ঢুকে দেখি তিনি তখন ছেলেমেয়েকে পড়ানোয় ব্যস্ত। ভাবলাম, বাঁচা গেল। ছেলেমেয়েকে পড়ানো ফেলে তিনি নিশ্চয়ই আমার কাছে এতদিন দেরি করে আসার জন্য কৈফিয়ৎ চাইবেন না। আমি তাই অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে দীপুদির পড়ানো দেখছিলাম। ছেলেমেয়ে পড়ছিল। তিনি শুধু লক্ষ্য রাখছিলেন। কখনো কখনো এটা-ওটা দেখিয়ে বা বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন।

দীপুদি ছেলেমেয়েকে নিজেই পড়ান। গোড়া থেকেই। ছেলেমেয়ের জন্য প্রাইভেট টিউটর রাখা তিনি খুব একটা পছন্দ করেন না। তাঁর কথা হলো, যতদিন পারি নিজেই দেখিয়েশুনিয়ে দেব। তারপর না হয় অন্য ব্যবস্থা করা যাবে। দীপুদির এই কথা আমার খুব মনঃপুত। ছেলেমেয়েদের যথাসম্ভব নিজেরই কোচ করা উচিত। প্রথম থেকেই প্রাইভেট টিউটরের হাতে ছেড়ে দিলে নিজের ছেলেমেয়ে সম্বন্ধে নিজেরই কোন ধারণা থাকে না। আমরা কিন্তু অনেকেই এই দায়িত্ব নিতে চাই না। সংসারের কাজের চাপ দেখিয়ে ছেলেমেয়েকে প্রাইভেট টিউটরের হাতে তুলে দিই। প্রাইভেট টিউটর হয়তো আসেন সকাল কিংবা সন্ধ্যায়। সেই যা ছেলেমেয়ের পড়াশোনা হলো। তারপর সারাদিন আর তাদের সম্বন্ধে আমরা খোঁজখবর নিই না। এদিকে পরীক্ষায় যদি রেজাল্ট খারাপ হয় তবে সব দোষ গিয়ে পড়ে প্রাইভেট টিউটরের ঘাড়ে। অথচ আমার ছেলেমেয়ে যে পড়াশোনায় কেমন তা আমার নিজেরই জানা নেই। মাঝখান থেকে দোষের ভাগী হয় বেচারা প্রাইভেট টিউটর। অপরকে দোষী করার আগে নিজের জানা উচিত ছেলেমেয়ে পড়াশোনায় কেমন। দীপুদি তাই সংসারের সব কাজ করেও ছেলেমেয়েকে নিজেই পড়ান।

আমি চুপ করে বসেছিলাম। দীপুদি ছেলেমেয়েকে অংক কষতে দিলেন। দু ভাইবোন একই ক্লাসে পড়ে। পড়ার সময় ওরা খুব একটা ঝামেলা করে না। মন দিয়ে পড়াশোনা করে। কোন কিছু আটকে গেলে মায়ের কাছে জেনে নেয়। এসব আমি আগে থেকেই জানতাম। আর ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার সময় দীপুদি কারো সঙ্গে কোন কথাও বলেন না। আমাদের অনেকের অভ্যাস ছেলেমেয়েকে পড়াতে বসিয়ে সেলাইয়ের কাজ করা অথবা উল বোনা। দীপুদি তাও করেন না। তিনি বলেন, ছেলেমেয়ে তাহলে মায়ের অমনোযোগের সুযোগ নেয়। পড়ায় ঠিকমতো মন দেয় না। যখন ছেলেমেয়েকে পড়াতে বসব তখন শুধু পড়াবই। অন্য কাজ নয়।

অংক কষা হয়ে যাওয়ার পর দীপুদি ওদের ছুটি দিলেন, দুজনে একটু খেলে এস। খুব বেশি দেরি করবে না। ছেলেমেয়ে মায়ের কথা শুনে বইপত্তর গুছিয়ে হাসিমুখে বেরিয়ে গেল। এবার দীপুদি পড়লেন আমাকে নিয়ে, আর কয়েকদিন পরেই ওদের অ্যানুয়াল পরীক্ষা শুরু হবে। তাই এখন সকাল, সন্ধ্যা আর দুপুর এই তিনবেলাই নিয়ে বসতে হচ্ছে। সকাল আর সন্ধ্যায় খুব একটা সময় পাই না। রান্নাবান্না থাকে। এ সময় অনেকখানি অবসর পাওয়া যায়। স্কুল থাকলে দুপুরটা আমি ঘুমিয়ে কাটাতাম। কিন্তু এখন আর সে অবসরও নেই। আর যা ছেলেমেয়ে হয়েছে মোটে পড়তে বসতে চায় না। জোর করে বসাতে হয়। এইতো খাওয়াদাওয়ার পর ওদের বই নিয়ে বসতে বললাম তা কেউ বসলো না। মেয়ে বসলো পুতুলের বাকস খুলে আর ছেলে গেল পাশের গলিতে ক্রিকেট খেলতে। আমার তখনো সব কাজ সারা হয়নি। এসে দেখি কেউ নেই। ডাকাডাকি করে তারপর দুজনকে নিয়ে বসি। পরীক্ষা যাদের তাদেরই হুঁশ নেই। এ যেন আমারই পরীক্ষা। আর যদি প্রাইভেট টিউটর রাখতাম তাহলে কি অবস্থা হতো বলতো! যখন মাস্টারমশাই আসতেন তখনই পড়া আর বাদবাকি সময় খেলা।

ইদানিং প্রায় সকলের কাছে একই অভিযোগ শুনতে হয় যে, ছেলেমেয়েরা পড়াশোনায় ভীষণ অমনোযোগী হয়ে পড়েছে। আগেও এরকম কথা শুনেছি। ছেলেমেয়ের সম্বন্ধে অনেক মা-বাবাই এই অভিযোগ করেন। তবে এমন ব্যাপক আকারে কখনো শুনিনি। এখন প্রায় সব মা-বাবার মুখে একই কথা। অন্তত কয়েক বছর আগেও তো দেখেছি সারা বছর যা হোক পরীক্ষার সময় সবাই ঘাড় গুঁজে পড়াশোনা করে। বাচ্চা ছেলেমেয়ের কাছ থেকে অবশ্য অতটা আশা করা যায় না এবং তা সম্ভবও নয়। কারণ, পড়াশোনার গুরুত্ব সঠিক উপলব্ধি করার বয়স ওদের নয়। ওরা খেলাধুলো করতেই ভালবাসে। আর এমনিভাবেই ওদের পড়াশোনায় মন ঘোরাতে হয়। তবুও এমন অভিযোগ সকলের কাছ থেকে শুনতে হয়নি। এমনকি দীপুদির কাছেও।

আমি দীপুদিকে একটু উসকে দিই, তা ছেলেমেয়েরা একটু এরকম হয়।

দীপুদি কিঞ্চিৎ উত্তেজিত বোধ করেন আমার কথায়। সে মনোভাব যথাসম্ভব চেপে উত্তর দেন। এখন আর একটু আধটু নয়। সবাই একইরকম। আর হবে নাই বা কেন! বছর দুয়েক যা অশান্তি গেল।

পড়াশোনার পাট তো প্রায় চুকে যেতেই বসেছিল। স্কুল হয় না, পরীক্ষা বন্ধ। আর এরকম হলে কোন ছেলেমেয়েই বা পড়াশোনা করতে চায়। আমরা তো ধরে নিয়েছিলাম, স্কুল-কলেজ আর কোনদিন খুলবেই না। তখন ছেলেমেয়েকে পড়ার জন্য তেমন জোর করতে পারিনি। সে অভ্যাসটাই এখন পাকাপোক্ত হয়ে গেছে। স্বাভাবিক অবস্থা আবার ফিরে এসেছে। স্কুল-কলেজ চালু হয়েছে। এবং উপযুক্ত পরিবেশে পরীক্ষাও হচ্ছে এবং হবে। কিন্তু ছেলেমেয়ের সেই অমনোযোগ কাটানো যাচ্ছে না কিছুতেই। আর এই ত্রুটি হলো আমাদের মজ্জাগত। বিদেশীদের কাছ থেকেও আমরা খারাপটাই নিয়েছি ভাল জিনিস তেমনভাবে নিতে পারিনি। এবং সাম্প্রতিক এই অশান্ত পরিবেশের সুযোগ নিয়ে পড়াশোনায় অমনোযোগ এমনভাবে আয়ত্ত করেছে যে আগেকার মনোযোগের কথা তারা ভুলে বসে আছে।

গত বছর দুই আড়াইয়ের ঘটনা শিক্ষা শিক্ষাক্ষেত্রে এক বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি করেছে। খুব সহজে তা পূরণ হবার নয়। অনেক চেষ্টা আর যত্নে আবার আমাদের সেই পুরোন ছিন্দুতে পৌঁছুতে হবে। এছাড়া আর একটা কারণও বোধহয় এজন্য দায়ী আর তা হলো আমাদের স্কুল-কলেজের ছুটি এবং পরীক্ষা। দুটো প্রায় একই সঙ্গে চলে। ছুটি শেষ হলেই পরীক্ষা। এবং পরীক্ষা শেষ হলেই পড়া। মাঝে কোন ফাকফোকর নেই। ছেলেমেয়েদের একটু নিশ্চিন্দ বিশ্রামের সুযোগ নেই। ছুটি যে ছুটোছুটি করে অথবা ঘুরে বেড়িয়ে কাটাবে তার কোন উপায় নেই। আমাদের দেশে পরীক্ষা যেন ছুটিকে তাড়া করে ফেরে।

অবশ্য কেউ কেউ বলতে পারেন যে, আগাগোড়াই তো এরকমই হচ্ছিল। আর তখন তো এতো বায়নাক্কা শোনা যায়নি। তাঁদের জ্ঞাতার্থে শুধু একটা কথাই বলবো যে, তখন দিনকাল একরকম ছিল আর এখন দিনকাল অন্যরকম। তখন ছেলেমেয়েকে পড়ার জন্য খুব একটা তাড়া করতে হতো না। অনেকটা নিজের গরজেই তারা পড়তে বসতো। কিন্তু এখন আব তেমন একটা বড়ো দেখা যায় না। অনেক ক্ষেত্রেই চোখ রাঙিয়ে ছেলেমেয়েকে বইপত্তর নিয়ে বসাতে হয়। তাই এমন যে আমার দীপুদি তাঁকেও ছেলেমেয়ের পড়াশোনার জন্য ভাবতে হয়।

তবে ছুটি আমাদের ছেলেমেয়েদেরও আছে। আর সেটা হলো অ্যানুয়াল পরীক্ষা শেষ হবার পর। এসময়টা ছেলেমেয়ের অখণ্ড অবসর। যত খুশি খেল আর আনন্দ কর কেউ মানা করবে না। আর দীপুদির তো প্রতিবারের প্রোগ্রাম ছেলেমেয়ের পরীক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোন জায়গা থেকে দিন দশেকের জন্য ঘুরে আসা। আমি তাই শুধোই, এবার কোথায় যাচ্ছ দীপুদি?

দীপুদি হেসে উত্তর দেন, এবার ওদের ছোট মাসির বিয়ে। ছেলেমেয়ের পরীক্ষা মিটলে তাই বাপের বাড়ি যাব। বিয়ের দিন ঠিক হয়েছিল আরো আগে। শুধু আমার জন্যই পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কথায় কথায় বিকেল গড়িয়ে আসে। উঠতে যাব এমন সময় দীপুদি বললেন, চল একসঙ্গেই বেরোন যাক। আমি একটু ডাক্তারখানায় যাব। কদিন থেকে মনু আর বুলু দুজনেরই খুব সর্দিকাশি হয়েছে। চেঞ্জ অব সিজনে এরকম হয়েই থাকে। অন্য সময় হলে ততটা গা করতাম না। কিন্তু পরীক্ষার মুখে যদি বাড়াবাড়ি হয় তাই একটু ওষুধ নিয়েই আসি। আর ছেলেমেয়ের পড়াশোনা থেকে পরীক্ষা সব কিছুতেই মায়ের দায়িত্বই সর্বাধিক। ওদের বাবারা তেমন মাথা ঘামান না। সারাদিন বাইরে বাইরে থাকেন সুযোগও পান না। পড়াশোনা থেকে ডাক্তার বদ্যি সব মায়েদেরই করতে হয়।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোকে তো এসব ঝামেলা পোয়াতে হয় না। একটিমাত্র ছেলে তাকেও দিয়ে রেখেছিস বোর্ডিং-এ। মনু আর বুলু আর একটু বড় হলে আমাকেও তাই করতে হবে।

দীপুদির সঙ্গে চোখাচোখি হতে আমরা দুজনেই হেসে উঠি।

—প্রমীলা

আজকের জিজ্ঞাসা

ইদানীংকালে আধুনিকারা অধিকাংশই বিবাহিত জীবনে পশ্চিমীদের অনুকরণে স্বামী ও শিশুসন্তানদের নিয়ে পৃথক সংসার গড়ে তুলতে আগ্রহী। আগেকার সেই যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবারের আকর্ষণটা কমে গিয়েছে। এই কমে যাওয়ার মূলে অবশ্য অনেক কারণ আছে। বর্তমানে মানুষের চিন্তা-ভাবনা, রুজি-রোজগারের পথ অনেকটা বদলে গিয়েছে। আর বদলে গিয়েছে কাজের অবসরে পান চিবিয়ে দুপুরের বিশ্রামটাকে গল্পগুজবে কাটিয়ে দেওয়ার চিন্তা। ঠাকুমা দিদিমা বলি কেন মায়েদের মত ঘরকন্নার কাজে আজকালকার মেয়েদের মন ভরে না। বিশ্রামের অবসরটুকুতে তাঁদের কত কাজ। বাইরের কাজের জন্য তাঁরা আর পুরুষদের অত মুখাপেক্ষী নয়। যতটা সম্ভব নিজেরাই করে নেন। তাছাড়া বিজ্ঞান দিয়েছে তাঁদের বিরাট সুযোগ-সুবিধা। গ্যাস জ্বালিয়ে, কুকার চাপিয়ে কত অল্প সময়ে তাঁরা ঘরকন্নার কাজটি সমাধা করেন। বিশেষ করে অফিস আদালতে যে মেয়েরা কাজ করেন প্রায় সকলেই এ দুটোর ব্যবহার বেশি পছন্দ করেন। শুধু পছন্দ নয়, ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছেন কারণ অফিস যাবার ফাঁকেই তাঁদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পৌঁছে দিতে হয়। সংসারে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই প্রধান। দুজনেই প্রায় চাকুরীজীবি। এই দুজনকে সাহায্য করতে কাজের লোক ছাড়া আর তৃতীয় ব্যক্তি নেই। বিজ্ঞান তাঁদের যত সাহায্যই করুক এতে তাঁদের পরিশ্রম আর চিন্তার কি খুব লাঘব হচ্ছে?

চাকুরীজীবি প্রত্যেককেই প্রায় ভাবতে হয় ছেলেমেয়েদের ছুটির পর কাজের লোক ছাড়া আপনজনের সঙ্গীহীনতার কথা। ভাবতে হয় তাদের খাবার কথা। কোথায় গেল, কার সঙ্গে মিশলো এ দুশ্চিন্তাও তাঁদের অস্থির করে তোলে। আপনজনের অসাক্ষাতে ছোটরা অনেক সময়েই বেপরোয়া আচরণ করে। মাইনে করা কাজের লোক সেসব ঝক্কিঝামেলা এড়াবার জন্য বাচ্চাদের স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হয়। ফলে শিশুদের ভবিষ্যৎ বাল্যকালেই কেমন অস্বাভাবিক ও অসামাজিক হয়ে গড়ে ওঠে। পিতা-মাতা ও আত্মীয়স্বজন থেকে দূরে বসবাস করে সংসারের প্রতি আকর্ষণ ও মোহ অনেকটা কমে যায়। পরবর্তী জীবনে এর বিষময় ফল আমাদের সমাজজীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

সারাদিনের ক্লান্তির পর ধৈর্যসহকারে সন্তানদের আদর-আবদারের দিকে মনোযোগ দেওয়া; লেখাপড়া বা স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য দেওয়া এ দুটোর অভাবই অধিকাংশ মায়েদের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। এসব লক্ষ্য করে জনাকয়েক চাকুরীজীবি মহিলাদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলাম। সর্বপ্রথমেই নন্দাদিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'শ্বশুরশাশুড়ী থেকে পৃথক হয়ে তিনজনের সংসার চালাতে কেমন লাগছে?'

নন্দাদি একটি অফিসে চাকুরী করেন সেই সুবাদে সকাল ন'টার ভোঁ বাজতেই ছুটতে ছুটতে বাস ধরতে হয়। ছোট ছেলেটাকে কোনমতে দুটো মুখে গুঁজিয়েই স্কুলের ব্যাগটাকে কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে গরুর মতো হ্যাট্, হ্যাট্ করতে করতে স্কুলে পৌঁছে দেন। পথিমধ্যে ছেলের বিন্দুমাত্র বাসনাকে চরিতার্থ করার সুযোগ নেই। না থাকাই স্বাভাবিক। নন্দাদি নিজেই বহুদিন সময়ের অভাবে ভাত খাবার সুযোগই পান না।

এতসব অসুবিধার কথা নন্দাদিকে বলতে তিনি বললেন, 'এই বেশ আছি পৃথক হয়ে। আনকালচারড্ শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে বসবাস নরকবাসের সামিল।' কথাটা শুনে আমি বোবা হয়ে গিয়েছিলাম। ইতিপূর্বে শ্বশুর-শাশুড়ীর বিরুদ্ধে এত রূঢ় অভিযোগ শুনেছিলাম বলে তো স্মরণ হয় না।

বিয়ের কিছুদিন পরেই নন্দাদি শ্বশুরবাড়ীর নিন্দায় সোচ্চার হয়েছিলেন। তাঁরা নাকি নন্দাদিকে মোটেই মানিয়ে নিতে চান নি। নন্দাদিও কস্মিনকালে তাঁদের সঙ্গে সদ্ভাব রাখতে চেষ্টা করেন নি। পৃথক একা সংসারের দিকে নন্দাদির বরাবরই ঝোঁক। নন্দাদি অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে যৌথ পরিবারের নিন্দা করলেন। বললেন, 'একলা ঘরে আমার ছেলেকে বেশ মনের মতো মানুষ করবো। একান্নবর্তী পরিবারে থাকলে আমার ছেলে হয়তো সকলেরই দোষগুলো রপ্ত করতো।' তারপর আক্ষেপের সুরে বললেন, 'কাজ থেকে ফিরে নিজে হাতে খাবার নিতে চোখ ফেটে জল আসে। তখন মনে হয় ননদ, শাশুড়ী থাকলে ভালই হত।'

নন্দাদির ছ'বছরের ছেলে সকলের দোষ রপ্ত করা থেকে মুক্তি পেয়ে সে যে কোন লোকের সঙ্গে সহজভাবে মিশতে শিখলো না সেটা নিশ্চয়ই একা সংসারের একটা মহৎ গুণ!

কিছুদিন বাদে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাতেই সবিতাদির বাড়ী গিয়েছিলাম। রাশভারী মহিলা অথচ হাসিখুশী। বিরাট একটা কোয়ার্টারে স্বামী-স্ত্রী আর তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে সচ্ছল সংসার। শুধু সবিতাদির মনে খুব একটা সুখ নেই। এবারের বিজয়াপর্ব সমাধা করতে গিয়ে সবিতাদির সেই অসুখী মনটার কারণ জানতে পারলাম।

পুজো উপলক্ষে সবিতাদির বাড়ী বেশ জমজমাট ছিল। প্রবাসী ননদ, ভাসুর, দেওরেরা এই একটা উৎসবকে কেন্দ্র করে সবিতাদির বাড়ীটা জমজমাট করে রেখে-ছিল। এই জমজমাটটুকুকে কেন্দ্র করে সবিতাদি বেশ আমোদ আহ্লাদে মেতে উঠেছিলেন। ছুটি শেষ হলে সকলেরই প্রস্থানের সময় হল। সবিতাদি ওদের চলে যাবার পরেই অসম্ভব একলা বোধ করেন। মাঝে মাঝে আক্ষেপে বলেন, 'এই এক হাল হয়েছে আজকালকার। সকলেই কেমন একা একা, তাই অন্তরের টানটাও কম। কেন আর দুটো দিন বেশী ছুটি নিয়ে আমার কাছে থাকলে কি হতো?'

আমি সুযোগ বুঝে বললাম, 'কেন এই তো ছিমছাম নিজের পছন্দমতো সংসার করছেন। কোন রেষারেষি, কথা কাটাকাটি নেই, নিশ্চিন্ত আরামে আছেন।'

সবিতাদি আমার ব্যাখ্যায় ক্ষুব্ধ হলেন। ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন, "আজকাল 'আমার' 'আমার' চিন্তাটাই কাল হয়েছে। একসঙ্গে মিলেমিশে থাকার সেই সহনশীলতা, আনন্দ সেটা আর বুঝবে কেমন করে। আমরাও তো কাকা-জ্যাঠা কত ভাই-বোনের সঙ্গে মানুষ হয়েছি। মনোমালিন্য তাই থাকুক, আন্তরিকতা ছিল অনেক বেশী। কম আর বেশি যাইহোক সকলে মিলেমিশে ভোগ করার আনন্দ, একা পৃথক, ছোট সংসারের পক্ষপাতীরা বুঝবেন কেমন করে! দেখ না আমাদের সহনশীলতার কত অভাব। ট্রামে-বাসে কে কাকে গুঁতো দিল তাই নিয়ে কুরুক্ষেত্র বাধার উপক্রম। কষ্ট করে সকলে মিলেমিশে থাকতে তো আর আজকালকার মানুষেরা পছন্দ করে না।'

সবিতাদির যে কর্তব্যবোধ, দায়িত্ববোধ, মিলেমিশে থাকার যে আগ্রহ তার অভাবেই বোধহয় সব থেকেও তিনি নিঃসঙ্গ, বিমর্ষ।'

সবিতাদি শুধু ঘরকন্নার কাজেই ব্যস্ত। বাইরের জগতে তাঁকে কমই বেড়োতে হয়। তাঁর পক্ষে একান্নবর্তী পরিবার খুব সহজেই কাম্য হতে পারে। কিন্তু নয়নাদি। স্কুলে বারো বছর ধরে শিক্ষকতা করছেন। দুটি সন্তানের জননী নয়নাদি তো শ্বশুরবাড়ীর সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলেছেন।

নির্দিষ্ট সময় বাদ দিয়েও তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে বাইরে খানিক গল্প-গুজব করে কাটাতে বিন্দুমাত্র অসুবিধাবোধ করেন না। তিনি জানেন যৌথ পরিবারে তাঁর সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণের লোকের অভাব হবে না।

আসলে যৌথ পরিবার, ইংরাজীতে যাকে বলে জয়েণ্ট ফ্যামিলি, তার জন্য মানসিকতার প্রয়োজনও অনেকাংশে। প্রাচীনকালের লোকেদের মতো দৃঢ়তা, সহনশীলতা, আন্তরিকতার একান্ত অভাবই বোধহয় আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে পাল্টে দিচ্ছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির পরি-বর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সুবিধা হয়তো অনেকটা ভোগ করছি, কিন্তু যৌথ পরিবার বিমুখতার কুফলও পরিবারের সমাজের অনেকক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হচ্ছে। অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হবে অর্থ-নৈতিক বিপর্যস্ততাই যৌথ পরিবারে আনছে বিরাট ভাঙ্গন। বাসস্থানের স্বল্পতা, দূর দূর দেশে, কর্মক্ষেত্রে, এগুলোতে আত্মসর্বস্ব চিন্তা ছাড়া উদার চিন্তা করার সুযোগ কোথায়? যৌথ পরিবারে বসবাস করে শাশুড়ী বৌয়ের কোন্দল, ভাই-এ ভাই-এ লাঠালাঠি, ভাজে-ননদে ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব, জায়ে জায়ে চুলোচুলি করার চেয়ে ছোট ছোট সংসারে পৃথক হয়ে সদ্ভাব রক্ষা করা মন্দ কি? তবুও যখন প্রবীণদের মুখে এক ডালায় মুড়ি মেখে দশজনে ভাগ করে খাবার গল্প শুনি তখন আমাদের মনটা কেমন উদাস হয়ে এক প্রাচীন কল্পলোকে ঘুরে বেড়ায়।

—অঞ্জলি চৌধুরী
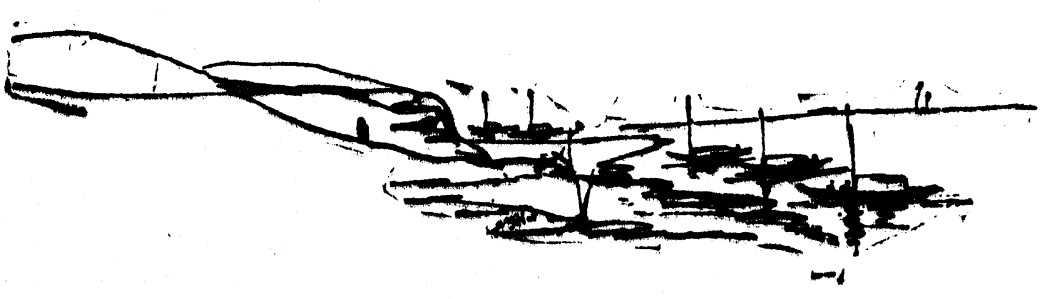
গাঁয়ের নাম তিলফুল।

সদর কৃষ্ণনগর থেকে চল্লিশ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে সরকারী সড়ক ডিঙিয়ে তিলফুলের নিশানা ছুঁয়ে বরাবর বাস যাবে রাণীচক অবধি। বাসপথ থেকে কাঁচারাস্তায় ক্রোশখানেকের পথ বটে গাঁয়ের বাজার। গরুর গাড়ি নয়ত হাঁটাপথে মানুষজন চাষাভুসো শহর থেকে হামেশাই এ অঞ্চলে যাতায়াত করে।

গায়ত্রী কিন্তু তিলফুল গাঁয়ে চলেছেন কৃষ্ণনগর থেকে ট্যাক্সি ভাড়া করে। দিগন্তজোড়া খেত-খামার বোশেখের আগুনে ধুঁকছে। ফুটিফাটা মাটির জ্বলন্ত নিঃশ্বাস বাতাসের গায়ে। তার ওপর রয়েছে মোটরইঞ্জিনের তপ্ত হলকা। মোটরের আওয়াজ যেন মাটির করুণ আর্তনাদের মত—প্রাণহীন রুক্ষ জীবনে শুধু খরাই একমাত্র সত্য। ক্লান্ত চোখ মেলে গাড়ির পেছনের সিটে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসেছিলেন গায়ত্রী।

শহর থেকে গাঁয়ের পথ এমন কিছু দূরদূরান্ত নয় কিন্তু দীর্ঘ বছরগুলোর পদচিহ্ন যেন এবড়োখেবড়ো মাটির গায়ে সাঁটা। এই রাস্তা, গাছপালা, মাটি আর তার অশান্ত নিঃশ্বাস গায়ত্রীর জীবনে বুঝি এক বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায়, একে চিনতে ভুল হয়, ভাবতেও ভয় করে। কারণ আর কিছু নয়, দীর্ঘ তিরিশ বছর বাদে বাপের বাড়ি চলেছেন গায়ত্রী।

কালাপাড় ফরাসডাঙ্গা শাড়ী আর আদ্দির জামায় তাঁকে কেমন মোমের পুতুলের মত মনে হচ্ছিল। শুধু বাইরের তাপে মুখটা একটু আরক্ত। ঘোমটা টানার ভঙ্গীটি বিচিত্র—যেন এই ক'দিনের নতুনবৌ। সরু নাক, চোখ দু'টি মাঝারি কিন্তু চোখের এক ধরণের নিরাসক্ত ভাবে কোথায় যেন রহস্যের ছোঁয়া লেগে রয়েছে।

চওড়া সরকারী সড়কে বাসপথ ডিঙিয়ে কাঁচা রাস্তায় গাড়ি বাঁক নিল। অনেকগুলো চালা-ঘরের জটলাকে ছুঁয়ে গাড়ি দৌড়তে থাকে। কবেকার কথা সেই তিরিশ বছর আগে এই পথ দিয়ে নববধূ শ্বশুরবাড়ি গেছেন, মনে করতে তাঁর ঠোঁটে চাপা বিদ্রূপ খেলে যায়। যাওয়া নয় মানে গ্রাম থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। কেউ কি ভাবতে পারে একটা পনের বছরের

মেয়েকে ঢাক ঢোল পিটিয়ে দেশছাড়া করতে পারে কারও আপন জন? সেই গাঁয়েই আবার ফিরছেন! আশ্চর্য। মানুষের জীবনে কতই না ঘটে।

সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে চৌধুরী পরিবারের নায়েবের ছেলে মানিক। ও কৃষ্ণনগরে পড়ে। কথায় কথায় ইংরেজী বুকনি ঝেড়ে সে যে মোটেই গ্রাম্য নয় সে কথা প্রমাণ করবার চেষ্টা করে। গাড়ি গাঁয়ের কাছাকাছি আসতে মুখ ফিরিয়ে বলে—বাপের বাড়ির দেশে পৌঁছানর চেয়ে চাঁদে যাওয়া ঢের সোজা তাই না পিসীমা?

গায়ত্রী একটু হেসে মাথা হেলান।

ওর মনের ভাব বুঝতে না পেরে মানিক স্বগতোক্তি করে—

—আপনারা হাজার হলেও রাজা মানুষ। আমাদের এই হতভাগা দেশে......

গাড়ির আওয়াজেও প্রতিবাদের সুর শোনা যায়—

—খুব কথা জান ত বাবা। তবে রাজা গড়ে আর কি হবে? এ যুগে ত প্রজার।

মানিক কি বুঝল জানে না। হিহি করে হেসে বলে—এই যে এসে গেছি। দেখুন দিকি স্বরূপেশ্বর ঠাকুরের থান। ঐই বাবার মন্দির। আর ঐ দূরে মস্ত গেট জমিদারবাবুদের বাড়ি পিসীমা আপনার বাপের বাড়ীর......

মা বললেন—ঠিক তোর মত না আর কেউ?

প্রণাম করে মার বুকে মাথা রেখেও গায়ত্রীর মনে হল—কি আশ্চর্য মা তার সঙ্গে পরিহাস করছেন কেমন করে? মায়ের গলায় অভিযোগ বা অভিমানের সুর ত ফুটে উঠছে না।

মেয়ে মুখ তুলে সটান জবাব দেয়—বলিহারি তোমায়। তিরিশ বছর পর আমার মাকেও পাল্টে দিলে? মার সঙ্গে যেদিন শেষ দেখা সেদিন তাঁর লক্ষ্মীপ্রতিমার মত চেহারাখানা আর আজ এই জরাগ্রস্ত বৃদ্ধার মধ্যে মায়ের সান্নিধ্যের উত্তাপ কোথায়? গায়ত্রী অনুভব করেন শুধু মা নয় তিনি নিজেই আজ কতো পাল্টেছেন। নইলে কোথায় সেই অভিমান আর যন্ত্রণার জ্বালা যা তাঁকে ভুলিয়ে দিয়েছে তাঁর আবাল্যের চেনাজানা তিলফুলে গ্রাম, তাঁর মা বাবা, ভাই বোন......

কিন্তু তিরিশ বছর বড় কম নয় আর বয়সে বড় ভয়ানক জিনিস, চাপা বারুদে বিস্ফোরণ হয় আবার কখনও তা ছাই হয়ে যায়। মনের অনুভূতিগুলো ঠিক সেই রকম।

তিরিশ বছর আগেকার যে সুতীব্র ঘৃণা ও অভিমান নিয়ে গ্রাম ছেড়েছিলেন আজ তিরিশ বছর বাদে হঠাৎ সেই দেশের প্রতি আকর্ষণের তীব্রতায় গায়ত্রী দিল্লী থেকে বাঙলাদেশের এই অখ্যাত গাঁয়ে ছুটে এসেছেন।

উঁচু তক্তপোষের নিচে উপুড়করা কাঁসা পিতলের ঝকঝকে বাসন। আমকাঠের সিন্দুকটার গায়ে সিঁদুরের আঁচড়। একটা পুরোন গন্ধ যেন বেড়াজালে জড়িয়ে রেখেছে। কুলুঙ্গীতে লক্ষ্মীর পট ঠিক যেমনটি এ ঘরে ছিল তিরিশ বছর আগে। শুধু দেয়ালে সংযোজন হয়েছে বাবার একটি ছবি। তার পাশে বাঁধান রয়েছে বাবার মৃত্যুর পর লাল আলতায় ছাপ মারা তাঁর চরণযুগল। ছবিতে মাথা ঠেকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলেন গায়ত্রী। শুধু পিতৃবিয়োগের বেদনা হয়ত চোখের জলে মেশামেশি ছিল না তার সঙ্গে আরও কি ছিল অভিমান নয়ত আর কিছু।

ঠক্‌ঠক্‌ করে মা তাঁর হাড়-গোড়বারকরা হাতটা মেয়ের পিঠে রেখে ফিসফিস করে বললেন—মনে করে কর্তার ওপর অভিযোগ করিস না মা আজ। উনি তোকে যত শাস্তিই দিন বর নিয়েছেন তার চেয়ে শতগুণ নইলে"...

গায়ত্রী সুখের নিঃশ্বাস ছাড়েন।

তাঁর মত শান্তির নীড় কজনের আছে। তিরিশ বছর ধরে যে মানুষটির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে রয়েছেন তাঁর চেয়ে আর কেউ আপন হতে পারত একথা আজ ভাবাই যায় না।

বৈশাখী-পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে আকাশে। জানলার বাইরে আগাছা আর জঙ্গলে ঘের পোড়ো বাড়িটাকে কেমন অচেনা লাগে। কিন্তু উঠান ডিঙিয়ে সেই বকুলগাছটা কোথায়। গায়ত্রীর হঠাৎ কেমন সব ভুল হয়ে যায়। ও গাছের সঙ্গে যে তাঁর ভাগ্য এক নিবিড় সূত্রে গাঁথা।

মা মনের ভাব বুঝতে পেরে বললেন—সব ওলটপালট লাগছে তাই না? আসলে বকুলগাছটা সেইবার মাঘ মাসের ঝড়ে পড়ে গেল। এ পাড়ার কত ভারী ভারী আম, জামের ফলন্ত গাছ যে গেছে সেই ঝড়ে।

গায়ত্রী স্পষ্ট দেখতে পান বকুলফুল টুপটুপ করে ঝরে পড়ছে রাতভোর। এখনও তার গন্ধ মৌ মৌ করছে। স্মৃতিসায়রে ভেসে ওঠে একটি কিশোরী মুখ। তিন দিন তিন রাত্তির সেই গন্ধভরা বকুলগাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাবা তাকে বেঁধে রেখেছিলেন।

বকুলগাছের কথায় মায়ের মনেও পূর্বস্মৃতি হঠাৎ বুঝি ঝলসে ওঠে। বললেন—তা বাপু কর্তার ছিল চণ্ডাল রাগ। নিজের মেয়েকে এমন শাস্তি কেউ দেয় নাকি কস্মিন কালেও শুনিনি এমন কথা।

পাশাপাশি আর একটি মুখ অস্পষ্ট মনে পড়ে। আশ্চর্য মণিময়কে ভুলেই গেছেন গায়ত্রী। এমন কি আজ এই মুহূর্তে ঠিক সেদিনের সেই চেহারায় মণিময় সামনে এলেও ঠিক তাকে চিনে উঠতে পারবেন না। অথচ তাদের নিয়ে ছোট্ট একটি ব্যাপারে আলোড়ন উঠেছিল। ওদের গেটের উলটো দিকে ইস্কুলবাড়ির লাগোয়া দোতলা বাড়িটায় মণিময় নামে কলেজের এক স্বদেশী ছোকরাকে পুলিশ ইনটার্ণ করে রেখেছিল কিছুকাল। কেমন করে কবে ওদের আলাপ হয়েছিল তারপর ঘনিষ্ঠতা। ক্রমশ কাঁচাবয়সের রঙিন আকাশে অনেক তুলির আঁচড় কাটতে থাকে। আর চৌধুরীবাড়ির একটি কিশোরী মেয়ে স্বপ্ন দেখে বোমা, পিস্তল ও সন্ত্রাসের মাঝে একটি মানুষ তাকে ক্রমশই বেঁধে ফেলছে। সে মণিময়। চৌধুরীবাড়ির পাঁচিল গেটের সাধ্য কি তাকে দূরে সরিয়ে রাখে।

খবরটা পল্লবিত হয়ে রাষ্ট্র হতে দেরি হয় নি। শুনলেন গায়ত্রীর বাবা। ভাবলেন ছেলেটার লাশ ফেলে দেবেন নাকি নদীর জলে? না অতদূর বেআইনী কাজ তিনি করেন না। প্রথমটা খেসারত দিতে হল নিজেকে। তার অর্থ নিজের মেয়েকে ঐ বকুলগাছের সঙ্গে বাঁধলেন নির্মমভাবে। তারপর থানায় গেলেন দারোগাবাবুর খোঁজে। দুজনে চুপিচুপি কি এক পরামর্শের পর আইনভঙ্গের অপরাধে মণিময়কে বেশ কয় বছর জেলে আটকে রাখা হল।

তিন দিন তিন রাত সেই বকুলগাছে বাঁধা পড়ে যেন বিকারের মধ্যে ধুঁকতে থাকে সেই মেয়েটি। রাত আসে, রাত ভোর হয়। বকুলফুল টুপটুপ করে ঝরে পড়ে তার সারা অঙ্গে। মাঝরাতে আধখানি চাঁদ বকুলগাছের পাতার ঝালরে উঁকি দিয়ে বলে—'কি গো মেয়ে মনের দাহ ঘুচল নাকি।'

সাত দিনের মধ্যে চৌধুরীবাড়িতে সানাই বাদ্যি বাজল। কলকাতা থেকে খুঁজেপেতে মানী ঘরের গুণী বর জোগাড় করে ফেললেন গায়ত্রীর বাবা। কনের গা-গতরের ব্যথা তখনও জুড়োয় নি। বিয়ের পিঁড়িতেই সে ক্ষণে ক্ষণে ঝিমিয়ে যেতে থাকে।

ঘটনাটা যারা দেখেছে যারা শুনেছে তারা গল্প করেছে অন্যকে। ক্রমশই বুড়ো-বুড়ীরা একে একে মারা গেছে। তাদের মুখের গল্প কাহিনী হয়ে তিলফুলে গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। গায়ত্রী এখন আর চৌধুরীবাড়ির কন্যে নন। তিনি যেন রূপকথার এক রাজকন্যে। ওরা গায়ত্রীর অপমানে অপমানিত, ওর যন্ত্রণায় বেদনা বোধ করে।

নয়নবৌ গায়ত্রীর সব ছোট ভাইটির বউ। বিয়ে হয়ে এসে অবধি সে শুনে এসেছে তার এই ননদটির কথা। বয়সের ভার বড় কম নয়নবৌয়ের। দুচোখে অপরিসীম বিস্ময় নিয়ে সে গায়ত্রীকে দেখে আর ভাবে এমন রাজরাণীর মত মেয়েকে কি কেউ প্রাণে ধরে শাস্তি দিতে পারে।

কিন্তু তিরিশ বছর আগেকার বৃত্তান্ত বড়রাই ভুলে গেছে। নয়নবৌর বয়েস কম। ভাবে আহাগো...দিদির মনে সব স্মৃতিই বুঝি ধুয়ে মুছে গেছে।

একলা পেয়ে প্রগলভতা চাপতে না পেরে বলেই বসে—তিরিশ বছর মা বাপের কথা কেউ ভুলে থাকতে পারে?

আলতোভাবে নিঃশ্বাস ছেড়ে নয়নবৌর পিঠে হাত রাখলেন গায়ত্রী।

ম্লান জোছনায় সমস্ত চত্বরটা যেন অস্পষ্ট স্মৃতির মত ভেসে ভেসে মিলিয়ে যাচ্ছে।

—চল না বউ একবার ঘুরে আসি।

গায়ত্রীর গলায় চাপল্যের আভাস পেয়ে নয়ানবৌ বলে—ওমা যাবেন কোথায় এ বন-বাদাড় জঙ্গলে?

—দূর এ আমার বাপের ভিটে। চেনা-জানা কতকালের, তখন তুই জন্মাসনি জানিস।

কিন্তু সে রাতে মার পাশে উঁচু তক্তপোষে শুয়ে একটুও ঘুমতে পারেন না গায়ত্রী। জানলা দিয়ে নিষ্পলক চোখে চেয়ে থাকেন আগাছার গন্ধে ভরা পোড়ো চত্বরটির দিকে। সেখানে সেদিন বকুলগাছ ছিল। বসন্তের সুরুতে ভিনদেশ থেকে কোকিল এসে বসত ডালে ডালে, আজ শুধু একঘেঁয়ে ঝিঁঝিঁর ডাক। আসশ্যাওড়ার ঝোপের মাঝে জোনাকি জ্বলছে। তিরিশ বছর পেরিয়ে এসে এ জায়গায় শুধু অজানা গন্ধ। নয়ানবৌ ঠিকই বলেছে বনবাদাড়...জঙ্গল।

সকালবেলা আরও ভাল করে চোখে পড়ল চৌধুরীবাড়ির পোড়ো কুৎসিত চেহারাটা। এরই মধ্যে পিল পিল করে সবাই তাঁকে দেখতে আসে। বড়দের মধ্যে যাঁরা তাঁকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছেন, কিংবা সমবয়সী যাঁরা ধারেকাছে রয়েছেন, নয়ত পরবর্তী যুগে যাঁরা গায়ত্রীকে কিংবদন্তীর নায়িকা রূপে দেখেছেন তাঁরা সবাই স্তম্ভিত। কৌতূহলে থচথচ করে অনেকের বুক—

—মাগো কি রাজরাণীর মত চেহারা।

গায়ত্রীর মুখে মিটমিটে হাসি। একদিন যারা অপবাদে ছিল পঞ্চমুখ তাদের চমক দেবার জন্যই যেন বলেন—এই গায়ের চাদরটা তোমার জন্যেই দুলিপিসী। দেখ দিকি পছন্দ হবে ত!

জনে জনে উপহার বিলিয়ে স্মিত হাসেন গায়ত্রী। কে একজন মন্তব্য করে—মাগো যৌবনটাকে কোন যাদুতে বেঁধে রাখলি ভাই। গায়ত্রী খিলখিল করে হাসেন। কে বলবে তিনি তিন-চার সন্তানের মা, বয়স্কা গৃহিণী। সামনের চুলে এখনও পাক ধরে নি। চামড়ার উজ্জ্বলতায় এতটুকু ছায়া নামে নি। সিঁথিতে সুদীর্ঘ গাঢ় সিঁদুরে রেখা। ছোট্ট কপালে আধলার মত সিঁদুরের টিপ। কানে কানপাশা আর নাকে যুঁই ফুলের মত হীরের নাকছাবি।

দুলিপিসী তবু বলেন—তাজ্জব ব্যাপার। আমি বলি কোনকালে ভুলেই গেছিস।

গায়ত্রী ঠোঁট ফুলিয়ে বলেন—বারে তুমিই তো ভুলে গেছ। কেয়া খয়েরের দেওয়া পান কেউ বুঝি খেতে জানে না।

দুলিপিসী উথলে ওঠেন—ওমা মরে যাই। সে কথাও তোর মনে আছে?

বড় তরফের বড়বৌ বলেন—যা ধুলো বালি রাস্তায়, মাথায় সাবান দিয়েছিস বুঝি? কোন কোম্পানীর সাবান লো, যা বাস ছড়াচ্ছে।

গায়ত্রী বলেন—বলব কেন? এতক্ষণে ত আসা হল। মাথার জটা কে ছাড়াবে শুনি। সব ভুলে গেছ।

বড়বৌ আহ্লাদে গলে যান—মাগো, তাইত! ও চুলে আমি ছাড়া কে কবে হাত দিয়েছে?

নয়ানবৌয়ের যেন ধন্দ লাগে—দিদি এতও জানে বাপু। তিরিশ বছর জটায় হাত পড়েনি বুঝি! শহুরে লোকের সঙ্গে কথায় কে পারে।

এরই মধ্যে মা একদিন ফিসফিসিয়ে বলেন—পাড়াগেঁয়ে মানুষের জিভে বড় ধার। খুব সাবধানে চলিস মা।

গায়ত্রী যেন বিষম খান, জীবনের এই অপরাহ্ণ বেলায় আবার আশঙ্কা, আবার অপবাদের ঘূর্ণি!

—কেন শুনি? মেয়ের রূপান্তরে বৃদ্ধার চোখ জোড়া আবার কোটরে ঢুকে পড়ে। বলেন—মণিময়কে মনে আছে?

—মণিময় কে মণিময়?

—ওমা অবাক করলি! গাঁয়ে যাকে নিয়ে তোর অমন কাণ্ড ঘটল!

মাকে ধমকাতে যেয়েও থমকে গেলেন গায়ত্রী।

—কেন তিরিশ বছরেও যে পর্ব শেষ হয় নি?

খাঁচা বন্দী বাঘটা যেমন গর্জে ওঠে তেমনি গলার মধ্যে গরগর আওয়াজ তোলেন গায়ত্রী।

মা বলেন তাঁর কর্তার চণ্ডালে রাগের কথা। ছোঁড়াটা যে কত বছর জেল খাটল। তারপর কবে ছাড়া পেয়ে বিয়েথাওয়া করে সংসারী হয়েছে তা জানার কথা নয়। টের পেলেন যেদিন পাঁচিলের ওপারে সেই ঘরটায় বি-ডি-ও আপিসে মানুষটা চাকরি নিয়ে আসার পর। একটা ঘরে আগণ্ডা ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার করছে মানুষটা।

গায়ত্রী ঘেমে নেয়ে ওঠেন। বিস্ফারিত চোখে যেন বিভীষিকা দেখছেন। আজ আর মণিময়ের কোন অবয়বই তাঁর স্মরণে নেই। কিন্তু চাপা স্তুতি আর যশের যে পরিমণ্ডলটি এই কদিনে রচনা করেছেন তা কি আবার ভেঙে যাবে? আবার তাঁর অপযশের জোর হাওয়ায় ছোট্ট তিলফুল গাঁখানি উদ্বেল হয়ে উঠবে?

কিন্তু মায়ের আশঙ্কা মিথ্যে হয়ে গেল। পর পর তার আসে দিল্লী থেকে তিলফুল নামে এই অখ্যাত গাঁয়ে। সবার মুখে গর্বের হাসি খেলে যায়। দিল্লীর নামী লোকের স্ত্রী কদিন আর থাকবেন এই ছোট্ট পাড়াগাঁয়। গাঁয়ের মেয়ের লক্ষ্মী সম্পদের কপালখানা যেন সারা গাঁয়ে ছুঁইয়ে দিয়েছেন।

তাই আবার সেই মোটরগাড়ি আর মানিক নামে ছোকরাটি চৌধুরীবাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ায়, রাজেশ্বরীর মত প্রশান্তি আর স্নিগ্ধতা নিয়ে গায়ত্রী বিদায় নিলেন তাঁর আত্মীয়স্বজন পরিবার পরিজনের কাছ থেকে। চোখে জল, মুখে হাহুতাশ। গায়ত্রীর স্নিগ্ধ মুখেও বেদনার আভাস, তাঁর চোখেও জল টলটল করে।

বেরুবার মুখে ঠিক যেখানে একদিন বকুলগাছ ছিল সেখানে কি পায়ে লেগে হোঁচট খেলেন। সবাই হাঁহাঁ করে উঠল। নয়ানবৌয়ের কান্নাভরা চোখের ওপর চুমু খেয়ে গাড়িতে উঠলেন গায়ত্রী।

আবার সেই দীর্ঘ পথ বেয়ে মোটর চলবে পাকা সড়ক ধরে। চৌধুরীদের পোড়ো বাড়ি আর ভগ্নস্তূপ, বনবাদাড়, পুকুর ডিঙিয়ে গাড়ি বেরুল গাঁয়ের রাস্তায়। সামনেই বি-ডি-ওর আপিস। কে একজন সেখান থেকে বেরিয়ে হাত তুলে গাড়ি থামায়।

—দোহাই ভাই, কেষ্টনগর একবার যেমন করে হোক পৌঁছতে হবে। সকালে বাস ছেড়েছে সেই কোন ভোরে।

মানিক রুক্ষ স্বরে বলে—হবে না সরকারবাবু। দেখছেন রেলের টাইম পেরিয়ে যাচ্ছে। মহা ঝামেলা শুরু করলেন দেখছি।

গায়ত্রী অন্যমনস্ক হয়ে পেছনের সিটে বসেছিলেন। হঠাৎ যেন ভূত দেখার মত চমকে উঠলেন। ভ্রূকুটি তীক্ষ্ণ চোখে প্রৌঢ় লোকটির দিকে চেয়ে দেখলেন গায়ত্রীর দিকে তাঁর দৃষ্টি নেই। ড্রাইভার ও মানিককে সে কেমন দীনতা নিয়ে অনুরোধ করে চলেছে।

গম্ভীর গলায় গায়ত্রী বলেন—কেষ্টনগর যাবেন তো উঠে আসুন, পেছনের সিটে জায়গা রয়েছে।

মণিময় থতিয়ে গেলেন। গায়ত্রীর রক্তশূন্য ফ্যাকাশে মুখটার দিকে চেয়ে সহসা কোন কথা বলতে পারলেন না।

মন্ত্রমুগ্ধের মত পাশে বসতে হাত বাড়িয়ে দরজাটা সশব্দে বন্ধ করলেন গায়ত্রী।

ইঞ্জিন গর্জে উঠল।

শান্ত অথচ দৃঢ় মেয়েলি গলায় আদেশ হল—ড্রাইভার গাড়ীটা ঘুরিয়ে ফের অন্দরের দরজায় নিয়ে যাও ত। চাবিটা মনে হচ্ছে ফেলে এসেছি।

চৌধুরীপরিবারের বিস্মিত আত্মীয়-পরিজনের সামনে গাড়ি থামল। চাপা হাসিতে গায়ত্রীর তুলতুলে গাল আবিরের মত লাল হয়ে ওঠে। আর তিরিশ বছর বাদে কেন কোনদিনই হয়ত আর তিলফুল গাঁয়ে ফিরবেন না। কিন্তু জীবনের প্রথম লগ্নে যে অপমানের বোঝা মাথায় নিয়েছিলেন আজ শেষ বেলাতেও সেই অপযশ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠুক না। তালগোল পাকান পাশের এই বুড়ো মানুষটি গায়ত্রীর কাছে আজ মৃত হলেও জীবনের প্রথম আর শেষ লগ্নে একই অপযশের প্রবাহ চলুক না কেন!

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পীদের একটি প্রতিনিধিত্বমূলক প্রদর্শনী

পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ সক্রিয় চিত্রকর, ভাস্কর ও ছাপের ছবি নির্মাতাদের ও তাঁদের যে-সব সংস্থা আছে সে-সবের যৌথ উদ্যোগে সৃষ্ট নবগঠিত ফেডারেশন অফ আর্টিস্টস্ এণ্ড আর্ট অর্গানাইজেশন্স অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল-এর দ্বিতীয় প্রদর্শনী হয়ে গেল কলকাতার বিড়লা একাডেমি অফ আর্ট-এর প্রদর্শনী কক্ষে। এই প্রদর্শনীতে এগারোজন ভাস্করের চোদ্দটি রচনা ও বাইশজন চিত্রকর এবং ছাপের-ছবি নির্মাতার একত্রিশটি রেখাঙ্কন (ড্রইং) ও ছাপের-ছবি (গ্রাফিক প্রিন্ট) প্রদর্শিত হয়। ফেডারেশনের প্রথম চিত্র প্রদর্শনীর মতন এ-প্রদর্শনীতেও পশ্চিমবঙ্গের নামী এবং দামী শিল্পী সংস্থার সভ্যরা ও একক ব্যক্তি শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। এতদ্‌সত্ত্বেও একথা নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে বলা সম্ভব নয় যে প্রদর্শনীটি খুব উঁচু মানের হয়েছিল। তার অর্থ অবশ্য এ-নয় যে প্রদর্শনীতে কোন উঁচু মানের কাজের দেখা মেলেনি। উঁচু মানের কাজ যথেষ্টই ছিল, বিশেষ করে ভাস্কর্য বিভাগটিতে। বেশ কয়েকটি ভাল ছাপের-ছবিও দেখা গেছে। কিন্তু নানা মানের (কয়েকটি তো বেশ নিম্নমানের শিক্ষানবীশি কাজ) কাজ মিলে প্রদর্শনীটিকে একটু কুড়ানি প্রদর্শনীর চেহারা দিয়েছিল। অবশ্য এ-জাতের সংকলনধর্মী প্রদর্শনীর চেহারা এতদ্‌রূপ হতে বাধ্য। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক সংকলনধর্মী প্রদর্শনীগুলি যা হয়ে থাকে তাদের কোনটির চেয়ে এ-প্রদর্শনীটির মান নীচু ছিল না। তার কারণ প্রদর্শনীটিতে খারাপ নিদর্শনের প্রাদুর্ভাব নয় বহুল সংখ্যক ভাল কাজের উপস্থিতি।

প্রথমেই আকৃষ্ট করে প্রদর্শনীর ভাস্কর্য বিভাগটি। এই বিভাগটি যথেষ্ট চিন্তার খোরাকও যোগায়। আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলা তার ঐতিহ্য, তার মূল সন্ধানে বার বার কোন না কোন ফেলে আসা ঐতিহাসিক রীতিতে অথবা আজো অনুসৃত অবহেলিত কোন রীতিতে ফিরে গেছে। আধুনিক ভারতীয় চিত্রকর সেই ফেলে আসা বা অবহেলিত রীতি থেকে উপাদান সংগ্রহ করে আনতে চেয়েছেন। সে-সব উপাদানে আধুনিককালের অভিজ্ঞতাকে রূপ দিতে চেয়েছেন। যদিচ ভারতীয় দৃশ্য-শিল্পের ঐতিহ্যে চিত্রকলার চেয়ে ভাস্কর্য অনেক বেশী সমৃদ্ধ তবু আধুনিক ভারতীয় ভাস্কররা কদাপি সে ঐতিহ্যের শ্বারস্থ হয়েছেন। আধুনিক ভারতীয় ভাস্কর্য সমকালীন চিত্রকলার চেয়ে সব সময়েই বেশী পশ্চিমমুখী। আধুনিক ভারতীয় ভাস্কর্যে একদা ছিল একাডেমিক ন্যাচারালিজমের যুগ, তারপর গেল র‍্দ্যা-মাইয়ল প্রবর্তিত নিও-ক্লাসিসিজমের অনুগমনের কাল। অতঃপর গত বিশ-পঁচিশ বছর ধরে চলেছে হেনরী মুর, বারবারা হেপওয়ার্থ, কমস্তানতিন ব্রাকুসি কিংবা বড়জোর জাদ্‌কিন জ্যাকোমেত্তি বা কেনেথ আর্মিটাজ যুগ। নিও-ক্লাসিসিজমের পরবর্তী যুগের ভাস্কর্য, একদিকে জগৎ-এবং-জীবন সম্বন্ধে এবং অপর দিকে শিল্প সম্বন্ধে ব্যক্তি শিল্পীর একান্ত নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ও অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি। আধুনিক ভাস্করের একমাত্র অন্বেষা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শিল্পভাষার মধ্যস্থতায় শিল্পবস্তু হিসেবে রূপ দেওয়া। ফলতঃ, ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার মতনই শিল্পবস্তুর ভাষাও একান্তভাবে ব্যক্তিগত; শুধু তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার মধ্য দিয়েই সর্বজনীনতা পায়। অতএব একজন সার্থক আধুনিক ভাস্করের শিল্পভাষা যত সংযোগশীল হোক না কেন, তা একান্তই ব্যক্তিগত। কারিগরী দক্ষতা এবং মনন দিয়ে আর একজন পূর্ববর্তী শিল্পীর শিল্প-ভাষা যতই আয়ত্ত করুন না কেন, সে-ভাষায় সৃষ্ট বস্তু অর্থবহ বস্তু হবে না, হবে অর্থহীন অলঙ্কার অথবা মূলের দুর্বল প্রতিনিধি মাত্র। তবু শিল্পে চিরকালই সংযোজন-পরিবর্ধনের (improvisation) ভূমিকা স্বীকৃত। উদ্ভাবক শিল্পী (innovator) শতকে হয় কয়জন? অধিকাংশই তো সংযোজনকারী-পরিবর্ধন-সাধক। সার্থক পরিবর্ধন সাধকের ভূমিকাও তো শিল্প ইতিহাসে তুচ্ছ নয়।

অজিত চক্রবর্তীর ব্রোঞ্জে নির্মিত "বর্শা হাতে বীর" প্রতিমালক্ষণের (iconologically) দিক থেকে হেনরী মুরের কাজ স্মরণ করায়। তা সত্ত্বেও এটি একটি সার্থক সৃষ্টি। এই বসে-থাকা বীরটির মধ্যাংশ লক্ষণীয়। মধ্যাংশের ভরসংস্থাপন এবং ঘনত্ব মূর্তিটিকে অমিতবিক্রমের প্রতিচ্ছবি করে তুলেছে। মধ্যাংশের অনুপাতে ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক এবং পদদ্বয় চিত্র-কল্প এক দ্বিতীয় অর্থ আরোপ করেছে— এক ভয়াবহ সমাহিতির। এই সমাহিতি— বসে থাকা ভারপুঞ্জের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার মধ্যে প্রতীয়মান। দেবব্রত চক্রবর্তীর তারের জাল ও কাঁচের তন্তুর সাহায্যে নির্মিত রচনাটি গঠনচাতুর্যের গুণে না হলেও একাধিক পরস্পর সন্নিবিষ্ট রূপকল্পের ইঙ্গিতবাহী ভাস্কর্য হিসাবে স্মরণীয়; অনেকগুলি মনুষ্যরূপী পাখী বা মাছ, কিংবা পাখী বা মাছরূপী মানুষ উড্ডীন বা ভাসমান অবস্থায় পরস্পর-সংলগ্ন হয়ে একটি ঊর্ধ্বগ-চক্রছন্দ সৃষ্টি করেছে। চিন্তামণি কর মহাশয় খ্যাতনামা ভাস্কর। ব্রোঞ্জের নির্মিত তাঁর নারীমূর্তিটি ছন্দোগুণে সমৃদ্ধ। মূর্তিটি সরলীকৃত এবং এ-সরলীকরণ উদ্দেশ্যসাধক। নারীদেহের ছন্দকে তরঙ্গছন্দের রূপ দেওয়া হয়েছে এ মূর্তিটিতে। মূর্তিটির অঙ্গ সংস্থাপনে তরঙ্গের উপর ভাসমান নৌকার ইঙ্গিত লক্ষ্যণীয়। রূপকল্পের এই দ্যোতনা যৌবন এবং নারীত্বে একটি দ্বিতীয় অর্থ আরোপ করে। মাণিক তালুকদারের এলুমিনিয়মে নির্মিত দুটি ভাস্কর্যে পাখীর রূপের সরলীকৃত জ্যামিতিকরণ এবং ঘনবস্তুর ভারশূন্যকরণ যথেষ্ট কৌতূহল উদ্রেক করে। নিরঞ্জন প্রধান তাঁর কাষ্ঠ-তক্ষণগুলিতে মনুষ্যরূপ এবং বৃক্ষরূপের রূপগত সম্বন্ধ আবিষ্কার ও পরিবৃত্ত-রেখাচ্ছন্দ ও ঘনত্বের সম্বন্ধ নির্ণয় করতে ব্যস্ত বলে মনে হল। দিলীপ সাহা মনে করিয়েছেন জেকব এপস্টাইনকে, করবী ঘোষ বারবারা হেপওয়ার্থকে এবং সুরেন দে রামকিঙ্কর বৈজকে। এঁদের প্রত্যেকেরই কাজ অত্যন্ত দক্ষ, বিশেষ করে সুরেন দের। বিকাশ দেবনাথও তার কাষ্ঠ-তক্ষণে মনুষ্যদেহের সঙ্গে বৃক্ষদেহের সম্বন্ধ আবিষ্কারে রত, কিন্তু সে দেহ নিরঞ্জন প্রধানের মতন রক্ত-মাংসের দেহ নয়, দেহাভ্যন্তরস্থ অস্থি-সর্বস্ব কাঠামো।

অন্য বিভাগে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কাজ সোমনাথ হোড়ের। সোমনাথ হোড়ের কাজ দুটি কোন পরিচিত মাধ্যমে নয়। যে-ভাবে অন্যান্য মাধ্যমে ছাপের ছবি তৈরী হয়, তেমনি এ-ছবিও ছাঁচের ছাপে তৈরী।

কিন্তু ছাপ, তৈরী কাগজের উপর না নিয়ে, নেওয়া হয়েছে কাগজের মন্ডের উপর চাপ দিয়ে। সেই চাপে কাগজের মন্ড যখন শুকিয়ে কাগজ হয়েছে, তখন তা হয়েছে বুকে ছাঁচের ছাপ নিয়ে। যে ধরণের রিলিফ বা মন্ডন তৈরী কাগজে বা ছাপের ছবির সাধারণ-জাত মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব নয়, শিল্পী সেই রিলিফ এনেছেন এই মাধ্যমে। এ-ছবিতে কোন রঙ নেই, নেই কোন রেখা। আছে আকার, আকৃতি এবং তল ভূমি। ছবিতে চিত্র-ক্ষেত্র বা ভূমির ব্যবহার লক্ষণীয়। দ্বিমাত্রিক চিত্রতলে সন্নিবিষ্ট আকার চিত্রক্ষেত্রকে সীমাহীন ব্যাপ্ত দিয়েছে। এ ব্যাপ্তি ক্ষেত্র-রংশূন্য শাদার মরুভূমি। সেই শ্বেত মরুভূমিতে হঠাৎ দেখা যায় কিছু বাস্তব আকার, বুঝিবা মাংসপিন্ড। এই সোচ্চার পুঞ্জিভূত উঠে থাকা মাংসপিন্ড কোথাও গাড়ীর চাকার দাগে পিষ্ট, কোথাও গভীর ছুরিকাঘাতে ছিন্ন কোথাও বা গুলির ছিদ্রের গভীর ক্ষতে বিদীর্ণ। আপাতঃদৃষ্টিতে এ ছবি বিমূর্ত। কিন্তু আদপেই তা নয়। বক্তব্যকে চাঁচাছোলা, তীক্ষ্ণধার করতে গিয়ে শিল্পী বাড়তি সব কিছুকে বাদ দিয়ে শিল্পের ভাষায় এমন এক রূপের সৃষ্টি করেছেন যা বক্তব্য হিসাবে সরাসরিভাবে দৃষ্টি এবং স্পর্শগ্রাহ্য।

ছাপের-ছবি বিভাগে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কাজ লালুপ্রসাদ সাউ-য়ের। এঁর এচিংগুলি বিশুদ্ধ বিমূর্ত রচনা। সনৎ করের রঙিন এচিংগুলিও একই জাতের। লালুপ্রসাদ যেখানে আয়তক্ষেত্র বিভাজন করে রেখার দ্বারা তাঁর রচনাকে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছেন সনৎ কর সেখানে আয়তক্ষেত্রকে সম্পূরক রঙের উল্লম্ব-ক্ষেত্রে বিভাজন করেছেন। নিরাময় রায় তাঁর লিথোগ্রাফে বর্ণদ্বারা ক্ষেত্র বিভাজন করে বর্ণপ্রধান নকশা গড়ে তুলতে চেয়েছেন। তিনি অবশ্য সনৎ বা লালুর মতন অতটা জ্যামিতিক মন। তাঁর কাজে মনুষ্যাবয়বের আভাস মেলে।

রেখাঙ্কন বিভাগে যাঁদের কাজ দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাঁরা হলেন মাধবী পারেখ, জোফিন মুছালা, ডবলু আর কাপুর, সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় এবং স্বপ্না সেন। এ-বিভাগটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল।

* * *

ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্টস বহুদিনের ঐতিহ্যবাহী সংস্থা, বোধহয় বাংলার তথা ভারতের জীবিত শিল্প-সংগঠনগুলির প্রাচীনতম। এ-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ এবং গগনেন্দ্রনাথের মতন আধুনিক ভারতীয় শিল্পের পুরোধারা। এঁর সঙ্গে জড়িত ছিলেন হ্যাভেল, ব্রাউন, ক্রামরিশ, কুমারস্বামীর মতন শিল্প-ইতিহাসবেত্তা ও সমালোচকরা। পরবর্তীকালে অবশ্য এই সব সমালোচক এবং শিল্প-ঐতিহাসিকদের নেতৃত্বাধীনে গবেষণা এবং প্রকাশনার আতিশয্য ঘটায় শিল্পীরা ক্রমে সংস্থাটি থেকে দূরে সরে যেতে থাকেন। কালক্রমে শিল্প-ঐতিহাসিক ও সমালোচকদের সঙ্গে সক্রিয় শিল্প-চর্চার সম্পর্ক ক্ষীণ হয়ে যায়, ক্ষীণ হয়ে আসে আধুনিক শিল্পীদের শিল্প-ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহ। ফলে এই সংস্থার সক্রিয় ভূমিকার অবসান হয়। আজ বছর দশ-বারো হল এ-প্রতিষ্ঠানের নতুন কর্মকর্তারা প্রতিষ্ঠানের নতুন প্রাণসঞ্চার কাজে লিপ্ত। সারা বছর এ-প্রতিষ্ঠান কি কাজ করে আমরা জানি না। তবে বৎসরান্তে এঁরা একটি করে সংকলনধর্মী প্রদর্শনীর আয়োজন করে থাকেন। তবে, প্রদর্শনীতে শুধু প্রতিষ্ঠানের সভ্যরাই অংশগ্রহণ করেন, অথবা বাইরের শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন, সভ্যরা ও বাইরের শিল্পীরা সমভাবে অংশগ্রহণ করেন তা আমাদের জানা নেই। বাইরের শিল্পীরা অংশগ্রহণ করলে তা তাঁরা কি-ভাবে করেন তাও আমরা জানি না। প্রাপ্ত শিল্পবস্তু বোধহয় প্রদর্শনীতে স্থান পাবার আগে কোনরূপ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যায় না।

ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্টস এ-বছর তাঁদের বাৎসরিক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন বিড়লা একাডেমি অফ আর্টের প্রদর্শনী কক্ষে। এ-বছর তাঁদের চিত্র ও ভাস্কর্য প্রদর্শনীর সঙ্গে, সোসাইটির কর্মকর্তারা এক অভিনব প্রদর্শনীর আয়োজন করেন এবং এই অভিনব বিভাগটি খুবই আকর্ষণীয় হয়।

লোকশিল্পকে যদি আমরা দু'ভাগে ভাগ করি, তাহলে তার একভাগে পাই লৌকিক চিত্রকলা এবং ভাস্কর্যকে। সেখানে চিরন্তন এবং গতানুগতিক নকশার মধ্যে চিরন্তন এবং গতানুগতিক লৌকিক মানসিকতার কোন-না-কোন রূপ স্বপ্রকাশ। আর একটি ভাগে পাই শুধুই নকশা, কথা-না-বলা নকশা। লৌকিক শিল্পের এই নকশাসর্বস্ব রূপটি দেখতে পাই ব্যবহার্য সামগ্রীর রূপে। এ-দুভাগের শিল্পবস্তুকেই আবার দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, এক ভাগে আচার-অনুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় বস্তু, অন্য ভাগে আচার-নিরপেক্ষ বস্তু। আচার-অনুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য সামগ্রীর রূপ কোন কোন সময়ে প্রথাসিদ্ধভাবে অর্থ-বহ হয়, যথা আলপনা।

বাঙালী হিন্দুর এবং মুসলমানের বিবাহে দানসামগ্রীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাঙালী হিন্দুর বিবাহে কিছু দানসামগ্রী, বিশেষ করে খাদ্যসামগ্রী তত্ত্ব হিসাবে পাত্র-গৃহ থেকে কন্যাগৃহে এবং কন্যা-গৃহ থেকে পাত্র-গৃহে যায়। এক গৃহ থেকে অন্য গৃহে পাঠাবার সময়ে তা সাজিয়ে-গুছিয়ে পাঠানটাই রীতিসম্মত। আজকাল শহুরে জীবনে সামগ্রীর বাজার-দর অনুসারে তা সাজান হয়। কিন্তু আগেকার কালে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের বিত্তশালীদের মধ্যে, তত্ত্ব সাজিয়ে পাঠানর অন্য একটা অর্থ ছিল। সাজানো বলতে বোঝাত সামগ্রী সকলের বিন্যাসে গড়ে তোলা নকশা। নকশা গঠন ছিল সাজানো শব্দের অর্থ। যদিও বিবাহে দেয় দানসামগ্রীর কিছু কিছুর, যথা হলুদ, পান-সুপারী, সিঁদুর, ধান-দূর্বা, মুসুরির ডাল, মাছ, শাঁখা ইত্যাদির রীতিসিদ্ধ [illegible] অর্থ ছিল তত্ত্ব [illegible] এবং [illegible] দ্রব্যের সমাহারে গড়ে তোলা নকশায় [illegible] রীতিসিদ্ধ ও রীতিবিরুদ্ধ রূপ ছিল না। নকশার রূপ ছিল রীতি নিরপেক্ষ। যিনি যেমন খুশি নকশা গড়ে তুলতে পারতেন এবং নকশা-কারের কারিগরী দক্ষতাই ছিল প্রশংসার বিষয়। যিনি যত ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র বস্তু সমাহারে কারিগরী দক্ষতা দিয়ে যত জটিল নকশা গড়ে তুলতে পারতেন বা একাধিক বস্তুসমাহারে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের বস্তুর অবিকল রূপ আনতে পারতেন তিনি ততই বিস্ময় উদ্রেক করতেন, ততই বাহবা পেতেন! বিস্ময় সৃষ্টিই ছিল এ কারুশিল্পের একমাত্র উদ্দেশ্য।

আমাদের কালে যখন আমরা সব বিস্ময় হারিয়েছি, সামগ্রিক মানবিক অভিজ্ঞতায় অর্থবহ না হলে কোন বিস্ময়কেই আমরা যখন মূল্য দিতে অপারগ, তখন বিবাহের দানসামগ্রী এবং বিবাহে ব্যবহৃত সামগ্রী সাজানোতে যে নকশা, একদা আমাদের পূর্বপুরুষদের বিস্ময় সঞ্চার করে আনন্দিত করত, তা আমাদের কাছে উপস্থাপিত করে ইতিহাস-পাঠের আনন্দ। এই আনন্দই দিয়েছেন ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটির কর্তৃপক্ষ। আলাদা করে কারো নাম করব না, যেসব মহিলারা এই বিবাহের দানসামগ্রী সাজিয়েছেন তাঁরা সকলেই আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করেছেন।

চিত্র এবং ভাস্কর্য প্রদর্শনীতে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁদের অধিকাংশই বোধহয় এখনও তাঁদের কলা-শিক্ষা সমাপন করেননি অথবা শৌখিন শিল্পী। কারণ, দু'-একজন ছাড়া এঁদের কারো কাজ কলকাতার বা অন্য শিল্পকেন্দ্রের কোন প্রদর্শনীতে দেখা যায় না। এ তো গেল বহিরঙ্গ বিচারের কথা। অন্তরঙ্গ বিচারে প্রায় সবাই এখনও শিক্ষানবীশী করছেন। সে-বিচারে সবাই নিজ নিজ সাধ্যমত ভাল কাজ করেছেন। প্রদর্শনীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছবি এঁকেছেন স্বপ্না সেন। এটি কাপড়ের উপরে আঁকা একটি জল-রঙের ছবি। একটি ভাঙ্গা-বাড়ীর অংশ, পুরোন ঘোরান লোহার সিঁড়ির কতকাংশ, রেলিং বেয়ে লতিয়ে-ওঠা ইঁট-ফাটানো বটের পাতা, একটি পেঁচা ও একটি বাদুড়ের একত্র বাস, প্রায় এক রঙা। রঙ, বস্তুবিন্যাস এবং অলঙ্করণ অর্থবহ। বি আর পানেসর দিয়েছেন জলরঙে একটি, তেলরঙে একটি এবং কোলাজ-এ একটি দৃশ্যচিত্র। ওঁর বস্তুবিন্যাস পদ্ধতি আকর্ষণীয়। আর ভাল লেগেছে, গোপীনাথ দাসের একটি পেঁচামুখো ফুলদানী। ঘন করে জলরঙে, একমাত্রিক কায়দায় বর্ণ-প্রলেপ করে, দ্বিমাত্রিক জমির উপর স্থাপিত এই ফুলদানীটি মোটেই ঘনত্বহীন নয় এবং এই কায়দায় সৃষ্ট হবার ফলেই ছবিটি একটি রহস্যঘন আমেজ সৃষ্টি করে।

—প্রণবরঞ্জন রায়

পুরোন তাঁত

মেচ জাতির এণ্ডি শিল্প

সুনীল পাল

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর খণ্ডে যেসব উপজাতি ও গোষ্ঠী বসবাস করেন তাদের মধ্যে 'মেচ' (বড়ো) জাতি অন্যতম। তাঁরা মোঙ্গল মহাজাতির একটি শাখা।

মেচদের মূল জীবিকা কৃষি। আচার-আচরণে তাঁরা অতি সৌম্য ও বিনয়ী। এঁদের কিছু অংশ খৃস্ট ধর্মাবলম্বী, কিছু বৌদ্ধ এবং বেশীর ভাগই হিন্দু।

এণ্ডি-শিল্প মেচদের মধ্যে বংশানুক্রমিকভাবে প্রচলিত। এ অঞ্চলে এণ্ডি পোকা পালন ও তা থেকে বস্ত্রবয়ন অন্য কোনো উপজাতি ও তপশীল জাতির মধ্যে বর্তমানে প্রচলিত নেই। পূর্বে ছিল কিনা তাও অজ্ঞাত।

এই শিল্পের সঙ্গে মেচদের জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত, কেননা এই শিল্প-ধারাটি আবহমানকাল থেকে তাদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। ঠিক কবে থেকে এণ্ডি পোকা পালন ও বস্ত্র বয়ন শুরু হয়েছে তা কেউ বলতে পারেন না। জলপাইগুড়ি জেলার প্রায় সব মেচ অধিবাসীই এবিষয়ে পারদর্শী। তবে বর্তমান আর্থিক কৃচ্ছতার জন্য, আগ্রাসী যান্ত্রিক সভ্যতার দ্রুত সম্প্রসারণের জন্য এই সুপ্রাচীন কুটীর শিল্পটি মৃতকল্প। অনেক পরিবারেই বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রম বিমুখ পরিবারগুলি থেকে এবং দরিদ্র পরিবার— যাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে এ শিল্পে সময় দেবার সময় নেই সেই সব পরিবার থেকে এ শিল্পটি বিদায় নিয়েছে।

অতীতে 'মেচ' মহিলাদের এণ্ডি পোকা লালন পালন, তা থেকে বস্ত্র বয়ন এবং নিজেদের পরিধের বস্ত্র 'ডোখনা' এবং ওড়না বয়ন অবশ্য শিক্ষণীয় ছিল। যিনি যত সুন্দর বস্ত্র বয়ন করতেন তাঁর

সামাজিক সম্মানও তত বেশী ছিল। পাত্রী নির্বাচনের সময় পাত্র পক্ষ এই শিল্পে পাত্রীর দক্ষতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন এবং তাদের হাতের কাজ দেখতে চাইতেন। বর্তমানে অবশ্য তা শিথিল।

এণ্ডি চাষ ও বয়নের অর্থকরী দিকটি ততটা উল্লেখযোগ্য নয়, কারণ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এণ্ডি পোকা লালন ও বস্ত্র বয়ন হয় না। কেননা এই শিল্পটি একান্তভাবে মহিলারাই দেখাশুনা করে থাকেন—তাঁদের গেরস্থালির কাজকর্ম সেরে যে অবসর সময় তাঁরা পান তার মধ্যেই এগুলো করে থাকেন। হিসেব করে দেখা গেছে একজন মহিলার পক্ষে এক ঋতুতে পোকা পালন গুটি সংগ্রহ থেকে সুতো কাটা এই সব পর্ব সমাধা করে তিন থেকে চারটি চাদর বয়ন সম্ভব।

১ কেজি গুটি থেকে সুতো পাওয়া যায়—৭০০ গ্রাম

১ কেজি গুটির মূল্য—১৬·০০ টাকা

১ কেজি সুতোর মূল্য—২৫·০০ টাকা একটি চাদর বুনতে সুতো প্রয়োজন ১ কেজি।

একটি চাদর ৩½ হাত × ৬ হাত মূল্য ৩০ টাকা থেকে ৪০ টাকা। এক কেজি সুতো কাটতে সময় লাগে তর্কলিতে—একজনের দুই সপ্তাহ, দুই তিন ঘণ্টা করে দিনে সুতো কাটলে। একটি চাদর বুনতে একজনের সময়ের প্রয়োজন দিনে তিন ঘণ্টা করে দুই সপ্তাহ। এণ্ডির চাদর বোনা হয়, এণ্ডি পোকার গুটি থেকে পাওয়া সুতো দিয়ে। মেচ মহিলারা এণ্ডি পোকা নিজেরাই লালন পালন করেন। এই পোকা পালন করা হয়, জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত। এই মাসগুলির মধ্যে সবচেয়ে উপযুক্ত হল শ্রাবণ-ভাদ্র মাস। পোকা পালনের জন্য যে আর্দ্রতা এবং উষ্ণতা প্রয়োজন তা ঐ মাস দুটোতেই যথোপযুক্ত-ভাবে পাওয়া যায়।

এণ্ডি পোকার বিবর্তন হয় এইভাবে—

প্রজাপতি—ডিম—শূক কীট—গুটি। মেচ ভাষায়—প্রজাপতি (পুং) চিক্রি জ; প্রজাপতি (স্ত্রী) চিক্রি জে-লা। এণ্ডি পোকার ডিমকে মেচ ভাষায় বলে 'এমফো বি-দৈ'। ডিম থেকে পোকা ফুটে বের হতে সময় লাগে সাতদিন। পর পর চারটি ধাপে 'এমফো' বাড়তে থাকে এবং শেষে গুটি বাঁধে। প্রথম ধাপে পোকার বয়স কাল চারদিন। এই সময়ে এগুলো খোলস পালটায়, এই খোলস পাল্টানোর সময় ওগুলো খাওয়া বন্ধ করে। মেচরা বলে থাকেন পোকার জন্ম হয়েছে। খোলস পাল্টানোকে তাঁরা বলেন গোমস-লাইদেং। খোলস পাল্টানোর প্রথম স্তর এঁদের ভাষায় গুমুম, দ্বিতীয় স্তর গুমুলাং—সময়কাল চারদিন। তৃতীয় স্তর 'আখাই মজি'। সময়কাল চারদিন। চতুর্থ স্তর আখাই মা সময় চারদিন, পঞ্চম স্তর বি-মা, সময়কাল চারদিন।

ডিম ফোটার সময়ে যথেষ্ট যত্ন নেওয়া হয়ে থাকে, যাতে ডিমগুলো ঠিকমত ফোটে। ডিম ফোটানোর সময়ে পরিচর্যাকারীর মাথায় তেল দেওয়া বা শরীরে কোনো গন্ধ দ্রব্য দেওয়া নিষিদ্ধ। ডিম ফোটার জন্য যে তাপাঙ্ক দরকার তা হল—৬০ ডিগ্রী ফাঃ হিঃ—১০০ ডিগ্রী ফাঃ হিঃ। এবং আর্দ্রতা ৬০ ডিগ্রী ফাঃ হিঃ—১০০ ডিগ্রী ফাঃ হিঃ। তাপাঙ্ক এবং আর্দ্রতা যা আদর্শস্থানীয় তা হল ৭৫ ডিগ্রী—৮৫ ডিগ্রী ফাঃ হিঃ। ডিম ফুটে পোকা বের হলে কয়েকটি রেড়ি পাতা [এণ্ডি বিলায়েব] পেতে তাতে ঐগুলি রেখে আরও কটি পাতা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। পাতাসহ ঐগুলি বাঁশের চটা দিয়ে তৈরি ডালাতে [খোংগ্রায়] রাখা হয়। পোকাগুলো বড় হতে থাকলে তার খাবার হিসেবে দেওয়া হয় এণ্ডি পাতা। এই সময়েই রূপান্তর 'গোস-লাইদের' শুরু হয়। রূপান্তরের শেষ পর্বে কুড়িদিনের মাথায় গুটি বাঁধা শুরু করে পোকাগুলো।

এই সময়ে গুটি বাঁধার সুবিধার জন্যে কলাগাছের শুকনো পাতা আম পাতা দিয়ে আশ্রয় তৈরি করে দেওয়া হয়, গুটি বাঁধার সময় পোকাগুলো ঘন ঘন প্রস্রাব করে এবং খাওয়া বন্ধ করে দেয়। ডিম ফুটে পোকা বের হওয়া থেকে ফের গুটি বাঁধা পর্যন্ত সময় সীমা ছেচল্লিশ দিন।

ডিম সংরক্ষণ :

এণ্ডি পোকার ডিম সংরক্ষণের জন্য ঐগুলির মধ্যে প্রজাপতির পাখা এবং কাঠ কয়লা দিয়ে একটি ন্যাকড়ার মধ্যে জড়িয়ে রাখা হয়। এবং ঐগুলি ক্রমাগতভাবে ফুটিয়ে তা থেকে পূর্ণবয়স্ক প্রজাপতি পাওয়া যায় এবং তা থেকে ফের ডিম সংগ্রহ করা হয়। ভাল প্রজাপতি পাওয়ার জন্য পুষ্ট গুটিগুলি বেছে নেওয়া হয় এবং ঐগুলিকে সুতো দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয় সাময়িকভাবে। গুটি কেটে প্রজাপতি বের হলে, প্রজাপতিগুলিকে ডিম পাড়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য লম্বা খড়ের আঁটিতে বসিয়ে দেওয়া হয়। ডিম পাড়া হয়ে গেলে ওগুলি তুলে নিয়ে বাঁশের ডালায় রাখা হয় ফুটে পোকা বের হওয়া পর্যন্ত।

সুতো তৈরী করার পদ্ধতি :

গুটি সংগ্রহ করে তার মুখ কেটে পোকা [ফুগি] বের করে দেওয়া হয়। মেচ ভাষায় এণ্ডি পোকার গুটি হচ্ছে 'এমফো বিথপ'। ঐগুলো সুতো তৈরীর উপযুক্ত করার জন্যে একটি কড়াইতে জল দিয়ে তার মধ্যে ঐগুলো রেখে এক ঘণ্টা জ্বাল দিয়ে ফুটিয়ে নেওয়া হয়। ঠাণ্ডা হবার পর জল থেকে তুলে কলা পাতার মধ্যে গুটিগুলি সাতদিনের জন্য রেখে দেওয়া হয় যাতে সুতো কাটার উপযোগী নরম হয়।

এণ্ডি সুতো কাটা হয় টাকুরীতে। এই পদ্ধতি মেচদের মধ্যে বহুকাল ধরে চলিত। এই পদ্ধতিতে সুতো কাটতে বেশ সময় লাগে; একটি চাদরের জন্য সুতো কাটতে সময় লাগে পনের দিন, দৈনিক তিন ঘণ্টা করে কাটলে। সুতোর প্রয়োজন এক কিলোগ্রাম। বর্তমানে উন্নত পদ্ধতিতে সুতো কাটার জন্য ব্যবহার করা হয় প্যাডলযুক্ত চরকা। বসে পা দিয়ে এর প্যাডল ঘুরিয়ে বেশ তাড়াতাড়ি সুতো কাটা যায়। চরকাতে এক কিলোগ্রাম সুতো কাটতে সাতদিনের মতন সময় লাগে, দিনে দুই-তিন ঘণ্টা করে কাটলে। চরকা অবশ্য সব মেচ বাড়ীতেই নেই। যারা অবস্থাপন্ন বা 'এণ্ডি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' থেকে শিক্ষণপ্রাপ্ত তাদের বাড়ীতেই এর ব্যবহার আছে।

টাকুরিতে বা চরকায় সুতো কাটার জন্য গরম জলে ভেজানো নরম গুটি এক হাতে অল্প পরিমাণে মুঠো করে নিয়ে সুতো কাটা হয়। তুলোর সুতো কাটার জন্য যেমন 'পাঁজ' তৈরীর প্রয়োজন হয় এণ্ডি সুতোর জন্য তেমন পাঁজ প্রয়োজন হয় না। সুতো কাটার পর ঐ সুতোগুলো 'তাং নাটায়' জড়ানো হয়। সুতোকে মেচ ভাষায় বলা হয় "খুনডুং," এণ্ডির সুতো এণ্ডি খুনডুং।

সুতোয় মাড় দেওয়া [মায় দৈ]

এণ্ডির সুতোকে চাদর বোনার উপযোগী করার জন্য টাকুরি থেকে তাং নাটায় তোলা হয়। তারপর ঐ সুতো তোলা হয় সেরকীতে। পরে তা পাকিয়ে করে নিয়ে ভাতের মাড় ['মায় দৈ'] দেওয়া হয়। মাড় তৈরীর জন্য এক কিলোগ্রাম আতপ চাল ফুটিয়ে নেওয়া হয়। সেরকী থেকে সুতো খুলে নিয়ে হাত দিয়ে চেপে মাড় দেওয়ার পর একদিন রোদে শুকানো হয়। এরপর টানা দেওয়া হয়।

সুতোয় টানা দেওয়া (দুং-দুং)

এণ্ডি সুতোয় টানা দেওয়ার জন্য সুতোকে ছোট ছোট চার পাঁচটা সেরকীতে প্রবেশ করিয়ে লম্বাভাবে দুদিকে দুটি বাঁশের খুঁটির সংগে জড়ানো হয়। তারপর

ঐ সুতোর দুইদিকে দুটি গ-ন্-সা [বাঁশের সরু চটা] তার মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করিয়ে সুতো উঠানে সমান্তরালভাবে পাতা হয় চারটি ছোট খুঁটির ওপরে। সুতোকে উপরে নীচে সমানভাগে দুভাগ করা হয়, তার মধ্যে একটি বাঁশের বাতা 'চেমপার' ঢুকিয়ে দিয়ে। এরপর একটি 'রাসো' [শা না] প্রবেশ করিয়ে রাখা হয়। সুতো সমানভাবে পাট করার জন্য একটি বিমার কাঠির ঝারু "থারসান" ব্যবহার করা হয়। ঐ ঝারু দিয়ে ধীরে ধীরে সুতো টেনে দিয়ে সযত্নে পাট করা হয়; যাতে বোনার সময় কোন অসুবিধা না হয়। এইভাবে সুতো পাট করাকে বলা হয় "মোহর ছি পাই নাই"। দুই ভাগে বিভক্ত ঐ সুতোর মধ্যে দুইটি 'ন' পরিয়ে দেওয়ার পর ঐ টানা দেওয়া সুতো যা 'গণসার' সঙ্গে জড়ানো থাকে তা দুটি 'শাল গান্ডই' [টানা গুটানো নরজ এবং কাপড় গুটানো নরজ] এর সঙ্গে গুটিয়ে নিয়ে তাঁতের মূল কাঠামোর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়।

তাঁত ['সান্ছালি']

মেচরা এণ্ডি চাদর ও তাদের পরিধেয় বস্ত্র, ওড়না, গামছা রুমাল বয়নের জন্য যে তাঁত ব্যবহার করেন তা অতি প্রাচীন ধরনের। বিভিন্ন অংশ নিয়ে সম্পূর্ণ তাঁতকে তারা বলেন 'সান্ছালি'। এই সান্ছালির যে সব অংশ আছে তা বাইরের

থেকে কিনে আনা হয় বা নিজেরাই তৈরী করে নেয়। তাঁতের বিভিন্ন অংশ আলাদা-ভাবে খুলে রাখা যায়। এর নির্মাণ পদ্ধতি অত্যন্ত সরল। তাঁতটি পাতা হয় চারটি বাঁশের বা সুপারির খুঁটির ওপরে। খুঁটি গুলির নাম মেচ ভাষায়—সানছালি ডোং ফাং। সামনের দিকে অর্থাৎ যেদিকে বসে কাপড় বোনা হয় সেই দিকের 'গান্ডই'টিকে [কাপড় গোটানো নরজ] ধরে রাখার জন্যে দুটি বড় খুঁটির কোলে ছোট দুটি খুঁটি পোঁতা হয়, যা 'বিষ করম' নামে পরিচিত। একেবারে সামনের দিকের গান্ডইটি বাঁধা থাকে খুঁটির সঙ্গে দড়ি দিয়ে আলগাভাবে যাতে কাপড় বোনার সঙ্গে সঙ্গে কাপড় গোটানো গান্ডইটি ঘুরিয়ে দিলে ওটাও ঘোরে।

তাঁতের বিভিন্ন অংশ, তার নাম ও ব্যবহার :

(১) **শাল সাইফং :**—এটি একটি বাঁশের দণ্ড পরিমাপ সাত ফুট ছয় ইঞ্চি। এর সঙ্গে বাঁধা থাকে 'ন' ['ব' ও 'রাসো সা না] এবং 'নাচ্নি'।

(২) **'নাচনি' :** প্রতিটি তাঁতে দুটো 'নাচনি' থাকে—দুটি লোহার বা বাঁশের তৈরী। এদের কাজ হল 'ন' কে টেনে ধরে রাখা এবং বুননের সময়ে সুতোকে ওপরে ও নীচে ওঠানামা করান।

(৩) **বাগজা :** বাঁশের দুটি দণ্ড বা রড, 'সানছালি ডোং ফাং' বা তাঁতের খুঁটির ওপরে আড়াআড়িভাবে থাকে যার ওপরে 'সাল সাইফং' পাতা থাকে, এর পরিমাপ হল দুই ফুট ছয় ইঞ্চি।

(৪) **পুতুল :** দুটি বাঁশের শলাকা যার মাথায় বঁড়শীর মতন বাঁকা লোহার আঁকড়া আছে। বোনা কাপড়কে টেনে ধরে রাখে, এতে কাপড়ের টান টান ভাব বজায় থাকে।

(৫) 'ন' খুনন [ব]-এর কাজ দুই ভাগে বিভক্ত। টানার সুতোকে চাদর বা কাপড় বোনার সময়ে উপরে উঠান ও নামান এবং 'মাকু'র সাহায্যে পড়েনের সুতোকে টানার সুতোর মধ্যে প্রবেশের সুবিধা করে দেওয়া। এণ্ডি চাদর এবং সাধারণ কাপড় বোনার জন্য দুটি 'ন খুনন' ব্যবহৃত হয়। নকশা করা কাপড়ের জন্য চারটি ন খুনন প্রয়োজন। এগুলো নাচনির সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং শাল সাইফং-এর সঙ্গে বাঁধা থাকে।

(৬) রাসো [সানা]-এর কাজ হল, পোড়েনের সুতোকে টানার সুতোর মধ্যে যথাযথভাবে চেপে রাখা। রাসোটি একটি কাঠামোর মধ্যে আটকে দেওয়া হয়, ঐ কাঠামোর নাম 'শাল বেঙেব'। এর দুটি প্রান্ত 'শাল সাইফং'-এর সঙ্গে দড়ি দিয়ে আলগাভাবে বাঁধা থাকে যাতে সহজভাবে টানা যায়। 'রাসো'টিকে টানার সুতোর মধ্যে আগেই ভরে নেওয়া হয়। এর অন্যতম কাজ টানার সুতোকে পরিচ্ছন্নভাবে রাখা। যদি সুতোর মধ্যে কোনো গিঁট থাকে বা সুতো ছেঁড়া থাকে তবে এর সাহায্যে ধরা যায়।

(৭) মাক [মাকু]—এটি নিজেদের হাতে তৈরী। উন্নত ধরনের তাঁতে যে মাকু ব্যবহার করা হয়, তার থেকে বেশ বড় আকারের—লম্বায় এক ফুট দশ ইঞ্চি। ভিতরের যে অংশে 'মোচরা' [নলি] থাকে সেটি সাত ইঞ্চি লম্বা খাঁজ। এই 'মাক'টি হাত দিয়ে এধার ওধার করা হয় টানার সুতোর মধ্যে দিয়ে।

(৮) মোচরা [নলি]—এটি পাট কাঠির তৈরী। একটি লম্বা পাট কাঠিতে সুতো জড়িয়ে নেওয়া হয় হাঁটুর ওপর হেলিয়ে হাত দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। প্রয়োজন মতন সুতো জড়ানো হলে ঐটির দুদিক ভেঙে দিয়ে একটি লোহার শলাকার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে 'মাক'র খাঁজের মধ্যে বসানো হয়।

(৯) **শাল গান্ডই :** কাপড় গোটানো ও টানা গোটানো নরজ তাঁতের সামনের দিকে ও পেছনের দিকে এই দুটি থাকে। একটাতে সুতোর টানা গোটানো থাকে। অন্যটাতে কাপড় গোটানো হয়। ছয় ফুট এক ইঞ্চি দীর্ঘ। মাঝখানে ১½" চওড়া ও ১½" গভীরতাবিশিষ্ট একটি খাঁজ থাকে। খাঁজটির দৈর্ঘ্য ৫"—২½" তার মধ্যে ½" চওড়া একটি পাঁচ ফুট লম্বা গনসা বাঁশের শলাকা থাকে।

(১০) **'গন্সা' :** টানার সুতোর দুই প্রান্তে আটকানো থাকে, এই দুটি 'গন্সা' দুটি শাল গান্ডই-এর মধ্যে প্রবেশ করানো হয়, সুতো গোটানোর সুবিধার্থে। তাছাড়া ন(ব)এর সঙ্গে আরও কয়েকটি গনসা থাকে—যথাক্রমে উপরে ছয়টি নীচে চারটি।

(১১) **'কাইটা' :** রাসোর মধ্যে এবং দুটি 'ন'এর মধ্যে টানার সুতোকে একটি একটি করে পরিয়ে দেওয়ার জন্যে 'কাইটা'র প্রয়োজন।

(১২) বার্ডডাংগিতে দুটি বাঁশের গোলাকার দণ্ড, তাঁতের নীচের দিকে থাকে—যার সঙ্গে 'ন' (ব) গুলি যুক্ত। ঐ বার্ডডাংগিতে সংযুক্ত থাকে গরখাগুলো [পাসানলি] যাতে চাপ দিয়ে 'ন'কে উপরে নীচে করান হয়।

(১৩) **গরখা :** [পাদানি, পাসানলি] এণ্ডি চাদর বোনার জন্য দুটি গরখা ব্যবহার করা হয়, অন্যান্য কাপড় ডাখনা বা উড়ুনি, রুমাল, যাতে নকশা কাটা হয়। তার জন্যে চার ছয়, বা আটটি গরখা ব্যবহার করা হয়। কাপড় যত নকশাদার, ততই গরখার সংখ্যা বেশী হবে। গরখায় 'ন' যুক্ত থাকার জন্যে পা দিয়ে চাপ দিলে টানার সুতো ওঠানামা করে, তখন 'মাক' চালনার পক্ষে সুবিধা হয়।

(১৪) **চেমপার :**—(জো কাঠি) এটি একটি বাঁশের বাতা লম্বা পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি। টানার সুতোকে সমানভাগে বিভাগ করে রাখার জন্য এটি প্রয়োজন।

মোটামুটিভাবে উপরোক্ত অংশগুলি তাঁতের পক্ষে অপরিহার্য। এছাড়া আরো যে দুটি যন্ত্র সুতো কাটার পর গোটানো এবং মাড় দেওয়ার সময় প্রয়োজন সেগুলি হল—

সেরাক—সুতোয় মাড় দেওয়ার আগে লাছি করার জন্যে এবং মাড় দেওয়ার সময় এর ব্যবহার করা হয়। এটি বাঁশের শলা দিয়ে তৈরী। এর আটটি বাহু। সেগুলির নাম 'আশি'। যে দণ্ডটির ওপর খাড়া থাকে তাকে বলে 'বিছ'। এর ঘেরের পরিমাপ হল, তিন ফুট আট ইঞ্চি।

ডাংনাটা—সুতো কাটার পর তক্লি বা টাকুরি থেকে এই ডাংনাটায় তোলা হয়। ডাংনাটার চারটি বাহু আছে, ঐ বাহুগুলির নাম গাং। এর ঘেরের পরিমাপ হল—তিন ফুট আড়াই ইঞ্চি।

তাঁতের বিভিন্ন অংশগুলোকে সমবেতভাবে পাতার জন্য মোট চারটি খুঁটি আছে। চারটি বড় খুঁটির নাম মেচ ভাষায়—'সানছালি ডোং ফাং'। এই গুলি হয় বাঁশের বা সুপারি গাছের। যেদিকে বসে তাঁত বোনা হয়, সেইদিকে আরও দুটি ছোট খুঁটি থাকে। যার ওপর গান্ডই রাখা হয় তাকে বলে 'বিষ করম'।

মেচদের বাড়ীতে এই তাঁতের কাঠামোটি উঠোনে গাছের ছায়ায় পোঁতা থাকে স্থায়ীভাবে। বর্ষার দিনে তাঁতের ব্যবহার সাধারণত কম হয়। শীতের দিনে বিশেষ করে কার্তিক মাস থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত তাঁতের কাজ বেশী হয়। এণ্ডি চাদর এবং তুলোর সুতোর ডোখনা [মেচ মেয়েদের পরিধেয় বস্ত্র] উড়ুনি, রুমাল, গামছা এইসব বোনা হয়, তাছাড়া ছেঁড়া কাপড় দিয়ে বা নতুন সুতো দিয়ে দুণিপুরী কাঁথাও বোনা হয়ে থাকে। *

---

* তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে কামাখ্যাগুড়ি অঞ্চলের 'মেচ' অধিবাসীদের কাছ থেকে।

অর্থনৈতিক সমীক্ষা : কালো টাকা

শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

গল্প হলেও সত্যি :

তরুণ দুটি অনেক কিছুরই অর্ডার দিয়েছিল, কিন্তু খাওয়া শুরু করতে না-করতেই বিল আনতে বলল। ওয়েটার একটু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে—অর্থাৎ এখনই কিনা তা যাচাই করার ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকাতে তরুণদের একজন তাড়া দিল : জলদি লে আও।

অনেক কিছু নিলেও বিল খুব বেশী হয়নি—মাত্র বিয়াল্লিশ টাকার। একশ' টাকার একখানি নোট নিয়ে ওয়েটার ক্যাসে জমা দিতে গেল। চেঞ্জ নিয়ে ফিরে এসে দেখে তরুণ দুজনের একজনও নেই—টেবিলের ওপর ডিসগুলো সাজানো, কোনোটাতে বা অর্ধভুক্ত খাদ্য, আর কোনটার খাদ্য স্পর্শই করা হয়নি। হতভম্ব হয়ে ওয়েটার এদিক-ওদিক খুঁজতে লাগল। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। একজন প্রবীণ সহকর্মী এগিয়ে এসে কানে কানে কি বলতেই আমাদের পরিবেশক ওয়েটার মৃদুস্বরে 'ব্লেক—সমঝ লিয়া' বলে চেঞ্জটা পকেটে পুরল। পরে নিশ্চয়ই বকরা হবে।

সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্ট। আজ বিশেষ কাস্টম চেকিং-এর ব্যবস্থা। এয়ারপোর্টে কাস্টমের স্বয়ং বড়কর্তা নন—মেজোকর্তা এসে হাজির। দূরপ্রাচ্য থেকে আগত একখানি প্লেনের যাত্রীদের মালপত্র চেকিং-এর সময় একটি স্যুটকেশের কোন দাবিদারই পাওয়া গেল না। মেজোকর্তার নির্দেশে স্যুটকেশটি খুলে ফেলা হল। দেখা গেল, প্রথম স্তরে গেরুয়া বসনের তলায় (প্লেনে একজন সন্ন্যাসী যাত্রীও ছিলেন) বহুসংখ্যক হাতঘড়ি ও প্যানোসনিক পকেট ট্রানজিস্টার থাকে থাকে সাজানো। দাবিদার না থাকায় স্যুটকেশটি চালান করা হল কাস্টম অফিসে।

পিয়ারীলাল পাণ্ডে মশায় ওঁর কাছে যাননি বা কাউকে পাঠাননি, ভদ্রলোকই নিজে থেকে এসে হাজির। অবশ্য তিনি যে আসবেন তা ফোনে জানিয়েছিলেন, আর অনুরোধ করেছিলেন তিনি যখন আসবেন তখন পাণ্ডে মশায়ের ঘরে যেন আর কেউ না থাকে। ঘরে ঢুকে একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে আগন্তুক পকেট থেকে বের করলেন—না, রিভলবার-পিস্তল জাতীয় কিছু নয়, একটি একশ' টাকা নোটের তাড়া। তাড়াটি পাণ্ডে মশাই-এর সামনে টেবিলের ওপর রেখে শুধু একটু মুচকি হাসলেন। পাণ্ডে মশায় জিজ্ঞাসা করলেন : কেত্তনা?

অনুরূপ সংক্ষিপ্ত উত্তর : দশ্।

তাড়াটি ড্রয়ারের মধ্যে ভরে ফেলে পাণ্ডে-মশাই একটা বড়গোছের ডায়েরী বের করে তাতে কি যেন লিখলেন। তারপর ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে তিনিও এবার মুচকি হাসলেন। নমস্কার করে ভদ্রলোক ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

পাণ্ডেমশায় একটি বড় রাজনৈতিক দলের অন্যতম প্রধান নির্বাচন-পরিচালক।

কাগজটার ওপর চোখ বুলিয়েই উকিলবাবু মুখ তুলে চাইলেন। তারপর বেশ কয়েক সেকেণ্ড নীরব থাকার পর বললেন : এতটা কম দেখানো কি ঠিক হবে? মক্কেল ভদ্রলোক বেশ কিছুক্ষণ কোন জবাব দিলেন না। তারপর বললেন : তাছাড়া আমিই বা কিনি কি করে। আর কনভেয়ারও এর বেশী দেখাতে রাজী নন।

—ঠিক আছে, বলে উকিলবাবু আবার কাগজটায় মনোনিবেশ করলেন।

ওপরের চারটে ঘটনাই হয়ত গল্প, কিন্তু গল্প হলেও সত্যি। অন্তত যাঁরা ওয়ানচু বা কালো টাকা অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট পড়েছেন তাঁরা বর্ণিত ঘটনাগুলোকে সম্পূর্ণ সত্যি বলে মনে করতে কোনরকম দ্বিধাই করবেন না। বাস্তব যে অনেক সময় কল্পনাকে ছাড়িয়ে যায়—এই সুপ্রচলিত উক্তি বর্তমান দিনের কালো টাকার যুগে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কালো টাকা :

আজ পর্যন্ত বোধহয় কালো রং-এর টাকা কোথাও দেখা যায়নি। অতীতে মানুষ গরু-ছাগল ধানগম চামড়া লবণ তুলো কড়ি (যা থেকে 'টাকাকড়ি' শব্দটির উৎপত্তি) এমনকি ক্রীতদাসকে (ক্রীতদাসীও গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত) টাকা হিসেবে ব্যবহার করেছে। এই সেদিনও—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর —আজকের পশ্চিম জার্মানীতে আর কিছু নয়—সিগারেট বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। মুদ্রাঙ্কনের জন্য শেষ-পর্যন্ত মানুষ কিন্তু ধাতুর দিকেই ঝুঁকেছে—হলদে আর সাদা ধাতু : সোনা আর রুপোর মধ্যে মধ্যে অবশ্য তামার ব্যবহারও করা হয়েছে, কিন্তু এক মহম্মদ বিন তুগলক ছাড়া আর কেউ তামার প্রামাণিক মুদ্রা প্রচলনের প্রচেষ্টা করেননি।

কাগজী মুদ্রার যুগেও কালো রং-কে মোটামুটি পরিহার করা হয়েছে। জলছাপ বা অক্ষর মুদ্রণের ক্ষেত্রে অনেক সময় কালো ব্যবহার করলেও কাগজের রং করা হয়েছে হরিৎ ধূসর গোলাপী লাল ইত্যাদি।

কালো রং-এর টাকা না থাকলেও কালো টাকা সব দেশেই অল্পবিস্তর আছে, আর আমাদের দেশে বর্তমানে এতে বাজার ছেয়ে গেছে। এই কালো টাকা দিয়েই অভিজাত রেস্তোরায় অভিজাত সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকগণ ঢুকে কোনরকমে একটু খাবার ঠুকরে বিয়াল্লিশ টাকার বিলে আটাম টাকা টিপ দিয়ে বেরিয়ে আসেন, এই টাকার মারফতেই চোরা আমদানির বিরাট ব্যবসা চলে আর রাজনৈতিক দলগুলোকে মোটামোটা চাঁদা দেওয়া এবং বেনামীতে—দাম অনেক কম দেখিয়ে সম্পত্তি কেনা হয়। ওয়ানচু কমিটি দেখিয়েছে যে, আরও অনেক কিছু করা হয়।

যে টাকায় গোপন লেনদেন ও ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়মিতভাবে চলে—অর্থাৎ যে টাকা কর বিভাগের হদিসের বাইরে তাকেই কালো টাকা বলে অভিহিত করা হয়। ওয়ানচু কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে সংক্ষেপে বলা যায় : কর ফাঁকি দেওয়াই কালো টাকার উদ্ভবের কারণ।

সমান্তরাল অর্থ-ব্যবস্থা :

কর-বিভাগের হদিসের মধ্যে যে লেন-দেন ব্যবসা-বাণিজ্য চলে তাকে সামগ্রিক-ভাবে প্রকাশ্য অর্থ-ব্যবস্থা বা 'অফিসিয়াল

ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হয়। আয় অনুপাতে কালো টাকার কাজকারবারকে সমান্তরাল অর্থ-ব্যবস্থা বা 'প্যারালাল ইকনমি' বলে অভিহিত করা হয়। এই সমান্তরাল অর্থ-ব্যবস্থার অস্তিত্ব আমাদের বর্তমান অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যা। যেভাবে এই অর্থ-ব্যবস্থা দিন দিন সম্প্রসারিত হচ্ছে, তাতে সমস্যা সংকটে পরিণত হতে বেশী দেরী নেই বলেই অনেকে মনে করেন। এর দরুণই হয়ত অর্থ-ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে এমনকি রাষ্ট্রবিপ্লবও ঘটতে পারে। বিষয়টির বোধহয় একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

একটি সাম্প্রতিক হিসাব অনুসারে আমাদের সমান্তরাল অর্থ-ব্যবস্থার সম্প্রসারণের হার জাতীয় আয় বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশী। এর অর্থ—দারিদ্র্য দূরীকরণ বা 'গরীবী হটাও' লক্ষ্যের দিকে পৌঁছোন ত যাচ্ছেই না, বরং আয় বৈষম্য বৃদ্ধির ফলে সমাজতান্ত্রিক ভারতে ধনী আরও ধনী এবং দরিদ্র দরিদ্রতর হচ্ছে। কিছুদিন আগে হিসেব করা হয়েছিল যে, ভারতে মাথাপিছু দৈনিক ভোগব্যয় ৭৫ পয়সার মত, কিন্তু জনসংখ্যার প্রায় ৬০ শতাংশ মাথাপিছু দৈনিক ৪৭ পয়সার বেশী ব্যয় করতে সমর্থ নয়। আজকের দামের ভিত্তিতে মোট ভোগব্যয়ের পরিমাণ হয়ত কিছুটা বেড়েছে। কিন্তু ঐ শতকরা ৬০ ভাগ লোকের জীবনযাত্রার মানে যে-কোন উন্নতিই ঘটেনি তা বিতর্কের ঊর্ধ্বে। বরং জনসংখ্যার বৃহদংশের ক্ষেত্রে জীবনযাত্রার মানে অবনতিই ঘটেছে এবং জনসংখ্যার একটা মোটা শতাংশ 'ন্যূনতম স্বাস্থ্য ও শালীনতার মান থেকে চরম দারিদ্র্যের পর্যায়ে নেমে এসেছে। তারা আজ গৃহহীন হয়ে রাস্তাঘাটে ফুটপাতে রেলস্টেশনে জন্তুজানোয়ারের মতই বাস করে। অথচ অপরদিকে কালো টাকার বলে বলীয়ানদের ঐশ্বর্যের নির্লজ্জ প্রদর্শন, বাহ্যাড়ম্বর-পূর্ণ ভোগের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নতুন ধনিকতন্ত্র :

কালো টাকার বলে বলীয়ান এই শ্রেণীকে নতুন ধনিকশ্রেণী বলে বর্ণনা করা যায়। (যুগোস্লাভিয়ায় এদের বলা হয় 'দীনার বিলিওনিয়ার্স'।) এই শ্রেণী সমাজকে ঠকিয়ে আয় ও ভোগের (কিছুটা বিপজ্জনক হলেও) একটা সহজ পন্থা আবিষ্কার করেছে। এই নতুন ধনিকশ্রেণী মার্কিন অর্থনীতিবিদ থর্স্টিন বান্ডে ভেবলেনের (১৮৫৭—১৯২৯) বিখ্যাত গ্রন্থ 'দি থিয়োরী অব দি [illegible] ক্লাস'-এর (১৮৯৯) কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। [illegible] ক্লাস বা অবসরভোগী শ্রেণীর অর্থ-নৈতিক আচরণের মুখ্য দিক হল বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ ভোগ বা [illegible] লোককে দেখাবার জন্য ভোগব্যয়। আমার আছে তোমার নেই—এইটে প্রচার করতেই অবসরভোগী শ্রেণী সর্বদাই উন্মুখ। তাই রুচিপছন্দ নিত্য পরিবর্তিত হয় এবং এর দরুণ উপকরণসমূহ নিয়োজিত হয় অকাম্যদ্রব্য উৎপাদনে। পোশাক-পরিচ্ছদ গৃহসজ্জা আমোদপ্রমোদ — সবকিছুর ব্যাপারেই লক্ষ্য হল নতুন কিছু করো। সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর পালামৌ-এ লিখেছিলেন : 'ঋষির আশ্রমপার্শ্বে প্রতিবেশী বসাও দুইদিনে ঋষির ঋষিত্ব যাইবে।' নতুন ধনিকশ্রেণী বা ভেবলেনের 'অবসর-ভোগী শ্রেণী' প্রতিবেশীকে শুধু নকলই করে না—জোনসদের সঙ্গে শুধু তাল রাখতেই চায় না, প্রতিবেশীদের—জোনসদের ছাড়িয়ে যেতেই সকল সময় সচেষ্ট। এ অবস্থায় সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থ-নৈতিক মুক্তির কথা চিন্তাই করা যায় না। আরও উল্লেখযোগ্য, যে অকল্পিত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি আজকে আমাদের অর্থ-ব্যবস্থাকে পযুর্দস্ত করছে তার মূলেও বহুল পরিমাণে আছে এই কালো টাকার ভূমিকা। একজনের ব্যয় যখন অপর একজনের আয় তখন কালো টাকা বেশ কিছু লোকের ক্রয়-ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে অপ্রচুর দ্রব্যাদির ওপর চাপ দিতে বাধ্য। ফল : ঊর্ধ্বমুখী দ্রব্যমূল্য।

ওয়ান্‌চু কমিটি—অনুসন্ধান :

কালো টাকা ও সমান্তরাল অর্থ-ব্যবস্থার কুফল সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ বা কেন্দ্রীয় সরকার যখন সজাগ হলেন তখন নতুন ধনিকশ্রেণী শিকড় গেড়ে বসেছে। যা'হোক শেষ পর্যন্ত এ বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান ও সুপারিশ করবার জন্যে সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শ্রী কে, এন, ওয়ান্‌চুর নেতৃত্বে ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে পাঁচজন সদস্যবিশিষ্ট এক কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির আসল নাম 'ডাইরেক্ট ট্যাকস এনকোয়্যারি কমিটি' বা প্রত্যক্ষ কর অনু-সন্ধান কমিটি। সভাপতি বা নেতার নামানুসারে একে সংক্ষেপে ওয়ান্‌চু কমিটি এবং উদ্দেশ্য অনুসারে একে 'কালো টাকা অনুসন্ধান কমিটি'ও বলা হয়। ওয়ান্‌চু কমিটির অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট ১৯৭০ সালের শেষের দিকে এবং চূড়ান্ত রিপোর্ট ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত হয়।

কমিটির হিসাবে ১৯৬৮-৬৯ সালে ১৪০০ কোটি টাকার আয়ের ওপর ৪৭০ কোটি টাকা কর ফাঁকি দেওয়া হয়েছিল এবং ঐ বছর কালো টাকার দ্বারা পরি-চালিত ব্যবসাবাণিজ্য ও লেনদেনের পরিমাণ ছিল ন্যূনপক্ষে ৭০০০ কোটি টাকা। যেসব কাজকারবার এই টাকায় চলে তার মধ্যে আছে বৈদেশিক মুদ্রাসহ গুপ্ত ব্যবসার লেনদেন, সোনা ও বিলাস দ্রব্যাদির চোরা আমদানি, প্রিমিয়ামে কোটা ও লাইসেন্স ক্রয়, গোপনে কমিশন দেওয়া, রাজনৈতিক দলগুলিকে চাঁদা দেওয়া, বেনামীতে ও দলিলে কম দেখিয়ে সম্পত্তি ক্রয় ইত্যাদি।

কর ফাঁকি দেওয়ার ফলে এই কালো টাকার উৎপত্তি হয়েছে। কর ফাঁকি দেওয়ার প্রধান কারণগুলোও ওয়ান্‌চু কমিটি নির্দেশ করেছে : আয়করের মত প্রত্যক্ষ করের এবং বিক্রয়করের মত পরোক্ষ করের অতি উচ্চ হার, কৃষি থেকে আয়কে কেন্দ্রীয় আয়করের বহির্ভূত রাখা, ব্যবসায়ের ব্যয়ের উচ্চতম সীমা নির্ধারণ, ঘাটতির অর্থনীতি, লাইসেন্স-পারমিট-কোটা-কন্ট্রোল প্রথা, রাজনৈতিক দলগুলিকে চাঁদা দেওয়ার ব্যবস্থা, ব্যবসাবাণিজ্যে অসাধুতার প্রসার, করসংক্রান্ত আইনগুলোর প্রয়োগে দৃঢ়তার অভাব, এবং—সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য—সমাজে নৈতিক মানের অবনতি।

সুপারিশ :

ওয়ান্‌চু কমিটি কালো টাকার উদ্‌ঘাটনের উদ্দেশ্যে যেসব আইন ও ব্যবস্থা প্রবর্তিত আছে তাদের পর্যালোচনা করে ৩০০টির মত সুপারিশ করেছে।

কমিটি স্বেচ্ছায় প্রকাশ পরিকল্পনার বিরোধী, কারণ এর ফলে কর ফাঁকি দেবার ঝোঁক বৃদ্ধি পাবে এবং প্রশাসন বিভাগের মনোবলও ক্ষুণ্ণ হবে বলে কমিটি মনে করেন। বস্তুত, স্বেচ্ছায় প্রকাশ পরি-কল্পনার সফলতা নৈতিক মান উন্নয়নের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং বর্তমানে ঐ ব্যবস্থা অকার্যকর হতে বাধ্য।

দ্বিতীয়ত, কমিটি কালো টাকার সন্ধানে খানাতল্লাসি ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করবার সুপারিশ করেছে।

তৃতীয়ত, কমিটি প্রবর্তিত লাইসেন্স-কোটা—কন্ট্রোল ব্যবস্থার পর্যালোচনা করবার জন্যে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেছে।

চতুর্থত, গুপ্ত আয় উদ্‌ঘাটিত হলে বর্তমানে যে আয়ের ভিত্তিতে জরিমানা করা হয়, তা না করে ফাঁকি দেওয়া করের পরিমাণের ভিত্তিতেই জরিমানা করা উচিত বলে কমিটি মনে করে।

পঞ্চমত, আয়কর প্রশাসনের অনুসন্ধান বিভাগকে আরও জোরদার করতে হবে। গুপ্ত আয়ের সংবাদদাতাকে বর্তমানে যে পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা আছে তা বহাল ত' রাখতেই হবে, প্রয়োজন হলে ঐ পুরস্কারের পরিমাণও বৃদ্ধি করতে হবে।

ষষ্ঠত, আয়করের অতি উচ্চ হারের জন্যেই কর ফাঁকি দেওয়া লাভজনক ও আকর্ষণীয় বলে কমিটি সর্বস্তরের আয়-করের হারকে হ্রাস করবার সুপারিশ করেছে। কমিটির মতে, সর্বোচ্চ প্রান্তিক হার যেন ৭৫ শতাংশের বেশী না হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে অধ্যাপক নিকোলাস ক্যালডোরও আয়করের সর্বোচ্চ প্রান্তিক হার ৯২ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ৪৫ শতাংশ করবার সুপারিশ করেছিলেন। কিছুদিন ঐ সুপারিশ কার্যকর করার

প্রবণতা দেখা গেলেও আবার সর্বোচ্চ আয়ের স্তরে প্রান্তিক হারকে অদূরদর্শী-ভাবে বৃদ্ধি করে, ৯০ শতাংশের অঙ্ক অতিক্রম করা হয়েছে।

সপ্তমত, বর্তমানে কৃষি থেকে আয় ভারতীয় আয়করের আওতার বাইরে। সংবিধান এ বিষয়ে কোন সন্দেহই রাখেনি (৭ম তপশীলভুক্ত রাজ্য তালিকার ৪৬ সংখ্যক দফা)। কৃষির ওপর ভূমি-রাজস্ব ও আয়করের ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু এই কর ধার্য করবার ক্ষমতা রাজ্যগুলির, কেন্দ্রের নয়। রাজ্যগুলি প্রধানত রাজনৈতিক কারণে এই করধার্যের ব্যাপারে যথাসম্ভব উদারতা দেখাতেই উন্মুখ। ওয়ানচু কমিটির মতে, কৃষিগত আয় ভারতীয় আয়করের আওতার বাইরে থাকায় কর ফাঁকি দেবার বিশেষ সুবিধা হয়। অতএব, এ করকেও ভারতীয় আয়করের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে, ওয়ানচু কমিটির পরবর্তী 'রাজ কমিটি'ও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছে।

অষ্টমত, পশ্চিম জার্মানী ও জাপানে নির্বাচনের সকল ব্যয়ভার সরকারই বহন করে। ওয়ানচু কমিটি ভারতেও এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করেছে। এর জন্যে সরকারকে রাজনৈতিক দলগুলোকে সাহায্য স্বরূপ অনুদান বা গ্র্যান্টস-ইন-এড প্রদান করতে হবে। করদাতারা রাজনৈতিক দল-গুলোকে চাঁদা দিলে কতকগুলি বাধানিষেধ-সাপেক্ষ আয় থেকে ঐ দানের একটা অংশ ছাড় দিতে হবে।

নবমত, কমিটি এক উন্নয়নমূলক তহবিল গঠন করতে নির্দেশ দিয়েছে। এই তহবিলে ব্যক্তি হিসেবে করদাতাগণ তাদের আয়ের সর্বাধিক ১০ শতাংশ বা ২০ হাজার টাকা স্বেচ্ছায় জমা দিতে পারে। এই জমার পরিমাণের একটা নির্দিষ্ট অংশ করদাতার মোট আয়ের হিসাব থেকে বাদ দিতে হবে। প্রদত্ত অর্থ ৭ বছরের জন্যে জমা থাকবে এবং এর ওপর অন্যূন ৪·৫ শতাংশ হারে সুদ দিতে হবে।

কমিটির আর একটি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য সুপারিশ হল যে প্রমাণিত কর-প্রবঞ্চক ভবিষ্যতে যাতে ঋণ গ্রহণের সুযোগ না পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যবস্থাটি কঠোর হলেও করপ্রবঞ্চকদের প্রতি কোনরকম সহানুভূতি দেখানো উচিত নয় বলেই কমিটি মনে করে।

কমিটির সমীক্ষা ও সুপারিশগুলো বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ কয়েকটি সুপারিশ কার্যকর করবার জন্যে সরকার ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই বিল আনবেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

উপসংহার :

আশা করা যায় নতুন আইনের ফলে কালো টাকার উদ্ঘাটনে কিছুটা সুরাহা হবে। কিন্তু কতটা? আইন বর্তমানে আছে। হবে। কিন্তু কতটা? আইন বর্তমানে আছে। ভবিষ্যতে হয়ত আরও জোরদার আইন হবে। কিন্তু কালো টাকার পথ যারা দেখেছে তারা সব সময়েই বলবে : 'আইনে যতই থেকো, আছে ফাঁক আমাদেরও।' সুতরাং আইন জোরদার করার সঙ্গে সঙ্গে এই ফাঁক বন্ধ করতে হবে। কিন্তু তা করা যায় কি করে? এ সমস্যা প্রধানত সমাজের নৈতিক মান-উন্নয়নের সমস্যা। ওয়ানচু কমিটি এ সমস্যার উল্লেখ করলেও তার সমাধানের পথনির্দেশ করে নি।

সমাজে নৈতিক মানের অবনতি ঘটেছে —ওয়ানচু কমিটির এই অভিমতের অর্থ হল সমাজের সকল স্তরেই নৈতিক মানের অবনতি ঘটেছে। এ ব্যাপারে প্রকৃতিগত দিক দিয়ে এক পেশার সঙ্গে আর এক পেশার, এক ব্যবসায়ের সঙ্গে আর আর ব্যবসায়ের কোন তফাৎই নেই—সকলেই সুযোগ পেলে আয় গোপন করে, আর সোজা পথে উপার্জনের প্রচেষ্টা করে। ওয়ানচু কমিটি অবশ্য চুনোপুঁটিদের ছেড়ে দিয়ে রুই কাৎলাদের প্রতিই দৃষ্টি দিতে নির্দেশ দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য আয়কর প্রশাসন বিভাগকেও জোরদার করতে উপদেশ দিয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে সর্ষের মধ্যের ভূত তাড়ানো কি সম্ভব হবে? আয়কর প্রশাসন বিভাগের কর্মীরাও যে সমাজভুক্ত—অনসম্ভোগী শ্রেণীভুক্ত না হলেও তাঁদের পত্নীদের প্রতিবেশীর পত্নীরা অলংকার প্রদর্শন করে যান, আর সংক্রামক ব্যাধি বলে প্রদর্শনপ্রবণতা থেকে তাঁরাও মুক্ত থাকতে পারেন নি। অতএব চুনোপুঁটিদের ছেড়ে দিয়ে শুধু রুই কাৎলা ধরবার জন্যে আয়কর বিভাগকে গঙ্গাজলে ধুয়ে নেবার ব্যবস্থা করলে প্রচেষ্টা কতদূর ফলবতী হবে অনুমান করা কঠিন।

তা হলে কি করতে হবে? এ প্রশ্নের উত্তর প্রকৃতপক্ষে কারও জানা নেই। তবে বলা যায়, সমাজের ওপরের স্তর থেকে অভিযান শুরু করা যেতে পারে। সমাজের ওপরের স্তর বলতে রাষ্ট্রক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত শ্রেণীকেই নির্দেশ করছি। তাঁদের পক্ষে শুধু সৎ হলেই চলবে না, ব্যক্তিগত জীবনে তাঁদের বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ ভোগ ও ব্যয় সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে হবে। সংক্ষেপে বলা যায়, যদি সরল অনাড়ম্বর জীবন রাষ্ট্র-নেতাদের লক্ষ্য হয়ে ওঠে তবে কাজ অনেকখানি এগিয়ে যাবে। নচেৎ নীতি-শিক্ষার জন্য পোস্টারে দেওয়াল ছেয়ে ফেললেও, সংবাদপত্রে একপাতা জুড়ে বিজ্ঞাপন দিলেও, এমনকি নীতিশিক্ষার স্পেশাল ক্লাসের ব্যবস্থা করলেও কিছু হবে না—[illegible] একদিন প্রকাশ্য অর্থব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার ভিত্তিমূল ধরে নাড়া দেবে।

তপন সিংহর জিন্দেগী জিন্দেগীতে ওয়াহিদা রেহমান

বাঙলা ছবির প্রদর্শনী ব্যাহত

একে তো বাঙলা ছবি প্রস্তুতই হচ্ছে কম; তার ওপর কন্টেসন্টে যে-কটি তৈরী হয়ে সেন্সারের ছাড়পত্র পাচ্ছে, তাও চিত্র-গৃহের মালিকদের কারচুপির ফলে সময়মতো মুক্তি পাচ্ছে না। এ-ব্যাপারে নাকি চিত্র-পরিবেশকদের অদৃশ্য হস্তের প্রভাব খুবে বেশী কার্যকরী। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের বিষয় এই যে, বহুপ্রকার বাধা অতিক্রমের তিক্ত অভিজ্ঞতার পরে যে-চিত্রপ্রযোজক তাঁর সাধের ছবিটির শুভমুক্তি দেখে ধন্য হলেন, কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহ ছবি চলার পরে অত্যন্ত অতর্কিত-ভাবে তাঁকেও তিমির রাত্রি গ্রাস করে মালিক-শ্রমিকের লড়াইয়ের দরুন তাঁর ছবি যে-চিত্রগৃহে চলছিল, তা' বন্ধ হওয়া ফলে। সম্প্রতি মিনার-বিজলী-ছবিঘর রূপবাণী-ভারতী-অরুণ, পূর্ণ এব ইন্দিরা—এই আটটি চিত্রগৃহ বন্ধ হবা দরুন 'বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা 'ছিন্নপত্র', 'পদি পিসীর বর্মি বাক্স' ও 'স্ত্রী —এই চারখানি ছবির প্রযোজকগণ উলুখড়ের মতোই যার-পর-নাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, এ-কথা সর্ববাদীসম্মত। যুদ্ধ হচ্ছে মালিক-শ্রমিকে; কিন্তু আসলে এ'রা হলেন তার শিকার। মজার কথা, পশ্চিম বঙ্গের কমবেশী ৩৭০টি চিত্রগৃহের মধ্যে ৩৫০টি চিত্রগৃহের মালিকই তাঁদের কর্ম

রূপ তেরা মস্তানায় জীতেন্দ্র ও মমতাজ

শেষ পৃষ্ঠায় লেখক/সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং অপর্ণা সেন। পরিচালনা : সলিল দত্ত। ফটো : অমৃত

রীদের বকেয়া প্রাপ্য মিটিয়ে দেওয়া ম্পর্কে উদাসীন। কিন্তু কর্মীদের তিনিধি সংস্থা বেঙ্গল মোশান পিকচার ম্পলয়িজ ইউনিয়নের (বি-এম-পি-ই-ইউ) র্তৃপক্ষ এ-ব্যাপারে আন্দোলন চালাবার ন্যে এমন আটটি চিত্রগৃহকে বেছে নিলেন, যখানে বাঙলা ছবির মুক্তি দেওয়া হয় বং যে-চিত্রগৃহগুলির মালিক হচ্ছেন াঙালী।

বি-এম-পি-ই-ইউ-এর যাঁরা নেতৃস্থানীয় াঁরা নিশ্চয়ই জানেন, আজ নানা কারণে াঙলা ছবি খুব কমই তৈরী হচ্ছে। তাঁরা -কথাও জানেন, বাঙলা ছবির প্রযোজকরা াদের ছবির আয়ের এক-তৃতীয়াংশ থেকে র্ধেক পর্যন্ত পাবার আশা করেন লকাতার 'রিলিজ হাউস চেন' (যে-কটি চিত্রগৃহে তাঁদের ছবি মুক্তিলাভ করে, তার) থেকে। এ-অবস্থায় আন্দোলনের জন্যে অগণিত হিন্দী-ছবি-চলার চিত্রগৃহগুলিকে বাদ দিয়ে উপরে-লিখিত ছবিঘরগুলিকে চিহ্নিত করার অর্থ কি পরোক্ষে বাঙলা ছবির প্রযোজকদের বুকে ছুরি মারার সামিল নয়? এবং সমগ্রভাবে বাঙলা চলচ্চিত্রশিল্প কি এর ফলে আরও বেশী করে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না?
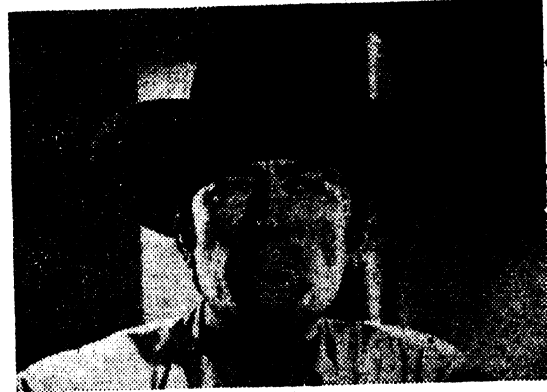
আমাদের একান্ত অনুরোধ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার উভয় পক্ষকেই ডেকে অবিলম্বে ছবিঘরগুলিকে চালু করবার ব্যবস্থা করবেন, বিরোধের মীমাংসা শীঘ্রই করবার আশ্বাস দিয়ে, বাঙলা ছবির অবসন্নকে অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবেন।

চিত্রসমালোচনা

জিন্দগী জিন্দগী

জান পিকচার্স নিবেদিত, নারীম্যান, এ, ইরানী এবং এ, পি, শর্মা প্রযোজিত ও তপন সিংহ পরিচালিত প্রথম গানে-ভরা হিন্দী ছবি 'জিন্দেগী জিন্দেগী' (ইস্টম্যান কলারে তোলা) ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরে মুক্তিপ্রাপ্ত ও শ্রীসিংহ পরিচালিত বাঙলা ছবি 'ক্ষণিকের অতিথি'র হিন্দী সংস্করণ। বাঙলার কার্বন-কপি অর্থাৎ হুবহু হিন্দী চিত্ররূপ হলে হিন্দী ছবির সাধারণ দর্শকদের মনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হত, তা অনুমান করা কঠিন। কিন্তু দর্শকদের চিত্তবিনোদনের জন্যে ছবির একেবারে শেষ দৃশ্যে যে-ভাবে নায়ক-নায়িকার মিলন ঘটানো হয়েছে তা কাহিনীর ধারার সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং রসবিরোধী। যে অনন্ত প্রেম ফল্গুধারার মতো নায়ক-নায়িকার মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছিল, তার ন্যায়-সঙ্গত পরিণতি ছিল তাদের বিচ্ছেদে— রোগমুক্ত সন্তানকে নিয়ে নায়িকার প্রত্যাগমনের মধ্যে। কাহিনীবিন্যাসে ছোটোখাটো ত্রুটি অনেক আছে। তার মধ্যে, যিনি হচ্ছেন হাসপাতালটির প্রতিষ্ঠাতা, সেই রামপ্রসাদ চৌধুরী হৃদরোগের চিকিৎসার জন্যে কি করে অন্যান্য রোগীর সঙ্গেই থাকেন, সেইটি বুঝে ওঠা কঠিন; বিশেষ

গ্রেগরি পেক

আমি সিরাজের বেগম/বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায়। পরিচালনা : সুশীল মুখার্জি। ফটো : অমৃত

করে যেখানে দেখি, দেব মুখোপাধ্যায় অভিনীত রোগীটি অন্যান্যদের থেকে পৃথকভাবে অবস্থান করছে। হিন্দী ছবিটির সংলাপ লিখেছেন খাজা আহমেদ আব্বাস। ফলে, মনে হয় খানিকটা জবরদস্ত ভাবেই তিনি সংলাপের মাধ্যমে নায়ক, ডাঃ সুনীলের বাবার সমাজবিরোধী কাজ করে কারাবরণ করবার ও সেখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হবার সংবাদ দিয়েছেন এবং যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন, সেখানেই ধনিকবিরোধী সংলাপ ব্যবহার করে ছবিকে বাড়তি হাততালি পাইয়েছেন। চিত্রনাট্যকার রূপে শ্রীসিংহ অবশ্যই বহু উপভোগ্য মুহূর্ত সৃষ্টি করেছেন ছবির এখানে-ওখানে। দুর্ঘটনার ফলে নায়িকার চলচ্ছক্তিহীন সন্তানের চিকিৎসাকে ঘিরে যেমন অনেকগুলি নাটকীয় পরিস্থিতি, তেমনই হৃদরোগী চৌধুরী রামপ্রসাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী লোকনাথের সঙ্গে নির্বাচনী প্রচারমঞ্চে বিরোধ ও মিলনের দৃশ্যটি এবং পরবর্তী দুটি দৃশ্যের মাধ্যমে উত্তেজনার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ রাম-প্রসাদের মৃত্যুটিও গভীর মননযোগ্য।

জবাব / সমিত ভঞ্জ ও রাধা সালুজা

অস্ত্রোপচারের পরে নায়িকার সন্তান 'বাবু'র মনোবলকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে নায়কের আপ্রাণ চেষ্টাটি সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে।

'জিন্দেগী জিন্দেগী'র অভিনয়াংশ সামগ্রিকভাবে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। নায়ক ডাঃ সুনীল ও নায়িকা মিতার চরিত্রে সুনীল দত্ত এবং ওয়াহীদা রেহমানের সংবেদনশীল অভিনয় বিশেষ প্রশংসাপূর্ণ। নায়ক সুনীলের মায়ের ভূমিকায় ছায়া দেবী স্নেহশীলা মাতৃত্বের প্রতিমূর্তি। কিন্তু নায়িকার কাকা-কাকীর দ্বারা অপমানিত হওয়ার দৃশ্যে তাঁকে দিয়ে রেগে ভেঙে-পড়ার অভিনয় করানো কি যুক্তিযুক্ত হয়েছে? অন্যায়ভাবে অপমানিতা হওয়ার রূপে অন্যভাবে ব্যক্ত হতে পারত। হৃদরোগাক্রান্ত চৌধুরী রামপ্রসাদের চরিত্রে প্রবীণ অভিনেতা অশোককুমারের ভংগী কিছুটা লাউড বা আতিশয্যপূর্ণ এবং সেটা হওয়াই স্বাভাবিক। এবং পার্শ্ব-রোগীর ভূমিকায় আনোয়ার হোসেনও অত্যন্ত জীবন্ত। চক্ষুপীড়াগ্রস্ত রোগীবেশে ইফতেকার এঁদের দুজনের সংগে তাল রেখে চলেছেন। যুবক রোগী রতনলালরূপে জালাল আগাও খুবই প্রাণবন্ত। গাইয়ে-রোগীর ভূমিকায় দেব মুখোপাধ্যায় এবং তারই সেবিকারূপিনী ফরিদা জালাল বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছেন নিশ্চয়ই। কিন্তু পরস্পরে বিবাহিত হতে চলেছে এই আনন্দসংবাদ পরিবেশনের পরে তাদের পুলকের অভিব্যক্তিস্বরূপ দ্বৈত নৃত্য-গীত হাসপাতালের পরিবেশে কিছুটা অস্বস্তিকর। কলেজ প্রিন্সিপ্যাল ও সার্জেনের ভূমিকায় নাসির খান অত্যন্ত স্বাভাবিক ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ। রামপ্রসাদের নির্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বী লোকনাথরূপে সমর রায় সু-অভিনয় করেছেন; তাঁকে ঐ ভূমিকায় মানিয়েওছিল চমৎকার। ডাঃ সুনীলের কম্পাউণ্ডারবেশে মঙ্গল মুখোপাধ্যায় বেশ স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন। নায়িকার দিল্লীর বান্ধবীর ভূমিকায় চাঁদ ওসমানী প্রাণোচ্ছল। রামপ্রসাদের বে-পরোয়া ছেলেরূপে রমেশ দেও উদ্ধত, বাউণ্ডুলে যুবকের প্রতিমূর্তি। অপরাপর ভূমিকায় মাস্টার টিটো (নায়িকার সন্তান বাবু), জাগীরদার (নায়িকার কাকা), শ্যামা (নায়িকার কাকী), রাজকুমার (সুনীলের গৃহভৃত্য) প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

ছবিটির একটি বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে এর সংগীতাংশ। সুরকার শচীন দেববর্মণের নিজের গাওয়া দুখানি গান তো আছেই; এ ছাড়া আছে কিশোরকুমার, মান্না দে এবং লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া গান যেগুলি, বোধকরি, ইতিমধ্যেই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। আবহসংগীত রচনাতেও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন শচীন দেববর্মণ।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ প্রশংসনীয়। কাহিনীর ভাব অনুযায়ী ছবির গতি কিছুটা ধীর হওয়াই স্বাভাবিক হলেও কোনো কোনো অংশে ছবিটি যেন বড্ড বেশী ধীরগতিসম্পন্ন হয়েছে।

জ্ঞান পিকচার্স নিবেদিত ও তপন সিংহ পরিচালিত 'জিন্দেগী জিন্দেগী' কাহিনী, অভিনয় ও সুরবৈচিত্র্যগুণে দর্শকচিত্তকে আকৃষ্ট করবে।

রূপে ভরা মস্তানা

বোম্বাইয়ের চিত্রনির্মাতারা—বিশেষ করে তাঁদের কাহিনীকারেরা—একটি বিষয়ে ঈর্ষাযোগ্য দক্ষতা অর্জন করেছেন। তাঁরা একটি চিত্রকাহিনীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটির পর একটি অবাস্তব পরিস্থিতি রচনা করে কি ক্ষিপ্রতার সংগে তাদের গ্রথিত করে দর্শকচিত্তে বিভ্রমের সৃষ্টি করেন, তা রীতিমত অনুশীলন সাপেক্ষ। সুচিত্রা কলামন্দির নিবেদিত, এম-এম-মালহোত্রা, বলদেব ও মোহন বালি

যোজিত এবং খালিদ আখতার পরিচালিত 'রূপ তেরা মস্তানা' ছবিটির কাহিনীর কথা ন করেই কথাগুলি বলতে হল।

কোন এক দেশীয় রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী ঊষাকে তার প্রাপ্তবয়স্কা হবার তিনদিন আগেই তার কুচক্রী সেক্রেটারী অজিত সিং হত্যা করে বসল এবং বলতে গেলে মুহূর্তের মধ্যে ঠিক তারই মতো দেখতে এক মেয়েকে এনে ধায় পরিণত করল। ধনরত্নের প্রলোভন, ত্রাস বিভীষিকা, হত্যাকারিণীর পে দণ্ড প্রভৃতি বহুতর সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য পরিণতির কথা বলে গরীব ঘরের মেয়ে কিরণকে নিকটবর্তী একটি এস্টেটের কুমার সাহেবের প্রেমিকা ঊষার পদে অভিষিক্ত করে কুচক্রী অজিত সিং সমস্ত ধনরত্নের মালিক হয়ে বসবার জন্যে কতরকম নারকীয় চক্রান্ত যে করল, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু, বলা কথা যে, সে শেষ পর্যন্ত তার উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হবেই হবে। ছবি দেখবার পরে ভাবতে চেষ্টা করলুম, সেক্রেটারী অজিত সিং প্রকৃত উত্তরাধিকারিণী ঊষাকে হত্যা না করে তাকেই তো নিজের তাঁবে রাখতে পারত। অবশ্য তা হলে এমন উত্তেজক অবাস্তব উদ্ভট কাহিনীর সৃষ্টি হত না।

ঘটনার ঘনঘটা অবশ্যই ছবির দ্বিতীয়ার্ধে দর্শককে এমনভাবে আকৃষ্ট করে যে, সে তার বিচারবুদ্ধিকে ছুটি দিতে বাধ্য হয় এবং এইখানেই বোম্বের অধিকাংশ কাহিনীকারদের বাহাদুরী। এছাড়া উৎকণ্ঠা, রোমান্স, সেক্স প্রভৃতির চতুর সমন্বয়ে দর্শকমনে বিভ্রান্তি ঘটানোর আয়োজনটি সম্পূর্ণ করা হয়ে থাকে। অতএব অত্যন্ত সুপরিচিত ফর্মুলা অনুসারেই 'রূপ তেরা মস্তানা' সাধারণ হিন্দী দর্শকের কাছে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। আগুন ধরে প্লেন পুড়ে গেলেও কুমারসাহেব অক্ষত দেহে রইলেন, মোটরগাড়ী দুরন্তচালে এগিয়ে দুর্ঘটনায় পতিত হওয়া সত্ত্বেও অজিত সিং ও কিরণ বহালতবিয়তে রইল, কুমারসাহেবের বৃদ্ধ বাবা ছেলের বিবাহ-বাসরে উপস্থিত হয়ে 'বুঢ়াপে পে আগই জোয়ানী' গান গেয়ে রীতিমত নৃত্য করতে থাকেন এবং বরফের ঠাণ্ডা ঘরে ঊষার মৃতদেহ লুকোনো থাকে। রূপ তেরা মস্তানাতে অনেক—অনেক মজা।

অভিনয়ের সুযোগ কোথায় এমন ঘটনাপ্রধান ছবিতে? তবু যেটুকু সুযোগ পাওয়া গেছে তার সদ্ব্যবহার করেছেন মমতাজ (কিরণ), প্রাণ (অজিত সিং), আই-এস জোহর (ডিটেকটিভ), লীলা মিশ্র (কিরণের মা), ব্রহ্ম ভরদ্বাজ (কিরণের বাবা) প্রভৃতি।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ উচ্চপ্রশংসার যোগ্য। মহীশূরের স্টেটের রাজবাড়ী এবং অন্যান্য বহির্দৃশ্যের চিত্রগ্রহণে চিত্রশিল্পী ভি. দুর্গাপ্রসাদ অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ভি. যাদব রাওয়ের শিল্পনির্দেশনা এবং সুপারের সম্পাদনাতেও প্রচুর কৃতিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়। সুরযোজনায় লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল স্বভাবসিদ্ধ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন।

সুচিত্রা কলামন্দির নিবেদিত "রূপ তেরা মস্তানা" সাধারণ দর্শকউপভোগ্য ছবি।　　—নান্দীকর

স্টুডিও সংবাদ

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের নতুন আঙ্গিকের ছবি
'নকলসোনা' আগতপ্রায়!

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় রচিত পরিচালিত নবজাত প্রোডাকসন্সের নতুন আঙ্গিকের ছবি 'নকলসোনা'র চিত্রগ্রহণ সম্প্রতি শেষ হয়েছে। ছবিটি বড়দিনের সময় শহর ও শহরতলীর বিশিষ্ট চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে। বাংলার চলচ্চিত্র লোকের শিল্পী, প্রযোজক, পরিচালক, সংগীত পরিচালক, কন্ঠশিল্পী, প্রচার পরিচালক এবং অন্যান্য কলাকুশলীদের জীবনের হাসিকান্না, ব্যথা-বেদনাকে কেন্দ্র করে এ ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে। সংগীত পরিচালনা করেছেন নচিকেতা ঘোষ। নেপথ্যে কন্ঠদান করেছেন—মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, অনুপ ঘোষাল ও স্বপ্না দাশগুপ্তা। এই ছবিতেই সর্বপ্রথম বাংলার ১০৮ জন নবাগত, নবাগতা ও জনপ্রিয় শিল্পীর সমন্বয় ঘটেছে। এবং তাঁরা প্রত্যেকেই গৃহীত চরিত্রগুলিতে স্বনামে অভিনয় করেছেন। যাঁরা সাধারণত নায়ক-নায়িকার চরিত্রে রূপদান করেন, তাঁরা এ ছবিতে অতিথি শিল্পী হিসেবে ছোট ভূমিকা করেছেন। আর যাঁরা নবাগত/নবাগতা বা ছোট্ট ছোট্ট ভূমিকায় অভিনয় করেন, তাঁরাই এ ছবির মুখ্য চরিত্রগুলিতে রূপদান করেছেন। এছাড়া, পরিচালক, সম্পাদক, চিত্রগ্রাহক, শব্দযন্ত্রী, প্রচার পরিচালক, রূপসজ্জাকর এবং অন্যান্য কলাকুশলীবৃন্দও স্বনামে স্বীয় ভূমিকায় পর্দায় দেখা দেবেন। ১০৮ জন তারকার মধ্যে কিছু নামের তালিকা হলো—কল্যাণী মণ্ডল, নবাগতা রুপা চৌধুরী, পিনাকী সেনগুপ্ত, পিনাকী মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, কাজল মজুমদার, জগদীশ মণ্ডল, রবীন মজুমদার, তরুণ মজুমদার, জহর রায়, কৃষ্ণ

বসু, সর্বেন্দ্র, সতীশ হলদার, শ্রীপঞ্চানন, শ্রীকান্ত গুহঠাকুরতা, অমিয় মুখোপাধ্যায়, পারিজাত বসু, সুনীল দাশগুপ্ত, বুদ্ধদেব ঘোষ, শ্যামল মিত্র, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, নচিকেতা ঘোষ, পবিত্র চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, আরতি চট্টোপাধ্যায়, শর্বরী চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়, শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, নির্মল গুপ্ত, ভানু চট্টোপাধ্যায়, রবীন বসু, অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর ঘোষ, সত্যেন চট্টোপাধ্যায়, নৃপেন পাল, তপতী দেবী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময় রায়, পার্থ মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা সেন, সুপ্রিয়া দেবী, অপর্ণা সেন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, উত্তমকুমার প্রভৃতি পশ্চিম বাংলার প্রায় সমস্ত শিল্পী ও কুশলীবৃন্দ।

জিনি পিকচার্স পরিবেশিত 'একক সোনা' ছবিটি বাংলার চিত্রজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

দেবকুমার বসুর বাংলা ছবি 'ভোরের আকাশ'

স্বর্গত দেবকীকুমার বসুর পুত্র দেবকুমার বসু কয়েকখানি আসামী ও মণিপুরী ভাষায় ছবি নির্মাণ করবার পরে সম্প্রতি বাংলা ছবি নির্মাণে ব্রতী হয়েছেন এবং তাঁর প্রথম বাংলা ছবি 'ভোরের আকাশ'-এর নিয়মিত চিত্রগ্রহণ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। নারীর যৌবন-জিজ্ঞাসা আজকের সমাজজীবনে যে সব বিচিত্র সমস্যার সৃষ্টি করে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে স্ব-রচিত এই বলিষ্ঠ কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনা করছেন পরিচালক স্বয়ং। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করছেন শমিত ভঞ্জ, তপেন চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গা বোস, শেখর চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, সাধনা রায় চৌধুরী, ললিতা চট্টোপাধ্যায়, শিবানী বসু, নবাগতা রীতা রায় এবং আরও অনেকে। সুর সংযোজনার দায়িত্বে রয়েছেন, সুকুমার মিত্র এবং আলোকচিত্র গ্রহণে শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়।

জীবন রহস্য

তপেশ ঘোষ ও জয়ন্ত দেব প্রযোজিত জাগ্রত পিকচার্সের প্রথম ছবি সলিল রায় পরিচালিত 'জীবন-রহস্য'-এর কাজ দ্রুতগতিতে সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। কাহিনী রচনা করেছেন পরিচালক শ্রীরায় স্বয়ং। চিত্রনাট্য তপেশ ঘোষের। অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ছবির সুরকার। ছবির বিশেষ আকর্ষণ হিন্দী চিত্রজগতের সর্বজন প্রিয় চিত্র তারকা প্রাণ। বাংলা ছবিতে এই প্রথম। ছবির বিভিন্ন চরিত্রে আছেন—মাধবী চক্রবর্তী, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, কমল মিত্র, অপর্ণা দেবী, হরিধন, জ্ঞানেশ, মানিক রায়চৌধুরী, মন্মথ, আনন্দ মুখোপাধ্যায়, দিলীপ রায় ও কল্যাণী মণ্ডল প্রভৃতি। আশা ভোঁসলে ও মান্না দে ছবিতে গান গেয়েছেন। চিত্রগ্রহণে আছেন পুণা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের বিমান সিন্‌হা। ব্যবস্থাপনায়—প্রশান্ত পাট্টাদার।

'আমি সিরাজের বেগম' সমাপ্তপ্রায়

মানিক রায় প্রযোজিত এম আর প্রোডাকসন্সের বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায় অভিনীত 'আমি সিরাজের বেগম' ছবির চিত্রগ্রহণের কাজ শেষ পর্যায়ে। জানা গেল, শিগগীর ছবিখানি সম্পাদকের টেবিলে যাবে চূড়ান্ত সম্পাদনার জন্য। শ্রীপারাবত ছবির কাহিনীকার এবং প্রণব রায় ছবির চিত্রনাট্যকার। সুশীল মুখোপাধ্যায় ছবিখানির পরিচালনায় যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন বলে জানা গেল। সুর দিয়েছেন অনিল বাগচী। অন্যান্য চরিত্রে আছেন বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, চন্দ্রাবতী, বাসবী নন্দী, দিলীপ রায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। আমি সিরাজের বেগম ছবির আর এক বিশেষ আকর্ষণ বম্বের প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী এবং নৃত্যশিল্পী মিস অলকা। মিস অলকা সম্প্রতি কলকাতায় এসে একটানা প্রায় সাতদিনের কাজ শেষ করে ফিরে গেছেন। মিস অলকাকে 'আমি সিরাজের বেগম'-এ কৈজীর ভূমিকায় দেখা যাবে।

বিবিধ সংবাদ

সুরসভা : গত ১৭ নভেম্বর বালিগঞ্জস্থিত 'রবিতীর্থ' ভবনে সুরসভার উদ্যোগে এক মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীমতী ছবি ভট্টাচার্য। 'সবারে করি আহ্বান' গানটি দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পরে নজরুলগীতি, হিমাংশুগীতি, লোকগীতি ও উচ্চাঙ্গ সংগীত পরিবেশিত হয়। এতে অংশ নেন শিপ্রা ভট্টাচার্য, প্রতিমা শীল, শ্যামলী বসু, অসীমা ভট্টাচার্য, মমতা ঘোষ, তোড়া সরকার, সুষমা ঘোষ, কল্যাণী বসু, সুপ্তা শ্যাম ও উর্বশী নিয়োগী। উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসরে কান্তি মৈত্র যোগ রাগে খেয়াল পরিবেশন করেন। এঁর পর গৌর বসাক ভীম রাগে খেয়াল গেয়ে শোনান। এঁদের সঙ্গে তবলায় ও যন্ত্রসংগীতে সহযোগিতা করেন দুলাল ভট্টাচার্য, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, শম্ভু পাল, স্বপন মুখোপাধ্যায় ও রথীন চৌধুরী।

সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সম্বর্ধনা : সম্প্রতি মহাজাতি সদনে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে 'অনুষ্টুপ' সাংস্কৃতিক সংস্থা বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। পরে সংস্থার শিল্পীবৃন্দ কবিগুরুর উপসংহার গল্পের নাট্যরূপ 'মাধবী-কুমারসেন' (নৃত্যনাট্য) পরিবেশন করেন। নাট্যরূপ দেন জগৎ মজুমদার। সঙ্গীতে ও নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেন সংহিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মল্লিকা মিত্র, জগৎ মজুমদার, অসিত পাল, শোভনেন্দু দত্ত, বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়, শর্মিলা চক্রবর্তী, মিলি দাশগুপ্ত, চৈতালী দত্ত, ছবি মল্লিক, শর্বরী দত্ত (সেন), কানন দত্ত, রেবা চট্টোপাধ্যায়, অরুণ দে, সজল দে, বিভাস ঘোষ, সুনীল সরকার, অশোক সাউ, বিজন ভট্টাচার্য, বন্যা মজুমদার ইভা বসু, অসীমা ভড়, অণিমা ভড়, সুলগ্না মুখার্জি, মঞ্জরী মিত্র, অজন্তা বসু, আরতি দাস, দীপ্তি পাত্র এবং গোপাল পাত্র। নৃত্য ও সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন যথাক্রমে শর্বরী দত্ত (সেন) এবং গোপাল পাত্র।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া কর্মচারী সমিতি হেড অফিস শাখা ১৬ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট, কলিকাতা-১-এর উদ্যোগে গত ১৪ নভেম্বর ১৯৭২ রবীন্দ্রসদন মঞ্চে বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়। সভার প্রস্তাবিত উদ্বোধক সর্বজনপ্রিয় উত্তমকুমার অনিবার্য কারণবশতঃ উপস্থিত থাকতে পারেননি। সভাপতি এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন যথাক্রমে শ্রীঅমূল্যরঞ্জন সাহা ও শ্রীপ্রভুরঞ্জন সেন। অনুষ্ঠানে নজরুল গীতির আসরে সুখ্যাত নজরুল-গীতি সাধক মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং আধুনিক গানে কৃষ্ণা রায় শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। পরিশেষে সমিতি সদস্যদের দ্বারা অভিনীত এবং শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র বিরচিত 'কাঞ্চনরঙ্গ' নাটকটি পরিবেশিত হয়। নাটকটি দলগত সংহতিতে মোটামুটিভাবে উঁচু পর্দায় বাঁধা ছিল এবং দর্শকদের সপ্রশংস অভিনন্দন লাভে সমর্থ হয়।

মঞ্চাভিনয়

নাট্যলোক গোষ্ঠীর 'রোশেনারা' : বাংলাদেশে আকাশে আজ স্বাধীনতার সূর্য ঝলমল করছে তারই দীপ্তিতে বিকশিত হোতে চলেছে সবার মন। কিন্তু এই আকাশের নীরবতা বিদীর্ণ করে একদিন গর্জন করে উঠেছিল ইয়াহিয়া শাহীর দানবীয় উল্লাস, গর্জে উঠেছিল কামান। নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও স্বাধীনতার দুর্বার স্বপ্নকে সফল করাই যাদের একমাত্র ব্রত ছিল, তারাই অর্থাৎ সেই মুক্তিপাগল মানুষের দল রুখে দাঁড়িয়েছিল এই কামানের গর্জনের বিরুদ্ধে। অগণিত মানুষের অনেক রক্ত ঝরিয়ে এরা ছিনিয়ে নিলো স্বাধীনতা। এ এক রক্তাক্ত, প্রদীপ্ত ইতিহাস। মুক্তিযুদ্ধের এই প্রাণবন্ত ইতিহাসের সঙ্গে রক্তের অক্ষরে লেখা থাকবে

তিতাস একটি নদীর নাম/রোজী, রাণী সরকার ও রওসন জামিল। প্রযোজক : হাবিবুর রহমান, পরিচালক : ঋত্বিক ঘটক

একটি মহিমময়ী মহিলার জীবনকাহিনী। নাম তাঁর রোশেনারা। বুকে মাইন বেঁধে সে পাকিস্থানী ট্যাংকের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বিনা দ্বিধায়। তাঁর এই দুঃসাহসিক জীবন-কাহিনী বিধৃত হয়েছে 'রোশেনারা' নাটকে। 'নাট্যলোক গোষ্ঠী'র শিল্পীরা সম্প্রতি এ নাটকের একটি সপ্রতিভ প্রযোজনা উপস্থিত করে নাট্যানুরাগীদের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। নাটকটি রচনা করেছেন নির্মল রায়।

নাট্যনির্দেশক অরুণ সেনগুপ্ত প্রযোজনায় নানারকম চমকের আয়োজন করেছেন। চলচ্চিত্র, যাত্রা ও থিয়েটারের নানা আঙ্গিককে একই সংগে মাঝে মাঝে কাজে লাগানো হয়েছে। এতে যে অবশ্য সব সময়েই প্রত্যাশিত সার্থকতা এসেছে তা বলা যায় না। কয়েকটি মুহূর্তে সোজাসুজি ঘটনা বিবৃত করার চেষ্টা করলে বোধহয় ভালো হোত।

দলগত অভিনয়ে শৈথিল্য প্রায়ই দেখা যায়নি। শিল্পীদের ব্যক্তিগত চরিত্র-চিত্র নানা বৈশিষ্ট্যে দীপ্ত হয়ে উঠেছে। 'রোশেনারা'র অনমনীয় ব্যক্তিত্ব ও স্বদেশপ্রেমের ঔজ্জ্বল্য অসাধারণ ব্যঞ্জনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে কাজল মুখার্জির অভিনয়ে। অন্যান্য চরিত্রে স্বচ্ছন্দ অভিনয় করেছেন অমলেন্দু রায়চৌধুরী, মানিক চক্রবর্তী, মনোজ মিত্র, মণিকা ঘোষ, প্রণব ভট্টাচার্য, রবীন ঘোষ, কমল দত্ত।

মুজিবর রহমানের চরিত্রে সমর বোস (পর্দায়) ও অরুণ সেনগুপ্ত (মঞ্চে) নাটনৈপুণ্যের পরিচয় রাখতে পেরেছেন।

বাঁকুড়ায় নাট্যোৎসব : বংগরঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে সম্প্রতি বাঁকুড়ায় তিনদিনব্যাপী এক নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হোল। জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে সাতটি নাট্যগোষ্ঠী এতে যোগ দেয়। যেসব নাটক এই উৎসবে পরিবেশিত হয় তা হোল রতনকুমার ঘোষের 'বিষুবরেখা', সুধাংশু দাশগুপ্তের 'আমি এ চাইনি', রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'মাশাল', 'পাপ-পুণ্য', বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'সংঘাত', 'রক্তে রোয়া ধান' ও মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'পুষ্পক রথ'।

মেবার পতন : অমৃতবাজার-যুগান্তর-অমৃত কর্মচারী সমিতির সভ্যরা সম্প্রতি তৃতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ডি. এল. রায়ের 'মেবার পতন' নাটকটি পরিবেশন করলেন বিশ্বরূপার মঞ্চে। এর আগেরবারের নাটক 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবারে'র মতো তীব্র বেগদীপ্ত না হোলেও 'মেবার পতন' প্রযোজনা হিসেবে মোটামুটিভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে বলতে হবে। নাটকটির মধ্যে যে গভীরতর এক আদর্শবাদ বিঘোষিত হয়েছে, তা কয়েকটি মুহূর্তে ভাষা পেয়েছে মঞ্চের আলোয়। এ ব্যাপারে কৃতিত্বের অধিকারী পরিচালক শ্রীসুধীর মুস্তাফী। 'মেবার পতন' নাটকটি খুব বেশী অভিনীত হয় না, সেদিক দিয়েও এই প্রযোজনা বেশ কিছুটা বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত হোতে পেরেছে বলে মনে হয়।

সংঘবদ্ধ অভিনয়ের ঐকতানেই এ ধরনের ঐতিহাসিক নাটকের প্রাণোত্তাপ বিকশিত হয়ে ওঠে। নাটকটির প্রযোজনা দেখে মনে হয়েছে এ ব্যাপারে শিল্পীদের নিষ্ঠার অভাব ছিল না। তবে মাঝে মাঝে কয়েকজনের কন্ঠে আবেগের অভাব চরিত্রের দীপ্তিকে ঠিক প্রকাশ করতে পারেনি, এবং জায়গায় জায়গায় দু-একটি কন্ঠ দর্শকের কর্ণকুহর স্পর্শ করতে পারেনি। সুধীর মুস্তাফীর 'গোবিন্দ সিংহ' একটি বৈশিষ্ট্যদীপ্ত চরিত্র-চিত্রণ হোতে পেরেছে, যন্ত্রণার মুহূর্তে তাঁর অভিব্যক্তি পরিস্রুত অভিনয়ের ছাপ বহন করে। ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অমর সিংহ' দৃঢ়তায় যেমন মুখর হয়ে উঠেছে, তেমনি প্রত্যাশিত আবেগ অনুভূতির স্পন্দনে প্রদীপ্ত হয়ে উঠতে পারেনি হয়তো। তবে শিল্পীর চরিত্রের সঙ্গে মিশে যাওয়ার প্রচেষ্টায় নিষ্ঠার অভাব পরিলক্ষিত

অমৃতবাজার-যুগান্তর-অমৃত কর্মচারী সমিতির বার্ষিক অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন সমিতির সভাপতি

হয়নি। 'সগর সিংহ', 'মহাবৎ' খাঁ ও 'অজয় সিংহ' চরিত্রে ধীরেন চক্রবর্তী, আধারেন্দ্র ঘোষ, বীরেন ঘোষ, মোটামুটিভাবে ভালোই অভিনয় করেছেন। রাজলক্ষ্মী দেবীর 'সত্যবতী' সত্যিই সমগ্র প্রযোজনার একটি বলিষ্ঠ সম্পদ। তিনি যখনই মঞ্চে এসেছেন নাটকের গতি হয়েছে সমুদ্রের মতো মুখর। সংগীতা সুরের 'কল্যাণী' একটি মর্মস্পর্শী চরিত্র-চিত্রণ হোতে পেরেছে।

অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন শ্যামল দে, বরুণ ঘোষাল, আশিস ভট্টাচার্য, অনিল দাস, জীবন ভট্টাচার্য, মৃত্যুঞ্জয় রায়, সুবীর সেন, সুহৃদ দাশগুপ্ত, হিরন্ময় মুন্সী, অচ্যুত সিনহা, রমেশ ভঞ্জ, শ্রীকান্ত দাস, শীতল দাস, রবীন্দ্র জানা, রমেন্দ্র জানা, সুবিনয় সেন, শাশ্বতী রায়, শর্মিষ্ঠা চ্যাটার্জি।

সংগীতপরিচালনায় ছিলেন শ্রীনির্মল ভট্টাচার্য। নৃত্য ও সংগীতে অংশ নেন সুরগীতি মিউজিক কলেজের ছাত্রীবৃন্দ। এর মধ্যে ছিলেন শিপ্রা রায়, উজ্জ্বলা রায়, তন্দ্রা দাশগুপ্তা, তপতী বসু, গীতশ্রী ঠাকুর, ফাল্গুনী ঠাকুর, শীলা সাহা, শর্মিলা বর্ধন, শিবানী সাহা, প্রতিমা রায়। পরিচালনায় ছিলেন বুলা সাহা ও বিভা পাল।

আবহসংগীত, মঞ্চ ও আলোর পরিকল্পনায় শ্রীবিভাস মুখোপাধ্যায় গভীরতর শৈল্পিক মানসের পরিচয় দিতে পেরেছেন।

নাট্যানুষ্ঠানের পূর্বে ভাষণপর্বে যাঁরা ছিলেন তাঁরা হোলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ শ্রীঅপূর্বলাল মজুমদার (সভাপতি), শ্রীপশুপতি বোস (প্রধান অতিথি), অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, পৌরমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষ, সমিতির সম্পাদক শ্রীপ্রফুল্লরতন গাঙ্গুলী, সমিতির সভাপতি শ্রীসমর সেন।

নাট্য প্রতিযোগিতা :

অগ্রণীর পরিচালনায় নাট্যপ্রতিযোগিতা শুরু হবে ২৩শে ডিসেম্বর থেকে। নাম দেবার শেষ তারিখ ৩০শে নভেম্বর। যোগাযোগের ঠিকানা—অগ্রণী, ৫৮ ক্ষেত্র মিত্র লেন, সালকিয়া, হাওড়া।

সংগঠনীর আগামী নাট্যানুষ্ঠান : বারাসতের প্রখ্যাত নাট্যগোষ্ঠী 'সংগঠনী'র শিল্পীরা এবারে যে দুটি নাটকের মহড়ায় ব্যস্ত আছেন তা হোল ডি এল রায়ের 'সাজাহান' ও ভৈরব গাঙ্গুলীর 'একটি পয়সা'। ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে নাটক দুটি অভিনীত হবে।

নাট্য প্রমোদকর উচ্ছেদের জন্য দাবী সনদ পেশ : 'দিশারী'র পক্ষ থেকে গত ১৪ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থমন্ত্রী শ্রীশংকর ঘোষের নিকট নাট্যাভিনয়ের উপর থেকে প্রমোদকর উচ্ছেদের জন্য একটি দাবী সনদ পেশ করেন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক রমেন ঘোষ। প্রতিনিধি দলে ছিলেন ইন্দ্রব্রত চট্টোপাধ্যায়, নান্টু গাঙ্গুলী ও সনৎ রাণা।

অর্থমন্ত্রী শ্রীঘোষ আশ্বাস দেন তিনি এবিষয় চেষ্টা করবেন।

উল্লেখযোগ্য অভিনয় : গত ২৪ নভেম্বর নিউ ইণ্ডিয়া রিক্রিয়েশন ক্লাব বুদ্ধদেব গুহর বিখ্যাত উপন্যাস 'বাতিঘর' মঞ্চস্থ করেন একাডেমি অফ ফাইন আর্টসে। নাট্যরূপ দিয়েছেন ভাস্কর মুখার্জি। জয়ের চরিত্রে চন্দন ব্যানার্জির অভিনয় সকলকে মুগ্ধ করে। বৃদ্ধা নুলিয়া 'চন্দ্রাইয়া' চরিত্রে হারাধন চ্যাটার্জি অপূর্ব। অভিনয়ের ছোটখাট ত্রুটি বাদ দিলে তাদের টিমওয়ার্কই ছিল সেদিনের বৈশিষ্ট্য। ঘন্টু ঘোষের চরিত্রে শুভেন্দু মুখার্জি, ফাদার পাউণ্ডের চরিত্রে কিরণ দত্ত, তোতোর চরিত্রে সুধীন দত্ত স্বীয় চরিত্রের যোগ্য রূপ দিয়েছেন। জুডিথের চরিত্রে বন্দনা বিশ্বাস-এর অভিনয় সুন্দর। কয়েক স্থানে আবহসংগীতের অতিরিক্ত স্থায়িত্ব নাটকের গতি ব্যাহত করেছে। পরিচালক বিজন চ্যাটার্জি শেষ দৃশ্য পরিকল্পনায় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। আলোক-সম্পাত আরও সুন্দর হতে পারত।

খেলাধূলা

ক্রীড়ক

দলীপ ট্রফি ফাইনাল

[illegible] প্রথম [illegible] দলীপ ট্রফির ফাইনালে এবং [illegible] বিজয়ী মধ্যাঞ্চলকে [illegible] পশ্চিমাঞ্চল গতবারের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছে।

[illegible] দলীপ ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা [illegible] এ পর্যন্ত [illegible] ট্রফি জয়ী হয়েছে এই তিনটি [illegible] পশ্চিমাঞ্চল ৭ বার, দক্ষিণাঞ্চল ৫ বার, এবং মধ্যাঞ্চল ১ বার। ১৯৬৩-৬৪ সালের ফাইনাল খেলায় পশ্চিমাঞ্চল এবং দক্ষিণাঞ্চল দুদলকে যুগ্ম বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

মধ্যাঞ্চল দলের অধিনায়ক হনুমন্ত সিং টসে জিতে প্রথমেই ব্যাট করার মনস্থ নেন। খেলার সূচনা সুবিধার হয়নি। লাঞ্চের সময় মধ্যাঞ্চল দলের রাণ দাঁড়ায় ৬টা উইকেট পড়ে ১২১। ৩য় উইকেটের জুটিতে দুরাণী এবং দেশপাণ্ডে দলের ৫৩ রাণ যোগ করেছিলেন। চা-পানের সময় মধ্যাঞ্চলের রাণ ছিল ১৬২ (৭ উইকেটে)। ৭ম উইকেটের জুটিতে বেঞ্জামিন এবং হনুমন্ত সিং ৩৭ মিনিটের খেলায় মূল্যবান ৪০ রান সংগ্রহ করেন। প্রথম দিনের খেলায় মধ্যাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংসের রাণ দাঁড়ায় ৯টা উইকেট পড়ে ২৩১। খেলায় কৈলাশ ঘাটানি ৪১ রান করে অপরাজিত থাকেন। মধ্যাঞ্চল দলকে ঘায়েল করেছিলেন মহারাষ্ট্রের পেস বোলার পি সালগাঁওকার। নিষ্প্রাণ পীচে তিনি ৬২ রাণে ৬টা উইকেট পান। এখানে উল্লেখ্য, প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় তাঁর অভিজ্ঞতা মাত্র দু বছরের। তিনি এ বছরে বোম্বাইয়ের বিপক্ষে ইরাণী ট্রফির খেলায় ৫৬ রাণে ৪ ও ৯৯ রাণে ২উইকেট এবং দক্ষিণাঞ্চল দলের বিপক্ষে দলীপ ট্রফির সেমি-ফাইনাল খেলায় ৭৭ রাণে ৫ ও ৫৬ রাণে ৫টা উইকেট নিয়ে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেন।

দ্বিতীয় দিনে মধ্যাঞ্চল দলের ১ম ইনিংস ২৪৬ রাণের মাথায় শেষ হয়। ঘাটানি শেষ পর্যন্ত ৪৬ রাণ করে অপরাজিত থাকেন।

দ্বিতীয় দিনের খেলার বাকি সময়ে পশ্চিমাঞ্চল মাত্র দুটো উইকেট খুইয়ে ৩২১ রাণ সংগ্রহ করে। মধ্যাঞ্চল দলের ১ম ইনিংসের ২৪৬ রাণের থেকে ৭৫ রাণ বেশী। অধিনায়ক অজিত ওয়াদেকার ১৪৬ এবং দিলীপ সরদেশাই ১২৯ রাণ করে অপরাজিত থাকেন। তাঁরা অসমাপ্ত ৩য় উইকেটের জুটিতে ২১৩ মিনিটে এবং মাত্র ৫০ ওভারের খেলায় [illegible] রাণ সংগ্রহ করেছিলেন। অবিচ্ছিন্ন [illegible] দলের ফিল্ডিংয়ের দোষে তাঁরা খুবই লাভবান হন। ওয়াদেকার তাঁর ১১ রাণ সংগ্রহ করার আগে তিনবার সহজ ক্যাচ তুলে খুব জোর বেঁচে যান। সরদেশাইয়ের ৫৫ রাণের মাথায় সহজ ক্যাচ ধরা পড়ে দি-

অজিত ওয়াদেকার

দ্বিতীয় দিনের শেষ ১২ ওভারের খেলায় ওয়াদেকার এবং সরদেশাই পিটিয়ে খেলে দলের ৭১ রাণ তুলে দেন। যোশীর বলে সরদেশাই এবং ওয়াদেকার একটা করে ওভার-বাউন্ডারী করেন। দুরাণীর এক ওভারের খেলায় ওয়াদেকার একটা বাউন্ডারী এবং ওভার-বাউন্ডারী মারেন।

তৃতীয় দিনে পশ্চিমাঞ্চল ১ম ইনিংসের ৫৩০ রাণের মাথায় (৭ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে ২৮৪ রণে এগিয়ে যায়। ৩য় উইকেটের জুটিতে ওয়াদেকার (১৭১ রাণ) এবং সরদেশাই (১৫৫ রাণ) ২৭২ মিনিটে মাত্র ৬৫ ওভারের খেলায় ৩২০ রাণ সংগ্রহ করেন। এখানে উল্লেখ্য, দলীপ ট্রফির খেলায় তাঁদের এই ৩২০ রাণই যে কোন উইকেট জুটিতে সর্বোচ্চ রাণের রেকর্ড। তাঁরা আরও রাণ তুলতে পারতেন, কিন্তু কানিতকার এবং চৌহানের কথা স্মরণ করে তাঁরা খেলায় আউট হওয়ার পথই বেছে নেন। কানিতকার ৭২ রাণ এবং চৌহান ৫৩ রাণ করেন।

তৃতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় মধ্যাঞ্চল দল ২য় ইনিংসের ৩টে উইকেট খুইয়ে মাত্র ৬৫ রাণ সংগ্রহ করেছিল।

চতুর্থ অর্থাৎ শেষ দিনে মধ্যাঞ্চল দলের ২য় ইনিংস খেলা শেষ হবার নির্দিষ্ট সময়ের ৪ ঘণ্টা আগেই ১১২ রানের মাথায় শেষ হয়। ফলে পশ্চিমাঞ্চল দল এক ইনিংস ও ১৭২ রানে জয়লাভের গৌরব লাভ করে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

মধ্যাঞ্চল : ২৪৬ রান (হনুমন্ত সিং ৪১ এবং কৈলাস ঘাটানি নট আউট ৪৬ রান। পি এম সালগাঁওকার ৭২ রানে ৭ উইকেট)

ও ১১২ রান (হনুমন্ত সিং ৩৪ এবং অশোক জাগদালে ৪৫ রান। ইসমাইল ৩০ রানে ৩ এবং শিভালকার ২৮ রানে ২ উইকেট)

পশ্চিমাঞ্চল : ৫৩০ রান (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। ওয়াদেকার ১৭১, সরদেশাই ১৫৫, কানিতকার ৭২ এবং চৌহান ৫৩ রান। ঘাটানি ১৩৩ রানে ২, জামদেকর ৯০ রানে ২ এবং দুরানী ১৩৩ রানে ২ উইকেট)

দিলীপ সরদেশাই

জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতা

[illegible] জান্না সুইমিং পুলে আয়োজিত ২১তম জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় দলগত খেতাব জয়ী হয়েছে পুরুষ বিভাগে সার্ভিসেস, মহিলা ও বালিকা বিভাগে মহারাষ্ট্র এবং বালক বিভাগে পশ্চিম বাংলা। এখানে উল্লেখ্য, গতবারের দলগত খেতাব বিজয়ীরা স্বস্থানেই থেকে গেছে। ওয়াটার পোলোতে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে সার্ভিসেস দল। তাদের পক্ষে এই খেতাব জয় এই প্রথম। জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় মহারাষ্ট্রের সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তারা মহিলা ও বালিকা বিভাগে দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে এবং পুরুষ ও বালক বিভাগে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে। মহারাষ্ট্রের কুমারী এস পি দেশাই মহিলা বিভাগে সর্বাধিক স্বর্ণপদক (ছয়টি) জয়ের সূত্রে অসামান্য ব্যক্তিগত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। পশ্চিম বাংলার সাফল্য : বালক বিভাগে দলগত চ্যাম্পিয়ান, মহিলা বিভাগে দ্বিতীয় স্থান এবং বালিকা বিভাগে তৃতীয় স্থান।

প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে সার্ভিসেস দলের এম এস রাণা এবং মহিলা বিভাগে মহারাষ্ট্রের শ্রীমতী এস পি দেশাই ছয়টি করে স্বর্ণপদক জয়ী হয়ে অসাধারণ ব্যক্তিগত ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

পাঁচদিনের এই জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় মোট ৯টি নতুন জাতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—পুরুষ বিভাগে ৫টি, বালক বিভাগে ৩টি এবং বালিকা বিভাগে ১টি

দলগত চ্যাম্পিয়ানশীপ

পুরুষ বিভাগ : ১ম সার্ভিসেস (১৭৮ পয়েন্ট), ২য় মহারাষ্ট্র (৬৭ পয়েন্ট) এবং ৩য় কেরালা (৩৬ পয়েন্ট)

মহিলা বিভাগঃ ১ম মহারাষ্ট্র (৯৬ পয়েন্ট), ২য় পশ্চিমবাংলা (৪৮

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় পূর্বাঞ্চলীয় চ্যাম্পিয়ান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

পয়েন্ট) এবং ৩য় গুজরাট (৩৩ পয়েন্ট)।

বালক বিভাগঃ ১ম পশ্চিমবাংলা (৭৭ পয়েন্ট), ২য় মহারাষ্ট্র (৫৮ পয়েন্ট) এবং ৩য় মহীশূর (৩২ পয়েন্ট),

বালিকা বিভাগ ঃ ১ম মহারাষ্ট্র (৫৩ পয়েন্ট), ২য় রাজস্থান (২৭ পয়েন্ট), এবং ৩য় বাংলা (১৩ পয়েন্ট)।

সন্তোষ ট্রফি

গোয়াতে গত নভেম্বর ১১ থেকে ২৯তম জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। লীগের খেলায় ১২টি দল খেলছে। 'এ' গ্রুপে খেলছে গতবারের সন্তোষ ট্রফি জয়ী বাংলা, তামিলনাড়ু, কেরালা, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান এবং কাশ্মীর। অপরদিকে 'বি' গ্রুপের যোগদানকারী দল—মহীশূর, গোয়া, পাঞ্জাব, গতবারের রানার্স-আপ রেলওয়ে, অন্ধ্র এবং আসাম। গতবারের সন্তোষ ট্রফি বিজয়ী বাংলা ৫—০ গোলে তামিলনাড়ু, ৩—০ গোলে মহারাষ্ট্র এবং ৩—১ গোলে রাজস্থানকে পরাজিত করে কেরালার সঙ্গে ১—১ গোলে খেলা ড্র করেছে। 'এ' গ্রুপের লীগ তালিকার শীর্ষস্থানে আছে বাংলা এবং 'বি' গ্রুপে মহীশূর।

পরলোকে সীতেশ দাস

কলকাতা ময়দানের খ্যাতনামা ফুটবল খেলোয়াড় সীতেশ দাসের অকাল মৃত্যু অদৃষ্টের এক নিষ্ঠুর পরিহাস—খুবই বেদনাদায়ক ঘটনা। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২৬ বছর। খড়্গপুর স্টেশনে হাওড়াগামী এক ট্রেনে উঠতে গিয়ে তিনি গুরুতরভাবে আহত হন। তাঁকে অচৈতন্য অবস্থায় খড়্গপুর রেলওয়ে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে তাঁর জীবন[illegible] ডান পা [illegible] দিতে হয়েছিল। কিন্তু খ্যাতনামা চিকিৎসকদের আপ্রাণ চেষ্টাতেও তাঁর জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। কয়েকদিন জীবনযুদ্ধে প্রচণ্ড লড়াই করে শেষপর্যন্ত তিনি মৃত্যুর কোলেই আত্মসমর্পণ করেন। এ তাঁর [illegible] জীবনের প্রতি অভিমান। হাঁ অভিমানই। বোধহয় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর ডান পা-খানা নেই। ডান পা বাদে তাঁর খেলোয়াড়-জীবনই যে ব্যর্থ।

সীতেশ দাসের প্রথম কিভাবের ফুটবল খেলা—হাওড়া ইউনিয়ন, রাজস্থান, ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান এবং মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব নিয়ে। মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তিনি ছিলেন শেষোক্ত দলের খেলোয়াড়। তিনি জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় বাংলা দলের এবং আন্তর্জাতিক এশিয়ান ইয়ুথ ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করেন। খেলার সময় তিনি যেমন নির্ভীক ও কঠোর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, তেমনি মাঠের বাইরে ছিলেন নম্র ও ভদ্রতায় মাটির মানুষ।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

এক নজরে

মাউন্টব্যাটেনের জরিমানা : ভারতে ইংরেজ সরকারের শেষ গভর্নর জেনারেল ও রাজপ্রতিনিধি লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন ও তাঁর নাতি অনারেবল নর্টন ন্যাচবুলের সব 'অনার' (দুধের) জলে ডুবতে বসেছে। বর্তমান ইংলন্ডেশ্বরীর মামাশ্বশুর এবং অবসর-ভোগী বিশিষ্ট রাজকর্মচারী হলেও মাউন্টব্যাটেন সাহেব অবসরভোগের অবকাশ পাননি। জীবিকার প্রয়োজনে তাঁকে হ্যাম্পশায়ারের রমসে পল্লীতে একটি দুগ্ধশালা স্থাপন করতে হয়। তাঁর নাতিও তাঁর ঐ কারবারের অংশীদার। গত ১৬ নভেম্বর হ্যাম্পশায়ার আদালতে তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় যে, তাঁদের ডেয়ারির ৩৪৯ গ্যালন দুধ পরীক্ষা করে দেখা যায় যে তার মধ্যে ১৬ গ্যালন জল ছিল। আসামীদের কেউই অবশ্য আদালতে উপস্থিত থাকেন না এবং অভিযোগ উত্থাপিত হওয়া মাত্র তাঁদের পক্ষের উকিল তা মেনে নেন। সুতরাং বিচারকও আর ব্যাপারটা বেশিদূর গড়াতে না দিয়ে প্রত্যেককে ৪০ পাউন্ড জরিমানা ও আরও ২০ পাউন্ড মামলা খরচ দেওয়ার নির্দেশ দেন।

সরকারপক্ষের অভিযোগে বলা হয় যে, গত ৫ সেপ্টেম্বর একজন 'ওয়েট্স এন্ড মেজারস ইন্সপেক্টর' মাউন্টব্যাটেন সাহেবদের ফার্মে হঠাৎ উপস্থিত হয়ে তাঁদের দুধের ট্যাঙ্ক পরীক্ষা করে দেখেন যে তাতে সঞ্চিত দুধে অন্তত ৪ শতাংশ জল মেশানো হয়েছে। তারপর ১৭ সেপ্টেম্বর আবার একইভাবে অতর্কিতে পরীক্ষা করে দেখা যায় সেদিনের দুধে অন্তত শতকরা তিন ভাগ জল মেশানো হয়েছে। অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে কোন অভিযোগই অস্বীকার করা হয়নি, শুধু বলা হয়েছে যে তাঁদের অজ্ঞাতসারে ঐসব ব্যাপার ঘটে। কারণ তাঁরা ত ঐ ফার্মে বাস করেন না বা তার দৈনিক কাজকর্মও দেখেন না। তার জন্য ম্যানেজার ও অন্যান্য কর্মচারী নিযুক্ত করা আছে। কিন্তু যেহেতু তাঁরা মালিক সেহেতু আইনত তাঁরাই দোষী এবং দোষের যা শাস্তি তাও তাঁরা মেনে নেবেন, আর এধরনের ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে না ঘটে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন।

আমাদের কাছে অবশ্য সমস্ত সংবাদটাই একটা নতুন অভিজ্ঞতা। ফিফ্টি ফিফ্টি দুধে-জলে অভ্যস্ত আমরা, দুধে শতকরা তিন ভাগ জল মেশানো শাস্তিযোগ্য অপরাধ, একথা কল্পনা করাই কঠিন আমাদের পক্ষে। তারপর সে অপরাধ যাঁরা করে থাকেন রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত কারও অতি সম্মানিত শ্বশুর-ভাসুর স্থানীয় কোন ব্যক্তি, তাহলে তাঁকে শমন ধরাতে পারেন এমন ঘাড়ে দুটি মাথাবিশিষ্ট পুলিশ কর্মচারীর সঙ্গে পরিচয় আজও আমাদের হয়নি। যে দেশে এক সের দুধে তিন তোলারও কম [illegible] মেশালে রাণীর [illegible] জরিমানা হয়, সে দেশের মানুষ [illegible] এতে অবশ্য বিস্ময়ের কিছু নেই।

বিশ্ব টাক সম্মেলন : [illegible] 'বাল্ডহেড ইন্টারন্যাশনাল'-এর উদ্যোগে প্রথম আন্তর্জাতিক টাক সম্মেলন আহুত হয়েছে, এবং উদ্যোক্তাদের আশা, সারা পৃথিবীর অন্তত ৯০০ জন বিশিষ্ট টাক-বিশিষ্ট ব্যক্তি সম্মেলনে যোগ দিতে আসবেন। আন্তর্জাতিক টাক সংস্থা 'বাল্ডহেড ইন্টারন্যাশনাল' গঠিত হয় ১৯৭৯ সালের এপ্রিল মাসে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে যেসব টাকবিশিষ্ট ব্যক্তি খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে সৌভ্রাত্র গড়ে তোলাই ঐ সংগঠনের প্রধান কাজ। তারাও মাথায় টাক পড়ে যাওয়ার জন্য যাদের মন খারাপ হয়ে যায় তাদের চাঙ্গা করে তোলাও হবে সংগঠনটির অন্যতম কাজ।

সংস্থার প্রেসিডেন্ট শ্রী কে জি খোসলা সম্প্রতি পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশ সফর করে এসেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে ঐসব দেশে সংগঠনের অনুকূলে বিপুল সাড়া পাওয়া গেছে। জাপানে ও সিঙ্গাপুরে শীঘ্রই তাদের সংস্থার শাখা স্থাপন করা হবে এবং দিল্লীর সম্মেলনে ঐসব দেশ থেকে অনেক প্রতিনিধি আসবেন। কম্যুনিস্ট দেশগুলির মধ্যে পূর্ব জার্মানি থেকে প্রতিনিধি আসার খবর পাওয়া গেছে। দিল্লী সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রী আই কে গুজরাল।

নতুন ইহুদি : পূর্ব ভারতের রাজ্য মণিপুরের শতাধিক লোকের একটি গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে যে তারা ইহুদি জাতিরই একটি হারিয়ে যাওয়া সম্প্রদায় এবং ভারতের কেন্দ্রীয় ইহুদি সংস্থা 'জিউইশ এজেন্সি'র কাছে তারা ইস্রায়েলে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার জন্য দাবি জানিয়েছে। তারা নিজেদের নিয়ে একটি স্বতন্ত্র সংস্থাও গঠন করেছে, যার নাম 'মণিপুর জিউইস অর্গানিজেশন'। জিউইস এজেন্সির প্রধান কর্মকর্তা এবং ভারতের ইহুদিদের ইস্রায়েলে পুনর্বাসনের ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী শ্রী এ সারুন মণিপুরের ইহুদিদের আবেদনের উত্তরে জানিয়েছেন যে ভারত সরকারের অনুমতি পেলেই তিনি মণিপুরে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন এবং তাঁদের দাবির সমর্থনে যেসব ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ আছে তা যাচাই করে দেখবেন।

বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে, ২৮ অধ্যায়ের ৬৪তম অনুচ্ছেদে ইহুদিদের সম্বন্ধে লেখা আছে : "ঈশ্বর তোমাদের পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র ছড়িয়ে দেবেন এবং সেখানে তোমরা অন্য ভগবান, পাথর ও কাঠের পুজো করবে, যা তোমাদের বা তোমাদের পিতৃপুরুষদের কারও পরিচিত নয়।" ওল্ড টেস্টামেন্টেই জেকবের দ্বাদশ পুত্রের নামে পরিচিত দ্বাদশ ইহুদি সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। প্রচলিত কাহিনী অনুসারে ঐ দ্বাদশ সম্প্রদায়ের মধ্যে দশটি পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর দু হাজার বছর ধরে তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। আন্তর্জাতিক ইহুদি সংস্থার দাবি মতে, ঐ ছড়িয়ে পড়া দশটি ইহুদি উপজাতির মধ্যে আটটির এ পর্যন্ত সুনিশ্চিত সন্ধান পাওয়া গেছে। অবশিষ্ট দুটির তাঁরা কোন হদিশ পাননি। সেকারণে মণিপুরের একটি ক্ষুদ্র জন-গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে হঠাৎ এই দাবি ওঠায় আন্তর্জাতিক ইহুদি মহলে বেশ সাড়া জেগেছে। পাখতুন ও আফগানদের মধ্যে একটি ইহুদি উপজাতি হারিয়ে গেছে বলে ইহুদি বিশেষজ্ঞদের অনুমান, কিন্তু মণিপুরে কোন ইহুদি সম্প্রদায় আছে বলে তাঁরা কখনও শোনেননি। ভারতীয় ইস্রায়েলি কনসুলেট থেকে বলা হয়েছে, তাঁরা এখনই এ ব্যাপারে কিছু বলবেন না বা করবেন না। মণিপুর থেকে যে 'সেন্ট্রাল জিউইশ বোর্ড অব ইন্ডিয়া'র কাছে ঐ সংস্থার সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন এসেছে তার ন্যায্যতা উক্ত বোর্ড কর্তৃক যাচাই হওয়ার পর তাঁরা তাঁদের করণীয় স্থির করবেন।

ব্যাপারটি এখন যে ভেবেচিন্তে যাচাই করে তবেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ ইহুদি মানে এখন আর ঘরছাড়া দেশছাড়া একটি বিচ্ছিন্ন জাতি নয়। এখন ইহুদি হওয়া মানে ধর্মসূত্রে একটি অতি সমৃদ্ধ ও সম্ভাবনাময় রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়ার সুযোগ। সে সুযোগ দাবি করলেই পাওয়ার দিন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

—[illegible]

বাংলা রঙ্গালয়ের শতবর্ষ

থিয়েটার দেখেই একটি জাতির সাংস্কৃতিক মান নিরূপণ করা যায়। এই উক্তির মধ্যে কোনো অত্যুক্তি নেই। নাটকই হল সাহিত্যের দর্পণ, সমাজের প্রতিচ্ছবি। নাটকাভিনয়ের মাধ্যমে আমরা পাই যুগের চিন্তার পরিচয়। সামাজিক চিন্তাভাবনার নিরিখেই যথার্থ নাটকের বিচার। আমাদের বাংলা নাটকের প্রথম অভিনয়ের গৌরব একজন বিদেশীর। রুশদেশবাসী গেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেডেফ কলকাতায় সর্বপ্রথম বাংলা নাটকের অভিনয় আয়োজন করেন। 'দি ডিসগাইজ' নামে একটি ইংরেজি নাটকের বাংলা তর্জমা 'কাল্পনিক সংবদল' নাম দিয়ে বাংলা রঙ্গমঞ্চে এটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় কলকাতার ডোমটোলায় (বর্তমান এজরা স্ট্রীট) ১৭৯৫ খৃস্টাব্দের ২৭ নভেম্বর। তার দ্বিতীয় সাফল্যজনক অভিনয় হয় পরবর্তী বছর ২১ মার্চ তারিখে। এ হচ্ছে প্রথম বাংলা নাটক অভিনয়ের গোড়ার কথা। নাট্যানুরাগীরা এসব তথ্য ভালভাবেই জানেন।

কিন্তু জনসাধারণের জন্য প্রকৃত অর্থে প্রথম সার্থক নাটকাভিনয়ের ইতিহাস বিচার করতে গেলে আমরা সে সম্মান দেব দীনবন্ধু মিত্রের বিখ্যাত 'নীলদর্পণ' নাটককে। বাংলা সাধারণ রঙ্গালয় বা প্রফেসনাল স্টেজের জন্ম হয় তারই অভিনয়কে কেন্দ্র করে একশো বছর আগে, ১৮৭২ সালের ৭ ডিসেম্বর এই কলকাতা শহরেই। তৎকালীন ইংরেজ বড়লাটের অনুমতি তাঁর মিলেছিল। নাটকের দর্শনীও কম ছিল না। প্রথম রজনীতে বক্স আসনের টিকিটের দাম ছিল আট সিক্কা টাকা, গ্যালারির চার সিক্কা টাকা। পরবর্তী রজনীতে টিকিটের হার ছিল এক মোহর। ধনী বিলাসী বাঙালীবাবু ছাড়া এই উচ্চমূল্য দিয়ে সেদিন সাহেবদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাংলা নাটক দেখতে পেরেছিলেন ক'জন? সাধারণ দর্শকদের জন্য আসল বাংলা থিয়েটারের জন্য আকাঙ্ক্ষা তাই অপূর্ণই রয়ে গিয়েছিল।

সেই প্রত্যাশা পূরণ করল ন্যাশনাল থিয়েটার। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী প্রমুখ নাট্যোৎসাহী সুধীজনের উদ্যোগে জোড়াসাঁকোস্থিত মধুসূদন সান্যাল মহাশয়ের বাড়িতে ১৮৭২ সালের ৭ ডিসেম্বর 'নীলদর্পণ' দিয়ে সাধারণ রঙ্গালয়ের পত্তন। ৫ ডিসেম্বর অমৃতবাজার পত্রিকায় (তখন বাংলায় প্রকাশিত হত) নাটকের বিজ্ঞপ্তি বেরুল। তাতে জানানো হল টিকিটের দাম : প্রথম শ্রেণীর আসনের জন্য এক টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণী আট আনা। পুরনো নথিপত্রে আরও জানা যায়, মাসিক ৪০ টাকা ভাড়া দিয়ে সান্যাল মহাশয়ের বাড়ির উঠোনটি নেওয়া হয়েছিল নিয়মিত স্টেজে অভিনয়ের জন্য। প্রথম রাত্রির অভিনয়ে মোট সাতশো টাকার টিকিট বিক্রী হয়েছিল। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী একাই চারটি ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। (উড সাহেব, সাবিত্রী, গোলোক বসু ও জনৈক চাষী)। বাঙালী দর্শকের নাট্যতৃষ্ণা সেদিন তৃপ্ত হয়েছিল এই অভিনয়ে, তার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছিল সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপনে। অমৃতবাজার পত্রিকা গোড়া থেকেই বাংলা নাটকের প্রধান পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা গৌরবের সঙ্গে পালন করে আসছে। অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ নিজে ছিলেন একজন নাট্যানুরাগী এবং নাট্যকার। তাঁর রচিত নাটকও বাঙালী দর্শকদের মনে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অমৃতবাজার পত্রিকা এই নাটকাভিনয়ের বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশ করে ১৮৭২ সালের ১২ ডিসেম্বর। তাতে লেখা হল : "গত শনিবারে নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে।...ইহা খোসপোষাকী বাবুদিগের বৈঠকী সকের অভিনয় নহে।...নীলদর্পণের অভিনেতৃগণ সমাজবদ্ধ হইয়া এই অভিনয়কর্ম সম্পাদন করিতেছেন। ...টিকিট বিক্রয় করিতেছেন ও সেই অর্থে অভিনয় সমাজের উন্নতি ও পুষ্টি সাধন করিবেন মানস করিয়াছেন। ...আমরা একান্ত মনে তাঁহাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি। ...অভিনয় সমাজ চিরস্থায়ী হউক এবং দিনে দিনে উন্নতি লাভ করিতে থাকুক।"

মাইকেল মধুসূদন তৎকালীন সখের বাংলা নাটক অভিনয়ের নিম্নমান দেখে আক্ষেপ করে বলেছিলেন : 'অলীক কুনাট্য রঙ্গে, মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে, নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।' তিনি নিজে বাংলা নাটক লিখে পাঠকদের দেখিয়ে দিয়েছিলেন নাটক কী রকম হওয়া উচিত। তাঁর 'শর্মিষ্ঠা', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' 'একেই কি বলে সভ্যতা' বাংলা নাট্যসাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি অবশ্য সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা দেখে যেতে পারেননি। তবে এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, তিনিই থিয়েটারে স্ত্রী অভিনেত্রী গ্রহণের উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'তোমরা গোঁফ দাড়ি কামানো ব্যাটাছেলেকে স্ত্রীলোক সাজাইতে পারিবে না।' বাংলা নাট্যজগত সে সময়েই পেয়েছিল মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষকে। মতান্তরের জন্য ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম রজনীতে অভিনয় না করলেও মাস দুই বাদে তিনি তাঁদের সঙ্গে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে ভীম সিংহের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। একশো বছর পর আজ বাংলা সাধারণ রঙ্গালয় গৌরবের সঙ্গে তার পথিকৃতদের স্মরণ করছে। এই একশো বছরে বাংলা নাটক ও বাংলা থিয়েটারের বিস্ময়কর অগ্রগতি হয়েছে। নীলদর্পণের মতো একটি বিপ্লবী নাটক দিয়ে আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়ের যাত্রা শুরু। এর মধ্যেই বোধহয় নিহিত ছিল বাংলা নাটকের গতিপথের ইঙ্গিত। সুস্থ নাট্যরস পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সেই প্রতিবাদের কণ্ঠ আজও বাংলা নাটকে ধ্বনিত। তার জয়যাত্রা সার্থক হোক।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জনাব আবু সৈয়দ চৌধুরী রবিবার দমদম বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্যদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন।

দেশে বিদেশে
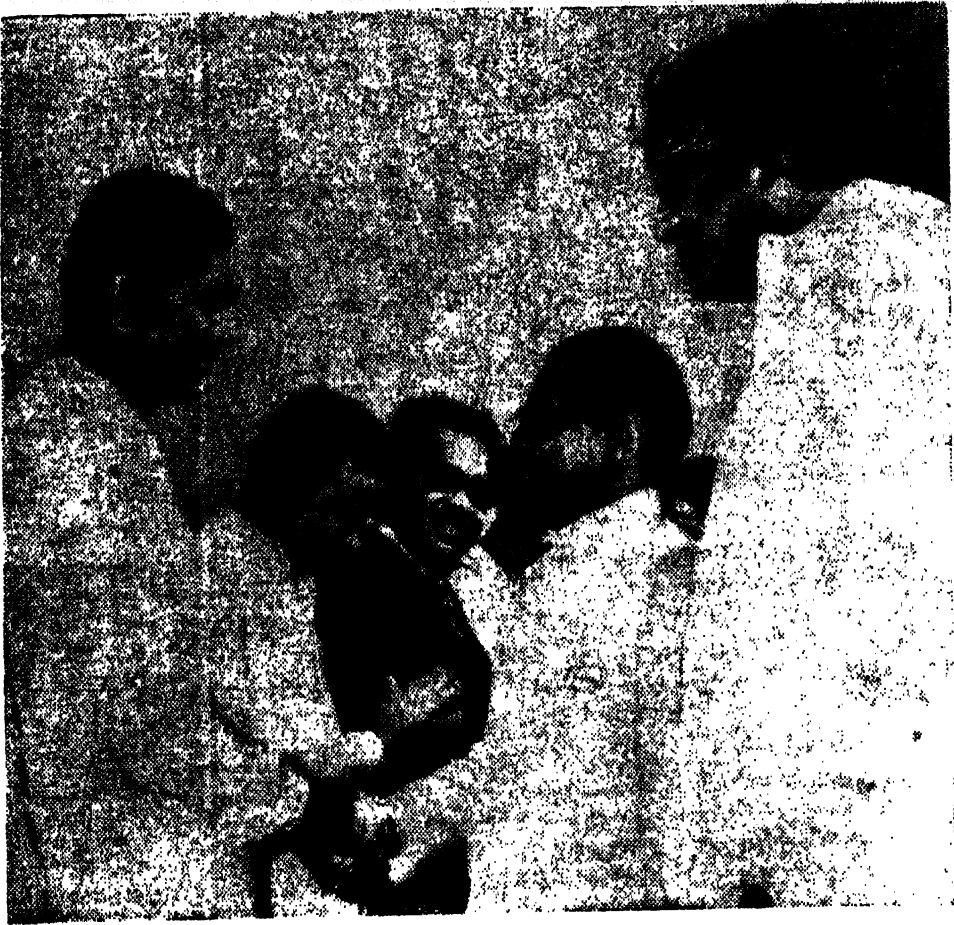
কটক উপনির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী নন্দিনী শতপথীর জয় কংগ্রেসের পক্ষে একটি বিরাট জয়। সম্প্রতি মহীশূরে ও গুজরাটে পর পর দুটি উপনির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় হওয়ায় কোন কোন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক বলতে আরম্ভ করেছিলেন, ইন্দিরা হাওয়া ফুরিয়েছে, এখন থেকে কংগ্রেসের নৌকা বাইতে হবে হাওয়ার উল্টো দিকে। কটক উপনির্বাচনের প্রাক্কালে কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যেও যে কেউ পরাজিত হওয়ার সম্ভাবনায় বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন তার লক্ষণ স্পষ্ট ছিল। এই পরাজয়ের সম্ভাবনা নিবারণ করার জন্য ঐ নেতারা শ্রীবিজু পট্টনায়কের সঙ্গে একটা আপোষরফা করতেও প্রস্তুত ছিলেন। সেইজন্যই ব্যস্তসমস্ত হয়ে শ্রীদ্বারকাপ্রসাদ দর শ্রীপট্টনায়কের সঙ্গে দর কষাকষি করেছিলেন এবং কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রজিৎ যাদব ও পর্যবেক্ষক মথুরাদাস মাথুর শ্রীপট্টনায়কের নেতৃত্বের প্রশংসা করে বিবৃতি দিয়েছিলেন। শ্রীপট্টনায়কের সঙ্গে এসব আলোচনা যে শেষ পর্যন্ত সফল হয় নি তাতে কংগ্রেসেরই লাভ হয়েছে। এতে কংগ্রেসের জয়ের গৌরব আরও বেড়েছে। এই জয় কংগ্রেসের মনোবল বাড়িয়ে দেবে, দলের মধ্যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে এবং দলের মধ্যে বিরুদ্ধ গোষ্ঠী গড়ে ওঠার যে প্রবণতা ইদানীং দেখা যাচ্ছিল সেই প্রবণতা রোধ করবে।

এই জয় অনেকাংশে শ্রীমতী শতপথীর নিজেরও জয়। বড় ঝুঁকি নিয়ে রাজনীতি করার সাহস ও ক্ষমতা যে তাঁর আছে সেটা তিনি এই প্রথম বার প্রত্যক্ষ নির্বাচনে দাঁড়িয়েই প্রমাণ করলেন। পরাজয়ের আশঙ্কায় ম্রিয়মাণ কংগ্রেস নেতারা যখন বিজুর সঙ্গে একটা আপোষ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন তখনও শ্রীমতী শতপথী বিজুকে কংগ্রেসে না নেওয়ার নীতিতে অটল রয়েছেন। শ্রীমতী শতপথী প্রধানমন্ত্রীর মনোনীত মানুষ হিসাবে দিল্লি থেকে এসে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বিধানসভার সদস্য হওয়ার জন্য তিনি ইচ্ছা করলে আর একটি অধিকতর নিরাপদ কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে দাঁড়াতে পারতেন। তিনি তা করেন নি। যে কটক থেকে শ্রীবীরেন মিত্র তিনবার নির্বাচিত হয়ে এসেছেন সেই কটক কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে তিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমিত্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। এই নির্বাচনে কংগ্রেসের পিছনে ছিল শুধু সি-পি-আই আর পি-এস-পি। আর নির্দলীয় প্রার্থী শ্রীবীরেন মিত্র সমর্থন পেয়েছিলেন উৎকল কংগ্রেসের নেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজু পট্টনায়কের কাছ থেকে, সংগঠন কংগ্রেস, স্বতন্ত্র পার্টি, সোস্যালিস্ট পার্টি, সি পি এম প্রভৃতি ছোটবড় অন্য প্রায় সব দলের কাছ থেকে। আর একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব বাহ্যত এই নির্বাচনে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করলেও তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি শ্রীবীরেন মিত্রের অনুকূলেই গিয়েছিল। প্রতিপক্ষ তাঁকে নানাভাবে বিপদে ফেলার চেষ্টা করেছেন। নির্বাচনের প্রাক্কালে উৎকল কংগ্রেসের সঙ্গে কংগ্রেসের সংযুক্তির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার

[illegible] করে থাকে তাহলে সেই [illegible] এলাকা নিজেদের অধিকারে [illegible] হবে, যদিও ১৯৭১ সালের [illegible] পর কোন অঞ্চল অধিকৃত [illegible] সেটা ছেড়ে যেতে হবে। কিন্তু [illegible]তিক সীমানার ক্ষেত্রে সিমলা [illegible] স্পষ্ট নির্দেশ এই যে, উভয় পক্ষের [illegible] নিজ নিজ সীমান্তে সরিয়ে [illegible] হবে। ঐ নির্দেশ অনুযায়ী ঠাকো [illegible] এলাকা থেকে পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী সরিয়ে নিয়ে আসার কথা। কেননা, ভারতের মতে ঐ এলাকাটি কাশ্মীরের যুদ্ধবিরতি রেখার আওতায় পড়ে না। কিন্তু পাকিস্তান এটা মানতে রাজি নয়। গত ১৩ আগস্ট থেকে দুই পক্ষের সৈন্যবাহিনীর স্থানীয় অধিনায়কদের মধ্যে যে কথাবার্তা চলছিল সেটা এই ঠাকো চকের প্রশ্নে এসেই আটকে গিয়েছিল। প্রশ্নটি মীমাংসার আশায় ভারতীয় স্থলবাহিনীর প্রধান জেনারেল স্যাম মানেকশ লাহোরে গিয়েছিলেন পাকিস্তানী স্থলবাহিনীর প্রধান জেনারেল টিক্কা খাঁর সঙ্গে আলোচনা করার জন্য। কিন্তু মানেকশকে শূন্য হাতে ফিরে আসতে হয়েছে। এখন এবিষয়ে যা কিছু করার দুই দেশের সরকারকেই করতে হবে।

লাহোরের এই ব্যর্থ বৈঠকের আগেই প্রেসিডেন্ট ভুট্টো ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিদান সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ভারত সঙ্গে সঙ্গেই এতে সাড়া দেন। পার্লামেন্টে পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরণ সিং জানান যে, গত বছরের যুদ্ধের সময় পশ্চিম রণাঙ্গনে যেসব পাকিস্তানী সৈনিক বন্দী হয়েছিলেন তাঁদের মুক্তি দেওয়া হবে। এঁদের সংখ্যা ৫১৪। স্বরণ সিং জানান যে, সিমলা আলোচনার সময়ই ভারত এঁদের মুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছিল, কারণ এই সৈনিকরা শুধু ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর কাছেই আত্মসমর্পণ করেছিল, এঁদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অনুমোদনের কোন প্রশ্ন নেই। কিন্তু সেসময়ে পাকিস্তান এই ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখায় নি। এছাড়া ভারত ও বাংলাদেশ নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে পাকিস্তানের সামরিক ও অসামরিক বন্দীদের পরিবারের নারী ও শিশুদের মুক্তি দেওয়ারও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। এবং পাকিস্তান জানিয়েছে যে, পাকিস্তানে যেসব বাঙালী পরিবার আটকে গেছেন তাঁদের মধ্য থেকে দশ হাজার নারী ও শিশুকে চলে যেতে দেওয়া হবে।

আসলে পাকিস্তান এখন তার গলার কাঁটা তোলার জন্য ব্যস্ত। সেই গলার কাঁটা হচ্ছে ভারতের বন্দীশালায় যে ৯০ হাজারের বেশি পাকিস্তানী সৈনিক আটক রয়েছেন তাঁরা। বাংলাদেশের উপর চাপ সৃষ্টি করার আশায় প্রেসিডেন্ট ভুট্টো পাকিস্তানে আটকে-পড়া বাঙালীদের ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্নটির সঙ্গে পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের মুক্তির প্রশ্নটি জড়িয়ে দিয়েছেন, যদিও সামরিক বন্দীদের মুক্তির প্রশ্নটি এবং অসামরিক অধিবাসীদের নিজেদের দেশে ফিরে যাওয়ার [illegible] বিচার্য হতে পারে না।

ইতিমধ্যে রাষ্ট্রসংঘের [illegible] দুটি সর্বসম্মত প্রস্তাব [illegible] হয়েছে। একটি প্রস্তাবে বাংলাদেশকে রাষ্ট্রসংঘের সদস্য করতে চাওয়া হয়েছে। অন্য প্রস্তাবটিতে জেনেভা কনভেনশন ও স্বস্তি পরিষদের প্রস্তাব অনুযায়ী যুদ্ধবন্দীদের ফিরিয়ে দিতে বলা হয়েছে। দুটি প্রস্তাবের কোনটিই কার্যকর হবে বলে মনে হয় না। স্বস্তি পরিষদের অনুমোদন ছাড়া বাংলাদেশ রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হতে পারবে না, আর স্বস্তি পরিষদে চীন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আবার ভিটো দেবে, এটা অবধারিত। যুদ্ধবন্দীদের ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার আগে কিছুই হবে না।

•

কেন্দ্রীয় সরকার অবশেষে অন্ধ্রের মুলকি বিধি সংক্রান্ত বিরোধের ব্যাপারে তাঁদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। নয়াদিল্লি যে সূত্র দিয়েছেন তার প্রধান কথাগুলি হল:—সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে স্থানীয় অধিবাসীদের বিশেষ সংরক্ষণ ব্যবস্থা তেলেঙ্গানায় ১৯৮০ সাল পর্যন্ত এবং হায়দরাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদ শহরে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত চালু থাকবে। এমনিতে এই সব সংরক্ষণ ব্যবস্থার মেয়াদ ১৯৭৪ সালের মার্চ মাসেই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। এই বিশেষ সংরক্ষণ ব্যবস্থা কেবল নন-গেজেটেড পর্যায়ের সরকারী কর্মচারী, তহশিলদার, সিভিল অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন ও জুনিয়ার ইঞ্জিনীয়ারদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। তবে যেসব অফিসের কাজের এক্তিয়ার সারা রাজ্যেই বিস্তৃত, যেমন সেক্রেটারিয়েট, বিভাগীয় প্রধানদের দপ্তর প্রভৃতি, সেসব অফিসে সে প্রতি তিনটি সরাসরি নিয়োগের মধ্যে দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে মুলকি বিধি প্রযোজ্য হবে। (অর্থাৎ ঐ চাকরিগুলি অন্তত ১৫ বছরের পুরোন তেলেঙ্গানা-বাসীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।) কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষালয় সহ হায়দরাবাদের বিভিন্ন শিক্ষালয়ে এখন তেলেঙ্গানাবাসী মুলকিদের জন্য যেসব বিশেষ সুবিধা আছে সেগুলি অক্ষুণ্ণ থাকবে। তবে ভবিষ্যতে এই সব শিক্ষালয়ের সম্প্রসারণ করা হবে এবং তখন এইসব সম্প্রসারিত শিক্ষালয়ে আর কোন আঞ্চলিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা থাকবে না।

যে কোন আপোষসূত্রের মত এই আপোষসূত্রও নিশ্চয়ই সকলকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না। অন্ধ্র মন্ত্রিসভা এই আপোষসূত্র অনুমোদন করেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রিসভা দাবি জানিয়েছেন, তেলেঙ্গানা আঞ্চলিক কমিটি ও তেলেঙ্গানার জন্য পৃথক বাজেটের ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে। তাছাড়া, তেলেঙ্গানার জন্য যে ধরনের বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে অন্ধ্রের রায়লসীমাও অন্যান্য অনগ্রসর অঞ্চলের জন্যেও সে ধরনের বিশেষ ব্যবস্থা রাখার দাবি জানান হয়েছে।

৩০-১১-৭২ —[illegible]
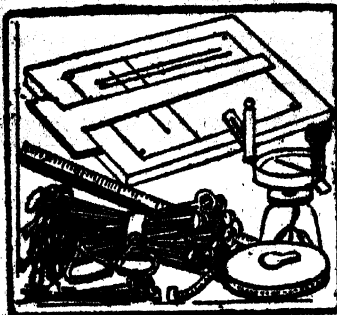
সাধারণ রঙ্গালয়ের নেপথ্যনায়ক এবং কুশিলব

বিশ্বরঞ্জন সেনগুপ্ত

বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা কারো একক প্রচেষ্টায় হয়েছে একথা ভাবলে শুধু যে ঘটনার বাস্তবতাকেই অস্বীকার করা হবে তাই নয়, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ধারাকেও উপেক্ষা করা হবে। বস্তুতঃ ১৮৭২ খৃঃ ৭ই ডিসেম্বর জোড়াসাঁকোয় মধুসূদন সান্যালের খড়খড়িওয়ালা বাড়ীতে যে রঙ্গালয়ের উদ্বোধন হয়, তা কারোর ব্যক্তিগত অভিলাষের ফলশ্রুতি, এমনকি কোন নাট্যগোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশের ঘটনাও নয়, তা হল বাঙালীর জাতীয় সাংস্কৃতিক ধারার অনিবার্য এবং স্বাভাবিক পরিণতি। সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রকৃত স্রষ্টা বাগবাজার ড্রামাটিক ক্লাবের সদস্যরাও নন, এর স্রষ্টা উনিশ শতকের সমগ্র শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীসমাজ।

লেবেডফের পরে এবং সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে কলকাতায় যে সব নাট্যাভিনয় হয়েছে, তার উদ্যোক্তা এবং সংগঠক ছিলেন নগরীর শিক্ষিত অভিজাত পরিবারসমূহ। নবীন বসু তাঁর শ্যামবাজারের নাট্যশালায় বিলেত থেকে নানা উপকরণ এনে বিলিতি কায়দায় 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকের অভিনয় করিয়েছিলেন। লেবেডফের 'বেঙ্গলী থিয়েটারের' মত তিনিও স্ত্রীভূমিকায় অভিনেত্রীদের নিয়োগ করেছিলেন। তারপর পাথুরিয়াঘাটার প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁর 'হিন্দু থিয়েটারে' শেক্সপীয়রের 'জুলিয়াস সীজারের' অংশবিশেষ এবং ভবভূতির 'উত্তররামচরিতের' উইলসনকৃত ইংরেজী অনুবাদের অভিনয় করালেন (১৮৩১ খৃস্টাব্দের, ২৮শে ডিসেম্বর)। ১৮৩৫ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে নবীন বসুর নাট্যশালায় অভিনীত 'বিদ্যাসুন্দর'ই লেবেডফের থিয়েটারের পরবর্তীকালে প্রথম বাংলা থিয়েটার, কেননা প্রসন্নকুমারের হিন্দু থিয়েটারে শুধুমাত্র ইংলন্ডীয় ভাষায় অভিনয় হয়েছিল। বিভিন্ন স্কুল কলেজেও ইংরাজী থিয়েটারের কায়দায় অভিনয় হয়েছিল। ১৮৩৭ খৃঃ ২৯ মার্চ হিন্দু কলেজের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব উপলক্ষে শেক্সপীয়রের নাটক থেকে আবৃত্তি করা হয়। ১৮৫৩ খৃঃ হেয়ার স্কুলের ছাত্রেরা 'মার্চেন্ট অ ভেনিস' নাটকের অভিনয় করেন। ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতেও 'সাঁসুসি' থিয়েটারের মিঃ ক্লিঙ্গারের পরিচালনায় 'ওথেলো' নাটকের অভিনয় হয়েছিল। এই সময় কলকাতার ধনাঢ্য অভিজাত পরিবারসমূহের উদ্যোগে নাট্যাভিনয়ের ধুম পড়ে যায়। আশুতোষ দেব-এর (ছাতুবাবু) বাড়ীতে 'শকুন্তলা', রামজয় বসাকের বাড়ীতে 'কুলীনকুলসর্বস্ব', কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিদ্যোৎসাহিনী' মঞ্চে ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার' নাটকের রামনারায়ণকৃত অনুবাদ-নাটকের, বেলগাছিয়ার পাইকপাড়ার রাজাদের রঙ্গালয়ে 'রত্নাবলী', মেট্রোপলিটান থিয়েটারে কেশব সেনের সম্পর্কে উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ নাটক' এবং যতীন্দ্রমোহন-সৌরীন্দ্রমোহনের পাথুরিয়াঘাটার বঙ্গনাট্যালয়ে 'মালবিকাগ্নিমিত্র' 'রুক্মিণীহরণ' প্রভৃতি নাটক, শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটির রঙ্গমঞ্চে 'একেই কি বলে সভ্যতা?' এবং জোড়াসাঁকোর দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্রদের উদ্যোগে 'নব-নাটক' অভিনীত হয়েছিল। বলা বাহুল্য, এই সকল রঙ্গালয়ের প্রত্যেকটিই ছিল সৌখিন এবং অস্থায়ী। এক বা একাধিক নাটকের অভিনয়ের পরই তা উঠে যায়। বাংলা রঙ্গালয়ের ধারা এইভাবে ধীরে অথচ দৃঢ়পদক্ষেপে বিকাশমুখী হয়ে উঠেছিল। ১৮৬৮ খৃঃ সপ্তমী পূজোর রাত্রিতে প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়ীতে যেদিন দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশীর' অভিনয় হয়, সেদিন সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্মের লগ্ন আসন্ন হয়ে ওঠে। বাংলা রঙ্গালয়ের ধারা ততদিনে পাথুরিয়াঘাটা বেলগাছিয়া শুঁড়ার বাগান ছাতুবাবু'র রামজয় বসাকের প্রাসাদ ও উদ্যানের মনোহারী দেউল পার হয়ে বাগবাজারের মধ্যবিত্ত বাঙালীর উঠোনে পা দিয়েছে। সমগ্র জাতির সাংস্কৃতিক কামনা রূপায়িত হয়ে উঠল তার কয়েক বছর পর অর্ধেন্দুশেখর, ধর্মদাস সুর, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের 'ন্যাশনাল থিয়েটারের' মধ্যে।

(খ)

অভিনয়যোগ্য বাংলা নাটকও ততদিনে প্রচুর লেখা হয়েছে। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কয়েকখানি নাটক লিখেছেন। কিন্তু অধিকাংশ নাটক লেখা হয়েছে সাধারণ বাঙালীর চোখের জলে এবং হৃদয়ের বেদনা মিশিয়ে এবং যাঁরা তা লিখেছেন এই অনুভূতি তাদের নিজেদের অন্তর থেকে উৎসারিত। এঁরা সবাই বাঙালী মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী। মাইকেল মধুসূদন এক নির্ঝর স্বপ্নভঙ্গে নিজেকে আবিষ্কার করেছেন, তথা বাংলাভাষা ও বাঙালীজাতিকে, ভাববিপ্লবের স্রোতস্বিনীরূপে। তাঁর প্রহসনে প্রাচীনমুখী সংস্কারাচ্ছন্ন সামন্ততান্ত্রিক জীবন এবং পাশ্চাত্যমুখী উন্মার্গগামিতার ওপর প্রচণ্ড আঘাত পড়ল। রামনারায়ণ তর্করত্ন ব্রাহ্মণ বুদ্ধিজীবী, পুরস্কারের লোভে হলেও তাঁর স্বগোত্র স্বজাতিকৃত বহুবিবাহ, কৌলীন্য ইত্যাদির ওপর আঘাত লক্ষণীয়। দীনবন্ধুর নাটকে গ্রামবাংলার শোষিত লাঞ্ছিত দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত সমাজ প্রতিকার চাইল। রঙ্গালয়ের তপস্বী ভগীরথদের হাতে শঙ্খ তুলে দিলেন বাঙালী নাট্যকার। রঙ্গালয়ের কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হল ভাবপ্রচেষ্টা।

থিয়েটার ও নাটকের মধ্যে বাঙালীর যে সাংস্কৃতিক জীবনধারা মুক্তি খুঁজেছে তাকে স্পষ্ট করে তুলেছে বাংলা সংবাদপত্র। সেদিনের সংবাদপত্র ছিল গঠনমুখী ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আশ্রয়ে

জাতীয় রঙ্গালয়ের চেতনার উন্মেষ হয়েছে। পাশ্চাত্য প্রভাবিত বিকাশে সমাজজীবনের পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে এগিয়ে এসেছে। এদের মধ্যে 'ন্যাশনাল পেপার', 'অমৃতবাজার পত্রিকা,' 'মধ্যস্থ' প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদপ্রভাকর' ছিল বাংলার প্রথম দৈনিক পত্রিকা। কিন্তু এই সংবাদপত্রেও নাট্যাভিনয়ের নানা সংবাদ প্রকাশিত হত, নাট্যকার ও অভিনেতা এবং উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা হত। ১৮৬৫ খৃঃ ২১ সেপ্টেম্বর নাট্যাভিনয়ের উপর একটি সম্পাদকীয় পর্যন্ত লেখা হয়েছিল, নাম— 'খেমটার নাচ, যাত্রা, ও ওস্তাদী কবি'। সম্পাদকীয়ের এক স্থানে লেখা হয়, "উপসংহারস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে, সঙ্গীতের তুল্য মনোরঞ্জনে বাঙ্গালীরা যতদিন নাটকাভিনয়রূপ বিশুদ্ধ প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে না পারিতেছেন, ততদিন বরং নির্দোষ যাত্রা করি প্রচলিত থাকুক, কিন্তু জঘন্য খেমটা নাচকে দেশত্যাগী করা আশু কর্ত্তব্য হইয়াছে।' এই সংবাদপত্রেই কোলকাতার সর্বপ্রথম বৈতনিক নাট্যাভিনয়ের প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। ১৮৬৫ খৃঃ জগদ্ধাত্রী পূজার সময় বহুবাজারের রাজেন্দ্রলাল দত্তের বাড়ীতে মাইকেলের 'পদ্মাবতী নাটকের' অভিনয় হয়। সেই সংবাদ পরিবেশন করে শেষে লেখা হয়, "একটি দুঃখের বিষয় এই যে, গৃহমধ্যে বহু জনতা ও স্থান সংকীর্ণ হওয়াতে বাটীর বহির্ভাগ হইতে অনেক ভদ্রলোককে হতাশ হইতে হইয়াছে।......রাজেন্দ্রবাবু যদি টিকিটের বিক্রয় করিতেন তাহা হইলে বোধহয় এরূপ অসুবিধা হইত না" (সংবাদপ্রভাকরে বাংলার পুরাকথা/[illegible]কুমার দাশগুপ্ত/ভারতবর্ষ/২০শ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা)

(খ)

জাতীয় এই আশা আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দিতে এগিয়ে এসেছিলেন একদল যুবক। এ'রা রঙ্গালয়যাত্রার ভগীরথ। এ'রা নাটকের মুক্তি দিলেন বৃহত্তর দর্শক-সমাজের মধ্যে, বাঙালীকে 'অলীক কুনাট্য রঙ্গ' থেকে মুক্তি দিলেন, নাটক আর সাধারণ মানুষকে মুখোমুখি করে দিলেন। এই অর্থে, সাধারণ রঙ্গালয়ের এ'রা স্রষ্টা।

গিরিশচন্দ্রের একটি ব্যঙ্গ কবিতায় সাধারণ রঙ্গালয়ের সংগঠক যুবকদের নাম পাই। প্রথম ন্যাশনাল থিয়েটারের কালে গিরিশচন্দ্র জনমুখী নাট্য-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু দর্শনীর বিনিময়ে থিয়েটার করা তাঁর পছন্দ হয় নি। তাই ন্যাশনাল থিয়েটারের আত্মপ্রকাশের সময় তিনি সংগঠকদের থেকে দূরে থাকেন। ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম অভিনয় উপলক্ষ করে গিরিশচন্দ্র গান বাঁধলেন—

> [illegible] চমৎকার।
> [illegible] পূর্ণ অর্ধ [illegible]
> [illegible] হবে।।

ধর্মদাস সুর

> নগ হতে ধারা ধায়,
> সমুদ্রাত্রী [illegible]
> বিবিধ [illegible] উপর
> [illegible]—
>
> শিবশম্ভু [illegible]
> [illegible]।।
>
> কিবা [illegible] শ্যাম
> [illegible] বিন্দু বরে [illegible],
> [illegible] মুনি ঋষি
> [illegible] রসে [illegible]—
>
> সবাই মিলে ডেকে বলে
> দীনবন্ধু কর পার।।
>
> কিবা [illegible] মেলা
> [illegible] খেলা,
> ভুবনমোহন চরে কত্রে গোপনে খেলা;—
> মিলে যত চাষা, [illegible] আশা,
> নীলের গোড়ায় দিতেছে সার।।
>
> [illegible] শশী হরষ, অমৃত বরষে,
> [illegible] যায় [illegible],
> [illegible] হাড়ি [illegible]
> [illegible]।।"

গানটির ব্যাখ্যা এই—

নগেন্দ্রনাথ—[illegible]

লুপ্তবেণী—বেণী [illegible]; অভিনয় করিতেন না। অথচ কমিটির মাথার উপরে প্রতিষ্ঠিত।...পূর্ণ—পূর্ণচন্দ্র ঘোষ।

অর্ধইন্দু—অর্ধেন্দু

কিরণ—কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মতি—মতিলাল সুর।

নগ হতে ধারা [illegible]—নগেন্দ্রই কর্মাধ্যক্ষ ছিল। ......

ধর্মক্ষেত্রস্থান—ধর্মদাস ও [illegible]মোহন স্টেজ তৈয়ারী করিয়াছিলেন।

[illegible] গান করিতেন।

[illegible]।

ভুবনমোহন চরে—গঙ্গাতীরের ভুবনমোহন নিয়োগীর বৈঠকখানা [illegible]।......

দীনবন্ধু—নীলদর্পণ [illegible]।......

শশী—শশিভূষণ দাস।

অমৃত—অমৃতলাল বসু।" (পুরাতন প্রসঙ্গ / বিপিনবিহারী গুপ্ত / দ্বিতীয় সংস্করণ।পৃঃ ২৩০)

গিরিশচন্দ্রের ব্যঙ্গ গীতিকায় যাঁদের নাম আছে তাঁরা নিশ্চয়ই প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়ের স্রষ্টারূপে সম্মানিত হতে পারেন। কিন্তু সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রকৃত সংগঠকরূপে চার-জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ'রা হলেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু ও ধর্মদাস সুর। অর্ধেন্দুশেখর ও অমৃতলাল নটরূপে যশস্বী হয়েছিলেন। অমৃতলাল বসু নাট্যকাররূপে সমধিক খ্যাতি লাভ করেছিলেন। নগেন্দ্রনাথ ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রধান সংগঠক। ধর্মদাস সুর সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ স্টেজ ম্যানেজার ও মঞ্চ-পরিকল্পক ছিলেন।

ন্যাশনাল থিয়েটারের সংগঠক রূপে অর্ধেন্দুশেখর, নগেন্দ্রনাথ ও ধর্মদাস সুরের অবদান সবচেয়ে বেশী। বাগবাজার শৌখিন নাট্যসমাজের উদ্যোগে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার কাজ যখন খানিকটা এগিয়েছে, তখন অমৃতলাল তাদের সঙ্গে যোগ দেন। গিরিশচন্দ্র তাদের সঙ্গে প্রথমাবধি থাকলেও ন্যাশনাল থিয়েটারের আত্ম-প্রকাশের কালে দূরে সরে যান। সংগঠকদের আর একজন রাধামাধব কর।

(গ)

'বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার' (পরবর্তীকালে 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ') প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ও নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম। ১৮৬৮ খৃঃ সপ্তমীপূজার রাত্রিতে বাগবাজারের দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীর নিকটবর্তী প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়ীতে এ'রা 'সধবার একাদশী' অভিনয় করেন। অভিজাত সমাজের আশ্রয় ও আনুকূল্যের বাইরে নব্যশিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তের হাতে এই সর্বপ্রথম নাট্য-ভারতীর পূজা হল। ১৮৭২ খৃঃ ১১ মে শ্যামবাজারের রাজেন্দ্রনাথ পালের বারবাড়ীতে নাট্যসমাজের পরবর্তী নাটক 'লীলাবতী' অভিনীত হয়।

'লীলাবতীর' অভিনয় দেখে জনৈক দর্শক ঠাকুরবাড়ীর নাট্যামোদীদের বলেছিলেন, 'আপনাদের অভিনয় সোনার খাঁচায় দাঁড়কাক [illegible]।' তা যদি হয় তবে শ্যামবাজারের নাট্যসমাজের অভিনয় বাঁশের খাঁচায় [illegible]। চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। অমৃতবাজার পত্রিকা, ন্যাশনাল পেপার, মধ্যস্থ প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা যুবকদের কর্মনিষ্ঠার প্রভূত উৎসাহ দিয়েছেন। এবার পত্র-পত্রিকায় [illegible] জানানো হয় এই অভিনয়ের। [illegible]

রঙ্গালয়ের একটা সুযোগ্য পরিচালক হয়ে উঠল এবং খাঁটি বাংলা নাটকও যে দর্শকদের অভিভূত করবার শক্তি রাখে তা প্রমাণিত হল। আর 'লীলাবতীর' এই অভিনয়ের মধ্য দিয়েই প্রতিভাবান নটরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। 'সধবার একাদশীতে' জীবনচন্দ্রের ভূমিকায় অর্ধেন্দুর অভিনয় দেখে দীনবন্ধু বলেছিলেন, 'আপনি অটলকে যে লাথি মারিয়া চলিয়া গেলেন, উহা improvement on the author'' 'লীলাবতীতে' 'হরবিলাসের' ভূমিকায় অর্ধেন্দুকে দেখে দীনবন্ধু তাঁর প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় পেলেন।

রঙ্গমঞ্চে অর্ধেন্দুশেখরের আবির্ভাব ঘটেছে কিন্তু 'সধবার একাদশী' অভিনয়েরও আগে। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর 'বুঝলে কিনা' নামে একখানি নাটক লেখেন। তাঁর পাথুরিয়াঘাটার রঙ্গনাট্যালয়ে এই নাটকের অভিনয় হয়। হরকুমার ঠাকুরের পুত্র এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র যতীন্দ্রমোহন ও সৌরীন্দ্রমোহন তখন কলকাতার অভিজাত সমাজ তথা বাঙালী শিক্ষিত সমাজের নেতৃস্থানীয়। জনহিতকর নানা কার্যের স্বীকৃতিস্বরূপ এবং সম্মানিত ও অনুগত ভূ-স্বামীরূপে যতীন্দ্রমোহন ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে 'মহারাজা' উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। বোধকরি এই অধিকারে তিনি 'বুঝলে কিনা' নাটকে কিছু নীতিমূলক উপদেশ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শিক্ষিত বাঙালী, ধনী ভূ-স্বামীর এই প্রয়াস সুনজরে দেখতে পারেনি। স্বাতন্ত্র্যবোধ ও আত্মসচেতনতা ছিল তখনকার বাঙালীর জীবনবোধের অঙ্গস্বরূপ। যতীন্দ্রমোহনের নাটকের জবাব দিলেন ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় তার 'কিছু কিছু বুঝি' নাটকে। জোড়াসাঁকোর কয়লাঘাটায় দেবেন্দ্রনাথের জামাতা হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে এই নাটকের অভিনয়ে অর্ধেন্দুশেখর 'দন্তবক্র মুরাদ আলী' ও 'চন্দনবিলাসের' ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। অভিনেতারূপে অর্ধেন্দুশেখর এবং স্টেজ ম্যানেজাররূপে ধর্মদাস সুর এই প্রথম রঙ্গালয়ের সঙ্গে যুক্ত হলেন।

এই ঘটনা বাংলা রঙ্গালয়ের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। কেননা এই ঘটনার পরিণতিতে অর্ধেন্দুশেখর চূড়ান্ত আর্থিক সঙ্কটে পড়েছিলেন এবং সেই সঙ্কট সমাধানে পেশা হিসাবে অভিনয় এবং তার ক্ষেত্রস্বরূপ পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ গড়ে তুলতে সঙ্কল্পবদ্ধ হয়েছিলেন। অর্ধেন্দুশেখর ছিলেন যতীন্দ্রমোহনের মামাতো ভাই। 'কিছু কিছু বুঝি' নাটকে সৌরীন্দ্রমোহনের চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ ছিল। 'দন্তবক্র' চরিত্রটি তাকে লক্ষ্য করেই সৃষ্টি করা হয়েছিল। এই নাটকে অভিনয় করবার অপরাধে যতীন্দ্রমোহন অর্ধেন্দুশেখরের পিতাকে মাসিক বৃত্তি বন্ধ করে দেন। ফলে অর্ধেন্দুশেখরের পরিবারকে অর্থ কৃচ্ছ্রের [illegible] হয়। অমৃতলাল বসু তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, "অর্ধেন্দুর কিছু কিছু টানাটানি ছিল; তাঁহাকে প্রায় টাকা দিতে হইত। নীলদর্পণের তৃতীয় অভিনয় রজনীতে অর্ধেন্দুর অদর্শনে আমরা অস্থির হইয়া পড়িলাম; কোনরকম করিয়া নগেন্দ্রনাথ মিত্রকে দিয়া তাঁহার কাজ চালাইয়া লইলাম। পরদিন প্রাতে অর্ধেন্দুর বাড়ীতে গিয়া তাঁহার পিতা শ্যামাচরণ মুস্তফী মহাশয়ের হস্তে [illegible] বাবদ চল্লিশটি টাকা দিয়া আসিলেন।"

অর্ধেন্দুশেখরকে মাঝে মাঝে কিছু টাকা দেওয়া হত। কিন্তু বেতনভোগী কেউই ছিলেন না। [illegible] অভিনয়ের সময় মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিযুক্ত করা হয়েছিল। "বঙ্গের সাধারণ নাট্যশালার ইনিই প্রথম ও একমাত্র [illegible]।'

(৬)

অর্ধেন্দুশেখর ১৮৫০ খৃঃ জানুয়ারী মাসে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থান কোলকাতার বাগবাজার। পিতা শ্যামাচরণ মুস্তফী মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের মামা ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই নাটকের ও থিয়েটারের আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছেন। অর্ধেন্দুশেখরের বাল্যকাল কাটে তাঁর পিতৃস্বসা যতীন্দ্রমোহনের জননীর নিকট, পাথুরিয়াঘাটায়। পাথুরিয়াঘাটার বঙ্গনাট্যালয়ে যে সকল নাটকের অভিনয় হত সেগুলি দেখবার সুযোগ তাঁর হত। নাটকের মহলাও তিনি দেখতে পেতেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর অভিনয় দেখাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হত। 'বিশ্বকোষ' গ্রন্থে লিখিত হয়েছে যে ঠাকুরবাড়ীতে ([illegible]নাথ ঠাকুরের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে) নবনাটকের অভিনয় দেখে তাঁর অভিনয় শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়।

কিন্তু গিরিশচন্দ্র লিখেছেন, "স্মরণ হইতেছে যেন সে সময় ঠাকুরবাড়ীতে 'চক্ষুদান' ও 'উভয় সঙ্কটের' অভিনয় চলিতেছিল। অর্ধেন্দু সেই অভিনয়ের অনুকরণ আমার বন্ধুর বাসায় আসিয়া কখন কখন করিতেন।"

অর্ধেন্দুশেখর অমৃতলাল বসুর সহপাঠী ছিলেন। ছেলেবেলায় নাম [illegible]

তাঁর আর কোন বৈশিষ্ট্য কারো চোখে পড়ে নি; বোধ হত তাঁর মধ্যে রসকষ কিছু নেই। স্কুলের শিক্ষক হাইড সাহেব ছেলেদের নামের শেষের অংশ ধরে ডাকতেন। অর্ধেন্দুর নাম ঠিক করে বলতেন না, মুস্তফীর বদলে তাকে 'ম্যাস্টিফ' বলে ডাকতেন। ছেলেরা অর্ধেন্দুকে খুবই জ্বালাতন করত। অমৃতলালের সংগে দুই বছর কম্বুলীটোলার স্কুলে পড়ে অর্ধেন্দু পাইকপাড়ার স্কুলে চলে গেলেন।

মুস্তফীবাড়ীর সামনে কৃষ্ণকিশোর নিয়োগীর বাড়ীতে একটি প্রভাতী বিদ্যালয় ছিল। এই স্কুলেই অমৃতলাল ও অর্ধেন্দুশেখর পড়তেন। গিরিশচন্দ্রের অনুজও ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। ঐ বিদ্যালয়েই গিরিশ প্রথমে তাকে দেখেন। তারপর দীর্ঘকাল গিরিশ তাকে দেখেন নি। গিরিশচন্দ্র লিখেছেন, "যখন বাগবাজারে 'সধবার একাদশী' থিয়েটার সম্প্রদায়ের আড্ডা বসে, তখন উক্ত সম্প্রদায়ের উৎসাহী প্রসিদ্ধ অভিনেতা স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, তিনি কয়লাহাটায় 'কিছু কিছু বুঝি' প্রহসনের অভিনয় দেখিতে গিয়া একজন অত্যুৎকৃষ্ট অভিনেতা দেখিয়াছেন। অভিনেতা বাগবাজারেই থাকে। আমার বিশেষ আগ্রহে নগেন্দ্রনাথ অভিনেতাটিকে আনেন। দেখিলাম—আমার পূর্ব পরিচিত অর্ধেন্দুশেখর।" (নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী/১৩১৫ সাল ৩রা আশ্বিন, শনিবার, মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনয় আরম্ভের পূর্বে স্মরক-সম্বন্ধে পঠিত/গিরিশচন্দ্র ঘোষ)

অমৃতলালের সংগেও অর্ধেন্দুর দীর্ঘকাল যোগাযোগ ছিল না। আহেরীটোলার ভোলানাথ মুখার্জীর লেখা 'কিছু কিছু বুঝি' প্রহসনের অভিনয় হল জোড়াসাঁকোর কয়লাঘাটায়। সেই উপলক্ষে অর্ধেন্দুর নাম আবার শুনতে পেলেন অমৃতলাল। সেখানেই প্রথম থিয়েটারের স্টেজ দেখলেন অমৃতলাল, থিয়েটার দেখা হলো না, তবে অভিনেতারূপে অর্ধেন্দুর নাম শুনে এলেন। দেখা করার ইচ্ছা হল, কিন্তু সম্ভব হল না।

তারপর অমৃতলালও একদিন ন্যাশনাল থিয়েটারে এলেন।

অমৃতলালের পিতা কৈলাসচন্দ্র বসু ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর শিক্ষক ছিলেন। কয়েক বৎসরের জন্য হেডমাস্টারও হয়েছিলেন। বঙ্গাব্দ ১২৬০ এর ৬ বৈশাখ রামনবমীর দিনে অমৃতলালের জন্ম হয়। শোভাবাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের বাড়ীর সামনে তাদের পুরাতন বাটী ছিল। অমৃতলালের পিতামহ বলচিন্তা গ্রাম থেকে কোলকাতায় এসে এখানে বাস করতে থাকেন। অমৃতের শিক্ষা শুরু হয় তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত কম্বুলীটোলার স্কুলে (বর্তমান শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুল)।

ছেলেবেলায় পিতার মুখে সেক্সপীয়রের আবৃত্তি শুনতেন। কবিতা আবৃত্তির দিকে

নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাল্যকাল থেকে তাঁর ঝোঁক ছিল। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অমৃতলাল ডাক্তারী পড়তে লাগলেন। কিছুদিন ডাক্তারী পড়বার পর এ্যালোপ্যাথিক ছেড়ে হোমিওপ্যাথি চর্চার জন্য কাশীতে যান।

কিছুকাল পর কলকাতায় ফিরে এসে থিয়েটারের সংস্পর্শে আসেন। অমৃতবাজার পত্রিকা তখন বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হত। অমৃতবাজার পত্রিকায় 'বিবিধ' শিরোনামে হাস্যোদ্দীপক প্রসঙ্গ প্রকাশিত হত। এইগুলি পড়ে অমৃতলাল হাস্যকৌতুকের প্রতি আকৃষ্ট হন।

কয়লাঘাটায় 'কিছু কিছু বুঝি' প্রহসনের পর একদিন অমৃতলালের সংগে অর্ধেন্দুর দেখা হয়। অর্ধেন্দুর কাছেই অমৃতলাল শুনলেন 'নীলকমল ঘোষের ছেলে' 'নবীন সরকার মহাশয়ের জামাই' 'কলাপাতায় প্রকাণ্ড ঠোঙায় সাজা পান নিয়ে যে রোজ অফিসে যায়' 'দিগম্বর দে'র কাছে বুক-কিপিং শিখে ভালো বুক-কিপার হয়েছে' সেই-ই নাকি সধবার একাদশীতে নিমে দত্তের পার্ট করে। অমৃতলাল ভাবলেন—সে ত কেরানীগিরি করে—সে সেক্সপীয়র আওড়াবে কি করে!

বাংলা রঙ্গালয়ের নটরাজের কি কৌতুক! সেই অমৃতলাল গিরিশকে গুরু মেনেছিলেন। বাগবাজারের নটবর চৌধুরীর বাড়ীতে ব্যায়ামের আখড়া ছিল। সেখানে মাঝে মাঝে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ করে ডেকে এনে ব্যায়াম দেখানো হত। সেই নটবর চৌধুরীর বাড়ীতেই গিরিশের সংগে অমৃতলালের আলাপ হল। অর্ধেন্দুও সেখানে আসতেন। বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের ক্ষেত্র ক্রমে ক্রমে প্রস্তুত হতে লাগল।

তারপর অমৃতলাল কাশী চলে গেলেন।

কাশী থেকে ফিরে অমৃতলাল দেখলেন কম্বুলীটোলার স্কুলে অর্ধেন্দুশেখর ও ধর্মদাস সুর রিহার্সাল করছেন। অর্ধেন্দুর সংগে দেখা হলে তিনি অমৃতলালকে বললেন—তুমি এসেছ ভালোই হয়েছে, 'লীলাবতীর' অভিনয় করতে হবে। অর্ধেন্দুর নির্দেশে অমৃতলাল যোগজীবনের ভূমিকায় অভিনয় করতে রাজী হলেন। কিন্তু বড়লাট লর্ড মেয়োর হত্যাকাণ্ড উপলক্ষ করে তখনকার মত 'লীলাবতীর' অভিনয় বন্ধ হয়ে গেল। অমৃতলাল আবার কাশী চলে গেলেন।

কাশী থেকে ফিরে এসে দেখেন 'ন্যাশনাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ সম্পূর্ণ, 'নীলদর্পণ' নাটক অভিনয়ের আয়োজন চলছে। গিরিশচন্দ্রের সংগে অন্যান্য সঙ্গীদের বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। ১৮৭২ খৃঃ ৭ ডিসেম্বর মধুসূদন সান্যালের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে 'নীলদর্পণের' অভিনয় হয় 'ন্যাশনাল থিয়েটার' রঙ্গালয়ে। অমৃতলাল ক্ষেত্রমণির ভূমিকায় অভিনয় করলেন।

(৮)

বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার প্রতিষ্ঠার মূলে দুজন ছিলেন অগ্রণী। এঁরা হলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কোলকাতায় তখন পাড়ায় পাড়ায় যাত্রার আসর বসত। কবি পাঁচালী, আখড়াই হাফ-আখড়াই সঙের আসর বসত। গিরিশচন্দ্র লিখেছেন, "অভিনয়ও সাধারণের পক্ষে এক আশ্চর্য জিনিস ছিল। কোথা হতে অভিনেতারা আসে, কিরূপে পট-উত্তোলন ও পট-পরিবর্তন হয়—মূল্যবান পরিচ্ছদ—যাত্রার ন্যায় দর্শকের নিকট হাত-পা-মুখ না নাড়িয়া পরস্পর কথা কওয়া, রাজা রানী রাজমন্ত্রী প্রভৃতির হাবভাব, এই সমস্তই অদ্ভুত জ্ঞান হইত।...বড়লোকের অনুকরণ করিয়া নানা স্থানে সখের থিয়েটার হইতে লাগিল।" (বর্তমান রঙ্গভূমি/গিরিশচন্দ্র ঘোষ/সাপ্তাহিক রঙ্গালয়/২৬শে পৌষ, ১৩০৮ সাল)

১৮৫৬ খৃঃ থেকে ১৮৬১ খৃঃ পর্যন্ত কালকে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন বঙ্গ সমাজের পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ। এই মাহেন্দ্রক্ষণ বাঙালীর জীবনে কিরূপ আলোড়ন তুলেছিল, সমসাময়িক ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। এই আলোড়ন তোলার পিছনে বাংলার নাট্য-আন্দোলনের ভূমিকাও কম ছিল না। এই নাট্য-আন্দোলনের প্রভাব কিরূপ সর্বব্যাপী হয়েছিল তা বোঝা যাবে এই ঘটনা থেকে যে সমসাময়িক মনীষীদের মধ্যে কেউ-ই এই আন্দোলন থেকে দূরে থাকতে পারেননি। এই যুগের মনীষীদের মধ্যে মধুসূদন স্বয়ং নাটক লিখেছেন, 'জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর নাট্যশালার কমিটি অব ফাইভের' সদস্য ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মধুসূদন দত্ত। মেট্রোপলিটন থিয়েটারে 'বিধবা বিবাহ' নাটকের অভিনয়কালে অধ্যক্ষ ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। চুঁচুড়ার মল্লিকবাড়ীতে 'লীলাবতী' নাটকের যে অভিনয় হয়েছিল তার পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন অন্য-

ছিল।' এবং এখানেই ন্যাশনাল থিয়েটারের ক্তিত্ব।

(খ)

থিয়েটারের উৎকর্ষ নির্ভর করে কয়েকটি দিকের ওপর। এঁরা হলেন নাট্যকার, দর্শক, নাট্যসংগঠক ও কুশীলব। উনিশ শতকের নাট্যকার ও দর্শকেরা উন্নত রুচির পরিচয় দিয়েছেন, বিশেষতঃ উনিশ শতকের মাঝামাঝি কাল থেকে। কিন্তু নাট্যসংগঠক ও কুশীলবরা সমাজের শ্রদ্ধা পেয়েছেন অনেক পরে। সাধারণ-রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পর দীর্ঘকাল কেটে যায় মনের স্থিরতা আসতে। তারপর পূর্বেকার অস্থির কাল পর্যন্ত থিয়েটারের অংশভাগী এই দুই শ্রেণী সমাজে বিশেষ কোন সম্মান পায়নি। এমনকি শৌখিন অভিনয় এবং তার অভিনেতাদেরও সমাজ ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছে।

বাগবাজারে 'সধবার একাদশী' অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র নিমচাঁদের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। নিমচাঁদের ভূমিকা নিয়ে গিরিশ বলছেন, রাত্রিতে মদের বদলে বোতল বোতল ঠাণ্ডা জল কোন কাজের কথা নয়, রাত্রিতে বেশী জল খেলে গলায় সর্দি বসে যাবে—অতএব সত্যিকারের মদ চাই। গিরিশকে সত্যিকারের মদই দেওয়া হয়। "অনেকদিন পরে স্বনামধন্য ডাক্তার সূর্যকুমার সর্বাধিকারী একজন অভিনেতাকে চিকিৎসা করিতে আসিয়া বলিয়াছিলেন—আমি কখনো থিয়েটার দেখি না। তোমাদের পাবলিক থিয়েটার কিন্তু সমাজের একটা উপকার করেছে। আমাদের পাড়ার রাস্তায় মাতালদের বেলেল্লাগিরি একেবারে কমে গেছে।" (গুরুপ্রসঙ্গ। রাধামাধব করের স্মৃতিচারণ)।

পাবলিক থিয়েটারে অভিনেত্রীর আবির্ভাবও সমাজে আলোড়ন তুলেছিল। বলা বাহুল্য, সেই রক্ষণশীলতার দিনে যাঁরা অভিনেত্রীর জীবিকা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই ছিলেন পতিতা-সমাজ থেকে আগত। বাংলা রঙ্গালয়কে তাঁরাই প্রথম মণ্ডিত করেছিলেন। সেদিনকার রক্ষণশীল সমাজ কিভাবে এটাকে নিয়েছিলেন, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মজীবনী থেকে তা জানা যায়। তিনি লিখেছেন যে তিনি মাঝে মাঝে নাটকাভিনয় দেখতেন, কিন্তু যেদিন থেকে রঙ্গালয়ে বারাঙ্গনাদের আবির্ভাব হল সেইদিন থেকে তিনি থিয়েটার দেখা বন্ধ করে দিলেন। ১৮৬১ খৃঃ সংস্কৃত কলেজে 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে শিবনাথ যযাতির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। কলেজের ছাত্রদের মধ্যেও নাটকাভিনয় রুচি বিকৃতি ঘটিয়েছিল। "আমাকে দুর্যোধন করিয়াছিলাম সে ক্লাসের একটি অল্পবয়স্ককে প্রেয়সী বলিয়া আলিঙ্গন করিতে এবং কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিতে লাগিল।" (আত্মচরিত। শিবনাথ শাস্ত্রী। পৃঃ ১১৪)।

অমৃতলাল বসু

এই নাট্যরুচি বিকৃতির জন্য সামাজিক কলহ ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষও অনেকখানি দায়ী ছিল। কলকাতার ধনীরা নাটক ও নাট্যকারদের ব্যক্তিগত বিদ্বেষ প্রকাশ করবার জন্য কাজে লাগাতেন। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'বুঝলে কিনা' প্রহসনের উত্তরে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় লিখলেন 'কিছু কিছু বুঝি'। এই প্রহসনে ভুবন মুখুজ্যে পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরকর্তাদের কটাক্ষ করে গান বাঁধলেন—

'ওরে নেশাতে চুলচুলু করে দু নয়ন
রাবণ মারিল রামে কাঁদে দুর্যোধন।
না বুঝে করেছি নেশা
কোথায় আমার রইল পেশা
এলো কেশে এলো কেশা করিবারে রণ।
দময়ন্তী ভয়ে কেঁচো
শরীরে পেয়েছে পেঁচো
কিসে হল গর্ভবতী, ঠাকুরের লিখন।
শিবের ঘরে কেষ্টার মেয়ে
পেঁচার মত রইল চেয়ে
শকুনি চাকা গঙ্গায় নেয়ে করলে পলায়ন।

স্মরণীয়, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক লিখে তাঁর নিজের রঙ্গালয়ে সেই নাটকের অভিনয় করিয়েছিলেন। 'কেশা' হলেন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। 'বিদ্যাসুন্দরে' তিনি অভিনয় করেছিলেন।

এর জবাব দিলেন প্রিয়মাধব বসুমল্লিক নিজে এক প্রহসন লিখে। বাগবাজারে রাজবল্লভ পাড়ায় বদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে এক নাট্যসম্প্রদায় গঠিত হয়। তাদের উদ্যোগে এই প্রহসনের অভিনয় হল। অভিনয়ের দিন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর দর্শকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। প্রিয়মাধব ভালো মুখুজ্যের জবাব দিলেন। সে জবাবের সবটুকু আজকের পাঠকরুচির উপযোগী নয়। প্রিয়মাধবের গানের কিছু অংশ এই—

(১) ওরে হায়রে দেশের থিয়েটার
আগে শশধরের মত ছিল
[illegible] অন্ধকার।
কমলা হাটার অমলা হাটার
হল তোমার ঠাঁই
কি ছিলে কি হলে তুমি মনে ভাব তাই,
পড়ে হাড় হাভাতে 'ভুলোর' হাতে
গেলে তুমি ছারেখার।।

জোড়াসাঁকোর কমলাহাটার দেবেন্দ্রনাথের জামাতা হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে সর্বপ্রথম ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কিছু কিছু বুঝি' প্রহসনের অভিনয় হয়। উপরের গানটিতে তার প্রতি কটাক্ষ রয়েছে। আরেকটি গান—

(২) আমি থিয়েটারের ছিপ্সি
গ্রীণ চশমা নাকে দিয়ে গো
দেখি গ্রীনরুমের মিপ্সি।
রাঙ্গা রাঙ্গা ছেলেগুলো সখি সাজে সব
তাদের নারীর মতন রব
তাদের আকার দেখলে আরোল গড়ুম
ইচ্ছে হয় কিস্ করি।
পানের খিলির দোকানেতে
হলো একটা এ্যাক্টো
বলছি তারি ফ্যাক্টো
হল বুগীর পোলা দময়ন্তী
এমন থিয়েটারে গড় করি।

'কিছু কিছু বুঝি' প্রহসনেই অর্ধেন্দুশেখর সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করলেন অভিনেতারূপে আর ধর্মদাস সুর মঞ্চাধ্যক্ষরূপে।

এই তো গেল অভিনেতা নাট্যকার বা গীতিকারদের রুচি। নাট্যসংগঠকদের মধ্যেও কেউ কেউ নাটকের গণমুখীনতায় আপত্তি করেছিলেন। তাঁরা বোধহয় 'সোনার খাঁচায় দাঁড়কাক' দেখতেই অভ্যস্ত ছিলেন। প্রথমদিকে এই মনোভাব গিরিশেরও ছিল। তাই তিনি 'দর্শনীর' বিনিময়ে থিয়েটার করতে প্রথমে রাজী হন নি। আরও একটা ব্যাপারে গিরিশচন্দ্রের রক্ষণশীলতা প্রকট হয়ে পড়ে। পাবলিক থিয়েটারে 'নীলদর্পণ নাটকের' অভিনয়ের পর তিনি উদ্যোক্তাদের ব্যঙ্গ করে যে কবিতাটি লিখেছেন তার মধ্যে একটি চরণ ছিল 'মিলে যত চাষা, কোরে আশা, নীলের গোড়ায় দিচ্ছে চাষ।' ন্যাশনাল থিয়েটারের দলে তথাকথিত নিম্নবর্ণের লোক ছিলেন, গিরিশের উদ্দিষ্ট ছিলেন তারাই।

নাটকের বিকাশে দুর্নীতির প্রসার ঘটবে এমন আশঙ্কাও কেউ কেউ করেছেন। ১৮৫৮ খৃঃ ২৭ আগস্ট সাপ্তাহিক বার্তাবহ' জনৈক পত্রলেখক বেলগাছিয়া রঙ্গালয়ে 'রত্নাবলী' নাটকাভিনয় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেন, "অতীব আক্ষেপের বিষয় এই যে এক্ষণে নাটকামোদ বৃদ্ধি পাইয়া লোকের মন কুসংস্কার পরতন্ত্র হইল।" (পুরাতন বাংলা সংবাদপত্রে বিগত শতাব্দীর বাংলার কথা/ অনন্তকুমার সান্যাল/ভারতবর্ষ। ৪০শ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা)

প্রথম দিকের এই রক্ষণশীলতার কথা গিরিশ নিজেও লোকের প্রকাশ্য [illegible]

লোক মদ খাইয়া—ভদ্রলোকের বাড়ীতে গোলযোগকারী করিত বটে। (দেবগণের মর্ত্যে আগমন/দুর্গাচরণ রায়/পৃঃ ৫৪৯)

শুঁড়িপাড়ায় জনার্দন সাহার বাড়ীতে 'লীলাবতীর' অভিনয় খুবই ভালো হয়েছিল। 'ন্যাশনাল থিয়েটারের' অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই নাটকের অভিনয়ে সর্বপ্রথম রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। এর সবগুলি যদিও সৌখীন অভিনয় তথাপি এই ধারাই সাধারণ রঙ্গালয়ের ভিত্তি রচনা করেছে।

(ট)

নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্মদাস সুর, রাধামাধব কর, অমৃতলাল বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ প্রত্যেকেই শিক্ষিত ছিলেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন নি, কিন্তু সাহিত্যে, বিশেষ করে ইংরেজী সাহিত্যে তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল। ১৮৬৬ খৃঃ থেকে ১৮৭৯-৮০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতার বিভিন্ন সওদাগরী অফিসে তিনি বিভিন্ন কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করেছেন। ন্যাশনাল থিয়েটারের দলের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ হয়ে গেলেও, এর সংগঠনের যুগে তার অবদান অস্বীকার করা যায় না। সে সময় নাট্য-শিক্ষকরূপেও তিনি দল গড়ে তুলতে সাহায্য করেছেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অমৃতলাল ভর্তি হয়েছিলেন মেডিক্যাল কলেজে। দু'বছর ডাক্তারী পড়বার পর তিনি হোমিওপ্যাথির দিকে ঝুঁকলেন এবং কাশীর বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক লোকনাথ মৈত্রের কাছে হোমিও-প্যাথি শেখবার জন্য সেখানে যান। তার আগে প্রবেশিকা পাশ করবার পূর্বে বাল্যের সহপাঠী অর্ধেন্দুর সঙ্গে তাঁর দেখা হল। তিনিই তাকে অভিনয়ের দিকে টেনে আনলেন। কাশী থেকে অমৃতলাল মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন। একবার কলকাতায় এলে অর্ধেন্দু তাকে 'লীলাবতী' নাটকে পার্ট নেবার জন্যে বলেন। অমৃত-লাল রাজী হলেন। ইতিমধ্যে অর্ধেন্দুর সঙ্গে গিরিশের সংযোগ হয়েছে। অমৃত-লালের সঙ্গে গিরিশের আগেই পরিচয় ছিল। সবাইকে একত্রিত করবার কৃতিত্ব নগেন্দ্রনাথের। অর্ধেন্দুর সঙ্গে ধর্মদাসের যোগাযোগ তো আগেই হয়েছিল।

অমৃতলাল কলকাতা এলে মাঝে মাঝে তাঁর পিতার কম্বুলীটোলার বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। সেখানে ধর্মদাস সুরও শিক্ষকতা করতেন। অর্ধেন্দুশেখরও কিছুদিন সেই স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। সবাই মিলে লীলাবতী নাটক অভিনয়ের তোড়-জোড় চালাতে লাগল। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেই অভিনয় আর হল না। অর্ধেন্দু মেয়ো হাসপাতালে ভর্তি হলেন। নাটকের অভিনয় বন্ধ হয়ে গেল। অমৃতলাল কাশী ফিরে গেলেন।

লীলাবতীর অভিনয়ে আবার সবাই মিলিত হলেন। পরে গিরিশচন্দ্র দূরে রয়ে রইলেন। কিন্তু তাদের এগিয়ে যাওয়া বন্ধ হল না। অর্থবল নেই অথচ নিন্দার ভয় আছে, বিরোধিতা আছে। হাল ছাড়লেন না রঙ্গমঞ্চের নবভগীরথেরা। কলকাতার জাতীয়তাবাদী মহল তাদের উৎসাহিত করেছেন। তাদের উৎসাহ দিতে এসেছেন অমৃতবাজারের শিশির ঘোষ, অক্ষয় সরকার, প্যারিমোহন রায়। 'ন্যাশনাল পেপারের' সম্পাদক নবগোপাল প্রথম থেকেই তাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মনোমোহন বসুও এগিয়ে এসেছেন। নগেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও একজন বড় উৎসাহদাতা ছিলেন। উপেন্দ্রনাথ ঠাকুরও নবীন সংগঠকদের বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন। ইংরেজদের মধ্যে স্যর উইলিয়ম হান্টার এবং লর্ড মেয়োর ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনয় দেখতে এসেছেন। তাঁরা অনেক সময় সুপরামর্শও দিয়েছেন। নাটোরের রাজা চন্দ্রনাথ তখন বড় সরকারী রাজকর্মচারী। তা সত্ত্বেও ন্যাশনাল থিয়েটারে এসে তিনি নানাভাবে সংগঠকদের সাহায্য করেছেন। 'তিনি অম্লানবদনে আমাদের থিয়েটারের গ্রীন-রুমে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে পোষাক পরাইয়া দিতেন। হয়ত তাড়াতাড়ি নারী-বেশ পরিত্যাগ করিয়া পুরুষবেশে রঙ্গ-মঞ্চে দেখা দিতে হইবে; রাজা চন্দ্রনাথ অসঙ্কোচে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া অভিনেতার পায়ের মোজা খুলিয়া দিতেন। পুরাতন প্রসঙ্গ/পৃঃ ২৩৩)।

সংগঠকরূপে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, মঞ্চাধ্যক্ষরূপে তেমনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন ধর্মদাস সুর। কোন পাদপ্রদীপের সামনে এলেন না, নেপথ্যে চিরকাল আপনার স্বপ্নের মাধুরী দিয়ে সাজিয়ে দিলেন রঙ্গমঞ্চ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন একজন ইঞ্জিনিয়ার—যোগেন্দ্রনাথ বসু।

মধুসূদন সান্যালের বাড়ী রঙ্গমঞ্চ তৈরী করেছিলেন ধর্মদাস। তাঁর সঙ্গী হন আব্দুল মিস্ত্রি। ধর্মদাস 'সীনও' এঁকেছেন। ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ও আর্ট স্কুলের ছাত্রেরাও তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

(ঠ)

রাধামাধব কর বলেছেন, "নগেনবাবুই দল গড়িলেন। অর্ধেন্দুবাবু দলের শিক্ষকতা করিতেন।" এই অর্ধেন্দুশেখরই সাধারণ রঙ্গালয়ের একটি অভিনয়ের ধারা গড়ে তুললেন। একমাত্র গিরিশের সঙ্গেই তাঁর অভিনয়প্রতিভার তুলনা করা চলে।

অর্ধেন্দুশেখরের অ ভি ন য় প্র তি ভা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে গিরিশ লিখেছেন, "অর্ধেন্দু যে অংশ স্পর্শ করিতেন তাহাই অননুকরণীয় হইত।" অর্ধেন্দুর 'হরবিলাস' (লীলাবতী) দেখে দীনবন্ধু মুগ্ধ হয়েছিলেন; 'নবীন তপস্বিনীর' জলধরের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় দেখে নাটোরের রাজা চন্দ্রনাথ অশেষ প্রশংসা করেছিলেন। শিশিরকুমার ঘোষের 'নয়শো রুপেয়া' প্রহসনে হাস্যু-লালের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় দেখে স্বয়ং নাট্যকার বলেছিলেন, "এই বাবুটির অভিনয় যাহা দেখিলাম, তাহা যে কোন বিলাতী থিয়েটারে কোন অভিনেতা পারে, ইহা আমাদের বিশ্বাস হয় না।"

অর্ধেন্দুশেখরের প্রতিভার পরিচয় দেওয়া এই আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। এক কথায়, বাংলা রঙ্গালয়কে অর্ধেন্দু-শেখর মাতিয়ে দিয়েছিলেন। এক প্রবল সাজাত্যাভিমানের তিনি অধিকারী ছিলেন। কলকাতার এক রঙ্গালয়ে তখনকার দিনে 'দেবকার্সন' নামে এক সাহেব বাঙালীদের ব্যঙ্গ করে কৌতুকাভিনয় করতেন। তিনি ইংলিশম্যান পত্রে বিজ্ঞাপন দিতেন,
'Dave Carson Sahib Ka Pucka Tumasha.'
তাঁর উত্তর দিয়েছিলেন 'অর্ধেন্দুশেখর তাঁর Mastaphi Sahab Ka Pucka Tamasha

ব্যঙ্গাভিনয়ে। সাহেবদের ব্যঙ্গ করে ইংরেজী কায়দায় নৃত্য করে অর্ধেন্দু উত্তর দিতেন—

"হাম বড়া সাহাব হ্যায় ভুনিয়ামে
None can be compared
হামারা সাথ
Mr. Mastaphi name
হামারা
চাটগাও মেরা আছে বিলাট—
Romi-ti-tom-ti—tom etc.'

নীলদর্পণের উড সাহেবের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন অর্ধেন্দু; 'পাক্কা তামাসার' পর তাঁর 'সাহেব' নামও পাকা হয়ে গেল।

(ড)

১৮৭২ খৃঃ ৭ ডিসেম্বর শনিবার 'ন্যাশনাল থিয়েটারে' নীলদর্পণের অভিনয় হয়।

"বিকাল চারিটার সময় টিকেট বিক্রয় আরম্ভ হয় এবং সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে সমস্ত টিকেট বিক্রয় হইয়া যায়। শহরের অধিকাংশ ধনী রিজার্ভ সিটের টিকেট লইয়াছিলেন। তখন নাচের আসরে লোকে যেমন পোষাক পরিয়া যাইত, এই থিয়েটার দেখিতেও সেই-রূপ পোষাক পরিয়া দর্শকেরা আসিয়া-ছিলেন। এখনকার মত যথেচ্ছবেশে তখন কোন মজলিসে যাওয়া ঘৃণাকর ছিল।" (বিশ্বকোষ/নগেন্দ্রনাথ বসু/ষোড়শ খণ্ড, রঙ্গালয় (দেশী) পৃঃ ৪৯)

প্রথম দিনের অভিনয় সুশৃঙ্খলভাবে হয় নি। দর্শকদের নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। (১) অডিটোরিয়াম যথেষ্টরূপে আলোকিত ছিল না। অনেক দর্শককে দেশলাই জ্বালিয়ে 'প্রোগ্রাম' দেখে নিতে হয়েছিল। বাইরে রাস্তায় গ্যাসের আলো অবশ্য ছিল। (২) কনসার্ট বাজিয়েছিল ভাড়াটে ফিরিঙ্গী কনসার্ট বাদকেরা। তবে দেশীয় বাদ্যের ব্যবস্থাও ছিল। "কালিদাস সান্যাল, হারমোনিয়াম, নিমাই ওস্তাদজী, গোরাদাস বাবাজী ও

মাথা ধরেছে?

অ্যানাসিন

ব্যথাবেদনায় অনেক বেশী আরাম দেয়
কারণ জোরালো অথচ নির্ভরযোগ্য

অলিম্পিক ফুটবল খেলোয়াড় নেভিল ডি'সুজা অ্যানাসিন ব্যবহার করেন। উনি বলেন, "আমি সবসময় হাতের কাছে অ্যানাসিন রাখি।"

জোরালো কারণ সারা দুনিয়ার ডাক্তাররা ব্যথা-বেদনা উপশমের যে সব ওষুধ সবচেয়ে বেশী খেতে বলেন তা অ্যানাসিনে বেশী পরিমাণে আছে। তাই অ্যানাসিন ব্যথা-বেদনায় চট করে আরাম দেয়।

নির্ভরযোগ্য কারণ ডাক্তারদের দেওয়া ওষুধের মতই এটি বিভিন্ন ওষুধ মিশিয়ে তৈরী। আপনি বাচ্চাদেরও নিশ্চিন্তে অ্যানাসিন দিতে পারেন। বাচ্চাদের সঠিক মাত্রার জন্য আপনার ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করুন,—যেমন অন্য আর সব ওষুধের জন্য করেন।

কার্যকরী,—সর্দি ও জ্বরের ব্যথা-বেদনায়, মাথার যন্ত্রণায়, পিঠ কোমরের ব্যথায়, পেশীর ব্যথায়, দাঁতের ব্যথায়।

অ্যানাসিন

Regd. User of TM: Geoffrey Manners & Co. Ltd.

শতবর্ষ আগে বঙ্গরঙ্গমঞ্চ

অতীন রায়চৌধুরী

আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগে—৭ ডিসেম্বর ১৮৭২। ঠিক এই দিনটি বাংলাদেশের রঙ্গালয়ের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন, যে দিনে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। আজ সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবর্ষ পূর্তি উৎসব দিকে দিকে পালিত হচ্ছে। বাঙালী নাট্যামোদী বা জনসাধারণ আজ কাউকেই এই বিশেষ দিনটির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না। আজ সকলেই জানেন ঠিক শতবর্ষ আগে এই দিনটিতে প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ জনসাধারণকে টিকিট বিক্রি করে এই প্রথম নাটক অভিনয় করা হয়। এর আগে নাট্যাভিনয় প্রধানতঃ ধনী ও বিলাসীদের ঘরোয়া পরিবেশেই হয়ে আসতো।

আজকের নাট্যামোদীরা ও পাঠক সমাজ সকলেই সেই সাধারণো টিকিট-বিক্রী-করা প্রথম নাট্যাভিনয়ের নাটক 'নীলদর্পণ' পড়েছেন বা পরে অভিনীত হতে দেখেছেন। বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও বাস্তববাদী নাটক হিসেবে 'নীলদর্পণ' বাংলার নাট্য জগতের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে ও থাকবে। তবু যদি কোনদিন 'নীলদর্পণ' নাটক বিস্মৃতির অতলে তলিয়েও যায়, সাধারণ রঙ্গালয়ের বা জাতীয় নাট্যশালার (যা আজ একশো বছর পরেও কার্যতঃ সম্ভবপর হয় নি) পথিকৃৎ হিসেবে এর নাম বাংলাদেশের রঙ্গালয়ের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

শতবর্ষ আগের সেই অভিনব রজনীর সকল তথ্যাদি এবং এই অবিস্মরণীয় নাটক সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য, বিশেষ করে তদানীন্তনকালে নাটকটি কিভাবে সারা দেশে ঝড় তুলেছিল, কোন অবস্থায় ও কিসে প্রভাবিত হয়ে দীনবন্ধু মিত্র এই নাটকটি লিখেছিলেন। সেই ইতিহাস প্রকাশ করার জন্যই এই নিবন্ধের সৃষ্টি। দীনবন্ধু আরো বহু সফল নাটক লিখেছেন, তবু নাট্যকার দীনবন্ধুর নাম উঠলেই আগেই নীলদর্পণ-এর কথা কেন মনে পড়ে?

আজকের মানুষ নীলকর বা নীল চাষের ব্যাপারে বিশেষ কিছুই জানেন না। তাই বাংলাদেশে নীলচাষের কিছু ইতিহাস ও নীলকর সাহেবদের কথা না বলে নিলে, দীনবন্ধু কেন এই নাটক রচনায় হাত দিয়েছিলেন তা ঠিক বোঝা যাবে না।

রঞ্জনদ্রব্য হিসাবে নীলের প্রয়োগ খুবই ব্যাপক আজকাল, এই বস্তুটি তৈরী হয় রসায়নাগারে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নীল তৈরী আবিষ্কারের আগে নীল নামে এক রকম গাছ থেকেই এই রং সংগ্রহ করা হোত। ভারতবর্ষে নীলের চাষ খুবই প্রাচীন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এই দেশে পাকাপাকিভাবে আস্তানা গাড়বার পর থেকেই তারা নীলের কারবার করতো। ১৭৭৯ খৃঃ কোম্পানী সাধারণভাবে সকলকে নীলচাষের অধিকার দেয়।

বাংলা ও বিহারের কিছু অঞ্চল নীলচাষের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী ছিল। নীলের ব্যবসা ছিল প্রচুর লাভজনক। তাই কোম্পানীর অনুমতি পাওয়া মাত্র শ্বেতাঙ্গ বণিক সম্প্রদায় ব্যাপকভাবে নীলচাষ আরম্ভ করে দেয়। বেনের জাত। ব্যবসাটা তারা ভালই বোঝে।

প্রথম প্রথম দেশীয় জমিদারদের প্রলোভিত করে তাদের জমিতেই এই চাষ চলতো। সাহেবরা নানা জায়গায় 'নীলকুঠি' স্থাপন করে জমিদার ও জোতদারদের কাছ থেকে নীলের ফসল চড়া দামে কিনে নিতেন। তারপর তার থেকে এই রং নিংড়ে বার করা হোত। সেই সব নীলকুঠিগুলো প্রধানতঃ তাদের ব্যবসায়ের প্রধান ঘাঁটি ছিল। সেইখানেই নীলের ফসল থেকে রং বার করা ও তা চালান করার কাজ চলতো।

ক্রমশঃ তাদের লোভ গেল বেড়ে। রং-এর সঙ্গে সঙ্গে তারা প্রজাকুলের রক্তও

*

নিংড়ে বার করতে সুরু করতে লাগলেন। কেউ কেউ নিজেরাই জমি কিনে সেখানে নীলের চাষ করতে সুরু করেন। অনেকে আবার নিজেদের ও জমিদারদের প্রজাকে দাদন দিয়ে তাদের নীলচাষ করতে বাধ্য করতে লাগলেন। শ্বেতাঙ্গদের লোভ ক্রমশঃ সীমাহীন হয়ে ওঠে এবং অর্থ ও সামর্থ্যের জোরে তারা জোর করে চাষীদের শ্রেষ্ঠ জমিগুলো নীলের জন্য চিহ্নিত করে দিতে থাকে। কেউ প্রতিবাদ করলে কুঠিয়াল সাহেবরা তাদের ওপর চালাতে থাকে অকথ্য অত্যাচার। কুঠির গুদোমে আটকে রাখা, লাঠিয়ালদের সাহায্যে নিদারুণ প্রহার, ঘর জ্বালানো, নারী ধর্ষণ—সব রকম নৃশংস অত্যাচার ক্রমে ভয়াবহ আকার ধারণ করে। বাংলা-বিহারের আকাশ বাতাস গরীব চাষীদের হাহাকারে ভরে ওঠে। ১৮৫৮ খৃঃ কিছু কিছু প্রজা ধর্মঘট আরম্ভ করে ও নীলচাষ করবে না বলে মনস্থ করে। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতি নেতারা প্রজাদের পক্ষ নিয়ে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন। সাহেবদের অত্যাচারও আরো বাড়তে থাকে।

দীনবন্ধু তখন পোষ্ট-মাষ্টার হিসেবে একের পর এক নানা জায়গায় বদলী হচ্ছিলেন। ১৮৫৫ খৃঃ তিনি প্রথম চাকরী নেন পাটনায় পোস্ট-মাস্টার হিসেবে। তারপর উড়িষ্যায় বদলী হন। সেখান থেকে ঢাকা, তারপর নদীয়া। বিভিন্ন জেলায় ঘোরার ফলে দীনবন্ধু নীলকর অত্যাচারের করাল রূপ দেখতে পান। গ্রামে গ্রামে ঘুরে তিনি দেখেন অত্যাচারিত চাষী প্রজাদের—শুনলেন তাদের করুণ কাহিনী। সাধারণ লোকের সঙ্গে মিশবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তাঁর। উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারী হয়েও সমাজের নিম্ন, অশিক্ষিত ও অবজ্ঞাতদের সঙ্গে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়—ছিল আত্মিক যোগ। নীলকর সাহেবদের ভয়াবহ অত্যাচারের রূপ দেখে ও অত্যাচারিতদের অশ্রুসজল কাহিনী শুনে দীনবন্ধুর অন্তর হোল বিচলিত। পরদুঃখকাতরতা ও সহানুভূতির সঙ্গে মিললো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা—সৃষ্টি হোল 'নীলদর্পণ' নাটক—সেটা ১৮৬০ সাল।

উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী হিসেবে ইংরাজদের অধীনেই দীনবন্ধুকে চাকরী করতে হোত। এই কারণেই নীলদর্পণ নাটকে নিজের নাম প্রকাশ না করে 'কস্যাচিৎ পথিকস্য' এই নামে নাটক প্রণীত হয়। প্রথম প্রকাশিত নীলদর্পণ নাটকের আখ্যাপত্র ছিল নিম্নলিখিতভাবে—

'নীলদর্পণ/নাটকং/নীলকর - বিষধর-দংশন-কাতর-প্রজানিকর ক্ষেমঙ্করেণ/কস্যাচিৎ পথিকেনাভি প্রণীতং/ঢাকা/রামচন্দ্র ভৌমিক কর্ত্তৃক বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত/শকাব্দা ১৭৮২/২রা আশ্বিন'।

নাটকটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে বহু আলোচনা ও বহু তর্ক প্রশংসা আরম্ভ হয়ে যায় ও ক্রমে রচয়িতা হিসেবে দীনবন্ধুর নামও প্রকাশিত হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের তদানীন্তন সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 'নীলদর্পণ' যে বিপ্লব ও আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল, বাংলা সাহিত্যের অন্য কোন গ্রন্থই বুঝি এতটা পারে নি। শুধু তাই নয়, 'নীলদর্পণ' নাটকই নীলকর অত্যাচার প্রশমনের প্রধান কারণ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন 'নীল-দর্পণ বাংলার অঙ্কল টমস কেবিন'। 'টম কাকার কুটির' আমেরিকার, কাফ্রিদিগের দাসত্ব ঘুচাইয়াছে, আর 'নীলদর্পণ' নীল দাসদিগের দাসত্ব মোচনে অনেকটা কাজ করিয়াছে।'

'এ নেটিভ' ছদ্ম নামে মাইকেল মধুসূদনকৃত নীলদর্পণের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ায় নীলকরদের মধ্যে ও বাংলা সরকার মহলে অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য পড়ে যায়। ইংরেজী অনুবাদের মুদ্রাকর সি. এইচ ম্যানুয়েল ও প্রকাশক রেভারেন্ড লঙের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। ম্যানুয়েলের জরিমানা হয় ও ১৮৬১ খৃঃ ১৯ জুলাই রেভারেন্ড লং-এর বিচার আরম্ভ হয় সুপ্রীম

কোর্ট'। বিচারের প্রহসনে লং-এর এক মাস কারাবাস ও ১০০০্ টাকা জরিমানা হয়। কালীপ্রসন্ন সিংহ আদালতে উপস্থিত থেকে জরিমানার টাকা দিয়ে দেন। সীটনকার, গ্রান্ট প্রভৃতি বিশিষ্ট প্রগতিশীল ইংরেজরাও নানাভাবে অপদস্থ হন। ক্রমশঃ নীল হাঙ্গামার কথা পৃথিবীময় রাষ্ট্র হয়ে পড়ে ও ধীরে ধীরে কর্তৃপক্ষ দৃঢ়তার সঙ্গে নীলকর অত্যাচার বন্ধ করে দেন।

শুধু ইংরেজী ভাষাতেই নয়, কিছুদিনের মধ্যেই বহু ইউরোপীয় ভাষায় বইটি অনূদিত হয়। আজ থেকে এক শতাব্দীর বেশী আগে একটি বাংলা নাটকের ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ হওয়া সোজা ব্যাপার নয়।

নীলদর্পণ নাটক কোনও সত্য ঘটনাকে ভিত্তি করে রচিত কিনা এ বিষয়ে নানা লোকের নানা মত। যদিও এ বিষয়ে কোন সঠিক প্রমাণ নেই, তবে অনেকে বলেন, নদীয়ার অন্তর্গত গুয়াতেলীর মিত্র পরিবারের দুর্দশাই নীলদর্পণ উপাখ্যানের ভিত্তিভূমি।

'নীলদর্পণ' দীনবন্ধুর প্রথম নাটক। নীলদর্পণ প্রকাশিত হবার আগে পর্যন্ত দীনবন্ধুর শুধু কবি বলিয়াই পরিচিতি ছিল—বিশেষ করে হাস্যরসের কবি। দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যশিষ্য ছিলেন এবং ঈশ্বরচন্দ্রের শিষ্যদের মধ্যে দীনবন্ধু গুরুর যতটা কবি-স্বভাবের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন, তেমন আর কেউ হননি। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—'সেই ১৮৫৯/৬০ সাল বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয়—উহা নূতন পুরাতনের সন্ধিস্থল। পুরোনো দলের শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র অস্তমিত, নূতনের প্রথম কবি মধুসূদনের নবোদয়। ঈশ্বরচন্দ্র খাঁটি বাঙালী, মধুসূদন ডাহা ইংরেজ—দীনবন্ধু ইহাদের সন্ধিস্থল'।

১৮৬০ খৃঃ নীলদর্পণ প্রকাশ হবার পর থেকে দীনবন্ধু প্রধানত নাট্যকাররূপেই দেখা দেন। ক্রমশ তাঁর 'সধবার একাদশী' 'লীলাবতী', 'জামাই বারিক' 'বিয়ে-পাগলা বুড়ো' 'নবীন তপস্বিনী' প্রভৃতি নাটক প্রকাশ হতে থাকে। কবি দীনবন্ধু নাট্যকার দীনবন্ধুরূপে আপামর সকলের স্বীকৃতি লাভ করতে থাকেন।

অনেকেই বলে থাকেন, 'নীলদর্পণ' এবং দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটকগুলি অশ্লীলতা-দোষে দুষ্ট। কথাটা হয়ত আংশিক সত্য। কিন্তু দীনবন্ধুর চরিত্রই এমন ছিল কোন কিছু ঢেকে-ঢেকে লেখা তার অভ্যেস ছিল না। যারা স্থূল, লজ্জাস্পদ, ভদ্রসমাজের ব্যতিক্রম, ও আদর্শবাদীর সমালোচ্য, তাদের কথা লিখতে গিয়ে দীনবন্ধু কোন সংকোচ বা দ্বিধ বোধ করেননি, তাদের নগ্নতা ঢাকবার অহেতুক প্রয়াস ছিল না তাঁর। দীনবন্ধুই বোধ হয় বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতার অগ্রদূত। রুচি ও শালীনতার দিকে নজর দিতে গেলে তাঁর রচনা এত বাস্তব হোত না এবং সৃষ্ট চরিত্র হয়ত থাকতো অসম্পূর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় 'রুচির মুখ রক্ষা করতে গেলে আমরা ছেড়া তোরাপ, কাটা আদুরী ও ভাঙা নিমচাঁদ পাইতাম।'

এবার নীলদর্পণ-এর প্রথম অভিনয়ের কথায় আসা যাক। আগেই বলেছি, অভিনীত নাটক হিসেবে 'নীলদর্পণ'-এর স্থান বাংলাদেশে অতুলনীয়। কারণ এই নাটকের অভিনয় নিয়েই বাংলাদেশে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হয় ১৮৬০ খৃঃ আর এই নাটক প্রথম অভিনীত হয় ১৮৭২ খৃঃ ৭ ডিসেম্বর। অভিনয় করে ন্যাশনাল থিয়েটার। তখন ন্যাশনাল থিয়েটারই বাংলা নাটকাভিনয়ে অগ্রণী। এর আগেও ন্যাশনাল থিয়েটার 'নীলদর্পণ'-এর পরে প্রকাশিত দীনবন্ধুর 'লীলাবতী' ইত্যাদি নাটক অভিনয় করে। কিন্তু নীলদর্পণ প্রকাশ হওয়ার দীর্ঘ বারো বছরের মধ্যে কেন এই নাটক অভিনীত হয়নি, তা ভেবে দেখার কথা। এর প্রধান কারণ স্বভাবতই রাজরোষের ভয়। 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই যে রকম হৈ-চৈ মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদি চলতে থাকে, তাতে সকলেরই এই ভয় ছিল এই নাটক প্রকাশ্য মঞ্চে অভিনীত হলে সরকার হয়ত জোর করে অভিনয় বন্ধ করে দেবেন। তাই ন্যাশনাল থিয়েটারের উৎসাহী যুবকরাও এতদিন নীলদর্পণ অভিনয় করার সাহস পাননি। তাছাড়া নাটকে অজস্র চরিত্র এবং নানা ধরনের টাইপ চরিত্র। অভিনয় করবার পক্ষে খুবই দুরূহ কাজ। ক্রমে নীলদর্পণ নিয়ে হৈ-চৈ ও আন্দোলন যখন থিতিয়ে এসেছে তখন ন্যাশনাল থিয়েটারের পাণ্ডারা - গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দু মুস্তফী, রসরাজ অমৃতলাল প্রভৃতি ঠিক করেন এই নাটক অভিনয় করতে হবে। জোর কদমে রিহার্সাল শুরু হয়। একদলের মত হয় টিকিট বিক্রী করে এই নাটক অভিনয় করার কিন্তু আর একদলের তাতে জোর আপত্তি। শেষোক্ত দলের পুরোভাগে ছিলেন গিরিশচন্দ্র। এই টিকিট বিক্রির ব্যাপার নিয়েই মতভেদ এত প্রবল হয়ে ওঠে যে গিরিশচন্দ্র ও আরো অনেকে ন্যাশনাল থিয়েটার ছেড়ে চলে যান। দলের অন্যান্য সকলে পড়েন মহামুস্কিলে। ঠিক হয় অভিনয় করা হবে না। কিন্তু শেষে অর্ধেন্দুশেখরের দুরন্ত উৎসাহে সব বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে সাধারণ্যে টিকিট বিক্রি করে ৩৬৫নং আপার চিৎপুর রোডে মধুসূদন সান্যালের বাহির্বাটির প্রাঙ্গণটি ৪০্ টাকায় ভাড়া নিয়ে ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রযোজনায় 'নীলদর্পণ' অভিনীত হয় ৭ ডিসেম্বর, ১৮৭২ খৃঃ এবং প্রচুর সুখ্যাতি ও সুনামের অধিকারী হয়। তারপর আরো বহু রজনী ন্যাশনাল থিয়েটার-এর অভিনয় চালিয়ে যান। অর্ধেন্দুশেখর শুধু নাট্য-শিক্ষক হিসেবেই দেখা দেন না, নিজে প্রথম রজনীতে একাই চারটি চরিত্রে অভিনয় করে লোককে চমক লাগিয়ে দেন—এর মধ্যে তিনটি চরিত্রই ছিল প্রধান প্রধান চরিত্র এবং এই তিনটের মধ্যে একটি আবার নারী চরিত্র। বলাবাহুল্য, তখনো পর্যন্ত নারীচরিত্রে পুরুষেরাই অভিনয় করতেন।

প্রথম রজনীর কুশীলবগণের নামঃ—

অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী—উড্, গোলোক বসু, সাবিত্রী ও একজন রায়ৎ
নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—নবীনমাধব
কিরণ „ (নগেন্দ্রের ভাই)—বিন্দুমাধব
অমৃতলাল বসু (রসরাজ)—সৈরিন্ধ্রী
মতিলাল সুর—তোরাপ ও রাইচরণ
শশিভূষণ দাস—আমিন, কবিরাজ ও [illegible]।
মহেন্দ্রলাল বসু—পদী ময়রাণী
শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—গোপীনাথ
পূর্ণচন্দ্র ঘোষ—লাঠিয়াল
অবিনাশচন্দ্র কর—রোগ্ সাহেব
গোপালচন্দ্র দাস—আদুরী ও একজন রায়ৎ
যদুনাথ ভট্টাচার্য—একজন রায়ৎ
ক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলী—সরলতা
তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়—রেবতী
গোলক চট্টোপাধ্যায়—খালাসী
অমৃতলাল মুখোঃ (বেলবাবু)—ক্ষেত্রমণি

শিক্ষকতায় ছিলেন অর্ধেন্দুশেখর, স্টেজ পরিকল্পনায় ধর্মদাস সুর ও যোগেন্দ্রনাথ মিত্র ও ড্রেসার ছিলেন কার্তিকচন্দ্র পাল। ন্যাশনাল থিয়েটারের সভাপতি ছিলেন বেণীমাধব মিত্র ও সেক্রেটারী নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

টিকিটের মূল্য ধার্য হয়েছিল এক টাকা ও আট আনা এবং এই প্রথম রজনীতে মোট টিকিট বিক্রী হয়েছিল চারশ' টাকা। অমৃতবাজারের শিশিরকুমার ঘোষ, 'মধ্যস্থ' পত্রিকার মনমোহন বসু ও ন্যাশনাল পত্রিকার নবগোপাল মিত্র নানাভাবে ন্যাশনাল থিয়েটারের ছেলেদের উৎসাহ দেন।

এর পর ন্যাশনাল থিয়েটার বহু রাত্রি নীলদর্পণের অভিনয় করেন এবং প্রচুর খ্যাতিলাভ করেন। নীলদর্পণ-এর মাধ্যমেই বাংলা রঙ্গমঞ্চে একটা নতুন যুগের জন্ম শুরু। প্রকৃতপক্ষে 'উনবিংশ শতকের পঞ্চম দশকের শেষভাগে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে মধুসূদন যে পদ্ধতির পরীক্ষা আরম্ভ করেন, দীনবন্ধুই সেই পদ্ধতিতে প্রাণসঞ্চার করিয়া বঙ্গদেশের রঙ্গমঞ্চকে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা দান করেন'।

'নীলদর্পণ' অভিনয় প্রসঙ্গে একটি বহুল প্রচারিত ঘটনার কথা, যা প্রায় সকলেই শুনেছেন, উল্লেখ করছি। একদিন বিদ্যাসাগর মশায় অভিনয় দেখতে এসেছেন। অত্যাচারী উড্ সাহেবের ভূমিকায় অর্ধেন্দুশেখরের অভিনয় এতই নিপুণ হোল যে, বিদ্যাসাগর ক্রোধে আত্মহারা হয়ে স্থান-কাল-পাত্র ভুলে নিজের পায়ের এক পাটি জুতো খুলে ছুঁড়ে মারলেন স্টেজের ওপর অর্ধেন্দুশেখরের গায়ে। উড্-রূপী অর্ধেন্দুশেখর মহানন্দে সেই চটি নিজের মাথায় তুলে নিয়ে বললেন, 'আজ আমি ধন্য'। এই গল্পটি শোনেননি এমন লোক বোধহয় বাংলাদেশে কমই আছে। কিন্তু ঘটনাটির সত্যতা সম্বন্ধে প্রচুর মতভেদ আছে এবং এ বিষয়ে কোন প্রামাণ্য তথ্য আজো পাওয়া যায়নি। লোকের মুখে মুখে ফেরা এই ঘটনাটি নিছক গল্পই এবং অর্ধেন্দুশেখরের নট-নিপুণতার জন্য ও তার প্রতি নাট্যামোদীদের ভালবাসা ও

প্রশ্নাতীত প্রমাণ। একথা অস্বীকার করা যায় না যে নীলদর্পণ অভিনীত হওয়ার ও সুনাম অর্জন করার প্রায় সমস্ত কৃতিত্বটুকুই প্রাপ্য অর্ধেন্দুশেখরের। তিনি নিজে পরবর্তী জীবনে অবশ্য বলেছেন যে, গিরিশচন্দ্র যদি তাঁদের দল ছেড়ে না যেতেন তাহলে অভিনয় হয়ত আরো উৎকর্ষ লাভ করতো। গিরিশচন্দ্র নিজেও পরে তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছিলেন এবং প্রবেশ মূল্যের বিনিময়ে অভিনয় না করলে সাধারণ রঙ্গালয়ের সৃষ্টি হোত না তা স্বীকার করেছিলেন। নটেন্দ্র তাই তাঁর 'শাস্তি কি শান্তি' নাটক দীনবন্ধুর নামে উৎসর্গ করেছিলেন এবং সেই কথা স্মরণ করে লিখেছিলেন, 'বঙ্গে রঙ্গালয় স্থাপনের জন্য মহাশয় কর্মক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন........ আপনাকে রঙ্গালয়স্রষ্টা বলিয়া নমস্কার করি'।

আজ বাংলাদেশে (কলকাতায়) অনেকগুলি সাধারণ রঙ্গালয়। তাঁদের মালিকদের কজন প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাতার কথা জানেন তা বলতে পারি না। আমার অনুরোধ, কলকাতার প্রতিটি সাধারণ রঙ্গালয় প্রতি বছর ৭ ডিসেম্বর তারিখটিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করুন এবং এই দিনটি পালিত হোক উপযুক্তভাবে। প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়ের পথিকৃৎ নীলদর্পণ নাটক ও নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করে রাখার কিছু ব্যবস্থা হোক।

আজকের গাথা ॥

হরপ্রসাদ মিত্র

হলুদ পাখি সবুজ পাখি শাদা পাখির মধ্যে
আমার কথা বলছি আমি সহজ সরল পদ্যে—
চন্দ্র সূর্য আকাশ নিয়ে কে কতোদিন বাঁচি,
সত্যি আজো জানিনা কেউ, ইঁট-কাঠেতেই আছি।
'মুক্তি' একটি শব্দ এবং 'শান্তি' আর এক শব্দ:
তিনি উনি আপনি আমি এই দু'কথায় জব্দ।

•

প্রকৃতির কাজ প্রজাবৃদ্ধি, মানুষের কাজ বিরোধ,
বর্তমানের সঙ্গে তাতেই সনাতনের বিরোধ।
আহোমরাজের দশশালা মার চেনে বঙ্গ[illegible]
তেলেঙ্গানায় মুলকি-আইন শান্তির [illegible] মুলুকে।

টাক্ ডুমাডুম্ টাকডুমাডুম ঢাকের বাদ্যি বাজে,
গণতান্ত্রিক ম্যাজিক ঘটে জীবনখাতার ভাঁজে।

•

আকাশবাণী সুর ছেলেছে শীতের সকাল জুড়ে,
বোম্বাইয়ে একচেটিয়া বাজার, আরব-সমুদ্দুরে—
কী মনোহর শোভা, আহা, কী মনোহর শোভা,
ভিখিরিরা হচ্ছে আর এক ভগবানের বোবা।
'মুক্তি' একটি শব্দ এবং 'শান্তি' আর এক শব্দ;
তিনি উনি আপনি আমি এই দু'কথায় জব্দ।

ঘরে সাদা দেওয়ালে বিদ্রূপ ॥

[illegible]

ঘরে নিয়ে গেলে পাল্টে যায় ফুল।

বাইরে প্রচুর রৌদ্র হাওয়া
লাল নীল লাল নীল লাল নীল
বাইরে প্রচুর লাল নীল সমারোহ
রন্ধ্রে উজ্জ্বল নীল লাল
ঘরে নিয়ে গেলে পাল্টে যায় ফুল।

ঘরে গেলে পাল্টে যাবে
ঃ এর ভয়
ঘরে গেলে পাল্টে যাবে
ঃ ওর ভয়

বাইরে প্রচুর রৌদ্র হাওয়া নিয়ে
যাক লাল নীল লাল নীল দোল খাক।

লোভাতুর হঠাৎ একদা লাল নীল
বাগান উজাড় করে নিয়ে যায় ঘরে,
ঘরে রৌদ্রহীন রক্তশূন্য হাওয়া
ভালোবাসাহীন সাদা দেয়ালে বিদ্রূপ
রৌদ্রের সোহাগী লাল নীললাল আর্তনাদে মরে।

বীজতলা, আজন্মের সাধ ॥

নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বীজতলা বানাবার সাধ কয়েক জন্মের থেকে রক্তে মিশে আছে
মাঘ বীজতলা, চারাগুলি হেজে গেলে পলি-পড়া মাটির হৃদয়ে
দুধকলমা মোরশাল কিশোরী হিংচের মত জলের ভিতরে
গোছ বাঁধবে, নিজেদের আদর খেয়ে
যৌবনবতী হবে সাত সকালেই।

অন্ধকার গাঢ় হলে সাঁই সাঁই বাতাসের মত
ফুকরে কেঁদে উঠছে কারা? ফড়িঙের আড়িপাতা থেমে গেছে কবে
শঙ্খবাক কাদাখোঁচা চলে গেছে বাঁধের ওপারে
কত দীর্ঘশ্বাস পুঁতে রেখেছিল তিনু-বিপিনের ছেলে
সারাটি বোশেখ কাঁধে ফেলে।

যারা চলে গেছে উত্তরে মাটি কাটতে কিংবা বাড়ুই-এর কাজে
তাদের হৃদয়ে কোন বীজতলা নেই, নেই কোন চেলাভাঙা মই
প্রথম বর্ষার রূপ ভুলে গেছে ছাতারের পাখিরা
আমি এই নিষ্ঠুর রোদ্দুরে বীজতলাদের থেকে
পেয়েছি গোপন চাবিকাঠি।

যারা চলে গেল হা-হুতাশ বুকে নিয়ে শহরে বন্দরে
এই হেমন্তে আমি তাদেরও দেখাতে চাই
পাতাল বুকের স্নেহ-দুধ অভিমানে সব বীজধান
আটুট রয়েছে দেখ মাটির কোচড়ে
জল যায় ভালবাসা কে দিয়েছে অকৃপণ হাতে
শিশুদের বিশ্চতলা পেলে মাটি কুড়ে মোরশাল মাথা ঝাড়া দেবে।

হাসপাতালে যেতে যেতে চারু টের পেল, ও খুব ভেঙে পড়ছে, এই ভেঙে পড়ার মূলে প্রিয় জেঠুর জন্য দুঃখ যতটা, ততখানিই আছে অন্য কোন কারণ। অস্থির চিত্তে সেই 'কারণ'-এর খেই না পেলেও এইটুকু বুঝল, অন্যরকম কোন ঘটনা ঘটতে চলেছে। চলতি প্রথার সঙ্গে যার অনেক প্রভেদ। বহু কষ্টে, অগোছাল ভাবনার অস্বস্তির মধ্যেই জেঠুকে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছে গেল। ভর্তি করলো জেঠুকে। বাড়ির ডাক্তার বলেছিলেন, 'হাসপাতালে নিয়ে যান। ঘরে ট্রিটমেন্টের অসুবিধে হবে।'

'কি বলছেন ডাক্তারবাবু?' জিজ্ঞেস করেছিল চারু।

'[illegible] না কাটলে কিছুই বলা সম্ভব নয়।'

এরকম কথা কেবল সংকটাপন্ন রোগী সম্পর্কেই বলা চলে। চারুর কাছে জেঠুর অসুখের গুরুত্ব অনেকখানি বেড়ে গেল। জীবন মরণ [illegible] জেঠুকে বাঁচিয়ে তুলতে এখন যতখানি করা দরকার, তার সবখানি সাধ্যমতো করতে প্রস্তুত আছে চারু। তাতে যে জেঠু বেঁচে উঠবেই এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। তবু সংসারে আর পাঁচজন এইভাবেই প্রিয়জনের জন্য তৎপর হয়, চারুরও বাধা নেই। জেঠু মরতেও পারে। চারু নিরুপায়। শুধু মনে মনে এই সংকটে ভগবানের কাছে জেঠুর প্রাণভিক্ষা করতে পারে। এই সময়ে জেঠুর মৃত্যু হওয়া গুরুতর এক বিপদের সংকেত। অতএব এ মৃত্যু অযৌক্তিক। এইসব এলোমেলো ভাবনার সময় চোখ খুলল জেঠু। 'আমার আশা ছেড়ে দে রে চারু।' খুব নিচু গলায় অথচ স্পষ্ট উচ্চারণ করল জেঠু। যেন চারুর মনের কথা জানতে পেরেছে। জেঠুর বেঁচে ওঠার সঙ্গে ওর বাঁচার নিশ্চয়তা বাঁধা আছে। চারুও কম সংকটাপন্ন নয়। জেঠুর এই কথার উত্তরে সান্ত্বনার মতো কিছু বলা উচিত। কিভাবে বলবে সেটাই এখন সমস্যা। তাকে মরতে বলা শোভা পায় না। বাঁচতে বলাও না। তাহলে জেঠু ওকে স্বার্থপর ভাববে। রোগীর কপালে মাথায় হাত বুলিয়ে শেষ পর্যন্ত সান্ত্বনাই দিল চারু, 'কোন ভয় নেই জেঠু।'

একটু বোধহয় হাসার চেষ্টা করল জেঠু। পারল না। ও মুখে এখন হাসি-কান্না সবই সমান।

দীর্ঘকাল বাঁচতে বাঁচতে একবারও যে মৃত্যুকে এত হাতের কাছে পায় নি, সে জেঠু এখন শুধু মৃত্যুর কথাই আওড়াবে।

'একটু ঘুমুবার চেষ্টা করো।' ফিসফিসিয়ে বলল চারু। জেঠুর দুই গাল চোখের জলে ভরে গেল। কার জন্য কাঁদছে? কিসের জন্য কাঁদছে জেঠু? কেউ চায় না তার মৃত্যু হোক। অথচ হবে। তার আগে মানুষ এমনি করেই কাঁদে হয়তো। তা নয় তো চারুর জন্য শোকপ্রকাশ করছে। কোথায় চারু এখন জেঠুর জন্য কাঁদবে, না, জেঠুই চারুর দুঃখে কেঁদে কেঁদে একশা হচ্ছে।

চারু খুব মুশকিলে পড়ত, যদি না মার্শ তখন তাকে মনে করিয়ে দিত, আঁধার হয়ে গেছে। ওয়ার্ডে আর থাকা চলবে না। কেন

না, জেঠুর শোক ও সহ্য করতে পারছিল না। 'হাই জেঠু' বলে ওয়ার্ডের বাইরে এসে হাঁফ ছাড়ল।

সিঁড়ির মুখে চার পাঁচজনের জটলা। একটু তফাতে এক মধ্যবয়সী মহিলা মুখে কাপড় দিয়ে বোধহয় কান্না রোধ করার চেষ্টা করছে। মারা গেছে বাড়ির কেউ। ওই মহিলার কেউ। সিঁড়ির গোড়ার চার-পাঁচজন মৃত-দেহের জন্যে প্রতি কর্তব্য সম্পাদনের পরি-কল্পনায় ব্যস্ত।

দৃশ্যটি উপভোগ করল চারু। জেঠু যদি একদিন মরে যায় তবে এই মহিলার মতো মুখে দাঁড়িয়ে ও শোক জানাবে। আত্মীয়-স্বজনরা সিঁড়ির মুখে দুঃখ হবে। যত কিছুই ঘটুক না কেন, এ জনের সংগে আর একজনের যত অমিলই থাক না কেন, শেষ দশায় এই মিলটুকু ভেবে বিস্ময় বোধ করল। আর সংগে সংগে এতক্ষণের বুকে বেকানো অস্বস্তি ওকে ম্লান করে দিল।

ক্রমশ আরও ম্লান হতে লাগল।

কাঁদার চেষ্টা করল জেঠুর জন্য। ওর প্রতি তার ভালবাসার সবচেয়ে স্মরণীয় ক্ষণগুলি স্মরণে আনার চেষ্টা করল। ফুরিয়ে যাচ্ছে সব। কাঁদতে পারছে না।

অস্বস্তি আরও বড় হয়ে দেখা দিল।

রাস্তায় আলো নেই। আজকাল মাঝে মাঝেই এরকম হয়। গাড়ির হেডলাইটের আলো অনেক জোরালো মনে হচ্ছে। অন্ধকার পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে বিগত যুদ্ধের কথা মনে পড়ল। ব্ল্যাক আউটের কথা ভাবল। কি অদ্ভুত সময় গেছে! সীমান্তে সৈনিক লড়ছে। আর শহরে মানুষ হাঁটছে অন্ধকারে। কেমন একটা গর্ব আর থ্রিল ছিল। অন্তত চারুর মনে। ওর যা বয়েস তাতে তা বেমানান ছিল না। আর এখন? চারুই যুদ্ধ করছে। বাইরের কোন শত্রুর সংগে নয়। নিজেরই সংগে।

এইবার আরও ভেংগে পড়ল চারু। এসব ও ভাবছে কী? এখন জেঠু ছাড়া আর কোন বিষয়ে ভাবার কথা নয়। এতকাল জেঠু লক্ষ্য ছিল। ওকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। এখন জেঠু মরে যাবে। চারুও মরবে। তাহলে কি ও নিশ্চিত যে জেঠু এবার কিছুতেই বেঁচে উঠবে না?

কোথাও কোথাও অন্ধকার খুব বেশি। তারই মধ্যে হাঁটার বেগ বাড়িয়ে দিল। চাব-কোনা বদ্ধ ঘর ওকে টানল এখন। বাড়ির পথ ফুরিয়ে এসেছিল প্রায়।

রাস্তার আলো নেভানো বলে এত কম রাতেই সদর দরজায় খিল এঁটে দিয়েছে বাড়িওয়ালা। কড়া নাড়তে ভেতর থেকে 'কে' প্রশ্নের উত্তর প্রচণ্ড জোরে দিয়ে দিল চারু। বাড়ির মালিক প্রকাশবাবু ওকে দেখেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

'আরে! তুমি এসে গ্যাছো—? কি ব্যাপার? খবর কী? নলিনীবাবু আছেন কেমন?'

'কিছু বলা যায় না।' সিঁড়ির দিকে [illegible] উচ্চারণ করল চারু। আসলে, জেঠুর বাঁচা-মরা দুটোই অনিশ্চিত।

'প্যাথেটিক। এতদিন একসংগে রইলাম! ভেরি স্যাড। ওরকম একটা বিউটিফুল লোক বড় একটা দেখা যায় না।'

সমর্থনের ভংগীতে হাসল চারু।

'ওনার ভালো-মন্দ কিছু হলে তুমি বড় বিপদে পড়বে হে চারু। ওহ্! এই বাজারে—'

চারু আর শুনল না। ওকে বিদায় দেখাল। ঠোঁট চেপে উঠতে লাগল ওপরে।

দোতলার মাসীমা দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। উদগ্রীব প্রশ্নে জেঠুর কথা জানতে চাইল। চারু একই জবাব দিল, 'বলা যায় না কিছু।'

'তাই নাকি? তবে তো খুব ভাবনার কথা। অমন শক্ত শরীর—, দ্যাখো—হয়তো ভালো হয়েও যেতে পারে। ভগবানকে ডাকো।' উত্তর দিল না চারু। বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল ঘষতে লাগল মেঝেয়। মাসীমা গলার স্বর করুণ করে বলতে লাগল, 'তোমার কথাই বলাবলি করছিলাম আমরা। নলিনীবাবু তো কিছু রেখে যেতে পারবেন না তোমার জন্য। কোথায় যে দাঁড়াবে!'

চারুর চোখ কুঁচকে গেল। ঠোঁট কাঁপল। আর কিছু শোনার নেই ওর। তেতলায় আবার বাধা। ভাড়াটে বুড়ি দাঁড়িয়ে আছে বউ, মেয়ে আর বাচ্চাদের নিয়ে। ওরই অপেক্ষায় দাঁড়ানো। যেন জেঠুর খবরের জন্য ওরা খুব উদ্বিগ্ন। ওর কিছু জিজ্ঞেস করার আগে চারু এক কথায় বক্তব্য শেষ করতে চাইল। বলল, 'অবস্থা ভালো নয় ঠাকুমা। বিপদ কাটে নি।' বলে ফেলেই বিচলিত হয়ে উঠল চারু। এভাবে না বললেই পারত। কঠিন কথা শুনতে হবে এখন। বুড়ি অনেক কথার শেষে ওর অক্ষমতার কথাটা জোর দিয়ে বলবে। করুণায় আর্দ্র হবে। হলও তাই। কাশতে কাশতে বুড়ি বলতে লাগল, 'তোমার কপালটাই পোড়া গো বাছা! নইলে কেনই বা কম বয়সে মা-বাবাকে খোয়াবে, কেনই বা তোমায় এমন বিপদে ফেলে তোমার জেঠু— যাক গে, ভগবান আছে মাথার ওপর। তিনিই দেখবেন। এই আমি বলে রাখলুম দেখো, তোমার একটা কিছু গতি না করে নলিনীবাবু যাবেন না। ধর্ম বলে তো আছে একটা কিছু?'

চারু ক্রমশ ক্ষীণবল হয়ে আসছিল। এখন ওর চোখ ফেটে জল আসতে চাইল। চিৎকার করতে ইচ্ছে হল গলা ফাটিয়ে। ওকে নিয়ে বাড়িময় লোক এত কিছু ভাবে? জেঠুর প্রাণ যায়, তা কোন ব্যাপারই নয়? চারুকে নিয়ে মজা করাটাই বড় হল? ওর অক্ষমতাটাই এখন বড় হয়ে দেখা দিল?

ঘরে ঢুকে জোরে জোরে নিশ্বাস নিল। ভালোই হল। জেঠুর গুরুতর অসুখ ওর দীনতাকে স্পষ্ট করে তুলেছে। প্রথম থেকে যে অস্বস্তির খোঁচায় ম্লান হয়েছিল, তার সূত্র মিলল এবার। জেঠুর মৃত্যু হলে ও কি করবে? এই ছিল এতক্ষণের অজ্ঞাত ভাবনা। তারই ফলে অস্বস্তি।

মরুক জেঠু। চারু পথে নামবে।

ঈশ্বরের কাছে শক্তি ভিক্ষা চাইল চারু। এখন জেঠুর মৃত্যু কামনা করল। জেঠু বাঁচলে ও বাঁচবে না। জেঠু মরলেই ও বাঁচতে পারে। এতদিন এ বাড়িতে আছে, কেউ, কখনও ওর এই করুণ অবস্থা সম্পর্কে একটি কথাও বলে নি। আজ সুযোগ এসেছে। জেঠু মরণাপন্ন। মনের সুখে সকলে খুব আমায়, আক্রোশ জানিয়ে দিয়েছে। করুণা করেছে। সহানু-ভূতি দেখিয়েছে। ওর সম্মানের দিকে একবারও তাকায় নি।

পা ঝুলিয়ে খাটে বসে পড়ল। একটু পরে শুয়ে পড়ল টান টান হয়ে। উঠল আবার।

চারু বেরিয়ে পড়বে। যেখানে হোক। চব্বিশ বছরের তাজা জীবনটাকে অন্যের করুণা আর বিদ্রূপে নির্জীব হতে দেবে না।

ঘরে নিজস্ব আসবাব বলতে কয়েকখানা দেশী-বিদেশী বই, কিছু পোষাক-আশাক, মা আর বাবার ছবি। আর একটা ভাঙা হার-মোনিয়াম। এখন সেগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। নিজের এই সম্পদটুকু ও সংগে নেবে। কোথায় যাবে, তা এখনও ঠিক করে নি। খাটখানা আর বাসনপত্র বেচে দিলে টাকা হবে কিছু। তাই সম্বল করে পরীক্ষায় নামবে। জেঠু বেঁচে থেকে যে সুযোগ দিতে পারে নি, তার মৃত্যুর আশংকায় এখন তা হাতের মুঠোয়।

শুধু অপেক্ষা। জেঠু মারা গেছে, এই সংবাদটি আসতে যতক্ষণ, তারপরে আর এক দণ্ডও ক্ষয় করবে না চারু।

রাত্রে মনের সুখে ঘুমল। নিশ্চিন্তে বেরোবার আগে আরামের নিদ্রা।

পরের দিন সকাল হতেই গুটি গুটি হাসপাতালের দিকে হাঁটা লাগাল। দূর থেকে হাসপাতালের জানালা দেখে মৃত্যুজনিত কোন ইঙ্গিতের সন্ধান করল।

সিঁড়ি ভাঙতে বুক ওঠা-নামা করছে।

করিডরে দাঁড়িয়ে নার্সের সংগে কথা বলছিলেন ডাক্তার। চারুর তর সইল না। ওদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সরাসরি প্রশ্ন করল, 'দশ নম্বর বেডের নলিনীবাবু কি মারা গেছেন?' ডাক্তারবাবু একদৃষ্টে ওকে খানিক-ক্ষণ দেখলেন। তারপর মুচকি হেসে ঠাট্টা করলেন, 'কি খাওয়াবেন বলুন—পেসেন্টকে এ যাত্রা বাঁচিয়ে দিলাম।'

চারুর চোখের সামনে ডাক্তার, নার্স, বারান্দা বা অন্য কিছু রইল না। স্থির হয়ে গেল সব।

কাল রাত থেকে আজ একটু আগে পর্যন্ত যে আনন্দটুকু বুকের মধ্যে লালিত হচ্ছিল তা ওই পরিহাসে ধুয়ে গেল। জেঠু বাঁচল? তাহলে উপায়? ও আবার বন্দী হল। অসম্মানের দিন কাটবে। কেন না, জীবন্ত জেঠুকে ছেড়ে ও কোথাও যেতে পারবে না।

নিজের মৃত্যু এখন কাম্য হয়ে উঠল চারুর।

পরক্ষণে আপন মনে কিছু ভেবে নিয়ে ফিরে এল জেঠুর কাছে।

কবি শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীঅরবিন্দের অনেক পরিচয়। তিনি বিপ্লবী। ১৯০৩-এর বোমার মামলার আসামী। তিনি ঋষি। তিনি যোগী। তিনি দার্শনিক। কিন্তু এই সব-কিছুর আড়ালে যা চাপা পড়ে আছে তা হল শ্রীঅরবিন্দের কবি-সত্তা। কবি হিসাবে তিনি কত মহান সে বিচার এখনও শুরু হয়নি। শ্রীঅরবিন্দ আজো পূর্ণাঙ্গভাবে আবিষ্কৃত হননি।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর প্রথম জীবনে ইংলণ্ডে বসেই ইংরাজী ভাষায় কাব্যচর্চা শুরু করেন। তারপর পরিণত মানসের অধিকারী হওয়ার পর শ্রীঅরবিন্দের কবি-সত্তার প্রজ্ঞাদীপ্ত পরিচয় বিকশিত হয়ে ওঠে। শ্রীঅরবিন্দ একাধারে স্রষ্টা, আবার সমালোচক। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের 'সাগর-সংগীতে'র শ্রীঅরবিন্দকৃত ইংরাজী অনুবাদে তার এই পরিচয় প্রকাশিত।

শ্রীঅরবিন্দ সৃজনমূলক কল্পনা বিষয়ে এক চমৎকার উক্তি করেছিলেন। তাঁর 'লেটারস' (থার্ড সিরিজ—১৯৪৯) নামক গ্রন্থে তিনি বলেছিলেন :

"Each artist is a creator of his own world - why then insist on this legal fiction that the artist's world must appear as an exac invitation of the actual world around us? Even if it does so seem, that is only skilful make up of an appearance".

নিজের সৃজনীমূলক কল্পনায় কবি তাঁর নিজের জগৎ রচনা করেন। তাঁর সেই সৃজনশীল কল্পনার ভূমিতে তা বাস্তবের রূপ গ্রহণ করে। কবির জগৎ তাই বাস্তবের এক মোহিনী-মায়া বা ইল্যুস্যান। শ্রীঅরবিন্দের জগৎও তাই বাস্তব-বিচ্যুত এক স্বপ্নের মায়ালোক মাত্র নয়। তাঁর মানসলোক প্রদীপ্ত প্রজ্ঞায় উদ্ভাসিত, তাই অন্তরের সেই অন্তর্ধ্যানপটে বিকশিত হয়ে উঠেছে অসীম জ্ঞানের শ্বেত-শতদল।

শ্রীঅরবিন্দের 'লাইফ-ডিভাইন' বা দিব্য-জীবন এক মহাগ্রন্থ—'ম্যাগনাম ওপাস অব ফিলসফি' এই মন্তব্যও শোনা যায়। 'দিব্য-জীবন' এক বিরাট গ্রন্থ এবং সাধারণ পাঠকের পক্ষে তার মর্মগ্রহণ সহজ নয়। এই কাব্যধর্মী দার্শনিক গ্রন্থ শাশ্বত-কালের দরবারে এক অবিস্মরণীয় অবদান।

মূলগ্রন্থে শ্রীঅরবিন্দ এক জায়গায় বলেছেন :

At a higher stage of the evolution of peorsonality the being of mind may rule."

এই যে ব্যক্তিত্বের বিবর্তন, তার উচ্চতম স্তরে মানুষ কিভাবে পৌঁছাতে পারে, কিভাবে মানুষ অতি-মানসের অধিকারী হতে পারে শ্রীঅরবিন্দের 'দিব্য-জীবনে'র দর্শনে তারই অত্যাশ্চর্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যে মনোত্তর মহাসত্তা মানব মনের পিছনে প্রচ্ছন্ন থাকে—তার সন্ধান ও তার সাধনা আমাদের কর্তব্য এবং শ্রেয় একথা শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন : 'বিজ্ঞানময় পুরুষের জীবনকেই দিব্যজ্ঞান বলা হয়। কারণ ভগবানের মধ্যেই এই জীবন। অধ্যাত্ম ও অতি-মানসিক অতি-মানবত্বের সহিত এই অতিমানসিক অতিমানবত্বের কোনো মিল নেই।' তিনি এই সূত্রে আরো বলেছেন—বর্তমান অতিমানব 'অহমাত্মক অবিদ্যাময় মানবেরই বড় সংস্করণ' এবং 'তার অহং-এর দাবীও অনেক বেশী এবং 'তার কাজ হল অন্যদের ওপর জোর করে আধিপত্য করা।' শ্রীঅরবিন্দের বিচারে এরা নীটশে ধরনের অতিমানব। তবে এঁরা আসুরিক শক্তি-সম্পন্ন। আর শ্রীঅরবিন্দের নিজস্ব উপলব্ধিতে 'বিবর্তনের লক্ষ্য হ'ল আত্মজ্ঞান-সমৃদ্ধ, দিব্যশক্তিসম্পন্ন অতিমানসিক জীবের আবির্ভাবে পার্থিব জীবনে ভগবদ-বিকাশ সাধন।' এঁরাই প্রকৃত অতিমানব। পার্থিব জীবনে যে ভগবদ-বিকাশ-সাধন সম্ভব, স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দ তাঁর নিজের জীবনের মধ্যে তার পরিপূর্ণ প্রকাশ দেখিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে 'লাইফ-ডিভাইনে'র দর্শন নিজের জীবনে ফলিত হয়েছে তাই শ্রীঅরবিন্দের জীবন দিব্য-জীবনে পরিণতি লাভ করে সার্থকতা লাভ করেছে।

শ্রীঅরবিন্দের এই মহাগ্রন্থ বিষয়ে শিক্ষিত-প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই পরিচয় থাকা প্রয়োজন। আয়ু অল্প, বিষয়ও অনেক; তাই মূলগ্রন্থ পাঠে যাঁদের সুযোগ কম তাঁরা শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীঅরবিন্দের দিব্য-জীবন' পাঠে উপকৃত হবেন। এত সহজে এবং সরলভঙ্গীতে একালের এক অতিশয় দুরূহ অথচ মূল্যবান গ্রন্থের এই-ভাবে সংক্ষিপ্ত আকারে পরিবেশন করার মধ্যে অশেষ কৃতিত্ব ও শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। অসাধারণ নিষ্ঠায় সৌন্দর্য বোধের সংমিশ্রণেই এমন একটি গ্রন্থ-রচনা সম্ভব হয়েছে এই কথা বার বার মনে জেগেছে 'শ্রীঅরবিন্দের দিব্য-জীবন' পাঠ করে।

এই গ্রন্থের লেখক শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় ভূমিকাংশে লিখেছেন :

'অবশ্য বইটির একাধিক আক্ষরিক বাংলা-অনুবাদ বের হয়েছে। কিন্তু আয়তন ও পরিভাষা সহ সূক্ষ্ম দার্শনিক আলোচনার জন্য এগুলও অনেকের আয়ত্তের বাইরে। সেজন্য যতদূর সম্ভব সহজ কথায় প্রধান প্রধান বক্তব্য নিয়েই এই পুস্তক রচনা।'

প্রকৃতপক্ষে শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের এই গ্রন্থকে সেই হিসাবে প্রায় মৌলিক কর্ম বলা যায়। শ্রীঅরবিন্দের মূলগ্রন্থ অনুসরণ করে তিনি মোটামুটিভাবে প্রধান বক্তব্যগুলি পরিবেশনের চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টায় তিনি আশ্রম থেকে শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ পেয়েছেন এবং সেই কথাটি এখানে উল্লেখ প্রয়োজন মনে করি। আলোচ্য গ্রন্থটি দুটি খণ্ডে সম্পূর্ণ; মোট আটাশটি অধ্যায়ে 'দিব্য-জীবনের' পরিচয় ছড়ানো। এই গ্রন্থের লেখকের কোনো পরিচিতি এই গ্রন্থে দেওয়া নেই। তবে তিনি যে শ্রীঅরবিন্দের দর্শনের একজন আগ্রহী মানুষ এ গ্রন্থ পাঠে সহজেই তা বলা যায়।

শ্রীঅরবিন্দের কবি মানস এই 'দিব্য-জীবনে'র দর্শন রচনায় তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। পদার্থ বা জড়জীবনের বশ্যতায় কবির মুক্তি নয়, কবির মুক্তি, কবির সত্তা তাঁর দায়িত্ববোধের প্রতি নির্ভরশীল। মানবমনের বিবর্তনের ফলে মানুষ দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। রবীন্দ্রনাথের কথায়, 'আপন থেকে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়াতে পারে।' শ্রীঅরবিন্দের দিব্য-জীবন' গ্রন্থের সূচনাতেই লিখিত হয়েছে একটি পরম তত্ত্বকথা। যথা :

'যেমন জড়ের মধ্য থেকে প্রাণ ও প্রাণের মধ্য থেকে মনের আবির্ভাব হয়েছে, সেরূপ মন থেকে মানসোত্তর চেতনার আবির্ভাবই বিবর্তনের বর্তমান লক্ষ্য। অতিমানস চেতনা-সম্পন্ন অতিমানবের আবির্ভাব অর্থাৎ জড় জগতে ভগবানের আত্মপ্রকাশের জন্যই প্রকৃতির প্রয়াস। ভগবান জড়ের মধ্যে থেকে সুপ্ত থেকে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছেন। পার্থিব জীবনে তাঁর পূর্ণ প্রকাশ, অর্থাৎ দিব্য-জীবনের আবির্ভাব যে সম্ভব ও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, অর্থাৎ বিবর্তনের স্বাভাবিক পরিণতি এ অনস্বীকার্য।'

শ্রীঅরবিন্দের লাইফ-ডিভাইন' মহাগ্রন্থের মত আরও একটি গ্রন্থকে সুধীসমাজ মহাগ্রন্থ বিবেচনা করেন। সেই সুপ্রশস্ত মহাকাব্যটির নাম 'সাবিত্রী'। এই মহাকাব্যের ব্যঞ্জনাময় পরিধি, ছন্দ, শব্দ চয়ন ও রূপকল্পের বিশালত্ব স্মরণ করে প্রবীণ সাহিত্যসেবী শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 'শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী' নামে একটি বিশ্লেষণধর্মী গ্রন্থ রচনা করেছেন। অবশ্য তিনি ভূমিকায় স্বীকার করেছেন :

'আমার আলোচনা যথাযথিক বিশ্লেষণ, যা পর্ব, সর্গ ও বিষয়সূচী অনুসারে ভাষ্য, টীকা বা অন্বয় নয়—'

কাব্য পাঠ করে তাঁর মনে যে ভাবের জেগেছিল এ তার অভিব্যক্তি মাত্র। ...

...রের মুখোমুখিত্বের সঙ্গে কাব্য-রসপিপাসু পাঠকের অভিজ্ঞতার একাত্মতার পরিচয় এই গ্রন্থের সব ক'টি অধ্যায়ের মধ্যে ছড়ানো। মূলত এই আলোচনা বিভিন্ন কালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতার ভিত্তিতে পুনর্লিখিত। 'সাবিত্রী' কাব্য-গ্রন্থ বাঙালী পাঠকের কাছে যথেষ্ট পরিচিত নয়, অনেকে শুধু এই মহাকাব্যের নামোল্লেখটুকুই দেখেছেন, মূল গ্রন্থটি দেখেন নি। লেখক পঞ্চদশটি বিভিন্ন অধ্যায়ে সাবিত্রী কাব্য-গ্রন্থ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে সাবিত্রীর পরিচয় দিয়েছেন। সেই সঙ্গে ফুটে উঠেছে পাঠক হিসাবে তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়া।

মহাভারতের একটি কাহিনীকে উপলক্ষ করে এই কাব্য রচিত। কবি শ্রীঅরবিন্দের দিব্য-জীবনের ক্রম-বিকাশের সঙ্গে এই কাব্যটি গড়ে উঠেছে। প্রায় পঞ্চাশ বছরকাল ধরে এই মহাকাব্য রচিত। ১৮৯৮-৯৯ খৃষ্টাব্দে কাব্যের এই উপজীব্য তাঁর চিত্তে উদিত হয়েছে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বলিখিত কাব্যের অংশ পাঠ করছেন। তিনি নীরদবরণকে বলেছিলেন বারো বার সংশোধন করে তিনি 'সাবিত্রী'র প্রথম পর্ব শেষ করেছিলেন।

সাবিত্রীর কাহিনী অনেকেই জানেন। অশ্বপতি তপস্যার ফলে জগৎজননী সাবিত্রীকে কন্যারূপে লাভ করেন। সেই কন্যা পরিণত যৌবনে দ্যুমৎসেন তনয় সত্যবানকে স্বামীরূপে বরণ করতে মনস্থ করলেন। নারদ সতর্ক করেছিলেন, সত্যবান মাত্র এক বছর বাঁচবেন। সাবিত্রী তবু বিবাহ করলেন সত্যবানকে এবং যথাকালে সত্যবানকে মৃত্যুদূত এসে নিয়ে গেল। সাবিত্রী অনুসরণ করলেন মৃত স্বামীকে, যমের সঙ্গে বিতর্কে তিনি বিজয়িনী হয়ে মৃত সত্যবানকে আবার প্রাণবন্ত করে ফিরিয়ে আনলেন। শ্রীঅরবিন্দ এই সর্বজনবিদিত কাহিনীকেই রূপ দিলেন এই মহাকাব্যে।

সাবিত্রী পরমাশক্তির অধিকারিণী হয়ে বলেছিলেন—

"I am a deputy of the aspiring world
My spirit's liberty I ask for all".

সত্যে বিধৃত সত্যবানকে মৃত্যুর গহন-অন্ধকার থেকে অমৃতলোকে ফিরিয়ে আনলেন। মৃত্যুকে জয় করাই সাবিত্রীর যোগ, তিনি মৃত্যুর বিরুদ্ধে অমৃতত্বের জেহাদ ঘোষণা করলেন। এই প্রতীকী কাহিনীকে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর কাব্যে প্রাণবন্ত করলেন।

'শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী' গ্রন্থের লেখক তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণে উপযুক্ত কারণেই অনেক পারিপার্শ্বিক তথ্য সমাবেশ করেছেন। তিনি অত্যন্ত সহজ ভঙ্গীতে একালের এক স্মরণীয় মহাকাব্যের পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন, আর সেখানেই তাঁর কৃতিত্ব। তিনি গ্রন্থশেষে বলেছেন—

'তাই শ্রীঅরবিন্দের ধ্যানে শেষ নেই অশেষের, যে ভালোবাসে, যে ভালোবাসা পায়, তার অবসান নেই, নেই সমাপ্তির গান। এই তো সাবিত্রীর শেষ কথা। মৃত্যু নেই, রূপান্তরিত সত্তাই সত্য, অমর্ত্য, অমৃত, নূতন ঊষার স্বর্গদ্বার দেখায়, উদ্ভাসিত প্রজ্ঞায়, প্রোজ্জ্বল অরুণার্ক-রাগে দীপ্ত।'

মহাতমসার বক্ষ বিদীর্ণ করে যখন মহত্তমা প্রত্যূষের আবির্ভাব—সেইখানেই এই কাব্যের সমাপ্তি।

এই গ্রন্থের লেখক সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙালী সাহিত্য-পাঠকদের কাছে স্মরণীয় হয়ে রইলেন শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রীর সঙ্গে পরিচয়সাধনের মহৎ দায়িত্ব পালন করে।

(১) **শ্রীঅরবিন্দের দিব্য-জীবন** (১ম ও ২য় খণ্ড)—শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় লিখিত। প্রকাশক : শ্রীঅরবিন্দ পাঠ-মন্দির। ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি—১২। মূল্য যথাক্রমে তিন টাকা ও পাঁচ টাকা মাত্র।

(২) **শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী**—শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত। প্রকাশক : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭২)। (মূল্য উল্লেখ নেই)

—অভয়ংকর

সাহিত্যের খবর

সাহিত্য সংবাদ : বাঙলাদেশ

ঢাকায় আয়োজিত আন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলায় দেশীবিদেশী গ্রন্থ প্রদর্শনের বারটি স্টল খোলা হয়েছে। বাঙলাদেশ ছাড়া, আমেরিকা, জাপান, পূর্বজার্মানী বুলগেরিয়া, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া যোগ দেবে। গ্রন্থমেলায় জাপান, পূর্বজার্মানী ও রাশিয়ার বই সম্পর্কিত চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে। নজরুল জীবন নিয়ে তোলা বাঙলাদেশের ছবিটিও দেখান হবে এখানে। ঢাকার প্রায় সব বিশিষ্ট গ্রন্থ প্রকাশক মেলায় যোগ দিচ্ছেন। তাঁদের বিক্রয় কেন্দ্র থেকে বাঙলাদেশে প্রকাশিত বই শতকরা বিশ টাকা কমিশনে বিক্রি হবে। গ্রন্থমেলা উপলক্ষে বসছে ছয়দিনব্যাপী আলোচনা-চক্র। দেশী-বিদেশী বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আলোচনায় যোগ দিচ্ছেন।

* * *

আগামী ১৪ ডিসেম্বর বাঙলা আকাদমি প্রকাশ করছে সচিত্র শহীদ-বুদ্ধিজীবী স্মারকগ্রন্থ। শহীদবুদ্ধিজীবীদের জীবনী, সাহিত্যকর্ম, কর্মজীবন, ভাষা আন্দোলনে, স্বাধীনতা সংগ্রামে ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য থাকবে।

* * *

বাঙলাদেশ লেখক শিবিরের তিনদিনব্যাপী আলোচনা শিবির শুরু হচ্ছে ১০ ডিসেম্বর। এই আলোচনা শিবির চলবে তিনদিন। যোগ দেবেন বাঙলাদেশের খ্যাতনামা লেখক, কবি, বুদ্ধিজীবী। সেই সঙ্গে তরুণ লেখকরাও থাকছেন।

বাঙলা আকাদমিতে আয়োজিত এই সভায় প্রথম দিন পালিত হবে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের জন্মবার্ষিকী। 'সংস্কৃতির সংকট' এবং বাঙলা সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ' আলোচিত হবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন।

নতুন বই

ছয় ঋতু (গল্প সংকলন)—সতীকান্ত গুহ। বাক সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩, কলেজ রো, কলকাতা—৯। পাঁচ টাকা।

বাংলা শিশু সাহিত্যে শ্রীযুক্ত সতীকান্ত গুহের একটি উজ্জ্বল স্থান চিহ্নিত হয়ে আছে। কিন্তু শিশু সাহিত্য ছাড়াও যাঁরা তাঁর ইতিপূর্বে-প্রকাশিত একাধিক গল্প-গ্রন্থ, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি পড়েছেন, তাঁরা বর্তমান 'ছয়ঋতু' গ্রন্থটি পড়ে শ্রীযুক্ত গুহের আর এক নতুন স্বাদের সাহিত্য কীর্তি সম্পর্কে উৎসাহী হবেন, আর যাঁরা এখনো তাঁর লেখা পড়েন নি, তাঁরা নিশ্চয়ই এই ক্ষমতাবান লেখকের সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করবেন বলে মনে করি।

শ্রীযুক্ত গুহের অনুসন্ধিৎসু লেখক মন এই গল্পগুলিতে যে সমস্ত চরিত্রের পিছনে ঘুরেছে, তারা একটিও গতানুগতিক চরিত্র নয়। প্রচলিত গল্পের প্যাটার্নে যে নাগরিক চরিত্র গড়ে উঠতে থাকে, এরা তা হয়ে ওঠে নি। একদিকে যন্ত্রজাগতিক জীবনভাবনার অসহায় শূন্যতাবোধ, একাকীত্ব, অলস বোহেমিয়ানিজম, আর একদিকে অসম বয়সের নায়িকাসঙ্গলাভ—এই মন, অভিজ্ঞতা ও বয়সের বৈপরীত্যে গল্পগুলির চরিত্র তথা সমগ্র গল্পভাবনা থেকে একটা গভীর দার্শনিক তাৎপর্য উঠে আসে অবধারিতভাবে এবং সে তাৎপর্য মানুষের জীবন সম্পর্কে নিহিত। শ্রীযুক্ত গুহ তাঁর রচনায় মানবমনের জটিল-গভীর অন্ধকারের একটা বিশেষ স্তরে নায়ক-নায়িকাদের এনে জীবন ও জগতের দিকে তাকিয়েছেন। দার্শনিকতা তাই প্রতিনিয়ত বেঁচে থাকার সঙ্গে মানব মনের অসম টানাপোড়েনে অদ্ভুত এক দার্শনিক আবেগ ও জিজ্ঞাসা তুলে ধরে।

'সুভদ্রার রথ' গল্পের পঁচিশ বছরের বিবাহিত অধ্যাপক-নায়ক রমেন মজুমদার ও ছাত্রী-নায়িকা শর্মিলার নীরব নিগূঢ় প্রেম-সংঘর্ষের মধ্যে নায়কের উপলব্ধি হল—'সমস্যার সমাধান হচ্ছে মানুষের কীর্তি, সমস্যার অংকফল হচ্ছে গোটা মানুষ।' এই উপলব্ধির কারণেই গল্পটি নিছক রোমান্টিক প্রেম-বিলাসিতার হয়ে ওঠে নি, রোমান্টিক অনুভাবনার মুদুস্বাদী বেদনায় সিক্ত পরিণামী ব্যঞ্জনাটি চিরকালের পুরুষ-রমণীর মৌল জিজ্ঞাসাকে স্পষ্ট করায়।

...গ্রন্থ রচনা করে যে ক্ষমতা ও ...পরিচয় দিয়েছেন, বর্তমান গ্রন্থটিতে ...রক্ষিত হয়েছে। চৈতন্যের মত ...তাঁর সমকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-... সাধনার, ভক্তির ও ...পরিচয় দিয়েছিলেন। চৈতন্য-... পরেই নিত্যানন্দজীবনী তাই ...উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে তিনটি, মধ্যখণ্ডে ...টি এবং অন্ত্যখণ্ডে তেরোটি অধ্যায় আছে। প্রাচীন পয়ারে জীবনীকার যে শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্বটি জীবনব্যাখ্যার মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন, তা বাস্তবিকই এমন সহজ, সরল ও ভক্তিস্নিগ্ধ আন্তরিক ভাষায় লিখিত হয়েছে, যা ভক্তগণ সহজেই বুঝতে সক্ষম হবেন। গ্রন্থটির সবচেয়ে মূল্যবান অংশ শ্রীমদনমোহন গোস্বামী লিখিত ভূমিকা। ভূমিকাটি গ্রন্থ পাঠের চাবিকাঠির মত। বৈষ্ণব ধর্মের ও সাহিত্যের ছাত্র-গবেষকদের পক্ষে গ্রন্থটি সংগৃহীত করে রাখার উপযোগী।

বাংলার সাধক (প্রথম খণ্ড)। শ্রীগঙ্গেশচন্দ্র চক্রবর্তী। সন্দেশ প্রকাশন। ৩৬।৩, বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা-৯। মূল্য : ছয় টাকা।

সাধনার চরম লক্ষ্যে পৌঁছে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি নয়, সাধারণ মানুষের জীবনে মঙ্গল এবং আনন্দের প্রতিষ্ঠাই বাংলার সাধকগণের লক্ষ্য। বাংলার ঐতিহাসিক সাধকগণের এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে, প্রশান্ত জীবনীকারের ভঙ্গীতে লেখক কয়েকজন সাধকের জীবন-কাহিনী পরিবেশন করেছেন 'বাংলার সাধক'-এর প্রথম খণ্ডে। সাধারণ মানুষের দুঃখে-শোকে সমব্যথী বাংলার সাধকগণের অন্তরূপ্য এই জীবনীগ্রন্থখানি বাঙালী পাঠকের চিত্তে ভক্তিভাবের উদ্রেকের সঙ্গে সঙ্গে রসের সঞ্চার করবে। সাধারণ পাঠকের প্রতি লক্ষ্য রেখেই সম্ভবত গ্রন্থটির পরিকল্পনা। প্রাঞ্জল ভাষায়, কাহিনীকারের ভঙ্গীতে বাংলার শ্রেষ্ঠ সাধক, মহাপুরুষগণের জীবনের লৌকিক অলৌকিক ঘটনাসম্বলিত জীবনী-গ্রন্থটি সাধারণ পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্ত করবে।

যে মহাপুরুষের জীবনকাহিনী দিয়ে গ্রন্থের সূচনা—তিনি হলেন তারাপীঠ ভৈরব মহাতান্ত্রিক শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা। স্বল্প পরিসরে লেখক বামাক্ষ্যাপার সাধক-জীবনের পরিচয় দানে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।—একদিকে বামাক্ষ্যাপা, কমলাকান্ত ও আরো কয়েকজন তান্ত্রিক সাধকের কাহিনী, অন্যদিকে শ্রীচৈতন্যদেব, অদ্বৈতপ্রভু, আবার শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর অতীশ-এর কাহিনী গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

সাধক মহাপুরুষগণের জীবনী কালানুক্রমিক উপস্থাপিত হলে গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্য বৃদ্ধি পেত।

শ্রীননীগোপাল তর্কতীর্থ মহাশয়ের ভূমিকাটি গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি করেছে।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

পরিচয় : সম্পাদক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তরুণ সান্যাল। ৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭। তিন টাকা।

সাহিত্য সমালোচনার আদর্শ স্থাপন করে পরিচয় পত্রিকা এককালে তরুণদের সাহস জোগাত, প্রবীণদের চিন্তিত করত। এখনো সেই ঐতিহ্য বহন করেই পত্রিকাটি নিয়মিত বেরুচ্ছে। এ সংখ্যায় লিখেছেন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, লোকনাথ ভট্টাচার্য, শঙ্কর চক্রবর্তী, দিলীপ বসু, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য, অন্নদাশঙ্কর রায়, মণীন্দ্র রায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র, গোলাম কুদ্দুস, রাম বসু, ধনঞ্জয় দাশ, তরুণ সান্যাল, গণেশ বসু, সিদ্ধেশ্বর সেন, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, শিবশম্ভু পাল, রত্নেশ্বর হাজরা, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, আশিস সান্যাল, জয়ন্তী দেবী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সত্য গুহ, তুলসী মুখোপাধ্যায়, সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপেন রায়, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, অমিয় ধর, অনন্ত দাস, শম্ভু বসু, দুলাল ঘোষ এবং আরো অনেকে। প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে ভি শ্চেরবিনার লেখাটি ভালো। ভাবায়। দেবেশ রায়, মিহির সেন, চিত্তরঞ্জন ঘোষ ও মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের গল্পগুলি উল্লেখযোগ্য। ভবানী সেনের একটি অপ্রকাশিত উপন্যাস এ সংখ্যা থেকে বেরুচ্ছে ধারাবাহিকভাবে। পত্রিকাটি সংগ্রহযোগ্য।

অবাক : সম্পাদক শৈলেন্দ্রনাথ বসু ও সুখেন্দু ভট্টাচার্য। ৬৮ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯। দু টাকা।

চিত্রকলা ও ভাস্কর্য সম্পর্কে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর সঙ্গে সুখেন্দু ভট্টাচার্যের সাক্ষাৎকারের বিবরণটি চমৎকার। তাছাড়া 'হারলেম সাহিত্য ও সংস্কৃতি' শীর্ষক ক্রোড়পত্র দুটি উল্লেখযোগ্য। কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন অচ্যুত গোস্বামী, সুবন্ধু ভট্টাচার্য, অর্ধেন্দু বিশ্বাস, সুবল চক্রবর্তী, রবীন সুর, সনৎকুমার মিত্র, দিলীপ মিত্র, সুদর্শন বসু, মানস বসু প্রমুখ। সম্পাদনা উন্নতমানের।

রূপ ভারতী (নভেম্বর ১৯৭২) — সম্পাদক প্রদ্যোৎ গুহ ও তরুণ সান্যাল। ৭৭ লেনিন সরণী, কলকাতা ১৩।

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রবন্ধের লেখক এরিক কোমারোভ, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় (কবি আলেকসান্দর তভারদোভস্কির প্রয়াণে), অরুণ সান্যাল, মণীন্দ্র রায় (সোভিয়েতে আঠারো দিন), তরুণ সান্যাল, কল্যাণ দত্ত, প্রদ্যোৎ গুহ (রুশ চিত্রকরের চোখে উনিশ শতকের ভারত) এবং আরো কয়েকজন। কয়েকটি কবিতাও ছাপা হয়েছে। সব মিলিয়ে পত্রিকাটি আগ্রহী পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণের যোগ্য।

উত্তরসূরি (কার্তিক-পৌষ)—সম্পাদক অরুণ ভট্টাচার্য। ১৮।৮ ... রোড, কলকাতা ৫০। দু টাকা।

স্বদেশী কবিতা যেমন ছাপা হয়েছে বিদেশী কবিতার অনুবাদও তেমনি ছাপা হয়েছে, বেশ মর্যাদার সঙ্গে। প্রবন্ধগুলি উল্লেখযোগ্য। লিখেছেন অরুণ ভট্টাচার্য, ভূষণ বসু, পৃথ্বীন্দ্র চক্রবর্তী, শোভন সোম, সুনীথ মজুমদার, লোকনাথ ভট্টাচার্য, মানস রায়চৌধুরী, ... গুপ্ত, অমিতাভ দাশগুপ্ত, ... মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী এবং অনেকে। কবিতার পাঠক ও সমালোচকেরা এই সংখ্যাটি হাতে পেয়ে খুশি হবেন।

কালি ও কলম (কার্তিক ১৩৭৯)—সম্পাদক শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ১৫ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা ১২। দাম এক টাকা।

কবিতা, গল্প, প্রবন্ধে সমৃদ্ধ। লিখেছেন নিখিল সেন, সুরেশপ্রসাদ নিয়োগী, তারাপদ লাহিড়ী, অরিজিৎ মুখোপাধ্যায়, কুমারেশ ঘোষ, নির্মলেন্দু গৌতম, সৈয়দ কওসর জামাল, শচীন বিশ্বাস, শঙ্করীপ্রসাদ বসু এবং আরো কয়েকজন। কয়েকটি উপন্যাস ও জীবনী ধারাবাহিকভাবে বেরুচ্ছে। পত্রিকাটি সংগ্রহযোগ্য।

সপ্তস্বর : সম্পাদক: শেখ নজরুল ইসলাম। শিল্প ও সাহিত্য ত্রৈমাসিক। ধুলো সিমলা। হাওড়া। দাম দু টাকা।

বিশেষ ঈদ সংকলন সপ্তস্বরের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ নতুন লেখকদের রচনা নিয়ে প্রকাশ। এই জাতীয় বিশেষ সংখ্যায় প্রবীণ লেখকদের রচনা মুদ্রনের যে রেওয়াজ আছে, সম্পাদক তা সাফল্যের সঙ্গে লঙ্ঘন করেছেন। পত্রিকাটির রচনা সৌকর্যের দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

আলেখ্য : সম্পাদক ক্ষিতীন্দ্রচন্দ্র ঘোষাল। ৫০ সন্তোষপুর এভিনিউ। কলকাতা-৩২। দাম তিন টাকা।

আলেখ্য সুসম্পাদিত সাহিত্য ত্রৈমাসিক পত্রিকাটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশে। বর্তমান বিশেষ সংখ্যাটিতে সম্পাদক প্রয়োজনীয় বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ ছেপেছেন। গল্প, কবিতা, ধারাবাহিক উপন্যাস আছে। অনুবাদ কবিতাগুলি সংখ্যাটির বিশেষ আকর্ষণ।

বিস্ময় : সম্পাদক নরেশ চাকলাদার। ৬৪বি গৌরীবাড়ী লেন কলকাতা ৪। পঞ্চাশ পয়সা।

মূলত তরুণেরা লিখেছেন। কয়েকটি ভালো কবিতাও আছে। কবিতার ভাষা সম্পর্কে শ্যামসুন্দর দত্তের আলোচনাটি উল্লেখযোগ্য।

[অতীতের সঙ্গে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কোথাও প্রত্যক্ষ কোথাও পরোক্ষভাবে সম্বন্ধ। আপাতদৃষ্টিতে অতীতের সঙ্গে অনাগতকালের সম্বন্ধ যদিচ পরম্পরাবিচ্ছিন্ন বলে প্রতীত হয়, তথাচ উভয়েই উভয়ের ধারাবাহিকতার সূক্ষ্ম যোগসূত্রে আবদ্ধ। ঐতিহাসিকরা ইত্যাকার পূর্বাপর সম্বন্ধ-সূত্রকে স্বীকার করেই তাঁদের সাহিত্যের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা করেন। অতীত বা পুরাতন ঘটনার স্মৃতিমন্থন সেকারণ মানুষের ব্যক্তিজীবনেও যেমন সুখদেয়ত্তক, তেমনি সাহিত্য, শিল্প ও সমাজ সম্বন্ধীয় অতীতের ঘটনা-বৈচিত্র্য কেবলমাত্র পুরাতত্ত্ববিদদের নিকটেই নয়, সাধারণ মানুষের জীবনেও বহুলাংশে শিক্ষাপ্রদ ও কৌতূহলোদ্দীপক। এই সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতেই অতঃপর 'পুনশ্চ'র আত্মপ্রকাশ। ইতোমধ্যে আমরা অতীতের বিশিষ্ট ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনা-সমূহের সমাহার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সাহায্যে আমাদের সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের কাছে উপস্থিত করব।]

বাংলা রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে অতীতের বহু ইতিহাস, রঙ্গমঞ্চ, নাট্যশালা ও বহু নট-নটীর বিচিত্র কথা-কাহিনী বহু পত্রিকার মাধ্যমে ইতিমধ্যে প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়েছে এবং সভা-সমিতিতেও আলোচিত হচ্ছে ও হবে। বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের পঞ্চাশ বছর পূর্তিতেও এ ধরনের কিছু কিছু সমারোহ দেখা দিয়েছিল নাট্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতেও নানা ধরনের রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে আমরা 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত, তৎকালীন নাট্যসমাজের অগ্রগণ্য অভিনেতা ও খ্যাতিমান লেখক রসরাজ অমৃতলাল বসু যে কবিতাটি রচনা করেন এখানে তা আমরা উদ্ধৃত করে দিলাম। এ থেকে নাট্যজগতের প্রতি তাঁর প্রভূত আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা প্রকাশ পায়। কবিতাটি হচ্ছে—

আজি এ উৎসব-রাতি আনন্দে মাতিছে মন।
স্মৃতি-সাথী হোলো পথে কত কথা পুরাতন।
অর্দ্ধ শত অব্দ হইল বিগত,
জাতীয়তা শব্দ নব কর্ণগত,

নবীন তরঙ্গ-ভঙ্গে বঙ্গ-অঙ্গ আন্দোলন।।
মহর্ষি মন্দিরে এ মহানগরে,
কবি-মুখে স্বরে জাগ রে জাগ রে,

বন্দ্যো হেমচন্দ্র দুন্দুভি নিনাদে
ঘোষে জাগরণ।।
দৃপিত্তে তামস অলস নিশির,
যশোর-কেশরী আসিল শিশির,

নরে শিশুপাল সে নব-গোপাল করে
মেলা বিরচন।।
স্বধর্ম্মে আবার ফিরিল বিশ্বাস,
দেশ-মন্ত্রে সবে কৌশল বিন্যাস,

ন্যাশনাল ব্যায়াম অভ্যাস করে
বহু যুবজন।।
সাহিত্য অকাদেমী, সুরেন্দ্রনাথ,
রাজু, শশিভূষণ, বঙ্কিম, অক্ষয়,

সিংহ মহোদয়, প্যারী, রায়,
নবীনাদি বিদ্যা নিকেতন।।
নাটকের হাটে রামনারায়ণ,
দত্ত মিত্র বসুজ মনোমোহন,

ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ যতীন্দ্র উৎকৃষ্ট রচে
নাট্য প্রহসন।।
নবীন লেখনী ধরিল তখন,
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রতিভার খনি,

খুঁজে হরলাল ক্ষত্র তরোয়াল
নাটকে সৃজিল রণ।।
সেই ধন্য দিনে পুণ্যদ অঘ্রাণে,
অভিনয় কলা-কুসুম আঘ্রাণে,

কতিপয় যুবা-চিত অতিশয় হয় উচাটন।।
ধনীর ভবনে বিনা নিমন্ত্রণে,
যেতে নাহি পারে সাধারণ জনে,
অভিমান নিতে দান মানীগণে করে নিবারণ।।
জাতীয় ভাবেতে মাতি অতঃপর,
সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত খ্যাত বংশধর,

বাগবাজারেতে যুবা কটি ওঠে
ফলাতে স্বপন।।
শ্রীকেশব গঙ্গো আদি নট বঙ্গে,
স্মরিরা সম্ভ্রমে সঙ্গী রঙ্গী সঙ্গে,

রঙ্গালয়-অলঙ্কারে বঙ্গ-অঙ্গ সাজাতে যতন
বন্দ্যোজ নগেন্দ্র দলে কেন্দ্র-স্থল,
কর্ম্মপটু ধর্ম্মদাসে বলে বল,

মরতে ভরত ঋষি গিরীশ অর্দ্ধেন্দু দুইজন।।
নটেন্দ্র মহেন্দ্র মতি বসু শিবু,
গোপাল গোলক কেতু ক্ষেত্রবাবু,

অবিনাশ তিনকড়ি যোগী পূর্ণ
কার্ত্তিক কিরণ।।
বালক বিহারী দন্তি দুলে শিশু,
শ্রীহরিমোহন মুকুন্দ সে আশু,

শশি মাধু গদাই গোপাল ধনী
নিয়োগী ভুবন।।
আগু পাছু কিছু ইহারা উদ্যোগী,
স্বার্থত্যাগী ইহা সবে কর্মযোগী,

সাথে সাথে সত্তসাথে চাঁদ আছে
এই অভয়।।
সাহিত্য কুমার বাঁধ অগ্রগামী
যাদ ফিরে সাম, পথে ধরে স্বামী,

সবাই আমার বড় আপনার সুখের স্মরণ।।
দীপ হ'তে দীপ জ্বলে যে প্রকার,
অচিরে গোচর বঙ্গরঙ্গাগার,

কবি মধুসূদনের রঙ্গমঞ্চে নটী আগমন।।
ছাতুবাবু বংশধর বিধিমতে,
শরৎ সারথী হইল সে রথে,
শ্রীবিহারী চট্টো কুমার উমেশ আদি
নাট্যরথিগণ।।
আদ্যা নটী এলোকেশী সুকুমারী,
জগত্তারিণী শ্যামা নামে নারী,

অক্ষয় গিরীশ হরিদাস আদি
জন-বিনোদন।।
পঞ্চাশ বছর পরেতে নটেশ!
নটকুল মান্য রাখে অপরেশ,

লুটায়ে প্রাচীন শির পরশি হে
তোমার চরণ।
দর্শকেরে হর্ষ দাও নটকুলে
শুভ বরিষণ।।

চিরাশ্রিত
শ্রীঅমৃতলাল বসু।

[স্টার থিয়েটার, ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩২১]

* * *

পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর একটি অভিভাষণ থেকে তৎকালীন নাটক ও নাটকাভিনয় সম্বন্ধে কিছু উক্তি এখানে কিছু উল্লিখিত হ'ল। এই অভিভাষণটি শ্যামাচরণ কবিরত্ন সম্পাদিত 'সাহিত্য-সংহতি' পত্রিকায় (বৈশাখ, ১৩২১) প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গত তিনি বলেন—

"...প্রথম প্রথম নাটকগুলি সংস্কৃতের অনুকরণে লিখিত হইত, কিন্তু অভিনয় ইংরেজী ধরণেই হইত। কারণ সেকালে হিন্দুদের যে প্রেক্ষাগৃহ বা থিয়েটার ছিল, যেরূপে সেই গৃহ নির্মিত বা সুসজ্জিত হইত, তাহা এখনও লোকে জানে না। আশী বৎসর পূর্বে (অর্থাৎ লেখক ১২৪১ সালের কথা বলছেন) সে কথা জানিবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। সুতরাং থিয়েটারও ইংরেজী ধরনে হইত,

।। সতের ।।

স্ত্রীর অনুযোগ শুনে বাণীব্রত শুধু হাসলেন। একটি কথাও বললেন না। আসলে মানুষটার এমনি অমায়িক স্বভাব। কোনো বিষয়েই হৈ-চৈ, মাতামাতি নেই। বরং একটু চুপচাপ, নীরব থাকার ইচ্ছে।

অল্প হাসলে তাকে খুব সুন্দর দেখায়। বয়সের একটা সৌন্দর্য আছে। বাণীব্রতকে হাসতে দেখলে সেই কথাটা মনে পড়ে। পলিমাটির মত নরম মসৃণ মুখ। দৃষ্টির মধ্যে কার্তিক-অঘ্রাণের পাকা ধান-ক্ষেতের মত একটা পূর্ণতার ভাব আছে। বাণীব্রত খুব বেশী কথা বলেন না। কিন্তু যেটুকু বলেন, তাই যথেষ্ট। তার মধ্যে একটা ভাববার বিষয়বস্তু থাকে।

তাকে চিন্তামগ্ন দেখে কিরণ বলল,—'মা কিন্তু ঠিকই বলেছে বাবা। অফিস থেকে ফিরে আসবার পর তুমি যেন কেমন গম্ভীর হয়ে গেলে।' একটু থেমে সে আবার লঘু স্বরে প্রশ্ন করল,—'দাদার চাকরির খবর শুনে তোমার মন খারাপ হয়ে গেল নাকি?'

বাণীব্রত জানেন তাঁর মেজছেলে কিরণ কিঞ্চিৎ বাকপটু। কথাবার্তায় চৌকস। ভেবেচিন্তে এমন কোণঠাসা ধরনের সব প্রশ্ন করে যে উত্তর না দিয়ে রেহাই নেই। বাণীব্রত তাই হেসে বললেন, —নারে, মিলুর চাকরির খবর শুনে আমার মন খারাপ হবে কেন? আমি অন্য কথা চিন্তা করছিলাম।'

—'অন্য কথা আবার কি?' মনোরমা ঈষৎ সন্দিগ্ধ সুরে প্রশ্ন করল।

বাণীব্রত ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন,—'চিন্তার বিষয় আছে বৈকি কিরণ। একটু তলিয়ে দেখলে তোরাও সব বুঝতে পারবি। তুই বিশ্বাস কর টেলিফোনে খবরটা পেয়ে প্রথমে আমি যেন চমকে উঠেছিলাম। মিলু বলে কি? এমন মোটা মাইনের চাকরি। মাস গেলে প্রায় আট হাজার টাকা হাতে পাবে। এ যে বিশ্বাসই হয় না। আমাদের অফিসের বড় সায়েব আর কত পান? এর অর্ধেকের চেয়ে সামান্য কিছু বেশী হতে পারে। শেষ পর্যন্ত মিলু যে এমনিভাবে কিস্তিমাৎ করবে, তাই কি আমি আগে ভাবতে পারতাম? ঈশ্বর কার প্রতি কখন সদয় হ'ন, কেউ তা বলতে পারে?'

—'বেশ তো, তাই যদি মনে কর, তাহলে অত ভাবনা-চিন্তার কি আছে? ভগবান মিলুর উপর সদয় হয়েছেন, সে ওর ভাগ্য। আমরা পাঁচজনকে বলি। তাই নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করি।'

—'নিশ্চয় করব।' বাণীব্রত সায় দিয়ে বললেন। 'শুধু কি তোমাদের সঙ্গে আনন্দ করলেই হবে? খবর পেয়ে আমার সেক্-শনের লোকেরা তো এখনই বলতে শুরু করেছে। ছেলে আমেরিকায় যাওয়ার আগে তাদের একদিন ভালো করে খাওয়াতে হবে।'

—'ওমা!' মনোরমা গালে হাত রাখল। পরিহাসের সুরে বলল,—'অফিস শুদ্ধু লোক এরই মধ্যে সব জেনে গেল? তুমি কি ঢাক-ঢোল পিটিয়ে খবরটা চাউর করে এলে নাকি?'

বাপের পক্ষে কিরণ ওকালতি করল। 'তুমি মিছিমিছি ঠাট্টা করছ মা। অফিসের ঘর তো নয়। যেন হাট-বাজার। টেলিফোনে বললে আশেপাশের লোকেদের কানে সব খবরই যায়। কিছুই চাপা থাকে না। তাছাড়া ছেলে আমেরিকায় যাচ্ছে। এ তো একটা জব্বর খবর। বাবা যদি ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সে-খবর জানিয়ে আসে, তাহলে কিছু দোষের হয় না।'

মিলন এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। তার স্বভাব কিছুটা বাণীব্রতর মত। বেশী কথা বলে না। বরং মিতভাষী। চুপচাপ থাকতেই পছন্দ করে। সে জিজ্ঞাসা করল, —'কিন্তু বাবা, তুমি অন্য কথা কি চিন্তা করছিলে, তা আমাদের এখনও বলনি।'

—'আমি বুঝতে পেরেছি মিলু। তুই আমার চিন্তা-ভাবনার কারণ জানবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিস।' বাণীব্রত হেসে ছেলের মুখের দিকে তাকালেন। বললেন, —'তোর টেলিফোন পাওয়ার পর যতক্ষণ অফিসে ছিলাম, খুব আনন্দ লাগছিল। আমার টেবিলের চারপাশে সারাক্ষণ লোকের ভিড়। তাদের সকলের প্রশ্ন,—ছেলে আমেরিকায় কি চাকরি পেল? কত টাকা মাইনে? কবে রওনা হবে? কেউ তারিফ করে বলল, —'বাহাদুর ছেলে তোমার। এই কলকাতায় বসে সাত-সমুদ্দুর পারের একটা আট হাজার টাকা মাইনের চাকরি বাগিয়ে নিল।' তারপর এক সময় অফিস থেকে বেরিয়ে নীচে এলাম। আর কি অদ্ভুত ব্যাপার দ্যাখ্‌, ট্যাক্সিতে উঠে একা হবার পর আমার মনের ভিতর এই ভাবনা-চিন্তাগুলো এসে জড় হল।'

বাণীব্রত তার আগের কথার জের টেনে বললেন—'জানিস মিলু, অনেক দিন আগে অবন্তীর বিয়ের ঠিকঠাক হবার পর আমার মনটা এমনি খারাপ হয়েছিল। তোর মার হয়তো মনে আছে। অফিস থেকে বাড়িতে ফিরে আমি অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিলাম।'

কিরণ প্রশ্ন করল, —'তুমি দিদির বিয়ের কথা বলছ বাবা?'

—'হ্যাঁরে কিরণ, তোরা তখন ছেলে-মানুষ। তোর দিদির বিয়ের জন্য অনেক চেষ্টা করলাম। অমন দশ-পনের জায়গায় বিয়ের সম্বন্ধ হল, কথাবার্তা চলল। আবার ভেঙেও গেল। শেষে অরুণের বাবা রাজি হলেন। একদিন অফিসে গিয়ে ওর চিঠি পেলাম। মেয়ে পছন্দ হয়েছে তার। দেনা-পাওনাতেও আপত্তি নেই। ছেলের বিয়ে সামনের অঘ্রাণেই দেবার ইচ্ছে। অসুবিধে না হলে আমি যেন সত্বর তার সঙ্গে দেখা করি।'

বাণীব্রত শুকনো ঠোঁটের উপর জিভটা একবার বুলিয়ে নিয়ে কের শুরু করলেন, —'জানিস মিলু, অফিসে দু-একজন বন্ধু-

গোবিন্দনগরে শিবমন্দিরের পোড়ামাটির ভগ্নমূর্তি

বাঙলার মন্দিরে

কালনার দেবমন্দির ও মসজিদ

[illegible]

পুরাবস্তুর অনুসন্ধানে যাঁরা আমাদের এই বাংলাদেশের নানাস্থানের মাটি খুঁড়ে প্রাচীনকালের অনেক দুষ্প্রাপ্য বস্তুর উদ্ধার করেন তাঁরা প্রাচীন ইতিহাসের অনেক মূল্যবান উপকরণ যে ইতিহাসপ্রেমীদের উপহার দিয়ে থাকেন তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু আমাদের চোখের সামনে যে অসংখ্য দেবালয় ও মসজিদ রয়েছে তাদের প্রতি আজও আমাদের অনেকের দৃষ্টি পড়ে নি (অবশ্য বিদেশীরা এ নিয়ে অনেক আগে থেকেই সাগ্রহে গবেষণা করে আসছেন)। উপযুক্ত দৃষ্টি দিয়ে এসব মন্দির-মসজিদগুলি লক্ষ্য করলে প্রাচীন বাংলার অনেক লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করা যে সম্ভব হবে সেকথা বলাই বাহুল্য। এগুলির প্রাচীনত্ব মৃত্তিকান্তর থেকে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুগুলির তুলনায় নিতান্ত নগণ্য হলেও বাঙালীর কয়েক শ বছর আগের ইতিহাস এগুলি থেকে যে অনেকাংশে পাওয়া যেতে পারে তাতে সন্দেহ নেই। বাংলার এসব মন্দির-মসজিদের গায়ে পোড়ামাটির কাজের যেসব নমুনা সেগুলি থেকে একদিকে বাঙালীর শিল্প ও ধর্মবোধের যেমন পরিচয় পাওয়া যায় অন্যদিকে সামাজিক ইতিহাসের নানা উপকরণও এর থেকে সংগ্রহ করা যায়। তাই বর্তমানের দৃষ্টিতে এরা উপেক্ষণীয় বলে মনে হলেও সত্যাগ্রহী ঐতিহাসিকের জন্যে এসবের এক বিশেষ প্রয়োজন আছে।

বাংলার শহর ও নগরস্থানীয় অঞ্চলে যেখানে সেকালের রাজা ও ধনী জমিদারদের রাজধানী ও বাসস্থান কেন্দ্রীভূত ছিল বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মন্দিরের আধিক্য সেখানেই যে লক্ষ্য করা যায় সেকথা বলাই বাহুল্য। তাছাড়া রাজা ও ধনী-জমিদারেরা অনেক সময় রাজধানী ছাড়া গঙ্গাতীরের কোনস্থানে রাজকার্য পরিচালনা বা অবসর-বিনোদনের জন্যে নিজেদের যে আবাস তৈরী করতেন সেসব অঞ্চলেও মন্দিরের বাহুল্য লক্ষ্য করা যায়। গঙ্গাতীরবর্তী প্রাচীন কোন শহরে মন্দিরের সংখ্যাধিক্য আমাদের চোখে পড়ে। এপ্রসঙ্গে হুগলি জেলার গুপ্তিপাড়া ও বর্ধমানের অম্বিকা-কালনার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অম্বিকা-কালনার মন্দিরগুলির বৈশিষ্ট্য হল এদের উচ্চতা ও টেরাকোটা প্রাচুর্য। এই উভয়ের সমন্বয় বাংলাদেশের খুব বেশী একটা মন্দিরে দেখা যায় না। সেদিক থেকে অম্বিকা-কালনার মন্দিরগুলি আর বেশির ভাগই আঠারো শতকে তৈরী হয়েছিল) উল্লেখযোগ্য পুরাবস্তু হিসেবে এ প্রসঙ্গে আলোচ্য।

অম্বিকা-কালনা শ্রীচৈতন্যের বা তৎপূর্ববর্তী সময় থেকেই বৈষ্ণবধর্মের এক প্রসিদ্ধ পীঠস্থান বলে পরিগণিত হলেও পরবর্তীকালে এ অঞ্চলে শাক্ত, শৈব প্রভৃতি নানা ধর্মের বিকাশ ঘটেছিল। অবশ্য চৈতন্যের আবির্ভাবের অনেক আগেই এ

পঞ্চানন রায়

অঞ্চলে জৈনধর্মীদের উপাস্য দেবী অম্বিকা এ অঞ্চলে পূজিতা হচ্ছেন যিনি এখন সিদ্ধেশ্বরী দেবীতে রূপান্তরিতা হয়েছেন। এই অম্বিকার নামানুসারে সেকালে ঐ স্থানের নাম হয়েছিল অম্বিকানগর। আঠারো শতকের গোড়ার দিকে অম্বিকানগরের কবি প্রাণবল্লভ ঘোষের 'জাহ্নবী-মঙ্গল' কাব্যের পুঁথি থেকে অম্বিকা-কালনার প্রাচীন নাম যে অম্বিকানগর ছিল তা জানা যায়। প্রাচীন অম্বিকাদেবী অম্বিকা-কালনায় এখন সিদ্ধেশ্বরী নামে পরিচিতা। ইনি চতুর্ভুজা কালীমূর্তি, শিবের বক্ষের উপর দণ্ডায়মানা। সিদ্ধেশ্বরীর বর্তমান জোড়বাংলা মন্দিরটি তৈরী করিয়েছিলেন কীর্তিচন্দ্রের পুত্র চিত্রসেন ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে। একজোড়া দোচালা মন্দির পরস্পর সংযুক্ত হয়ে এটি একটি জোড়বাংলা মন্দিরে পরিণত হয়েছে। মন্দিরটির সামনের দিকে ওপরে যে শিলালিপিটি আছে সেটি হল :

"শুভমস্তু শকাব্দা ১৬৬১।২।২৬।৬ শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী দেবী শ্রীযুক্ত মহারাজা চিত্রসেন তস্য মিস্ত্রী শ্রীরামচন্দ্রস্য।" দক্ষিণমুখী এ মন্দিরটিতে পোড়ামাটির কারুকার্য বিশেষ কিছু নেই, শুধুমাত্র থামের ওপর সমুখের তিন প্রস্থে দুটি দুটি করে পোড়ামাটির ফুল ছাড়া। বক্রাকৃতি কার্ণিসের নীচে টেরাকোটা টালি বসাবার জন্যে বক্রাকার সারি আছে। সিদ্ধেশ্বরীর এ মন্দিরটির অনুরূপ আর একটি মন্দির কাঞ্চননগরে আছে। এদের উভয়ের সাদৃশ্য দেখে মনে হয় একই মিস্ত্রী বোধহয় এগুলি তৈরী করেছিলেন। সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের ঠিক পুবে আছে চারটি আটচালা শিব-

মন্দির। এঁদের একটির প্রতিষ্ঠাত্রী হলেন কুমার মিত্রসেনের ধর্মপত্নী ও মহারাজ ত্রিলোকচন্দ্রের মাতা লক্ষ্মীদেবী। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি এখানে একটি শিবমন্দির তৈরী করিয়েছিলেন। সিদ্ধেশ্বরী বাড়ীর আর একটি শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা হলেন বর্ধমান রাজবাড়ীর [illegible]। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি শিবমন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কবি ভারতচন্দ্র এই রাজাদের [illegible] থেকেই তাঁর বিখ্যাত নাটক রচনা করেছিলেন।

বর্তমানে কালনার প্রায় সব মন্দির-গুলিই তৈরী করিয়েছিলেন বর্ধমানের মহারাজারা। কালনা শহরে বর্ধমান রাজার প্রতিষ্ঠিত বহু মন্দির ও গঙ্গাতীর-বর্তী একটি সমাজবাড়ী আছে। এই সমাজবাড়ীতে বর্ধমান রাজা ও রাজবংশের ব্যক্তিদের স্মৃতিমন্দির বর্তমান। কালনার বর্তমান বাজারের ঠিক দক্ষিণেই প্রাচীর-বেষ্টিত রাজবাড়ীর বিরাট এলাকার মধ্যে যে কয়েকটি মন্দির আছে তার সবগুলিই প্রায় সুদৃশ্য ও সুউচ্চ। নিজস্ব, মিশ্র ও বিদেশিক সব রীতির মন্দিরই রাজবাড়ীর সংলগ্ন এই এলাকায় দেখতে পাওয়া যায়। এই এলাকার মধ্যে চালা, চাঁদনী, ইস্লামীয় ও বহুচূড় মন্দির আছে। বাজার অতিক্রম করে প্রধান ফটক দিয়ে ঢুকলেই ডানদিকে একটি আটচালা মন্দির দেখতে পাওয়া যায়। এটি প্রতিষ্ঠা করেন মহারাজা তেজশ্চন্দ্র ১৭০৫ শকাব্দ বা ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে। দক্ষিণমুখী এই মন্দিরটির সামনে পোড়ামাটির অক্ষরে যে লিপি আছে সেটি হল :

বাণব্যোমধরাধরেন্দুগণিতে শাকে
শশাঙ্কপ্রভ—
শ্রীকন্দস্য নিবাসমন্দিরমিদং
রাধাপতিপ্রীতয়ে
ধীর শ্রীযুত তেজচন্দ্রধরণী ধৌরেয়
চূড়ামণে
র্মূর্তিং সম্প্রতি নির্মমে সুরুচিরং
ক্ষেত্রং শিবকাথোপমে।।　　১৭০৫।।

মহারাজ তেজশ্চন্দ্র শ্রীকন্দর্পের এই মন্দির ও মূর্তি তৈরী করিয়েছিলেন। বর্তমানে মন্দিরের ভেতরে শ্বেতপাথরের শিবলিঙ্গ স্থাপিত। উদ্ধৃত সংস্কৃত লিপিটির অর্থ হল : বাণ=৫, ব্যোম=০ ধরাধর (পর্বত)=৭ ইন্দু=১। বাঁদিক থেকে অঙ্কগুলি সাজালে হবে ১৭০৫। এই ১৭০৫ শকাব্দ বা ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজাধিরাজ শ্রীযুত তেজশ্চন্দ্র গঙ্গাতীরবর্তী অম্বিকা নামক নগরে রাধাপতির (কৃষ্ণের) প্রীতির জন্যে শ্রীকন্দর্পের বাসগৃহ এই মন্দির ও মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন। মন্দিরটির সামনের দিকে কার্নিশের নীচে কোন টেরাকোটা নেই। শুধু সারি সারি খোদাই ফুল ও [illegible] তিন প্রবেশের খিলানের ঠিক ওপরে শিবের প্রতীক দেউল ও দেউলের [illegible] প্রতীক শিবলিঙ্গ। প্রতীক দেউলগুলির [illegible] [illegible] ও [illegible] শিখর—৪+৪, [illegible] শিখর—৪+৪ ও [illegible]

অনন্তবাসুদেবের আটচালা মন্দিরে পোড়ামাটির কাজের নমুনা

৪+৪। চারটি প্রতীক দেউলের ঠিক মাঝখানে ওপরে ওপরে স্থাপিত কলস ও সকলের ওপরে কলসে পতাকা। এ মন্দিরে পোড়ামাটির কাজ যে একেবারে নেই তা নয়, ভিত্তিবেদির ঠিক ওপরের মন্দিরগাত্রে কৃষ্ণলীলা, নৌকাবিলাস ও যুদ্ধদৃশ্যের টেরাকোটা আছে। গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বারের দুদিকে দুই দ্বারী বর্তমান। এ মন্দিরটির গায়ে পোড়ামাটির সুন্দর সুন্দর বহু ফুল আছে।

রাজবাড়ী এলাকার অন্তর্ভুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের সংলগ্ন আর একটি আটচালা শিবমন্দির (কতকটা কাটাচালের বিষ্ণুপুরী ধাঁচের তৈরী) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কুমার মিত্রসেনের ধর্মপত্নী মহারাজ ত্রিলোক-চন্দ্রের মা লক্ষ্মীদেবী। এই আটচালা মন্দিরে বিজয়াদিবৈদ্যনাথ শিবলিঙ্গ তিনি স্থাপন করেছিলেন। মন্দিরে কালো পাথরের তৈরী একটি শিবলিঙ্গ বর্তমান। মূল লিপিটি নেই (সম্ভবত এটি পোড়া-মাটির অক্ষরে ছিল) তার বদলে মন্দির-দ্বারের ঠিক ওপরে মার্বেল পাথরে কালো হরফে খোদাই করা তিনটি সংস্কৃত শ্লোক আছে। কোন তারিখ বা প্রতিষ্ঠাকালের উল্লেখ নেই। তবে এ মন্দিরটির ঠিক পাশেই দক্ষিণদিকে কৃষ্ণচন্দ্রের যে পঁচিশ-চূড়ার বৃহৎ মন্দিরটি আছে সেটিও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহারাজ তিলকচন্দ্রের মা লক্ষ্মী দেবী ১৬৭৩ শকাব্দ বা ১৭৫১ খৃস্টাব্দে। এই আটচালা শিবমন্দিরটি খুব সম্ভব কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দিরের আগে তৈরী হয়েছিল। লিপির তিনটি সংস্কৃত শ্লোক হল :

কুমার শ্রীমিত্রসেন ধর্মপত্নী
প্রিয়ান্বিতা।
লক্ষ্মী দেবী বৈদ্যনাথং সমারাধ্য
সন্তার্থিনী।।২।।
ত্রিলোকচন্দ্রং তনয়ং লব্ধা
দেবপ্রসাদতঃ।

মজলিস সাহেবের প্রাচীন ধ্বংসপ্রায় মসজিদের সামনের দিক

নির্মায় মন্দিরমিদং কারুকার্য
সুশোভিতম্ ॥২॥
বিজয়াদিবৈদ্যনাথ নাম্নাত্র
শিবলিঙ্গকম্ ।
মহেশ্বরস্য প্রীত্যর্থং স্থাপয়ামাস
ভক্তিতঃ ॥৩॥

শ্লোকগুলির অর্থ হল—কুমার শ্রীমিত্র-সেনের ধর্মপত্নী শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবী পুত্রাভিলাষী হয়ে বৈদ্যনাথের আরাধনা করে তাঁর কৃপায় ত্রিলোকচন্দ্রকে পুত্ররূপে লাভ করেছিলেন। মহেশ্বরের প্রীতির জন্যে সুন্দর কারুকার্যে শোভিত এ মন্দিরটি নির্মাণ করে ভক্তিসহকারে বিজয়াদি-বৈদ্যনাথ নামক শিবলিঙ্গ এখানে স্থাপন করেছিলেন। মহারাজ ত্রিলোকচন্দ্র কীর্তি-চন্দ্রের * ভাই কুমার মিত্রসেনের পুত্র। কীর্তিচন্দ্রপুত্র চিত্রসেনের মৃত্যুর পর ১৭৪৪ খৃস্টাব্দে তিনি বর্ধমানের রাজপদে অভিষিক্ত হন। ত্রিলোকচন্দ্রের জন্ম অন্তত এর থেকে কুড়ি বছর আগে ধরলে ১৭২৪ খৃস্টাব্দ বা তার কিছু পরে এই আটচালা মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাকাল বলে অনুমান করা যায়। অন্তত উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোকগুলির অর্থ থেকে তাই মনে হয়। মূল লিপিতে সম্ভবত শকাব্দের উল্লেখ ছিল বলেই মনে হয়। কোন কারণে সেটি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় পুনঃস্থাপন করা আর সম্ভব হয়ে ওঠে নি। শ্রীরূপের আটচালা মন্দিরের মতো এটির গর্ভগৃহদ্বারের বামে ও ডাইনে চারটি করে আটটি প্রতীক শিবলিঙ্গ খোদিত। সামনের দালানের থামের প্রতি খিলানের ওপরে বামে ও ডাইনে পাঁচটি করে মোট দশটি হিসেবে তিনটি খিলানে ত্রিশটি প্রতীক দেউল উৎকীর্ণ। ফুল ও লতাপাতা নক্সার প্রাচুর্য এ মন্দিরটিকে যথার্থই 'কারুকার্যসুশোভিত' করেছে। এ মন্দিরটির আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এর সুন্দর সুন্দর পোড়ামাটির কাজ। সামনের দালানের কার্নিসের নীচে দুটি প্যানেলে এবং বাঁ ও ডান পাশের ঊর্ধ্বাধ প্যানেলের মাঝে মাঝে পোড়ামাটি টালি আঁকিত।

আমাদের আগের উল্লিখিত শ্রীরূপের আটচালা মন্দিরটির শুধু সামনের দিকের দেওয়ালের নীচে ভিত্তিভূমির একটু ওপরে মন্দিরগাত্রে পোড়ামাটির কিছু কিছু কাজের উল্লেখ করেছি। কিন্তু আলোচ্য এ মন্দিরটির সামনের প্রায় সব স্থানেই টেরাকোটা দেখতে পাওয়া যায়। এর পোড়া-মাটি নক্সায় যে দৃশ্যগুলি আমার চোখে আকর্ষণীয় বলে মনে হয়েছে সেগুলি হল : কৃষ্ণের বিরহে রাধার স্মরশয্যা, শ্রীকৃষ্ণের নৌকাবিলাস, কৃষ্ণকে নিয়ে বসুদেবের যমুনাতরণদৃশ্য, দেবকীক্রোড়ে কৃষ্ণের জন্ম, পুতনাবধ প্রভৃতি। সামাজিক চিত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : শিবিকারোহণে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে জমিদারের যাত্রা, সামনে পেছনে লোকলস্কর, শিকারদৃশ্য, হাতি, ঘোড়া, উট প্রভৃতি। এই ভাস্কর্য-গুলি এবং ফুল লতাপাতার সুন্দর সুন্দর নক্সাগুলির জন্য এটি কালনার অন্যতম দর্শনীয় মন্দিররূপে গণ্য হবার যোগ্য। পোড়ামাটির অলঙ্করণ শুধু সামনের দিকেই, পাশে ও পেছনে কিছু নেই।

কৃষ্ণচন্দ্র বাড়ীর প্রাচীরের পশ্চিম পাশে উত্তর থেকে দক্ষিণে পাশাপাশি স্থাপিত রয়েছে ছোট বড় পাঁচটি আটচালা শিব-মন্দির, কোন লিপি বা অলঙ্করণ এগুলিতে নেই। এগুলির পাশেই ঐ এলাকার একমাত্র চাঁদনী মন্দিরটি রয়েছে। এ মন্দিরটির গায়ে মার্বেল পাথরে কালো হরফে খোদিত যে লিপি সেটি মূল লিপির পুনঃস্থাপন বলে অনুমান করা যায়। এ লিপিটি থেকে জানা যায় ১৬৮৬ শকাব্দে বা ১৭৬৪ খৃস্টাব্দে এটি তৈরী হয়েছিল। চাঁদনী ধরণের আর কোন মন্দির রাজবাড়ীর ভেতরে বা বাইরে কোনস্থানে নেই। মন্দিরটিতে কারুকার্য বিশেষ কিছু নেই।

রাজবাড়ী এলাকার দক্ষিণ ফটকের বাইরে রাস্তার ঠিক দক্ষিণ দিকেই কালনার বিখ্যাত একশ আটটি শিবমন্দির। এগুলি সবই আটচালা রীতির। মহারাজ তেজশ্চন্দ্র এগুলি তৈরী করিয়েছিলেন। অন্তর্বলয়ে স্থাপিত এ মন্দিরগুলির প্রথম মণ্ডলে আছে চুয়াত্তরটি মন্দির। প্রথম এই মণ্ডলটির ভেতরে আর একটি যে মণ্ডল রয়েছে তাতে মন্দিরের সংখ্যা হল চৌত্রিশ। সামনের ফটকটির দুপাশে দুটি মন্দির। ফটকটির প্রবেশপথের ওপরে উৎকীর্ণ লিপিটি সংস্কৃতভাষায় রচিত। বেশ উঁচুতে থাকার জন্যে উদ্ধার করা বেশ কষ্টসাধ্য। তা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ লিপিটি যা উদ্ধার করতে পেরেছি (অবশ্য কিছু ভুল-ভ্রান্তি যে আছে তাতে সন্দেহ নেই) সেটি হল :

শাকে চন্দ্রগ্রহাব্ধিবাণেন্দু (?) কুমিতে
শ্রীতেজশ্চন্দ্রাভিধেয়ো
রাজা সূর্য ইব ক্ষিতারর্পিত
চণ্ডচণ্ডপ্রতাপানলঃ।
অন্যো ধর্ম পরং নবাধিকশতং
শ্রীমন্দিরৈর্মণ্ডলং
প্রাকারান্মহদম্বিকাখ্যনগরে
কৈলাসমেতং নবম্।

লিপিটির প্রথম সারিতে শকাব্দের উল্লেখ আছে। কিন্তু অস্পষ্টতার জন্যে এটির উদ্ধারে কিছু ভ্রান্তি ঘটায় সময় ঠিক ঠিক নিরূপণ করা বর্তমানক্ষেত্রে কঠিন। তেজশ্চন্দ্রের রাজ্যকাল ১৭৭০ খৃস্টাব্দ থেকে ১৮৩২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত। এ প্রবন্ধে উল্লিখিত প্রথম আটচালা মন্দিরটি তেজশ্চন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৭৮৩ খৃস্টাব্দে। তাই এ মন্দিরমণ্ডল সম্ভবত এ সময়ের কাছাকাছি বা কিছু পরে প্রতিষ্ঠিত বলে মনে হয়। অবশ্য লিপির ঐ অংশটি সঠিক উদ্ধার না করা পর্যন্ত কোন কিছু বলা যুক্তিসঙ্গত নয়।

রাজবাড়ী এলাকার মধ্যে বেশ বড়ো দুটি রত্নমন্দির ও একটি সুদৃশ্য ইসলামীয় রীতির দেউলের কথায় পরে আসছি। এ প্রবন্ধ শেষ করার আগে কালনার উল্লেখযোগ্য আর একটি আটচালা মন্দিরের কথা অবশ্যই বলা দরকার। এ মন্দিরটি রাজবাড়ী এলাকার অনেক দূরে পশ্চিমে সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের কাছাকাছি গঙ্গাতীরবর্তী অনন্তবাসু-দেবের। এ আটচালা মন্দিরটি কতকটা বিষ্ণুপুরী কাটাচাল ধরনের। প্রতিষ্ঠাকাল ১৬৭৬ শকাব্দ। অঙ্কে শকাব্দের উল্লেখ-লিপির প্রথমেই আছে। লিপির প্রথম অংশটি হল : 'রসাব্ধিরসচন্দ্রাঙ্ক' অর্থাৎ রস=৬ অব্ধি (সমুদ্র)=৭ রস=৬ চন্দ্র =১। বামদিক থেকে অঙ্কগুলি সাজালে হবে ১৬৭৬ শকাব্দ বা ১৭৫৪ খৃস্টাব্দ। বহু উঁচুতে উৎকীর্ণ বলে লিপির সম্পূর্ণ অংশ উদ্ধার করা যায় নি। তবে লিপির মধ্যে কীর্তিচন্দ্র ও তিলকচন্দ্রের নাম আছে। মনে হয় তিলকচন্দ্র বা তাঁর মাতা এটি প্রতিষ্ঠা করেন।

টেরাকোটার ক্ষেত্রে কালনার অনন্ত-বাসুদেবের এই আটচালা মন্দিরটি কালনাটি নবরত্ন মন্দিরের সাথে, শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ দেখাবার মতো

আট

অন্ধকার ভেদ করে ট্রেন ছুটে চলেছে। জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিলাম। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। হয়তো একটা বড় মাঠ রয়েছে চোখের সামনে। মাঠের মধ্যে কোন ঘর-বাড়ি নেই, থাকলে আলো দেখা যেত নিশ্চয়। যদিও বর্ষাকাল নয়, বাতাস ভেজা ভেজা লাগছিল। সহসা কানের খুব কাছে যেন শুনতে পেলাম। 'জানালাটা বন্ধ করে দিই।' ঠিক মার গলা। অথচ মাকে পিছনে রেখে আমি কত দূরে চলে এসেছি। পিছনের একটা অংশের দিকে তাকাতে ইচ্ছে হল।

তখন আমি ছোট। বাবার স্বাস্থ্য ক্রমশই ভেঙে পড়ছে। ডাক্তার বায়ু পরিবর্তনের পরামর্শ দিলেন। আমি, বাবা আর মা ট্রেনে করে চলেছি। ট্রেনের কামরা ফাঁকা। বাবা পিঠের নীচে উঁচু করে বালিশ গুঁজে আধশোয়া মত হয়ে জানালার বাইরে তাকিয়ে আছেন, উল্টোদিককার বেঞ্চিতে আমি আর মা, তখন শীতকাল, হু-হু করে ঠাণ্ডা বাতাস কামরায় ঢুকছে। আমাকে একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে শুইয়ে রাখা হয়েছিল। আমি চুপ করে শুয়েছিলাম, কিন্তু ঘুমোইনি। হঠাৎ মা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'জানালাটা বন্ধ করে দি-ই।' বাবা হয়তো মার কথা শুনতে পেলেন না। যেমন বসেছিলেন, তেমনি বসে রইলেন। মা আবার বললেন, 'তোমাকে বলছি।'

বাবা যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠলেন, 'আমাকে।'

'হ্যাঁ, জানালা দিয়ে হিম আসছে, তোমার ঠাণ্ডা লাগবে।'

বাবা খুব আস্তে কণ্ঠে বললেন, 'জানালা খোলা থাক। ভাল করে শরীর ঢেকে রেখেছি।'

'তোমার হয়ত [illegible] লাগছে, কিন্তু আমার হাত-পা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কী [illegible]'

বাবা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। মনে হচ্ছিল, বাবা হয়তো মার কথার উত্তর দেবেন না। হঠাৎ বাবা বলে উঠলেন, 'নিজেকে দেখার চেষ্টা করছি কমল।' বাবার কথার মধ্যে একটা বিষণ্ণতার সুর ছিল, আমার মন কেমন করে উঠল। কম্বলের ফাঁক দিয়ে আমি বাবা আর মাকে দেখতে লাগলাম। বাবা তখনও বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন, মা বাবার দিকে একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাবা আর মা দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর মা কথা বলে উঠল, 'আর নিজেকে দেখতে হবে না। জানালাটা বন্ধ করে দি-ই।' বলে মা সার্টার নামিয়ে দিল।

বাবা আপত্তি করলেন না। খুব শান্ত ভাবে শুয়ে রইলেন। মা কিছুক্ষণ বাবার বেঞ্চিতে বসে রইল। মা যে একটা হাত বাবার কপালে বুলিয়ে দিচ্ছিল, আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, এক সময় মা ফিসফিস করে বলল, 'অসুখ-বিসুখ প্রত্যেক মানুষের হয়, কেউ এমন মুষড়ে পড়ে না।'

বাবা উত্তর দিলেন না। শুধু শীর্ণ হাত দিয়ে মা'র হাত চেপে ধরলেন।

বড় হয়েও অনেকদিন পর্যন্ত এই ছবিটা চোখের খুব কাছে দেখতে পেতাম। সেদিনের সেই ঘটনাটা আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। কেন করেছিল জানি না। হয়তো বাবা যে বলেছিলেন, অন্ধকারে নিজেকে দেখা যায়, আমি সেই কথাটা বিশ্বাস করতে চাই, যা বাবার সেই বিষণ্ণ দৃষ্টির আড়ালে আমি ক্ষিপ্রগতিতে মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করেছিলাম সেদিন, কিংবা বাবার সেই শান্ত সমাহিত মূর্তি আমাকে ভয়ানকভাবে নাড়া দিয়েছিল। আজ সন্ধ্যায় মা'র যে অবসন্ন চেহারা দেখে এলাম, তা আমার মনকে তীব্র বিষাদে ভরিয়ে তুলেছিল। মনে মনে মার কথা ভাবতে ভাবতে কখন পিছনের একটা অংশ আমাকে আকর্ষণ করল। অতীত মানুষকে দুর্বল করে দেয়। যে সকল [illegible] নিয়ে কিছুক্ষণ আগে ট্রেনে উঠেছিলাম, সেই মন ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible]

শব্দ হতে লাগল। গুম-গুম শব্দে ট্রেন তখন একটা পোল পার হচ্ছে। আবার উঠে বসলাম। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম।

আসার সময় মা বারবার করে বলে দিয়েছে, ওখানে গিয়ে বাড়ি ঠিক করে যেন তাড়াতাড়ি মাকে নিয়ে যাই। অথচ আমি তো জানি, পাটনায় গিয়ে বাড়ি ঠিক করতে দেরী হবে। নতুন চাকরির যোগদান দিতায় করতে হবে। তখন পর্যন্ত পিছু হটবার পথ খোলা রাখা প্রয়োজন। আবার কলকাতায় ফিরে আসতে হতে পারে। শুধু শুধু সংসার পেতে বসা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তার চেয়ে মা মানুকাকার বউমার সঙ্গে থাকুক। কিছুদিন বিশ্রাম নিলে মার শরীরও ভাল হবে। ইদানীং ঘুরে ঘুরে মার সর্দিজ্বর হচ্ছিল। শরীর ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়ছিল। মা এ কথা বলতে চায় না। শরীরের কথা উঠলেই বলে, 'শরীর থাকলেই অসুখ-বিসুখ থাকে; তাই বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে কি মেয়েমানুষের চলে।' মার এ-ধরনের কথা রাগ ধরায়। নিজের সম্বন্ধে মা যদি আর একটু সচেতন হতো কিংবা নিজের সুখ-দুঃখ আমোদ-আহ্লাদ নিয়ে আর কিছুটা মাথা ঘামাত, তাহলে অনেক বেশী নিশ্চিন্ত হতে পারতাম আমি। মা যেন ক্রমশই নিজের সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পড়ছে। যত বেশী নিজের সম্বন্ধে উদাসীন হচ্ছে, তত বেশী আমার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠছে। এই সচেতনতা মাঝে মাঝে আমাকে পীড়া দেয়। আসার কিছুক্ষণ আগে মা আমার খুব কাছে সরে এসে বলেছিল, 'নিতুকে এখন কথা দেবো না। তোর ইচ্ছা না থাকলে কোনদিনই দেবো না। দয়া বা করুণা করে বিয়ে হয় না। সারা জীবনের ব্যাপার কিনা।' তারপর মা খুব নীচু স্বরে বলল, 'বাঁদ আর কাউকে তোর পছন্দ হয়, আমার একটুও আপত্তি নেই।' মা যে [illegible] [illegible] কথাটা বলল, বুঝতে [illegible]।

বাইরে এসে দাঁড়ালাম। চারদিকে অন্ধকার ঘুটঘুটে করছে। চোখের সামনে নিজের হাত তুলে ধরলাম। না, দেখা গেল না। ওপরদিকে তাকালাম, একটাও তারা নেই। কী বিশ্রী যে একটা রাত, কী বলবো! হঠাৎ আমাদের মধ্যে থেকে কে একজন বলে উঠল, 'ঐ দেখুন।' তাকিয়ে দেখলাম, কয়েকটা লালচে আলো এগিয়ে এগিয়ে আসছে। বুঝলাম, গ্রামের লোক ওরা, হ্যারিকেন নিয়ে ছুটে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকগুলো এসে পড়ল। ওরা ভয়ঙ্কর হাঁপাচ্ছিল। হাঁপাতে হাঁপাতে যা বলল, শুনে লালমুখো গার্ডের মুখ কালো হয়ে গেল। মাথায় হাত দিয়ে চেঁচাতে লাগল 'মাই গড, মাই গড,' শেষ পর্যন্ত আমার দিকে নজর যেতেই হঠাৎ দুই হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল, 'কনগ্রাচুলেট মি, মাই গড।' ক্ষমা অবশ্য করে দিলাম। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সেদিন যে দৃশ্য দেখেছিলাম, তা জীবনে ভুলবো না। কী ভয়ঙ্কর প্লাবন মশাই, প্লাবনে নদীর ওপরের পোলটা ভেসে চলে গেছে। আর কয়েক গজ এগোলেই সমস্ত ট্রেনটার সলিলসমাধি হয়ে যেত, বুঝলেন কিনা।'

হঠাৎ অসতর্ক মুহূর্তে বলে ফেললাম, 'শীতকালে প্লাবন?'

ব্রহ্মচারী ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর বেঞ্চির ওপর পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়তে পড়তে বললেন, 'বাবার শেষ আজ্ঞা ছিল, রতন আর যাই করিস, জীবনে মিথ্যে কথা বলিস না। বাধ্য সৈনিকের মত ফাদার্স কমান্ড আজ পর্যন্ত মেনে চলছি মশাই।' বলে টুপি দিয়ে মুখ ঢাকলেন ব্রহ্মচারী।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্রহ্মচারীর নাসিকা গর্জন কানে আসতে লাগল। নিজের বিছানায় এক কোণে বসে রয়েছি। নড়াচড়ার উপায় নেই। ব্রহ্মচারীর একটা হাত এসে আমার উরুতে পড়েছে। নড়লে চড়লে পাছে ভদ্রলোকের ঘুম ভেঙে যায়। ওর শোকাবহ ভঙ্গি ওকে খুব অসহায় করে তুলেছিল।

এতক্ষণ তবু ভাল চলছিল। ভদ্রলোকের গল্প বলার ক্ষমতা অদ্ভুত। সময় বেশ কাটছিল, হঠাৎ প্লাবনের কথায় সব মাটি হয়ে গেল। নিজের ওপর সময় সময় খুব রাগ ধরে। সেদিন যে ওদের সবার তালে পড়ে কাপ্তেনের মুখের ওপর বলে এলাম, আমরা কারা, কথাটার কোন মানে হয় না। এ প্রশ্ন যে কেউ করতে পারে, এর মধ্যে কোন বাহাদুরী ছিল না। কিন্তু স্বার্থ-সিদ্ধির তালে ওরা এমনভাবে পিঠ চাপড়ালো যেন কেউকেটা হয়ে গেছি আমি। নির্বোধের মত আরও কত নীচে নেমে যেতাম কে জানে। সময়মত সুপ্রিয়া এসে টেনে তুলল বলেই না! অথচ ওর সঙ্গেই চরম অভদ্রতা করে এলাম। আমার সময়, সামান্য একটু অনুরোধ, ফোনে দুটো কথা বলা, তাও করলাম না। সম্মান সম্মান করে মরলেই মানুষের সম্মান বাড়ে না, সুপ্রিয়া যে বারবার মাথা নীচু করে আমার কাছে এসে দাঁড়াচ্ছে, কই, ওর মাথা তো নীচু হচ্ছে না। বরং দিনকে দিন অনেক উঁচুতে উঠে চলেছে ও। উঁচুতে উঠলে মানুষ নীচের মানুষকে স্পর্শ করতে চায়। সুপ্রিয়াও হয়ত তাই চায়। অসমান মানুষের মধ্যে আলাপ জমে উঠতে পারে কিন্তু অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে না। আমি ক্রমশই সুপ্রিয়ার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছি। কেউ যে আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে তা নয়। সুপ্রিয়া তো সময় সময় খুব কাছে টেনে নিতে চায়, কিন্তু কোথায় যেন বিরাট একটা বাধা, অতিক্রম করার ক্ষমতা ওর কিম্বা আমার কারও নেই। আমরা সবাই পারিপার্শ্বিকতার দাস, সেই বন্ধন ছিন্ন করে বেরিয়ে আসার পথ কারও জানা নেই।

একটা স্টেশনে এসে গাড়ি দাঁড়াল। একটা লোক চা ফেরি করছিল, খুরিতে করে চা দিল, চা খেতে যাব, ব্রহ্মচারীর গলা কানে এল, 'আমাকে একটা দেবেন।'

'আপনি ঘুমোন নি?' ভদ্রলোককে ঘুমোতে দেবার ইচ্ছে ছিল না।

ব্রহ্মচারী উঠে বললেন, 'নাঃ, ট্রেনে ঘুম হয় না, অথচ কুম্ভকর্ণরা ঠিক ঘুমিয়ে যাচ্ছে। ওরা যদি কোনদিন না জাগতো!' বলতে বলতে অট্টহাসিতে ভেঙে পড়লেন ব্রহ্মচারী। শেষ রাত্রের ঘুম গাঢ় হয়। কারও ঘুম ভাঙল না।

চায়ের খুরিতে চুমুক দিতে দিতে ব্রহ্মচারী বললেন, 'এই যে চা দেখছেন, ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর। চামড়ার গুঁড়ো থেকে হেন জিনিস নেই, যা এতে পাবেন না। আমাদের বিজনেসম্যানেরা ভীষণ অসাধু। অসাধু বলেই উন্নতি করতে পারে না। কিন্তু সাহেবদের দিকে তাকিয়ে দেখুন, কী অনেস্ট জাত—'

'সাহেবদের মধ্যেও আজকাল চোর গজাচ্ছে।'

'আমি বিশ্বাস করি না।' ব্রহ্মচারী হুঙ্কার ছাড়লেন, বিশ্বাস করি না, কারণ আজও দু একজন সাহেব যা দেখতে পাওয়া যায়, তারা কী ভয়ঙ্কর রকমের সাধু চরিত্রের লোক। জানেন, আমার এই বিজনেসের ক্যাপিটাল কে দিয়েছিল? একজন সাহেব। বিলেতে যাবার আগে বলে গেল, বিজনেস করে বড় হও, তারপর চার্চে আমার টাকাটা দিয়ে দিও। দেখো দেখো করেও দেওয়া হচ্ছে না। ভাবছি কোলকাতায় গিয়ে সব ব্যবস্থা করবো, অথচ সেই মৌলিক প্রশ্ন, একটা মানুষ একাই কয় দু জায়গায় থাকতে পারে কী করে? বাড়ি ছেড়ে একটা রাতও কাটানো সম্ভব না আমার পক্ষে। কিন্তু আজকের রাতটা কেটে গেল। জানি না, ওদিকে কী হচ্ছে। মা ভুতের ভয়!'

'আপনার স্ত্রী বুঝি ভূত বিশ্বাস করেন?'

ব্রহ্মচারী কী রকম অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। 'আর বলেন কেন' বলে চুপ করে গেলেন।

ট্রেন চলতেই লাগল। না ঘুমোলে সময় কাটতে চায় না, অথচ আর তিনজন মানুষ তিনটে বার্থে কী সুন্দর ঘুমোচ্ছে, ভোরে ঘুম ভাঙবে ওদের। যে যার জায়গায় নেমে পড়বে।

ব্রহ্মচারী শব্দ করে নস্যি নিলেন। ভদ্রলোকের সবকিছুই লাউড। কথা বলেন চীৎকার করে, হাসেন প্রচণ্ড শব্দে; নস্যি নেওয়াটাও কী অস্বাভাবিক। অথচ কোথায় যেন একটা আকর্ষণ আছে, যা ওঁকে কাছে টানে। ভদ্রলোকের শার্টটা নোংরা, কলারের পেছনটা ছিঁড়ে গেছে, প্যান্টের নীচের দিকে ছিটে ছিটে কাদা। ভদ্রলোকের স্ত্রী নিশ্চয়ই খুব আলসে। আলসে না হলে স্বামীর দিকে আর একটু নজর দিতে পারতেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জামা প্যান্ট পরাতে পারতেন। আমার মা বাবাকে খুব যত্ন করত। বাবা খুব রোগে ভুগতেন, মা নিজের হাতে সেবা যত্ন করত, বাবার সুখ-সুবিধার দিকে সব সময় নজর রাখত। তারপর বাবা মারা গেলেন। মার যা-কিছু সেবাযত্ন আমার ওপর এসে পড়ল। এক-এক সময় অস্বস্তি হয়। মার ব্যবহারে সময় সময় অসহ্য মনে হয়। বুঝি, মা কষ্ট পায়। তবু সময় সময় নিষ্ঠুরের মত ব্যবহার করতে হয়। মার দুঃখ কেউ বুঝল না। বাবা না, আমি না। মা যে একজন রক্ত-মাংসের মানুষ, তার যে সাধ-আহ্লাদ আছে, সামান্য এই কথাটা বোঝার মত উদারতা, অনুভূতি আমার অন্তরে নেই। থাকলে নিশ্চয় বলতে পারতাম তুমি নিভাকে কথা দাও মা, সুবলকে

আশীর্বাদ নৃত্য-পোষাক

ভাইয়ের বিয়ে কখনও হয় না। মামাতো বোন বা পিসতুতো বোনের সঙ্গে বিয়ে-থা চলে। তবে মামাতো বোনের চেয়ে পিসতুতো বোনকে পাত্রী হিসাবে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়। মামাতো বোন বা ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয় বিশেষভাবে। পিতামাতার মতের বিরুদ্ধে অনেক সময় পালিয়ে গিয়েও বিয়ে হয়। তাতে রোমান্স আছে। তবে এসব ক্ষেত্রে পরে বাপ-মাকে মানিয়ে নিতে হয়।

শেরদুকপেনদের মধ্যে এক স্ত্রী বা এক পতির রীতি। বহুপতি বা বহুপত্নীর রীতি এদের সমাজে অচল। রক্ষিতা রাখারও নিয়ম নেই, এদের সমাজে। তবে বিধবা বিবাহের রীতি আছে। আবার স্ত্রী মারা গেলে স্বামীও দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারে।

স্বামী মারা গেলে স্ত্রী স্বামীর বড় ভাই কিংবা ছোট ভাইকে বিবাহ করতে পারে। আবার স্ত্রী মারা গেলে স্বামী বড় শালী কিংবা ছোট শালীকে বিবাহ করতে পারে। এদের প্রথম বিবাহ খুব ধুমধামের মধ্যে হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিবাহ অত ধুমধামের মধ্যে হয় না।

শেরদুকপেনদের মধ্যে আর একটি অদ্ভুত রীতির প্রচলন আছে। ছেলে বা মেয়ে যৌবনে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা আর রাত্রিতে বাড়ীতে শয়ন করে না। তারা বাড়ীর বাইরে অন্য একটি বাড়ীতে শয়ন করে। এই বাড়ীটি সাধারণতঃ গ্রামের অনেকটা ক্লাব-ঘরের মত। এখানে ছেলেমেয়ে সমানভাবে মেলামেশার সুযোগ পায় এবং এইভাবেই তারা ভবিষ্যত জীবনসংগী নির্বাচনের সুযোগ পায়।

বিয়ের পর ছেলে নতুন কনের সঙ্গে প্রথম দশদিন শয়ন করতে পারে না। পরে ছেলের বন্ধুরা তাকে অনুরোধ উপরোধ করার পর ছেলে তার নতুন স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসে রাজী হয়।

শেরদুকপেন সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদের রীতি প্রচলিত। অবশ্য তাতে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ের সম্মতি থাকা দরকার। যদি বিবাহবিচ্ছেদ মেয়ের তরফ থেকে দাবী করা হয়, তবে তাকে যে কন্যামূল্য দেওয়া হয়েছিল তা ফেরৎ দিতে হয়। সাধারণতঃ চারিত্রিক দোষ, শারীরিক অক্ষমতা, রূঢ় ব্যবহার, পারিবারিক অশান্তি এই রকম কোন কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ সম্ভব।

শেরদুকপেন সমাজে পিতাই সংসারের অধিকর্তা হলেও মার স্থান তার পাশেই। সংসারের সব কিছুতেই মায়ের মতামতের মূল্য আছে। মেয়েরা পুরুষদের পাশাপাশি কাজ করে। সেদিক দিয়েও সমাজে তাদের মূল্য আছে।

শেরদুকপেন সমাজে স্থাবর সম্পত্তির অধিকারী মেয়েরা কখনও হয় না। পিতার মৃত্যুর পর ছেলেরাই স্থাবর সম্পত্তির অধিকারী হয়। বেশীর ভাগ অংশ বড়ছেলে পায়। বাকী অংশ সব ছেলেদের মধ্যে সমান ভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়। যদি মৃত ব্যক্তির ছেলে না থাকে তবে তার সম্পত্তির অধিকারী স্ত্রী হয় না। নিকটস্থ আত্মীয় হয়। ব্যক্তিগত পোশাকাদি সাধারণতঃ মৃত দেহ দাহ করার সময় বা হয়, কবর দেওয়ার সময় মৃত দেহের সঙ্গে যায়। তাছাড়া আর বাকি যা থাকে তা সব ছেলেদের মধ্যে সমান-ভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়। সম্পত্তির মুখ্য অংশের অধিকারী যে হবে তাকেই মৃতদেহ সংস্কারের দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে। শেরদুকপেন সমাজে দত্তক নেওয়ারও রীতি আছে। দত্তক পুত্রের অধিকার স্বপুত্রের তুল্যই।

শেরদুকপেন সমাজে বিবাহাদির যেমন উৎসব আছে তেমনি পুত্র-সন্তান জন্মাবার পরও বিভিন্ন উৎসবাদি পালন করা হয়। পুত্র-সন্তান জন্মাবার তিনদিন পরে তার নামকরণের উৎসব হয়। পাঁচদিনের দিন শিশুকে বাইরে বের করে সূর্যদর্শনের জন্য। এই উৎসবের নাম ‘গীনী আছো আছো’। আয়োজন করেন স্থানীয় লামা। শিশুর এক বছর বয়সে কেশচ্ছেদন উৎসব হয়। কেশচ্ছেদন করেন মামা। দিন-স্থির করা হয় স্থানীয় লামার পরামর্শ অনুযায়ী। কেশচ্ছেদনের পরে এই কেশ বাড়ীতে রাখাই রীতি।

প্রতিটি প্রধান গ্রামে একটি করে আঞ্চলিক কমিটি আছে। এই আঞ্চলিক কমিটির নাম ‘জং’। জংয়ের কাজ স্থানীয় দেওয়ানী ও ফৌজদারী সংক্রান্ত সকল প্রকার ন্যায়বিচার পরিচালনা। আঞ্চলিক কমিটির প্রধানকে বলা হয় গাঁওবুড়া বা ‘জিক আকছাও’। আঞ্চলিক কমিটির সভ্যদের বলা হয়—‘থংমী’। এছাড়া থাকে ‘কাচুং’ এবং চৌকিদার। কাচুংদের বলে সাধারণতঃ সংবাদবাহক। এরা গাঁওবুড়াকে সহায়তা করে এবং চৌকিদার রাতে পাহারা দেয় গ্রামে।

কাচুং প্রতি বৎসর অথবা দুই বৎসর অন্তর নির্বাচিত হয়। গাঁওবুড়া একবার নির্বাচিত হলে সারা জীবন ধরে থাকেন যতদিন না পর্যন্ত তাঁর কর্মশক্তি রহিত না হয়। অবশ্য গ্রামের লোক যদি তার ওপর বিশ্বাস না রাখে তবে তাকে পদত্যাগও করতে হতে পারে। গাঁওবুড়ার ছেলে কিংবা ছোট ভাইও গাঁওবুড়া নির্বাচিত হতে পারে গাঁওবুড়ার মৃত্যুর পর। সাধারণতঃ উপযুক্ত ছেলের দাবীই বিবেচিত হয়।

শেরদুকপেনরা মারা যাওয়ার পর সারা বাড়ীতে নেমে আসে শোকের ছায়া। মৃত-দেহকে প্রথমে স্পর্শ করে থংসরা। মৃতদেহ সংস্কারের কাজ করেন ছাওসরা। লামার পরামর্শ অনুযায়ী মৃতদেহকে বিশেষ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় দাহ করার জন্য। আর যদি সে সামর্থ্য না থাকে তবে কবর দেওয়া হয়। মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাওয়ার সময় লামা মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে যান প্রথমে।

শ্মশান বন্ধুদের সেদিন মৃত ব্যক্তির বাড়ী থেকে খেতে দেওয়া হয় এবং প্রত্যেককে পাঁচ টাকা করে দক্ষিণাও দেওয়া হয়। তৃতীয় দিন লামা মৃতব্যক্তির আত্মার শান্তির জন্য জল, চাল এবং মদ্য দান করেন। সেদিন উপস্থিত সবাইকে লাও-পানিও পান করতে হয়। এই একই রীতি সাতদিন ধরে চলে। আবার ১৪ দিনের দিন এবং ২১ দিনের দিনও পর্ব পালন করা হয়। মৃত-ব্যক্তির নিকট-আত্মীয়েরা এই সময় কোন গহনা অংগে ধারণ করেন না। টুপি পরিধান করেন না। মাংস খান না এক বছর। নাচ ও গানেও অংশ গ্রহণ বন্ধ থাকে এক বছর। অনেকটা আমাদের কাল-অশৌচের মত।

শেরদুকপেনরা আজকাল ব্যাপক হারে লেখাপড়া শিখছে। প্রায় প্রতিটি গ্রামেই নিম্ন প্রাইমারী, না হয় উচ্চ-প্রাইমারী বিদ্যালয় আছে। শেরদুকপেনদের একজন ১৯৭১ খৃঃ নরেন্দ্রপুর কলেজ থেকে ইতি-হাসে অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করেছেন। এখন সে বোধহয় এম-এ এবং আই এ এস পরীক্ষার জন্য উৎসাহী। আরও একজন ডিব্রু-গড় মেডিক্যাল কলেজের পঞ্চম বার্ষিকী ছাত্র। আরও কয়েক জন এ বৎসর পুরুলিয়া থেকে হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষা দিয়েছেন।

চিঠিপত্র

'মধ্যযুগের এক অজ্ঞাত কবি' প্রসঙ্গে

'অমৃত'-এর গত ১৭ই কার্তিক শুক্রবার সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীবিমলেন্দুমোহন রক্ষিত মহাশয়ের 'এক অজ্ঞাত কবি' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করলাম। ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত দ্বিজ রামদেবের 'অভয়ামঙ্গল' পুঁথির ভূমিকায় বলেছেন বাংলা সাহিত্যের 'আসল পাঠকের বিষয়' নিয়ে গবেষণা করবেন তাঁদের কিছু সংখ্যকও যদি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অনুসন্ধানে লেগে যান তাহলে বঙ্গভারতীর যথার্থ সেবা করা হবে। তাঁর এ আশা আজ যে কিছুটা পূর্ণ হতে চলেছে তাতে সন্দেহ নেই। 'অমৃত'-এ প্রকাশিত 'অজ্ঞাত কবি' শঙ্কর প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের এক হারিয়ে যাওয়া কবি যাঁর কাব্য সম্পর্কে আজও বিশেষ আলোচনা হয় নি। অবশ্য ডঃ সেন মহাশয় তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে'র (১ম খণ্ড অপরার্ধ ১৯৬৩ সং) ৪০৬ পৃষ্ঠায় শঙ্করের একটি পুঁথির সন্ধান দিয়েছেন। এটি হল কবির 'রঘুপতের পালা' নামক পুঁথি, লিপিকাল হল ১২৩৭ সাল। এটি বর্ধমান সাহিত্যসভার ২৩৫ নং পুঁথি। এ পালার আর একটি পুঁথি হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের। পুঁথির নম্বর ৩৫০৮, লিপিকাল ১২৫৭। শ্রীবসুর প্রাপ্ত 'রঘুপতের পালা' পুঁথিখানি অবশ্য আরেকটু আগের। এর লিপিকাল সন ১১৯৮ সাল। কবি শঙ্করের অনুনাবিষ্কৃত পুঁথিগুলি মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সংযোজন।

এ প্রসঙ্গে মেদিনীপুর জেলার বরদা অঞ্চলের আঠারো শতকের এক শক্তিশালী কবি অকিঞ্চন চক্রবর্তীর নাম উল্লেখযোগ্য। ইতিপূর্বেই এ কবি সম্পর্কে আমার দুটি প্রবন্ধ 'অমৃত'-এ প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিজ নিত্যানন্দ ও শঙ্করের ন্যায় অকিঞ্চনও একটি শীতলা মঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন এবং এ কাব্যও ঘাটাল অঞ্চলে এককালে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। অকিঞ্চনের পুঁথিগুলি আজও প্রকাশিত হয়নি। প্রায় বছর দশেক আগে বরদা অঞ্চল থেকে এ পুঁথিগুলি সংগ্রহ করার সুযোগ আমার হয়েছিল। এগুলি হল চণ্ডী মঙ্গল শীতলামঙ্গল ও গঙ্গামঙ্গল। এছাড়া কবিরচিত অনেকগুলি ভক্তিমূলক পদেরও সন্ধান পাওয়া গেছে। অকিঞ্চনের 'শীতলামঙ্গলে'র গোকুলপালা পুঁথিতে রচনাকাল জানা না গেলেও এতে বর্ধমানরাজ তিলকচন্দ্রের নামের উল্লেখ থেকে অনুমান করা যায় এ কাব্যটি ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দের পরে রচিত হয়েছিল। শ্রীবসুর প্রবন্ধে কবি শঙ্করের 'শীতলামঙ্গল' পুঁথির রচনাকালের উল্লেখটি যদি ত্রুটি বা পরবর্তী সংযোজন না হয় তাহলে আরও প্রাচীন কোন পুঁথি আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত এটিকেই শীতলামঙ্গলের প্রাচীনতম পুঁথি বলে ধরতে হবে না। কবি অকিঞ্চন চক্রবর্তীকে 'শীতলামঙ্গল' কাব্যধারায় দ্বিতীয় কবি বলা যায় আর দ্বিজ নিত্যানন্দ চক্রবর্তী হলেন এ কাব্যধারায় তৃতীয় কবি। নিত্যানন্দকে কোনমতেই এ কাব্যধারার প্রথম কবি বলা যেতে পারে না। শ্রীবসু কর্তৃক প্রাপ্ত নিত্যানন্দের শীতলামঙ্গলের পুঁথিতে রচনাকালের যে প্রহেলিকা আছে তা থেকে জানা যায় শীতলামঙ্গলের বিরাট ও গোকুলপালা ১৭৭৭ থেকে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়। কবি অকিঞ্চন চক্রবর্তীর পুঁথির সঙ্গে আরও যেসব প্রাচীন নথিপত্র আমি পেয়েছি তার মধ্যে (সম্ভবত কবির) ছোট একটি হিসাবনামায় (যাতে ১১৬৮ সালের উল্লেখ আছে) কবির শীতলামঙ্গলের কিছু অংশ লিপিবদ্ধ আছে। সম্ভবত এটি মূল পুঁথি থেকে নকল করা। তাই কাব্যটির রচনাকাল যে ১১৬৮ সালের আগে, তাতে সন্দেহ নেই। কবির চণ্ডীমঙ্গলের রচনা কিন্তু এর অনেক আগেই শেষ হয়েছিল। তাই আঠারো শতকের এক শক্তিমান কবি হিসেবে মেদিনীপুর জেলার বরদা পরগণার কবি অকিঞ্চন চক্রবর্তীর নাম অবশ্যই স্মরণীয়। চেতুয়াপরগণার কবি শঙ্কর ঘাটাল-দাসপুর অঞ্চলের আঠারো শতকের এক কবিগোষ্ঠীরই যে অন্যতম ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। এসব কবির রচনা সেকালে এ অঞ্চলে যে বেশ প্রচারলাভ করেছিল নানা-স্থানে অনেক পুঁথিপত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় এটা অনুমান করা যায়। কালক্রমে বিদ্রোহ, বিপ্লব বা অন্যান্য সামাজিক অভ্যুত্থান-পতনের ফলে এসব পল্লীকবিদের রচনা বিস্মৃতিতে তলিয়ে যায়। গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে থাকা অনেক পুঁথি কলকাতার অনেক গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হলেও অপ্রকাশিত ও অজ্ঞাত অনেক কবিকৃতি যে পল্লীর গৃহ-কোণে আজও অন্তরীণ হয়ে রয়েছে তারই নিদর্শন হল অকিঞ্চন ও শঙ্করের নবাবিষ্কৃত এই পুঁথিগুলি।

প্রণব রায়
অধ্যাপক, কৃষ্ণনগর কলেজ
কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

চা-বাগিচা কি সরকার হাতে নেবেন?

সংবাদটি সত্যের। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় নাকি দার্জিলিংয়ে অনুষ্ঠিত জেলা অফিসারদের বৈঠকে বলেন যে, সরকার পার্বত্য এলাকার রুগ্ন চা-বাগানগুলির পরিচালনভার নেবার কথা ভাবছেন এবং রুগ্ন বাগিচাগুলি পরিচালিত হবে সমবায় পদ্ধতিতে। স্থানীয় লোকদের কর্মসংস্থানের কথা মনে রেখেই সরকার এরূপ চিন্তা করছেন।

[illegible] পত্রিকায় [illegible] সরকারের এ-উদ্যোগের সংবাদে [illegible] জানালেন। [illegible] [illegible] নতুন [illegible] ব্যবস্থা [illegible] জনসাধারণ [illegible] আমরা [illegible] বহুজন [illegible] [illegible] হবে।

[illegible] জানেন, পশ্চিমবঙ্গের চা-[illegible] দেশি-বিদেশী মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির [illegible] নেই। [illegible] বাগিচা-[illegible] ১৯৫৫ সালের পর নতুন করে লিজের জন্য আবেদন করার দায় না থেকেই বেশ ফুলে-ফেঁপে উঠেছেন। ঘরে তুলেছেন লাভের বিশাল অঙ্ক। অথচ এ রাজ্যের চা-শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান কেমন? তাঁদের বেতন হার কি রকম? চাকরি-বাকরির কোনো বাঁধাধরা নিয়মকানুন আছে কি? থাকলেও অধিকাংশ চা-বাগিচামালিক তার কোনো তোয়াক্কা করেন তো? এক কথায় বলা যায়, না। এমনকি, সরকারী আইনমাফিক চা-বাগিচা মালিকেরা শ্রমিকদের জন্য বছর-বছর ঘর তৈরি করতে বাধ্য। এজন্য সরকার প্রতি বছর এক-একটি ঘর তোলা বাবদ ৫০ ভাগ ঋণ ও ২৫ ভাগ অনুদান দিয়ে থাকেন। কেন্দ্রীয় খাত থেকেও প্রত্যেক বছর ২৩ লাখের বেশি টাকা এজন্য আসছে। কিন্তু—

হ্যাঁ, ঐ কিন্তুই গোলমেলে। চা-বাগিচা মালিকরা নতুন লিজ নেয় নি। সুতরাং আইনত ঐ অর্থে তাদের অধিকার নেই। ফলে বছর বছর ঐ মোটা অঙ্কের টাকা ফেরত চলে যাচ্ছে। রাজ্যের সমস্যার কোন সুরাহাই হচ্ছে না।

কোনো কোনো মহলের মতে ১৬ বছর আগেই অধিকাংশ চা-বাগিচা মালিকের জমির লিজ খারিজ হয়ে যায়। তাহলে সঙ্গত কারণেই ঐ সব জমি এখন সরকারের। আর আইনমাফিকই তা যখন সরকারের হচ্ছে তখন তথাকথিত চা-বাগিচা মালিকদের বিরুদ্ধে সরকার কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন?

এই পটভূমিতেই মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য আশার সঞ্চার করছে। চা-বাগিচা শ্রমিকদের মধ্যেও দিচ্ছে নতুন পথের ইঙ্গিত। একই সঙ্গে সরকার ও কর্মীদের ঠকিয়ে যে-ভাবে অধিকাংশ চা-বাগিচা মালিক ব্যবসা চালাচ্ছেন তার হাত থেকে মুক্তির একমাত্র পথ এই 'শিল্পটির' জাতীয়করণ এবং মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগ সেই পথই প্রশস্ত করবে বলে বিশ্বাস।

[illegible]
[illegible]

বিস্মৃত রাজধানী : বাণগড়

উৎপল চক্রবর্তী

'মাৎস্যন্যায়মপোহিতুং প্রকৃতিভির্লক্ষ্ম্যাঃ
করংগ্রাহিতঃ
শ্রীগোপাল ইতি ক্ষিতীশ শিরসাং
চূড়ামণিস্তৎসুতঃ।
যস্যানুক্রিয়তে সনাতন যশোরাশির্দিশামাশয়ে
শ্বেতিম্না যদি পৌর্ণমাসী রজনী
জ্যোৎস্নাতিভারশ্রিয়াঃ।।'

না। আমার মতো যাঁরা সাধারণ অ'সংস্কৃত' জন, তাঁদের কাছে এই শ্লোকমালার কোন তাৎপর্যই নেই। যেমন ছিল না সেই কৃষকের কাছেও।

১৮৯৩ সালের এক দুপুরে অবিভক্ত গৌড়ের পূর্বদিকে ভাতিয়ার বিলের কাছে খালিমপুর গ্রামের এক উঁচু ভূখণ্ডে চাষ করতে গিয়ে তাঁর লাঙলের ফালে উঠে এল একটি তামার ফলক। সোনা নয় বুঝতে পেরেছিলেন তিনি। গৌড়ের মাটিতে সংগুপ্ত স্বর্ণভান্ডার কচুবার এভাবেই উদ্ঘাটিত তাদের সন্মুখে! তবে কি কোন দেবতার পাদপীঠ! অজ্ঞাত রেখায় অলংকৃত সেই তাম্রফলক নিয়ে এলেন তিনি ঘরে। তারপর সিঁদুরে চন্দনে সুরু হলো পূজার্চনা। কিন্তু ফুলের মালা আর ধূপের ধোঁয়ার দীর্ঘকাল আচ্ছন্ন রইল না এর প্রকৃত পরিচয়। কৌতূহলী প্রত্নবিদের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি আবিষ্কার করল, সোনা নয় কিন্তু সোনার চেয়েও দামী এই তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ আছে এক বিচিত্র কাহিনীর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত, বাংলায় এক তমসাচ্ছন্ন লুপ্তপ্রায় অধ্যায়। আলোকিত হবার চূড়ান্ত মুহূর্তের জন্য যেন অপেক্ষমান!

মূঢ়তার আবরণ সরিয়ে পাঠ করা হলো সেই লিপিমালা আর বাংলার ইতিহাসের এক ছিন্নসূত্র যেন সেই ক্ষণেই পুনর্যোজিত হলো।

আমি কি নামে ডাকব তাকে। ঈশ্বর না প্রকৃতি!

এই বিচিত্র রহস্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমি বারংবার বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেছি। যাঁরা ঈশ্বর অবিশ্বাসী তাঁরা স্বীকার করবেন, আদিবর্তী আদিযুগ থেকে বর্তমান মুহূর্ত পর্যন্ত মানবজাতির যে ইতিহাস লেখা হয়েছে তার অধিকাংশ উপকরণই সংগৃহীত হয়েছে এইভাবেই, প্রকৃতির অসীম অনুগ্রহে। সম্পূর্ণ ভিন্নকারণে মাটি খুঁড়তে গিয়ে কখনো বেরিয়ে এসেছে প্রস্তরযুগের কুঠার। ভ্রাম্যমাণ কোনো উদাসী পথিকের চোখে অকস্মাৎ এক বিপুল সৌন্দর্যের গুপ্ত ঐশ্বর্য ধরা দিয়েছে কোন গুহাচিত্র, শ্রমিকের কোদালের আঘাতে আর্তনাদ করে উঠেছে রূপময় কোন শিলীভূত মূর্তি, কৃষকের লাঙলের ফালে উঠে এসেছে মূল্যবান তাম্রলিপি, বৃষ্টির করুণাধারায় নিবারণ সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে লুপ্তপ্রায় কোন সভ্যতার ভিত্তিপ্রস্তর। ইতিহাসের কোন অন্ধকার অধ্যায়ে আলোকপাত যখন সম্পূর্ণ অসম্ভব বলে মনে হয়েছে, তখন নিঃশব্দে মানুষের হাতে প্রকৃতি তুলে দিয়েছে, একটুকরো প্রত্নচিহ্ন, বিস্ময়ে কৌতূহলে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার আলোয় তৎক্ষণাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে অন্ধ অতীত।

প্রকৃতির চেয়ে বড় প্রত্নতাত্ত্বিক আর কে আছে!

নইলে, মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কের মৃত্যুর পর মাৎস্যন্যায়ের প্রবল আলোড়নে বিপর্যস্ত গৌড়তন্ত্র, নিদারুণ দুর্ভিক্ষ, দুর্বল শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতালোভী ষড়যন্ত্র, অসহায় গৌড়নাগরিকদের বিমূঢ় মানসিকতা এবং একশ বছর দীর্ঘ এই গভীর গভীর অসুখের পর সম্মিলিত প্রকৃতিপুঞ্জের নির্বাচিত প্রতিনিধি গোপালদেবের নেতৃত্বে সুস্থ সবল প্রাণপ্রাচুর্যে সমুজ্জ্বল নতুন বাংলা ও বাঙালীর পুনর্জীবনে উত্তরণের যে চমকপ্রদ নাটকীয় ইতিবৃত্ত—সে তো সম্পূর্ণ অজ্ঞাতই থেকে যেত যদি সেদিন প্রকৃতি ঐ কৃষকের লাঙলের ডগায় তাম্রশাসনটি না তুলে দিতো।

আমি প্রণাম করি ঈশ্বরকে, এইভাবেই তিনি মানুষের ইতিহাসকে সম্পূর্ণতা দান করছেন।

কি ছিলো সেই তাম্রশাসনে? কৌতূহলী প্রত্নবিদ দেখলেন, পালবংশের মহান নৃপতি ধর্মপাল কর্তৃক প্রচারিত এই তাম্রশাসনে লিখিত আছে পালবংশের প্রথম নৃপতি গোপালদেবের বংশপরিচয়, তাঁর সম্রাট হবার ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত, বাংলার ইতিহাসের এক বিলুপ্ত অধ্যায়ের রোমাঞ্চকর তথ্য।

বুদ্ধদেবের দশবলকে নমস্কার করে এর আরম্ভ। দ্বিতীয় শ্লোকে পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা দয়িতবিষ্ণুর পরিচয়, যাঁর বিশেষণ ছিল 'সর্ববিদ্যাবদাত'।

তৃতীয় শ্লোকে বপ্যটের কথা যাঁর কীর্তিমালা সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আর তারপর সেই চতুর্থ শ্লোকরাজি 'মাৎস্যন্যায়মপোহিতুং'...... যার অর্থ, মাৎস্যন্যায় দূর করবার অভিপ্রায়ে প্রকৃতিপুঞ্জ যাঁকে রাজলক্ষ্মীর করগ্রহণ করিয়েছিল, পূর্ণিমা রজনীর জ্যোৎস্নারাশির অতিমাত্র ধবলতাই যাঁর স্থায়ী যশোরাশির অনুকরণ করতে পারত, নরপাল-কুলচূড়ামণি গোপাল নামক সেই প্রসিদ্ধ রাজা বপ্যট থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

এই সেই বিখ্যাত খালিমপুর লিপি, ধর্মপালের তাম্রশাসন, বাংলার ইতিহাসের এক অমূল্য দলিল।

কিন্তু এ কি শুধু পালবংশের প্রতিষ্ঠার ইতিকথা, বংশানুক্রমের বিজয়ভূষিত বিবরণী! যদি তাই হতো হয়তো ঐতিহাসিকদের কাছে এতটা মর্যাদা পেত না এই তাম্রশাসন। এর প্রতিটি অক্ষরের আড়ালে সংগুপ্ত আছে বাংলা ও বাঙালীর এক গৌরবময় অধ্যায়ের বিস্ময়কর সাক্ষ্য, এই শ্লোকরাজিতেই বিধৃত আছে বাংলার প্রথম গণচেতনার স্বাক্ষর, গণতান্ত্রিক নির্বাচনের সুস্পষ্ট পরিচয়, জনজাগরণের বজ্রনির্ঘোষ. আজ প্রায় দেড় হাজার বছর পর সেকথা মনে পড়লে শ্রদ্ধায় অভিভূত হয় কল্পনা, বাঙালীর অজেয় আত্মশক্তির অপরাজেয় অভিব্যক্তির এই সুপ্রাচীন ঐতিহ্য দেখে সেই পুণ্যভূমির স্পর্শলাভের আশায় চঞ্চল হয়ে ওঠে মন, যেখানে দীর্ঘ চারশ বছর ধরে পাল সম্রাটগণ শৌর্যবীর্য শিল্পসংস্কৃতি এবং সর্বোপরি গণশক্তির উদ্বোধন ঘটিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষে বাংলা ও বাঙালীকে স্বভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন—তাঁদের সেই রাজধানীর দিকে, সেই তীর্থের দিকে পা বাড়াতে চায় আমার পর্যটকআত্মা।

কিন্তু কোথায় ছিল পালসম্রাটদের রাজধানী?

কবি সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁর 'রামচরিত'-এ স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন, পাল রাজাদের জনকভূমি বরেন্দ্রীদেশ তোজদেবের গোয়ালিয়র লিপি সাক্ষ্য দেয়, ধর্মপাল ছিলেন বঙ্গাধিপতি। তিব্বতীয়লামা তারানাথ বলেন, পুণ্ড্রবর্ধনের কোন ক্ষত্রিয়বংশে গোপালের জন্ম, কিন্তু পরে তিনি তিন

কালোদীঘির জলের অতলে ক্লান্ত যন্ত্রণায় আবার মাথা রাখেন রাজমহিষী কালোরাণী।

আর বাণগড় থেকে কয়েক মাইল দূরের ঐ তপনদীঘির দিকে আঙুল তুলে স্থানীয় মানুষেরা বলেন, ঐ সেই দীঘি, যার তীরে একদিন কঠোর এক তপস্যায় নিজেকে তীক্ষ লৌহশলাকায় বিদ্ধ করে মহাদেবকে তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন সহস্রবাহু বাণরাজা। তপস্যায় নিষ্ঠা প্রমাণের জন্য নয়শো নিরানব্বইটি বাহু ছেদন করে এইখানেই একদিন যজ্ঞ করেছিলেন তিনি। সন্তুষ্ট হয়েছিলেন মহাদেবাদিদেব। যদিও শ্রীকৃষ্ণের হাতে বাণাসুরের নিধন দৈবনির্দিষ্ট ছিল, তবু উত্তরকালের মানুষ যাতে বাণরাজাকে শ্রদ্ধা জানায় তার জন্য মহাদেবেরই আদেশে সেই বিচিত্র তর্পণের জায়গায় খনিত হলো বিশাল এক দীঘি তর্পণদীঘি—আজ মানুষের মুখে যা তর্পণদীঘি নামে খ্যাত, আর ঐ সেই স্থান করদহ, যেখানে সহস্রবাহু বাণরাজার নয়শো নিরানব্বইটি কর দাহ করা হয়েছিল।

কিন্তু এ সবই সেই কল্পনার গল্প। ইতিহাসে বাণগড়ের অস্তিত্ব কবে থেকে স্বীকৃত? ১৯৩৭-৩৮ এবং পরে ১৯৪০-৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামীর নেতৃত্বে বাণগড়ে ব্যাপক [illegible] শুরু হয়। যদিও তারপর আর [illegible] সে-উদ্যম সক্রিয় হয়ে ওঠেনি, তবু সেই প্রাথমিক অনুসন্ধানের সময়ই [illegible] বহু ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ঘাটিত হয় সর্বসমক্ষে, এবং বাণগড় যে কত প্রাচীন তারও একটা নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে।

প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত ছিল এই বাণগড় যা কোটিবর্ষ হিসেবেও পরিচিত ছিল। হরিষেণের বৃহৎকথাকোষগ্রন্থে (৯৩১ খৃঃ) উল্লেখ আছে, মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের গুরু প্রখ্যাত জৈনসূরী ভদ্রবাহু ছিলেন এই দেবকোট বা কোটীবর্ষ বা বাণগড়েরই এক ব্রাহ্মণের সন্তান। তিনি যখন ছোট ছিলেন তখন চতুর্থ শ্রুতকেবলী গোবর্ধন একবার এখানে বেড়াতে এসে শিশু ভদ্রবাহুকে দেখে মুগ্ধ হন এবং তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যান। পরে জৈনধর্মে দীক্ষিত হয়ে ভদ্রবাহু শ্রুতকেবলী পদে উন্নীত হন। জৈন কল্পসূত্র গ্রন্থে 'কোডি-বর্ষীয়া' নামে ভিক্ষুদের একটি শাখার কথাও আছে, সেই কোটীবর্ষ, বলা বাহুল্য আজকের এই বাণগড়।

১৯৩৮-৪১ এর খননকার্যের ফলে সবচেয়ে প্রাচীন যে নিদর্শন পাওয়া গেছে তাও মৌর্য এবং শুঙ্গ যুগের।

আমি যখন চন্দ্রকেতুর গড়ে গিয়েছিলাম, তখন সেখানকার মন্দিরের ভিত্তিভূমি দেখে চাঁদতে মনে পড়েছিল এই বাণগড়ের কথা। সেকথা বলেওছিলাম বন্ধুবর গৌরীশঙ্কর দেকে। মন্দিরময় দেবালয় বা দেউলগুলা বা কোচাঁপাড়ার মতো এই দেবকোট বা বাণগড়ও যে দেবালয় পূর্ণ ছিল সেকথা পরবর্তীকালে সন্ধ্যাকর নন্দী রামচরিতেও পড়েছি। পুণ্যতোয়া পুনর্ভবার তীরে একদা এই বাণগড়ে গড়ে উঠেছিল অসংখ্য মন্দির। পৌরাণিক বাণরাজা ছিলেন শৈব। আজও নিকটবর্তী শিবকোটি গ্রামের নাম তার সাক্ষ্য বহন করছে, সেখানকার শিবমন্দিরে আজো পূজোর্চনা হয়।

এর পরবর্তী স্তরে পাওয়া গেছে গুপ্তযুগের অসংখ্য স্মারকচিহ্ন। কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামীর বিবরণী বলে, সবচেয়ে গভীর পঞ্চম স্তরে পাওয়া গেছে একটি ২ ফুট ৫ ইঞ্চির ব্যাসের কুয়ো। মৌর্যযুগের সভ্যতার কিছু নিদর্শনসহ এই কুয়োর আবিষ্কার বাংলার এ অঞ্চলের আদি সভ্যতার এক স্মারক হিসেবে চিহ্নিত। এছাড়া পালিশকরা কালো মৃৎপাত্রের অজস্র উপকরণ যেমন থালা, ডিশ, জলপাত্র ইত্যাদিও মৌর্যযুগের [illegible] প্রমাণের মতো সংগৃহীত হয়েছে। চতুর্থ স্তরের শুঙ্গ যুগের পয়ঃপ্রণালী, আর ইঁটের তৈরী ঘরবাড়ির চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে।

তৃতীয় স্তরে প্রায় ১১ ইঞ্চি ব্যাসের দেওয়ালের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। গঠন-কৌশল এবং বিভিন্ন ধাতুর ঘরের চিহ্ন ও কুণ্ডের চিহ্ন দেখে অনুমিত হয় সম্ভবত এগুলি কোন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। এছাড়া আবাসগৃহ, ভাণ্ডার, রান্নাঘরের উদ্দেশে ব্যবহৃত ঘরবাড়ীর ভগ্নপ্রায় দেয়ালগুলি এবং অন্যান্য উপকরণ প্রমাণ করেছে এই স্তরটি গুপ্তযুগের। দ্বিতীয় স্তরে পাল-যুগের স্থাপত্যভাস্কর্যের নিদর্শন। গড়ের প্রাকার, গৃহপ্রাচীর, আবাসগৃহ, মন্দির, স্নানঘর, পয়ঃপ্রণালী, কুয়ো প্রভৃতি অজস্র নিদর্শন পালযুগের বাণগড়কে আজো স্মরণীয় করে রেখেছে। এই প্রথম পাথরের তৈরী থাম, দরজার অর্গল এবং অসংখ্য কারুকার্যময় পাথরের উপকরণ শিল্পসমৃদ্ধ পালযুগের ঐশ্বর্যকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছে দেখা গেল।

ফুল, পাখী, পশু, মানুষ, অলংকৃত লতাপাতা, কল্পিত, পাথরের উপর মানুষের সৌন্দর্যসৃষ্টির যাবতীয় উপকরণ এই বাণগড়ের মাটি থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। সাধারণত, পোড়ামাটির অলংকরণ যেখানে বাংলার প্রধান শিল্পমাধ্যম, সেখানে পাল-যুগে, রাজমহল থেকে সংগৃহীত পাথরের এত অজস্র কারুকার্য সম্ভবত সারা বাংলার আর কোথা থেকেও পাওয়া যায় নি।

এ ছাড়া সংখ্যাধিক তাম্রমুদ্রা পোড়া মাটির ভাস্কর্যও আবিষ্কৃত হয়েছে। আর প্রথম স্তরে স্পষ্টতই মুসলমান যুগের স্থাপত্য নিদর্শন ছড়ানো রয়েছে দেখা যায়। যদিও প্রকৃতির হাতে এই অংশেরই ক্ষতি হয়েছে সবচেয়ে বেশি। ইতিহাস বলে, বখতিয়ার খিলজী নদিয়া বা নদীয়া অধিকার করে লক্ষ্মণাবতী বা গৌড়ে প্রথম রাজধানী না করে এইখানে এই দেবকোটেই প্রথম রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। এই দেবকোটেই ছিল তাঁর সেনানিবাস, যা এখন দমদমা নামে পরিচিত।

—দাঁড়ান। আপনি কোথা থেকে আসছেন?

রিক্সা থেকে নেমে আমি বাণগড়ের প্রথম প্রত্নচিহ্নের কারুকাজ দেখার জন্য উঁচু টিলার উপর উঠতেই প্রশ্ন করলেন একজন সেনাবাহিনীর অফিসার।

না, মৌর্য নয়, শুঙ্গ নয়, কুষাণ গুপ্ত পাল বা বক্তিয়ার খিলজীর সেনানিবাসের কোন সতর্ক প্রহরী নন, বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের সেনাবাহিনীর একজন প্রতিনিধি।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। হাতের ক্যামেরা দুলে উঠল।

আবার গম্ভীর জিজ্ঞাসা,

—কি জন্য এখানে এসেছেন?

মুহূর্তে বুঝতে পেরেছি ভুলটা কোথায় হয়েছে। ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ চলছে, গঙ্গারামপুরে মিলিটারী-ক্যাম্প বসেছে শুনেছিলাম। কিন্তু তা যে বাণগড়ের এই টিলার উপরে তা জানতাম না।

পরিচয় দিলাম।

—আইডেন্টিটি কার্ড আছে?

দুর্ভাগ্য, ছিল না।

—আপনাকে থাকতে হবে এখানে!

হাত পা হিম হয়ে এল আমার। এখন যে এটা নিষিদ্ধ অঞ্চল আমাকে তা কেউ-ই বলে নি। এমনকি রিকসাওয়ালাও নয়। বরং ফটো তুলতে কোন আপত্তি নেই, সে কথাই বলেছিলো সে। অন্ধকার নেমে আসছে বাইরে পৃথিবীতে এবং বুঝতে পারছি আমার মনেও। কি করব ভাবতে পারছি না। বালুরঘাটের সর্বজনপরিচিত সমাজসেবী শ্রীব্যোমকেশ চক্রবর্তীর নাম করব কি না ভাবছি, সেই অফিসারটি আবার জানতে চাইলেন কেন এখানে এসেছি আমি। প্রায় শেষ চেষ্টার মতো অত্যন্ত বিনীতভাবে যতদূর সম্ভব ভুল হিন্দীতে এই ঐতিহাসিক স্থান দেখতে আসার কারণ ব্যক্ত করলাম। এর আগেও এখানে আমি এসেছি, কথাটার হিন্দী কিছুতেই মনে পড়ল না। সামান্য ইংরেজী মেশাতে হলো। এবং কিছুক্ষণ নিজেদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁরা কি ঠিক করলেন কে জানে, আমাকে বললেন সেই অফিসার।

—ইংরাজী তো জানেন, বাইরে তো নোটিশ দেওয়া আছে এটা প্রোটেকটেড এলাকা দেখেন নি!

নোটিশ দেখতে আমি আসি নি। বললাম সে কথা, আর আমার উদ্দেশ্য যে কিছু অসৎ নয় তাঁরা তা বুঝলেন। বললেন,—বাণগড়ের কোথাও ছবি তুলবেন না, এটা বর্ডার এলাকা, যুদ্ধ চলছে এখন। এখন ফিরে যান।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালাম মনে মনে। তিলমাত্র দেরী না করে ফিরে এলাম রিকসায়। দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে পিছনে টিলা, আর দেখছি দেবতার [illegible] দাঁড়িয়ে আমার [illegible] রাখছেন সেনাবাহিনীর সতর্ক প্রহরীরা। আরও মিলিয়ে যাচ্ছে, আমি কল্পনায় দেখছি পুণ্ড-

ভূমিতে যেন স্পষ্ট অক্ষরায়, বহু যুগের ওপার থেকে বাংলার [illegible] আবার [illegible] বৈভব নিয়ে থেকে অর্বাচীন এক যুগ দর্শককে [illegible] মর্যাদায় ফিরিয়ে দিচ্ছে।

কিন্তু এ প্রত্ন দেশের [illegible] এক [illegible] ঘটনা। এখন আপনি শিবমন্দির উঠোনে দাঁড়ান সেই টিলাতে। উঠলেই দেখতে পাবেন কালের [illegible] শুধু কঙ্কাল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি যুগের প্রাচীর। বাতাসে যেন আস্ফালন নেই, প্রবল বাতাস শুধু [illegible] বুকে আপনার মতো যেন অতীতের ঐশ্বর্যের সন্ধানে ছুটে বেড়ায়। এখান থেকে স্পষ্টই দেখা যায় গড়ের ঐ পুনর্ভবাকে। কে জানে, এই জায়গাটিই সেই বিপণীশ্রেণী কিম্বা সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে যার উল্লেখ আছে। কোটীবর্ষপাড়া ও দামোদরপুরের পট্টোলীতেও তো আছে মধ্যাবকাশিকা ও কোটীবর্ষ বণিক ও ব্যবসায়ীদের খুব সমৃদ্ধ মিলনকেন্দ্র ছিল। আমি এসব কিছুই জানি না, শুধু জানি, বাণগড়ের ধুলোয় মিশে আছে হাজার হাজার বছর প্রাচীন ইতিহাস। টিলা থেকে নেমে আরো এগোই। ঐ সেই বিশাল গড়ের ভগ্নাবশেষ, যে গড় একদিন এই সমৃদ্ধশালী নগরবন্দরকে রক্ষা করেছিল। গড়ের সামনে ঘন শৈবালে ঢাকা পরিখা। তার পাশ দিয়ে কাঁচামাটির রাস্তা চলে গেছে বাণগড়ের আরো ভেতরে। জনপদবাসী প্রায় অধিকাংশ জনই সাঁওতাল। বাংলা বোঝেন। নিকোন উঠোন, পরিচ্ছন্ন রুচির এই আদিবাসীদের জিজ্ঞাসা করলেই এই প্রাচীন ভূখণ্ডের অতীত গরিমার কথা তাঁরা সগৌরবে বলবেন। তথ্যে ভুল থাকে, রাজাদের ক্রমও ঠিকঠাক মেলে না, তবু তাঁরা যে এই জায়গাটির গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন—এই অভিজ্ঞতা সত্যিই বিস্মিত করে দেবে।

বিস্মিত হয়েছিলাম সত্যিই। কর্ণসুবর্ণেতে যেমন দেখেছি স্থানীয় মানুষের কিছুটা অবহেলা, এখানে কিন্তু তা নয়। স্থানীয় পোস্টমাস্টারমশায়ের বাড়ীতেই আলাপ হয়ে গেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের সঙ্গে। দূরে কলকাতা থেকে তাঁদের এই নগণ্য গ্রাম দেখতে এসেছি শুনে তিনি আমাকে সাগ্রহে ঘুরিয়ে দেখালেন বাণগড়ের বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ। যতই এগোই, তিনি একে একে বলতে থাকেন এই জনপদের প্রাচীন কাহিনী। পোস্টমাস্টারমশায়ের [illegible] ঠিক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমলের, আর তার একটু দূরে আছে দুটি পুষ্করিণী অমৃতকুণ্ড ও জীবৎকুণ্ড। কিংবদন্তী বলে এই কুণ্ডদুটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন [illegible] [illegible]। [illegible] ছিল তাঁর প্রাসাদ। এ দুটি পুকুরের জলে স্নান করলে মৃত সৈন্য আবার পুনর্জীবন লাভ করত। না আজ আর সেই মৃতসঞ্জীবনী ক্ষমতা নেই কুণ্ডদুটির। [illegible] বলে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

বিদেশী পর্যটক বুকানন হ্যামিলটন লিখেছেন, সম্ভবত কুণ্ডদুটি [illegible] দুটি [illegible] [illegible] ছিল। অমৃতকুণ্ডের জলে একটি [illegible] পাওয়া যায়। দিনাজপুরের মহারাজা সেটি তুলবার চেষ্টা করেছিলেন [illegible] পারেননি। পরে আর একবার চেষ্টা করা হয়েছিল। তখন দেখা যায় ঐ পাথরটিই একটি বুদ্ধের শিলামূর্তি, সম্ভবত [illegible] [illegible] [illegible] জলে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।

যেন গভীর বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে অমৃতকুণ্ড আর জীবৎকুণ্ড। জলের রং কোন সম্ভ্রম জাগায় না সাধারণ দর্শকের চোখে, তবু আজও, চৈত্র মাসের বারোনী তিথিতে পুণ্যার্থীরা তীরে যেদিন বারুণী মেলা বসে, সেদিন প্রথমে অমৃতকুণ্ডে ও পরে জীবৎকুণ্ডে স্নান করে পুণ্যার্থীরা শিববাটির প্রাচীন শিবমন্দিরে পুজো দিতে গিয়ে হাজার হাজার বছর আগের এক স্মৃতির কাছেই যেন শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন। দেখালেন সেই শিক্ষকমহাশয়, এমন অজস্র স্মৃতির অতীতের স্মারক চিহ্নগুলি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত বিভিন্ন যুগের প্রত্নসম্পদ আজো ছড়ানো আছে বাণগড়ের মাটিতে। শিববাটিরই একটি একচালায় গ্রামের মানুষেরা সযত্নে সংরক্ষণ করে রেখেছেন সংখ্যাধিক পাথরের মূর্তি। সেগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছে, কলকাতার যাদুঘর, আশুতোষ চিত্রশালা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এবং সমগ্র বাংলা দেশে ছড়ানো অসংখ্য মানুষের ব্যক্তিগত সংগ্রহে যত পালযুগের মূর্তি সংগৃহীত হয়েছে তার সংখ্যা কয়েক হাজার হবে। বালুরঘাট মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীঅচিন্ত্যকৃষ্ণ গোস্বামী, জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীচিত্ত দত্ত এবং কোটীবর্ষ বাণগড় বিষয়ে একনিষ্ঠ গবেষক প্রবীণ ব্যবহারজীবী শ্রীকমলেন্দু চক্রবর্তীর উদ্যোগে জেলায় একটি সংগ্রহশালা স্থাপিত হয়েছে, তাতেও মূর্তির সংখ্যা কিছু কম নয়। তবু, এখনও সমগ্র পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় পথে-প্রান্তরে, পুকুরের পাড়ে, অরণ্যের নিভৃতে, দীঘির গভীরে যত মূর্তি অবহেলায় পড়ে আছে, তা সংগ্রহ করতে পারলে একটি অমূল্য সংগ্রহশালা স্থাপন করা কিছুই অসম্ভব নয়। অসম্ভব শুধু সেগুলি সংগ্রহ করা। কেননা দীর্ঘ পাথরের মূর্তিগুলি বহন করে আনা সত্যিই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এবং যেগুলির আকৃতি ছোট, চোরাই ব্যবসায়ীদের লোভদৃষ্টি ক্রমশ সেগুলিকে গ্রাস করছে এবং স্থানীয় মানুষেরা কখনও অভাবের জন্য, কখনও [illegible] [illegible] সেগুলি বেচে দিচ্ছেন। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ অনায়াসে এগুলি সংরক্ষণ করতে পারেন এবং তা না করলে বহু অমূল্য প্রত্নসম্পদ চিরকালের মতো লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যাবে। বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে পথের ধার থেকে, পুকুরের পাড় থেকে এমন বহু মূর্তি সংগ্রহ করেছিলেন আমার বাবা এবং স্বাধীনতাপূর্ব যুগে সেগুলি রাজশাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিতে দিয়ে দেন।

সেই একচালার সামনে থেকে আর একটু এগোতেই শিক্ষকমশায় একটি [illegible] দেখিয়ে বললেন, স্থানাভাবে সেটা এখান থেকেই [illegible] [illegible] [illegible]-মূর্তি সংগ্রহ করেছিলেন। সামনে একটি ছোট খাল। সেটা পেরোতেই ওপারে আর একটি টিলার উপর সেই প্রাচীন শিবমন্দির: কিংবদন্তী বলে এই শিবমন্দির রাজা বাণের তৈরী। কিন্তু বাণগড়ের ধ্বংসস্তূপ থেকে দিনাজপুরের মহারাজার যে অপূর্ব কারুকার্যময় প্রস্তরস্তম্ভ সংগ্রহ করেন তার পাদদেশে উৎকীর্ণ এক শিলালিপি বলে, দুর্দমনীয় শত্রুসৈন্য বধের জন্য 'কম্বোজান্বয়জ' গৌড়পতি 'কুঞ্জর ঘটাবর্ষ' ইন্দুমৌলির (শিবের) এই ভূ-ভূষণ মন্দির নির্মাণ [illegible]। [illegible] [illegible] মহাশয় [illegible] [illegible] এই স্তম্ভলিপি [illegible] [illegible] [illegible] সিদ্ধান্ত করেছেন [illegible] 'কম্বোজান্বয়জ' [illegible] অর্থ কাম্বোজ [illegible] বা জাতীয় [illegible] বংশসম্ভূত [illegible] আর একটি [illegible]লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে [illegible]। সেটি রাজা নয়পালের [illegible] তাম্রপট্ট [illegible]। এই নয়পাল [illegible] [illegible] রাজা ছিলেন। ইনিই কি কিছুকালের জন্য বরেন্দ্রভূমি জয় করে এই শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন? এই বংশের আদি রাজা ছিলেন রাজ্যপাল—তিনি 'পরম সৌগত' অর্থাৎ বৌদ্ধ, পরবর্তী রাজা নারায়ণপাল বাসুদেবের ভক্ত এবং নয়পাল শৈব ছিলেন। পালরাজারাও প্রথমে বৌদ্ধ ছিলেন, যদিও তাঁদের মন্ত্রীরা ছিলেন শাস্ত্র ও শাস্ত্রকুশলী ব্রাহ্মণ। সম্ভবত সমাজে ব্রাহ্মণ্যাদর্শ দৃঢ়প্রতিষ্ঠ ছিল ও তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম পরে তান্ত্রিক শৈবধর্মের সঙ্গে মিশে যায়।

কিন্তু রাজা নয়পাল নয়, আমি ভাবছি প্রথম গোপালদেবের কথা, মাৎস্যন্যায় দূর করার অভিপ্রায়ে প্রকৃতিপুঞ্জ যাঁকে রাজলক্ষ্মীর কর গ্রহণ করিয়েছিল। কোথায় ছিল তাঁর রাজপ্রাসাদ! তাঁর পুত্র দিগ্বিজয়ী ধর্মপাল সেই প্রাসাদের কোন কক্ষ থেকে সেই বিখ্যাত তাম্রশাসন ক্ষোদিত করার অনুজ্ঞা জারি করেছিলেন? আজ তার কোন চিহ্ন নেই। হারিয়ে গেছে কবে সেই প্রাসাদমালা। শুধু পালসম্রাটদের কারো কারো নাম আজো কোন কোন মানুষের মনের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছে। আর তাদের মধ্যে মহীপালের নামই বোধ হয় কিছুটা অগ্রাধিকার পেয়েছে। আজও স্থানীয় মানুষেরা বলেন 'ধান ভানতে মহীপালের গীত'। বাণগড় থেকে কিছু দূরে বিশাল মহীপালদীঘি আজো তাঁর নামের সকরুণ স্মৃতি বুকে নিয়ে ঢেউ তুলছে। আর বালুরঘাটের কাছে মহীসন্তোষেই তো ছিল তাঁর প্রাদেশিক রাজধানী। আর মুর্শিদাবাদের মহীপালে তবে কি ছিল? আমি জানি না। শুধু জানি এই বাণগড় থেকেই পাওয়া গেছে এই মহীপালের তাম্রশাসন।

[illegible] তিনটি ছবি, [illegible] ১৯৩০৭, ১৯৬৩ ও ১৯৬৪ সালের। তিনটি ছবি [illegible] [illegible] দক্ষিণ [illegible] [illegible]।

বিজ্ঞানের কথা

মহাকাশ অভিযানের তথ্যের আলোকে বুধগ্রহ ও শুক্রগ্রহ

সোভিয়েত বিজ্ঞানী অধ্যাপক ওয়াই শুরকভের একটি প্রবন্ধ আমাদের হাতে এসেছে। প্রবন্ধে সোভিয়েত ব্যোমযানের শুক্রগ্রহ অভিযান থেকে লব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে তিনি জানাচ্ছেন শুক্রগ্রহ সম্পর্কে নতুন কী ধারণা করা হচ্ছে। ওই প্রবন্ধের বক্তব্য সংক্ষেপে উপস্থিত করছি।

এক সময়ে ধারণা ছিল শুক্র প্রায় পৃথিবীর মতোই একটি গ্রহ। এই ধারণা এখন বদলাতে হচ্ছে। শুক্রের বায়ুমণ্ডলে পাওয়া গিয়েছে ৯৭ শতাংশ কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস, অনধিক ২ শতাংশ নাইট্রোজেন, অনধিক ০·১ শতাংশ অক্সিজেন ও গড়ে প্রায় ০·০৫ শতাংশ জল। শুক্রের উপরিতলে তাপমাত্রা ৪৭৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও বায়ুমণ্ডলের চাপ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপের ৯০ গুণ।

দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে শুক্রের বায়ুমণ্ডলের মিল সামান্যই। শুক্রের এই অস্বাভাবিক বায়ুমণ্ডল গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াটি কী, লব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।

শুক্রের বায়ুমণ্ডল এমন হল কি করে? তার হেতু নির্দেশ করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা বলছেন, মূলে রয়েছে এই ঘটনা যে শুক্র পৃথিবীর চেয়ে সূর্যের আরো কাছে। শুক্র যে-সময়ে গড়ে উঠছিল তখন কোনো একটি পর্বে যদি এমনকি সামান্য পরিমাণেও কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস ও জলের অস্তিত্ব থেকে থাকে, তাহলেই—যাকে বলা হয় 'হটহাউস ক্রিয়া' (অর্থাৎ, এমন একটি অবস্থা যখন সূর্যের উত্তাপ বায়ুমণ্ডলকে ভেদ করে গ্রহের উপরিতলে পৌঁছতে পারে ও গ্রহের উপরিতলকে উত্তপ্ত করে, কিন্তু মাটি থেকে বিকীরিত উত্তাপ বহুলাংশেই শুষে নেয় এই বায়ুমণ্ডল)—এমনি একটি ব্যাপার অবশ্যই ঘটে থাকবে। তার ফল কী দাঁড়ায়? গ্রহের উপরিতল ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এবং যতোই উত্তপ্ত হয় ততোই আরো বেশি জল ও কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস উবে যায় বায়ুমণ্ডলে। এমনিভাবে হটহাউস ক্রিয়ার তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়ে চলে, সঙ্গে সঙ্গে উত্তপ্ত হয়ে চলে গ্রহের উপরিতলও এবং কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাসের ভারী একটি বায়ুমণ্ডল তৈরি হয়ে যায়। গ্রহের অভ্যন্তর থেকে উদ্গত উত্তাপও এই প্রক্রিয়াকে কিছুটা ত্বরান্বিত করেছে।

শুক্রের বর্তমান বায়ুমণ্ডল গড়ে ওঠার পিছনে এমনিভাবে কাজ করেছে গ্রহের তাপমাত্রার অবস্থা।

তবে শুক্রের বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে অনেক কিছুই এখনো ধাঁধা রয়ে গিয়েছে। এমনি একটি বড়ো রকমের ধাঁধা হচ্ছে শুক্রের বায়ুমণ্ডলে মেঘের স্তরটি বা এখনো পর্যন্ত এই মেঘের গড়ন ও [illegible] সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্যের অভাব, ফলে এ-সম্পর্কে নানা রকমের কল্পনা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে এই মেঘের স্তরে আছে জলের কণা, বরফের টুকরো, ফেরাম ক্লোরাইড হাইড্রেট, অ্যামোনিয়াম যোগপদার্থ, কার্বনিক অক্সাইড, ধুলো ইত্যাদি। তবে জলের কণা বা বরফের টুকরো যে এই মেঘে থাকতে পারে তা মোটামুটি পাকাপাকিভাবেই জানা গিয়েছে। এই মেঘে যে অ্যামোনিয়াম আছে তার সপক্ষেও প্রমাণ যথেষ্ট।

অ্যামোনিয়া নিঃসৃত হয় আগ্নেয়গিরির তৎপরতার ফলে। এই অ্যামোনিয়ার সঙ্গে কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস ও জলের ক্রিয়ায় তৈরি হয় অ্যামোনিয়াম যোগপদার্থ—সাদা স্ফটিকের মতো দেখতে এই পদার্থটি উত্তাপে সহজেই গলে যেতে পারে। অ্যামোনিয়াম মেঘের ঘনত্ব অবশ্যই বাষ্পের মেঘের চেয়ে অনেক বেশি।

এখনো পর্যন্ত আরো একটি বড়ো সমস্যা রয়ে গিয়েছে শুক্রের শিলার উদ্ভব, বিবর্তন, [illegible] ও প্রকৃতি নিয়ে। প্রশ্ন উঠতে পারে, শুক্রেও কি [illegible] স্তরে স্তরে সজ্জিত? তাই যদি হয় তাহলে কি শুক্রেও পৃথিবীর মতো ভূত্বক আছে? এসব প্রশ্নের জবাব জানতে হলে শুক্রের শিলায় সরাসরি অনুসন্ধান-কার্য চালাতে হবে। [illegible] এমনটি হওয়া [illegible] উপরিতলের অবস্থা [illegible] শিলা পৃথিবীর শিলার থেকে [illegible] ভিন্ন। [illegible] অনুসন্ধানে জানা গিয়েছে শুক্রের শিলা [illegible]

(পটাসিয়াম, ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম) অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ। গোটা শুক্রগ্রহের শিলা একই ধরনের কিনা তা জানতে হলেও ভবিষ্যতের আরো ব্যাপক অনুসন্ধানের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

শুক্রের অভ্যন্তর গড়ন কি-রকম? এই বিষয়টি নিয়েও ভবিষ্যতে অনুসন্ধান চালাতে হবে।

মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে

মহাকাশ-অভিযানে মঙ্গলগ্রহের অনুসন্ধান শুরু হয়েছে আজ থেকে দশ বছর আগে, এখনো চলছে। এই গ্রহটি সম্পর্কেও একসময়ে যে-সব ধারণা ছিল সবই ধূলিসাৎ হয়েছে। কল্পনা করা হয়েছিল মঙ্গলে জীবন আছে, সেখানকার সভ্য জীবরা খাল খনন করে কৃত্রিম সেচব্যবস্থা করেছে, মঙ্গলের উপগ্রহদুটিও নাকি কৃত্রিম, অর্থাৎ সব মিলিয়ে পৃথিবীর বাইরের উন্নত এক সভ্যতার নিদর্শন ইত্যাদি ইত্যাদি। মহাকাশ-অভিযান থেকে লব্ধ তথ্য মঙ্গল সম্পর্কে যে ধারণা দিচ্ছে তা কিন্তু একেবারেই অন্যরকম।

প্রথমেই বলতে হয়, পৃথিবীর বা শুক্র বা চাঁদের সঙ্গে মঙ্গলের কোনো মিল নেই। মঙ্গল সম্পূর্ণ ভিন্ন। আজ পর্যন্ত যতো জ্যোতিষ্ক সম্পর্কে খবর নেওয়া হয়েছে তার কোনোটির সঙ্গেই মঙ্গলের মিল নেই। মঙ্গল সম্পর্কে বলা যেতে পারে, মঙ্গলের তুলনা মঙ্গল নিজে। মঙ্গলের উপরিতলে আছে অজস্র গহ্বর, তাছাড়াও আট কিলোমিটার পর্যন্ত উঁচু আগ্নেয়গিরি (কোনো-কোনোটি সম্ভবত এখনো সক্রিয়) ও বিরাট এলাকা জুড়ে সমতল জমি। মঙ্গলে প্রচন্ড রকমের ধুলোর ঝড় হয়ে থাকে। এই সমতল জমি ও ধুলোর ঝড় থাকার দরুন অনেক বিজ্ঞানীর ধারণা, মঙ্গলে অবতরণ একেবারেই অসম্ভব, তাতে ধুলোয় ডুবে যাবার আশঙ্কা। এক সময়ে চাঁদে অবতরণ নিয়েও একই আশঙ্কা করা হয়েছিল।

মঙ্গলের জমিতে এমন সমস্ত চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে যাতে ধারণা হয় সেখান দিয়ে প্রচণ্ড বেগে কোনো তরল পদার্থ (সম্ভবত জল) প্রবাহিত হয়েছিল। মঙ্গলের বায়ুমন্ডলে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের জলীয় বাষ্পের পরিমাণের চেয়ে হাজার ভাগ কম। তবে এ-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে মঙ্গলের মেরু-টুপিতে বরফের আকারে জলের অস্তিত্ব রয়েছে (তার সঙ্গে আছে জমাট কার্বনিক অ্যাসিড)। সম্ভবত মাটির নিচে শিলীভূত বরফের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে, যে-বরফ কোনো কোনো অবস্থায় জলে রূপান্তরিত হওয়াও অসম্ভব নয়। তাই যদি হয় তাহলে জীবনের অস্তিত্বও সম্ভব। মঙ্গলের পরিস্থিতি এখন যতোই প্রতিকূল হোক, আদিম ধরনের জীবন মঙ্গলে থেকে যেতেও পারে। সম্ভবত এই জীবন এখন ফসিলীভূত বা অবলুপ্ত।

কিছুকাল আগেও ধারণা ছিল, মঙ্গলের উপরিতলে মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলের চাপ উচ্চমাত্রার—পৃথিবীর উপরিতলে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের চাপের দশ-ভাগের এক-ভাগ। এখন জানা গিয়েছে, এই চাপের মাত্রা একশো-ভাগের এক ভাগ। আগে ধারণা ছিল, মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণ নাইট্রোজেন আছে এবং এই বায়ুমণ্ডলের মূল উপাদান হচ্ছে কার্বন ডাই-অক্সাইড। তবে একটি ধারণা সঠিক প্রমাণিত হয়েছে—মঙ্গলের বায়ুর বেগ অতি উচ্চমাত্রার, সেকেন্ডে ১০০ মিটারেরও বেশি।

মঙ্গলের এই প্রচন্ড বায়ুপ্রবাহের দরুন মঙ্গলের মাটিতে আলতোভাবে অবতরণ অতি দুরূহ ব্যাপার। সেজন্যে যোয়ানদের

আমাদের সূর্য ও তার গ্রহমণ্ডল যে গ্যালাক্সির অন্তর্গত, বাইরে থেকে দেখলে তার চেহারাটিও এমনি দেখতে। প্রায় ১৫,০০০ তারা আছে এই গ্যালাক্সিতে। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, এই ১৫,০০০ তারার মধ্যে এক কি দুই শতাংশের আছে নিজস্ব গ্রহমণ্ডল, যেখানে জীবনের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব।

সাজাবার ফুল হিসাবে ডালিয়ার উপর আমাদের দৃষ্টি সবেমাত্র পড়লেও গৃহসজ্জার কাজে ডালিয়ার ব্যবহার পাশ্চাত্যে দিন দিন বাড়ছে। ডালিয়ার বিভিন্ন আকৃতি ও আয়তনের ফুল, অসংখ্য রঙের ফুল, ফুলের লম্বা ডাঁটি ও প্রজাতির বিপুল সংখ্যা গৃহসজ্জার ক্ষেত্রে ডালিয়ার জনপ্রিয়তার চাবিকাঠি। ফুল সাজাবার কাজে পমপন, বল, স্মল ও মিডিয়াম ক্যাকটাস, স্মল ও মিডিয়াম ডেকরেটিভ ডালিয়া বেশি উপযুক্ত। এদের ভিতরেও আবার পমপন, বল ও স্মল ক্যাকটাস ডালিয়া ফুলদানিতে সতেজ থাকে বেশিদিন ধরে, তাই ফুল সাজাবার কাজে এদের সমাদর সবচেয়ে বেশি। যে কোন ধরনের গৃহসজ্জার পিছনে কৃতকার্যতার চাবিকাঠি সৌন্দর্যবোধ ও চর্চা। ডালিয়ার বেলায়ও এ দুটির মণিকাঞ্চনযোগ ঘটাতে পারলে ফুল সাজানোতে সাফল্যলাভ একরকম সুনিশ্চিত।

অনেক সময়ে শখ করে ডালিয়া দিয়ে ফুল সাজিয়েছি বিভিন্ন রকমের। যদিও উপযুক্ত ফুল না থাকার অসুবিধা অনুভব করেছি বহু সময়েই। নিজের সাধারণ অভিজ্ঞতা ও গুণীজনের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে ডালিয়া দিয়ে গৃহসজ্জার বিভিন্ন দিক তুলে ধরছি। কি ধরনের সাজাব তা আগে থেকে মনে মনে ঠিক করে তার প্রয়োজন অনুযায়ী ডালিয়া ও পাতা যোগাড় করে ফুল সাজানোর কাজ আরম্ভ করবেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কি করে ডালিয়া দিয়ে বিভিন্ন রকমের সার্থক গৃহসজ্জা করা যায় তা বার করা যেতে পারে। এ কাজ ফুলদানিতে ডালিয়ার ব্যবহার ছড়িয়ে পড়লে স্বাভাবিকভাবেই হয়ে উঠবে।

জায়ান্ট ও লার্জ ডেকরেটিভ ডালিয়া যে সব জায়গা সবাই দূরে থেকে দেখেন, যথা পূজার বেদি ইত্যাদি সাজাতে ভাল কাজ দেবে। এদের সঙ্গোর ফুল হিসাবে বড় ডাঁটির স্মল বা মিডিয়াম ক্যাকটাস ডালিয়া মানাবে ভাল। এ ধরনের জায়গা ছাড়া জায়ান্ট বা লার্জ ডেকরেটিভের কোন ব্যবহার নেই। জায়ান্ট বা লার্জ ক্যাকটাস ডালিয়া দিয়ে খুব বড় ধরনের ফুলদানি সাজালে তা ভাল মানাবে।

ফুলদানি সাজাতে স্মল ক্যাকটাস ও পমপনের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি এবং

পুষ্পসজ্জার [illegible] বিভিন্ন ডেকোরেটিভ [illegible] ও বল ডালিয়ার [illegible] দিয়ে প্রতিপদের চাঁদ, [illegible], [illegible] ত্রিভুজ বা ইংরেজী এস্ [illegible] আকৃতিতে ফুল সাজানো যেতে পারে। এছাড়া খুব অল্প ফুল দিয়ে একটি বিশেষ আকৃতির রেখা তৈরী করাও খুব জনপ্রিয়। এই রেখা তৈরীর কাজে [illegible] ক্যাকটাস [illegible]। এ রেখা তৈরী করতে শুধুমাত্র একই প্রজাতির ফুলের ব্যবহার করবেন। এবং এ ফুলগুলি হালকা কোন রঙের হলে ভাল। অল্প ফুল দিয়ে রেখা তৈরীর বেলায় পাতা ইত্যাদিও খুব কম সংখ্যায় ব্যবহৃত হবে। [illegible] ডালিয়া দিয়ে ফুলদানি সাজাবার বেলায়ও একই প্রজাতির কোন ফুল দিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট রেখা তৈরী করা যেতে পারে। এই মূল রেখাটিকে বজায় রেখে তার পাশে ও মাঝে বিভিন্ন রঙের ও বিভিন্ন আকৃতির আরও ফুল দিতে হবে। অনেক ফুলের মাঝে কোন রেখা সৃষ্টি করতে পম্পম ডালিয়া ব্যবহার করবেন। স্পল ক্যাকটাস ডালিয়া অল্প ফুল দিয়ে সুনির্দিষ্ট রেখা তৈরীর কাজে উপযুক্ত হলেও, অনেক ফুলের মাঝখানে রেখা তৈরীর কাজে এগুলি তত মানায় না। ফুলদানিতে পুষ্পসজ্জার উচ্চতায় এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ পুষ্পসজ্জার পাত্রের গভীরতা হওয়া দরকার। নাহলে পুষ্পসজ্জাটি অত্যন্ত নেড়া নেড়া দেখাবে। বিভিন্ন ধরনের ফুলদানি সাজাবার কাজে বিভিন্ন গাছের পাতা, বিশেষ করে যেগুলি অনেক সময় ধরে ফুলদানিতে তাজা থাকে সেগুলি ব্যবহার করা চলে। এইসব পাতার ভিতরে ম্যাগনোলিয়া গ্রানডিফ্লোরা, কামিনী, অরোকেরিয়া কুকি, গ্লাডিওলাস, ফার্ন ইত্যাদি উল্লেখ করা যেতে পারে। এছাড়া কাশফুল ও বিভিন্ন ঘাসের ফুলও ডালিয়ার পুষ্পসজ্জায় চমৎকার মানায়। ফুল সাজাবার কাছে একথা মনে রাখার দরকার যে প্রান্তসীমায় হালকা রঙের ফুলের ব্যবহার বেশি হবে এবং পুষ্পসজ্জার মাঝখানে ঘন রঙের ফুলের। বিভিন্ন ডালিয়া দিয়ে সাজাবার বেলায় প্রথমেই চোখে পড়ে পুষ্পসজ্জার এরকম জায়গায় সবচেয়ে ভাল ফুলটি বসাবেন। ডালিয়ার ফুলদানি হিসাবে খাবার প্লেট, মিক্স-বোল থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন আকৃতির সুদৃশ্য ফুলদানির ব্যবহার রয়েছে। ডালিয়া দিয়ে ফুলদানি সাজাতে [illegible] পিন-হোল্ডার ও টুকরো তারের জাল ব্যবহারের দরকার পড়বে। ফুল এমনভাবে সাজাবেন যাতে এগুলি ফুল বা পাতার নিচে সম্পূর্ণরূপে ঢাকা পড়ে। বড় ফুলদানির বেলায় বেশি ডালিয়া দিয়ে অথবা একটি বড় [illegible]

ডালিয়া দিয়ে সাজানো ভাল, এদের বেলায় ফুল অল্প হলে পুষ্পসজ্জা খালি খালি দেখায়। ছোট ফুলদানি পম্পম বা স্পল ক্যাকটাস দিয়ে সাজানো সহজ এবং এই ফুলগুলি এই ধরনের ফুলদানিতে মানায়ও চমৎকার।

ফুল ভাল ফুটেছে কিন্তু ফুটে যাওয়া শেষ হয়নি এরকম ডালিয়া পুষ্পসজ্জার কাজে বেছে নেবেন। ফুল সাজাবার কাজের ডালিয়া কাটবেন ভোরবেলায় অথবা বিকেলবেলায়। সঙ্গে করে জলপূর্ণ পাত্র নিয়ে যেতে হবে যাতে ডালিয়া কেটেই তার ডাঁটি তাতে মিনিট কয়েক রেখে জল খাইয়ে নেওয়া যায়। এছাড়া কোন ডালিয়াগুলি কাটার পরে অনেক সময় ধরে সতেজ থাকে তাও ফুলদানি সাজাবার আগে পরীক্ষা করে নেওয়া দরকার। কিছু কিছু ডালিয়া কাটার কিছুক্ষণ পরেই ঢলে পড়ে, আবার অনেক ডালিয়া কয়েকদিন ধরে সতেজ থাকে। তাই কোন প্রজাতির ডালিয়া কিরকম ভাল থাকে তা বেশ কয়েকদিন আগেই পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত। ফুল সাজাবার পরে কোন কোন ফুল কিছুক্ষণের ভিতরেই ঢলে পড়লে তা নিশ্চয়ই অত্যন্ত বিসদৃশ দেখাবে। জয়শ্রী, [illegible], জয়ানীতা প্রভৃতির বেলায় দেখেছি এরা কাটার কিছু সময়ের ভিতরেই ঢলে পড়ে, তাই এদের ফুলদানিতে ব্যবহার করা যাবে না। ফুল কাটার সময়ে যতটা সম্ভব লম্বা ডাঁটিসহ কাটবেন যাতে ফুল সাজাবার সময়ে ডাঁটির দৈর্ঘ্য প্রয়োজনমত কমানো চলে। বেশিভাগ ডালিয়ার পাতা কাটার পরে সহজে ঢলে পড়ে, তাই ডালিয়ার পাতা পুষ্পসজ্জায় ব্যবহার করতে চাইলে কোনগুলির পাতা ভাল থাকে তা আগে থেকেই দেখে নিতে হবে।

ফুলের রঙ সম্পর্কেও সাবধান হওয়া দরকার। সব রঙ সব রঙের পাশে মানায় না, মানাবে না বলে সন্দেহ হলে ভিন্ন রঙের ফুল দুটি পাশাপাশি রেখে দেখে নেবেন। কালচে লাল, অন্যান্য ঘন লাল ও ঘন পার্পেল রঙের ডালিয়া ঘরের ভিতরের আলোতে ভাল দেখায় না। এ ছাড়া, বৈদ্যুতিক আলোতে ম্লান, লাইলাক ও নীল ধরনের রঙের ফুলের খোলতাই হতে চায় না। ঘরের দেয়ালের রঙের সঙ্গে

রূপকথার রাজপুত্র ওনাসিস

এষা ভট্টাচার্য

জ্যাকি আবার সংবাদের শিরোনামায়। 'সূর্যস্নানরতা অসম্পিণ্যা জ্যাকির ফোটোর মালা সাজিয়ে জগৎকে উপহার দেওয়ার জন্য কত প্রতীক্ষা, পরিশ্রম, অনুসন্ধান—ক্যামেরা-চক্ষু তীক্ষ্ণ রেখে শিকারী বিড়ালের মতো। প্রেসিডেন্ট-নির্বাচনী প্রচার পর্বে রমা হাসিতে ঝলমল মুখে সেই যে জ্যাকি প্রথম উচ্চ মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন তারপর থেকেই তাঁকে ঘিরে সংবাদ রচিত হয় ফিরে ফিরে। দুঃসংবাদ, সুসংবাদ, ঔৎসুক্য-সঞ্চারী বিচিত্র তথ্য কতো। আড়ালে যান বার বার, প্রচ্ছন্ন থাকেন মাঝে মাঝেই, কিন্তু কখনই হারিয়ে যান না। "শী অলওয়েজ ম্যানেজেস টু বি ইন দ্য 'নিউজ'"—অনেক সাংবাদিকদের মন্তব্য। মানতেই হবে, এই বিশ শতকের শেষার্ধে জ্যাকি প্রায় কিংবদন্তীতে পৌঁছেছেন, হলিউডের আকাশে যে কটি বিশ্ববন্দিতা প্রোজ্জ্বল তারকা বিরাজ করেন, তাদের প্রত্যেকের প্রতিযোগী তিনি এবং অনেকের পক্ষেই ঈর্ষণীয়।

কিন্তু বোধ হয় আরো বিচিত্র সেই মানুষটি, যাকে তিনি প্রেসিডেন্টের বেদনাদায়ক মৃত্যুর পর আপন জীবনসঙ্গীরূপে বেছে নিয়েছেন। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিমান রাষ্ট্রের প্রধানতম পুরুষের ঘরণী ছিলেন তিনি, তাঁর দ্বিতীয় নির্বাচনও যে রোমাঞ্চকর হবে, এতে আর সন্দেহ কি? আর সত্যিই এক অসাধারণ ব্যক্তি এই ওনাসিস—রূপকথার রাজপুত্রের মতোই জ্যোতির্ময় পরিমণ্ডলে জনমানসে তিনি অধিষ্ঠিত, চার মহাদেশ জুড়ে বিস্তৃত তাঁর সম্পদ, সমুদ্রতলের সীমাহীন জলরাশি তাঁর বিলাস-পোতের বিহারক্ষেত্র, তাঁর অবসরযাপনের জন্য তাঁরই নিজস্ব দ্বীপভূমি। ...স্পর্শমণির মতো যাতে তিনি হাত দেন, তা-ই যেন সোনা হয়ে যায়।

জন্মের পর তাঁর পারিবারিক নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো তারই মত প্রাচীন স্বদেশবাসী [illegible] [illegible] নাম। আরিস্ততল, সক্রেটিস ওনাসিস [illegible] দর্শনের [illegible] থাকেন [illegible] [illegible] পুলকিত হয়েছেন এই ভেবে যে কত [illegible]

হাড়াই তিনি দিব্যি বেঁচে থাকতে পারেন' কিন্তু ওনাসিসের প্রাতরাশের পাঁউরুটি আসে প্যারী থেকে, আর তাঁর জামাকাপড় কাচতে যায় প্লেনে উড়ে আথেন্সে। তাঁর বিলাস-পোত ক্রিস্টিনা থেকে প্রেম এটা-ওটা সরিয়ে বড়লোক হয়ে গেছে অনেক স্টুয়ার্ড আর খালাসী, আর সমাধার মতো যথেষ্ট সামগ্রী সেখানে প্রস্তুত—নানা শিল্পকর্ম, গ্যাসোলিন, মদ, দামি বেশবাস, খাদ্যদ্রব্য, শিল্পদ্রব্যের মধ্যে রয়েছে এক অমূল্য হিরণ্ময় বুদ্ধমূর্তি ও আঠারো-শতকী গজদন্তনির্মিত নৌকো বেশ কয়েকটি, পিকাসো ও গগ্যার আঁকা মূল ছবি, তিমির দাঁতে গড়া যারস্টুল চার্চিলের সাদৃশ্যে রচিত টৌবি জগ... নাঁসা-ডিবে, সংখ্যায় দেদার, তা-ও সোনার গড়া—ছড়িয়ে আছে যত্রতত্র। মা, পিতৃদত্ত নাম তাঁর যা-ই হোক, শাহজাহান কিংবা রাজা মিডাস কিংবা গ্রীক জোর্বার মতো তাঁর জীবনযাপন, চঞ্চলা লক্ষ্মী তাঁর ললাটে অচলা হয়ে বিরাজ করেন।

এমন কৌতূহলোদ্দীপক মানুষের পিছনে সাংবাদিকের চেষ্ট লেগে থাকবে এতে আর আশ্চর্য কি! প্রকাশ্য ওনাসিসেং অপ্রকাশ্য ওনাসিস, সামাজিক মুখোশের আড়ালে ব্যক্তিগত মুখচ্ছবিটি কেমন তাঁর, কিভাবে তাঁর দৈনন্দিন জীবন কাটে, কি তাঁর খেয়াল, অভ্যাস, রুচি ও চালচলন—ব্যবসায়, বিনোদন ও প্রেমের ক্ষেত্রে কেমন রূপে তিনি প্রতিভাত, তা জানার জন্যে ওকে তক্কে থাকে সাতাশটি দেশের পেশাদার ক্যামেরাম্যান, আটচল্লিশটি প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রের উদীয়মান ফীচার-লেখক এবং প্রতিষ্ঠিত কলামনিস্ট। কিন্তু জাহাজে নিরত ভাসমান এবং অগণ্য কর্মচারী, অনুচর-কিংকরে নিত্যপরিবৃত মানুষটিকে ধরা-ছোঁয়ার আশাই এক বিরল [illegible]। [illegible] সাংবাদিক [illegible] হার্ভে' সেই অসাধ্য সাধন করেছেন এক অদ্ভুত উপায়ে। ক্রিস্টিনা [illegible] এক প্রাক্তন 'স্টুয়ার্ড' [illegible] কাকারাকিসকে তিনি পাকড়াও করেছেন। ওনাসিসকে [illegible] কাজের থেকে [illegible] সংবাদ পেয়েছিলো কাকারাকিস—সেই ১৯৫৭ সাল থেকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ক্রিস্টিনার স্টুয়ার্ড হয়ে সে কাজে যোগ দেয়, ওনাসিসের তদানীন্তন পত্নী টিনা'র অনুমোদনে। কাকারাকিসকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে করে যথাসম্ভব এক সম্পূর্ণাঙ্গ চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেছেন হার্ভে। ফল যা দাঁড়িয়েছে তা এক সম্ভাব্য বেস্ট-সেলার : বইটির নাম 'আশ্চর্য ওনাসিস।'

আশ্চর্য নিশ্চয়ই। মিলিওনেয়ার, বিলিয়নেয়ার, বা জিলিয়নেয়ার, যা-ই বলুন আজ ওনাসিসকে, তাঁর সমস্ত দৌলত তাঁরই স্বকৃত এবং স্বীয় পরিশ্রম ও প্রতিভার দ্বারা উপার্জিত, উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ নয়। জন্মেছিলেন স্মির্ণায়, তুরস্কের উপান্তে। তাঁর বয়স যখন ষোলো, তুর্কীরা আক্রমণ করে শহরটিকে, বহু গ্রীক নিহত হয়, অনেকে হয় কারারুদ্ধ। ওনাসিসও সেই সময় জেল খাটেন কিছুদিন, পরে অপ্রাপ্তবয়স্ক বলে ছাড় পেয়ে বেরিয়ে আসেন। বেরিয়ে এসে দ্যাখেন তাঁর পিতা তখনও কারাগারে।

পরিবারটির ছিলো তামাকের ব্যবসা। মুনাফা কম হতো না, সঞ্চয়ের পরিমাণও বেশ সচ্ছল। সেই সঞ্চিত অর্থের কিছুটা ভেঙে, লাভলোলুপ তুর্কী আমলার বাঁ-হাতে গুঁজে দিয়ে, বাপকে ছাড়িয়ে আনলেন ওনাসিস। কিন্তু আর্থিক ব্যাপারে অত্যন্ত খুঁতখুঁতে বাপ ছেলের এই আচরণে মোটেই খুশি হলেন না। বহুদিন বাকে [illegible] এমনটি তাঁকে ছেড়ে দিতে অর্বাচীন ছোকরা অধৈর্যবশে মিছিমিছি এতগুলো টাকা জলাঞ্জলি দিলো—এমন ছেলের ওপর বেশ একহাত নিলেন তিনি। ছেলে পিতার এই অকৃতজ্ঞতায় রেগে টং, বাপকে তক্ষুনি 'গুড বাই' জানিয়ে চড়ে বসলো এক আর্জেন্টিনাগামী উদ্বাস্তু বোঝাই জাহাজে, লক্ষ্য—নিজের ভাগ্য নিজেই গড়বেন। তাঁর প্রথম চাকরি ঐ আর্জেন্টিনাতেই—এক বৃটিশ টেলিগ্রাফ কোম্পানীতে সেন্ট্রাল [illegible] কাজ, মাইনে সাকুল্যে মাসকাবারে চল্লিশটি মাত্র ডলার।

কিছুদিন আর্জেন্টিনায় থাকতে থাকতেই ওনাসিস কিন্তু বুঝে নিলেন, এখানে তামাকের বাজারের বিপুল সম্ভাবনা। [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁর আত্মীয় [illegible] [illegible] [illegible]

আর্জেন্টিনার বাজারে চালু তামাক বিলকুল বাতিল। কর্তৃপক্ষ খবর পাঠালেন দেশে—নমুনা পাঠাও। নমুনা পৌঁছতে দেরী হলো না, কিন্তু হাতে পেয়ে যথারীতি অর্ডার দিলেন না ওনাসিস, কিন্তু ব্যাবসা হলো দুর অস্ত। চালু তামাকের বাজার ভাঙা সহজসাধ্য নয়, খদ্দেররা উদাসীন রইলো, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কাছেও তাই নিষ্ফল প্রত্যাখ্যানের বেশি আর কিছু জুটলো না। ওনাসিস তবু হাল ছাড়লেন না, সে-দেশের বৃহত্তম কারবারের মালিকের পিছু পিছু ছায়ার মতো ঘুরে বেড়ালেন এক পক্ষকাল। "আপনাদের বাজার-দরের চেয়ে কমে আপনাদের বাজারের চালু মালের চেয়ে ভালো মাল আমি দেবো—কেন আমাকে সুযোগ দেবেন না বলুন।" ছোকরার উৎসাহে ও নির্বন্ধাতিশয্যে, কিছুটা কৌতুকবশে ও কিছুটা উপরোধে ঢোক গিলে মালিকপক্ষ অবশেষে তাঁকে পরিচিত ও অনুমোদনপত্র লিখে দিলেন তাঁর কাছে ক্রয়কারী বড়োবড়ো ডিলারদের উদ্দেশে। এইমাত্র খুঁটি অবলম্বন করে আর্জেন্টিনার তামাকের বাজারে ওনাসিসের প্রথম বর্তন।

তার পরের ইতিহাস রুদ্ধশ্বাস গতিতে দুরন্ত। মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে বাজারের এক-তৃতীয়াংশ তিনি অধিকার করে নিলেন। মুনাফার টাকা জমিয়ে তিনি যখন এক পেল্লায় সিগারেট ফ্যাক্টরী খুলে বসলেন তখনও তাঁর বয়স কুড়ি পেরোয় নি। আবেক আস্তি তামাক ছাড়াও শস্য ও পশমের ব্যবসায়ে নেমে পড়লেন তিনি। স্বল্পান্য কয়েক বছরের মধ্যেই 'ডলার-মিলিয়নেয়ার' হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো।

কিন্তু আদার-ব্যাপারী হয়ে থাকতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। জাহাজের দিকে তীক্ষ্ণ নজর ছিলো বরাবর। ১৯৩১ সালে 'মন্দা' যখন চরমে উঠেছে, হঠাৎ খবর এলো কানাডার কয়েকটি জাহাজ বিক্রির জন্য বিজ্ঞাপিত হয়েছে—একেবারে জলের দরে। জাহাজ পিছু কুড়ি হাজার ডলার হিসেবে ছটি জাহাজ তিনি কিনে নিলেন। পাঁচ বছর পরে গড়লেন সাড়ে পনেরো হাজার টন ওজনের তাঁর নিজস্ব ট্যাংকার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন শুরু হল ততদিনে তিনি তিন-তিনটি ট্যাংকারের মালিক।

ব্যবসায়িক দূরদৃষ্টির ফলে ওনাসিস একটি ব্যবস্থা করেছিলেন : সেটা এই যে, জলদস্যু হিসেবে [illegible] ব্যবহারের দিন ফুরিয়ে এসেছে; অচিরেই মধ্য ইওরোপ [illegible] [illegible] স্থান নেবে তেল। তৈল-ব্যবসায়ী বিভিন্ন কোম্পানীর সঙ্গে সওদাগির বোঝাপড়া করলেন ওনাসিস। তৈলবাহী ট্যাংকার নির্মাণের আগেই তাদের নিয়ে তিনি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করালেন। তারপর ধীরে ধীরে তাঁর জাহাজের প্রধান পণ্য-সম্ভার হয়ে উঠল শস্যের বদলে তেল।

হিসেব-কষা অতি সতর্ক ব্যবসায়ী বলতে আমরা যা বুঝি, ওনাসিস তা কখনই না। অ্যাডভেঞ্চার তাঁর মজ্জাগত, বাজি রেখে কোটি কোটি ডলারের ঝুঁকি নিয়ে নতুন ব্যবসায় পত্তন করতে তিনি সর্বদা প্রস্তুত। একবার এক নরওয়েজীয় ভদ্রলোক তাঁর কাছে মন্তব্য করেন একমাত্র নরওয়েজীয়রাই নাকি তিমি শিকারের ব্যবসাকে লাভজনক করে তুলতে পারে। ওনাসিস বললেন, 'বটে?' সঙ্গে সঙ্গে এক শিকারী জাহাজ কিনে ক্যালিফোর্ণিয়ার তটে তিমির জন্য ওৎ পাতলেন, পাঁচবার হানা দিলেন অ্যান্টার্কটিকে, অতলে ঐ বিশাল-বপু জলজীবটির খোঁজে, দু-হাত ছাপিয়ে মুনাফা লুটলেন।

একাধারে কৃপণ ও দিলদরিয়া, কটু-ভাষী ও উদারহৃদয় এই মানুষটির সম্পর্কে বহুবিচিত্র কাহিনী আজকের দুনিয়ায় [illegible] ক্যাকারাকিস্। এইরকম দুটি কাহিনী বলেই বর্তমান নিবন্ধের উপসংহার টানব।

একদিন দেখা গেল আধরাতের কিছু আগে ওনাসিস তাঁর ক্রিস্টিনা পোতের জঞ্জাল ফেলার আধারগুলি পায়ের ডগা দিয়ে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করছেন। পরপর তিনটি আধারে সমীক্ষা চালানোর পর গম্ভীর হয়ে উঠল তাঁর মুখ, দৃষ্টি থমথমে, ক্রোধের আভাস পড়লো মুখের ভাঁজে—বোঝা গেল হাওয়া খারাপ, ঝড় আসন্ন। রাত দুটোর সময় জাহাজের তাবৎ খালাসী স্টুয়ার্ড ও অন্যান্য কর্মচারীদের তলব পড়ল খালাসীদের আহারশালায়। দুরু দুরু বুকে ঘরে ঢুকে সবাই চেয়ে দ্যাখে, পিছনে হাতদুটি মুষ্টিবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছেন ওনাসিস, অবরুদ্ধ ক্রোধে বক্ষদেশ স্ফীত এবং দু-চোখে বিদ্যুতের ঝলক।

"অপদার্থের দল!" তাঁর কণ্ঠ গমগম করে উঠল : "সারা পৃথিবীজুড়ে হাজার হাজার মানুষ অনাহারে অপুষ্টিতে মারা যাচ্ছে, আর তোমরা হাতের কাছে যা পাচ্ছ, সবকিছু জলাঞ্জলি দিচ্ছ জঞ্জালে!"

অনুসন্ধান চালিয়ে কি কি পেয়েছেন তার একটি তালিকা দিলেন তিনি : মুরগীর তৈরি দুটি [illegible], গোটা এক [illegible] [illegible] সাবান [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], টাটকা-তৈরী রুটির পাহাড়...

এ-কাহিনীর একটু পরেই সম্পূর্ণ উল্টো আর এক কাহিনীর [illegible] [illegible] আমরা। প্যারী নগরীতে ওনাসিসের এক [illegible] আছে। কুড়ি বছর ধরে সেই বাড়িতে তাঁর [illegible] ও [illegible] হিসেবে [illegible] [illegible] জর্জ এবং হেলেনা। ১৯৫৫ সালে একদিন দুজনে এসে উৎসব সসম্ভ্রমে মনিবকে জানালো তাদের দু-সপ্তাহের ছুটি চাই।

—"ছুটি? ছুটি কেন?"

—"আজ্ঞে আমরা বিয়ে করতে চাই। বিয়ের জন্য একবার দেশে—গ্রীসে—ফিরতে চাই।"

—"বিয়ে করবে? উত্তম!" সেদিন খোশ-মেজাজে ছিলেন ওনাসিস, খানিকটা অন্যমনস্ক মতই বললেন, "ঠিক আছে দেখা যাক, কতদূর কি করতে পারি।"

বললেন ত' বটে, কিন্তু তারপর থেকে মনিবের কাছ থেকে কোনো সাড়াশব্দ পায় না জর্জ আর হেলেনা। বেচারীরা বিষণ্নমুখে দিন কাটায় আর ভাবে, মনিবমশায় ব্যস্ত মানুষ, হয়তো ভুলেই গেছেন সব কথা।

তারা ভাবতেও পারে নি তাদের জন্য এক সানন্দ বিস্ময় অপেক্ষা করছিলো।

আসলে দিনের পর দিন ধরে এক রাজকীয় বিবাহোৎসবের পরিকল্পনা রচনা করে চলেছিলেন ওনাসিস। তখনও তিনি স্কর্পিয়স্ দ্বীপ কেনেন নি। তাই এক বন্ধুকে গিয়ে ধরলেন, তোমার দ্বীপটি বাপু আমাকে কিছুদিনের জন্য ধার দিতে হবে। জর্জ আর হেলেনার বিয়ে আমি ওখানেই দিতে চাই।"

এদিকে আবিষ্কৃত হলো, দ্বীপটির প্রবেশ-প্রণালী খুবই অগভীর। 'ক্রিস্টিনা'র মত অতিকায় জাহাজ সেখানে ঢুকতেই পারবে না। কুছ পরোয়া নেই—বললেন ওনাসিস, কন্ট্রাক্টর লাগিয়ে দিলেন পঞ্চে এক লাখ ডলার খরচ করে টন টন মাটি আর বালি কাটিয়ে জাহাজের প্রবেশপথ সুগম করে ফেললেন। অবশেষে জুলাই মাসে জর্জ আর হেলেনাকে ডেকে জানালেন বিয়ের সব কিছু রেডী। তারা ত অবাক। ১৮ই জুলাই বিয়ের দিন নির্ধারিত হলো। বিয়ের আসরে জর্জের সাক্ষী হিসেবে দাঁড়ালেন ওনাসিস নিজে আর ওনাসিসের সেই বন্ধু হলেন হেলেনার সাক্ষী। তিন দিন ধরে একটানা চলল সেই পার্টি—উদ্যানের ফুলের উৎসব, বর্ণা বইল নানাবিধ সুরার। [illegible] থেকে ভাড়া করে আনা তিন তিনটি [illegible] অর্কেস্ট্রা দল পরিবেশন করলো [illegible] সুরে, আনন্দে, মূর্ছনায়। নাচ-গান-হুল্লোড়ের সেই উৎসব আবহে সমস্ত সামাজিক ভেদ [illegible] করতেই সবাই মেতে উঠেছিল সে কটি দিন।

—এই হলেন ওনাসিস, [illegible] বেপরোয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চরিত্র।

অনেকদিন পরে ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিসের যৌথ উদ্যোগে সুনীল দাশের ছবির একক প্রদর্শনী দেখলাম। ঈর্ষণীয় তাঁর চিত্র-সংগঠন ক্ষমতা। দ্বিমাত্রিক চিত্রতলকে তিনি অনায়াসে বিভাজিত করে, রেখা ও পুঞ্জের সাহায্যে সৃষ্ট রূপবন্ধসকল বিন্যস্ত করে নকশায় পরিণত করতে পারেন। বহির্জাগতিক বস্তু-রূপকে রেখা, পুঞ্জ ও বুনটের সাহায্যে চিত্র-জগতের রূপবন্ধে এবং রেখা, পুঞ্জ ও বুনটের সাহায্যে গড়ে তোলা চিত্রতলের রূপবন্ধকে তিনি বহির্জাগতিক বস্তু-রূপের প্রতিভূ হিসাবে উপস্থাপিত করতে পারেন। এক-কথায় স্টাইলাইজেশন বা শৈলীবদ্ধ করার ক্ষমতা তাঁর অসীম। ছেড়ে-দাওয়া চিত্র-ক্ষেত্রকে শেষ করে তোলার ক্ষমতা তাঁর শিল্পীর-ঈর্ষণীয়। কিন্তু তাঁর কারুদক্ষতাই ছবির পক্ষে আততায়ী।

প্রধানত তেলরঙ ও বিভিন্ন ঘনশরীর-বিশিষ্ট দ্রব্যসংস্থাপনে (কোলাজ) ক্যানভাসের উপর আঁকা তাঁর ছবিগুলি দেখলে মনে হয় তারা যেন বা বিশুদ্ধ বিমূর্ত নকশামাত্র নয়, রূপবন্ধগুলির পারম্পর্য যেন রূপকল্পের ইঙ্গিত দিচ্ছে। সেই ইঙ্গিত অনুসরণ করে, রেখাসীমায় বদ্ধ আকৃতিগুলির, রঙের পুঞ্জে গঠিত আকারগুলির এবং রূপবন্ধগত জমির বুনটের প্রতি মনঃসংযোগ করলেই অবশ্য দেখা যাবে যে চিত্রগত আকার, আকৃতি এবং রূপবন্ধ স্বকীয় গরিমায় প্রতিষ্ঠিত হবার পরে দর্শন অভিজ্ঞতাকে অনুসন্ধানী করে কোন বহির্জাগতিক বস্তুরূপ এবং তৎকেন্দ্রিক অনুষঙ্গের ব্যঞ্জনা দিতে পারছে না। অন্যপক্ষে দেখা যাবে যে চিত্রগত আকার আকৃতি, রূপবন্ধগুলি কতগুলি নির্দিষ্ট বহির্জাগতিক বস্তু-রূপের একাধারে সরলীকৃত এবং অলঙ্কৃত রূপ। শৈলীবদ্ধকরণের কাজে বস্তুর জাগতিক রূপের প্রকৃতিকে যে কোনভাবেই কাজে লাগানো হয়নি, তার থেকে কি এই অনুমিত হয় না যে জাগতিক রূপকে শুধুমাত্র নকশার অংশে পরিণত করার জন্যই শৈলীবদ্ধ করা হয়েছে। ফলে শ্রীদাশের ছবিতে নানারকম যৌন প্রতীক এবং গর্ভ, স্তন, নিতম্ব এবং লিঙ্গ, বিবাহে ব্যবহৃত ত্রিকোণ কাষ্ঠ শাঁখা, দর্পণ কড়ি ও সিঁদুরে রঙ, দূর্বা-হরিৎ রঙ তাদের বহির্জাগতিক শরীরের বিভিন্নতা হারিয়ে সমশরীর বিশিষ্ট ভিন্ন আকার চিহ্ন এবং /বা আলঙ্কারিক নকশায় পরিণত হয়েছে।

তিনি ঐ সব যৌন প্রতীক এবং সর্প, অণ্ড গর্ভ, বীজ ইত্যাদি চিহ্ন দিয়ে, তাদের বহির্জাগতিক সমানুপাত ভেঙে ফেলে, দৃষ্টিনন্দন নকশা তৈরী করার কারুকলা আবিষ্কার করে ফেলেছেন। ছবিকে যদি গভীরভাবে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভাবে অর্থবহ করে তুলতে হয় তবে রূপবন্ধের, রঙের, রেখার, পুঞ্জের, বুনটের, ছেড়ে-দাওয়া ক্ষেত্রের পারস্পরিক শুধুমাত্র দৃষ্টিনন্দন তারতম্যমূলক না হলেই চলবে না, [illegible] সেই সঙ্গে নকশাময় চিত্রভাষায় বহির্জাগতিক বস্তুকে নতুন অর্থে মণ্ডিত করতে হবে। তিনি কি তা করেছেন? তাঁর ছবির রূপের সঙ্গে রঙের সম্বন্ধ কি?

অথচ আপাতদৃষ্টিতে তাঁর ছবি অর্থবহ। যেসব বহির্জাগতিক বস্তুরূপকে তিনি সরলীকরণ এবং অলঙ্করণের জন্য বেছে নেন, তা দিয়ে তিনি যেন যৌনানুভূতি ও জীবসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা ও রহস্যকে সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বাঙালী হিন্দু যে রীতি-নীতি আচার-অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে তার মানবিকতা, তার প্রকৃতিবিধানমর্যাদা, তার সংকেতধর্মিতা ইত্যাদিকে দর্শনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তা বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। তিনি শাঁখা, সিঁদুরে রঙ, কড়ি, দর্পণ, দূর্বার রং, সর্প ইত্যাদি বস্তু বা বস্তু-রূপের আলঙ্কারিক চিহ্নকে যখন কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছেন, তখন তার নিত্য-ব্যবহার্য আনুষ্ঠানিক-সাংকেতিক অর্থটাকেই ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন। এ-সব বস্তু বা বস্তু-রূপের উপর নোতুন কোন দৃষ্টিগ্রাহ্য অর্থ আরোপ করেননি। পুরাতন অর্থের সম্প্রসারণও ঘটেনি। ফলে, তাঁর ছবি নকশা ছাড়া অন্য কিছুর আকার ধারণ করলেও অন্য কিছু হয়ে ওঠেনি। তাঁর ছবিতে অর্থবহতাটুকু আছে তা হল বহির্জাগতিক জগৎ-রূপ হবে, না হয় বাড়তি। সার্থক শিল্পে অতিরিক্তের স্থান কোথায়?

সারা পৃথিবীতে আজ 'সারফেস পেইনটিং' বা অঙ্কিততলসর্বস্ব চিত্রের জয়-জয়কার। চিত্রতলে অঙ্কিত বস্তু বা চিত্রদ্রব্য দর্শনেন্দ্রিয়কে এবং শুধুমাত্র দর্শনেন্দ্রিয়কে চরমভাবে উদ্দীপ্ত করবে, কিন্তু সার্বিক মানবিক অভিজ্ঞতায় কোন অনুসন্ধানী অর্থময়তা সৃষ্টি করবে না-এর নাম সারফেস পেইনটিং। শ্রীদাশের ছবি শিল্পশরীরের দিক থেকে একান্তভাবে অঙ্কিততলসর্বস্ব চিত্র। কচিৎ কখনও রূপবন্ধগুলি রূপকল্প হয়ে উঠতে চেয়েছে, কিন্তু তিনি তা হতে দেননি। তিনি কোথায় যেন বলেছেন ইয়োরোপে গিয়ে তিনি ভারতীয় হতে শিখেছেন! সত্যিই কি তিনি ভারতীয় হয়েছেন? ছবিতে ভারতবর্ষে ব্যবহৃত কিছু বস্তুরূপের রূপাভাস বা রঙ ছড়িয়ে দিলেই কি ছবি ভারতীয় হয়ে ওঠে? চিত্রশরীর সম্বন্ধে তাঁর যে ভাবনা তাঁর ছবিতে প্রতিভাত—সেই মানবিক-সার্বিকতা বিযুক্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতি [illegible] প্রবণতা অভিজ্ঞতাজাত [illegible] [illegible] পশ্চিম ইয়োরোপ এবং মার্কিন [illegible] [illegible] ভারতীয়ত্বের পক্ষে এ-প্রবণতা অতীব ক্ষতিকর।

তেলরঙ ও কোলাজ শিল্পী : সুনীল দাশ

প্রদর্শনী

সুনীল দাশ ও শিল্পের ভারতীয়তা এবং মূক-বধিরদের শিক্ষায় শিল্প

খেলাধুলা

দর্শক

ভারত সফরে এম সি সি

টনি লুইসের নেতৃত্বে এম সি সি দলটি ভারতের মাটিতে ক্রিকেট সফরের উদ্দেশ্যে গত ৩০শে নভেম্বর বোম্বাইয়ে পৌঁছে গেছে। ১৯৭২-৭৩ সালের ভারত সফরে তাদের প্রথম খেলা শুরু ৫ ডিসেম্বর এবং শেষ খেলা শুরু ৬ ফেব্রুয়ারী। ১১ সপ্তাহের এই ভারত সফরে এম সি সি দল মোট ১১টি ম্যাচ খেলবে—ভারতের বিপক্ষে ৫টি টেস্ট এবং প্রথম শ্রেণীর খেলা ৬টি। দলের ১৬ জন খেলোয়াড়ই ১৯৭১ সালে ইংল্যান্ডের মাটিতে ভারতীয় ক্রিকেট দলের বিপক্ষে খেলেছিলেন। তবে ভারতের বিপক্ষে টেস্ট ম্যাচ খেলেছিলেন এই পাঁচজন খেলোয়াড়—অ্যালেন নট (৩টি), নর্ম্যান গিফোর্ড (২টি), কিথ ফ্লেচার (২টি), ডেনিস অ্যামিস (১টি) এবং ডেরেক আন্ডারউড (১টি)। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৭২ সালের টেস্ট সিরিজে ইংল্যান্ডের পক্ষে যে ১৮ জন খেলেছিলেন তাঁদের মধ্যে এই ৭ জন খেলোয়াড় ১৯৭২-৭৩ সালের ভারত সফরে এসেছেন—নট গ্রীগ, গিফোর্ড, আরনল্ড, আন্ডারউড, উড এবং ফ্লেচার।

এম সি সি দলের খেলোয়াড় হিসাবে ১৬ জন খেলোয়াড়েরই এই প্রথম ভারত সফর। তবে এই সফরের আগে ১৯৬৮ সালে এক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট একাদশ দলের পক্ষ নিয়ে এই ছয়জন খেলোয়াড় বোম্বাই এবং মাদ্রাজে খেলে গেছেন—ডেনিস অ্যামিস, কিথ ফ্লেচার, টনি গ্রীগ, ডেরেক আন্ডারউড, জিওফ আরনল্ড এবং মাইক ডেনেস। বোম্বাইয়ের খেলায় অ্যামিস এবং ফ্লেচার সেঞ্চুরী করেছিলেন এবং মাদ্রাজের খেলায় গ্রীগের সেঞ্চুরী এবং আন্ডারউডের ৭ উইকেট লাভ উল্লেখযোগ্য। ভারতের জলবায়ু এবং উইকেট সম্বন্ধে এই ছয়জনের কিছুটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে।

টনি লুইসের পক্ষে অধিনায়কের পদলাভ এক তাজ্জব ব্যাপার। এই পদলাভের আগে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার আসরে খেলোয়াড় হিসাবে তাঁর কোন নাম-গন্ধই ছিল না। ইংল্যান্ডের পক্ষে কোন টেস্ট ম্যাচ না খেলেই একেবারে দলের অধিনায়ক হিসাবে আগামী ২০শে ডিসেম্বর ভারতের বিপক্ষে তাঁর খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নামবেন। টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ডের অধিনায়কের পদলাভ ওয়েলসের ক্রিকেট খেলোয়াড়দের পক্ষে এই প্রথম। কোন টেস্ট ম্যাচ না খেলেই ইংল্যান্ডের অধিনায়কের পদলাভ করেছেন টনি লুইসকে নিয়ে এ পর্যন্ত ১২ জন খেলোয়াড়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একাদশ পরিচালক, [illegible] টেস্ট ম্যাচ না খেলেই ১৯৫১-৫২ [illegible] সফরে এম সি সি-র অধিনায়ক হয়ে এসেছিলেন।

১৯৭২-৭৩ সালের ভারত সফরকারী এম সি সি দলের বর্ষীয়ান খেলোয়াড় টনি লুইসের বয়স ৩৪ বছর। অপরদিকে দলের সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় ক্রিস ওল্ডের বয়স ২৪ বছর। দলের ১১ জন টেস্ট খেলোয়াড়ের মধ্যে সব থেকে বেশী টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন উইকেটকিপার অ্যালেন নট, মোট ৩৬টি। তাছাড়া একমাত্র তিনিই টেস্ট খেলায় ১,০০০ রান এবং সেঞ্চুরী করেছেন—৩৬টি টেস্টের ৫৪ ইনিংসে (নট আউট ৭ বার) মোট রান ১৬৭৪, সেঞ্চুরী ২টি এবং এক ইনিংসে সর্বাধিক রান ১১৬ (বিপক্ষে পাকিস্থান, বার্মিংহাম, ১৯৭১)।

১৯৭২-৭৩ সালের ভারত সফরকারী এম সি সি দলটি হাতের কাছে যাঁদের পাওয়া গেছে তাঁদেরই নিয়ে তৈরী হয়েছে। অনেক নামকরা খেলোয়াড় ভারত সফরে আসতে তাঁদের অক্ষমতা জানিয়ে দিয়েছিলেন। ভারতের অগণিত ক্রিকেট অনুরাগী ভারত সফরকারী এম সি সি দলে জিওফ বয়কট, রে ইলিংওয়ার্থ এবং জন স্নোর অনুপস্থিতির অভাবই সব থেকে বেশী অনুভব করছেন।

এম সি সি'র খেলার তালিকা

(১) বিপক্ষে বোর্ডের সভাপতি একাদশ হায়দরাবাদ, ডিসেম্বর ৫-৭

(২) বিপক্ষে মধ্যাঞ্চল ইন্দোর, ডিসেম্বর ৯—১১

(৩) বিপক্ষে উত্তরাঞ্চল অমৃতসর, ডিসেম্বর ১৫—১৭

(৪) প্রথম টেস্ট (দিল্লী) ডিসেম্বর ২০, ২১, ২৩, ২৪ ও ২৫

(৫) দ্বিতীয় টেস্ট (কলকাতা) ডিসেম্বর ৩০, ৩১, জানুয়ারী ১, ৩ ও ৪

(৬) বিপক্ষে দক্ষিণাঞ্চল, বাঙ্গালোর, জানুয়ারী ৬—৮

(৭) তৃতীয় টেস্ট (মাদ্রাজ) জানুয়ারী ১২, ১৩, ১৪, ১৬ ও ১৭

(৮) বিপক্ষে পূর্বাঞ্চল জামসেদপুর, জানুয়ারী ২০—২২

(৯) চতুর্থ টেস্ট (কানপুর) জানুয়ারী ২৫, ২৭, ২৮, ২৯ ও ৩০

(১০) বিপক্ষে পশ্চিমাঞ্চল আমেদাবাদ, ফেব্রুয়ারী ২—৪

(১১) পঞ্চম টেস্ট (বোম্বাই) ফেব্রুয়ারী ৬, ৭, ৮, ১০ ও ১১

অজিত ওয়াদেকার

ভারত বনাম ইংল্যান্ডের ১৯৭২—৭৩ সালের টেস্ট সিরিজের পাঁচটি টেস্ট খেলাতেই অজিত ওয়াদেকার ভারতের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য, তাঁর নেতৃত্বে ভারত ১৯৭২ সালের টেস্ট সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং ইংল্যান্ডের বিপক্ষে 'রাবার' জয়ী হয়েছিল।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

শুভবিবাহে
এই
উপহার
অনন্য
অতুলনীয়...

সারা জীবনের সুখের জন্য
উষা সেলাই মেশিন!

শুভ-বিবাহে অন্য কোন উপহারে এমন তৃপ্তি ও উপকার পাওয়া যায়না — সারা জীবন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারে একমাত্র উষা সেলাই মেশিন।
উষা সেলাই মেশিন যে কোন সুখের সাজ-সজ্জার সঙ্গে মানান-সই নানা মনোরম রং ও মডেলে পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি মেশিন হাতে, পায়ে কিংবা ইলেকট্রিকে চলে এবং প্রত্যেকটি মেশিনের জন্য ভারতের সর্বত্র রয়েছে বিক্রয়োত্তর সার্ভিস ব্যবস্থা। উষা মেশিন চালানো খুব সহজ — এর সাহায্যে নব বধূকে বাড়ীতে সেলাইয়ের আনন্দ ও উপকারিতা উপলব্ধি করার সুযোগ দিন। আজই একটি উষা সেলাই মেশিন কিনে দিন।

'এক নজরে'

মেরু-মরু সংযোগ : চেরাপুঞ্জি থেকে এক খণ্ড মেঘ ধার করে গোবি সাহারার বুকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চিন্তা উন্নত-মানের কবি-কল্পনা হলেও বিজ্ঞানীর যুক্তিভিত্তিক অতিবাস্তব চিন্তাধারার সংগে তা সংগতিবিহীন নয়। এই গ্রহের একাংশের প্রাচুর্য দিয়ে অন্যাংশের রিক্ততা পূরণ বর্তমান কালে অতি-স্বাভাবিক ঘটনা এবং জলও তার ব্যতিক্রম নয়। এক দেশের মেঘকে বন্দী করে অন্য দেশে নিয়ে গিয়ে তার পুঞ্জিত জলরাশি নিংড়িয়ে বার করে দেওয়া এখনও পর্যন্ত সম্ভব না হলেও দূর-ভবিষ্যতেও তা অসম্ভব থাকবে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন না। কারণ কৃত্রিম বৃষ্টি সৃষ্টি করা বা অবাঞ্ছিত বৃষ্টি নিরোধকল্পে সঞ্চিত মেঘকে বিতাড়িত করা ইতিমধ্যেই সম্ভব হয়েছে। তারপর সমুদ্রের জল-রাশিকে লবণমুক্ত করে সুস্বাদু পানীয়তে রূপান্তরিত করাও এখন বহু জলাক্রান্ত দেশের নিয়মিত ব্যবস্থা। তবে মেরু অঞ্চলে সঞ্চিত হিমবাহ [illegible] বড় বড় তুষার দূর করাকেই বিজ্ঞানীরা জল-সমস্যার সর্বাধিক স্থায়ী, সন্তোষজনক ও স্বল্প ব্যয়ের সমাধান বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

দক্ষিণ আমেরিকার দীর্ঘ বিলম্বিত দেশ চিলি এই মেরু-মরু সংযোগের মাধ্যমে তার জল-সঙ্কটের প্রতিকারে উদ্যোগী হয়েছে। তার পরিকল্পনার মূল দক্ষিণ মেরুর হিমানী রাশিকে টেনে এনে আটাকামা মরু অঞ্চলের জনপদগুলিতে মিষ্ট জল সরবরাহ করা। দীর্ঘ পথ অতিক্রমকালে ঐ হিমানী খণ্ডগুলির অর্ধেক গলে যাবে, তাহলেও যে জল পৌঁছাবে শেষ পর্যন্ত, তা হবে পৃথিবীর যে কোন জলের চেয়ে টাটকা, মিষ্ট ও নরম। আর সমুদ্রের জল লবণমুক্ত করতে যে খরচ হয় এই প্রকল্প বাবদ ব্যয় হবে তার একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ। যে বৃটিশ বিশেষজ্ঞরা ঐ প্রকল্পটি হাতে নিয়েছেন তাঁদের মতে, চিলির সঙ্গে দক্ষিণ মেরুর এই সংযোগ স্থাপনের পথে কোন বড় প্রাকৃতিক বাধা নেই। বড় বড় বরফের চাঙড়গুলি যে টেনে আনা হবে তা সমুদ্রের জলের মধ্যে দিয়ে এলেও সম্পূর্ণ লবণমুক্ত থাকবে। তারপর চিলির উপকূলে সেগুলি পৌঁছালে সেখানে সামান্য প্রক্রিয়ার সাহায্যেই তাদের মিষ্ট জলে রূপান্তরিত করে পাইপের সাহায্যে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেওয়া যাবে। দক্ষিণ মেরু থেকে যে বরফের চাঙড়গুলি টেনে আনা হবে তার ঘন আয়তন আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন। সেগুলি হবে ১০০ মাইল লম্বা, ৩০ মাইল চওড়া ও অন্তত ১০০০ ফুট গভীর।

সুমেরু শিখর : ভারতের মহাকাব্যে ও পুরাণে যে বার বার সুমেরু পর্বত শিখরের উল্লেখ আছে তার সঠিক অবস্থিতি আজও নির্ধারিত হয় নি। পুরাণের বর্ণনায় আছে, রবিকরোজ্জ্বল তুষার মুকুট শোভিত সেই পর্বতশৃঙ্গগুলির গা বেয়ে নেমে এসেছে [illegible] বায়ু গম্ভীর গর্জনের ধ্বনি-প্রতিধ্বনিত নদী [illegible] হয় সেই চিরবেষ্টিত উপত্যকায় [illegible]। যার বিচিত্রবর্ণ ফুলের শোভায় [illegible] সৌন্দর্যও ম্লান হয়। [illegible] মুখরিত হয়ে থাকে নিষ্কলঙ্ক পক্ষিকুলের [illegible]।

বিশ বছর ধরে হিমালয়ের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করে ও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে বিশিষ্ট গবেষক শ্রী ইউ কে শুক্লা দাবী জানিয়েছেন, পুরাণে বর্ণিত সুমেরু শিখরের সন্ধান তিনি পেয়েছেন। সে স্থানটি হল মন্দাকিনী, অলকানন্দা ও পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর উৎসস্থল থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার নিম্নবর্তী ও প্রায় অর্ধেক কিলোমিটার পরিধির একটি ত্রিকোণাকৃতির উপত্যকা। ঐ উপত্যকার চারিদিকের শিখরগুলির উচ্চতা ছয় হাজার থেকে সাত হাজার মিটার এবং তুষারাবৃত প্রতিটি শৃঙ্গই মন্দিরের চূড়ার মতো ঋজু ও তীক্ষ্ণ। সেখানে যা ফুলের মেলা তা পৃথিবীর কোন সুরম্য স্থানেই দেখতে পাওয়া যাবে না, এমন কি হিমালয়েও এমন পত্রপুষ্পশোভিত স্থান আর একটিও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তিনি দেখেছেন, সেখানে ফুলের সর্বাধিক সমারোহ ঘটে, আগস্টের দশ থেকে একত্রিশ তারিখের মধ্যে।

পুরাণে বর্ণিত 'ব্রহ্মকমল' ফুল আবিষ্কারেরও দাবী জানিয়েছেন শ্রীশুক্লা। তিনি বলেছেন, ঐ দুষ্প্রাপ্য ফুলটি সুমেরু পর্বত-শিখরটিকে প্রায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তিনি দেখেছেন, পূর্ণ প্রস্ফুটিত ব্রহ্মকমল ফুলের ব্যাস দশ থেকে বারো সেণ্টিমিটার দীর্ঘ এবং তার গন্ধ এমনই মধুর ও মদিরাময় যে যে দ্রাণে তন্দ্রা এসে যায়। ঋষিরা যে সুমেরু পর্বতে গিয়ে ধ্যানমগ্ন হতেন তার অন্যতম কারণ বোধহয় ছিল ঐ ব্রহ্মকমল ফুলের মদিরাময় ঘ্রাণের আকর্ষণ।

বোরম্যানের সন্ধানে : সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতে ইংরেজ সরকারের শিরঃপীড়ার কারণ হয়েছিলেন ঐ বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক নানাসাহেব। বিদ্রোহের নায়কদের অধিকাংশই রণক্ষেত্রে প্রাণ দেন, বাকী সকলে ধরা পড়েন। একমাত্র নানাসাহেব কোনরকমে রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে সম্ভবত নেপালের জঙ্গলে আত্মগোপন করেন। তারপর তাঁর কি হয় তা কোনসূত্রেই জানা যায় না। কিন্তু ইংরেজ সরকার অসীম উৎসাহে নানাসাহেব সন্দেহে একের-পর-এক ব্যক্তিকে ধরে আটক করতে থাকেন। কিন্তু অন্য মতের নানাসাহেব ধরা পড়ার ও সন্দেহের অবকাশে মুক্তিলাভের পর ইংরেজ সরকার ও ব্যাপারে হাল ছেড়ে দেন। আর ধরে নেওয়া হয় যে, ইতিমধ্যে নানা-সাহেব কোথাও-না-কোথাও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। হিটলারের অন্যতম প্রধান সহযোগী মার্টিন বোরম্যানকে নিয়েও অনুরূপ কাণ্ড ঘটে চলেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর বিগত সাতাশ বছর ধরে।

হিটলারের প্রধান অনুচরদের মধ্যে একমাত্র মার্টিন বোর-ম্যানকেই যুদ্ধের শেষে খুঁজে পাওয়া যায় নি। তাই অনুমান করা হয় যে, জার্মানীর আত্মসমর্পণের ঠিক আগে, হয়ত কোন বৈদেশিক দূতাবাসের সহায়তায় বোরম্যান অবরুদ্ধ জনাকীর্ণ বার্লিনের প্রায় নিশ্ছিদ্র শত্রুবেষ্টনী কোনক্রমে ভেদ করে, সম্ভবত প্রচুর ধনদৌলত নিয়ে ডুবোজাহাজে চেপে দক্ষিণ আমেরিকায় পালিয়ে যান। তার-পর থেকে এ পর্যন্ত মোট ষোলজনকে বোরম্যান সন্দেহে দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আবার পরে প্রমাণাভাবে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি লণ্ডনের 'ডেইলী একসপ্রেস' পত্রিকায় আবার দাবী জানানো হয়েছে যে, বোরম্যানের প্যারাগুয়েতে অবস্থিতির সুনিশ্চিত প্রমাণ তাদের হাতে আছে। স্বাভাবতই এ দাবীতে আবার চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং কূট-নৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠেছে, সন্ধান [illegible] কি সত্যই প্রমাণ হবে? দেখা যাক কি হয়।

[illegible]

একটি রাজ্যের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি পশ্চিম বঙ্গের মতো ভাষাভিত্তিক হলেও ভারতের বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে সংখ্যালঘুদের সমস্যা মিটে যায় নি। এমন কি একই ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যেও রয়েছে আঞ্চলিক বিরোধ। আমরা এতদিন এই ধারণা পোষণ করে এসেছি যে, একই ভাষাগোষ্ঠীর লোকদের একই রাজ্যসীমানায় এনে দিতে পারলেই তার রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথ পরিষ্কার হবে। এই চিন্তার মধ্যে শুভবুদ্ধি যতটা কাজ করেছে বাস্তবতা ততটা যে ছিল না অভিজ্ঞতা থেকে তা এখন আমরা বুঝতে পারছি। আরেকটি বিষয় উপেক্ষিত থেকে গেছে। তা হল এই যে, একই রাজ্যসীমানায় ভাষাগত সংখ্যালঘুদের অবস্থান কিভাবে ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনের নীতির সঙ্গে খাপ খাবে।

এ কথাই সম্ভব নয় যে, একটি রাজ্য থেকে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের আলাদা করে [illegible] অঞ্চলের সৃষ্টি করা হবে। আমাদের মতো একটি বহুভাষী ও বহুজাতিগোষ্ঠী অধ্যুষিত দেশে পারস্পরিক বোঝাপড়া ছাড়া রাষ্ট্রকাঠামোকে অটুট রাখা কখনই সম্ভব নয়। ভাষাই যে রাষ্ট্রসত্তা নির্ণায়ক একমাত্র শক্তি নয় তার প্রমাণ ইতিহাস। ভাষা যদি জাতিগত সমদৃষ্টি আনতে পারত তাহলে বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক সত্তা আলাদা হত না। তেমনি দুই জার্মানী আলাদা থাকত না। কিংবা আইরিশ ও ইংরেজরা একই ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও আলাদা রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব রাখত না।

সম্প্রতি অন্ধ্রে এই বিরোধ দেখা গেছে। তেলেঙ্গানা অঞ্চল ও অন্য অঞ্চলের অধিবাসীরা একই ভাষাভাষী। উভয়েরই মাতৃভাষা তেলুগু। ভাষার কারণে তারা একই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অর্থনৈতিক স্বার্থে দুটি অঞ্চল আজ পরস্পরের বিরোধিতায় কমবুদ্ধীন। এজন্য মুলকী আইনের প্রশ্নে সেখানে রক্তপাত ও অগ্নিকাণ্ড হয়ে গেছে। সুতরাং ভাষার ভিত্তিতে ঐক্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সমস্যারও সমাধান হওয়া দরকার। আরেকটি দৃষ্টান্ত মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ অঞ্চল। প্রাক্তন মধ্যভারতের মারাঠীভাষী অঞ্চলকে ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের সময় মহারাষ্ট্রের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনগ্রসর বিদর্ভ এলাকার লোকেরা তাতে খুশী হতে পারে নি। বৃহৎ মহারাষ্ট্রে তারা পিছিয়ে-পড়া। তাই ওখানে আলাদা বিদর্ভ রাজ্য গঠনের একটা আন্দোলন আছে। বোম্বাই ও নাগপুরে পালা করে বিধানসভার অধিবেশন বসিয়ে মহারাষ্ট্র সরকার বিদর্ভীয়দের তোয়াজ করলেও ক্ষোভ এখনও যায় নি। উত্তরপ্রদেশের মতো বৃহৎ হিন্দীভাষী রাজ্যেও অনুন্নত কুমাওন, বালিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেরা উত্তরখণ্ড রাজ্য গঠনের দাবি জানায় মাঝে মাঝে। এগুলো আসলে অর্থনৈতিক সমতার দাবি। যতক্ষণ সব রাজ্যের সব এলাকা সমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ না পাচ্ছে ততক্ষণ এই দাবি থাকবে এবং নানা জটিলতার সৃষ্টি করবে।

একই রাজ্যে দুই ভাষা প্রধান গোষ্ঠীকে একসঙ্গে রাখবার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। ভাঙা পাঞ্জাব ভেঙে আবার দু টুকরো হয়েছে হিন্দী ও পাঞ্জাবি দাবি মানতে। দ্বিভাষী বোম্বাই টিকল না, দ্বিভাষী মাদ্রাজও নয়। এখন আসামে শুরু হয়েছে একই গোলযোগ এবং তা অত্যন্ত মারাত্মক। ঠিক এমন ঘটনা অন্য কোনো রাজ্যে ঘটে নি। একটি প্রধান সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠীকে বাহুবলে উৎখাত করার চেষ্টা অন্য কোনো রাজ্যে অন্য কোনো ভাষাগোষ্ঠী করেছে বলে নজীর নেই। সেদিন আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশরৎচন্দ্র সিংহ কলকাতায় এসে বাঙালী ছাত্রদের আসামে ফিরে যাবার উপদেশ দিয়ে গেলেন। শ্রীসিংহ চান সবাই নির্ভয়ে গিয়ে আবার বসবাস করুক, আবার শুরু করুক স্বাভাবিক জীবন। কিন্তু ভাষাপ্রশ্নের ফয়সালা না হলে তারা যাবে কোন ভরসায়। সেদিন আসামের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, সমস্ত অসমীয়া স্কুলে অসমীয়া ভাষা চালু করা হবে। এই ঘোষণার পর অনসমীয়া ছাত্রছাত্রীরা কোন ভরসায় যাবে [illegible]। দিল্লীর মনোভাবও বড় অদ্ভুত। তাঁরা বলেন, বাঙালীরা নাকি বাড়াবাড়ি করছে আসামে। অসমীয়া ভাষা না শেখাটা বুদ্ধিবোধিত কাজ নয়। অসমীয়া ভাষা শেখা আর শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে অসমীয়াকে বাধ্যতামূলক করা এক জিনিস নয়। এ হল ভাষান্ধতার চরম নিদর্শন।

এই ঘটনাবলী দুঃখজনক পরিণতির দিকেই দেশকে নিয়ে যাচ্ছে। কোনো ভাষাগোষ্ঠীই নিজেকে প্রধান অপরিহার্য মনে করে চললে সংঘাত অনিবার্য। এই সংঘাত এড়াবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে সুস্পষ্টভাবে তাদের নীতি ও কার্যক্রম ঘোষণা করতে হবে। হিন্দী চালাতে গিয়ে কী রূপ মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তা আশা করি কেন্দ্রীয় সরকার ভুলে যান নি। তামিলনাড়ুতে দ্রাবিড় আন্দোলনের মূলে আছে এই ভাষার একাধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা। আঞ্চলিকতাকে প্রশ্রয় দিলে ভারতের সার্বিক ঐক্য ব্যাহত হবে। শুধু মুখে সংহতি [illegible] ঐক্য বা সংহতির কথা বললেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। প্রতিটি ভাষাগোষ্ঠীর ন্যায্য স্বার্থ রক্ষা করে গড়ে তুলতে হবে ঐক্যের বুনিয়াদ। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য একটা কথার কথা নয়। তাকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারকে এই আন্দোলনের হাল ধরতে হবে [illegible]। তাদের আত্মঘাতী পথে সমস্যার সমাধান হবে না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রত্যেক ভাষাগোষ্ঠী পাবে তার ন্যায্য অধিকার ও সুযোগ। স্থানীয় [illegible] তার কণ্ঠরোধ করা চলবে না।

দেশে বিদেশে

ভারত সরকারের খাদ্য বিভাগের সেক্রেটারী আর আর বেহ্‌ল্‌কে গত নভেম্বর মাসের শেষে যখন ওয়াশিংটনে দেখা গেল তখন সেখানকার ভারতীয় দূতাবাসের কর্তৃপক্ষ ঘটনাটির গুরুত্ব খাটো করে দেখাবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেননি। বলা হল যে, শ্রীবেহ্‌ল্‌ ওখানে তাঁর কিছু আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

কিন্তু আসল কথটা শেষ পর্যন্ত চাপা থাকেনি। শ্রীবেহ্‌ল্‌ গিয়েছিলেন আমেরিকার বাজার থেকে ভারতের জন্য কিছু গম পাওয়া যায় কিনা তার সন্ধানে।

ভারতে সবুজ বিপ্লব নিয়ে অনেক হৈ-চৈ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ভারত খাদ্যশস্যে স্বয়ংম্ভরতা অর্জন করেছে, এমনকি এখন নাকি ভারত থেকে খাদ্যশস্য রপ্তানি করার কথাও ভাবতে হবে। এত কথা বলার পর এখন ভারত সরকার তাঁদের একজন অফিসারকে আমেরিকায় পাঠিয়েছেন গমের খোঁজ করতে, এটা ভারত সরকারের পক্ষে স্বীকার করে নেওয়া সহজ ছিল না।

কিন্তু গত ২২ নভেম্বর রাজ্যসভায় অস্বস্তিকর সত্যটাই সরকারিভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। খাদ্য বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী আন্নাসাহেব সিন্ধে বলেছেন, বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করার কথা বিবেচনা করা হচ্ছে, যদিও ঠিক কি পরিমাণ আমদানি করতে হবে তা এখনও স্থির করা হয়নি।

ঐ বিবৃতিতে শ্রীসিন্ধে এবিষয়ে একটি সরকারি নীতি পরিষ্কার করে দিয়েছেন। সেটা হল এই যে, যদি খাদ্যশস্য আমদানি করা স্থির হয় তাহলে 'আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা অপর কোন দেশ থেকে সাধারণ ব্যবসায়িক সর্তেই আমদানি করব। কোন দেশ থেকে ভিক্ষা করার কোন প্রশ্নই নেই।' অর্থাৎ সরকারি প্রতিশ্রুতি এই যে, খাদ্যশস্য আমদানির জন্য আবার পি-এল ৪৮০ ধরনের কোন চুক্তি করা হবে না। নগদ দাম দিয়ে কিনেই এই খাদ্যশস্য আনা হবে, এর জন্য আমেরিকা বা অপর কোন দেশ থেকে বিশেষ সুবিধা চাওয়া হবে না।

ব্যর্থ সবুজ বিপ্লবের বিড়ম্বনা ছাড়া আরও অন্তত দুটি অসুবিধা ছিল যে কারণে এই ধরনের প্রকাশ্য ঘোষণা করা যাচ্ছিল না।

প্রথম অসুবিধা হল, ভারতবর্ষ বিশ্বের বাজার থেকে খাদ্যশস্য কিনতে চাইছে, একথা জানাজানি হয়ে যাওয়া মাত্র খাদ্যশস্য রপ্তানিকারীরা চড়া দাম হাঁকতে থাকবে। দ্বিতীয় অসুবিধা হল, ভারতের পক্ষে এমন একটা ধারণার সৃষ্টি হতে দেওয়া সম্ভব নয় যে, আমেরিকা থেকে গম আমদানির গরজে সে সেদেশের কাছে নতিস্বীকার করে দুই দেশের মধ্যে সব বিরোধ মিটিয়ে ফেলেছে।

কিন্তু তবু যে কথাটা সংসদে জানিয়ে দেওয়া হল তার কারণ সম্ভবত এই যে, না জানালে অন্য অসুবিধা দেখা দিতে পারত। প্রথমত, খাদ্য দপ্তরের সেক্রেটারি যে খাদ্যের সন্ধানে বিদেশে গেছেন সেই খবর দেশী ও বিদেশী সাংবাদিকদের কাছে লুকিয়ে রাখা যায় নি। দ্বিতীয়ত, দ্রুতই দেশের খাদ্য পরিস্থিতি দিনকে দিন খারাপ হচ্ছে। খরায় খরিফ ফসল প্রচণ্ড মার খেয়েছে। রবি ফসল বাড়াবার জন্য যে জরুরী প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল সেই প্রকল্প সার, বিদ্যুৎ ও জলের অভাবে আশানুরূপ সাফল্য লাভ করবে বলে মনে হচ্ছে না। কথা ছিল দেড় কোটি টন অতিরিক্ত রবি ফসল উৎপাদন করা হবে। এখন বলা হচ্ছে অতিরিক্ত রবি ফসলের উৎপাদন এক কোটি টনের বেশি হবে না। এদিকে, সরকারের হাতে মজুত বাফার স্টকের পরিমাণ হু হু করে কমছে। ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলি থেকে খাদ্যশস্য বণ্টনের পরিমাণ বাড়াতে হচ্ছে। এখন প্রতি মাসে ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলির খরিদ্দারদের চাহিদা মেটাতে বাফার স্টক থেকে মাসে ১২।১৩ লাখ টন খাদ্যশস্য খরচ হচ্ছে। মাস পাঁচেকের মধ্যে বাফার স্টকের পরিমাণ প্রায় অর্ধেক হয়ে এসেছে। এই যেখানে অবস্থা সেখানে দেশের লোককে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশ্বস্ত করার জন্যই খাদ্য বিভাগ সম্ভবত একটা কিছু করা দরকার মনে করছেন। বল্গাহীন ফাটকাবাজি ও মজুতদারি যাতে খাদ্যশস্যের বাজার সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে ফেলতে না পারে সেজন্যই এধরনের আশ্বাস সৃষ্টি করা দরকার।

ঠিক কি পরিমাণ খাদ্যশস্য এবার বিদেশ থেকে আমদানি করতে হবে সেবিষয়ে ভারত সরকার কোন সিদ্ধান্তে আসেন নি। লোকসভায় শ্রীআন্নাসাহেব সিন্ধে বলেছেন, দেশের ভিতরকার উৎপাদনের ঘাটতি পূরণ করার জন্য কি পরিমাণ মাল বিদেশ থেকে আমদানি করতে হতে পারে তার হিসাব পাওয়ার জন্য আগামী খরিফ ফসল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হত। কারণ আগামী বছরও এবারকার মতই প্রকৃতি নির্দয় হবে কিনা, অথবা আগামী বছর আবহাওয়া চাষের অনুকূল হবে, এরই উপর সব কিছু নির্ভর করছে। কিন্তু, শ্রীসিন্ধে বলেছেন, আমরা সেই পর্যন্ত অপেক্ষা করার ঝুঁকি নিতে পারি না। কারণ, ফসলহানির সম্ভাবনা রয়েছে এবং সরকারের হাতে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুত নেই, এটা বুঝতে পারা মাত্রই ফাটকাবাজরা বাজার কব্জা করে ফেলবে।

১৯৭১-৭২ সালে দেশের ভিতর খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ সম্পর্কে খাদ্য বিভাগ যে চূড়ান্ত হিসাব দিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে, এই বছর দেশে মোট ১০ কোটি ৪৭ লাখ টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়েছে। এটা লক্ষ্য মাত্রা থেকে ৭৩ লাখ টন ও ১৯৭০-৭১ সালের উৎপাদন থেকে ২৪ লাখ টন কম। ●

১৯৭২ সালে সরকারি ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলি থেকে মোট ১ কোটি ২০ লাখ টন খাদ্যশস্য বণ্টন করা হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। সে জায়গায় সরকারের হাতে দেড় কোটি টনের বেশি খাদ্যশস্য আসবে বলে মনে হয় না (বছরের গোড়ায় মজুত ৮০ লাখ টন ও সারা বছরে দেশের ভিতর থেকে সংগ্রহ ৭০ লাখ টন) অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের গোড়ায় সরকারি মজুত ভাণ্ডারে থাকবে মাত্র ৩০ লাখ টন। আর সে জায়গায় যদি ধরে নেওয়া যায় যে, সরকারি ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলিতে চাহিদা বেড়ে ১ কোটি ৩০ লাখ টনে দাঁড়াবে তাহলে শুধু এই চাহিদা মেটাবার জন্যই সরকারকে ১৯৭৩ সালে সংগ্রহ করতে হবে ১ কোটি টন খাদ্যশস্য। এর সবটাই কি দেশের ভিতরকার উৎপাদন থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব হবে? আগামী বছর যদি খুব ভাল ফসল হয় এবং এবারকার মত কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হয় তাহলেই এক কোটি টন খাদ্যশস্য দেশের ভিতর থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। (এ বছরের সংগ্রহের পরিমাণ মোটামুটি ৭০ লাখ টন হবে।) আর যদি ধরেও

নেওয়া যায় যে, ১৯৭৩ সালে ভাল ফসল হবে এবং দেশের ভিতর থেকে এক কোটি টন খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা যাবে তাহলেও ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলির চাহিদা মেটাতে বছরের শেষে বাফার স্টকের পরিমাণ শূন্যের কোঠায় এসে ঠেকবে। সুতরাং ভাণ্ডার যাতে তলানিতে না ঠেকে সেজন্য ভারতকে বাইরে থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করে তার মজুত ভাণ্ডার পরিপূরণ করতে হবেই বলে মনে হচ্ছে।

ভারতের পক্ষে মুশকিল হচ্ছে এই যে, সে খুব খারাপ সময়ে বিশ্বের বাজারে গম কিনতে বেরিয়েছে। বিক্রি করার মত গম আছে পৃথিবীতে এমন দেশের সংখ্যা এখন মাত্র চার—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও আর্জেন্টিনা। এই সব দেশের উপরই গমের চাহিদার চাপ খুব প্রবল। খারাপ আবহাওয়ার দরুন সোভিয়েট রাশিয়ায় প্রায় ২৫ শতাংশ ফসল নষ্ট হয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়া এই মরশুমে বিদেশ থেকে প্রায় দুই কোটি টন গম কিনেছে বলে প্রকাশ। প্রায় সবটাই সে কিনেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে, কিছুটা কানাডা থেকে। নগদ ডলারে এই গমের দাম দেওয়ার জন্য কিছুদিন আগে সোভিয়েট রাশিয়া লন্ডনের বাজারে এত সোনা বিক্রি করেছিল যে, সেখানে সোনার দাম পড়ে গিয়েছিল। শুধু সোভিয়েট রাশিয়াই নয়, চীনও এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম কিনেছে; চীনের আমদানির পরিমাণ চার লাখ টন। খবরে প্রকাশ যে, অস্ট্রেলিয়ায় শ্রমিকদল নির্বাচনে জয়লাভ করার পর এখন চীন সেদেশ থেকেও গম সংগ্রহের চেষ্টা করছে।

রাশিয়া যখন আমেরিকার বাজার থেকে গম কিনতে গিয়েছিল তখন সে এই লেনদেনের ব্যাপারটা গোপন রাখতে পেরেছিল। জিনিসটা এত গোপন ছিল যে, শিকাগোর বড় বড় খাদ্যশস্য রপ্তানিকারীরা নালিশ করেছেন তাঁদের দেশের সরকার রাশিয়ার চাহিদার কথা যদি আগে থেকে জানিয়ে দিতেন তাহলে তাঁরা রাশিয়ার কাছ থেকে চড়া দাম আদায় করতে পারতেন। অন্যদিকে, মার্কিন গম উৎপাদকদের ক্ষোভ হল, এই লেনদেন থেকে যা লাভ ওঠাবার সেটা উঠিয়ে নিয়েছেন খাদ্যশস্য রপ্তানিকারী কোম্পানীগুলি, চাষীরা এর থেকে মোটেই লাভবান হননি।

সে যাই হোক না কেন, আসল ঘটনা হল এই যে, এইসব চাহিদার চাপে দুনিয়ার বাজারে গমের দাম গেছে চড়ে। গত বছর যে গমের দাম ছিল টন প্রতি ৪৫ থেকে ৫৫ ডলার সেই গমের দাম এখন দাঁড়িয়েছে টন প্রতি ৮০ ডলার। এখন ভারতকে যদি বিদেশ থেকে গম সংগ্রহ করতে হয় তাহলে এই চড়া দামে এবং নগদ বৈদেশিক মুদ্রা ফেলে কিনতে হবে। ভারতবর্ষের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয়ের যে অবস্থা তাতে এটা সহজ হবে না। প্রকাশ, এই বাবদ ভারতের অর্থ মন্ত্রণালয় ১৫০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দ করে রেখেছেন।

•

চেস্টার বোলজ যে সময়ে ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ছিলেন সে সময়কার অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে তাঁর একটি বইয়ের এক জায়গায় লিখেছেন, 'ভারতবর্ষে যে একটি রাজনৈতিক ঘটনার গুরুত্ব সম্ভবত সবচেয়ে বেশি সেটা হল আসলে একটি অর্থনৈতিক ব্যাপার—মোসুমি বৃষ্টি ঠিকমত হল কি না হল।'

ভারতের আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে এবারকার খরার যেসব প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয়, বোলজ সাহেব হয়ত অত্যুক্তি করেন নি।

সবচেয়ে নাটকীয় প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে সম্ভবত ভারত-মার্কিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে। দুই দেশেরই সরকারি সূত্র থেকে সম্প্রতি এমন কিছু মন্তব্য করা হয়েছে যাতে মনে হতে পারে যে, ভারতের খাদ্য পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে দুটি দেশ তাদের নিজেদের বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে আগ্রহী।

গত ৩০ নভেম্বর লোকসভায় ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরণ সিং বলেন, ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরস্পরের মধ্যে কোন মৌলিক সংঘাত নেই। প্রকৃতপক্ষে, দুই দেশের মধ্যে অনেক বিষয়েই ঐক্য আছে এবং তাদের কতকগুলি মূল্যবোধও অভিন্ন। শ্রীসিং আরও বলেন, 'উপমহাদেশের বাস্তব অবস্থা স্বীকার করে নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি কেঁচে গণ্ডূষ করতে রাজি থাকে তাহলে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক ভাল হবে।

পরের দিন রাজ্যপালদের এক সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরস্পরের মধ্যে অধিকতর সুষ্ঠু সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন উল্লেখ করলেন। ওয়াশিংটন থেকে এই সব সদিচ্ছার অনুকূলে সাড়া মিলতে দেরি হয়নি। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিব পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরণ সিং ও রাষ্ট্রপতি গিরির বিবৃতিতে সন্তোষ প্রকাশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন সরকারি মুখপাত্র একথাও জানিয়ে দিতে ভুললেন না যে, খাদ্যের ব্যাপারে ভারত যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে কোন সাহায্য চায় তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই আবেদন যথাযথভাবে বিবেচনা করে দেখবে।

ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে যে এই ঘটনাগুলির প্রতিফলন হতে পারে তার লক্ষণ ইতিমধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে। ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি ঘটনাগুলিকে খুবই সন্দেহের চোখে দেখছে। তাদের আশংকা এই যে, আমেরিকা থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করতে গিয়ে ভারতবর্ষ হয়ত আবার সেদেশের সঙ্গে পি-এল-৪৮০ চুক্তিতে জড়িয়ে যাবে এবং পরিণামে আবার আমেরিকার হাতের মুঠোয় এসে পড়বে। সি পি আই এগুলিকে দক্ষিণ বলে মনে করছে এবং কংগ্রেস সরকারকে সমর্থন করার নীতি বাতিল করে এখন তারা সরাসরি বিরোধিতা করবে কিনা সেকথাও সি পি আই বিবেচনা করে দেখছে বলে প্রকাশ।

•

খাদ্যশস্যের পাইকারি ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করার প্রশ্নটি দেশের এই খাদ্য পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করছে। গত অক্টোবর মাসে গুজরাটের ইন্দ্রচাচা নগরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে খাদ্যশস্যের পাইকারি ব্যবসায় রাষ্ট্রায়ত্ত করার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। ১৯৭৩ সাল শেষ হওয়ার আগেই এর জন্য প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করে রাখার কথাও বলা হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন রাজ্যের কংগ্রেসী সরকার এখন সেই প্রস্তাব কার্যকর করতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। মহীশূরের সরকার জানিয়ে দিয়েছেন, যেহেতু খাদ্যশস্য সংগ্রহের দাম বাড়াতে কেন্দ্রীয় সরকার রাজি হন নি সেহেতু তাঁরা খাদ্যশস্যের পাইকারি ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করতে পারবেন না। গুজরাট সরকার জানিয়েছেন, তাঁরাও এ-আই-সি-সির এই প্রস্তাব কার্যকর করতে পারবেন না। অন্যান্য যেসব রাজ্য সরকার সরাসরি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছেন না তাঁরাও এবিষয়ে প্রস্তুতির লক্ষণ দেখাচ্ছেন না। রাজ্যপাল সম্মেলনে কয়েকজন রাজ্যপাল খাদ্যশস্যের পাইকারি ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করার পথে অসুবিধাগুলির উল্লেখ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, খাদ্যশস্যের পাইকারি ব্যবসাকে যদি সরকারের নিজের হাতে নিতে হয় তাহলে দেশের লোককে খাওয়াবার সম্পূর্ণ দায়িত্বও সরকারের নিজের হাতে নিতে হয়। কিন্তু এত বড় দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষমতা সরকারি প্রশাসনযন্ত্রের আছে কিনা সেবিষয়ে রাজ্যপালরা রীতিমত সন্দিহান।

বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য কেন্দ্রীয় খাদ্য বিভাগ কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীদের একটি বৈঠক আহ্বান করেছেন।

৭।১২।৭২ —পুণ্ডরীক

আমাদের সহকর্মীর লোকান্তর

ঘটনাটি সম্পূর্ণ আকস্মিক এবং মর্মান্তিক! মৃত্যুর অসীমে হারিয়ে গেলেন আমাদের দীর্ঘদিনের কর্মজীবনের সঙ্গী ভূপেশ চট্টোপাধ্যায়, মাত্র ৫৬ বছর বয়সে। বয়সের ছাপ ছিল না ও'র অঙ্গে। কর্মঠ এবং পরিশ্রমী মানুষ চ্যাটার্জিদাকে আমরা আর ফিরে পাবো না। শুধু জেগে থাকবে স্মৃতি।

সুদীর্ঘ কর্মজীবনে অসংখ্য মানুষ এসেছে তাঁর সান্নিধ্যে। কিন্তু যে আন্তরিক এবং অন্তরঙ্গ ব্যবহারে তিনি সকলকে আপন করে নিয়েছিলেন তা বিরলদৃষ্ট। শুধু কর্মজীবনে নয় ব্যক্তিগত জীবনাচরণে তিনি ছিলেন সুখী-পরিবার, নিরহংকারী এবং অতিথি বৎসল।

'চ্যাটার্জিদা' আমাদের ছেড়ে গেছেন গত ৫ ডিসেম্বর বেলা দেড়টায়। অমৃতবাজার পত্রিকা, যুগান্তর এবং অমৃত কর্মচারী সমিতির পক্ষ থেকে তাঁর শবাধারে মাল্যদান করা হয়।

নাটক নিয়েই নাট্যমঞ্চের আবির্ভাব ও স্থিতি। সে কারণ আজ বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে নাটকের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আলোচনার যথেষ্ট ক্ষেত্র আছে। বঙ্গীয় নাট্যকলার বিষয় যদিও বহু গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে, তথাপি এ স্থলে 'সেবা ও সাধনা' (বৈশাখ, ১৩২৯) নামক পত্রিকা হতে যতীন্দ্রমোহন দে রচিত এই রচনাটি এখানে আমাদের পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন করলাম—

বঙ্গীয় নাট্যকলা

'বঙ্গীয় নাট্যকলার উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে ধারাবাহিক ইতিহাস অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায় শ্রীচৈতন্যদেব পার্ষদ-বর্গের সহিত কৃষ্ণলীলা অভিনয় করিতেন। আপামরজনসাধারণ সমক্ষে যখন এসকল অভিনীত হইত, তখন সে সমুদয় বঙ্গ-ভাষায় হওয়াই সম্ভব। তখন বাংলাভাষা নিতান্তই ক্ষীণ ছিল এবং তৎকালীন অভিনীত নাটকাদির নমুনা পাওয়া সুকঠিন। তবে প্রাচীন পদাবলী হইতে অভিনয়োপযোগী রচনার বিশেষ আভাষ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ উক্ত প্রকারের রচনা আধুনিক গীতনাট্যের অন্তর্ভুক্ত।

খৃস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে বাঙ্গালা ভাষায় নাটকাদি রচিত হইতে আরম্ভ হয়। তবে ইহার মধ্যে অধি-কাংশই সংস্কৃত নাটকাদির অনুবাদ হইলেও অলঙ্কার শাস্ত্রানুসারে রচিত নহে। তন্মধ্যে লোচন দাসের 'জগন্নাথ বল্লভ', যদুনন্দন দাসের 'বিদগ্ধ মাধব' বা 'রাধাকৃষ্ণলীলা কদম্ব' এবং প্রেম দাসের 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয় কৌমুদী' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ব্যাখ্যাসহ পয়ার ছন্দে লিখিত মূলের অনুবাদ মাত্র। খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন স্থানে নাটকাদির অভিনয় বিশেষভাবে সমাদৃত হইতে থাকে। এ সমুদায় গীতিনাট্যের অন্তর্ভুক্ত এবং দৃশ্য-পটাদির সাহায্য ব্যতিরেকে অভিনীত হইত। নবদ্বীপ নিবাসী কৃষ্ণকমল গোস্বামী বিশেষ আগ্রহ ও যত্নসহকারে প্রথমে নবদ্বীপে 'নিমাই সন্ন্যাস' ও পরে সময় পূর্ব-বঙ্গে 'স্বপ্নবিলাস', 'রাই উন্মাদিনী', 'বিচিত্র বিলাস', 'ভারত-মিলন', 'সুবল-সংবাদ', 'নন্দ হরণ' প্রভৃতি গীতাভিনয় প্রকাশ করিয়া অতিশয় খ্যাতিলাভ করেন। কৃষ্ণকমল প্রকাশিত 'স্বপ্ন বিলাস', 'রাই উন্মাদিনী' ও 'বিচিত্র বিলাস' এই তিনখানি গ্রন্থ অবলম্বনে ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় 'The popular drama of Bengal. নামক পুস্তক প্রকাশ করেন ও জর্মন, রুশ প্রভৃতি দেশেও প্রচার করেন। এতৎপ্রসঙ্গে বিষ্ণুপুর, বীরভূম, নদীয়া, যশোহর, ঢাকার জমিদারগণের আন্তরিক চেষ্টা ও সহানুভূতি বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। তাঁহাদের উৎসাহে তৎকালীন নাট্যসম্প্রদায় (যাত্রাপার্টি) গীতাভিনয় দ্বারা জন-সাধারণের মনোরঞ্জনচ্ছলে নৈতিক শিক্ষা-দানে সমর্থ হইয়াছিল। পরে খৃস্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গালা ভাষায় নাটকাদি রচিত ও প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৮২১ খৃঃ অব্দে কলিকাতার যাত্রা এবং ১৮৩১ খৃঃ অব্দে বিদ্যাসুন্দর নামক নাটক বাগবাজার নিবাসী নবীনচন্দ্র বসুর রঙ্গালয়ে প্রথম অভিনীত হয়। কেহ কেহ বলেন, বিদ্যাসুন্দরের পূর্বে জেনারেল এসেম্বি (স্কটিশ চার্চ) বিদ্যালয়ের গণিত অধ্যাপক তারাচাঁদ সিকদার ইংরাজী নাটকের আদর্শগত 'ভদ্রার্জুন' নাটক রচনা করেন। ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে পণ্ডিত রামগতি তর্করত্নের সংস্কৃত নাটকের আদর্শমত 'মহা-নাটক' প্রকাশিত হয়। ১৮৫২ খৃঃ অব্দে 'নলদময়ন্তী' তৎপরে যোগেন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক 'কীর্তিবিলাস' নীলমণি পাল কর্তৃক 'রত্নাবলী' তর্করত্নের 'বিল্বমঙ্গল', ১৮৫৪ খৃঃ রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুলসর্বস্ব' এবং অল্পদিন পরে সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতগণের সাহায্যে কালীপ্রসন্ন সিংহ 'বিক্রমোর্বশী' ও 'বেণী সংহার' নাটক প্রকাশ করেন। অনতিকাল পরে সিমলা ছাতুবাবুর বাড়ীতে 'মালবিকাগ্নিমিত্র' এবং পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ীতে 'বিদ্যাসুন্দর' দ্বিতীয়বার অভিনীত হয়। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নামক সংস্কৃত নাটকের ছায়া অবলম্বনে 'বোধেন্দুবিকাশ' নামক নাটক প্রকাশ করেন। ইহার পর হইতে ইংরাজী নাটকের অনুকরণে বাঙ্গালা ভাষায় বহুতর নাটক প্রকাশিত হইতে থাকে। তন্মধ্যে হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতীর চিত্তবিলাস' উল্লেখযোগ্য। উহা মহাকবি শেক্সপীয়রের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস'-এর অনুবাদ। অতঃ-পর ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'শর্মিষ্ঠা' নাটক প্রকাশ করেন এবং পর পর অন্যান্য নাটকগুলি প্রকাশিত হয়।

এই সময় ভবানীপুর নিবাসী উমেশ-চন্দ্র মিত্র 'বিধবা বিবাহ' ও 'সীতার বন-বাস' নাটক রচনা করেন। তৎপরে ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে রামনারায়ণের 'নবনাটক' প্রভৃতি এবং মনোমোহন বসুর 'রামাভিষেক' প্রভৃতি প্রকাশিত ও অভিনীত হইতে থাকে।

রঙ্গালয়ের রঙিন আলো

আসলে 'রঙ্গালয়ের রঙিন আলো' নিবন্ধটি সুযোগ্য নাট্যশিল্পী অমরনাথ রায়ের স্মৃতিসভায় পঠিত হয় সভাপতির অভিভাষণ হিসাবে। এই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন শিল্পীপ্রবর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই রচনাটির মধ্যে সেকালের রঙ্গমঞ্চের অর্থাৎ অবনীন্দ্রনাথের বাল্যকালের একটি সুন্দর ছবি ফুটে উঠেছে। বিশেষ করে দৃশ্যপট রচনা, ফুটলাইট ব্যবহার প্রভৃতি 'স্টেজ ক্রাফট' বলতে যা বোঝায় তার সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানা যায় অবনীন্দ্রনাথের ভাষণটি থেকে। এটি প্রকাশিত হয় ভারতী (৪৬ বর্ষ, ৫ সংখ্যা) ১৩২৯ সালের ভাদ্র সংখ্যায়। আমরা উক্ত অভিভাষণের কিয়দংশ এখানে প্রকাশ করলাম—

'কোন আর্টের কোনো-কিছুর জ্ঞান যখন হয়নি সেই শিশুকালের একটা সন্ধ্যে-বেলা—আমার মনে পড়ে ভূতপূর্ব বেঙ্গল থিয়েটারে 'অশ্রুমতী' নাটকের দর্শকরূপে আমাকে আমার রামলাল চাকর ঠিক স্টেজের গোড়ায় বালক-বালিকাদের জন্য রিজার্ভ করা একখানা চৌকিতে বসিয়ে দিয়েছিল। সেদিনের কনসার্টের কথাটা আমার কিছুই মনে নেই; বোধহয় এখনকার চেয়ে কিছু মিঠে ছিল; নানা বাদ্যযন্ত্রের সুর-বেসুর মিলে একটা ভীষণ ব্যাপার নিশ্চয়ই সেদিন ঘটেনি, তাহলে মনে থাকত। সেদিনের ড্রপসিনটা দেশী ছিল না। সাহেবের আঁকা গ্রীক পুরানের একখানা খুব রংচং দেওয়া—অতএব ছেলে-ভোলানো ছবির দিকে হাঁ করে চেয়ে আছি, এমন সময় ড্রপ উঠল. সেই মুহূর্ত থেকে পঞ্চম অঙ্কে ড্রপ পড়া পর্যন্ত সেলিম, প্রতাপ, পৃথ্বী-রাজ, অশ্রুমতী, মলিনা, ভীলসর্দার সবাই মিলে শিশুজগৎ থেকে মনটাকে আমার

রোমান্সের একটা স্বপ্নময় জগতে এমন ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছিল যে সে সময় যদি আমার লেখার বিদ্যে থাকতো তো তখনকার বঙ্গদর্শনে এইরকম একটা সমালোচনা ছাপা হয়ে থাকতো—এখনকার নাট্যরসিকদের জন্যে, যথা—সেলিমটা অতিরিক্ত মাত্রায় বোকা এবং সেন্টিমেন্টাল, অশ্রুমতীটা তার প্রেমে পড়ে ভুল করেছে। প্রতাপসিংহ চন্দনসই, উদ্দীপনাপূর্ণ কথাগুলো ওর মুখ থেকে কেড়ে নিলে বাকী কিছুই থাকে না। শক্তসিংহ—একটা দরোয়ান বল্লেই হয়, গাল-পাট্টাই সার; আমি প্রতাপসিংহ হলে তলোয়ার দিয়ে ওর গালপাট্টা কামিয়ে একগালে চুন আর একগালে কালি দিয়ে দূর করে দিতুম এবং নিজে শক্তসিংহ সেজে একেবারে দিল্লীর বাদশার মাথা কাটতে দৌড়ুতুম।...অশ্রুমতীর বিশেষত্ব—যখন 'প্রেমের কথা আর বলো না' গাইতে গাইতে সন্ন্যাসিনী সেজে শেষ দৃশ্যে সে দেখা দিলে, তখন মনে হল এর সবই ভালো তবে একটু বেশী ন্যাকা আর পিনপিনে, আর কেন দু-একবার সে রাজপুতের মেয়ে হয়েও চিনেবাড়ির বার্ণিস করা রুপোর বকলস-দেওয়া পম্পসু পোরে বেরিয়ে রসভঙ্গ করে গেল বুঝলুম না। জুতোটা গ্রীনরুমে রেখে এলেই ভাল হতো! জুতোটা মনে পড়িয়ে দেয় স্টেজের ছায়া আর মায়ার চেয়ে হাল ফ্যাসানটার টান ও শক্তি কতখানি প্রবল, আরো মনে পড়িয়ে দেয় জুতো-মোজা-দাতাকে অসময়ে।

সেদিনের অশ্রুমতীর জুতোজোড়া যেভাবে আমার শিশুমনের মৌচাকে খোঁচা দিয়েছিল, তেমনি এখন থিয়েটারে গেলেই নানা দিক থেকে নানা বেশভূষার খুঁটিনাটির খোঁচা এসে আমার লাগে,—পার্শি সাড়ি, বিলিতি ব্রেসলেট, মাথার উপর মার্কেটের ফুলের ঝুড়ি, গলায় গোরস্থানে দেবার রিদ্‌ মালা! রাজারাজড়ার সাজ--তখনো যে যাত্রার দলের নকল, এখনো প্রায় তাই; তার বদ রং একটুও মেলায় নি এখনো, বরং ইলেকট্রিক আলোয় আরো সুস্পষ্ট রকমে চক্ষের পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে। সখের থিয়েটারগুলোর কথা বলব না। একবার একদল কোনো এক দৃশ্যে একটা আস্ত সদ্যোজাত মানবক হাজির করেছিল! দুপুর রাতে ছেলের কান্নাটা সব দর্শকই সেদিন এত উপভোগ করেছিল এবং এত হাততালি লাগিয়েছিল যে, সারারাত তারি চটাপট আর ছেলে-কাঁদুনীর দুঃস্বপ্নটা থেকে থেকে ঘুমের চটক ভাঙিয়ে আমায় বিষম রাগিয়ে তুলেছিল। সখের দলের অনুকূলে কি প্রতিকূলে কোনো কিছুই লেখার উৎসাহ সেই থেকে আমার কমে গেছে।

সংখ্যায় থিয়েটারগুলো এখন তখনকার চেয়ে অনেক বেড়েছে এবং আয়ের দিক দিয়েও কত যে বেড়েছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই, কিন্তু নাট্য-শিল্পের দিক দিয়ে এখনকার স্টেজ তখনকার চেয়ে যে বেশী এগিয়েছে তা বলা যায় না। তবে জাঁক বেড়েছে, জমক বেড়েছে, নাচ বেড়েছে, চেঁচানো বেড়েছে, আরো কতকগুলো নতুন এবং অদ্ভুত সামিগ্রি বেড়েছে যার ফর্দ দিলে হয়তো আমাদের দর্শকদের মন খুসি হতে পারে। প্রথম হচ্ছে—আগে যে বইগুলো বিশেষভাবে স্টেজ করবার জন্যে লেখা হতো, সেইগুলোই কেবল প্লে করা সম্ভব ছিল; এখন একটা এমনি অদ্ভুত শক্তি পেয়েছে আমাদের স্টেজ যে যাতে করে যেমনই বই হোক না কেন, এমন কি নাটক না হলেও সেটা প্লে করা চলবে আর দর্শকরা সেটা দেখে মনে করবে খুব চমৎকার নাটক দেখলে। আর একটা বেড়েছে—সময়ে-অসময়ে যে-সে দৃশ্যে নাচ; এতে জোরে দর্শক যে কত বেড়ে গেছে তার ঠিক নেই! অপিচ পূর্বে থিয়েটারের গান— সুরে-তালে দেশের মধ্যে এবং ওস্তাদির মধ্যে বন্ধ থাকতো, এখন থিয়েটারের গান সুর-তাল ইত্যাদির গন্ডী থেকে এতটা মুক্তিলাভ করেছে যে, থিয়েটারের টিকটিকিরও সেটার রস উপভোগ করতে একটুমাত্র কষ্ট হয় না। রঙ্গমঞ্চ এবং নাট্যশিল্পের দিক দিয়ে আমি এতক্ষণ যে কথাগুলো বল্লেম তা সামান্য দর্শকের দিক দিয়েই বল্লেম, কেননা আমি থিয়েটারের অধ্যক্ষ বা অভিনেতা নই....কিন্তু দৃশ্যপট-রচয়িতা পরলোকগত যে অমরবাবুর দুঃস্থ পরিবারবর্গের সাহায্যের জন্য আজকের এই আয়োজন, তাঁর জীবন সম্বন্ধে বেশি কিছু না জানলেও শিল্পের দিক দিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার একটু বিশেষ জানাশোনা ছিল।...

...তিনি দৃশ্যপট রচনা বিষয়ে একজন পাকা আর্টিস্ট ছিলেন এবং আর্টিস্ট ছিলেন বলেই তিনি কিছু সঞ্চয় করে যেতে পারেন নি। লোকটির সমস্ত চেষ্টা দৃশ্যপট তাঁর নানা কলাকৌশল, তার আলোছায়া, বর্ণসমন্বয় এবং নানা খুঁটিনাটি নিয়ে এমন ব্যস্ত ছিল যে, সংসারের দিকটা ভাববারই বেচারার সময় হয়নি। এমন কি কিছু পয়সা এবং নাম রেখে না গেলে মাসিকপত্রে তাঁর অকাল মৃত্যুর খবর বার হবে না, পরিষদে তাঁর স্মৃতিসভা বসবে না, এমন কি মেয়ের বিয়ে হওয়াও দায়, একথাও তাঁর ভাববার অবসর হয়নি।

...তাঁর অসমাপ্ত সব কাজের থেকেই দৃশ্যশিল্পের এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছায়া ও স্বপ্ন আমার চোখে পড়েছিল। কিন্তু এখন আর সেটুকু আশা করতে পারিনে, কেন না আর্টিস্ট পালিয়েছে! স্টেজ-ম্যানেজাররা কিন্তু নিশ্চয়ই নিরাশ হননি, কেননা তাঁরা জানেন—রাংতা আর রং দিয়ে দর্শকের চোখ ঠিকরে দিতে পারে এবং মোগল রাজপ্রাসাদে লুই ফিলিপের আমলের আসবাব ঠিকঠাক এঁকে দিতে একটুও আপত্তি করে না...কিন্তু আমি বলছি স্টেজ-ম্যানেজার নিরাশ হবেন —অমরবাবুর কাছ থেকে যেমন, অমন সস্তায় আর তাঁরা কারু কাছে কাজ নিতে পারবেন না। এখন হয়ত যারা আসরে আসবে তারাও তেল-রং নয় জলরং দিয়েই এঁকে চলবে, কিন্তু তাদের পায়ে ও মাথায় তেল এবং খাবারের থালায় জল দুইই বেশি-বেশি চাই।...

রঙ্গমঞ্চের সামনে দর্শকের মধ্যে আমি ছেলেবেলা থেকে অনেকবার বসেছি এবং বার-দুচ্চার মঞ্চের উপরে উঠেও দেখেছি। তাতে করে আমার ধারণা যে নাট্যশালার মধ্যে দুটো আলো আছে—একট ফুট লাইটের তীক্ষ্ণ আলো, আর একটা হচ্ছে ম্যাজিক লণ্ঠনের রঙিন আলো। ফুটলাইটের আলোটা নীচের দিকের আলো বা পদতলের আলো এবং রঙিন আলোটা উপর দিক থেকে রামধনুককে ছুঁয়ে এসে পড়ে। যে পদতলের আলোর সেবা করে সে অভিনেতা বা অভিনেত্রী নিম্নগতি লাভ করতে করতে শেষ রঙ্গপীঠ থেকে পিটের দর্শকশ্রেণীর চৌকির পায়ের তলায় গিয়ে বিরাম পায়। নাট্য-কলার রহস্য-রঙ্গে বিচিত্র ম্যাজিক-লণ্ঠন বা উপরের রঙিন আলোয় যে সাঁতার দিতে পারে, সে ঊর্ধ্বগতি পায়— উত্তমের দিকে উন্নতির দিকে। অমরবাবু সেই রঙিন আলোর স্রোতে আপনাকে নিক্ষেপ করেছিলেন, সুতরাং রঙ্গালয়ের উপরের বক্স ছাড়িয়েও অনেকখানি উপরে তাঁর জায়গা ঠিকই হয়েছিল।"...

—অপণক

অর্জুন ।। জগন্নাথ চক্রবর্তী

মনের মধ্যে একটা মাছ খেলা করছে
একটা জলপরী, যেন জলপাখি,
অথচ আমি খেলতে পারছি না।
জলাধারের মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

চুপ ক'রে আছি।
পাছে শব্দে জল কেঁপে ওঠে
পাছে মৎসরাণীর খেলা ভেঙে যায়।
আমি এই দৃশ্যটি নষ্ট করতে চাই না
তাই একেবারেই ঠোঁট নাড়ছি না।

অথচ আমার ওষ্ঠ সত্যিই
এত বোবা বা নিরামিষ নয়।

আমার ইচ্ছে করছে নিজের জলে
নিজেই ডুব দিই,
আঁধার এবং আধের এক করে
খুব একটা নতুন খেলা খেলি
যে-খেলায় নিজেকে জলে ফেলে দিত হয়
সাঁতার ভুলে দুহাতের আবেগ ছুঁড়ে দিতে হয়
জলের গভীরে, তৃষ্ণার দিকে, আঁধারে।

বোধ হয় আত্মবিসর্জনের এক নাম ভালবাসা,
কি জানি!

চোখ বন্ধ করে আছি, তবু
তার সুন্দরী ভাসমান চোখ দুটি আমি দেখতে পাচ্ছি,
কিন্তু সে আমাকে দেখছে না, দেখতে চাইছে না।
হয়তো কোনোদিনই দেখবে না।

একমাত্র অর্জুনই পারে লক্ষ্যভেদ করতে।

এই ঊর্ণজালে নয় ।। কালীপদ কোঙার

তোমাকে গাছের ডালে পাতার সাম্রাজ্য থেকে
ছিঁড়ে নিয়ে এ সংসারে প্রতিষ্ঠা দিয়েছি,
কেমন বিবর্ণ হয়ে গেছ ধীরে ধীরে
তুমিই তো চেয়েছিলে এ সংসারে প্রতিষ্ঠিত হতে।
তুমি কেন নীড় চেয়েছিলে? কী নীড় তোমাকে দেব,
তোমাকেই নীড় বলে জানি!

আমরা কি অনেক বেশি নিজেদের তৈরী করা
ঊর্ণজালে জড়িয়ে পড়ি নি?
তবে চলো, এ রাজত্ব ছেড়ে চলে যাই—
হাতে রাখো হাত, চোখে বিশ্বাসের নীল ধ্রুবতারা,
ফের আমরা চলে যাই প্রাকৃতিক প্রকৃতিস্বভাবে।
ঝর্ণার আবেগ নিয়ে ডালে ডালে পাতায় পাতায়
পাশাপাশি ফুটে উঠি, কাছাকাছি ঢেউ হয়ে দুটি,
তোমার আশ্রয় আমি, আর তুমি কেবল আমার;
তুমি যদি হাসো আমি এখনও সমস্ত কিছু ভুলে যেতে পারি।

দিনশেষের আলোয় ।। অজিত দাস

এই পৃথিবী দুঃখের।

আমার মরমী বন্ধু পানশালার টেবিলে
দুহাতের বেষ্টনীতে মাথা রেখে নিঃশব্দে
কাঁদছে।

কী তার দুঃখ আমি জানি। কত গভীরে
তার মর্মমূলে বিদ্ধ হয়ে চলেছে, তা
আমি জানি না।

২।।
মর্মান্তিক বেদনায় কাঁদছে সে।
পানশালার পরিচারক সমবেদনার এক
পাত্র সুরা রেখে গেছে সম্মুখে।
সে তা স্পর্শও করে নি।

এই পৃথিবী বড় দুঃখের। তার চেয়েও
দুঃখকর, আমি আমার বন্ধুকে তার দুঃখ থেকে
বাঁচাতে পারি নি।

৩।।
নিঃশব্দে সে কাঁদছে। কার হাতের
নিক্ষিপ্ত শরে তার মর্মমূলে রক্তক্ষরণ
হয়ে চলেছে আমি জানি না। সে জানে না।
সূর্য অস্ত গেছে কি যায় নি! অথচ—
তার পিছনেই জানালাভাসা শেষ সূর্যের
রক্তাভায় অপেক্ষা করছে এক পরিচারক,

যার মুখের হাসির বাঁকানো রেখায় কিছু
নিষ্ঠুরতা আছে,

যে নিষ্ঠুরতা জন্ম, মৃত্যু ও প্রবহমান
কালের গভীরে নিহিত।

দু' পাশের ঘন বাঁশঝাড়ের মাঝখান দিয়ে ধুলোভরা পথ ধরে ওরা এগিয়ে যাচ্ছিল। দূর থেকে হেঁটে আসায় ওদের দেহ মলিন, চোখের কোলে ক্লান্তির ছায়া। প্রথম প্রথম টুকরো টুকরো কথা, কয়েকবার চাপা হাসিও শোনা গিয়েছিল। তারপর রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিল। শুধু শেষ রাতের হিমেল হাওয়া বাঁশবন কাঁপিয়ে বয়ে যাচ্ছিল কখনো কখনো। কর্কশ স্বরে পেঁচা ডেকে উঠল, ঝাপড়া চালতাগাছের কোন ডাল থেকে। কালি-পড়া লণ্ঠনের আলোয় আবছা আবছা মুখের সারি। ক্লান্ত। ক্ষুধার্ত। যেন আর একটু এগুলেই পেঁছে যাবে এই পৃথিবীর শেষ সীমারেখা। সেখানে হারিয়ে যাবে সবাই একে একে। সুখ-দুঃখের পৃথিবী ছাড়িয়ে, সব অনুভূতি মিশে যাবে গাঢ় অন্ধকারে, কুয়াসার আবরণে। অস্তিত্বের শেষে পেঁছে যাবার পূর্বে সবাই যেন সেরে নিচ্ছিল শেষ কথাবার্তা। এখন শুধু প্রস্তুত হয়ে চলা কখন সেই অদৃশ্য পুরুষ তাদের খুঁটেখুঁটে তুলে নিয়ে যাবে।

হারাণের গলার কাছে অনেক কথা জমা হয়েছিল। অথচ সে কিছুই বলতে পারছিল না। বোবা দৃষ্টি নিয়ে দেখছিল কুচি ফুলের মতো শেষ প্রহরের তারা-ভরা আকাশ। জোনাকির ব্যস্ত আনাগোনা। শুনছিল বাঁশপাতার মর্মর ধ্বনি। অথচ কিছুই তার মনে ছায়া ফেলছিল না। মাত্র কিছুক্ষণ আগে সে শ্রীপদকে কিছু বলতে চেয়েছিল। শ্রীপদ শোনেনি। চাপা ধমক দিয়ে বলেছে, 'এখন কিছু বলিস না। চুপচাপ আওগাইয়া চল।' এমনভাবে বলেছিল, যেন হারাণ কি বলবে তা সে আগেই জেনে নিয়েছে।

পথের পাশের ঝোপ থেকে দু-তিনটে শিয়াল ভয় পেয়ে হঠাৎ একসঙ্গে ডেকে উঠল। ভয়ে হারাণের বুক কেঁপে উঠল। ভুলতে চাওয়া ঘটনা যেমন বার বার বেশী করে মনে পড়ে, হারাণেরও তেমনি বাড়ির কথা মনে পড়ল। 'ঘরে এমন, এখন তখন পোয়াতি বউ রাইখ্যা কোথাও যাইস না হারু। আমি তো আবার রাইত-কানা, বিপদ হইলে কেডা কি কইরবো। আমার কথা শোন বাপ্।'

হারাণ প্রথমে খুব উৎসাহিত হয়েছিল, যখন প্রহ্লাদের কাছে শুনলো সবাই মিলে খাস জমি দখল করতে যাবে। মহাজনের খাতা লিখে দুবেলা দুমুঠো ভাত ডাল হয়ত পাওয়া যায়, কিন্তু প্রয়োজনের বাইরে সাধ-আহ্লাদের ঘর থাকে শূন্য। যদি সামান্য কিছু জমি পায়, অন্ততঃ দু-তিন মাসের ধান আনতে পারে, তাহলে সংসারের অনটন একটু কমে। কিন্তু মায়ের কথা শুনে বুকল বাড়িতে থাকাটাও কম জরুরী নয়। তাই শেষ পর্যন্ত ঠিক করল প্রহ্লাদকে বুঝিয়ে বলবে।

বাড়ি থেকে বেরুতেই প্রহ্লাদ আর শ্রীপদর সঙ্গে দেখা। ওদের দেখে বলল,

'প্রহ্লাদদা আমি আর যামু না। অন্য সকলেই তো যাইতাছে। বউটার তো এখন তখন অবস্থা। কখন কি হয়।'

'তোর মায়তো থাকবো। অত ভয় কিসের। যাওনের সময় আমি প্রভা খাত্রীরে কইয়া যামুনে, আইজ রাত্তিরে না হয় তোদের বাড়ি থাকব নে। কাইলকা দুপুরের আগেই তো ফিরা আইমু।'

'কিন্তু যদি কিছু বিপদ-আপদ ঘটে?'

'যদির উপর দুনিয়া চলে না।'

'তবু মনটা যেন কেমন করে।'

'আসলে বউন্যাওটা তোর মন', প্রহ্লাদ রেগে গেছে, 'লজ্জা করে না। বিয়ার পর বৌমারে কি দিচিস্? একটা টিকলি না একটা নথ? ভাব কইরা বিয়া করনের সময় তো ছিলি। তগো লিগা কিছু কইরতে লাগে না।'

'আসলে হারুটা ভয় পাইছে। যদি দাঙ্গা হয়, যদি ও মইরা যায়। এমন সোন্দর পৃথিবী, তার থিকাও সোন্দর সোনার মত বউটা থাকব না, বুঝলা না।'

ব্যঙ্গ করে হারাণকে আঘাত করল শ্রীপদ। ওদের উপহাস এতক্ষণ হারাণ চুপচাপ শুনছিল। হারাণের মনের অবস্থা ওরা কেউ বুঝবে না। সে-মন ওদের নেই। জিদ করে হারাণ যাওয়া বন্ধ করতে পারে। কিন্তু তাতে লাভ এই হবে, শ্রীপদদের

উপহাস আরো বেড়ে যাবে। লোককে দেখিয়ে বলবে, 'ঐ দেখ ব্যাটা বিয়া কইর‍্যা ভেড়া বইন্যা গেছে। কাপুরুষের মতন সইর‍্যা দাঁড়াইল।'

আর যাই হোক, কাপুরুষ, এ-কথা সে কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে ওদের সঙ্গে চলে এসেছে।

শীতের বিকেল খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে আঁধার নেমে এলো। হারাণকে বিকেলের আগেই সুবলা আলুভাতে রেঁধে দিয়েছে। চলে আসার সময় কুপি নিয়ে বাইরের জামরুল গাছ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেছে। হারাণ সুবলার চোখের দিকে তাকাতে পারে নি। জানে ওর বড় বড় চোখে ভয়, শংকা আর অস্বস্তির জল টল-টল করছে। মেঠো পথ ধরে অনেকটা এসে ফিরে দেখেছে, সুবলা তখনও পাতলা কুয়াসার মাঝে কাঁপা কাঁপা শিখা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যে পথ দিয়ে ও এসেছে, সেই পথের দিকে। অন্ধকারে হারাণের দু চোখের কোণ চিক-চিক করে ওঠে।

বাড়ির কথায় হারাণের মন ভেঙে দুমড়ে যাচ্ছিল। অথচ নিজের ব্যথাটা কাউকে না বলেও স্বস্তি পাচ্ছিল না। কাকে বলা যায়? কে আছে ওর সমব্যথী হবে? ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, একদম শেষে ধুঁকতে ধুঁকতে বুড়ো চৌলীন্দ্র মিস্ত্রী আসছে। দলের মধ্যে সব থেকে বড়। কি করে যে সে এতগুলো ছেলেমেয়ের দুবেলা খাবার জোগাড় করে, সে রহস্য আজও হারাণ জানে না। অথচ অনুভব করে অনেকদিনই খাবার জোটে না। তবু আশ্চর্য, এত অভাব-অনটনের মাঝেও ওর মুখের হাসিটি মিলোয় না। সরে গিয়ে ডাকল, 'চৌলীন্দ্রদা।' মাথা নিচু করে নিশিতে পাওয়া মানুষের মত হাঁটছিল। আশপাশের পরিবেশ সম্বন্ধে সে উদাসীন। যেন নিজের কোন শক্তি নেই—নিয়তি-নির্ধারিত পথে এগিয়ে চলেছে। ডাক শুনে চমকে উঠলো, 'কে রে?'

চোখ তুলে বলল, 'অ হারু! তা কি কও।'

'মনটা বড় উথাল-পাথাল কইরতাছে।'

'ক্যান?'

'বউডারে রাইখ্যা আইলাম। কি যে হয়। মায়ের কথা শুনলাম না।'

'প্রজা ধাত্রীরে কস নাই।'

'কইচি তো।'

'তাইলে ভাবনা নাই। সেই ব্যবস্থা করবনে। তবে মনটা আমারো ভাল নাই রে।'

'ক্যান, তোমার আবার কি হইল। তোমার মনতো কোনদিন খারাপ দেখি নাই।'

'লোভ কইরাতো আইলাম। মনে কর যদি কোন গণ্ডগোল হয়। আমার ভাল-মন্দ কিছু একটা হইয়া গেল, তাইলে এত-গুলান ছেলেপিলে নিয়া তোর বউদি কোথায় যাইবো।'

চৌলীন্দ্রের কথায় হারাণের বুক কেঁপে উঠলো। সত্যি তো ওর-ও যদি কিছু হয়ে যায়? তাহলে সুবলা ওর রাত-কানা মাকে নিয়ে কোথায় দাঁড়াবে? আর সুবলার প্রাণের ভেতর যে আর একটি প্রাণ বড় হচ্ছে, সে? হারাণের বুকে আবার নিদারুণ ভয়, অস্বস্তি আর যন্ত্রণা ঘন হয়ে বাসা বাঁধছিল।

পায়ে পায়ে বাঁশঝাড় ছেড়ে আলপথে নামল সবাই। পায়ের নিচে দুব্বো ঘাস, আর খুদি মানামানির ছোট ছোট ঝোপ। রাতের হিমে নেয়ে আছে। পায়ের স্পর্শে শরীর শির শির করে ওঠে। ক্ষেতের কোথায় আরম্ভ কোথায় শেষ ঠাহর হয় না। চারদিক ঘিরে নিকষ কালো অন্ধকার আর কুয়াসা। সতর্ক না হয়ে চললে পথ হারাবার সম্ভাবনা। কিন্তু প্রহ্লাদের দিক ভুল হবার সুযোগ নেই। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, মাঠের মধ্য দিয়ে, নদী পেরিয়ে গ্রামের পর গ্রাম ঘুরেছে। প্রতিটি আল-পথ, নদী তার চেনা। এমনকি এক্ষুনি বলে দিতে পারে আর কতদূর এগলে কাটারী ঝিল পাবে, কোথায় বুড়ো বটগাছের মাথায় কয়েকশ' বাদুড়ের বাসা।

মাঝে মাঝে দেশান্তরী হাওয়া বয়ে আসে। চোখ মুখে শঙ্কর মাছের লেজের ঝাপটা মারে। হাত-পা অবশ করে দূরে চলে যায়। মনে হয় আগুনের ছোঁয়া লাগলেও পুড়বে না। দু হাতের তালু বগলে চেপে এগিয়ে চলেছে চৌলীন্দ্র। ওর দু'পাশে গন্ধ বিলোনো পাকা ধানের ক্ষেত। কাটারী ভোগ ধানের গন্ধে মন আনচান করে উঠলো। যদি কিছু জমি পায়, নিজের হাতে চাষ করবে, ভোগ ধানের বীজ ছড়াবে। আপন সন্তানের মতো চোখে চোখে রাখবে। টিয়া, ময়না আর হরিতালের তীক্ষ্ণ ঠোঁট থেকে বাঁচাবে শিশু চারাগাছ। আশ-পাশে আসতে দেবে না, গরু কিংবা মোষ। যখন রৌদ্র-হাওয়ায় বড় হয়ে উঠবে, তখন দিন-রাত শরীর ডুবিয়ে ওদের কাছে বসে থাকবে। হাওয়ার সঙ্গে লুকোচুরি খেলা দেখবে। সুখের স্বপ্ন দেখতে দেখতে এগিয়ে চলল চৌলীন্দ্র।

পথ ছোট হয়ে আসছে। সময়ও বয়ে যাচ্ছে। প্রহ্লাদের বুকের মধ্যে চিন্তার অশান্ত সমুদ্র। এতগুলো মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা আর জীবনকে সে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্রতি পদক্ষেপে বিপদ তীব্র ফণা তুলে অপেক্ষা করছে। একটু হেললে দুললেই ছোবল দেবে। সবথেকে ভাবনার কথা গ্রামের আর একটি দলেরও জমিটার প্রতি লোভ আছে। খবর পেয়েছে, ওরাও জমিটা দখল করতে যাবে। প্রহ্লাদ তাই ওদের আগেই জমিটা দখল করতে চায়। এত গভীর রাতে সবার অগোচরে রওনা হওয়ার এটাও একটা কারণ। পর পর কয়েকটি ঘটনা প্রহ্লাদের মনে পড়ল, এমনি-ভাবে জমি দখল করতে গিয়ে কয়েকটি তাজা প্রাণ পৃথিবী থেকে সরে গেছে। কে জানে হয়ত আজকেও সবাই একসঙ্গে ফিরবে না। তবু আজকের দখল তার চাই। অপর দল জমি দখলের যত চেষ্টা করুক, প্রহ্লাদ সব ব্যর্থ করে দেবে। এতগুলো উপোসী মানুষের হঠাৎ গড়ে-ওঠা স্বপ্নকে সে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নিশ্চিতের দুর্গে।

নিজের জন্য প্রহ্লাদের ভাবনা নেই। যেদিন একটি বিশেষ আদর্শকে বিশ্বাস করে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে এসেছে, সেই-দিনই সব স্থির হয়ে গেছে। মৃত্যু তার কাছে পরম বন্ধুর মতো। সে দ্বার খুলেই রেখেছে। কিন্তু অসহায় পশুর মতো মরতে চায় না। নিজের আদর্শের জন্যে মৃত্যুতে তার কোন দুঃখ নেই। কেননা, সে মৃত্যু আসবে নিজের বিশ্বাসের জন্যে, মানুষের জন্যে। ইচ্ছে করেই প্রহ্লাদ এমন কঠিন পথ বেছে নিয়েছে। সে জানে এ-কাজে তার কোন সুখ নেই, স্বাচ্ছন্দ্য নেই। কিন্তু আছে তীব্র অনুভূতি, নিবিড় আনন্দ। এমন সংকট মুহূর্তেও মানুষের জন্যে কিছু করতে পারার তীব্র আনন্দ অনুভব করল। তার শিরা-উপশিরা দিয়ে শিহরণ খেলে গেল। গাঢ় কুয়াসা থেকে পরিচ্ছন্ন বাতাস খুঁজে খুঁজে নিশ্বাস নিল বুক ভরে। এমন অনুভূতি তার আরো হয়েছে। অনেক দিন। গভীর রাতে। নির্জন বনের পথে একলা হেঁটে যেতে। শান্ত-ভাবে যাওয়া নদীর ধারে। চাঁদের আলোয়।

নিকষ কালো অন্ধকারে। মাড়ী-ছেঁড়া তীব্র যন্ত্রণার ক্ষণে।

হাল্কা জল রঙের ছবির মত দিগন্তে অস্পষ্ট আলোর রেখা। জীবনে এই প্রথম হারাণ কুয়াসা-ঘেরা এমন গভীর রাতে চলেছে। দিগন্তে সুন্দর একটি দৃশ্য তৈরী হচ্ছে ক্রমশঃ। ধীরে ধীরে গাছপালার মাথায় আলো ছিটিয়ে টুপ করে একফালি মিষ্টি কুমড়োর মতো চাঁদ আকাশে উঠে এলো। হারাণ দেখল চাঁদের সংগে কুয়াসার লুকোচুরি খেলা। দেশান্তরী হাওয়ার দাপাদাপিতে কখনো কুয়াশা জমাট হচ্ছে। ভেঙে যাচ্ছে। রাত শেষ হয়ে আসছে। আর কিছুক্ষণ পরেই দিগন্তে আলোর রেখা ফুটে উঠবে। ভোরের পাখি ডাকবে। আঁধারে ঢাকা সব অবয়ব পাবে: চোখের সামনে আলো আর কুয়াশার মাখামাখি হয়ে অপরূপ দৃশ্য তৈরী হবে দিক চক্রবালে।

দলটা ক্ষেতের শেষে পেঁাছে যাচ্ছে। আর কিছুটা এগুলেই ওরা জাতীয় সড়ক পেয়ে যাবে। ততক্ষণ সূর্য উঠে যাবে। চাঁদের আলো মিলিয়ে যাবে আকাশের গায়ে। অথচ এক ফালি সাদা চাঁদের রেখা থাকবে আকাশের বুকে। তার কিছুক্ষণ পরেই ওরা পেঁাছে যাবে নির্দিষ্ট ভূমিতে। চৌলীন্দ্রের সুখের স্বপ্ন থিতিয়ে গেছে। সামনে শ্মশান। এই শ্মশানকে বাঁয়ে রেখে ওরা এগিয়ে যাবে। সদ্য নেভা একটি চিতার দৃষ্টি পড়ল চৌলীন্দ্রের। তখনো ধোঁয়া উঠছে অল্প অল্প। মাত্র কিছুক্ষণ আগে হয়ত মাটির কলসীতে করে জল ঢেলে শেষ হরিধ্বনি দিয়ে বিদায় নিয়েছে অচেনা-জনেরা। একবারও চিতার দিকে ফিরে তাকায় নি। চৌলীন্দ্রের বুকের ভেতর হুহু করে উঠলো। কে জানে হয়ত তাকেও ফেরার পথে এইখানে দাহ করে সবাই ফিরে যাবে। দুচোখ জ্বালা করে উঠলো চৌলীন্দ্রের। নিজের জন্যে, নিজের দুঃখের সংসারের জন্যে অদ্ভুত মায়া হল চৌলীন্দ্রের। যদি সে আর সত্যি সত্যি ফিরে না আসে? সংসারে কেন এত দুঃখ? কেন এত বেদনা? চৌলীন্দ্র কিছুই বুঝতে পারে না। ছোট্ট মাথায় সব গুলিয়ে যায়। কিছুই ভেবে পায় না। জ্বালা ধরা চোখের জলে বুক ভাসে। হতাশায়।

নতুন জাতীয় সড়কে সবাই উঠে এলো। রাস্তার বাঁকে ছিটিয়ে থাকা কয়েকটি কলা-গাছ পেরুলেই পেঁাছে যাবে অম্বরক্রান্তের খাস জমিতে। কার অম্বর করে ক্রান্ত হয়েছিল সে খবর কেউ জানে না, কিন্তু দলের সকলে এখন ক্লান্ত, অবসন্ন। যে যার জমিটুকু দখল করে বিশ্রাম করতে চায়।

ওদিকে রাত ফিকে হয়ে আসছে। ঝোপঝাড়ের ভেতর লুকিয়ে থাকা অন্ধকার বিদায় নেবার আগে আড়মোড়া ভাঙছে। ঝরে পড়া কুর্চি ফুলের মতো একটি দুটি তারা কখন যে মুছে গেছে আকাশ থেকে। এখন সাদাটে আকাশ, আলোর রেণু মেখে দিনের সাজে তৈরী হচ্ছে। প্রহ্লাদের কিন্তু চিন্তার শেষ নেই। ঐ দলের লোকেরা আগে জমি দখল করবে না তো? কিন্তু তা কি করে সম্ভব, ওরা তো খুব গোপনে এই নিশীথ অভিযান করেছে।

দেখতে দেখতে সবাই এইটুকু পথ পেরিয়ে এলো। প্রত্যেকের বুক কাঁপছিল। প্রহ্লাদ জানে, এখন তাকে স্থির থাকতে হবে। অবিবেচকের মতো কোন কাজ করলে চলবে না। সবার দৃষ্টি ওর মুখের দিকে। কিন্তু কলাগাছের ঝোপ পার হয়ে এসে সবাই অবাক। জগতের সমস্ত বিস্ময় কে যেন এক সংগে জড়ো করে প্রহ্লাদের চোখের তারায় ঢেলে দিয়েছে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না প্রহ্লাদ। চিৎকার করে বলে উঠলো, 'এ অসম্ভব!' পাশে শ্রীপদ দাঁড়িয়েছিল। সেও অবাক। ওদের বুঝতে বাকি রইল না, সেই দল ওদের আগেই, অন্য পথ দিয়ে এসে জমি দখল করেছে। কিন্তু দলের কে ওদের সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করল? কে ওদের জানাল আজই ওরা এই জমি দখল করবে? ওরা দেখছিল কেউ বাঁশ কাটাচ্ছে, কেউ শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। বোঝা যাচ্ছিল জমিটা ঘিরে দ্রুত নিজেদের অধিকার কায়েম করতে চায়। প্রহ্লাদ দ্রুত ভাবছিল, কিন্তু একটা এখুনি করতে হবে। যেই দখল করুক, এ জমি তার চাই। এত-গুলো মানুষকে ভরসা দিয়ে এনে এখন চোরের মত ফিরে যাবে? তাহলে ওর কি থাকল? এতদিন তিল তিল করে বুকের রক্ত দিয়ে যে দল গড়ে তুলেছে, তা কি একদিনের ব্যর্থতায় শেষ হয়ে যাবে? বৃষ্টি-ধোয়া জলের মতো ওর অস্তিত্ব মুছে যাবে সকলের মন থেকে? নিজের জন্য ভাবে না, কিন্তু ওর ব্যর্থতার সংগে সংগে কি একটা বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার বীজ চাপা পড়ে যাবে চিরকালের জন্যে? প্রহ্লাদ কঠিন হবে, দৃঢ় হবে। সব বাধা তুচ্ছ করে এগিয়ে যাবে। সারা রাতের বাসি, ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত মুখ-গুলো ঘিরে আছে ওকে। প্রহ্লাদের এত কাছে ওরা তবু প্রহ্লাদ চিৎকার করে বলে উঠল, 'বদরুদ্দিন চাচা, চৌলীন্দ্রদা, হারাণ, আমি জানি না, আমাগো সংগে কে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করছে। আমাগো মুখের গেরাস কাইর‍্যা নিবো, এ সহ্য করুম না। পরশুদিন শ্রীপদ আমাগো নিশান গাইড়্যা আমাগো। আইজক্যা আইস্যা এই জমি গেছে। তখনই ঠিক হইয়া গেছে এ জমি আমাগো। আইজক্যা আইস্যা এই জমি কেউ দাবী করলে তা আমরা মানুম না। এই মাটি আমাগোর চাই, চাই।'

'জান থাইকতে জমি ছাড়ুম না। তোরষার জল লাল কইর‍্যা দিমু। তবু জমি ছাড়ুম না।' চৌলীন্দ্র পাগলের মতো চিৎকার করে উঠল।

সমস্বরে প্রতিধ্বনি উঠল, 'জীবনের থিকা মাটি বড়। মাটি চাই।' এক মুহূর্তে সারা রাতের উপবাসী মানুষগুলো ভুলে গেল সব দুর্বলতা। ভুলে গেল আপন প্রিয়-জনদের কথা। সবার বুকের মাঝে লুকিয়ে থাকা মশালগুলো কে যেন জ্বালিয়ে দিল দাউ দাউ করে। এমনি বোধহয় হয়। জীবনে বোধহয় এমন কোন সময় আসে যখন পথের ধুলোও প্রবল ঝড়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে বলতে পারে, তুমি আমাকে কিছুতেই উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। এতদিনের সেই ক্লান্ত মানুষগুলোও যেন আজ সে কথাই বলতে চাইছে। কেউ তাদের ফেরাতে পারবে না। এগিয়ে তারা যাবেই।

সবার পেছনে দাঁড়িয়েছিল হারাণ। এতক্ষণ সে একটি কথাও বলে নি। সব শুনছিল নীরবে। এবার সবাইকে পাশ কাটিয়ে প্রহ্লাদের কাছে চলে এলো।

'আমার একটা কথা ছিল প্রহ্লাদদা।'

'তোর আবার কি কথা,' খুব বিরক্তির সংগে বলল প্রহ্লাদ, 'এখন কথাটথা রাইখ্যা দে।'

'না, এক মিনিট মাত্র। আমিও তো দলে আছি। আমার কথা শুইনতেই হইবো।' দৃঢ় এবং স্পষ্ট স্বর।

'যা বলার তাড়াতাড়ি বল। অখন আর পিরিত করনের সময় নাই।'

'দেখ একদল মানুষ জমিটারে দখল করছে, দখল করা জমি আবার দখল করতে গেলে অনিবার্য দাংগা হইব। কত্তনতো যায় না, দুই একজনের প্রাণও যাইতে পারে। কোনভাবে বাইচ্যা আছি, আর একটু ভাল-ভাবে থাকনের লাইগ্যা জান দেওনটা কি উচিত হইবো। ধরো চৌলীন্দ্রদার যদি কিছু হয়, এতগুলান ছেলেপিলে যাইবো কোথায়? ভাবছ সে কথা?'

'বেইমানের মত কথা কইস না। তোর যদি ডর লাগে, তুই বাড়ি যা। বউরে কগা খিনুক বাটিতে দুধ খাওয়াইতে। আমাগো মধ্যে ভাংগন ধরাইস না।'

'তুমি অযথাই রাগতাছ। যারা জমি দখল করছে, তারাও আমাগোর মতই। ওদের সংগে মারামারি কইর‍্যা কি লাভ হইব। মাঝখান থিকা পুলিশ আইবো। পুলিশ বোকা না, সবাইর কোমড়ে দড়ি দিব।'

'চোপ্ শালা দালাল।' কে যেন চিৎকার করে উঠল।'

'তুই বললি না কোন রকমে বাইচ্যা আছি, সে কি আর বাচা রে। ক্ষিধার জ্বালা আমার মত তুই পাইস নাই। তুই বুঝবি না। প্রতিদিন তিল তিল কইর‍্যা মরণের থিকা একদিন মরাই ভাল।' চৌলীন্দ্র এক-টানা কথাগুলো বলল।'

'তুই এক কাজ কর, —বলেই এমন সব কথা শোনাল শ্রীপদ যে জিয়োল মাছের কাঁটার চাইতেও তার জ্বালা বেশী।

এতদিনের পরিচিত সংগীরা—যারা তার আত্মীয়ের চাইতেও বেশী, ওকে ফেলে রেখে চলে গেছে। হারাণ একলা শিরীষ গাছের নিচে সবুজ প্রকৃতির মধ্যে হারাণ। ওরা যখন উল্লাসে বিজয় পতাকা নিয়ে গ্রামে ফিরে যাবে, তখন তুমি রাতের অন্ধকারে চোরের মত নিজের ঘরে ফিরবে। গ্রামে ততক্ষণ কথাটা রটে যাবে তুমি বিশ্বাস-ঘাতক, বেইমান। সুবলার উজ্জ্বল মুখ লজ্জায় ম্লান হয়ে যাবে। সুবলার পৃথিবীতে যে প্রাণটি আরেক পৃথিবীর আলো দেখার জন্যে উন্মুখ আছে, তার প্রাণেও কি এই কুৎসিত ছোঁয়া লাগবে না? ওরা ভুল করতে যাচ্ছে, কিন্তু ভুলের রাস্তা ধরেই তো একদিন জয়ের তিলক আঁকবে। তুমি ওদের সঙ্গে যাও পিছিয়ে থেকো না। নিজের মনে সঙ্গে কথা বলল হারাণ, তারপর দ্রুত এগিয়ে গেল।

যেতে যেতেই শুনল প্রচণ্ড চিৎকার, হই হট্টগোল, কথা কাটাকাটি। নিজেদের দলের কে যেন ওদের দলের কাউকে বলল, 'ঐ দালালের বাচ্চারা, একজন মানুষের নাম ভাংগাইয়া আর কতদিন খাবি রে। জানের মায়া থাকে তো সইর‍্যা পড়।'

'মুখ সামলাইয়্যা কথা কইস। দাঁত উপর‍্যাইয়া নিমু।'

'কি বললি—' দেখতে দেখতে হাতাহাতি, মারামারি শুরু হয়ে গেল। প্রত্যেকে, প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আদিম হিংস্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে। যেন সুযোগ পেলেই ছিঁড়ে খাবে। একটা মোটা মতন লোক বাঁশ দিয়ে ধাঁ করে মারল, চৌলীন্দ্র চিৎকার করে পড়ে গেল। বদরুদ্দিন ঐ লোকটির মুখে প্রচণ্ড জোরে ঘুষি হাঁকল। নাক দিয়ে গলগল করে ছুটল রক্ত। প্রহ্লাদের গায়ে প্রচণ্ড শক্তি। ওর কাঁধের কাছে অনেকখানি জায়গা কেটে গেছে। পেছন দিকের জামা পিঠের সংগে রক্তে সেঁটে গেছে। প্রচণ্ড বিক্রমে একলাই বিরাট ডাণ্ডা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। হারাণ জীবনে কোনদিন এমন অবস্থায় পড়ে নি। কি করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। ওর দিশেহারা অবস্থা। দম বন্ধ হয়ে আসছে। হয়ত দ্বিতীয় নিঃশ্বাস ফেলার আগেই তীক্ষ্ণ বর্শা প্রহ্লাদের পাঁজর ফুঁড়ে গেঁথে যাবে। কি খেয়াল হল, ঝটকায় প্রহ্লাদকে সরিয়ে নিয়ে এলো। কিন্তু টাল সামলাতে পারল না। হুমড়ি খেয়ে পড়ল প্রহ্লাদের জায়গায়। আর তক্ষুনি তীক্ষ্ণ বর্শা হারাণের পাঁজর ফুঁড়ে গেঁথে গেল। হারাণ অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল, 'প্রহ্লাদদা।'

'হারাণ তুই! তোর—' আর কিছু বলতে পারল না। ঝুঁকে এক টানে বর্শা বের করে ফেলল। তাজা রক্ত উতলে উঠে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল ঝলকে ঝলকে। অসহ্য যন্ত্রণা হারাণের সমস্ত শরীর গ্রাস করছে। গলা বুক বেয়ে একটা তীব্র যন্ত্রণা ক্রমশঃ শিরা উপশিরায় ছড়িয়ে পড়ছে। নিঃশ্বাস ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে হয়ে আসছে। বুকে অপরিসীম তৃষ্ণা। একটি দুটি কথা বলার মতও জীবনীশক্তি আর নেই। মুখ বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। বিস্ফারিত চোখের কোনা বেয়ে মোটা জলের ধারা।

চিরতরে জ্ঞান লুপ্ত হবার আগে, শেষ অনুভূতি নিয়ে সুখ দুঃখের পৃথিবীকে একবার দেখে নিল। সুর্য ... নরম নীল আকাশের গায়ে যেন উঠে আসছে একখণ্ড সাদা মেঘ দেশান্তরী হাওয়ায় একা ... ভেসে যাচ্ছে। দেশান্তরী হাওয়া এক সময় এই মেঘকে পেঁছে দেবে হারাণের গ্রামে: যেখানে জামরুল গাছের নিবিড় ছায়ায় নিজের প্রাণের ভেতর আর একটি প্রাণের পাপড়ি মেলে ধরার শেষ প্রহর গুনছে সুবলা।

এখন কেউ নেই। নিঃসংগ, নিস্তব্ধ অশ্বক্রান্তের মাঠ। বহুজনের হঠাৎ জেগে ওঠা স্বপ্নকে পথ দেখিয়ে এখানে নিয়ে এসেছিল প্রহ্লাদ। এবারের মত এই স্বপ্ন-বীজ মাটির পৃথিবীতে রোপণ করতে পারে নি। শুধু হাতে ফিরে গেছে। শুধু একজন আর কোনদিনই ফিরে যাবে না। পাথর হয়ে পড়ে আছে রক্ত ফুলের ভেতর। তার বিস্ফারিত বীভৎস চোখে এখনো স্বপ্ন মাখানো। হারাণকে ফেলে প্রহ্লাদ যেতে চায় নি। সংগীরা সব ওকে জোর করে সরিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু প্রহ্লাদের অনেক কাজ বাকি। চৌলীন্দ্রের মুছে যাওয়া স্বপ্নকে সে আবার প্রতিষ্ঠা করবে।

চারদিকের সবুজ সতেজ কচি কচি ঘাসের ভেতর ফুটে থাকা লাল ফুলের মতন রক্ত ফুলের ভেতর শুয়ে হারাণ। ওদের দেহের রক্ত এঁকে বেঁকে গড়িয়ে জমেছে পাশের ধান গাছের গোড়ায়, নীল ঘাস ফুলের ঝোপে।
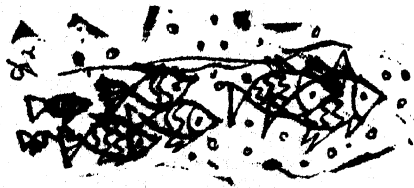
উনিশ শতকের নবজাগরণ একটি সমীক্ষা

অমিতাভ দাশগুপ্ত

উনিশ শতকের নবজাগরণ সম্পর্কে অসংখ্য ইতিবাচক, নেতিবাচক ও প্রশ্নচিহ্ন সম্বলিত প্রবন্ধ ও আলোচনা ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষত অধুনা এই বহু আলোচিত বিষয়টির পুনর্মূল্যায়নের এক তীব্র তাগিদ দেখা দিয়েছে। অনেকে নবজাগরণের ঘটনাটিকে সরাসরি নস্যাৎ করতে চেয়েছেন। দুর্ভাগ্যবশত এ-জাতীয় মন্তব্য অধিকাংশ সময়ই দায়িত্ববিহীন ভাবে তথাকথিত আধুনিকতার চটকদারি বাকজালের দৃষ্টান্ত হয়ে উঠছে। যিনি এক সময় বিশ্লেষণাত্মক ভাবে মন্তব্য করেছেন, 'পাশ্চাত্য আদর্শের বীজ ছড়ানো হয়েছে এদেশের বর্ধিষ্ণু নাগরিক বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে। কেবল বীজের গুণে প্রথম দিকে উনিশ শতকে তার বিস্ময়কর অঙ্কুরোদ্গমে আমরা ধাঁধিয়ে গেছি। ভেবেছি, নব-জাগরণের সেই তরঙ্গের জোয়ার আসবে ভবিষ্যতে! তা-ও আসেনি। কারণ পুরনো মাটিতে নতুন বীজের পরিপূর্ণ উদ্গম হয়নি। সমাজের অর্থনৈতিক স্তরের মৌলিক কাঠামো খানিকটা বদলেছিল ঠিকই। তার ফলে সমাজের গড়নও যে কিছুটা বদলায়নি তা নয়' (বিনয় ঘোষ : বাঙালী বিদ্বৎসমাজের সমস্যা)। তিনিই আবার পনের বছর পর এরকম উক্তি ক'রে বসলেন, 'কুণ্ডলিনীর কোন চক্রে তখন আমাদের অর্থাৎ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের জাতীয়তাবোধ বা স্বাদেশিকতা-বোধ নামক চৈতন্য অবস্থান করছিল! তখন কলকাতা শহরে তাঁরা ভারতবর্ষীয় সভার বৈঠক করছেন, বিধবা-বিবাহ নিয়ে ঘোঁট পাকাচ্ছেন, এবং ভদ্রলোকের মেয়েরা ঘরের বাইরে বিদ্যালয়ে গিয়ে লেখাপড়া শিখবে কিনা তাই নিয়ে কাগজপত্রে লেখালেখি করছেন। এই সমস্ত নিয়ে বেশ সমারোহে বাঙালি ভদ্রলোক ও বুদ্ধিজীবীরা 'নবজাগরণের উৎসবে মেতে ছিলেন।' (বিনয় ঘোষ : গৌরিব গণবিদ্রোহ এবং ভগবান)। যে কোনো বিষয়ই যখন একপেশে আলোচনার শিকার হয়ে পড়ে, তখন সেই বিষয়টিকে হয় পরিকল্পিতভাবে মাথায় তোলা হয়, নয় ধুলোয় টেনে নামানো হয়: এতে আর যাই হোক সেই অতি-নিন্দিত বা অতি-নন্দিত বিষয়ের কোন সঠিক মূল্যায়ন ঘটে না। আমরা অতিরিক্ত আবেগ-প্রবণ জাত—তাই ভারসাম্যহীন ভাবে আমাদের বিচারের কাঁটা কখনো অতিবামে, কখনো অতি দক্ষিণে হেলে। শুধু রাজনৈতিক নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আলোচনাতেও একদিকে অন্ধভক্তি অন্য দিকে আ-শির-নখর নিন্দা—এই দুই মেরুর দেখা মেলে।

১৮ শতকের বাংলার প্রাণকেন্দ্র ছিল মুর্শিদাবাদ। স্বয়ং লর্ড ক্লাইভ লিখেছিলেন, 'এই শহরটি লন্ডনের মতই বড়, জনবহুল এবং সম্পন্ন। লন্ডনের সঙ্গে মুর্শিদাবাদের পার্থক্য এই যে, এখানে অনেক বেশি বিত্তবান মানুষ আছেন।'

ইংরেজরা যখন এদেশে বাণিজ্য শুরু করে, তখন তাদের প্রধান সংঘাত বেধেছিল মুর্শিদাবাদবাসী ধনিক বণিক ও তাদের অনুচরদের সঙ্গে। শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ডঃ মোরল্যান্ডের সাক্ষ্য তুলে বলেছেন, 'বণিক এবং দালালদের সঙ্গে লড়ে ওঠা তাদের (ইংরেজদের) পক্ষে রীতিমত কষ্টকর হয়েছিল, কারণ তারা সাধারণভাবে ইংরেজদের চেয়ে ঢের বেশী চালাক-চতুর ছিল। তাছাড়া প্রচণ্ড প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে ইংরেজদের (দেশীয়) একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পাল্লা দিতে হয়েছে। তাদের পথে প্রধান বাধা ছিল উচ্চতলার কর্মচারী ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের হস্তক্ষেপ। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, ১৬৫৯ সালে লিখিত জনৈক ইংরেজের একখানি পত্র থেকে জানা যায় যে, মীরজুমলা কাশিমবাজারে ইংরেজদের কারখানা বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং ইংরেজদের সঙ্গে বাণিজ্য করার বিরুদ্ধে এক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন—যতক্ষণ না তারা তাঁর সঙ্গে দেখা করছে, ততক্ষণ তাদের সঙ্গে কোনো কারবার চলতে পারে না। একটা মিটমাট ছাড়া এদেশে টিঁকে থাকা সম্ভব নয় বলে ইয়োরোপীয় বণিক কখনো সফল, কখনো ব্যর্থভাবে তাদের খুশি করার চেষ্টা করত' (অ্যান অ্যাডভান্সড হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া : আর সি মজুমদার ও অন্যান্য)।

সিরাজদ্দৌলার পতনের পর থেকে এদেশে ইংরেজের লুণ্ঠনের পরিমাণ হয়ে উঠল সীমাহীন। প্রথমে তারা অপরিমেয় টাকার লোভ দেখেছিল নবাব-তৈরির বিশেষ লাভজনক কারবারে। অল্প কিছুকালের মধ্যেই এই চতুর বেণিয়ার জাত এদেশের লোকদের কাছ থেকে শিখে নিল দাদন-প্রথা এবং বিন্দুমাত্র দয়ামায়া না ক'রে এই প্রথাকে তারা অতিকায়ভাবে ফাঁপিয়ে ফাঁপিয়ে চলল। ইংলন্ডে শিল্প-বিপ্লবের রাজকীয় অভ্যুত্থান হয়েছিল শুধু তখনই যখন আমাদের দেশের বাণিজ্য ও কৃষি সম্পূর্ণভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতের মুঠোয় চলে আসে। একদিকে তারা বিনা শুল্কে যাবতীয় পণ্য নিয়ে আমাদের বাজার দখল করল, অন্যদিকে সামন্ততান্ত্রিক ও কর্ষণজীবী গ্রামীন সমাজকে ভেঙে দিয়ে প্রমাণ করল যে, জমির প্রকৃত মালিক হ'ল শাসক শক্তি। ১৭৬৯-এ ইংলন্ডস্থ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর এ জাতীয় হুকুমনামা এদেশে বাণিজ্যরত ইংরেজদের লোভের আগুনে ঘি ঢালল।' বাংলা দেশে রেশম সুতোর উৎপাদনে উৎসাহ দাও, কিন্তু রেশমী কাপড়ের উৎপাদনকে মারো। রেশমী সুতো উৎপাদনকারীদের বাধ্য কর কোম্পানির কল-কারখানায় কাজ করতে। তাদের নিজেদের বাড়ি বসে কাজ করা বন্ধ করে দাও।' (ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া : ডঃ রাধাকমল মুখার্জি)।

ধর্মশাসিত, ক্ষীণজীবী, কৃষিনির্ভর বাঙালী সমাজে মুসলমান নবাবেরা যে শাসন পত্তন করার চেষ্টা মাঝে মাঝেই চালাতেন, তার প্রকৃত চরিত্র ছিল নিছক কর-আদায় করা। গ্রামীণ সমাজে ধর্মের ছিল একচ্ছত্র দাপট এবং সেখানকার সমাজ-ব্যবস্থার ক্রিয়াশীল কর্ণধার ছিলেন হিন্দু জমিদারকুল বা সামন্তবর্গ। ইংরেজদের সগর্জ অভ্যুদয়ে তাদের প্রাধান্য গেল। মুর্শিদাবাদের গৌরবকে হত্যা করে জেগে উঠল রাজধানী কলকাতা। শুরু হল নতুন যুগ। এই নতুন যুগেই ইতিহাসের অমোঘ স্বাভাবিক নিয়মে অঙ্কুরোদ্গম ঘটল—খণ্ডিতই বলুন, অসমাপ্তই বলুন, উনিশ শতকের বাংলা তথা ভারতীয় সমাজের নবজাগরণের। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মন্ত্রে দীক্ষিত পাশ্চাত্য বুর্জোয়া শ্রেণী ও উপনিবেশবাদীরা সামন্ত সভ্যতার কাঠামো ভেঙে ফেলে বিশ্বময় যে সাম্রাজ্য ও নয়া সভ্যতার

ছড়িয়ে দিল, তারই একটি বেগবান তরঙ্গ এসে উনিশ শতকে ভাগীরথীর কূলকে আন্দোলিত ক'রে তুলল।

ইংরেজ শাসনের প্রথম পর্যায়েই রাজস্বর জমা ও পরে সূর্যাস্ত আইনে গ্রামীণ জমিদারদের প্রভাব চলে গেল এবং তাদের শূন্যস্থান গ্রহণ করল একটি নতুন মুৎসুদ্দি গোষ্ঠি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আর্থিক যোগ লাভের উপায় হিসেবে তারা বেছে নিল সরকারী বা সওদাগরী অফিসের 'বাবু'-র জীবন।

একথা অস্বীকার্য নয় যে, এই নতুন শ্রেণী পাশ্চাত্য রাজনীতি ও সংস্কৃতি থেকে শিক্ষা নিয়ে তরুণ গরুড়ের মত আন্তর্জাতিক চেতনার অঙ্গনে ডানা মেলতে চেয়েছিল। ইংরেজ-কৃপালাভের ব্যর্থতায় বিদ্রোহী বাঙালী তারুণ্যের ভেতরে যে বিক্ষোভের বাষ্প জমেছিল, তার বেগও খুব কম ছিল না। সামন্ততন্ত্রের নাভিশ্বাস উঠেছে, সমাজের প্রাচীন আচার্য ধর্মজীবীরা মুখ-ভ্রষ্ট ও অশক্ত—এমনই দুটি প্রাচীন বন্ধন-মুক্তির মোহানায় এসে দাঁড়িয়েছিল উনিশ শতকের নতুন কলকাতা। মনে হয়েছিল এবং নিশ্চয়ই তা অ-কারণ নয়, নতুন বাংলার গঠন শুরু হল। এ বাংলার সর্বশক্তি অগ্রগামী হওয়ার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত, প্রাচীন সমাজ-জীবনের সংহতি কমজোর হবার ফলে এর পিছুটান খুবই কম। ছোট ছিপের মতো এ তরতর ক'রে এগিয়ে চলেছিল। এই অগ্রগতির বিবরণ যেন ছোট একটি সরল রেখার উভয় প্রান্তে সুদীর্ঘ দুই সরল রেখা অন্তর্বিন্দুতে ত্রিভুজের আকার ধারণ করেছে। অন্তর্বিন্দু পশ্চিমের প্রভাবজাত আমাদের বিদগ্ধ মন, ছোট সরলরেখা আমাদের সুপ্রাচীন সংস্কার ঐতিহ্য—দুই বাহু কালপ্রবাহের প্রচণ্ড গতি' (উনবিংশ শতাব্দীর স্বরূপ ঃ বিনয়কৃষ্ণ দত্ত)।

কিন্তু একথা তো অসত্য নয় যে বাংলাদেশের মধ্যবিত্তদের নবজাগরণ অর্থনীতিক ভিত্তির অভাবে বহুলাংশেই কল্পনাবিলাসী ও সংস্কারবাদী হয়ে উঠেছিল। কেউ কেউ এমন কথাও মনে করেন যে, তখন বিজ্ঞানচর্চা বা অর্থনীতিক প্রচেষ্টার পরিবর্তে শুরু হয়েছিল বেদ উপনিষদ শাস্ত্রগ্রন্থের নিরাপদ অন্তরাল থেকে সমাজ সংস্কারের প্রয়াস এবং সুবিধা আদায়ের জন্য বিদেশী শাসকদের দুয়ারে ধর্ণা দেওয়ার পর্ব।

মুনাফালোভী ইংরেজবণিক ভারতবর্ষের শিল্পবাণিজ্যের যতই সর্বনাশ করুক না কেন, নিজেদের সাম্রাজ্য রক্ষার প্রয়োজনে যেমন তাদের সৃষ্টি করতে হয়েছিল কিছু কল-কারখানা, রেলপথ, ডাক-তার, তেমনই সস্তায় 'নেটিভ' কর্মচারী ও কেরানীকুল সংগ্রহের জন্যই তাদের এদেশে চালু করতে হয়েছিল ইংরেজি শিক্ষা—যার জানালা দিয়ে তেরছা ভাবে হলেও আন্তর্জাতিক রাজনীতি-অর্থনীতি ও সংস্কৃতির আলো আমাদের মাটিতে এসে পড়েছিল। তা সত্ত্বেও অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাষ্ট্রের ইতিহাস স্বাদিক নিয়ম নতুন দিকে মোড় ফেরার সম্ভাবনায় আক্রান্ত হয়েছিল। দেশীয় কুটিরশিল্প, বাণিজ্য ও কৃষির উৎপাদনের মধ্যে মধ্যে বহু শতকের ঐতিহ্যবাহী সনাতন ভারতের গ্রামীণ সভ্যতার ভিত অস্থিরতায় নড়ে গেল। সমাজজীবনে শুরু হয়ে গেল নানা ওলোট-পালোট। এমনকি ইংরেজনবিশ বাবুরাও নিছক কেরানীগিরির, বড়জোর ডেপুটি-গিরির, অন্তরে পুরোপুরি বিশ্বাসী থাকতে পারলেন না। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্পর্শে ভারতের কুম্ভকর্ণ-নিদ্রা ভেঙে গেল এবং এই নবজায়মান বোধ, রবীন্দ্রানুসারী হয়ে বলা চলে "যে আমাদের স্থাবর চিত্তভূমিকে জঙ্গম বৃষ্টিধারার মতো এসে আঘাত করল।

পুরোনো সংস্কৃতির মধ্যে এক তীব্র আলোড়ন শুরু হল। এই আলোড়নের রূপ যেমন বিক্ষুব্ধ তেমনই জটিল। এর কম্পন কমবেশি উঠেছে উনিশ শতকের নতুন ভাবে ঢেলে সাজা ধর্মাচরণে, সাহিত্যে, রাজনীতিতে, পঙ্গু হলেও অল্পবিস্তর শিল্পায়নে, প্রাথমিক বিজ্ঞান-বোধে, সংস্কার আন্দোলনে, সমাজ-বিদ্রোহে, যুক্তি ও বোধের চর্চায় এবং সর্বোপরি ব্যক্তি-মানুষের উদ্বোধনে। যদিও সত্যের খাতিরে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে উনিশ শতকের বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আলোড়নের পার্থক্য আকাশ-পাতাল, এবং কখনোই তা সমাজের উপরিতলকে ভেদ করে বনিয়াদকে স্পর্শ করতে পারে নি, তবু এই নবতরঙ্গই সেখানের তরুণ বুদ্ধিজীবীদের মনে প্রথম গণ-বিচরণের একটা আকাঙ্ক্ষার জন্ম দিয়েছিল, গুরুবাদ-বর্জিত মুক্ত বুদ্ধি ও যুক্তির চর্চারও অঙ্কুরোদ্গম ঘটেছিল। পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে শুধু অনুকরণ নয়, আত্মীকরণেরও প্রয়াস কমবেশি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। উৎকট ইংরেজিয়ানা, ঐতিহ্যকে সার্বিকভাবে নস্যাৎ করার মেকলীয় ঢং ও ইংরেজি ভাষাকে মাতৃভাষার আসনে বসানোর হাস্যকর প্রচেষ্টায় ক্লান্তি এসেছিল নবজাগৃতির দ্বিতীয় পর্বে। বেশ অভিনিবেশ সহকারে প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সারটুকু আহরণ করা ও মাতৃভাষাকে যোগ্য মর্যাদায় বসানোর ইতিবাচক জাতীয়তাবাদী অনুভবের তীব্রতাও উপলব্ধ হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, দীনবন্ধু থেকে শুরু ক'রে অনেকেই দেশের কৃষক ও নিম্নবিত্ত মানুষের অসহনীয় জীবন ও অস্তিত্বের চরিত্রকে সামাজিক দায়িত্ববোধের সঙ্গে পরিস্ফুট করার চেষ্টা করেছিলেন। এ-কালের কিছু কিছু আত্মবিস্মরণী সমালোচক, যাঁরা রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের সমালোচনায় মুখর, তাঁরা সম্পূর্ণভাবে সময় ও ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত বোধের অভাবে দিকভ্রান্ত। কেমন পরিবেশে, কোন অচলায়তনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এই দুই মনীষী জাতিভেদ, বহু বিবাহ, বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে ও বিধবা বিবাহের পক্ষে লড়াই করতে চেয়েছিলেন, শিক্ষায় আনতে চেয়েছিলেন বিজ্ঞানকে, সমালোচনা করেছিলেন ভারতের প্রশাসন পদ্ধতিতে ভারতীয়দের দাবির কথা, লড়েছিলেন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য, প্রাণপণে প্রয়াসী হয়েছিলেন জনশিক্ষা বিস্তারের—সে সম্পর্কে কোনো ধারণা এই লেখকদের আছে কিনা সন্দেহ।

উনিশ শতকের নবজাগরণের গুরুত্বকে ক্ষুন্ন না করেও একথা অবশ্য বলা অনুচিত হবে না যে কি সমাজ কি সাহিত্য কি সংস্কৃতি—সর্বস্তরেই এর প্রভাব কলকাতার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আটকা পড়েছিল, দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে নি। কিন্তু সে সীমাবদ্ধতা থেকে গিয়েও এর যেখানে গুরুত্ব সেদিকেই বরং নজর দেওয়া ভালো।

নিঃসন্দেহে উনিশ শতকীয় পুনরুজ্জীবনের শ্রেষ্ঠ ফসল আধুনিক বাংলা সাহিত্য। ১৮৫৭ সালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু এবং ১৮৬১-তে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের প্রকাশ—এই চারটি বছরকে একথায় পুরোনো ও নতুন সাহিত্য অধ্যায়ের সেতুভঙ্গের কাল ব'লে উল্লেখ করা যেতে পারে। সাংস্কৃতিক চেতনার মুক্তির আকাশে উড্ডীন অথচ অর্থনীতিক ক্ষেত্রে শৃঙ্খলিত নব্যশিক্ষিত বাঙালীর অস্তিত্বের সংকট পারস্পরিক বিরোধিতা, সাধ ও সাধ্যের অমিল—এবং এ সব থেকে জাত এক প্রবল স্বাদেশিকতা-বোধ ও জাতির আত্মানুসন্ধানের বাসনা মধুসূদন, বঙ্কিম, হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র, দীনবন্ধু থেকে পরিণত রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে বিশদ ও বিস্তীর্ণ রূপে আত্মপ্রকাশ করে। বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেছিলেন, 'নিজের বস্তুবদ্ধ জীবনকে ধিক্কার জানানো ও নির্মম আত্মসমালোচনা করার ক্ষমতা বুদ্ধিজীবীকে উচ্চমন্যতা ও ভ্রান্তির জলায় ভরাডুবি থেকে বাঁচায়।" একালের অধিকাংশ মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীই তাঁদের শ্রেণীগত অবস্থানের কঠোর সমালোচনা করেন, কখনো বা একটু মাত্রাতিরিক্তভাবেই করেন। আশাকরি, তাঁরা ইতিমধ্যেই পুরোপুরি বিস্মৃত হননি যে এই আত্ম-বিশ্লেষণের উত্তরাধিকারও তাঁরা অর্জন করেছেন 'নবজাগরণ'-এর সাহিত্যরথীদের কাছ থেকেই। যা ছিল আঠার শতক পর্যন্ত নেহাৎ আঞ্চলিক সেই সাহিত্যকে আন্তর্জাতিকতায় বয়স্ক ও সম্পন্ন ক'রে তোলার মুখ্য ভূমিকাও এঁদেরই। উনিশ শতকের নবজাগরণের সীমাবদ্ধতাকে আবিষ্কার করার জন্য সেই শতকের লেখকদের তাঁদের উত্তরপুরুষদের বিবেচনার জন্য অপেক্ষা করতে হয়নি। অন্ততঃ তাহলে লেখা হত না 'আলালের ঘরের দুলাল', 'হুতোম প্যাঁচার নকশা', 'একেই কি বলে সভ্যতা' বা 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত।' মাঝে মাঝে মনে হয়, কি মিলল না তার হিসেব কষতে গিয়ে কি কি প্যাওয়া গেছে, তা আমরা কত সহজেই অস্বীকার করতে পারি! আমরা কি তাহলে সেই কৃতঘ্ন সময়ের মোহনাতেই দাঁড়িয়ে গেছি যেখানে অর্জিত বিজয়ের স্বীকৃতি জানানোর সাধারণ সৌজন্যকেও 'দুর্বলতা' বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়?

।। আঠার ।।

ঘরের মধ্যে এখন নিশীথের স্তব্ধতা। সকলেই চুপ। কেউ একটি কথা বলছে না। বাণীব্রত, মিলন, কিরণ এমন কি মুখরা নিস্তব্ধ। মনোরমা একটা চুপসানো বেলুনের মত বিছানার উপর প্রায় হেলে পড়েছে।

অনেকক্ষণ পরে মিলন মুখ খুলল। সে দুঃখ করে বলল,—'এই কাঁচা বয়সে হিরু বাড়ী ছেড়ে রাজনীতি করতে চলে গেল! আর কদিন পরেই ওর টেস্ট পরীক্ষা। সেটাও দিল না।'

কিরণ মুখ তুলে বলল,—'তুমি ওর চিঠির ভাষা শুনে বুঝতে পার নি দাদা? হিরুর কনভিকশন বা বিশ্বাস এখন ইস্পাতের মত কঠিন রূপ নিয়েছে। পড়া-শুনো বা পরীক্ষার চিন্তা ওর মাথায় নেই। তার সিদ্ধান্তকে তুমি ভুল বা ঠিক যাই বল হিরু এখন ওই পথেই চলবে।'

মনোরমা কাঁদতে কাঁদতে বলল,—'তোরা দুই ভাই হিরুকে খুঁজে বের কর বাবা। একটিবার আমার সামনে নিয়ে আয় তাকে। আমি আর এক বেলাও কলকাতায় থাকতে চাই না। তোর বাবা নিয়ে যায় ভালো, নইলে হিরুকে সঙ্গে করে আমি একাই চন্দনপুরে চলে যাব।'

মায়ের কথার মিলন কোনো উত্তর দিল না। সে চুপ করে রইল। কিরণ মাথা চুলকে ঈষৎ সন্দেহের সুরে বলল,—'কিন্তু হিরু কি তোমার সঙ্গে চন্দনপুরে যেতে চাইবে মা?'

মনোরমা চোখ মুছে জবাব দিল,—'আমি সামনে দাঁড়ালে হিরু কোনোদিন না বলে নি। কখনও আমার কথার অবাধ্য হয় নি। আজ যদি দুঃখিনী মাকে বিমুখ করে তাহলেও আমি ছাড়ব না কিরণ। যেমন করে পারি ওকে রাজি করাব। যতক্ষণ না আমার সঙ্গে চন্দনপুরে যেতে চাইবে, ততক্ষণ আমি কাঁদব, চোখের জল ফেলব। দেখি সে কতক্ষণ শক্ত থাকতে পারে। তোরা শুধু একটিবার তাকে ফিরিয়ে আন বাবা।'

কিরণ ঠোঁট কামড়ে অল্পক্ষণ চিন্তা করল। নাস্তিকের মত মাথা নেড়ে বলল,—নিজেকে শক্ত কর মা। হিরুকে বোধহয় এখন আর ফিরিয়ে আনা যাবে না।'

—'তার মানে? তোরা দুই ভাই ওকে খুঁজে আনতে পারবি না?'

কিরণ ম্লান হাসল। 'কোথায় খুঁজতে যাব বলতে পার? হিরু তো রাগ করে বাড়ী ছেড়ে চলে যায় নি। যে তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে আবার ঘরে ফিরিয়ে আনব? কিম্বা বাইরে বেরিয়ে সে পথ হারিয়ে ফেলবার ছেলে নয়। বরং যেখানে যাবার, সেখানে হিরু পথ চিনেই গেছে মা।'

—'ছাই চিনেছে।' মনোরমা রাগ করে বলল, 'দুধের ছেলে, ভালো-মন্দ সে কি বোঝে তাই বলতে পারিস? তোদের আর চিন্তা-ভাবনা কিসের বল? তোরা দুই ভাই মানুষ হয়ে গেছিস। মিলু ইনজিনিয়ারিং পাশ করেছে। আজ বাদে কাল আমেরিকায় চলে যাবে। সেখানে আট হাজার টাকা মাইনের চাকরি তার জন্য তৈরী আছে। আর তুই পাশ-করা ডাক্তার। শীগগির তোর ভালো চাকরি হবে। কিম্বা পশার জমবে। ছোট ভাইটা স্কুলের গণ্ডী পেরোয় নি। তাকে নাবালক বলতে পারিস। সে কোথায় মরল কি বাঁচল, তার খোঁজে তোদের আর প্রয়োজন কি?'

মিলন তাড়াতাড়ি বলল,—'এসব কি বলছ মা? হিরুর জন্য আমাদের যথেষ্ট দুর্ভাবনা। এই বয়সে লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচিয়ে সে বাড়ী ছেড়ে চলে গেল। এর চেয়ে দুঃখের আর কি হতে পারে? কেমন করে ওর খোঁজ পাওয়া যায় আমি তাই ভাবছি। তুমি চিন্তা ক'র না মা। আমরা নিশ্চয় হিরুর খোঁজ করব।'

বাণীব্রত এতক্ষণ কোনো কথা বলেন নি। মানুষটা নির্বাক বসে। তাঁর দুঃখ চিন্তা সবই গভীর। বাইরে সীমিত প্রকাশ। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বাণীব্রত মন্থর এবং বিষণ্ণ গলায় বললেন,—'আমি তখন বলি নি মিলু? এবার ঘণ্টা বাজছে। হাতে আর সময় নেই, বিদায়ের বেলা ঘনিয়ে এল। অমিয় বারিক লেনের ফ্ল্যাট বাড়ী ছেড়ে আমরা সব দিকে দিকে চলে যাব। কিন্তু তাই বলে ঘণ্টা বাজিয়ে আমার হিরু যে প্রথম বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে, একথা আমি কোনোদিন ভাবি নি রে।'

মনোরমা কান্না-ভেজা গলায় মিনতি করল,—তোমার ওই অলক্ষুণে কথাগুলো আমার কানে আর শুনিও না। খালি ঘণ্টা বাজছে আর ঘণ্টা বাজছে। এতই যদি ঘণ্টা শুনতে পাও, তাহলে একবার বল না আমার মরণের ঘণ্টা কবে বাজবে? কবে এই জ্বালা-যন্ত্রণা সব জুড়োবে গো?—'

কিরণ মায়ের হাত ধরে বলল,—'চুপ কর মা। স্থির হও। এত চঞ্চল হলে কি চলে? দাদা তো বলেছে, আমরা নিশ্চয় হিরুর খোঁজ করব। তুমি একটু ধৈর্য ধর।'

ছেলের সান্ত্বনায় কাজ হল। মনোরমা কান্না থামিয়ে উঠে দাঁড়াল। পুলিশ চলে যাবার পর বিনিত বুদ্ধি করে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে। কিছুক্ষণ আগে কৌতূহলী প্রতিবেশীদের উঁকিঝুঁকি দিতে দেখেছে মনোরমা। বাড়ীতে পুলিশ ঢুকে খানা-তল্লাসী করে গেল। এমন মুখরোচক খবর এখন এই ফ্ল্যাট বাড়ীর প্রতিটি দুয়ারে প্রচার হয়ে গেছে। কক্ষে কক্ষে তাই নিয়ে সরস আলোচনা। নেহাৎ রাত্তির এগারোটা বাজে। নইলে কৌতূহলী গৃহিণীরা কেউ কেউ মনোরমার কাছে নিশ্চয় আসত। আর হিরুর চিঠির খবর শুনলে তো কথাই নেই: শুধু ফ্ল্যাটের লোকে নয়। পাড়ার মেয়েরাও বাদ থাকবে না। তার দুঃখে সমবেদনা জানাতে সব দল বেঁধে হাজির হবে।

আজ রাত্তির বেশী বলে মনোরমা রেহাই পেল। কিন্তু কাল সকাল হলেই পড়শীদের আনা-গোনা, সমব্যথীদের জ্বালায় তাকে অস্থির হতে হবে। শুকনো সান্ত্বনার বুলি কত শোনা যায়? মনে হয় যেন কাটা ঘায়ের উপর নুনের ছিটে পড়ছে।

রাত আটটা বাজলে বাণীব্রত খেতে বসেন। ডাক্তারের নির্দেশ সে রকম। কিন্তু অত সকালে মানুষটা কি খেতে চায়? কেবল গাইগুঁই, আর একটু রাত করবার অভিপ্রায়। কিন্তু মনোরমা নাছোড়বান্দা, ডাক্তার যখন বলেছে, তখন রাত আটটা বাজলেই খেতে বসতে হবে। বিন্তিটা সারাদিন এ-ঘর, ও-ঘর ছুটে বেড়ায়। তারপর স্কুলে যাওয়া আছে। আবার নাচের পরিশ্রম। রাত একটু বেশী হলেই সে ঘুমিয়ে পড়ে। কিম্বা বসে ঢুলবে। স্বামীর সঙ্গে মেয়েকেও তাই খাইয়ে দেন মনোরমা। অত বড় মেয়ে। একবার ঘুমোলে তাকে তুলে খাওয়ানো এক ঝামেলা। যা ঘুমকাতুরে বিন্তি। রাগ করে মনোরমা বলে,—'আদিখ্যেতা।' আড়ালে অবশ্য হাসে আর নিজের মনে বকে,—'দেখব মা। বিয়ের পরে ছেলেপুলে কোলে আসুক। তখন এই ঘুম কোথায় পালাবে। দরকার হলে সমস্ত রাত্তির ছেলে কোলে নিয়ে বসে থাকতে হবে। অমনি ছেলে-মেয়ে বড় হয় না।'

মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মনোরমা তাই অবাক হল। দেখে মনে হয় বিন্তি যেন একটু ভয় পেয়েছে। এত রাত্তির পর্যন্ত সে বেশ জেগে আছে। দিব্যি বড় চোখ। নিদ্রার ভারে তেমন ছোট হয় নি। অথচ অন্যদিন খাওয়ার পরই বিন্তি বিছানায় শোয়। আর বড়জোর দশ মিনিট পেরোবার আগেই সে নিদ্রামগ্ন, অসাড়। কানের কাছে শাঁখ না বাজালে তার ঘুম ভাঙবে বলে মনোরমা বিশ্বাস করে না।

স্বামীকে লক্ষ্য করে সে বলল,—'তুমি আর জেগে আছ কেন? ওষুধটা খেয়ে শুয়ে পড়গে। বিন্তি এক পাশে দাঁড়িয়েছিল। মনোরমা তাকে দেখে সস্নেহে হাসল। 'তুই দেখছি আজ রাতচরা পাখি হয়েছিস। চোখে এক ফোঁটা ঘুম নেই।' ফের বিষণ্ণ ধরা গলায় জিজ্ঞাসা করল,—'ছোড়দার জন্যে খুব মন কেমন করছে, নারে?'

এতক্ষণ বিন্তি কাঁদে নি। কিন্তু মায়ের কথা শুনে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। মনোরমার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে দিয়ে বলল,—'ছোড়দা আর ফিরে আসবে না মা?'

—'বালাই ষাট। ফিরে আসবে না কেন? নিশ্চয় ফিরে আসবে।' মনোরমা যেন নিজের অবুঝ মনকে সান্ত্বনা দিল। ধীরে ধীরে বলল,—'মা-বাবা, ভাই-বোন, নিজের বাড়ী-ঘর ছেড়ে বাইরে থাকতে ক'দিন ভাল লাগে? কিন্তু তুই আর রাত করিস নে মা। যা, এবার শুয়ে পড়। তোর দাদাদের খেতে দিয়ে আমি এখুনি আসছি।'

মিলন প্রস্তাব করল,—'আজ আমরা একসঙ্গে খাব মা। তুমি, আমি আর কিরণ তিনজনে বসব।'

—'আমাকে আজ আর খেতে বলিস না মিলু।' মনোরমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ফের চোখের জল মুছে বলল,—'সেই শত্তুরের জন্য আমি আজও হাঁড়িতে চাল নিয়েছি বাবা। এই রাত্তিরে সে কোথায় পড়ে রইল, কি খেল কিছুই জানতে পারলাম না। আর আমি পঞ্চব্যঞ্জন দিয়ে সাজানো থালার সামনে বসে দিব্যি [illegible] তুলব, তা পারব না। [illegible] পারব না।'

কিরণ যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চাইল,—'মিছিমিছি শরীরকে কষ্ট দিচ্ছ মা। হিরু দুদিনের জন্য বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে বেড়াতে যেত, তাহলে কি তুমি উপোস করে থাকতে? আর দাদা তো বলেছে, আমরা নিশ্চয় হিরুর খোঁজ করব।'

—'দ্যাখ, খুঁজে যদি পাস তাকে।' মনোরমা ফের একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ম্লান হেসে বলল,—'তোর ভয় নেই কিরণ। শরীর যখন আছে, তখন আহার নিদ্রা দুই প্রয়োজন হবে। আর দুঃখ-শোক কি চিরকাল সমান থাকে? দিনে দিনে কমবে বাবা। আজ খেলাম না তো কি হয়েছে? দেখবি কাল দুপুরে আবার ভাতের থালার সামনে বসব। তার পরের দিন হাসব, বেড়াব। হিরুর কথা ভেবে কি নিত্যি উপোসী থাকতে পারব?'

রান্নাঘরে শেকল তুলে দিয়ে মনোরমা নিজের ঘরে ঢুকল। রাত্তির প্রায় বারোটা হবে। খাটের উপর বাণীব্রত শুয়ে। মানুষটা ঘুমোচ্ছে কিনা কে জানে। নীচে মেঝের উপর বিছানা পেতে সে আর বিন্তি শোয়। মেয়ের দিকে তাকিয়ে মনোরমা নিশ্চিন্ত হল। বিন্তি এখন ঘুমে কাদা। তবু ভাল মেয়েটা ঘুমিয়েছে। নইলে বিছানায় শুয়ে তাকে পাঁচ রকম প্রশ্ন করত। সব কথার জবাব দিতে মনোরমার হয়তো ভালো লাগত না।

ঘরের জানালা খোলা। বাপ আর মেয়ে কেউ বন্ধ করে নি। একটু রাত বাড়লেই ঠাণ্ডা পড়বে। ভোরের দিকে বেশ শীত-শীত করে। ঋতু পরিবর্তনের সময়,—সাবধানে না থাকলেই সব রোগে ভুগবে। শোবার আগে মনোরমা তাই জানালা বন্ধ করে রাখে। শুধু পূব দিকের একটা পাল্লা খোলা থাকে। কিন্তু তাই যথেষ্ট। শেষ রাত্তিরে ঠাণ্ডা বাতাস সেই ফাঁকটুকু দিয়ে হু-হু করে ঢোকে।

বিছানায় শুয়ে মনোরমা এপাশ-ওপাশ করল। কই, তার চোখ ভারী হয়ে আসছে না তো? আজ রাত্তিরে কি ঘুম হবে না তার? মনোরমা নানা রকম সব কথা মনে করবার চেষ্টা করল। ছেলেবেলার বন্ধুদের মুখ......খুঁটিনাটি কত রকম ঘটনা। তার বাবা বলতেন দুঃখ পেলে পুরোন দিনের কথা ভাববি। যে সমস্ত কথা মনের মাটির তলায় বহুদিন ঢাকা পড়ে আছে। দেখবি, তাতে অন্তরের ভার লাঘব হয়। কিন্তু মনোরমা কত চেষ্টা করছে। কবরের মাটি খোঁড়ার মত মনের ভিতরটা কেবল খুঁচিয়ে চলেছে। তবু তার একটা ঘটনাও ভালো করে মনে পড়ল না। মনোরমা বার বার চোখ খুলে তাকাচ্ছে। ভাগিস ঘরে আলো নেই...প্রায় অন্ধকার। নইলে এই রাত দুপুরে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকতে তার কি রকম অস্বস্তি লাগত। অথচ চোখ বন্ধ করলেই সেই শত্তুরের মুখ।' তার [illegible] স্মৃতি। ছোটখাট কত ঘটনা। ঠিক যেন মিছিল করে মনের পর্দায় ধীরে ধীরে ভেসে উঠছে। নিজেকে আর কিছুতেই সামলাতে পারল না মনোরমা। তার চোখের কোল বেয়ে অবাধ্য অশ্রুধারা ফোঁটা ফোঁটা গড়িয়ে পড়ল। [illegible] বলে [illegible],—'হিরুর কথা তুমি বেশী [illegible] মা। তাহলেই তোমার [illegible] একটু [illegible] হবে।' তার ছেলেরা [illegible] হয়েছে [illegible]। কিন্তু মায়ের মনের [illegible] কতটুকু [illegible]? কেমন করে হিরুর [illegible] মনোরমা? শুধু অন্য [illegible] ভাবতে হবে? [illegible] হিরুর স্মৃতি। ঘরেতে ফিরতে গেলে সব চোখে পড়ে। আরো কত সূক্ষ্ম স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে। কাল সকালে কেৎলিতে মাপ করে জল নেবার মুহূর্তে সেই হতভাগা ছেলেটার কথা তার মনে পড়বে না? হাঁড়িতে চাল ফেলবার সময় হিরুকে বাদ দিতে হবে। তারপরও [illegible] নিজের জন্য চাল মাপতে পারবে মনোরমা? হায় ঈশ্বর। আর কিছুদিন আগে কেন তার স্বামী অবসর নিলেন না? এক মাস পূর্বেই কেন সে চন্দনপুরে চলে যায়নি?

* * *

বিকেল প্রায় মরতে বসেছে। ঘড়িতে পাঁচটা বাজে। অবসন্ন বেলা যায় যায়। মেট্রোর সামনে অপরেশ দাঁড়িয়েছিল। পরনে একটা হাল্কা নীল রঙের প্যান্ট আর কোট। গায়ে সাদা জামা। গলায় নিপুণভাবে বাঁধা সুদৃশ্য টাই। মুখে জ্বলন্ত সিগারেট। সে বারবার এদিক ওদিক তাকিয়ে কাকে যেন খুঁজছে। মাঝে মাঝে অন্যমনস্কভাবে আঙুলের টোকা দিয়ে সিগারেটের ছাই ঝাড়ছিল। সুন্দর অভিজাত চেহারা। মেয়ে-পুরুষ অনেকে যেতে যেতে তার দিকে দু-একবার চোখ তুলে তাকাল।

সামনে ছোটখাটো একটা ভিড়ের মধ্যে মিলনকে দেখতে পেয়ে অপরেশ ব্যস্ত হল। হাত নেড়ে ইশারা করে তাকে কাছে ডেকে বলল,—'কিরে, দেরি কেন? রেজিগনেশন লেটার তো শুধু টাইপ করতে বাকি। এখনও কাজে এত আঠা কিসের?'

মিলন একটু লজ্জিতভাবে বলল,—'খুব দেরি হয়ে গেল, তাই না রে?'

—'ভীষণ।' ঘড়ির দিকে এক নজর তাকিয়ে অপরেশ জবাব দিল, 'ঝাড়া আধ ঘণ্টা তোমার জন্যে আমি অপেক্ষা করে আছি। টেলিফোনে সাড়ে চারটে টাইম দিয়েছ অ্যান্ড ইউ আর লেট।' তারপর বিজ্ঞজনের মত মৃদু হেসে সে আবার বলল,—'বাট নি কেয়ারফুল। যে দেশে যাচ্ছিস, সেখানকার লোকেরা সব ব্যাপারেই দারুণ পাংচুয়াল।'

—'ভেরি সরি', মিলন কৈফিয়ৎ দেবার ঢঙে কথা কইল, 'কি করব বল? ঠিক সাড়ে চারটের সময় আমাদের একজন অফিসার ডেকে পাঠালেন। মানে কোনো কাজের জন্য নয়। এমনি দুটো কথা বলবার ইচ্ছে। আমি আমেরিকায় যাচ্ছি খবরটা শুনেছেন। তাই নিয়ে আলোচনা। চাকরির [illegible] আমি

কোথায় পেলাম? কার চেষ্টায় এমন লোভনীয় অফার আমার ভাগ্যে জুটল। তারপর কবে ফ্লাই করছি। সেখানে মাসে আমেরিকার লাইফ কেমন হবে? এরকম আরো অনেক প্রশ্ন'—

অপরেশ ভুরু কুঁচকে শুধোল,—'তোর বসকে কি জবাব দিলি?'

—'কি জবাব দেব আবার? তোমার নাম করলাম। বললাম আমার একজন স্কুলফ্রেন্ড। হি ইজ নাউ এ বিগ বিজনেস এক্সিকিউটিভ। চেষ্টা-চরিত্র করে এই চাকরিটা সে আমাকে জোগাড় করে দিল।'

—'দূর!' অপরেশ কাঁধ ঝাঁকিয়ে একটা বিচিত্র ভঙ্গি করল। বলল,—'আমি হলে তোর বসকে অন্যরকম উত্তর দিতাম।'

—'তাই নাকি? কি উত্তর বল না—'

—'বলতাম আমার একজন ওল্ড স্কুলফ্রেন্ডের সঙ্গে হঠাৎ একদিন পথে দেখা। অনেকদিন সে ফরেনে ছিল। এখন কলকাতার একটা ফার্মের বিজনেস এক্সিকিউটিভ। ইনজিনিয়ারিং পাশ করে কেরানীগিরি করছি শুনে হেসে খুন। জিভ কেটে বলল,—মাই গড্। এদেশে ইনজিনিয়াররা পাশ করে কেরানী হয় নাকি? এরপর কোনদিন শুনব কলেজ থেকে বেরিয়ে ডাক্তাররা সব স্কুলের মাস্টার। আর ছাত্ররা এম-এ ডিগ্রী নিয়ে পিওনের চাকরির জন্য লাইন দিয়েছে। আমার দুরবস্থা দেখে সে এই অফারটা জোগাড় করে দিল স্যর।' কথা শেষ হতেই অপরেশ হা-হা করে হাসল। ফের ঈষৎ চিন্তিত এবং গম্ভীর মুখে বলল,—'তবে একটা কথা বোধহয় ভুল বললাম। তোর এই চাকরিটা কিন্তু আমি জোগাড় করিনি। সত্যি কথা বলতে এর জন্য আমার কোনো কৃতিত্ব নেই। আসলে সমস্তটাই এলসীবৌদির চেষ্টা জানবি। সেজন্য বসের কাছে তোর এলসীবৌদির নাম করা উচিত ছিল।'

—'দূর! আমি জানি চাকরিটা তোর চেষ্টাতেই হয়েছে।' মিলন পরিষ্কার জবাব দিল। ফের মুচকি হেসে বলল,—'তাছাড়া তোর সেই বিদেশিনী বৌদিকে তো আমি চিনি না বা তাকে চোখে দেখিনি।'

—'এবার দেখতে পাবি।' অপরেশ ভুরু নাচিয়ে রহস্য করল। বলল,—'আজকের ডাকে আর একখানা চিঠি এসেছে। তুই কবে যাচ্ছিস, অবিলম্বে জানাতে হবে। এয়ারপোর্টে তোকে রিসিভ করার জন্য এলসীবৌদি নিজেই আসবে লিখেছে।'

মেট্রোর সামনে ক্রমেই ভিড় বাড়ছে। ম্যাটিনি শো ভাঙতে দেরি নেই। আবার নতুন শো আরম্ভ হবার সময় এগিয়ে আসছে। বিকেল হতেই চৌরঙ্গীতে কি জনসমাগম। পথের উপর দোকানপাট,—যেন মেলা বসেছে। জোড়ায় জোড়ায় মেয়ে-পুরুষ, বোঝাই ট্রাম-বাস। খালি ট্যাক্সি কদাচিৎ চোখে পড়ে। অফিস ফেরত চার-পাঁচজন লোক বেশ লম্বা লম্বা পা ফেলে সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউয়ের দিকে হেঁটে গেল।

মিলন বলল,—'আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে? সেই দরজীর দোকান তো কাছেই। চল যাই—।'

—'সাটেনলি।' অপরেশ তাড়াতাড়ি জবাব দিল। 'আরো আগে গেলেই ভালো হত। সন্ধ্যের মুখে ওসমানের দোকানে আবার বেশ ভিড় জমে যায়।'

চৌরঙ্গী ছেড়ে ওরা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোডে ঢুকল। পাশেই ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস। সাজানো-গোছানো লাইব্রেরী। প্রায় নিঃশব্দ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে নানা বয়সী মেয়ে-পুরুষ, বই-টই কিম্বা পত্রিকার পাতায় চোখ বুলোচ্ছে। পথের দু-পাশে ফুটপাতের উপর স্বল্প দূরত্বে ব্যাঙের ছাতার মত বিপণি। দম দেওয়া গাড়ি, দামী খেলনা, সুগন্ধী সেন্ট-সাবান, জাপানী ছাতা, ছুরি-কাঁচি, ক্যামেরা-ট্রানজিস্টর আরো কত কি। কয়েক জন খুড়ে দালাল গোছের লোক খানিকটা ছিটকাপড় কিম্বা ফাউন্টেন পেন হাতে নিয়ে খরিদ্দারের কাছে ফরেন গুডস্ বলে চালাবার ফন্দী-ফিকির খুঁজেছে।

অপরেশ বলল,—'তোর প্লেনের টিকিট বুক করে ফেললাম। শনিবার সন্ধ্যে সাতটায় ফ্লাইট।'

—'শনিবার?'

—'ইয়েস। নেকসট সাটারডে।' একটু হিসেব করে অপরেশ আবার বলল,—'এখনও প্রায় বারো দিন আছে। এর মধ্যে ঝুটঝামেলাগুলো মিটে যাবে মনে হয়। অবশ্য তোর কিছু চিন্তা করবার নেই। হাতের মুঠোয় রঙের গোলাম। আই মিন জব ভাউচার রয়েছে। সুতরাং স্টেটসে যাওয়া কে আটকাবে?'

মিলন ধীরে ধীরে বলল,—'জানিস, চাকরি পাওয়ার আগে বেশ একটা উত্তেজনা ছিল। রোজ ভাবতাম কবে তোর বৌদির চিঠি আসবে। এক একদিন চোখে ঘুম নামত না। আর এখন সব কিছু সেটলড্ হবার পর কেমন ঝিমিয়ে পড়ছি। উৎসাহ দূরে থাক, যাওয়ার কথা ভাবলেই মনটা ভার-ভার, অবসন্ন লাগছে।'

অপরেশ হাসল। বলল,—'ও রকম হয়। চাকরি পাওয়ার পর কি উত্তেজনা থাকে? আর তুই নিশ্চয় জানিস,

The real joy lies in chase and not in possession.

আসলে অনুসরণেই আনন্দ। পেয়ে গেলে তো আর কিছু করবার রইল না।'

—'কি জানি।' মিলন স্বগতোক্তির মত কথা কইল। পরে বলল,—'অবশ্য সবটা বোধ-হয় তাই নয়। মন ঝিমিয়ে পড়ার পিছনে যথেষ্ট কারণও আছে।'

—'কারণ?'

—'হ্যাঁ। কিছুদিন ধরেই ব্যাপারটা চলছিল। মানে বাড়িতে একটা অস্বাস্তিকর ভাব। আমরা সকলেই বেশ উদ্বিগ্ন ছিলাম। তারপর কাল রাত্তিরে হঠাৎ এমন একটা কান্ড ঘটল, যার জন্য কেউ তৈরি ছিলাম না।'

—'তার মানে?' অপরেশকে ঈষৎ চিন্তিত দেখাল।

মিলন ধীরে ধীরে বলল,—'কাল অনেক রাত্তিরে আমাদের ফ্ল্যাটে পুলিশ এসেছিল।'

—'পুলিশ?'

—'হ্যাঁ। আমার ছোটভাই হিরু মানে হিরণের খোঁজে। পুলিশের দারোগা বলছিল, তার বিরুদ্ধে নাকি অভিযোগ রয়েছে।'

—'কিসের অভিযোগ?' অপরেশ সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল। 'তোর ভাই রাজনীতি করে নাকি?'

—'ঠিক বলতে পারি না। তবে রাজনীতির ব্যাপারে তার বোধহয় একটা নিজস্ব ধারণা আছে। আমি আমেরিকায় যাচ্ছি শুনে সে একটুও খুশি নয়। ঠাট্টা করে বলল, ধনতন্ত্রের দেশের একটা নাট-বল্টু হতে চলেছি।'

—'আই সী।' অপরেশ রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট কেসটা পকেট থেকে বের করল। মিলনের দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে প্রথমে নিজেরটা ধরাল। তারপর কথার সিগারেটের মুখে লাইটারের আগুন ঠেকিয়ে প্রায় নিশ্চিতভাবে মন্তব্য করল,—'তোর ভাই কম্যুনিস্ট, তাই না?' একটু থেমে সে স্পষ্ট শুধোল,—'পুলিশ তাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে?'

—'অ্যারেস্ট করতেই এসেছিল মনে হয়।' মিলন ম্লান হাসল। 'তবে পায়নি! হিরু তার আগেই পালিয়েছে।'

অপরেশ কিছু বলার আগেই মিলন ব্যাপারটা প্রাঞ্জল করল। দুঃখ এবং ঈষৎ রাগের সঙ্গে সে বলল,—'হতভাগা ছেলে। যাবার আগে শুধু একটা চিঠি লিখে গেছে। আমার মত ডলারের দেশে পা বাড়ায়নি। যেখানে যাচ্ছে, সেখানে অট্টালিকা দূরে থাক একটা ইট-কাঠের বাড়িও নেই। শুধু অন্নহীন, বস্ত্রহীন মানুষ। একদিন সেই গ্রাম থেকেই তারা দলে দলে আবার শহরে এসে ঢুকবে।'

অপরেশ সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করল। নাক-মুখ দিয়ে প্রচুর ধূম উদ্গীরণ করে সে বলল,—'তোর ভাই তাহলে শুধু কম্যুনিস্ট নয়। হি ইজ এ রেভলিউশনারি।'

মিলন মৃদু হেসে জবাব দিল,—'আমার মেজভাই এসব নিয়ে মাথা ঘামায়। তোর মত কথা-টথা বলে। কিন্তু হিরুর সম্বন্ধে আমি এসব চিন্তা করিনি। এই তো দু-তিন বছর আগেও তাকে কত ছোট দেখেছি। এই বইটা কিনে দাও। ওই জিনিসটা এনে দিও। এমনি সব নানা আবদার করত। সেই হিরু কম্যুনিস্ট কিম্বা রেভলিউশনারি এই ধরনের কোনো চিন্তা আমার মাথায় আসেনি।'

সিগারেটে একটা ছোট টান দিয়ে সে আবার বলল,—'আমি শুধু ভাবছি মায়ের কথা, আমার বাবার কথা। হিরু চলে যাবার পর বাড়িতে যেন মেঘলা দিনের অন্ধকার নেমেছে। কেমন একটা স্যাঁতসেঁতে ভিজে ভাব। সকলেই বিষণ্ণ। মা তো অনবরত কাঁদছে। বাবা শুকনো, গম্ভীর। আর সেজন্যই বোধহয় আমার মনটা অবসন্ন। এদের এই অবস্থায় ফেলে আমেরিকায় যেতে পা উঠছে না।'

(ক্রমশঃ)

চিঠিপত্র

অংগনা : হাওড়া স্টেশনে লেডিজ স্পেশ্যাল

সেদিন একটা ঘটনা ঘটলো হাওড়া স্টেশনে। বেলা তখন আনুমানিক সাড়ে দশটা। পিক আওয়ার্স। সবাই অফিসে যাবার জন্য ব্যস্ত। পড়ি কি মরি করে বাস ধরতে ছুটছেন। যাঁরা ভাগ্যবান তাঁরা বাসেও উঠেছেন। কেউ কেউ বসে। তবে অধিকাংশ দাঁড়িয়ে। বাস স্টার্ট নিল। কিন্তু বাঁক ঘুরতেই দাঁড়িয়ে গেল। বাসের মধ্যে সবাই উসখুশ করতে শুরু করলেন। ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন কেউ কেউ। একজন মন্তব্য করলেন, আজ আর লেট আটকানো গেল না। দু-একজন উৎসাহী বাস থেকে নেমে পড়লেন। আসল ঘটনাটা সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করার জন্য। একে অন্যকে জিগ্যেস করলেন, ব্যাপারটা কি?

ক্রমে ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো। একদল মহিলা অফিস যাত্রী বাসের পথ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের দাবি, অফিস আওয়ার্সে লেডিজ স্পেশ্যাল বাসের ব্যবস্থা না করলে তাঁরা পথ ছাড়বেন না। সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। একজন মন্তব্য করলেন, অফিস আওয়ার্স বাদ দিয়ে অন্যসময়ে আর অন্য উপায়ে তাঁরা তাঁদের আরজি জানালেই পারতেন। এভাবে সকলের অসুবিধা ঘটানোর কোন মানে হয়? আবার আর একজন বললেন, মানে হবে না কেন। লেডিজ স্পেশাল ট্রাম আছে, অন্য জায়গায় বাসের ব্যবস্থা আছে আর হাওড়া স্টেশনেই বা থাকবে না কেন? ছেলেরাই বাসে উঠতে পারে না মেয়েরা অতো ধস্তাধস্তি করে বাসে ওঠে কি করে?

এই ভদ্রলোকের কথায় দু একজন নানা-রকম সরস মন্তব্য ছুঁড়ে দিলেন। তবে অধিকাংশ যাত্রী আর কোন কথা না বলে চুপ করে রইলেন। কিছুক্ষণ পরই মেয়েদের অবরোধ প্রত্যাহৃত হলো। স্টেট বাস কর্তৃ-পক্ষ সেদিনের মতো লেডিজ স্পেশাল-এর বন্দোবস্ত করলেন।

কিন্তু তারপর অবস্থা আবার যথাপূর্ব তথা পরং। লেডিজ স্পেশাল আর হাওড়া স্টেশন থেকে ছাড়ছে না। অথচ এদিকে সুপ্রচুর বাসেরও কোন বন্দোবস্ত নেই। সেই হুড়োহুড়ি আর ধস্তাধস্তির দৈনন্দিন চিত্র।

তাই কর্তৃপক্ষের কাছে সবিনয় নিবেদন তাঁরা অফিস আওয়ার্সে হাওড়া স্টেশন থেকে ডালহৌসি হয়ে ভবানীভবন (আলিপুর) পর্যন্ত অন্তত দুটি লেডিজ স্পেশালের বন্দোবস্ত করুন।

অনিমা নিয়োগী
কদমতলা, হাওড়া।

কলকাতা '৭১ প্রসঙ্গে

কলকাতা-'৭১ প্রসঙ্গে সাধনা মুখো-পাধ্যায়ের চিঠিখানা (১লা অগ্রহায়ণ) পড়লাম। উক্ত ছবিখানির সেই স্মরণীয় মুহূর্তটি যে মুহূর্তে তা পশ্চিমবাংলার দর্শকসাধারণের উদ্দেশে প্রথম নিবেদিত হোল, তখনকার মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান দর্শক-দের মধ্যে নিজেকে একজন হিসেবে অনুভব করে গর্ববোধ করেছিলাম। তারপর থেকেই, কেমন একরকম দায়িত্ববোধ অনুভব কর-ছিলাম নিজের মধ্যে, আমার বোধহয় কিছু বলা আবশ্যক। পরিচিত বন্ধুগোষ্ঠীর মধ্যে আলোচনা করেও আমি তৃপ্তিলাভ করছিলাম না। পশ্চিমবাংলার অন্তপ্রান্তের মননশীল মানুষদের উদ্দেশে আমার বলতে ইচ্ছে করছিল, বাঙালী হিসেবে আমি গর্ববোধ করি; আমাদের সংস্কৃতি আমায় স্মরণ করিয়ে দেয়, আমাদের বিবেকানন্দ, রবীন্দ্র-নাথ, সূর্য সেন, নেতাজীর মত অসংখ্য মহৎ ব্যক্তিত্বের। কিন্তু অসংখ্য ইচ্ছের মত, এ ইচ্ছেটাও এতদিন মনের ভেতরেই কোনো এক দুর্গম প্রকোষ্ঠে পোষণই করছিলাম। সাধনা মুখোপাধ্যায়ের চিঠিখানা নজরে আসবার পর আর চুপ করে থাকা সম্ভব হোল না। তাঁর প্রথম অভিযোগ, নামে কলকাতা '৭১ হলেও ছবিখানি মোটেই তৎকালীন অবিশ্বাস, অস্থিরতা, বীভৎসতা অবলম্বন করে গড়ে ওঠেনি—গড়ে ওঠেনি এর উৎপত্তি, ব্যুৎপত্তি নিষ্পত্তি ঘটিত শিল্পসম্মত ব্যাখ্যান।—পরিবর্তে আমাদের অগ্রসরমান দৃষ্টিক্ষেপকে ঘুরিয়ে, টেনে নিয়ে আছড়ে ফেলতে হয়েছে, ত্রিশ দশকের কর্দমাক্ত কোনো এক অন্ধ-কারাচ্ছন্ন জীর্ণ কুটিরের অভ্যন্তরে, যেখানে গুটিকয় নিতান্তই সাধারণ মানুষ টিমটিম্ কোরছেন। ব্যাপারটা খুবই অপ্রাসঙ্গিক এবং হতাশাব্যঞ্জক—লেখিকার মতে। কিন্তু, সত্যি কি তাই? আজকের '৭১ কি কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যাপার? যুগযুগসঞ্চিত বেদনা-অভিমান - অভিযোগের ফলশ্রুতি হিসেবে আজকের 'কলকাতা ৭১'-এর এই অসহ-নীয়তা। এর মূল রয়েছে অনেক গভীরে। সুসংবদ্ধ মনন নিয়ে অনুভব করলে আমরা প্রত্যক্ষ করব, মূলত সবই অভিন্ন। দারিদ্র্যের অসহায়তা, অকম্পনীয় আত্মবিপণন—'তার পরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি।'

সবশেষে বলব, এই প্রসঙ্গে ছবিখানির সঙ্গে সংযুক্ত কুশীলবদের স্মরণ না কোরলে, ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করা হবে। তথাকথিত গ্ল্যামারসর্বস্ব ফিল্মী দুনিয়ার আসন্ন মোহ-মুক্তির ও'রাই অগ্রদূত।

কাজলকান্তি চক্রবর্তী
ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা।

সন্ধ্যের এসপ্ল্যানেড

গত ৫ ডিসেম্বর, আমি একজন বিদেশী বন্ধুর সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম এসপ্ল্যানেডের ট্রাম গুমটির কাছে। তখন সান্ধ্য সাড়ে ছটা। এমন সময় আমাদের পাশে এসে নীরবে দাঁড়ালেন দুই মহিলা। একজন মধ্য বয়সিনী, অন্যজন যুবতী। তাঁদের বেশভূষণ দেখেই মনটা কেমন করে উঠল। ফিসফিসিয়ে মধ্য বয়সিনী যা বলতে চাইলেন তাতে হকচকিয়ে গেলাম। এবং কালক্ষেপ না করেই সরে এলাম অন্যত্র। দূরবর্তী ট্রাফিক পুলিশকে এ ঘটনা বলতে গিয়েও বলা হোল না। কোন কথায় আবার কি ঝামেলা হয়—তারই ভয়ে। যাই হোক পরের দিন কয়েকজন বন্ধুকে একথা বললাম। তাঁরা মোটেই অবাক হলেন না আমার কথায়। বললেন রাতের এসপ্ল্যানেড-চৌরঙ্গী-ডালহৌসি অঞ্চলে এটা নাকি আকছার ঘটছে। এবং ইদানিং ভয়ঙ্কর বেড়ে গেছে। সন্ধ্যে হতে না হতেই দেহপসারিনীরা কলকাতা প্রাণকেন্দ্রে বেশ জাঁকিয়ে তোলে তাদের ব্যবসা। আশপাশের ছোটখাটো হোটেল-রেস্তোরাঁ বা ময়দানের অ[illegible]কের কাছ থেকেও নাকি তারা এ ব্যাপারে সহযোগিতা পায়।

প্রশ্ন হচ্ছে—আমরা এখন চলেছি কোন অন্ধকারের পথে। অশ্লীল সাহিত্য এবং চলচ্চিত্র প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কি সম্পূর্ণ মানসিক মৃত্যু ঘটবে? এ পাপ ব্যবসা বন্ধ করে জনজীবনকে সুস্থ করার দায়িত্ব নিতে হবে আমাদের জনসাধারণকেই।

কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
কলকাতা-১৯।

অষ্টম তপসিলী প্রসঙ্গ

নেপালী ভাষাকে অষ্টম তপশিলীভুক্ত করবার জন্য বেশ কিছুদিন আন্দোলন চলে আসছে। নেপালীভাষীদের এই দাবী একে-বারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু আমার মনে হয়, যদি নেপালীকে অষ্টম তপশিলী-ভুক্ত করা হয়, তাহলে কিছুদিন পর মণিপুরীরাও অনুরূপ দাবী তুলবেন। এভাবে বিকাশমান প্রতিটি ভাষাগোষ্ঠীই একের পর এক দাবী তুলতে থাকলে ভারতে ভাষা সমস্যার কখনও সমাধান হবে না।

তাই আমার প্রস্তাব, সংবিধান থেকে অষ্টম তপশিলীটিই বাতিল করা হোক এবং ভারতের সমস্ত ভাষাকেই জাতীয় ভাষা বলে স্বীকার করে নেওয়া হোক। তাহলে অতি সহজেই এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। তখন দেখা যাবে, অনেক ভাষাই হয়তো প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আপনা থেকেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে, আবার কিছু কিছু ভাষা আপন আপন শক্তিতে নির্ভর করে এগিয়ে যাবে। তখন আর অকারণ কোনও বিরোধ থাকবে না। তাছাড়া অষ্টম তপশিলীতে থাকার ফলে কোনও ভাষার আলাদা সুযোগ-সুবিধা নেই। বরং তপশিলীভুক্ত নন এমন ভাষাভাষী মানুষদের মনে নিজেদের ভাষার যোগ্য স্থান দেওয়া হচ্ছে না, ইত্যাদি অভিযোগগুলি থাকবে না। বহুভাষিক ও বহুজাতিক ভারতবর্ষে অষ্টম তপশিলীর প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, আজ তা ভেবে দেখা দরকার।

গোপাল গোস্বামী
[illegible]।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

মানুষ, পাখী আর মেয়ে

বিখ্যাত গল্প ও উপন্যাস লেখক পল গ্যালিকো-র বর্তমান বয়স প্রায় প'চাত্তর বছর। তাঁর 'দি স্নো গুজ', 'স্মল মিরাকল', 'দি মাদার অব প্রেজেন্ট', 'দি স্মল মিরাকল', 'থমাসিনা' ইত্যাদি অনেকখানি গ্রন্থ আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও মর্যাদার অধিকারী হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের কালে গ্যালিকো যুক্তরাষ্ট্রীয় নৌ-বিভাগে কাজ করেছেন। যুদ্ধান্তে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি লেখাপড়া করেন। ১৯২২ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শ্রেণীর সংবাদ-পত্র ও সাময়িকপত্রে সমালোচনা এবং সম্পাদনার কাজও করেছেন। গ্যালিকো-র জন্ম আমেরিকায়, তাঁর পিতা ইতালীয়ান, জননী অস্ট্রিয়ার মেয়ে আর তিনি স্বয়ং একটি হাঙ্গেরীয় মহিলার পাণি পীড়ন করেছেন আর বর্তমানে আছেন স্থায়ীভাবে ইংলণ্ডে। ১৯৩৬-এ ইংলণ্ডের একটি ধীবর-পল্লীতে গিয়ে যখন বাসা বাঁধলেন তখন থেকেই শুরু করলেন গল্প-উপন্যাস রচনা। পল গ্যালিকো এক অনাবিষ্কৃত জগতের কাহিনী রচনায় মন দিলেন। তার ফলে তাঁর সিদ্ধি লাভও ঘটেছে অতি দ্রুত। 'দি স্নো গুজ' বা 'তুষার হংসী' নামক তাঁর ক্ষুদ্রপদী উপন্যাসের সমালোচনা প্রসংগে স্যার উইলিয়াম বীচ টমাস 'স্পেকটেটর' পত্রিকায় লিখেছিলেন—

> 'It is indeed a master-piece, I should put it down as almost the best story about a bird in literature."

'তুষারহংসী' যে পক্ষী বৃত্তান্তের জন্যই অতুলনীয় তা নয়, এর মধ্যে এক নিঃসংগ পংগু বিকলাঙ্গ তরুণের জীবনের একটি মর্মান্তিক কাহিনীও জড়ানো রয়েছে। পল গ্যালিকোর এই বহুল আলোচিত উপন্যাসটি সম্প্রতি বাংলায় অনুবাদ করেছেন শ্রীযুক্ত নরেশ দেব। প্রসংগত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ইতিপূর্বে বাংলা ভাষায় পল গ্যালিকোর আর কোনো গ্রন্থ অনুদিত হয়নি।

এই গ্রন্থটি অনুবাদের জন্য নির্বাচন করায় অনুবাদকের দরদী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণত চটুল এবং বাণিজ্যিক সাফল্যের সম্ভাবনাপূর্ণ গ্রন্থাদিই ইদানীং অনুদিত হয়ে থাকে, সেই অবস্থায় এমন একটি কাব্যধর্মী মহাসাহিত্যের অনুবাদ করে অনুবাদক সুরুচি ও সৎ সাহসের পরিচয় দান করেছেন। এর জন্য তিনি অভিনন্দনযোগ্য।

স্বয়ং পল গ্যালিকো তাঁর এই গ্রন্থটি সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন মনে করি তা এখানে উদ্ধৃত করলে আমাদের পাঠক-সমাজ এই গ্রন্থের মর্মবাণী কিছু পরিমাণে উপলব্ধি করবেন। একজন মহৎ লেখকের ভাবনার পরিচয় আছে এই বক্তব্যে। গ্যালিকো বলছেনঃ স্নো গুজ কাহিনীটির পিছনের কাহিনী অনেক কাল আগের ঘটনা। প্রায় সিকি শতাব্দীর ব্যাপার। বিস্তারিত খুঁটিনাটি বিষয়ে আমার স্মৃতিকে আমি একরকম অবিশ্বাস করি—তবে এর উৎপত্তি বিষয়ে আমার মনে এতটুকু সংশয় নেই। আমি এমনই স্পষ্ট-ভাবে সমস্ত ব্যাপারটি স্মরণ করি যেন তা গতকালের ব্যাপার। ডানকার্কে ব্রিটিশ-দের সরে আসার (ইভ্যাকুয়েশন) ব্যাপারটি আমার অন্তরে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। মনে হয়েছিল এ নিয়ে আনন্দ করি। অদম্য মানবিক প্রাণশক্তির দ্বারা চালিত হয়ে যারা ব্রিটেন থেকে সর্বপ্রকার ছোট-খাটো নৌকা নিয়ে তাদের স্বজনদের সমুদ্র উপকূল থেকে উদ্ধার করেছিল আমার অন্তরে সেই মানবিক সাহস যেন একটি বাদ্যযন্ত্রের সুরের মত গুঞ্জরিত হয়েছিল। মনে মনে ভাবলাম আমি যদি একজন সুরকার হতাম তাহলে এই আশ্চর্য মেলডিকে সুরারোপ করে এক বিচিত্র 'সিমফনি' রচনা করতাম। অভাবে যদি কবি হতাম—, কিন্তু উভয়বিধ গুণের একটিরও অধিকারী না হওয়ায় আমার হাতে যে সব যন্ত্রপাতি ছিল, আমার পেশা-গত হাতিয়ার, তাই দিয়ে আমি একটি গল্প লিখলাম।'

এই পটভূমিকাটি এই ক্ষুদ্রায়তন গ্রন্থ-টির বিচারে স্মরণ রাখা প্রয়োজন। স্রষ্টা যেখানে ঈশ্বরের সমতুল সেইখানে আপন জগতে বসে তিনি এক বিচিত্র সংসার সৃজনে মগ্ন। মগ্ন-চৈতন্যের এই অভিব্যক্তির ফলেই কালে কালে যুগে যুগে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

এরপর গ্যালিকো বলেছেনঃ

'কাহিনী কোথা থেকে আসে? অনেক সময় ভাবাবেগই মুখ্য উৎস। কিন্তু তারপর সেই অনুভূতিকে উপযুক্ত সাজ-পোশাক পরিয়ে জনসমাজে হাজির করতে হবে। সানফ্রানসিসকোয় আমাদের ভাড়াবাড়ির পাঠাগারে কেপলিঙের একসেট গ্রন্থাবলী ছিল। আমি 'সোলজার্স থ্রী' নামক গল্পটি পড়ছিলাম। মনে হল সমুদ্র উপকূলের মানুষগুলি কিপলিঙ-এর কালের অপেক্ষা এমন কিছু অন্য রকম হবেন না। তবে বিশেষভাবে আমায় এক বন্ধুর দিকে চিত্ত-ধাবিত হল, তাঁর নাম পিটার স্কট। তিনি এসেকসের একটি পরিত্যক্ত নির্জন বাতিঘরে বাস করতেন। সে অঞ্চলটা ছিল বুনো-হাঁসের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। এইখানে তিনি পড়াশোনা করতেন এবং ছবি আঁকতেন, বিষয়বস্তু উড়ে যাওয়া বুনো পাখির দল। পিটারও একজন ছোট নৌকার নাবিক ছিলেন। পিটার যদি নৌ-বাহিনীতে যোগ না দিয়ে থাকেন আমি অন্তত একটি বিষয়ে সুনিশ্চিত যে নৌ-বাহিনী সেনাদলের সংকট ত্রাণে সেদিনের অভিযানে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন পিটার নিঃসন্দেহে তাদের শরিক।

আমি পিটারের স্যাঙ্কচুয়ারীতে তুষার হংসী দেখেছি এবং তার মুখে এইসব পাখির রহস্যময় কাহিনী শুনেছি—তারা যেন স্বর্গ থেকে নেমে আসা দেবদূতের

দল। এই সব কারণে যে ভাবেই হোক ডানকার্ক, তুষার হংসী, একজন পক্ষী চিত্রকর, আর সোলজার্স প্রী সব কিছু আমার মনের গভীরে জড়িয়ে গেল। আর যে ছোটমেয়েটে বাতিঘরে একটি আহত হংসী নিয়ে এসেছিল সেই মেয়েটি কে, কোথা থেকে এসেছে তা বলতে পারি না, তবে আমার অবচেতন মন এর জন্য হয়ত দায়ী। আজীবন যে কন্যা কামনা করে এসেছি এবং যা আমি পাইনি, এ হয়ত সেই।

আমি শুনেছি অনেক জায়গায় 'স্নো-গুজের' কাহিনী একটি উপকথায় পরিণত হয়েছে এবং অনেক পত্রকারের প্রশ্নের জবাবে আমাকে বলতে হয়েছে, এ এক নিছক প্রয়াসমাত্র।'

এই কাহিনীর নায়ক ফিলিপ রায়েডোর। তার বয়স মাত্র সাতাশ-আটাশ। তার সারা মুখমণ্ডল ঘন দাড়ি গোঁফের জঙ্গলে আকীর্ণ। সে বিকৃতদেহ। পিঠে কুঁজ। দেহকাণ্ডের ওপর মাথাটা বিশ্রীভাবে জোড়া। বাম হাত পঙ্গু—মণিবন্ধ থেকে বিপরীত দিকে ঘোরানো। আঙুলে আর নখ পশুর মত তীক্ষ্ন ও বক্র। এমন বীভৎস তার আকৃতি বটে, কিন্তু মন সুন্দর। ভালোবাসা ও মমতায় ভরপুর। পাখিদের সে ভালোবাসে। শিকারীদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য সে সদা উৎকণ্ঠ। ফিলিপ চেয়েছিল জনসমাজে বাস করতে কিন্তু সমাজ তাকে আশ্রয় দেয় নি। তাদের কাছে সে 'বাতিঘরের সেই লোকটা—ও আবার নাকি ছবি আঁকে।' ছেলেমেয়েরা ওকে দেখে ভয় পায়। নির্জন এই জলাভূমিতে ফিলিপের সাথী শুধু পাখ-পাখালি। বুনোহাঁস, রাজহাঁস গাঙচিল, তিতির আর ডাকপাখির দল। হেমন্তকালের হিমেল হাওয়া বইতে শুরু হয় যখন তখন পাখিরা আসে আর বসন্তের হাওয়া গায়ে লাগলেই তারা উড়ে যায়। সে সময় রায়েডোর একেবারে নিঃসঙ্গ। তখন সে শুধু ছবি আঁকে। তার ছবি বাইরের জগতে পৌঁছেছে এবং শিল্পীসমাজের প্রশংসা লাভ করেছে।

তিন বছর এইভাবে কাটাবার পর নভেম্বর মাসের এক অপরাহ্ণে একটি মেয়ে একটা রক্তমাখা রাজহাঁসকে বুকে নিয়ে তার কাছে এলো। মেয়েটির বয়স বছর তেরো। যেন জলপরীর মত সুশ্রী আর পাখির মত ভীরু।

মেয়েটির নাম ফ্রিথ, ফ্রিথা। সে কাছাকাছি উইকেলড্রেথে জেলেপাড়ায় থাকে। হাঁসটির ভার ওর হাতে দিয়ে মেয়েটি পালায়। বলে যায় সে আবার আসবে। এরপর মেয়েটি মাঝে মাঝে আসে। রাজহাঁসকে কেন্দ্র করে উভয়ের মধ্যে একটা প্রীতির সুমধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেই রাজহাঁসটি রায়েডোরকে ভালোবেসেছিল। সে তাকে ছাড়ে নি। তার নাম দিয়েছিল রাজকন্যা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ডানকার্ক সৈকতে আটক ব্রিটিশ সৈন্যদের উদ্ধার করার ব্যাপারে ফিলিপ ব্রতী হল। ফ্রিথা বলে, ফিলিপ আমিও সঙ্গে যাবো। ফিলিপ বলে, তা হয় না ফ্রিথা। প্রতিবার আমাকে সাত-আটজন করে সৈনিককে আনতে হবে। তুমি সঙ্গে থাকলে একজন করে কম উদ্ধার করা হবে। যাবার সময় সে বলে—বিদায় ফ্রিথা! বিদায়! আমি যতদিন না ফিরি পাখিদের ভার রইল তোমার হাতে।

ফ্রিথা কি আর বলবে। সে বলল—তুমি সফল হও। ভগবান তোমাকে রক্ষা করুন। পাখিদের আমি দেখব। ওদের ভার আমি নিলাম।

তুষারহংসী কিন্তু ফিলিপের সঙ্গে রইল ধীরে ধীরে নৌকার পাল এবং সেই পাখি দিগন্তে মিলিয়ে গেল। ফ্রিথা আপন মনে বলে—রাজকন্যা (রাজহংসীর নাম) তুমি ফিলিপকে দেখো—ফিলিপকে দেখো—তারপর ফ্রিথা ভারাক্রান্ত মনে বাতিঘরে ফিরে যায়।

ফ্রিথা নির্জন বাতিঘরে ফিলিপের প্রতীক্ষায় দিন কাটায়। তারপর একদিন সহসা রাজকন্যার ডানার ঝাপট শোনা যায়। নীচের পাখিরা কলরব করে ওঠে। কিন্তু রাজকন্যা আর নীচে নামল না। সে একটু নীচে নেমেই আবার ঊর্ধ্ব আকাশে মিলিয়ে গেল।

ফ্রিথা বুঝল ফিলিপ আর নেই। সে চীৎকার করে বলে—বিদায় ফিলিপ! তোমার আত্মার মঙ্গল হোক। বিদায়—বিদায়—'

তারপর একদিন সেই বাতিঘরও কর্কশ-কণ্ঠী ইস্পাতী রাজপাখি'র বুক থেকে নিক্ষিপ্ত বোমায় ধ্বংস হয়ে গেল। শত্রুপক্ষ মনে করেছিল এটা একটা সামরিক লক্ষ্যবস্তু। তাই এই নির্মম আঘাত।

ফ্রিথা এসে দেখল কোথাও কিছু নেই। চারদিকে শুধু জল আর জল।

গ্যালিকোর এই উপন্যাসটির পরিচয়ে বলা হয়েছে 'এ বিউটিফুল অ্যান্ড ডিপলি মুভিং মডার্ণ ক্লাসিক'—এই মন্তব্য আক্ষরিকভাবে সত্য। শ্রীযুক্ত নরেশ দেব অনন্যসাধারণ ভঙ্গীতে এই গ্রন্থটি অতি স্বচ্ছভাষায় অনুবাদ করে বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করেছেন এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

—অভয়ংকর

* THE SNOW GOOSE : (A NOVEL) By Paul Gallico : (original publishers—Michael Joseph, London).

তুষার হংসী—(বঙ্গানুবাদ) শ্রীনরেশ দেব অনুদিত। প্রকাশক : মেসার্স এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স (প্রা) লিমিটেড। কলিকাতা-১২।। দাম তিন টাকা মাত্র।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংবাদ।।

গত ১৬ অঘ্রাণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশনে জাতীয় অধ্যাপক, ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পরিষদের ৭৯তম বর্ষের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

কলকাতায় পোলিশ লেখক।।

পোল্যাণ্ডের প্রখ্যাত লেখক স্ট্যানিসল জেইলিন্সি কলকাতায় এসেছিলেন মাত্র দুদিনের জন্য। এর মধ্যে মিলিত হয়েছিলেন বাঙালী কবি-লেখকদের সঙ্গে এক সভায় বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে খোঁজখবর নেবার তাগিদে। সভার আয়োজন করেছিলেন 'সর্ব ভারতীয় কবি সম্মেলন' গত ৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ১০ হিন্দুস্থান রোডে। ঘরোয়া পরিবেশে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে সেদিনের আলোচনায় বাংলা ও পোলিশ সাহিত্যের বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন সতীকান্ত গুহ।

জেইলিন্সির প্রধান খ্যাতি গল্পকার ও ঔপন্যাসিক হিসেবে। তাঁর 'বটম অব দি আউরল' এবং 'বিফোর ডন' গল্প সংকলন দুটি পোলিশ সাহিত্যে স্মরণীয় সংযোজন। অনেকের মতে তিনিই পোল্যাণ্ডের সেরা গল্পকার। শুধু বিষয়বৈচিত্র্যে নয়, আঙ্গিক প্রকরণেও তিনি পোলিশ সাহিত্যে নতুন যুগ আনয়ন করেছেন বলে অনেকের ধারণা। তাঁর একাধিক বই পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়েছে। সেদিনের আলোচনা সভায় তিনি জানান যে তাঁর দেশের শতকরা ৯০ জনই বইয়ের পাঠক। কবিতার চেয়ে গল্পের পাঠক সংখ্যাই বেশি। ভারতীয় লেখকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথই সবচেয়ে বেশি পঠিত ও অনুদিত। আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মণীন্দ্র রায়, লীলা রায়, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, দিলীপকুমার সেনগুপ্ত, দক্ষিণারঞ্জন বসু, কবিতা সিংহ, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, আশিস সান্যাল।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল কবিতা পাঠ। স্বরচিত কবিতা পড়ে শোনান প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, মণীন্দ্র রায় কবিতা সিংহ, আশিস সান্যাল ও শুভ মুখোপাধ্যায়। জেইলিন্সি মূল পোলিশ ভাষায় তাঁর রচনা থেকে কিছু অংশ পড়ে শোনান।

হাইনের ১৭৫তম জন্মবার্ষিকী

গ্যয়টের নাম যত শোনা, বা ম্যাক্সমূলার যতখানি সাধারণ বাঙালীর কাছে পরিচিত হাইনরিশ হাইনে ততখানি নয়। তবে কবি হিসেবে জার্মান কবিদের মধ্যে হাইনেই সম্ভবত আধুনিক বাঙালী পাঠকের কাছে সবচেয়ে বেশী পরিচিত এবং প্রিয়। গত ষাট বছর ধরে যে জার্মান কবির রচনা বাংলা ভাষায় সবচেয়ে বেশী অনূদিত হয়েছে তিনি হলেন হাইনরিশ হাইনে। আর রবীন্দ্রনাথই হলেন প্রথম পুরুষ যিনি সর্বপ্রথম হাইনেকে পরিচয় করিয়ে দেন বাঙালী পাঠকের সঙ্গে। 'সাধনা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ হাইনের নয়টি কবিতা ভাষান্তরিত করেন আজ থেকে প্রায় আটাত্তর বছর আগে।

এ বছর সেই মহান কবি হাইনরিশ হাইনের ১৭৫তম জন্মদিবস পালিত হল দেশে দেশে। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে হাইনে বলেছিলেন : মুক্তির সংগ্রামে আমি কাটিয়েছি ত্রিশ বছর।' আর কবি হিসেবে নিজর স্থান নির্ধারণ করে লিখেছিলেন 'আমিই হচ্ছি রোমান্টিক যুগের শেষ কবি। একদিকে পুরোনো ধারার জার্মান গীতিকবিতা আমার সঙ্গেই যাবে যেমন শেষ হয়ে, তেমনি অন্যদিকে আমিই খুলে দিয়েছি জার্মান গীতিকবিতার নবরূপায়ণের উজ্জ্বল সড়ক।' ম্যাথু আর্নল্ডের মতে 'গ্যয়টের পর হাইনেই হলেন ইউরোপীয় সাহিত্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পুরুষ।' তিনি এও বলেছিলেন, মানুষের বোকামি, দম্ভ অত্যাচার ইত্যাদি দেখে ঈশ্বরের মুখে যে বিদ্রূপের তিক্ত হাসি ফুটে উঠল তার নাম হাইনে।'

একথা ঠিক গ্যয়টের বিশ্ববীক্ষা বা শীলারের রচনার ধ্রুপদী রীতি হাইনেতে অনুপস্থিত, কিন্তু বাঙালী পাঠকের কাছে হাইনে অনেকটা ঘরের লোক। বিশেষ করে কবির রোমান্টিক মেজাজ, ভারততত্ত্বে তাঁর গভীর মনীষা এবং কবিতায় আকছার ভারতীয় প্রতীক, চিত্রকল্পের ব্যবহার, পৌরাণিক কাহিনী ও চরিত্রের ঘন ঘন উল্লেখ হাইনরিশ হাইনেকে করে তুলেছিল বাঙালী কবিদের একান্ত আপন জন। কোকিল-ডাকা পদ্মবন, তুষারমৌলি হিমালয়, তরঙ্গায়িত গঙ্গা, তার তীরবর্তী সৌম্য পুরুষ, ভগীরথ, কোনারক মন্দিরের শিল্পকলা—সব কিছুই উপমা হিসেবে ঘুরে ফিরে এসেছে তাঁর কাব্যে।

হাইনরিশ হাইনে জন্মেছিলেন জার্মানীর ডুসেলডর্ফে। সেটা ১৭৯৭ সালের ১৩ ডিসেম্বর। বাবা স্যামসন হাইনে ছিলেন ব্যবসায়ী আর মা বেটী হাইনে ছিলেন জাতীয়তাবাদের অনুরাগিণী। এঁরই প্রেরণায় হাইনে স্কুল ছাড়বার পর নেপোলিয়ন-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাবার জন্য তৈরী হলেন। স্বেচ্ছা-সৈনিক হিসেবে নামও লেখান। কিন্তু যুদ্ধে যাওয়া আর হয় নি। তার বদলে গেলেন হামবুর্গে, বড়লোক খুড়ো সলোমানের কাছে ব্যবসায় হাতে খড়ি নিতে। সেখানেই খুড়তুতো বোন অ্যামেলিয়াকে দেখে তিনি মুগ্ধ। অথচ অ্যামেলিয়া হাইনরিশকে সুনজরে নিতে পারেন নি, বিয়ে করেন আরেকজনকে। ভাঙা-মনে হাইনে গুটিয়ে ফেললেন তাই ব্যবসাপত্তর। ঢুকলেন বন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়তে। বলাই বাহুল্য, হামবুর্গের দিনগুলি তাঁকে কবিতা লিখতে অনেক বেশী সাহায্য করে।

মিউনিখে একটি পত্রিকায় ছিলেন সম্পাদক। সাহিত্যই তখন তাঁর পেশা। মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতেন হার্ৎস এলাকায় এবং ইতালীতে। ১৮৩০-এই জার্মানী ছেড়ে চলে যান ফ্রান্সে। ১৮৩৫-এ বিয়ে করেন ম্যাটিলডা মিরাট নামে এক সুন্দরী ফরাসিনীকে। ১৮৪৩-এ ফিরে আসেন একবার জার্মানীতে। দেখতে এলেন শয্যাশায়িনী জননীকে। এটাই তাঁর শেষ আসা জন্মভূমি জার্মানীতে। ১৮৫৩-য় প্যারিসে মারা যান হাইনে। আলমানৎসার, ল্যিরিসিজ ইন্টারমেৎসো, রাইসেবিল্ডার, বুখডার লিডার, আটাট্রল প্রভৃতি হল তাঁর বিখ্যাত সব গ্রন্থ।

হাইনে বলতেন, আমি একই সঙ্গে ইহুদী এবং খৃস্টান, ট্রাজিডি এবং কমেডি। সত্যি কথা বলতে, এই দ্বৈত এবং পরস্পরবিরোধী ব্যক্তিত্বই হাইনের কবিতারও বৈশিষ্ট্য।

আগেই বলেছি রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম হাইনেকে বাঙালী পাঠকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। শুধু 'সাধনা' নয় 'প্রবাসী', 'ভারতী', 'সাহিত্য' প্রভৃতি পত্রিকাতেও ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে নিয়মিতভাবে বেরুতো হাইনের অনুবাদ। 'পরিচয়' পত্রিকাতেও বেরিয়েছিল কিছু কিছু।

হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথের পরে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, মোহিতলাল মজুমদার, দেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আরো অনেকে হাইনের অনুবাদ করেছেন। এখনো করছেন বহু তরুণ ও প্রবীণ কবি।

এই প্রসঙ্গে বলা যায়, জি ডি আরের সংস্কৃতি মন্ত্রক থেকে হাইনে পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে সেই ১৯৫৭ সাল থেকে। পুরস্কারের মূল্য ১২,৫০০ মার্ক (পঁচিশ হাজার টাকার ওপর)। প্রতি বছর অগ্রগণ্য লেখক, কবি ও সাংবাদিকদের দেওয়া হয় এই পুরস্কার। গত বছরেই এই প্রাইজ পেয়েছেন কবি ফোলকার ব্রাউন।

সবশেষে বলা যায়, হাইনে হলেন সেই পুরুষ যিনি ছিলেন বিপ্লবী, গণতান্ত্রিক। তিনি হলেন সেই কবি যিনি বলতেন 'আমি সেই তলোয়ার, আমিই অগ্নিশিখা।'

নতুন বই

সনেট পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা : প্রমথ চৌধুরী। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ। কলকাতা। মূল্য ১০-০০ টাকা।

প্রমথ চৌধুরীর কবিতাগুলি যে কবিতা নয়, এ সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরী নিজে সচেতন, এবং একথা তিনি জানতেন কবিতার জগৎ থেকে গদ্যে আসা চলে, কিন্তু গদ্যের জগৎ থেকে কবিতায় আসা চলে না। তবু তিনি যে কবিতা লিখতে বসেছেন, তার কারণ অমিয় চক্রবর্তীকে একটি চিঠিতে বলেছেন : 'সনেট লেখবার অন্য কারণও ছিল—রবীন্দ্রনাথের কবিতার খেলো নকল পড়ে পড়ে আমি একটু বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলুম। তার প্রমাণ আমার একটি অপ্রকাশিত কবিতায় আছে।...উপরন্তু আমার মনে হয় যে লেখা অত্যন্ত ঢিলে হয়ে আসছে।... আমি যে সনেট লিখেছি সে একটা অনেকটা experiment হিসেবে। যদি তা সত্ত্বেও আমার কতকগুলি সনেটধর্মী কবিতা হিসেবে উতরে থাকে তা এই সনেটের বাঁধাবাঁধি নিয়মের গুণে। আমার সনেটের অন্তরে হয়তো art -এর চাইতে artificiality বেশি। তার কারণ Donte প্রভৃতি মহাকবিদের আমি বংশধর নই।'

সত্যেন্দ্রনাথকে 'পদচারণের' উৎসর্গপত্রে লিখেছেন : 'গদ্যের কলমে লেখা এই পদ্যগুলি যে আপনাকে উপহার দিতে সাহসী হয়েছি, তার কারণ, আমার বিশ্বাস, এগুলির ভিতর আর কিছু না থাক, আছে rhyme এবং সেই সঙ্গে কিছু কিঞ্চিৎ reason.

যিনি নিজের কবিতার সম্বন্ধে এই সত্য ভাষণ করে গেছেন, তাঁর কাব্য সম্বন্ধে বিরূপ কোনো কথা না বলাই ভালো। সত্যেন্দ্রনাথও তাঁর কবিতায় গদ্য ও হাল্কা-ভাব দেখেছেন, কিন্তু ভাষার স্বাতন্ত্র্যের জন্যে প্রশংসা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে প্রশংসা করেছেন, 'একটি স্নেহে, অন্যটি তাঁর লিরিকের বিপরীত ভিন্ন চরিত্রের বৈচিত্র্য দেখেছেন বলে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথও এই কাব্যের ত্রুটি দেখেছেন পাঠকের মনকে প্রীতি ছন্দে ফুটিয়ে দেবার দিকে এর যে ঝোঁক আছে, সেটা আপনি ফুটে ওঠবার দিকেই সম্পূর্ণ হবে, তখন কবিতা এমন নির্মমভাবে নিখুঁত হবে না।'

প্রমথ চৌধুরী ফরাশি সনেটের আদর্শ গ্রহণ করেছেন, প্রথম দুটি চতুষ্ক, নবম ও দশম চরণ দ্বিপদী, পরে আবার একটি চতুষ্ক। অন্য, অর্থাৎ পেত্রার্কীয় সনেটও আছে, তবে খুব কম। প্রমথ চৌধুরীর মতে সনেট স্থাপত্য ধর্মী, প্রতিমার রূপ স্পষ্ট হয়। সনেট কেন চতুর্দশ পদী, এর উত্তরে বলেছেন পৃথিবীতে তিনটি ছন্দই আদি, দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চতুষ্পদী। দ্বিপদীতে চরণ দুটি পরপর মিলে যায়, ত্রিপদীতে একটি চরণ ডিঙিয়ে চলে, চতুষ্পদীতে চারটে চরণের মিলে জট রচিত হয়। সনেটের প্রথম দুটি চতুষ্কের ছাঁচ চতুষ্পদীর ধরনে, এই চতুষ্পদীর মধ্যে দ্বিপদী লুকিয়ে আছে, ষটকের মধ্যে ত্রিপদীর ছাঁচ আছে। সুতরাং চতুষ্পদী এবং ত্রিপদী মিলে সপ্তপদী এবং এর গুণিতক হলেই চতুর্দশপদী হয়। বলা বাহুল্য প্রমথ চৌধুরী ছন্দের চরণের মিল অনুসারে এর রহস্য আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। কিন্তু যতোদূর মনে হয় ত্রুবাদুর সঙ্গীতের রীতির মধ্যে চতুর্দশ পদীর চতুষ্ক ও ষটকের অন্তর রহস্য লুকিয়ে আছে। যেমন এলিঅটের পড়োজমির ফর্ম আহৃত হয়েছে কন্ট্রাপান্টাল সঙ্গীত রীতি থেকে।

প্রমথ চৌধুরীই বাংলা সাহিত্যে বিদেশী অনেক কাব্য বন্ধ আমদানি করেছেন, ত্রিয়োলেত, তেরজা রিমা এবং ফরাশি সনেট এই তিনটি তাঁর বিশেষ অবদান। এদিক থেকেও তিনি উল্লেখযোগ্য।

পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত গ্রন্থে প্রমথ চৌধুরীর সকল কবিতা, গান কবিতা সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব, রচনার ইতিহাস-প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য সব এক সঙ্গে পাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথের, দ্বিজেন্দ্রনাথের চিঠি, অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা প্রমথ চৌধুরীর দুটি পত্র, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ও প্রিয়নাথ সেনের দুটি মূল্যবান প্রবন্ধ সনেট পঞ্চাশৎ সম্বন্ধে, এবং সনেট কেন চতুর্দশপদী প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ গ্রন্থ পরিচয় অংশে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে এই অংশটি আকর্ষণীয় মনে হবে। সম্পাদনার এই কৃতিত্বের প্রশংসা না করে পারা যায় না। বাংলা সাহিত্যে সনেট সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা এই অংশের মধ্যেই পূর্ণতা পেয়েছে।

মানব জীবনের দিকদর্শন জ্যোতিষ (জ্যোতিষ) —দাশরথি সোম। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। আট টাকা।

গ্রহ নক্ষত্রের বিচার নিয়েই জ্যোতিষ শাস্ত্র। যুগে যুগে আমাদের দেশে জ্যোতিষ শাস্ত্র এত উন্নতমানের পরিচয় দিয়েছে যাতে দেখা গেছে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে এ-বিষয়ে আজো আমাদের আসন অপরাজেয়। প্রাচীন পঞ্জীতে দেখা যায় আঠেরজন জ্ঞানী-গুণী জ্যোতির্বিদদের গবেষণার ফলই হচ্ছে ভারতীয়দের জ্যোতিষ শাস্ত্র। এদের মধ্যে ভৃগু ও পরাশরের সারগর্ভ রচনার ফলই আমাদের জ্যোতিষ শাস্ত্রের ভিত্তি। উত্তরকালে খনা, বরাহ, মিহির প্রভৃতি প্রখ্যাত ভারতীয় জ্যোতির্বিদেরা জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রভূত উন্নতিসাধন করেন।

বাংলাভাষার রত্নভাণ্ডারে জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ক বহু গ্রন্থ এর আগেও রচিত হয়েছে। কিন্তু শ্রীদাশরথি সোম রচিত আলোচ্য গ্রন্থখানি তাদের মধ্যে অনন্য-সাধারণ। এক কথায় শ্রীসোম তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারা নিয়ে এতে যে রেখাপাত করেছেন তা ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে এক নতুন অধ্যায় রচনা করবে বলেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। সাধারণ মানুষের উপলব্ধির জন্য তিনি সহজ সরলভাবে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছেন। বেশ বোঝা যায়, তিনি দীর্ঘ দিন এ নিয়ে নিখুঁত গবেষণা করেছেন। আর সেই গবেষণাই মহামূল্য সম্পদ এই রচনা, একথা সবাই একবাক্যে স্বীকার করবেন বলেই মনে হয়।

এর আরো মনোজ্ঞ উপাদান হলো বহু বিশিষ্ট জাতচক্র এতে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন—যা আমাদের প্রতিটি মানুষেরই জানবার মত। যেমন—শ্রীরামচন্দ্র, চৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শিশিরকুমার ভাদুড়ী, বাঘা যতীন, মহাকবি গ্যেটে, হিটলার, মুসোলিনী, শ্রীশ্রীসীতারাম ওঙ্কারনাথ, জওহরলাল নেহরু, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, জেনারেল ম্যানেকশ, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, মুজিবর রহমান প্রভৃতি।

তাই মনে হয় শ্রীসোমের এই জ্যোতিষ-বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থখানি বাংলা সাহিত্যের জ্ঞানভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি করবে এবং সর্বসাধারণের কল্যাণে বিশেষ সহায়ক হবে।

যেখানে প্রবাদ। মৃণাল বসুচৌধুরী। বিশ্বজ্ঞান। ৯/৩, টেমার লেন, কলকাতা-৯। দাম : তিন টাকা।

'মগ্ন বেলাভূমি' এবং 'শহর কলকাতা'র পর কবির তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'যেখানে প্রবাদ' —'৭০-৭১-এ লেখা নির্বাচিত কবিতার একটি অত্যন্ত মার্জিত সংকলন। কবিতা রচনায় মৃণাল বসুচৌধুরী দক্ষতা অর্জন করেছেন, তার পরিচয় আছে কবির বর্তমান গ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায়। কবির পূর্ববর্তী কিছু কিছু কবিতায় এক ধরনের দার্শনিকতা লক্ষ্য করা গেছে, বর্তমান কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতায় দার্শনিকতা আছে, কিন্তু তার সুর ভিন্ন বলে মনে হয়। গ্রন্থের প্রথম কবিতাটি—'জলাধারে ফুল রেখে/চলে গেলে/ভেবেছ কি দায়িত্ব ফুরোবে।'... 'বিকল্প'-এ শকুনের ক্ষুধার্ত ডানায় জ্বলে ক্রোধ/'...'এখন'—'ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে আছি/বলতে পারি না। বলতে পারি না। দুহাত উপুড় করলে—ঝরবে বকুল না পোকামাকড়'.../কবি সময়-সচেতনার স্বাক্ষর রেখেছেন বর্তমান গ্রন্থের বহু কবিতায়। 'স্বদেশ' কবির একটি উল্লেখযোগ্য রচনা।

গ্রন্থটির বহিরঙ্গ সৌষ্ঠব এবং গৌতম রায়ের আঁকা প্রচ্ছদ সুন্দর।

বাঙলার মন্দির

টেরাকোটা

চন্দ্রকোণার বিখ্যাত জোড়বাংলার মন্দির

বাংলার অসংখ্য মন্দিরে টেরাকোটা বা পোড়ামাটির কিছু কিছু ভালো কাজ আজও চোখে পড়ে। পশ্চিম বাংলার বিষ্ণুপুর টেরাকোটা কাজের জন্যে বিখ্যাত একথা অনেকের জানা। মন্দির-শিল্পের অন্যতম আঙ্গিক হিসেবে টেরাকোটাসজ্জা যে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী তা বলা বাহুল্য। একে শুধু শিল্প হিসেবে দেখলেই চলবে না, এর মধ্যে সে যুগের বাঙালীর সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ভাবনার যে এক আশ্চর্যরকমের বিমিশ্রণ ঘটেছে সেকথা ভুললে চলবে না। অবশ্য সত্যিকারের শিল্পকৃতির মধ্যে শিল্পীর সমসাময়িক ভাবনার যে কিছুটা রেখাপাত ঘটে শিল্প-রসিকমাত্রেই সেকথা জানেন। টেরাকোটা নির্মাণকালে পৌরাণিক ও রামায়ণীয় কথা শিল্পীর মন জুড়ে থাকলেও তিনি সমসাময়িক জীবনচক্রকে উপেক্ষা করতে পারেন না। সমাজের বিভিন্ন অবস্থার চিত্রগুলিকে তিনি মাটির রেখায় ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পান। কিন্তু এটি ফুটিয়ে তোলা যে কতো পরিশ্রমসাপেক্ষ তা বাংলার পোড়ামাটির ভালো কাজ করা কোন মন্দির লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা যাবে। শুধুমাত্র মাটির গায়ে পুত্তলিকাগুলি উৎকীর্ণ করাই যথেষ্ট নয় বরং কমনে তাদের শিল্পসৌন্দর্য প্রবেশ করিয়ে দেবার জন্যে পুত্তলিকার দেহসৌষ্ঠবের মধ্যে যে ভাববিন্যাস করতে হয় শিল্পসাধনার সেখানেই ঘটে সিদ্ধিলাভ। মন্দিরের বিগ্রহনির্মাণের ব্যাপারেও একথা খাটে। এসব তৈরী করতে গিয়ে শিল্পীকে কঠোর সাধনায় নিমগ্ন থাকতে হতো। শিল্পীদের এই অতন্দ্র সাধনা সম্পর্কে কিছু কিছু অলৌকিক কাহিনীরও পরিকল্পনা করা হয়েছে পরবর্তীকালে। মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা শহরে 'রঘুনাথবাড়ী' নামে ঠাকুরবাড়ীতে ভগবান রঘুনাথজীউর বিগ্রহ তৈরী করার সময়ে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল বলে জনশ্রুতি আছে। জনশ্রুতিটি হল গঙ্গারাম দাস নামে এক শিল্পী রুদ্ধদ্বার কক্ষে বসে যখন মূর্তিটি তৈরী করছিলেন সে-সময় চন্দ্রকোণার রাজা বিগ্রহের পাদদেশে তাঁর নাম উৎকীর্ণ করার জন্যে শিল্পীকে নির্দেশ দিয়ে যান। কিন্তু রঘুনাথ বিগ্রহের পাদদেশে শিল্পী ঠাকুরের নির্দেশে নিজের নাম অংকিত করেছিলেন। পরের দিন সকালে শিল্পীকে দেখা যায় নি এবং বিগ্রহের অপরূপ জ্যোতিতে সমস্ত মন্দিরখানি নাকি ভাস্বর হয়ে উঠেছিল। এছাড়া আর একটি অলৌকিক ঘটনা শুনি রঘুনাথের [illegible] শিল্পী যখন [illegible] করছিলেন তখন মূর্তির গা থেকে রুধির নির্গত হয়েছিল। এসব ঘটনার সত্যতা বা অসত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন না তুলেও যেটা সহজেই মনে আসে তা হল শিল্পী নিপুণ-হাতে এমন মূর্তি তৈরী করতে পারতেন যার মসৃণতা মানবদেহের কোমলতার থেকে কোন অংশেই কম ছিল না। সুন্দর সুঠাম মূর্তিনির্মাণে এঁরা ছিলেন অদ্বিতীয়। এঁদের বংশধরেরা আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও বাংলাদেশের কোন কোন স্থানে মৃৎ ও প্রস্তর শিল্পীদের হাতের সুন্দর কাজ আজও দেশবিদেশে খ্যাতিলাভ করেছে। কৃষ্ণনগরের (নদীয়া) ঘূর্ণি অঞ্চলের শিল্পীদের এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

পঞ্চানন রায়

এঁরা চেষ্টা করলে হয়তো টেরাকোটা-শিল্পকে পুনর্জীবিত করতে পারবেন। বাঁকুড়া জেলার পাঁচমুড়া অঞ্চলের শিল্পীরাও ঐতিহ্যবাহী মৃৎপুত্তলিকা তৈরীতে পটু। তবে এঁদের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ঘোড়া, হাতী, মনসার পট যতখানি সুন্দর হয় অন্যান্যক্ষেত্রে ততখানি নৈপুণ্য লক্ষ্য করা যায় নি।

মূল আলোচনা থেকে আমরা কিছুটা এগিয়ে এলেও মন্দিরটেরাকোটার শিল্প-মানস সম্পর্কে একথাটাই মোটামুটি বলা যায়। টেরাকোটাশিল্পে প্রাচীন বাংলার সমাজচিত্রের দিকটি শিল্পীদের কাছে তাই অবহেলায় বিরত হয়ে ওঠে নি। বাইজী নাচ, হাতী ঘোড়ার ওপর চড়ে জন্তুজানোয়ার শিকার, [illegible] পাল্কীবাহী জমিদার, অলিন্দে বসা তামাকুসেবীবাবু, পদাতিক সৈনিক প্রভৃতির সুন্দর সুন্দর মূর্তি অনেক মন্দিরের গায়ে লক্ষ্য করা যায়। এমন কি বাঙালীর অন্দরমহলের ঘটনাবহুল চিত্রও বাদ পড়ে নি। এদের মধ্যে আছে যুবতী-প্রসাধন, সাজসজ্জা, কন্যাসম্প্রদান প্রভৃতি। মন্দিরগাত্রের অলংকরণে এছাড়া আরও আরও অনেক সামাজিক ঘটনা স্থান পেয়েছে।

মন্দিরটেরাকোটার মধ্যে সাহিত্যের কাহিনীকে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরার এক প্রয়াস শিল্পীরা পেয়েছিলেন। মঙ্গল কাব্যের মধ্যে লৌকিক কাহিনী নিয়ে যেসব কাব্য রচিত হয়েছিল তার মধ্যে চণ্ডী মঙ্গলের কালকেতু-ফুল্লরা ও ধনপতি শ্রীপতির কাহিনী জনমানসে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছিল। শিল্পীরা এসব কাহিনীর জনপ্রিয়তা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। কালকেতুকাহিনীর থেকে সদাগরের উপাখ্যান ছিল অধিক জনপ্রিয় বিশেষ করে অকূল সমুদ্রে নৌকা ভাসিয়ে ধনপতি-শ্রীপতির সিংহলযাত্রাকালে কমলে কামিনী দর্শন দৃশ্যটিকে শিল্পীরা অমর করে রেখেছেন পোড়ামাটির ভাস্কর্যের মধ্যে। পশ্চিম বাংলার বহু মন্দিরগাত্রে এ দৃশ্যটি দেখতে পাওয়া যায়। মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার অন্তর্গত রাধাকান্তপুরের দাসেদের পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক বছরের কিছু বেশী আগে মেরামত হলেও এর সম্মুখদিকের পোড়ামাটির কাজগুলির যে সুষমা ও ভঙ্গী লক্ষ্য করা যায় তাতে এগুলি যে মূল মন্দিরের সঙ্গেই নির্মিত হয়েছিল তা অনুমান করা যায়। [illegible]

পঞ্চানন্দের মন্দিরে (রাধাকান্তপুর) পোড়ামাটির সুন্দর কাজ
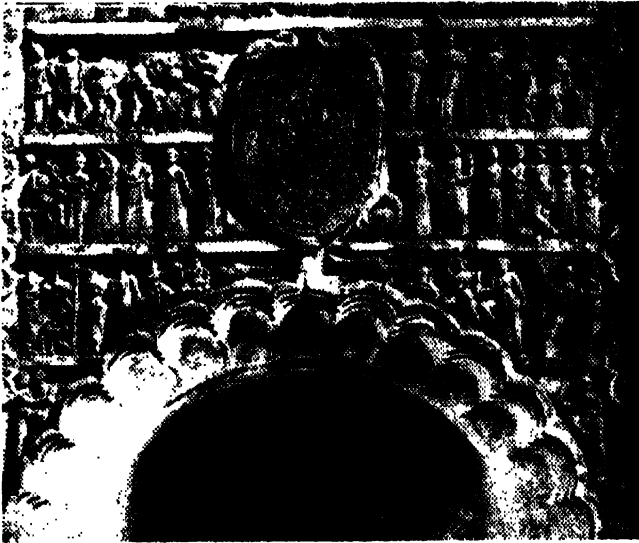
গুলির হাত, পা ও মুখের নিখুঁত বিন্যাস ও ভঙ্গীর সংগে সতেরো-আঠারো শতকের মন্দিরটেরাকোটার সাদৃশ্য অনেকাংশে লক্ষণীয়। এ মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সমাজচিত্রের মধ্যে আছে চড়ক-গাজনের একটি দৃশ্য। ঊর্ধ্বে লম্বিত চড়ককাঠ থেকে দোদুল্যমান ভক্ত এবং রজ্জুর সাহায্যে দোলা দেওয়ার দৃশ্যটি বড়ই সুন্দর হয়ে উঠেছে পোড়ামাটির একাজের মধ্যে। এছাড়া খেজুরগাছে রস-সংগ্রহের জন্যে এক ব্যক্তিকে দেখা যাচ্ছে, তার পিঠে রয়েছে বাঁশের তৈরী একটি ছোট বাক্স যার মধ্যে গাছ ছোলার উপকরণ-সামগ্রী রয়েছে। পুত্তলিকাগুলির মাথায় এক বিশেষ ধরণের পাগড়ীর সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। দাসপুর থানার চেঁচুয়ার রাধাগোবিন্দের মন্দিরেও পোড়ামাটির সুন্দর অলংকরণ লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে শিবিকাবাহী এক জমিদারের যাত্রার দৃশ্যটি উল্লেখযোগ্য। শিবিকার নীচে গমনরত কুকুরের ছবিও স্থান পেয়েছে। এ ধরণের ছবি দাসপুরে গোপীনাথের আলগোছ্‌-টুভী মন্দিরেও দেখা যায়। সেকালের জমিদারেরা একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়ার সময়ে সংগে নিয়ে যেতেন তাঁদের প্রিয় পোষা কুকুর ও অন্যান্য লোকলস্করদের। দাসপুরের নিকটবর্তী লাওদাগ্রামে বঙ্ক রায়ের যে নবরত্ন আছে তার গায়েও পোড়ামাটির সুন্দর কাজ লক্ষণীয়। গতানুগতিক পৌরাণিক ও রামায়ণীয় কাহিনীর ভাস্কর্য-রূপ এদের মধ্যে লক্ষ্য করা গেলেও পুত্তলিকার ভঙ্গী ও বিন্যাসরীতির মধ্যে শিল্পীর বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। চেঁচুয়ার কাছাকাছি গোবিন্দনগরের শিবমন্দিরটি বাংলা ১২৫৭ সালে তৈরী হলেও মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ পোড়ামাটির কাজগুলির বেশীর ভাগই ভগ্ন। নতুনত্ব বিশেষ কিছু না থাকলেও উড়িষ্যার শিল্পরীতির প্রভাব এতে কিছু কিছু লক্ষ্য করা যায়। নগ্ন মনুষ্যমূর্তির কিছু কিছু নমুনা এই মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ হয়েছে।

পোড়ামাটির অলংকরণের যে বিন্যাসরীতি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় তা হল ভিত্তিবেদির ঠিক ওপরে মন্দিরগাত্রে প্রথমে থাকে জীবজন্তুর মূর্তি, তার ওপরে মানুষ ও সামাজিক চিত্র এর ওপরে পৌরাণিক ও রামায়ণীয় কাহিনী। মন্দির-দ্বারের প্রবেশপথের ওপরের অংশ সাধারণতঃ ওপরে-নীচে লম্বিত বা সমান্তরাল বিভাজন রেখার দ্বারা তিনটি স্তরে বিভক্ত থাকে। এতে প্রধানতঃ প্রসিদ্ধ পৌরাণিক ও রামায়ণীয় কাহিনীর দৃশ্যগুলি দেখা যায়। জনপ্রিয় চিত্রগুলি হল মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর কাহিনী অবলম্বনে অষ্টভুজা বা দশভুজা দেবীদুর্গার স্তব। দেবর্ষি নারদ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর কর্তৃক শক্তিরূপা অষ্টভুজা দেবীর নিকট প্রার্থনা দৃশ্যটি অনেকস্থানে খুব সুন্দরভাবে উৎকীর্ণ দেখা যায়। এ ধরণের একটি চিত্র ঘাটাল মহকুমার শ্যামসুন্দরপাটনায় দধিবামনের মন্দিরে লক্ষ্য করা যায়। মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাকাল হল বাংলা ১২৬১ সাল বা ইংরেজী ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ। এর ওপরে খোদাইকরা নকশা এবং তার ওপরে দুটি সমান্তরাল বিভাজন রেখার মধ্যবর্তী খোপে খোপে টেরাকোটার যে টাইলগুলি স্থাপিত তার মধ্যে বেশীর ভাগেই বাঈজী নাচের দৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিটি ঠিক মাঝখানে স্থাপিত। গোপীগণ-সংগে কৃষ্ণের লীলাচিত্রের এক ব্যর্থ রূপায়ণ এর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। উনিশ শতকের বর্ধিষ্ণু সমাজে বাঈজী নাচের যে খুব প্রচলন ছিল তারই প্রভাবপরিমণ্ডলের মধ্যে এগুলি যে তৈরী হয়েছিল তা অনুমান করা যায়। এই পুত্তলিকাগুলির ওপরে ছাদের কার্নিসের নীচের অংশগুলিতে খোদাই নকশার কাজ যে বেশ প্রশংসনীয় তাতে সন্দেহ নেই। প্রসিদ্ধ কাহিনীগুলির মধ্যে রাম-রাবণের যুদ্ধ ও লক্ষ্মণের শক্তিশেল দৃশ্যগুলি জনপ্রিয়তার শীর্ষদেশে যে উপস্থিত হয়েছিল বেশীর ভাগ মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ পোড়ামাটির কাজে এসব দৃশ্যের রূপায়ণ দেখে তা মনে হয়। বাংলা ১০৮৮ সালে তৈরী দাসপুর থানার চেঁচুয়ার রাধাগোবিন্দের মন্দিরের একটি টেরাকোটায় এ দৃশ্যগুলির এক সুন্দর রূপায়ণ লক্ষ্য করা যায়। (এই মন্দিরের টেরাকোটার আলোকচিত্রটি বর্তমান সিরিজের চতুর্থ প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়েছে।) সৌভাগ্যের বিষয় প্রায় তিন শ বছরের পুরানো এই মন্দির ও তার পোড়ামাটির কাজগুলির বিশেষ কোন ক্ষতি এখনও হয়নি। প্রাচীন মন্দির হিসেবে এটির সংরক্ষণ খুব বিশেষ প্রয়োজন। বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলির কয়েকটি সতেরো শতকে তৈরী হয়েছিল। চেঁচুয়ার রাধাগোবিন্দের এই পঞ্চরত্ন-মন্দিরটিও সতেরো শতকের শেষের দিকে তৈরী। ঐ শতকের পোড়ামাটির কাজের যে বিশেষ ভঙ্গী ও রীতিটি শিল্পি-সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুসৃত হতো চেঁচুয়ার রাধাগোবিন্দের মন্দিরে তার চমৎকার নিদর্শন পাওয়া যাবে। প্রাচীনত্বের দিক থেকে দাসপুর থানার মন্দিরগুলির মধ্যে দ্বিতীয়স্থানাধিকারী মন্দিরটি ছিল চেতুয়া-বরদার জমিদার শোভাসিংহের দেওয়ান বলরাম চৌধুরীর আলগোছটুভী (একরত্ন) মন্দির।

দুঃখের বিষয় বেশ কিছু টেরাকোটা শিল্পনৈপুণ্যের প্রশংসনীয় দৃষ্টান্তস্থল হলেও আজ শুধু আলোচনার মাধ্যমে মুষ্টিমেয় শিল্পপ্রেমিকের কাছে তাদের পরিচয় দান করা ছাড়া এ শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার কোন সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। নিতান্ত স্বাভাবিক কারণেই এ শিল্পটির যে অবলুপ্তি ঘটেছে সেকথা আগেই বলেছি। যে যুগে মন্দির সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানের আবশ্যকীয় কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হতো সে সময়ে এ শিল্পটির বিকাশ ও উন্নতি যে স্বাভাবিকভাবেই হয়েছিল তা অনুমেয়। আর মন্দির-স্থাপত্যের ক্রমাবলোপের ফলে টেরাকোটা-শিল্পের ক্ষীয়মান রূপটি লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন সময়ের পোড়ামাটির কাজগুলিকে তুলনামূলকভাবে বিচার করলে পরবর্তী শতকের সংগে পূর্ববর্তী শতকের কাজগুলির ইতরবিশেষ সূক্ষ্মপার্থক্য সহজেই চোখে পড়বে। অবশ্য পার্থক্যটি শতকের ব্যবধানে এটি একান্তই কাল্পনিক। কেননা, শিল্প বা সাহিত্যের কোন বিশেষ দিক বা পার্থক্য সীমাবদ্ধ সময়ের ব্যবধানে সম্পূর্ণরূপে বোঝা যায় না। অলোকসামান্য কোন ব্যক্তিত্বের প্রভাবে শিল্প বা সাহিত্য এক নতুন পথে মোড় নেয়। ষোল শতকে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে সমাজের সর্বস্তরে সে এক সুদূরপ্রসারী ভাব-বিপ্লব ঘটে তার ফলে সাহিত্য ও শিল্পের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। শ্রীচৈতন্যোত্তর যুগে

মন্দিরটেরাকোটার যে অভাবনীয় উন্নতি হয়েছিল তা তৎপূর্ববর্তী যুগে ততখানি ছিল না। আঠারো শতক পর্যন্ত শ্রীচৈতন্য লীলার অনুকরণে শ্রীকৃষ্ণলীলা শিল্পীদের বিশেষ অনুপ্রেরণা দান করেছিল। অপৌরাণিক দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের কাহিনী অবলম্বনে (যা প্রাক্-চৈতন্য যুগের কবি চণ্ডী দাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে পাওয়া যায়) তৈরী হতে লাগল কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পোড়ামাটির শিল্প যা বেশীর ভাগ মন্দিরগাত্রেই এসময় উৎকীর্ণ হয়েছিল। রাধাকান্তপুরের (দাসপুর থানার অন্তর্গত) গোপীনাথ মন্দিরের কৃষ্ণলীলা নৌকা ও দানখণ্ডের কাহিনী নিয়ে পৃথক পৃথক টেরাকোটা স্থাপিত হয়েছে দেখতে পাওয়া যায়। নৌকাখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের নৌকাবিলাস অংশে তরঙ্গবিক্ষুব্ধ কালিন্দীর ওপর চলমান নৌকার দৃশ্য ও কৃষ্ণলীলা যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এর ঠিক ওপরের চিত্রটি দানখণ্ডের। কৃষ্ণলীলার অন্যান্য আরও চিত্র এ মন্দিরে পাওয়া যায়।

কৃষ্ণলীলা অনেক মন্দিরগাত্রে প্রাধান্য লাভ করলেও বিষ্ণুর দশাবতার চিত্রও বিরল নয়। দাসপুর অঞ্চলের প্রায় সব মন্দিরেই বুদ্ধ অবতারের পরিবর্তে জগন্নাথ স্থান পেয়েছেন দেখা যায়। বিষ্ণুপুরের মন্দিরেও এ রূপ আছে, আবার কোন কোন স্থানে শ্রীচৈতন্যকেও একাদশ অবতাররূপে কল্পনা করা হয়েছে। দাসপুর ও বিষ্ণুপুর বাঁকুড়ার কোন কোন মন্দিরে ষড়ভুজ গৌরাঙ্গের মূর্তিও দেখা যায়।

শ্যামসুন্দর পাটনায় দধিগমনের মন্দিরে পোড়ামাটির কাজ। প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৫৪ খৃঃ।
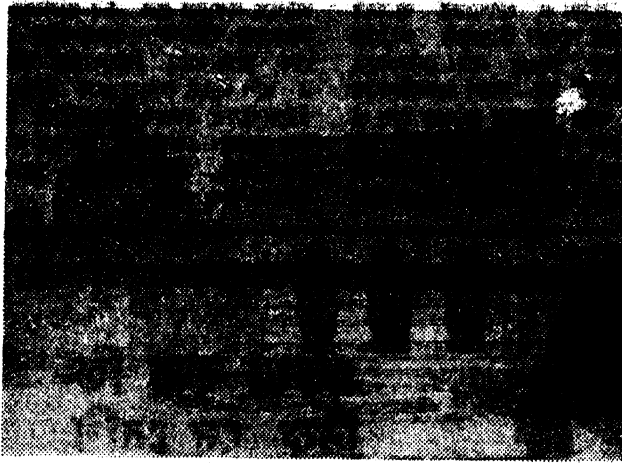
মন্দিরগাত্রে পোড়ামাটির নিদর্শনগুলির মধ্যে একটি বিষয় লক্ষণীয় হ'ল এই যে নানা ধর্মমতের সমন্বয় এসবের মধ্যে পাওয়া যায়। তাই রাধা-কৃষ্ণের মন্দিরে শিব, দুর্গা, কালী ও চামুণ্ডার মূর্তিও স্থান পেয়েছে। কোন কোন শিবমন্দিরে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তিও দেখা যায়। আবার যেসব মন্দিরে লৌকিক দেব-দেবীর বিগ্রহও স্থাপিত আছে যেমন, শীতলা, চণ্ডী, মনসা প্রভৃতি সেখানেও পৌরাণিক দেব-দেবীর মূর্তি ক্ষোদিত হয়েছে দেখা যায়। অনার্যপ্রভাবিত কোন কোন দেব-দেবীর মন্দিরে রাধাকৃষ্ণলীলার চিত্রও বিরল নয়। অবশ্য চৈতন্যোত্তর যুগে রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাহিনীর অত্যধিক জনপ্রিয়তার ফলে প্রায় সব মন্দিরের গায়ে টেরাকোটাবিন্যাসের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি আবশ্যিক ভাবেই উৎকীর্ণ হতে শুরু হয়েছিল, এটি মন্দিরটেরাকোটাগুলি লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা যায়। কিন্তু রাধা-কৃষ্ণের মন্দিরে তন্ত্রোক্ত দেবদেবীর মূর্তি উৎকীর্ণ হতে দেখে আজকালকার যুগে অনেকেরই আশ্চর্য হবার কথা। বিষ্ণুপুরের কোন কোন মন্দিরই এর প্রমাণ। বিখ্যাত কেষ্টরায়ের যোড়বাংলায় কালী, তারা, ভৈরবী প্রভৃতির মূর্তি আছে। শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের উদার মত-বাদের ফলেই এটি সম্ভব হয়েছিল। রাধা-কৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যের অলোকসামান্য লীলা তাই বাংলার যে কোন মন্দির তা শৈবই হ'ক বা শাক্তই হ'ক না কেন নির্দ্বিধায় গৃহীত হয়েছিল বলে পোড়ামাটির ভাস্কর্যে এঁরা স্বাভাবিকভাবেই স্থান পেয়েছেন।

মন্দিরের সম্মুখদিককে সুন্দর সুন্দর পোড়ামাটির কাজের দ্বারা যেমন অলংকৃত দেখতে পাওয়া যায় কাঠের তৈরী মন্দির-দ্বারও তেমনি। অবশ্য বর্তমানে বেশীর-ভাগ মন্দিরদ্বারের কোন অস্তিত্বই নেই। বহুদিন আগে এদের মধ্যে অনেকগুলিই অপসারিত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত যে সব মন্দিরে দেবীবিগ্রহ নিত্য পূজিত হচ্ছেন সে সব মন্দিরের যে দু-একটি দরজার নমুনা চোখে পড়ে তাতে স্বাভাবিকই আশ্চর্যান্বিত হতে হয়। মন্দিরদ্বারে পোড়ামাটির কাজের কোন প্রসঙ্গই ওঠে না। কারণ এটিই একমাত্র বস্তু যা মন্দিরাঙ্গের অন্যতম হয়েও সম্পূর্ণ ভিন্ন উপাদানে গঠিত। আমি উপাদান বলতে কাঠের কথাই যে বলছি পাঠকেরা তা আশা-করি বুঝতে পারছেন। কাঠ এমন একটি জিনিস যার ওপর খোদাই কাজ এক দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু মন্দিরদ্বারের এমন কিছু নমুনা আমার চোখে পড়েছে যার ভাস্কর্য-নিদর্শন সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে। উদাহরণস্বরূপ দাসপুর থানার শ্রীধরপুর গ্রামে রঘুনাথ মন্দিরদ্বারের উল্লেখ করা যেতে পারে। দ্বারের আয়তক্ষেত্রাকার দুটি কপাট ও এ দুটির মাথায় অর্ধচন্দ্রকৃতি যে শীর্ষদেশ আছে তার খোদাই কাজের প্রশংসা না করে পারা যায় না। কপাট দুটির অর্ধ-চন্দ্রাকার অংশে রাম-রাবণের প্রতিদ্বন্দ্বিত যুদ্ধদৃশ্যটির মধ্যে সার্থকভাবে যুদ্ধের তীব্রতাটাই ধরা পড়েছে। রামচন্দ্রের কোদণ্ডের আস্ফালনের কাছে দশাননের অস্ত্রের নিষ্ফল তুচ্ছ বলে মনে হয়। কপাটদুটির গায়ে ফুল ও লতাপাতার নকশাগুলির সূক্ষ্মতা চোখে পড়বার মতো না হলেও কারুকার্য হিসেবে এগুলি নেহাৎ নগণ্য নয়। এ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখতে হবে। কাঠখোদাইয়ের কাজে শিল্পীর দক্ষতা চাই অনেক বেশী। মাটির ন্যায় কাঠের যে যথেষ্ট ব্যবহার চলে না তা সকলেই স্বীকার করবেন। কাঁচা নরম মাটিতে মূর্তি বা কোন নকশা তৈরী করে ভাটায় পুড়িয়ে নিয়ে মন্দিরগাত্রে তা স্থাপন করা চলে। অবশ্য ঐ-কাজটি যে খুব সহজ ও সাধারণ একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। কাঠের কাজকে একেবারেই ফিনিশ্ করতে হয়, কাঁচামাটির মধ্যে খোদাই ভুল হলে যেমন তাকে আবার পরিবর্তন করে নেওয়া চলতে পারে, কাঠের কাজে তা হয় না। কাঠের শক্ত আবরণ ভেদ করে বিশেষ ধরণের মূর্তি বা সূক্ষ্ম নকশা এর ওপর খোদাই করা যে কতো কঠিন কাজ তা সাধারণের কাছে দুর্বোধ্য। কিন্তু বাঙ্গালী সূত্রধর যে একাজেও অসাধারণ দক্ষতা দেখাতে পেরেছিলেন তা প্রমাণ আজ অবশিষ্ট কয়েকটি মন্দিরদ্বারে পাওয়া যায়। বিষ্ণুর দশাবতারের সুন্দর কাজকরা মন্দিরদ্বারের দুটি কপাট আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় আছে। পল্লীতে পল্লীতে ঘুরলে হয়তো সুন্দর কাজকরা এ ধরণের দরজা আরও দেখতে পাওয়া যাবে। শ্রীধর-পুরে রঘুনাথমন্দিরদ্বারের আরেকটি স্থানে খোলবাদনরত কীর্তনীয়ার মূর্তিটির মধ্যে ভক্তিভাবের আবেশ এতই স্পষ্ট যে মূর্তিটির চোখেমুখে তা ফুটে উঠেছে। কীর্তনীয়ার দুদিকে বালগোপালের নৃত্য সাধকভক্তের হৃদয়মন্দিরে মানসপ্রত্যক্ষ হয়েছে। কাঠের তৈরী মন্দিরদ্বারে ঐ ধরণের আরও অনেক সুন্দর সুন্দর কারুকার্য চোখে পড়ে। কিন্তু বেশীরভাগ মন্দিরেই এ-সব কপাট বা দরজা আজ আর নেই। কাঠের স্থায়িত্ব খুব বেশী দিনের না

রাজবাড়ী এলাকায় একটি চাঁদনী মন্দির, অদূরে লালজীর বিশাল পাঁচিশ চূড়ার মন্দির।

হলেও অনেক ক্ষেত্রে এগুলি যে নানাকারণে অপসারিত হয়েছে তা বেশ বোঝা যায়।

মন্দিরগাত্রের পোড়ামাটির কাজ ও মন্দিরদ্বারের কাঠের কারুকার্য—এ দুটিতে প্রাচীন বাংলার ভাস্কর্যনিদর্শন যতটা মেলে অন্য কিছুতে বোধহয় ততটা পাওয়া যায় না। আজ মন্দির তৈরীর প্রয়োজন শেষ হয়েছে আর তার সঙ্গে যুগ শেষ হয়েছে টেরাকোটার যুগ। কিন্তু কাষ্ঠশিল্পের যুগ কখনও শেষ হবে বলে মনে হয় না। দেবমন্দিরের দরজা আজ বন্ধ হয়ে গেলেও মানবমন্দিরের দরজা কাষ্ঠশিল্পীর জন্যে অবারিতই রয়েছে। আজ নিত্য নতুন অট্টালিকা তৈরী হলেও তার গাত্রে পুত্তলিকা অলঙ্করণ ব্যাপারটা একেবারে দেশকাল-বিরোধী। কিন্তু কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের তৈরী পোড়ামাটির সুন্দর সুন্দর পুতুলগুলিকে যখন বাড়ীর ড্রইংরুমের সুসজ্জিত কেসে সাজানো দেখি তখন এগুলিকে টেরাকোটার নবতম রূপান্তর বলে মনে করতে দ্বিধা হয় না। আসলে শিল্পের নাশ কথনই হয় না, যুগ ও কালের বিচারে তার নব নব রূপান্তর হয় মাত্র।

চন্দ্রকোনার মন্দির

অতিসম্প্রতি যে বিদেশীটি এদেশের মন্দির নিয়ে গবেষণা সুরু করেছিলেন সেই স্বর্গত ডেভিড ম্যাককাচ্চন তাঁর বহু গ্রামপরিক্রমাকালে এসব মন্দিরের বহু আলোকচিত্র নিয়েছিলেন। তাঁর তোলা নেগেটিভের সংখ্যা যে কুড়ি হাজারেরও বেশী ছিল তা জানতে পেরেছি। অবশ্য এ-সবের মধ্যে মন্দিরগাত্রের টেরাকোটারও বহু নেগেটিভ ছিল। কিন্তু ডেভিড সাহেব মন্দিরের সন্ধানে বহু গ্রাম পরিক্রমা করলেও পশ্চিম বাঙলার সমস্ত স্থান (বিশেষ করে যেসব স্থানে মন্দির আছে) যে তাঁর ভ্রমণসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছিলেন তা মনে হয় না। নানা কারণে হয়তো তা সম্ভব হয়নি। তা সম্ভব না হলেও ডেভিড সাহেবের তোলা কুড়ি হাজার নেগেটিভ থেকে বাঙলার মন্দিরের এক বিরাট সংখ্যার কথাই মনে হয়।

চন্দ্রকোণা শহরটি মেদিনীপুর জেলার উত্তর ও পূর্ব সীমান্তের মাঝামাঝি অংশে অবস্থিত। প্রাচীন সমৃদ্ধির স্মৃতি ও নানা ধরনের মন্দির স্থাপত্যের নিদর্শন নিয়ে মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা শহরটি আজও তার পূর্ব গৌরবের স্মৃতি বহন করে চলেছে। প্রাচীন চন্দ্রকোণার সুসমৃদ্ধ রূপটি আজ হয়তো আর ওখানে পাওয়া যাবে না। কিন্তু বহু বিচিত্র মন্দিরস্থাপত্যে অলঙ্কৃত এই ধ্বংসোন্মুখ প্রাচীন শহরটি মন্দিরপ্রেমিকদের মনের খোরাক জোগাবার জন্যে একান্তই আকর্ষণীয়। তাই বাংলার

মজলিশ সাহেবের মসজিদের লিপির অংশ

মন্দির সম্পর্কে বলতে গেলে মন্দিরের দেশ চন্দ্রকোণার আলোচনা অপরিহার্য। প্রধানত দুভাবে কলকাতা থেকে চন্দ্রকোণায় পৌঁছানো যেতে পারে : (১) হাওড়া স্টেশন থেকে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের পাঁশকুড়া স্টেশনে নেমে পাঁশকুড়া-ঘাটাল বাসে উঠে মহকুমা শহর ঘাটালে নেমে ওখান থেকে ঘাটাল-মেদিনীপুর বাসে উঠে সরাসরি চন্দ্রকোণা শহরে (যা 'টাউন চন্দ্রকোণা' নামে ঐ অঞ্চলে পরিচিত) পৌঁছে যাওয়া যায়। চন্দ্রকোণা শহর ও চন্দ্রকোণা রোড পরস্পর আলাদা আলাদা জায়গা। আমাদের আলোচ্য মন্দিরগুলি হল চন্দ্রকোণা শহরে যেখান থেকে চন্দ্রকোণা রোড স্টেশন কিছুটা দূরে চন্দ্রকোণা রোড স্টেশন দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের খড়গপুর-আদ্রা ডিভিশনের একটি ছোট্ট স্টেশন। চন্দ্রকোণা রোড স্টেশনের পরে উত্তরদিকের স্টেশনটি হল গড়বেতা। গড়বেতার বিখ্যাত সর্বমঙ্গলার মন্দিরের কথা অনেকেই জানেন। ঘাটাল থেকে ক্ষীরপাই হয়ে চন্দ্রকোণায় পৌঁছতে এক ঘণ্টার বেশী সময় লাগে। (২) আবার খড়গপুর থেকে বাস বা ট্রেনে চন্দ্রকোণা রোড স্টেশনে পৌঁছে ওখান থেকে বাসে একেবারে চন্দ্রকোণা শহরে পৌঁছানো যেতে পারে। আমার এ ক্ষুদ্র পথনির্দেশিকা অনেকের জানা থাকলেও কৌতূহলী দর্শকেরা যাঁরা এ অঞ্চলে একবারও পদার্পণ করেন নি তাঁরা হয়তো এর থেকে এ অঞ্চলে আসার কিছুটা হদিশ পেতে পারবেন।

একটি প্রাচীন সমৃদ্ধিসম্পন্ন জনপদ হিসেবে চন্দ্রকোণা আজ একটি ঐতিহাসিক স্থান বলে প্রসিদ্ধ। এর প্রাচীন ইতিহাস ও সমৃদ্ধির কারণ আলোচনা অবশ্য এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আসাম সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ থেকে প্রকাশিত 'বাহারিস্তান-ই-খায়েরী' নামক ফরাসী বিবরণীর ইংরেজী অনুবাদ থেকে জানা যায় সতেরো শতকের গোড়ার দিকে চন্দ্রকোণার জমিদার ছিলেন চন্দ্রভান। বীরভান নামে আরও একজন জমিদারের নাম এ প্রসঙ্গে জানা যায় বীরভানের পুত্র হরিভান বা হরিনারায়ণের পত্নী লক্ষ্মণাবতী ১৫৭৭ শকাব্দ বা ১৬৫৫ খৃঃ চন্দ্রকোণার লালজীর বিখ্যাত নবরত্ন-মন্দিরটি তৈরী করিয়েছিলেন। লালজীর মন্দিরে উৎকীর্ণ একটি বৃহৎ শিলালিপি থেকে একথা জানা যায় (এ শিলালিপিটির উল্লেখ আগের একটি লেখায় করেছি)। একসময়ে সাহিত্যিক শ্রীবিনয় ঘোষের সঙ্গে গ্রামপরিক্রমা করতে করতে চন্দ্রকোণায় লালজীর মন্দিরের এ লিপিটির যথাযথ উদ্ধারকার্য আমাকেই করতে হয়েছিল। লিপিটির

মসজিদে প্রাচীন হিন্দু মন্দিরের অংশ

মর্ম হল ঃ পৃথিবীতে খ্যাতকীর্তি হরিনারায়ণের পত্নী, শ্রীবীরভানুর পুত্রবধূ, শ্রীছোলরায়ের কন্যা, মল্লরাজ শ্রীনারায়ণের ভগিনী এবং শ্রীযুত মিত্র সেনের মাতা শ্রীলক্ষ্মণাবতী রাধাকৃষ্ণের প্রীতির জন্য এই নবরত্নমন্দিরটি তৈরী করিয়েছিলেন। ১৫৭১ শকাব্দের (বা ১৬৪৯ খৃঃ) বৈশাখ-মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে এ মন্দিরটির নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়েছিল। আর শেষ হয়েছিল ১৫৭৭ শকাব্দ বা ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে।

সম্ভবত ভানরাজাদের আমলে বা তারও কিছু আগে থেকে চন্দ্রকোণার সমৃদ্ধির সূচনা হয়। সে-সময় ও তৎপরবর্তী সময়ে চন্দ্রকোণার এই সমৃদ্ধি ও বড় একটি জনপদরূপে তার পরিচয় প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। প্রবাদটি হল ঃ 'বাহান্ন বাজার তিপ্পান্ন গলি, তবে জানবি চন্দ্রকোণা এলি'। সেই বাহান্ন বাজার বা তিপ্পান্ন গলি আজ শুধু প্রবাদের মধ্যেই রয়ে গেছে। তার অস্তিত্ব চন্দ্রকোণার কোথাও তেমন লক্ষ্য করা না গেলেও শহরটির প্রাচীনত্ব ও সমৃদ্ধির চিহ্ন অনুমান করতে অসুবিধে হয় না। এককালে চন্দ্রকোণা ও তার পাশাপাশি আরও অনেক স্থান তাঁত, বাসন ইত্যাদি নানা শিল্পে ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল। ভানুরাজা ও ধনী ব্যবসায়ীদের দ্বারা এ অঞ্চলে সেসময়ে বহু মন্দির নির্মিত হয়েছিল। সেসব মন্দিরের বেশীর ভাগ আজ ভগ্ন, পরিত্যক্ত, জঙ্গল ও ঝোপঝাড়ে পরিপূর্ণ। বাঙলার পূজোপার্বণে ও উৎসবে, সন্ধ্যার শুভলগ্নে এসব মন্দির থেকে শাঁক-কাঁসরের মধুর শব্দ যে এককালে আকাশ-বাতাস মুখরিত করতো তা আজ কেবলমাত্র কল্পনাতেই থেকে গেছে।

ভানরাজা ও ধনীব্যবসায়ীদের প্রতিষ্ঠিত চন্দ্রকোণার এসব মন্দির লক্ষ্য করলে এ অঞ্চলের মন্দিরস্থাপত্যে উৎকলীয় রীতির প্রভাব বেশী করে চোখে পড়ে। অবশ্য বাঙ্গালী শিল্পীর নিজস্ব শৈলী চারচালা, আটচালা জাতীয় মন্দিরও এখানে কয়েকটি আছে। মিশ্ররীতির অনেকগুলি পঞ্চরত্ন ও নবরত্ন মন্দিরও এখানে আছে। চাঁদনী ও জোড়বাংলাও এখানে আছে। মোটকথা প্রায় সবরকম রীতির মন্দিরই চন্দ্রকোণায় দেখতে পাওয়া যায়। সেদিক থেকেও বাংলার দেবালয়স্থাপত্যের ক্রমপরিণতির রূপটি জানতে হলে চন্দ্রকোণার মন্দিরগুলির এক বিশেষ ভূমিকা আছে। মন্দিরস্থাপত্যে উত্তর ভারতীয় শৈলী, ওড়িষ্যায় যার নাম হল রেখদেউল, চন্দ্রকোণায় সে ধরনের মন্দিরের একটি বিশিষ্ট নিদর্শন হল রঘুনাথবাড়ীর অন্তর্গত রঘুনাথজীউর মন্দির। মন্দির সংলগ্ন জগমোহন ও মন্দিরটি অনেকাংশে পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরের অনুকরণে তৈরী। জগন্নাথদেবের মন্দিরের এ ধরনের অনুকৃতি চন্দ্রকোণা পেরিয়ে আরও উত্তরপূর্ব দিকে গেলে তেমন লক্ষ্য করা যায় না। বিশেষ করে ঘাটাল ও দাসপুর অঞ্চলে এ ধরনের রেখদেউল বাঙালী শিল্পীর হাতে নতুন রূপ পেয়েছে দেখা যায়। চন্দ্রকোণার রঘুনাথজীউর এ মন্দিরটিতে ও বাঁকুড়ার কিছু কিছু স্থানে পাথরের তৈরী এ জাতীয় মন্দিরে পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরের রূপটির অনুকৃতি এত স্পষ্ট যে এর থেকে মনে হয় ওড়িষ্যার রাজাদের আধিপত্য ও রাজ্যের আয়তন এসব অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল। রঘুনাথ জীউর এ মন্দিরটি পাথরের তৈরী ও পূর্বাভিমুখী। এই মন্দিরে রঘুনাথ, সীতা, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন প্রভৃতির মূর্তি আছে। এই মন্দিরের ঠিক সম্মুখে প্রাচীরের বাইরে হনুমানজীউর মন্দিরে রামচন্দ্রের নিকট রামভক্ত হনুমানের আজ্ঞা-প্রার্থনার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। এছাড়া রঘুনাথবাড়ীতে লালজীউ, আনন্দময়ী দক্ষিণাকালী ও রামেশ্বর শিবের মন্দিরও আছে।

চন্দ্রকোণা শহরের কাছাকাছি মল্লেশ্বরপুর গ্রামে মল্লেশ্বর জীউর ঠাকুরবাড়ী আছে। এই ঠাকুরবাড়ী রাজা খয়ের মল্লের প্রতিষ্ঠিত বলে জানা যায়। মল্লেশ্বর জীউর মন্দিরটি অতি উচ্চ ও প্রস্তরনির্মিত। এটি পঞ্চরত্নশ্রেণীর মন্দির। চন্দ্রকোণা শহরের দক্ষিণে বারদুয়ারী নামে চন্দ্রকেতু রাজার অন্দরমহলের যে ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় তার পশ্চিম দিকে একটি জোড়বাংলার মন্দির আছে। দক্ষিণবাজার গ্রামের জোড়বাংলা মন্দিরটির অবস্থা এখনও বেশ ভাল। কিন্তু চন্দ্রকোণার সবচেয়ে থেকে আকর্ষণীয় হল রঘুনাথপুরের পার্বতীনাথ শিবের সতেরো চূড়োর মন্দির। মন্দিরটি ইঁটের তৈরী ও বেশ প্রাচীন। এই মন্দিরটি ত্রিতল। চূড়াগুলি এই দুটি তলেই সন্নিবিষ্ট। চূড়াগুলিতে উৎকলীয় রীতির চেয়ে ইসলামীয় রীতির প্রভাবই বেশী। চন্দ্রকোণার লালবাজার গ্রামের রাধারসিক জীউর পঁচিশচূড়োর মন্দিরটি ইঁটের তৈরী। পোড়ামাটির সুন্দর কাজে সমৃদ্ধ এই মন্দিরটি চন্দ্রকোণার যে একটি দর্শনীয় মন্দির তাতে সন্দেহ নেই। এই মন্দিরগাত্রে রামায়ণ ও পুরাণের কাহিনী অবলম্বনে ভাস্কর্যনিদর্শনগুলি ছাড়াও গৌরাঙ্গলীলার কিছু কিছু নিদর্শনও উল্লেখযোগ্য। আজ ১৩১৭ সালে ভূমিকম্পে মন্দিরটির সম্মুখদিক পড়ে যাওয়ায় এর প্রস্তরলিপিটি নষ্ট হয়ে গেছে। পঁচিশচূড়ো মন্দির পশ্চিম বাঙলার খুব কম স্থানেই দেখতে পাওয়া যায়। কালনার (বর্ধমান) লালজী, কৃষ্ণচন্দ্র ও গোপালবাড়ীর বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী গ্রামের শ্রীধরের মন্দির ও চন্দ্রকোণার রাধারসিক জীউর মন্দির ছাড়া পঁচিশ চূড়োর মন্দির পশ্চিম বাঙলায় আর কোথাও আছে কিনা আমার জানা নেই। মন্দিরগবেষক সহৃদয় কোন ব্যক্তির কাছ থেকে এ বিষয়ে আরও খবর পেলে সুখী হবো।

উল্লিখিত মন্দিরগুলি চন্দ্রকোণার প্রসিদ্ধ মন্দির বলে পরিচিত। এছাড়াও নিজস্ব ও মিশ্র পদ্ধতির আরও অনেক মন্দির এখানে আছে যাদের সকলের কথা বললে এ প্রবন্ধের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। চন্দ্রকোণায় আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এখানকার কয়েকটি অস্থল। এর মধ্যে রামানুজ সম্প্রদায়ের একটি বড় অস্থল উল্লেখযোগ্য। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের বৈকুণ্ঠপুর অস্থল সম্পর্কে এ সিরিজের পূর্ববর্তী একটি লেখায় আলোচনা করেছি। চন্দ্রকোণার রঘুনাথগড়ের কাছাকাছি নবাগঞ্জগ্রামে রামানুজ সম্প্রদায়ের এ অস্থলটি অবস্থিত। কাছাকাছি নরহরিপুর গ্রামেও রামানন্দী সম্প্রদায়ের একটি ছোট অস্থল আছে। অস্থলটি বেশ প্রাচীন বলে অনেকের ধারণা। এছাড়া গোপীনাথপুর গ্রামে শ্রীরাধাগোপীনাথ জীউর শ্রীপাট, পুরুষোত্তমপুরের শ্রীভাগবত আশ্রম ও রঘুনাথপুরের শ্রীগৌর মন্দিরও চন্দ্রকোণার দর্শনীয় মন্দিরসমূহের অন্যতম।

লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে ধর্মঠাকুরের খুব প্রভাব এককালে যে চন্দ্রকোণায় ছিল তা এখানকার ধর্মরাজের বহু মন্দির দেখে অনুমান করা যেতে পারে। ধর্মঠাকুরের পুরানো মন্দিরগুলি দেখে এঁদের এ অঞ্চলে এক কালে প্রতিপত্তির কথা মনে হয়। গোবিন্দপুর, নরহরিপুর, জয়ন্তীপুর প্রভৃতি পাড়ায় কয়েকটি মন্দিরের মধ্যে ধর্মঠাকুর বিরাজিত আছেন। গোবিন্দপুরে বাঁকুড়া রায়, স্বরূপনারায়ণ প্রভৃতি ধর্মঠাকুর আছেন এবং তাঁদের সঙ্গে ধর্মকামিন্যা বারবুড়ী কালীবুড়ীও আছেন। নরহরিপুরে ধর্মকামিন্যা কনকাজি দেবী আছেন। জনৈক ... কোন বণিক ধর্মকামিন্যা কনকাজি দেবীর এ মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রায় ... বছর আগে। মন্দিরটির ... এক শিলায় ধর্মরাজকে দেখা যায়।

(আলোকচিত্র ডেভিড ম্যাককাচিয়নের)

বাচ্চা ছেলেটার বড় অসুখ। সকাল থেকে কাঁদছে কেবলই। উনি টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে লিখে চলেছেন ছাইপাঁশ। বললাম, একবার ডাক্তারের কাছে যাও। জবাব এল, আমার সময় কোথায়? লেখাটা শেষ করে রেডি হয়ে বেরুতে হবে না তাড়াতাড়ি, বাচ্চাদের ওরকম একটু-আধটু জ্বরজ্বালা হয়েই থাকে। ও আপনিই সেরে যাবে।

বুঝুন একবার। উনি যাবেন কোন চুলোয় সভাপতিত্ব করতে। ছেলে মরে মরুক, সভায় বক্তৃতা করার এমন সুযোগ তাঁর মতো সাহিত্যিকদের আবার কবে জুটবে ঠিক নেই। শুধু কি হাততালি, খবরের কাগজে নাম যায় হবে ছাপার অক্ষরে। দেশ-বিদেশের লোক বাবুর নাম দেখবে, খ্যাতি আর যশে দেশ ভরে যাবে। তা ফেলে কেউ ছেলের অসুখ নিয়ে মাথা ঘামায়। বিশেষ বলরাম ঘোষের মতো লেখকের পক্ষে রুগ্ন ছেলেকে কোলে নিয়ে ডাক্তারের বাড়ি ধর্ণা দেওয়ার প্রেস্টিজ টিলে হয়ে যায় না। ভিজিট দিয়ে ডাক্তার আনার মুরোদ যে নেই তা তো বোঝেনই!

যদি কোনদিন শুধান, কি লাভ হয় এই দৌড়াদৌড়িতে। কোন কথা না বলে হাসবে বোকার মতো মুচকে মুচকে, তারপর পকেট থেকে সভাপতিকে দেওয়া বাসি ফুলের মালাটা বার করে তার ঘ্রাণ নেবার চেষ্টা করবে। আমার ধারণা লাভ তো নেই-ই, বরং দূর-দূরান্তরে (মফঃস্বল ছাড়া বলরাম ঘোষকে কে আর ডাকবে) যাওয়া আসার ভাড়াটাও পকেট থেকে যায় সময় সময়। নদী পার হলে কে আর মনে রাখে প্যাটনীকে। গভীর রাত্রে সভার শেষে সভাপতিকে বাড়ি পৌঁছে দেবার ঘটনা যাদের ভাগ্যে ঘটে, সেরকম সাহিত্যিক এক আঙুলের কর গুণেই বলা যায়। তবু মোহ ঘোচে না। নামের মোহ।

শুনেছি প্রথম রিপুর তাড়নায় পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করে, মূক বাচাল হয়। আমার ধারণা চতুর্থ রিপুও কম অঘটন ঘটায় না এবং আমার জীবনেই তা ঘটে গেল। এককালে সুন্দরীই বলতো লোকে আমায়। বেশ ভাল জায়গায় বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল। ছেলে দেখতে এসেছিল নিজেই। সুপুরুষই বলা যায়। সকলের মতো আমারও পছন্দ। ঠাকুমা বললেন, যেন হরগৌরী মিলন হবে।

হরগৌরীর জায়গায় শেষপর্যন্ত মিলন হলো রাধাকেষ্টর। দাদার সঙ্গে বেড়াতে এসেছিল কেষ্টঠাকুর। বর্ণ কৃষ্ণ হলেও তার মনের রঙ সুন্দর। কল্পনায় যে কথা মাটিতে ফলায় সোনার ফসল, পুষ্পহীন বৃক্ষে ফুলের সমারোহ। বলা বাহুল্য দাদার একটু কবিতা লেখার বাতিক ছিল। সেই সূত্রে এই তরুণ সাহিত্যিকের সঙ্গে বন্ধুত্ব। সঙ্গে ছিল কয়েকটি লেখা। পড়ে শুধু মুগ্ধই হলাম না, স্বপ্ন দেখলাম রূপকথার রাজপুত্রের। বাবা-মার মত ছিল না। জায়গা জমি বাড়ি ঘর নেই, শুধু সম্বল এক চাকরি। হয়তো কেঁদেই ফেলতো। কিন্তু আমার সাত জন্মের শত্রু দাদার এক জ্বালাময়ী ভাষণের কথা আজও মনে পড়ে। জায়গা জমি টাকা পয়সা দিয়ে অভাব মেটায়, দেহের ক্ষুধা দূর হয় কিন্তু মনের ক্ষুধা মেটাতে গেলে মিলন [illegible]

সংস্কৃতির শরণাপন্ন হতে হয়। অর্থ দু-দিনের কীর্তি, সুনাম চিরকালের। কীর্তির্যস্য স জীবতি। সাহিত্য মানুষকে অমর করে রাখতে পারে। বাল্মীকি কালিদাস রবীন্দ্রনাথ—

ব্যস, ব্যস আর বলতে হয়নি। সাহিত্যিক ছিলেন দিন-তিনেক। এরই মধ্যে ফাঁকে ফাঁকে দু-একবার কাঁপনের দেখা, চার চোখের মিলন, একটু হাসি, একটু রোমাঞ্চ। সব বাধা দূর হল, সাহিত্যিকের বউ হলাম। স্বপ্ন দেখলাম তখন, সুখ-সমৃদ্ধি নাম যশের। কি হতাম বড় অফিসারের বউ হয়ে। হয়তো ঐ তথাকথিত বুর্জোয়া সমাজের মক্ষিরাণী হয়ে নেচে বেড়াতাম এদিক-সেদিক, নয়তো দু-চারজনকে নাচাতাম। কিন্তু অক্ষয় কীর্তির অধিকারিণী কি হতে পারতাম কোনদিনও!

সাহিত্যিকের বউ হয়ে আজ নামের ফাঁস গলার পরে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরতে বসেছি। আমার বিশ্বরূপ দর্শন হচ্ছে এখানে বসে। দেখছি সাহিত্যের এক বিরাট ভাঁটিখানায় নামের মদ জ্বাল দেওয়া হচ্ছে। অমৃতের স্বাদ কেউ পাচ্ছে না আর পাবার চেষ্টাও নেই। কড়াই-এর গা বেয়ে যে গাদ উপচে পড়ছে মাছির মতো তার জন্য লক্ষ করে তারই একটু স্বাদ নিয়ে আত্মারাম হবার জন্য কামড়াকামড়ি। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে সাহিত্যিকের দল। কে কাকে ল্যাং মেরে আগে পাতনায় মুখ দেবে তাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা। দেখে মনেই হবে না এরা মননশীল জীবনবাদী সাহিত্যরচনার জন্যই এ-পথে নেমেছে। জাতি গঠনের দায়িত্ব এদেরই, তরবারির চেয়ে কলম শক্তিশালী এ-কথা এদের কাছে প্রহসন মাত্র। এরা নাম কেনার ব্যবসাদার। ব্যবসাদার যেমন মুনাফা ছাড়া খরিদ্দারের কথা ভাবেই না, এদেরও নাম যশ অর্থ একমাত্র কাম্য। তাই উপন্যাস লিখছে সিনেমার দিকে লক্ষ্য রেখে। সিনেমার গল্প ছাড়া কিছুই নেই মাথায়। দু-চারজন আবার একচেটিয়া হতে চায়। এক-একটি পত্রিকা ঘিরে গোষ্ঠী, মধু খাবে কেবল স্তাবক ভ্রমরেরা। পালপার্বণে যেমন ব্যবসায়ীদের দু হাতে পয়সা লোটার মরশুম, তেমনি পূজো সংখ্যাগুলোয় এক-চেটিয়াদের এক-একজন আট-দশখানা করে উপন্যাস-নামের বস্তাপচা মাল ফেরি করে কেশ কিছু রেস্ত গস্ত করার পর ছুটবে পুরী, ওয়ালটেয়ার, দার্জিলিং ভ্রমণে।

আমি নাম-না-করা বলরাম ঘোষের স্ত্রী মালতি ঘোষ সেদিক দিয়ে ভাগ্যবতী! আমার স্বামী এখনও তেমন সাহিত্যিক হতে পারেননি, যিনি এই রাজ্যকে অন্য রাজ্যের সঙ্গে মার্জ করার স্বপক্ষে স্বাক্ষর করেছিলেন সরকারী পুরস্কারের লোভের আশায়। বিদেশী অর্থের টোপ গিলে সাহিত্যিকের জীবনধর্ম সংগ্রাম ও সংগ্রামী মানুষের বাঁচার প্রচেষ্টাকে বানচাল করার কাজে ব্যবহৃত হয়নি। প্রগতিশীল সাহিত্যের ভেক ধরে অশ্লীল যৌন সাহিত্যের বাজার বসাতে চায়নি যেখানে পচাই মদ খেয়ে মুখ দিয়ে গাঁজলা ঝরছে, আর কুকুরে সেই গাঁজলা চেটে খাচ্ছে। মানুষের সুস্থ সুখী জীবনধারাকে সস্তা যৌন সুড়সুড়ি দিয়ে বিপথগামী করার যে বিরাট ষড়যন্ত্র দেশী-বিদেশী ফড়েরা করছে, সে দলেও নেই। নাম ও অর্থের মোহে দেশের যুবশক্তির নৈতিক অধঃপতন ঘটাতে বলরাম ঘোষ সচেষ্ট বলে আমি বিশ্বাস করি না।

তবু নাম ও অর্থের মোহে ছোটার বিরাম নেই। বলরাম ঘোষ ছুটেছে সরল সহজ পথে। আর আমি মালতি ঘোষ চাইছি দুটো কোনরকমে খেয়ে পরে আস্তে আস্তে নিমতলার পথের দিকে যেতে। আমার বিলাসিতা এখন চা খাওয়ায়। তাও খেতে পারতাম না। প্রায়ই সাহিত্যিক বন্ধুদের জুটিয়ে আনতো আর এলেই হুকুম করতো চা-এর। তাও এক-আধ কাপ নয়, চার-পাঁচ কাপ। নিজের হাতে অনেক কষ্টে লুকিয়ে রাখতাম যে দু-চারটে পয়সা তাও ব্যয় হোতো বন্ধুদের পিছনেই। রেগে বলতাম—কি দরকার এই সব ইয়ার-বন্ধু জোটানোর?

আমার স্বামী অবাক হয়ে বলতেন—সে কি! এসব গুণী লোক, এঁদের আদর-আপ্যায়ন না করলে নাম হবে কি করে?

—দরকার নেই নামে? নাম ধুয়ে কি জল খাব?

—আহা চটো কেন? নাম মানেই অর্থ। একখানা উপন্যাস ধরাতে পারলে আর ভাবতে হবে না।

আমার স্বামীর এই সব কথায় হাসিও পেতো, দুঃখও হোতো। একটু নামের জন্য কি কাঙালপনা, লেখার জন্য যেটুকু সময় লাগে তাকে বই আকারে ছাপাতে কি ধান্ধাবাহিক পরিশ্রম করতে একটা গোটা জীবনেও কুলাবে না এমনই কঠিন বাজার। দশ ভাগ লেখার গুণ নব্বুই ভাগ দৌড়াদৌড়ি সুপারিশ স্তাবকতা।

এপর্যন্ত সাহিত্যিক বন্ধুরাই আসতো। এবার শুরু হোলো সম্পাদকের পদার্পণ। সম্পাদক থেকে এঁর পত্রিকার মালিক হিসাবে বড়। মালিক-সম্পাদক এই অবাঙালী ভদ্রলোকের প্রচুর অর্থ, অনেক ব্যবসা। এখন চমৎকার বাংলা বলেন আর প্রায় বাঙালী বলেই পরিচিত। এহেন সম্পাদকের দপ্তরে যেতেই হোলো একদিন আমার সাহিত্যিক স্বামীর পীড়াপীড়িতে। আমার আপত্তি টিকল না কোনরকমেই।

—গল্প-উপন্যাস লিখবে তুমি, সেখানে আমাকে কি দরকার?

—আহা বোঝ না, ভদ্রলোক আলাপ করতে চান।

আলাপ থেকে প্রলাপ। আমার মতো সুন্দরী বউ যার তার সাহিত্যে নাম করার ভাবনা নেই। অস্থির হলাম সম্পাদকের আদর-আপ্যায়নে। সাহিত্যিক কোণঠাসা। তাঁর বউয়ের মুখেই বলরাম ঘোষের পরবর্তী ধারাবাহিক উপন্যাসের খসড়া লেখা আছে। আবার আসব কথা দিয়ে উঠে এলাম কোনরকমে।

আমি না গেলে কি হবে, সম্পাদক রামরামবাবু নিজেই হাজির। ছোট্ট একখানা ঘরে কোথায়ই বা তাঁকে বসাই আর কি দিয়ে বা আপ্যায়িত করি। আমার হাতের তিক্ত কষায় কটু সবরকম স্বাদমিশ্রিত চা তিনি মুখে তুললেন অমৃত ভেবে। আমার সামান্য চা-এর লোভে অমন অসামান্য সম্পাদকের ঘন ঘন পদার্পণ ঘটতে লাগল।

এমনকি আমার সাহিত্যিক স্বামীর অনুপস্থিতিতেই।

—তোমার সম্পাদক কিন্তু কাল দুপুরে এসে হাজির। একখানা ঘর, শুয়েছি সবে, এর মধ্যে বাইরের লোক এলে বসাই বা কোথায় আর নিজেই বা চলাফেরা করি কেমন করে? ভদ্রলোককে বারণ করে দিও এভাবে আসতে।

—কেন কেন? সাহিত্যিক তো অবাক! তার বড় হবার যে স্বর্ণযুগ আপনা থেকেই ধরা দিয়েছে তাকে বোধহয় এবারে হেলায় হারালাম আমরা।
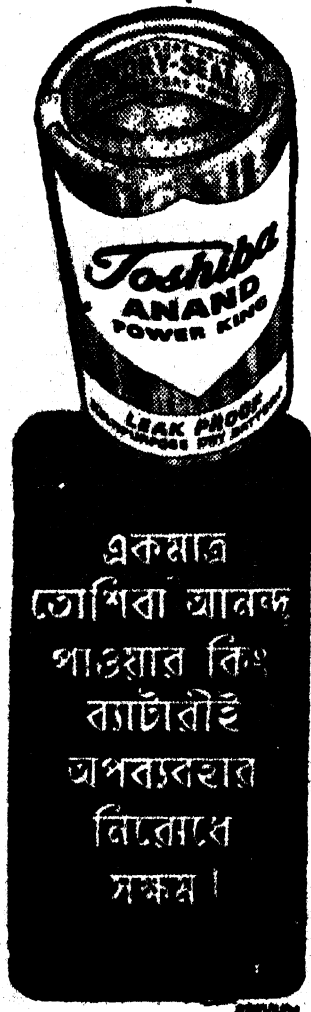
—ভদ্রলোকের মতিগতি ভাল নয়। তোমার উপন্যাস থেকে লোকের কাছে তোমার বউ, বুঝলে নামকাওলা সাহিত্যিক মশায়?

—যাও! কি যে বল! অমন মানুষ হয় নাকি? তুমি আদর-আপ্যায়ন করেছ তো ঠিক ভাবে?

—আমি আদর না করলেও তিনি যথারীতি আগ্রহ সহকারেই আসবেন মনে হচ্ছে। তুমি বরং আজ দুপুরে থেকে যাও। নয়তো ছুটি নিয়ে চলে এসো, আপ্যায়িত করবে ভদ্রলোককে।

—না, না আমার সময় কোথায়! তুমিই যা হোক ম্যানেজ কোরো।

বাধ্য হয়েই ম্যানেজ করতে হোলো আমাকে পাড়ার ছেলেদের দিয়ে। সন্দর মুখের জয় সর্বত্র। বৌদির বিপদে তারা এগিয়ে আসতে দ্বিধা করেনি কিন্তু যার এগিয়ে আসা দরকার তিনি সবে উপন্যাসটি সম্পাদক-মালিকের হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন। নামকরা লেখক ছাড়া ঐ বিখ্যাত মাসিক পত্রিকায় অন্য কারো লেখা ছাপে না। বলরামের মতো তরুণ সাহিত্যিকের ঘরে যখন ঐরকম মালিকের শুভ পদার্পণ ঘটেছে তখন তাকে কোনরকমে খুশি করতে পারলেই বাজীমাৎ। ধারাবাহিক লেখা 'পরাগে' এক সংখ্যায় বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে পাবলিশাররা ছুটে আসবে পুস্তকাকারে উপন্যাসটি ছাপার জন্য। বিশ থেকে শতকরা পঁচিশ ভাগ রয়্যালটি সুনিশ্চিত। তারপরই সিনেমা কন্ট্রাক্ট. হিট পিকচার অতঃপর ধীরে ধীরে নাম-ধাম গাড়ী-বাড়ি।...

মালিক ভদ্রলোক উপন্যাস ছাপার সনদ প্রাপ্তির আশায় তৈরী হয়েই এসেছিলেন। উনি ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ঘরখানা বাসমাতাল হয়ে গেল উগ্রগন্ধে। অস্পষ্ট কথায় আবেগ প্রকাশের পর আমাকে কাছে পাবার উদগ্র কামনায় এতদূর এগিয়ে এলেন যখন বাধ্য হয়ে চীৎকার করতেই হোলো আমাকে। আর তখনই ছেলেরা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমারই গাড়ীবাড়ির স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করতে আমারই ইঙ্গিতে।

পরের ঘটনায় কয়েকদিন সাহিত্যিকের কথা বন্ধ। মুখের দিকে তার চাওয়া যায়নি। যত ক্রোধ ঘৃণা সব একমুখে। আমি দোষ দিই না ওঁকে। নামের মোহ কি শুধু বলরাম ঘোষের? ইতিহাসের দিগ্বিজয়ী বীরেরা দেশ জয় করেছিলেন আর সেখানে জয়স্তম্ভ রেখে গিয়েছিলেন সে কি নামের মোহে নয়? তাজমহল তৈরী হয়েছিল কি শুধুই স্মৃতিরক্ষার্থে, তার পিছনে নাম কীর্তি এসবের সম্পর্ক ছিল না? মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের দিকপাল যারা, যাঁরা বৈষ্ণব পদাবলীর মহাজন তাঁদের ভণিতায় তাঁরা নাম রেখে যান নি অমর হয়ে থাকার জন্য? মহাভারতের দাতা কর্ণ তাঁর মূত্তাকবচ-কুণ্ডল দান করেছিলেন এমনকি পুত্র হত্যা করেছিলেন সেও কি এই দুর্লভ যশের কামনায় নয়? আজকের যুগের রাজনীতিবিদরা সংবাদপত্রে নাম ছাপানোর জন্য কি না করে? মন্ত্রী এম এল-এ হওয়ার জন্য দল ভাঙে। চোরাকারবারী একচেটিয়া শিল্পপতি সারাজীবন মানুষকে শোষণ করে শেষ বয়সে তীর্থস্থানে ধর্মশালা স্থাপন, হাসপাতাল বা বিদ্যালয় তৈরী করে তার পিছনেও ঐ একই ইতিহাস। সর্বত্র ঐ চতুর্থ রিপুর জয়জয়কার। সুতরাং আমার স্বামী ঐ নামের মোহের কাছে মাথা নত করবে তা এমন বেশী কথা কি।

কিন্তু আমার সাহিত্যিক স্বামী দমে যায়নি এতটুকু। শুধু আমার উদ্দেশ্যে একটি কথা বলেই সে সিনেমার লাইনের দিকে তার পদক্ষেপ বিস্তৃত করেছিল। আমাকে বলেছিল নিজের সর্বনাশ এমন করে কেউ করে এই আমি প্রথম দেখলাম।

সত্য আমার সর্বনাশ এমন করে ঘনিয়ে এসেছিল বুঝিনি। সিনেমায়ও ওর গল্প নেয়নি আশা দিয়ে তাতে নতুনত্ব নেই, বিপদও নেই। যে মেয়েটি আমাদের বাসায় দু-একবার এসেছিল সে লেখা ছাপানোর জন্য না এসে সিনেমায় নায়িকা হবার জন্য আমার স্বামীকে ধরেছিল তা জানতাম না। নায়িকা সে হয়নি কিন্তু আমার স্বামীর সহায়তায় ও প্ররোচনায় এক দুষ্ট চক্রের হাতে পড়ে নিষ্পাপ মেয়েটি হারিয়ে গিয়েছিল চিরকালের জন্য। তারই অনুশোচনায় আর মেয়েটির মায়ের অভিশাপে যখন উনি পাগলপ্রায় তখনই ঘনিয়ে এল চরম বিপদ। আমার স্বামীর বহু-আকাঙ্ক্ষিত সম্পূর্ণ উপন্যাস প্রকাশিত হোলো বিশেষ এক সংখ্যায়। অবশ্যই আমার স্বামীর নামে নয়, ঐ মালিক-সম্পাদকের নামে।

আপনারা যাঁরা তরুণ সাহিত্যিক বলরাম ঘোষকে চিনতেন তাঁরা যদি কোনওদিন দয়া করে আসেন তাঁকে চিনতে পারবেন বলে মনে হয় না। শিকল দিয়ে পাড়ার ছেলেরাই বেঁধে রেখে দিয়েছে জানলার গরাদের সঙ্গে। সারা শরীর তাঁর কাঁপে। সম্পূর্ণ উন্মাদ। কখনও হাসে, কখনও কাঁদে। শুধু মাঝে মাঝে 'আমার উপন্যাস বেরুবে, জানো, আমার উপন্যাস বেরুবে' বলে পাগলের সেই অট্টহাসি শুরু হয়। হয়তো রাঁচীতে পাঠাতে পারলে ভাল হয়ে আসতেন। কিন্তু ও'র তো কোন বন্ধু নেই। অবশ্য মালিক-সম্পাদক রামরামবাবু আমার স্বামীকে ভোলেননি। আমার স্বামীর উপন্যাসের লেখক হিসাবে তাঁর নিজের নাম ছাপা হলেও উৎসর্গ করা হয়েছে শুনলাম আমার স্বামীর নামেই। যদি ঐ উপন্যাস একখানা কিনে এনে স্বামীকে দেখাই তাতে কি ও'র পাগলামি কমবে না বাড়বে? শুনেছি উপন্যাসটা খুব নাম করেছে। এ খবরটা তাঁকে জানালে ফলাফল ভাল হবে না মন্দ হবে কেউ এই পরামর্শটুকু দিয়ে আমার উপকার করতে পারেন?

মিনতি মিত্র

বিরোধিতার মুখোমুখি রামমোহন

'যখন আমাদের আর্থিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক শক্তি ক্ষীণতম, যখন আমাদের দৃষ্টিশক্তি মোহাবৃত...আপন চিত্তদৈন্য সম্বন্ধে লজ্জা করবার মতো চেতনাও যখন দুর্বল, সেই দুর্গতির দিনেই রামমোহন রায়ের এদেশে আবির্ভাব।' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারত পথিক রামমোহন রায়)।

নানা চিত্ত-বিক্ষেপে সংসারে প্রাণের ভিত্তি যখন কেঁপে যায়, অশিব শক্তির কাছে শিব শক্তির অবমাননা যখন প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে তখনই সমাজের পাপ মর্মান্তিকভাবে দুর্ভর বলে মনে হয়। সাধারণ মানুষ আর্ত-কণ্ঠে আকুতি জানায়, দুঃখ দূর করো, বিপদ মুক্ত করো, বাধা অপসারিত হোক। দেশে যখন অসত্যের কালিমায় চারিদিক অন্ধকার, অমানুষে দেশ যায় ভরে, মিথ্যা অহংকার মাথা উঁচু করে চোখ রাঙায়, তখনই দেশের প্রকৃত দুর্দিন। আমাদের ভারতবর্ষেও ঠিক এমনই দুর্দিন উপস্থিত হয়েছিল। সে আজ দুশো বছর আগেকার কথা। সে সময় মানুষের কত দীনতা, কত কলুষ, কত হিংসা-দ্বেষ জমা হয়েছিল। চলার পথে এই পাহাড়-প্রমাণ বাধা কল্যাণ-তপস্যার পথকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। এমনই এক ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্যে দেশে যখন কেবল আগাছারই জন্ম ছিল স্বাভাবিক, সেই দুঃসময়ে জন্মেছিলেন রামমোহন। গাঢ় তমিস্রা, চরমতম অজ্ঞতা জাতির মজ্জায় মজ্জায় যখন অনুপ্রবেশ করেছিল, সেই বিমুখতা ও বৈরিতার দিনে রামমোহনের বজ্রকণ্ঠে নিনাদিত• হয়েছিল, ভারতের সত্যমন্ত্র, চিরন্তন ঐক্যমন্ত্র। একমুহূর্তে তিনি যেন জানিয়ে দিলেন, কলুষকে উত্তীর্ণ হতে হবে, সংকীর্ণতাকে জয় করতে হবে। তাই মহাপুরুষের ইংগিতমাত্র সাধারণ মানুষ সচকিত হয়ে কান পেতে রইল। এদেশের পুরাতন অভয়মন্ত্র, নতুন শক্তিতে উচ্চারিত হল রামমোহনের বাণীতে। মৃত্যুঞ্জয়ের নৃত্যচ্ছন্দ রূপ পেল তাঁর কার্যকলাপে। তিনি বললেন যে, দুঃখ যত তীব্র হোক, ক্লেশ যতই অনতিক্রমণীয় হোক, তাকে পরাজিত করতে হবে। অকল্যাণের দুঃখের মধ্য দিয়ে কল্যাণের জয়যাত্রায় উত্তীর্ণ হতে হবে। তাই 'সুখ নয়, খ্যাতি নয় বিরুদ্ধতার' বন্ধুর পথই তাঁকে বেছে নিতে হল। একথা সর্বজনবিদিত যে, বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের প্রবর্তন করেছিলেন বলে তাঁকে নিজভূমে পরবাসী হতে হয়েছিল। আর রামমোহনকে স্বজন-পরিত্যক্ত হয়ে শ্মশানবাসী হতে হয়েছিল তাঁর সমাজ-সংস্কারের অপরাধে।

কোন মনীষীই তাঁর সমসাময়িক কালে পূর্ণমূল্যে ভূষিত হন না। চৈতন্যদেব থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ অবধি আমাদের দেশে কোন লোকোত্তর পুরুষের বেলাতেই এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। কিন্তু রাম-মোহনের ক্ষেত্রে যে চূড়ান্ত বিরোধিতা হয়েছিল, তার দৃষ্টান্ত বুঝি দুর্লভ। তাঁর কর্মকান্ড পর্যালোচনা করলে এই কথাই প্রমাণিত হবে, তীব্র বিরুদ্ধতার জ্বালা তিনি যত সহ্য করেছিলেন, তেমন বোধহয় আর কাউকেই করতে হয়নি। ধর্মসংস্কারে, সমাজ-সংস্কারে, নিজের জীবনসংগ্রামে প্রতি পদক্ষেপে বিরূপতা তাঁর জীবনের গতিবেগকে করেছিল খরতর।

জীবনের সুনিশ্চিত ক্ষেত্রে নেমে আসার অনেক আগে হিন্দু পৌত্তলিকতার বিরোধিতা করায় রামমোহনের সঙ্গে তাঁর পিতার মতান্তর হয় এবং এই কারণে তিনি বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। সেই সময় তিনি ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের বাইরেও কিছু কিছু দেশ ভ্রমণ করেছিলেন। বলতে গেলে, এই সময়েই তাঁর অর্ধস্ফুট মনটি তৈরী হবার অবকাশ পেয়েছিল। পিতৃকুল এবং মাতৃকুলের উদার এবং রক্ষণশীল বিচিত্রতার মধ্যে পড়ে ইতিমধ্যেই রামমোহন কিছু কিছু ভাষা, ধর্ম, স্মৃতিশাস্ত্র শিক্ষা করেছিলেন। এইভাবে নৈতিক দিক থেকে

*

পুষ্ট চিরেটি পরিচিত গন্ডী ছেড়ে এসে প্রকৃতির উন্মুক্ত আবহাওয়ায় যেন অবগাহন করল। এবং তাঁর দৃষ্টির সামনে নতুন এক দিগন্ত উন্মোচিত হল। ভিতর এবং বাহির—এর অপূর্ব সংমিশ্রণে রামমোহনের অন্তরটি এমন এক পূর্ণতা লাভ করল, যাতে ভবিষ্যতের কর্মশক্তির অনেকখানিই সঞ্চিত হয়ে গেল তখনই। রামমোহন দৃঢ় পদক্ষেপে জীবনের পথে পা বাড়ালেন।

ধর্মসংস্কারের ক্ষেত্রেই প্রথম তাঁর হাত পড়ল। জীবনের প্রথম থেকে প্রচন্ড রক্ষণ-শীলতার মধ্যে বর্ধিত হওয়ায় মানুষের ধর্মান্ধতা তিনি দেখেছিলেন। এই গোঁড়ামি তাঁর কাছে অসহ্য বোধ হল। তাই তিনি হিন্দু ধর্মশাস্ত্র বেদান্ত পাঠ করে লিখলেন, 'বেদান্তসার'। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর বন্ধু জন ডিগবীর হাতে ইংরেজীতে এর অনুবাদ বেরোল। এই ইংরেজী অনুবাদের মাধ্যমে রামমোহনের সঙ্গে রক্ষণশীলদের ধর্মীয় বিরোধ বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রকাশ হয়ে পড়ল। হিন্দুধর্মের এই পরিশীলিত যুগোপযোগী ব্যাখ্যার জন্যে তিনি কোথাও পেলেন অকুণ্ঠ প্রশংসা আবার কোথাও উঠল তাঁর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার। কিন্তু মোটামুটিভাবে সমগ্র হিন্দু সমাজের রোষ গিয়ে পড়ল তাঁর ওপর। ধর্ম যে মানুষের হাত বদল হয়ে ইচ্ছামত ব্যাখ্যাত হতে পারে এবং যে কোন ভাষায় অনূদিত হয়ে অনুবাদকের মতামতের বিষয় হতে পারে এমন অভিজ্ঞতা তৎকালীন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজকে চঞ্চল করে তুলে-ছিল। তাদের আক্রোশ ক্রমেই বেড়ে উঠল। এই উত্তেজনা হ্রাস করার জন্য রামমোহন এগিয়ে এলেন, কিন্তু এতে তাদের অন্ধ আবেগ বিপরীত পথ ধরল। তাদের অসহিষ্ণুতার আর সীমা রইল না। শোনা যায়, এই সময় রক্ষণশীল ব্রাহ্মণদের দ্বারা তাঁর দু-দুবার প্রাণ সংশয় পর্যন্ত ঘটেছিল। অজ্ঞতাবশে রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের ধারণা হয়েছিল যে, 'বেদান্তসার' বা অনূদিত উপনিষদের সমস্ত ব্যাখ্যা রামমোহনের নিজস্ব। তার সঙ্গে আদি এবং অকৃত্রিম হিন্দু-ধর্মের কোন সম্পর্কই নেই। রাম-মোহন যে পথে হিন্দু সমাজের কোপকে প্রশমিত করতে গিয়েছিলেন তা হল, জ্ঞানের পথ। তাই অনিবার্যভাবেই সে পথে তিনি হতাশ হলেন। জনসাধারণ তাঁকে ক্রমাগতই ভুল বুঝতে শুরু করল। মানুষের শুভবুদ্ধির দ্বারে তিনি বারে বারে আঘাত করলেন। কিন্তু সবই বৃথা হল। ব্যর্থ হলেন রামমোহন। প্রথমে মৌখিক তর্ক-বিতর্ক পরে মসীযুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন বিরোধী পক্ষ। সে ঘটনা সর্বজন বিদিত।

এদিকে ১৮১৬ সালের ১৯শে নভেম্বরে ক্যালকাটা গেজেটে রামমোহনের উপরিউক্ত প্রচেষ্টা অর্থাৎ হিন্দুধর্মের নবতর ব্যাখ্যার জন্যে তাঁকে অভিনন্দিত করা হল। এই সময়েই মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' প্রকাশিত হল 'বেদান্তসারে'র প্রতিবাদে। 'বেদান্তচন্দ্রিকা' বাংলা ও ইংরিজী ভাষায় প্রকাশিত হওয়ায় রামমোহন এর উত্তরও বাংলা এবং ইংরিজীতেই দিলেন। এই বই দুখানি হল—'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' ও

> A second defence of the monotheistical system of the Vedas; in reply to an apology for the present state of Hindoo worship.

রামমোহন শাস্ত্র থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি সহযোগে নিজ বক্তব্যের সারবত্তা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ভট্টাচার্যের কটু কথার উত্তরে একটিও দুর্বাক্য বা ব্যঙ্গ প্রয়োগ করেন নি। বরং তিনি সেকথার জবাব দিয়েছিলেন এইভাবেঃ

'অস্মাদিগের সম্বন্ধে যে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, দুর্বাক্য ভট্টাচার্য লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর না দিবার কারণ আদৌ এই যে পরমার্থ বিষয়-বিচারে অসাধু ভাষা এবং দুর্বাক্য কথন সর্বথা অযুক্ত হয়।...অতএব ভট্টাচার্যের দুর্বাক্যের উত্তর প্রদানে আমরা অপরাধী রহিলাম।'

এই উত্তরদান কালে রামমোহনের অমিত সংযম এবং শালীনতাবোধ উল্লেখযোগ্য। তিনি বার বার এইরকম সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। যুক্তির সারবত্তা যেখানে অনমনীয়, দুর্বাক্য প্রয়োগের কোন প্রয়োজনীয়তাও সেখানে অনুভূত হয় নি। এই শুচিস্নিগ্ধ সৌন্দর্যবোধ রামমোহনের বিধি-নির্দিষ্ট বন্ধুর যাত্রাপথকে চিরদিন আকর্ষণীয় করে রেখেছিল।

মৃত্যুঞ্জয়ের পর রামমোহনের বিরুদ্ধে অসিধারণ করলেন জনৈক গোস্বামী। তাঁর ১১ পৃষ্ঠাব্যাপী পুস্তিকার উত্তরে রামমোহন ৫০ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি পত্র লেখেন। এর রচনাকাল ১৮১৮ খৃঃ জুন মাস; নাম—'গোস্বামীর সহিত বিচার'। গোস্বামীর সঙ্গে বিচারের পর রামমোহনের বিরোধিতায় এগিয়ে এলেন জনৈক কবিতাকার। কবিতাকারের লক্ষ্য কেবলমাত্র রামমোহনই ছিলেন না, তাঁর অনুবর্তী সকলেই ছিলেন এই বিরোধের লক্ষ্য। কবিতাকারের বিরোধ প্রতিপক্ষকে অনেক নিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনে। তিনি রামমোহনকে 'পাষণ্ড', 'নাস্তিক' ইত্যাদি আখ্যায় চিহ্নিত করতে দ্বিধা করেন নি। ভট্টাচার্য, 'গোস্বামী' অথবা কবিতাকার সকলেই তর্কের মুক্ত লক্ষ্য থেকে চ্যুত হয়ে ব্যক্তিগত আক্রোশের বশবর্তী হয়ে উঠেছিলেন। অন্যথায় তাঁদের ব্যক্তি-রামমোহনের বিরোধী হয়ে ওঠার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না; তাঁরা মতামতের বিরোধী হতেন মাত্র। যাইহোক, কবিতাকারের বক্তব্যের উত্তরে রামমোহন লিখলেন, 'কবিতাকারের প্রতি ক্রোধ না জন্মিয়া দয়ামাত্র জন্মে।...'

ইতিমধ্যে দেশে রামমোহন এবং তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা বেশ গোচর হয়ে উঠেছেন। উভয়পক্ষে দ্বন্দ্ব রীতিমত জটিল রূপ নিয়েছে। হিন্দুধর্মকে যে কোন ভাবেই স্পর্শ করুন না কেন রামমোহন, সেটা রক্ষণশীল সমাজের কাছে আঘাত বলেই মনে হয়েছে। তাই অপর পক্ষও পাল্টা আঘাত হানার জন্যও সর্বদাই প্রস্তুত হয়ে থাকতেন। এরকম একটা ঘটনা ঘটল ১৮২২ খৃঃ। ঐ সময় সমাচার দর্পণে জনৈক রক্ষণশীল ধর্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর ছদ্মনামে চারটি প্রশ্ন পাঠালেন। এই প্রশ্নের উত্তরও দিলেন রামমোহন ছদ্মনামে। নামটি হল—'শিবপ্রসাদ শর্মা'। এই প্রশ্নে রামমোহনের প্রতি ব্যক্তিগত ইঙ্গিত ছিল। প্রশ্নকর্তার স্পষ্ট বক্তব্য ছিল, রামমোহন পুরোপুরি একজন ভণ্ড। কারণ, যে ম্লেচ্ছ সেবা করে, সুরাপান করে, আহারের জন্য প্রাণী বধ করে, তার যজ্ঞোপবীত ধারণ করা ভণ্ডামি মাত্র। চমৎকার একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে রামমোহন এ কথার জবাব অবশ্য দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন:

'আর যদি এক ব্যক্তি বহুকাল ম্লেচ্ছসেবা ও ম্লেচ্ছকে শাস্ত্র অধ্যাপনা করিয়া এবং ন্যায়-দর্শন ভাষাতে রচনাপূর্বক ম্লেচ্ছকে তাহা বিক্রয় করিতে পারে, সে আস্ফালন করিয়া অন্যকে কহে, যে তুমি ম্লেচ্ছের সংসর্গে কর এবং দর্শনের অর্থ ভাষায় বিবরণ করিয়া ম্লেচ্ছকে দেও অতএব তুমি স্বধর্মচ্যুত হও, তবে সে ব্যক্তিকে কি কহা উচিত।'

প্রশ্ন-কর্তা এই উত্তরে আরও বিরক্ত হয়ে 'পাষণ্ডপীড়ন' নামে এক পুস্তক প্রকাশ করে কিছুটা গাত্রদাহ নিবারণ করেন। এই পুস্তকে ধর্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী অর্থাৎ কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন রামমোহনের উত্তর দেওয়ার ছলে তাঁর বাসস্থানের উল্লেখ করে তীব্র আক্রমণ করেন। রামমোহনের বিরুদ্ধে 'পাষণ্ডাশ্রমবাসী' কথাটি তিনি ব্যবহার করেন। এই উদ্ধত আক্রমণের প্রত্যুত্তরে রামমোহন লিখলেন: 'পথ্যপ্রদান'। রামমোহনের রুচির উৎকর্ষ বিরুদ্ধবাদীদের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আর একবার প্রমাণিত হল। আর একবার তাঁর সমুন্নত চেতনার প্রমাণ পাওয়া গেল 'পাষণ্ডপীড়নে'র উত্তর 'পথ্যপ্রদানে'।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে সর্বধর্ম-সমন্বয়ের যে জোয়ার এসেছিল, তার সূচনা দেখা গিয়েছিল রামমোহনের সময় থেকেই। রামমোহন একাধারে যেমন হিন্দুধর্মের সার সংগ্রহ করে নতুন ধর্মের প্রবর্তন করেন, অন্যদিকে তেমনই খৃষ্টান ধর্মের মূল বিষয় অবগত হয়ে অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য বিধানে প্রয়াস পেয়েছিলেন। এ কাজেও তাঁকে বিরোধিতারই সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এবং সে বিরোধিতার জ্বালা রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের বিরোধিতার তীব্রতার চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। প্রকৃত পক্ষে হিন্দুসমাজের সঙ্গে খৃষ্টান সমাজের ধর্মবিরোধ দেশে উপস্থিত ছিলই। সেই বিরোধ রামমোহন নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। দেশের লোকের পক্ষ অবলম্বন করে হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য শ্রীরামপুরের খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে রীতিমত বোঝাপড়া করতে তিনি প্রবৃত্ত হলেন। মুখ্যতঃ এই উদ্দেশ্যেই তিনি দুখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। একখানি ইংরিজী ভাষায় ও অন্যখানি বাংলায়। ইংরিজী কাগজের নাম 'ব্রাহ্মিক্যাল ম্যাগাজিন' ও বাংলাখানির নাম 'ব্রাহ্মণ-সেবধি'। সেযুগে নিজস্ব মুখপত্র ব্যতিরেকে নিজের বক্তব্য প্রকাশে অসুবিধা ছিল। সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিমাত্রই তাই নিজস্ব মুখপত্র রাখবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন।

১৮২০ খৃঃ রামমোহন 'প্রিসেপটস অফ জেসাস, গাইড টু পিস অ্যাণ্ড হ্যাপিনেস' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। এটি মোটামুটিভাবে যীশুর উপদেশের সঙ্কলন। এই বইখানি মিশনারী সমাজে রামমোহনের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও অপ্রীতি প্রচারের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মিশনারী সম্প্রদায় এত ক্রুদ্ধ [illegible] রামমোহনের বিরুদ্ধে সমালোচনায় তাঁরা সাধারণ এবং সামান্যতম শিষ্টতাও বজায় রাখতে পারেননি। সেই সমালোচনা থেকে দু-একটি কটূক্তি এখানে উদ্ধৃত করলেই মিশনারীদের হঠকারিতার উত্তাপ অনুভূত হতে পারবে। কটূক্তির নমুনা:

'মিথ্যার পিতা যাহা হইতে হিন্দুর ধর্ম উৎপত্তি হয়', 'হিন্দুর মিথ্যা দেবতাদের মিশ্রিত বর্ণন সকল' ও 'হিন্দুদের মিথ্যা দেবতা সকল' ইত্যাদি।

'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র ৩৮ সংখ্যায় হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে এইরকম মন্তব্য প্রকাশিত হলে রামমোহন অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তার প্রতিবাদ জানালেন। তিনি লিখলেন, 'এদেশের লোকের নীতি ও ধর্মের ত্রুটি বিষয়ে যাহা আপনি লিখিয়াছেন, তাহাতে এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদের ও ইউরোপ দেশীয়দের গার্হস্থ্যধর্ম বিষয়ে উৎপ্রেক্ষা দিয়া দোষের ন্যূনাধিক্য অনায়াসে আমি দেখাইতে পারিতাম কিন্তু শাস্ত্রীয় বিচারে এরূপ দ্বন্দ্ব করা অনুচিত সুতরাং তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলাম...।'

পাশ্চাত্যের রেনেসাঁয় ধর্মের পুনর্মূল্যায়ন হয়। এই নবজাগরণের সূচনায় বাইবেলের বহুল সমালোচনা হয়। বাইবেলের সমালোচনা এই প্রথম এবং এটি ঘটে ফ্রান্সে। এই সমালোচনার ফলে প্রতীচ্যের খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বিমত দেখা যায়। কোন কোন খৃষ্টান প্রাচ্য ধারা অনুযায়ী একেশ্বরবাদে আস্থা স্থাপন করেন। আবার অনেকেই খৃষ্টীয় ধর্ম মতানুসারে ঈশ্বরের 'ত্রিত্ববাদ' স্বীকার করেন। একেশ্বরবাদের প্রবর্তকদের মধ্যে রামমোহন অন্যতম বলে ওদেশের খৃষ্টমতাবলম্বীরা আজও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। কিন্তু উক্ত চিন্তাধারার প্রবর্তক বলেই এদেশীয় খৃষ্টানেরা আবার রামমোহনের নিন্দায় মুখর হয়ে ওঠেন এবং এদেশের সমগ্র মিশনারী সমাজ হঠাৎ রামমোহনের তীব্র বিরোধী হয়ে ওঠেন। তাঁদের সন্তুষ্ট করার জন্য 'অ্যান অ্যাপিল টু দি ক্রিশ্চয়ান পাবলিক' শিরোনামে এক আবেদন রামমোহন খৃষ্টান সমাজের কাছে উপস্থিত করলেন। এই আবেদনপত্র প্রচারের আগেই খৃষ্টান ধর্মের মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়ার জন্য রামমোহন হিব্রু ভাষা শিখে মূল ওল্ড টেস্টামেণ্ট এবং গ্রীক ভাষা শিক্ষা করে নিউ টেস্টামেণ্ট পড়ে শেষ করেছিলেন। এতখানি নিষ্ঠার কোন মূল্যই কিন্তু তিনি তাঁর প্রতিপক্ষের কাছ থেকে পাননি। চারিদিকের এহেন অসহিষ্ণুতার আবর্তে পড়ে রামমোহন কতকটা হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। বিশেষ করে ইংরেজ মিশনারীদের গোঁড়ামিতে তিনি বিস্মিত এবং তাদের প্রতি বিদ্বিষ্টও হলেন। কিন্তু কর্মী মানুষ এক কূল হারিয়ে অন্য কূলে গিয়ে তরী ভিড়ালেন নতুন কর্মের প্রেরণায়।

১৮৩১ খৃঃ স্কচ মিশনারী আলেকজাণ্ডার ডাফ তাঁর আশ্রয়প্রার্থী হলে তিনি তাকে আশ্রয় দেন। তিনি হয়ত ভেবেছিলেন, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। এক [illegible] প্রতারিত হলেও সর্বত্র নিশ্চয়ই তিনি প্রতারিত হবেন না। তাই তাঁর

সাধ্যানুসারে সর্বরকমে সহায়তা দিয়ে তিনি ইংরেজ নয়, স্কচ মিশনারীকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। ডাফের স্কুল প্রতিষ্ঠিত হল হিন্দু কলেজের পাশেই। কাছাকাছি তিনি বসবাসও শুরু করলেন। হিন্দুধর্মের ভ্রান্তি ও ত্রুটি-গুলির প্রতি হিন্দু কলেজের শিক্ষিত এবং বুদ্ধিদীপ্ত ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করানোই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য। আশ্চর্য, এমন ঈর্ষার কথা কিন্তু রামমোহন দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেননি। পরে দেখা গেল, ডাফ এবং ডিরোজিওর তত্ত্বাবধানে এদেশের নব্য যুবক সম্প্রদায় যাদের হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই ছিল না, তারাই হিন্দুধর্মের সমালোচক হয়ে উঠল এবং অধ্যাপক ডিরো-জিওর প্রচেষ্টায় সম্যকরূপে হিন্দুধর্ম বিদ্বেষী হয়ে উঠতে তাদের অনেকেরই বাধা রইল না। এইভাবে প্রতি বছরে কত যে উদ্দীয়মান তরুণ ধর্মীয় বিবাদের যূপকাষ্ঠে বলি হলেন তার সংখ্যা নেই। এইভাবে খৃষ্টান সমাজের দ্বারা যুবশক্তির প্রচণ্ড অপচয় ঘটতে লাগল। দেশে জনরব উঠল, হিন্দু কলেজের ভাল ছেলেরা সকলেই খৃষ্টানধর্ম গ্রহণ করবে। আর ঠিক এই সময়েই জোর করে খৃষ্টানধর্মে দীক্ষিত করার দু-একটি সংবাদে পরিস্থিতির গুরুত্ব বেড়ে গেল অনেকখানি।

রামমোহনের সাহায্যপুষ্ট ডাফ সাহেব ১৮৩০ থেকে ১৮৬৩ খৃঃ পর্যন্ত এদেশে মিশনারীর কাজে লিপ্ত ছিলেন। রামমোহনের সহায়তা ব্যতিরেকে তিনি

কোনমতেই এদেশে এতখানি প্রতিষ্ঠা পেতে পারতেন না। এবং এই দীর্ঘ সময় এখানে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে অতিবাহিত করতে পারতেন না। কিন্তু তিনি দেশে ফিরে গিয়ে এদেশের সমস্ত সুখস্মৃতি ভুলে গিয়ে 'ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান মিশন' নামে একখানি বই প্রকাশ করেন। তাতে হিন্দুধর্মকে তিনি বিশেষভাবে বেদান্তকে অত্যন্ত নগ্নভাবে আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, হিন্দুধর্ম অর্থহীন এবং নীতিহীন। সর্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও খৃষ্টান স্কচ মিশনারীদের ব্যবহারে রামমোহন অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। এদেশীয় লোকদের জোর করে খৃষ্টান করার চেষ্টাকে তিনি কঠোর ভাষায় ধিক্কৃত করেন। এ বিষয়ে তিনি দুটি কারণের উল্লেখ করেছিলেন :

'খৃষ্টানরা নিজেদের চেষ্টা নিজেরাই প্রতিহত করেন কারণ তাঁহারা যে সমস্ত জাতি খৃষ্টান চার্চের মতামত এবং অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের কথা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নয় তাহাদিগের উপর সেইগুলিই চাপান। তাহার ফল হইয়াছে এই যে দেশের লোকেরা বাইবেল পড়িয়া কোথায় উপকৃত হইবে তা নয় অনেক সময় বিনামূল্যে প্রাপ্ত বাইবেল গ্রন্থগুলি তাহারা সাদা কাগজের মত ব্যবহার করিয়া থাকে। আর কথাবার্তা বলিবার সময় খৃষ্টানী মতামতের ভাষা অত্যন্ত অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ব্যবহার করে।'

'এ পর্যন্ত যাহারা খৃষ্টানধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে তাহারা প্রায়ই অশিক্ষিত শ্রেণীর লোক। সুতরাং তাহাদের অধিকাংশই খৃষ্টানী ডগমার সত্য সম্বন্ধে বিশ্বাসী হইয়া যে এ ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহা নয়। অন্যান্য আকর্ষণই তাহাদের কাছে প্রবলতর।'

অন্ধকারের বিপক্ষে আলোর বিরোধ নিয়ে যে সকল মহাপুরুষ এই পৃথিবীতে আসেন, তাঁদের সারা জীবনই কণ্টকাকীর্ণ পথ ধরে চলতে হয়। রামমোহন সেই পথের পথিক।

ভারতীয়দের সর্বধর্মের প্রতি যে স্বাভাবিক শ্রদ্ধা এবং সহিষ্ণুতা আছে, সে সম্পর্কে ইংরেজ মিশনারীদের কোন সম্যক ধারণা না থাকায় অনেক সময়েই তাঁরা বিভ্রান্ত হতেন। রামমোহনের ক্ষেত্রেও ইংরেজ মিশনারীরা এই শ্রদ্ধা এবং সহিষ্ণুতাকে খৃষ্টধর্মের প্রতি আস্থাজ্ঞাপক বলে মনে করেছিলেন। তাই তাঁদের ধারণা হয়েছিল, সময়মত তাঁকে উদ্দীপিত করতে পারলে তিনি হয়ত খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হতে পারেন। এই আশা পোষণ করে দুজন পাদ্রী অ্যাডাম ও ইয়েটস বহুদিন ধরে প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ ভাবে তাঁকে ধর্মান্তরিত করার প্রয়াস করেছিলেন। এমনকি এই সুসংবাদটি ইংলণ্ডে মূল মিশনারী গোষ্ঠীর কাছে পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু অচিরেই তাঁদের এই ভুল ভেঙে যায়। রামমোহনকে নতুন ধর্মে দীক্ষিত করার কথা দূরে থাকুক তাঁরাই রামমোহনের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এ সমস্ত ঘটনাই কিন্তু রামমোহনের বিপক্ষে গিয়েছিল। সমস্ত মিশনারী সমাজ রামমোহনের বিরুদ্ধে খড়্গ ধারণ করেছিলেন। ১৮২১ খৃঃ ১৪ জুলাই 'সমাচার দর্পণে' মিশনারীরা হিন্দুধর্মকে তীব্র আক্রমণ করে নানা কটু মন্তব্য সহযোগে একটি সরস আলোচনা প্রকাশ করলেন। এতেও যথারীতি কতকগুলি প্রশ্ন ছিল। প্রশ্নের ভাষা এরকম :

'সর্বদেশীয় বিজ্ঞ পণ্ডিত মহাশয়দের প্রতি আমার নিবেদন এই, বর্তমান সময়ে কলিকাতা নগরে নানা জাতীয় ভাষা ও শাস্ত্র ও শ্রদ্ধা একত্রে আছেন। শাস্ত্রার্থে সন্দেহচ্ছেদস্থল এরূপ অন্যত্র প্রায় নাই। তান্নিমিত্ত ধারাবাহিক কয়েক প্রশ্ন নিবেদিতেছি...।'

রামমোহন শিবপ্রসাদ শর্মার ছদ্মনামে এর উত্তর দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু 'সমাচার দর্পণে' সে উত্তর প্রকাশিত না হওয়ায় তাঁর নিজস্ব পত্রিকায় ঐ সকল উত্তর ছেপে বের করলেন। তাছাড়া 'ব্রাহ্মণ সেবধি, ব্রাহ্মণ ও মিশনারী সম্বাদ' নামে এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় তিনি যে ভূমিকাটি লিখেছিলেন, তাও ঐ মিশনারীদের প্রশ্নের উত্তরের পক্ষে যথেষ্ট। ভূমিকাংশটি এইরকম :

'শতার্দ্ধ বৎসর হইতে অধিককাল এদেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাঁহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্বত্র বিখ্যাত ছিল যে তাঁহাদের নিয়ম এই যে কাহারও ধর্মের সহিত বিপক্ষতাচরণ করেন না......ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাঁহারা মিশনারী নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্তরূপে তাঁহাদের ধর্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খৃষ্টান করিবার যত্ন নানাপ্রকারে করিতেছেন। প্রথম প্রকার এই যে নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তকসকল রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান করেন যাহা হিন্দুর ও মোছলমানের ধর্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতার ও ঋষির জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পরিপূর্ণ হয়, দ্বিতীয় প্রকার এই যে লোকের দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দাঁড়াইয়া আপনার ধর্মের ঔৎকর্ষ ও অন্যের ধর্মের অপকৃষ্টতাসূচক উপদেশ করেন, তৃতীয় এই যে কোন নীচ লোক ধনাশায় কিংবা অন্য কোন কারণে খৃষ্টান হয় তাহাদিগ্যে কর্ম দেন ও প্রতিপালন করেন যাহাতে তাহা দেখিয়া ঔৎসুক্য জন্মে।......কিন্তু বাংলাদেশে যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের নাম মাত্রে লোকে ভীত হয়, তথায় এরূপ দুর্বল ও দীন ও ভয়ার্ত প্রজার উপর দৌরাত্ম্য করা কি ধর্মত কি লোকত প্রশংসনীয় হয় না।'

এইভাবে স্বধর্মী, বিধর্মী সকল প্রতিবেশীর সঙ্গে ধর্মসংক্রান্ত বিরোধিতার মুখোমুখি হয়ে তার প্রতিকারে রামমোহনের অধিকাংশ সময়ই ব্যয়িত হয়েছিল। তবু তিনি এই অনগ্রসর অনুভূতিহীন জড় সমাজ-ব্যবস্থার কথা ভুলে থাকতে পারেন নি। তিনি যখন বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেন, তখন সেখানে কালরাত্রির অন্ধকার। [illegible], [illegible] এবং ভীরুতা বিরাট সমাজকে গ্রাস করতে বসেছিল। সজীব সমাজ-দেহের জড়স্তূপের মধ্যে প্রবল প্রাণের বিরোধ নিয়ে আসেন রামমোহন। এর ফলে ধর্ম, সমাজ ও শিক্ষার ক্ষেত্রে এল প্রচণ্ড একটা বিপ্লবাত্মক রূপান্তর। তাঁর অবয়বের মুখে ছিল শান্ত একটা বিষাদের ছায়া। এই বিষাদ হতাশা নয়, জড়ত্ব নয়, তামসিকতা নয়—অন্যায়কে পদদলিত করার দৃঢ়তা মাত্র। হিমালয়ের গাম্ভীর্য তাঁকে নীচতা এবং অজ্ঞতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখত।

বঙ্গদেশবাসীকে যেন দীর্ঘ সুপ্তির পর তিনি জাগিয়ে তুলেছিলেন। জড়ত্বের সাধনা যখন কোন জাতিকে পেয়ে বসে, তখন তার চেতনা হয় লুপ্ত। কোন প্রজ্ঞার আলোকই তার চেতনাকে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত আচম্বিতে জাগিয়ে তুলতে পারে না। কারণ, তখন মনের ধার যায় কমে। ঠিক এই সময়েই উদ্ধারকর্তার আবির্ভাব ঘটে। গীতায় তাই বলা হয়েছে, 'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্‌ ।/ পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্‌ । / ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।'

এই শুষ্ক নির্জীব দেশে মুক্তির সংবাদ নিয়ে এসেছিলেন রামমোহন। দুঃখিনী বঙ্গনারীর প্রতি তাঁর সমবেদনার অন্ত ছিল না। পুরুষ-শাসিত সমাজে নারীর অতি করুণ অবস্থা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সহমরণ যে শাস্ত্রীয় অনুশাসন বলেই স্ত্রী-সমাজ তাকে মানতে বাধ্য হয়েছিলেন, এমন কথা রামমোহন অন্তত বিশ্বাস করতেন না। কারণ তিনি জানতেন এদেশের বিধবাদের অপরিমেয় দুঃখের কথা। অনুন্নত সমাজে পরিকল্পনাহীন

সংসারে স্বামী-বিয়োগের পর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্ত্রীর ভরণপোষণের কোন ব্যবস্থা থাকত না। যে ক্ষেত্রে পুত্র সে ভার গ্রহণ করতেন, সেখানে কোন গোল থাকত না। কিন্তু এর অন্যথা হলেই যে দুঃখ বিধবাকে সহ্য করতে হত, সেই দুঃখের হাত এড়াতেই বিধবারা একেবারে স্বামীর চিতায় জ্বালা জুড়োতেন। তবে, একথাও সর্বকালে স্বীকৃত যে, বেশির ভাগ সময়েই বিধবাদের জোর করে চিতায় নিক্ষেপ করা হত। রামমোহন জাতিকে এই ক্লীবতা থেকে উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন। এই কারণে এর বিরুদ্ধে দেশের নারী-পুরুষকে একাধারে উদ্বুদ্ধ করা, অন্যদিকে শাস্ত্র থেকে নজির উদ্ধার করে এই প্রথার অবাস্তবতা প্রমাণ করা প্রভৃতি দুরূহ কাজে আত্মনিয়োগ করলেন রামমোহন। সতীদাহ রদ বিষয়ে সরকারী আনুকূল্য পাওয়ার আশায় তৎকালীন বড়লাট এবং তদীয় পত্নীর সঙ্গে রামমোহন যোগাযোগ করেন। এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই সতীদাহপ্রথা রহিত করার জন্য তাঁকে দীর্ঘ দশটি বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এর মধ্যে একটি মুহূর্তও রামমোহনের বিশ্রাম ছিল না। নানাবিধ কর্মকাণ্ডের মধ্যেও তাঁর এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য তথ্য সংগ্রহ, সহমরণকামী বিধবাদের নিবৃত্ত করা প্রভৃতি কাজে বহু সময় ব্যয়িত হত। এ ছাড়াও সতীদাহ প্রথার সমর্থক যাঁরা ছিলেন, গোপনে তাঁদের কার্যকলাপে বাধাদান এবং প্রতিটি বিষয়ে রাজপুরুষদের অনুগ্রহ প্রার্থনা প্রভৃতি নানাভাবে সমাজে নারীর অধিকার সমর্থন করতে একলা তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। নারী-সমাজের অধিকার অর্জনের জন্য এহেন দুর্দমনীয় প্রচেষ্টা যখন ভারতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তখনও পশ্চিম মহাদেশে নারী-জাগরণ ঘটেনি।

বাংলাদেশে বিধবা অবস্থায় বেঁচে থাকা যে কী কষ্টের বিষয়, সে সম্বন্ধে রামমোহন একটি নিবন্ধে বলেছিলেন,

> "It is not from religious prejudices and early impressions only that Hindoo widows burn themselves on the piles of their deceased husbands, but also from their witnessing the distress in which widows of the same rank in life are involved and the insults and slights to which they are daily subjected, that they become in a great measure regardless of their existence after the death of their husbands and this indifference accompanied with the hope of future reward held out to them leads them to the horrible act of suicide.

উপরিউক্ত লেখা থেকে একথা নিশ্চিত-রূপে বুঝতে পারা যায় যে, রামমোহন আমাদের দেশের সতীদাহ প্রথাটির যথার্থ মর্মস্থানে গিয়ে আঘাত করেছিলেন। তিনি অবধারিতরূপে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, কোন্ মনোভাব বিধবাদের এমন নৃশংসভাবে আত্মহত্যায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। আর, কতখানি সহানুভূতি থাকলে যে মানুষ মানুষের কাছে এমন দেবতার বেশে দেখা দেয়, তা ভাবলে মন আপ্লুত হয়ে ওঠে। মানুষের জন্যে এই ব্যথা বক্ষে সঞ্চিত করে যে মহাত্মা সতীদাহ প্রথা রহিত করতে চেয়েছিলেন, তিনি যে সার্থকতা লাভ করবেন, তাতে সন্দেহ কি? কিন্তু যেসব রক্ষণশীল সতীদাহ প্রথার পক্ষে রামমোহনের সঙ্গে বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, সমাজের স্ত্রীলোক সম্পর্কে তাঁদের কোন দায় ছিল না। তাঁরা মনে করেছিলেন, সতীদাহ একটা প্রথা মাত্র বৈ তো নয়! অতএব জড়ভাবে একে মেনে চলার মধ্যেই বোধহয় নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা! তাঁরা আপনার শরীর-মন দিয়ে অথবা আপন আত্মজের দেহ-মন দিয়ে কখনই এই প্রথার কঠোরতা সম্বন্ধে চিন্তা করেন নি। অপরপক্ষে রামমোহন তাঁর অন্তরাত্মা দিয়ে নারী জাতির এই দুঃখের কথাটি বুঝে-ছিলেন। তাই কোন অন্ধ সংস্কার নয়, কোন ভান নয়, কোন বিরোধিতাই সেদিন তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেনি। এক দুঃখের সমাধান করতে গিয়ে শত শত নির্যাতনের কাহিনীর পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন সেদিন। মেয়েদের বিরুদ্ধে ধর্মভয়ের অল্পতার প্রসঙ্গ যখন বিরোধীদের কণ্ঠে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল, তখন তিনি লিখলেন,

"তাহারদের ধর্ম্মভয় অল্প, এ অতি অধর্ম্মের কথা. দেখ কি পর্যন্ত দুঃখ অপমান, তিরস্কার যাতনা, তাহারা কেবল ধর্ম্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে। অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ যাঁহারা দশ পোনর বিবাহ অর্থের নিমিত্ত করেন, তাহারদের প্রায় বিবাহের পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হয় না, অথবা যাবজ্জীবনের মধ্যে কাহারও সহিত দুই-চারিবার সাক্ষাৎ করেন, তথাপি ঐ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকেই ধর্ম্মভয়ে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ ব্যতিরেকেও এবং স্বামীর দ্বারা কোন উপকার বিনাও পিতৃগৃহে অথবা ভ্রাতৃগৃহে কেবল পরাধীন হইয়া নানা দুঃখ সহিষ্ণুতাপূর্ব্বক থাকিয়াও যাবজ্জীবন ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন; আর ব্রাহ্মণের অথবা অন্য বর্ণের মধ্যে যাহারা আপন ২ স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করেন, তাহারদের বাটীতে প্রায় স্ত্রীলোক কি ২ দুর্গতি না পায়? বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্দ্ধ অঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন।"

রামমোহনের এই উক্তি থেকে এই কথা পরিষ্কারভাবে অনুমান করা যায় যে, কোন ভীরু ধর্মবিশ্বাস বা কোন বিশেষ নীতি অথবা কোন নিষ্ঠা প্রদর্শনের জন্য বিধবারা স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দিতেন না। সংসারে দুঃখভোগের সীমা মাত্রা ছাড়িয়ে যাবেই—এটা তাঁরা স্থির জানতেন বলেই তাঁরা আত্মবিসর্জন করতেন। তথাপি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষের মতই তাঁদেরও জীবনের আকাঙ্ক্ষা শেষ পর্যন্ত থাকত। কিন্তু সতীদাহ প্রথার সমর্থকেরা লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে বিধবাদের চিতায় তুলে দিতেন, যাতে সেই হতভাগিনীরা কোনমতেই চিতা থেকে লাফিয়ে পড়তে না পারেন এবং তাদের ধর্ম রক্ষিত হয়! তাদের আর্ত চিৎকার শুনতে পেয়ে যাতে লোকে ছুটে না আসে, সেজন্য ঢাকঢোল পিটিয়ে অসহায়ের কান্নাকে ঢেকে দেওয়া হত। পাশ্চাত্যের নারী-জাগরণের পূর্বেও যে নারী-সমাজের উন্নতির জন্য রামমোহন দেশের লোকের শত্রু হয়ে উঠেছিলেন, সেই নারী-জাতির লাঞ্ছনা তাঁকে যে কতখানি পীড়িত করেছিল, তা সহজেই অনুমেয়। নারী জাতির যন্ত্রণার কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে তিনি সাধারণের কাছে তাদের জন্যে কিঞ্চিৎ দয়া ভিক্ষা করে লিখেছিলেন,

"তাহারা আপন স্ত্রীকে কিঞ্চিৎ ত্রুটি পাইলে অথবা নিষ্কারণ কোন সন্দেহ তাহারদের প্রতি হইলে চোরের তাড়না তাহারদিগকে করে...যদ্যপিও কেহ তাদৃশ যন্ত্রণার অসহিষ্ণু হইয়া পতির সহিত ভিন্নরূপে থাকিবার নিমিত্ত গৃহত্যাগ করে, তবে রাজদ্বারে পুরুষের প্রাবল্য নিমিত্ত পুনরায় প্রায় তাহারদিগকে সেই ২ পতি হস্তে আসিতে হয়, পতিও সেই পূর্বজাত ক্রোধের নিমিত্ত নানা ছলে অত্যন্ত ক্লেশ দেয়, কখনও বা ছলে প্রাণবধ করে; এ সকল প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সুতরাং অপলাপ করিতে পারিবেন না। দুঃখ এই যে এই পর্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধনপূর্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।"

রক্ষণশীল হিন্দুধর্মের প্রবক্তা কাশীনাথ তর্কবাগীশ সতীদাহ প্রথার সমর্থনে রামমোহনের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তার উত্তর-প্রত্যুত্তর প্রসঙ্গে রামমোহন উপরিউক্ত পত্র লেখেন। সমাজে শক্তির প্রবাহ যখন বিঘ্নিত হয়, জীবনের ধারা যখন সীমিত হয়ে আসে, জ্ঞান যখন সংকীর্ণতার মধ্যে আবর্তিত হতে থাকে তখনই প্রকৃত সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য যুগ-পুরুষের আবির্ভাব অনিবার্য হয়ে ওঠে। যখন চারিদিকে অশিক্ষার অন্ধকার, চেতনার সকল দ্বার যখন রুদ্ধ, নিবিড় তামসিকতায় দিগ্বিদিক যখন পরিব্যাপ্ত দীপশিখার আলো যখন এই গভীর অন্ধকারে দুর্লক্ষ্য, তখনই অভাবনীয়রূপে দেবতার দূত উপস্থিত হন। রামমোহন রায় আমাদের দেশে সেই অভাবিত দূতস্বরূপ। তিনি দ্বিশত বৎসর পূর্বে কোন্ নবপ্রভাতের বার্তা নিয়ে দুস্তর বিরোধিতাকে সঙ্গী করে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছিলেন। শোনা যায়, ভারতবর্ষের ঋষিদের সাধনার ফল নাকি প্রত্যেকের জন্যই সঞ্চিত থাকে। রামমোহনের ন্যায় ঋষির সাধনাও তাই ব্যর্থ হয়নি, হতে পারে না। তিনি আমাদের অত্যন্ত আপনজন। এই অনগ্রসর এবং অবহেলিত ভারতবর্ষ তাঁকে পেয়ে ধন্য।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সত্যি আধঘণ্টার মধ্যেই পাটনায় পৌঁছে গেলাম। ট্রেন আসার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচারী হন্তদন্ত হয়ে নেমে পড়লেন। নেমে একরকম দৌড়েই চলে গেলেন। যাবার আগে একটা কথাও বলে গেলেন না। কী অদ্ভুত মানুষ! অথচ কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত অন্তরঙ্গ হয়ে কথা বলছিলেন।

ভিড়ের মধ্যে ব্রহ্মচারীকে খুঁজছিলাম। হঠাৎ প্রশ্নটা কানে গেল, 'আপনি কি মিস্টার চ্যাটার্জি?' তাকিয়ে দেখলাম প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে একজন লোক। আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। চোখে চোখ পড়তেই সে আবার বলল, 'কোলকাতা থেকে আসছেন? আসুন আমার সঙ্গে।' লোকটি কুলি ডেকে আমার মালপত্র নামিয়ে নিল। যেতে যেতে সে আবার বলল, 'অনিমেষ-বাবুরই আসার কথা ছিল। উনি বিশেষ জরুরী কাজে কাল জামসেদপুরে গেছেন। আজই বিকেলে আসবেন।'

প্রশ্ন করলাম, 'অনিমেষবাবু কী কাজ করেন?' মনে পড়ল সুপ্রিয়া অনিমেষের কথা আগেই বলেছিল।

'উনি সারভিস ডিপার্টমেণ্টের ইন-চার্জ। আমি ও'র আণ্ডারে কাজ করি। উনি যাবার সময় বারবার করে বলে গেছেন, আপনার যেন কোন অসুবিধা না হয়। আপনার কোন অসুবিধা হবে না, হোটেলে সব ব্যবস্থা করা আছে। উনি আর একটা কথাও বলে গেছেন স্যার, আজ আপনার অফিসে যাবার দরকার নেই। কাল উনি ফিরে এসে সবকিছু বুঝিয়ে দেবেন।'

'অনিমেষবাবু তো সার্ভিস ডিপার্ট-মেণ্ট দেখাশুনো করেন, আমি দেখবো সেলস্। সম্পূর্ণ আলাদা লাইন।'

লোকটি সবিনয়ে বলল, 'উনি খুব এফিসিয়েণ্ট, সব ডিপার্টমেণ্টের কাজই ভাল করে জানেন, বড়সাহেব পর্যন্ত খুব খাতির করে চলেন।'

হঠাৎ অনিমেষের ওপর মন বিরূপ হয়ে উঠল। বললাম, 'আমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়েই অফিসে যাব।'

হোটেলটা মন্দ নয়। সবচেয়ে ভাল লাগল নিরিবিলি পরিবেশ। এদিকে লোক-জন গাড়িঘোড়া সবই কম। লোকটি বলল, 'অনেক খুঁজেপেতে এই হোটেল ঠিক করা হয়েছে। আপনি নাকি একটু ফাঁকা জায়গা পছন্দ করেন।'

'আমি ফাঁকা জায়গা পছন্দ করি?'

'সেরকমই নাকি কোলকাতা থেকে জানানো হয়েছে। হোটেলটা আমিই খুঁজে বার করেছি, পছন্দ হয়েছে স্যার?'

'হ্যাঁ, জায়গাটা বেশ ভাল। অনিমেষ-বাবুর পদবী কি? অফিসে বাবুটাবু বলে ডাকাটা ভাল শোনায় না।'

'উনি সবাইকে বাবু বলে ডাকতে শিখিয়েছেন। শুধু বড়সাহেব ডাট বলে ডাকেন।'

বুঝলাম, অনিমেষরা দত্ত। বললাম, 'আপনার নাম কি?'

'আমাকে আপনি বলে লজ্জা দেবেন না স্যার। আমি নিখিল মিস্ত্রী। কোম্পানির ফিটার।' বলে লোকটা অকারণে হাত কচলাতে লাগল। কোলকাতা থেকে এসে ওর এই বিনয় বিষম চোখে ঠেকল।

এখানকার অফিস কোলকাতার তুলনায় অত্যন্ত ছোট। গুটিচারেক বাবু, তিনজন সুপারভাইজার, স্টেনো-টাইপিস্ট চারজন, চাপরাশী-দারোয়ান নিয়ে আরও জনা-আষ্টেক লোক। তাছাড়া আছে অনিমেষ, অফিস-মাস্টার, পারচেজ অফিসার আর আছেন সি আর দেশপাণ্ডে—ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। আমি যেতেই মিস্টার দেশপাণ্ডে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। করমর্দন করে বললেন, 'আই ওয়াজ এক্সপেক্টিং ইউ এনি মোমেণ্ট। সত্যি কথা বলতে কি, একটা জরুরী কাজ ফেলে রেখে আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। বসুন।'

দেশপাণ্ডে সম্পর্কে আগে থাকতেই শুনে এসেছি। সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে মেপেও শোনা কথার সঙ্গে লোকটির কোন মিল খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এতদিন শুনেছি, যারা চুরি করে তাদের নাকি শেয়াল-শেয়াল মতন ধূর্ত চেহারা হয়। দেশপাণ্ডের মত সুপুরুষ আমি খুব কম দেখেছি। শুধু সুপুরুষ না, ও'র চেহারার মধ্যে এমন একটা সৌম্যভাব রয়েছে যা সাধু-সন্ন্যাসীদের ছবিতে দেখতে পাই। গৌরবর্ণ লম্বা চেহারা, বড় বড় দুটি চোখ, চোখের দৃষ্টি শান্ত। হাসিটি ভারী মধুর। এ-ধরনের লোককে চোর কিম্বা চরিত্রহীন বলে কল্পনা করা কষ্টকর। দেশপাণ্ডে বললেন, 'আপনার সম্বন্ধে চিঠি আগেই পেয়েছি। আগে যে ভদ্রলোক সেলস্-ইন-চার্জ ছিলেন, তিনি কোরাপ্টে থাকায় কোম্পানী আশানুরূপ ব্যবসা করতে পারেনি এত-দিন। আশা করি আমরা এখন সেই ক্ষতি-পূরণ করতে পারবো।' কথা শেষ করে উনি সাগ্রহে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

এসব ক্ষেত্রে একটি মাত্র কথাই বলা চলে, 'আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করবো।'

'গুড।' বলে সিগারেট কেস খুলে আমার সামনে বাড়িয়ে ধরলেন দেশপাণ্ডে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত যে মানুষ অফিসের নীচু মহলের লোক হিসেবে গণ্য হতো, তার পক্ষে উঁচু মহলে সরাসরি উঠে আসা অস্বস্তিকর। আমি সেই অস্বস্তির আবর্তে পড়ে গেলাম। বললাম, 'নো, থ্যাঙ্কস।'

'আপনি কি সিগারেট খান না?'

'খাই, তবে আপনার সামনে—'

দেশপাণ্ডে হো হো করে হেসে উঠলেন, এখানে কোন পদে বৈষম্য মেনে চলার প্রয়োজন নেই। এদিক থেকে আমি আউট অ্যাণ্ড আউট এ সোস্যালিস্ট। আমার মেয়ে

আমার সামনে যে শুধু স্মোক করে তাই না, সে ইচ্ছেমত ড্রিংকও করে। তাছাড়া আপনি আর সাধারণ অ্যাসিস্টেন্ট নন এখন, বলতে গেলে ইউ আর অ্যান একজিকিউটিভ। আপনাকে সেলস ইনচার্জ করে আনা হয়েছে, যদিও আমি বুঝতে পারি না, ডেজিগনেশনটা সেলস-ম্যানেজার করা হল না কেন।'

বুকের মধ্যে একটা আলপিন এসে বিঁধলো যেন। বললাম, 'হয়তো কেরানী থেকে সরাসরি ম্যানেজার করতে কোম্পানির সম্মানে লাগলো।'

দেশপাণ্ডে ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন। ভদ্রলোকের হাসিটাও চমৎকার। প্রাণখোলা। এ-ধরনের মানুষ যে কী করে—

'আপনার থাকার বা কোন কিছুর অসুবিধা হলে জানাবেন। আর একটা কথা।' দেশপাণ্ডে পেপারওয়েট নিয়ে খেলা করতে করতে বললেন, 'যদিও অফিসিয়ালি সে-রকম কোন ইনস্ট্রাকশন নেই, কিন্তু আপনিই আমার নেক্সট ম্যান, এই কথাটা সব সময় মনে রাখবেন। মনে রাখার কারণটা আর কিছু না, জাস্ট অফিসিয়াল এটিকেট। যার-তার সঙ্গে মিশলে আপনার পদমর্যাদা ক্ষুন্ন হতে পারে। তাছাড়া আর একটা কথাও মানতে হবে, আমরা যে যত উঁচু পজিশনেই কাজ করি না কেন, আসল কাজের লোক হচ্ছে নীচের লোকেরা। আমাদের সেই দুর্বলতা ঢাকতে হয়, একটা ভ্যানিটি দিয়ে। এ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালাতে গেলে এটাই হচ্ছে প্রথম নীতি কথা।' বলে দেশপাণ্ডে আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। ভাবটা, কেমন হে ছোকরা, বুঝলে কিছু।

ঘাড় নেড়ে উত্তর দিলাম, 'আমার কিন্তু মনে হয়, আমরা সবাই যদি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করি, নিজেদের বড় ছোট বলে জ্ঞান না করি, তবে আরও ভালো হয়। এই যে কোলকাতায় গোলমাল চলছে, আমার তো মনে হয়, ইচ্ছে করলে এসব মিটিয়ে ফেলা মোটেই কষ্টসাধ্য ব্যাপার না। একদল নীচে নামতে চাইছে না, আর একদল তাদের নীচে টেনে নামাবেই। তার চেয়ে যদি উঁচু নীচুর প্রশ্ন না থাকতো, সবাই যদি সবাইকে আপন ভাবতো—'

দেশপাণ্ডে বলে উঠলেন, 'তাহলে পৃথিবী স্বর্গ হতো, কিন্তু সেটা যখন হচ্ছে না, তখন আমাদের এই নরকটাকেই যথাসাধ্য সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতে হবে।'

দেশপাণ্ডের কথা বলার ধরন ভাল। কথায় জোর আছে। প্রথম দিনেই ভদ্রলোককে আর বেশী ঘাটানো বুদ্ধিমত্তা বলে মনে হল না। বললাম, 'কিন্তু কীভাবে?'

দেশপাণ্ডে সমানে পেপারওয়েট নিয়ে খেলা করছেন। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, 'আজ প্রায় ত্রিশ বছর ধরে ম্যানেজারী করছি। নিশ্চয়ই আমার একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতায় আমি দেখতে পাচ্ছি, আলটিমেটলি ইণ্ডিয়াতে যা ছিল তাই আবার হবে। ছোট ছোট রাজা গজাবে, তারাই দেশ শাসন করবে। আমাদের জনসাধারণ প্রতাপশালী শাসক চায়, তারা সর্ব মানুষের সমান অধিকার বলে চেঁচায়, কিন্তু বিশ্বাস করে না। তারা কি চায় জানেন? চায় কিছু টাকা। দ্যাটস অল।'

'আমার তা মনে হয় না।'

'আপনার আমার মনে হওয়া না হওয়ায় কিছু যায় আসে না। চাষীদেকে তাকিয়ে দেখুন, মানুষ খেতে পাচ্ছে না। গিভ দেম ফুড, দে উইল সারভাইভ। তারা আপনার অনুগত পার্শ্বচর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, কোন গণ্ডগোল করবে না, আমাদের এই অফিস দেখছেন। কেন কিছু লোক এখানে কাজ করছে। আমার অনুপস্থিতিতে প্রত্যেকজনকে জিজ্ঞেস করুন, আমি কী ধরনের মানুষ। তারা বলবে, চমৎকার। কেন বলবে, না, আমি প্রতি মাসে ওদের টাকা দি-ই।'

'আপনি ওদের টাকা দেন?'

'ইয়েস, নিজের পকেট থেকেই দি-ই। কেন দি-ই জানেন? মানুষের দুঃখ কষ্ট সহ্য করবার মত শক্ত হৃদয় ভগবান আমাকে দেন নি। ডু ইউ বিলিভ, ইণ্টার অফিস ক্যারাম প্রতিযোগিতায় প্রতি বছর আমার তিন চারশো টাকা ব্যয় হয়। অথচ কোম্পানীকে যদি এ বিষয়ে লিখি, তারা হাসবে, আমাকে উপদেশ দেবে। মানুষ চায় টাকা, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, আমোদ, ফূর্তি। সাধারণ মানুষ হিসেবে নয়। তারা খেতে পরতে পেলেই খুশী। আপনার কি আছে না আছে তা নিয়ে মাথা ঘামানর সময় বা প্রয়োজন তাদের নেই।'

দেশপাণ্ডের কথা শুনতে শুনতে কী রকম আবেশ এসে গেল, বলার মত কথা অনেক ছিল, কিন্তু কিছুই মনে পড়ল না। শুধু বললাম, 'এখানে লেবার প্রবলেম কেমন?'

'প্রবলেম সর্বত্রই এই এক, হাঙ্গার। হাঙ্গার অবিশ্যি কোনদিনই মেটানো যাবে না, কিন্তু ওদের বোঝাতে হবে, আমরা ওদের ক্ষুধা মেটাতে সচেষ্ট।'

'আজকালকার মানুষ এত বোকা না।'

'মানুষ চিরদিনই বোকা ছিল, থাকবেও, একটা ক্ষুদ্র গোষ্ঠী চিরদিনই বৃহত্তর গোষ্ঠীর ওপর প্রভুত্ব করবে। নোবডি ক্যান স্টপ ইট।' দেশপাণ্ডে এমনভাবে কথাটা বললেন, যেন মানব সম্বন্ধে চরম রায় এই মুহূর্তে ঘোষিত হল।

কথা না বলে চুপ করে রইলাম। দেশপাণ্ডে কিছুক্ষণের মধ্যে নিজেকে শান্ত করে নিলেন। হেসে বললেন, 'যৌবনে পলিটিক্স করেছিলাম। তার রেশ এখনও রয়েছে। তাই সহজেই উত্তেজিত হয়ে পড়ি। আপনি কিছু মনে করবেন না। আসুন আপনাকে অফিসটা দেখিয়ে আনি।'

একে একে সকলের সঙ্গেই পরিচয় হল। আলাপচারিতে মনে হল, বাঙালীরা সবাই বিনয়ী। কিংবা না বলে ভীতু বলাই সমুচিত। ওরা সবাই সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছিল। কলকাতা অফিসের লোক বলে ওদের চোখে সন্দেহের ছায়া পড়েছিল। অফিস মাস্টারকে দেখে মনে হল ভদ্রলোক খুব দুঃখী। এক একজন মানুষকে দেখলে এই কথা আমার মনে হয়। [illegible] ভদ্রলোকের শরীর [illegible], মাথায় চুল খুব ছোট করে ছাঁটা, মুখটা গোল, [illegible] বিন্দুমাত্র বুদ্ধির ছাপ নেই—আছে সীমাহীন বিষণ্ণতা। ছোট ছোট কোটরগত চোখে দু' বিন্দু জল যেন আটকে রয়েছে। এই ধরনের পুরন্ত মুখে এই চোখ মানায় না। ভদ্রলোকের নাম বিশ্বনাথ তেওয়ারী। পাটনার লোক। বিশ্বনাথবাবুর সামনে আমাকে বসিয়ে দেশপাণ্ডে চলে গেলেন। যাবার সময় বললেন, 'আপনি মোটামুটি-ভাবে আপনার কাজকর্ম এই ভদ্রলোকের কাছ থেকে বুঝে নিন। পুরনো লোক, কাজকর্ম ভাল জানেন।'

বিশ্বনাথবাবু আমাকে খাতির করে বসালেন, ফাইল খুলে এটা ওটা দেখাতে লাগলেন।

বললাম, 'আপনাদের এখানকার সেল ক্রমশই পড়ে আসছে কেন?'

বিশ্বনাথবাবু থতমত খেয়ে বললেন, 'পড়ে যাচ্ছে বুঝি?'

'আপনি ব্যালান্স সিট দেখেন না?'

'না, হ্যাঁ, দেখি, তবে মনে থাকে না। ভুলে যাওয়া আমার একটা রোগ। এই যেমন ধরুন, আপনি যদি জিজ্ঞেস করেন, আজ কী খেয়ে এসেছি বাড়ি থেকে, বলতে পারবো না। অনেক সময় এমনও হয়, একটা পান মুখে থাকতে থাকতেই আর একটা পানই হয়ত মুখে পুরে দিলাম।' বলে উনি হাসতে গিয়েও সামলে নিলেন, ভদ্রলোকের মুখ ভীতি পান।

এক একজন মানুষ খুব সহজেই করুণার উদ্রেক করে। হয়ত সত্যি সত্যি করুণা করার মত কিছু নেই, তবু মনে হয়, আহা ভদ্রলোকের বড় কষ্ট। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার কে কে আছেন?'

'স্ত্রী, তিনটি মেয়ে।'

মনটা খচ করে উঠল। ভদ্রলোকের একটিও ছেলে নেই, বুড়ো বয়সে কে দেখবে। অথচ কথাটা মনে হবার যুক্তিপূর্ণ কারণ নেই। হয়ত এর জন্য বিশ্বনাথবাবুর কোন দুঃখই নেই। তিনি হয়ত এ বিষয় নিয়ে তিলমাত্র চিন্তাই করেন না।

'কত বছর চাকরি হল আপনার?'

'চব্বিশ বছর হয়ে গেল। এবার তো রিটায়ার করার সময়।'

'রিটায়ার করে কী করবেন, ঠিক করেছেন কিছু?'

'গ্রামে চলে যাব, মাইল তিনেক পরেই আমাদের গ্রাম। খুব সুন্দর। আপনাকে নিয়ে যাব, দেখবেন খুব ভাল লাগবে। মাঠ ভর্তি গম, যব, সর্ষে, দেখলে চোখ

জ্বড়োয়।' ভদ্রলোক কথা বলতে বলতে যেন আর এক জগতে চলে গেলেন।

বললাম, 'আপনি গ্রাম খুব ভালবাসেন।'

'হ্যাঁ, খুব, অথচ যাওয়া হয় না। স্ত্রী যেতে চায় না। ছেলেটা সেখানেই মারা গেল কিনা।'

'আপনার ছেলে ছিল?'
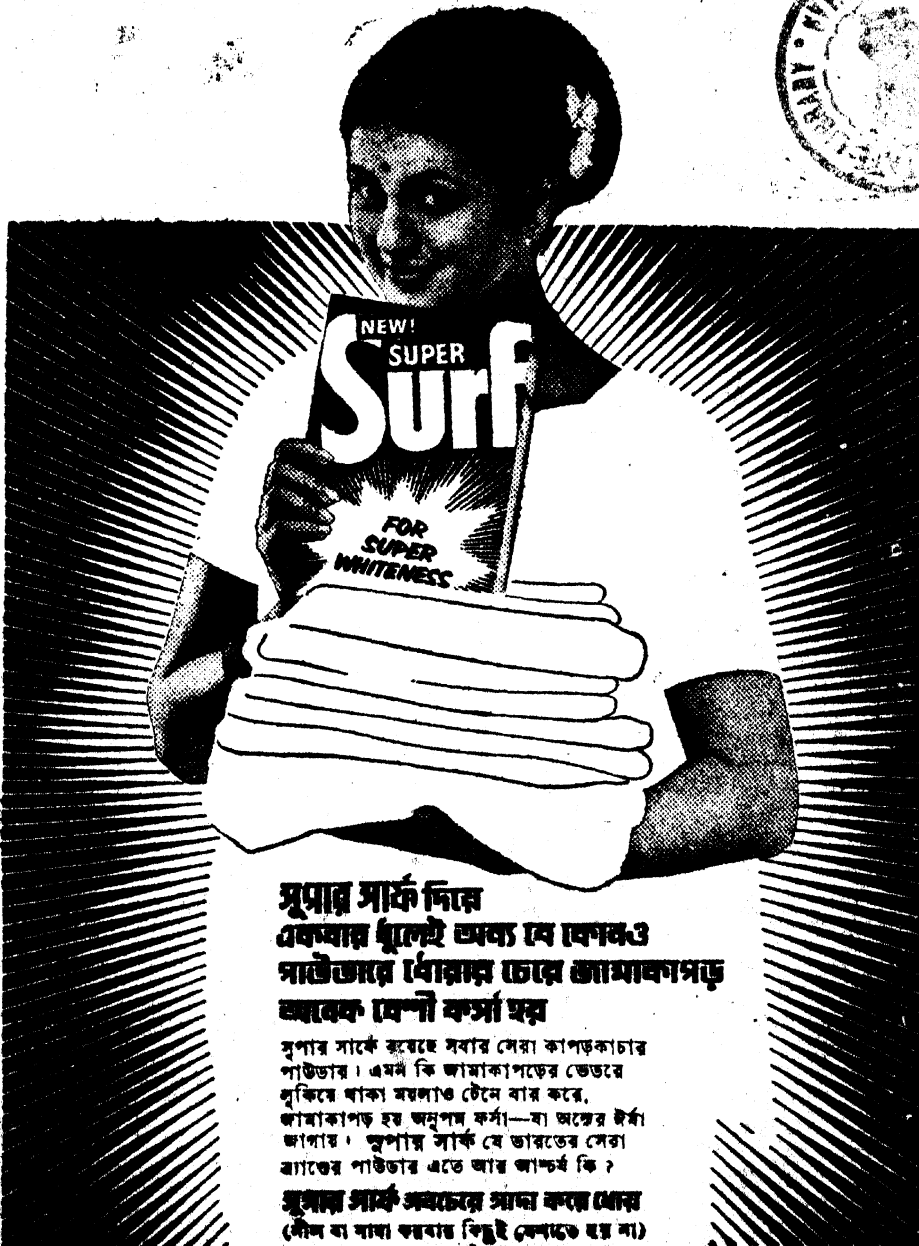
'হ্যাঁ, কুড়ি বছর বয়সে মারা গেল। কলেরায়।'

দৃশ্যটির ঝাপসা ভাবটা অতর্কিতে কেটে গেল। বিশ্বনাথবাবুর বিষণ্ণ চেহারা খুব স্বাভাবিক হয়ে উঠল। প্রথম দেখেই যে ভদ্রলোককে নিতুদা-নিতুদা মনে হয়েছিল তার যথেষ্ট কারণ আছে। নিতুদা সুষমাকে খুব ভালবাসে। অথচ অর্থের অনটনে ভাল পাত্র পাচ্ছে না। অবিশ্যি এমন না যে সুষমার বিয়ে হলেই নিতুদা দারুণ সুখী হয়ে যাবে। হয়তো আর একটা দুঃখ এসে এই দুঃখের জায়গা দখল করবে।

দুঃখ জিনিসটা এমনিই, একবার এসে পড়লে আর যেতে চায় না। পুকুর থেকে এক ঘড়া জল তোলার সংগে সংগেই নতুন জল এসে সেই জায়গাটা ভরিয়ে তোলে। পুরনো দুঃখটা যাওয়ার সংগে সংগেই নতুন দুঃখ এসে সেই জায়গা দখল করে রাখে। এই যেমন আমি। আমার দুঃখ ছিল, আমি যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করতে পারি না। অর্থের প্রয়োজন মিটতে না মিটতেই দুঃখ হতে লাগল, মাকে ছেড়ে একলা

বিদেশে চলে আসতে বাধ্য হলাম বলে। মাকে যখন এখানে নিয়ে আসব, তখন নিশ্চয় আর একটা দুঃখ এসে পুরনো দুঃখের জায়গায় আসন পেতে বসবে। ঢেউয়ের পর ঢেউ—দুঃখের ঢেউ, আসতেই থাকে।

তেওয়ারীবাবু বললেন, 'আজ আপনি টায়ার্ড', কাল না হয় ফাইল দেখাবো।'

হঠাৎ প্রশ্ন করে ফেললাম, 'অনিমেষবাবু তো বাইরে গেছেন। ভদ্রলোক কাজকর্মে কেমন?'

তেওয়ারী পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'কেমন বলতে?'

'এফিসিয়েন্ট না চলনসই।'

তেওয়ারী এবারেও ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেলেন, 'ওর সঙ্গে আমার ডাইরেক্ট টাচ নেই।'

বুঝলাম তেওয়ারী যতটা দুঃখী, ততটা বুদ্ধিহীন না।

হঠাৎ প্রশ্ন করলাম, 'কোম্পানীর লাভ যাতে বাড়তে পারে, সেই লাইনে আপনি কোনদিন চিন্তা করেছেন?'

তেওয়ারী ক্ষীণ হেসে বললেন, 'চিন্তা করে কোন লাভ নেই, শুধু চিন্তাই সার।'

'লাভ নেই কেন?'

'কে আর আমার সাজেশান শুনতে যাচ্ছে, বলুন।'

'যদি শুনতো, কিম্বা ভাবাতে যদি শোনে, তাহলে কী করবেন?'

'তা হলে যা ঘটে গেছে যা ঘটছে সেই সব মনে রাখার চেষ্টা করবো, আর আমার একটা স্কিম সাবমিট করবো।'

'তা হলে আপনি একটা স্কিম সাবমিট করুন তেওয়ারীজী।'

তেওয়ারী মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানালেন।

এর পরে পার্সোনেল অফিসার জয়ন্ত দেশাইর ঘরে নিয়ে গেলেন তেওয়ারী। দেশাইর বয়স কম। আমার চেয়ে বছর তিন চারেকের ছোটই হবে। স্মার্ট আর সুন্দর চেহারা। আমি যেতেই উঠে দাঁড়িয়ে করমর্দন করে বলল দেশাই, 'এখানে পারচেজ সেকশন রাখা, আর বন্দরে বসে ধর্মশালা খোলা একই কথা।'

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, 'কেন?'

'যেখানে ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট নেই, সেখানে কী পারচেজ হবে?'

'আপনি কতদিন হয় আছেন এখানে মিস্টার দেশাই?'

'ছয় মাস হয়ে গেল।'

'নিশ্চয়ই কোম্পানীর আইডিয়া আছে আপনার সম্বন্ধে, শুধু শুধু একজন মোটা মাইনের লোককে বসিয়ে রাখে না কেউ।'

'আইডিয়া যদিও কিছু থাকে, সেটা আছে তাদের মাথার কোন এক গোপন কোণে, যার সন্ধান পাওয়া আমার পক্ষে খুবই দুষ্কর। কিন্তু এভাবে আর বেশীদিন থাকা যাবে বলে মনে হচ্ছে না।'

হেসে বললাম, 'কেন, বসে বসে তো বেশ আছেন।'

দেশাই হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'বসে থাকাটা যে কী দুর্বিসহ, আপনি হয়ত জানেন না। যদি না জানেন, জানবার চেষ্টা করবেন না। তবে এইভাবে আর বেশীদিন থাকবো না। আর দুটো মাস দেখবো, তারপরই—' দুই আঙুলের মাথায় তুড়ি দিল দেশাই।

'তারপর কি?'

'আমি পালাবো।'

'পালাবেন কেন? কেউ তো আপনাকে বন্দী করে রাখে নি।'

'রাখে নি মানে? আমার বাবা জোর করে এখানে আটকে রেখেছে আমাকে। জানেন, কেন?' দেশাই আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'বম্বেতে একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম হয়েছিল। ওঃ, কী ভয়ঙ্কর প্রেম! একটা কিছু হয় হয়, এমন সময় পিতাজী এসে সব ভণ্ডুল করে দিলেন। বিগ বসের বন্ধু কিনা। এক কথাতেই এই রটন জায়গায় ট্রান্সফার। না আছে ভাল ক্লাব, না আছে সিনেমা, গার্ল ফ্রেন্ড তো আউট অব কোয়েশ্চেন। এর চেয়ে সাহারা মরুভূমিও ভাল। কিছু না হোক বালির ঝড়ের মধ্যে দৌড়নোর থ্রিল পাওয়া যেত তবু।'

দেশাইয়ের কথায় হাসব কি কাঁদব বুঝতে পারলাম না।

দেশাই আবার বলতে লাগল, 'কাজ ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে কখনও, আপনিই বলুন। মিস্টার দেশপাণ্ডেকে বললে, উনি বলেন, ধৈর্য ধর। ধৈর্য ধরতে ধরতে যে এদিকে আমি বুড়ো হয়ে গেলাম।'

হেসে বললাম, 'আপনার বুড়ো হতে এখনও অন্তত বছর পনেরো দেরী আছে।'

দেশাই চোখ বড় করে বলল, 'আমার বয়স কত বলুন তো।' চুপ করে আছি দেখে সে আবার বলল, 'নেকস্ট জানুয়ারীতে চব্বিশ কমপ্লিট করে পঁচিশে পড়বো। এর পরেও বলতে চান, আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি না।'

গম্ভীরভাবে বললাম, 'শুধু বুড়ো হচ্ছেন না, দারুণ বুড়ো হচ্ছেন। এর পরে তো আপনার বিয়েই হবে না।'

দেশাই খুশি হল, 'আপনি যেভাবে আমার দুঃখ বুঝলেন, নিজের বাবা সেইভাবে চিন্তা করতেই পারলেন না। সবচেয়ে বড় অসুবিধা কী হয়েছে জানেন, আমার দুঃখের কথা কাউকে বলতে পারছি না। মা থাকলে বলা যেত।'

'আপনার মা কতদিন হয় মারা গেছেন?'

দেশাইয়ের উজ্জ্বল মুখের ওপর দুঃখের ছায়া পড়ল। বিষণ্ণভাবে বলল, 'আমার মা বেঁচে আছেন। শুনেছি ভালই আছেন। উনি গোল্ড কোস্টে থাকেন। একজন আমেরিকানকে বিয়ে করেছেন। মার কথা আমার খুব মনে হয়, অথচ মা আমার কথা একবারও ভাবে না। যদি ভাবতো, একটা চিঠি দিত নিশ্চয়ই, তাই না।'

কী বিচিত্র এই পৃথিবীর মানুষ। যত দেখছি, তত বিস্মিত হচ্ছি। প্রথম সাক্ষাতেই যে একজন মানুষ আর একজন মানুষের কাছে এভাবে অকপটে নিজেকে উন্মোচিত করতে পারে, কোনদিন কি ভেবেছিলাম। দেশাইয়ের সুন্দর চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মার কথা মনে পড়ে গেল। মা এই সময় রোজ ঘুমায়। কে জানে, মা এখন কি করছে। নতুন জায়গায় গিয়ে মার ঘুম হচ্ছে কিনা তাই বা কে জানে। দুপুরে না ঘুমালে মার শরীর খারাপ হয়। আসার আগে বড়মামীমাকে এই কথা বলা হয় নি। অনেক কথাই বলে আসতে ভুলে গেছি। শুধু নিজের কথা চিন্তা করতে করতেই সময় কেটে গেছে। মার কথা ভাবাই হয় নি। অথচ আমার কথা ভেবে মার অত প্রিয় বাড়ী তালা বন্ধ করে বড়মামার বাড়ীতে চলে এল। মা বেঁচে আছে শুধু আমারই জন্য।

আর আমি?

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালাম। দেশাই প্রশ্ন করল, 'আপনার কি কিছু মনে পড়ে গেল?'

অন্যমনস্কভাবে বললাম, 'হ্যাঁ, কোলকাতায় চিঠি দিতে হবে।'

দেশাই ছেলেমানুষের মত খিলখিল করে হেসে উঠল। 'দেখুন তো, কি ভিন্ন ধরনের মানুষ আপনি এবং মিস্টার তেওয়ারী। সব কিছু মনে রাখাটা যে আপনার নেচার, বোঝা গেল। আর মিস্টার তেওয়ারী ঠিক বিপরীত ধাঁচের মানুষ। ওর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সব ভুলে যাওয়া। আপনি শুনলে বিস্মিত হবেন, সেদিন ওর বাড়ীর ঠিকানা বলতে গিয়ে ভদ্রলোক দস্তুরমত বিপদে পড়ে গিয়েছিলেন। এক সাপ্লায়ার ওঁর বাড়ীর ঠিকানা জিজ্ঞাসা করাতে উনি এমন ভাব করলেন যেন উনি কোন খোলা মাঠের বাসিন্দা। শেষ পর্যন্ত কিন্তু বাড়ীর ঠিকানা ভদ্রলোক কিছুতেই মনে করতে পারলেন না। ভীষণ ইন্টারেস্টিং মানুষ না!'

'হয়ত বাড়ীর ঠিকানা সেই মুহূর্তে উনি মনে করতে চান নি।'

'কেন?' এক-একজন মানুষকে বিস্মিত হলে ভারী সুন্দর দেখায়। মনে হয় চোখের সামনে এক নিষ্পাপ শিশুকে দেখছি।

বললাম, 'সেখানে আর কে কে উপস্থিত ছিলেন?'

দেশাই একটুক্ষণ চিন্তা করে বলল, 'শুধু আমিই ছিলাম।'

'আপনার কি একবারও মনে কৌতূহল জাগে নি, সাপ্লায়ার তেওয়ারীজীর বাড়ীর ঠিকানা জানতে চাইছে কেন?'

'না তো।'

'আপনি নিতান্তই ছেলেমানুষ।'

দেশাই চোখ পাকিয়ে বলল, 'আপনাকে আগেই বলেছি কিছুদিনের মধ্যেই আমি বুড়ো হতে চলেছি।'

হেসে ফেললাম। 'সেই কিছুদিন আপনার জীবনে কোন দিনই আসবে না, এবং প্রার্থনা করবো সেই দিন যেন না আসে।'

আপনি আ-জীবন শিশু থাকুন। আজ আর দেরী করবো না। আমাকে হোটেলে ফিরে গিয়ে অন্তত দুটো জরুরী চিঠি লিখতে হবে।'

জয়ন্ত দেশাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম। আসার সময় দেশ-পাণ্ডের ঘরে উঁকি মেরে দেখলাম ঘর খালি। তেওয়ারী একটা ফাইলের ওপর ঝুঁকে পড়েছিলেন। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই যেন জেগে উঠলেন। বললাম, 'খুব ব্যস্ত?'

'না, তেমন কিছু না। একটা টেণ্ডার বেরিয়েছে, কাগজগুলো খুঁটিয়ে দেখছিলাম।'

'কি দেখলেন?'

'ভাল করে দেখি নি এখনও।'

'টেণ্ডারটা কাল আমার টেবিলে পাঠিয়ে দেবেন।'

তেওয়ারী মরা মাছের চোখ দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। বললাম, 'আমি এখন থেকে সেলস সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখবো।'

তেওয়ারী ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত কথাটা বলে ফেললেন, 'যদি কিছু মনে না না করেন, এ সম্পর্কে একটা অফিস অর্ডার বেরনো দরকার। আমরা তো হুকুমের চাকর ছাড়া কিছু না।'

'কাল সকালেই সেই অর্ডার পাবেন।' বলে গটগট করে বেরিয়ে এলাম। পিছনে না তাকিয়েও বুঝতে পারছিলাম, তেওয়ারী আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।

হোটেলে এসে মাকে আর বড় মাসীমাকে চিঠি লিখলাম। দুপুরে না ঘুমোলে যে মার শরীর খারাপ হয় এবং রাত্রে ঘুমের মধ্যে মার সময় সময় দারুণ শ্বাসকষ্টটা পায়, তখন গলার মধ্যে ঘড় ঘড় শব্দ হয়, সব কথা বড়মামীকে লিখে জানালাম। আরও জানালাম, অফিসে চিঠি লিখে দিচ্ছি, ডাক্তার গিয়ে মাকে দেখে আসবে। ওষুধ যদি কিছু দেয় ওখান থেকেই যেন কিনে নেওয়া হয়। এখান থেকে পাঠাতে গেলে দেরী হয়ে যাবে। লিখতে গিয়ে বড়মামার কথা মনে পড়ে গেল। তাই পুনশ্চ দিয়ে লিখতে হল, বড়মামার ওষুধের ক্যাশ-মেমো এখানে পাঠিয়ে দিতে। টাকাটা অফিস থেকে আদায় করে নেব। কিন্তু ভাল করেই জানি, এ টাকা কোনদিনই অফিস থেকে পাব না।

শেষ চিঠিটা সুপ্রিয়াকে লিখলাম। প্রথমে লিখলাম, ডিয়ার ম্যাডাম। নিজেরই হাসি পেল। চিঠি ছিঁড়ে ফেলে বাংলায় লিখলাম। লিখলাম, আমি ভালভাবে পৌঁছেছি। আজ কিছুক্ষণের জন্যে অফিসে গিয়েছিলাম। অনিমেষবাবু শহরের বাইরে। দেখা হয়নি। আশা করি কাল দেখা হবে। দেশপাণ্ডে ভাল ব্যবহার করেছেন। আর দুটি লোকের সঙ্গে আলাপ হল। বিপরীত চরিত্রের দুটি মানুষ। একজন বৃদ্ধ, আর একজন শিশু। একজন যদি বিচক্ষণতায় বটবৃক্ষ হন, অপরটি সজলতায় কিশলয়।

একজন বিশ্বনাথ তেওয়ারী, অপরজন জয়ন্ত দেশাই। অফিসিয়াল চিঠি দুই একদিন পরে দেব। এই চিঠি তোমাকে দিলাম, কারণ আমার সম্বন্ধে তোমার একটা উদ্বেগ লক্ষ্য করে এসেছি। তুমি কাপুরকে কথা দিয়েছিলে, আমি পাটনায় যেতে রাজী আছি। তোমার কথার মর্যাদা যে রেখেছি সে কথা তুমি তাকে জানাতে পারো। আর একটা কথা। মার শরীর ভাল না। যদি সম্ভব হয়, অফিসের ডাক্তার মৈত্রকে একবার মাকে পরীক্ষা করে দেখতে বলো। ভিজিট উনি যেন মার কাছ থেকে নিয়ে নেন। ডাক্তার মৈত্রকে আমিই চিঠি দিতে পারতাম, কিন্তু উনি অফিসে রোজ আসেন না, আর ওর বাড়ির ঠিকানা আমার জানা নেই। আশা করি এই কাজটা করতে খুব অসুবিধা হবে না।

চিঠি লিখেই পোস্ট করে দিয়ে এলাম। ভয় ছিল, কিছুক্ষণ ফেলে রাখলে এই চিঠি শেষপর্যন্ত পোস্ট করা হয়ে উঠবে না। সুপ্রিয়া যে আমাকে দয়া দেখাতে ভালবাসে এতদিনে সে কথা আমার অজানা নেই। দয়া দেখান সহজ, কিন্তু নেওয়া কষ্ট। সেই কষ্টের হাত থেকে মুক্তি পেতে গিয়ে চিঠিটা হয়ত ছিঁড়েই ফেলতাম, তাই তাড়াতাড়ি পোস্ট করে দিয়ে এলাম।

হোস্টেলে ফিরে লম্বা এক ঘুম দিলাম। সন্ধ্যার পর মনে হল কে যেন দরজায় টোকা দিচ্ছে। খুলে দেখলাম, একটি লোক। সে বলল, 'আমার নাম অনিমেষ দত্ত। শুনলাম আপনি এসে গেছেন, তাই দেখা করতে এলাম।'

'আসুন, আসুন। আপনার কথা কোলকাতায় বসেই শুনেছি।'

অনিমেষ এসে বসল। একটুক্ষণ চুপ থেকে প্রশ্ন করল, 'অফিস কি রকম দেখলেন?'

'বাইরে থেকে তো ভালই লাগল। সাজানো গুছনো, বেশ ঠাণ্ডা আবহাওয়া, কোলকাতার মত এলোমেলো বাতাস নেই।'

অনিমেষ সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, 'একটু বেশী ঠাণ্ডা।'

'আপনার বুঝি হৈ চৈ হট্টগোল ভাল লাগে?'

'সময় সময় লাগে। জীবনের স্বাদ পাওয়া যায়।'

'তা হলে তো আপনাকে কোলকাতায় ট্রান্সফার করা উচিত।'

'উচিত হলেই কি সব কাজ হয়?'

'আপনার তো মুরুব্বির জোর আছে।'

অনিমেষের ঠোঁটে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল। বলল, 'চলুন বেড়িয়ে আসি। শহরও চেনা হবে, মন মেজাজও ঠাণ্ডা হবে।' বলে ধোঁয়ার রিং বাতাসে ভাসাতে লাগল অনিমেষ।

ঘিঞ্জি শহর। মানুষজন, হৈ চৈ, দোকান পসার, অনেকটা কলকাতার মতই। ঘুরতে ঘুরতে এক সময় মনে হয় আমার ভেতরের ক্ষুব্ধ মানুষটা অনেক শান্ত হয়ে গেছে। অনিমেষ আমার পাশাপাশি হেঁটেছিল, আর জ্বলন্ত সিগারেট খাচ্ছিল। এক সময় বললাম, 'এত সিগারেট খান কেন?'

অনিমেষ পাল্টা প্রশ্ন করল, 'বেশী সিগারেট খেলে কি হয়, ক্যান্সার?'

'তা না। সিগারেট না খেলেও ক্যান্সার হয়। আমার এক পিসীমা ক্যান্সারে মারা গিয়েছিলেন। উনি পান পর্যন্ত খেতেন না।'

অনিমেষ হাসল। অর্ধদগ্ধ সিগারেটের ধোঁয়া বাতাসে ছড়াতে ছড়াতে বলল, 'আমরা অহেতুক ভয় পাই। সিগারেটের একটা দোষ অবিশ্যি বলতে পারি, পয়সা খরচা হয় খুব। আপনি একেবারে খান না?'

'খাই মাঝে মাঝে। ভাল লাগে না। মনে হয় অহেতুক একটা জিনিস পুড়ে গেল, পেট ভরল না।'

'আসুন কিছু খাওয়া যাক।' বলে সামনের রেস্টুরেন্টটার দিকে পা বাড়াতে যাচ্ছিল অনিমেষ।

বললাম, 'আমার খিদে নেই, বেলা করে খেয়েছি।'

অনিমেষ হাত দিয়ে মাথার চুল পিছন দিকে সরাতে সরাতে বলল, 'আমার খিদে পেয়েছে।'

এ অবস্থায় না বলা চলে না। মুখোমুখি দুটো চেয়ারে এসে বসলাম। অনিমেষকে ভাল করে দেখার সুযোগ মিলল। রোগা রোগা মতন চেহারা। ময়লা রঙ। নাকটা টিকলো। মাথার চুলের স্বল্পতা। যাওবা আছে, তেলের অভাবে রুক্ষ। চোখে চশমা। কাঁচের ভেতর দিয়েও চোখের উজ্জ্বলতা ধরা পড়ে। অনিমেষের খাওয়া দেখে একটুও মনে হচ্ছিল না যে ওর খিদে পেয়েছে। ও খুব অবহেলার সঙ্গে খাচ্ছিল।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে এক সময় অনিমেষ বলল, 'আমার ইচ্ছে ছিল না আজই আপনি অফিসে যান। অবিশ্যি খুব যে একটা ক্ষতি হয়েছে তা না। তবু আগে থাকতে এখানকার স্টাফ সম্বন্ধে দু' চারটি কথা জেনে রাখা আপনার দরকার। যেমন, প্রথমেই দেশপাণ্ডেকে ধরা যাক। ভদ্রলোকের চেহারাটা চরিত্রের ঠিক বিপরীত। ও আপনাকে কোনদিনই ভাল চোখে দেখবে না। এর আগে আপনার জায়গায় কোন বিশেষ লোক ছিল না। যে বাবুটি সেলস দেখতো সে দেশপাণ্ডের লোক ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বখরা নিয়ে গোলমাল বাধল। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চরিত্র হল আমাদের তেওয়ারীজী। খুব যে শয়তান ধরনের মানুষ তা না। তবে অকারণে লোককে বিপদে ফেলতে ভালবাসেন, এবং পরমুহূর্তেই উনি নাকি সে কথা ভুলে যান। জয়ন্ত দেশাইর সঙ্গে আলাপ হয়েছে?'

'হ্যাঁ, বেশ ছেলেটি। আপনি তো বেশ সুন্দরভাবে বোঝাতে পারেন। আগে প্রফেসরটর ছিলেন নাকি।'

চুলের মধ্য দিয়ে আঙুল চালাতে চালাতে অনিমেষ বলতে লাগল, 'আমি ইঞ্জিনীয়ারিং গ্রাজুয়েট। পাশ করেই চাকরিটা পেয়ে গেলাম। প্রফেসরি করার সুযোগ পাই নি, আর সেরকম বিদ্যেও নেই আমার।'

'কোন সালে পাশ করেছেন?'

ও একটা সনের নাম করল। হিসেব করে বললাম, 'আপনি তো আমারই বয়সী।'

অনিমেষ হেসে ফেলল, 'আপনার বয়সটা আমার জানা নেই। আমার আঠাশ চলছে।'

'আমারও।' বলে হাত বাড়ালাম। অনিমেষও হাত বাড়াল, ওর হাতের উষ্ণতা আমাকে সাহস দিল। আবার বললাম, 'আজ থেকে আমরা দুজনে বন্ধু, কী বলেন?'

'কী বলেন না, কী বলো।' বলে শব্দ করে হেসে উঠল অনিমেষ। এক একজন মানুষ এমনিতে সুন্দর না, কিন্তু হাসলে সুন্দর দেখায়। অনিমেষ সেই জাতের সুন্দর।

রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে আবার হাঁটতে লাগলাম। মানুষের মধ্য দিয়ে হাঁটতে সময় সময় আমার ভাল লাগে। ভারতবর্ষের সব প্রদেশের মানুষই কিন্তু একরকমের। এখানেও মানুষ জোরে কথা বলছে, রাস্তার মাঝখানেই পানের পিক ফেলছে। একটা ছেলের দল হৈ হৈ করতে করতে চলে গেল। বললাম, 'এরা কারা?'

অনিমেষ বলল, 'ছাত্র, কোন মিটিং টিটিং করে ফিরছে হয়ত।'

'পলিটিকাল আবহাওয়া কেমন এখানে?'

'সবাই সচেতন হয়ে উঠছে। মুখ বুজে মার খেতে কেউ আর রাজী না।'

'ছাত্ররাই তো দেশের ভবিষ্যত। তবে আর একটু ডিসিপ্লিনড হলে ভাল হয়।'

অনিমেষ কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ওর দৃষ্টির গভীরতা আমাকে স্পর্শ করল। অনিমেষ বলল, 'সুখী মানুষেরা ডিসিপ্লিনের কথা ভাবতে পারে। কিন্তু বিক্ষুব্ধ মানুষ নিজেকে হারিয়ে ফেলে। কিছুক্ষণ আগে তুমি কী আমার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পেরেছিলে। অথচ তুমি নিজেই হয়ত জানতে না, বিক্ষোভটা কার বিরুদ্ধে। আমার, না তোমার নিজেরই বিরুদ্ধে। এদেরও সেই অবস্থা। পাশ করে চাকরি বাকরি পাচ্ছে না। চারদিকে অভাব অনটন। ভাল খেতে পারছে না, পরতে পারছে না। অথচ আর একদিকে কী প্রাচুর্য! যে কোন একটা ভাল হোটেল বা বার-এর সামনে গিয়ে দাঁড়াও, দেখবে গভীর রাত পর্যন্ত উন্মত্ত মানুষের কী পৈশাচিক উল্লাস সেখানে। পৈশাচিকই বলবো। রাস্তার ওপর একটা মানুষ মরে পড়ে থাকলেও এরা গাড়ি একটু পাশ কাটিয়ে যাবে না।' বলতে বলতে অনিমেষ ক্রমশই উত্তেজিত হয়ে উঠছিল।

'এটা তোমার বাড়াবাড়ি অনিমেষ। সব ধনীরাই কিছু নিষ্ঠুর হয় না। আমি অনেক ধনবান ব্যক্তিকে জানি, তারা ভাল কাজের জন্যে কোটি কোটি টাকা দান করে।'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে অনিমেষ যেন আমাকে ধমকে উঠল, 'দান বলতে কী বোঝ তুমি। আমার এই যে ঘড়িটা রয়েছে, তুমি যদি ছলে বলে কৌশলে এটাকে নিয়ে এর সামান্য একটা অংশ আর একজনকে বিলিয়ে দাও, দান বলবো একে। ননসেন্স। এক্সপ্লয়টেশান। চতুর্দিকে এই নিপীড়ন চলছে।

সাধারণ মানুষ আজ তার প্রতিবাদ জানাতে চায়। দ্যাটস্ অল।' অনিমেষ যেন হাঁপাতে লাগল।

হেসে বললাম, 'তোমাকে কী রকম উত্তেজিত করে তুললাম!'

হাসতে গিয়েও অনিমেষ হাসতে পারল না। বলল, 'খুব খারাপ লাগে, যখন দেখি, মানুষ কী বীভৎস রকমের নিষ্ঠুর হতে পারে। সেদিন একটা মিটিংএর ওপর পুলিশ যেভাবে গুলী চালাল, একটা মরা মানুষের মাথায়ও প্রতিশোধের নেশা চেপে যায়। তুমি জানো, দেশপান্ডে কী করেছে। ওর দেশের বাড়িতে শুধুমাত্র একটা প্রাইভেট রোড তৈরী করতেই খরচা করেছে দেড় লক্ষ টাকা। বাড়ির কথা তো ছেড়েই দিলাম। টাকাটা কোত্থেকে এল?'

'কোত্থেকে?'

'তোমার আমার মত সাধারণ মানুষের পকেট থেকে। ও যদি চুরি না করতো কোম্পানী লাভ করতে পারতো। আর নিশ্চয়ই ফোর পার্সেন্ট বোনাস ডিক্লিয়ার করতো না। কত উদাহরণ দেব? অজস্র ছোট বড় নালার মধ্য দিয়ে টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে। অথচ সাধারণ মানুষ তার হদিশ পাচ্ছে না। এরা কিছু চাইলেই বলা হয় আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা হচ্ছে। বিস্ময়কর মনে হয় না!' অনিমেষের চোখ জ্বলতে লাগল।

ওর হাত ধরে বললাম, 'ঐদিকটা ফাঁকা, চলো, ভীড়ে তোমার মাথা গরম হয়ে গেছে।'

অনিমেষ হেসে ফেলল। বলল, 'প্রথম দিনেই তোমাকে ভয় পাইয়ে দিলাম।'

'একটা সিগারেট দাও।' সিগারেট ধরাতে ধরাতে আবার বললাম, 'আমরা কোলকাতার মানুষ, পাটনার গরম বাং গায়ে লাগে না, নরম নরম মনে হয়।' বলে হেসে উঠলাম। অনিমেষও আমার সঙ্গে হাসতে লাগল।

সন্ধ্যে পর্যন্ত দুজনে হাঁটলাম। বেশ লাগছিল। হাঁটতে চিরদিনই আমার ভাল লাগে। কিছুক্ষণ আগেই একটা ফাঁকা মাঠের পাশ দিয়ে হাঁটছিলাম। সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছিল। আকাশের রঙ নীল ছিল। মাঠের রঙ সবুজ। শুধু একটা না, অনেক-গুলো পাখি মাঠের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। সেইদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় বলে ফেললাম, 'মিস সুপ্রিয়া মিত্র তোমার কে হয় অনিমেষ?'

'খুব নিকটের কেউ না, দূরের সম্পর্ক।'

'আমার মনে হয়েছিল খুব কাছের কেউ। তোমাকে খুব—কী বলবো, স্নেহ বললে ঠিক বোঝায় না, খুব প্রীতির সম্পর্ক তোমাদের, না?'

'হ্যাঁ, খুব।' বলে অনিমেষ চুপ করে গেল।

'এই সময়টা আমার খুব ভাল লাগে। ভালও লাগে, কষ্টও হয়। মনে হয় একটা দিন চলে গেল। একদিন আমার বয়স বাড়ল। পৃথিবীটা কিন্তু দারুণ ভাল। বাসের উপযোগী ক্ষেত্র, কী বলো।' আমি তখন আকাশের ঐদিকটার দিকে তাকিয়ে-ছিলাম, যেদিকে কিছুক্ষণ আগে সূর্য অস্ত গিয়েছে।

'তুমি আর সুপ্রিয়া রোজ এই সময় হেঁটে হেঁটে বাস স্ট্যান্ডে আসতে।'

'তুমি কি করে জানলে?'

'তোমার একটা স্বভাব, তুমি অল্পতেই রেগে যাও।' অনিমেষ কৌতুক-মেশানো দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল।

'আমি যে শুক্তো খেতে ভালবাসি তা জানো না?'

'তাও জানি। তুমি আইসক্রীমও খুব ভালবাসো।'

বুঝলাম, অনিমেষ আমার সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানে। কিন্তু সুপ্রিয়া অনিমেষ সম্বন্ধে আমাকে কিছুই বলেনি। অনিমেষ যে এত সিগারেট খায়, তাও না।

'সুপ্রিয়া কৌশল করে আমাকে পাটনায় বদলি করেছে। বদলি করে আমাকে বিপদে ফেলেছে।'

'বিপদ কেন? এখানে তো তোমার প্রমোশন হল। ওপরে ওঠার একটা পথ পেলে।'

'আমি ওপরে উঠতে চাইনি।'

অনিমেষ হাসল। ওর হাসিটা অনেকটা এইরকম, অনেক খেলে টেলে পরিশ্রান্ত হয়ে ছেলে এসে পড়তে বসল। পড়তে পড়তে টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। মা এসে ছেলের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ডাকলেন, 'খোকা।' ধড়মড় করে জেগে উঠল ছেলে। মাকে বলল, 'ইস্, একেবারে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কাল থেকে আর খেলবো না। খেললেই ঘুম পায়।' মা কিছু বললেন না। হাসলেন। হাসিটা আর কিছু না। মা ছেলের কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না। অনিমেষের হাসিটাও সেই ধাঁচের।

বললাম, 'বিশ্বাস হল না! সত্যি সত্যি আমি বড় হতে চাই না। যা আছি, তাই থাকবো। শুধুই ভাসবো, উড়বো না।'

অনিমেষের হাসিটা তখনও ঠোঁটে লেগে রয়েছে। ও বলল, 'আরও একটা কথা তোমার সম্বন্ধে জানি, জগৎ সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান খুব সীমাবদ্ধ। বয়সের তুলনায় তুমি খুব ছেলেমানুষ। বাড়ি এসে গেল। এসো।', বলে অনিমেষ সামনের একটা একতলা বাড়ি দেখাল।

অনিমেষের সংসারে চারজন লোক। অনিমেষ, ওর বাবা কেদারবাবু, মা, এবং বোন বিভা। কেদারবাবু পাটনা সেক্রেটারি-য়েটে কাজ করতেন। এখন অবসর নিয়েছেন। এই একটু সময়ের মধ্যে ভদ্রলোক অনেক কিছু বললেন। বললেন, 'আগের সেই সোনার দিনগুলি আর নেই, যখন মানুষ সত্যি সত্যি শান্তিতে বসবাস করত। আজকালকার মানুষ অসম্ভব উদ্ধত আর অসহিষ্ণু হয়েছে।' একটা আরাম কেদারায় শুয়েছিলেন কেদারবাবু। দুপাশ দিয়ে হাত দুটো ছড়িয়ে দিয়ে গল্প করছিলেন।

'প্রথম যখন পাটনায় এলাম, কী শহর ছিল তখন। মানুষ মানুষকে ভালবাসতো। নতুন এক ঘর বাঙালী এলে আর সব বাঙালীরা কত আদর যত্ন করতো। পুরো একটা মাস ধরে রান্নাবান্নার সুযোগই হয়নি আমাদের। শুধু নেমন্তন্ন আর নেমন্তন্ন।' ভদ্রলোক কথার মাঝখানে মাঝে মাঝে গিন্নীর দিকে তাকাচ্ছিলেন। অনিমেষের মা চুপ করে বসেছিলেন। ভালমন্দ কিছু বললেন না। 'সবচেয়ে বড় কথা ছিল, একজন আর একজনের সুখে দুঃখে এগিয়ে আসতো। আজও মনে আছে, এসেই উনি অসুখে পড়লেন। তখন ছেলেমেয়ে কেউ জন্মায়নি। একা মানুষ, কী বিপদ বলুন তো। অফিস করবো না, রুগীর শুশ্রূষা করবো। তখন বিজয় রুদ্র বলে এক ভদ্রলোক বাড়ির কাছাকাছি থাকতেন। বিজয়বাবুর পরিবার এসে এ বাড়িতে থাকতেন। তাঁর এক বিধবা বোনও ছিলেন। কী সব মানুষ ছিলেন তখন। আপন পর জ্ঞান ছিল না। আর এখন! পাশের বাড়িতে কেউ মরে গেলেও অন্য বাড়ির রেডিওটা একটু আস্তে বাজে না। কী বলেন, বাজে?' কেদারবাবু আমার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

'আপনি আমাকে তুমি বলবেন। আমি অনিমেষেরই বয়সী।'

'বেশ।' মনে হল কেদারবাবু খুশী হলেন। এক একজন মানুষ খুশী হলেও তাদের মুখে ভাবান্তর ঘটে না। কেদারবাবুর মুখ সেই ধরনের। গোলগাল মানুষ। চ্যাপ্টা নাক, ছোট চোখ, অনিমেষের মতই ময়লা রঙ। মাথার সব চুল পাকা। মুখের কোথায় যেন একটা কাঠিন্য রয়েছে, যা দেখে প্রথমেই মনে হয়, ভদ্রলোক স্বার্থপর। হয়ত তা না, হয়ত কেদারবাবু দারুণ পরোপকারী, আত্মভোলা মানুষ। চেহারা দেখে মানুষ যাচাই করতে গিয়ে এক এক সময় কী ভীষণ ভুলই না হয়ে যায়। সুপ্রিয়াকে প্রথম দেখে আমার মনে হয়েছিল, ও খুব সরল আর নিষ্পাপ মানুষ, একটু নির্বোধ-নির্বোধও মনে হতো প্রথম দিকে। তারপর ধীরে ধীরে ওর চেহারার কী অসম্ভব পরিবর্তন ঘটে গেল! এমন কী ম্যাজমেজে ময়লা রঙটাও কত ফর্সা হয়ে গেল। শুধু ফর্সা না, একটু উত্তেজনায় বা খুব হাসলে সুপ্রিয়ার মুখে লাল রঙ ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম প্রথম ও একটুও সাজগোজ করতো না। আর এখন!

'নতুন এসেছো, এখন সাবধানে চলাফেরা করবে। এখানে যদিও এরা মুখে

বিন্দু বলছে না, একটা অন্যরকম ফিলিংও রয়েছে।'

অনিমেষের মা বললেন, 'তোমার কে কে আছেন ?'

'মা। বাবা ছেলেবেলায় মারা গেছেন। তখন আমি সবে কলেজে ঢুকেছি।'

'ভাই বোন ?'

'আমি বাবা মার একমাত্র সন্তান।'

ভদ্রমহিলা আর কথা বললেন না। চুপ করে তাকিয়ে রইলেন। সেই তাকানোর মধ্য দিয়ে তিনি যেন আমাকে সমবেদনা জানালেন। অনিমেষের মাকে দেখতে দেখতে মার কথা মনে পড়ে গেল। মাও এক এক সময় এভাবে তাকিয়ে থাকে। বিশেষ করে বলাইয়ের দিকে। মনে আছে, বলাইয়েরও মা মারা যাবার পর যখনই মা বলাইকে দেখতো, তখনই কাঁদতো। অনিমেষের মা যদি আমাকে দেখতে দেখতে হঠাৎ কেঁদে ফেলেন বিষম বিব্রত হয়ে পড়ব। তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'আমার তিন মামা আছেন, আর অনেক মামাতো ভাইবোন।'

'তোমার কাকা কিম্বা জ্যাঠা কেউ নেই ?'

'আমার বাবাও ঠাকুর্দার একমাত্র সন্তান ছিলেন। অবিশ্যি বাবার দুইজন খুড়তুতো ভাই আছেন। তাঁরা বিদেশে চাকরি করেন। বড় মামার কাছেই তো মাকে রেখে এলাম। একরকম জোর করেই বড়মামা মাকে নিয়ে গেলেন, একমাত্র বোন কিনা।'

অনিমেষ বলে উঠল, 'তুমি তো দস্তুর-মতো হিংসার পাত্র দেখছি। কথায় বলে না, মামাবাড়ি! তিন তিনটি মামা, আর একটি-মাত্র ভাগ্নে, আদর খায় কে।'

গর্বিত দৃষ্টিতে অনিমেষের মার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'মামা মামীরা খুব ভাল-বাসেন আমাকে।'

অনিমেষের মা খুশী হলেন। বললেন, 'সে তো স্বাভাবিক। তোমার মত ছেলেকে না ভালবেসে কি পারা যায়।'

অনিমেষ মার পেছনে লাগল, 'মুহূর্তের মধ্যেই অংশুকে ভালবেসে ফেললে মা! মার ভালবাসাটা কী রকম জানো। লতার মত, একটা শুকনো কাঠি মাঠি যা পেল, লতাতে শুরু করে দিল।'

অনিমেষের মা নকল রাগ দেখিয়ে বললেন, 'তুই চুপ কর।'

সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলাম। হাসলেন না শুধু কেদারবাবু। উনি একটা হাই তুললেন। লক্ষ্য করে দেখছিলাম, অনিমেষ ওর বাবার সঙ্গে একবারও কথা বলে নি। কেদারবাবুও যতক্ষণ কথা বল-ছিলেন, হয় আমার দিকে না হয় অনিমেষের মার দিকে তাকাচ্ছিলেন। একবারও অনিমেষকে দেখেন নি।

একটি মেয়ে ট্রে হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল। অনিমেষ পরিচয় করিয়ে দিল, 'আমার বোন বিভা। বিভা খুব ভাল মালপো তৈরী করে।'

বিভা নিমেষের জন্য আমার দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল। প্লেট দুটো আমার আর অনিমেষের সামনে রেখে দিয়ে ট্রে নিয়ে ভেতরে চলে গেল। কেদারবাবুর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আপনি খাবেন না ?'

'নাঃ।' ভদ্রলোক চোখ বুজে ছিলেন। সেভাবেই উত্তর দিলেন।

অনিমেষের মা বললেন, 'বিকেলের দিকে ওঁর অম্বল হয়।'

'এসব দেশে অম্বল ? শুনেছি এদিককার জল-হাওয়া ভাল।'

'সব শোনা কথা। পশ্চিমে হাওয়া বদলাবার কথাটা আজকাল একেবারে বাজে। সর্বত্রই ভেজাল। সর্ষের তেল খাও, শেয়াল কাঁটা। ঘি খাও সাপের চর্বি। খাবেটা কি ? হাওয়া খেয়ে বাঁচতে চাও, সেখানেও ভেজাল, ডিজেলের ধোঁয়া, কারখানার চিমনীর ধোঁয়া, উনুনের ধোঁয়া—সব মিলিয়ে শুধু ধোঁয়া। শুনলাম, তোমাদেরও নাকি কারখানা হবে এখানে ?'

'সঠিক জানি না, একটা প্রপোজাল তো শুনে এসেছি।'

'তবেই বোঝ, দেশটা যাচ্ছে কোথায়। অথচ প্রথম যখন এখানে এলাম কি ছিল। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শহর, নির্মল বায়ু—'

অনিমেষের মা বাধা দিলেন, 'শহর কোন কালেই পরিষ্কার ছিল না। তবে বাতাসে হয়তো এত ধোঁয়া ছিল না। মানুষও তো বাড়ছে।'

কেদারবাবু দাঁত খিঁচিয়ে উঠলেন, 'প্রথম যখন বাড়ী হল, এত ঘিঞ্জি ছিল এদিকটায় ?'

অনিমেষের মা বললেন, 'তা অবিশ্যি ছিল না। এদিকটা তো শহরের বাইরে ছিল তখন। ক্রমশই শহর এগিয়ে আসছে। একে আর আলাদা বলে মনে হয় না এখন। অথচ কিছু দিন আগেও রাত্রে শেয়ালের ডাক শুনতে পেতাম।'

বিভা চা নিয়ে এল। অনিমেষ হাত বাড়িয়ে চা নিতে নিতে বলল, 'এলাচ লবঙ্গ দিয়ে বিভা এমন চা করে না! খেলে আর ভুলবে না।'

বিভা নিমেষের জন্য আমাকে দেখে নিয়ে মৃদু স্বরে বলল, 'আজ শুধু এলাচ দিয়েছি। লবঙ্গ ছিল না।'

চা সত্যি অপূর্ব হয়েছে। বললাম, 'এ ধরনের চা গুজরাটিদের দোকানে পাওয়া যায়। তবে এত ভাল হয় না। ওরা ভয়ানক চিনি দেয়।'

'আপনি বুঝি চিনি কম খান ?' বিভা প্রশ্ন করল।

'কম খাই না, মাপ মত খাই। ওরা যেটা দেয়, সেটা মাপের বাইরে।'

এবারেও দেখলাম, কেদারবাবু চা খেলেন না। ভদ্রলোক চোখ বুজে পড়ে রয়েছেন। ঘুমিয়ে পড়েছেন, না জেগে রয়েছেন বোঝা গেল না। বিভার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'ভাল চা করাটা এক মস্ত গুণ।'

অনিমেষ বলল, 'বিভা শুধু যে ভাল চা আর মালপো করে তা-ই না। রান্না-বান্নায়ও ওর খুব পাকা হাত। রোববার দিন তো খাইয়ে ওকে।'

আমি বললাম, 'না, না আর একদিন খাবো'খন।'

অনিমেষের মা বললেন, 'তুমি এত পর পর ভাবছো কেন বাবা। বিদেশে বাঙালী আত্মীয়ের সমান। তাছাড়া তুমি অনিমেষের বয়সী, এক অফিসে চাকরী করো, বলতে গেলে বাড়ীর ছেলেই। তুমি কোন সংকোচ করো না।'

এর পরে আপত্তি করা চলে না। বিভা যতক্ষণ বসেছিল, সঙ্কুচিত হয়ে ছিল। মাঝে মাঝে কেদারবাবুর দিকে তাকাচ্ছিল। মনে হল, কেদারবাবুর সঙ্গে বাড়ীর কারও সম্পর্ক তেমন মধুর না। ভদ্রলোক কেমন যেন একটা শক্ত আবরণের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন। মাঝে মাঝে ক্ষুব্ধ দৃষ্টি দিয়ে জগৎ দেখছেন, আবার গিয়ে সেই সাধারণের আড়ালে লুকিয়ে পড়ছেন। এ ধরনের লোক আমি বহু দেখেছি। সংসারে ঘা-খাওয়া মানুষ এরা। কেদারবাবু যে কোথায় আঘাত পেয়েছেন, বুঝতে চেষ্টা করছিলাম। আপাতদৃষ্টিতে ভদ্রলোককে সুখী বলে মনে না হওয়ার কোন কারণ নেই। সুস্থ ছেলে-মেয়ে, ভালমানুষ স্ত্রী। অম্বল কিম্বা পেটের রোগটোগ যদি কিছু থেকে থাকে, এই বয়সে সেটা এমন কিছু না যে মানুষকে অসুখী করে তুলবে। বড়-মামাও তো পেটের রোগে ভোগেন। কিন্তু অসুখী বলতে যা বোঝায় তা তো উনি নন। বরং কথায় কথায় কত রসিকতা করেন বড়মামা, কত জানেন। কেদারবাবুর তুলনায় বড়মামাকে মানসিক দিক থেকে অনেক সুস্থ বলে মনে হল।

গল্পে গল্পে নটা বেজে গেল। উঠে পড়লাম। অনিমেষ আমার সঙ্গে চলল।

'আমি না হয় একটা ট্যাক্সি কিম্বা রিকশা নিয়ে চলে যাব, তুমি যাবে কেন শুধু শুধু।'

অনিমেষ কথা শুনল না। আমার সঙ্গে বেরিয়ে আসছিল, বিভা বলল, 'দাদা খুব হাঁটতে ভালবাসে।'

অনিমেষ বলল, 'অংশুও এই বিদ্যায় খুব পারদর্শী।'

বিভা হেসে উত্তর দিল, 'তাহলে দুজনে জমবে ভাল।'

লক্ষ্য করে দেখলাম, হাসলে বিভার গালে টোল পড়ে। আমার বড়মামীমারও হাসলে গালে টোল পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, বিভা খুব ভাল মেয়ে। যাদের গালে টোল পড়ে তারা কখনও খারাপ হয় না।

অনিমেষ নীচু গলায় বলল, 'সিগারেট না খেয়ে দম বেরিয়ে যাচ্ছে। চলো।'

দুজনে রাস্তায় পা দিলাম। বাড়ীর সামনে ছোট একটু বাগান। তারপরে একটা শাদা ফটক। ফটকের ওপর একটা হাত রেখে বিভা তখনও দাঁড়িয়ে আছে।

(ক্রমশঃ)

কালাপানি

অতুল চক্রবর্তী

পূর্বে আমাদের দেশে অপরাধীকে নানারূপ বীভৎস শাস্তিদানের কথা শোনা যায়, যথা—জীবন্ত সমাধি, শূলে চড়ানো, ডাল কুত্তা দিয়ে খাওয়ানো ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু দ্বীপান্তরে নির্বাসন দণ্ড ইংরেজ আমলের আমদানী। বিশেষ করে বারীন ঘোষের যুগে মানিকতলা বোমার মামলার পর থেকে বহু বাঙালী যুবকই আন্দামান কারাগারের করুণ অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। তাঁদের রচিত মর্মান্তিক কাহিনীর মাধ্যমে বাঙালী সমাজ আন্দামান বন্দীশালার নির্মম অত্যাচারের চিত্রের সঙ্গে সবিশেষ পরিচিত।

আমাদের বাল্যাবস্থায় আন্দামানের বন্দীজীবন সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ ছাত্র সমাজে বিশেষ প্রচলিত ছিল। তাদের মধ্যে 'নির্বাসিতের আত্মকথা', 'বন্দীজীবন' 'দ্বীপান্তরের বিভীষিকা', 'ঊনপঞ্চাশী' প্রভৃতি অন্যতম। এই সকল বই আজকাল তেমন চোখে পড়ে না।

যাই হোক, মূল কথা এই—অপরাধীকে দ্বীপান্তরে প্রেরণের প্রথা, পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলির উপনিবেশ বিস্তারের অন্যতম বাহন হিসেবেই জন্ম লাভ করে। এর প্রধান কারণ শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলির জনসংখ্যা বিশ্বের অন্যান্য দেশের জনসংখ্যার তুলনায় নগণ্য। তাই শ্বেতাঙ্গ জাতিগুলি প্রথম অবস্থায় সাগর পারের বিজিত এবং অজ্ঞাত-পরিচয় দেশগুলিতে দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধী প্রেরণ করে উপনিবেশের ভিত্তি স্থাপনের চেষ্টা করে।

এমন কি পঞ্চদশ শতাব্দীতে আমেরিকা আবিষ্কারের সময় থেকেই বিদেশে কয়েদী প্রেরণের এই অভিনব নীতির সূচনা দেখতে পাওয়া যায়। ১৪৯৮ খৃঃ কলাম্বাস যখন তৃতীয়বার সমুদ্র পার হয়ে আমেরিকা যাত্রা করেন, তখন প্রচুর স্পেনীয় কয়েদী সঙ্গে নিয়ে যান আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু এই নীতি শেষ পর্যন্ত শোচনীয় বিফলতায় পর্যবসিত হয়।

প্রধানত কয়েদীদের মধ্যে আইন ও শৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্য অত্যন্ত ক্ষীণ, নিজেদের মধ্যে প্রায়ই খুনোখুনি লেগে থাকত। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য উপনিবেশ শাসনকর্তার বেশীর ভাগ সময়ই ব্যয়িত হতো। দ্বিতীয়ত নিজেদের মধ্যে আত্মকলহের সুযোগ নিয়ে বিক্ষুব্ধ ও উৎপীড়িত আদিবাসীরা অনেক সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশগুলি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে ফেলতো। কয়েদীদের মাধ্যমে উপনিবেশ বিস্তারের প্রচেষ্টা স্পেনীয়দের পক্ষে মোটেই সাফল্যমণ্ডিত হয় নি।

পরবর্তীকালে ইংরেজরা স্পেনীয়দের পদাঙ্ক অনুসরণ করে উত্তর আমেরিকায় কয়েদী উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা করে। কিন্তু সে চেষ্টাও তেমন ফলপ্রসূ হয় নি। দুঃসাহসী অপরাধীদের কারাগার থেকে মুক্ত করে একবার বিদেশে পাঠালে তাদের আয়ত্তাধীনে রাখা বিশেষ কষ্টসাধ্য হতো। পরবর্তীকালে এই সকল অপরাধীরা অনেক ক্ষেত্রে জলে ও স্থলে দুর্ধর্ষ দস্যুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদের দমন করতে ইংরেজের শক্তিশালী নৌবহর পর্যন্ত হিমশিম খেয়েছে।

যাই হোক অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইংরেজ সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করবার পর আমেরিকায় ইংরেজ অপরাধী প্রেরণের প্রথা কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। এর পর ইংরেজরা জাহাজ বোঝাই করে করে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে কয়েদী প্রেরণ শুরু করে। প্রথমেত অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ-ওয়েলস প্রদেশেই এই অভিযান কেন্দ্রীভূত হয় এবং দ্বীপান্তর-নির্বাসিত জাহাজ-যাত্রীর সংখ্যা ক্রমশই স্ফীত হয়ে উঠতে থাকে।

অনেকেই অবগত আছেন, সেই সময়ে ইংলণ্ডের আইন অত্যন্ত নির্মম ছিল। একটি মুরগী, দু পাউণ্ড চিনি অথবা এক জোড়া মোজা চুরি করলেও দ্বীপান্তর হতো এবং তার কবল থেকে চোদ্দ-পনেরো বছরের বালকও রেহাই পেত না। কাজেই দ্বীপান্তর দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীর সংখ্যা এই সময়ে ইংলণ্ডে অত্যন্ত বেড়ে যায় এবং বিনা-দ্বিধায় জাহাজ বোঝাই করে তাদের পৃথিবীর অপর প্রান্তে নির্বিচারে প্রেরণ করা চলতে থাকে।

মজার কথা, এই সব দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত অপরাধীর যদি কোন আত্মীয়-পরিজন দ্বীপান্তরের সহযাত্রী হতে চাইত তবে তাদের বিনা ভাড়ায় অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছে দেওয়া হতো। আরও মজার কথা, এই সকল দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তির শাস্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হলেও দেশে অর্থাৎ ইংলণ্ডে ফিরে আসবার পথ খোলা ছিল না। ঐ সকল অঞ্চলে জাহাজের ক্যাপ্টেনদের ওপর কড়া হুকুম ছিল ইংরেজ সম্রাটের বিশেষ অনুমতি ভিন্ন মুক্ত অথবা বন্দী কোন যাত্রীকেই যেন অস্ট্রেলিয়া থেকে ইংলণ্ডে ফিরিয়ে আনা না হয়। এই সব ব্যবস্থার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সুদূর সমুদ্রপারের দেশগুলিতে স্থায়ী শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশ স্থাপন।

কিন্তু প্রথম অবস্থায় এই সকল অপরাধী-উপনিবেশগুলিতে গুরুতর হাঙ্গামা ও অশান্তি দেখা দেয়। গৃহ-প্রত্যাবর্তনের সকল আশা অবলুপ্ত হবার ফলে দ্বীপান্তর-বাসীরা অত্যন্ত বেপরোয়া হয়ে ওঠে। পলায়নের দুঃসাধ্য চেষ্টা করে কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করে। আবার কিয়দংশ বিদ্রোহে লিপ্ত হয়ে আত্মাহুতি দেয়। অবশেষে ইংরেজ সরকার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা অর্পণ করে অস্ট্রেলিয়ায় এক মিলিটারী গভর্ণর নিয়োগ করে এবং তিনি কঠোর হস্তে অপরাধীদের দমন করতে থাকেন।

এই নীতি শেষ পর্যন্ত কতটা কার্যকরী হতো তা বলা যায় না। কিন্তু অচিরেই অস্ট্রেলিয়ার খনিজ সম্পদ ও অন্যান্য শিল্প-বাণিজ্য সম্ভাবনায় আকৃষ্ট হয়ে সম্ভ্রান্ত, ধনী এবং আইন-অনুগত শ্রেণীর ইংরেজেরা ক্রমে ক্রমে এই মহাদেশে পদার্পণ করতে থাকে এবং ধাপে ধাপে অস্ট্রেলিয়া শ্বেতাঙ্গ-অধ্যুষিত এক বর্ধিষ্ণু দেশে পরিণত হয়। এই নবগঠিত শ্বেতাঙ্গ সমাজে পূর্ববর্তী কয়েদিদের উত্তরপুরুষ সমাহিত হয়ে যায় এবং অস্ট্রেলিয়ার নবজাত শ্বেতাঙ্গ জাতি ইংরেজের কয়েদি প্রেরণ নীতির প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। পরিশেষে ইংরেজেরা অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে কয়েদি প্রেরণ বন্ধ করতে বাধ্য হয়।

কিন্তু দ্বীপান্তর নির্বাসনের সর্বাপেক্ষা করুণ কাহিনী আমরা জানতে পারি ফরাসী দেশের ইতিহাস থেকে। ফরাসীরা তাদের দ্বীপান্তর নির্বাসিত আসামীদের প্রেরণ করতো দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলে ফরাসী গায়নাতে। পৃথিবীর ইতিহাসে স্থানটি 'ডেভিলস্ আইল্যাণ্ড' অথবা 'শয়তানের দ্বীপ' নামে কুখ্যাত। সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের রাজত্বকাল থেকে এটি অপরাধী উপনিবেশরূপে ব্যবহৃত হতে থাকে। এই স্থান থেকে পলায়নের চেষ্টা একরূপ অসাধ্য ছিল। একদিকে অনন্ত জলরাশি অন্যদিকে দুর্ভেদ্য অরণ্য, বিষাক্ত সর্প ও অন্যান্য নরঘাতী কীট-পতঙ্গ ও জীবজন্তুতে পরিপূর্ণ অথবা হিংস্র বন্যজাতি-অধ্যুষিত। এই দ্বীপান্তর থেকে বারবোর পলায়নের চেষ্টা করে প্রতি বৎসর সংখ্যাতীত বন্দী প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। কিন্তু তবুও এই অর্থহীন প্রয়াস কখনও বন্ধ হয়নি। কারণ এখানকার জীবন্ত মৃত্যুর চেয়ে পলায়নে মৃত্যু বন্দীরা শ্রেয়স্কর বলে মনে করতো। 'ডেভিলস্ আইল্যাণ্ড' নামে বিনু মুখোপাধ্যায়ের ছোটদের একখানি বই আছে।

এই বন্দী উপনিবেশে প্রহরীর সংখ্যা ছিল বিস্ময়কররূপে অল্প। কর্তৃপক্ষ মনে করতো, এখানকার অরণ্য এবং সমুদ্র যে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর রচনা করেছে তার সামনে অতিরিক্ত প্রহরীর ব্যবস্থা অনাবশ্যক। এই অভিশপ্ত ফরাসী বন্দীশিবিরের সঙ্গে এক বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক রেনে বেল-বেনয়েট-এর জীবন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তিনি পনেরো বৎসরকাল এই বন্দী উপনিবেশে অবরুদ্ধ ছিলেন এবং তিনবার ফরাসী গায়না থেকে পলায়নের ব্যর্থ চেষ্টার পর চতুর্থবার সাফল্য লাভ করেন। তিনি পলায়নের সময়ে তাঁর নির্বাসিত বন্দীজীবন সম্বন্ধে রচিত যে পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে এনেছিলেন তা সাহিত্যজগতে একটি মূল্যবান অবদানরূপে পরিগণিত এবং তার থেকে ফরাসী বন্দীশিবিরের অনেক দুর্দশা ও

অমানুষিক কাহিনী জগত সমক্ষে আত্ম-প্রকাশ করে।

রেনে ১৯২০ খৃঃ একুশ বৎসর বয়সে চুরির অপরাধে আট বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করে ফরাসী গায়নায় প্রেরিত হন। ফরাসী সরকারের আদেশ ছিল, কয়েদি বিচারালয়ের নির্দেশে যতদিনের সাজা লাভ করেছে দণ্ডাদেশের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে, আরও ততদিন মুক্ত নাগরিক হিসেবে বন্দী উপনিবেশে তাকে বাস করতে হবে। অবিশ্যি এর ভেতরে যদি তার মৃত্যু না ঘটে। অর্থাৎ কারো যদি সাত বৎসরের শাস্তি হয় তবে চোদ্দ বৎসর অতিবাহিত না হলে বন্দী উপনিবেশ ত্যাগ করবার তার অধিকার ছিল না।

এই নিয়মের অর্থ, ফরাসী সরকার চেয়েছিল বন্দীরা যাতে বিয়ে শাদি করে ঘর-সংসার পেতে দক্ষিণ আমেরিকার উপ-কূলের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে ফরাসী সাম্রাজ্যের অংগ হিসেবে বিরাজ করতে থাকে। কিন্তু বন্দীদের ওপরে যে উৎপীড়ন করা হতো তার ফলে স্থায়ীভাবে ঘরসংসার পাতবার কল্পনা তাদের মনে মুহূর্তের জন্যেও স্থান পেতো না। প্রতি বৎসরের প্রথম দিকে জাহাজে করে প্রায় সাত শত বন্দী দ্বীপে নিয়ে আসা হতো। এর ফলে বন্দী সংখ্যা দাঁড়াতো প্রায় ৩৫০০ শত, কিন্তু বৎসর ঘুরতে না ঘুরতেই সংখ্যা নেমে আসতো প্রায় ২৮০০শর কাছাকাছি। অর্থাৎ গড়ে প্রায় সাত শত লোক প্রতি বৎসর

অজানিতভাবে প্রাণ হারাতো অথবা সমুদ্র কিংবা অরণ্যপথে পালাবার চেষ্টা করে চিরদিনের জন্য নিখোঁজ হয়ে যেতো।

অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে ধীরে ধীরে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের ফলে একটি সভ্য সমাজ গড়ে উঠে ভূতপূর্ব বন্দীদের সন্তান-সন্ততির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছে এবং তারা নতুন সভ্য সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। কিন্তু ফরাসী গায়নায় অনুরূপ উন্নতির চেষ্টা ফরাসী সরকার আদৌ করেনি। ১৯৩৮ খৃঃ পর্যন্ত ফরাসী গায়নায় এক মাইল রেলপথ অথবা একটিও ফ্যাক্টরিও স্থাপিত হয়নি। যে সকল জাহাজ এখানে পণ্য নিয়ে আসতো তাদের ফিরে যেতে হতো শূন্য হাতে। বিনিময়ে নিয়ে যাবার মত কোন পণ্যসম্ভার এখানে উৎপন্ন হতো না।

উদ্যোগ ও কর্মের অভাবে মানুষ এখানে অবনতির পথ ধরে নেমে আসতো পশুর স্তরে। পরস্পরকে বঞ্চিত করবার প্রবৃত্তি হয়ে উঠতো প্রবল। সামান্য কারণে কলহ এমন কি হত্যা করতেও তারা কুণ্ঠিত হতো না। মমতা, ক্ষমা, স্নেহ প্রভৃতি মনুষ্যোচিত গুণগুলি অবলুপ্ত হয়ে বন্দীরা হয়ে উঠতো স্বার্থপর হিংস্র জন্তুর মত।

বেনে তাঁর প্রথম পলায়নের ব্যর্থ প্রচেষ্টার যে বিবরণ দিয়েছেন তার থেকে কয়েদীদের স্বভাবের কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে। সেদিন ছিল বড়দিনের রাত্রি। এই সময়ে প্রহরীরা সাধারণতঃ নেশার ঝোঁকে বেহুঁশ থাকে কাজেই আমরা নয়জন কয়েদি এই রাত্রিই উপযুক্ত সুযোগ বলে বেছে নিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য সমুদ্রপথে পলায়ন। জোগাড় করেছিলাম ছোট একটা ডিঙ্গি, সামান্য কিছু রসদ ও এক টব পানীয় জল। [illegible] এক পায়খানায় ব্যবহৃত হতো। ওটাকে [illegible] নদীর জলে কয়েকদিন ফেলে রেখে দুর্গন্ধ দূর করলাম।

অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে পায়ে হেঁটে আমরা ওলন্দাজ গায়নার সীমান্তে মারোনি নদীর তীরে পৌঁছে ডিঙ্গিতে চড়লাম। তার পর ক্ষিপ্র স্রোতের টানে অচিরেই একুশ কিলোমিটার পথ পার হয়ে আমরা পড়লাম আটলান্টিক মহাসমুদ্রের দিকচিহ্নহীন জলরাশির মধ্যে। সহসা কানে এলো বজ্রগম্ভীর এক ভয়ংকর গর্জন। প্রচণ্ড ঢেউ ছুটে আসছে হুংকার করতে করতে। আমাদের দলপতি মার্সাই চেঁচিয়ে উঠল—বাস্ক, ঠিক করে হাল ধর, তরঙ্গ ভঙ্গ হচ্ছে।

সমুদ্রের অভিজ্ঞতা আমাদের কারও ছিল না। একমাত্র বাস্ক-এর ওপরই ছিল ভরসা। বাস্ক ভান করেছিল, সে নাবিক এবং সমুদ্রে হাল ধরতে পারদর্শী। পালাবার সুযোগ লাভের আশাতেই সে এই ছলনাটুকু করেছে। কিন্তু সহস্র সহস্র ক্রুদ্ধ ঐরাবতের মত তরঙ্গের ভয়াল রূপ দেখে বাস্ক দিশেহারা হয়ে পড়ল। মার্সাই-এর [illegible] সত্য কথা স্বীকার করে [illegible] লাগল। কিন্তু [illegible] [illegible] প্রচণ্ড সংঘাতে ডিঙ্গিটা উল্টে গেল মোচার খোলার মত। রসদ ও পানীয় জল যেটুকু ছিল সব খোওয়া গেল। জীবন পণ করে নৌকোর দাঁড়দড়া ধরে আমরা কজন কোন রকমে ভেসে থাকলাম জলের ওপরে। ভাবলাম আর একটি তরঙ্গাঘাতে আমাদের সকলেরই সলিলসমাধি সুনিশ্চিত। অচিরেই গর্জন করতে করতে ধেয়ে এলো আর একটি ঢেউ। জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম সকলেই। সম্বিৎ ফিরে এলে দেখলাম ক্ষুব্ধ তরঙ্গ আমাদের গ্রাস করে নি, জঞ্জালের মত ছুঁড়ে দিয়েছে সমুদ্র সৈকতে।

একটু দম নেবার পরই দেখলাম, মার্সাই তার কোমরে খাপেঢাকা ধারালো ছুরি বের করে হঠাৎ বাস্ক-এর সামনে উপস্থিত হয়ে বলল—যদি জীবনের মমতা থাকে তবে এক্ষুনি দল ছেড়ে চলে যাও। কোন অনুনয় বিনয় শুনল না মার্সাই। প্রতিহিংসায় তার চোখ থেকে আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে। আমরা সকলেই বাস্ককে ক্ষমা করতে প্রস্তুত ছিলাম কিন্তু মার্সাই-এর প্রতিবাদ করবার সাহস ছিল না কারোও। অগত্যা মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে বাস্ক চলে গেল জঙ্গলের মধ্যে।

বেলা অল্পই বাকী ছিল। খিদের-জঠরের মধ্যে আগুন জ্বলছে। নিজের নিজের ঝোলায় যৎকিঞ্চিৎ সামান্য আহার্য ছিল তাও বিস্বাদ হয়ে গিয়েছিল নোনা জলে। তাই খেয়ে সকলে পড়ে থাকলাম বালির ওপরে। আশা, সকালে উঠে কোন একটা পথ খুঁজে বের করা যাবে। কিন্তু সকালে উঠেই দেখি বাস্ক আবার ফিরে এসেছে এবং অনুনয়ের সুরে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলে। সে জানাল, অঞ্চলের গোটাটাই জলে-ডোবা বেরিয়ে যাবার কোন পথই সে পাচ্ছে না। মার্সাই কিন্তু এবার আর মুহূর্তও সময় দিল না। বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ছোরা আমূল বসিয়ে দিল বাস্ক-এর হৃদপিণ্ডের অভ্যন্তরে। সুতীক্ষ্ণ আর্তনাদ-সহকারে বাস্কের দেহ লুটিয়ে পড়ল বালির ওপরে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল, খানিকক্ষণ ছটফট করে দেহটা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

যেন কিছুই হয় নি এইভাবে মার্সাই রক্তাক্ত ছোরাখানা বাস্ক-এর কাপড়ে মুছে পুনর্বার খাপের মধ্যে রাখল। তার পর মৃতদেহটা টানতে টানতে জলের কিনারে নিয়ে ফেলে দিল। সম্ভবত জোয়ারের স্রোতে সেটা ভেসে যাবে।

চারদিক অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও ওলন্দাজ গায়নার দিকে বেরিয়ে যাবার কোন পথ পাওয়া গেল না। বাস্ক সত্যই বলেছিল চতুর্দিক জলমগ্ন। অবশেষে স্থির করা হলো, পুনরায় ফরাসী গায়নায় ফিরে গিয়ে আত্মসমর্পণ করা হবে। তবে সেটাও খুব সহজ কথা নয়। নিবিড় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ কেটে কেটে অনেক কষ্টে আমরা এগোতে লাগলাম উত্তর দিকে। আমাদের মধ্যে জীপসীর ছিল একটি কাঠের পা। অসিদ্ধ পা-খানা খোঁড়া [illegible] করতে পারে। তাই তাকে চলতে হতো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, অনেক সময়ে হোঁচট খেয়েও পড়ে যেত। তাকে সাহায্য করবার জন্য ওর বন্ধু রবার্ট সকল সময়েই ওর সঙ্গে থাকতো। তাই ওরা দুজন প্রধান দল থেকে অনেকটা পিছিয়ে পড়ল। আমরা অন্য সকলে আগে আগে পথ কেটে চললাম।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যাবেলায় ক্লান্ত হয়ে আমরা যখন বিশ্রাম করছিলাম তখন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে জীপসী এসে উপস্থিত হলো আমাদের দলে কিন্তু রবার্টকে দেখা গেল না। সন্দিগ্ধভাবে মার্সাই জানতে চায়—রবার্ট কোথায়? — জীপসী থেমে থেমে জবাব দেয়—কি জানি কোথায়! ক্লান্ত হয়ে পথের পাশে বিশ্রাম করছিল, হয়তো এক্ষুনি চলে আসবে। কিন্তু এক ঘণ্টা পরেও যখন রবার্ট ফিরে এলো না তখন মার্সাই ব্যস্ত হয়ে নিজেই খুঁজতে বেরোলো।

অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করেও মার্সাই কোন হদিস করতে পারল না। অবশেষে হতাশ হয়ে সে যখন ফিরে আসছিল হঠাৎ চোখে পড়ল পথের পাশে ঝোপের আড়ালে লুকোনো রয়েছে রবার্টের লাশ। মাথাটা তার ফেটে চৌচির; পাশেই পড়ে রয়েছে শূন্য খাবারের থলি। [illegible] না, কয়েক টুকরা ট্যাপিওকা এবং একটু গুঁড়ো দুধের জন্য জীপসী তার [illegible] বন্ধুকে অসতর্ক মুহূর্তে মাথায় বাড়ি দিয়ে খুন করেছে।

নিঃশব্দে মার্সাই ফিরে এলো শিবিরে। কাউকেই কিছু বলল না। জীপসী বারংবার ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলো—আমার প্রিয় বন্ধুর কোন খবর পেলে? — চরম ঔদাসীন্য দেখিয়ে জবাব দেয় মার্সাই—নাঃ কোন কিনারাই করতে পারলাম না। মার্সাই কিন্তু গোপনে একজনকে জানিয়েছিল আসল কথাটা, তার বন্ধু ভাগড়া মার্সেলকে।

মার্সাই যাই বলুক না কেন জীপসী কিন্তু তাকে বেশ চোখে চোখে রাখতে আরম্ভ করল। অর্থাৎ মনে মনে তার ভয় ঢুকেছে। হঠাৎ একবার মার্সাই জীপসীর সামনে উপস্থিত হওয়ায় সচকিত হয়ে জীপসী পিছিয়ে আসবার চেষ্টা করল আর সেই অতর্কিত মুহূর্তে ভাগড়া মার্সেল পেছন দিক থেকে আমূল ছুরি বসিয়ে দিল তার বুকে।

সেটা ছিল বিভীষিকাময়ী রাত্রি। খাবার কিছু নেই। খিদের জ্বালায় মানুষগুলো যেন নেকড়ের মত হন্যে হয়ে উঠেছে! এমন সময়ে ভাগড়া মার্সেলের ছোট ভাই জেরাড প্রথম বলে উঠল—কাজকের মত জীপসীর মাংস খেয়েই রাত কাটানো যাক। —সঙ্গে সঙ্গে মার্সাই জোর দিয়ে সমর্থন করল, নিশ্চয়! [illegible] বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করতে পারে সে জানোয়ারেরও অধম। ওর মাংস খেতে দোষ নেই। [illegible] [illegible] [illegible] কলিজা এবং যকৃৎ [illegible] বিদ্ধ করে

শিক কাবাব বানিয়ে পরম পরিতোষপূর্বক খেতে আরম্ভ করল। আমরা কেউ আর স্বাভাবিক মানুষ ছিলাম না।

ব্যাপার দেখে আমার মাথা ঘুরতে লাগল, দেহের মধ্যে ঘিন ঘিন করে উঠল। কিন্তু দলের সমস্ত মানুষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবো, সে শক্তি ও সাহস কোথায়! তাছাড়া আমিও তো ক্ষুধায় অবসন্ন ও অস্থির। আমাকেও সেই মাংসই খেতে হলো। সেই রাত্রিতে আমাদের কারারই ঘুম হয় নি। মুখে যে যতই বড় কথা বলি না কেন, মনের মধ্যে প্রত্যেকেরই প্রচণ্ড আলোড়ন চলছিল। সারা রাত্রি কেউ কারো সঙ্গে কথা বলি নি।

দু দিন পরে আমরা এক আদিবাসীদের গ্রামে পেঁছুলাম। আমাদের অবস্থা দেখে দয়াপরবশ হয়ে খুবই যত্ন করল তারা। এত দিন পরে আহার এবং বিশ্রাম লাভ করে অচিরেই সকলে নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়লাম। নিদ্রা ভঙ্গ হতেই দেখি পিস্তল নিয়ে ওলন্দাজ পুলিশ আমাদের ঘিরে রয়েছে। আদিবাসীরাই তাদের খবর দিয়েছিল। ওরা আমাদের গ্রেপ্তার করে ফরাসী গভর্নরের হাতে পুনর্বার সমর্পণ করলো।

এর পর আরও দুবার পালানোর চেষ্টা করে ব্যর্থকাম হয়েছি। বারংবার বিফলতার ফলে জীবন থেকে ক্ষীণ আশার আলোটুকুও নিভে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। আমাদের আর মানুষ বলে চেনবার উপায় ছিল না। চুল-দাড়ি হয়েছিল বনমানুষের মত। কয়েদীদের পরিধেয় জাঙ্গিয়া ও ফতুয়া শতচ্ছিন্ন অথবা অপহৃত। প্রায় অর্ধ-নগ্ন অবস্থায় দিন কাটাতে হতো। নিজেদের মধ্যে পরিধেয় বস্ত্র অথবা ঘটি-বাটি চুরি করে নেশার খোরাক যোগানো কয়েদীদের এক সুবিদিত অভ্যাস। এই পাণ্ডববর্জিত দেশেও নেশার চোরাকারবারী কম ছিল না। কয়েদীদের সঙ্গে তাদের গোপন লেনদেন চলতো। আমাদের কাঠের খড়মের মত এক জাতীয় পাদুকা দেওয়া হতো। অনভ্যস্তের পক্ষে সেগুলো ব্যবহার করা খুব শক্ত। হয় টাল খেত, নয় হোঁচট খেত। তাই অচিরেই কয়েদীরা সেগুলো ফেলে দিয়ে নগ্নপদে চলাফেরা করত। হঠাৎ কেউ আমাদের দেখলে তার সন্দেহ হত, বন্য বর্বর জাতীয় মানুষ।

একদিন নির্জন সমুদ্র সৈকতে বিকেলের কিছু আগে ঘুরছিলাম। হঠাৎ কানে ভেসে এলো এরোপ্লেনের গর্জন। অচিরেই নীল আকাশের পটে দৃষ্টিগোচর হলো ছোট একটি প্লেন এবং সেটা এসে নামল তটভূমির ওপরেই। কৌতূহলবশে এগিয়ে যেতেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো এক মার্কিন পাইলট। ভাঙ্গা ফরাসীতে আমায় জিজ্ঞেস করে — আচ্ছা এখানে কেউ ইংরেজিতে কথা বলতে জানে? আমি জবাব দিই, বিলক্ষণ! আমি নিজেই জানি।

—বাঃ বেশ ভাল কথা। আচ্ছা এখানে রেনে বেলবেনয়েট নামে কোন কয়েদী থাকে, যার কথা লেখিকা ব্লেয়ার নাইলস তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'শয়তানের দ্বীপে নির্বাসিত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন?

—রেনে বেলবেনয়েট! এ যে অবাক কাণ্ড! ও তো আমারই নাম। হ্যাঁ ব্লেয়ার নাইলস যখন ফরাসী গায়নার একবার এসেছিলেন তাঁর কাছে আমি কিছু পাণ্ডুলিপি বিক্রয় করেছিলাম।

—অতি উত্তম। তাহলে শোন, আমি মার্কিন মুলুকের এক ফিল্ম কোম্পানীর প্রতিনিধি। এই 'শয়তানের দ্বীপ' সম্বন্ধে আমরা একটি সিনেমা প্রস্তুত করছি। তুমি আমাদের সাহায্য কর।

সারা রাত ধরে সেই পাইলট বন্দী উপনিবেশ সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন করল এবং সাধ্যানুসারে আমি যথাযথ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করলাম। এমন কি কতগুলো স্থানের নকসা পর্যন্ত এঁকে দেখালাম। প্রভাতে সেই পাইলট সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে আবার উড়ে চলে গেল বিমান পথে। আমি একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করলাম। মুক্ত জগতের সঙ্গে যে ক্ষণিকের আত্মীয়তা স্থাপিত হয়েছিল, তা ছিন্ন হয়ে গেল, আমি আবার ফিরে এলাম বন্দী-উপনিবেশের নারকীয় পরিবেশের মধ্যে। কিন্তু পাইলট চলে যাওয়ার আগে আমার হাতে দিয়ে গেল দুই শত ডলার। এই তো আমার পারের কড়ি। মনের মধ্যে নির্বাপিত আশার প্রদীপ আবার দপ করে জ্বলে উঠল। এতকাল যে চেষ্টা সফল হয় নি, এবার তা নিশ্চয়ই হবে। এই পর্যাপ্ত অর্থ সাহায্যের ফলে পথ অনেক সুগম হয়ে গেল।

এক চীনে চোরাকারবারীকে ধরে একটা ডিঙ্গি এবং অন্যান্য তৈজসপত্র যোগাড় করলাম। ১৯৩৫ সালের দোসরা মার্চ রাত্রির প্রথম প্রহরে আমরা বাছা বাছা ছয়জন কয়েদী ডিঙ্গি নৌকায় সমুদ্র-পাড়ি দেওয়ার অসাধ্য সাধনে আবার ব্রতী হলাম। প্রথম বারের মত এবার আর ভুল করি নি। এবার সত্য সত্যই এক ওস্তাদ নাবিক সঙ্গে নিয়েছিলাম। তাহলেই বা কি হয়! প্রথম দু দিন আশা ও উৎসাহের মধ্যে কেটে গেল কিন্তু তৃতীয় দিন থেকেই পলাতকদের মধ্যে আত্মকলহ দেখা দিল। সারা দিন সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে দেহ পুড়ে যায়। জল তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাওয়ার উপক্রম, আর থেকে থেকে লাগে নোনা জলের ঝাপটা। সকলের দেহ এক অস্বস্তিকর নোন্তা ঘামে চট চট করছে। পানীয় জলের সঞ্চয় ও রসদ ক্রমেই ফুরিয়ে আসছে। তদুপরি এই দিকচিহ্নহীন সমুদ্রে কত দিন কাটাতে হবে কেউ জানে না।

চতুর্থ দিনে তো রীতিমত বিদ্রোহের সূচনা। বেবার্ট চেঁচিয়ে বলে,—খুব হয়েছে! আর পালিয়ে কাজ নেই। এবার ফিরে চল আবার বন্দী-উপনিবেশে। আমি প্রতিবাদ করে জানাই,—কখনই নয়! হয় মুক্তি, নয় মৃত্যু, মাঝামাঝি কিছু নয়।

দাদারকে দেখলাম হামাগুড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। ওর মতলব ভাল মনে হলো না। আমার সার্টের তলায় গুলীভরা পিস্তল ছিল, সেটাকে টেনে বের করে প্রস্তুত হলাম। এরকম একটা সংকট মুহূর্ত আসতে পারে সেই কথা মনে করেই পিস্তলটা সঙ্গে এনেছিলাম। অবাধ্য পলাতকদের স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলাম—তোমরা যদি বিদ্রোহের চেষ্টা করো, তবে প্রত্যেককেই আমি হত্যা করবো। রুখে উঠল চিক্লট—হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছো কেন বেবার্ট, পালের দড়িটা ছিঁড়ে ফেল না?

ওদিকে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার পিস্তল কেড়ে নেবার চেষ্টায় দাদার ব্যর্থকাম হয়ে ঢেউয়ের টাল সামলাতে না পেরে ডিঙ্গির মধ্যে পড়ে গিয়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল। চিক্লটেরও সেই অবস্থা। এমন সময়ে উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল কাস্কেট—ওই যে ডাঙ্গা দেখা যাচ্ছে! ডাঙ্গা দেখা যাচ্ছে। আমরা ত্রিনিদাদে পেঁছে গেছি।

হঠাৎ বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো না একথা। আমাকে বিভ্রান্ত করবার কৌশল নয় তো। পিস্তলের নিশানা থেকে দৃষ্টি কোন দিকে ফেরালাম না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে যাত্রীদের কলহ সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে গেল। দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখলাম বৃটিশ অধিকৃত দ্বীপ ত্রিনিদাদে সত্যিই পেঁছে গেছি। যা হোক, এ যাত্রা বাঁচা গেল।

ত্রিনিদাদের নিয়ম ছিল অন্য রকম। একবার পদার্পণ করতে পারলে সেখান থেকে পলাতক ফরাসী কয়েদীদের আবার শয়তানের দ্বীপে ফেরৎ পাঠান হত না। বরং তাদের পলায়নের সুবিধা করে দেওয় হতো। বেলবেনয়েট এবং তাঁর সহযাত্রীর এখানে মাসাধিক কাল বিশ্রাম করে এব উপযুক্ত রসদ ইত্যাদি সংগ্রহ করে ১০ জু পুনরায় যাত্রা শুরু করেন। বৃটিশ নৌবহ তাঁদের ডিঙ্গিটাকে টেনে নিয়ে মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের মিয়ামী বন্দরের দিক নির্দেশ দিয়ে ছেড়ে দেয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ডিঙ্গিখান দিকভ্রষ্ট হয়ে প্রবল বায়ুর সংঘাতে ত্রিনিদা থেকে রওনা হবার ষোল দিন পরে কলম্বিয় রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হয়। এখানে সকলে আবার কলম্বিয়া রাজ্যের পুলিশের হা গ্রেপ্তার হয়ে যান। কিন্তু তখন বে বেনয়েটের নাম সাহিত্য জগতে সুপরিচি হয়েছে। তাই কলম্বিয়া সরকার প্রতিভা সম্মান রক্ষা করে বেলবেনয়েটকে স্থলপ যুক্তরাষ্ট্রে যাত্রা করার অনুমতি দিয়ে তাঁ অন্য সকল সহযাত্রীকে পুনর্বার শয়তানে দ্বীপে ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়।

অবশেষে বেলবেনয়েট মার্কিন যুক্তরা পেঁছে সেখানকার নাগরিক অধিকার ল করতে সমর্থ হন এবং লেখনীর মাধ্য বন্দী-উপনিবেশ দ্বীপের প্রতিব অবিশ্রান্ত প্রচার অভিযান চালাতে থাকে শেষ পর্যন্ত ফরাসী কর্তৃপক্ষ ১৯৪৪ জনমতের চাপে ফরাসী গায়নার বন্দ উপনিবেশ বন্ধ করে দেয়। রেনে বেলবেনে ১৯৪৯ খৃঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দেহত্যা করেন।

লোকোমোটিভ ও একদিন হবিবপুর

অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

দশ বছর আগের দেখা সেই ছোট্ট রেল স্টেশনটির সঙ্গে আজকের হবিবপুরের কোনো মিল নেই।

শিয়ালদহ বিভাগে তখন বৈদ্যুতিক গাড়ি ত দূরের কথা, চূর্ণির ধারে এখন যে কালীনারায়ণপুর স্টেশন তার চিহ্নমাত্রও ছিল না। রানাঘাট শান্তিপুর শাখালাইনে তখন কয়লার এনজিন যাওয়া-আসা করত। দু-ধারের মাঠে গরু ছাগলের পাল নিবিষ্ট মনে ঘাস খেত, আর আমরা তাদের হঠাৎ চমকে দিয়ে বাঁশি বাজিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিতাম। গাড়ি যতক্ষণ বাঁকের মুখে ঘুরত গার্ড হাত নাড়িয়ে সবুজ পাখা দেখাতেন। তাই দেখে খোকা-খুকুরা লাইনের পাশ দিয়ে ছুটত। উঠোনের কোণে দাঁড়িয়ে বৌ-ঝিয়েরা পর্যন্ত হাতের কাজ ফেলে গাড়ি দেখত। মাথার কাপড় পড়ে গেলেও খেয়াল করত না।

খালাসী থেকে ড্রাইভার হওয়ার আগে অনেকটে সিঁড়ি টপকাতে হয়। আগওয়ালা (অ্যাংলোসাহেবরা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলত 'জ্যাক'), ফায়ারম্যান, তারপর শান্টার। দুদ্দাড় করে উঠে যাওয়া নয়। শেষ ধাপে পেঁছাতে কুল্লে কুড়ি থেকে পঁচিশ বছর লাগত। কেউ শান্টার হয়ে বা না হয়ে রিটায়ার করত। কেউ কেউ আবার ড্রাইভার হওয়ার আগেই মারা যেত।

আর পাঁচজনের মতই আমিও প্রথমে খালাসী, তার কিছুদিন পরে আগওয়ালা হয়েছিলাম। শান্তিপুর লোকোশেডে তখন কখানাই বা এনজিন। তিন কি চার। তাও আবার ছোটো লাইনের। দিনে রাতে বার-খানা ট্রেন শান্তিপুর থেকে সড়কগঞ্জ ঘাট যায় আর আসে। কলকাতা থেকে বড় লাইনে গাড়ি আসত। কিন্তু আমরা তার কোনো কাজই করতাম না।

এনজিন চালানোর শখ আমার প্রথম থেকেই। রেগুলেটর হ্যান্ডেল ধরে হ্যাঁচকা টান দিলেই পিস্টন রড সামনে অথবা পিছনে যায়। আর সংগে সঙ্গেই চাকা ঘোরে। চাকা ঘোরা দেখতে দেখতে আমি এনজিনের পাশাপাশি হাঁটতাম। ড্রাইভারকে মনে হত খুব সুখী পুরুষ। এনজিন চালাতে গিয়েই আমি একবার এমন ভুল করেছিলাম যা মনে পড়লে এখনও জেগে থেকে দুঃস্বপ্ন দেখছি বলে মনে হয়। ঘটনাটি হবিবপুরেই ঘটেছিল।

এনজিন চালানো অবশ্য কিছু শক্ত কাজ নয়। কিন্তু যাতে করে আর কেউ-ই এনজিন চালাতে না পারে সেজন্যে খুবই কড়াকড়ি আছে। শেডে বা ইয়ার্ডে শান্টারই এক লাইন থেকে আর এক লাইনে এনজিন নিয়ে যায়। কিন্তু সঙ্গে গাড়ি থাকলে খোদ ডি এম ই সায়েবও হাত দিতে পারেন না। এ যেন ব্রাহ্মণেরই একমাত্র অধিকার আছে পুজো করবার। দেবতার অঙ্গ আর কেউ ছুঁতে পারবে না।

কড়াক্কড়ি যতই থাক তা বইয়ের পাতায় লেখা থাকে। কে আর মানছে? আর গাড়ি যখন ফাঁকা মাঠে ছুটছে তখন ড্রাইভার চালাচ্ছে না তার ফায়ারম্যান, আগওয়ালা, কে দেখতে যাবে? ড্রাইভারেরও একঘেয়েমি লাগে। ক্লান্তি আসে। খিদে তেষ্টা পায়। প্রায় সব ড্রাইভারই দু-চারটে স্টেশনের জন্যে এনজিনের রেগুলেটর ফায়ারম্যান বা আগওয়ালারা হাতে দিয়ে পেছনের দিকে বসে বিশ্রাম করে। অনেকে আবার একঘেয়েমি কাটাবার জন্যে ফায়ারও করে।

এনজিনের কাজে ভুল কিন্তু পদে পদে, আর প্রতিটি ভুলের মাশুল সব সময়ই বেশি দিতে হয়। কিন্তু লোহালক্কড়ের কাজ, আগুনের সঙ্গে লড়াই। যা কিছু দুঃখ তা ঘামের সঙ্গেই গলে যায়। মুখের হাসি মরে গেলে কাজ করার উৎসাহ আর থাকে না। আমরা তাই যখন কারও কোনো সাজা হত তা হাসিমুখেই মেনে নিতাম। অন্যের ওপর দিয়ে গেলে বলতাম—অমুকের সঙ্গে সায়েবের 'প্যার' হয়েছে। বড় রকমের কিছু হলে বলতাম 'মহব্বত'।

আমার সঙ্গেও একবার ফোরম্যান সাহেবের 'মহব্বত' হওয়ায় আমার নৈহাটি শেডে বদলি হল। তখন আমি পাঁচের বছরের। মালগাড়ির অতিকায় এনজিন-গুলিকে কোনো মতেই কায়দা করতে পারতাম না। না পেরে নিজেই কায়দা হয়ে গেলাম। শেষ পর্যন্ত যা হয়—ফোরম্যানকে 'হুজুর, আপ মেহেরবান' ইত্যাদি বলে ভজিয়ে-ভাজিয়ে প্যাসেঞ্জার গাড়ির হাল্কা কাজ চেয়ে নিলাম। আমরা নৈহাটি থেকে সন্ধ্যেবেলায় শান্তিপুর যেতাম। রাত দশটার রানাঘাট লোকাল নিয়ে রানাঘাট গিয়ে রাতটুকু রানিংরুমে কাটিয়ে দিতাম। ভোরবেলায় আবার ঐ এনজিন আর বগি-গুলিকে নিয়ে শান্তিপুর লোক্যাল করে ফিরে আসতাম। সারাদিন ছুটি থাকত। আমি আবার শান্তিপুরেই থাকতাম বলে কাজ করার শেষে আর নৈহাটি ফিরতাম না।

প্যাসেঞ্জার গাড়ির হাল্কা কাজ যখন করছি তখন শীতকাল। মাঘ মাসের মাঝা-মাঝি। স্কুলে পড়ার সময় সুকোমলবাবু বলতেন শান্তিপুর কর্কটক্রান্তির কাছা-কাছি, তাই যত গ্রীষ্ম তত শীত। কিন্তু লেপ চাদরে মাথা মুড়ি দিয়ে ভূগোল মুখস্থ করার সময় কে আর ভেবেছিল যে চূর্ণির জোলো হাওয়া একদিন মাঘ মাসের ভোরে কর্কটের মত দাঁড়া বার করে আমার শরীরে কামড়ে ধরবে।

অনেককেই বলতে শুনেছি এনজিনে যারা কাজ করে তাদের খুব মজা। গরমের দিনে গাড়ি চললে হু-হু করে হাওয়া, আবার কনকনে শীতে এনজিনের ওমে শরীর গরম হয়। কিন্তু ঠিক উল্টোটাই হয়। যিনি এনজিন বানিয়েছেন (আবিষ্কারক ওয়াটস সায়েবের কথা বলছি না) তিনি আমাদের কষ্টের কথা যে একবারও ভাবেন নি—এ কথা হলফ করে বলতে পারি। ক্যারেজটা এমন করে তৈরী যে ভেতরের উত্তাপ একদম বাইরে আসে না। তাছাড়া ভেতরের সাতশো ডিগ্রী ফারেনহিটের এক শতাংশও যদি বাইরে এসে বাতাসের সঙ্গে মেশে তাহলে গরমের দিনে গায়ে সঙ্গে সঙ্গে ফোস্কা পড়বে। শীতকালে ফায়ারবক্সের দরজা যেই বন্ধ হত বাইরের কনকনে মাঠের বাতাস হাড় কাঁপিয়ে দিত।

আমি তখন আগওয়ালা। আমার ফায়ারম্যান ছিল ঘোষদা। লোকোশেডে কারও নাম ধরে বড় একটা কেউ ডাকে না। পদবীর সঙ্গে দাদা কাকা জুড়ে দিয়ে ডাকা হয়। ড্রাইভার ছিল সুখাড়িয়া। কিন্তু ঐ শব্দ-টার আগে বা পরে আর কিছু ছিল কিনা জানতাম না। ঘোষদা ছাপোষা মানুষ। সাতেও নেই পাঁচেও নেই। সুখাড়িয়া আমাকে খাতির করত লেখাপড়া জানি বলে। আর ভালবেসে ডাকত 'খোকাবাবু'। সুখাড়িয়াকে প্রায়ই আপিস আপনার দিয়ে গাড়ি চালাতাম। কেতাবী বিদ্যের দু-চারটে বুকনি ঝাড়লেই সুখাড়িয়ার চোখ বড় বড় হয়ে যেত। বলত, 'হাম লোক তু মুরখ খোকাবাবু।'

রানিংরুম থেকে কোনো রকমে মুড়ি-সুড়ি দিয়ে প্ল্যাটফরম পার হয়ে আমরা এনজিনে এলাম। হাতের আঙুল, নাকের ডগা ঠান্ডায় শিরশির করছে। এনজিনে এসেই ফায়ারবক্সের দরজা খুলেই আগে হাত পিঠ সেঁকে নেওয়া। তারপর কাজে হাত।

এখন যেখানে রানাঘাট নর্থ কেবিনের কাছে বৈদ্যুতিক সিগন্যাল আছে, তখন সেখানে লম্ফ জেলে সিগন্যাল দেওয়া হত। সীমাফোর পাখা নীচে ঝুলে পড়লেই সবুজ কাচ আলোর সামনে নেমে আসত। আমরা তাই দেখে বুঝতাম লাইন ক্লিয়ার।

গার্ড সিগন্যাল দিতেই সুখাড়িয়া গাড়ি ছেড়ে দিল। আমি একটু বেশি জোরে বাঁশি বাজাচ্ছিলাম। আশেপাশে ঘুমন্ত বাড়িগুলোকে দেখে কেমন যেন হিংসে হচ্ছিল। দিই না সকলের ঘুম ভাঙিয়ে। আমরা এই ঠান্ডায় এনজিন নিয়ে রানাঘাট আর শান্তিপুর করব আর বাবুরা সব আরাম করে শুয়ে থাকবেন—ভাবনাটা এই-রকম আর কি!

গাড়ি যখন মেন লাইন থেকে ব্রাঞ্চে ঢুকল, সুখাড়িয়া তার ছ্যাদলো ধরা দাঁত বার করে হেসে বললে—'কি খোকাবাবু, গাড়ি চালাইবো?' খোকাবাবু ত পা বাড়িয়েই আছে। সুখাড়িয়ার বয়েস তখন পঞ্চাশের ওপরে। বেচারার শরীরে কুষ্ঠ রোগের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। খুব গরমে বা শীতে তার কষ্ট হয়। সে ঠান্ডা সহ্য করতে পারছিল না বলেই আমাকে সেদিন নিজের থেকেই গাড়ি চালাতে দিয়েছিল। অবশ্য বার বার সাবধান করে দিয়েছিল যে তার রোটি আমার হাতে।

রোটি অবশ্য কোনোমতেই মারা যাবে না। কারণ যদি কোনো সায়েবসুবো দেখে ফায়ারম্যান বা আগওয়ালা গাড়ি চালাচ্ছে, তবে জরিমানা, ইনক্রিমেণ্ট বন্ধ, রিভার্সন, অনেক কিছুই হতে পারে। কিন্তু এই ভোর বেলায় নদীর চড়ায় সায়েব আসবে কোত্থেকে? সায়েব এখন ঘুমিয়ে আছে নারকেলডাঙ্গায় মোগলসরাইনে রেল কোয়ার্টারে। জেগে যদিও বা থাকে মেমকে কাছে টেনে 'ডার্লিং ডিয়ার' বলে নিজেকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করছে। এনজিন লাইনের ওপর দিয়ে ছুটবে, বাঁকের মুখে যেমন হিসেব করা আছে, ঘুরবে। ড্রাইভারের কাজ গতি বাড়ানো, কমানো। স্টেশনে ঠিক জায়গায় দাঁড় করানো। এ সবই আমি পারি।

'খোকাবাবু, তব হাম লেট যাই-ই'—বলে সুখাড়িয়া কয়লা টাঁকির যেখানে যন্ত্রপাতি থাকে তার ঢাকনার ওপর ফায়ার-বক্সের দিকে পিঠ দিয়ে শুয়ে পড়ল। একটু পরেই তার নাক ডাকছে শুনতে পেলাম। ঘোষদাও দেখি চোখ দুটোকে সরল রেখা করে ফেলেছে। ভাবটা—'বলো ত আমিও শুয়ে পড়ি'—এই। আমি তাই-ই চাইছিলাম।

দূর থেকেই চূর্ণি ব্রীজের আলো দেখতে পাচ্ছি। এনজিনের হেডলাইট অনেকদূর পর্যন্ত লাইন শিশিরে ঝকঝক করছে। স্লিপার, খোয়া, মাইল স্টোন, পাশেই টেলিগ্রাফ পোস্ট সব শিশিরে ভেজা। লাইনের দুপাশে ঘাসের ডগায় শিশিরকণা [illegible] জরী হয়ে [illegible]

ওপর শুয়ে পড়েছে। দু' একটা শক্ত ডাঁটা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পাতার ডগায় টোপ হয়ে জমা শিশিরের ফোঁটা ঝির্‌ঝিরে বাতাসে ঝরে পড়ছে খোয়ার ওপর।

দূরে দূরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বাড়িঘর। কলাবাগান, মটর বা বুটের খেত। ব্রীজের ওপর সিগন্যালের আলো জ্বলছে। চূর্ণির জলে তা যেন আরও বেশী লাল দেখাচ্ছে। নদীটাকে দেখতে লাগছে একটা পাথরের তৈরী অজগরের মত। ব্রীজের ওপর গাড়ী উঠতেই ঝমঝম শব্দে মায়ের বুকে খোকা-খুকুর ঘুম ভাঙল। ভাঙল না সুখাড়িয়া আর খোবদার। সুখাড়িয়া বুড়ো। খোবদার যৌবন লেগে আছে খোসার মত। তারা নিশ্চয় তেমন কাউকে স্বপ্নে দেখছে না। তাদের ঘুম হাড়ভাঙা খাটুনির ঘুম। আলাতনির ঘুম।

চূর্ণি-ব্রীজ কেবিন থেকে লাইন ক্লিয়ার টোকেন নিলাম। তারপর গার্ডের সিগন্যাল পেতেই গাড়ি ছেড়ে দিলাম। আমার খুব ভাল লাগছিল। কথায় বলে ঘুমোলে মানুষ মরা। ড্রাইভার, কারারম্যান ঘুমোচ্ছে। আমার ওপর খবরদারি করার কেউ-ই নেই। আমিই ফায়ার করছি। ইনজেক্টর লাগিয়ে বয়লারে জল ভরছি। লাইনে কোনো রাত-চরা গরু মোষ এলে বাঁশি বাজিয়ে তাড়িয়ে দিচ্ছি। আবার এনজিনও চালাচ্ছি। মনে মনে গর্ব হচ্ছিল খুব।

চুর্ণির পর হবিবপুর। সেই হবিবপুরের আজ কি জাঁকজমক। মুরেশ্বর কথায় কথায় বলত—'এত্‌না ঘামণ্ড মৎকর ইয়ার'—অর্থাৎ এত গুমোর করিস না। হবিবপুরের যেন বড্ড গুমোর হয়েছে এখন। আগের দিনের সেই ঘরোয়া ভাবটুকু আর নেই। আজ সেখানে বিদ্যুৎ বাতির জেল্লা। নিয়নের বেলেল্লাপনা।

ড্রাইভার ফায়ারম্যানকে না হয় তাপ্পি দিয়ে ঘুম পাড়াতে পারি। কিন্তু হাওয়া ত আমার বশে নয়। তাছাড়া সব কাজ একা একা করছি। পরিশ্রম বেশী হওয়ায় কষ্ট হচ্ছে খুবই। উলেন জার্সির নীচে সারা গা ঘামে ভিজে গিয়েছে। ঠাণ্ডা বাতাস লাগলে মনে হচ্ছে গায়ে কে যেন শিল ছুঁড়ে মারছে। এক কোণে বসতে পারলে মন্দ হয় না।

এইচ পি এস (ওয়ান) এনজিনগুলির এক ধরনের আভিজাত্য আছে। ফুটপ্লেটে অনেকখানি জায়গা। যন্ত্রপাতি কেউ কারো গায়ে লেগে থাকে না। ড্রাইভার এবং ফায়ারম্যান, ফ্লাগওয়ালার দাঁড়াবার জায়গার ব্যবধান অনেকখানি। ইচ্ছে করলেই কাঠের পাল্লা হাত রোলার পর্যন্ত টেনে দিয়ে ফুটপ্লেটের প্রায় অর্ধেকটাই ঢেকে দেওয়া যায়। লাইন দেখবার জন্যে দুদিকে দুটো বড় বড় লুকিংগ্লাস থাকে। সেগুলো আটকে দিলে আর হাওয়া ঢোকে না। তখন ফায়ারবক্সের গা-ঘেঁষে কোণের দিকে দাঁড়ালে শীত করে না।

সব ঠিক আছে দেখে আমি কাঠের পাল্লা দুটো টেনে দিয়ে লুকিংগ্লাস দুটো আটকে দিলাম। হবিবপুর পেঁছানোর আগে জল কয়লা কিছুই লাগবে না আর। এনজিনের ওম যাতে গায়ে লাগে সেজন্যে হাত রোলারের সঙ্গে ফিট করা ড্রাইভারের সীটটাকে ঘুরিয়ে নিলাম। তারপর লিভার হুইলে পা তুলে থাকলাম।

গাড়ি চলছে। একটানা একটা ঝিকঝিক শব্দে কেমন যেন ঘোর লাগে। কি হিসেব করে শব্দ হয়। একটুও এদিক-ওদিক হয় না। ঐ শব্দ শুনেই ত লোকে কত ছড়া বলে। সবচেয়ে ভাল ছড়া আমার দিদি বলত —'রেলগাড়ি ঝমাঝম, পা পিছলে আলুর দম।' আর রামশুকুল শাস্টার বলত—'ঝিক ঝিক ঝিক, ঘরমে হ্যায় ঔরৎ মেরা, ম্যায় করুংগা সিক।'

গায়ের ঘাম শুকিয়ে যেতেই বেশ আরাম লাগছে। একটা সিগারেট ধরালাম। সুখাড়িয়া জেগে থাকলে খইনি টিপত। ইচ্ছে করেই এনজিনের গতি কমিয়ে দিলাম। হবিবপুর বার মিনিটের পথ। যাতে করে কুড়ি মিনিট হয়। এতো অফিস লোক্যাল নয় যে একটু দেরী হলেই কেরানীবাবুরা হৈচৈ করবে। ড্রাইভার যেহেতু হিন্দুস্থানী, অতএব সে মুলুকে ভৈঁষ চরাত। বাংলাদেশে এসেছে বলেই ড্রাইভার হয়েছে। আমি আর ঘোষদা নেহাৎই যখন বাঙালী, ভৈঁষ চরাই না। কিন্তু কয়লা বিক্রীর ধান্দায় থাকি, সুতরাং লেট হবে না ত কি হবে? চুপ করে সহ্য করতেই হয়। সব গাড়িই ত আর ভোরবেলার রানাঘাট শান্তিপুর লোক্যাল নয় যে ড্রাইভার ইচ্ছে করলেই লেট করতে পারে। কিন্তু কে বোঝাবে? কেরানীবাবুদের পেটে বিদ্যে যত গজগজ করে মুখ দিয়ে তত খিস্তিখেউড় বার হয়। তবে শুধু বাংলা নয়। ইংরিজিও। আমি একবার একজনের সঙ্গে মুখোমুখি তর্ক করেছিলাম অফিস লোক্যাল রিলিফের কাজ করতে গিয়ে। নৈহাটি স্টেশনে গাড়ি ইন করাতে দেরি করল স্টেশন মাস্টার। দোষ হল আমাদের। ভদ্রলোক আমাকে প্ল্যাটফরমে একা পেয়ে আমার ডান হাতটা এত জোরে মুচড়ে দিয়েছিলেন যে চোখে জল এসে গিয়েছিল। ভদ্রলোক ডি এস, শিয়ালদহ অফিসেরই একজন হোমরা-চোমরা কেরানী।

এনজিনের ওমে বলতে গেলে আমার শীত ভাবটা একদমই কেটে গিয়েছিল। কান কপাল নাকের ডগা ত একটুতেই তেতে উঠেছে। পাল্লা একটু ফাঁক করতেই একঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে মুখ জুড়িয়ে দিল। মাঝামাঝি পথ এসে গেছি। এক নম্বর কালভার্ট দেখতে পাচ্ছি। পাশে শিমুল গাছটাও ঠায় দাঁড়িয়ে। গরমের দিনে যখন ট্রেন নিয়ে গিয়েছি তখন ঐ গাছটায় অজস্র ফুল ফুটে থাকত। দেখতে দেখতে আমি ভুলে যেতাম আমার কোনো কষ্ট আছে।

হবিবপুর এখনও মিনিট আটেকের পথ। দেরি করে গেলেও চলবে। এখন প্যাসেঞ্জার বলতে বেঞ্চির তলায় শুয়ে থাকা দু' চারজন ভিখিরি বা দু' চারজন মেয়েমানুষ, যারা রাতবিরেতে ধান্দার ঘোরে। চাকার ঝিকঝিক শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। সুখাড়িয়া, ঘোষদা দুজনেই সমানে নাক ডাকাচ্ছে। ঘাম শুকিয়ে যেতেই আমার হাই উঠতে লাগল। চোখের পাতা ভারী হয়ে এল। আমারও ঘুম পেয়েছে।

যে কোনো একজনকে ডাকলেই হয়। গাড়ি যখন চলছে, পালা করে ঘুমোনোর অবশ্য কোনো নিয়ম নেই। কিন্তু নিয়ম মেনে চলতে গেলে সুবিধের চেয়ে অসুবিধে হয় বেশী। তাছাড়া ওরা ত একটু ঘুমিয়েছে। এখন আমি শুতে চাইলে ওরা কেউ আপত্তি করবে না। কিন্তু ড্রাইভারের সীটে বসে গাড়ি চালাচ্ছি। কেউ দেখছে না যদিও। না দেখুক, আমি ত জানছি। একটা এনজিন, তার পেছনে সাতখানা বগি। আমিই চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। যেখানটায় বসে আছি ঠিক তার তলায় বিরাট চাকা ঘুরছে। আমি ইচ্ছে করলেই ওর ঘোরা বন্ধ করে দিতে পারি। এইসব ভাবতে ভাবতে আমি যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

ঝিকঝিক শব্দটা এতক্ষণ কানে আসছিল। একটু একটু করে যেন মিলিয়ে যাচ্ছে। এরকম হয়। রেললাইন যেখানে সোজা, আর ফিসপ্লেট থাকে অনেক দূরে দূরে, সেখানে গাড়ি চলার শব্দ এক এক সময় মিলিয়ে যাওয়ার মত হয়! হঠাৎ মনে হল গাড়ি যেন বনবাদাড় ভেঙে ছুটছে। চাকার ধাক্কায় স্লিপার ভেঙে কাঠের টুকরো আর খোয়া ছররার মত ছুটছে। সর্বনাশ। তবে তো গাড়ি ডিরেলড হয়েছে। নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে। সুখাড়িয়া যে বলেছিল তার রোটি আমার হাতে। সামনেই আবার একটা কালভার্ট। এখনও গাড়ি না বাঁধলে সব শেষ হয়ে যাবে। প্রায় লাফ দিয়ে উঠে ব্রেক হ্যাণ্ডেল ধরতে গিয়ে দেখি একটু দূরে সার সার আলো জ্বলছে। ভোর হয়ে এসেছে। চাপ চাপ কুয়াসা বাতাসে ভাসছে। ঝিকঝিক শব্দটা এবার বেশ স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছি। গাড়ি ডিরেলড হয়নি। আমিই ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলাম।

কিন্তু এত আলো কোত্থেকে এল? হবিবপুরে অবশ্য প্ল্যাটফরমে দুটো ল্যাম্পপোস্ট আছে, যার একটা আজ কয়েক মাস ধরে কানা হয়ে পড়ে আছে। আর একটা স্টেশন পোর্টারের মর্জিমত জ্বলে। এসব ভাবছি আর একবার ব্রেক করে আবার ছেড়ে দিয়ে গাড়ির গতি আয়ত্তে আনছি। প্ল্যাটফরমে ঢোকার আগেই হেডলাইটের আলোয় স্টেশন বোর্ড চোখে পড়ল। হবিবপুর নয়। ফুলিয়া। ইচ্ছে হল এনজিন থেকে লাফ দিয়ে নেমে পালাই।

ফুলিয়া থেকে গাড়ি ছাড়লে আমি সব ভাবতে লাগলাম। শান্তিপুর আর কয়েক

কয়েক মিনিটের পথ। আর একদল ড্রাইভার ফায়ারম্যান আগওয়ালা এনজিনের সব দায়িত্ব বুঝে নেবে। আমাদের ছুটি হয়ে যাবে। কিন্তু যে কাণ্ডটা এতক্ষণে ঘটে গেল, যার নায়ক আমিই, তার শাস্তি একা সুখাড়িয়াকে মাথা পেতে নিতে হবে। মালগাড়ি হলেও বা কথা ছিল। প্যাসেনজার গাড়ি যখন ছুটছে তখন ড্রাইভার ফায়ারম্যান আগওয়ালা সবাই ঘুমিয়েছে। না হলে চূর্ণির পর হবিবপুর গাড়ি না থেমে কুলিয়া কি করে এল? অবশ্য গাড়িতে যদি শুধু ভিখিরি বা কুলিকামিনরা থাকে তবে কিছু হবে না। কিন্তু যদি কোনো প্যাসেনজার থাকে যার কাছে হবিবপুরেরই টিকিট আছে?

স্টেশনমাস্টারও রিপোর্ট করবেন।...নং আপ হবিবপুর থ্রু বেরিয়ে গেছে। তিনিও যদি ঘুমিয়ে থাকেন—এই ঠাণ্ডায় কে আর আসবে ভেবে, গার্ড আছেন। সকলকে এড়ানো যায়, কিন্তু গার্ডএর কাছ থেকে এনজিন টিকিট তো নিতে হবে। গার্ড প্রত্যেক স্টেশনে গাড়ি থামা এবং ছাড়ার সময় ঘণ্টা মিনিটের হিসেবে লিখে দেবেন। ট্রেন নং, তারিখ লিখে সই করবেন। তারপর ড্রাইভার সই করে সেই টিকিট লোকো অফিসে জমা দিলে তবে মাইনে হবে। না হলে কি প্রমাণ আছে যে কাজ করেছে? সুতরাং হবিবপুরের ঘরে গার্ড কি লিখবেন?

বাবলা লেভেল ক্রসিংয়ের মুখে গাড়ি বেঁকল। ডিসট্যান্ট সিগন্যালের সবুজ আলো দেখতে পাচ্ছি। সব কিছুই যে যার জায়গায় নিজের কাজ বুঝে নিয়ে ডিউটি দিচ্ছে যেন। গয়ারাম সবুজ বাতি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। অ্যাডভান্সড স্টার্টার, স্টার্টার, ফেসিং পয়েন্টের আলো, ফাউলিং মার্কের বড় বড় অক্ষর—সব কিছুই। মাঝখানে এতবড় একটা উলোটপালট হয়ে গেল কেউ না জানলে কিছু হবে না। জানলে শিবের বাবারও সাধ্যি নেই বাঁচায়।

শান্তিপুরে গাড়ি দাঁড়াল। মুখ বাড়িয়ে দেখছি এনজিনের দিকে কেউ আসছে কিনা? আমি ত আমার ভাবনা ভাবছি। ওদিকে গাড়িতে এমন কেউ ছিলেন যার হবিবপুরের টিকিট। এসেই শুধোলেন—'হবিবপুরে গাড়ি দাঁড়াল না কেন?' কি উত্তর দেব? সুখাড়িয়া, ঘোষদা গালে আচমকা চড় খাওয়ার মত চুপ হয়ে যাবে। ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকাবে।

আরও আছে। ওপরে রিপোর্ট যাবে। জয়েন্ট এনকোয়ারি হবে। আলাদা করে ড্রাইভার, ফায়ারম্যান, আগওয়ালা আর গার্ডের বিবৃতি নেওয়া হবে। স্টেশন মাস্টার অবশ্য—'আমি সিগন্যাল দিলেও গাড়ি থামেনি'—এই কথা বললেই পার পাবে। তারপর বিচার। সুখাড়িয়াকে ছ' মাসের জন্যে শান্টারে রিভার্ট করা হবে। বেচারী আর কদিনই বা কাজ করতে পারবে। দু'পায়ে রোগ বেশ ফুটে বেরিয়েছে। সব সময় প্যান্ট পরে থাকে। জুতো সহজে খোলে না। কী শীত কী গ্রীষ্ম উলেনের মোজা পায়ে দেয়। হাতের আঙুলও ফুলো ফুলো। কোনো কোনোটার আবার দুই গাঁটের মাঝখানে চামড়া ফেটে গিয়েছে।

শান্টিং পোর্টারের হাঁকাহাঁকিতে সুখাড়িয়ার ঘুম ভেঙেছে। ঘোষদাও চোখ রগড়াচ্ছে। কি করব? বলব? শুনলেই ত মাটি ছেড়ে লাফিয়ে উঠবে সুখাড়িয়া—'আরে তু হার্মারা নোকরি খা লৈল।' আর তার দোষ কি?

শেষ পর্যন্ত বললাম যে হবিবপুরে গাড়ি দাঁড়ায় নি। আমি ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম। সুখাড়িয়া লাফাল না। চেঁচালও না। হাসল একটু। তারপর বললে—'নিদ এসে গেলো? ওত আসবেই।' তার মুখ খুবই করুণ দেখাচ্ছে। সে সব সময় হাসে। শেডে তার চেয়ে নির্বোধ ব্যক্তি দ্বিতীয় কেউ ছিল না। তাকে নিয়ে সকলে যখন হাসত, সকলের হাসিকে ডুবিয়ে দিয়ে সুখাড়িয়া হেসে উঠত।

সেই সুখাড়িয়ার মুখ করুণ। সে বললে—'লোহে কা কাম খোকাবাবু, তোমার খুব তকলিফ হয়েছে। পশিনা নিকালবে তো শরীরকা তাকত কমে যাবে। নিদ তো আসবেই।' সুখাড়িয়া কি সত্যিই নির্বোধ? এখনও কি সে বুঝতে পারছে না কি সর্বনাশ তার মাথার ওপর ঝুলছে, যে, সে শুধু আমার তকলিফ হয়েছে বলেই আপসোস করছে।

আমিই বলি, 'গাড়ি হবিবপুরে দাঁড়ায় নি...' আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে সে বলে—'নসীব কা মার, ও তুম কেয়া করো গে? দেখো গার্ড সাবকো বাতলাও, যদি কুছ সুরাহা হয়।'

আমার জুতোর চাপে পাটাতনের কাঁকর কড়কড় শব্দ করে যেন বাতাসের গালে চড়াচ্ছে। চায়ের ভাঁড়ে কুলিয়া পিতৃ করেছে। হঠাৎ একটা কথা মনে হল। আমাদের সঙ্গে গার্ডকেও তো ফাঁসান যায়। আর গার্ড তখন নিজে বাঁচার জন্যেই যা হয় কিছু করবে নিশ্চয়ই। যে ব্রেক এনজিনে তা গার্ডের কামরা থেকেও দরকার হলেই ব্যবহার করা যায়। এনজিন থেকে শেষ বগি পর্যন্ত একই ব্রেক। ড্রাইভার, গার্ড যেই-ই ব্রেক করুক না কেন গাড়ী থেমে যাবে। গার্ড অবশ্য জরুরী অবস্থা না হলে ব্রেক করবে না। কিন্তু গাড়ি হবিবপুরে না দাঁড়িয়ে থ্রু বেরিয়ে যাচ্ছে অথচ গার্ড ব্রেক করল না। এনজিনের ব্রেক ফেল করতেও তো পারে। স্টেশন মাস্টার না হয়—'আমি সিগন্যাল দিলেও গাড়ি থামেনি'—বলে ছাড় পাবে। কিন্তু গার্ড তো বলতে পারবে না—'আমি ব্রেক করেছি কিন্তু গাড়ি থামেনি।' কিছুটা নিশ্চিন্ত হই।

গার্ডের কামরায় ঢুকে দেখি তিনি পেছন ফিরে লাইন বক্স বন্ধ করছেন। জবাব আমার তৈরি। ভাল কথায় না রাজী হলে বলব—'আসুন তবে, একই সঙ্গে ঝুলি।' আপনিও গাড়ি থামাতে পারতেন। কিন্তু করেননি। সব সময়ই কি পরের ঘাড়ে বন্দুক রেখে ফায়ার করা চলে?' তালা লাগিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন গার্ড। আমাকে দেখেই বললেন—'ও এসেছ, এই নাও ভাই তোমাদের এনজিন টিকিট। সব রাইট টাইম। রাইট টাইম। আমার আবার ৮-৫০-এ নবদ্বীপ লোক্যাল। চলি।'

আশ্চর্য লাগল, গার্ড কিছুই বলল না। তবে কি ভেতরে ভেতরে রিপোর্ট দিয়ে ওপরে ভালমানুষি দেখাচ্ছে? টিকিটের ভাঁজ খুলে দেখছি। গার্ড বললেন—'সব রাইট টাইম।' অর্থাৎ গাড়ি সব স্টেশনে, হবিবপুরেও, যথারীতি থেমেছে এবং ছেড়েছে। বাধ্য হয়ে বলি 'গাড়ি ত হবিবপুরে দাঁড়ায়নি।' 'দাঁড়ায়নি?'—গার্ড থমকে গেলেন। কি যেন ভাবলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললেন—'চেপে যাওয়াই ভাল, বুঝলে? তেমন বোধ-হয় কেউ-ই এ গাড়িতে নেই। আর বুঝতেই পারছ ভাই, যা কনকনে ঠাণ্ডা। কম্বল ঢাকা দিয়ে কখন যে ঘুমিয়ে গিয়েছি নিজেই জানি না। তা তোমরাও তো......' কথা শেষ না করে আমাকে পাশ কাটিয়ে তিনি নেমে গেলেন।

আজকের উজবেকিস্তান

পাঁলটোটডেল কালেকটিভ ফার্মের একজন কর্মীর বাড়ীতে আধুনিক জীবনধারণ ব্যবস্থা
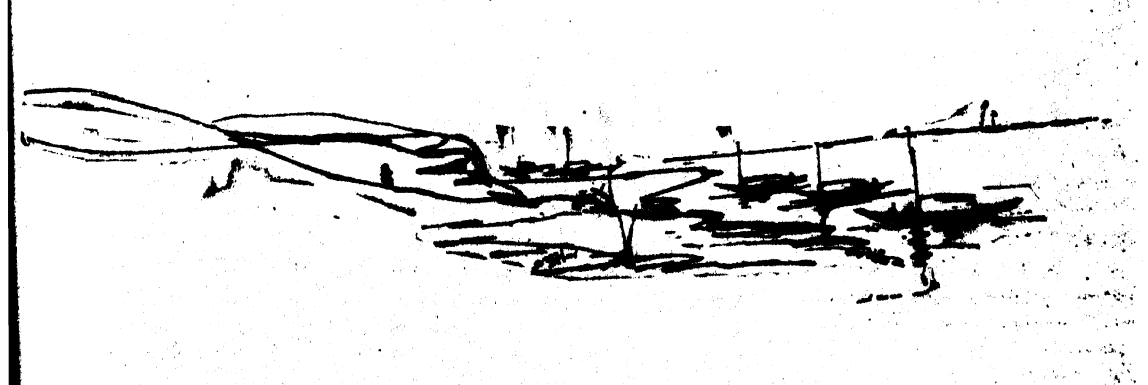
সোভিয়েত ইউনিয়ন ঘুরে এসে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, খুঁড়িয়ে চলার লাঠিকে ওরা এগিয়ে চলার জয়রথ বানিয়ে নিয়েছে। কথাটা উজবেকিস্তান সম্পর্কে যতটা প্রযোজ্য বোধ করি সোভিয়েত জাতিসংঘের আর কোন অঙ্গ-প্রজাতন্ত্র সম্পর্কে ততটা নয়।

উজবেকিস্তান হচ্ছে সোভিয়েত জাতিসংঘের পনেরোটি অঙ্গ-প্রজাতন্ত্রের অন্যতম। আয়তন ৪৪৯,৬০০ বর্গ কিলোমিটার, জনসংখ্যা ৯ কোটি ২৩ লক্ষ। ১৯২৪ সালে উজবেকিস্তান সোভিয়েত জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত হয়। মাত্র ৪৮ বছরে সেদেশের যে অগ্রগতি হয় তা সত্যিই বিস্ময়কর।

বিপ্লবের আগে উজবেকিস্তান ছিল একটা পিছিয়ে পড়া দেশ, অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত রুশ সাম্রাজ্যের একটি উপনিবেশ। তখন শতকরা দুজন কোনমতে মাত্র নাম সই করতে পারত। এখন সেখানে নিরক্ষরতা সম্পূর্ণ অবলুপ্ত। শুধু তাই নয়, জনসংখ্যার প্রতি ১০ হাজারে এখন যত উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ আছে তার সংখ্যা ফ্রান্সের দ্বিগুণ, তুরস্কের সাত গুণ এবং ইরানের ২৮ গুণ। স্থাপিত হয়েছে উজবেক বিজ্ঞান আকাদেমি, পারমাণবিক পদার্থবিদ্যার ইনস্টিটিউট এবং একটি পারমাণবিক রি-অ্যাকটর।

বিপ্লবের আগে উজবেক ভাষায় মাত্র একটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হত, এখন উজবেকিস্তানে প্রকাশিত হয় ২২৭টি সংবাদপত্র। তার মধ্যে ১৬২টি প্রকাশিত হয় উজবেক কিম্বা কারা-কল্পাক ভাষায়।

বিপ্লবের আগে উজবেকিস্তানে শ্রমশিল্প ছিল না বললেই চলে, কৃষিও ছিল অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। এখন সে অবস্থা বদলে গেছে। ১৯৭০ সালে উজবেকিস্তানের খেতে-খামারে ১,৩০,০০০ ট্রাকটর এবং ৩০ হাজার তুলো তোলার যন্ত্র কাজ করেছে।

উজবেকিস্তানের প্রধান ফসল তুলো, উজবেকিরা যার নাম দিয়েছে 'সাদা সোনা।' সারা সোভিয়েত দেশে যত তুলো উৎপন্ন হয় তার তিন-পঞ্চমাংশই উৎপন্ন হয় উজবেকিস্তানে। ব্রাজিল, পাকিস্তান, তুরস্ক এবং ইরানে যত তুলো উৎপন্ন হয় তার সমপরিমাণ তুলো উৎপন্ন হয় উজবেকিস্তানে। বিপ্লবের পর উজবেকিস্তানে তুলোর উৎপাদন বেড়েছে সাড়ে পাঁচ গুণ। নতুন নতুন এলাকা সেচের আওতায় আনা হয়েছে। তার ফলে উৎপাদন আরও বাড়বে।

চলতি পাঁচসালা পরিকল্পনার প্রথম বছরে উজবেকিস্তানে ২১০০ কোটি কিলো-ওয়াট ঘন্টারও বেশী বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়েছে। ১৯৭৫ সালে এর পরিমাণ দাঁড়াবে ৩২০০ কোটি কিলোওয়াট ঘন্টা। ঐ বছরে গ্যাসের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৩৬০ কোটি ঘন মিটার, কয়লার উৎপাদন ৩,৮১২,০০০ টন, তেল ১৭৫২০০, ইস্পাত ৩,৯৯,০০০ টন এবং সুতীবস্ত্র ৩৯০,০০০,০০০ মিটার।

১৯৭৫ সালে উজবেকিস্তানে শ্রমশিল্পের উৎপাদন বাড়বে ৫০ শতাংশ এবং কৃষি উৎপাদন ২০ শতাংশ। কারখানার শ্রমিক এবং অফিসের কর্মচারীর গড় মাসিক আয় দাঁড়িয়েছে ১২৬ রুবল।

উজবেকিস্তানের রাজধানী তাশখন্দের জনসংখ্যা ১৫ লক্ষ। সারা উজবেকিস্তানের শহরাঞ্চলের বাসিন্দার সংখ্যা ৪৫ লক্ষ। জন্মহারের দিক থেকে সোভিয়েত জাতিসংঘে তার স্থান প্রথম (প্রতি হাজারে ৩২-৮)।

উজবেকিস্তান হল সোভিয়েত মধ্য এশীয় প্রজাতন্ত্রগুলির মধ্যে বৃহত্তম।

উজবেকিস্তানের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য লক্ষ্য করবার মত—এক দিকে তুষারমৌলি পর্বত-শ্রেণী অন্য দিকে নিম্নভূমি, এক দিকে প্রাণহীন মরুভূমি, অন্য দিকে হরিৎ মরূদ্যান। বৈচিত্র্য শুধু নিসর্গেরই নয়—নতুন ও পুরাতনের অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটেছে এই প্রজাতন্ত্রে। মধ্যযুগের স্থাপত্য নিদর্শনের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে আধুনিক যুগের স্থাপত্য নিদর্শন, আধুনিক রঙ্গালয়, বিদ্যালয় ইত্যাদি। সমরখন্দ, বুখারা, খিভা প্রভৃতি প্রাচীন শহরের পাশাপাশি গড়ে উঠেছে নভোইয়ের মত নতুন শহর।

একটা পিছিয়ে-পড়া দেশ সমাজতন্ত্রের জাদু স্পর্শে যে কিভাবে রূপান্তরিত হতে পারে উজবেকিস্তান তার জলন্ত নিদর্শন।

—শচীন বসু

দিল্লীর চাঁদনী চক

কিষণচাঁদ বর্মণ

দিল্লীতে এমন বহু জায়গা আছে যার নাম শুনলেই কল্পনায় ভেসে ওঠে সেই জমকালো বাদশাহী আমলের কথা যখন চারদিকে ধন-দৌলত, সোনা-রুপো, হীরে-জহরত আর বিলাস আড়ম্বরের ছড়াছড়ি যেত। এই সব জায়গার মধ্যে দিল্লীর চাঁদনী চকের নামই বোধহয় সবচেয়ে আগে মনে পড়ে। চাঁদনী চক মানে রুপোলী রাস্তা। চাঁদনী চক উত্তর ভারতের সবচেয়ে বড় ব্যবসা কেন্দ্র। এখানে রোজ কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয়, কাজেই আজও এখানে সোনা-রুপোর ছড়াছড়ি। কিন্তু এই প্রসিদ্ধ রাজপথের কল্পিপূর্ণ নামের তাৎপর্য আজকের চাঁদনী চকে সন্ধান করতে যাওয়া বৃথা। আধুনিক চাঁদনীচক নিতান্তই গদ্যময়, জনবহুল, কর্মচঞ্চল ও কোলাহলমুখর একটি ব্যবসা কেন্দ্র। এর আসল পরিচয় পেতে হলে আমাদের যেতে হবে ইতিহাসের সুদূর অতীতে, বাদশাহী আমলে।

মোগল সম্রাট শাহজাহানের প্রিয়তমা কন্যা ছিলেন জাহানারা বেগম। ইনি সম্রাটের জ্যেষ্ঠা দুহিতা আর শোকাতুর বিরহী নিঃসঙ্গ সম্রাটের বিষাদময় শেষ জীবনের একমাত্র সাথী, উপদেষ্টা ও পথ-প্রদর্শিকা। আজ থেকে সাড়ে তিনশো বছরের আগে ১৬০০ সালে জাহানারা বেগম এই বিখ্যাত রাজপথ নির্মাণ করিয়েছিলেন। তখন এই রাজপথের দৈর্ঘ ছিল ১৫২০ গজ ও প্রস্থ ৪০ গজ। লাল কেল্লার লাহোরী দরওয়াজা থেকে শুরু করে ফতেপুরী মসজিদ পর্যন্ত এই রাজপথ বিস্তৃত ছিল। পথের দু পাশে শ্রেণীবদ্ধ বিপণী — দোকানগুলি একতলা সমান উঁচু, তার সামনে গুদাম ঘর আর বসবাসের ঘর পিছনের দিকে। রাজপথের দু পাশে দোকান আর তার ঠিক মধ্যিখান দিয়ে চলে গিয়েছিল এক 'নহর' অর্থাৎ খাল। নহরের দু ধারে ছিল শ্রেণীবদ্ধ তরু-বীথিকা। মরুভূমি দিল্লীর রুক্ষ আব-হাওয়ায় এই গাছের সারি পথিককে ছায়া দিত আর পথের সৌন্দর্য তো বাড়াতোই। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাতে চাঁদের আলো এই নহরের জলে পড়ে এক চাঁদ শত চাঁদ হয়ে জ্বলত আর কে জানে চাঁদনীর আলো-ঝলমল এই রুপোলী রাজপথ একদিন হয়ত সম্রাট দুহিতার কবিমন থেকে চাঁদনী চক নাম উৎসারিত হয়েছিল স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে।

তবে কোথায় গেলেন বাদশাহ তনয়া জাহানারা আর কোথায় গেল সেই সোনাঝরা, মধুক্ষরা গোলাপ-চামেলীর আতরমাখা দিনগুলি। এই নহরের চিহ্ন পর্যন্ত আজ চাঁদনী চকের আশে পাশে কোথাও নেই। ১৯১০ সালে বৃটিশ গর্ভমেন্ট চাঁদনী চকের এই নহর বুজিয়ে ফেলে দু ধারের তরু-বীথিকা কেটে ধূলিসাৎ করেন। সেকালে বড় বড় ধনী সওদাগর আর আমীর-ওমরাহের দল এই পাড়ায় থাকতেন কিন্তু সারা বাজারটার নাম তখন চাঁদনী চক ছিল না। বাজারের বিভিন্ন অংশের নাম ছিল ভিন্ন ভিন্ন। লাহোরী দরওয়াজা থেকে দরিবা পর্যন্ত এলাকাকে বলা হত উর্দি বাজার বা সামরিক বাজার কারণ এখানে তখন 'লশকর' বা পদাতিক সেনারা ছাউনি ফেলে থাকত। দরিবা থেকে 'ফোয়ারা' পর্যন্ত অংশের নাম ছিল 'ফুল কি মন্ডী' বা ফুলের বাজার, কারণ দরিবার পিছনের দিকে এই জায়গাটা ছিল ফুল, ফল ও সব্জীর বিরাট পাইকারী বাজার। বাজারে কত রকমারী ফল আসত সমরখন্দ, বোখারা ও আশ পাশের আরো কত জায়গা থেকে। খরমুজা, আঙুর, বেদানা, খুবানি, কিশমিশ ও আরো হাজার রকম মেওয়ার বিকি-কিনিতে জায়গাটা সুগন্ধে ম-ম করত। তারই সঙ্গে মোতিয়া, গোলাপ, যুঁই, চামেলী ও আরো কত রকম ফুলের সমারোহ বসত বাজারে। সৌখিন বেগম, বাদশাজাদী আর নগর মোহিনীর কেশপাশ সুরভিত করে তাদের কণ্ঠে দুলত এই ফুলের গজরা, কত মোহময়ী রাতের জলসাকে আবেশে ভরিয়ে তুলত মোতিয়া-চামেলীর মাতাল করা গন্ধ। বাজারের শেষ অংশ ছিল আজকের টাউন হল থেকে ফতেপুরী মসজিদ পর্যন্ত। এর নাম ছিল ফতেহপুরী বাজার।

এই পুরো রাজপথটা তখন তিনটি সমান ভাগে বিভক্ত ছিল। এক একটি ভাগ বা চকের আয়তন ছিল ১০০ বর্গগজ। প্রথম চক ছিল আজকের কোতওয়ালীর সামনে। এটা ছিল 'চবুতরা' অর্থাৎ চতুষ্কোণ, আয়তন ছিল ১০০ বর্গগজ। দ্বিতীয় চকের আয়তনও ছিল ১০০ বর্গগজ তবে সেটা চতুষ্কোণ নয়, অষ্টভুজাকৃতি ছিল। এই চকটিও দেখতে চমৎকার। বর্তমান টাউন হলের ঠিক সামনে ছিল এই চক। এই দ্বিতীয় চকের নাম ছিল চাঁদনী চক, কারণ ফোয়ারা ও টাউন হলের মধ্যবর্তী এই অংশকে তখন জহুরী বাজার বলা হত। এখানেই ছিল সোনা-রুপো-হীরে-জহরতের বাজার। চাঁদনী চক নামের এও একটা উৎস বলা চলে। পরে অবশ্য পুরো রাজপথটার নামই চাঁদনী চক হয়েছিল।

জাহানারা বেগম শুধু এই বাজারই তৈরী করান নি, তিনি এখানে একটি বিরাট বাগান ও এক সরাইও তৈরী করিয়েছিলেন।

*

দিল্লীতে হাজার হাজার বণিক আসত ব্যবসা-বাণিজ্য করতে, শত শত ভ্রমণকারী আসত বেড়াতে। এই সব মুসাফিরদের থাকার জন্যে তৈরী হয়েছিল এক সরাই। জাহানারা বেগমের তৈরী বাগানের নাম ছিল 'বেগম-কা-বাগ'। বেগম নিজের তহবিল থেকে টাকা খরচ করে এই বাগানের দেখা-শুনো করতেন। ইংরেজরা এসে এখানে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এক মূর্তি স্থাপন করে। তাছাড়া বর্তমান টাউন হলের বাড়ীটিও তাদেরই তৈরী। গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর মহাত্মা গান্ধী এখানে বিরাট এক জনসভা করেছিলেন। তখন থেকে এর নাম হয়েছে 'গান্ধী ময়দান'। আজ অবশ্য সেকালের 'বেগম-কা-বাগ' এর আর কিছুই অবশিষ্ট নেই, চেনাই যায় না দেখলে। রাজপথের মাঝে একদা যে 'ঘন্টাঘর' ছিল তাও আজ আর নেই। নিরেট পাথরের তৈরী এই বিরাট স্তম্ভের চারপাশে ঘড়ি লাগান ছিল। প্রায় বছর দশেকেরও বেশী হল এই 'ঘন্টাঘর' ভেঙে পড়েছে। অনেক প্রাণহানিও হয়েছিল সেই দুর্ঘটনায়।

চাঁদনীচকের সঙ্গে এত ঐতিহাসিক কাহিনী জড়িয়ে আছে যে ইতিহাসে বোধ হয় তার জুড়ি মেলা ভার। চাঁদনী চক বাজার এমন জায়গায় তৈরী করা হয়েছিল যাতে সম্রাট তার সামনে লাল কেল্লার দেওয়ান-ই-আমের মসনদে বসে চাঁদনী চকের এই বাজারের টাটকা প্রাণচঞ্চল রূপ প্রত্যক্ষ করতে পারেন। মোগল বাদশাহেরা নিশ্চয়ই দেওয়ান-ই-আমের মসনদে বসে চাঁদনীচকের ওপর প্রতিদিনকার জীবন্ত নাট্যাভিনয় দেখে মশগুল হয়ে যেতেন, তাঁরা প্রাণভরে সেই নাট্যরস উপভোগ করতেন। কিন্তু গোলমাল বাধল পরে। রাজদরবারের আদব-কায়দা সম্পর্কে অতিশয় সচেতন কোন এক বাদশাহ এতে খুব অপমানিত বোধ করলেন। সেকালে বাদশাহের সামনে দিয়ে যেতে হলে কুর্নিশ বা সেলাম করতে হত। কিন্ত বাদশাহের চোখের ওপর হাজার হাজার লোক নেচে-কুঁদে বেড়াবে, না কোন কুর্নিশ, না সেলাম, এ আবার কোন দেশের বেয়াদবী? এই অমার্জনীয় অপরাধ এভাবে চলতে পারে না তাই সম্রাটের হুকুমে তাঁর চোখের সামনে থেকে এই কটু দৃশ্য আড়াল করে দেবার ব্যবস্থা হল একটি দেয়াল গেঁথে দিয়ে। এই 'পরদা দিওয়ার' আজও রয়েছে।

চাঁদনী চককে একটি ক্ষুদ্র জগৎ বলা যায়। পূব দিকে লাল কেল্লার সামনে দিয়ে ঢুকলে এই বাজারের মুখেই পড়ে টাউনহল

একটি মন্দির আর বাজারের শেষে পশ্চিম প্রান্তে রয়েছে ফেতহ্‌পুরী মসজিদ। দুই প্রান্তের মধ্যে আছে হিন্দুদের একটি মন্দির, কাশ্চানদের একটি গীর্জা, শিখদের একটি গুরুদ্বার আর মুসলমানদের আর একটি মসজিদ। এই মসজিদটির নাম সুনহেরী মসজিদ। এর সম্পর্কে বিখ্যাত ঐতিহাসিক জেনারেল ক্যানিংহাম সাহেব লিখেছেন :

"Some buildings may be remarkable only for their historical interest but they are worth preserving on that account although they may be otherwise insignificant. Such for instance is the small mosque in Chandni Chowk where Nadir Shah sat for several hours while plunder and massacre was going on all around him".

ব্যাপারটার সূত্রপাত হয়েছিল এইভাবে। ১৭৩৯ সালের শীতকালে নাদির শাহ সসৈন্যে দিল্লী অভিমুখে রওনা হলেন তখন দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ শাহ লাল কেল্লায় মোসাহেবদের নিয়ে স্ফূর্তি আর সুরাপানে মত্ত। খোশ মেজাজে তিনি সেদিন বলেছিলেন, 'দিল্লী দূর অস্ত্‌'। অবশ্য দিল্লী প্রবেশের পথে নাদির শাহ কোন বাধাই পান নি। এর পর একদিন নাদির শাহের কয়েকজন সেপাই চাঁদনী চকের বাজারে কবুতরের দরদস্তুর করছিল। সেখানে স্থানীয় কয়েকজন লোকের সঙ্গে তাদের কি নিয়ে বচসা হয়। বচসা থেকে মারামারি আর তার ফলে নাদির শাহের কজন সেপাই মারা পড়ে। আর যায় কোথায়? নাদির শাহ এমনিতেই মাথা গরম লোক। তিনি একথা শুনে ক্ষেপে লাল। তখুনি লাল কেল্লা থেকে বেরিয়ে সুনহেরী মসজিদে চলে এলেন তারপর সেখানে বসে সেপাইদের ঢালাও হুকুম দিলেন—'সব লুঠ কর, খুন কর, যার যা পাও কেড়ে নাও। নিষ্ঠুর নির্মমভাবে যত পার অত্যাচার কর।' সমসাময়িক এক ঐতিহাসিক নিজের বাড়ীর ছাদ থেকে এই হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসলীলা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে তার বিবরণ এইভাবে লিখে গেছেন, 'মনে হচ্ছিল এক মুহূর্তেই যেন সব ধ্বংস হয়ে শেষ হয়ে যাবে। চাঁদনী চক, ফলের বাজার, দরিবা বাজার সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ওখানকার বাসিন্দা লোকজন যাকে পেল তাকেই ওরা নির্বিচারে কেটে ফেলল। খুনোখুনি, রক্তারক্তি আর ধ্বংসলীলা যেভাবে চলেছিল তার দরুন ক্ষতি হল অপূরণীয়, কত পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। বহুদিন রাস্তায় মানুষের মৃতদেহ স্তূপীকৃত হয়ে পড়েছিল, ঠিক যেমন বাগানে ঝরাপাতা আর শুকনো ফুল মাটিতে বিছিয়ে পড়ে থাকে তেমনিভাবে।' সুনহেরী মসজিদের ভেতর বসে নাদির শাহ এই হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করে এক পৈশাচিক আনন্দ উপভোগ করছিলেন। এইভাবে ন ঘণ্টা ধরে প্রলয় কাণ্ড চলার পর বিকেলে চারটে নাগাদ দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ শাহ তাঁর প্রধানমন্ত্রী আসফ জাহ্‌কে সুনহেরী মসজিদে পাঠালেন নাদির শাহের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে তাঁর করুণা প্রার্থনা করার জন্যে। সব দেখেশুনে নাদির শাহে নিজস্ব হাকিম মীর্জা মেহদির মনে দিল্লীবাসীর জন্যে একটু সহানুভূতি জেগেছিল। তিনি নাদির শাহের কাছে ওকালতি করে বললেন, 'হিন্দুস্তানের প্রধানমন্ত্রী নগ্ন মস্তকে, অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে একথা জানতে এসেছেন যে আপনার বিজয়ী সেনারা এবার কি জলের বদলে রক্তে হাত ধোবে?' নাদির শাহ এর উত্তরে বলেছিলেন, 'হিন্দুস্তানের প্রধানমন্ত্রীর শ্বেতশ্মশ্রুর সম্মানে আমি দিল্লীবাসীকে এযাত্রা মাপ করলাম।' এর পর নাদির শাহ হত্যাকাণ্ড বন্ধের আদেশ দেন।

নতুন দিল্লীতে আজ পার্লামেন্ট স্ট্রীট যেমন প্রধান রাজপথ সেকালে চাঁদনী চকও ছিল তেমনি। সন্ধ্যের পর নহরের ধার দিয়ে গাছের ঠাণ্ডা ছায়ায় বাদশাহ বেগমেরা হাওয়া খেতে বেরুতেন। ১৮৬২ খৃঃ বৃটিশ গভর্নমেন্ট এখানে মিউনিসিপ্যাল কমিটি ভবন (বর্তমান টাউন হল) তৈরী করিয়েছিলেন। গোরক্ষা আন্দোলন থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের আন্দোলন পর্যন্ত সব দাবী সোচ্চার হয়ে ওঠে আজ পার্লামেন্ট স্ট্রীটের ওপর, কিন্তু সেকালে এই সব আন্দোলন হত চাঁদনী চকে।

বিজয়ী আওরংগজেব তাঁর গুণীজ্ঞানী ও সরল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারা শিকোহকে এই চাঁদনী চকের ওপরেই চরম লাঞ্ছিত করেছিলেন। ভিক্ষুকের মলিন বস্ত্র পরিয়ে এক কদাকার হাতীর পিঠে চড়িয়ে দারা শিকোহকে এই পথ দিয়ে শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। দারা শিকোহকে প্রজারা সবাই শ্রদ্ধা করত, প্রাণের তুল্য ভালবাসত, কিন্তু সেদিন প্রবল প্রতাপান্বিত আওরংগজেবের রক্তচক্ষুর সামনে কারুর টুঁ শব্দ করার সাহস ছিল না। লোকে তাই পথের দু পাশে দাঁড়িয়ে তাদের প্রিয় রাজপুত্রের এই লাঞ্ছনা প্রত্যক্ষ করে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলেছিল। পরে দারা শিকোহকে লাল কেল্লায় নিয়ে গিয়ে তাঁর শিরচ্ছেদ করা হয়।

আওরংগজেবের সময় আর এক মহাপ্রাণ নেতার মুণ্ডও এই চাঁদনী চকে ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল। তিনি নবম শিখগুরু তেগ বাহাদুর। গুরু তেগ বাহাদুর আওরংগজেবের কথামত স্বধর্ম ত্যাগে সম্মত হন নি তাই তাঁকে এই চরম শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল।

চাঁদনী চকের রক্ততৃষ্ণা এত রক্তেও কিন্তু মেটে নি। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর এখানে আর এক নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের আয়োজন করা হয়। বাজারের মধ্যে কোতোয়ালীর সামনে এক ফাঁসির মঞ্চ তৈরী করা হয়। এখানে বহু বিখ্যাত স্বাধীনতার যোদ্ধাকে ইংরেজরা ফাঁসিতে লটকিয়েছিল। তারপর তাঁদের মৃতদেহ লোককে ডাক করে দেখানো হয়েছিল। এই বীর যোদ্ধাদের মধ্যে ছিলেন ঝঝর-এর নবাব আব্দুর রহমান খান, বল্লভগড়ের রাজা নহর সিং ও আরো তিনজন রাজা।

লর্ড হার্ডিং তখন ভারতের বড়লাট। বিপ্লববাদীরা বৃটিশ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে তখন খুব সক্রিয়। সেই সময় দিল্লীর দরবারে দুটি বড় বিষয়ের ঘোষণা করা হয়েছিল। প্রথম, বঙ্গভঙ্গ ব্যবস্থায় পরিবর্তন ও দ্বিতীয়, কলকাতা থেকে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা। ১৯১২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর লর্ড হার্ডিং চাঁদনী চকের ওপর দিয়ে যখন গাড়ীকে করে লাল কেল্লায় যাচ্ছিলেন সেই সময় ফোয়ারার কাছে বড়লাটের গাড়ীতে একটি বোমা নিক্ষেপ করা হয়। এর ফলে বড়লাটের পশ্চাৎস্থিত এক অনুচর মারা যায় এবং লর্ড হার্ডিং নিজেও আহত হয়েছিলেন।

বিখ্যাত উর্দু কবি গালিব থাকতেন এই চাঁদনী চকের একটি পাড়াতেই। তিনি যে অঞ্চলে থাকতেন তার নাম বিল্লীমারন।

চাঁদনী চকের দরিবা অঞ্চলের কথা আগেই বলা হয়েছে। বাদশাহী আমল থেকে এই দরিবা জহুরীদের পাড়া বলে বিরাট ঐতিহ্য বহন করে এসেছে। পুরুষানুক্রমে জহুরী ও মণিকাররা দরিবায় রত্নালঙ্কারের ব্যবসা করে আসতেন। তাঁদের আশ্চর্য শিল্পনৈপুণ্যের খ্যাতি ছিল দেশ জোড়া। দরিবার শুরুতেই 'কিনারী বাজার' সোনা-রূপোর জরির পাড় বসানো ও বুটিদার কিংখাব ও রেশমীর কাপড়ের জন্যে 'কিনারী বাজার' বিখ্যাত। রাতের আলোয় এই সব দোকানের মহামূল্যবান কাপড়ের জরি থেকে সহস্র আলোর ধারা বিচ্ছুরিত হয়।

চাঁদনী চকের বাজারের শেষ প্রান্তে 'পরঠাওয়ালা গলি'। এ হল ভোজন বিলাসীর স্বর্গ। পরঠাওয়ালা গলির ঘাটি ঘিয়ে ভাজা পরঠার সুগন্ধে এ পাড়া মাত হয়ে থাকত। কাছের আর দূরের বহু ভোজনবিলাসী এই গলিতে ছুটে আসতেন সুস্বাদু পরঠার স্বাদ গ্রহণ করতে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন তালপুকুরের নামটাই থেকে গেছে, ঘটি ডোবে না। শোনা যায়, এখন নাকি একটি পরঠার দোকান এই গলিতে টিমটিম করছে।

শুধু পরঠা কেন, ঐতিহাসিক চাঁদনী চকের বাজারে পয়সা ফেললে কি না মেলে? From Radish to Radio সব কিছু! তালিকা দীর্ঘ করে লাভ নেই। জীবনের চাঞ্চল্য ও কর্মের ব্যস্ততায় চাঁদনী চক সদা-ভরপুর। প্রাচীন ও নবীন, ধনী ও নির্ধন, হৃদয়বান ও হৃদয়হীনের এক অদ্ভুত সমাবেশ এখানে। চাঁদনী চক এক আশ্চর্য paradox, কত যুগের কত সভ্যতা আর ইতিহাস এখানে ভেঙেচুরে নতুন করে রূপ নিয়েছে, কিন্তু চাঁদনী চক অনেক পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে আজও যেন অপরিবর্তনীয়, তার বাইরের খোলটাই শুধু বদলায় আজও গভীর রাতে কান পেতে শুনলে চাঁদনী চকের মাটিতে ইতিহাসের কত পদধ্বনি বোধহয় শোনা যাবে।

অঙ্গনা

সম্মানিতা সাহিত্যিক

সাহিত্য আকাদেমীর পুরস্কারের তালিকায় মহিলা সাহিত্যিকেরা ভীষণভাবে উপেক্ষিত। দীর্ঘদিন পর্যন্ত এ পুরস্কার থেকে তাদের বঞ্চিত রাখা হয়েছে। দেখেশুনে মনে হয়েছিল যে, এদেশে মহিলারাও যে সাহিত্য সাধনা করেন সাহিত্য আকাদেমীর কর্মকর্তারা সেকথা ভুলে বসে আছেন। এই ধারণাই আমাদের মনে দৃঢ়মূল হতো যদি না তিনজন মহিলা সাহিত্যিক এই সম্মান লাভ করতেন। সাহিত্য আকাদেমীর ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম মহিলা সাহিত্যিকরা নিজেদের প্রাপ্য মর্যাদা পেলেন। আশা করা যায় যে, এরপর থেকে এই ধারা অব্যাহত থাকবে।

এই তিন মহিলা সাহিত্যিকের অন্যতমা হলেন শ্রীমতী দুর্গা ভাগবত। তিনজনের মধ্যে তিনি বয়সেও প্রবীণা। ১৯১০ সালে তাঁর জন্ম। এক প্রগতিশীল মারাঠী পরিবারের সন্তান শ্রীমতী দুর্গা পড়াশোনার সুন্দর পরিবেশে বড় হয়ে ওঠেন। তাঁর মা-বাবা তো বটেই এমনকি ঠাকুমাও পড়াশোনা করতে খুব পছন্দ করতেন। তাঁর নিজের ভাষায় ঠাকুমা ছিলেন একজন, ভোরেসাস রীডার। বৃদ্ধার বয়েস হয়ে গিয়েছিল। চোখের নজরও তেমন জোরালো নয়। তবু তিনি পড়ায় ক্ষান্তি দিতেন না। বড় বড় হরফের ছাপানো বই পড়ে তিনি তাঁর জ্ঞানতৃষ্ণা মেটাতেন। ঠাকুমার এই পড়ার দারুন আগ্রহই পরবর্তী জীবনে তাঁকে লেখায় প্রেরণা জোগায়।

নাসিক থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করার পর শ্রীমতী দুর্গা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়তে যান। স্কুল থেকে কলেজ আর সেখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত আগাগোড়া তিনি বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে প্রতিটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অ্যান্থ্রোপলজি এবং সোসিওলজিতে তিনি এম-এ পাশ করেন। এরপর তিনি কিছুকাল গবেষণা কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু তেমন উৎসাহ পেলেন না। ইতিমধ্যে গোখেল ইনস্টিটিউট থেকে তিনি আমন্ত্রণ পেলেন সোসিওলজির প্রধানের পদ গ্রহণের। এ প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি দিলেন। কিন্তু কিছুদিন কাজ করার পর তিনি এ পদেও ইস্তফা দিলেন। এবং পুরোপুরি এবার লেখায় মনোনিবেশ করলেন।

এ পর্যন্ত তিনি অনেক লিখেছেন। আজো একই রকম অক্লান্তভাবে লিখে চলেছেন। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে 'ঋতুচক্র' বিশেষভাবে পাঠকমহলে সাড়া তুলেছে। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, আমি ঘরের জানালা দিয়ে তাকিয়ে ঋতু পরিক্রমা লক্ষ্য করে এই উপন্যাস লিখেছি। তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য বই হলো 'তুলসী বিবাহ'। এই বইটি হিন্দীতেও অনুবাদ হয়েছে। তবে যে বইটির জন্য তিনি পুরস্কৃত হয়েছেন তা হলো একটি রচনা-সংকলন-পেস। এটি অনেকটা ভ্রমণকাহিনী ধরনের। এলাহাবাদের নৈনি ব্রীজ থেকে শুরু করে বোম্বের সেন্ট টমাস ক্যাথেড্রালে যার সমাপ্তি। পথ পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে বস্তু এবং পরিস্থিতি সম্বন্ধে লেখিকার প্রতিক্রিয়াই এই বইয়ের মূল সুর।

এই বয়সেও শ্রীমতী দুর্গা সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে নারী প্রগতি এবং সামাজিক অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিটি বিষয়ে সমান ঔৎসুক্য প্রদর্শন করেন। তিনি মনে করেন যে, আগেকার তুলনায় আমাদের দেশে মেয়েদের অবস্থার অনেক পরিবর্তন হলেও আরো উন্নতি প্রয়োজন। তা হলে নিজের সমাজকে তিনি পাশ্চাত্য ঢংয়ে সাজাতে রাজি নন। সেই সঙ্গে মহিলাদের স্বাধীনতা কোনরকম ক্ষুণ্ণ হোক তিনি তারও বিরোধী। ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশায় তাঁর কোন আপত্তি নেই। তবে এর সামাজিক স্বীকৃতি প্রয়োজন। নাহলে সেই পুরোন দিনের মতো মেয়েদের এক্ষেত্রেও চোখের জল ফেলতে হবে। আবার বিবাহ-বিচ্ছেদ ব্যবস্থাকে স্বাগত জানাতেও তাঁর কোন কুণ্ঠা নেই। তবে এক্ষেত্রেও তাঁর আশংকা যে, অপরিপক্ব মানসিকতায় এর অনেক অপপ্রয়োগ ঘটবে। তার মেয়েদের প্রতি তাঁর আবেদন অর্থের পিছনে না ছুটে সাদাসিধে জীবনে অভ্যস্ত হোন।

পঞ্চনদের দেশের মেয়ে শ্রীমতী দিলীপ কাউর তিয়ানা অন্যতম পুরস্কার বিজয়ী। এ পর্যন্ত তিনি আটটি বই লিখেছেন। সবই ছোট গল্প আর উপন্যাস। যে বইটির জন্য তিনি পুরস্কার পেয়েছেন তার নাম 'এ হি হামারা জীবন'। গুরুদ্বারায় প্রার্থনারত এক মহিলাকে দেখে তিনি উপন্যাসটি লিখতে অনুপ্রাণিত হন। বয়সে নবীনা শ্রীমতী দিলীপ কাউর পাঞ্জাবী ভাষার একনিষ্ঠ লেখিকা। তিনি পাঞ্জাবী সাহিত্যে ডকটরেট এবং পাতিয়ালায় অধ্যাপনা করেন।

শ্রীমতী দিলীপ কাউর স্বল্পভাষী। কথাবার্তা কম বলেন এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে, কথার চেয়ে কাজে বেশি পটু হওয়া প্রয়োজন। এই একটি মূল্যবান গুণ তাঁর চরিত্রে যা কিনা আজকাল বেশি তেমন দেখা যায় না। আমরা কাজ সরিয়ে রেখে কথায় বেশি পটুত্ব প্রকাশ করি। তাই তিনি পুরস্কার হাতে নিয়ে বলেন, এবার পাঠকদের প্রতি আমার দায়িত্ব আরো বাড়লো। তিনি মেয়েদের নিয়েই বেশি লেখেন। মেয়েদের দুঃখ-দুর্দশাই তাঁর গল্প-উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। এ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য, সকলের দুঃখ-দুর্দশাতেই তিনি সমানভাবে অভিভূত হন। কিন্তু মেয়েদের বেদনা তিনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পারেন একজন মেয়ে হিসেবে। সেজন্যই মেয়েদের কথাই তিনি বলতে চান।

সাহিত্য সাধনা করতে গিয়ে পুরস্কার পাওয়ার ব্যাপারটা তিনি তেমন গুরুত্ব সহকারে বিচার করতে রাজি নন। সৃষ্টি হচ্ছে সাহিত্যিকের একমাত্র আনন্দ যা পড়ে পাঠক তৃপ্ত হবে। তাই পুরস্কার পাওয়া না পাওয়া তেমন কোন ব্যাপার নয়। আসলে লেখকের স্বীকৃতি হলো পাঠকের কাছে। পাঠক পরিতৃপ্ত হলে লেখকের আর কিছু চাওয়ার বা পাওয়ার থাকে না।

পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠা হলেন শ্রীমতী পদ্মা সচদেব। মাত্র ৩২ বছর বয়স। কিন্তু তিনি বয়সকে যোগ্যতার মাপকাঠি মনে করেন না। আর এটো সত্যি যে প্রতিভা বয়সের হিসেবে চলে না।

তবে তার সবচেয়ে আনন্দ যে, তাঁর প্রথম বইটি তাঁকে এই পুরস্কারের সুযোগ এনে দিয়েছে। জম্মুর মেয়ে শ্রীমতী পদ্মা যে ডোগরি কবিতার বইটির জন্য পুরস্কার পেয়েছেন তার নাম 'মেরি কবিতা মেরে গীত'। তিনি কোন ভাষার গন্ডীর মধ্যে নিজেকে আটকে রাখেন নি। তিনি হিন্দী আর উর্দুতেও কবিতা লেখেন। কাশ্মিরী তো তাঁর নিজের ভাষা। এখন তিনি হিন্দীতেই অবশ্য বেশি লিখছেন।

এই অল্প বয়সে শ্রীমতী পদ্মা বেশ খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর প্রতিভা আর অভিজ্ঞতার এক অভূতপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে তাঁর কবিতায়। যখন তাঁর বয়স মাত্র ১৫ বছর তখন তিনি একদিন বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। এটা তাঁর তখনকার প্রায় নিত্য দিনের অভ্যাস। এসময় তিনি গরীব ভিখিরিদের যথাসম্ভব দান করেন। সেদিনও তিনি তাই করেছিলেন। যা কিছু সবই দেওয়া হয়ে গিয়েছে। এমন সময় একজন ভিখিরি এলো। তিনি তাকে ফেরাতে পারলেন না। নিজের গায়ের শালটি তাকে দিয়ে দিলেন। ঘটনাচক্রে সে ভিখিরিটি ছিল অন্ধ। সে অনুভবে বুঝলো শালটি খুবই মূল্যবান। আরো সে বুঝতে পারলো যে, এরকম মূল্যবান শাল যিনি দিতে পারেন তিনিও নিঃসন্দেহে বড় বাড়ির সন্তান। এরকম আন্দাজ করেই সে মন্তব্য করলো, এতবড় বাড়িটা কি তোমার? একথা বলে অন্ধ ভিখিরি চলে গেল। সে আর উত্তরের অপেক্ষা করলো না। কিন্তু শ্রীমতী পদ্মার মনে তা আলোড়ন তুললো। আর তা থেকেই জন্ম নিল তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা।

জম্মুর এক সংস্কৃত পন্ডিত পরিবারে শ্রীমতী পদ্মার জন্ম। আর্থিক অবস্থাও সচ্ছল। তবু ভাগ্যের সঙ্গে তাঁকে লড়তে হয়েছে প্রচন্ডভাবে। তাঁর তখন মাত্র সাত বছর বয়স। তাঁর বাবা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বলি হলেন। তাঁর প্রতি ভাগ্যের নিষ্ঠুরতা কিন্তু এখানেই শেষ হল না। দ্বিতীয়বার ভাগ্যের সঙ্গে তাঁকে আবার পাঞ্জা কষতে হলো। তখন তাঁর বয়স ১৭ বছর। তিনি টিউবারকুলোসিসে আক্রান্ত হলেন। প্রায় গড়ে তিন বছর তাঁকে শ্রীনগর স্যানিটোরিয়ামে থাকতে হয়। ডাক্তারদের পরামর্শে এ-সময় তাঁকে লেখা পর্যন্ত বন্ধ করে দিতে হয়। যা তাঁর বাঁচার একমাত্র অবলম্বন তা থেকেই তিনি বঞ্চিত হলেন। এতো তার মরারই সামিল। কিন্তু শ্রীমতী এসময় প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তিতে উজ্জীবিত হলেন। স্তরে স্তরে সৃষ্টির নতুন রঙ লেগেছে। তারা তাঁকে প্রতিনিয়ত তাড়া করে ফিরছে। সৃষ্টির অদম্য আকাঙ্ক্ষা তাঁর মধ্যে গুমরে মরছে। কিন্তু ডাক্তারদের নির্দেশে তিনি নিশ্চুপ হয়ে আছেন। তারপর একসময় তিনি সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন আর সৃষ্টির পথের বাধাও হলো অপসারিত। পড়াশোনা আর বেশিদূর এগুলো না।

শ্রীমতী পদ্মা কবিতা লেখার অবসরেও নিপুণা গৃহিণী। ঘরসংসারের কাজ তিনি নিজেই করেন। আবার তিনি চাকরিও করেন। অল ইন্ডিয়া রেডিওর তিনি ঘোষিকা। গানের অনুষ্ঠানসূচী তিনি নিজে তৈরি করেন। বিয়েও করেছেন এক গায়ককে। তিনি পছন্দ করেন বোল, তান আর তাল। এবং শ্রীমতী পদ্মারও পছন্দ তাই। এছাড়া সামাজিক কাজকর্মও করতে হয় কিছু কিছু। প্রতিবেশির সাহায্যে তিনি এগিয়ে যান সকলের আগে।

এর মধ্যে শ্রীমতী পদ্মা কবিতার কথা চিন্তা করার সুযোগ খুব কমই প্যান। সুযোগ পেলেই যে তিনি কবিতার চিন্তায় তন্ময় হয়ে যান এমন নয়। বরং লোকজনের কথা কইতে কইতে কবিতা তাঁর মনের কোণে ধীরে ধীরে রূপ নেয়। তাই তিনি পরিহাস তরল কণ্ঠে বলেন, আমাকে কবিতার কথা ভাবতে হয় না—কবিতাই এসে আমার কাছে ধরা দেয়।

নতুন খাবার

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের নির্দেশ যে মিষ্টি দিয়ে ভোজনপর্ব সমাধা করলে তা যেমন তৃপ্তিদায়ক হয় তেমনি শক্তিবর্ধকও বটে। আগে আগে প্রতি বাড়িতেই নানারকম মিষ্টি তৈরি হতো। এখন আর তা সম্ভব নয় দিনকালের পরিস্থিতিতে। তবু সহজ পদ্ধতির দু-একটি মিষ্টির কথা বলা হলো যাতে ভোজনপর্বের সমাপ্তি সুন্দরভাবে হতে পারে।

হালুয়া-বাদাম

উপকরণ : দু' সের দুধ, আধসের বাদাম, একতোলা এলাচ, একতোলা পেস্তা, একসের মিছরি, এক ছটাক কিশমিশ।

প্রথমে বাদাম ছাড়িয়ে ভিজিয়ে নিতে হবে। তারপর মিহি করে বাটতে হবে। এবার উনুনে কড়াই চাপিয়ে ঘি গরম করে সেই বাটা বাদাম ভেজে নিতে হবে। বাদামের রং যখন একটু লাল হবে তখন এলাচ এবং পেস্তা পেশাই করে দিতে হবে। এভাবে দুধ মিছরি এবং কিশমিশও দিতে হবে। মৃদু আঁচে এবার ধীরে ধীরে নাড়তে হবে। জিনিসটা যখন বেশ একটু গাঢ় হবে তখন নামিয়ে থালায় ঢেলে নিতে হবে।

হালুয়া কিশমিশ :

উপকরণ : দু ছটাক খোয়া ক্ষীর, আধসের কিশমিশ, দু ছটাক ঘি, দু ছটাক মিছরি, দুটো বড় এলাচ।

রাতে শুতে যাবার সময় একসের আন্দাজ জলে কিশমিশ ভিজিয়ে দিতে হবে। সকালবেলা সেই কিশমিশ ভাল করে ধুয়ে পেশাই করে নিতে হবে। এবার উনুনে কড়া চাপিয়ে এক ছটাক ঘি দিয়ে খোয়া ক্ষীর ছেড়ে দিতে হবে। খোয়া ক্ষীর লাল হয়ে এলে নামিয়ে নিতে হবে। এবার আর এক ছটাক ঘি দিয়ে পেশাই করা কিশমিশ মৃদু আঁচে বসিয়ে দিতে হবে। ইতিমধ্যে মিছরির রস করে নিতে হবে। তারপর রসের মধ্যে কিশমিশ ঢেলে দিতে হবে। কিশমিশ গলে যখন গাঢ় হয়ে আসবে তখন খোয়া ক্ষীর আর এলাচ দিয়ে নামিয়ে নিতে হবে।

হালুয়া আলু :

উপকরণ : এক পোয়া আলু, আধ-পোয়া ঘি, আধ সের দুধ, আন্দাজমত চিনি, কিশমিশ, পেস্তা।

আলু সেদ্ধ করে ছাড়িয়ে নিয়ে পেশাই করে নিতে হবে। কড়ায় ঘি দিয়ে পেশাই করা আলু ভাজতে হবে। এবার দুধ দিতে হবে। বেশ ভালভাবে যখন মাখোমাখো হয়ে আসবে তখন চিনি দিয়ে নামিয়ে নিতে হবে। এরপর কিশমিশ ও পেস্তা দিয়ে গরম গরম পরিবেশন করতে হবে।

—প্রমীলা

সাহিত্যিকা সম্বর্ধনার আসরে

রাতে আলোর রোশনাই, গাছে গাছে কুয়াশার পাতলা আবরণ, দলে দলে লোকের ভিড় যেখানে জমজমাট সেই মাঠময়দানের পাশেই রবীন্দ্রসদনে গত ২৬শে নভেম্বর শীতের সকালে য়ুনিভার্সিটি উইমেনস এ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সেই অনুষ্ঠানে পুণ্যলতা চক্রবর্তী, শৈলবালা ঘোষজায়া, সীতাদেবী, শান্তাদেবী, জ্যোতির্ময়ী দেবী, গিরিবালাদেবী প্রমুখ বিশিষ্ট ছজন সত্তর-আশি বছরের অগ্রগণ্যা লেখিকাকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এই অনুষ্ঠানে অনেক লেখক-লেখিকা ছাড়াও সাহিত্যরসিক দর্শক ও শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। যাঁদের লেখা এতদিন সকলে সাগ্রহে পড়েছে অথচ তাঁদের অধিকাংশকেই জানার, দেখার কোন সুযোগই হয়নি, এই অনুষ্ঠানে তাঁদের উপস্থিতিতেই এত জনসমাগম। রমা চৌধুরী ও আশাপূর্ণা-দেবীর ভাষণের পর প্রবীণা লেখিকাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন জনাকয়েক একালের লেখিকা।

পুণ্যলতা চক্রবর্তীকে চিনিয়ে দিলেন মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়। উপেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরীর কন্যা পুণ্যলতা চক্রবর্তী তিরাশী বছরের বার্ধক্যে পৌঁছেও সকলের সঙ্গে উদার মনে কথা বলতে ভালবাসেন। রায়-চৌধুরী পরিবারের শিক্ষা-সংস্কৃতি, কৃষ্টি পুণ্যলতা যে সবটাই গ্রহণ করতে পেরেছেন সেটা তাঁর কথায়, ব্যবহারে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট। স্বামীর কর্মজীবনের সংগী হিসেবে তিনি বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। চোখে দেখা জঙ্গল, পাহাড়ের বিভিন্ন মডেল হাতে তৈরী করে অত্যন্ত আধুনিক পদ্ধতিতে মেয়েদের ভূগোল পড়িয়েছেন। সেই সঙ্গে পড়িয়েছেন ইংরেজী, বাংলা, ইতিহাস।

শিশু-সাহিত্য ক্ষেত্রে পুণ্যলতা চক্রবর্তী একটি উজ্জ্বল নাম। ছোটদের মত করে সহজ, সরল, অনাড়ম্বর ভাষায় গভীর দরদের সঙ্গে গল্প লিখে ছোটদের তিনি তা উপহার দিচ্ছেন। বড়রাও তাঁর লেখা গল্প পড়তে পড়তে ছোটদের মত পুলকিত হয়ে ওঠেন। ইদানীংকালে 'সন্দেশ' পত্রিকায় তাঁর গল্প প্রায়ই প্রকাশিত হয়। জীবনে তিনি অনেক গল্প লিখলেও তাঁর লিখিত 'ছেলেবেলার দিনগুলি' একমাত্র প্রকাশিত পুস্তক।

সম্বর্ধনা সভায় পুণ্যলতা যখন বললেন বয়সে অগ্রজা হলেও লেখিকা হিসেবে আমি পিছনের সারিতে, তখন মনে হল এত দরদ আর উদারভাবে বিনয়ের বাণী এই কণ্ঠেই শোভা পায়।

এরপর সংক্ষিপ্ত ভাষণে গিরিবালাদেবী তাঁর বক্তব্য রেখেছিলেন। আজ তিনি প্রায় আশি বছরের বৃদ্ধা। সেইদিন যেদিন মেয়েরা ছিল উপেক্ষিতা, তাঁদের কোন কাজেরই সম্মান ছিল না, সে সময় মাত্র কুড়ি বছর বয়সে গিরিবালা দেবী মানসী ও মর্মবাণীতে' 'ছলনা' গল্পটি ডাকে পাঠিয়েছিলেন। লেখাটি ছাপাও হয়। 'ছলনা'র সঙ্গে সঙ্গেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের 'নারায়ণ' পত্রিকায় বেরোল তাঁর একটি গল্প। 'মানসী ও মর্মবাণীর' সম্পাদক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে তিনি তাঁর সাহিত্যজীবনের গুরু হিসাবে মনে করেন। 'সচিত্র শিশির', 'ভারতবর্ষ', 'মাসিক বসুমতী', 'প্রবাসী' প্রভৃতি অনেক পত্রিকায় তাঁর লেখা ভ্রমণকাহিনী, গল্প, উপন্যাস ছাপা হয়। তিনি প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছিলেন। 'কালিয়' পত্রিকায় 'আমীর আলির ঘাট' উপন্যাসটি ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে। 'সন্দেশ' পত্রিকায় মাঝে মাঝেই ও'র কবিতা দেখা যায়। এত খ্যাতি ও প্রশংসার অধিকারিণী গিরিবালা দেবী নিরভিমান। প্রখ্যাত পণ্ডিত [illegible] শাস্ত্রীর কন্যা গিরিবালা দেবী স্বামীর আন্তরিক সহযোগিতায় নিজের সাধনা [illegible] [illegible] ছুঁয়েছেন। বিশিষ্ট [illegible] [illegible] [illegible] ও'র কথায়।

সীতাদেবী ভাষণদানকালে আজকাল-কার শিক্ষিতাদের সামনে বিরাট এক প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন তাঁদের সময়ে মেয়েদের প্রগতির কাজে ছিল অনেক বাধা অথচ সেই বাধা অতিক্রম করে অনেক মেয়েরাই সাহিত্যসাধনায় ছিলেন পুরুষদের সমকক্ষ। কিন্তু আজকের এই শিক্ষার অগ্রগতি সত্ত্বেও মেয়ে সাহিত্যিকের সংখ্যা এত কম কেন?

ছোটগল্প ও উপন্যাসের জন্য সীতা-দেবীকে সবাই মনে রাখবে। সীতাদেবী কয়েকশ' ছোটগল্প লিখেছেন কিন্তু 'বজ্র-মণি' ও 'ছায়াবীথি' ছাড়া তাঁর লেখার কোন সঙ্কলনগ্রন্থ হয়নি। স্বামী সুধীর চৌধুরীর সঙ্গে সীতাদেবী রেঙ্গুনে গিয়েছিলেন। বর্মার পটভূমিকায় তাঁর রচিত 'পরভৃতিকা' উপন্যাসটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সীতাদেবী রচিত গল্প বা উপন্যাস গতানুগতিকধারায় মানুষের পারিবারিক জীবনের বহুলোচনার দুঃখ-সমস্যারই জর্জরিত নয়, তৎকালীন যুগের প্রেমের ভাবাবেগও তাঁর লেখায় মূর্ত হয়েছে। তাঁর সাহিত্যমানস রবীন্দ্র-নাথের সাহচর্য লাভ করেছিল। শান্তা-দেবীর সঙ্গে একযোগে তিনি 'সাতরাজার ধন', 'আজব দেশ', 'নিরেট গুরুর কাহিনী' প্রভৃতি অনুবাদ সাহিত্য রচনা করে বাংলার
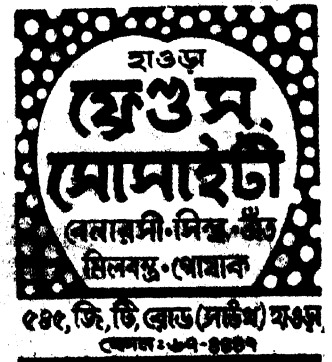
শিশুসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। সীতাদেবী একসময়ে সংগায়িকাও ছিলেন।

শৈলবালা ঘোষজায়া আক্ষেপ ও উৎসাহ দুই-এ মিলিয়ে বলেছেন আমাদের সময়ে মেয়েদের লেখার এত সুযোগ ছিল না, তার জন্য আমরা অনেক কষ্ট পেয়েছি। তাই স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের সংগে সংগে তিনি মেয়েদের সাহিত্যজগতে আরও এগিয়ে যেতে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন।

শৈলবালা ছাত্রী হিসেবে কৃতী ছিলেন। সাহিত্যের প্রতি তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ। সাহিত্য রচনায় পারিবারিক আনুকূল্য না পেলেও স্বামী নরেন্দ্রমোহন ঘোষের সহযোগিতা পেয়েছিলেন। তাঁর হাত দিয়েই 'শেখ আন্দু' তিনি প্রবাসী পত্রিকায় পাঠিয়েছিলেন। যথেষ্ট সম্মানের সংগে প্রবাসীতে লেখাটি ছাপা হয়েছিল। তৎকালীন পাঠকমহলে 'শেখ-আন্দু' আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। মুসলমান দরিদ্র নায়কের প্রেম অনেকেই ভাল মনে নিতে পারেন নি। এখনকার দিনে এ গল্প স্বাভাবিক মনে হলেও সেই সময়ে লেখনীর এই সাহসিকতা, বলিষ্ঠতা তাঁর নির্ভীকমনের ও দুঃসাহসিকতারই পরিচায়ক।

একসময় লেখিকার জীবনের শান্তিকে স্বামীর অসুস্থতা ভীষণভাবে বিঘ্নিত করলো। বিয়ের মাত্র দু বছর বাদে নরেন্দ্রমোহন উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হন। দশ বছর অসুস্থতার পর তিনি পরলোকগমন করেন। হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে তিনি একটি চোখের দৃষ্টি হারান। অবশ্য এই ভাগ্যবিপর্যয়ে তাঁর লেখনী থেমে থাকে নি।

সাহিত্যিক হিসেবে তিনি স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। তিনি কবিকঙ্কণ চণ্ডীর ওপর তথ্যমূলক প্রবন্ধ লিখে 'সরস্বতী' উপাধি পান। 'সাহিত্য ভারতী' ও 'রত্নপ্রভা' উপাধি লাভ করেছিলেন নদীয়ার 'মানদমণ্ডলীর' কাছ থেকে। তার লিখিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে শেখ আন্দু, জন্ম অভিশপ্তা, বিনির্ণয়, গঙ্গাজল, চোকো চোয়াল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তবে তাঁর লিখিত 'শেখ আন্দু' সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

জ্যোতির্ময়ী দেবী প্রায় ভুলে যাওয়া সম্পাদিকাদের কথা বললেন, বললেন অনিন্দিতা চক্রবর্তীর কথা।

সদাহাস্যময়ী জ্যোতির্ময়ীদেবী সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক' পুরস্কার পেয়েছেন। জয়পুরে জ্যোতির্ময়ী দেবী জন্মগ্রহণ করেন। তাই তাঁর অনেক গল্পের পটভূমিকাতে রাজোয়ারার রাজোয়ারী, সাধারণ মানুষেরা ভিড় করেছে। আসলে রাজস্থানকে তিনি মনেপ্রাণে ভালবেসে ছিলেন। জ্যোতির্ময়ীদেবীর লেখার আবেদন, ভাব, অনুভূতি সাহিত্যরসিককে অভিভূত করে। রাজশেখর বসু, মোহিতলাল মজুমদার প্রমুখ লেখকেরাও জ্যোতির্ময়ীদেবীর লেখার উৎসুক পাঠক ছিলেন। তাঁর লিখিত গল্পসংগ্রহের মধ্যে 'আরাবল্লীর কাহিনী', 'ব্যাণ্ড মাস্টারের মা', উপন্যাসের মধ্যে 'এপার গংগা ওপার গংগা', বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ' বিশেষ স্মরণীয়।

শান্তাদেবী তাঁর ভাষণে বলেছিলেন আয়োজনটা একটু আগে হলে ভাল হতো কারণ চোখ-কানের শক্তি কমে গেছে। তবু দেরিতে হবার জন্যও তিনি খুশী। তাঁর মতে সাহিত্যের বিচারে মহিলা সাহিত্যিকদের সংকীর্তিরও যাতে বিচার হয়, তার ব্যবস্থা হওয়া দরকার।

শান্তাদেবীর পিতা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও পিতৃবন্ধু রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসু ছিলেন তাঁর চিত্রাঙ্কনের গুরু। এস্রাজ বাজাতে তিনি ছিলেন দক্ষ। পিতার সংগে তিনি 'প্রবাসী' সম্পাদনায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সাহিত্যসেবা ছিল ওঁর জীবনের মহান আদর্শ। বেথুন কলেজ থেকে বি-এ পাশ করে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েও সেখানে পড়া সমাপ্ত করতে পারেন নি।

শান্তাদেবীর লিখিত গল্প, উপন্যাস সংখ্যায় অনেক। তাঁর লেখার ভাষা সহজ, সরল। ইংরেজী থেকে বিষয়বস্তু সংগ্রহ করে 'পঞ্চশস্য' লিখেছেন। শান্তিনিকেতনে তিনি থেকেছেন, পড়িয়েছেন সেই সংগে হাতে লেখা পত্রিকা 'প্রেয়সী' সম্পাদনা করেছেন। শান্তাদেবী ও সীতাদেবী সংযুক্তাদেবী নামে একসংগে ফক টেলস অব হিন্দুস্তান' বই-এর অনুবাদ করেন। শান্তাদেবীর ছোটগল্প সংগ্রহের মধ্যে 'সিঁথির সিঁদুর', 'পঞ্চদশী' ও উপন্যাসের মধ্যে 'অলখঝোরা', 'স্মৃতির সৌরভ', 'জীবনদোলা' উল্লেখযোগ্য।

তিনি ব্যক্তিগত জীবনে শুধুমাত্র ছবি আঁকা আর সাহিত্য রচনায়ই ব্যাপৃত ছিলেন না, তিনি নৈশ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাও ছিলেন। লেডি অবলা বসুর নারী শিক্ষা সমিতির কাজে সাহায্য করেছেন।

লীলা মজুমদারের উক্তি চিরকাল মনে থাকবে। তিনি বলেছিলেন বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর মহিলা নেই বলেই জানি। শুনেছি মেয়েদের মাথার ওজন পুরুষদের চেয়ে কম। অবশ্য সত্যি কিনা জানি না। তবে বর্তমানে মেয়েদের পরীক্ষার ফলাফল দেখে তো সেটা মনে হয় না।

এই অনুষ্ঠানে পায়ে ফুলের অর্ঘ্য, গরদের কাপড় ও গ্রন্থাবলী উপহার দিয়ে তাঁদের প্রতি যে শ্রদ্ধা দেখানো হয়েছে তা সত্যিই অতুলনীয়। কিন্তু শুধুমাত্র অনুষ্ঠান আর উপহারে তাঁদের প্রতি বোধহয় যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হয় না, কারণ তাঁদের অধিকাংশেরই লেখার সংকলনগ্রন্থ অতি অল্প। যাও বা কিছু সংকলন আছে তা নিঃশেষিত, দুষ্প্রাপ্য। নব উদ্যমে তাঁদের লেখার সংকলনের প্রচেষ্টাও সম্মান প্রদর্শনের একটি সুষ্ঠু উপায়। তাঁদের সেই সম্মানের সংগে সংগে উত্তরসূরীরা লাভবান হবেন, নয়তো তাঁরা শুধু আগামী দিনে প্রবীণা লেখিকাদের নামটুকুই জানবেন— তাঁদের সাহিত্যের সাক্ষাৎ হয়তো পাবে না।

—অঞ্জলি চৌধুরী

প্রদর্শনী

সোভিয়েত জীবনের আলেখ্য ও একজন গ্রীক পর্যটকের চোখে ভারতবর্ষ

গত সপ্তাহে একাডেমি অফ ফাইন আর্টস গৃহে কলকাতার-সোভিয়েত কনস্যুলেট ও সোভিয়েত সংবাদ সরবরাহ সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত একটি প্রদর্শনী হয়ে গেল।

প্রদর্শনীর বেশী অংশ জুড়ে ছিল সোভিয়েত রাষ্ট্র ও জনসমাজের নানান কর্মকাণ্ড নিয়ে তোলা আলোকচিত্রসমূহ। শতকরা নব্বই ভাগ ছবি তথ্যবর্ণনামূলক। ভাবসৃষ্টিমূলক বা অভিব্যক্তিমূলক ছবি যে একেবারেই ছিল না তা নয়, তবে সংবাদধর্মী ছবির ভিড়ে তা হারিয়ে গিয়েছিল। পশ্চিম ভূখণ্ডের অথবা সোভিয়েত দেশেরই বিপ্লব-পর্বের সংবাদধর্মী আলোকচিত্রে মাঝে মাঝে যে নাটকীয়তা দেখা যায় তা সাম্প্রতিক সোভিয়েত আলোকচিত্রে দুর্লভ। মানবিক আবেদনের দিক থেকে সোভিয়েত যুগের গোড়ার দিককার আলোকচিত্রগুলি স্মরণীয়। অর্থনৈতিক-সামাজিক পরিবর্তনের রূপটি চাক্ষুষ করে তোলার জন্য পুরানো কালের কিছু আলোকচিত্র সাম্প্রতিক চিত্রের পাশাপাশি স্থান পেয়েছিল এই প্রদর্শনীতে: তার থেকেই আমরা আমাদের পূর্বোল্লিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। সোভিয়েত দেশের বিভিন্ন জাতির সমাজ-জীবন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মোদ্যোগের বিভিন্ন দিক, যেমন কৃষি, পশুপালন, বাগিচা, শিল্প, যানবাহন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খেলাধূলা, চারু ও কারুকলাচর্চা সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডের ছবিগুলি সোভিয়েত সমাজ এবং সেই সমাজে মানুষের যৌথজীবন সম্পর্কে আমাদের অনেক তথ্য সরবরাহ করে।

প্রদর্শনীর সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ অবশ্য ছিল কারুশিল্প ও চারুশিল্প বিভাগটি। যদিও এ বিভাগে দর্শনীয় বস্তুর সংখ্যা প্রথম বিভাগের চেয়ে কম ছিল, তবু শিল্প গুণে এই অংশটি ছিল অধিকতর সমৃদ্ধ। আবার এই বিভাগেরও সবচেয়ে আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য ছিল ছাপের ছবিগুলি। যদিও কাজগুলি খুব একটা উন্নত মানের নয় তবু একটা জিনিষ দেখে আশ্বস্ত হওয়া গেল যে এই কাজগুলিতে অষ্টাদশ শতকের প্রকৃতিবাদকেই সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা বলে চালাবার চেষ্টা নেই। বরং কান্দিনস্কি, শাগাল অথবা মালেভিচ, তাৎলিন, গাবো, পেভস্নার সোভিয়েত চিত্রকলাকে যেখানে রেখে গিয়েছিলেন সেখান থেকেই আবার শুরু করার একটা প্রচেষ্টা আছে। অবশ্য এখনকার দ্রষ্টব্য এবং প্রদর্শিত কোন ছবিতেই কান্দিনস্কি বা শাগালের তন্ময়তা অথবা মালেভিচ, তাৎলিন, গাবো বা পেভস্নারের ভবিষ্যমুখী জ্যামিতিক ঋজুতা নেই। সবচেয়ে আকর্ষণীয় লেগেছে ভে কালিনাউস্কাসের শাদা-কালো এচিংটি। এ ছবির রূপবন্ধ রচনায় বাইজেন্টাইন রঙিন কাচ সাজানোর পদ্ধতি এবং ফার্নান্দ লেজের প্রবর্তিত কিউবিজমের এমন একটি আলঙ্কারিক সংমিশ্রণ ঘটেছে যা দৃষ্টিকে টানে। আবার এ ছবির বিন্যাসে বিশেষ করে দৃশ্য সাজানোর রীতিতে মার্ক শাগালের ছাপ। শেক্সপীয়রের সনেটের জন্য এবং অন্য একটি রূপভাষি কবিতার বইয়ের জন্য করা এস ক্রাসাউসকাসের চারটি। চারটি আর্টিস্ট ইলাস্ট্রেশন—রেখাঙ্কন এবং কালো-শাদার বিতরণ গুণে অনবদ্য। এঁর এই এচিংগুলিতে ইনতালিও (কালো) অংশ বেশী। নির্দিষ্ট-অথচ-পেলব তানে রেখাগুলি শাদা এবং তারা রূপবন্ধের সীমা নির্দেশক। মনুষ্যাবয়বই ছবিগুলিতে প্রধান কিন্তু মনুষ্যাবয়ব এবং তা কেন্দ্র করে পিছনে লতাজাতীয় আলঙ্কারিক নকশা ছবিগুলিকে আর্ট-ন্যুভোর নিও-ক্লাসিসিজমকে মনে করিয়ে দেয়। এস কিসারাউসকিয়েন-এর এচিংয়ে মাতিসের শেষ যুগের ছবির সিল্যুয়েট ধাঁচের দ্বি-মাত্রিক অথচ ঘনত্বজ্ঞাপক রূপবন্ধ দেখা যায়। ভে আরকাদিন তাঁর লিথোগ্রাফের জন্য এমন একটি শহুরে দৃশ্য বেছে নিয়েছেন যা দিয়ে রেখা এবং পুঞ্জের সাহায্যে দ্বি-মাত্রিক চিত্রতলে নির্মাণধর্মী নকশা গড়ে তোলা যায়। ঠিক তাই তো ছিল নাউম গাবোর প্রথম যুগের কাজের অভিপ্রায়। আ স্তেপানো-ভিকিউসের এচিং-এ বসে আছে পিকাসোর অতীতের পর্বের মানুষেরা। আর যে ভে কোতলভের জলরঙের দৃশ্যচিত্র তো পোলে সেজানের মঁ সাং ভিক্তোয়ার জলরঙের মডেলে আঁকা। আর চারিয়েভের জলরঙে আঁকা গ্রামের রাস্তায় মরিস উত্রিল্লোর সারল্য ও বিস্ময় লক্ষ্যণীয়।

প্রদর্শনীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিভাগে ছিল সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের নানান অঙ্গ রাজ্যের এবং নানান ভাষাভাষী জাতিগোষ্ঠির ঐতিহ্যানুসারী কারুকলার নিদর্শন। এই নিদর্শনের মধ্যে ছিল চীনামাটি ও কাচের নানা জাতের পাত্র, চামড়ার জিনিষ, কাঠের জিনিষ, কাঠের ইনলে করা কাজ, জাতি-গোষ্ঠির ঐতিহ্যানুযায়ী গ্রামীণ পোষাক পরা পুতুল এবং পশম ও ফারের তৈরী পোষাক। বলা বাহুল্য এর কোনটিই শহরের কারখানায় তৈরী একধাঁচের জিনিষ নয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে গ্রামজীবনের শতেক আধুনিকীকরণের পরেও যেভাবে প্রাক-শিল্পায়ন পর্বের কারুকলার গ্রামীণ ঐতিহ্য লালিত হচ্ছে তা সত্যিই শিক্ষণীয়। বহুদিন ধরে লালিত লৌকিক শিল্পরীতিতে যে ফুল-লতা-পাতা এবং গৃহপালিত পশু-পাখির আকার ভিত্তিক অলংকার-সমৃদ্ধি দেখা যায় তার সবই আছে এই কারুনিদর্শনগুলিতে।

●

এই সপ্তাহে ঐ আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের অন্য একটি কক্ষে শ্রীমতী হাকা পাপাথিয়োডোরু নামে এক ভারতপ্রবাসী গ্রীক ভদ্রমহিলার ১৩টি তেল-রং ছবির ও ৪৪টি শাদা-কালো ড্রইং-এর (কালি-কলমে আঁকা রেখাঙ্কনের) একটি প্রদর্শনী হয়ে গেল। শ্রীমতী পাপাথিয়োডোরুর রেখাঙ্কনগুলি ভ্রাম্যমাণ বিদেশী পর্যটকের চোখে দেখা ভারতবর্ষের দুঃস্থ মানুষ, প্রাকৃতিক দৃশ্য ইত্যাদির ঝটিতি-স্কেচের পর্যায়ে পড়ে। রেখার সঙ্গে রূপবন্ধের, বুনটের সঙ্গে রূপকল্পের কোন বিশেষ সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া যায় না এই স্কেচগুলিতে। জলে ভেজা কাগজে কলমের আঁচড়ে আঁকার যে পদ্ধতি ভদ্রমহিলা গড়ে তুলেছেন, তার সার্থকতা খুঁজে পাওয়া গেল না। তুলনায় শিল্পীর তেলরঙের কাজগুলি আকর্ষণীয়। তবে যেহেতু এ কাজগুলি মনুষ্যাবয়ব ভিত্তিক সেহেতু মনুষ্যপ্রতিমা সম্বন্ধে শিল্পীর নিজস্ব ধারণা ধারণকারী বিশিষ্ট শৈলী দেখতে পাব আশা করেছিলাম। কিন্তু শিল্পী এখনও পর্যন্ত তাঁর ধ্যান-ধারণার শৈলীকরণ করতে পারেননি। তবু বলব, শিল্পীর তেল রঙের ছবি বেশ সম্ভাবনাময়। বিশেষ করে দ্বি-মাত্রিক চিত্রক্ষেত্রে বর্ণলেপন করে তার উপর রঙ অথবা আলোছায়ার সাহায্য না নিয়ে শুধুমাত্র রেখার সাহায্যে ঘনশরীর-বিশিষ্ট মনুষ্যাবয়ব ফুটিয়ে তোলাতে শিল্পীর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু শুধু আয়ুনকতা দিলেই কি ছবি হয়?

ইউক্রাইনের লৌকিক কারুশিল্পের একটি নিদর্শন : মেষরূপী মদ্যাধার

প্রণবরঞ্জন রায়

শিল্পী : সন্তোষ রোহাতগী

সন্তোষ রোহাতগীর চিত্র প্রদর্শনী : শ্রীমতী সন্তোষ রোহাতগী (মৈণ) কলকাতার সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্রশিল্পী। দেশ-বিদেশের অভিজ্ঞতা আছে। লন্ডন-প্যারিসে এঁর চিত্র-শিল্পের প্রদর্শনী হয়েছে। এক যুগ কলকাতায় হয়েছে এঁর চিত্র প্রদর্শনী ডজন খানেক।

ম্যাক্সমুলার ভবনে শ্রীমতী রোহাতগীর চিত্র প্রদর্শনী হয়ে গেল ২৭ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর-এর মধ্যে। পঁচিশটি ছবির মধ্যে পাঁচটি ছিল বাটিকের কাজ। ভারতের পুজো-পার্বনে মহিলা আচারের দৃশ্য বস্তু নিয়ে ছবির কাজ। তুলির টানে ও রং নির্বাচনে প্রতিটি ছবি হয়ে উঠেছে জীবন্ত। এক যুগ আগে এই শিল্পীর আঁকা ছবি দেখেছিলাম। তার তুলনায় এখনকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা সার্থক হয়েছে বলতে পারি। যাঁরাই এই প্রদর্শনী দেখেছেন তাদের মুখে প্রশংসা করতে শুনেছি।

সোনপুরের মেলায়

জীবনময় দত্ত

গঙ্গাযাত্রী কী...

গগনবিদারী শব্দে চমক ভাঙলো। সংগে সংগে প্রাইভেট লঞ্চ ছাড়ার তীব্র সিটিতে কানের পর্দা ফেটে যাবার জোগাড়। এতক্ষণ ধরে প্রায় একঘন্টা যাবৎ কানের কাছে চলছিল মাইকের একটানা বিচিত্র সুরের হায় হায় জাতীয় বোম্বাই আর্তনাদ। কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছিল। তারই তালে তালে লঞ্চের সামনেই আঁতোরঙ পাউডার আর রঙ মেখে একটি ছেলে, মেয়ে সেজে অভব্য ভঙ্গীতে অস্বাভাবিকভাবে নেচে চলেছে। এটা প্রাইভেট কোম্পানীর ব্যবসা-বুদ্ধি। মেলায় যাবার জন্যে যাত্রী সংগ্রহ করার ব্যবস্থা। আর ইতিমধ্যে যারা লঞ্চে এসে উঠেছে তাদের মনোবিনোদনও হচ্ছে। বিরক্ত হয়ে উঠছিলাম পাটনার ঘাটেই লঞ্চে এতক্ষণ বসে বসে। লঞ্চ ছাড়ায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

প্রাইভেট লঞ্চে যাবার কারণ আগে পেঁছন। অনেক তাড়াতাড়ি যায়। রেলে চড়ার ঝামেলা থাকে না মেলায় পেঁছাবার জন্যে। এই ব্যবস্থায় কিছুটা লম্বা পথ পাড়ি দিতে হয় পায়ে হেঁটে। সেটাও একটা আকর্ষণ।

গঙ্গার ওপারের মাটিতে পা রাখা মানেই সারণ জেলায় উপস্থিত হওয়া। এপারে পাটনা ঠিক উল্টোদিকে সারণ। লঞ্চ থেকে নেমে চলতে শুরু করে দিলাম। অগণিত জনতার স্রোত পিল পিল করে চলেছে। ছেলে-মেয়ে-বুড়ো সকলেরই গতি মেলামুখো। সবার এক উদ্দেশ্য। স্নান আর হরিহরনাথ দর্শন। আগামীকাল পূর্ণিমা। কার্ত্তিক পূর্ণিমা। ঠিক যেখানটায় নামলাম তার একটু আগেই গঙ্গার সঙ্গে এসে মিলেছে গণ্ডক। এখান থেকেই শুরু মহাক্ষেত্রের।

আমাদের ধর্মশাস্ত্রে হরিহরক্ষেত্রকে মহাক্ষেত্রের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। এখানে হরি আর হরের মূর্ত্তি ও মন্দির আছে। এই জন্যেই এ বিরাট বিস্তৃত ভূখণ্ডের নাম হরিহরক্ষেত্র।

এই মহাক্ষেত্র সংজ্ঞা পাওয়ার পিছনে সুন্দর একটি কাহিনী পদ্মপুরাণ ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে আছে। অতি প্রাচীনকালে মহর্ষি দেবশিরা নামক একজন মুনি গঙ্গার তীরে তপস্যা শুরু করেছিলেন। তাঁর উগ্র তপস্যা দেখে দেবরাজ ইন্দ্রের আসন টলে উঠল। তিনি শংকিত হলেন মনে মনে। মুনির তপস্যা ভাঙবার জন্যে মঞ্জুঘোষা (আধুনিকীকরণ মঞ্জু ঘোষ!) নামে একজন পরমা সুন্দরী, যৌবনমদে মত্তা অপ্সরাকে পাঠালেন। মঞ্জুঘোষা তার তূণের সব অস্ত্রই একে একে প্রয়োগ করে। কিন্তু সব বিফল। মুনি একেবারে হিমালয়ের মতো অটল। তবে অপ্সরার ছলা কলায় মুনির কিছুটা চিত্তচাঞ্চল্য ঘটল। মুনি ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করেই রেগে অগ্নিশর্মা। তিনি অপ্সরাকে অভিসম্পাত দিলেন—তুই তরঙ্গিণী নদী হয়ে যা।

অপ্সরা বিপদ দেখে শাপমুক্তির জন্যে অনুনয় বিনয় শুরু করল। মুনি কিছুটা নরম হয়ে বললেন—তুই নদী হলেও খুব পবিত্রবতী হবি। লোকের মনে তোর সম্বন্ধে যথেষ্ট ভক্তিভাব থাকবে। তোর গর্ভে ভগবান বিষ্ণু বাস করবেন। শালগ্রাম শিলারূপে তিনি তোর গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসবেন এইজন্যে তোর নাম হবে শালগ্রামী......। এই শালগ্রামীর উত্তর আর হিমালয়ের দক্ষিণ দিকের বিশাল বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডই মহাক্ষেত্র। শালগ্রামী বা গণ্ডক হরিহরের মন্দির থেকে কিছুদূরে এসে পতিতপাবনী গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে। সঙ্গমক্ষেত্র হওয়ার জন্যে এই মহাক্ষেত্রের মূল্য আরও বেড়ে গেছে। এই মহাক্ষেত্রে পুজো, স্নান ও দান সব পাপ নাশ করে এবং সকল মনস্কামনা পূর্ণ করে।

বালুর বিস্তৃত মরুভূমি পেরিয়ে মেলার দিকে এগোতে শুরু করলাম। কিন্তু বিপদ হলো কিছুদূর গিয়ে। সামনেই একটি নাতিদীর্ঘ খাল। জল প্রায় কোমর সমান। মুস্কিলে পড়লাম। কি করে পার হওয়া যায় এই বৈতরণী? সঙ্গের সকলেই দেখলাম চটপট লুঙ্গি বার করে পরছে। আমার সঙ্গে সে সবের কোন বালাই নেই। শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে ভাবছি কি করা যায়। পিছন থেকে এসে বন্ধুবর প্রশান্ত পিঠে হাত রাখল— আরে ঘাবড়াচ্ছ কেন? এস আমার কাঁধে ওঠ—দিব্যি পার হয়ে যাব।

প্রশান্তকে আমরা বন্ধুবান্ধবরা গুরু বলে ডাকি। ওর কথা শুনে ভাবলাম লোকটা বলে কি, জ্যান্তই আমায় কাঁধে তুলবে। বললাম—না গুরু এখন ওটা থাক। যখন সময় হবে তখন আর কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে না। স্বচ্ছন্দে তোমার কাঁধে উঠে অন্তিম যাত্রা করব।

দলের অন্যান্যরা হাসল। গুরু তাড়া দিল—ওসব দার্শনিক মন্তব্য ছেড়ে কাঁধে ওঠ, নইলে পড়ে থাকবে।

সত্যিই হয় ভিজে যেতে হবে নইলে পড়ে থাকতে হবে। শেষ পর্যন্ত তাই করলাম। একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। হাসির দমকা লহর ছড়িয়ে পড়ল। যাত্রীদের মধ্যে অনেক মহিলাও ছিল। হাসিটা তাদের মধ্যেই বেশী। অথচ তারাই হাঁটুর অনেকখানি ওপরে স্বচ্ছন্দে শাড়ী তুলে দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে। কোন লজ্জা নেই, নেই কোন আড়ষ্টতা। তারা যাদের কল্যাণে পার্শ্বসঙ্গিনী তাদের এই অবস্থা দেখে আমারও হাসি পেল।

হে'টে মেলায় পেশছতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। বন্ধুদের মুখে শুনেছিলাম মেলার প্রধান পরিচয় তিন 'ধ' দিয়ে। ধুরি, ধুঁয়া আর ধাক্কা। ধুরি অর্থাৎ ধুলোর সাক্ষাৎ পেয়েছি মেলায় পেশছাবার কিছু আগেই। অগণিত মানুষের চলার তালে আকাশে ধুলোর বৃষ্টি। আর এখন মেলায় ঢুকবার মুখেই দ্বিতীয়টির সাক্ষাৎ পেলাম। প্রচুর ধোঁয়া। চোখ, নাক-মুখ জনালা করে ওঠে। যে যেখানে পেরেছে ই'ট বা মাটির ঢেলা বিছিয়ে রান্নার ব্যবস্থা করছে। আর আছে শীতের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যে অগ্নিকুণ্ডলীর ব্যবস্থা। ধুলো আর ধোঁয়া আর লক্ষ লক্ষ কণ্ঠের হট্টগোল—এইসব মিলে চারদিকে একেবারে গুলজার। ধাক্কার সঙ্গে পরিচিত হতে একটু দেরীই হয়েছিল। পরের দিন ভোরে স্নানের সময় দেখেছিলাম ভীড় বা ধাক্কার অবস্থা ...। যাক সে কথা। মেলায় ঢুকে বাবা হরিহরনাথের মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। প্রচুর ভীড়। সকলেই রাতের মতো ঠাঁই করে নিতে ব্যস্ত।

হরিহরক্ষেত্র আরও একটি কারণের জন্যে ধর্মপ্রাণ নরনারীর কাছে আকর্ষণীয় স্থান। হরিহরনাথের ঠিক সামনাসামনি। শালগ্রামীর অপর পারে কোনহারা ঘাট। এই ঘাটেই হস্তী আর কুমীরের বিখ্যাত যুদ্ধ হয়েছিল। পরাজিত হস্তীপুঙ্গবকে বাঁচাবার জন্যে স্বয়ং বিষ্ণু এখানে অবতরণ করেছিলেন বলে প্রচলিত।

হস্তী ও কুমীরে জন্ম বৃত্তান্তের ইতিহাস বিভিন্ন। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী যেটা প্রচলিত সেটা এই—শ্বেত দ্বীপের সরোবরে শ্রীদেব মুনি স্নান করছিলেন। হাহা নামক এক গন্ধর্ব ঐ একই সময়ে ঐ সরোবরে স্নান করছিল। কৌতুকপ্রিয় ঐ গন্ধর্ব জলের ভিতর দিয়ে গিয়ে শ্রীদেব মুনির পা জড়িয়ে ধরে। মুনি প্রচণ্ড রেগে গিয়ে হাহাকে কুমীরে পরিণত হবার অভিশাপ দিলেন। তখুনি হাহা কুমীর হয়ে সেই সরোবরের জলে বাস করতে লাগল।

হস্তীর উৎপত্তি কাহিনীও কৌতূহলজনক। ইন্দ্রবদন রাজা রাজ্যপাট ছেড়ে দিয়ে গুহায় আশ্রয় নিলেন। সেখানে মৌনব্রত অবলম্বন করে কাল কাটাতে লাগলেন। একদিন শ্রীঅগস্ত্য মুনি দয়া করে সেখানে এলেন। কিন্তু মৌনব্রতধারী রাজা মুনির উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করলেন না। মুনি অপমানিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশম্পাতে রাজাকে গজে পরিণত করলেন।

কথিত আছে যে এই যুদ্ধ এক হাজার বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল।

আজ যে জায়গায় এশিয়ার এই বৃহত্তম পশু মেলা বসে, আগে কিন্তু সেখানে বসত না। ইতিহাসের পুরনো পাতা ঘে'টে প্রায় ৩০০ বছর আগের নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু কোন নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি এ ব্যাপারে।

হরিহরনাথের মন্দির
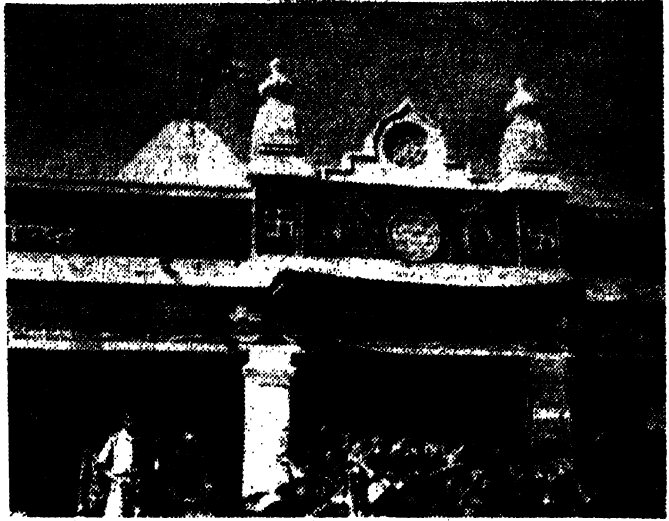
সোনপুরের প্ল্যাটফরম পৃথিবীর দীর্ঘতম। ২৩০০ ফুট লম্বা। ছেলেবেলায় সাধারণ জ্ঞানের বইয়ে পড়ে এই লম্বা প্ল্যাটফর্ম সম্বন্ধে মনের মধ্যে কত রোমাঞ্চই না জাগত। আজ সোনপুর প্ল্যাটফর্মের সেই কৌলিন্যও ক্ষুণ্ণ। সুইডেনের স্টরভিক্ রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘতম।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রায় সব দেশেই আবহমান কাল থেকে মেলার প্রচলন। এক সময় ছিল যখন সোনপুরের মেলা বৃহত্তম পশুমেলা বলে পরিগণিত হত। আজ এই মেলা এশিয়ার বৃহত্তম হলেও পৃথিবীর মধ্যে এর স্থান হয় ২য় বৃহত্তম হিসেবে। রাশিয়ার নিজ্‌নি নোভোগরোড-এ একটি পশু মেলা হয় যার বৃহদায়তন সম্বন্ধে সকলেই একমত।

আজকের রাত পোহালেই আগামী ভোর কার্তিক পূর্ণিমার ভোর। এই পুণ্য দিনে মেলায় আগত লক্ষ লক্ষ যাত্রী এই মহাক্ষেত্রে স্নান করে পুণ্য অর্জন করবে। ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষের অনেক জায়গা থেকে পুণ্যার্থীর সমাগম হয়েছে। চারদিক থেকে যে তাদের আগমন এখনও অব্যাহত রয়েছে তা টের পাওয়া যাচ্ছে।

খিদে পেয়েছিল প্রচণ্ড। ঘুরতে ঘুরতে কিছু খাবারের দোকানের সন্ধান পেলাম। তার আগে সরকারী লোকদের হাত এড়াতে অনেক কথা ব্যয় করতে হয়েছে। মেলায় আগত যাত্রীদের কলেরার ইঞ্জেকশান দেয়া হচ্ছে। সাবধানতা অবলম্বন। ভাল ব্যবস্থা। ওদের হাত থেকে বেঁচে এসে খাবারের দোকানের সামনে পাতা বেঞ্চে বসলাম। এখানটা দেখলে কেউ বলবে না যে এটা মেলা। একেবারে জমজমাট অবস্থা। আলোর ঝলকানিতে চারদিক ফুটফুট। সবই অস্থায়ী হোটেল-রেস্টুরেন্ট। প্রচুর হাঁক-ডাক সবার। সব কিছুই পাওয়া যায়। আমাদের গুরু প্রশান্ত গরম পুরীর অর্ডার দিল।

দোকানে আরও লোকজন ছিল। তাদের কথাবার্তা কানে আসছিল। ওরা গ্রাম্য হিন্দীতেই মেলা সম্বন্ধে আলোচনা করছিল।

●

একজনের আক্ষেপ—সুখা বা ভারী বর্ষা হলে তার ছাপ মেলায় পড়ে।

অন্যজন—এবার ঠিক সুখা না হলেও পানী এত কম হয়েছে যে প্রায় আকালের অবস্থা।

তৃতীয়জন—সে জন্যে হাতে পয়সা নেই কারও। ভেবেছিলাম একটা ভাল ভৈ'স (মোষ) কিনব কিন্তু...

কথাগুলো ঠিক। প্রকৃতির অঢেল জল বা অকারণ রুক্ষতা দেশের মানুষের কাছে এক অভিশাপ। এই অবস্থার ছাপ সোনপুরে মেলায়ও পড়ে। কারণ এই মেলার আর্থিক ও সামাজিক গুরুত্ব এই এলাকার মানুষের কাছে অপরিসীম। কেনা-বেচা, মেলামেশার যে অবাধ সুবিধা তাতে নিজেদের আর্থিক কাঠামোটাকে খানিক সতেজ করার সুযোগ ঘটে বছরের এই সময়টায়।

আগেকার মেলার সেই প্রাচীন রূপ আর নেই। সেই গ্রাম্য সরলতা, ধর্মভীরু মানুষের আন্তরিকতা, অগোছাল ভাব—এসব আজ অদৃশ্য। তার বদলে শহুরে সমস্ত কিছুই মেলায় উপস্থিত। ভাল রাস্তা, বৈদ্যুতিক আলো, কলের জল, হাসপাতাল, থানা-পুলিশ, সিনেমা, থিয়েটার, হোটেল ইত্যাদি ইত্যাদি সব আধুনিক নাগরিক সুবিধেগুলো আজকের মেলায় উপস্থিত। বারবধূদের তাঁবুও অনেক। তারা আসে মুজফ্‌ফরপুর, বেনারস ও লক্ষ্ণৌ থেকে। সব মিলে আজ সোনপুর মেলায় এক পরিবর্তিত আধুনিক রূপ।

খাওয়া দাওয়ার পর ঘুরে ঘুরে সব দেখতে শুরু করলাম। আলোয় ঝলমল করছে মেলার মধ্যাঙ্গন। সরকারী প্রদর্শনী প্রাঙ্গণ। বড় বড় দেশী বিদেশী প্রতিষ্ঠান-গুলোর মণ্ডপ সজ্জা মনোহারী। অধিকাংশই কৃষি সম্বন্ধীয়। কুটির শিল্পের

সোনপুরের পশুর মেলা

স্টলও প্রচুর। সমস্ত রকমের জিনিস সাজিয়ে বসেছে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের দোকানীরা। জায়গায় জায়গায় মেয়েরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে লোকগীতি গাইছে। আকাশ ঘোলাটে। শীত ক্রমশঃ বাড়ছে। রাতও। এই সমস্ত দোকানপাট ছেড়ে মেলার বিস্তৃতির দিকে গেলেই দেখা যায় পশুদের রাজ্য। গরু, ঘোড়া, মোষ, হাতী প্রচুর এসেছে। একজন অভিজ্ঞ কৃষকের মতে এসবের মিলিত সংখ্যা প্রায় ২০,০০০ হবে। মেলা শুরু হবার অনেক আগে থেকেই এসব জন্তু জানোয়ার আসতে শুরু করে। পাখীর বৈচিত্র্যও কম নয়। কিচির মিচিরের বিচিত্র শব্দ হচ্ছে। দেখলাম এই রাত্তিরেও সদ্যজাত ছোট ছোট হাতীর বাচ্চাদের ঘিরে জনতার ভীড়। এসব এসেছে আসাম থেকে। কিছু উটও চোখে পড়ল। বলদ ও ষাঁড় এসেছে বেশীর ভাগ পাঞ্জাব ও হরিয়ানা থেকে। এগুলোর জাত ভাল। এবার মেলায় বাংলাদেশের কিছু কিনতে ইচ্ছুক ব্যক্তির দেখা পেলাম। মুক্তি সংগ্রামের সময় যে বিপুল ক্ষতি বর্বররা করে গেছে তার মধ্যে থেকে ষাঁড় ও বলদও বাদ যায়নি। সেই ক্ষতি পূরণের জন্যে মেলা থেকে কিছু বলদ ও ষাঁড় কিনে নিয়ে যেতে এসেছে সব। ওদের বেশ খুশী খুশী দেখলাম। বহুদিন পর আবার স্বাধীনভাবে নির্ভাবনায় স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়ে ভারতে আসতে পারার জন্যেই সম্ভবতঃ এই খুশীর ভাব।

জমিদারী প্রথা বিলোপের পর বছর কয়েক হাতী বিক্রীর পরিমাণ কমে গিয়েছিল। জমিদারদের সেই ঐশ্বর্যে ভাটা পড়ায় এই বিলাসটিও ত্যাগ করতে হয়েছে। তবে দুর্গম রাস্তায় হাতী এখনও উত্তম সওয়ারী। সেই জন্যে বিহার ও উত্তর প্রদেশে হাতীর চাহিদা এখনও কিছু রয়েছে। তাছাড়া গ্রামে এখনও এমন কিছু ধনীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যারা নিজেদের সদরে হাতী বেঁধে রাখাকে নিজেদের আভিজাত্য, মর্যাদা ও ঐশ্বর্যের প্রতীক বলে মনে করে।

পশু পাখীর বিরাট চত্বর ঘুরে আবার মেলার জমাট অংশে ফিরে এলাম। ক্লান্তিবোধ হচ্ছিল। রাতও হয়েছে প্রায় পৌনে এগারটা।

গুরু প্রশান্ত বললো—চল 'নৌটঙ্কী' দেখি, সময় কেটে যাবে।

'নৌটঙ্কী' সম্বন্ধে আগেই শুনেছিলাম যে, বাংলার আদি যাত্রা বা মহারাষ্ট্রের তামাসার মতোই এই লোক বিনোদনের ব্যাপারটি। তবে স্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না। কৌতূহল ছিলই। বললাম—চল।

বিরাট তাঁবু। হাজার খানেক মহিলা-পুরুষ টিকিট কেটে তামাসা দেখতে ঢুকেছে। যাত্রার ঢঙে ঢোল, নাকাড়া ইত্যাদি বাজিয়েরা বাইরে বসে উচ্চগ্রামের মিউজিক দিচ্ছে। গোটা কয়েক ফ্লাড লাইট। মাঝে মধ্যে বিভিন্ন রঙের সেলোফেন পেপার দিয়ে নাটকীয় মুড সৃষ্টির ব্যবস্থা। স্টেজের পর্দা ওঠার পর শুরু হলো অভিনয়। লয়লা-মজনুর বিখ্যাত প্রেম উপাখ্যান। উচ্চগ্রামের অতি নাটকীয় অভিনয়। পোষাক জমকালো। মেয়েদের ভূমিকা মেয়েরাই করছে। প্রতি দৃশ্যের শেষে অশ্লীল নাচ ও গান পরিবেশিত হচ্ছিল।

রাত ক্রমশঃ গভীর হয়। ভেবেছিলাম বাকী রাতটুকু ওখানে শুয়েই কাটিয়ে দেব। কিন্তু তা হলো না। শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বার করে দিল। তারপর শুরু হলো আমাদের নিজেদের শোবার জায়গা খোঁজার পালা। রাত তখন দুটো। আর কিছু না হোক মাথার ওপর একটা ঢাকনা চাই। নইলে ঘুমোলে শীতে ঠাণ্ডা লেগে কেলেঙ্কারী হবে। নেই, নেই, ঠাঁই নেই—সর্বত্র এক অবস্থা। কোথাও ফ্লুরোসেন্ট আলোও নিবে গেছে। বাকী আলোগুলো নিঃসঙ্গ। চারদিক নীরব। লক্ষ লক্ষ মানুষ কাঁথা কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে আছে। অধিকাংশের মাথার ওপর কোন রকম আচ্ছাদন নেই। তেমন করে কান পাতলে বোধ হয় এই ঘুমন্ত মানুষের গভীর ঘুমের শ্বাস প্রশ্বাসের আওয়াজ শুনতে পাওয়া যাবে।

অনেক খুঁজতে খুঁজতে ধৈর্যের শেষ সীমানায় এসে শেষ পর্যন্ত একটা মাটির দেয়ালের পাশে কিছুটা জায়গা পাওয়া গেল। মাটি দেখলাম বেশ গরম। চারদিকে ছাই ছড়িয়ে আছে—ছাই ঘেঁটে দেখলাম, আগুন নেই। বুঝলাম সন্ধ্যেবেলা কেউ রান্না করেছিল। এখনও বেশ তাপ আছে। দাঁড়াতে বেশ ভাল লাগছে।

প্রশান্ত তার কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে চটপট সতরঞ্চি বিছিয়ে বললো—শুয়ে পড়।

ইতস্ততঃ করছিলাম। এ ধরনের কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। গুরু আবার তাড়া দিল—দেরী করো না, লম্বা হও।

শুয়ে পড়লাম। একটা কম্বল খুলে দুজনে আপাদমস্তক মুড়ি দিলাম। অন্য সবাই দলছুট হয়ে কোথায় আছে কে জানে।

সারাদিনের ঘোরাঘুরি আর অবসাদ—ঘুম আসতে দেরী হলো না। ঘুমিয়ে যেন স্বপ্ন দেখলাম—অনেক দিনের ইচ্ছা পূরণ করতে মেলায় এসেছি। দেখে শুনে ভাল লাগছিল। শেষে সারাদিন ঘুরে ফিরে রাত্তিরে একজায়গায় শুয়ে পড়েছি। ভাল ঘুম হচ্ছে না। কারণ পাশেই একজন বুড়ো লোক শুয়ে অনবরত কেশে চলেছে। সে কি অমানুষিক পাঁজর-ভাঙ্গা কাশি......

একটা দূরাগত সমুদ্র কোলাহলে ঘুম ভেঙ্গে গেল। হকচকিয়ে উঠে বসে পরিবেশটার সঙ্গে পরিচিত হতে বেশ কিছুটা সময় লাগল। তখনও ভাল করে আলো ফোটেনি। মাইক বাজতে শুরু করে দিয়েছে। আর অগণিত জনস্রোত চলেছে স্নান করতে। তাদেরই কথাবার্তার রেশ খোলা আকাশের নীচে বিস্তৃত মাঠের বুকে ছড়িয়ে যাচ্ছে। আজই সেই পুণ্য তিথি। কার্তিক পূর্ণিমা। ব্রাহ্ম মুহূর্তে স্নান সেরে হরিহর দর্শন। তারপর মেলা দেখা...

প্রশান্তর ঘুমও ভেঙ্গে গিয়েছিল। উঠে বসে চারদিক একবার দেখে নিয়েই সব কিছু গুটিয়ে নিল। দূরে বিজলী বাতির আলো এসে পাশের দেয়ালটায় পড়েছে। এতক্ষণে পাশের ভাঙ্গাচোরা বুড়ো লোকটাকে দেখলাম। মাঝে মধ্যে কাশছে। কিছু জিনিষপত্র নিয়ে পসরা সাজাতে ব্যস্ত। টুকিটাকি শিশি আর প্যাকেট। ভোরের তো আর দেরী নেই। স্নানশেষে নিশ্চয়ই গ্রাহক পাওয়া যাবে। এখন কাশি হলেও সেই অমানুষিক দম-বন্ধ করা অবস্থা নেই। তাহলে স্বপ্ন নয় ঘুম আর জাগরণের মধ্যে এরই কাশি শুনছিলাম। সেই সময় দেয়ালের গায়ে লেখাগুলোর নজর পড়তেই বুকের মধ্যে একটা অজানা ব্যথা অনুভব করলাম—। হিন্দীতে কাশি ও হাঁফানীর অব্যর্থ স্বপ্নদত্ত ওষুধের বিজ্ঞাপন দিয়েছে লোকটা। অথচ......

মনটা ভার হয়ে গেল।

এগোলাম আমরাও। জানি না এই পাপপুণ্যের ঘাটে কার ভাগ্যে কতটা পাপ আর কার কপালে কতখানি পুণ্য...। সূর্য তখন আরও একটু মাথা তুলেছে ...।

ঠগিনী / পরিচালনা : তরুণ মজুমদার। সন্ধ্যা রায় এবং অনুপকুমার। ফটো : অমৃত

বাংলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষ্যে

আমরা বাঙালী—এই কথাটিই আমরা আর একবার প্রমাণিত করলুম বাংলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষ্যে। আমরা নিশ্চয় জানি, ১৯৭২-এর ৭ ডিসেম্বর তারিখটি আমাদের জীবনে একদিনই এসেছিল এবং হাজার মাথা খুঁড়লেও আর ফিরে আসবে না। আমরা এও জানি, যেহেতু ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৭ ডিসেম্বরে আমাদের এই বঙ্গভূমে প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়টি ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, সেই কারণে বাংলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষপূর্তি উৎসবটি সগৌরবে সাড়ম্বরে সমগ্র বাঙালী জাতি কর্তৃক পালিত হবার দিন ছিল গেল বৃহস্পতিবার, ৭ ডিসেম্বর, ১৯৭২। কিন্তু যেভাবে সেদিন এই জাতীয় উৎসবটি পালিত হয়েছে, তা স্থিরচিত্তে স্মরণ করলে ধিক্কার জন্মায় গোটা বাঙালী জাতটার ওপর। এ-ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে টানাটানি করে লাভ নেই। কারণ আমরা জানি, বাঙালীর ব্যাপারে তাঁদের

টনক নড়ে না। কিন্তু আমাদের জনপ্রিয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার? এতো বড়ো একটা জাতীয় ঘটনাতে তাঁদেরই কি অগ্রণী হয়ে এই উৎসবটিকে জাতীয় মর্যাদার সঙ্গে পালন করা উচিত ছিল না? বাংলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চ তো বাঙালীমাত্রেরই আদরের জিনিস। এবং বাঙালীর সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে বাংলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের দান কৃতজ্ঞচিত্তে যে স্মরণীয়, এ-কথাও অনস্বীকার্য। কিন্তু, কৈ? 'বাংলা সাধারণ নাট্যশালা শতবর্ষপূর্তি উৎসব সমিতি'কে এককালীন ১৫,০০০ টাকা সাহায্যদান করেই কি তাঁরা তাঁদের কর্তব্য সমাধা করলেন? রাজ্য সরকারের কি একবারও মনে হল না, বাঙালীর জাতীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের এতো বড়ো একটা ঘটনাকে এইভাবে উপেক্ষা করলে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে তাঁরা নিন্দাভাজন হবেন? উৎসব সমিতি জোড়াসাঁকোর মধুসূদন সান্যালের (বর্তমানে মল্লিকভবন) বাড়ীতে যে-উৎসব অনুষ্ঠান করেছিলেন, তাতে রাজ্য সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর প্রধান অতিথিরূপে যোগ দেবার কথা ছিল। কিন্তু সেইদিন বৈকাল এবং সন্ধ্যায় অন্য দুটি অনুষ্ঠানে তাঁকে দেখতে পাওয়া গেলেও আসল জায়গায় তিনি অনুপস্থিত ছিলেন কেন, এ-প্রশ্নের সদুত্তর আমরা তাঁর কাছ থেকে পেতে চাই।

মল্লিক ভবনের অনুষ্ঠানটি হয়েছিল যাকে বলে দুঃখিনীর দুর্গোৎসব। এতো বড়ো একটা উৎসব উপলক্ষ্যে মল্লিকভবন ছিল নিরাভরণ—না ছিল ফুলসাজ, না ছিল আলোকসজ্জা। মাত্র দ্বারদেশের ওপরে টাঙানো ছিল একটি সাদা কাপড়ের ওপর লাল লেখা ফেস্টুন : বাংলা সাধারণ নাট্যশালা শতবর্ষপূর্তি উৎসব সমিতি। ভিতরে প্রবেশ করে আর একটি আশাভঙ্গের পালা। কোথায় সেই পূর্বতন সান্যালভবনের প্রশস্ত অঙ্গন, একশো বছর আগেই যার মাসিক ভাড়া সাব্যস্ত হয়েছিল ৪০ টাকা। বর্তমানের মল্লিকভবন যে কয়েকটি অংশে বিভক্ত হয়ে গেছে, বাইরেটা দেখে তা বোঝবার উপায় নেই। তাই সেই বিস্তৃত উঠানের একটি টুকরায়—সম্ভবত সিকি অংশে—অনুষ্ঠানের আসর বিছানো হয়েছিল। উদ্বোধক তুষারকান্তি ঘোষ সুদূর দেওঘর থেকে এসে উপস্থিত হলেও বিজ্ঞাপিত সভাপতি নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী ও প্রধান অতিথি রাজ্যশিক্ষামন্ত্রী মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়—এই দুজনের কেউই শেষপর্যন্ত হাজির হননি এবং তাঁদের পরিবর্তে ঐ দুই পদে বরণ করা হয় যথাক্রমে সমিতির কার্যকরী সভাপতি মন্মথ রায় ও প্রথিতযশা সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়কে। একশোটি দীপের প্রথমটিকে প্রজ্বলিত করে শ্রীঘোষ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। এবং যথারীতি উদ্বোধক, প্রধান অতিথি সভাপতি ও সরযূবালার ভাষণের সঙ্গেই অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

বাংলা রঙ্গমঞ্চকে যাঁরা ভালোবাসেন, এমন কিছু সংখ্যক সজ্জন ব্যক্তি এই ক্ষুদ্র সভাস্থলে নিশ্চয়ই উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ভেবে অবাক হই, একটি 'রবীন্দ্রসদন'-এর শিলান্যাস বা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এই কলকাতা শহরে যদি ন্যূনকল্পে চার-পাঁচ হাজার লোকের সমাগম সম্ভব হয়, তাহলে বাঙালীর এই জাতীয় অনুষ্ঠানে কি রকম জনসমাগমই বা হওয়া উচিত ছিল এবং কি রকম আড়ম্বরের সঙ্গে তা সম্পন্ন হওয়ার প্রয়োজন ছিল! পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমগ্র নাট্যজগৎ ও বাঙালী সমাজকে শরিক করে যদি এই অনুষ্ঠানে উদ্যোগী হতেন, তাহলে দেখা যেত, বিবেকানন্দ রোডের সংযোগস্থল থেকে বিডন স্ট্রীটের সংযোগস্থল পর্যন্ত বিস্তৃত রবীন্দ্র সরণিতে অন্ততপক্ষে দু-তিন ঘণ্টার জন্য যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দিয়ে ঐ মল্লিকভবনের সামনের রাজপথে জনাকীর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে ঐ পুণ্য দিনটিকে স্মরণ করে এবং সেখানে সমবেত হয়েছেন ভারতের রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে সমগ্র ভারতের তাবৎ মনীষীবর্গ। দেখতে পেতুম, ঐদিন সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে, সমস্ত সাধারণ রঙ্গালয় সেদিন বন্ধ, দলে দলে মঞ্চশিল্পীরা সমবেত হচ্ছেন ঐ মল্লিকভবনে তাঁদের প্রাণের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে। ময়দানে বা অন্য কোনো বিস্তৃত ভূখণ্ডে আয়োজিত হয়েছে বাঙালীর নাট্যপ্রচেষ্টা সম্পর্কে একটি বিরাট প্রদর্শনী।—কিন্তু না, তার কিছুই হয়নি। বরং 'বাংলা সাধারণ নাট্যশালা শতবর্ষপূর্তি উৎসব সমিতি'র সাধারণ সম্পাদকরূপে অমর গাঙ্গুলী নামে ভদ্রলোকটি গেল এক বছরের ওপর ধরে যা-কিছু আয়োজন করবার প্রয়াস পেয়েছেন, তার প্রতি পদেই পেয়েছেন দুরন্ত বাধা। শেষপর্যন্ত রাজ্য সরকারের কাছ থেকেও এমন অনতিক্রম্য বাধা এসে উপস্থিত হল চরম মুহূর্তে যে, কলকাতা ময়দানে গান্ধী-মূর্তির দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে একমাসব্যাপী যে নাট্যোৎসব করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল, তাও বোধ করি ভেস্তে যাবার উপক্রম হয়েছে। দেখতে পাচ্ছি, ভদ্রলোক অমর গাঙ্গুলীর একমাত্র অপরাধ, যখন তিনি দেখলেন, সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে কেউই কিছু করতে অগ্রসর হচ্ছেন না, তখন তিনি এগিয়ে এসেছিলেন সাধ্যমত যা-হোক কিছু করবার জন্যে। তাঁর উৎসব সমিতির চিঠিতে অন্তত এমন পঞ্চাশটি নাম ছাপা দেখেছি, যাঁরা এক হয়ে কাজ করলে শুধু পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন, কেন্দ্রীয় সরকারকে পর্যন্ত এই উৎসবানুষ্ঠানের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পারতেন। নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী এই সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন এবং তাঁরই বাড়ীতে

মল্লিক ভবনে অনুষ্ঠিত 'নীলদর্পণ'-এ ক্ষেত্রমণি ও রোগ সাহেবের ভূমিকায় গঙ্গোপাধ্যায় [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুব্রত মুখোপাধ্যায়

ছিল সমিতির প্রধান কার্যালয়। তবু এই সমিতি সমগ্র বাঙালী জাতির সহযোগিতা আকর্ষণ করবার পরিবর্তে বহু প্রভাবশালী ব্যক্তির বিরুদ্ধবাদিতার পাত্র হয়ে পড়ল কেন, এ-প্রশ্ন আমাদের মনে স্বভাবতই জাগছে।

কিন্তু এই শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পালন করা তো আমাদের জাতীয় কর্তব্য ছিল। এই অনুষ্ঠানের চেয়ে ত' সমিতি বড়ো নয়। অমৃতলাল বলেছিলেন : ভারত যদি স্বাধীন হয়, তো আমার দ্বারাই হোক, নইলে ভারত রসাতলে যাক।—এও তো সেই বৃত্তান্ত। আমাদের কি বুঝতে হবে, বর্তমান যুগের বাঙালীর কাছে বাংলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষপূর্তির ব্যাপারটার কোনো মূল্য নেই? শেক্‌সপীয়ারের জন্মের চারশো বছর পূর্তি উৎসব ইংরেজরা সারা জগৎ জুড়ে কিভাবে পালন করেছিল, সে-কথা কি আমরা এত শিগ্‌গীরই ভুলে গেছি? স্টেট্‌সম্যান পত্রিকায় (২৫।২৬ নভেম্বর) প্রথম পাতায় একশো বছর আগে বাংলার সাধারণ রঙ্গালয় এই বাড়ীতেই খোলা হয়েছিল বলে 'মল্লিকভবন'-এর যে-ছবি প্রকাশিত হয়েছিল, তা দেখে লণ্ডন থেকে কৌতূহল প্রকাশ করে পত্র এসেছিল এখানে, এ-খবরটুকু শুনলে বহু পাঠকেরই বিস্ময়ের অন্ত থাকবে না এই ভেবে যে, আমরা নিজেরা যখন নিজেদের ঐতিহ্য সম্বন্ধে আদৌ আগ্রহী নই, ইংলণ্ডের লোকেরা তখন আমাদের নাট্যশালার ঐতিহ্য নিয়ে এই কৌতূহল প্রকাশ করে কেন?—সাধে কি বঙ্কিমচন্দ্র লি[illegible]ছেন : বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি!

চিত্র-সমালোচনা

জবান (বাংলা)

ইংরেজীতে যাকে বলে 'ওয়ার্ড অফ অনার' বাংলায় তাকেই বলি—জবান, না, বাংলায় নয়, ফার্সিতে বলি জবান। অবশ্য কথাটা বাংলা অভিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

মুক্ত প্রোডাকসন্স নিবেদিত 'জবান' ছবির কাহিনীর নায়ক কিনু জবান দিয়েছিল দুজনকে। এক, সে তার বিধবা মাকে কথা দিয়েছিল : সে তার বাপ-চোদ্দ-পুরুষের ভিটে ছেড়ে কোনোদিন কোথাও যাবে না। এবং দুই, সে তার প্রতিবেশী কন্যা লক্ষ্মীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তাকে বিবাহ করবে বলে। কিন্তু এই দুই প্রতিশ্রুতি রাখতে গিয়ে তাকে পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিতে হয়েছে, কারণ, ঘটনাচক্রে সে হয়ে পড়েছিল সমাজদ্রোহী। কি সেই ঘটনাচক্র, কেন সে তার ভালোবাসার সামগ্রী লক্ষ্মী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, ধনী, লম্পট প্রাণেশ রায় কেমনভাবে লক্ষ্মীকে নিজের বাগানবাড়িতে তুললেন, এসব বৃত্তান্ত ছবিতেই দেখা ভালো।

অত্যন্ত দুর্বল কাহিনী দুর্বলতর চিত্রনাট্যের মাধ্যমে ছবির পর্দায় তুলে ধরা হয়েছে। লক্ষ্মীর মামা অর্থের লোভে নিজের ভাগ্নীকে এক লম্পটের হাতে তুলে দিলেন, এও যেমন এক অবিশ্বাস্য ঘটনা, প্রাণেশ রায়কে হত্যা করবার পরে ছুটে পালাতে পালাতে কিনু সহসা এসে পড়ল এক সমাজদ্রোহীদের আড্ডায়, তাও তেমনই হাস্যকরভাবে অবিশ্বাস্য।

কাজেই ধর্মেন্দ্র, অমিতাভ বচ্চন, শত্রুঘ্ন সিংহ, সোনিয়া সাহানী প্রভৃতি বোম্বাইয়ের নামকরা শিল্পীর অতিথিরূপে ছবিতে অবতরণ এবং রাখী সাল্‌জার বাংলা ছবির নায়িকাবেশে প্রথম আবির্ভাব 'জবান' ছবির কাহিনীগত দুর্বলতাকে আদৌ ঢেকে দিতে পারেনি। না, সমিত ভঞ্জ, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিন্ময় রায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ রায় এবং আরও বহু শিল্পী-সমন্বয়ে গঠিত ছবিটি কোনোদিক দিয়েই আমাদের মনকে আকর্ষণ করতে পারেনি আদৌ।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজও সবিশেষ প্রশংসনীয় নয়। এমনকি পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুধীন দাশগুপ্ত রচিত ও শেষোক্তজনের সুরারোপিত গান চারখানিও ছবির আকর্ষণ হয়ে উঠতে পারেনি।

ছবির সমস্ত পরিস্থিতিই যেন ঘটেছে অকারণ পুলকে। অতএব...

হালচাল (হিন্দী)

ও, পি, রালহান পরিচালিত ও প্রযোজিত ইস্টম্যানকলারে নির্মীত ছবি 'হালচাল' একটি অর্জনবভাবে উপভোগ্য ছবি। ও, পি, রালহান ও সি জে পাভ্‌রি

দ্বারা মন্দকাজের 'উদ্বিগ্নতা' ক্রান্তিবিন্দুটিকে যথার্থই 'চায়ের পেয়ালায় তুফান' আখ্যায় ভূষিত করা যায়। পিটার নামে একজন শ্রমিক এক লোহ-নির্মিত সাঁকোর নীচে কাজের ফাঁকে টিফিন খেতে খেতে শুনতে পেল—এক পুরুষকণ্ঠ এক রোমান্সময়ী নারীকে বলছে : দুদিন সবুর কর, স্ত্রীকে হত্যা করবার পরেই তোমাকেই করব মিসেস মহেশ জেটলি। রইল পিটারের টিফিন খাওয়া। তাড়াতাড়ি পোলের ওপরে উঠে সে দেখল—একজোড়া পুরুষ-স্ত্রী মোটরকারে উঠে চলে গেল। সে দ্রুত গেল টেলিফোন-বুথে। ডাইরেক্টরীতে দেখল : তিনজন মহেশ জেটলির নাম। তিনজনের স্ত্রীকেই সে আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সাবধান করে দিল। শুরু হয়ে গেল একসঙ্গে তিনটি ঘটনার অগ্রগতি। কিন্তু বহু পথপরিক্রমার পরে আবিষ্কৃত হল তার আশঙ্কা মিথ্যা। কারণ, সে যা শুনেছিল, সেটি হচ্ছে বেতারে অভিনীত নাটকের কিছু সংলাপ। প্রমাণিত হল সময় সময় মাত্র কানে শোনা কথার ওপর নির্ভর করে পরের উপকার করতে গেলে পরের উপকার তো হয়ই না, বরং তাদের অপকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও সমূহ বিপদে পড়বার সম্ভাবনা।

ছবিতে অনাবশ্যকভাবে একটি বিরাট নাচের সিকোয়েন্স সন্নিবেশিত হয়েছে, সিকোয়েন্স বলতে হল এই কারণে যে, কয়েকটি সমবেত নৃত্যের সমাবেশ ঘটেছে। বিচ্ছিন্নভাবে এগুলি যতই চমৎকার হোক না কেন, মূল কাহিনীর সঙ্গে এদের কোনোই সম্পর্ক নেই। এটি বাদ দিতে পারলে ছবির কাহিনীটি আরও সংহত হোতো।

অভিনয়ে স্বয়ং রালহান সবচেয়ে আনন্দদায়ক। এছাড়া প্রেম চোপরা, মদনপুরী, রমেশ দেও, জাগীরদার, সোনিয়া সাহনী, চাঁদ উসমানী, টুনটুন, হেলেন প্রভৃতি সকলেই নিজ নিজ ভূমিকায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ উচ্চ প্রশংসনীয়। রাহুল দেববর্মণের সুরে গীত গানগুলিও আকর্ষণীয়। নৃত্যের দৃশ্যগুলি বিরাট ও স্বাধীনভাবে উপভোগ্য।

ও. পি. রালহানকৃত 'হালচাল' একটি সর্বাংশে উপভোগ্য চিত্র।

(৩) **ক্রিস্টাল উইন্ডো (তথ্যচিত্র)**

দু' রীলে সম্পূর্ণ, সাদাকালো ফোটোগ্রাফীর সাহায্যে তোলা 'ক্রিস্ট্যাল উইন্ডো' তথ্যচিত্রটি কলকাতার অরোরা সিনেমা এবং অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের গত ষাটবর্ষব্যাপী কর্মপ্রচেষ্টার একটি চূড়ান্ত দলিল। পরলোকগত অনাদি বসু দ্বারা ১৯১২ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থাটি আমাদের জাতীয় জীবনের বহু স্মরণীয় ঘটনার ছবিও যেমন তুলেছে, তেমনই নির্বাক যুগে 'রত্নাকর' থেকে শুরু করে সবাক যুগের 'আরোগ্যনিকেতন' 'ভগিনী নিবেদিতা', 'রাজা রামমোহন' প্রভৃতি বহু অভিনন্দিত কাহিনীচিত্রেরও প্রযোজনা করেছে। ১৯৪৫ সালে ফিল্ম-গুদামে আগুন লেগে যাওয়ায় পূর্ববর্তী-কালের সকল ফিল্ম ভস্মীভূত হওয়ায় ঐ যুগের বহু তথ্যচিত্র বিনষ্ট হয়েছে। এ সত্ত্বেও এই তথ্যচিত্রটি অরোরা ঐতিহ্যকে নির্ভুলভাবে যে তুলে ধরেছে, এ-কথা অনস্বীকার্য। ছবিটি 'এশিয়ান মেলা, ৭২'-এ প্রদর্শিত হবার জন্যে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে প্রস্তুত হয়েছে আরোরার বর্তমান কর্ণধার অজিত বসুর নির্দেশনায়।

জবাব / শমিত ভঞ্জ এবং অমিতাভ বচ্চন

স্টুডিও সংবাদ

স্টুডিওর ফ্লোরে এবং প্রাঙ্গণে আজ পর্যন্ত বহু সেট—ছোট এবং বড়ো তৈরী হতে দেখেছি। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর স্টুডিওতে তরুণ মজুমদার পরিচালিত 'ঠগিনী' ছবির জন্যে বিশেষভাবে গড়ে-ওঠা সেটটি যেখানে দেখলুম, তা সাধারণত কল্পনার বাইরে। ওখানকার সেট-রাখা গুদামটিকে কিছু কিছু খালি করে গড়ে তোলা হয়েছে একজন 'ব্যানার'-আঁকিয়ের স্টুডিও। এখানে সদ্য-সমাপ্ত ব্যানার, ওখানে আগে আঁকা কিছু পুরনো ব্যানার, ও-পাশে রং-তুলি, ব্রাশ, আবার তারই মধ্যে এক পাশে পাতা হয়েছে ফুলশয্যা।

নেহাৎ রাত্রিবেলা। নইলে ইচ্ছে ছিল, ওই সঙ্কীর্ণ জায়গায় কোন্‌খানে ক্যামেরা পেতে কেমনভাবে শুটিং চালান শ্রীমজুমদার। তাকিয়ে তাকিয়ে ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি কতগুলি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ওখানে শুটিং করা যায়। অথচ শুনলুম, ঐ অপরিসর সেটে শ্রীমজুমদার পাঁচ-ছ রাত কাজ করেছেন। সুবোধ ঘোষের কাহিনী 'ঠগিনী'তে বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন সন্ধ্যা রায়, অনুপকুমার, উৎপল দত্ত, রবি ঘোষ, চিন্ময় রায় এবং আরও অনেকে। ছবির সঙ্গীত-পরিচালক হচ্ছেন হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়।

অমৃতের স্বাদ

নব গঠিত চিত্র প্রতিষ্ঠান অগ্রাঙ্কিকার প্রথম প্রচেষ্টা 'অমৃতের স্বাদ'-এর চিত্রগ্রহণ নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে শেষ হয়ে এসেছে।

ছবিটি পরিচালনা করেছেন পরিমল ভট্টাচার্য এবং সঙ্গীত-পরিচালনা করেছেন হীরেন ঘোষ। ছবির অভিনয়াংশে আছেন শমিত ভঞ্জ, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, অসিতবরণ, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার, মঞ্জিনা দেবী,

মুস্তাফা মেহমুদ পরিচালিত 'আগন্তুক' পূর্ণদৈর্ঘ্য-তে মুস্তাফা, মতিন, নারায়ণ চক্রবর্তী ও আয়েশা হাসান (বাংলাদেশ)

কমল মিত্র, জহর রায়, দীপিকা দাস এবং মাধবী মুখোপাধ্যায় ও শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়। ছবিতে চারখানি গান আছে, গেয়েছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও মান্না দে এবং লিখেছেন শ্যামল গুপ্ত। চিত্রগ্রহণ, শিল্প-নির্দেশনা ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে বিজয় ঘোষ, রবি চট্টোপাধ্যায় এবং অমিয় মুখোপাধ্যায়। ছবিটি প্রযোজনা করেছেন অঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়।

'ছন্দপতন' মুক্তি প্রতীক্ষায়!

গুরু বাগচী পরিচালিত নবরূপার 'ছন্দপতন' ছবিটি বর্তমানে মুক্তি প্রতীক্ষায়। পুলক মজুমদারের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা ও সম্পাদনা করেছেন—অমিয় মুখোপাধ্যায়। শৈলেশ রায় ছবিটির সুরকার। নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, অনুপ ঘোষাল ও সুমিত্রা সেন।

চরিত্র-চিত্রণে আছেন—শমিত ভঞ্জ, নন্দিনী মালিয়া, অনিল চট্টোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী, শিবানী বসু, অনুভা ঘোষ, গীতা মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, শ্রীমান অরিন্দম, কুমারী শর্মিলা, মলিনা দেবী, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, প্রীতি মজুমদার প্রভৃতি।

এস বি ফিল্মস ছবিটির পরিবেশক।

জীবন যে রকম : এস আর বি প্রোডাকসন্স নিবেদিত ভরতকুমার নন্দী প্রযোজিত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বাস্তবধর্মী কাহিনী 'জীবন যে রকম'-এর চলচ্চিত্রায়নের কাজ স্বদেশ সরকারের পরিচালনায় বহির্দৃশ্য গ্রহণের মাধ্যমে শুরু হয়ে গেছে। প্রথমেই পুণার বিভিন্ন লোকেশনে এই ছবির নায়িকা ওয়াহিদা রহমান এবং চরিত্রাভিনেত্রী অচলা সচদেবকে নিয়ে বেশ কয়েকদিনের কাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। ওয়াহিদা এবং সৌমিত্রের জুটি সুদীর্ঘ দশ বছর পর আবার দেখতে পাওয়া যাবে বাংলা ছবির পর্দায়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য অচলা সচদেব-এর সুদীর্ঘ শিল্পী-জীবনে এইটিই হচ্ছে বাংলা ছায়াছবিতে প্রথম অবতরণ। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য চরিত্র-চিত্রণের সম্ভাব্য শিল্পীরা হলেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও একাধিক চেনা ও অচেনা মুখ। আলোক-চিত্রগ্রহণ করছেন সত্য রায়। প্রধান সহযোগী পরিচালক অমিয় সান্যাল। ব্যবস্থাপনা—ক্ষিতীশ আচার্য। সঙ্গীত রচনা ও পরিচালনা : সলিল চৌধুরী। শিল্প নির্দেশনায় রয়েছেন সুনীতি মিত্র।

ফুলু ঠাকুরমা

দীর্ঘ আট বছর পর অভিনেতা ও পরিচালক সাধন সরকার নিজের চিত্রনাট্যে শৈলেশ গুহ নিয়োগী ও প্রবোধবন্ধু অধিকারীর 'সেমসাইড' কাহিনী অবলম্বনে হাসির ছবি 'ফুলু ঠাকুরমা'র চিত্রগ্রহণ শুরু করেছেন ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে। প্রথম পর্যায়ের স্যুটিং ২১ নভেম্বর থেকে ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত শেষ করে ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে পরবর্তী স্যুটিং-এর প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত আছেন। ছবির সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন শ্যামল মিত্র এবং তাঁর সুরারোপে নেপথ্য সংগীত পরিবেশন করেছেন শ্যামল মিত্র এবং আরতি মুখোপাধ্যায়। ছবির গান রচয়িতা হচ্ছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, শিল্প নির্দেশনায় ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে বটু সেন ও রমেশ যোশী এবং চিত্রগ্রহণে রয়েছেন বিজয় দে। সাধন ফিল্মস্-এর নিবেদন এই ছবিতে ফুলু ঠাকুরমার নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন মলিনা দেবী এবং অন্যান্য চরিত্রে দেখতে পাওয়া যাবে কমল মিত্র, অনুপকুমার, শিপ্রা মিত্র, জহর রায়, হারাধন বন্দ্যোঃ, সত্য বন্দ্যোঃ, বিশু রায়, চিন্ময় রায়, তপন দত্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোঃ, মৃণাল রায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায় ও বঙ্কিম ঘোষকে।

'শ্রাবণ সন্ধ্যা' আসছে!

কালীমাতা প্রোডাকসন্সের প্রথম ছবি 'শ্রাবণ-সন্ধ্যা' রাখী, পূর্ণির পরবর্তী আকর্ষণ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে মুক্তির দিন গুনছে। শেখর চট্টোপাধ্যায়ের চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করেছেন বীরেশ্বর বসু। প্রান্তিক গোষ্ঠী ছবিটির উপদেষ্টা। সংগীত বহুল ছবিটিতে সুরারোপ করেছেন নচিকেতা ঘোষ। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার রচিত গানগুলিতে কণ্ঠদান করেছেন মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায় ও সুমিত্রা সেন। চরিত্রচিত্রণে সুচিত্রা সেন, সমিত ভঞ্জ, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, জহর রায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ, চিন্ময় রায়, সাধনা রায়চৌধুরী, বনানী চৌধুরী, কল্যাণ চক্রবর্তী, সুনীলকুমার, তৃপ্তি দাস, তপতী বর্মণ, ইন্দিরা দে, কল্যাণ ঘোষ, আইভিলতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

কালীমাতা ফিল্মস ছবিটির পরিবেশক।

মঞ্চাভিনয়

ঝিন্দের বন্দী অভিনয় : শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত নাটক 'ঝিন্দের বন্দী' 'রঙ্গনা' থিয়েটারে সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশন করেছিলেন স্টীল অ্যান্ড অ্যালায়েড প্রোডাক্টস স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা।

একটি সিংহাসনের উত্তরাধিকারীকে কেন্দ্র করে 'ঝিন্দের বন্দী' নাটকটির সংঘাত গড়ে উঠেছে। দুটি স্বাধীন রাজ্য—ঝিন্দ ও ঝড়োয়া। ভাস্কর সিং এর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ঝিন্দ রাজ্যে জ্বলে ওঠে অসন্তোষের আগুন। সিংহাসনের উত্তরাধিকারী শংকর সিং-এর প্রধান প্রতিবন্ধক তারই ছোট ভাই উদিত সিং আর উদিতের অনুচর ধূর্ত ময়ূরবাহন।

রাজভক্ত ফৌজী সর্দার ধনঞ্জয় শেষবারের অভিষেকের জন্যে ব্যবস্থা করেন। কিন্তু এবারও শংকর সিং নিখোঁজ হলেন। অভিষেক নির্দিষ্ট দিনেই। বিস্মিত হল উদিত সিং আর ময়ূরবাহন। যেমন করেই হোক এবে

শেষ করতেই হবে। উদিত আর ময়ূরবাহনের চক্রান্তে নতুন রাজার জীবন হয়ে উঠলো বিপন্ন। 'পাপের ফল অশুভ' এইটেই যোগ্য-তম 'ঝিন্দের বন্দী' নাটকের চিরন্তন সত্য।

নাটকের প্রয়োজনাকে প্রাণবন্ত করে তুলতে নাট্যনির্দেশক ও শিল্পীদের নিবিড় সংযোগিতা প্রথম থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নাটকটির দু-একটি জায়গায় জোনাল এ্যাক্টিং এফেক্ট কিন্তু স্পষ্ট হোতে পারেনি। অদৃশ্য অচলা বৌদিকে ঘটনাগত নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে মঞ্চে উপস্থিত করলে নাটকটি আরও সফল হয়ে উঠতো—একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ভীত সন্ত্রস্ত অথচ প্রতিশোধ বাসনায় উল্লসিত প্রহ্লাদের ভূমিকায় মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্যের আচরণ অনেকটা বাধা প্রাপ্ত হয়েছে তার পোশাকের অসামঞ্জস্যের জন্যে। অভিনয়ের ব্যাপারে যাঁদের কৃতিত্বের কথা প্রথমেই মনে আসে তাঁরা হলেন বৈদ্যনাথ কর্মকার (গৌরীশংকর), দেবাশীষ বন্দ্যো-পাধ্যায় (উদিত সিং) অরবিন্দ দাশগুপ্ত (ময়ূরবাহন)। মঞ্চে তাঁদের স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিমা সত্যি অপূর্ব। সুষ্ঠু চরিত্র চিত্রণের জন্য যাঁদের প্রয়াস অভিনন্দন যোগ্য তাঁরা হলেন নীলিমা চক্রবর্তী (রুক্মা) শচীন সরকার (ভবানী প্রসাদ), লতিকা বোস (চম্পা) ও হিমানী বন্দ্যোপাধ্যায় (কস্তুরীবাঈ)।

কেদার রায় নাট্যাভিনয়ঃ বি টি পি এবং অফিস নাট্যসংস্থার (ত্রিবেণী, হুগলী) সদস্যরা তাঁদের দ্বিতীয় নাট্যনিবেদন রমেশ গোস্বামী রচিত কেদার রায় সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন গত ২ ডিসেম্বর শনিবার ত্রিবেণীতে।

এমন একটি ঐতিহাসিক নাটককে সঠিক-ভাবে রূপায়িত করা সহজ নয়। কিন্তু এঁরা অখণ্ড নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সঙ্গে অভিনয় করে প্রমাণ করেছেন যে এ নাটকও প্রাণবন্ত করে তোলা যায়। মফঃস্বলে এসব নাটকের অভিনয় বিরলদৃষ্ট। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন নবীন ও প্রবীণ শিল্পীরা। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নাটকের গতি অব্যাহত ছিল, কোনখানেই বৈচিত্র্যের অভাব ঘটেনি। শিল্পীদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় ঈশা খাঁ, কেদার ও শ্রীমন্তের ভূমিকায় শিবদাস চক্রবর্তী, অজিতকুমার চক্রবর্তী ও নাট্য পরিচালক মনোরঞ্জন চক্রবর্তীর। এঁরা আগাগোড়া নাটকটিকে জমিয়ে রেখেছেন ও বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাছাড়া ছোট ভূমিকায় যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁরাও দর্শকমনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছেন—এঁদের মধ্যে তাহের—রবীন ঘোষ, কিলমল খাঁ— সুনীল ভাদুড়ী, সাদ খাঁ—সুকুমার দাস, ওসমান খাঁ - শৈলেশ মুখার্জি স্ব স্ব চরিত্র যথা-যথভাবে অভিনয় করে নিষ্ঠার পরি-চয় দিয়েছেন। কাভাঁলো, কালু সর্দার ও মুকুট রায়ের ভূমিকায় অমলেন্দু মুখার্জী চিত্তরঞ্জন কর ও কল্যাণকুমার গুহ নাটকের গতি বজায় রাখতে অভিনয়ে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। অন্যান্য সকল শিল্পীই প্রাণ দিয়ে অভিনয় করেছেন বলা যায়। স্ত্রী-চরিত্রে

প্রান্ত বেলা/ক্যামেরাম্যান পরিচালক দীনেন গুপ্ত নায়িকা রাজশ্রী বসুকে একটি দৃশ্য বুঝিয়ে দিচ্ছেন।　　ফটো ঃ অমৃত

সোনার ভূমিকায় সুলেখা ব্যানার্জি, মায়ার ভূমিকায় বন্দনা চ্যাটার্জী দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। মঞ্চপরিকল্পনা ও সঙ্গীতে কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও এ অভিনয় সামগ্রিকভাবে সফল হয়েছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতির নাট্যোৎসব

আজ পর্যন্ত বাংলা থিয়েটারের যে শৈল্পিক গৌরব অর্জিত হয়েছে, তাকে আরো গভীরতর ও প্রসারিত করার বলিষ্ঠ ও মহৎ যে প্রয়াস, তাকেই আবেগ ও বেগের নিবিড় সেতুবন্ধনে এনে বাংলা নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতির কর্মীরা গত চার বছর ধরে একটি স্বপ্নকেই বাস্তব মুখরতায় সোচ্চার করে তুলতে চাইছেন। সেই স্বপ্নটি হোল—একটি বৃহত্তম সংস্কৃতি কেন্দ্র স্থাপন করা, যার মধ্যে প্রাণময় শিল্পের সব কটি দিকের চর্চা করা যেতে পারে। এই কঠিন ব্রতকে সামনে রেখে এঁরা এগিয়ে চলেছেন, নাট্যোৎসব করছেন চার বছর ধরে, অর্থও সংগৃহীত হয়েছে বেশ কিছু। নতুন নতুন নাটকও পরিবেশিত হয়েছে, নাট্যানু-রাগীরা মুগ্ধও হয়েছেন এইসব নাটকের বিষয়বস্তু ও অভিনয়-[illegible]।

কিন্তু শত চেষ্টা করেও কলকাতা শহরের বুকে সংস্কৃতি ও শিল্পচর্চার প্রাণকেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য একখণ্ড জমিও আজ পর্যন্ত পাওয়া গেল না। অথচ এই শিল্প-কেন্দ্র স্থাপিত হোলে যে গৌরবের দীপ্তি বিকশিত হবে, তাতে দেশের জাতীয় ঐতিহ্যই সমৃদ্ধতর হবে। 'এ নেশন ইজ নোন বাই ইটস স্টেজ'—এই গভীরতম সত্যটির প্রতি সকারই আন্তরিক বিশ্বাস আছে, তবুও কেন একটি জাতীয় মঞ্চ যে বাস্তব রূপ নিয়ে গড়ে উঠতে পারছে না! এই গড়ে না উঠতে পারার নেপথ্যে কাদের উদাসীনতা বা অবহেলা রয়েছে?

যাদের দেবার মতো ক্ষমতা আছে, তাঁরাই তো দিতে পারেন এক খণ্ড জমি। যাঁরা কলকাতার কথা ভাবেন, কলকাতাকে সুন্দর করে গড়ে তোলার দায়িত্ব যাঁদের ওপর ন্যস্ত হয়েছে, তাঁরাও তো নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতির কর্মীদের এই বিরাট প্রয়াসকে সার্থক করে তুলতে পারেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের ও পরিতাপের বিষয় যে শিল্পকেন্দ্র স্থাপনের জন্য এক টুকরো জমি সংগ্রহ করে দেওয়ার আবেদনে আজ পর্যন্ত এঁরা সাড়া দেননি। বুঝতে পারি না উপলব্ধির কেন এই মর্মান্তিক ব্যবধান।

আমি সিরাজের বেগম/অলকা, পরিচালক : সুনীল মুখার্জি

রাজনীতি বা দলীয় মতবাদ—সবারই উর্ধ্বে তো সংস্কৃতি ও শিল্প চিন্তা—এই সত্যটিকে প্রাণভরে সেই দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ কেন মেনে নিতে পারছেন না! বাংলা রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষপূর্তির ঐতিহাসিক মুহূর্তেও তো তাঁরা কিছু উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি রাখতে পারতেন!

যাই হোক, নাট্যমঞ্চের প্রতিষ্ঠার জন্য যে প্রয়াস শুরু হয়েছে, তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন সবাই। সবার স্বীকৃতি আর অভিনন্দন একদিন বলিষ্ঠ সংঘবদ্ধ শক্তি হয়ে মুখর হয়ে উঠবে এবং সোচ্চারে তার দাবী পেশ করবে। আমরা বিশ্বাস করি, সেই দৃঢ়তার কাছে, সেই ঐকান্তিকতার কাছে সব উদাসীনতাই সেদিন সহমর্মিতায় রূপ নেবে।

এবারে নাট্যমঞ্চ আয়োজিত চতুর্থ নাট্যোৎসবে যে ক'টি নাটক পরিবেশিত হয়েছে তার সব ক'টিই গোষ্ঠীর নতুন নাটক। বিভিন্ন স্বাদের নাটক নির্বাচন করে সমিতির কর্মী ও শিল্পীরা শৈল্পিক গভীরতার পরিচয় রেখেছেন। তবে একটা কথা। আজকের এই রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষপূর্তির ঐতিহাসিক লগ্নে 'নীলদর্পণ' বা 'সধবার একাদশী'র মতো উজ্জ্বলতার নিদর্শন কোন যুগান্তর সৃষ্টিকারী কোন একটি নাটক অন্তত প্রযোজিত হওয়া উচিত ছিল বলে মনে হয়।

নাট্যোৎসবের প্রথম দিনে মঞ্চস্থ হয়েছে গিরিশ কারনাড় রচিত 'তুঘলক'। প্রযোজনা করেছেন বাংলা নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি। ইতিহাস প্রসিদ্ধ সেই 'পাগলা' রাজা তুঘলকের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও হৃদয়সংঘাতকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এ নাটকের গতিবেগ। কিন্তু সত্যি কি তুঘলক পাগলা ছিলেন? তিনি তো হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতিও চেয়েছিলেন। তাঁর ভিতরে লুকিয়েছিল নিভৃতে আলাপনরত এক কবি। আবার তিনি নিজের হাতে খুনও করেছেন, পাশাপাশি রক্তাক্ত দুটি হাত দিয়ে ভেবেছেন প্রজাদের মঙ্গলের কথা, ভেবেছেন স্বপ্নময় কবিতার কথা। কোন্ শক্তি তাঁকে নিয়ন্ত্রিত করছিল—জনগণের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা? কবিমানসের গভীরতা? রক্ততৃষ্ণা? যৌন বিষয়ে অতৃপ্তি? ইতিহাসের এই জটিল চরিত্রকে গিরিশ কারনাড় নতুন আলোয় তুলে ধরেছেন এই নাটকে। এই নাটকটি নির্দেশনার দায়িত্ব নেন বহু হিন্দী নাটকের সফল নির্দেশক শ্রীশ্যামানন্দ জালান। শ্রীজালানের কল্পনাশক্তি ও সূক্ষ্ম শিল্পবোধ এই নাট্যপ্রযোজনার বিভিন্ন মুহূর্তে ধরা পড়েছে।

'তুঘলক' নাট্যপ্রযোজনার একটি আকর্ষণীয় সম্পদ হোল 'তুঘলক' চরিত্রে শ্রীশম্ভু মিত্রের অসাধারণ অভিনয়। রাজা গুয়াদিপাউসের পর আর একটি অনন্যসাধারণ চরিত্রচিত্রণ হোল এই 'তুঘলক'। বিভিন্ন মানসিকতার পরিবর্তনের মুহূর্তগুলোতে তাঁর নিখুঁত অভিব্যক্তি সত্যি ভোলা যায় না। কেয়া চক্রবর্তীর 'সৎমা' সব সময়ে সপ্রতিভ না হোলেও, শেষ পর্যন্ত তাঁর চরিত্রচিত্রণ মর্মস্পর্শী হোতে পেরেছে। এই প্রযোজনায় আর যাঁরা আকর্ষণীয় অভিনয়ের নজীর রেখেছেন তাঁরা হোলেন সবিতাব্রত দত্ত (সাহাবুদ্দিন), রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত (বরণী), অরজিৎ গুহ (নজীব), সন্তোষ দত্ত (গিয়াসুদ্দিন) ও হিমাংশু চট্টোপাধ্যায় (আজীজ)। এ নাটকের গতিবেগকে গভীরতর করেছে তাপস সেনের শৈল্পিক আলোকসম্পাত ও চৌধুরীর পরিচ্ছদ ও প্রতীকী মঞ্চসজ্জা।

দ্বিতীয় দিনের নাটক 'নান্দীকার' প্রযোজিত 'নটী বিনোদিনী'। পুরনো আমলের 'অভিনেত্রী কুলসাম্রাজ্ঞী' হোলেন বিনোদিনী। বাংলাদেশের সাধারণ রঙ্গালয়ের একশ বছর পূর্ণ হোল। এই রঙ্গালয়ের জন্য বিনোদিনীর যে সীমাহীন আত্মত্যাগ আছে, তা জানেন তাঁরাই, যাঁদের বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসের সঙ্গে একটি নিবিড় যোগসূত্র আছে। চিত্তরঞ্জন ঘোষের এই নাটক কয়েকটি প্রশ্নের ওপর মরমী আলোকসম্পাত করেছে। মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে, যখন যশের চূড়ায় তখন বিনোদিনী কেন নিজের ইচ্ছায় সে সাম্রাজ্য ছেড়ে চলে গেলেন? এর কারণ কি? থিয়েটার কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহার? ভালোবাসার আবেগবিহ্বল কামনা? রামকৃষ্ণদেবের পবিত্র প্রভাব, না নতুন প্রেমিকের প্রাণোচ্ছল আহ্বান? না, ভাবী সন্তানকে কলঙ্কমুক্ত আলোকরেখার সন্ধান দেওয়া? মুন্সিয়ানার সঙ্গে শ্রীঘোষ বিনোদিনীর জীবনের এই যন্ত্রণার অধ্যায়গুলোকে মঞ্চের আলোয় তুলে ধরেছেন।

নির্দেশক অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এই নাটকের প্রায় প্রতিটি মুহূর্তকেই প্রাণবন্ত করে তুলতে পেরেছেন। শিল্পীরাও খোঁটিনাটিভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে চরিত্রচিত্রণে প্রাণময়তা আনবার চেষ্টা করেছেন। এই প্রযোজনার একমাত্র আকর্ষণ বলতে হয় 'বিনোদিনী'র ভূমিকায় মঞ্জু ভট্টাচার্যের প্রাণস্পর্শী অভিনয়। যন্ত্রণার প্রায় প্রতিটি মুহূর্তই দক্ষতার সঙ্গে পরিস্ফুট করে তুলতে পেরেছেন শ্রীমতী ভট্টাচার্য। অন্য কয়েকটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অংশ নেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (গুরুমুখ), হিমাংশু

চট্টোপাধ্যায় (রাঙাবাবু), মনুপ্রসাদ সেন-গুপ্ত (অ-বাবু)। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন সুমৌলীন্দ্র আচার্য, অরুণ চট্টোপাধ্যায়, লতিকা বসু, পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন মুখোপাধ্যায়, পশুপতি বসু, বুদ্ধদেব রায়চৌধুরী, রবীন চক্রবর্তী রণজিৎ চক্রবর্তী ও পরিমল মুখোপাধ্যায়।

.........একটি বকুল গাছের নীচে প্রসন্ন রোদ, আর বিষন্ন অন্ধকারকে সাক্ষী রেখে আকাশের দিকে নির্বিকার চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে এক পাগল। নাম তার অরুণ। মাঝে মাঝে সে চিৎকার করে বলে ওঠে......'মেল ট্রেন, মেল ট্রেন...টেলিগ্রাম... টেলিগ্রাম'। সামনে একটি ছোট্ট সংসার—সেখানকার সুখ দুঃখ, স্মৃতি ও প্রীতির বাসর শুধু দুজন—কল্যাণী ও তুষার। অরুণ ভালোবাসতো কল্যাণীকে, কিন্তু কল্যাণী ভালোবাসতো তুষারকে। তাই তুষারই পেলো কল্যাণীকে। কিন্তু তুষারের বুও মনে হয় সে হেরে যাচ্ছে পাগলটার কাছে। এই অনুভব তাকে মাঝে মাঝে ক্লান্ত করে তোলে—সে ছুটে যায় ঐ পাগলটার কাছে—আবার চলে আসে তার হাত ধরে। এ এক অদ্ভুত যন্ত্রণা। উত্তরের ব্যালকনি থেকে বকুল গাছের মাঝখানের সীমাটুকু বড়ো দুঃসহ।

অপূর্ব কাব্যময় অনুভূতিমদির এই নাটকটির নাম 'উত্তরের ব্যালকনি'। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বনে নাট্যরূপ দিয়েছেন প্রলয় শূর। অসাধারণ নিষ্ঠা, আর শৈল্পিক সংযমের সঙ্গে নাটকটির নির্দেশনার দায়িত্ব বহন করেছেন শ্যামল সেন। ন্যাচারাল এ্যাকটিং ও তার কয়েকটি মুহূর্ত পরিকল্পনা সত্যি প্রশংসার দাবী রাখে। অভিনয়ও করেছেন স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিমায় ...র' চরিত্রে, প্রতিটি অভিব্যক্তি হয়েছে ...র সুন্দর। 'কল্যাণী' চরিত্রটিও ...মনের মর্মস্পর্শী অভিনয়ে প্রাণ পেয়েছে। ...মীর লাহিড়ীর 'অরুণে'র ভাবভঙ্গিমাও আমাদের মনকে ছুঁয়েছে। নাটকটি প্রযোজনা করেছেন 'থিয়েটার গিল্ড'।

ঐ একই দিনে 'গান্ধা'র পরিবেশিত নাটক 'পুরনো আসবাব' কিন্তু মনের সেই ...ন্ত্রী স্পর্শ করতে পারেনি। নাটকটির ...তিবেগ প্রত্যাশিত ছন্দ তুলতে পারেনি ...নে। আর্থার মিলারের 'দি প্রাইস' অবলম্বনে এ নাটকটি রচনা করেছেন ...বরূপ ভট্টাচার্য। একটি বাড়ীর পুরনো আসবাব বিক্রীকে কেন্দ্র করে দুই ভাইয়ের ...ত্ত হৃদয়-সংঘাতেই এই নাটকে ভাষা পেয়েছে। নাটকটি যাতে শিথিল না হয়ে ...ড়ে সেদিকে মনে হয় আরো গভীরতর ...ষ্টি দেওয়া উচিত ছিল পরিচালক অসিত মুখোপাধ্যায়ের। বিভিন্ন ভূমিকায় মোটা-...টি অভিনয় করেন অমর বসু (বিজয়-নারায়ণ), অসিত মুখোপাধ্যায় (সঞ্জয়), ...বরূপ ভট্টাচার্য (শৈলমোহন), গীতা ...ক্রবর্তী (অনীতা)।

নিশিকন্যা/মিঠু মুখোপাধ্যায়

পরের দিন এই নাট্যোৎসবে 'বহুরূপী' গোষ্ঠী পরিবেশন করলেন 'গন্ডার' নাটক। আয়ানেস্কোর 'রাইনোসেরাস' অবলম্বনে এ নাটকটি গড়ে তুলেছেন শাঁওলী মিত্র। নাটকটির প্রযোজনায় অসামান্য শৈল্পিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্র। মঞ্চের বিভিন্ন মুহূর্তের পরিকল্পনা আলোয় আর অভিনয়ে অসাধারণ এক ব্যঞ্জনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন ভূমিকায় প্রাণবন্ত অভিনয় করেন কমলা সিংহ, নমিতা মজুমদার, কালীপ্রসাদ ঘোষ, অরাজিৎ গুহ, শর্মিলা গোস্বামী, মুকুল দাস, উৎপল ভট্টাচার্য, সুনীল সরকার, মহম্মদ আম্ফিয়া, শাঁওলী মিত্র, শান্তি দাস, দেবতোষ ঘোষ, উদয় সিংহ, রমলা রায়, তুষার বসু, সমীরণ মুখোপাধ্যায়।

নাট্যোৎসবের শেষের দিনে অভিনীত হোল নীতিশ সেনের 'অরুন্ধতী সন্ধানে'। প্রযোজনা করলেন 'রূপকারের' শিল্পীরা। একটি মেয়ে—দুর্গা নাম তাকে ঘিরে—রয়েছে দুই পুরুষ অজিত ও সুপ্রকাশ। অজিত যুবক ও সুপ্রকাশ যৌবনোত্তীর্ণ পুরুষ। দুজনেই সমানভাবে হয়তো আকর্ষণ করতে চায় দুর্গাকে। শেষ পর্যন্ত স্থির হোল, তিনজনে একই সঙ্গে অপেক্ষা করে থাকবে সেই দিনটির জন্য, যে দিনে বিশ্বাসের মধ্যে ফুটে উঠবে এক নতুন ফুল, আকাশে আলো দেবে নতুন এক নক্ষত্র। এরই সন্ধানে দিন কাটাবে তিনজন।

এই সুন্দর পরিচ্ছন্ন নাটকটিকে মঞ্চের আলোয় বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন সবিতাব্রত দত্ত। 'সুপ্রকাশে'র ভূমিকায় তাঁর অভিনয়ও হয়েছে বেশ প্রাণোজ্জ্বল। বেশ কিছুদিন পর দত্তের একটি স্বচ্ছন্দ অভিনয় দেখলাম। সলিল চক্রবর্তীর 'বিভূতি'ও হয়েছে বেশ স্বাভাবিক। প্রশান্ত বসু (স্বপন)র রূপসজ্জায় অবশ্য আরো গাম্ভীর্য আনা উচিত ছিল। গীতা দত্ত

রূপাঙ্কন প্রযোজিত শের আফগান নাটকের একটি দৃশ্য।
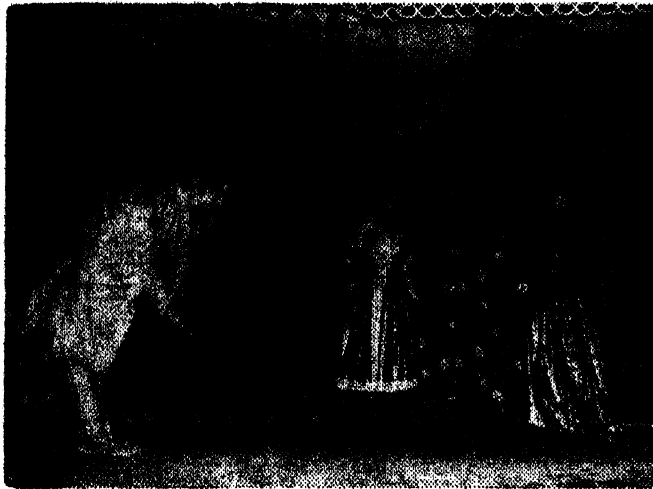
মোটামুটিভাবে 'নর্তকী' চরিত্রের প্রাণময়তাকে রূপ দিতে পেরেছেন। অন্য কটি চরিত্রে ছিলেন অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দিতা চক্রবর্তী, সুপ্রিয়া ঘোষ। —দিলীপ মৌলিক

রূপাঙ্কনের 'শের আফগান': বাংলা রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে 'রূপাঙ্কনে'র শিল্পীরা কয়েকদিন আগে রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক নাটক 'শের আফগান' পরিবেশন করেন 'বিশ্বরূপা'র মঞ্চে। 'দোহাই ফাঁসি দেবেন না', 'সিঁড়ি' প্রভৃতি নাটক প্রযোজনা করে এই সংস্থা নাট্যানুরাগীদের যে স্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন তা বোধ হয় আরো প্রসারিত ও গভীরতর হয় আলোচ্য নাটকটির পরিবেশনার মধ্য দিয়ে। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের এই নাটকটির সম্পাদনা ও নির্দেশনার দায়িত্ব নেন তীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। নির্দেশকের সুক্ষ্ম শিল্পভাবনা প্রযোজনায় বিশেষ কয়েকটি মুহূর্তে চিহ্নিত হয়েছে। নাটকটির সুষ্ঠু সম্পাদনায় শ্রীচট্টোপাধ্যায় যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় রাখতে পেরেছেন। নাটকটি হয়েছে তীব্রতর গতিবেগে সমৃদ্ধ।

ঐতিহাসিক নাটকের প্রাণোত্তাপ আসে সংযমবদ্ধ অভিনয়ের দৃঢ়তায়। এদিক দিয়ে 'রূপাঙ্কনে'র শিল্পীরা মোটামুটি সার্থকতা লাভ করেছেন বলা যায়। যে ক'জন শিল্পীর চরিত্র-চিত্রণ প্রথমেই সবার মনকে স্পর্শ করেছে তাঁরা হোলেন তীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (আকবর), বীরেন ঘোষ (আলিকুলি), তারাচাঁদ ভাদুড়ী (আবদুল্লা)। এই তিনজনের সমাহিত অভিনয় সামগ্রিক প্রযোজনাকে যথেষ্ট পরিমাণে বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছে বলে মনে হয়। সেলিমের ভূমিকায় শ্যামল রায়চৌধুরী উচ্চাঙ্গের অভিনয় করেন। তাকে মানিয়েও ছিল খুব ভালো। শেখর ভদ্রর 'কুতব খাঁ' ও সুনীলবরণ চৌধুরীর 'আব্বা খাঁ' দুটি বলিষ্ঠ চরিত্র-চিত্রণ হোতে পেরেছে। 'রাজা রায়' চরিত্রে দিলীপ রাহা সব সময় স্বাভাবিক ভঙ্গিমায় নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেননি। একটি অসাধারণ প্রাণচঞ্চল অভিনয়ের নজীর রেখেছেন মীনা দাস জাহিরা বিবি'র চরিত্রে। শর্মিষ্ঠা চট্টোপাধ্যায়ের 'মেহেরউন্নিসা' মোটামুটিভাবে চরিত্রের কাছে এসে পৌঁছতে পেরেছে। রাজলক্ষ্মী দেবী হয়তো তাঁর পরিণত অভিনয়ের ঔজ্জ্বল্যকে সব সময়ে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি 'সেলিমা বেগম' চরিত্রে।

অন্য কয়েকটি ভূমিকায় ছিলেন পীযূষকান্তি সরকার (গিয়াসবেগ), অনিল দাস (ফকির সাহেব), অজিতকৃষ্ণ দে (চরণ দাস), নীরেন চট্টোপাধ্যায় (চারণ)। নৃত্যে ছিলেন মিস জুহিনা। মঞ্চসজ্জা ও সুরসৃষ্টিতে ছিলেন স্বপন রক্ষিত ও নির্মল ভট্টাচার্য।

কালিন্দী: ই-পি-এম স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব (এস-ই রেলওয়ে)-এর শিল্পীরা সম্প্রতি 'কলামন্দিরে' তাঁদের পঞ্চম বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে তারাশংকরের 'কালিন্দী' নাটকের একটি সফল প্রযোজনা উপস্থিত করেন। নাটকটির তীব্র গতিবেগ শিল্পীদের অভিনয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে। নির্দেশনার দায়িত্ব নেন শ্রীশম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভিনয়ের ব্যাপারে যিনি সবার আগে দর্শকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন তিনি হোলেন নির্মল ঘোষ। তাঁর 'রামেশ্বর চক্রবর্তী' সমগ্র নাট্য প্রযোজনার একটি অসাধারণ সম্পদ হোতে পেরেছে। গীতা নাগের সুনীতিও একটি বলিষ্ঠ চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে। জগদীন্দ্র চক্রবর্তী (ইন্দ্র রায়), সুনীল সেনগুপ্ত (অচিন্ত্য), শ্যামল দাস (ডগরু), প্রতিমা পাল (উমা), বেলা রায় ও (সারি) প্রাণবন্ত অভিনয় করে দর্শক মনে ছাপ রাখেন।

অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন পূর্ণেন্দু মুখার্জী, পরিতোষ চক্রবর্তী, আশুতোষ সরকার, পরেশনাথ চ্যাটার্জী, প্রশান্ত চ্যাটার্জি, শৈলেন মিত্র, কৈলাসনাথ চ্যাটার্জি, সমর সিকদার, শশীভূষণ ঘোষ, অনিল দাস, প্রভাত দে, প্রীতিময় সিমলাই, বীরেন্দ্রকিশোর ঘোষ, শাশ্বতী রায় ও মালতী চৌধুরী।

লৌহ প্রাচীর: ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে সম্প্রতি 'কলামন্দিরে' পরিবেশিত হোল অমিলবরণ দত্তের 'লৌহ প্রাচীর' নাটকটি। নাটকটির সামগ্রিক অভিনয় সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। প্রখ্যাত চলচ্চিত্রাভিনেতা ও মঞ্চাভিনেতা শ্রীবঙ্কিম ঘোষ নির্দেশনার দায়িত্ব বহন করেন। শ্রীঘোষের সুগভীর শিল্পবোধ প্রযোজনার বহু মুহূর্তেই মূর্ত হয়ে উঠেছে।

বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেন বিজয় সেনগুপ্ত, রমেন চৌধুরী, গোরা বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজল বর্ধন, পার্থসারথী চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যুৎ বসু, সুনীল বসু, প্রণব মজুমদার, শিশির দে, বিশ্বনাথ ধাড়া, বারিদকান্তি নন্দী, রবীন অধিকারী, দেবপ্রসাদ রায়, গোপাল দত্ত, শিপ্রা চক্রবর্তী, অনিমা দত্ত।

নাটকটির সংগীত পরিচালনা করেন বারীন চট্টোপাধ্যায়। আলোকসম্পাতে ছিলেন অজিত মিত্র।

কালচারাল সেমিনারের একটি অভিনব অনুষ্ঠান: বাংলা রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ পূর্তি যে একটি ঐতিহাসিক সত্যের গৌরবে দীপ্ত তা আজ সবার কাছেই স্পষ্টতার আলোয় উদ্ভাসিত। বহু নাট্যগোষ্ঠীই এই ঐতিহাসিক মুহূর্তকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন ও করছেন। কিন্তু 'কালচারাল সেমিনারে'র শিল্পীদের প্রয়াস বোধ হয় এদিক দিয়ে বেশ খানিকটা স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত হোতে পেরেছে। রঙমহল থিয়েটারের সামনে খোলা জায়গায় এঁরা শতবর্ষ পূর্তির উৎসব উদ্‌যাপন করলেন। এদের প্রয়াসে তাদের চাঞ্চল্য ও আবেগ নিশ্চয়ই ছিল। অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন প্রবীণ অভিনেতা শ্রীসন্তোষ সিংহ।

অনুষ্ঠানে অভিনীত হয় জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাঙ্ক নাটক 'চন্দ্রবিন্দু'। অভিনয়ে অংশ নেন কালচারাল সেমিনারের বিভিন্ন শিল্পীরা। এর মধ্যে ছিলেন মানস দে, গোপাল দে, অনিল পাল, সলীল ঘোষ, রূপা রায়চৌধুরী, দিলীপ ভট্টাচার্য, জয়ন্ত দে। নাট্যনির্দেশনায় ছিলেন সমর মুখার্জী।

বিবিধ সংবাদ

কল্যাণী ই এস আই হাসপাতালে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান: গত ১৮ ও ১৯ নভেম্বর কল্যাণী ই এস আই ইলেভেন ক্লাবের উদ্যোগে নাটক অভিনয় হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীবিমল ঘোষ (মৌমাছি) ও প্রধান অতিথিরূপে আসেন পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার ডেপুটি স্পীকার শ্রীহরিদাস মিত্র। অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে মন্মথ রায়ের 'মমতাময়ী হাসপাতাল' অভিনীত হয়। দ্বিতীয় দিনে অভিনীত হয় 'প্রতিবিম্ব' নাটকটি। দর্শক সমাকীর্ণ অনুষ্ঠানে নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়।

বাটা স্পোর্টস ক্লাবের উদ্যোগ: গত ১৯ নভেম্বর বাটা স্পোর্টস ক্লাবের বিজয়া সম্মিলনী ৩০, সেকসপীয়র সরণীর প্রাঙ্গণে

অনুষ্ঠিত হয়। বিচারকের আসনে উপস্থিত ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরী, সবিতা চৌধুরী, কৃষ্ণা রায় প্রভৃতি। তারপর গ্রাম বাংলার পটভূমিকায় রচিত (রচনা: স্বপ্না সেনগুপ্ত) 'উষা হতে সন্ধ্যা' নৃত্যনাট্য ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের প্রযোজনায় ও নৃত্যাবিদ নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নির্দেশনায় অনুষ্ঠিত হয়। বিমল সাহার ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়েছিল। কৃষ্ণা রায়ের নৃত্যশৈলী প্রশংসাধন্য ছিল। অন্যান্য শিল্পীরা হলেন, পাপড়ি বোস, তন্দ্রা রায়, স্বপ্না সেনগুপ্ত, অনুপশংকর, নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কানাই মজুমদার, রঞ্জনা রায়, অঞ্জনা ব্যানার্জি প্রভৃতি। জে সি গাঙ্গুলির অক্লান্ত পরিশ্রমে অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দররূপে পরিবেশিত হয়।

শতবর্ষের অভিনয়-ধারা : বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ পূর্তির পরিপ্রেক্ষিতে গত একশ বছরের আদি, মধ্য, নব এবং আধুনিক, এই চার যুগের অভিনয়ধারা একটি মনোজ্ঞ আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করেন মন্মথ রায়, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ, কালীকিংকর সেনগুপ্ত, অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুশীল মুখোপাধ্যায়, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ দাশগুপ্ত, ধীরেন মল্লিক ও রবীন্দ্র মৈত্র।

আনন্দ মন্দিরের সম্পাদিকা কল্পনা দে ও সহ-সভাপতি কেশব দে স্বাগত ও সমাপ্তি ভাষণ দেন। ২৬ নভেম্বর সন্ধ্যায় স্বর্গত ডাক্তার যতীন্দ্র মৈত্রের গৃহপ্রাঙ্গণে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সোদপুরে নতুন সাংস্কৃতিক সংস্থা : 'মোনালিসা', সোদপুর (২৪ পরগণা) সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্বোধনী উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ২ ডিসেম্বর, সোদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথি [illegible] শান্তশীল দাশ। সংগীতে অংশ গ্রহণ [illegible] মুখোপাধ্যায়, অশোক ভট্টাচার্য ও আরো অনেকে। মূকাভিনয়ে ছিলেন কমলেশ ভট্টাচার্য, হাস্যকৌতুকে ছিলেন সুবোধ মুখোপাধ্যায় এবং সবশেষে 'ক্রান্তি-কাল' (সোদপুর) নাট্যসংস্থা কর্তৃক 'জোয়ার' নাট্যাভিনয়।

পথিক গোষ্ঠী :

সংস্কৃতি চর্চায় সুদূর গ্রামবাংলাও [illegible] পিছিয়ে নেই, কুলপীস্থ 'পথিক' সৌখীন নাট্যসংস্থা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত 'দশম বার্ষিক মিলনোৎসব অনুষ্ঠানে তারই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। গত ১২ নভেম্বর স্থানীয় প্রেক্ষাগৃহে গোষ্ঠীর সভ্যরা তাদের দশম বার্ষিক মিলনোৎসবে বিচিত্রানুষ্ঠানের পর সুদীপ্তকুমার রায়ের একাঙ্ক নাটক ইরম্মদ ও সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শেষ থেকে শুরু' এ নাটক দুটি বাণীপ্রসাদের সুপরিচালনার বিশেষ সাফল্যের সংগে মঞ্চস্থ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বিধানসভার সদস্য সন্তোষকুমার মন্ডল, স্থানীয় বি ডি ও তপনেশ্বর হালদার এবং ই ও এস ই সাজিমুদ্দিন মল্লিক ভাষণ দেন। নাটক

ই-পি-এস স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব (দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ে) প্রযোজিত 'কাদম্বরী' নাটকের একটি উত্তাপঘন মুহূর্ত।

দুটিতে বিভিন্ন চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেন—রঞ্জন হালদার, আনন্দ মন্ডল, নির্মল প্রামাণিক, প্রদীপ চক্রবর্তী, অপূর্ব ঘোষ, পঞ্চম কোটাল, অমলেন্দু তরী, মিহির হালদার, সুরথ নস্কর, মদন হালদার, শিশির চক্রবর্তী, পঞ্চানন হালদার, মৃগাংক রাজ, মাঃ তনু, নিরঞ্জন দাস, দিলীপ চক্রবর্তী, দুলাল হালদার, রামচন্দ্র দাস, কুমারী আলোরাণী এবং সমীরণ চক্রবর্তী। নাটক দুটির প্রয়োগনৈপুণ্য, প্রত্যেকটি শিল্পীর চরিত্রানুগ প্রাণবন্ত অভিনয় বিশেষ দক্ষতা ও প্রশংসার দাবী রাখে।

মল্লিক ভবনে বাঙলা সাধারণ নাট্যশালার শতবর্ষপূর্তি উৎসব

গেল ৭ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার বৈকাল ৫টায় 'বাংলা সাধারণ নাট্যশালা শতবর্ষপূর্তি উৎসব সমিতি'র উদ্যোগে জোড়াসাঁকোর যে বাড়ীর উঠানে ঠিক একশো বছর আগে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' সাধারণের কাছে টিকিট বিক্রি করে বাঙলা সাধারণ নাট্যশালার উদ্বোধন করেন, সেই বাড়ীর (বর্তমানে মল্লিক ভবন নামে পরিচিত) সেই উঠানের এক অংশে প্রথমে একটি প্রীতি সম্মেলন ও পরে 'নীলদর্পণ' অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে একশোটি প্রদীপের প্রথমটি প্রজ্জ্বলিত করেন সম্মেলনের উদ্বোধক তুষারকান্তি ঘোষ। সকল প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হবার সংগে সংগে উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীঘোষ বাঙলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের আদিপর্ব, সেই সময়ে মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ তথা অমৃতবাজার পত্রিকার ন্যাশনাল থিয়েটারের সংগে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, শিশিরকুমারের উদ্যমে গিরিশচন্দ্রের ন্যাশনাল থিয়েটারে যোগদান প্রভৃতি থেকে শুরু করে যুগ-পরিবর্তনের উল্লেখের পরে প্রশ্ন তোলেন, এই একশো বছরের মধ্যে বাঙালীর গর্ব করবার মতো একটি সর্বাধুনিক (টপ গ্রেড) রঙ্গশালা প্রতিষ্ঠিত হয়নি কেন? এবং থিয়েটার চালাতে গিয়ে বাঙালী বারংবার হেরেই বা যাচ্ছে কেন? অবাঙালীর হাতেই থিয়েটার হস্তান্তরিত হয় কেন? প্রধান অতিথিরূপে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেন : ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র বাঙালীই গর্ব করতে পারে, তাদের সাধারণ রঙ্গশালা একশো বছর অতিক্রম করবার গৌরব অর্জন করেছে। কুড়ি বাইশ বছর আগেও কলকাতা ছিল নাটক অভিনয়ের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য। আজ দিল্লী, বোম্বাই প্রভৃতি শহরে নাটক মঞ্চস্থ করা হচ্ছে। নাট্যাভিনয়ের মূল উদ্দেশ্য নাকি আনন্দ বিতরণ করা। কিন্তু আমি আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলতে চাই, রঙ্গমঞ্চই দেয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে সংগ্রামের প্রেরণা। মঞ্চ হচ্ছে সমাজদর্পণ। স্বাধীনতার প্রেরণা যুগিয়েছে রঙ্গমঞ্চ ও সংবাদপত্র। আজ নাটক মঞ্চ ছেড়ে রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছে। সভাপতির ভাষণে প্রবীণ নাট্যকার মন্মথ রায় বলেন, আমাদের সাধারণ রঙ্গমঞ্চ দেশের ও সমাজের প্রভূত উপকার করেছে, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছে, প্ররোচিত করেছে। আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেছি বটে, কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এখনও আসেনি, আমাদের জীবনযন্ত্রণা, বেকারি এখনও অব্যাহত। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' থেকে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা নাটকে প্রতিফলিত হতে শুরু করেছে এবং এই ধারা আজ বহু নাটকের মাধ্যমে প্রবাহিত। আমাদের মনে রাখতে হবে, সকল আর্টের বড়ো হচ্ছে বাঁচার আর্ট। সেই আর্ট আজ মঞ্চে প্রতিফলিত হোক। সম্পাদকীয় বিবৃতির পরে সভার কার্য শেষ হয়।

সভা সমাপ্ত হবার কিছু পরে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ শতবর্ষপূর্তি উৎসব

সমিতি মঞ্চস্থ করেন দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'—সেই বিশেষ নাটকটি, যা দিয়েই ওই উদ্যানেই একশো বছর আগে বাঙলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের দ্বারোদ্ঘাটন হয়েছিল। সেই বিশেষ দিনটিকে বিশেষভাবে মনে পড়াবার জন্যে উদ্যোক্তারা পাদপ্রদীপ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন গ্যাসের আলো এবং যুগোপযোগী সাজসজ্জা ও দৃশ্যপট। শুধু তাই নয়। ওঁরা স্ত্রী-ভূমিকাতে তখনকার মতো পুরুষদের অবতরণ করিয়েছিলেন। সুষ্ঠুভাবে বিচার করে দেখলে প্রতিকৃতির উদ্যম প্রায়ই সার্থক হয়েছিল। পুরোনো দিনের অভিনয়ধারাকে অনুসরণ করেও অধিকাংশ শিল্পীই—এমন কি স্ত্রী-ভূমিকার অভিনেতারাও দর্শকদের তুষ্টিবিধান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মূল নাটককে প্রায় অবিকৃত রেখে যৎসামান্য কাটছাঁট করেও সারা অভিনয়টি এমন ক্ষিপ্রতার মধ্যে সমাপ্তির দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়, যা উপস্থিত সকলকেই বিস্ময়াবিষ্ট করে।

রবীন্দ্র সদনে বাঙলা সাধারণ নাট্যশালার শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে নাট্যোৎসব

রবীন্দ্রসদন কর্তৃপক্ষ বাঙলা সাধারণ নাট্যশালার শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে চারটি পর্যায়ে নাট্যোৎসবের যে আয়োজন শুরু করেছিলেন গেল বছর ৭ ডিসেম্বরে, এ-বছরের ৭ ডিসেম্বরে তার চতুর্থ ও শেষ পর্যায় আরম্ভ হয়েছে। ঐদিন সন্ধ্যায় স্বরাষ্ট্রবিভাগীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের উদ্বোধনী ভাষণের পরে তৃতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। শিক্ষামন্ত্রী মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতি হিসাবে ভাষণের সঙ্গে সঙ্গে সভার সমাপ্তি ঘোষণা হয়। এর দশ মিনিট পরে রবীন্দ্রসদনের কর্মীবৃন্দ ও পরিচালকমণ্ডলীর মিলিত প্রচেষ্টায় 'নীলদর্পণ' নাটকটি অভিনীত হয়। লব্ধপ্রতিষ্ঠ নট-নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য নাটকটির সম্পাদনা ও পরিচালনা করেন। বর্তমান দশকের দর্শকবৃন্দের প্রতি লক্ষ্য রেখে নাটকের সংলাপকে আরও বোধগম্য এবং সমগ্র নাট্যক্রিয়াকে আরও সংঘবদ্ধ ও গতিশীল করবার সুযোগ গ্রহণ করা উচিত ছিল নাটকটির সম্পাদনার সময়ে। ধরুন, কুঠির গুদামঘরে বন্দী তোরাপ প্রভৃতি রায়তদের দৃশ্যটিতে ভাষাকে আরও সরলীকৃত এবং দৃশ্যটিকে আরও সংক্ষেপিত করার প্রয়োজন ছিল। মঞ্চোপস্থাপনায় কল্পনাশক্তির বিচিত্র বিকাশ প্রশংসনীয় এবং প্রশংসনীয় অধিকাংশ ভূমিকাতেই শিল্পীদের অভাবনীয় সাফল্য। আশ্চর্য নাটনৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন ক্ষেত্রমণির ভূমিকায় কল্যাণী রায়, উড সাহেবের ভূমিকায় সমীর লাহিড়ী এবং পদি ময়রাণীর বেশে গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের অভিনয় যে-কোনও প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর সমকক্ষ। এঁদের পরেই নাম করতে হয় সাবিত্রী, আদুরী, রেবতী, সাধুচরণ, তোরাপ, নবীনমাধব, আমিন, বন্দী মোক্তার, গোপীনাথ ও দীনু মণ্ডলের ভূমিকায় যথাক্রমে তপতী রায়, আরতি মৈত্র, অমলাশঙ্কর, সন্তু মুখোপাধ্যায়, তপন চক্রবর্তী, দিলীপ চৌধুরী, অনিল দে, বিমল চট্টোপাধ্যায়, বারীন বসু ও তপেন চট্টোপাধ্যায়ের। অন্যান্য ভূমিকা চলনসই। মঞ্চসজ্জা এবং আলোকসম্পাত নাটকাভিনয়কে একটি বিশিষ্ট মর্যাদা-মণ্ডিত করেছে। যখন মনে করা যায় যে, এই দুরূহ নাটকটির প্রযোজনাতে মাত্র রবীন্দ্রসদনের কর্মী ও সদস্যরাই অংশগ্রহণ করেছেন, তখন বিস্মিত হতে হয় নাট্য-পরিচালক বিজন ভট্টাচার্যের অভিনয়-শিক্ষা ও পরিচালনগুণের এ-হেন পরিচয় লাভ করে। আশা করব, রবীন্দ্রসদন 'নীলদর্পণে'র কয়েকটি পুনরভিনয় করে অগণন নাট্যামোদীদের এটি দেখবার সুযোগ দেবেন।

স্টারে 'সাধারণ নাট্যশালার শতবর্ষপূর্তি' উপলক্ষ্যে আয়োজিত আনন্দানুষ্ঠানের পরিণতি

কথা ছিল, ৭ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার, বেলা ৪টায় স্টার থিয়েটার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আয়োজিত আনন্দানুষ্ঠানটি শুরু হবে। যথাসময়ে পৌঁছে দেখা গেল, প্রচুর জন-সমাগম,—মাননীয় অতিথি, অভ্যাগত পুরাতন যুগের শিল্পী, দর্শকের উপস্থিতি। কিন্তু প্রেক্ষাগারের দ্বার খোলা হয়নি, আলো জ্বলেনি। প্রাঙ্গণে লক্ষ্য করা গেল, স্টারের কর্মীদের জটলা। কে একজন তাঁদের কাছে যেন মিনতি করছেন, সহযোগিতা প্রার্থনা করছেন। কিন্তু কর্মীরা অনড়, অটল। অতঃপর প্রথমে দৃঢ় নিম্নকণ্ঠে এবং ক্রমে উচ্চ থেকে উচ্চগ্রামে শ্লোগান উঠল : বন্দে মাতরম্, ইন্দিরা গান্ধী যুগ যুগ জিও, মালিকের কালো হাত ভেঙে দাও।—অর্থাৎ স্টারের অসন্তুষ্ট কর্মীরা ঐ বিশেষ দিনটির বিশেষ অনুষ্ঠানটিকে পণ্ড করতে বদ্ধপরিকর, দৃঢ়সংকল্প।

তবু মঞ্চের ওপর বাতি জ্বালিয়ে বিগত যুগের শিল্পীদের সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল। কিছু বক্তৃতাও। রাজ্য শিক্ষা-মন্ত্রীর বক্তৃতার সময়ে নানারকম অভদ্র সম্বোধন ও বিরূপ মন্তব্যসহ কিছু লোককে মঞ্চের দিকে অগ্রসর হতেও দেখা যায়। অতঃপর মন্ত্রীমহাশয় বক্তৃতাকে সংক্ষিপ্ত করে তৎপরভাবে বিদায় গ্রহণ করেন। এবং ঐদিন অভিনয়াদিও সম্ভব হয়নি।

স্টার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কর্মীদের প্রচুর অভিযোগ থাকতে পারে এবং তাঁদের তরফ থেকে ক্ষোভ প্রদর্শন ও রীতিও নীতিবিরুদ্ধ নয়। কিন্তু পরিস্থিতি অনুযায়ী ক্ষোভ প্রদর্শনের রূপটা পরিবর্তন করতে হয়, এ জ্ঞান, বোধকরি, তাঁদের নেই। আমরা যদি বিক্ষুব্ধ কর্মী হতুম, আমরা ক্ষোভজ্ঞাপক বিশেষ ব্যাজ ধারণ করে ঐ বিশেষ অনুষ্ঠানটি যথারীতি হতে দিতুম এবং নিয়মের অতিরিক্ত করে ঐ বিষয়ে সহযোগিতা করতুম। উপস্থিত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শর্ত থাকত, সকলের বক্তৃতার শেষে আমাদের প্রতিভূ আমাদের অভিযোগটিকে সভাতে ভদ্র ও সংযতভাবে ব্যক্ত করতে পাবেন। কর্মীদের প্রতিনিধি কর্তৃক সভার মাঝে অভিযোগ পেশকে কারুরই বন্ধ করবার সাধ্য থাকে না, এটা জানা কথা। কাজেই এইভাবে ঐদিন ক্ষোভ প্রদর্শিত হলে স্টারের কর্মীরা উপস্থিত সজ্জনমণ্ডলীর সহানুভূতি আদায় করতে পারতেন ঢের অধিক পরিমাণে এবং তাদের অভিযোগ ও দাবি সংবাদপত্র মারফতও যথেষ্ট প্রচারিত হতে পেত। কিন্তু নির্ভুল পন্থাটি বাতলে দেবার নেতৃত্বের অভাবে স্টারের কর্মীরা সেদিন এমন একটা কাণ্ড করলেন, যা ঐখানে উপস্থিত সুধিজনের সমর্থনলাভে বঞ্চিত হল এবং জাতীয় উৎসবটিকে করল পণ্ড।

মুক্তি পথে : 'নিশিকন্যা'

শতরূপা পিকচার্সের প্রথম চিত্রার্ঘ্য বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে গৃহীত 'নিশিকন্যা'র চিত্রগ্রহণের কাজ আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় শেষ হয়ে গেছে। এখন ছবিখানি সম্পাদক অরবিন্দ ভট্টাচার্যের টেবিলে। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। সুর দিয়েছেন সুধীন দাশগুপ্ত। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও মিঠু মুখোপাধ্যায় ছবির নায়ক-নায়িকা। অন্যান্য চরিত্রে আছেন—তরুণকুমার, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা গুহঠাকুরতা প্রভৃতি। রামানন্দ সেনগুপ্ত চিত্রগ্রহণের দায়িত্বে ছিলেন এবং নৃত্য পরিচালনায় শক্তি নাগ। নেপথ্যকণ্ঠে : মান্না দে, আশা ভোঁসলে, রুমা গুহঠাকুরতা। শতরূপা ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স ছবিখানির পরিবেশক।

একটি সংশোধন

গত ২২ অগ্রহায়ণ তারিখের ৩১ সংখ্যা 'অমৃতে'র সম্পাদকীয় 'বাংলা রঙ্গালয়ের শতবর্ষ' নিবন্ধের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে 'নীলদর্পণ' নাটকাভিনয় উল্লেখের পরেই অবশিষ্ট লাইন কটি স্থানচ্যুত হয়ে মুদ্রিত হওয়ায় একটি বিষয় পাঠকদের কাছে বিভ্রান্তিকর মনে হতে পারে। উক্ত অনুচ্ছেদে লেখা আছে 'প্রথম রজনীতে বক্স আসনের টিকিটের দাম ছিল আট সিক্কা টাকা, গ্যালারি চার সিক্কা টাকা'...ইত্যাদি। এই অনুচ্ছেদের মন্তব্য প্রথম অনুচ্ছেদে উল্লিখিত লেবেডেফের প্রথম নাটক 'কাল্পনিক সংবদল' অভিনয় সম্পর্কেই প্রাসঙ্গিক 'নীলদর্পণ' সম্পর্কে নয়। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

—সম্পাদক, অমৃত

হাওড়া-স্টেশনে সন্তোষ ট্রফিসহ বাংলা দলের খেলোয়াড়বৃন্দ

খেলাধূলা

দর্শক

সন্তোষ ট্রফি

গোয়াতে আয়োজিত ২৯তম জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় ফাইনালে গতবারের বিজয়ী বাংলা ৪—১ গোলে তামিলনাড়ুকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে সন্তোষ ট্রফি জয়ী হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, বাংলা এই নিয়ে ২৩-বার ফাইনালে খেলে ১৪-বার সন্তোষ ট্রফি পেল। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সর্বাধিকবার ফাইনালে খেলার এবং সর্বাধিকবার সন্তোষ ট্রফি জয়ের রেকর্ড বাংলা দলেরই। অপরদিকে তামিলনাড়ুর পক্ষে এই প্রথম ফাইনালে খেলা।

একদিকের সেমি-ফাইনালে বাংলা ২—২, ০—০ ও ৩—২ গোলে (চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য পেনাল্টি কিকের সাহায্যে) গোয়াকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল। অপরদিকের সেমি-ফাইনালে তামিলনাড়ু ২—২ ও ২—০ গোলে মহীশূরের বিপক্ষে জিতেছিল।

ফাইনালের প্রথমার্ধের খেলায় বাংলা ২—০ গোলে এগিয়েছিল। দ্বিতীয়ার্ধে তামিলনাড়ু আরও ২টো গোল খাওয়ার পর খেলা শেষ হওয়ার ৫ মিনিট আগে একটা গোল শোধ দেয়। এখানে উল্লেখ্য, লীগ পর্যায়ের খেলায় বাংলা ৫—০ গোলে তামিলনাড়ুকে হারিয়েছিল।

লীগ পর্যায়ের খেলা

আলোচ্য প্রতিযোগিতার লীগ পর্যায়ের খেলায় চ্যাম্পিয়ান এবং রাণার্স-আপ হওয়ার সুবাদে 'এ' গ্রুপ থেকে বাংলা ও তামিলনাড়ু এবং 'বি' গ্রুপ থেকে মহীশূর ও গোয়া দল প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছিল।

'এ' গ্রুপের লীগের খেলায় গতবারের সন্তোষ ট্রফি বিজয়ী বাংলা ৯ পয়েন্ট সংগ্রহ করে লীগ তালিকায় শীর্ষস্থান পায় এবং তামিলনাড়ু ৮ পয়েন্ট পেয়ে রাণার্স-আপ হয়।

'বি' গ্রুপের লীগের খেলায় শীর্ষস্থান লাভ করে মহীশূর এবং মহীশূরের সমান ৮ পয়েন্ট সংগ্রহ করে রাণার্স-আপ হয় গোয়া। তাদের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে গোল সংখ্যাও সমান ৭ এবং ১ দাঁড়ায়।

'এ' গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান বাংলা ৫—০ গোলে তামিলনাড়ু, ৩-০ গোলে মহারাষ্ট্র, ৩-১ গোলে রাজস্থান ও ৫-০ গোলে কাশ্মীরকে পরাজিত করে এবং কেরালার সঙ্গে ১-১ গোলে খেলা ড্র করে।

'বি' গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান মহীশূর ২-০ গোলে আসাম, ২-০ গোলে অন্ধ্র এবং ২-০ গোলে গতবারের রাণার্স-আপ রেলওয়েকে পরাজিত করে। গোয়ার বিপক্ষে ১-১ গোলে এবং পাঞ্জাবের বিপক্ষে গোলশূন্যভাবে মহীশূরের খেলা ড্র হয়।

'এ' গ্রুপ

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
বাংলা	৫	৪	১	০	১৭	২	৯
তামিলনাড়ু	৫	৪	০	১	১০	৬	৮
কেরালা	৫	৩	১	১	১৮	৩	৭
মহারাষ্ট্র	৫	২	০	৩	১২	৯	৪
রাজস্থান	৫	১	০	৪	১০	২২	২
কাশ্মীর	৫	০	০	৫	২	২৮	০

'বি' গ্রুপ

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
মহীশূর	৫	৩	২	০	৭	১	৮
গোয়া	৫	৩	২	০	৭	১	৮
পাঞ্জাব	৫	২	৩	০	৮	১	৭
রেলওয়ে	৫	২	০	৩	৮	৭	৪
অন্ধ্র	৫	১	১	৩	৩	৮	৩
আসাম	৫	০	০	৫	১	১৬	০

সুব্রত কাপ

সর্বভারতীয় স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে কলকাতার পাইকপাড়া কুমার আশুতোষ ইনস্টিটিউট ২-০ গোলে গত বছরের বিজয়ী দেরাদুনের গোর্খা বয়েজ কোম্পানী দলকে পরাজিত করে দ্বিতীয়বার সুব্রত মুখার্জি কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে। তারা প্রথম কাপ জয়ী হয় ১৯৬৮ সালে।

আলোচ্য বছরের ফাইনাল খেলার শেষ তিন মিনিটে বিজয়ী দলের পক্ষে গোল দুটি দেন কার্তিক চৌধুরী এবং মিহির সরকার। খেলার প্রথমার্ধে কুমার আশুতোষ স্কুল এবং দ্বিতীয়ার্ধে গোর্খা বয়েজ স্কুল আধিপত্য বিস্তার করে খেলেছিল।

ফাইনালে বাংলার জয়লাভের তালিকা

বছর	বিজয়ী	বিজিত	গোল	স্থান
১৯৪১	বাংলা	দিল্লী	৫—১	কলকাতা
১৯৪৫	বাংলা	বোম্বাই	২—০	বোম্বাই
১৯৪৭	বাংলা	বোম্বাই	০—০, ১—০	কলকাতা
১৯৪৯	বাংলা	হায়দরাবাদ	৫—০	কলকাতা
১৯৫০	বাংলা	হায়দরাবাদ	১—০	কলকাতা
১৯৫১	বাংলা	বোম্বাই	১—০	বোম্বাই
১৯৫৩	বাংলা	মহীশূর	০—০, ৩—১	কলকাতা
১৯৫৫	বাংলা	মহীশূর	০—০, ১—০	এর্নাকুলাম
১৯৫৮	বাংলা	সার্ভিসেস	১—০	মাদ্রাজ
১৯৫৯	বাংলা	বোম্বাই	৩—১	নওগাঁ
১৯৬২	বাংলা	মহীশূর	২—০	বাঙ্গালোর
১৯৬৯	বাংলা	সার্ভিসেস	৬—১	নওগাঁ
১৯৭১	বাংলা	রেলওয়ে	৪—১	মাদ্রাজ
১৯৭২	বাংলা	তামিলনাড়ু	৪—১	গোয়া

কোচবিহার কাপ

সর্বভারতীয় স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতার (কোচবিহার কাপ) পূর্বাঞ্চলের ফাইনালে বাংলা ১ম ইনিংসে বেশী রান করার সুবাদে উড়িষ্যাকে হারিয়ে উপর্যুপরি দু' বছর পূর্বাঞ্চলের চ্যাম্পিয়ান হয়েছে।

প্রথম দিনে উড়িষ্যার ১ম ইনিংস মাত্র ৬৮ রানের মাথায় শেষ হলে বাকি সময়ে বাংলা দুটো উইকেটের বিনিময়ে ১৩৪ রান সংগ্রহ করে ৬৬ রানে এগিয়ে যায়।

দ্বিতীয় দিনে বাংলার ১ম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৪৭৭ (৫ উইকেটে)। বাংলার অধিনায়ক উদয়ভানু ব্যানার্জি ১০৬ রান (বাউন্ডারী ১৫ ও ওভার বাউন্ডারী ১) করে খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। প্রবীর চেল করেন ১০১ রান (বাউন্ডারী ১৪)।

তৃতীয় দিনে বাংলা ১ম ইনিংসের ৫৪১ রানের (৮ উইকেটে) মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে ৪৭৩ রানে এগিয়ে যায়। তৃতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় উড়িষ্যার ২য় ইনিংসের ৮টা উইকেট পড়ে ১৩৯ রান উঠেছিল।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

উড়িষ্যা : ৬৮ রান (বি নাগ ১৯ রান। উদয়ভানু ১২ রানে ৬ এবং বর্মণ ২২ রানে ৩ উইকেট)

ও ১৩৯ রান (৮ উইকেটে। এস সাহু নট আউট ৫৯ রান। বরুণ বর্মণ ১৬ রানে ৪ উইকেট)

বাংলা : ৫৪১ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। উদয়ভানু ব্যানার্জি ১০৬ (অবসর), প্রবীর চেল ১০১, সৌরভ বসু ৫১, অমিত চক্রবর্তী ৫৯ এবং সুবীর ভট্টাচার্য নট আউট ৫৫ রান। এস জী ১৫৩ রানে ৪ উইকেট)

ভারত সফরে এম সি সি

হায়দরাবাদের লালবাহাদুর শাস্ত্রী স্টেডিয়ামে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের প্রেসিডেন্ট একাদশ দলের বিপক্ষে এম সি সি-র ভারত সফরের প্রথম খেলাটি ড্র গেছে।

প্রথম দিনে বোর্ডের প্রেসিডেন্ট একাদশের ১ম ইনিংসের ৪টে উইকেট পড়ে ২৩৭ রান উঠেছিল। ১ম উইকেটের জুটিতে সুনীল গাভাস্কার এবং রামনাথ পার্কার ১১৫ মিনিটে ১০০ রান তুলেছিলেন এবং ২য় উইকেটের জুটিতে গাভাস্কার এবং চৌহান তুলেছিলেন ৯০ রান। নিস্তেজ উইকেট থেকে এম সি সি-র বোলাররা কোনরকম সুবিধা পাননি। বোর্ড একাদশ দলের অধিনায়ক মনসুর আলী খাঁ ব্যক্তিগত কোন রান করার আগেই কোট্টামের বলে 'ক্যাচ' তুলে এম সি সি-র ২নং উইকেট-কিপার টলচার্ডের হাতে ধরা দেন। টলচার্ড বাঁদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মাটি থেকে কয়েক ইঞ্চি উপরের বলটি হাতাতে লুফে নিলে দর্শকরা অজস্র করতালি দিয়ে তাঁকে তারিফ করেন।

দ্বিতীয় দিনে বোর্ডের প্রেসিডেন্ট একাদশ দল ৩১৭ রানের মাথায় (৫ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করলে খেলার বাকি সময়ে এম সি সি তাদের ৩টে উইকেট খুইয়ে ১৯৬ রান সংগ্রহ করেছিল। প্রথম উইকেট জুটিতে মাইক ডেনেশ (৯৫ রান) এবং ডেনিশ অ্যামিস (৮১ রান) ১৮০ রান তুলেছিলেন। মাত্র ৫ রানের জন্যে ডেনেশ তাঁর শত রান পূর্ণ করতে পারেন নি।

তৃতীয় অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে এম সি সি ৩২১ রানের (৭ উইকেটে) মাথায় তাদের প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে এবং খেলার বাকি সময়ে বোর্ডের প্রেসিডেন্ট একাদশ দলের ২য় ইনিংসের খেলায় ২টি উইকেট পড়ে ৮৪ রান উঠেছিল।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

প্রেসিডেন্ট একাদশ : ৩১৭ রান (৫ উইঃ ডিক্লেঃ। গাভাস্কার ৮৬, পার্কার ৫১, চৌহান ৫৩ এবং মানকাদ নট আউট ৬০ রান। কোট্টাম ৫৫ রানে ২ উইঃ।)

ও ৮৪ রান (২ উইকেটে। চৌহান নট আউট ৫৬ রান)

এম সি সি : ৩২১ (৭ উইকেটে ডিক্লেঃ। ডেনেস ৯৫ এবং অ্যামিস ৮১ রান)

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

না কখনো ছিল, না পাবেন—এমন
সাদা
সাবানের তুলনায়
১½ গুণ
বেশী কাপড় ধোয়
সাবানের তুলনায় অর্ধেক
মেহনত—দু'গুণ পরিষ্কার—
তা সে জল যে ধরণেরই হোক।
NEW!
det
detergent washing cake
ডেট কেক

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনমতেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষর লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য অমৃত কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে অমৃত কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে অমৃত কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫.০০	টাকা ৩০.০০
ষান্মাসিক	টাকা ১২.৫০	টাকা ১৫.০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬.২৫	টাকা ৮.০০

বিঃ দ্রঃ—উৎপাদন শুল্কের হার
(চাঁদার সহিত অবশ্য প্রেরণীয়)

বার্ষিক	টাকা	১.০৫
ষান্মাসিক	টাকা	০.৫২
ত্রৈমাসিক	টাকা	০.২৬

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১২শ বর্ষ
৩য় খণ্ড

৩৩ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক—২ পয়সা
মোট ৫২ পয়সা

Friday 22nd December, 1972 শুক্রবার, ৭ পৌষ, ১৩৭৯ .52 Paise

এক নজরে

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি : একদা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে এদেশে প্রবল আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। বাঙালীর ঘরে ঘরে ভাই-বোনকে এক রাখার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বাংলার নগরে, জনপদে, গ্রামে, গঞ্জে, অগণিত সভা-শোভাযাত্রা হয়েছিল সেদিন। আর সে প্রার্থনা যথাস্থানে পৌঁছেছিল বলেই বোধহয় বঙ্গ সাত বছর ভঙ্গ থাকার পর আবার যুক্ত হয়েছিল। ঐ সংযুক্তির পঁয়ত্রিশ বছর পরে আবার বঙ্গবাসীদের দাবীতেই বঙ্গভূমি দ্বিখণ্ডিত হল। আর ঘটনা পরম্পরা এমন খাতে বইল যে, শেষ পর্যন্ত খণ্ডিত বঙ্গের একাংশের জাতীয় সঙ্গীত হল এমন একটি গান যা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের দিনে মিলিত বঙ্গের সাধনায় রচিত হয়েছিল।

বছর দুই আগে তেলেঙ্গানার স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবী তেলেঙ্গানা অঞ্চলে যথেষ্ট জোরদার হলেও বিশাল অন্ধ্রের অনমনীয় মনোভাবের কাছে তাদের শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে হয়। সেদিন বিশাল অন্ধ্রের দাবীদাররা অন্ধ্র মাতার জয়গান করে কোন সঙ্গীত রচনা করেছিলেন কিনা জানি না। কিন্তু দু বছর না যেতেই মুলকী আইনের অতর্কিত শরাঘাতে এমনই এক অভাবিতপূর্ব পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে অন্ধ্রে যে, এখন বৃহৎ অন্ধ্রের দাবীদাররাই অন্ধ্র বিভাগের দাবী তুলেছেন। মুলকী আইনের জোরে তেলেঙ্গানা অঞ্চলের লোকেরা যে চাকরীর ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা পাওয়ার অধিকারী তা তেলেঙ্গানাবহির্ভূত অন্ধ্র অঞ্চলের অধিবাসীরা মানতে রাজি নন। রাজ্যের রাজধানী হায়দরাবাদ তেলেঙ্গানা অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় তেলেঙ্গানাবহির্ভূত অন্ধ্রবাসীদের অসুবিধা হয়েছে সব চেয়ে বেশী। সুতরাং এবার পদত্যাগের হুমকী, আন্দোলনের শাসানি এবং তেলেঙ্গানাকে অন্ধ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করার দাবী তাদের পক্ষ থেকেই উঠছে যারা দু বছর আগে তেলেঙ্গানার বিচ্ছিন্নতার দাবীকে নস্যাৎ করে বলেছিল অন্ধ্র এক ও অবিচ্ছেদ্য। দেখা যাচ্ছে যে, মাটিকে আমরা মা'টি বলে যত ভাবাবেগই প্রকাশ করি না কেন, মানুষের স্বার্থ ও প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক বড়। সে প্রয়োজনে ভিটে ভাগ হতে খুব বেশী সময় লাগে না।

সমৃদ্ধির হিসাব : ভারতের বৃহৎ শিল্পের সমাবেশ বলতে গেলে তার উপকূলবর্তী কয়েকটি রাজ্যেই সীমিত। গুজরাত, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যে বৃহৎ শিল্প আছে তা প্রায় অনুল্লেখ্য। বিহার, উত্তরপ্রদেশে তবু বহু চিনির কল আছে। সেদিক থেকে পাঞ্জাব ও হরিয়ানার হিসাবের ঘর প্রায় শূন্য। অথচ দেখা যাচ্ছে যে, মাথাপিছু আয়ের হিসাবে পাঞ্জাব ও হরিয়ানাই এখন ভারতের সর্বাধিক সমৃদ্ধ দেশ। চলতি বাজার দরের হিসাবে পাঞ্জাবের অধিবাসীদের এখন মাথাপিছু আয় বছরে ৯৪৫ টাকা (১৯৬০-৬১ সালের বাজার দরের হিসাবে ৪৭০ টাকা)। হরিয়ানার ঐ সংখ্যা দুটি যথাক্রমে ৭৮৮ টাকা ও ৪৪০ টাকা। দরিদ্র রাজ্যগুলির মধ্যে ওড়িশার চলতি আয় ৩২৫ টাকা ও ১৯৬০-৬১ সালের বাজার দরের হিসাবে ২৪৯ টাকা। বিহারের ঐ দুটি সংখ্যা হল ৪২০ ও ২১৬ টাকা। ত্রিপুরার ৪৫৯ ও ২৪৫ টাকা। মণিপুরের ৪৭৬ ও ২০৭ টাকা।

চলতি বাজার দর অনুসারে অন্য রাজ্যগুলির আয়—অন্ধ্র—৫৪৫, মধ্যপ্রদেশ—৫৫৪, মহারাষ্ট্র—৭৭৮, মহীশূর—৫৩২, তামিলনাড়ু—৬৪৪, উত্তরপ্রদেশ—৫০৪, পশ্চিমবঙ্গ—৫২৪, আসাম—৫৪৫, গুজরাত—৫৬৭, হিমাচল প্রদেশ—৫[illegible], রাজস্থান—৪৮০, কেরল—৫২৬, জম্মু ও কাশ্মীর—[illegible]১০। দেখা যাচ্ছে যে, বৃহৎ পুঁজির কৃপায় বা সংখ্যাতত্ত্বের মারপ্যাঁচে দেশের সমৃদ্ধি হয় না। সাফল্যের ব্যাপারে শ্রমনিষ্ঠার কোন বিকল্প নেই।

গণবিবাহ : গণবিবাহ এদেশেও প্রচলিত আছে। বিহার, ওড়িশা বা দাক্ষিণাত্যে অনেক সময় এক গ্রামের সব বালকের সঙ্গে আর এক গ্রামের সব বালিকার বিবাহ হতে দেখা যায়। একটি মুক্ত প্রাঙ্গণে একদিকে সারবন্দী হয়ে ছেলেরা বসে আর একদিকে বসে মেয়েরা। মধ্যস্থলে একটি হোমানল প্রজ্বলিত হয় এবং এক পণ্ডিতজী এক মন্ত্রে কয়েক জন দম্পতিকে পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ করেন। কিন্তু এ ব্যাপারটা অনেকটা বাগদান অনুষ্ঠানের মতো। কারণ ঐ বিবাহের পর কোন বালিকা বধূই তার বালক স্বামীর ঘর করতে যায় না। পরে যখন তার যৌবন আসে তখন আর একবার 'গাওনা' অনুষ্ঠান হয় এবং তখনই বস্ত্র ও অলঙ্কার দিয়ে সজ্জিতা বধূকে ঘরে আনা হয়।

মেকসিকোর কদিন আগে যে গণবিবাহ হয়ে গেল তা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। প্রায় ৯০,০০০ দম্পতি সেদিন দেশের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি বিবাহ বাসরে যোগ দিতে এসেছিল তাদের সন্তান-সন্ততি এমন কি বহুজন পৌত্র-পৌত্রীকে নিয়ে। মেকসিকোর প্রেসিডেন্টের পত্নী শ্রীমতী লুই ইকেবেরিয়ার উদ্যোগে দেশব্যাপী ঐ গণবিবাহের আয়োজন হয়। যারা দারিদ্র্য অথবা অশিক্ষার জন্য ধর্ম অথবা আইনসম্মতভাবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে নি অথচ দশ-বিশ কি ত্রিশ বছর ধরে স্বামী-স্ত্রীর মতো বাস করেছে এবং সন্তান-সন্ততি জন্ম দিয়েছে তাদের বিবাহ আইনগ্রাহ্য করার জন্যই ঐ গণবিবাহের ব্যবস্থা হয়। মেকসিকোর একটি বিবাহ সম্পন্ন হতে অন্যূন ১৬ ডলার অর্থাৎ একশ দশ টাকার মত খরচ হয়। কিন্তু গত ৩ ডিসেম্বর তারিখে আয়োজিত গণবিবাহে যোগদানের জন্য কাউকে কিছু দিতে হয় নি।

বাপের বিয়ে দেখাটা আমাদের দেশে একটা গুরুতর রকমের অ-শাস্ত্রীয় ব্যাপার বলে বিবেচিত হলেও মেকসিকোর গণবিবাহ সভায় সে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় নি। যেমন সিলেস্টিনো মার্টিনেজ নামে পঞ্চাশ বছর বয়স্ক এক ব্যক্তি ও তাঁর স্ত্রী ক্লেমেনটাইন তাঁদের বিবাহ 'শুদ্ধ' করে নিতে আসার সময় সঙ্গে আটটি ছেলেমেয়েকেও এনেছিলেন। মার্টিনেজ দম্পতিকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তাঁরা বলেন, তাঁদের বিবাহটাকে শুদ্ধ করে নিতে কোন দিনই আপত্তি ছিল না, শুধু টাকার অভাবেই এত দিন সেটা করে উঠতে পারেন নি। আর রাষ্ট্রের প্রথম মহিলা এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছেন, খবর পাওয়ামাত্রই তাঁরা এগিয়ে এসেছেন।

চিলির প্রেসিডেন্টের পত্নী শ্রীমতী সালভাডোর আলেন্দে একটি গণবিবাহ সভায় উপস্থিত ছিলেন। ঐ অনুষ্ঠান তাঁর এতই ভাল লাগে যে, তিনি মেকসিকোর প্রেসিডেন্ট পত্নীকে তাঁর দেশেও অনুরূপ গণবিবাহ প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছেন।

পানের বয়স : বৃটেনের পানশালাগুলির দরজা এবার অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্যও খোলার ব্যবস্থা হচ্ছে। এতদিন সেখানে ১৮ বছরের কম বয়সের কারও প্রবেশাধিকার ছিল না। আর পানশালাগুলির দরজা যে সপ্তাহের দিনগুলিতে বিকেল সাড়ে পাঁচটায় ও রবিবারে রাত সাড়ে দশটার মধ্যে বন্ধের ব্যবস্থা ছিল, সেটাও পাল্টে প্রতি দিন রাত সাড়ে দশটা ও রবিবারে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত করার ব্যবস্থা হচ্ছে। কারণ বৃটেনের রক্ষণশীল ব্যবস্থা নাকি পর্যটন ব্যবসার পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হচ্ছে। ইংলণ্ড ও ওয়েলসের ৬৪০০০ পানশালা এই ব্যবস্থাকে স্বাগত জানিয়েছে।

ঐতিহাসিক কংগ্রেস অধিবেশন

চুয়াল্লিশ বছর পর কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে নবনির্মিত লবণ হ্রদ উপনগরীতে। স্বর্গত বিধানচন্দ্র রায়ের নামাঙ্কিত এই উপনগরীতে কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠান করে পশ্চিম বাংলার অন্যতম স্থপতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে জাতির পক্ষ থেকে। ১৯২৮ সালে কলকাতায় পার্ক সার্কাস ময়দানে কংগ্রেস অধিবেশন হয়েছিল। ইতিহাসের দিক থেকে এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে, সেই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন মতিলাল নেহরু, ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর পিতা এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পিতামহ। কলকাতার সেই অধিবেশনও ছিল ঐতিহাসিক। স্বাধীনতার দাবীতে কংগ্রেস তার অল্পদিন পরেই মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে শুরু করে আইন অমান্য আন্দোলন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতির ঘৃণার প্রকাশ ঘটেছিল সেই আন্দোলনের মারফৎ। স্বরাজ তখন আসে নি। কিন্তু স্বরাজই যে জাতির একমাত্র লক্ষ্য তা সুস্পষ্ট ভাষায় সেদিন ব্যক্ত হয়েছিল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে।

এর পর ভাগীরথী দিয়ে অনেক জলধারা বয়ে গিয়ে সাগরে মিশেছে। সেদিনকার কংগ্রেস অধিবেশনের উদ্যোক্তা ও অংশগ্রহণকারী নেতাদের মধ্যে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ আজ ভারতের জাতীয় ইতিহাসে স্মরণীয় নাম। সুভাষচন্দ্র সেদিন কংগ্রেস অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর প্রধানের কর্তব্য পালন করেছিলেন। সামরিক শৃংখলায় শিক্ষিত করে তুলেছিলেন স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীকে। জি ও সি রূপে সামরিক কায়দায় পোশাক পরিহিত সুভাষচন্দ্রের সেই প্রতিকৃতি যেন পরবর্তীকালে আজাদ হিন্দ সরকারের প্রধান নেতাজীরই পূর্বাভাষ।

স্বাধীনতালাভের পর থেকে কংগ্রেস তার দুরূহ দায়িত্ব পালন করে এসেছে জাতির সেবায়। দেশের প্রশাসন তার হাতে। একটানা পঁচিশ বছর পৃথিবীর আর কোনো গণতান্ত্রিক দল এইভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে জাতির অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করতে পারে নি। সদস্যসংখ্যার দিক থেকেও সম্ভবত ভারতের জাতীয় কংগ্রেস পৃথিবীতে বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল। বৃহৎ জাতীয় দলের সুবিধা এবং অসুবিধা সবই আছে এই দলের। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াতেই এই বৃহৎ দলের শুদ্ধিকার্য সমাপন করেছেন শ্রীমতী গান্ধী। যুগের সঙ্গে, সময়ের সঙ্গে এবং কংগ্রেসের ঘোষিত আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য না রেখে যাঁরা এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটিকে ক্ষমতা দখলের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছিলেন তাঁদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই সরিয়ে দিয়ে শ্রীমতী গান্ধী কংগ্রেসের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক চরিত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। ভারতের মানুষের গণতন্ত্র-চেতনাই তা সম্ভব করেছে। একনায়কতন্ত্রী দেশের মতো নেপথ্য-ষড়যন্ত্র বা রক্তপাতের পথে নয়, শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পথেই ঘটেছে এই রূপান্তর।

পশ্চিম বাংলার সৌভাগ্য, কংগ্রেসের এবারকার গুরুত্বপূর্ণ, ঐতিহাসিক অধিবেশনের আতিথ্যদানের ভার পড়েছে তার ওপর। গত কয়েক বৎসর নানা অশান্তিতে পশ্চিম বাংলা ছিল বিপর্যস্ত। সেই দুঃস্বপ্নের কালো রাত্রি অতিক্রম করে পশ্চিম বাংলা শান্তির সূর্যোদয়ের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কংগ্রেসকেই আবার ফিরিয়ে এনেছে পশ্চিম বাংলার মানুষ। নতুন সরকার পূর্ণ উদ্যমে কাজ করছেন এই বাংলার বিপর্যস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠনে, তার শিল্পসম্ভাবনা রূপায়ণে এবং তার জনজীবনে শান্তি ও স্বস্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠায়। বাংলার সমস্যা বহুবিধ এবং জটিল। সারা ভারতের দৃষ্টি তার দিকে আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন। কারণ, পূর্বাঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র হল পশ্চিম বাংলা ও তার রাজধানী কলকাতা। এই শহরের সমৃদ্ধির সঙ্গে পূর্বাঞ্চলের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি জড়িত। এই শহর কেন্দ্রীয় সরকারের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে প্রধান সহায়ক। এই শহর পূর্বাঞ্চলের মানুষের প্রধান কর্মসংস্থান কেন্দ্র। তার শিল্পসমৃদ্ধি গোটা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক। আজ তার নানাবিধ সমস্যা দূরীকরণে কেন্দ্রীয় সরকার যদি এগিয়ে না আসেন তাহলে একা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে তা কি সম্ভব? বাংলার দারিদ্র্য ও তার যুবসমাজে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যার দিকে তাকালে সমস্যার গভীরতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে দেশের নানাবিধ সমস্যা সমাধানে কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। দেশের নেতারা এখানে সমবেত হচ্ছেন দেশের সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতির পথ সম্পর্কে আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য। সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি বাংলার আনুগত্য অবিচল। প্রগতিশীল চিন্তাধারার উৎসভূমি হল বাংলা। কংগ্রেসের মধ্যে যখনই আদর্শগত সংঘাত ও সংকট দেখা দিয়েছে বাংলার মানুষ তখনি সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখেছে প্রগতিশীল আদর্শের পক্ষে, সমাজতন্ত্রের পক্ষে। গোটা জাতির জন্য অনেক দুঃখ ও ত্যাগ স্বীকার করেছে বাংলার মানুষ। আজ সে এক সর্বাত্মক সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে কংগ্রেসেরই সমাজকল্যাণের আদর্শ রূপায়ণে। তরুণ ও যুবসমাজ আন্তরিকতার সঙ্গে এই আদর্শের আহ্বানে সমবেত হয়েছে কংগ্রেসের পতাকাতলে। জাতীয় কংগ্রেস পথ দেখাক। বাংলার আবেদন যেন ব্যর্থ না হয়। বাংলার সমস্যার দিকে এই অধিবেশন যেন সজাগ দৃষ্টি দেয়। এই আশা নিয়ে আমরা স্বাগত জানাই জাতীয় কংগ্রেসের ঐতিহাসিক অধিবেশনে সমবেত সমস্ত প্রতিনিধিকে

কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন

নিরঞ্জন সেনগুপ্ত

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হয়েছিল বোম্বাইয়ে ১৮৮৫ সালে। আর তার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়েছিল কলকাতায় ১৮৮৬ সালে। প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন কলকাতারই মানুষ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। অতএব বলা চলে, কলকাতার সঙ্গে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের যোগ একেবারে সেই গোড়াকার দিনগুলি থেকে।

ভারতবর্ষের এই বৃহত্তম রাজনৈতিক সংস্থা তার সেই গোড়াকার দিনগুলি অনেক কাল আগেই পার হয়ে এসেছে। তার প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পূর্ণ হতে আর বড় বেশি বাকি নেই। ইতিমধ্যে তার ৭৪তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের প্রস্তুতি চলছে। কংগ্রেস এখন দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যে অংশের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন সেই অংশ নতুন উৎসাহ, আদর্শ ও প্রেরণায় সঞ্জীবিত হয়েছে।

ইদানীংকালে কলকাতা অনেক অপযশের ভাগী হয়েছে। কলকাতা নোংরা শহর, মিছিলের শহর, ভয় ও মৃত্যুর শহর। বিদেশী পর্যটকরা ত বটেই, দেশের মানুষরাও কলকাতাকে এড়িয়ে চলতেই পছন্দ করছিলেন। তাই, এই শহরে যে বড় রকমের কোন সভা বা সম্মেলন হতে পারে তা যেন ইদানীংকালে ভাবাই যাচ্ছিল না। কিন্তু বর্তমান বছরের গোড়া থেকে কলকাতার উপরকার সেই নিরন্তর বিভীষিকার ছায়াটা যেন সরে গেছে। লবণ হ্রদ ওরফে বিধাননগরে কংগ্রেসের অধিবেশন কলকাতার সেই রাহুমুক্তির উৎসবেরই যেন একটা অঙ্গ।

কলকাতাকে এবারকার কংগ্রেস অধিবেশনের স্থান হিসাবে নির্বাচিত করার পিছনে সম্ভবত কংগ্রেস নেতাদের আরও একটা হিসাব রয়েছে। প্রায় পাঁচ বছর পরে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস শাসনক্ষমতা ফিরে পেয়েছে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্ব কংগ্রেসের মধ্যে যে নতুন উদ্দীপনা এনেছে পশ্চিমবঙ্গ তার বাইরে নয়। এখানেও কংগ্রেসের মধ্যে বহু নতুন মানুষ এসেছেন। কংগ্রেস নেতারা সঙ্গতভাবেই মনে করেছেন যে, এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে কলকাতায়, দলের অধিবেশন হলে এখানে দলের সংগঠন শক্তিশালী হবে এবং গত কয়েক বছরের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার পর পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে যে বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে তার স্পষ্টতর পরিচয় রাখা যাবে।

এর আগে কলকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের শেষ অধিবেশন হয়েছিল ১৯২৮ সালে। কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে ঐ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

কলকাতায় ঐ অধিবেশন কংগ্রেসের ইতিহাসে একটি দিকচিহ্ন। ভারতবাসী পূর্ণ স্বাধীনতার কম কোন কিছুতেই খুশি হবে না, কংগ্রেস প্রথম এই স্পষ্ট ঘোষণা করেছিল ১৯২৯ সালে ইরাবতীর তীরে লাহোর অধিবেশনে। ঐ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। আর সেই অধিবেশনের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল ১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসে, যেখানে সভাপতিত্ব করেছিলেন জওহরলালের পিতা পণ্ডিত মতিলাল নেহরু।

১৯২৮ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের সেই অধিবেশনের প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল নেহরু রিপোর্ট নামে পরিচিত দলিল। ঐ দলিলে ভবিষ্যৎ ভারতের সংবিধানের একটি খসড়া উপস্থিত করা হয়েছিল। ঐ রিপোর্ট বিবেচনা করে কলকাতার অধিবেশনে সমবেত কংগ্রেস প্রতিনিধিরা প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন যে, ১৯২৯ সাল শেষ হওয়ার আগেই বৃটিশ সরকার যদি ঐ প্রস্তাবিত সংবিধান মেনে না নেন তাহলে কংগ্রেস অহিংস অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করবে এবং খাজনা বন্ধ সহ সর্বপ্রকার আন্দোলনে নামার জন্য দেশের মানুষের প্রতি আহ্বান জানাবে।

কিন্তু কলকাতা কংগ্রেসের এই প্রস্তাব বিনা বিতর্কে গৃহীত হয় নি। বিতর্ক উঠেছিল, দেশের পূর্ণ স্বাধীনতাকে এখনই কংগ্রেসের লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করা হবে কিনা সেই প্রশ্নে।

এই অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ দিতে গিয়ে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু বলেছিলেন, 'আমাদের লক্ষ্য কি? আমার স্পষ্ট ও সহজ জবাব হচ্ছে, যথার্থ স্বাধীনতা. শুধু স্বাধীনতার খোলসমাত্র নয়। সেই স্বাধীনতার নাম যাই দেওয়া হোক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না।...আমি চাই পূর্ণ স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতা যতখানি পূর্ণাঙ্গ হতে পারে ততটাই হবে. এই আমি চাই। কিন্তু আমি ডোমিনিয়ন স্টেটাসের বিরুদ্ধে নই। আজকের ডোমিনিয়নগুলি যে মর্যাদা ভোগ করে সেই মর্যাদার [illegible] আনাই আমাদের চাই।"

মতিলাল নেহরুর ঐ বক্তৃতায় ডোমিনিয়ন স্টেটাসের কথা উল্লেখ করার একটি বিশেষ কারণ ছিল। ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা মতৈক্যে পৌঁছবার চেষ্টা করতে গিয়ে কংগ্রেস একটি সর্বদলীয়

মতিলাল নেহরু
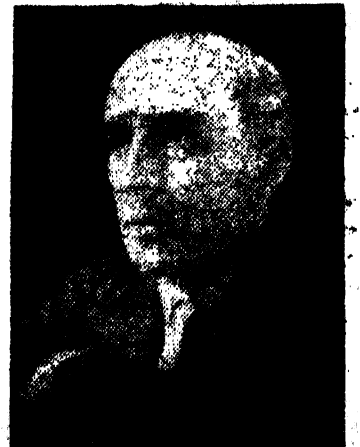
জওহরলাল নেহরু

সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। সেই সম্মেলন ডোমিনিয়ন স্টেটাসের সুপারিশ করেছিল। এই সুপারিশ বিবেচনা করার জন্য কংগ্রেস মতিলালের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে। সেই কমিটির রিপোর্টই নেহরু রিপোর্ট নামে পরিচিত।

কমিটির একজন সদস্য হিসাবে সুভাষচন্দ্র বসুও নেহরু রিপোর্টে স্বাক্ষর করেছিলেন। কিন্তু ১৯২৮ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে যখন সেই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে প্রস্তাব এল তখন সুভাষচন্দ্র ভিন্নমত প্রকাশ করে দাবি জানালেন, পূর্ণ স্বাধীনতাকেই স্পষ্ট করে লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করতে হবে এবং আকারে ইঙ্গিতেও ডোমিনিয়ন স্টেটাসের কথা বললে চলবে না। সুভাষচন্দ্র বললেন, নেহরু রিপোর্ট তৈরি হওয়ার পর দেশের অবস্থার এত পরিবর্তন হয়েছে যে, এখন আর পূর্ণ স্বাধীনতার কমে সন্তুষ্ট থাকা যায় না। সুভাষচন্দ্র ছাড়া আরও একজন কংগ্রেস নেতা ১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তুলেছিলেন। তিনি হলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। একদিকে পণ্ডিত মতিলাল অন্যদিকে তাঁরই পুত্র জওহরলাল—এই বিতর্কে কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশন সেদিন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। সুভাষচন্দ্র, জওহরলাল প্রভৃতি যে সংশোধন প্রস্তাব এনেছিলেন তা অল্প ভোটের ব্যবধানে অগ্রাহ্য হয়ে গিয়েছিল।

জওহরলাল নেহরু ১৯২৮ সালে কলকাতায় যা চেয়েছিলেন ১৯২৯ সালে তাঁরই সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে তাই হল— দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা কংগ্রেসের লক্ষ্য হিসাবে ঘোষিত হল।

সুতরাং ঐতিহাসিক বিচারে নিঃসংশয়েই বলা চলে যে, ১৯২৮ সালের কলকাতা অধিবেশন কংগ্রেসের রাজনৈতিক চিন্তার বিবর্তনের ইতিহাসে একটি বিশেষ অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত।

স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম যে পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হয় সেটি হয় ১৯৫৪ সালে কল্যাণীতে। ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু আর ১৯৫৪ সালে কল্যাণী কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন তাঁর পুত্র জওহরলাল নেহরু যিনি ইতিমধ্যে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

১৯২৮-এ কলকাতার কংগ্রেস সভাপতি মতিলাল নেহরু, ১৯৫৪তে কল্যাণীর কংগ্রেসে [illegible] জওহরলাল নেহরু, আর ১৯৭২-এ [illegible] কংগ্রেসে নেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী—বংশানুক্রমিক ধারায় এও এক লক্ষণীয় দৃষ্টান্ত। কংগ্রেসের মধ্যে ধারাবাহিক ঐতিহ্যের আধারে সর্বদা যে পরিবর্তন হয়ে চলেছে তারই প্রতীক যেন বাংলার মাটিতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনগুলির ইতিহাস।

পিছন ফিরে তাকিয়ে আমরা যদি ১৯৫৪ সালে কল্যাণীতে অনুষ্ঠিত

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

সুভাষচন্দ্র বসু

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সেই ৫৯তম অধিবেশনের কথা স্মরণ করি তাহলেই আমরা দেখব, কংগ্রেস যেমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই তেমনি আবার অনেক পুরানো সমস্যার উত্তরাধিকার তারা আজও বহন করে চলেছে।

১৯৫৪ সালের জানুয়ারি মাসে কল্যাণীতে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল। ঐ অধিবেশনের উপর প্রকাণ্ড বড় ছায়া বিস্তার করেছিল যে প্রশ্নটি সেটি হল পাকিস্তানকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সাহায্য দেওয়ার প্রস্তাব। [illegible] ভাষণে, প্রতিনিধিদের বক্তৃতায় ও অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে সেদিন এই আসন্ন পাক-মার্কিন সামরিক সমঝোতায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল। আজও যে ভারতকে পাকিস্তানের প্রতি আমেরিকার পক্ষপাতিত্ব সম্পর্কে অনুরূপ উদ্বেগ প্রকাশ করতে হচ্ছে তাতে বোঝা যাচ্ছে, কোন কোন ব্যাপারে আমরা প্রায় একটা জায়গাতেই আটকে আছি।

কল্যাণী কংগ্রেসে দ্বিতীয় আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন গঠনের প্রস্তাবে বিহারের কংগ্রেস প্রতিনিধিদের প্রবল বিরোধিতা এবং এই নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রচণ্ড বিতর্ক। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের পর্ব কবে চুকে গেছে। মোটামুটিভাবে কমিশনের সুপারিশ অনুসারেই ভারতবর্ষে ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠিত হয়েছে। কিন্তু তারপরও অন্ধ্রের তেলেগুভাষীরা একত্রে থাকতে অসুবিধা বোধ করছেন এবং আসামে উগ্র ভাষান্ধতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। তাতে আবার প্রমাণ হচ্ছে, ১৯৭২-এ এসেও আমরা ১৯৫৪কে একেবারে ঝেড়ে মুছে ফেলতে পারিনি।

আবার অন্য দিক থেকে দেখতে গেলে ১৮ বছর আগেকার সেই কংগ্রেস অধিবেশনের সঙ্গে আজকের অনেক গরমিলও পাওয়া যাবে। সেদিন সবে দেশে প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান চালু হয়েছে, সবে প্রথম সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। সারা দেশে কংগ্রেস তখন অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী, একমাত্র ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন ও পেপসু ছাড়া অন্যত্র কোথাও কংগ্রেসকে কড় রকমের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয় নি। কল্যাণী কংগ্রেসের মাত্র কয়েক মাস আগে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চালু হয়েছে। মূল্যবৃদ্ধি, খাদ্যসংকট প্রভৃতি তখনও ভবিষ্যতের সমস্যা। দেশের লোকসংখ্যা তখন ৩৬ কোটি, আজ ৫৮ কোটি।

সেদিনকার কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে ও প্রতিনিধিদের বক্তৃতায় বৈদেশিক প্রসঙ্গের যে প্রাধান্য লক্ষ্য করা গিয়েছিল সেটা আজকের দিনে বেখাপ্পা মনে হতে পারে। কিন্তু তখনকার পরিস্থিতিতে এর কারণ দুর্বোধ্য নয়। কংগ্রেসকে তখনও দেশের ভিতরকার সমস্যায় বিব্রত হতে হয় নি, তখনও তাকে অন্তর্মুখী ভাবনায় ডুবে যেতে হয়নি। তখন বিশ্বব্যাপী ঠান্ডা যুদ্ধের উত্তাপ অনেক প্রখর এবং পারমাণবিক যুদ্ধের বিভীষিকা অনেক প্রবল। এর মধ্যে ভারত তার সদ্যোলব্ধ স্বাধীনতার ফল আস্বাদন করতে পারবে কিনা, শান্তিপূর্ণভাবে সে নিজেকে গড়ে তুলতে পারবে কিনা, সেটাই তখন দেশের নেতাদের বড় উদ্বেগের বিষয় ছিল। স্বাধীন দেশের পথযাত্রার সেই প্রথম লগ্নে ভারত জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে যে মর্যাদা লাভ করেছিল তার প্রতিফলন ঘটেছিল কল্যাণী কংগ্রেসে।

কল্যাণী কংগ্রেসের এগার বছর পর ১৯৬৫ সালে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়েছিল সেটি হয়েছিল দুর্গাপুরে। নেহরুহীন কংগ্রেসের অধিবেশন সেই প্রথম। তখন কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীকামরাজ আর প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী।

সমাজতন্ত্রকে লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করে কংগ্রেস তখন সবে নতুন যাত্রা আরম্ভ করেছে। দুর্গাপুরে কংগ্রেসের ঠিক আগের

বছরই ভুবনেশ্বর অধিবেশনে কংগ্রেস "গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র" সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে।

কিন্তু স্বাধীনতার অব্যবহিত পরবর্তী কালের কংগ্রেসের উজ্জ্বল আশাবাদ ততদিনে অনেক ম্রিয়মাণ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ এর আগে নৈতিকতার যে উচ্চভূমি থেকে কথা বলে এসেছে সেখানে তার আসন ততদিনে কতকটা টলে গেছে। ১৯৬২ সালে চীনের সঙ্গে যে সংঘর্ষ হয়ে গেছে সেই অভিজ্ঞতা তখন ভারতের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। দুর্গাপুর কংগ্রেসের কয়েক মাস আগেই চীন তার প্রথম পারমাণবিক বোমা ফাটিয়েছে। স্বভাবতই ঐ ঘটনা কংগ্রেসের সেই অধিবেশনে একটি প্রধান প্রসঙ্গ হিসাবে আলোচিত হয়েছিল।

আজকের মত দুর্গাপুর কংগ্রেস অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল দেশব্যাপী খরা ও তজ্জনিত খাদ্যসংকটের পরিপ্রেক্ষিতে। তখন দেশে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চলছে। খাদ্যাভাবের সম্মুখীন হয়ে কংগ্রেস এই প্রথম উপলব্ধি করল যে, এমনভাবে পরিকল্পনার সংশোধন করা দরকার যাতে কৃষির উপরই সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়। দেশকে খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংনির্ভর করতে হবে, সেজন্য আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত কৃষিপদ্ধতির প্রবর্তন করতে হবে, খাদ্যশস্য বণ্টনের জন্য একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, রাজ্যে রাজ্যে অ্যাগ্রো-ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন গড়ে তুলে গ্রামে কৃষিজাত্মক ও কৃষিনির্ভর শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এইসব ধারণা দুর্গাপুর কংগ্রেসেই প্রথম দানা বাঁধল।

দুর্গাপুর কংগ্রেসের প্রেরণায় এবং প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে ভারতবর্ষ ইতিমধ্যে তার খাদ্যশস্যের উৎপাদন অনেক বাড়িয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, স্বয়ংনির্ভরতা

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

যখন আমাদের করায়ত্ত বলে মনে হচ্ছিল তখন, বিধাননগর কংগ্রেসের প্রাক্‌কালে, আবার দেশে খরা, জায়গায় জায়গায় প্রায় দুর্ভিক্ষের অবস্থা এবং খাদ্যশস্য আমদানির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সামনের দুর্দিন কি ভাবে কাটান যাবে, সেই চ্যালেঞ্জ বিধাননগরে সমবেত কংগ্রেস প্রতিনিধিদের গ্রহণ করতে হবে।

"গরীবী হঠাও" শ্লোগান তুলে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যখন কংগ্রেসের রক্ষণশীল প্রগতিবিরোধী অংশের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন তখন থেকে তাঁর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের সুসময় চলেছে। তাঁর ঐ শ্লোগান দেশের মানুষকে নতুন আশায় সঞ্জীবিত করেছে ও কংগ্রেসকে নতুন আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর নেতৃত্বে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রের যে বলিষ্ঠতর কর্মসূচী গ্রহণ করেছে সেটা তাকে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে নিয়ে গেছে। কেন্দ্রে ও বিভিন্ন রাজ্যে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের মারফৎ কংগ্রেস তার হারানো শক্তি ত ফিরে পেয়েছেই, এমন কি আগেকার রেকর্ডও ম্লান করে দিয়েছে। বাংলাদেশে ভারতের গৌরবময় সামরিক, কূটনৈতিক ও নৈতিক জয় কংগ্রেসেরও গৌরব বাড়িয়ে দিয়েছে।

কিন্তু ইদানীংকালে কিছু কিছু ঘটনার মনে হতে আরম্ভ করেছে যে, কংগ্রেসের পালে অনুকূল হাওয়া এখন আর তত প্রবল নয়। গুজরাটে ও মহীশুরের উপনির্বাচনে কংগ্রেসের অপ্রত্যাশিত পরাজয় হয়েছে, যদিও ওড়িশায় উপনির্বাচনে শ্রীমতী নন্দিনী শতপথীর জয় কংগ্রেসের মনোবল ফিরিয়ে দিয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গাহাঙ্গামা হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রবিক্ষোভ হচ্ছে। এইসব ঘটনায় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যে উদ্বিগ্ন তার প্রমাণ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনেই পাওয়া গিয়েছে। প্রকাশ ঐ অধিবেশনে কমিটির একজন সদস্য বলেছেন যে, কংগ্রেসই গরীবী হঠাও শ্লোগান দিয়ে দেশের মেহনতী জনতাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। এখন সেই জনতা যদি তাদের প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ায় বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে তাহলে সেজন্য সি পি আই এম বা মহাজোটকে দায়ী করা অর্থহীন হবে।

ইদানীংকালে কংগ্রেস দেশের মানুষের যে প্রকাণ্ড বিশ্বাস অর্জন করেছে আজকের কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে কি করে সেই বিশ্বাস ধরে রাখা যায়, ভারতবর্ষের দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষকেও আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি কংগ্রেস দিয়েছে সেই প্রতিশ্রুতি কিভাবে রক্ষা করা যায় লবণ হ্রদের কংগ্রেস অধিবেশনে অনিবার্যভাবে সেগুলিই প্রধান বিবেচ্য বিষয় হবে।

সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়

তরুণকান্তি ঘোষ

অরুণ মৈত্র
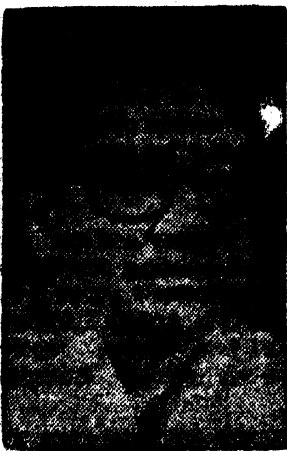
স্টার থিয়েটারের ভয়ানক দুর্নাম

বর্ত্তমানকালে দৈনিক পত্রিকাগুলি ব্যতীত অন্যান্য সাময়িক পত্রিকাগুলিতে থিয়েটারের দোষত্রুটি সম্বন্ধে খুব কমই আলোচিত হতে দেখা যায়। প্রধানতঃ যে নাটকগুলি মঞ্চস্থ হয়, সেগুলির মধ্যে অশোভন বা অপ্রীতিকর কিছু লক্ষিত হলেও, নানা কারণে সমালোচনার ক্ষেত্রে বিশদভাবে কদাচিৎ তা প্রকাশিত হয়ে থাকে। অতীতে এ সম্বন্ধে পত্রিকার সম্পাদকগণ যে কি পরিমাণ নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী ছিলেন, আজ বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ পূর্তির যুগে ইদানীন্তনকালের নাট্যসমালোচকদের অবগতির জন্য দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত পাক্ষিকপত্র 'অনুসন্ধান'-এর (১৫ই আশ্বিন, ১২৯৭) একটি সংখ্যা থেকে স্টার থিয়েটারের ভয়ানক দুর্নাম' নামক বিরূপ সমালোচনাটির অংশ-বিশেষ এস্থলে উদ্ধৃত করে দেওয়া হ'ল—

"থিয়েটারের বাজারে স্টার থিয়েটারের' প্রতিই আমরা অনেক আশা-ভরসা করিয়াছিলাম। উঁহাদের দ্বারাই নট-নাট্যেরও অনেকটা সংস্কার হইবে, ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু এতদিনে, এখন বুঝিতেছি, আমাদের সেই আশা মিটিল না। এখন দেখিতেছি, যাও ছিল, তাও বুঝি আর থাকে না। শুধু বাড়ীটার বাহারে আসে যায় কি! লোকজন চাই—প্রকৃত নাটক-প্রহসন চাই! নহিলে ভুয়া আড়ম্বরে কয়দিন কাটিবে? প্রথম উদ্যমে স্টার থিয়েটারের যে অবস্থা দেখিয়াছিলাম, এখনকার অবস্থা দেখিয়া তাহার সহিত তুলনা করিলে, বাস্তবিকই কান্না আসে। একা গিরিশ এখন আর কদিক রাখিবেন? অভিনয় করিবেন, না সং সাজিবেন, না নাটক লিখিবেন? বিধি-নিগ্রহে বাস্তবিকই স্টার থিয়েটার' এখন এইরূপ বিপন্ন!

বিশেষতঃ প্রসিদ্ধ অভিনেতা কাপ্তেন বেল, [illegible] অভিনেত্রী কিরণশশী—এইরূপ কয়েকজন অভিনেতা-অভিনেত্রীর হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতেই, বাস্তবিক মনে স্টার থিয়েটার' বড়ই ব্যথা পাইয়াছেন! তাছাড়া দুই-একজন অভিনেতা-অভিনেত্রী নাকি স্টার থিয়েটার' ছাড়িয়া দিয়াও, থিয়েটারকে বড়ই বিপন্ন করিয়াছেন। কাজেই আর সে জমজমা হইবে কেমন করিয়া।

সে দিনও তাই 'বনিতা-বিকাশ' ও 'বাজারাম' দেখিতে গিয়া আমাদিগকে বড়ই দুঃখিত হইয়া ফিরিতে হইয়াছে। একে পুস্তক দুখানি তো কিছুই নহে—তাহার উপর আবার অভিনেতা-অভিনেত্রীরও অভাব। সুতরাং কিছুই যেন জমিল না। রুচি দোষে, অভিনয় দোষে সকল রকমেই অভিনয় না দেখিবারই যোগ্য।...বদনামে কি দর্শক জুটে!

আর সেও যা হউক, অভিনয় চিরদিন সমান নাও হইতে পারে—ভালমন্দ, দুদিকই তো আছে! কিন্তু তাই বলিয়া, মন্দকে মন্দ বলিলে, এ সময় লোকের উপর চটাটাও থিয়েটার-কোম্পানির কিন্তু ভাল হইতেছে না। 'বিষ নাই কুলোপানা চক্র' ধরিলে চলিবে কেন? এ দুঃসময়ে তাঁহাদের এখন শিষ্ট শান্তের মত চলা কর্ত্তব্য। এ কথাটায় অনেকে অনেকরূপ মনে করিতে পারেন; করিবারও কথা। কিন্তু বাস্তবিকই যে এরূপ ঘটনা স্টার থিয়েটারে প্রতিনিয়তই ঘটিতেছে! অধিক দিনের কথা নয় এই সেদিনও—গত পূর্ব্ব শনিবারেও, প্রসিদ্ধ 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রের প্রতিনিধি বাবু বিপিনবিহারী বড়ালকে থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণ আপনার কম্পাউণ্ডে পাইয়া অপমানিত করিয়াছেন। আমাদের আফিসে আসিয়ে বিপিনবাবু সে সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিলেন, তাহা তো আর প্রকাশ করিতে পারি না! তবে তাঁহার অপরাধ, আজকালকার অভিনয় খারাপ হইতেছে, এই কথা 'স্টেটসম্যানে' লেখা হইয়াছিল। তা বাপু, চটিলে চলিবে কেন? ভালকে ভাল, মন্দকে মন্দ যদি না বলিতে হয়, তবে সংবাদপত্র কেন? যাঁহারা তাহা পারেন, তাঁহারা করুন! আমরা কিন্তু সেরূপ পারি না। আপনারা হাজার খোসামুদিই করুন, খোসামুদির বশীভূত হইয়া, আমরা কিন্তু সেটি পারিবই না। এবং চোখ রাঙাইলেও বোধহয়, সত্য বলিতে কুণ্ঠিত হইব না।...

এই ধরুন, স্টার-থিয়েটারের স্ত্রীলোকদিগের বসিবার আসন-সম্বন্ধে কতই কলঙ্ক-কেলেঙ্কারির কথা উঠিয়াছে। বেশ্যার সহিত ভদ্রঘরের মেয়েছেলেদিগকে একত্রে বসিবার আসন দেওয়া, সেই সব বেশ্যাকে আবার সেই ক্ষেত্রে মদ না কি খাইতে দেওয়া—এসব কথা শুনিলে কি আর ভদ্রলোকের ঘরের স্ত্রী-কন্যা অভিনয় দেখিতে যাইবেন?...তাঁদের হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া আমরা যদিও সকল প্রকাশ নাও করিতে পারি; কিন্তু 'নবযুগ', 'Saturday Herald,' 'Statesman' প্রভৃতি সংবাদপত্রেও যখন, বিশিষ্ট প্রমাণ পাইয়া, এই সকল কথা বাহির হইতেছে, তখনও কি ইহার একটা পরিবর্তন করা উচিত নয়?

অবশ্য আমরা স্টার সম্বন্ধে আরও যেসব গুরুতর অভিযোগ পাইতেছি, তাহা নাও প্রকাশ করিতে পারি—বাধ্যভাবে নির্জ্জনে তাঁহাদিগকে বলিয়াও প্রতিকারের চেষ্টা পাইতেছি; কিন্তু অন্য সকলে শুনিবে কেন? আপনাদের বন্দোবস্তের ত্রুটী আছে; থাকুক! কিন্তু তাই বলিয়া মদ খাওয়ার গণ্ডা নয়েক পয়সা ধুস খাইয়া একজন খাট আনার দর্শককে দুই টাকার আসনে আনিয়া বসাইলে কি লোকে সন্তুষ্ট হয়? তারপর ধরুন, সেদিন স্ত্রীলোকের আসনে বসিয়া একটা স্ত্রীলোক অপর একটা স্ত্রীলোকের গায়ে বমি করিয়া দিয়াছিল বলিয়া যে বাজারে গুজব সেটাও তো আর সহরে রাষ্ট্র হইতে বাকী নাই? সুতরাং কোন মুখে জবাব দিবেন? যাহা হউক, এখন কোম্পানির উচিত যে, প্রকাশ্যতঃ সকলের নিকট এ সকল অপরাধের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়া বন্দোবস্তের পরিবর্তন করা। আর যদি তাই করেন, তবেই আবার আমাদের ও ভদ্রলোক-মাত্রেরই সহানুভূতি পাইবেন। নহিলে...এ সকল জানিয়া-শুনিয়া কোন ভদ্রলোক বা কোন ভদ্র-পরিবার আর থিয়েটারে যাইতে অগ্রসর হইবেন?"

—কৃপণক

অজ্ঞাতবাস ॥

রাম বসু

যে অনন্য বীজ বিশ্ব করলে উচ্ছ্বসিত হতো বৈশাখ্য
পদ্মের মুঠোর চাপে যুবতীর ভুঁইচাঁপা অঙ্গের জ্বালা
আর সমস্ত বালিচর জলের শান্ত উচ্চারণে হতো ধ্বংস
সম্রাট ইচ্ছার পদপাতে মাথা নিচু করতো গাছপালা
আমি সেই অনুপম বীজ বিশ্ব করতে পারি নি এখনো

অথচ ওদিকে ন্যাড়া পাহাড়ের মুখে অবিরল বসন্ত
বাঘিনীর মিলনের কালে নীলকান্ত মণি বালিয়াড়ি
গিরিমাটি কাদার পায়ের প্রবল ছাপ আঁটসাট ছাঁচ
জল ভুমুরের ঝোপে ঝর্ণার গান, আর অন্ধকার
হৃদয়হীন প্রেমিকার মতো নক্ষত্রের পাপড়ি খুলে ছিঁড়ে ফেলেছে

আমি মৃত ভালবাসার শব নিয়ে আগুনের চিৎকার
হৃদয়ের বিশাল বৃক্ষের চার পাশে সমুদ্রের ক্রুদ্ধ সিংহ
শীত করে উড়ে যাওয়া হৃদয় এখন কান-পেতে-থাকা
লজ্জারিক্ত হবার বাসনা লালন করে চলেছে এক চারা গাছ
সহিষ্ণু প্রেমিকের মতো ঢেকে রাখছে সব ক্ষত, জ্বালা, ফুল

এই কি নয় সীমিত মানুষের সীমাহীন স্পর্ধা ও গৌরব
কপালের অমিত প্রান্তরে ঋতুচক্রের তাঁবু ফেলা, তাঁবু ভাঙা
তাই কি সে বয়ে চলে না সাধ্যের চেয়ে ঢের বেশি নুনের ভার?
সেই বীজের উন্মীলনে আমাদের অজ্ঞাতবাসের অবসান
প্রতিবাদের অঙ্কুরের ওপর দীর্ঘশ্বাস স্থাপন করে চলে যাওয়া।

সে কথা বলিনি তাকে ॥

আশিস সান্যাল

সেকথা বলিনি তাকে,
কোনদিন হয়তো বলবো না;
নিতান্তই সংরক্ষিত বাগানের বিস্তীর্ণ বাসনায়
যে ফুল ফুটেছে শব্দ
তার প্রতিদানে
আমার নির্মল স্মৃতি তার হাতে প্রত্যহও দেবো না।

দ্যাখোরে আশ্চর্য রোদ,
দ্যাখো দ্যাখো কতো নীল ছড়ানো বাগানে—
সামান্য বাতাসে কাঁপে গন্ধরাজ-ছায়া;
যা ছিলো আমার সে তো আমারই গোপন—
বেদনার অন্তরালে
সে তার ধরেছে আজ স্নিগ্ধতার পরিপূর্ণ কায়া।
না, সে স্মৃতি দেবো না তাকে,
কোনদিন সেকথা বলবো না;
বাগানে ফুটেছে ফুল,
সারাবেলা দ্যাখো তার
বুকে জুড়ে কম্পমান রোদের আলপনা।

জেনেছি আশ্চর্য তাই
সৌরভ-নন্দিত এই বাগানের স্মৃতি সত্য হয়ে;
জেনেছি মৃত্যুকে আমি,
যখন দেখেছি দূরে শূন্যতায় প্রতীক্ষী আয়ায়,
এই ফুল প্রতিরূপ
জেনেছি কোথাও নেই প্রত্যাশার নিভৃত বিরাম।

বাবার নিজের বড়োমামার বড়োছেলে সোনাকাকু হঠাৎ সপরিবারে রাণীগঞ্জ থেকে কলকাতায় এসে হাজির। আত্মীয়-স্বজনের অভাব ছিল না। কিন্তু সবাইকে বাদ দিয়ে অতসীর আতিথ্য গ্রহণ করা—এ একেবারে অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। বিশেষ অতসী সবে সংসার শুরু করেছে। বিয়ে হয়েছে মাসখানেকও হয়নি। দু'খানি ছোটো ছোটো ঘর। জায়গাটাও কোনোরকম আভিজাত্য দাবী করতে পারে না। না পারুক, অতসীর প্রেমমাধুর্যে আর নতুন সংসারের উৎসাহে এখানেই দাম্পত্যজীবনের প্রথম পর্বের সূচনা হলো। জানলায় জানলায় পর্দা, খাটের ওপাশে ড্রেসিং টেবিল। মাথার কাছে শেলফে ছোট্ট ট্রানজিস্টার।

দুটো ঘর কিন্তু পাখা একটি। অবশ্য একটা টেবিল ফ্যানও আছে। টেবিল ফ্যান অতসীর বিশেষ পছন্দ নয়। আগামীবার বোনাসের টাকা পেলেই একটা সিলিং ফ্যান কিনে রাখবে। আর—মনের কোণে একটা গোপন সাধ আছে, সে-কথা কাউকে প্রকাশ করেনি, নির্মলেন্দুকেও নয়—ফ্রিজ একটা চাই-ই।

সোনাকাকু এসেছে—সঙ্গে কাকীমা আর তার বড়ো ছেলে চন্দন। ভারী খুশী অতসী। নির্মলেন্দুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। সোনাকাকু যে ডক্টরেট উপাধিধারী অধ্যাপক সে-কথাও স্বামীকে বার বার স্মরণ করিয়ে দিল। আর এই আমার কাকীমা—কী সুন্দর গলা! কাল সকালে কাকীমার গলায় রবীন্দ্রসংগীত শুনো। আর এই হল চন্দন—বি এস-সি পড়ছে। কী রে অমন মিটি মিটি হাসছিস কেন? ভারী দুষ্টু—

চন্দন তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে উঠল—আমি দুষ্টু? কক্ষনো না। বরং তুমিই রাণীদিকে নিয়ে কম দুষ্টুমি করতে! আমাদের বাড়ির ছাদ ডিঙিয়ে পাশের

বাড়ির ছাদ থেকে আচার চুরি করে খেতে মনে আছে?

কথাটা কিছু মিথ্যে নয়। এক সময়ে রাণীগঞ্জে বেড়াতে গিয়ে একাধিক নিষিদ্ধ কাজের মধ্যে দিয়ে ভাই-বোনে দুজনেই বেশ আনন্দ পেয়েছে। কিন্তু তাই বলে সেই ঘটনা আজ নির্মলেন্দুর সামনে তোলায় অতসী লজ্জা পেল। বিশেষ করে চুরি কথাটা যেন বড্ড বেশি অপমানকর! চন্দন নিতান্ত ছেলেমানুষটি নয়। কোথায় কখন, কোন কথা বলতে হয় না হয় তা তার জানা উচিত। তবু অতসী মনে কিছু করল না। কারণ, প্রথমত মফস্বলের ছেলে—সাদামাটা। দ্বিতীয়ত, চন্দনের মনটাই যেন, কেমন অপরিণত। কাকীমা অবশ্য ধমক দিলেন ছেলেকে। কিন্তু চন্দন বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হয়ে হেসে উঠল। আগের ঘটনার জের ধরে বলল, আর বুড়িটা কিরকম লাঠি নিয়ে আমাদের তেড়ে এসেছিল অতসীদি!

ওর মুখটা সুন্দর—হাসিটাও শিশুর মতো সরল বলে অতসীর রাগ হল না। সেও একটু হাসল।

নির্মলেন্দু স্বল্পভাষী। অতসীর ওপর আতিথ্যের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নাইট ডিউটিতে চলে গেল।

আতিথ্যের কোনো ত্রুটি রাখেনি অতসী। এই অল্প সময়ের মধ্যে সে বেশ গুছিয়ে রান্না করে ফেলেছে, দই-মিষ্টিও আনিয়েছে। কিন্তু অসুবিধে ছিল শুতে দেবার। দুখানি মাত্র ঘর। ভাগ্যিস আজ ওর নাইট ডিউটি।

অতসী প্রথমে ঠিক করেছিল খাটটা ওদের ছেড়ে দিয়ে পাশের ঘরে সে একাই মাটিতে শোবে। কিন্তু পরে ভেবে দেখল ঐ খাটে তিনজন ধরে না। দুজনেই খুব ঘেঁষাঘেঁষি হয়। কিন্তু উপায় বা কি? এই সময়ে কাকীমা বলে বসলেন—ওরা বাপ-ব্যাটায় খাটে শুক, তুমি আর আমি শোব মাটিতে।

এ-কথা অতসী আগেই ভেবেছিল। কিন্তু কাকীমাকে মাটিতে শোবার কথা বলতে পারেনি। এখন সমস্যার সমাধান আপনা থেকেই হয়ে গেল। বিছানাও সেই-রকম করে পাতা হল। এমনি সময়ে চন্দন এসে খোঁচ তুলল। বলল, অতসীদি, তুমি কি আমাকে বাবার সংগে শুতে দিচ্ছ? ইমপসিবল!

কাকীমা অবাক হয়ে বললেন, ওখানে শুবি না তো শুবি কোথায়?

চন্দন সে-কথার উত্তর না দিয়ে অতসীকে জিজ্ঞেস করলে, ও-ঘরে মাটিতে শুচ্ছে কে গো?

অতসী মশারি টাঙাতে টাঙাতে বললে, কেন? আমি আর কাকীমা।

চন্দন কিনা ভূমিকায় তৎক্ষণাৎ বললে, আমি তোমার সংগে শোব।

এ এমন প্রস্তাব যে সকলেই থমকে গেল। অতসী মশারির দড়িতে ফাঁস দিচ্ছিল, গিঁট পড়ে গেল।

কাকীমা ধমক দিয়ে উঠলেন।—তাই আবার হয় নাকি?

সোনাকাকা বললেন, কেন, আমার সংগে শুতে আপত্তি কি?

চন্দন এসবের কোনোটারই জবাব না দিয়ে অতসীকে বলতে লাগল, আমি তোমার সঙ্গে শোব।

—মাটিতে কষ্ট হবে। টেবল ফ্যান।

—কিছু কষ্ট হবে না। বলেই ঝুপ করে মশারি তুলে বিছানার এক পাশে শুয়ে পড়ল।

চন্দনের মা খুব চেঁচামেচি শুরু করলেন। এমনকি মশারি তুলে ছেলের হাত ধরে টেনে আনবার চেষ্টা করলেন। চন্দনও উঠবে না। বিছানা আঁকড়ে পড়ে রইল।—সে এক দৃশ্য!

তখন অতসী অগত্যা হেসে বললে, থাক থাক। শুয়েছে শুক।

কাকীমা চোখ বড়ো বড়ো করে বললে, লোকে দেখলে বলবে কি? পাল্টাপাল্টি এই ইঙ্গিতে অতসীর মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করে বললে, আহা! ও তো ছেলেমানুষ।

চন্দনের মা গজগজ করতে করতে চলে গেলেন। তার ভাবার্থ—এমন অবুঝ ছেলেকে নিয়ে কোথাও বেরোন উচিত নয়। ভবিষ্যতে কখনো আর এ-ভুল করবেন না।

অতসী দরজা বন্ধ করে দিল। অভ্যাসমতো শোবার আগে জল খেয়ে নিল। আরো কিছু অভ্যাস ছিল—আলো নিভোতেই খেয়াল হল। কিন্তু আজ উপায় নেই। ব্লাউজের বোতাম খুলে ফেলেছিল। সেগুলো আবার আটকালো। পাউডারটা গায়ে ঢালা হল না, অল্প একটুখানি নিয়ে মুখে-ঘাড়ে মাখল।

বিছানায় ঢোকবার আগে বাইরে থেকে মশারির ভেতরটা একবার দেখল। চন্দন বোধহয় এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে।

অতসী এবার পাপোষে ভালো করে পা মুছে ধীরে ধীরে মশারির ভেতর ঢুকল। ঢুকতেই এতক্ষণে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করল। পুরুষমানুষের সংগে শোওয়া শুরু হয়েছে এখনো এক মাস হয়নি। সে-মানুষটা, যাই হোক ক্রমশ অভ্যাস হয়ে এসেছে। কিন্তু এ-ছেলেটা—ছেলে, না মানুষ?

প্রায় পৌনে ছ' ফিট লম্বা—নির্মলেন্দুও এত লম্বা নয়। শুয়েছে দু হাঁটু ভেঙে। নইলে বিছানা ছেড়ে পা বেরিয়ে যাবে। আঃ—কী জ্বালা—পাতলুনটা উঠে গেছে কোথায়! কী বিশ্রী শোওয়া!

কিন্তু লম্বা হলেও ছোঁড়াটার স্বাস্থ্য বেশ ভালোই। থাইটা কিরকম চওড়া—হাতের মাসলগুলো উঁচু হয়ে আছে।—নিশ্চয় এক্সারসাইজ করে। নির্মলকেও কতবার বলেছে—একটু-আধটু এক্সারসাইজ করো না। শোনেনি। হেসে বলেছে, কারখানার রোজ যা এক্সারসাইজ করছি তার ঠেলায় অস্থির!

সে-কথা ঠিক। বেচারা যখন বাড়ি ফেরে তখন কী ক্লান্তই না দেখায়।—এখন বাপের হোটেলে আছ, দিব্যি খাচ্ছ-দাচ্ছ মাসল ফোলাচ্ছ। অ্যাইসা দিন নেহি রহেগা বাছা! একবার চাকরিতে ঢোক—তখন দেখব কোথায় থাকে এই রঙ আর মাসল!

না, চন্দনকে এখন আর ঠিক ছেলে বলা যায় না। ও এখন পুরোপুরি মানুষ।

এটা প্রমাণিত হতেই অতসীর সংকোচ কেমন বেড়ে গেল। কিন্তু এখন আর উপায় নেই। সারারাত বসে বসে মশার কামড় খাওয়া তো যায় না।

অগত্যা অতসীকে শুতে হল। শুল অনেকখানি তফাৎ বাঁচিয়ে। এ-পাশে আবার টেবিল ফ্যানটা চলছে। বিশ্রী গোঁ গোঁ শব্দ। হাওয়ার ধাক্কায় মশারি এসে অতসীর গায়ে ঠেকছে—সেও এক অস্বস্তি।

এতক্ষণ তার সংকোচ হচ্ছিল। বালিশে মাথা রেখে পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে শোবামাত্র তার কেমন ভয় করতে লাগল। হঠাৎ তার মনে হল সম্পর্কটা কিছুই নয়—ওটা একটা ঢিলে গিঁট মাত্র। আসলে একটা মেয়ের কাছে একটা পুরুষের পরিচয়—পুরুষ। যেমন পুরুষের কাছে একটা মেয়ের সব-চেয়ে বড়ো যে পরিচয় তা হচ্ছে তার বৈপরীত্য। তা না হলে মেয়ে বড়ো হয়ে গেলে বাপের কাছে শুতে তার বাধা কি? মা—গর্ভধারিণী জননীই বা কেন ছেলেকে পাশে নিয়ে শুতে পারে না? তার অর্থ তো পরিষ্কার—এখন আর ছেলে 'ছেলে' নেই—'মানুষ' হয়ে গেছে। অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের বা বিপরীতের ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠেছে।

কিন্তু চন্দনকে নিয়ে বোধহয় এতটা দুর্ভাবনার কারণ নেই। সোনাকাকুর ছেলে। এই সোনাকাকুকে দেখছে জন্মে থেকে। তারই ছেলে চন্দন। মনে পড়ল একবার কলকাতায় চিড়িয়াখানায় গিয়েছিল। চন্দন হাতির পিঠে কিছুতেই উঠবে না। শেষে অতসী যখন তার হাত ধরে নিয়ে গেল, তখন সে উঠল। তাছাড়া এই তো সেদিন—হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষা দিয়ে এসেছিল সোনাকাকুর সংগে। এসেই খোঁজ—অতসীদি কোথায়? কি না—চুপি চুপি পরামর্শ—কাউকে কিছু না বলে দুজনে সিনেমায় যাবে।

যেতে হয়েছিল। আর সারাক্ষণ কী ছেলেমানুষি! ছেলেটা বড়ো হয়েছে ঠিকই কিন্তু মনটা সাদা।

অতসী বেশ খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে পাশ ফিরে শুল।

পাশ ফিরে শুল তবু ঘুম আসে না। একা শুলে এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়ে কিন্তু পাশে আর একজন কেউ থাকলে অত সহজে ঘুম আসতে চায় না, ঘুমোতে দেয় না। আজও পাশে একজন অবশ্য রয়েছে—কিন্তু কার জায়গায় কে!

অতসী চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মনে মনে ভাবল, আচ্ছা, নাইট-ডিউটিটা তুলে দেয় না গভর্নমেণ্ট? অন্তত তাদের জন্যে যাদের ঘরে বউ আছে—একা!

এমনি সময়ে চন্দনের হাতটা এসে পড়ল তার গায়ে। অতসী চমকে একেবারে উঠে বসল। কী ব্যাপার!

সে এতদূর চমকে উঠেছিল যে, বুকের মধ্যে হাতুড়ি পেটা শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ লাগল সামলাতে। হাতটা তখনো তার বালিশের ওপরে পড়ে ছিল। না, নড়ছে না। তাহলে হয়তো ঘুমের ঘোরেই লেগে গেছে। তবু সন্দেহ যায় না। অতসী অন্ধকারে ঝুঁকে পড়ে চন্দনকে দেখতে লাগল সত্যি ঘুমোচ্ছে কিনা। প্রায় সব লক্ষণই মিলছে! একটু নিশ্চিন্ত হল। কিন্তু সমস্যা—হাতটা সরাবে কী করে? যদি ঘুম ভেঙে যায়? যদি উল্টে ও কিছু ভেবে বসে?

কিন্তু হাতটা না সরালেও তো শোয়া যাচ্ছে না। তখন অতি সাবধানে অতসী চন্দনের হাতটা একটুখানি সরিয়ে কোনো-রকমে নিজের জন্যে সামান্য জায়গা করে নিলে।

রাত বোধহয় এখন দুটো। এবার ঘুমোতে হবে। তাকিয়ে থাকলে ঘুম আসবে না, চোখ বুজল। কিন্তু কানের কাছে টেবিল ফ্যানের সেই উৎকট শব্দ।

ঘুম আসছে না দেখে অতসী চোখ বুজিয়ে আজ সারাদিনের সুখের স্মৃতি-গুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। র‍্যাশানের চালটা এবার বেশ ভালো দিয়েছে...ডাক্তার বলেছে নাকি বাবার প্রেসারটা নর্মাল হয়ে এসেছে।...ওদের আপিসে... কী একটা অ্যালাউন্স দেবে... সোনাকাকু কী ভাগ্যি মনে করে তাদের সংসারে উঠেছে—বড়োলোক আত্মীয়র তো অভাব ছিল না। আর সোনাকাকুর কদর সর্বত্র। হ্যাঁ, তাদের এই নতুন সংসারে—সোনাকাকুরাই প্রথম এল। আর একটা ঘর না হলে চলে না। গেস্টদের জন্যে বেশ আলাদা একটা রুম।...চন্দনটা কত বড়ো হয়ে গেছে। বি এস-সি পড়ছে। চেহারাটিও বেশ। আগেকার দিন হলে বাপ-মা এই বয়সেই ছেলের বিয়ে দিত। এখন ভাবলে হাসি পায়। কুড়ি বছরের ছেলে বিয়ে করতে যাচ্ছে! আচ্ছা এই বয়েসের ছেলেরা সত্যি কিছু বোঝে? মুখে খিস্তি করা আর মেয়েদের পেছু নেওয়া কিম্বা দুটো প্রেমপত্তর লেখাই তো সবকিছু নয়। মনে করো যদি কোনো মেয়ে হঠাৎ রাজি হয়ে পড়ে—ছেলেটা পারবে? অসম্ভব। তার জন্যে বোধহয় একটু বয়েসের দরকার।

তাই বা কেন? কুড়ি বছরের ছেলে বিয়ে থা করে পুত্রোপৌত্র সংসারী হয়েছে, এ-কথাও তো শুনেছে। এখনও শুনছে—এই বয়েসের ছেলেরা হিতাহিতজ্ঞানশূন্য বলে সংযমের ধার ধারে না। বাধ্য হয়ে বৌকে ছেলের বাপ-মা মাঝে মাঝে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। আর? চন্দনের তো বয়েস কুড়ি।—সেই হিতাহিতজ্ঞানশূন্যতার বয়েস।

পরক্ষণেই মনে হল তারা শোয়ার ব্যাপারে কাকীমা অমন আপত্তি করল কেন? একেবারে হাত ধরে টানাটানি! কই মেয়ে হয়ে সে তো আপত্তি করেনি? একটা উপযুক্ত ছেলে আর মেয়ে একসঙ্গে শুলেই কি সব অশুদ্ধ হয়ে গেল! মানুষের বোধ থাকবে না? বিবেক থাকবে না? সংযম থাকবে না? কিন্তু কাকীমা একটু বাড়াবাড়িই করেছিল। চন্দনকে তার সঙ্গে শুতে দেবার ব্যাপারে তাঁর যেন খুব আপত্তি ছিল। কেন? তবে কি মা ছেলেকে চেনেন বলেই আপত্তি করছিলেন? চন্দন কি কলেজে ঢুকে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে? সে-খবর তো জানার উপায় নেই।

এ-কথা মনে হতেই অতসীর আবার কেমন ভয় করতে আরম্ভ হল। সে যতবার নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করল—চন্দন তার ভাই—রক্তের সম্পর্ক রয়েছে—ততবার তার কেবল এই কথাটাই মনে হতে লাগল—অনুকূল পরিবেশ পেলে মানুষের পশুবৃত্তি জেগে ওঠে। তখন আর সে সম্পর্কের দোহাই মানে না।

উঃ, টেবিল ফ্যানটার কী বিশ্রী শব্দ!

অতসীর ধারণা হল, চন্দন এখন আর চন্দন নেই। সে কুড়ি বছরের উচ্ছৃঙ্খল যুবক মাত্র। ঘুমোয়নি, মটকা মেরে পড়ে আছে। সুযোগের অপেক্ষা করছে। ঘুমোয়নি নিশ্চয়—তাহলে একটু নাক ডাকতই। পুরুষমানুষের নাক প্রায়ই ডাকে। নির্মলের ডাকে, তার বাবার ডাকে, গোহাটি থেকে বাবার বন্ধুর এক ছেলে এসেছিল—তার নাক ডাকার ঠেলায় বাড়ির কেউ ঘুমোতে পারেনি। চন্দনের ডাকছে না কেন?

অতসী আবার উঠে বসল। খিলটা বন্ধ করে ভুল করেছে। খুলে রাখবে নাকি? ধরো যদি ও হঠাৎ কিছু করতে আসে, তাহলে চেঁচামেচি করার চেয়ে অন্তত ঘর থেকে পালিয়ে যাবে। তাহলে এখন কী কর্তব্য?

টেবিল ফ্যানটা গোঁ গোঁ করে শব্দ করেই যাচ্ছিল। কখন এক সময়ে শব্দটা আর অত অসহ্য শোনা গেল না। তার বদলে ঠান্ডা ঝিরঝিরে হাওয়া।

অতি কষ্টে অতসী চোখ মেলে তাকাল। এ কোথায় শুয়ে আছে!

খেয়ালই নেই রাত্রের শেষ প্রহরে কখন দরজা খুলে চুপি চুপি বেরিয়ে ভেতরের ঘরে এসে শুয়েছিল। তারপর সেখানেই কাকিমা ঘেঁষে শুয়ে পড়েছে।

যাক, ফাঁড়া কাটল। যাকে বলে দুঃস্বপ্নের রাত্রি। ●

অতসী এবার একবার জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল টেবিল ফ্যানের দাপটে মশারি এলোমেলো। চন্দন উপুড় হয়ে দেহটা কুঁকড়ে বালিশে মুখ গুঁজে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। না, ছেলেটা সত্যিই ঘুমোচ্ছে।

অতসীর এতক্ষণে কেমন যেন মায়া হল। ইচ্ছে করল গিয়ে মশারিটা ভালো করে গুঁজে দেয়। ঠেলা দিয়ে বলে, নে, অনেক জায়গা, ভালো করে শো।

কিন্তু মনে মনে ভাবলেও কাজে পারল না। বরঞ্চ নিজের শূন্য জায়গাটা আর পরিত্যক্ত মাথার বালিশটার দিকে চোখ পড়তেই মনটা কেমন অস্বস্তিতে ভরে গেল।

এমনি সময়ে বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। অতসী চমকে উঠল। নির্মল এরই মধ্যে এসে গেল।

সাড়া না দিয়েই ও তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে মশারিটার হ্যাঁচকা টান মেরে দড়ি-গুলো ছিঁড়ে ফেলল। তারপর এক হাতে তার বালিশটা সরিয়ে নিয়ে লুকিয়ে ফেলল। চাদরটা টান টান করে দিল। তারপর চন্দনকে দু হাতে করে একেবারে বিছানার মাঝখানে ঠেলে দিল। হঠাৎ কেউ দেখলে মনে করবে এ-বিছানায় কেউ অংশীদার নেই—ছিল না।
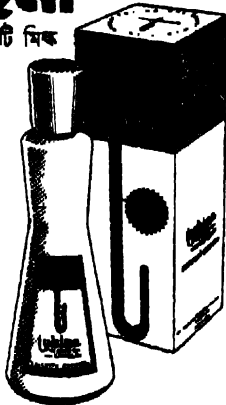
।। উনিশ ।।

গ্র্যান্ট স্ট্রীটে দরজীর দোকানে বেশী দেরি হল না।

অবশ্য শুধু টেলারিং শপ বললে ভুল বলা হবে। কারণ দোকানে জামাকাপড়ের স্টক কিছু কম নয়। গরম কাপড় তো প্রচুর। এবং ক্রেতার ভিড়ও আশানুরূপ।

অপরেশ আগেই ফোনে কথা বলে রেখেছিল। তারা দোকানে ঢুকতে ওসমান সাহেব নিজেই এগিয়ে এল। নানা ধরনের গরম কাপড় বের করে দেখাতে শুরু করল।

এক ফাঁকে অপরেশ বলল,—'বড় দোকানে গেলে তোর খরচ অনেক বেশী পড়ত। কিন্তু এখানে কাপড়ের ভ্যারাইটি কিছু কম নয়। মেকিং চার্জও মডারেট। অথচ বেশ ভালো কাটার আছে। মাপে-জোপে এতটুকু গরমিল পাবিনে। তাছাড়া ওসমান সাহেব আমাদের অফিসের কাজ-কর্ম করে। আমি বললে আর একটু কমে-সমে রাজি হবে।

দুটো স্যুটের কাপড় অপরেশ পছন্দ করল। এসব ব্যাপারে মিলন নেহাৎ আনাড়ি। আসলে তার গরম স্যুট নেই। একটা টুইডের কোটই সম্বল। ডিসেম্বরের শেষে কিম্বা জানুয়ারীর প্রথমে সেটা বাক্স থেকে বের করে। তাছাড়া কলকাতায় শীতের স্বভাব ঠিক চড়ুই পাখির মত। উড়ু-উড়ু ভঙ্গি। নরম পা ফেলে ঘাসের উপর বসছে, আবার ফুড়ুৎ করে পালাচ্ছে। হাড়-কাঁপানো শীত দূরে থাকুক, কনকনে ঠাণ্ডা আর কটা দিন পড়ে? একটা পুল-ওভারে শীত কাটে। গরম স্যুট বাহুল্য, লোক-দেখানো চটক বলা চলে।

দোকান থেকে বেরিয়ে অপরেশ প্রস্তাব করল,—তোর মন-মর্জি ভালো নেই, মরচে পড়েছে বলছিলি। চল একটু চাঙ্গা করে আসবি।'

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। মিলন বুঝতে পারল। অপরেশের যা স্বভাব তাই। এই সন্ধ্যেবেলায় সে শুঁড়িখানায় যেতে চায়। আধুনিক বার অ্যান্ড রেস্তোরায়। যেখানে পান এবং আহার দুই প্রস্তুত। উর্দি-পরা বেয়ারার দল শুধু অর্ডার পাবার অপেক্ষায় আছে।

মিলন এক মুহূর্ত চিন্তা করল। অপরেশের বারে যাওয়া মানেই আরো দুটি ঘণ্টা কাবার। কিন্তু তার হাতে কি কাজ? বাড়ি ফিরেই বা কি করবে? গতকাল রাত্তিরে পুলিশ হানা দেবার পর থেকে তাদের বাড়িতে একটা বিষণ্ণ স্তব্ধভাব। মা আর বাবা কারো মুখে কথা নেই। দুজনেই চুপ....ছিন্নমূল বৃক্ষের মত নিস্তেজ। অথচ তার আমেরিকায় চাকরি হয়েছে শুনে মা কেমন চঞ্চল বোধ করল। তারপর তাড়াতাড়ি কত কি যে ঘটে গেল। হঠাৎ এক খণ্ড কালো মেঘ এসে তাদের বাড়ির সুখের সূর্যটাকে আড়াল করে দাঁড়াল। এখন বাড়ি ফিরে মিলন সেই একই অবস্থা দেখবে। তার মত কিরণও নিশ্চয় এখন পথে পথে ঘুরছে। বাড়িতে শুধু মা, বাবা আর বিনি। কে জানে বিনি এতক্ষণ তার থিয়েটারের রিহার্সাল শেষ করে বাড়ি ফিরেছে কিনা! আর একটু মদ খেলেই বা দোষ কি? অপরেশ বলে সে যে-দেশে যাচ্ছে, সেখানে মদ্যপান অপরিহার্য। ড্রিংক করা প্রায় স্বাস্থ্যবিধির আওতায় পড়ে। তাছাড়া সুরা উত্তেজনা জোগায়,...এতে তার মনের অবসন্নতা কাটে।

অন্তরের ইচ্ছা গোপন রেখে সে বলল,—'চল, তোকে একটু কম্‌প্যানী দিতে আমার আপত্তি নেই।'

—'এই তো গুড বয়ের মত কথা।' অপরেশ দাঁত বের করে হাসল। ফের গলা খাটো করে বলল,—'আজ কিন্তু জিন নয়। তোকে এক পেগ হুইস্কী খেতে হবে।'

পার্ক স্ট্রীট পর্যন্ত গেল না অপরেশ। গ্র্যান্ট স্ট্রীট থেকে বেরিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে ছোটখাটো একটা বারে তাকে এনে তুলল। খুব জমকালো বার নয়। ঠাঁটবাট চোখ ধাঁধায় না। বাজনাবাদ্যি নেই। বেয়ারা-দের পোশাক-পরিচ্ছদ সাধারণ। আগন্তুক-দের চেহারায় চটক কম। বেশবাসে স্বাচ্ছল্যের ইঙ্গিত নেই। বরং দু-একজনকে দেখে মিলনের সাধারণ জেলাখের মাতাল বলে মনে হল। এখানে অপরেশ বেমানান। তার সুন্দর পোশাক, উজ্জ্বল চেহারা এই বার অ্যান্ড রেস্তোরার সঙ্গে আদৌ মিশ খায় না।

এদিক ওদিক তাকিয়ে মিলন বলল, —'এই বাজে জায়গায় মরতে এলি কেন? এর চেয়ে পার্ক স্ট্রীট রেস্তোরা অনেক ভাল ছিল।'

—'এখানে তোর ভাল লাগছে না বুঝি?' অপরেশ মুখ না তুলে জবাব দিল। বলল, —'এই ছোটখাটো বারগুলোতে কিন্তু ভিড় কম হয় না। বিশেষ করে সেলার্স মানে নাবিকেরা যখন বন্দরে নামে। তখন একটি আসনও খালি পাবি না। সব ভর্তি। হৈ-হৈ....হুল্লোড়।' মুচকি হেসে সে যোগ করল,—'তাছাড়া কল-গার্লরা আসবে। সেলার্সরা এলেই চিড়িয়াদের ভিড় ভীষণ বেড়ে যায়। অবশ্য একটু ভয়ের কারণও আছে। মাঝে মাঝে পুলিশ হানা দেয়। কিন্তু নেহাৎ অ্যাকসিডেন্ট। বছরে কটা দিন আর পুলিশের এসব দিকে নজর পড়ে।'

সুরার পাত্রে ঠোঁট ডুবিয়ে অপরেশ ভ্রু কুঞ্চিত করল। ছোট্ট এক চুমুক দিয়ে সে আবার বলল,—'অবশ্য আমি আর কল-কাতায় বেশীদিন থাকছিনে। সামনের মাসে হয়তো এখান থেকে চলে যেতে পারি।'

—'তাই নাকি?' মিলন খুব অবাক হয়ে শুধোল। কোনোদিন তো আমাকে বলিস নি? ভীষণ চাপা স্বভাব তোর।'

অপরেশ হেসে বলল,—'দূর! ...স্বভাব হবে কেন? এখনও ফাইন্যাল কিছু হয়নি। তবে মনে হয় ওরা আমাকে সিলেক্ট করবে। আমার এক্সপেরিয়েন্স আছে। তারপর বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের বিলিতী ডিপ্লোমা পেয়েছি। তাছাড়া বাবা একটা ভালো রেফারেন্স জোগাড় করেছেন। প্রাইভেট ফার্মে কানেকশন আর রেফারেন্সের খুব দাম। উঁচু পোস্টে যেতে হলে এগুলো ভীষণ প্রয়োজন।

মিলন খুশি হল। 'তাই বল। তুই

বেটার চান্স পেয়ে যাবি। কিন্তু চাকরিটা কোথায়? কি পোস্টের জন্য লোক চেয়েছে?'

ঢক করে খানিকটা হুইস্কী গিলে অপরেশ সোজা হয়ে বসল। পীরিতির কথা শুনলে মেয়েরা যেমন চঞ্চল হয়, মিলনের তেমনি কৌতূহলী ছটফটে ভাব। অপরেশ তাই খুলে বলল,—'চাকরিটা ফরিদাবাদে। ওয়ার্কস ম্যানেজারের পোস্ট। দিল্লী থেকে বাবা লিখলেন একটা দরখাস্ত পাঠাতে। আমি টাইপ করে ছেড়ে দিয়েছি। এখন মনে হচ্ছে ওরা আমাকে সিলেক্ট করবে। তারপর আর দেরি করবার কোনো মানে হয় না। আই শ্যাল হ্যাভ টু প্যাক আপ।'

মদের পাত্রে ঠোঁট ডুবিয়ে মিলন চাঙ্গা হতে চাইল। আজ জিন নয়, অপরেশ তার জন্য হুইস্কীর অর্ডার দিয়েছে। কিন্তু মিলন এখনও আনাড়ি। সুরা তাকে উদ্দীপ্ত করে না। বরং মুখে দিলে কটু ঝাঁঝালো মনে হয়।

বন্ধুকে সে প্রশ্ন করল,—'তোর নতুন পোস্টে কেমন মাইনে-টাইনে হবে?'

—'প্রায় আড়াই হাজার টাকা। তাছাড়া ফ্রি কোয়ার্টার্স অ্যান্ড এ কার।'

মিলন হেসে বলল,—'সত্যি তোকে দেখলে জীবনটাকে ঠিক লুডো খেলার ঘুঁটি বলে মনে হয়। কেমন এক লাফে দেড় হাজার থেকে আড়াই হাজার টাকায় পেঁছে গেলি। এর উপর আবার ফ্রি-কোয়ার্টার্স অ্যান্ড এ কার। নিশ্চয় আরো কিছু সুবিধে আছে।'

মদের পাত্র নিঃশেষ করে অপরেশ আর এক পেগের অর্ডার দিল। ঘাড়টা ঈষৎ কাত করে একটা নতুন ভঙ্গি করে বলল,—'কিন্তু জীবনকে হঠাৎ লুডো খেলার ঘুঁটি বলে মনে হল কেন, তোর?'

—'তাছাড়া আর কি বলব?' মিলন ঈষৎ ঠোঁট ফাঁক করে হাসল। বলল,—'দেখছি তো, এই পৃথিবীতে সবাই লুডোর ঘুঁটি। তবু জীবন দু-রকম। কেউ সাপ লুডোতে তরতর করে উপরে উঠছে। আবার কেউ সাদা লুডোর ঘুঁটি সেজে ঘর থেকে বেরোতেই পারছে না। কিম্বা এক-ঘর, দু-ঘর করে ধীরে ধীরে শম্বুকের মত এগোচ্ছে।'

অপরেশ মুচকি হাসল। তারিফ করে বলল,—'গ্র্যান্ড উপমা তোর। আমি তাহলে স্নেক লুডোর ঘুঁটি?'

—'নিশ্চয়।' মিলন জোর গলায় বলল, 'জীবন তোর কাছে একটা সাপ-লুডোর বোর্ড। একটা করে দান ফেলে হাতের কাছে উপরে উঠবার সিঁড়ি পেয়ে যাচ্ছিস। অবশ্য তুই একা নস। এমন আরো অনেকে আছে। ব্যবসায়ী, সাপ্লায়ার, বড় ডাক্তার, জাঁদরেল অফিসার, কিম্বা তোর মত বিলিতী ডিগ্রী যাদের পুঁজি, এদেশে এখন তারাই ভাগ্যবান। অথচ আর দশজনের দিকে তাকিয়ে দ্যাখ, সাধারণ কেরানী, শিক্ষিত বেকার, কিম্বা অল্প মাইনের কর্মচারী। বেচারীরা পড়ে পড়ে মার খায়। জীবনের লুডোর বোর্ডে তারা ক্রমাগত দান ফেলবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। ভালো দানের দেখা কি মেলে? কপাল জোরে হয়তো একটা ছক্কা পড়ে। তবু তার ক্ষমতায় আর কতদূর নড়বে। কতটুকু এগোতে পারে?'

মদের গ্লাস থেকে মুখ তুলে অপরেশ হঠাৎ হা-হা করে হেসে উঠল। সুরার নেশায় তার চোখ দুটি ক্রমেই ভারী এবং স্থির মনে হচ্ছিল। মিলনের পিঠের উপর একটা আলতো চাপড় মেরে সে বলল,—'খুব তো বুলি কপচাচ্ছ বাবা। কিন্তু তুমি নিজেও একটি সাপ লুডোর ঘুঁটি হয়ে বসেছ। এক দান ফেলেই যা ভেল্কি দেখালে। একেবারে কিস্তিমাত। ইণ্ডিয়া থেকে উড়ে গিয়ে আমেরিকায় জুড়ে বসবে। তোমার কপালকে এখন আমার মত ভাগ্যবানরাই হিংসে করছে।'

মিলন লজ্জা পেয়ে বলল,—'দূর! ভাগ্য না ছাই। এতদিন তাহলে ঘাস কাটছিলাম কেন? ও সব তোর চেষ্টা। নইলে বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে?'

এক পেগ, দু পেগ শেষ পর্যন্ত তিন পেগ হুইস্কী টেনে অপরেশ উঠবার জন্য প্রস্তুত হল। ঘড়িতে প্রায় আটটা বাজে। দরজার দিকে আর একবার নিরাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে উঠল,—'চল, চপলা নন্দী বোধহয় আজ এখানে আসবে না।'

—'চপলা নন্দী?' মিলন ভুরু কুঁচকে তাকাল।

—'বারে, এরই মধ্যে নামটা ভুলে গেলি? না, তুই একেবারে হোপলেস। মেয়েদের নাম এত তাড়াতাড়ি কেউ ভোলে?'

মিলন মনে করবার চেষ্টা করল। কিন্তু স্মৃতির অরণ্য হাতড়ে নামটা খুঁজে না পেয়ে শূন্য দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে রইল।

অপরেশ হেসে বলল,—'তুই নির্ঘাত বুড়ো হয়ে গেছিস। নইলে একটা মেয়ের নাম এখনও মনে পড়ল না?'

—'কোন্ মেয়েটা বল তো?'

—অপরেশ চোখ নাচিয়ে বেশ রহস্য করে বলল,—'সেই যে পার্ক স্ট্রীটে থাকে দেখে তুই ভয় পেয়ে পালালি। তোর কানে কানে আমি বললাম, ওর নাম অলকা নয়। নামটা চপলা,—চপলা নন্দী। সার্কাস রেঞ্জে ওরা থাকে।'

—'ও, হ্যাঁ।' মিলন ডান গালে তর্জনীর অগ্রভাগ চেপে কথা কইল। 'এখন মনে পড়েছে। সেই ট্যাক্সি-গার্ল মেয়েটা? তার কি আজ এখানে আসবার কথা ছিল?'

—'ইয়েস। আমি তাই জানতাম। চপলা ইদানীং এখানে আসে। এবং আজ তার আসবার কথা ছিল।' ডান চোখটা ঈষৎ ছোট করে এক মুহূর্ত চিন্তা করল অপরেশ। তারপর টেবিলের উপর দু-তিনবার টোকা মেরে বলল,—'ঠিক আছে। এখন ওর বাড়ি যাব।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই অপরেশের মাথাটা হঠাৎ বোঁ করে ঘুরে গেল। তার পা টলছিল। কোনো মতে টেবিলটা ধরে সে নিজেকে সামলে নিল। মুচকি হেসে বলল,—'দেখছিস তো? অজন্তা বার ছোট হলে কি হবে? কিন্তু জলমেশানো চীজ নয়। এরা খাঁটি মাল সার্ভ করে। নইলে তিন পেগে আমি আউট হই?'

রাস্তায় নেমে অপরেশ একটা ট্যাক্সি নিল। পাঞ্জাবী ড্রাইভার। গাড়িতে উঠে সে ঈষৎ জড়িত কণ্ঠে নির্দেশ দিল,—'থোড়া ময়দানমে ঘুমকে সার্কাস রেঞ্জ চলিয়ে।'

—'এত রাত্তিরে আবার ময়দানে?'

—'হ্যাঁ। মাথাটা কেমন ঘুরছে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় ভালো লাগবে। এক চক্কর মেরে তোকে আবার মেট্রোর সামনে নামিয়ে দেব।'

মিলন অনুরোধ করল। 'এত রাত্তিরে নাই বা সার্কাস রেঞ্জে গেলি? বাজে জায়গা। ওখানে কি মেয়ে আছে?'

—'তুই চল না।' সে মৃদু হাসল। 'দেখবি, সময়টা ভালো কাটবে। তাছাড়া চপলার একটা খুবসুরৎ বোন আছে।' অপরেশ নীচের ঠোঁটটা কামড়ে একটি অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করল। মুচকি হেসে বলল,—'তোর তো কোনো এক্সপেরিয়েন্স নেই। বেরিয়ে আসবার সময় ওরা কেমন মিষ্টি হেসে বলে,—আবার এসো, বুঝলে?'

মিলন সজোরে মাথা নাড়ল। 'অসম্ভব। ওসব কল-গার্লদের সঙ্গ আমার আদৌ ভাল লাগে না।' একটু থেমে সে বন্ধুকে সকাতর অনুনয় করল,—'এই বাজে মেয়েগুলোর পিছনে কেন ছুটোছুটি করিস? ভগবান তোকে সব দিয়েছেন অপরেশ। কন্দর্পের মত চেহারা, মোটা মাইনের চাকরি, ভালো কনেকশনস্... তোর উন্নতির সিঁড়ি ক্রমেই আকাশে ঠেকবে। জীবনে একটা লোক আর কি চায়? তুই এবার বিয়েটা সেরে ফেল অপরেশ। কিম্বা একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে প্রেম-ট্রেম শুরু কর। অফিসের পর তাকে নিয়ে বেড়াবি। তোর পয়সা আছে, সামর্থ্য আছে। ছুটির দিনে কবুতর-কবুতরীর মত গঙ্গার ধারে বসে দুজনে গল্পের জাল বুনবি।'

তার কথা শুনে অপরেশ মাতালের মত হা-হা করে হেসে উঠল।

মিলন আহত গলায় বলল,—'অমন হেসে উঠলি কেন? একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তোকে প্রেম করতে বলেছি। এতে হাসবার কি হল?'

সুরার নেশায় অপরেশের চোখ দুটি ঈষৎ লাল দেখাচ্ছিল। সে অসংলগ্ন জড়িত কণ্ঠে জবাব দিল,—'তুই শেষ পর্যন্ত পীরিতি করতে বলছিস শুনে আমার ভীষণ হাসি পেল।'

মিলন চুপ করে রইল।

অপরেশ ফের বলল,—'জানিস মিলন, লণ্ডনে থাকতে একটা গান শুনতাম। তখন মোটামুটি সেটা হিটসঙ হয়েছিল। শুনবি গানটা?'

বন্ধুর সম্মতির জন্য অপেক্ষা না করে অপরেশ গলা ছেড়ে গাইতে শুরু করল—

When I was just a lad of ten
My father said to me, Come here
and take a lesson from the
lovely lemon tree. Dont' put
your faith in love my boy My
father said to me, I fear you will
find that love is like The lovely

lemon tree. Lemon tree is very
pretty And the lemon flowers are
sweet, But the fruit of the poor
lemon is impossible to eat.

মদের নেশা একটু বেশী হয়েছিল। গান শেষ করে অপরেশ তাই অর্থহীন আনন্দে হা-হা করে হেসে উঠল। মিলনের গলা জড়িয়ে ধরে বলল,—'কিরে, গান শুনে কেমন লাগল তোর?' ফের চোখ ঘুরিয়ে অদ্ভুত একটা ভঙ্গি করে মন্তব্য করল,—'প্রেম বৃক্ষের ফল মধুর নয় বন্ধু। টক, টক,...দারুণ টক।'

—'তুই আজ বাড়ি যা অপরেশ। এত রাত্তিরে সার্কাস রেজে নাই বা গেলি?' মিলন প্রায় মিনতি করল।

অপরেশ জড়িত কণ্ঠে বলল,—'যাব না কেন? দেখিস, আজ চপলা নন্দীর সঙ্গে নিশ্চয় প্রেম করব। ওকে কি বলব জানিস?'

অপরেশ নেশার ঝোঁকে ফের গান গাইতে শুরু করল,—

A long long time ago
On a graduation day
You handed me a book
I signed this way.
Roses are red my love
Violek are blue
Sugar is sweet my love
But not as sweet as you.

মেট্রোর সামনে তাকে নামিয়ে দিয়ে ট্যাক্সিটা আবার চলতে শুরু করল।

মিলনের ইচ্ছে করছিল অপরেশকে জোর করে ট্যাক্সি থেকে নামিয়ে আনে। এত রাত্তিরে সার্কাস রেঞ্জের সেই নিষিদ্ধ বাড়িতে যাওয়া ওর কখনও উচিত হবে না। কিন্তু অপরেশ কি তার কথা শুনবে? মিলন কিছু বলতে গেলে সে ফের একটা গানের কলি ভাঁজবে। নেশার ঝোঁকে তার সব অনুরোধ হাসির ঝোড়ো বাতাসে কোথায় উড়িয়ে দেবে।

রাস্তার উপর সে চুপচাপ কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। রাত প্রায় সাড়ে আটটার মত হবে। ইদানীং চারপাশে গণ্ডগোল বলে চৌরঙ্গীতেও ভিড় অনেক কম। এরই মধ্যে রাস্তাঘাট ফাঁকা। সিনেমা হলের সামনে অপেক্ষমান জনতার সংখ্যা হাতের আঙুলে গোনা চলে। ট্রামে-বাসে দিব্যি স্বচ্ছন্দে ওঠা যায়।

মিলন হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলল। আকাশে চাঁদ হাসছে। শীতের আকাশ নির্মেঘ. কি তিথি কে জানে? কিন্তু চৌরঙ্গীতে জোৎস্না কি বোঝা যায়? শুক্লপক্ষে আর কৃষ্ণপক্ষে একই চেহারা। সন্ধ্যে হলেই চৌরঙ্গীর নটীর বেশ। দুধশাদা নিওন বাতি আলোয় দিন আর রাত সমান। মনে হয়।

এই কলকাতায় সে আর কদিন আছে? খুব জোর দশ বারো দিন। তারপরই সে হাজার হাজার মাইল দূরের এক নতুন দেশে গিয়ে পৌঁছবে। আমেরিকা... পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশ। ছিরু বলে সে ধনতন্ত্রের বড় মেসিনটার একটা নাটবল্টু হতে চলেছে। সেখানে কলকাতার এই দিনগুলি শেষরাতে দেখা স্বপ্নের মত প্রায়ই তার মনে ভেসে উঠবে।

কলকাতা ছেড়ে যাবার কথা ভাবলেই কেন তার মন ভারী হয়ে উঠছে? কিসের এই বেদনা? এখানে তার মা-বাবা, ভাই-বোন, সবাই আছে বটে। কিন্তু তারা কেউ কলকাতায় থাকছে না। ডিসেম্বরের শেষে চন্দনপুরে চলে যাবে। শুধু তার মেজভাই বাদে। তাই বা কদিন? চাকরি-বাকরির নিয়ে কিরণ যে দূরে পাড়ি দেবে না, এমন কি কোনো গ্যারান্টি আছে?

আসলে এই মহানগরীর সঙ্গে তার নাড়ির বন্ধন। যাবার আগে শহরটা তাই পিছু ডাকছে। সুন্দরী যুবতীর মত রূপসী কলকাতার আকর্ষণ। অথচ এখানে কি আছে তার? আত্মীয়স্বজন নেই বললেই চলে। বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা নেহাৎ কম। তবু কলকাতা যেন এক মোহিনী মায়া। কিছুতেই তার মোহ কাটে না। এত গণ্ডগোল, হিংসা-বিদ্বেষ, মারামারি, হানাহানি, পথেঘাটে প্রাণ সংশয়, তবু কলকাতা ছেড়ে যাবার কথা ভাবলেই মন ভিজে ভিজে লাগে। কোথায় যেন কাঁটার মত কি খচখচ করে। যাবার দিনে নিশ্চয় অনেক বেশী খারাপ লাগবে।

হাঁটতে হাঁটতে মিলন নিজের মনে কথা বলছিল নতুন বিয়ের পর একাকী প্রবাসে যাবার সময় তরুণ স্বামী যেমন সদ্য পরিণীতা যুবতী স্ত্রীর কানে ফিসফিস করে কথা বলে, ঠিক তেমনি ভঙ্গিতে সে বলছিল, —কলকাতা, আমার কলকাতা। রাগ করো না তুমি। দেখো বিদেশে আমি বেশীদিন থাকছিনে। তোমার কাছে আবার ফিরে আসব। দু-বছর, কিম্বা পাঁচ বছর পরে। ততদিনে আমাকে ভুলে যাবে না তো?

স্টপে গিয়ে দাঁড়াতেই একটা আমহার্স্ট স্ট্রীটগামী বাস ঠিক তার পাশে এসে থামল। রাত অনেক হয়েছে। দিনকাল সুবিধের নয়। মা নিশ্চয় তার জন্য ভাবতে শুরু করেছে। মিলন আর দেরি করল না। সে হাতল ধরে বাসে উঠে পড়ল।

* * *

অফিস ছুটির পর ভিড় বাড়ছে। রাস্তার ফুটপাতে শুধু মানুষ। ওরই মধ্যে কমলালেবু, আঙুর আরো কতরকম ফল সাজিয়ে দোকান বসেছে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা দায়। এত লোক। প্রতি মুহূর্তে ভয়, এই বুঝি কেউ ঘাড়ে এসে পড়ছে।

সেই বেলা দুটো থেকে ওয়াই-এম-সি-এর সামনে অপেক্ষা করছে রীতাবরী। তার বিমর্ষ মুখ. চিন্তিত চাউনি। মাঝে মাঝে চোখ তুলে সে ভিড়ের মধ্যে কাউকে খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছে।

কিরণ এল আড়াইটের কিছু পরে। ঈষৎ দুঃখিতভাবে বলল,—'তুমি নিশ্চয় অনেকক্ষণ এসেছ?'

আশ্চর্য! রীতাবরী একটুও রাগল না। অভিমান করে দু' কথা শুনিয়ে দিতে পারত। কিন্তু তা করল না। বরং কোনোরকম কৈফিয়ৎ না চেয়ে জবাব দিল,—'চল, তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার।'

কিরণ এদিক ওদিক তাকিয়ে ট্যাক্সির খোঁজ করছিল। রীতাবরী তার জামাতে মৃদু টান দিয়ে বলল,—'উঁহু। আজ অত সময় হবে না। ধারেকাছে কোথাও নিয়ে চল। আমাকে এখুনি বাড়ি ফিরতে হবে।'

—'কেন? এত তাড়া কিসের?' কিরণ ভ্রূ কোঁচকাল। 'তোমাদের পাড়ায় আবার গণ্ডগোল নাকি?'

—'হ্যাঁ।' রীতাবরী ঘাড় হেলাল। তবে পাড়ায় নয়, গণ্ডগোল আমাদের বাড়িতেই।' মলিন মুখে সে বলল,—বেলা চারটের মধ্যে না ফিরলে অপমানের আর বাকি থাকবে না।'

ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য না হওয়ায় কিরণ মাথা চুলকাল। রীতাবরী গুরুতর কিছু বলতে চায়। এবং খুব সম্ভব। তার বাড়ি ফেরবার তাগিদও বেশী। নিশ্চয় সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে।

ট্রামলাইন পেরিয়ে একটু হাঁটলেই দিলখুস। রীতাবরীকে নিয়ে কিরণ সেখানে ঢুকল। কলেজ স্ট্রীট পাড়ার রেস্তোরাগুলি দুপুরের দিকে প্রায় খালি। তবু শনিবার বলে কিছু লোকজন। নইলে ভিড় বাড়ে সন্ধ্যের মুখে। তখন চেয়ার খালি পাওয়ার জন্য দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

একটা গ্রীলে ঢুকে কিরণ বসল। দু কাপ চা এবং আরো কিছু খাবারের অর্ডার দিয়ে বলল,—'নাও, তোমার কথা এবার শুরু করতে পার।'

টেবিলের উপর মাথা গুঁজে রীতাবরী নির্জীব কণ্ঠে বলল,—'আমার স্বপ্নের বাড়ি এবার ভেঙে যাচ্ছে কিরণ।'

—ভেঙে যাচ্ছে!' কথার গুরুত্ব বুঝে কিরণ সোজা হয়ে বসল। 'কি হয়েছে খুলে বলবে আমায়?'

রীতাবরী মাথা না তুলে জবাব দিল,—'যা হবার তাই হয়েছে। বাবা অন্যত্র আমার বিয়ের চেষ্টা করছেন।'

—'আহা! একথা তুমি আগেও বলেছ আমায়।' কিরণ হাসবার চেষ্টা করল। ফের গলা নামিয়ে শুধোল,—আমাদের কথা তুমি জানাওনি বাড়িতে?'

—'জানিয়েছি।' রীতাবরী অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, —'তবে বাবাকে নয়। মাকে শুধু তোমার কথা বলেছি।'

—'তিনি কি বললেন?' কিরণ সাগ্রহে জানতে চাইল।

—'যা ভয় করেছিলাম তাই।' রীতাবরী মুখ তুলে তাকাল। বড় বড় চোখ করে বলল,—শুনে মা ভীষণ ভয় পেল। বলল, এ বিয়েতে তোর বাবা কখনও মত দেবে না। বরং শুনলে রাগারাগি করে একটা বিশ্রী কাণ্ড করবে।'

—'তারপর?'

—'মা আমাকে সাবধান করে দিল। বলল, তোমার সঙ্গে যেন আর মেলামেশা না করি। ওসব কাঁচা বয়সের রঙ, দু-দিন থাকে। বিয়ের জল পড়লেই সব ধুয়ে-মুছে উঠে যায়।'

কিরণ চুপ করে শুনছিল।

ঢোক গিলে রীতাবরী আবার বলল,—'আরো একটা মুস্কিল হয়েছে। বর্ধমান থেকে কয়েকজন ভদ্রলোক পরশুদিন আমাকে দেখতে এসেছিলেন। বাবা কাল রাত্তিরে মাকে বলছিলেন যে ছেলের নাকি আমাকে খুব পছন্দ হয়েছে।'

(ক্রমশঃ)

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

নবযুগের ফ্যানটাসি

স্লাভোমির ম্রোৎসেক তরুণ পোলিস লেখক। ১৯৩০-এ পোলাণ্ডের বোৎসারৎসিন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। স্থপতিবিদ্যা এবং শিল্পকলা শিক্ষার পর তিনি সাংবাদিক এবং কার্টুনিস্ট হিসাবে কাজ করেন পোলিস সংবাদপত্র এবং বিভিন্ন সাময়িকপত্রে। এই-ভাবে সাময়িকপত্রে তাঁর কয়েকটি শ্লেষাত্মক রস রচনা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সরস রচনার শ্রেষ্ঠ লেখক হিসাবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। 'দি পুলিশম্যান' নামক সুবিখ্যাত নাটকসহ তিনি অনেকগুলি নাটক লিখেছেন। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের পোলিশ-এ বা রাজনৈতিক সুমন্দ বাতাসের অনুকূল আবহাওয়ায় তিনি 'পুলিশম্যান' লিখেছেন। টেলিভিশন, শিশুদের উপযোগী কাহিনী প্রভৃতির মধ্যে তীব্র শ্লেষাত্মক কষাঘাত দ্বারা ম্রোৎসেক একজন জনপ্রিয় লেখক হিসাবে এক অসাধারণ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। ম্রোৎসেক রচিত 'দি এলিফ্যান্ট' নামক গ্রন্থটি পোলিশ স্টেট কালচারাল রিভ্যু আনুকূল্যে প্রদত্ত বাৎসরিক পুরস্কারে সম্মানিত হয়।

'দি এলিফ্যান্ট' ম্রোৎসেক লিখিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্বপ্রথম ইংরাজী ভাষায় অনুদিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন কোনরাদ সাইরোপ। 'দি এলিফ্যান্ট' নামক কাহিনীটি সম্পর্কে নানা রকমের মন্তব্য হয়েছে। কেউ বলেছেন—'এ লর্ট [illegible]' আর আরেক দল বলেছেন 'এ ব্রিলিয়ান্ট লিটারারি ক্যু'। প্রতিদিনের কাহিনীকে কিভাবে তীব্র রচনায় পরিণত করা যায় তার কলাকৌশল ম্রোৎসেক চমৎকারভাবে আয়ত্ত করেছেন। 'দি এলিফ্যান্টে' সাতটি কাহিনী আছে। এই কাহিনীগুলির মাধ্যমে তরুণ পোলিশ লেখক তাঁর নিজের সমাজের ব্যুরোক্র্যাটদের প্রতি তীক্ষ্ন বক্রোক্তি করেছেন, এবং রচনাগুলির মধ্যে সরস ফ্যানটাসি যুক্ত হওয়ায় কাহিনীগুলির আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর রচনার কৌশলে যা উদ্ভট তাকে মনে হবে বাস্তব, আর যা বাস্তব তাই যেন উদ্ভট বা অ্যাবসার্ড।

গল্পগুলির রচনাভঙ্গীও বাঁধা ধরা প্রথামাফিক নয়। তাঁর প্রথম গল্পটির নাম 'দি এলিফ্যান্ট'। এই গল্পটিতে জু গার্ডেনের ডাইরেক্টার সম্পর্কে তীব্র মন্তব্য করা হয়েছে কাহিনীর সুরুতেই। ডাইরেক্টারটি একজন ভুঁইফোড়। জু গার্ডেনের পশুগুলি যেন তাঁর উন্নতির সোপানমাত্র। জু গার্ডেনের যে একটা শিক্ষামূলক গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে সে বিষয়ে তিনি উদাসীন। তাঁর জু-তে জিরাফের লম্বা গলা নয়, পাখিরা শিস দেয় না, গান করে না—যদি বা শিস দেয় সে একরকম কালে ভদ্রে। জু-তে স্কুলের ছেলে-মেয়েরা নিয়মিত আসে, সেখানে এমন করা অনুচিত। কিন্তু কে সে কথা ভাবে।

এই জু গার্ডেনটি একটি প্রাদেশিক শহরে অবস্থিত, সুতরাং এর আবাসিক দলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী আছে, একটা হাতি নেই। যদি তিন হাজার খরগোস থাকত—তাহলে তা হাতির কাছে নস্যি। যাই হোক ২২শে জুলাই তারিখে মুক্তি দিবসের উৎসবের দিন—সংবাদ এল যে এই জু-র জন্য একটি হাতি বরাদ্দ করা হয়েছে। যে সব কর্মী কাজ-কর্মে একটু উৎসাহী তারা মহা খুশি। কিন্তু তারা দুঃখিত হল যখন শুনল জু-ডাইরেক্টার এইভাবে হস্তী বরাদ্দ করায় তেমন প্রীত হননি। তিনি একটা আবেদন পাঠালেন যে হাতি পাঠান বন্ধ রাখুন—বরং যাতে কম খরচে ব্যবস্থা করা যায় তার চেষ্টা করা যাক। তিনি লিখলেন—

'আমি এবং আমার সমস্ত সহকর্মীরা সকলেই পরিপূর্ণভাবেই জানেন যে, হাতি কি গুরুভার পদার্থ—পোলিস খনি শ্রমিক আর ফাউণ্ড্রির লোকজনের পক্ষে এ এক ভীষণ বোঝা। খরচ কমাবার জন্য আমাদের একটা উপায় নির্ধারণ কর্তব্য। আমরা যথাযথ আকারের একটা রবারের হাতি তৈরী করতে পারি। ঠিকমত রং সেই রবারের হাতির গায়ে দিয়ে দিলে তাকে একেবারে জীবন্ত হাতির মতই দেখাবে। কাছাকাছি দেখলেও লোকে বুঝবে না। রবারের হাতিটায় হাওয়া পুরে রেলিং-এর কাছে রেখে দেওয়া হবে। সবাই জানি হাতি অতি অথর্ব প্রাণী, সহজে দৌড়-ঝাঁপ করতে পারে না। এইভাবে যে টাকা বাঁচানো যাবে সেই টাকায় একটা জেট প্লেন কেনা যাবে বা একটি গির্জাকে মিউজিয়ামে রূপান্তরিত করা যাবে।' এই চমৎকার আইডিয়াটি যে তাঁরই অবদান সেই সংবাদটুকুও উহ্য রাখবেন। সাধারণের কাজে ও সংগ্রামে এই তাঁর সামান্য নৈবেদ্য।

যে উপরওলার হাতে এই দরখাস্ত পৌঁছল সে লোকটা হৃদয়হীন একটি গবেট বিশেষ, কাজ-কর্ম সম্পূর্ণ ব্যুরোক্রেটিক পন্থায় আমলাতন্ত্রী দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করাই তাঁর নীতি। তিনি ভেতরের ব্যাপারটি তলিয়ে না বুঝে ব্যয় সংকোচ সম্ভাবনার দিকেই বেশী নজর দিলেন। তিনি ডাইরেক্টার মহাশয়ের পরিকল্পনাটিকে মন্ত্রিসভার আশীর্বাদে পুষ্ট করলেন। একটি রবারের হাতি তৈরি হল। হাতিটাকে ফুঁ দিয়ে ফোলাতে হবে। কাজটা গোপনে করতে হবে। কারণ শহরের লোক হাতি আসছে শুনে ভীষণ উদগ্রীব হয়ে আছে। তারা যেন জানতে না পারে। তাই সারারাত জেগে এই ফুঁ দিয়ে ফাঁপানোর কাজ চলল। ডাইরেক্টারও চান কাজটা জলদি হয়। হলে তিনি একটা বোনাস পেতে পারেন; এমন চমৎকার একটা আইডিয়ার খাতিরে সম্মানও পাবেন হয়ত।

কিন্তু হাতিকে ফুঁ দিয়ে ফোলানো অত সহজ নয়। একজন শ্রমিক বলে—এভাবে ফোলাতে সারারাত লেগে যাবে। আমার গিন্নীকে কি বলব? বলব সারারাত ধরে হাতি ফুলিয়ে কাটিয়েছি।

অপর শ্রমিক বলে—সত্যি! কিন্তু হাতি ফোলানোর কাজ ত আর প্রাত্যহিক ব্যাপার নয়। আর ডাইরেক্টার লেফটিস্ট তাই এই জ্বালা।

আবার ফোলানোর কাজ চলল। আরো আধ ঘন্টা কাজ করার পর ওরা অতি ক্লান্ত হয়ে পড়ে, আর পারে না। ফুলছে বটে কিন্তু তখনও হাতির আকারই হয়নি।

দুজনে স্থির করে এইবার একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক। বিশ্রাম করার সময় হঠাৎ এক-জন আবিষ্কার করল একটা গ্যাস পাইপ সামনেই রয়েছে একেবারে ভ্যালভসহ। সে তার সঙ্গীকে বলল গ্যাস দিয়ে হাতিটাকে ফুলিয়ে দিলে কেমন হয়? চেষ্টা সুরু হল। হাতিটাকে গ্যাস পাইপে লাগিয়ে গ্যাস ভর্তি করার কাজ সুরু হল। অচিরাৎ হাতিটা ফুলে-ফেঁপে একটা প্রমাণ সাইজের হাতি হয়ে দাঁড়াল—দুজনের ভারী ফুর্তি। একেবারে খাঁটি হাতি। অতিকায় আকৃতি। পাগুলি যেন স্তম্ভের মত—কুলোর মত কান, আর সেই অবশ্যম্ভাবী হাতির শুঁড়। উচ্চা আশা ডাইরেক্টার সাহেবের, তাই তিনি তাঁর জু-তে একটা বড়ো-সড়ো হাতিই চেয়েছিলেন।

যে শ্রমিকের মাথায় গ্যাস ভর্তির আইডিয়া এসেছিল—সে বলল—ফার্স্ট ক্লাস, এখন বাড়ি যাওয়া যাক।

পরদিন প্রভাতে জু গার্ডেনের কেন্দ্রস্থলে একেবারে বানরদের পাড়ায় একটা সুবৃহৎ প্রকৃত টিলার কাছে হাতিটা রাখা হল। সে এক চমৎকার ও ভয়ংকর দৃশ্য। একটা নোটিশ লাগিয়ে দেওয়া হল 'একেবারে স্থবির। কদাচিৎ নড়ে চড়ে।'

সেইদিন যারা জু-তে এলো তাদের মধ্যে ছিল স্থানীয় স্কুলের একটা দল। স্কুলের মাস্টারমশাই ছাত্রদের হাতি বিষয়ে একেবারে হাতে কলমে শিক্ষা দিতে মনস্থ করেছিলেন। ছেলেদের দলকে হাতির সামনে দাঁড় করিয়ে তিনি বলতে লাগলেন গড়গড় করে—'হাতি তৃণ-লতা ভোজী প্রাণী। শুঁড়টাই ওর সব—

এই শব্দের মাধ্যমেই গাছের ডাল-পালা ভেঙে দিয়ে মুখে পোরে। হাতি বর্তমানে লুপ্ত ম্যামথের সাক্ষাৎ বংশধর। সুতরাং হাতি যে পৃথিবীর বৃহত্তম জীব এতে আর আশ্চর্যের কি আছে?'

ছাত্ররা বেশ মন দিয়ে নোট নিতে লাগল। এমন একটা বস্তু কদাচিৎ মেলে। মাস্টার-মশাই আরো বললেন—'একমাত্র তিমি মাছ হাতির চেয়ে ভারী, তবে তিমি থাকে জলে, হাতি ডাঙ্গায়। স্থলে হাতিই সব।'

এমন সময় হাতিটা নড়ে উঠল এবং মাটি থেকে একটু ওপরে উঠল। ব্যাপার কি? কয়েক সেকেন্ড সেইভাবেই ছিল, কিন্তু হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ার ঝাপট লেগে হাতিটা উড়ে চলল, কিছুক্ষণ পর্যন্ত মর্ত্য-ভূমির মানুষ হাতিটার গোদা-পা চারখানা এবং মোটা পেটটা দেখতে পেল, কিন্তু অচিরাৎ তা গাছের শির ডালের আড়ালে সরে মিলিয়ে গেল। বিস্মিত বানরবৃন্দ তাদের খাঁচায় কিচমিচ করতে লাগল।

হাতিটাকে পাওয়া গেল পাশের বোটানি-ক্যাল গার্ডেনসের প্রাঙ্গণে। একটা ফণিমনসা ঝোপের খোঁচায় তার ফুলো পেটটা ফেঁসে গেছে এবং হাতি চুপসে পড়ে আছে।

এর ফলে এই হল যে—সব ছাত্র জু-তে হাতি দেখেছিল তারা সবাই পড়াশোনায় অমনোযোগী হল, তারপর পড়াশোনা ছেড়ে মস্তান হল। মদ্যপান শুরু করল, কাঁচের জানলা-দরজা ভেঙে হট্টগোল শুরু করল। ওরা এখন আর হাতিতে বিশ্বাসী নয়।

কাহিনীর এইখানেই সমাপ্তি। প্রায় সমগ্র কাহিনীটিই পরিবেশন করার প্রয়াস করেছি পাঠকের রসগ্রহণ ও বিচারের সুবিধার জন্য। অতি অল্প কথায় এবং বিনা পালিশে আমলাতান্ত্রিক মনোভাব এবং সেই সঙ্গে হাতির রূপক ব্যবহার করে লেখক অতি সহজেই তাঁর বক্তব্য ফুটিয়ে তুলেছেন। সোভিয়েত রাশিয়ার লেখক মিখাইল যোগচেংকো একদা এই শ্রেণীর কাহিনী লিখে স্বদেশে-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। পোলিস লেখক ম্রোৎসেক নিজস্ব আঙ্গিকে শ্লেষাত্মক কাহিনী রচনার ক্ষেত্রে একটি নতুন ধারা প্রবর্তন করলেন।

এই গ্রন্থের 'দি লায়ন', 'দি সোয়ান', 'দি জিরাফ', 'দি মনুমেন্ট', 'এ সিটিজেনস ফেট' ও 'স্প্রিং ইন পোল্যান্ড' প্রভৃতি অন্য গল্পগুলিও পরিকল্পনা ও পরিবেশনার জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিশেষ করে 'দি জিরাফ'। এই স্বল্প পরিসর আলোচনায় অন্য কাহিনীগুলির পরিচয় দেওয়া সম্ভব হল না। অন্তত 'দি জিরাফ' গল্পটির বিবরণ দিতে পারলে আমরা আনন্দিত হতাম।

—অভয়ঙ্কর

THE ELEPHANT By SLAWOMIR MROZEK (Translated by KONRAD SYROP:) (Published in Poland by WYDAWNICTWO LITERACKIE — KRAKOW —) Published in England by Messrs: MACDONALD & Co Ltd. Price 20 Shillings only.

সাহিত্যের খবর

বাংলাদেশের হৃদয় হতে।।

কিছুদিন আগে একটি খবরে জানা যায়, বাংলা একাডেমির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন প্রথিতযশা শিল্পী জয়নুল আবেদিন। আবেদিন।

গত ১৯ অঘ্রাণ বাংলা একাডেমিতে বসেছিল গল্পপাঠের আসর। সভাপতিত্ব করেন ডঃ মযহারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে নিজের লেখা গল্প পড়ে শোনান আলা-উদ্দিন আল আজাদ, সরদার জয়েনউদ্দিন রশীদ হায়দার, সুব্রত বড়ুয়া, সাদেকা শফিউল্লাহ।

পরের দিন, অর্থাৎ ৬ই ডিসেম্বর একই জায়গায় বসেছিল কবিতা পাঠের আসর। তরুণ কবিরাই অংশ নিয়েছিলেন এই প্রাণবন্ত অনুষ্ঠানে।

পদ্মভূষণ উপাধিতে ঔপন্যাসিক

মাত্র কিছুদিন আগে খ্যাতনামা লেখক ও অধ্যাপক রাজা রাও হলেন পদ্মভূষণ। বর্তমানে তিনি সানফ্রান্সিসকোয়। সেখানেই ভারতের কনসাল জেনারেল এ কে ভুটানি এই সম্মানের কথা তাঁকে জানান এবং পুরস্কারটি দেন। ইতিপূর্বে রাজা রাও লাভ করেছিলেন সাহিত্য-আকাদমির পুরস্কার। সেটা ১৯৬৪ সাল। দ্য সার্পেন্ট অ্যান্ড দ্য রোপ-এর জন্যই সেদিন পেয়েছিলেন আকাদমির পুরস্কারটি। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর দ্য পুলিশম্যান অ্যান্ড দ্য রোজ। এটি তাঁর কয়েকটি আলোড়ন-কারী গল্পের সংকলন গ্রন্থ।

এ বছরের বুখনার পুরস্কার।।

কিছুদিন আগে ডার্মস্টাট হয়ে উঠেছিল ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানির কবি-সাহিত্যিক - সংস্কৃতিসেবীদের মিলন-কেন্দ্র। এখানেই বসেছিল সেদিন ডয়েটশে আকাদেমি ফ্যুর স্প্যাখে উন্ড ডিশটুং-এর সভা। দেওয়া হয় কয়েকটি সাহিত্য-পুরস্কার।

বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের জন্য সিগমুন্ড ফ্রয়েড পুরস্কার পান অধ্যাপক এরিক ভলার। লেখক হোর্স্ট ক্রুগার পান সাহিত্য-সমালোচনার জন্য ওহান হাইন-রিশ মেরক পুরস্কার। তবে প্রধান পুরস্কার গেওর্গ বুখনার প্রাইজ লাভ করেন এলিয়াস সানেত্তি। জন্মেছিলেন তিনি বুলগেরিয়ায়। সেটা ১৯০৫ সাল। সানেত্তির বাবা ছিলেন স্প্যানিশ ইহুদি। গত ৩০ বছর যাবত সানেত্তি বসবাস করছেন ব্রিটেনে।

লেখক হোর্স্ট বীনেক পুরস্কার দান প্রসঙ্গে তাঁর ভাষণে বলেন, সানেত্তি লিখেছেন একরকম বর্তমান সময়েরই বিরুদ্ধে। তিনি বলেন, ব্লেনডিং-য়ের লেখকের কাছে মৃত্যু হল প্রধান বিষয়। বলাই বাহুল্য, সানেত্তির রচনা নিয়ে হাল আমলে ব্রিটেনে এবং ফ্রান্সে বেশ আলোড়ন ওঠে। বীনেক বলেন, জার্মান সমালোচকরা তাঁর রচনায় মার্কস-এঙ্গেলসের উদ্ধৃতি ব্যবহারের জন্য অবশ্য কখনোই ছেড়ে কথা বলেন নি।

'মাসে উন্ড মাগত' রচনায় শেষে এলিয়াস সানেত্তি তাঁর ডায়েরিতে লিখেছিলেন, 'কণ্ঠ দিয়ে আমি বর্তমান শতককে গ্রহণ করেছি, ফলে লাভ করেছি সাফল্য।' পুরস্কার গ্রহণকালে সানেত্তি শ্রদ্ধা জানান বুখনারের প্রতি। তিনি বলেন, 'আমি আমার পরলোকগত স্ত্রীর কাছ থেকে যদি গেওর্গ বুখনারের কথা না শুনতাম, না জানতাম, তাহলে 'ডি ব্লেনডুং' লেখা হয়তো আদৌ সম্ভব হত না। বুখনার শুধু চরিত্রই সৃষ্টি করেন নি, তাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন। অথচ নিজেকে রক্ষা করার জন্য বিন্দুমাত্র প্রয়াস করেন নি। এমনকি পক্ষাঘাতের দুরবস্থা থেকে নিজেকে সারিয়ে তোলার চেষ্টা-চরিত্র করাও ছিল তাঁর পক্ষে অসহ্য। হ্যাঁ, বুখনার মারা যেতেনই তবে এত কম বয়সে নয়। সত্যি কথা বলতে তিনি ছিলেন অতৃপ্ত মানুষের এক চরম উপমা।'

তুর্কমেনিয়ার মহিলা কবি।।

রবীন্দ্র রচনাবলীর মধ্য দিয়েই পেয়েছিলাম ভারতবর্ষের রূপ। স্বাদ নিয়েছি ঐতিহ্যপূর্ণ প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির। পরে এই সত্যিকারের গরীব দেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ফলে সঞ্চয় করলাম অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান। রাজ্য পরিচালনায় ও বর্তমান সময়ের জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশে ভারতীয় মহিলাদের সাফল্যে আমি বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত। কথাগুলি বলেছেন সোভিয়েতের আফ্রো-এশীয় সংহতি কমিটির সদস্যা কবি তুশান এসেনোভা। কিছুকাল আগে ঘুরে গিয়েছেন তিনি নেপাল আর ভারত।

বহু বিচিত্র জীবনের অধিকারী তুর্কমেনিয়ার এই মহিলা কবি তুশান এসেনোভা উচ্চশিক্ষা শেষ করে যোগ দেন 'সোভেতস্কি তুর্কমেনিস্তান' সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে। তারপর আশখাবাদ এয়ার ক্লাবে দু'বছর ধরে শিক্ষাগ্রহণ করেন প্লেন চালানোর। এসেনোভা বলেন 'আমার প্রথম আকাশে ওড়ার কথা জীবনে কখনো ভুলব না। মনে হচ্ছিল, আমার যেন পাখা গজিয়েছে।' তারপর কিছুক্ষণ থেমে আবার বললেন, 'আর কবিতা? তাও কি এমনই ওড়ার অনুভূতি, মুক্তির অনুভূতির সঙ্গে জড়িত নয়? হ্যাঁ, কিছুটাতো বটেই। তবে আমার মধ্যে কবিত্ব সত্তার জন্যে আমি আমার সাংবাদিক পেশার কাছে ঋণী। জীবন সম্পর্কে, মানুষ সম্পর্কে, মানুষের চিন্তা ও অনুভব সম্বন্ধে আগের চেয়ে বেশি করে জানতে আমায় সাহায্য করেছে এই পেশা।'

রাজতন্ত্র থেকে স্ব-রাজতন্ত্র (প্রবন্ধ)। কৃষ্ণানন্দ দাশগুপ্ত। লেখক কর্তৃক ১৭, চন্দ্রনাথ সিমলাই লেন, কলিকাতা—২ থেকে প্রকাশিত। তিন টাকা।

ইংরেজের হাতে ভারতের শাসনক্ষমতা যাওয়ার সময় থেকেই অত্যন্ত সংগোপনে ইংরেজ বিদ্বেষ সক্রিয় ছিল ভারতীয় সচেতন বুদ্ধিজীবীদের মনোলোকে। তার পর থেকে দীর্ঘদিন অতিবাহিত। স্বাধীনতা লাভ ঘটে ঊনিশ শ' সাতচল্লিশ সালে। তারও পরে প্রায় আড়াই দশক কেটেছে ভারতের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের শাসনের ছায়ায়। বর্তমান গ্রন্থটি এসবেরই একটি বিশ্লেষণাত্মক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। কিন্তু লেখক ইতিহাসের ধারাবাহিকতা আলোচনা করেছেন কয়েকজন রাজনীতিবিদ দেশপ্রেমিকের জীবন ও বাণীর ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে। মহাত্মা গান্ধী, মানবেন্দ্রনাথ রায়, রাসবিহারী বসু, জিন্না, সুভাষচন্দ্র, জওহরলাল, লালবাহাদুর শাস্ত্রী—এ'দের স্বতন্ত্র বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। আলোচনা যুক্তিনিষ্ঠ, বৈজ্ঞানিক। কিন্তু লেখকের প্রতিটি অনুচ্ছেদের গদ্যে গুরু-চণ্ডালী দোষ চোখে পড়ে। এমন অসতর্ক ভাষাভঙ্গী শিল্পের ক্ষেত্রে অস্বস্তিকর।

স্বাগত দেবদূত—নবনীতা দেব সেন। কৃত্তিবাস প্রকাশনী। দাম : তিন টাকা।

নবনীতা দেব সেন আধুনিক বাংলা কবিতার জগতে সুপরিচিত নাম। বেশ কিছুকাল ধরে এঁ'র কবিতা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে আসছে। 'স্বাগত দেবদূত' কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। কবির প্রথম কবিতার বই 'প্রথম প্রত্যয়' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৯-এ।

'৫৯ থেকে '৬৯, এই ক'বছরের বেশ কিছু রচনা বর্তমান সংকলনে স্থান পেয়েছে। অভিজ্ঞতার নানান মুহূর্তে অনুভূতির রঙে কত সুন্দর হয়ে ওঠে বর্তমান গ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় তার পরিচয় পাঠককে মুগ্ধ করে। কবিতাগুলি পড়ার পর কবির বিশেষ কাব্যভাবনা সম্পর্কে একটি সামগ্রিক প্রতীতি জন্মায়।

বর্তমান সংকলনের কবিতাগুলি বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত। যত 'নীল পাগল পাহাড়' পর্যায়ের 'বৃষ্টি পড়লে' কবিতাটি উল্লেখযোগ্য। 'এক গুচ্ছ' পর্যায়ের 'ফেরা' অনুভূতির নিবিড়তায় সুন্দর। 'এই অন্তর্জালিক'—এ বিভিন্ন স্বাদের কয়েকটি কবিতার সংযোজন ঘটেছে। 'চড়ুই'—'কোথাও যদি হঠাৎ অসময়ে/অবোধ কোনো চড়ুই ডেকে ওঠে/অমনি তুমি ঘুমিয়েছেন নেই/ঘুলঘুলিতে চড়ুই পাখির বাসা।খড় ছড়িয়ে ময়লা করে মেঝে/মায়ের চাবির আঁচল, চুড়ি বাজে।'...'স্বাগত দেবদূত'-এর 'স্বাগত দেবদূত' কবির একটি স্মরণীয় রচনা। পূর্ণেন্দু পত্রীর আঁকা প্রচ্ছদ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

জীবন অদম্য (অনুবাদ)। অ্যালবার্ট মাল্টস। অনুবাদক—সিদ্ধার্থ ঘোষ। কথা ও কাহিনী, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা—১২। পাঁচ টাকা।

'জীবন অদম্য' উপন্যাসটি ত্রিশ দশকের মার্কিন প্রগতিবাদী লেখকদের অন্যতম অ্যালবার্ট মাল্টস-এর 'এ টেল অব ওয়ান জানুয়ারী' নামক সর্বশেষ উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ। বিশ্লেষণধর্মী এই বিদেশী বিখ্যাত উপন্যাসটির সম্ভবত এটিই প্রথম বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হল। অনুবাদকের প্রয়াস প্রশংসনীয়। নাজি কনসেনট্রেশান ক্যাম্প থেকে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ভিন্ন দেশের ভিন্ন মতাবলম্বী চারজন পুরুষ ও মহিলা নিয়ে এ উপন্যাসের কাহিনীটি বিন্যস্ত হয়েছে। আন্দ্রে, নরবার্ট, অটো, ও জুরেক—এই চারজন পুরুষ ও ক্লেয়ার এবং লিলি—দুই মহিলা মূল কাহিনীকেন্দ্রে সপ্রাণ। ক্লেয়ারের সঙ্গে আন্দ্রের লিলির সঙ্গে নরবার্টের প্রেম, অটোর কোন সঙ্গী না পাওয়াজনিত ঈর্ষা, ক্রোধ এবং আন্দ্রের প্রতি প্রতিশোধ-স্পৃহা—এই সমস্তই যুদ্ধের পটভূমিতে গতি পেয়েছে। যুদ্ধ মানুষকে পশুশক্তিসম্পন্ন করে তোলে। উপন্যাসে লেখক যুদ্ধের নরক থেকে বলিষ্ঠ সুস্থ জীবন যাপনের আর এক বৃত্তে এনেছেন চরিত্রগুলিকে। উপন্যাসের শেষে চারজন পুরুষ সৈনিকের দৈহিক মৃত্যু আত্মিক জীবনবরণের পদক্ষেপ হয়ে ওঠে। অনুবাদক এই অসাধারণ মানবীয় কাহিনীটির অনুবাদে অত্যন্ত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। মূলানুগ হয়েও গদ্যে সাবলীলতা, চরিত্রের সংলাপে সহজ, স্বতঃস্ফূর্ততা এবং বর্ণনার মধ্যে বিদেশী মেজাজেও বাঙ্গালী পাঠকদের আপনত্ব আনতে পেরেছেন। তাই অনুবাদকর্ম সর্বাংগে সার্থক হয়েছে।

চন্দ্রের বিশ্বরূপ দর্শন (কাব্য)। গোপেশচন্দ্র চক্রবর্তী। প্রকাশক—শ্রীরুচি চক্রবর্তী ৯৫-বি, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

বর্তমান গ্রন্থটি একটি ব্যঙ্গ কাব্য। জীবন-নীতির একটি বিষয়কে আদর্শরূপে সামনে রেখে তা থেকে ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে সমাজে যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়, তাকেই কবি শ্রীগোপেশচন্দ্র চক্রবর্তী ব্যঙ্গাত্মক বক্তব্যে উপস্থাপিত করেছেন। মানুষের চন্দ্রলোক অভিযান অব্যাহত, কিন্তু মানুষ তার অন্তরের হাহাকার জয় করতে পারেনি। ব্যক্তির স্বাধীনতা বিলুপ্ত, আত্মবিকাশ তাই সম্যক ব্যাহত। দেশের শান্তির জন্য ঐতিহ্য, পরিবার সমাজ ও ধর্ম—সমস্ত কিছুর বন্ধনকে মানতে হবে। স্থায়ী শান্তি এর মূলে। ব্যঙ্গাত্মক ছন্দে, শব্দে, ভাষায় 'চাঁদের স্বপ্নদর্শন', 'নিদ্রাভঙ্গ', 'বিশ্বরূপ দর্শন' ইত্যাদির মাধ্যমে কবি সার্থকভাবে তাঁর মূল বক্তব্য বোঝাতে পেরেছেন।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

জাগরণ : তৃতীয় বর্ষ ১৯৭২। সম্পাদক—গুরুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও গৌতম লাহিড়ী।

'জাগরণ' বরাহনগর ভিকটোরিয়া উচ্চ মাধ্যমিক সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ের বার্ষিক মুখপত্র। স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রদের বিবিধ-বিচিত্র বিষয়নির্ভর রচনায় সমৃদ্ধ আলোচ্য পত্রিকাটি ছাত্রদের ও স্কুলের সাংস্কৃতিক শিক্ষা ও মানকে স্পষ্ট করেছে। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ও রম্য রচনা ইত্যাদি সংখ্যায় বেশী থাকায় স্কুলের সর্বশ্রেণীর ছাত্রদের তৃপ্ত করার ক্ষমতা রাখে এই পত্রিকাটি। একাদশ শ্রেণীর বাণিজ্য বিভাগের ছাত্র সুখেন্দু দাসের অঙ্কিত প্রচ্ছদচিত্রটি পত্রিকার অন্যতম গর্ব।

অনুক্ত : সম্পাদক সুনীলকুমার নন্দী। ২২, বনফিল্ড রোড, কলকাতা-১। তিন টাকা।

একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস লিখেছেন পূর্ণেন্দু পত্রী। প্রবন্ধগুলিও সুনির্বাচিত। লিখেছেন সঞ্জয় চন্দ্র, সুদেষ্ণা চক্রবর্তী, শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত ও অজয় সিংহরায়। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় অনূদিত অ্যাদালবার্ট ফন শামিসোর একটি উপন্যাসের একটি কিস্তি ছাপা হয়েছে। কবিতা ও গল্প লেখকদের মধ্যে আছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দীনেশ রায়, সুবিনয় মুস্তাফী, শচীন্দ্র-নারায়ণ দেব, সৌমেন সেন, শঙ্খ ঘোষ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, লোকনাথ ভট্টাচার্য এবং আরো অনেকে। পত্রিকাটিও পরিচ্ছন্ন। সকলেরই ভালো লাগবে।

মনীষা (৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা) সম্পাদক : নারায়ণচন্দ্র ইন্দ্র। ২৯৯।বি, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা ৬।

জগৎ ও জীবনের নানা সমস্যা বয়স্কদের মতো স্বল্পবয়সীদের মনেও ভাবনার ঢেউ তোলে। তরুণ মনের সেই ভাবনাই প্রতিবিম্বিত হয়েছে 'মনীষা'য় (টাকী হাউস মাল্টিপারপাস স্কুলের মুখপত্র)। এতে গল্প কবিতা ছাড়াও আছে : আলো-আঁধারে '৭২-এর মিউনিক অলিম্পিক, ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, র‍্যাডার রহস্য, রামমোহনের ধর্মচেতনা, রামমোহন ও বিজ্ঞান-চিন্তা—এমনকি বিশ্ববিখ্যাত দাবাড়ু স্প্যাসকি-ফিসার প্রসঙ্গ। বিদ্যার্থীরা মুন্সিয়ানার সঙ্গে বক্তব্যকে যুক্তিগ্রাহ্য ও আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। ছোটদের আঁকা ছবিগুলিও প্রশংসনীয়। শিশুদের জন্যে প্রাথমিক বিভাগও উল্লেখের দাবী রাখে।

(নয়)

আমার চেম্বার দেশপাণ্ডের পাশেই। পদমর্যাদায় যে আমি অফিসের দ্বিতীয় ব্যক্তি সে-কথাও বোঝা গেল। আর কারও আলাদা চেম্বার নেই। অনিমেষ আর জয়ন্ত দেশাই এক চেম্বারে বসে। বিশ্বনাথ তেওয়ারী বসেন বড় হলঘরে, যেখানে সব বাবুরা কাজ করে। তেওয়ারীকে দেখলে অনেকটা পাঠশালার পণ্ডিত বলে ভ্রম হয়। বৃহৎ টিকি, কপালে বড় করে শ্বেত চন্দনের ফোঁটা। শুধু একটা বেত থাকলেই হতো।

অফিসে যেতে না যেতেই দেশপাণ্ডের ঘরে ডাক পড়ল। ঘরে ঢুকতেই দেশপাণ্ডে বললেন, 'এর সঙ্গে আলাপ করাবার জন্যে ডেকে পাঠালাম, মিট মিস্টার ব্রহ্মচারিয়া। দিস ইজ মিস্টার চ্যাটার্জি, আমাদের নতুন সেলস ইনচার্জ। এখন থেকে ইনিই সেলস্ দেখবেন। আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলাম।' দেশপাণ্ডে একজন তৃপ্ত মানুষের মত মুখ করলেন।

যে ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে তাঁর মুখ দেখতে [illegible]। শুধু টেবিলের ওপর একটা টুপি নজরে পড়েছিল। খাকী রংয়ের হ্যাট, প্ল্যাস্টিক দিয়ে মোড়া। টুপিটা দেখেই কী রকম চেনা চেনা মনে হচ্ছিল।

দেশপাণ্ডের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পৃষ্ঠ-প্রদর্শনকারী ব্যক্তিটি উঠে দাঁড়ালেন। আমার দিকে হাত বাড়াতে গিয়েও বাড়াতে পারলেন না। শুধু অস্ফুট স্বরে বললেন, 'আপনি!'

আমি হেসে ফেললাম, 'ইচ্ছে করলেই একজন মানুষ আর একজনের কাছ থেকে সরে সরে যেতে পারে না এর থেকেই প্রমাণ হয়, পৃথিবীটা গোল, ঘুরতে ঘুরতে এক সময় না এক সময় আবার দেখা হয়ে যায়।'

দেশপাণ্ডে বিস্মিতভাবে বললেন, 'আপনারা কি পরস্পরকে চেনেন!'

'হ্যাঁ, ট্রেনে আলাপ হয়েছিল।'

'তাই বলুন, আমি ভাবলাম—কী আশ্চর্য ব্যাপার! মিস্টার চ্যাটার্জি, আপনি কাজের বিষয়ে এঁর সাহায্য নিতে পারেন। এই টেরিটরির সম্বন্ধে ব্রহ্মচারিয়ার জ্ঞান অদ্ভুত। কোথায় কোন্ ডিলার কী করছে না করছে সেই সম্বন্ধে সব খবর ওঁর নখ-দর্পণে।'

প্রশ্ন করলাম, 'এই অফিসের সঙ্গে যোগাযোগটা ঠিক বোঝা গেল না। উনি কি আমাদের সেলস্ দেখাশুনো করেন?'

দেশপাণ্ডে বলে উঠলেন, 'নো, নো, সেটা নিশ্চয়ই ওঁর কাজ না। তবে আন-অফিসিয়ালি আমরা মাঝে মাঝে ওঁর সাহায্য নিয়ে থাকি। আসলে উনি আমাদের কনট্রাকটর।'

'উনি কী কী জিনিস সাপ্লাই দেন?'

'স্পেয়ার পার্টস, ফার্ণিচার থেকে শুরু করে আলপিন পর্যন্ত সবকিছু। নতুন ফ্যাকটরী হলে কনস্ট্রাকশনের কাজটা ত একে দেওয়া হবে বলে আমার বিশ্বাস।'

'স্পেয়ার পার্টস আমরা বাইরে থেকে কিনি কেন? ইচ্ছে করলে জিনিসগুলো কোলকাতার অফিস থেকে আনিয়ে নেওয়া যায়।'

'দেশপাণ্ডে বললেন, 'সময় পেলে সে-রকমই ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এমার্জেন্সীর সময় লোকাল পার্চেজ করতেই হয়।'

ব্রহ্মচারীর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এজন্যে আপনার সব সময় স্পেয়ার পার্টস মজুত রাখতে হয়। অনেক টাকার ইন-ভেস্টমেণ্ট, অসুবিধে হয় না?'

ব্রহ্মচারী বুক উঁচিয়ে নেপোলিয়ানের ভঙ্গী করে বললেন, 'বিজনেস করতে গেলে, বিশেষ করে আপনাদের কোম্পানীর মত ইজ্জতদার কোম্পানীর সঙ্গে, একটু-আধটু টাকা ঢালতেই হয়। তাই কিনা বলুন?'

হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলাম, 'স্পেয়ার পার্টস আপনি কোথায় পান [illegible]র কোম্পানী তো বাইরে স্পেয়ার [illegible] করে না।'

অতর্কিত প্রশ্নে ব্রহ্মচারী হকচকিয়ে গেলেন। দেশপাণ্ডে বললেন, 'বিশেষ ব্যবস্থায় ব্রহ্মচারী অ্যান্ড কোম্পানী এ-বিষয়ে আমাদের কাছে সুবিধা পেয়ে আসছে।'

'কিন্তু কোম্পানীকে নিশ্চয়ই বেশী দাম দিয়ে নিজের জিনিসই কিনতে হচ্ছে আবার?'

দেশপাণ্ডে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'কিন্তু উপায় নেই, মাল স্টক করার মত জায়গা নেই আমাদের।'

'ইচ্ছে করলেই আমরা সেই জায়গা তৈরী করে নিতে পারি।'

দেখতে দেখতে দেশপাণ্ডের মুখ লাল হয়ে উঠল। বললেন, 'ইচ্ছে করলে অনেক কিছুই করা যায়। স্টাফদের বোনাসের ব্যাপার নিয়ে বহু লেখালেখি করে এ-বছর কত পার্সেণ্ট বোনাস ডিক্লেয়ার্ড হয়েছে জানেন? ওনলি টুয়েলভ অ্যাণ্ড হাফ পার্সেণ্ট।'

'কিন্তু কোলকাতায় এবার হয়তো টুয়েণ্টি দেবে।'

'কোলকাতার কথা স্বতন্ত্র, সেখানকার মানুষ নিজেদের দাবী আদায় করে নিতে জানে। আর এখানে—' দেশপাণ্ডে হতাশ ভাব দেখালেন।

এতক্ষণ পর্যন্ত ব্রহ্মচারী চুপ করে আমার আর দেশপাণ্ডের মুখের দিকে দেখছিলেন। এবার কথা বলে উঠলেন, 'এখানে যদি এদের এক মাসের মাইনে নাও দেন, কি করবে জানেন? আপনার কাছে এসে হাত কচলিয়ে কান্নাকাটি করতে থাকবে।'

দাঁতে দাঁত পিষে বললাম, 'এদের খুন করা উচিত।'

ব্রহ্মচারী এতক্ষণে হাসলেন। বললেন, 'কিন্তু খুন করবেটা কে? একদিকে এরা যেমন শান্ত, আর একদিকে তেমনি ধুরন্ধর। টুক করে আপনার নামে একটা মামলা ফাইল করে দেবে। খুব মামলাবাজ মানুষ এরা, বুঝলেন কিনা।'

গম্ভীর মুখে বললাম, 'এদিককার লোকেরা যে খুব মামলাবাজ, এমন কথা তো শুনিনি।'

'আপনি আর এদের সম্বন্ধে কতটুকু শুনেছেন স্যার। এরা দিনেদুপুরে ডাকাতি করে। কিছুদিন আগে কাগজে দেখেনি, একজন তিনটে খুন করে শেষপর্যন্ত ভোজালী দিয়ে নিজের পেট দু' খণ্ড করে ফেলল।'

'না, সেরকম কথা কাগজে বেরোয়নি।'

'বেরিয়েছে স্যার। কোলকাতার কাগজে না বেরোলেও এখানকার কাগজে বেরিয়েছে। দারুণ ভাল কাগজ স্যার। খুব ভাল নিউজ দেয়। স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের মিশন যে ফেল করবে, খবরটা কিন্তু এই কাগজটাই দিয়েছিল প্রথমে। না কি বলেন স্যার?'

ব্রহ্মচারী দেশপাণ্ডের মুখের দিকে তাকালেন। দেশপাণ্ডে তখন আমাকে দেখছিলেন, উত্তর দিলেন না।

বললাম, 'কাগজের কথা থাক। দরকার হলে আপনাকে খবর দেব, এবং প্রয়োজন মত অ্যাডভাইসও নেব। তখন কিন্তু কার্পণ্য করবেন না।'

ব্রহ্মচারী এবার বেশ খোলাখুলিভাবেই হাসলেন, 'কী যে বলেন স্যার। আমি করবো কার্পণ্য। আমার ঠাকুর্দাকে লোকে দাতাকর্ণ বলতো। ঠাকুদা একবার কী করেছিলেন জানেন স্যার, ঝোঁকের মাথায় নিজের বসতবাড়ি, মায় থালা ঘটি বাটি সর্বকিছু দান করে ফেললেন। শেষে ঠাকুরমার কান্নাকাটিতে লোকেরা বাসনপত্রগুলো ফেরৎ দিয়ে গেল। কিন্তু বাড়িটা, গন উইথ দ, উইণ্ড। হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।'

ইচ্ছে হল বলি, 'আপনার ঠাকুর্দা নিশ্চয় জুয়া খেলতে গিয়ে যথাসর্বস্ব খুইয়েছেন।' কিন্তু সব কথা সব জায়গায় বলা চলে না।

দেশপাণ্ডে বললেন, 'ইউ মে গো নাউ ব্রহ্মচারিয়া।' বুঝলাম দেশপাণ্ডে এখন ব্রহ্মচারীকে সরিয়ে দিতে চান।

যাবার সময় ব্রহ্মচারী টুপি বুকের কাছে ছুঁইয়ে বাউ করলেন।

ব্রহ্মচারী চলে যেতেই দেশপাণ্ডে বললেন, 'লোকটি আস্ত পাগল। অবিশ্যি ব্যাচিলারদের অনেক সময়ই মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে বলে শুনেছি।'

চমকে উঠলাম, 'কে ব্যাচিলার? উনি যে বেরিয়ে আসতে আসতে বললেন, বাড়িতে ওঁর স্ত্রী একা থাকতে ভয় পায়।'

দেশপাণ্ডের ভ্রূ কুঁচকে গেল। সন্দিগ্ধভাবে বললেন, 'আপনি ঠিক শুনেছেন, স্ত্রী বলে মেনশন করেছে ব্রহ্মচারিয়া?

'না, ঠিক স্ত্রী বলেন নি, বলেছেন, ও একা থাকতে ভয় পায়।'

'তাই বলুন।' স্পষ্ট দেখলাম দেশপাণ্ডে একটা বড় রকমের নিঃশ্বাস ফেললেন। 'ভাল কথা, এই চিঠিটা দেখুন, আজ কোলকাতার অফিস থেকে এসেছে, জামসেদপুরে কিছু দিন ধরেই ডিলারশিপের গণ্ডগোল চলছিল, কতগুলো পার্টি জোট পাকিয়ে হেড অফিসে কমপ্লেন করেছে। তাই ক্যালকাটা অফিসের ওপর তদন্তের ভার পড়েছে। ক্যালকাটা অফিস সেই ভার দিয়েছে আমাদের ওপর। আমি দিলাম আপনার ওপর। আপনি যত তাড়াতাড়ি হয় জামসেদপুরে গিয়ে ব্যাপারটা সেটল্ করে আসুন।' বলে চিঠিটা আমার হাতে দিয়ে দিলেন দেশপাণ্ডে।

বললাম, 'আমি সামনের সোম কিম্বা মঙ্গলবার যেতে পারি। যাবার আগে ফাইল পত্র দেখা মোটামুটিভাবে আমাদের পলিসি দেখে নেব।'

'পলিসি নিয়ে খুব মাথা ঘামাবেন না। যা ভাল বুঝবেন করবেন। পুরনো পার্টি আগরওয়ালা অ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ড সানস ভালই ছিল। সেল ও ভালই দিত। কিন্তু ইদানীং ওদের কাজ একটুও ভাল হচ্ছে না।' দেশপাণ্ডের মুখে বিরক্তির চিহ্ন ঘন হয়ে উঠল।

নিজের চেম্বারে এসে দেখলাম, কোলকাতা থেকে আমার নামে একটা চিঠি এসেছে। কাপুরের সই করা চিঠি। জামসেদপুরে নতুন ডিলার অ্যাপয়েন্ট করার জন্যে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ন্যূনতম বিক্রীর গ্যারাণ্টির সঙ্গে সঙ্গে একটা মোটা টাকা যেন জমা নেওয়া হয়। এতদিন পর্যন্ত এ নিয়ম চালু ছিল না। এখন থেকে এই নিয়ম বলবৎ হল এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। চিঠিটা ড্রয়ারে রেখে দিলাম। সব চিঠি তেওয়ারীর জিম্মায় ছেড়ে দেওয়া যুক্তি যুক্ত বলে মনে হল না।

জয়ন্তকে ডেকে পাঠাতে জয়ন্ত এল। বললাম, 'আপনি বলেছিলেন আপনার কাজ নেই। আপনি কাজ চান?'

'নিশ্চয়, বসে থেকে থেকে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি।'

'আপনার ডিপার্টমেণ্টে যথেষ্ট কাজ রয়েছে। কোম্পানী বাইরে থেকে স্পেয়ার পার্টস কিনছে, শুধু স্পেয়ার না অনেক কিছুই কিনতে হচ্ছে।'

জয়ন্ত বিস্মিত হয়ে বলল, 'অথচ আমি কিছুই জানি না।'

'আপনাকে নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে আর একটু সচেতন হতে হবে।'

'কিন্তু কী ভাবে?'

'আপনি কোলকাতা অফিসে চিঠি লিখে জানতে চান, স্পেয়ার পার্টস, স্টেশনারী, ফার্ণিচার, কিম্বা অন্যান্য জিনিসপত্রের জন্য টেণ্ডার ডাকা হবে কিনা। এক ঢিলে দুই পাখি মরবে। প্রথম কথা কৌশলে কোলকাতাকে জানানো হবে, এই সব জিনিসপত্র, বিশেষ করে নিজেদের তৈরী স্পেয়ার বাজার থেকে চড়া দামে কিনতে হয়। দ্বিতীয়ত, আপনার হাতে ক্ষমতা আসবে, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ব্যস্ত রাখার মত কাজও পেয়ে যাবেন।'

জয়ন্ত খুশী মনে বলল, 'বেঁচে যাই তাহলে। কদিন ধরে যশোদা মনের মধ্যে খুব ঘোরাঘুরি করছে।'

'যশোদা কে?' বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম।

জয়ন্ত বিরক্ত হয়ে বলল, 'আপনার অবস্থা তেওয়ারীর মত হয়েছে দেখছি। মাত্র কালকের কথা, আজই ভুলে গেলেন। আমার প্রিয় বান্ধবী। যশোদা নামটা ভাল না? মাইথলজিক্যাল নামগুলো খুব রোমাণ্টিক হয়, না?'

ইচ্ছে হল বলি, 'তাই বলে যশোদা মোটেই রোমাণ্টিক নাম না।' মুখে উত্তর না দিয়ে ঘাড় দুলিয়ে হ্যাঁ জানালাম।

অনিমেষ এসে ঘরে ঢুকল। জয়ন্তকে দেখে বেরিয়ে যাচ্ছিল। বললাম, 'এসো জয়ন্তবাবুকে কাজ যোগাড় করার পরামর্শ দিলাম।'

'কী রকম?'

জয়ন্তকে যা যা পরামর্শ দিয়েছিলাম, অনিমেষকে বললাম। সব শুনে অনিমেষ বলল, 'যে কাজ করতে যাচ্ছো, তার ভয়াবহ পরিণাম সম্বন্ধে সম্যক পরিচিতি প্রয়োজন।'

'তুমি সাধু ভাষায় কথা বলছো অনিমেষ।' আমি বললাম।

'যেহেতু তোমরা একটা সাধু কাজ করতে চলেছো। কিন্তু আবার বলছি, সাবধান। দেশপাণ্ডে মানুষের ঝাঁপির তলায়-পড়ে-থাকা সাপ না। টাটকা বুনো নাগ। এমন ছোবল মারবে যে স্বয়ং রাজবৈদ্যও কিছু করতে পারবে না।'

জয়ন্ত বাংলা কিছু কিছু বোঝে, বলতে পারে না। বুক ফুলিয়ে সে বলল, 'আমি কাউকে কেয়ার করি না। এরা যদি আমাকে চার্জের থেকে ছাড়িয়ে দেয়, বেঁচে যাই।'

অনিমেষ বলল, 'তোমার তো যশোদা রয়েছে বাবা, আমরা কোথায় যাই।'

জয়ন্ত বলে উঠল, 'কী বললে অনিমেষ?'

অনিমেষ হাসতে হাসতে বলল, 'বললাম, জয়ন্ত খুব সাহসী ছেলে। যশোদার উপযুক্ত।'

প্রথমটায় জয়ন্ত খুশী হয়ে ঘাড় দোলাতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে বলল 'যশোদাকে উপযুক্ত বলছো কেন, তুমি তো যশোদাকে দেখনি।'

'না, দেখিনি, কিন্তু আন্দাজ করতে পারি। যশোদা সাহসী না হলে তোমাকে ছেড়ে দিয়ে বম্বেতে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারতো না। যাকগে, কাজের কথা বলি। চারদিক থেকে কমপ্লেন আসছে, বড় বড় পাম্পগুলো ঠিকমত জল সাপ্লাই দিতে পারছে না। এসম্বন্ধ কোলকাতার অফিসে জানানো দরকার। তারা সব দোষটাই আমাদের ঘাড়ে চাপাচ্ছে কিন্তু সবটাই আমাদের দোষ না।'

বললাম, 'ইরেকশন অ্যাণ্ড সার্ভিসিং হয়তো ঠিকমত হচ্ছে না।'

অনিমেষ সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, 'কথাটা নতুন না। দেশপাণ্ডে বহুবার এই কথা লিখে জানিয়েছে। তোমার এখানে আসার এও একটা কারণ। যথাযথভাবে যাচাই করে নেওয়া, কথাটার মধ্যে সত্যের পার্সেণ্টেজ কতখানি।'

'কিন্তু এ-বিষয়ে আমি কিছুই জানি না।' আমি বললাম।

'আমরা সবাই অজ্ঞানতার অন্ধকারে ঘুরে মরছি।' অনিমেষ বলল।

'দার্শনিক তত্ত্ব থাক অনিমেষ। আমি জানি, আমার কাছ থেকে যদিও সেই ধরনের রিপোর্ট যায়, তোমার গায়ে আঁচড় পর্যন্ত লাগবে না। সত্যি কিনা?'

'সেন্ট পার্সেন্ট।'

'এবং এ-বিষয়ে তুমি কার শেলটারে আছ, তাও আমার অজানা না।'

'এ-বিষয়ে বলতে?' অনিমেষ চোখে প্রশ্ন নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

'এই তোমাকে দোষী প্রতিপন্ন করার বিষয়ে।'

'বুঝলাম। কিন্তু সাই রক্ষাকর্তাটি কে?' অনিমেষ একরকমভাবেই তাকিয়ে রইল।

'কর্তা না, কর্ত্রী। উনি তোমার এবং আমার উভয়েরই খুব পরিচিত।' নাম বলতে গিয়েও চেপে গেলাম। জয়ন্ত আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল।

জয়ন্ত হঠাৎ বলে উঠল, 'আপনারা দেখছি চাকরির ব্যাপারে খুব ইন্টারেস্টেড। চাকরি আমার ভাল লাগে না। বরং ব্যবসাটা মন্দ না। অবিশ্যি কিছু না করে ঘুরে বেড়ানোটাই সবচেয়ে আনন্দের।'

'আনন্দের, কিন্তু পেট সে-কথা শুনবে না। তোমার ব্যাপার অবিশ্যি আলাদা। বাড়িতে খাবার ব্যবস্থা আছে, মনে ফুর্তি রয়েছে, জোয়ারের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলে ঘাটে হোক আঘাটায় হোক এক জায়গায় গিয়ে ঠেকবেই।' বলল অনিমেষ।

জয়ন্ত অনিমেষকে নিয়ে পড়ল, 'তোমাকে ফুর্তি করতে কে বারণ করেছে। মিস দেশপাণ্ডে তো অনিমেষ বলতে পাগল।'

প্রশ্ন করলাম, 'মিস দেশপাণ্ডে কে?'

অনিমেষ জয়ন্তর দিকে তাকিয়ে রইল। জয়ন্ত বলল, 'সী ইজ রিয়েলী টেরিফিক। যেমন ফিগার, তেমন সার্প ফিচার, তেমন—'

বাধা দিয়ে বললাম, 'ও কথা থাক, কাজের কথা হোক। আপনি আজই আপনার বক্তব্য কোলকাতায় পেশ করুন, কোলকাতা যদি কোন অ্যাকশন না নেয়, আপনি হেড অফিসে লিখুন।'

অনিমেষ বলল, 'শুনলাম জামসেদপুরে যাচ্ছো। সাবধানে কাজ করো। দেশপাণ্ডে সম্বন্ধে আগেও বলেছি, আবার বলছি, ওর তালে তাল মিলিয়ে চলো, খুব ভদ্রলোক, ওর কাজে বাধা দিলে লোকটা রেগে উন্মাদ হয়ে যায়। এর আগে যে সেলস্ দেখতো, লোকটাকে একেবারে নাজেহাল করে ছাড়লো। হাতপায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে শেষ পর্যন্ত দিল্লী অফিসে ট্রান্সফার নিল।'

'আমার দ্বারা সেই কাজ হবে না।'

মানুষের দ্বারা যে কী হয়, আর না হয় আজ পর্যন্ত বুঝলাম না। জয়ন্ত মুখে বসোদা বসোদা করে মরছে, আবার লীলাবতী দেশপাণ্ডেকে দেখলে অস্থির হয়ে উঠছে।'

জয়ন্ত চোখ পাকিয়ে বলে উঠল 'মোটেই না।'

'বেশ, দেখা যাবে। দিন কয়েকের মধ্যেই লীলাবতী আসছে দেখো তখন।' বলে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল অনিমেষ।

'লীলাবতী আসছে!' জয়ন্ত এমন উত্তেজিতভাবে কথাটা বলল, যে আমি আর অনিমেষ একসঙ্গে হেসে উঠলাম।

তেওয়ারী ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলেন, থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললাম, 'আসুন।' তেওয়ারী ঘরে ঢুকে চুপ করে বসে রইলেন। বললাম, 'কিছু বলবেন?'

'একটু দরকারী কাজ ছিল।' বলে অনিমেষ আর জয়ন্তর দিকে তাকালেন। ওরা দুজনে ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে গেল। তেওয়ারী আরও কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, 'একটা কথা আপনাকে জানানো কর্তব্য বলে মনে করি।'

'বলুন।' আমি সোজা হয়ে বসে তেওয়ারীর কথা শোনার প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

তেওয়ারী আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে বললো, 'একটা বিষয়ে আপনাকে জানাবো। আপনি হয়তো জানেন না, আমি খুব দুঃখী মানুষ। ছেলেবেলায় বাবা মারা গিয়েছেন। তারপর নিজের চেষ্টায় যা কিছু করেছি। স্ত্রী চির রুগ্ন, ছোট মেয়েটা জন্মান্ধ।'

মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'আহা।'

তেওয়ারী উৎসাহ পেয়ে বলতে লাগলেন, 'শুধু তাই না। বড় মেয়েটি বিধবা হয়ে আমার সংসারেই রয়েছে। ভাল ঘর দেখে বিয়ে দিয়েছিলাম। জামাইটিও ভাল ছিল। সব কপাল। শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে বনলো না, চলে এল। পারিবারিক দুঃখের কথা আপনাকে বলার একটা কারণ আছে। কারণটা আর কিছুই না। আমি একজন দুঃখী মানুষ: শুধু দয়া করে এই কথাটা মনে রাখবেন।'

বিস্মিত হয়ে বললাম, 'কিন্তু আপনার দুঃখ বাড়াবার মত কোন কাজ তো আমি করিনি।'

'করেন নি, কিন্তু করতে কতক্ষণ। ব্যাপারটা খুলেই বলি। আজ কাপুরসাহেবের একটা ডি ও লেটার এসেছে। তাতে জানলাম, আপনার সম্বন্ধে উনি যা লিখেছেন, সেটাই আমার ভয়ের কারণ। উনি লিখেছেন, মিস্টার দেশপাণ্ডে যেন আপনার ডিপার্টমেন্ট নিয়ে মাথা না ঘামান। আপনি কোলকাতার ট্রেনিং পাওয়া লোক, কাজের ব্যাপারে আপনাকে ফ্রি-হ্যান্ড দেওয়া দরকার। মুস্কিলটা হয়েছে সেখানেই। চিঠি পেয়ে দেশপাণ্ডেজী গর্জাচ্ছেন। আমি কোন দলের লোক না। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হলে নির্বিরোধী প্রজারা মারা পড়ে। আমি মারা পড়তে চাই না।'

হেসে বললাম, আপনার বক্তব্য বুঝলাম। কিন্তু রাজায় রাজায় যে যুদ্ধ হবেই সেকথা ধরতে গেলেন কেন। সন্ধি করেও তো কাজ করা চলে।'

'এক রাজ্যে দুই রাজা চলে না। যদিও মিস্টার কাপুর পজিশনে দেশপাণ্ডেজীর চেয়ে বড়, কিন্তু একথাও তো ভুললে চলবে না, ম্যানেজিং ডাইরেকটর দেশপাণ্ডেজীর সাক্ষাৎ শ্বশুরবাড়ির লোক। যদিও ওর স্ত্রী বেঁচে নেই, কিন্তু সম্পর্কটা তো রয়ে গেছে।'

হঠাৎ মাথায় কূটবুদ্ধি খেলে গেল, 'সেলস হাত থেকে বেরিয়ে গেলে দেশপাণ্ডে গর্জাবেন কেন। কাজ কমা তো সুখের কথা।'

তেওয়ারী ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বলতে লাগলেন, 'কেউ কাজ কমাতে চায় না। একটু যদি লক্ষ্য করে দেখেন, বুঝতে পারবেন, প্রত্যেকেই কাজ দেখাতে চায়। এমনকি চাপরাশিটিও চায়, অফিস তাকে কাজের লোক বলে ভাবুক। এটা মানুষের দুর্বলতাও বলতে পারেন, শঠতাও বলা যায়।'

'কিন্তু মিস্টার দেশপাণ্ডের সেই জাতীয় দুর্বলতা থাকা উচিত না। উনি যে কাজে খুব দক্ষ আমি আগেই তা শুনেছি।'

ভেবেছিলাম কথার উত্তরে তেওয়ারী মুখ খুলবেন। উনি অন্য পথ ধরলেন, 'দেশপাণ্ডেজীর কাজে খুব ভাল নাম। লোকও ভাল। তবে সময় সময় রেগে যান। ওকে রাগানো আপনার উচিত হবে না।'

আবারও বুঝলাম, তেওয়ারী যতটা দুঃখী, ততটা বুদ্ধিহীন না।

বললাম, 'ডিলারদের লিস্ট আমাকে দেবেন তো। কোথায় কজন ডিলার আছে, আমার জানা দরকার।'

তেওয়ারী বিষণ্ণ মুখে বললেন, 'লিস্টটা আপনি দেশপাণ্ডেজীর কাছেই চাইবেন। উনি বললে আমার পক্ষে দেওয়া সুবিধাজনক হবে। বুঝতেই তো পারছেন, ম্যানেজারকে চটিয়ে লাভ হয় না।'

বললাম, 'ঠিক আছে, আমিই চেয়ে নেব। আপনার আর কোন কাজ আছে?'

'ম্যানেজার বলেছেন, আপনার টাকা পয়সার দরকার হলে ক্যাস থেকে সাসপেনস অ্যাকাউন্টে নিয়ে নেবেন। একটা ভাউচার সই করে দেবেন শুধু।'

মনে মনে বিরক্ত হতে শুরু করেছিলাম। এক একজন মানুষ নিজের দুঃখের সুযোগ নিতে চায়। লোকে তাকে করুণা করুক তাই চায়। বললাম, 'দরকার হলে টাকা নেব। ভাউচারও সই করবো। এখানকার অ্যাকাউন্টেন্ট কে? তাকে তো দেখি নি।'

'ভদ্রলোক বুড়ো আর খুব অসুস্থ। ওর কাজ আমাকেই দেখতে হয়।'

বললাম, 'ওর কি রিটায়ারমেন্টের সময় হয়নি?'

তেওয়ারীর মুখে ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল, 'হলেও অফিসিয়াল বয়স খুব কমানো আছে। আরও বছর দুয়েক চাকরি আছে।'

বিরক্ত হয়ে বলে উঠলাম, 'এখানকার অবস্থা তো দেখছি খুব খারাপ। যার যা ইচ্ছে করে যাচ্ছে।'

তেওয়ারী যেন আকাশ থেকে পড়লেন, বললেন, 'কেন?' বললাম, 'জয়ন্ত দেশাইয়ের কোন কাজ নেই; অ্যাকাউন্টটে বাড়িতে বসে থাকে। অফিস রেজিস্ট্রারে যে ক'জনের নাম আছে, তারা সবাই বেঁচে আছে তো, না স্বর্গ থেকে এসে মাইনে ড্র করে যাচ্ছে।'

'আপনার কথাটা ঠিক বোঝা গেল না।' তেওয়ারীর গোল মুখ লম্বাটে দেখাল।

'কথাটা সরল। অফিস ডিসিপ্লিন বলতে এখানে কিছু নেই। যার যা ইচ্ছে করে যাচ্ছে। আপনি এখন যেতে পারেন। আপনার কাছ থেকে কোন কাগজপত্র কিম্বা ইনফরমেশন পাওয়া যাবে না, একথা বোঝা গেল।'

'আমাকে দোষী সাব্যস্ত করবেন না মিস্টার চ্যাটার্জি'। আমি একজন দুঃখী মানুষ। দুঃখী মানুষেরা খুব ভীতু হয়।' বলে তেওয়ারী কাঁদ কাঁদ মুখ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বললাম, 'ঠিক আছে, আপনি যান। আমার দ্বারা আপনার কোন ক্ষতি হবে না।'

তেওয়ারী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এর বেশী কিছু চাই না।' বলে ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

দেশপাণ্ডে ফোন করছিলেন। হাত দিয়ে চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন। কিছুক্ষণের মধ্যে দেশপাণ্ডের ফোন শেষ হল। হাসি মুখে প্রশ্ন করলেন, 'এনি প্রবলেম?'

'প্রবলেম ঠিক না। আমি ডিলারদের লিস্টটা চাইছি। জামসেদপুরে যাবার আগে ফাইলগুলো দেখে নিতে চাই।'

ভেবেছিলাম দেশপাণ্ডে কাজে বাধার সৃষ্টি করবেন। উনি উল্টো পথ ধরলেন। 'দিস ইজ রিয়্যালি ভেরী নাইস অফ ইউ; আমি কাজের মানুষ দেখতে ভালবাসি। বিশেষ করে ইয়ংম্যান কুঁড়ে হলে ভাল লাগে না।' সঙ্গে সঙ্গে বেল বাজিয়ে চাপরাশীকে ডাকলেন। চাপরাশী আসতেই তেওয়ারীকে ডেকে পাঠালেন।। হন্তদন্ত হয়ে তেওয়ারী ছুটে এলেন। দেশপাণ্ডে বললেন, 'মিস্টার চ্যাটার্জিকে সব ফাইলগুলো দেখাবেন। শুধু ফাইল না, উনি যা যা ইনফরমেশন চান, কিছুই লুকোবেন না। এমন কি, গোপন কথা যদি কিছু থাকে তাও জানাবেন। আপনার তো আবার বহু গোপন কথা থেকে যায়।' বলে দেশপাণ্ডে প্রাণখোলা হাসিতে ঘর ভরিয়ে তুললেন। আমার দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, 'এনি থিং এলস?'

ধন্যবাদ জানিয়ে তেওয়ারীর পিছন পিছন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। তেওয়ারী আমার কাছে সরে এসে ফিস ফিস করে বললেন, 'ব্যবস্থাটা পাণ্ডেজীর মুখ থেকে হয়ে ভাল হল, তাই না?'

বললাম, 'হ্যাঁ এখন আর কোন কাগজপত্র দেখাতে আপনার আপত্তি থাকা উচিত না।'

তেওয়ারী উৎসাহের সংগে বললেন, 'নিশ্চয়ই না।'

শনিবার হাফ ডে। তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে যাবার মত জায়গা নেই। অফিসে বসে ফাইল ঘাঁটছিলাম। ডিলারদের বিশাল লিস্ট। এত ডিলার রাখার যে কী মানে হয় কে জানে। অনিমেষ এসে ঘরে ঢুকল। চেয়ারে কিছুক্ষণ বসে থেকে বলল, 'খুব ব্যস্ত।'

'না, তেমন না। আচ্ছা অনিমেষ, তোমরা এত ডিলার রেখেছো কেন?'

'অনিমেষ, পাল্টা প্রশ্ন করল, 'আমরা বলতে?'

'এই অফিসে। ডিলারশিপ তো এখান থেকেই দেওয়া হয়।'

'হ্যাঁ।' অনিমেষ আপন মনে সিগারেট টানতে লাগল।

'এ বিষয়ে তোমার বক্তব্য কিছু নেই?'

অনিমেষ খুব নির্বিকারভাবে উত্তর দিল, ''না।'

'কেন?' অনিমেষের ওপর ক্রমশই বিরক্ত হচ্ছিলাম।

'যেহেতু আমি সেলস ডিপার্টমেন্টের লোক না। এবং আদার-ব্যাপারীর জাহাজের খবরে দরকার হয় না, এই কথাটা আমি খুব বিশ্বাস করি।'

'তার মানে তুমি আমাকে সাহায্য করার চেষ্টা করছো না। অথচ কোলকাতায় শুনে এসেছিলাম, তোমাকে দিয়ে আমার সাহায্য হবে।' আমার কথার মধ্যে ঝাঁজ ছিল।

'আমার সাহায্য তুমি চাও না।' অনিমেষ কায়দা করে সিগারেটের রিং ছাড়তে লাগল।

'কে বলল, তোমার সাহায্য চাই না। এখানে এসে দেখছি, একমাত্র জয়ন্ত ছাড়া প্রত্যেকটি মানুষই অসাধারণ কৌশলী। কিছুক্ষণ আগে তেওয়ারী যে খেলা দেখাল ভুলবো না। দেশপাণ্ডে তো গভীর জলের মাছ। ধরা ছোঁয়ার বাইরে।'

কথা শেষ হতে না হতেই অনিমেষ বলে উঠল, 'অথচ সেই মাছটার পেছনেই প্রথমে লেগে বসলে। বার বার বলছি, সাবধান হও। ভাল কাজ করতে চাইলেই করা যায় না। গন্তব্যে পৌঁছতে গেলে আগে রাস্তা তৈরী করে নিতে হয়। তুমি হুটপাট করে দৌড়ে মরছো। একদিনেই সব কাজ করে ফেললে, বাকী দিনগুলো কী করে কাটাবে?'

দুহাত তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে বললাম 'বেশ, নির্দেশ দাও, মেনে চলবো।'

অনিমেষ অত সহজে ছাড়ল না। বলল, 'প্রতিজ্ঞা করো, জিদের বশে কিছু করবে না।'

'তোমার কথা রাখার চেষ্টা করবো অনিমেষ।'

অনিমেষ বলল, 'চলো, সিনেমা দেখে আসি। একটা ভাল ইংরেজী বই এসেছে।'

'চলো, যদিও আমি বেশী সিনেমা দেখি না।'

'কি করে সময় কাটাতে কোলকাতায়? রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়ে?'

হেসে বললাম, 'উপযুক্ত সংগী পেলে রাস্তায় ঘুরতে বেশ লাগে।'

'উপযুক্ত সংগী দিন কয়েকের মধ্যেই আসছে, তখন ঘুরো।'

'কে?'

'লীলাবতী দেশপাণ্ডে। খুব ফুর্তিবাজ মেয়ে, হৈচৈ করে বেড়াতে ভালোবাসে।'

'ওর জন্যে তো জয়ন্ত দেশাই আছে। তোমার ওপর নাকি দারুণ নজর মিস দেশপাণ্ডের?'

অনিমেষ হাসল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'নজর হয় দুই কারণে। এক আকর্ষণ থাকলে, আর হয় বিকর্ষণে। আমাকে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করতে পার।'

'কিন্তু তোমার প্রতি বীতরাগের কারণ?'

'কারণটা যৎসামান্য। কয়েকদিন আগে কাপুর এসেছিলেন। একটা ককটেল পার্টি হয়েছিল। পার্টিটা নাকি দিয়েছিলেন কাপুর। কাপুর হঠাৎ আমাকে নেমতন্ন করে বসেছিলেন, কেন করেছিলেন জানি না। এই সব উঁচু মহলের পার্টিতে আমাদের মত নিচু মহলের লোকদের নিমন্ত্রণ সচরাচর হয় না। সেইদিন কাপুরসাহেব ভয়ানক নেশা করেছিলেন, আর তাকে গরম বাহু দিয়ে একান্ত করে টেনে নিয়েছিলেন এই মিস লীলাবতী দেশপাণ্ডে। উনিও পাল্লা দিয়ে ড্রিংক করেছিলেন। তারপর দুজনে একসঙ্গে গাড়ি করে চলে গিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্য ঘটনাটার সাক্ষী হয়ে থেকে গেলাম আমি। তাই হয়তো মিস দেশপাণ্ডের এই—কী বলবো, অনুরাগ কথাটা

ভাল, কী বলো!' বলে অনিমেষ খুব জোরে হেসে উঠল।

আমি বললাম, 'কাপুর হঠাৎ তোমাকে নেমন্তন্ন করতে গেলেন কেন?'

'জানি না।'

'আমি জানি।'

'কি?'

'তোমার যে মনুবুদ্ধি রয়েছে, কাপুর তাকে খুশী করতে চেয়েছিল।'

'কী জানি। যা ঘটেছে তাই বললাম, চলো। দেরী হয়ে যাবে।'

উঠে পড়লাম। সিনেমা হলে বিশেষ কথা হল না। অনিমেষ চুপচাপ সিনেমা দেখতে লাগল। আমি দু-একবার কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম, অনিমেষ উৎসাহ দেখায়নি। অবিশ্যি হলে বসে কথা বলাটাও ঠিক না। অপরের ব্যাঘাত ঘটে।

শো ভাঙার পর হোটেলের দিকে চললাম। অনিমেষ চুপচাপ ছিল। বিদায় নেবার সময় শুধু মনে করিয়ে দিয়ে গেল, 'কাল কিন্তু দুপুরে নেমন্তন্ন। ভুলো না।'

হোটেলে ফিরে দেখলাম, রতন ব্রহ্মচারী লাউঞ্জে আমার জন্য বসে রয়েছেন। বললাম, 'কী ব্যাপার?'

'আপনার সঙ্গে একটু কনফিডেনসিয়াল কথা ছিল স্যার।'

'অফিসেই বলতে পারতেন।'

'এসব কথা অফিসে বলা যায় না।'

ইচ্ছে হল বলি, যে কথা অফিসে বলা যায় না, সেকথা বলার দরকার কি। কিন্তু বললাম না। কিছু সংখ্যক মানুষকে করুণা করতে ইচ্ছে হয়। ভাগ্যের হাতে যারা মার খেয়ে মরছে তাদের আর মেরে কী লাভ। অবিশ্যি ব্রহ্মচারী একজন দুঃখী মানুষ কিনা আমি জানি না, কিন্তু সুখ যে ভদ্রলোকের কাছ থেকে অনেক দূরে রয়েছে, সেটা আন্দাজ করতে পারছিলাম। তাছাড়া ব্রহ্মচারীর কথা শুনতে ভাল লাগে। বিশেষ করে এই সময়ে, যখন কিনা ঘণ্টা তিনেক মুখ বন্ধ করে কাটিয়ে দিল অনিমেষ। বললাম, 'ঘরে চলুন।'

ব্রহ্মচারী উঠে দাঁড়ালেন। সেই এক পোষাক। ঢলঢলে খাকী প্যাণ্ট, হাফ সার্ট, সোলার টুপির ওপর প্ল্যাস্টিক মোড়া। পায়ের জুতোটা খুব পুরনো বলেই মনে হল। কোনদিন যে রং পড়েছে তার চিহ্নমাত্র নেই। হাসি মুখে বললাম, 'আপনি সাজপোষাক সম্বন্ধে খুব উদাসীন।'

ব্রহ্মচারী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'কিন্তু এক সময় ছিল, যখন কোলকাতা থেকে আমার কাপড়চোপড় ধুয়ে আসতো। ভালো লণ্ড্রী ছাড়া কোথাও ধুলে মনঃপুত হতো না।'

'এখানেও তো ভালো লণ্ড্রী আছে। ইচ্ছে হলে ধোয়ালেই পারেন।'

'সে মন আর নেই স্যার। মনটা মরে গেছে।'

'কেন?'

মুখ কাচুমাচু করে ব্রহ্মচারী বললেন, 'সংসারের চাপে, বিশ্বাস করবেন, আগে শুধু যে পরিষ্কার জামা-কাপড় পরতাম তাই না, আমার বত্রিশ জোড়া জুতো ছিল, বারো ডজন প্যাণ্ট, সার্ট গোনাগনতি থাকতো না। শীতকালে দস্তুরমতো টাই বেঁধে সুট পরতাম, ব্যাটন হোলে গোলাপের কুঁড়ি গোঁজা থাকতো।'

উৎসাহ দেবার জন্য বললাম, 'তাই নাকি?'

'ইয়েস স্যার। বাবা বলতেন, রতন জীবনে খুব ফুল ভালবাসবি। ফুলের তুল্য বস্তু নেই। তখন বাটন হোলে ফুল গুঁজতাম; এখন তো আর সুট পরি না। কিন্তু ঘরে কোন না কোন ফুল ফ্লাওয়ার-ভাসে থাকবেই। মরার সময় বাবার কী ইচ্ছে ছিল জানেন? তখন কথা বলতে বাবার দস্তুর মতো কষ্ট হচ্ছে। হাতের ইসারায় আমার কান নিজের মুখের কাছে নিয়ে এসে বললেন, আমি মরে গেলে সমস্ত শরীরটা ফুলে ঢেকে দিস। বিশ্বাস করবেন স্যার, বাবার ডেডবডি দু মণ ফুল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। ফুলের গন্ধে কত ভ্রমর যে এসে জুটেছিল কী বলবো!'

ইচ্ছে হল জিজ্ঞেস করি, ফুল কি ওজন করে বিক্রী হতো তখন? ট্রেনের কথাটা মনে পড়ে গেল। কী হবে ভদ্রলোককে শুধু শুধু আঘাত দিয়ে। নির্বান্ধব দেশে তবু কথা বলার একজন লোক পাওয়া গেল। না হলে সন্ধ্যেটা ভীষণ ফাঁকা ফাঁকা লাগতো।

ঘরে এসে দুজনে বসলাম। বেয়ারা এসে কফি দিয়ে গেল। কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে ব্রহ্মচারী বললেন, 'এই কফি দেখে একটা কথা মনে পড়ে গেল। তখন প্রথম পাটনায় এসেছি। লিটন সাহেব তখন জে ডবলিউ আথারটন কোম্পানীর বড়সাহেব। সাহেব একদিন বললেন, ব্রহ্মচারী তোমাদের কানাট্রি-লিকার খাওয়াতে পারো। খুব নাম-ডাক শুনেছি। রাম খেয়ে আর নেশা জমছে না সাহেবের। সে সব কী সাহেব ছেল মশাই! ষণ্ডা মার্কা চেহারা, যেন জন বুল। ওর কি আর রাম ফামে পানায়। বললাম, আজ্ঞা করলেই হয়। তারপর বুঝলেন কিনা, এখান থেকে বত্রিশ মাইল দূরে তিনসুকিয়া বলে একটা গ্রাম আছে, তখন যাতায়াতের ভাল ব্যবস্থা ছিল না, গরুর গাড়ি করে যেতে হতো, এখন অবিশ্যি বাসটাস হয়ে গেছে। বললাম, সাহেব দিন চারেক সময় লাগবে। এমন নেশা করাবো যে জীবনে ভুলবে না। তারপর বুঝলেন কিনা, গিয়ে তো হাজির হলাম তিনসুকিয়ায়। গিয়ে যা দেখলাম চক্ষুস্থির। গোটা বিশ-পঁচিশ ঘর নিয়ে গ্রাম। সমস্ত গ্রামে লোকজনের সাড়াশব্দ নেই। সবাই নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে আছে। কুকুরগুলোও টান টান হয়ে ঘুমোচ্ছে। আমি যে নতুন লোক গেলাম, একটু চেঁচামেচি পর্যন্ত করলো না। আমার সঙ্গে আর একটা লোক ছিল। সেই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল আমাকে নামটা ঠিক মনে পড়ছে না। দুখিয়া কী সুখিয়া গোছের নামটা ছিল। যাকগে, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, একটা জাগ্রত লোকেরও দেখা পেলাম না। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দুখিয়া কিম্বা সুখিয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, কী করি বল তো। ও একটা উপায় বাৎলে দিল। ওর পরামর্শে দুজনে একটা বাড়িতে ঢুকে পড়লাম। বাড়ি আর কী বলবো। মাটির দেয়াল, মাথার ওপর খড়ের ছাউনী। ঘরে ঢুকে অন্ধকারে প্রথমটা কিছুই দেখা গেল না। লোকটার চোখ খুব শার্প ছিল। ঘরের কোণায় একটা মাটির হাঁড়ি দেখিয়ে বলল, এটাতেই মাল আছে। হাঁড়িটা বাইরে এনে দেখলাম, তলার দিকে তখনও কিছুটা সারবস্তু পড়ে রয়েছে। ঠিক এই কফির মত রং আর কী গন্ধ মশাই! পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি উগরে আসার যোগাড়। দুইজনে মিলে সেই হাঁড়ি তো নিয়ে এলাম। লিটন সাহেব মহাখুশী। বলে কিনা, কী মিণ্টি গন্ধ। নাকে রুমাল চাপা দিয়ে বাঁচি না। আর সাহেব কিনা হাঁড়ির মধ্যে নাক ঢুকিয়ে গন্ধ শুঁকছে। তারপর হল কী জানেন। সাহেব তো হাঁড়িয়া খেল। খেয়ে অজ্ঞান! অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল বাহাত্তর ঘণ্টা। আমরা তো ভয়েই অস্থির, সাহেব বুঝি মরেই গেল। ভাগ্যিস পরিবার ছিল না সাহেবের। তাহলে কী কেলেঙ্কারী হতো ভাবুন তো একবার। বাহাত্তর ঘণ্টা পরে সাহেব চোখ খুলে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। বললাম, 'ইয়েস স্যার!' ভেবেছিলাম সাহেব বুঝি রাগ করবে। কিন্তু ও হরি, দু' হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে সাহেব কী বলল জানেন? রতন, ইউ আর মাই স্যান!' সেই যে বলেছিলাম না, আমার ব্যবসার ক্যাপিটাল এক সাহেবের দেয়া, সেই হচ্ছে লিটন সাহেব। খুব ভালবাসতো আমাকে। ঠিক ছেলের মতন। নেহাৎ ম্লেচ্ছ ছিল সাহেব, না হলে মারা যাবার পর ঠিক মাথা কামিয়ে শ্রাদ্ধ-শান্তি করতাম!'

ব্রহ্মচারী কথা শেষ করে আমার দিকে তাকিয়ে মিণ্টি মিণ্টি হাসতে লাগলেন। ভদ্রলোককে যত দেখছি, ততই বিস্মিত হচ্ছি। অদ্ভুত গল্প বলার ক্ষমতা লোকটির। গল্প বলতে বলতে সে কী মুখের ভঙ্গী! কখনও আনন্দে মুখ উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠছে, কখনও বিষাদের ছায়া পড়ছে সেখানে। মনে হচ্ছে ব্রহ্মচারী একজন দিগ্‌বিজয়ী পুরুষ, আবার কখনও ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে শশকের মত এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন, যেন কত অসহায়।

বললাম, 'আপনার গল্প বলার ভঙ্গী সত্যিই অপূর্ব। এবার আপনার আসার উদ্দেশ্য বলুন। আমাকে, দিয়ে যদি কোন সাহায্য হয়, চেষ্টা করবো।'

'আপনার চেষ্টা করতে হবে না স্যার, শুধু আঙুল তুললেই হবে। শুনলাম সোম-বার নাকি জামসেদপুরে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, সেরকমই তো কথা আছে।'

ওখানে আগরওয়ালার ডিলারশিপ ছিল।'

'লোকটা কাজ দেখাতে পারছে না।'

ব্রহ্মচারী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ব্যাকুলভাবে বললেন, 'আগরওয়ালা খুব ভাল লোক স্যার। খুব কাজের মানুষ। ওর 'স্কোলেট' মারা গেল বলেই তো লোকটা এমন মুষড়ে আছে।'

'তিন বছর ধরে তো ওর ছেলে মরছে না। এই তিন বছরে ওর সেল খুব খারাপ।'

'আমি কথা দিচ্ছি স্যার, সেল বাড়বে। এবারকার মত ওকে মাপ করে দিন।'

'আপনি কী করে আগরওয়ালার হয়ে কথা দেবেন? ওর সংগে কী আপনার বিজনেসের সম্পর্ক আছে?'

ব্রহ্মচারী থতমত খেয়ে গেলেন। মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'প্রত্যেক মানুষের সংগেই তো মানুষের সম্পর্ক রয়েছে স্যার। এই যে আপনি। আপনি কী বলতে পারেন আপনার সংগে আমার কোন সম্পর্ক নেই। নিশ্চয় আছে। না হলে এত লোক থাকতে আমাকে স্নেহ করবেন কেন। আগরওয়ালার হয়ে যে বললাম, সে কথাই বা রাখছেন না কেন?'

'আমি এখন পর্যন্ত আপনাকে কথা দিই নি।'

'দেন নি, কিন্তু দিতে কতক্ষণ।' বলে ব্রহ্মচারী সরল মুখে হাসতে লাগলেন। এই এই সব মানুষকে কটু কথা বলা যায় না।

বললাম, 'আমার সাধ্যমত চেষ্টা করবো।'

ব্রহ্মচারী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনার একটু চেষ্টাতেই কাজ হবে স্যার। আর দেরী করবো না, ন'টা বাজতে চলল। ও আমার একা থাকতে খুব ভয় পায় কিনা। চলি স্যার। হন্ত-দন্ত হয়ে ব্রহ্মচারী বেরিয়ে গেলেন। মুহূর্তের মধ্যেই আবার এসে ঘরে ঢুকলেন, 'আর একটা কথা। এ বিষয়ে জেনারেল ম্যানেজারকে কিছু বলবেন না।'

'কিন্তু ওর সংগে তো আপনার খুব ভাব।'

'শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি, বুঝলেন কিনা। আর দেরী করবো না। চলি।' বলে ব্রহ্মচারী দ্রুত বেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

আজ রবিবার। সকাল সকাল স্নান সেরে অনিমেষের বাড়ী চলে এলাম। অনিমেষ আমার জন্যই বসেছিল। আমি যেতেই বলল, 'রান্নার দেরী আছে, চলো বেড়িয়ে আসি।' দুজনে বেরোচ্ছি এমন সময় বিভা এসে ঘরে ঢুকল। কাপড়ে হাত মুছতে মুছতে বলল, 'এখন কোথায় যাবে? রান্না তো প্রায় হয়ে এল।'

অনিমেষ বলল, 'একটুনি ঘুরে আসবো। তোরা ততক্ষণ রান্না কর।'

বিভা রেগে বলল, 'রান্না করে মা আর আমি গালে হাত দিয়ে বসে থাকি, জিনিসপত্র সব ঠাণ্ডা হয়ে যাক।'

অনিমেষ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'তোদের রান্না শেষ হতে-না-হতেই চলে আসবো।'

বিভা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি কিন্তু দাদাকে সময় মত ধরে নিয়ে আসবেন। গল্প করতে বসলে দাদার বাড়ীর কথা মনেই থাকে না।'

'তুই কি করে বুঝলি ওর গল্পের সময় বাড়ীর কথা মনে থাকে।'

'এক একজন মানুষকে দেখলে বোঝা যায় তারা খুব ঠিকঠাক মানুষ।' বিভা সংগে সংগে উত্তর দিল। একটু থেমে আবার বলল, 'উনি কী সুন্দর করে চুল আঁচড়ান, আর তোমার চুল! ঠিক যেন কাকের বাসা।' বলে বিভা খিল-খিল করে হেসে উঠল।

বিভার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'বিভা যে খুব ভাল মেয়ে বোঝা যায়।'

বিভা হাসি থামিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওমা, সে কী কথা।'

'হ্যাঁ, হাসলে যাদের গালে টোল পড়ে, তারা ভাল হয়। অন্তত আমি যে ক'জনকে দেখেছি তারা ভাল।'

বিভা প্রশ্ন করল, 'আপনি ক'জনকে দেখেছেন?'

চিন্তা করে বলতে লাগলাম, 'রাজলক্ষ্মীর, বড়মাইয়ের আরও টোল পড়ত। ভদ্রমহিলা অবিবাহিতা মারা গেছেন। খুব ভাল ছিলেন। আর একজনকেও দেখেছি, কিন্তু নামটা জানি না। তাঁর চেহারাটা খুব মনে আছে। মাথায় কোঁকড়া চুল, লম্বাটে ধরনের মুখ, চোখ দুটো বড় বড়, ফর্সা গায়ের রঙ। ভদ্রলোক হয়তো কবি-টবি হবেন। ঠিক সেই ধরনের চেহারা। উনি আর একজনকে সংগে নিয়ে বাসে উঠেছিলেন। দুজনে খুব কথা

বলছিলেন। এক সময় দুজনেই হেসে উঠলেন। তখনই দেখলাম ভদ্রলোকের গালে দুটো গভীর টোল।'

বিভা বলে উঠল, 'তার মানে এই না যে ভদ্রলোক খুব ভাল।'

'কিন্তু সেদিন আমার মনে হয়েছিল, এ রকম সরল আর ভাল মানুষ এর আগে কখনো দেখি নি। আমার বাবাও খুব ভাল ছিলেন, তবে তাঁর গালে টোল পড়ত না।'

বিভা হেসে ফেলল, 'তার মানে, আপনার কথায় কিছুই প্রমাণ হল না। টোল না পড়লেও মানুষ ভাল হতে পারে, আবার টোল পড়লেও মানুষ খারাপ হয়।'

দু হাত তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে বললাম, 'আমি সারেন্ডার করলাম।'

বিভা খুব খুশী মনে হাসতে লাগল। কত অল্প খুশীতেই বিভা কত বেশী হাসতে পারে। আমরা দুজনে বেরিয়ে এলাম। বিভা আবার তাড়াতাড়ি ফিরে আসার জন্য অনুরোধ জানাল। বাইরে এসে পিছন ফিরে তাকালাম। বিভা তখনও বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। বেশ মেয়ে বিভা। মানুষ দেখলে খুশী হয়, যত্ন করে খাওয়াতে ভালবাসে। আজকালকার মেয়েদের মত হাল ফ্যাসানের না। কথাটা মনে হতেই হাসি পেল। এমনভাবে চিন্তা করছি যেন সাবেকী আমলের কোন মানুষ আমি।

অনিমেষ বলল, 'একা একা হাসছো কেন?'

অনিমেষকে কথাটা বলতে লজ্জা লাগল। বললাম, 'মানুষকে আছাড় খেতে দেখলে দারুণ মজা লাগে। দ্যাখো, আর একটু হলে ঐ মোটা লোকটা আছাড় খেত।'

সেদিকে তাকিয়ে অনিমেষও হেসে ফেলল।' উদ্দেশ্যবিহীনভাবে কিছুক্ষণ হাঁটা-চলি করার পর এক সময় বললাম, 'চলো. ফেরা যাক। বিভা তাড়াতাড়ি ফিরতে বলেছে।'

অনিমেষ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আর আধ ঘণ্টা পরে ফিরবো।'

আমিও ঘড়ি দেখলাম, বারোটা বেজে গেছে। বললাম, 'আধ ঘণ্টা কেন?'

অনিমেষ একটু ইতস্তত করে বলে ফেলল, 'তোমাকে বলতে আপত্তি নেই। বাবার খাওয়ার পর ফিরবো। প্রত্যেক ছুটির দিনেই সেটা আমার অভ্যেস। শোনো নি, বিভা কী রকম বলছিল। ওতো আর জানে না, ইচ্ছে করে রাস্তায় ঘুরে ঘুরে এই সময়টা আমি বাইরে কাটাই।'

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, 'কিন্তু কেন অনিমেষ? সঙ্গে সঙ্গে আবার বললাম, 'অবিশ্যি বলতে যদি বাধা থাকে, থাক।'

অনিমেষ ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলল, 'না কোন বাধা নেই। সব তোমাকে বলবো।' একটুক্ষণ থেমে থেকে অনিমেষ বলতে শুরু করল, 'লক্ষ্য করেছো কিনা জানি না, বাবা আমার সঙ্গে কথা বলেন না। আমার সঙ্গে খেতে বসলে বাবার খাওয়া হয় না। এমন কি আমি বাড়ীতে থাকলে পর্যন্ত বাবা অস্বস্তি বোধ করেন। অথচ বাবার সঙ্গে যে কোন দুর্ব্যবহার করি, তা না। বাবা আমাকে আর সহ্য করতে পারছেন না। অনিমেষ কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার বলতে লাগল, 'অথচ আগে বাবা আমাকে খুব ভালবাসতেন. একসঙ্গে নিয়ে খেতেন, গল্প-গুজব করতেন। এই ব্যাপারটা হয়েছে বছর দুয়েক ধরে।' অনিমেষ আবার চুপ করল। আমরা একটা জায়গা দিয়ে হাঁটছিলাম। এদিকে লোক চলাচল কম। গাড়ী কিম্বা রিকশার শব্দও নেই। খুব ধীরে কথা বললেও শুনতে অসুবিধা হয় না। অনিমেষের নীচু গলা আমার কানে আসতে লাগল, 'অথচ এই ব্যাপারে আমাকে দায়ী করার কোন অর্থই হয় না। কিন্তু বাবা তা বুঝবেন না। সমস্ত ব্যর্থতা আমার ওপর চাপিয়ে দিচ্ছেন ক্রমশ। বছর দুয়েক আগে বিভা হঠাৎ একদিন বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেল—'

আমার মুখ দিয়ে অস্ফুট শব্দ বেরোল, 'বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেল?'

'হ্যাঁ। কিছু দিন ধরেই ওর স্বভাবে অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করছিল মা। আমরা তখন বিশ্বাস করি নি। পরে ডাক্তার ডাকা হল। চিকিৎসা হল। বিভা এখন প্রায় সময়ই সুস্থ থাকে। গরমের সময় মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন মাথার যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকে, যা-তা বলে, গালাগাল দেয়। অনেক ডাক্তার, বহু অসুধপত্র হল. কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। বাবা কিন্তু প্রথম দিন থেকেই এক কথা বলে আসছেন, বিয়ে দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি সে কথা মানতে পারি নি।'

'শুনেছি বিয়ের পরে নাকি অনেকে ভাল হয়ে যায়।' আমার অন্তরে ক্রমশই দুঃখের ছায়া ঘন হয়ে উঠছিল।

'তুমি শুনেছো ভাল হয়ে যায়, আমি কিন্তু শুনেছি, ভাল হয়ে যায় না। ধরো যদি বিভা বিয়ের পর স্বাভাবিক না হয়। ভাবতে পারো, ওর জন্যে আর একটা পরিবার কীভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। বাবা একবার ওর বিয়ে প্রায় ঠিক করে ফেলেছিলেন, আমি ছেলেটির বাড়ীতে গিয়ে সেই বিয়ে বন্ধ করে দিয়ে এসেছিলাম। সেবারে বাবা সাত দিন ভাত খান নি। আমি বাড়ীতে থাকলে বাবা খেতে পারেননা, আমি কাছে গেলে উনি অস্বস্তি বোধ করেন, কিন্তু বলতে পারো আমার দোষটা কোথায়। নিজেদের স্বার্থ দেখতে গিয়ে অপরের বিপদ ঘটানো কি মানুষের কাজ!' বলতে বলতে অনিমেষ বিষম উত্তেজিত হয়ে পড়ল।

কোন সান্ত্বনার কথা মুখ দিয়ে বার হল না। বার বার হাসিভরা মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। হাসলে বিভাকে কত সুন্দর দেখায়। বিভা কত মিষ্টি করে কথা বলতে পারে, কত যত্ন করে মানুষকে খেতে দেয়, আর সেই বিভা কিনা পাগল হয়ে গিয়েছিল!

অনিমেষ আবার ঘড়ির দিকে তাকাল। বলল, 'চলো ফেরা যাক। এতক্ষণে বাবার খাওয়া হয়ে গেছে। সেদিন যে বাবা মারগো, চা খেলেন না, আর কিছু না আমাকে জব্দ করলেন। উনি জানেন, ওঁর এই উপোস করে থাকাটা আমি সহ্য করতে পারি না, তাই আমাকে কষ্ট দেন। তুমি জানো না অংশু বাবা কী অমানুষিক নিষ্ঠুর।' বলতে বলতে অনিমেষের গলা বুজে এল।

মানুষ কী বিচিত্র! অনিমেষের এই রিক্ত অসহায় রূপ কী কোন দিন কল্পনা করতে পারতাম। প্রথম দেখার পর থেকেই ওকে সুস্থ, সবল কিছুটা বা কঠিন একজন মানুষ বলে ভাবতে শুরু করেছিলাম। শুধু যে সুস্থ সবল তাই না, সময় সময় মনে হয়েছিল. সুপ্রিয়ার ওপর সুযোগ নিয়ে নিজের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে অনিমেষ। তখন ক্ষুব্ধ হয়েছি। ক্ষুব্ধ হয়ে দূরে সরে গেছি। কিন্তু নিজের দুঃখের মধ্য দিয়ে অনিমেষ আবার কত কাছের মানুষ হয়ে গেল। দুঃখের ঘা না খেলে মানুষ অন্তরঙ্গ হয় না।

চুপচাপ দুজনে পাশাপাশি বাড়ীর দিকে হাঁটতে লাগলাম। এক সময় বললাম, 'বিভা জানে?'

অনিমেষ বলল, 'হ্যাঁ বিভা জানে। যে সময় সময় ওর মাথায় খুব যন্ত্রণা হয়, তখন ও আর স্বাভাবিক থাকে না। তাই বাইরের মানুষের কাছে ও খুব সংকুচিত হয়ে পড়ে। একমাত্র তোমার কাছেই ও খুব ফ্রি।'

এক সময় হঠাৎ বলে ফেললাম, 'তুমি বিয়ে করবে না অনিমেষ?'

অনিমেষ মৃদু হাসল, 'বাবার ক্ষোভের এও একটা কারণ। ওঁর এক বন্ধুর মেয়ে নিয়ে খুব ঝুলোঝুলি চলেছিল ক'দিন।'

'আজীবন বিয়ে না করে থাকতে পারবে?' প্রশ্নটা নিজের কানেই কী রকম শোনাল। অনিমেষ উত্তর দেবার আগেই আবার বলে উঠলাম. 'অবিশ্যি অনেক মানুষ ব্যাচিলার থাকে। বিশেষ করে পলিটিশিয়ানরা।'

অনিমেষের ঠোঁটে তখনও ক্ষীণ হাসি লেগে রয়েছে। ও বলল, 'আমি পলিটি-শিয়ান না। এবং বিশ্বাস করি, রাজনীতি না করেও মানুষ অবিবাহিত থাকতে পারে। জীবনের সঙ্গে যে বিয়ের কী গভীর সম্পর্ক আমি বুঝতে পারি না। আমার বাবাও তো বিবাহিত মানুষ। কিন্তু উনি একজন স্বার্থ মানুষ ছাড়া কিছু না। শুধু

একটা অতীত নিয়ে পড়ে আছেন। কবে এখানে এসেছিলেন, কবে কী করেছেন, শুধু তাই আঁকড়ে বসে আছেন। যা চলছে, তা বাতিল করে দিয়ে যা চলছে না, তাই চালাতে ইচ্ছুক তিনি। কী বলবে একে। সার্থক জীবন!' অনিমেষ আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

বললাম, 'তা না। তবে তোমার বাবার আশা-আকাঙ্ক্ষাটাও তো অবহেলা করার মত না।'

অসহিষ্ণু গলায় অনিমেষ বলে উঠল, 'অবহেলা করা না করার সমস্ত দায়িত্বই ও'র নিজের। উনি নিজের দায়িত্ব আমার কাঁধে কিছুতেই চাপিয়ে দিতে পারেন না। নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করে করে দিনকে দিন বাবা যে কী হয়ে যাচ্ছেন ভাবাই যায় না। আগে আমাদের পরিবারে অর্থ ছিল না কিন্তু শান্তি ছিল। এখন আমার রোজগার, বাবার পেনশন নিয়ে কম টাকা হয় না কিন্তু কারুও মনে শান্তি নেই। মা লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে, বিভা মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়ায়, বাবা সব-সময় আক্রোশে ফুঁসছেন। কোন মানে হয় এভাবে জীবন কাটাবার?' অনিমেষ শব্দ করে দেশলাই জেলে সিগারেট ধরাল।

অনিমেষদের বাড়ীটা দূরে থেকে দেখা যাচ্ছে। বিভা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। ওর দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গী দেখে বোঝা যাচ্ছিল, ও আমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছে।

(ক্রমশঃ)

চিত্রলেখা

আশা দেবী

বীত-বর্ষণ এ সময়টা ভারি ভালো লাগে সুমন্তর। গরম গরম কেমন একটা ভাব, কিন্তু খুব গরমও তখন পড়েনি। স্টীমারে চলেছিল সে বাড়ীতে কোন এক সংক্ষিপ্ত ছুটির অবকাশে। নতুন চাকরির পর এই তার প্রথম বাড়ী ফেরা।

চারিদিকে কালো জলে বাতাসে ছোট ছোট ঢেউ উঠছে। ঝির-ঝির করে বাতাস বইছে। মাথার ওপর দিয়ে পাখী উড়ে যাচ্ছে। জলে তার ছায়া পড়ছে। বিশ্বাস-ঘাতক ঘুমটা এরই ভেতর কখন যে চোখের পাতা জড়িয়ে এলো ভালো করে টেরও পেল না সুমন্ত।

উমাকে সে চিঠি লিখে দিয়েছে। বাড়ী সে পৌঁছবে কাল ভোরে। নিশ্চয়ই উমা তার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে। তারপর স্টীমার থেকে নেমে বাড়ী গিয়ে ভালো করে চা-টা খেয়ে ধীরে ধীরে সে উমাদের বাড়ীতে যাবে। সেই আম-জাম-সুপুরির বাগান পেরিয়ে ছোট পুকুরটাকে বাঁ-হাতে রেখে। টুকরো টুকরো স্বপ্ন ভাসছে।

উমা তখন সদ্য স্নান করে ভিজে চুল পিঠের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে ঠিক ওকে যেন দেখেইনি—দেখেইনি এমনি ভাব করে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যাবে। যেন সে কত ব্যস্ত। এরই মধ্যে তার চকিত-চাউনি সুমন্তর ওপর যে সে আলতোভাবে কয়েক-বার বুলিয়ে নেবে না সে-কথা বলা যায় না। উমার স্বভাব সে জানে।

তারপর উমার মা কিরণমাসীমা হাঁক ছাড়বেন : উমা, সুমন্ত এসেছে ওকে একটু চা আর কালকের বানানো নারকেল নাড়ু দে।—

উমা যেন অবাক হবে : সুমন্তদা এসেছে...? কখন এলে?—আমি তো এতক্ষণ লক্ষ্যই করিনি একটুও।—

এটুকু মিথ্যাকে বরাবরের মত এবারও সমন্ত প্রশ্রয় দেবে। দিতে তার ভালো লাগে। উমার মুখে এই ধার করা বিস্ময়টা তার ভারি ভালো লাগে। কেমন যেন ছায়া ছায়া পড়ে ওর আলোভরা মুখে। সেখানে জানা-না-জানার ছায়া ফেলা ফেলা বিস্ময়টা ওর খুব আকর্ষণীয় বোধ হয়।

সারেং জল মাপছে—'মাটি পায়ে না—মাটি পায়ে না' একটানা স্বর। সুমন্ত পাশ ফিরে শুলো একটু উস-খুস করে।

উমা বলবে : সুমন্তদা আজ দুপুরে একবার আসবে, আমাকে একটা অংক একটু বুঝিয়ে দেবে?—

—আসবো। নিশ্চয়ই আসবো। না গেলে হবে কেন। কত কথাই তো জমে আছে। এতদিন পর দেখা, তাও মাত্র তিনদিনের জন্যে। একটা দুপুরও তো বাদ দেওয়া যাবে না। নতুন চাকরি পাওয়ার পর নতুন স্বপ্ন দেখা দুজনের।

সুমন্ত একটু মাথা চুলকোলো।

'লখাই কোলে লইয়া বেউলা কান্দে
পাপ-কর্মের ভাগে তোরে খাইল কাল নাগে
প্রাণ গেল সমুদ্রের বিবাদে
যদি বেউলা হস সতি সাহসে জিয়াস পতি
জেন জস ঘোষবে সংসারে'

সারা শ্রাবণ মাস ধরে মনসামঙ্গল পড়ে উমা, আর কিরণমাসীমা শোনে। উমার গলার আওয়াজটা ভারি মিষ্টি। আর একটা বিশেষ ধরনের সুর করে পড়ে সে। ভারি ভালো লাগে শুনতে সুমন্তর। শুনতে শুনতে যেন নেশা লাগে। যখন ওদের উঠোনের সামনে যাবে, তখন ওর কানে বাজবে লখাই কোলে লইয়া'

ও ডাকবে উমা—উমা।—এসো তোমার পড়ার ঘরে।—মার দিকে একবার তাকাবে উমা। মার ভাত-ঘুম এসেছে চোখে বুজে, নইলে বলাত লখাইকে না বাঁচিয়ে যেতে পারবি না। কিন্তু মার মাথাটা বালিশের পাশে বেঁকে গেছে, নাকের ভেতর থেকে আওয়াজ উঠছে—ফু-ফুর ফু-র-র—ফু-র-র।

মা ঘুমিয়ে পড়েছেন অঘোরে।

উমা উঠে আসবে ধীর পায়ে পায়ে। যেন মা না জানেন। হাতের বইটা টেবিলে রেখে। পড়ার ঘরে আসবে ওরা দুজনে।

সুমন্ত জানে এবার সে একটু বিশেষ ভাবেই সাজবে। পায়ে দেবে আলতা—নীল শাড়ীর সঙ্গে সাদা ব্লাউজ পড়লে ওকে ভারি ভালো লাগবে। চোখে ঘন কাজল যেন টল-টলে নদীর জলে মেঘের ছায়ার রেখা।

কতদিন পরে তুমি এলে সুমন্তদা।—উমার [illegible] অভিযোগ [illegible]—আমি [illegible]

[illegible] মুখে হাসি—দুষ্টুমির হাসি। ওর হাতখানা চেপে ধরে বলবে, স্কুল-ফাইনালটা দেবে না।—

—না।—দিতে ইচ্ছে নেই। পড়তে ভালো লাগে না একটুও। তোমাকে ছেড়ে আর থাকতে পারছি না।

—ওঃ, এই কথা।—সুমন্ত কপট গাম্ভীর্য আনবে মুখে। —পড়তে ভালো লাগে না। তবেই তো সেরেছে—

'বাবু নামবেন কনে'—। এক ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলো।

ঘুমের চটকাটা ভেঙ্গে গেল। হাতের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললে, দেরী আছে এখনও অনেক দেরী।। সবে তো রাত একটা। ভোরে নামবো আমি।—

ঘুমের চটকাটা ভেঙ্গে গেল। স্বপ্নটা যেন কেমন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল এক মুহূর্তে।

হঠাৎ ওর মনে হলো উমাকে সে বহুদিন যেন দেখে না।—আর দেখবে কী, বাড়ীই তো আসছে অনেকদিন পর। কিন্তু উমাও তো ওকে চিঠিপত্র দেয় না। অনেক চিঠি দিয়েছে ও, কিন্তু কোন চিঠিরই সে উত্তর দেয়নি।

কেন?—নিজের মনকেই সে প্রশ্ন করলো। আবার নিজের মনেই তার উত্তর দিল ঃ হয়তো রাগ করেছে। বড্ড অভি-মানী মেয়ে ও। অমন ধারা রাগ করে চিঠি-দেওয়া আরো অনেকবার বন্ধ করেছে সে। কিন্তু এতদিন?—এত দীর্ঘদিন চিঠি দেওয়া বন্ধ করে ও কখনও থাকেনি।—

উমার কথা মনে হতেই মনটা ভারি চঞ্চল হয়ে উঠলো সুমন্তর। উদভ্রান্তের মতো চারদিকে তাকালো সুমন্ত। পেছনে অন্ধকার একটানা জলের কলধ্বনি। স্টীমার-টার আলোকোজ্জ্বল দেহটা জল কেটে কেটে এগিয়ে চলেছে। যে ঠাণ্ডা হাওয়াটা একটু আগেই সারা শরীর জুড়িয়ে দিচ্ছিল তার—এই মুহূর্তে তার মনে হচ্ছে তাতে পৌষের কনকনে ছোঁয়াচ লেগেছে। আলোর ঝিলিক-গুলো দূরে দূরে বুদ্বুদ তুলে মিলিয়ে যাচ্ছে। দূরে দূরে গ্রাম নিথর পাথরের মত যেন জমে আছে ঘুমে। হঠাৎ তার মনে হলো উমা? কি করছে উমা এখন। তার কথাই কি ভাবছে?—

সেইটেই তো স্বাভাবিক। মনে পড়ছে একদিন ওদের বাড়ী গিয়ে ভারি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল সুমন্ত। ওর বাবা নেই—একা মা। ওদের সংগতিও খুব নয়, সুতরাং মা'র ইচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি দেখে-শুনে একটা বিয়ে দিয়ে দেন। সুমন্তরা প্রতিবেশী হলেও বেশ অবস্থাপন্ন। সুতরাং তার সঙ্গে বিয়ের আশা উমার মা মোটেই করেন না। তিনি তাঁর একমাত্র মেয়েকে মোটামুটি মধ্যবিত্তের ঘরে বিয়ে দিয়ে সে মোটা ভাত-কাপড় খেয়ে পরে সুখী থাকে এটা জানলেই সুখী হবেন।

সুতরাং অনেক কষ্টে একটি পাত্র জুটিয়ে এনেছেন, তাঁরা উমাকে দেখতে এসেছেন কিন্তু উমা কিছুতেই রাজি হচ্ছে না তাঁদের সামনে বেরোতে।—সে বিয়ে করবে না।

এই পরিস্থিতির মধ্যে সুমন্ত গিয়ে হাজির হতেই উমা কেঁদে ফেললো ঃ আমাকে বাঁচাও। —আমাকে বাঁচাও সুমন্তদা।

মা বাইরে আগতদের সঙ্গে কথা বল-ছিলেন; ছুটে এলেন ঃ দেখ তো বাবা। মেয়েটার কি জেদ। ভদ্রলোকেরা দেখতে এসেছেন—বলে, যাব না, জোর করলে গলায় দড়ি দেব।—মেয়েমানুষের কি এত জেদ ভালো। আমাদের বিয়ে হয়েছে সেই চৌদ্দ বছর বয়েসে। তখন আমাদের মুখে তো আর এত বুলি ফুটত না। বাবা মা যা ঘরে দিয়েছেন সেই ঘরই খুশী হয়ে করছি। আমাদের এত মতামতও ছিল না! থাকলেও তা প্রকাশ করে বলতে সংকোচে মরে গেছি। আজকাল দিনে দিনে কি হলো সুমন্ত; এইটুকু দুধের মেয়ে যার মুখ টিপলে এখনও দুধের গন্ধ পাওয়া যায় সে আবার মতামত প্রকাশ করে বলে ঃ বিয়ে করবো না। আরে বিয়ে না করে কি করবি। আমি মরে গেলে তোকে দেখবে কে? তোর কি কেউ আছে? তুমিই বল বাবা।

ঃতাতো বটেই—সুমন্ত বললে।

ঃ তাহলে তুমি ওকে একটু বুঝিয়ে শুঝিয়ে ঠিক কর। ভদ্রলোকরা বসে আছেন। ওরা আমাদের পাশের গ্রামের। একটা মেয়ে, বেশী দূরে যাবে তাও তো হয় না। মরবার সময়ও একবার দেখতে পাব না। তা ছাড়া মেয়েটি সুন্দরী। দেখলেই ওদের পছন্দ হবে। আমি চার হাত এক করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবো।

বলেই মা অনেকক্ষণ সুমন্তর দিকে চেয়ে রইলেন। বোধহয় তাঁর বাড়ীতে আসা-যাওয়া; মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা—সর্বোপরি মা'র দৃষ্টি তো অন্তর্যামীর দৃষ্টি, সুতরাং তাঁর চোখে কিছুই এড়াইনি। হয়তো তাঁর মনের কোণে ক্ষীণ আশা ছিল সুমন্ত আশাপ্রদ কিছু বলবে। কিন্তু সে সেদিক দিয়েই গেল না। বরং বললো ঃ কেন তৈরী হয়ে নাও না। ঘর-বর ভালো—মারও যখন পছন্দ, তখন—

উমা দরজা ধরে একটা কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইলো। অনেকক্ষণ কোন কথাই সে বলতে পারলো না। তারপর বললে ঃ সুমন্তদা, শোন। তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে যেন ওর মনটা এ ধরনের কোন কথা শোনবার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না।—একটু বিরক্তই যেন হলো। বাইরে কতকগুলো লোক, আরদালীর মত তাদের চেহারা, আর ভেতরে মাসীমার আর্তি। যেন তার মনকে বিতৃষ্ণ করে তুলল হঠাৎ-যেন কেন।

বললে ঃ কী বলবে বল।—

কোন ভূমিকা না করেই উমা বললো ঃ আমি এখানে বিয়ে করবো না। কিছুতেই না।

সে তোমার ইচ্ছে—। তুমি তো আর ছোট নয়। যা ভালো বোঝ কর। এখুনি তো মাসীমা বললেন, তোমার বয়েসে তিনি সংসারের পাকা গিন্নী। সুতরাং তোমার যা ভালো মনে হয়—তাই কর। আমি কি বলবো।

উমা আর কোন কথা বলেনি। যেন নিভিয়ে দেওয়া প্রদীপের মত নিস্প্রভ হয়ে গেছে।

আবার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল—।

লোক ওঠা-নামা করছে। আবার চোখে ঘুম জড়িয়ে এলো সুমন্তর ঃ না এবার গিয়ে কথাই দিতে হবে উমাকে। রেগে হয়তো কি-যে করে বসবে তার ঠিক নেই। ভারি অভিমানী উমা।

আবার যেন নেশার মত সেই সুর,—সেই গলার আওয়াজ ভেসে এলো ঘুমের সঙ্গে সঙ্গে নেশার মত ঃ

'চান্দো বলে পুত্র চাহিমু গিয়া পাছে,
বিচারিয়া চাহি নাগ কোনখানে আছে।
বিস্তর চাহিয়া তবে নাগ না পাইয়া
কান্দিতে লাগিল চান্দো বিষাদ ভাবিয়া'—

ভারি মিষ্টি গলার আওয়াজ উমার। জলের শব্দ—স্টীমারের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে যেন মনে হলো সে যেন কোন এক পাতালের পথে তলিয়ে যাচ্ছে। ওপরে যেন ঝড়ের দাপাদাপি—আর তলায় মরণ-ঘুমে নাগ পরিবেষ্টিত রাজকন্যা—তার মুখখানা যেন ঠিক উমারই মত ঢল-ঢলে। চট করে ঘুমের চটকা ভেঙ্গে গেল সুমন্তর।

ভোরের আলো ফুটে উঠতে আর দেরী নেই। পূবে আকাশ ফ্যাকাশে হয়ে আসছে। দূরে পাখীদের কুলায় কূজন শোনা যাচ্ছে। ছোট ছোট ঢেউ-ভাঙ্গা জলের ধারার ওপর যেন লক্ষ লক্ষ নাগ খেলছে হেলে-দুলে।

চমকে উঠলো সুমন্ত। কারা যেন নামবার জন্যে এগিয়ে আসছে, সঙ্গে ঘোমটা পরা একটি নব-বিবাহিতা বধূ। মুখ তার আর দেখা যাচ্ছে না ঘোমটার আড়ালে।

—একটু আস্তে আস্তে এস, এবার

নামতে হবে।—লোকটার চেহারা লেফ্টেন্যান্টের মত। ব্যবসায়ী বলে মনে হয়। কিন্তু ভাগ্য খুব ভালো—বধূটি সুন্দরী লোকটার। যেন বাঁদরের গলায় মুক্তোমালা।

—নামবো এবার? মেয়েটি বললে ঘোমটা একটু সরিয়ে—

উমা—সুমন্ত চিৎকার করে উঠলো।

এক মুহূর্তে মুখের ওপর থেকে ঘোমটা টেনে ফেলে দিলো উমা। তারপর একটা পটে আঁকা ছবির মত বেঁকে দাঁড়ালো। অনেক অনেক সুন্দর হয়েছে উমা।
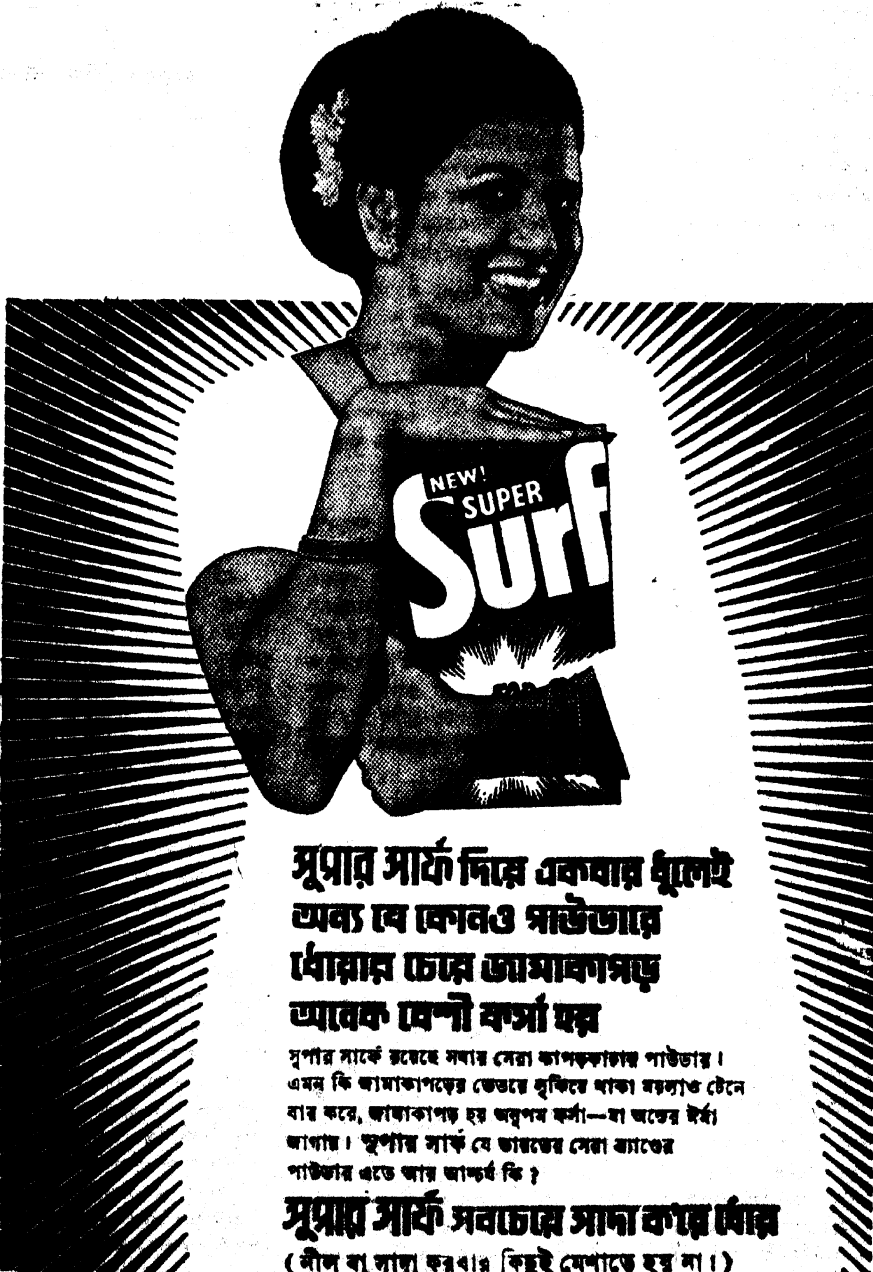
: উমা আমি তোমাকে কথা দিতে এসেছি। চাকরি আমার পাকা হয়ে গেছে। এখন আর কোন বাধা নেই। এবার আমি তোমাকে নিয়ে যাব চাকরির জায়গায়।

হঠাৎ একটা ঝপ করে শব্দ হল। উমা আর নেই—সে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে।

* * *

আবার চার বছর পর খাল বেয়ে নৌকো চলছে। ঘোলা জলের ওপর খেলা করছে দুপুরের রোদ। মাথার ওপর শঙ্খচিলের কান্না। চার বছর আগেকার সেই রাতটা এখন স্বপ্নের চেয়েও মিথ্যে হয়ে গেছে। তবু মনে হয় আবার যদি কোনো অন্ধকার রাতে পথ ভুলে এখানে ফিরে আসি, তাহলে থেমে-যাওয়া সেই মনসা-মঙ্গলের সুর আবার কি ঝঙ্কৃত হয়ে উঠবে না? আর রাত্রির হাওয়ায় হাওয়ায়—দরজার আলো-কোজ্জ্বল প্রেক্ষাপটে দেখা দেবে না সেই চিত্ররেখা উমা নিজের ছায়ার অবগুণ্ঠনে আবৃত্ত যার মুখ।

চিঠিপত্র

উপেক্ষিত ক্যানিং অঞ্চল

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় ক্যানিং অঞ্চল নানা কারণেই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিভিন্ন সমস্যায় এই এলাকার জনজীবন দীর্ঘকাল ধরে বিপর্যস্ত। দিনের পর দিন এই সমস্যা বেড়েই চলেছে। অথচ তা মোকাবিলা করার দিকে কারো কোনো মাথা ব্যথা আছে বলে মনে হয় না।

বলাই বাহুল্য, যোগাযোগের অব্যবস্থাই এই অঞ্চলের মুখ্য সমস্যা। গোটা এলাকায় পাকা রাস্তা বলতে আছে মাত্র দুটি। ক্যানিং থেকে বারুইপুর হয়ে গড়িয়া পর্যন্ত সড়কটিই প্রধান। অন্যটি ক্যানিং থেকে হেড়োভাঙ্গা অবধি। বাকি সব রাস্তাই কাঁচা, বর্ষার সময় শেয়াল-কুকুরেরও চলা অসাধ্য। মানুষ তো দূরে অস্তু। (এমনকি, ক্যানিংয়ের প্রাণকেন্দ্র মাতলা বাজার অঞ্চলের রাস্তাগুলিকে রাস্তা না বলে এঁদো গলি বলাই ভালো। তাছাড়া, এ অঞ্চলটা আবর্জনার সব সময়েই নরককুণ্ড হয়ে থাকে। রাস্তাগুলির প্রশান্ত সাধনে যেমন কারো ভ্রূক্ষেপ নেই ড্রেজিং আবর্জনা সরানোর দিকেও নেই কারো দায়-দায়িত্ব। এ এক অদ্ভুত ব্যবস্থা।

একথা সকলেই জানেন, ক্যানিং হলো সুন্দরবন অঞ্চলের দরজা বিশেষ। ক্যানিং থেকে লঞ্চ কিংবা নৌকোয় সুন্দরবনের বাসন্তী, গোসাবা, সন্দেশখালি, ঝড়খালি, দেউলবাড়ি অঞ্চলে যাতায়াত করতে হয়। কিন্তু লঞ্চঘাট বা নৌকোঘাটা থেকে ক্যানিং রেল স্টেশন কিংবা বাস স্ট্যাণ্ডে আসবার কোনো ভালো রাস্তা নেই। লক্ষ লক্ষ যাত্রীর আসা-যাওয়ার জন্য এখানে কি কোনো রাস্তাই তৈরি করা যায় না?

হ্যাঁ, পানীয় জলের সমস্যাও তীব্র। কোনো কোনো জায়গায় জনসাধারণকে দু-তিন মাইল পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে খাবার জল সংগ্রহ করতে হয়। অবশ্য সম্প্রতি সরকারী উদ্যোগে কিছু কিছু নলকূপ বসানো হয়েছে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই কম। আমার মনে হয়, কম করে হলেও প্রতিটি গ্রামসভায় বসানো উচিত তিন-তিনটি নলকূপ।

সকলেই জানেন, এখানকার মানুষের প্রধান জীবিকা কৃষি। কিন্তু উন্নত প্রথায় কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় পাম্প সেট, স্প্রেয়ার মেশিন পাওয়া যায় না এই অঞ্চলে। সরকারী তরফে যে কটি পাওয়া গেছে তা প্রয়োজনের পাঁচ শতাংশও নয়। এ ব্যাপারে সরকারের টনক কি নড়বে? এর সঙ্গে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের দিকেও দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

গোটা অঞ্চলের জন্য রয়েছে মাত্র একটি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র। এর উপরেই নির্ভরশীল ক্যানিং সুন্দরবন অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ মানুষ। অবশ্য, সম্প্রতি বাঁশড়া এলাকায় খোলা হয়েছে একটি সহায়ক চিকিৎসা কেন্দ্র। কিন্তু এখানে এমার্জেন্সি বিভাগ নেই। তাছাড়া ক্যানিং প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রের শয্যাসংখ্যাও খুব সীমিত। ফলে বহু লোককে সুদূর টালিগঞ্জে অবস্থিত বাঙ্গুর হাসপাতালের জন্য ছুটতে হয় কয়েক ঘণ্টা ধরে। সুতরাং চিকিৎসার ব্যাপারেও নজর দেওয়া দরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের।

পরিশেষে বলব, সরকার ক্যানিং অঞ্চলের উন্নয়নের দিকে একটু নজর দিন। কেননা নজর দিলে তার প্রতিদান দেবার ক্ষমতা এ অঞ্চলের সত্যিই সীমাহীন।

রামচরণ মণ্ডল
ক্যানিং, ২৪ পরগণা।

॥ ২ ॥

ক্যানিং ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত তাম্বুলদহ অঞ্চলের মৌখালি গ্রামসভা গোটা অঞ্চলই শুধু নয় ব্লক এলাকা থেকেও বিচ্ছিন্ন। আমার প্রস্তাব মৌখালি গ্রামসভাকে ক্যানিং ২ নম্বর ব্লকের সঙ্গে যুক্ত করা হোক। অন্যদিকে বাসন্তী ব্লকের ইটখোলা ও গোপালপুর অঞ্চল ব্লক এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন। এ দুটো অঞ্চলকে ক্যানিং ১ নম্বর ব্লকের সঙ্গে যুক্ত করলে প্রশাসনিক ব্যাপারে সুবিধে হয় না কি?

সুনির্মল সেন
ক্যানিং, ২৪ পরগণা।

॥ ৩ ॥

শিয়ালদহ থেকে ক্যানিং, ক্যানিং থেকে শিয়ালদহ—এ এক দুঃস্বপ্নের ট্রেনযাত্রা। সকালের দিকে এক ঘণ্টা আর দুপুরের দিকে দু ঘণ্টা বাদে বাদে ট্রেন, ফলে বাঁইচি ফলের মতো ঝুলে ঝুলে কিংবা আনাজের মতো ঠাসাঠাসি গাদাগাদি করে মানুষজনকে আসতে যেতে হয় নিয়মিত এই পথে। তার উপর মাত্র একটি লাইন। সুতরাং কি অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে যে ডেলি প্যাসেঞ্জারদের জীবন কাটে ভাবলে চোখে জল আসবে। অথচ রেল কর্তৃপক্ষ সব জেনে-শুনেও নীরব হয়ে আছেন, যাত্রী সমস্যার কোন সুরাহাই করছেন না। লাখ লাখ নিয়মিত যাত্রীকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এভাবে ট্রেনে যাতায়াত করতে বাধ্য করে রেল কর্তৃপক্ষ কোন মহৎ কাজ করছেন? ক্যানিং টু শিয়ালদহে কি ডবল লাইন চালু করা যায় না? পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষের ঘুম ভাঙবে কবে?

মিনতি সোম
বাসন্তী, ২৪ পরগণা।

ওড়িশায় উপনির্বাচন

ওড়িশার সাম্প্রতিক নির্বাচনে শ্রীমতী নন্দিনী শতপথীর জয়লাভ নানা কারণেই সাম্প্রতিককালের একটি উল্লেখ্য ঘটনা। নির্বাচনের আগে বিজু পট্টনায়ক ও বীরেন মিত্রকে কেন্দ্র করে যেভাবে জল ঘোলা করা হয়েছিল তাতে অনেকের মনেই নির্বাচনের ফলাফল সম্বন্ধে সংশয় দেখা দিয়েছিল। এমন কি কংগ্রেস হাই-কমাণ্ডের অনেক সদস্যও শ্রীমতী শতপথীর জয় সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ছিলেন বলে মনে হয় না। কিন্তু নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর দেখা গেল, শ্রীমতী শতপথী শুধু জয়লাভই করেন নি, বিজিত প্রার্থীর সঙ্গে এমন ব্যবধান গড়ে তুলেছেন, যা এই কেন্দ্রে তাঁর আগে কেউ পারেননি। শ্রীমতী শতপথীকে সি পি আই এবং সি এম পি সমর্থন জানিয়েছিল।

যাই হোক, এই নির্বাচন সম্বন্ধেও বিজিত পক্ষের লোকেরা নানা অভিযোগ তুলেছেন। মনে হয়, যাঁরা এইসব অভিযোগ তুলছেন তাঁদের সঙ্গে দেশের সাধারণ মানুষের নাড়ীর যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেছে। তাছাড়া আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, যাঁরা নির্বাচন আরম্ভ হবার আগের মুহূর্তেও শ্রীমতী শতপথীর পরাজয় সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ছিলেন, তাঁরা রাতারাতি এই নির্বাচনে নানা ধরনের জালিয়াতি দেখেছেন। ব্যাপারটা আমাদের মত সাধারণের কাছে হাস্যকর বলে মনে হয়। জালিয়াতি দিয়ে এত ব্যবধান যে গড়ে তোলা যায় না, তা সকলেই স্বীকার করবেন।

শ্রীমতী শতপথী মাত্র কয়েক মাস মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে কেন্দুপাতা ও ভূমি-সংস্কারে যে প্রগতিশীল নীতি গ্রহণ করেছেন, তাই তাঁকে সাধারণের হৃদয় জয়ে সাহায্য করেছে। আজকের পরিবর্তিত পরিবেশে মনে রাখা দরকার, জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ-বিহীন রাজনীতির দিন শেষ। জনগণের দৈনন্দিন সংগ্রামের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে না দিতে পারলে, কারও পক্ষে আর রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। শ্রীমতী নন্দিনী শতপথীর জয় এ পরেরই ইঙ্গিত।

সুচরিতা সান্যাল
যাদবপুর, কলকাতা।

কিম্বদন্তীর বীরভূম

প্রতুল দত্ত
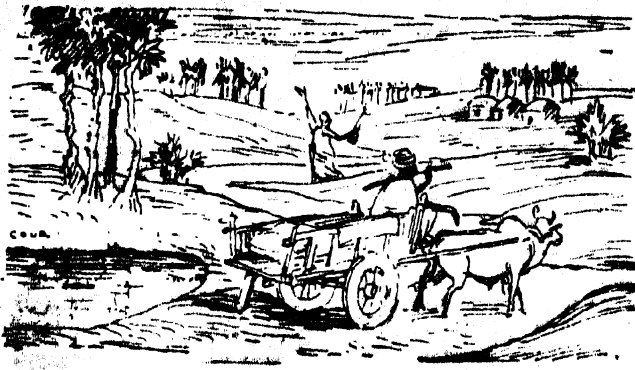
কাঁকর মেশানো পাথুরে মাটির রঙ লাল। পাহাড়ী ঝর্ণার জল শীর্ণধারায় গড়িয়ে চলে। মাঠের মাঝে পড়ে আছে বেওয়ারিশ নিকষ কালো পাথরের চাঁই। অজয়-ময়ূরাক্ষীর দীর্ঘ বালুচর চোত-বোশেখে গা-এলিয়ে পড়ে আছে, যেন রোদ পোয়াতে জল থেকে ডাঙায় উঠে-আসা বিশালকায় কুমীর। ভরদুপুরে রেলের কামরায় জানলা থেকে তন্দ্রালস যাত্রীর চোখে ভাসে সরষে ফুলে ভরা খেত, কোথাও প্রায় শুকিয়ে-যাওয়া দীঘি, তারই পাড় ধরে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে অজস্র তালগাছ। গভীরে অন্য সব গাছেরও দেখা মেলে, কিন্তু চেনা দুষ্কর নয়। আঁকাবাঁকা বনের পথে যেতে চিনতে পারি শাল, সেগুন কি মহুয়া, চিনতে পারি বকুল, অর্জুন কি পিয়াল কিন্তু জেওলা, চাকলতা, ধোয়া, মুরগা, গাব, করমচা, বৈঁচি, হরিতকি, আমলকি, বহেড়া, অনন্তমূলী কি শতমূলী বনস্পতির মেলায় এদের অনেক-কেই সঠিক চেনা ভার। পথের দু ধারে এসব ছাড়াও প্রায়ই চোখে পড়বে ফণি-মনসা আর বাবলা কি কুঁচের ঝাড়। কোথাও কোন বনে পেল্লায় বড় বড় থাম আলু দেখে থমকে দাঁড়াতে হয়। একদা জঙ্গল ছিল গহন, মাটিতে রোদ পড়ত না, দিন-দুপুরের ছায়া অন্ধকারে হিংস্র জন্তু-জানোয়ার ঘুরে বেড়াত। সে সব আজ গল্পকথা বলে মনে হলেও এখনও দৌরাত্ম্য আছে খরগোশ, বেজী আর বনশুয়োরের, বাঘ ও সাপের উৎপাতে আজও সদা-ভটস্থ গ্রামজীবন। কিন্তু চোখজুড়ানো, মন-ভোলানো জানা-অজানা পাখী আছে ঝাঁকে ঝাঁকে। 'বউ কথা কও' কি 'চোখ গেল' ডাক শুনে মন না জানি কেমন করে। আছে শালিখ, কোকিল, ময়না, টিয়া, ট্যাশকোনা, আছে তিতির, পেয়ারা, ডাহুক, ঘুঘুও। বন ছেড়ে গাঁ-মুখো লম্বা মাটির রাস্তা ধুলোয় ভরা, গরুর গাড়ীর চাকার লম্বা দাগ। মাথার ওপর মাঝ-আকাশে গনগনে আগুনের গোলার মতো সূর্যের প্রচণ্ড দাপট—তারই গরম আঁচে থমথমে চারি ধারে অবসাদবিধুর এক শূন্য নির্জনতা। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ায় ওঠে ধুলো আর শুকনো পাতার ঘূর্ণিঝড়, ভেসে আসে মহুয়া আর আমের বোলের মাতাল-করা গন্ধ। আপাত রুক্ষ উদাসীন এই পরিবেশে দূরে এক বিন্দুর মতো গেরুয়া বেশে, মাথায় জটা বৈরাগী বাউল চলেছে, তার হাতে একতারা, গলায় গান—

'কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে!
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে।'

●

এই বীরভূম! রাঢ়দেশ বা সুহ্মের এই অঞ্চলকেই তর্কশাস্ত্রে বলেছে কামকোটি। পাথুরে মাটিকে সাঁওতালী ভাষায় বলে রাঢ়ো। পাথর সদৃশ কাঁকর মেশানো লাল মাটির দেশ বীরভূমের বারো আনা ভূখণ্ডই অনেক কালের পুরোনো পার্লিক শিলার আস্তরণে ঢাকা। নগরলালিত কিশোর রবীন্দ্রনাথ বীরভূমের পল্লীশ্রীর মনোহর কল্পনায় একদা স্বপ্নে দেখেছিলেন—ধানের খেত থেকে চাল সংগ্রহ করে রাখাল বালকের সঙ্গে মিতালী পাতিয়ে ভাত রেঁধে খাচ্ছেন, কিন্তু ভুবনডাঙার ধু-ধু মাঠ দেখে আশাভঙ্গে উত্তরকালে কবি খেদ করেছিলেন, 'হায়রে মরু প্রান্তরের মধ্যে কোথায় ধানের খেত!'

সবুজ শ্যামলিমা না থাক, বীরভূমের আছে অনন্য এক নৈসর্গিক রূপ। পার্বত্য প্রধান কঠিন এই ভূখণ্ডকে উদাসীন এক সৌন্দর্যে ভূষিত করেছে তার ঢেউখেলানো দিগন্ত প্রসারিত মাঠের পর মাঠ জুড়ে অসীম শূন্যতার বিস্তার। শালবন, একলা মেজাজের তালগাছ, সবুজ মাঠের সঙ্গে রাঙামাটির মিতালী, আম জাম তাল তেঁতুলে ঢাকা সাঁওতাল পাড়া, পুর্তির লাল কাঁকরের নিস্তব্ধ তোলপাড়, মাঝে মাঝে মরচে-ধরা কালো মাটি মহিষাসুরের মুন্ড যেন, চাষের খেত, মাঠে গরু চরছে, রাঙা-মাটির রাস্তা বেয়ে হাট করতে যায় গ্রামের লোক—কবির আঁকা এই শব্দ ছবিতে দেখি বীরভূমের অনন্য রূপের অপরূপ প্রকাশ।

নৈসর্গিক রূপবৈশিষ্ট্যই কেবল নয়, বীরভূমের অন্যতর আকর্ষণ হল তার গ্রাম-গ্রামান্তরের মেলা আর মন্দির। শৈব-শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মভাবনার ত্রিবেণী এই রাঢ়ভূমিতে কত শত সাধক-পীর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। সাধুসন্ত, বাউল-বৈষ্ণব তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর সাধনক্ষেত্র এই বীরভূম। সহজিয়া সাধনার পূজারী চণ্ডীদাসের নানুর, গীত-গোবিন্দের অমর কবি জয়দেবের কেন্দু-বিল্ব, সাধক বামাক্ষ্যাপার তারাপীঠ, অবধূতশ্রেষ্ঠ নিত্যানন্দের গ্রাম একচক্রপুর, এমন সব কত না লোকতীর্থ ছড়িয়ে আছে এ জেলায়। লোকতীর্থ কেন, মহাতীর্থই কি কম বীরভূমে! দক্ষ আয়োজিত মহাযজ্ঞে মেয়ে-জামাই নিমন্ত্রিত হন নি। সতী তা সত্ত্বেও যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হলে শিব মত দেন নি। সতী রেগে পরমাপ্রকৃতি মহামায়া রূপে কালী, তারা, রাজরাজেশ্বরী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলামুখী, মাতঙ্গী ও মহালক্ষ্মী—এই দশ মূর্তিতে মহাদেবকে বিভ্রান্ত করলেন। তখন মহাদেব আদেশ দিলে, সতী দক্ষযজ্ঞে গেলেন। কিন্তু সেখানে পিতৃমুখে স্বামী নিন্দা শুনে অপমানিতা সতী দেহত্যাগ করেন। খবর পেয়ে শিব তাঁর অনুচরদের নিয়ে হাজির হলেন। দক্ষযজ্ঞ পণ্ড হল, দক্ষের হল মুন্ডচ্ছেদ। সতীশোকে উন্মত্ত শিব সতীর মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে প্রলয়ঙ্কর তাণ্ডব নৃত্য শুরু করলেন, তাতে বিশ্ব-সংসার ছারখার হওয়ার উপক্রম। সৃষ্টির বিনাশ আশঙ্কায় বিষ্ণু তাঁর চক্রের সাহায্যে সতীর দেহ টুকরো টুকরো করতে লাগলেন। একান্ন টুকরোয় সতীর সেই দেহাংশ ভারতবর্ষের নানা ● জায়গায় পড়ে মহাপীঠ নামে পবিত্র তীর্থের মর্যাদা লাভ করেছে। এক বীরভূম জেলার সাত-সাতটা জায়গায় নাকি সতীর দেহের বিভিন্ন অংশ পড়েছিল। অবশ্য, ঠিক-বেঠিক হদিশ পাওয়া শক্ত। তবে বিশ্বাস ও তর্কের মধ্যে সমুদ্রত্ব রেখে মানা যায় বীরভূমের বক্রেশ্বর, নলহাটি, নন্দীপুর ও অট্টহাস এই চার মহাপীঠের দাবী। মেলা, মন্দির ও ধর্মীয় মাহাত্ম্য ছাড়াও বীরভূমের নানা জায়গা ঘিরে অসংখ্য প্রবাদ, জনশ্রুতি, পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক গল্পকথা ও কিম্বদন্তী রয়েছে। কৌতূহলী যাঁরা, তাঁদের কাছে সেই সব জায়গার নেপথ্য-কাহিনীর মূল্য বড় কম নয়। প্রাচীন জনপ্রিয় সেই সব কাহিনী প্রামাণ্য কিনা তা যাচাই করার দায় ঐতিহাসিক গবেষকের, আমার-আপনার মত গল্প শোনার বাতিক-গ্রস্ত মন লোকমুখে কবে থেকে চলে আসা সেই সব কিম্বদন্তীর কাহিনীর রস উপভোগ করতে পারলেই খুশী। তাই সরেজমিনে চাক্ষুষ যাচাই করার বাসনা মূলতুবী রেখে প্রমাণের ঝক্কি-ঝামেলা এড়িয়ে আপাতত বরং পাড়ি জমানো যাক কিম্বদন্তীর বীরভূমেই।

আদিবাসীদের বাসভূমি বীরভূম প্রাচীনকালে ছিল জঙ্গলময় দেশ। গল্প শোনা যায়, বিচিত্র এক বিবাহ সূত্রে সভ্যতা আর সংস্কৃতির প্রবেশ ঘটে এই অঞ্চলে। প্রাচীন বাংলাদেশের রূপসী ও গুণবতী এক রাজকন্যাকে জোর করে চুরি করে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করে অসভ্য এক জঙ্গলী রাজা। রাজকন্যার প্রভাবে আরণ্যক সেই রাজার অমার্জিত মন যায় বদলে। পরবর্তীকালে এই অরণ্যভূমির রাজকুমার রাঢ়ভূমির জঙ্গল সাফ করে বসতি স্থাপন করেন।

আজও বীরভূম জেলার প্রায় সর্বত্রই সাঁওতালগোষ্ঠীর বসবাস। এই জেলার সাঁওতাল পুরুষ রমণীরাই সারা বাংলা জুড়ে খেত-মজুরের কাজ করে। সাঁওতালী ভাষার 'বীর' শব্দের অর্থ জঙ্গল—প্রাচীনকালে বীরভূম জেলা জঙ্গল ভরা ছিল বলেই সাঁওতালেরা এই জঙ্গল রাজ্যের নাম দিয়েছিল বীরভুঁইয়া—হয়তো তাই থেকেই বীরভূম নামের উৎপত্তি।

জনশ্রুতিতে অবশ্য এ প্রসঙ্গে আরো একটি কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী আছে। কাহিনীটির সময়কাল বেশ প্রাচীন। বিষ্ণুপুরের এক রাজা বীরভূমে এলেন শিকার করতে—ঢাল-তরোয়াল, হাতী-ঘোড়া, কাড়া-নাকাড়া, পাত্র-মিত্র রাজকার্য কোন কিছুই সঙ্গে না নিয়ে এলেন একা। গহন অরণ্যে বাঘ-ভাল্লুকের সঙ্গে ভেট-মোলাকাত করার আদৌ কোন ইচ্ছে ছিল না তাঁর। তীর-ধনুক দিয়েও নয়, শিক্ষিত শিকারী এক বাজপাখীর সাহায্যে পাখীশিকারের চেষ্টায় নদীর ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন রাজা। নদীর চরে স্থির পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা এক বক দেখতে পেয়ে কাঁধের পোষা বাজপাখীটিকে সেদিকে লক্ষ্য করে রাজা ছেড়ে দিলেন। শূন্যে ঘুরপাক খেয়ে বাজপাখী বকের সামনে যেতেই বক ঘুরে দাঁড়াল। বক পালাল না উড়ে ভয়ে আর্ত চিৎকার করল না, পাল্টা আক্রমণ করলে বাজপাখীকে। লম্বা ঠোঁটের ঠোকরে কাহিল করে দিলে। দ্বিতীয়বার ছোঁ মারতে গিয়ে বাজপাখী দেখলে বকের দুই ঠোঁটের সাঁড়াশী বন্ধনে তার মাথাটা আটকে আছে। গলা দিয়ে স্বর পর্যন্ত বেরোচ্ছে না। রাজা তো অবাক! ছুটে গিয়ে বকের কবল থেকে উদ্ধার করে আনলেন রাজা তার সাধের বাজপাখীটিকে। বক হেন পাখীর এই কেরামতি দেখে রাজা ভাবলেন যে দেশের পাখীর এমন বিক্রম সে দেশের মানুষ না জানি কি দুর্জয় শক্তিমান। রাজা তাই এদেশের নাম রাখলেন বীরভূমি বা বীরভূম।

ইতিহাসের সূত্র ধরে বীরভূম নামের উৎস খুঁজতে চাইলে রাজা বীরচন্দ্রের কথা পাড়তেই হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই অরণ্যভূমিতে তিনি তাঁর রাজ্যের পত্তন করেন। বাংলার মুসলমান সুবেদারদের আক্রমণ থেকে স্বদেশ রক্ষা করার সংকল্পে স্বাধীনতার যুদ্ধে তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন। সিউড়ি থেকে ছ-সাত মাইল দূরে বীরসিংহপুর গ্রামের পূব দিকে জঙ্গলঘেরা যে ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ আজও দেখা যায়, লোকে বলে রাজা বীরচন্দ্র বা বীর সিংহের প্রাসাদ ছিল সেখানে। মুসলমানদের হাতে পিতার মৃত্যুর পর বীরসিংহ, চৈতন্য সিংহ ও ফতে সিংহ তিন রাজপুত্র বীরভূমে এসে এই এলাকার আদিম অধিবাসীদের পরাজিত করে তিন ভাই তিন স্বতন্ত্র রাজ্যের পত্তন করেন। বীরসিংহ তাঁর নিজের নামে রাজধানীর নামকরণ করেন বীরসিংহপুর। বীরসিংহকে কেউ কেউ জরাসন্ধ কিংবা তাঁর পুরোহিতের বংশধর বলে মনে করেন। বীরত্ব ছাড়াও ধর্মপরায়ণতার খ্যাতি ছিল বীরসিংহের। তিনি তাঁর রাজধানীতে যে কালী মূর্তির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা আজও সেখানে বিদ্যমান।

লোক মুখে শোনা যায়, রাজা বীরসিংহ রোজ ঘোড়া ছুটিয়ে বীরসিংহপুরে থেকে কাটোয়া গিয়ে গঙ্গা স্নান ও আহ্নিক সেরে বাড়ী ফিরে আসতেন। তিনি এতো শক্তিমান ছিলেন যে স্নানের সময় নাকি গায়ে তেল মাখার জন্য দু' হাতে সরষে পিষে তেল বার করতেন। স্নান করে ফেরার পথে নোয়াডিহি নামে এক জায়গায় বিশ্রাম করতেন—সেখানকার উঁচু একটা জায়গাকে স্থানীয় লোকেরা সেই কারণে বলে বিশ্রাম পীঠ।

রাজা বীরসিংহের রাজ্য ১২২৬ অব্দে বাংলার সুবেদার গিয়াসউদ্দিনের দ্বারা আক্রান্ত হয়। কিন্তু বীরসিংহ, চৈতন্যসিংহ ও ফতেসিংহ তিন ভাই মিলে যুদ্ধে তাকে হটিয়ে দেন। লোকেদের ধারণা, পরে গিয়াসউদ্দিন কূট চালে তিন ভাইয়ের মধ্যে বিদ্বেষের সৃষ্টি করে, ফতে সিংহের মন্ত্রণায় সৈন্য দলের আগে এক পাল গাভী রেখে রাতের বেলায় বীরসিংহপুরে আক্রমণ করেন। আচমকা এই আক্রমণ ঠেকাতে গিয়ে বীরসিংহ দেখলেন শত্রু সৈন্যকে আঘাত হানতে হলে গো-হত্যা করতে হয়। হতাশায় নিরুপায় রাজা তখন তাঁর সৈন্যবাহিনীকে অস্ত্র সম্বরণ করতে বললেন। বিনা বাধায় শত্রুসৈন্য বীরসিংহকে হত্যা করল। রাজরাণী কালীদীঘিতে ঝাঁপ দিলেন। সেই কালীদীঘি আজ রাণীদহ বা রাণীর বাঁধ নামে পরিচিত। যে বীরসিংহকে কেন্দ্র করে এত সব কাহিনী, তারই নাম থেকে বীরভূম জেলার নামকরণ হওয়া নেহাৎ অমূলক নয়।

●

বীরসিংহপুরের ঐতিহাসিক কাহিনীর যোগসূত্র রয়েছে বীরসিংহপুরের মাইল আটেক দূরে প্রাচীন এক রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ রাজনগরে। কারও কারও ধারণা, ১২২৭ খৃষ্টাব্দে সুলতান গিয়াসউদ্দিনের মৃত্যুর পর বীরসিংহপুরের রাজা বীরসিংহের পলাতক পুত্র সুযোগ বুঝে বীরসিংহপুরের অল্প দূরেই নাগর বা নগর নামে এক জায়গায় তাঁর রাজধানীর পত্তন করেন। এই পলাতক রাজকুমার বীররাজ নামে নিজের পরিচয় দেন। পালাবার সময় তিনি কুলদেবী কালিকাদেবীর মূর্তি সঙ্গে নিয়ে আসেন। নতুন রাজধানী নগরে কালীদহ নামে প্রকাণ্ড এক দীঘি খনন করিয়ে তারই তীরে দেবীমন্দিরের পুনঃ

তারামার মন্দির — তারাপীঠ

বক্রেশ্বর

প্রতিষ্ঠা করেন। কথিত আছে, ১২৪৪ খৃঃ বীরভূমির রাজধানী এই নগর বা নাগর বীরভূমির পশ্চিম দিকের অধিবাসী পার্বত্য সাঁওতালদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়। বীররাজের পতনের পর রাজনগর মুসলমান ফৌজদারদের অধিকারে আসে। এই স্বাধীন মুসলমান শাসনকর্তারা বর্গীর হামলা থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করেছিলেন অপরিসীম সাহস আর দুর্জয় প্রতিরোধে।

রাজনগর বা নগর সম্পর্কে অন্য জনশ্রুতি হল মহারাজ বল্লালসেনের কোন অধার্মিক কাজে ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর ছেলে লক্ষ্মণ সেন পিতার রাজ্য ছেড়ে অজয় নদীর দক্ষিণ তীরে এসে বসবাস আরম্ভ করেন। তাঁরই নামানুসারে সে জায়গার নাম সেনপাহাড়ী, যা অধুনা বর্ধমান জেলায়।

সেনপাহাড়ীর কাছেই লক্ষ্মণ সেন নিজের নামে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে সেই লখনৌর নাগর, নগর ও ক্রমে রাজনগর নামে চিহ্নিত হয়।

●

বিখ্যাত জায়গার অভাব নেই বীরভূমে—দুবরাজপুর, বক্রেশ্বর, নলহাটি, সাঁইথিয়া, কেন্দুবিল্ব, মল্লারপুর, তারাপীঠ, তারাপুর বাংলাদেশের মানচিত্রে হয়তো এই সব জায়গার কোন একটাকে খুঁজে বার করা সহজ নয় কিন্তু আশ্চর্যনিয়ামে, ভ্রমণযোগ্য স্থান, পুণ্যতীর্থ, কিংবা পৌরাণিক কি ঐতিহাসিক কোন কাহিনীর স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই জায়গাগুলির প্রত্যেকটির সঙ্গেই। বীরভূমের বহু জায়গার সঙ্গে রামায়ণ-মহাভারতের যোগ রয়েছে। সুপ্রাচীনকালে বীরভূমের অরণ্যময় প্রদেশ ছিল মুনি-ঋষিদের তপোবন। চোদ্দ বছর বনবাস পর্বে রাম-সীতা বীরভূমের বনভূমিতে বেশ দীর্ঘ সময় কাটিয়েছিলেন, পাণ্ডবরাও অজ্ঞাতবাস করেছিলেন রাঢ়বঙ্গের এই অঞ্চলে। সেই প্রাচীন স্মৃতির সূত্রে প্রচলিত নানা পৌরাণিক কিম্বদন্তী বীরভূমের নানা স্থানকে মাহাত্ম্য দান করেছে।

গেরুয়ায় উঁচু উঁচু অসংখ্য বেলে পাথরের চাঁই ইতস্ততঃ ছড়ানো দুবরাজপুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চোখ চেয়ে দেখবার মত। বেলেপাথর দিয়ে তৈরী অসংখ্য দেব মন্দির রয়েছে এখানে। প্রাচীন শিবমন্দিরও বড় কম নয় দুবরাজপুরে। শহরময় ছড়িয়ে থাকা ওই সব পাথর সম্পর্কে ভারী মজার গল্প শোনা যায়। কুমারিকা থেকে লঙ্কা পর্যন্ত সেতু বাঁধবার জন্য হিমালয় থেকে পুষ্পক রথে করে পাথর নিয়ে যাচ্ছিলেন রামচন্দ্র। দুবরাজপুরের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় ঘোড়া ভয় পেয়ে রথ নড়ে যায়, তখন ওই সব পাথর এখানে-সেখানে পড়ে যায়।

দুবরাজপুর থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে বক্রেশ্বর—মহাশ্মশানের ওপর পীঠস্থান। দেবীর ভ্রূর মাঝের অংশ নাকি এখানে পড়েছিল। দেবীর নাম মহিষমর্দিনী, ভৈরব বক্রনাথ। এখানে সাতটা উষ্ণ প্রস্রবণ রয়েছে। বক্রনাথ-মহাদেবের দর্শন পেতে দেবী-মন্দিরের প্রাঙ্গণ শ্বেত সরোবর নামে উষ্ণকুণ্ডে স্নান করে গুহায় নামতে হয়। এই বক্রনাথ-মহাদেব সম্পর্কিত কাহিনী হল—পুরাকালে ব্রাহ্মণপুত্রোদ্ভব হিরণ্যকশিপুপিতাকে মারার জন্য ব্রহ্মহত্যার পাপে ভগবান নৃসিংহদেবকে যন্ত্রণার জ্বালা থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য নিজে সে জ্বালা মাথায় ধারণ করলেন। যন্ত্রণায় অষ্টাবক্র মুনিকে ছটফট করতে দেখে নৃসিংহদেব তাঁকে বক্রনাথ-মহাদেবকে স্পর্শ করতে বললেন। গুহায় নেমে অষ্টাবক্র মুনি বক্রনাথকে ছুঁয়ে বসে থাকলেন গুহার মধ্যে সর্বতীর্থের জল এসে তাঁকে স্নিগ্ধ করে, তখন তাঁর সব জ্বালা-যন্ত্রণার উপশম হল।

শ্বেত সরোবর ছাড়া সাতটি কুণ্ড আছে বক্রেশ্বরে—অগ্নিকুণ্ড, সৌভাগ্যকুণ্ড, সূর্যকুণ্ড জীবনকুণ্ড, ভৈরবকুণ্ড ও ব্রহ্মকুণ্ড। প্রতিটি কুণ্ডকে কেন্দ্র করে একটি কাহিনী

বীরভূমের মেলা

প্রচলিত আছে। একবার দেবর্ষি নারদ বিন্ধ্য পর্বতের কাছে গিয়ে সুমেরু পর্বতের উচ্চতার গুণগান করলে বিন্ধ্য রেগে গিয়ে অভিমান আর গর্বে ফুলে উঠে এমনই মাথা চাড়া দিলেন যে, সূর্যের তাপ, আলো আর পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় না। বেগতিক দেখে সূর্যদেব এক কুণ্ডের কাছে এসে তপস্যায় বসলেন শিবকে আবেদন জানাতে। খুশী হয়ে শিব বিন্ধ্য পর্বতকে মাথা নামাতে হুকুম দিলেন। যে কুণ্ডের কাছে বসে তপস্যা করে শিবকে খুশী করে সূর্যদেব কার্যোদ্ধার করেছিলেন, তারই নাম সূর্যকুণ্ড।

জীবনকুণ্ড সম্পর্কে কাহিনীটি আরো চিত্তাকর্ষক। পুরাকালে সর্ব ও চারুমতী নামে এক বৃদ্ধ ও ধর্মভীরু দম্পতি সংসার ছেড়ে বনে গিয়ে ধর্মচর্চায় মন দিলেন। একদিন এক বাঘ এসে সর্বকে মেরে ফেলল। শোকাকুলা চারুমতী স্বামীকে ফিরে পাওয়ার জন্য মহাদেবের কাছে ধর্ণা দিলেন। চারুমতীর তপস্যায় প্রীত হয়ে মহাদেব তাকে তার মৃত স্বামীর হাড়গুলো বক্রেশ্বর তীর্থের এই কুণ্ডের জলে ধুতে বললেন। চারুমতী তা করামাত্র সর্ব প্রাণ ফিরে পেলেন। সেই কারণেই এই কুণ্ডের নাম জীবনকুণ্ড।

ভৈরব-কুণ্ডের কাহিনীটিও কম চমকপ্রদ নয়—আগে ব্রহ্মার পাঁচটি মুখ ছিল বলে তিনি নিজেকে শিবের সমান মনে করাতে শিব রেগে গিয়ে তাঁর মাথা থেকে তখনই একটা জটা ছিঁড়ে ফেললেন। জটা থেকে সঙ্গে সঙ্গে বটুক ভৈরব বেরিয়ে এসে জানতে চাইলেন শিবের আদেশ। শিব তাকে ব্রহ্মার প্রধান মুখটি কেটে ফেলতে বললেন। যে কথা সেই কাজ—বটুক ভৈরব তা করলেই ব্রহ্মার কাটা মুখটি কিন্তু লেগে রইল তার আঙুলে। নানা তীর্থে গিয়েও তিনি কোন রকমেই তা আঙুল থেকে ছাড়িয়ে ফেলতে পারলেন না। শেষে বারাণসীতে গেলে মুখটি খসে পড়ল। কিন্তু বটুক-ভৈরব আঙুলের অসহ্য জ্বালায় কষ্ট পেতে লাগলেন। নানা পবিত্র তীর্থ ঘুরে শেষে বক্রেশ্বর তীর্থে এই কুণ্ডের জলের স্পর্শে তাঁর আঙুলের জ্বালার উপশম হল। সেই থেকে এই কুণ্ডের নাম ভৈরব-কুণ্ড। এই সব কাহিনী মাহাত্ম্যেই উষ্ণকুণ্ডগুলির জলে নানা রোগনিরাময়ের ক্ষমতা আছে বলে লোকের বিশ্বাস।

বক্রেশ্বর মহাশ্মশানে বহু তান্ত্রিক তন্ত্র-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অঘোরীবাবার নাম বাংলাদেশের লোক মাত্রই জানেন। অঘোরী বাবার সমাধি আজও বক্রেশ্বরের মহাশ্মশানে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে। প্রাচীন শিল্প ও স্থাপত্যকলার নিদর্শনস্বরূপ মন্দিরগুলিও বক্রেশ্বরের অন্যতম আকর্ষণ।

●

অট্টহাস, বক্রেশ্বর, নন্দীপুর আর নলহাটি বাদ দিয়ে বীরভূমের আরও একাধিক জায়গা সতী মাহাত্ম্যজড়িত জাগ্রত পীঠস্থান বলে ভক্তজনে সমাদৃত। দান্তনদীঘি অনুরূপ একটি স্থান। ফুলবেরা দুবরাজপুরের অদূরেই এক গ্রাম। সেই গ্রামের বিরাট এক পুকুরের নাম দান্তন, তারই তীরে দন্তেশ্বরী মন্দিরের খ্যাতি গোটা বীরভূম জুড়ে। লোকের বিশ্বাস, এখানে সতীর দাঁত পড়েছিল। প্রবাদ, দীঘিটি খনন করিয়েছিলেন রাজা খগাদিত্য। এই রাজা খগাদিত্যের প্রতিষ্ঠিত খগেশ্বর শিব রয়েছে ফুলবেরার পাশের গ্রাম খাগড়ায়।

অট্টহাস, বীরভূম জেলার লাভপুরের জাগ্রত সতীপীঠ। এখানে নাকি দেবীর নীচের ঠোঁট পড়েছিল। দেবীর নাম ফুল্লরা, ভৈরব বিশ্বেশ। বিগ্রহ নয়, দশ-বারো হাত লম্বা এক শিলাখণ্ড দেবীর ঠোঁট বলে পূজো পায়। তন্ত্রমন্ত্রে দেবীকে শিবাভোগ দেওয়ার সময় রূপসিরূপী বলে ডাক দিলে শেয়ালের পাল পোষমানা জানোয়ারের মতো খাবার জন্য জঙ্গল থেকে ছুটে আসে। মন্দিরের পাশে দলাদলি নামে মজে-যাওয়া এক দীঘি রয়েছে। প্রবাদ, রামচন্দ্র যখন অকালে দুর্গাপূজো করেন তখন এই দেবী-দহ থেকেই নাকি নীলোৎপল নিয়েছিলেন। লাভপুর থেকে অল্প দূরেই দুর্গাসোঃ গোপালপুর নামে যে গ্রাম, জনশ্রুতি যে, সেখানে দুর্গাবা মুনির আশ্রম ছিল।

বিশ্বভারতীর বিশ্বজোড়া কীর্তির স্মৃতি-বিজড়িত শান্তিনিকেতন বীরভূমের, মহকুমা শহর বোলপুরের অন্তর্গত। বোলপুরের পাশের গ্রাম সুপুরে সুরথরাজার পুজো-করা সুরথেশ্বর শিব আজও রয়েছে। প্রবাদ,

সুরথ রাজা দেবী চণ্ডিকার পুজোয় লক্ষ বলি দিয়েছিলেন বলেই এই জায়গার নাম হয়েছিল বলিপুর। বলিপুরই পরে বোল-পুর নামে পরিচিত হয় বলে অনেকের ধারণা।

বোলপুর থেকে মাইল চার দূরে শিয়ান গ্রামে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম ছিল। মুনি-কুণ্ড নামে ঠাণ্ডা জলের প্রস্রবণও রয়েছে একটি। কথিত আছে যে, অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে নিজের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলে তাঁর বাবা বিভাণ্ডক মুনি বীরসিংহপুরের কাছে ভাণ্ডীর বনে নতুন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এই বনে সিদ্ধনাথ বা ভাণ্ডেশ্বর নামে অনাদি লিঙ্গের মন্দির আছে। বিভাণ্ডক মুনি সুদীর্ঘকাল ধরে এই শিবের পুজো করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বলে এই শিব 'ভাণ্ডেশ্বর' নামে পরিচিত।

'পুরাণে প্রসিদ্ধ এই নদীর নাম, মন্দা-কিনীর প্রবাহ ওর নাড়িতে'—কবির সেই নদী কোপাই, বোধকরি একদা যা ছিল কোপবতী, তারই তীরবর্তী গ্রামও নামে কোপাই — সতীপীঠের মহিমামণ্ডিত। এখানে নাকি দেবীর কঙ্কাল পড়েছিল, দেবীর নাম বেদগর্ভা, ভৈরব রুরু। তাই থেকে নিকটবর্তী জায়গার নাম কঙ্কালী-তলা। চৈত্রসংক্রান্তিতে এখানে যে মেলা হয়, সেই মেলা উপলক্ষ্যে পবিত্রকুণ্ডের জলে স্নানের পর দেবীর পুজো করে পুণ্য অর্জনে ভীড় করেন বহু যাত্রী।

বীরভূমের ব্যবসাকেন্দ্র সাঁইথিয়ার কাছে নন্দীপুরে দেবীর হাড় পড়েছিল বিশ্বাসে পীঠস্থান বলে স্বীকৃত। কিন্তু তীর্থ-যাত্রীদের কাছে নন্দীপুর যেন কতকটা অনাদৃত। দেবীর নাম নন্দিনী, ভৈরব নন্দিকেশ্বর। মোড়েশ্বর সাঁইথিয়ারই এক গ্রাম—প্রাচীন এক শিবমূর্তির অধিষ্ঠান এখানে। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মাতামহ মুকুট রায় ছিলেন এই গ্রামের রাজা।

মল্লারপুর বীরভূমের এক সমৃদ্ধ গ্রাম। প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ মল্লেশ্বর নামে শিব রয়েছেন মল্লারপুরে। গ্রামে শিবপাহাড়ী নামে যে পাহাড়, জনশ্রুতি যে দ্রৌপদী-হরণে ব্যর্থ ও ভীম দ্বারা অপমানিত জয়দ্রথ এই শিবপাহাড়ীতে এসে সিদ্ধনাথ শিবের উপাসনা করে যুদ্ধে অপরাজেয় বরলাভ করেন।

বৈষ্ণবদের প্রিয়তীর্থ নিত্যানন্দ মহা-প্রভুর জন্মস্থান গর্ভবাস মল্লারপুর থেকে সাত মাইল দূরে। গর্ভবাসের প্রাচীন নাম একচক্রপুর বা একচাকা। অনেকের অনুমান এই গ্রামের সঙ্গে পাণ্ডবদের সংস্রব ছিল। একচক্রার ঠিক আগের গ্রামের নাম হল বীরচন্দ্রপুর—নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর পুত্র বীরচন্দ্র বা বীরভদ্রের নামেই এই গ্রামের নামকরণ। জতুগৃহ থেকে পালাবার পথে হিড়িম্ব রাক্ষস নাকি পাণ্ডবদের আক্রমণ করেছিল একচক্রপুরে। এখানেই হিড়িম্ব রাক্ষসকে বধ করে তার বোন হিড়িম্বাকে বিয়ে করেছিলেন ভীম। এই হিড়িম্বার গর্ভেই জন্ম হয়েছিল ঘটোৎকচের। সাঁই-থিয়া আর মল্লারপুরের কাছাকাছি কোটাসুর নামে এক গ্রাম আছে—এখানেই নাকি হিড়িম্বা ও বকরাক্ষসের বাস ছিল। অসুরের কোট বা আবাস ছিল বলেই গ্রামের নাম হয়েছে কোটাসুর।

নন্দীপুরের মতোই অনাদৃত বীরভূমের আরেক সতীপীঠ নলহাটি। ছোটোখাটো সমৃদ্ধ এক শহর অধুনার নলহাটি। নল-হাটিতে নাকি দেবীর কণ্ঠনালী পড়েছিল। এ সম্পর্কে ভিন্ন মত এই যে কণ্ঠনালী নয়, দেবীর ললাট পড়েছিল। দেবীর নাম ললাটেশ্বরী, ভৈরব যোগীশ। পাহাড় ও নানা গাছপালা দেবীর মন্দিরের পিছনে, মন্দিরে কোনো বিগ্রহ নেই। দেবীর আননের প্রতীক রূপে সিঁদুরমাখানো গোল একটি পাথরকে পুজো করা হয়। নলহাটি রেলস্টেশনের কাছেই যে ধ্বংসা-বশেষ দেখা যায়, লোকে বলে তা ছিল নল-রাজার রাজপ্রাসাদ কিন্তু এই নলরাজার ইতিবৃত্ত কেউ জানে না।

মুরারই থেকে কিছু দূরে কনকপুর গ্রামে অপরাজিতা নামে প্রাচীন এক পাষাণ দেবীমূর্তি অধিষ্ঠিতা। কাছেই বীরকিটি গ্রাম—মুর্শিদাবাদের বড়নগরের রাজা উদয়-নারায়ণ মুর্শিদকুলী খাঁর সঙ্গে লড়ায়ের ফলে বড়নগর ছেড়ে এই বীরকিটি গ্রামে এসে বসবাস করতে থাকেন। উঁচু এক

নলহাটির দৃশ্য

জয়দেবের আরাধ্য রাধামাধবের মন্দির : কেঁদুলী

টিলার ওপর ছিল বীরকিটির গড়। রাজা উদয়নারায়ণের সঙ্গে খাজনা নিয়ে মুর্শিদ-কুলী খাঁর বিবাদ হলে বীরকিটি গ্রামের পশ্চিম দিকের প্রান্তরে বিরাট লোকক্ষয়ী যুদ্ধ হয়—এই যুদ্ধ জগন্নাথপুরের যুদ্ধ নামে খ্যাত। লোকে সেই প্রান্তরকে আজো মুণ্ডমালা বা মুড়মুড়ে ডাঙা বলে। আজো এই প্রান্তরে নাকি গোলাগুলির টুকরো কুড়িয়ে পাওয়া যায়।

গম্ভীরা নদীর তীরে বারা বা বারানগর মুর্শিদাবাদ জেলার কোল ঘেঁষে লোহা-পুরের কাছেই এক বিচিত্র গ্রাম। চারপাশে হিন্দুপ্রধান গ্রামের মাঝখানে বারা ব্রাহ্মণ-শূন্য মুসলমান-বহুল এক গ্রাম। একসময় বজ্রযানী বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের কেন্দ্র ছিল এখানে। এই বারা বা বারানগর বানরাজা বা বালারাজার রাজধানী ছিল। অনেকের ধারণা, বারা, বারার কাছাকাছি বাণেশ্বর ও নগর এই তিনটি গ্রাম নিয়ে মহাভারতের বারনাবত নগর ছিল। সেই বারনাবতেই পাণ্ডবেরা কিছুকাল অজ্ঞাতবাসে কাটিয়ে-ছিলেন এবং সেখানেই জতুগৃহ দাহ হয়।

●

শারদীয়া লক্ষ্মীপুজোর প্রাক্কালে শিয়ালদা স্টেশনে গয়া প্যাসেঞ্জারে ওঠার আগে শতকরা নব্বুই জন যাত্রীকে কোথায় যাবেন শুধোলে শুনবেন—রামপুরহাট। আলাপ ঘনীভূত করার চেষ্টায় গল্পের সুতোয় ঢিল দিলে জানতে পারবেন—যথার্থ গন্তব্য স্থল তারাপীঠ। তারাপীঠ হল্ট নামে স্টেশন থাকলেও যাত্রীরা রামপুর-হাটে নেমে বাসে কি রিক্সায় তিন মাইল

পথ পাড়ি দেয়। দ্বারকানদীর ধারে চণ্ডী-পুর বা তারাপুর গ্রামে তারাদেবীর মন্দির ও প্রাচীন যোগাশ্রম রয়েছে। লোকের বিশ্বাস, বশিষ্ঠ মুনি এখানেই তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। প্রাচীন তন্ত্র-গ্রন্থে আছে একবার বশিষ্ঠ মুনি কামাখ্যা প্রভৃতি জায়গায় সাধনায় বিফল হয়ে গৌতম-বুদ্ধের শরণ নেন, তাঁরই নির্দেশে বীরভূমের তারাপীঠে এসে তিনি উগ্রতারার সাধনায় সিদ্ধ হন। কাজেই এই বশিষ্ঠ মুনি আর যেই হন, রাজা দশরথের গুরু ত্রেতাযুগের বশিষ্ঠ নন। যতদূর মনে হয় ইনি সিদ্ধাচার্য নাগার্জুন, যিনি নেপাল তিব্বত থেকে তন্ত্রবিদ্যা বাংলায় নিয়ে আসেন। আটলা গ্রামের উন্মাদ সাধক বামাচরণ চট্টোপাধ্যায় এই তারাপীঠের মহা-শ্মশানেই সিদ্ধিলাভ করে বামাক্ষ্যাপা নামে খ্যাত হন। কিম্বদন্তী যে এখানে সতীর চোখের তারা পড়েছিল, যদিও একান্নটি সতীপীঠ আর ছাপ্পান্নটি উপপীঠের তালিকায় তারাপীঠ বাদ পড়েছে। তা সত্ত্বেও তারাপীঠ বোধকরি বীরভূম জেলার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ তীর্থ। প্রতি আশ্বিনে এখানে বিপুল যাত্রী সমাগমে বিরাট মেলা হয়। তারাপীঠের দেবীমন্দির তৈরী করিয়েছিলেন। নাটোরের মহারাণী ভবানী।

মন্দিরে অধিষ্ঠিতা তারামূর্তি সম্পর্কে ভক্তজনের মুখে শোনা যায় এক অলৌকিক গল্প। কাহিনী কয়েকশ' বছরের প্রাচীন। দ্বারকানদীর অবস্থা তখন এখনকার মত

মল্লেশ্বরের মন্দির — মল্লারপুর

শীর্ণ নয়। বেগবতী দ্বারকানদী তখন নাব্য ছিল। ব্যবসাবাণিজ্যের উদ্দেশ্যে দেশবিদেশে মাল নিয়ে তখন নদীতে নৌকা চলাচল করত। দিনের শেষে সাঁঝবেলাতে একদিন জয়দত্ত নামে বিত্তশালী এক বণিক বাণিজ্য-পণ্যেভরা নৌকা বাঁধলেন দ্বারকানদীর তীরে তারাপীঠের এই শ্মশানের ধারে। খাওয়া-দাওয়ার পর হিসেবনিকেশ সেরে ক্লান্ত নৌকাযাত্রীরা বিশ্রামের জন্য শয্যা পেতেছেন। কিন্তু মন্দভাগ্য জয়দত্তের একমাত্র পুত্রের ভেদবমি আরম্ভ হল। ভোর হওয়া পর্যন্ত আর তর সইল না, জয়দত্ত পুত্রহারা হলেন। পুত্রশোকে কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি। বুড়ো এক মাঝির পরামর্শে মৃতপুত্রের দেহ কাছেই কুণ্ডের জলের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। কেননা, গতকাল সে ঐ কুণ্ডের জলে একটা কাটা শোলমাছ ধুতে গিয়ে দেখে ওই জলের স্পর্শে কাটা শোলমাছটিতে প্রাণের স্পন্দন। জয়দত্তের মৃতপুত্রকে ওই কুণ্ডের জলে স্নান করাতেই সে প্রাণ ফিরে পেল আইতেই এই কুণ্ডের নাম জীবিতকুণ্ড।

পুত্র ফিরে পেয়ে জয়দত্ত পরদিনও রয়ে গেলেন ঐ শ্মশানভূমিতে। সেদিন রাত্রে নিদ্রামগ্ন বণিক স্বপ্নে দেখা পেলেন দেবী তারিণীর। দেবীর নির্দেশ মতো বুড়ো এক শিমুলগাছের তলা খুঁড়ে জয়দত্ত পেলেন বশিষ্ঠ মুনির আসন আর সেই আসনের নীচেই পেলেন শিলাময়ী তারা, চন্দ্রচূড় শিব আর দেবীর শ্রীচরণ। তারাপীঠে গেলে দেখতে পাবেন শিমুলতলায় সেই আসন যেখানে বসে বশিষ্ঠ সাধনা করেছিলেন ত্রেতাযুগে(?), সাধক বামাক্ষ্যাপা সিদ্ধিলাভ করেছিলেন কলিযুগে।

●

মেলা খেলাতে বীরভূমের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য। এক পৌষসংক্রান্তিতেই বীরভূমের কত জায়গায় যে মেলা হয়, কত লোকজন, দোকানপাট, বাউল-বৈষ্ণবের সমাবেশ। রাণীপাথরের কাছে 'মায়ের থানের মেলা', বোলপুরের 'অজয়ঘাটের মেলা' রাইপুরের কাছে 'দেউলির মেলা', কিন্তু সবার সেরা গীতগোবিন্দের কবি জয়দেবের জন্মস্থান 'কেন্দুবিল্ব বা কেঁদুলীর মেলা'। কবি জয়দেব যে আসনে বসে সাধনায় সফল হয়েছিলেন, তা আজো যত্নসহকারে রাখা আছে। আধুনিক বাংলা কবিরা নিশ্চয় তাঁদের পূর্বসূরীর এই সমাদরে গর্ব-পুলক এবং কিঞ্চিৎ ঈর্ষাবোধও করে থাকেন।

লোকমুখে শোনা যায়, জয়দেব নাকি রোজ কেন্দুলি থেকে আঠারো ক্রোশ পায়ে হেঁটে কাটোয়ায় গঙ্গাস্নান করে ঘরে ফিরে এসে রাধামাধবের পুজো করতেন। একদিন রাধামাধব স্বপ্নে জয়দেবকে অতো কষ্ট না করে অজয়নদীতে স্নান করে পুজোর নির্দেশ দিলেন। জয়দেবের প্রত্যয়ের জন্য দেবতা বললেন, 'পৌষসংক্রান্তির দিন তিনি উজানী বইবেন। সেইদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে জলে পদ্মফুল ভাসতে দেখা যাবে আর নদীর জলও যাবে বেড়ে। সেই থেকে জয়দেব রোজ কদমখণ্ডীর ঘাটে স্নান করতেন। প্রতি বছর সংক্রান্তির দিন রাধামাধবকে পুজো দিতে আর জয়দেব পদ্মাবতীকে স্মরণ করতে এখানে অসংখ্য ভক্ত সমাগম হয়। ঘাটে বড় একটা কদমগাছ ছিল বলেই তার নাম কদমখণ্ডীর ঘাট। সেই কদমগাছের কোটরে বাসা বেঁধেছিলেন মনোহরক্ষ্যাপা—যিনি আজ কোটরেবাবা বলে খ্যাত।

জয়দেব আর তাঁর নৃত্যগীতপটিয়সী স্ত্রী পদ্মাবতীকে ঘিরে আছে অজস্র কিংবদন্তী। জয়দেব গান রচনা করে গাইতেন আর সেই গানের তালে তালে নাচতেন পদ্মাবতী। বিচিত্র কাহিনী শুনবেন জয়দেবের গীতগোবিন্দ রচনা সম্পর্কে—একদিন কবি জয়দেব একটি পদপূরণে বার বার চেষ্টা করেও বিফল হয়ে বিক্ষিপ্ত চিত্তে স্নানের উদ্দেশ্যে ঘাটে গেলেন—'স্মরগরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং'—এই অসমাপ্ত পদটি রেখে। ফিরে এসে দেখেন পুঁথির পাতায় সেই পদের নীচে 'দেহি পদপল্লব মুদারম্' —স্বয়ং নারায়ণ কোন্ ফাঁকে জয়দেবের রূপ ধরে এসে লিখে রেখে গেছেন। সেই বিখ্যাত লেখাটি দেখতে আজো কতো কৌতূহলী চিত্ত এসে ভীড় করেন কেঁদুলীতে—কিন্তু আসলপাণ্ডুলিপির সে পুঁথি আজ সেখানে নেই। বৃন্দাবনে যাওয়ার সময় জয়দেব তাঁর আরাধ্য দেবতা রাধামাধব ও সেই পুঁথি সঙ্গে নিয়ে যান।

জয়দেব কেঁদুলী সম্বন্ধে আরো অনেক প্রচলিত কিম্বদন্তীর মধ্যে একটি হল রাধামাধবের মন্দির প্রাঙ্গণে মাঘমেলার সময় মহোৎসবের যে খিচুড়ি পুঁতে রাখা হতো পরের বছর মাটি খুঁড়ে পাওয়া যেত সেই একই খিচুড়ি।

●

কেঁদুলীর কাছেই অজয় নদীর দক্ষিণ কিনারে যে ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায় তা হল প্রাচীন ত্রিষষ্ঠীগড় বা ইছাই ঘোষের অজয় ঢেকুরের। ধর্মমঙ্গল কাব্যে যে ইছাই ঘোষের কথা আমরা পড়ি তিনি ছিলেন শক্তির উপাসক। ত্রিষষ্ঠীগড়ের রাজা কর্ণসেনকে পরাজিত করে তিনি শ্যামামন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ঢেকুরের কাছে লাউসেন তালাও, কান্দুনে ডাঙা ও রক্তনালী ইত্যাদি জায়গাগুলি মহাবীর লাউসেন ও ইছাই ঘোষের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের স্মৃতি-বিজড়িত। লাউসেনের সেনাপতি কালিডোম ইছাই ঘোষকে হত্যা করেন।

বীরভূমের লোকায়ত দেবতা হলেন ধর্মঠাকুর। তাঁকে নিয়ে মেলার যেমন অন্ত নেই, তেমনি তাঁকে ঘিরে বিশ্বাসেরও ইয়ত্তা নেই। কূর্মাকৃতি পাথরের টুকরো কোথাও ধর্মঠাকুর, কোথাও ধর্মরাজ বা বুড়োরাজ আবার কোথাও বা বাবাঠাকুর বলে পুজো পান। এক এক অঞ্চলের ধর্মঠাকুরের বিশেষ এক দৈবী ক্ষমতা—লাঙ্গুলিয়ার ধর্মরাজ পেটবেদনা, পা-ফোলা নিরাময় করেন, বেলের ধর্মরাজ বাতের। বৈশাখী পূর্ণিমায় রামপুরহাট লোক্যাল বা গয়া কি দানাপুর প্যাসেঞ্জারে যাত্রীর ভীড় দেখেই ঠাহর করতে পারবেন ধর্মরাজের টোটকা-মহিমা।

বীরসিংহপুরের উপাখ্যান দিয়ে শুরু করেছিলাম কিম্বদন্তীর বীরভূম, উপসংহারে তাই বীরনগরের কথা বলি। বীরনগর রাজগাঁ থেকে চার মাইল পশ্চিমে। বীরসেন নামে রাজার প্রাসাদের ভগ্নচিহ্ন আজও চোখে পড়ে এখানে। কাছেই সীতাপাহাড়ী নামে যে ছোট্ট পাহাড় তার গুহাতে নাকি বনবাসকালে সীতাদেবী ও শ্রীরামচন্দ্র কিছুকাল বাস করেছিলেন।

●

ধূপ পুড়ে ছাই হয়ে যায় কিন্তু বাতাসে রেখে যায় তার গন্ধের রেশ। ঘটনা কবেকার, কিন্তু সময়ের অতিক্রান্তিতেও কিংবদন্তীর সূত্রে রয়ে যায় নেপথ্যকাহিনীর অমোঘ আকর্ষণ। সেই কারণেই সত্যমূল্য থাক বা নাই থাক এই সব কিংবদন্তীর আবেদন সার্বজনীন।

শহীদ স্মৃতিবাসরে

উপেক্ষিত—প্রফুল্লচন্দ্র

পুলকেশ দে সরকার

কিছুদিন আগে সর্বজনীন মনের তৃপ্তি-সাধন ক'রে ক্ষুদিরাম-সেতুর উদ্বোধন হ'ল। আরও কিছুদিন আগে ক্ষুদিরামের মূর্তি-প্রতিষ্ঠা হয়েছে। একাধিক জায়গায় তাঁর মূর্তি বিরাজিত। একদার মাত্র জওহরলাল মজঃফরপুরে ক্ষুদিরামের মূর্তির আবরণ উন্মোচনে নারাজ হয়েছিলেন। কিন্তু আবরণ উন্মোচিত হয়েছিল। ক্ষুদিরামের ছবিও বিরল নয়। ক্ষুদিরামকে নিয়ে সাধারণ্যে বহুল-প্রচারিত গান আছে, রেকর্ড আছে, অসহ্য হিন্দী চীৎকারের মধ্যেও কোন এক অবাঙালীর কণ্ঠে 'একবার বিদায় দে মা' গানটি আচমকা শোনা যায় এবং বলা বাহুল্য, সে-গান ক্ষুদিরামকে উদ্দেশ করেই। (১)

কৃতজ্ঞ জাতি যা সঙ্গত, বাঞ্ছিত ও অভিপ্রেত তাই করেছে এবং কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ জাতির প্রাণধারারই পরিচয়।

ভিন্ন পরিবেশে, মিথ্যা অভিযোগে, বে-আইনীভাবে রাজদন্ডধারী বৃটিশ বণিকী ষড়যন্ত্রের প্রথম বলি মহারাজ নন্দকুমারকে বাদ দিলে যথাযথ বিধিবদ্ধ বৃটিশ ভারতের প্রথম প্রশাসনিক বলি ক্ষুদিরাম এবং হাসি-মুখে তিনিই প্রথম ফাঁসিমঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়েছেন। কিন্তু তিনিই কি প্রথম শহীদ?

যিনি ধরা দেননি, ধরা দিয়ে কোন কথা বের করার লেশমাত্র অবকাশ রাজশক্তিকে দেন নি, ধরা দেবার মুখে নিষ্কম্প্র বজ্র-মুষ্টিতে আত্মহনন করেছেন, আত্মবিলোপের পথে নিজেকে নিশ্চিহ্ন করেছেন, ক্ষুদিরামের সেই সঙ্গীকে কি বলব? ক্ষুদিরামও তাঁর নাম জানতেন না, পুলিশ তো নয়ই। ক্ষুদি-রাম-সঙ্গীর আত্মপরিচয়ের অবগুণ্ঠন উন্মোচন হয়েছে অনেক পরে। হয়তো গুপ্ত-সমিতির নিয়মানুসারে ক্ষুদিরাম সঙ্গীর নাম জানতেন না, কিংবা দলে সদ্য আগত ক্ষুদি-রামের কাছে ক্ষুদিরাম-সঙ্গী তাঁর আত্ম-পরিচয় উদ্ঘাটন করেন নি: এমনও হ'তে পারে, পুলিশকে বিভ্রান্ত করার জন্যে 'মিথ্যে' নাম বলেছেন। মনে হয় না: সরল প্রকৃতির

ক্ষুদিরাম ধরা পড়ার পর যে সাদাসিধে বিবৃতি দেন তাতে কিছু গোপন করবার লক্ষণ নেই। ধরা পড়ার প্রথম সংবাদেই ক্ষুদিরাম বসুর নাম প্রকাশ: সঙ্গীর প্রকৃত নাম জানা থাকলে তিনি তা অপ্রকট রাখতেন না। কেবল ক্ষুদিরাম-সঙ্গী নয়, পরবর্তী-কালে উদ্ঘাটিত দল-নেতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষের কাছেও ক্ষুদিরাম অপরিচিত ছিলেন। বারীন্দ্র ক্ষুদিরাম-সঙ্গীকে চিনতেন, জান-তেন, ক্ষুদিরামকে নয়! শুধু মজঃফরপুর যাবার দিনে তিনি ছেলেটিকে দেখেন।

তবু ক্ষুদিরাম একেবারে অপরিচিত নাম ছিল না। কিছুকাল আগেই মেদিনীপুরে এক সরকারী প্রদর্শনীতে 'রাজদ্রোহাত্মক' ইস্তাহার বিলির অভিযোগে ধরা পড়েছিলেন এবং দায়রা সোপর্দ পর্যন্ত হয়েছিলেন। যথেষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু দায়রা বিচারের আগেই বৃটিশ সরকারের সুমতি হওয়ায় মামলা প্রত্যাহৃত হয়। এবং ক্ষুদি-রামের নাম যিনি বারীন্দ্রের কাছে প্রস্তাব করেন, সেই প্রবীণ বিপ্লবী ক্ষুদিরাম কি ধাতুতে গড়া তা জানতেন। কিন্তু দল থেকে যাঁর প্রস্তাবমত যাঁকে এই ভার দেওয়া হয়েছিল এবং ক্ষুদিরামকে সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল, মজঃফরপুরের যবনিকা উঠলে দেখা গেল, তাঁর কোন পরিচয় নেই অথবা যে পরিচয় প্রকাশ পেল তা সত্যি নয়। পক্ষান্তরে, ক্ষুদিরামের নাম সূর্যের মত অজস্র কিরণে ছড়িয়ে পড়ল।

মজঃফরপুরে কি একটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটেছিল? না, অন্ততঃ দুটি? খবরে প্রকাশ, প্রচন্ড বিস্ফোরণে নাকি শহর কেঁপে উঠেছিল। কেবল গাড়ীর আরোহী মিসেস ও মিস কেনেডি নন, গাড়ীটিও বিধ্বস্ত হয়ে গেছল। সুতরাং যদি একাধিক বোমা হয় এবং তাই সম্ভব, তবে নিশ্চয়ই ক্ষুদিরামের সঙ্গী অথবা যাঁর সঙ্গী ছিলেন ক্ষুদিরাম তিনিও নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। বিস্ফোরণের পরই তাঁরা সম্ভবতঃ পরামর্শ-ক্রমে দুটি পৃথক পথে সরে পড়লেন। ক্ষুদিরাম কোটের পকেটে দুটি রিভলবারসহ ধরা পড়লেন, একটিও বের করার অবকাশ পাননি।

পক্ষান্তরে, তখনও অজ্ঞাতনামা ক্ষুদি-রাম-সঙ্গীর পিছু ধাওয়া করেছিল এক বাঙালী গোয়েন্দা। একই স্টীমারে একই রেলে গোয়েন্দা ও বিপ্লবী। হয়তো ক্ষুদি-রাম-সঙ্গীর দৃষ্টিতে এমন কিছু সঙ্কল্পের তেজ ছিল, যা গোয়েন্দার বজ্রমুষ্টি শিথিল ক'রে দিয়েছে। গঙ্গা-স্নানও নির্বিঘ্নে হ'ল: রিভলভার ও পরিচ্ছদ হাত-ছাড়া হয়নি; গোয়েন্দা-কাহিনীর মতই চমকপ্রদ।

শেষ মোকাবিলা মোকামা স্টেশনে। গোয়েন্দা জোটবদ্ধ হ'য়ে গেছে; পরি-বেষ্টনী পড়ছে বিপ্লবীর চারদিকে; কাছে আরও কাছে। আর নিস্তার নেই। চরম সিদ্ধান্ত। ক্ষুদিরাম-সঙ্গী হাতের পিস্তলটা বাগিয়ে ধরলেন, তাগ করলেন নিজের দিকেই; তুচ্ছ মৃত্যুকে মহিমান্বিত ক'রে ধরা দিলেন মৃত্যুর কাছেই পুলিশের কাছে নয়। একটা কথা বললেন না, উঁচু গলায় নয়, মৃদু ভাবেও নয়, আত্ম-পরিচয়ের ঘোষণা করলেন না। লোকটা কে?

ক্ষুদিরামের কাছে পুলিশ জেনেছিল—লোকটা ডি সি রায় বা দীনেশচন্দ্র রায়। পুলিশের নিজস্ব কোন খবরই ছিল না। মানিকতলার বাগানবাড়ী আবিষ্কৃত না হ'লে, বারীন্দ্রকুমার প্রমুখ স্বীকারোক্তিতে নামোল্লেখ না করলে, মিথ্যা নামই সত্য হয়ে থাকতে পারত।

পুলিশ নিঃসংশয় হয়নি। বর্বরতার অমার্জনীয় দৃষ্টান্ত রাখতে পুলিশ ক্ষুদি-রাম-সঙ্গী ওরফে দীনেশচন্দ্র রায়ের ধড় থেকে শির ছিন্ন করল, স্পিরিটে ভিজিয়ে নিয়ে এল লালবাজারে শনাক্তকরণের জন্য—চেনো তোমরা এই লোকটাকে, এই আততায়ীকে?

মানিকতলা বাগান আবিষ্কারের পর (অথচ ক্ষুদিরাম মানিকতলার খবর বলেন নি, তিনি মানিকতলার খবর রাখতেনও না; আর ওরফে দীনেশচন্দ্র রায় তো কোন কিছু কওয়ার অবকাশই রাখেন নি), কোন কোন চিঠি বা বইয়ে একটা নাম পাওয়া গেল প্রফুল্লচন্দ্র চাকী: তারপর বারীন্দ্রকুমারের স্বীকারোক্তিতে জানা গেল ক্ষুদিরাম যাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন, তিনি বারীন্দ্রকুমার প্রমুখের বিশ্বস্ত সঙ্গী প্রফুল্লচন্দ্র চাকী।

এবং এই প্রফুল্লচন্দ্র চাকীই আধুনিক-কালে বৃটিশ-শাসন উৎপাদন-সঙ্কল্পের প্রথম শহীদ; দ্বিতীয় শহীদ ক্ষুদিরামের রোমাঞ্চ-কর ফাঁসির মঞ্চারোহণের বেশ কিছুদিন আগে। সম্পূর্ণ অপরিচয়ের মধ্যে কর্ম-সাধনার পথে মোকামায় আত্মবিলোপ ঘটিয়েছেন—

While being arrested he drew his revolver and shot himself dead.

সংক্ষিপ্ত সংবাদে এই তাঁর পরিচয়।

শহীদের স্মৃতিবাসরে [illegible] না হ'লেও প্রফুল্লচন্দ্রের আত্ম-বলিদান গৌণ। প্রফুল্লচন্দ্র দ্বিতীয় [illegible] নন। [illegible] না— প্রফুল্ল-ক্ষুদিরাম, [illegible] [illegible] অনেকটা [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] ঐ [illegible] [illegible] ধরা পড়া নেই [illegible] নেই, বলা-কওয়া নেই, মামলা নেই, [illegible] [illegible]

(১) সংবাদপত্রে এক ভদ্রলোক ক্ষুদিরাম বানানে আপত্তি তুলেছেন। তিনি বলেছেন, ক্ষুদিরাম নয়, খুদিরাম। খুদ থেকে খুদিরাম, ক্ষুদ্র থেকে নয়। খুদও ক্ষুদ্রই, চালের কণা। আমরা বাঙালীরা ক্ষ ও খ উচ্চারণে কোন পার্থক্য করিনে। সেদিক থেকে কিছু এসে যায় না। তথ্যগত ভুল, দীর্ঘকাল বহুজনে প্রচলিত হ'লেও, অত্যন্ত আপত্তিকর ও সংশোধনীয়, কিন্তু বানানে ব্যুৎপত্তিগত ব্যতিক্রম সম্ভবতঃ সহনীয়। আমি প্রচলিত বানান রেখেছি।

দিন শুনানী নেই, লোকের উৎকণ্ঠা আকুলতা নেই, প্রতীক্ষা নেই এবং নির্মম আইনের কণ্ঠরোধের শেষ কথার প্রচার নেই; প্রফুল্লচন্দ্রের নাম-মাহাত্ম্য বাকরুদ্ধ মহাকালে বিলীন হচ্ছে, কোনো লোক নাম-কীর্তনের সুযোগ পায়নি। তিনি প্রফুল্লচন্দ্র চাকী শহীদ বাসরে উপেক্ষিত, গৌণ, হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়া আর একটি নাম, ছন্দরক্ষার আর একটি শব্দ মাত্র।

উত্তর বাঙলার আকস্মিক আবির্ভাব প্রফুল্লচন্দ্র চাকীর ছবি নেই, মূর্তি নেই, তাঁর নামাঙ্কিত সেতু নেই, রাস্তা নেই। আমাদের যে-লোককবি ক্ষুদিরামের গান বেঁধেছিলেন, তাঁর কাছে প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন অভিরাম, অজ্ঞাতার দ্বীপান্তর পর্যন্ত পৌঁছেছেন, আত্মাহুতি যে দিয়েছেন এ খবর তাঁকে কেউ পৌঁছে দেয়নি। বাঙলার বিপ্লবী আন্দোলনে প্রথম বিস্ফোরণের যুগ্ম-নায়ক দীনেশচন্দ্র রায় প্রফুল্লচন্দ্র চাকী রয়েছেন এই আমাদের তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য; এবং কিংসফোর্ডের বাংলোয় উদ্যত মারণাস্ত্র নিয়ে একদা যে যুগলমূর্তি দাঁড়িয়েছিলেন, আমরা তাঁদের মধ্যে ব্যবধান রচনা করেছি; সম-মর্যাদায় প্রফুল্ল-স্মৃতি রক্ষার কথা আমাদের মনে জাগে না। বাঙলার বিপ্লববাদের প্রথম কাব্যে প্রফুল্ল চাকী উপেক্ষিত।

(দুই)

মানিকতলার বাগানবাড়ীতে সদলে ধরা পড়বার পর বারীন্দ্রকুমার ঘোষ স্বেচ্ছায় আলিপুরের তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এক বার্লির কাছে যে বিবৃতি দেন তাতে প্রফুল্ল চাকীর কিছু কর্ম-পরিচয় আছে, তেমন আত্ম-পরিচয় নেই।

লেঃ গবর্ণর এণ্ডরু ফ্রেজার যে ট্রেনে আসছিলেন, তা ধ্বংস করবার জন্য একদল বিপ্লবী লাইনে মাইন পাততে গিছলেন। তাঁদের একজন আধুনিক বাঙলার প্রথম শহীদ প্রফুল্লচন্দ্র চাকী। বারীন ঘোষও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। বারীনবাবু ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বলেছেন, অগ্রভাগে প্রফুল্লচন্দ্র চাকী। তাঁরা প্রথমে চন্দননগরে গেছলেন; পরে চন্দননগর ও মানকুণ্ডুর মাঝামাঝি জায়গায় রেল লাইনে বসিয়েছিলেন ঐ মাইন। বসিয়ে দিয়ে মাইলখানেক দূরে ছিলেন তাঁরা। আশা ছিল, লেঃ গবর্ণর বেঙ্গল-নাগপুর রেল লাইনে যে-পথে গেছেন সে-পথেই ফিরবেন। ফিরলেন না। পরে, বিপ্লবীরা চন্দননগর স্টেশনে খোঁজ করে জানলেন, সে পথে তিনি ফিরবেন না। মাইনটা তুলে আনতে হল।

বিপ্লবীদের এটি ছিল দ্বিতীয় প্রচেষ্টা। তৃতীয় উদ্যমেও প্রফুল্লচন্দ্র বারীন ও বিভূতির সঙ্গী ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা খড়্গপুর রওনা হয়ে যান। সকালের ট্রেনে গিয়ে সেখানে নামেন। বিকেলবেলা একটা ট্রেনে চেপে গেলেন নারায়ণগড়। পাকা রাত্তিরের অপেক্ষা করতে লাগলেন। অন্ধকার ছেয়ে এলে রেল লাইনের দিকে এগোলেন। ন'টা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। তারপর ঘন্টাখানেকের মধ্যে নারায়ণগড়ের উত্তরে, খড়্গপুরের দিকে, একটা মাইন পাতলেন। বারীন ঘোষ এই সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। ছয় পাউণ্ড ডিনামাইট দিয়ে মাইনটা তৈরী করেছিলেন বারীন ঘোষ। একটা লোহার পাত্রে রাখা ছিল, পাত্রের ঢাকনার মাঝখানে একটি ফুটো। ফিউজ। ইত্যাদি। সঙ্গে ছিল মোমবাতি বসানো কালো কাচের একটা ল্যান্টার্ণ। লাইনের নীচে একটা ঝোপের কাছে কিছু মিষ্টি খেয়েছিলেন। রাত এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে মাইন পাতেন। বারীন চলে যান। থেকে যান প্রফুল্ল ও বিভূতি। যখন বিস্ফোরণ ঘটে তখন তাঁরা সেখান থেকে মাইল দেড়েক দূরে। অনেক জিনিস, কিন্তু তাঁরা নিজেরাই বয়ে নিয়েছিলেন। কুলির সাহায্য নেন নি।

বারীন্দ্রকুমার বলেছিলেন, 'আর একটি মাত্র ঘটনা বলতে বাকী আছে। (এবং প্রফুল্লচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনের চতুর্থাংক।) শেষ ঘটনা। কিংসফোর্ড জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে অনেক মামলা করেছেন। প্রফুল্লচন্দ্র চাকী জেদ ধরলেন, তিনি এর প্রতিশোধ নেবেন, বোমা ফেলে কিংসফোর্ডকে মারবেন। (অর্থাৎ, প্রফুল্লচন্দ্রই প্রস্তাব করলেন এবং কাজের ভারও নিলেন নিজে; অন্যান্য বিপ্লবী বন্ধু সাহায্যে এগিয়ে এলেন।)... হেমচন্দ্র ও উল্লাস দত্ত, ১৫নং গোপীমোহন দত্ত লেনে, একটা কাঠের হাতলওলা বোমা তৈরী করলেন।...হেমচন্দ্র মেদিনীপুরের এক ক্ষুদিরাম বসুর নামও সুপারিশ করলেন। তাঁকেও যেতে দেওয়া হল। আমরা তাঁদের দুটো রিভলবার দিলাম, (২) এজন্য যে, ধরা-পড়ার অবস্থায় পড়লে আত্মহনন করবেন তাঁরা এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। ক্ষুদিরাম মানিকতলা বাগানবাড়ী বা গোপীমোহন দত্ত লেনের খবর রাখতেন না। আমরা বাইরের কাউকে বিশ্বাস করতাম না।'

অর্থাৎ, বারীন্দ্রকুমারের সঙ্গে ক্ষুদিরামের তখনও পরিচয় হয়নি, তিনি তাঁকে জানতেন না এবং তাঁকে তখনও 'অন্তরঙ্গ' ক'রে নেন নি, নেবার আর অবকাশও পাননি। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্র কেবল যে বারীন্দ্র-নেতৃত্বের বিপ্লবীদলের 'অন্তরঙ্গ' তাই নন, বৈপ্লবিক পরিকল্পনার উদ্ভাবক ও বিশ্বস্ত উদ্যোগীও বটেন। বারীন্দ্র প্রমুখের সহযোগী হিসেবে অন্তরমহলে একটা 'ভয়েস' ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র।

বারীন্দ্র বলেছেন, আমি প্রফুল্লকে ৩২নং মুরারীপুকুর থেকে ১৫নং গোপীমোহন দত্ত লেনে নিয়ে এলাম। সেখানে একটা ক্যানভাস ব্যাগে বোমা ও রিভলভার প্যাক করলাম। তারপর প্রফুল্লকে হেমের কাছে নিয়ে গেলাম। সেখানে আমি তাঁকে ক্ষুদিরামের সঙ্গে রেখে এলাম।'

উল্লাসকর দত্ত তাঁর জবানবন্দীতে 'আসল কর্মীদের' নামোল্লেখে বলেছেন: 'বারীন (মানে বারীন্দ্র) আমি, উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, প্রফুল্লচন্দ্র চাকী, বিভূতিভূষণ সরকার।'

উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি তাঁর স্বীকারোক্তিতে বলেছেন, বারীন্দ্রবাবুর কাছে দিন পনেরো আগে শুনেছি, প্রফুল্ল এবং ক্ষুদিরাম নামে অপর একজনকে মিঃ কিংসফোর্ডের প্রাণনাশের জন্য পাঠানো হবে। অর্থাৎ, উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিও জানতেন না, ক্ষুদিরামকে।

বারীন্দ্রকুমারের কথায়ই জানা যায়, প্রস্তাবটা প্রফুল্লচন্দ্রেরই। তাতে সায় দিয়েছেন বারীন্দ্রকুমার ও উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। হেমচন্দ্রের প্রস্তাবক্রমে ক্ষুদিরাম নামে 'একজনকে' উল্লাসকর-কথিত অন্যতম 'আসল কর্মী' প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে দেওয়া হয়। এবং প্রফুল্লচন্দ্র প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, ধরাপড়ার উপক্রম হ'লে, নিজেই নিজের প্রাণ দেবেন। আর, এজন্যই বারীন্দ্রকুমার বলেছেন, দুজনের জন্য দুটি রিভলভার দিয়েছেন। কার্যতঃ দেখা যায়, ক্ষুদিরাম যখন ধরা পড়েন, তখন তাঁর কাছেই দুটি রিভলভার পাওয়া যায়। প্রফুল্লচন্দ্রের কাছেও আর একটি আগ্নেয়াস্ত্র ছিল এবং প্রতিশ্রুতিমত, ধরা পড়ার উপক্রম হতেই হাতের অস্ত্র নিজের দিকে তাগ করলেন। যা প্রত্যাশিত ছিল, সিনিয়ার কর্মী হিসেবে তিনি তাই করেছেন। ধরা পড়ে বা ধরে দিয়ে আত্মপরিচয় দেন নি, আত্মপ্রচার করেন নি, বা কোনক্রমে পালিয়ে 'বাঁচা' বা 'বেঁচে থেকে' আত্মমহিমাকে ক্ষুণ্ণ করেননি। দেশমুক্তির সাধনায় আত্মবিলোপের সংকল্প অক্ষরে অক্ষরে উদযাপন করেছেন।

সেকালে, ১৯০৮-এর মে মাসে তাঁর ধরা পড়ার এই সংবাদটুকু বেরোয়:

ডি ডি রায় (২) শুক্রবার বি এন ডব্লিউ রেলওয়ের সমস্তিপুর স্টেশন অবধি চলে গেছলেন। সেখানে মোকামাঘাটের একখানা ইন্টার ক্লাশের টিকিট কেনেন। তারপর সেখানে ট্রেন পৌঁছালে নামেন।

মোকামাঘাটে আর একখানি ইন্টার ক্লাশের টিকিট কেনেন হাওড়া যাবেন ব'লে। মজঃফরপুরের একজন কনস্টেবল সন্দেহবশে সাদা পোষাকে সমস্তিপুর থেকে তাঁকে অনুসরণ করছিল। সেই কনস্টেবল অকস্মাৎ প্রফুল্লচন্দ্রকে ধরে ফেলে। প্রফুল্লচন্দ্র নিজেকে ছাড়িয়ে প্ল্যাটফর্ম ধরেই ছুটতে থাকেন। পুলিশ তার পেছনে ছোটে।

তারপর আর পালানো সম্ভব নয় বুঝে তিনি ফিরে দাঁড়ান। যে কনস্টেবল তাঁর কাছে ছিল তাকে লক্ষ্য ক'রে গুলী ছোড়েন। গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। কনস্টেবল আবারও এগিয়ে আসে। সামান্য সময় ছিল। তিনি সেটুকু সময়ের সদ্ব্যবহার করেন; আগ্নেয়াস্ত্র নিজের ওপরই ঘুরিয়ে ধরেন, একটা চিবুক ভেদ করে যায়, আর একটা বাম অক্ষকাস্থির ওপরে লাগে। প্রচুর রক্তপাতের মধ্যে তাঁর দেহ লুটিয়ে পড়ে। আগ্নেয়াস্ত্রটা ছিল ব্রাউনিং পিস্তল।

---

(২) ডি সি ছাপতে ডি ডি হয়েছে, দীনেশচন্দ্র রায়, অর্থাৎ প্রফুল্লচন্দ্র।

বাবা

অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়

এই পৃথিবীতে সব মানুষের সব কিছু থাকে না। কারোর এটা নেই, কারোর ওটা বেশী। কেউ গরীব, কেউ বড়লোক। কারো হাত নেই, কারো চোখ নেই। যার যাই থাক বা না থাক, সব মানুষের একজন থাকবেনই তিনি হলেন বাবা। কাকা, দাদা, পিসি-মাসি থাকতে পারে নাও থাকতে পারে। কিন্তু বাবাকে থাকতে হবেই। তা সে বাবা যে রকম বা যে ধরণেরই হক। বেঁটে মোটা, ভাল মন্দ, রাগী বদরাগী। এবং যার বাবা সে যে রকমই হক খিট-খিটে, কঞ্জুস কুলি বা অফিসার। মোট কথা মানুষ মাত্রেরই বাবা আছে অবশ্যই। অনেকের একই বাবা, অর্থাৎ এক বাবার একাধিক পুত্র-কন্যা। তবে এর উল্টোটা সম্ভব নয়, মানে কারো একাধিক বাবা। সম্ভব নয়, তাই বা বলি কি করে। কারণ ডাইভোর্স বা বিবাহবিচ্ছেদের কৃপায় মায়ের স্বামী বদল হলে, মায়ের আগের পক্ষের পুত্র-কন্যাদের বাড়তি বাবা হতে পারে বৈকি। অতএব জন্মদাতা বাবা ছাড়াও, ছেলেমেয়েদের বাবা নম্বর দুই থেকে নানা সংখ্যার বাবা পেতে বাধা নেই।

বাবার ব্যাপারে বাড়তি বাবা থাকুক বা না থাকুক, বাবা থাকতে হবে সব মানুষেরই। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। বাবা আগে, পুত্রকন্যারা তার পরে। অবশ্য কথাটা ঠিক হল না। বাবা আগে হলেও সন্তান না হলে কোন পুরুষই বাবা আখ্যা পাবে না। লোক যে রকমই হক, বাবা ছাড়া তার গতি নেই। গতি তো পরের কথা, বাবা ছাড়া তার পৃথিবীতে আগমনই নেই। সুতরাং আমাদের সকলেরই জীবন বাবাময়। বাবা ভাগ্য আপনার ভাল নাও হতে পারে, উপায় নেই। বাবাকে আপনার পছন্দ হক বা না হক, বাবার ব্যবহার, মতবাদ ও কাজকর্মে আপনার মতের যতই অমিল হক, বাবার বোঝা আপনাকে বইতেই হবে। বাবার বাড়াবাড়ি সহ্য করতেই হবে। আপনি ইচ্ছে করলে কাটতে পারেন বাবাকে, কিন্তু ছাটতে কিছুতেই পারবেন না।

কারণ সব সময় সদা সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে। জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনি বাবার কাঁধে বা বাবা আপনার কাঁধে। আপনি জন্মালেন, নামকরণ হবার আগেই মায়ের পেট থেকে পড়া মাত্রই হয়ে গেলেন সন অফ অমুক চন্দ্র অমুক অর্থাৎ অমুকবাবুর পুত্র। কন্যা হলে ডটার অফ অমুকবাবু। সেই অমুক-বাবুকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ছাড়াতে পারবেন না। না ভুল হল। মৃত্যুর পরও পারবেন না। কেননা বাবার মৃত্যু হলেও আপনি যে অমুক বাবুর পুত্র এ সত্য কিছুতেই যাবে না। শুধু একটু সংশোধন হবে এই যে, আপনি এখন স্বর্গত অমুক বাবুর পুত্র বা কন্যা। বাবাকে বাদ দেয়া সোজা নয়। আপনি মরে গেলেও ভাবছেন বাবার হাত থেকে রেহাই পেলেন? মোটেই না। মৃত্যুর পর পুত্র-কন্যারা যখন আপনার শ্রাদ্ধ করবে (অবশ্য যদি করে) তখন লেখাবেন তাদের বাবার নাম এবং বাবার বাবার নাম, অর্থাৎ আপনার বাবার নাম টেনে আনতে হবে।

বাবা সর্বস্ব আমাদের জীবন। যে কোন ব্যাপার, যে কোন কাজ প্রথম প্রয়োজন নিজের নাম এবং তারপরেই বাবার নাম। স্কুলে ভর্তি, চাকরির দরখাস্ত, মামলা-মকদ্দমা, বিয়ে, পৈতে, ইনসিওরেন্স-প্রপোসাল: বাবা কোথায় নেই? সব ক্ষেত্রেই বাবার নাম লেখার ব্যবস্থা। ট্যাক্সের পাওনা থেকে শ্মশানের রেজিস্টার: বাবা নাক গলিয়ে আছেনই। বাবা ছাড়া গতি নেই। আলাপ-পরিচয়, চেনা-জানার প্রথম প্রশ্ন মশায়ের নাম কি, আর তার পরের প্রশ্ন, বাবার নাম। বাবা ছাড়া আমরা কেউ সম্পূর্ণ নই।

আপনি যদি পিতৃভক্ত হন, অতি উত্তম কথা। পিতাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করা প্রতি সন্তানেরই অবশ্যকরণীয় কর্তব্য। কিন্তু ও জিনিসটা ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। কেন আজকাল কমে যাচ্ছে সে আলোচনা এখানে নয়। তবে এটা ঠিক যে তেমন তেমন বাবা হলে সব মেয়েই বাবার ভার বইতে রাজি। বাবার নাম বলার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ খাতির, বলকি, অমুক বাবুর ছেলে তুমি, জেনে ভারি আনন্দ হল। বস, বস। ছেলেমেয়েরা ইদানীং বাবার হাঁকডাক, সম্মান, প্রভাব প্রতিপত্তি দেখে বাবার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধায় উচ্ছসিত হচ্ছে।

এম-পি বা মিনিস্টার বা ওই ধরনের কিছু হলে যে কোন ছেলেমেয়েই বাবার পরিচয় সগর্বে জাহির করে বেড়ায়। স্কুল মাস্টার কি কেরাণী বাবাতে পিতৃভক্ত ও কর্তব্যপরায়ণ পুত্রকন্যারা ছাড়া আর কেউ বড় একটা খুশী হয় না। এই অবস্থার জন্যে কোন পক্ষ কতটা দায়ী সে আলোচনাও এখানে অপ্রাসঙ্গিক। তবে কোন ছেলেমেয়ে কোথাও বাবার নাম জানাবার পর যদি মন্তব্য শোনে, ও তুমি সেই মাতাল, বদমাইস, জুয়াচোর, লম্পট বা হারামজাদার ছেলে, তখন তাদের যদি পিতৃভক্তি মাথায় ওঠে, তবে বলবার কিছু আছে কি?

জন্মদাতা বাবা বা পুনরায় বিবাহের বাবা ছাড়াও বাবা অনেক আছে। বিয়ের পর সব ছেলেমেয়েরই একটি বাবা বাড়েন। তিনি হলেন শ্বশুরমশাই। শ্বশুরমশাইও জামাইকে বাবাজীবন ডাকে সম্বোধন করে আর একটি বাবা বাড়ান। এছাড়াও বাবা অনেক। বাবার সংখ্যা দিনে দিনে বাড়তিরই দিকে। সাধু-বাবাতে আজকাল দেশ একরকম ছেয়েই গেছে। সাধুবাবার আবার নানা সংস্করণ—মৌনীবাবা, যোগীবাবা, পাগলাবাবা ইত্যাদি। বাবা থাকতে বাবা ডাক তো থাকবেই। কিন্তু যদি কোন মহাপ্রলয়ে পৃথিবী থেকে সব বাবারা খতম হয়ে যায়, তবুও বাবা ডাক থেকে যাবে। কারণ বাবা ডাকের এ জগতে শেষ নেই। এই যে কেমন আছ বাবা, সব ভাল তো বাবা। দেখা হলে পরিচিতদের প্রশ্ন। অপরিচিতদেরও প্রশ্ন আছে, অমুক রাস্তাটা কোন দিকে বাবা, অমুক নম্বরের বাড়ীটা কোথায় বাবা, অমুক জায়গায় যাবার বাস কোথা থেকে ছাড়ে বাবা ইত্যাদি। বাবা আশীর্বাদে তো আছেই—সুখে থাক বাবা, বেঁচে থাক বাবা, উন্নতি কর বাবা এই সব। শুধু তাই কেন পেট ব্যথা, বাতের ব্যথা, দাঁত কনকনানি ইত্যাদি নানা রকমের প্রচণ্ড ব্যথাতে বাবাকেই স্মরণ, বাবারে যন্ত্রণায় মরে গেলুমরে। মারামারিতেও মারের আগে ও পরে বাবাকে ডাক। বাবারে মেরে ফেললেরে, বাবারে বাঁচান। সংসারের অভাব-অভিযোগ, নানা ঝামেলা, ঝঞ্ঝাটে, বহুবিধ ঝক্কিতে, ছেলেমেয়েদের কাণ্ড-কারখানায় বিরক্ত ও অতিষ্ঠ হয়ে বাবা-মার মাঝে মধ্যে চীৎকার তো আছেই। বাবারে আর পারি না, বাবারে এরা হাড়মাস জ্বালিয়ে খেলে, বাবারে এবার পাগল হয়ে যাব ইত্যাদি। প্রশংসা ও তারিফ করাতেও বাবা হাজির। পিঠ চাপড়ে বা বা। একগাল হেসে, বাবা, বেশ বেশ। ঝগড়া মারামারিতে বাবা তো আছেনই, গালাগালিতেও বাবাবাদ নেই। আয় দেখি কেমন বাপের ব্যাটা। এক চড়ে বাপের নাম ভুলিয়ে দেব। এত সহজে বাবার নাম ভোলান কোনমতেই সম্ভব নয়। অপর পক্ষও থামবেন কেন? খবরদার বাপ তুলিস না বলছি। বাবাকে সশরীরে তোলা সম্ভব না হলেও, বাপ তুলে গালাগালিতে মাথা ফাটাফাটি অনেক হয়েছে। অতএব বাবারা জগতে কেউ যদি নাও থাকেন, বাবা ডাক ঠিকই থেকে যাবে। ঠাকুর দেবতাদের মধ্যেও দেখুন না, বাবাদেরই সংখ্যাধিক্য। বাবা ভোলানাথ, বাবা বিশ্বনাথ, বাবা শংকর। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তিন প্রধান দেবতাই তো বাবা। কার্তিক ও গণেশও বাবার পর্যায়ে।

বাবাময় এ জগতে বাবা ডাক, বাবা নাম সর্বত্র। নিজের বাবা তো আছেই। তার ওপর গুরুদের আরো বাবা। কেউ বাবা ওংকারনাথের শিষ্য, কেউ সাইবাবার, কেউ মেহেরবাবার। এই বাবাদের অগুণতি সন্তান। ছেলেমেয়েদের নালিশ সব অবুঝ বাবার কাছে, বাবার নালিশ আবার সবচেয়ে বড় বাবার কাছে, বাবা গো এ ভবসিন্ধু পার করাও। সুখে যেমনি বাবা, বাবা, বেশ বেশ। দুঃখেও তেমনি বাবা, বাবাগো এ কি সর্বনাশ করলো।

পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সব গভর্ণমেন্টই চিন্তিত। লোক বাড়ার প্রথম ধাপ বিয়ে। বিয়ে বাড়লেই বাড়বে বাবা। বাবা বাড়ছে, তাই বাড়ছে লোকসংখ্যা। অদ্য যে ছেলে, কাল সে বাবা, আবার পরশু তার ছেলেও হবে বাবা। অতএব বাবা হবার জন্যে চাই বিয়ে। অবশ্য বিয়ে না করেই যারা বাবা হচ্ছে, সেই অবৈধ বাবাদের বাদ দিলাম। বাবার ব্যাপারে বড় কথা, বাবা হওয়া পুরুষদেরই একচেটিয়া। মেয়েরা শত চেষ্টা করেও বাবা হতে পারবে না। তবে সব পুরুষমানুষ ইচ্ছে করলে বিয়ে অবশ্যই করতে পারবে, কিন্তু বাবা হতে পারবে এ গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবেন না। বাবা হবার জন্যে তখন ওষুধ-পত্তর, মাদুলি, তুকতাক, শেষে বাবা তারকেশ্বরের দোরে হত্যা। অবশ্য যারা বাবা হতে চান না বা বাবা হওয়া বিলম্বিত করতে চান, তাঁদের কথা আলাদা।

বাবার ব্যাপারে বিশেষত্ব এই, বাবা সকলের একটিই। কাকা, জ্যাঠা, দাদাদের বেলায় তারা একটিও থাকতে পারে বা একাধিকও, কিন্তু বাবা একটি মাত্র: জন্মদাতা বাবাকে বলছি। বড়দা, ছোড়দা, বড় জ্যাঠা, সেজো কাকা মেজো জ্যাঠা, ইত্যাদি শ্রেণী বিভাগ আছে কিন্তু বাবার ব্যাপারে বড় বাবা, সেজো বা ছোটো বাবা নেই। বাবা একটিই। তাকে বাবা বলুন, না হয় ড্যাডি বলুন, পাপা বলুন বা বাবু বলুন। আধুনিকতার প্রচণ্ড বন্যায় বাবার 'বাবা' নাম কতদিন টিঁকে থাকবে কে জানে।

আপনার বাবা জীবিত থাকুন বা মৃত, আপনি বাবা হন বা না হন, হতে পারুন বা না পারুন, বাবাময় এই পৃথিবীতে বাবা নাম বহুবার ডাকতে হবে আপনাকে, আর বিরক্ত ও অতিষ্ঠ হয়ে বলতে হবে বহুবার, বাবারে বাবা!

অকিঞ্চনের গঙ্গামঙ্গল পুঁথির উত্তরাংশের প্রথম পৃষ্ঠা
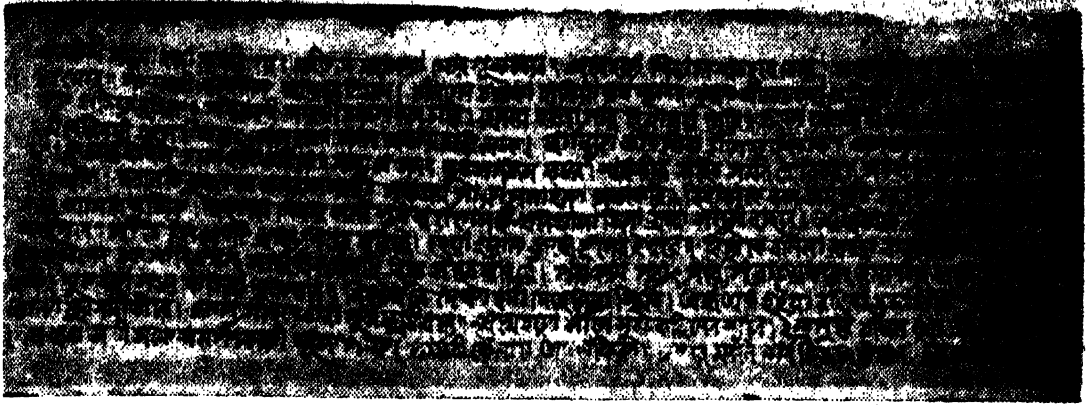
বিস্মৃত কবি দ্বিজ বাঞ্ছারাম

গ্রাম বাঙলার কোন কোন স্থানে অনুসন্ধান করলে কিছু কিছু প্রাচীন পুঁথি আজও চোখে পড়ে। এদের মধ্যে যেগুলি আবার অপ্রকাশিত ও অজ্ঞাত সেগুলি খুবই কৌতূহলের সৃষ্টি করে। এরকম দু-একটি অপ্রকাশিত পুঁথির কথা আগে উল্লেখ করেছি। সম্প্রতি আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে লেখা আর একটি অপ্রকাশিত পুঁথির সন্ধান আমি পেয়েছি। এটিকে একটি সম্পূর্ণ পুঁথি বলে মনে করলে ভুল করা হ'বে। কিন্তু প্রাচীন তুলট কাগজে বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ের আকারের একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকায় বাঙলা ১১৬৩ সালে লেখা কয়েকটি পদ্যপূরণ একটি দোহা, একটি দীর্ঘ চৌতিশা ও ছোট ছোট আরও অনেক কবিতা লক্ষ্য করে এটিকে অন্যান্য জীর্ণ পুঁথিপত্রের মতো উপেক্ষা করা চলে না। মোটা তুলট কাগজের প্রতি পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল কালো কালিতে লেখা এই পুস্তিকাটির অবস্থা এখনও বেশ ভালো। পুস্তিকাটিকে একটি সংকলন-গ্রন্থবিশেষ বললে চলে। এতে জ্যোতিষগণনাপদ্ধতি, কাড়াকুড়ি, তুকতাকের মন্ত্রের সঙ্গে উপরি উল্লিখিত কবিতাগুলিও স্থান পেয়েছে। কবিতাগুলিতে যে ভণিতা আছে, তা হ'ল দ্বিজ বাঞ্ছারামের। বাঙলা-সাহিত্যের ইতিহাসে কোথাও এ কবির নাম আছে বলে জানা হয় না। কিন্তু দ্বিজ বাঞ্ছারামের রচিত দোহা ও পদ্যপূরণসমূহে তাঁর কবিত্বশক্তির পরিচয় মেলে। পুস্তিকার তিনটি স্থানে সালের উল্লেখ আছে। ১১৫৬ সাল দুবার ও ১১৬৩ সাল একবার উল্লিখিত হয়েছে। লেখা খুব স্পষ্ট ও সুন্দর। আজ থেকে দু'শ বাইশ বছর আগে পুস্তিকার আকারের এই ছোট পুঁথিটিকে বর্তমানের মুদ্রিত কোন ক্ষুদ্র গ্রন্থের মতো দেখে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়। লেখার ছাঁদ ও হস্তাক্ষরও আঠারো শতকের লিপির মতো। মনে হয় কোন ব্যক্তি এটিকে একটি সংকলন গ্রন্থ করতে চেয়েছিলেন। দ্বিজ বাঞ্ছারামও এতে স্থান পেয়েছেন।

প্রাচীন বাঙলায় বিশেষ করে আঠারো শতকের দিকে কবিতাপূরণ কবিদের মধ্যে খুব চালু ছিল মনে হয়। রাজসভায় কবিদের কবিত্বের পরীক্ষা হ'তো কবিতার কোন একটি চরণ বা চরণের অর্ধাংশকে কেন্দ্র করে একটি পূর্ণ কবিতা রচনার মধ্যে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে ভারতচন্দ্রের কবিত্বের পরীক্ষা হয়েছিল এভাবে। 'পায় পায় পায় না' অংশটিকে নিয়ে ভারতচন্দ্র রচনা করেছিলেন চৌপদী ছন্দের একটি ছোট্ট কবিতা। কবিতাটি হ'ল :

চিনিতে নারিনু আমি আইল জগৎস্বামী
মাগিল ত্রিপদভূমি আর কিছু চায় না ।।
খর্ব দেখি উপহাস শেষে একি সর্বনাশ
স্বর্গ মর্ত্য দিব আশ তাহে মন যায় না ।।
গেল সকল সম্পদ এক্ষণে পরম পদ
বাকী আছে একপদ অঙ্গশোধ যায় না।
হ্যাদে শুন হরিপ্রিয়ে বন্দ্যাবেবী দেখাইয়ে
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দিয়ে পায় পায় পায় না ।।
(বলি রাজার উক্তি)

দ্বিজ বাঞ্ছারামের একটি কবিতাপূরণও এখানে উদ্ধৃত করা হ'ল। পূরণীয় বাক্য হ'ল 'কিমিতি কিমিতি'। সম্পূর্ণ কবিতাটি হ'ল এই—

বপু জস্য কুঞ্জ ভুত্যা...ত্তি জন্তি খরা।
শ্রবণযুগল বাক বিধি নিল্য হয়্যা ।।
শুক্লকেশ মস্তকে বিশীর্ণা দন্তাবলি।

চক্ষে না দেখিতে পায় তিমির সকলি ।।
তথাপি নির্লজ্জ মন বিষয়ে স্পৃহতি।
বিপ্র বাঞ্ছারাম বলে কিমিতি কিমিতি।

হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্রের ছোট ছোট কিছু গল্পকেও বাঞ্ছারাম পদ্যাকারে রূপ দিয়েছিলেন। এসব গল্পের শেষের দিকে নীতিমালার গল্পের ন্যায় নীতিবাক্যও রয়েছে দেখা যায়, যেমন :

বাঞ্ছারাম বলে নিজজন স্থানে
কটু না কহিবে তায়।
(অভি?)—মান উত্তর করে সে পামর
ক্ষণেকে মর্যাদা যায় ।।

এর সঙ্গে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে 'সুন্দরের বর্ধমান প্রবেশ' বর্ণনায় একটি অংশের কিছু মিল আছে। যেমন :
নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে
রায় বলে যটি বিদ্যাজোর।

রামায়ণ ও মহাভারতের কোন কোন কাহিনী অবলম্বন করে দ্বিজ বাঞ্ছারাম কয়েকটি ছোট ছোট কবিতা লিখেছিলেন। এই কবিতাগুলির একটি ভণিতা নিম্নরূপঃ
বাঞ্ছারাম দ্রুত ভাবেতে মত্ত
পরিল শ্রীবর্ণজলে।
দা- সর্বনাশ রাখিবে আমাকে
ওহে প্রভু নারায়ণে।।

প্রণব রায়

কবীন্দ্র অকিঞ্চনের সদাগর উপাখ্যানের শেষাংশ

উধৃতির প্রথমার্ধের অর্থ তেমন পরিস্ফুট নয়। দ্বিতীয়ার্ধে কবি সর্বানন্দের জন্য নারায়ণের কাছে প্রার্থনা করেছেন। এই দাস সর্বানন্দ কবির পোষ্য অথবা প্রিয়ভাজন কোন ব্যক্তি কিনা বলা দুরূহ। ভণিতাটি অভিমন্যুর মৃত্যুতে শোকাহত অর্জুনের জয়দ্রথবধ নামক কাহিনীতে আছে। ভারথের অন্ত বলাতে কবি মহাভারতের কথা মনে করেছেন না মহাকবি ভারতচন্দ্রের ইঙ্গিত করেছেন বোঝা যায় না। দ্বিজ বাঞ্ছারামের আরও কয়েকটি ভণিতা হ'ল :

(১) রচে বাঞ্ছারাম যোধানুসারে।
সারদা শ্বহায় সদত্ত জারে
(২) দ্বিজ বাঞ্ছারাম রচে সারদার বরে।
নানা মত ভারত কে বর্ণিতে পারে।।
(৩) দ্বিজ বাঞ্ছারাম রচিল নব্য।
দোষ না লইবে জে জনা ভব্য।।

মহাভারত ও রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত বাঞ্ছারামের এযাবৎ প্রাপ্ত ছোট ছোট কবিতার সংখ্যা হ'ল মাত্র ছয়টি। এছাড়া একটি দোহা গানে ও শ্রীমতী রাধা কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তবচৌতিশায় বাঞ্ছারামের কৃতিত্ব কিছুটা লক্ষ্য করা যায়, যথা—

দোহা।।
দ্বিজত চির দুঃশাসন দারুন
দ্রৌপদী ক্রিয়ত জেভ নটধারি।
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর সভাজন
কোহি না দুহত বত(?) শুধারি।।

দেখি সভাজন জিউ অতি ভারি
কুন্তীবধু পহলাজ মুকারে লাজ
রাখো ব্রজরাজ হামারি।।
এর পর গদ্যের ভাষায় রচিত অংশটি হ'ল:
'শ্রীমতী রাধিকার কলঙ্কভঞ্জনার্থে সহস্রধারাকলশে জমুনার জল আনিতে শ্রীমতি জাত্রা করিলেন সেই কালে ঠাকুরকে স্তব করিতেছেন তাহা অবধান করুন।'

এর পর স্তবচৌতিশার প্রথম কয়েকটি চরণ হ'ল :

কলশী করিয়া কাখে কাঁদে কলাবতি।
কালাচাঁদ কর কৃপা করিহে মিনতি।।
খগদু গন্ধর্ব নর্মদিনি হাসে খল ২।
খর্ব কর খগপতি খল বলাবল।
গদাধর গোবিন্দ গোপাল গিরিধারি।
গন্ধর্বচূর্ণ গোপীনাথ গোকুলবেহারি।।
ঘর হল্য ঘোর মোরে শুন ঘনশ্যাম।
ঘুর‍্যা পড়ি ঘন২ বহে ঘোর ঘাম।

এখানে চৌত্রিশটি অক্ষরের প্রতিটির দুটি করে পংক্তি কবি রচনা করে গেছেন। চৌতিশার শেষে যে ভণিতা আছে এইরূপ:

অনক্ষণ রাখি মন শ্রীমতির পায়।
দ্বিজ বাঞ্ছারাম গান স্তবচৌতিশায়।।

দ্বিজ বাঞ্ছারামের এ চৌতিশার কয়েকটি পংক্তির সাথে ভারতচন্দ্রের একটি চৌতিশার কয়েকটি পংক্তির মিল সহজেই চোখে পড়ে। তবে ভারতচন্দ্র স্বরবর্ণগুলিরও নিপুণভাবে ব্যবহার দেখিয়েছেন। ভারতচন্দ্রের চৌতিশাটি হ'ল সুন্দরের কালীস্তুতির আর বাঞ্ছারামের চৌতিশাটি কৃষ্ণস্তুতির। নীচের কয়েকটি পংক্তি থেকে উভয়ের অনেকটা মিল প্রতিপন্ন হবে—

(১) (ক) গিরিজা গিরিশী গৌরী
গণেশজননী (ভারতচন্দ্র)
(খ) গদাধর গোবিন্দ গোপাল গিরিধারি
(বাঞ্ছারাম)
(২) (ক) ছলে লোক ছি-ছি বলে
আঁখি ছল-ছল (ভারতচন্দ্র)
(খ) ছল-ছল মন ছলে করহ ছেদন।
ছি ছি জে লোকে বলে
তোজিব জীবন।। (বাঞ্ছারাম)

বাঞ্ছারামের এ চৌতিশাটির অনেকগুলি পংক্তির সংগে ভারতচন্দ্রের চৌতিশার বহু পংক্তির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। তাই মনে হয় বাঞ্ছারাম ভারতচন্দ্রের কিছু পরে কবিতা রচনায় হাত দিয়েছিলেন। অন্ততঃ খ্যাতিমান্ কবি ভারতচন্দ্রের রচনার সংগে তাঁর যে বিশেষ পরিচয় ছিল তা বেশ বুঝতে পারা যায়। তাই বাঞ্ছারামকে ভারতচন্দ্রের পরবর্তী মনে করলে বোধহয় অসঙ্গত হবে না। তবে আঠারো শতকের উত্তরার্ধে তিনি হয়তো কবিখ্যাতি লাভের জন্য প্রয়াসী হয়েছিলেন।

বাঞ্ছারাম খনার প্রবচনের আকারে কতগুলি পদও রচনা করেছিলেন, যেমন—

তারাশুদ্ধি তত্ত্ব বাঁজ ভাসায় শুন্যম।
জন্মতারায় যাত্রা করা বড়ই বিসম।।
সম্পৎ সকল শুভ সর্বত্র মর্যাদা।
বিপৎ আপৎ বাড়া অতয়েব বাধা।।
ক্ষেম হেম সমতুল্য জানিহ তরায়।
প্রত্যারিপাপিষ্ঠ নানা উৎপাত করায়।।
সাধকে বাধক নাঞি অতি শুভ করা।
বধ-বিসতুল্য ত্যাগ এই প্রাণহরা।।
মিত্রাদিমিত্রসংজ্ঞা সাদু এই তারা লব।
বাঞ্ছারাম দ্বিজে বলে ইথে শুভাশুভ।।

এছাড়া বাঞ্ছারাম সপ্তসলাকার ভাষানুবাদও করেছিলেন। এই অনুবাদের শেষে ভণিতায় তিনি বলেছেন :

স্বাতি শতভীষা স্বাত বিসাখা ধনিষ্ঠা জাত
সারদায় করিয়া প্রণাম।
সপ্তসলাকার জত ভাষিল ভাষায় মত
দ্বিজকুলোদ্ভব বাঞ্ছারাম।।

বাঞ্ছারাম সম্পর্কে আর কিছু জানা যায়নি।

আঠারো শতকের সাহিত্যের একটি মূল্যবান অবদান হ'ল শাক্তপদাবলী। রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের মতো শক্তিসাধকের শাক্তপদাবলী বাঙালীর অন্তরকে গভীরভাবে ভক্তিরসে সঞ্জীবিত করেছিল। বাঙলার আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠতো মাতৃরূপিণী শক্তির প্রতি ভক্ত সন্তানের কাতর প্রার্থনায়। সেই মাতৃসঙ্গীত আজও সকলের প্রিয় ও ঘরে ঘরে আদৃত। রামপ্রসাদী ও কমলাকান্ত ছাড়া আঠারো শতকের কবি অকিঞ্চন চক্রবর্তীর ভক্তিমূলক কয়েকটি মাতৃসংগীত আজও আমাদের অজ্ঞাতে রয়ে গেছে। রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের মতো অকিঞ্চনের পদগুলির ভাবও খুব উচ্চস্তরের। নীচে অকিঞ্চনের দু-একটি পদ উদ্ধৃত করা হ'ল। এগুলি থেকে ভক্তিমূলক পদ রচনায় অকিঞ্চনও যে রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের সমকক্ষ ছিলেন তা বোঝা যায়—

(১) মা বল্যা দুর্গার নাম অমনি দিন
গেল গো আমার দিন
বিজ্ঞান হরিয়া লের কেন মা অজ্ঞান দের
ক্রিয়াহীন দেখ্যা দিন পায় ঠেল্যা গেল।।
ইন্দ্রিয় হইল জালা ঘটার সর্পের মালা
ভজনে করিয়া হেলা জন্মের জালা মাথার
করা নিজ।।

রূপার গোম্পা ও কাকলিং

সুমিত সান্যাল

রূপা। শেরদুকপেনসের প্রাণকেন্দ্র।

ঘুরতে ঘুরতে আগস্টের এক সন্ধ্যায় ঠিকরে এসে পড়েছিলাম রূপায়। জ্যোৎস্না রাত। কোথাও বিজলীর রশ্মি নেই। তাই যেন সে রাত ছিল আরও মিষ্টি। অপরূপ রূপার রাতের সৌন্দর্য। রূপসী রূপাব দুক্সা খো'র মিষ্টি গান যেন মনকে আরও দূরদিগন্তে বার বার হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। এ যেন অনেকটা সেই প্রথম দর্শনে প্রেমে পড়ার মতন। পরের দিন সকালে ভোরের কুয়াশা ভেদ করে যখন প্রথম সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ল তখন রূপা যেন সত্যিই রূপার মত ঝিলিক দিয়ে উঠল।

যেমন সুন্দর নাম তেমন সুন্দর এখানকার অধিবাসী। চারিদিকে পাহাড়। মাঝখান দিয়ে ছুটে চলেছে দুক্সা খো নদী। তার দুপাশে সরু এক ফালি সমতল এলাকা। ধারে ধারে শেরদুকপেনসের বসতি। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে এক পাশে অধুনা গড়ে উঠেছে উদ্বাস্তু তিব্বতীয়দের ডেরা। প্রায় নদীর কোল দিয়ে ছুটে চলেছে সরু কালো ফিতের মত পিচে-ঢালা পথ। তার দুপাশ দিয়ে সারিবদ্ধ কয়েকটি দোকান। নদীর আর এক পারে এক কোণে একটি সিনেমা হল। ওটা ফৌজীদের। হাট-বাজার এবং মনোরঞ্জনের জন্য দূর গাঁ থেকে অনেককে রূপায় আসতে হয়। আর সেই জন্যই বোধ হয় রূপা শেরদুকপেনসের প্রাণকেন্দ্র। এখানে কোন বড় সরকারী অফিস নেই।

এখানে আছে একটি সরকারী হাসপাতাল, একটি উচ্চ প্রাইমারী স্কুল। এবং সি পি ডবলিউ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ারের অফিস। নদীর পার ঘেঁষে একটি ইন্সপেকশন বাংলোও আছে।

রূপার অধিবাসী শেরদুকপেনসের সম্বন্ধে জানার একটা প্রবল আগ্রহ ছিল। আগ্রহ ছিল তাদের স্মৃতিপটে ধরে রাখার জন্য আলোকচিত্র গ্রহণ করা। কিন্তু পাহাড়ীরা বড়ই লাজুক। ফটো তুলতে গেলে লজ্জায় পালিয়ে যায়। কাজেই মন চাইছিল ঘনিষ্ঠ হতে। কিন্তু বিনা কারণে কেউই ঘনিষ্ট হতে চায় না। এবং সে প্রচেষ্টা অনেকেই সন্দেহের চোখে দেখে। তবুও একদিন সুযোগ মিলে গেল।

স্থানীয় ডাক্তারের আড্ডায় আলাপ হয়ে গেল নোরবু থংসের সঙ্গে। সে পুরুলিয়ার রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুলে একাদশ শ্রেণীতে পড়ে। তার মেজর ভার্নিকুলার বাংলা। কাজেই হিন্দী, ইংরেজী, বাংলা এবং অসমীয়া চারটে ভাষায় সে সমানভাবে পারদর্শী। স্থানীয় গাঁওবুড়োর ছেলে সে। তারই খুড়তুতো না হয় মামাতো ভাই নরেন্দ্রপুর থেকে ইতিহাসে অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করেছে। তার সঙ্গেও আমার আলাপ হয়েছিল। চমৎকার বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। কথায়-বার্তায় আলাপে অদ্ভুত স্মার্ট।

একটি মুখোস

যাই হোক নোরবুর সঙ্গে আলাপে খুব তাড়াতাড়ি আন্তরিকতায় এসেছিলাম। কারণ ভাষার কোন ব্যবধান ছিল না।

•

গ্রাম ছাড়িয়ে এক প্রান্তে রূপার গোম্পা। দূর থেকে পতাকা উড়তে দেখা যায়। তারপর প্রার্থনার চাকা। মন্দিরে প্রবেশ করার আগে বাঁদিকে মন্দির সংলগ্ন আর একটি ছাউনি। এখানেই মন্দিরের লামা থাকেন। পাশেই একটি পাঠাগার। ১৫০ থেকে ২০০র মত পুঁথি হবে। সবই নাকি তিব্বতীয় ভাষায়। পাশেই দাঁড় করান লম্বা লম্বা তিব্বতীয় শিঙ্গা। তামার তৈরী।

গোম্পার মূল অট্টালিকাটি তিনতলা-বিশিষ্ট। এক সময় এটাকে দুর্গ হিসেবে ব্যবহার করা হোত। এখনও দেখলে তাই মনে হবে। আকা'রা যখন রূপা গাঁও আক্রমণ করত তখন গ্রামের লোক এই দুর্গে এসে আশ্রয় নিত। নীচের তলায় এক কোণে এখনও একটি কয়েদখানা আছে।

গোম্পার ভিতরে সম্মিলিত ভোজের রান্নার জন্য বিশেষ পাকশালা এবং ভোজন কক্ষেরও ব্যবস্থা আছে। প্রতি গোম্পার মত রূপারও গোম্পার একজন লামা আছেন। তাঁর কাজ প্রতিনিয়ত মন্দিরে পূজাপাঠ করা, পাঠাগার রক্ষা করা। গ্রামের প্রতিটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দেওয়া।

তাওয়াং-এর গোম্পার পর রূপার গোম্পা সব চেয়ে প্রাচীন। আনুমানিক রূপার গোম্পার বয়স দুইশ বৎসরের মত। কাজেই শেরদুকপেন এলাকায় এই গোম্পাটি সব থেকে পুরোন।

মন্দির আসলে দোতলায়। প্রশস্ত হল ঘর। ভিতরে অন্ধকার। নানা মূর্তি আছে সেখানে। তাদের কারও নাম জেমজান নোরবু,

রূপার [illegible] ছবি

রূপসী রূপা

গোপান পেম্মা থুং মে—এই রকম। সব নাম আজ মনেও নেই। দেয়ালে কয়েকটি দেয়াল-চিত্রও আছে। এই সব দেয়ালচিত্র নাকি তওয়াং থেকে শিল্পীরা এসে তৈরী করেছে।

তিনতলায় প্রশস্ত হল ঘর। তার ওপর মাচাং। সেখানে লাইন ধরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে বিভিন্ন মুখোস। এই সব মুখোস বিভিন্ন নৃত্যের সময় ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া গোটা কয়েক টুপিও আছে। ইয়াকের লেজ থেকে এগুলো তৈরী। এবং কয়েকটি চামরও আছে। এ সবই নাকি তওয়াং থেকে সংগ্রহ করা। কিন্তু মাচাং-এর ওপর ঘুটঘুটে অন্ধকার।

তবে তওয়াং-এর গোম্পার মতন কার্পেট রঙীন পর্দা, ডিভান ও চেয়ার দিয়ে সাজানো রূপার গোম্পা তেমন নয়। তওয়াং-এর গোম্পা যেন ঐশ্বর্যের প্রতীক। আর রূপার গোম্পা দীনের ভক্তির স্থান। তবে রূপার গোম্পায় ১৯৫৮ খৃঃ তওয়াং-এর রিয় পচে এসেছিলেন। আর ১৯৫৯ খৃঃ এপ্রিল মাসে দলাই লামা এসেছিলেন।

রূপার গোম্পায় বার কয়েক গিয়েছি। শেষবার গিয়েছিলাম আমার কিশোর বন্ধু নোরবুর সঙ্গে। আশা ছিল কয়েকটি ফটো ভাণ্ডারে নিতে পারব। আমার কিশোর বন্ধু যাকেই অনুরোধ করল সেই-ই হাসি হেসে পালিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছুলাম গোম্পায়। তার আগের দিন ওদের গ্রামের এক মহিলা মারা যান। তারই আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে তখন সম্মিলিত ভোজ হচ্ছিল। লামা সবে মন্ত্র পাঠ শেষ করেছেন। সবাইকে লাও-পানি বিতরণ করা হচ্ছিল।

এমন সময় একটি মেয়ে লাজুক লাজুক মিষ্টি হাসি হেসে নোরবুর সঙ্গে যেন কি বলছিল। মেয়েটি বেশ সুন্দরী। পায়ে জুতো-মোজা পরা। নোরবু আলাপ করিয়ে দিল যে, সে তার সম্পর্কে বোন। বোম-ডিলার স্কুলে পড়ে। ছুটিতে এসেছে।

আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে নোরবু বললে—

—ও জিজ্ঞেস করছে আপনারা যদি একটু লাও-পানি খান?

—আমি তো ভাই ওসব খাই না।

—একটু যদি খান তাহলে ওরা খুশী হবে।

—যদি না খাই তাহলে—?

—ওরা মনে কষ্ট পাবে। ভাববে যে, ওদের আপনি ঘৃণা করেন।

—এ তো খুব মুস্কিলের কথা নোরবু?

—একটু খান না। একটু খেলে কিছু হবে না।

—তুমি খাচ্ছ?

—আমিও তো খাই না। তবে আজকে সামাজিক রীতি হিসেবে খেতে হবে।

আমি তখন সঙ্গীদের দিকে তাকালাম। একজনের নাম গোড়। [illegible] লোক। আর একজন কাকলে। মহারাষ্ট্রের অধি-বাসী। তারা উভয়েই আমার মতো ঐ এলাকায় নতুন। কিন্তু কিছু এদের রীতিনীতি ও ভাষার সঙ্গে পরিচিত। তারা সংসারী। বোধ হয় তাদের চক-চক করছিল। শুধু একটু অনুমতির অপেক্ষা। আমি জিজ্ঞেস করলাম—

—কেমন হোগা খোয়া?

—আই [illegible] দে তো—

—পহলে কি পিয়া [illegible]?

—বহুত দফে সাব।

—ক'হা মিলতে হ্যায়?

—চ'র সে [illegible] তো মিলতী [illegible] হ্যায়।

—তো দো আব—। অর্থাৎ নোরবুকে বললাম তোমার অনুরোধ রাখবে।

মেয়েটি হাসতে হাসতে ছুটে চলে গেল। চারটে সুন্দর নক্সার পোর্সিলিনের বাটি নিয়ে এল। আর লাও-পানির জন্য একটি মাটির কলসী। কলসী থেকে একটি বাটিতে [illegible] [illegible] আমি [illegible] উঠলাম,—থোক অলপ্থাম দিবেন।

—অর্থাৎ আমায় অল্প একটু দেবেন। ভাষাটা অসমীয়া। এঁরা অনেকেই অল্প-বিস্তর অসমীয়া জানেন। এদিকে দীর্ঘদিন থাকতে-থাকতে আমিও অল্প-বিস্তর বুঝতে এবং বলতে শিখেছিলাম।

গোড় আর কাকলে চোঁ চোঁ করে তিন বাটি উড়িয়ে দিলে। আমার আর বাটিতে আমি একটু আঙুল দিয়ে ছিটিয়ে ফেলে বাকী বাটিটা গোড়ের দিকে এগিয়ে দিলাম। সেটা ও চোঁ করে উড়িয়ে দিল। নোরবুও এক বাটি শেষ করে দিল। আমরা মেয়েটিকে নমস্কার জানিয়ে চলে এলাম।

গোম্পা থেকে বেরিয়ে রাস্তার তেমাথায় এলাম। একটি পথ রূপার বাজারের দিকে গেছে। একটি জীগাঁও, শেরগাঁও-এর দিকে গেছে। আর একটি গোম্পার দিকে। এই তেমাথায় ওরা আসামের মাননীয় মন্ত্রী এরিং-এর একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করছিল। অপেক্ষা করছিল স্থানীয় স্কুল শিক্ষক মহাশয়ের জন্য। যিনি এসে ঐ সিমেন্ট বাঁধার উপরে ইংরেজীতে—

"In memory of Honourable Minister of Assam ERRING — erected by Rupa Peopl"

এই কথা কটি লিখবেন। এদিকে মাস্টার-মশায়ের বিলম্ব। আর একদিকে আমায় পেয়ে গেল। অতএব আমাকেই শুরু করতে

হয়েছে গ্রামবাসীদের অনুরোধে। এক লাইন শেষ করতেই শিক্ষক মশায় এসে গেলেন। বাকীটা তিনিই শেষ করলেন। আমি গাঁও-বুড়োকে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলাম।

•

যে পথে গোম্পায় গিয়েছিলাম সেই পথে প্রথমেই কাকলিং পড়ে। নোরবু আমাদের সঙ্গে ছিল। সেই আমাদের কাকলিং-এর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে শুনিয়েছিল।

কাকলিং কথার অর্থ ফটক বা গেট। সে ফটক গ্রামেরও হতে পারে, গোম্পারও হতে পারে। কিম্বা কোন বিদ্যালয়েরও হতে পারে। দুদিকে ১৫ ফিট উচ্চতাবিশিষ্ট দেয়াল। তার উপর গম্বুজবিশিষ্ট ছাদ। ছাদের নিম্নভাগে আঁকা থাকে ড্রাগন ও বুদ্ধমূর্তি। বৌদ্ধ সংস্কৃতি অনুযায়ী আরও বিভিন্ন চিত্র।

কাকলিং প্রতিষ্ঠা করা হয় যাতে গ্রামে ফসল ভাল হয়। গ্রামবাসী যাতে বিভিন্ন রোগে না ভোগে। এবং এও বিশ্বাস করা হয় যে কাকলিং গ্রামের লোকদের উন্নতি ও শান্তির সহায়ক। ভূত-প্রেতের কোপদৃষ্টি থেকে গ্রামকে মুক্ত রাখে। মারী ও মড়ক থেকে গ্রামকে রক্ষা করে। যারা এই ফটকের মধ্যে দিয়ে যায় ভগবান বুদ্ধ তাদের মঙ্গল করেন। প্রাণীরা এই ফটকের মধ্যে দিয়ে গেলে পরজন্মে মানুষ হয়ে জন্মলাভ করবে।

কথিত আছে বুদ্ধ পরার পাওয়া যায় 'মীন্টো পেথা' নামে একটি পদ্মফুল। তার থেকে জন্ম নেন 'সাম্পো থুঙ্গে গে সুং' বা এক বৌদ্ধ ভিক্ষু। তিনিই নাকি জনসাধারণকে উপদেশ দেন যে, যদি এই রকম কাকলিং গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহলে গ্রামের লোকের প্রচণ্ড উপকার হবে। সেই থেকে বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসীদের গ্রামে গ্রামে কাকলিং প্রতিষ্ঠা করা একটা ট্রাডিশন হিসেবে চলে আসছে।

এক একটি কাকলিং প্রতিষ্ঠা করতে হাজার টাকার উপরে ব্যয় হয়। গ্রামের লোক চাঁদা তুলে এর ব্যয়ভার বহন করে।

রুপোয় দুটি কাকলিং আছে। একটি উচ্চ প্রাইমারী বিদ্যালয়ের সামনে। দ্বিতীয়টি রুপোর গোম্পার পাশে। এইটিই বিশিষ্ট এবং পুরোন কাকলিং। রুপোর এই বিশিষ্ট কাকলিংটির ছাদের নীচের ভাগের চিত্রটি চারটি ফটক এবং মধ্যবর্তী ভাগে আটটি বৃত্তের সমষ্টি একটি বৃহৎ বৃত্ত। তারও মধ্যবর্তী স্থানে আরও একটি বৃত্ত। তার মাঝখানে একটি পুস্তকের চিত্র। এই পুস্তকটি ধার্মিক এবং চিকিৎসা শাস্ত্র বিষয়ক। তার নাম 'মান্দে পেচা'। কথিত আছে এই গ্রন্থটি আটজন লামা মিলে লিখেছিলেন। তাদের মধ্যে সাক্‌সচা থুবার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। তিনি নাকি ১১৬টি ধর্মবিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতা।

মধ্যবৃত্তের চারিদিক ঘিরে আছে আটটি বৃত্ত। প্রতিটি বৃত্তের মধ্যে এক একজন লামার প্রতিমূর্তি। তাদের ঘিরে আছে একটি চতুষ্কোণ। তার চারটি কোনায় সুন্দর নক্‌সার চিত্র চিত্রিত। সবটাকে মিলিয়ে বলা হয় দয়ান নাগ্গা। কথিত আছে যে এই চারটি কোণ চারটি বস্তুর প্রতীক। রেগ্‌চা—অর্থাৎ কাপড়ের টুকরো। জো—অর্থাৎ আহার্য। দ্রা—অর্থাৎ শঙ্খ। ব্রে—অর্থাৎ করতাল। জুক—অর্থাৎ আর্শি বা আয়না। এইগুলি সব সময় একজন লামার কাছে থাকার রীতি। তারও চার পাশ দিয়ে আর একটি চতুষ্কোণ। তার মধ্যে ১৬টি লামার প্রতিমূর্তি। এক একজন এক একটা ক্ষমতাবিশিষ্ট। এদেরও ঘিরে আছে আর একটি চতুষ্কোণ। তার মধ্যে ২৪টি লামার প্রতিমূর্তি। প্রত্যেকে এক একটি বিশিষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন।

তার নাকি আরও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আছে। তা ক্রমেই নিরস লাগছিল। নোরবু তা বুঝতে পেরে অন্য কথা পাড়ল। আমিও যেন একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। সে তখন তাদের নানা প্রকার উৎসবের কথা বলতে লাগল। তাদের সাত-আট রকমের উৎসব আছে। সেই গল্প শুনতে শুনতে আমরা গোম্পার দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম।

সূর্য পশ্চিম পাটে হেলে পড়েছে। আস্তে আস্তে সন্ধ্যারাণী ধরণীর ওপর তার কালো আঁচলখানি বিছিয়ে দিল। জমাট ঠাণ্ডা আর কুয়াশা আস্তে আস্তে রুপোর বুকে চেপে বসতে চাইল। আমরা নোরবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আরও তাড়াতাড়ি পা চালালাম। কিন্তু হাজার হলে রুপো সেরদুকপেনদের প্রাণকেন্দ্র। কিছু দূরে এগিয়ে যাওয়ার পর দোকানের পেট্রোম্যাক্সগুলোর রশ্মি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

দশ বছর আগে রুপোয় যে চেহারা দেখেছি আজ দশ বছর পরে সে চেহারার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টেছে। আগামী পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে রুপোর অনেক পরিবর্তন হবে। রুপো সত্যিই রূপসী আর রমণীয় হয়ে উঠবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বিজ্ঞানের কথা
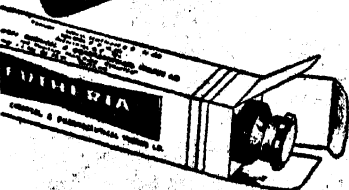
অতিক্ষুদ্র থেকে অতিবৃহৎ জগতের রহস্য-সন্ধানে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা
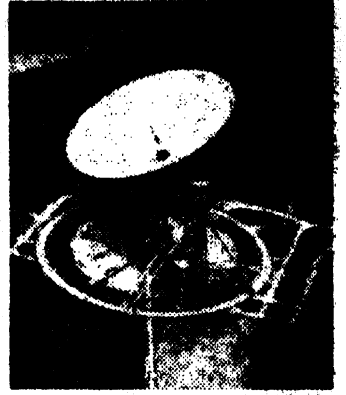
'স্প্যান' পত্রিকার নভেম্বর সংখ্যায় বিজ্ঞানের সীমান্ত নাম দিয়ে বিজ্ঞানবিষয়ক কয়েকটি বিশেষ প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তার মধ্যে একটি প্রবন্ধ বোম্বাইয়ের টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফাণ্ডামেন্টাল রিসার্চের বিজ্ঞানীদের কাজকর্ম সম্পর্কে, লেখক এস পি কুমার। লেখক বলছেন, বিজ্ঞানের কোনো আবিষ্কারই একজন বিজ্ঞানীর একক কৃতিত্বে ঘটে না, তা হচ্ছে অজস্র গবেষকের গবেষণার সম্মিলিত ফল। এই গবেষকরা সব সময়েই যে পুরস্কার ও স্বীকৃতি পেয়ে থাকেন, তাও নয়। গবেষণাগারের বাইরে তাঁদের নাম হয়তো অজ্ঞাতই থেকে যায়। তবুও তাঁরা নিরলস গবেষণা চালিয়ে যান এই আশা নিয়ে যে তাঁদের গবেষণার ফলে বিজ্ঞানের অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে। ভারতের বিজ্ঞানীরাও এই আশা ও নিষ্ঠা নিয়েই কাজ করছেন বোম্বাইয়ের টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চে, আমেদাবাদের ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে, কলকাতার সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়র ফিজিক্স-এ ও সারা দেশে ছড়ানো আরো অজস্র গবেষণা-কেন্দ্রে। লেখক বিশেষভাবে বলেছেন টাটা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের গবেষণার কথা। বিজ্ঞানের কথায় পাঠকদের কাছে এই প্রবন্ধের কিছু তথ্য উপস্থিত করতে চাই।

টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফাণ্ডামেন্টাল রিসার্চ-এর প্রতিষ্ঠা ১৯৪৫ সালে। গত পঁচিশ বছরেরও অধিক কাল ধরে এই সংস্থার বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছেন। তাঁদের গবেষণার বিষয়ের মধ্যে আছে নিউক্লিয়র পদার্থবিদ্যা, কসমিক রে বা মহাজাগতিক রশ্মি, কম্পিউটার, প্রযুক্তিবিদ্যা ও উন্নততর গণিতের মতো পরিশীলিত বিষয়ও।

১৯৪৫ সালেও পরমাণু সম্পর্কে ধারণায় সরলতা ছিল। তখনো পর্যন্ত জানা ছিল পরমাণুর ভিতরকার মাত্র সাতটি মৌলিক কণিকার খবর—ফোটোন, ইলেকট্রন, পজিট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, মিউয়ন ও নিউট্রিনো। শেষেরটি কল্পনা করে নেওয়া হয়েছিল আর প্রথম দুটি আবিষ্কৃত হয়েছিল কসমিক রশ্মি নিয়ে গবেষণা থেকে।

কসমিক রশ্মি নিয়ে গবেষণায় বিশেষ তৎপরতা শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পরের দশকে। গবেষণা চালাবার উপযোগী উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতিও বিজ্ঞানীরা হাতে পেয়ে গিয়েছিলেন—যেমন, উন্নত ধরনের রেডিয়েশন কাউন্টার, উন্নত ইলেকট্রনিক ব্যবস্থাপনা, অধিকতর কার্যকর ফটোগ্রাফির আরক, অধিকতর সূক্ষ্ম ক্লাউড চেম্বার, আকাশের আরো উঁচুতে আরো ভারী যন্ত্রপাতি তোলার উপযোগী বেলুন।

পঞ্চাশের দশকে কসমিক রশ্মির গবেষণার ক্ষেত্রে ভারতের প্রবেশ ঘটল বেশ বড়োভাবেই যখন ডঃ হোমি ভাবা টাটা ইনস্টিটিউটে কসমিক রশ্মি নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। কসমিক রশ্মি নিয়ে গবেষণার পক্ষে ভারত বিশেষ সুবিধাজনক স্থান। উচ্চতর অক্ষাংশের দেশগুলিতে—যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও ইউরোপে—কসমিক রশ্মির যে-সব কণিকা বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে তা নিচু তেজমাত্রার। কিন্তু ভারতের অবস্থান এমন এক অক্ষাংশে যেটা চুম্বকস্বরূপ এই বিরাট পৃথিবীর দুই চৌম্বক মেরুর মাঝামাঝি। অর্থাৎ বলা চলে, ভারতের অবস্থান পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের বিষুব বরাবর। কসমিক রশ্মির উঁচু তেজমাত্রার কণিকাগুলো প্রবেশ করতে পারে একমাত্র এই চৌম্বক বিষুবের এলাকাতেই—অর্থাৎ ভারতে। এ-কারণে অবিমিশ্র উঁচু তেজমাত্রার কসমিক রশ্মি নিয়ে গবেষণার আদর্শ স্থান হচ্ছে ভারত।

গবেষণার এই বিশেষ ক্ষেত্রে টাটা ইনস্টিটিউটের একটি বড়ো রকমের সাফল্য

জোড্রেল ব্যাঙ্কের ৭৫ মিটার রেডিও দূরবীক্ষণযন্ত্র

লাভ হয়েছে। মহাজাগতিক রশ্মির কণিকাগুলোর হদিশ নেবার জন্যে বিশেষ এক ধরনের আরক উদ্ভাবিত হয়েছে এই কেন্দ্রে। পৃথিবীর চৌম্বক বিষুবের কাছাকাছি এলাকায় (যে এলাকা নিচু তেজমাত্রার মহাজাগতিক রশ্মির কণিকা থেকে মুক্ত) আরকমাখানো ব্লক বেলুনের সাহায্যে আকাশের অনেক উঁচুতে তুলে দেওয়া—এই হচ্ছে ইনস্টিটিউটের গবেষণার পদ্ধতি। এমনিভাবে গবেষণা চালিয়ে ইনস্টিটিউটে একটি নতুন কণিকা আবিষ্কৃত হয়েছে : নেগেটিভ কে-মেসন। উচ্চতর বায়ুমণ্ডলে মহাজাগতিক রশ্মির কণিকাগুলোর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ে গবেষণা ও আবিষ্কারের ফলে, কণিকা-বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে ভারতের স্থান এখন সম্মুখসারিতে।

মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে ইনস্টিটিউটের গবেষণা থেকে আরো ভালোভাবে জানা গিয়েছে পরমাণুর গড়ন ও দূরের তারাগুলোর রাসায়নিক গঠন। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই দূরের তারাগুলোও কসমিক রশ্মির উৎস।

কসমিক রশ্মি নিয়ে গবেষণার জন্যে টাটা ইনস্টিটিউট যে-সব কেন্দ্র স্থাপন করেছে তার একটি রয়েছে মহীশূরের কোলার স্বর্ণখনিতে। এখানে এই রশ্মির অনুশীলন হয় মাটির নিচে—তিন কিলোমিটারেরও অধিক গভীরে। মাটির নিচে এত গভীরে কসমিক রশ্মি নিয়ে পরীক্ষা-কার্য চালাবার মতো স্থান গোটা পৃথিবীতে অতি অল্পই আছে। মাটির নিচের এই

সমস্ত পর্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া গিয়েছে মিউওন ও নিউট্রিনো সম্পর্কে গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

প্রাথমিক কসমিক বিকীরণ পর্যবেক্ষণ করা হয় যন্ত্র ভর্তি পলিথিলিনের বেলুন ঊর্ধ্ব আকাশে তুলে। এই বেলুনে থাকে [illegible] সব যন্ত্রপাতি। দুই দশকেরও অধিক কাল ধরে টাটা ইনস্টিটিউট এরকম বেলুনের সাহায্যে ঊর্ধ্ব আকাশে তুলছে। তোলা হয় হায়দ্রাবাদ থেকে, যার অবস্থান পৃথিবীর চৌম্বক বিষুবের খুবই কাছাকাছি। এক্স-রে সমন্বিত বেলুন তোলা হয়েছে ১৯৬৮ সালের এপ্রিলে প্রথমটি, পরবর্তীকালে আরো দুটি।

এই ধরনের মাপের প্লাস্টিক বেলুনগুলো তৈরি হয় ইনস্টিটিউটের ল্যাবরেটরিতে। কিন্তু বেলুন যদি রাত্রিবেলা আকাশে ঝুলাতে হয় তাহলে তা হওয়া চাই বিশেষ [illegible] পলিথিলিনের। বিদেশে এ-ধরনের বেলুনের একমাত্র প্রস্তুতকারক আমেরিকার একটি কোম্পানী। ১০০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত ওজন নিয়ে প্রায় ৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত উঁচুতে উঠতে সক্ষম এই বেলুনের দাম ৩০,০০০ টাকা। শুধু বেলুনেরই দাম, তার ওপরে আছে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির খরচ। কিন্তু চড়া দাম সত্ত্বেও বেলুনের সাহায্যে পরীক্ষাকার্যই এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে কম খরচের।

বেলুনের সাহায্যে পরীক্ষাকার্য চালিয়ে আরো নানা বিষয়ে এমন সব তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে যা থেকে বিশ্ব-ব্যাপারের অনেক প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে—যেমন, মহাবিশ্বের উদ্ভব কিভাবে, দুই গ্যালাক্সির মধ্যবর্তী পদার্থের প্রকৃতি কী, ইত্যাদি।

সম্প্রতিকালে যাকে বলা হয় রকেট এক্স-রে জ্যোতির্বিদ্যা-টাটার বিজ্ঞানীদের নজর সেদিকে পড়েছে। ভবিষ্যতে এই গবেষণার কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রেও তাঁরা সার্থক কাজ দেখাতে পারবেন আশা করা চলে।

কসমিক রশ্মি নিয়ে গবেষণা থেকে এসেছে টাটা ইনস্টিটিউটের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধানের এলাকা—[illegible]-গত গবেষণার কর্মসূচী। এই কর্মসূচীর মূলে রয়েছে এই ঘটনা যে কসমিক রশ্মি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আপতিত হলে তৈরী হয় বিভিন্ন রাসায়নিক মৌলিক পদার্থের রেডিওআইসোটোপ। আবহবিদ্যা, সমুদ্রবিদ্যা ও প্রত্নবিদ্যার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার গতিবিন্যাস ও ঘটনাক্রম এই রেডিওআইসোটোপগুলোর সাহায্যে নির্ধারিত হতে পারে।

টাটার বিজ্ঞানীরা তাঁদের [illegible] থেকে বিজ্ঞান-জগতের সর্বশেষ ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত থাকেন। অল্প কিছুকাল আগে তিনজন আমেরিকান বিজ্ঞানী নতুন একটি পদ্ধতির সাহায্যে দেখান যে কসমিক কণিকাগুলো কোনো একটি কঠিন পদার্থের মধ্যে দিয়ে যাবার পরে তার ছাপ থেকে যায় এবং কোটি কোটি বছর পরেও রাসায়নিক উপায়ে সেই ছাপ পর্যবেক্ষণ করা চলে। অন্য ভাষায় বলা চলে, কসমিক রশ্মি পিছনে রেখে যায় একটি রেকর্ড-[illegible] রেকর্ড। টাটার বিজ্ঞানীরা এই আবিষ্কারকে কাজে লাগালেন ও বহু-সংখ্যক উল্কাপিণ্ড পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করলেন। দেখা গেল উল্কাপিণ্ডের পর্যবেক্ষণে কসমিক রশ্মির এই ছাপ অনুসরণ করার পদ্ধতি বিশেষ ফলপ্রসূ। এই কাজ দেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'নাসা'-র (ন্যাশনাল এরোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিসট্রেশন) কর্তৃপক্ষ কয়েকটি চান্দ্র-শিলা টাটার বিজ্ঞানীদের হাতে দিলেন। চাঁদের শিলা নিয়ে গবেষণা করে টাটার বিজ্ঞানীরা কয়েকটি চাঞ্চল্যকর তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন। একটি এই যে এই বিশ্বে অতিমাত্রায় ভারী পারমাণবিক নিউক্লিয়াসের অস্তিত্ব আছে এবং ইউরেনাস গ্রহের কক্ষপথ বেশ কিছুটা ছাড়িয়ে গেলে তার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

কসমিক রশ্মি নিয়ে পরীক্ষাকার্যের একটি অসুবিধে এই যে প্রাথমিক কসমিক রশ্মির তেজ ও প্রকৃতি নির্ধারণ করা খুবই শক্ত ব্যাপার। আবার তেজ বাড়লে ঘটনা-চক্র অতিমাত্রায় কমে যায়। কিন্তু এই অসুবিধে দূর হয়েছে গবেষণার আধুনিক সব যন্ত্র বিজ্ঞানীদের হাতে আসার ফলে। এমনি একটি যন্ত্র হচ্ছে অ্যাক্সিলেটর, যার সাহায্যে প্রোটোনের তেজ শতকোটি ইলেকট্রন ভোল্টের মাত্রায় তোলা সম্ভব। অপর একটি যন্ত্র হচ্ছে বুদবুদ প্রকোষ্ঠ (বাব্‌ল চেম্বার), যার সাহায্যে তড়িতাবিষ্ট কণিকার সঙ্গে পরমাণুর নিউক্লিয়াসের সংঘর্ষ পর্যবেক্ষণ করা চলে।

তবে এই অ্যাক্সিলেটরের দাম অসম্ভব বেশি। পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো অ্যাক্সিলেটর রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল অ্যাক্সিলেটর ল্যাবরেটরিতে। এই বিশেষ যন্ত্রটির দাম ৫০ কোটি ডলারেরও (৩৭৫ কোটি টাকারও) বেশি। বলা বাহুল্য, ভারতের মতো একটি উন্নতিশীল দেশের পক্ষে একটি যন্ত্রের জন্যে এত টাকা ব্যয় করা অসাধ্য। তবে যন্ত্রের অভাবে টাটার বিজ্ঞানীদের গবেষণা কিন্তু বন্ধ হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশের অ্যাক্সিলেটর কেন্দ্রে গিয়ে গবেষণা করার সুযোগ তাঁরা পেয়ে থাকেন।

কসমিক রশ্মি নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে টাটার বিজ্ঞানীরা ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন— কণিকা-পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন দিক থেকে। ১৯৬৭ থেকে তাঁরা শুরু করেছেন এই বিশেষ ক্ষেত্রে পরীক্ষাকার্যের জন্যে বুদবুদ প্রকোষ্ঠ থেকে পাওয়া চিত্রের বিশ্লেষণ। তড়িতাবিষ্ট কণিকাগুলো যখন বুদবুদ প্রকোষ্ঠের মধ্যে দিয়ে ধাবিত হয় তখন তাদের গতিপথে সৃষ্টি হয় ছোট ছোট বুদবুদের সারি। উচ্চবেগসম্পন্ন ফিল্‌ম-এ এই বুদবুদগুলোর ফটো নেওয়া যেতে পারে। উচ্চবেগসম্পন্ন কণিকার দ্বারা বিপন্ন হলে নিউক্লিয়াসের প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে ঠিক কী ঘটে তার একটা মাপ পাওয়া সম্ভব এই চিত্রগুলো থেকে।

এখানে বলা দরকার, ভারতে কণিকা-পদার্থবিদ্যায় গবেষণার স্থান একমাত্র এই টাটা ইনস্টিটিউট নয়। কলকাতার সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়র ফিজিক্স-এও এক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ কাজ হয়ে থাকে। কলকাতার এই ইনস্টিটিউটে ব্যবহৃত হয় সাইক্লোট্রন বীম এবং কিছু [illegible] ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ চলে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আরো

বহু বিজ্ঞানী এ-বিষয়ে তত্ত্বমূলক গবেষণা করছেন।

পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে ঘিরে ইলেক-ট্রনগুলো পাক খায়। মহাজাগতিক স্তরে এই একই ব্যাপার ঘটে চলেছে আমাদের চারিদকের অসংখ্য সৌরমণ্ডলে ও গ্যালাক্সিতে। এই সাদৃশ্য দেখেই স্যার জেমস জীন্স কল্পনা করেছিলেন, তারা-গুলো সম্ভবত এক অতি-ব্রহ্মাণ্ডের মূল উপাদান—যেমন আমাদের মূল উপাদান হচ্ছে পরমাণু ও অণু। এই অতিক্ষুদ্র জগৎ থেকে এই অতিবৃহৎ জগৎ পর্যন্ত সর্বত্রই কিন্তু বজায় আছে সমান শৃঙ্খলা ও ভার-সাম্য। এটাই সকল জাগতিক ব্যাপারের লক্ষণ।

জ্যোতির্বিদ্যার জানার বিষয় হচ্ছে এই বিশ্ব ও তার বিভিন্ন উপাদান। ভারত ছিল এই প্রাচীন বিজ্ঞানের লালনাগার এবং আধুনিককালেও এই বিশেষ বিজ্ঞানের গবেষণায় ভারত প্রভূত অবদান রাখছে।

আধুনিককালে এই গবেষণার ক্ষেত্রও অনেক অনেক প্রসারিত। তারার বিকীরণ চলে বৈদ্যুৎ-চুম্বক বর্ণালীর গোটা এলাকা জুড়ে। কিন্তু এতকাল জ্যোতির্বিদ্যার
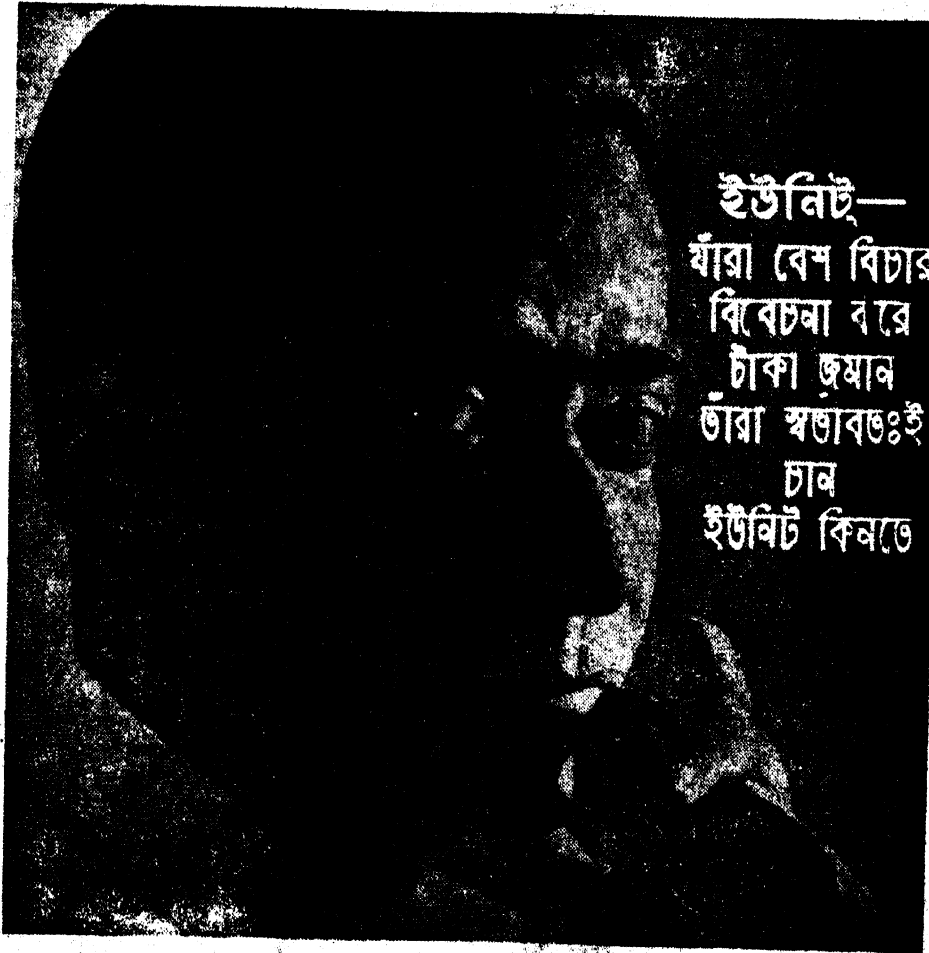
আয়ত্তে তার সবখানি ছিল না। বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ সীমাবদ্ধ ছিল মাত্র সেই সঙ্কীর্ণ অংশটুকুতে যা চোখে দেখা যেতে পারত। অর্থাৎ 'দৃশ্যমান' আলোর এলাকা—অপটিক্যাল তরঙ্গদৈর্ঘ্যের এলাকা—পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যা বাধা পায় না। তাছাড়াও আছে রেডিও তরঙ্গের এলাকা ও অবলোহিত বিকীরণের এলাকা। কিছুকাল আগেও শেষোক্ত দুই এলাকার কোনো খবরই বিজ্ঞানীদের কাছে ধরা পড়ত না।

পৃথিবীর বাইরের এলাকা থেকে রেডিও তরঙ্গ পৃথিবীতে এসে পৌঁছাচ্ছে, এ-ঘটনা আবিষ্কার করেন আমেরিকান রেডিও ইঞ্জিনীয়ার কার্ল ইয়ানস্কি, ১৯৩১ সালে। তখন থেকেই রেডিও জ্যোতির্বিদ্যার পত্তন।

টাটা ইনস্টিটিউট এই বিশেষ ক্ষেত্রে প্রবেশ করে ষাটের দশকের গোড়ার দিকে। ১৯৬৫ সালে স্থাপিত হয়েছে একটি রেডিও দূরবীক্ষণযন্ত্র, বোম্বাই থেকে ৫৫ কিলোমিটার দূরে কল্যাণের কাছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটেছে ১৯৭০ সালে। তামিলনাড়ুর উটকামণ্ডে স্থাপিত হয়েছে একটি অনন্যসাধারণ নলাকৃতি রেডিও দূরবীক্ষণযন্ত্র। খরচ দিয়েছে ভারতীয় পরমাণু শক্তি বিভাগ, যন্ত্রাংশ, ইত্যাদি কেনার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশন্যাল সায়েন্স ফাউণ্ডেশন থেকে অনুদান হিসেবে পাওয়া গিয়েছে ৭০,০০০ ডলার (সোয়া-পাঁচ লাখ টাকা)। রেডিও দূরবীক্ষণযন্ত্রটির প্রতিফলন-তল অধিবৃত্তাকার এবং তার সংগ্রহ-ক্ষমতা ব্রিটেনের বিখ্যাত জোড্রেল ব্যাঙ্ক নিরীক্ষণাগারের রেডিও দূরবীক্ষণযন্ত্রের চেয়ে চারগুণ বেশি। উটকামণ্ডের রেডিও দূরবীক্ষণযন্ত্রটির ডিজাইন ও নির্মাণকর্ম পুরোপুরিভাবে ভারতেই হয়েছে। এই যন্ত্রটি স্থাপনার ফলে অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে বড়ো রকমের একটি জাতীয় সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

উটকামণ্ডের রেডিও দূরবীক্ষণযন্ত্রটি এমনভাবে তৈরী যাতে চাঁদের আচ্ছাদনের

উটকামণ্ডের ৫২৯ মিটার দীর্ঘ নলাকৃতি রেডিও দূরবীক্ষণযন্ত্র। এটি হচ্ছে বিশ্বের এ জাতীয় রেডিও দূরবীক্ষণযন্ত্রের মধ্যে একটি সর্বোত্তম

●

ব্যাপারটি কাজে লাগানো যেতে পারে। চাঁদের আচ্ছাদনের ব্যাপারটি কী? চাঁদের তীক্ষ্ম কিনার যখন কোনো একটি রেডিও উৎসকে আড়াল করে, তখন সেই উৎসের রেডিও বিকীরণের মাত্রা লক্ষণীয় রকমের কমে যায়। উৎসটি যদি হয় একটি বিন্দু—যেমন একটি কোয়াসার—তাহলে রেডিও বিকীরণ আচমকা বন্ধ হয়ে যায়। আবার শুরু হয় চাঁদ সরে যাবার পরে। আর উৎসটি যদি বিন্দু না হয়ে কিছুটা স্থান জুড়ে ছড়ানো হয় যেমন একটি গ্যালাক্সি—তাহলে মাত্রা কমে ধীরে ধীরে। আর চাঁদ হচ্ছে এমন একটা জ্যোতিষ্ক যার অবস্থান ও চলার গতি সঠিকভাবে জানা আছে। এ থেকেই রেডিও উৎসগুলোর আকার ও অবস্থান সম্পর্কে একটা মাপ নেবার সঠিক পদ্ধতি পাওয়া যাচ্ছে।

উটকামণ্ডের এই রেডিও দূরবীক্ষণযন্ত্রটির বিশ্লেষণকরণের ক্ষমতাও যথেষ্ট বেশি। বিশ্লেষণকরণের ক্ষমতা কী? দূরের যে-সব বস্তুকে এমনিতে মনে হয় কাছাকাছি তাদের পৃথক পৃথক ছবি ধরতে পারা।

উটকামণ্ডে যে-সব বিষয় নিয়ে গবেষণা চলছে তার একটি হচ্ছে 'পালসার' সম্পর্কিত। পালসার হচ্ছে এক ধরনের অতি-ঘন নিউট্রন তারা। ঘনত্ব এতই বেশি যে কয়েক টন পরিমাণ বস্তু একটি দেশলাইয়ের বাকসে পুরে রাখা চলে। উটির রেডিও দূরবীক্ষণ যন্ত্রে সম্প্রতি দুটি নতুন পালসার আবিষ্কৃত হয়েছে।

শুধু তাই নয়, মাত্র দু-বছরের মধ্যে উটির এই রেডিও দূরবীক্ষণযন্ত্রে নির্ধারিত হয়েছে ৫০০টির বেশি গ্যালাক্সি-বহির্ভূত রেডিও উৎসের সঠিক অবস্থান, উজ্জ্বলতা, ব্যাপ্তি ও গড়ন। দু-বছরের কৃতিত্বের দিকে তাকালে এ-আশা অবশ্যই পোষণ করা চলে যে উটির এই বীক্ষণ-কেন্দ্র রেডিও জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে আরো বড়ো অবদান রাখতে পারবে।

অতিক্ষুদ্র থেকে অতিবৃহৎ জগতের রহস্য-অনুসন্ধানে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের কৃতিত্বের কিছু খবর এই প্রবন্ধে দেওয়া গেল। আশা করা চলে, এই কৃতিত্বও আরো উজ্জ্বল হবে এবং এই গ্রহের জীবনকে সমৃদ্ধ করে তুলতে সহায়তা করবে।

—অয়স্কান্ত

অঙ্গনা

সুস্থ শরীর : রোগ নিরাময়

যোগব্যায়ামে রোগ নিরাময়। শুনে অনেকেই হয়তো অবিশ্বাসের হাসি হাসবেন। ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতেও অনেকে কসুর করবেন না। আবার কেউ হয়তো গম্ভীর হয়ে চিন্তা করতে বসবেন। গালে হাত দিয়ে ভাবতে শুরু করবেন, এও কি সম্ভব! এরকম ভাবনা স্বাভাবিক। আজকাল ডাক্তার-বদ্যি প্রতি পরিবারে প্রায় বাঁধা। আয়ের একটা বড়ো অংশ চলে যায় ওষুধ-পত্র কিনতে। ডাল-তেল-মশলার মতো ওষুধও এখন প্রতি বাড়িতে অপরিহার্য সাংসারিক খরচের তালিকাভুক্ত। তবু রোগ সামাল দেওয়া যাচ্ছে না। আজ এটা কাল সেটা লেগেই আছে। এমন সময় যোগ-ব্যায়ামে রোগ নিরাময়ের কথা শুনে অনেকেই ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দিতে চাইবেন। যেখানে ডাক্তার-বদ্যি হার মেনে যাচ্ছেন সেখানে যোগব্যায়াম যে কিছু করতে পারবে একথা অনেকেই মেনে নিতে চাইবেন না। জড়ি-বুটি ধারণের মতো সমস্ত কিছু আজগুবি বলে উড়িয়ে দিতে চাইবেন। কিন্তু জড়ি-বুটি হলো দ্রব্যগুণ আর যোগব্যায়াম হলো দৈহিক কসরত। তাই দুয়ের মধ্যে তফাৎ আকাশ-পাতাল। একটু ধৈর্য ধরে যোগব্যায়াম অভ্যাস করতে পারলে বহু ডাক্তারের হাত-ফেরত রোগীও নিরাময় হতে পারেন। এবং হয়েছেনও।

রোগীর মস্তিষ্ক বিকৃতি। ওষুধপত্র খেয়ে হার মেনেছেন। ডাক্তাররা হাল ছেড়ে দিয়েছেন, এ রোগী আর ভালো হবার নয়। যোগব্যায়ামে তিনিও সুস্থ স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেয়েছেন। এ কাহিনীই সেদিন শোনাচ্ছিলেন শ্রীমতী কুশলা দাস। সায়েন্স কলেজের উল্টোদিকে যে মহিলা যোগব্যায়াম কেন্দ্র আছে, তিনিই তার শিক্ষিকা-প্রতিষ্ঠাতা। মেয়েদের শেখানোর অবসরে একটু সময় করে নিয়ে তিনি বললেন সেই মস্তিষ্ক বিকৃত মেয়েটির কথা। মেয়েটি নিজে নিজেই হাসতো আবার কান্না শুরু করলে তা আর থামতো না। প্রথম যেদিন রোগীকে নিয়ে আসা হলো তখন শ্রীমতী দাসও খুব একটা নিশ্চিত হতে পারেননি যে, এ রোগী সারবে। তবু তিনি রোগীর আত্মীয়-পরিজনকে আশ্বাস দিলেন যে, চেষ্টার কোন ত্রুটি তিনি করবেন না।

প্রথম দিকে তিনি মেয়েটির পাগলামির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের চেষ্টা করেন। তারপর আরম্ভ করেন যোগব্যায়াম শেখানো। এভাবে বেশ কিছুদিন কাটে। আস্তে আস্তে মেয়েটির উন্নতি দেখা যায়। ক্রমে একসময় মেয়েটি সুস্থ হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে সময় কেটে গেছে দু বছর। সকলের সব হতাশা দূর করে রোগীকে তিনি নিরাময় করে দিলেন। আত্মীয়-পরিজনের মুখে হাসি ফুটলো। কোন ওষুধপত্র নয়, যোগব্যায়ামেই এ অসম্ভব সম্ভব হয়েছে।

এমনি আরো অনেক অসম্ভব তিনি সম্ভব করেছেন। সে কথায় পরে আসা যাবে। তার আগে বলা যাক কেমন করে এই যোগব্যায়াম কেন্দ্র শুরু হলো। শ্রীমতী দাস নিজে ব্যায়ামাচার্য বিষ্ণুচরণ ঘোষের ছাত্রী। ছেলেবেলায় তাঁর পেটে খুব ব্যথা হতো। আর তখনই তিনি ফিট হয়ে যেতেন। তখন তিনি ব্যায়ামাচার্যের সংস্পর্শে আসেন আর যোগব্যায়ামে নিরাময় হন। রুগ্ন দেহকে সুস্থ করা এক কথা আর দেহকে সুস্থ-স্বাভাবিক রাখা অন্য কথা। রোগের আক্রমণের বিরুদ্ধে শরীরে যদি প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায় তবে তার চেয়ে ভাল আর কিছু হতে পারে না। বাঁচবো অথচ প্রতি-মুহূর্তে ডাক্তার আর ওষুধপত্রের উপর নির্ভর করে থাকবো এরকম বাঁচা মরে বাঁচার মতোই। শ্রীমতী দাস এরকম জীবন চান না। তিনি আরো চান, দেশের সব মেয়েই সুস্থ-সবল দেহ নিয়েই বেঁচে থাকুক। ব্যায়ামাচার্যের কাছে যোগব্যায়াম অভ্যাস করার সময় তিনি লক্ষ্য করেন, অনেকেই অসুস্থ শরীর নিয়ে শেষ ভরসা হিসেবে এখানে আসেন রোগ সারাতে। অথচ এই কষ্টটুকু যদি তাঁরা আগে করতেন তবে রোগের দুর্ভোগ তাঁদের আর পোয়াতে হতো না। সেদিন থেকেই তিনি মনে মনে দৃঢ়সঙ্কল্প হন যে শিক্ষা শেষে মেয়েদের জন্য যোগব্যায়ামের কেন্দ্র খোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। এমনিতেই মেয়েদের শরীরচর্চার বিশেষ কোন বন্দোবস্ত নেই। যা আছে তাও ছেলেমেয়ের একসঙ্গে শেখার ব্যবস্থা। অনেক মা-বাবাই ইচ্ছে থাকলেও মেয়েদের সেখানে ব্যায়াম শিখতে যেতে দিতে চান না। তাই তখন থেকেই তাঁর আকাঙ্ক্ষা মেয়েদের জন্য যোগব্যায়াম কেন্দ্র খোলার।

কিন্তু ভাবা যত সহজ কাজে এগুনো তত সহজ নয়। হাজার সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও। আর তখন তিনি সবেমাত্র কলেজের ছাত্রী। তাই তাঁর কথা কানে তোলার মতো লোকেরও একান্ত অভাব। অনেক জায়গায়ই তিনি বিফল হচ্ছেন কিন্তু হাল তবু ছাড়ছেন না। অবশেষে সুযোগ এলো। ১৯৬৫ সালে উল্টোডাঙ্গায় তিনি নিবেদিতা সংঘ নামে সর্বপ্রথম মেয়েদের জন্য যোগ-ব্যায়াম কেন্দ্র শুরু করলেন। সেদিন শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল জনা চারেক। এখানে তিনি নিয়মিত মেয়েদের যোগব্যায়াম শেখাতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বাড়তে লাগলো। শ্রীমতী দাস বুঝলেন যে, যোগব্যায়ামের তাৎপর্য এবার অনেকেরই বোধগম্য হতে আরম্ভ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে আরেক চিন্তা, কল-কাতায় এরকম একটি কেন্দ্র শুরু করতে হবে। প্রথম থেকেই তাঁর সেরকম ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তেমন আনুকূল্য পাননি।

১৯৬৭ সালে তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের অনুমতি পেলেন সায়েন্স কলেজের উল্টো দিকে লেডিস পার্কের টালি ছাওয়া উঠোনটুকু মেয়েদের যোগব্যায়াম শেখানোর জন্য ব্যবহার করার। অনুমতি পাওয়া মাত্র তিনি কাজ শুরু করে দিলেন। সে বছরই জন্মা-ষ্টমীর দিনে এই কেন্দ্রের উদ্বোধন হয়। পৌরোহিত্য করেন তাঁর গুরু এবং শিক্ষক ব্যায়ামাচার্য বিষ্ণুচরণ ঘোষ। কেন্দ্রের নাম-করণও তিনি করেন। সেদিন শিক্ষার্থীর

সংখ্যা ছিল মোটে পাঁচজন। আজ তা এসে দাঁড়িয়েছে ২২৫ জনে এবং আর একটি কেন্দ্রও খোলা হয়েছে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে। সেখানে অরবিন্দ শারীর শিক্ষা কমিটির ঘরটি ব্যবহারের অনুমতি তাঁরা পেয়েছেন। এখানে বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৮০ জন। দক্ষিণ কলকাতার এই কেন্দ্রটি খোলার পেছনে একটি সুন্দর ঘটনা আছে। শ্রীমতী দাস উদ্যোক্তা হলেও এই কেন্দ্রের সভানেত্রী শ্রীমতী দীপ্তি চক্রবর্তীর প্রেরণাই ছিল সবচেয়ে কার্যকরী। শ্রীমতী চক্রবর্তী নিজে প্রায়ই সর্দি-কাশিতে ভোগেন। যোগব্যায়ামে তিনি নিরাময় হন। তখন তিনি শ্রীমতী দাসকে দক্ষিণ কলকাতায় এই কেন্দ্রটি খোলার প্রেরণা দেন। নিয়মিত যোগব্যায়াম অভ্যাস করে শ্রীমতী চক্রবর্তীর অপরিণতবুদ্ধি মেয়েটিও এখন অনেকখানি উন্নতির পথে। যে মেয়ে হাত-পা সিধে করে চলতে পারতো না, সে এখন বেশ ভালভাবে চলাফেরা করতে পারে। স্মৃতিশক্তিও ক্রমেই প্রখর হচ্ছে। আর শরীর যে মজবুত হয়েছে সে-কথা বলা বলাই বাহুল্য।

অনেক হাসপাতাল থেকে রোগী আসে শ্রীমতী দাসের যোগব্যায়াম কেন্দ্রে। আর তাঁরা যে সবাই বহু ডাক্তারের হাত ঘুরে আসেন সেকথা তো আগেই বলেছি। ১৯৬৯ সালে একটি মেয়ে এসেছিল। রোগ অনিদ্রা। সারারাত ঘুম নেই। দু চোখের পাতা কখনো এক হয় না। সে এক ভীষণ

দুঃসহ অবস্থা। শ্রীমতী দাস ভার নিলেন মেয়েটির। আরম্ভ করলেন যোগব্যায়াম শেখানো। দু-এক মাসের মধ্যেই অবস্থার স্পষ্ট উন্নতি ঘটলো। ছ মাসে সম্পূর্ণ নিরাময়। মেয়েটির সঙ্গে যুদ্ধের এখন পুরোপুরি মিতালি। স্বাভাবিক মানুষের যেমন হয়। মধ্যবয়স্কা এক ভদ্রমহিলা এলেন। হাই ব্লাডপ্রেশারের রোগী। এখানে এসে যোগব্যায়াম অভ্যাস করে নতুন জীবন পেলেন। এমনিতরো অনেক ঘটনা আছে। বাত, কোষ্ঠকাঠিন্য আর অম্বল তো আছেই। জটিল স্ত্রীরোগ থেকেও নিরাময় হয়েছেন এরকম নজীরও এখানে আছে। প্রচণ্ড হাঁপানীতে কাতর রোগী এখানে এসে নিরাময় হয়েছেন মাত্র ছ'মাসে। অম্বলের রোগীও আছেন। এসব ক্ষেত্রে সময় লাগে চার থেকে ছয় মাস। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের ঘটনা যে, বাচ্চাদের সেপটিক টন্সিলও ভাল হয়েছে যোগব্যায়ামের নিয়মিত অভ্যাসে। কলকাতার ধারেকাছে তো বটেই মেদিনীপুর থেকে অনেকে এখানে আসেন। দূরের যাঁরা নিয়মিত আসতে পারেন না তাঁরা শ্রীমতী দাসের পরামর্শ নিয়ে যান আর আসন শিখে যান।

শ্রীমতী দাসের আরেকটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য হলো দর্জিপাড়ার মাতৃজাতি স্কুলে যোগব্যায়ামের কেন্দ্র শুরু করা। এবছরই এটা সম্ভব হয়েছে এবং তিনি চান যে, কলকাতার প্রতিটি মেয়েদের স্কুলেই এরকম ব্যবস্থা হোক। তাহলে মেয়েরা গোড়া থেকেই সুস্থ-সবল দেহমন নিয়ে গড়ে উঠতে পারবে। প্রতি মুহূর্তে রোগাক্রমণের ভয় থেকে বাঁচবে। শরীর সুস্থ থাকলে জীবন অনেক সহজ হয়ে যাবে।

মেয়েদের সঙ্গে সঙ্গে শিশুদেরও যোগব্যায়াম শেখার ব্যবস্থা করেছেন শ্রীমতী দাস তাঁর কেন্দ্রে। বাচ্চাদের যা শেখানো হয় সবই খেলাচ্ছলে। যোগব্যায়াম তো আছেই সেই সঙ্গে আরো শেখানো হয় ফ্রি-হ্যান্ড এক্সারসাইজ এবং হালকা ধরনের জিমনাসটিকস্। মেয়েদেরও জিমনাসটিকস্ শেখানো হয়। তবে যন্ত্রপাতির বড়ো অভাব। অথচ শ্রীমতী দাস জানালেন যে, এখানে এমন মেয়ে আছে যাঁরা যেকোন কম্পিটিশনে ভাল ফলাফল করতে পারেন। কিন্তু ইনস্ট্রুমেন্টের অভাবে তা সম্ভব হচ্ছে না। অর্থাভাবই এর মূল কারণ। যোগব্যায়ামের এই প্রতিষ্ঠান মূলতঃ চলে শিক্ষার্থীদের মাসিক চাঁদায়। অনেক আবেদন-নিবেদন করেও সরকারী বা বেসরকারী কোন তরফ থেকেই তিনি আর্থিক সমস্যার কোন সুরাহা করতে পারেন নি। এছাড়া লেডিস পার্কের কেন্দ্রটিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি, কিন্তু সে তুলনায় জায়গা খুবই স্বল্প পরিসর। টালির ছাউনি থাকা সত্ত্বেও বর্ষাকালে তা আবার জলে ভেসে যায়। প্রতিকূলতা অজস্র। তেমনি শ্রীমতী দাসের উৎসাহও অদম্য। সব প্রতিকূলতা তুচ্ছ করে তিনি নিজের ব্রতে অবিচল রয়েছেন। এবং একনিষ্ঠও। রোজ ৪টা থেকে ৮টা পর্যন্ত তিনি নিজে উপস্থিত থেকে মেয়েদের যোগব্যায়াম শেখান। একমাত্র বুধবার বাদে। সেদিন তিনি যান রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম কেন্দ্রে। উলুবেড়িয়া কেন্দ্রে এখন আর তিনি নিজে যেতে পারেন না। তাঁরই শিষ্যারা সে কেন্দ্রে শেখানোর দায়িত্ব নিয়েছেন। তবে তেমন প্রয়োজনে সেখান থেকে ডাক এলে সাড়া দিতেই হয়।

শ্রীমতী কুশলা দাস জানালেন, আমাদের মধ্যে স্কুল-কলেজের ছাত্রীর সংখ্যাই বেশি। এই আমার কথাই ধরুন না, আমি গতবার এম-এ পরীক্ষা পাশ করেছি। আর আমাদের জিমনাসটিকসের শিক্ষিকা শ্রীমতী স্বর্ণা চ্যাটার্জি বি-এ ক্লাশের ছাত্রী, এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যেও তাঁরাই সংখ্যাগুরু। তবে সব ধরনের সভ্যাই আমাদের আছে। তিন বছরের বাচ্চা থেকে ষাট বছরের বৃদ্ধা পর্যন্ত। ঘরের বৌঝিরা যোগব্যায়ামে খুব উৎসাহী। তাঁরা অনেকেই আসেন। কেউ রোগ সারাতে। আবার কেউ দেহ-মন সুস্থ রাখতে।

শ্রীমতী দাসের কথায় আমার মনে পড়লো এক ভদ্রমহিলাকে। তিনিও ঘরের বউ। মধ্যবয়সী। দুটি সন্তানের জননী। একদিন তিনি সখেদে আমাকে বলেছিলেন, ইচ্ছে তো আমাদেরও হয় একটু খেলাধুলো করতে, হাত-পা ছুঁড়ে সাঁতার কাটতে, কিন্তু সুযোগ তো তেমন নেই। একটু ঘেরা-জায়গা নাহলে আমাদের মতো ঘরের বৌ-ঝিদের এই সাধ চিরকাল অপূর্ণ থেকে যাবে। বলতে গেলে একান্ত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় শ্রীমতী দাস ঘরের বৌঝিদের সেই অপূর্ণ সাধের অনেকটা পূরণ করলেন।

সেই ভদ্রমহিলার কথায় একটু অন্যমনা হয়ে গিয়েছিলাম। সম্বিত ফিরে পেলাম শ্রীমতী দাসের কথায়। তিনি বেশ গর্বের সুরে বললেন, এ পর্যন্ত আমাদের যোগব্যায়াম কেন্দ্র থেকে হাজার দেড় হাজারের উপর রোগী নিরাময় হয়েছেন। ডাক্তার-বদ্যি আর ওষুধপত্র হার মেনেছে। আমরা কিন্তু কোথাও হার মানিনি। প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজয়ী হয়েছি। আমাদের এখান থেকে কেউ নিরাশ হয়ে ফেরেননি। সবাই সুস্থ দেহ আর হাসিমুখে ঘরে ফিরেছেন। এরপরও কি সরকার এবং কর্পোরেশন আমাদের সম্বন্ধে উদাসীন থাকবেন? আমাদের এই বিরাট সমাজসেবার স্বীকৃতিতে সাহায্য করতে দ্বিধা করবেন? শ্রীমতী দাসের কণ্ঠে স্পষ্টতই অভিযোগের সুর। এবং এই অভিযোগ আমাদেরও।

উল্লেখযোগ্য সংবাদ

রাষ্ট্রপুঞ্জের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা প্রতি বৎসর কয়েকটি পদক প্রস্তুত করেন। রোমানদের কৃষি ও শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সিয়ারিজ-এর প্রতীক হিসেবে এসব পদকে সমসাময়িক কোন মহিলার মূর্তি খোদাই করা হয়। এবছর আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মূর্তি খোদাই করা হয়েছে রাষ্ট্রপুঞ্জের এই রোজ ও রৌপ্যপদকে। কৃষিক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতিতে শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বের প্রতিই এই শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।

* * *

কয়েকদিন আগে তুরস্কের আটারোজন মধ্যবয়সী মহিলা একত্রে মিলিত হয়ে 'তুর্কী জাতীয় মহিলা সমিতি' নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। এদেশের মহিলাদের পক্ষে অগ্রগতির পথে এটি একটি বড় পদক্ষেপ। ইতিমধ্যেই নাকি দু হাজার আবেদন-পত্র পাওয়া গেছে সদস্যপদভুক্তির জন্য। এই দলের উদ্দেশ্য হলো, মহিলাদের মুক্তির মাধ্যমে শক্তিশালী তুরস্ক গড়ে তোলা। ছয়টি প্রদেশে এই দলের শাখা স্থাপন করে উন্নততর বিবাহ আইন, সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে নারীদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে দাবি জোরদার করা হবে।

নবগঠিত এই সমিতির মতে, তুরস্কে এতকাল নারীদের পরাধীন করে রাখা হয়েছিল। এবার সেই পরাধীনতার বিরুদ্ধেই তাঁদের আন্দোলন।

—প্রমীলা
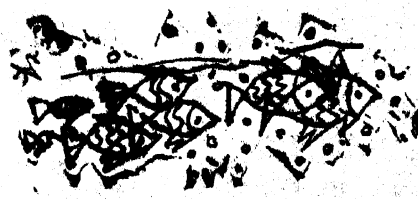
বিষাদ ও বিরক্তির মনোবিশ্লেষণ

অসীম বর্ধন

বেঁচে থাকার সমস্যায় মানুষকে সত্যি-কারের সাহায্য করতে পারা একটা কাজের মতো কাজ। তবে এ কাজটা সযত্নে আরম্ভ করতে হয়।

আমাদের ব্যক্তিত্বের সুর - ছন্দে যখন সামঞ্জস্য সৃষ্টি করতে শিখি, বেসুরো জীবনধারাকে যখন মনোরম উপভোগ্য উচ্ছ-লতায় ভরিয়ে তুলে গেয়ে উঠতে পারি— 'আমাকে ডাক দিল কে ভিতর পানে'— তখন বুঝতে পারি জীবনের সত্যিকারের মাধুর্য কোথায়!

দৈনন্দিন জটিলতা থেকে দূরে পালিয়ে বেড়ালে সেই মাধুর্য-সুখ কেউ উপভোগ করতে পারে না। কোথাও নির্জনে গিয়ে একলাটি চুপ করে বসে থাকলে কী বেঁচে থাকার সমস্যা থেকে রেহাই কেউ পেতে পারে? পারে না।

আমাদের চারিপাশের সব কিছুর সংগে সব দিক দিয়ে সামঞ্জস্য করে চলতে পারলেই জীবনের মাধুর্য ফুটে ওঠে। পৃথিবীতে যাঁরা সবচেয়ে সুখী মানুষ, তাঁরা পরি-বেশের সংগে নিজেকে মানিয়ে নিতে জানেন, এমন কি পরিবেশকেও নিজের মতো গড়ে পিটে নিতে জানেন।

সামঞ্জস্য করে চলতে না পারলেই জাগে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা আর এই উদ্বেগই ক্রমে মনটাকে কুরে কুরে নষ্ট করতে থাকে। বিষাদ, বিরক্তি তখন নানাভাবে দেহমনকে পঙ্গু করে ফেলতে সুরু করে।

বিষাদ এবং বিরক্তির কবলে আমরা সকলেই কখনো না কখনো পড়তে বাধ্য হই। এই সমস্যা সকলেরই। তাই এই নিয়ে যত বেশি আলোচনা করা যায়, ততই একে জয় করার নতুন নতুন পথের সন্ধানও পাওয়া যেতে পারে। বিশেষ করে, আজকের দিনে আমাদের সমাজ যেমন বারুদের স্তূপ হয়ে রয়েছে, একটুতেই সকলে বিরক্ত হয়ে পড়ছে, তখন এ নিয়ে আলোচনা এবং পথের সন্ধান খুবই দরকার।

এমন কি খুব আত্মবিশ্বাসী দিল-খোলা হাসিখুশি সদা প্রফুল্ল লোককেও মাঝে মাঝে হঠাৎ বিষণ্ণ মনমরা হয়ে পড়তে হয়; বলে ওঠেন 'আমি ফেড আপ হয়ে পড়েছি'। কাজ ভালো লাগে না তখন, হাসি আনন্দ ভালো লাগে না, নিজের কোনো কাজ নিজের কাছেই বাজে বলে মনে হয়, সকলের ভাবভঙ্গী কথাবার্তা আচরণে কেবল ভুল ধরা পড়ে চোখে, ইচ্ছাশক্তি যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে, যা চিন্তা করার দরকার হয় তার মধ্যে থাকে না গতি, সবকিছু চিন্তাই জটিল জটপাকানো মনে হয়, মেলামেশা ছেড়ে দিতে ইচ্ছে হয়, আর তখন শুধু ভালো লাগে নিজের কথা, নিজের অবস্থার কথা। কিংবা কারো সংগে দেখা হলেই বলতে থাকি,— আবহাওয়া কি বিশ্রী, ব্যবসা বাণিজ্য বড় মন্দা, সময়টাই যাচ্ছেতাই'! এমন অবস্থায় বিষাদগ্রস্ত কেউ কেউ এমন কথাও বলেন, 'আর বেঁচে থাকা যায় না। একটা অ্যাকসি-ডেন্ট হয়ে মরলে বাঁচি।'

এই বিষাদ মনোভাব ভারী মারাত্মক রকমের ছোঁয়াচে। বিষণ্ণ মানুষ যখন মন-মরা হয়ে কথা বলে, তখন সহানুভূতি খোঁজে আর যখনই কেউ সহানুভূতি সহকারে তার কথা শোনে এবং দুটো মিষ্টি কথা বলে, তখনই বিষণ্ণতার সুর সংক্রামিত হতে থাকে। হবেই।

এই জন্যে বিষাদগ্রস্ত মানুষকে 'আহা-উহু' করে প্রচুর মিষ্টি কথায় সান্ত্বনা দিয়ে তার বিষাদ মনোভাবকে নিজের মধ্যে সংক্রামিত না করে, আশা উদ্দীপনার কথা বলে হাসি উচ্ছলতায় দমকা হাওয়া বইয়ে তার মনমরা ভাব কাটিয়ে দেবার চেষ্টাই করতে হয়।

বিষণ্ণ মনকে আবার উদ্দীপ্ত করে তোলার জন্যে কেউ যান দীক্ষা গুরুর কাছে, কেউ ডাক্তারের কাছে, কেউ বা যান সাই-কিয়াট্রিস্ট-এর বাড়ী।

এঁদের কাছে মনমরা কোনো কোনো মানুষ সহানুভূতি পেলেই বেশ চাঙ্গা হয়ে ওঠেন, আবার অনেক মনমরা লোককে বেশ খানিকটা ধাতানি দিলে তবে তাজা বোধ করেন। কিন্তু এঁদের সকলেরই দরকার খানিকটা সহায়তা, তা না হলে তাঁরা নিজেরা বিষাদ কাটিয়ে উঠতে খুব সহজে পারেন না, আর যতক্ষণ সেটা না পারবেন, ততক্ষণ তাঁরা আমাদের সবার কাছে বিরক্তির কারণ হয়ে থাকবেন, তাঁদের অনেক বোঝা এসে পড়তে থাকে আমাদের কাঁধে। অশান্তি সৃষ্টি হতে থাকে নিত্যনতুন।

ধরুন এক চাষীকে বলা হলো, 'আজ-কের দিনটা বেশ রোদ উঠেছে,' সে বলে উঠলো, 'এই দ্যাখেন না, খানিকটা পরেই জলে নামবে।' তাকে কখনো হয়তো বলা হলো 'বেশ বিষ্টিটা ভালোই হচ্ছে,'—সে অমনি বলে উঠতে পারে, 'অনেক হয়েছে, এখন একটু সূর্যের মুখ দ্যাখলে বাঁচি!'... তবে জীবনটাকে এমনভাবে অসন্তোষ নিয়ে দেখা শুধু চাষীটিরই স্বভাব নয়।

আপনার মধ্যেও একটি মানুষ আ যিনি অসন্তুষ্ট, বিরক্ত, বিষণ্ণ। উৎস হয় একই, কিন্তু একই কারণে কখনো হ বিরক্ত, কখনো বা বিষণ্ণ। আপনার বি খিটখিটে মেজাজের ফলে সামান্য কারণে হয়তো কখনো দারুণভাবে হৈ চৈ বাধি ফেলেন। এরকম যাঁরা করেন, তাঁরা অত্য আত্মসচেতন এবং নিজের সম্পর্কে লো কে কি বলছে, তা নিয়ে মনের মধ্যে বড় বে তোলাপাড়া করেন।

অনেক সময়ে, এই বিরক্তি এবং বিষা মনোভাব আচরণের মধ্যে প্রকাশ না পে চোখের জলে প্রকাশ পেতে দেখা যায়; বিশে করে মেয়েদের মধ্যে। এঁরা যেন নিজে শহীদ বলে মনে করেন; সিনেমায় যেতে বললে বলবেন, 'তোমর যাও, আনন্দ করো, আমার জন্যে ভেবো না।' যদিও বা উপরোধের চাপে সিনেমায় যেতে রাজিও হন, তা হলে ঐ ক'ঘণ্টা অত্যন্ত অস্বস্তির মধ্যে কাটাবেন ওরকম মানুষকে নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করতে যাঁরা চান, তাঁদের সকলেরই ভারী বিশ্রী লাগে, ঐ একটি মানুষের বিরক্তি ও বিষাদ-ভাব অন্য সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, সন্ধ্যা বেলার সব স্ফূর্তিটুকু যেন মাঠে মারা যায়।

কতকগুলো কাল্পনিক দুঃখ দুর্দশা, সামান্য মান-অপমানের গ্লানি, মনের আঘাত—অথচ তাই নিয়েই নিজেকে বার—হতাশার অন্ধকারে ডুবিয়ে যেন মেরে ফেলতে চান এঁরা।

আমার মনে হয়, পুরুষরাও এরকম করেন। মনমরা যখন হয়ে থাকি, কেন এমন হচ্ছে, তার কোনো কারণই বলতে পারি না। আসলে হয়তো আমরা যখন আমাদের বড়-দের কাছ থেকে শুনি, আমরা অপদার্থ, কোনো কাজের নয়, তখন মনে আঘাত পাই, হীনমন্যতা জাগে, তার ফলে যে বিষাদ সৃষ্টি হয়, সেটাই খুব সম্ভব আমাদের কাছ থেকে মেয়েদের মধ্যে সংক্রামিত হয়ে পড়ে।

যাঁরা আমাদের ভালোবাসেন, তাঁরা আমাদের এই মনমরা ভাব থেকে কষ্ট পান, আমাদের পেছনে এগিয়ে এসে এই আঁধার-যাতনা থেকে টেনে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা যথাসাধ্যই করেন, কিন্তু আমরা মুখ ফিরিয়ে বলি, 'না থাক, আমার কথা ভাবতে হবে না।'

একদিন তাঁরা হাল ছেড়ে দেন, মন খারাপ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে যান নিজের কাজে।

তখন আমরা যেন বিষাদ-বিলাসের একটা বীভৎস সুখ অনুভব করতে থাকি। যেন খুব জিতে গেছি। যেন সকলকে বেশী জব্দ করা গেছে মনে করি।

কিন্তু মেয়েরা এমনই যে, যতই পুরুষেরা নিজেকে বিষণ্ণতার গহ্বরে লুকিয়ে ফেলতে চাই, ততই যেন তারা এগিয়ে এসে চায়ের কাপটা কাছে তুলে ধরে, বিছানার চাদরটা টেনে সমান করে দেয়, দুধের বাটিটা বিছানার পাশেই এনে রাখে, শীতের দিনে জল গরম করে রেখে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নেওয়ার জন্যে ডেকে ডেকে ব্যস্ত করে তোলে।

বেশ ভালো লাগে, অমন যত্ন পেয়ে বেশ একটা পুরুষালী মর্যাদায় আনন্দে বুকটা যেন ভরে ওঠে। বারেবার অমনভাবে যত্ন পেতে ইচ্ছে করে; করে না কী?

আর তারই ফলে, বারেবারে ঐ রকম শহীদ মনোভাবের ছেলেমানুষী জেগে ওঠে মনের মধ্যে। যতই নিজেকে নিয়ে অব-হেলার ভাব দেখাবো, ততই সকলের সহানুভূতি বেশি পাবো, এই কাল্পনিক বিলাসের চর্চা করতে করতে একটা স্বভাবই দাঁড়িয়ে যায় মনমরা হয়ে থাকা।

সমস্ত ব্যাপারটাকে প্রথমে শারীরিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করে দেখতে হবে। তারপরে ভেবে দেখা দরকার, এর পেছনে মানসিক সমস্যার জটিলতা কতোখানি রয়েছে। আর সবশেষে, বুঝতে চেষ্টা করা উচিত, মানুষের বিষাদ-বিরক্তির মূলে আত্মিক সমস্যার দায়িত্বই বা কতোখানি।

এই তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিষাদ ও বিরক্তির কারণ বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে আমাদের। সঠিকভাবে সব দিক দিয়ে বিচার করে সমস্যাটির ঠিক মূল কেন্দ্রে যদি আমরা পৌঁছতে পারি, তাহলে হয়তো বিষাদ-গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসার একটা পথ আমরা বাতলাতেও পারি।

নিজের মনমরা ভাব এবং খিট-খিটে স্বভাবের জন্যে অনেকেই নিজেকে খুব ঘৃণা করতে শুরু করেন। এটা মারাত্মক ক্ষতিকর, সেকথা নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে না। তাঁদের মন যখন একটু ভালো থাকে, তখন যদি ঠিক পথের সন্ধান তাঁদের দেওয়া যায়, তাহলে এই মারাত্মক মনমরা-পিচ্ছিল পথ থেকে সময় থাকতে তাঁদের আমরা ফিরিয়ে আনতেও পারি।

শারীরিক

প্রথমেই তাহলে ভাবা যাক, মনমরা খিটখিটে স্বভাবের মূল কারণ সবটাই থাকতে পারে দেহের মধ্যে। দেহ ভালো থাকলে সব ভালো থাকে। কেবল রোগ-ভোগের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার কথা নয়, দেহের প্রতি অবহেলামূলক মনোভাবের কথাও ভাবতে হবে। দেহচর্চার দিকে অবহেলার [illegible] নিলে [illegible] স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। আপনি যতো ভালো হতে চান, ততো ভালো হতে হলে শরীর-টাকে তাজা রাখতে হবে, [illegible]

অনেকে হয়তো এ [illegible] করে বলতে পারেন, [illegible] চলে না, কারণ বড় বড় [illegible] ঋষিরা [illegible] শারীরিক অস্বস্তি আর [illegible] ভোগ সিদ্ধিলাভ করেছেন।”

এর জবাবে আমি বলবো, [illegible] করেছেন বলেই তাঁরা মুনি-ঋষি হননি; তাঁরা সিদ্ধি লাভ করেছেন কষ্ট সহ্য করতে পেরেছেন বলে। নানা দুর্ভোগ তাঁদের আত্মাকে জাগিয়েছে, উদ্দীপ্ত করেছে এবং নিদারুণ চ্যালেঞ্জকে অতিক্রম করতে পেরে-ছেন বলে অসংখ্য অশুভ সম্ভাবনার মধ্যে থেকেও শুভ সার্থকতা অর্জন করতে পেরে-ছেন। কিন্তু তাঁদের আত্মাকে যদি অন্য কোনোভাবে জাগানো যেতো, তাহলেও হয়তো তাঁদের চারিত্রিক উন্নতির তেমনি সুউচ্চ শিখরেই উঠতে পারতেন।

একটি যুক্তির অবতারণা করে এর ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। দুঃখ-কষ্ট যন্ত্রণা-দুর্ভোগ—এ সবের এমন কোনো অটো-মেটিক প্রভাব নেই যার ফলে বলা চলে, দেহের অস্বস্তি-অসুস্থতা জাগলে আত্মার স্বাস্থ্য ভালো হয়ে ওঠে। মনে রাখতে হবে, অস্বস্তি-অসুস্থতার ফলে মেজাজ খিট-খিটে অবসন্ন হয়ে পড়ে, আমরা সেই কথাই আলোচনা করছি।

যদি আপনার বাতের যন্ত্রণা, দাঁত ব্যথা, কিংবা বদহজমের কষ্ট হয়, তখন ব্যাপারটা নিজেই যাচাই করে দেখতে পারেন।

ধরুন, দাঁত ব্যথা নিয়ে দাঁতের ডাক্তারের কাছে গিয়ে শুনলেন, দাঁতের গোড়া একে-বারে ক্ষয়ে গেছে। একথা শুনে আপনার মনে মুনি-ঋষিদের মতো শুদ্ধ প্রশান্ত আত্মার অভিজ্ঞতা জেগে উঠেছিল, এ যদি শুনি তাহলে নিশ্চয়ই আশ্চর্য হয়ে যাবো।

যাঁরা শারীরিক কষ্টকে সহ্য করে বড় হয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা এত-টুকু কম নয়; কিন্তু তাঁরা যদি সুস্থ সুঠাম দেহের অধিকারী হতে পারতেন, তাহলে নিশ্চয়ই আরো তাড়াতাড়ি আরও সুন্দর-ভাবে বড় হয়ে ওঠার পথ খুঁজে পেতেন। আমরা সবাই জানি, বুদ্ধদেব প্রথমে নিজের দেহকে নিদারুণ অবহেলার মধ্যে ফেলে রেখে আত্মার প্রশান্তির সাধনা করতে গিয়ে দেখেছিলেন, দেহকে সুস্থ সবল রাখতে না পারলে আত্মার সত্যিকারের প্রশান্তি আনা যায় না।

এসব কথাই আলোচনা করতে হলো বিষাদ ও বিরক্তির উৎস সন্ধানে নেমেছি বলে।

যদি দেহের মধ্যে বিভিন্ন গ্রন্থি ঠিক ঠিক মতো রস সৃষ্টি এবং বিতরণ না করতে পারে, যদি যথেষ্ট পরিমাণে জল না খাওয়া হয়, শরীরের আবর্জনা নিয়মিত নিষ্কাশন করে দেওয়া না হয়, কিংবা যদি খুব বেশি [illegible] খুব কম খাই, ব্যায়ামবর্জিত [illegible] না, [illegible] ও [illegible] যথেষ্ট না [illegible], অথবা খুব বেশি [illegible] খুব অল্প [illegible]—তাহলে দেহ [illegible] প্রফুল্ল থাকতে পারে না।

[illegible] ব্যারিকেডের কাচ যদি পরিষ্কার না [illegible], তাহলে ভেতরের আলোর দীপ্তি-[illegible]রের উজ্জ্বলতা বাইরে থেকে ঠিকমতো কিছুতেই বোঝা যায় না। দেহও যদি শুদ্ধ সুস্থ না থাকে, তাহলে মনের শুদ্ধ অভি-প্রকাশ ঘটতে অসুবিধা ঘটে, একথা বুঝতে তো সবাই পারি।

শরীরকে অসুস্থ রেখে আত্মা ও মনের পূর্ণ প্রকাশ ব্যাহত করা ভয়ানক অন্যায়। অসুস্থ হওয়াটা পাপ নয়, কিন্তু আপনি যতটা অসুস্থ তার চেয়ে বেশি অসুস্থ হয়ে পড়াটাই পাপ।

তাহলে কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, যখনি আমরা বিষণ্ণ এবং বিরক্ত বোধ করবো, তখনই তার কারণ খোঁজবার উদ্দেশ্যে নিজের দেহটির দিকেই আগে নজর দিতে হবে। একজন ডাক্তারের কাছে গিয়ে দেহটা ভালো করে দেখিয়ে নেওয়া দরকার তখন। বছরে অন্ততঃ একবার জমানি করা ভালো।

মানসিক

বিষাদ ও বিরক্তির সমস্যাকে একটা মান-সিক সমস্যা হিসেবেও বিচার করা যায়। মানুষ যখন বিষণ্ণ মনমরা খিটখিটে হয়ে থাকে, তখন তার পেছনে যে সব মানসিক কারণ থাকতে পারে, সেগুলিকে ছটি ভাগে ফেলা যায়।

১। প্রথম কারণ হলো মানসিক অস্থি-রতা। খুব বেশি কাজ করার জন্যে যে এটা হয় তা নয়;—এটা হওয়ার কারণ, মানসিক সামর্থ্যের ভুল ব্যবহার। মনমরা খিটখিটে লোক যিনি, তিনি বলবেন, কোনো কাজে গভীরভাবে মন লাগাতে পারছেন না। আমি বলবো, মনমরা খিটখিটে ভাবটা সৃষ্টি হয়েছে মনোনিবেশ করার চর্চা না করার ফলেই।

কিভাবে আবিষ্ট হয়ে কাজ করতে হয়, তার চর্চা না করলে বিষাদ আর বিরক্তি জাগার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। একটু যত্ন করে মনের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে যদি মনো-নিবেশ করার চেষ্টা অভ্যাস কেউ করেন, তাহলে আশ্চর্য রকম দ্রুতগতিতে মনের সব বিষণ্ণতা, সব বিরক্তি কোথায় যেন মিলিয়ে যায়।

অনেকে আছেন, বোকার মতো অবিরাম, [illegible] দিন কাজ করে চলেছেন। একটানা সারাদিন কেউ কী খাটতে পারে? সন্ধ্যে ছটার সময় দেখবেন, তাঁরা ক্লান্ত অবসন্ন এবং [illegible] হয়ে পড়েছেন, ভাবছেন এখনো [illegible] কিছু করতে হবে, কিন্তু শরীর ভেঙে পড়ছে। খিটখিটে করে বাড়ীতে অশান্তি বাধিয়ে তুললেন

কিন্তু শান্তভাবে বিশ্রাম নিয়ে তিনি অনায়াসেই পরীক্ষাটুকু উপভোগ করতে পারতেন।

কেনাকাটা করবার সময়ে অনেকে কোনো কিছুর তালিকা সঙ্গে নিয়ে বেরোন না, ফলে দেখা গেল, দরকারী জিনিস কেনা বাদ পড়ে গেছে। আবার বেরুতে হলো। হয়তো এমনি ভুলের জন্যে তিন চারবার দোকানে ছুটোছুটি করতে হলো। মেজাজ তো খারাপ হবেই। সকলেই মানবেন, এরকম অভ্যাস হানিকর এবং অহেতুক মানসিক সামর্থ্যের অপচয় ঘটায়।

মন্দিরের এক পুরোহিত নভেল পড়ায় মন বসাতে পারতেন না। তাঁকে বলা হলো, ধর্ম পুস্তক পড়ায় মন বসাবার চেষ্টা করে দেখুন তো! পুরোহিত মশাই আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, কতো স্বচ্ছন্দভাবে তিনি ধর্মপুস্তক পড়তে পারছেন মনোনিবেশ সহকারে। এ থেকে বোঝা যায়, মানসিক সামর্থ্যকে অনুপযুক্ত ক্ষেত্রে নিয়োগ করলে সে খোঁড়া হয়ে চলে।

যদি আপনি প্রায়ই স্বপ্ন দেখেন, থলিতে কী সব যেন ভরতে চাইছেন কিন্তু কিছুতেই ভরতে পারছেন না, কিংবা ট্রেন ধরবার জন্যে ছুটছেন, কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না; অথবা জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়ে গেছেন, কেবলই ঝোপে-আগাছায় হোঁচট খাচ্ছেন, নয়তো খাড়া পাহাড়ে উঠে চলেছেন তো চলেছেনই, কিছুতেই চুড়োয় পৌঁছনো যাচ্ছে না— তাহলে বুঝতে হবে এসব স্বপ্নের মানে হলো, আপনি বড় বেশি পরিমাণে কাজের দায়িত্ব নিয়ে উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলেছেন।

এমন বয়সে পৌঁছলে বুঝেছেন, জীবনটাকে স্বচ্ছন্দ করার জন্যে নিজের অপারগতা নিয়ে আপনি বড় বেশি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন মনে মনে। কিছু কিছু বোঝা কমিয়ে ফেলতেই হবে আপনাকে। কম কাজ করতে হবে হয়তো যা করবেন তা বেশ গুছিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় যেখানে খেটে করতে হবে, তাই করবেন। সমস্যাটা আসলে এখানে আপনার দৈহিক সামর্থ্যের সমস্যা নয়; এখানে আপনার ব্যক্তিত্বের সদ্ব্যবহার এবং মনের আয় ব্যয়ের একটা পাকা বাজেট তৈরী করাটাই হলো সমস্যা।

আমার নিজের তো খুব ইচ্ছে করে, দিনটা যদি ৫০ ঘণ্টার হতো, আর সপ্তাহে যদি কুড়িটা দিন থাকতো! কত কাজ করা যেতো! কিন্তু জীবনভর শুধু কাজ করলেই হয় না, হিসেব করে কাজ করতে হয়। নিজের সামর্থ্য কতোখানি তা জেনে তার সদ্ব্যবহার করতে হয়, কম দরকারী কাজ কেমন সরিয়ে রাখতে হয়—তার সঠিক হিসেব করাটাই আসল কথা। যে কাজের প্রয়োজন কম, সে কাজ যতোই ভালো হোক, সে কাজ না করলে লোকে যতোই মন্দ বলুক, তবু বাদ দিতেই হবে নিজের সামর্থ্যের মাপকাঠিতে বিচার করে। না হলে মনমরা হতে হবে।

২। বিষাদ এবং বিরক্তির দ্বিতীয় প্রধান কারণ হলো, আর্থিক এবং কাজ কর্মের ব্যাপারে আমাদের মন উদ্বিগ্ন হতে থাকে। আজকাল এ কথাটা কাউকেই বুঝিয়ে বলতে হবে না, সকলেই ভুক্তভোগী। তবে এমন লোকও অনেক আছেন, যাঁরা টাকা পয়সার সমস্যায় উদ্বেগ বোধ করেন না খুব, কারণ তাঁরা আর্থিক ব্যাপারেই কেবল মন দিয়ে রাখেন এবং অন্য সব ব্যাপার থেকে মন সরিয়ে নেন। আরও একটা বিষয়ে তাঁদের কাছ থেকে আমরা শিখতে পারি, তা হলো বর্তমানকে নিয়ে চিন্তা করা। যদিও ২০, ৩০, কিংবা ৪০ বছর বাঁচতে পারি, তা হলে অতোদিনের ভাবনা এখনই আজই ভাবতে বসার কী দরকার?

৩। তৃতীয় যে কারণটির জন্যে মনে বিষাদ ও বিরক্তি জাগে, সেটি হলো মনের আবদ্ধ ভাব। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, প্রত্যেকটি মানুষের মনে শক্তি ক্ষমতা সামর্থ্যের বাসনা পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে। এই পুঞ্জীভূত শক্তি যদি মনের মধ্যে রুদ্ধ হয়ে থাকে, মানসিক সামর্থ্যের ধারা যদি বাইরে বেরিয়ে কোনো কাজ করবার সুযোগ-সুবিধে না পায়, তাহলে রুদ্ধ আবদ্ধ মনে হতাশা বিষাদ বিরক্তি জেগে উঠতে থাকে।

৪। চতুর্থ কারণটি সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিষাদ ও বিরক্তির জন্য খুব বেশি দায়ী। এই কারণটি নিয়েই বেশি করে আলোচনা করা দরকার।

নিদারুণ বিষাদ এবং বিরক্তি সৃষ্টির মূলে যে প্রচণ্ড শক্তিটি কাজ করে, মনো-বিদরা তাকে বলেছেন, ছেলেবেলায় ফিরে যাবার মানুষী প্রবৃত্তির পশ্চাৎগতি সুপ্ত বাসনা (ইনফ্যানটাইল রিগ্রেসন)।

অনেক সময় দেখা যায়, দেহের গঠনে একটি মানুষ বড় সড় হয়ে উঠেছেন, তাঁর মস্তিষ্কের বিকাশও ঠিকমতো হয়েছে, কিন্তু তিনি মনের দিক থেকে বড় হয়ে উঠতে নারাজ। অর্থাৎ কোনো কোনো ব্যাপারে তাঁর মনোভাব ছেলেবেলার দিনগুলির মতো হয়ে ওঠে। পেরেক ঠুকতে গিয়ে আঙুলে হাতুড়ী বসিয়ে দেন, নিজের রুমাল হারিয়ে গেলে হাতের কাছে বন্ধু বান্ধবদের ধমকে দেন, চা খেতে গিয়ে প্রায়ই জামা কাপড়ে চা ফেলেন, এমনি সব ছেলেমানুষী করে বসেন।

কেন তিনি এমন করেন? বলি শুনুন। যখন তিনি ছোট্ট শিশু ছিলেন, মুখ থেকে চুষিকাঠিটি পড়ে গেলে, কিংবা ঝুমঝুমিটা ছিটকে গেলে, সুরু হতো তারস্বরে কান্না, চীৎকার। আর, যখনই এমন হতো, তখনই খোকার মতো মা বোন কেউ দৌড়ে এসে সেটা তুলে দিতেন। অর্থাৎ, শিশু কাঁদলেই তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে সবাই ছুটে আসতো।

এ থেকে শিশুর মনের গভীরে একটা বদ্ধমূল ধারণা সৃষ্টি হয়ে গেল যে, কাঁদলেই সাহায্য পাওয়া যায়, আরাম এসে পড়ে। এবং বড় হয়ে এখনও অবচেতন মনে ঐ বিশ্বাসটি এমনভাবে কাজ করছে যে, ব্যর্থতা বিষাদ বিরক্তি দেখিয়ে সবার কাছ থেকে সহানুভূতি সহযোগিতা আদায়ের চেষ্টা দেখা দিচ্ছে।

একথা শুনে যিনি বলে উঠবেন, 'যতো সব বাজে কথা!'—তিনি শিশুসুলভ বিরক্তির পরিচয় দিয়ে ফেলবেন। অর্থাৎ আবেগ-প্রক্ষোভের দিক থেকে তিনি এখনো যথেষ্ট বড় হয়ে উঠতে পারেননি।

কোনো এক ভদ্রমহিলা কাজের বাড়ীতে অর্থাৎ উৎসব বাড়ীতে গিয়ে চা পরিবেশন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কোন কারণে তাঁকে সে কাজ দেওয়া হয় নি। দেখা গেল, তিনি মনে অত্যন্ত কষ্ট পেয়ে চোখের জল ফেলছেন এক কোণে গিয়ে। এও শিশু-সুলভ বিষাদ। ছেলেবেলায় চোখের জল ফেললেই সব কিছু সহজে পেয়ে যেতেন, সেই অভ্যাসেই চোখ থেকে জলের ধারা এসেছে নেমে।

আর একজন ভদ্রলোকের কথা বলি, গ্র্যাজুয়েট তিনি, বিবাহিত, ছেলেমেয়ে আছে, কাজকর্ম রোজগারও করেন ভালো। কর্মক্ষেত্রে তাঁর সুনামও আছে কাজের লোক বলে। কিন্তু তবু তিনি বলতেন, 'আমি কিছু বুঝতে পারছি না, জীবনটা আমার আতঙ্কে ভরে যাচ্ছে। কঠোর কর্মজীবনের লড়াইএর মধ্যে যেতে আর ভাল লাগছে না। ইচ্ছে করে, কেবল শুয়ে থাকি।'

বেশ বোঝা গেল, ভদ্রলোক শিশুসুলভ বিষাদ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁকে মনোবিদ যখন বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই আপনার মাকে এখনো দারুণ ভালোবাসেন। আপনি হাঁটু দুটি বুকের দিকে মুড়ে শুয়ে থাকেন। আপনি নাগরদোলায় চড়তে বা ঐ ধরনের দোলায় দুলতে খুব ইচ্ছে করেন। আপনি বেশ গভীর ভাল ছন্দের গান-বাজনা ভালবাসেন।' শুনে ভদ্রলোক মনে করলেন, এ সব নিশ্চয়ই পরিচিত কারুর কাছে জেনে বলা হলো কিংবা থট্ রিডিং এর রহস্য রয়েছে এর পেছনে। আসলে তা নয়, যে কোনো মনোবিদের পক্ষেই এভাবে বলে দেওয়া সহজ। শিশু-সুলভ আচরণের দিকে ঝোঁক থাকলে ঐসব আচরণ লক্ষণ দেখা দেবেই।

বিখ্যাত মনোবিদ ফ্রয়েড বলেছেন, শিশুসুলভ আচরণের দিকে এই যে পশ্চাদ্গতি, শৈশবে ফিরে যাওয়ার বাসনা, তার ফলে অবচেতন মনটি যেন চায় আবার মাতৃজঠরে ফিরে যেতে, তাই হাঁটু মুড়ে শুয়ে থাকার লক্ষণ দেখলে মনে হয়, মাতৃ-জঠরে শিশু যেভাবে পা মুড়ে থাকে, সেই ভঙ্গীটাতেই যেন মানুষটি ফিরে যেতে চাইছে।

মাতৃগর্ভে শিশু আরামে নিরাপদে নির্ভয়ে হাঁটু মুড়ে থাকে, কিছুই তাকে করতে হয় না। মা যখন হাঁটেন, শিশুটি তখন দোলা খেতে থাকে, আর সেইজন্যেই ফ্রয়েডের মতে, বয়স্ক মানুষের মনে দোলা খাওয়ার আনন্দ-বাসনা খুব বেশি করে জাগলে নিশ্চিতভাবে বুঝতে হবে, মাতৃ-গর্ভের মতো নিশ্চিত জীবনের লালসাই জেগে উঠেছে।

ফ্রয়েড এ কথাও বলেছেন, মায়ের জঠরে প্রচুর রক্ত চলাচলের যে অবিরাম বিপুল ছন্দ শিশু মাসের পর মাস শুনতে থাকে, তার ফলে তার সমস্ত স্নায়ুতে সেই ছন্দের অনুরণন খেলা করতে থাকে, এবং যে-মানুষ খুব বেশি পরিমাণে ছন্দবহুল গানবাজনায় খুশি হতে চান, তিনি মাতৃ-জঠরের সেই ছন্দ সুখকেই ফিরে পেতে চাইছেন বলেই ফ্রয়েডের বিশ্বাস। বিখ্যাত দার্শনিক মনোবিদ ডঃ পল বোউসফিল্ড তাঁর লেখা 'ওমনিপোটেন্ট সেলফ' (সর্ব-শক্তিমান আত্মা) বইখানিতে ফ্রয়েডের অভিমতের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই বিশ্বাসটিকেই সমর্থন করেছেন।

৫। বিষাদ ও বিরক্তির মানসিক কারণ-গুলির মধ্যে পঞ্চমটি হলো বাস্তব থেকে সরে যাওয়ার ইচ্ছা। নানা কারণে মানুষের মন যখন নিরাপত্তার অভাববোধ করতে থাকে, হীনমন্যতা জাগে, তখন আর কিছু ভালো লাগে না এই জগতের, মনে হয়, সব কিছু থেকে দূরে সরে যাই, হারিয়ে যাই সবার চোখের আড়ালে। এই জগতের সমাজকে আমাদের আদর্শের মাপকাঠি দিয়ে যাচাই করতে গিয়ে যখন দেখি, এই সমাজ আদর্শচ্যুত, দোষত্রুটিতে পরিপূর্ণ, তখন মন ভরে ওঠে বিরক্তিতে এবং তা থেকেই বিষণ্ণতার জন্ম হতে শুরু করে।

পাখিখাঁচা যে ভঙ্গীতে মন্দির ঝোলানো, একপ্রান্ত বুঝতে পারলে এই বিষণ্ণতা

কাটিয়ে উঠে সহজভাবে সব কিছুকে মেনে নেবার মন গড়ে উঠতে থাকে।

৬। ছ' নম্বর কারণ হলো প্রশংসা লাভের আকাঙ্ক্ষা। দেহের জন্যে যেমন খাবার দরকার, খোলা বাতাস, রোদের প্রয়োজন, ছুটিছাটার দরকার, ঠিক তেমনি কিছু কিছু প্রশংসারও প্রয়োজন মনের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে। প্রশংসা যেন এক ধরনের টনিক, মানুষকে সঞ্জীবিত করে। অথচ এ জিনিসটার জন্যে আমাদের পয়সা খরচ করতে হয় না কিছুই।

কত লোক আছে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়ে চলেছে—কেউ তাদের একটা কাজেরও প্রশংসা করে না। ফলে, অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ মনমরা হয়ে পড়ে, বিরক্তি জাগে তা থেকেই—কারণ, জীবনটা বিস্বাদ মনে হতে থাকে। এই জন্যেই মানুষকে প্রশংসার কথা শোনাতে হয়, উৎসাহ দিতে হয় ভালো কিছু দেখলেই। প্রশংসা না পেয়ে কোনো লোক বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়লে সেই বিষাদ পাশের লোককেও জড়িয়ে ধরতে থাকে।

বিষাদে বিরক্তিতে আত্মগ্লানিতে মনকে ভরিয়ে রেখে কেবল অদৃষ্টকে দায়ী করলে কোনো ফল হয় না। ভগবান আছেন, ভাগ্য অদৃষ্ট এসবও আছে, কিন্তু তা বলে নিজের মধ্যে যে শক্তি আছে তাকে বিষাদে আচ্ছন্ন অকর্মণ্য করে ফেলে রেখে কেবল ভগবানকে ডাকলে তিনি কখনো খুশি হতে পারেন না।

আত্মিক

ভগবানের কথা যখন এসেই পড়লো, তখন বিষাদ ও বিরক্তির আত্মিক বা অধ্যাত্মিক দিকটার কথাও ভেবে দেখা যাক। বিষাদ ও বিরক্তি একটা শারীরিক সমস্যাও বটে, মানসিক সমস্যাও বটে, একথা এতক্ষণ আলোচনা করে বোঝা গেল। একে আত্মিক সমস্যাও বলতে পারি। তবে মানসিক এবং আত্মিক (স্পিরিচুয়াল)—এই দুটির মধ্যে পার্থক্য বোঝানো বড় মুস্কিল। মনের কাজ কোথায় শেষ আর আত্মার কাজ কোথায় শুরু, তা বলা বড় শক্ত।

তবে একথা ঠিক, মনের স্নায়বিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার চেয়েও সূক্ষ্ম একটা জিনিস আমাদের মধ্যে আছে, সেটা আত্মারই স্বরূপ। আত্মার মধ্যে যখন জাগে স্বার্থপরতা, বিষাদ-বিরক্তির সৃষ্টি তখনই শুরু হয়। কিন্তু কোনো স্বার্থপর মানুষকেই আমরা মেনটাল হসপিটালে পাঠাই না, কিন্তু তাঁর স্বার্থপরতা একটা আত্মিক ব্যাধি ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং এই স্বার্থপরতা থেকেই নানাধরনের মানসিক ব্যাধির সৃষ্টি হয়।

সত্যিই, স্বার্থপর মানুষদের ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ মনে করে চিকিৎসা করানোই উচিত। স্বার্থপরতা মানুষের মনে যে আত্মিক বিষণ্ণতা ও বিরক্তির সমস্যা বাধিয়ে তোলে, তার তিনটি মূল কারণ হলো :

১। সমালোচনা শুনলে অনেকে অনর্থক ভুল ধারণা করে বসেন। হয়তো সমালোচনাকে সইতে পারেন না, আর না হয়, সমালোচনার চাপে নিজের সামর্থ্যের বাইরে কিছু করতে চেষ্টা শুরু করে দেন। অথচ সামর্থ্যের বেশি কাজ না করলেও চলে, করতে গেলে ভালোও হয় না। ফলে, অর্ধেক পথ থেকে তাঁরা ফিরে আসেন, ক্লান্ত অবসন্ন, বিরক্ত, বিষণ্ণ দেহমন নিয়ে। অমন করার কোনো মানেই হয় না।

২। অন্য লোকের মতামতকে মানতে না চাওয়ার ফলেও বিষাদ ও বিরক্তি জাগে নিজেরই মনে। নিজে মতামতকে খুব বেশি মর্যাদা দিয়ে আঁকড়ে ধরে থাকার জন্যেই এমন হয়। ঘর-সংসারে এমনি হামেশাই ঘটছে না কি? মতভেদ হবেই, কিন্তু অনেকদিন ধরে তার জের টেনে চললে বিষাদভাব জাগে, মন খিটখিটে হয়ে পড়ে। এরকম অবস্থায় একমাত্র ওষুধ হলো রসিকতা বোধ, মতের অমিল থাকা সত্ত্বেও সরস আলোচনার মধ্যে থাকতে পারলে অনেক মতপার্থক্যের গ্লানি কমে যায়।

৩। পাপবোধও মানুষকে বিষণ্ন খিটখিটে করে রাখে। পাপ অন্যায় এসব নীতিগত ব্যাপার, কিন্তু মনোবিজ্ঞানেও বিবেকের দংশনকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাপবোধ সম্পর্কে বিবেকের দংশন এবং অন্তর্দ্বন্দ্বকে প্রশমিত করতে না পারলে স্নায়ু রোগ সৃষ্টি হতে থাকে, নার্ভাস হয়ে পড়ে মানুষ, তখন বিরক্তি জাগে।

যা পাপ, যা অন্যায়, তাকে জোর করে ভালো বলে নিজের মনকে বোঝাতে গেলে পাপটাই প্রমাণ হয়ে যায়। পাপ-অন্যায় বলে কিছু নেই বললে পাপ-অন্যায় উড়ে যায় না। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বলে কিছু নেই বলে ছাদ থেকে লাফ যদি মারেন, তাহলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি মিথ্যে হয়ে যায় না, বরং আরো একবার সুপ্রমাণিত হয়েই যায়।

আবার, কেবল পাপ-অন্যায় নিয়ে অবিরাম চিন্তা করাও ঠিক নয়। পৃথিবীতে পাপ-অন্যায় যেমন আছে, ভালোও অনেক কিছু আছে। পাপবোধ বেদনা দুঃখ এ সবই ক্ষণিকের জন্যে আসে, এবং যিনি জীবনের আনন্দকে সব সময়ের জন্যে মনের মধ্যে ধরে রাখতে পারেন, তিনি কখনো বিষণ্ণ হন না।

* * *

সবশেষে বলি, বিষাদ বিরক্তি যখন দেহ থেকে জেগেছে বুঝবেন, তখন দেহের দিকে মন দেবেন আগে। আধুনিক বিজ্ঞানে কতরকমের ওষুধ চিকিৎসা আবিষ্কার হয়েছে, ম্যাসেজ করাতে পারেন, আলট্রা-ভায়োলেট, ইনফ্রা-রেড রশ্মি দিতে পারেন। দেহ যখন চাঙ্গা হয়ে উঠবে, তখন মনের নিভু নিভু প্রদীপটি আবার ঝলমল করে উঠবে।

যখন মানসিক অসামঞ্জস্যের জন্যে বিষাদ বিরক্তির সৃষ্টি হবে, তখন মনের সামর্থ্য ব্যয় করতে হবে বাজেট করে। নিজেকে ভালোভাবে বুঝতে হবে, ছেলেমানুষ হয়ে থাকলে চলবে না, বয়স্ক মানুষের মতো আচরণ রপ্ত করতে হবে, জীবনের বাস্তব দিকটার সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্যে নিজেকে তৈরী করতে হবে।

যখন সমালোচনা নিন্দা থেকে আত্মিক বিষাদ জাগবে, তখন অন্যায়ের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতে হবে, সমালোচনার মধ্যে থেকেই কিছু শিখে নেওয়ার, জেনে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। যতদূর যতটুকু করতে পারি, ঠিক ততটুকুই সম্পূর্ণ মনোযোগ ঢেলে দিয়ে সুষ্ঠুভাবে করতে হবে—আর এমনি করতে করতেই ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠবে শতদলের মতো।

অন্যের সঙ্গে মতের অমিল হলে যদি বিষাদ বিরক্তি জাগে, তাহলে অন্যজনকে ভালবাসতে চেষ্টা করতে হবে, প্রত্যেকের মধ্যে যেটুকু ভালো আছে, সেটুকুর দিকেই মন দিতে হবে—'ছাড়ি দোষ গুণ ধরো।'

যখন পাপবোধ থেকে বিষাদ জাগে, তখন ক্ষমাভিক্ষা করে নিতে হবে এবং আবার নতুন করে জীবনধারা শুরু করার কথা ভাবতে হবে। অন্তরের বাণী শোনাবার চেষ্টা করতে হবে। হ্যাঁ, অন্তরের বাণী, আত্মার বাণী। ঘুমোতে যাবার আগে এবং ঘুম থেকে উঠে প্রার্থনা করতে হবে যেন, সব কিছু সুন্দর মনোরম হয়ে ওঠে।

সঙ্গিনী রঙ্গিনী ও ঈশ্বর

উজ্জ্বল মজুমদার

'প্রতিভা' কথাটা শুনলেই মানুষের মন যতটা উদ্দীপ্ত হয় মানুষের বুদ্ধি ততটা তৃপ্তি পায় না। কারণ প্রতিভা ব্যাপারটাই সাধারণের বুদ্ধির অগম্য, তার রহস্য আমাদের কাছে ব্যাখ্যায় কখনোই স্পষ্ট হয় না। প্রতিভাকে ধরতে পেরেছেন বলে সমালোচকেরা অনেক সময়েই নিশ্চিন্ত হয়ে যান। কিন্তু পরমুহূর্তেই বুঝতে পারেন, তিনি প্রতারিত হয়েছেন। কখনো কখনো এমন এমন শিল্পীর আবির্ভাব ঘটে যায় যিনি যৌবনেই সাধারণের বিস্ময় ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে বসেন দুর্বারভাবে। অন্য পাঁচজনের থেকে পৃথক হয়ে পড়েন তিনি। শুধু অসাধারণ কতকগুলি মহৎ সৃষ্টির জনক বলেই নয়, অস্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক বলের অধিকারী হয়েও তিনি বিস্ময়ের বস্তু হয়ে পড়েন।

ভিক্টর হুগো এই রকম একজন শিল্পী। শারীরিক বল ছিল তাঁর সীমাহীন, মানসিক শক্তিও তাই। বাইরের চেহারাটিও তাঁর আকর্ষণীয় ছিল। সংকল্প-শক্তিতেও তাঁর মতো মানুষ দুর্লভ। এবং এই পর্যন্ত তুলনায় বারবারই আমাদের রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়ে যায়: মহৎ সৃষ্টির প্রাচুর্যে, শারীরিক ও মানসিক সংকল্প-শক্তিতে, আকর্ষণীয় চেহারায় এই দুই মহৎ শিল্পী যৌবন থেকেই এক অসাধারণ স্বকীয়তা অর্জন করেছিলেন এবং অশীতিপর এই দুই 'বৃদ্ধ' নিহিত যৌবনকে অক্ষুণ্ণ রেখে গেছেন বরাবর।

তবে রবীন্দ্রনাথ যেমন মাঝে মাঝে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও মানসিক শক্তিকে অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন এবং ষাট বছরের পর থেকেই যেমন চিঠিপত্রে ও অন্যান্য নানা প্রসঙ্গে অসুস্থতার কথা বলতেন, কাব্যসৃষ্টিতে যেমন কঠিন ব্যাধির অভিজ্ঞতা ও মৃত্যুর অস্পষ্ট কিন্তু দুরপনেয় ছায়া রেখে গেছেন, হুগোর সৃষ্টিতে তেমন কোনো যন্ত্রণা বা অনিবার্য মৃত্যুর ছায়াপাত লক্ষ্য করি না। বাহাত্তর বছরেই প্রথম হুগো জানলেন রোগের যন্ত্রণা কী জিনিস। সেই প্রথম তাঁর দাঁতে ব্যথা হলো এবং সেই ব্যথাই নারীর প্রথম গর্ভযন্ত্রণার মতো তাঁকে বিস্মিত, হতচকিত করলো। যখন তিনি আশী বছর পেরিয়ে গেলেন (রবীন্দ্রনাথের চেয়ে কিছু বেশি তাঁর আয়ুষ্কাল—চুরাশী বছর) তখনও তিনি তাঁর শীতে 'গ্রেটকোট' গায়ে না দিয়ে রাস্তায় বেড়াতে বেরোতেন। আশী বছরের যৌবন দেখলো শুধু 'কোটে'ই শরীরের উত্তাপকে অক্ষুণ্ণ রাখা যায়। ওই বয়সেই প্যারিসের অম্নিবাসে কারুর সাহায্য না নিয়েই তাঁকে উঠতে দেখা গেছে এবং সেই বাস তাঁকে নিয়ে গেছে কোনো গোপন আড্ডায়। 'গোপন অভিসারে' বললেও অন্যায় হয় না। কারণ, চিরকালই নারীর প্রতি তাঁর ভালোবাসার আবেগে তাঁকে রক্তিম দেখা গেছে। মৃত্যুর কয়েক মাস পরেই প্রেমিক হুগোর উচ্ছ্বাসের উজ্জ্বল স্মৃতি রাজা ডেভিডের সঙ্গে তাঁকে তুলনীয় করেছে পরিচিত কোনো সঙ্গীর লেখনী।

অধিকাংশ স্রষ্টার জীবন উত্থান-পতনে ভরা। প্রচুর সৃষ্টির উচ্ছ্বাসের পরেই আসে দীর্ঘ অনুর্বরতা বিষণ্ণ পর্ব। বহুদিনের জনপ্রিয়তার করতালির উচ্চরোল ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসে। অন্তরঙ্গ ভক্তের কপালেও ভ্রূকুঞ্চন দেখা যায়। কিন্তু এমন অশুভ অপ্রিয় বিমর্ষতার পর্ব সৌভাগ্যতঃ হুগোর জীবনে আসে নি। জীবনের পর্ব-পর্বান্তরে ক্রমশঃ প্রশস্তি ও জনপ্রিয়তার নতুন নতুন ঢেউ এসেছে, জয়ধ্বনির দমকে দমকে তাঁর জীবন-বীণার তারগুলি ঝংকৃত হয়েছে এবং সেই দমকগুলির মধ্যে তুলনায় যেটি সবচেয়ে উজ্জ্বল ও দীর্ঘস্থায়ী, সেটি হলো তাঁর বিখ্যাত ট্র্যাজেডি-কাব্য Hernani প্রথম অভিনয়-মুহূর্তটি। সেই প্রথমাঙ্ক ট্র্যাজেডি-কাব্যটির অভিনয় উপলক্ষ্যে যে তুমুল বিক্ষোভ ঘটে গেল কমেদি ফ্রাঁসেজ-এর রঙ্গমঞ্চে তার সঙ্গে আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটে-যাওয়া গৃহযুদ্ধেরই তুলনা চলে।

প্রাচীনপন্থী সাহিত্যরথীরা হুগোর ওই কাব্যনাটকের বিষয়বস্তু ও অভিনয়কে সমালোচনার অস্ত্রাঘাতে ছিন্নভিন্ন করবেন বলে তূণ ভরতি করে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। হুগো-ও তাই শুনে তাঁর সহমর্মী বুদ্ধিজীবী যোদ্ধাদের নিয়ে প্রতিরক্ষার ব্যূহ তৈরি করলেন। সেই সহমর্মী যোদ্ধাদের নেতা ছিলেন বিখ্যাত লেখক থিয়োফিল গোতিয়ে। প্রেক্ষাগৃহে ঢুকতেই দেখা গেল পরনে তাঁর রক্তগোলাপ সার্ট, ভেলভেট কলারের কোট আর হাল্কা সমুদ্র-সবুজ

প্যান্ট। কাব্যনাটকের অভিনয়ের সময়ে বহু ক্ষেত্রেই নানা পংক্তির উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বিরুদ্ধপক্ষ ধিক্কার দিলেন। হ্যুগো-র দল প্রতিবাদ করলেন। মৌখিক প্রতিবাদ শীঘ্রই হাতাহাতিতে গড়িয়ে গেল। সারা রঙ্গমঞ্চ জুড়ে খণ্ডযুদ্ধ। শেষে রোম্যান্টিকদের এই সৈনিকসুলভ আগ্রাসী মনোভাবই Hernani কাব্যনাটক অভিনয়ের শ্রবণ-দর্শনের কিছুটা সুযোগ অবশ্য করে দিল। মাদাম হ্যুগো স্বামীর এই জয়োৎসবে সভাজেত্রী হলেন। অজস্র প্রশস্তির মধ্যে হ্যুগো বাড়ি ফিরলেন। পুরস্কারের উৎসাহ তাঁর সৃষ্টির আবেগে জোয়ার নিয়ে এলো।

Hernani অভিনয় উপলক্ষ্যে যে খণ্ড-যুদ্ধ ঘটে সেটা শুধু তা হ্যুগোর জীবনে ভবিষ্যৎ সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপই নয়, ফরাসী রোমান্টিক আন্দোলনকেও শীর্ষমুখে নিয়ে এলো। লেখক ও শিল্পীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুন রঙ লাগালো। তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনেও গভীর পরিবর্তন ঘটলো। চলতি-কালের ফ্যাশানেও নতুন ছাপ পড়লো। শুধু কবি নয়, সাহিত্যিক পোষাক-পরিচ্ছদের ফ্যাশান-পরিকল্পকের কল্পনা-দৃষ্টি বদলে গেল। সমসাময়িক কালের বিখ্যাত লিথোগ্রাফার ও ডিজাইনার ছিলেন শেভালিয়ে। 'গাভারনি' নামেই তিনি বেশি পরিচিত। প্রজাপতির মতো রঙ-বেরঙের হাল্কা সব পোষাক বেরোলো মেয়েদের জন্যে। গাভারনির ফ্যাশনের কাগজে সেই সব পোষাকের ডিজাইন ছাপা হতে লাগলো। বায়রনীয় ভঙ্গির সাজে-পোষাকে ফুলবাবুর দল রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। আর মেয়েদের দেখা গেল সুন্দরী অপ্সরীর দিব্য আভা ছড়িয়ে চলাফেরা করতে। সমস্ত আবহাওয়াটাই যেন দূরে কল্পলোকের সৌন্দর্যে মোহাচ্ছন্ন। যেন সৌন্দর্য এখনই ক্ষয়ে যাবে, ঝরে যাবে, আর তাই যেন এ সৌন্দর্য পার্থিবতায় বিষণ্ণ। যে -সব সুন্দরীর দল সংসারে ঘরে বেড়াচ্ছে তারা যেন এখন মর্ত্যে নেমে এসেছে, অথবা এখনই কোনো মুহূর্তে হীনতায় [illegible] হয়ে যাবে। বড় পাখির ডানার মতো তাদের দুদিকে জামার হাতা ঝুলছে। গাঢ়বদ্ধ সঙ্কীর্ণ কোমরবন্ধ [illegible] উচ্ছ্বাসকে আরও [illegible] যেন। মাটির দু-এক ইঞ্চি [illegible] উচ্ছ্বাস এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। সেই ইঞ্চি দুয়েকের ব্যবধানে শীর্ণ সমতল-সোলের জুতো দেখা যায়। পায়ের সঙ্গে সে জুতো আবার জালীর মসলিন বা অর্গান্ডি মসলিন অথবা ওই জাতীয় কোনো সূক্ষ্ম বননের রিবনে বাঁধা। বল-ড্রেস খুবই অলংকার-হীন। কিন্তু গায়ের অলংকারে দুর্মূল্য হীরে জহরৎ। রোম্যান্টিক মনোভাব এই রকম চরম বৈপরীত্যেই তৃপ্তি পেতো বেশি।

কয়েক যুগ পরে এই রোম্যান্টিকরা প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ হয়ে ঊনিশ শতকের তিরিশের দশকের এই সোনালি দিনগুলোর কথা যখন ভেবেছেন তখন মনে হয়েছে যেন [illegible] হারানো জগৎ দূরে দিগন্ত রেখায় সরে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে সূক্ষ্ম সোনালি [illegible] বাষ্প ফেটে গিয়ে ইন্দ্রিয়লালসা প্রাধান্য করে নিয়েছে সাহিত্যে। অপার্থিব ঔজ্জ্বল্যকে ম্লান করে দিয়ে বিকৃতরুচির বিলাসিতাই সাহিত্যিকের লিপি হয়েছে তখন।

হ্যুগোও হয়তো তাঁর ফেলে-আসা রঙীন রোম্যান্টিক উচ্ছ্বাসের দিনগুলির জন্যে আক্ষেপ [illegible]ছিলেন। হয়তো পরবর্তী যুগ-পরিবর্তনের জোয়ারের কোনো বাতাসকেই হ্যুগো এড়িয়ে যাননি। এবং, পরিবর্তিত যুগের রঙ্গমঞ্চে ইচ্ছা করলেই হ্যুগো তাঁর দুর্লভ প্রতিভার নিজের প্রাধান্যকে অব্যাহত রাখতে পারতেন, কিন্তু তিরিশের দশকের সেই জয়টীকা চিহ্নিত যৌবন—সেই প্রতিভা ও শৈশব-সাম্রাজ্যে মিশ্রিত মোহাচ্ছন্ন দিনগুলিই তাঁর শ্রেষ্ঠ সম্পদ হয়ে রইল। Hernani অভিনয়ের কিছুদিন পরেই তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর সুন্দরী ও আপাত-অনুরক্ত স্ত্রী স্বামীর অসাধারণ সাফল্যে ও জনপ্রিয়তায় ক্রমশঃই ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন। তিনি যেন স্বামীর এই জনপ্রিয়তা চাইছেন না। আরও একটু নেমে এলেই যেন ভালো হয়, আরও একটু স্বাভাবিক হলে ভালো হয়।

এই ক্লান্তির দিকচিহ্ন মুহূর্তে আদল (মাদাম হ্যুগো) মনে মনে এমন এক ব্যক্তির আকর্ষণ অনুভব করলেন যিনি হ্যুগোর বন্ধু, রোম্যান্টিক আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা ও গত শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক। হ্যুগো পরিবারের সঙ্গে স্যাঁত-ব্যভ-এর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। এবং হ্যুগো-র মতোই তিনি ছিলেন অস্থির, বিমর্ষ, আত্মসচেতন কিন্তু আরও কিছু বৈশিষ্ট্য তাঁর ছিল। স্যাঁত-বুভ ছিলেন [illegible] সংবেদনশীল সুরুচির মানুষ। হ্যুগোর চরিত্রে এই বৈশিষ্ট্যগুলির অভাব ছিল। অন্ততঃ আদল-এর সঙ্গে আচার আচরণে হ্যুগোর এই গুণগুলির অভাব চোখে পড়তো।

হ্যুগো ধীরে ধীরে বুঝতে পারলেন স্ত্রীকে তিনি হারাতে বসেছেন। দেবদূতের মতো দীর্ঘ আকৃতির সেই চেহারা যেন আহত টাইটানের মতো গর্জে উঠলো। চিঠি দিলেন আবেগপ্রবণ সংবেদনশীল সূক্ষ্মরুচি কিন্তু কুৎসিত চেহারার সেই বন্ধুটিকে। দুই বন্ধুর দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ হোক এই কথা পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন। কিন্তু স্যাঁত-ব্যভের সঙ্গে আদল গিয়ে দেখা করতে লাগলেন। থিয়েটারের নটীদের সঙ্গে হ্যুগোর মেলামেশা করেন। খাওয়ার সময়টুকু বাড়িতে আসেন। তাও আবার [illegible] মায়েন, আদলকে একা-একা খেতে হয়, ছোট ছেলে-মেয়েদের প্রতি [illegible] ইত্যাদি নানান অভিযোগে তিনি হ্যুগো-র মুখ বন্ধ করে দিলেন।

যাই হোক দাম্পত্যজীবনে ফাটল ধরলেও পুরোপুরি ভাঙলো না। আদল হ্যুগোর সংসার দেখাশুনো করেন, ছেলে-মেয়েদেরও দেখেন, স্বামীর বন্ধু-বান্ধব দেখা করতে এলে কর্তব্যও করেন কিন্তু হ্যুগো-র প্রেরণার কেন্দ্রভূমি থেকে তিনি সরে গেলেন। এবং তাঁর বদলে জুলিয়েত নামে এক সুন্দরী তরুণী অভিনেত্রী হ্যুগো-র প্রেরণার সান্ত্বনার সেবার প্রতিমূর্তি হয়ে দেখা দিলেন। এই তরুণী জুলিয়েত পরবর্তী অর্ধশতাব্দী ধরে হ্যুগো-র জীবনসঙ্গিনী হয়ে থেকেছিলেন। মানব-মানবীর সম্পর্কের ইতিহাসে এই ঘটনা খুবই বিস্ময়কর ও মর্মান্তিক হয়ে রইল। শিল্পীর জীবনে সঙ্গিনী আর রঙ্গিনী দুই পৃথক নারীর দীর্ঘকালের সমান্তরাল অবস্থিতি যেমন বিস্ময়কর তেমনি মর্মান্তিক বটে।

আঠারো শ' বত্রিশের এক বসন্তের দিনে তরুণী জুলিয়েতের সঙ্গে হ্যুগো-র যখন প্রথম আলাপ হলো, তখন জুলিয়েত ছাব্বিশ বছরের এক উচ্ছৃঙ্খল লাবণ্যময়ী তরুণী। অভিনেত্রী হিসেবে ততটা নাম-ডাক তাঁর নেই তখন। কিন্তু তাঁর সৌন্দর্য আনাচেকানাচে আলোচনার বিষয়। বিখ্যাত ভাস্কর প্রাদিয়ের সঙ্গিনী হিসেবে তাঁর একটি শিশু-সন্তান জন্মেছে ইতিমধ্যেই। এবং পরে প্রাদিয়ে-কে ছেড়ে আনাতোল দেমিদফ নামে এক অমিত-ব্যয়ী রুশীয় লক্ষপতির তিনি রক্ষিতা হয়েছেন। প্রতিভার অহংকারে হ্যুগো যেমন স্ত্রীকে অবমাননা করেছেন, জুলিয়েতের কাছে দাবি জানাতেও সেই অহংকারই অন্য-ভাবে প্রকাশিত হলো। হ্যুগো চাইলেন জুলিয়েত তার অতীত জীবনকে বিদায় দেবেন এবং যেটা সবচেয়ে কঠিন কর্তব্য, বাকি জীবনটা অনুতপ্ত 'নান' হয়ে কাটিয়ে [illegible] যাবেন নির্জনে। আশ্চর্যের ব্যাপার, আদল যে অহমিকা সহ্য করতে পারেননি, জুলিয়েত হৃদয়ের প্রতি অসীম ভালো-বাসায় ও শ্রদ্ধায় সেই অহমিকার দাবি মেনে নিলেন। দেমিদফের প্রচুর প্রেমোপহার হেলায় পড়ে রইল। অভিনেত্রী-জীবনকে পিছনে ফেলে রেখে জুলিয়েত চলে এলেন

চীজলিং! হরদম খান! চিবিয়ে যান!
চীজের গন্ধে ভরপুর, অনন্য স্বাদে টৈটম্বুর!
চীজলিং! কুড়মুড়ে তাজা, খেয়ে পাবেন মজা!
সেই সঙ্গে পার্লে থেকে পাবেন আরো ৪টি সুস্বাদু বিস্কুট

everest/277d/PP ben

ছোটখাটো সাধারণ ঘরের এক ফ্ল্যাটে। সে ফ্ল্যাট থেকে তিনি বেরোতেনও খুব কম। বেরোলেও সঙ্গে থাকতো এক বৃদ্ধা রক্ষিকা। প্রতিদিনের খরচপত্রের হিসেব দাখিল করতে হতো হুগোর কাছে। রোমান্টিক হুগো ছিলেন বৈষয়িকতার মধ্যে সেই সব হিসেবপত্তর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন।

যে জীবন জুলিয়েত এতকাল কাটিয়ে এসেছেন সে-জীবনের তুলনায় এই আত্মত্যাগকে প্রায় অমানুষিক বলতে হবে। কিন্তু এই আত্মত্যাগে, এই সন্ন্যাসিনী-প্রেমিকার ভূমিকা নিয়ে কী পুরস্কার তিনি পেলেন? শুধু হুগো-র মতো অসাধারণ প্রতিভাবান এক পুরুষ তাঁকে ভালোবাসেন এই চেতনাই কী তাঁর পুরস্কার? প্রশ্নটা [illegible] তাই। কিন্তু যতই দিন গেল, জুলিয়েত [illegible], হুগো [illegible] ব্যাপক ও বিচিত্রভাবে অভিযানী হয়ে পড়ছেন। হুগোকে অনুসরণ করার অনুমতি তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু [illegible] দূরে থেকে। তৃতীয় নেপোলিয়নের সিংহাসন-আরোহণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ক'রে গণতন্ত্র-বিশ্বাসী হুগো নির্বাসিত হলেন চ্যানেল আইল্যাণ্ডস্-এ। সেখানেও জুলিয়েত তাঁর অনুসরণ করেছেন। উনিশ বছর বাদে তুমুল জয়ধ্বনির মধ্যে দিয়ে এলেন হুগো রিপাবলিক হয়ে-যাওয়া প্যারিসে। ফরাসীদের চোখে তখন তিনি একাধারে 'প্রফেট' আর 'হিরো'। এই দুঃখ-দুঃখের [illegible] মধ্যে যখনই জুলিয়েত আর হুগো একটু দূরে থেকেছেন তখনই দুজনের মধ্যে অজস্র ভালোবাসার বিনিময় হয়েছে চিঠিপত্রের মাধ্যমে। জীবনের শেষ পর্যন্ত জুলিয়েত এই নারীমুগ্ধ অসাধারণ নায়কের প্রতি অসম্ভব ভালোবাসায় তাঁর ঈর্ষার বিষ মিশিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু সেই নিয়ামতের আস্বাদকে তিনি নীরবেই গ্রহণ ক'রে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেছেন। তাঁর নায়কের দুরপনেয় আধিপত্যকে তিনি ঠেলে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেন নি কোনোদিনই। সমগ্র শতাব্দীর একমাত্র রূপকার হিসেবে হুগোর প্রচণ্ড আত্মাভিমানের সামনে জুলিয়েতের ভালোবাসা নিরন্তর আত্মসমর্পণে নতমুখী

হয়ে থেকেছে চিরকাল। দুরারোগ্য ক্যানসার যখন তাঁর শরীরে ছড়াতে আরম্ভ করেছে তখনও [illegible] [illegible] তিনি এসে বসেছেন, হুগোর স্যাব্যালো [illegible] হয়ে তিনি দু-একটি [illegible] [illegible] শুনেছেন। শেষ পর্যন্ত যখন শরীরের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে হুগোকে প্রত্যাখ্যান করেছেন তখনও হুগো-কে রাগে-অভিমানে ক্ষুব্ধ হয়ে বলতে শোনা গেছে: "কেন যৌবনে এসে তুমি বলবে না?"

শেষ পর্যন্ত জুলিয়েত মারা গেলেন। যে-মৃত্যুকে অশীতিপর হুগো শরীরে-মনে কোনোদিনই গ্রাহ্যের মধ্যে আনতেন না সেই মৃত্যুই তাঁর পঞ্চাশ বছরের আত্মগুঞ্জার আত্মনিবেদনের সন্ন্যাসিনী প্রেমিকাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল নিষ্ঠুরভাবে।

ছিনিয়ে নিয়ে গেল হুগোর কণ্ঠটিকেও। হুগো মৌন হয়ে গেলেন। 'নীরব কবি' কথাটা বোধহয় এই সময়েই মানুষকে সবচেয়ে বেশি মানায়। মৃত্যুর পূর্বে জুলিয়েত জেনে গিয়েছিলেন হুগো কতকগুলি আশ্চর্য সুন্দর কবিতা তাঁকে উৎসর্গ করেছেন। জেনে হয়তো তিনি তৃপ্তি পেয়েছিলেন। হয়তো সান্ত্বনার সঙ্গে কিছুটা গর্বও হয়েছিল তাঁর।

জুলিয়েতের মৃত্যুশোক যেভাবে হুগোকে নীরব করে দিয়ে গেল, তাতে অন্ততঃ কিছুটা বোঝা যায় দান্তের কাছে বিয়াত্রিচে কিংবা পেত্রার্কের কাছে লরা কিংবা গোয়েটের কাছে [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ছিলেন কতখানি। সৃষ্টির অন্দর [illegible] খোলাতেই যে প্রেমের চরম সার্থকতা তা দান্তে পেত্রার্ক, গোয়েটে কিংবা হুগোর প্রেমিকারাই প্রমাণ করে গেছেন।

জুলিয়েতের মৃত্যুর পর দুটি [illegible] হুগো বেঁচেছিলেন। নিভৃতে তিনি মৃত্যুর রঙীন মুহূর্তটির জন্যে অপেক্ষা করেছেন। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে তিনি পাবেন এই তাঁর স্থির ধারণা ছিল। সেই [illegible] স্বপ্নে তিনি [illegible] ছিলেন। এক [illegible] কবিকে তিনি লিখেছিলেন, 'আমি বৃদ্ধ হয়েছি। শীঘ্রই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবো। ঈশ্বরের সঙ্গে [illegible] দেখা হবে। ঈশ্বরের সঙ্গে দেখা! তাঁর সঙ্গে কথা বলা! সে এক পরমাশ্চর্য মুহূর্ত বলে মনে হয়! কিন্তু কী বলবো? প্রায়ই ভাবি। বলবার জন্যে তৈরী হচ্ছি...'

এখন থেকে হুগো-র দেখা-পাওয়া দুর্লভ হয়ে পড়েছে। শেষ সামাজিক অনুষ্ঠানে তাঁকে দেখা গেল পল মেনার-এর বাড়িতে। সেদিন মেনার-পরিবারের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে হুগো-র নাতি-নাতনীরাও 'তম জুয়ান' থেকে নির্বাচিত একটি অংশ নিয়ে ছোট নৃত্যনাট্যের আয়োজন করেছিল। অনুষ্ঠানের একটু আগেই হুগো [illegible] [illegible] আছে তাঁর দুটি [illegible]। [illegible] [illegible] দিকেই দৃষ্টি নেই। [illegible] তাঁর [illegible] [illegible] [illegible] তাঁর চোখ পড়েছিল একবার। [illegible] [illegible] এই দুই [illegible] [illegible] [illegible] ছিল। [illegible] তিনি [illegible] [illegible] ভিতর দিয়ে এগিয়ে আসছেন তখন পূর্ব-[illegible] মতো মাথার ওপর থেকে অজস্র গোলাপ ফুলের বারিবর্ষণ হলো। [illegible] [illegible] [illegible] হয়ে রইলেন। [illegible] [illegible] [illegible] বেজে উঠলো। সকলেই ভাবছিল হুগো কী ভাবছেন। এই চমৎকার আনুষ্ঠানিক পরিবেশ কি তাঁর ভালো লাগছে? না-কি এসব উপভোগের সময় তাঁর ফুরিয়ে আসছে?

অনুষ্ঠানের শেষে—ভায়োলিনের সুরের রেশ তখনও মিলোয় নি—হুগো হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে নীরবে বেরিয়ে গেলেন। একটু ঝুঁকে কিন্তু দৃঢ়-গম্ভীর পদক্ষেপে চলে গেলেন দরোজার বাইরে অন্ধকারের দিকে। যেন সেই অন্ধকারে ছায়ার রাজ্যে জুলিয়েত তাঁর জন্যে অপেক্ষায় রয়েছেন: এই অনুষ্ঠানের কয়েক সপ্তাহ পরে তাঁর বাড়ির সামনের বাগানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলছিল। হঠাৎ বাড়ি থেকে বৃদ্ধ হুগো বেরিয়ে এলেন। যেন রাজকীয় পদক্ষেপে এসে শিশুদের কাছে দাঁড়ালেন। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন: 'মাটির পৃথিবী আমায় ডাকছে।' তারপর ধীরে ধীরে বাগানের পথ ধরে চলে গেলেন।

নিজেকে 'প্রফেট' বলে মনে করতে ভালোবাসতেন হুগো। মানুষের সব ভবিষ্যৎ বাণী মেলে না। কিন্তু কিছু কিছু আশ্চর্য-ভাবে মিলে গেছে তাঁর জীবনে। এবারও [illegible]।

[illegible]-র পাশাপাশি [illegible] যে [illegible] এক [illegible] এক সান্ধ্যভোজের আসর থেকে বেরিয়ে ফিরবার পথে মৃত্যুর ঠাণ্ডা হাত তাঁকে ছুঁয়ে গেল। সে-যাত্রাও শরীরের উত্তাপ আর শুধু [illegible] দিয়ে ঠেকানো গেল না।

ভিক্টর হুগো মারা গেছেন এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই প্যারিসের সমস্ত শাসনযন্ত্র যেন বিকল হয়ে গেল। সিনেট ও চেম্বারের অধিবেশন বন্ধ হয়ে গেল। মে-মাসের শেষ দিনটিতে দুঃখক শোকার্ত জনতা ভিক্টর হুগোর কফিন বয়ে নিয়ে চললো প্যারিসের আলোকস্তম্ভমালার উজ্জ্বল রাস্তার মাঝখান দিয়ে। শোভাযাত্রার অসংখ্য মানুষের কালো মাথার ওপরে মাঝে মাঝে ঝলসে উঠতে লাগলো [illegible] [illegible] খোদাই-করা হুগো-র লেখা বিশ্ববিখ্যাত সব বইয়ের নাম: লা মিজারেবল, লা ওম্মি কি রি, নোত্রদাম, কোয়াত্রে-ভিন্ট্রিজ...।

চিত্র-সমালোচনা

(১) ফির ভী (হিন্দী)

ছবিভারতী নিবেদিত এবং শিবেন্দ্র সিংহ পরিচালিত ও প্রযোজিত রঙীন ছবি 'ফিরভী' হিন্দী চলচ্চিত্রজগতে নিশ্চয়ই একটি দুঃসাহসিক ব্যতিক্রম এবং তা বহু দিক দিয়ে। প্রথম, ছবিটির কাহিনী হিন্দী ব্যবসায়িক চিত্রজগতের ফর্মুলা অনুসরণ করেনি, উল্টে কাহিনীর প্রতিপাদ্য বর্তমান যুগের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদেরও নতুন করে ভাবতে বসাবে। দুই, স্বয়ং চিত্রনাট্যকার-পরিচালকের মতো ছবির প্রতিটি শিল্পীই আমাদের কাছে প্রায় নতুন। সুরকার রঘুনাথ শেঠও ফিল্মস্ ডিভিশনের বহু তথ্যচিত্রে সঙ্গীতপরিচালনা করলেও, কাহিনীচিত্রে এই তাঁর প্রথম প্রবেশ। 'সারিকা'র সম্পাদক কমলেশ্বর হিন্দী সাহিত্যজগতে ছোটগল্প, উপন্যাস ও নাটকের লেখক হিসেবে সুপরিচিত হলেও সম্ভবত এই প্রথম তাঁর কাহিনী চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হল।

পরিচালক শিবেন্দ্র সিংহ মনোবিজ্ঞানের এম-এ এবং নাটকের কৃতী পুরুষ। তিনি বহু নাট্য-প্রযোজনা করেছেন, অভিনয়ও করেছেন। টেলিভিশন সম্পর্কেও তাঁর অভিজ্ঞতা কম নয়। নাটক, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনের ক্ষেত্রে তিনি পরীক্ষামূলক মননশীল। মনস্তত্ত্বের খোরাক আছে বলেই কমলেশ্বরের এই কাহিনীটি শ্রীসিংহকে আকৃষ্ট করেছে। এবং 'ফিরভী' ছবিটিকেই শুধু পরীক্ষানিরীক্ষামূলক বললে যথেষ্ট হবে না, এর কাহিনীটিতেও পরীক্ষা-নিরীক্ষার বীজ উপ্ত রয়েছে। সংক্ষেপে কাহিনীটি শুনলেই আমাদের কথার যথার্থ উপলব্ধি করতে পারা যাবে।

স্ত্রী এবং একমাত্র কন্যাকে নিয়ে এক ভদ্রলোকের সুখেই দিন কাটছিল। স্বাস্থ্যবান ভদ্রলোক খেলায়-ধুলোয়, ঘোড়ায়-চাপায়, সাঁতারে সর্ববিদ্যাবিশারদ। এই তিনজনের জগতে হঠাৎ এক বিপর্যয় ঘটল, ভদ্রলোক সাঁতার কাটবার জন্য জলে ঝাঁপ দিয়ে আর উঠলেন না। স্ত্রী মালতী ও কন্যা সুমনের মনে বিষাদের ছায়া নেমে

সন্ধ্যা রায় ও অনুপ কুমার / 'ঠগিনী' ছবিতে

এল। দুজনেরই জীবনকে জুড়ে রইল ভদ্রলোকের স্মৃতি। ছবির শুরু যে-সময়ে, তখন ভদ্রলোকের মৃত্যুর পরে বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। মঞ্জরীর বয়েস ৩৮ হলেও তিনি যৌবনকে এখনও ধরে রেখেছেন। একটি মেয়ে-কলেজে তিনি বায়োলজির লেকচারার। সুমন বা সুমির বয়েস ২২ এবং সে তার বাবার বন্ধু মিঃ মালহোত্রার সুপারিশে বোম্বে টেলিফোনে একজন অপারেটার। সুমি একদিন মাকে এসে জানায়, মহেন্দ্র নামে ওদের একজন অফিসার ওকে জ্বালাতন করতে শুরু করেছে। মা শুনে বললেন, লোকটি হয়ত তোকে ভালোবাসতে চায়। অসহিষ্ণুভাবে মেয়ে বলে, মা, না, ওসব আমি পছন্দ, করি না। আমাদের জগতে খালি তুমি, আর আমি, আর বাবার স্মৃতি।' সে ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজারের কাছে মহেন্দ্রের নামে অভিযোগ করতে তিনি বলে উঠলেন, 'সেকি! মহেন্দ্র অতি ভালো ছেলে। হাসিখুশী তার স্বভাবগত, কিন্তু কোনোরকম অন্যায় তার দ্বারা অসম্ভব।' কিন্তু সুমি পুরুষ মানুষ থেকে তফাতে থাকতে চায়, তা সে ভালোই হোক, আর মন্দই হোক। কিন্তু হঠাৎ তার মায়ের এ কী হোলো? সে সবিস্ময়ে আবিষ্কার করল, তার মা কোনো পুরুষকে শয্যাসঙ্গী করছেন। মার যদি ইচ্ছা হয় যে, তিনি আবার বিবাহ করে সুখী হোন, এই চিন্তা করে সুমি মাকে ছেড়ে হোস্টেলে বাস করতে গেল। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও মঞ্জরী সাহস অর্জন করতে পারলো না। বরং যে-জোয়ার তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, সেই জোয়ার যেন ক্রমেই স্তিমিত হয়ে এল। যেন নতুন দৃষ্টি খুলে গেল, মনে স্থৈর্য ফিরে এল, অনেক মানসিক যন্ত্রণা ভোগের পরে মঞ্জরী স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছুল, কন্যার জীবনের পূর্ণতাই তাকে পূর্ণতা দেবে। অপরদিকে হোস্টেলে বসবাস করবার ফলে সুমির জীবনেও পরিবর্তন এসেছিল। মহেন্দ্রকে সে চিনেছিল, জেনেছিল, ভালোবেসেছিল। হঠাৎ-দেখা এক তরুণ-তরুণীর প্রণয়ালিঙ্গন তারও জীবনে এনেছিল যৌন অনুভূতি, যা শেষ পর্যন্ত হয়ত তাকে মহেন্দ্রকে স্বামীরূপে বরণ করতে প্রেরণা দিয়েছিল।

—এই যে যৌবনের প্রান্ত-সীমায় পৌঁছে এক সুন্দরী, বিদুষী বিধবার যৌনআকৃতি—এ-ব্যাপারটা নিশ্চয়ই যেমন মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু, তেমনই এক যুবতী নারীর পিতৃস্মৃতিকেই আঁকড়িয়ে ধরে থাকা এবং সেই কারণে অপর কোনো পুরুষকে—সে যতই সুন্দর, স্বাস্থ্যবান ও সৎস্বভাববিশিষ্ট হোক না কেন—কাছে ঘেঁষতে না দেওয়া মনোবিজ্ঞানীর কাছে একটি অত্যন্ত উপাদেয় খোরাক। 'ফিরতী' কাহিনীর মা ও মেয়ে—এই দুই চরিত্রের মনোজগতের এই অস্বাভাবিকতাই যে মনোবিজ্ঞানের ছাত্র শিবেন্দ্র সিংহকে কাহিনীটির প্রতি আকর্ষিত করেছে, এ-কথা নির্দ্বিধায় বলতে পারা যায়।

এবং তাদের জীবনের এই বৈচিত্র্য এবং তৎসংক্রান্ত অভিজ্ঞতাকে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে, সুন্দরভাবে ও পরিচ্ছন্নভাবে চিত্রিত করার মধ্যেই শ্রীসিংহের কৃতিত্ব লক্ষণীয়। মঞ্জরীর যে প্রেমিক, যার নাম রণধীর, তাকে ছবির কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। অথচ সে যে মঞ্জরীর সঙ্গে শয্যাগ্রহণ করেছিল, সুমির দৃষ্টি দিয়ে সে-চিহ্ন দর্শকের কাছে সুপরিস্ফুট। মঞ্জরী কিছুদিনের জন্যে বেড়াতে যাচ্ছে, কিন্তু একা যে নয়, সঙ্গে রণধীরও যাচ্ছে, তা মাত্র সিগারেট-কেসটি আবিষ্কারের মাধ্যমেই বোঝানো হয়েছে। আবার তরুণ-তরুণীর প্রেমালিঙ্গন প্রত্যক্ষ করবার পরে ঘুমের ঘোরে সুমির যৌন-সম্ভোগের স্বপ্নটি রঙের বিচিত্র ব্যবহারের মারফত কি অপরূপভাবেই না ফুটে উঠেছে। অবশ্য এখানে আমাদের সহসা মনে পড়ে গেছে, 'গার্ল অব দি মোটার সাইকেল' ছবিটির কথা। জানি না, শ্রীসিংহ এই ছবিটি দেখেছেন কিনা এবং দেখে থাকলে তার দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছেন কিনা।

মা ও মেয়ের সম্পর্কটাও কি আশ্চর্যভাবে পরিবর্তনশীল দেখানো হয়েছে। সেই মেয়ে দেখল, মায়ের জীবনে এসেছে একজন নতুন পুরুষ, অমনই সে মায়ের যৌবনসত্তাকে বড়ো করে তুলতে চাইল, নিজে হয়ে পড়ল মা, মা যেন তার মেয়ে। মাকে চাইল সে সাজাতে-গোছাতে। আবার তার নিজের জীবনে যখন সে বসন্তের আগমনবার্তা শুনতে পেল, তখন যে মায়ের জন্মতিথিতে মাকে অভিনন্দিত করতে গেল ফুলের গুচ্ছ নিয়ে, সে আশা করছিল, মা আবার বিবাহিত জীবন যাপন করছে। কিন্তু না, মা আবার তার সেই আগেকার মা হয়ে পড়েছে, সেই মা মেয়েকে সার্থক দেখে ধন্য। এবং সুমন বা সুমি! যে-মহেন্দ্রকে সে একদিন একজন বিরক্তি-উৎপাদনকারী প্রগল্ভ যুবক ছাড়া অন্য কিছু ভাবেনি, সেই মহেন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হবার পরে সে তার মধ্যে তার মৃত পিতার ছায়া দেখতে লাগল ক্ষণে ক্ষণে, তার প্রতি অসঙ্কোচে বিনা দ্বিধায় নির্ভর করতে পারা যায়, এই প্রত্যয় জাগরণের কি চমৎকার চিত্রকল্প!

১৯৭১ খৃঃ শ্রেষ্ঠ হিন্দী কাহিনীচিত্র [illegible]

একটি স্বাধীন দেশের শতকরা প্রায় সত্তর ভাগের নিরক্ষরতা দেশের কলঙ্কস্বরূপ। এ অবস্থায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা উপাচার্য ডঃ সত্যেন সেনের নেতৃত্বে এই সমিতি গঠন করে এবং এর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে কাজ করে যে মহতী প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হয়েছেন, তারই প্রতি জনগণকে অবহিত করবার জন্যে 'বর্ণ পরিচয়' এবং 'হায় কলকাতা!' নামে তথ্যচিত্র দুটির মারফত যথাক্রমে পশ্চিমবঙ্গে ও কলকাতায় নিরক্ষরতার ভয়াবহতা এবং তার দূরীকরণে এই সমিতির চেষ্টা সম্বন্ধে কিছু তথ্য পরিবেশন করেছেন। প্রথম ছবিটি থেকে দ্বিতীয় ছবিটি বেশী আকর্ষক। তবে ছবি দুটি দেখে মনে হয়, বয়স্কদের নিরক্ষরতা এবং শিশুদের নিরক্ষরতার মধ্যে কোনো সীমারেখা টানা হয়নি। নির্বিচারে শিশু, বালক-বালিকা ও বয়স্করা ছবি দুটিতে স্থান পেয়েছে। 'হায় কলকাতা'য় বস্তিবাসীদের দুঃখ-দুর্দশা সম্বন্ধে বিলাসী ধনীদের নিস্পৃহতা দর্শকচিত্তকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে।

বিবিধ সংবাদ

শীতের মরশুমে সার্কাস

আমাদের ছেলেবেলায় ডিসেম্বর মাস পড়তে না পড়তেই কলকাতার ময়দানে—আমরা বলতুম গড়ের মাঠ—সার্কাসের তাঁবু পড়ত প্রতি বছর। এবং একসঙ্গে আসত তিনটি থেকে চারটি সার্কাস। প্রসিদ্ধ ছিল বোসের সার্কাস, হিপোড্রোম সার্কাস, হারমিনস্টোন সার্কাস। বোসের সার্কাসে যাদুকর গণপতির খেলা অবিস্মরণীয়। এই গণপতিই ছিলেন সম্প্রতি পরলোকগত জগদ্বিখ্যাত যাদুকর পি সি সরকারের গুরু। মাঝে শহর থেকে সার্কাস বিদায়-প্রাপ্ত হয়ে হাওড়া ময়দানে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। এ-বছরও একটি সার্কাস হাওড়া গোলমোহর পার্কে আস্তানা গেড়েছে।

কিন্তু গেল ১৬ ডিসেম্বর, শনিবার থেকে টালা পার্কে 'গ্রেট ওরিয়েন্টাল সার্কাস' নামে যে-সার্কাসটি খেলা দেখাতে শুরু করেছে, অত বড়ো সার্কাস সাম্প্রতিক কালে আমরা দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।

এদের জীবজন্তুর সংখ্যাটা হিসেব করলেই এদের বিরাটত্ব সম্পর্কে একটা ধারণা জন্মাতে পারে : (১) সিংহ—১২টি, (২) রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার—১০টি, (৩) হাতী—১১টি, (৪) ঘোড়া—১১টি, (৫) উট—৪টি, (৬) জেব্রা—২টি এবং (৭) ... ১টি। এছাড়া নারী ... সংখ্যা প্রায় ১০০।

... যখন ... ঘেরা ... হাজির হল ১০টি রয়্যাল বেঙ্গল ... ১২টি সিংহ এবং তার ভিতর দাঁড়িয়ে প্রোফেসর ডি কে রাও তাঁর চারজন সহকারীদের নিয়ে নির্ভয়ে ওদের বিভিন্ন কাজ করবার জন্যে আদেশ দিতে লাগলেন, তখন আর কার মনে কি হয়েছিল জানি না, আমরা তো এই ভেবে অস্থির হচ্ছিলুম, ওদের মধ্যে কয়েকটি যদি দৈবাৎ ক্ষেপে গিয়ে প্রোঃ রাওকে আক্রমণ করে, তাহলে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে। প্রায় আধঘণ্টা পরে ... জন্তুগুলি যখন একে একে ... বেষ্টিত পথের ভিতর ... গেল, তখন এবং মাত্র ... আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পেরেছিলুম।

এই সার্কাস দলের দ্বিতীয় আকর্ষণ হচ্ছে 'হাতী মেরে সাথী'র সেই 'রামু' হাতী ও তার সঙ্গীরা। ওরা এই সার্কাসের অন্যতম খেলা হিসেবে ঐ ছবির গণেশ-পুজো দৃশ্যটি পুরো দেখায়। গণেশকে স্নান করানো, তার গলায় মালা পরানো, নারকেল ভাঙা, ঘণ্টা নাড়া, হাঁটু গেড়ে প্রণাম করা প্রভৃতি অনুষ্ঠান নিষ্ঠাসহকারে করে বিস্ময়ের উৎপাদন করে।

৫৮ বছর বয়স্ক 'মিঃ ইউনিভার্স' মনোহর আইচ হচ্ছেন এই সার্কাসের একটি বিশিষ্ট আকর্ষণ। যখন তিনি ৭০০ পাউন্ড ওজনের দুই বিরাট চাকাযুক্ত বারটিকে কাঁধে নিয়ে পাদচারণা করেন বা তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিভিন্ন পেশীর সংকোচন ও নৃত্য প্রদর্শন করেন, তখন বিস্ময়ে অভিভূত না হয়ে পারা যায় না।

এছাড়া ট্রাপিজের খেলা, দুচাকা ও একচাকার সাইকেলের খেলা, প্লাস্টিক স্কেচ বারের খেলা, তারের ওপর খেলা, দোলনার খেলা, বাঘ-রানীর লোহার দড়ির ওপর দিয়ে যাতায়াত, রামু হাতীর সাইকেল চালানো, ভালুকের সাইকেল চালানো প্রভৃতি বহু বিস্ময়কর এবং উত্তেজনাপূর্ণ খেলা দেখতে দেখতে কোথা দিয়ে যে তিন ঘণ্টা কেটে যায়, তা বোঝাই যায় না।

গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস টিচার্স ট্রেনিং কলেজের ছাত্রীবৃন্দ গত ১০ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় কলেজ হলে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান উপহার দেন। বিচারপতি শঙ্করপ্রসাদ মিত্র ও ব্রিগেডিয়ার কে কে কাউলের ছোট্ট ভাষণের পর নিবেদিত হয় একটি একাঙ্কিকা "নেমন্তন্নের চিঠি"। রচনা হাসি-দাসগুপ্তা। নাটকের ক্ষেত্রে এঁর নাম অচেনা নয়। নাটকটি হাস্যরস প্রধান। মধ্যবিত্ত সংসারে মাসের শেষ তারিখে হঠাৎ নেমন্তন্নের হলদে চিঠি আসলে কি বিপত্তির সৃষ্টি হয়, তাই নিয়ে এই নাটক। নাটকটিতে ... অভিনয় করেন জয়শ্রী ঘোষ (মলিনা), ... মুখার্জি (সুকুমার), গীতা নাথ (...মণি) ও শিপ্রা দত্ত (ঘোষ) বিন্দুর ভূমিকায়।

... পরে অভিনীত হয় নৃত্যনাট্য "আমি জেগে আছি"। সুপ্রযোজনার ফলে এটি অভূতপূর্ব সাফল্যলাভ করে। আখ্যান বস্তুটি অতি সুন্দরভাবে ছায়ায় আলোয়, সুরে-গানে, নৃত্যে-ছন্দে রূপায়িত হয়ে ওঠে ছাত্রীবৃন্দের ঐকান্তিক নিষ্ঠায়। হিমালয়ের পাদদেশে প্রকৃতির কোলে লালিত রঙিলা গাঁয়ের মানুষ ... বাস করছিল। কিন্তু ... একদা যুদ্ধের বিভীষিকা নেমে এল। ... গ্রামবাসীরা ভয়ে গ্রাম ছাড়লো। চাষী ভিখুরাম স্ত্রী রাঙাবৌকে নিয়ে পথ হারিয়ে একেবারে সীমান্তে লড়াইয়ের মাঝখানে এসে পৌঁছলো। সেখানে তারা তাদের পরিত্রাতা হিসেবে পেল সৈনিক বন্ধু প্রিয়লালকে। প্রকৃতির সব বিপর্যয় সহ্য করে সে পাহাড়ের মতই অতন্দ্র প্রহরায় দেশকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে চলেছে। ভিখুরাম ও রাঙাবৌ তার সাহায্যে নিরাপদ স্থানে আসতে পারে। বিদায়ের বেলা সেপাইভাইকেও তারা সঙ্গে নিতে চায়। কিন্তু প্রিয়লাল তো যেতে পারে না, সমস্ত দেশ পাহারার কাজ তার ওপর ন্যস্ত। তাকে জেগে থাকতে হবে রাত্রিদিন শত্রুর মোকাবিলায়।

আলোছায়ার মাধ্যমে অপূর্ব দৃশ্য ... (... নির্দেশিত), আরতি ... ও প্রসেন চক্রবর্তীর সুর-সংযোজনায়, তদোপরি রঞ্জন মজুমদারের আবহসঙ্গীত পরিচালনায় ও বলাই দত্তের

মস্কো স্বার্কাসের রুশ্তম কাসেরভ ভালুকদের ট্রেনিং দিয়ে 'হংসনৃত্য' প্রদর্শন করছেন। 'স্বপ্নরাজ্যের পথে' এই নামে যে নতুন প্রদর্শনীটি হচ্ছে এই 'হংসনৃত্য' তারই অঙ্গ। রুশ কম্পোজার চাইকোভস্কির বিশ্বখ্যাত সৃষ্টি 'সোয়ান লেক' ব্যালেটের একটি ক্ষুদ্র অংশ হোল এই 'হংসনৃত্য'। 'সোয়ান লেক' ব্যালেটিতে সাধারণতঃ চারজন তরুণী নর্তকী অংশগ্রহণ করে থাকেন।

নাট্য ও নৃত্য পরিচালনায় "আমি জেগে আছি"র সাফল্য আসে। নাচ গানে সামান্য ত্রুটি থাকলেও যথেষ্ট নিষ্ঠার ছাপ ছিল। নৃত্যে প্রথমেই নাম করতে হয় ভিখুরাম বেশী অনিতা মিত্রের, প্রিয়লাল বেশী, স্বাতী রায়ের ও রাঙাবৌ বেশী সুচিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। পরের সারিতে উল্লেখযোগ্য নাম রীণা মিত্র, শিখা বসু, ইন্দ্রাণী বসু, ছবি চক্রবর্তী প্রভৃতির। শব্দ প্রক্ষেপণে অপূর্ব কৃতিত্ব দেখান অনুপ মুখোপাধ্যায় ও সাধন সরকার (হরবোলা)। সংলাপ ও গ্রন্থনা চলনসই। তবে হিমালয়ের পার্বত্য সীমান্ত অঞ্চলে কোথায় — ইলিস মাছ ঝাঁকে ঝাঁকে পাওয়া যায় জানতে ইচ্ছে হয়। "আমি জেগে আছি"র রচয়িতাও হাসি দাসগুপ্তা। এমন একটি চমৎকার নৃত্যনাট্য রচনার জন্যে তিনি ধন্যবাদার্হ।

বন্ধু সংঘের অনুষ্ঠান : বন্ধু সংঘ (বারুইপুর) আয়োজিত বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে শতবর্ষপূর্তি ও সংঘের অভিনয় রজনীর সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে তিনদিনব্যাপী নাটানুষ্ঠানে সুখ্যাত নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়, বিভূতি মুখোপাধ্যায় ও কুমার রায় নাটক ও সাধারণ রঙ্গমঞ্চের উপর শতাব্দীব্যাপী বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করেন। তারপর সংঘশিল্পী দ্বারা চারখানি নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। যথা—মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১) বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ, (২) শিশির বসুর 'ভংগুর', (৩) জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের—"বিসর্গ" ও (৪) ক্ষীরোদ প্রসাদের "আলিবাবা"। এই সকল নাটকে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্যে শক্তিমান নট—শম্ভু মিত্র, সমর দাস, সুকুমার ঘোষ, অজিত সরকার, কানাইলাল মুখার্জি, দীপক মিত্র, প্রশান্ত চক্রবর্তী ও শম্ভুদেব চ্যাটার্জি তাঁদের অভিনয় নৈপুণ্যে দর্শকমণ্ডলীকে অভিভূত করেন। তাছাড়া অরুণ চ্যাটার্জি, শিশির চ্যাটার্জি, প্রশান্ত অধিকারী ও স্বপন মুখার্জি, সুশান্ত মুখার্জির অভিনয় উল্লেখযোগ্য। আবদাল্লার ভূমিকায় ডাঃ প্রশান্ত চক্রবর্তীর নাম সর্বাগ্রে। তাঁদের শিল্পীজীবনের সার্থকতার নজীর তুলে ধরেন।

ভারিগামী প্রদর্শনী : গত চারদিনব্যাপী আকাদেমীতে শিল্পী অমলাভ দত্তের ভারিগামী প্রদর্শনীটি দর্শকের মনে বিশেষ

মিঠু মুখোপাধ্যায় / লিপিকন্যা

সাড়া দেয়। সাধারণ কাগজকে বিশেষ জ্যামিতিক কোণে ভাঁজ দেওয়া আর ভাঁজকে খোলা ও বন্ধ রেখে এই শিল্পসৃষ্টি সত্যই আশ্চর্যজনক। না দেখলে বিশ্বাস হয় না, এত প্রাণোজ্জ্বল শিল্পকলা শুধুমাত্র কাগজের ভাঁজের মাধ্যমে সম্ভব। জাপানী শিল্পধারায় 'ওরিগামী'র একটি বিশেষ স্থান আছে। শিল্পী নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের গুণে তৈরী করেছেন এক আশ্চর্য রসজগৎ। ধারাবাহিক প্রচলিত ওরিগামীর ভাঁজ ইত্যাদি ছাড়াও অনেকগুলি নিজস্ব সৃষ্টিও শিল্পী অমলাভ দত্ত আমাদের উপহার দিয়েছেন যেমন আমাদের দেশের গরু, মহিষ, ষাঁড়, গণ্ডার, ডোরাকাটা বাঘ, কাঁকড়া বিছে, পেঁচা। সব মিলিয়ে একটি অসাধারণ আনন্দের জগৎ শিল্পী আমাদের উপহার দিয়েছেন।

বিচিত্রানুষ্ঠান : গত ১২ ডিসেম্বর উত্তর কলকাতা কো-অর্ডিনেশন কমিটির বিরাট এক বিচিত্রানুষ্ঠানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্ট শিল্পীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যাদু জগতের বিশিষ্ট যাদুকর মদন কুণ্ডু। শ্রীকুণ্ডুর প্রতিটি খেলাই দর্শকরা গভীর আগ্রহের সঙ্গে দেখতে থাকেন। স্পটনিক ও জীবন্ত মেয়ের শূন্যে ভাসমান অবস্থায় সাঁতার কাটা খেলাগুলি মদন কুণ্ডু বিশেষভাবে দেখানোর দরুন দর্শক বিস্ময়ে [illegible] পড়েন।

রানাঘাট যোগানন্দ আশ্রমে [illegible] :

নদীয়া জেলার রানাঘাট যোগানন্দ [illegible] গত ৪, ৫ ও ৬ ডিসেম্বর দক্ষিণাকালী [illegible] পূজা অনুষ্ঠিত হয়। [illegible] ও প্রধান অতিথি ছিলেন [illegible] ভানুমুনি দশমহাবিদ্যা আশ্রমাচার্য [illegible] [illegible] সর্ববিদ্যা ও নাট্যকার [illegible] বসু। [illegible] সর্ববিদ্যা তাঁর ভাষণে [illegible], শক্তিই জগতের মূলাধার। মা ও মাটির সেবা করাই সর্বকালের সর্বযুগের মূলধর্ম। [illegible] শান্তির একমাত্র পথ ঈশ্বরচিন্তা ও জীব সেবা। এরপর প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণে বলেন, সব ধর্মই এক—শাক্ত বৈষ্ণবে কোন বিভেদ নেই। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, [illegible] [illegible] জল। কেউ বলছে—ওয়াটার, কেউ বলে—পানি—আবার কারো [illegible] জল।' আমাদের দেশের শ্যামাপূজার প্রবর্তক কালিকানন্দ আগমবাগীশের বাড়ীতে—এই নদীয়া জেলারই নবদ্বীপধামে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু একবার সংগীতে কালীপূজোতে উপস্থিত থেকে—শাক্তবৈষ্ণবের তখনকার ঘোরতর বিদ্বেষের মীমাংসা করেছিলেন। পরে শাক্ত ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন বহু গুণীজ্ঞানীজন। তাঁদের মধ্যে এককালের অনুশীলন সমিতির অন্যতম বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অধ্যাপক প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, জ্যোতিষশাস্ত্রী, হারানাথ আচার্য, ডাঃ গিরিশ চন্দ্র দেবনাথ, রাধেশ্যাম পোদ্দার, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী নকুলেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও মহেন্দ্রনাথ দাস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। সমাপ্তি ঘটে যোগানন্দ আশ্রমের আচার্য স্বামী যোগানন্দের উপস্থিত অতিথিদের ধন্যবাদমূলক ভাষণের পর।

সংক্রান্তি : গত ৫ ডিসেম্বর সি-টি-ও শিল্পী সংসদের (রাষ্ট্রীয় পরিবহণ) সভোরা স্টার রঙ্গমঞ্চে 'সংক্রান্তি' অভিনয়

অশনি সংকেত / ননী গঙ্গোপাধ্যায় এবং সন্ধ্যা রায়। পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়
ফটো : অমৃত

ওরিগামী প্রদর্শনী

করল। নাটক পরিচিত ও বহু অভিনীত, তবু প্রাণবন্ত অভিনয়ের জন্য এই নাটক দর্শকের মন জয়ে সক্ষম হয়েছিল। অভিনয়ে প্রশংসা দাবী রাখলেন 'রতন' বেশী রমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া 'শঙ্কর' বেশী রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কালীনারায়ণ' বেশী বিজন বন্দ্যোপাধ্যায় ও 'আদিত্যনারায়ণ' বেশী অতুল চক্রবর্তী প্রমুখের অভিনয় উল্লেখ্য। স্ত্রীচরিত্রে অজন্তা চৌধুরী, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায় ও রুমা গুহ কৃতিত্বের দাবী রাখেন। সমগ্র নাটকটি পরিচালনায় দায়িত্ব ছিল অনিল মিত্রের। এদিন পরিবহনমন্ত্রী শ্রীজ্ঞানসিং সোহন পাল এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

বীণাপাণি সঙ্গীতসমাজের আসন্ন নাট্যানুষ্ঠান : বাংলা সাধারণ নাট্যশালার শতবর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষে পঁচিশে ডিসেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় একটি একাঙ্ক এবং একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক মঞ্চস্থ করবে "থিয়েটার সেন্টারে"। জনৈক "মনোমোহন" থিয়েটারের দুজন প্রখ্যাত নায়ক-নায়িকার ক্ষুব্ধ জীবনের একটি রাত্রির ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখা বিধায়ক ভট্টাচার্যের "সরীসৃপ" (একাঙ্ক) এবং অপরটি মহাভারতের ভীষ্ম চরিত্রের দুর্বলতম ঘটনাগুলি নতুনভাবে চিত্রিত করেছেন মণীন্দ্র রায় "নাটকের নাম ভীষ্ম" এই একাঙ্কিকাটিতে। বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নেবেন শ্রীপ্রকাশ চ্যাটার্জি (দুর্যোধন/সুখন গুন্ডা), সুপ্রকাশ ব্যানার্জি (ভীষ্ম/নিকুঞ্জ), সুনীল ভট্টাচার্য (কর্ণ), সুশীল ভট্টাচার্য (অর্জুন), মানিক গাঙ্গুলী (হিতেন/নোংরা), বিশ্বনাথ পাল (রাজেন), অরবিন্দ ব্যানার্জি (অজয়), রাণী ব্যানার্জি (ম্যাডাম/অম্বা), বেবী ঘোষ (সত্যবতী), অর্পণা ঘোষ (উমা), কৃষ্ণা দাস (দ্রৌপদী/চাঁপা), দুর্গাদাস ব্যানার্জি (দুঃশাসন/বন্ধু), সরোজ পালিত (বিকর্ণ/মানকে), প্রদীপ চ্যাটার্জি (পরশুরাম), প্রভাত ব্যানার্জি (সঞ্জয়), উদয় মুখার্জি (বিদুর), প্রবোধ ব্যানার্জি (বিভাস)। নির্দেশনায় আছেন সুপ্রকাশ ব্যানার্জি।

দিল্লীতে থিয়েটার ওয়ার্কশপের অভিনয় : সঙ্গীত নাটক আকাদেমী দিল্লীতে আগামী ২৬ থেকে ৩০ ডিসেম্বর ১৯৭২ ছয়দিনব্যাপী একটি সর্বভারতীয় নাট্য উৎসবের আয়োজন করেছেন এবং এই উৎসবে পশ্চিমবঙ্গ থেকে থিয়েটার ওয়ার্কশপের '৭২-এর প্রযোজনা 'চাকভাঙা মধু' আমন্ত্রিত হয়েছে। উৎসবের প্রথম দিন আগামী ২৬ ডিসেম্বর কামানি প্রেক্ষাগৃহে 'চাকভাঙা মধু' অভিনীত হবে।

দেশবন্ধুনগরে জলসা : গত ২৫ নভেম্বর সন্ধ্যায় দেশবন্ধুনগর বাগুইপাড়াস্থ 'নেতাজী কিশোর সঙ্ঘের' ব্যবস্থাপনায় এবং কৌতুক-শিল্পী অলোক ভট্টাচার্যের পরিচালনায় এক বিচিত্রানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিল্পিবৃন্দের মধ্যে দীপক চক্রবর্তী, রঞ্জিত ঘোষাল, সুজয় মিত্র, বিশ্বনাথ দে, গৌতম দাশগুপ্ত, শাশ্বতী দাশগুপ্তা, জয়শ্রী ভট্টাচার্য এবং কৃষ্ণা ভট্টাচার্য-র পরিবেশিত গান মনে রাখার মত। তবলায় শঙ্কর ভট্টাচার্য যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। হাস্যকৌতুক পরিবেশন করেন মাঃ বাবু চক্রবর্তী ও ব্যঙ্গ-গীতি পরিবেশন করেন অলোক ভট্টাচার্য। বাউল সঙ্গীত পরিবেশন করেন—শ্যামদাস বাউল। যন্ত্রসঙ্গীতে শিশির ভট্টাচার্য-র পরিচালনায় দীপক এণ্ড পার্টি অর্কেস্ট্রা পূর্বের ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন। কৃষ্ণা ভট্টাচার্য পরিবেশিত 'এমন একটি ঝিনুক খুঁজে পেলাম না'—গানটি উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর যথেষ্ট প্রশংসা লাভে সমর্থ হয়।

ইউথ পাপেট থিয়েটার, ইন্ডিয়া

সুন্দর পুতুলনাচের মধ্যে দিয়ে ইউথ পাপেট থিয়েটার, তাঁদের নবম বার্ষিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী উৎসব পালন করলেন গেল শনিবার ৯ ডিসেম্বর '৭২ বালিগঞ্জ শিক্ষাসদনে।

স্বাগত ভাষণের মধ্যে উদ্যোক্তারা জানালেন যে, পূর্ণ সাজসরঞ্জামসহ শিক্ষাকেন্দ্র, 'পাপেট্রির' জন্য একটি পাঠাগার ও পুতুলনাচের জন্য ছোট একটি প্রেক্ষাগৃহের তাঁদের বিশেষ প্রয়োজন—এই শিল্পকলার গবেষণার জন্যে। কারণ, এখানে সেখানে কয়েকটি পুতুলনাচ দেখিয়ে জনসাধারণকে আনন্দ দেওয়াই এঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হোল, বিস্মৃতপ্রায় ঐতিহ্যবাহী এই শিল্পকলাকে পুনরুজ্জীবিত করা, জনসমাজে একে ব্যাপকভাবে বিস্তার এবং প্রচার করা, এর মান উন্নত করে নাটক, নৃত্যনাট্য ও অন্যান্য 'পারফরমিং আর্টস'-এর সমস্তরে আনা এবং এর মাধ্যমে ছোটদের শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা করা। এই প্রসঙ্গে তাঁরা আর্থিক অসুবিধা ও স্থানাভাবের কথা বিশেষভাবে প্রকাশ করেন এবং সরকারী ও বেসরকারী সাহায্যের জন্য একান্ত আবেদন জানান।

উদ্বোধনী ভাষণে লোকসভার সদস্য প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী ইউথ পাপেট থিয়েটারের কার্যকলাপের ও উদ্দেশ্যের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন যে, এঁরা সর্বদাই সমাজের একাংশের মঙ্গলসাধনে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন। উত্তরপুরুষদের পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও সুস্থ সমাজগঠনে এই

নের কার্যাবলীর বিশেষ প্রয়োজন তিনি ...ভব করেন। এবং সংস্থার আবেদনের ...রে তিনি সরকারকে প্রয়োজনীয় সকল ...হায্যদানের অনুরোধ জানাবেন ও চেষ্টা ...রেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

এরপর শুরু হয় দেড়ঘন্টাব্যাপী পতুল ...;—'সিলহয়েট', 'রিদম অফ নেচার' ও ...সের গর্জন-এর সঙ্গীত, নৃত্যকলা ও রাগপদ্ধতি দেখে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ ঘনঘন তালিতে মুখর হয়ে ওঠে। অন্তে পশ্চিম...গর বিভিন্ন জেলা ও কলকাতার অনেক ...লের প্রায় ১৬০জন ছাত্র-ছাত্রী পুরস্কার ও ...পত্র গ্রহণ করেন।

বৈষ্ণব সাহিত্যাচার্য প্রভুপাদ প্রাণ...শোর স্বামীজীর শুভ জন্মোৎসব : ...খিল ভারত বৈষ্ণব সম্মেলনের প্রতিষ্ঠাতা, ...দীঘাট পাথুরিয়াঘাট্টি হরিসভার ...পতি, বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্যতম ...পাল, বৈষ্ণব সাহিত্যাচার্য, পতিতপাবনা...র শ্রীমন্নিত্যানন্দবংশাবতংস প্রভুপাদ ...ৎ প্রাণকিশোর গোস্বামীজীর শুভ ...তিথিতে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পঞ্চশত বার্ষিক আবির্ভাব উৎসবে স্মরণে শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির, শ্রীভূমিতে ১৪ অগ্রহায়ণ তিনদিনব্যাপী এক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। উৎসবের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবসে ... ও শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ... অনুষ্ঠিত হয়। ... শিল্প ও ... সমাবেশে ... আবহে ভাবনার ... শান্তি ... সন্ধানী প্রেমপথ পরিব্রাজক ... সাধক প্রভুপাদ প্রাণকিশোর। প্রভুপাদ প্রাণকিশোরজীই মারাঠী ভাষা থেকে জ্ঞানেশ্বরী গীতা ও একনাথী একনাথী ভাগবতের প্রথম বাংলা অনুবাদ করেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পঞ্চশত বার্ষিক আবির্ভাব উৎসবের প্রবীণ প্রবর্তক। প্রভুপাদ প্রাণকিশোর গীতা জয়ন্তী, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত জয়ন্তী প্রভৃতি বিচিত্র ও ভাবমধুর উৎসবের প্রবর্তক। ঢাকা বিদ্যালয়, ঢাকা বেতারকেন্দ্র, কলকাতা বেতারকেন্দ্র প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রদত্ত তাঁর সারগর্ভ বক্তৃতাবলী আধ্যাত্মিক ভারতের মহাজন বাণী ও সত্যধর্ম প্রচারের প্রোজ্জ্বল স্বাক্ষর। তেমনি সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলী ও রসোত্তীর্ণ গ্রন্থ প্রণয়নেও তিনি ... প্রবেশ, ... মানসপূজা, ... গ্রন্থাবলী তাঁর ... ধর্মপ্রচার ব্রতের সার্থক নিদর্শন।

... চৌরঙ্গী ...

পরিচালক আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় শতরূপা পিকচার্সের 'নির্জন-কন্যা'র চিত্রগ্রহণ কাজ শেষ হয়ে গেছে। সম্প্রতি চিত্র-সম্পাদক অরবিন্দ ভট্টাচার্যর টেবিলে ছবিখানির ফাইনাল এডিটিংয়ের কাজ চলছে। কাহিনী রচনা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুর : সুধীন দাশগুপ্ত। চিত্রগ্রহণে : রামানন্দ সেনগুপ্ত ও দৃশ্য-পরিকল্পনায় শক্তি নাগ। নেপথ্য-কণ্ঠে আছেন : মান্না, আশা ও রুমা। ছবিটির প্রধান চরিত্র রূপায়ণে—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মিঠু ..., তরুণকুমার, জানু ..., অরুন্ধতী চট্টো, দিলীপ রায় প্রসেন ... ও রুমা গুহঠাকুরতা ও অনেকে। শতরূপা ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স ছবিটির পরিবেশক।

একক আসরে মানব ও স্বপন : সম্প্রতি ...দমি অফ ফাইন আর্টস প্রেক্ষাগৃহে ...ক্ত আয়োজিত এক প্রভাতী আসরে ...দ্রসঙ্গীত ও নজরুল-গীতি পরিবেশন ...ন—স্বপন গুপ্ত ও মানবেন্দ্র মুখো...ায়। বাংলা-সঙ্গীতের দুই অগ্রজ ও ...জের কথা ও সুরে উভয়ের মানস...কর গীতিরেখা-র ইঙ্গিতটি সুরে ও ...পে অনুভব করা গেল। গান শোনার ...দ ছাড়াও এটাই হল উপরি পাওনা।

প্রথমে আসন গ্রহণ করেন স্বপন গুপ্ত। মোট ১১খানি গান পরিবেশন করেন। ...ত বিশ্বাসের গায়কীর একটা সুন্দর ছবি এ'র গানে পাওয়া যায়। আর ...ট উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, আজকাল রবীন্দ্র-সঙ্গীত অথবা আধুনিক গানের ...ীরা বই না দেখে গান গাইতে পারেন কিন্তু স্বপন গুপ্ত একাদিক্রমে এত-...। গান গেয়ে গেলেন—বই, খাতা অথবা পার্শ্বচরের সাহায্য ছাড়াই। স্মরণ-...। তারিফ না করে উপায় কি?

স্বপন গুপ্তের গাওয়া 'তোমায় কিছু বলে,' 'মধুর ধ্বনি বাজে', 'এ-কি রস'—খুবই উপভোগ্য। তবে শিল্পীকে আর একটু সংযত হতে হবে পরিবেশনা-পদ্ধতির ক্ষেত্রে। ঠিক জায়গায় থামতে না জানলে অনেক সমৃদ্ধ শিল্পসৃষ্টিও ব্যর্থ হয়ে যায়।

এর পরই শুনলাম মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নজরুল-গীতি। মানববাবুর শিক্ষা আছে, ধ্যান আছে সাঙ্গীতিক অভিজ্ঞতাও প্রচুর। কাজী সাহেবের সেইসব রাগভিত্তিক গানগুলিই তিনি বেছে নিয়েছিলেন, যেসব গান তাঁর মত শিক্ষিত কণ্ঠেই মানায়। 'পিউ পিউ বিরহী পাপিয়া'য় ললিতের বিচ্ছেদশঙ্কিতা নায়িকার ব্যাকুলতা যেন একপলকে সারা প্রেক্ষাগৃহে ছড়িয়ে গেল যুগল মধ্যমের চকিতস্পর্শে। এর পর 'সাজিয়াছে যোগী', 'সতীহারা উদাসী ভৈরব কাঁদে', 'যারে হাত দিয়ে মালা', 'অরুকান্তি' 'পোহালো নিশি'—ইত্যাদি নানান গানের ধারায় 'ভৈরবী' ও 'ভৈরব' কতরকমের রূপ প্রয়োগ কবি-কল্পনার ছোঁয়া ... আবেশ সৃষ্টি করতে পারে তারই এক সুবিস্তৃত পরিচয় পাওয়া গেল শিল্পীর গানে আর পরিচিত হওয়া গেল তাঁর অধ্যয়ন প্রয়াসী মনটির সঙ্গে। কৃতিত্বের একটা বড় অংশ প্রাপ্য শ্রীরাধাকান্ত নন্দীর দাদরা, তেওড়া কাহারবা ও ত্রিতালের রকমারী ঠেকায় শিল্পীর মেজাজকে অনুপ্রাণিত রাখার জন্য।

দুশো বছরের বাংলা গান : কিছুদিন আগে রবীন্দ্রসদনে 'অরূপ' আয়োজিত দুশো বছরের বাংলা গানের সভায় বাংলা গানের ধারাটি প্রত্যক্ষ করা গেল সুচিত্রা মিত্র ও হিমাংশু রায়চৌধুরীর কণ্ঠ-সঙ্গীতে ও কেরামতুল্লা খাঁর তবলা সহযোগিতায়।

ঠিক এই বিষয়বস্তুর ওপর সঙ্গীতালেখ্য এর আগেও এ'রা মঞ্চস্থ করেছেন। এই নিয়ে তৃতীয়বার হল। হিমাংশু রায়চৌধুরীর নিষ্ঠা ও শ্রম অভিনন্দনীয়। এবারের নিবেদন আরো পরিণত পরিকল্পনা সুষ্ঠুতর। 'শুধু অভাব অনুভব করেছি ভাষ্যকার সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের—যাঁর সুচিন্তিত ব্যাখ্যায় আলোয় —বাংলা সঙ্গীতের ক্রমবিবর্তনের পথ-রেখাটির একটি সুন্দর রূপ ফুটে উঠেছিলো।

অনুষ্ঠান সুরু হয় শ্রীমতী মিত্র ও হিমাংশু রায়চৌধুরীর দ্বৈত কণ্ঠে একটি রবীন্দ্রসংগীত দিয়ে। অতঃপর রামমোহন, নজরুল, দ্বিজেন্দ্রলাল, শৌরী মিঞা, নিধুবাবু, রজনীকান্ত, নীলকণ্ঠ, শ্রীধর কথক রসিকচন্দ্র, রজনীকান্ত, দিনেন্দ্রনাথ, ...নাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সৌরীন্দ্রনাথ, গোবিন্দ অধিকারীর গান ...

বিশ্বজিৎ ও রাজশ্রী বসু / প্রান্তরেখা

এবং একই ভাবাশ্রিত রবীন্দ্রসংগীত শোনান সুচিত্রা মিত্র। এ ছাড়াও শ্রীমতী মিত্রর কণ্ঠে একটি অতুলপ্রসাদের গান (কে আবার বাজায় বাঁশী')। ও একটি নজরুল-গীতি ('ভরিয়া পরাণ শুনিতেছি গান') স্বাদ-বৈচিত্র্য রচনা করেছে।

দ্বৈতকণ্ঠে 'মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে'—অত্যন্ত সুখশ্রাব্য হয়। সুচিত্রা মিত্রের 'কথা কসনে লো রাই'এর (রবীন্দ্রনাথ) উত্তরে হিমঘ্ন রায়চৌধুরীর 'শ্যাম কাঁদানো ভাল নয়'—(গোবিন্দ অধিকারী) মধুর ও কৌতুকরসের সমন্বয়ে এক উপভোগ্য পরিবেশ রচনা করে। একটিতে সমমর্মী নায়িকার সখাদের গর্ব-অভিমান—অন্যটিতে তাদের বিনীত আবেদন একই পরিবেশের প্রতিক্রিয়ায় দুই কবির বিভিন্নধর্মী মানসিকতার এক চিত্তগ্রাহী রূপ সৃষ্টি করে।

তবে অনুষ্ঠান এত দীর্ঘ-বিলম্বিত না হলে মনে বেশী দাগ কাটত।

মূল অনুষ্ঠানের আগে অরূপ শিল্পী-গোষ্ঠীর উদ্বোধনী সঙ্গীত সংগীত।

শচীন শঙ্করের আসন্ন নৃত্যোৎসব : কয়েকদিন আগে শ্রীভূদেবশঙ্কর আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে শঙ্করভ্রাতা শচীন শঙ্কর ও তার নৃত্যভাবনার এক মনোজ্ঞ ছবি পাওয়া গেল।

'আলমোড়ায় দাদার সেই ধ্যানস্বর্গের স্মৃতিই আমায় অনুপ্রেরিত করেছে ১৯৫৩ সালে শচীনশঙ্কর ব্যালে ইউনিট সৃষ্টি করতে। আমার পরিশ্রম ব্যর্থ হয়নি। এই প্রতিষ্ঠানের নৃত্যানুষ্ঠান ভারতের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, ছাড়াও বিদেশাগত বহু দেশের রাজনৈতিক নেতার (আইসেনহাওয়ার, ব্রহ্ম-দেশ, তুর্কী ও জাপানের নেতৃবর্গ) উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন আমায় এগিয়ে চলার শক্তি যুগিয়েছে'—আবেগভরে জানালেন শচীন-শঙ্কর।

কিন্তু উদয়শঙ্করজীর মত অমন বিরাট নৃত্যব্যক্তিত্বের পর দর্শকচিত্তে রেখাপাত করতে পারাটা একটা দুঃসাধ্য কাজ নয় কি?'

অমৃতের প্রতিনিধির এই প্রশ্নের উত্তরে শিল্পী সবিনয়ে জানালেন 'দুঃসাধ্য ত নিশ্চয়ই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ সত্যও অস্বীকার করা যায় না দাদা দর্শকচিত্ত যে নৃত্যরস আস্বাদের উপযোগী করে তুলে-ছিলেন, এবং দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে দিয়েছিলেন বলেই নবাগত শিল্পীদের দরদের আলোয় তাঁরা বিচার করতে পেরেছেন। তাছাড়া কোনো শিল্পীর কাজে যদি সত্যিকার নিষ্ঠা থাকে—তবে তা রসিকচিত্ত স্পর্শ করবেই, তার পরিসর ছোট-বড় যাই হোক না কেন। এই নিষ্ঠায় কোনো ফাঁক ছিল না। শুধু আমি নয়—যাঁদের সহৃদয় সহযোগিতায় এই প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে শিল্প ও সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সেইসব উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব—যেমন কবি নরেন্দ্র শর্মা, অনিল বিশ্বাস, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, বলবন্ত দেব মদগলকার, চিরতরুণ হারীন্দ্রনাথ, সলিল চৌধুরী, কুমুদিনীশঙ্কর আরও অনেকের কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

'জনপ্রিয় হয়েছে কোন ব্যালেগুলি?' 'শিকারমহান এন্ড মারমেড, শাঁকলবেরা উৎসব', 'জয়-পরাজয়', 'ছত্রপতি শিবাজী'।

'এত গেল বোম্বে ও ভারতের অন্যান্য দেশের কথা। কলকাতায় আপনি অনুষ্ঠান করেছেন?'

'এগার বছর আগে স্বর্গত [illegible] উদ্যোগে কলকাতায় কয়েকটি অনুষ্ঠান [illegible] করেছি। এছাড়া মহাজাতি সদনে [illegible] একমাস ধরে বেশ কয়েকটি ব্যালে [illegible] এই সময় হৃদয়বান শিল্প-রসিক [illegible] কাছে যে স্নেহ ও আনুকূল্য পেয়েছি সারাজীবনে তা ভোলার নয়।''

শচীনশঙ্করজীর সাম্প্রতিক নৃত্যনাট্য 'ছত্রপতি শিবাজী' ও 'ট্রেন' সবশ্রেণীর দর্শকের অকৃপণ সাধুবাদ পেয়েছে। মহারাষ্ট্র সরকারের উদ্যোগে কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে 'ছত্রপতি শিবাজী'-র ২০টি শো দেখানো হয়। তাঁর ব্যালে ইউনিট দিল্লীর সঙ্গীত নাটক একাডেমী ও মধ্যপ্রদেশ সরকারের স্বীকৃতি পেয়েছে। ভারত ও সাগরপারে সাংস্কৃতিক দূতরূপে তিনি স্ব-সম্প্রদায় সফর করেছেন।

ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁর সেতার বাদন : গত সপ্তাহে কলামন্দির কর্তৃপক্ষ আয়োজিত ওস্তাদ বিলায়েত খাঁ সাহেবের একক সেতার বাদনের আসর পরিবেশ ও অনুষ্ঠান উভয় বিচারেই এক আনন্দসভা হয়ে ওঠে।

'লতা-গুল্ম সজ্জিত অলিন্দ, পটভূমিকায় নীল ও সোনালী রঙের মিলনসৃষ্ট প্রভাতী আকাশ সব মিলিয়ে এক চিত্তহারী আবেষ্টনী —তারই মধ্যে দুই ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁন ও কেরামৎ খাঁকে স্বপ্নালোকবাসীর মতই দেখাচ্ছিল। খাঁ-সাহেব ধরলেন 'চাঁদনী-কল্যাণ' রাগ। কল্যাণের গাম্ভীর্যের সঙ্গে কোমল নিষাদের ব্যঞ্জনার এক মুগ্ধকারী রসরূপ সৃষ্টি হয়েছিলো। গতের মুখটি অনেকটা দক্ষিণ ভারতীয় চারুকেশীর মত। বিলায়েতী মীড়, আশ, ঝটকা ও গমকের অলঙ্কার শ্রোতাদের যথারীতি 'বাহবা' আদায় করেছে। কিন্তু অকস্মাৎ আঙ্গিকের ওপর তাঁর সমস্ত চিত্ত কেন্দ্রীভূত হওয়ায় সযত্নরচিত ভাবের মায়াজাল যেন ছিন্ন হয়ে গেল।

শিল্পীকে আবার ফিরে পাওয়া গেল 'ঝালা'র অঙ্গে। চিকারী ও জোড়ের ধ্বনি-সৌন্দর্যের তরঙ্গে অনুভূত হোলো তাঁর বৈশিষ্ট্য। ভৈরবী দিয়ে আসরের মধুর অবসান ঘটল কেরামৎ খাঁর তবলা-লহরা—আনন্দের আয়োজনকে পূর্ণ করেছে।

বিবেকানন্দ পাঠচক্রের রবীন্দ্র-নজরুল প্রভাত : রবিবার ২৪ ডিসেম্বর সকাল নটায় বিবেকানন্দ পাঠচক্রের প্রযোজনায় রবীন্দ্র-নজরুল সঙ্গীত ও আবৃত্তির একক অনুষ্ঠান হবে রংমহল রঙ্গালয়ে। সঙ্গীতে অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনুপ ঘোষাল। আবৃত্তিতে সৌমিত্র মিত্র ও দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তঃ কলেজ অ্যাথলেটিক্স স্পোর্টসে ছাত্রদের ১৫০০ মিটার দৌড়ে নতুন রেকর্ডস্রষ্টা নির্মল দাঁতরা (বাঁদিক থেকে দ্বিতীয়)

দর্শক

ভারত বনাম ইংল্যাণ্ড

প্রথম টেস্ট—নিউ দিল্লী

নিউ দিল্লীতে ডিসেম্বর ২০ থেকে ভারত বনাম ইংল্যাণ্ডের ১৯৭২-৭৩ সালের টেস্ট ক্রিকেট সিরিজের ১ম টেস্ট খেলা শুরু হয়েছে। ইতিপূর্বে নিউ দিল্লীতে এই দুই দেশের যে তিনটে সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলা হয়েছে, তার ফলাফল অমীমাংসিত ছিল। নিউ দিল্লীতে বিভিন্ন দেশের বিপক্ষে ভারত মোট ১১টা সরকারী টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলেছে। ভারতের পক্ষে খেলার ফলাফল : জয় ৩, হার ১ এবং ড্র ৭।

স্বাধীনতালাভের আগে নিউ দিল্লীতে কোন সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলা হয়নি। এখানে সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসর প্রথম বসে ১৯৪৮ সালের ১০ই নভেম্বর—ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম টেস্ট, তথা স্বাধীন ভারতের মাটিতে প্রথম সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার অনুষ্ঠান। এ পর্যন্ত নিউ দিল্লীতে [illegible] দেশের বিপক্ষে ভারতের মোট ১১টি সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলা হয়েছে। ভারতের পক্ষে খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে : [illegible] ৩, হার ১ এবং ড্র ৭। ভারতের জয় : ১৯৫২-৫৩ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে [illegible] ইনিংস ও ৭০ রানে (১ম টেস্ট), ১৯৬৫ সালে নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে [illegible] উইকেটে (৪র্থ টেস্ট) এবং ১৯৬৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৭ উইকেটে ([illegible] টেস্ট)। ভারতের পরাজয় : ১৯৫৯-৬০ সালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে এক ইনিংস ১২৭ রানে।

নিউ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ভারত-বনাম ইংল্যাণ্ডের বিগত তিনটি টেস্ট খেলার বিবিধ রেকর্ড :

এক ইনিংসে দলগত সর্বোচ্চ রান

ভারতবর্ষ : ৪৬৬ রান, ১৯৬১-৬২
ইংল্যাণ্ড : ৪৫১ রান, ১৯৬৩-৬৪

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রান
(পুরো ইনিংসের খেলায়)

ভারতবর্ষ : ৩৪৪ রান, ১৯৬৩-৬৪
ইংল্যাণ্ড : ২০৩ রান, ১৯৫১-৫২

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান

ভারতবর্ষ : ২০৩ (নট আউট) মনসুর আলী ১৯৬৩-৬৪
ইংল্যাণ্ড : ১৫১ কলিন কাউড্রে ১৯৬৩-৬৪

সেঞ্চুরী

ভারতবর্ষ : ৭ এবং ইংল্যাণ্ড ৩

খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী

ভারতবর্ষ : ১০৫ রান — হনুমন্ত সিং, ১৯৬৩-৬৪

এক ইনিংসে ৪০০ রান

ভারতবর্ষ : ৩ বার
ইংল্যাণ্ড : ১ বার

উল্লেখযোগ্য সেঞ্চুরী

১৯৬৩-৬৪ সালের টেস্ট সিরিজের নিউ দিল্লীর ৪র্থ টেস্ট খেলায় ৪টি সেঞ্চুরী হয়—ভারতের ৩টি (১০৫ হনুমন্ত সিং, ১০০ কুন্দরণ এবং ২০৩ নট আউট মনসুর আলী) এবং ইংল্যাণ্ডের ১টি (১৫১ কলিন কাউড্রে)

পার্টনারশীপ রেকর্ড

১৯৫১-৫২ সালে ৩য় উইকেটের জুটিতে ভি এম মার্চেণ্ট এবং ভি এস হাজারে যে ২১১ রান সংগ্রহ করেছিলেন, তা আজও উভয় দেশের পক্ষে ৩য় উইকেট জুটির রেকর্ড রান।

ভারত সফরে এম সি সি

ইন্দোরের নেহরু স্টেডিয়ামে এম সি সি বনাম মধ্যাঞ্চল দলের তিনদিনের খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। এই খেলাটি ছিল বর্তমান ভারত সফরে এম সি সির ২য় খেলা। এম সি সির ওপনিং ব্যাটসম্যান কেরী উডের সেঞ্চুরী (১১৭ রান) এই খেলার এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এখানে উল্লেখ্য, বর্তমান সফরে এম সি সির খেলোয়াড়দের পক্ষে এই প্রথম সেঞ্চুরী।

প্রথম দিনে এম সি সি ১ম ইনিংসের ২৬৯ রানের মাথায় (৯ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। খেলার বাকি ১৫ মিনিটে মধ্যাঞ্চল এক উইকেটের বিনিময়ে মাত্র ১ রান সংগ্রহ করেছিল, নো-বল থেকে। লাঞ্চের সময় এম সি সির ৭৬ রান (৩ উইকেটে) দাঁড়ায়। দলের খুবই সঙ্গীন অবস্থা তখন। লাঞ্চের পর অবস্থা আরও খারাপ দাঁড়াল। অধিনায়ক লুইস, উইকেট-কিপার ব্যাটসম্যান নট এবং ফার্নেশ তাড়াতাড়ি খেলা থেকে বিদায় নিলেন। শেষ পর্যন্ত ওপনিং ব্যাটসম্যান উডের দৃঢ়তায় এম সি সি বিপর্যয় থেকে উদ্ধার পায়। উডের দর্শনীয় কভার ও একস্ট্রা-কভার ড্রাইভ এবং পুল দর্শকদের চিত্তবিনোদনের খোরাক হয়েছিল। উড ২৬০ মিনিট খেলে তাঁর ১১৭ রানে ১৮টা বাউণ্ডারী করেছিলেন এবং মাত্র একবার তাঁর ব্যক্তিগত ৮৯ রান এবং দলের ১৬৭ রানের মাথায় (৬ উইকেটে) 'ক্যাচ' তুলে সে যাত্রা রক্ষা পেয়েছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে মধ্যাঞ্চল ১ম ইনিংসের ২৫৫ রানের (৩ উইকেটে) মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করলে এম সি সি বাকি সময়ে ১০টা উইকেট হাতে জমা রেখে ১৮ রান সংগ্রহ করেছিল। লাঞ্চের সময় মধ্যাঞ্চল দলের রান ছিল ৯০ (১ উইকেটে)। দলের ১২১ রানের মাথায় অনিল দেশপাণ্ডে ব্যক্তিগত ৪৫ রান করে আউট হন। ২য় উইকেটের জুটিতে দেশপাণ্ডে এবং সুর্যবীর সিং দলের ১২১ রান সংগ্রহ করেছিলেন। চা-পানের বিরতির সময় মধ্যাঞ্চল দলের রান দাঁড়ায় ২০৫ (২ উইকেটে)। সুর্যবীর সিং ১০২ এবং সেলিম দুরানী ৫৩ রান করে অপরাজিত ছিলেন। দলের ২০৬ রানের মাথায় সুর্যবীর সিং তাঁর ব্যক্তিগত ১০২ রান করে আউট হন। সুর্যবীর ২৫৮ মিনিট খেলে তাঁর ১০২ রানে ১৫টা বাউণ্ডারী

করেছিলেন। ৩য় উইকেটের জুটিতে সুর্যবীর এবং দুরানী দ্রুতগতিতে ৭৩ মিনিটের খেলায় দলের ৮৫ রান সংগ্রহ করেছিলেন। সুর্যবীরের সেঞ্চুরী কিন্তু সেলিম দুরানীর নট আউট ৮১ রানের কাছে নিষ্প্রভ হয়ে যায়। সেলিম দুরানী তাঁর এই দিনের চিত্তাকর্ষক খেলায় টেস্ট খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলীর সভ্যদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছেন। প্রবীণ টেস্ট খেলোয়াড় সেলিম দুরানী ২৬টি টেস্ট ম্যাচ খেলে তিনি যে ফুরিয়ে যাননি তা প্রমাণ করে দিয়েছেন। সেলিম দুরানীর এইদিনের খেলা দর্শকদের অনেকদিন মনে থাকবে। দুরানী ৬৮ মিনিটে তাঁর ৫০ রান পূর্ণ করেন। তাঁর অপরাজিত ৮১ রানে ছিল ১৫টা বাউণ্ডারী। পেস এবং স্পিন বোলারদের সমস্ত আক্রমণ এবং চাতুরী তুচ্ছ করে তিনি তাঁর কাট, পুল ও হুকের বৈশিষ্ট্য দর্শকদের চোখে তুলে ধরেছিলেন।

তৃতীয় অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে লাঞ্চের একঘণ্টা পরে এম সি সি তাদের ২য় ইনিংসের ২০৯ রানের মাথায় (৪ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে মধ্যাঞ্চলকে খেলার বাকি সময়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২১৬ রান সংগ্রহের 'চ্যালেঞ্জ' জানায়। মধ্যাঞ্চল ১৩ রানের মাথায় ২য় এবং ৪৪ রানের মাথায় ৩য় উইকেট পড়ার পর জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহের সংকল্প ছেড়ে খেলা ড্র রাখার পথ নেয়। তাদের ১১১ রানের মাথায় (৪ উইকেটে) খেলাটি শেষ হলে শেষ পর্যন্ত খেলা অমীমাংসিত থেকে যায়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

এম সি সি: ২৬১ রান (৯ উইকেটে ডিক্লে:। বেরী উড ১১৭ রান। কৈলাশ ঘাটানি ৫৭ রানে ৩ এবং জগদেল ৬৯ রানে ৩ উইকেট)

ও ২০৯ রান (৪ উইকেটে ডিক্লে:। ফ্লেচার ৫৬, রুপ ৫০ এবং নট অপরাজিত ৩৫। দুরানী ৬৬ রানে ৩ উইকেট)

মধ্যাঞ্চল : ২৫৫ রান (৩ উইকেটে ডিক্লে:। সুর্যবীর সিং ১০২, দেশপাণ্ডে ৪৫ এবং দুরানী নট আউট ৮১ রান। বার্কেনশ ৪৭ রানে ২ উইকেট)

ও ১১১ রান (৪ উইকেটে। পার্থসারথি ৫১ রান। আরনল্ড ৯ রানে ২ উইকেট)

সুস্মিতা দে
আন্তঃ কলেজ স্পোর্টসে
মেয়েদের ব্যক্তিগত বিভাগের চ্যাম্পিয়ান

আন্তঃ কলেজ অ্যাথলেটিক্স

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত আন্তঃ কলেজ অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতার ছাত্র-বিভাগে বিদ্যাসাগর সান্ধ্য বিভাগ দলগত চ্যাম্পিয়ান হওয়ার সূত্রে উপর্যুপরি ৯বার (১৯৬৪-৭২) ছাত্র-বিভাগের দলগত চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভের গৌরব অর্জন করেছে। অপরদিকে ছাত্রী-বিভাগের দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে বিদ্যাসাগর মহিলা বিভাগ। ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন ছাত্র-বিভাগে বিকাশ পাল (বিদ্যাসাগর সান্ধ্য) এবং ছাত্রী-বিভাগে সুস্মিতা দে (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন)।

দলগত চ্যাম্পিয়ান

ছাত্র-বিভাগ : বিদ্যাসাগর সান্ধ্য (৬৭ পয়েন্ট)

ছাত্রী-বিভাগ : বিদ্যাসাগর মহিলা বিভাগ (২৩ পয়েন্ট)

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান

ছাত্র-বিভাগ : বিকাশ পাল (বিদ্যাসাগর সান্ধ্য)—২০ পয়েন্ট।

ছাত্রী-বিভাগ : সুস্মিতা দে (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন)—১৫ পয়েন্ট।

রঞ্জি ট্রফি

পূর্বাঞ্চলের লীগ খেলা

কলকাতার ইডেন উদ্যানের রঞ্জি স্টেডিয়ামে বাংলা বনাম উড়িষ্যার খেলায় বাংলা এক ইনিংস ও ৭৬ রানে জয়ী হয়েছে।

প্রথম দিনের খেলায় বাংলা ১ম ইনিংসের ৩৬২ রানের (৬ উইকেটে) মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে এবং বাকি ৩২ মিনিটের খেলায় উড়িষ্যা হাতে ১০ উইকেট জমা রেখে ২১ রান সংগ্রহ করেছিল। বাংলার ১ম উইকেটের জুটিতে পলাশ নন্দী এবং গোপাল বসু দলের ১২২ রান তুলে খেলার ভিত শক্ত করেছিলেন। গোপাল বসু ১৭৯ মিনিট খেলে তাঁর ১৩৩ রানে ২৩টা বাউণ্ডারী করেন।

দ্বিতীয় দিনে উড়িষ্যার ১ম ইনিংস ১১২ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ২৫০ রানের পিছনে পড়ে 'ফলো-অন' করে এবং দ্বিতীয় ইনিংসের ৪টে উইকেট খুইয়ে ১০৮ রান সংগ্রহ করে।

তৃতীয় অর্থাৎ শেষ দিনে লাঞ্চের ২৪ মিনিট আগে উড়িষ্যার ২য় ইনিংস ১৭৪ রানের মাথায় শেষ হলে বাংলা এক ইনিংস ও ৭৬ রানে জিতে যায়। এই দিন ৯৬ মিনিটের খেলায় উড়িষ্যা ২য় ইনিংসের বাকি ৬টা উইকেটের বিনিময়ে ৬৬ রান যোগ করেছিল।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

বাংলা : ৩৬২ রান (৬ উইকেটে ডিক্লে: নন্দী ৫৮, গোপাল বসু ১৩৩, রাজু মুখার্জি নট আউট ৫০ রান)

উড়িষ্যা : ১১২ রান (ভিজ ৩৫ রান। দিলীপ দোসী ২৩ রানে ৪ এবং দীপঙ্কর সরকার ১৫ রানে ৩ উইকেট)

ও ১৭৪ রান (বিনোদ গুপ্ত ৫৫ রান। দোসী ৪৯ রানে ৪ উইকেট)

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

১৪শ বর্ষ
৩য় খণ্ড

৩৪ সংখ্যা
মূল্য—২.০০
পর্ষৎ—২ পয়সা
মোট ২.০২ পয়সা

Friday, 29th December, 1972 শুক্রবার, ১৪ পৌষ, ১৩৭৯ **Rs. 2.02**

ক্রীড়া ও বিনোদন সংখ্যা

সূচী-পত্র

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন স্ট্যাম্প পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫·০০	টাকা ৩০·০০
ষান্মাসিক	টাকা ১২·৫০	টাকা ১৫·৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬·২৫	টাকা ৮·০০

বিঃ দ্রঃ—উৎপাদন শুল্কের হার (চাঁদার সহিত অবশ্য প্রেরণীয়)

বার্ষিক	টাকা	১·০২
ষান্মাসিক	টাকা	০·৫২
ত্রৈমাসিক	টাকা	০·২৬

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

ক্রীড়া ও বিনোদন সংখ্যা

সূচী-পত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীপ্রদীপ দাস

উৎসব ও আনন্দের দিন

খৃস্টের আবির্ভাব দিবসকে কেন্দ্র করে বড়দিনের উৎসব। মানবত্রাতা তিনি। আত্মোৎসর্গ করে তিনি মহৎ নিষ্পাপ জীবনের উত্তরাধিকার দিয়ে গেছেন বিশ্ববাসীকে। এই উৎসব তাই সকলের। আমরাও তার অংশভাগী। এই উৎসব মানবপ্রেম ও বিশ্বজনীনতার আবেদনে মহিমান্বিত। কিন্তু আমরা তাঁর জন্মদিন কীভাবে পালন করব? আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণে কি এই দিনের তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায়? ধর্মাচরণ ও জীবনচর্যার মধ্যে দুস্তর পার্থক্য একদিন রবীন্দ্রনাথকে বেদনার্ত করেছিল। তিনি বলেছিলেন, 'দেবালয়ে স্তবমন্ত্রে তাঁকে আজ যারা ঘোষণা করছে তারাই কামানের গর্জনে তাকে অস্বীকার করছে, আকাশ থেকে মৃত্যুবর্ষণ করে তাঁর বাণীকে অতি ভীষণ ব্যঙ্গ করছে। লোভ আজ নিদারুণ, দুর্বলের অন্নগ্রাস আজ লুণ্ঠিত, প্রবলের সামনে দাঁড়িয়ে খৃস্টের দোহাই দিয়ে মার বুক পেতে নিতে সাহস নেই যাদের তারাই আজ পূজাবেদীর সামনে দাঁড়িয়ে মৃত্যুশৃংখলবিদ্ধ সেই কারুণিকের জয়ধ্বনি করছে অভ্যস্ত বচন আবৃত্তি করে। তবে কিসের উৎসব আজ? কেমন করে জানব খৃস্ট জন্মেছেন পৃথিবীতে? আনন্দ করব কী নিয়ে?'

আজ ভিয়েতনামের দিকে তাকিয়ে সে কথাই কি আবার মনে পড়ছে না আমাদের? যুদ্ধ ও সংঘাতে খৃস্টের বাণীর অবমাননা করছে তারাই যাদের হাতে মারণাস্ত্র, মুখে তাঁর পুণ্য নাম। এই কপটতাই আজকের উৎসবকে সেই শক্তিমানদের কাছে করে তুলেছে অর্থহীন। ভারতবর্ষ চিরকাল বিশ্বজনীন ধর্মমতকে জানিয়েছে শ্রদ্ধা। অগণিত ভারতবাসী খৃস্টধর্মাবলম্বী। তারা ছাড়াও আজ এই উৎসব প্রাঙ্গণে সমবেত হয়েছে বহু উদার-হৃদয় মানুষ যাদের কাছে খৃস্টের জীবন ও বাণী বিশ্বপ্রেমের আলোকে উদভাসিত। বড়দিনের উৎসব আমাদের দেশে তাই এক বিশেষ তাৎপর্যে চিহ্নিত হয়ে সর্বসাধারণের আনন্দের উৎসবে পরিণত।

এক সময়ে ইংরেজ শাসনের আমলে বড়লোকের পাড়ায় এই উৎসব থাকত সীমাবদ্ধ। রাজশক্তির দম্ভ ও আড়ম্বরের সঙ্গে যুক্ত থাকত বলেই সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার ছিল না সেখানে। সেই অশুভশক্তির পরাভব ঘটেছে। বড়দিনের উৎসবের মর্মবাণী পৌঁছে গেছে ধর্মের গন্ডী পেরিয়ে সর্বসাধারণের কাছে। এই সময়ে আমাদের এই বাংলায়, বিশেষ করে কলকাতায়, নানান সৃষ্টিশীল আনন্দের বন্যা প্রবাহিত হয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আমাদের কাছে এই শীতকালটা মনোরম। প্রসন্ন সূর্যালোকে স্নাত ধরিত্রীর রূপও হয়ে ওঠে স্নিগ্ধ। আগেকার দিনে বিত্তবানদের বিলাস-প্রাচুর্যের চমকই ছিল বড়দিনের আকর্ষণ। এখন শিল্পী, সঙ্গীতকার, ক্রীড়াকুশলী সকলেই নিজেদের সৃজনপ্রতিভার পরিচয় মেলে ধরেন এই সময়ে। চিত্রশিল্পের প্রদর্শনী কলকাতায় বিরাট আকর্ষণ সৃষ্টি করে। প্রতিভাবান শিল্পীদের নতুন শিল্পকর্মের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ ঘটে চিত্রপ্রদর্শনীগুলোতে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রতি বাংলার একটা বিশেষ অনুরাগ ও আকর্ষণ আছে। ভারতবিখ্যাত গায়ক ও যন্ত্রশিল্পীরা এই সময়ে আসেন কলকাতায় বিভিন্ন সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য। এ শুধু বিত্তবানদের মনোরঞ্জনের জন্য নয়। সঙ্গীতানুরাগী সাধারণ মানুষ যাঁরা সারা বছর অপেক্ষা করে থাকেন এই সময়ের জন্য তাঁরা নিজেদের প্রিয় শিল্পীদের গীতবাদ্য শোনবার সুযোগ পেয়ে ধন্য হন। শিল্পীরাও চান প্রকৃত সমঝদার শ্রোতা। কলকাতার ও বাংলার শ্রোতারা দীর্ঘদিনের অনুরাগের দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জন্য তাঁদের আগ্রহ ও উপলব্ধি কত গভীর। শিল্পীরাও জানেন কলকাতার আসরে খ্যাতি অর্জন করতে পারলে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়বে সুনাম। শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চার কলকাতা এখনও অনন্য। তার প্রমাণ সংস্কৃতি সম্মেলনগুলোতে আগ্রহী শ্রোতা ও দর্শকদের ভীড়। নিছক হুজুগে এই অনুরাগ গড়ে ওঠে না। তার জন্য শিক্ষা ও মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন।

এবারের আনন্দ উৎসবে আরেকটি বড় আকর্ষণ কলকাতায় আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলা। ক্রিকেট, ফুটবলে কলকাতার দর্শকদের অনুরাগ বলা চলে বিশ্ববিদিত। কলকাতায় ভারত বনাম ইংল্যান্ডের টেস্ট ক্রিকেট খেলা প্রবল আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে সর্বত্র। দর্শকের তুলনায় আমাদের ইডেন উদ্যানে আসন-সংখ্যা নিতান্তই কম। তা সত্ত্বেও এবার যথাসম্ভব সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা হয়েছে সাধারণ দর্শকদের জন্য। ইডেন উদ্যান প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটের লীলাভূমিরূপে নন্দিত। ভারতীয় ক্রিকেট দলের কাছে এর আগে পরাজিত হয়েছে ইংল্যান্ড দল তাদের নিজের দেশে। সে কারণেই এবারের খেলা হবে খুবই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক। ইংরেজরাই ক্রিকেট খেলা শিখিয়েছিল তার কমনওয়েলথের দেশগুলোকে। তার সাম্রাজ্যিক মহিমা যেমন অস্তমিত, ক্রিকেটে নৈপুণ্যও তেমনি স্তিমিত। ইডেনে নতুন করে পরীক্ষা হবে ইংল্যান্ড সত্যিই তার পূর্বগৌরব উদ্ধার করতে পারবে কিনা। ইডেনই বলবে, ভারতীয় ক্রিকেটের মান এখন কত উঁচুতে। এই আনন্দের পরিবেশেই আমরা অমৃত-র পৃষ্ঠায় পাঠকদের উপহার দিচ্ছি ক্রীড়া ও বিনোদনের বিভিন্ন দিকের পরিচয়। পাঠকদের আগ্রহ ও কৌতূহল তৃপ্তিতে যদি সাহায্য করতে পারি তাহলেই মনে করব আমাদের প্রচেষ্টা হয়েছে সার্থক। এই উৎসব সকলের জীবনে আনন্দ ও প্রত্যাশা পূর্ণ করুক। সকলের সঙ্গে মিলেই যেন আমরা আনন্দ ভোগ করতে পারি।
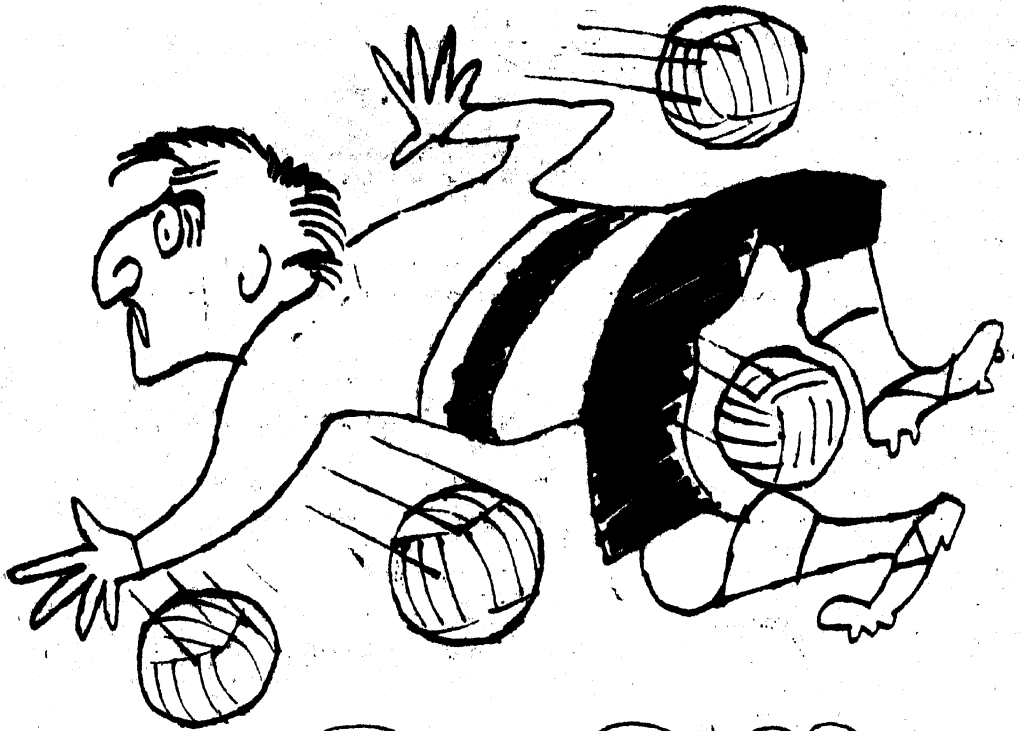
আমরাও একদিন খেলেছি

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

সেবার আমাদের দিগ্বিজয়ী টীম। এ-অঞ্চলের অর্থাৎ উত্তর বিহারের যতগুলো শীল্ড আর কাপ, সবগুলোই জিতে নিয়েছি। [illegible]খানা জেলায় আমাদের টীম রীতিমতো আতঙ্কের সৃষ্টি ক'রে ছেড়েছে। ঠিক হয়েছে পরের বছর গঙ্গা পেরিয়ে প্যাটনায় হামলা দোব।

তার আগেই কিন্তু এ-বছরেই মস্তবড় একটা ঘা খেয়ে মুশড়ে যেতে হোল।

একেবারে শেষেরদিকে, যখন ফুটবলের মরশুম একরকম শেষ হয়ে এসেছে, ক্লাবে একটা খুব বড়রকমের ভোজের ব্যবস্থা ক'রে সব শীল্ড-কাপ সাজিয়ে ফটো নেওয়ার জল্পনা-কল্পনা হচ্ছে। শহরের বড় বড় করেকজন রেইস আমাদের পেট্রন, তাঁরাও থাকবেন।

আঘাতটা যে পড়ল তা একেবারে মরশুমটাকে একেবারে নিখুঁত করে তোলবার উচ্চাশায়। দুঃখের কথা এই যে, উচ্চাশাটার লক্ষ্য ছিল নিতান্তই নীচের দিকে এক হিসাবে বলতে গেলে। পরিণামটা দাঁড়াল—যখন যশের সমুদ্রে স্নান করছি ঠিক সেই সময়েই অপযশের গোষ্পদে ডুবে মরতে হোল।

আরও দুঃখ এইজন্যে যে, যার ওপর আমাদের সবচেয়ে নির্ভর, যার বলে আমাদের এই আকাশচুম্বী যশ আর প্রতিষ্ঠা, এই নিম্নমুখী উচ্চাশাটা দেখা দিল সর্বপ্রথম তারই মনে, আত্মবিশ্বাসের বিকৃত রূপে।

আমাদের গোলকীপার কপিলদেও চৌধুরী। পাঁচটা কম্পিটিশনে আমাদের সতেরোটি ম্যাচ খেলতে হয়। কপিলদেও এতগুলি ম্যাচে মাত্র তিনটি গোল খায়, তার মধ্যে একটা সেম-সাইড, অর্থাৎ নিজের-দিকের প্লেয়ারের ভুলে, ব্যাক রাজেন্দার বেকায়দায় পড়ে কর্ণার করে বাঁচাতে গিয়ে বলের মুখ ঠিক ঠিক রাখতে পারেনি, আচমকা নিজেদের গোলেই সেঁদিয়ে যায় বলটা।

প্রায় ছ'ফুট লম্বা, থাড়া শরীর, হাড়কাঠ মোটাসোটা কপিলদেওর নাম পড়ে গিয়েছিল চাইনীজওয়াল, অর্থাৎ চীনের প্রাচীর। আমাদের সময় গোলকীপারকে চার্জ করা আইনবহির্ভূত ছিল না। কিন্তু এমন বেপরোয়া ফরওয়ার্ড কমই দেখেছি যাকে গতিবেগের মাথায় গোলের কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়াতে না হয়েছে। পেনালটি এরিয়ার বাইরে থেকে শট করে কপিলদেওকে কাটিয়ে কেউ গোল করতে পেরেছে—এমন দৃশ্য নিতান্তই বিরল ছিল। দীর্ঘ শরীর আর লম্বা লম্বা দুটো হাত নিয়ে কপিলদেও যখন আসন্ন বিপদের জন্যে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াত, মনে হোত যেন সমস্ত গোলটা জুড়ে দাঁড়িয়েছে।

শুধু দৈহিকশক্তিতে ভালো গোলকীপার হওয়া যায় না। শরীরটা আততায়ী খেলোয়াড়ের পক্ষে ভারী হলেও, ওর নিজের কাছে খুব হাল্কাই ছিল, অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বলটাকে দুহাতের থাবার মধ্যে যেন চুম্বকের মতো টেনে নিত কপিলদেও। তারপর, কেমন বলা হয়েছে, যে ফরোয়ার্ড তাল সামলাতে না পেরে ঘাড়ে গিয়ে পড়ল, তাকে প্রায়ই ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে ফিরে আসতে হোত।

কথাটা যখন উঠলই তখন আর একটু বলে নিতে হয়।

সে সব দিনের খেলার কথা মনে হলে আজকালকার খেলাকে আমাদের সে সময়ের অনেকের নিতান্ত কাবুবাচ্চাদের খেলা ব'লে মনে হয়। দণ্ডগীর কথা বললে অনেকটা বোঝা যাবে। ফুটবলের মান আজকল কত উঁচু, টেকনিক কত সূক্ষ্ম বোঝবার জন্যে একবার একটা ভালো খেলা দেখাতে নিয়ে যাই গড়ের মাঠে। দুটো নামকরা টীমের মরণ-বাচন খেলা। ভিড় কাটিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে কেমন দেখলে প্রশ্ন করতে দণ্ডগী হোহো ক'রে হেসে উঠল। বললে—'ওরা খেলছে কখন যে তুই কেমন খেলা হোল জিজ্ঞেস করছিস? গায়ে একটু ঘা ঠেকছে

কি না ঠেকছে, অমনি ফাউল, রেফারীর ঠোঁট থেকে হুইসল থামে না। একেও ফুটবল খেলা বলতে হবে!'

দণ্ডী সিং ছিল আমাদের সেণ্টার হাফ-ব্যাক। আমাদের পাঁচমিশালী টীমের মধ্যে ও ছিল চৌহান রাজপুত, ছাপরার দিকের ছেলে। মারা আর-মার হজম করাটা সকলেরই রপ্ত করে নিতে হোত সেকালে—যে টীকী খেলোয়াড় তাকেও—তার মধ্যে দণ্ডী ছিল বিশিষ্ট। বিশেষ বিশিষ্ট কথাটা যদি বলা চলে তো তাই বললেই ওকে ঠিক বোঝা যায়। হাফব্যাক, তবে ওকে ঢালা আমমোক্তারনামা দেওয়া ছিল, নিজের দিকের কোনও প্লেয়ার যদি ঘায়েল হয় তো নিজের পজিশন ছেড়ে যেকোন পজিশনে গিয়ে আততায়ীকে ধরাশায়ী ক'রে ফিরে আসতে পারে। এক কপিলদেও চৌধুরী ছাড়া। তার কথা বলা হয়েছে। তার দরকার হোত না। কপিলদেও ছিল ভূমিহার ব্রাহ্মণ।

আমাদের ক্লাবের সেক্রেটারি ছিলেন ধীরু বাঁড়ুজ্জে। বাংলা স্কুলের হেডমাস্টার। একসময় ভালো খেলতেন। খুব বিচক্ষণ ব্যক্তি, খেলার জগতে চাণক্য বললেও হয়। বেছে বেছে টীম সাজাতে, দরকার পড়লে খেলোয়াড় ভাঙিয়ে আনতে, চর লাগিয়ে প্রতিপক্ষের হাঁড়ির খবর বের করতে তাঁর জুড়ি ছিল না।

তবে নিজে খেলতেন না। একটু বয়সও হয়ে গিয়েছিল, তাছাড়া ওঁ'র মতে ওঁদের সময়ের তুলনায় আমাদের সময়ের খেলা নাকি নিতান্ত জোলো, ফিকে হয়ে গিয়েছিল। এ-যুগের খেলাকে আমাদের অনেকে যেমন বাবু-বাছাদের খেলা মনে ক'রে।

গল্প করতেন না। এমনি স্বল্পভাষী কাজের লোক ছিলেন, চাণক্যের মতোই। বলতেন—'থাক সেসব কথা, তোরা বানু মেরে গেছিস, শুনলে ভির্মি খাবি।'

ক্লাবঘরে সবাই বসে ফীল্ড সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে, মৈনুল হক ফটোর ব্যবস্থা ক'রে এসে উপস্থিত হতে আলোচনার মোড়টা ঐদিকে ঘুরে গেল। ক্যাপটেন অনিল বলল, এবার গ্রুপের মাঝখানে থাকবে কপিলদেও। সবাই সমর্থন ক'রে উঠেছে হৈহৈ করে, কয়েকটা হাততালিও পড়েছে উৎসাহের সঙ্গে, কপিলদেও এসে উপস্থিত হোল। একটু মন্থরগতিতে, যেন কতকটা মনমরা। অনিলই বলল—'কপিলদেও, এবার আমরা ঠিক করলাম ফটোতে তোর সীট থাকবে মাঝখানে, টীমের যেভাবে এবার মুখোজ্জ্বল করেছিস।'

কপিলদেও মুখ আরও অন্ধকার করে নিয়ে আস্তে আস্তে একপাশে গিয়ে বসল।

অনিল প্রশ্ন করল—'কী হোল?'

কপিলদেও হাতজোড় ক'রে বলে উঠল—'মাফ করবেন ক্যাপটেন সাহেব, কপিলদেওকে ফটো থেকে বাদই দেবেন। ফটো থেকেও, আর ফীল্ড থেকেও।'

'কী হোল আবার!'—কয়েকজনই বিস্মিতভাবে প্রশ্ন ক'রে উঠল।

হীরেন বলল—'ওর ল্যাজ মোটা হয়েছে।'

হীরেন টীমের দ্বিতীয় গোলকীপার। একটু ঈর্ষার দৃষ্টিতেই দেখত কপিলদেওকে।

কপিলদেও ওর দিকে একবার আড় চোখে দেখে নিয়ে অনিলকে বলল—'তোমাদের সবার মুখোজ্জ্বল হয়েছে কিনা তোমরাই জান, তবে অভাগা কপিলদেও মুখে চুনকালি মেখে বেড়াচ্ছে। আজও ইলেভেন হিরোজের মহাবীর ঝা ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে—সবাই বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছিস, সেওয়ান থেকে কাপটা তুলে নিয়ে আসতিস তাহলে বোঝা যেত, হ্যাঁ বুক ফোলাবার মতন কাজ করেছে একটা।'

সবাই একেবারে চুপ করে গেছে, সেক্রেটারি ধীরু ব্যানার্জি এসে উপস্থিত হলেন। থমকে দাঁড়িয়ে সবার মুখের ওপর

চোখ বুলিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করলেন—ব্যাপার কি? একেবারে নিশ্চুপ যে? ...টীমের, ফটোর ব্যবস্থা করে এসেছ?'

অনিল বলল—তা তো এসেছে, ক্লাবের মাংস-দই-মিষ্টির কমপ্লাস দেওয়া হয়ে গেছে। এখন কপিলদেও বলছে, সে ফটোও তোলাবে না, ফাংশনেও থাকবে না। এদিকে আমরা ঠিক করেছি টীমের ফটোর ওরই মাঝখানে সীট থাকবে।'

'বেশ ভালো কথা তো। তা, থাকবে না কেন? কি কপিলদেও?'

অনিলই বলল, 'সেওয়ান কাপে আপনারা এনট্রি নেননি। এ-সবের কোন মূল্যই নেই। ওকে ইস্টেডন্ হিরোজ-এর মহাবীর ঝা নাকি ঠাট্টা করে বলেছে।'

ধীরুবাবুও হঠাৎ একটু চুপ করে গেলেন, একটু যেন চিন্তিতভাবেই। তখনি সামলে নিয়ে বেশ সহজ গলায় বললেন—তা নেওয়া যাবে সামনের বছর। এবার তো কমপিটিশন সব শেষ হয়ে গেছে। ফুটবল সিজনও কাবার হয়ে এল। ...এর জন্যে তুমি মনমরা হয়ে রয়েছ কেন, কপিলদেও? মহাবীরকে জিজ্ঞেস করলে না কেন, তিনটে কমপিটিশনে নাম দিয়েছিল এগারোজন বাছা বাছা হীরো মিলে, তা কটাতে কতদূর পর্যন্ত উঠতে পেরেছে? বলবে—আসছে বছর আসুক, অত হাঁকডাকের সেওয়ান' কাপও..."

এখনও কমপিটিশন শুরু হয়নি ওদের...কপিলদেও মুখ তুলে বলল।

'তার মানে?'—একটা যেন ধাক্কা খেয়ে ধীরুবাবু চেয়ে রইলেন ওর দিকে।

কপিলদেও বলল— 'ওদের প্রেসিডেন্ট মারা যেতে ঠিকই হয়েছিল, কমপিটিশন হবে না, সোবার মত বদলেছে। হিরোজ ক্লাবের সেক্রেটারির কাছে নোটিশ এসেছে।'

'বেশ তো।'—একটা যেন কূল পেলেন ধীরুবাবু, বললেন—'আমাদের যখন ডাকেনি—একটা ক্লাব বলেই গণ্য করে না, তখন সেধে যাওয়াটা কি ঠিক হবে? তুমিই বলো না।...তোমরাও কি বল?'

সবার ওপর দিয়ে নজর ঘুরিয়ে আনলেন। দণ্গী চুপ করে বসেই ছিল, দাঁড়িয়ে উঠে বলল—'সংযুক্তার স্বয়ংবর-সভায় জয়চন্দ্র তো পৃথ্বীরাজকে নেমতন্ন করেননি স্যার।'

ওর চোহানী চোখ দুটো জ্বলে উঠেছে।

ধীরুবাবু বললেন—'বেশ, তোমাদের সবারই যদি তাই মত হয়তো আমি অমত করতে-যাব কেন? খেলবে তো তোমরাই।'—খুব বেশি যেন উৎসাহের সঙ্গে নয়। একটু ভেবে নিয়ে বললেন—'তবে, আমার কথা যদি শোন, ফীস্ট আর ফটো—এ দুটো হয়েই যাক, এতদূর যখন এগুনো গেছে! না হয়, দুটো ফীস্ট আর দুটো ফটোই হবে।'

'হ্যাঁ ঠিক!...সেই ঠিক!...দুটো ফীস্ট! দুটো ফটো!...' সবাই হৈ-হৈ করে সমর্থন করল। কয়েকটা তালিও পড়ল।

এদিকের মতো ওদিকেও দুদিক বজায় রইল। সেইদিনই বাড়ি ফিরে সেক্রেটারি সেওয়ান কম্পিটিশনের কাছ থেকে নোটিশের সঙ্গে বিশেষ অনুরোধ করে একটা চিঠি পেলেন।

ধীরুবাবুর এবং হয়তো টীমের মধ্যেও অনেকের অনিচ্ছার কারণ ছিল।

সেওয়ান জায়গাটা ছাপরা জেলার একেবারে শেষপ্রান্তে, উত্তর প্রদেশের কাছাকাছি একটা মাঝারি গোছের শহর তখন। এখানে একটা ফুটবল কম্পিটিশন চলত, ট্রফি একটা রুপোর কাপ। কিন্তু কেউ নাকি সেটা সেওয়ান থেকে নিয়ে আসতে পারেনি।

অনেক দূর, সেসব দিনে রেলের ব্যবস্থাও মোটেই সুবিধাজনক ছিল না, যার জন্যে, ছাপরার সঙ্গে খানিকটা যোগাযোগ থাকলেও, এদিকের আমাদের সেওয়ানের সঙ্গে আদৌ ছিল না বলা চলে। ফলে, ওদিকের কম্পিটিশন সম্বন্ধে একটা রহস্য দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। 'এবারেও সেওয়ান কাপ কেউ আনতে পারবে না।'—এই ধরনের একটা খবর এদিকে হালকাভাবে প্রতি বছরই ছড়িয়ে পড়ত; কিন্তু কেন, কি কারণে, নির্ধারণ করবার উপায় ছিল না। তার ফলে, এরূপ ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে, নানারকম আন্দাজ বাতাসে ভেসে বেড়িয়ে একটা আতঙ্কের আবহাওয়াই সৃষ্টি করে রাখত।

ছাপরাই উত্তর বিহারে সবচেয়ে শক্তিশালী জায়গা, ভোজপুরীদের আড্ডা; ওর ওদিকে সেওয়ানের লোকগুলো নাকি আরও জবরদস্ত। মার দেওয়ার জন্যে ছাপরার একটু বদনাম ছিল, সেসব দিনের হিসেবেও, তবে ওদের ছিল খেলার মাঠের মধ্যেই যা কিছু। সেওয়ানের মার নাকি মাঠের বাইরেও গড়িয়ে যেত, জনসাধারণের মধ্যে। অনির্দিষ্ট আতঙ্কের যা দোষ—এমনও গুজব দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, ওরা নাকি নানারকম তন্ত্রমন্ত্র জানে—আরও নানারকম সব জনশ্রুতি, বিভীষিকার মধ্যে যাদের জন্ম।

এসব সত্ত্বেও যাওয়াই ঠিক হয়ে নাম পাঠিয়ে দেওয়া হোল। কপিল দেওয়ের ঠাকুরদাদা তান্ত্রিক, বলল তাঁকে দিয়ে একটা অনুষ্ঠান না হয় করিয়ে নেবে।

একেবারে একপ্রান্তের খেলা বলে সেওয়ান কাপের কম্পিটিশনটা দুভাগে বিভক্ত ছিল। একভাগের খেলা শেষ করে একটা টীম এদিক থেকে উঠত ফাইনালে, একটা টীম ওদিক থেকে। ওদিক থেকে 'সেওয়ান স্টার্স'র একচেটিয়া ছিলই, এদিক থেকে আমাদের উঠতে বেগ পেতে হোল না। ফাইনাল খেলার দিন ভোরে গিয়ে আমরা নামলাম গাড়ি থেকে।

সেক্রেটারি ধীরুবাবু যে সব কম্পিটিশন খেলার ছেড়েছেন আমাদের সঙ্গে এমন নয়, তাঁর স্কুল রয়েছে। তবে এগাতে গেলেন। সমস্ত পথটা আমাদের নানাভাবে সতর্ক করতে করতে—যখন যেকথাটা ওঁর মনে উদয় হচ্ছে। সাহস দিচ্ছেন, আবার সাবধানও করছেন।

এতবড় একটা নাম-করা টীম গেছি, সেই প্রথমও, নামতেই স্টেশনে এক বিপুল অভ্যর্থনা। নেহাৎ ছোট একটা মহকুমা শহর তখন সেওয়ান, মনে হোল আধখানা শহর যেন উঠে এসেছে।

ধীরুবাবু আমায় একটু একান্তে পেয়ে বললেন—'শৈলেন সবাইকে বলে দিও, অতি-ভক্তি চোরের লক্ষণ! ভেতরে কোন কু-মতলব আছেই। সেক্রেটারি হিসাবে ওঁকে একটা মালা পরিয়েছে, কিন্তু মুখটা শুকিয়ে গেছে ওঁর।

এরপর একে একে আরম্ভ হয়ে গেল—

ফ্রেন্ডলী নয়, কম্পিটিশন ম্যাচ, সবার নিজের নিজের ব্যবস্থা, আমরা সেইমতো প্রস্তুতও, এখানকার ধর্মশালায় আগে লোক পাঠিয়ে জায়গা ঠিক করা হয়েছে, বাতিল হয়ে গেল। আমাদের জন্য আটটা বাছা বাছা এক্কা ঠিক করে রাখা হয়েছে, ওঁরা কোনমতেই শুনলেন না; নিজেরাই জিনিসপত্র উঠিয়ে এখানকার একজন রেইসের ভালো বাগান-বাড়িতে গিয়ে তুললেন। ওঁদের সৌজন্যের, শিষ্টাচারের কথায় উত্তর দিতে হচ্ছে, তবে লক্ষ্য করছি ওঁর মুখের হাসি ক্রমেই কাষ্ঠ হাসি হয়ে আসছে।

একবার ঘুরে ফিরে এসে আমায় আর অনিলকে একসঙ্গে পেয়ে বললেন—'খাবারের দোকান আর ভালো হোটেলের কথা জিজ্ঞেস করতে বললে—সেসব ব্যবস্থা ওদেরই, আমাদের কিছু চিন্তা করতে হবে না। কী এক দুশ্চিন্তায় ফেললে বলো দিকিন! মাথা গুলিয়ে দিচ্ছে! তোমরা খাবে?...ঐ দ্যাখো, এনে হাজির করছে! চাঙারী করে কচুরি-সিঙাড়া, পরাতে পরাতে করে মেঠাই, হালুয়া, ঐ আমাদের এই কুড়ি জনের জল-খাবার! কী করবে বলতো?'

চাকর আর একস্ট্রা প্লেয়ার নিয়ে আমরা জনকুড়ি যাই।

বললাম—'ছাপরা সেওয়ানের জল স্যার, ওরা নিজের অন্দাজে এনেছে। আমাদের হিসেব করে খেলেই হোল।'

পাশে একটা হলঘর, বড় টেবিল পাতা, চারিদিকে চেয়ার। সাজিয়ে রাখছে, সবার স্নান হয়ে গেছে, একে একে গিয়ে বসল। ধীরুবাবু বললেন—সর্বনাশ করলে! আর কচুরী-সিঙারা যে সর্বনেশে জিনিস—সিঁধ দেওয়া অবধারিত জেনো। খাওয়ার এই ফার্স্ট রাউন্ডেই তোমাদের শেষ করবে। এখন বুঝেছি।...না, অত ভাবলে চলবে না, এখুনি শুরু করে দেবে, তারপরেই '

একটু মরীয়া হয়েই এগিয়ে গিয়ে বললেন—'না, না, তোমরা কচুরি-সিঙাড়া কেউ খেও না যেন!'

সবাই হাত তুলে নিয়ে চাইল ওঁর দিকে। ওদিক থেকে যিনি দেখাশোনা করছিলেন, চিন্তিত হয়ে প্রশ্ন করলেন—'কেন স্যার, কচুরি-সিঙাড়ায় কি হবে?'

হলে আরও কয়েকজন ভিড় করে রয়েছেন, চোখের ইশারা চলে না, ধীরুবাবু একটু থতমত খেয়ে গিয়ে আমতা-আমতা করে বললেন—'না, ইয়ে আর কিছু নয়—ভিজের জিনিস, অম্বল হয়ে যেতে পারে, তাই...'

এই সময়—'কি হোল? হাতবন্ধ যে সবার!' —বলতে বলতে একজন বাঙালী ভদ্রলোক এসে উপস্থিত হলেন। খুব মোটা-সোটা, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি তখনকার ফ্যাশান মতো, পরে শুনলাম ফৌজদারি মোকদ্দমায় এখানকার লিডিং প্লীডার, এবং কমিটির প্রেসিডেন্টও। সবাই একটু তটস্থও হয়ে গেছে উনি আসতে, যিনি তদারক করছিলেন, অনুযোগের স্বরে বললেন—'দেখুন না স্যার, উনি বলছেন—অম্বল হয়ে যাবে ঘিয়ের জিনিস খেলে।'

শরীর দুলিয়ে অট্টহাস্য করে উঠলেন ভদ্রলোক, তারই মধ্যে নিজের বুকের মাঝখানে ডানহাতের তর্জনীটা টিপে ধীরুবাবুর দিকে চেয়ে বললেন—'না, না, সেওয়ানের জলে অম্বল হয় না। বেশি বোঝাতে হবে না, এই লাসখানাই দেখুন না। সতেরো বছর আগে হুগলী জেলার হিংচে গ্রাম থেকে অম্বল পিলে, ন্যাবা—সব বোঝাই করে এনেছিলাম— হাঃ...হাঃ...হাঃ...না, তোমরা সব খাও।...বলে দিন আপনি।'

ধীরুবাবু হতাশ হয়ে বললেন—'তাহলে খাও। যখন বলছেন উনি।'

ওঁর দিকেই যেন একটু এ্যাপীলের দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন—'তাবলে এত? আপনি একটু দয়া করে যদি মানা করে দেন লোকটিকে...'

হাঃ হাঃ করে আবার সেই হাসি—

'খেয়ে উঠতে না উঠতে সব ভষ্ম হয়ে যাবে স্যার, আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন? দাঁড়িয়ে দেখুন না।'

দঙ্গী তার চারটে আগেই শেষ করে ফেলেছিল, বলল—'খুব খাস্তা চিজ, বেনারসের কচুরি গলির মতন।'

'বাঃ, এইতো বাহাদুর!'—উৎসাহ দিলেন ভদ্রলোক।

ওঁর নির্দেশে চেঙারিওলা আরও চারটে চাপিয়ে দিল।

ধীরুবাবু দঙ্গীর দিকে একটা তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি হেনে হতাশভাবে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

দঙ্গী অবশ্য আন্দাজ করে আগেই মুখ নামিয়ে নিয়েছিল।

এই অনুপাতেই দ্বিপ্রাহরিক আহারের ব্যবস্থা। পোলাও, মাছ, মাংস, ব্যাসন দিয়ে কয়েকরকম ভাজা, দই, মিষ্টি, কয়েকরকম আচার, বাঙালী-বেহারী প্রথায়।

উদ্দেশ্যটা যে খাইয়েই বেকার করে দেওয়া, তাঁর বাধা দেওয়াও যে চলবে না, এ বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হয়ে উনি আর উপস্থিত থাকলেন না। পেট ভার, পরে খাবেন বলে শুয়েই রইলেন।

বেশ ভালো করে খেয়ে-দেয়ে গাঢ় নিদ্রার পর আমরা উঠে যে যার ইউনিফর্ম পরে খেলার জন্যে প্রস্তুত হলাম।

ধীরুবাবুর নিদ্রা হয়নি। আমাদের অত তাজা দেখে যেন আরও হতভম্ব হয়ে গেছেন। তাঁর আন্দাজ এভাবে কখনও মিথ্যা হয় না। কিছু হোল না দেখে, আরও দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেছে, তাহলে ভেতরে কিছু নিশ্চয় হচ্ছেই, খেলার মাঠের জন্যে তোলা রয়েছে। একবার কতকটা যেন নিজের বিশ্বাস প্রতিপন্ন করবার জন্যে বললেন—'এত গাঢ় ঘুম! জেনে রেখো ও সিদ্ধি!'

দঙ্গী ইউনিফর্ম টেনে ফিট করে নিয়ে গা'টা ঝেড়ে নিয়ে বলল—'হলেও কেটে গেছে স্যার। এমনি করে খেলার মাঠেও ওদের চাল মাৎ করব। আশীর্বাদ করুন।'

পায়ের ধুলো নিল। আমরাও সবাই নিয়ে বিদায় হলাম। উনি মন্দ কণ্ঠে বললেন—'দ্যাখো তাহলে, আমার আশীর্বাদ তো রয়েছেই।'

কি দেখতে হবে সেই আশঙ্কায় নিজে গেলেন না সঙ্গে।

খেলার ইতিহাসটা সংক্ষিপ্ত। আজকালকার নিরিখে 'ফাউল' যা হোল তা তখনকার নিরিখে তেমন কিছু নয়; হয়তো একটু ছাপরেয়ে ধরন আছে এই পর্যন্তই। আমাদের একজনকে বসতে হোল খেলা ছেড়ে। তার বদলে দঙ্গী নিজের পজিশন ছেড়ে দুজনকে বসাল। রেফারি 'ফাউল' নিয়ে ঐ তিনটির মধ্যে মাত্র দুটির জন্য হুইসিল দিল।

আমাদের টীম খেলল খুবই ভালো। ওদের দলও শক্তিশালী; তা সত্ত্বেও আমাদের টীম প্রথমার্ধে দুটো গোল দিয়ে এগিয়ে রইল। কপিলদেও খেলল যেন যাদু দেখাচ্ছে। দর্শকরাও হাততালি দিল।

সব কিন্তু এই প্রথমার্ধ পর্যন্ত। দ্বিতীয়ার্ধের প্রথমাংশে কয়েকটা বেশ বাঁচাল, তারপর শেষের দিকে যে চারটি বল এসেছিল, চারটিই যেন ওর হাত গলে গোলে ঢুকে পড়ল। তার মধ্যে একটি স্কুলের একটা হেঁজিপেঁজি গোলকীপার অনায়াসে রুখে নিতে পারত।

মিনিট পনেরোর মধ্যেকার ব্যাপার। ঘাড় হেঁট করে সবাই মাঠ ছাড়লাম।

ফিরে এসে আমরা একরকম গা-ঢাকা দিয়েই বেরিয়েছি ক'দিন ধরে। একসঙ্গে নামিওনি সবাই, ছুতোনাতা করে পথেই অনেকে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ল। কপিলদেওর মামার বাড়ি মোতিহারীতে, সে সেখানেই চলে গেল।

শহরে একটা গুজব রটাবার চেষ্টা করল দঙ্গী প্রভৃতি কয়েকজন মিলে—বেনারসের কাছে—অলিতে-গলিতে কত তান্ত্রিক আর পিশাচসিদ্ধ প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে—কাউকে দিয়ে ওরা একজন নকল কপিলদেও দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল, নৈলে আসল কপিলদেওয়ের হাত দিয়ে সেসব বল পারেই না ফসকাতে।

আমাদের এদিকটা তান্ত্রিকেরই দেশ, হয়তো কিছু কিছু করল বিশ্বাস।

তারপর কপিলদেও এলে রহস্যটা পরিষ্কার হোল। তাও শুধু আমার কাছেই। আমিও এই আজ প্রকাশ করছি। এই করে করেই সেওয়ানের রহস্যটা নিশ্চয় চাপা থাকত।

চেপে ধরতে কপিলদেও দিব্যি দিয়ে বলল—'ভাই সে লজ্জার কথা কারুর কাছে বলবার নয়। তাই জিজ্ঞেস করলে আমিও বলেছি—শেষের দিকে মাথাটা কেমন যেন চক্কর খেতে লাগল, বল দেখলেই বেড়ে যায়। ওঁর সিদ্ধির আন্দাজটা ব্যর্থ হয়নি বলে ধীরুবাবু খুশীই হয়েছেন। আসল কথা কিন্তু অন্যরকম। দেখলিই তো, শহরের বাইরে চষা খেতের পাশে খেলার মাঠ। সেকেন্ড হাফে আমাদের পড়ল মাঠের দিকেই। দর্শকও কম। পাশেই ধানক্ষেত। একটু দূরে আখ।

বেশ খেলা চলছে। আমাদের টীম চেপেও ধরেছে, হাতে কাজ কম। গোলপোস্টের কাছের লোকগুলো গল্প টেনে আমার অন্যমনস্ক করবারও চেষ্টা করছে। ঠাট্টাবিদ্রূপও আছে, উত্তরও দিচ্ছি, এমন সময় দেখি আখ বোঝাই দুটো গাড়ি এসে গোলপোস্টের পেছনটিতে দাঁড়াল। খেলা দেখতেই এসেছে, ঠাট্টা চলছিল, জিতে রয়েছি, খেলাও ভালো হচ্ছে, আমি একজনের ঠাট্টার উত্তরেই বললাম—শুধু কাপ নয়, একগাছা করে আখও দিও, দেহাতী সওগাৎ হিসেবে নিয়ে যাব সবাই।'

জায়গাটা যে 'দেহাৎ' অর্থাৎ চাষাভুষোদের দেশ, তার ওপর জোর দিয়েই বললাম। ঠিক এই সময় আরও একটা গোল দিলাম আমরা। তাইতেই কথাটা আর আত্মসম্মানের চোটে চেপে রাখতে পারল না, নৈলে কী যে হোত ভাবলেও বুক কেঁপে ওঠে।

ঠাকুরদাদার কাছ থেকে অপরাজিতা কবচ শুদ্ধ করে নিয়ে টিকিতে বেঁধে রেখেছিলাম, 'পণ্ডিতজী—পণ্ডিতজী' বলেই কথা কইছিল আমার সঙ্গে, একজন বললে—'তাহলে শুনে রাখুন পণ্ডিতজী, সেওয়ান থেকে কাপ আজ পর্যন্ত কেউই যে নিয়ে যেতে পারেনি, তার অন্য মন্ত্রও আছে, আপনার মন্ত্র তার কাছে এঁটে উঠতে পারবে না। একটা কেন, আপনাদের কুড়িজনের প্রত্যেকের জন্যে দশ-গাছা করে আখ তোয়ের রয়েছে গাড়িতে। একটু সমঝে বুঝে খেলবেন!'

তারপরেই কী যে হোল ভাই!

ওদিকে তখন মরিয়া হয়ে খানিকটা চাপও দিয়েছে সেওয়ান, যে বলটি আসছে আর ফিরে যাচ্ছে না, হাত যেন অবশ হয়ে গেছে। একটা হতে আরও চাপ, তারপরে আরও, তারপরে আরও, কাণ্ড দেখে তোরাও খেঁকিয়ে দলে, আর ওদিকে বলাই যায় না, হুইসিল বেজে খেলা ওভার হতে হাড়ে বাতাস লাগল। দিব্যি রইল ভাই, কাউকে বলবিনি। সেক্রেটারি ধীরুবাবু ভাগ্যিস সিদ্ধির কথাটা চাপা করেছেন, কোনরকমে মান বাঁচিয়ে যাচ্ছি।'

বুঝে গেছি

আশাপূর্ণা দেবী

গাড়ির হর্ণ দেওয়াটা বাহুল্য, পঙ্কজের ফেরার সময়ের আগে থেকেই দুজনেই উৎকর্ণ হয়ে থাকে। ভৃত্য এবং গৃহিণী।

সুখলাল ছুটে এসে গ্যারেজের কোলাপসিবল গেটটা ঠেলে দুহাট করে দিয়ে সরে দাঁড়ালো, পঙ্কজ ধীরে সুস্থে গাড়িটা তুলে নেমে এসে বললো, 'গেটের খাঁজে খাঁজে একটু তেল দিস সুখলাল।'

সুখলাল সবিনয়ে বলল, 'কিছু তো গড়বড় হয়নি সাহেব।'

'হয়নি, হঠাৎ হতে পারে। মাঝে মাঝে একটু তেল দেওয়া ভালো।'

ভৃত্যের পক্ষে যেমন ছুটে আসা সম্ভব, গৃহিণীর পক্ষে তেমন নয়। ভৃত্যবর্গের কাছেই প্রেস্টিজ থাকে না। তবে ভিতরের চাঞ্চল্য দমন করাও শক্ত। রান্নার লোকটাকে নির্দেশ দিয়ে চপ ভাজাচ্ছিল ঝর্ণা, সাহেবের জন্যেই অবশ্য।

বিকেলে ফিরে চায়ের সঙ্গেই ভালমন্দ খেতে ইচ্ছে করে পঙ্কজের, রাত্রে সামান্যই খায়। অতএব এই সময়টাই ঝর্ণাকে আয়োজন করতে হয় ভালো, তৎপরও হতে হয়।

হর্ণের শব্দেই ঝর্ণার মুখটা আলো ঝলমলে হয়ে উঠলো, তবে গাম্ভীর্যটা বজায় রাখা দরকার। রান্নাকরা ছোকরাটা আবার বাঙালী, পঙ্কজের বিয়ের আগে থেকেই ছিল। সব বোঝে।

সাবধানে মুখের আলো চেপে ঝর্ণা বলে, 'আচ্ছা তুমি বাকি ক'টা ভেজে ফেল, সাহেব বোধহয় এসে গেলেন। এখনই না পরে খাবেন জিগ্যেস করে আসি।'

মনে মনে বলে, 'তুই যা বোঝবার বোঝ বাবা, তবে শ্যামের বাঁশী শুনে উন্মাদিনী রাইয়ের মতো ছুটে তো যেতে পারি না। অতএব অজুহাত।'

দরজার কাছে চলে এসেছিল, পঙ্কজ গ্যারেজের দিক থেকে ঘুরে দাঁড়াতেই মুখোমুখি হলো। পঙ্কজ একটা আলোর ছবি দেখতে পেলো।

মুখের দুপাশে হালকা ফুরফুরে খাটো চুলের থাক, মুখের রেখায় রেখায় আহ্লাদের আলপনা। যেন অনেকদিন ছেড়ে থাকার পর বরকে এইমাত্র দেখলো। চোখের চশমাটার ওপর পড়ন্ত বেলার রোদ এসে পড়ে দৃশ্যটা আরো ঝকঝকে করে তুলেছে।

ঝর্ণা পঙ্কজের শেষ কথাটা শুনতে পেয়েছিল।

ঝর্ণা চাপা হাসির সঙ্গে বললো 'কিসে মাঝে মাঝে তেল দেওয়া ভালো?'

পঙ্কজ গলা খাটো করে বললো, 'মেমসাহেবের পায়ে।'

'সেটা কী ভৃত্যের করণীয়?'

'প্রভু-ভৃত্য—উভয়েরই।'

'তোমার অধস্তনেরা ভাগ্যিস শুনতে পাচ্ছে না। তারা নিশ্চয় সাহেবের পায়ের জন্যে তেলের শিশি পকেটে করে অফিসে আসে।...নাকি শিশিতে কুলোয় না?'

'ঘটনাটা একদিন প্রত্যক্ষ দেখে এলে পারো।'

'নাঃ বাবা! নিশ্চিন্ততা ঘুচে যাবে আমার।' ঝর্ণা কানের ঝাড়-ইয়ারিং দুলিয়ে মুখের রেখায় একটি মধুর কৌতুকের অভিব্যক্তি ফুটিয়ে বলে, 'অহিমা-টাহিমা প্রত্যক্ষ দেখলে ভয় ধরবে। এ বাবা খাসা আছি।'

'তোমার খাসা থাকা মারে কে?'

পঙ্কজ হেসে উঠে বলে, 'তুমি তো সকালবেলাই রাতদিন আহ্লাদের সমুদ্রে ভাসছো—'

'অকারণে?'

ঝর্ণা ভুরু বাঁকিয়ে তাকায়।

'আমি তো কারণটা খুব জোরালো দেখি না।'

ঝর্ণা বলে ওঠে, 'দেখাবো মজা।' আর সঙ্গে সঙ্গেই বলে ওঠে, 'জানো আজ কী দারুণ মজা হয়েছে!'

এটা অবশ্য ঝর্ণার মুখে নতুন নয়। অতএব পুষ্কর সেই দারুণ মজাটায় গুরুত্ব দেয় না। 'দারুণ মজা'টা ঝর্ণার মুদ্রাদোষ। সবকিছুতেই ওর দারুণ মজা।

চিরকাল কলকাতার মেয়ে, অবস্থাও এমন ছিল না বাপের যে এখান-ওখান হাওয়া বদলে বেড়িয়েছে, বিয়ে হয়ে বরের কাছে বেহারের এই মফঃস্বল শহরটায় এসে আর অগাধ সুখ এবং অবাধ স্বাধীনতা পেয়ে সবকিছুতেই মজার উপকরণ পাচ্ছে ঝর্ণা।

এখানে যে ইঁদারা থেকে জল তোলার কপিকলটায় বিচিত্র একটা শব্দ ওঠে, সেটা ঝর্ণার কাছে মজার, ওদের বাসন মাজা দাইয়ের যে একজোড়া যমজ ছেলে আছে, যাদের পাশাপাশি বসিয়েও চেনা যায় না, সেটা মজার, একটা আতা আর পেয়ারা বেচতে আসা বুড়ি, জরিদার ঘাগরা পরে, সেটা তো মজারই। আর একদিন বুড়ি দুপুর রোদে তার ফলের ডালার ওপর কাৎ হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, আর একটা আতা গলে গিয়ে বুড়ির নাকে-মুখে লেগে গিয়েছিল সেটা একটা দারুণ মজার।

আর ওদের বাগানে যে মাঝে মাঝে একজোড়া নীলরঙা পাখি এসে বসে সরু শিস দেয়, সে মজার তো তুলনা নেই।

ঝর্ণা সবকিছুতেই হেসে কুটি কুটি হবার উপাদান পেয়ে যায়।

ঝর্ণার পৃথিবীতে শুধু আহ্লাদ আছে, আলো আছে, আর মজা আছে।

ততক্ষণে ঘরে চলে এসেছে ওরা।

পুষ্কর পোশাক-পরিচ্ছদ বদল করতে করতে বলে, 'কোনো চিঠিপত্র এসেছে?'

'এসেছে বাবা, এসেছে। কতকগুলো বাজেবাজে চিঠি এসেছে। পোড়ো পরে।'

ঝর্ণা রাগ দেখায়, 'বলতে গেলাম মজার কথা, তার মাঝখানে, 'চিঠিপত্র এসেছে!' বেরসিক কোথাকার!'

পুষ্কর আরাম করে বসে পড়ে বলে, 'মজাটা তো জানি।'

'জানো? ওমা তুমি আবার কখন জানলে? কী জানো শুনি?'

'তোমার উঠোনে একটা ছোট্ট ছাগলছানা ঢুকে পড়েছিল।'

'এ মা, এ আবার কী। মোটেই ঢোকেনি। আর যদি ঢুকেই থাকে, সেটা মজার কী হল?'

'হল না? আমি তো ভাবছি সেটা দারুণ মজার ব্যাপার।'

'আচ্ছা ঠাট্টা হচ্ছে তো! দেখো আজ কীরকম জোরালো মজার ঘটনা শোনাই।'

পুষ্কর চিন্তার ভঙ্গীতে বলে, 'তবে বোধহয় রেখামাসীমা কোনো নতুন রান্নার নমুনা দিয়ে গেছেন?'

এটা অবশ্য মজারই।

কারণ, রেখামাসীমা—ওই 'নতুন রান্না'র জন্যে পাড়ায় বিখ্যাত। গলা দিয়ে নামানো শক্ত, অথচ ভূয়সী প্রশংসার দাবি করেন। কিন্তু সেটাও তো নতুন নয়।

ঝর্ণা মাথা নেড়ে বলে, 'ধারেকাছেও যেতে পারলে না।'

'তবে হার মানছি। বল শুনি।'

ঝর্ণার মুখে চাপা হাসির ঝলক।

ঝর্ণার পরনের জাপানী নাইলন শাড়ির আঁচলটা হাওয়ায় ঢেউ খাচ্ছে।

ঝর্ণাকে অপরূপ দেখাচ্ছে।

পুষ্করের মনে হয় ঝর্ণার রূপটা কি দিন দিন বাড়ছে।

ঝর্ণা সেই অপরূপ মুখে বিদ্যুৎ খেলিয়ে বলে, 'না এখন বলতে বসবো না দেরী হয়ে যাবে তোমার। আগে হাতমুখ ধুয়ে এসো, খেতে খেতে শুনো।'

'মজা'র কথায় অপেক্ষা অচল।'

'আহা রে! তা আর নয়। তুমি আমার কথায় যতই যেন কান দাও। আসল কথা উঠতে আলিস্যি—'

'আসল কথাটা যত ধরে ফেলতে পারো তো তুমি। ভাবনা ধরে যাচ্ছে।'

'ইস, আমার কথায় সাহেবের ভাবনা!'

বলেই ঝর্ণা 'অপেক্ষা'র প্রশ্ন ভুলে উচ্ছলে-ওঠা গলায় বলে ওঠে, 'আচ্ছা হ্যাঁ গো, তোমাদের অফিসে আজ একটা ইণ্টারভ্যু ডেকেছিলে?'

পঙ্কজ অবাক হলো, 'কে বললো?'

'ওই তো ওইখানেই তো মজা! কেউ বললো না, অথচ জেনে ফেললাম!'

'নিশীথ এসেছিল বুঝি?'

'মোটেই না।'

'বরেন?'

'না হে, না।'

'তবে রহস্যজাল নিজেই ভেদ করো।'

ঝর্ণা বরের ছাড়া জামাজোড়া গুছিয়ে তুলে রাখতে রাখতে বলে, 'যদি বলি হাত গুনেছি।'

'তবে তাই।'

'এ মা, তুমি রেগে যাচ্ছো নাকি?' ঝর্ণা তেমনি চোখ ভুরু কাঁপিয়ে বলে, 'দুপুরে ইণ্টারভ্যুর ঝামেলা মিটে যাবার পর জনৈক প্রার্থী নিজে এসে আমায় জানিয়ে গেল, বুঝলেন সাহেব?'

'তার মানে?' পঙ্কজ সোজা হয়ে বসে বলে, 'এখানে এসেছিল? তোমার কাছে কে এসেছিল?'

'বলবো কেন? এলো, বসলো, পাখার হাওয়া খেলো, চা খেলো, মিহিদানা খেলো, তোমার ভাগ থেকে মাংসের ঘুগনি খেলো—'

পঙ্কজ বুঝলো চেনাজানা কেউ। বোধ করি সন্ধান নিয়েই এসেছে ঘটক সাহেবের কোয়ার্টারটি কোথায়, সেখানে গিয়ে খোদ মিসেসকে ধরাধরি করে চাকরিটা পাবার সুরাহা করে নেবে।...এই ধরনের মনোবৃত্তি আদৌ পছন্দ করে না পঙ্কজ, বলতে কি দু' চক্ষের বিষ দেখে। তবে মনে হচ্ছে ঝর্ণার বাপের বাড়ির দিকের কেউ, অতএব বিরক্তি চেপে ঠাট্টার সুরে বলে, 'যে রকম 'খাওয়ার' ফিরিস্তি চালিয়ে যাচ্ছো, ভাবনা ধরে যাচ্ছে—'

'ভাবনা? ভাবনাটা কিসের?'

'ভাবছি আমার মাথাটাও খেয়ে গেল কিনা!'

'দেখ ভালো হবে না বলছি!'

'ভালো তো নয়ই। মাথা খাওয়া গেলে আর ভালোর কী রইল?'

'ঠিক আছে, আমি আর কিছু বলবো না। এমন অসভ্য!'

'না বললেও বুঝতে পারছি। কেউ একটু চেনা-জানার সুযোগ নিয়ে ধরাধরি করতে এসেছিল।'

ঝর্ণা প্রতিজ্ঞা ভুলে ফস্ করে বলে ওঠে, 'মোটেই নয়। মুকুল সেরকম আত্ম-সম্মান জ্ঞানহীন ছেলে নয়।'

'মুকুল? মুকুল বোস?'

'হুঁ।'

'রোগা লম্বা? ফর্সা? মাথার মাঝখানে টাক?'

—'একেবারে টাক বলে দিচ্ছো? আহা বেচারা! মাঝখানের চুলটা একটু পাতলা হয়ে এসেছে। কলেজে পড়ার সময়ই হয়েছিল। কী আক্ষেপ ছিল সে জন্য।'

'ওঃ, তোমার সহপাঠী?'

'যাক, বুঝলে তাহলে?'

পঙ্কজ আবার পিঠ এলিয়ে বসে বলে, 'তা ধরাধরি না করলেও কাজটা ঠিকই গুছিয়ে গেছে। জানে মেমসাহেবের সহপাঠী শুনলেই সাহেব—'

'নাঃ, তোমাদের এই কেল্ট-বিল্টুদের কেবল কুটিল চিন্তা! এমনি শুধু শুধু বিনা মতলবে কেউ কোথাও আসতে পারে না?'

পঙ্কজ এবার মৃদু হেসে বলে, '.একেবারে বিনা মতলবে? নাঃ, বিশ্বাস হয় না। নিদেন অন্ততঃ পুরনো প্রেম ঝালাতে এসেছিল।'

'এই দ্যাখো যা তা বলবে না বলছি।' বলেই হেসে ফেলে বলে ওঠে ঝর্ণা, 'তা যা বলেছো মিথ্যেও নয়। ঝালাতে না হলেও হা-হুতাশ করতে আসতে পারো। খুব আবোল তাবোল বকে গেল খানিক।'...

আর তারপর খানিকটা খিলখিলিয়ে হেসে বলে, 'আমার জন্যেই না-কি তার জীবন মরুভূমি হয়ে গেছে, আমার বিরহেই বিয়ে-টিয়ে না করে দার্শনিক হয়ে গেছে। ইহ-জীবনে না-কি আমার মতো মেয়ে আর দেখলো না—'

পঙ্কজের মুখের রেখায় যে পরিবর্তন এসে যাচ্ছে সে খেয়াল করে না ঝর্ণা, ও ঝর্ণার বেগেই বলে চলে, 'শুনে হাসিও পাচ্ছিল, আবার সত্যি বলতে একটু মায়াও হচ্ছিল, ব্যস্ আমিও মজা পেয়ে দিব্যি চালাতে শুরু করে দিলাম।'

পঙ্কজ আর একবার শক্ত হয়ে বসে, 'কী শুরু করে দিলে?'

'অভিনয়!'. ঝর্ণা অবলীলায় বলে, 'দস্তুরমত ব্যর্থ প্রেমের অভিনয়। যেন আমারও জীবন হাহাকারের মরুভূমি, আমিও মুকুল বোসের ছবি হৃদয়ে গেঁথে বসে আছি। এই যে বাড়ি, গাড়ি, টাকাকড়ি, অফিসার-বর, সবই আমার কাছে এই বাহ্য। খাঁচার পাখির মত রাতদিন ডানা ঝট-পটাচ্ছি আমি—'

ঝর্ণা হেসে গড়িয়ে পড়ে। তারপর সামলে নিয়ে বলে, 'এমন একখানা মুখ করে বলেছি না, ও ঠিক বাসায় ফিরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকবে।'

পঙ্কজ কেমন একরকম বিকৃত গলায় বলে, 'সত্যি-মিথ্যে ধরবার বুদ্ধি হল না এম এস-সি পাশ লোকটার?'

'রাখো তোমার এম এস-সি' ঝর্ণা চোখের পাতা কাঁপিয়ে বলে, একেবারে তো বিচলিত বিগলিত বিষাদিত, বিহ্বলিত, এইরে—ব্যাকরণ ভুল হয়ে যাচ্ছে। তা যাক, তুমি ঠিকই বুঝে নেবে। নেবে না? কিন্তু শুনতে শুনতে বুদ্ধটা কী বলে বসলো আন্দাজ কর দিকিন?'

পঙ্কজের গলা বোদা বিস্বাদ, 'কী করে আন্দাজ করবো?'

'তা সত্যি।' ঝর্ণা বলসায়, 'আন্দাজ করা শক্ত। বলে কিনা...হি হি হি...বলে কিনা, 'তাহলে এই মিথ্যে জীবনের বোঝা বয়ে কী লাভ ঝর্ণা? চলো আমরা কোথাও চলে যাই।'...আমি মা দারুণ উৎসাহ দেখিয়ে বললাম, 'তাই চলো মুকুল। দূরে অনেক দূরে। কর্তা বাড়ি ফেরবার আগেই কেটে পড়ি।...তারপর বুঝলে, মুখটা খুব নিরীহ করে বললাম, 'কিন্তু তোমার চাকরীটা? যদি আজকের পরীক্ষায় উৎরে যাও? কোম্পানী তো তখন তোমায় খুঁজে বেড়াবে, অথচ পাবে না?...' আহা বেচারা! মাথাটা নীচু করে বললো, 'গরীবের ভালবাসাও অপরাধ ঝর্ণা!' তার মানে সবার উপরে চাকরি সত্য। হি-হি!'

পঙ্কজ তিক্ত ব্যঙ্গের গলায় বলে, 'যাক্ দুপুরটা তাহলে তোমার বেশ মজায় কেটেছে?'

ঝর্ণা তৎক্ষণাৎ বলে, 'তা আর বলতে? তবে একটু একটু মায়াও হচ্ছিল না তা নয়। আহা অবোধ অজ্ঞান বেচারী! দিব্যি বিশ্বাস করছে ওর অভাবে আমার জীবন বৃথা হয়ে গেছে। বেশ বিদীর্ণ বিদীর্ণ আর বিষণ্ণ বিষণ্ণ গলায় কথা বলছিলাম তো? আমার এই খাঁচার পাখির জীবনের দুঃখ বেদনায় অনেক সান্ত্বনা আর সহানুভূতির মলম লাগিয়ে গেল। আর আশ্বাস দিয়ে গেল যদি এখানে চাকরিটা হয়ে যায়, তাহলে মাঝে মাঝে অন্ততঃ দেখা হবে। অতএব আমার এবং ওর উভয়েরই হৃদরোগের ওষুধ পড়বে।'

ঝর্ণা হেসে কুটি কুটি হয়, 'পরম আনন্দ আর গভীর বেদনা, এই দুই বোঝা বুকে নিয়ে প্রায় ঘসটাতে ঘসটাতে চলে গেল।'

'গভীর বেদনাটা তো বুঝলাম। আরো কিছু বুঝলাম, কিন্তু 'পরম আনন্দ'টা কিসের?'

পঙ্কজ তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠলো।

কিন্তু মজার মজে থাকা ঝর্ণার অনুভূতিতে ওটা ধরা পড়লো না। ঝর্ণা তেমনি কলকল ধ্বনিতে বলে উঠলো, 'বাঃ আনন্দটা কিসের ধরতে পারলে না?' তার মত হতভাগ্যের জন্যে আমার মত এমন এক খানা সুন্দরী বিদুষী 'আহামরি' মেয়ের জীবন বৃথা হয়ে গেছে, এ খবরটা জানতে পারা কি কম আনন্দের? পরম আনন্দের। জানো না তো কী নিধিটি পেয়ে গেছো তুমি। প্রথমে তাই বলছিল—তোমার কথা তুলে আর কি, 'ভাগ্য যাকে দেয়, তাকে দু-হাত ভরে দেয়। ঘটক সাহেবের ভাগ্য বটে একখানা। পুরুষের জীবনের যা কিছু কাম্য তা পেয়েছেন, তার ওপর তোমাকে পাওয়া—' তখনই তো মজা পেয়ে মুখটা একেবারে করুণ করুণ করে ছলছল চোখে বললাম, 'বিয়ে করে ঘরে এনে ফেলাটাই যদি পাওয়া হয়, তা'হলে অবিশ্যি পেয়েছে।' কিন্তু সেটাই কি পাওয়া?' একেবারে গল্প উপন্যাসের নায়িকার মতন কথা হয়নি গো?...ও তাই বিশ্বাস করলো। এমন বুদ্ধু সত্যি! কী করে যে অফিসে কাজ করবে!'

পঙ্কজ নির্নিমেষ চোখে ঝর্ণার ওই হাসিতে ভেঙে পড়া মূর্তির দিকে তাকিয়ে দেখছে। এ মূর্তি তার কাছে নতুন নয়!

তুচ্ছ মজাতেই এমনি হাসি হাসতে পারে ঝর্ণা। হাসেও।...একবার এখানেরই এক প্রতিবেশী কবিমার্কা ভদ্রলোকের ঝর্ণার প্রতি উৎসাহের প্রাবল্য দেখে লোকটাকে কী নাজেহালই করেছিল ঝর্ণা। নিজের দু'বার চা খাওয়া হয়ে গেলেও ভদ্রলোক যেই আসতেন, ঝর্ণা দিব্যি অভিমান অভিমান গলায় বলে উঠতো, 'আপনি এতোক্ষণে এলেন? আমি চা না খেয়ে বসে রয়েছি আপনার সঙ্গে খাবো বলে।'

বলাই বাহুল্য ভদ্রলোকের চোখে-মুখে আবেগ আর আহ্লাদে উথলে উঠতো, কাব্য কথার বান ডাকতো। ঝর্ণাও চালিয়ে যেতো তার সঙ্গে।

তখন তো পুষ্কর এই মজা উপভোগের অংশীদার ছিল। যদিও বলতো, 'আহা লোকটাকে এমন করে শরাঘাত কোরো না, শেষে বাসায় গিয়ে মরে থাকবে? খুনের পাপে পাপী হবে তুমি।'

ঝর্ণা হেসে গড়াতো, 'তা কী করবো? বোকাদের দেখলে আমি না ক্ষেপিয়ে পারি না।' কলেজে এইজন্যে অন্য মেয়েরা আমায় দেখতে পারতো না। একজনের প্রেমিককে আমার প্রেমিক করে নিতে এক ঘণ্টা সময়ও লাগতো না আমার। সত্যি ছেলেগুলো এতো বুদ্ধু হয়। রূপ দেখলো কি গলে গেল।'

তখন কিন্তু পুষ্কর বিরূপ মন্তব্য করতো না, বড়জোর বলতো, 'রূপের অহংকারে মাটিতে পা পড়ছে না যে?'

কিন্তু এখন যখন ঝর্ণা বললো, 'কিন্তু মুকুলটা যে এমন বুদ্ধু বনে যাবে, তা জানতাম না—'

তখন পুষ্কর তেতো গলায় বলে উঠলো, 'নিজে বুদ্ধু কি তোমায় বুদ্ধু বানিয়ে গেল, তাই বা কে বলতে পারে? তদন্ত করতে পারলে হয়তো দেখতে পেতে, তিনিও গিন্নীর কাছে বাহাদুরী করছেন, 'চাকরির সিওর! ভাবী 'বস'-গিন্নীর সঙ্গে ব্যর্থ প্রেমের অভিনয় করে এমন ভিজিয়ে এসেছি, ও আর দেখতে হবে না।'

'গিন্নী! ধ্যেৎ! বললাম না সে বিয়েই করেনি!'

সেটা তো তোমার কাছে বলেছে। চাকরি পাবার আশায় লোকে দিনকে রাত, রাতকে দিন করতে পারে। জ্যান্ত বাপকে মরিয়ে দিতেই দেখলাম কত।'

'এ-মা! তার মানে? কেন?'

'কেন বুঝতে পারছো না? বাপ নেই মাথার ওপর বিরাট সংসার, অতএব চাকরিটা না পেলেই নয়—'

'ওঃ! তা ওসব ব্যাপারে যে যতই চৌকস হোক, প্রেম প্রেমের ব্যাপারে পুরুষরা একেবারে বোকা বনে যান!'

ঝর্ণা বিজয়িনীর হাসি হেসে বলে, 'সত্যি আমি তো ভেবেই পাই না, ছেলে-গুলো কেন এত বোকা হয়। ছেলে, মানে ছোটো-বড়ো সব। পুরুষ জাতটাই এ ব্যাপারে এমন দুর্বলতা—'

পুষ্কর তীক্ষ্ণ গলায় বলে,—'ওটা বোধহয় সৃষ্টিকর্তারই কারসাজি। তোমাদের মেয়ে-দের ছলা-কলার আর অভিনয়-নৈপুণ্যের জন্যে একটা স্টেজ দরকার তো? নির্বোধ পুরুষ জাতটাই তোমাদের সেই স্টেজের জোগানদার।'

ঝর্ণার হঠাৎ মনে হয় কোথায় যেন একটা বেসুরো বাজছে। পুষ্কর কি এর আগে অধস্তনের এরকম ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়াটায় চটে গেছে?

—মুকুল আস যে চাকরির ধরাধরি করতে আসেনি, একথা তো পুষ্কর আদৌ বিশ্বাস করছে না। তাহলে আর কী করে বিশ্বাস করাবে ওকে মুকুল এখানে 'ইন্টারভ্যু' দিতে আসছে শুনে ঝর্ণার দাদাই নিজে থেকে ঠিকানা দিয়ে বলেছিল, 'আরে তোমার এক-জামিনার মিঃ চ্যাটার্জী তো ঝর্ণার বর। যাও যদি তো দেখে এসো একবার ঝর্ণা টিনের কারখানার গিন্নী হয়ে কেমন কাটাচ্ছে। তার ভাগ্যে আখের রসটা জুটেছে, না ছিবড়েটা।'

সবই তো একে একে বলবে ভেবেছিল।

কিন্তু পুষ্কর যেন গোড়া থেকেই অন্য-মনস্ক।

না। কি রেগেই গেছে সত্যি?

ঝর্ণা বরের মুখের দিকে পুরো চোখে তাকায়। কী দেখে কে জানে, বলে ওঠে, 'এ-মা পুরুষ জাতটাকে বোকা বলেছি বলে, তুমি চটে যাচ্ছো না-কী? মুখটা হঠাৎ অমন কয়লা-কয়লা হয়ে গেল কেন?'

পুষ্কর একটু কটু হাসি হেসে বলে, 'তা' জাত তুললে কে না চটে? তবে ওহে বুদ্ধিমতী ঝর্ণা দেবী, পুরুষ জাতের কিছু কিছু নমুনা হয়তো তোমার দেখা আছে, তবু—ওই 'কিছু' নমুনার ওপর নির্ভর করে পুরো জাতটা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকা সেফ নয়। সবাইকেই কিছু আর বোকা বানানো যায় না, আর কাউকেই চিরদিন বোকা বানিয়ে রাখা যায় না, বুঝেছো?'

ঝর্ণা চকিত হয়ে তাকায়।

বলে, 'কী বললে?'

'যা বলেছি সেটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে?'

ঝর্ণার সেই সর্বদা মজায় উথলে ওঠা আলো-আলো মুখটা মুহূর্তে অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে যায়। ঝর্ণা স্তব্ধ হয়ে যায়।

ওদের খেয়াল নেই সন্ধ্যা হয়ে গেছে, ঘরে এখনো আলো জ্বালা হয়নি। কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকার কী ঝর্ণার গলার স্বরেও ছায়া ফেললো?

তাই ঝর্ণা ছায়া-ছায়া গলায় বললো, 'হঠাৎ বুঝতে একটু অসুবিধে হচ্ছিল। আর হবে না। আর হবেও না কখনো বুঝে গেছি তো। আচ্ছা ঠিক আছে, আর নিশ্চিন্ত থাকবো না।'

'হ্যাঁ স্বামী, নামে মাত্র স্বামী, নিকৃষ্টতম স্বামী—আমি তাকে খুন করেছি, মেরে ফেলেছি তাকে !'...উত্তেজিত হয়ে পুলিসের কাছে বলতে বলতে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন মিসেস আলি বে।

'যত নিকৃষ্টই হোক, অপরাধী হোক, স্বামীকে 'কেউ কখনো খুন করে ?' মিসেস বোস স্বামীর কথা শুনে বললেন।

স্ত্রীর কথার উত্তরে ডাঃ বোস বললেন, 'করে, অবস্থার বিপাকে, উত্তেজনার বশে, নিজেকে বাঁচাবার জন্যে।'

'আমাদের দেশে এ ঘটনা কদাচিৎ ঘটে কিনা সন্দেহ।'

'ঘটে। আমাদের দেশের মেয়েরাও আজ আর আগেকার দিনের মত মুখ বুজে পতির নির্যাতন সহ্য করে না। একটু এদিক-ওদিক হলে তারাও আজ স্বামীকে 'স্পেয়ার' করে না, প্রাণে না মারুক হাতে মারে, তালাক দেয়। আইনে আজ তাদের নিরাপত্তা ও দাবি সংরক্ষণের অনেক ব্যবস্থা আছে।'

'সে তো ওদেশেও আছে, তবু ওখানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এত অসামাজিক ও নৃশংস ঘটনা ঘটে কেন ?'

'ঘটে নানা কারণে। ওদেশের মেয়েরা আমাদের দেশের মেয়ের চেয়ে যেমন কম অসহিষ্ণু, তেমনি পুরুষরাও আবার আমাদের দেশের পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি অত্যাচারী। সে জন্যে সময় সময় স্ত্রীরাও তার প্রতিশোধ নেয়। যেমন ঘটেছিল মার্গারিত এলিবার্থ-এর জীবনে। এই মার্গারিত এলিবার্থই পরবর্তী জীবনে প্রিন্স আলি বে'কে বিবাহ করে হয়েছিলেন মাদমোআজেল আলি বে—যার গল্প তোমাকে বলছি।' বললেন ডাঃ বোস।

'কিন্তু এ ব্যাপারে সেই মার্গারিত বেচারাকে ঠিক দোষ দেওয়া যায় না। তিনি ভালবেসেছিলেন, শুধু ভালবেসেছিলেনই নয়, পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন, তাঁর চেয়ে দশ বছরের ছোট প্রিন্স আলি কামাল বে নামক মিশরের এক ধনীর সন্তানকে। নিজের ধর্মও পরিত্যাগ করেছিলেন, তার সঙ্গে সারা জীবন পরম আনন্দে স্বামী-স্ত্রীর মত কাটাবেন বলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘটনাচক্রে সেই স্বামীকেই হত্যা করতে হয়েছিল মার্গারিতকে। অবশ্য হত্যা সে করেছিল নিদারুণ উত্তেজনার মাথায়।'

এরপর ডাঃ বোস টানা বলে যেতে লাগলেন আনুপূর্বিক সমূহ কাহিনী।

'আগে একবার বিবাহ হয়েছিল মার্গারিত-এর এবং প্রথম বিবাহ-বিচ্ছেদের পরই ১৯২২ সালে তিনি প্রিন্স আলির সঙ্গে প্রেমের গভীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁদের ভালবাসা এমনই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল যে, কেউ কারুকে তারা মুহূর্তের জন্যেও ছেড়ে থাকতে পারতেন না। প্যারিসের ইজিপসিয়ান লিগেসন-এ সুদর্শন তরুণ প্রিন্স আলি কাজ করতেন। তাঁর পুরো নাম প্রিন্স আলি কামাল বে ফামাই। অনেকে তাঁকে অতীতের ফিল্ম-জগতের বিখ্যাত সুপুরুষ রুডলফ ভ্যালেন-টিনোর সঙ্গে তুলনা করত। তিনি যেমন ছিলেন ধনীর সন্তান, তেমনি ছিল তাঁর দুই চোখে স্বপ্নময় আবেশ। মেয়েরা তার দিকে চাইলে চোখ ফেরাতে পারত না। এই মিশরীয় যুবকের সাজ-পোশাকও ছিল যেমন স্মার্ট, তেমনি প্রিন্সলি।

ফরাসী মেয়ে মার্গারিত এলিবার্থও ছিলেন অপরূপ সুন্দরী। তাঁর বাবা প্যারিসে ট্যাক্সি চালাতেন, অবস্থা তাঁদের

খুব খারাপ ছিল না। তাঁর মা খুব বড় জায়গায় চাকরি করতেন এবং তাঁরও সুন্দরী হিসাবে বেশ খ্যাতি ছিল। আর এক বড় বোন ছিল মার্গারিতের।

প্রেমে পড়ে প্রিন্স আলি সারা প্যারিসের রেস্তোরাঁ, হোটেল, ক্যাবারে, পিকচার গ্যালারি, অপেরা ও বড় বড় দোকান-পসারে মার্গারিতকে নিয়ে চষে বেড়াতেন। সে সময় খুব কমই তাঁদের দুজনকে আলাদা-আলাদা দেখা যেত। সত্যিকার প্রিন্সের মতই দুহাতে খরচ করতেন আলি বে। মার্গারিত ক্রমশই অভিভূত হয়ে পড়েন তার ব্যবহারে এবং খরচপত্রের বহর দেখে। কেউ কারুকেই যেন আর ছেড়ে থাকতে পারেন না তাঁরা। কিন্তু তখনও তাঁদের মধ্যে বিয়ের কোন কথা হয়নি এবং নিজেদের মধ্যে কেউই তাঁরা কোন যৌন সম্বন্ধের আকর্ষণ অনুভব করেন নি।

প্যারিসে যখন তাঁদের উভয়ের মধ্যে প্রেমের এই উন্মাদনা চলছে, তখন প্রিন্সকে কায়রো থেকে তাঁর বাবা ডেকে পাঠালেন। তিনি সেখানকার একজন ধনী ব্যবসায়ী। কায়রোয় গিয়ে প্রিন্স সেখান থেকে প্রেমপত্র লিখতে আরম্ভ করেন মার্গারিতকে এবং অল্প সময়ের মধ্যে অজস্র চিঠি লিখে-ছিলেন। সম্প্রতিকালে বিলেত থেকে প্রকাশিত প্রেমপত্রের একটি সংকলনে তাঁর অনেকগুলি চিঠি স্থান পেয়েছে।

প্রিন্স আলির লেখা একটি চিঠির কিয়দংশ হ'ল : 'তোমাকে ছেড়ে এসে এখানে আমার সব অন্ধকার হয়ে গেছে। সারাক্ষণ তোমার মোহনীয় মুখ আমার চোখের সামনে ভাসছে, আর নাইটেঙ্গেলের মত তোমার মধুর কণ্ঠস্বর কানে বাজছে।'...

বিবাহের জন্য কাকুতি-মিনতি করে অনেকগুলি চিঠি প্রিন্স কায়রো থেকে প্যারিসে মার্গারিতের কাছে লিখেছিলেন। তার একটি হ'ল : 'তুমি আমার জীবনে আলোর মত। সেই আলোয় আমি আমার ভবিষ্যৎ চলার পথ নির্ণয় করব। তুমি আমি অভিন্ন। তুমি ছাড়া আমার আর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, পথ নেই, শক্তি নেই। ...চলে এসো প্রিয়তমে, আমার পিতৃ-পুরুষের পবিত্র জন্মভূমিতে, যারা তোমাকে তাদের ভালবাসা, ঐশ্বর্য আর হৃদয়ের উত্তাপ দিয়ে গ্রহণ করার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে।...চলে এসো প্রিয়, চলে এসো এখানে যত শীঘ্র সম্ভব।'...

এই চিঠি পাবার পর আর থাকতে পারেন নি মার্গারিত। তাঁর বোন যোভানি ও নিজের একজন পরিচারিকা নিয়ে চলে এসেছিলেন ইজিপ্টে। প্রিন্স আলি তাঁদের যথারীতি প্রীতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন তাঁর প্রাসাদে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাঁর ঐশ্বর্যপূর্ণ মনোরম প্রাসাদের সবকিছু দেখিয়েছিলেন। আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে। তাঁদের নিয়ে নিত্র-ইয়াটে করে ঘুরেছিলেন। চুপি চুপি মার্গারিতকে বলেছিলেন, 'এ সব যা দেখছ, তা সবই হতে পারে এবং হবেও তোমার।' বলেই সজোরে চুমু খেয়ে দিয়ে-ছিলেন তিনি তাঁকে।

এরপর যখন প্রিন্স বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তখন মার্গারিত আর সে সম্বন্ধে কোন চিন্তা করার প্রয়োজন বোধ করেন নি এবং এমন কি নিজের ধর্মও পরিত্যাগ করে তিনি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ভেবেছিলেন, প্রেমের ধর্মই তো এই, জাতিকুল সে কিছুই মানে না।

কায়রোতে একদিন মহাসমারোহের মধ্যে রাজকীয় খাওয়াদাওয়া ও জাঁকজমকের মধ্যে এবং বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে তাঁদের উভয়ের বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গিয়ে-ছিল।

মার্গারিত তাঁদের বিবাহের চুক্তিপত্রে একটি ধারা সংশ্লিষ্ট করেছিলেন যে, যদি কখনো দুজনের ছাড়াছাড়ির প্রয়োজন হয়, তাহলে মার্গারিত যেন তার সুযোগ পেতে পারেন। কিন্তু প্রিন্স সে বিষয়টি অপ্রয়োজনীয় হিসাবে বিবাহের পূর্বেই চুক্তিপত্র থেকে বাদ দিয়ে দেন। এতে করে অন্যান্য মুসলমান মেয়েদের মতই স্বামীর দ্বারা পরিত্যক্তা হওয়া ছাড়া তিনি নিজের ইচ্ছায় স্বামীর হাত থেকে কোনদিনই মুক্তি পেতে পারবেন না—স্বামীর ইচ্ছামতই তাঁকে চলতে হবে।

বিবাহের আগে পর্যন্ত মার্গারিতের ভগ্নী ও তাঁর নিজস্ব পরিচারিকাটি তাঁর সঙ্গেই থাকত। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই প্রিন্স এই অভিমত ব্যক্ত করলেন যে, এখন কেবলমাত্র তারা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই একত্রে থাকতে চান; অতএব এখন ইচ্ছে করলে তাঁরা প্যারিসে ফিরে যেতে পারেন। এরপর মার্গারিতের বোন ও পরিচারিকা দুজনেই ফ্রান্সে ফিরে যান।

মার্গারিতের বোন ও পরিচারিকা চলে যাবার কয়েক দিনের মধ্যেই আরম্ভ হয় সমস্ত আনন্দ-উদ্দীপনা ও প্রেমের যবনিকা-পাত। মার্গারিত ক্রমেই বুঝতে আরম্ভ করেন, যে প্রিন্সের প্রেমে তিনি এতদিন বিগলিত, মুগ্ধ ও অভিভূত হয়েছিলেন, এ যেন সে মানুষই নয়, অন্য কোন অস্বাভাবিক অমানুষ পুরুষ। বিশেষ করে তাঁর আসঙ্গ-লিপ্সার বিপরীত ধরন দেখে মার্গারিত-শুধু চিন্তিতই নয়, ভীষণ ভীত হয়ে পড়লেন। ভীতির অন্য কারণও প্রকাশ পেতে লাগল, যখনই আলির অস্বাভাবিক কামনার বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করতে আরম্ভ করলেন। ক্রমশঃ রাত্রি মার্গারিতের কাছে এক বিভীষিকার রাজ্যে পরিণত হল। ভয়ে শোবার ঘরে ঢুকতে চাইতেন না তিনি। তখন জোর করে টেনে নিয়ে যাওয়া হ'ত তাঁকে। প্রাচীনকালের মত অন্তঃপুররক্ষী খোজা চাকররা সদাসর্বদা তাঁকে পাহারা দিত। প্রিন্স আলির বিকৃত যৌনলালসাকে পরিতৃপ্ত করতে না পারলে বা প্রত্যাখ্যান করলে, মার খেতে হ'ত তাঁকে।

অন্ধের মত ভালবাসার পরিণতি যে এই ঘটবে কে জানত তখন! কে জানত, এই কন্দর্পকান্তি, প্রেমের জীবন্ত প্রতীক, অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী তরুণের মধ্যে, এমন জঘন্য অস্বাভাবিক ধর্ষকামীর মনো-বৃত্তি লুকিয়ে আছে! হাতের মুঠোয় পেয়ে মার্গারিতের উপর যথেচ্ছাচার করতে লাগল প্রিন্স আলি বে।

সূক্ষ্ম শিল্পরুচিসম্পন্না ফরাসী মেয়ে মার্গারিত এলিবার্থ হতাশায় ভেঙে পড়লেন। কি স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, আর কি হল! একটি পয়সাও তাঁর হাতে দিতেন না প্রিন্স। তাছাড়া সারাক্ষণ বাড়ির মধ্যেই বন্দী-জীবন যাপন করতেন তিনি। আর প্রিন্সের সেক্রেটারী সৈয়দ ইরাণী সারাক্ষণ গোয়েন্দার মত গোপনে চোখ রাখত তাঁর উপর। তাঁকে কোথাও কোন চিঠিপত্র লিখতে দেওয়া হত না।

বিকৃত, বিপরীত যৌনপ্রবৃত্তির অত্যা-চার ছাড়াও, মার্গারিতের স্বামী নানাভাবে
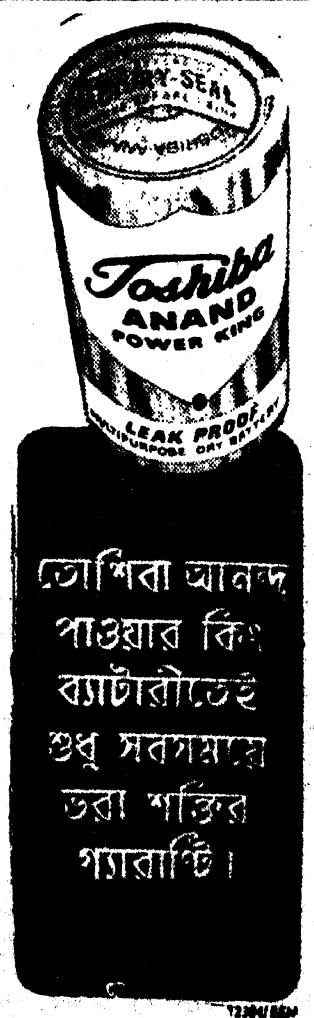
পীড়ন করতেন তাঁকে। একবার প্রিন্সের একটি লঞ্চের কেবিনে তিনদিন তিনি বন্দী হয়ে ছিলেন। তাঁকে ভয় দেখাবার জন্যে মাথার উপর দিয়ে পিস্তল ছোঁড়া হত। তাছাড়া যদি তিনি কখনো পালাবার চেষ্টা করেন, তাহলে তাঁর মুখ যাতে এসিডের সাহায্যে বিকৃত করে দেওয়া যায়, তার জন্য রক্ষী নিযুক্ত করা হয়েছিল। আলি নিজেও তাঁকে একবার এমন একটি ঘুঁষি মেরেছিলেন যে, তাঁর চোয়ালের হাড় সরে যায়।'

এতক্ষণ একটানা এই কাহিনী বলে চলেছিলেন ডাঃ বোস। আর তাঁর সহধর্মিণী মিসেস বোস চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এখানে এসে তিনি আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। বললেন, 'প্রেমিক বটে! তা এমন স্বামীকে কে আর আদর করে দুধ-কলা খাওয়াবে? খুন করেছে, বেশ করেছে।'

ডাক্তার বোস বললেন, একটু রহস্য করেই বললেন, 'ছি ছি, বাঙালী মেয়ে হয়ে তুমি কিনা আবার স্বামীকে খুনের কথা বলছ!' তারপর আবার বললেন, 'এবার খুনের সেই শেষ পর্বের কথাই শোন।'

এই সময় মার্গারিত প্যারিসে তাঁর বোন যোস্তানি ও বোনের এ্যাটর্ণীকে সমস্ত বিবরণটি খোলাখুলিভাবে লুকিয়ে চিঠিতে জানিয়ে দেয় এবং যোস্তানি ও তার এ্যাটর্ণী প্রিন্স আলিকে দীর্ঘ এক চিঠি লিখে, তাঁর বিরুদ্ধে কেস করবে বলে ভয় দেখায়। এই চিঠি আরও খাপ্পা করে তোলে আলিকে। তিনি তৎক্ষণাৎ যোস্তানিকে টেলিগ্রাম করে জানান যে, তিনি তাঁর বিরুদ্ধে যা লিখেছেন, তা সবই মিথ্যে। কিন্তু সেইদিনই মার্গারিতের সামনে কোরান হাতে করে তিনি শপথ করেন, 'আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমিই তোমাকে হত্যা করব— অনিবার্যভাবে আমার হাতেই তোমার মৃত্যু ঘটবে।'

কিন্তু এই ঘটনার পর কিছুদিন তাঁর মতিগতির কিছুটা যেন পরিবর্তন হয়। তিনি, পূর্বে যা-যা ঘটেছে তা সবই তাঁর স্ত্রীকে ভুলে যেতে বলেন। বলেন, খেয়ালের বশে এমন অনেক কিছু মানুষ করে ফেলে, কিন্তু সবই আবার ভুলে যায়। এই সব বলার পর, দিন কতকের জন্য তিনি তাঁর স্ত্রীর কাছে কোথাও ঘুরে আসার জন্য প্রস্তাব করেন। মিসেস আলি এর মধ্যে কোন গূঢ় রহস্য আছে কিনা ধরতে না পারলেও সম্মতি জানান।

সেটা ১৯২৩ সালের জুলাই মাস। তাঁরা দুজনে ও তাঁদের সেক্রেটারী ইরাণী এসে উঠেন লণ্ডনের স্যাভয় হোটেলে। সেখানে মার্গারিত একটি আলাদা ঘরে শুতেন বটে, কিন্তু কখন কি ঘটে এই ভয়ে তিনি সর্বদাই একটি গুলি-ভরা পিস্তল তাঁর বালিশের তলায় রেখে দিতেন।

লণ্ডনে এসে পোঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই মিসেস আলি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ডাক্তার ডাকা হয়। কিন্তু ডাক্তার এসে তাঁকে প্যারিসে গিয়ে পেটে একটি অস্ত্রোপচার করার জন্য উপদেশ দেন। কিন্তু ডাক্তারের এই কথা শুনেই ক্ষেপে যান প্রিন্স এবং তিনি মনে মনে ভাবেন যে, ডাক্তারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৯ই জুলাই দুপুরে হোটেলে খাবার সময়, তাঁর সঙ্গে অর্কেস্ট্রা বাদকদলের ফরাসী অধিনায়কের আলাপ হয়। তিনি মাদমোআজেল আলি নতুন কোন সুর শুনতে চান কিনা জিজ্ঞাসা করলে, উত্তরে ফরাসী ভাষায় শ্রীমতী আলি বলেন, 'আপনাকে ধন্যবাদ, কিন্তু যার স্বামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই তার স্ত্রীকে হত্যা করতে যাচ্ছে, তার আর নতুন কোন সুর শোনার অভিলাষ থাকতে পারে কি?'

উত্তরে অর্কেস্ট্রার অধিনায়ক একটু কায়দা করে বললেন, 'মাদাম, আশা করি আপনি কালও এখানে এই সময় থাকবেন।'

সেদিন রাত্রে ডিনারের সময় ভীষণ ঝড়জল ও বজ্রপাত আরম্ভ হল। মিসেস আলি অনেক রাত পর্যন্ত নাচলেন, কিন্তু তাঁর স্বামীর সঙ্গে নয়। রাত প্রায় ১-৩০ মিনিটের সময় তিনি একাকী নিঃশব্দে তাঁর ঘরে এসে ঢুকলেন। প্রিন্স আলি তাঁর সঙ্গে ছিলেন না। এই সময় বিদ্যুতের কর্ণবিদারী কড়কড় শব্দ ও আলোর ঝলকানির মধ্যে করিডোরে যে পোর্টার ডিউটিতে ছিল, সে হঠাৎ সব আওয়াজ ছাপিয়ে পর পর তিনটি গুলির আওয়াজ শুনে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। একটা বাঁক ঘুরেই সে দেখতে পেল, পায়জামা-পরা একটা লোক খোলা দরজার সামনে পড়ে আছে, আর তার মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। তার পাশেই হাঁটু গেড়ে বসে আছেন মিসেস আলি বে। তখনও তিনি তাঁর ডিনারের পোশাক ও জড়োয়ার গহনা গা থেকে খোলেননি। একটা ব্রাউনিং অটোমেটিক পিস্তলও পড়ে আছে মেঝেয় আলি বে-র পায়ের কাছে।

হোটেলের সহকারী ম্যানেজার তৎক্ষণাৎ ছুটে এলেন। এসেই তিনি সামনে মিসেস আলিকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন আপনি এই সাংঘাতিক কাজ করলেন?'

পাশে দাঁড়িয়েছিল প্রিন্সের সেক্রেটারী। তাকে জড়িয়ে ধরে মিসেস আলি অসংলগ্ন জড়ানো গলায় কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রিন্সকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল, কিন্তু পনের মিনিটের মধ্যেই সব শেষ। মারা গেলেন প্রিন্স আলি। একজন ডাক্তার ও পুলিশ সার্জেণ্টের সামনে শ্রীমতী আলি বে স্বীকার করলেন যে, তিনি রিভলবার দিয়ে তাঁর স্বামীকে গুলি করেছেন।

এর পর তাঁকে স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং হত্যার অপরাধে অপরাধী হিসাবে কোর্টে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।

মিসেস বোস এই সময় আর একবার বাধা দিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'এর পর তোমরা তো বলবে, বিচারে তাঁর ফাঁসি হল, অথবা খুনের দায়ে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসিয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটান হল?'

উত্তরে ডাঃ বোস বললেন, 'না, এর কোনটাই হয়নি। ১৯২৩ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর ওল্ড বেইলীতে মিঃ জাস্টিস সুইফট-এর এজলাসে তাঁর বিচার আরম্ভ হয়েছিল। যদিও মিসেস আলি স্বীকার করেছিলেন, তিনি তাঁর স্বামীকে হত্যা করেছেন, কিন্তু একটা সন্দেহের ভাব তবুও থেকে গিয়েছিল যে, তিনি সত্যিই তাঁর স্বামীকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন কিনা। তাছাড়া মিসেস আলি প্রায় নিঃসংশয় ছিলেন যে, সে-রাত্রে তাঁর স্বামী তাঁকে হত্যা করবে। এছাড়া এই মামলায় প্রিন্স আলির সেক্রেটারী সৈয়দ ইরাণীর সহানুভূতিপূর্ণ সাক্ষ্য মিসেস আলির পক্ষে খুবই সাহায্য করেছিল। তিনি বিবাহের পর থেকে শ্রীমতী আলির প্রতি প্রিন্স আলির অকথিত অত্যাচারের কাহিনী বিনা দ্বিধায় কোর্টের সামনে ব্যক্ত করে দেন। এতে শ্রীমতী আলির প্রতি কোর্টের কিছুটা অনুকম্পার ভাব প্রকাশ পায়। এই খুনের মামলায় সবচেয়ে যিনি বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেন, তিনি হচ্ছেন প্রতিবাদী পক্ষের কাউন্সিল বিখ্যাত আইনজ্ঞ মার্শেল হল। এমন কতকগুলি বিশ্বাসযোগ্য তথ্য ও নথিপত্র তিনি জজদের সামনে উপস্থিত করেন এবং আসামী শ্রীমতী আলি বে-কে কাঠগড়ায় তুলে এমন কতকগুলি প্রশ্ন করেন, যা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, সেই ভয়াবহ গভীর রাত্রে নিজেকে সম্পূর্ণ বাঁচাবার জন্যে এবং প্রিন্সের দ্বারা নিহত হওয়ার হাত থেকে তাকে নিবৃত্ত করার জন্য, তাঁর মুখের সামনে পিস্তল তুলে ধরেছিলেন এই মহিলা। কিন্তু আতঙ্কে অভিভূত হওয়ার ফলে গুলি ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিল তা থেকে।

এরপর কোর্টে রায় দেবার দিন জুরিদের সমবেত অভিমত প্রকাশিত হয়। প্রায় একঘণ্টা পরে তাঁরা ফিরে এলে গভীরগম্ভীরভাবে বেঞ্চ-ক্লার্ক তাঁদের প্রশ্ন করেন, 'আপনারা কি আসামীকে হত্যার অপরাধে অপরাধী বলে মনে করেন?'

জুরিদের ফোরম্যান তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন, 'না, তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ।'

নকলদানা

সুমথনাথ ঘোষ

নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারেন না সহদেববাবু! স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকেন আয়নাটার ভেতরে। রোজ যে মুখ দেখতে অভ্যস্ত, তার বদলে মনে হয় এ-যেন আর একজনের।

ঘাড়টাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, এপাশে-ওপাশে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলেন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে।—নাঃ একেবারে বেমালুম কালো হয়ে গেছে। সাদা চুল কোথাও আর একগাছিও নেই। সস্নেহে একবার হাতটা নিজের মুখটার ওপর বুলিয়ে নিয়ে মনে মনে ধন্যবাদ দেন মিসেস সেনকে। তাঁর শালাজ, বড় শালার স্ত্রী, স্বামীকে অপিসের কাজে দিল্লী থেকে দু-দিনের জন্যে কলকাতায় যেতে হবে শুনে তাঁরই সঙ্গে জোড়ে এসে উঠেছেন সহদেববাবুর বাসায়।

অবশ্য এর পিছনে কার চক্রান্ত সবই তিনি জানেন। গত দু-তিন বছর ধরে তাঁর স্ত্রী মলিনা যখন তখন বলে, চুলটাতে একটু রং দিলেই ত পারো। ইচ্ছে করে বুড়ো অপবাদ নেবার দরকার কি। মল্লিক-মশাই, চ্যাটার্জিবাবু, জয়ার বাবা সকলেই তোমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়, কিন্তু কারো চুল তোমার মত এমন অল্পবয়সে ধুতরো ফুল হয়ে যায়নি!

অল্পবয়েস। ষেটের কত হলো জানো? সামনের ফেব্রুয়ারীতে পঞ্চান্নতে পড়বো! সহদেববাবু বয়সের উল্লেখ করেও স্ত্রীকে ক্ষান্ত করতে পারেন না বরং তাঁর ক্রোধ আরো বেড়ে যায়। বলে, মল্লিকমশাইয়ের বৌ আমায় নিজে বলেছেন, তাঁর স্বামীর এই উনষাটোত্তর হলো। আর চ্যাটার্জি-বাবুকে তিনি দাদা বলে যখন ডাকেন শুনতেই পারছো, অন্ততঃ দু-এক বছরেরও বড়। কিন্তু কার মাথায় তোমার মত এত পাকা চুল! কেউ ত তাঁদের বুড়ো বলে না।

সহদেববাবু জবাব দেন, বলে কি না বলে, তুমি কি করে জানলে?

থামো। আমি সব জানি। বলে ঝাঁজালো কণ্ঠে জবাব দেয় মলিনা। সেদিন মুচিটা এসে ডাকছে, মা বুড়োবাবু আমায় পাঠিয়ে দিলেন, তাঁর কি জুতো সারতে হবে!

আর একদিন এক ছুতোর মিস্ত্রী এসে বলে, বুড়োবাবু আছেন, কোন্ দরজার নাকি কব্জা ভেঙে গেছে। সেদিন বাজারে দেখা হয়েছিল, বলেছিলেন সেরে দিয়ে বাড়ী থেকে পয়সা নিয়ে যেতে!

সবচেয়ে রাগ হয়, পাড়ার লোক যারা সবাই তোমাকে ছেলেবেলা থেকে চেনেজানে, তারা যখন চাঁদা চাইতে এসে বলে, বুড়ো-কত্তা বাড়ী আছেন নাকি?

সঙ্গে সঙ্গে তাদের মুখের ওপর দরজাটা আছড়ে বন্ধ করে দিতে ইচ্ছে করে মলিনার। তবু একদিন প্রশ্ন করেছিল, বুড়োবাবু কে?

মানে, ওই সুকান্তর বাবা।

স্ত্রীর মুখ থেকে ওই সব শুনে সহদেববাবু হেসে উঠেছিলেন, তা বুড়োমানুষকে বুড়ো বললে যদি তোমার রাগ হয়, তাহলে ত নাচার। জানো শাস্ত্রে বলেছে 'পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ'। পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে গেলে, তার বনে গিয়ে বাস করা উচিত।

কিন্তু তোমার সঙ্গে রাস্তায় বেরুতে আমার যে লজ্জা করে। জানো সেদিন কাজলের মা জিজ্ঞেস করছিল, আপনি কি দ্বিতীয়পক্ষ। ওঁকে দোষ দেওয়া যায় না, তিন বছর হলো, এ-পাড়ায় ভাড়া এসেছেন। তোমার পাকা চুল দেখে, শুধু তাঁর কেন অনেকের মনেই এ প্রশ্ন জাগে। সেদিন ঠাকুরতলায় তুমি আমায় পুজো দেখতে নিয়ে গিয়েছিলে, তোমার সঙ্গে আমার বয়েসের কত তফাৎ ঠারে-ঠোরে অনেকেই সে-কথা শুনিয়ে দিলে।

সহদেববাবু রসিকতা করে বলে উঠলেন, তা তুমি যদি কুন্তীর মত অনন্ত যৌবনা হও, সে-কি আমার দোষ।

থামো! এ নিয়ে আর রঙ্গ করতে হবে না!

বাস্তবিকপক্ষে এক একজন মেয়ের দেহের গঠন এমন, সেই যে তিরিশে এসে থমকে থেমে যায়, আর যেন এগুতে চায় না। মলিনাকে এই দলের নেত্রী বললে অত্যুক্তি হয় না। হাল্কা করে মুখে পাউডারের তুলি বুলিয়ে সেদিন বড় মেয়ে এ-বছর যে এম-এ পরীক্ষা দিয়েছে তাকে নিয়ে মার্কেট করতে গিয়েছিলেন। কোয়ালিটীতে 'আইসক্রীম' খেতে ঢুকে মলিনার সঙ্গে অনেক দিন পরে তার পুরনো কলেজ ফ্রেণ্ড দীপ্তি রুদ্রের দেখা, ওমা তুই মলি, মাইরি এখনো তোকে কি ছেলেমানুষ দেখতে। আমি ত আগে ভেবেছিলুম তোদের দুই-বোন—তারপর টেবিলে বসে তোর মুখের দিকে তাকাতে হঠাৎ মনে হলো, আরে এ-তো সেই আমাদের মলি, তোর মেয়েকে দেখেছিলুম বোধ হয় বছর দশেক আগে। তোর মুখের সঙ্গে খুবই সাদৃশ্য ছিল, তখন চিনতে বাকী রইলো না।

তারপর মেয়ে এম-এ পরীক্ষা দিয়েছে শুনে, কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর টেনে বললে, বাবা এতবড় হয়ে গেছে তোর মেয়ে! মাইরি তুই কি করে চেহারাটা এখনো এমন রেখেছিস বল্ না। আমি ত দিনে দিনে ফুলছি। আমার কত্তা তো আমার সব খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। রাত্রে দুখানা

রুটি খাই। মাংস নয়, ডিম নয়, ঘি-দুধ সব ছেড়ে দিয়েও তো দেহের মেদ কমাতে পারছি না।

অবশ্য এ-সবই সহদেববাবুকে সবিস্তারে গল্প করেছিল মলিনা। তাকে যে এখনো কত 'ইয়ং' দেখায়, সেটা তার কানে ঢুকিয়ে দেবার জন্যে।

বলা বাহুল্য সহদেববাবু এ-সব শুনেও চুপচাপ ছিলেন। কলপ মেখে চুল কালো করার কথা চিন্তা করে দেখেননি কোনদিন।

অবশ্য এই ব্যাপারে মলিনা একদিন চরম আঘাত পেয়েছিল. সেকথাটাও সহদেববাবু জানতেন, তবু তিনি তেমনি নীরব ছিলেন।

ঘটনাটা ঘটেছিল শিশুমঙ্গল হাসপাতালে। স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ মেয়ে-ডাক্তার দেখাবার জন্যে তিনি মলিনাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাকে পরীক্ষা করে ওষুধপত্রের কথা লিখে দিয়ে ডাক্তার বলেছিলেন, আজ থেকেই ওষুধটা খেতে পারলে ভালো হয়। আপনার বাবা ত সঙ্গে এসেছেন. বলুন, যাবার সময় এই-খানে কাছেই যে ওষুধের দোকান রয়েছে যেন কিনে নিয়ে যান।

অবশ্য এটা বেশ কিছুদিন আগের কথা। তারপর তিন-চার বছর কেটে গেছে।

সেদিন ঘুম ভাঙতে একটু দেরী হয়েগিয়েছিল সহদেববাবুর। অবশ্য রবিবার। আপিসের ছুটি। বেলাতে বাজারে গেলেও চলবে। যদিচ বাড়ীতে অতিথি—বহুদিন পরে তাঁর শ্যালকদম্পতি এসেছেন, বিশেষ ভাবে আদর-আপ্যায়নের কথা এবং কি 'মেনু' হবে রাত্রেই স্বামী-স্ত্রীতে মিলে ঠিক করে রেখেছিলেন। তবু সহদেববাবুকে বেলা পর্যন্ত ঘুমতে দেখেও যে কেউ ডাকেনি কেন, তা বুঝতে বিলম্ব হলো না। হঠাৎ মাথায় একটা চটচটে তেলের মত কি বস্তুর স্পর্শ পেয়ে ধড়মড় করে সহদেববাবু খাটের ওপর উঠে বসেই সামনে মিসেস সেন ও মলিনাকে দেখে চমকে উঠলেন। মিসেস সেনের এক হাতে একটা শিশি চায়ের কাপ, আর এক হাতে একটা দাঁত মাজার ব্রাশ। মিচকি মিচকি হাসছেন দুজনেই। তবে হাসির ছটা বেশী যেন মলিনার মুখে। ভাবটা এই, কেমন জব্দ, এবার না বলো। এতদিন পরে তোমায় বাগে পেয়েছি।

না, না, এসব কি করছেন বৌদি—এই বুড়োবয়সে! বলে মাথায় হাত দিতেই কালো মত রং আঙুলে লেগে গেল সহদেববাবুর।

মিসেস সেন হেসে জবাব দিলেন, বুড়ো বয়সেই ত এসব করে ভাই। ছোকরা বয়েসে ত দরকার হয় না। এখন রাগ করছেন কিন্তু পরে আমায় ধন্যবাদ দেবেন এর জন্যে। জানি। বলে এক ঝলক হাসি উথলে দিলেন ঠাকুরজামাইয়ের মুখের ওপরে।

মলিনা ঝাজে উঠলো, হাত দিয়ো না মাথায়।

চোখে যেন লাগে না। এই তোয়ালেটা দিয়ে চোখটা চেপে ধরে আমাদের সঙ্গে বাথরুমে আসুন। এ রংটা বড় খারাপ। কোথাও লেগে গেলে আর সহজে ওঠানো যায় না।

চোখ চেপে বাথরুমে গিয়ে ঢুকতে, ওরা ননদ-ভাজে মিলে সহদেববাবুর মাথায় বেশ করে রং লাগিয়ে দিলো। তারপর মিসেস সেন বললেন, এখন ভিজে চুলটা পাখার নীচে বসে শুকিয়ে নিন। তারপর আর কিছু করার নেই। ঘোড়াদিঘণ্টা পরে মাথায় সাবান দিয়ে এই রংটা ধুয়ে ফেলবেন। কিন্তু শুধু একটু সাবধান থাকবেন, ওই রং ধোয়া জল যেন চোখের ভেতরে না যায়।

যথা আজ্ঞা দেবী। সহদেববাবু রসিকতা করে উঠতে ও'রা ননদ-ভাজে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ঘণ্টাখানের পরে মলিনা বাথরুমে এসে সহদেববাবুর মাথাটা বেশ করে ধুইয়ে দিয়ে চলে গেলে, তিনি স্নান করে তোয়ালে দিয়ে মাথা মুখ মুছতে মুছতে ঘরে এসে বড়ো আয়নাটার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যান! এ কি! একেবারে কুচকুচ করছে মাথায় চুল! সেই কুড়ি বছর আগের চেহারাটা যেন ফিরে এসেছে বলে মনে হয়!

মিসেস সেন, ভেতরের ঘরের দেওয়াল থেকে তাঁদের বিয়ের তোলা ফটোটা এনে, ননদকে নন্দাইয়ের পাশে দাঁড় করিয়ে বলেন, দেখুন ত ফটোটার সঙ্গে মিলিয়ে, একেবারে এক দেখাচ্ছে না? অকালে চুলগুলোকে পাকিয়ে বুড়ো হয়ে যাবার কি দরকার ছিল!

অ-কালে! বলেন কি বৌদিভাই! পঞ্চান্ন বছর অকাল?

মলিনা খপ্ করে বলে ওঠে, দাদা ত তোমার চেয়েও দু-বছরের বড়—কিন্তু তাকে দেখলে, এখনো মনে হয় না চল্লিশ পেরিয়েছে।

অবশ্য তার জন্যে আমাকে ধন্যবাদ দাও। ঠিক রেগুলার কলপটা পনেরো দিন অন্তর লাগিয়ে তবে আমি ওকে বাইরে বেরুতে দিই। কেউ বলতে পারবে না যে একদিন ওর মাথায় একটা সাদা রেখা দেখতে পেয়েছে।

আমিও সব দেখে নিয়েছি। এবার থেকে ঠিকমত লাগিয়ে দেবো। তখন সহদেব হাসতে হাসতে বলেন, জানেন বৌদিভাই, ওকে এতদিন বলিনি কথাটা। সেদিন আমার আপিসের বড়বাবু আমায় চুপিচুপি জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কি দ্বিতীয়পক্ষ নাকি? গত বছর মুসৌরীতে আমরা যেদিন 'সিলভারটোন হোটেলে' যাই, উনি আমাদের দেখেছিলেন ওপরের ঘর থেকে। নীচে লনে তাঁর ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে, সেইদিনই কলকাতায় ফিরবেন, তাই আলাপ করতে আসতে পারেননি।

তখন তুমি কি বললে? ঝাঁজালো কণ্ঠে প্রশ্ন করলে মলিনা।

বললুম, ঠিকই ধরেছেন।

তোমার লজ্জা করলো না একটু? দেখছেন বৌদি কি বেহায়া পুরুষ? বলে মলিনা মিসেস সেনকে সালিশী মানতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে সহদেববাবু হাসি চেপে বলে উঠলেন, লজ্জা কি। ওটাতে বরং পুরুষের আরো গৌরব। এই বয়সেও ভালবেসে আর একজন মালা গলায় দিয়েছে। কি বলেন, বৌদিভাই।

ভালবেসে, না ছাই! বলে মুখে কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বেরিয়ে যান মলিনা ঘর থেকে।

সহদেববাবু যখন আপিস বেরোন, রোজই তাঁর হাতে সিগারেটের টিন আর. পোর্টফোলিওটা দিতে এসে মুচকি হাসে মলিনা।

হাসছো যে।

হাসছি তোমায় দেখে। মাইরি বলছি, তুমি যখন অফিস থেকে আসো, ওই গলির মোড় থেকে তোমায় দেখা যায়, আমার চোখের সামনে একেবারে সেই বিয়ের পরের ছবিটা ভেসে ওঠে। কতদিন ধরে বলছি, একটু কলপ লাগাও, তা আমার কথা ত কানে নেবে না। এতে লজ্জার কি আছে বুঝি না। চোখের দৃষ্টিশক্তি কমে এলে লোকে যেমন চশমা নেয়, দাঁত পড়ে গেলে দাঁত বাঁধায় ফোকলা মুখটা কাউকে দেখাতে চায় না, অহলে এই চুলটার বেলায় যত অপরাধ হলো। তোমার এ বিরূপ মনোভাবের কোন অর্থ হয় না। যে যুগের যেমন হাওয়া। এই বলে একটু থেমে মলিনা বললে, তুমি বিশ্বাস করবে না একদিন লক্ষ্মীদির স্বামীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা লেকের ধারে, ও'রা পাইকপাড়ার বাসা ছেড়ে উঠে এসেছেন কেয়াতলা লেনে —ছড়ি হাতে নিয়ে পায়জামা আদ্দির পাঞ্জাবি পরে বেড়াচ্ছিলেন ঠিক যেন মনে হয় 'ইয়ংম্যান'—মাথায় চুল যেমন কালো, দাঁতগুলো বাঁধানো, চোখে চশমা অথচ বয়েস খুব যদি কম হয়, ত পঁয়ষট্টির নীচে ত নয়ই বরং ওপরের দিকে। ও'রা তারপর একদিন রামকৃষ্ণ মিশনের সামনে লক্ষ্মীদির সঙ্গে দেখা হলে, আমায় টেনে নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়ীতে। বললেন, ওষুধ কিনতে এসেছিলুম, স্বামী খুব ভুগছেন, এক মাস ধরে। বললে বিশ্বাস করবে না, ঘরে ঢুকে ভদ্রলোককে দেখে অবাক—মাথার চুলগুলো সব সাদা, বাঁধানো দু-পাটি দাঁত খোলা, চোখে চশমা নেই—মনে হচ্ছে যেন একটা অতি বৃদ্ধ মানুষ শুয়ে আছেন!

সহদেববাবু স্ত্রীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, এই জন্যেই ত এইসব 'জাল' জিনিস ব্যবহার করতে চাই না।

আরে, এক মাস ধরে যে লোকটা অসুস্থ, বিছানায় শুয়ে আছে বিছানায় তার মাথায় রং দেবে নাকি? তোমার যত সব উল্টো কথা।

আপিসের সহকর্মীরা প্রথমটা একটু ঠাট্টা-তামাসা করেছিল সহদেববাবুর সঙ্গে কিন্তু কিছুদিন পরে অনেকেই এসে তাঁকে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করে, আপনি কোন কলপ লাগান, নামটা একটু লিখে দিন না ভাই!

কিন্তু স্বামীর মাথার চুল কালো দেখে মালিনা, খুশি হলে কি হবে, মনে মনে গজরাতে থাকেন সহদেববাবু ট্রামে-বাসে আসা-যাওয়ার সময়।

ভীড়ের মধ্যে আগে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে নিজেরা দেহটাকে সঙ্কুচিত করে আপনি বুড়োমানুষ বসুন বলে একটু জায়গা করে দিতো। কিন্তু এখন উল্টো বিপত্তি হয়েছে। কনুয়ের গোঁজা মেরে, ঠেলেঠুলে ওঁকে ভেতরের দিকে পাঠিয়ে দিয়ে বলে, দেখতে পাচ্ছেন না, লোক বাইরে ঝুলছে, একটু ভেতরে চাপুন না।

আর কত চাপবেন। চাপতে চাপতে এদিকে দেহটা যে চিঁড়ের মত হয়ে গেছে। হাঁপ ধরে। যেন নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

তাছাড়া মেয়েরা পাশে খালি সিট থাকলে আগে যেমন মাথার পাকা চুলের

মেয়েরাই পিছনে ধপ্ করে বসে পড়লে, তাদের কেউ আপত্তি করতো না। বরং কেউ কেউ ডেকে বসতে বলতো পাশে। তাদের গায়ের সংগে গায়ে ধাক্কাধাক্কি লাগলেও কিছু মনে করতো না, এখন তাদের মনোভাব পাল্টে গেছে। তারাই ভাবে, কেন সুযোগগ্রহণকারী। স্ত্রীলোকের দেহের স্পর্শ-সুখ লাভ করতে চান। এক-দিন একটি মেয়ে এক ট্রামভর্তি লোকের সামনে একরকম অপমানই করলে বলা যেতে পারে।

খুব ভীড়। অভ্যাসবশত একটি মেয়ের পাশেই শূন্য আসন দেখে তিনি ধপ করে বসে পড়লেন। যেমন বসা মেয়েটি তাঁর দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করে বলে উঠলো, ভদ্রলোকের ঘাড়ের ওপরে যে এসে বসছেন, দেখছেন না, 'লেডিস সীট' লেখা রয়েছে।

লজ্জা পেয়ে সহদেববাবু তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন বটে কিন্তু সকলে যখন উল্টে উল্টে তাঁর মুখের দিকে পিছন ফিরে তাকাতে লাগল, তখন যেন বিনাদোষে নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হতে লাগল এবং সারা পথটা তিনি মলিনার মস্তক চর্বণ করতে করতে এলেন। সত্যি কথা বলতে কি এক এক সময় ইচ্ছা করছিল, ঝাঁপ দিয়ে ট্রামের তলায় পড়ে আত্মহত্যা করতে।

কিন্তু একদিন এর ব্যতিক্রম দেখে মনটা খুশিতে ভরে উঠলো সহদেববাবুর। শেয়ারের ট্যাক্সিতে চাপতে গিয়ে কোথাও আর সিট পান না। তিনি বুড়োমানুষ এগিয়ে যাবার আগেই অন্য লোক টপাটপ উঠে পড়ে। শেষে একটা ট্যাক্সির কাছে গিয়ে দেখেন সেটাতে চারজনই মেয়ে যাত্রী, বোধ হয়, আর একজন মেয়ের জন্যে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু তিনি কাছে যেতেই একটি মেয়ে বলে, উঠুন আসুন।

ভেতরে উঠেই বিশেষ করে যে তরুণী মেয়েটির ঠিক পায়ের কাছে বসেছিলেন, সেদিনের যেন লজ্জায় নিজের দেহটাকে যত-দূর সম্ভব সঙ্কুচিত করে নিতে থাকেন সহদেববাবু। এই সময় হঠাৎ মেয়েটি বলে ওঠে, আপনি ভাল হয়ে বসুন।

একটু অবাক হয়ে সহদেববাবু মেয়েটির মুখের দিকে একবার তাকালেন। সেদিনের ট্রামের সেই মহিলাটির অপ-মানের কথা বুঝি আজো ভোলেন নি। সে ছিল বিবাহিতা। এর চেয়ে কেবল বয়েস বেশী নয়, দেখতেও কুৎসিত। আর এই মেয়েটি কুমারী, সুশ্রী, তরুণী। তাঁর সংগে গায়ে গা দিয়েই সারাটা পথ এলেন। মেয়েটির মুখে কোথায় কোন বিরক্তির রেখা না দেখে হঠাৎ একবার মনে উদয় হলো, বোধহয় তাঁর মাথার চুল কালো বলে মেয়েটি ভেবেছে 'ইয়ং'। 'ইয়ংম্যান'দের প্রতি প্রতি 'ইয়ং' মেয়েদের যে সহজাত আকর্ষণ থাকে, বোধহয় তাই। নইলে এত লোক থাকতে তাকে ডেকে পাশে বসালে কেন?

এই সময় সহদেববাবু হেড অপিস থেকে খিদিরপুরের ব্রাঞ্চ অপিসের ম্যানেজার হয়ে এলেন।

স্ত্রীর কাছে এই পদোন্নতির সংবাদ দিতে তিনি উল্লসিত হয়ে উঠলেন এবং স্পষ্টই বলে ফেললেন, এর জন্যে সব 'ক্রেডিট' বৌদির। সেদিন যদি তিনি তোমার চুলটাকে এইভাবে কালো করে না দিতেন, তাহলে বুড়োমানুষকে কেউ এতবড় দায়িত্বপূর্ণ পদে কি বসাতো? সবাই জানে বুড়োকে দিয়ে কাজ বেশী হয় না।

অবশ্য তখন থেকে নিয়মিত মলিনা সহ-দেববাবুর চুলে কলপ দিয়ে যাচ্ছিল। এক-দিনের জন্যেও তার একাজে ত্রুটি হয়নি।

নতুন অপিসে সহদেববাবুর জন্যে যেমন কাঁচঘেরা নিজস্ব সুন্দর ঘর তেমনি তাঁর নিজস্ব পি-এ—মিস চ্যাটার্জি। সুশ্রী তরুণী, তন্বী ছিপছিপে গঠন। নিত্যনতুন বেশভূষা করে তাঁর পাশে এসে বসে। সহদেববাবুর ওই ছোট্ট ঘরে সে যেন একটা জাগ্রত বসন্তের প্রতীক!

মিস চ্যাটার্জি আধুনিকা কেবল নন, অতি সূক্ষ্ম রুচিসম্পন্না। অতি সূক্ষ্ম জর্জেটের শাড়ি পরে আসেন। ঘরে ঢোকা-মাত্র তার গা থেকে দামী পাউডার ও এসেন্স-মিশ্রিত একঝলক সুগন্ধ যেন সহদেববাবুর মুখের ওপর আছড়ে পড়ে তাঁকে কেমন উন্মনা করে তোলে! হালকা পেটকরা মুখ, কাজল টানা চোখ ও মুক্তোর মত ঝকঝকে দাঁত, ঈষৎ উঁচু, কথা কইতে গেলে পাতলা ঠোঁটের আড়াল থেকে আগেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সহদেববাবু কাজের ফাঁকে ফাঁকে যতটুকু অবসর পান মিস চ্যাটার্জির সংগে গল্প করেন। খুব ভাল লাগে ওর মুখের কথাগুলো। তার ওই ফুলের পাপড়ির মত পাতলা ঠোঁট ও মুক্তোর মত দাঁতগুলির স্পর্শে ভরা ওর মুখের কথাগুলো শুনতে শুনতে যেন গিলে খেতে ইচ্ছা করে সহদেব-বাবুর।

ধীরে ধীরে তার সংগে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে সহদেববাবুর। 'ওভারটাইম' কাজের ছুতোয় ছুটির পরও দু ঘন্টা আড়াই ঘন্টা একসংগে অপিসে কাটান। তারপর বাড়ী ফেরার পথে কখনো কখনো, তাকে নিয়ে বিলিতি ঢঙের কোন রেস্তোরাঁয় খেতে ঢোকেন।

খাওয়াটা উপলক্ষ্য, মুখ্যতঃ তাকে কাছে পাওয়া। তার সংগে ঘনিষ্ঠ হওয়া। একথা মিস চ্যাটার্জিও জানে। কাজের উন্নতির আশায় মাঝে মাঝে তার জন্যে সহদেববাবুকে প্রশ্রয় দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না।

এইরকম রুচিসম্পন্না আধুনিকার প্রীতিলাভে সহদেববাবুর জীবন যেন ধন্য মনে হয়।

এদিকে বাড়ীতে ফিরতে প্রায়ই রাত হওয়াতে, মলিনার মনে সন্দেহ দেখা দেয়। একই প্রশ্ন রোজই করে সে। এত দেরী হবে ফিরতে বলে গেলেই পারো।

অপিসের কাজ, বেশীকম আগে থেকে কি জানা যায়! জরুরী কাজ এলে শেষ না করে তো আসা যায় না।

সেদিন যখন সহদেববাবু রাত করে বাড়ী ঢুকলেন, তাঁর কাছে এসে দাঁড়াতেই কেমন একটা সুগন্ধ যেন নাকে এসে লাগল মলিনার। সহদেববাবুর জামাটা চট করে শুঁকে সে প্রশ্ন করলে, এসেন্স মেখেছো নাকি?

সেকি! না......কেমন যেন থতমত খেয়ে যান সহদেববাবু।

মলিনার কিন্তু ভুল হয় না সে গন্ধ চিনতে। ওই দামী এসেন্সটা একদিন তার খুব প্রিয় ছিল। ইদানীং দাম অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ায় ছেড়ে দিয়েছে।

সেদিন কি জানি কেন, সারারাত তার চোখে ঘুম এলো না। পরদিন হঠাৎ তার পিসতুতো ভাই এসে খবর দিলে, দিদি জামাইবাবুকে সেদিন দেখলুম মেট্রোতে একটি সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে ছবি দেখতে গেছেন। ও মেয়েটি কে গো?

কিরকম দেখতে বলতো।

খুব সুন্দর। যেমন লতানে চেহারা তেমনি বেশভূষা। আমি ছিলুম দোতালায়। নেমে আসতে আসতেই ওরা বেরিয়ে ট্যাক্সিতে চেপে কোথায় চলে গেল!

আর বেশী কিছু বলতে হলো না। কালকের সেই সুগন্ধ এসেন্সের ইতিহাসটা পরিষ্কার হয়ে গেল!

পিসতুতো ভাই চলে যেতেই বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো। এবং নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। এরপর মলিনা দুতিনদিন বেশ গম্ভীর হয়ে রইলো। স্বামীর সংগে ভাল করে কথা পর্যন্ত কইলে না। ঠিক তিনটে দিন পরে সহদেববাবু বললেন, আজ আমার কলপ দেবার দিন মনে আছে।

আছে। গম্ভীরভাবে উত্তর দিলে মলিনা।

কিন্তু শিশিটা ত দেখতে পাচ্ছি না। বাথরুমের শেলফ-এ ছিল কোথায় গেল বলো ত?

মলিনা বললে, নর্দমায়।

সেকি! কে ফেললে?

আমি ভেঙে ফেলে দিয়েছি।

তার মানে?

তার মানে আজ থেকে আর কোনদিন তুমি ওটা মাথায় দেবে না।

কিন্তু তাহলে চুলগুলো আবার সাদা হয়ে যাবে যে। লোকে কি মনে ভাববে। বিশেষ করে অপিসে—

দৃঢ়স্বরে মলিনা বললে, আমি তাই চাই! বিশেষ করে অপিসের লোকেরা তোমার স্বরূপ চিনতে পারবে। আসলে তুমি যে বৃদ্ধ সেটা আমি তাদের জানাতে চাই।

বলতে বলতে কান্না চাপতে না পেরে একেবারে স্বামীর পায়ের ওপর আছড়ে পড়লো মলিনা। আমি নিজের সর্বনাশ নিজে হাতে করেছি—বুড়োমানুষের চুলে কালো রং দিয়ে তাকে যুবক সাজাতে গিয়ে। আমার ভুল বুঝতে পেরেছি।

কোন কথায় কী ঘটে যায়, কেউ বলতে পারে না। কুমকুম যখন বলল, 'আর একটু বসুন না বাবা, এত তাড়া কিসের'—মুহূর্তে ধরা পড়ল ওকে আমার ভালো লেগে গেছে।

অবশ্য এই ভালো লাগা ঠিক ভালোবাসা নয়—একটা ক্ষীণ সূত্রপাত হতেও পারে। পর-পর অনেকগুলো গান কুমকুম গেয়েছে। খুব আবেগ ছিল গলায়। এ সময় সন্ধ্যার থাবলা-থাবলা ছায়া জমছিল পাহাড়ের খাঁজে, আবহাওয়াটাও ভারি চমৎকার, গাছপালায় পুষ্পিত অর্কিডের ঘাগরা। এ সময় যে-গলায় গান গাওয়া হোক না, ভালো লাগবে সবার।

কিন্তু গানকে রেহাই দিয়ে তখন কুমকুমকে ভালো লেগে উঠল প্রচণ্ডভাবে। মনে হল, এখন যদি খেলনার মতো ওর একটা হাত হাতে তুলে নিই, ও বাধা দেবে না। ওর চেহারায় অদ্ভুত আত্মসমর্পণের চঞ্চলতা টলমল করছিল যেন। আজ তিনদিন তিনটি রাত ওর অবকাশভোগী ছোট্ট পরিবারে এসে উঠেছি ওর অন্ধ স্বামীর সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রে। এর মধ্যে কতবার কত মুহূর্ত গেছে ঘনিষ্ঠ হবার মতো, সাহস পাইনি। এখন কিন্তু আমার মধ্যে ভীতু লাম্পট্য গুটিসুটি ঘুরঘুর করতে থাকল। অমরেশটার কোন মানে হয় না। স্রেফ নিজের সঙ্গীতপ্রতিভার দামে এখন একটি সুরম্য যৌবন কিনে ফেলেছে, ঈর্ষায় বন্ধুত্ব ও যাবতীয় বন্ধুত্ব-মূলক স্মৃতি দাউদাউ জ্বলে ছাই হয়ে গেল।

অনেক বর্ণাঢ্য মূল্যের গায়ে প্রজাপতিদের ওড়াওড়ি করতে দেখেছি, কষ্ট হয়নি কিংবা চোখ টাটায়নি। কবি তো বলেই গেছেন যত্তো সব 'সোনার পিত্তলমূর্তি'! কিন্তু মোটামুটি মধ্যবিত্ত, কিছুটা খ্যাত এবং পুরোপুরি জন্মান্ধ একটি লোকের পাশে কোন মোটামুটি সুন্দরী মেয়ে অকাতরে ঘুমোতে পারে, এটা ভারি অসহ্য লাগে। টাকা দিয়ে খাসা বউ কিনেছ এ এক কথা, আর গানটান গেয়ে বউ কিনেছ আরেক কথা। টাকা তো বেশ [illegible] আর কুবুদ্ধি খরচ করে যোগাড় করা যায়—কিন্তু গানটানের ব্যাপারটা অনেকখানিই প্রকৃতির দান নয় কি? আসলে গলা যার নেই, হাজার সাধনাতেও সেখানে কী গানের ফুল ফোটাতে চাও? আর, অন্ধদের নাকি প্রকৃতি এই গুণটা পুষিয়ে দেয় বেশ। অমরেশ তাই ভালো গাইয়ে হয়েছে। এটা ওর জন্যেই স্বাভাবিক।

এই মুহূর্তে আমার আরেকটা ভাবনা মাথায় এল। অমরেশ তো জানেই না, ওর বউ দেখতে কেমন। পৃথিবী কিংবা বস্তু কিংবা শূন্যতার ধারণা ওর কাছে কোন-কোন বা কী ধরনের প্রতীকে ধরা পড়ে কে জানে। অন্ধরা বস্তুকে বোঝে, বস্তুর রূপ বোঝে না। অতএব ধরেই নিলুম, অমরেশ কুমকুমের শরীর যতটা বোঝে, কিংবা শ্রুতিক্ষমতার দরুন কণ্ঠস্বর—মন তো বোঝেই না, কারণ মনের প্রায় সব আভাসই রূপে ফুটে ওঠে না। আর, চোখ বন্ধ করে কথা শুনলে শব্দ

কথাই শোনা যায়—কথার মানে কি বোঝা যায়?

কুমকুমের কথায় আমি বসে পড়েছিলুম। দু টুকরো কালো পাথরের ওপর পাশাপাশি দুজন মানুষ—মধ্যে দু'ইঞ্চিটাক ফাঁক কিছু শুকনো ঘাসে ভরা।

বললুম, 'আপত্তির কিছু নেই—বলছি। একটু পড়ে চাঁদ ওঠার কথা আছে। বেশ রোমান্টিক সময় এটা। তবে ও একা রয়েছে, ভাবনা করবে নাকি.....'

কুমকুম বলল, 'কিছু করবে না। ও এতক্ষণ তানপুরা নিয়ে বসেছে। আপনার ক্লাসিক ভালো লাগে না?'

'নিশ্চয় লাগে। আপনি ক্লাসিক গান না?'

'একটু-একটু।'

'শুরু করুন। পুরবীর সময় এখন।'

অভ্যাসমতো একটু কেসে কুমকুম পুরবীর তান ধরল। কিন্তু তক্ষুনি বন্ধ করে কিছুটা দূরে নিচের রাস্তার দিকে আঙুল তুলে বলল, 'দেখুন দেখুন—কতসব লোক যাচ্ছে।'

'হুঁ। আদিবাসীরা হাট থেকে ফিরছে।'

'কিন্তু নাচতে নাচতে যাচ্ছে কেন?'

'মাতাল হয়েছে, তাই। পুরবীর কী হল?'

'পালিয়েছে।' বলে হেসে কুমকুম আঙুল দোমড়াতে থাকল।...... 'ভ্যাট্! সব সময় শুধু গান নিয়ে থাকতে ভাল লাগে?'

'আমি তো জানি, গাইয়ে যাঁরা—তাঁরা সারাক্ষণ গান নিয়ে থাকতেই পছন্দ করেন। যেমন লেখকরা সব সময় মনে মনে হাজার গোলমালের মধ্যেও লেখা চালিয়ে যান—ওটাই অভ্যাস।'

কুমকুম দ্রুত বলল, 'আমি কি গাইয়ে নাকি? একটা স্পেশাল টেস্ট মাত্র।'

দুম করে ধরে বসলুম, অমরেশকে বিয়ে করেছেন কিন্তু গান শিখতে গিয়ে—স্পেশাল টেস্ট?'

কুমকুম খিলখিল করে হেসে উঠল। তারপর গম্ভীর হতে চেষ্টা করে বলল, 'ওসব থাক। আপনি সেই অদ্ভুত ইঁদুরগুলোর গল্প আবার বলুন। সত্যি কি ওরা দল বেঁধে সমুদ্রে গিয়ে আত্মহত্যা করে? একজনও কি যেতে যেতে দিক বদলায় না? ভ্যাট্, সে অসম্ভব।' আপনি আর একটা গল্প বলুন।'

আমি টের পেলুম দু'ঘন্টা ধরে সবকিছু স্বাভাবিক চলছিল দিব্যি, হঠাৎ কেন যেন একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে। কুমকুমের মধ্যে অন্যমনস্কতা এবং চঞ্চলতা থমথম করছে। এবং আমিও মনে মনে খানিকটা উপদ্রুত। একটা সিগ্রেট ধরিয়ে বললুম, 'আপনি যতগুলো গান জানেন, তার এক সহস্রাংশ গল্পও আমার জানা নেই।'

'যা হয়, একটা কিছু বলুন। চুপচাপ থাকতে ইচ্ছে করেনা।'

কুমকুমকে উত্তেজিত মনে হচ্ছিল। দূরের কালো একটা স্তূপের দিকে আঙুল তুলে বললুম, 'ওখানটায় গেছেন কখনও?'

'না তো। কী আছে ওখানে?'

'ওটা একসময় ছিল দুর্গ। অনেক ভুতের গল্প চালু আছে। একবার......'

কুমকুম একটু সরে এল।...'বলুন, বলুন—শুনি।'

'একবার আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে ওখানে রাত কাটাচ্ছিলুম। পরিষ্কার জ্যোৎস্না ছিল। আর, বুঝতেই পারছেন আমরা বেশ খানিকটা মাতাল হয়ে পড়েছিলুম। রাত তখন বারোটার বেশি। হঠাৎ দেখি সাদামতো কী একটা বসে আছে কিছু তফাতে—ভাঙা পাঁচিলের ওপর, তার নিচে একটা গভীর মজা কুয়ো রয়েছে। আমি কাকেও কিছু না বলে দৌড়ে চলে গেলুম—আর অমনি মনে হল সাদা কাপড়পড়া একটা মূর্তি উঠে দাঁড়াল। তারপর কাছে যেতে-না-যেতেই ভীষণ নিঃশব্দে কুয়োয় ঝাঁপ দিল—যেমন করে খানিকটা তুলো পড়ে যায়।'...

কুমকুম আরো সরে বলল, 'তারপর, তারপর?'

'প্রথমে ভাবলুম সবটাই হ্যালুসিনেসান—মত্তাবস্থায় কী দেখতে কী দেখেছি। কিংবা পুরো কল্পিত দৃশ্য। পরে ভাবলুম, তা কেন হবে? দিব্যি সব ইন্দ্রিয় টনটনে আছে—এতটুকু বুদ্ধি গুলিয়ে যায় নি। যা দেখেছি, তা একটুও মিথ্যে নয়। তখন বুক কেঁপে উঠল। ওদের ডাকলুম। টর্চ ছিল সঙ্গে। ব্যাপারটা বলতেই টর্চের আলো ফেলা হল কুয়োর মধ্যে। তখন দেখি কী জানেন?'

কুমকুম রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'কী দেখলেন, কী দেখলেন?'

'একপাশের দেয়ালে ফাটল থেকে গাছ গজিয়েছে—তার ওপর একটা সাদা কাপড় পড়ে রয়েছে। কাপড়টা ধুতি নয়—যেন সাদা সাড়িরই অংশ—খানিকটা ছেঁড়া। আমাদের কাছে এমন কিছু নেই, যাতে ওটা টেনে তুলে পরীক্ষা করি। কতক্ষণ পরে আমরা চলে এলুম। গাড়ি ছিল সঙ্গে। গাড়িতে ফেরার পথে আর কোন গন্ডগোল হয় নি।'

কুমকুম একটু চুপ করে থেকে বলল, 'দিনে গিয়ে আর পরীক্ষা করেন নি?'

'করেছিলুম। তবে মজার কথা, কাপড়ের টুকরো একটা ওইভাবেই আটকানো ছিল—কিন্তু রাতে যত সাদা মনে হয়েছিল, তত নয়। ময়লা ছেঁড়া খানিকটা ন্যাকড়া মাত্র।'

ঘাড় ঘুরিয়ে চাঁদ ওঠা দেখে কুমকুম বলল, 'কতদূরে জায়গাটা?'

'যেতে ইচ্ছে করছে নাকি?'

'হুঁ-উ!'

'কিন্তু ভূতকে ভীষণ ভয় পান মনে হচ্ছিল যে?'

'সঙ্গে কেউ থাকলে ভয় কিসের? চলুন না একবার—কতদূরে?'

'সে কী! অনেকখানি হাঁটতে হবে—আধঘন্টা লেগে যাবে। তাছাড়া এদিকটা খুব ভালো এলাকাও নয়। প্রায়ই ছিনতাই হয়।'

কুমকুম উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার কী নেবে? এই কাচের বালাদুটো? কানের পাথরটাও তো ঝুটো পাথর থাকে বলে! আপনার অবশ্য ঘাড় আছে। লুকিয়ে ফেলুন।'

কুমকুম গয়না পরে না—সেটা দেখছি, প্রসাধনেও খুব আসক্তি নেই—কেমন নিরামিষ টাইপ মেয়ে। ওর শরীরে বা চেহারায় প্রকৃতি যা দিয়েছে, হেসেখেলে তাই দিয়ে অনেক দীর্ঘ যৌবন কাটানো যায়। এবং সেজন্যেই হঠাৎ পুরুষের চোখে চমক আনার মতো মেয়ে না হলেও পরে—ক্রমশ গভীরতর চমকগুলো একে একে বেরিয়ে যেকোন পুরুষকে অসহায় পোষ্য ও নির্বোধ করে রাখার পক্ষে যথেষ্ট। যেমন আমার ক্ষেত্রে হয়েছিল। প্রথমদিকে ওর সম্পর্কে অসামাজিক কিছু ভাবিই নি—পরে ক্রমশ দেখছি ওর অস্তিত্ব থেকে একটা করে পাপড়ি খুলছে। এবং চোখ ট্যারা করে দিতে এ সবের জুড়ি নেই। এখন তো বলতে ইচ্ছে করে, অমরেশ, তুই পাচ্ছিস কী? শুধু তো একরাশ নরম মেদ—কসাইয়া যা পায়।

ব্যস্ত হয়ে বললুম, 'সত্যি সত্যি যাবেন বলছেন?'

কুমকুম ঝট্ করে আমার হাত ধরে টানল।...'ভ্যাট! বেড়াতে এসে চুপচাপ বসে থাকার মানে হয় না! দেখব-শুনব—ঘুরব—ছটফট করব, তবে না আনন্দ!' আমরা যখন ঢালু বেয়ে সাবধানে নামতে শুরু করেছি, তখন ও ফের বলল, 'সত্যি, আপনি না এলে কী যে করতুম! ও তো বেশিদূরে হাঁটতেও পারে না—তাছাড়া বাইরে থাকতেও চায় না বেশিক্ষণ। রেওয়াজ নষ্ট হবে যে! দুপুরে সেই নিয়ে লেগেছিল—'

'আপনাদের তাহলে লাগে?' হাসতে হাসতে বললুম কথাটা।

'আপনি বিয়ে করেন নি তো—তাই জানেন না। তবে দাম্পত্যজীবনের এই একটা আনন্দ। একটু-আধটু না লাগলে চলে? প্রেমভালবাসা একঘেয়ে হয়ে উঠবেই।'

'বাঃ! বলুন—শুনে অভিজ্ঞতা হচ্ছে।'

'আমার পরামর্শ নিতে চান তো শুনুন—যখন বিয়ে করবেন, খোঁজ নেবেন ঝগড়া করার ক্ষমতা আছে কিনা।'

'বলেন কী! ঝগড়া করতে ক্ষমতার দরকার হয়?'

'নিশ্চয় হয়।' কুমকুম একটা ছোট্ট পাথর ডিঙোবার সময় পাথরটায় উঠে আমার দিকে হাত বাড়াল—পড়ে যাবার আশঙ্কায় নিশ্চয়, এবং আমি হাতটা নিলুম এবং নেমে গেলে ছেড়ে দিতে গেলুম, ও ছাড়ল না। অজস্র পাথর পড়ে আছে এখানটায়। অল্প জ্যোৎস্নায় সাবধানে চলতে হচ্ছে। একবারের জন্যে হঠাৎ মনে হল, প্রকৃতির রাজ্যে গিয়ে পড়লে যেন অনেক ঘোরালো সমস্যার সমাধান খুব সহজেই হয়ে যায়। কুমকুম ফের বলল, 'সবার এ ক্ষমতা তো থাকে না। আমার ছিল না। এখন একটু একটু আসছে।

এরপর হবে দেখবেন হয়তো দিনরাত আপনার বন্ধুর সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছি!'

সকৌতুকে বললুম, 'অমরেশটা নির্ঘাৎ হেরে যাবে!'

'উঁহু। মোটেও না!'

'সে কী! ও তো ভীষণ গোবেচারা ছেলে ছিল বরাবর।'

'সেজন্যে নয়—ওর আত্মরক্ষা কিংবা আক্রমণের বড় অস্ত্র আছে।' ...কুমকুম খুব শান্তগলায় বলে উঠল। ...'সেটা কী জানেন তো?'

'না।'

'সঙ্গীতসাধনা।'

আমরা রাস্তায় নেমে এসেছি এতক্ষণে। ভ্রমণবিলাসীদের দু'একটা গাড়ি সুতীব্র আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে—দুজনে একপাশে সরে দাঁড়াচ্ছি। পথগুলো এবং রাস্তাটাও সংকীর্ণ। যেদিকে আমাদের কটেজ, তার উল্টোদিকে একটু হেঁটে বললুম 'তাহলে সত্যি যাবেন ওখানে?'

'হুঁ। তবে কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'সাপটাপ থাকতে পারে। আলো নেই সঙ্গে।' ...চিন্তিতভাবে বললুম। এবং সত্যিসত্যি সেই প্রাচীন ঐতিহাসিক দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখন আমার মনের ভিতর রহস্যতর আর দুর্গম আর রহস্যময় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অজস্র রক্তচান্ডাকরা ভুতুড়ে ব্যাপার যেন সেখানে ওঁৎ পেতে রয়েছে। সেইসঙ্গে অনুজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় চকচক করছে অসংখ্য পিচ্ছিল জিভ, ভীষণ পাশব এবং হিংস্র, অচরিতার্থ এবং ক্ষুধিত। সহস্রবাহু অতিকায় প্রাণীর মতো সেই ভাঙা দুর্গ হাঁটু চাটতে চাটতে চারদিকে নিঃশব্দে কোষবিভাজন করছে—সেই থলথলে আঠালো জ্যান্ত কোষগুলো ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে। গাছগুল্ম লতাপাতা ঘাসে লালায় ভিজে যাচ্ছে। অথচ কী প্রচন্ড নিবিড় আকর্ষণ তার! আমার প্রাণীজ সত্তাকে সে ক্রমাগত প্ররোচিত করে চলেছে।

কুমকুম বলল, 'আরে! এই আপনার ভূত দেখার পরিণতি? যার ভূত একবার দেখা হয়ে গেছে, সে কেন ভূতের ভয় করবে? আসুন!'

প্ররোচনার মতো লাগল। পা বাড়ালুম। 'চলুন—মন্দ লাগবে না। তবে ভূতের কোন গ্যারান্টি থাকে না কিন্তু।'

দুজনে একই সঙ্গে হেসে উঠলুম। তারপর কুমকুম গুনগুন করে উঠল।...

•

নারী ও জ্যোৎস্নার মধ্যে একটা অন্তর্গূঢ় মিল ছিল আছে, ওই পোড়ো দুর্গে না গেলে জানতে পারতুম না সে রাতে।

এদিকে আত্মসমর্পণের মৃদু গন্ধে চৈত্রের অস্থির বাতাস ধাচ্ছিল ভরে। শব্দময় উচ্চারণে স্পন্দিত হতে এবং ফেটে ছড়িয়ে যেতে চাচ্ছিল একটা গভীর বোধ। অথচ কোথাও চুপিচুপি পাহারা দিচ্ছিল একটা বাধা—দেখতে পাচ্ছিলুম ক্ষণেকের জন্যে সেই ভয়ঙ্কর হাবসী প্রতিহারীর শিরস্ত্রাণ। সে কি নীতিবোধ? বিবেক-বুদ্ধি? বারবার সে মনে পড়িয়ে দিল, অমরেশ অন্ধ—অমরেশ অন্ধ মানুষ! দূর শৈশবের দেখা একটা বিবর্ণ পড়ার বইয়ের পাতা ভেসে এল—অন্ধকে দয়া করো।

প্রকৃতির 'সৌন্দর্য' বেশিক্ষণ ভালো লাগে না। কে দাঁড়িয়ে থাকতে চায় অনন্তকাল নির্জন জ্যোৎস্নায়? বর্ণাঢ্য পুষ্পবিলাস একসময় চক্ষুশূল হয়। ঐতিহাসিক দুর্গের রহস্যময়তা, বসন্তকালের অল্পভাষী জ্যোৎস্না, প্রকৃতির করতলগত এই ভূমি—আস্তে আস্তে অপ্রয়োজনীয় হয়ে এল। অন্তিম আশ্রয়ের মতো সামনে রইল শুধু কুমকুম নামে এক নারী। তাকেই ভাল লাগল যে ভালোবাসার শেষসীমা কোথায় আপাতত দেখা যাচ্ছিল না। আমি শুধু ওর দিকেই তাকিয়ে রইলুম। ও অনর্গল কথা বলছিল এবার। ওর ছেলেবেলার গল্প, ওর পারিবারিক কিছু ঘটনা, এমনকি নিজের বিয়ের গল্প। বাবা-মায়ের সম্মতি না নিয়েই ও অমরেশকে বিয়ে করেছে—রাতারাতি রেজিস্ট্রি করে অমরেশের কাছে উঠেছে। খুব হঠাৎ ঘটেছিল ব্যাপারটা। একটা উগ্র ধরনের ঝোঁক চেপেছিল মাথায়। হ্যাঁ, ভাবা যায় না যে নিতান্ত গানের ছাত্রী হতে গিয়ে এরকম একটা অ্যাকসিডেন্ট ঘটে যাবে। অ্যাকসিডেন্ট? এখন তো তাই মনে হয় ওর। তবে কি ও অসুখী হয়েছে এ বিয়েতে? সেটা বলা খুবই কঠিন ওর পক্ষে। তবে মাঝে মাঝে কোন-কোন সময় হঠাৎ একটু বিরক্তি আসে নিজের ওপর। এটুকুই বলা সহজ। তা, গান নিয়ে ডুবে থাকলেই পারে! উঁহু, পারে না। কারণ, এতদিনে আবিষ্কার করেছে গানে ওর সহজাত ক্ষমতা কিছু নেই—নেহাৎ সখ। অমরেশ কিছুকাল ক্লাসিক শেখাচ্ছিল, দম নেই—ছেড়ে দিয়েছে। তারপর আস্তে আস্তে গান ব্যাপারটা যেন ওকে ছেড়ে যাচ্ছে। ও স্পষ্ট টের পায়। এবং ভালই লাগে। স্বস্তি আসে। কিন্তু অন্য কিছু তো দরকার—যা নিয়ে থাকবে! পড়াশুনো? এম-এটা দিতে ইচ্ছে করে—এখনও মাথায় আছে। তবে, এক ছটফটানি নিয়ে পাশ করা কোনদিনও হয়তো সম্ভব হবে না। একটা গুরুতর ঝড় উঠছে মনে হয় খালি। ব্যারোমিটারের পারা চঞ্চল হয়ে উঠছে ক্রমশ। '...আমি আমি ভীষণ—ভীষণভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ছি। জানিনা, শেষঅব্দি কী ঘটবে!'

কুমকুম চুপ করে সামনে পাঁচিলটার দিকে তাকিয়ে রইল।

এতসব আমাকে জানাবার কী দরকার ছিল ওর? আমি তো ওর স্বামীর বন্ধু! আমাকে এসব জানানো শোভন যেমন নয়, তেমনি সঙ্গতও নয়। আমাকে কেন বেছে নিল কুমকুম? নিছক বলে ফেলে হাঁফ ছেড়ে হালকা হওয়া? কেন—ওর বান্ধবী নিশ্চয় আছে কেউ-না-কেউ, তাদের বললেই সঙ্গত হত। একজন পুরুষকে বেছে পড়ে এসব শোনানো উচিত হল কুমকুমের—যে পুরুষ কিনা স্বামীর বন্ধু?

ওর স্বামীর এই বন্ধুর মধ্যে একটা ভীতু বোকা লাম্পট্য প্রায়ই চনচন করে ওঠে, ও জানে না। বস্তুত এমন একেকটা সময় এসে যায়, যখন চরিত্রহননের কান্নাকাটা বেজে ওঠে শরীরে।

অথচ কুমকুম অতসব কথা বলার পর লক্ষ্য করলুম, আমার মধ্যে একটা ঠান্ডা নিঃসাড়তা জেগেছে। ওর গভীর কন্ঠটা খুব স্পষ্ট হয়ে আমার অনেকখানি মমত্ব প্রার্থনা করছে। আমি আস্তে আস্তে বললুম, 'কেন অতসব ভাবেন? সকলেরই জীবনে কোন না কোন সমস্যা থাকে। না থাকাটাই সন্দেহজনক। তাই বলে আমরা তো সেই ইঁদুরজাতীয় অদ্ভুত প্রাণীগুলোর মতো দলবেঁধে সমুদ্রে মরতে যাইনে! দিব্যি আমরা বেঁচে থাকি।' হাসতে হাসতে আরও বললুম, 'একবছর পরে ফের যদি কোথাও দেখা হয়, হয়তো দেখব—চমৎকার সংসারী হয়ে ঘরকন্না করছেন। শুনেছি, প্রেমে ব্যর্থ মেয়েরা দারুণ হাউসওয়াইফ হয়ে ওঠে।'

কুমকুম হাসল না। ক্ষুব্ধভাবে বলল, 'আমি তো ব্যর্থ মেয়ে নই!'

মেয়েদের সঙ্গে জটিল আলোচনা করতে আমার ভালো লাগে না। বললুম, 'বেশ তো, তাহলে তো ভালই আছেন বলব।'

কুমকুম বলল, 'একদিক থেকে খুব ভালো নিশ্চয়।' তারপর একটু হাসল। ...'স্বামীভাগ্যে আমি ভাগ্যবতী বলতে পারেন। যখন বিয়ের জন্যে তৈরী হচ্ছি, অনেক বলেছিল অন্ধরা ভীষণ কুচুটে হয়, ঝগড়াপ্রবণ হয়। চোখে দেখতে পায় না বলেই তো...'

হঠাৎ থেমে সে অস্ফুটকণ্ঠে বলে উঠল, 'ওটা কী?'

আমরা বসেছিলাম একটা বড়ো পাথরের ওপর—পা ঝুলিয়ে—মধ্যে আগের মতো ছ'ইঞ্চি ফাঁক, জ্যোৎস্না পড়েছিল উঁচু পিছনের দেয়াল টপকে। কুমকুম একেবারে গা ঘেঁষে চলে এল সঙ্গে সঙ্গে। আমি ওকে না ধরলে পড়ে যেত নিচে। বললুম, 'কই কী?'

কুয়োর দিকটা দেখিয়ে কুমকুম বলল, 'আর তো কিছু দেখতে পাচ্ছিনে; কিন্তু হঠাৎ মনে হল, কে যেন দাঁড়িয়ে আছে।'

'আপনার চোখের ভুল নির্ঘাৎ। ওই গল্পটা বলেছিলাম কিনা!'

কুমকুম একটু হাসল ...'কিন্তু বুক ঢিপঢিপ করছে। বিশ্বাস করুন, ভীষণ ভয় পেয়েছি!'

আমি একলাফে নিচে নামলে কুমকুমও নেমে এল তক্ষুণি।...'দেখে আসি না—যদি এবারও আগের মতো কিছু মিরাকলের নমুনা পাই!' ...বলে আমি প্রাঙ্গণে হাঁটতে থাকলুম। কুমকুম পাশে ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করল।

কুয়োটার এসে আমরা দাঁড়ালুম। চারপাশে মোটামুটি ফাঁকা হলেও অজস্র উঁচুনিচু পাথরের টুকরো বা ভাঙা পাঁচিল রয়েছে। কিছু ঝোপঝাড় আর একটা করে গাছও আছে। আমার মনে একটুও ভয়—অর্থাৎ ভূতের ভয় নেই। কিন্তু কুমকুমকে কিছুটা আড়ষ্ট মনে হল। সে সন্দিগ্ধভাবে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। ওকে আশ্বাস দিয়ে বললুম, 'কোথায় কিছু নেই। আর বসবেন, নাকি ফিরে যাবেন?'

সেই সময় একটা বাতাস এল। কিছুক্ষণের জন্যে আমাদের গায়ের ওপর লাফালাফি করে চলে গেল। কুমকুম আবার ভয় পেয়ে আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল।

এবার একটু বিরক্ত হয়ে বললুম, 'কী মুশকিল! এত ভয় পাচ্ছেন মিছিমিছি, অথচ...'

কুমকুম আমাকে ছেড়ে মুখোমুখি ফিসফিস করে বলল, 'ভয় পেতে কিন্তু ভালো লাগছে!'

'তাই বুঝি!'

'হুঁ'! এক্ষুণি আবার যদি কেউ কোথাও দাঁড়িয়ে থাকে—ভীষণ ভয় পাব আর ভীষণ ভালো লাগবে!'

এই মুহূর্তে একটা অদ্ভুত দৃশ্য কেন জানিনা আমার মনে ভেসে উঠল। একটি মেয়ে—অবিকল কুমকুমের মতো, জ্যোৎস্নাময় এই উঠোনটায় শুয়ে দু'হাতে প্রতিরোধ করছে, ঠেলে সরিয়ে দিতে চাচ্ছে একটা পুরুষকে; সেই পুরুষের মুখমণ্ডলে চোখের বদলে দুটো কালো গর্ত—হয়তো দুটো ঠুলি, এবং মেয়েটি যেন হেসেও উঠছে—ঝড়ের মধ্যে ফুলের ছটফটানির মতো। যত ভাবলুম, এটা ভাবব না—তত বেশি দৃশ্যটা ভেসে উঠতে থাকল।

কী বলব, ভেবে পাচ্ছিলুম না। আমার মধ্যেকার ঠাণ্ডা ভাবটা বেড়ে যাচ্ছিল। খুব চেষ্টা করলুম, আবার গরম হয়ে উঠতে—পারলুম না। আমার ইচ্ছে করল, কুমকুমকে বলি—অমরেশকে ছেড়ে আমার পাশে চলে এসো, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট। তোমাকে ভালবাসতে পারব মনে হচ্ছে; এবং কুমকুম, অন্ধদের কোথাও যেন একটা দারুণ হিংস্রতার ব্যাপার থাকে, ক্ষমাহীন বিবেকহীন নিষ্ঠুরতার ছুরি তারা আড়ালে রেখে জীবনযাপন করে—সেই অনিবার্য দুর্ঘটনা তোমার এড়িয়ে যাওয়া উচিত।

কিন্তু ঠাণ্ডায় জমে গেলুম যেন। দেখলুম, আমি ভারি ক্লান্ত। এই রহস্যময় দুর্গের সকল রহস্যের অবসান হয়েছে। পড়ে আছে কিছু পাথরের টুকরো আর বানানো ভয়। এখানে সব অলৌকিকই এখন বানিয়ে নিতে হচ্ছে।

'চলুন—ফেরা যাক্। অমরেশ ভাববে।'

কুমকুম অনিচ্ছুক ভঙ্গীতে বলল, 'ফিরবেন? আমার যেতে ইচ্ছে করছে না।'

'কিন্তু ও ভাববে।'

'ও ভাববে না!'

'বাঃরে! অচেনা জায়গা—'

কুমকুম আমার একটা হাত হাতে তুলে নিল নিঃসঙ্কোচে। ...'আপনার সঙ্গে বেরিয়েছি, ও তো জানে?'

একটু ইতস্তত করে বললুম, 'তাহলে—এখানেই বসা যাক্।' বলে প্রাঙ্গণের শক্ত চত্বরে বসে পড়লুম। তারপর ফের বললাম, 'একটা শর্ত। ভূতটুত নয় আর। গান শোনান।'!

কুমকুম সুন্দর হেসে বলল, 'ভাগ্যিস এতদিনে একজন শ্রোতা পেয়েছি। ওর কাছে যারা আসে, তাদের তো আমার গান ভালো লাগবার কথা নয়—উচিতও নয়।'

'অমরেশ তো শোনে!'

'হ্যাঁ—শোনে, এবং পিঠ চাপড়ে বলে—তোমার হবে, চালিয়ে যাও।'

"হবে-টবে আমি অবশ্য বুঝি না। আপনার গান তো ভালই লাগল।'

কুমকুম গাইতে লাগল। আমি অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে ছিলুম অন্যদিকে। হঠাৎ মনে হল, বেশ খানিকটা দূরে পাথর আর ঝোপের মধ্যে কী একটা চলন্ত জিনিস অমনি লাফিয়ে উঠলুম। চেঁচিয়ে বললুম 'কে, কে?'

কুমকুম গান থামিয়ে হুড়মুড় করে উঠে দাঁড়াল।

কোন সাড়া এল না। কিন্তু এতক্ষণে টের পেয়ে গেছি, আমাদের সত্যি ফেরা উচিত বারবার নিজেদের বানানো ভয়ে আমাদের তাল এরপর ক্রমাগত কাটতেই থাকবে।...

●

কটেজে ঢুকে অমরেশের কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে আমরা অবাক হলুম। রাঁধুনী ব চাকর একজন স্থানীয় লোক। সে ঘরের ভেতর উঁকি মেরে বলল, 'ছিলেন তো কখন বেরিয়েছেন, বলে যাননি দেখছি এখানটায় বড় চোরের উপদ্রব—সর্বনাশ কিছু হারায়নি তো, মা?'

কঠিনমুখে কুমকুম দাঁড়িয়েছিল। হঠা সে ছিটকে বেরিয়ে গেল। আমি বেরিয়ে এসে বললুম, 'কোথায় যাচ্ছেন এমন করে নিশ্চয় সামনের রাস্তায় ঘুরতে বেরিয়েছে এক্ষুণি ফিরবে। বেশিদূর যেতে পারবে ন তো!'

কুমকুম দাঁড়াল না। তখন আমি ব্যস্ত ভাবে আমার ঘর থেকে টর্চটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। একদৌড়ে কুমকুমকে ধ ফেললুম। কুমকুম সেই দুর্গের দিকে যাচ্ছিল। তাহলে কি দুজনেই যা দেখেছি তা ভুল নয়—এবং...

কেউ কোন কথা না বলে হনহন ক এগোচ্ছি। কিছুদূর গিয়ে আমার মনে হল এভাবে বোকার মতো না খুঁজে ওর না ধরে ডাকি। কিন্তু যা ভাবছি, তা যদি হ ও কি সাড়া দেবে?

তবু ডাকতে লাগলুম বারবার—'অমরেশ! অমরেশ! অমরেশ!'

কোন সাড়া এল না। ডাকতে ডাকতে গলা ভেঙে গেল।

পোড়ো দুর্গটার কাছে আবার জোরে চেঁচিয়ে ডাকলুম। অশান্ত বাতাসে ডাক এলোমেলো হয়ে কোথায় ভেসে গেল কুমকুম হঠাৎ আমার হাত থেকে টর্চটা কেড়ে নিল। তারপর সামনের পাথরছড়ানো ঝোপ ঝাড়ে ভরা মাঠটার দিকে এগোল। যেভাবে ও হাঁটছিল, যেকোন মুহূর্তে আছাড় খে হাড় ভাঙার সম্ভাবনা। ঝোপের কাঁটায় ও কাপড় ছিঁড়ে যাচ্ছিল ফরফর করে, তা

লক্ষ্য করলুম। এদিক-ওদিক টর্চের আলো ফেলছিল কুমকুম।

কিছুদূর যাবার পর সামনে পাকা-রাস্তাটা ঘুরে গেছে মনে হল। ডাইনে পাথরভরা শক্ত জমি, বাঁয়ে একটা বিশাল পাথর পড়ে আছে। হঠাৎ এতক্ষণে টর্চের আলোয় আবছা একটা মূর্তি ভেসে উঠল পাথরটার কাছে—সম্পূর্ণ সাদা পোষাক। টলতে টলতে সে পাথরের দেয়ালে একটা হাত রেখে এগোচ্ছে—আছাড় খাবার মতো ঝুঁকে-পড়ে আবার সামলে নিচ্ছে—অন্য হাতটা ওপরদিকে শূন্যে কিছু হাতড়াচ্ছে। কুমকুম দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরে ফেলল।

একটু ধীরেসুস্থে সময় নিয়ে আমি ওদের কাছে গেলুম। কুমকুম ভেঙে পড়েছে অমরেশের গায়ে। অমরেশের চোখে কালো গগলস যথারীতি—সে একহাতে ওকে সামলে ধরেছে। তার ঠোঁট দুটো কাঁপছে। বিড়বিড় করে কী বলছে, বাতাসের শব্দে শুনতে পাচ্ছিলুম না।

রাস্তায় ওঠা অব্দি আমি কোন কথা বলিনি। অপরাধীর মতো পিছনে আসছিলুম। অমরেশের সাদা পাঞ্জাবি ছিঁড়ে গেছে। এখানে-ওখানে রক্তও লক্ষ্য করলুম। আমি আস্তে ডাকলুম, অমরেশ!!

অমরেশকে ধরে নিয়ে হাঁটছিল কুমকুম—ডাক শুনে একবার আমার দিকে তাকাল। জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দেখা গেল না। এবং অমরেশ হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'পথ হারিয়ে ফেলেছিলুম রে!"

নতুন করে মেঘ জমছে। ঝড় উঠবে, বৃষ্টি নামবে এবার। তাই কি, সারাদিন, সারারাত জুড়ে চলবে তাণ্ডব। গাছ-পালা, বাড়ি-ঘর ভেঙে পড়বে, তছনছ হবে একে-একে। হয়তো নিশ্চিহ্ন হবে চেনা আর অচেনা প্রতিটি মঠ, মন্দির, মানুষের প্রাচীন আবাস। চাই কি, তিনিও চলে যেতে পারেন।

ভাবতে ভাবতে বামা অর্থাৎ বামাসুন্দরী যেন অনেক দূরে চলে যাচ্ছিলেন। স্থান-কালের বিভেদ ঘুচিয়ে নিজের কাছ থেকে সরে যাচ্ছিলেন ক্রমশ। ভুলে যাচ্ছিলেন, এটা কংগ্রেস রোডের সেই বাড়ি যেখানে তাঁর অজ্ঞাতবাসের দিনগুলি চলেছে ভেসে, নাবিক আর নোঙরহীন নৌকোর মত স্রোতের খেয়ালে।

দশ বছর!

চমক লাগে যেন। কোথা দিয়ে যে আসে। আবার কেমন করে না জানি চলে যাচ্ছে সময়। ভাবতে অবাক লাগে আজ, শক্তি, সাহস আর সামর্থ্যে একদিন অটুট ছিল এই দেহ, এই মন। মেয়ে বলে মনেই হত না নিজেকে। যারা পর অথচ যাদের সঙ্গে ছিল প্রায় সারাক্ষণের চলা-ফেরা, ওঠা-বসা, সুযোগ পেলে নিন্দে করতো তারাই। আড়ালে দাঁড়িয়ে হাসাহাসি করতো কেউ কেউ।

বিদেশ-বিভুঁয়ে আপনার বলতে আর কে-ই বা ছিল তখন? সুখ-দুঃখের কথাগুলিই গোপন করে রাখার মত ঘনিষ্ঠ, নিকট?

একজন ছিল, শুধু একজন? অন্তর-
অঙ্গ ছিল সে-ই। নাম তার সুধীশ।

প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে। এতব
সংসারে কেমন করে একজন অন্যজন
খুঁজে পায়! বিশ্বাস করতে বাধো-বা
ঠেকে। স্বপ্ন নয়তো? নাকি ঠাট্টা? হা
পায়। নিজের দিকে চেয়ে অট্টহাস্যে ফে
পড়তে ইচ্ছে করে আবার।

বাস্তবিক, কী আশ্চর্য দেখা! জীব
অমন করে দেখা হয়? অমন আচমকা
একি নাটক? দৈবের যোগাযোগ? এক স
খেলা হত ভেবে। দৈব! সে তো মধ্যযুগী
[illegible] সূত্রপাত। অথচ ঘটনা য
ঘটে তখন আর একভাবে ছাড়া ব্যাখ্যা ক
মনে হয়, অচল, অসংগত।

বিলম্ব হয়ে গেছে। দিকে-দিকে সমবয়সিনীদের তখন ঘরে ফেরা শেষ। মুখ ফুটে বলা যাবে না কাউকে। কেমন করে যে দিন কাটছে তাঁর। অন্তরে বুকের ভেতরে শুরু হয়েছে কী তুমুল ঝড়!

'কেমন করে যাবেন?' প্রথম দিন। বামার ভয় হচ্ছিল। হাত-পা, বুকের ভেতরে থর-থর করছিল।

'তাই তো ভাবছি।' সুধীশ নিশ্চিন্ত, নির্বিকার। সারা মুখে রং লেগেছিল। যেন মঞ্চে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন তখনো। তেমনি গম্ভীর, আচ্ছন্ন মনে হচ্ছিল তাঁকে।

'যা শুরু হয়েছে! মনে হচ্ছে না তো চট করে থেমে যাবে।' গলায় আতংক ফুটিয়ে বামা আনমনা হতে চাইলেন। তিনি কি অস্বস্তি বোধ করছিলেন? আকাশের কাণ্ড-কারখানা দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলেন খুব? একটানা বৃষ্টি দেখে ছটফট করছিলেন ভেতরে-ভেতরে? অসময়ে এমন করে মেঘ জমে, না বৃষ্টি নামে কোনোদিন? গোটা ব্যাপারটাই মনে হচ্ছিল, একটা পাকা ষড়যন্ত্রীর কাজ। নইলে সুধীশ কেন এসেছিলেন? কেন? কে তাঁকে ডেকেছিল? তিনি নন। ইচ্ছে থাকলেও তিনি তা পারতেন না।

'শুনলাম অসুখ?' বিনীত ভঙ্গিতে সুধীশ এসে সামনে দাঁড়ালেন।

'এখন ভালো আছি।' জবাব বুঝি তৈরী করেই রেখেছিলেন বামা।

'একটু বসবো।' যেন অনুমতি চাইছিলেন সুধীশ।

ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। তিনি হাঁপাচ্ছিলেন। মুখে-চোখে ছায়ার মত ছড়িয়ে থাকা বিষাদ। সুধীশকেই রুগ্ন দেখাচ্ছিল বরং। হয়তো দীর্ঘ পথ পেরিয়ে আসতে হয়েছে একা। তিস্তোবার সময় ছিল না হাতে। মায়া হচ্ছিল। এমন মানুষকে বসতে বলা হয়নি! নিজেকে বার-বার ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করছিল তাঁর। খুব যত্ন করে হাত ধরে বসিয়েছিলেন সুধীশকে।

'ছাড়ুন। আমি অন্ধ নই, অথর্ব হয়ে পড়িনি এখনো। আমাকে হাত ধরে বসাবার কোনো মানেই হয় না।' বলতে বলতে তিনি হাসছিলেন, আর হাসতে-হাসতে বামার হাতে এগিয়ে দেয়া শ্রীনিকেতনী মোড়া ছেড়ে বিছনায় গা এলিয়ে দিয়েছিলেন।

বাধা দিতে পারেননি। বামা বরং বলেছিলেন, 'আপনি অতিথি।'

সুধীশ বলেছিলেন, 'থাক।' গম্ভীর, রহস্যময় চোখ তুলে চেয়েছিলেন। বামাকে দেখছিলেন। কেমন আড়ষ্ট বোধ করছিলেন বামা। বয়স যেন কমে গেছে। সময়ের পারদ নেমে গেছে পনেরো বিশ বছরের নিচে। আবছায়ার ভেতরে ঘর-দোর, আসবাব, এমনকি নিজেকে অবধি অদ্ভুত সুন্দর ঠেকছিল তাঁর। কান্না পাচ্ছিল বামার। খুব আস্তে করে বলেছিলেন, 'আপনাকে দেখে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে আজ।'

এতদিন হয়নি। শুধু আজ, এখন, এই মুহূর্তে। কেন? বামা বলেছিলেন, 'আপনি এভাবে আসেন আর কলোনির লোকে নানান কথা বলে।' একটু থেমে শুধরে দিয়েছিলেন হয়তো, 'আমি অবশ্য গ্রাহ্য করিনে কাউকে।'

কথাটা কীভাবে গ্রহণ করেছিলেন সুধীশ কে জানে। কোনো জবাব দেননি। চোখের পাতা বুজিয়ে অল্প হাসছিলেন। আচমকা উঠে বসেছিলেন তারপর। বামার দিকে একটুও না তাকিয়ে দেয়ালের কাছে এগিয়ে গিয়েছিলেন। আলো জেলে দিয়ে গলায় মমতা ঢেলে বলেছিলেন, 'বামী, লক্ষ্মীটি আমার। এবার তুমি বাইরে যাও। আমি ঘুমোবো নইলে বাঁচবো না।' নাটুকে মানুষ। চালচলন, কথাবার্তা সবই খাপছাড়া, সবই অদ্ভুত।

বলতে বলতে বামার কাঁধে হাত রাখলেন সুধীশ। চেয়ে দেখলেন না তাঁর চোখে কত জল। জোর করে ঠেলতে ঠেলতে বামাকে তিনি চৌকাঠের ওপারে পাঠিয়ে দিলেন। খুব মৃদু কিন্তু আদেশের সুরে বললেন, 'এখুনি বৃষ্টি শুরু হবে আবার। বৃষ্টি না থামলে আমাকে যেন জাগিয়ে দিও না, বামী।'

দরজা বন্ধ করে অসময়ে শুয়ে পড়লেন। যেন তিনিই মালিক। এই ঘর-দোর আসবাবের ওপরে বামার কোনো হক নেই, দাবী বলতে কিছু নেই আর।

তারপর বৃষ্টি নামল। অসময়ের বৃষ্টি। মেঘের পরে জমল মেঘ। পথ-ঘাট নদী হয়ে গেল। পুরোনো বাড়ির ছাদ আর দেয়াল পড়ল ধসে। রাস্তার মাঝখানে মুখ থুবড়ে পড়ল প্রাচীন বট কিংবা অশ্বত্থ। বাজ পড়ে গোটা বাড়ির বিজলির তার পুড়ে গেলে কেরোসিনের টেমি জ্বালিয়ে জীবনে প্রথম অন্যের জন্য, বিশেষ করে পুরুষমানুষের জন্যে বামা খুব যত্ন করে খিঁচুড়ি রান্না করে উনুনের পাশে বসেই কাঁপতে থাকেন। বৃষ্টি যদি না থামে আজ? সুধীশকে তিনি কোন মুখে ডাকবেন? দরজা খুলতে বলবেন কোন সাহসে? ভাবতে গিয়ে সারা গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। বুকের ভেতরে শীতল হয়ে জড়িয়ে আসছিল এতকালের সকল আক্ষেপ, সমস্ত যন্ত্রণা।

সারা রাত বৃষ্টি ছিল। দরজায় খিল তুলে নিঃসাড়, নিশ্চুপ পড়ে ছিলেন সুধীশ। বামাকে তাঁর মনেই পড়ে নি। ভোরবেলা জেগে উঠে দেখলেন, কোথায় ঝড়, কোথায় বৃষ্টি! আকাশ তেমনি নীল। আলোয় আর উত্তাপে ঝলমল করছে চারদিক। গাছের পাতা আরো সবুজ, আরো কোমল দেখাচ্ছিল তখন। জানলায় চোখ রাখতে গিয়ে হয়তো বামার কথা মনে পড়ল। মুগ্ধ চোখে মাঠ দেখলেন সুধীশ। মাঠের ঘাস ঘন আর মসৃণ মনে হচ্ছিল। পথ-ঘাট ধোয়া-মোছা, তক-তকে। ঘরে থাকার আর একটুও ইচ্ছে হল না তাঁর।

বাইরে বেরিয়ে এসে বামাকে খুঁজলেন।

আর তিনি তখন ভেতর থেকে কলঘরের দরজা এঁটে সশব্দ জলের ধারায় তাঁর ক্লান্ত, ধ্বস্ত শরীরের সমস্ত আবরণ খুলে ফেলে নিজেকে ঠিক কিশোরীর চোখ দিয়ে নিরীক্ষণ করছিলেন আর শোরাজীবনের মত স্নিগ্ধ, শান্ত, পবিত্র হচ্ছিলেন ধীরে ধীরে।

ইদানিং চলতে গেলে কষ্ট হয়। জোরে কথা বলা অবধি বারণ। সকাল হলে রণবীর একবার দেখে যায়। বিয়ে-থা করেনি, পসারও জমেনি তেমন। সদ্য-সদ্য পাশ করে বেরিয়েছে। বাপের পয়সায় চালিয়ে যাচ্ছে। সেন্ট্রাল পার্কের ওদিকে কোথায় ডিসপেনসারী ছোকরার। আসে রোজ। একবার করে খোঁজ নিয়ে যাওয়া চাই। মায়ের হুকুম। কর্মজীবনে ললিতার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল তিক্ততার। রণবীরের মা যদি খবর রাখতেন? মৃত বোনের স্মৃতির প্রতি কত শ্রদ্ধা, কত উৎসাহ! আহা, আছে থাক!

'কেমন আছেন, মাসীমা?'

'ভালোই তো।'

'মন্দ কী, বলুন?' হাসতে-হাসতে হাত, বুক, পেট তন্ন-তন্ন করে দেখবে সব। তারপর শাসনের সুরে বলবে 'উঁহু, এভাবে আর নয়। রাত্রে কিছু খেতে হবে আপনাকে।'

'খাওয়ার বয়স কি আমার আর আছে?'

'থাকবে না কেন? আমার মায়ের চেয়ে তো আপনি ছোট?'

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সেই একই পথে এনে দাঁড় করানো! সেই সময়, বয়স, বার্ধক্য! সর্বশেষ ললিতা, প্রেম, অপমৃত্যু! কী আশ্চর্য! কাছে থাকতে কেউ কারো বন্ধু ছিলেন না কোনোদিন। হতে পারেন নি; এখন আর ললিতা নেই। অবসর নিয়ে কর্মক্ষেত্র থেকে তিনিও সরে এসেছেন দূরে। এখন কী অবলীলায় তাঁকে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে সেই ললিতা! অথচ ললিতাকে যদি কেউ হত্যা করে থাকে সে তো বামা-ই!

সুধীশ বলেছিলেন, 'তোমাদের আমি বুঝতে চাই, অথচ দুর্বোধ্য অঙ্কের মত তোমরা যেন ক্রমশ জটিল।' দ্রুত পায়চারি করছিলেন। ভেতরে-ভেতরে ছট-ফট করছিলেন তিনি। মনে মনে হয়তো রুষ্ট।

ততদিনে সুধীশকে কাছে পেয়েছেন। ঘনিষ্ঠতা নিবিড় হয়েছে আরো।

অশান্ত, চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন বামা। কান্না চাপতে-চাপতে বলেছিলেন, 'তুমি আর এসো না, সুধীশ।' অস্পষ্ট, অনুক্ত কথাটাই তাঁর চোখে-মুখে ফুটে উঠতে চাইছিল ব্যথায়, ক্লান্তিতে, কালিমায়।

'কোনোদিন তুমিই কি আসতে বলেছিলে আমাকে?' বিরক্ত, ক্ষুব্ধ মনে হয়েছিল সুধীশকে।

'না, বলিনি।' কেঁদে উঠেছিলেন বামা। বলেছিলেন, 'তাই বলে কি বারণ করা যাবে না?'

জড়িয়ে আসা গলায় সুধীশ হয়তো কিছু একটা বলতে চেয়েছিলেন।

কান পেতে অপেক্ষা করছিলেন বামা।

'আমি তোমাদের ভালোবাসিনে। এই জন্যে, ঠিক এইজন্যে ভালোবাসতে পারিনে তোমাদের। না তোমাকে, না ললিতাকে, কাউকেই না।' তারপর খুব আস্তে করে অনেকটা আত্মগতভাবে বলেছিলেন, 'মন যেদিন বলবে আর না, যেদিন আমি-ও বলবো তবে থাক। অযথা দুঃখ পাচ্ছো কেন?'

'ললিতা তোমাকে ভালোবাসে না।' বামা বুঝি ফুঁসে উঠেছিলেন।

'সে খবর আমি রাখিনে।'

'তোমার নামে ও কেমন হয়ে ওঠে।'

'সে ওর নিজের ব্যাপার। তুমি হও না?'

'আমি সইতে পারিনে সুধীশ। তোমাকে নিয়ে আর কেউ ভাবুক সে আমি চাইনে।'

'পাগল, পাগল!'

বলতে বলতে পিছু হটছিলেন সুধীশ। মরিয়া হয়ে বামা তাঁকে জড়িয়ে ধরতে চাইছিলেন। দুহাতে জড়িয়ে চিরকালের মত বুকে বেঁধে রাখতে।

কিন্তু সুধীশ ততক্ষণে বাইরে। পৃথিবীর মানুষের কান্না, কোলাহল, কৌতূহলের স্রোতে নির্বিচারে গা ভাসিয়ে দিয়ে পরিত্রাণ পেতে চাইছিলেন। হায় রে দুরাশা!

বামা ভাবছিলেন সেই মানুষটির কথা, ঘরে যার বামা নেই, ললিতা-ও নেই অথচ বামা কিংবা ললিতার ঘরে জীবন বিপন্ন করা ভয়ঙ্কর সুন্দর আর মহৎ অভিজ্ঞতার মতই যিনি একমাত্র পুরুষ!

ফেলুর মা চলে যাবে। সন্ধ্যার পর সংসারের যাবতীয় কাজ সেরে সে তার সংসার, সন্তানের কাছে ফিরে যায়। আজ তাঁর ইচ্ছে হল বলেন, 'এই ঝড় জল বৃষ্টির ভেতরে তুমি আর যেও না ফেলুর মা।' কিন্তু জানেন, ফেলুর মা শুনবে না। শুনতে চাইবে না এসব। বনের পাখিটি অবধি সন্ধ্যা হলে ঘরে ফেরে। আর এ তো মানুষ। জল-জ্যান্ত, শক্ত-সমর্থ মেয়েমানুষ ফেলুর মা।

কথা ছিল রণবীর আসবে। পরীক্ষা করে দেখবে প্রেসার বেড়েছে কিনা। আকাশে নতুন করে মেঘ জমতে দেখে ছেলেটা হয়তো রাস্তায় নামতে সাহস করেনি আর। কাল কি আসবে আবার? আকাশে এমন ঘন, কালো, কদাকার মেঘ দেখেও ছুটে আসবে তাঁর কাছে? মনে মনে এঁচে রাখছেন, সকালবেলা সিঁড়িতে পা রাখতে না রাখতে ভেতর থেকে বলে উঠবেন, 'কোন দিশী ডাক্তার তুমি, রণবীর? এমন একটা দুর্যোগের রাত গেল, তুমি তবু ভাবলে না, দেখতে ছুটে এলে না। রোগী যদি তোমার মা হতেন?'

এমন করে কত দিন ভেবেছেন। হয়তো বাঁচবেন না। এবার চলে যাবেন। অথচ তারপরেও টিকে আছেন বেশ। আসলে মৃত্যুর কথা ভাবা মানেই জীবনকে বেশী করে চাওয়া। নইলে আজ আবার এমন হচ্ছে কেন? ফেলুর মাকেই বা থাকতে বলবেন কেন? অসময়ের মেঘ তাঁকে ভয় দেখাচ্ছে। হয়তো ঝড় উঠবে। মুষলধারায় বৃষ্টি নামবে যেন। আলো নিবে গেলে একলা অন্ধকারে তাঁর থাকা হবে দায়। আতঙ্কে বুকের ভেতরে কেমন করে।

ললিতা যেদিন যায় আকাশে মেঘ ছিল না সেদিন। অথচ কলোনির কাউকে জানতে দিলে না ললিতা, সে যাচ্ছে। চিরদিনের মত চলে যাচ্ছে এবার। দু'দিন পরে দরজা ভেঙে বার করতে এসেছিল পুলিশ।

মর্গে, শ্মশানে সারাক্ষণ ছায়ার মত ঘুরে বেরিয়েছেন সুধীশ। সবাই জানে, শিল্পী মানুষ খানিকটা খেয়ালি ধরনেরই হয়। কিন্তু তিনি কেন ছিলেন?' বামাসুন্দরী? সুধীশের মন থেকে ললিতাকে মুছে ফেলার প্রাণপণ বাসনাই কি ছিল না তাঁর?

সুধীশ নাটক ছেড়ে দিলেন! বামা মরে গেলে আর ললিতা বেঁচে থাকলে-ও কি নাটকে এমনি অরুচি হত তাঁর? কথাটা অনেকদিন ভেবেছেন বামা। সুধীশকে ঠিক বোঝা গেল না, চেনা হল না। অথচ মন থেকে মুছে ফেলা যাচ্ছে না তাঁকে।

অন্ধকারে মেঘ দেখা যায় না। ফেলুর মা হিসেবী মানুষ। যাবার আগে হাতের কাছে মোমবাতি, দেশলাই গুছিয়ে রেখে গেছে ঠিক। এমন করে সংসারী হওয়া গেল না। অথচ লোভ হয়। এখনো লোভ হয় কেমন। সময় থাকতে জীবনটাকে গুছিয়ে নিতে না পারার দুঃখ অহরহ পীড়ন করে তাঁকে। প্রথম প্রথম খারাপ লাগতো। এখন সহ্য হয়ে গেছে। একা থাকা, অন্ধকারে থাকা অভ্যাস হয়ে গেছে। এমন রাত্রে আলো না জ্বালিয়ে চুপ-চাপ বসে থাকতেই ভালো লাগে বরং।

মেঘের ডাক শুনতে-শুনতে বুকের ভেতরে তোলপাড় করে। সারারাত জেগে বসে থাকতে হবে এবার। চোখের ঘুম পাতলা হয়ে গেছে ইদানীং। এমন সময় আপনার বলতে কেউ নেই। একদিন দিদি বলতে অজ্ঞান হত মলি। আজ সে কোথায়? পুজোর পরে শেষ চিঠি লিখেছিল। তা-ও দায়সারা গোছের। মা বেঁচে থাকলে অন্তত প্রণবের সঙ্গে যোগাযোগটুকু থাকতো। সংসার বড় নিষ্ঠুর। মানুষের মত অকৃতজ্ঞ বুঝি নেই। নইলে মলি কেমন করে ভুলে থাকে? প্রণব? মা চলে যাবার পরে-ও বাবা কাউকে দূরে ঠেলে দেন নি। বরং বুকে টেনে নিয়েছিলেন অপোগণ্ড দুটি ভাই-বোনকে। বাবা মারা গেলেন অসময়ে। আত্ম-সুখ ভুলে গেলেন বামা। সেদিন যদি ঘরের বার হতেন? অন্ধকারে চমকে উঠলেন বামা। তাঁর চোখে জল। বুকের যন্ত্রণা নতুন করে দেখা দিচ্ছে ফের। অনেকদিন পরে নিজের কথা ভেবে কষ্ট হচ্ছে তাঁর। সুধীশ বলেছিলেন, 'ভালোবাসা-টাসা আমার আসে না। প্রেম আমার কাছে পেটখারাপের চেয়েও জঘন্য ব্যাধি। তাই বলে আমাকে একটা কিম্ভূতকিমাকার জানোয়ার বিশেষ ভাবলে ভুল করবে। মানুষকে আমি অপছন্দ করিনে একটুও। বরং তোমাদের চেয়ে মানুষের প্রতি আমার টান কিছু বেশী, কিছু গভীর।'

প্রমাণ দিয়েছিলেন সুধীশ। নইলে মলির বিয়ে হত না। প্রণব হয়তো চিরদিন তাঁর আঁচল ধরেই কাটিয়ে দিত। অথচ সুধীশ কিছু চায় নি, সুধীশ কিছু পায় নি। একদিন চাকরি ছেড়ে দিয়ে আচমকা এসে হাজির।

'এবার আমাদের সখের খেলা ভেঙে দিয়ে চললাম, বামী!'

'কোথায়?'

'তা তো জানিনে।' বলে থেমেছিলেন খানিক। শেষে কি ভেবে আস্তে-আস্তে বলেছিলেন, 'ঘর-সংসার আগলে পড়ে থাকা সম্ভব হবে না জেনেই ওসবের বালাই আমি রাখিনি। পিছুটান বলতে কিছু নেই আমার। তোমাকে তবু মনে রাখতে হবে। সময় পেলে যেখানেই থাকি চিঠি দেবো। প্রয়োজন হলে তুমিও যেন ডাকতে ভুলে যেও না।'

সখের দল ভেঙে গিয়েছিল সত্যি। নাটক আর জমে নি। কে করবে? ললিতা নেই। সুধীশ নিরুদ্দেশ। তিনি একাই আর যারা আছে তারা সংসার আর চাকরি নিয়ে ব্যস্ত। অথচ তাদের নিয়ে গুঞ্জনের অন্ত ছিল না। কলোনীর মানুষ বলতে ছিলেন যেন তাঁরাই।

কথা রেখেছিলেন সুধীশ। ছ মাস আগে মণিপুর থেকে চিঠি লিখলে, এক বছর পরে এসেছে রাজস্থানের মরুভূমির খবর। এমনি করেই চলছিল খেলা। তারপর কেমন শীতল হয়ে গেল সব। হয়তো চিরজীবনের মত চুপচাপ।

সুধীশ কি বেঁচে আছেন?

গত বর্ষায় শেষ চিঠি লিখেছিলেন বামাই। হয়তো ভেবেছিলেন, বাঁচবেন না।

কিন্তু কোথায় সুধীশ? তিনি কি ঠিক ঠিকানার মানুষ? নিত্য যার বাসা বদল করার স্বভাব, তাঁকে কি পুরনো বাড়ীর সদরে দাঁড়িয়ে ডাকলেই পাওয়া যায়! সুধীশেরও চিঠি আসে কি আর! বেঁচে আছেন? আছেন তো ঠিক? কথাটা মনের মধ্যে উদয় হল হঠাৎ। হাত-পা হিম হয়ে আসে বামার। সংসারে তাঁর যে কেউ নেই। আপনার বলতে কেউই নেই আর।

অনেক রাতে বাজ পড়ার শব্দে বাড়ি-ঘর কেঁপে উঠল হঠাৎ। অন্ধকারে আলো জ্বালাবার সাহস হল না। নাকি ইচ্ছে হল না তাঁর? শুয়ে-শুয়ে বারান্দায় মানুষের চলা-ফেরার অস্পষ্ট আওয়াজ শুনতে পেলেন বামা। কাউকে যে ডাকবেন কাছে-পিঠে তেমন মানুষ নেই। দু নম্বর ট্যাঙ্কের ওদিকে চিৎকার শোনা যাচ্ছিল কার। আজকাল নিরাপদে থাকার মত জায়গা কোথাও নেই। দিন-দুপুরে খুন হচ্ছে মানুষ। বড় অসহায় ঠেকে নিজেকে। দেখবার কেউ নেই। সেদিন [illegible] গা ভেসে পড়লে হত। [illegible] কার [illegible] হাতেই নিজেকে মার থেকে হত না? যদি দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতে হয়? শিউরে ওঠেন। মলি কি [illegible] প্রণব? অথচ রক্তের সম্পর্ক ওদের সঙ্গেই ছিল তাঁর। মুছে যায়, মুছে যায় [illegible] মুছে যায়। হৃদয়ের ক্ষত তবু থেকে যায়!

'কে? কে ওখানে?' চমকে উঠলেন বামা। শার্সির গায়ে অস্পষ্ট ছায়া নড়ে উঠল কার।

'আমি, আমি গো!' যেন দূরে সমুদ্রের ওপার থেকে পরিচিত কণ্ঠ শোনা গেল।

'এখন, এই অসময়ে?' বামা খানিক বিস্ময় বোধ করেন। কিছু ভয়।

'আমিই তো বলেছিলাম, সময় হলে ডাকতে।' আগন্তুক বুঝি গা ঘেঁষে দাঁড়াল। দেখা গেল না। চেনা গেল না সবটা। তবু বড় বেশী কাছের মানুষ বলে মনে হল তাকে। কেমন নিস্তেজ, নিস্পৃহ কণ্ঠ তার। তবু প্রাণের আবেগ লুকোতে পারছে না।

'কে তুমি?' বামা বিরক্ত হলেন। না চেনার ভান করেন বুঝি।

'ভুলে গেলে? বামী, তুমি আমাকে ভুলে গেলে?' দেয়ালের ওপারে কার আর্তনাদ শোনা গেল। ভয়ংকর অসহায়, পরাজিত মনে হল তাকে।

কুকুরের ডাক শোনা গেল বাইরে। পথের দু পাশে দেবদারু গাছগুলি এখন ঝড়ের পায়ে মাথা কুটছে। চারদিকে এক অদ্ভুত, চাপা উত্তেজনা। আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে হাওয়ায়। বামা ভাবলেন, দরজা খুলে দেবেন? বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে লোকটা। তাঁকে ডাকছে। সে যে-ই হোক, এখন বিপন্ন। বামা কি এই ঘরে অন্ধকারে নির্ভয়ে আশ্রয় দেবেন তাকে? দিতে পারেন?

'এই কি তোমার সময়?' খুব ভয়ে-ভয়ে সন্তর্পণে প্রশ্ন করেন বামা। যেন অভিযোগ করেন।

'তোমার অসময়েই আমার সময় হবে বলেছিলাম।' লোকটা পুরনো কথা শোনাতে চায়। কিছু গোপন কথা। কিন্তু বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে বামার। তিনি কি আসবেন? এখন, অসময়ে? বামাকে ভুলে যান নি তাহলে? কান্না পাচ্ছে। ভেঙে খান-খান হতে ইচ্ছে করছে বামার। তবু বিছানা থেকে নেমে মাটিতে পা রাখার সাহস হল না। দরজা খুলে নির্ভয়ে বলতে পারলেন না, 'এসো।'

ঝড় উঠল। প্রবল, দুঃসহ বেগে নামল বৃষ্টি। অন্ধকারে চুপ-চাপ বসে থাকতে হবে এবার। সর্বাঙ্গে অসম্ভব কাঁপুনি বোধ করছিলেন বামা। মনে মনে অপেক্ষা করছিলেন কার! এই ঘরে অন্ধকারে তিনি একা। বাইরে বারান্দায় নাকি ঝড়ের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আরেকজন? মাঝখানে দুর্ভেদ্য দেয়াল। সারা রাত, সারাটা জীবন এইভাবে, ঠিক এমনি করেই কাটিয়ে দিতে হবে। বামা হয়তো সেকথা জানেন। কিন্তু আগন্তুক?

অন্ধকার চমকে দিয়ে অনেক দূরে বাজ পড়ল কোথাও। প্রচণ্ড শব্দে বুকের ভেতরে কেঁপে উঠল বামার। ঝন-ঝনিয়ে বেজে উঠল শার্শি, দেয়াল, দরজার বন্ধ কপাট। বারান্দায় পরিচিত পায়ের শব্দ ক্রমশ দ্রুত, অস্থির, দুর্নিবার মনে হচ্ছিল।

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

কাছে আসতেই বিভা বলল, 'ইস, খিদেয় মুখ শুকিয়ে গেছে।'

অনিমেষ রুক্ষ গলায় ধমক দিল, 'খিদে খিদে করিস না তো তুই।'

বিভা রাগ করল না। খিল খিল করে হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখলেন তো, খিদে পেলে দাদার মাথা কী রকম গরম হয়ে ওঠে।'

কে বলবে বিভার মাথায় সময় সময় গণ্ডগোল হয়ে যায়। অনেক স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের চেয়ে বিভা অনেক বেশী বয়সের সুস্থ আর স্বাভাবিক।

বললাম, 'অনিমেষের মাথা গরম হয়েছে কিনা জানি না, আমার পেটে কিন্তু আগুন জ্বলছে।

বিভা শশব্যস্তে ভেতরের দিকে যেতে যেতে বলল, 'সত্যিই, আপনাদের কত খিদে পেয়েছে, আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসি-তামাশা করছি।'

অনিমেষের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই অনিমেষ চোখ ফিরিয়ে নিল।

আমি আর অনিমেষ খেতে বসলাম। বিভা পরিবেশন করছিল। ওদের মা একটা মোড়ায় বসে তদারক করছিলেন। কেদারবাবুকে দেখা গেল না। অনিমেষের মা বললেন, 'উনি অম্বলের রুগী, সকাল সকাল খেয়ে না ঘুমোলে ওঁর শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে।' কথাটা অনেকটা সাফাই গাওয়ার মত শোনাল।

এখানে চুপ করে থাকলে কী রকম বিরত বোধ হয়। বললাম, 'আমার বাবারও অম্বল ছিল।' কথাটা মিথ্যা না। বহু রোগের মধ্যে অম্বলও বাবার একটা রোগ ছিল, কিন্তু বাবা কখনও আগেভাগে খেয়ে শুয়ে পড়তেন না। বিশেষ করে যেদিন বাড়িতে অতিথি থাকত।

অনেক রকমের রান্না, সব খাওয়া যায় না। এক সময় করুণ মুখে বললাম, 'আর পারছি না। পেট ফেটে যাবার উপক্রম।'

বিভা তখনও এক হাতা ভাত নানা কৌশলে আমার প্রসারিত হাতের ফাঁক দিয়ে পাতে দিয়ে দেবার চেষ্টায় ছিল। ধমক দিয়ে বলল, 'হাত সরান। হারাধনের ছেলের পেট ফেটেছিল বলে সত্যি সত্যি মানুষের কী পেট ফাটে? ওসব গল্প।'

করুণ চোখে বিভার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'সত্যি সত্যি আর পারছি না বিভা, বিশ্বাস করো।'

'আপনি তো ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণরা খুব খেতে পারে।' বলতে বলতে বিভা হাতের ফাঁক দিয়ে এক হাতা ভাত পাতে দিয়ে দিল।

অনিমেষ হো হো করে হেসে উঠল। এতক্ষণ বাদে ওর মনের মেঘটা কেটে গেল। অনিমেষ বলল, 'বিভার হাতে পড়েছো বুঝিয়ে দেবে মজা, ও এখনও আমার পেট টিপে দেখে সেখানে কন্টেসন্টে আরও একটু ভাতের স্থান করে দেওয়া যেতে পারে কিনা।'

বিভা নকল রাগ দেখিয়ে বলল, 'তুমি চুপ কর। আজ তোমার দিকে নজর দিতে পারছি না বলে কিছুই খেলে না। আচ্ছা, আপনিই বলুন তো, দাদা রোগা মানুষ, ওর কি বেশী না খেলে পুষ্টি হয়।'

কী উত্তর দেব! বলতে চাইলাম, তোমার দাদা মোটা হয়ত না, কিন্তু তার মানে এই না যে, সে রুগ্ন বা রোগা। বেশী খাওয়ালেই মানুষ সবল হয় না বিভা, কখনও কখনও দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়ে। কিন্তু উত্তর দিলাম না। কী হবে বিভার বিশ্বাস ভেঙে দিয়ে।

খাওয়া-দাওয়ার পর হাঁটাচলা করতে কষ্ট হচ্ছিল। বিভা বলল, 'সামনের ঘরে আপনার আর দাদার বিছানা করে দিয়েছি। একটা জোর ঘুম লাগান, দেখবেন, সব হজম। তারপর বিকেলে—'

সভয়ে লাফিয়ে উঠলাম, 'আবার বিকেলে?'

বিভা খুব মিষ্টি করে হেসে বলল, 'পেট ভরা থাকলে মানুষের এরকমই মনে হয়। দেখবেন বিকেলে আবার খিদে পেয়ে গেছে।' বলে বিভা হাসতে হাসতে আঁচল দিয়ে মুখ চেপে ধরল। মুখ চেপে ধরল বলে এই মুহূর্তে ওর গালের টোল আমার নজরে পড়ল না। অথচ এই মুহূর্তে আমি তা দেখতে চেয়েছিলাম।

অনিমেষের মা যতক্ষণ বসেছিলেন, বিশেষ কথা বলেননি। ভদ্রমহিলা সময় সময় যেন বহু দূরে কোথাও চলে যাচ্ছিলেন। স্বামীর এই বিসদৃশ ব্যবহার কি ওঁকে পীড়া দিচ্ছিল! কিন্তু আমি তো কিছু মনে করিনি। বরং সব মিলিয়ে কেদারবাবুকে আমার খুব স্বাভাবিক মানুষ বলে মনে হতে লাগল। একবার আমার মা খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল। অনেক ডাক্তার ওষুধ-পথ্য করেও মার শরীর ভাল হচ্ছিল না। রোজ বিকেলের দিকে ঘুষঘুষে জ্বর হতো। অথচ মাকে সমস্ত দিন একলা থাকতে হয়। অফিসে গিয়েও মন দিয়ে কাজ করতে পারি না। একদিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে। সেদিন সকালে মা বেশ সুস্থ ছিল। খুশি মনে বাড়ি ফিরে এসেছি। ভেবেছিলাম, মার আর জ্বর আসবে না। কিন্তু কপালে হাত ঠেকাতেই গরম ঠেকল। সেই মুহূর্তে একটা অসহ্য রাগ আমার শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। মা যত হাসতে হাসতে বলছে, কাল আর জ্বর আসবে না, দেখিস তুই, আমার রাগ ততই চড়তে লাগল। শেষপর্যন্ত, ভাবতে এখন লজ্জা হয়, কী প্রচণ্ড চীৎকার করতে শুরু করেছিলাম। মা কবে আচার খেয়েছিল, কবে চান করে ঠিকমত চুল শুকোয়নি, কবে সর্দি নিয়ে পুকুরঘাটে গিয়েছিল বাসন মাজতে, সেই সব বলে মাকে বকাবকি করতে লাগলাম। মা একটা কথাও বলল না। হাসি-হাসি মুখে চুপ ক'রে বসে রইল। কেদারবাবুর রাগটাও হয়ত সেই অসহায়তার রাগ। মাকে সেদিন যে সুস্থ দেখতে পাইনি, সেটা ছিল আমার এক নিদারুণ

পরাজয়। সেই পরাজয়ের গ্লানি থেকে মুক্তি চেয়েছিলাম চেঁচিয়ে, মাকে বকাবকি করার মধ্য দিয়ে। মা বুদ্ধিমতী, আমার আক্রোশ বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু অনিমেষের মা সেই কথা বুঝতে পারেন না কেন? কেদারবাবু যে সব সময় রেগে থাকেন সে তো অনিমেষ আর বিভাকে ভালবাসেন বলেই!

শুয়ে শুয়ে অনিমেষ সিগারেট খাচ্ছিল। বললাম 'এভাবে সিগারেট খাও, চাদর-টাদর পোড়ে না?'

'পোড়ে, বিভা রিপু করে দেয়।' হাল্কা গলায় অনিমেষ বলল।

'তুমি শুধু শুধু ওর ওপর অত্যাচার কর।'

'তা করি। সময় সময় শার্ট-প্যান্টের আস্ত বোতাম ছিঁড়ে ফেলে আবার বিভাকে দিয়ে লাগিয়ে নিই। অনেক সময় ইচ্ছে করে ধুতির একটা জায়গা ছিঁড়ে ফেলে রিপু করাই।' অনিমেষ মজার কথা বলছিল, কিন্তু ওর গলার স্বরে কোন মজা ছিল না।

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, 'কেন?'

'ডাক্তার বলেছে, ওকে এনগেজড রাখতে। ছোট সংসারে সব সময় কাজ থাকে না, কাজ তৈরী করতে হয়। ভাবছি একটা গরু পুষবো।'

'বিভা দুধ দোয়াবে?'

'তা না, তবে দেখাশনো করবে, গরুর বাচ্চা হবে, তাদের আদর-যত্ন করবে। দরকার হলে কুকুরও পুষবো একটা। বেড়াল তো গণ্ডাকয়েক আছেই। দেখ না, সময় সময় বেড়াল নিয়ে কত আদর করে ও। ওরা ভালবাসা দিতেই জন্মায়।' অনিমেষ ঘন ঘন সিগারেটে টান দিতে লাগল।

প্রশ্ন করলাম, 'বিভার হঠাৎ এরকম হল কেন?'

'কি জানি।' বলে অনিমেষ কায়দা করে ধোঁয়ার রিং তৈরী করে চলল।

'ধরো অনিমেষ, সত্যি সত্যি তোমার যদি কোনদিন বিয়ে হয় তখন বিভাকে কে দেখবে। তার চেয়ে সব কথা বলে কারও সঙ্গে বিয়ে দিলে হয় না ওর।'

অনিমেষ লাফিয়ে উঠে বসল, 'বলো কী, সমস্ত জেনেশুনে পাগল ছাড়া কেউ ওকে বিয়ে করবে! আরও একটা পাগল এনে জোটাবো!' বলে অনিমেষ হেসে উঠল। যেন একটা দারুণ মজার কথা বলে ফেলেছে।

বিভার কথা বলতে বলতে মনটা ক্রমশই ভারী হয়ে উঠছিল। একটা পরিবার সুখী হতে গিয়েও কত দুঃখী হয়ে গেল। অথচ এর জন্যে কাউকেই তো দায়ী করা যায় না। সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রিয়ার একটা কথাও মনে পড়ে গেল। সুপ্রিয়া বলত, 'আমরা পারিপার্শ্বিকতার দাস। সেই যে একটা অদৃশ্য গণ্ডী যা আমাদের চারিদিক দিয়ে ঘিরে রেখেছে, তার সীমা অতিক্রম করার ক্ষমতা তো কারও নেই। তখন অবিশ্যি অনেক তর্ক তুলেছি, কিন্তু এখন মনে হতে লাগল, সুপ্রিয়া খুব জ্ঞানী মহিলা। জ্ঞানী কিন্তু রসকষহীন। শুধু কাজ, আর বাস্তব নিয়ে যে-মানুষ, তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা চলে, তার বেশী কিছু না। কয়েক দিন পর আজ আবার সুপ্রিয়ার কথা মনে পড়ল। এখানে এসে সুপ্রিয়াকে চিঠি দিয়েছি। হয়ত উত্তর দেবে না। উত্তর দেবার মত কিছু নেই বলেই দেবে না। যদি থাকতো, নিশ্চয় উত্তর দিত, আর সেই উত্তরটা একটা শুকনো চিঠি ছাড়া আর কিছুই হতো না। ইহা করিও, তাহা করিও না, বলে এক ঝুড়ি উপদেশ। মানুষ আর যাই পারুক, সহকর্মিণীর উপদেশ শুনতে পারে না। এক-এক সময় দারুণ অসহ্য মনে হয়। মনে হয় চাকরি-বাকরি ছেড়ে দিয়ে কোনও দূর দেশে চলে যাই, যেখানে সুপ্রিয়া নেই। কিন্তু কোথায় যাব, কে আমাকে চাকরি দেবে। কলকাতা ইউনিভার-সিটির গ্রাজুয়েট রাস্তায় ঘুরে ফেরি করে বেড়ায়, ঘরে বসে কাগজের ঠোঙা বানায়, কে আর আমাকে হাতে ধরে চাকরি দেবে। একলা হলেও কথা ছিল, মা রয়েছে সঙ্গে। শুধু মা মা। মার সঙ্গে রয়েছে একটা পূর্ণাঙ্গ ছবি। স্ত্রী, পুত্র, পরিবার। আমার বিয়ে হবে। আমার ছেলেপুলে সংসার, আর তার মধ্যে সম্রাজ্ঞীর মত মা ঘুরে বেড়াবে। বৌ মার কথা শুনবে, নাতী-নাতনীরা আদর-আবদার করবে, আর খুশি-খুশি মুখ নিয়ে সেই সংসার দেখাশুনো করবে মা। হঠাৎ মাকে দারুণ স্বার্থপর বলে মনে হতে লাগল। সেই পুরনো প্রশ্নটা আবার মনের মধ্যে ঘুরতে লাগল। মানুষ বাঁচে কেন? বাঁচে, যেহেতু সে মরতে পারে না। ফুসফুস, হৃদপিণ্ড ক্রমাগত কাজ করে চলেছে বলেই মানুষ বাঁচছে। শরীরের শিরায় শিরায় রক্তপ্রবাহ চলছে বলেই মানুষ বাঁচছে। এই বেঁচে থাকাটার জন্যে তার বিন্দুমাত্র পরিশ্রম করতে হচ্ছে না। যদি হতো, আমি হলপ করে বলতে পারি, অনেক মানুষ দিব্বি শুয়ে থাকতে থাকতে ইচ্ছামৃত্যু বরণ করে নিত। যেমন নিয়েছিলেন ভীষ্ম। আচ্ছা, ভীষ্মের কী সত্যি সত্যি ইচ্ছামৃত্যু হয়েছিল।

অনিমেষ উপুড় হয়ে শুয়েছিল। ওর পিঠে ঠেলা দিয়ে বললাম, 'আচ্ছা অনিমেষ, একটা কথার ঠিকঠাক উত্তর দিতে পারবে?'

'বলো।' আওয়াজ শুনে প্রশ্নে হল অনিমেষের চোখে ঘুম এসে গেছে।

'আচ্ছা, ভীষ্ম কি ইচ্ছে করে মরে গিয়েছিলেন?'

অনিমেষ তড়াক করে বসে পড়ল, 'হোয়াট?'

ওর এই হঠাৎ উঠে বসায় কী রকম বিব্রত বোধ করতে লাগলাম। বললাম, 'কথাটা হঠাৎ মনে হল। মহাভারতের ভীষ্ম ছিলেন না, তাঁর কী ইচ্ছামৃত্যু হয়েছিল?'

অনিমেষ রেগে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি জানবো কী করে। আমি কি সেই সময় জন্মেছিলাম!'

অনিমেষের রাগ দেখে আমার বিষম হাসি পেয়ে গেল। হাসতে হাসতে বললাম, 'চেঙ্গিস খান কিম্বা বাবর বা আকবর, কিম্বা মীরাবাঈ, কিম্বা রবীন্দ্রনাথ, কিম্বা বিবেকানন্দ, কিম্বা রামকৃষ্ণ, তুমি তো কাউকেই দেখোনি অনিমেষ; কিন্তু তাঁরা কে কিভাবে মারা গিয়েছেন তুমি নিশ্চয় জানো। সবার কোন জানা না থাকলেও কয়েক-জনের খবর জানো নির্ঘাৎ। তবে?'

অনিমেষ আবার শুয়ে পড়ল। ওর পিঠে ঠেলা দিতে দিতে বললাম, 'শুয়ে পড়লে কেন, উত্তরটা দাও। দারুণ ইণ্টারেস্টিং ব্যাপার চলেছে এদিকে।'

শুয়ে শুয়েই অনিমেষ বলল, 'কোন্-দিকে?'

'আমার মস্তিষ্কে। আমার আইডিয়া হচ্ছে, মানুষকে যদি চেষ্টা করে বাঁচতে হতো, যেমন কষ্ট করে ফুসফুসকে দিয়ে হাওয়া টানানো বা হৃদপিণ্ডকে দিয়ে রক্ত পাম্প করানো, কিম্বা ইরিগেশন ক্যানালের মত শিরাগুলোকে মাঝে মাঝে পরিষ্কার করার দায়িত্ব যদি মানুষের ওপর থাকতো, কিম্বা—'

কথার মাঝখানেই অনিমেষ ধমক দিয়ে উঠল, 'কী আশ্চর্য, বেশী খেয়ে কী তোমার মাথায় গণ্ডগোল হয়ে গেল! কী বকছো তখন থেকে। একটু ঘুমোতে দাও।'

'না, আগে কথাটার উত্তর দাও।' বলে অনিমেষকে ঠেলাঠেলি করছিলাম, ঘরে ঢুকল বিভা। ওর হাতে ছোট একটা প্লেট। বিভা বলল, 'পান সেজে রেখে-ছিলাম। একেবারে ভুলে গেছি। নিন।'

'তোমার খাওয়া হয়েছে?' বিভাকে জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ।'

'কেমন খেলে?'

মুখ কুঁচকে বিভা বলল, 'ভীষণ বাজে।'

'আর আমার কী মনে হচ্ছে জানো! মানুষ যদি কোন একটা প্রক্রিয়ায় গরুদের মত সমস্ত খাবার আবার রোমন্থন করতে পারতো।' আমার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিভা হেসে উঠল। এবার আর আঁচল দিয়ে মুখ চেপে ধরল না বিভা। ওর গালের টোল দুটো পরিষ্কার দেখতে পেলাম। দেখতে পেয়ে ভাল লাগল।

অনিমেষ ধমক দিল, "সায়লেন্স"।

বিভা বলল, 'দাদা ভীষণ ঘুমোয়। ছুটির দিনে কোথাও যাবে না, শুধু শুধু ঘুমোবে।'

অনিমেষ উত্তর দিল না। দুপুরে ঘুমোতে আমার ভাল লাগছিল না। মনে হচ্ছিল, একটা দিন শুধু শুধু নষ্ট হয়ে যাবে। বিভার দিকে তাকিয়ে বললাম, আচ্ছা বিভা, আমার একটা কথার ঠিকঠাক উত্তর দাও তো?'

'বলুন।' বিভা শান্তভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

'ভীষ্ম কি নিজের ইচ্ছায় মরেছিলেন?'

(ক্রমশঃ)

দশটা-পাঁচটার কেরানী, ছটা-নটার প্রাইভেট টিউটর! বাসস্টপে দাঁড়িয়ে আছি আধ ঘণ্টার ওপর। বাঘ মার্কা এক একটা সিঙ্গল কি ডাবল্ ডেকার এসে দাঁড়ায়—দুঃসাহসীরা জোড়া জোড়া সঙ্গীন উঁচিয়ে ধেয়ে যায়। আমার দু দুটো হাত থেকেও হাত নেই—কোনবার হাতলের নাগাল পাই না!—মরিয়া হয়ে শেষপর্যন্ত ঝুলন্ত কোন ভদ্রলোকের জামার খুঁট কি কোন ভদ্রমহিলার শাড়ির আঁচল আঁকড়ে ঝুলে পড়ি—জুতো খেয়ে রাস্তার ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে যাই;

পড়েই থাকি, ভাবি, আর উঠব না কোনদিন!

উঠতে হয়! উঠে গা হাতের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে মস্তিষ্কে আগুন অনুভব করি। অনাহারে মৃত্যু নয়, বেকারী নয়, উগ্র রাজনীতি নয়—বাসে ওঠা ছাড়া কোন সমস্যা নেই দেশে। এ দেশে জন্মেছি যখন, আমার সব সমস্যার সমাধান করে ফেলব আজ বাসের চাকায়!

বাসের চাকার স্পর্শ পেলাম গর্দানে! চমকে পিছনে ফিরে দেখি থাবা একটা—ফর্সা সুডোল লোমশ একটা হাত!

হাতের মালিক হেসে আত্মপ্রকাশ করল, চিনতে পারলি না—আমি দীপেন।

কাপুরুষ

চণ্ডী মণ্ডল

দীপ্তেনকে চিনতে পারব না! পাল্টা হেসে জবাব দিলাম, চিনতে পারিনি নয়—ভরসা পাচ্ছিলাম না!—কিন্তু আমাকে এত-দিন পরে তুই চিনলি কেমন করে?

দীপ্তেন বলল, তোকে খুব খুঁজছিলাম মনে মনে।

সত্যিই দীপ্তেনকে দেখে মনে হচ্ছে কাউকে সে সত্যিই খুঁজছিল এক মনে!

বললাম, আমাকে মনে মনে খুঁজছিলিস—ব্যাপারটা কী রকম?

দীপ্তেন বলল, হ্যাঁ, তোর সঙ্গে এরকম দেখা হয়ে যাবে এতটা অবশ্য ভাবি নি, দেখা হয়ে যেতে এখন মনে হচ্ছে তোকেই আমি খুঁজছিলাম!

বললাম, ভাল, তা বল কেন খুঁজছিলি?

সে কথা কি এখানে এইভাবে [illegible] বলা যায় নাকি!—চল আমার সঙ্গে। [illegible] থেকে বাড়ী ফিরছিস ত?—কী চাকরী!

বললাম, চেহারা কী বলে?

হ্যাঁ, খুব রোগা হয়ে গেছিস!

তুই কিন্তু বেশ হৃষ্টপুষ্ট—দিব্যি অবাঙালী অবাঙালী করে তুলেছিস চেহারাখানা!—কোথায় আছিস এখন?

একটা আধা-বিলাতী কোম্পানীতে, একসিকিউটিভ র‍্যাঙ্কে,—সামান্য।

হ্যাঁ শুনেছিলাম, মনে পড়েছে।

সত্যি মনে পড়ে না, কবে সেই [illegible] দেখা হয়েছিল—। শোন প্রমথ, বাড়ী ফেরা ছাড়া তোর জরুরী কোন কাজ নেই ত আপাতত? ভাল কথা, কে কে আছেন বাড়ীতে—বিয়ে সাদী করেছিস নাকি?

বললাম, বিয়ে?—পাগল!

গুড্‌!—চল।

কোথায়?

চল না।

যাব?

যাবি না মানে?

না পোশাকআশাকে, চেহারায় এমন দীপ্ত ব্যক্তিত্ব দীপ্তেনের, নিয়তির মত এড়ানো অসম্ভব! ওর পাশে হাঁটতে সঙ্গত কারণেই সংকোচ হচ্ছে খুব, কিন্তু প্রায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাঁটতে হচ্ছে! কথা চালিয়ে যেতে হচ্ছে, ভাবনা, চিন্তা, রুচি অভিরুচিতে—কোন [illegible] দুজনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই এমন ভাবে।

একটা রেস্তোরাঁর সামনে এসে থামল দীপ্তেন।

[illegible] একপাশে রেস্তোরাঁয় রঙীন [illegible] একটা পোস্টার টাঙানো। প্রায় নগ্ন একটি মেয়ের নাচের ভঙ্গীমা আঁকা সোনালী রঙে।

দীপ্তেন বলল, মিস্‌ অনীটার প্রোগ্রাম আছে আজ।

মিস অনীটা?

একটা মেয়ে—ক্যাবেরা গার্ল। সুইট!—এক মিনিট! দীপ্তেন দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

সমান সংখ্যক নারীপুরুষের ছোট ছোট দল ভেতরে ঢুকছে। এই শ্রেণীর নরনারী, নরনারীর এই রকম পোশাক আশাক আমার দেখা আছে, এই রকম রেস্তোরাঁর বাইরেটাও দেখেছি, কিন্তু ভেতরটা—আসল দেখার জিনিসটা দেখা হয় নি কখনো। যারা দেখেছে যা রোজই দেখে যারা তাদের কারো সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেনি কখনো। আজ পরি-চিত এমন একজন দাঁড়িয়ে [illegible]—দীপ্তেন বেরিয়ে এল।—ম্যানেজ করেছি একটা টেবিল—আয়!

আমার হাত ধরে [illegible] আমাকে দীপ্তেন ভেতরে ঢুকিয়ে নিল। যেন নিজের কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

দেখি বিরাট একটা হল ঘরের মত। ডিমের আকৃতি। প্রায় [illegible] একটা রং। ছাদটা ঠিক মাথার ওপর আকাশের। [illegible] আকাশ যেমন হয়। ফুটে আছে গুঁড়ি গুঁড়ি আলো। নীলচে জ্যোৎস্নার মত আলোয় রেস্তোরাঁটাকে মনে হচ্ছে যেন হেঁয়ালী একটা! মঞ্চে কিন্তু তীক্ষ্ণ আলো—চোখ ধাঁধিয়ে যায়। চার পাঁচজন লোক কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে কী বাজনা বাজিয়ে চলেছে। বোধ হয় জ্যাজ।

সমস্ত টেবলই ভরে গেছে মনে হচ্ছে। তামাক আর মদের উগ্র গন্ধের সঙ্গে পুরুষ-দের হুল্লোড় আর মেয়েদের হাসির এমন ককটেল যত্নে আমাকে কি আহ্বান জানাবার জন্যে আনা হল? বললাম, দীপ্তেন এ কোথায় নিয়ে এলি রে?

কেন, নিরিবিলি না বেশ! কথা বলবার এমন জায়গা এই শহরে বেশী নেই জানিস ত?

তাই নাকি?

ওয়েটার এসে দাঁড়াল। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দীপ্তেন বলে গেল, টু চিকেন রোস্ট—টু হুইস্কি—লার্জ।

সিগারেট ধরাতে ধরাতে দীপ্তেন হঠাৎ বলে উঠল, লাইফ প্রবলেম, লাইফ ইজ জাস্ট আ চান্সেস আন্ড অ্যাকসিডেন্টস! আমার দিকে বাড়িয়ে দিল তার অত্যন্ত দামী সিগা-রেটের সোনালী প্যাকেটটা।

অপরাধীর মত প্যাকেটটা থেকে একটা সিগারেট তুলে নিলাম।

দীপ্তেন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। বলল, কী?

বললাম আমার লাইফ কিন্তু জাস্ট অফ অ্যাকসিডেন্টস!

কী রকম শুনি?

বাবা মারা গেলেন—।

কত দিন হল?

দু' বছর হয়ে গেল।

কিছু রেখে গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ, তাঁর বিধবা পত্নী—নিত্যরোগিণী আমার মা, একটি বিবাহযোগ্যা রুগ্না কন্যা, একটি অর্ধশিক্ষিত বেকার পুত্র এবং আমাকে—তাঁর স্বপ্নের সংসারকে বাস্তব রূপ দেবার দায়িত্ব দিয়ে।

বুঝলাম—কিন্তু এটা বুঝতে পারছি না প্রমথ, তুই একটা ভাল চাকরী কেন পেলি না?

জীবনে আমার কোন চান্স এল না দীপ্তেন, তাই ত মাঝে মাঝে খুব আশ্চর্য লাগে এখন আমি, কেমন এমন হল। এক এক সময় কী মনে হয় জানিস—মনে হয়, আসলে আমার হয়ত কোন যোগ্যতা ছিল না!

তাই কি?

তাছাড়া আর কী বলব বল?

প্রমথ, যদি কিছু মনে না করিস বন্ধু হিসেবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি—তুই যা মাইনে পাস তাতে তোদের সংসার চলে?

চলে না ত। দুটো টিউশানী করি—তবু চলে না! আর সংসার না চালাতে পারলে যে কী যন্ত্রণা সে তুই—দীপ্তেন, কী বলব—আমার সুখ নেই এক মুহূর্ত—একটুও আনন্দ নেই আমার এই বেঁচে থাকায়! আমি বেঁচে নেই দীপ্তেন!—থাক্‌, আমার কথা! তোর কথা বল শুনি—কেমন আছিস তুই?—মনে পড়ে সেই সব কথা! মাত্র ক'বছর আগের কথা, অথচ মনে হয় যেন গতজন্মের কথা! আমরা দুজনে কী বন্ধুই না ছিলাম!—তুই কবিতা লিখতিস। রোজ সন্ধ্যায় সস্তা একটা রেস্টুরেন্টের অন্ধকার কোণে বসে তোর ডাইরির পাতা থেকে কবিতা পড়ে শোনাতিস—একটার পর একটা, কবিতা আর ফুরোয় না! রোজ রাত্রে কতগুলো করে কবিতা লিখতিস তুই? মনে

মোটে তা ও নয়—আনস্মার্ট, আনকালচার্ড—দেহসর্বস্ব! ওই যে মেয়েটা নাচছে আর এই যে সব মেয়ে আনন্দ করছে—এদের কারো চেয়ে একটুও আলাদা নয় সুপর্ণা!

তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে দীপেন্দ্রন? —চল এখান থেকে।

কোথায়, কোথায় যাব প্রমথ? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! আমাকে সব কথা বলতে দে। লেট মি কনফেস টু ডে। তুই জানিস না, সুপর্ণাকে বিয়ে করার ছ'মাসের মধ্যেই আমি আলাদা ফ্ল্যাট নিয়েছিলাম!

সে কী?—তুই তোর বাবামার একমাত্র সন্তান!

হ্যাঁ কিন্তু সুপর্ণাকে ওরা মানিয়ে নিতে পারেনি। আসলে সুপর্ণা ওদের সহ্য করতে পারেনি। আমিও সুপর্ণার মতে মত দিয়ে ওদের সহ্য করতে পারিনি। সুপর্ণা স্বাধীনতা চেয়েছিল। আমিও তাই চেয়েছিলাম। অবশ্য এতে আমার বাবা-মার তেমন কোন অসুবিধা হয়নি, হবেও না কোনদিন। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আমাদের বরাবর ছিল। বাবা খুব ভাল চাকরী করতেন। রিটায়ার্ড করার পর থেকে বাবা মাসে মাসে সাতশ টাকা করে পেনসন পেয়ে আসছেন। ব্যাঙ্কে বাবার প্রচুর টাকা আছে—তা প্রায় পাঁচ লাখ ত হবে। বাড়ীতে ঝি-চাকর আগের মতই আছে সব। আমি না থাকলে—অবশ্য স্টীল আই অ্যাম দেয়ার চাইল্ড—চিরদিন আমি ও'দের সন্তান থাকব। আমি জানি আমার ওপর ও'দের দুর্বলতা আছে, চিরকাল থাকবেও। ও'দের মৃত্যুর পর ও'দের সব টাকা আমিই পাব। বাট আই কেয়ার লিটল ফর মানি। আমার সামনে এখন একটাই সমস্যা—হাউ আই ক্যান ডিভোর্স সুপর্ণা। অ্যান্ড আই মাস্ট ডিভোর্স হার! আই মাস্ট ফাইন্ড এ ওয়ে আউট!—একটা উপায় আমাকে বের করতেই হবে!

কী বলার আছে আমার, বললাম, পাঁচ বছরের ওপর তোদের বিয়ে হয়েছে—তোদের কোন ছেলেপুলে—?

তুই এখনো ছেলেমানুষ আছিস প্রমথ, স্পিকিং লাইক এ চাইল্ড।—আমার জেনারেশন বৃদ্ধির জন্যে সুপর্ণাকে আমি বিয়ে করিনি। আই হেট দ্যাট।—সী ওয়াজ প্রেটি, ও তখন সুন্দরী ছিল, স্মার্ট ছিল—আমার মনের মত ছিল। কিন্তু ও এখন ঘর চায়, সংসার চায়।

তুই এসব চাস না?

চাই। হাজার বার চাই, লক্ষ বার চাই—আমার চেয়ে এত বেশী করে চায় আর কে আছে দ্বিতীয়জন! কিন্তু দ্বিতীয়জন কারো মত করে আমি ওসব চাই না! আমার আর সুপর্ণার চাওয়ার মধ্যে এখন মস্ত ব্যবধান। দুজনের চাওয়ার চরিত্র এখন সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেছে। দুজনের সম্পর্কে যে ফাটল ধরেছিল একদিন, এখন সেটা হয়ে গেছে গিরিখাতের মত ভয়ঙ্কর। সুপর্ণা যা হতে চায়, মধ্যবিত্ত ঘরের সাধারণ বধূ হতে চায়। তাহলে কাবেরীর থেকে আলাদা কী ও? কাবেরীকে যদি বিয়ে করতাম কী বেশী ক্ষতি হত আমার?—কাবেরীকে আমার জীবন থেকে চলে যেতে হয়েছে।— ওকেও আমার জীবন থেকে চলে যেতে হবে!—এখন শুধু কয়েকটা মন্তর বাঁধনে ওর জীবনের সঙ্গে আমার জীবন বাঁধা আছে।—আই ওয়ান্ট টু বী ফ্রী ফ্রম দ্যাট বণ্ডেজ।

জিজ্ঞাসা করলাম, তুই ওকে ভালবাসিস না?

আমি ভালবাসি এ্যাঞ্জেলাকে।

এ্যাঞ্জেলা?

আমাদের কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টার থাপ্পার মেয়ে। থাপ্পা পাঞ্জাবী। বিয়ে করেছিল ইংলিশ লেডীকে। বিয়ের পনের বছর পরে সেই লেডী থাপ্পাকে ডিভোর্স করে ইংল্যাণ্ডে ফিরে গিয়েছিল।—থাপ্পার বয়েস হয়েছে। ক'বছর পরেই রিটায়ার্ড করবে।—আমি যদি ওর মেয়েকে বিয়ে করতে পারি—। মেয়ের ওপর থাপ্পার ভীষণ দুর্বলতা। রিটায়ার করার আগে থাপ্পা নিশ্চয় আমাকে বড় একটা কার্যের একজিকিউটিভে পোস্টেড করে দেবে। ওর ভীষণ রেপুটেশন ইণ্ডাসট্রিয়াল ওয়ার্ল্ডে! তাছাড়া থাপ্পা ভাস্ট প্রোপার্টির মালিক। কলকাতার একখানা বাড়ী, দিল্লীতে একখানা বাড়ী—ব্যাঙ্কে আট-দশ লাখের ওপর টাকা আছে।—নতুন একটা গাড়ী কিনেছে থাপ্পা—ক্যাডিলাক!—ওয়েটারকে ডাকল দীপেন্দ্রন হাতের ইসারায়। আমার মুখের দিকে তাকাল।—তুই কি কিছুই খাবি না প্রমথ? ওয়েটারের দিকে ফিরে অর্ডার দিল—হুইস্কী ডবল পেগ।—সিঙ্গল পেগ।

হুইস্কী এসে গেল।

বললাম, দীপেন্দ্রন, এ্যাঞ্জেলা তোকে ভালবাসে?

ইয়েস!—সী লাইকস মী!

কখনো কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিস তোরা?

অনেকবার!—দিল্লী, বম্বে গেছি একসঙ্গে।—কানের কাছে মুখ এনে বলল

(এক)

'কি আশ্চর্য ! তুমি এখনো ঘুমোচ্ছ ?'

অম্বর ঘুমুচ্ছে না। তন্দ্রার আবেশে স্বপ্নের মধ্যে ডুবে আছে। রোজই থাকে। রোজ সকালে। ভোরের দিকে মিঠু উঠে যাবার পর সকালবেলার সলজ্জ রোদের প্রথম আত্মপ্রকাশের সময় ও রোজ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে বিছানায় পড়ে থাকে। স্বপ্ন দেখে। মিঠুর বালিশ দুটোতে মুখ গুঁজে ওর গন্ধ, সৌরভ উপভোগ করতে করতে স্বপ্ন দেখে। হাত, পা ঘোরাঘুরি করে। মিঠুকে খুঁজে বেড়ায়। সারা রাত্রি ধরে পূর্ণ হয়েও কেমন একটা অপূর্ণতার স্বাদ, বিস্বাদ পায় অম্বর। আর একটু, আর একবার, মাত্র কয়েকটা টুকরো টুকরো মুহূর্তের জন্য মিঠুকে কাছে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তাইতো ঘুম চলে কিন্তু নেশা ভাঙে না।

আশ্চর্য ! সত্যি আশ্চর্য ! মানুষ যেন কিছুতেই সুখী হতে জানে না। পারে না। কিছুতেই যেন মানুষের মন ভরে না। তা না হলে এই ভোরবেলায়, রোজ সকালে মিঠুকে আবার একটু কাছে পাবার জন্য অম্বর এমন করে ওকে খুঁজে বেড়ায় ? অথচ ও জানে মিঠুকে এখন পাবে না, পেতে পারে না। মিঠু যেন হাস্নাহানা। দিনের আলো ফুরিয়ে যাবার পর, রাত্রির অন্ধকার গাঢ় হলেই ওকে কাছে পাওয়া যায়, ওর সৌরভ উপভোগ করা যায়। চাঁপা-চামেলী-রজনীগন্ধাকে দিনে পাওয়া যায়, রাতে পাওয়া যায়, কিন্তু হাস্নাহানা ভোরের শিশিরের আঘাতটুকু পর্যন্ত সহ্য করতে পারে না। তা হোক। ঐ রাত্রিটুকুতেই মন ভরিয়ে দেয়, হাস্নাহানা। মিঠুও। তবুও অম্বর মনে মনে ঠিক তৃপ্তি পায় না। পূর্ণকুম্ভে স্নান করেও যেন মনের কুম্ভ পূর্ণ হয় না !

মিঠু এগিয়ে এসে অম্বরের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, কি হলো ? উঠবে না ?

'এক্ষুনি ?'

মিঠু হাসে। 'কটা বাজে জান ?'

'কটা ?'

'পৌনে নটা।'

'বাজুক গে ! তুমি একটু কাছে আসবে না ?'

'কাছেই তো দাঁড়িয়ে আছি।'

চোখ দুটো বন্ধ করেই অম্বর এক হাত দিয়ে মিঠুকে কাছে টানতে চায়। 'এসো না একটু কাছে।'

'অনেক হয়েছে। একবার ওঠ তো।'

'আজ তো রবিবার।'
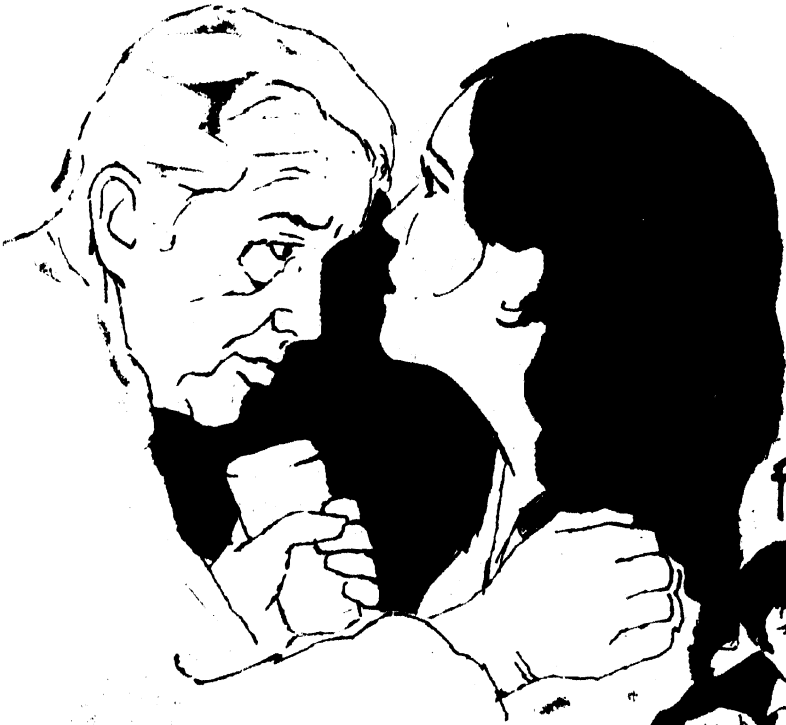
'তাই বলে কি এখন আবার তোমার পাশে শুতে হবে?' অম্বরের মনের কথা জেনেই মিঠু হাসতে হাসতে প্রশ্ন করে।

এবার অম্বর চোখ মেলে মিঠুকে দেখে। 'তুমি অত ভোরে ওঠ কেন বলো তো?'

মিঠু আবার হাসে। 'ভোরে উঠলাম কোথায়?'

'ভোরেই তো উঠলে।'

'জান কটায় উঠেছি?'

'কটায়?'

'সওয়া আটটায়।'

'মোটেও না। তখন বেশ অন্ধকার ছিল।'

মিঠু জানে একটু পাশে না বসলে ও বিছানা ছেড়ে উঠবে না। পাশে বসে অম্বরের গায় হাত দিতে দিতে বললো, উঠতে গেলেই তুমি এমন করে জড়িয়ে ধর যে উঠতে পারি কই?

বালিশ ছেড়ে মিঠুর কোলের উপর মুখ রেখে দু হাত দিয়ে ওর কোমর জড়িয়ে ধরে অম্বর বললো, ভোরে না উঠলে অত অন্ধকার থাকে?

মুখ টিপে টিপে হাসতে হাসতে মিঠু জবাব দেয়, জানলা-দরজায় অত মোটা মোটা পর্দা থাকলে আলো আসবে কোন্‌খান দিয়ে?

'ঠিক আছে। আজ থেকে পর্দা না টেনেই দেখব।'

'তা তো বটেই! পর্দা না টেনে এই ঘরে শোওয়া যায়?'

'কেন যাবে না?'

'তুমি বোধহয় আমাকে নিয়ে কনট প্লেসেও শুতে পার!'

অম্বর এবার মুখ তুলে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, আর তুমি বোধহয় এই বেডরুমেও শুতে না হলে বেঁচে যাও!

'আমি যেদিন তোমার কাছে শোব না সেদিন তোমার মাথার ঠিক থাকবে?'

'তুমি কি ভেবেছ বলো তো?'

'কিছু ভাবিনি। এবার ওঠ। আমি চা আনতে যাই।' দুটো বালিশ টেনে আলতো করে অম্বরের মাথা ওর উপর রেখে মিঠু চা আনতে চলে গেল।

উপুড় হয়ে বালিশ দুটো জড়িয়ে অম্বর পূর্ণ হয়েও পরিপূর্ণ হবার নেশায় বিভোর হয়ে পড়ে রইল। উঠল না। উঠতে পারল না।

'হা ভগবান! তুমি এখনো শুয়ে আছো?' ছোট্ট ট্রেতে দু কাপ চা আর একটা স্যাসারে কয়েকটা বিস্কুট নিয়ে বেডরুমে ঢুকেই মিঠু অবাক হলো।

অম্বর বালিশ থেকে মুখ তুলে মিষ্টি একটু হাসি হাসতে হাসতে বললো, জান, তুমি উঠে যাবার পরও সারা বিছানায় অনেকক্ষণ তোমার মিষ্টি গন্ধ লেগে থাকে।

'আমি উঠে যাবার পর বোধহয় অন্য অনেক বান্ধবীর কথা মনে পড়ে বলে বেশী মিষ্টি লাগে, তাই না?' ট্রে টিপয়ে নামাতে নামাতে মিঠু টিপ্পনী কাটল।

অম্বর অবাক হয় না। রাগ করে না। বরং স্বাভাবিক মনে হয়। যে স্ত্রী স্বামীকে সন্দেহ করে না, সে স্বামীকে ভালবাসে না।

'প্রেম গলি বহু সাঁকরি, ইহি মা দুই না সমায়। প্রেমের গলি বড় সরু, এখানে দু'জন পাশাপাশি হাঁটা যায় না, তাই না মিঠু?'

'আমি পারি না বলে কি তুমিও পারবে না? তুমি ঠিকই পার।'

অম্বর শুয়ে শুয়েই একটা পেয়ালা তুলে চুমুক দিয়ে বললো, তাই নাকি?'

মিঠুও আরেকটা পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললো, তবে কি? তুমি দু-চারটে 'শের' শিখেছ বলে কি যা বলবে তাই ঠিক?

'আমি কি তাই বলেছি?'

'অন্তত ভাবখানা সেই রকম। এবার আমি তোমার মনের কথা বলি?'

'তার মানে?'

'তোমার কথা তুমিই জান না?'

'না।'

'তবে শোন—হুয় গাঁলিবে হ্যায় জোর মজার, হাঁহা পে দেখা হুস্ন ঐহি মর গ্যায়া! বুঝলে?'

'না।'

'তা কেন বুঝবে? বলছিলাম সমস্ত গলিতেই তোমার কবর! কারণ যেখানেই সুন্দরী দেখেছ, সেখানেই মরেছ।'

'শেরটা সত্যি সুন্দর কিন্তু আমি তো ঐ গৌরবের অধিকারী না।'

'কেন? দুঃখ হচ্ছে নাকি?'

'হলেও তো উপায় নেই। তুমি তো আর কাছে এসে আদর করে সান্ত্বনা জানাবে না!'

'অংগার শত ধোতেন...

অম্বরকে না টেনে অঙ্গারকে টানছ কেন?'

অম্বরের কথায় মিঠু না হেসে পারে না। 'কি করব বল? তোমার যা স্বভাব।'

সীমাহীন আকাশ, উদার প্রান্তর, মৌনী হিমালয়কে উপভোগ করার সুযোগ পায় না অম্বর। আগে পেত। মন ভরে যেত। মনের মধ্যে বিন্দুমাত্র অতৃপ্তি থাকে নি। এখন স্নিগ্ধ রাত্রির মধ্যেই প্রকৃতির অকৃপণ ঔদার্যের মিষ্টি স্পর্শ অনুভব করে। উপভোগ করে। শতরূপা প্রকৃতি যেন মিঠুর মধ্যে বন্দিনী হয় রাতের অন্ধকারে। তাই তো সূর্য ওঠার পর রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি হতে অম্বরের এত দ্বিধা, এত সংকোচ। বিছানা ছেড়ে ওঠার আগে এই-রকম একটু নাটক চাই-ই। হবেই। ছুটির দিনে একটু দেরীতে, একটু বেশী।

চা খাওয়া শেষ হলো। অম্বর আবার মিঠুর কোলে মাথা রাখল।

'উঃ! আবার!'

'কেন কি হলো?

'উঠবে না?'

'ব্যস্ত কি?'

'তাই বলে এই এত বেলায় কোলে মাথা রেখে শোবে?'

'তোমার কোলে শোবার আবার বেলা-অবেলা আছে নাকি?'

'তুমি বাঙালের মত কথা বলতে পার।'

'জীবন ভাল লাগে।'

'তাই বলে সব সময়?'

'সব সময় কোথায়?'

'সারা রাত্তির কিভাবে শুয়ে থাক তা জান?'

'কিভাবে?'

'আমি না। তবে আমি বলতে পারব না।'

অম্বর জানত ও বলতে পারবে না। তবু জিজ্ঞাসা করেছিল। শুনতে পারলে ভাল লাগত।

'জান মিঠু, শৈশব আর কৈশোর মিলিয়েই তো যৌবন। সুতরাং......

কথাটা শেষ করতে দিল না মিঠু। 'আর না, এবার ওঠ।'

মিঠু চলে যায়। অম্বর উঠে পড়ে। দিন শুরু হয়।

আজ রবিবার হলেও নিয়ম এক। কুন্দন সিং বাজারে। মিঠু রান্নাঘরে। অম্বর বাথ-রুমে। তারপর ব্রেকফাস্ট। অন্য দিন লিভিং রুমে ডাইনিং টেবিলে। ছুটির দিন বারান্দায় সিপিং চেয়ারে বসে। কারণ আছে। সুজন সিং পার্ক একেবারে শহরের মাঝখানে হলেও ফ্ল্যাটগুলো বেশ পুরানো ধরনের। লিভিং-রুমটা প্রায় হল ঘর কিন্তু দুটো বেডরুমই বেশ ছোট ছোট। বাথরুমটাও বেশ স্যাঁত-সেঁতে। ঘরগুলোতে আলো আছে, বাতাস আসে না। একটা বেডরুমে আর লিভিং-রুমে সামান্য রোদ্দুর আসে। তাই ছুটির দিন বারান্দায় বসে ব্রেকফাস্ট খেতে বা গল্প-গুজব করতে সত্যি ভাল লাগে। গরমের দিন সন্ধ্যার পর এই বারান্দায় বসে ওরা গল্পগুজব করে, রাত্রের খাওয়াদাওয়াও সেরে নেয়।

সুজন সিং পার্কে ফ্ল্যাট পাওয়া এক কথায় অসম্ভব। এইগুলিই নিউদিল্লীর প্রথম ফ্ল্যাট বাড়ী। পান্ডারা রোড পার হলেই ইন্ডিয়া গেট। পশ্চিমের দিকে পাঁচ মিনিট হাঁটলেই লোদী গার্ডেন। পাশেই গলফ লিঙ্ক। রাস্তার ওপারেই এ্যাম্বাসেডর হোটেল আর খান মার্কেট। সুজন সিং পার্কের পিছনে, খান মার্কেটের সামনে সরকারী অফিসারদের কোয়ার্টার। এক কথায় আই-ডিয়্যাল জায়গা কিন্তু ফ্ল্যাট খালি পাওয়া সত্যি অসম্ভব। অম্বর তবু পেয়েছে। পেয়েছে মানে একজন দিয়েছেন। হাজার হোক রায়সাহেব তারাপ্রসন্ন সরকারের নাতি।

আজকের কথা নয়। অনেক দিন আগের কথা। এনট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করার পরই নিঃসন্তান বড় মাসীর সঙ্গে তীর্থে বেরিয়ে-ছিলেন তারাপ্রসন্ন। প্রথমে কাশী, তারপর প্রয়াগ। সেখান থেকে মথুরা-বৃন্দাবন। সব শেষে হরিদ্বার। ঠিক ছিল দু'তিন দিন থেকেই কেষ্টনগরে ফিরবেন কিন্তু মন মানল না। সন্ধ্যার সময় গঙ্গার আরতি না দেখে আশ মেটে না বড় মাসীর। মথুরাদাস পাণ্ডাও ছাড়তে চায় না। তারাপ্রসন্ন বড় মাসীর সঙ্গে আরো কদিন হরিদ্বারে থেকে গেলেন। ভালই লাগত তারাপ্রসন্নর। মাসীর আঁচল থেকে সিকি-আধুলি চুরি করে পাসিং শো সিগরেট আর চা খেয়ে বেশ কাটছিল দিন-গুলো। বিধির বিধান কে খণ্ডাবে। একদিন সন্ধ্যার গঙ্গার আরতি দেখতে গিয়ে আলাপ হলো বরদাকান্ত সর্বাধিকারীর সঙ্গে। এই বরদাকান্তের আগ্রহেই নব্য যুবক তারাপ্রসন্ন সরকার হিজ ম্যাজেস্টিস গভর্ণমেন্টের খাতায় নাম লেখালেন।

এখন এসব আরব্য উপন্যাসের কাহিনী মনে হলেও তখনকার দিনে বরদাকান্তের মত বাঙালী বাবুরা ডেকে ডেকে চাকরি দিতেন। দিতে পারতেন। এদেরই আগ্রহে ও প্রচেষ্টায় সেকালে দিল্লী-সিমলায় বাঙালীবাবুতে ভরে যায়।

কেষ্টনগর বা মুড়াগাছা তো দূরের কথা, এই দিল্লীতেও তারাপ্রসন্নকে নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার শেষ নেই। হয়ত কারণও আছে। কিন্তু একথাও ঠিক তারা-প্রসন্ন সরকার সত্যি মরদের বাচ্চা ছিলেন। এনট্রান্স পাশ করে মাত্র সাতাশ টাকা মাইনেতে হিজ ম্যাজেস্টিস গভর্ণমেন্টের সেবা শুরু করেন আর শেষ?

তারাপ্রসন্ন অম্বরকে বলতেন, জানিস দাদু, পলিটিক্যাল ব্যাকিং থাকলে আমিও ভি, পি, মেননের মত গভর্ণর হতাম। তার-পর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে প্রায় আপন মনে বলতেন, ভি, পি, গভর্ণর হলো আর আমি ডেপুটি সেক্রেটারী হয়ে জীবন শেষ করলাম!

অম্বর তখন অত কিছু বুঝত না। তবে এটুকু বেশ বুঝতে পারত দাদু লাটসাহেব না হলেও কম কিছু না। তাইতো দাদুকে সান্ত্বনা দিত, সে যাই হোক তুমিও কি কম বড়।

কথাটা ঠিকই। সাতাশ টাকা মাইনেতে জীবন শুরু করে ডেপুটি সেক্রেটারী হয়ে রিটায়ার করা কম কৃতিত্বের কথা নয়। সে কৃতিত্বের কথা আর কেউ স্বীকার না করলেও অম্বর করে। কারণ ছোটবেলা থেকে দাদুর সঙ্গে এই দিল্লী ঘুরতে ফিরতে অজস্র কাহিনী শুনেছে। জেনেছে। শিখেছেও অনেক কিছু।

তারাপ্রসন্ন যখন চাকরি নিলেন তখন লর্ড চেমসফোর্ড দিল্লীর মসনদে অধিষ্ঠিত। এরই রাজত্বকালে অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগে চারণ' নিরস্ত্র মানুষকে মশা-মাছির মত মারল জেনারেল ডায়ার। অম্বর দাদুর কাছে শুনেছে ডায়ার দেশে ফিরে গেলে শত শত ইংরেজ যুবতী ওকে সাদা লাল লাল ফিতার ও গুণমুগ্ধরা দশ হাজার পাউন্ড উপহার দেয়! আরো কত কি হলো! চেমস-ফোর্ডকে বিদায় জানাল ভারত। তারপর রিডিং। রবীন্দ্রনাথ নাইটহুড ত্যাগ করলেন, আইন অমান্য আন্দোলন

শুরু করলেন গান্ধীজি। খলিফার সাম্রাজ্য তুরস্ককে টুকরো টুকরো করার প্রতিবাদে শুরু হলো খিলাফৎ আন্দোলন। দেশব্যাপী রাওলাট এ্যাক্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

এই সব ঝামেলার মাঝখানে কবে যে চেমসফোর্ড চলে গেলেন আর রিডিং এলেন, তা কেরানী তারাপ্রসন্ন খেয়াল করলেন না। রাওল্যাট আইন বাতিল হলে, তাও গ্রাহ্য করলেন না, কিন্তু হঠাৎ ইন্ডিয়ানরা আর্মিতে অফিসার হতে শুরু করায় চমকে উঠলেন। এই লর্ড রিডিং'এর অনুগ্রহে ভারত সরকারের নানা বিভাগে বহু ভারতীয়দের পদোন্নতি হলো। তারাপ্রসন্নরও অদৃষ্টে লর্ড রিডিং'এর একটু চরণামৃত জুটল।

অম্বরের হাত ধরে কার্জন রোড দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে হেইলি রোড দেখিয়ে তারাপ্রসন্ন জিজ্ঞাসা করতেন, এই রাস্তাটার নাম জানিস দাদু?

'এটা তো হেলি রোড। তোমার বন্ধু তো এই গলিতেই থাকেন'।

'তোর সে কথাও মনে আছে?'

'কত বড় বাঘের সঙ্গে তোমাদের ছবি আছে ঐ বাড়ীতে.........

এই হেইলি রোডেই দেওয়ান গোবিন্দ সিং'এর বাড়ী। রায়সাহেব তারাপ্রসন্ন সরকারের অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বহু দেশীয় রাজ্যে ঘুরেছেন। আলোয়ার থেকে জামনগর, জুনাগড়। উনি যখন ভরতপুরে মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন তখন হিজ ম্যাজেস্টিস গভর্নমেন্টের পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টের আণ্ডার সেক্রেটারী রায় সাহেব তারাপ্রসন্ন সরকারকে মাঝে মাঝেই ভরতপুর যেতে হতো। আগে পরিচয় থাকলেও বন্ধুত্ব হয় এই সময়। একবার বড়দিনের ছুটিতে হিজ হাইনেসের আমন্ত্রণে মহারাজার সঙ্গেই বাঘ শিকারে গিয়েছিলেন। আসলে এক ছোকরা এ-ডি-সি'র গুলীতেই বাঘটা মারা যায় কিন্তু বেহেড মাতাল মহারাজাও সূর্যের দিক লক্ষ্য করে একটা গুলী ছুঁড়েছিলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এবং সেজন্য সবাই মুক্তকণ্ঠে ও সানন্দে স্বীকার করল হিজ হাইনেসের গুলীতেই বাঘ মরেছে।

'সূর্যের দিক লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়েছিলেন মানে?' অম্বর জানতে চায়।

রায়সাহেব একটু হাসেন। না হেসে উপায় কি? প্রাসাদের মধ্যে সখীদের নিয়ে স্ফূর্তি করতে ভাল না লাগলেই হিজ হাইনেসের মাথায় উদ্ভট চিন্তা আসত। বড়দিনের ছুটিতে হিজ ম্যাজেস্টিস গভর্নমেন্টের পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টের কিছু ইংরেজ অফিসারদের নেমন্তন্ন করতেই হতো। সেবার বড়দিনের ছুটিতে বাঘ শিকারের আয়োজন হয়। আয়োজনে কোন ত্রুটি না থাকলেও শিকারে কারুরই আগ্রহ ছিল না। খাওয়াদাওয়া ও মদ্যপানের এলাহি ব্যবস্থা ছাড়াও প্রত্যেক তাঁদের জন্য আলাদা আলাদা সুন্দরী বাইজী থাকলে শিকারে কার আগ্রহ থাকতে পারে? আর হিজ হাইনেস? সারা দিনই গাছের ছায়ায় সখীদের লীলা উপভোগ করতেন। হঠাৎ সূর্যের আলো চোখে পড়ায় হিজ হাইনেস এক প্রিয় বান্ধবীর নাচ ঠিক মত উপভোগ করতে না পারায় নেশার ঘোরে সূর্যকে লক্ষ্য করেই গুলী ছুঁড়লেন। ঠিক কয়েক মুহূর্ত আগেই কয়েক শ' গজ দূরে এ-ডি-সি'র গুলীতে বাঘ মারা যায়। এমন কথা তো মাতিকে বলা যায় না, তাই তারাপ্রসন্ন শুধু বললেন, রাজা-মহারাজাদের খেয়াল-খুশীর কি কোন মাথামুণ্ড থাকত?

তারাপ্রসন্ন কথার মোড় ঘুরিয়ে অম্বরকে জিজ্ঞাসা করলেন, জানিস এই হেইলি সাহেব কে ছিলেন?

'না জানি না তো।'

'স্যার ম্যালকম হেইলি ছিলেন ভাইসরয় কাউন্সিলের হোম মেম্বার।'

পুরনো দিনের স্মৃতির নেশায় বেহুঁস হয়ে তারাপ্রসন্ন ঠিক বুঝতে পারেন না স্যার ম্যালকমের গুরুত্ব বোঝার বয়স নাতির হয় নি। তবু অনেক কথাই বলেন। যেন না বলে পারেন না।

'সি, আর, দাশ আর মতিলাল নেহরুর স্বরাজ্য পার্টিওয়ালারা সেন্ট্রাল এ্যাসেম্বলীতে ঢুকেই ডিমাণ্ড করল ইণ্ডিয়াকে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দিতে হবে। মতিলাল ঝড় বইয়ে দিলেন সেন্ট্রাল এ্যাসেম্বলীতে।......

অম্বর অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে দাদুর মুখের দিকে।

... 'তারপর স্যার ম্যালকমের সঙ্গে মতিলালের কি ভীষণ তর্ক। বাপরে বাপ!'

অম্বর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, তুমি ওদের তর্ক শুনেছিলে?

তারাপ্রসন্ন হেসে জবাব দিলেন, শুনেছিলাম। আমি তো তখন হোম ডিপার্টমেন্টেই ছিলাম। সেন্ট্রাল এ্যাসেম্বলীর সেসন থাকলে রোজই যেতে হতো।

তারপর একদিন শুধু স্যার ম্যালকম হেইলিই নয়, লর্ড রিডিংও চলে গেলেন। এলেন লর্ড আরউইন। নতুন বড়লাট। ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিয়েই বুঝলেন কিছু একটা করা দরকার। নয়ত এত বড় দেশকে সামলান যাবে না। ইতিমধ্যে দেশীয় রাজ্যের নৃপতিদের মনেও নানারকম সন্দেহ জমতে শুরু করেছে। ওরা দাবী করলেন হিজ ম্যাজেস্টিস কিং এম্পারার অব ইণ্ডিয়ার সঙ্গে দেশীয় রাজ্যগুলির সম্পর্ক ঠিক করার জন্য নিরপেক্ষ তদন্ত দরকার। উনিশ শ' উনিশের ভারত আইনের ভবিষ্যৎ ভেবেচিন্তে দেখার জন্য নিযুক্ত হলো সাইমন কমিশন আর দেশীয় রাজ্যগুলির ব্যাপারে স্যার হারকোর্ট বাটলার কমিটি নিয়োগ করা হলো। হোম ডিপার্টমেন্ট থেকে আরো অনেকের সঙ্গে মিঃ টাকা প্রমোশনো সরকারকেও পাঠান হলো বাটলার কমিটির কাজের জন্য। তারাপ্রসন্ন আর হোম ডিপার্টমেন্টে ফিরলেন না। চলে গেলেন দেশীয় রাজ্যদের কন্ট্রোল-করা পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টে।

রায় সাহেব লর্ড উইলিংডনের আমলে আণ্ডার সেক্রেটারী হতে পারেন নি বলে ওকে দেখতে পারতেন না কিন্তু লিনলিথগোর আমলে আণ্ডার সেক্রেটারী হয়ে রায় সাহেব উপাধি পাওয়ায় আমৃত্যু তাঁর অন্ধ ভক্ত ছিলেন। সুযোগ পেলেই সবাইকে বলতেন, লোকটা মানুষ চিনতো, জানতো কাকে দিয়ে কাজ হবে। দাদুকে দিয়ে হিজ ম্যাজেস্টিস গভর্ণমেন্টের কি কাজ হয়েছিল তা অম্বর জানে না কিন্তু জানে দেওয়ান গিরিধারী লালজীর সঙ্গে দাদুর ঐ রকম নিবিড় বন্ধুত্ব না থাকলে উনি ওকে সুজন সিং পার্কের ফ্ল্যাট ছেড়ে দিতেন না।

ফ্ল্যাট পুরোনো হলেও অম্বর মেরামত করিয়ে নিয়েছে নিজের খরচে। প্রায় সব ভাড়াটেরাই করিয়ে নেন। ভাড়া এত কম যে কেউ কিছু মনে করেন না। মেরামত করাবার পর সমস্ত ফ্ল্যাটটা চমৎকার হয়েছে। শুধু বাথরুমটা এখনও স্যাঁতসেঁতে। প্রথম কথা একেবারেই রোদ্দুর আসে না। তাছাড়া এই বাথরুমের পাশেই পিছন দিকের ফ্ল্যাটের বাথরুম। ঐ বাথরুমের পাইপটা বোধ হয় খারাপ। জল লিক করে। তাই অম্বরদের বাথরুমটা এখনও স্যাঁতসেঁতে। তাহোক! ওদের কোন অসুবিধা হয় না। দুজন মানুষের পক্ষে এত বড় ফ্ল্যাট যথেষ্ট। বরং প্রয়োজনের অতিরিক্ত। কুন্দন সিং খান মার্কেটে থাকে, সরকারী চাকরি করে। শুধু সকাল-সন্ধ্যায় এদের রান্না বা টুকিটাকি বাজার-হাট করে দেয়। সারাদিনের জন্য লোক রাখার প্রয়োজন হয় না। মতও নয়। মিঠু সারাদিন একলা থাকে। সুতরাং ফ্ল্যাটের মধ্যে একটা চাকর রাখা ঠিক নয়। চাকর-বাকর নিয়ে এই সুজন সিং পার্কের অনেক ফ্ল্যাটেই অনেক ঘটনা ঘটেছে। মাঝে মাঝেই ঘটে। দেওয়ান গিরিধারী লালজী নিজেও অম্বরকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, বি-কেয়ারফুল অফ সারভেন্টস। পরে এখানে আসার পর এর-ওর কাছে চাকর-বাকরদের সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছে। মিঠু অবশ্য বলে, ফাঁকা ফ্ল্যাট পেয়ে তোমার বেশ সুবিধে হয়েছে।

'কেন?'

'ফাঁকা বলেই তো তুমি যা ইচ্ছে করতে পার।'

কথাটা মিথ্যে নয়। ঝি-চাকর থাকলেও অনেকটা সংযত থাকতে হতো। তাছাড়া ফ্ল্যাটগুলো এত বড় ও এমনভাবে তৈরী যে এক ফ্ল্যাটে একজন খুন হয়ে গেলেও পাশের ফ্ল্যাটের লোকজন জানতে পারবে না। বারান্দায় বসলে আলাদা কথা। অন্য ফ্ল্যাটের লোকজন দেখা যায়, কথাবার্তাও বলা যায়। অবশ্য কথা বলে শুধু যোশীদের সঙ্গেই। দুটো বারান্দা প্রায় মুখোমুখি। তাছাড়া মিঠুর মত মিসেস যোশীও সারা দিন একলা থাকেন। সামনা-সামনি বারান্দায় বসে-দাঁড়িয়ে দুজনেই গল্প করে। আলাপ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়েছে। তার কারণ মিঃ যোশী সিভিল ইঞ্জিনীয়ার আর অম্বর আর্কিটেক্ট। আগে সরকারী চাকরি করতেন। এখন একটা প্রাইভেট কনস্ট্রাকশন ফার্মে

'তোমার মত সবাই তো অন্য গ্রহের প্রাণীর নিন্দা করতে বা শুনতে অভ্যস্ত নয়!'

এবার চন্দনা রেগে গেল, এবার বলি কেন রাগ করেছিলাম।

বিশু তাড়াতাড়ি চন্দনার কানের কাছে ফিস ফিস করে বললো, এটা আমাদের হাসব্যান্ড-ওয়াইফের ব্যাপার। ওদের কাছে বলার কি দরকার?

বিশুর কাণ্ড দেখে অম্বর সিগারেট টানতে টানতে হাসছিল, কিন্তু মিঠু হাঁ করে হোঁচট খেয়ে। কৌতূহল চাপতে পারল না, কি ব্যাপার কি?

'মীয়াং ভেবে দেখলে এমন গল্প পড়ে যে কি বলব।'

বিশু হাসতে হাসতে বলে, আরে বাপু লাটাই তো তোমার হাতে; ঘুড়ি কতদূর যাবে বল?

হো হো করে হেসে উঠল মিঠু আর অম্বর।

ওদের হাসির আওয়াজ থামতেই বিশু হাঁক দিল, কুন্দন সিং!

কুন্দন সিং আসতেই বিশু পার্স থেকে টাকা দিয়ে বললো, দো বোতল বিয়ার লে আও জলদি।

একটু শাসন করার সুরে চন্দনা বললো, বিয়ার দিয়ে শুরু করছ, শেষ করবে কি দিয়ে?

'ইফ ইউ প্লীজ বিয়ার মী, তাহলে নিশ্চয়ই হুইস্কী দিয়ে শেষ করব।'

চন্দনা একটু গম্ভীর হবার চেষ্টা করলেও পারল না। তিনজনেই হাসল।

বিশু অত্যন্ত বুদ্ধিবাদীর মত বিকল্প প্রস্তাব করল, ইফ ইউ কান্ট বিয়ার দ্যাট, বিয়ার এ চাইল্ড উইদাউট ফিলে।

হাসিতে ফেটে পড়ল মিঠু আর অম্বর।

চন্দনা বললো, আমি জীবনে এমন অসভ্য লোক দেখি নি।

দশ টাকার নোটটা হাতে নিয়ে কুন্দন সিংকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই বিশু চীৎকার করে উঠল, যাও! জলদি লে-আও!

(দুই)

শুধু ছুটির দিন নয়, বিশু আর চন্দনা প্রায়ই আসে। এরাও যায় ওদের বেণ্টিংক মার্কেটের বাসায়। হাসি-ঠাট্টা, গল্প-গুজব, খাওয়া-দাওয়া, বেড়ান, সিনেমা দেখা হয় একসঙ্গে। আরো কত কি। বিশু আর অম্বর শুধু আশৈশবের বন্ধু নয়, তার চাইতে আরো কিছু। অনেক কিছু। ছোট-বেলা থেকে সুখে-দুঃখে ওরা বার বার কাছে এসেছে। ঘনিষ্ঠ হয়েছে। তার কারণ আছে, ইতিহাস আছে।

উনিশ'শ তিরিশ। হঠাৎ ভারতবর্ষের রাজনীতিতে কাল বৈশাখীর মাতলামী শুরু হলো। পয়লা ফেব্রুয়ারী কিশোরগঞ্জ রামানন্দ ইউনিয়ন স্কুলের শিক্ষক সতীশ রায় বিপ্লবীদের ক্ষতি করার জন্য প্রাণ হারালেন। ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকে অমৃতসরে খালসা কলেজের অধ্যক্ষকে লক্ষ্য করে বোমা পড়ল। একজন মারা গেলেন, আহত হলেন অনেকে। মার্চে বিশেষ কিছু না ঘটলেও আঠারই এপ্রিল চট্টগ্রামের মাস্টারদা সারা ইংরেজ সাম্রাজ্যকে চমকে দিলেন। জালালাবাদ পাহাড় থেকে বারুদের গন্ধ হারিয়ে যাবার আগেই শিকলবাহা গ্রামে বিপ্লবীদের রাইফেল রিভলবার গর্জে উঠল। পর পর আরো কত ঘটনা। হাওড়ার শিবপুর, রংপুরের গাইবান্ধা, ময়মনসিং থেকে কাশী, ঝান্সী, কানপুর, লুধিয়ানা, লায়ালপুর, ঝঙ্গ, অমৃতসর, লাহোর, রাওয়ালপিণ্ডি। এসব ঘটনাকে ম্লান করে দিল পঁচিশে আগস্টের প্রায় অবিশ্বাস্য নাটক। দিনে-দুপুরে বৃটিশ রাজশক্তির প্রাণকেন্দ্র কলকাতার ডালহৌসী স্কোয়ারে কুখ্যাত চার্লস টেগার্টকে লক্ষ্য করে বোমা ফাটল। অনুজ সেন মারাত্মকভাবে আহত হলেন ও পরে মারা যান। ডাঃ নারায়ণ রায়, ডাঃ ভূপাল বসু ও আরো কয়েকজন ধরা পড়লেন। ঠিক পরের দিনই জোড়াবাগান থানায় বোমা পড়ল। তারপর দিন ইডেন গার্ডেনের পুলিশ ফাঁড়িতে। উনত্রিশে দেশবন্ধু পার্কে রতন হাজরা মারা যান। ঐ দিনই ঢাকার মিটফোর্ট হাসপাতালে নারায়ণগঞ্জের জল পুলিশের সুপারিন-টেনডেণ্ট অসুস্থ হির্টসাহেবকে দেখতে গিয়েছিলেন ইন্সপেকটর জেনারেল অফ প্রিজন লোম্যান। জেলের মধ্যে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর অকথ্য নির্যাতন করার জন্য লোম্যানের উপর বাংলার বিপ্লবীদের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। সেদিন সুযোগ জুটে গেল। মেডিক্যাল স্কুলের ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র বিনয়কৃষ্ণ বসুর ছোট্ট একটা পিস্তলের মাত্র তিনটি বুলেট। লোম্যান লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। ওর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন ঢাকা পুলিশের হডসন। হাজার হোক লোম্যানের মত তো ভি-আই-পি নয়, তাই মাত্র দুটি বুলেট দিয়েই বিনয় ওকে পুরস্কৃত করল। একটু দূরেই দাঁড়িয়েছিল সরকারী ঠিকাদার মীরজাফর সত্যেন সেন। সে জড়িয়ে ধরল বিনয়কে। বুলেট ফুরিয়ে গেলেও দেহটা তো ছিল। মাত্র একটা ঘুষি। দালাল সত্যেন সেন ছিটকে পড়তেই বিনয় এক দৌড়ে স্কুল মাঠ পেরিয়ে অ্যাডিক্যাল মেস। পায়খানার ছাদ টপকে আরমানীটোলা। ঘোড়ার গাড়ী আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল। সেই গাড়ীতে বক্সীবাজারে বিপ্লবী মনি দেওয়ার বাড়ী। ঐখানেই সুপতি রায়ের সঙ্গে বিনয়ের দেখা হলো।

তারপর?

তারপর কখনো চাষী, কখনো ভদ্র-লোক সেজে সুপতি আর বিনয় শত শত ইংরেজ গোয়েন্দাদের ফাঁকি দিয়ে একদিন কলকাতায় সাত নম্বর ওয়ালিউল্লা লেনের গ্যারেজে আশ্রয় নিল। এদিকে মেদিনীপুর জেল থেকে ছাড়া পেয়েই মেজদা সত্য গুপ্ত এলগিন রোডে গিয়ে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা করলেন। রসময় শূর বিনয়ের সঙ্গে দেখা করে এলগিন রোডে সব কিছু জানাতেই সিদ্ধান্ত হলো রাইটার্স বিল্ডিং হানা দেওয়া হবে আর বিনয় বসু হবে তার নেতা। সব কিছু ঠিক হবার পর তিন মাসের জন্য বিনয়কে ধানবাদে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

আটই ডিসেম্বর। সকাল সাড়ে নটায় নিউ পার্ক স্ট্রীটের বাড়ী থেকে ট্যাক্সিতে রওনা হলো দিনেশ আর সুধীর (বাদল) গুপ্ত। পাইপ রোডের মোড়ে ট্যাক্সি থামার পর পরই অন্য একটা ট্যাকসি চড়ে বিনয় আর রসময় হাজির। বিপ্লবী দলের জি-ও-সি সুভাষচন্দ্রের আদেশের কথা মনে করিয়ে দিয়ে রসময় চলে গেল আর ওরা তিনজন পাকা সাহেব সেজে চলে গেল রাইটার্স বিল্ডিং। তখন বেলা সাড়ে বারোটা। দোতলার বারান্দায় সার্জেণ্ট ফোর্ড তো ওদের বড় অফিসার ভেবে স্যালুটই করল। তুর্কি নতুন ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ প্রিজন কর্ণেল সিম্পসনের ঘরে। একসঙ্গে তিনটি রিভলবার গর্জে উঠল। সিম্পসনের পার্সোনাল অ্যাসিস-ট্যাণ্ট রায় বাহাদুর জ্ঞান গুহ ভয়ে আতঙ্কে বলির পাঁঠার মত কাঁপতে লাগলেন। রায় বাহাদুরের জন্য বুলেট নষ্ট না করে ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। এরপর জুডিসিয়াল সেক্রেটারী টুইনহাম, তারপর হোম সেক্রেটারী আলবিয়ন। পাত্রী জনসন জলের পাইপ বেয়ে নীচে নেমে প্রাণ বাঁচালেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই লালবাজার থেকে টেগার্ট দলবল নিয়ে পৌঁছে গেলেন রাইটার্স বিল্ডিং। ওদের বুলেট ফুরিয়ে এলেও পটা-সিয়াম সাইনেড পকেটেই ছিল। সুধীর

(বাদল) সাইনেডের প্যাকেট মুখে পুরে দিতেই ঢলে পড়ল। বিনয় সাইনেড খেয়েও ঠিক নিশ্চিন্ত হতে পারল না। একবার বন্দেমাতরম চীৎকার করে নিজের কানের কাছে রিভলবার চেপে ট্রিগার টিপল। তেরই মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ওর মৃত্যু হলো। পরের দিন খবরের কাগজে হেডিং হলো, বিনয় ইজ ডেড—লং লিভ বিনয়। বেঁচে রইল শুধু দিনেশ। আলিপুরের জজ গার্লিকের বিচারে তাঁর ফাঁসী হলো। আর ঐ জজ সাহেবের বিচার করল কানাই ভট্টাচার্য। একেবারে এজলাসের মধ্যে গুলী করে শেষ করে দিল কিন্তু কানাই'এর বিচার করার সুযোগ কারুর হলো না। পটাসিয়াম সাইনেড খেয়ে সে হাসতে হাসতে পালিয়ে গেল।

সাহেবদের খুশী করার জন্য সোমেশ্বর স্বদেশী ছেলেগুলোর উপর খড্ড বেশী অত্যাচার করছিল। সোমেশ্বরকে মারার জন্য একবার বোমাও মেরেছিল। বেঁচে যায় কিন্তু ডান পা'র বেশ খানিকটা জায়গা পুড়ে যায়......

দাদুর কথা শুনতে শুনতে অবাক হয়ে অম্বর প্রশ্ন করে, তাই নাকি?

'ঐ ঘটনার কিছু দিনের মধ্যেই সোমেশ্বর দিল্লী বদলী হলো। তার অবশ্য অনেক কারণ ছিল। প্রথমতঃ স্বদেশীদের হাত থেকে ওকে বাঁচান। তাছাড়া তখন যোগেশ চ্যাটার্জী, ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদের দলে বহু বাঙ্গালীর ছেলে নর্থ ইণ্ডিয়ার নানা শহরে ছড়িয়েছিল। ঐসব বাঙ্গালী ছেলেদের উপর নজর রাখার জন্য তখন অনেক বাঙ্গালী আই-বি অফিসারকে বাংলা থেকে দিল্লী আনা হয়।'

অম্বর দাদুর কাছে সব কিছু শুনেছে। শুনেছে কিভাবে সোমেশ্বরবাবু স্বদেশী ছেলেদের ধরিয়ে দিতেন, অত্যাচার করতেন ও রায় বাহাদুর হলেন। রায় বাহাদুর সোমেশ্বর চ্যাটার্জীর ছেলে আশুতোষও সরকারী চাকরিতে ঢুকল। তবে পুলিশে নয়, হোম ডিপার্টমেন্টে। তাও আবার তারাপ্রসন্ন সরকারের অধীনে। এই চাকরি পাবার পরই আশুতোষের বিয়ে হলো।

'আশুর বৌ'এর কথা তোর মনে আছে দাদু?'

'আমাকে খুব আদর করতেন, তাই না দাদু?'

'হ্যাঁ, তোকে খুব ভালবাসত। ঐ মেয়েটার জন্যেতেই তো আমি তোকে কেষ্টনগর থেকে নিয়ে এলাম।'

স্ত্রী আর পুত্র মারা যাবার পর তারাপ্রসন্ন প্রায়ই কেষ্টনগর যেতেন পুত্রবধূ আর অম্বরকে দেখতে। রায় বাহাদুর সোমেশ্বর চ্যাটার্জী পাশের কোয়ার্টারেই থাকেন। অম্বরের দাদুকে ওরা সবাই যথেষ্ট সম্মান ও খাতির করতেন। দুই বাড়ীর মধ্যে হৃদ্যতাও ছিল বেশ। দিল্লীর বাইরে যাবার সময় তারাপ্রসন্ন ওর শোবার ঘরের চাবি আশুতোষের স্ত্রীর কাছে রেখে যেতেন। কেষ্টনগর যাবার কথা শুনলেই আশুতোষের স্ত্রী বলতেন, জেঠু, এবার অম্বরদের আনবেন তো?

একটু ম্লান হাসি হেসে তারাপ্রসন্ন বলতেন, 'আমি যে মদ খাই বৌমা। আমার কাছে কি বিধবা পুত্রবধূ থাকতে পারে?'

'কি বলছেন আপনি?'

'ঠিক কথাই বলেছি বৌমা। এই একটু মদ খাই বলেই তো সবাই আমাকে ছেড়ে চলে গেল।' চাবিটা আশুতোষের স্ত্রীর হাতে দিতে দিতে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তারাপ্রসন্ন বললেন, মনে হয় ছেলের মত পুত্রবধূও আমাকে ঘেন্না করেন। তাই তো আসার কথা বলতে সাহস হয় না। দূর থেকেই কর্তব্য করে যাচ্ছি।

কথাগুলো বলতে বলতে তারাপ্রসন্নর চোখের কোণায় জল এসে যেতো। আর কোন কথা বলতে পারতো না।

'না, না, জেঠু, তা হতে পারে না। আপনাকে কি কেউ ঘেন্না করতে পারে?'

আশুতোষের স্ত্রী সত্যি ভাবতে পারতেন না এমন মানুষকে কেউ ঘেন্না করতে পারে। তারাপ্রসন্ন সরকার সন্ধ্যার পর মদ খান, রাজাদের গেস্ট হাউসে গিয়ে স্ফূর্তি করেন—এসব কথা ওরা জানতেন। তবুও চ্যাটার্জি পরিবারের সবাই ওঁকে ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন। রায়বাহাদুরের স্ত্রী ঘোমটা দিয়ে দূরে দূরে থাকতেন, আশুতোষ অফিসার বলে রায় সাহেবকে একটু ভয়ই করতেন। তাই খাতিরটা বেশী ছিল রায়বাহাদুর আর ওঁর পুত্রবধূর সঙ্গে। রায়বাহাদুরকে প্রায়ই দিল্লীর বাইরে যেতে হতো বলে আশুতোষের স্ত্রীর সংগে গল্পগুজব করেই রায়সাহেবের সময় কাটত।

তারাপ্রসন্নর সংসার দেখাশুনার জন্য চাকর থাকলেও আশুতোষের স্ত্রী নিজের সংসারের কাজকর্ম সেরে নিয়মিত তদ্বির-তদারক করতেন। দুবেলা, প্রতিদিন। তারাপ্রসন্ন একদিন হাসতে হাসতে ওকে বলেছিলেন, তুমি যদি আমার পুত্রবধূ হতে তাহলে বোধহয় সত্যি মদ খাওয়া ছাড়তে পারতাম।

'না, না, জেঠু মদ খাওয়া ছাড়বেন না।'

'তুমি একি কথা বলছ?'

'একটু-আধটু মদ না খেলে মানুষ বোধহয় উদার হতে পারে না।'

তারাপ্রসন্ন হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, কে বললো তোমাকে?

'কে আবার বলবে? শরৎবাবুর বইগুলো পড়লেই বোঝা যায়।'

পরেরবার কলকাতা গিয়ে তারাপ্রসন্ন গুরুদাস চ্যাটার্জীর দোকান থেকে শরৎবাবুর বইগুলো কিনে এনে আশুতোষের স্ত্রীকে দিয়েছিলেন।

বুড়ো বয়সে, চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর মানুষ বোধহয় একটু বেশী কথা বলতে পছন্দ করে। তাছাড়া এই একটি নাতি ছাড়া তারাপ্রসন্নর তো আর কোন আপনজন, প্রিয়পাত্র ছিল না। তাই তাঁর দীর্ঘজীবনের সব কথাই অম্বরকে বলতেন। 'আমি মদ খেতাম ও আমার স্ত্রী-পুত্র আমার কাছে থাকত না, এ খবর দিল্লীর বাঙ্গালী সমাজের অজানা ছিল না। বেয়ার্ড রোড—গোল মার্কেটের বাঙ্গালীদের আড্ডাখানায় আমাকে নিয়ে অনেকরকম সরেস আলোচনাও হতো কিন্তু হঠাৎ একদিন আশুর বৌ আমাকে চমকে দিল—

'একটা খবর শুনেছেন জেঠু?'

'কি খবর বৌমা?'

'আমি আপনার কাছে আসি বলে কিছু শোনেন নি?'

'কই না তো!'

আশুতোষের স্ত্রী একটু হাসল। 'দেখছি শরৎবাবু ইচ্ছে করলে দিল্লী নিয়েও পল্লী-সমাজ লিখতে পারতেন।'

তারাপ্রসন্ন ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন, হঠাৎ একথা বলছ কেন?

'আমি আপনার কাছে আসি বলে একদল বাঙ্গালী বড় যা-তা বলে বেড়াচ্ছে।'

আশুতোষের স্ত্রী অত্যন্ত নির্বিকারভাবে কথাটা বললেও তারাপ্রসন্ন লজ্জিত না হয়ে পারলেন না। হাতের খবরের কাগজটা পাশে রেখে মাথা নীচু করে ইজিচেয়ারে বসে রইলেন। চুপচাপ, অনেকক্ষণ।

'একি জেঠু! আপনি কথা বলছেন না কেন?' আগের মতই সহজ সরলভাবে আশুতোষের স্ত্রী প্রশ্ন করল।

আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে তারাপ্রসন্ন কি যেন ভাবলেন। তারপর মুখ না তুলেই বললেন, জানি অনেকেই আমার নিন্দা করে। তুমি বরং আর এসো না।

আশুতোষের স্ত্রী একটু জোরেই হাসল, আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে জেঠু! কিছু লোক আজে বাজে কথা বলছে বলে আমি আসব না কেন?

আগের মতই মুখ নীচু করে তারাপ্রসন্ন বললেন, হাজার হোক তুমি রায় বাহাদুরের পুত্রবধূ। তাছাড়া তোমার মত একটা মেয়েকে নিয়ে এইসব নোংরা আলোচনা হোক, তা তো আমি চাইব না। এবার একটা চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে রায় সাহেব বললেন, দিল্লীর বাঙ্গালী সমাজে তো আমার বিশেষ সুনাম নেই. সুতরাং তোমার না আসাই ভাল।

'আমি কি ওদের খাই না পরি যে ওদের এত ভয় করব?'

'কিন্তু বৌমা, তোমার তো শ্বশুর-শাশুড়ী স্বামী আছে...

'তারা তো আমাকে কিছু বলেন নি।'

'তবুও তাদের কানে যদি এইসব গুজব পৌঁছায় তাহলে কি লজ্জার কথা...

তারাপ্রসন্নকে কথাটা শেষ করতে দিল না আশুতোষের স্ত্রী, সে আমি বুঝব জেঠু। আপনি এইসব আজে-বাজে ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।

রায় সাহেব তারাপ্রসন্ন সরকার রোজ ডায়েরী লিখতেন। অম্বর জানত কিন্তু দাদুর জীবিতকালে সে পড়ে নি। দাদুর মৃত্যুর পর পড়েছে।...আশুর স্ত্রীকে দেখতে সত্যিই সুন্দরী। সরোজনলিনী স্কুলে লেখাপড়া শিখেছে। মেয়েটির অনেক গুণ। সব চাইতে বড় গুণ মনের মধ্যে কোন মালিন্য নেই আর প্রাণ খুলে হাসতে পারে। ঠিক ঝর্ণার ধারার মত ওর হাসি। কোন প্রচেষ্টা নেই, আপন বেগে সে

হাসি ওর অন্তর থেকে বেরিয়ে আসে। শূন্য, পরিত্যক্ত মন্দির থেকে হঠাৎ পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের আওয়াজ ভেসে এলে মানুষ যেমন বিস্ময়ের সঙ্গে আনন্দিত হয়, আমার কোয়ার্টারে আশুর স্ত্রীর প্রাণখোলা হাসি শুনে আমার ঠিক সেই রকম আনন্দ অনুভব করেছিলাম। এখন প্রায় নেশার মত হয়ে গেছে। রোজ কিছুক্ষণ বৌমার সঙ্গে গল্পগুজব না করলে ভাল লাগে না। রায় বাহাদুরের স্ত্রী আমার সঙ্গে কথা বলেন না অথচ আমি জানি আমার সম্পর্কে ওর উৎকণ্ঠার শেষ নেই। রোজ আমার জন্য কিছু না কিছু রান্নাবান্না বৌমার হাত দিয়ে পাঠাবেনই। আমি রায় বাহাদুরের কাছে পর্যন্ত নালিশ করেছি। ফল হয়নি। রায় বাহাদুর হাসতে হাসতে জবাব দিয়েছেন, আরে মশাই, পুলিশের চাকরি করি বলে কি ভদ্দরলোক না? তাছাড়া আপনার বৌঠানের ধারণা চাকর-বাকরের রান্না খেয়ে ঠিক পেট ভরে না। সুতরাং আমি বারণ করলেও উনি শুনবেন না।...

ডায়েরীতে পাতার পর পাতা লিখেছেন তারাপ্রসন্ন।

...প্রথম প্রথম শুধু রান্না পৌঁছে দিতেন বৌমা। আস্তে আস্তে আমার ঘর-সংসারের তদারকী শুরু করলেন।...

'আপনি তো আচ্ছা লোক জেঠু!'

'কেন বৌমা? কি করলাম?'

'আপনার বিছানায় কটা চাদর পাতা আছে জানেন?'

'নোংরা বিছানায় আমি শুতে পারি না বলে কাল রাত্রে শুতে যাবার সময় ময়লা চাদরটা না পাল্টিয়েই ধোপাবাড়ীর একটা চাদর পেতেছি।'

আশুতোষের স্ত্রী হাসেন। বলেন, তাহলে তো দুটো চাদর থাকত।

'তবে কটা আছে?'

'তিনটে।'

'তাহলে বোধহয় এর আগের বারেও ময়লা চাদরের উপরেই কাচাম চাদর পেতেছি।'

'বোধহয় নয়, নিশ্চয়ই।'

এর পর থেকে প্রত্যেক রবিবার সকালে এসে বিছানার চাদর পাল্টে দিতেন বৌমা। কবে কি রান্না করতে হবে, তাও উনি চাকরবাকরকে বলে দিতেন। কোন কোনদিন বৌঠান নিজেও চাকরটাকে ডেকে বলে দিতেন। বেশ লাগত। সংসার না করেও সংসারের আনন্দ উপভোগ করছিলাম। আস্তে আস্তে বৌমা আমার সংসারের সমস্ত দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে নিলেন। এখন সত্যি যদি বৌমা আমার সংসারের দেখাশুনা না করেন তাহলে আমি বিপদে পড়ব কিন্তু অমন সুন্দর একটা মেয়েকে নিয়ে আজে বাজে কথাবার্তা হোক, তা আমি চাই না।...

অম্বরের যখন এক বছর বয়স তখন বিশুর জন্ম হলো। নাতি হওয়ায় রায় বাহাদুর আর তাঁর স্ত্রী সারা বেয়ার্ড রোডের সব কোয়ার্টারে মিষ্টি পাঠালেন, বেয়ার্ড রোড কালী মন্দিরে ঘটা করে পুজো দিলেন। আর রায় সাহেব? বৌঠানকে একটা গরদের শাড়ী আর বৌমাকে একটা বেনারসী দিয়ে বললেন, আমার ছোট নাতিকে যদি অন্তত একবার করে আমার বিছানায় হিসি করতে না দেন, তাহলে কিন্তু প্রেজেনটেশন ফেরৎ নিয়ে নেব।

রায় বাহাদুর চুরুট টানতে টানতে জিজ্ঞাসা করলেন, আর দাদুকে যদি আপনার বিছানায় হাগু করতে দিই তাহলে কি আমাকে একটা স্যুট দেবেন?

এসব আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হলো না। আশুতোষ হঠাৎ মারা গেলেন। এর বছর খানেকের মধ্যে রায় বাহাদুরও রিটায়ার করলেন।

'ওর কথা কি তোর মনে আছে দাদু?'

'না।'

'তোকে দিল্লী আমার কয়েক মাস পরেই রায় বাহাদুর মারা যান।'

'ওর কি হয়েছিল দাদু?' অম্বর জানতে চায়।

'মারা গেলেন হার্টফেল করে কিন্তু আসলে আশুর মৃত্যুর পর থেকেই কেমন হয়ে যান...

'তার মানে?'

রায় সাহেব একটু ম্লান হাসি হাসলেন। একটু উদাস দৃষ্টিতে দূরে কি যেন দেখলেন। 'আশু মারা যাবার পর রায় বাহাদুর রাতারাতি একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। কোনমতে অফিস করে এসেই তোকে আর বিশুকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। কারুর সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা পর্যন্ত বলতেন না। কয়েক মাস এমনি কাটল। তারপর একদিন রাত্রিবেলায় হঠাৎ আমার কোয়ার্টারে এলেন—

'রায় সাহেব! ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি?

এত রাত্রে রায় বাহাদুর? তারাপ্রসন্ন প্রথমে ঠিক বিশ্বাস করতে পারেন নি। ভাবলেন বোধ হয় ভুল শুনেছেন।

'রায় সাহেব! ঘুমুলেন?'

তারাপ্রসন্ন এবার তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে বললেন, আসুন, আসুন।

'কিছুতেই ঘুম আসছিল না। তাই ভাবলাম আপনার কাছে এসে একটু হুইস্কী খেয়ে যাই।'

তারাপ্রসন্ন যেন গাছ থেকে পড়লেন। রায় বাহাদুর সোমেশ্বর চ্যাটার্জি হুইস্কী খাবেন? 'আরে আসুন, আসুন। আপনার মত সাধু প্রকৃতির লোক আবার হুইস্কী খাবে!'

রায় বাহাদুর একটু অদ্ভুতভাবে হেসে উঠে বললেন, কি বললেন রায় সাহেব? আমি সাধু? জানেন আমার জন্য কতগুলো ছেলে ফাঁসিকাঠে ঝুলেছে? রিভলবারের গুলীতে মরেছে?

তারাপ্রসন্ন সব কিছু না জানলেও অনেক কিছু জানতেন, কিছু কিছু অনুমান করতেন। কিছু স্বদেশী ছেলের সর্বনাশ না করলে যে এমন লাফিয়ে লাফিয়ে প্রমোশন বা রায় বাহাদুর খেতাব পাওয়া যায় না, তা উনি জানতেন। তবুও বললেন, ওসব আজেবাজে কথা ছাড়ুন তো। আসুন, ভিতরে আসুন।

রায় বাহাদুর একটা চেয়ারে বসেই বললেন, আজেবাজে কথা? আমি মোটেও আজেবাজে কথা বলিনি। টেগার্ট সাহেবকে খুশী করার জন্য, চাকরিতে প্রমোশন পাবার লোভে নেকড়ে বাঘের মত স্বদেশী ছেলেগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তাম। মোটা বুটের লাথি মারতে মারতে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছি। এমন জোরে পেটে লাথি মারতাম যে ছেলেগুলো পায়খানা করে দিত, দিনের পর দিন রক্তবমি করত।

'ওসব কথা এখন ভেবে কি হবে?'

'আশু মারা যাবার পর থেকে শুধু ঐ সব কথাই তো ভাবছি। আর কিছু ভাবতে পারি না।'

'না, না, ওসব কথা ভাববেন না।'

প্রায় পাগলের মত রায় বাহাদুর হাসলেন, ভাববেন না বললেই কি ভাবনা দূর হয়?

রায় বাহাদুর নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দিলেন, হয় না রায় সাহেব, হয় না। যাদের আমি অত্যাচার করেছি তারা সবাই রোজ রাত্রে আমার কাছে আসে......।

'আঃ! কি যা তা বলছেন রায় বাহাদুর?'

'বিশ্বাস করুন রায় সাহেব, আপনার কাছে আমি মিথ্যা কথা বলছি না। কারুর কাছে এসব কথা বলতে পারি না। নিজের স্ত্রী-পুত্র বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী—কারুর কাছে এসব কথা বলতে পারিনি...

'আমার কাছেই বা বলছেন কেন?'

'না বলে থাকতে পারছি না। এতদিনের এত অপকর্মের কথা কাউকে না বলে আমি প্রায় পাগল হয়ে উঠেছি...

তারাপ্রসন্ন বললেন, বৌঠানকে বললেই পারতেন।

'আপনি পাগল হয়েছেন রায় সাহেব? আপনার বৌঠান আমার এইসব কীর্তি জানলে আমাকে নিয়ে ঘর করতেন? নাকি ভালবাসতেন? নাকি আমাকে ভাল-মন্দ খাওয়াবার জন্য সারা দিন রান্না ঘরে কাটাতেন?'

সেই পাগলের মত আবার একবার বিচিত্র হাসি হাসলেন রায় বাহাদুর। তারপর বললেন, এই পৃথিবীতে কোন মানুষ কি কোন একজনের কাছে সব কথা বলতে পারে? কারুর কাছেই জীবনের সব কথা বলা যায় না রায় সাহেব।

কথাটা শুনেই রায় সাহেব চমকে উঠলেন। সত্যিই তো সব কথা কাউকে বলা যায় না। রায় বাহাদুর তো ঠিকই বলছেন। তাহলে তো ওর মাথা খারাপ হয়নি। তারাপ্রসন্ন ক্ষণিক মুহূর্তের মধ্যেই নিজের জীবনের সমস্ত অতীতটাকে দেখে নিলেন। মনে পড়ল আরতির কথা।

আরতি!

সবাই জানে তারাপ্রসন্ন সরকার মদ খায়। হয়ত জানে রাজা-মহারাজাদের প্যালেসে গিয়ে বাইজীর নাচ দেখে। রাত্রে স্ফূর্তি করে কিন্তু কেউ জানে না আরতির

কথা! এমন কি বরদাকান্ত সর্বাধিকারীও জানতেন না।

এসব ঘটনা আজকাল তারাপ্রসন্নর মনে পড়ে না। রায় বাহাদুর সোমেশ্বর চাটার্জির কথা শুনে আজ সব কিছু মনে পড়ল। খুঁটিনাটি, সব কিছু স্পষ্ট মনে পড়ল।

একদল বাঙালী তীর্থযাত্রীর সঙ্গে স্বামী হরিদ্বার থেকে কলকাতা চলে গেলেন আর তারাপ্রসন্ন বরদাকান্ত সর্বাধিকারীর সঙ্গে দিল্লী এলেন। বরদাকান্ত একা তীর্থে যাননি, গিয়েছিলেন স্ত্রী আর বিধবা আরতিকে নিয়ে। হরিদ্বার থেকে ট্রেনে আসার সময় বরদাকান্ত নিজের জীবনের দুঃখের কাহিনী শোনাচ্ছিলেন তারাপ্রসন্নকে, পর পর তিনটি সন্তান নষ্ট হবার পর এই মেয়েটির জন্ম হলো। দশটা নয়, পাঁচটা নয়, এই একটি সন্তানকে নিয়েই বেশ ছিলাম কিন্তু পূর্ব জন্মের কর্মফলের জন্য এই মেয়েটিকে নিয়েও সুখী হতে পারলাম না। বিয়ের এক বছরের মধ্যেই বিধবা হলো।

কোন কথা না বলে তারাপ্রসন্ন চুপ করে শুনেছিল বরদাকান্তের দুঃখের ইতিহাস।

বরদাকান্তের স্ত্রী বললেন, সংসার করতে আর ভাল লাগে না বাবা। মাঝে মাঝেই তাই বেরিয়ে পড়ি। তীর্থে-টীর্থে গেলে তবু মনটা একটু ভাল লাগে।

সারা ট্রেনে আরতির সঙ্গে একটিও কথা বলেনি তারাপ্রসন্ন। বলার প্রয়োজন বা সুযোগ আসেনি।

বরদাকান্তের লেক স্কোয়ারের কোয়ার্টারেই তারাপ্রসন্ন আছেন। অফিস করেন। মাসখানেক পরে তারাপ্রসন্ন মেসে চলে যাবার কথা জানাতেই ওরা আপত্তি করলেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই। কিছুতেই যেতে দিলেন না। তারাপ্রসন্ন থেকে গেলেন।

আরতি কখনও কখনও তারাপ্রসন্নর খাবার জায়গা করে দিত বা অফিস থেকে আসার পর এক কাপ চা দিয়ে যেত কিন্তু কেউ কোন কথাবার্তা বলত না। সকালে অফিস যাবার ব্যস্ততা থাকত। বিকেলে অফিস থেকে ফিরে তারাপ্রসন্ন অধিকাংশ দিনই একটা নাটক-নভেল পড়তে বসত। বরদাকান্ত রোজ সন্ধ্যার পর তাসের আড্ডায় যেতেন। যদি কোনদিন কোন কারণে তাসের আড্ডা না বসত তাহলে দুজনে বসে গল্পগুজব করতেন। দিল্লীর রাস্তাঘাট চেনার পর তারাপ্রসন্ন একটু ঘুরে ফিরে সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরতেন।

সেদিন বোধহয় একটু বেশী দেরীই হয়েছিল। দরজায় আওয়াজ করতেই আরতি এসে দরজা খুলে ভিতরে চলে গেল। নিত্যকার মত তারাপ্রসন্ন জামা-জুতো খুলল। তারপর আলনা থেকে ধুতিটা নিতে গিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পেল না। ঘর থেকেই উঁকি মেরে দেখল বাইরে দাঁড়িয়ে মেয়েটা আছে নাকি। না বাইরের দাঁড়িয়ে কেউ নেই। আর একবার আলনাটা খুঁজে দেখে না পেয়ে বলল, মাসীমা, আমার ধুতিটা কোথায় জানেন?

জবাব না পেয়ে আবার ডাকল, মাসীমা, একটু এ-ঘরে আসবেন?

মাসীমা এলেন না, এলো আরতি। 'মা নেই।'

'আমার ধুতিটা দেখতে পাচ্ছি না বলে......

'এখানেই তো ছিল' বলে আরতিও আলনাটা খুঁজল। পেল না। 'তাহলে কি বাবা ভুল করে পরলেন?'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি সুটকেশ থেকে একটা ধুতি বের করে পরছি।'

আরতি আর কোন কথা না বলে রান্না-ঘরে চলে গেল।

তারাপ্রসন্ন হাত-মুখ ধুয়ে ঘরে আসার পর আরতি চা দিতে এলো।

'মাসীমা কোথায়?'

'মা কীর্তন শুনতে গিয়েছেন।'

'মেসোমশাই?'

'রোজ যেখানে যান, সেই তাসের আড্ডায়।'

তারাপ্রসন্ন অবাক হলো, আপনি একলা বাড়ীতে?

আরতি একটু হাসল, তাতে কি হলো? আমি কি কচি শিশু যে ভয় পাব?

'তাহলেও......

'তাহলেও আবার কি? বুড়ী হতে চললাম, এখন আর ভয় কি?'

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে তারাপ্রসন্ন মুখ নীচু করেই বললো, ভয় নেই, সেকথা আলাদা, কিন্তু তাই বলে আপনি বুড়ী হবেন কেন?

'জানেন আমার কত বয়স?'

'কত?'

'আপনার চাইতে অনেক বেশী।'

তারাপ্রসন্ন একটু হাসল। 'অনেক বেশী হতে পারে না।'

'জানেন সামনের ভাদ্দরে আমি চব্বিশে পা দেব?'

'ভাদ্দরের এখন অনেক দেরী।'

'তাহলেও তো তেইশ!'

'হলোই না হয় তেইশ কিন্তু তাই বলে বুড়ী হবেন কেন?'

'মেয়েরা তো কুড়িতেই বুড়ী হয়।'

'সে অল্প বয়সে বিয়ে-থা হয়ে বাচ্চা-কাচ্চা হলে আলাদা কথা।'

আরতি একটু হাসি চাপতে চাপতে আবার রান্নাঘরে চলে গেল। তারাপ্রসন্ন একটা নভেল নিয়ে পড়তে বসল। কিছুক্ষণ পরে আরতি দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, চা খাবেন?'

'এইত খেলাম।'

'আমি খাব তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম।'

'তখন আপনি চা খান নি?'

'খেয়েছি।'

'তবে?'

'আমি একটু বেশী চা খাই।' একটু থেমে আবার আরতি বলল, চায়ের দোকানে বসে খাবার-দাবার খেতে খুব ভাল লাগত। এখন তো আর তা সম্ভব নয়; তাই মাঝে মাঝেই শুধু চা খাই।

আরতির কথায় তারাপ্রসন্ন মুহূর্তের জন্য একটু আনমনা হয়ে গেল।

একটু পরে আবার দু পেয়ালা চা নিয়ে এলো আরতি। একটা তারাপ্রসন্নর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, এই নিন।

চা খেতে খেতে কেউ কোন কথা বলল না। চা খাওয়া শেষ হলে আরতি জিজ্ঞাসা করল, আপনি খুব লাজুক, তাই না?

'কে বলল?'

'কে আবার বলবে? আপনাকে দেখে মনে হয়।'

'আমাকে দেখে মনে হয়?'

'দেখে মনে হয় মানে আর কি এতদিন আছেন অথচ একদিনও কথা বলেন নি বলে ধারণা হয়েছে।'

'ঠিক জানি না তো কথা বলা উচিৎ হবে কিনা, তাই বলিনি।'

'উচিৎ হবে না কেন?'

'মানে মাসীমা-মেসোমশাই বা আপনি পছন্দ নাও করতে পারেন।'

'এতদিন এখানে থাকার পর আমাদের সম্পর্কে এই ধারণা হলো?'

তারাপ্রসন্নর ধারণা যে ভুল, তা [illegible] রাতেই প্রমাণ হলো। তারপর সম্পর্ক সহজ হতে দেরী হলো না।

বরদাকান্ত অফিসে রওনা হয়েছেন। তারাপ্রসন্নও একটু পরে বেরুবে। হঠাৎ আরতি এলো! 'একটা কাজ করতে পারবেন?'

'কি কাজ?'

'খুব গোপনে করতে হবে কিন্তু।'

একটু অবাক হয়ে তারাপ্রসন্ন আরতির দিকে তাকাল, তার মানে?

'অফিস থেকে ফেরার পথে গোল মার্কেট থেকে গরম গরম সিঙ্গাড়া কিনে আনতে পারবেন?' ফিস ফিস করে আরতি বলল।

'তা গোপনে কেন?'

আরতি ইসারা করে চুপ করতে বলল। 'আমার ওসব খাওয়া বারণ, অথচ দারুণ খেতে ইচ্ছে করছে।'

তারাপ্রসন্নও ফিস ফিস করে জানতে চাইল, মাসীমা-মেসোমশাই থাকবেন যে?

'আপনি একটু দেরী করে আসবেন। ওরা তখন থাকবেন না।'

তারাপ্রসন্ন আর প্রশ্ন করে না। 'আনব।'

'একটু সাবধানে কিন্তু।'

'আচ্ছা।'

তারাপ্রসন্ন বেরুবার সময় আরতি আরো একবার সাবধান না করে পারল না, জানা-জানি হলে কিন্তু আমার সর্বনাশ!

বারান্দায় পা দিয়ে তারাপ্রসন্ন পিছন ফিরে আরতিকে একবার ভাল করে দেখে বলল, ভয় নেই, কেউ জানতে পারবে না।

অফিস ছুটির পর রোজই দু'এক-জন বন্ধুবান্ধব নিয়ে তারাপ্রসন্ন ঘুরে বেড়ায়। সেদিন একাই ঘুরে বেড়াল। বেড়াতে বেড়াতে ভাবছিল আরতির কথা। জীবনের সমস্ত আনন্দ থেকে বঞ্চিতা ভাগ্যহীনা বিধবার কথা। এইত ক'টা বছরই আনন্দের সময়। বসন্তের কোকিল তো

দীর্ঘ নয়। মধ্যাহ্নের সূর্য ঢলে পড়তে কতক্ষণ? আরতি তাও উপভোগ করতে পারল না। কিছুটা অদৃষ্টের জন্য, কিছুটা মনুষ্যত্বহীন সমাজের জন্য! ভাবতে ভাবতে বিভোর হয়ে গেল সে। আরতির প্রতি সমবেদনায়, ভালবাসায় ভরে গেল সমস্ত মন।

বাবা-মা বসাক মশায়ের মেয়ের বিয়েতে যাবার জন্য টিটাগড়ে রওনা হবার পর থেকেই আরতি জানলার ধারে বসে ছিল। দূর থেকে তারাপ্রসন্নকে দেখতেই প্রায় দৌড়ে দরজা খুলতে গেল। তারাপ্রসন্ন ঘরে ঢুকতেই তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে খুব নীচু গলায় প্রশ্ন করল, এনেছেন?

'হ্যাঁ।'

'কেউ টের পায়নি তো?'

'না না, কে আবার টের পাবে?'

'মল্লিক মশায়ের সংগে দেখা হয়েছে নাকি?'

[illegible] তো।'

[illegible] আগেই উনি ওটিকে [illegible]। তাই [illegible] যদি [illegible] দেখা হত তাহলে......

তারাপ্রসন্ন একে [illegible] করার [illegible] বলল, এ পাড়ার কেউ যাতে টের না পায় সেজন্য আমি গোলা মার্কেট না গিয়ে বেলগাছী মার্কেট থেকে কিনেছি।

'তাই নাকি?'

'আমি কি আপনার কাছে মিথ্যে কথা বলব?'

'না, না, তা বলছি না।'

সত্যি সত্যি বহুদিনের একটা সখ পূর্ণ হলো আরতির। তারাপ্রসন্নর প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেল। 'আপনাকে খুব কষ্ট দিলাম তো?'

'কষ্ট হবে কেন? বরং আনন্দ হলো?'

আপনার আর কি আনন্দ হলো? আনন্দ হলো আমার।'

'আমারও আনন্দ হলো।'

'কেন?'

'যে কোন জিনিষ চুরি করে খেলে সত্যি আনন্দ হয়। তাছাড়া...

'তাছাড়া কি?'

'আপনার অনেক দিনের ইচ্ছাটা যে পূর্ণ করতে পারলাম—সেজন্যও খুব ভাল লাগল।'

আরতি দৃষ্টিটা গুটিয়ে নিয়ে কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আস্তে আস্তে বলল, জীবনের ছোটখাট ইচ্ছাগুলো পূর্ণ করতে পারলেও এত দুঃখ, এত কষ্ট হতো না।

'আমার দ্বারা যদি কিছু সম্ভব হয়, বলবেন। কোন লজ্জা বা দ্বিধা করবেন না।'

আরতি হাসতে হাসতে বলল, শেষকালে কোনদিন রাগারাগি হলে সব বলে দেবেন তো?

হঠাৎ তারাপ্রসন্ন আরতির গায় হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন, আপনার কোন কথা কোনদিন কাউকে বলব না।

বহুদিন পর একজন যুবকের স্পর্শে আরতি কেমন যেন চমকে উঠল, একি! আপনি আমার গায় হাত দিলেন?

আরতির কথায় তারাপ্রসন্ন ছিটকে পড়ল হিমালয়ের উপর থেকে। সত্যি বিশ্বাস করুন, আমি হঠাৎ ভুল করে.....

বেশ গাম্ভীর্যের সঙ্গে আরতি বলল, ভুল করেই হোক, আর ইচ্ছে করেই হোক, আমার মত অল্প বয়সী বিধবার গায় হাত দেয়?

তারাপ্রসন্ন আরো ঘাবড়ে গেল, আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন আমি মা কালীর পা ছুঁয়ে বলতে পারি.........

আরতি এবার হেসে ফেলল—এত ঘাবড়াচ্ছেন কেন?

'সত্যি ভীষণ অন্যায় হয়ে গেছে।'

'আপনার চাইতে আমি আরো বেশী অন্যায় করেছি।'

'আপনি আবার কি অন্যায় করলেন?'

'দোকানের সিঙ্গাড়া খাওয়া আমার পক্ষে কি ভীষণ অন্যায় তা জানেন?'

'আপনি হয়ত অনিয়ম করেছেন, আর আমি অন্যায় করেছি।'

জাহ্নবী যত এঁকেবেঁকেই যাক না কেন সমুদ্রের মধ্যে বিলীন হওয়াই তার স্বপ্ন সাধনা পরিণতি। ইহাই নিয়তিও। জাহ্নবী-যমুনাকে পাবার জন্য সমুদ্রও উন্মুখ হয়ে থাকে। একটি এগিয়েছে লুকিয়ে-চুরিয়ে হলেও জাহ্নবীর মত আরতিও নিরতির দিকে এগিয়ে চলল। আর তারাপ্রসন্ন? জাহ্নবীর জল, আরতির ভালবাসার স্বাদ পাবার জন্য সমস্ত অন্তর-সত্তার মধ্যে উন্মাদ হয়ে উঠল।

রায় বাহাদুর সোমেশ্বর চ্যাটার্জীর একটি কথায় তারাপ্রসন্নর অন্ধকার স্মৃতির অরণ্য দিনের আলোর ভরে গেল। সব কথা, সব স্মৃতি বহু দীর্ঘ পথ পরিক্রমন করে অপ্রত্যাশিতভাবে একেবারে মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। আর এগুতে পারলেন না। দৃষ্টিটা পর্যন্ত ঝাপসা হয়ে গেল। রায় সাহেব তারাপ্রসন্ন সরকার হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। হবেন না? নিজের হৃৎপিণ্ডটা যদি নিজের অপারেশন করতে হয়, তাহলে?

'কি হলো রায় সাহেব, একটু হুইস্কী খাওয়াবেন না?'

'সত্যি খাবেন?'

'সত্যি খাব। বেশ খানিকটা হুইস্কী না খেলে বোধহয় আজ রাত্তিরেই আমি পাগল হয়ে যাব।'

'আবার ঐসব আজেবাজে কথা বলছেন?'

রায় বাহাদুর একটু শুকনো হাসি হাসলেন। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লেন। 'রায়সাহেব! আপনি তো কোনদিন মানুষ খুন করেন নি, তাজা তাজা ছেলেগুলোকে ফাঁসির কাঠে ঝুলান নি, তাই আমার যন্ত্রণা বুঝবেন না।'

তারাপ্রসন্নর মুখ দিয়ে একটি শব্দ বেরুল না কিন্তু মনে মনে চীৎকার করে উঠলেন খুন! ডাকাত। না না খুন করি নি, ডাকাতি করি নি। কাউকে ফাঁসিকাঠে দিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মারি নি, ফাঁসি কাঠেও ঝুলাই নি কিন্তু...........

কিন্তু কি? মনের মধ্যে কি একটা কিন্তু জেগে আছে? অনেক, অনেক কিন্তুর ভীড়। মনে হলো বরদাকান্তর আশ্রমে উঠেছিলাম না থাকলেই ভাল হতো।

একবার নয়, কয়েকবার তারাপ্রসন্ন মেস বাড়ীতে যেতে চেয়েছিলেন। 'অনেকদিন হলো। এবার বরং আমি মেসে যাই। অনেক কাল তো আপনাদের জ্বালাতন করলাম।'

'এটা কি মাস জান?' বরদাকান্ত প্রশ্ন করলেন।

'জানি।'

'তবে? আশ্বিন মাসে কুকুর-বেড়ালকে পর্যন্ত কেউ বাড়ী থেকে বিদায় করে না।'

এলো আশ্বিন।

বরদাকান্তের স্ত্রী বললেন, মা আসছে, সামনে পূজো। এখন আবার কোথায় যাবে?

এমনি করে দিন এগিয়ে চলে, এগিয়ে চলে জাহ্নবী আরতি। সমুদ্র এগিয়ে আসে কাছে আসে তারাপ্রসন্ন। মোহনা তখনও বেশ খানিকটা দূরে। তবু সমুদ্রের গর্জনে জাহ্নবী চঞ্চলা হয়, দুহাত প্রসারিত করে সমুদ্রকে আলিঙ্গন করার জন্য পাগল হয়ে ওঠে।

তারপর?

যাবে যাবে সমুদ্রের ঢেউ এসে গায় লাগে।

জীবন-নদীর মোহনায় দাঁড়িয়েও তারাপ্রসন্ন আবার অনুরোধ করলেন মেসেতেই এবার আর আপনারা বারণ করবেন না।

বরদাকান্ত জবাব দেবার আগেই তাঁর স্ত্রী বললেন এখন তুমি চলে গেলে বাড়ীটা বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগবে। তাছাড়া সামনের বছর উনি রিটায়ার করলে তো আমরাও দেশে চলে যাব। আমরা চলে যাবার পরই তুমি মেসবাড়ী যেও এখন আর যেও না।

কিন্তু;

আর কিন্তু? অরণ্য-পর্বত আর দীর্ঘ সমতলভূমি অতিক্রম করে যে জাহ্নবী সিন্ধু-সমাগমে সমাগত সেখানে কি কোন কিন্তু তার গতিরোধ করতে পারে?

'কি হলো রায় সাহেব? কি এত ভাবছেন? আমি সত্যিই হুইস্কী খাব।'

তারাপ্রসন্ন তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন না, না কি আর ভাবব?

'রায় সাহেব! আমি পুলিশ অফিসার। আমাকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করবেন না।' রায় বাহাদুর সোমেশ্বর চ্যাটার্জী আবার একটু শুকনো হাসি হাসলেন আমার কথা শুনে ভাবনা হওয়া স্বাভাবিক। ভাবছেন এতগুলো ছেলের সর্বনাশ করার পরেও লোকটা কিভাবে এতদিন সবকিছু চেপে রেখেছিলেন, তাই না?

তারাপ্রসন্ন ক্লান্ত শূন্য দৃষ্টিতে একবার রায় বাহাদুরের দিকে তাকালেন।

রায় বাহাদুর নিজেই আবার বলা শুরু করলেন, জামা-কাপড়ের তলায় সবারই একটা নগ্ন দেহ লুকিয়ে থাকে কিন্তু উন্মাদ ছাড়া কেউ পুরো নগ্ন দেহটা দেখাতে পারে না। আমি তো পাগল নই যে সবকিছু প্রকাশ করে ফেলব।

রায় সাহেব তারাপ্রসন্ন সরকারও পাগল না। জীবনে কত কি পেয়েছেন, কত কি হারিয়েছেন, তবু পাগল হন নি। তাইতো উনিও সিন্ধুর কাছে জাহ্নবীর বিলীন হবার কথা, আরতির আত্মসমর্পণের ইতিহাস কাউকে বলেন নি। বলতে পারেন নি, পারবেন না কিন্তু ভুলতে পেরেছেন কি? অসম্ভব। পাগল না হলে সে রাত্রের কথা ভুলা যায় না।

শীতকাল। ডিসেম্বরের শেষ। সিমলার মত বরফ পড়ছে না কিন্তু মানুষ জমে যাচ্ছে। তারপর বিকেল থেকে বৃষ্টি নেমেছে। সঙ্গে উত্তরের ঝড়ো হাওয়া। অফিস থেকে এসেই বরদাকান্ত লেপ মুড়ি দিয়ে বিছানায় বসলেন। তারপর চা খেয়ে গিন্নীকে বললেন হ্যাগো, আজ আর অন্য কিছু রান্নাবান্নার ঝামেলা না করে খিচুড়ি কর। গিন্নী জবাব দিলেন তা তো বুঝলাম কিন্তু কয়লা-কাঠ সব ভিজে গেছে। কিভাবে যে উনুন ধরাই, তাই ভাবছি।

একটু দেরী হলেও খিচুড়ি রান্না হলো, খাওয়া হলো। আরতিও দুধ-মিষ্টি খেয়ে নিল। তারপরই শোবার পালা। তারাপ্রসন্ন বারান্দার ঘেরা জায়গায় থাকে। অন্য দুটি ঘরের একটিতে কর্তা-গিন্নী অন্যটিতে আরতি। সেদিন শুতে যাবার আগে গিন্নী

বললেন, তারা আজ বরং তুমি ঐ ঘরে শোও। বৌ এ ঘরেই শোবে এখন।

তারাপ্রসন্ন যেন অবাক হলো, কেন মাসীমা?

কেন আবার? আজ ওখানে শুলে তোমার দারুণ ঠাণ্ডা লাগেবে।'

প্রস্তাবটা হেসেই উড়িয়ে দিল তারাপ্রসন্ন, লেপ মুড়ি দিলে অম্বর ঠাণ্ডা। আপনি কিছু ভাববেন না।

ওরা তিনজনেই অনুরোধ করলেন। কিন্তু তারাপ্রসন্ন বার বার বলল, কিছু ভয় নেই। আমি মহা আরামে ঘুমোব।

সব শেষে আরতি বলল, এই ঠাণ্ডায় আমরা এমন ঘুম ঘুমোব যে মাঝ রাত্তিরে আপনি ডাকাডাকি করলেও আমাদের সাড়া পাবেন না।

বরদাকান্ত লেপের ভিতর থেকেই মন্তব্য করলেন, মাঝ রাত্তির তো দূরের কথা, দ্যাখ সকালে কখন উঠি।

যে যার জায়গায় শুতে শুতেই আলো নিভে হয়ে গেল। সামনের স্কোয়াড্রের মিত্তির-দের কোয়ার্টারে রোজ অনেক রাত অবধি আলো জ্বলে। এই শীতের মধ্যেও বারোটা একটা পর্যন্ত আলো জ্বলে কিন্তু আজ ও বাড়ীতেও আলো নেই। এত জোরে ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে যে রাস্তার আলোগুলো অস্পষ্ট আবছা মনে হচ্ছে। রাস্তা দিয়ে একটা টাঙ্গা পর্যন্ত যাচ্ছে না। এক কথায় যা দুর্যোগের রাত্রি। লেপ মুড়ি দিয়ে শোবার কিছুক্ষণের মধ্যেই তারাপ্রসন্ন ঘুমিয়ে পড়ল।

তখন কত রাত্রি তা তারাপ্রসন্ন জানে না। ঘুম ভেঙে গেল। ঝড়-বৃষ্টির তেজ আরো বেড়েছে। ঠাণ্ডা বাতাস এসে বিছানাপত্র বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। লেপ মুড়ি দিয়েও শীত যাচ্ছে না। তবু অনেকক্ষণ ঐভাবে পড়ে রইল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্যি অসহনীয় হয়ে উঠল। অথচ কাউকে ডাকাডাকি করতে পৌরুষে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল।

না, তারাপ্রসন্ন আর সহ্য করতে পারল না। উঠে পড়ল। মনে মনে ঠিক করল দরজায় একটু আওয়াজ করলে যদি আরতির ঘুম না ভাঙে তাহলে ওপাশের জানলায় ধাক্কাধাক্কি করবে। আলনা থেকে শাল আর ফুলহাতা সোয়েটার নিয়ে চলবে। খুব আস্তে দরজা খুলে বারান্দায় পা দিতেই ঠাণ্ডা ঝড়ো হাওয়ায় কেঁপে উঠল। আস্তে আস্তে পা টিপে দরজার সামনে এগুতেই তারাপ্রসন্ন চমকে উঠল। আর একটু হলেই চীৎকার করত। সারা গায় কম্বল জড়িয়ে আরতি দরজার সামনেই দাঁড়িয়েছিল। মন্ত্রমুগ্ধের মত তারাপ্রসন্ন এগিয়ে আসতেই আরতি একটু হাসল।

অবাক বিস্ময়ের সঙ্গে তারাপ্রসন্ন ফিস ফস করে প্রশ্ন করল, তুমি এভাবে দাঁড়িয়ে আছ?

'তোমার জন্য।'

'আমার জন্য?'

আরতি তারাপ্রসন্নর হাত ধরে ঘরের মধ্যে এনে বলল, আমি জানতাম তুমি উঠবেই।

তারাপ্রসন্ন কোন কথা না বলে শুধু ওর হাতখানা নিজের হাতের মুঠোর নিয়ে চেয়ে রইল।

'শীত করছে?'

'হ্যাঁ। দারুণ শীত করছে।'

'এসো বিছানায় বসি।'

'না, না, যদি মাসীমা-মেসোমশাই।

'কিছু ভয় নেই। ডাকাত পড়লেও ওদের ঘুম ভাঙবে না।'

তারাপ্রসন্ন বসল।

'পা তুলে বসো।'

তারাপ্রসন্ন পা তুলে বসল। আরতি পাশে বসে লেপটা টেনে বলল, কাছে এসো লেপ গায় দিয়ে বসি।

বাইরের মতন ওদের দুজনের মনের মধ্যেও ঝড়ো বাতাস উঠল। প্রথমে আস্তে, তারপর তার বেগ বাড়তে আরম্ভ করল।

'কি হলো রায় সাহেব? উঠবেন না—' রায় বাহাদুর যেন আর ধৈর্য ধরতে পারেন না।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইত যাচ্ছি' বলে প্রায় দৌড়ে গিয়ে রায় সাহেব হুইস্কীর বোতল এনে দুটো গেলাস ভরে দিলেন।

(তিন)

'একি জেঠু! আপনি এখানে বসে আছেন?' এই ভোরবেলায় বোতল-গেলাস নিয়ে তারাপ্রসন্নকে এইভাবে বসে থাকতে দেখে অবাক না হয়ে পারলেন না আশু-তোষের স্ত্রী।

অবাক হবেন না? তারাপ্রসন্ন মদ খান কিন্তু তাই বলে এইভাবে সামনের ঘরে দরজা খুলে? তারপর এই এত ভোরে? তাছাড়া যে অম্বর ওর প্রাণ, সে এত জোরে এতক্ষণ ধরে কাঁদছে অথচ উনি মদের বোতল নিয়ে বসে আছেন?

'কে আরতি?' তারাপ্রসন্ন হঠাৎ যেন চমকে উঠলেন।

'না জেঠু, আমি আরতি না, আমি হেনা, আপনার বৌমা।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ তুমি হেনা। আরতি কোথায় থেকে আসবে?'

তারাপ্রসন্নর কথায় আশুতোষের স্ত্রী আরো বেশী অবাক। এতদিন ধরে দেখছে কিন্তু কোন দিনের জন্যও এমনভাবে কথা-বার্তা বলতে শোনে নি। অম্বর কাঁদছে বলে উনি আর না দাঁড়িয়ে শোবার ঘরে চলে গেলেন। ঘুম থেকে উঠে দাদুকে পাশে না দেখে অম্বর ভয় পেয়েছে। হেনা ওকে কোলে নিতে গিয়ে বিছানা দেখেই বুঝলেন জেঠু ঘুমোতে আসেন নি। সারা রাত বাইরের ঘরে বসেই মদ খেয়েছেন।

হেনা অম্বরকে নিয়ে ওদের কোয়ার্টারে চলে গেলেন। তারাপ্রসন্নকে কোন প্রশ্ন করলেন না কিন্তু মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন, অনেক জিজ্ঞাসা থেকে গেল। আরতি? কে এই আরতি? রায় সাহেব তারাপ্রসন্ন সর-কার তো পিছন ফিরে তাকান না। উনি তো অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করেন না। তবে কে এই আরতি? রায় সাহেব তারাপ্রসন্ন সরকারকে পর্যন্ত এইভাবে আনমনা করতে পারে? সারা রাত্রি অম্বরের কাছ থেকে টেনে রাখতে পারে?

অজস্র সহস্র প্রশ্ন হেনার মনে উঁকি দিতে লাগল। হঠাৎ ওকে আরতি বলে ভুল করলেন কেন? এর আগে তো কখনো এমন ভুল করেন নি?

পরের ক'দিন তারাপ্রসন্ন কেমন একটু আনমনা হয়ে দিন কাটালেন।

'বৌমা অম্বর রইল। আমি যাচ্ছি।'

হেনা অম্বরকে কাছে টেনে নিয়েই প্রশ্ন করল, একি জেঠু, চটি পরেই অফিস যাচ্ছেন?

তারাপ্রসন্ন তাড়াতাড়ি কোয়ার্টারে গিয়ে চটি ছেড়ে বুট পরে অফিস গেলেন।

মা ভগবতীর কত রূপ! কখনও দুর্গা, কখনও কালী-তারা-ভুবনেশ্বরী! আরো কত কি। মা ভগবতীর মত একই নারীর কত রূপ! তারাপ্রসন্ন আপন মনে ভাবেন। বিয়ের আগের দিন এক রূপ, বিয়ের পরের দিন অন্য রূপ। বর্ষার পদ্মার মত এক রাতের মধ্যে সে প্রমত্তা হয়ে ওঠে। শাঁখা, সিঁদুর আর রঙ্গীন শাড়ী ছাড়লে আবার কি আশ্চর্যভাবে পাল্টে যায়। যেমন আশুর বৌ হেনা পাল্টেছে।

হেনাকে প্রথম দিন দেখেই তারাপ্রসন্নর ভাল লাগে। আপন মনে হয়। স্নেহ করতে ইচ্ছে করে। ভাবভোলা উদার মদ্যপ তারা-প্রসন্নকেও হেনার ভাল লেগেছিল। তাই তো এমন সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠল।

কিন্তু?

ভাবতে গিয়েও তারাপ্রসন্ন চমকে উঠলেন। হেনা বিধবা হবার পর ঠিক আরতির মত লাগল কেন?

আশুতোষের মারা যাবার পর থেকেই হেনাকে দেখে তারাপ্রসন্ন মনের মধ্যে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করতেন অথচ ঠিক বুঝতে পারতেন না, ধরতে পারতেন না কেন এমন অস্বস্তি হয়। রোগ হবার সঙ্গে সঙ্গেই কি রোগ ধরা পড়ে? সেদিন রাত্রে রায় বাহাদুরের কথায় জমাই সবকিছু মনে পড়ল। আরতির সমস্ত ইতিহাস। এমন কি দেশে ফিরে যাবার পর তার আত্মহত্যার কথাও! নিঃস্তব্ধ রাত্রিতে নিঃসঙ্গভাবে গেলাস গেলাস হুইস্কী খেতে খেতে মনের রোগটাও ধরা পড়ল! হেনাকে হঠাৎ দেখলে আরতিই মনে হয়।

মানুষের মনের মধ্যে কত প্রশ্ন, কত কথা লুকিয়ে থাকে কিন্তু জীবন তো এগিয়ে চলবেই। সুখে-দুঃখে, শীত-গ্রীষ্মে সমান-ভাবে। এগিয়ে চলে তারাপ্রসন্নর জীবন রায় বাহাদুরের জীবন, হেনার জীবন। দিনে দিনে তিলে তিলে বড় হয় অম্বর, বিশু। অম্বর এখন আর দাদুর কাছে শুতে চায় না, অধিকাংশ দিনই শোয় না। বিশুর সঙ্গে খেলা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে। তারাপ্রসন্ন শুতে যাবার আগে একবার রায় বাহাদুরের কোয়ার্টারে এসে হেনাকে ডা[illegible] কেন, হ্যাগো বৌমা দাদু কি ঘুমিয়ে পড়েছে?

হেনা হাসতে হাসতে জবাব দেয়, সে কি এখন? ওদের তো এখন মাঝ রাত্তির।

'তাহলে?'

'তাহলে আবার কি? আমার কাছে যেমন থাকে অমনি থাকবে। আপনি নিঃশ্চিন্ত মনে শুতে যান।'

'কিন্তু.........

'কিন্তু আবার কি?'

'মাঝ রাতে যদি তোমাকে বিরক্ত করে?'

'ও আজকাল কিছু বিরক্ত করে না। সেই ভোরবেলায় ঘুম ভাঙলেই দুটো বিস্কুট চাই। তাছাড়া সারা রাত্রি কোন ঝামেলা নেই।'

তারাপ্রসন্ন একাই ফিরে আসেন। প্রায় প্রতিদিনই এমন হয়।

সেদিন রবিবার। রায় বাহাদুর বিশু আর অম্বরকে নিয়ে ডালকোটরায় বেড়াতে গিয়েছেন। রায় বাহাদুরের স্ত্রী রান্নাঘরে। রায় সাহেব সামনের বারান্দায় বসে একটা বই পড়ছিলেন। চাকরটা এই মাত্র এক কাপ চা দিয়ে গেছে। ঠিক এমন সময় হেনা এলো।

'এসো বৌমা এসো। চা খাবে?'

'এক্ষুনি চা খেয়েছি। আর খাব না।'

'বসো।'

হেনা বসল। 'কি বই পড়ছেন?'

'শরৎবাবুর চরিত্রহীন।'

হেনা হাসতে হাসতে বলল, আজকাল আপনি শরৎবাবুর বই খুব পড়েন, তাই না জ্যেঠু?'

'কি করব বল? তুমি সার্টিফিকেট দেবার পর না পড়ে পারি?'

'আমার সার্টিফিকেটের এত দাম?'

'নিশ্চয়ই।'

'যাক তবু আপনার কাছে আমার মতামতের একটা দাম আছে।'

'কেন? আর কারুর কাছে কি নেই?'

'থাকলেও এতটা নিশ্চয়ই নেই।'

'কে বলল তোমাকে?'

'কেউ বলেনি। এমনি আমার মনে হয়।' এক মুহূর্তের জন্য একটু ভেবে হেনা বলল, আপনি আমাকে একটু বেশী ভালবাসেন তাই না জ্যেঠু?

তারাপ্রসন্ন খুশীতে হাসলেন।

'হাসলে কি হবে? আমি ঠিকই বলেছি।'

'তোমার যদি তাই মনে হয় তাহলে আমি আর কি বলব? ভালবাসা উপলব্ধির জিনিষ, স্বীকৃতি - অস্বীকৃতিতে কিছু আসে যায় না।'

'ঠিক বলেছেন জ্যেঠু। কিরণময়ী বা উপেনের ভালবাসার কি কোন তুলনা হয়? অথচ কোন স্বীকৃতিই ওরা পায়নি।'

তারাপ্রসন্ন আবার হাসলেন, তুমি পড়াশুনা করলে স্বচ্ছন্দে বি-এ এম-এ পাশ করতে পারতে।

'ইচ্ছে থাকলেও কি জীবনে সব কিছু হয় জ্যেঠু? তাছাড়া মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের ইচ্ছা - [illegible] কে মূল্য দেয় বলুন?'

'তুমি [illegible] সন্দেহর কথা বল।'

হেনা একটু হাসল।

'হাসির কথা নয় বৌমা। সত্যি তোমার সঙ্গে কথা বলে বড় আনন্দ পাই।'

বিকেলের দিকে রায় বাহাদুর বিশু আর অম্বরকে নিয়ে বেড়াতে গেলে হেনা প্রায় রোজই তারাপ্রসন্নর সঙ্গে গল্প করেন। বিকেল বেলায় রান্নাবান্নার কাজ রায় বাহাদুরের স্ত্রীই করেন। হেনা দুপুরের রান্না করে বলে ওকে আর এ-বেলা হেঁসেলে ঢুকতে দেন না। হাজার হোক বিধবা তো।

নানা রকম কথাবার্তা গল্প-গুজব হয়। কোনদিন কিরণময়ী - উপেনকে নিয়ে, কোনদিন সংসারধর্ম বা অন্য কোন বিষয়ে। কিরণময়ীর জন্য হেনার বড় দুঃখ, বড় সমবেদনা।

'কিরণময়ীর কি ছিল না বলুন তো জ্যেঠু? রূপ ছিল, বুদ্ধি ছিল সাহস ছিল। আর কি চাই?'

হেনা প্রশ্ন করে তারাপ্রসন্নর দিকে তাকাতেই উনি বললেন তা ঠিক। তবে কামনা-বাসনা বোধ হয় একটু বেশীই ছিল আর সেজন্যই সবকিছু ভেঙেচুরে ছারখার হয়ে গেল।

'কামনা - বাসনা কার নেই বলতে পারেন? আপনার নেই? আমার নেই?' হেনা একটু উত্তেজিত হয়েই পাল্টা প্রশ্ন করল।

তারাপ্রসন্ন চমকে উঠলেন।

কতই বা বয়স হবে হেনার? সাতাশ-আঠাশ। বড় জোর তিরিশ। তার বেশী তো কিছুতেই নয়। কত অজস্র কামনা - বাসনা চরিতার্থ করার এইত মরশুম অথচ ক-বছর আগেই ওর জীবনের আনন্দমেলা চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু দেহ আর মন? তারা তো শুকিয়ে যায়নি। এখনও সতেজ। অভাবিত সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ।

তারাপ্রসন্ন আপন মনে ভাবছিলেন এই-সব কথা। নানা কথা। বিধবা হেনার দুঃখের কথা। হঠাৎ আরতির একটা কথা মনে পড়ল। 'মাছ - মাংস - ডিম বা মুসুরের ডাল খাই না। খেতে নেই। ওগুলো খেলে উত্তেজনা বাড়ে। কিন্ত নিয়ম করে দুধ আর ফল খেয়ে আমার শরীরটা কি হয়েছে দেখেছ?'

আজকের মত সেদিনও তারাপ্রসন্ন কোন জবাব দিতে পারেনি। চুপ করে বসেছিল আরতির মুখের দিকে তাকিয়ে।

আরতি বলেছিল, মাছ-মাংস-ডিম না খেলেই যদি সংযমী হওয়া যেত তাহলে সমস্ত হিন্দুস্থানীগুলোই সন্ন্যাসী হয়ে যেত।

হেনার মত আরতির এত বুদ্ধি বা রুচিবোধ ছিল না কিন্তু সেও মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিল জীবনের অনেক কথা, অনেক সমস্যা। আরতির কথায় তারাপ্রসন্ন অবাক না হয়ে পারেন না। বুঝতে পারেন ওর কথাগুলি অত্যন্ত যুক্তিসংগত অথচ সম্মতি জানাতেও দ্বিধা আসে, সংকোচ আসে। জ্ঞান, সত্যকার জ্ঞান অথবা চরম সুখ-দুঃখেই তো মানুষ জীবনের পরম সত্য উপলব্ধি করতে পারে কিন্তু তারাপ্রসন্নর জীবনে তো সে অবকাশ আসেনি।

নিজের সুখ-দুঃখের কথা বলার সুযোগ আরতি বিশেষ পেত না। তাছাড়া কাকে বলবে? মনের কথা বলার মত মানুষ কোথায়? তাই তো তারাপ্রসন্নর কাছে এগিয়ে এসেছিল।

'কদিন আপনার সঙ্গে খুব বকবক করেছি বলে নিশ্চয়ই আমাকে খুব খারাপ লেগেছে?'

তারাপ্রসন্ন আশ্বস্ত করেছে ওকে, না, না, খারাপ লাগবে কেন?

'নিজের কথা বলতে পারলেও অনেকটা শান্তি পাওয়া যায়।'

'এ পাড়ায় আপনার কোন বন্ধু নেই?'

'দুজন ছিল। একজনের কলকাতায় বিয়ে হয়েছে, আরেকজন অবশ্য কাছাকাছিই থাকে।'

'তার সঙ্গে দেখাশুনা হয় না?'

'আগে হতো। এখন হয় না।'

'কেন?'

'আমার ভাল লাগে না।' আরতি একটু অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, ও শুধু স্বামীর গল্প করে বলে আমার ভীষণ অস্বস্তি হয়, রাগ হয়।

তারাপ্রসন্ন চুপ করে রইল।

কিছুক্ষণ পরে আরতি আবার বলল, যখন আমার বিয়ে হয় তখন স্বামীর গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা ঠিক বুঝতাম না কিন্তু যখন মনপ্রাণ দিয়ে স্বামীকে চাইলাম, তখনই পাট চুকে গেল।

বেশ কিছুকাল পরে আরতি একদিন কথায় কথায় বলেছিল, বিধবা হয়েছি বলে কি দেহটা ইঁট-কাঠ দিয়ে তৈরী হয়েছে? নাকি থান কাপড় পরি বলে দেবতা হয়ে গেছি?

হেনার কথায় আরতির কথাগুলো মনে না করে পারলেন না তারাপ্রসন্ন। 'ঠিকই বলেছ তুমি। তবে সমাজ-সংসার আর পারিপার্শ্বিকতা বিচার করে মানুষকে অনেক কিছুই মেনে নিতে হয়।'

রায় বাহাদুর বিশু আর অম্বরকে নিয়ে ডালকাটরা থেকে ফিরে আসতেই হেনা উঠে যায়। তারাপ্রসন্ন চুপ করে বসে থাকেন। ভাবেন। হেনার কথা ভাবেন। শুধু দুঃখ, আক্ষেপ নয়, একটু যেন বিদ্রোহের সুর শুনতে পান ওর কথাবার্তায়। তবে কি ওর জীবনেও কিছু ঘটেছিল? কিছু চাপা পড়ে আছে দায়িত্ব-কর্তব্য সমাজ-সংস্কারের অদৃশ্য বন্ধনের নীচে? আশ্চর্য কি অসম্ভব কি?

রায়বাহাদুর রিটায়ার করলেন। [illegible]

তারাপ্রসন্ন জিজ্ঞাসা করলেন, দেশে ফিরে যাবেন নাকি?

'দারাজীবন [illegible] করার পর কোন [illegible] দেশে ফিরব?'

'তাহলে?'

'তাহলে আবার কি? [illegible] থাকব।'

[illegible] বাড়ী [illegible] নিলেন রায়বাহাদুর। বাড়ী ভাড়া নেবার পর রায়সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা চলে গেলে আপনি থাকবেন কিভাবে?

হাসতে হাসতে রায়সাহেব জবাব দিলেন, যেভাবে আপনারা থাকবেন।

'কথাটা কত সহজ হয়ে থাকা কি অত সহজ হবে?'

'উপায় কি বলুন রায়বাহাদুর?'

'কষ্ট করেও আপনি না হয় থাকলেন কিন্তু ঐ বাচ্চা দুটো? ওরা কি কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারবে?'

তারাপ্রসন্ন চট করে কোন জবাব দিতে পারলেন না।

রায়বাহাদুর আবার বলেন, তাছাড়া বৌমা কি অম্বরকে ছেড়ে থাকতে পারবেন?

রায়সাহেব চুপ করেই রইলেন।

পরের দিন সকালে হেনা রায়সাহেবের শোবার ঘর গুছোতে গুছোতে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা জেঠু, কদিন পর কে আপনার বিছানাপত্র গেলাস-বোতল সামলাবে?

রায়সাহেব সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে পালটা প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা বৌমা, তোমার বাবা কি মদ খেতেন?

'হঠাৎ এ প্রশ্ন করছেন কেন?'

তারাপ্রসন্ন হাসতে হাসতে বললেন, নিশ্চয়ই তোমার কোন প্রিয়জনকে তুমি মদ খেতে দেখেছ নয়ত......

'নয়ত কি?'

'নয়ত আমাকে তুমি এত পছন্দ করতে না।'

রায়সাহেবের কথা শুনে হেনা এক-মুহূর্তে পাথর হয়ে কোথায় যেন তলিয়ে গেল, হারিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে নিজেকে সামলে নিয়ে একটু ম্লান হাসি হেসে বলল, জেঠু, কিরণময়ীর মত সাহস থাকলে আপনার কথার জবাব দিতাম কিন্তু আমার অত সাহস বা মনের জোর নেই।

হেনার উত্তর শুনে তারাপ্রসন্ন অত্যন্ত লজ্জিত হলেও জিভ্ কসকে বলে ফেললেন, কিন্তু বৌমা, আসল কথাটাই যে বলে ফেললে।

'বলে ফেললেও তো ভয় নেই। আপনি তো আর পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ঘুরে কুৎসা রটিয়ে বেড়াবেন না।'

'আমার প্রতি তোমার এত আস্থা? এত বিশ্বাস?'

'নিশ্চয়ই, একশ'বার।'

'আমি তোমার কোন ক্ষতি করতে পারি না?'

'পারেন কিন্তু করবেন না।'

'কেন বলো তো বৌমা?'

'কাউকে বেশী ভালবাসলে, স্নেহ করলে তার ক্ষতি করা যায় না।' কথাটা বলেই হেনা একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল।

রায়বাহাদুর কদিন পরেই বাড়ী পাল্টালেন। হেনা বাচ্চা দুটোকে নিয়ে সব দেখে গেল। তখন রায়সাহেব অফিসে। রায়সাহেবের চাকরের হাতে একটা ছোট্ট চিঠি দিয়ে গেল। জেঠু, আপনাকে প্রণাম করে বিদায় নেবার ক্ষমতা নেই বলেই আপনি অফিস যাবার পর ও বাড়ী রওনা হচ্ছি। আপনার দাদুর জন্য চিন্তা নেই। ও আমার কাছে অনেক কিছু না পেলেও মায়ের স্নেহ নিশ্চয়ই পাবে।

বিকেলবেলায় অফিস থেকে ফিরে চিঠিটা পড়তে পড়তে তারাপ্রসন্নর চোখে জল এসে গেল।

'জানিস দাদু, জীবনে ঐ একটা দিনই শুধু আমি চোখের জল ফেলেছি। নিজের স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ হারাবার পর দুঃখ পেয়েছি কিন্তু চোখের জল ফেলি নি।'

অম্বর মুখ বুজে দাদুর কথা শুনছিল।

জীবনে যেমন অনেক কিছু পেয়েছি তেমনি না পাবার দুঃখও কম সহ্য করিনি। আজ এতদিন পর যখন হিসাব-নিকাশ করতে বসি। তখনই এই মেয়েটার কথা বড় বেশী মনে হয়। পরের জন্মেও ওর ঋণ শোধ করতে পারব কিনা জানি না।'

বিশুকে দেখলেই অম্বরের অনেক কথা মনে হয়। বহুদিনের বহু স্মৃতি একসঙ্গে মনের মধ্যে ভীড় করে। কিছু ঝাপসা, কিছু স্পষ্ট। কিছু মনে পড়ে, কিছু ভুলে গেছে। তবে সবচাইতে দাদুর একটা কথা, একটা অনুরোধ, উপদেশ সবচাইতে বেশী মনে পড়ে। চন্দনাকে দেখলে মনে পড়বেই। শুনলি দাদু, মাতৃঋণ শোধ করতে নেই, শোধ করা যায় না। একেবারেই অসম্ভব। হেনা বেঁচে থাকলে তবু বলতাম ওর গোলাম হয়ে থাকিস কিন্তু ও তোকে শুধু দিয়েই গেল, তোর কাছ থেকে কিছু নিল না। তাইতো বলছি বিশু-দাদুকে দেখিস। তোর দ্বারা যেন ওর কোন ক্ষতি না হয়।'

বুড়ো তারাপ্রসন্ন বিশুকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলতেন, ছোট দাদু, তোদের দুজনের যেন ছাড়াছাড়ি না হয় কোনদিন। বৌমা নেই কিন্তু ওর আত্মা তোদের আশে-পাশেই ঘোরাঘুরি করে। দেখিস ওর আত্মা যেন কোন কষ্ট না পায়।

না, ওরা ছাড়াছাড়ি হয় নি। একে একে যখন সবাই চলে গেলেন, পড়ে রইল শুধু ওরা দুজনে, তখন ওরা আরো বেশী নিবিড় হলো, ঘনিষ্ঠ হলো। দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল কত মাস, কত বছর। বিশু আর অম্বর আর্কিটেক্ট হলো।

'ভাবতে পারিস বিশু, আজ নতুন মা আর দাদু থাকলে কি কাণ্ডটাই না হতো।' রেজাল্ট বেরুবার পর সারাদিন দুজনে মিলে বাইরে বাইরে ঘুরে-ফিরে, সিনেমা দেখে, রেস্তোরায় খেয়ে বাড়ী ফিরতেই অম্বর বললো।

বিশু আনন্দে শিস দিয়ে গান গাইতে গাইতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। একবার মায়ের ফটোটার দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে অম্বরের কাঁধে হাত রেখে বলল, মন খারাপ করিস না।

আর একটিও কথা বলতে পারল না ওরা দুজনে। কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে দুজনে শুয়ে পড়ল।

'অম্বু, ঘুমিয়েছিস?'

'না।'

'রেজাল্ট বেরুবার পরই বাড়ীতে এসে মা আর দাদুর ফটোতে প্রণাম করা উচিত ছিল, তাই নারে?'

'আমি তো তোকে বলেছিলাম। তুই তো শুনলি না।'

'আমি হঠাৎ এমন মেতে উঠি যে তখন কিছুই খেয়াল থাকে না।'

'তাই বলে মার ফটোতে প্রণাম করতেও ভুলে যাবি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বিশু বললো, সত্যি ভীষণ অন্যায় হয়ে গেছে।

অম্বর কিছু বলল না। দুজনেই চুপচাপ শুয়ে রইল কিন্তু কারুরই চোখে ঘুম এলো না অনেকক্ষণ।

'যাই বলিস অম্বু, তুই কিন্তু আমার চাইতে মাকে বেশী ভালবাসিস।'

'জানি না।'

'তুই না জানলেও আমি তো বুঝতে পারি।'

সময় আপন বেগে এগিয়ে চলল। বিশু হঠাৎ একটা টেম্পোরারী চাকরি পেল ভূপালে। অম্বরকে জিজ্ঞাসা করল, কি করি বলতো অম্বু?

'কি আবার করবি? নিয়ে নে।'

'একে তো টেম্পোরারী, তারপর মাইনে কম। তাও আবার ভূপালে।'

'একেবারে বসে থাকার চাইতে তো ভাল।'

'তুই একলা একলা থাকবি কি করে?'

'তুইও তো ভূপালে একলাই থাকবি।'

'আমি তো আর তোর মতন সেন্টি-মেন্টাল না।'

'সেন্টিমেন্টাল হলাম তো কি হলো?'

'একে তো সারাদিন কোন কাজকর্ম নেই, তারপর সেন্টিমেন্টাল। হয়ত সারাদিন দাদু আর মার ফটোর সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কাঁদবি।'

অম্বর বিশুকে বকুনি না দিয়ে পারল না, তুই বড্ড বাজে বকিস।

বিশু ভূপাল চলে গেল।

জীবনে এই প্রথম ওরা ছাড়াছাড়ি হলো। ভূপালে পৌঁছেই বিশু চিঠি দিল, ভাই অম্বু, ঠিক মতনই এসে পৌঁছেছি কিন্তু তোকে ছেড়ে এসে একটুও ভাল লাগছে না। সব সময়ই তোর কথা মনে পড়ছে। এখন মনে হচ্ছে চাকরিটা না নিলেই ভাল হতো। দিল্লীতে দুজনেই যে চাকরি পাব, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বড় জোর দু'এক মাস দেরী করতে হবে। বাবার ইন্সিওরেন্সের পুরো তিন হাজার টাকাই তো পোস্টাফিসে পড়ে আছে। ভয় কি? তোর চিঠি পেলেই আমি রওনা দিতে পারি।

চিঠিটা পেয়ে অম্বর হাসল। মনে মনে বলল, বিজে! কে সেন্টিমেন্টাল? তুই না আমি? লিখল, হাজার হোক জীবনের প্রথম চাকরি, করছিস। নিশ্চয়ই মন দিয়ে কাজ করে সবাইকে খুশী করবি। তাছাড়া এখানে একটা ভাল চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত ও চাকরি ছাড়ার কোন কথাই উঠতে পারে না। আমি ভালই আছি। আমার জন্য চিন্তা করিস না। স্বরূপ সিং কোম্পানীতে একটা দরখাস্ত দিয়েছি। হয়ত হতে পারে। তোর সব খবর জানাস।

দেখতে দেখতে আরো কয়েক মাস পার হলো। ভুপালে বিশু বেশ জমিয়ে নিয়েছে। স্বরূপ সিং কোম্পানীতে নয়, চৌধুরী অ্যান্ড গুপ্তাতে অম্বরও একটা চাকরি পেয়েছে। তবে চাকরিতে জয়েন করার আগে অম্বর কদিনের জন্য ভুপাল গিয়েছিল। সেখান থেকে দুজনে দিল্লী ঘুরে গেছে এক সপ্তাহের জন্য।

এর মধ্যে অম্বর বাবর রোডের ইন্দুবাবুর ছেলের বিয়ের বরযাত্রী গেল পুসা রোডে। তিন-চারজন ভদ্রলোক বরযাত্রীদের আদর-অভ্যর্থনা করছিলেন। অম্বর চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখতেই একজন এগিয়ে এসে বললেন, এই নিন সিগারেট।

অম্বর হাত জোড় করে বললো, ধন্যবাদ! আমি সিগারেট খাই না।

'সে কি? ইয়াংম্যান, সিগারেট খান না?'

'না আমি খাই না।'

'বরযাত্রী এসে সিগারেট খাবেন না, সে কি হয়? নিন, নিন, একটা তুলে নিন।'

'সত্যি আমি সিগারেট খাই না। খেলে নিশ্চয়ই নিতাম।'

'আজকাল তো প্রায় সব ছেলেরাই সিগারেট খায়। আপনি দেখছি রিয়েলি একজন এক্সসেপসন!'

বয়স্ক ভদ্রলোক এত সম্মান করে কথাবার্তা বলছেন বলে অম্বর অস্বস্তিবোধ করে, আমি আপনার চাইতে বয়সে অনেক ছোট। আমাকে আপনি বলার কোন দরকার নেই।

খাওয়া-দাওয়ার পর ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি দিল্লীতেই থাকেন?

'হ্যাঁ। আমি দিল্লীরই ছেলে।'

'কোথায় থাকেন?'

'বেঙ্গলী মার্কেটে।'

'বরাবরই ওখানে আছেন?'

'না। আগে বেয়ার্ড রোডে থাকতাম। তবে সে অনেককাল আগে।'

'বেয়ার্ড রোডে?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার বাবার নামটা জানতে পারি?'

'আমার বাবাকে চিনবেন না, উনি দেশে থাকেন। তবে আমার দাদুকে চিনতে পারেন......'

'কে আপনার দাদু?'

'রায় সাহেব তারাপ্রসন্ন সরকার।'

ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে বললেন, তুমি অম্বর?

'হ্যাঁ।'

ভদ্রলোক একটু উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করলেন; আমাকে চিনতে পারছ কি?

একটু সংকোচের সঙ্গে অম্বর ওর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, না, ঠিক চিনতে পারছি না তো।

'আমি পবিত্র মুখার্জী। এবার মনে পড়ছে?'

অম্বর জবাব দেবার আগেই ভদ্রলোক আবার বললেন, রাঙা কাকিমার কথা মনে আছে?

'হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। আপনি কি চন্দনার বাবা?'

'তাহলে মনে পড়েছে দেখছি।'

অম্বর প্রণাম করতেই উনি ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন, কত দিন পরে তোমাকে দেখছি!

তারপর ঐ বিয়ে বাড়ীর ভীড়ের মধ্যেই পবিত্রবাবু অম্বরকে নিয়ে হৈ চৈ শুরু করে দিলেন। প্রথমে গিন্নীর কাছে নিয়ে বললেন, চিনতে পারছ?

'কে বলো তো?'

অম্বর সঙ্গে সঙ্গে বলল, রাঙা কাকিমা, আমি অম্বর।

'ও অম্বর! তুই এত বড় হয়ে গেছিস?'

অম্বর প্রণাম করবার আগেই রাঙা কাকিমা ওকে জড়িয়ে ধরে বললেন, এখনও পায়েস খেতে অমনি ভালবাসিস তো?

'এখন আর পাই কোথায়?'

অম্বরের কথাটা শুনে রাঙা কাকিমার বড় কষ্ট হলো। 'কবে আসবি বল পায়েস খেতে?'

'যেদিন বলবেন।'

'কাল তো এই বিয়ে বাড়ীতেই ব্যস্ত থাকব; কাল আর আসিস না। পরশু আয়।'

'দুপুরে অফিস আছে। সন্ধ্যায় পর আসব।

'বেশী রাত করিস না যেন।'

'এতদিন পর আপনার হাতের পায়েস খাব, দেরি করি কখনও? হয়ত অফিস থেকেই সোজা চলে আসব।'

'সেই ভাল। অফিস ছুটি হলেই চলে আসিস।'

'আসব।'

অম্বর রাঙা কাকিমাকে প্রণাম করতেই পবিত্রবাবু বললেন, চল, এবার চন্দনার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিচ্ছি।

বিয়ে বাড়ীর সর্বত্র একদল মেয়ের জটলা। চন্দনাকে খুঁজে বের করতে বেশ একটু সময় লাগল।

'হ্যাঁরে খুকু, একে চিনতে পারছিস?'

হঠাৎ একজন সুন্দর লাজুক যুবকের যুবককে সামনে হাজির করে এমন প্রশ্ন করতেই চন্দনা একটু অপ্রস্তুত হলো। এক ঝলক দেখে নিয়ে বললো, না তো।

অম্বর হাসতে হাসতে বলল, একবার ভাল করে আমার কপালের দিকে তাকিয়ে দেখো তো চিনতে পার কিনা।

সামান্য একটু মুখটা তুললেও অম্বরের মুখের দিকে ভাল করে চাইতে পারল না চন্দনা।

পবিত্রবাবু আর ধৈর্য ধরতে পারলেন না, ওরে, এ আমাদের অম্বর। এবার চিনতে...

'তুমি অম্বরদা?'

'তবে কি ভুত?'

(চার)

বহুকাল পরে রাঙা কাকিমার হাতের পায়েস খেতে খেতে অম্বরের অনেক কথা মনে পড়ল। ছোটবেলায় সে-সব সোনালী দিনগুলো বেশ কাটত। দাদুর আদর, নতুন মার ভালবাসা, ঠাম্মার কাছে গল্প শোনা, ছোট দাদুর সঙ্গে বিকেলে বেড়ানর উপরে ছিল রাঙা কাকিমার পায়েস।

'তুই আর বিশু যেদিন প্রথম স্কুলে গিয়েছিলি সেদিনকার কথা মনে আছে?' রাঙা কাকিমা অম্বরকে প্রশ্ন করলেন।

'না ঠিক মনে নেই।'

'পাছে তুই কান্নাকাটি করিস বলে ছোনা সারাদিন স্কুলে একটা টিফিন কৌটোয় পায়েস নিয়ে বসে ছিল।'

শুনতে ভারি মজা লাগল অম্বরের। হাসল।

চন্দনা জিজ্ঞাসা করল, পায়েস কি তুমি করে দিয়েছিলে?

রাঙা কাকিমা উত্তর দেবার আগেই অম্বর পাল্টা প্রশ্ন করল, তবে কি তোমার তৈরী পায়েস নিয়ে নতুন মা স্কুলে গিয়েছিলেন?

'একদিন আমার হাতের পায়েস খেয়ে দেখো। মাথা ঘুরে যাবে।'

রাঙা কাকিমা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ওর হাতের পায়েস কিন্তু সত্যি খুব ভাল।

'ঠিক আছে। সামনের শনিবার পরীক্ষা করব।'

কাকু আর কাকিমা প্রায় একসঙ্গেই বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়ই আসবি।

চন্দনা বললো, দুধ পাঠিয়ে দিও। পায়েস করে দেব।

এমনি গল্পগুজব হাসি-ঠাট্টা করে অম্বরের বেশ কাটল সে সন্ধ্যাটা। অনেক কাল পরে দেখা হলেও ওরা কেউই পাল্টান নি। ঠিক আগের মতই আছেন। পবিত্রবাবুকে যে রায় সাহেব চাকরি দিয়েছিলেন, সেকথা উনি ভোলেন নি। সেদিন কথায় কথায় বার বার বললেন সেকথা। 'জান অম্বু, তোমার দাদুর মত উদার মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। উনি যে কত লোকের উপকার করেছেন, তার ঠিক ঠিকানা নেই।'

অম্বরের শুনতে ভীষণ ভাল লাগছিল।

'অথচ দুঃখের কথা কি জান? যারা ওর মজার করে খাচ্ছে, তারাই ওর বেশী নিন্দা করে।'

এসব অম্বর জানে। তাই শুধু একটু হাসল।

রাঙা কাকিমা বললেন, তোর বোধহয় বলাই বিশ্বাসের কথা মনে নেই। জ্যেঠু না হলে উনি কি জীবনে কোনদিন অফিসার হতে পারতেন? অথচ আমাদের ঘরে জ্যেঠুর ফটোটা দেখলেই যা তা বলতেন।

অম্বর আবার একটু হাসল।

রাঙা কাকিমার হাতের পায়েস খেতে তো ভাল লাগলই কিন্তু তার চাইতে আরো ভাল লাগল ওদের আদর, ভালবাসা। সহজ, সরল, পরজাতীয়ের মত ব্যবহার। মাঝে মাঝে টুকটাক মন্তব্য করলেও চন্দনা সংযত। হাজার হোক বড় হয়েছে, কলেজে পড়ছে। ছোটবেলার খেলার সঙ্গিনী চন্দনাকে এত দিন পরে দেখে অম্বরের মনটা খুশীতে ভরে গেল।

'ছোটবেলায় তুমি কি দারুণ ঝগড়াটে আর মারপিটে ছিলে, তা জান?' অম্বর জানতে চাইল।

'ছোটবেলায় সবাই ঐ রকম থাকে।'

'মোটেও না। তোমার মত কেউ মাথা ফাটিয়ে দেয় না।'

চন্দনা লজ্জা পায়। মুখ নীচু করে সলজ্জ হাসি হাসে।

'এখনও কত লোক আমার কপালে কাটা দাগ দেখেই জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু বলতে পারি না তুমি খুন্তী দিয়ে আমার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলে'।

চন্দনা বললো, সেটা কি আমার প্রতি মহত্ত্ব দেখাবার জন্য? নাকি নিজের দুর্বলতা ঢাকার জন্য?

'বাঃ। তুমি তো ভারী চমৎকার কথা বলো।'

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকে। তারপর অম্বর জিজ্ঞাসা করে, তুমি কোন কলেজে পড়ছ।

লেডী আরউইনে।'

'তাহলে তো আমাদের বাসার খুব কাছে।'

'হ্যাঁ।'

'কলেজ ছুটির পর চলে এসো মাঝে মাঝে।'

'আমরা বন্ধু-বান্ধব মিলে ওদিকে তো প্রায়ই যাই।'

'কেন?'

'ফুচকা, আলুর টিকিয়া খেতে।'

অম্বর হাসতে হাসতে বললো, আমাদের পাড়ার ঐ দোকানগুলো সত্যি প্রায় পপুলার।

কদিন পরে সকালের দিকে অম্বর অফিস যাবার জন্য তৈরী হচ্ছে, এমন সময় কে এসে 'বেল' বাজাল। ভাবল, বোধহয় বিশুর এক্সপ্রেস ডেলিভারী চিঠি এসেছে। দরজা খুলে দেখল চন্দনা।

'একি তুমি? হঠাৎ এ সময়?'

'মাতৃ আজ্ঞা পালন করবার জন্য এসেছি।'

'তার মানে?'

'হাতের কৌটো দেখে বুঝতে পারছ না?'

'নিশ্চয়ই কিছু খাবার-দাবার পাঠিয়েছেন।'

দরজার বাইরেই দাঁড়িয়েছিল চন্দনা। তাই চন্দনা প্রশ্ন করল, ভেতরে ঢুকে ঢোকা কি বারণ?'

অম্বর লজ্জিত হলো। 'সরি! এসো ভিতরে এসো।'

খাবারের কৌটোটা সামনের সেন্টার টেবিলে নামিয়ে রেখে চন্দনা একবার সমস্ত ঘরটা দেখল। 'ঘর দেখলে তো মনে হয় না ব্যাচিলারের ফ্ল্যাট।'

'তাই নাকি?'

'সত্যি, ভারী সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।'

'ভয় নেই, বিশু একদিনের জন্য এলেই সব বারোটা বাজিয়ে দেবে।'

'ও বুঝি ভীষণ অগোছাল?'

'ও একদিন থাকার পর এসো। মনে হবে ভূতের নৃত্য হয়ে গেছে ঘরের মধ্যে।'

অম্বর থেমে বললো, যাই হোক বসো।'

হাতের ঘড়িটা দেখে পাশের সোফায় বসতে বসতে চন্দনা বললো, আর বিশেষ সময় নেই।'

'ক্লাশ কটায়?'

'রোজই ন'টায় শুরু হয়; তবে আজ ফার্স্ট পিরিয়ডের লেকচারার আসবেন না।'

'ক্লাশ শেষ হয় ক'টায়?'

'অধিকাংশ দিনই সাড়ে চারটেয়।'

'একটু বসো। আমি জুতোটা পরে আসি। এক সঙ্গেই বেরুব।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই অম্বর তৈরী হয়ে এলো। 'চলো'।

'তোমার খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে?'

'সকালে বিশেষ কিছু খাই না।'

'না খেয়েই অফিস যাও?'

'ঐ একটু বিস্কুট বা কেক-টেক খেয়ে নিই।'

'ভাত খাও না?'

'লাঞ্চের সময় মাদ্রাজী হোটেলে খাই।'

'আর রাত্রে?'

'রাত্রেও কোন কোনদিন ওখানেই খাই। নয়ত রুটি-মাখন-দুধ।'

চন্দনা আরেকবার হাতের ঘড়িটা দেখল। একটু কি যেন ভাবল। তারপর বললো, প্লেট আছে।?'

'আছে কিন্তু কেন?'

'একটা প্লেট দাও তো।'

অম্বর ভিতর থেকে একটা প্লেট এনে ওর হাতে দিতেই চন্দনা কৌটো খুলে পায়েসটা ঢেলে দিল। 'নাও, খাও।'

'এতখানি পায়েস এখনই খাব?'

'মোটেও এতখানি না। খেয়ে নাও।'

শুরু হলো চন্দনার আসা-যাওয়া। কখনও সকালে খাবারের কৌটো নিয়ে, কখনও বিকেলের দিকে ফুচকা আর আলুর টিকিয়া খাবার লোভে। এছাড়া প্রায় প্রতি রবিবারই রাঙা কাকিমার নেমন্তন্ন। এর মধ্যে একবার দুদিনের জন্য বিশু এসেছিল। অম্বর অনেকবার বললো রাঙা কাকিমার ওখানে যেতে কিন্তু ও গেল না। দিল্লীর পুরানো বাঙালী বাসিন্দাদের ও বিশেষ পছন্দ করে না। ওর ধারণা অনেকেই ওর আড়ালে সোমেশ্বর দারোগার নীতি বলে ওকে নিয়ে ঠাট্টা করে, হাসিহাসি করে। পবিত্র মুখার্জী রায় বাহাদুর সোমেশ্বর চ্যাটার্জীর অনেক কীর্তির কথা জানলেও ওর নিন্দা করেন না। উনি ঠিক ঐ ধরনের মানুষ না। অম্বর সব বললো, তবু বিশু গেল না।

'কি ইন্টারেস্টিং, বিশুদা এলো না?' রাঙা কাকিমা জিজ্ঞাসা করলেন।

'না কাকিমা, ও অফিসের কাজে খুব ব্যস্ত।'

'ওকে দেখতে ভীষণ ইচ্ছে করে। অনেক কাল দেখি নি তো।'

'পরের বার এলে নিয়ে আসব।'

'নিশ্চয়ই নিয়ে আসিস।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ আনব।'

খুব বেশী লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে অম্বর পছন্দ করে না কোন কালেই। এখনও করে না। অফিস ছাড়া মাঝে মাঝে রাঙা কাকিমার ওখানে যায়। নয়ত বাড়ীতে থাকে। বইপত্র-জার্নাল পড়ে। অথবা কোন ডিজাইন নিয়ে বসে। তাতেও যখন সময় কাটে না তখন বাড়ীতে রান্না করা শুরু করল।

সেদিন ছুটি ছিল। রান্না শুরু করল দশটার পর। খেতে খেতে দুটো বেজে গেল। তারপর শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়তে পড়তে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে তা নিজেই টের পায় নি। ঘুম ভাঙল কলিং বেলের আওয়াজে। পর পর কয়েকবার বেশ জোরে বেল বাজতেই তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠল। তখন বেলা পড়ে গেছে, প্রায় সন্ধ্যা লাগে লাগে। ঘড়িটা দেখার ইচ্ছা ছিল কিন্তু দেরী হবে বলে তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজাটা খুলল। চন্দনাকে দেখে বললো, তুমি এ সময়?

চন্দনা সে কথার জবাব না দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুমি বুঝি ঘুমাচ্ছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'এই সন্ধ্যেবেলা পর্যন্ত কেউ ঘুমোয়?'

ঘরের আলোটা জ্বালাতে জ্বালাতে অম্বর বললো, বই পড়তে পড়তে অনেক বেলায় ঘুমিয়েছি।'

'তুমি বিকেলে কোথাও যাও-টাও না?'

'কোথায় আবার যাব?'

'কোথায় আবার যাব মানে? এই সময় কেউ বাড়ীতে বসে থাকে?' চন্দনা যেন একটু রাগ করেই কথাগুলো বললো।

অম্বর একটু সহজ হবার জন্য বললো, বাড়ীতে না থাকলে কি তোমার সঙ্গে দেখা হতো?'

'সে কথা ছাড়। তাই বলে এই সময় কেউ একলা একলা বাড়ীতে বসে থাকে না।'

'আগে বসো। তারপর তোমার কথার জবাব দিচ্ছি।'

'বসছি কিন্তু আমার কথার জবাব দাও।'

'আমি একলা মানুষ একলাই থাকি।'

'একলা বলে কি কোন বন্ধু-বান্ধবও থাকতে নেই?'

'আজেবাজে-ফালতু লোকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব করতে ভাল লাগে না।'

'তাই বলে কি একজনও তোমার বন্ধু নেই?'

'বিশু ছাড়া আমার আর কেউ নেই।'

'এত বড় বাড়ীতে একলা একলা থাকতে ভাল লাগে?'

'ভাল লাগে না, তবে অভ্যাস হয়ে গেছে।'

'চন্দনা আর কোন প্রশ্ন করল না। অম্বরও চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'আজ ছুটির দিন তুমি কোথায় গিয়েছিলে?'

'ক'জন বন্ধুতে মিলে কনটুম্পোসে সিনেমা দেখতে এসেছিলাম।'

'কি খাবে বল।'

'কিছু না।'

'তাই কি হয়? চা না কফি?'

'তোমাকে আর চা-কফি বানাতে হবে না।'

'আমিও তো বিকেলে চা-কফি খাইনি। বসো; আমি এক্ষুনি আসছি' বলে অম্বর ভিতরে চলে গেল।

কয়েক মিনিট পরে চন্দনাও উঠল। শোবার ঘর পেরিয়ে রান্নাঘরে।

'তুমি আবার রান্নাঘরে এলে কেন?'

'তোমার সংসার দেখতে।'

'আমার সংসারে কি দেখার কিছু আছে?'

রান্নাঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে চন্দনা একটু চাপা হাসি হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি বিয়ে করেছ অম্বরদা?'

অম্বর হাসল, 'হঠাৎ এমন অদ্ভুত প্রশ্ন করছ?'

'তোমার রান্নাঘর দেখে মনে হচ্ছে তোমার আর আজকাল মাদ্রাজী হোটেলে খেতে হয় না।'

'এই রান্নাঘরে গিন্নীকে ঢোকাবার আগে তোমরা জানতে পারবে।'

'এইসব রান্নাবান্না কে করল?'

'কে আবার করবে? আমি নিজেই।'

'তুমি?' চন্দনা সত্যি অবাক হয়।

'হ্যাঁ আমি।'

'তুমি রান্না করতে পার?'

'পারতাম না, সম্প্রতি শিখেছি।'

'মাস্টারনীটি কে?'

অম্বর হেসে বলল, 'তোমার মত কোন সুন্দরী নয়।'

'সুন্দরী না হয় নাই হলো কিন্তু তিনি কে?'

'চলো। চা খেতে খেতে বলছি।'

চা নিয়ে ওরা দুজনে ড্রইংরুমে এসে বসল। চায়ের কাপে দু' একবার চুমুক দিয়ে অম্বর বললো, 'বাড়ীতে তো বিশেষ কাজ থাকে না, তাই একটা রান্নার বই কিনে নিজেই রান্না করছি।'

'বই পড়ে পড়ে রান্না শিখছ?'

'হ্যাঁ।'

'তাই বুঝি এতদিন আমাদের ওদিকে যাচ্ছ না?'

'না, সেটা ঠিক কারণ নয়।'

'তবে?'

চা খাওয়া শেষ করে অম্বর চন্দনার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'সত্যি জানতে চাও?'

'কেন, বলতে আপত্তি আছে?'

'না, না, আপত্তি নেই। তবে তোমার কি শুনতে ভাল লাগবে?'

'তোমার বলতে আপত্তি না থাকলে আমারও শুনতে আপত্তি নেই।'

অম্বর একটু চুপ করে থাকল। ভাবল। তারপর বললো, 'দাদু আর নতুন মার জন্য আমি বড় আদুরে। মানুষের আদর-ভালবাসা পেলে আমি নিজেকে সামলাতে পারি না......'

'তাতে কি হলো?'

'তাই ভাবলাম অত বেশী যাতায়াত ঠিক হবে না।'

'তুমি তো আচ্ছা লোক!'

'না চন্দনা তুমি ঠিক আমাকে বুঝতে পারছ না। আমি তো বেশী লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করি না, তাই মিশতে গেলে বড় বেশী এগিয়ে যাব। সেটা ঠিক নয়।'

'কেন?'

চন্দনার কথাটা যেন অম্বর শুনতেই পেল না। আপন খেয়ালে আবার বলতে শুরু করল, 'তোমার সঙ্গে ছোটবেলায় খেলাধুলা করেছি ঠিকই কিন্তু এখন তো তুমি বড় হয়েছ।'

চন্দনা মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'তাতে কি হলো?'

'কিছু হয় নি কিন্তু তোমাকে নিয়ে কেউ কিছু বলাবলি করুক, তা আমি চাই না।'

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? কে আবার বলাবলি করবে?'

'এখন কেউ কিছু বলছে না বলে কি ভবিষ্যতেও বলবে না?'

'ঐসব আজেবাজে চিন্তা বাদ দাও তো।' একটু থেমেই আবার বললো, 'আমি যে তোমার এখানে আসি?'

'তুমি তো আর রেগুলার আস না। তাছাড়া এ পাড়ার সবাই আমাকে চেনে, কেউ কিছু মনে করবে না।'

'যাই হোক এখন ওঠ। আমার সঙ্গে চল।'

'কোথায়?'

'কোথায় আবার? আমাদের ওখানে।'

'কেন?'

'মা ডেকেছেন।'

'রাঙা কাকিমা বলেছেন?'

'তবে কি আমি মিথ্যে কথা বলছি?'

'না, তা বলছি না তবে......'

'মা বলেছেন বলেই তো আমি এলাম।'

'কিন্তু আমার রান্নাবান্না তো হয়ে গেছে।'

'তা হোক। তুমি এখন চল।'

'তাহলে চল।'

মানুষ কত কথা বলে কিন্তু মনের কথা মনে থেকে যায়। তা বলা হয় না, বলা যায় না। কাউকেই না, কখনই না। শৈশবে না, কৈশোরে না, যৌবনে না, বার্ধক্যে না। সারা জীবনেই বলা হয় না মনের কথা। সভ্যতার অনেক অবদান কিন্তু কেড়ে নিয়েছে মানুষের সারল্য। স্বভাব, চরিত্র, রূপে ভাল হয়, মন্দ হয় কিন্তু মন? সে শরতের আকাশের মত নির্মল, মালিন্য মুক্ত। গঙ্গাজল ঘোলা হলেও গঙ্গোত্রীর জল স্বচ্ছ স্ফটিকের মত পরিষ্কার।

অম্বর যায়, চন্দনা আসে, রাঙা কাকিমা পায়েস খাওয়ান কিন্তু তবু কোন মন ভরে না। আশা মেটে না। ছোট্ট-ছোট্ট এক-একটা বুদ্বুদ জমতে জমতে বিরাট একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়।

'একটা কথা জিজ্ঞাসা করব অম্বরদা?'

'বল।'

'উত্তর দেবে তো?'

'পারলে নিশ্চয়ই দেব।'

'না পারার মত প্রশ্ন করব না।'

'তাহলে ঠিকই উত্তর পাবে।'

'আচ্ছা, তুমি সব সময় এত কি ভাব বলো তো।'

'ভাবি নাকি?' অম্বর হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল।

মাথা দোলাতে দোলাতে চন্দনা বললো, 'তুমি জান না, তাই না?'

'কই আমি তো কোনদিনই বেশী কথা-বার্তা বলি না।'

'তা তো জানি কিন্তু তবুও সব সময় তুমি যেন কি ভাবছ মনে হয়।'

অম্বরের ঠোঁটের কোণায় একটু হাসির রেখা ফুটে ওঠে। 'তুমি আমাকে বেশ লক্ষ্য করেছ।'

'করেছি বৈকি।'

'কেন?'

'কেন আবার? তোমাকে এত চুপচাপ দেখতে ভাল লাগে না। একটু চুপ করে থেকে বলে, 'আমাদের বাড়ীর সবাই তোমার কথা কত ভাবে তা জান?'

'তুমিও ভাব?'

'ভাবি বৈকি।'

'কি ভাব?'

মাথাটা নেড়ে চন্দনা বলে, 'তা বলতে পারব না।'

'বল না কি ভাব।'

'ভাবি তুমি কেন এত চুপচাপ থাকো।'

চন্দনার কথাটা ভীষণ ভাল লাগে অম্বরের। একটু হাসে। খুশীতে মনটা ভরে ওঠে মুহূর্তের জন্য। চন্দনার কানের কাছে মুখটা এগিয়ে নিয়ে একটু চাপা গলায় প্রশ্ন করল, 'কাকু বা রাঙা কাকিমা জানেন না তো?'

ঝট করে মুখ সরিয়ে নিয়ে চন্দনা বললো, জানি না।

অম্বর হাসে।

মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত। তারপরই চন্দনা কেমন যেন অদ্ভুত সুরে বললো, 'না অম্বরদা, তুমি এমন চুপচাপ থাকবে না তো! আমার ভীষণ খারাপ লাগে।'

'চন্দনা।'

চন্দনা কোন উত্তর দেয় না, দিতে পারে না।

'চন্দনা!' অম্বর আবার ডাকল।

'কি?'

'আর একটু ভেবে দেখবে না?'

'কি আবার ভাববো?' অম্বরের দিকে এক পলক তাকিয়ে বললো, 'ভাবার আমার কি আছে?'

'তাহলে আমিও আর কিছু ভাববো না তো?'

'না।'

ডালিমের মেঘ কেটে গেল, ঝলমল করে উজ্জ্বল শরতের সকাল। জীবন এগিয়ে চলে।

অম্বরের, চন্দনার, বিশ্বের। বিশ্ব ভূপাল ছাড়ে নি কিন্তু অম্বর নতুন চাকরি নিল। চন্দনার ফাইন্যাল পরীক্ষা হয়ে গেছে। পবিত্রবাবুর একবার হার্ট এ্যাটাক হয়ে তিন মাস উইলিংডনে ছিলেন। এখন ভাল। অফিস যাচ্ছেন। রাঙা কাকিমা আবার হাসছেন।

দু' হাত দিয়ে চন্দনার মুখখানা তুলে ধরে অম্বর বললো, 'একটা কথা বলব?'

'বলো।'

'দুজনের এ'কটা ছবি তুলবে?'

চন্দনা হাসল। 'দেখে আশা মিটছে না?'

'বল না তুলবে কিনা?'

'তোমার খুব ইচ্ছে করছে বুঝি?'

'হ্যাঁ। দারুণ।'

'বেশ, তুলবো।'

ঠিক দিন, ঠিক সময়ে চন্দনা এলো। সুন্দর ডোয়াকাটা একটা তাঁতের শাড়ী, কপালে বিরাট একটা টিপ, মাথায় খোপা। ঠোঁটেও বোধহয় ন্যাচারাল কলারের লিপস্টিক বুলিয়েছে, তবে বোঝা যাচ্ছে না। দরজা খুলে দিতেই অম্বর অবাক। মুগ্ধ।

'কি হলো? ভিতরে ঢুকতে দাও।'

অম্বর কোন জবাব না দিয়ে নীচের ঠোঁটটা কামড়াতে কামড়াতে আগের মতই মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

'কি আশ্চর্য ! ভিতরে যেতে দেবে না ?'

'চন্দনা !' অম্বর একটা ছোট্ট দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো।

'কি ?'

'কি সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে !'

'খুব ভাল কথা। এখন সরে দাঁড়াও তো।'

অম্বর সরে দাঁড়ালো। চন্দনা ঘরে ঢুকল।

'আমার পাশে দাঁড়িয়ে কি ছবি তুলবে ?' অম্বর হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল।

'একটু বেশী সুন্দর দেখতে বলে তোমার বড় বেশী অহংকার হয়েছে।'

'আমাকে সুন্দর দেখতে ? কে বললো তোমাকে ?'

'সবাই বলে।'

'সবাইটা কারা ? তুমি আর তোমার বাবা-মা ?'

'আমাদের কথা বাদ দাও। অন্য যাঁরাই দেখেন তাঁরাই বলেন।'

'সেই তাঁরাটি কারা ?'

'এইত সেদিন কর্ণেল মাসিমা তোমার রূপের কি দারুণ প্রশংসা করলেন।'

'কর্ণেল মাসিমা ?'

'হ্যাঁ।'

'মাসিমা আবার কর্ণেল !'

চন্দনা অম্বরকে একটা ধাক্কা দিয়ে বললো, মাসিমা আবার কর্ণেল হবেন কেন ? মেসোমশাই কর্ণেল বলে মাসিমাকে কর্ণেল মাসিমা বলি।

অম্বর হাসতে হাসতে বললো, তাই বলো ! মেয়ে পুলিশ দেখেছি, কিন্তু মাসিমারাও যে কর্ণেল হতে শুরু করেছেন, তা তো কোনদিন শুনি নি...

'আগে তুমি যেমন গম্ভীর থাকতে আজকাল ঠিক তেমনি অসভ্য হয়েছো।'

স্টুডিওতে যাবার পথে অম্বর জিজ্ঞাসা করল, তোমার মেসোমশাই কর্ণেল, তা তো জানতাম না।

'উনি আমার নিজের মাসিমা না।'

'তবে ?'

'হায়দ্রাবাদে থাকার সময় আলাপ হয়েছে।'

'তাই বলো।'

'তবে আমাদের সঙ্গে খুব বেশী ঘনিষ্ঠতা।' চন্দনা ঘাড় ঘুরিয়ে অম্বরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুমি সেদিন মাসিমাকে দেখনি ?

'না তো।'

'উনি তোমাকে দেখেছিলেন। তোমার কি দারুণ প্রশংসা।'

'হঠাৎ ?'

'থাক। নিজের প্রশংসা আর শোনে না।'

চন্দনা সত্যিই কিছু বললো না।

স্টুডিওতে [illegible] ভারী মজা হলো। দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে। ক্যামেরা-ম্যান ক্যামেরার ভিউ-ফাইন্ডারে দেখে নিয়ে ওদের সামনে এসে বললো, না, না, ঠিক ভাল লাগছে না।

ওরা দুজনে একবার দুজনকে দেখে নিল।

ক্যামেরাম্যান বললেন, 'ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, আপনাদের দুজনকে ঠিক করে দাঁড় করিয়ে দেব ?'

অম্বর শুধু বললো, 'দিন।'

ক্যামেরাম্যান ওদের দুজনকে খুব নিবিড়ভাবে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আলো ঠিক করলেন। তারপর ক্যামেরার কাছে ফিরে গিয়ে ভিউ-ফাইন্ডারে দেখলেন। 'লাভলি !' ভিউ-ফাইন্ডার থেকে দৃষ্টি তুলে বললেন, আফটার অল ইয়াং কাপল-এর ছবি। একটু রোমান্টিক না হলে কি ভাল লাগে !'

অম্বর আর চন্দনা মুগ্ধ দৃষ্টিতে মুহূর্তের জন্য দৃষ্টি বিনিময় করলো।

কদিন পরে ছবি ডেলিভারী নেবার সময় কাউন্টারের ভদ্রলোক বললেন, খুব সুন্দর হয়েছে ছবিটা। একটা ছবি আমরা শো-কেস-এ রাখতে পারি ?

কথাটা শুনে খুশী হলেও অম্বর বললো, 'এখন না। কিছুকাল পরে রাখবেন।'

শরতের টুকরো টুকরো মেঘের মত আপন গতিতে ভেসে যায় দিনগুলো।

'জান-চন্দনা, তোমাকে কিছু দিতে পারি না বলে ভীষণ খারাপ লাগে।'

'ব্যস্ত হচ্ছো কেন ? সারা জীবনই তো তুমি দেবে।'

'তবু ইচ্ছে তো করে। তাছাড়া তুমি আমাকে কত কি দিয়েছ।'

'আমি দিয়েছি বলেই তোমাকে দিতে হবে ?'

'তা বলছি না। কাউকে তো কিছু দেবার সুযোগ পেলাম না, তাই তোমাকে অনেক কিছু দিতে ইচ্ছে করে।'

'আবার মন খারাপ করছ ?'

'মন খারাপ করছি না। তবে মনে হয়।' অম্বর লুকিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো, আমি রোজগার করার আগেই তো দাদু, নতুন মা—সবাই চলে গেলেন। এমন কি নিজের একটা ছোট ভাইবোনও নেই যে তাদের কিছু দেব।'

'আমি তো আছি। তবে আবার কেউ নেই বলছ কেন ?'

'তুমি তো নিশ্চয়ই আছো। তুমি আছো বলেই তো হাসতে পারছি।' একবার চন্দনার দিকে তাকিয়ে অম্বর বললো, আমি সত্যি ভাগ্যবান। তা না হলে তোমাকে পাই ?'

'তোমার চাইতে আমার ভাগ্য অনেক ভাল।'

'কেন ?'

'মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছি, তখন স্বামী একটা জুটবেই কিন্তু তোমার মত স্বামী পাওয়া সত্যি ভাগ্য না থাকলে হয় না।'

'তুমি আমাকে বড় বেশী ভাল মনে কর।'

'নিশ্চয়ই মনে করি আর সেইজন্যই তো বুক ফুলিয়ে এগিয়ে চলেছি। মনের মধ্যে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা সংকোচ থাকলে এমনভাবে তোমাকে চাইতাম না।'

'কি বলছ তুমি ?'

'ঠিকই বলছি অম্বরদা। ছেলেরা হঠাৎ অনেক কিছু করতে পারে কিন্তু মেয়েরা বড় [illegible]। অনেক ভেবে-চিন্তে তারা এগিয়ে থাকে।'

'কাকু বা রাঙা কাকিমা কিছু জানেন নাকি ?'

'না। আগে এম-এ পাশ করে নিই। তারপর বলব।'

'সেই ভাল।'

'তুমি বিশুদাকে কিছু বলেছ ?'

'না, কিছু বলি নি। ভেবেছি আগে তোমাদের সঙ্গে আলাপ করাই, তারপর আস্তে আস্তে বলব।'

'সত্যি ! বিশুদা একদিনও এলো না তো।'

'ওকে অনেকবার বলেছি কিন্তু কিছুতেই যেতে চায় না।'

'এমনই মজার ব্যাপার যে তোমার এখানেও কোনদিন ওর সঙ্গে দেখা হলো না।'

'ওর তো আসা-যাওয়ার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। তাছাড়া আজকাল ও কম আসে।'

'কেন ?'

'একটা প্রমোশন পেয়ে ওর দায়িত্ব বেশ বেড়ে গেছে। তাছাড়া প্রায় প্রত্যেক মাসেই বোম্বে যায়।'

মাস খানেকের মধ্যেই হঠাৎ ওলট-পালট হয়ে গেল সব কিছু। দুপুরের পর অম্বরের অফিসে গিয়ে বিশু হাজির হয়ে বাড়ীর চাবিটা নিল। বললো, তাড়াতাড়ি আসিস। অমনই কপাল সেদিনই ওর ফিরতে দেরী হলো।

অম্বরকে দরজা খুলে দিয়েই বিশু পাগলের মত চীৎকার করে বলে উঠল, সর্বনাশ হয়ে গেছে।

ঘাবড়ে গিয়ে অম্বর জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে ?

'কি হয় নি তাই বল।'

'আরে কি হয়েছে বল।'

'চন্দনা এসেছিল।'

'তাতে কি হলো ?'

'আমার বারোটা বাজিয়ে গেছে।'

'তার মানে ?'

'তুই ব্যবস্থা কর।'

'কি ব্যবস্থা করব ?'

'বিয়ের।'

বিশুর কথা শুনে অম্বরের মনে হলো ভূমিকম্পে সারা দিল্লী শহরটা দুলিয়ে গেল। তবুও নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললো, 'তোর কি মাথা খারাপ হলো ?'

'তুই ভাল করে চন্দনাকে দেখেছিস ?'

'হ্যাঁ দেখেছি।'

'ওকে দেখে মাথা খারাপ হবে না ?'

'তোর কি হলো বল তো ?'

'বিশ্বাস কর অম্বু, ওকে দেখে আমার মাথা ঘুরে গেছে।' তারপর বললো, 'ওকে দেখলে সাত্তা কারুর মাথার ঠিক থাকতে পারে না।'

বিশুর কথাবার্তায় অম্বর পাথর হয়ে গিয়েছিল। তবু বললো, 'কই, আমি তো হই নি।'

'আরে তুই তো একটা সাধু !'

অম্বর মনে মনে বললো, 'আমি সাধু ? আমি মহাপাপী নিজেই [illegible] নই ?

আমি বুঝি ভালবাসতে জানি না? আমার বুঝি ভালবাসা পেতে নেই? নাকি আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো মরে গেছে? ইচ্ছা করল আরো অনেক কথা বলতে কিন্তু পারল না। চেষ্টা করেও পারল না। হাজার হোক বিশু! নতুন আর ছেলে! মুখে শুধু বললো, 'তুই জানিস আমি সাধু?'

'তোর কথা আমি জানি না?'

'আমার সব কিছু জানিস?'

'জানি বলেই তো বললাম তুই একটা সাধু।'

'তাছাড়া তুই বোধ হয় জানিস না......

বিশু কি যেন বলতে চেয়েছিল কিন্তু অম্বর শোনে নি, শুনতে চায় নি। আর কিছু শোনার মত মন ওর ছিল না।

পরের রবিবার সকাল বেলায় পবিত্রবাবু আর স্ত্রী এলেন অম্বরের কাছে। পবিত্রবাবু বললেন, জানিস তো অম্বু, আমি সামনের বছর রিটায়ার করছি?'

'তাই নাকি?'

হ্যাঁ। তাই ভাবছি রিটায়ার করার আগেই মেয়েটার বিয়ে দিয়ে দিই। তাছাড়া আমি হার্ট পেসান্ট। কখন কি হয়......

রাঙা কাকিমা বাধা দিলেন, আঃ! আবার ঐসব কথা। তুমি চুপ কর, আমি বলছি।'

'হ্যাঁ' তারপর রাঙা কাকিমাই বললেন, 'তোনার খুব ইচ্ছে ছিল ওর একটা মেয়ে হোক কিন্তু তা যখন আর হলো না তখন ও ঠিক করেছিল খুকুর সঙ্গে বিশুর বিয়ে দেবে। তাছাড়া খুকুকে তো ও দারুণ ভালবাসত......'

অম্বর অবাক হয়, 'তাই নাকি? এসব তো আমি জানতাম না।'

'আমি তোকে বলব বলব ভাবছিলাম কিন্তু বলা হয়নি।' একটু থেমে রাঙা কাকিমা বললেন, 'এই জন্যই তো একবার বিশুর খোঁজ করছিলাম। হাজার হোক অনেক কাল আগেকার কথা। কিন্তু কেমন হয়েছে বা ও কথা রাখবে কিনা ভেবে তোকেও আর কিছু বলি নি।'

অম্বর মাথা নীচু করে সব শুনেছিল।

'সেদিন খুকুর কাছে শুনলাম বিশুর সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল। বাড়ীতে ফিরে খুব বিশুর কথা বললো......

অম্বর একটু শুকনো হাসি হেসে জানতে চাইল 'কি বললো?'

'বললো বিশু নাকি দারুণ ইন্টারেস্টিং হয়েছে, ভীষণ হাসি-খুশী......

'ঠিকই বলেছে।'

পবিত্রবাবু বললেন, তাই ভাবছি একবার ভূপাল গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করি। তাই বলছিলাম তুই যদি আমার সঙ্গে যেতে পারতি তাহলে খুব ভাল হতো।

সঙ্গে সঙ্গে অম্বর বললো, 'কাকু, আমি তো একদিনও ছুটি পাব না। অফিসে দারুণ কাজের চাপ।'

'আমি একলা গেলে ও কিছু মনে করবে না তো?'

'না, না, ও-রকম [illegible]।' —ক্র

শান্তিপ্রসাদ কুণ্ডুর থেকে ফিরে আসার পর বন্দনা যখন সব কিছু শুনল জানল তখনই ছুটে এসেছিল অম্বরের কাছে। 'একি হলো অম্বরদা?'

অম্বর দু-হাত দিয়ে বন্দনাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললো, 'অদৃষ্ট বন্দনা! অদৃষ্ট। এর হাত থেকে কারুর মুক্তি নেই।'

চন্দনা কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'কিন্তু এ হতে পারে না অম্বরদা! কিছুতেই হতে পারে না।'

'মানুষের জীবনে সব কিছু হতে পারে চন্দনা।' চন্দনার মাথার উপর নিজের মুখ-খানা রেখে অম্বর বললো, 'তাছাড়া বিশুকে নিয়েও তুমি সুখী হবে।'

'অমন সুখ আমি চাই না। আমি তোমাকেই চাই অম্বরদা।'

'আমি তো জানি চন্দনা! সারা জীবনই তোমাকে আমি ভালবাসব।'

'কিন্তু......'

অম্বর আর কিছু বলতে পারল না। সমস্ত শক্তি দিয়ে চন্দনাকে জড়িয়ে ধরে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো।

একটা বুক ভরা আশা, প্রাণভরা স্বপ্ন চিরদিনের মত হারিয়ে গেল।

(পাঁচ)

মাটির তলায় একটা হরপ্পা একটা মহেঞ্জোদাড়ো পাওয়া গেছে। হয়ত এমনি আরো কয়েকটা শহর মাটির তলায় চাপা পড়ে আছে। প্রত্নতাত্ত্বিকরা একদিন না একদিন তাদের আবিষ্কার করবেনই কিন্তু মানুষের প্রত্যেক মানুষের মনের মধ্যে যে স্বপ্ন, যে আশা, যে ইতিহাস, সাফল্য-ব্যর্থতার কাহিনী চাপা পড়ে আছে, তাদের হদিশ কি কেউ কোনদিন পাবে?

বোধহয় না।

কুন্দন সিং চলে গেছে। অম্বরও অফিসে চলে গেল। মিঠু কয়েকটা জিনিস কেনাকাটা করতে খান মার্কেট গিয়েছিল। সুজন সিং পার্কের কম্পাউণ্ডে ঢুকতেই বীরেনের সঙ্গে দেখা। 'কখন এলে?' মিঠু জিজ্ঞাসা করল।

'কাল অনেক রাত্তিরেই তো আমরা ফিরে এসেছি।'

'তাই নাকি?' একটু থেমেই মিঠু বললো, 'কাল সকালেই ব্যালকনিতে বসে ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে আমরা তোমার কথা বলছিলাম।'

'আমি তো আপনার ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম কিন্তু আপনারা ছিলেন না।'

'কখন?'

'তখন বোধহয় আটটা — সাড়ে আটটা বাজে।'

'আই এ্যাম সো সরি! আমরা বিশুদা আর চন্দনার সঙ্গে বেরিয়েছিলাম।'

'কাল তো রবিবার ছিল। না থাকারই কথা।'

'এসো। আইসক্রীম খাওয়াব।'

—খুশীতে ঝলমল করে উঠল বীরেন, রিয়েলি?

'আমি তোমাকে মিথ্যে কথা বলব? যেই শুনলাম তোমার বাবা - মা চণ্ডীগড় যাচ্ছেন তখনই জানি তুমি আসবে......

'জানতেন?'

'জানতাম বলেই তো তোমার জন্য আইসক্রীম করে ডীপ-ফ্রিজে রেখে দিয়েছি।'

'আপনি যান। আমি এই চিঠিটা পোস্ট করেই আসছি।'

মিঠু উপরে এসে কিচেনে জিনিসপত্র গুলো রাখতে না রাখতেই বেল বাজল। ও দরজা খুলে বীরেনকে দেখেই বললো, এসো।

বীরেন ভিতরে এসে বসল না। বিরাট লিভিংরুমের মধ্যে পায়চারি করতে শুরু করল।

মিঠু রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে বললো, এক্ষুনি আসছি।

'কিছু ব্যস্ত হবেন না।'

কয়েক মিনিট পরেই মিঠু লিভিংরুমে ঢুকতেই বীরেন বললো, এত বড় ফ্ল্যাটে আপনি সারাদিন একলা একলা থাকেন কিভাবে?

মিঠু হাসতে হাসতে বললো, এখন তো মাস খানেক তোমার সঙ্গে গল্প-গুজব করে কাটান যাবে। তারপর আবার ভেবে দেখব।

'এক মাস না, ঠিক ছ-সপ্তাহ ছুটি।'

'তাহলে তো আরো ভাল কথা।'

'কিন্তু দু-সপ্তাহ বেশী যে আইসক্রীম খাওয়াতে হবে?' বীরেন মজা করে জিজ্ঞাসা করল।

'এখন আইসক্রীম ঠিকই পাবে কিন্তু পাশ করার পর কি দেবে না।'

'তাই বলুন।'

মিঠু ফ্রিজ খুলে আইসক্রীম বের করে দিল। 'নাও।'

'আপনার?'

'আমি তোমার মত অত আইসক্রীম খাই না।'

'অত না খেলেও একটু তো খাবেন।'

'আইসক্রীম খেলেই ভীষণ দাঁত শির শির করে।'

'সে কি? আপনার তো এমন হবার কথা নয়।'

'কেন?'

'জেনারেলি ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সী হলে এসব হয় কিন্তু আপনারা তো বাঙালী!......

'তাতে কি হলো?'

'রোজ তো মাছ খান। ক্যালসিয়াম......

'না, না, রোজ মাছ খাই না।'

বীরেন বেশী অবাক হলো। 'সে কি?'

'মাছ খেতে আমার তত ভাল লাগে না।'

'রোজ দুধ বা মাংস খান?'

'মাংস প্রায়ই খাই, তবে দুধ খাই না।'

অভিজ্ঞ ডাক্তারের মত বীরেন বললো, তাহলে তো ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সী হবেই।

'পরে ক্যালসিয়ামের কথা ভেবো। এখন খাও।'

'আমি একলা একলা খাব?'

'তাতে কিছু হবে না।'

এক চামচ আইসক্রীম মুখে দিয়েই বীরেন বললো, দারুণ হয়েছে।

'সত্যি ভাল হয়েছে?'

'সত্যি বলছি দারুণ হয়েছে।'

আইসক্রীম খাওয়া শেষ করে বীরেন বললো, আমি ছুটিতে এলেই আপনাকে ভীষণ বিরক্ত করি, তাই না?

মিঠু হাসতে হাসতে জবাব দেয়, বিরক্ত কেন করবে? বরং আমারই বেশ সময় কাটে। নয়ত দিনটা যেন কাটতেই চায় না।

'আপনি না থাকলে আমারও একই অবস্থা হতো। বাবা-মা বাইরে লেখাপড়া করায় দিল্লীতে আমার একজনও বন্ধু নেই।' বীরেন একটু থেমে আবার শুরু করে, হোস্টেলে থেকে থেকে এমন হ্যাবিট হয়ে গেছে যে কিছুতেই একলা একলা থাকতে পারি না। সব সময় হৈ-হুল্লোড় না হলে ভাল লাগে না।

'ছেলেরা একটু হৈ-হুল্লোড় না করলে কি ভাল লাগে!'

'আপনার ভাল লাগে? মা তো ভীষণ বিরক্ত হন।'

'না, না, বিরক্ত হবেন কেন?'

'সত্যি ভীষণ বকাবকি করেন। তাইতো যখন তখন আপনার এখানে চলে আসি।'

'তোমার বাবা-মা কিন্তু সত্যি খুব ভাল লোক।'

'এমনি খুব ভাল তবে বড় বেশী কনজারভেটিভ। একটুও হৈ-হুল্লোড় সহ্য করতে পারেন। না।'

'খুব ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ তো!'

বীরেনের হঠাৎ খেয়াল হয় অনেকক্ষণ গল্প করছে। 'এবার উঠি: অনেকক্ষণ আপনাকে আটকে রেখেছি।'

'আমার কি কোন কাজ আছে যে আটকে রেখেছ?'

'আজ লাঞ্চে আসবেন না?'

'না। ও অফিসেই খেয়ে নেবে।'

'আপনি তো স্নান খাওয়া-দাওয়া করবেন?'

মিঠু হাতের ঘড়ি দেখে বললো, এখন তো মোটে সাড়ে এগারোটা বাজে।

'মোটে সাড়ে এগারোটা?'

'তুমি কি ভেবেছিলে?'

'আমি ভেবেছিলাম একটা বেজে গেছে।'

মিঠু উঠে দাঁড়িয়ে বললো, বসো, একটু কফি করি।

কফি খাবার পর বীরেন চলে গেল।

মিঠুর বেশ লাগে ওকে। [illegible] সুন্দর চেহারা। দেখলেই মনে হয় ভাল ক্রিকেট খেলতে পারে। সব সময় মুখে হাসি। তবে একটু চঞ্চল। পাঁচ মিনিটও চুপ করে বসে থাকতে পারে না। [illegible] প্রায় সব সময়ই বলেন, এত চঞ্চল হলে ডাক্তারী করবি কি করে? বীরেন জবাব দেয় না, শুধু হাসে। মিঠুর এখানে এসেও গল্প করতে করতে সারা বাড়ী ঘুরে বেড়াবে, এটা-ওটা দেখবে আর একটার পর একটা প্রশ্ন করবে। মিঠু কখনো উত্তর দেয়, কখনো শুধু হাসে। প্রথম

বীরেন বলে, বাইরেকার বাঙালীর খবর মশুকে হয়।

'তুমি বুঝি অনেক বাঙালী ফ্যামিলীর সঙ্গে মিশেছ?'

'না। বিদেশীদের সঙ্গেই অনেক বেশী সম্পর্ক, তবে বাঙালীদের কথা অনেক শুনেছি।'

'আমরা বুঝি খুব মিশুকে?'

'নিশ্চয়ই।' বীরেন একবার মিঠুর দিকে তাকিয়ে বললো, আপনার মত মিশুকে মেয়ে পাওয়া তো প্রায় অসম্ভব।

'তাই নাকি?' খুশীতে মিঠু প্রশ্ন করে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, কত মেয়ের সঙ্গে মিশেছে যে এমন কমপ্লিমেন্ট দিতে পারলো?

বীরেন একটু লজ্জা পায়। 'আমার ধারণা বলেই বললাম।' একটু থেমে আবার বললো, দাদা ও ভালো আর্কিটেক্ট, এত ভাল চাকরি করেন অথচ কথাবার্তা কি সুন্দর!

মিঠু আবার হাসে, তাহলে দাদাও ভাল, আমিও ভাল?

'ভালই তো।'

মিঠু একটু পাশের ঘর ঘুরে আসতেই বীরেন বললো, দাদা আমাকে কি বলে ডাকেন জানেন?

'কি বলে?'

'আইসক্রীম ডকটর বলে।'

'কই, আমি তো কোনদিন শুনি নি।'

'অফিস যাবার সময় প্রায় রোজই আমার সঙ্গে দাদার দেখা হয়। আর দেখা হলেই আইসক্রীম ডকটর বলবেন।

'নামটা কিন্তু ঠিকই দিয়েছে।'

বিকেলের দিকে, সন্ধ্যার পর বীরেনের দেখা পাওয়া যায় না। রোজ কনটিকোলে ঘুরবে, জনতা কফি হাউসে আড্ডা দেবে। অথবা সিনেমা। এ বাড়ীতে আসে সকালে, দুপুরে।

অম্বর চলে যাবার কিছুক্ষণ পরে কুন্দন সিং চলে গেল। মিঠু ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে চুলের জট ছাড়াচ্ছিল। অনেক দিন শ্যাম্পু করা হয়নি। তারপর একদিন ভালভাবে না আঁচড়াতে পারলেই জট পড়ে। হঠাৎ বেল বাজতেই মিঠু দরজা খুলে দেখল বীরেন। 'এসো।'

মিঠুর পিছন পিছন আসতে আসতে বীরেন জিজ্ঞাসা করল, বাথরুমে যাচ্ছেন?

'চুলের জট ছাড়াচ্ছি।'

মিঠুর চুলের দিকে তাকিয়ে বীরেন বললো, বাপরে বাপ! কি দারুণ চুল আপনার!

'তুমি বলছ দারুণ কিন্তু সামলাতে আমার জান বেরিয়ে যায়।' চুলের মধ্যে মোটা চিরুণী টানতে টানতে মিঠু জবাব দিল।

'কেন?'

'একদিন ভালভাবে না আঁচড়ালেই এমন বিশ্রী জট পড়ে যে রাগের চোটে সব চুল কেটে ফেলতে ইচ্ছে করে।'

'এমন সুন্দর চুল কেউ কাটে?'

'আর সুন্দর বলো না। আমার তো প্রাণ বেরিয়ে যায়।' চুলের গোছা বুকের সামনে ধরে খুব জোরে চিরুণী টানতে টানতে মিঠু বলে।

'তাহলে অন্য মেয়েরা কি করে?'

'রেগুলার আঁচড়ালে আর শ্যাম্পু করলে আর জট পড়ে না।'

'আপনি করেন না কেন?'

'এত চুল যে নিজে নিজে ঠিক শ্যাম্পু করতে পারি না।'

'আমি হেলপ করব?'

ওর কথা শুনে মিঠু না হেসে পারে না। 'না, না, তুমি কি পার নাকি?'

'না পারার কি আছে?'

'না, না, তোমাকে কিছু করতে হবে না। আমি চুলটা আঁচড়েই কফি করছি।'

বীরেন ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। মিঠু চুল আঁচড়ায়। কিছুক্ষণ চুল আঁচড়াবার পর মিঠু বললো, এত বেশী চুল উঠে যাচ্ছে যে কিছুদিন পরে বোধহয় ন্যাড়া হয়ে যাব।

বীরেন সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারী করতে শুরু করে, সেদিন বললেন আইসক্রীম খেতে দাঁত শিরশির করে, আজ বলছেন চুল উঠে যাচ্ছে। আপনার ডেফিনিটলি ভিটামিন-ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সী হয়েছে।

নিটোল সুন্দর হাতটা এগিয়ে ধরে মিঠু বললো, এদিকে তো দিনের দিন ফুলছি।

'মোটেও আপনি ফুলছেন না।'

সত্যি মোটা হচ্ছি। পেটে কি দারুণ চর্বি হয়েছে।'

'ছেলেদের চাইতে মেয়েদের চর্বি একটু বেশীই হয়। তাছাড়া আপনি নিশ্চয়ই কোন এক্সারসাইজ করেন না?'

'কি আবার এক্সারসাইজ করব?'

'কেন? স্কিপিং।'

'এই বুড়ো বয়সে স্কিপিং করব?'

বীরেন হাসতে হাসতে বললো, এসব কথা ছাড়ুন। রোজ পাঁচ মিনিট করে স্কিপিং করুন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

দাঁড়াও এখন কফি খাওয়া যাক। পরে তুমি ডাক্তারী করো।'

মিঠু রান্নাঘরে যায়। বীরেনও বসে থাকে না। একটু পরে রান্নাঘরে হাজির হয়। মিঠুর পাশে। হঠাৎ বলে, আপনি এত বেঁটে কেন?

'আর কত লম্বা হবো?'

'সত্যি আপনি ভীষণ বেঁটে?' বীরেন মিঠুর পাশে দাঁড়িয়ে বললো, আমার চাইতে অন্তত চার-পাঁচ ইঞ্চি ছোট।

'চার-পাঁচ ইঞ্চি না এক ফুট ছোট।'

'দেখুন না আপনি আমার কানের নীচে......' বীরেন একেবারে মিঠুর গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে দেখে।

মিঠুর একটু কেমন লাগে। বীরেন ওর চাইতে বয়সে ছোট। চার-পাঁচ কি হয়ত ছ' বছরের ছোট। তবু তো ইয়ংম্যান। তাছাড়া এর আগে কোনদিন এমন করে দাঁড়ায় নি। বীরেনের মধ্যে কিন্তু কোন সংকোচ নেই। বিন্দুমাত্রও না।

'তুমি বয়সের তুলনায় একটু বেশী লম্বা। তাছাড়া রোগা......

মিঠুর কথা শেষ করতে না দিয়েই বীরেন হেসে উঠল।

'হাসছ কেন?'

'আমি রোগা?'

'আমার চাইতে নিশ্চয়ই রোগা।'

বীরেন খপ করে মিঠুর একটা হাত ধরে বললো, মোটেও আমি আপনার চাইতে রোগা না।

হঠাৎ মিঠুর মনে হলো, বীরেন অনেকটা মেজর ভরদ্বাজের মত! ইনজেকশনটা দেবার সময় সারা হাত যেন অবশ হয়ে গেল কিন্তু তারপরই মেজর ভরদ্বাজ মিঠুকে ধরে একটু

ঝাঁকুনি দিয়ে বলতেন, কি হলো মিস বেঙ্গল! বেশী লেগেছে?

লাগত তো বটেই কিন্তু মিঠু ওর কথায় মুখ নীচু করে হাসত। মেজর ভরদ্বাজের ঐ আন্তরিকতাটুকু বড় ভাল লাগতো।

হাজার হোক কর্নেল সাহেবের মেয়ে। মেজর ভরদ্বাজ যথেষ্ট খাতির করতেন। প্রথম দিন মার সঙ্গে গিয়েছিল কিন্তু তারপর একাই চলে যেত। রোজ না হলেও সপ্তাহে অন্তত একদিন মেজর বলতেন, মিস বেঙ্গল, একটু যে শুতে হবে। পেটটা একটু দেখতাম।

মিঠু টেবিলের উপর শোবার সময় মেজর হাসতে হাসতে বলতেন, কর্নেল সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন আমি আগে ভীষণ সাই ছিলাম কিন্তু বিলেতে পড়তে গেলে এক প্রফেসার একদিন বললেন মেয়েদের পরীক্ষা করার সময় হাসব্যান্ডের মত ফ্রি হতে হবে।

মিঠু শুয়ে শুয়ে হাসত। কোমরের কাপড় একটু নামিয়ে দিত। মেজর এবার ওর পেট টিপে টিপে দেখতেন। মিঠুর সারা শরীরটা শিরশির করে উঠত।

'কি, লজ্জা করছে?' মিঠুর উত্তরের অপেক্ষা না করেই মেজর ভরদ্বাজ বলতেন, আমারও লজ্জা করছে কিন্তু কি করব? মিস বেঙ্গলের অসুখ না হলে তো এসব ঝামেলা হতো না।

ওর কথাবার্তা মিঠুর ভারী ভাল লাগতো। বড় সতেজ, সজীব লাগতো। ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে যাতায়াতের সময় দেখা হলেই মিঠু জিজ্ঞাসা করত, কেমন আছেন মেজর সাহেব?

মেজর ভরদ্বাজ মজা করে বলত, আপনার মত রোগী পেলে আমার মত ছোকরা ডাক্তার ভালই থাকে।

মিঠু মুখ টিপে টিপে হাসতে হাসতে চলে যেত।

আগে ইনজেকশন নিতে মিঠুর ভয় ছিল কিন্তু পরে ছিল না। ওর মা জিজ্ঞাসা করতেন, হ্যাঁরে মিঠু, ইনজেকশন নিতে খুব ব্যথা লাগে নাকি রে?

মিঠু গম্ভীর হয়ে বলতো, লাগলে কি করব? ঐ ব্যথার কষ্ট পাবার চাইতে ইনজেকশন নেওয়া অনেক ভাল।

'তা তো বটেই।'

মিঠু মাকে বলতে পারত না, ভাল লাগত মেজর ভরদ্বাজকে। কি সুন্দর ওর কথাবার্তা, তা তো তুমি জান না। তাছাড়া কি দারুণ হ্যান্ডসাম!

ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটিতে ওর সঙ্গে যেসব মেয়েরা পড়ত, তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের বিয়ে হয়ে গেল। মিঠু নিজের বিয়ের কথাও ভাবতো। ভাবত ঠিক মেজর ভরদ্বাজের মত একটা স্বামী পাবার। এসব কথা কাউকে বলত না, বলতে পারত না। বলা যায় না।

'ব্যথা লাগছে?' মিঠুর পেট টিপতে টিপতে মেজর জিজ্ঞাসা করতেন।

'আগের চাইতে কম।'

'তাহলে আগের চাইতে ভাল আছেন, কি বলুন?'

'হ্যাঁ আগের চাইতে ভাল আছি।'

মেজর ভরদ্বাজ হাসতে হাসতে বললেন, বুড়ো ডাক্তার চিকিৎসা করলে কিন্তু এত তাড়াতাড়ি সারত না।

মিঠু হাসতো। 'আমার তো মনে হয় আপনিও ইচ্ছে করে দেরী করাচ্ছেন।'

'কি করব বলুন? আপনার মত রোগী কি হাতছাড়া করতে ইচ্ছে করে?'

মন চেয়েছিল ডাক্তারকে বিয়ে করতে কিন্তু হলো না। বিয়ে হলো আর্কিটেক্টের সঙ্গে। ইয়াং আর স্মার্ট ডাক্তার দেখলে এখনও মিঠুর মনে পড়ে হায়দ্রাবাদের দিনগুলোর কথা। মেজর ভরদ্বাজের কথা। অফিসার্স ক্লাবের এ্যানুয়াল বল-এ মেজর এসে হঠাৎ ওর হাত ধরে টেনে বললো, একি! আজকে চুপচাপ বসে?

মিঠু নাচতে পারত না। জানতো না। তবু উঠেছিল। কোন রকমে নেচেছিল মেজরের সঙ্গে।

'বিলেতে গিয়ে বোধ হয় মেয়েদের সঙ্গে নাচতেন?' স্লো স্টেপিং করতে করতে ফিস ফিস করে মিঠু জানতে চাইল।

'মাঝে মাঝে নেচেছি কিন্তু আপনার মত মিস বেঙ্গল তো কপালে জোটেনি।'

'কিন্তু ওদের সঙ্গে নাচার পর কি আমার সঙ্গে নেচে মন ভরবে?'

'মন ভরাবার মালিক তো আপনি।' মেজর মিঠুর কোমর ধরে একটু বেশী নিবিড় হয়ে বললো।

মিঠু একবার মেজরের দিকে তাকিয়েই দৃষ্টিটা নামিয়ে নেয়।

অম্বর ওকে ভালবাসে কিন্তু ঠিক এই পৌরুষ, এই বলিষ্ঠতা নেই। অম্বর যেন ওর কাছে ভিক্ষা চায়, দাবী করতে পারে না। পুরুষের পৌরুষটাই তো মেয়েদের সব চাইতে ভাল লাগে, তা বোধহয় ও জানে না।

ঐ অত লোকের ভীড়ের মধ্যেও মেজর ভরদ্বাজ এক ফাঁকে ওর চিবুকে একটু চুমু খেয়েছিল। শিউরে উঠলেও ভাল লেগেছিল। খুব ভাল, দারুণ ভাল। এমন ভাল আর যেন কোনদিন লাগেনি।

বীরেন হঠাৎ হাত ধরায় সব মনে পড়ল মিঠুর। এর আগে টুকরো টুকরো কথা, স্মৃতি মনে এসেছে কিন্তু আজ যেন সব মনে এলো। প্রথম যৌবনের আনন্দ উত্তেজনা আর রোমাঞ্চের ঢেউ বয়ে গেল মনের উপর দিয়ে, দেহের উপর দিয়ে। মিঠু একবার বীরেনের দিকে তাকিয়ে বললো, আয়নার সামনে একবার পাশাপাশি দাঁড়াব।

'আয়নার সামনে দাঁড়ালে তো আর আপনি মোটা হবেন না।'

'আগে কফি খাই, তারপর দেখা যাবে কে মোটা, কে রোগা।'

কফি খেতে খেতে বীরেন জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা দাদা জানেন, আমি সারা দিন আপনার সঙ্গে আড্ডা দিই?

'দাদা জানলে কি হয়েছে?'

আফটার অল আপনি ইয়াং ও সুন্দরী...

বীরেন হয়ত আরো কিছু বলত কিন্তু পারল না। মিঠু হাসতে হাসতে ওর একটা কান ধরে বললো, এবার পিঠে দুম দুম করে কয়েকটা কিল মারব?

'মারুন, কিন্তু কেন?'

'আমার সঙ্গে ফাজলামি হচ্ছে?'

'ফাজলামি করছি কোথায়?'

'তবে ওসব আজে-বাজে কথা বললে কেন?'

'আপনি ইয়াং না? আপনি সুন্দরী না?'

মিঠু পাল্টা প্রশ্ন করে, আমি ইয়াং? আমি সুন্দরী?

বীরেন হাসে। বলে, নিজের চোখ দিয়ে দেখছি আপনি ইয়াং ও সুন্দরী অথচ বললেই দোষ?

'আবার কান টানব?'

'যাই করুন, আপনি বেশ সুন্দরী।'

বীরেনের মুখে প্রশংসা শুনতে ভাল লাগে মিঠুর। মুখে বলে, আমি যাই হই, তোমার মত অত সুন্দর তো না।

ছুটির দিনগুলো বেশ কাটে বীরেনের। হাল্কা মনে হয় মিঠুর।

সেদিন বীরেন হাতে একটা ক্যামেরা নিয়ে ঢুকল। মিঠু জিজ্ঞাসা করল, ক্যামেরা নিয়ে কোথায় গিয়েছিলে?

'কোথাও যাইনি। আপনার ছবি তুলব বলে নিয়ে এলাম।'

'আমার ছবি তুলে কি করবে?'

'কেন দাদা বকবেন?'

'দাদা বকবেন কেন? কিন্তু আমার তুলে কি হবে?'

'কি আবার হবে? অ্যালবামে রাখব।'

হাজার হোক যৌবনের উচ্ছ্বাস! একটু বেহিসেবী হবেই। বীরেন একটার পর একটা ছবি তুলল মিঠুর। লিভিংরুমের এ কোণায়, সে কোণায়, ব্যালকনিতে, কিচেনে।

'এত ছবি তুলে কি করবে?'

'দাঁড়ান। এখনও অনেক বাকি।'

'সে কি?'

শোবার ঘরে বিছানায় উপুড় হয়ে বই পড়তে বললো, মিঠুকে।

'এত কায়দা করে ছবি তোলা শিখলে কোথায়?'

'কেন, ফিল্ম ম্যাগাজিন দেখে।'

'কিন্তু আমি তো ফিল্ম স্টার না।'

'আপনি ফিল্ম স্টার না ঠিকই, তবে স্টার।'

'এসব কথা বললে কিন্তু ছবি তুলব না।' মিঠু অভিমান করে বলে।

বীরেন সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে আলতো করে এক হাত দিয়ে মিঠুকে একটু জড়িয়ে ধরে বলে, সরি! আর ওসব বলব না।

একটা, দুটো, তিনটে, চারটে ছবি তোলে বীরেন। ক্যামেরার ভিউ-ফাইন্ডারে দেখে মিঠুর মুখটা ঘুরিয়ে দেয়, হাতটা সরিয়ে দেয়, চুলগুলো একটু ঠিক করে। একবার সামনের দিকের শাড়ীটাও একটু টেনে-টুনে দিল। মিঠু কিছু বললো না, বলতে পারল না।

'আইসক্রীম খাব,কফি খাব, গল্পগুজব করব, নাচব।'

'না নাচলে কি তোমার ঘুম হচ্ছে না?'

'আপনার অত কথন রয় তখন আগে নাচটাই সেরে নিই।'

'সত্যিই আমি পারব না।'

'আমি বলছি পারবেন।'

'না, না, আমি পারব না। আমি কোনদিন...

বীরেন কিছুতেই কথা শুনল না। মিঠুর হাত ধরে টেনে তুললো। 'রাম্বা নাচব। ভীষণ সিম্পল।'

'সত্যি বলছি, আমি জানি না।'

তবু বীরেন থামল না। হয়ত থামতে পারল না। সত্যি মিঠুর কোমরে আর কাঁধে হাত দিয়ে নাচতে শুরু করল। কি করবে? মিঠুও ওর কোমরে আর কাঁধে হাত রেখে ওর সংগে সংগে স্টেপ মেলাবার চেষ্টা করল। প্রথম দু-পাঁচ মিনিট সত্যি দারুণ অস্বস্তি হচ্ছিল মিঠুর।

তারপর?

ঠিক মেজর জনস্বাক্ষের মত বীরেন আরো একটু ওকে কাছে টেনে নিতেই মিঠু যেন ভিতরে ভিতরে একটু রোমাঞ্চ অনুভব করল।

'এই জানলা দিয়ে যদি কেউ দেখে?'

'বেশ তো! ও ঘরে যাচ্ছি।'

'ও ঘরে কোথায় যাবে? বরং ওপাশে সরে যাই।'

স্টেপিং আর টার্ন নিতে নিতেই বীরেন মিঠুকে নিয়ে উল্টো দিকের কোণায় চলে গেল।

মিঠুর কানের কাছে মুখ নিয়ে খুব চাপা গলায় বললো, তবে যে বলছিলেন পারবেন না?

'এ কি নাচ হচ্ছে? শুধু তোমাকে ধরে ঘুরে যাচ্ছি।'

'কে বললো নাচ হচ্ছে না?'

বীরেন আরো একটু কাছে টেনে নেয় মিঠুকে। দুটো দেহ প্রায় একসঙ্গে নাচে।

'জান, আমি এর আগেও একজন ডাক্তারের সংগে নেচেছি।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায়?'

'হায়দ্রাবাদে।'

'সেদিন কে?'

'বাবারই আন্ডারে এক ইয়ং ডাক্তার ছিলেন, তার সংগে।'

'তারপর আর কার সংগে?'

'তারপর এই তোমার সংগে।'

'রিয়েলি?'

'সত্যি আর কারুর সংগে নাচিনি।'

'নাচতে ভাল লাগে না?' বীরেন প্রায় মিঠুর মুখের পর মুখ রেখে জিজ্ঞাসা করল।

'আনন্দ হৈ-হুল্লোড় করতে আমার খুব ভাল লাগে।'

'করেন না কেন?'

'করব কেমন করে? ও যে ভীষণ ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ।'

'সারা ছুটি আপনাকে বিরক্ত করলাম বলে আমার উপর খুব রাগ করেছেন তো?' নাচতে নাচতেই কথা হয়।

'রাগ করব কেন? বরং বেশ লাটল দিনগুলো।'

'ইউ আর লাভলি!' বলেই বীরেন মিঠুকে দু হাত দিয়ে বুকের মধ্যে টেনে নিল।

মিঠু কোন প্রতিবাদ করতে পারল না।

রাত্রে শোবার পর মিঠু অম্বরকে জড়িয়ে ধরে বললো, তুমি সারা দিন থাক না, আমি কিভাবে থাকি বলো তো? আমার কষ্ট হয় না?

'আমি কি করি বল? আমার যে অফিস আছে।'

'লাঞ্চের সময়ও একবার আসতে পার না? আমি সারাদিন একলা একলা পড়ে থাকি, আমাকে যদি কেউ কোনদিন খুন করে রাখে তাহলেও তো তুমি জানতে পারবে না।'

'ওসব কথা বলো না।'

'তুমি বল এবার থেকে লাঞ্চে আসবে।'

'আসব।'

'ঠিক বলছ?'

'তোমাকে ছুঁয়ে বলছি আসব।'

পরের দিন রবিবার। অনেক বেলায় ঘুম ভাঙল দুজনের। কুন্দন সিং এসে বেল বাজাবার পরই মিঠু উঠল। অম্বর উঠল বিশু আর চন্দনা এসে ডাকডাকি করার পর।

'এ কি অম্বরদা, এখনও বিছানায়?' মুখ টিপে টিপে হাসতে হাসতে চন্দনা প্রশ্ন করল।

অম্বর কিছু বলার আগেই বিশু বললো, এই বিছানায় শুয়ে শুয়েই তো অতীত ভবিষ্যতের কত স্বপ্ন দেখে। উঠবে কি করে বল?

'তাই বলে এত বেলা পর্যন্ত?'

'তুমি তো অবাক করলে চন্দনা! তোমার অম্বরদাকে তুমি চেন না?'

ছোট্ট ট্রেতে চার কাপ চা নিয়ে ঢুকতে ঢুকতে মিঠু বিশুর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। অম্বর আস্তে আস্তে বিছানায় উঠে বসল।

ট্রে থেকে এক কাপ চা নিয়ে বিশু বললো, এসো মিঠু, একটু তোমার পাশে বসি। এবার চন্দনাকে বললো, যাও, তুমি তোমার অম্বরদার পাশে বসো।

হাসতে হাসতে মিঠু বিশুর পাশে বসল, চন্দনা বসল অম্বরের পাশে।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বিশু মিঠুর কানে কানে বললো, সামনের ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় দেখ আমাদের দুজনকে কি সুন্দর মানিয়েছে?

মিঠু হাসল।

'হাসছ কেন? সত্যি বলছি আমাদের দুজনকে দারুণ মানায়।'

মিঠু হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলো, আমার স্বামীর পাশে বুঝি আমাকে মানায় না?

'যাই বল, ওর পাশে চন্দনাকেই বেশী মানায়।'

চন্দনা সুন্দর সংগে বিশুকে শাসন করল, এবার কিন্তু এক থাপ্পড় মারব।

'তা মার কিন্তু যা সত্যি তাই বললাম।'

কেউ জানল না আগের দিন দুপুরে কনটপ্লেসে একটা স্টুডিওর শো-কেসে বিশু চন্দনা আর অম্বরের সুন্দর একটা ছবি দেখেছে।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

এভাবে তার দুপুরটা কেটে গেল। সকাল থেকে বৃষ্টি। বৃষ্টি আর থামছে না। ইলশে-গুঁড়ি বৃষ্টি। ঘাস-পাতা ভিজে যাচ্ছে। মাটি তেমন ভাল করে ভিজছে না। বৃষ্টিতে ঘুড়ি ওড়ে না। সে বৃষ্টি না থামলে ঘুড়ি ওড়াতে পারছে না।

ওর মনটা এমনিতেই ভাল না। তবু এদিনে সে ঘুড়ি ওড়াবে। সে আকাশে চোখ তুলে তাকালেই টের পায় সব নানা-বর্ণের ঘুড়ি যেন ভেসে বেড়াচ্ছে। কোনোটা খুব আকাশের ওপরে, কোনোটা দূরের বাড়িতে ছাদের মাথায়—আবার কোনো ঘুড়ি উড়তে উড়তে অনেক দূরে ভেসে যাচ্ছে। নিরিবিলি নীল নীলিমায় ঘুড়ি ভেসে গেলে ওর ভীষণ ভাল লাগে।

সেও চায় এভাবে ওর ঘুড়িটা কখনও কখনও অন্তহীন আকাশের ওপাশে উড়ে যাবে। কিন্তু সে কোনোদিন অত ওপরে ঘুড়ি ওড়াতে পারেনি। সে তো নীলবর্ণের ঘুড়ি কিনে আনতে পারেনি। সে তার পুরানো খাতার সব লেখা কাগজ আঠা দিয়ে জুড়ে নেয়। সে মাচান থেকে বাঁশের পুরানো বাতা কেটে খুব যত্নের সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে ঘুড়ি বানায়। কখনও সে ছুটন্ত ঘুড়ির পিছনে ছুটতে থাকে। কিন্তু ঘুড়িটা সে পায় না। কেউ না কেউ তার আগেই ঘুড়িটা ধরে ফেলে। কেউ তখন দয়া করে কিছু সুতো ওকে দিয়ে দিলে সে তা একটা বাঁশের কঞ্চিতে জুড়ে নেয়। তারপর খেলা। নিরিবিলি মাঠে নির্জনে তার খেলা আরম্ভ হয়ে যায়।

সেই যে সে ঘুড়িটা বানিয়েছে, কাগজ কেটে কেটে লম্বা লেজ বানিয়ে, সে থাকে এক পাশে—অন্য পাশে কেউ থাকলেই তার বলা, তোমরা আমার ঘুড়িটা উড়িয়ে দাও, দ্যাখো আমার ঘুড়িটা কোথায় উঠে যায়। কিন্তু সে পারে না। কিছুদূর উঠতে না উঠতেই কেমন ওটা লাট খেতে থাকে, যেন একটা দিক ভারি হয়ে গেছে ওটার। ওটা বাতাসে ভেসে থাকতে পারছে না, নেমে আসার জন্য প্রাণপণ লাট খাচ্ছে। আর তখন সে ঘুড়িটা যাতে লাট না খায়—বাতাসে যেন ওটা ভেসে থাকে—সে প্রাণপণ ছুটছে

পেছনের দিকে—তবু কেন যে সে এক সময় দেখতে পায়, ঘুড়িটা লাট খেয়ে একেবারে ঘাসের ওপর পড়ে ছড় ছড় শব্দ তুলছে। আর মা তখন জানালায়, মার চোখ দুটো চিক চিক করতে থাকলে কেন জানি ভীষণ ওর কষ্ট হয়।

সে তখন বলে, মা আমাকে তুমি একটা রং-বেরং-এর ঘুড়ি কিনে দাও। বাবাকে বলতে আমার ভয় লাগে। আমার যে ইচ্ছা, ঘুড়িটা অনেক দূরে উঠে যাবে, অনেক দূরে, যেখানে আকাশে মেঘেরা ভেসে বেড়ায় সেখানে, অথবা মা, তার ওপারে কি আছে জানি না, ইচ্ছা হয় আমার ঘুড়িটা যেখানে নক্ষত্রদের বাড়িঘর আছে সেখানে উঠে যাক, মা আমাকে একটা লাটাই কিনে দাও, লাটাইয়ে থাকবে অনেক অনেক সুতো। যত ইচ্ছা সুতো ছেড়ে তোমাকে আমি দেখাব—কত ওপরে ঘুড়ি আমি তুলে দিতে পারি। আমার যে ইচ্ছা, মা, তোমার চোখের ওপর ঘুড়িটা আকাশের নীলিমায় ভেসে বেড়াক।

যাবার দিনে মা ওকে ডেকেছিল, বুনো কাছে আয়।

সে তখন দরজায় দাঁড়িয়ে কাঁদছিল।

মা বলেছিল, কাঁদছিস কেন খোকা। আমি ঠিক ভাল হয়ে চলে আসব। কথা বলতে বলতে মার চোখে জল।

বুনোর দুঃখ তখন আরও বেশি। রাস্তায় সাদা রঙের গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। বাবা, মার কি সব গোছগাছ করে নিচ্ছে পিসি তাড়াতাড়ি একটু ফল কেটে দিচ্ছে মাকে। মা চলে যাচ্ছে সাদা রঙের গাড়িতে।

বাবা বলেছিলেন, বুনো, যা তো গাড়িতে এ-বালিশটা রেখে আয়।

বুনো এক দৌড়ে বালিশটা সাদা গাড়িতে রাখতে গেলে দেখল, ড্রাইভার সামনে। দুজন মানুষ, ওদের শরীরে খাঁকি পোশাক, ওরা নেমে আসছে। ওদের হাতে লম্বা ভাঁজ করা কি একটা।

বুনো বাবাকে ভীষণ ভয় পায়। সে বাবাকে নানাভাবে প্রশ্ন করতে পারে না। পিসিকে বললে, কোন কিছু বলতে চায় না পিসি। কেবল বলবে, সে অনেক দূরে যাবে। সেখানে কত বড় বাড়ি! কত বড় বড় ডাক্তার। পৃথিবীতে এমন কোন অসুখ নেই যা তারা ভাল করতে পারে না।

আমি যেতে পারব পিসি? মার সঙ্গে থাকব। দ্যাখো কোনো দুষ্টুমী করব না—এ-সব বলার ইচ্ছা কিন্তু সে কেন যে পারে না, মা একবারও বলছে না তুই বুনো আমার সঙ্গে চল, মার ওপর ওর ভীষণ অভিমান। অত বড় বাড়ি, অত সব মানুষ, সে একজন আর কি বেশি, কিন্তু মা, না বাবা, কেউ ওর সম্পর্কে কোন উৎসাহ দেখাচ্ছে না। মার শীর্ণ হাত এখন বুকের ওপর। ছাদের দিকে মার মুখ। মার সাদা মুখে কালো চোখ দুটো কেমন মাছের চোখের মতো মনে হচ্ছে।

সে চুপি চুপি ড্রাইভার সাবের পাশে উঠে বসে থাকল।

ড্রাইভার বলল, তুমি কাঁহা যাবে খোকাবাবু।

—বড় বাড়িতে।

—সেখানে তো বাচ্চালোকের যানা মানা হ্যায়।

—আমি যাব।

ড্রাইভার হাসতে গিয়ে হাসতে পারল না। চোখ দুটো ভীষণ মায়াভরা। টল টল করছে চোখ দুটো। বুনো কোনদিকে তাকাচ্ছিল না পর্যন্ত। যেন চারপাশে তাকালেই সকাই ওকে টেনে নামিয়ে নেবে। সে সে-জন্য ড্রাইভারের শরীর ঘেঁষে বসে-ছিল। যেন সে পারলে ড্রাইভারের শরীরের ভিতর লুকিয়ে থাকতে চায়।

ড্রাইভার মাথার চুলে বিলি কেটে বলল, খোকাবাবু তুমকো হাম ঠিক লে যাবে। দোসরা টাইম এসে লিয়ে যাবে।

বুনোর কানে কোন কথা যাচ্ছে না। সে যতটা পারছে আরও সেঁটে বসছে। সে ড্রাইভারের পাশে বসে ওকে আঁকড়ে ধরে-ছিল। কেউ বুনোকে আর বুঝি নামাতে পারছে না।

কিন্তু বাবা এসে কেমন গম্ভীর গলায় ডাকলেন, বুনো এদিকে এস।

বুনো ভাল ছেলের মতো বাবার পায়ের কাছে নেমে গেল।

বাবা বললেন, আমার ফিরতে রাত হবে বুনো। তুমি পিসির সঙ্গে খেয়ে নেবে।

বুনো বলল, মা কবে ফিরে আসবে বাবা।

—ভাল হলেই নিয়ে আসব।

মাকে তখন ওরা নিয়ে আসছে। একটা স্ট্রেচারে মা শুয়ে আছে। সাঁঝ, গাছের মাচানের পাশ দিয়ে মার পা দেখা যাচ্ছে, তারপর ধীরে ধীরে মার কপাল দেখা যাচ্ছে। চোখ চুল মুখ মাথা শরীর, হাত-পা, শাড়ি, শাড়ির রঙ। মা সুন্দর সাদা জমিন আর হলুদ পাড়ের শাড়ি পরেছে। মার চুল সুন্দর বিনুনি করা। পিসি মার কপালে বড় সিঁদুরের টিপ দিয়েছে। পায়ে সুন্দর করে আলতা পরিয়ে দিয়েছে। সিঁথিতে কি লম্বা দাগ সিঁদুরের। মাকে তার কেন জানি খুব সেদিন সহসা অচেনা মনে হচ্ছিল। মা আকাশের দিকে সোজা তাকিয়ে আছে। চারপাশে কোনদিকে তাকাচ্ছে না। চার পাশে তাকালেই বুঝি মার চোখ বুনোর ওপর পড়ে যাবে। বুনোর ওপর চোখ পড়ে গেলে মা বুঝি কিছুতেই স্থির থাকতে পারবে না।

বুনো তবু স্ট্রেচারের পাশে পাশে হেঁটে গিয়েছিল। এবং মা তাকালেই সে হাউ হাউ করে কেঁদে ছিল, পিসি জোরজার করে কোলে তুলে নিয়েছে বুনোকে। আরও যারা দাঁড়িয়েছিল, প্রতিবেশীরা, বুনোকে তারা নানাভাবে বোঝ প্রবোধ দিচ্ছে। কিন্তু বুনো তো স্কুল থেকে ফিরে এলেই সেই নিরিবিলি মাঠটাতে ঘুড়ি ওড়াতে চলে যেত। মা জানলায় বসে দেখছে বুনো ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। বুনোর কি প্রাণান্তকর ইচ্ছা। হাওয়ায় ঘুড়ি উড়ে যাক, ঘুড়ি নীল নীলিমায় ভেসে যাক, কিন্তু সে কোনদিন তার ঘুড়িটাকে নীল নীলিমায় উড়িয়ে দিতে পারে নি। মার কি কষ্ট তখন।

কিন্তু মার সাহসে কুলোয় নি বলতে, তুমি বুনোকে একটা রং-বেরংয়ের পাতলা কাগজের ঘুড়ি কিনে দিও, মানুষটা তার অসুখে অসুখে সব নিঃশেষ করে ফেলেছে। একটা বাড়তি খরচার কথা সে যে কি করে বলবে, একটা লাটাই, কিছু গুটি সুতো আর একটা ঘুড়ি। সে শুধু বলতে পারত মানুষটাকে, কিন্তু মানুষটার আছে এক অহেতুক ভয়, যেন বলা, বুনো তুমি একা একা মাঠে যাবে না, আমার সময় খারাপ, গ্রহ খারাপ, কোনদিক থেকে যে বিপদ আসবে আমার বুঝতে পারছি না। বাড়ি ফিরে আসতেই আমার ভয় লাগে। যেন চার পাশ থেকে সবাই আমার শত্রুতা করছে। এমন কি ঈশ্বর পর্যন্ত।

একদিন বুনোকে এসে কি ধমক মানুষটার, আবার তুমি মাঠটায় গেল। সেখানে তোমাকে বলেছি না যাবে না, সেখানে কত রকমের পোকামাকড় থাকে। কিছুতে কামড়ে দিলে কি যে হবে।

এবং এভাবে এক ভয়, ভয় থেকে মানুষের বুঝি মুক্তি থাকে না। সাদা গাড়ি বড় রাস্তায় এভাবে উঠে যায়, বুনো পিসির কোলে দাঁড়িয়ে দেখতে পায় ক্রমে সাদা গাড়িটা বড় রাস্তার বিন্দুবৎ হয়ে যাচ্ছে। ক্রমে মার মুখ চোখের ওপর ভাসতে থাকে, তারপর কেমন কুয়াশার মতো চোখ থেকে মার মুখটা অস্পষ্ট হয়ে যায়। সে ফিরে আসে, একা জানালায় চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে থাকে। মাঠটা পুকুর পার হলেই। ওর ঘুড়ি ওড়ানো, কাল থেকে নিবিষ্ট মনে পৃথিবীর আর কেউ দেখবে না।

গভীর রাতে মনে হয়েছিল বুনোর কেউ তাকে ডাকছে। ওর মাথার কাছে ছোট্ট একটা সবুজ রংয়ের আলো। অন্য দিন মা, সেদিন ওর পাশে পিসি। পিসিই ওকে ডেকে তুলেছিল, দ্যাখ তোর জন্য কি এনেছে বুনো।

বুনো ধড়মড় করে উঠে বসেছিল।

সে দেখেছিল বাবা তার সামনে।

বাবা বলেছিল, বুনো তোমার ঘুড়ি-লাটাই। প্যাকেটে সুতো।

বুনো নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। সে তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে ঘুড়িটা চোখের ওপর রেখে দেখতেই বাবা বলেছিলেন, এখন ঘুমোও, সকাল হলে দেখবে।

বুনো দেখেছিল বাবার মুখে ক্লান্তি। বাবার চোখ ভীষণ লাল। বুনোর মনে হয়ে-ছিল, মাকে রেখে এসে বাবা একা একা কোথাও গোপনে কেঁদেছে। মানুষ না কাঁদলে চোখ এমন লাল হয় না। বাবার

শেষ ট্রেনে ফিরে আসতে সেজন্য দেরী হয়েছে। সে ঘুড়িটা টেবিলের ওপর রেখে দিলে বাবা বললেন, তোমার মা তোমাকে কিনে দিতে বলেছে। তুমি খুশী।

—খুউব বাবা।

—মা বলেছে ভাল ছেলে হয়ে থাকতে।

বুনো ঘাড় কাত করে জানাল, সে ভাল হয়েই থাকবে।

—মা বলেছে, পিসির কথা শুনতে।

—আমি পিসি তোমার কথা শুনি না?

—তোমাকে বলেছে সন্ধ্যা না হতেই ফিরে আসতে।

যেন বুনোর মনে হল, মা এতগুলো কথা রাখার বিনিময়ে ঘুড়ি-লাটাই-সুতো বাবাকে কিনে দিতে বলেছে।

বুনোর শুয়ে ঘুম এল না। মার যে কি কষ্ট, বুনো নীল মাঠে ঘুড়ি ওড়াতে পারে নি! বুনো ঘুড়ি ওড়াতে না পারলে কোথায় যেন একটা কষ্টের জায়গা আছে মায়ের, সে শুয়ে শুয়ে সেটা যখন টের পায় তখন আর মাকে খুব স্বার্থপর মনে হয় না। আহাঃ সকাল হলে, না ঠিক সকালে সে যেতে পারবে না। সকালে ওর কটা সরল অংক করতে হবে, সরল অংক করতে ওর মাথা যেন গুলিয়ে যায়, সরল অংক করতে করতে স্কুলের বেলা হয়ে যাবে—সে সকালে ঘুড়ি ওড়াতে পারবে না। বিকেলে, আহা বিকেল যে কতক্ষণে হবে—সেদিন সে শুয়ে শুয়ে সারা রাত কিছুতেই ঘুমোতে পারে নি।

ঘুম ভাঙলে প্রথমেই বুনোর চোখে পড়েছিল ঘুড়িটা। দেয়ালে ঘুড়িটা ঝুলছে। নানা রংয়ের ঘুড়ি। ঠিক একটা রং নেই। মাথার পাছে সাদা রং। বুকের কাছে নীল রং। পেটের কাছে হলুদ রং। দু পাশে লাল রং। আর ঠিক নীচে সোনালী রং। বাবা কি যে সুন্দর ঘুড়িটা এনেছে!

বুনোর অংক করতে বসে একটাও অংক ঠিক হল না। সে একটা অংকেরও ফল মেলাতে পারল না। স্কুলে সবার পিছনে বসেছিল সেদিন। মাস্টারমশাই ওর চোখ-মুখ দেখে কি যেন টের পেয়েছিলেন, অথবা হয়ত জানেন বুনোর মন ভাল নেই। ওর মাকে সাদা গাড়িতে অনেক দূরের একটা বড় বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে ইচ্ছা করলেই সব সময় যাওয়া যায় না। সেখান থেকে সবাইকে শেষ ট্রেনে ফিরে আসতে হয়।

ঘরে ফিরে এলে পিসি বলেছিল, বুনো তুমি কোথাও বের হবে না।

—কেন পিসি।

—আমি একা। কত দিকে সামলাব।

—বাবার আসতে আজ দেরী হবে?

—যেমন আসেন তেমনি আসবেন।

—তুমি পিসি মাকে দেখতে যাবে না?

—আমি গেলে তোকে কে দেখবে। অনেক যে দূর।

আমার খুব যেতে ইচ্ছা করছে। এখন আমি ঘুড়ি ওড়াব পিসি। বেশী দূরে যাব না।

—দ্যাখো, ডাকলে যেন সাড়া পাই।

—ঠিক পাবে পিসি।

মা চলে গেলে পিসির কি যে ভয়! পিসি এমন ভয় পায় কেন সে জানে না। আসলে পিসি একা একা থাকতে পারে না। মা নেই, বাবা কারখানায়, রান্নাবান্নার কাজ শেষ হলে বোধ হয় পিসির হাতে কোন কাজ থাকে না, তখন বুনো কাছে না থাকলে ভয় লাগারই কথা। সেও তো ভয়ে মায়ের ঘরটাতে বেশী যেত না। বাবাও কেমন যাওয়া কমিয়ে দিয়েছিলেন। সবাই মার ঘরটাকে এড়িয়ে চলছিল। সে বলেছিল, আমি ঠিক যাই মা। সে সেজন্য তিন-চারবার এক সঙ্গে বার বার ঘুরে-ফিরে ঢুকে যেন দিনে যত বার ঢোকা উচিৎ সব ঢোকার ব্যাপারটা সে নিমেষে শেষ করতে চেয়েছিল সেদিন।

তারপর খেলা। ঘুড়ি নিয়ে খেলা। নিরন্তর খেলা। সে বার বার ঘুড়ি সুতো লাটাই সব নিয়ে সেই নীল মাঠে হাজির। পাশাপাশি বাড়ির সব মানুষেরা দেখল সেই ছেলেটা এসেছে আবার। ঘুড়ি ওড়াবে। ওর হাতে আর পুরানো খবরের কাগজে তৈরী ঘুড়ি নেই। একেবারে নতুন চক চক করছে। ওরা দেখল যেন সে আসায় গোটা মাঠ, মাঠের সজীব ঘাস এবং যে সব পাখির উড়ে যাবার কথা তারা পর্যন্ত সব থেমে দেখছে, এক নিরীহ স্বভাবের ছেলে লাটাইতে সুতো জড়িয়ে যাচ্ছে। সে বসে আছে ঘাসের ওপর। সে পরেছে সাদা রংয়ের প্যান্ট। ডোরা-কাটা হাফ সার্ট। চুল ওর মাথা ভর্তি। মুখ কি যে সুন্দর! সরল অনাড়ম্বর মুখ চোখ নিয়ে সে বসে আছে ঘাসের ওপর। নানা বর্ণের ফড়িংয়েরা উড়ে বেড়াচ্ছে চারপাশে। এই মাঠের নির্জনতা ছেলেটি এসে কেমন আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ওর চুপচাপ বসে থাকা, নিবিষ্ট মনে লাটাই ঘুরিয়ে যাওয়া—আর এভাবে আছে এক নিরিবিলি নির্জনতা, না দেখলে ঠিক বোঝা যায় না, এমন নীল আকাশের নীচে, সবুজ ঘাসের ওপর কোন বালক ঘুড়ি ওড়াবে বলে পৃথিবীর যাবতীয় দুঃখ ভুলে বসে থাকতে পারে।

বুনো দেখল বাবা তাকে অনেক অনেক সুতো কিনে দিয়েছে। যেন মা বলে দিয়েছে, বুনোকে তুমি এমন সুতো কিনে দেবে সে যেন মেঘের ওপরে ওর ঘুড়ি উড়িতে দিতে পারে।

আসলে বুনো এই নিরিবিলি নির্জন মাঠে এলেই টের পায় মা তার কাছেই আছে। যেন মা তার জানালায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। খোকা নতুন ঘুড়ি ওড়াবে মার কি আনন্দ।

কিন্তু বুনো ঠিক ঘুড়ি ওড়াবার মুখে জানালায় তাকিয়েছিল। খালি জানালা। সেখানে কেউ নেই। শুধু এক আশ্চর্য নীরব দুঃখ বুকের ভিতর বেজে উঠলে সে চুপচাপ ফের হেঁটে এসেছিল। সে, মা না থাকলে ঘুড়ি ওড়াতে পারে না। মা ফিরে এলে এই নানাবর্ণের ঘুড়ি আকাশে উড়িয়ে দেবে। মার চোখের সামনে ঘুড়ি উড়িয়ে বলবে, দ্যাখো মা কত ওপরে ঘুড়ি উড়িয়ে দিয়েছি। দ্যাখো, দ্যাখো, কত ওপরে উঠে যাচ্ছে। কি সুন্দর লাগছে না মা! এখনও তুমি দেখতে পাচ্ছ ঘুড়িটা?

হ্যাঁ। ঐ তো, অনেক উঁচুতে, যেখানে ছোট্ট ময়ূরের মতো সাদা মেঘের ছবিটা আছে তার ঠিক নিচে।

—এবার মা?

—হ্যাঁ। ঐ তো, ঠিক মাছের মতো মেঘেরা যেখানে ভেসে যাচ্ছে বাতাসে তার নিচে। কত ছোট হয়ে গেছেরে! একেবারে ছোট্ট একটা প্রজাপতির মতো মনে হচ্ছে।

—এবার মা?

—না। কোথায় গেল!

—ঠিক দেখতে পাচ্ছ না!

—নারে দেখতে পাচ্ছি না! আমার খোকা কত ওপরে ঘুড়ি তুলে দিতে পারে! পৃথিবীতে এমন আর কেউ পারে না।

সুতরাং মা না এলে বুনো ঘুড়ি ওড়াতে পারে না। মা না এলে ঘুড়ি ওড়াতে তার ভাল লাগবে না। সে, সেদিন ঘুড়ি না উড়িয়ে বাড়ি ফিরে এসেছিল। কারণ পৃথিবীতে মার মতো আর কেউ তার ঘুড়ি ওড়ানো দেখে খুশি হবে না।

তারপর কি করে যে দিনকাল পার হয়ে যায়। ঘুড়িটা তেমনি দেয়ালে ঝুলে থাকে। বুনো স্কুল থেকে ফিরে একটা পুরানো কাগজের ঘুড়ি নিয়ে মাঠে চলে যায়। সে চার অভ্যাসটা না থাকলে, মাকে ঠিকমতো নতুন ঘুড়িটা উড়িয়ে দেখাতে পারবে না। আর এভাবে এই সংসারে মানুষের এক নিত্য খেলা জমে ওঠে। সে নিজেও জানে না, তার ভিতরেই আছে ভুলে থাকার স্বভাব, এ-স্বভাবেই সে এই প্রিয় মাঠে চলে আসতে পারে, দৌড়াতে পারে, ঘাসের ওপর দিয়ে ছুটে যেতে পারে, নীল নীলিমাতে মাছের মতো মেঘেরা ভেসে গেলে সে বুঝতে পারে কিছুই থেমে থাকে না। ক্রমাগত সব চলে যায় এভাবে।

বাবা কতকাল পরে যেন সহসা মনে করার মতো বলেছিলেন, বুনো তুমি যাবে। তোমাকে ওরা নিয়ে যেতে বলেছে।

—পিসি যাবে না?

—পিসিও যাবে।

—মা আমাদের সঙ্গে চলে আসবে বাবা?

বাবা কোন জবাব দিতে পারেননি। তিনি চুপচাপ ঘুড়িটার দিকে তাকিয়ে শুধু বলেছিলেন, তুমি যে ওর দেওয়া ঘুড়িটা ওড়ালে না বুনো।

—মা এলে ওড়াব।

বাবা ঘরের ভিতর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। বোধ হয় তিনি

দেয়ালের নতুন রঙ করা দরকার হবে কিনা দেখছেন। মা আসবে, সব নতুন সাজে সাজবে, যেমন, গোলাপের গাছ, গাছে কি যে ফুলের বাহার, কিছু লাল, কিছু সাদা এবং মার হাতে লাগানো নানারকমের জবা, মার বড় বেশি সখ কেবল কি করে সারা বাড়িতে গাছেরা ফুল ফোটাতে পারে। বাবা বেশ সময় পার করে দিয়ে একসময় মুখ ফেরালেন বুনোর দিকে।

তিনি বলেছিলেন, বুনো আমরা যাব।

তারপর বুনোর মনে আছে সে কেমন একটা বড় বাড়িতে পিসির হাত ধরে সিঁড়ি ধরে উঠে গিয়েছিল।

সে অবাক হয়ে যায় পৃথিবীতে এমন একটা জায়গা আছে।

কেমন ঝাঁঝালো গন্ধ। সে তো মায়ের ঘরে মাঝে মাঝে এমন একটা গন্ধ পেত।

কত বড় বাড়ি। বাবা আগে। সঙ্গে আরও সব আত্মীয়স্বজন। মাঝে মাঝে সে দেখছে, সবাই তাকে ভীষণ ভালবাসতে চাইছে। বাবা পর্যন্ত কোন কঠিন কথা বলছেন না। সে দুষ্টুমি করলে বাবা রাগ করছেন না। সে ক্রমাগত উঠে যাচ্ছে সিঁড়ি ধরে। সে লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙছে। কতদিন পর সে মাকে দেখতে পাবে। মা তার জন্য কত কথা জমা করে রেখেছে। সেও মাকে কত কিছু বলবে স্থির করেছে। সে মাঝে মাঝে ডাকছিল—বাবা!

—কি!

—আর কতদূর বাবা।

—বেশিদূর না। লিফট খারাপ না হলে কখন উঠে যেতে পারতাম।

—বাবা।

—এস। আমরা সহজেই উঠে যেতে পারব।

—বাবা!

—কি!

—আমরা কতদূর উঠে যাব।

—ঐ অনেক দূরে।

—বাবা!

—কি!

—ওটা আই ডিপার্টমেণ্ট?

—হ্যাঁ।

—বাবা।

—তুমি এস বুনো। এত কথা বলে না।

—বাবা!

—কি বলবে বল।

—মাকে কোথায় রাখা হয়েছে।

—পাঁচ তলায়।

বুনো পাঁচ তলায় উঠেই দেখেছিল লেখা রয়েছে বড় বড় অক্ষরে—এম এস এম এম। লম্বা করিডোর। দুদিকে সারি সারি ঘর। ওর কেমন ভয় করছিল। ওদিকের ঘরটাতে কিছু মানুষের ভিড়। বাবা কোন দিকে তাকাচ্ছিলেন না। বাবা প্রায় যেন ছুটে যাচ্ছেন। সে বাবার সঙ্গে প্রায় দৌড়ে গেল। দেখল বাবা চুপচাপ দাঁড়িয়ে গেল সহসা। বুনো বলেছিল, মা কোথায় বাবা।

—এখানে ছিল।

সে বলেছিল, মা! মা আমি এসেছি।

বাবা বলেছিলেন, বুনো এমন জোরে ডাকে না।

নার্স এসে কি একটা নম্বর দিতেই বাবার ঠোঁট বেঁকে গিয়েছিল। বুনো দেখেছিল বাবার শরীর কাঁপছে। হাত পা কাঁপছে। বাবা এমন কেন করছে সে বুঝতে পারছে না। পিসি এবং মামারা বাবাকে ধরে আবার সিঁড়ির দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

সে জোরে ডেকেছিল, বাবা, মা কোথায়? মা কোথায়?

বাবা নামতে নামতে কেমন চিৎকার করে উঠেছিলেন, বুনো তোমার মাকে ওরা ঠাণ্ডা ঘরে রেখে দিয়েছে।

পিসি বুনোকে বুকে জড়িয়ে নিচে নামছিল বাবার হাতের নম্বরটা হাত বদলে বদলে অনেক আগে সিঁড়ির ঠিক নিচে এবং যেখানে রেলিঙের বেড়া, পুকুরের জল শান্ত, এবং এখনও পাখিরা ডাকে, সূর্য উঠলে ছায়া দেখা যায়, তেমনি এক জায়গায় সেই হাতের নম্বরটা একটা গাছের বিন্দুতে লটকে রেখে কেউ কোথাও চলে গেল। ওরা সবাই তার নিচে গিয়ে দাঁড়াতেই এল ফলওলা। এল মানুষ জন। বুনোকে সবাই তখন ভীষণ ভালবাসছে। সে মায়ের কথা কাউকে বলতে পারছে না। ঠাণ্ডা ঘরটা কোনদিকে, এখানে কে নম্বর গাছে আটকে দিয়ে গেল, কারা আবার আসবে, কাদের সঙ্গে বাবা আবার ঠাণ্ডা ঘরটায় যাবে, এবং বাবার দিকে সে তাকালে দেখেছিল, বাবা মাথা গোঁজ করে গাছের ছায়ায় বসে আছেন। সে বাবার পিঠে দুম করে কিল মেরে চিৎকার করে উঠেছিল, বাবা মাকে নিয়ে আসবে না! মা ঠাণ্ডা ঘরে কেন আছে!

তারপরই বুনো দেখেছিল হা হা করে বাবার শিশুর মতো কান্না, বাবা হয়ে কেউ এমন কাঁদে সে জীবনে দেখেনি। যেমন সে মার কাছে কিছু না পেলে মাঝে মাঝে ভীষণ কাঁদত, হাউ হাউ করে কাঁদত, তেমনি বাবা একটা শিশুর মতো কাঁদছে। বাবাকে কাঁদতে দেখে ওর ভীষণ লজ্জা হচ্ছে। এখানে একটা কিছু হয়েছে সে বুঝতে পারছিল। বাবাকে বসিয়ে রেখে, কেউ কেউ, বিশেষ করে মামারা এবং অন্য কেউ কেউ, সে সবাইকে ভাল করে চেনেও না, কি যেন আনবে বলে চলে গেছে। বাবা আর উঠছে না। বাবা যেন কেমন অসহায় সহায়সম্বল-হীন মানুষ হয়ে গেছে মুহূর্তে। এখন সে ইচ্ছা করলে বাবাকে নানাভাবে শাসন করতে পারে। এই যে রাগে দুঃখে সে বাবার পিঠে একটা কিল পর্যন্ত বসিয়ে দিল, অন্য সময় হলে সে এমন ভাবাও পর্যন্ত সাহস পেত না। অথচ বাবা কিছু বলছে না। কি ভাল-মানুষ বাবা! বাবা কি সরল সহজ। বাবাকে সে এখন সম্মান দিয়ে কথা বলতে পর্যন্ত লজ্জা পাচ্ছে। বরং যেন বলার ইচ্ছা, কিহে ধেড়ে খোকা এভাবে বসে গাছতলায় কেউ কাঁদে। যাও, মাকে নিয়ে এস ঠাণ্ডা ঘর থেকে। তোমার কান্না দেখে আদৌ মায়ের কথা ভুলে যাচ্ছি না।

আসলে মনের ভিতর কি যে হচ্ছিল তখন, সে সরল গণিতের কঠিন অঙ্কের মতো সেখানে একটা ভীষণ সমস্যায় পড়ে গিয়েছিল. তাকে কেউ কিছু স্পষ্ট বলছে না। কেমন ধাঁধার মতো সব কথা। এমন সবারই হয় বুনো। কেউ চিরদিন বাঁচে না। আমরা কেউ বাঁচব না। তোমরা বাঁচবে না বলে আমার কি! আশ্চর্য! মাকে কারা যে
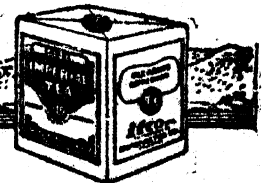
সেদিন ঠাণ্ডাঘরে রেখে দিয়েছিল। সে ওদের পেলে ঠিক ফড়িঙের লেজ কেটে দেখার মতো ওদের লেজ কেটে দিত। এবং আশ্চর্য মনে হয়েছিল তার সেদিন, ঘুড়ির লেজের মতো ফড়িঙের লেজের মতো মানুষেরও একটা লেজ থাকে।

সে গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ভেবেছিল ঠিক একদিন না একদিন সে মানুষের লেজ কেটে দেবে। না হলে মানুষেরা ঘুড়ির মতো স্বাধীন হতে পারবে না।

ঝড়ের বিকেলে সে হরদম ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল। সে যেন ফুসমন্তরে এখন ইচ্ছা করলে সবটা আকাশে ঘুড়ি ছেড়ে দিতে পারে। প্রাণের ভিতর তার এক আশ্চর্য হাহাকার। সে বাড়ি ফিরে এমন কি, সে খোঁট পরতে পরতে মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে পর্যন্ত টের পায়নি, সে ভীষণ হাহাকারে ভুগছে। এখন এই ঘুড়ির পেছনে ওকে ছুটতে দেখলেই বোঝা যায় কি তীক্ষ্ণ তার ভেতরের দুঃখটা।

ঝড়ের বিকেলে সে এভাবে ঘুড়ি উড়িয়ে যাচ্ছে। দুপুরে পর্যন্ত বৃষ্টি ছিল। এখন বৃষ্টি নেই। ঝড়ো হাওয়া। দুপুরে পর্যন্ত কেউ ঘর থেকে বের হয়নি। বৃষ্টি না সারলে ঘর থেকে বের হওয়া যায় না। আর এখন কেবল বাতাস। বেশ বেগে বাতাস বয়ে যাচ্ছে। আর বাতাসে আকাশের নীলিমাতে ঘুড়িটা ধীরে ধীরে কাঁপছে। কোনো মেঘের রাজত্ব সে খুঁজে পাচ্ছে না, যে যেখানে ইচ্ছে করলে ঘুড়িটা তুলে দিতে পারে।

চারপাশের সাদা রঙের জানালা খোলে, সবাই দেখল, আবার অনেকদিন পর মাঠটার একা একা ভাব কেটে গেছে। সেই ছেলেটা এসেছে ঘুড়ি নিয়ে। নতুন ঘুড়ি। রঙবেরঙের ঘুড়ি। অনেক দূরে অনেক ওপরে নদী পার করে ঘুড়িটা একটা বড় অশ্বত্থের মাথায় বেশ সোজা দাঁড়িয়ে আছে। আর ছেলেটা কেবল সুতো ছেড়ে যাচ্ছে চুপচাপ। সে কোনদিকে তাকাচ্ছে না।

এই মাঠ এবং সাদা রঙের বাড়িগুলো কতদিন থেকে যেন একা একা। ছেলেটা এলে সবার একা একা ভাবটা একেবারে কেটে গেল।

অন্যদিকে একটা বড় মেঘ উঠে আসছে। এবং এই শরতের আকাশ নিমেষে আঁধার ঢেকে দিতে পারে। কখন বৃষ্টি যে এসে পড়বে! কেউ বাইরে থাকতে সাহস পাচ্ছে না। অথচ পশ্চিম থেকে ঠিক রোদ মাথার ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। কেউ ভাবতেই পারে না, আকাশে এভাবে রোদ এবং বৃষ্টি একসঙ্গে ঘোরাফেরা করতে পারে।

আর সবাই যখন ঘরে ফিরছিল বৃষ্টি আসবে ভেবে তখন ছেলেটার ঘুড়িটাকে নিয়ে কি যে নিশ্চিন্ত খেলা। একবার ঘুড়িটাকে টানতে টানতে সে মাথার ওপর নিয়ে আসছে, আবার সুতো ছেড়ে, সেই কোন অজানা রহস্যের এক দেশ বুঝি আছে, মানুষের, যেখানে সরল গণিতের অঙ্ক দিয়ে সে ফল মেলাতে পারে না, সেখানে পৌঁছে দিতে চাইছে।

কখনও কখনও সে লাটাইটা মাটিতে গুঁজে চুপচাপ বসে থেকে, কি সব ভাবে। সবুজ ঘাস, সাদা বাড়ি, নীল রঙের আকাশের নিচে তখন ছেলেটাকে ভীষণ মায়াবী মনে হয়। জানালা কেউ কেউ বন্ধ করে দিলেও সবাই বন্ধ করতে পারে না। কেউ কেউ খুলে চুপচাপ ওর ঘুড়ি ওড়ানো দেখতে ভালবাসে।

চারপাশে মানুষের কি ব্যস্ততা। মানুষ এমন বৃষ্টির দিনে অনবরত এক দুঃখের ভিতর যেন ডুবে থাকে। চারপাশে সেই এক প্যাচপ্যাচে কঠিন অস্তিত্ব আর ছেলেটা এই বিকেলে বেশ সুন্দর ঘুড়ি আকাশে ছেড়ে বসে রয়েছে। সে আর কোনদিকে কিছু দেখছে না। লাটাই থেকে সে কেবল সুতো ছেড়ে যাচ্ছে সে বুঝি ভেবেছিল, এভাবে ঘুড়ির সুতো ছেড়ে মেঘের রাজত্ব পার হয়ে কোথাও একটা যে দেশ আছে সেখানে ঘুড়িটাকে পৌঁছে দেবে।

আকাশে ঘুড়িটা কি যে একলা! সেও বড় একা। তার মা নেই। গত বছর ঠিক এ-সময়ে একটা গাড়িতে করে তার মাকে বাবা বড় শহরে নিয়ে গেল। সামনের সাদা বাড়িটা পার হয়ে বড় রাস্তা গেছে। মা আর ফিরে এল না। সে ভেবেছিল, মা এলেই রঙবেরঙের সুন্দর ঘুড়িটা আকাশে উড়িয়ে দেবে। সে এবার কেমন বড় চুপচাপ হয়ে গেল।

বাবাও কেমন চুপচাপ দুঃখী মানুষ বনে গেছে। বাবা বাড়ি ফিরে এসে অনেকক্ষণ চুপচাপ ওকে কোলে নিয়ে বসেছিলেন। বাবাকে সে কখনও এমন আদর করতে দেখেনি। ওর কেবল বলতে ইচ্ছা হচ্ছিল, বাবা তুমি মাকে এত সাজিয়ে কোথায় নিয়ে গেলে! আমাকে সঙ্গে নিলে না কেন! শেষ পর্যন্ত সে শুধু বলেছে, বাবা আমার ভীষণ ভয় করছে। মা আর ফিরবে না বাবা!

বাবা শুধু বললেন, তোমার মা আর ফিরবে না বাবা।

—কেন বাবা? আমি যে ভেবেছি, মা এলে নীলরঙের মাঠে ঘুড়ি ওড়াতে যাব।

—কখনও কখনও বুনো মানুষ আর ফিরে আসে না।

—তারা কোথায় যায় বাবা?

—অনেক দূরে চলে যায়।

—কষ্ট হয় না বাবা? আমাদের ছেড়ে থাকতে কষ্ট হয় না!

—খুব কষ্ট, তবু মানুষকে এভাবে বুনো, যেতে হয়।

বুনো বলল, মার ওপর ভীষণ রাগ করেছি।

এর পর বাবা তাকে নিয়ে সেই রাস্তার পাশে হাত ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। এই রাস্তাটা দিয়েই গাড়িটা গেছে। যেন এখানে এলেই পিতাপুত্রে একজন হারিয়ে যাওয়া মানুষের কথা মনে করতে পারে।

বাবার কেমন পাগলপারা দেখার স্বভাব হয়ে গেছে। বুনোকে কোথাও যেতে বারণ করছে। —তুমি কোথাও যাবে না বুনো। এ-সময় দূরে যেতে হয় না। দূর বলতে তো এই নীল মাঠ। কটা বাড়ি পার হয়ে এলেই মাঠটা। মাঠের ঘাস রোদে নীলরঙের হয়ে যায়। সে তার ওপর একটা সাদা হাফপ্যাণ্ট হাফসার্ট গায়ে দিয়ে দৌড়াতে ভালবাসে।

আজ সে এসেছে পালিয়ে ঘুড়ি ওড়াবে বলে। গলায় কি সব পরিয়ে দিয়েছে। সে একটা খোঁট পরেছে। এমন পোশাকে ওকে কেমন আরও বিশ্রী দেখাচ্ছে।

সে তবু কি করে যে কি সব ভেবে ফেলেছিল, মা তবে সেই গল্পের দেশে চলে গেছে। সেখানে ঘুড়িটা উড়িয়ে দিতে পারলে মা বলবে, ওরে খোকা তুই আমাকে মনে রেখেছিস! আমাকে ভুলে যাসনি!

বুনো এভাবে সব সুতো ছেড়ে দিয়ে দেখল, আর উড়তে পারছে না ঘুড়িটা, ঘুড়িটা এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে, আর একটু উঠে গেলেই মেঘের দেশ পেয়ে যেত, কিন্তু সুতো নেই বলে, ঘুড়িটা ক্রমে রুপালী নদী পার হয়ে তেপান্তরের মাঠ পার হয়ে মেঘেদের দেশে ঢুকে গেল। নানা রঙের ঘুড়িটা ক্রমে চোখের ওপর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলে, সে লাটাইটাও নদীর জলে ফেলে দিল। ওর ভীষণ কান্না পাচ্ছে। কে যেন মাকে বলছে, মা আমি কোন দোষ করিনি। আমি তো তোমার ভাল ছেলে মা। তুমি কেন তবে ফিরে আসবে না?

তারপর আবার সেই নীলরঙের মাঠ একা। সাদা বাড়িটা একা। এখানে আর কোনদিন বুনো ঘুড়ি ওড়াতে আসবে না। সবাই ওর দিকে তাকিয়ে আছে। যেন বলছে বুনো, আমরা তো আছি। তুমি আমাদের মায়া কাটাবে কি করে!

বুনোর মনে হল, পাশের সব বাড়ি, গাছপালা, মাঠ সবাই ওর সঙ্গে কিছু বলতে চায়। সে কোনদিকে তাকাল না। একা একা হেঁটে যাচ্ছে। ওর ভেতরটা ভীষণ ভার। এমন বিকেলে শরতের দিনে ওর মুখ ভারি কষ্টে ভরা। এমন সুন্দর পৃথিবীতে মাকে বাদে সে একা হবে ভাবতেই পারে না।

অশনি সংকেত
চিত্রনাট্যের অংশ

সত্যজিৎ রায়

[১৯৪২ সাল। গঙ্গাচরণ চক্রবর্তী ও তার স্ত্রী অনঙ্গ বৌ নতুন গাঁয়ে বসবাস করছে কয়েক মাস ধরে। এ গাঁয়ে এরাই একমাত্র ব্রাহ্মণ পরিবার। কবিরাজী পুরুতগিরি ও পাঠশালায় গুরুগিরি করে গঙ্গাচরণ দিব্যি পসার জমিয়েছে। যদিও তিনটির কোনটাই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার মতো বিদ্যেবুদ্ধি তার নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলেছে কয়েক বছর ধরে। মাঝে মধ্যে আকাশে সামরিক উড়োজাহাজ দেখতে পায় গ্রামের লোকেরা, কিন্তু যুদ্ধ সম্বন্ধে ধারণা কারুরই স্পষ্ট নয়।]

আশ্বিন মাসের সন্ধ্যা। কামদেবপুরে 'গ্রাম বাঁধার' পুজো সেরে গরুর গাড়িতে বাড়ি ফিরছে গঙ্গাচরণ। ঘাড় গোঁজ করে ছইয়ের তলায় বসে সে ঝিমুচ্ছে, এমন সময় কার জানি কণ্ঠস্বরে তার তন্দ্রা ভাঙে। সে দেখে গাড়ির পিছনে ধাওয়া করে আসছেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। গঙ্গাচরণ গাড়ি থামাতে বলে। বৃদ্ধ দীনু ভট্টাচার্য ব্যস্তভাবে এগিয়ে আসেন।

দীনু   আপনার কাজ হয়ে গেল?

গঙ্গা   আপনাকে ত—?

দীনু   আমার নাম শ্রীদীনবন্ধু ভট্টাচার্য। আমি থাকি এই পাশের গাঁয়ে—বাসানগাঁ।

গঙ্গা   তা কী ব্যাপার?

দীনুর হাসি মিলিয়ে যায়। সে কাতরভাবে গঙ্গাচরণের দিকে চায়।

দীনু   আমি না খেয়ে মরছি পণ্ডিতমশাই। ঘরে একদানা চাল নেই। চালের দর চার টাকা থেকে সাড়ে ছ'টাকা হয়ে গেছে।

গঙ্গা   বলেন কি!

দীনু   চোখে দেখতে পাই না বলে রোজগার প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। এদিকে বাড়িতে পুষ্যি অনেক, বয়সও হল গিয়ে উনসত্তর।

গঙ্গা   কিন্তু চালের দাম......কই আমাদের ওদিকে ত—

দীনু   বলে ত যুদ্ধের জন্য নাকি এমনটা হচ্ছে—

অপর্ণা সেন / ফটো : অমৃত

গঙ্গা যুদ্ধর জন্যে?

দীনু জাপানীরা নাকি সিঙ্গাপুর নিয়ে নিয়েছে—তাই নাকি চালের দর বাড়ছে। ফলে আরো নাকি বাড়বে—সর্বত্রই বাড়বে।

গঙ্গা তা আমি.....কী করতে পারি?

দীনু আজ যা পেলেন. তার কিছু যদি আমাকে দিয়ে যান। সামান্য—যৎ-সামান্য—দুটি চাল আর ডাল হলেই হবে।

অগত্যা গঙ্গাচরণ তার আজকের রোজগারের চাল ও ডাল থেকে দু-মুঠো তুলে দীনুকে দেয়, দীনু সেটা গামছায় বেঁধে কাঁধে ফেলে।

দীনু আপনার নামটা—?

গঙ্গা শ্রীগঙ্গাচরণ চক্রবর্তী।

গরুর গাড়ি আবার রওনা দেয়।

দীনু ওঃ—কত যে উপকার হল আমার! ......একদিন যাবো আপনার ওখানে!

রাত।

গঙ্গাচরণ রান্নাঘরের দাওয়ায় খেতে বসেছে, অনঙ্গ তার সামনে হাতপাখা নিয়ে বসে। গঙ্গা ভোজনরসিক, বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে চলেছে সে।

গঙ্গা একদিন—তুমি যখন রাঁধবে না? —আমি বসে বসে দেখব।

অনঙ্গ রান্না শেখার শখ হয়েছে বুঝি?

গঙ্গা তোমার রান্নার এত সোয়াদ হয় কি করে সেইটে দেখব। এই যে পেঁপের ডালনা রেঁধেছ—এতে কী কী দিলে, কেমন করে দিলে, বলত।

অনঙ্গ কেন বলব? তুমি ত অনেক কিছুই জান বাপু, এটা না হয় নাই জানলে।

গঙ্গাচরণ স্মিতহাস্য করে।

গঙ্গা আর জেনেই বা কী হবে বল। চালের দাম যদি সত্যিই বাড়ে ত ভালো ভালো রান্নার কথা ভুলেই যেতে হবে।

অনঙ্গ সত্যিই বাড়বে? তুমি যে বললে বুড়ো বানিয়ে বলেছে?

গঙ্গা বিশ্বাস ত হয় না ঠিকই। তবে যুদ্ধ যে হচ্ছে সেটা ত ঠিক।

অনঙ্গ কার সঙ্গে কার যুদ্ধ হচ্ছে গো?

গঙ্গা অমাদের রাজার সঙ্গে জার্মানি আর জাপানীর। মাথার উপর দিয়ে এরো-পেলেন যায় দেখনি?

অনঙ্গ হ্যাঁ!—কী সুন্দর লাগে দেখতে।

গঙ্গা ওই সব এরোপেলেন যায় যুদ্ধু করতে। আর যুদ্ধু হলে কখন কী হয় তা কি কেউ বলতে পারে?

অনঙ্গ আচ্ছা, কেমন করে ওড়ে বল ত?

গঙ্গা এরোপেলেন? ও সব কলকব্জার ব্যাপার। ...আকাশে খুব হাওয়া ত। যত উপরের দিকে যাবে তত বেশি হাওয়া। ঘুড়ি ওড়ে দেখনি?

অনঙ্গ ও!

কয়েকদিন পর। সকাল। ইয়াসিনের মুদির দোকান। কেরোসিনের খালি বোতল হাতে গঙ্গাচরণ দোকানের দিকে এগিয়ে আসে। ইয়াসিন আরেকটি খদ্দেরের কাছ থেকে পয়সা গুনে নিয়ে গঙ্গাচরণের দিকে দেখে।

ইয়াসিন সেলাম পণ্ডিতমশাই।

গঙ্গা জয়স্তু! —কেমন আছ ইয়াসিন?

ইয়াসিন আছি ত একরকম পণ্ডিতমশাই—কিন্তু তেল ত নাই।

গঙ্গাচরণের যেন কথাটা বিশ্বাস হয় না।

গঙ্গা তেল নাই?

ইয়াসিন চালান আসেনি একদম পণ্ডিত-মশাই।

গঙ্গা বল কি হে—কাসিন নাই তোমার দোকানে?

ইয়াসিন মহকুমা হাকিমের কাছে দরখাস্ত করতি হবে—তবে চালান আসবে।

গঙ্গা পয়সা দিলি দোকানে জিনিস পাওয়া যায় না এমন ত কখনো শুনিনি ইয়াসিন। এও কি যুদ্ধের জন্যে হচ্ছে নাকি

ইয়াসিন সেই রকমই ত বলছে।

খদ্দের এই বেলা কিছু চাল আর নুন কিনে রাখুন পণ্ডিতমশাই।

গঙ্গা কেন বাপু—ও-গুলোও পাওয়া যাবে না নাকি?

খদ্দের সাবধানের মার নেই পণ্ডিতমশাই!

ইয়াসিন আমরা হলাম ব্যবসাদার মানুষ—সব দিক দেখেশুনে চলতি হয়। এক-বার যখন গণ্ডগোল বেঁধেছে—কখন কি হয় তা কি কেউ বলতি পারে?

গঙ্গাচরণ অগত্যা তার খালি বোতলটা আবার হাতে তুলে নেয়।

গঙ্গা এ যে বড় চিন্তায় ফেললে হে ইয়াসিন বড় চিন্তায় ফেললে...

এরোপ্লেনের শব্দ শোনা যাচ্ছে। গঙ্গা-চরণ আকাশের দিকে চায়। প্লেনের শব্দ মিলিয়ে গিয়ে ঢেঁকির শব্দ শোনা যায়।

কাপালিদের বাড়িতে ধান ভানা হচ্ছে। হীরু কাপালির বৌ ছুটকি ঢেঁকিতে পাড়

দিয়েছে। তাঁর সঙ্গেই শান্তির মা কুলোয় চাল [illegible] বৌ ধান এনে দিয়েছে।

নিশ্চিন্ত গ্রামের মধ্যে ঘরে থেকে ঢেঁকির শব্দ ভেসে আসছে। ক্ষেতে চাষীরা লাঙল চষছে। পুকুরে হাঁস চরছে। এমন সময় দীননাথ ভট্টাচার্যকে দেখা যায় ছাতা মাথায় দিয়ে পায়ে জাল, ধুলোমাখা ক্যাম্বিসের জুতো পরে নতুন পাড়ার দিকে এগিয়ে আসছে

[illegible] মুখোপাধ্যায়। অনঙ্গ বৌ সকোয় হাঁড়ি থেকে ভাত তুলে নিজের পাতে ঢেলেছে এমন সময় দীননাথের কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

দীনু। চক্কোত্তি মশাই বাড়ি আছেন?

অনঙ্গ হঠাৎ চমকে উঠে ঘোমটা টেনে দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়ায়।

দীনু। ও চক্কোত্তি মশাই।

অনঙ্গ উনি ত বাড়ি নেই—[illegible]।

দীনু। কে মা লক্ষ্মী? আমাকে একটু খাবার জল দিতে পার মা লক্ষ্মী? আমি ব্রাহ্মণ—

অনঙ্গ আসছি।

দীনু [illegible] দাওয়া-ঘরের দিকে [illegible] অনঙ্গ ঘটিতে জল এনে দেয়।

দীনু। একটা কথা মা লক্ষ্মী—আমি [illegible] এখানে দুটি খাবো

পাঠশালা।

বাংলাদেশের ছবি আঁধারে আলো / উজ্জ্বল এবং শাবানা। পরিচালনা : নূরউল আলম।

গঙ্গাচরণ এক হাতে হুঁকো এক হাতে হাতপাখা নিয়ে বাঁশের মাচায় বসে ছাত্র পড়াচ্ছে। সে বাংলা শব্দ বলে বলে যাচ্ছে, ছাত্ররা শ্লেটে বানান লিখছে।

রান্নাঘরের দাওয়া।

দীনু ভট্টাচার্য গোগ্রাসে ভাত গিলছে, অনঙ্গ পাখা হাতে দরজার চৌকাঠের পিছনটায় দাঁড়িয়ে আছে।

দীনু আরেকটু চচ্চড়ি দেবে মা লক্ষ্মী?

অনঙ্গ জিভ কাটে।

অনঙ্গ চচ্চড়ি তো নেই। ঢ্যাঁড়স ভাজা দেবো দু'খান?

দীনু তাই দাও। আর একখান কাঁচা-লঙ্কা। মা লক্ষ্মীর রান্না যেন অমৃত্যো।

অনঙ্গ ঢ্যাঁড়শ ভাজা ও লঙ্কা এনে দেয়। দীনু ভট্টাচার্য অত্যন্ত তৃপ্তি সহকারে খেতে থাকে।

কিছুক্ষণ পর।

অনঙ্গ দীনুর জন্য কলকেতে তামাক সেজে এনে দেয়। দীনু ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

দীনু আরে দ্যাখ দ্যাখ দ্যাখ—দাও দাও—আমারে দাও। তামাক সাজতি সাজতি বলে বুড়ো হয়ে গেলাম।

অনঙ্গ ঘর থেকে মাদুর এনে দাওয়ায় বিছিয়ে দেয়।

অনঙ্গ এবার একটু জিরিয়ে নিন।

বিকেল।

গঙ্গাচরণ পাঠশালার কাজ সেরে গ্রামের মাতব্বর বিশ্বেস মশাইয়ের বাড়িতে আড্ডা দিতে এসেছে। সব মিলিয়ে আট-দশজন লোকে জটলা করছে। আলোচনার বিষয় যুদ্ধ।

নবদ্বীপ জার্মানরা কী একটা শহর নাকি নিয়ে নিয়েছে?

হরি শহর!

গঙ্গাচরণ বিজ্ঞের মত খবরটা দেয়।

গঙ্গা সিঙ্গাপুর।

সকলের দৃষ্টি এখন গঙ্গার দিকে।

হরি সিঙ্গাপুর।

ক্ষেত্র সেটা কোন্ জেলা হল পণ্ডিতমশাই?

গঙ্গা মেদিনীপুর। ......জার্মান না, জাপানী।

নবদ্বীপ শহরের কাছে কি?

গঙ্গা ঠিক কাছে নয়। একটু দূরে। পশ্চিম দিকে।

হরি তাহলে এই সব জায়গায় তার মানে যুদ্ধু হচ্ছে—আর এই যুদ্ধুর জন্যই চালের দর বাড়ছে?

গঙ্গা তা ত বটেই।

বিশ্বেসমশাই সকলকে আশ্বাস দেন :

বিশ্বেস যুদ্ধুই হোক আর যাই হোক—চালের দাম বাড়ছে বলে চিন্তা করার কিছু নাই। আমার বাড়িতে গোলা রয়েছে, গোলা ভর্তি চাল রয়েছে, এ গাঁয়ে কারুর চালের অভাব হবে না এইটা আমি বলতে পারি।

বিকেল।

গঙ্গাচরণ বাড়ি ফেরে। ফটক দিয়ে ঢুকেই দাওয়ায় অচেনা মানুষকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে সে অবাক হয়। দীনু এমন ভাবে শুয়ে আছে তাকে দেখে চেনার উপায় নেই। গঙ্গাচরণ এগিয়ে গিয়ে আগন্তুকটিকে নিরীক্ষণ করে। অনঙ্গ রান্নাঘরের দেয়ালের পাশে আড়াল থেকে তার স্বামীর কীর্তি-কলাপ উপভোগ করছে। শেষটায় সে আর থাকতে না পেরে মুখে কাপড় দিয়ে সশব্দে হেসে ওঠে। গঙ্গা অনঙ্গকে দেখে। অনঙ্গ হাতছানি দিয়ে তাকে কাছে ডাকে। গঙ্গা এগিয়ে যায়। দুজনে ফিসফিস করে কথা হয়।

গঙ্গা কে?

অনঙ্গ তোমার খোঁজ করছিলেন।

গঙ্গা কে লোকটা?

অনঙ্গ নাম বলেন নি। তোমার নাম ধরে ডাকছিলেন।

এতক্ষণে গঙ্গা বুঝতে পারে।

গঙ্গা বুঝেছি সেই বুড়ো ভটচায। কখন এলো?

অনঙ্গ অনেকক্ষণ। ভাত খেল ত।

গঙ্গা ভাত ছিল?

অনঙ্গ থাকবে না কেন?

গঙ্গা অ—তোমার অন্ন ধ্বংস করেছে বুঝি?

অনঙ্গ আহা, কী যে বল। অতিথি না?

অনঙ্গ স্বামীর পাশ দিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে যায়।

গঙ্গা শোন—কেরাসিন নেই বাজারে। চাল এক টাকা কাঠা। ওরকম ফস্ করে যাকে তাকে খেতে দিলে—

দীনু ভট্টাচার্যের ঘুম ভাঙে। সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে গঙ্গাকে দেখে।

দীনু ও—আপনি ফিরেছেন?

গঙ্গা কিছু না বলে দাওয়ার দিকে এগিয়ে গিয়ে পা ধুতে ব্যস্ত হয়।

দীনু মালক্ষ্মীর হাতের রান্না খেয়ে দিব্যি ঘুমটা হল।

গঙ্গা কোন মন্তব্য করে না।

দীনু আমি এসেছি চক্কোত্তিমশাই—আপনার সঙ্গে একটা পরামর্শের জন্য। আমাদের ওদিকে কোনো গাঁয়ে চাল মিলছে না। আর যদি বা মেলে—দেড় টাকা করে কাঠা।

গঙ্গার পা ধোওয়া হয়ে গেছে। সে দাওয়ায় রাখা হুঁকোটা তুলে নেয়।

গঙ্গা এদিকেও অবস্থা ভালো না।

দীনু আপনার ত ও জোয়ান বয়স। আর আপনারা হলেন গিয়ে দুটি মাত্র প্রাণী সন্তানাদি নেই তো?

গঙ্গা তামাক সাজতে রান্নাঘরের দিকে এগোয়। রান্নাঘরের দরজার মুখে দাঁড়িয়ে অনঙ্গ এদের কথাবার্তা শুনছে।

দীনু আমি এই বুদ্ধ বয়সে এতগুলো পুষ্যি নিয়ে কী করি বলুন ত।

গঙ্গা আপনার গাঁয়ের ব্যবস্থা আর এখান থেকে কী করে হয় বলুন।

দীনু তা ত বুঝলাম কিন্তু..

গঙ্গা কতটা চাল চাই আপনার? একবার বিশ্বেসমশাইকে বলে দেখতে পারি।

দীনু চাল...কিনতি হবে?

গঙ্গাচরণ তামাক সেজে দাওয়ায় ফিরে এসেছে। দীনু অসহায়ভাবে তার দিকে চায়।

গঙ্গা না হলে পাবেন কী করে?

দীনু গাল চুলকোয়।

দীনু পয়সা ত আনিনি।

গঙ্গা আনেন নি?

দীনু মাথা নেড়ে না বলে। গঙ্গা সবিশেষ বিরক্ত।

গঙ্গা তাহলে আর কী হবে বলুন। আমিই বা কী করতে পারি?

গঙ্গা দাওয়ার অন্য প্রান্তে হুঁকো হাতে বসে পড়ে।

দীনু দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

দীনু বুড়ো বয়সে তাহলে না খেয়েই মরতে হবে।

অনঙ্গ দীনুর দিকে অনুকম্পার দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। এবার সে স্বামীর দিকে দেখে। গঙ্গা কোন দিকে দৃকপাত না করে হুঁকো খেয়ে চলেছে। অনঙ্গ তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু গঙ্গা যেন তাকে দেখেও দেখে না।

দীনু আমি তাহলে... আসি!

দীনু মাদুর থেকে উঠে সিঁড়িতে বসে তার লাল ক্যাম্বিসের জুতো পরতে শুরু করে। কাজটা করতে সে বিস্তর সময় নেয়, কিন্তু তাতে কোনো ফল হয় না। গঙ্গা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে। শুধু একা অনঙ্গর মন ভিজিয়েও কোনো লাভ নেই। অগত্যা দীনু উঠে পড়ে।

দীনু আসি চক্কোত্তিমশাই! আসি, মা-লক্ষ্মী!

দীনু ফটকের দিকে এগিয়ে যায়।

দীনু মালক্ষ্মী যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা।... সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা।

দীনু ফটক দিয়ে বেরিয়ে যায়।

গঙ্গা তার জায়গা ছেড়ে উঠে দাওয়ার অন্য প্রান্তে গিয়ে দীনুর মাদুরটা গুটিয়ে ফেলে।

এইবার অনঙ্গ স্বামীকে না ডেকে পারে না। একটা বোঝাপড়া না করলেই নয়।

অনঙ্গ শোনো—

গঙ্গা অনঙ্গর দিকে এগিয়ে আসে।

গঙ্গা কী?

অনঙ্গ বেশ ঝাঁজের সঙ্গে কথা বলে।

অনঙ্গ বুড়ো মানুষটাকে শুধু হাতে ফিরিয়ে দিলে?

গঙ্গা তা আমি কি করব? ও পয়সা আনেনি—অত্যন্ত ধাড়িবাজ লোক। ও ভিক্ষে করতে বেরিয়েছে। ওকে আমি চিনি না?

অনঙ্গ তুমি ওকে ডাক—দোহাই তোমার—নইলে আমি মাথা খুঁড়ে মরব—

গঙ্গা এ তো আচ্ছা মুস্কিল। ডেকে হবেটা কী? আমি ত আর ওর জন্য চালের ধান্দায় ঘুরতে পারব না। অনেক ঘুরেছি আজ।

অনঙ্গ আজ যাবে কেন—কাল যেও। আজকে রাতটা উনি থাকুন। বেচারা—আমাদের ঘরে চাল আছে, ওর ঘরে নেই। তুমি ওকে ডাকো—দোহাই তোমার—তুমি ডাকো।

অগত্যা ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্ত্রীর অনুরোধ রক্ষার জন্য গঙ্গাচরণ ফটকের দিকে এগোয়। এক পা গিয়েই বুঝতে পারে তাকে বেশি দূর যেতে হবে না। মাত্র বিশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে দীনু তার ছাতাটাকে খোলার চেষ্টায় সেটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে।

স্বামী-স্ত্রীতে দৃষ্টি বিনিময় হয়। তারপর গঙ্গা দীনুকে উদ্দেশ্য করে হাঁক দেয়।

গঙ্গা ও ভটচাযমশাই!

দীনু এইটারই অপেক্ষায় ছিল এতক্ষণ। ডাক শুনে সে দন্ত বিকশিত করে গঙ্গার ফটকের দিকে এগিয়ে আসে।

সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় / ফটো : অমৃত

অহীন্দ্র চৌধুরী

সে আমলে রঙ্গালয় ছিল নাট্য-সাধনার পীঠ। আর তখনকার দিনের রঙ্গালয় সম্পর্কে একটু বিশ্লেষণ করে দেখলে সে কথার প্রমাণ সহজেই পাওয়া যায়।

আমাদের সৌভাগ্য, আমরা সে যুগে জন্মেছিলাম। যে যুগ ছিল নাটকের স্বর্ণযুগ।

আমাদের সৌভাগ্যের কথা তো আছেই, সেই সঙ্গে বাংলার নাট্যশালার সৌভাগ্যের কথাও তুলছি। বাংলা নাট্যশালা সূচনাতেই পেয়েছিল, এমন একদল উজ্জ্বল প্রতিভাকে, যাঁদের দীপ্তি শতাব্দীর পরেও অম্লান। গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল, ধর্মদাস প্রমুখের মতো দিকপাল নাট্যকার, অভিনেতা এবং আচার্য—আর বিনোদিনী, তারাসুন্দরীর মতো অভিনেত্রী—এঁরা রঙ্গালয়ের সেই স্বর্ণযুগেরই এক-একটি রত্ন। আরো বলছি, মাইকেল মধুসূদন, রামনারায়ণ তর্করত্ন, দীনবন্ধু মিত্রের মতো যুগান্তকারী নাট্যকারের আবির্ভাবও নাট্যশালার প্রথম যুগে। সত্যি কথা বলতে কি, এঁরা তো সে যুগে রীতিমতো 'জাগরণ' সৃষ্টি করেছিলেন। আরো বলতে হয়, সেদিনের নাট্যশালা ঠাকুর রামকৃষ্ণের আশীর্বাদ থেকেও বঞ্চিত হয়নি।

সেই 'জাগরণ' কাল আমি প্রত্যক্ষ করিনি বটে, তবে সে কালের স্পষ্ট-প্রভাবের মধ্যেই আমাদের নাট্য-জীবন শুরু। যখন মঞ্চে এলাম, তখন মঞ্চের একচ্ছত্র সম্রাট গিরিশচন্দ্রের পুত্র সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ—আমরা যাঁকে দানীবাবু বলে জানি। দানীবাবু ছিলেন গিরিশযুগের সার্থক উত্তরসাধক।

উনিশ শ তেইশ সাল। আমি মঞ্চে যোগ দিলাম। আর মঞ্চের সঙ্গে যিনি আমার গাঁটছড়াটি শক্ত করে বেঁধে দিয়েছিলেন, তিনি হলেন বাংলা মঞ্চের স্বনামধন্য পুরুষ তিনকড়ি চক্রবর্তী। যাঁকে আমি আচার্য রূপে গ্রহণ করেছিলাম।

সে তো আর আজকের কথা নয়—পঞ্চাশ বছর আগের কথা। কিন্তু সেদিনের কোন কথাই বিস্মৃত হবার নয়। বাংলার নাটমঞ্চে তখনও স্বর্ণযুগের জোয়ার। বাংলার নাটমঞ্চ তখন নানা প্রতিভার দীপ্তিতে ভাস্বর।

সার্থক নাট্যকার, সার্থক আচার্য, বলিষ্ঠ অভিনেতা-অভিনেত্রী আর কুশলী কলা-কৌশলী—সকলকে নিয়ে মঞ্চ যেন এক বিচিত্র পরিবার। সবার ওপরে সম-অনুভূতিসম্পন্ন দর্শক-সমাজ। সব মিলিয়ে সেদিন এক আদর্শ নাট্যসমাজ গড়ে উঠেছিল।

আমি যখন মঞ্চে এলাম, তখন শ্রদ্ধেয় তিনকড়ি চক্রবর্তী, নরেশচন্দ্র মিত্র, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ থিয়েটার জগতে এসেছেন। আর রয়েছেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী। অধ্যাপক শিশিরকুমারের মঞ্চে যোগদান নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। অধ্যাপনা ছেড়ে নাট্যজগতে যোগদান, এর আগে তেমন ঘটনা ঘটেনি বললেও হয়।

এখানে একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ না করে পারছি না। সেটা সম্ভবত ১৯২২ সাল। সেবারে উত্তরবঙ্গে প্রচণ্ড বন্যা হয়েছে। আর এই বন্যাপীড়িতদের সাহায্যকল্পে কলকাতার শৌখিন অভিনেতৃবর্গের এক যুক্ত সংস্থা অভিনয়ের আয়োজন করলেন। যে অভিনয় অনুষ্ঠানে ছিলেন, তিনকড়ি চক্রবর্তী, নরেশচন্দ্র মিত্র, শিশিরকুমার ভাদুড়ীর মতো কৃতী শিল্পীরা। সে অভিনয় অসাধারণ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। আর সেই অসাধারণ অভিনয় দেখেই কলকাতার একদল নাট্যপ্রেমিক এবং ধনী ব্যক্তি এমনই অনুপ্রাণিত হলেন, যার ফলে বাংলা রঙ্গমঞ্চে একদল তরুণ অভিনয়শিল্পীর সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হলো শুধু নয়—কলকাতার থিয়েটার সমৃদ্ধ হলো। আর 'আর্ট থিয়েটারের' পত্তন হলো এই সময়েই। যে আর্ট থিয়েটার সে আমলে একটা প্লাবনের সূচনা করেছিল বাংলা রঙ্গমঞ্চের ক্ষেত্রে। একসঙ্গে অনেক তরুণ প্রতিভার সমাবেশ ঘটেছিল এই মঞ্চে। সার্থক নাট্যপ্রযোজক প্রবোধচন্দ্র গুহ, দিকপাল নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আর অভিনয় শিল্পীদের তালিকায় তরুণ প্রতিভা—যাঁদের মধ্যে তিনকড়ি চক্রবর্তী, নরেশচন্দ্র মিত্র, দুর্গাদাস ব্যানার্জি, ইন্দু মুখার্জি প্রমুখ ছিলেন। অভিনেত্রীদের মধ্যে কৃষ্ণভামিনী, নীহারবালা, নিভাননী ছাড়া আরো অনেকেই ছিলেন। আমার সৌভাগ্য, আমিও ছিলাম ওই শিল্পীদের মধ্যে। আর্ট থিয়েটার তখন অপরেশচন্দ্রের 'কর্ণার্জুন' পরিবেশন করছে মঞ্চে।

১৯১৬ সালের পর থেকে বাংলা রঙ্গমঞ্চের দুর্দশা কতকটা চরমে পৌঁছেছিল। রঙ্গমঞ্চের জনক গিরিশচন্দ্র, জাতীয় নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ উজ্জ্বল প্রতিভার তিরোধান ঘটেছিল ওই সময়ে। রঙ্গমঞ্চের ক্ষেত্রে তখন কেবলমাত্র সান্ত্বনা-স্বরূপ ছিলেন রসরাজ অমৃতলাল, পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ—কিন্তু তাঁরা তখন বয়সের ভারে জীর্ণ। আর ছিলেন গিরিশচন্দ্রের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) ও অভিনেত্রী তারাসুন্দরী। বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রদীপটুকু এঁরা কোন মতে প্রজ্বলিত রেখেছিলেন।

উনিশ শ বাইশের সেই সম্মিলিত অভিনয়ের পর বাংলা মঞ্চে আবার নতুন সম্ভাবনার আলো দেখা দিল। আর এই সম্ভাবনার যুগেই এলেন অধ্যাপক শিশিরকুমার।

আর্ট থিয়েটার চলছে। সেখানে মহাসমারোহে অপরেশ-চন্দ্রের কর্ণার্জুন। কিন্তু মিনার্ভা তখন বন্ধ। কিছুদিন আগে মিনার্ভা আগুনে পুড়ে গেছে, তখনো পুনর্নির্মাণ সম্ভব হয়নি। আর একটি থিয়েটার তখন চালু ছিল, সেটি মনোমোহন থিয়েটার। সেখানে ছিলেন দানীবাবু। কিন্তু মনোমোহন থিয়েটারের অবস্থাও তখন শোচনীয়। কোন মতে চলছিল, তাও বন্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু নাট্যপ্রেমী বাঙালীর নাট্য-সাধনার ক্ষেত্রে যতই বাধা আসুক, সে বাধা উত্তীর্ণ হতে তার সময় লাগেনি। মনোমোহন

থিয়েটার আবার চালু হলো। আর শিশিরকুমারই এই শুভ কাজটি করলেন। তিনি নিজেই দায়িত্ব নিলেন। এবং 'সীতা' মঞ্চস্থ করলেন। ১৯২৪ সালের ৬ই ডিসেম্বর প্রথম অভিনয় হলো শিশিরকুমারের পরিচালনায়। অসাধারণ সাফল্য অর্জন করলো 'সীতা'।

'কর্ণার্জুন' আর 'সীতা'—সে আমলে রীতিমতো চমক সৃষ্টি করেছিল। সীতা নাটকে শিশিরবাবু রামের চরিত্রে সার্থক রূপদান করেছিলেন।

মঞ্চে তখন নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। নাটকের পরিবেশ রচনার জন্যেও তখন রীতিমতো চেষ্টা চলছে। একটি নাটকের প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করছি, নাটকটি হলো ইরানের রানী। সে নাটকটি প্রযোজিত হয়েছিল নতুন আঙ্গিকে। আর সেদিনের নাট্য-উপস্থাপনায় অপরেশচন্দ্রের 'ইরানের রানী' একটি নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। নাটকের প্রতিটি দৃশ্য ছিল সুচিন্তিত। এমনকি 'দ্রাক্ষাকুঞ্জ' নিখুঁতভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছিল। আর নাটকের 'বিরামক্ষণে' যে 'ঐকতান বাদন' পরিবেশন করা হতো, সেই বাদক দলে ছিলেন প্রায় বিশজন শিল্পী। যে ঐকতান বাদন নাটকের বিরামক্ষণে মঞ্চ-গৃহে সুরের ইন্দ্রজাল রচনা করতো। 'ইরানের রানী' সে আমলে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল।

যে কথা আগেও বলেছি, সে কথা আবার বলছি, সে আমলে রঙ্গালয় ছিল নাট্যসাধনার পীঠ। আমরা, যারা অভিনয়-শিল্পী, শিক্ষার্থীর মন নিয়ে অভিনয় করেছি। কোনদিন মুহূর্তের জন্যেও আমরা মনে করিনি, আমরা সার্থক অভিনেতা হতে পেরেছি। এক-একটা নতুন নাটক মঞ্চস্থ হবে—তার প্রস্তুতি-পর্ব সে এক ইতিহাস। হয়তো আজকের অনেকের কাছে তা অবিশ্বাস্য মনে হবে। একটা নাটক মঞ্চস্থ করার পূর্বে সেই নাটকের পাণ্ডুলিপি যে কতবার পাঠ করা হতো তার ঠিক নেই। যত সময় না মনে হয়েছে, নাটক ত্রুটিহীন, ততো সময় নাটক সংশোধনের কাজ চলতো। কিন্তু শেষ বিচারের ভার ছিল দর্শকদের হাতে। নাটক মঞ্চস্থের দিন আমরা দর্শকদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতাম। দর্শক নাটক কিভাবে নিলে, কোথায় ভালো লাগলো, কোথায় খারাপ লাগলো, সবই লক্ষ্যের মধ্যে থাকতো। যদি কোথাও মনে হয়েছে, নাটকের কোন অংশে দর্শক খুশী হতে পারছে না, তখন আবার সেই অংশ সংশোধন করা হতো। অভিনয়ের ক্ষেত্রেও তাই। আমরা এক-একটা চরিত্রে রূপদান করার আগে রীতিমতো চিন্তিত হয়ে পড়তাম কেমন করে এই চরিত্রে রূপদান করবো। দর্শক কিসে খুশী হবে। প্রতিটি অভিনেতা-অভিনেত্রীর ক্ষেত্রে এ কথা সত্য ছিল। অভিনেতা-অভিনেত্রী, আমরা ছোট-বড় যেমন চরিত্রেই রূপদান করি না—আমরা কিন্তু ছোট-বড় ছিলাম না। আমরা সব সময়ে মনে করতাম, মঞ্চ আমাদের বিদ্যাপীঠ, আমরা সেখানে শিক্ষার্থী। আর এই মন নিয়েই আমরা অভিনয় করে এসেছি।

আর দর্শকের মানসিকতার সঙ্গে শিল্পীর মানসিকতার সার্থক যোগসূত্রই সফল নাটকের জন্ম দিত। আর একথা শুধু সেকালেরই নয়, হয়তো একালের সার্থক মঞ্চ-সফল নাটকের সাফল্যের উৎসমুখ এখানেই।

বাঙলা রঙ্গালয়ের শতবর্ষ পূর্তি উৎসবে উদ্বোধনী ভাষণ

তুষারকান্তি ঘোষ

আমার এখনও একশো বছর বয়স হয় নি। যখন বাঙলা সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন আমার জন্মই হয়নি। তাই সে সময়কার কথা আমি জেনেছি বই পড়ে ও সে-যুগের কিছু কিছু লোকের মুখ থেকে শুনে। আজ আমরা যে-বাড়ীতে সমবেত হয়েছি, এই বাড়ীর এই উঠানে একশো বছর আগে বাঙলার প্রথম সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্বোধন হয়েছিল। আগে বড়লোকের বাড়ীতে থিয়েটার হ'ত: কিন্তু জনসাধারণে সে থিয়েটার দেখবার সুযোগ পেতেন না। সেইজন্যে গেরস্ত ঘরের কয়েকজন নাট্যোৎসাহী যুবক স্থির করেছিলেন স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ গড়বেন জন-সাধারণকে থিয়েটার দেখাবার জন্যে। এ ব্যাপারে যখন ধনীদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া গেল না, তখন তাঁরা টিকিট বেচে টাকা সংগ্রহ করবার কথা ভেবেছিলেন। তখনকার সমাজ কি রকম রক্ষণশীল ছিল তা আজকের দিনে আমরা ধারণাই করতে পারব না। যাঁরা নট ছিলেন, তাঁদের বিশেষ সম্মানের চোখে দেখা হ'ত না। কাজেই বাগবাজার নাট্যসমাজের ছেলেরা দুঃসাহসের কাজ করেছিলেন।

সে যুগের থিয়েটারের কথা বলতে গেলে গিরিশবাবুর কথা না বললে কিছু বলাই হবে না। তিনি বললেন, "ভালো বাড়ী ভালো স্টেজ, ভালো সিনসিনারি কর, তবে তো 'ন্যাশনাল' নাম দিয়ে টিকিট বেচবে। 'ন্যাশনাল' নাম শুনে লোকে মনে করবে-- এই বুঝি চরম ! এ অবস্থায় টিকিট বিক্রি করা উচিত হবে না।" অর্দ্ধেন্দু, অমৃতলাল, নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল বললেন, "আমাদের যেমন অবস্থা তেমনি করব।" ফলে গিরিশবাবু সরে দাঁড়ালেন। ন্যাশনাল নামটা দিয়েছিলেন নবগোপাল মিত্র। আমার বাবা মহাত্মা শিশিরকুমার এই থিয়েটার সম্বন্ধে বরাবরই উৎসাহী ছিলেন। উনি এদের উৎসাহ, পরামর্শ সবই দিতেন। 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের প্রশংসা করে অমৃত-বাজারে প্রকাণ্ড আলোচনা বেরিয়েছিল; [illegible]টির কথারও উল্লেখ ছিল।

অমৃতবাজারে এই সমালোচনাটি ১৮৭২ সালের ১২ই ডিসেম্বর (বৃহস্পতিবার) বেরিয়েছিল। এটা পড়লে তখনকার কালের নির্ভীক সমালোচনা ও থিয়েটারের ওপর আন্তরিক দরদ বোঝা যাবে। সমালোচনাটা এই :—

"ন্যাশানাল থিয়েটার"

"নীলদর্পণ অভিনয়।— গত শনিবারে নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। নাটকের অভিনয় কলিকাতা সহরে বা মফঃস্বলেও নূতন নহে। কিন্তু এ সেরূপ অভিনয় নহে। খোসপোষাকী বাবুদিগের বৈঠকী সকের অভিনয় নহে। সে সকলের স্থায়িত্ব অনেক অব্যবস্থিত চিত্তের প্রসাদের উপর নির্ভর করে, তাহাতে প্রায়ই সাধারণের মনোরঞ্জন হইবার সম্ভাবনা নাই। নীলদর্পণের অভিনেতৃগণ সমাজবদ্ধ হইয়া এই অভিনয় কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন। তাঁহারা টিকিট বিক্রয় করিতেছেন ও সেই অর্থে অভিনয়সমাজের উন্নতি ও পুষ্টি সাধন করিবেন মানস করিয়াছেন। আমরা একান্ত মনে তাঁহাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি। এখন সকলে দেখিতে পারিবে অভিনয় ক্রিয়া চিরস্থায়িনী হইবে। মাছের তেলে মাছ ভাজা চলিবে, [illegible] — [illegible] করিতে হইবে না। আর এরূপ অভিনয়-সমাজ দেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে আর একটি মহৎ ফল ফলিবে। উপযুক্ত গ্রন্থকারগণ নাটক লিখিতে উৎসাহিত হইবেন, ভরসা অচিরাৎ আমরা দুই একখানি ভাল নাটক পাঠ করিতে পারিব।

"অভিনয় সুচারু হইয়াছিল। আমরা পরিতৃপ্ত হইয়াছি। [illegible] সূত্রধর যখন গানের পর 'আমাকে অর্থলোভীই বলুক আর যে যা বলুক আমি দর্শকবর্গের উৎসাহ পাইলেই কর্ত্তব্যকর্ম্ম সাধনে পরাঙ্মুখ হইব না' এই বলিয়া কিঞ্চিৎ সদর্প কাতর স্বরে নিজ মনোবেদনা নিবেদন করিলেন, তখন আমরা বুঝিতে পারিলাম যে বাস্তবিক তিনি অসারগ্রাহী অল্প বিবেচক লোক কর্ত্তৃক কটুবাক্যে পীড়িত হইয়াছেন। কিন্তু বঙ্গ সাহিত্য সমাজ তাঁহাকে উৎসাহ দানে কখনই বিমুখ হইবে না। আমরা [illegible] এই অভিনয়সমাজ সকল বৈরী বাক্য অবহেলাপূর্ব্বক স্বকার্য্য সাধনে নিযুক্ত থাকিবেন।

"নীলদর্পণ নাটক দেশপ্রসিদ্ধ। ইহার গল্পভাগ অনেকেই জানেন। কিন্তু একথাও বলিতে হয় যে গত শণিবারে নীলদর্পণের 'নবযৌবন' হইয়াছে। শ্বেতাঙ্গগণের পক্ষপাতত্ব ও অত্যাচার অনেকেই মধ্যে মধ্যে দেখিতেছেন কিন্তু তথাপি সেই সকল কার্য্য রঙ্গভূমিতে অভিনীত দেখিলে একরূপ অপরূপ মনোভাব মনোমধ্যে প্রকটিত হইতে থাকে। সংসারে নানা প্রকৃতির শঠ ও বিশ্বাসঘাতক লোক আছে, কিন্তু ইয়াগো চরিত্র রঙ্গভূমিতে দেখিয়া মনোমধ্যে ঘোরতর ঘৃণা জন্মে। নূতন ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ফলাফল বিচার অনেকেই করিয়া মনে মনে ক্রন্দন করিতেছেন, কিন্তু রঙ্গস্থলে যখন নবীনমাধব বলিলেন যে "আবার যে নূতন আইন চলিবে শুনিতেছি তাহা হইলেই সর্বনাশ" বাক্য কয়েকটি উচ্চারিত হইবামাত্রেই দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে যে কোলাহল উপস্থিত হইল, তাহা আমরা কখনই ভুলিতে পারিব না। কিন্তু আর অরণ্যে রোদনে ফল কি? আমরা অভিনয় সমালোচনে ফৌজদারী কার্য্যবিধির কথা পাড়িলাম। এমনি দুর্দ্দশাই হইয়াছে, সকল কথাতেই [illegible] আইনে। যাহা

হউক অভিনেতৃগণ সম্বন্ধে কিছু বলা বোধ হয় কর্তব্য হইতেছে। নীলদর্পণের পুনরানুবাদ করিবার আবশ্যক নাই এবং দীনবন্ধুবাবু পরিচিত গ্রন্থকার, তদীয় প্রশংসাবাদও নিষ্প্রয়োজন।

"আর একটি কথা বলিতে হইতেছে। নীলদর্পণ অভিনয়ের প্রকৃত স্থান কলিকাতা নহে। মফস্বলে যে কাণ্ড হইতেছে তাহা কলিকাতার লোকেরা প্রায়ই জানিতে পারেন না। যখন নীলকর সাহেবের পদাঘাতে গরিব রাইয়ত ধূলাবলুণ্ঠিত হইয়া উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল তখন কলিকাতাবাসী দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে উচ্চৈস্বরে হাস্যধ্বনি উঠিল। কয়েকটি পল্লীগ্রামের ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন তখন তাঁহারা ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাহাতেই আমরা বলি যে, এই নীলদর্পণ একবার কৃষ্ণনগরে যশোহর বা বহরমপুরে অভিনীত হইলে ভাল হয়। আমরা ঐ সকল জেলার ধনবান জমিদারগণকে অনুরোধ করি যে, তাঁহারা এই অভিনেতৃগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া একবার অভিনয় করাউন। আমরা চরিতার্থ হইব। নীলকর নিষ্পীড়ন আর নাই মনে করিয়া উপেক্ষা করিবেন না। মফস্বলে কি হইতেছে তাহা আর কি বলিব ?

"অভিনেতৃগণের মধ্যে আমরা তোরাপেরই সম্যক প্রশংসা করি। তেজস্বী, প্রভুভক্ত তোরাপের চরিত্র সুন্দর প্রদর্শিত হইয়াছিল। গোলোক বসু ও গোলোক বসুর গৃহিণীর চরিত্র একজন কর্তৃকই অভিনীত হইয়াছিল। ইনি একটি পাকা লোক। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ইনি গৃহিণীর চরিত্রে তেমন সুন্দর রূপে দেখাইতে পারেন নাই। সাবিত্রী ও রেবতী অতি উত্তম, সৈরিন্ধ্রী তত ভাল হয় নাই।

সান্যালবাড়ীর ঝাড়লণ্ঠন

কিন্তু তাহার রোদনস্বর অপূর্ব বলিতে হইবে। সরলা অতি সুশীলা, প্রকৃত ছোট বোই বটে। আদুরি—উত্তম। আর অধিক সমালোচনের প্রয়োজন নাই। সকলেই আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন। অভিনয় ক্রিয়াও সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। আমরা নিকটে বসিয়াছিলাম, দৃশ্য সকলের বর্ণচাতুর্য্য তত উপলব্ধি করিতে পারি নাই। কোন দোষও দেখি নাই। কিন্তু সঙ্গীত ভাগে কেহই তৃপ্ত হন নাই। শুনিলাম এই ন্যাসনাল থিয়েটার কোন বড় মানুষের বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই। এটি একটি সামান্য কথা নহে। দেশের একটি প্রকৃতির স্ফূর্তি পাইতে চলিল। এমন সকল কার্য্যের আমরা নিয়ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। অভিনয়সমাজ চিরস্থায়ী হউক এবং দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে থাকুক।"

এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে মহাত্মা শিশিরকুমার ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম বোর্ড অফ ডাইরেক্টরের একজন ডাইরেক্টর ছিলেন।

কিন্তু মাসতিনেকের মধ্যে টাকাপয়সা নিয়ে গোলমাল বাধাতে আমার বাবা শিশিরকুমার, জেঠামশাই হেমন্তকুমার প্রভৃতি মধ্যস্থ হয়ে মনোমালিন্য কিছুদিনের জন্যে মিটিয়ে দেন। শুধু তাই নয়। আমাদের বাগবাজারের বাড়ী থেকে বোসপাড়া লেনে গিরিশবাবুর বাড়ী তো বেশী দূরে নয়। তাছাড়া গিরিশবাবুর সঙ্গে আমার বাবার বন্ধুত্ব ছিল এবং গিরিশবাবু তাঁর রচিত একটা নাটকও আমার বাবাকে উৎসর্গ করেছিলেন। শিশিরকুমারই গিরিশবাবুকে বলে কয়ে ন্যাশনালে যোগ দিতে রাজী করেন। গিরিশবাবু আসাতে ন্যাশনালের দল ভারি হল।—কিন্তু কিছুদিন বাদেই ও'রা দু'দল হয়ে গেলেন। গিরিশবাবুর দল নাম নিলেন ন্যাশনাল থিয়েটার। অন্য দল নাম নিলেন গ্রেট ন্যাশনাল। এরপর পাকাপোক্ত সব থিয়েটার হ'ল। স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্যে

মধুসূদন সান্যালের সেই ঐতিহাসিক বাড়ী

মেয়েদের আনা হ'ল। তখনকার দিনে এইসব মেয়েদের নেওয়াতেও বেশ কিছু সামাজিক আন্দোলন হয়েছিল। আর আজ ভদ্রলোকের মেয়েরাও থিয়েটার করছেন। এখন থিয়েটারের সমাজ অনেক উন্নত। আর আজকালকার মেয়েরা অফিসের কাজের মত থিয়েটারের কাজ করেন। তখনকার কালেই,

কিন্তু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব শ্রীচৈতন্যের অভিনয় দেখে বিনোদিনীকে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন, তার অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে। এই অভিনয় সম্বন্ধে বিনোদিনী তাঁর জীবনীতে লিখেছেন: 'চৈতন্যলীলার রিহার্স্যালের সময় অমৃতবাজার সম্পাদক বৈষ্ণব চূড়ামণি মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ আমাকে এই পার্ট যাতে সুষ্ঠুভাবে করতে পারি তার উপদেশ দিতেন। তিনি বলেছিলেন: 'তুমি সতত গৌরপাদপদ্ম হৃদয়ে চিন্তা কর। তিনি অধম তারণ, পতিতপাবন। পতিতের উপর তাঁর অসীম দয়া।' অনবরত মহাপ্রভুর পাদপদ্ম চিন্তা করতেন বিনোদিনী। এবং তাঁর এই পার্ট দেখেই রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব নিজে এসে বিনোদিনীকে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন।

এরপরে গিরিশবাবু, অর্দ্ধেন্দুবাবু প্রভৃতির মৃত্যুতে প্রথম বা আদি যুগের অবসান হল। এল মধ্য যুগ—দানীবাবু, তারাসুন্দরী, অমর দত্তের যুগ। তারপরে এলেন শিশির ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি। আজ আর এক যুগ চলছে।—অভিনয়ধারার পরিবর্তন হয়েছে, দর্শক রুচির পরিবর্তন হয়েছে। আমার সে যোগ্যতা নেই যে, আগেকার এবং আজকের শিল্পীদের গুণাগুণ নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করব। আজ এখানে অহীন্দ্র চৌধুরী মশাই উপস্থিত থাকলে তাঁকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতুম। আগেকার নাটকে সখীদের নাচগান ছিল। কিন্নরী, আলিবাবা, আবুহোসেন, য্যারসা-কা-ত্যায়সা।—বেশ লাগত। আজকাল ওসব উঠে গেছে।

বাঙলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের একশো বছর কেটে গেল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এতদিনে আমরা কি করলুম? বাঙালীরা ভারতবর্ষের মধ্যে পাইয়োনীয়ার হয়েও একটা top grade (যথার্থ উচ্চশ্রেণীর) থিয়েটার তৈরী করতে পারলেন না কেন? কৈ একটা ভালো থিয়েটার? শুনেছি, শিশির ভাদুড়ীকে আমাদের সরকার যখন পদ্মভূষণ উপাধি দেবার প্রস্তাব পাঠান, তখন তিনি সেটা গ্রহণ না করে বলেছিলেন, 'ওটা না দিয়ে আমাকে একটা ন্যাশনাল থিয়েটার করে দাও—সত্যিকার কাজ হবে।' ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া থেকে বড়ো বড়ো থিয়েটার পার্টি এসে আগে এখানে এম্পায়ার থিয়েটারে অভিনয় করে গেছে। বাইরের বড় দল এসে অভিনয় করবে, এখন আমাদের তেমন থিয়েটার কৈ?

আগেকার নাটক শুধুই আনন্দ দেবার জন্যে লেখা হত না। তাতে লোকশিক্ষার ব্যবস্থাও থাকত। আমার বাবা শিশিরকুমারের 'নয়শো রুপেয়া' নাটকে ব্রাহ্মণদের বিবাহ ব্যাপারে কুপ্রথাকে নিয়ে আলোচনা ছিল—এটা ছিল সামাজিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে। দীনবন্ধুবাবুর 'নীলদর্পণ' নীলকরদের জুলুমের প্রতিবাদ করে লেখা হয়েছিল। তাঁর 'সধবার একাদশী'তে দেখানো হয়েছিল মদ্যপানের কুফল। গিরিশ ঘোষের 'বলিদানে' পণপ্রথার কুফল দেখানো হয়েছিল।

একটা শতাব্দী তো পার হয়ে গেল। এখনো কি একটা জাতির মর্যাদাসূচক থিয়েটারবাড়ী গড়ে তোলবার সময় আসেনি?

বাংলা রঙ্গমঞ্চের শতবার্ষিকী বলে যে উৎসবাদির আয়োজন করা হোল সেটা 'পাবলিক থিয়েটার'-এর শতবার্ষিকী হতে পারে হয়তো, কিন্তু রঙ্গমঞ্চের শতবার্ষিকী কিনা সে বিষয়ে অনেকেরই মনে গভীর সন্দেহ আছে। যদি টিকিট বিক্রি করে অভিনয় করার প্রথার কথা ধরা হয় তাহলে সেটা ১৮৭২-এর পূর্বেও হয়েছে বলে অনেকে বলেন। এবং বিগত চল্লিশের দশক থেকে আজ পর্যন্ত বহু নাট্যগোষ্ঠী টিকিট বিক্রি করে অভিনয় করে থাকেন। অর্থাৎ একশোর মধ্যে প্রায় তিরিশ বছর তথাকথিত 'পাবলিক থিয়েটার'-এর বাইরে অভিনয়াদি হচ্ছে। সুতরাং তাদের কাহিনীটাও খুব বড়ো করে আসা উচিত ছিল। এটাও তাঁরা বলেন।

আবার যদি নির্ধারিত গৃহে নিয়মিত দিনে টিকিট বিক্রি করে অভিনয় করার কথা ধরা হয় তাহলে কলকাতার কয়েকটি নাট্যগৃহের উৎসব মাত্র এটা। এও কিছু লোকের মত।

কিন্তু একটা দুঃখের কথা বর্তমান লেখকের মনে হয়। সেটা হোল যে, ঠিক হোক বা ভুল হোক এই 'উৎসব' আধুনিক নাট্য-প্রচেষ্টাকে সাহায্য করার মতো কিছু করলো না। কী করলে আজকের বিশিষ্ট নাট্যপ্রয়াস-গুলোর সাহায্য হবে, কী করলে আগামী দিনের নাট্যশিল্প আরো গভীর হবে, সে সম্পর্কে দেশের লোককে সচেতন করবার দায়িত্ব যেন কারোর নেই। তাই বর্তমান লেখকের আশঙ্কা হয় যে ব্যাপারটা কেবলমাত্র হুজুগেই পর্যবসিত হোলো না তো। এবং হুজুগে ব্যাপারটা যে সব সময়েই সিরিয়াস কাজকে ব্যাহত করে সেটা তো আমরা সকলেই জানি।

মাঝে মাঝে অবশ্য আমাদের মন্ত্রী-মহোদয়রা 'ন্যাশনাল থিয়েটার' করা হচ্ছে বলে এক-একটা রব তোলেন। সেই ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের আমল থেকেই এটা চলছে। কিন্তু বাংলায় 'জাতীয় থিয়েটার' হবে বলার মানে কী? তাহলে কি আসামে আর একটা

শম্ভু মিত্র

'জাতীয় থিয়েটার' হবে? বোম্বাইয়ে? মাদ্রাজে? —আর যদি এইসবগুলোই একটা ভারতব্যাপী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বসে ঠিক করতে হবে, কোনো একলা রাজ্যের পক্ষে করা সম্ভব নয়।—যাই হোক এ সম্পর্কে আমি অন্যত্র লিখেছি সুতরাং এখন তার মধ্যে যাবার প্রয়োজন নেই।

বরং ভাবা যাক যে কী করলে নাট্য-শিল্পকে সাহায্য করা যেতে পারে। একথা সত্যি যে আজকের ব্যবসায়িক রঙ্গমঞ্চগুলোর বাইরে যে প্রচুর নতুন ধরণের নাট্যাভিনয় হচ্ছে তার জন্যে বহু লোককে বহু প্রতি-কূলতার মধ্যে কাজ করে যেতে হয়েছে এবং হচ্ছে। সেই সমস্ত বিশিষ্ট শিল্পীদের কিভাবে সাহায্য করা যেতে পারে?

প্রথমত সকলেরই প্রায় মহলা দেবার উপযুক্ত জায়গার বড়ো অভাব। এবং তেমনিই অভাব নিজেদের মঞ্চোপকরণগুলো রাখবার গুদামের। ভালো করে মহলা দেবার জায়গা না থাকাতে প্রায় প্রত্যেক নাট্যগোষ্ঠীকেই মুশকিলে পড়তে হয়। তাতে প্রথম কয়েকটি অভিনয়ে অন্ততঃ নাট্যের উচ্চমান বজায় রাখা খুবই কঠিন। সুতরাং অন্ততঃ বিশিষ্ট কয়েকটি গোষ্ঠীকে মহলা দেবার জায়গা করে দিতে সরকার প্রথমেই চেষ্টা করতে পারেন। তারপর একটা বিশিষ্ট মান পর্যন্ত যাঁরা আসবেন তাঁদের সবাইকে।

এই জায়গাগুলো বিনাভাড়ায় দেবার কথা বলছি না কিন্তু ন্যায্য ভাড়ায় বা অল্প ভাড়ায় তো দেওয়া যায়। তেমনিই কিছু গ্যারেজ সদৃশ জায়গায় যেখানে মঞ্চসজ্জার উপকরণ ও পোষাক ইত্যাদি রাখা যাবে।—এগুলো করার ইচ্ছে থাকলে করা মোটেই কঠিন নয়। এখনই সরকারের হাতে যেসব জায়গা আছে তাতেই এটুকু গঠনমূলক কাজ করা যেতে পারে।

তাছাড়া, দিল্লীতে অনেকগুলো নাট্য-গোষ্ঠীকে জায়গা দেওয়া হয়েছে তাদের মনোমত মঞ্চ তৈরী করে নেবার জন্যে। তার ফলে দিল্লীতে প্রচুর কাজ সুরু হয়ে গেছে নাট্যাভিনয়ের। যেখানে কিছুই ছিল না সেখানে একটা নিয়মিত নাট্যাভিনয়ের রীতি গড়ে উঠছে। আর কলকাতায়, যেখানে এতো-দিনের একটা ঐতিহ্য রয়েছে সেখানে যেন সরকারের অনুজ্ঞা যে 'যে যেমন পারো খুঁটে খাও'। কেন? এখানে কি কয়েকটা প্রথম শ্রেণীর গোষ্ঠীকে এই ২৫ বছরের মধ্যে একটুকরো করে জমি দেওয়া যেত না? তাতে কি নাট্যশিল্পের উন্নতি হোত না?—কিন্তু কোনো সরকার এসব ব্যাপারে এতটুকুও চিন্তা করেননি। এমন কি এসব ব্যাপারে যে নাট্যসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কোনো আলোচনা করার দরকার আছে তাও তাঁরা মনে করেননি। এমন কি কলকাতা শহরে রবীন্দ্রসদন তৈরী করার সময়ে স্থানীয় নাট্যশিল্পীদের কারোর সঙ্গে আলোচনা করার দরকার বোধ হয়নি যে আধুনিক বাংলা নাট্যাভিনয়ের জন্যে কেমন ধরণের মঞ্চগৃহের দরকার। অথচ সেই সরকার বলছেন তাঁরা ন্যাশনাল থিয়েটার করে দেবেন।

এ এক অদ্ভুত অহঙ্কার, যখন রাজ-নৈতিক নেতারা ভাবেন যে তাঁরা ওপর থেকে

যেটা চাপিয়ে দেবেন সেইটাই একমাত্র ভালো। দেশের মানুষের কর্মৈষণাকে সাহায্য করলেই যে দেশগঠনের সবচেয়ে সাহায্য হয় এটা বোধহয় সরকারি দপ্তরের লোকেরা কেবলই ভুলে যান। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর সহস্র কাজের মধ্যেও দিল্লীতে নাট্যাভিনয় দেখতে যান। আমন্ত্রিত হয়ে নয়, নিজের থেকে। আমাদের এই ২৫ বছরের ইতিহাসে কজন মন্ত্রী বিনা নিমন্ত্রণে অভিনয় দেখতে গেছেন? আমি ব্যক্তিগতভাবে কেবল শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়কেই (মুখ্যমন্ত্রী অবস্থায়) একদিন দেখেছিলাম হঠাৎ অভিনয় দেখতে আসতে।

অর্থাৎ শিল্পসম্পর্কিত কাজকে সাহায্য করতে গেলে শিল্পীদের উৎসাহিত করতে হয়, ওপর থেকে কিছু একটা চাপিয়ে দিলেই কাজ হয় না। তার জাজ্বল্য প্রমাণ তো রবীন্দ্রসদনের ইতিহাসেই রয়েছে।

মানুষের কাজের ইচ্ছাকে যতো বাড়ানো যাবে ততোই কিন্তু ব্যুরোক্র্যাসীর খারাপ দিকটা কমবে, তার কাজের বোঝাও সহজ হবে। নইলে দেশগঠনের—বিশেষ কলা-শিল্পের উন্নতির—কাজ যদি ব্যুরোক্র্যাসীর মাধ্যমেই কেবলমাত্র করবার উদ্যোগ হয় তাহলে সে উদ্যোগ ব্যর্থ হতে বাধ্য।

তাই অনেক বড়ো করে মঞ্চকে সাহায্য করার আগে অনেক ছোট ছোট ক্ষেত্রেই একে সাহায্য করা সুরু হোক, এই আমার প্রার্থনা। তাতেই দেখা যাবে কাজটা ভালো করেই সুরু করা গেল।

বাঙলার সাধারণ মঞ্চ ও আমি

মন্মথ রায়

মেয়েটা হঠাৎ এমন ক্ষেপে গেল যে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আমাকে তরোয়াল দিয়ে আঘাত করতে লাগল।

কিন্তু কথা তা ছিল না। কথা হয়েছিল, আমাকে দেখেই মেয়েটা আমাকে আক্রমণ করবে বটে, কিন্তু কিছুটা যুদ্ধের পরই ও হেরে যাবে, পড়ে যাবে, মরে যাবে। সেসব না করে মেয়েটাই আমাকে মেরে-ধরে, সত্যি সত্যি ক্ষতবিক্ষত করে তরোয়াল হাতে ছুটে পালিয়ে গেল।

ঘটনাটা সত্যি, কিন্তু লড়াইটা এত সত্যি হওয়ার কথা ছিল না। কথা ছিল আমাকে দেখেই মেয়েটা বাঁশের তরোয়াল হাতে ছুটে এসে বলবে—'তবে রে পাপিষ্ঠ আকবর, তুই আমাদের দেশে এসেছিস, আজ তোকে আমি কেটে ফেলবো।' আমি আকবর তাতে বলবো—'তবে রে পাপিষ্ঠা দুর্গাবতী, আজ তোকে আমি বধ না করে যাচ্ছি না।' খুব লড়াই হবে, তবে সেটা হবে খেলার লড়াই। কথাই ছিল, কোন আঘাত গায়ে যেন কারও না লাগে। চারদিকে ঘুরেফিরে দুজনেই খুব তরোয়াল চালাবো এবং শেষ পর্যন্ত ঐ রানী দুর্গাবতীই আমি—আকবরের পায়ের তলে লুটিয়ে পড়বে। এবং যতক্ষণ লড়াই চলবে পাড়ার ছেলেগুলো কেউ মুখে আর কেউ টিন পিটিয়ে যুদ্ধের বাদ্য বাজিয়ে যাবে। হায়, সেসব তো কিছু হলই না, উপরন্তু দুর্গাবতীর বাঁশের তরোয়ালের খোঁচায় আকবর-আমার গা কেটে গেল কয়েক জায়গায়। এবং যার জন্য বাড়িতে মায়ের হাতে আর এক চোট মার খেতে হল আকবর-রূপী শিশু মন্মথ রায় আমাকে পঁয়ষট্টি বৎসর আগে আমাদের বালুরঘাট মহকুমা শহরের বাসভবনে। কিছুদিন আগেই বাড়ির পাশে কালীমন্দির প্রাঙ্গণে মথুর সাহার যাত্রাদল 'পদ্মিনী' পালা অভিনয় করে গেছেন। পাড়ার ছেলে-মেয়ে আমরা রাত জেগে বসে সেই পালা দেখেছি, আলাউদ্দিন খিলজি রাজপুতানার পদ্মিনীকে ধরে আনতে গেলে যে প্রচন্ড তরোয়াল-যুদ্ধ হয়েছিল তা আমরা দেখেছি, সেই যুদ্ধে প্রাণমন পাগল-করা যে বাদ্য বেজেছিল তা আমরা শুনেছি। যাত্রার দল পালাগান গেয়ে চলে গেলেও যে উন্মাদনা আমাদের মনে রেখে গিয়েছিল তারই ফলে বাঁশের তরোয়াল তৈরি করে কোমরে বেঁধে রেখেছি আমরা বহুদিন—সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে দেখা হলেই সেই তরোয়াল কোমর থেকে একটানে খুলে নিয়ে পরস্পরের প্রতি প্রথম সংলাপই ছিল—তবে রে পাপিষ্ঠ, আয়! এবং এতেও তৃপ্ত না হয়ে দুপাতার একটা নাটকই লিখে ফেললাম আমি। যার নাম দেওয়া হল 'রানী দুর্গাবতী'। যার যুদ্ধেই শুরু এবং অনেক আস্ফালন, অনেক পতন, অনেক উত্থানের পর যুদ্ধেই শেষ। হ্যাঁ, পঁয়ষট্টি বৎসর আগে লেখা 'রানী দুর্গাবতী'ই আমার প্রথম নাটক।

এতসব ব্যক্তিগত কথা লিখতে খানিকটা লজ্জা হচ্ছে, খানিকটা সংকোচও। কিন্তু উপায়ই বা কি—যখন পত্রিকা সম্পাদক স্বয়ং আমার ব্যক্তিগত কথা শুনতে চেয়েই আমার রচনার নাম নির্দেশ করেছেন 'বাঙলা সাধারণ মঞ্চ ও আমি'। ব্যক্তিগত কথা লেখা যেমন সহজ, তেমনি কঠিন। এ নিয়ে আর আলোচনা না করে সম্পাদকীয় আদেশ পালনে অগ্রসর হচ্ছি।

সাধারণ রঙ্গমঞ্চ বঙ্গভূমিতে একমাত্র কলকাতাতেই আছে। শুধু বঙ্গভূমি কেন আজ পর্যন্ত ভারতেও বোধহয় আর নেই। আমার শৈশব, বাল্য, কৈশোর এবং প্রথম যৌবন অতিবাহিত হয়েছে উত্তরবঙ্গের বালুরঘাট নামক ছোট শহরে। আমাদের আদি নিবাস ছিল মৈমনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল শহরের তিন মাইল উত্তরে 'গালা' গ্রামে। ম্যালেরিয়ার অত্যাচারে 'গালা' ছেড়ে আমার পিতা-পিতামহ যখন আমাকে নিয়ে চিরতরে বালুরঘাটে চলে আসেন, তখন আমার বয়স বছর ছয়েক। কিন্তু ঐ বয়সেই থিয়েটারের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটে গেছে। হ্যাঁ, ঐ 'গালা'তেই।

'গালা'তে আমাদের পুরোহিত বংশের শ্রীযুত সুরেন ঠাকুর কলকাতার শ্যামাদাস কবিরাজের ছাত্র ছিলেন। ছুটিতে গালাতে এসে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের অভিনয় করার জন্য মেতে উঠলেন। আমার কাকা ছিলেন তাঁর প্রাণের বন্ধু। ঠিক হল, অভিনয়-রাত্রে আমাকে শিশু ধ্রুব সাজানো হবে। প্রায় সত্তর বছর আগে 'গালা'র মত একটা ক্ষুদ্র গ্রামে বাঁশ আর তক্তা দিয়ে মঞ্চ বেঁধে থিয়েটার হতে যাচ্ছে, না যাত্রা নয়—একটা সম্পূর্ণ নতুন জিনিস 'থিয়েটার'। এতে গোটা অঞ্চলের লোক মেতে উঠলো। যেদিন থিয়েটার হবে সেদিন আমার ঠাকুর্মা বরদাসুন্দরী আমাকে কোলে নিয়ে বেঁকে বসলেন, আমাকে ধ্রুব সাজানো চলবে না। কে যেন তাঁকে বলেছে, ঐ থিয়েটারে ধ্রুব মানে আমাকে বলি দেওয়া হবে। পিতা দেবেন্দ্রগতি এবং পিতামহ গুরুগতি পিতামহীকে বোঝালেন, না-না এটা হতেই পারে না। কিন্তু তাতেও পিতামহী বরদাসুন্দরী আমাকে কোল থেকে নামালেন না। নামালেন তখন, যখন পিতৃব্য বীরেন্দ্রগতি মায়ের পা ছুঁয়ে শপথ করে বললেন, 'এরকম একটা কান্ড হতে পারে না এবং হবে না। এটা থিয়েটার, এতে সত্যি করে কেউ কাউকে মারে না, সবটাই লোক দেখানো হৈ-হৈ রৈ-রৈ খেলা মাত্র।' মঞ্চে ধ্রুববেশে সেই আমার প্রথম অবতরণ। কিন্তু অবতরণের পূর্বেই ঘুমিয়ে পড়ায় সেটা আমার জীবনে একটা কাহিনী হয়েই রয়েছে।

বালুরঘাট হাইস্কুলে আমি যখন ক্লাশ এইট কি নাইন-এ পড়ি তখন আমাদের হেডমাস্টার প্রত্নতাত্ত্বিক পন্ডিত শ্রদ্ধেয় নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ মহাশয় স্কুলের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন উপলক্ষে ছাত্রদের দিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকের অভিনয়ে আমাকে অমল-এর ভূমিকায় নামান। ঐ ভূমিকা তৈরী করার কালে আমি যেন সত্যি সত্যি 'অমল' হয়ে গিয়েছিলাম। কেবলই মনে হত, সেই রাজা কবে আসবেন, যাঁর চিঠিও এসে গেল। মা সরোজিনী দেবীকে জিজ্ঞাসা করে করে শেষে জেনে নিয়েছিলাম, সে রাজা নাকি ঈশ্বর। অমলের সেই বয়সেই রাজার ডাক এসেছিল। কিন্তু আজ এই চুয়াত্তর বৎসর বয়সেও আমার রাজার ডাক কেন আসছে না তাই ভাবি। সে যাক, ঐ অমল-এর ভূমিকায় আমার বেশ নাম হয়েছিল। কিন্তু সবচেয়ে বড় লাভ হয়েছিল, ঐ নাটকের মাধ্যমেই সর্বপ্রথম আমি জেনে নিতে পেরেছিলাম যে, এই জীবনই শেষ নয়—আর একটা জগৎ আছে—সেখানে জীবন-দেবতা রাজা বসে আছেন, তাঁর দিকেই এগিয়ে চলেছি, আর দূরত্বও ক্রমে ক্রমে দূর হচ্ছে।

বাল্যকালেই থিয়েটারের ঝোঁকটা এসে গেল। বালুরঘাটে তদানীন্তন যুবক এবং মধ্যবয়সীদের মধ্যে থিয়েটার প্রীতিটা

জোয়ালো হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। এ'দের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন দক্ষ অভিনেতা আশুতোষ ঘোষ, চিন্তাহরণ মুখার্জি, ক্যারিওনেট-বাদক মতিলাল মুখার্জি এবং সংগঠকরূপে একজন কন্ট্রাক্টর শশাঙ্কশেখর রায়। শশাঙ্কবাবু আবার ছিলেন তদানীন্তন এস-ডি-ও সুরেশচন্দ্র সেন-এর শ্যালক। অন্যান্য উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন উকিল রাধাচরণ ভট্টাচার্য, মোক্তার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উকিলের মুহুরী সুরেন্দ্রনাথ সেন। পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে ছিলেন ওখানকার শ্রেষ্ঠ উকিল নলিনীকান্ত অধিকারী, আমার পিতা দেবেন্দ্রনাথ রায় এবং অন্যান্য বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যাদের নাম আজ আর আমার মনে পড়ছে না। বালুরঘাটে একটা স্থায়ী নাট্যশালা গড়ে তোলবার জন্য এ'রা সবাই উঠে পড়ে লাগলেন। সরকারী হাসপাতালের উত্তর দিকে একখন্ড জমি এজন্য সংগৃহীত হল। খুব কাছেই ছিল একটা ই'টখোলা। সেখান থেকে ই'ট বয়ে এনে তা থিয়েটারের ভিতে ফেলার কাজে আমরা পাড়ার ছেলের দল মেতে উঠলাম। এবং আজ আমার এই বয়সেও পরম গর্ব যে, ওখানে পরে যে স্থায়ী নাট্যশালাটি গড়ে উঠলো তার ভিত-এ আমার বয়ে আনা ই'ট আর তার মেহনৎ আছে। এবং এটাও আমার পরম আনন্দ যে জনসাধারণের সম্পত্তি ঐ স্থায়ী নাট্যশালাটি, প্রথমে 'এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল ক্লাব' এবং দেশ স্বাধীন হবার পর 'নাট্যমন্দির' নামে আজও সগৌরবে বর্তমান। একসময় আমার বাবা এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ছিলেন বলে মনে পড়ছে, যদিও তিনি অভিনেতা ছিলেন না।

—আমার পরবর্তী জীবনে আমিও এর সম্পাদক ছিলাম বেশ কিছুদিন। নাটকে নাচগানের জন্য এবং ছোট-খাটো স্ত্রীভূমিকা করার জন্য পল্লী অঞ্চলের নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘর থেকে সামান্য কিছু হাত খরচ বা বেতন দিয়ে কার্যক্ষম কিছু ছেলে-ছোকরা সংগ্রহ করা হত। তাদের কারও কারও খাওয়া-পরার ভারও নিতেন থিয়েটারের উদ্যোগী পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে কেউ কেউ। আমাদের বাড়িতেও এমনি একটি ছেলে ছিল বেশ কিছুদিন। দেখতে ছিল সুঠাম, নাচ-গানও করত বেশ। নাম ছিল যোগেন। বয়সে আমার কিছুটা বড় হলেও তার উপর জন্মেছিল আমার গভীর অনুরাগ। আমি যখন যা খাই তাকেও তাই দেওয়া চাই-ই, এটা আমি চাইতাম—না দিলে আমি চুরি করে এনে তাকে তা খাওয়াতাম। আমার মায়ের চোখে এটা ভাল লাগছিল না। ছেলেটিকে বিদায় নিতে হয়েছিল।

এমনি সব টুকরো টুকরো কত কথাই না আজ মনে পড়ছে। ঐ বয়সেই থিয়েটারের সব নাটক লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তে সুরু করেছিলাম। পড়েছিলাম গিরিশ গ্রন্থাবলীর নাটকগুলি, রাজকৃষ্ণ রায়-এর নাটকগুলি, অমৃতলাল বোস-এর নাটকগুলি এবং হরিপদ চট্টোপাধ্যায়-এর যাত্রাপালাগুলি। এটা সম্ভব হয়েছিল আমার মা-এর জন্য। তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতা লিখতেন, যার একমাত্র পাঠক ছিলেন আমার বাবা। এবং শাড়ী-গয়নার আব্দার না করে বাবাকে দিয়ে কেনাতেন চলতি নাটক-নভেল-এর বই—অবসরকালে পড়বার জন্য। বাবার আপত্তি ছিল না, কারণ তাঁরও ছিল প্রবল সাহিত্যানুরাগ। কিন্তু বাবা-মা দুজনেই হঠাৎ ক্ষান্ত হয়ে গেলেন সেইদিন যেদিন দেখা গেল স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় আমি প্রথম স্থান অধিকার করলেও প্রত্যেক বিষয়ে আমি হয়েছি দ্বিতীয়। লুকিয়ে লুকিয়ে নাটক-নভেল পড়াই এর একমাত্র কারণ—যেই সেটা তাঁরা বুঝলেন, নাটক-নভেল মা-র বাক্সবন্দী হয়ে গেল। ১৯১৭ খৃঃ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় সকলের আশা ছিল স্কলারশিপ পাব, কিন্তু পেলাম না। পেল আমার এক প্রিয় বন্ধু প্রফুল্লকুমার দে, যে এতদিন সব পরীক্ষায় দ্বিতীয় হত। বাবা বললেন, এ যে হবে আমি জানতাম। পড়ার বই না পড়ে থিয়েটারের বই পড়লে এমনি যবনিকাই পড়বে।

রাজশাহী কলেজে আই-এ পড়ার সময় কলেজ-এর নাট্যাভিনয়ে সুদক্ষ ছাত্র অভিনেতা অশ্বিম বোস-এর পরিচালনায় গিরিশ ঘোষ-এর 'পান্ডব গৌরব' নাটকে দন্ডিরাজ-এর ভূমিকায় অভিনয় করে প্রশংসা পেলাম এবং নাটক-এর দিকে আর এক ধাপ এগিয়ে গেলাম। সাহসটা বেড়ে গেল। কলেজ-এর ছুটিতে বালুরঘাটে ভ্যাকেশন ক্লাব স্থাপন করে পর পর বছর দুই প্রফুল্ল নিয়োগী, অনিলশঙ্কর চৌধুরী, জিতেন চৌধুরী, তারকেশ্বর গুহ প্রভৃতি বন্ধুদের সহযোগিতায় অতুলানন্দ রায়-এর 'পাণিপথ' এবং ডি এল রায়-এর নূরজাহান' প্রভৃতি নাটকও ই-এস-ডি ক্লাব মঞ্চে অভিনয় করে আমরা নামও পেলাম—হাতও পাকালাম।

আমার নিজের কথা বলতে গেলে বলতে হয় শুধু যে হাতই পাকালাম তা নয় নাটক লেখার সলতে পাকানো সেই থেকেই যেন শুরু হল। ইতিমধ্যে রাজশাহী কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই-এ পাশ করে কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজে বি-এ ক্লাশে যখন ভর্তি হয়েছি তখন আমি নাট্যকারও হয়ে গেছি। বক্তিয়ার খিলজি কর্তৃক বঙ্গদেশ বিজয়ের ঐতিহাসিক কাহিনীকে ভিত্তি করে 'বঙ্গে মুসলমান' নামে একটি পঞ্চাঙ্ক নাটক লেখা শুরু করেছি। যতদূর মনে হচ্ছে, লিখে ফেলেছি। এবং ভক্ত কবিদের জীবনী নিয়ে, আর একটি পঞ্চমাঙ্ক নাটক লেখা শুরু করেছি। যতদূর মনে হচ্ছে খুব সম্ভবত ১৯২০ সালে 'বঙ্গে মুসলমান' নাটকটি আমাদের সেই ভেকেশান ক্লাব-এর প্রযোজনায় এবং আমার পরিচালনায় বালুরঘাটের ই-এস-ডি ক্লাব মঞ্চে অভিনীত হল। সেখানে যেমন আমার উত্তেজনা তেমনি উৎকণ্ঠা। বালুরঘাটে সাধারণত নাট্যাভিনয় হত রাত ৯টা থেকে ১০টার মধ্যে। পঞ্চাঙ্কনাটক অভিনয় হতে লাগতো চার থেকে পাঁচ ঘন্টা। আমার 'বঙ্গে মুসলমান'ও সুরু হল রাত দশটায়। পরদিন সূর্যোদয় হল কিন্তু আমার নাটক অস্ত গেল না। বলাবাহুল্য, সূর্য উঠতেই দর্শকরা একে একে যে যার ঘরে ফিরে গেল, নাটকের শেষটা আর কাউকে দেখা গেল না। বার-বার দৃশ্য পরিবর্তন করতে গিয়েই এই বিপত্তি ঘটলো। লোকের সঙ্গে দেখা হতেই মন্তব্য শুনতে লাগলাম, নাট্যকার বটে, সূর্য উঠিয়ে ছেড়েছে।

এই বিদ্রূপাত্মক মন্তব্যটি আমার নাট্য-জীবনে সত্য সত্যই সূর্যোদয় ঘটিয়েছে। 'বাংলা সাধারণ মঞ্চ ও আমি' প্রবন্ধের সূত্রপাত-ই বলা যায় ঐ ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য থেকে। সেটা পরে বলছি।

১৯২১ সালে ভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন শুরু হল। একমাত্র পুত্র-সন্তান হওয়ায় একদা সংসারের দায়-দায়িত্ব আমাকে বহন করতে হবে বলে বাবার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না যে অসহযোগ আন্দোলনের ফলে ঐ বৎসর আমি বি-এ পরীক্ষা বর্জন করি। বাবার অবাধ্য ছিলাম না কোনদিন। কিন্তু প্রথম দিন পরীক্ষা দিতে গিয়েই যখন দেখলাম সিনেট হাউস-এর সামনে অশ্বারোহী মিলিটারী সৈন্যরা মেয়ে-পিকেটারদের ওপর হামলা চালাচ্ছে, তখন বাবার নির্দেশ মান্য করা আমার পক্ষে আর সম্ভব হল না—পুঁথিপত্র ছুড়ে ফেলে দিয়ে 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়' ধ্বনি তুলে পিকেটারদের সামিল হয়ে অসহযোগ আন্দোলনে নেমে পড়লাম। মহাত্মাজীর প্রতিশ্রুত স্বরাজ আসবার কথা ছিল ঐ বৎসরই ৩১ ডিসেম্বর-এর মধ্যে। পূর্ণোদ্যমে 'ভারত সেবক সংঘ-এর' সভ্যরূপে দেশ-এর কাজে আত্মনিয়োগ করে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে লাগলাম।

কিন্তু ৩১ ডিসেম্বর-এর মধ্যে গান্ধীজীর প্রতিশ্রুত স্বরাজ এল না। উপায়ান্তর না দেখে সুভাষচন্দ্র প্রমুখ দেশনেতারা পরিচালিত 'গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন' থেকে উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম। বাবার নির্দেশে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এও পাশ করলাম ১৯২২ খৃঃ। এবং তার পরেই ভর্তি হয়ে গেলাম সদ্য-প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইকনমিকস নিয়ে এম-এ ক্লাশে। মানুষের জীবনটাই যে কতবড় নাটক হতে পারে জীবন দেবতার সেই খেলা দেখলাম এখানে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি জগন্নাথ হলের আবাসিক ছাত্র ছিলাম। আমাদের প্রোভোস্ট ছিলেন তৎকালীন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক এবং আইন-বিশারদ ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ ডি-এল নাট্যচর্চার চেয়ে ক্রীড়াচর্চাই তখন আমার নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঢাকা ইউনিভার্সিটি এ্যাথেলেটিক ক্লাব-এর সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছি আমি। ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন-এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকও হয়েছিলাম আমি। জগন্নাথ হল-এর ছাত্ররা থিয়েটার করবেন। প্রোভোস্ট ডক্টর সেনগুপ্ত বললেন, তোমরা একটা নিয়ম কর—ছাত্রদের নিজে-

দের লেখা নাটক তোমরা করবে। যারা লিখতে পারো, তারা চেষ্টা করো। প্রলোভন ত্যাগ করতে পারলাম না আমি। কিন্তু না, এবার আর বড় নাটক না। সূর্য ওঠে কিন্তু নাটক শেষ হয় না, এমন নাটক তো নিশ্চয় না। আর বিশেষ করে ঐ দৃশ্য বদলের হাঙ্গামা এবার কখনই নয়। দিন সাতেক-এর মধ্যেই লিখে ফেললাম এমনই একটা নাটক—একটি মাত্র দৃশ্যে সম্পূর্ণ মাত্র দেড় ঘন্টায় অভিনয়যোগ্য একখানি একাঙ্ক নাটক। বৌদ্ধযুগের পটভূমিকায় লিখিত ক্ষুদ্র নাটকটি পড়ে ভারী খুশী হলেন আমার সতীর্থ বন্ধু পরিমল রায় (যিনি পরে পশ্চিমবঙ্গের ডি পি আই হয়েছিলেন) এবং ক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী (যিনি পরে পশ্চিমবঙ্গের এ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল হয়েছিলেন)। এঁরা যখন প্রোভোস্টে ডক্টর সেনগুপ্তকে জানালেন যে, আমি একটা 'সুন্দর' নাটক লিখেছি ডক্টর সেনগুপ্ত তখন পরিহাস করে বলেছিলেন 'ফুটবল-এর নাটক নাকি, ওতো আমাদের এ্যাথলেটিক সেক্রেটারী। দিও তো, পড়ে দেখবো।"

পড়লেন তিনি, আমায় ডেকে বললেন, 'আমাকে চমকে দিয়েছো তুমি। অপূর্ব নাটক হয়েছে এটা কিন্তু এ নাটকে তো ছাত্রদের চলবে না। মাত্র গোটা সাতেক চরিত্র, ছাত্রদের নাটকে চাই অন্ততঃ গোটা কুড়ি পঁচিশ চরিত্র। সবাই পার্ট করতে চায় যে। এ নাটক থাক। তুমি মন খারাপ কোরো না। আমি কলকাতায় যাচ্ছি, দেখি —এই নাটকটা ভারতবর্ষ পত্রিকায় ছেপে দিতে পারি কিনা।"

বেশ কিছুটা উৎসাহ পেলাম। এর পরই চলে আসি বালুরঘাটে। ঐ ১৯২৩ সালেরই ৬ নভেম্বর থেকে ১১ নভেম্বরের মধ্যে লিখে ফেললাম আর একখানি একাঙ্ক নাটক। একটি দৃশ্যে এক একটি অঙ্ক। নাম দিলাম 'দেবদাসী'। কবি কহলন প্রণীত 'রাজতরঙ্গিণী' অবলম্বনে কাশ্মীরের যুবরাজ জয়াপীড়-এর সঙ্গে পৌণ্ড্রবর্ধনের দেবদাসী কমলার প্রণয় রোমাঞ্চ ভিত্তিক একটি কাহিনী। ঢাকায় ফিরে গিয়ে এ নাটকটি যখন নাট্য কর্তৃপক্ষকে দেখালাম তখন তাঁরা পূর্বকল্পিত চন্দ্রশেখর-এর নাট্যরূপ অভিনয় করবার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকলেও জগন্নাথ হলেরই ছাত্র রচিত নাটক বলে সেই সঙ্গে আমার দেবদাসীও অভিনয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। ১৯২৩ সালের ২১ ডিসেম্বর এবং ২২ ডিসেম্বর জগন্নাথ হল ড্রামাটিক আসোসিয়েশন দেবদাসী এবং চন্দ্রশেখর অভিনয় করল। দেবদাসীতে আমি নিয়েছিলাম বিনয়াদিত্যের ভূমিকা।*

অভিনয়কালে হঠাৎ আমরা খবর পেলাম, প্রোভোস্ট ডকটর সেনগুপ্ত সেইদিনই কলকাতা থেকে ঢাকা ফিরেছেন এবং আমাদের নাটক দেখতেও এসেছেন। শুনে আমার বুক দুরু দুরু করে কাঁপতে লাগলো। প্রথম অঙ্কের নির্গমের পরেই দেখতে পেলাম গ্রীণরুমে এসে ঢুকেছেন ডকটর সেনগুপ্ত। আমাকে দেখেই তিনি বললেন—'নাহে, হোল না। ভারতবর্ষে তোমার নাটকটা ছাপা গেল না। তুমি মুষড়ে পড়লে যে। আমি তোমাকে ভাল খবরই দিচ্ছি।' আমি বোকার মত ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

'হ্যাঁ, ভাল খবর ছাড়া কি, তোমার নাটকটা আসছে বড়দিনে কলকাতার ষ্টার থিয়েটার প্লে করছে। আর, সেইজন্যই নাটকটা ভারতবর্ষে ছাপা গেল না।'—আমার পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে ডকটর সেনগুপ্ত যখন আমাকে এই কথাগুলো বলছিলেন, তখন তাঁর কথা বিশ্বাস করতেই বাধছিল—এত অপ্রত্যাশিত সুখবর ছিল এটা। 'তুমি কাল সকালে আমার বাড়িতে এস, ষ্টার থিয়েটার কর্তৃপক্ষকে একটা অনুমতিপত্র কালই পাঠিয়ে দিতে হবে তোমাকে'—বলে, তিনি নাটক দেখতে চলে গেলেন।

পরের দিন ভোরে যেন সূর্য আর উঠতেই চায় না, অথচ যেদিন 'বঙ্গে মুসলমান' আমরা অভিনয় করেছিলাম, সেদিন এত ভোরে সূর্য উঠে গেল যে, নাটক আর শেষ হল না।

ডকটর সেনগুপ্ত-এর কাছে গিয়ে ঘটনাটা যা শুনলাম সেটা লিখছি, ভারতবর্ষ পত্রিকার কর্তা হচ্ছেন হরিদাস চট্টোপাধ্যায়। তিনি আবার ষ্টার থিয়েটার-এর তদানীন্তন পরিচালক আর্ট থিয়েটার লিমিটেড-এর অন্যতম ডিরেকটার। তিনি আমার ঐ—

—নাটকটি ডকটর সেনগুপ্ত-এর কাছ থেকে পেয়ে নিজেই পড়েছেন এবং তাঁর কাছে নাটকটা সব দিক দিয়েই অভিনব মনে হয়েছে। বড়দিনের আসরে তিনি তাঁদের বিজয় বৈজয়ন্তী কর্ণার্জুনের সঙ্গে আমার ঐ নাটকও মঞ্চস্থ করবার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। সেইজন্যই নাটকটা এখন ভারতবর্ষে প্রকাশ করা হবে না সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেনগুপ্তকে তিনি অনুরোধ করেছেন নাট্যকার-এর অনুমতিক্রমে যেন অবিলম্বে তাঁকে পাঠানো হয়। নাটকটির আমার দেওয়া নাম ছিল 'অম্বা', তাঁরা নামকরণ করেছেন 'মুক্তির ডাক'। ডকটর সেনগুপ্ত-এর খসড়া অনুযায়ী আমি অনুমতিপত্র লিখে সই করে তাঁর হাতে দিলাম। তিনি পত্রটি সেইদিনকার ডাক-এই কলকাতায় যথাস্থানে পাঠিয়ে দিলেন।

১৯২৩ সালের বড়দিনে মহাসমারোহে 'মুক্তির ডাক'-এর শুভ উদ্বোধন হল। বলাই বাহুল্য, উদ্বোধন উৎসবে আমি উপস্থিত ছিলাম। ষ্টার থিয়েটার-এর ডিরেক্টার হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ম্যানেজার প্রবোধচন্দ্র গুহ এবং 'মুক্তির ডাক-এর পরিচালক অহীন্দ্র চৌধুরী ২০ বৎসর বয়স্ক এই নাট্যকারটিকে দেখে কিছুটা বাৎসল্যরসে স্নেহপরায়ণ হয়ে উঠলেন। বাংলা সাধারণ মঞ্চ-এর সঙ্গে আমি এই সর্বপ্রথম সংযুক্ত হলাম। দীর্ঘ নাটক লিখে যে সূর্যোদয়-এর সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম, সে সূর্য আমায় করেছিল ব্যঙ্গ। সেই ব্যঙ্গের ভয়ে এবার লিখলাম ক্ষুদ্র নাটক। এতেও হল সূর্যোদয়, হল আমার ভাগ্যের আকাশে। সেদিন সেটা বুঝিনি, বুঝেছিলাম পরে। যখন 'মুক্তির ডাক' নাট্য ইতিহাসে বাংলা একাঙ্ক নাটক-এর প্রবর্তকরূপে সম্মানিত হল'

'মুক্তির ডাক' ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হল বটে কিন্তু জনপ্রিয় হল না। তদানীন্তন কালে অন্যতম শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী কৃষ্ণভামিনী প্রধান ভূমিকা 'অম্বার' ভূমিকায় অবতরণ করেছিলেন, পার্শ্বচরিত্রগুলিতেও সুদক্ষ নট-নটীর সম্মেলন ছিল। নবাগত নাট্যপ্রদীপ অহীন্দ্র চৌধুরীর পরিচালনা প্রতিভাদীপ্তও ছিল কিন্তু মুক্তির ডাক জনপ্রিয় হল না। নাটকটি নাকি অশ্লীলতা দোষদুষ্ট এরূপ অপবাদও শোনা গেল। যদিও এই অপবাদের প্রতিবাদ করেছিলেন তৎকালে সাহিত্যের স্বাস্থ্য পরিদর্শকরূপে আখ্যাত প্রবীণ সমালোচক সাহিত্যিক রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর। তিনি আমাকে এক পত্র লিখেও জানিয়েছিলেন : 'আপনার এই প্রথম উদ্যম সফল হইয়াছে। ......আপনার গ্রন্থরচনা সার্থক হইয়াছে।' তৎকালীন বহুল প্রচারিত নাট্য পত্রিকা 'শিশির'—বঙ্গাব্দ ১৩৩০।১৩ পৌষ শনিবার সংখ্যায় লিখলেন :—

'ছোট একখানি ছবির মত বই! এক দৃশ্যে সম্পূর্ণ। ভারতবর্ষে বৌদ্ধ-প্রভাব যখন অপ্রতিহত বেগে প্রবাহিত

* পাদটীকা—দেবদাসী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি। পাণ্ডুলিপি বর্তমান।

হইয়াছিল, আপামরসাধারণ ভগবান বুদ্ধের শরণ লইয়া মুক্তিমার্গের সন্ধানে ছুটিয়াছিল—আখ্যায়িকাটি সেই সময়কার। একটা কুহেলিকাবৃতে শ্রান্তির পথে চলিতে চলিতে যেদিন নাটিকার চারিটি নায়ক নায়িকা হঠাৎ যখন মেঘমুক্ত সূর্যের রূপ দেখিতে পাইল, তখন তাহাদের জীবনের গতি এক ভীষণ অভিশাপ তরঙ্গে নিমজ্জিত হইয়া গেল। তখন বুদ্ধের মুক্তিমন্ত্র গ্রহণ করা ছাড়া আর কাহারই কোন উপায় রহিল না। শেষ পর্যন্ত দর্শককে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে এই নাটিকাখানি।"

নাটকটি জনপ্রিয় হচ্ছে না আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরে খানিকটা অবাকই হলাম। কারণ, নাটকটি দেখতে ঢাকা থেকে কলকাতার এলো' ন্যাটকের শুভ উদ্বোধন-এর পূর্বে অতবড় ঔপন্যাসিক ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত-এর কাছ থেকে যে শুভেচ্ছাবাণী পেয়েছিলাম তাতে তিনিও লিখেছিলেন :—

'মুক্তির ডাক' বাংলার নাট্য-সাহিত্যে একটা নূতন পথ ধরিয়াছে তাহা সবাই স্বীকার করিবে। অত ছোট একাঙ্ক একখানা নাটকের ভিতর ঘটনা ও বাক্যের সমাবেশ দ্বারা তুমি চরিত্রগুলি এমন সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছ যে, ইহাতে অনেক পাকা পুরাতন সাহিত্যিক রীতিমত হিংসা করিতে পারেন। গল্প গাঁথিবার ক্ষমতা তুমি ভালোরূপেই দেখাইয়াছ।"

তবু দেখা গেল নাটকটা দর্শকরা নিচ্ছেন না। অভিনয় চমৎকার, সাজসজ্জা নিখুঁত, শুধু দর্শকদের সাড়া মিলছে না। অধিকাংশ দর্শকই বলছেন, এ আবার কি নাটক এল—আর গেল!' স্পষ্ট বোঝা গেল, চার-পাঁচ ঘণ্টার নাটক দেখতে অভ্যস্ত দর্শকরা মাত্র দেড় ঘণ্টার এই নাটকটিতে আকৃষ্ট হতে পারছেন না। ঘটনার স্রোত এত দ্রুত যে, দর্শকরা যেন তাল সামলাতে পারছেন না। ম্যানেজার প্রবোধ গুহ মহাশয় হরিদাস বাবুকে বললেন—এ যুগের নাটক এটা নয়।' কিছুকাল পর নাটকটিকে ষ্টার মঞ্চ থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হল।

শ্রদ্ধেয় হরিদাসবাবুর যেন মনে হল, এটা তাঁরই পরাজয়। মুখ-চোখ দেখে মনে হল, তিনি মনে বেশ ব্যথা পেয়েছেন। আমার তো কথাই নেই। হরিদাসবাবু আমাকে বললেন—'বইটা আমি ছেপে দিচ্ছি। পাঠকরা কি বলে দেখা যাক। আপনি একখানা পঞ্চাঙ্ক নাটক লিখুন তো। আমি দেখছি চলে কিনা।'

এই সহানুভূতি, এই মহানুভবতা যে কোন যুগে, যে কোন দেশে বিরল। মুক্তির ডাক শীঘ্রই গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স প্রকাশ করলেন। ছোট্ট একখানি বই, দাম মাত্র ছয় আনা।—আমার প্রথম মুদ্রিত নাটক—

আমার নাট্যজীবনের প্রথম স্মরণীয় স্তম্ভ। হরিদাসবাবু বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বইটি সমালোচনার জন্য পাঠিয়েছিলেন। ফল হল যেমন অভাবনীয়, তেমনই বিস্ময়কর। বঙ্গাব্দ ১৩৩১ সালে আষাঢ় সংখ্যায় বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা 'প্রবর্তক' লিখলেন:—মুক্তির ডাক নাটকখানি ক্ষুদ্র হইলেও প্রথম শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। পড়িতে পড়িতে মেটারলিঙ্কের 'মনাভিনা'র কথা মনে পড়িয়া যায়। নাটকখানি ঠিক সেইরূপই। নাটকখানিতে পাকা হাতের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেছে।'

কিন্তু সব চেয়ে যা আমাকে তখন অভিভূত করেছিল, শুধু তখনই বা কেন আমার সারাটি জীবন অভিভূত করে রেখেছে তা হচ্ছে একখানি ছোট চিঠি। লিখেছিলেন তৎকালীন বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য সমালোচক, বাংলা সাহিত্যে স্বনামধন্য বীরবল এবং 'সবুজপত্র' সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী। এবং এ চিঠি তিনি লিখেছিলেন সম্পূর্ণ অখ্যাত অজ্ঞাত আমাকে প্রকাশক গুরুদাস চ্যাটার্জি এ্যান্ড সন্স-এর ঠিকানায় :—

২০, মে ফেয়ার
বালীগঞ্জ, ১৩-৭-২৪

সবিনয় নিবেদন,

আপনি শুনে খুসি হবেন যে, 'মুক্তির ডাক' আমার খুব ভাল লেগেছে। আপনার নাটকখানির মহাগুণ এই যে এখানি যথার্থই একখানি ড্রামা। বাংলা সাহিত্যে ও জিনিষ একান্ত দুর্লভ। নাটককে আমরা দৃশ্যকাব্য বলি। কিন্তু যা যথার্থ নাটক তা শুধু দেখবার বস্তু নয় পড়বারও জিনিষ। সত্য কথা বলতে গেলে পৃথিবীর অধিকাংশ নাটক আমরা পড়বার বই হিসেবেই জানি, অ্যাকটিং পিস হিসেবে জানিনে। আমরা চোখে না দেখলেও মানসচক্ষে সে সব নাটকের অভিনয় দেখতে পাই। 'মুক্তির ডাকের' অভিনয়ও আমি মানসচক্ষে দেখেছি এবং তাই দেখেই বলছি যে 'মুক্তির ডাক' একখানি যথার্থ ড্রামা।

বাংলা সাহিত্যে নাটক এক রকম নেই বল্লেই হয়। আশাকরি আপনি আমাদের সাহিত্যের এ অভাব পূর্ণ করবেন। ইতি
শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

শ্রদ্ধেয় প্রমথ চৌধুরীর এই পত্রখানি শুধু আমার মনেই যে একটি প্রত্যয় সৃষ্টি করেছিল তা নয়, পুত্র সম্পর্কে আমার বাবার মনেও এনে দিয়েছিল পরম প্রতীতি। পুত্রের নাট্যচর্চার জন্য যে পিতা এতদিন ছিলেন বিরক্ত, তিনি এখন হলেন গর্বিত। এবং এ গর্ববোধের কারণও ছিল। তিনি ছিলেন সবুজপত্র-এর একজন গ্রাহক। এবং তারই সম্পাদক-এর এই চিঠি : চিঠিটা পড়ে আমাকে ডেকে বলেছিলেন—'তা-না-হ্যাঁ, তুমি লিখে যাও।'

তা লিখতে লাগলাম। জগন্নাথ হল থেকে প্রকাশিত ছাত্রদের বার্ষিক সাহিত্য-পত্রিকা 'বাসন্তিকা'। বঙ্গাব্দ ১৩৩২ সালের সংখ্যাটিতে প্রকাশিত হল আমার একাঙ্ক নাটক 'শেমিরেসিশ'। এরও একটি দৃশ্যে এক একটি অঙ্ক। ইতিহাসের আদ-যুগে রাণী শেমিরেসিস্ ভারত আক্রমণ করেছিলেন এই এক অস্পষ্ট ঐতিহাসিক কাহিনীকে কল্পনার রং-এ রাঙিয়ে নাটকটা লিখি। এখন মনে হয় লেখকের প্রথম যৌবন যে রোমাণ্টিক রসে সাধারণতঃ আচ্ছন্ন থাকে এটা ছিল সেই উচ্ছ্বাস। কিন্তু এই নাটকটাও আমার কাছে আর এক অচিন্তনীয়, অপ্রত্যাশিত সম্পদ হয়েছিল। যা আজও আমার নাট্যজীবনে অক্ষয় স্তম্ভ হয়ে রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৪ সালে এম-এ এবং ১৯২৫ সালে বি-এল পাশ করে ১৯২৬ সাল থেকে বালুরঘাট মহকুমা সহরে আমার বাবার বাসনা পূর্ণ করে ওকালতি পেশা নিয়েছি। যদিও নাটক লেখাটাই তখনও দারুণ নেশা হয়ে রয়েছে। হরিদাসবাবু আমাকে একটি পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক লিখে তাঁকে দিতে বলেছিলেন একথা সর্বদা স্মরণে রয়েছে, কিন্তু পঞ্চাঙ্ক নাটকের বিশাল দৈর্ঘ্য সম্পর্কে আমি তখনও ভীত এবং ত্রস্ত। কলকাতায় তদানীন্তন সাধারণ নাট্যশালায় যে সকল পঞ্চাঙ্ক নাটক আমি দেখেছিলাম তার মধ্যে ষ্টার থিয়েটারে অপরেশচন্দ্রের 'কর্ণার্জুন' এবং নাট্যমন্দিরে যোগেশ চৌধুরীর 'সীতা' আমাকে অভিভূত করেছিল সত্য কিন্তু ঐ নাট্যসৃষ্টির প্রধান চমক ছিল ষ্টার-এর অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস এবং নাট্যমন্দিরে শিশিরকুমার প্রমুখ নবাগত নাট্য শিল্পীদের অভিনয়ের নবনাট্য রীতির সমৃদ্ধি। সাহিত্যরস কিন্তু এই নবনাট্য সৃষ্টিতে কিছুটা উপেক্ষিত আমার মনে হয়েছিল।

তদানীন্তন বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে সাহিত্যরস সমৃদ্ধ নাট্য রচনা সাধনায় একাঙ্ক নাটকই আমার কাছে বরণীয় মনে হওয়ায় হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের সস্নেহ আহ্বান সত্ত্বেও আমি বঙ্গাব্দ ১৩৩২ থেকে বঙ্গাব্দ ১৩৩৪ সাল পর্যন্ত পুরো তিনটি বৎসর একাঙ্ক নাটক রচনার সাধনা করি, এবং তার ফলে তদানীন্তন বাসন্তিকা সবুজপত্র, ভারতবর্ষ, কল্লোল এবং বিচিত্রা প্রমুখ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যপত্রিকাগুলিতে আমার যে একাঙ্ক নাটকগুলি প্রকাশিত হয় তার মধ্যে ইলা (বাসন্তিকা। ১৩৩১) রাজপুরী (ভারতবর্ষ। ১৩৩২) মাধুরী (সবুজপত্র। ১৩৩২) যজ্ঞফল (সবুজপত্র। ১৩৩২) কালরাত্রি (ভারতবর্ষ। ১৩৩২), লক্ষহীরা (ভারতবর্ষ। ১৩৩৩) অরূপ-রতন (ভারতবর্ষ। ১৩৩৩), অজগরমণি, কল্লোল। ১৩৩৩) স্মৃতির ছায়া (বাসন্তিকা। ১৩৩৩) কাজলরেখা (শিশুসাথী। বার্ষিকী ১৩৩৩), বিদ্যুৎপর্ণা (ভারতবর্ষ। ১৩৩৪), চরকা (কল্লোল। ১৩৩৪) উইল (ভারতবর্ষ। ১৩৩৪) হ্যারিকেন (বিচিত্রা। ১৩৩৪) বহুরূপী (ভারতবর্ষ। ১৩৩৪) ভারতী (ভারতবর্ষ। ১৩৩৪) সাহিত্য সমাজে উচ্চ-প্রশংসিত এবং সমাদৃত হয়। এই সময় বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সম্পাদকদের কাছে

থেকে ঐরূপ নাট্য রচনার জন্য আমার কাছে তাগিদপত্র আসতে থাকায় তার প্রমাণ মেলে।

আমার 'সেমিরেমিস' নাটক-এর কথায় ফিরে যাচ্ছি। তখন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম দেশ এবং জাতির চিত্ত জয় করে ফেলেছেন। তাঁর নাম তখন বাঙালীর ঘরে ঘরে প্রীতি এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত। ৪।৭।২৭ তারিখে লেখা তাঁর একখানি চিঠি পেয়ে আমি ধন্য হয়ে গেলাম। এ চিঠিখানি তার বহু জীবনী-গ্রন্থে আদ্যোপান্ত প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র একখানি চিঠি কোন একজন লেখককে কি পরিমাণ উৎসাহিত এবং প্রেরণা যোগাতে পারে যা আজ আমার এই চুয়াত্তর বৎসর বয়স পর্যন্ত অক্ষয় হয়ে রয়েছে তা বোঝাতে হলে সেই পত্র থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা মার্জনীয় হবে বলে মনে করি:—

'নন্দ চৌধুরী লেনের সেই সুশ্রী ছিপছিপে তরুণের চোখে অপ্রকাশ প্রতিভার যে আয়োজন দেখেছিলাম—তার পরিপূর্ণ বিকাশের সমারোহ আজ আমাকে শুধু বিস্মিত করে নি—পূজারী করে তুলেছে। একবুক কাদা ভেঙে পথ চলে এক দীঘি পদ্ম দেখলে দু'চোখে আনন্দ যেমন ধরে না তেমনি আনন্দ দু'চোখ পুরে পান করেছি আপনার লেখায়—এ বললে আপনি কী মনে করবেন জানি নে, তবে আমার প্রাণের আনন্দ এর চেয়ে ভালো করে প্রকাশ করার শক্তি আমার নেই বলে লজ্জা অনুভব করছি। ......পবিত্রের (সাহিত্য সারথি পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়) মারফৎ আপনার প্রথম লেখা পড়ি—মুক্তির ডাক। পড়ে, আমার কেমন লাগে পবিত্র লিখতে বলেছিল। ইচ্ছে করেই লিখিনি। সূর্যকে অভিবাদন করতে পারি—কিন্তু তাকে উজ্জ্বলতর করে দেখানোর মতো আলো ও অভিমান আমার নেই। আজো আপনার শক্তিকে অন্তর দিয়ে নমস্কার জানাচ্ছি মাত্র, তার প্রশংসা করিনি। আপনাকে প্রশংসা করার শক্তি আমার নেই।........ সেমিরেমিস পড়ে কী যে আনন্দ পেয়েছি তা বলে উঠতে পারছিনে। যতবার পড়ি

ততবারই নতুন মনে হয়। আজ ইওরোপে জন্মালে আপনার প্রশংসায় দশদিক মুখরিত হয়ে উঠতো। এ ঈর্ষার—এবং ততোধিক ঈর্ষাতুর সাহিত্যিকের দেশে আপনার যোগ্য আদর হয়নি দেখে বিস্মিত হইনি একটুও। দুঃখিত বড়ই হই।

'লীলা'ও আমার বুকে কম দোলা দেয়নি—কিন্তু 'সেমিরেমিসে' আমি যেন তলিয়ে গেছি। এত বড় সৃষ্টি! দৃশ্যমাহাত্ম্যের দিক থেকে বলছিনে—এর সৃষ্টির সার্থকতার ও পরিপূর্ণতার দিক দিয়ে বলছি—আমায় আর কারুর কোনো লেখা এত বিচলিত করেনি।*

এই সময়ে আমার পরম শুভানুধ্যায়ী হরিদাস চট্টোপাধ্যায় একখানি পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক লেখার জন্য আবার তাগিদ দিলেন। তাঁদের আর্ট থিয়েটার লিমিটেড তখন মনোমোহন থিয়েটার-এরও কর্তৃত্ব অর্জন করেছে। ঐ মনোমোহন থিয়েটারেই আমার নাটকটি প্রদর্শন তাঁর ইচ্ছা। বালুরঘাটে ওকালতি কাজে তখন আমি বেশ জড়িয়ে পড়েছি। তবু একটা পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক লিখতে উদ্যোগী হলাম।

এতকাল আমাদের পৌরাণিক নাটকে ভক্তিরসের আধিক্য এবং প্রাবল্য দেখা গেছে। সুরটা বদলাতে ইচ্ছা হল। লৌকিক পুরাণ মনসামঙ্গল থেকে চাঁদসদাগর ও বেহুলার আখ্যানটি বেছে নিয়ে চাঁদসদাগরকে একটি বিদ্রোহী বাঙালীরূপে চিত্রিত করার সাধনা চলল। নাটকটির কাঠামো তৈরি করে চলে এলাম কোলকাতায়। উঠলাম আমার দাদা-মহাশয় ঐতিহাসিকপ্রবর পূজ্যপাদ রাম-প্রাণ গুপ্তের স্নেহনীড়ে। তিনি লোক-সাহিত্যেও ছিলেন পরম পণ্ডিত। বাঙালীর ব্রতকথা নামক একটি গ্রন্থের লেখকও ছিলেন তিনি। মনসাপূজার রীতিনীতি তাঁর কাছেই পাওয়া গেল। এক মাসের কম সময়েই নাটকটি লিখিত হয়ে ১৯২৭ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর বুধবার মহাসমারোহে মনোমোহন মঞ্চে মুক্তিলাভ করল। চাঁদসদাগরের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী এবং বেহুলার ভূমিকায় সুশীলা নাটকটিকে প্রথম রাত্রেই এমন অপরিসীম জনপ্রিয়তায় অভিষিক্ত করেছিলেন যাতে নাট্যকাররূপে আমার ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠা অনেকটা অবধারিত হয়ে গেল. হ্যাঁ এইকথা বলেই যে লোকটি এতে সবচেয়ে সুখী হয়েছিলেন, নাট্য-ভবিষ্যৎদ্রষ্টা সেই হরিদাস চট্টোপাধ্যায় আমাকে অভিনন্দন জানালেন। চাঁদসদাগর-এর ভূমিকায় নাট্যপ্রদীপ অহীন্দ্র চৌধুরীর অপরূপ অভিনয় এবং অতুলনীয় রূপসজ্জা নাটকটিকে যেমন দিল এক অপূর্ব মর্যাদা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সমালোচনা এক তরুণ নাট্যকার-এর পঞ্চাঙ্ক নাটক প্রণয়নের এই প্রথম প্রয়াসকে তেমনি দিল অকুণ্ঠ প্রশস্তি। নিম্নে উদ্ধৃত সমালোচনাগুলি অনুধাবন করলেই দেখা যাবে যে ঐ সময় নাট্য-জগতে একটা নূতনত্বের চাহিদা জোরালো হয়েছিল। নাট্য গবেষকদের কাছে এই কয়েকটি উদ্ধৃতি প্রয়োজনীয় হতে পারে:

'নাচঘর'—৬ই আশ্বিন, ১৩৩৪......'নাটকখানি শুধু 'মনোমোহনে'ই নতুন নয়, নাট্যসাহিত্যেও নতুন। পঞ্চাঙ্ক নাটক রচনায় তাঁর এই প্রথম চেষ্টাই এতটা জয়যুক্ত ও সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে, দেখে আশা হচ্ছে যে, বাঙলা দেশে অন্ততঃ একজন এমন নাট্যকার জন্মেছেন, যিনি ভবিষ্যতের রঙ্গমঞ্চকে কু-নাটক অভিনয়ের দায় হতে রক্ষা করতে পারবেন।'

'কল্লোল'—অগ্রহায়ণ ১৩৩৪—বাঙলার নাট্য-সাহিত্যের অত্যন্ত দৈন্য।...নাট্যসাহিত্যে নতুন প্রতিভার অত্যন্ত প্রয়োজন। সে প্রতিভা শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়-এর কাছে আশা করা যেতে পারে। তাঁর কলমের কাজ শুধু সূক্ষ্ম নয়, জোরালো ও রঙদার।...নাটকটিতে শক্তির ছাপ আছে। ভবিষ্যতে তাঁর হাত থেকে অনেক কিছু আশা করা যায়।'

'আত্মশক্তি'—৪ঠা কার্তিক, ১৩৩৪—'নাটকখানি আমাদের ভালো লেগেছে নাট্যকারের চরিত্রাঙ্কন ও ঘটনা-সংস্থাপনের প্রশংসনীয় দক্ষতায়। আর আমাদের মুগ্ধ করেছে তাঁর সৃষ্ট বেহুলার চারু চিত্রটি। পুরাণোল্লিখিত চরিত্রের ওপর কল্পনার তুলিতে তিনি যে রঙ ফলিয়েছেন, তা বাস্তবিকই অনিন্দনীয়।'

'আনন্দবাজার পত্রিকা'—২৬।৯।২৭—কি ভাষার দিক দিয়া, কি চরিত্রাঙ্কনে প্রকৃত শিল্পীর রসবোধের বহু পরিচয় তিনি দিয়াছেন। বাঙলার প্রাণের বেদনা-করুণা ও অশ্রুমাখা অতীত স্মৃতি এই 'চাঁদসদাগর' শত শত দর্শককে পরিতৃপ্ত করিবে সন্দেহ নাই।'

"The Bengalee' in its issue of October 18th, 1917:—"Once in a while a play is produced which theatre-goers love to witness over and over again, which leaves the beaten track and carves out a path of its own, which is hailed as something out of the ordinary,—such a play is undoubtedly Mr. Mannatha Ray's "CHANDSADAGAR'.

যাক, সাধারণ নাট্যশালায় নাট্যকাররূপে, এমনি করেই আমার জীবনদেবতা আমাকে চিহ্নিত করে দিলেন। আর তা যখন দিলেন তখন এ উপলব্ধিও আমার এল সাধারণ নাট্যশালার ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হতে হবে আমাকে। সে ঐতিহ্যটি কি? নাটকের মাধ্যমে সমাজ সংস্কার এবং স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম—শুধু স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামও নয় অত্যাচার নিপীড়ন, শোষণ এবং দুঃশাসন-এর বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম। নাট্যকাররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েই মনে হল যে সুযোগ দিয়ে জীবনদেবতা আমাকে চিহ্নিত করলেন, তার আর কোন উদ্দেশ্য নেই। বাঙলা সাধারণ নাট্যশালা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৭২ সালে ৭ ডিসেম্বর কতিপয় দুঃসাহসী নাট্যশিল্পীর প্রাণপণ সংকল্প এবং সাধনায়। নাট্যবন্ধু দীনবন্ধু মিত্রের যে নাটকটি দিয়ে এই ন্যাশনাল থিয়েটারের শুভ উদ্বোধন হয় সেটি ছিল 'নীলদর্পণ'—বাংলার দরিদ্র চাষী প্রজাদের ওপর দুর্দান্ত নীলকর ইংরেজদের উৎকট অত্যাচার, নিপীড়ন ও অর্থনৈতিক শোষণের

* পাদটীকা পত্রটির ফটোস্টাট কপি বঙ্গাব্দ ১৩৭৯ সালে শারদীয়া চিত্রিতা পত্রিকায় মুদ্রিত।

বর্বর অভিযানের হৃদয়ভেদী কাহিনী। থিয়েটারকে জাতীয় আন্দোলনের ধারক ও বাহক-এর পর্যায়ে নিয়ে আসার মূলে অমৃত-বাজার পত্রিকার সম্পাদক নাট্যকার শিশির-কুমার ঘোষ-এর প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছিল। নীলদর্পণ অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি প্রমুখ দক্ষ নাট্যশিল্পীদের অভিনয়ে প্রাণবন্ত হয়ে জাতীয় আন্দোলনে একটি পরম শক্তিতে পরিণত হয়েছিল।

বাংলার সাধারণ নাট্যশালা নাটকের এই পরম শক্তি সম্পর্কে স্বাধীনতা অর্জন না হওয়া পর্যন্ত চিরদিনই সচেতন ছিল। নাট্যগুরু গিরিশচন্দ্র প্রফুল্ল এবং বলিদান রচনা এবং প্রযোজনা করে যেমন সমাজ সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন তেমনি 'ছত্রপতি শিবাজী', 'সিরাজদ্দৌলা' এবং 'মীরকাশিম' রচনা ও প্রযোজনা করে পরাধীনতার জ্বালা দেশময় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর শেষোক্ত নাটক তিনটিই রাজরোষে নিষিদ্ধ হয়েছিল। এক কথায় বলা যায় রাজরোষে থিয়েটার বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলেও কলকাতার সবকটি পাবলিক থিয়েটারই দেশাত্মবোধক নাটক অভিনয় করতে কখনই পশ্চাদপদ হন নি। আর তাতেই দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, অমরেন্দ্র দত্ত, অমৃতলাল বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদ-প্রসাদ, ভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ স্বাধীনচেতা নাট্যকারদের প্রচুর দেশাত্ম-বোধক নাটক দেশবাসীকে জাতীয়তা এবং স্বাধীনতা মন্ত্রে উদ্দীপ্ত করতে পেরেছে। আমি প্রথমে ঐতিহাসিক নাটকের পথে না গিয়ে পৌরাণিক নাটকের আবরণে সম-সাময়িক রাজনৈতিক চিন্তাকে প্রকাশ করবার ব্রত গ্রহণ করলাম আমার প্রথম দেশাত্মবোধক নাটক 'দেবাসুর'। ঋগ্বেদে দেবাসুর সংগ্রামের যে সুপ্রচুর ইঙ্গিত রয়েছে তারই ভিত্তিতে পরিকল্পিত, দধীচির আত্মদান কাহিনী অবলম্বিত এই নাটক ষ্টার থিয়েটার প্রথম অভিনয় করেন অপরাজেয় অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরী।

দীর্ঘ এক সেতুপ্রান্তে বন্দীকৃত দেব-গণের মুক্তিপণ নির্দ্ধারণ করলো খেয়ালী বৃত্রাসুর, নদীস্নানার্থী দধীচির নিকট এই বলে 'ঐ পৌলমী যে দেবতার মুক্তি চেয়ে তার নাম উচ্চারণ করবেন, তিনি যদি, আপনি যতটুকু সময় নদীতে ডুব দিয়ে থাকবেন, সেই সময়টুকুর মধ্যে ঐ সেতুপথে নদীর পরপারে চলে যেতে পারেন, মুক্ত হবেন তিনি। আপনি ডুব দিয়ে ওঠার পর—আমাদের এপারে যে দেবতাকে পাব তৎক্ষণাৎ হত্যা করবো তাকে—সে ইন্দ্রই হোন আর যেই হোন। এই আমার প্রতিজ্ঞা।"

দধীচি স্বীকৃত হলেন, নদীতীরে গিয়ে জলে নামতে নামতে বললেন, 'আমি ডুব দিলাম শচী। তুমি নাম উচ্চারণ কর, যদি পার অন্ততঃ একজন দেবতারও জীবন রক্ষা কর। আজ না হয়, এক যুগ পরে সেই দেবতার ভাবিবংশ বংশধরগণ অসুরের অত্যাচার হতে দেবভূমিকে রক্ষা করে দেব-ভূমির শৃংখলপাশ ছিন্ন করবে—সেই আশাতে আমি ডুব দিলাম—আমার জাতি অক্ষয় হোক—আমার জাতি অমর হোক—আমার জাতি জয়লাভ করুক।'

সব দেবতাই ক্রমে ক্রমে ওপারে চলে গেলেন। দধীচি সেই যে ডুব দিলেন, আর উঠলেন না। সে যাত্রায় দেবগণ এমনি করে রক্ষা পেলেন এবং এই দধীচির অস্থি থেকে নির্মিত বজ্র-অস্ত্রেই দেবরাজ ইন্দ্র বধ করলেন বৃত্রাসুরকে। দেবতার হৃত-স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার হল।

১৩৩৫ সালের ১২ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় আনন্দবাজার পত্রিকা লেখেন :—'পরাধীন ভারতের মর্মকথা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নাটকের মধ্যে সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। নাট্যকলা হিসাবেও গ্রন্থখানি অনবদ্য হইয়াছে। বিশেষভাবে আত্মত্যাগী দধীচির চরিত্র অতি মহান হইয়াছে।.. এই নাটকখানি বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।"

১৩৩৫ সালের পৌষ সংখ্যায় 'কল্লোল' লেখেন :—নাটক প্লাবিত বঙ্গদেশে মাঝে মাঝে যে দুই একখানি নাটক স্বীয় বৈশিষ্ট্যে কলারসিকের মনোহরণ করে, 'দেবাসুর' তাহারই একখানি। ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত, সুললিত ভাষা গৌরব, অপূর্ব চরিত্রচিত্রণ নাটকখানিতে অপরূপ রূপ দান করিয়াছে। শৃংখলিতা নির্যা-তীতা দেশজননীর মুক্তির জন্য ব্যাকুলতা কোনওখানে নাটককে ক্ষুন্ন না করিয়া জাতিকে দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত করি-য়াছে। বৃত্রাসুর বলাসুর শচী এবং দধীচির চরিত্র চতুষ্টয় দর্শক ও পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ করিবে। শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়ের নাটক লেখার নিজস্ব মনোমদ ভঙ্গী এই নাটকে বর্তমান। নাটকখানি মাত্র পাঁচটি অঙ্কে সমাপ্ত।

আমার আর এক দেশাত্মবোধক পৌরাণিক নাটক 'কারাগার'-এর অভিনয় সুরু হয় মনোমোহন থিয়েটারে ১৯৩০ সালের ২৪ ডিসেম্বর। দেশে তখন রাজ-শক্তির বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন চলছিল। দলে দলে লোক কারাবরণ করছিল। মহাত্মাজীর নির্দেশও ছিল তাই। এই পটভূমিকায় মহাভারতে বর্ণিত কংস কারাগার-এর কথা আমার মনে এসেছিল। যে কারাগারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল সেই কারাগারই—

সেই কারাগারেই আজও উদিত হবে আমাদের জাতীয় জীবনের স্বাধীনতা সূর্য। চল সব সেই মহাতীর্থে—এই ভাব থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল আমার এই কারাগার নাটক। কারাগার নাটক-এর সঙ্গে আমার অনেক অবিস্মরণীয় স্মৃতি জড়িত রয়েছে। তা নাটক-এর ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত করছি :—

"গান রচনায় আমি অক্ষম। কিন্তু আমার এই অক্ষমতা সার্থক হইয়াছে সেই এক পুণ্য প্রভাতে যেদিন সারা বাংলার কবি-দুলাল কাজী নজরুল ইসলাম আমার হাত দুখানি পরম স্নেহে ধরিয়া বলিয়াছিলেন, "আপনি আপনার নাটকের জন্য আমাকে দিয়া গান লেখাইয়া না লইলে আমার অভিমানের কারণ হইবে।" যে আন্তরিক স্নেহে তিনি আমার 'মহুয়া'র কণ্ঠে গান দিয়াছিলেন এবারও আমার 'কারাগারে'র জন্য তেমনি আন্ত-রিক স্নেহে তিনি গান রচনা করিয়াছেন। রাজদন্ডে দন্ডিত হইবার পূর্ব মুহূর্তেও তিনি 'কারাগারে'র জন্য শুধু গান রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরমোল্লাসে উহাতে স্বয়ং সুরযোজনা করিয়াছেন। আমার আরো সৌভাগ্য, বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকার দরদী-কবি শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ও আমার প্রতি তাঁহার অসীম স্নেহে এবং মমতায় 'কারাগারে'র জন্য কয়েকটি গান রচনা করিয়া দিয়া-ছেন। এইরূপ মহা সৌভাগ্যে, আজ আমার শুধু এই প্রার্থনাই মনে জাগি-তেছে, জন্মে জন্মে যেন গীত রচনার এই অক্ষমতা নিয়াই জন্মগ্রহণ করি, এবং জন্মে জন্মে যেন সে অক্ষমতা এমনিভাবেই সার্থক হয়।"

'সাজসজ্জা এবং রূপ-পরিকল্পনা যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়াই তৃপ্ত হইব. তাঁহাদের সম্যক পরিচয় দিবার শক্তি আমার নাই। তাঁহারা শ্রীযুক্ত চারু রায় এবং শ্রীযুক্ত যামিনী রায়। ধন্যবাদ দিয়া তাঁহাদের স্নেহের ঋণ শোধ করিবার ধৃষ্টতা আমার নাই।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যামিনী রায় পর-বর্তী কালে বিশ্ববিখ্যাত চিত্রশিল্পীর মর্যাদা লাভ করে সম্প্রতি পরলোক গমন করেছেন।

ঐ ভূমিকা থেকেই আর একটি উদ্ধৃতি :—

'মুগ্ধচিত্তে আর একজনের কথা স্মরণ করি, তিনি বাংলার নাট্য জগতের কলা-লক্ষ্মী-কল্পা শ্রীযুক্তা নীহারবালা। মাতার মমতায়, ভগিনীর স্নেহে আমার এই নাটক রচনায় তিনি আমাকে উৎসাহিত ও সঞ্জীবিত রাখিয়াছিলেন। নাটকের নৃত্য-পরিকল্পনাও তাঁহার।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই নাট্যলক্ষ্মী পরবর্তী জীবনে পন্ডিচেরীতে শ্রীশ্রীঅর-বিন্দ আশ্রম-এর স্নেহচ্ছায়া লাভ করে সাধনোচিত ধামে গমন করেছেন।

আর একটি অবিস্মরণীয় স্মৃতি হল একটি উপাধি। কারাগার নাটক-এর ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরীর নাম উল্লেখ করতে গিয়ে আমি লিখেছিলাম—'নটসূর্য' শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী। তাঁকে আমার দেওয়া এই 'নটসূর্য' উপাধি সমগ্র দেশ স্বীকার করে নিয়েছে। সরকারী উপাধি প্রাপ্তির অভিনন্দন সভাতেও তিনি সেদিন বলেছেন—'যেদিন আমি চিরবিদায় নিয়ে চলে যাব সেদিন যেন লোকে শুধু এই

কথাটিই বলে, নটসূর্য অস্ত গেল।' তিনি শান্তায় হোন আজ সমগ্র জাতির এই কামনা।
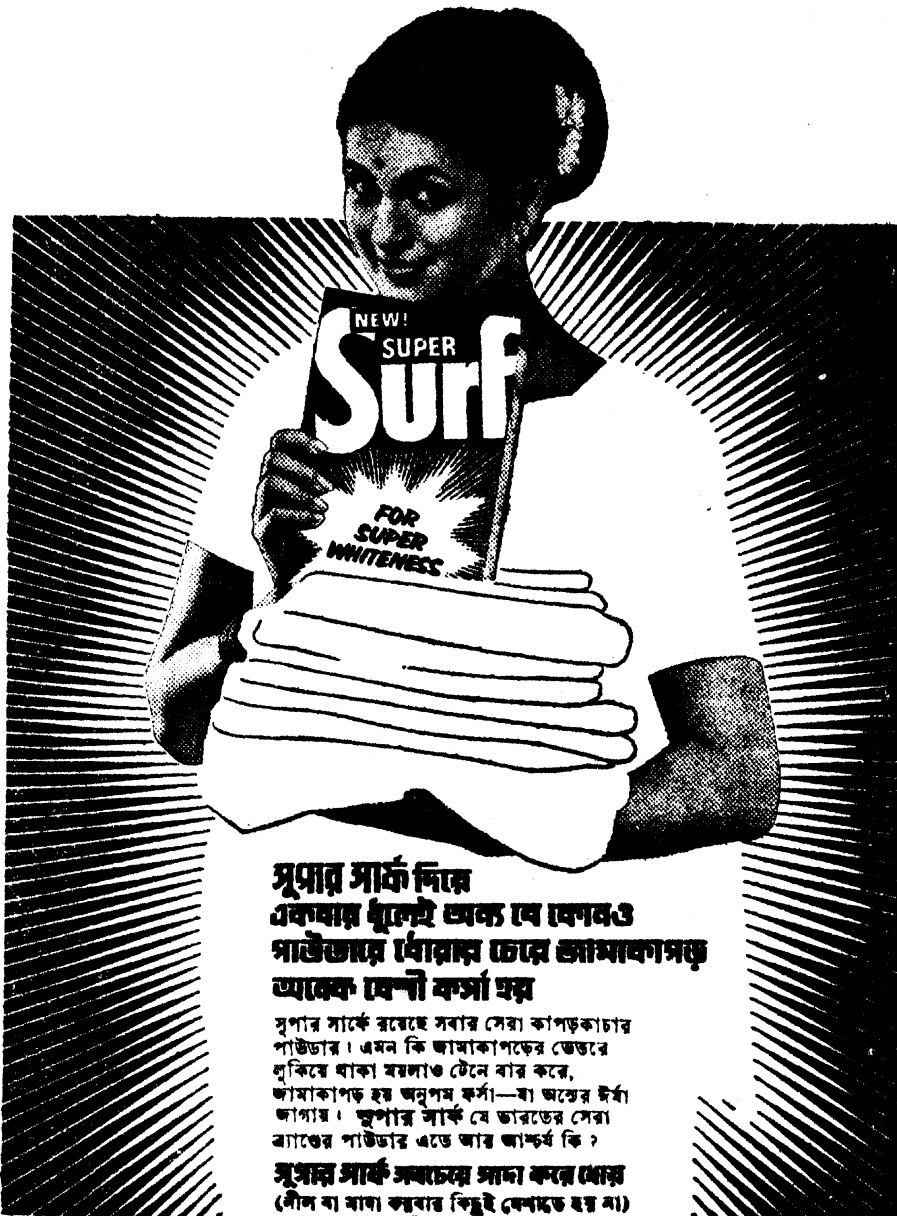
এই প্রসঙ্গে আমাকে নানাভাবে উৎসাহ দেওয়ার জন্য শিল্পী-সাহিত্যিক-বন্ধু শ্রীঅখিল নিয়োগীর নামও মুগ্ধচিত্ত স্মরণ করছি।

কংস-এর ভূমিকায় বাণীকিনের নির্মলেন্দু লাহিড়ীর অবিস্মরণীয় অপরাজেয় ধ্রুপদী অভিনয় প্রতিভার উল্লেখ না করে তৃপ্ত হতে পারছি না। অমর এই মহান শিল্পীর উদ্দেশ্যে আজ আবার নতুন করে স্মৃতিতর্পণ করছি।

মনোমোহন থিয়েটারে কারাগার নাট্যাভিনয়ে যে বিপুল উন্মাদনা সৃষ্টি হল, তা লক্ষ্য করে—পরবর্তী ১ ফেব্রুয়ারী অষ্টাদশ অভিনয়ের পর বাংলা সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করে কারাগারের পুনরাভিনয় নিষিদ্ধ করেন। সুরু হয় দেশব্যাপী বিক্ষোভ। সুপ্রসিদ্ধ কথাসাহিত্যিক ও আইনবিদ ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত তখন ছিলেন বেঙ্গল কাউন্সিলের সদস্য, তাঁর প্রশ্নের উত্তরে বাংলা কাউন্সিলে ১৯৩১ সালের মার্চ অধিবেশনে Home member hon'ble Mr. W. D. R Prentice ঘোষণা করেন —

"The Government had prohibited the further performance of the mythological play "Karagar" as it

was likely to excite feelings of disaffection towards Government. The Home member added that ostensibly the play did not relate to present day politics, but actually its bearing on present day politics was beyond doubt'.

কারাগার সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত তৎকালীন রাজনৈতিক আবহাওয়ারও নির্দেশক : 'নবশক্তি'—১৭ই পৌষ, ১৩৩৭। শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় কুশলী শিল্পীর মতো কংসের কারাগারকে কেন্দ্র করে নিপীড়িত মানুষের মর্মভেদী আর্তনাদ ফুটিয়ে তুলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে অভয়ংকরের যে আগমনী তিনি গেয়েছেন, তা যুগপৎ আশা ও আনন্দের বাণী বহন করে এনেছে, ...কংস চরিত্রে ...নূতন আলোকপাত...অপূর্ব বর্ণবৈচিত্র্য... সূক্ষ্ম রসবোধ। convention কে অতিক্রম করে যে শিল্পী নিজের সৃষ্টিতে প্রাণ দিতে পারেন তিনি যথার্থ শক্তিমান। 'কারাগারের' অনেক জায়গাতেই তাঁর নাট্যকারের এই শক্তির পরিচয় পেয়েছি। ......'কারাগার' সাধারণ নাট্যশালার ইতিহাসে নূতন অধ্যায় সংযোজন করতে পারবে।

'নাচঘর' —১৯শে পৌষ, ১৩৩৭। 'কারাগার' কেবল নাটকের দিক দিয়েই অপূর্ব হয় নি। রঙ্গালয়ের জীবন-উৎসবকেই 'কারাগার' দিয়েছে একটা শ্রী যার সাধনাই হচ্ছে রঙ্গালয়ের সত্যিকারের সাধনা।

'দীপালী'—(শ্রীনরেন্দ্র দেব) ১লা মাঘ, ১৩৩৭। 'কাহিনী পুরাতন হলেও শক্তিমান নাট্যকারের হাতে পড়ে সে আখ্যায়িকা যেন সম্পূর্ণ নূতন হয়ে উঠেছে। কোন বিশেষ দেশ কাল পাত্রের গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, কারাগারের যে ছবিটি মন্মথবাবু এঁকেছেন তা বিশ্বজনীন হয়ে দেখা দিয়েছে। ...এর চেয়ে ভাল একখানি পৌরাণিক নাটক বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত রচিত হয় নি।'

'আনন্দবাজার পত্রিকা'— প্রথিতযশা নাট্যকার শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়-এর নূতন নাটক 'কারাগারের' অভিনয় দেখিয়া আমরা আনন্দ লাভ করিয়াছি। ...এই নাটক আধুনিক দর্শকদের চিত্ত স্পর্শ এবং স্থায়ী সাহিত্যে স্থান লাভ করিবে।

'Amrita Bazar Patrika' 11th February, 1931, Dak.

...The news that the well-known drama called "Karagar" from the pen of the well known dramatist Sj Manmatha Ray was been lately banned has surprised many people in the country. If terms of sedition can be discovered in this book then we believe very little in the ancient epics and Puranas of the Hindus can be considered safe by the authorities....Is it then the belief of the censoring authorities in Bengal that loyalty can be engendered in the mind of a people in this twentieth Century by excluding from it all that is great and noble?

আমার অন্য দেশাত্মবোধক নাটক 'মীরকাশিম' সেন্সরের ছুরিতে ক্ষতবিক্ষত হলেও, নটসম্রাট ছবি বিশ্বাসের সুঅভিনয়ে জাতীয় উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়নি নাট্যনিকেতন মঞ্চে, ১৯৩৮ সালে।

দেশবাসীর উদ্দেশ্যে মীরকাসিমের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসের সেই আকুল আবেদন, সেই জেহাদ ঘোষণা আজও কানে বাজছে :—

'কে আছ শহীদ, কে আছ গাজী, কে আছ খোদার নফর বিদেশী অত্যাচার অবসানের এই ঘৃণ্য জেহাদে যোগ দিয়ে পলাশীর পাপ প্রক্ষালনের জন্য প্রস্তুত হও। পাটনায় মুঙ্গেরে বাংলায় বিহারে কোম্পানীর প্রতিষ্ঠিত সব কুঠি অবরোধ কর, সমগ্র ইংরেজ ব্যবসায়ীকে বন্দী করে শাঠ্যের সমুচিত শাস্তি দিয়ে পলাশীতে অনুষ্ঠিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর।'

নামভূমিকায় নটসম্রাট ছবি বিশ্বাসের ঐন্দ্রজালিক অভিনয়ে এবং নটশেখর নরেশ মিত্র কর্তৃক খোজা পিদ্রুস-এর অপূর্ব চরিত্র চিত্রণে এবং সামগ্রিক প্রযোজনায় 'মীরকাসিম' নাট্যাভিনয় যে দেশব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তার নিদর্শন রয়ে গেছে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে :—

'বর্তমান যুগে এই নাটকখানি বিশেষ আদর পাইবে আশা করি।' ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার।

'আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, নাটকখানি দেশপ্রাণ বাঙ্গালী নরনারীর চিত্ত জয় করিতে সমর্থ হইবে।' —দেশ।

'প্রত্যেকটি বাঙ্গালীর এই 'মীরকাসিম' দেখা অবশ্য কর্তব্য। 'মীরকাশিম' নাটকে মৃতসঞ্জীবনীর মন্ত্র রহিয়াছে।' —যুগান্তর

'ঐতিহাসিক সত্য অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় অনবদ্য নাটক সৃষ্টি করিয়াছেন।' —আনন্দবাজার পত্রিকা।

আমার এই রচনাটি 'বাংলা সাধারণ মঞ্চ ও আমি' রূপে সম্পাদক কর্তৃক সীমিত, নতুবা আমি দেখিয়ে দিতে পারতাম বাংলার নট, নাট্যকার এবং নাট্যশালা দেশাত্মবোধক নাট্য সৃষ্টিতে জাতির স্বাধীনতার সংগ্রামে কি সুবিপুল অংশ গ্রহণ করেছিল। এ সম্পর্কে আজ আমার সবিশেষ মনে হচ্ছে গৈরিক পতাকা এবং সিরাজদ্দৌলা নাটক রচয়িতা শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর স্বর্গতঃ শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কথা। বন্ধুবর মহেন্দ্র গুপ্তের কথা। আরও অনেকের অনেক কথাই আজ মনে পড়ছে,—

কিন্তু সম্পাদক কর্তৃক সীমাবদ্ধ আমার এই প্রবন্ধে তার স্থান নেই। এখানে যা বলতে হবে তা মূলতঃ আমার কথাই বলতে হবে এবং তাই বলছি। কিন্তু এ প্রবন্ধেরও কলেবর দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে দেখে কাজেই সংক্ষেপে অনেক কিছু সারতে হবে।

আমার উপরোক্ত নাটকগুলি বাদে সাধারণ মঞ্চে আমার যে কটি নাটক সর্বসম্মতরূপে সমাদৃত হয়েছিল তাদের মধ্যে উল্লেখ করছি :—

প্রথম পর্ব
(১৯২৩-১৯৩৮)

মহুয়া (মনোমোহন থিয়েটার ১৯২৯), সাবিত্রী (নাট্যনিকেতন ১৯৩১), অশোক (রংমহল ১৯৩৩), খনা (নাট্যনিকেতন ১৯৩৫), বিদ্যুৎপর্ণা (সি এ পি ফার্স্ট এম্পায়ার ১৯৩৭), রাজনটী (সি এ পি ফার্স্ট এম্পায়ার ১৯৩৭), রূপকথা (সি এ পি ফার্স্ট এম্পায়ার ১৯৩৮)।

দ্বিতীয় পর্ব
(১৯৫২-১৯৭২)

মহাভারতী (লোকরঞ্জন ১৯৫২), মমতাময়ী হাসপাতাল (১৯৫২), জীবনটাই নাটক (মিনার্ভা থিয়েটার ১৯৫৩), ধর্মঘট (বহুরূপী ১৯৫৩), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৯৫৮), অমৃত অতীত (গন্ধর্ব ১৯৫৯), মহাপ্রেম (১৯৫৯), স্বর্ণকীট (স্টার থিয়েটার ১৯৬২), জওয়ান (বিশ্বরূপা ১৯৬২), মহা উদ্বোধন (লোকরঞ্জন ১৯৬৩), বন্যা (অভিনেতৃ সংঘ ১৯৬৩), দুর্গেশনন্দিনীর জন্ম (বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন ১৯৬৫) তারাস শেভচেঙ্কো (দশরূপক ১৯৬৫), লালন ফকির (রূপকার ১৯৬৯) এবং ১৮৭২ (রঙ্গসভা ১৯৭২) বেতারে প্রচারিত ১৭-১১-৭২)।

এই তালিকা আমার রচিত পূর্ণাঙ্গ নাটকাবলীর সম্পূর্ণ তালিকা নয়, শুধু মাত্র সাধারণ মঞ্চে অভিনীত নাটকগুলির তালিকা। উপরোক্ত তালিকা থেকে সাধারণ মঞ্চে অভিনীত কয়েকটি নাটকের মাত্র একটি করে সমালোচনা উদ্ধৃত করে আমার নাট্যজীবনের প্রথমপর্ব শেষ করছি।

প্রথম পর্ব :—মহুয়া—(মনোমোহন থিয়েটার) নদেরচাঁদ—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হুমরো বেদে—নির্মলেন্দু লাহিড়ী, মহুয়া—সরযূবালা।

'পালাগানের মহুয়া এই নাটকের মধ্যে এমন অপরূপ হয়ে ফুটে উঠেছে যে তাকে ওদেশের জগৎপ্রসিদ্ধ কারমেনের সঙ্গে তুলনা করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ হয় না।' (নবশক্তি ১ম বর্ষ, ৩৫শ সংখ্যায় 'চন্দ্রশেখর'—শ্রীমনুজেন্দ্র ভঞ্জ।)

সাবিত্রী— (নাট্যনিকেতন) অশ্বপতি—নির্মলেন্দু লাহিড়ী, দ্যুমৎ সেন—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সাবিত্রী—নীহারবালা।

সর্বপ্রকার বাহুল্য বিবর্জিত, সহজ-সরল এবং বর্ণাঢ্য ভাষায় রচিত এই নাটকখানি বাংলার নাট্য সাহিত্যে একটি বিশেষ সম্পদরূপে গৃহীত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

নাট্যনিকেতন এই সর্বাঙ্গসুন্দর নাটকখানির সর্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় করে যে খ্যাতি অর্জন করলেন, যথার্থ শ্রেষ্ঠত্ব ব্যতীত তা অর্জন করা সম্ভবপর নয়।'
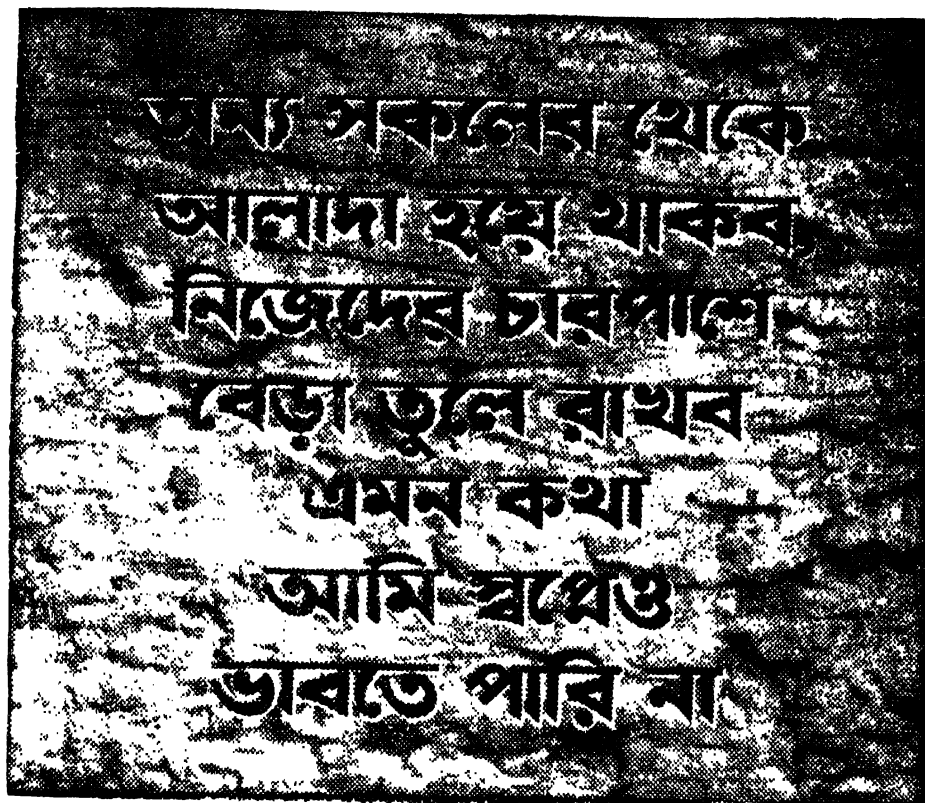
(নাচঘরে প্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত)।

অশোক — (রংমহল)— অশোক—রবি রায়, বীতশোক—ভূমেন রায়, খল্লাতক—নরেশ মিত্র, উপগুপ্ত—যোগেশ চৌধুরী, তিষ্যরক্ষিতা—শান্তি গুপ্তা, কুনাল—রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, কাঞ্চনমালা —রেণুবালা। 'নাট্যকারের মুন্সিয়ানা দেখে মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না। অশোকের জীবনে যে দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তির সংঘর্ষ চলেছে এবং পশুশক্তির প্রভাবমুক্ত হয়ে পরিশেষে যেভাবে অশোকের ধর্মচৈতন্যের আত্মবিকাশ ঘটেছে, তা সম্পূর্ণভাবে উচ্চাঙ্গের ড্রামার বিষয়বস্তু। নাট্যকার যেভাবে কুনালের প্রতি তিষ্যরক্ষিতার প্রেমের পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছেন তা একমাত্র প্রথম শ্রেণীর আর্টিস্ট-এর তুলির কাজের সঙ্গে তুলনীয়। নাট্যকারের ভাষানৈপুণ্যে এবং প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যে নাটকের গল্পটি দর্শক সাধারণেরও চিত্তাকর্ষক হবে।'—(দীপালীতে চন্দ্রশেখর—শ্রীমনুজেন্দ্র ভঞ্জ।)

খনা— (নাট্যনিকেতন) বরাহ—অহীন্দ্র চৌধুরী, মিহির—জীবন গাঙ্গুলী, কামন্দক—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, খনা—সরযূবালা, ধরনী—চারুশীলা।

"Khana, from the pen of Manmatha Ray, is perhaps Gods answer to the theatre owners prayer for a play that will please all classes of audiences without calling forth the best in the artists. And he is where the dramatist triumphs over the players as a whole.... An excellent example of this noted author's rare knack of turning legends of yore into engrossing plays to the liking of modern audiences ....Ray wields a powerful pen and is a past master in giving such twists to a story that go long way in creating dramatic situations and climexes — In "Khana' both these qualities have admirably been combined to effect popular entertainment with a capital Pand E ... A strong story interest that never lets the attention of the audience flag till the very curtain'— (Thespis in Dipali).

বিদ্যুৎপর্ণা— (সি এ পি ফার্স্ট এম্পায়ার) বিদ্যুৎপর্ণা — সাধনা বসু, মোহান্ত—অহীন্দ্র চৌধুরী।

'গ্রন্থকারের অপূর্ব সৃষ্টি। নাটকীয় ঘটনা সংস্থাপনায়, সংলাপ ও কল্পনার মনোহারিত্বে অভিনব।'—(যুগান্তর)

"আলোচ্য নাটিকাটি ১৩৩৪ সালের আষাঢ় সংখ্যা ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকার নাটিকাটি মঞ্চোপযোগী করিয়া রূপান্তরিত করিয়াছেন। সম্প্রতি কলিকাতার বিখ্যাত সৌখীন সম্প্রদায় ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্স কর্তৃক বিদ্যুৎপর্ণা অভিনীত হইতেছে ও সাফল্যলাভ করিয়াছে।' নায়িকা বিদ্যুৎপর্ণা মন্দিরের মোহান্ত কর্তৃক বাল্যাবধি প্রতিপালিত। তিনি বেদেনী বালিকাকে দেবদাসীর যোগ্য করিয়া গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট। এদিকে বিদ্যুৎপর্ণার রূপের মোহে মন্দিরের প্রায় সকলেই আকুল। স্বয়ং মোহন্তও মনের অগোচরে বিদ্যুৎপর্ণাকে কামনা করে। বিদ্যুৎপর্ণা ভালবাসে ইন্দ্রজিৎকে। সকল দ্বন্দ্বের অবসান হয় একদা এক অত্যাচারী রাজার আবির্ভাবে। এই কাহিনী নাটকীয় ঘটনা সংস্থাপনায়, সংলাপ ও কল্পনার মনোহারিত্বে অভিনব। —(আনন্দবাজার পত্রিকা)।

রাজনটী—(সি এ পি ফার্স্ট এম্পায়ার) রাজনটী মধুচ্ছন্দা—সাধনা বসু, কাশীশ্বর—অহীন্দ্র চৌধুরী, চন্দ্রকীর্তি—মধু বসু)।

ঘটনাবহুল বা বৈচিত্র্যময় নহে, একটি শান্ত সুন্দর কোমল ঘটনা লইয়া রচিত এই ক্ষুদ্র নাটকখানি শান্তরসে ভরপুর। রাজনটী ও যুবরাজের প্রেমকে কেন্দ্র করিয়া সঙ্গীতে, রূপে, ছন্দে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এই ক্ষুদ্র সুলিখিত নাটকখানি এক অপূর্ব সৌন্দর্যে বিকশিত। বাংলার নাট্য সাহিত্যে মন্মথ রায় নব নব রস পরিবেশন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। রাজনটী তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। —আনন্দবাজার পত্রিকা—৬ই মার্চ ১৯৩৮)।

রূপকথা— (সি এ পি ফার্স্ট এম্পায়ার) যক্ষ—অহীন্দ্র চৌধুরী, রাজকন্যা—সাধনা বসু, রাজকুমার — প্রীতিকুমার মজুমদার।

"Manmatha Ray the noted playright of the mdoern Bengali school has given it an exquisite dramatic shape mostly on the lines of the European pantomime' — N.K.G in Amritabazar Patrika.

সাধারণ মঞ্চে আমার নাট্যজীবনের প্রথম পর্ব ১৯৩৮ সালে ছেদ পড়ল সুদীর্ঘ ১৪ বৎসরের জন্য। দ্বিতীয় পর্বটা অনেকটা সাম্প্রতিক যুগের কথা। এবং দ্বিতীয় পর্বে, এই সাম্প্রতিক যুগে, সাধারণ মঞ্চে আমার যে যোগাযোগ—এবার সংক্ষেপে সেই সম্বন্ধে কিছু লিখছি। প্রথম পর্ব (১৯২৩—১৯৩৮)-এর কথা একটু সবিস্তারে লিখতে হল এইজন্য যে ওটা অতীত যুগের কথা। যে যুগের মানুষ বিরল হয়ে এসেছে, অনেক কিছু বিস্মৃতির অতলতলে ডুবে গেছে ও যাচ্ছে এবং নাট্য ইতিহাসের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে তো আমি বর্তমানের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছি।

এ পর্যন্ত সাধারণ রঙ্গমঞ্চে আমার যেসব নাটক অভিনীত হয়, তার কোনটিই সামাজিক নাটক ছিল না। ১৯৫২ সালে আমি পুনরায় নাটক লিখতে মনস্থ করে ঐ বৎসরেরই এপ্রিল মাসে 'মহাভারতী' রচনা করি। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের জন্য লিখিত আমার নাটকগুলির মধ্যে মহাভারতীই প্রথম সামাজিক নাটক। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ, ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ, ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৩০—৩১ সালে আইন অমান্য ও লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন, ১৯৪২ সালে আগস্ট বিপ্লব এবং ১৯৪৬ সালে বৃটিশ কর্তৃক ভারতের হস্তে ক্ষমতা অর্পণ এই রাজনীতির ঘটনাগুলি এই পঞ্চাঙ্ক নাটকের বিষয়বস্তু। মেদিনীপুর জেলার সমুদ্রকূলবর্তী একটি গ্রামে মহাভারত মাইতি নামক এক মধ্যবিত্ত কৃষক এবং তাহার পরিজনবর্গকে কেন্দ্র করে এই রাজনীতিক নাটকটি পরিকল্পিত হয়েছে। চরিত্রগুলি সমস্তই কাল্পনিক এবং অতি সাধারণ মানুষ। স্বাধীনতা-সংগ্রামে জনসাধারণ যে ইতিহাস রচনা করেছিল এ নাটকটি তারই ইতিহাস। এই নাটকটি জহর গাঙ্গুলীর পরিচালনায় রংমহলে মঞ্চস্থ হবার জন্য রিহার্সালে পড়েছিল। এমন সময় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার প্রযোজক। ডকটর রায় বললেন, কল্যাণীতে জাতীয় কংগ্রেসের আসন্ন অধিবেশনে সর্বভারতীয় প্রতিনিধিদের মনোরঞ্জনের জন্য কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করো। তদনুযায়ী রংমহল থেকে তুলে আনা হল মহাভারতী। এবং জহর গাঙ্গুলীর পরিচালনাতেই সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য পঙ্কজ মল্লিক এবং আমার প্রযোজনায় নবগঠিত সরকারী নাট্য সংস্থা লোকরঞ্জন শাখা আশ্চর্য সাফল্যের সঙ্গে 'মহাভারতী' পরিবেশন করলেন কল্যাণী কংগ্রেসের ১৯৫৪ সালের ২২শে জানুয়ারী 'জাতীয় মহাসভা কংগ্রেস নাট্যমঞ্চে'। অভিনয় শেষ হওয়া মাত্র মঞ্চে ছুটে এলেন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এবং মাইক-এর সামনে গিয়ে তিনি দুটি কথা বললেন—

"Only Bengal could do it—and Bengal has done it."

এই প্রসঙ্গে লোকরঞ্জন শাখা সম্বন্ধে দু-চারটি কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছে। সাধারণ রঙ্গমঞ্চ-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে একটা কথা জেনেছিলাম থিয়েটারের নট-নটীরা দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে। দর্শকরাও তাদের গুণমুগ্ধ হয় কিন্তু নট-নটীদের সামাজিক স্বীকৃতি বা মর্যাদা ছিল না। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার প্রমুখ শিক্ষিত নাট্যশিল্পীরা যখন মঞ্চে যোগ দিলেন, তখন দেখেছিলাম এই অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হল। কিন্তু সামগ্রিকভাবে হল বলে মনে হল না। পঙ্কজকে নিয়ে আমি ডকটর রায়-এর কাছে ১৯৫৩ সালের ১ অকটোবর সাময়িকভাবে গঠিত লোকরঞ্জন শাখাকে সরকারী নাট্য প্রতিষ্ঠানরূপে পাকা করতে আবেদন জানালাম। ডকটর রায় সানন্দে সম্মত হলেন পঙ্কজ মল্লিককে উপদেষ্টা এবং প্রচার-প্রযোজক আমার প্রশাসন আধিকারিকের অতিরিক্ত দায়িত্বে স্থায়ীভাবে গড়ে উঠলো বর্তমান লোকরঞ্জন শাখা। ভারতে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি পেল লোকরঞ্জন শাখার শিল্পীবর্গ। সরকারী কর্মচারীরূপে শিল্পীদের সামাজিক মর্যাদা উচ্চতর হল। 'মহাভারতী' লোকরঞ্জন শাখা কর্তৃক বাংলার পল্লীতে পল্লীতে অভিনীত হয়ে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত '১৮৫৭

বিদ্রোহ শতবার্ষিকী জয়ন্তী' উৎসবে ভারত সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার লোকরঞ্জন শাখা ১৪ই এবং ১৫ই আগস্ট (১৯৫৭) এই মহাভারতী নাটক হিন্দী ভাষায় অভিনয় করেন।

১৯৩৮ সালে নাট্যনিকেতনে আমার 'মীর কাশিম' নাটকের নামভূমিকার অপূর্ব অভিনয় করে ছবি বিশ্বাস রাতারাতি সুবিখ্যাত হন। পনেরো বছর পর ১৯৫৩ সালে মিনার্ভা থিয়েটারে যখন তিনি আমার 'জীবনটাই নাটক' খোলেন তখন তিনি চিত্র ও মঞ্চজগতে নট-সম্রাট। নাট্যশিল্পীদের আর্থিক দৈন্য ও দুরবস্থা এবং এক নটবধূর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার এক চমকপ্রদ সংগ্রাম নিয়ে গঠিত ছিল নাটকটি। ছবি বিশ্বাসের প্রতিভাদীপ্ত পরিচালনা এবং অভিনয়ে নাটকটি সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নিম্নোক্ত দুই-জন প্রখ্যাত সাহিত্যিকের লিপিবদ্ধ মন্তব্যে তা প্রমাণিত হয়:—

'বাংলা রঙ্গমঞ্চে প্রায় শতাব্দীব্যাপী অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে—এটা হল নবীনতম। আমার তো মনে হয়ঃ এই নাটক থেকে মঞ্চের নতুন চেহারা ফুটবার সম্ভাবনা হল।'

—মনোজ বসু

'আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি আধুনিক কালে এ নাটকের তুলনা নেই, এ অভিনয়ের উদাহরণ নেই।'

—প্রবোধকুমার সান্যাল

দ্বিতীয় পর্বে আমার পরবর্তী নাটক-গুলি রাজনৈতিক এবং সামাজিক ভাবধারার সঙ্গে অধিকতর সংযুক্ত না হয়ে পারেনি, কারণ যুগমানসকে উপেক্ষা করা নাট্যকারের ধর্ম নয়। আমার পরবর্তী নাটক[illegible] ধর্মঘট (১৯৫৩) সাঁওতাল বিদ্রোহ [illegible] অমৃত অতীত (১৯৫৯) এবং দেশাত্মবোধক মহা-প্রেম (১৯৫৯) স্বর্ণ কীট (১৯৬২) এবং জওয়ান (১৯৬২) এই ভাবধারারই দ্যোতক। আনন্দবাজার পত্রিকা (৫ই মে ১৯৫৭ তারিখে) এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন: 'বর্ত-মান যুগচিন্তা সাহিত্যের কাছে যে দাবী করে চলেছে, মন্মথ রায় নাট্যকাররূপে সেই অব্যক্ত বিক্ষোভ এবং মানবমনের সত্যানু-ভূতিকে বাণীরূপে দান করে এক মহান কর্তব্য সাধিত করে চলেছেন।'

কিন্তু যুগচিন্তারূপ মহান কর্তব্য সাধনে বিপদও আছে। ১৯৪৭ সালে পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের 'প্রচার প্রযোজক'-এর গেজেটেড পদে নিযুক্ত হই আমি। কিছুদিন পরেই প্রচার অধিকর্তার এক হুকুম পেলাম—বাইরের জন্য আমি যা লিখব প্রকাশের পূর্বে প্রচার অধিকর্তার অনুমতি ও অনুমোদন চাই। সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগপত্র দাখিল করি আমি। তখন কংগ্রেস নেতা স্বর্গত কিরণ-শঙ্কর রায় স্বরাষ্ট্র প্রচার মন্ত্রী। প্রচার অধি-কর্তার হুকুম তিনি বাতিল করে দেন। ১৯৪৯ সালের ২২শে মার্চের ১৭২৫ নম্বর সরকারী পত্রে আমাকে জানানো হল—

"Shri Manmatha Ray's informed that Government regret their in-ability to accept his resignation. He may undertake occasional work of a literary or artistic character provided his public duties do not suffer thereby'.

আর এতেই সম্ভব হয়েছিল আমার পক্ষে চাকুরি করেও লিখতে রাজনৈতিক নাটক 'ধর্মঘট', 'আজব দেশ', 'সাঁওতাল বিদ্রোহ', 'অমৃত অতীত'।

ইউক্রেন পল্লীবাসী চিত্রশিল্পী ও লোক-কবি 'তারাস শেভচেঙ্কো' একদা ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দেন গোটা রাশিয়ায়। জার-এর শাসনে নিপী-ড়িত নিষ্পেশিত এই জীবনশিল্পীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই রাশিয়ায় ভূমিদাস প্রথা তিরোহিত হতে বাধ্য হয়। এই মহান নাটকীয় জীবন অবলম্বনে আমি একটি মৌলিক নাটক প্রণয়ন করি—'তারাশ শেভ-চেঙ্কো'। রুশ-ভারতী পত্রিকায় নাটকটি প্রকাশিত হয়। দশরূপক নাটকটি মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনয় করে। এই নাটকটি প্রণ-য়ন-এর জন্য ১৯৬৭ সালে আমি আন্ত-র্জাতিক 'সোভিয়েত ল্যান্ড নেহরু সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কারে সম্মানিত হই। অনন্য-নাট্য কৃতিত্বের স্বীকৃতিজ্ঞাপক বঙ্গ রঙ্গ-মঞ্চের সর্বোচ্চ পুরস্কার 'বিশ্বরূপা স্বর্ণ-পদক দ্বারা ১৯৬৪ সালে সম্মানিত হওয়ার পর এই আমার প্রথম বৃহৎ সম্মান। তার পরও আর যে তিনটি সম্মান পেয়েছি তা হল—সাহিত্য বাসর উল্টোরথ পুরস্কার (১৯৬৭)। ন্যাশনাল সঙ্গীত নাটক আকা-দমি শ্রেষ্ঠ নাট্য রচনা পুরস্কার (১৯৬৯)। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট সঙ্গীত নাটক চারুকলা আকাদমি শ্রেষ্ঠ নাট্য রচনা পুরস্কার (১৯৭১)।

আমার নাট্য সাধনার ব্যাপ্তিকাল অর্ধ-শতাব্দীতে দাঁড়িয়েছে। অনেক কিছু কোলাহল করে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে চিন্তা জাগে এই দীর্ঘ সাধনায় কি ফসল ফললো। সমসাময়িক নাট্য ইতিহাসে দেখেছি আমার নাট্য সাধনা সম্পর্কে লেখা হয়েছে:—

'পৌরাণিক নাটক লিখিয়া যাঁহারা প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে মন্মথ রায়ের নাম করিতে হয়। শুধু পৌরাণিক নাটক নহে সর্বপ্রকার নাটক আলো-চনার কালে ইঁহাকে আধুনিক সময়ের সর্ব-শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলা চলে। নাটকের মধ্যে ইনি এক অনাবিষ্কৃত রহস্য এবং এক অনাস্বাদিত রস বিকাশ করিয়া দেখাইলেন। নাটকে এরূপ সুতীব্র ভাবাবেগ এবং সুপ্রখর ক্রিয়াময়তা সৃষ্টি করিতে খুব কম নাট্যকারই পারিয়াছেন। সূক্ষ্মতম অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রতিটি পর্দা ইনি অতি সুনিপুণ হস্তে স্পর্শ করিয়াছেন। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের অবিরাম সংঘাতে ইঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির মর্মস্থল ছিঁড়িয়া যাই-তেছে বলিয়া বোধ হয়, ইঁহার নাটকের উদ্বেলিত ভাবতরঙ্গ ঘূর্ণ্যমান আবর্তের মধ্যে লীলা করিয়া অমোঘ অবস্থার কঠিন শিলায় নিরুপায়ভাবে আর্তনাদ করিয়া মরিয়াছে। ইহার নাটক দর্শনকালে চরম উত্তেজনায় মন নাচিতে থাকে, নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যায়, কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া পড়ে।'

বাংলা নাটকের ইতিহাস
ডঃ অজিতকুমার ঘোষ
(বাংলা বিভাগ প্রধান এবং
ফ্যাকাল্টি অব আর্টসের ডীন
রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)

'তাঁহার নাটকের ঘটনাসমূহ সাধা-রণতঃ রোমাঞ্চকর - দৃশ্যের পর দৃশ্যের ভিতর দিয়া পাঠককে রুদ্ধশ্বাসে অগ্রসর হইতে হয়। অতি আধুনিক যুগে বাহ্য-নাটকীয় ক্রিয়া অপেক্ষা যে অন্তর্দ্বন্দ্বের উপর জোর দেওয়া হইয়া থাকে—তাঁহার নাটক তাহা হইতেও বঞ্চিত নহে। রোমাঞ্চ-কর ঘটনা-প্রবাহের সঙ্গে নাটকীয় চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ তাঁহার নাটকের একটি প্রধান গুণ। ...এই দিক দিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে এক-মাত্র তাঁহার মধ্য দিয়াই এই যুগে, আধু-নিক যুগের সঙ্গে অতি আধুনিক যুগের সংযোগ রক্ষা পাইয়াছে বলিয়া মনে হইবে।'

বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস
ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য
(রবীন্দ্র অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়)

কিন্তু প্রকৃত মূল্যায়ন-এর কর্তা মহাকাল। এমন দিন হয়তো এসে গেছে অথবা এসে যাবে যেদিন কালের কষ্টি-পাথরে যাচাই হয়ে আমার এই পঞ্চাশ বৎসর-এর ফসল মূল্যহীন প্রমাণিত হবে।

চিত্রগীতি/বন্দী ও প্রতাপ শর্মা

কিন্তু তাতে আনন্দও আছে এই জন্য যে, আমি যা দিয়েছি তার মূল্যের চেয়ে, যেটা আসছে বা এসেছে তার মূল্য কালের কষ্টিপাথরে অনেক বেশী। আর সান্ত্বনাও থাকবে এই জন্য যে, একে একে যে সোপান শ্রেণী আমরা রচনা করে দিয়েছি সেই সোপানই উত্তীর্ণ হয়ে তবেই হবে সেই মহা উত্তরণ। এবং আমি আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করি আমার সোপান অতিক্রম করে আমাদের নাট্য-সাহিত্য সেই মহা-উত্তরণ-এর পথে এগিয়ে যাক। বিশ্ব নাট্য-সাহিত্যের আসরে এক মহান আসন অর্জন করুক।

আবার মাটিতে নেমে আসছি। সাধারণ মঞ্চের কথায় ফিরে আসছি। স্মরণ করছি এর শতবার্ষিক পরিণতি।

১৭৯৫ সালে ইংরাজী থিয়েটারের অনুকরণে ভারতীয় সংস্কৃতির অনুরাগী গেরেশেম লেবেডেফ নামক এক রুশ যুবক কর্তৃক কলকাতায় স্থাপিত 'বেঙ্গালী থিয়েটারে' গোলকনাথ দাস অনুবাদিত 'ডিসগাইজ' নামক ইংরাজী নাটকের বঙ্গানুবাদ অভিনয়ে শুরু হয় কলকাতায় প্রথম বাংলা থিয়েটার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। এই নাটকের প্রচেষ্টা ১৮৭২ সাল পর্যন্ত ধনীদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। ইংরাজী ও সংস্কৃত নাটকের প্রভাব এই প্রচেষ্টায় গুরুত্ব লাভ করলেও ক্রমশঃ বাংলা সামাজিক নাটকের ক্ষেত্র তৈরি হতে থাকে। ১৮৫৭ সালে অভিনীত রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুল সর্বস্বই প্রথম বাংলা সামাজিক নাটক। ধনীগৃহে এই সব নাট্যাভিনয়ের একমাত্র দর্শক ছিলেন ধনীরাই এবং তাঁদের আত্মীয় - স্বজন - বন্ধু - বান্ধবগণ। নিমন্ত্রিত হয়েই তাঁরা যেতেন, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দারওয়ানের গলা ধাক্কাও খেতে হত অনেককে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী যুবকদের মধ্যে নাট্যপ্রীতি যথেষ্টই ছিল, কিন্তু বিত্তহীন বলে তাদের থিয়েটার করা সম্ভবপর হয়ে উঠত না। বাঙালীর স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক চেতনা ক্রমশঃ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। তদানীন্তনকালে কয়েকজন নাট্যপ্রিয় যুবক স্থির করলেন তাঁরা জনসাধারণ-এর সুবিধার জন্য একটি সাধারণ নাট্যশালা স্থাপন করবেন। এঁদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ নাট্যসাধকরা। এই সাধারণ নাট্যশালার নামকরণ হয় 'ন্যাশনাল থিয়েটার'। ন্যাশনাল থিয়েটার' নামে গিরিশচন্দ্রের সবিশেষ আপত্তি ছিল। তিনি মনে করতেন 'ভাঙ্গাচোরা স্টেজ' এবং জোড়াতালি দেওয়া সিন-সিনারি নিয়ে ন্যাশনাল থিয়েটার নাম দেওয়া উচিত নয়। সব কিছু শ্রেষ্ঠ না হলে ন্যাশনাল থিয়েটার কথাটার মর্যাদা থাকে না।

গিরিশচন্দ্র দল ছেড়ে ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও উদ্যোক্তারা জোড়াসাঁকোতে মধুসূদন সান্যালের গৃহ প্রাঙ্গণে সাধ্যমত আয়োজন করে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক অভিনয় করে ন্যাশনাল থিয়েটারের শুভ উদ্বোধন করলেন ১৮৭২ সালের ৭ ডিসেম্বর। এই নাটকের অভাবনীয় সাফল্য দেখে গিরিশচন্দ্র ঐ ন্যাশনাল থিয়েটারে ফিরে আসেন। এই ন্যাশনাল থিয়েটার অবশ্য বছর খানেকের বেশী পরমায়ু পায় নি। কিন্তু এই ন্যাশানাল থিয়েটার থেকে বাঙালীর সাধারণ মঞ্চ বা পাবলিক থিয়েটার প্রবর্তিত হল।

এই 'নীলদর্পণ' নাটকের ক্রমাগত অভিনয়ে একটি জিনিস আবিষ্কৃত হল—সেটি সার্থক নাটক ও নাট্যাভিনয়ের সত্যিকার শক্তি। 'নীলদর্পণ' হয়ে দাঁড়াল গণবিদ্রোহের জয়শঙ্খ। প্রবঞ্চিত, নির্যাতিত, শোষিত, দিশেহারা, সাধারণ মানুষ একটি বাস্তব নাটকের মধ্যে নিজেদের খুঁজে পেল, বিদ্রোহের ভাষা পেল, পরিত্রাণ-এর ইঙ্গিত পেল। জনবিক্ষোভের প্রাবল্যে বাংলার বুক থেকে চিরবিদায় নিতে বাধ্য হল নীলকর। নাটক ও নাট্যশালার অন্তর্নিহিত এই পরমশক্তি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলেন নাট্যসাধকেরা। নাট্যাভিনয়ের আনন্দের পথে সুরু হল নবজাগরণ-এর সাধনা। এই মাধ্যমেই শুরু হয়ে গেল

সমাজ সংস্কার, শুরু হয়ে গেল স্বাধীনতা সাধনা। জাতির অনেক আত্মত্যাগ, অনেক রক্তাক্ত আত্মদানে স্বাধীনতা সূর্যের উদয় হল ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট।

১৯৭২ সালের ৭ ডিসেম্বর 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামক প্রথম সাধারণ নাট্যশালা স্থাপনের শতবর্ষপূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঐ দিনটি নানা দিক দিয়ে আমাদের কাছে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই একশ বছরে আমরা কি পেলাম সেটা দেখা যাক। প্রথমতঃ ধনীদের হাত থেকে জনসাধারণ নাট্যশালা নিজেদের হাতে নিতে পেরেছে। দ্বিতীয়তঃ নাট্যানুশীলন ক্রমশঃ প্রগতি-পন্থী হয়েছে। এই একশ বছরে যাঁদের অসাধারণ কৃতিত্বে ও প্রতিভায় বাংলা নাটক ও নাট্যশালা বাঙালীর প্রাণের ধন হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁদের মধ্যে আজকের যুগে যাঁরা সর্বাধিক স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল, অমর দত্ত, বিনোদিনী, তারাসুন্দরী, দানীবাবু, শিশিরকুমার, অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী প্রভা, নীহারবালা, সরযূদেবী প্রমুখ শিল্পিগণ এবং গিরিশচন্দ্র, দীনবন্ধু, মধুসূদন, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রমুখ নাট্যকারগণ। সাধারণ মঞ্চের সঙ্গে যোগ না রেখেও নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ আপন মহিমায় বিশ্বনাট্য সাহিত্যে সমুজ্জ্বল। বহু ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়েও সাধারণ নাট্যশালাগুলি বাঙালীর নাট্যরসধারা প্রবাহিত রেখেছেন। স্টার, মিনার্ভা, মনোমোহন, নাট্যনিকেতন, রঙমহল, নাট্যভারতী, শ্রীরঙ্গম, বিশ্বরূপা প্রমুখ থিয়েটারগুলি আধুনিক যুগেও স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। তৃতীয়তঃ এই সাধারণ নাট্যশালাগুলি চিরদিনই নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে জাতিকে সমাজসংস্কারে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবুদ্ধ ও উদ্দীপ্ত করেছে। চতুর্থতঃ এই শতবর্ষের শেষার্ধে সাধারণ নাট্যশালাগুলি যখন জাতির উচ্চাশা এবং উচ্চাকাঙ্খার সামনে তালে তালে চলতে পারছিল না তখন এক শক্তিশালী অপেশাদার নাট্য আন্দোলন-এর সূত্রপাত হয়। ১৯৪৪ সালে ভারতীয় গণ-নাট্য সংঘ কর্তৃক বিজন ভট্টাচার্য-এর 'নবান্ন' নাটকের অভিনয় থেকেই আমাদের নাট্যজগতে এই নবযুগটির সূত্রপাত হয়। বলতে দ্বিধা নেই, এই গণনাট্য ও তৎপরবর্তী নবনাট্য আন্দোলন-এর কল্যাণেই আজকের বাংলা নাটক দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। নাটক আজ জাতীয় জীবনে বিলাস নয়, জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার সত্যিকারের ধারক ও বাহক, প্রগতির মশাল।

কিন্তু এই নাট্য শতবর্ষের শেষার্ধেও আমরা পরিতাপের সঙ্গে লক্ষ্য করছি—মঞ্চের স্বল্পতা। ১৮৭২ সালেও এ বিষয়ে যে দৈন্য ছিল, ১৯৭২ সালেও লোকসংখ্যা ও নাট্যানুরাগী লোকসংখ্যার অনুপাতে সেই দৈন্যই বিকটভাবে প্রকট। শুধু তাই নয়, এই নাট্যশতাব্দীর প্রথম যুগেই যেমন সাধারণ নাট্যশালাগুলি ব্যবসায়ী মালিকদের হয়েছিল, নাট্যশতাব্দীর শেষ প্রান্তেও তাই। আর এরই ফলে আমাদের নাট্য-প্রগতি পদে পদে পূর্বেও ব্যাহত হয়েছে, আজও হচ্ছে। অনেক ধনী সাধারণ মঞ্চ চালাতে গিয়ে দেউলিয়া হয়ে গেছেন, তা শ্রদ্ধার সঙ্গে যেমন স্মরণীয়, সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্মর্তব্য যে নাট্যচর্চার ব্যবসায়িক দিক ছাড়াও আর একটা লক্ষ্য রয়েছে—সেটা হল নাট্যানুশীলনের প্রগতি, এবং লোক-শিক্ষা এবং সংস্কৃতির অগ্রগতি। ঐ লক্ষ্য পূরণের জন্য এবং সত্যিকার নাট্যপ্রতিভার নিরংকুশ বিকাশের জন্য নাট্যমনীষীরা কামনা করতেন একটি জাতীয় নাট্যশালা। এই কামনাই ধ্বনিত হয়েছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র এবং নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর চিন্তা-ভাবনায় এবং আকাঙ্ক্ষায়। পদ্মভূষণ খেতাব প্রত্যাখ্যান করে শিশিরকুমার দাবী করেছিলেন একটি জাতীয় নাট্যশালার। গত ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন দিবসে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়-এর আমন্ত্রণে জওহরলাল নেহেরু জাতীয় নাট্যশালা রূপে ঘোষিত রবীন্দ্র স্মরণী (বর্তমান নাম রবীন্দ্র সদন) সৌধের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। আমাকে সভাপতি করে গঠিত সর্বদলীয় নাট্য-সম্মিলন আয়োজিত এক তীব্র আন্দোলন অভিযানের ফলে দীর্ঘ পাঁচ বৎসর অন্তে ১৯৬৬ সালে ঐ রবীন্দ্র সদনের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। তাতে টেপ রেকর্ডে বিঘোষিত শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর শুভেচ্ছাবাণীতেও রবীন্দ্র সদনকে জাতীয় নাট্যশালারূপে উল্লেখ করা হয়। সত্যজিৎ রায়, ও সি গাঙ্গুলী, বিষ্ণু দে, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, দৈবাল গুপ্ত, ডঃ ত্রিগুণা সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষী সমেত আমরা বাংলার সর্বদলীয় শিল্পীরা একটি স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে রবীন্দ্র সদনকে 'নির্বাচিত স্বয়ংশাসিত জাতীয় নাট্যশালা' করার জন্য দাবী করি এবং আরও দাবী করি যে, 'রবীন্দ্র স্মরণী'র পরিচালনভার একটি নির্বাচিত স্বয়ংশাসিত সংস্থার হাতে অর্পণ করা হোক। রেজেস্ট্রীকৃত নাট্য, নৃত্য ও সংগীতসংস্থাগুলি থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা এই জাতীয় নাট্যশালার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিচালনার নীতি নির্ণীত হোক। পরিচালকমণ্ডলীতে নাটক, নৃত্য ও সংগীতের দেশবিখ্যাত প্রতিভাধরদের সদস্য নির্বাচিত করা হোক। সরকার সমগ্র দেশের আস্থাভাজন এই নির্বাচিত স্বয়ংশাসিত সংস্থার হাতে জাতীয় নাট্যশালার আর্থিক দায়ভার গ্রহণ করুন। একমাত্র 'অডিট' করা ভিন্ন সরকারের এই সম্পর্কে আর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। দেশের শিল্পমানসের উপর সরকারের এই আস্থা দেশবাসী অবশ্যই দাবী করতে পারে।'

আমি সিরাজের বেগম / সন্ধ্যা রায়

নিশিকন্যায় / মিঠু মুখোপাধ্যায়

প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার কর্তৃক মনোনীত রবীন্দ্রসদনের প্রথম কার্যনির্বাহক সমিতির প্রথম সভাতেই উক্ত দাবীর মূলনীতি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অদ্যাবধি তা কার্যকরী হয়নি। আজ পর্যন্ত এর একমাত্র ঘোষিত লক্ষ্য 'প্রোমোটিং দি কজ অফ কালচারাল এডুকেশন ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল—পারটিকুলারলি ইন দি ফিল্ডস অফ ড্যান্স, ড্রামা এ্যান্ড মিউজিক।' সরকার মনোনীত সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত সাংস্কৃতিক সংস্থা কখনো জাতীয় নাট্যশালা হতে পারে না। জাতীয় নাট্যশালাকে নৃত্য, নাট্য ও সঙ্গীতের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান হতে হবে। এই মতবিরোধের ফলে এবং অন্যান্য সংকীর্ণ মনোভাবের প্রতিবাদে আমি ঐ কার্যনির্বাহক সমিতি থেকে গত ১৬ নভেম্বর পদত্যাগ করেছি। একশো বছরের মধ্যে আমরা একটি জাতীয় নাট্যশালা অর্জন করতে পারিনি—এটা জাতীয় কলঙ্ক।

আশা করি রবীন্দ্রসদনকে বাংলা সাধারণ নাট্যশালার বর্ষব্যাপী উৎসবকাল মধ্যেই উপরোক্ত দাবী অনুযায়ী একটি জাতীয় নাট্যশালায় পরিণত করে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর অন্তিম কামনা ও জওহরলাল নেহেরু, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ঘোষণার মর্যাদা রক্ষা করবেন।

কি সাধারণ মঞ্চ কি অসাধারণ মঞ্চ, আমাদের মঞ্চজগত সম্পর্কেই একটা প্রচণ্ড দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল বর্তমান নাট্যশতাব্দীর শেষপাদে। বৃটিশ শাসনকালের কুখ্যাত নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন স্বাধীন ভারতের সংবিধান অনুযায়ী বাতিল গণ্য হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গে গত ১৯৬২ সালে তদানীন্তন কংগ্রেসী সরকার ড্রামাটিক পারফরমেন্স বিল' এনে পশ্চিমবঙ্গে অভিনয়ের জন্য প্রত্যেকটি নাটক—তা সে রবীন্দ্রনাথেরই হোক আর সেকসপীয়ার-এরই হোক—রাম শ্যাম যদু মধু যারই হোক পুলিশের অনুমোদনসাপেক্ষ, এই আইন করতে বদ্ধপরিকর হন। প্রতিটি নাট্যাভিনয়ের জন্য উচ্চ লাইসেন্স ফি নির্দেশিত হয়। বাংলার শিল্পীরা দলমত নির্বিশেষে এই দুঃশাসন রোধে আমাকে সভাপতি করে একটি নাট্যসংকট প্রতিরোধ কমিটি গঠন করেন। ১৯৬৩ সালেই কমিটির প্রবল আন্দোলনের চাপে সরকার ঐ বিল প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন।

অনেক উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে বাঙালীর (১৭৯৫-১৯৭২) ১৭৭ বৎসরব্যাপী নাট্যসাধনা এগিয়ে চলেছে। শতাব্দী অতিক্রান্ত এই নাট্যসাধনায় প্রত্যেক নাট্যপ্রচেষ্টাই পরবর্তী পদক্ষেপকে সাফল্য অথবা অসাফল্যের মধ্য দিয়ে শক্তিশালী করেছে। বাংলা সাধারণ নাট্যশালার শতবর্ষ পূর্তি উৎসবে আমরা যেন আমাদের অতীত ঐতিহাসিক শ্রদ্ধা এবং প্রীতির সঙ্গে স্মরণ করি এবং অনন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা পোষণ করি। পঁচিশ বৎসর পূর্বে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি সত্য কিন্তু দারিদ্র্যকে আমরা এখনও জয় করতে পারি নি। অসীম দারিদ্র্যই আমাদের সর্বগুণনাশক হয়ে রয়েছে। এই প্রসঙ্গে একটি প্রাচীন সংস্কৃত সুভাষিত পরিবেশন করছি।

'কাব্যং হি দর্শনম্ হন্তি
কাব্যং গীতেন হন্যতে
গীতম্ নাট্য বিলাসেন
সর্বং হন্তি বুভুক্ষতা।।'

অর্থাৎ দর্শনের আসরে কাব্যচর্চা সুরু হলে দর্শনের নাশ হয়। কাব্যের আসরে সংগীত সুরু হলে কাব্যের আসর নাশ হয়। সংগীতের আসরে নাট্যাভিনয় সুরু হলে সংগীতের আসর নাশ হয়। কিন্তু দর্শনকাব্য সংগীত নাটক সবকিছুর প্রাণ নাশ হয় বুভুক্ষতায়। পেটে ক্ষুধার জ্বালা থাকলে এসব কিছুই হবে না। অসীম দারিদ্র্যের জন্যই আমাদের সর্ববিধ জাতীয় অগ্রগতি ব্যাহত হয়ে রয়েছে। অপরিসীম জীবনযন্ত্রণা দূর করতে ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাই একমাত্র পথ বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে বাংলার নাটক ও নাট্যশালা জাতিকে সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছিল। সুতরাং এ আশা আমরা অবশ্যই করবো যে, দেশে সমাজতন্ত্রের জমি তৈরী করার কাজেও বাংলার নাটক ও নাট্যশালা আত্মনিয়োগ করবে।

'বাংলা সাধারণ মঞ্চ ও আমি'—'অমৃত' সম্পাদক নির্দেশিত এই নাট্যপরিক্রমা আমার কথাতেই ভরে গেল। আমার জন্ম বঙ্গাব্দ ১৩০৬। 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবস'। এখন আমার বয়স চয়াত্তর। যদি স্বাস্থ্য সময় ও সুযোগ পাই, অপরাপর সমকালীন নাট্যকারদের নাট্যাবদান যথাশক্তি বর্ণনা করে ধন্য হওয়ার কামনা রইল।

স্বাধীনতাসংগ্রামী অতীতকে নমস্কার করছি। স্বাধীনতা উদ্ভাসিত বর্তমানকে বরণ করছি। সমাজতান্ত্রিক ভবিষ্যৎকে অগ্রিম প্রণাম জানাচ্ছি। জয়হিন্দ।

২০শে নভেম্বর, ১৯৭২।

কথাটা উঠেছে 'কলকাতা ৭১' নিয়ে। কিঞ্চিৎ কপাল কুঁচকে কলকাতার জনৈক প্রখ্যাত সমালোচক লিখেছেন, অনেকটা এই ধরনের : মৃণাল সেন একি করলেন? হাতে ক্যামেরা মজুত থাকতে ক্যামেরার কথা ভুলে গিয়ে ভদ্রলোক ছবিতে এতো লিখিত শব্দের— শব্দ ও বাক্যের— আশ্রয় নিলেন কেন?

যাঁরা 'কলকাতা ৭১' দেখেন নি উপরোক্ত অভিযোগ শুনে তাঁদের মনে অবশ্যই একটা সন্দেহ জাগতে পারে। তবে কি মৃণাল সেন ছবি চলাকালীন দলের কাউকে দিয়ে ছবির পর্দায় কথাগুলো লিখিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে? অথবা কোনো যান্ত্রিক উদ্যোগে ঐ জাতীয় কিংবা উদ্ভট অন্যকিছু? কোনো শারীরিক উপস্থাপন?

ঐ ধরনের কোনো বেয়াড়া বা সৃষ্টিছাড়া ঘটনা পৃথিবীর অন্য কোথাও যে এক-আধটু ঘটছে না তা বলবো না। ঘটছে আমেরিকায়, অত্যন্ত ছোটো আকারে ঘটলেও ঘটছে। এবং উদ্যোগীরা তার নাম দিয়েছেন Expanded cinema। কিন্তু 'কলকাতা ৭১' যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন যে, এসব কিছুই এ-ছবিতে করা হয়নি। তাঁরা জানেন, ছবির সবটাই, আদ্যোপান্ত সব কিছুই, ছবির ফিতেয় নিধৃত হয়েছে এবং তাই তাঁরা দেখেছেন ছবির পর্দায়।

তাহলে অভিযোগটা কিসের? এবং কেন?

অভিযোগকারী যেসব লেখার কথা বলছেন বাস্তবিকই সেসব লেখা রয়েছে ছবিতে। নানা জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে। ছবির নির্মাতা হিসেবে আমার মনে হয়েছে ওগুলোর প্রয়োজন আছে, লিখিত আকারেই তা ছবিতে লাগাতে চেয়েছি আমি। এবং তাই করেছি। অর্থাৎ অংকনশিল্পীকে দিয়ে প্রয়োজনমতো ছোটো বড়ো করে সাজিয়ে লিখিয়েছি, প্রয়োজনমতো কোনোটা সাদায় এবং কোনোটা বা কালোয়। এবং যেহেতু ছবি অর্থাৎ ফিল্ম বলতে বুঝি ক্যামেরায় গৃহীত দৃশ্যবস্তু ও শব্দযন্ত্রে গৃহীত শব্দের সংকলন, তাই অংকনশিল্পীর আঁকা লেখাগুলোকে ক্যামেরার সামনে দাঁড় করিয়েছি। ক্যামেরাকে প্রয়োজনমতো এগিয়ে দিয়েছি বা পিছিয়ে এনেছি অথবা আড়াআড়িভাবে বা ওপর থেকে নীচে কিংবা নীচে থেকে ওপরে ঘুরিয়েছি। শেষ পর্যন্ত সম্পাদনার কাজে লাগিয়েছি তোলা ছবিগুলোকে। অর্থাৎ যা ঘটে থাকে বা ঘটানো হয়ে থাকে ফিল্ম তৈরির নির্মাণশালায় তাই করেছি। ক্যামেরাকে কাজে লাগানো হয়েছে প্রতিটি মুহূর্তে। তবু এই অভিযোগ কেন? কেন বলা হচ্ছে ক্যামেরাকে ভুলে গিয়ে মৃণাল সেন অত্যন্ত অন্যায় করেছে?

তবে কি অভিযোগকারী বলতে চান ক্যামেরায় কি কি তোলা যেতে পারে তার একটা ফর্দ আছে ফিল্ম-ইসথেটিকস-এর কেতাবে? এবং যেহেতু আমাদের আগেকার ফিল্ম-নির্মাণকারীরা লিখিত শব্দের ছবি তেমন একটা তোলেন নি তাই কি আমাদেরও তোলা বারণ? মানুষ পশুপাখী পথপ্রান্তর জলজঙ্গল কলকারখানা স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত রকম দৃশ্যবস্তু তোলায় অভিযোগকারীর কোনো আপত্তি নেই, যতো আপত্তি লিখিত শব্দের ব্যবহারে?

আপত্তি উঠেছিল বহু আগেও যখন গ্রিফিথ সাহেব ক্লোজ-আপ-এর ব্যবহার করলেন তাঁর ছবিতে। অভিযোগকারীরা তখন রীতিমতো চেঁচাতে শুরু করলেন, বললেন : এ কি অন্যায় কথা! গোটা মানুষ না দেখিয়ে শুধু হাতের মুঠো দেখানো হচ্ছে কেন? ক্যামেরাকে এগিয়ে পিছিয়ে আংশিক ছবিতে এতো বড়ো করে সমস্ত পর্দা জুড়ে দেখানোর অর্থ কি? কিন্তু 'অনর্থ'র জয় হোলো শেষ পর্যন্ত, অভিযোগকারীরা তলিয়ে গেলেন। আবার ওঁরা ভেসে উঠলেন, কয়েক বছর পরে, দল পাকালেন, বললেন : চলমান ছবিতে আবার শব্দ কেন? ফিল্ম কেন সবাক হবে? কিন্তু দেখা গেল ফিল্ম শেষ পর্যন্ত সরব হোলো এবং অভিযোগকারীরা আবার দমে গেলেন। এবং ফিল্মের ইতিহাস ঘাটলে আমরা দেখতে পাবো যে ছোটো-বড়ো এমনি অভিযোগ প্রায় সব সময়েই এক-আধটু শোনা যাচ্ছে নানা মহল থেকে এবং দেখতে পাচ্ছি প্রায়ই এই অভিযোগ বাতিল হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ ফিল্ম এগিয়ে চলেছে। যেমন এগিয়ে চলেছে বিজ্ঞান।

লিখিত শব্দ ব্যবহার করার জন্যে বকুনি খেয়েছি। লম্বা চওড়া বকুনি নয়, মৃদু। কিন্তু ঐ হালকা বকুনির পিছনে বেশ দাঁড়াগোছের শাসন লুকিয়ে আছে। চালু ব্যবস্থার মধ্যে আটকে রাখার শাসন। এবং বলা বাহুল্য, এই শাসনকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে চাই বলেই তুচ্ছ একটা অভিযোগ তুলে ধরেছি। অভিযোগটি আপাতদৃষ্টিতে Slight হতে পারে, কিন্তু তার পিছনে যে-শক্তিটি কাজ করছে সেই শক্তির মুখোমুখি হওয়ার প্রয়োজন আমি আজ আমার সমস্ত বিশ্বাস আর অনুভূতি দিয়ে বুঝতে পারছি। মুখোমুখি হওয়া মানে ঝগড়া করা, আপোষহীন ঝগড়া, ফিল্মের ভাষায়, অর্থাৎ ফিল্মের মধ্য দিয়ে। অবশ্যই এই ব্যাপারে একটা বিশেষ ধরনের প্রবণতা দেখা দেওয়া সম্ভব। অর্থাৎ বাড়াবাড়ি করা। ঝগড়া করতে গিয়ে, লড়াই করতে গিয়ে হয়তো কিঞ্চিদধিক বাড়াবাড়ি করে ফেলবো, হয়তো যন্ত্রপাতির ব্যবহারগুলো একটু জাঁকিয়ে করে বসবো, অভিযোগকারীদের পবিত্র ঐতিহ্যের ওপর হামলা হয়তো বা কিঞ্চিৎ চড়া মেজাজেই হবে, হয়তো বা সবকিছুই সব সময়ে সমর্থনযোগ্য হবে না, তবু বলবো এ-লড়াই চলবেই। এ-লড়াই সমস্ত রকম স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই, এ-লড়াই শেষ পর্যন্ত অচলায়তনের বিরুদ্ধে লড়াই, এ-লড়াইয়ের বিস্তার সমাজের সর্বস্তরে।

তপন সিংহ ভারতের সফল চিত্র পরিচালকদের অন্যতম। রুচিসম্মত পরিচ্ছন্ন ও উচ্চাঙ্গের ছবি নির্মাণে তিনি সিদ্ধহস্ত। দর্শক সব সময়, তপন সিংহের ছবির প্রতি মানসিক দিক দিয়ে একাত্মবোধ করে এবং কিছু না কিছু নিজের কথা খুঁজে পায়। সমকালীন ছবিতেও তিনি একজন অন্যতম পথ-প্রদর্শক। স্থিতধী চিন্তার এমন বলিষ্ঠ পরিচালক সমগ্র ভারতে খুব বেশী নেই। তপন সিংহের সামগ্রিক চলচ্চিত্র চিন্তার কিছু ভাবনা এখানে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তুলে ধরা হল।

প্রশ্ন: ১৯৪৬ সালে কলেজ জীবন থেকে বেরিয়ে হঠাৎ চলচ্চিত্রে যোগদানের কথা ভাবলেন কেন?

উত্তর: ভাগলপুরে স্কুলে পড়ার সময় চার্লস ডিকেন্সের 'এ টেল অব টু সিটিজ' ছবিটি দেখে আমার মনে প্রথম চলচ্চিত্র সম্পর্কে উৎসাহ বা আকর্ষণ জাগে। পরবর্তী সময়ে কলকাতায় যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পড়ার সময় অনেক বিদেশী ছবি দেখতে সুরু করি। সেই সময় আমার মনে চলচ্চিত্রে যোগ দেওয়া ও ভবিষ্যতে ছবি করার চিন্তা আসে। এই ভাবেই একদিন কলেজ ছেড়ে নিউ থিয়েটার্সে সাউন্ড বিভাগে যোগ দেই। চলচ্চিত্রে যোগ দেওয়া হঠাৎ নয়—মানসিক প্রস্তুতি অনেকদিনের।

প্রশ্ন: প্রথম ছবি 'অঙ্কুশ' করতে গিয়ে আপনি কি কি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন? পরবর্তী ছবি 'উপহার' এবং 'টনসিল' এর ক্ষেত্রে সমস্যা কি একই রকম ছিল?

উত্তর: 'অঙ্কুশ' ছবি করার পরিকল্পনা ও উদ্যোগ কয়েকজন বন্ধু নিয়ে সুরু করি। আমাদের নিজেদের সামান্য টাকা ছিল সম্বল। অসম্ভব কষ্ট করতে হয়েছিল ছবি সম্পূর্ণ করতে আর ডিস্ট্রিবিউশনের ঝামেলা ছিল সাংঘাতিক। কেউই ছবিটি নিতে চাননি, চলবে না বলে। অবশ্য তাঁদের কথাই ঠিক হয়েছে, ছবিটি চলেনি। কিন্তু আজ আমার মনে হয়—আর কিছুদিন যদি ছবিটি হাউসে প্রদর্শিত হত তাহলে রেজাল্ট এতটা খারাপ হয়তো হত না। 'অঙ্কুশ' ছবির ঋণ আমাকে দীর্ঘদিন অর্থ সঞ্চয় করে শোধ করতে হয়েছে। সেদিন নতুন ছবি করতে এসে নানা বাধা ও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। পরবর্তী ছবি করতে গিয়ে একই অবস্থা। কারণ প্রথম ছবি অসফল হওয়ায় সুনামের বদলে দুর্নামই হয়েছিল। তবে—'অঙ্কুশ' ছবি ফ্লপ করার পর এই উপলব্ধি এল যে ছবি করতে গিয়ে দর্শক নিতে পারে এমন ছবিই করা দরকার।

প্রশ্ন: আপনার 'কাবুলীওয়ালা' ছবি সাফল্য, সম্মান সবই এনে দিয়েছে। এই ছবিটি করার পূর্বে আপনার প্রস্তুতি ও চিন্তা পূর্ববর্তী ছবিগুলির চিন্তাধারা থেকে কি স্বতন্ত্র ছিল?

উত্তর: 'অঙ্কুশ' ছবিতে আঘাত পাবার পরই আমার গোটা চিন্তাধারাই পাল্টে যায়। মাঝখানে, ভেবেছিলাম ছবি ছেড়ে অন্য কোন চাকরী নিয়ে চলে যাই। শেষ পর্যন্ত থেকে গেলাম। তখনই ঠিক করলাম এমন ছবি করতে হবে যা দর্শক গ্রহণ করতে পারে, তাঁদের মনোরঞ্জন করতে না পারলে ছবি করার অর্থ কি? শুধু চলচ্চিত্রে আমার বিশ্বাস নেই—তার থেকে 'অনেস্ট এন্টারটেনমেন্ট'-এর সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করার কথা ভাবলাম। আর তারই ফলশ্রুতি 'কাবুলীওয়ালা'। কাবুলিওয়ালার সাফল্য আমার সেই চিন্তাধারাকে শক্তি দিয়েছে।

প্রশ্ন: 'কাবুলীওয়ালা' ছবির পর আপনার ক্রমাগত সাফল্যের জয়যাত্রা। এবার নতুন ছবি নিয়ে আপনি কোন কোন দিক-গুলি সবার আগে ভাবেন এবং কী কী সমস্যা আপনাকে বিব্রত করে?

উত্তর: 'কাবুলীওয়ালা' ছবির পর অনেক সমস্যাই দূরে চলে যায়। ছবি করা বা ডিস্ট্রিবিউশন এসব নিয়ে আর কোন চিন্তা থাকে না। সমস্যা এবার অন্যদিকে। ভাল ছবি করা, বিভিন্ন দিকের ঘটনা নিয়ে ছবি করা, নানা চরিত্র সৃষ্টি করা [illegible] প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে [illegible] নতুন [illegible] সৃষ্টি। কারণ মানুষের [illegible] এবং পরিবর্তনশীল। তাই [illegible] প্রধান সমস্যা বলা যেতে [illegible] ছবি-গুলিতে তাই চেষ্টা [illegible] নানা ধরনের চরিত্র উপস্থিত করার।

প্রশ্ন: আপনার 'আপনজন', 'সাগিনা মাহাতো', 'এখনই' ছবিগুলি সমকালীন সমাজজীবনের কথা বলছে। এর পূর্ব পর্যন্ত এই ধরনের ছবি আপনি করেননি। এই সমকালীন ছবি করার চিন্তা ও মানসিকতা বিদেশী চলচ্চিত্রের গতি প্রকৃতির প্রভাব-প্রসূত নাকি বর্তমান জীবন যন্ত্রণাই আপনাকে প্রলুব্ধ করেছে?

উত্তর: বিদেশী চিন্তায় আমি প্রভাবান্বিত নই। বর্তমান জীবন যন্ত্রণাই আমাকে সমকালীন ছবি করার প্রেরণা দিয়েছে। 'আপনজন' করার মূলে কারণ কলকাতার রাজনৈতিক যন্ত্রণা। আমি তখনকার কলকাতার অল্পবয়স্ক ছেলেদের দেখে এই ছবি করার কথা ভেবেছি। যদিও সবটা হয়তো সফল হয়নি। তেমনিভাবেই 'সাগিনা মাহাতো' এবং 'এখনই'।
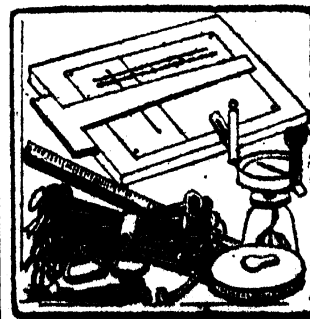
রাজশ্রী বসু / ফটো : অমৃত

প্রশ্ন :—এই সমকালীন ছবি করার পথে কী ধরনের সমস্যা আপনাকে বিব্রত করেছে? এই ছবিগুলির সমস্যা কি পূর্ববর্তী ছবিগুলি থেকে স্বতন্ত্র?

উত্তর :—সমকালীন ছবি করতে গিয়ে সবচাইতে বাধা মনে হয়েছে যে সমকালীন জীবনের প্রকৃত সত্য কথা ছবিতে দেখাতে পারছি না। নানা মহলের চাপ এবং অপ্রিয় সত্য বলতে গেলে অন্যান্য অসুবিধা। 'সাগিনা মাহাতো' করতে গিয়ে রাজনৈতিক চাপ এসেছে, যে কারণে আমি যে-রকম ভেবেছিলাম, তেমন ছবি করতে পারি নি। আমায় কম্প্রোমাইজ করতে হয়েছে। হয়তো ছবি হয়েছে কেবল না। অনেক সময় মাইণ্ডের সবকিছু করতে না পারার বেদনা আছে।

প্রশ্ন :—ইদানিং আপনি ছবিতে নিজেই সংগীতের দায়িত্ব নিচ্ছেন। এই বিষয়ে আপনার মূল লক্ষ্য কি এবং চলচ্চিত্রে সংগীতের ব্যবহার সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?

উত্তর :—সংগীতের দায়িত্ব নিজের হাতে নেবার মূল কারণ হল—সমগ্র ছবিতে সংগীতের সংগে অভিনয়, ঘটনা ও বক্তব্যের মধ্যে একাত্মবোধ গড়ে তোলার জন্য। কারণ এই হারমনি গড়ে না তুললে সংগীতের ব্যবহার আর ছবি ভিন্ন গতির হয়ে পড়ে। চলচ্চিত্রে সব সময় সংগীতের প্রয়োজন হয় না বা যে কোন সিকোয়েন্সে যে কোন রকমের সংগীতযোগ ভ্রান্ত বলেই আমার ধারণা। তাই আমি সংগীত সম্পর্কে সচেতন হয়ে পড়ি এবং নিজেই সেই দায়িত্ব নিয়ে চলেছি।

প্রশ্ন :—আপনি নিউ থিয়েটার্সের শেষ সময়কালের কুশলী। নিউ থিয়েটার্সের প্রথম যুগের মতো এখানেই হিন্দী ছবি কেন করছেন না? এখানে হিন্দী ছবি করার অসুবিধা আছে না বোম্বাই সম্পর্কে আপনার কোন ভাবনা রয়েছে?

উত্তর :—সে যুগে নিউ থিয়েটার্সের ব্যানারে যে কোন ছবি চলতো। ওই ব্যানারের দারুণ জনপ্রিয়তা ছিল। তাই হিন্দী ছবি করায় কোন অসুবিধা ছিল না। কিন্তু এখন আর নিউ থিয়েটার্সের মত সেরকম ব্যানার নেই। আর বর্তমান কালে স্টার-ব্যানার প্রধান। আমাদের কলকাতার স্টারদের নিয়ে হিন্দী ছবি করলে তা চলবে না। সেখানে বোম্বাইয়ের খ্যাতনামাদের অবশ্যই দরকার। অন্ততঃ কয়েক বছর তো বটেই। ইতিমধ্যে আমাদের ছেলেমেয়েরা হিন্দী ছবি করে মোটামুটি তৈরী হয়ে যাবে তখন হয়তো ভবিষ্যতে হিন্দী ছবি করা সম্ভব। বোম্বাইতে একটি হিন্দী ছবি করেছি কিন্তু এখন আর ওখানে নতুন কিছু করার পরিকল্পনা নেই। কারণ আমি কলকাতাতেই ছবি করতে চাই।

প্রশ্ন : সম্প্রতি আপনি একটি হিন্দী ছবি বোম্বাইতে করে এলেন। বোম্বাই এবং কলকাতায় নতুন একটি ছবি করার সমস্যা কি একই ধরনের?

উত্তর : না, এক রকমের নয়। বোম্বাইতে ছবি করার টেকনিক্যাল সুযোগ সুবিধা অনেক। ওদের স্টুডিওগুলি অনেক উন্নত। কলকাতার স্টুডিওর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, আর কতদিন যে এই অবস্থায় কাজ করা যাবে সে বিষয়ে আমি চিন্তিত। বোম্বাইতে ছবি [illegible] তারকাদের

কাজের 'ভেট' নিয়ে। যেটা কলকাতায় অনদ্‌-ভূত হয় না।

প্রশ্ন : আপনার 'আঁধার পেরিয়ে' ছবির লোকেশন কুলু উপত্যকায় নিয়ে গেলেন কেন? এটা কি ছবির জন্য অনিবার্য ছিল?

উত্তর : এটা ছবির জন্য প্রয়োজন ছিল। চিত্রনাট্য সেভাবে তৈরী হয়েছে। 'আঁধার পেরিয়ে' ছবিতেও সমকালীন কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন : ভবিষ্যতে কোন পরীক্ষামূলক ছবি করার কথা কি ভাবছেন? বাঙলা ছবির ভবিষ্যত নিয়ে কি ভাবছেন?

উত্তর : 'অংকুশ' করার পর আর ভাবিনি। তবে এখন সব সময় ভাবছি। এ সম্পর্কে আমার সাজেশন হল—সরকারের সাহায্য ছাড়া এ ধরনের ছবি করা সম্ভব নয় সরকার যদি কয়েক লক্ষ টাকার একটা তহবিল পরীক্ষামূলক ছবির জন্য রাখেন তাহলে নিশ্চিন্তে ভাল পরীক্ষামূলক ছবিতে হাত দেওয়া যায় এবং সেই ছবি বিদেশেও দেখানো যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি। কয়েকজন ভাল পরিচালককে সরকার এরকম সুযোগ দিতে পারেন। বাংলা ছবির ভবিষ্যত ভেবেও সরকারের এগিয়ে আসা উচিত। নতুন যাঁরা চিত্র-পরিচালনায় আসবেন, তাঁদের কষ্ট করেই এই দিকে এগুতে হবে, তাই সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা একান্তভাবেই প্রয়োজন বলে মনে করি।

(এই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন শ্যামল চক্রবর্তী)

১৯৫২ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী। দিনটিকে আমরা মনে রেখেছি নিশ্চয়ই। লগ্নটি আমাদের ক্রিকেট ক্যালেণ্ডারে লাল কালিতে চিহ্নিত হয়ে আছে। কারণ, দীর্ঘ উনিশ বছরের মনোভঙ্গের বেদনা ভুলে ওই দিনেই আমাদের ক্রিকেট প্রত্যাশা পূরণের আলো মেখে ঝলমলিয়ে উঠেছিল। অন্ধকার পেরিয়ে আলোর যুগে আসতে ভারতকে নয় নয় করে পঁচিশটি টেস্টম্যাচ খেলতে হয়েছিল। তবু পঁচিশ বারের সুযোগে টেস্ট ক্রিকেটে জেতা ছিল অসাধ্য। পঞ্চাশের দশকে পৌঁছেই ভারত অসাধ্য সাধন করে হারা-পার্টির খোলস ছেড়ে অবশেষে জেতা-পার্টির উত্তরীয়টি নিজের গায়ে জড়িয়ে নিয়েছিল।

সে এক অভূতপূর্ব কীর্তি, সন্দেহ নেই। ইংলণ্ডের বিপক্ষে টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম জয়। প্রথম বলেই ঘটনাটি ইতিহাসের পাতায় অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে ইংলণ্ড ও ভারত, দু দেশেই ক্রিকেটের সন্ধিক্ষকাল। ইংলণ্ড তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধাক্কা সামলাতে ব্যস্ত। আগের আমলের লেন হাটন, ডেনিস কম্পটন, সিরিল ওয়াসব্রুক এবং সদ্য প্রতিভাত তারকা গডফ্রে ইভান্স, আলেক বেডসারকে ঘিরে ইংলণ্ডের ক্রিকেটের পুনঃ সংস্কারের কাজ চলছে। আর আমাদের দেশে নাইডু, নিসার, ওয়াজির, নাজির, অমর সিংয়ের যুগ বিগত। মায় অতি বিশ্বস্ত বিজয় মার্চেণ্টও ১৯৫১-৫২ মরশুম সুরু হতে না হতেই স্বেচ্ছায় অবসর নিয়েছেন। দু দেশই তখন নতুন নতুন সামর্থ্যের আবির্ভাবের পথ চেয়ে আছে।

এমন সময় দলবল নিয়ে নাইজেল হাওয়ার্ড ভারতে এসে পৌঁছলেন। নেতা তিনি। সঙ্গে আরও ষোলজন। বেশির-ভাগই আনকোরা মুখ। যাঁদের মধ্যে টম গ্রেভনি, ব্রায়ান স্ট্যাথামকে উত্তরপর্বে বহু-বার এবং বিক্ষিপ্ত লগ্নে এলান ওয়াটকিন্স, ডন কেনিয়ান, রয় ট্যাটারসেল, ডেরেক স্যাকলটন প্রমুখকে টেস্ট ক্রিকেটের আসরে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল।

ইংলণ্ডের ক্রিকেট সেই পঞ্চাশের দশকের মুখে যদিও সদ্য থেমে যাওয়া যুদ্ধের জের কাটিয়ে সামলে উঠছিল তবুও পেস বোলিংয়ে তাদের ঘাটতি ছিল না। যে ঘাটতিতে ভারতীয় ক্রিকেটের অবস্থা হীনবীর্য হয়ে পড়ার উপক্রম ঘটেছিল। মহম্মদ নিশার নেই, সুঁটে ব্যানার্জিও কর্তৃপক্ষের অবিচারে উপেক্ষিত এবং অবসৃত। দাত্তু ফাদকারও তখন তেমন প্রস্তুত নন। কাজেই সিম্ বোলিংয়ের দৈন্য ঢাকার জন্যে দলের আক্রমণ সুরু করতে ডাক পেতেন অমরনাথ, হাজারে, সোহনী, ফাদকার, দিভেচা ও এন চৌধুরীরা। কিন্তু সত্যিকারের পেস বলতে যা বোঝায়, সে অস্ত্র এঁদের কারুর হাতেই ছিল না। তাই আক্রমণের মূল দায়িত্ব আপনা হতেই এসে পড়তো স্পিন বোলারদের হাতে। ঠিক যেমনটি ঘটছে আজকের দিনে।

সুখের কথা, ভাটার টানে ভারতীয় স্পিন বোলিংকে কোনো দিনই ভুগতে হয় নি। আজও নয়। নয় সেদিনেও। সেদিনে স্বমহিমায় সক্রিয় ছিলেন ভিনু মানকাদ। একাই একশো। এক পর্যায়ে পঁচিশটি টেস্টে ৩৪টি উইকেট (গড়ে ১৬-৭৯) নিয়ে ভিনু তাঁর অসামান্য ক্রীড়াকৃতির অম্লান পরিচয় রেখে দিয়েছিলেন। তার মধ্যে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত পঞ্চম টেস্টে ভিনু তো একাই এক ডজন শত্রুকে নিধন করেন। যার ফলে জয়, জয় থেকে আনন্দ ও আবেগে সারা ভারত সেই প্রথম সোচ্চার হওয়ার আকাঙ্ক্ষিত সুযোগ পায়।

মাদ্রাজে আসার ঠিক আগেই কানপুরের গ্রীণ পার্কে ইংলণ্ড জিতেছিল আট উইকেটে। তার আগের তিনটি টেস্টই অমীমাংসিত থেকে গিয়েছিল।

মাদ্রাজে খেলা হয় ৬ই, ৮ই, ৯ই, ১০ই ফেব্রুয়ারী। অসুস্থ নাইজেল হাওয়ার্ডের বদলে ডোনাল্ড কার ইংলণ্ডকে নেতৃত্ব দেন। আর নতুন পুরানো খেলোয়াড় সংমিশ্রণে গড়া ভারতের হাল ধরেন বিজয় হাজারে। পাঁচ দিনের খেলা চার দিনের অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হলো কেন? কারণ অবশ্যই ছিল। প্রথম দিনেই খবর রটে, ইংলণ্ডেশ্বর ষষ্ঠ জর্জ দেহ রেখেছেন। তাই ৭ই ধার্য হয় শোকদিবস রূপে।

একদিকে সম্রাটের তিরোধানে শোক, অন্যদিকে ভারতীয়দের ক্ষুরধার আক্রমণের 'শক', এই দুয়ের টানাপোড়েনে পড়ে ইংলণ্ড নাজেহাল হয়ে যায়। প্রথম ইনিংসে যদিও বা তাঁরা ২৬৬ করতে পেরেছিলেন দ্বিতীয় দফায় ১৮৩ রানেই আটকে পড়েন। আর অবস্থা অনুকূল জেনে ভারতীয়েরা খোশ মেজাজে ব্যাট চালিয়ে এক ইনিংসেই রাণ তোলেন ন উইকেটে ৪৫৭।

খোশ মেজাজে থাকলে বিত্তবান বড় ঘরের কর্তামশাই যেমন আত্মীয় পরিজনের উদ্দেশ্যে অনুগ্রহ বিতরণ করেন পলি উমরিগড় ও পঙ্কজ রায়ের ব্যাটও সেই মেজাজে মাদ্রাজে রানের মিষ্টান্ন বিতরণ করেছিলেন গ্যালারিতে জমাট বাঁধা দর্শকদের উদ্দেশ্যে। দু জনেই একটি করে সেঞ্চুরী করেন। আর ওঁদের দেখে ফাদকারের মাথার পোকাটিও নড়ে চড়ে তাঁর হাতের ব্যাটটিকে নাড়া দেয়। ফলে ফাদকারের হাতিয়ারটিও একষট্টির খোরাক যোগাতে ভোলে নি।

মজার কথা, মাদ্রাজের এই টেস্ট উপলক্ষে প্রথমে নির্বাচিত এগারো জনের দলে পলি উমরিগড়ের ঠাঁই হয় নি। অধিকারী অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁর ডাক পড়ে। আর সেই ডাকে সাড়া দিয়েই পলি উমরিগড় গুণে গুণে ১৩০ করে দলের আর সকলের মায় পঙ্কজেরও (১১১) ব্যক্তিগত স্কোরকেও ডিঙিয়ে যান। সুযোগ যে কখন কার বরাতে আসে তা কে বলতে পারে! তবে পড়ে পাওয়া সুযোগটিকে বজ্রমুঠি বাগিয়ে ধরে রাখার সাধ্য থাকা চাই বৈ কি। পলির সে সামর্থ্য ছিল। তাই ১৯৫১-৫২র পর আর তাঁকে পেছন পানে তাকাতে হয় নি। তাকিয়েছেন শুধু সামনের দিকে। সেদিনের উঠতি পঙ্কজ মাদ্রাজে আসার আগে বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ণ স্টেডিয়ামেও ১৪০ করেছিলেন। বলবার কথা এই যে ওই পর্যায়ের টেস্টে পঙ্কজ রায় ও দলনায়ক বিজয় হাজারে ছাড়া আর কোনো ভারতীয় একাধিক সেঞ্চুরী করতে পারেন নি।

টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের প্রথম জয়ের মুহূর্তে আরও একজন বাঙালী ক্রিকেটারের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। তিনি হলেন জাতীয় দলের উইকেটরক্ষক প্রবীর সেন। দু ইনিংসে পাঁচ পাঁচজনকে স্টাম্প আউট করে প্রবীর সেন ওই ম্যাচে মানকাদের হাতে গড়া মরণ ফাঁদে ইংলণ্ডের রথী মহারথীদের জড়িয়ে ধরেন।

সেবার মাদ্রাজে খেলা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই কোন্ দল যে শ্রেষ্ঠতর তার হদিশ মিলে যায়। ফাদকার তিন রাণের মধ্যেই লোসনকে ফিরিয়ে দেন। স্পুনার, রবার্টসন ও গ্রেভনি প্রাথমিক ধাক্কা সামলে দিলেও দফায় দফায় তাঁরা বিচ্ছিন্ন হওয়া মাত্রই ভিনু মানকাদের বিশাল ছায়া (৫৫ রাণে ৮ উইঃ) ইংলণ্ডের অস্তিত্বকে গিলে ফেলে।

তারপর দ্বিতীয় ইনিংস। ভিনু তো আস্তিন গুটিয়ে তৈরীই (৫৩ রাণে ৪ উইঃ) ছিলেন। এবার আবার পাশে পান অফ-স্পিনার গোলাম আমেদকে। ন্যাটা ভিনুর

ছল চাতুরীর শেষ ছিল না। একা তাঁকে সামলাতেই ইংলেণ্ডের ব্যাটসম্যানেরা অস্থির। তার ওপর আবার গোলাম (৫৭ রানে ৪) গোদর! কাজেই অবস্থাটা অনুমেয়।

বিজয় হাজারের আনন্দের পেয়ালা ওই লগ্নে নিশ্চয়ই সান্তনা ও তৃপ্তিতে ভরে উঠেছিল। হাজারের মুখেই বিজয়ী দল-নায়কের মনের কথাটি বরং জেনে নেওয়া যাক।

অনেক দিন পর ঠোঁটের ডগায় আনন্দ-পেয়ালাটিকে ঠেকিয়ে নেওয়ার ফাঁকে বিজয় হাজারে বলেছেন ঃ বিজয়ী দলকে নেতৃত্ব দেবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমারই। দলের সবাই ফিল্ডিংয়ে প্রাণপাত করেছেন। জয় হাতের মুঠোয় জেনে তাঁরা জনে জনে অনুপ্রাণিত বোধ করেছেন। একটানা পঁচিশটি টেস্ট খেলার পর সেই আমাদের প্রথম জয়। জয়! বস্তুটি কি মিষ্টিই না! খুসীতে মন ভরে উঠেছিল বৈকি। কানপুরে হেরেও আমরা হাল ছেড়ে দিই নি। মাদ্রাজে সুযোগ আসতেই দু হাত বাড়িয়ে সেই সুযোগ আঁকড়ে ধরেছি। ভাবি, ভাগ্যদেবী আমার প্রতি কি প্রসন্নই না ছিলেন!"

আর এক লাল হরফের দিন ১৯৭১ সালের ২৪শে আগষ্ট। সেই মহালগ্ন যে লগ্নে ভারত ইংলণ্ডের মাটিতেই সব প্রথম ইংলণ্ডকে হারালো। সে দিনের সুখস্মৃতি আমাদের শিরায় শোণিতে বুঝি মিশে গিয়েছে।

মনে পড়ে, সুদূর ওভালে কি ঘটছিল সারা ভারতের মন ছিল সেই দিকেই। কান ছিল ইথার তরঙ্গে। ঘটনা ঘটছিল। নাটকও এগিয়ে চলছিল দ্রুতলয়ে। নাটকের আরম্ভ আগের দিন। চকিত লেগ, টপ্ স্পিন আর লুকানো গুগলির আয়ুধ হাতে রুদ্রমূর্তি চন্দ্রশেখর অপ্রতিরোধ্যপ্রায়। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে মাথা চাড়া দেওয়া ইংলণ্ড চন্দ্রশেখরের আক্রমণে (দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৮ রানে ৬ উইকেট) বিপর্যস্ত, অসহায়। গেল গেল আর্তনাদে ইংলণ্ডের শিবির ম্রিয়মাণ। শেষ পর্যন্ত তলিয়েই যেতে হলো। অবশেষে ইতিহাসের এক মহালগ্নে ওপারের ওভালে পণ্ডমাংকের উত্তেজনা যখন থিতিয়ে পড়লো এপারে তখন আনন্দ, উচ্ছ্বাসের তরঙ্গে ভেসে বেড়াবার পালা।

সুখবরটি শোনা মাত্র সারা দেশ খুসীতে নেচে উঠলো। ঘনীভূত আবেগ হলো শিথিল। উচ্ছ্বাসে উদ্বেল হলো জাতির অন্তরাত্মা। ঘরে ঘরে শাঁখ বেজেছে। মন্দিরে মঙ্গলধ্বনি। রাজপথে শোভা-যাত্রা। আর আলোর রোশনাই। ছেলে বুড়োর দল হুলায় গলায়। একে অন্যকে বাহুডোরে বেঁধেছে। বোমাবাজী পটকার শব্দে পরিপার্শ্ব সোচ্চার। হাউই উঠেছে ঊর্ধাকাশে। উড়ন্ত হাউইই তো মাটির মানুষের মনের জীবন্ত প্রতীক। মন বুঝি ওই মুহূর্তে হাউই হয়েই শূন্যে, মহাশূন্যে মিলিয়ে যেতে চেয়েছে।

সে এক আশ্চর্য অনুভূতি। শহর কলকাতার জীবনে সে অভিজ্ঞতা আরও বিচিত্র। তবে আনন্দঘন। অভিনব এই অভিজ্ঞতা। ফোটা ফুলের তাজা গন্ধের মতো তা মনমাতানো। কলকাতা তখন মিছিলের শহর। রাজনীতিকে অস্থিরতায়, সংঘর্ষ আর সংগ্রামে যার রক্ত-ক্ষরণ হচ্ছিল প্রতিক্ষণেই, সেই শহরও ওই লগ্নে নিজেকে ভুলে, নিজের পাপকে অস্বীকার করে অন্য মেজাজে অবগাহন করতে চেয়েছে। কল্লোলিনী কলকাতা সত্যিই পরমাশ্চর্য। ওই মুহূর্তে তার চেহারা ও চরিত্র দেখে বৈচিত্র্যের মধ্যে এক-তার শাশ্বত সত্যকে আবিষ্কার করেছি।
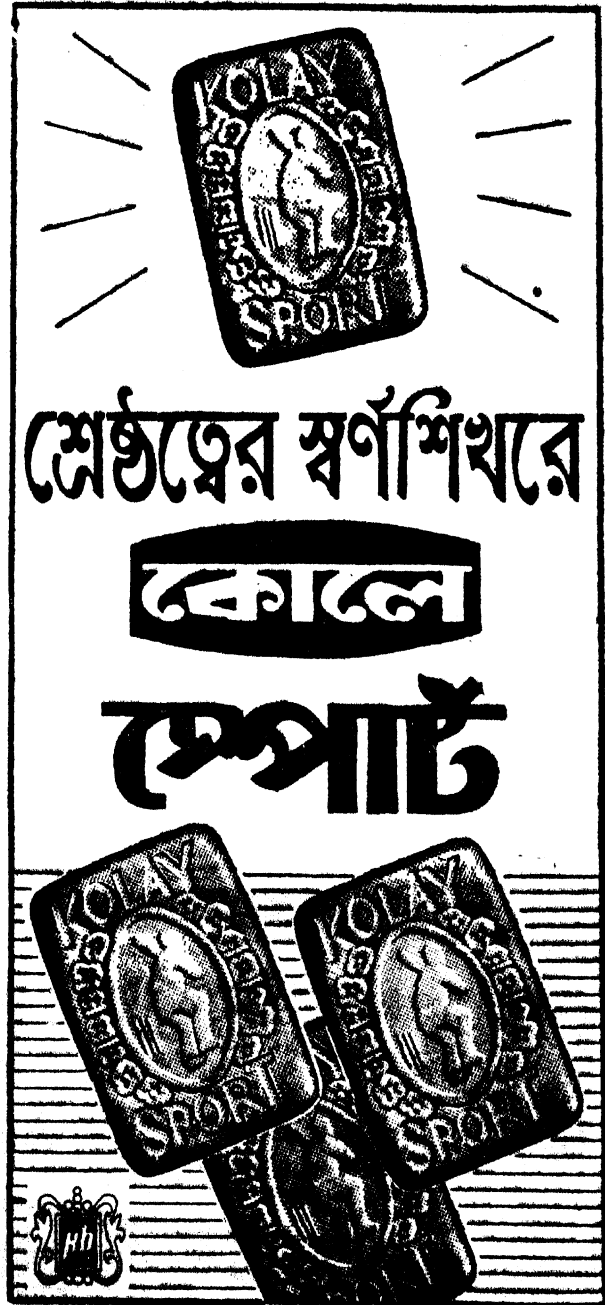
ওদিকে সাগর পারে ওয়াদেকারের তখন অবস্থাটা কি রকম?

আন্দাজ, অনুমানের প্রয়োজন নেই। একেবারে ঘোড়ার মুখেই খবর শুনুন। ওয়াদেকার বলছেন ঃ

"খেলা শেষ। তোমরাই জিতেছো। ওরা সবাই তোমাকে দেখতে চাইছে। একটিবার অলিন্দে এসে দাঁড়াবে না?"

কথাগুলি বলতে বলতে আমাদের সাজঘরে প্রথমে এসে ঢুকলেন কেন ব্যারিংটন। হ্যাঁ, প্রথম অভিনন্দন পেলাম তাঁরই কাছ থেকে। স্বর্গদূত যেন তিনি। এককালে ছিলেন ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়। তাই মনে হলো, ওঁর অভিমতে বুঝি সারা ইংলণ্ডেরই অভিনন্দন বাণী মিশে গেছে।

'আমি তখন সাজঘরে একটি কোচে আধশোয়া অবস্থায়। সবে ঘুম ভেঙেছে। একটু আগে মাঝ মাঠে চড়া ধাতের যে নাটক জমেছিল তার আঁচ আমি টের পাই নি। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কি ঘুমেই যে পেয়েছিল! ঘুম দেখে ডেইলি মেলের অ্যালেকস ব্যানিস্টার তো লিখেই ফেলেছিলেন, আলামেন যুদ্ধজয়ের সব পরিকল্পনা নিজের হাতে ছকে দিয়ে দুর্জয় সেনাপতি মন্টগোমারি ঘুমোতে গিয়েছিলেন। ওয়াদেকার তাঁকেই অনুসরণ করলেন। আত্মবিশ্বাস, প্রত্যয়ে দুজনেই অভিন্ন প্রায়। কি আশ্চর্য চরিত্র ওদের!

ওভালে খেলার ভাগ্য যখন সূক্ষ্ম সুতোর ওপর ঝুলেছিল তখনই আমি রাণ আউট হয়ে ফিরি। কিন্তু তাতেও বিচলিত হয় নি। আমি জানতাম, সরদেশাই, বিশ্বনাথ, সোলকার, ইঞ্জিনিয়ারেরা আছে। পারের কড়ি তারা কুড়িয়ে নিতে পারবেনই। কেন মিছিমিছি সুখনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটায়।

'এমনিতে আমি আবেগপ্রবণ নই। তবুও স্বীকার করছি, ব্যারিংটনের কথা শুনে সেদিন আর কান্না চেপে রাখতে পারি নি। সেই দিনটাই তো আমার জীবনের পরম লগ্ন!

'কিন্তু এ তো কান্না নয়। এ যে হাসি দিয়ে গাথা অশ্রুজলের মুক্তামালা! ওভালে চারপাশে তখন হাসির হুল্লোড়, উচ্ছ্বাসের ঝর্ণা। আমার স্বদেশবাসীরা হাতে জয়হিন্দ লেখা পোষ্টার নিয়ে উচ্চকণ্ঠ, অধীর। উত্তেজনা, উদ্দীপনায় চারপাশ টগবগ করছে। শুভাকাঙ্খীর দল কতো যে! সবাই পিঠ চাপড়ে যাচ্ছেন।

'প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর অভিনন্দন বার্তাও যথাসময়ে হাতে এসে পৌঁছে গেল। সব মিলিয়ে আমার অবস্থা তখন রীতিমতো অভিভূত। হঠাৎ মনে হলো, কোথা থেকে যেন আমার মার কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। হ্যাঁ, অবিকল সেই স্বর। আবেগে কাঁপছে। যেমন কেঁপেছিল একদিন সকালে সান্তাক্রুজ বিমানঘাটিতে। লণ্ডনের পথে আমরা বিমানে পাড়ি জমাবো। তারই আগে মা সেই রাত ভোরে বিমানবন্দরে এসেছিলেন আমাদের আশীর্বাদ জানাতে। ভাংগা, আবেগে কাঁপা কণ্ঠে মা আশীর্বাদ করলেন। কি আশ্চর্য, মার সেই আশীর্বাদ আজ সফল হোল। মার কথা কি কখনো মিথ্যে হয়! আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ও নির্বাচকমণ্ডলী এবং জনসাধারণও। তাঁদের প্রত্যাশা আজ পূর্ণ করতে পেরেছি। আমার জীবনে এর চেয়ে বড় লগ্ন আর কিই বা আসতে পারে!"

১৯৭০-৭১ এর মরশুমে ভারতীয় দল যখন ইংলণ্ডে যায় তখন ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে 'রাবার' পাওয়ার সূত্রে ভারতের নামডাক কিছুটা বেড়েছিল। তবুও ইংলণ্ড ছিল প্রবলতর প্রতিদ্বন্দ্বী। যেহেতু বেসরকারী স্বীকৃতিতে ইংলণ্ড তখন বিশ্বের সেরা ক্রিকেট দল। ক্রিকেটে কৌলীন্য গর্ব আদায় করতে ইংলণ্ড তার আগেই ওঃ ইণ্ডিজ ও অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছে। এহেন প্রতিদ্বন্দ্বীর ডেরায় হানা দিয়ে তার মুখের গ্রাসটি ছিনিয়ে আনা কম কথা নয়।

সত্য বটে ওই মরশুমে হারের হাত থেকে বাঁচাতে পর্জন্যদেব ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ভারতের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। ভাগ্য ছিল ভারতেরই সহায়ক। কিন্তু ক্রিকেটে ভাগ্যের ভূমিকা তো থাকেই। ভাগ্য যদি শত্রুতা না করতো তাহলে লর্ডসে প্রথম টেষ্টে ভারত যে জিততে পারতো না, একথাই বা কে হলপ করে বলতে পারে? লর্ডসে বৃষ্টি আসছে জেনেই ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা তাড়াহুড়োয় জয়ের মূলধন কুড়োবার চেষ্টাতেই না নিজেদের উইকেটগুলি বিলিয়ে দেন? আবহাওয়া যদি স্বাভাবিক থাকতো তাহলে ইংলণ্ডের পক্ষে পরাজয় এড়াবার রাস্তা খুঁজে পাওয়া হয়তো কঠিন হোতো। সুতরাং ভাগ্যের একপেশে প্রসন্নতা পেয়েই ভারত ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে দ্বিতীয় টেষ্টে হার এড়িয়েছে বলে ভারতীয় ভূমিকাকে ছোট নজরে দেখার কোনো কারণ নেই। উলটে বলা উচিত, ভাগের প্রসন্নতা তথা পর্জন্যদেবের সহযোগিতা যদি ভারত ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে পেয়ে থাকে তাহলে লর্ডসে ইংলণ্ডও সেই আনুকূল্যে বঞ্চিত থাকেনি।

কিন্তু এসব বিতর্কিত প্রশ্নে জড়িয়ে পড়ার দরকারই বা কি?
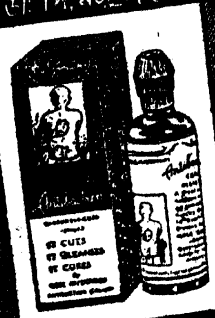
আমরা তো আজ চাইছি, ১৯৭০-৭১ মরশুমের সেই দিনটির দিকে আবার ফিরে তাকাতে যেদিন ইংলণ্ডের মাঠে ভারত সবপ্রথম ক্রিকেটে ইংলণ্ডের সম্মিলিত শক্তিকে নুইয়ে দিতে পেরেছিল অন্য কারুর অযাচিত সাহায্যে নয়, নিজের বাহুবলেই। পেছনের দিকে ফিরে সেই লাল হরফের দিনটাকে আবার খুঁজে পেতে চাই, যেদিনে কৈশোর পেরিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট যৌবরাজ্যে অধিষ্ঠিত হয়েছিল।

দিনটি সাবেক আমলেরও নয়। কথা তো এই সেদিনেরই। সেই কথা আমরা অনেকের মুখেই শুনেছি। এবার শোনা যাক স্বয়ং ওয়াদেকারের মুখেই ঃ

"প্রথম ইনিংসে আমরা ৭১ রানে পিছিয়ে পড়েছিলাম বটে। কিন্তু সোমবার অপরাহ্নেই খেলার গতি নিশ্চিতভাবে উলটো মুখে ঘুরে যায়। তখন ইংলণ্ড দ্বিতীয় দফায় ব্যাট করছে। আর চন্দ্রশেখর আগুলে, কব্জী, বাহুবে টানে বলে বলে ভেল্কি দেখাতে সুরু করেছে। পোর্ট অব স্পেনে দুরানী চোখের পলকে সোবার্স ও লয়েডকে প্যাভিলিয়নে ফিরিয়ে দিয়ে আমাদের জয়ের রাস্তা সুগম করে দিয়েছিল। ওভালে চন্দ্রশেখরও তাই করলেন পরপর দু বলে এডরিচ ও ফ্লেচারকে বোল্ড আউট করে। ওঁরা ফিরতেই আমার যেন মনে হলো, এই খেলায় আমরা বুঝি জিততেও পারি।

'চন্দ্রশেখর লেংথ মেপে বল ছাড়ছিলেন। তাঁর সামনে ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানেরা রীতিমতো জড়োসড়ো। বিপক্ষের কাছে চন্দ্রশেখরের ভূমিকা তখন এমনই ভীতিজনক যে আর এক প্রান্ত দিয়ে আক্রমণ গড়ার প্রয়োজনই দেখা দেয় নি। তাই ওপ্রান্তে বেদীকে না ডেকে আমি ভেঙ্কটের হাতে বল তুলে দিলাম। যাতে ভেঙ্কট রান ওঠার গতিকে দাবিয়ে রাখতে পারে। ঠিক সময়েই আমরা জেমসনকে রান আউট করতে পেরেছিলাম। বেচারী জেমসন! মন্দভাগ্য তাঁকে তাড়া করছিল। লাকহার্স্টের ড্রাইভের পর চন্দ্রশেখর শুধু আগুলে তাতানো বলটি উইকেটের দিকে ঠেলে দেন। জেমসন দু কদম

এগিয়ে গিয়েছিলেন। ফেরার আর সময় পেলেন না। জেমসনের আউট হওয়ার ব্যাপারে আমাদের প্রতি ভাগ্যের পক্ষপাতিত্বও ছিল বুঝি। জেমসন আউট হতেই আমরা ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানদের ঘিরে ধরি ওৎপাতা শিকারীর মতো।

ইংলণ্ডের রান তখন পঞ্চাশের কোঠা পেরোয় নি এমন সময়ে ভেঙ্কট অলিভিয়েরাকে টিকরে দেয়। পরক্ষণেই সোলকার নটের ক্যাচ ধরে ফেলে। শক্ত ক্যাচ। অমন ক্যাচ ধরা বুঝি সোলকারের পক্ষেই সম্ভব। লাকহার্স্ট কিন্তু অনেকক্ষণ উইকেটে টিঁকে থাকেন। প্রায় ঘন্টা দুয়েক পর হাটনকে আড়াল করতে গিয়ে তিনি স্লিপে ক্যাচ দিলে কৃতজ্ঞচিত্তে ভেঙ্কট সেটি ধরে নেয়। ওই সময় চন্দ্রশেখর কি করছিলেন শুনবেন? এক এক করে সে ইলিংওয়র্থ, লাকহার্স্ট ও স্নোকে ফিরিয়ে দিলেও ওই ফাঁকে তাঁর বলে একটি রানও ওঠে নি।

চন্দ্রশেখরকে বিশ্রাম দিতে বেদীকে ডাক দিয়েছিলাম। বেদীও এক ওভারের মধ্যে আন্ডারউডকে ফিরিয়ে দিয়ে তাঁর দলনায়কের প্রতি সুবিচার করেছিল। কিন্তু দিনটি যে চন্দ্রশেখরের জন্যে চিহ্নিত হয়ে আছে। তাই এক ওভার বাদে আবার তাকে ফিরিয়ে আনতেই চন্দ্রশেখর ইংলণ্ডের ইনিংস মুড়িয়ে দেয়। তার বোলিংয়ের শেষ হিসাব হলো ১৮.২-৩-৩৮-৬। এই হিসাব ক্রিকেট ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাকবেই!

মাত্র আড়াই ঘন্টার মধ্যেই ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়ে যায়। তারপর আমরা ব্যাট করতে নামলে স্নোর তৃতীয় ওভারে গাভাসকর শূন্য হাতে ফিরে আসে। মানকাদ ও আমি, দুজনে মিলে ৩৭ করি। দিনের শেষে ৭৬ ওঠার সময় আমি ও সরদেশাই অবিজিত। তখনই মনে হয়েছিল বিজয় তোরণের দরজা বুঝি আমাদের জন্যে আলগা হয়ে পড়েছে।

শেষদিনে নাটক আরও জমেছিল। উত্তেজনা আরও বেড়েছিল। ইংলণ্ড সহজে রণে ভঙ্গ দেয় নি। উইকেটে স্পিন জমছিল দেখে ইলিংওয়ার্থ ও আন্ডারউড বুক চিতিয়ে বল করছিলেন। তবে কেন জানি না, আমি কিন্তু এতটুকু ভয় পাই নি। সরদেশাই ও বিশ্বনাথ অগাধ ভরসা নিয়ে ব্যাট করছিলো। ভয় কিসের? সরদেশাই তো বদলা নিতে রানের পেছনে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছিল। মধ্যাহ্নের ভোজনের কিছু আগে সরদেশাই যখন আউট হয় তখন দরকার পঞ্চাশ রানও নয়।

'তখন হয়তো কেউ কেউ ভেবেছেন, শেষ পর্যন্ত জিৎ হবে তো? আমি মনে মনে বলেছি, কেন হবে না? তখনও বিশ্বনাথ, ইঞ্জিনীয়ার, আবিদ আলি রয়েছে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, আমার অনুমানই অভ্রান্ত। মজবুত ব্যাটের ঘা কষিয়ে আবিদ মাঠ থেকে জয়ের মূলধনটি কুড়িয়ে নিলে।

'পরের ইতিহাস সবাই জানেন। আমার শুধু মনে পড়ছে, অলিন্দে এসে যখন আমি দাঁড়ালাম তখন আমার দৃষ্টি জুড়ে রইল একটি পতাকা। ঊর্ধ্বাকাশে মাথা তুলে পতাকাটি গরবিনী রাজহংসীর মতো দুলে দুলে ভাসছে। ওই পতাকা কতোদিনের চেনা! শাদা, সবুজ, গেরুয়ায় ছোপানো ঝাণ্ডাটিই তো আমাদের সত্যিকারের পরিচয়। ভারতীয় অনুরাগীরা স্বদেশের প্রতীকটি উঁচুতে তুলে ধরেছিলেন। মনে হলো, মাথা তোলা ভারতের ভাবমূর্তির পায়ে মাথা ঠেকিয়ে বলি, আমাদের খেলা, না আমাদের জীবন বুঝি এতোদিনে সার্থক হলো!'

কে অস্বীকার করবে যে প্রত্যাশা পূরনের রাঙা আলোয় ওয়াদেকার ও তাঁর সাথী সঙ্গীরা ভারতীয় ক্রিকেটকে ভরিয়ে তোলেন নি!

ক্রিকেট তুমি কি হারিয়েছো!

কৃষ্ণ ধর

রাজার খেলা নয়. খেলার রাজা বলেই ক্রিকেটের এত আদর। আর সব খেলায় হারজিত। ক্রিকেটে খেলাটাই হল মুখ্য। জয়ে এবং পরাভবে সমান উজ্জ্বল। ক্রিকেট সেকারণেই তুলনাহীন। অন্য খেলায় প্রতি মুহূর্তে উত্তেজনা। দর্শকরা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষমান। কিছু ঘটা চাই, নইলে আবার খেলা কীসের?

ক্রিকেটে কিছু হওয়াটাই হল আসল।

ফুল ফোটা কি চোখে দেখা যায়? শিশির খেয়ে, রোদ ছুঁয়ে, জলে ভিজে তার কুঁড়ি ফোটে। বড় নীরব, বড় নম্র তার ফুলে পরিণতি।

ক্রিকেটও তাই। সে চলে আপন মনে। তার লয় একেবারে নিজস্ব। ক্রিকেট তো শুধু খেলোয়াড়ের খেলা নয়, দর্শকেরও। মাঠের প্রতিটি তৃণ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে লাল বলের ত্বরিৎ গতিতে। উইকেট আগলে থাকা ব্যাটসম্যানের পায়ে পায়ে, হাতের খেলোয়াড়ি কাজে সে ফুলের মতো ফুটে ওঠে। সে কিছু ঘটাবার জন্য আকুল নয়। সে হতে চায়।

ক্রিকেট অনিন্দ্য। সে অনুপম। নক্ষত্র-বীথির মতোই তার দূরায়ত আলো। মায়াবী বলেই তার এত আকর্ষণ।

এখন কি আর তা পাই? বলতে ইচ্ছে করে, ক্রিকেট তুমি কি হারিয়েছো জানো না। তুমি আজ মসৃণ। মাপা-জোখা তোমার চলাফেরা। তুমি নিখুঁত, তুমি হয়তো বা নির্ভুল। কিন্তু তুমি তো সেই অনন্ত নক্ষত্র-মালার আলোকের ইশারা এনে দাও না। তুমি তো ভোরের মালতীর মতো হয়ে ওঠার জন্য অপেক্ষা করো না। তুমি আমাদের কল্পনার জন্য কিছু আর বাকী রাখো না। তুমি কস্তুরিমৃগের মতো আপন গন্ধে তো মাতোয়ারা হও না। তুমি আমাদের স্বপ্নকে দিয়েছো নির্বাসন। তুমি উজ্জ্বল, হেমকান্ত তোমার। কিন্তু তুমি যেন অন্য এক সত্তা।

এখন ক্রিকেটে হারজিত চাই। খেলোয়াড়রা অতি সতর্ক, সাবধানী। অঙ্কের হিসেবে খেলা। প্রতিপক্ষ কেমন খেলছে তার দিকে যত না নজর, কীভাবে তাকে ভাবিয়ে ফেরানো যায় সেদিকেই সবার দৃষ্টি। মনে পড়ে একবার প্রতিপক্ষের ক্যাপ্টেন বলে-ছিলেন রণজিকে, আপনাকে এবং আপনার সহযোদ্ধা সি বি ফ্রাইকে অগণিত রান তোলা থেকে নিবৃত্ত করতে পারি লেগ সাইডে আটজন ফিল্ডার সাজিয়ে এবং বোলারদের নির্দেশ দিয়ে লেগ-স্টাম্পে সব আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করাতে।

রণজি উত্তরে বলেছিলেন, নিশ্চয়ই আপনি তা পারেন। কিন্তু আপনি তা করতে যাবেন কি? নিশ্চয়ই না।

প্রতিপক্ষের ক্যাপ্টেন তা করেননি। কারণ সেকালে ক্রিকেট অন্যভাবেই খেলা হত। সে সময়ে ক্রিকেট ছিল ব্যাটসম্যানের হাতে নয়নশোভন রান তোলার খেলা। আজ কি আমরা ভাবতে পারি বিপক্ষের চৌখস ব্যাটসম্যানকে এভাবে রান চলাতে দেবেন কোনো ক্যাপ্টেন? তাঁর খেলার ধরন, মাঠের ধরন যাচাই করে প্রলুব্ধ করবে অন্য ছলে বোলারের হাতে। দেখতে দেখতে বহু সাধনার ধন অমূল্য উইকেটটি করবেন উপার্জন।

ক্রিকেট এখন যেন কম্পিউটারের খেলা। একটু ভুলচুক হবার জো নেই। দলবদ্ধ হয়ে এমনভাবে খেলো যাতে ক্রিকেটের সৌন্দর্য ফুটুক না ফুটুক উইকেট পড়ে অথবা এমন সাবধানে ধূসর রঙের খেলা খেলো যাতে রান ওঠে। দর্শক কি পেলো না পেলো তার হিসেব পরে। রাবার ছিনিয়ে আনো—ডিসিসন করো।

সব্বাই যেন টেস্ট খেলছে। মরণ-পণ খেলা। ক্রিকেটের সেই আদিম সৌন্দর্য আর আনকোরা স্বাদ কোথায় গেল? সেই দর্শকই বা কোথায় যারা ছিলেন সহিষ্ণুতার প্রতীক। কাউণ্টি ক্রিকেটের মাঠে আগে যে দর্শক উপচে পড়ত টাটকা খেলা দেখবার জন্যে, নতুন খেলোয়াড় আবিষ্কারের নেশায় তারাই বা কোথায়? সিনেমা টেলিভিশন টেনে নিয়ে গেছে কত দর্শককে। রোদে পিঠ দিয়ে ঘাসের সবুজ গালিচায় পা রেখে চিরকালের ক্রিকেট দেখার দিন কি তবে গেছে?

ক্রিকেট ছিল সত্যিকারের নাইটদের খেলা। রাজসভার নাইট নয়, জনসভায় ছিল তাঁদের স্থান। রান দেখে তাঁরা খেলার বিচার করতেন না। বিচারটা ছিল খেলার শিল্পকর্ম দেখে। আজকে কি ভাবতে পারা যায় একজন আনকোরা নতুন অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়ের ব্যাট মারার নিপুণতা দেখেই

নবনগরের মহারাজা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, একদিন সে দুনিয়ার সেরা খেলোয়াড়ের দলে নাম লেখাবে অথচ সে সময়ে খেলোয়াড়টি রান তুলেছিল প্রথম ইনিংসে পাঁচ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে শূন্য। সে খেলোয়াড়ের নাম ভিকটর ট্রামপার। আজ বলতে পারি, নবনগরের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা ছিল না।

কীভাবে তা সম্ভব হত? ক্রিকেট ছিল চারুকলার মতো একটি শিল্পগুণান্বিত খেলা।

রণজির চোখ ঝলসানো উইকেটের পতন হলে বিপক্ষের ক্যাপ্টেন নোভিল কার্ডাস বলেছিলেন, তিনি শুধু ব্যাটই করেননি, তিনি আমাদের সব্বাইকে বিমুগ্ধ করে রেখেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি যখন উইকেট ছাড়লেন তখন মনে হল আমরা যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠেছি।

ব্যাটসম্যানের সেই শিল্পসৌন্দর্য যেন আজ অন্তর্হিত। ক্রিকেট এখন অংকের মতো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির খেলা কিন্তু তা আর শিহরণ জাগায় না। টেকনিকের দিক থেকে সে আজ অনেক উন্নত। কিন্তু কোথায় তার শিল্প-সৌন্দর্য, কোথায় তার অপ্রতিরোধ্য জাদুমায়া?

মুস্তাকের মতো শিল্পীর জন্ম হয় না আজকাল। টায়েটুয়ে টিকিয়ে টিকিয়ে সেঞ্চুরিতে পৌঁছানো নয়, যতক্ষণ উইকেটে থাকব ততক্ষণই প্রতি বলে ফোটাবো শব্দবাজি। তা না হলে ক্রিকেট খেলা কেন?

এখনকার যুগে শো-ম্যান ক্রিকেটারকে বরদাস্ত করা হয় না। এখন হল গোটা টিমের খেলা। এক একটা সিরিজ যেন এক একটা দেশের ওয়াটারলুর রণক্ষেত্র। না জিতলেই সব গেল। কেউ ঝুঁকি নিতে চায় না। খেলা দেখিয়ে কাজ নেই, রান তোলো। হয় জেতো, নয় তো ড্র করো। থাক শিল্পসৌন্দর্য তোমার টুপির তলায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই যেন ক্রিকেট কেজো খেলায় পরিণত হয়েছে। ব্যাডম্যানদের মতো একক ক্রীড়াকুশলীর দিন অপগত। তাদের খেলা আজ কল্পনার জগতের বস্তু। বাস্তবের সঙ্গে মেলে না। রণজি বা ব্র্যাডম্যানদের যুগ আর ফিরে আসবে না। সেদিন এক একজন খেলোয়াড়ের হাতের কাজ দেখবার জন্যই দুনিয়ার দর্শক থাকত উন্মুখ হয়ে। প্রতিটি ব্যাটের মারে ফুটে উঠত সৌন্দর্যের কারুকার্য। একটির সঙ্গে আরেকটির মিল নেই। রঙ ও তুলি নিয়ে শিল্পী যেমন ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলেন তাঁর অন্তরের সৌন্দর্য প্রতিমা, ক্রিকেটও ছিল এঁদের কাছে সেই সুন্দরের উপাসনা। দর্শকরা অবাক বিস্ময়ে দেখত ক্রিকেট কত সুন্দর, তার হৃদয়ের পরতে পরতে কত সৌন্দর্যের আলপনা, দক্ষের কাছে লুকানো পূর্ণিমা। ব্যাটসম্যানদের হাতে ছিল জাদুদণ্ড। আজ কে একই দিনে আলাদাভাবে তিনটি শতরান করতে পারবেন রণজির মতো অথবা একই দিনে তিনটি সেঞ্চুরি ব্র্যাডম্যানের মতো? একই দিনে ১৯টি উইকেট কে নিতে পারবেন আজ ইংলন্ডের বোলার জিম লেকার যেমন পেরেছিলেন?

প্রকরণগত কৌশলই আজকের ক্রিকেটের শিরোধার্য। কোনো রকমে উইকেট বাঁচানোই যেখানে রীতি, ব্যাটসম্যান তাঁর খেলা দেখাবার প্রেরণা পাবেন কোথায়? খেলা দেখিয়ে শূন্য হাতে ফিরলে তাঁকে না ক্ষমা করবেন তাঁর দল, না তাঁর দর্শক। এ যে হার-জিতের খেলা—খেলোয়াড়ের খেলা তো নয়! এ হলো আধুনিক প্রকরণের নামে নেতিবাদী খেলা। খেলা দেখানোর খেলা নয়, খেলা বাঁচানোর খেলা। তা সে কোরামিন মুখে দিয়েই বাঁচুক। নাড়ী ছাড়লেই রোগীর সর্বনাশ।

তবু, অনেকদিন ধূসর বিবর্ণ ক্রিকেটের পর সেবার ১৯৭০ সালে ওভালের মাঠে সোবার্স ১৬৫ রান তুলে ক্রিকেটের দীপক রাগ যেন ফিরিয়ে এনেছিলেন। অনেককাল পর ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধের খেলা শেষ করে ক্রিকেট যেন সত্যই ফিরে পেয়েছিল তার পরমলগ্ন—ফাইনেস্ট আওয়ার। ক্রিকেটের হারানো জাদুশক্তি সোবার্স পরখও করেছিলেন তাঁর উজ্জ্বল খেলার কৌশলে। ব্যাটসম্যান ফিরে পেলো তার হৃত গৌরব। মেশিন নয় মানুষ, অংক নয় শিল্পই হল ক্রিকেটের প্রাণ—এ সত্য আধুনিককালে দেখান তিন প্রধান—সোবার্স, কানহাই আর পোলোক।

তবে কি বলব, বেপরোয়া ব্যাট চালানোই ক্রিকেটের বৈশিষ্ট্য? না তা নয়। ক্রিকেট গোটা দলেরই খেলা। প্রত্যেকেই তার ব্যূহ রক্ষার দায়িত্ব নেবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ চালাবে প্রতিপক্ষের শিবিরে তাকে ছত্রভঙ্গ এবং ধরাশায়ী করবার জন্য। এই দুরূহ কাজে চাই সুদক্ষ, সতর্ক এবং স্থিরবুদ্ধি দল। কিন্তু তারই মধ্যে দু'একজন ব্যতিক্রম থাকলে খেলার সৌন্দর্য ও আকর্ষণ আরও বাড়ে—বোলার এবং ব্যাটসম্যান দুই-ই। বোলারকে ঠেকানো সত্যিকারের ক্রিকেট নয়। তাকে, রণজি বা ব্র্যাডম্যানের মতো, খান খান করে দিতে পারলে খেলা কি সুখ, খেলেই বা কি আনন্দ!

নিজে খেলা এবং অপরকে খেলানো দুই-ই চাই। আমাদের চৌখস খেলোয়াড় চন্দ্রশেখর একবার বলেছিলেন, সোবার্সের মতো শিল্পী খেলোয়াড়কে বল দিয়ে সুখ। কারণ তিনি নিজে নির্ভুল খেললেও বোলারের মনেও আশা জাগিয়ে রাখেন। কিন্তু ব্যারিংটনের মতো নেহাতই খেলোয়াড় এমন আদর্শনীয়ভাবে খেলবেন যে বোলার কোনো সুযোগ পান না।

আজকের খেলা নিশ্চয়ই অনেক উন্নত। দু-একজন ব্যক্তিগত ব্যাটসম্যানের ওপর নির্ভর না করে বোলার, ফিল্ডসম্যান, ব্যাটসম্যান সবারই যৌথ দায়িত্বে ক্রিকেট আজ গোটা দলের খেলা। একালের খেলার দায়িত্ব বেশি, ঝুঁকিও বেশি। টেস্ট খেলার সঙ্গে যেন এক একটা দেশের মান-সম্মান মর্যাদা জড়িত। তাই কোনো খেলোয়াড়ই বেশি ঝুঁকি নিতে নারাজ। হয়তো এটাই যুগের দাবি। জানি না, ভবিষ্যতে এ খেলার সৌন্দর্য কীভাবে বিকশিত হবে। তাহলে আমাদের আক্ষেপ থাকবে, রণজি বা ব্র্যাডম্যান, ট্রামপার বা হ্যামণ্ডদের দেখা হয়তো আর পাবো না। ক্রিকেটের আলাদিনের দীপ হয়তো আর মায়া জগতের দুয়ার খুলে দেবে না আমাদের কাছে।

ক্রিকেট তার নির্ভুল নিষ্প্রাণ ছকে-বাঁধা গণ্ডিতেই হয়তো আবদ্ধ থাকবে। বসন্তের এলোমেলো হাওয়া তার বাগানে আর হয়তো আসবে না ফুল ফোটাতে। কি জানি!

ক্রিকেটের পরিভাষা

ধ্রুব রায়

পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে এদেশে ক্রিকেট প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বিশেষ করে যখন বিদেশ থেকে কোন ক্রিকেট দল এদেশে খেলতে আসে তখন জনসাধারণের মধ্যে ক্রিকেট প্রসঙ্গে উৎসাহ লক্ষ্য করার মত। ক্রিকেটের বড় আসর অর্থাৎ টেস্ট খেলা অনুষ্ঠিত হবার বহু আগে থেকেই ক্রিকেট প্রসঙ্গে নানান আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে চারিদিক মুখর হয়ে ওঠে। একটা উৎসবের সাড়া পড়ে যায় চারিদিকে। ক্রিকেটে অনেক কথার প্রচলন আছে যার সঙ্গে খেলোয়াড় এবং সাধারণ উৎসাহীদের পরিচয় থাকা উচিত না হলে খেলা এবং খেলা দেখার আনন্দ পাওয়া যায় না।

বিদেশ সফরের সময় এম সি সি (মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব) ইংল্যাণ্ডের প্রতিভূ হিসেবে টেস্ট ম্যাচ খেলে থাকে। অর্থাৎ বিদেশের মাটিতে টেস্ট ম্যাচ খেলার সময় এম সি সির পরিচয় ইংল্যাণ্ড এবং অন্যান্য খেলার সময় তাদের পরিচয় এম সি সি।

উইকেট প্রসঙ্গে

ক্রিকেট মাঠের মাঝখানে ব্যাট ও বল করার জন্যে বাইশ গজ লম্বা এবং আট ফুট ৯ ইঞ্চি চওড়া যে অংশটুকু সযত্নে প্রস্তুত করা হয় তাকে ক্রিকেটের ভাষায় বলা হয় উইকেট। উইকেট সাধারণত হয় ঘাসের। ঘাসের উইকেটের অভাবে ম্যাটিং অথবা সিন্থেটিক আচ্ছাদিত উইকেটও ব্যবহার করা হয়। সাধারণত সিমেন্ট বা সুরকি বাঁধান শক্ত জমির ওপর ম্যাট পেতে ক্রিকেট খেলার উপযোগী করে তোলা হয়। ম্যাটিং উইকেট হয় দু রকমের। দড়ির ম্যাট অথবা পাটের। সিন্থেটিক উইকেট হয় সাধারণত তিন রকমের—(১) বিটুসেন, যা শক্ত জমিতে পাতা হয়। জলের ব্যবহার দরকার হয় না, (২) কাপড়ের আচ্ছাদন দেওয়া সেলুলার রবারের উইকেট, (৩) বেত ও আসবেস্টসের আঁশ চীনা মাটি ও বিটুসেনের সাহায্যে এক ধরনের উইকেট তৈরী করা হয় যাতে ঘাসের উইকেটের মত জল ও রোলারের দরকার হয়।

এই সব উইকেটে মধ্যে ঘাসের উইকেট প্রস্তুত ব্যাপারে নানান সমস্যা আছে, কারণ এই প্রস্তুতির অনেকটাই প্রাকৃতিক কারণের ওপর নির্ভরশীল। এই প্রস্তুত প্রণালীর ওপর নির্ভর করে উইকেটের চরিত্র। এছাড়া বৃষ্টি, রোদ, কুয়াশাও উইকেটের ওপর নানান প্রভাব বিস্তার করে। এই সব কারণের ওপর নির্ভর করে উইকেট ফাস্ট হবে না স্লো অর্থাৎ উইকেটে বল পড়ে তার গতি ব্যাহত হবে কি হবে না। উইকেট স্পিনিং বা টার্নিং হবে, না ব্যাটিং উইকেট অর্থাৎ উইকেটে বল স্পিন করালে বেশী পরিমাণে গতিপথ পরিবর্তন করবে না অল্প ঘুরে ব্যাটসম্যানের সহায়ক হবে। এছাড়া বৃষ্টির জল অনেক সময় উইকেটের বিপর্যয় ঘটায়, যাকে বলা হয় স্টিকিডগ। এই উইকেটে বল কখন কি মূর্তি ধারণ করবে ব্যাটসম্যানের পক্ষে বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে।

ক্রিকেট মাঠ প্রসঙ্গে

ক্রিকেট মাঠের বিভিন্ন অঞ্চলের একটা করে নাম আছে সেই অঞ্চলে কোন খেলোয়াড় ফিল্ডিংরত অবস্থায় থাকলে সেই অঞ্চলের নামানুসারে সেই ফিল্ডারের অবস্থান বোঝান হয়। চিত্র ১।

চিত্র ১

●

ডান হাতের ব্যাটসম্যান ব্যাট করার সময় ফিল্ডিংয়ের বিভিন্ন অঞ্চলের নাম ঃ

১। থার্ড ম্যান
২। সেকেন্ড স্লিপ
৩। ফার্স্ট স্লিপ
৪। সর্ট ফাইন লেগ বা লেগ স্লিপ
৫। ডিপ ফাইন লেগ
৬। লং লেগ
৭। গ্যালি
৮। উইকেট রক্ষক
৯। স্কোয়ার লেগ
১০। কভার পয়েন্ট
১১। সর্ট এক্সট্রা কভার
১২। ফরোয়ার্ড সর্ট লেগ বা সিলি মিড অন
১৩। ফরোয়ার্ড সর্ট লেগ বা সিলি মিড অন
১৪। মিড উইকেট
১৫। ডিপ এক্সট্রা কভার
১৬। মিড অফ
১৭। বোলার
১৮। মিড অন
১৯। লঙ অন
২০। লঙ অফ
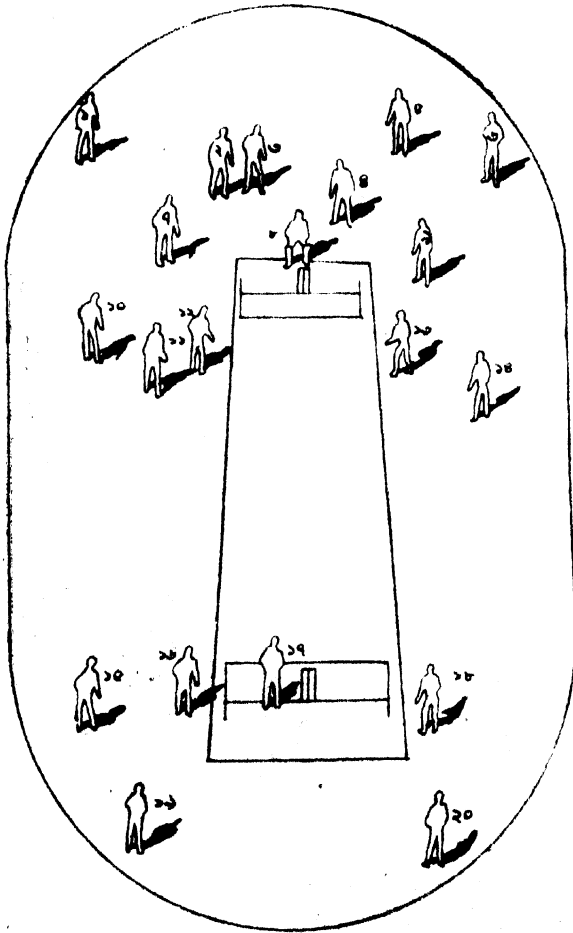
ব্যাটসম্যান বলে আঘাত করার পর, কোন মার মাঠের কোন্ অঞ্চল দিয়ে যায় দেখান হয়েছে।
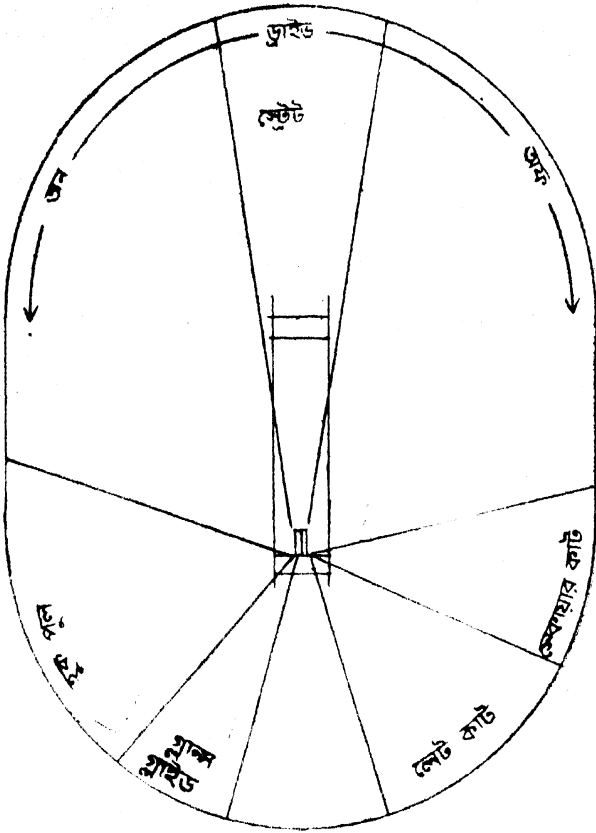
মোটামুটিভাবে ব্যাটসম্যান বোলার-মুখো হয়ে দাঁড়ালে তার সামনের দিকটাকে বলে 'অফ-সাইড' আর পেছনের দিকটা 'অন-সাইড'। অর্থাৎ ডান হাতের ব্যাটসম্যানের বেলায় মাঠের যে অংশ 'অফ-সাইড' বাঁ হাতের ব্যাটসম্যানের বেলায় সেটা হবে 'অন-সাইড'।

বলের পিচের প্রসঙ্গে

এবার বলবো বলের লেংথ প্রসঙ্গে। অর্থাৎ গুড লেংথ, সর্ট পিচ, হাফ ভলি, ফুলটস ইত্যাদি বলতে কি বোঝায়। ব্যাটসম্যান সামনের দিকে পুরো পা বাড়িয়ে ব্যাট দিলে তার ঠিক আগে যদি বল পিচ খায় তাকে বলে 'গুড লেংথ' বল। তারও অনেকটা আগে পড়লে বলা হবে সর্ট 'পিচ' বা লঙ হপ বলে। এক পিচে ব্যাটের ওপর বল এলে তাকে বলা হয় 'ফুলটস'। আর ব্যাট সামনের দিকে বাড়িয়ে পিচ পড়ার সময় যদি বলে ব্যাট লাগান যায় তাকে বলে হাফ ভলি। ব্যাটসম্যান ব্যাট হাতে নিজের জায়গায় দাঁড়ালে যে বল ব্যাট যেখানে মাটি ছুঁয়েছে সেখানে পিচ খায় তাকে ইয়র্কার বল বলে। এখানে মনে রাখা দরকার গুড লেংথ, সর্ট পিচ, হাফ ভলি এগুলো বিভিন্ন ব্যাটসম্যানের বিভিন্ন নাগালের ওপর নির্ভরশীল। যেমন ছ' ফুট লম্বা ব্যাটসম্যানের গুড লেংথ, পাঁচ ফুট লম্বা ব্যাটসম্যানের গুড লেংথ এক জায়গায় হবে না।

ব্যাটিং প্রসঙ্গে

অফ সাইডে স্লিপ থেকে পয়েন্ট অবধি যে সব মার মারা হয় সেগুলোকে কাট বলে। পয়েন্ট বা গালি অঞ্চল দিয়ে চাঁটি মেরে বল পাঠালে বলে স্কোয়ার কাট। বল উইকেট ছেড়ে চলে যাবার সময়ে চাঁটি মেরে স্লিপের মধ্যে দিয়ে বলে পাঠালে বলা হয় লেট কাট মার। ব্যাটসম্যানের পেছন দিয়ে চলে-যাওয়া বলে অল্প ব্যাট ছুঁইয়ে বল ফাইনলেগের দিকে পাঠালে বলা হয় গ্লান্স বা গ্লাইড মার। পিচ পড়ে উঁচু হয়ে আসা বল পেছনের পায়ে ভর দিয়ে মেরে স্কোয়ার বা ফাইন লেগের দিকে পাঠানোকে বলা হয় হুক সট। হাঁটু ভেঙ্গে নীচু হয়ে স্কোয়ার বা ফাইন লেগের দিকে বল পাঠানোর নাম পুল সট। এছাড়া বল মারার পর মাঠের যে অঞ্চল দিয়ে বলটা যায় মাঠের আঞ্চলিক নামের সঙ্গে সেই মারটা মোটামুটিভাবে যুক্ত হয় যেমন কভার ড্রাইভ, একস্ট্রা কভার ড্রাইভ। অন ড্রাইভ ইত্যাদি।

বোলিং প্রসঙ্গে

বোলিং প্রসঙ্গে ইন সুইং, আউট সুইং, লেট সুইং, অফ-ব্রেক, লেগ-ব্রেক এগুলো বহুল পরিচিত। কিন্তু এছাড়াও ক্রিকেটে কিছু কিছু ধরনের বোলিং আছে যাদের প্রসঙ্গে কিছু জেনে রাখা ভাল।

গুগলী, বসি বা রঙ-আন : যে বল লেগ ব্রেকের ভঙ্গীতে ছাড়া হয় কিন্তু মাটিতে পড়ার পর অফ ব্রেকের গতিপথে যায়। ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত বোলার বসাঙ-কোয়েটের নামে এর আর এক নাম বসি।

চ্যায়নাম্যান : বাঁহাতের লেগব্রেক বলকে চ্যায়নাম্যান বলে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের চীনদেশীয় ন্যাটা বোলার অ্যাচবে-এর নাম অনুসারে এর নামকরণ হয়েছে।

আর্মার : বাঁহাতের অফব্রেক বোলার যখন একটু কোণাকুণিভাবে অফের দিক থেকে লেগের দিকে বলটা ছাড়েন।

টপস্পিন : যে বল অফ বা লেগ ব্রেকের মত করে ছাড়া হয় কিন্তু মাটিতে পড়ে সোজা যায়। সাধারণত সোজা পাক খাইয়ে ছাড়া হয় বলে মাটিতে পড়ে গতিবেগও বৃদ্ধি পায়। লেগব্রেক বা অফব্রেকের সঙ্গে কখনও কখনও এই বল করলে ব্যাটসম্যান লেগব্রেক বা অফব্রেক বলে ভুল করে নিজের পতন ঘটান।

এছাড়া দ্রুতগতিসম্পন্ন বোলারদের মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা হয়। (১) খুবদ্রুতগতিতে যাঁরা বল করেন তাঁদের বলা হয় ফাস্ট বোলার আর বল অপেক্ষাকৃত কম গতি হলে মিডিয়াম ফাস্ট।
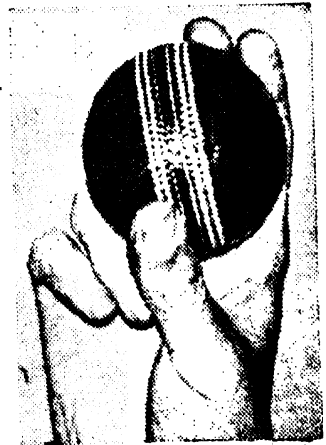
গ্যারী সোবার্স ইন সুইং বল করার সময় কিভাবে বল ধরেন দেখানো হয়েছে।

ছবিতে আম্পায়ারের বিভিন্ন সাংকেতিক ভঙ্গীর ব্যাখ্যা : ১। ওয়াইড, ২। ওভার বাউন্ডারী, ৩। **ওয়ান সর্ট** অর্থাৎ ব্যাটসম্যান ছুটে একাধিক রান নেওয়ার সময় যদি কোন একটি রান নির্দিষ্ট রেখা স্পর্শ না করে পরবর্তী রান সংগ্রহ করেন তাহলে সেই রানটি গণ্য হয় না—তাকেই বলে ওয়ান সর্ট। ৪। আউট, ৫। নো বল, অবশ্য এক্ষেত্রে মুখেও নো বলে ঘোষণা করতে হবে; ৬। লেগবাই, ৭। বাই, ৮। বাউন্ডারী
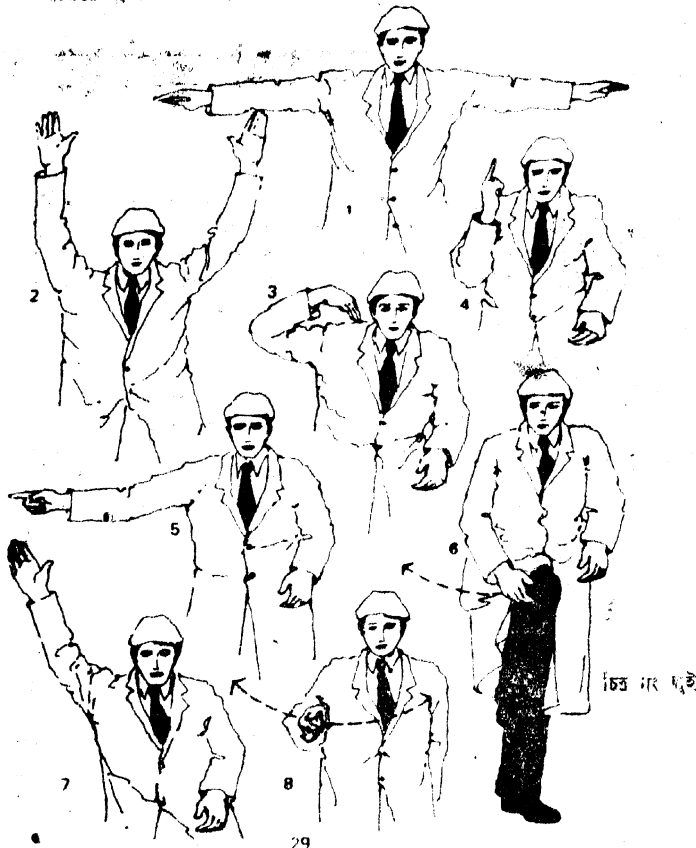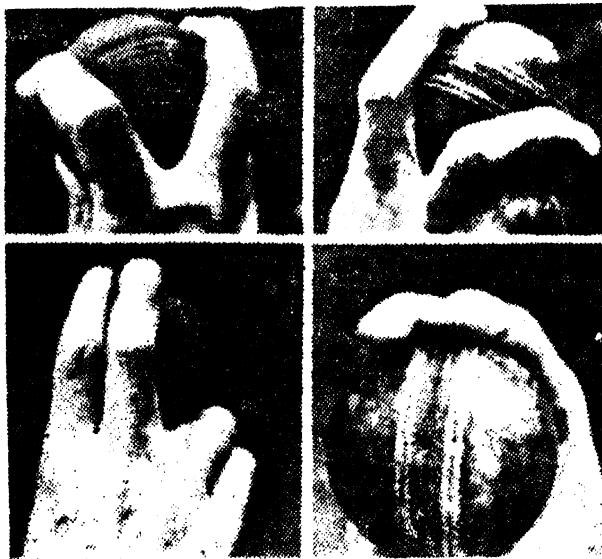
চিত্র ৩—উপরের বামদিকে অফ ব্রেক বল করার সময় কিভাবে বল করা হয় দেখানো হয়েছে। উপরের ডানদিকে লেগ ব্রেকের ভঙ্গী। নীচের বামদিকে ইন সুইংগ এবং ডানদিকে আউট সুইংগ।

ওভার দি উইকেট ও রাউন্ড দি উইকেট বোলিং : বোলার হাত থেকে বল ছাড়ার সময় উইকেট তার সামনে থাকলে বলে 'ওভার দি উইকেট' আর পেছনে থাকলে বলে 'রাউন্ড দি উইকেট'। অর্থাৎ ডান হাতের বোলারের ক্ষেত্রে যেটা ওভার দি উইকেট বাঁহাতের বোলারের বেলায় সেটা 'রাউন্ড দি উইকেট'।

ক্রিকেটের আইন প্রসঙ্গে

১। ওয়াইড বলে এক বা একাধিক রান হলে সেটা একটা ওয়াইড বলে ধরা হয়—যেমন ওয়াইড চার হতে পারে, সেটাকে বাই চার বলে ভুল করা ঠিক হবে না।

২। ব্যাটসম্যানের ব্যাটে না লেগে নো বলে এক বা একাধিক রান হলে সেটা একসংখ্যায় নো রানের মধ্যে ধরা হবে। কিন্তু ব্যাটসম্যানের ব্যাটে লেগে রান হলে নোর ঘরে কোন রান যোগ না হয়ে সেই ব্যাটস-ম্যানের হিসেবের সঙ্গে সেই রান যোগ হবে।

৩। ব্যাটসম্যানের পায়ে বা গায়ে লেগে কোন রান হলে লেগবাই হিসেবে গণ্য হবে, কিন্তু ব্যাটসম্যান সেই বল যদি ব্যাটে খেলার কোন চেষ্টা না দেখান তাহলে কোন রানই হবে না — ইচ্ছাকৃত প্যাড প্লে বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে বলটি 'ডেড বল' বলে গণ্য না হওয়া পর্যন্ত ব্যাটসম্যান রান নেবার চেষ্টা করলে রান-আউটের আওতায় পড়বেন।

৪। বল ব্যাটসম্যানের ব্যাটে লেগে মাটিতে পড়ার আগে শরীরের কোন অংশে বা প্যাডে আটকে গেলে সেই বলকে তখনই 'ডেড বল' বলে ধরে নিতে হবে।

ডাক : কোন ব্যাটসম্যান শূন্য রানে আউট হলে তাঁর রান সংখ্যাকে 'ডাক' বলা হয়।

স্পেকটাকেলস : কোন ব্যাটসম্যান একই ম্যাচের উভয় ইনিংসে শূন্য রানে আউট হলে বলা হয় 'এ পেয়ার অব স্পেকটাকেলস।'

নাইট ওয়াচম্যান : দিনের শেষে কোন খেলোয়াড়কে ব্যাট করতে পাঠানোর দরকার হলে অনেক অধিনায়ক অনেক সময় ব্যাটসম্যান হিসেবে খ্যাত নয় এমন খেলোয়াড়কে আগের দিকে পাঠিয়ে ঝুঁকি এড়াবার চেষ্টা করেন। সেইসব খেলোয়াড়কে 'নাইট ওয়াচম্যান' বলা হয়।

বার্ন ডোর গেম : যে ব্যাটসম্যান কোন রকম ঝুঁকি না নিয়ে খুব সাবধানে নিজের উইকেট রক্ষা করার চেষ্টা করেন সেই ধরনের লোককে 'বার্ন ডোর গেম' বা স্টোন ওয়ালিং বলা হয়। ইংল্যান্ডের অধিনায়ক জে. ডবলিউ এইচ. টি ডগলাস এই ধরনের ব্যাটসম্যান ছিলেন। ফলে তাঁর নামের আদ্যাক্ষর নিয়ে তাঁর নামকরণ হয়েছিল 'জনি ওন্ট হিট টুডে'।

যে ব্যাটসম্যান ঝুঁকি নিয়ে উইকেটের নানান দিকে বল মারার চেষ্টা করেন তাঁকে বলা হয় স্ট্রোক প্লেয়ার।

ভারত সফরকারী এম সি সি

ক্ষেত্রনাথ রায়

এম সি সির ১৯৭২-৭৩ সালের ভারত সফর ভারতের মাটিতে তাদের ৬ষ্ঠ সফর, অপর দিকে সরকারীভাবে ৫ম ভারত সফর। তাদের ১৯২৬-২৭ সালের প্রথম ভারত সফরটি ছিল বে-সরকারী। ভারতের মাটিতে বিগত চারটি সরকারী সফরে ইংল্যাণ্ডের প্রতিভূ হিসাবে এম সি সি যে ভারতের বিপক্ষে ৪টি টেস্ট সিরিজ খেলেছে তার ফলাফল : ভারতের 'রাবার' জয় ১ ইংল্যাণ্ডের 'রাবার' জয় ১ এবং সিরিজ অমীমাংসিত ২। এই চারটি সরকারী টেস্ট সিরিজের ১৮টি টেস্ট খেলার ফলাফল : ভারতের জয় ৩, ইংল্যাণ্ডের জয় ৩ এবং খেলা ড্র ১২।

ভারতের মাটিতে ইংল্যাণ্ডের 'রাবার' জয় ১৯৩৩-৩৪ সালে, ভারতের 'রাবার' জয় ১৯৬১-৬২ সালে এবং টেস্ট সিরিজ অমীমাংসিত ২ বার—১৯৫১-৫২ এবং ১৯৬৩-৬৪ সালে।

ভারত সফরকারী বর্তমান এম সি সি দলে আছেন ১১টি কাউন্টি ক্রিকেট দলের ১৬ জন খেলোয়াড়—কেন্টের ৩ জন, সারের ৩ জন, লেস্টারসায়ারের ২ জন এবং গ্লামর্গ্যান, ল্যাংকাসায়ার, সাসেক্স, এসেক্স, ওরস্টারসায়ার, ইয়র্কসায়ার, ল্যাঙ্কাসায়ার ও নর্দাম্পটনসায়ার—এই ৮টি কাউন্টির একজন করে ৮ জন খেলোয়াড়। দলে কাউন্টি ক্রিকেট দলের অধিনায়ক আছেন এই চারজন : গ্লামর্গ্যানের অধিনায়ক টনি লুইস, ওরস্টারসায়ারের অধিনায়ক নরম্যান গিফোর্ড, কেন্টের অধিনায়ক মাইক ডেনেশ এবং সাসেক্সের অধিনায়ক টনি গ্রীগ। দলে ব্যাটিং এবং বোলিংয়ের কত বিচিত্র রীতির সমাবেশ—ন্যাটা ব্যাটসম্যান অর্থাৎ বাঁহাতে ব্যাট করেন এই তিনজন—জ্যাক বার্কেনশ, নর্মান গিফোর্ড এবং ক্রিস ওল্ড; ডান হাতে ব্যাট এবং বাঁ-হাতে বল করেন এই দুজন—ডেরেক আণ্ডারউড এবং ডেনিস অ্যামিস; বাঁ হাতে ব্যাট এবং ডান হাতে বল করেন এই দুজন—জ্যাক বার্কেনশ এবং ক্রিস ওল্ড; বাঁ হাতেই ব্যাট এবং বল করেন মাত্র একজন—নর্মান গিফোর্ড।

এখানে উল্লেখ্য, এম সি সি দলের খেলোয়াড় হিসাবে ভারত সফরকারী বর্তমান এম সি সি দলের ১৬ জন খেলোয়াড়ই এই প্রথম ভারত সফরে এসেছেন। তবে ইতিপূর্বে ১৯৬৮ সালে এক আন্তর্জাতিক

টনি লুইস
অধিনায়ক : এম সি সি

ক্রিকেট একাদশ দলের সঙ্গে এসে বোম্বাই এবং মাদ্রাজে ভারতীয় একাদশ দলের বিপক্ষে ভারত সফরকারী বর্তমান এম সি সি দলের এই ৭ জন খেলোয়াড় খেলে গেছেন। ডেনিস অ্যামিস, কিথ ফ্লেচার, টনি গ্রীগ, ডেরেক আণ্ডারউড, জিওফ আর্নল্ড, মাইক ডেনেশ এবং জ্যাক বার্কেনশ। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য : বোম্বাইয়ে অ্যামিস (১০৯ রান) এবং ফ্লেচারের সেঞ্চুরী এবং আর্নল্ডের ৮০ রানে ৬ উইকেট। অপর দিকে মাদ্রাজের খেলায় গ্রীগের সেঞ্চুরী, অ্যামিসের ৬৭ রান এবং আণ্ডারউডের ৫৩ রানে ৯ উইকেট।

ভারত সফরকারী বর্তমান এম সি সি দলের ১৬ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে টেস্ট খেলোয়াড় আছেন ১১ জন। এই ১১ জন টেস্ট খেলোয়াড়ের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৭২ সালের টেস্ট সিরিজে খেলেছিলেন ৭ জন এবং ভারতের বিপক্ষে ১৯৭১ সালের টেস্ট সিরিজে স্বদেশের মাটিতে খেলেছিলেন এই ৫ জন খেলোয়াড়—নট (৩টি), গিফোর্ড (২টি), ফ্লেচার (২টি), অ্যামিস (১টি) এবং আণ্ডারউড (১টি)। বর্তমান ভারত সফরের আগে উল্লিখিত ৫ জন খেলোয়াড় বাদে বাকি ১১ জন খেলোয়াড় ভারতের বিপক্ষে কোন টেস্ট ম্যাচ খেলেননি। তবে বাকি ১১ জন খেলোয়াড়ই ১৯৭১ সালের ইংল্যাণ্ড সফরকারী ভারতীয় ক্রিকেট দলের বিপক্ষে নিজ নিজ কাউন্টি দলের হয়ে খেলেছিলেন। সুতরাং ভারতীয় ক্রিকেট খেলার রীতি-নীতি সম্পর্কে সকলেরই কম-বেশী ধারণা আছে।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৭২ সালের (জুন—আগস্ট) টেস্ট সিরিজে ভারত সফরকারী বর্তমান এম সি সি দলের এই ৭ জন খেলোয়াড় খেলেছিলেন—অ্যালেন নট, ডেরেক আণ্ডারউড, কিথ ফ্লেচার, নরম্যান গিফোর্ড, জিওফ আরনল্ড, টনি গ্রিগ এবং বেরী উড। এঁদের মধ্যে বেরী উড অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৭২ সালের টেস্ট সিরিজে মাত্র একটা টেস্ট ম্যাচ খেলে শেষ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের ব্যাটিংয়ের গড় তালিকায় শীর্ষস্থান পেয়েছিলেন (গড় ৫৮·০০)। ১৯৭২ সালের ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট সিরিজে যেখানে অস্ট্রেলিয়ার ছিল ৫টা সেঞ্চুরী সেখানে ইংল্যাণ্ডের সেঞ্চুরীর ঘর ছিল শূন্য। এক ইনিংসের খেলায় নব্বইয়ের ঘরে যে তিনজন খেলোয়াড় রান তুলেছিলেন তাঁদের মধ্যে অ্যালেন নট (৯২ রান) এবং বেরী উড (৯০ রান) এম সি সি-র সঙ্গে ভারত সফরে এসেছেন।

টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে হাজার রান এবং সেঞ্চুরী করেছেন এমন খেলোয়াড় ১৯৭২-৭৩ সালের ভারত সফরকারী এম সি সি দলে আছেন মাত্র ১ জন—উইকেট-কিপার-ব্যাটসম্যান অ্যালেন নট (৩৬টি টেস্ট খেলায় মোট রান ১৬৭৪ এবং সেঞ্চুরী ২)। তাছাড়া নট দলের টেস্ট খেলোয়াড়দের মধ্যে সব থেকে বেশী টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন—ভারতের মাটিতে পদার্পণ করার সময় তাঁর টেস্ট খেলার সংখ্যা ছিল ৩৬টি।

অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ১৯৭২ সালের টেস্ট সিরিজে ইংল্যাণ্ডের পক্ষে যাঁরা খেলেছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেক নামকরা খেলোয়াড় বর্তমান এম সি সি দলের সঙ্গে ভারত সফরে আসেননি। যেমন জিওফ বয়কট, রে ইলিংওয়ার্থ, জন স্নো, বেসিল ডি'অলিভেরা, স্নাক-হার্স্ট, মাইক স্মিথ, জন এডরিচ। এঁদের খেলা দেখার জন্যে ভারতের অগণিত ক্রিকেট অনুরাগী উদগ্রীব ছিলেন। ভারতবর্ষের বিপক্ষে ১৯৬৭ সালের লিডস মাঠের টেস্টে জিওফ বয়কট ২৪৬ রান করে অপরাজিত ছিলেন। তাঁর এই অপরাজিত ২৪৬ রান আজও ইংল্যাণ্ড-ভারতবর্ষের টেস্টে উভয়

দলের পক্ষে এক ইনিংসের খেলায় ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড। আমরা সব থেকে বেশী অভাব অনুভব করছি ইলিংওয়ার্থ, বয়কট এবং স্নো দলের সঙ্গে না আসাতে। ইংল্যান্ডের কয়েকজন খ্যাতনামা টেস্ট খেলোয়াড় যে-সব ব্যক্তিগত কারণ উল্লেখ করে এম সি সির ১৯৭২-৭৩ সালের ভারত সফরে যোগদানের অক্ষমতা জানিয়েছিলেন তা নতুন কিছু ব্যাপার নয়। এম সি সির ভারত সফরে প্রতিবারই এরকম ঘটেছে। ভারত সফর ব্যাপারে এম সি সি-র কর্তারা ভারতবর্ষকে সমকক্ষ মনে করেন না। দেখা যাচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৭১ সালের টেস্ট ক্রিকেট সিরিজে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক 'রাবার' জয়ের পরও এম সি সির অতীতের সেই নাকউঁচু মনোভাবের কোন পরিবর্তনই হয়নি। টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসরে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ইংল্যান্ডের জাতশত্রু সম্পর্ক। টেস্ট ক্রিকেটে ইংল্যান্ডের যত মাথা ব্যথা অস্ট্রেলিয়াকে নিয়ে। সুতরাং ভারতের মাটিতে ১৯৭২-৭৩ সালের টেস্ট সিরিজের ফলাফল ইংল্যান্ডের পক্ষে যদি খারাপই হয় তা হলেও স্বদেশে ফিরে সমালোচকদের তোপের মুখে পড়ে এম সি সি-র কর্মকর্তা এবং খেলোয়াড়দের জবাবদিহি করতে হবে না। এম সি সি-র উত্তর আগাম তৈরীই আছে—সাধ্যমত শক্তিশালী দল গঠন করা হয়েছে, খ্যাতনামা খেলোয়াড়রা যদি ব্যক্তিগত কারণে ভারত সফরে যেতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন তাহলে এম সি সির পক্ষে আর কি করার আছে। এই ভারত সফরে এম সি সি-র দুদিক থেকে ষোল আনা লাভ। প্রথমতঃ ভারতের খরচায় স্বদেশের তরুণ খেলোয়াড়রা ভারতের মাটিতে খেলার সুযোগ পেয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবেন এবং দ্বিতীয়ত এই ভারত সফর উপলক্ষে এম সি সি-র তহবিলে মোটা টাকার মুনাফা জমা পড়বে।

ভারত সফরকারী বর্তমান এম সি সি দলের অধিনায়ক টনি লুইস দলের বয়োজ্যেষ্ঠ খেলোয়াড়, বয়স ৩৪ বছর। অপরদিকে ২৪ বছরের ক্রিস ওল্ড দলের সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড়। দলের ১৬জন খেলোয়াড়ের মধ্যে এই তিনজন খেলোয়াড়—মাইক ডেনেস, ক্রিস ওল্ড এবং বেরী উড ভারতের মাটিতে এই ডিসেম্বর মাসে তাঁদের জন্মদিন উদযাপন করেছেন। ডেনেসের জন্ম ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর ১, ওল্ডের জন্ম ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর ২২ এবং উডের জন্ম ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর ২৬।

দলের ১৬ জন খেলোয়াড় ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৮—এই ১১ বছরের মধ্যে এইভাবে জন্মগ্রহণ করেছেন—১৯৪৬ সালে ৫জন, ১৯৪০ সালে ৩জন, ১৯৪৪ সালে ৩জন, এবং ১৯৩৯, ১৯৪১ ও ১৯৪৭ সাল বাদে বাকি বছরগুলিতে একজন করে খেলোয়াড়ের জন্ম। ৯টি মাসে এইভাবে তাঁরা জন্ম গ্রহণ করেছেন—৩জন ডিসেম্বরে, দুজন করে এপ্রিল, জুন, জুলাই, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে এবং একজন করে মার্চ, মে ও নভেম্বরে। বারমাসের মধ্যে কেবল জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী এবং আগস্ট—এই তিন মাস দলের কোনজন খেলোয়াড়ের কারও জন্ম মাস নয়। আর একটা লক্ষ্য করার বিষয়, কোন একটি মাসের একই তারিখে দুজন খেলোয়াড়ের জন্ম হয়নি।

দলের সব থেকে লম্বা খেলোয়াড় টনি গ্রেগের দেহের উচ্চতা ৬ ফিট ৭½ ইঞ্চি। এই সুবাদে তিনি খেলার মাঠে এক বাড়তি আকর্ষণ।

ভারত সফরকারী বর্তমান এম সি সি দলটি অভিজ্ঞ এবং তরুণ খেলোয়াড় সমন্বয়ে গঠিত। দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কারণেই এম-সি-সি'র কর্মকর্তারা যে ঝুঁকি নিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী।

ভারত সফরে এম সি সি

প্রথম শ্রেণীর খেলার ফলাফল

বছর	খেলা	জয়	হার	ড্র
১৯২৬—২৭	৮	৬	০	২
১৯৩৩—৩৪	১৬	৮	১	৭
১৯৫১—৫২	১৭	৬	১	১০
১৯৬১—৬২	১৫	৪	২	৯
১৯৬৩—৬৪	১০	১	০	৯
মোট :	৬৬	২৫	৪	৩৭

এম সি সি-র পরাজয়

১৯৩৩—৩৪ : বারাণসীতে ভিজিয়ানাগ্রাম একাদশ দলের কাছে ১৪ রাণে পরাজিত।

১৯৫১—৫২ : ভারতবর্ষের বিপক্ষে মাদ্রাজের ৫ম টেস্টে এক ইনিংস ও ৮ রাণে পরাজিত।

১৯৬১—৬২ : ভারতবর্ষের বিপক্ষে কলকাতার ৪র্থ টেস্টে ১৮৭ রাণে এবং মাদ্রাজের ৫ম টেস্টে ১২৮ রাণে পরাজিত।

খেলোয়াড় পরিচিতি

এম সি সি

টনি লুইস (গ্লামর্গান)

এম সি সি-র অধিনায়ক। জন্ম: জুলাই ৬, ১৯৩৮। চটকদার মিডল-অর্ডার ব্যাটসম্যান এবং লেগব্রেক বোলার। গ্লামর্গান কাউন্টির অধিনায়ক। তাঁর অধিনায়কত্বে ১৯৬৯ সালে গ্লামর্গান দলের কাউন্টি চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ। ওয়েলসের ক্রিকেট খেলোয়াড়দের পক্ষে তিনিই সর্বপ্রথম ইংল্যান্ডের টেস্ট খেলার অধিনায়কের পদলাভ করলেন। বর্তমান ভারত সফরের আগে ইংল্যান্ডের পক্ষে টেস্ট ম্যাচ খেলেন নি। তাঁকে নিয়ে ইংল্যান্ডের ১২ জন খেলোয়াড় তাঁদের খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলার আগেই ইংল্যান্ডের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। এক মরসুমের খেলায় সর্বাধিক মোট রাণ : ২,১৯৮ (গড় ৪১·৪৭), ১৯৬৬ সাল। প্রথম শ্রেণীর খেলায় এক ইনিংসের খেলায় সর্বোচ্চ রাণ : ২২৩ (বিপক্ষে কেন্ট), ১৯৬৬।

মাইক ডেনেস

মাইক ডেনেস (কেন্ট)

এম সি সি-র সহ-অধিনায়ক। জন্ম : ডিসেম্বর ১, ১৯৪০। ডান হাতে ব্যাট করেন। মিডিয়াম এবং অফ-ব্রেক বোলার। কেন্ট কাউন্টির অধিনায়ক।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ১ (বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড, ওভাল ১৯৬৯), এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রাণ নটআউট ৫৫ এবং মোট রাণ ৫৭।

অ্যালান নট (কেন্ট)

জন্ম : এপ্রিল ৯, ১৯৪৬। দলের নির্ভরশীল ব্যাটসম্যান এবং বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উইকেটকিপার। বর্তমান
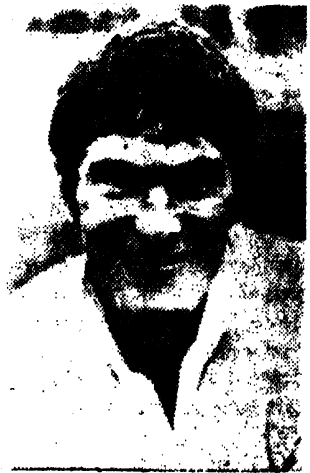
অ্যালান নট

এম সি সি দলের টেস্ট খেলোয়াড়দের মধ্যে একমাত্র তিনিই টেস্ট খেলায় ১০০০ রান

ডেরেক আন্ডারউড

এবং সেঞ্চুরী করেছেন। তাছাড়া সর্বাধিক (৩৬টি) টেস্ট ম্যাচও খেলেছেন। ১৯৬৯ সালে বিশ্ববিশ্রুত 'উইসডেন' ক্রিকেট বর্ষ-পঞ্জিকায় 'বছরের সেরা পাঁচজন ক্রিকেট খেলোয়াড়' তালিকায় স্থান লাভ করেন।

১৯৬৭ সালে ট্রেন্টব্রিজে পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট খেলায় 'ক্যাচ' ধরে সাতজনকে আউট করেন। ১৯৭১ সালে অকল্যান্ডে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে ১০১ এবং ২য় ইনিংসে ৯৬ রান করেন; ফলে মাত্র ৪ রানের জন্য একটি টেস্ট খেলার উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করার দুর্লভ গৌরব লাভ থেকে বঞ্চিত হন। ১৯৬৯ সালে করাচীতে পাকিস্তানের বিপক্ষে নটের নট-আউট ৯৬ রান - তাঁর আর একটি দুর্ভাগ্যের কাহিনী। তাঁর এই ৯৬ রানের মাথায় দর্শকদের বিক্ষোভ এবং হামলায় খেলা বাতিল ঘোষিত হয়। টেস্ট খেলায় তাঁর সেঞ্চুরী ২টি এবং নব্বই-এর ঘরে রান ওঠে চারবার।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ৩৬, মোট রান ১৬৭৪, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১১৬

জিওফ. আরনল্ড

(বিপক্ষে পাকিস্তান, বার্মিংহাম, ১৯৭১), সেঞ্চুরী ২। উইকেটকিপিং : কট ১১০ ও স্টাম্পড্ ১৩। এক সিরিজে সর্বাধিক ডিসমিস্যাল : ২৪টি (কট ২১ ও স্টাম্পড্ ৩), বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ১৯৭০-৭১।

ভারতবর্ষের বিপক্ষে টেস্ট : খেলা ৩, ইনিংস ৫, নটআউট ০, মোট রাণ ২২৩, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৯০ (৩য় টেস্ট, ওভাল), গড় ৪৪.৬০, অর্ধসেঞ্চুরী ২. কট ১০ ও স্টাম্পড্ ১—ইংল্যান্ডের ব্যাটিংয়ের গড় তালিকার প্রথম স্থান (১৯৭১)।

সফর : পাকিস্তান (১৯৬৬-৬৭), ওয়েস্ট-ইন্ডিজ (১৯৬৭-৬৮), পাকিস্তান ও সিংহল (১৯৬৮-৬৯), অস্ট্রেলিয়া ও নিউ-জিল্যান্ড (১৯৭০-৭১)।

ডেরেক আন্ডারউড (কেন্ট)

জন্ম : জুন ৮, ১৯৪৫। ডান হাতে ব্যাট করেন এবং বাঁ-হাতে মিডিয়াম পেস বল দেন। ১৯৭০-৭১ সালে নিউজিল্যান্ড সফর সময়ে তিনি তাঁর প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনের ১০০০তম উইকেটটি পান। এই সময় তাঁর বয়স ছিল ২৫ বছর ২৬৪ দিন। তাঁর থেকে কম বয়সে ১০০০-তম উইকেটটি পেয়েছেন ইংল্যান্ডের মাত্র এই দুজন খেলোয়াড়—ইয়র্কশায়ারের

ডেনিস অ্যামিস

উইলফ্রেড রোডস (১৯০২ সালে) এবং সারে কাউন্টির জর্জ লোহম্যান (১৮৯০ সালে)। ১৯৬৮ সালে 'উইসডেন' ক্রিকেট বর্ষপঞ্জিকায় 'বছরের সেরা পাঁচজন খেলোয়াড়' তালিকায় স্থান পান। বিভিন্ন দেশের যাঁরা আজও টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলছেন, তাঁদের মধ্যে একমাত্র তিনিই চার-বার একটি খেলায় ১০টি অথবা তার বেশি উইকেট পেয়েছেন—নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিনবার এবং ১৯৭২ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে একবার।

প্রথম ভারত সফরে আসেন ১৯৬৮ সালে এক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট দলের সঙ্গে। ১৯৭২-৭৩ সালের সফরটি তাঁর দ্বিতীয়-বারের ভারত পরিক্রমা।

বব্ কোট্টাম

টেস্ট পরিসংখ্যান :

খেলা ২৭, মোট রান ২৫১, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান নটআউট ৪৫। বোলিং : ২০৪২ রানে ১২০ উইকেট;

এক ইনিংসে সর্বাধিক উইকেট :

৭টি উইকেট (৩২ রানে), বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড, লর্ডস, ১৯৬৯;

সফর : পাকিস্তান (১৯৬৬-৬৭), পাকিস্তান ও সিংহল (১৯৬৮-৬৯), অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড (১৯৭০-৭১);

ভারতের বিপক্ষে টেস্ট : ১টি

ব্যাটিং : ২২ ও ১১ রান। বোলিং : ১২১ রানে ৪ উইকেট।

জিওফ আরনল্ড (সারে)

জন্ম : সেপ্টেম্বর ৩, ১৯৪৪। ডান-হাতে ফাস্ট মিডিয়াম বল করেন। কোরিন্থিয়ান ক্যাজুয়েলস দলের ফুটবল খেলোয়াড়। বর্তমান সফরটি তাঁর দ্বিতীয় ভারত সফর। এক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট দলের সংগে প্রথম ভারত সফরে আসেন ১৯৬৮ সালে। টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন ছয়টি—১৯৬৭ সালে

কিথ ফ্লেচার

নরম্যান গিফোর্ড

পাকিস্তানের বিপক্ষে তিনটি এবং দীর্ঘ চার বছর পর ১৯৭২ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিনটি।

টেস্ট পরিসংখ্যান :

খেলা ৬, মোট রান ১০২, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৫৯ (বিপক্ষে পাকিস্তান, ওভাল, ১৯৬৭)। বোলিং : ৪৫৬ রানে ২১ উইকেট।

এক ইনিংসে উল্লেখযোগ্য বোলিং : ৫ উইকেট (৫৮ রানে), বিপক্ষে পাকিস্তান, ওভাল, ১৯৬৭;

ডেনিস অ্যামিস (ওয়ারউইকশায়ার)

জন্ম : এপ্রিল ৭, ১৯৪৩। ওপেনিং ব্যাটসম্যান। বাঁ-হাতে মিডিয়াম পেস বল করতে পারেন, তবে টেস্টে করেননি। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ৯টা টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন। ১৯৬৬ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ৫ম টেস্টে তাঁর খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট খেলা। ১৯৭২

টনি গ্রিগ

সালে ওয়ারউইকশায়ার দলের কাউন্টি চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভের ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট অবদান আছে। ১৯৬৬-৬৭ সালের পাকিস্তান সফরে হাজার রান পূর্ণ করেন। ১৯৬৮ সালে বোম্বাইয়ে আন্তর্জাতিক একাদশ দলের পক্ষে তাঁর সেন্চুরী (১০৯ রান) মনে রাখার মত।

টেস্ট পরিসংখ্যান :

খেলা ৯, মোট রান ২৫৮, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৫৬ (বিপক্ষে পাকিস্তান, লিডস, ১৯৭১)

বব কোট্টাম (নর্দাম্পটনসায়ার)

জন্ম : অকটোবর ১৬, ১৯৪৪। ডান হাতে ফাস্ট মিডিয়াম বল দেন। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত হ্যাম্পসায়ার কাউন্টির খেলোয়াড় ছিলেন। ১৯৭২ সালের ক্রিকেট মরসুমে দেড় মাস দেরীতে কাউন্টি লীগের খেলায় যোগ দিয়ে ৫০টা উইকেট পান। দৈহিক উচ্চতায় ৬ ফিট ৩ ইঞ্চি।

প্যাট পোকক

টেস্ট পরিসংখ্যান :

খেলা ২, মোট রাণ ৮ এবং ১৮০ রাণে ৯ উইকেট। এক ইনিংসে উল্লেখযোগ্য বোলিং : ৪ উইকেট (৫০ রাণে) বিপক্ষে পাকিস্তান, লাহোর, ১৯৬৯

কিথ ফ্লেচার (এসেকস)

জন্ম : মে ২০, ১৯৪৪। ডানহাতে ব্যাট করেন। কভার ফিল্ডার হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি। ১৯৭২ সালের ক্রিকেট মরসুমে তাঁর মোট রাণ দাঁড়িয়েছে ১,৭৬৩। ১৯৬৮ সালে বোম্বাইয়ের ব্রেবোর্ণ স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক একাদশ দলের পক্ষে সেঞ্চুরী করেন।

টেস্ট পরিসংখ্যান :

খেলা ১৫, মোট রাণ ৪৯৩, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রাণ ৮৩ (বিপক্ষে পাকিস্তান, লাহোর, ১৯৬৯)।

সফর : পাকিস্তান (১৯৬৬—৬৭), পাকিস্তান ও সিংহল (১৯৬৮—৬৯), অস্ট্রেলিয়া

বেরী উড

ও নিউজিল্যাণ্ড (১৯৭০—৭১) এবং ভারতবর্ষ ১৯৬৮ ও ১৯৭২—৭৩)।

নরম্যান গিফোর্ড (ওরুস্টারসায়ার)

জন্ম : মার্চ ৩০, ১৯৪০, বাঁ হাতে ব্যাট এবং বল করেন। ওরুস্টারসায়ার দলের অধিনায়ক। এ পর্যন্ত ৯টা টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন। প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলেন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৬৪ সালে। দীর্ঘদিন পর ১৯৭১ সালে পাকিস্তান ও ভারতবর্ষের বিপক্ষে দুটো করে এবং ১৯৭২ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৩টে। ১৯৬৫ সালে ওরস্টারসায়ার দলের বিশ্ব পরিক্রমা সফরে তিনি কলকাতার মাঠে খেলে গেছেন।

টেস্ট পরিসংখ্যান :

খেলা ৯, মোট রাণ ১৪ এবং ৫১৬ রাণে ২০ উইকেট।

এক ইনিংসে উল্লেখযোগ্য বোলিং : ৪ উইকেট (৪৩ রাণে), বিপক্ষে ভারতবর্ষ, লর্ডস, ১৯৭১।

ক্রিস্ ওল্ড

রজার টলচার্ড

টনি গ্রীগ (সাসেক্‌স)

জন্ম : অকটোবর ৬, ১৯৪৬। ডান হাতে ব্যাট এবং মিডিয়াম-ফাস্ট বল করেন। দলের চৌকস খেলোয়াড় হিসাবে খ্যাতি। ১৯৭৩ সালের জন্য সাসেক্‌স কাউণ্টি দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। বর্তমান এম-সি-সি দলের দীর্ঘাঙ্গী খেলোয়াড় —উচ্চতায় ৬ ফিট ৭½ ইঞ্চি। খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট খেলা অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৭২ সালে। ইংল্যান্ড—অস্ট্রেলিয়ার ১৯৭২ সালের টেস্ট সিরিজে ইংল্যান্ডের ব্যাটিংয়ের গড় তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করেন (গড় ৩৬·০০)। ১৯৬৮ সালে মাদ্রাজে আন্তর্জাতিক একাদশ দলের পক্ষে আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে সেঞ্চুরী করেন।

টেস্ট পরিসংখ্যান :

খেলা ৫, মোট রাণ ২৮৮, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রাণ ৬২ (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৭২) এবং ৩৯৮ রাণে ১০ উইকেট।
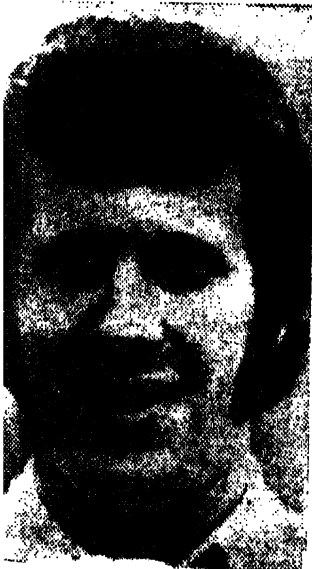
গ্রাহাম রূপ

জ্যাক বার্কেনশ

প্যাট পোকক্‌ (সারে)

জন্ম: সেপ্টেম্বর ২৪, ১৯৪৬। দলের শ্রেষ্ঠ অফ-ব্রেক বোলার। টেস্ট খেলা ৪টি। খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট খেলা ১৯৬৭-৬৮ সালের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে এবং শেষ টেস্ট খেলা ১৯৬৯ সালের পাকিস্তান সফরে। টেস্টের শেষের দিকের খেলোয়াড় হিসাবে তাঁর ব্যাটিংয়ের সহিষ্ণুতা আজও ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজের টেস্ট খেলার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। ১৯৬৮ সালে জর্জ টাউনে তিনি তাঁর খেলোয়াড়-জীবনের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় টনি লকের সহযোগিতায় ৯ম উইকেটের জুটিতে যে ১০৯ রাণ সংগ্রহ করেন তা আজও এই দুই দেশের টেস্ট খেলায় ৯ম উইকেট জুটির রেকর্ড রাণ।

টেস্ট পরিসংখ্যান :

খেলা ৪, মোট রাণ ৪৮ এবং ৫১৩ রাণে ১২ উইকেট।

এক ইনিংসে উল্লেখযোগ্য বোলিং: ৬টি উইকেট (৭৯ রাণে) বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৬৮।

বেরী উড (ল্যাঙ্কাসায়ার)

জন্ম : ডিসেম্বর ২৬, ১৯৪২। ডান হাতে ব্যাট এবং মিডিয়াম ফাস্ট বল করেন। গত আগস্ট মাসে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে শেষ ৫ম টেস্টে তিনি আহত বয়কটের শূন্যস্থানে খেলতে নেমে ২৬ ও ৯০ রাণ করেন এবং ইংল্যান্ডের ব্যাটিংয়ের গড় তালিকায় শীর্ষস্থান পান (গড় ৫৮·০০)।

টেস্ট পরিসংখ্যান :

খেলা ১, মোট রাণ ১১৬, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রাণ ৯০ (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ওভাল, ১৯৭২)।

ক্রিস ওল্ড (ইয়র্কসায়ার)

জন্ম: ডিসেম্বর ২২, ১৯৪৮। বাঁ হাতে ব্যাট এবং ডান হাতে ফাস্ট মিডিয়াম বল করেন। বর্তমান এম-সি-সি দলের সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড়, বয়স ২৪ বছর। যে কোন জায়গায় ভাল ফিল্ডিং করতে পারেন। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৭২ সালের টেস্ট সিরিজে তিনটে টেস্টে দ্বাদশ খেলোয়াড় হিসাবে দলভুক্ত হয়েছিলেন।

রজার টলচার্ড (লেস্টারসায়ার)

জন্ম : জুন ১৫, ১৯৪৬। উইকেট-কিপার। তাছাড়া প্রথম বিভাগের লিস্টার সিটি দলের ফুটবল খেলোয়াড়। দলের অধিনায়ক রে ইলিংওয়ার্থের টেস্ট খেলার সময় তিনি দক্ষতার সঙ্গে দল পরিচালনা করেন।

জ্যাক বার্কেনশ (লেস্টারসায়ার)

জন্ম: নভেম্বর ১৩, ১৯৪০। বাঁ হাতে ব্যাট এবং ডান হাতে অফ্-ব্রেক বল করেন। বর্তমানে ব্যাটিংয়ের থেকে বোলিংয়েই বেশী সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। বর্তমান সফর তাঁর দ্বিতীয় ভারত সফর। প্রথম ভারত সফরে আসেন ১৯৬৮ সালে আন্তর্জাতিক একাদশ দলের সঙ্গে।

গ্রাহাম রূপ (সারে)

জন্ম : জুলাই ১২, ১৯৪৬। ডান হাতে ব্যাট এবং মিডিয়াম ফাস্ট বল করেন। স্লিপ ফিল্ডিংয়ে বিশেষ পটু। চৌকস খেলোয়াড়। কোরিন্থিয়ান ক্যাজুয়েলস ফুটবল দলের গোলকিপার। ১৯৭১ সাল তাঁর খেলোয়াড়-জীবনের সাফল্যময় বছর। এই বছরে তাঁর দল কাউন্টি চ্যাম্পিয়ান হয়। ১৯৭১ সালে তাঁর সাফল্য : মোট রাণ ১,৬৪১ (গড় ৪৪·৩৫), লিস্টারসায়ারের বিপক্ষে একটি খেলার উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী (১০৯ ও নট আউট ১০৩), এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রাণ ১৭১ (বিপক্ষে ইয়র্কসায়ার) এবং ইংল্যান্ড সফরকারী ভারতীয় ক্রিকেট দলের বিপক্ষে একটি খেলায় ৬০ ও নট আউট ৫৬ রাণ।

অজিত ওয়াদেকার

ভারতীয় খেলোয়াড়

অজিত ওয়াদেকার (বোম্বাই):

জন্ম: এপ্রিল ১, ১৯৪১

অধিনায়ক। ন্যাটা চটকদার ব্যাটসম্যান। তাঁর নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এবং ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৭১ সালের টেস্ট সিরিজে ভারত 'রাবার' জয়ী হয়। ভারতের এই 'রাবার' জয় ঐতিহাসিক এই কারণে যে, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এবং ইংল্যাণ্ডের মাটিতে আয়োজিত টেস্ট ক্রিকেট সিরিজে এই দুই দেশের বিপক্ষে 'রাবার' জয় ভারতের পক্ষে প্রথম। তাছাড়া একই বছরে (১৯৭১ সালে) নতুন অধিনায়ক অজিত ওয়াদেকারের নেতৃত্বে ইংল্যাণ্ড এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মত শক্তিশালী টেস্ট দলের বিপক্ষে তরুণ খেলোয়াড়দের ভারতের 'রাবার' জয় ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এক নতুন যুগের সূচনা।
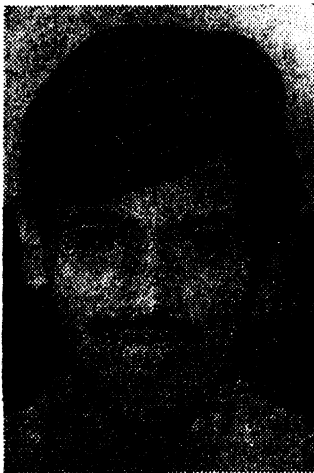
টেস্ট পরিসংখ্যান: খেলা ২৯, ইনিংস ৫৫, নটআউট ২-বার, মোট রান ১৭২১, সেঞ্চুরী ১ এবং গড় ৩২·৪৭
এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান: ১৪৩ (বিপক্ষে নিউজিল্যাণ্ড, ওয়েলিংটন, ১৯৬৮)

এস ভেঙ্কটরাঘবন

এস ভেঙ্কটরাঘবন (তামিলনাড়ু):

জন্ম: এপ্রিল ২১, ১৯৪৫। অফ-স্পিন বোলার।

টেস্ট পরিসংখ্যান: খেলা ২২, ইনিংস ৩৩, নটআউট ৬-বার, মোট রান ৪২১, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৫১ (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, পোর্ট অব স্পেন, ১৯৭১) এবং গড় ১৫·৫১

দিলীপ সরদেশাই

বোলিং: ২২৭৭ রানে ৮২ উইকেট (গড় ২৭·৭৬)। এক ইনিংসে ৫ উইকেট ৩-বার এবং একটি খেলায় ১০টি উইকেট ১-বার (৭২ রানে ৮ ও ৮০ রানে ৪, নিউদিল্লী, ১৯৬৫)

দিলীপ সরদেশাই (বোম্বাই):

জন্ম: আগস্ট ৮, ১৯৪০। নির্ভরশীল ব্যাটসম্যান।

টেস্ট পরিসংখ্যান: খেলা ২৯, ইনিংস ৫৩, নটআউট ৪-বার, মোট রান ১৯৭৮, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২১২ (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, কিংস্টন, ১৯৭১), সেঞ্চুরী ৫ এবং গড় ৪০·৩৬
ডাবল সেঞ্চুরী: ২টি (নটআউট ২০০, বোম্বাই, বিপক্ষে নিউজিল্যাণ্ড, ১৯৬৫ এবং ২১২ বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ কিংস্টন, ১৯৭১)

অশোক মানকাদ
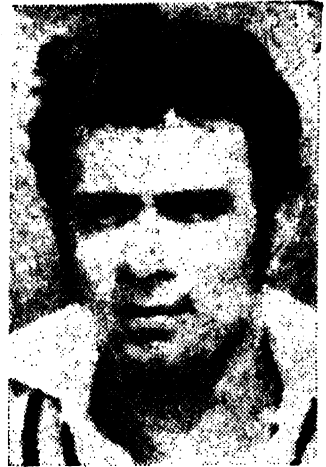
এক সিরিজে সর্বাধিক মোট রান: ৬৪২ (গড় ৮০·২৫) বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৭১

অশোক মানকাদ (বোম্বাই):

জন্ম: অকটোবর ১২, ১৯৪৬। ব্যাটসম্যান।

টেস্ট পরিসংখ্যান: খেলা ১৩, ইনিংস ২৩, নটআউট ২-বার, মোট রান ৬৪৪, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৯৭ (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, নিউদিল্লী, ১৯৬৯)

একনাথ সোলকার (বোম্বাই):

অল-রাউণ্ডার, ন্যাটা ব্যাটসম্যান।

জন্ম: মার্চ ১৮, ১৯৪৮।

টেস্ট পরিসংখ্যান: খেলা ১৩, ইনিংস ২১, নটআউট ৪-বার, মোট রান ৫৮৩, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৬৭ (বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, লর্ডস, ১৯৭১) এবং গড় ৩৪·২৯ বোলিং: ৬৬৮ রানে ১৩ উইকেট।
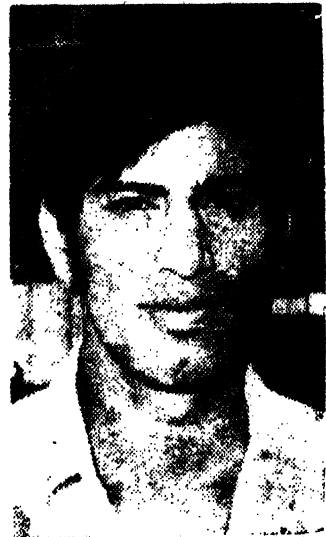
একনাথ সোলকার

সুনীল গাভাস্কার

এম এল জয়সীমা

ফারুক ইঞ্জিনিয়ার

সুনীল গাভাসকার (বোম্বাই):

জন্ম: জুলাই ১০, ১৯৪৯। একান্ত নির্ভরশীল ওপনিং ব্যাটসম্যান।

গাভাস্কার তাঁর খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম সরকারী টেস্ট ক্রিকেট সিরিজের (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ১৯৭১) ৪টি টেস্ট ম্যাচে মোট ৭৭৪ রান, ৫ম টেস্টের উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী (১২৪ ও ২২০ রান) এবং মোট ৪টি সেঞ্চুরী করার সূত্রে আন্তর্জাতিক সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে নানা দিক থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় নজির সৃষ্টি করেন।

সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার সুদীর্ঘ ৯৬ বছরের ইতিহাসে খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট সিরিজের ৪টি ম্যাচ খেলে মোট ৭০০ রান পূর্ণ করেছেন মাত্র এই দুজন খেলোয়াড়: ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জর্জ হেডলে (মোট রান ৭০৩, বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, ১৯২৯-৩০) এবং ভারতের সুনীল গাভাসকার (মোট রান ৭৭৪)। কিন্তু গাভাসকারের এই মোট ৭৭৪ রান এক দিক থেকে বিশ্ব রেকর্ড এই কারণে যে, খেলোয়াড় জীবনের প্রথম সরকারী টেস্ট সিরিজের ৪টি খেলায় গাভাসকারের থেকে অপর কোন খেলোয়াড় বেশী রান সংগ্রহ করেননি।

৫ম টেস্টে গাভাসকারের ১২৪ ও ২২০ রান খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম সরকারী টেস্ট সিরিজের একটি খেলায় সেঞ্চুরী ও ডাবল সেঞ্চুরীর প্রথম নজির এবং আন্তর্জাতিক সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে দ্বিতীয় নজির। এ বিষয়ে প্রথম নজির (তবে খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট সিরিজে নয়) সৃষ্টি করেন অস্ট্রেলিয়ার ডুগ ওয়াল্টার্স (২৪২ ও ১০৩ রান, সিডনি, বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ১৯৬৮—৬৯)
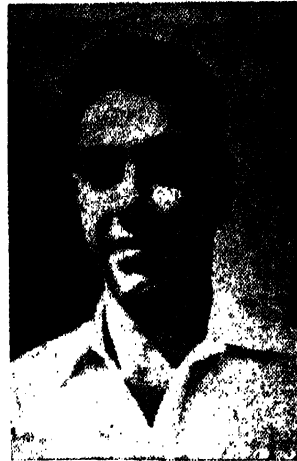
গাভাসকারের এক সিরিজে মোট ৭৭৪ রান এবং ৪টি সেঞ্চুরী—ভারতীয় টেস্ট খেলোয়াড়দের পক্ষে একটি সিরিজের খেলায় সর্বাধিক মোট রান এবং সর্বাধিক সেঞ্চুরীর রেকর্ড।

টেস্ট পরিসংখ্যান: খেলা ৭, ইনিংস ১৩, নট আউট ৩, মোট রান ৯১৮, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২২০ (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, পোর্ট অব স্পেন, ১৯৭১)

আর জি কিষনাথ

বি এস চন্দ্রশেখর

ফারুক ইঞ্জিনীয়ার (বোম্বাই):

জন্ম: ফেব্রুয়ারী ২৫, ১৯৩৮। উইকেট-কিপার ব্যাটসম্যান।

টেস্ট পরিসংখ্যান: খেলা ৩৩, ইনিংস ৬২, নটআউট ২-বার, মোট রান ১৭৭৯, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১০৯ (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, মাদ্রাজ, ১৯৬৬-৬৭), সেঞ্চুরী ১ এবং গড় ২৯·৬৫।
উইকেটকীপিং: ক্যাচ ৫০ ও স্ট্যাম্পিং ১৩

সৈয়দ আবিদ আলী (হায়দরাবাদ)

জন্ম: সেপ্টেম্বর ৯, ১৯৪২। অল-রাউন্ডার

টেস্ট পরিসংখ্যান: খেলা ২০, ইনিংস ৩৬ নটআউট ৩-বার, মোট রান ৬৯৯, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৮১ (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, সিডনির ৪র্থ টেস্ট, ১৯৬৭—৬৮) এবং গড় ২১·১৮।
বোলিং: ১৪১৮ রানে ৩৭ উইকেট। এক ইনিংসে ৫ উইকেট ১ বার। এক ইনিংসে শ্রেষ্ঠ বোলিং: ৫৫ রানে ৬ উইকেট (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, এডিলেড ১৯৬৭—৬৮)

পি কৃষ্ণমূর্তি (হায়দরাবাদ):
উইকেটকীপার। বয়স ২৫।

টেস্ট পরিসংখ্যান: খেলা ৫, ইনিংস ৬, নট-আউট ০, মোট রান ৩৩, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২০ এবং গড় ৫·৫০। উইকেটকীপিং: ক্যাচ ৭ এবং স্টাম্পিং ১।

এম এল জয়সীমা (হায়দরাবাদ):

জন্ম: মার্চ ৩, ১৯৩৯। অল-রাউন্ডার।

টেস্ট পরিসংখ্যান: খেলা ৩৯, ইনিংস ৭৯, নট আউট ৪-বার, মোট রান ২০৫৩, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১২৯ (বিপক্ষে ইংল্যান্ড, কলকাতা, ১৯৬৩—৬৪), সেঞ্চুরী ৩ এবং গড় ৩০·৬৮। বোলিং: ৮২৯ রানে ৯ উইকেট।

জি আর বিশ্বনাথ (মহীশূর):

জন্ম: ফেব্রুয়ারী ১২, ১৯৪৮

টেস্ট পরিসংখ্যান: খেলা ১০, ইনিংস ১১, নটআউট ২-বার, মোট রান ৫৯৭, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৩৭ (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, কানপুর, ১৯৬৯), সেঞ্চুরী ১ এবং গড় ৩৫·১১।

এরাপল্লী প্রসন্ন (মহীশূর):

জন্ম: মে ২২, ১৯৪০। অফ স্পিনার।

টেস্ট পরিসংখ্যান: খেলা ২৫, ইনিংস ৪২, নটআউট ৮-বার, মোট রান ৪২৩, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২৬ এবং গড় ১২·৪৪।

বোলিং: ৩৪৬৪ রানে ১২৪ উইকেট (গড় ২৭৯৩)। এক ইনিংসে ৫টা উইকেট ৮-বার এবং একটি খেলায় ১০ উইকেট ১ বার। এক ইনিংসে শ্রেষ্ঠ বোলিং: ৭৪ রানে ৬টা উইকেট (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, মাদ্রাজ, ২য় ইনিংস ১৯৬৯)
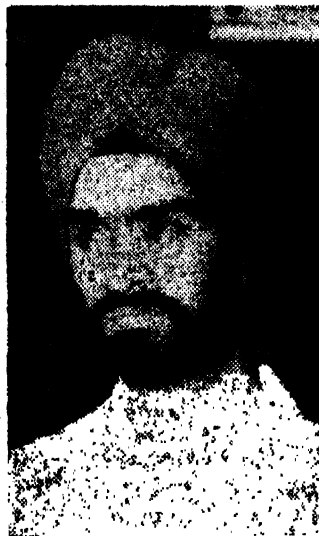
বিষেণ সিং বেদী

বি এস চন্দ্রশেখর (মহীশূর):

জন্ম: মে ১৮, ১৯৪৫। লেগস্পিন বোলার।

টেস্ট পরিসংখ্যান: খেলা ১৯, ইনিংস ২৩, নটআউট ১৫-বার, মোট রান ৭৬, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২২। বোলিং: ২৩২১ রানে ৭৫ উইকেট (গড় ৩০·৯৪), এক ইনিংসে ৫ উইকেট ৩-বার এবং একটি খেলায় ১০ উইকেট ১-বার —১১টি উইকেট (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বোম্বাই, ১৯৬৬—৬৭)। এক ইনিংসে শ্রেষ্ঠ বোলিং: ১৫৭ রানে ৭ উইকেট (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, বোম্বাই, ১ম ইনিংস, ১৯৬৬—৬৭)

বিষেণ সিং বেদী দিল্লী):

জন্ম: সেপ্টেম্বর ২৫, ১৯৪৬। লেফট-আর্ম স্পিন বোলার

টেস্ট পরিসংখ্যান: খেলা ২৭, ইনিংস ৪২, নটআউট ১২-বার, মোট রান ২৫৩, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২২।

এরাপল্লী প্রসন্ন

বোলিং: ২৭৭৯ রানে ৯৬ উইকেট (গড় ২৮·৯৪)। এক ইনিংসে ৫টি করে উইকেট ৪ বার। এক ইনিংসে শ্রেষ্ঠ বোলিং: ৯৮ রানে ৭টা (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, কলকাতা, ১৯৬৯)

সেলিম দুরানী (রাজস্থান):

জন্ম: আগস্ট ১৫, ১৯৩৫। অল-রাউন্ডার।

টেস্ট পরিসংখ্যান: খেলা ২৬, ইনিংস ৪২ নটআউট ২-বার, মোট রান ৯৫৯, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১০৪ (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, পোর্ট অব স্পেন ১৯৬২), সেঞ্চুরী ১ এবং গড় ২২·৮০।

বোলিং: ২৫৯৮ রানে ৭৪ উইকেট (গড় ৩৫·১০), এক ইনিংসে ৫টা করে উইকেট ৩-বার এবং একটা খেলায় ১০ উইকেট ১ বার। এক ইনিংসে শ্রেষ্ঠ বোলিং: ৭৩ রানে ৬ উইকেট (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, কলকাতা ১৯৬৪—৬৫)

সৈয়দ আবিদ আলী

সেলিম দুরানী

ইংল্যান্ডের টেস্ট খেলোয়াড়

১৯৭২ সালের ২০শে ডিসেম্বর ভারত বনাম ইংল্যান্ডের প্রথম টেস্ট খেলার আগে পর্যন্ত

ব্যাটিং

	খেলা	ইনিংস	নটআউট	মোট রান	এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান	গড়	সেঞ্চুরী
অ্যামিস	৯	১৫	২	২৫৮	৫৬	১৯.৮৪	—
আণ্ডারউড	২৭	৩৪	১৭	২৫১	৪৫*	১৪.৭৬	—
আরনল্ড	৬	৮	২	১০২	৫৯	১৭.০০	—
উড	১	২	০	১১৬	৯০	৫৮.০০	—
কোট্রাম	২	২	১	৮	৪*	৮.০০	—
গিফোর্ড	৯	১৩	৫	৯৪	১৭	১১.৭৫	—
গ্রীগ	৫	৯	১	২৮৮	৬২	৩৬.০০	—
ডেনেস	১	২	১	৫৭	৫৫*	৫৭.০০	—
নট	৩৬	৫৪	৭	১৬৭৪	১১৬	৩৫.৬১	২
পোকক্	৪	৭	০	৪৮	১৩	৬.৮৫	—
ফ্লেচার	১৫	২৫	২	৪৯৩	৮৩	২১.৪৩	—

বোলিং

	বল	রান	উইকেট	গড়
আরনল্ড	১১৮১	৪৫৬	২১	২১.৭১
আণ্ডারউড	৭৫২৮	২৩৪২	১২০	১৯.৫১
কোট্রাম	৫৫৫	১৮০	৯	২০.০০
গিফোর্ড	১৬৮৭	৫১৬	২০	২৫.৮০
গ্রীগ	৯৭৫	৩৯৮	১০	৩৯.৮০
পোকক্	১০৮০	৫১৩	১২	৪২.৭৫
ফ্লেচার	২২৬	১৪৬	১	১৪৬.০০

ভারতীয় টেস্ট খেলোয়াড়

১৯৭১ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এবং ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে 'রাবার' বিজয়ী ভারতবর্ষের যে ১৬ জন খেলোয়াড় টেস্ট ম্যাচ খেলেছিলেন তাঁদের টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনের পরিসংখ্যান (১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৭২ পর্যন্ত) নীচে দেওয়া হল।

ব্যাটিং

	খেলা	ইনিংস	নটআউট	মোট রান	এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান	গড়	সেঞ্চুরী
আবিদ আলী	২০	৩৬	৩	৬৯৯	৮১	২১.১৮	—
ইঞ্জিনিয়ার	৩৩	৬২	২	১৭৭৯	১০৯	২৯.৬৫	—
ওয়াদেকার	২৯	৫৫	২	১৭২১	১৪৩	৩২.৪৭	১
কৃষ্ণমূর্তি	৫	৬	০	৩৩	২০	৫.৫০	—
গাভাস্কার	৭	১৪	৩	৯১৮	২২০	৮৩.৪৫	৪
চন্দ্রশেখর	১৯	২৬	১৫	৭৬	২২	৬.৯০	—
জয়সীমা	৩৯	৭১	৪	২০৫৬	১২৯	৩০.৬৮	৩
জয়ন্তীলাল	১	১	০	৫	৫	৫.০০	—
দুরানী	২৬	৪৪	২	৯৫৯	১০৪	২২.৮৩	১
প্রসন্ন	২৫	৪২	৮	৪২৩	২৬	১২.৪৪	—
বেদী	২৭	৪২	১২	২৫৩	২২	৮.৪৩	—
বিশ্বনাথ	১০	১৯	২	৫৯৭	১৩৭	৩৫.১১	১
ভেঙ্কটরাঘবন	২২	৩৩	৬	৪২১	৫১	১৫.৫৯	—
মানকাদ	১৩	২৬	২	৬৪৪	৯৭	২৬.৮৩	—
সরদেশাই	২৯	৫৩	৪	১৯৭৮	২১২	৪০.৩৬	৫
সোলকার	১৩	২১	৪	৫৮৩	৬৭	৩৪.২৯	—

বোলিং

যাঁরা উইকেট পেয়েছেন তাঁদেরই নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে

	বল	রান	উইকেট	গড়
আবিদ আলি	৩০৯৯	১৪১৮	৩৭	৩৮.৩২
চন্দ্রশেখর	৫৬২৮	২৩২১	৭৫	৩০.৯৪
জয়সীমা	২০৯১	৮২৯	৯	৯২.১১
দুরানী	৬৩০৮	২৫৯৮	৭৪	৩৫.১০
প্রসন্ন	৮৫১৫	৩৪৬৪	১২৪	২৭.৯৩
বেদী	৮৩১৩	২৭৭৯	৯৬	২৮.৯৪
ভেঙ্কটরাঘবন	৬২৯১	২২৭৭	৮২	২৭.৭৬
সোলকার	১৪৯৭	৬৬৮	১৫	৪৪.৫৩

টেস্টের অধিনায়ক

ভারতবর্ষ

১৯৩২ : সি কে নাইডু, ১৯৩৩—৩৪ সি কে নাইডু, ১৯৩৬ : ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজা, ১৯৪৬ : পতৌদির নবাব (ইফতিকার আলি খাঁ), ১৯৫১—৫২ : বিজয় হাজারে, ১৯৫২ : বিজয় হাজারে, ১৯৫৯ : ডি কে গাইকোয়াড় (৪) এবং পঙ্কজ রায় (১), ১৯৬১—৬২ : নরী কন্ট্রাক্টর, ১৯৬৩—৬৪ : পতৌদির নবাব (মনসুর আলি), ১৯৭১ : অজিত ওয়াদেকার, ১৯৭২—৭৩ : অজিত ওয়াদেকার।

ইংল্যাণ্ড

১৯৩২ : ডি আর জার্ডিন, ১৯৩৩—৩৪ : ডি আর জার্ডিন, ১৯৩৬ : জি ও অ্যালেন, ১৯৪৬ : ওয়াল্টার হ্যামন্ড, ১৯৫১—৫২ : এন ডি হাওয়ার্ড (৪) ও ডি বি কার (১), ১৯৫২ : লেন হাটন, ১৯৫৯ : পিটার মে (৩) এবং কলিন কাউড্রে (২), ১৯৬১—৬২ : টেড ডেক্সটার, ১৯৬৩—৬৪ মাইক স্মিথ, ১৯৬৭ : ডি বি ক্লোজ ১৯৭১ : রে ইলিংওয়ার্থ, ১৯৭২—৭৩ : টনি লুইস।
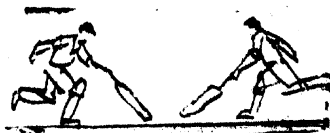
ভারত বনাম ইংল্যান্ড

সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার পরিসংখ্যান

১৯৭২ সালের ২০শে ডিসেম্বরের আগে ভারত বনাম ইংল্যাণ্ডের যে ৪০টি সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলা হয়েছে তার ভিত্তিতে নীচের পরিসংখ্যানগুলি তৈরী।

সি কে নাইডু
ভারতের প্রথম টেস্ট অধিনায়ক

টেস্ট খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

প্রথম টেস্ট খেলা : ২৫শে জুন, লর্ডস, ১৯৩২

বছর	স্থান	ভারত জয়ী	ইংল্যাণ্ড জয়ী	খেলা ড্র	মোট খেলা	রাবার জয়
১৯৩২	ইংল্যাণ্ড	০	১	০	১	ইংল্যাণ্ড
১৯৩৩-৩৪	ভারতবর্ষ	০	২	১	৩	ইংল্যাণ্ড
১৯৩৬	ইংল্যাণ্ড	০	২	১	৩	ইংল্যাণ্ড
১৯৪৬	ইংল্যাণ্ড	০	১	২	৩	ইংল্যাণ্ড
১৯৫১-৫২	ভারতবর্ষ	১	১	৩	৫	ড্র
১৯৫২	ইংল্যাণ্ড	০	৩	১	৪	ইংল্যাণ্ড
১৯৫৯	ইংল্যাণ্ড	০	৫	০	৫	ইংল্যাণ্ড
১৯৬১-৬২	ভারতবর্ষ	২	০	৩	৫	ভারতবর্ষ
১৯৬৩-৬৪	ভারতবর্ষ	০	০	৫	৫	ড্র
১৯৬৭	ইংল্যাণ্ড	০	৩	০	৩	ইংল্যাণ্ড
১৯৭১	ইংল্যাণ্ড	১	০	২	৩	ভারতবর্ষ
মোট :		৪	১৮	১৮	৪০	

এক নজরে
টেস্ট খেলার ফলাফল

স্থান	মোট খেলা	ভারত জয়ী	ইংল্যাণ্ড জয়ী	খেলা ড্র
ভারতবর্ষ	১৮	৩	৩	১২
ইংল্যাণ্ড	২২	১	১৫	৬
মোট :	৪০	৪	১৮	১৮

এক নজরে
টেস্ট সিরিজের ফলাফল

স্থান	মোট সিরিজ	ভারত জয়ী	ইংল্যাণ্ড জয়ী	সিরিজ ড্র
ইংল্যাণ্ড	৭	১	৬	০
ভারতবর্ষ	৪	১	১	২
মোট	১১	২	৭	২

বিভিন্ন মাঠে টেস্ট খেলার ফলাফল
ভারতবর্ষে

মাঠ	মোট খেলা	ভারতবর্ষ জয়ী	ইংল্যাণ্ড জয়ী	খেলা ড্র
বোম্বাই	৪	০	১	৩
কলকাতা	৪	১	০	৩
মাদ্রাজ	৪	২	১	১
দিল্লী	৩	০	০	৩
কানপুর	৩	০	১	২
মোট :	১৮	৩	১২	৩

ডি আর জার্ডিন
ভারতের বিপক্ষে ইংল্যাণ্ডের প্রথম অধিনায়ক

লালা অমরনাথ

ইংলণ্ডে

মাঠ	মোট খেলা	ভারতবর্ষ জয়ী	ইংল্যান্ড জয়ী	খেলা ড্র
লর্ডস	৭	০	৬	১
ম্যাঞ্চেস্টার	৫	০	২	৩
[illegible]ল	৫	১	২	২
লিডস	৩	০	৩	০
নটিংহাম	১	০	১	০
বার্মিংহাম	১	০	১	০
মোট :	২২	১	১৫	৬

প্রথম টেস্ট খেলার তারিখ

ইংল্যাণ্ডে

মাঠ	খেলার তারিখ	বৎসর	মোট খেলা
লর্ডস	জুন ২৫,	১৯৩২	৭
ম্যাঞ্চেস্টার	জুলাই ২৫,	১৯৩৬	৫
ওভাল	আগস্ট ১৫,	১৯৩৬	৫
লিডস	জুন ৫,	১৯৫২	৩
নটিংহাম	জুন ৪,	১৯৫৯	১
বার্মিংহাম	জুলাই ১৩,	[illegible]	১

ভারতবর্ষে

মাঠ	খেলার তারিখ	বৎসর	মোট খেলা
বোম্বাই	ডিসেম্বর ১৫,	১৯৩৩	৪
কলকাতা	জানুয়ারী ৫,	১৯৩৪	৪
মাদ্রাজ	ফেব্রুয়ারী ১০,	১৯৩৪	৪
দিল্লী	নভেম্বর ২,	১৯৫১	৩
কানপুর	জানুয়ারী ১২,	১৯৫২	৩

মনসুর আলি

বুধি কুন্দরন

[illegible]

[illegible]

খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

বছর	মাঠ	খেলার ফলাফল
১৯৩২	লর্ডস	ইংল্যান্ড ১৫৮ রানে জয়ী
১৯৩৩-৩৪	বোম্বাই	ইংল্যান্ড ৯ উইকেটে জয়ী
	কলিকাতা	খেলা অমীমাংসিত
	মাদ্রাজ	ইংল্যান্ড ২০২ রানে জয়ী
১৯৩৬	লর্ডস	ইংল্যান্ড ৯ উইকেটে জয়ী
	ম্যাঞ্চেস্টার	খেলা অমীমাংসিত
	ওভাল	ইংল্যান্ড ৯ উইকেটে জয়ী
১৯৪৬	লর্ডস	ইংল্যান্ড ১০ উইকেটে জয়ী
	ম্যাঞ্চেস্টার	খেলা অমীমাংসিত
	ওভাল	খেলা অমীমাংসিত
১৯৫১-৫২	নিউদিল্লী	খেলা অমীমাংসিত
	বোম্বাই	খেলা অমীমাংসিত
	কলিকাতা	খেলা অমীমাংসিত
	কানপুর	ইংল্যান্ড ৮ উইকেটে জয়ী
	মাদ্রাজ	ভারতবর্ষ এক ইনিংস ও ৮ রানে জয়ী
	লিডস	ইংল্যান্ড ৭ উইকেটে জয়ী
	লর্ডস	ইংল্যান্ড ৮ উইকেটে জয়ী
	ম্যাঞ্চেস্টার	ইংল্যান্ড এক ইনিংস ও ২০৭ রানে জয়ী
	ওভাল	খেলা অমীমাংসিত
	নটিংহাম	ইংল্যান্ড এক ইনিংস ও ৫৯ রানে জয়ী
	লর্ডস	ইংল্যান্ড ৮ উইকেটে জয়ী
	লিডস	ইংল্যান্ড এক ইনিংস ও ১৭৩ রানে জয়ী
	ম্যাঞ্চেস্টার	ইংল্যান্ড ১৭১ রানে জয়ী
	ওভাল	ইংল্যান্ড এক ইনিংস ও ২৭ রানে জয়ী
১৯৬১-৬২	বোম্বাই	খেলা অমীমাংসিত
	কানপুর	খেলা অমীমাংসিত
	নিউদিল্লী	খেলা অমীমাংসিত
	কলিকাতা	ভারতবর্ষ ১৮৭ রানে জয়ী
	মাদ্রাজ	ভারতবর্ষ ১২৮ রানে জয়ী
১৯৬৩-৬৪	মাদ্রাজ	খেলা অমীমাংসিত
	বোম্বাই	খেলা অমীমাংসিত
	কলকাতা	খেলা অমীমাংসিত
	নিউদিল্লী	খেলা অমীমাংসিত
	কানপুর	খেলা অমীমাংসিত
১৯৬৭	লিডস	ইংল্যান্ড ৬ উইকেটে জয়ী
	লর্ডস	ইংল্যান্ড এক ইনিংস ও ১২৪ রানে জয়ী
	বার্মিংহাম	ইংল্যান্ড ১৩২ রানে জয়ী
১৯৭১	লর্ডস	খেলা অমীমাংসিত
	ম্যাঞ্চেস্টার	খেলা অমীমাংসিত
	ওভাল	ভারতবর্ষ ৪ উইকেটে জয়ী

প্রতি উইকেটের জুটিতে রেকর্ড রান

ইংল্যান্ডের পক্ষে

উইকেট	রান	জুটির নাম	মাঠ	বছর
১ম	১৫৯	পি ই রিচার্ডসন এবং জি পুলার	বোম্বাই	১৯৬১-২
২য়	১৬৪	জি পুলার এবং কেন ব্যারিংটন	নয়াদিল্লী	১৯৬১-২
৩য়	১৬৯	রমণ সুব্বারাও এবং মাইক স্মিথ	ওভাল	১৯৫৯
৪র্থ	২৬৬	ডব্লিউ আর হ্যামন্ড এবং টি এস ওয়র্দিংটন	ওভাল	১৯৩৬
৫ম	১৪২	জে হার্ডস্টাফ এবং পি এ গিব	লর্ডস	১৯৪৬
৬ষ্ঠ	১৫৯	টম গ্রেভনী এবং টি জি ইভান্স	লর্ডস	১৯৫২
৭ম	১০৩	এলেন নট এবং আর হাটন	ওভাল	১৯৭১
৮ম	১৬৮	রে ইলিংওয়ার্থ এবং পি লেভার	ম্যাঞ্চেস্টার	১৯৭১
৯ম	৮১	আর বার্বার এবং টনি লক	কানপুর	১৯৬১-২
১০ম	৫৭	জে টি মারে এবং আর এন এস হবস	বার্মিংহাম	১৯৬৭

বিজয় হাজারে

বিজয় মঞ্জরেকার
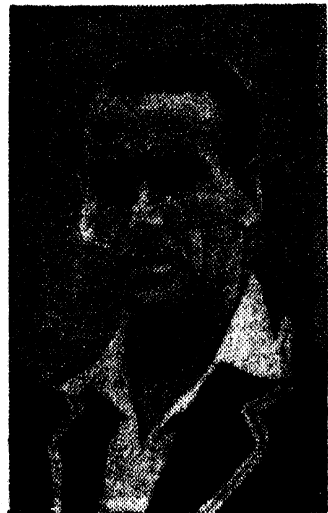
জোসেফ হার্ডস্টাফ

ভারতবর্ষের পক্ষে

উইকেট	রান	জুটির নাম	মাঠ	বছর
১ম	২০৩	বিজয় মার্চেণ্ট ও মুস্তাক আলী	ম্যাঞ্চেস্টার	১৯৩৬
২য়	১৬৮	ফারুক ইঞ্জিনিয়ার এবং অজিত ওয়াদেকার	লিডস	১৯৬৭
৩য়	২১১	বিজয় মার্চেণ্ট এবং বিজয় হাজারে	নয়াদিল্লী	১৯৫১-৫২
	২১১	ভিনু মানকাদ এবং বিজয় হাজারে	লর্ডস	১৯৫২
৪র্থ	২২২	বিজয় হাজারে এবং বিজয় মঞ্জরেকার	লিডস	১৯৫২
৫ম	১৯০	মনসুর আলি এবং এবং চাঁদু বোরদে	নয়াদিল্লী	১৯৬৩-৬৪
৬ষ্ঠ	১০৫	বিজয় হাজারে এবং দাত্তু ফাদকার	লিডস	১৯৫২
৭ম	১৫৩	চাঁদু বোরদে এবং সেলিম দুরানী	বোম্বাই	১৯৬৩-৬৪
৮ম	১০১	আর জি নাদকার্নী এবং এফ এম ইঞ্জিনিয়ার	মাদ্রাজ	১৯৬১-২
৯ম	৫৪	জি রামচাঁদ এবং এস জি সিন্ধে	লর্ডস	১৯৫২
১০ম	৫১	বাপু নাদকার্নী এবং বি এস চন্দ্রশেখর	কলকাতা	১৯৬৩-৬৪

ভিনু মানকাদ

এক ইনিংসে দলগত সর্বোচ্চ রান
ভারতবর্ষের পক্ষে

ভারতবর্ষে : ৪৮৫ রান (৯ উইঃ ডিক্লেঃ), বোম্বাই, ১৯৫১-৫২

ইংল্যাণ্ডে : ৫১০ রান, লিডস, ১৯৬৭

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে

ভারতবর্ষে : ৫৫৯ রান (৮ উইঃ ডিক্লেঃ), কানপুর, ১৯৬৩-৬৪

ইংল্যাণ্ডে : ৫৭১ রান (৮ উইঃ ডিক্লেঃ), ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৩৬

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রান
(পুরো ইনিংসের খেলায়)

ভারতবর্ষের পক্ষে

ভারতবর্ষে : ১২১ রান, কানপুরে, ১৯৫১-৫২

ইংল্যাণ্ডে : ৫৮ রান, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৫২

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে

ভারতবর্ষে : ১৮৩ রান মাদ্রাজ, ১৯৫১-৫২

ইংল্যাণ্ডে : ১০১ রান, ওভাল, ১৯৭১

কেন ব্যারিংটন

এক ইনিংসে দলগত ৫০০ রান

ইংল্যাণ্ড : ৫ বার

৫৭১ (৮ উইঃ ডিক্লেঃ), ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৩৬

৫৫৯ (৮ উইঃ ডিক্লেঃ), কানপুর, ১৯৬৩-৬৪

৫৫০ (৪ উইঃ ডিক্লেঃ), লিডস, ১৯৬৭

৫৩৭, লর্ডস, ১৯৫২

৫০০ (৮ উইঃ ডিক্লেঃ), বোম্বাই, ১৯৬১-৬২

ভারতবর্ষ : ১ বার

৫১০, লিডস, ১৯৬৭

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান
ভারতবর্ষের পক্ষে

ভারতবর্ষে : ২০৩* — মনসুর আলি, নিউদিল্লী, ১৯৬৩-৬৪.

ইংল্যাণ্ডে : ১৮৪ — ভিনু মানকাদ, লর্ডস, ১৯৫২

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে

ইংল্যাণ্ডে : ২৪৬* — জিওফ বয়কট, লিডস, ১৯৬৭

ভারতবর্ষে : ১৭৫ — টম গ্রেভনী, বোম্বাই, ১৯৫১-৫২

অমর সিং

একদিনে এক দলের সর্বোচ্চ রান

৪৭১ (৮ উইঃ) : ইংল্যাণ্ড, প্রথম দিন, ওভাল, ১৯৩৬

একদিনে দুই দলের সর্বোচ্চ রান

৫৮৮ (৬ উইঃ) : ইংল্যাণ্ড—৩৯৮ (৬ উইঃ) এবং ভারতবর্ষ—১৯০ (কোন উইকেট না পড়ে), দ্বিতীয় দিন, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৩৬ (বিশ্ব রেকর্ড)

একদিনে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান

২১৭ রান : ওয়াল্টার হ্যামণ্ড (ইংল্যাণ্ড), ওভাল, ১৯৩৬

এক সিরিজে সর্বাধিক মোট রান
(ব্যক্তিগত)

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে

ইংল্যাণ্ডে : ৩৯৯ [illegible] ৮০)— লেন হাটন, ১৯৫২

ভারতবর্ষে : ৫৯৪ (গড় ৯৯·০০)— কেন ব্যারিংটন, ১৯৬১-৬২

জিওফ বয়কট

ওয়ালী হ্যামন্ড

ভারতবর্ষের পক্ষে

ইংল্যান্ডে : ৩৩৩ (গড় ৫৫·৫০)—
বিজয় হাজারে, ১৯৫২

ভারতবর্ষে : ৫৮৬ (গড় ৮৩·৭১)—
বিজয় মঞ্জরেকার, ১৯৬১-৬২

এক সিরিজে সর্বাধিক মোট উইকেট
(ব্যক্তিগত)

ভারতবর্ষের পক্ষে

ভারতবর্ষে : ৩৪টি (গড় ১৬·৭৯)—
ভিনু মানকাদ, ১৯৫১-৫২

ইংল্যান্ডে : ১৭টি (গড় ৩৪·৬৪)—
সুভাষ গুপ্তে, ১৯৫৯

ইংল্যান্ডের পক্ষে

ইংল্যান্ডে : ২৯টি (গড় ১৩·৩১)—
ফ্রেডী ট্রুম্যান, ১৯৫২

ভারতবর্ষে : ২৭টি (গড় ২৭·৬৬)—
ফ্রেড টিটমাস ১৯৬৩-৬৪

একটি খেলায় দশ বা বেশী উইকেট

ভারতবর্ষের পক্ষে

১২টি (১০৮ রানে) : ভিনু মানকাদ,
মাদ্রাজ, ১৯৫১-৫২

১০টি (১৭৭ রানে) : সেলিম দুরানী,
মাদ্রাজ, ১৯৬১-৬২

ইংল্যান্ডের পক্ষে

১১টি (৯৩টি রানে) : এ ভি বেডসার,
ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৪৬

১১টি (১৪৫ রানে) : এ ভি বেডসার,
লর্ডস, ১৯৪৬

১১টি (১৫৩ রানে) : এইচ ভেরিটি,
মাদ্রাজ, ১৯৩৩-৩৪

১০টি (৭৮ রানে) : জি ও এ্যালেন, লর্ডস,
১৯৩৬

এক ইনিংসে সর্বাধিক উইকেট

ভারতবর্ষের পক্ষে

ভারতবর্ষে : ৮টি (৫৫ রানে) : ভিনু
মানকাদ, মাদ্রাজ, ১৯৫১-৫২

ইংল্যান্ডে : ৬টি (৩৫ রানে) : অমর সিং,
লর্ডস, ১৯৩৬
৬টি (৩৮ রানে) : বি এস চন্দ্রশেখর,
ওভাল,১৯৭১

ইংল্যান্ডের পক্ষে

ইংল্যান্ডে : ৮টি (৩১ রানে) : ফ্রেডী
ট্রুম্যান, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৫২

ভারতবর্ষে : ৭টি (৪৯ রানে) : এইচ
ভেরিটি, মাদ্রাজ, ১৯৩৩-৩৪

একটি খেলায় মোট রান
(দুই দলের রানের সমষ্টি)

সর্বোচ্চ রান

ইংল্যান্ড : ১৩৫০ রান (২৮ উইঃ), লিডস,
১৯৬৭। ইংল্যান্ড ৬৭৬ (৮ উইঃ) ও
ভারতবর্ষ ৬৭৪ (২০ উইঃ)

ভারতবর্ষে : ১২৫৮ রান (২৪ উইঃ)
নিউদিল্লী, ১৯৬৩-৬৪। ভারতবর্ষ
৮০৭ (১৪ উইঃ) ও ইংল্যান্ড ৪৫১
(১০ উইঃ)

সর্বনিম্ন রান

(পুরো ইনিংসের খেলা)

ইংল্যান্ডে : ৮৭০ রান (৪০ উইঃ),
বার্মিংহাম, ১৯৬৭। ইংল্যান্ড ৫০১
(২০ উইঃ) ও ভারতবর্ষ ৩৬৯ (২০
উইঃ)

ভারতবর্ষে : ১০৭৭ রান (৪০ উইঃ),
কলকাতা, ১৯৬১-৬২। ভারতবর্ষ ৬৩২
(২০ উইঃ) ও ইংল্যান্ড ৪৪৫ (২০
উইঃ)

ফ্রেডী ট্রুম্যান

একটি খেলায় দলগত রান
(দুই ইনিংসের রান সমষ্টি)

সর্বোচ্চ রান

ভারতবর্ষের পক্ষে

ভারতবর্ষে : ৮০৭ রান (১৪ উইঃ),
নিউদিল্লী, ১৯৬৩-৬৪। ৩৪৪ রান ও
৪৬৩ রান (৪ উইঃ)

ইংল্যান্ডে : ৬৭৪ রান (২০ উইঃ), লিডস,
১৯৬৭। ১৬৪ রান ও ৫১০ রান

ডি এইচ ভ্যালেনটাইন

ইংল্যান্ডের পক্ষে

ভারতবর্ষে : ৬৮৪ রান (১৩ উইঃ),
বোম্বাই, ১৯৬১-৬২

ইংল্যান্ডে : ৭৫৫ রান (১৮ উইঃ),
ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৫৩

সর্বনিম্ন রান

(পুরো দুই ইনিংসের খেলা)

ভারতবর্ষের পক্ষে

ভারতবর্ষে : ২৭৮ রান (২০ উইঃ),
কানপুর, ১৯৫১-৫২

ইংল্যান্ডে : ১৪০ রান (২০ উইঃ),
ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৫২

ইংল্যান্ডের পক্ষে

ভারতবর্ষে : ৪৪৫ (২০ উইঃ), কলকাতা,
১৯৬১-৬২

ইংল্যান্ডে : ৪৫৬ (২০ উইঃ), ওভাল,
১৯৭১

টেস্টে ১,০০০ রান

ভারত বনাম ইংল্যান্ডের টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ১,০০০ রান পূর্ণ অথবা তার বেশী করেছেন মাত্র এই দুজন খেলোয়াড় —ভারতবর্ষের বিজয় মঞ্জরেকার এবং ইংল্যান্ডের কেন ব্যারিংটন।

বিজয় মঞ্জরেকার : ১১৮১ রান (খেলা ১৭, ইনিংস ২৯, নটআউট ২, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৮৯ নটআউট, সেঞ্চুরী ৩ এবং গড় ৪৩·৭৪)

কেন ব্যারিংটন : ১৩৫৫ রান (খেলা ১৪, ইনিংস ২১, নটআউট ৩, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৭২, সেঞ্চুরী ৩ এবং গড় ৭৫·২৭)

টেস্টে ৫০ উইকেট

ভারত বনাম ইংল্যান্ডের টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ৫০টি উইকেট অথবা তার বেশী পেয়েছেন মাত্র এই দুজন খেলোয়াড়—ভারতবর্ষের ভিনু মানকাদ এবং ইংল্যান্ডের ফ্রেডী ট্রুম্যান।

ভিনু মানকাদ : ৫৪টি উইকেট (১২৪৯ রানে। গড় ২৩·১২)

ফ্রেডী ট্রুম্যান : ৫৩টি উইকেট (৭৮৭ রানে। গড় ১৪·৮৪)

টেস্ট সেঞ্চুরী

ইংল্যান্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে মোট ১১টি মাঠে টেস্ট খেলা হয়েছে—ভারতবর্ষের ৫টি এবং ইংল্যান্ডের ৬টি মাঠে। ভারতবর্ষের ৫টি মাঠে ভারতবর্ষের পক্ষে সেঞ্চুরী ১৯টি এবং ইংল্যান্ডের পক্ষে ১৩টি। অপরদিকে ইংল্যান্ডের ৬টি মাঠে ভারতবর্ষের পক্ষে সেঞ্চুরী ৮টি এবং ইংল্যান্ডের পক্ষে ১৭টি। ভারতবর্ষের ৫টি মাঠেই ইংল্যান্ড এবং ভারতবর্ষের পক্ষে টেস্ট সেঞ্চুরী হয়েছে। অপরদিকে ইংল্যান্ডের ৬টি মাঠে ভারতবর্ষের পক্ষে সেঞ্চুরী হয়েছে ৪টি মাঠে এবং ইংল্যান্ডের পক্ষে ৫টি মাঠে। অর্থাৎ ভারতবর্ষের খেলোয়াড়রা ২টি মাঠে (নটিংহাম ও বার্মিংহাম) এবং ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়রা ১টি মাঠে (বার্মিংহাম) আজও টেস্ট সেঞ্চুরী করেননি। উভয় দেশের মধ্যে টেস্ট সেঞ্চুরী হয়েছে ৫৭টি—ইংল্যান্ডের ৩০টি এবং ভারতবর্ষের ২৭টি। ইংল্যান্ডের ৩০টি সেঞ্চুরীর মধ্যে ভারতবর্ষের মাটিতে ১৩টি এবং স্বদেশে ১৭টি। অপরদিকে ভারতবর্ষের ২৭টি টেস্ট সেঞ্চুরীর মধ্যে ইংল্যান্ডের মাটিতে ৮টি এবং স্বদেশে ১৯টি।

সেঞ্চুরীর খতিয়ান

	ভারতবর্ষ	ইংল্যান্ড
বোম্বাই	৩	৩
কলকাতা	২	১
মাদ্রাজ	৫	১
দিল্লী	৭	৩
কানপুর	২	৫
মোট :	১৯	১৩

	ভারতবর্ষ	ইংল্যান্ড
লর্ডস	১	৪
ম্যাঞ্চেস্টার	৪	৬
ওভাল	১	৩
লিডস	২	৩
নটিংহাম	০	১
বার্মিংহাম	০	০
মোট :	৮	১৭

একনজরে সেঞ্চুরীর হিসাব

স্থান	ভারতের সেঞ্চুরী	ইংল্যান্ডের সেঞ্চুরী
ভারতবর্ষে	১৯	১৩
ইংল্যান্ডে	৮	১৭
মোট :	২৭	৩০

'ডাবল' সেঞ্চুরী
ইংল্যান্ডের পক্ষে

২৪৬* জিওফ বয়কট, লিডস, ১৯৬৭
২১৭ ওয়াল্টার হ্যামণ্ড, ওভাল, ১৯৩৬
২০৫* জে হার্ডস্টাফ, লর্ডস, ১৯৪৬

ভারতবর্ষের পক্ষে

২০৩* মনসুর আলি, দিল্লী, ১৯৬৩-৬৪

একটি খেলায় সর্বাধিক সেঞ্চুরী
(দুই দলের সেঞ্চুরী সমষ্টি)

৪টি সেঞ্চুরী : ভারতবর্ষ—২ ও ইংল্যান্ড—২, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৫৯। ভারতবর্ষ : ১১৮ রান—পলি উমরীগড় এবং ১১২ রান—আব্বাস আলি বেগ। ইংল্যান্ড : ১৩১ রান—জিওফ পুলার এবং ১০০ রান—মাইক স্মিথ

৪টি সেঞ্চুরী : ইংল্যান্ড—৩ ও ভারতবর্ষ—১, কানপুর, ১৯৬১-৬২। ইংল্যান্ড : ১১৯ রান—জিওফ পুলার, ১৭২ রান—কেন ব্যারিংটন এবং ১২৬ নট আউট—টেড ডেক্সটার। ভারতবর্ষ : ১৪৭ নট আউট—পলি উমরীগড়।

৪টি সেঞ্চুরী : ভারতবর্ষ ৩ ও ইংল্যান্ড ১, নিউদিল্লী, ১৯৬৩-৬৪। ভারতবর্ষ : ২০৩ নট আউট—মনসুর আলি, ১০৫—হনুমন্ত সিং এবং ১০০ বুধি কুন্দরন। ইংল্যান্ড : ১৫১ রান—কলিন কাউড্রে।

এক ইনিংসে সর্বাধিক সেঞ্চুরী
(এক দলের পক্ষে)

ইংল্যান্ড : ৩টি সেঞ্চুরী, কানপুর, ১৯৬১-৬২। ১১৯ রান জিওফ পুলার, ১৭২ রান কেন ব্যারিংটন এবং নট আউট ১২৬ রান টেড ডেক্সটার।

ভারতবর্ষ : ৭ বার এক ইনিংসের খেলায় ২টি করে সেঞ্চুরী আছে।

একটি সিরিজে সর্বাধিক সেঞ্চুরী
(দুই দলের সেঞ্চুরীর সমষ্টি)

১১টি সেঞ্চুরী : ভারতবর্ষ ৭ ও ইংল্যান্ড ৪, ১৯৬৩-৬৪

একটি সিরিজে সর্বাধিক সেঞ্চুরী
(দলগত)

ভারতবর্ষ : ৭টি, ১৯৬৩-৬৪
: ৭টি, ১৯৫১-৫২
ইংল্যান্ড : ৫টি, ১৯৬১-৬২

একটি সিরিজে সর্বাধিক সেঞ্চুরী
(ব্যক্তিগত)

ইংল্যান্ড : ৩টি—কেন ব্যারিংটন (নট আউট ১৫১ রান, বোম্বাই; ১৭২ রান, কানপুর এবং নট আউট ১১৩ রান, নিউদিল্লী, ১৯৬১-৬২)

ভারতবর্ষ : ২টি—বিজয় হাজারে : ১৬৪* (নিউদিল্লী) ও ১৫৫ (বোম্বাই), ১৯৫১-৫২; ২টি—বি কে কুন্দরন : ১৯২ (মাদ্রাজ) ও ১০০ (নিউদিল্লী), ১৯৬৩-৬৪; ২টি—পংকজ রায় : ১৪০ (বোম্বাই) ও ১১১ (মাদ্রাজ), ১৯৫১-৫২

ইংল্যান্ড বনাম ভারতবর্ষের টেস্টে প্রথম আবির্ভাবে সেঞ্চুরী
ইংল্যান্ডের পক্ষে

রান	খেলোয়াড়	মাঠ	বছর
২৪৬*	জিওফ বয়কট	লিডস	১৯৬৭
১০৯	বেসিল ডি'ওলিভেরা	লিডস	১৯৬৭
১৭৫	টম গ্রেভনী	বোম্বাই	১৯৫১-৫২
১০০	মাইক স্মিথ	ম্যাঞ্চেস্টার	১৯৫৯
১৩৬	বি ভ্যালেনটাইন	বোম্বাই	১৯৩৩-৩৪
১৩৮*	এ জে ওয়ার্টকিন্স	নিউদিল্লী	১৯৫১-৫২
	ভারতবর্ষের পক্ষে		
১১৮	লালা অমরনাথ	বোম্বাই	১৯৩৩-৩৪
১১২	আব্বাস আলি বেগ	ম্যাঞ্চেস্টার	১৯৫৯
১০৫	হনুমন্ত সিং	নিউদিল্লী	১৯৬৩-৬৪

দ্রষ্টব্য : ইংল্যান্ডের ওয়ার্টকিন্স এবং ভারতবর্ষের অমরনাথ, আব্বাস আলি বেগ ও হনুমন্ত সিং তাঁদের খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে নেমে সেঞ্চুরী করেন।

ভারতবর্ষের প্রতিটি মাঠের টেস্ট খেলায় ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান
(এক ইনিংসের খেলায়)
ইংল্যান্ডের পক্ষে

মাঠ	রান	খেলোয়াড়	বছর
বোম্বাই	১৭৫	টম গ্রেভনী	১৯৫১-৫২
কানপুর	১৭২	কেন ব্যারিংটন	১৯৬১-৬২
দিল্লী	১৫১	কলিন কাউড্রে	১৯৬৩-৬৪
কলকাতা	১০৭	কলিন কাউড্রে	১৯৬৩-৬৪
মাদ্রাজ	১০২	সি এফ ওয়াল্টার্স	১৯৩৩-৩৪

ভারতবর্ষের পক্ষে

মাঠ	রান	খেলোয়াড়	বছর
দিল্লী	২০৩*	মনসুর আলি	১৯৬৩-৬৪
মাদ্রাজ	১৯২	বুধি কুন্দরন	১৯৬৩-৬৪
বোম্বাই	১৫৫	বিজয় হাজারে	১৯৫১-৫২
কানপুর	১৪৭*	পলি উমরীগড়	১৯৬১-৬২
কলকাতা	১২৯	এম এল জয়সীমা	১৯৬৩-৬৪

* নট আউট

ইংল্যাণ্ডের প্রতিটি মাঠের টেস্ট খেলায় ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান

(এক ইনিংসের খেলায়)

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে

মাঠ	রান	খেলোয়াড়	বছর
লিডস	২৪৬*	জিওফ বয়কট	১৯৬৭
ওভাল	২১৭	ওয়াল্টার হ্যামণ্ড	১৯৩৬
লর্ডস	২০৫*	জে হার্ডস্টাফ (জুনিয়র)	১৯৪৬
ম্যাঞ্চেস্টার	১৬৭	ওয়াল্টার হ্যামণ্ড	১৯৩৬
নটিংহাম	১০৬	পিটার মে	১৯৫৯
বার্মিংহাম	৭৭	জে টি মারে	১৯৬৭

ভারতবর্ষের পক্ষে

মাঠ	রান	খেলোয়াড়	বছর
লর্ডস	১৮৪	ভিনু মানকাড	১৯৫২
লিডস	১৪৮	মনসুর আলি	১৯৬৭
ওভাল	১২৮	বিজয় মার্চেন্ট	১৯৪৬
ম্যাঞ্চেস্টার	১১৪	পলি উমরীগড়	১৯৫৯
বার্মিংহাম	৭০	অজিত ওয়াদেকার	১৯৬৭
নটিংহাম	৫৪	পঙ্কজ রায়	১৯৫৯

ভারতবর্ষের টেস্ট খেলা

বিপক্ষে	খেলা	জয়	হার	ড্র
ইংল্যাণ্ড	৪০	৪	১৮	১৮
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	২৮	১	১২	১৫
অস্ট্রেলিয়া	২৫	৩	১৬	৬
নিউজিল্যাণ্ড	১৬	৭	২	৭
পাকিস্তান	১৫	২	১	১২
মোট :	১২৪	১৭	৪৯	৫৮

ইংল্যাণ্ডের টেস্ট খেলা

বিপক্ষে	খেলা	জয়	হার	ড্র
অস্ট্রেলিয়া	২১৪	৭০	৮২	৬২
দঃ আফ্রিকা	৯৪	৪৫	১৭	৩২
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	৫৮	২০	১৬	২২
নিউজিল্যাণ্ড	৪২	২০	০	২২
ভারতবর্ষ	৪০	১৮	৪	১৮
পাকিস্তান	২১	৯	১	১১
মোট :	৪৬৯	১৮২	১২০	১৬৭

দ্রষ্টব্য : উপরের তালিকায় ইংল্যাণ্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার ১৯৬০ সালের পরবর্তী ৮টি টেস্ট খেলা বাদ দেওয়া হয়েছে যেহেতু ১৯৬১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা কমনওয়েলথ গোষ্ঠী পরিত্যাগ করেছে।

প্রতি টেস্ট সিরিজে সর্বাধিক রান

(ব্যক্তিগত)

মরসুম	ইংল্যাণ্ডের পক্ষে রান	গড়	খেলোয়াড়	ভারতবর্ষের পক্ষে রান	গড়	খেলোয়াড়
১৯৩২	১৬৪	১৬৪.০০	ডি আর জার্ডিন	৭০	৩৫.০০	এস ওয়াজির আলী
১৯৩৩-৩৪	২৮৪	৭১.০০	সি এফ ওয়াল্টার্স	২০৩	৪০.৬০	লালা অমরনাথ
১৯৩৬	৩৮৯	১৯৪.৫০	ডব্লিউ আর হ্যামণ্ড	২৮২	৪৭.০০	বিজয় মার্চেন্ট
১৯৪৬	২১০	১০৫.০০	জে হার্ডস্টাফ	২৪৫	৪৯.০০	বিজয় মার্চেন্ট
১৯৫১-৫২	৪৫১	৬৪.৪২	এ ওয়ার্টকিন্স	৩৮৭	৫৫.২৮	পঙ্কজ রায়
১৯৫২	৩৯৯	৭৯.৮০	লেন হাটন	৩৩৩	৫৫.৫০	বিজয় হাজারে
১৯৫৯	৩৫৭	৫৯.৫০	কে এফ ব্যারংটন	২০৩	৩৩.২৮	নরী কণ্ট্রাক্টর
১৯৬১-৬২	৫৯৪	৯৯.০০	কে এফ ব্যারিংটন	৫৮৬	৮৩.৭১	বিজয় মঞ্জরেকার
১৯৬৩-৬৪	৩৯১	৪৮.৮৭	জে বি বোলাস	৫২৫	৫২.৫০	বুধি কুন্দরন
১৯৬৭	৩২৪	৬৪.৮০	কে এফ ব্যারিংটন	২৬৯	৪৪.৮৩	মনসুর আলি
১৯৭১	২৪৪	৪০.৬৬	বি লাকহার্স্ট	২০৪	৩৪.০০	অজিত ওয়াদেকার

প্রতি টেস্ট সিরিজে সর্বাধিক উইকেট

(ব্যক্তিগত)

সাল	ইংল্যাণ্ডের পক্ষে উইকেট	গড়	খেলোয়াড়	ভারতবর্ষের পক্ষে উইকেট	গড়	খেলোয়াড়
১৯৩২	৬	১০.১৬	ডবলিউ বাউজ	৬	২২.৫০	মহম্মদ নিসার
১৯৩৩-৩৪	২৩	১৬.৮২	এইচ ভেরিটি	১৪	২৭.২৮	অমর সিং
১৯৩৬	২০	১৬.৫০	জি ও এলেন	১২	২৮.৫৮	মহম্মদ নিসার
১৯৪৬	২৪	১২.৪১	এ ভি বেডসার	১৩	২৫.৩৮	অমরনাথ
১৯৫১-৫২	২১	২৮.৫২	আর ট্যাটারসাল	৩৪	১৬.৭৯	ভি মানকাড়
১৯৫২	২৯	১৩.৩১	ফ্রেডী ট্রুম্যান	১৫	২৪.৭৩	গোলাম আমেদ
১৯৫৯	২৪	১৬.৭০	ফ্রেডী ট্রুম্যান	১৭	৩৪.৬৪	সুভাষ গুপ্তে
১৯৬১-৬২	২২	২৮.৫৪	টনি লক	২৩	২৭.৩৪	সেলিম দুরানী
১৯৬৩-৬৪	২৭	২৭.৬৬	ফ্রেড টিটমাস	১১	৪২.৮১	সেলিম দুরানী
১৯৬৭	২০	১৩.০০	রে ইলিংওয়ার্থ	১৬	২৭.১৮	বি এস চন্দ্রশেখর
১৯৭১	৮	১৫.৮৭	এন গিফোর্ড	১৩	২৬.৯২	এস [illegible]
	৮	২৫.৮৭	জন প্রাইস	১৩	২৯.১৫	বি এস চন্দ্রশেখর

সুস্থ সবল দেহে দীর্ঘকাল বাঁচতে কে না চায়? কিন্তু উপায় কী? 'যৌবনলাভের মহৌষধি' যদি কিছু পাওয়া যায় তাহলে এ-প্রশ্নের একটা অনায়াস মীমাংসা হতে পারে। যেমন আমাদের দেবদেবীরা, তাঁদের যৌবন চির-অটুট তার কারণ তাঁরা সবাই 'অমৃত' পান করে থাকেন। কিন্তু মর্ত্যের মানুষ আমরা এই অমৃত থেকে বঞ্চিত, অতএব চল্লিশ না পেরোতেই আমাদের যৌবন উধাও, শরীরে হাজারো ব্যাধি, এবং পঞ্চাশে না পৌঁছতেই স্ট্রোক বা করোনারি থ্রম্বোসিস যদি না হয় তো বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সঙ্গে বিশেষভাবে চিহ্নিত এবম্বিধ অন্য কোনো ব্যাধির প্রকোপে পড়ে অকালমৃত্যু। মাঝে মাঝে অবশ্য শোনা যায়, অমৃতরূপ যৌবনলাভের মহৌষধির সন্ধান নাকি পাওয়া গিয়েছে, কিছু খরচের ওয়াস্তা মাত্র। যৌবনের চেয়ে দামী আর কী আছে! তাই দুশ্চিন্তাহীন মানুষ অসম্ভব ছুটোছুটি লাগিয়ে দেয়, কল্পনাতীত ক্লেশ সহ্য করে, এবং অচিরেই হতাশ হয়। ঝাড়ফুঁক-মন্ত্রতন্ত্র-তাগাতাবিজ এখনো যেখানে চলে সেই আমাদের দেশে তো ধন্বন্তরীর আবির্ভাব যখন-তখন, কিন্তু এটা শুধু আমাদের দেশের ব্যাপার নয়—গোটা বিশ্বের। বরং বলা চলে, বিজ্ঞানে ও কারিগরীতে অগ্রসর এবং যন্ত্রীকরণে ও স্বয়ংক্রিয়করণে অত্যন্ত পশ্চিমের দেশগুলিতে সমস্যাটা যেন আরো প্রকট। সেখানেও যৌবনলাভের মহৌষধির জন্যে আপামর সকলেরই ব্যগ্রতা। কিন্তু তবুও, আর্থিক সম্পত্তির প্রাচুর্য থাকলেও, অকালেই কালব্যাধিতে পড়তে হচ্ছে, কিংবা এমন একটা অবস্থায় যখন মানুষের এমন সুন্দর শরীরটাও কিম্ভূতকিমাকার ও কার্যত প্রায় অচল—বেঁচে থাকার কোনো আনন্দই আর থাকে না।

অথচ একালের বিজ্ঞানীরা কিন্তু প্রকৃতই যৌবনলাভের মহৌষধির সন্ধান দিয়েছেন, যা অনায়াসলভ্য। তার জন্যে চাই শুধু অবসর সময়ের যৎকিঞ্চিৎ অংশ আর নিষ্ঠা ও নিয়মানুবর্তিতা। সেটা আর কিছু নয়, প্রতিদিন নিয়ম করে, অবশ্যপালনীয়রূপে, কিছুটা সময়ের জন্যে ব্যায়াম বা শরীরচর্চা বা খেলাধুলো বা হেঁটে-বেড়ানো পাহাড়ে-চড়া সাঁতার-কাটা ইত্যাদি রিক্রিয়েশন। কথাটা যেভাবে বলা হল তা শুনে অনেকে হয়তো হতাশ হচ্ছেন—ওঃ, এই ব্যাপার। কিন্তু কথাটা অত্যন্ত গুরুতর, যতোই মামুলি শুনতে হোক। রোজ সূর্য ওঠে—এই কথাটাও তো মামুলি, কিন্তু এর চেয়ে গুরুতর কথা আর কিছু আছে নাকি! রোজ ব্যায়াম বা ইত্যাদি করা চাই—এই কথাটাও তাই।

এই গুরুতর কথাটার গুরুত্ব কতখানি, তা বলার জন্যেই এই লেখা। তবে, যেহেতু এই লেখা বাংলায় লেখা হচ্ছে, অতএব এ-দেশের সাধারণ অবস্থা ভেবে আরও একটি কথা আগে থেকে বলে নেওয়া দরকার। এখানে আলোচনা করা হচ্ছে সুস্থ সবল শরীর নিয়ে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার বিবরটি নিয়ে। কথাটা তাদের পক্ষেই খাটে যাদের মোটামুটি খাওয়া-পরার সংস্থান আছে। নইলে যে-দেশে শহরাঞ্চলে শতকরা ৫০ জনের ও গ্রামাঞ্চলে শতকরা ৭৮ জনের দৈনিক আয় ৯৩ পয়সা মাত্র (মোট জন-সংখ্যার শতকরা ৮০-৯৩ ভাগ গ্রামের অধি-বাসী), যে-দেশে বেকারের সংখ্যা ৪৫ লক্ষ—সেখানে নিত্য ব্যায়ামের সুস্থ-সুন্দর সবল ও দীর্ঘ জীবন লাভ করার কথা বলাটা হয়তো উপহাসের মতো শোনাচ্ছে। তাই জানিয়ে রাখতে চাই—মোটামুটি খাওয়া-পরার সংস্থান আছে, এ-লেখা তাদের জন্যে। তবে অন্যরাও যদি খাওয়া-পরার সংস্থান করার চেষ্টা চালাতে চালাতে রোজ কিছুক্ষণ ব্যায়াম বা খেলাধুলো করেন তাতে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। বসে-থাকা শরীরে অন্য যে বহুবিধ গ্লানি দেখা দিতে পারে, অন্ততপক্ষে সেগুলোর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। উপরন্তু লাভের সম্ভাবনা আত্মবিশ্বাস। অবশ্য, বেকার বা নিঃসম্বল মানুষকে বাঁচার তাগিদেই এত ছুটোছুটি করতে হয় যে সেটাই তাদের পক্ষে ভালোরকমের ব্যায়াম। খেতে না পাওয়ার কষ্ট থেকে চোখ ফিরিয়ে তাকাতে পারলে তার লাভের দিকটাও চোখে না পড়ার মতো নয়।

কথাটার প্রমাণ পাবার জন্যে বরং অনেক স্বস্তিকর অতীতের দিকে তাকানো। দূর অতীতে আমাদের পূর্বপুরুষেরা একজায়গায় খাদ্য শিকার করে বেড়াত, কখনো কখনো একটানা দিনের পর দিন। কেননা তখনো তারা খাদ্য উৎপাদন করতে শেখেনি। কেমন ছিল সেই জীবন? বন্য জন্তুরা যেভাবে জীবন কাটায় তার চেয়ে খুব একটা উঁচুদরের নয়। একে যদি বেঁচে থাকা বলে তবে এই বাঁচার জন্যেই তাকে প্রয়োগ করতে হত শরীরের সমস্ত ক্ষমতা, ব্যবহার করতে হত শরীরের সমস্ত ব্যবস্থাপনা। ফলে তার শারীরিক ক্রিয়াগুলো হত নিয়মিত ও তীব্র। মানুষ যে মানুষ হয়েছে তা এই শ্রমের জন্যেই। মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসে শ্রমেরই মুখ্য ভূমিকা। নরবানর থেকে মানুষ

শিশুদের শরীর গঠনে প্রাথমিক পদক্ষেপ

হওয়াটা শ্রম না থাকলে কল্পনা করা শক্ত হত।

আর এই শ্রমনির্ভর বিবর্তনের ফলে মানুষের শরীরটাও হয়ে উঠেছে সমস্ত রকমের বাহুল্যবর্জিত—চাঁছাছোলা। সেখানে প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক অঙ্গের, প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক কোষের রয়েছে নিজস্ব বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া। মানুষের শারীরগত গঠনটাই এমন যে প্রাণবন্ত তৎপরতাই তার সঠিক আচরণ, শরীরচালনায় পটুত্বই স্বাভাবিক। ক্ষীণ বেলুনের মত শরীর নিয়ে হাঁসফাঁস করতে করতে বাস ধরতে ছোটা—তার জন্যে কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের শীর্ষে মানুষের আবির্ভাব ঘটেনি। কিংবা এজন্যেও নয় যে চারটি চাকা লাগানো একটা ধাতব বাক্সের মধ্যে ভাঙা-দ হয়ে ঘাড় গুঁজে বসে থাকা, যখন চারদিক থেকে তাকে ঠেসে ধরেছে এমনি আরো হাজার হাজার মানুষ, তার নিশ্বাসের বাতাস গ্যাসে ধোঁয়ায় কালিতে বিবর্ণ ও বিষাক্ত।

অথচ এইটেই আজকের দিনের নাগরিক জীবনের ছবি, যে-জীবন যন্ত্রসভ্যতার কল্যাণে আমরা পেয়েছি। আমরা বাস করি এক কৃত্রিম জগতে, প্রকৃতিকে প্রায় বিদেয় দিয়েছি, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা থেকে বিপরীত মেরুতে বাস, আর এমনই যন্ত্রনির্ভর যে আমাদের নড়াচড়ার প্রয়োজনও অনেকাংশে সীমিত। অর্থাৎ শরীরের যে ক্রিয়াগুলো চালু থাকা প্রয়োজন ছিল তা হয় বন্ধ কিংবা অত্যন্ত অনিয়মিত। বেঁচে থাকার জন্যেই একদিন যার ওপরে পুরোপুরি নির্ভর করতে হত, তাকেই বিসর্জন। ফল কী দাঁড়াচ্ছে? চল্লিশেই বুড়ো, পঞ্চাশের আগেই হার্টের অসুখে বা এবম্বিধ কোনো পীড়ায় পঞ্চত্বপ্রাপ্ত। এমনকি তিরিশেও ছুটে বাস ধরতে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে মরার দাখিল। কাঠামো ক্ষীণ, রক্ত চলাচল ব্যাহত, মেদবৃদ্ধি অস্বাভাবিক, শারীরিক সৌন্দর্য বিগত—যন্ত্রনির্ভর স্থাণু জীবনের এই হচ্ছে অমোঘ পরিণতি। অথচ মানুষের শরীরের গড়নটাই এমন যে অনুন একশো বছর সুস্থ সবল জীবন কাটাতে না পারার কোনো কারণ নেই।

শ্রমহীনতার জন্যে আমাদের শরীরটা যে কতখানি হতকুচ্ছিত হয়ে যায়, সে-বিষয়েও যদি আমরা সচেতন থাকতাম! মানুষ হচ্ছে জীবজগতের সবচেয়ে সুন্দর জীব, কিন্তু সে-সৌন্দর্য আমরা অচিরেই খুইয়ে বসি। এমনকি জন্তুজানোয়ারের সঙ্গে নিজেদের তুলনা করলেও ব্যাপারটা ধরা পড়ে। সেই মহিমা আমাদের কোথায় যা আছে একটি ঘোড়ার মুখমণ্ডলে? সেই ছন্দ ও মাধুর্য আমাদের কোথায় যা আছে একটি বেড়ালের চলনে? আমরা হয়ে উঠেছি লাবণ্যহীন, খর্বিত, বিকৃত, জবুথবু। স্পেস বা মহাশূন্যের যতোটুকু জায়গা আমাদের দখলে তাতে সুন্দরভাবে অবস্থান করার ক্ষমতাও আমাদের নেই। আমরা না পারি সুন্দরভাবে দাঁড়াতে, না পারি সুন্দরভাবে বসতে। অথচ জলের নিচের শামুক থেকে আকাশের চিল পর্যন্ত প্রত্যেকটি জীব নিজস্ব অবস্থানে কী আশ্চর্য সুন্দর। একটি হরিণ যখন প্রাণের ভয়ে ছোটে, এমনকি তখনো তার চলনে কবিতার মতো ছন্দ ও মাধুর্য। আর শরীরচালনার অভাবে আমাদের শরীরটাই এমন অষ্টাবক্র যে এমনকি ঘুমের সময়েও আমাদের শরীর সুন্দর একটি ভঙ্গিমা নিতে পারে না।

এসব কথা বিন্দুমাত্র বাড়িয়ে বলা নয়। বাস্তব বৈজ্ঞানিক তথ্য এর ভিত্তি। যেসব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে বহু পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে। একটির উল্লেখ করা যেতে পারে।

কয়েকটি বাচ্চা খরগোশ, একটি কালো বনমোরগ ও একটি বুলবুল পাখিকে দীর্ঘকাল খাঁচার পুরে রাখা হয়েছিল। বাইরে থেকে দেখে মনে হয়েছিল মুক্ত অবস্থায় অন্যান্য খরগোশ ও বনমোরগ ও বুলবুল যেভাবে বড়ো হয় খাঁচার জীবগুলোও তাই হচ্ছে, কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। কিন্তু তফাৎটা বোঝা গেল খাঁচার দরজা খুলে দিয়ে জীবগুলোকে মুক্ত করার পরে। একঘন্টার বেশি একটিও বাঁচেনি। খরগোশগুলো দু-একটা লাফ দেবার পরেই হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা পড়ে। বুলবুলেরও একই দশা, পুরো একটি তান শেষ করারও সময় হয় না। বনমোরগ মিনিটখানেক ডানা ঝাপটেছিল, তারপরেই শেষ। এতগুলো জীব যে এমনভাবে মারা পড়ল তার কারণ কী? বিজ্ঞানীর মতে, শরীরচালনার অভাব। শরীরচালনা না করার দরুন এই জীবগুলোর হৃদপিণ্ড এত দুর্বল ছিল যে সামান্য পরিশ্রমজনিত অত্যধিক রক্তচাপ সহ্য করতে পারেনি। অথচ মুক্ত অবস্থায় থাকা সমজাতীয় অন্যান্য জীব এত সামান্য পরিশ্রমে কিছুমাত্র কাহিল হয় না।

মানুষের বেলাতেও একই ব্যাপার ঘটে থাকে। আমেরিকান শারীরবিজ্ঞানী ডক্টর রাব দুদল মানুষ নিয়ে পরীক্ষাকার্য চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। এই দুদল মানুষের মধ্যে প্রথম দলে ছিল জনকয়েক অ্যাথলিট, সৈনিক ও ক্ষেতমজুর—অর্থাৎ এমন সব মানুষ জীবিকার তাগিদেই যাদের শরীরচালনা করতে হয়। দ্বিতীয় দলে এমন সব মানুষ যারা বসে কাজ করে—অর্থাৎ যাদের শরীরচালনা নেই। ডঃ রাব-এর পর্যবেক্ষণে প্রকাশ পেয়েছে, দ্বিতীয় দলে এমনকি ১৭ থেকে ৩৫ বছর যাদের বয়স তারাও পুরোপুরি সুস্থ ও সবল নয়—তাদের হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া কিছুটা গোলমেলে। বড়ো হয়ে এই মানুষগুলোই হার্টের অসুখে ভুগে থাকে, একই অবস্থা চলতে থাকলে ভুগবেই এবং সম্ভবত পঞ্চাশ বছর বয়সের আগেই ভবলীলা সাঙ্গ করবে।

ব্যাপারটা আরো মারাত্মক। শরীরচালনার অভাব ঘটলে শুধু যে হৃদপিণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয় (এই অবস্থার নাম হাইপোডাইনামিয়া ও হাইপোকাইনেসিয়া) তাই নয়, শরীরের প্রোটিনও অত্যন্ত বেশি মাত্রায় ভেঙ্গে পড়ে। তার ফল হিসেবে দেখা দেয় পেশীগত শীর্ণতা যা রোগীকে পঙ্গু করতে পারে। হাইপোডাইনামিয়ার

দরুন হাড় থেকে ক্যালসিয়াম খোয়া যায়, ফলে হাড় নরম হয়ে পড়ে। এখানেই শেষ নয়, হাইপোডাইনামিয়ার দরুন আরো একটি অস্বাস্থ্যকর পরিণতি ঘটতে পারে। রক্তবাহী ধমনীগুলোর মধ্যে এমন একটা অবস্থান্তর ঘটে যে রক্ত-চলাচল ব্যবস্থায় প্রবাহগত সামঞ্জস্য বজায় রাখার শক্তিগুলি বিনষ্ট হয়ে যায়। তখন যা ঘটে তা এই : মানুষটি উঠে দাঁড়ালেই তার শরীরের রক্ত গড়িয়ে চলে আসে শরীরের ওপরের অংশ থেকে নিচের অংশে ও হৃদপিণ্ডের নিচের ধমনীগুলোতে জড়ো হয়, ফলে রক্ত-চলাচলের মোট পরিমাণে ঘাটতি পড়ে। এই অবস্থায় মানুষটির পক্ষে অজ্ঞান হয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়, অন্তত পক্ষে চোখে অন্ধকার দেখা।

দীর্ঘকাল ধরে শরীরচালনার অভাব ঘটতে থাকলে মানুষের চরিত্র পর্যন্ত বদলে যায়। কাজ করতে হলে অল্পতেই ক্লান্ত বোধ করে, সামান্য শরীরচালনাতেই দম ফুরিয়ে যায়। মানুষটি হয়ে পড়ে বদরাগী ও খিটখিটে।

আজকের দিনে আমাদের জীবনযাত্রার ধরনই এমন যে যে-কেউ হাইপোডাইনামিয়ার শিকার হতে পারে। গত কয়েক দশক ধরে বিজ্ঞানীরা তাই এই সমস্যাটি নিয়ে বিশেষ ভাবিত আছেন। সারা বিশ্ব জুড়ে অজস্র পরীক্ষাকার্য চলেছে হাইপোডাইনামিয়ার অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খ জানার জন্যে ও তার প্রতিকারের পথ খুঁজে পাবার জন্যে।

বিষয়টি আরো জরুরি হয়ে উঠেছে মহাশূন্যে অভিযান শুরু হবার পর থেকে। সামান্য চাঁদ থেকে একবার ঘুরে আসতে হলেও নভশ্চরকে সপ্তাহদুয়েক ব্যোমযানের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে কাটাতে হয়। ভবিষ্যতে মানুষ যখন গ্রহান্তরে যাত্রা করবে তখন কাটাতে হবে একাদিক্রমে কয়েক মাস বা কয়েক বছর—ব্যোমযানের সেই ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যেই। যথেষ্ট শরীরচালনা না থাকাটা তখন অবশ্যই গুরুতর সমস্যারূপে দেখা দেবে।

মনে হতে পারে, নভশ্চরদের ক্ষেত্রে এই সমস্যার একমাত্র সমাধান হচ্ছে ব্যায়াম। সেজন্যে পেশীর শক্তিবর্ধক যন্ত্রের সাহায্যও নেওয়া যেতে পারে। সোভিয়েত ও আমেরিকান নভশ্চররা ইতিমধ্যেই মহাশূন্যে থাকা অবস্থায় ব্যোমযানের অল্প পরিসরের মধ্যেই সাফল্যের সঙ্গে ব্যায়াম সেরেছেন এবং তাঁদের অতিমাত্রার সহনক্ষম ও সুগঠিত শরীরের পটুত্ব বজায় রেখেছেন।

তবে বিষয়টি নিয়ে আরো অনেক গবেষণা করার আছে। হাইপোডাইনামিয়ার সমস্যাটিকে বিজ্ঞানীরা সমস্ত দিক থেকে খুঁটিয়ে দেখতে চান। দীর্ঘকাল শরীরচলনা নেই এমন একজন মানুষ কতকাল

মেয়েদের দেহগঠনে ব্যায়াম চর্চা

হাইপোডাইনামিয়া থেকে মুক্ত থাকতে পারে? হাইপোডাইনামিয়ার সম্পূর্ণ নিরাময় কি সম্ভব? কিছু কিছু শারীর-গত বিকার কি অবশিষ্ট থেকেই যায়? বছর দুয়েক আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চারজন তরুণ গবেষক কর্মীর ওপরে এ-বিষয়ে একটি পরীক্ষাকার্য হয়ে গিয়েছে। তাঁরা তিনটি মাস কাটিয়েছিলেন বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটি সিলিন্ডার বা চোঙের মধ্যে, অনেকটা মহাশূন্যে ব্যোমযানের ভিতরে থাকার মতো। এই অবস্থায় কিছু কিছু দুর্বিপাকও ঘটে—যেমন, অক্সিজেন ও জল সরবরাহের ব্যবস্থা ভেঙে পড়া ইত্যাদি—তাঁরা নিজেরাই তা সারিয়ে তোলেন। কাজগুলো এমন যাতে মাথা ঠাণ্ডা রেখে লেগে থাকতে হয়। ষাটদিন কাটার পরে দেখা গেল তাঁদের মানসিক অবস্থার অবনতি ঘটেছে ও কাজে গোলমাল হচ্ছে। তখন তাঁরা ব্যায়াম করতে শুরু করেন এবং দিন কয়েকের মধ্যেই এই অবস্থা কাটিয়ে ওঠেন।

প্রায় একই সময়ে সোভিয়েত বিজ্ঞানী-রাও একই ধরনের পরীক্ষাকার্য চালিয়ে-ছিলেন। বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পুরো একটি বছর কাটিয়েছিলেন তিনজন তরুণ বিজ্ঞানী। তাঁরা নিজেদের চাঙ্গা ও পটু রেখেছিলেন খেলাধুলা করে। তাঁরা বলেছেন, ব্যায়াম করলে তাঁরা আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতেন ও হতাশা কাটিয়ে উঠতে পারতেন।

সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের অপর একটি পরীক্ষাকার্যে দশজন মানুষ ১২০টি দিন কাটিয়েছিলেন অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক অবস্থায়। এই পরীক্ষাকার্য অনেক বেশি দুরূহ, কিন্তু দশজনই সফল হয়েছিলেন। কিন্তু পরীক্ষাকার্যের পরে সকলেই হয়ে পড়ে-ছিলেন চূড়ান্ত রকমের ক্লান্ত ও অবসন্ন, যদিও কাজ করা বলতে যা বোঝায় তা এই ১২০ দিনে তাঁদের কিছুই করতে হয়নি। এই চূড়ান্ত ক্লান্তি ও অবসাদ তাঁরা কাটিয়ে উঠেছিলেন খেলাধুলা করে।

এই সমস্ত পরীক্ষাকার্য থেকে বিশ্বের বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন, হাইপো-ডাইনামিয়া ও হাইপোকাইনেসিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রধান ও সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার হচ্ছে খেলাধুলো ও ব্যায়াম। বহু বিজ্ঞানী এই মত পোষণ করেন যে এটাই একমাত্র হাতিয়ার।

তার মানে, আধুনিক জীবনে—যেখানে জীবনধারণের তাগিদে শরীরচালনার সুযোগ না-থাকার মতো—খেলাধুলো ও ব্যায়াম ছাড়া গতি নেই। সুস্থ ও সবল দেহ নিয়ে বেঁচে থাকতে হলে খেলাধুলো ও ব্যায়াম চাই-ই চাই। এটি বাদ দিয়ে হাজারো টনিক বা এমন কি মহৌষধেতেও কোনো কাজ হবার নয়।

বিশ্বের প্রত্যেকটি অগ্রসর দেশে তাই রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে শুরু হয়েছে ছেলেবুড়ো নির্বিশেষে দেশের সমস্ত মানুষকে খেলাধুলো ও শরীরচর্চায় শামিল করার সমস্ত প্রয়াস। একাজে যে দেশ যতো বেশি সফল সে দেশের জনস্বাস্থ্য ততো ভালো, মানুষের আয়ু ততো বেশি, এমন কি অলিম্পিক-রেকর্ডও ততো উজ্জ্বল। এক্ষেত্রে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দেশ হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। তবে জি ডি আরের মতো এত ছোট দেশও তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে নেই, তার প্রমাণ এবারের মুানিখ অলিম্পিকে যথেষ্ট পাওয়া গিয়েছে। আর এই রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ না থাকার ফল কী হয় তার প্রমাণ আমাদের দেশ—কি স্বাস্থ্যের মাপকাঠিতে, কি উৎকর্ষের বিচারে।

বিষয়টিকে আরেকটু তলিয়ে দেখা যেতে পারে। বিজ্ঞান ও কারিগরীর অগ্রগতির কল্যাণে আমাদের জীবনের সর্বদিকেই যন্ত্র এসে গিয়েছে, অটোমেশনও। নেই সেই অরণ্য নেই সেই জীবনযাত্রাও যখন শিকার করে মানুষকে খাদ্য সংগ্রহ করতে হত। সেই প্রাকৃতিক পরিবেশটি আর নেই, জীবনযাত্রা কৃত্রিম, আবহাওয়া বিষাক্ত। তদুপরি যন্ত্রনির্ভর আমাদের জীবনে শরীরচালনার অবকাশ ও প্রয়োজন শূন্যের ঘরে। তবে এই অবস্থা আমাদেব নিজেদেরই সৃষ্টি, বিজ্ঞান ও কারিগরীর অগ্রগতিকে অভিযুক্ত করে লাভ নেই। অন্যদিকে এই বিজ্ঞান ও কারিগরীর উন্নতির কল্যাণেই আমাদের মানসিক উৎকর্ষ আগের আগের যে-কোনো যুগের মানুষের তুলনায় অনেক অনেক বেশি। এমনকি শারীরিক পটুত্বও।

এতক্ষণের আলোচনার পরে এই শেষের কথাটি গোলমেলে ঠেকতে পারে। বলা হয়েছে মানুষের মানসিক উৎকর্ষ আগের চেয়ে এখন অনেক উন্নত। কথাটা ঠিক। এই উন্নতির কোনো সীমা-পরিসীমা নেই, তাও ঠিক। কিন্তু শারীরিক পটুত্বলাভের সম্ভাবনা? তাও কি সীমাহীন?

এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যেতে পারে আমাদের কালের অ্যাথলিটদের কৃতিত্বের দিকে তাকালে। কোনো কালের কোনো মানুষের পক্ষে কি প্রায় নয় মিটার লংজাম্প দেওয়া সম্ভব হত? বা, প্রায় তিন মিটার হাইজাম্প? বা, দশ সেকেণ্ডেরও কম সময়ে ১০০ মিটার দৌড়? মুানিখ অলিম্পিকের কোনো রেকর্ড এই মানুষের পক্ষেই সম্ভব তা আগেকার কালের কোনো মানুষ কি কল্পনা করতে পারত? গত এক বছরের মধ্যে কতবার বিশ্ব-রেকর্ড ভঙ্গ হয়েছে তা মনে রাখলে কি জোর গলায় বলা যায় যে এই শেষতম রেকর্ডটিই মানুষের শারীরিক পটুত্বের সীমা? বলা যায় না।

তবে একথা বলা যায় যে অলিম্পিক রেকর্ড হচ্ছে নিতান্তই ব্যক্তি-মানুষের কৃতিত্ব—এমন এক ব্যক্তি-মানুষের যে অবিরাম অনুশীলন করেছে। কথাটা ঠিক, কিন্ত এই ব্যক্তি-মানুষটি সম্পর্কে সবচেয়ে বড়ো কথা—তার শরীরের স্বাস্থ্য উচ্চতম মাত্রায়। এবং তা সম্ভব হয়েছে অবিরাম অনুশীলনের ফলেই। এই অনুশীলন বা শরীরচালনাটাই এখানে বড়ো কথা।

কথাটা আরো স্পষ্ট হয় অ্যাথলিটের সঙ্গে সাধারণ একজন সুস্থ মানুষের তুলনা টানলে। এই সুস্থ মানুষটির শারীরিক পটুত্ব লাভের সম্ভাবনা কতখানি? আধুনিক সভ্যতার যেটা অভিশাপ—শরীর চালনার অভাব—তার সঙ্গে সে লড়াই করবে কোন হাতিয়ার দিয়ে?

শ্বাসপ্রশ্বাস, রক্ত-চলাচল ইত্যাদি ব্যাপারগুলো তুলনা করলে দেখা যাবে সাধারণ সুস্থ মানুষের চেয়ে অ্যাথলিটের শরীরে খরচ কম, মজুদ বেশি। অর্থাৎ তার শরীরের স্থিতিশীলতা অপেক্ষাকৃত উঁচু মাত্রায়। এ কারণে স্বাস্থ্য বা জীবন বিপন্ন হবার কারণ ঘটলে যুঝবার ক্ষমতা তার বেশি, সহজে তাকে কাবু করা যায় না। একই অসুখ—সাধারণ সুস্থ মানুষকে বিছানায় শুইয়ে দেয়, অ্যাথলিটকে ছুঁয়ে যায় মাত্র।

সাধারণ সুস্থ মানুষের শরীরে জীবনীশক্তির পুঁজি এত কম হবার কারণ কি? জবাব একটিই—শরীর চালনার অভাব বা হাইপোডাইনেমিয়া, যন্ত্রসভ্যতার যুগে যা প্রায় অবধারিত।

আবার সেই একই কথায় পৌঁছানো গেছে। সুস্থ সবল দেহ নিয়ে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতে হলে চাই, অবশ্যই চাই,—খেলাধুলো ও শরীরচর্চা। একজন অ্যাথলিট যে এতখানি জীবনীশক্তির অধিকারী, এতখানি দেহসৌষ্ঠবের—তার মূলে রয়েছে নিয়মিত খেলাধুলো ও শরীরচর্চা। আর অন্য একজন মানুষ সাধারণভাবে সুস্থ হওয়া সত্ত্বেও যে সহজেই মোটা হয়, অল্পতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, মাথাধরা বুক-ধড়ফড়ানি ইত্যাদি হাজারটা উপসর্গে ভোগে, বয়স হলেই বুড়িয়ে যায়—তার মূলে রয়েছে, খেলাধুলো ও শরীরচালনার অভাব। জীবজগতের সবচেয়ে সুন্দর জীব হচ্ছে মানুষ। তার পক্ষে সুন্দর থাকাটা সহজ—প্রতিদিন নিয়ম করে কিছুক্ষণের জন্যে খেলাধুলো বা শরীরচর্চা। আর অসুন্দর হওয়াটা ততোধিক সহজ—আধুনিক জীবনযাত্রার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে স্থাণু হয়ে থাকা।

মানুষকে অবশ্যই সুন্দর থাকতে হবে, সুস্থ সবল দেহ নিয়ে দীর্ঘকালের জন্যে। বয়স হলেই বৃদ্ধ হয়ে মরতে হবে কেন? যৌবনলাভের মহৌষধি তো নাগালের মধ্যে। খেলাধুলো ও শরীরচর্চা। মানুষের এই চাঁছাছোলা শরীরটা একশো বছর বয়স পর্যন্ত টগবগিয়ে ছুটবে।

রঞ্জিত সিংজী

এক বিস্ময়কর প্রতিভা

প্রশান্ত দাঁ

ক্রিকেটের জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে অদ্যাবধিকাল পর্যন্ত মসৃণ পীচের রঙ্গমঞ্চে কত অজস্র খেলোয়াড় যে তাঁদের ক্রীড়া কেরামতির পরিচয় রেখেছেন কে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব নিকাশ রাখছে? নতুন পথের দিশারী, যুগান্ত সৃষ্টিকারী, কয়েকজন কীর্তিমান খেলোয়াড়ের ক্রীড়া নৈপুণ্যকেই কেবল ইতিহাস তার স্মৃতির মণিকোঠায় চির জাগরূক করে রাখে। তাঁদের ক্রীড়া উৎকর্ষতার সাক্ষ্য সযত্নে বহন করে। আর তার মূল্যবান চিত্তাকর্ষক বিবরণ যুগে যুগে পৌঁছে দেয় ক্রিকেটরসিকদের কাছে। ইতিহাসের পাতার পুরনো তথ্য থেকে শতবর্ষ পূর্বের এমন এক ভারতীয় ক্রিকেটসাধকের সন্ধান পাওয়া যায়। পৃথিবী বিখ্যাত এই স্মরণীয় ও বরণীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়ের নাম রঞ্জিৎ সিংজী। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার আসরে তিনি রঞ্জি নামে সুপরিচিত।

রঞ্জিৎ ক্রিকেটের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এক অনন্যসাধারণ বিস্ময়কর প্রতিভা। ক্রিকেট খেলায় বিশেষতঃ ব্যাটিংয়ে তিনি এক নতুন যুগের প্রবর্তক। তিনি কখনও ক্রিকেটের ব্যাকরণ মেনে খেলতেন না। বলের গতির সঙ্গে তাল রেখে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তিনি নিঃশব্দে ব্যাটকে চালাতেন। এর জন্যে অধিকাংশ সময়েই তাঁকে অসম্ভব রকমের ঝুঁকি নিতে হত। লেগ স্ট্যাম্প, মিডল স্ট্যাম্প —যে কোন দিকেই বল আসুক না কেন তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে খুবই সহজভাবে দেহকে প্রয়োজনমত এগিয়ে বা পেছিয়ে দর্শনীয় মারের সাহায্যে দর্শকচিত্তে আনন্দের জোয়ার বইয়ে দিতেন।

একবার শতরাণ করে শত সহস্র মানুষের প্রশংসা কুড়িয়ে রঞ্জিৎ তাঁবুতে ফিরছেন, এমন সময় বিপক্ষ দলের একজন বোলার অভিনন্দন জানাতে রঞ্জিৎ তাঁর তুষার শুভ্র প্যাডে তিনটে লাল দাগ দেখিয়ে বললেন—তিনটে বল আমার চোখ ও ব্যাটকে ফাঁকি দিয়ে প্যাডে এসে লেগেছে। এর চেয়ে লজ্জার আর কি থাকতে পারে? উত্তরে সাবে দলের সেই বর্ষীয়ান অভিজ্ঞ বোলারটি বললেন—ঐ তিনটে বল আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ বোলিংয়ের নিদর্শন। বলের গতি ও প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি তার দেহকে অনায়াসে যেমন খুশি এত স্বচ্ছন্দে আন্দোলিত করতে পারতেন যে ক্রিকেটবিশারদরাও হতবাক হয়ে যেতেন। বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেটার সি বি ফ্রাই তো একদিন বলেই ফেলেছিলেন রঞ্জির দেহের নমনীয়তা ও স্বাচ্ছন্দ্যগতি দেখে, মনেই হয় না যে, তার দেহে কোন হাড় গোড় আছে। নিজের ক্রীড়া পদ্ধতি সম্পর্কে রঞ্জিৎ বলতেন আমার খেলার ভাবভঙ্গী ও মারের কায়দাকানুন আর পাঁচ জনের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং পুঁথিগত বিদ্যার বাইরে। ব্যাটে বলে সংযোগ না হলে আমি আউট হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা করি। তাই কাউকে আমার খেলার রীতি অনুসরণ করতে নিষেধ করি। কারণ তাতে প্রতি মুহূর্তে বিপদের ঝুঁকি থেকেই যাবে। রঞ্জির খেলায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের ছাপ সুস্পষ্ট। তাঁর ক্রীড়াধারায় স্বদেশ-বিদেশের কোন খেলোয়াড়েরই সঙ্গে কোন মিল নেই। লেগ গ্ল্যান্স, লেগ-কাট ও কয়েকটি বিশিষ্ট স্ট্রোক মারের আবিষ্কারক হিসেবে রঞ্জিৎ সিংজী আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর অভিনব জোরালো মারের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করে সি জে কার্টরাইট রঞ্জিৎ সিংজীকে 'উইজার্ড অব্ দি উইকেট' বলে অভিনন্দিত করেছিলেন।

১৮৯৬ সালে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল ট্রট-এর অধিনায়কত্বে ইংল্যান্ড সফরে আসে। ইংল্যান্ড দলের অধিনায়ক টেস্ট ক্রিকেট দলে রঞ্জির নির্বাচন যুক্তিসংগত মনে করলেও বর্ণবৈষম্যের কারণে খেলোয়াড়-নির্বাচন কমিটির প্রেসিডেন্ট তা অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু ওল্ড ট্রাফোর্ডে আয়োজিত দ্বিতীয় টেস্টে ল্যাঙ্কাশায়ার কাউন্টি দলের নির্বাচক মন্ডলী সরাসরি রঞ্জিৎ সিংজীকে ইংল্যান্ড ক্রিকেট দলে অন্তর্ভুক্ত করেন। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের ৪১২ রাণের উত্তরে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস মাত্র ২৩১ রাণে শেষ হয়। ইংল্যান্ড ফলো অন করে। ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে প্রথম সারির খ্যাতনামা ব্যাটসম্যান স্টোডার্ট, এ্যাবেল জ্যাকসন প্রমুখ সবাই আউট হয়ে যান। দলের চরম বিপর্যয়ের মুখে খেলতে নেমে রঞ্জিৎ সিংজী একশ নব্বই মিনিটে ২৩টি বাউন্ডারীসহ ১৫৪ রাণ করে অপরাজিত থেকে যান। প্রথম ইনিংসে তাঁর সংগৃহীত রান সংখ্যা ছিল ৬২। অস্ট্রেলিয়ান দলের বোলাররা নানা কৌশল করেও রঞ্জিৎ সিংজীকে আউট করতে পারেন নি। রঞ্জির এই খেলা

সম্পর্কে উইকেটরক্ষক আর্থার লিলির মন্তব্য, এটি আমার জীবনে দেখা একটি স্মরণীয় ইনিংস।

১৮৯৬ সাল রঞ্জিৎ সিংজীর ক্রিকেট খেলোয়াড় জীবনের এক স্মরণীয় বছর। ঐ বছর ৫৫ ইনিংস খেলে তিনি ১০টি সেঞ্চুরী-সহ ২৭৮০ রান সংগ্রহ করেন। ইংলিশ ক্রিকেটের পরমপুরুষ ডবলু জি গ্রেস-এর পঁচিশ বছরের রেকর্ড তিনি ভেঙ্গে দেন। এই বছর উইসডেন বর্ষপঞ্জিকা রঞ্জিৎ সিংজীকে পৃথিবীর সেরা পাঁচজন ব্যাটসম্যানের অন্যতম বলে অভিহিত করেন।

রঞ্জিৎ সিংজী সাসেক্স কাউন্টি ক্লাবের খেলোয়াড় ছিলেন। ১৮৯৬ সালে ইয়র্কশায়ারের বিপক্ষে রঞ্জিৎ সিংজী একই দিনে (আগস্ট ২২) দুটি ইনিংসেই সেঞ্চুরী করেন। প্রথম ইনিংসে ১০০ রান এবং দ্বিতীয় ইনিংসে নট আউট ১২৫ রান। একবার রঞ্জিৎ সিংজী একই দিনে তিনটি সেঞ্চুরী করেছিলেন। কেমব্রিজে অনুষ্ঠিত একটি খেলায় তিনি শতরান করে মাঠের বাইরে অন্য একটি ম্যাচে দ্বিতীয় সেঞ্চুরী করেন এবং পুনরায় আসল খেলার দ্বিতীয় ইনিংসে শতরান করেন। ক্রিকেটের ইতিহাসে এমন নজীর দুর্লভ।

সাসেক্স ক্লাবের সঙ্গে রঞ্জিৎ সিংজীর ক্রিকেট খেলোয়াড় জীবনের সম্পর্ক ছিল খুবই ব্যাপক ও গভীর। ১৮৯৯ সালে মারডকের অবসর গ্রহণের পর রঞ্জিৎ সিংজী সাসেক্স কাউন্টি অধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৯০১ সালে সামারসেটের বিপক্ষে তাঁর অপরাজিত ২৮৫ রানই প্রথম শ্রেণীর এক ইনিংসের খেলায় তাঁর ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান। অত্যাধিক বৃষ্টির জন্য খেলাটি চল্লিশ মিনিট বন্ধ ছিল। তা না হলে হয়ত তাঁর ত্রিশত রান পূর্ণ হয়ে যেত। সারে দলের বিপক্ষে দু'শ পাঁচ মিনিটে অপরাজিত ২৩৪ রান রঞ্জিৎ সিংজীর প্রথম শ্রেণীর খেলায় স্বল্প সময়ে সবচেয়ে দ্রুত রান তোলার নজীর। রঞ্জিৎ সিংজীর রান তোলার বহর লক্ষ্য করে একবার জনৈক সাংবাদিক বলেছিলেন—রঞ্জিৎ সিংজী যদি কোন একটি ইনিংসে হাজার রান করেন তা হলেও আমরা এতটুকু আশ্চর্য হব না। আর এক সাংবাদিক ঠাট্টা করে বলেছিলেন—বোলাররা রঞ্জিৎ সিংজীকে আউট করার আশা পরিত্যাগ করে কখন তিনি খেলা থেকে অবসর ঘোষণা করবেন সে দিকেই চেয়ে থাকতেন। একবার ইংল্যান্ডের এক দৈনিক সংবাদপত্রে একটা কার্টুন প্রকাশিত হয়েছিল। কার্টুনের বিষয়বস্তু মোটামুটি এই রকম—ইয়র্কশায়ারের অধিনায়ক লর্ড হক তাঁর দলের দুই বিখ্যাত বোলার হার্স্ট ও রোডসকে সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া থেকে বিরত করতে ব্যস্ত। আর তিনি মুখে বলছেন—ছেলেরা বোকার মত কাজ করো না। মনে রেখো কালকের দিনটা এখনও আমাদের হাতে আছে। উত্তরে বোলার দুজন করুণ মুখে বলছেন—ওদের এক উইকেটে ৩০০ রান তাও রঞ্জি ও ফ্রাই এখনও নট আউট।

কার্টুনের জন্যে ঐ দৈনিকটির নাকি রেকর্ড সেল হয়েছিল। রঞ্জিৎ সিংজীর ক্রীড়ানৈপুণ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লর্ড হক বলেছিলেন—'না দেখলে কোন বর্ণনার দ্বারা তাঁর খেলাকে বোঝান যায় না।'

১৯১৫ সাল ইংল্যান্ডের ক্রিকেট ইতিহাসে এক অন্ধকারময় যুগ। ঐ বছর ইংলিশ ক্রিকেটের দুই স্তম্ভ ডবলু জি গ্রেস ও ভিকটর ট্রামপার পরলোকগমন করেন। আর ক্রিকেটের যাদুকর রঞ্জিৎ সিংজীর জীবনে এক অভাবনীয় দুর্ঘটনা ঘটে যায়। জনৈক প্রতিবেশীর বন্দুকের গুলীতে তাঁর ডান চোখ চিরদিনের জন্য নষ্ট হয়ে যায়। তিনি কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে প্রতিবেশীর নাম প্রকাশ করেননি। প্রকৃতপক্ষে এইখানেই রঞ্জিৎ সিংজীর ক্রিকেট খেলোয়াড় জীবনের অবসান। এর পরেও কয়েকবার তিনি ক্রিকেট খেলেছেন মূলতঃ তার ভাইপো দলীপ সিংজীকে উৎসাহ দানের জন্যে। তারপর ১৯৩৩ সালের ২রা এপ্রিল সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান চিরকুমার রঞ্জিৎ সিংজী পরলোকগমন করেন।

রঞ্জিৎ সিংজী একদিকে যেমন দক্ষ ব্যাটসম্যান ছিলেন অন্যদিকে তেমনি নিপুণ ফিল্ডার। সারা জীবনের ধ্যানধারণা ও অভিজ্ঞতা স্বরচিত 'দি জুবিলি বুক অব ক্রিকেট' গ্রন্থে তিনি প্রকাশ করেছেন। বইটির নামকরণের একটা ইতিহাসও আছে। যে-বছর বইটি লেখা হয় সেই বছর রাণী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন আরোহণের বছর ছিল। এই ঘটনা উপলক্ষ্য করেই বইয়ের নামকরণ এবং বইটি উৎসর্গীত হয়েছিল রাণী ভিকটোরিয়াকে। ক্রিকেটের টেকনিক ও তত্ত্বকথা নিয়ে বইটি লেখা। এবং লেখার গুণে সরস ও সুপাঠ্য।

মানুষ হিসেবে রঞ্জিৎ সিংজীর তুলনা হয় না। পৃথিবীবিখ্যাত সর্বজনপ্রিয় কৃতী ক্রিকেটার রঞ্জিৎ সিংজী ছিলেন নিরহঙ্কার, অমায়িক এবং বন্ধুভাবাপন্ন মানুষ। চিঠি লেখার চেয়ে দীর্ঘ টেলিগ্রাম করতে তিনি বেশী ভালবাসতেন। কুড়ি পাতার টেলিগ্রাম তাঁর জীবনের রেকর্ড হয়ে আছে। এই টেলিগ্রামের মধ্যে তাঁর রসিক মনের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। একবার ভাইপো দলীপ সিংজী অল্প রানে আউট হয়ে গেলে তিনি এক টেলিগ্রামে তাঁকে ক্রিকেট খেলা পরিত্যাগ করে একজন উদীয়মান মহিলা টেনিস খেলোয়াড়ের সঙ্গে টেনিস খেলতে নির্দেশ দেন।

ক্রিকেট ছাড়া রঞ্জিৎ সিংজীর মাছ ধরার খুব বাতিক ছিল, তাছাড়া বিলিয়ার্ড এবং লন-টেনিস খেলারও নেশা ছিল। সুন্দর কথা বলতে পারতেন, আবার সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতাও দিতেন। অবসর সময়ে পড়াশুনায় ডুবে থাকতেন।

কালের অমোঘ নিয়মে রঞ্জিৎ সিংজী পৃথিবীতে আজ নেই। কিন্তু তিনি আজও বেঁচে আছেন তাঁর অসাধারণ ক্রীড়াকীর্তির মধ্যে। তাঁর স্মরণার্থে রঞ্জি স্টেডিয়াম এবং জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা রঞ্জি ট্রফির খেলার আয়োজন। কয়েকমাস আগে রঞ্জিৎ-সিংজীর শত-জন্মদিবস উপলক্ষে ইন্দোরে মুস্তাকআলী একাদশ বনাম মহারাজা যশোবন্ত রাও ক্রিকেট ক্লাবের একদিনের এক প্রদর্শনী খেলার আয়োজন করা হয়েছিল। ইন্দোরের মহারাণী ঊষাদেবী ক্রিকেট ক্রীড়ারত রঞ্জিত সিংজীর বিরাট তৈলচিত্রে মাল্য অর্পণ করে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। দেশের আরও নানা স্থানে নানা ভাবে রঞ্জিৎ-সিংজীকে স্মরণ করা হয়েছে।

পরবর্তীকালে কত ক্রিকেট খেলোয়াড়ের আবির্ভাব হবে কিন্তু সর্বকালের তালিকায় রঞ্জিৎ সিংজীর নাম শীর্ষস্থানেই থাকবে। রঞ্জিৎ সিংজীর অসাধারণ বিস্ময়কর প্রতিভা আরব্যরজনীর আশ্চর্য গল্পের মতই অনন্তকাল বেঁচে থাকবে।

রঞ্জির ক্রিকেট খেলার পরিসংখ্যান

১৫টি ক্রিকেট সিজন (১৮৯৩—১৯২০) : ইনিংস ৫০০, নট আউট ৬২ বার, মোট রান ২৪,৬৯৬, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান নট আউট ২৮৫, সেঞ্চুরী ৭২ (১৪টি ডাবল সেঞ্চুরীসহ) এবং গড় ৫৬-৩৮

কাউন্টি ক্রিকেটের ব্যাটিংয়ের গড় তালিকা

১ম স্থান : ৩ বার—১৮৯৬, ১৯০০ ও ১৯০৪ সাল।

২য় স্থান : ৩বার—১৮৯৯, ১৯০১ ও ১৯০৩ সাল।

৩য় **স্থান :** ২বার—১৮৯৫ ও ১৯০২ সাল।

৪র্থ **স্থান :** ১ বার—১৮৯৭

সিজনে উল্লেখযোগ্য মোট রান

১০০০ রান ৭ বার, ২০০০ রান তিনবার এবং ৩০০০ রান ২ বার। সিজনে ৩,০০০ রান : ৩১৫৯ রান (৮টি সেঞ্চুরী সহ) ১৮৯৯ সালে এবং ৩০৬৫ রান (১১টি সেঞ্চুরী সহ) ১৯০০ সালে।

খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নেমে সেঞ্চুরী : নট আউট ১৫৪ রান (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ম্যাঞ্চেস্টার ১৮৯৬); প্রথম শ্রেণীর এক ইনিংসের খেলায় সর্বোচ্চ রান : নট আউট ২৮৫ (বিপক্ষে সামারসেট, ১৯০১); ১৯০১ সালে ৫টি ডাবল সেঞ্চুরী; ১৯০০ সালে কেন্টের বিপক্ষে সাসেক্সের ২৯৩ রানের মধ্যে নিজস্ব ২২০ রান। টেস্টে লাঞ্চের আগে সেঞ্চুরী : নট-আউট ১৫৪ রান বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, খেলার ৩য় দিন, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৮৯৬)।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ১৫, ইনিংস ২৬, নট আউট ৪ বার, মোট রান ৯৮৫, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৭৫ (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, সিডনি, ১৮৯৭), সেঞ্চুরী ২, অর্ধসেঞ্চুরী ৬, গড় ৪৪-৭৭ এবং ক্যাচ ১৩

টেস্টের ব্যাটিংয়ের গড় তালিকায় ১৮৯৬ সালে ১ম স্থান (গড় ৭৮-৩৩), ১৮৯৭-৯৮ সালে ২য় স্থান (গড় ৫০-৭৭) এবং ১৮৯৯ সালে ২য় স্থান (গড় ৪৬-৩৩)

উপন্যাসের অন্তিমপর্ব

ভবানী মুখোপাধ্যায়

সম্প্রতি একটি কথা প্রায় শোনা যায় যে উপন্যাসের কাল শেষ হয়ে এসেছে। উপন্যাসের মাধ্যমে লেখকরা আর তাঁদের মনোভংগী বা চিন্তাধারা প্রকাশ করবেন না পাঠকরাও আর উপন্যাস পাঠে আগের দিনের মত আনন্দ, জ্ঞান, শিক্ষা বা চিন্তার খোরাক পাবেন না।

এছাড়া এ যুগের বিদগ্ধ মহলে এই প্রসংগটি আলোচিত হচ্ছে, প্রশ্ন উঠেছে উপন্যাসরে ভবিষ্যৎ কি? উপন্যাসের মূল্য কি? সমাজজীবনে তার প্রভাব কতটুকু?

উপন্যাস যে অমরত্ব লাভ করবে, সাহিত্যের আরো বহুবিধ শাখার মত পারপত্তে হবে একথা মনে করার কোনো হেতু নেই। সাহিত্যবক্তব্যের নানাবিধ ধর্ম, নানা ফর্মুলা এবং বিবিধ রকমের টেকনিক আছে। সাহিত্যের সব শাখার মধ্যে উপন্যাস বয়সে কনিষ্ঠতম, কারণ ইতিহাস মহাকাব্য, কাব্য, নাটক, বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রসঙ্গগুলি প্রাচীনতর। বহু শতাব্দী আগে তার উদ্ভব হলেও আজো তার প্রয়োজন শেষ হয়নি।

প্রায় হাজার বছরকাল মানুষ মহাকাব্য নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল। ট্র্যাজেডি-কমেডির শিহরণ এপিকেই মিটত। উপন্যাস তখনও ভূমিষ্ঠ হয়নি। তবুও দিন কেটেছে। সুতরাং কালের প্রবাহে কিংবা কালের কুটিল গতিতে এই সাহিত্যিক প্রকাশভঙ্গী লুপ্ত না হওয়ার কোনো যুক্তি নেই। যেমন ধর্ম সম্পর্কীয় প্রসঙ্গ, স্বাদ্দিক কবিতা কিংবা এপিক এসব ক্রমশঃ লুপ্ত হয়েছে।

হয়ত বর্তমান কালটি উপন্যাসের অনুকূল নয়। একালের মানুষ অধিকতর সচেতন একালের মেজাজ তাই উপন্যাসের পিটুলি গোলাকে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার মত দুধ বলে স্বীকার করে আনন্দে নৃত্য করতে রাজী নয়।

এর একটি প্রধান কারণ যে যুগে প্রতিদিনের ঘটনাবলী অতিশয় উত্তেজক রোমাঞ্চকর এবং লোমহর্ষক সেই যুগে মানুষ কল্পনার পক্ষীরাজ ঘোড়ায় উধাও হওয়ার হাস্যকর প্রচেষ্টায় মত্ত হতে রাজী নয়। পড়তে হয় তাই পড়া। কিছু পড়ে আত্মহারা হওয়া মগ্নচৈতন্যের যুগ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে—এখন 'ট্রুথ ইস স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকস্যন'—

সত্য ঘটনার বৈচিত্র্য এবং রোমাঞ্চ কম কিসে? যে কালে মানুষের পক্ষে চাঁদে পাড়ি দেওয়া প্রায় দৈনন্দিন ব্যাপার হয়ে এসেছে— সেইকালে জুল ভের্নের 'চন্দ্রালোক যাত্রা' কি জমবে? আগ্রহ হবে কি এইচ. জি ওয়েলসের 'এ সেপ অফ থিংস টু কাম' পড়বার?

এ ছাড়া ফিলম। টেলিভিসন, লাউড স্পীকার ইত্যাদি আমাদের বিস্ময় বোধ হ্রাস করে দিয়েছে। অতি সম্প্রতি পৃথিবীর একটি বিখ্যাত সচিত্র পত্রিকা ছত্রিশ বছর ধরে প্রকাশিত হওয়ার পর প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেল তাঁরা এর প্রধান কারণ বলেছেন টেলিভিসনের প্রসার। বিস্ময় বোধ এখন ভোঁতা হয়ে গেছে। উৎকট কল্পনা-বুভুক্ষাকে তৃপ্ত করেছেন আধুনিক বিজ্ঞান। এখন ভোরবেলায় দমদমে প্লেনে চেপে সন্ধ্যার পর লন্ডনে বসে ডিনার খাওয়া সম্ভব। আরো কয়েকদিন পরে এই দূরত্বটুকুও কমে যাবে। ত্রিশ-চল্লিশ বছর পূর্বেকার বাংলা সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠা ওলটালে দেখা যাবে সর্বত্র পুরী ভ্রমণ দেওঘর স্মৃতি, ভিজিয়ানা গ্রাম 'মির্জাপুরে তিন সপ্তাহ' ইত্যাদি ভ্রমণকথা প্রকাশিত হয়েছে এখন ঐ জাতীয় রচনা কি কোনো সম্পাদক প্রকাশ করবেন?

প্রতিদিন প্রত্যুষে সংবাদপত্রে পৃথিবীর সব সংবাদ পড়া যায়। বেতারে প্রায় প্রতি ঘন্টায় সংবাদ পরিবেশিত হয়। কোথায় কার মাত্রা ফাটলো, কোথায় কত ট্যাক্স বাড়ল, আবার কোন দেশে বিখ্যাত ধনকুবেরের পরমাসুন্দরী স্ত্রী বাগানের মালিটার সংগে উধাও হল তার রোমাঞ্চকর বর্ণনা চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেওয়ার সময় জমে ওঠে বটে কিন্তু ঐ পর্যন্ত, তারপর আর ওসব কেউ চিন্তা করে না। টেলিভিসনে ঘরে বসে প্রতিদিন কত কি দেখা যাবে, পৃথিবীর প্রখ্যাতদের ঘরের কোণে বসে দেখা যাবে। তাঁদের প্যাকামি-বোকামি, ন্যাকামি ইত্যাদি খুঁটিনাটি ম্যানারইজম স্বচক্ষে যখন দেখা যাবে তখন জীবনের অলস মুহূর্তটুকু কাটানোর জন্য উপন্যাস পাঠের মত অবসর কি থাকবে?

দৈনন্দিন জীবনের অবসাদ কাটানোর জন্য 'যাহা সত্য নহে'র চেয়ে 'ঘটে যাহা তাহা' স্বচক্ষে দেখা অনেক বেশী রোমাঞ্চকর। যাঁরা মাদকদ্রব্য সেবন করেন তাঁরা তাঁদের নেশাকে অধিকতর জোরদার করার জন্য মরফিয়া ইঞ্জেকশন নিয়ে থাকেন, তাতেও যখন মজা হয় না তখন প্রয়োজ হয় সাপের ছোবলের।

মানব-জীবনে আজ প্রয়োজন সেই সাপের ছোবলের। নেশার প্রাথমিক স্টেজ উত্তীর্ণ। এখন মাধ্যমিক অবস্থা অর্থাৎ মরফিয়া পর্বও সমাপ্ত। এখন তাই চাই সর্পদংশনের আনন্দ, তবে যদি জমে।

বিগত একশো বছরে জনশিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে, পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। পাঠাগার বেড়েছে অনেক। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও আমাদের আগের প্রজন্মের মানুষ যে সব মোটা-মোটা উপন্যাস পাঠ করে আনন্দে আত্মহারা হয়েছেন, অবসর বিনোদন করেছেন, এ যুগে আমাদের সেই সময় কই। এ যুগ হল 'গোলড অ্যান্ড স্পীডে'র যুগ—যা স্বর্ণ তাই স্বর্গ।

তাই এই কালে যাঁরা গবেষক, সাহিত্যের ছাত্র পরীক্ষা পাশের জন্য বেশী নম্বর প্রার্থী—তাঁরাই রাত জেগে, পাঠাগারে বসে জর্জ মেরিডিথ, হেনরী জেমস, বঙ্কিম, হেম, মধু ইত্যাদি পড়ে থাকেন।

।। দুই ।।

এ ছাড়া আরেক নতুন সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে। উপন্যাস ক্রমশঃই সাধারণ পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে। আগে ছিল গার্হস্থ্য উপন্যাস বড়বউ ছোটবউ-এর কোন্দল, রাজা মহারাজার কাহিনী আর উদ্ভট প্রেমের কান্নাভরা ন্যাকামি। কান্নাভরা হাইড্রোজেন বোমা জাতীয় উপন্যাস এ যুগে প্রাগৈতিহাসিক জীব সমাজের মত অবলুপ্ত। তাই পাঠককে এ যুগের উপন্যাসের পরিপূর্ণ রস গ্রহণ করতে হলে কিছু পরিমাণে পড়াশোনা করা ব্যক্তি হতে হবে। যাঁর যথেষ্ট পড়াশোনা নেই তিনি একালের কোনও মহৎ উপন্যাস পাঠ করে তার মর্ম গ্রহণ করতে পারবেন না। তাই কালের প্রভাবে উপন্যাসের চাহিদা কমে এসেছে। শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত উপন্যাসগুলির পাঠক সংখ্যা অবিশ্বাস্য রকমের কম। যাকেই প্রশ্ন করবেন অমুক লেখকের তমুক উপন্যাস যা এ বছর বহুল প্রচারিত শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে তা পড়েছেন না কি! সঙ্গে সংগে উত্তর আসবে এখনও পড়ে উঠতে পারিনি, কেউ বলছেন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে পড়া যাবে। খুব কম সংখ্যক পাঠক যাঁরা বিশেষ বিশেষ লেখকের অনুরাগী ভক্ত তাঁরাই শুধু নিষ্ঠার সংগে সব পড়ে থাকেন। প্রকাশকরাও এমন কথাই বলছেন। আগের দিনে অর্থাৎ থ্যাকারে, ডিকেন্স জোলা প্রমুখ উপন্যাস, লেখকদের পরিবেশিত কাহিনীর মধ্যে জীবন

সম্পর্কে নিজস্ব বক্তব্যও এমন সহজ ও সরল ভঙ্গীতে পরিবেশিত হত যে অতি সম্পর্কে নিজস্ব বক্তব্যও এমন সহজ ও করতে পারত।

তখনকার দিনে নিজের বক্তব্যটুকু পাঠককে বোঝানোই ছিল লেখকের আসল উদ্দেশ্য। পাঠকের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পায় লেখকের উদ্দেশ্যও তত সফল হয়। বর্তমান কালে উপন্যাস লেখকগণ কবিদের মত উপন্যাসকে ব্যক্তিগত নিরীক্ষার ক্ষেত্রে সীমিত রেখেছেন। যেন কোনও এক গোপন সংবাদ—তাই এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল একটা নির্ধারিত পরিধিতে সীমিত রাখাটাই তাঁর উদ্দেশ্য। লেখকের যাঁরা অন্তরঙ্গ বন্ধু সেই মহলই এই রসের আস্বাদ গ্রহণ করুক. অর্থাৎ নিমন্ত্রিতরা আসুক, বরাহুতের জন্য দ্বার রুদ্ধ।

এর ফলে পরিবেশ, ইঙ্গিত গমক, মীড়, মূর্ছনা সবই সেই লেখকমহোদয়ের নিজস্ব গন্ডীর। তিনি এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল সেই রসের সন্ধান জানেন। সেই রহস্যলোকের চাবি-কাঠি তাঁদের নিজের কাছে। পাঠকের হাতে তাঁরা তা তুলে দেননি। সাধারণ পাঠক বিস্ময় বিমূঢ়! ভয়ে মুখফুটে কিছু বলার সাহস নেই, সর্বদাই ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়। সকলেরই এই একই অবস্থা।

এই সব কারণে দিন দিন উপন্যাস পাঠকের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। তাঁরা দেখছেন নভেল পড়ে আর তেমন আনন্দ পাওয়া যায় না, নভেল পড়া সহজ কর্ম নয়। উপন্যাসকারও অসহায় তাঁকে প্রতিযোগিতার আসরে দাঁড়াতে হয়েছে, সুতরাং তাঁদের রচনায় নানা রকম আধুনিক টেকনিক আমদানি করতে হচ্ছে রচনায় জটিলতা বাড়াতে হচ্ছে। মনস্তাত্ত্বিক প্যাঁচ, রাজনৈতিক ইঙ্গিত, সামাজিক সমস্যা ইত্যাদির ককটেল এককাল উপন্যাসে এক বিচিত্র জগাখিচুড়ি ছিল, তার স্বাদ মধুর এবং তৃপ্তিকর ছিল কিন্তু বর্তমান কালের উপন্যাস ক্রমশঃই সঙ্কীর্ণ

গন্ডজরালের ছবির মত দুর্বোধ্য হয়ে উঠবে। ছবির গায়ে লেখা 'দি ক্যাট' দেখে যেমন বুঝতে হয় তেমনই উপন্যাসের নাম দেখে বুঝতে হবে তার বক্তব্য কি।

যাঁরা সঠিক সংবাদ রাখেন তাঁরা আমার বক্তব্য সমর্থন করবেন যে বর্তমানকালে পাঠাগারের পাঠকগণ অধিকতর আগ্রহে কবিতা, কবিতা বিষয়ক আলোচনা, ইতিহাস, স্মৃতিচারণ, জীবনী ইত্যাদি 'নন-ফিকস্যান' বেশী করে পড়ছেন, ফিকস্যান পাঠের উৎসাহ ক্রমশই হ্রাস পেতে চলেছে।

অনেকে প্রতিবাদ করবেন, (বিশেষত যাঁরা প্রবন্ধের বই লিখে থাকেন) যে কখনই নয়! লোকে গল্প-উপন্যাস বেশী পড়ে তাই আমাদের বই বিক্রী হয় না। কিন্তু তাঁরা জাতীয় গ্রন্থাগারে গিয়ে আনুপাতিক পরিসংখ্যান দেখে বুঝবেন নভেল পাঠকের চেয়ে কাব্য, ইতিহাস, জীবনী ও জীবন দর্শনের পাঠকের সংখ্যা অনেক বেশী। এমন কি নিজে বিজ্ঞানের ছাত্র না হলেও এ যুগের পাঠক বিজ্ঞানভিত্তিক রচনা পাঠে সমান আগ্রহী।

।। তিন ।।

উপন্যাসের যে জনপ্রিয়তা হ্রাস পাচ্ছে তার প্রমাণ হিসাবে একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। যে কোনও প্রকাশকের প্রকাশিত গ্রন্থতালিকা দেখুন। লক্ষ্য করবেন আত্মজীবনী, স্মৃতিচারণ, দেখা মানুষ, শিকার কাহিনী, বিচার কাহিনী ইত্যাদি ছাড়াও বৃত্তি অনুযায়ী রচনা যথা পুলিশ জীবন, বিচারক জীবন, কেরানী জীবন, জেলখানার বন্দী জীবন ইত্যাদিও প্রকাশিত হচ্ছে এবং তার চাহিদা আছে। ইদানীং সিনেমার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জীবনকথাও প্রকাশিত হচ্ছে। যাঁরা একটু সক্রিয় পাবলিক লাইফ পার হয়ে এসেছেন, যথা সাহিত্যিক সাংবাদিক, শিল্পী রাজনেতা, ব্যবসায়ী, মুনাফাখোর, পুঁজিবাদী, পুঁজিহীন, প্রভৃতি সবাই আত্মকথা সংকীর্তনে খোল-করতাল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন।

কারো কারো আবার জীবনকথা তিন-চার খণ্ডে সমাপ্ত। বলা বাহুল্য এঁরা 'আত্মপ্রচার' করতে বসেছেন তা নয় তবে নিজের জীবনের বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা পরিবেশনে কিছু পরিমাণে আত্মশ্লাঘা এসেই যায়। তখন সংযত হওয়া সম্ভব নয়।

আত্মজীবনী কখনই তুচ্ছ বস্তু নয়। কারণ এই সব আত্মজীবনীর মধ্যে ছড়ানো আছে বিচিত্র অভিজ্ঞতা—ইতিহাসের উপাদান। যাঁরা বলেন আত্মজীবনী লেখা সহজ আমি তাঁদের সমর্থন করি না, আত্মজীবনী রচনা সহজ ব্যাপার নয়। কারণ জীবনের সব রকম অভিজ্ঞতাকে এবং সত্য কাহিনীকে সাজিয়ে-গুছিয়ে প্রকাশ করতে যথেষ্ট কৃতিত্বের প্রয়োজন। যাঁরা সুরসিক তাঁদের আত্মজীবনী বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হয় সরসতার জন্য

যেহেতু উপন্যাসের সম্ভাব্য প্রতিযোগী আত্মজীবনী এবং সাহিত্যিক ভবিষ্যৎবক্তাদের ধারণা যে অচিরে উপন্যাসের আসন আত্মজীবনী অধিকার করবে, সেই কারণে আত্মজীবনী বিষয়ে আরো একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক।

আত্মজীবনী রচনা এক হিসাবে কঠিন কর্ম। যে অলসতা, কাপুরুষতা, আত্মাভিমানে আমাদের বাল্য-কৈশোর-যৌবন ও মধ্যবয়সের সমস্ত আকাশ ছেয়ে আছে তার সব কথা কিভাবে প্রকাশ করা যাবে? ধরা যাক, প্রকৃত সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলা যাবে না এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে আত্মজীবনী রচনা করা হচ্ছে। কিন্তু সত্যই যদি একমাত্র লক্ষ্য হয় তাহলে সেই সত্য প্রকাশে আত্মীয়-পরিজন, বান্ধব-বান্ধবীর পক্ষে তা অতি-নিদারুণ ব্যাপার হয়ে উঠবে না কি? কোন নর-নারীর পক্ষে বাল্যে বা শৈশবে কার প্রভাব জীবনের গঠনে সবচেয়ে সহায়তা করেছে, প্রভাবিত করেছে, কেউ মনে রাখে কি? ফ্রাঙ্ক হ্যারিস 'আত্মজীবনী' হলে অবশ্য কিছু বলার নেই, কারণ সেই আত্মজীবনী নাকি আগাগোড়া মিছে কথায় ভরা, কিন্তু উপন্যাসের মত সুখপাঠ্য। সমালোচকরা আপত্তি করেছিলেন—বলেছিলেন এ যে উপন্যাস হয়েছে, জীবনী হয়নি।

আমাদের চরিত্রের আকৃতি বয়নশিল্পীর মত বুনে রেখেছেন জীবনতন্তুবায়। আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু হয়ত পেয়েছি। আবার সেই সঙ্গে জীবনের যাত্রাপথে কিছু সঞ্চয় করেছি। কোথায় তা পেয়েছি, তার মধ্যে কিছু অংশ কেন মজবুত ও টেঁকসই—কে বলবে?

অতি নিষ্ঠাবান জীবন-বিশ্লেষকও এর সঠিক উত্তর দিতে পারবেন না। জাঁ জ্যাকোস রুশো বা বসওয়েল জীবনের জঘন্যতম খুঁটিনাটিও লিখেছেন তাঁদের আত্মজীবনীতে—এই সব কথা লেখবার আগে তাঁরা নিশ্চয়ই অনেক বিচার-বিবেচনা করেছেন। প্রকাশ করা আর প্রকাশিত হওয়া দুটি কাজই গুরুত্বপূর্ণ আত্মজীবনীকারের কাছে।

এ ছাড়া কোন মানুষই সম্পূর্ণ আত্মজীবনী লিখতে পারেন না। কারণ তার অনেকখানি অংশ হবে অপাঠ্য। অপ্রীতিকর অংশ সকলেই বর্জন করতে চাইবেন। আমাদের দেশে জনৈক লেখক তাঁর আত্মজীবনীতে অপর একজন লেখকবন্ধু যৌবনে কি আনন্দে বীয়ার পান করেছেন তার বিবরণ দিয়েছিলেন, সেই লেখকবন্ধুটি অপেক্ষাকৃত বড় লেখক তাঁর তখন খ্যাতি ও প্রতিপত্তি হয়েছে, তিনি ভীষণ চটে গেলেন। আত্মজীবনীকারকে তিনি একটা কড়া চিঠি পাঠালেন। আবার সমকালে অমৃতলাল তাকপাতে লিখেছেন, 'জাম্বি আর দারুদের যুগল ইয়ার, বিনির দাড়িতে বসে খেয়েছি বীয়ার।'

এই সব কারণে নির্বাচন চাই। সেই নির্বাচনে আমাদের জীবনের যে আনন্দময় উল্লেখ্য অংশ আছে তা পরিবেশন করতে হবে আর অপ্রীতিকর অংশ সকলে বর্জন করবেন। তাই মনে হয় সত্যকথামূলক আত্মজীবনী সোনার হরিণের মতই অসম্ভব।

তবু দেখা যায় জীবনে যাঁরা একটিও গ্রন্থ রচনা করেন নি তাঁরাও জীবনের শেষ প্রান্তে বসে 'আত্মজীবনী' রচনায় ব্যস্ত। একটি কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত, আত্মজীবনীকার ছেলেবেলাকার জীবনটাই বেশী করে প্রকাশ করতে চান। সেই সোনার অতীতের ঘটনা-পরিবেশ সম্পর্কেই তাঁর অসীম মমতা।

আর কোনকালে বিগত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের বাল্যজীবন, স্কুল-পাঠশালার কথা ইত্যাদি বিষয়ের জীবন নিয়ে যত বই প্রকাশিত হয়েছে তা আগে আর হয় নি। এই অবস্থা শুধু বাংলাদেশে নয়, পৃথিবীর সর্বত্র এই একই হাওয়া।

।। চার ।।

হঠাৎ সবাই মিলে কুইন ভিক্টোরিয়ার শেষজীবনে (যখন লেখকের শৈশবকাল) মানুষ কি করত কি খেতে ভালবাসত এই সব বৃত্তান্ত রচনার জন্য এত ক্ষেপে উঠলেন কেন?

এঁরা সকলেই বুদ্ধিমান, জ্ঞানবান, স্থিরমস্তিষ্ক মানুষ, তবে হঠাৎ এত বাল্য স্মৃতির রোমন্থন কেন? কেন ষোলো-আঠারো বা কুড়ি থেকে ত্রিশের কাহিনী জীবনীতে উপেক্ষিত? এর একমাত্র হেতু এই যে, ১৯০০ খৃষ্টাব্দ থেকে পৃথিবীর অতি দ্রুত রূপান্তর ঘটেছে—তাই এই সব শৈশব-বিলাসীর দল তাঁদের বাল্য জীবনের কথা লিপিবদ্ধ করতে এত আগ্রহী। ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকারের মুখ চেয়ে তাঁরা লিখেছেন। তাঁরা সেই অতীতের কথা লিখছেন, যখন গ্রাম ছিল, মানুষের অনেক জমি, অনেক খাদ্য আর অনেক দাস-দাসী নিয়ে সচ্ছল অবস্থা। জীবনের ধারা মন্দাক্রান্তা ছন্দে চলত। সন্ধ্যার পর চণ্ডীমণ্ডপে রূপো-বাঁধানো হুঁকো হাতে বসে রেড়ির তেলের ম্লান আলোয় আষাঢ়ে গল্প বলার দিন আজ আর নেই।

মানবেতিহাসের আর কোন কালে বা যুগে এমন দ্রুতগতিতে পৃথিবীর এমন রূপান্তর ঘটে নি, যা ঘটেছে বিগত ষাট বছরে। এবং এর সূত্রপাত ১৯০০ থেকে। সমাজজীবন পরিবর্তিত, সামাজিক রীতি-নীতি, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, প্রকরণ-পদ্ধতি, রুচি-অরুচি, শিক্ষা-সংস্কৃতিও সেই সঙ্গে মূল্যবোধ —সবই পরিবর্তিত। সেই সঙ্গে নর-নারীর জীবনে রূপান্তর ঘটেছে। নর-নারীর মধ্যে যে আকৃতি ও প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে—তাও ক্রমশ হ্রাস পেতে বসেছে। পুরুষ মানুষের পোশাক ও স্ত্রীলোকের সাজ পোশাক, চুল, সাজ-সজ্জা সবই এক রকমের হয়ে আসছে। এক নজরে কে যে নর আর কে নারী তা বোঝা কঠিন: সেই সব কারণে যাঁরা প্রাচীন, তাঁদের তাড়াতাড়ি সব লিখে রেখে যাওয়া প্রয়োজন। এই কলকাতা শহরে একদিন মেয়েরা পালকী-সুদ্ধ গঙ্গায় ডুব দিতেন, সূর্য তাঁদের স্পর্শ করতে পারতেন না, আজ তাঁরা ট্রামে-বাসে তড়াক করে লাফিয়ে ওঠেন, পানের দোকানে পান খেয়ে পানের বোঁটা থেকে চুনটুকু প্রকাশ্যে লেহন করে থাকেন।

এখন সবাই সমান। জীবন সংগ্রামে সমান অংশীদার।

আগে ঘোড়ার ট্রাম ছিল, এখন বৈদ্যুতিক ট্রামও প্রায় অচল। পাতাল রেল হওয়ার পর হয়ত মিনি-হেলিকপ চালু হবে। সুতরাং লেখো সেকালের কথা। সেই যে স্বপ্ন দিয়ে গড়া, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা অতীত।

যাঁরা এসব লিখছেন তাঁরা বাল্যে সুখী ছিলেন, তাঁদের গুরুজনেরা অধিকতর সুখী ছিলেন। সমস্যা ছিল না, সংকট ছিল না—একেবারে কুসুমাস্তীর্ণ পথ।

তবু মনে হয় এই সব নয়। বিলীয়মান অতীতকে পীচবোর্ডের মলাটে ধরে অমরত্ব দান করাও সব নয়। এ যুগের আরো অনেক ব্যাপারের মত এর পিছনে আছে ফ্রয়েডীয় প্রভাব। ফ্রয়েড, গুস্তাভ ইয়ুং প্রমুখ মনীষীরা আমাদের অবচেতন মনের কথা বলেছেন, আমাদের সমগ্র জীবনের মূল আকৃতি সেই ছোট বয়সে তিন কি চার বছরের কোনো একটি ঘটনার মধ্যেই চূড়ান্তভাবে স্থিরীকৃত হয়ে গেছে। অথচ সেই ঘটনাটি যে কি তা কারো খেয়াল নেই। থাকা সম্ভব নয়। তাই বাল্যজীবনের বিবরণে পাঠককে বিড়ম্বিত করা। তথাপি আত্মজীবনীর এই আধিপত্য একটা সাময়িক ব্যাপার মাত্র।

আসলে আজ জীবন রূপান্তরিত। সামগ্রিকভাবেই রূপান্তরিত। এই জীবন সরল নয়। সেই জীবন নৈর্ব্যক্তিক। তাই আজ আর নিছক কল্পনার দিন নেই—রোমাঞ্চের প্রয়োজন। শাদা, ছক বাঁধা, সরল গল্পের প্রয়োজন নেই। যা গল্প বা উপন্যাস হয়ে প্রকাশিত তা জীবনের উপলব্ধির একটা 'এপিসোড' বা পর্ব, তার রূপ বিকৃত, জটিল। উপন্যাসও তাই বিকৃত, জটিল। অ্যাবস্ট্রাকট্ ছবির আকার নিচ্ছে। তাই উপন্যাসের সরল ও স্বচ্ছন্দ গতি আর নেই। এই উপন্যাস বুঝতে বুদ্ধির দরকার, চিন্তার দরকার, জীবনের দর্শনের সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার। উপন্যাস যে তার জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে তার কারণ হয়ত এই। উপন্যাস অন্তিম পর্বে পৌঁছেচে একথা হয়ত ঠিক, কিন্তু একথাও ঠিক যে 'ফর্ম' হিসাবে আধুনিক উপন্যাস হয়ত আধুনিক কাল ও মনের সঠিক প্রতিচ্ছবি।

ছুটির দিনে

দিলীপ মালাকার

আমি বহু ব্যক্তিকে জানি যাঁরা ছুটি নিতে চান না। অনেকের মুখে শুনেছি, 'ছুটি নিয়ে কোথায় যাব? ছুটির দিনগুলো ভাল লাগে না।'

অনেকে আবার বলেন, ছুটির কদিন ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিই। সময় কাটাতে চায় না। আমি বহু লোককে দেখেছি ছুটির দিনে অফিসে এসে খানিক আড্ডা মেরে চলে যান। তাঁর মানে এই নয় যে এঁরা সবাই কর্মবীর। অথবা কাজে ডুবে থাকতে ভালবাসেন। তাঁদের কাছে সমস্যা হল অবসর বিনোদন।

আধুনিক সভ্যতায় যন্ত্রযুগের যন্ত্রণায় অনেক সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তার মধ্যে নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে, সেটি হল অবসর বিনোদন সমস্যা। আজকাল বড়লোক ও গরীব লোকের যেমন রোগেরও পার্থক্য বেড়ে চলেছে তেমনি 'অবসর বিনোদন রোগ'ও একটি অতিআধুনিক বিলাসিতার রোগ হিসেবেই দেখা দিয়েছে। আমাদের এই দরিদ্র দেশে এই নতুন রোগের তেমন প্রাদুর্ভাব ঘটেনি। বিদেশে অর্থাৎ ইউরোপ-আমেরিকার মতন উন্নত দেশে যতই যন্ত্রশিল্পের প্রভাব ও উন্নতি বাড়ছে ততই দেখা দিচ্ছে নতুন সংকট। উৎপাদন বাড়ছে সুতরাং কাজের সময় কমে যাচ্ছে। ছুটির দিন বাড়ছে। ইউরোপ-আমেরিকায় আজকাল সব অফিস ও কারখানায় সপ্তাহে পাঁচদিন কাজ হয়ে থাকে। সপ্তাহে দুদিন ছুটি। কয়েকটি দেশে উৎপাদন বৃদ্ধির সমস্যা এত প্রকট হয়ে উঠেছে যে সেখানে সপ্তাহে তিন দিন ছুটি দেবার কথা উঠেছে।

ইউরোপ-আমেরিকার বহু বড় বড় কারখানা আজকাল গ্রীষ্মকালের ছুটিতে দুই সপ্তাহ থেকে চার সপ্তাহ বন্ধ রাখা হচ্ছে। অর্থাৎ এক মাস ছুটি। তাই ওদেশের সমাজ বিজ্ঞানীরা অবসর বিনোদন সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। ছুটির দিনে যাতে লোক ঘুমিয়ে বা আড্ডা মেরে সময়টা নষ্ট না করে তার জন্যে নানা ব্যবস্থা বাতলেছেন সমাজ বিজ্ঞানীরা। সেখানকার সরকার ও কারখানার মালিকরা ছুটির দিনে অবসর বিনোদনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এ সমস্যা দেখা দিতে আরও একশ বছর লাগবে আমাদের দেশে। কারণ যে হারে আমাদের যন্ত্রশিল্পের উন্নতি হচ্ছে সে হারে চলে বহু সময় নেবে। আমাদের কৃষক ও মজুরে দিনে যত ঘন্টা কাজ করেন তারপরে তাঁরা কখনো অবসর বিনোদনের কথা চিন্তা করতে পারেন না। উপরন্তু যে দেশে লাখ লাখ বেকার সে দেশে দীর্ঘ অবকাশ ও অবসর বিনোদনের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তবে বড় বড় শহরে ও শিল্পাঞ্চলে যে কয়জন চাকুরীয়া ভাগ্যবান আছেন তাঁদের অবসর বিনোদন কাটে ঘুমিয়ে অথবা তাস পিটিয়ে।

শহর ও শিল্পাঞ্চলের চাকুরেদের মধ্যে বেড়াতে যান শতকরা পনেরজন। বাকী পঁচাশী জন ছুটির দিনে যে যার বাড়ীতে সপরিবারে ছুটি কাটান। ছুটিতে বাইরে না যাবার প্রধান কারণ অর্থনৈতিক। সপরিবারে ছুটিতে বেড়ান সবার পক্ষে সম্ভব নয়। অত অর্থ ব্যয় করার মতন সামর্থ্য অনেকেরই নেই। দ্বিতীয়তঃ যাদের ইচ্ছে ও সামর্থ্য আছে তাদের পক্ষে রেলের টিকিট ও আসন সংরক্ষণ এক সমস্যা, তারপর হল যেখানে যাবেন সেখানে উঠবেন কোথায়। হোটেলে জায়গা পাওয়া যায় না। কোথাও বাড়ি ভাড়া করে থাকা মানে সংসারের জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া এবং আরেকটি সংসার পাতা। তৃতীয় সমস্যা মানসিকতা। ছুটিতে অবসর বিনোদন যাপন করার কথা অনেকে ভাবতে পারেন না। কেবলমাত্র অসুখ বিসুখ করলে স্বাস্থ্যোন্নতির আশায় অনেকে যান পাহাড় অঞ্চলে বা স্বাস্থ্যপ্রদ জায়গায়। অর্থাৎ অসুখে না পড়লে আমরা সচরাচর কোথাও বেড়াতে যেতে চাই না। এখানেই কিন্তু বিদেশীদের সঙ্গে আমাদের মানসিকতার তফাৎ। ইউরোপ আমেরিকানরা বলেন, অসুখ বিসুখ যাতে না করে, শরীর যাতে না খারাপ হয় তার জন্যেই চাই মুক্ত বায়ু

ছুটির ক্যাম্পে শিশুরা

ও স্থান পরিবর্তন। গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের ধারে ও শীতকালে পাহাড়ে অন্ততঃ দু সপ্তাহ ছুটি উপভোগ করলে শরীর আরও ভাল হবে। অসুখ-বিসুখের সম্ভাবনা থাকবে না। এবং শরীর সুস্থ থাকলে আরও ভাল করে এবং মনোযোগ দিয়ে কাজ করা যায়। শরীরে বা মনে অবসাদ না থাকলে কেউ কাজে ফাঁকি দিতে চায় না। গ্রীষ্মকালে সারা ইউরোপময় চলে ছুটি উৎসব। ফলে ট্যুরিজম বা পর্যটন শিল্প সেখানে গড়ে উঠছে সাংঘাতিকভাবে। নিজের চোখে না দেখলে সেটা সহজে বিশ্বাস হবে না।

আমাদের দেশে পর্যটন শিল্প সবে জন্মলাভ করেছে। ভারত সরকার এদিকে এখন দৃষ্টি দিয়েছেন। ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে কয়েকটি রাজ্যে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নকল্পে বেশ টাকা ঢালা হচ্ছে। অবশ্য ভারত সরকার চাইছেন যাতে আরও বেশী সংখ্যায় বিদেশী ট্যুরিস্ট আমাদের দেশে বেড়াতে আসেন তাহলে তাদের কাছ থেকে বিদেশী মুদ্রা অর্জন আরও বাড়বে। এ ব্যাপারে একটি মন্ত্রীদপ্তরও রয়েছে। প্রত্যেকটি রাজ্যে এখন পর্যটন দপ্তর ও মন্ত্রী দপ্তর রয়েছে। সব রাজ্যই চাইছে তার রাজ্যে যেন পর্যটকের সংখ্যা বাড়ে। আমাদের দেশে জনসংখ্যার অনুপাতে সরকারী হোটেলগুলোর সংখ্যা মরুভূমিতে কয়েক ফোঁটা জলের মতন। ইউরোপের সঙ্গে তুলনা করা বাতুলতা মাত্র। ওদের এক একটা সমুদ্রের ধারে সার সার হোটেল। সে তুলনায় দীঘা বা পুরীর চিত্র তুলে ধরলে পাগলামী বলে মনে হবে। সমুদ্রের ধারে হোটেল বা বাসস্থান যেমন নেই বলে আমাদের পর্যটকরা বিরক্ত হয়ে সেখানে যেতে চান না। পাহাড় অঞ্চলেও সেই অবস্থা। তার ওপর রয়েছে যানবাহন সমস্যা। যদিওবা কেউ সপরিবারে গেলেন বেড়াতে হয় সমুদ্রের ধারে নয় পাহাড়ে। দুয়েকদিন থাকার পর সে জায়গাগুলো একঘেয়ে বলে মনে হয়। পুরীর না হয় আকর্ষণ জগন্নাথ দেবের মন্দির এবং তার আশেপাশে রয়েছে অনেক ঐতিহাসিক স্থান। সেখানে পর্যটকের ভীড় লেগেই আছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সমুদ্রের তীরে কিংবা পাহাড়ে তেমন কোনো ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য নেই বলে পর্যটকেরা দুদিন থেকেই পালিয়ে আসেন। অবসর বিনোদনের এটিও একটি প্রধান সমস্যা। ছুটি নিলেন এবং বেড়াতেও গেলেন কিন্তু সময় কাটাবেন কেমন করে? এ ব্যাপারে ইউরোপীয়েরা অনেক সমস্যার সমাধান করেছেন। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে দুচারটে উদাহরণ দিতে পারি।

ইউরোপে বছরে সাত-আট মাস বেশ ঠাণ্ডা। তখন বেড়াবার সময় নয়। এত কনকনে ঠাণ্ডা যে মাঠে-ঘাটে সমুদ্রের ধারে বেড়ান বেশ কষ্টকর। সত্যিকারের গ্রীষ্মকাল হল দুমাস। সে সময়টা সবাই চাটনির মতন উপভোগ করে। গ্রীষ্মের আগে এক মাস ও পরে আরও একমাস ধরে অনেকে ছুটি উপভোগ করেন।

শীতকালে উইক এণ্ডে অর্থাৎ শনি-রবিবার ছুটির দিনে বড় একটা কেউ শহরের বাইরে যেতে চান না। কারণ গ্রামে তখন আরও বেশী ঠাণ্ডা। বসন্তকাল শুরু হলেই সবাই উইক এণ্ডে বেড়িয়ে পড়ে গ্রামের দিকে। যার একটু অবস্থা ভাল সেই গ্রামে একটা ছোট্ট বাড়ি কেনে। পাঁচ-দশ হাজার টাকায় পুরোনো বাড়ি কিনে সেটাকে মেরামত করে নিয়ে বসবাস করে। অনেককে দেখেছি নিজের হাতে বাড়িঘর রং করতে। সেটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে এমন সুন্দর করে রাখে যে চোখ ফেরান যায় না। যার গ্রামে বাড়ি আছে তার তো কথাই নেই। যাদের অবস্থা আরও ভাল, তাঁরা কেনেন সমুদ্রের ধারে হয় ছোট্ট বাড়ি অথবা ফ্ল্যাট। আবার অনেকে কেনেন পাহাড়ে কাঠের বাড়ি। আজকাল প্রায় সবারই একটা না একটা মোটর গাড়ী আছে। তাই চেপে তাঁরা সপরিবারে যান উইক এণ্ডে গ্রামে, সমুদ্রের ধারে অথবা পাহাড়ে। যাদের গাড়ি নেই তাঁরা যান ট্রেনে অথবা বাসে। আবার অনেককে দেখেছি মোটর সাইকেল কিংবা স্কুটারে করে উইক এণ্ড কাটাতে। তবে এই শ্রেণীতে থাকে অ-বিবাহিত অথবা সদ্য-বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীরা। যাদের নিজের আস্তানা নেই তাঁরা যান হোটেলে। ইউরোপের এমন কোনো গ্রাম বা ছোট শহর নেই যেখানে অন্ততঃ একটা হোটেল নেই।

শনি-রবিবারের আগে অথবা পরে যদি একটি দিন ছুটি থাকে তাহলে সোনায় সোহাগা। তিন দিন ছুটি পেলে অনেকেই ছোটেন সমুদ্রের ধারে অথবা পাহাড়ে। মার্চ-এপ্রিল মাস থেকে শুরু হয় এই ধরনের অবকাশ যাপন এবং চলে অকটোবর মাস পর্যন্ত। নভেম্বরে ঠাণ্ডা পড়লে আবার সবাই যে যায় ঘরে।

বহু ব্যক্তি আছেন যাঁদের গ্রামে, সমুদ্রের ধারে কিংবা পাহাড়ে নিজস্ব বাড়ি নেই।

ছুটি কাটাবার জন্য সস্তায় তাঁবুর ঘর

হোটেলেও টাকা ঢালতে চান না। তাঁরা কি করে জানেন? নিজের গাড়ীর পিছনে ট্রেলার জুড়ে চলেন ছুটির ক্যাম্পে। ট্রেলারটি একটি ছোট্ট বাড়ি। একখানা ঘর তার সঙ্গে রয়েছে রান্না করার সাজসরঞ্জাম। হলিডে ক্যাম্পে গাড়ি ও ট্রেলার রাখার জন্যে দিনে এক টাকা ভাড়া। সেই ক্যাম্পে থাকে স্নানাগার ও পায়খানা। জায়গাটা ভাল লাগলে সেখানে ট্রেলার নিয়ে দশ-পনর দিন অনায়াসে কাটিয়ে দিতে পারেন। খরচ কম। যাঁদের গাড়িও নেই ট্রেলারও নেই তাঁরা যান ওই সব হলিডে ক্যাম্পে তাঁবু নিয়ে। ছোট তাঁবু খাটিয়ে তাতে ক্যাম্পখাট বিছিয়ে হাওয়ায় ফোলান বিছানা-গদি ইত্যাদি দিয়ে বেশ সংসার পাতেন অনেকে। সঙ্গে থাকে ছোট্ট গ্যাসের সিলিণ্ডার। তাই দিয়ে উনুন জ্বলে। টর্চের আলোয় রাত্রে অনেকে পড়েন; যাদের গানের নেশা তারা গীটার অথবা অ্যাকর্ডিয়ান নিয়ে বাজান। তাকে ঘিরে সঙ্গীত আসর জমে ওঠে।

এর চেয়ে আরও সস্তায় বেড়ান যায় ইউরোপে। আজকাল পর্যটন শিল্প বেড়ে উঠেছে বলে প্রত্যেক দেশেই বড় বড় পর্যটন শিল্প সংস্থা গড়ে উঠেছে। তারা আজকাল একএকটি ছোট দলকে নিয়ে যায় দেশ-বিদেশে বেড়াতে। ছোট দলে বেড়াতে গেলে খরচ অনেক কম পড়ে এবং কখনই নিঃসঙ্গ বোধ হয় না। এমনি একটি দলের সঙ্গে আমি বেড়াতে গিয়েছিলাম ইতালির নেপলস-এ। ক্লাব মেডিটেরেনিয়ান বলে একটি পর্যটন শিল্প সংস্থার ছোট দলের সঙ্গে আমরা গেলাম প্যারিস থেকে ট্রেনে নেপলস-এ। আমাদের দলে ছিল পঁচিশজন। বারজন পুরুষ ও তের জন মেয়ে। সবাই চাকরী করে। নেপলস-এর এক মাঝারি হোটেলে আমাদের রাখা হয়। একঘরে দুজন তিনজন করে থাকতাম। খাওয়া দাওয়ার সময় বাঁধা। আমাদের সঙ্গে ছিল একজন গাইড। লেখাপড়া জানা গাইড। সমুদ্রের ধারে বেড়ান, সমুদ্রে স্নান তো ছিলই। প্রতিদিন থাকত বিকেলের দিকে একঘণ্টা করে লেকচার-ক্লাস। গাইড আমাদের গল্প করে বোঝাতেন নেপলসের ইতিহাস ও সংস্কৃতি। এক একদিন নিয়ে যেতেন মিউজিয়ম দেখাতে। একদিন নিয়ে গেল বিসুভিয়স আগ্নেয়গিরি দেখাতে। নেপলস থেকে আমাদের বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয় ক্যাপ্রি দ্বীপে ও সার্দিনিয়ায় জাহাজে করে। প্রত্যেক রাত্রে খাওয়ার পরে চলত সান্ধ্য-আড্ডা। অনেক সময় নিয়ে যাওয়া হত কাফে-বারে ও নাচঘরে। সেখানে নাচ ও হৈ-চৈ করে আমাদের হোটেলে পৌঁছে দেওয়া হত। ওই ছোট্ট দলে আমরা সবাই ছিলাম অপরিচিত এবং এক-একজনের এক-এক ধরনের পেশা। শেষে দেখা গেল আমরা সব কতকালের পরিচিত। গড়ে উঠল বন্ধুত্ব। ছুটির পনরটা দিন যে কিভাবে কেটে গেল তা ভাবতেই পারলাম না। আমরা যদি একা যেতাম নেপলস-এ বেড়াতে তাতে যে খরচ হত তার অর্ধেক খরচে আমরা বেড়িয়ে এলাম নেপলস-এ।

এমনি দল করে বেড়ান ব্যবস্থা রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্যে এবং বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে। আমি ছাত্রাবস্থায় একবার গিয়েছিলাম প্যারিস থেকে দক্ষিণ ফ্রান্সের সমুদ্রতীরে নিস্-এ। আমাদের দলে ছিল পঁয়ত্রিশ জন ছাত্রছাত্রী। একশ টাকায় আমরা কুড়ি দিন ছুটি কাটিয়ে আসি। আমাদের জন্যে যা খরচ হয়েছিল তার বেশীর ভাগ বহন করেছিল সরকার, ছাত্র-ইউনিয়ন ও বিশ্ববিদ্যালয়। আমরা ছিলাম ওখানকার একটা বিদ্যালয়ের হোস্টেলে। বিছানাপত্র নিতে হয়নি। শুধু চাদর আর টাওয়েল নিয়েছিলাম। হোস্টেলে খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। তাছাড়া ছিল ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেস্তোরাঁ। আমাদের দলপতি প্রতিদিনই প্রায় ওই অঞ্চলের ঐতিহাসিক জায়গাগুলো দেখাতেন। আমাদের জন্যে থাকত একটা বাস। সমুদ্রে স্নান করা তো ছিলই। দুপুরে একটু বিশ্রাম করে যেতাম ঐতিহাসিক স্থানগুলো দেখতে। আর প্রতিরাত্রে হোস্টেলে হত নাচ-গানের আসর। তিন সপ্তাহের ছুটি ফুরিয়ে গেল যেদিন সেদিন মনে হল যেন একদিনে শেষ হল। এমনি ব্যবস্থা থাকে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে।

যাঁরা বিলাসী তাঁরা যান নৌকোয় চড়ে সমুদ্র বেড়াতে। শীতকালে যায় একদল পাহাড়ে বরফের ওপর স্কী করতে। সেখানেও তাই। সারাদিন বরফের ওপর দৌড়-ঝাঁপ করে রাত্রে হলঘরে আগুনের সামনে নাচ-গানে মশগুল থাকে সবাই। অবসর বিনোদন কাটে এই ভাবে সেখানে।

যাঁরা চিন্তাশীল অথবা শুধু বই পড়ে সময় কাটাতে চান তাঁরা যান নির্জন জায়গায় পাহাড়ে অথবা ঘন বনে। কয়েক মাস আগে মস্কোয় এক রুশ বন্ধুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি বললেন, গ্রীষ্মের ছুটিতে যাবেন উত্তর রাশিয়ায় এক নির্জন গ্রামে। তিনি মাছ ধরতে ভালবাসেন। লেনিনগ্রাদ ছাড়িয়ে আরও উত্তরে এক নির্জন বনে নদীর ধারে বসে মাছ ধরতে ধরতে তিনি দেখেন প্রকৃতির শোভা। তার ভাষায় ওটা তাঁর কাছে স্বর্গ। কত না পাখি সেখানে তখন চড়ে বেড়ায়। আমার রুশ বন্ধুটি বলছিলেন মস্কোর এই হৈ-হল্লা ভুলে প্রকৃতিদেবীর কোলে কয়েক দিন শান্তির লোভে আমি অপেক্ষা করি সারাটা বছর।

ছুটিতে অবসর বিনোদন যাপন করে ইউরোপে এক এক জন এক-এক ভাবে। কেউ নাচ-গান করে, কেউবা করেন মানসিক চর্চা অথবা স্রেফ প্রকৃতির শোভা দর্শন করে। শুধুমাত্র ঘুমিয়ে বা তাস পিটিয়ে অবসর বিনোদন যাপন করতে [illegible] আমি বিদেশে।

শুধু তার শিল্পকর্ম সাধনেই নয়, চল-গান সভ্য জগতের দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে চলচ্চিত্র আজকের সমাজজীবনের যে একটি অবিচ্ছেদ্য ও নিগূঢ় অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে ঐ সত্যটি যেমন সুপ্রমাণিত তেমন আবার চলচ্চিত্রশিল্প সম্পর্কে যে কোন আলাপ-আলোচনায় বারবার উল্লেখের দাবীও সে সত্য রাখে। কেননা, ঠিক জাতীয় সাহিত্য বা রঙ্গমঞ্চেরই মতো ঐ কথা আজ চলচ্চিত্র সম্বন্ধেও বলা যায় যে যে-কোন দেশের ও জাতির নিজস্ব শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্পসাধনার যে বৈশিষ্ট ও দীপ্তি তার চূড়ান্ত প্রতিফলন তার চলচ্চিত্রশিল্পের মধ্যেও। সেদিক থেকে তাই ঐ-কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, একটা জাতিকে সম্যকভাবে জানবার একটা শ্রেষ্ঠ উপায় তার চলচ্চিত্রশিল্প। এবং এই সত্যটি উপলব্ধি করেই আমাদের ভারতবর্ষের জাতীয় সরকার জাতীয় সং সাহিত্য, সঙ্গীত ও নাটকের সৃষ্টি ও পুষ্টি সাধনের জন্য যতোখানি উৎসাহ দিচ্ছেন, তুলনামূলোই তাঁরা জাতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের সুগঠন ও স্বাস্থ্যদীপ্ত সংবৃদ্ধির ব্যাপারেও প্রেরণা জোগাতে সঙ্কোচ করছেন না। যদিও তার সর্বক্ষেত্রে নয়। সেই কথাই এখানে বলতে চাই।

ঐ থেকে স্বতঃস্বীকার্যভাবে এই সত্যটিও এসে পড়ে যে এতোখানি জাতীয় কৃষ্টি পরিবহনের দায়িত্ব যে শিল্পের সে নিজেকে কোন-প্রকারেই শুধুমাত্র গণমনের আনন্দ-বিনোদনের মাধ্যম করে কোনমতেই একটি নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে আটকে রাখতে পারে না। শিল্পে আধুনিকতার দায়িত্বপূর্ণ শর্তপালনের জন্য তাকে সংপ্রসারিত হতে হবে শিল্পের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের দিকে দিকে। আবিষ্কার করতে হবে তাকে মানবমনের বহু অজানা রহস্যপুরী; করতে হবে তার বন্ধনহীন প্রখর কল্পনাশক্তির যে বিরাট ও অনন্ত দিক-মণ্ডল তারই নব নব অন্বেষণা। আমাদের দেশে আজ চলচ্চিত্রের এই সম্প্রসারিত শিল্প-কর্মসাধন এখনো পর্যন্ত অত্যন্ত সীমিত যা বহুলাংশে অনাস্বাদিত। এই ব্যাপারে চলচ্চিত্রের যে শিল্পমর্মিতা তার একটা বিশেষ দিকের বিরাট সম্ভাবনা আজকের যুগের মানুষকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করছে। এবং সেই সম্ভাবনাকে সমাজজীবনে শিক্ষাক্ষেত্রে ও আরো বহুবিধ ক্ষেত্রে সুপ্রয়োগের ব্যাপারে প্রত্যেক দেশের রাষ্ট্র আজ স্পষ্টই উৎসাহী।

এখান থেকেই সুরু হয় চলচ্চিত্রের একটি সর্বাধুনিক গভীর দায়িত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ যাত্রা। সেটি হল তার জনসংযোগের কর্তব্য শিল্পের মাধ্যমে শিল্পস্রষ্টার চিন্তাধারা ও মনোবিকাশের সঙ্গে বিশ্ব-সমাজের বা জাতীয় সমাজের মনোগত বার্তাবহনের আদান-প্রদানের নূতন আত্মীয়তাসাধন। এবং সেই পথে চিত্রশিল্পের আত্মনিয়োগের প্রধান ধারক হবে শ্রবণ ও দর্শনেন্দ্রিয়ের যুগলবন্দী। আজ তাই প্রত্যেক দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে দেখা যায় চলচ্চিত্রের বিপুলভাবে প্রয়োগ তার অডিও-ভিয়ুয়াল সীমাহীন সম্ভাবনাকে স্মরণে রেখে। জন-মনের অন্তঃপুরে পৌঁছুবার পক্ষে ও সেখানে থেকে নানা সম্ভাব্য কল্পনার সাহায্যে দিকে-দিকে তার রুচি শিক্ষা ও চিন্তার আলোক-প্রবাহকে দ্রুত বিচ্ছুরিত করে দেবার জন্য। চলচ্চিত্রকে নিয়ে আজ তাই ব্যাপকভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। বিশেষ করে এ ব্যাপারে উৎসাহী দেখা যায় বহির্জগতের মধ্যে আমেরিকা, ইংলণ্ড, জার্মানী, সোভিয়েত রাশিয়া ফ্রান্স ও চেকোশ্লোভাকিয়া। আমেরিকায় তো দেখি ঘরে ঘরে ছেলেমেয়েরা নয় এমন কি ষোল মিলিমিটার মুভি ক্যামেরা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে জীবনের অলিগলিতে কোথায় অকস্মাৎ জীবনের কোন নতুন দিগন্তের প্রাণের নতুন রহস্যের উৎস আবিষ্কৃত হয়ে যায় তারই সন্ধানে। তাদের এমন কি আছে নিজেদের ল্যাবোরেটারী সেই তোলা ছবি প্রিন্টিং - ডেভেলোপিং-এর জন্য। বালক অঙ্কনশিল্পীরা যেমন যে কোন জিনিস সামনে পায় তাই আঁকতে বসে যায় রং-এ ও রেখায়—তা সে সূর্যোদয় হোক ফুল গাছ হোক নদী-পাহাড় বা জীব-জন্তু হোক, মুভি ক্যামেরাশিল্পীও তেমনি ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়েছে কোথায় কি লুকোনো রত্ন বেরিয়ে পড়ে তারি সন্ধানে আর নিঃসন্দেহে বলি, এদের থেকে আবিষ্কৃত হবে ভবিষ্যতের বড়ো বড়ো চিত্র-স্রষ্টা। আসবেন ওয়াল্ট ডিস্‌নী গ্রীয়ার-সন-এর মতো দিকপাল। ●

এই প্রসঙ্গেই আসে প্রামাণ্য চিত্র ও তথ্য-চিত্রের কথা, যাকে ইংরেজীতে বলা হয় ডকুমেন্টারী ফিল্ম এবং ইনফরমেশন ফিল্ম। এর উভয়ের প্রয়োগেই নানা তথ্য সংবাদ ভাবগত কল্পনা থিওরি বা প্রশ্ন উৎসুক দর্শকমনের দুয়ারে শুধু পৌঁছে দেওয়াই হয়না সে দুয়ার খোলবার চাবিকাঠির কাজ করে তারা। আজ তাই দেশে দেশে ফিল্ম সোসাইটি ও মুভি ক্লাব হয়েছে যার অজস্র

কাজললতা/অপর্ণা সেনকে নির্দেশ দিচ্ছেন পরিচালক বিকাশ রায়। —ফটো : অমৃত

তরুণ সভা-সভ্যারা নিজেরা ছবি তুলছে, তা নিয়ে আলোচনা করছে। তারা অপরদেশের শ্রেষ্ঠ ছবি—কি কাহিনীচিত্র বা তথ্যচিত্র বা প্রামাণ্যচিত্র—এনে দেখছে, তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছে বিশ্লেষণ-বিচার করছে; সেই আলোয় নিজেদের গড়ে তুলছে। আর এই সবকিছুর মধ্যে দিয়ে সঞ্চারিত হচ্ছে, নতুন করে জন্ম নিচ্ছে মুক্ত চলচ্চিত্র-ভাবনা, তার সৃজনী রস-সম্ভোগতা ও উপলব্ধি; আমেরিকার মতো ধনী ও বিলাসী দেশের কথা বাদ দিই। পাশ্চাত্যের প্রায় প্রতিটি ছোট-বড় দেশেই আজ মুভি ক্যামেরা নিয়ে চলছে ছায়াচিত্রশিল্পকে ঘিরে জীবনের অনাবিষ্কৃত লোকের নানা তথ্যের নানা সম্ভাবনার নানা বিচিত্র অশ্রুত বার্তার অদৃশ্য অভিজ্ঞতার আবিষ্কার-অভিযান। যা পরিব্যাপ্ত হচ্ছে দিনে দিনে তরুণ সম্প্রদায়ের মানসে।

কাজেই নিঃসংশয়ে দেখা যাচ্ছে যে সমাজ-জীবনকে ও ব্যক্তি-মানসকে সেবা করবার পক্ষে বর্তমান যুগের আধুনিক শিল্প-স্বাধীনতা-যুক্ত চলচ্চিত্রের সম্ভাবনার কোন সীমারেখা নেই। অনন্ত প্রসারিত তার শিল্পদৃষ্টি; সাধকমনা আমাদের ভারতবর্ষে কিন্তু, দুঃখের বিষয় আজো শিল্পের এই বিশেষ সম্ভাবনা-যুক্ত দিকটি অবহেলিত। এতদিন তো এই বিশেষ শিল্পকর্মশিক্ষার মতো কোন সুযোগও ছিল না আমাদের দেশে। সরকারী আনুকূল্যে সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত ফিল্ম এ্যাণ্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অব ইণ্ডিয়া (পুনায় অবস্থিত)-তে এই বিদ্যায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ঘটেছে। কিন্তু তাও কতোটুকু? এবং তা স্কুলের মতো আর্থিক ব্যবস্থা আমাদের মতো দীন-দরিদ্র দেশের নিম্ন-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতী কেমন করে করবে? উচ্চবিত্ত বড়ো জোর মধ্যবিত্ত পরিবারের তরুণ-তরুণীদের মধ্যেই তাই এখানকার শিক্ষা সীমাবদ্ধ হয়ে আছে।

এই প্রসঙ্গে, সম্প্রতি কলকাতার একটি ঘরোয়া আসরে আমেরিকান ইউনিভার্সিটি সেন্টার-এর আয়তায় গড়ে ওঠা একটি 'ফিল্ম মেকিং ওয়ার্কশপ'এর তিনখানা খণ্ডচিত্র দেখলাম, যা করেছেন এ কাজে সম্পূর্ণ নতুন কয়েকটি শিক্ষিত, উৎসাহী তরুণ। এগুলি তথ্যচিত্র নয়, ডকুমেণ্টারীও নয়। এই খণ্ডচিত্রগুলিকে বোধ হয় বলা যায় রম্যচিত্র; যা কোথাও ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করেছে একটি কাহিনীর কেন্দ্রগত কল্পনাকে। যেমন দি শ্রুড। কোথাও একটি বিশেষ সূক্ষ্মভাবের পরিমণ্ডল রচনার কার্যে তার ক্যামেরার চোখ ও মন নিয়োজিত। যেমন টিউনিং আপ। যে ছবিটিতে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে দিনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের কাজে নিযুক্ত মানুষের হাতের একটি সূক্ষ্ম অনুপঠন। বলতে চেষ্টা করেছে তা এই কথাটি যে এই সমস্তরকম কর্মে নিয়োজিত মানুষের যে-হাত, যা শিল্প রচনা করে, সঙ্গীত সৃষ্টি করে, কারিগরি কাজ করে মানব-সমাজের বিরাট দৈনন্দিন জীবনযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করে, আরো নানাবিধ-ভাবে ব্যাপৃত করে নিজেকে, সেই হাতের সবরকম খেলার অন্তর্দেশে শিল্পমান দিয়ে খুঁজে পাওয়া যাবে "মানুষের আত্মশক্তির একটি ব্যাকুল ব্যঞ্জনা, একটি গভীর প্রকাশ-সামঞ্জস্য। তৃতীয় ছবিটি ইমেজ ভাইবিস-এর মধ্য দিয়ে দেখাবার চেষ্টা হয়েছে শিল্পের চোখে জীবনের কতকগুলো আপাত সাধারণ, পরস্পরবিচ্ছিন্ন কিন্তু ভিতরে-ভিতরে অর্থবহ সত্য। ডাঃ উইলিয়াম সিরৎস, যিনি লস এঞ্জেলস ফিল্ম মেকিং কো-অপারেটিভ-এর যুগ্ম পরিচালক তারই শিক্ষাধীনে কয়েকটি তরুণ বাঙালী চিত্রনির্মাতা এই যে ছবিকটি করেছেন তার মধ্যে এখনি কোন সম্পূর্ণ এবং পরিপুষ্ট ও মানসিক বয়োপ্রাপ্ত রূপ পেলাম না এ' কথাও যেমন সত্য, তেমনি এ কথাও অস্বীকার করবার নয় যে, এ'দের মধ্যে অনেকখানি সার্থক সম্ভাবনার অঙ্কুর নিহিত আছে। এইরকম বহু তরুণ তরুণী আজ সন্ধান করছে এই জাতীয় ছোট ছোট ছবি তৈরীর সুযোগ, যার মধ্য দিয়ে কেউ হয়ে উঠতে পারেন একদিন বিরাট কাহিনীচিত্রস্রষ্টা। কেউ মস্ত এক তথ্যচিত্র বা প্রামাণ্যচিত্রনির্মাতা। কিন্তু সেই সুযোগ ও সুবিধা দেবেন কে?

আমাদের দেশে এই ধরণের খণ্ডচিত্র-নির্মাণের আর এক মস্ত বড়ো বাধা সেসবের প্রদর্শনের সুযোগের একান্ত অভাব। ব্যবসায়িক প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সাধারণ চিত্রগৃহসমূহের মালিকরা এ সব ছবি দেখাতে সরাসরি অস্বীকার করেন, কেননা তার কোন ব্যবসাগত সম্ভাবনা নেই, তাদের দেখতে কেউ গাঁটের পয়সা খরচ করে আসবে না। সেটুকু সময় এই সব সাধারণ—চিত্রগৃহ কল্পিত করেন বা করতে পারেন।

শমিত ভঞ্জ ।। ফটো ঃ অমৃত
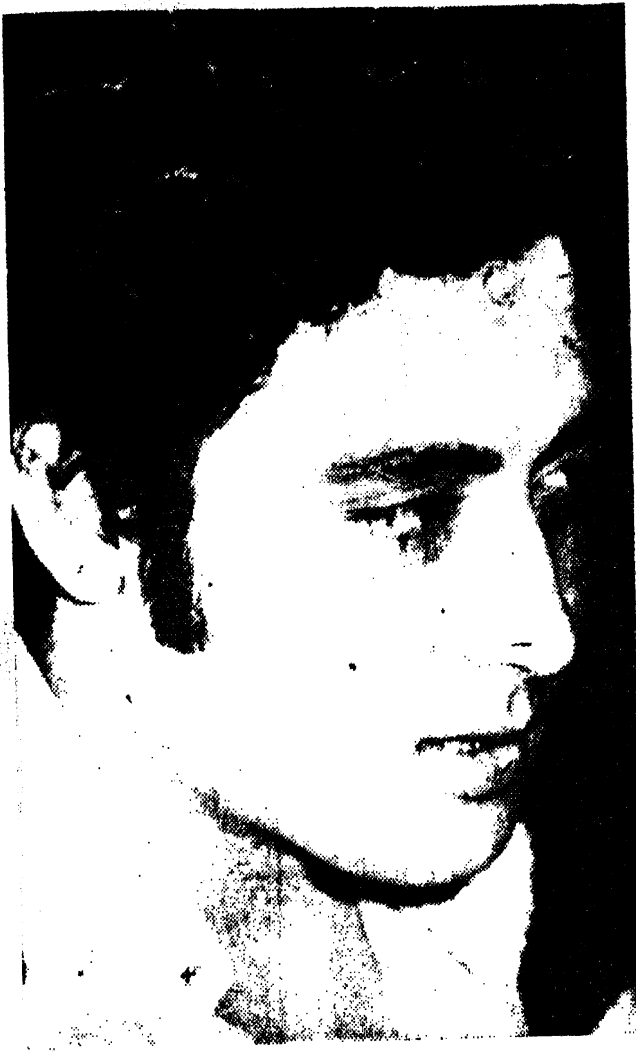
এই ধরণের খণ্ডচিত্র প্রদর্শনের জন্য তা নির্দিষ্ট করা আছে কেন্দ্রীয় ফিল্ম ডিভিশন বা প্রাদেশিক সরকারের নিজেদের তথ্যচিত্র দেখাবার জন্য, যার জন্য দেয় ভাড়াও নির্দিষ্ট করা আছে সরকারী পক্ষে। কাজেই এ সব ছবি দেখাবার একমাত্র স্থান হতে পারে আর্ট থিয়েটারে বা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ক্যাম্পাস-এ নির্মিত সিনেমাগৃহে। এদেশে যার কোনটারই এখনো পর্যন্ত কোন চিহ্নই দেখা যায় না। যে-কয়টি অতি-উৎসাহী শিল্পস্রষ্টা এই বিভাগে অল্পবিস্তর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে ফেলেছেন তাঁদেরও সর্বকর্ম পরিত্যাগ করে আজ ধর্ণা দিতে হয় কাজের জন্য সরকারী চলচ্চিত্র-বিভাগের কর্তাদের দুয়ারে, তাঁদের অনুগ্রহভিক্ষা লাভের জন্য পাত্র হাতে, তাকিত নয়নে। কয়েকটি বড়ো বড়ো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান (তাও অধিকাংশই বিদেশী) অবশ্য আজকাল এ-সব-ছবির কিছু কিছু করাচ্ছেন তাঁদের প্রচারকার্যে। তাঁরা পয়সাও অনেক ঢালছেন সরকারের তুলনায়। সেক্ষেত্রে চিত্রনির্মাতাদের ছবি তৈরীর সঙ্গে সঙ্গেই দায়িত্বমোচন হলো; কিন্তু এ রকম সুযোগই বা ক'জন পান, কতোখানি পান, যাতে অনুপ্রাণিত হয়ে এই অফুরন্ত সৃষ্টিমাধুর্যের সম্ভাবনাযুক্ত কর্মপথে তরুণ প্রতিভারা আসবেন।

এই অবস্থায় আজ আমাদের দেশে যা-কিছু চিত্রশিল্পসৃষ্টির প্রচেষ্টা চলছে তা স্বাভাবিকভাবেই পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কাহিনীচিত্র-নির্মাণের খাতে নিয়ন্ত্রিত। একথা গভীর দুঃখের কথা, গভীর সত্য কথা। দর্শক-সাধারণ অর্থব্যয় করে এ সব ছবির পৃষ্ঠপোষকতায় বিমুখ। সরকার বা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহেও খুব একটা খরচ করে এইসব চিত্রনির্মাণশিক্ষণব্যবস্থা প্রবর্তনে নারাজ। মুখে তাঁরা এই সব চিত্রের সার্থকতা, সমাজশিক্ষা ব্যাপারে বিরাট উপযোগিতা, এসব বিষয়েতে প্রচণ্ড উৎসাহী। তা নিয়ে লোকসভা বা বিধানসভাগৃহে বা জনসভায় উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা দিয়ে হাততালি কুড়োতেই কিন্তু তাঁদের উৎসাহ ফুরিয়ে যায়। তাই খণ্ডচিত্রনির্মাণশিল্প আমাদের দেশে আজো যে তিমিরে সেই তিমিরেই।

তাই মিঃ জন্ গ্রীয়ারসন-এর মতো বিখ্যাত চিত্রমনীষী পাশ্চাত্যের দেশসমূহের সরকার ও পাবলিক থিয়েটার-কে লক্ষ্য করে যে গভীর ক্ষোভের বাণী উচ্চারিত করেছিলেন, সেই ক্ষোভবাক্য আমাদের দেশের সরকার ও পাবলিক থিয়েটারসমূহের ক্ষেত্রে শতগুণ, সহস্রগুণ বেশী প্রযোজ্য। তাই গ্রীয়ারসনসাহেবের কণ্ঠে সুর মিলিয়ে আমাদেরও গভীর দুঃখের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হয় :

> Is it (the documentary film) being looked to by the theatres? Is it being looked to at all seriously vis-a-vis the great public audience in the great theatres which are at the heart of the matter in any discussion about national inspration?

তিনি বলতে চান : থিয়েটার (সিনেমা হাউস) গুলো কি ডকুমেণ্টারী ছবির দিকটা দেখছে? বিরাট জনসাধারণের দর্শক-সমাজপ্রমুখাৎ এ কর্তৃকে কি এতোটুকু গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে বড়ো বড়ো থিয়েটার হল-এ,—যে থিয়েটার হলগুলো জাতীয় প্রেরণাসম্পর্কিত যে-কোন আলোচনার ব্যাপারের মূল কথা?

এ প্রশ্নের জবাব দেবার লোক আমাদের এখানে নেই জানি। তবু সমালোচকের সত্তা নিয়ে বলতে চাই যে, এই জাতীয় তথ্য বা প্রামাণ্য বা রম্যচিত্র টিকেট-কেনা চিত্র-খরিদ্দারদের গলা দিয়ে জোর করে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা না করেও এই শিল্পের পুষ্টি-সাধন ও লোকপ্রিয়তাসাধন (অবশ্য নির্দিষ্ট গণ্ডীতে বা পাঠ্যাবস্থা থেকে) করা সম্ভব। কিন্তু জনমনের যে চিন্তা যে-চিন্তানায়কেরা চলচ্চিত্রশিল্পের এই বিরাট শিল্পভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে শিল্পের এই গভীররূপে অবহেলিত দিকটি কোলে তুলে নেবেন মায়ের মতো মমতায় সেই সব তিমিরবিদারী পুরুষসিংহরা কবে আবার আবির্ভূত হবেন আমাদের দেশে?

যতনে

অঞ্জলি চৌধুরী

দিন বদলেছে। এই দিন বদলের পালায় রুচিও পাল্টেছে। মানুষের শান্ত ও নিরুপদ্রব জীবন প্রতিনিয়ত কর্মজীবনের নিষ্ঠুর চাকায় নিষ্পেষিত। নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও শান্তি এটা স্বপ্নেরই সামিল। তবু মানুষ সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করতে চাইছে—তাই বোধহয় সুখ, সৌন্দর্য-সৃষ্টির এই প্রয়াস।

সভ্যতার উন্মেষকাল থেকে মানুষ সৌন্দর্যের উপাসক। এই সৌন্দর্যের তাড়নায় গুহাবাসী আদিম মানুষ একসময় হয়তো পাহাড় কুঁদে ছবি এঁকেছিল। অবশ্য তাদের এসথেটিক কোন চেতনা ছিল না বলে অনেকেই অনুমান করেন। কিন্তু যে শিশু জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির রং-এ আত্মহারা হয়, নিজের রং-তুলিতে তার রূপ দিতে চেষ্টা করে, যে শিশু সকালে চোখ খুলেই তার বিছানা গুছিয়ে রাখতে চেষ্টা করে, যে বেড়িয়ে ফিরলে জুতোজোড়া সাজিয়ে রাখে, খেলার পুতুলে রং মিলিয়ে পোশাক পরায়, তা নিশ্চয়ই সৌন্দর্যের প্রতি ভালবাসা—অন্তরের তাগিদ।

বর্তমান মানুষ যন্ত্রের হাতে ক্রীড়নক, তাই তাদের নাড়ীর স্পন্দন এত দ্রুত। ট্রামে-বাসের অশান্ত ঘড়ঘড়ানী মানুষের নিত্যসঙ্গী। শব্দমুখর পথ-ঘাটের কোলাহল মানুষকে ক্লান্ত, অবসন্ন করে তোলে। এই ক্লান্তি, শ্রান্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে চাই গৃহ। সেজন্যই বাড়ীর পরিবেশকে নিয়ে আমরা এত ভাবি। একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাড়ীর জন্য আমরা সবাই লালায়িত। সুন্দর পরিবেশ শারীরিক, মানসিক অবসন্নতা দূর করে। গৃহকোণে একগুচ্ছ রজনীগন্ধার উপস্থিতি নয়ন, মনকে আরাম ও আনন্দ দেয়। অথচ ফুলের সৌন্দর্য জানা সত্বেও অত দাম দিয়ে সে ফুলে ঘর সাজানো অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে সবুজ পাতার ডাল ছোট-বড় করে কেটে ফুলদানীতে গুছিয়ে রাখলে ফুলের অপূর্ণতা অনেকটা মেটানো যায়। সবুজ পাতা বা ফুল (সাদা বা হরেক রং-এর) যাই হোক সেটাকে এমনভাবে রাখতে হবে যা অন্ততঃ সরাসরি চোখের সামনে থেকে তৃপ্তি দিতে পারে।

আজকের বাসস্থান সঙ্কটে যারা বিব্রত নন তারা নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যশালী। এই সৌভাগ্যশালীদের অনেকেই জায়গার স্বচ্ছলতাকে ভরাট করতে চান অতিরিক্ত সোফা, সোফা-কাম বেড, নয়তো ডিভ্যান দিয়ে। তাতে শূন্য স্থান হয়তো জমজমাট-ভাবে পূর্ণ হয় কিন্তু চোখের পীড়ার কারণ হ'য়ে থাকে। সেখানে অত ঘন ক'রে আসবাবপত্র পূর্ণ না ক'রে ফাঁকা জায়গাটার একটু ছিরিছাঁদ ফেরানো যায়। ধরুন একটা মানি প্লান্ট ফুলদানীতে, না থাকে তো সুন্দর রং-এর একটা কাঁচের বোতলে রেখে হালকা সুতো দিয়ে গাছের ডগার সঙ্গে ওপরে বেঁধে দিন। দেওয়ালের রং-এর সঙ্গে সুতোর রং-এর যাতে সাদৃশ্য থাকে সেদিকে নজরটা একটু সজাগ থাকাই বাঞ্ছনীয়। নয়তো সবুজ গাছে সাদা বা হলুদ সুতো শুধু বেমানান নয় অশোভন। মানি প্ল্যান্টের অসাক্ষাতে ফুল রাখলেও সেই একই শোভা। কাঁচের বোতলটা যদি ফাঁকা মনে হয় তবে ঘরের রং, গাছের রং-এর সঙ্গে মিল রেখে ভেবেচিন্তেই হোক বা খেয়ালখুশী মত হোক খানকতক রঙীন মার্বেল পেপার টুকরো টুকরো করে কেটে আঠা দিয়ে বোতলের গায় আটকে দিতে হবে। তাতে সুন্দর ফুলদানীর অভাব পূরণ হবে। এবার বোতলটাকে কাশ্মিরী টুল নয়তো টেবিল ক্লথ ঢাকা ছোট কাঠের বাক্সের ওপর রাখতে হবে। টুলের পায়া ঘিরে একটু গোল বা চৌক আলপনা দিন। আলপনা দেবার জন্য সকলকেই আর্টিস্ট হবার দরকার নেই। আলপনা যত সোজা, সরল হয় ততই ভাল। তাছাড়া আমাদের চোখের সামনে ডিজাইনের ছড়াছড়ি। বিয়ের কার্ড ছাড়া নানাবিধ উৎসবের কার্ডেও আলপনার প্রচুর চলন রয়েছে, তার থেকে নিজের পছন্দমত একটু আধটু বেছে নিলেই ইচ্ছেটাকে কার্যকরী করা চলে। আমাদের দেশে মানিপ্ল্যান্টের চলনে নতুনত্ব কিছু নেই। কিন্তু মানিপ্ল্যান্ট শুধুমাত্র ঝুলিয়ে সাজানো যায় না, ফুলদানীতেই সাজিয়ে তার সঙ্গে একটু আলপনা দিলেই তার রূপ স্বতন্ত্র। আলপনার যে বৈশিষ্ট্য তার সামান্যতম প্রয়োগেই যে কোন স্থান রমণীয় হ'য়ে ওঠে। একারণেই বোধহয় গ্রাম্য সাঁওতালদের বাসগৃহ এত সুন্দর আর আকর্ষণীয়। ওদের খড়ে ছাওয়া মাটির ঘরে দামী জিনিসের প্রাচুর্য নেই। শহুরে লোকেদের ঘর সাজাবার আধুনিক পদ্ধতিও ওদের জানা নেই, নেই আর্থিক সঙ্গতি। জানা নাইবা থাকল ওদের দেওয়ালের সাদা আলপনা নয়তো দু'তিন রঙা আলপনার যে শান্ত শ্রী তা বোধহয় ঐ খড়ে ছাওয়া কুঁড়ে ঘরের একান্ত নিজস্ব।

বাংলার লোকশিল্পের অবদান এতদিনে আমরা বুঝতে শিখেছি, তার শিল্পমূল্যও দিতে শিখেছি। জনৈক আধুনিক ভদ্রলোকের বাড়ীতে ঢুকে মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলাম। সেখানে দামী দামী আসবাবের সমারোহ নেই। দেওয়ালে বিভিন্ন কালীঘাটের পট—যে জায়গায় যেমনটি দিলে
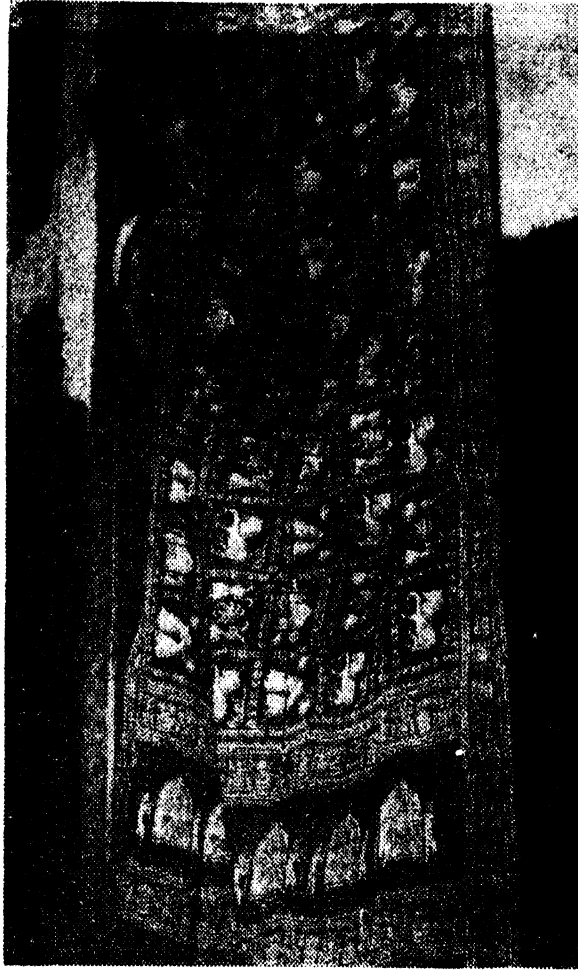
মানায় সেই রং, সেই আকারের পট সাজানো। বসার জন্য বিছানো হয়েছে একটা মাদুর, তার ওপরে কারুকার্য করা ছোট একটা কার্পেট। বাংলার লোকশিল্পের সুন্দর সমাদর ও সুষ্ঠু বণ্টনের দিন ফিরে এসেছে তাই দেখি কোষা-কুষি দিয়ে ঘর সাজাবার প্রচেষ্টা।

মঙ্গলঘট যেটা না হ'লে আমাদের উৎসবের মাঙ্গলিকের শঙ্খ বাজে না, উলুধ্বনি ওঠে না—গৃহসজ্জায় তার আয়োজনই কত। তামার তৈরি মঙ্গলঘট শো-কেসে, ঘরের কোণে অথবা তাকের মাথায় সাজিয়ে ঘর সাজাবার নতুনত্বের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। বিশেষ ক'রে যারা ভারতের বাইরে আছেন তাঁদের মধ্যে এ জিনিসটার বেশ রেওয়াজ আছে। আমার এক বান্ধবী মাস-কয়েক আগে কানাডা থেকে ভারতে এসে যে সমস্ত জিনিস কিনেছিল তার মধ্যে তামা, পিতল, কাঁসার জিনিসের ভূমিকাটাই বেশী। আমি হাসতে হাসতে বলেছিলাম, 'ও দেশে সাজাবার বিচিত্র জিনিস থাকতে তুমি এসব ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছো যে?' সব শুনে বান্ধবীটি মহা উৎসাহে বললো, 'এ জিনিসের কাছে এখানের অনেক জিনিসই খেলো মনে হয়। এর আভিজাত্য আর বনেদীয়ানার তুলনা কোথায়! আমার তো মনে হয় এখানকার জিনিস নিয়ে ওখানে যত সাজাতে পারবো, ওদের কাছে এ জিনিসটার মূল্য তত বেড়ে যাবে। অথচ ভারতের লোকেরা এগুলোর কিন্তু তেমন ব্যবহার করেনা।'

আমি বিদেশের বান্ধবীর কথা মানতে রাজী নই। রুচিবান লোকেদের ঘর সাজাবার উপকরণ তো পিতল, কাঁসা, তামার নিত্যব্যবহার্য জিনিস থেকে শুরু করে—নানারকম পশুপাখী, মূর্তি, বাতিদান ইত্যাদি।

পুতুল, যেটা অনেক সময় ছোটদের খেলার সঙ্গী হিসেবে আমরা সোহাগে দু'চার পয়সা অথবা বেশ দামে ওদের হাতে উপহার দিয়ে থাকি সেটা আমাদের গৃহসজ্জার কতবড় উপকরণ মোটামুটি অনেক বাড়ীতেই নজরে পড়ে। আধুনিক রুচির
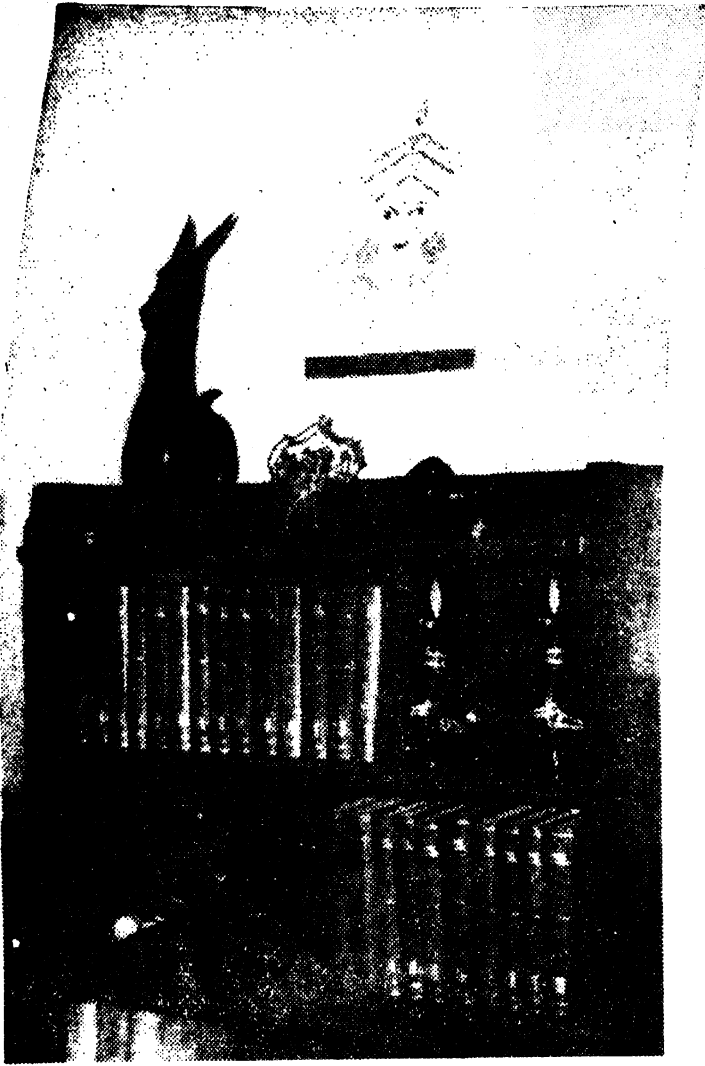
বাড়ীতে কাঁচ দিয়ে ঢাকা ছোট্ট তাক অথবা পুতুল সাজাবার বিশেষভাবে তৈরী সেলফ দেখা যায়। নবদ্বীপের কাঠের পুতুল, বাঁকুড়ার ঘোড়া, মাদ্রাজের ড্যানসিং ডল, মণিপুরী লোকনৃত্যের ঢং-এ পুতুল, কৃষ্ণনগরের বিভিন্ন অভিব্যক্তির মূর্তি একান্ত স্থানীয়, দেশজ রূপটি নিয়ে দর্শককে আনন্দ দেয়। এদের গায়ের বিভিন্ন রং-এর ছোপ ছাপ ঘরটিকে উজ্জ্বল করে তোলে। সেকারণেই দেখেন মেলাসরাই, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ-এর স্টেশনে ট্রেনের কামরায় বসে হাত বাড়ালে যে অপূর্ব পুতুল, ঘোড়ার গাড়ী কিনতে পারি তা দিয়ে ছোটদের খুশী করার চেয়ে ঘর সাজাতে বোধহয় আমরা বেশী আগ্রহী। তাছাড়া সোলা আর কুলো বাড়ী সজ্জার প্রধান দুই উপকরণ। যে কোন স্টল, দোকানঘর বা প্রদর্শনী, পুজো-মণ্ডপ সাজাবার জন্য সোলার চাহিদা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে।

এরপর ঘরের পর্দা, সোফার ঢাকা এগুলোকে সাজাবার দায়িত্বও আমাদের। সোফা দিয়ে ঘর সাজানো যদিও ব্যয়সাপেক্ষ তবুও বর্তমান যুগে সোফাবিহীন ঘর সাজানোর কথা কল্পনাও করতে পারি না। কল্পনা না করতে পারলেও অনেকের ক্ষেত্রে সোফা ছাড়াই ঘর সাজাতে হয়। অবশ্য দামী সোফার অপূর্ণতা তারা পূরণ করেন হয়তো কাঠের বড় প্যাকিং-বাক্সে। পুরনো কাপড় আর তুলো দিয়ে গদি তৈরী ক'রে তার ওপর পর্দার ভারী কাপড় দিয়ে সোফার শ্রীতেই প্রয়োজন মেটানো যায়। কাঠের বাকস্ না থাকে তো ক্ষতি একটা সাধারণ একরঙা চাদর চারপাশ ভাল করে ঢেকে তার ওপর একটা ফ বিছিয়ে দিলেই যথেষ্ট। শোবার ঘ চৌকিকে এভাবে সাজাতে পারলে প্রয়োজ বোধে অতিথি-অভ্যাগতকেও সেখা আপ্যায়ন করা চলে। জিনিস যাই থাকু সুরুচি ও সাজাবার বাসনাটা অন্তরের সহজাত প্রবৃত্তি।

পর্দার বেলায়ও সেই একই কথা বলা চলে। আধপুরনো হালকা রং-এর ছাপার শাড়ী দিয়ে বসার ঘরের পর্দা অনায়াসেই তৈরি করা যায়। যেখানে সকলেরই প্রবেশের অধিকার আছে সেখানে পাতলা পর্দাতে আপত্তির কিই-বা থাকতে পারে! শোবার ঘরে অবশ্য ভারী পর্দা লাগানোই শোভনীয়। পরিষ্কার, পরিপাটি রং নির্বাচন এগুলোই পর্দার শোভা বাড়ায়। পর্দা তৈরীর সময় নিখুঁত ওজনে কাপড় না নিয়ে মাপের চেয়ে একটু বেশী নিয়ে বাড়তি কাপড়টুকু ওপর থেকে সামনের দিকে কুঁচি দিয়ে ঝুলিয়ে দিতে হবে। তাতে পর্দার গতানুগতিক চেহারায় নতুনত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে। দামী পর্দার বেলায়ও জবরজং বিরাট বিরাট ছাপ ঘরের শোভা মোটেই বাড়ায় না। যে জিনিস মূল্য জাহির করে, শ্রী আর সৌন্দর্য বাড়ায় না তেমনি জিনিসে আমাদের প্রয়োজন কি?

ঘরে ক্যালেণ্ডার দু'একখানাই যথেষ্ট। রুচিবান সৌখীন লোকের ঘরেও সুন্দর ব'লে খানকতক ক্যালেণ্ডার ঝোলাতে দেখেছি। ভাল ছবি সংগ্রহ করে রাখলেই বোধহয় তার যথার্থ মূল্যায়ন হয়। ছবি টাঙাবার সময় তা ইলিউশন সৃষ্টি করে কিনা লক্ষ্য রাখতে হবে। স্বল্প আলো ঘরে ক্লান্ত চোখ যখন একটু নির্মল আকাশের সন্ধানে ফেরে তখন ছবির নীল আকাশ, ঝকঝকে আলো প্রকৃতির স্পর্শ দিতে পারে। যে ঘরে আলো সামান্য তার ছবির রং উজ্জ্বল হওয়া একান্তই দরকার। আলো ঝলমলে ঘরে ঘন, গভীর রং-এর ছবি টাঙালেও কোন অসুবিধা নেই।

ঘর সাজাবার পরিপার্শ্বকে সাজাবার, নিজেকে সাজাবার চিরন্তন বাসনা নিয়েই মানুষের জন্ম। বিশেষ করে মেয়েরা—ঘরই যাদের বেশীক্ষণের সঙ্গী—তারা ঘরকে, বাড়ীকে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সাজাতে চেষ্টা করে। অগোছালো, নোংরা ঘরদোর মানুষের বিকৃত রুচির কথাই ঘোষণা করে। জীবনধারণের জন্য যেমন আলো, হাওয়া, জল দরকার তেমনি বাঁচার মত বাঁচতে গেলে শান্ত, সুষ্ঠু, সুশ্রী, পরিবেশ সকলেরই কাম্য।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

১২শ বর্ষ
৩য় খণ্ড

৩৫ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক—২ পয়সা
মোট—৫২ পয়সা

Friday, 5th January, 1973 শুক্রবার, ২১ পৌষ, ১৩৭৯ .52 Paise

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৭০৮	এক নজরে		—শ্রীপ্রত্যক্ষদর্শী
৭০৯	সম্পাদকীয়		
৭১০	দেশেবিদেশে		—শ্রীপুণ্ডরীক
৭১৩	চলো বিধাননগর		—শ্রীদিলীপ মালাকার
৭১৬	পুনশ্চ		—শ্রীক্ষপণক
৭১৭	আত্মজার মুখ	(গল্প)	—শ্রীবীরেন্দ্র দত্ত
৭২১	ফুলের উৎসবে উৎসবের ফুল		—শ্রীগৌরাঙ্গ ভৌমিক
৭২৬	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		—শ্রীঅভয়ংকর
৭৩১	বাংলাদেশের গ্রন্থমেলায়		—শ্রীলোকনাথ ভট্টাচার্য
৭৩৩	বাড়ি	(উপন্যাস)	—শ্রীদেবল দেববর্মা
৭৩৭	অর্থনৈতিক সমীক্ষা : টাকার দাম		—শ্রীশান্তিলাল মুখোপাধ্যায়
৭৪০	পশ্চিমবঙ্গে ভ্রমণ		—শ্রীমনোজিৎ বসু
৭৪৯	ফুল ফোটার আগে	(উপন্যাস)	—শ্রীশৈলেন রায়
৭৫৪	চিঠিপত্র		
৭৫৫	বিজ্ঞানের কথা		—শ্রীঅয়স্কান্ত
৭৫৯	সম্মোহন বৈচিত্র্য		—শ্রীনন্দদুলাল পাল
৭৬০	দূষিত পরিবেশ		—শ্রীঅলোক সেন
৭৬২	প্রতিদ্বন্দ্বী নিজের পোশাকে	(কবিতা)	—শ্রীকৃষ্ণ ধর
৭৬২	চোখ	(কবিতা)	—সামসুল হক
৭৬২	বিক্ষোভ	(কবিতা)	—শ্রীআইভি রাহা
৭৬৩	গঙ্গা	(গল্প)	—শ্রীবেবী আনওয়ার
৭৬৬	অঙ্গনা		—শ্রীপ্রমীলা
৭৬৮	রমা গুহঠাকুরতা : সংলাপ মুহূর্তে		শ্রীসন্ধ্যা সেন
৭৭৫	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
৭৮৩	খেলাধুলা		—শ্রীদর্শক

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্য প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।
২। ভি-পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে অমৃত কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা		মফঃস্বল	
বার্ষিক	টাকা	২৫·০০	টাকা	৩০·০০
ষাণ্মাষিক	টাকা	১২·৫০	টাকা	১৫·৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৬·২৫	টাকা	৮·০০

বিঃ দ্রঃ—উৎপাদন শুল্কের হার
(চাঁদার সহিত অবশ্য প্রেরণীয়)

বার্ষিক	টাকা	১·০২
ষাণ্মাষিক	টাকা	০·৫২
ত্রৈমাসিক	টাকা	০·২৬

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

অমূল্য মদিরা : লণ্ডন শহরে গত নভেম্বর মাসের একুশ তারিখে ৪,৬৬১ পাউণ্ড মূল্যে এক বোতল পুরনো মদ বিক্রী হল, ভারতীয় মুদ্রার হিসাবে যার দাম হবে ৮৮ হাজার টাকার কিছু বেশী। ইতিপূর্বে এত দামে এক বোতল মদ কখনও লণ্ডন, প্যারিস বা লস এঞ্জেলসের নীলামে বিক্রী হয় নি। ১৮৭০ সালে রথসচাইল্ডদের তৈরী ঐ মদ ও মদের বোতল দুই নাকি হাতে তৈরী করা। ঐ ধরনের মদের বোতল আর একটিই আছে পৃথিবীতে। প্রায় ৬০০ বোতল বিভিন্ন সময়ের ও ভিন্নতর মানের মদ ঐ দিন লণ্ডনের বণ্ড স্ট্রীটস্থ সোথেবির বিখ্যাত নীলাম কেন্দ্র থেকে বিক্রী হয়। কিন্তু নীলামে ডাক চলে একসঙ্গে লণ্ডন, প্যারিস ও লস এঞ্জেলস শহরে। ক্রেতাদের মধ্যে টেলিফোনের সাহায্যে সংযোগ রক্ষা করা হয় এবং তিন কেন্দ্রে যিনি সর্বোচ্চ ডাক দেন তিনি তাঁর ঈপ্সিত বস্তুটি লাভ করেন। উল্লেখিত নতুন বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টিকারী দামটি দেন মারিও রুসপোলি নামে এক মদিরা রসিক। ঐ দিন নীলামে মোট ৩৮,০৭১ পাউণ্ড মূল্যের পুরনো মদ বিক্রয় হয়।

ওরা চলে গেল : গ্রীক, পারশিক, শক-হুন-পাঠান-মোগলের মতো ওরাও একদিন অনাহূত হয়েই এদেশে এসেছিল এবং এদেশের মাটিতে আশ্রয় পেতে তাদেরও কোন অসুবিধা হয়নি। স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ব ধর্মসভায় ভারতের শাশ্বত আতিথেয়তা ও ঔদার্যের কথা বলতে গিয়ে ওদের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন। বলেছিলেন, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষের দিকে ইহুদিরা যখন স্বদেশেই নিরাশ্রয় হয়, রোমানদের পীড়নে নিরুপায় হয়ে দেশ ছেড়ে ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর চারিদিকে তখন ভারতই ওদের আশ্রয় দিয়েছিল অসঙ্কোচে, সাগ্রহে। সে আতিথ্য তারা গ্রহণ করেছিল সকৃতজ্ঞচিত্তে। ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে ওদের বসতি গড়ে উঠেছিল। কিন্তু শক-হুন-পাঠান-মোগলদের ভারত আগমনের সঙ্গে ওদের ভারত আগমনের ব্যাপারে একটা পার্থক্য বরাবরই ছিল, এবং সে পার্থক্য সম্বন্ধে ওরাই ছিল সবচেয়ে বেশি সচেতন। এই ভারতের মহামানবের সাগরে একদেহে লীন হতে ওরা আসেনি। উনিশ শ বছর ধরে ওরা একথা কখনও ভোলেনি যে, ওরা এদেশের অতিথি, এটা ওদের স্থায়ী বাসভূমি নয়। ওদের 'প্রতিশ্রুত ভূমি' ইজরেইল ওরা আবার একদিন ফিরে পাবেই এবং সেদিন একবারের জন্যও পিছু ফিরে না তাকিয়ে ওরা স্বগৃহে ফিরে যাবে। তারপর বিগত দুই সহস্রাব্দে কত ঝড়ঝঞ্ঝা এসেছে ওদের জীবনে, দেশে দেশে লক্ষ লক্ষ ইহুদির প্রাণবলি হয়েছে, কিন্তু ওরা ওদের বিশ্বাস থেকে এতটুকুও টলেনি, একবারের জন্যও ভাবেনি যে ওদের দেশ ওরা আর ফিরে পাবে না। আর শেষ পর্যন্ত যখন ওদের বিশ্বাসেরই জয় হল, প্রতিষ্ঠিত হল ইহুদি রাষ্ট্র ইজরেইল তখনই শীতের পাখিদের মতো ওদের ঝাঁকে ঝাঁকে ঘরে ফেরা শুরু হল।

কোচিন থেকে কদিন আগে প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ, ৭০ খৃষ্টাব্দে যেসব ইহুদি কোচিনে এসে বসতি স্থাপন করেছিল, তিন দশক আগে তাদের সংখ্যা ১০,০০০ পেরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন সেখানে মাত্র পনেরটি ইহুদি পরিবার পড়ে আছে এবং তাদের মোট সংখ্যা ২৫০ জনের বেশি হবে না। ... সম্প্রদায়ের নেতা শ্রী এস এস কোডার বলেছেন, ইজরেইল রা[ষ্ট্র] প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই ওদের দলে দলে দেশত্যাগ শু[রু] হয়। ছেলেরাই প্রথমে যায়, তারপর মেয়েদেরও না গিয়ে উপা[য়] থাকে না। আজ যারা পড়ে আছে তাদেরও না চলে গিয়ে উপা[য়] নেই, কারণ তাদের ছেলেমেয়েদের বিয়ে হওয়াই এখন সবচে[য়ে] কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইহুদিদের প্রতিষ্ঠিত মালা গ্রা[মে] আজ একজন ইহুদিও বাস করে না তাই সেখানকার সিনা[গগের] সমাধিক্ষেত্র প্রভৃতির দায়িত্ব স্থানীয় পঞ্চায়েৎকে নিতে হয়েছে। কোচিন ও তার নিকটবর্তী চেনামঙ্গলমের সিনাগগের দরজা চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে, কারণ উপাসনা ভবনগুলি[র] দায়িত্ব নেওয়ার মত কোন যাজক আর সেখানে নেই।

●

ইউরোপ আমেরিকার ধনাঢ্য মহল আজ পাগল হয়ে উঠেছে এক চতুর্দশবর্ষীয় বালকগুরু—গুরু মহারাজজির ভক্তিপ্রেমে। মোটামুটি হিসাবে গুরু মহারাজজির লণ্ডনে ভক্তের সংখ্যা ৬০০০, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ৫০০০ আর আমেরিকায় ৩০,০০০। তারা সকলেই উচ্চশিক্ষিত ও সমৃদ্ধ ঘরের ছেলে এবং সকলেই সম্মানজনক বৃত্তিতে নিযুক্ত আর প্রায় সকলেই যুবক ও যুবতী। গুরু মহারাজজির জন্য তারা পাগল; এই মহাবিশ্বের প্রতি অণু পরমাণু গুরুজির নিয়ন্ত্রণে—এ বিষয়ে তাদের মনে কোন সন্দেহ নেই; গুরুজির দর্শন পেলে বা তাঁর চরণারবিন্দ স্পর্শের সুযোগ পেলে তারা নবজীবন লাভের আনন্দ ও শিহরণ অনুভব করে। গুরুজি যে ভগবান কৃষ্ণ যীশুর বিভূতির উত্তরাধিকারী! ইউরোপ আমেরিকা থেকে যে অনায়ে তিন হাজার শ্বেতাঙ্গ শিষ্যশিষ্যা জাম্বো জেট বিমান ভাড়া করে আসছে ভারতে, তাদের একমাত্র আনন্দ যে একটানা তিনদিন তারা ঐ বালমুকুন্দর চরণতলে বসে তার দর্শনে নয়ন ও বাণীতে শ্রবণ সার্থক করতে পারছে।

ইউরোপীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত, গোলগাল ও মাখনের মত নরম, চতুর্দশবর্ষীয় বালক গুরু মহারাজজি আর এক গুরু সৎগুরুদেব শ্রীহংস মহারাজজির পুত্র এবং তাঁর কাছেই দীক্ষিত। মাত্র দু' বছর বয়সে ঐ বালকের বিভূতির প্রকাশ পায় এবং ছ' বছর বয়সে বালক সুন্দর পরিচ্ছন্ন ইংরেজিতে এক তত্ত্ব সমৃদ্ধ ভাষণ দিয়ে সকলকে চমৎকৃত করে। আজ চতুর্দশ বর্ষ বয়সে ঐ বালক শতসহস্র ভক্তকে একটানা কয়েকঘণ্টা ধরে ভাষণ দিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। বালক গুরুর প্রায় সবটুকু সময় এখন বিশ্বময় ভক্তদের মাঝে ঘুরে ঘুরেই কেটে যায়। তার সংগঠনের নাম 'ডিভাইন লাইট মিশন', শিষ্যদের দেওয়া একটি রোলস রইস গাড়িতে চড়ে গুরু আশ্রমে আশ্রমে ঘুরে বেড়ান। ঐ আন্তর্জাতিক সংস্থাটির সাপ্তাহিক মুখপত্র 'দি ডিভাইন টাইমস' পত্রিকায় নিয়মিত গুরুজির বাণী ও ঐশ্বরিক লীলার কথা প্রচারিত হয়। বালক গুরু এখন বিশ্বগুরুর মর্যাদায় উন্নীত।

— প্রত্যক্ষদর্শী

নববর্ষের শুভ সূচনা

একটি বৎসর অতিক্রান্ত। আমরা প্রতিশ্রুতিময় সত্তরের দশকের আরেকটি বৎসরে পদার্পণ করলাম। বাহাত্তর সালে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে। বিগত কয়েক বৎসরের দ্বিধা সংশয় এবং অস্থিরতা কাটিয়ে ভারতবর্ষ তার পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের বনিয়াদকে আরও মজবুত করেছে। পশ্চিম বাংলায় দুঃখনিশার অবসান ঘটিয়ে এ রাজ্যে স্থায়ী প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করে বৃহৎ ভারতবর্ষের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে চলেছে তার লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্য। প্রতিবেশী বাংলাদেশ তার স্বাধীনতার প্রথম বার্ষিকী উদ্‌যাপন করেছে ডিসেম্বরে। এই মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতবর্ষের ভূমিকা ছিল উজ্জ্বল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রীর উজ্জ্বল ও অক্ষয় ভিত্তি আজ সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত।

বৎসরের শেষ সপ্তাহে আমাদের বাংলায়, কলকাতা শহরে জাতীয় কংগ্রেসের ৭৪তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। বাংলায় গত কয়বছর যে রাজনৈতিক অস্থিরতা ছিল এবং কংগ্রেসের সাংগঠনিক দুর্বলতা যে স্তরে গিয়ে পৌঁছেছিল তাতে কেউ আশা করতে পারে নি এত স্বল্প সময়ের মধ্যে এই রাজ্যে কংগ্রেস আবার তার হৃতমর্যাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। প্রধানমন্ত্রী এই গৌরবের অধিকারী করেছেন বাংলার যুবসমাজকে এবং বাংলার সাধারণ মানুষের সুস্থ রাজনৈতিক বুদ্ধিকে। তাদের জন্যই বাংলায় রাজনৈতিক স্থায়িত্ব এসেছে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজবাদের কর্মসূচী রূপায়ণের কাজে গোটা জাতি হয়েছে ঐক্যবদ্ধ। কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ শঙ্করদয়াল শর্মার ভাষণও বিশেষ তাৎপর্যময়। কংগ্রেসের মধ্যে যে সংকল্প ও প্রত্যয় ফিরে এসেছে নতুন উদ্দীপনায় সভাপতির ভাষণে তা সুস্পষ্ট। একথা ঠিক যে, পঁচিশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও বৃহৎ জনসমাজের অনেক সমস্যা এখনো সমাধান করা যায় নি। কিন্তু ধাপে ধাপে এবং প্রগতিশীল কর্মসূচী অনুযায়ী সেই সমস্যার মোকাবিলা করার যে চেষ্টা হচ্ছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। পুঁজিবাদী চিন্তাধারার জট থেকে মুক্ত করে শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসকে একটি গতিশীল এবং সমাজতান্ত্রিক গণসংগঠনে পরিণত করা হয়েছে। বৃহৎ দল বলেই তার মধ্যে নানা ধরনের লোক সহজে অনুপ্রবেশ করার সুযোগও পায়। প্রগতিশীল কর্মপদ্ধতি গ্রহণ ও রূপায়ণের পথে তারা যথাসময় বাধা সৃষ্টি করে। কংগ্রেস সভাপতি এই অপশক্তির বিরুদ্ধে জোরালো ভাষায় হুঁশিয়ারী দিয়েছেন এবং তাদের প্রতিকূলতা রোধের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন কংগ্রেসকর্মীদের।

ভারতের মতো বৃহৎ জনসমষ্টির দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ভূমি সংস্কার ও শিল্পসমৃদ্ধির অর্থপূর্ণ কার্যসূচী রূপায়ণ ত্বরান্বিত করা ছাড়া কোনো বিকল্প পথ নেই। অনেক পুঁজিবাদী দেশেও পরোক্ষভাবে সমাজতান্ত্রিক চিন্তা কার্যে রূপায়ণের মনোভাব দেখা দিয়েছে। আমাদের মতো দরিদ্র দেশে সামাজিক অসংগতি দূর করার জন্য ন্যায়নীতি ও সাম্যের ভিত্তিতে কার্যসূচী অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। সেদিকেই আজ কংগ্রেসের দৃষ্টি নিবদ্ধ। সামাজিক কুসংস্কার এবং অশিক্ষা দূর করতে না পারলে এই বৃহৎ ও পবিত্র কর্মযজ্ঞে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ অর্থহীন হয়ে পড়ে। স্থিতস্বার্থের শক্তি, কায়েমী উপস্বত্বভোগী শ্রেণী এবং পুঁজিবাদী চিন্তাধারায় আচ্ছন্ন আমলাতন্ত্রের দ্বারা দেশে সমাজতান্ত্রিক কার্যসূচী রূপায়ণ যে কত কঠিন তা নেতারা এখন ভালভাবেই উপলব্ধি করছেন। সে কারণেই কংগ্রেস সভাপতি তাঁর সংগঠনকর্মীদের এবং সমাজতন্ত্রে উদ্বুদ্ধ জনগণকে এই দুরূহ কার্যসূচী রূপায়ণে প্রত্যক্ষ অংশীদার হবার আহ্বান জানিয়েছেন। যত দিন যাচ্ছে জনগণের সংকল্পও হচ্ছে ততই দৃঢ়। কিন্তু সরকারী শৈথিল্য এবং নানা স্তরে কর্তব্য অবহেলা ও অনাচারের দরুন জনসাধারণের প্রাপ্য বস্তু নাগালের বাইরেই থেকে যাচ্ছে। পুঁজিবাদী, মুনাফাখোরদের চক্রান্ত এখনও ভাঙা সম্ভব হয় নি। তাই দ্রব্যমূল্য বেড়েই চলেছে। এর জন্য সাধারণ মানুষের দুর্গতি ও দুর্দশার অন্ত নেই। বস্তুত, এটাই হল সমস্ত হতাশার মূল।

সত্তরের দশকে আমরা পুরোপুরি খাদ্যে স্বয়ম্ভর হব এবং সকল মানুষকে মোটা ভাত-কাপড় দিতে পারব এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে পঞ্চম যোজনার কাজ শুরু হবে। নতুন বৎসরে সেই প্রত্যাশাই আমরা নতুন করে তুলে ধরতে চাই জনসাধারণের কাছে 'গরিবী হটাও' ধ্বনি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। গরিবীই হল সবচেয়ে বড় পাপ। এই পাপ দূর করার জন্য জাতীয় কংগ্রেসের বিধাননগর অধিবেশন নতুন করে যে সংকল্প ঘোষণা করেছেন তা সার্থক হোক, নববর্ষের এই শুভেচ্ছাই জানাই। আরও নিষ্ঠা, আরও শ্রম এবং আরও সততায় ঘোষিত কার্যসূচী রূপায়িত হোক এবং দেশের বুভুক্ষু কোটি কোটি মানুষের জীবনে তা নিয়ে আসুক প্রসন্নতার আশীর্বাদ।

দেশে বিদেশে

১৯৭২ সাল শেষ হয়ে যখন ১৯৭৩ সাল শুরু হতে চলল ঠিক সেই সংক্রান্তির ক্ষণেই ইন্দোচীনে শান্তির আশা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, এই একটি মাত্র ঘটনার দ্বারাই বিদায়ী বছরটি 'হতাশার বৎসর' হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। সম্ভবত এই শতাব্দীতে মানুষের শেষ চন্দ্রযাত্রা সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত করে যেদিন আমেরিকান নভশ্চররা পৃথিবীর বুকে ফিরে এলেন ঠিক সেদিনই মার্কিন বোমারু বিমানগুলি প্রচণ্ড পরাক্রমে ইতিহাসের ভীষণতম বোমাবর্ষণ করতে আরম্ভ করল ক্ষুদ্র উত্তর ভিয়েতনামের উপর. এই একটি তাৎপর্যপূর্ণ যোগাযোগের মধ্যে ১৯৭২ সাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে একই সঙ্গে মানুষের সাফল্য ও ব্যর্থতার বৎসর হিসাবে।•

অথচ বিদায়ী এই বৎসরের সূচনা হয়েছিল গভীর আশা নিয়ে। ঘটনার স্রোত এই বছর এমনভাবে বয়েছে যাতে মনে হচ্ছিল, দীর্ঘকাল বাদে মানুষ বুঝি পুরান বিরোধ ও বিবাদ ভুলে বিশ্বশান্তির একটি নির্ভরযোগ্য ভিত্তি খুঁজে পেতে চলেছে। ১৯৭২ সালে বিশ্বশান্তির ঐ আশার বৃহত্তম প্রতীক হয়ে উঠেছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিকসনের চীন সফর। ঐ সফরের ফলে আর কিছু না হোক, অন্তত এটুকু আশা করা গিয়েছিল যে, পৃথিবীর সবচেয়ে ধনবহুল আর সবচেয়ে জনবহুল নিজেদের ভিতরকার চিরাচরিত বৈরিতার পথ পরিহার করে সহজতর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পথ খুঁজে পাবে। চীন সফরের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট যখন রাশিয়া সফরে গেলেন তখন বিশ্বশান্তির আশা উজ্জ্বলতর হল। ঐ সফরের পর দুই দেশের মধ্যে যেসব চুক্তির কথা ঘোষণা করা হল সেগুলির ভিতর দিয়ে এটা প্রমাণিত হল যে, রাজনীতি ও মতাদর্শের বিরোধ সত্ত্বেও পৃথিবীর এই দুই শক্তিশালী দেশ কতকগুলি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা করতে পারে।

বিশ্বব্যাপী উত্তেজনা হ্রাসের এই প্রবণতা ১৯৭২ সালে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও লক্ষ্য করা গিয়েছিল। চীন ও জাপান তাদের দীর্ঘকালের শত্রুতার স্মৃতি মুছে একে অন্যের দিকে হাত বাড়াল। জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী তানাকা চীন ঘুরে আসায় চীন-জাপান সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হল। ১৯৭১ সালের শেষে রাষ্ট্রসংঘে লাল-চীনের অন্তর্ভুক্তির মধ্য দিয়ে যে শুভ প্রবণতার সূচনা হয়েছিল সেটা এইভাবে ১৯৭২ সালে সার্থক পরিণতির দিকে যাচ্ছিল।

এই ১৯৭২ সালেই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত দেশগুলিতে দেশ-বিভাগের বেদনাময় স্মৃতি মুছে দেওয়ার জন্য নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করতে আরম্ভ করা হয়েছে। পাকিস্থানের বাইরে বেরিয়ে গিয়ে বাংলাদেশ এই বছর তার মুক্তির প্রথম বার্ষিকী উদযাপন করেছে। বাংলাদেশের মুক্তি অনেক সঞ্চিত সংস্কারের মূলে আঘাত করে ২৫ বছরের মধ্যে এই প্রথম ভারত ও পাকিস্থানের ভিতর প্রতিবেশিসুলভ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পথ খুলে দিয়েছে। ১৯৭২ সালে সম্পাদিত সিমলা চুক্তি ভারত-পাকিস্থান সম্পর্কের ঐ পথটিকে আলোকিত করেছে। যদিও এই চুক্তির রূপায়ণ খুব সহজসাধ্য হচ্ছে না, তাহলেও বছরের শেষে অন্তত ঐ চুক্তির প্রথম ধাপটি পার হওয়া গেছে যার ফলে ১৯৭১ সালের যুদ্ধে দুই দেশের অধিকৃত এলাকাগুলি ভারত ও পাকিস্থানের সৈন্যবাহিনী ছেড়ে চলে এসেছে। ওদিকে আর একটি বিভক্ত দেশ জার্মানিও দেশবিভাগের ক্ষতচিহ্ন মুছে দেওয়ার জন্য বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণ করেছে। ১৯৭২ সাল বিদায় নেওয়ার আগে পশ্চিম জার্মানি ও পূর্ব জার্মানি আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। বিভক্ত কোরিয়ার উত্তর ও দক্ষিণ অংশও এই বছর নিজেদের মধ্যে পুনর্মিলন সংক্রান্ত আলাপ আলোচনা আরম্ভ করেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রিচার্ড নিকসন, পশ্চিম জার্মানিতে ভিলি ব্রাণ্ট ও জাপানে কাকুই তানাকার পুনর্নির্বাচন ১৯৭২ সালে ঐ তিনজনের শান্তিনীতির প্রতি দেশের মানুষের সমর্থন সূচিত করেছে। প্রেসিডেন্ট নিকসনের বিশেষ পরামর্শদাতা ডঃ হেনরি কিসিঞ্জার ও উত্তর ভিয়েতনামের প্রতিনিধি লেঃ ডুক থোর মধ্যে দীর্ঘ ও গোপন আলোচনার মধ্যে এক সময়ে এই আশার সঞ্চার হয়েছিল যে, ইন্দোচীনে যুদ্ধ বন্ধ করার একটা পথ খুঁজে পাওয়া গেছে। ডঃ কিসিঞ্জার নিজে ঘোষণা করেন 'শান্তি এখন করায়ত্ত'। বড়দিনের আগেই ইন্দোচীনে যুদ্ধবিরতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে বলেও আশা করা হয়েছিল। এই আশা যদি সার্থক হত তাহলে ১৯৭২ সালকে পথ-পরিবর্তনের বৎসর হিসাবে চিহ্নিত করে রাখতে কোন অসুবিধা ছিল না। কিন্তু প্রধানত সায়গনের বশম্বদ সরকারের প্রধান থিউ বাগড়া দেওয়ার ফলেই ঐ আশা বাস্তবে পরিণত হল। বছরের শেষে ঐ ব্যর্থতা ১৯৭২ সালে তিলে তিলে গড়ে তোলা আশা ও বিশ্বাসের প্রতিমাখানিকে নাটকীয়ভাবে ভেঙে চুরমার করে দিল। ১৯৭২ সালে আশা করার মত আর কিছুই অবশিষ্ট রাখলেন না প্রেসিডেন্ট রিচার্ড মিলহাউস নিকসন। হ্যানয়, হাইফং ও উত্তর ভিয়েতনামের অন্যান্য অঞ্চলে অসামরিক জনসাধারণ, সিনেমা হাউস, বিদেশী দূতাবাস, হাসপাতাল, এমনকি বন্দীশালাগুলোর উপর নির্বিচারে বোমাবর্ষণ করার জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে বি-৫২ বিমান পাঠিয়ে প্রেসিডেন্ট নিকসন সদম্ভে ঘোষণা করলেন, উত্তর ভিয়েতনাম (আমেরিকার নিজের শর্তে) চুক্তি করতে যতক্ষণ সম্মত না হচ্ছে ততক্ষণ আমেরিকা বোমা ফেলতেই থাকবে। খাস আমেরিকার মানুষ যখন বড়দিনের উৎসব নিয়ে ও নতুন বছরকে আবাহন করতে ব্যস্ত তখন উত্তর ভিয়েতনামের বন্দিশালায় আমেরিকান যুদ্ধবন্দীরা নিজেদের দেশের বিমানের হানাদারি থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য বিবর খনন করতে লেগেছিলেন—বিদায়ী ১৯৭২ সালের ঘটনাপ্রবাহের বিচিত্র পরিহাসের প্রতীক হয়ে থাকবে ঐ ঘটনা।

•

দেশের দিকে তাকালেও আমরা সম্ভবত ১৯৭২ সালটিকে আশাভঙ্গের বৎসররূপেই চিহ্নিত করব। ১৯৭১ সাল ভারতবর্ষে শেষ হয়েছিল একটা গভীর আত্মবিশ্বাসের মধ্য দিয়ে। পার্লামেন্টের মধ্যবর্তী নির্বাচন

তখন শ্রীমতী ইন্দিরা সরকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। একটি সফল যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ তখন বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে সম্ভব করেছে। আপন প্রত্যয়ের শক্তিতে তার বিশ্বাস তখন যেমন প্রবল বিশ্বের দৃষ্টিতেও তার আসন তখন তেমনি উচ্চে। ঘরের ভিতরে তখন ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্থিতি তখন অনেক বেশি স্বস্তিকর। ফসলের প্রাচুর্যে তখন তার শস্য-ভাণ্ডার পূর্ণ, বহু বছরের মধ্যে তখনই ভারতবর্ষ খাদ্যশস্যে স্বয়ংনির্ভর। বাজারের দাম তখন মোটামুটি আয়ত্তের মধ্যে ছিল। দেশের মধ্যে কংগ্রেসের ও কংগ্রেসের মধ্যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিপত্তি তখন অপ্রতিহত। কিন্তু বিদায়ী বছরের শেষে চিত্রটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। একটি খরার আঘাতে সবুজ বিপ্লব ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। মহারাষ্ট্র রাজস্থান ও গুজরাটের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আকাল দেখা দিয়েছে। হাজার হাজার নিরন্ন মানুষ শহরে ছুটে আসছে। খাদ্য-শস্যের সন্ধানে আবার আমাদের বিদেশের দিকে তাকাতে হচ্ছে। খাদ্যশস্যের জাহাজ আবার আমাদের বন্দর স্পর্শ করছে। অন্যদিকে ছাত্র ও শিক্ষকদের বিক্ষোভ, ভাষার লড়াই, সাম্প্রতিক দাবিদাওয়ার জন্যই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে নতুন অশান্তি ডেকে আনছে। অন্ধ্র ও আসামে যে অশান্তি কংগ্রেসের মাথা যে বিদ্রোহ শুরু করেছে, শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বের দ্বারা বিশেষ তেমনি বিরোধের নিরসন করা যাচ্ছে না।

এইভাবেই ভারতবর্ষের মানুষ ১৯৭২ সাল পার হয়ে এখন দেখা যাক ১৯৭৩ সাল এই দেশের জন্য কোন আশা নিয়ে আসে।

২৯-১২-৭২ —পুণ্ডরীক

মানেকশ ফিল্ডমার্শাল

সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষ এস এইচ এফ জে মানেকশ ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর ফিল্ড মার্শাল পদে উন্নীত হয়েছেন। আর সৈন্য-বাহিনীর অধ্যক্ষ হিসেবে ১৫ জানুয়ারী থেকে কার্যভার নেবেন লেঃ জেনারেল বেউর।

প্রতিরক্ষা দপ্তরের এক প্রেসনোটে বলা হয়েছে, জেনারেল মানেকশ আজীবন এই পদমর্যাদা ভোগ করবেন।

তাঁর প্রশংসনীয় কাজের স্বীকৃতি-স্বরূপে তাঁকে এই মর্যাদায় ভূষিত করা হল। স্বাধীনতার পরে জেনারেল মানেকশই সর্ব-প্রথম এই সম্মানের অধিকারী হলেন। এক-মাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছেন পাকিস্থানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ। ভারত উপমহাদেশে আর কোন ফিল্ড মার্শাল ছিলেন না।

১৯৬৫ খৃঃ পাকিস্থানের সঙ্গে যুদ্ধে ভারতের জয়লাভের পর কোন কোন মহল থেকে জেনারেল জে এন চৌধুরীকে ফিল্ড

ফিল্ড মার্শাল মানেকশ

মার্শাল পদে উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু সেই সময়ে সরকারের মনোভাব সেই প্রস্তাবের অনুকূলে ছিল না।

২ জানুয়ারী রাষ্ট্রপতি ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপতি জেনারেল মানেকশকে এই সম্মান স্মারক প্রদান করেন।

ফিল্ড মার্শাল সাম হরমুসজী ফ্রামজী জামশেদজী মানেকশ ১৯৬৯ খৃঃ ৮ জুন সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষের কার্যভার গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ডাঃ এইচ এফ মানেকশ প্রথম মহাযুদ্ধে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসে একজন ক্যাপ্টেন ছিলেন। ১৯১৪ খৃঃ ৮ এপ্রিল অমৃতসরে জেঃ মানেকশর জন্ম। নৈনীতাল এবং পরে অমৃতসরে তিনি শিক্ষালাভ করেন। ১৯৩৪ খৃঃ তিনি কমিশন পান এবং পরে সীমান্ত রাইফেলস বাহিনীতে যোগদান করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তিনি ব্রহ্ম রণাঙ্গনে ছিলেন। প্রথম বর্মা অভিযানে তিনি জাপানের বিরুদ্ধে অভিযানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। সিটাং নদী হতেই তিনি পেগু ও রেঙ্গুন অভিমুখী জাপ বাহিনীর সম্মুখীন হয়ে পড়েন এবং দক্ষতা ও কৌশলের সঙ্গে তাঁর বাহিনী পরিচালিত করেন। তাঁর সাহস এবং সাফল্যের জন্য তাঁকে অবিলম্বে পুরস্কার দেওয়া হয়। সেই থেকে তিনি গুরুতর আহত ছিলেন এবং চিকিৎসার জন্য তাঁকে ভারতে পাঠানো হয়।

অতঃপর তিনি কোয়েটা স্টাফ কলেজে যোগদান করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ দিকে তিনি স্টাফ অফিসার হিসেবে ইন্দো-চীনে জেনারেল ডেজির নিকট যান। জাপানের আত্মসমর্পণের পর তিনি দশ

হাজার যুদ্ধবন্দীর পুনর্বাসন কার্যে সাহায্য করেন।

১৯৫৭ খৃঃ তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের একটি বাহিনীর অধিনায়কত্ব করেন। অতঃপর তিনি ওয়েলিংটনে ডিফেন্স সার্ভিস স্টাফ কলেজে কম্যাণ্ডাণ্টের পদ গ্রহণ করেন। ১৯৬২ খৃঃ তিনি লেঃ জেনারেল পদে উন্নীত হন। চীনা আক্রমণের পরেই নেফার কোর কম্যাণ্ডার নিযুক্ত হন।

১৯৬৩ খৃঃ তিনি পশ্চিমাঞ্চলীয় কম্যাণ্ডের জি ও সি-ইন-সি নিযুক্ত হন এবং পরে পূর্ব কম্যাণ্ডের প্রধানরূপে কলকাতায় বদলী হন। ১৯৬৮ খৃঃ তাঁকে পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৯৬৯ খৃঃ ৮ জুন তিনি সৈন্য বাহিনীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

প্রকাশ লেঃ জেনারেল বেউর ১৪ জানুয়ারী সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষ হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করবেন।

সাধারণত ১৫ জানুয়ারী তারিখ সৈন্যাধ্যক্ষ সৈন্যবাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করে থাকেন। জেনারেল বেউর যথাসময়ে কার্যভার গ্রহণ করবেন।

বৃটিশ সামরিক বাহিনীর নিয়ম অনুসারে কোন বিশিষ্ট জেনারেলকে ফিল্ড মার্শাল পদে উন্নীত করা হলে সামরিক বাহিনীর তালিকায় তাঁর নাম রাখা হয় এবং অবসর গ্রহণের পর ভারত সরকার সেই নীতিই অনুসরণ করবেন বলে অনুমান করা হচ্ছে।

চলো বিধাননগর

দিলীপ মালাকার

চলো চলো দিল্লী চলো স্লোগান ছিল ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে। তখন চলছিল আই. এন. এ মুভমেণ্ট। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে স্লোগান ছিল চলো ঢাকা চলো। ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় স্লোগান চলো চলো বিধানগর।

দিল্লী চলো, ঢাকা চলোর সংগে বিধাননগর চলোর তফাত অনেক। ৭৪তম কংগ্রেস অধিবেশনে কলকাতার অর্ধেক বাস, মিনিবাস চলেছিল একটিমাত্র লক্ষ্যে—বিধানগরে। বিধাননগরে গিয়ে দেখি গাড়ির পর গাড়ি। তার বুকে সাঁটা 'অন এসেনশিয়াল সার্ভিস', 'অন স্পেশাল ডিউটি' 'এ' 'বি' পার্ক, প্রেস ইত্যাদির লেবেল সাঁটা। বিশেষ ট্রেন এসে থেমেছে উল্টোডাংগা স্টেশনে। যদি ট্রাম লাইনের বিশেষ ব্যবস্থা থাকত তাহলে বোধহয় ট্রামও থামত বিধাননগরে।

লবণ হ্রদ নামে যে জলাভূমি পড়েছিল মহাকাল তাকে উদ্ধার করে বালি দিয়ে ভরাট করে নগর বানাবার স্বপ্ন দেখেছিলেন ডঃ বিধানচন্দ্র রায়। তাঁর উদ্যমে লবণ হ্রদের কাজ শুরু হয় দশ বছর আগে। সে কাজ এখনও চলছে। বাড়ি ঘর হয়েছে প্রচুর। কিন্তু মনে হবে যেন রাজস্থান বা নয়াদিল্লীর কোনো উপনগরী। সবুজের চিহ্ন নেই। ধুধু করছে বালি। অনেকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, যদি বালি খেতে চাও তো বিধাননগরে যাও।

ধুলোর চেয়ে মারাত্মক ছিল সন্ধ্যের পর মশার কামড়। তারচেয়েও উল্লেখযোগ্য হল ডাকসাইটে-বিশালকায় পোকা-মাকড়। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পর্যন্ত এইসব পোকা-মাকড়ের আক্রমণে বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, এত বড় পোকা আমি জীবনে দেখিনি।

বিধাননগরে ৭৪তম কংগ্রেস অধিবেশন শুরু হয় ২৬শে ডিসেম্বর। কিন্তু অগণিত দর্শকের ভীড় শুরু হয় ২৪শে ডিসেম্বর থেকে। তাদের কাছে আকর্ষণীয় ছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নবনির্মিত অতিথিশালা। যেখানে প্রধানমন্ত্রী বাস করেছিলেন। বাড়িটা সম্পূর্ণ শীত-তাপনিয়ন্ত্রিত। সদ্য

ডঃ শঙ্করদয়াল শর্মা

বিধাননগরে কংগ্রেস অধিবেশনের বিষয় নির্বাচনী কমিটির বৈঠকের আগে 'বন্দে মাতরম্' গানের সময় মণ্ডপে নেতৃবৃন্দ দাঁড়িয়ে ওঠেন। ছবিতে কংগ্রেস সভাপতি ডঃ শঙ্করদয়াল শর্মার ডানদিকে এ আই সি সি-র সাধারণ সম্পাদক শ্রীচন্দ্রজিৎ যাদব, বাঁদিকে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ও সর্বদক্ষিণে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে দেখা যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনারত শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ
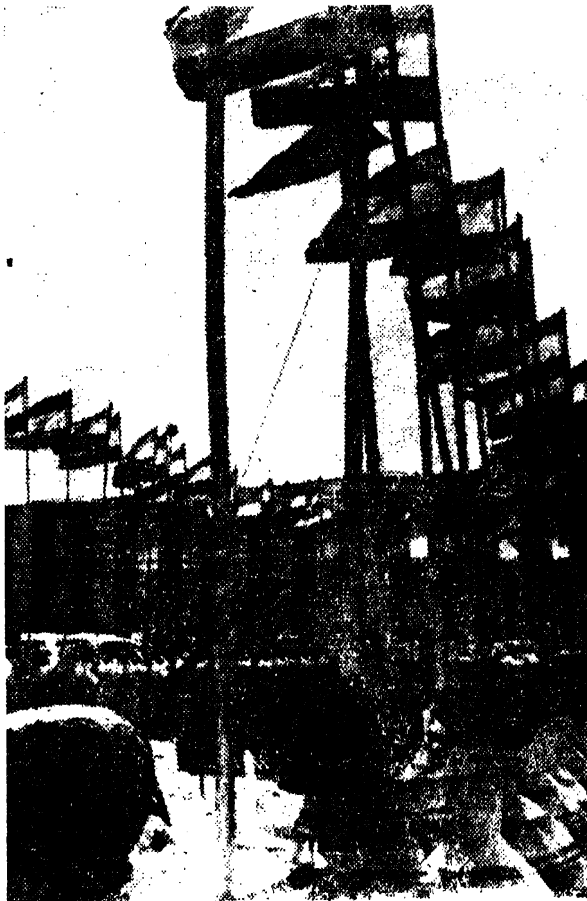
বিধাননগরে কংগ্রেস অধিবেশনে প্রধান প্যাণ্ডেলের পিছনে উড়ছে কংগ্রেস পতাকা।

বানান বাগানে বড় বড় খেজুর গাছ তুলে লাগান হয়েছিল। বানান হয়েছিল ফুল বাগান।

জনগণের ভীড় দেখা গেছে প্রদর্শনী মণ্ডপে। সেখানে লাখ লাখ লোকের ভীড়।

কংগ্রেস অধিবেশন দেখতে লক্ষ লোকের লাইন। অধিবেশন শুরু হওয়ার পর জনতার ভীড় রোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল সময় সময়। প্রথম দিন দেখলাম জনতা একবার এ. আই. সি. সি. সদস্যদের জন্যে সংরক্ষিত আসন ও সাংবাদিকদের জন্যে সংরক্ষিত জায়গায় ঢুকে বসে পড়েছেন। তাঁদের সরে যেতে অনুরোধ করেন কয়েকজন মন্ত্রী।

প্রথম যুগে কংগ্রেসের অধিবেশন বসলেই তার সঙ্গে বসত স্বদেশী মেলা। ১৯০৫ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময় স্বদেশী মেলার চলন করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুর পরিবার। সেই থেকে কংগ্রেসের অধিবেশনের সঙ্গে মেলার চলন চলে আসছে। এবারের কংগ্রেস অধিবেশনেও তাই হয়েছিল। কংগ্রেস অধিবেশনকে বাৎসরিক মেলা বলে কোনো সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল একটি সংবাদপত্রে। তাই নিয়ে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, কংগ্রেস অধিবেশন মেলা নয়। একে অত খেলো মনে করার কারণ নেই। কংগ্রেস অধিবেশনের শেষের দিন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়ও সেই একই কথা বললেন, যেসব দুষ্ট লোক কংগ্রেস অধিবেশনকে মেলা বলে প্রচার করছে তারা জেনে রাখুন এটি জনগণের মেলা।

কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করতে এসে বিহার-উত্তরপ্রদেশের কিছু লোক 'রথ দেখা ও কলা বেচা' দুই কাজই

করেছেন। কয়েকজনকে দেখলাম কংগ্রেসের প্যাণ্ডেলের সামনে চাদর বিক্রি করছে।

একদিন দেখলাম প্যাণ্ডেলের কাছে সাপ ও বেজীর খেলা দেখান হচ্ছে। বেশ ভীড় জমে গেছে। একজন কংগ্রেস সদস্য বললেন—ভিতরে সাপ-নেউলের খেলা হয়নি তাই বাইরে হচ্ছে। আমাদের অধিবেশন শান্তভাবেই হয়েছে।

এ বিষয়ে সবাই একমত। এবারকার বিধাননগর কংগ্রেস অধিবেশনে কোনো গণ্ডগোল হয়নি। এখানে যেসব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে তার ছক তৈরী করা হয়েছিল দিল্লীতে। বিধাননগরে কংগ্রেস অধিবেশনে যতক্ষণ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আসেন নি ততক্ষণ উত্তেজনা ও দর্শকদের কৌতূহল অত বেশী ছিল না। যখনই শ্রীমতী গান্ধী প্যাণ্ডেলে আসতেন তখনই দেখতাম গুঞ্জন ও জনতার কৌতূহলী দৃষ্টি। কংগ্রেস বলতে যেন ইন্দিরা গান্ধী। ইন্দিরা গান্ধী বলতেই যেন কংগ্রেস।

হিন্দিওয়ালাদের একটু বেশী মাত্রায় হিন্দিপ্রেমিক বলে মনে হল। অধিবেশন শুরু হওয়ার আগের দিন প্রদেশ কংগ্রেসের ক্যাম্পের সামনে এক হিন্দিওয়ালা বক্তৃতা শুরু করে দেয়, ইংরেজীতে কেন পথ-নির্দেশিকা ও প্রচারপত্র ছাপা হয়েছে। ইংরেজ তো বিদায় নিয়েছে। আর ইংরেজী কেন।

অধিবেশনের প্রথম দিন কংগ্রেস সভাপতি ডঃ শঙ্করদয়াল শর্মা ভাষণ দিচ্ছিলেন ইংরেজীতে। অমনি প্রতিবাদ উঠল, হিন্দিতে বলুন, ইংরেজীতে নয়। পরে অবশ্য সভাপতি হিন্দিতে বলেছিলেন।

প্রথম দিনের অধিবেশনে ডায়াসের সামনে এসে উপস্থিত এক নাগা সন্ন্যাসী। তার পরনে কৌপীন। খালি গা। হাতে একটি ছোট্ট কাঠের বাক্স। স্বেচ্ছাসেবকরা যখন তাকে নিয়ে এলো বাইরে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোত্থেকে এসেছেন। নাগা সন্ন্যাসী জানালেন যে তিনি হরিদ্বার থেকে এসেছেন। যেখানেই কংগ্রেস অধিবেশন হয় সেখানেই তিনি গিয়ে হাজির হন। ট্রেনে চাপলেই হল। কোনো ঝামেলা নেই। দেশে এত পাপ বাড়ছে তাই তিনি ধর্ম প্রচার করতে এসেছেন।

ব্যাজধারীদের সংখ্যা কম ছিল না। কেউ কেউ নিজের হাতে ব্যাজ তৈরী করেও এসেছিলেন। কিন্তু যাঁরা কর্মকর্তা, কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীদের কারুর কারুর ব্যাজও ছিল না, ছিল না তাঁদের গাড়িতে বিশেষ কাগজ সাঁটা। তাই নিয়ে বেশ রসিকতা চলে প্যাণ্ডেলে। উপমন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখার্জির জামায় ব্যাজ নেই। তাঁকে ঢুকতে দিতে চাইছিল না পুলিশের লোক যদিও তিনি পুলিশ মন্ত্রী। শেষে ইনস্পেকটর জেনারেল অব পুলিশ রঞ্জিত গুপ্ত এসে উদ্ধার করে নিয়ে যায় মণ্ডপে।

এমনি আরেক অঘটন ঘটে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীচাবনকে নিয়ে। তাঁর গাড়িতে কোনো ছাড়পত্রের কাগজ ছিল না। তাই শুনে পশ্চিমবঙ্গের পরিবহন মন্ত্রী জ্ঞান সিং সোহনপাল মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলেন। কারণ তাঁর দায়িত্ব ছিল গাড়ির ব্যবস্থা করা।

এ তো কিছুই নয়। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর সিকিউরিটি চীফ শ্রীহাণ্ডাকে নিয়ে টানাটানি করে স্বেচ্ছাসেবকরা। তার বুকে কোনো ব্যাজ ছিল না। পুলিশের লোক এসেও সেই এক কথা বলে। শ্রীহাণ্ডাকে কেউ চেনে না। তাই এত গণ্ডগোল।

দর্শকদের কৌতূহলের শেষ ছিল না রান্নাঘর দেখার। কারণ চল্লিশ হাজার লোকের আহারের ব্যবস্থা চাট্টিখানি কথা নয়। চল্লিশ হাজার লোকের দুবেলা খাবার অর্থাৎ আশী হাজার পাতের রান্না করেছে কয়েক হাজার পাচক। সেকালে রাজ-রাজড়াদের আমলে রাজসূয় যজ্ঞ হত বলে শুনেছি। সেখানে নাকি বহু লোক খেত। কিন্তু চল্লিশ হাজার লোকের রান্নার ব্যবস্থা ছিল বলে আমরা জানি না।

চা-জলখাবারের সময়ও সমস্যা বড় কম ছিল না। কেউ চা খান কেউ কফি। মণ্ডপে প্রধানমন্ত্রীকে কফি দিতে তিনি চাইলেন চা। চা আনতে ছুটলেন এক কর্মকর্তা। চা যখন এলো তখন প্রধানমন্ত্রী উধাও।

একটা জিনিস সবাই লক্ষ্য করেছিলেন যে, কোনো বক্তা একবার মাইক হাতে পেলে সহজে ছাড়তে চাইতেন না। তাই নিয়ে বেশ রসিকতা চলে ভি. আই. পি লাউঞ্জে।

বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিরা ছিলেন বিধাননগরের নবনির্মিত বাড়িগুলোতে। বাড়তি সদস্যরা ছিলেন টিনের চালের ক্যাম্পে। সবচেয়ে বেশী সদস্য আসে উড়িষ্যা থেকে—প্রায় সাড়ে তিন হাজার। তারপর হল উত্তরপ্রদেশের। সবচেয়ে কম আসে মিজোরাম থেকে। মাত্র তিনজন।

বিধাননগরে অধিবেশনও ব্যবস্থাদি সম্পর্কে এক এক প্রদেশের প্রতিনিধি এক এক রকমের মন্তব্য করেছে। কংগ্রেস অধিবেশনের এলাহি কাণ্ডকারখানা দেখে তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশের কয়েকজন প্রতিনিধি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

তামিলনাড়ু প্রদেশ কংগ্রেস অফিসের সেক্রেটারী শ্রীসুন্দর রাজন, সালেম জেলার প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্য শ্রীমতী মারাগাথাম ত্যাগরাজন ও মাদ্রাজ নগর কংগ্রেসের সহ-সভাপতি শ্রীএল মাথাই বলেছেন—১৯৫৫ সালের আবাদী কংগ্রেসের পর বিধাননগরের অধিবেশন বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ। ১৯৬৯ সালের বম্বে কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনের তুলনায় বিধাননগরের প্রকাশ্য অধিবেশন বিরাট ও এলাহি ব্যাপার। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থায় তাঁরা সন্তুষ্ট। প্রদর্শনীও আকর্ষণীয়। ভাষা সমস্যায় তাঁরা খানিক বিব্রত বোধ করেছেন। এই ধরনের ব্যবস্থায় সামান্য ত্রুটি ছিল।

অন্ধ্র প্রদেশ কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের মধ্যে শ্রীচিন্নাইয়া, এম, এল, এ এবং শ্রীরাজন মূর্তি বললেন—বম্বে অধিবেশনে যে আয়োজন ছিল তার তুলনায় বিধান-নগরের আয়োজন অনেকগুণ বড়। প্রদর্শনীও বিরাট। সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকলে আরও ভাল হত। যাবার আগে কলকাতা শহর দেখতে বেরুবেন।

মণিপুরের এক প্রতিনিধি শ্রীইবোতোম্বি সিং এর কাছে বিধাননগরীর সব ব্যবস্থাই ভাল লেগেছে। তাঁর দলের কোনো অসুবিধে হয়নি।

হিমাচল প্রদেশের শ্রীভার্গব, এম, পি, এবং শ্রীরমেশ বর্মা, এম, এল, এ বললেন—বিধাননগরে সবই ভাল কিন্তু তথ্য ও অনুসন্ধানের বড়ই অভাব। নইলে সব সুষ্ঠু হত।

বিহারের কৃষিমন্ত্রী শ্রী পি, সি, কিস্কু ও শ্রীমতী কিশোরী দেবী, এম, এল, সি বললেন—আমাদের কাছে বম্বে অধিবেশনের ব্যবস্থা ভাল লেগেছিল। বিধাননগরে বাস-স্থানের ব্যবস্থা তাঁদের মনঃপূত হয়নি। তাছাড়া রয়েছে যানবাহনের সমস্যা।

পাঞ্জাব প্রতিনিধি দলের শ্রী ও, পি, গুপ্ত (লুধিয়ানা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি) ও শ্রী এ, সি, মেহেতা জানালেন—তাঁদের খাওয়া থাকার কোনো অসুবিধে হয়নি। তবে তথ্য ও অনুসন্ধানের ব্যবস্থা ভাল নয়। সময় মতন অনেক খবরও পান না। অধিবেশনের পরে কলকাতায় শিল্পাঞ্চল দেখা তাঁদের একমাত্র মনের সাধ।

সাংবাদিকদের জন্যে ব্যবস্থা ছিল অনেক। এক সার বাড়ি তাঁদের জন্যে। মণ্ডপের বাইরে ডাক-তার বিভাগের তত্ত্বাবধানে ছিল বিরাট প্রেস লাউঞ্জ। সেখানে টেলিপ্রিণ্টার ও টাইপরাইটার মেশিনের ছড়াছড়ি। অধিকাংশ সংবাদপত্রের অফিসে ছিল টেলিপ্রিণ্টার ও সরাসরি টেলিফোন লাইন। মণ্ডপেও ছিল মঞ্চের ধার ঘেঁষে প্রেস কর্ণার। ভারতের প্রায় সবকটা বড় সংবাদপত্রেরই অফিস খোলা হয় বিধাননগরে। তাছাড়া ছিল চোদ্দজন বিদেশী সাংবাদিক।

কংগ্রেস অধিবেশনের জন্যে নাকী চল্লিশ লাখ টাকা তোলা হয়। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারও অর্থ ঢেলেছে প্রচুর বিধাননগরের জন্যে। তার সঠিক অংক জানা যায়নি। তবে একটি রাজনৈতিক দলের অধিবেশনের জন্যে সরকার এতখানি আগ্রহ দেখাবেন সেটা অনেকে ভাবতে পারেননি। অনেকে বলেছেন যে, ইংলণ্ডে যখন লেবার পার্টি বা কনজারভেটিভ পার্টির বাৎসরিক অধি-বেশন বসে ব্রাইটন বা ব্ল্যাকপুলে তখন কি সরকার এগিয়ে যায়? তা কখনই নয়। কারণ রাজনৈতিক দল যা করে তা তাঁরা নিজের টাকার জোরেই করে। সরকার এগিয়ে গেলে দেশময় মহা হৈচৈ বেধে যায়। এই নিয়ে অনেকে অনেক রকমের সমালো-চনা করেছে। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকেও এই সম্পর্কে এবং কোনোরকম উদ্বেগ নিশ্চয়ই রয়েছে। এই উপলক্ষে কলকাতার কাছে একটি উপনগরী গড়ে উঠল। এটাই আমাদের লাভ।

ঋতু হিসাবে পৌষ-মাঘ শীতকাল হলেও, অনেক বছর কার্ত্তিকের শেষ বা অগ্রহায়ণের গোড়া থেকেই শীতের জোরাল আমেজ দেখা দেয়, গরমের জামা-কাপড় বার করে ফেলতে হয়, কাঁথা-কম্বল-লেপ গায়ে দিতে হয়, তারপর পৌষ-মাঘ এলে তো আর কথাই থাকে না! এবার শীতের প্রকোপ কিন্তু এখনও তেমন জাঁকিয়ে দেখা দেয়নি। শীতকে অনেক সময় ভয়ের চোখে দেখলেও, শীত কিন্তু গ্রীষ্ম-বর্ষার মত যন্ত্রণাদায়ক নয় বলেই মনে হয়। গ্রীষ্ম-বর্ষায় যা পেটে সয় না, হজম হয় না, শীতে তা অনায়াসে হয়ে থাকে। শীতে ক্ষুধার উদ্রেক যেমন অন্যান্য ঋতুর চেয়ে স্বাভাবিকভাবেই বেশী হয়, তেমনি 'হজমও হয়ে যায় সহজে। প্রাকৃতিক দৃশ্যও মনোরম। এই সময় নানা রকমের আনাজ-কোনাজ ও ফল-ফুলারি যেমন ওঠে, তেমনি ফুলেরও সমারোহ দেখা যায় চারদিকে। সেজন্যই বসন্তকে যেমন ঋতুরাজ বলা হয়ে থাকে, তেমনি শীতকেও আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে 'সুন্দরী' 'মানী' প্রভৃতি বলে।

এসম্বন্ধে সুন্দর একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছিল 'জন্মভূমি' পত্রিকার ১৩০৩ সালের পৌষ সংখ্যায়। তখন অবশ্য পুরোপুরি ইংরেজ আমল এবং ইংরেজদের খুবই জোরদার অবস্থা। গরমের সময় হোমরাচোমরা, লাটবেলাট রাজপুরুষরা চলে যেত ঠাণ্ডা জায়গায়, পাহাড়ের দেশে শৈত্যাবাসে; আবার শীত জাঁকিয়ে পড়লে নেবে আসত তারা সমতলভূমিতে অপেক্ষাকৃত কম শীতের জায়গায় দলবল নিয়ে। 'জন্মভূমি'র এই লেখাটির মধ্যে ঐসকল বিষয় যেমন ইঙ্গিত আছে, তেমনি সাহিত্য-রসও আছে প্রচুর। সম্পাদকীয়টির নাম হচ্ছে 'শীত-সুন্দরী'। রচনাটি থেকে কিছু কিছু অংশ এখানে তুলে দেওয়া হল—বানান ও ভাষা যথাযথ রেখে।

শীত-সুন্দরী

"আমি শৌর্য্যে সিংহিনী; সৌন্দর্য্যে ইন্দ্রাণী; আমি বিলাস-বৈভবে বহুরূপিণী। আমি শীত। আমি নেমেছি।

আমি ইংরেজ-শাসনে ঋতু-রাজ্যের পাটরাণী। রাজ-দরবার ও শৈত্য-সোহাগে বিলাসসম্ভার বুকে করে আমি নেমেছি।

আমি শিমলা-শৈল-নিবাসে, স্বর্গ-বিলাসে ছিলুম। শরকুট করিতে, সখ করে, আমি নিম্নে—নেটিব-লোকে নেমেছি।

আমি, এই সহরে, মাস-দু-তিন শফর-প্রবাস করব। পৌষ-মাঘ-ফাল্গুন। চৈত্র পড়িতে-না-পড়িতে আমার চতুর্দ্দোল, পুনঃ স্বস্থানে উঠবে। চৌরঙ্গী ত্যজিয়া, আমার দলবল তখন চন্দ্রলোকে চম্পট দিবে।

আমি আট মাস অন্তরীক্ষে আরাম করি। সমতলের মাটীতে পা দিই না। নিদাঘের দারুণাতু আমার অতীব অপ্রিয়।... আমি নিদাঘে নামি না।...

আমার শৈত্য-সম্পদে বঞ্চিত হয়ে, সমতলভূমি শ্মশানবৎ সন্তপ্ত হয়। আমি আট মাস এ রাজ্যে নামি না। এ রাজ্যের নিয়ন্তাদিগকেও নামাই না। আমরা একত্রে, হিমালয়ের উচ্চ চূড়ায়, ইথরের অনুপম পরমাণু স্পর্শে পুলকিত হই; আর প্রমোদ-প্রবাহে, রাস-বিলাসে পান্সী ছোটাই। পৃথিবীতে পা বাড়াই না।

●

আমি নেমেছি। দেখ, এই সহরে, সুরলোক নামায়েছি। বর্ষা-বিড়ম্বিত, গ্রীষ্ম-শুষ্ক শ্মশানকে, আমি মুহূর্ত্তে মধ্যে, আমার মোহন স্পর্শে,—আ! আমার ঐন্দ্রজালিক চুম্বনে, পর রমণীয় প্রমোদ-উদ্যানে পরিণত করেছি। আমার ইঙ্গিত মাত্রে, দেব, দানব, গন্ধর্ব, কিন্নর, যক্ষ, বিদ্যাধর, অপ্সর আত্মীয়স্বজনসহ, এখানে এসে সমবেত হ'য়েছেন।

●

যে বৃটিশ-সিংহ স্বেচ্ছা করলে, সসাগরা সমগ্র পৃথিবী রসাতলে প্রেরণ করতে পারেন, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, বার্ত্তাকুবৎ—বরফ-ব্রাণ্ডির শরবৎ-বৎ অবহেলে উদরস্থ করতে পারেন,—এই বিশাল ভারতভূমি নিমেষ মধ্যে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে পারেন, তাহার সেই বৃটিশ-সিংহের স্বাস্থ্য এবং অস্বাস্থ্য আমারই হ্রাস-বৃদ্ধির উপর, নিত্য ও নৈমিত্তিকভাবে নির্ভর করে। তোমরা বুঝতে পেরেছ কি, আমি কে,—আর আমার শক্তি কত? আমি অপরিমেয় শক্তিময়ী; বৃটিশ সিংহের বক্ষে, শোণিতে, শিরায় শিরায় বিশ্ব-বিঘাতক-বল-সঞ্চারিণী; আমি শীত।

●

...আমি আমার সৌন্দর্য্যের কথা বোলবো না। সুন্দরী আপন সৌন্দর্য্যে আপনি দেখান না; লুকিয়েও রাখেন না; লোক তাহা দেখে। আমি আমার লাবণ্যরাশি তো আর লুকায়ে রাখিনি; লোকের চক্ষু থাকে তো দেখুক। আমার অঙ্গে অঙ্গে দেখুক, ওপাঙ্গে-ওষ্ঠে-নয়নে-বদনে-নিতম্বে দেখুক, আমার নীবীবন্ধে দেখুক, আমার কপোলে-কণ্ঠে-কুন্তলে দেখুক, আমার কাঁকালে, আমার বাহুতে ও বক্ষে দেখুক; আমার সম্মুখে ও পশ্চাতে দেখুক! আমার এই সহরের শিরায় শিরায় তোরা আমার সৌন্দর্য্য-শোভা দেখ! আমার হাট, আমার হোটেল, আমার ঠাট, আমার নাট, আমার পথ, আমার পার্ক, আমার যান, আমার বাহন, আমার অসংখ্য বর্ণের আর অসংখ্য আকারের বিচিত্র বসনবিভাতি, অলঙ্কার-জ্যোতি, আমার বিনোদ চিত্রশালা, আমার বিলাস-মন্দির, আমার ক্রীড়াস্থল, আমার সাজ-আসবাব আমার বারেন্দা-বৈভব সমস্তই আজ আমারই শীত-সৌন্দর্য্য প্রতিবিম্বিত করছে। আমার চৌরঙ্গী চাঁদের হাট, আমার ওয়েলেসলি অপ্সরোদ্যান, ফেয়ারলি ফ্যানসীপুলকিত, আমার পার্ক ষ্ট্রীট পরী-প্লাবিত; আমার হাস্যালোক-হিল্লোলিত হ্যারিসন প্রমোদ-ভুবন; আমার গার্ডেন—ওলো! এবার শ্রীবৃন্দাবন!

●

আমি শীত, সাতিশয় রসবতী। আমায় শুষ্ক বলে কে? আমি ষড়রসে সুন্দরী। আমি নবরসে রঙ্গিণী। আমার মু্যনিসিপাল মার্কেট আজ অশিত লক্ষ রসের আটলাণ্টিক মহাসাগর! বলিবে, ম্যুনিসিপালে ম্লেচ্ছরস? তা, 'মাধবে' যাও। রস-সাগর নম্বর নূতন বাজারে যাও; আর যাও তবে বহুরস-রসিকা আমার বউ বাজারে! খাটী আর্য্যরস হ'তে আরম্ভ করে, বিশুদ্ধ বাবু-রস, অর্থাৎ আমিরী রস, নোক্তাদার নবাবী রস,—সকল রসই সশরীরে মূর্ত্তিমান,— সজীবতায় দেদীপ্যমান দেখতে পাবে। ওলো! আমি রস নইলে কি এক নিমেষে রইতে পারি লো। আমি সর্ব্বরসে সোহাগিনী। আমার নব্য-রস, আমার সভ্যরস, আমার কাবারস, আমার চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্যরস চারিদিকে দৌড়িচ্ছে! ওলো! পেয়-রসে আমি প্যায়-গম্বরী! আমার পুলি, পুডিঙ, পিষ্টক আর পীরিতি রসের কি অবধি আছে! আমার কৌবি-কড়াই-কমলা; কেক্ ও কুল, কুকটি এবং কর্কট-রস কি তোরা চাকিস্ নি! জিহ্বার মাথা কি খেয়েছিস্!

●

তা, তোরা কি আমার কাব্যরস পান করেছিস, আমার কবিতা শুনেছিস? না, শীতের কবিতা শুনবি কেন! মরগে যা তবে, বয়াটে বাঁদর বসন্তের বাড়ী। কোকিলের কলকলানি নইলে কি আর কবিতা হয়! শীতের কবিতার যে কি সতেজ সৌন্দর্য্য, তা কাউপার বুঝতেন; বসন্ত-বিড়ম্বিত ব্যভিচারী লোকে তার কি বুঝবে! কিন্তু শোন্ বোলছি; আমার কবিতা যদি না শুনিস্ আর শুনে যদি না কাঁদিস, তা হ'লে আমার কড়াই-ক্যাঁকড়া খা'সনে, আমার কুল-কমলা চু'সনে! আমার ক্রিশমাস, কঙ্গরাস দেখিস নে! 'করে' কর্!

আমার ক্রিশমাস কঙ্গরস দুই একদিনে আরম্ভ! সেটী নইলে এখন আর আমি রইতে নারি। পৌষ পড়তে পড়তেই কঙ্গ-পীরিতে আমার প্রাণ কেঁদে ওঠে।"

(অতীতে সাধারণতঃ কংগ্রেসের অধিবেশন শীতকালেই বড়দিনের সময় ক্রিশমাসে ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হতে দেখা যেত। সে কারণ 'জন্মভূমি'র সম্পাদক শীত-সুন্দরীর আলোচনা প্রসঙ্গে কংগ্রেসের (কঙ্গরাস) কথা উল্লেখ করেছেন।)

—ক্ষপণক

এক মুহূর্তে আমার মনে হল, আমার ভিতর থেকে কেউ বুঝি আমার নাম ধরে চীৎকার করে ডেকে উঠল। ডাকটা অনেক দূরের। কন্ঠ নারীর না পুরুষের—এ বোঝার চেষ্টা করিনি। আমার পোষাকী নাম 'সীতেশ' অফিসে জানে 'পালিতবাবু' এরকম কোন শব্দে আমায় ডাকেনি। ডেকেছে 'বাবাই' বলে—শিশুকালে আমার বাড়ির দেওয়া অতি অন্তরঙ্গ ডাকনামে—আমার বাবা-মা ছোটবেলা থেকে যে নামে বারবার ডেকে আসতেন—সেই নামে।

ডাকটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমি চাঁপা দাসীর দিকে স্থির চেয়ে থেকেও কয়েক পলক অন্যমনস্ক। তারপরেই। চাঁপার কোন কথা আমার কানে যায় নি। দ্রুত উঠে দাঁড়ালাম। কম পাওয়ারের আলোর ঘর থেকে বারান্দায় এলাম। জানি, দোতলার সব ঘরের দরজা এখনো বন্ধ হয় নি। কোন কোন ঘরে মাচের সঙ্গে গান-বাজনা চলেছে। আমি যেন মাথার মধ্যে একটা ভারী বোঝা নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলাম।

সবটাই দ্রুততায় ঘটছে। একতলার বাইরে যাবার প্যাসেজটার আলো-আঁধারি। দু'পাশে সারি সারি নানা বয়সী মেয়ে সেজে-গুজে দাঁড়িয়ে আছে। আমি কারোর দিকে তাকাইনি। প্রায় দৌড়ে বাইরে পা দিলাম। শুনতে চাইনি, শোনার মত কান আমার এই মুহূর্তে নেই। তবু 'চাঁপাদি' 'প্রথম' 'এত তাড়াতাড়ি'—এই রকম ছোট ছোট শব্দের সঙ্গে অশ্লীল মন্তব্য, বিড়ির ধোঁয়া বের করা ফ্যাকফ্যাক হাসির শব্দ আমাকে যেন অজস্র ইঁটের টুকরো ছুঁড়ে মারল। ইঁটের ধাক্কায় মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে রাস্তায় দাঁড়িয়েছি যেন।

আমি ভিতরে বেপরোয়া, ভয়ংকর জেদী পশুর মত। যেন কিছুই শুনিনি, কিন্তু ভিতরে ভয় অসহায়তা, ওপরে তাচ্ছিল্য নিয়ে প্রায় দৌড়নোর মত হাঁটতে লাগলাম। কোন দিকে যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি—এসব মনে

নেই। শুধু আমি বুঝতে পারছি, আমি ভীষণ ঘামছি, অফিসের জামা-কাপড়ে সারাদিনের ঘামের ওপরে এখনকার ভেজা অবস্থা বিশ্রী গন্ধ ছড়াচ্ছে। কিন্তু আমি নিরুপায়। যেন আমি বাঁচতে চাই, আমার ডুবে যাওয়ার মুহূর্তের সেই ভয়ংকর শ্বাসকষ্ট থেকে একটু শান্তি চাই—এই ভেবে খানিকটা স্থলভাগ পেয়ে তাকে একমাত্র নির্ভর জেনে পাগলের মত পালাচ্ছি।

এমন হাঁপাতে হাঁপাতে আমি এ কোথায় এলাম! থমকে দাঁড়ালাম, জায়গাটা ঠাহর করতে পারছি না। আলোর থেকে অন্ধকার এখানে বেশী। রাস্তা নির্জন। মনে পড়ছে, কিছু সময় আগে একটা ট্রাম রাস্তা পেরিয়েছি, পেরিয়েই একটা গাড়ির তলায় যেতে যেতে কোনরকমে বেঁচে গেছি। গাড়ির ড্রাইভার হঠাৎ ব্রেক কষে দাঁতে দাঁত চেপে বিড়বিড় করে গালাগাল দিয়েছিল 'শালা কুত্তার বাচ্চা, রাস্তা চলতে জানে না! শালার মরার সাধ। আমি তাকাই নি। মুহূর্তের মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে সেই যে হেঁটেছি, এখন এখানে। কিন্তু এ রাস্তাটা কোথায় গেছে, কেন এদিকে এলাম?

থমকে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট চোখে গলি বরাবর সোজা সামনে তাকালাম। আমি বোধহয় গঙ্গার ধারে এসে গেছি। ঝির ঝির করে বাতাস গায়ে লাগল। আমি বুকের নিঃশ্বাস সামলাতে এগিয়ে গেলাম।

গঙ্গার ধারে এসে থমকে দাঁড়ালাম। এমন অসহ্য গরমের দিনে চারপাশে লোকজন গিজগিজ করছে। গঙ্গার গা বেয়ে ঢালের ওপর, পাড়ের রেখায়, রেলিং-এ বসে আছে ভিড় করে। আমি ঈষৎ ঠান্ডা বাতাস গায়ে মাখতে মাখতে দূরের ওই নির্জন ছায়াময় গাছের নীচে বসার জন্যে এগিয়ে গেলাম।

এখানটা অন্ধকার। অথচ সামনেই গঙ্গা চমৎকার দৃশ্যময়। বসেই মনে হল, কটা বাজে? হাতঘড়ি দেখলাম, সাড়ে আটটা! আমি ঘাসের ওপর বসে একটা সিগারেট ধরালাম। আমার হাত কাঁপছে এখনো। ঠোঁট থেকে দু'বার সিগারেটটা পড়ে গেল। তৃতীয়বার শক্ত করে সিগারেটটা দু' ঠোঁটের মাঝখানে চেপে দেশলাই কাঠি জ্বেলে ধরলাম।

এখন মনে হল আমি ভীষণ ক্লান্ত। আর বোধ হয় কোনদিন এই মাটি ছেড়ে উঠতে পারব না। অথচ একটু আগে কি ভয়ংকর শক্তি ছিল গায়ে। চাঁপার ঘর থেকে বেরিয়ে কি ভীষণ জোরে, সমস্ত কিছু তুচ্ছ করে এতটা হেঁটেছি। আর এখন!

আমি একভাবে সিগারেট টানতে লাগলাম। বুকের মধ্যে হৃৎপিন্ডের সেই দপদপ শব্দ নেই। কেমন নিস্তেজ হয়ে গেছি আমি। অথচ আধঘন্টা আগে আমি চাঁপা দাসীর ঘরে ছিলাম ওর নাম চাঁপা জানতাম না। রাস্তা থেকে ওদের একতলায় ঢোকার মুখে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছি, কয়েকটা মেয়ে আমার সামনে এগিয়ে এল।

'আমি ওপরে যাব।' আমি বিড় বিড় করেছিলাম। কারোর দিকে তাকিয়ে ছিলাম কিনা জানি না। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার মধ্যে ভয়ংকর এক দুর্ঘটনা অপেক্ষা করছিল।

'এই ওপরের ঘরে যাবে।' কে একজন চাপা গলায় বলেছিল।

'অ চাঁপা, তোর তো এবার!'

যে মেয়েটি আমার সামনে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল, সে বলল, 'আসুন।'

আমি ওর পিছন পিছন এগোচ্ছি, কানে এল—'চাঁপার ভাগ্যটা ভালো রে। সহজেই পেয়ে গেল।'

আমার তখন শক্ত শরীর। আমি একভাবে ফর্সা মেয়েটার পিছন পিছন উঠে ওর ঘরে ঢুকেছি।

'বসুন।' চাঁপা আমাকে বসার জন্যে নীল চাদর পাতা তক্তপোষের বিছানা দেখিয়ে দিল।

আমি অভিভূতের মত বসেই বলেছিলাম, 'আপনার নাম কি?'

'চম্পারাণী দাসী। সকলে চাঁপা বলে ডাকে' চাঁপা আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। ওর মুখে পান ছিল। চিবোতে চিবোতে একসময় উঠে গিয়ে ফেলে দিয়ে মুখ ধুয়ে এসে বসল। 'আপনি বুঝি নতুন? এত কাঁপছেন কেন?' চাঁপা বেশী হাসল।

আমি ওর কথার জবাব না দিয়ে বললাম 'এ লাইনে এসেছেন কেন? বিয়ে করে ঘর সংসার করতে তো পারেন।'

বিকট শব্দে হেসে উঠল চাঁপা। 'ঠিক বুঝেছি, আপনি নতুন। যারা নতুন আসে, তারা এসব কথা বলেই সময় কাটায়।' আবার হাসতে লাগল চাঁপা।

আমি চাঁপাকে দেখছি। রং ফর্সা, বছর পঁয়ত্রিশের একটি মেয়ে। মুখের প্রসাধনের আড়ালে এমন নির্মম ছায়া লুকোনো থাকতে পারে কোন মেয়ের মুখে, আমার ধারণা ছিল না। গায়ে কিছু মাংস আছে, খোঁপা অনেক কাঁটা দিয়ে শক্ত করে লাগানো।

'কি দেখছেন এমন করে?' চাঁপা খিল খিল করে হেসে উঠল। মুহূর্তে কাপড় খসে গেছে বুক থেকে।

'আপনার সিঁথিতে তো সিঁদুর আছে। বিবাহিত —' আমি জানি আমি ভিতরে ভীষণ কাঁপছি, শুধু নিজেকে সামলাবার জন্যেই এমনভাবে বলে চলেছি।

'এমনি সিঁদুর পরতে হয়। বিয়ে হবে কি করে?' চাঁপা একটু এগিয়ে এল আমার দিকে।

'কেন?' আমি সিঁথির সিঁদুর দেখছি।

সংসার করলে ছেলেপুলে দরকার। আমাদের ছেলেপুলে হবে না। এখানে আসা থেকেই ডাক্তার দিয়ে সে পথ বন্ধ করে দিয়েছি।' একটু থামল চাঁপা। 'আপনার ছেলে মেয়ে আছে বুঝি?

হ্যাঁ, আছে। মনে মনে বিড় বিড় করতে করতে চাঁপার দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

'আপনি এলেন কেন?' লাল ছোপ ধরা দাঁতে হাসতে হাসতে আরও এগিয়ে এল চাঁপা। আমার হাত ধরল। 'গান শুনবেন, না এখনি চলে যাবেন?' চাঁপা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ওর বুকের কাপড় কোলের ওপর লুটোচ্ছে।

আমি কেন এলাম। হঠাৎ কথাটা শুনে তখনি যেন মনে হয়েছিল। আর চাঁপা আমার হাত স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার বাড়ি, আমার স্ত্রী অশোকা, স্বর্গীয় বাবা-মার মুখ, আমার ছেলে-মেয়ের কথা চকিতে মনে হতেই 'বাবাই'—আমার এই ডাকনামে সেই মুহূর্তে কেউ যেন ডেকে উঠেছিল।.........

'কটা বাজল বলুন তো?' ঈষৎ দূরে [illegible] বয়স্ক ভদ্রলোক সময় জানতে চেয়ে কথা [illegible] তেই আমার সম্বিত ফিরে এল। ভদ্র[illegible] দিকে তাকিয়ে ঘড়ি দেখলাম। [illegible] বাজতে দশ' বলে আমি একটু আগে [illegible] স্মৃতিতে হাঁপ-ধরা বুক থেকে [illegible] নিঃশ্বাস ফেললাম। হাতের সিগারেট [illegible] নিভে গেছে।

মুখের ভিতরটা তেতো লাগছে। সারাদিন অফিসে থাকার পর কিছু না খাওয়ায় পিত্তি পড়েছে হয়ত। নাকি সস্তা সিগারেটের ধোঁয়ায় এমন মুখ তেতো [illegible] দৌড়োয় [illegible] পড়ে কনকন করতেই সোজা সজুত হয়ে বসলাম। হঠাৎ যেন চারপাশ থেকে বাতাস চলে গেছে। গুমোট গরমে বুক চাপা অবস্থা যেন এখানেও। সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে করছে না।

চাঁপার ঘরে কেন গিয়েছিলাম—চাঁপাও আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল। অথচ সেই মুহূর্তের আগে পর্যন্ত একবারও আমার নিজের মনে হয়নি কথাটা। আমিও ভাবিনি, কিসের জন্যে অশোকার স্বামী, ন বছরের মেয়ে ও একটি পাঁচ বছরের ছেলের পিতা, আমি, সতীশ পালিত, প্রায় আটত্রিশ বছরের একজন যুবক বেশ্যার ঘরে ঢুকেছি।

ঠিকই, সেই মুহূর্তে কোন চিন্তা ছিল না। কিন্তু তার আগে, কতবার যে আমি নিজেকে শেষ করতে চেয়েছি! নিজের চিন্তায় নিজেই আঁতকে উঠলাম। চাঁপার ঘরে আসার আগেও তো একবার ভেবেছিলাম, আমাদের পুরনো ওই ভাড়াটে ভর্তি বাড়ির ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি। তা না করে একসময়ে রাস্তায় বেরিয়ে পাড়ার অতি-পরিচিত ওষুধের দোকান থেকে কিছু ঘুমের বড়ি কেনবার কথাও তো ভেবেছিলাম! চাঁপাদের পাড়ায় ঢোকার আগে পার্কের সামনে দোতলা বাসের চাকাটার দিকে তাকিয়ে একবার গা গুলিয়ে উঠেছিল না? সেই মুহূর্তে গায়ের রক্ত সমস্ত মাথায় জমে গিয়েছিল না?

কি ভেবে আমি একটু আগে বেশ্যা... ঢুকেছিলাম? হঠাৎ এই মুহূর্তে ... নিজের ভাবনায় আমি উত্তেজিত বোধ করছি। আমার ভিতরটা আবার ঘামে ভিজে গেছে।

...ট্যাকের জোর যখন নেই বিয়ে করতে গিয়েছিলে কেন? সামনেই তো বেশ্যা-পাড়া ছিল!' অশোকা চেঁচিয়ে উঠল।

একতলার একখানামাত্র স্যাঁতসেঁতে ঘর। সামনে ছোট দালান, অন্ধকার, চাপা। ওপাশে জিনিসপত্তরে ডাঁই-করা রান্নাঘর। আমি রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে জল খাচ্ছি।

'অশোকা, সাবধানে কথা বলো। ছেলেটা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে।' আমি ঠান্ডা গলায় বললাম।

'আমাকে সাবধান করতে এসো না। তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার ঘেন্না ...'

আমি নীরব থেকে অশোকাকে দেখছি। ..., রুগ্ন বিষণ্ণ চেহারা অশোকার। গাল তোবড়ানো, বড় বড় চোখ দুটি ভিতরে ঢোকা। মাথার চুল উঠে গেছে অনেক। শরীরের কোথাও এতটুকু মাংস নেই। অ্যানিমিয়া থেকে কোন রকমে ধার-দেনা করে সামলে নিয়েছি।

বললাম, 'তুমি তো জানি, যা ধার হয়ে আছে, আর কেউ দেবে না।' আমি ঘরে এসে বসলাম। জামাটা এবার ছাড়ব বলে বোতাম খুলেছি।

'আমি সব জানি। কিন্তু এখন চলবে কি করে?'

'আমি কি করে জানব?'

'বাঃ' অশোকা যেন ভেংচাল। মুখ ভেঙালে অশোকাকে কুৎসিত দেখায়। 'তা হলে আমাকে বাইরে বেরতে বল।' একটা ঘরে তো ছেলে-মেয়ের জন্ম দিয়েছি, আর একটা ঘরে যাই তাদের খাওয়া-পরার জন্যে। তোমার বাবা-মা বুঝি তাই শিখিয়েছে।'

'চুপ কর।' ভীষণ জোরে ধমক দিলাম। ক্রমশঃ মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছিল। সহ্যের একটা সীমা আছে।'

'তোমার নয় ...' অশোকা শরীরের হাড় ক'খানা মুড়ে-ভেঙে ঘরের কোণে বসে রইল।

আমি চুপ করলাম। একদিন নয়, বিয়ের কদিন পর থেকেই অশোকার এই মূর্তি দেখে আসছি। আমার তখন সবেমাত্র বড় মেয়ে রূপা পেটে এসেছে। মেয়েকে মানুষ করতে গেলে, টাকা চাই অনেক। অভাবের সংসার আর নয়। ভাল চাকরী দেখ, টাকা রোজগার কর। অশোকা বার বার বলত। আমিও মনে মনে চাইতাম। কিন্তু রূপা হওয়ার পরও বাবলু এল। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি।

ছোট ছেলে বাবলু পাঁচ বছরের। রূপা বড় হয়েছে, বাইরে সমবয়সী মেয়েদের মধ্যে গিয়ে খেলে, গল্প করে। বাবলু বাইরে যায় না। ও এগিয়ে এসে মায়ের সামনে দাঁড়াল।' মা, দিদি কোথা?

হঠাৎ অশোকা ঠাস করে একটা চড় মারল বাবলুর গালে। ঘরে ছিটকে গিয়ে গড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে রইল বাবলু। কয়েক মুহূর্ত।
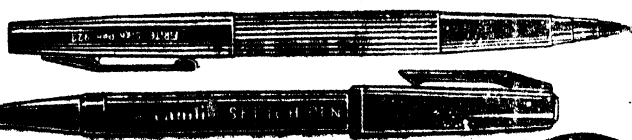
আমি দ্রুত উঠে দাঁড়ালাম। 'এ কি করলে।' অশোকার দিকে তাকিয়ে কথাটা বলেই বাবুলকে তুলে ধরলাম

'মরে যাক। ওদের মা আমি নই।' খন খন করে বেজে উঠল অশোকার গলা।।

আমি বাবুলকে সামনে ধরে দেখি বাবুল চোখ বুজিয়ে হাঁপাচ্ছে। মার খেতে অভ্যস্ত ওরা, জানি, কিন্তু এমন! আমি সারাদিন অফিসে থাকি, এদের দেখিনা। অশোকা এই করে! আমার ভয় করল। দ্রুত মুখে জল ছিটোলাম। কয়েকবার চুমু খেলাম। জোরে জোরে নাড়া দিয়ে ডাকলাম। একসময়ে বাবুল ফুঁকিয়ে কেঁদে উঠল।

আমার চোখে জল। নিঃশ্বাস দ্রুত। আমি বাবুলকে কোনরকমে থামিয়ে মেঝেয় শুইয়ে দিলাম। বাবুল, কেন যেন, ঘুমিয়ে পড়ল।

আমি এতক্ষণ অশোকার দিকে তাকাই নি। অশোকা দশ বছর ধরে এভাবে আমাকে শাসন করে এসেছে। আমার অক্ষমতা, অসহায়তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে। জামার বোতামগুলো খুলেছিলাম। আবার পরলাম। তাকালাম অশোকার দিকে। আমার মাথার মধ্যে ট্রাম যাওয়ার গুরগুর শব্দ। রগ দুটো দপ দপ করছে।

বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়ালাম।

'কোথায় যাচ্ছ?'

'যে দিকে ইচ্ছে।'

'রাগ দেখাচ্ছ?' তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল অশোকা।

'ওটা কি তোমার একার অধিকারে?'

'না, তা নয়। কিন্তু কার ওপর?'

'নিজের ওপর।'

'নিজেকে নিয়ে যা পার কর, আমাদের ব্যবস্থা কর।'

'আমি কিছু জানি না।' বেপরোয়ার মত এগোলাম।

অশোকা হঠাৎ এগিয়ে এল। সামনে দাঁড়িয়ে পথরোধ করল। 'যাওয়ার আগে আমার কথার জবাব দাও।

'তোমার কথার জবাব? ঘেন্না করে তোমার সঙ্গে কথা বলতে!'

'ও, তাই! কেন, আমি দেখতে খারাপ বলে। আমার কিছু নেই বলে!'

এ কথাগুলো শুনে শুনে অভ্যস্ত আমি। কিন্তু কেন যেন রেগে গেলাম। 'ঠিক তাই। কি তোমার আছে আমাকে ধরে রাখার। শরীরে এতটুকু মাংস রেখেছ? ওই কখানা হাড়ে একটা সুস্থ পুরুষ কিছু পায় না।'

'কি, কি বললে!'

ঠিকই বলেছি। বেশ্যারা তোমার থেকেও পরিষ্কার থাকে। তোমার জন্যে যা টাকা খরচ করেছি, অন্য জায়গায় কম খরচে অনেক পেতাম।' বলেই প্রায় ঠেলে সরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

অশোকাকে কোনদিন এরকম কথা বলিনি: দশ বছর ধরে যা বলেছে, তাই করেছি। যা পেয়েছি, তাই ওকে দিয়েছি। কিন্তু আজ চাঁপার ঘরে ঢোকার আগে অশোকার কাছ থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসার পর আমি নিজেকে নিঃসহায় ভেবেছিলাম, ঘর থেকে বেরিয়েই ভেবেছিলাম, পুরনো বাড়ির ছাদের কথা। রাস্তায় বেরিয়ে পাগলের মত ছটফট করে কখন যেন চাঁপার ঘরে ঢুকে পড়েছিলাম।

কিন্তু সেখান থেকে কে যেন আমায় ডেকে এখানে নিয়ে এল! কে? আমার মা-বাবা? শুধু তাঁরাই তো আমাকে 'বাবাই' বলে ডাকত। কতদিন মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে 'বাবাই' নামের সঙ্গে মিল রেখে মায়ের নিজেরই বানানো ছড়া শুনেছি! সেসব ছড়া কতদিন আমার মুখস্ত থাকত। এখন সব ভুলে গেছি।

নাকি রূপা আমাকে 'বাবা' বলে ডেকেছিল? বাড়ি থেকে বেরুবার সময় রূপা ছিল না। রূপার সঙ্গে দেখা হয়নি। রূপাই বুঝি আমাকে ডেকেছে! কেন যেন রূপার কথা মনে পড়ছে। রূপা বাড়িতে, আমায় খুঁজছে! আর আমি এখন কোথায়, কতদূরে!

ভয়ংকর এক চাপা ভয় আর উত্তেজনায় ভিতরে আতকে উঠলাম। আমার চারপাশ ভুলে ভাবনার মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম। এই মুহূর্তে সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে থাকা এক দম্পতিকে দেখলাম। সঙ্গে একটি মেয়ে: সম্ভবত ওদেরই এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছে।

'সত্যেন, তোর মেয়েটা খুব সুন্দর হয়েছে রে! ঠিক তোর মত।'

'না, ঠিক বললি না।' সত্যেন নামে যুবকটি হাসল। স্ত্রীর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'মেয়ে ঠিক ওর মায়ের মত, আগন্তুক পরেরটা আমার জন্যে ঠিক আছে।' হো হো করে হেসে উঠল ওরা।

......'মেয়েটা কার মত হবে বলতো?' এক বছর যেতে না যেতেই মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে অশোকা বলেছিল।

'ঠিক তোমার মতো।'

'যাঃ, তোমার মতন লম্বা হবে, স্বাস্থ্য পাবে। মুখের নীচের দিকটাতে তোমার মুখেরই একটা অংশ একেবারে ছাঁচে তোলা!'

'তার মানে তুমি-আমি মিলিয়ে আছি।'

হঠাৎ আমার কি হল, আমি ছিটকে মাটি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। সামনের ওরা হেসে ভেঙে পড়ছে। আমি ওদের হাসির মধ্যে কারোর কথা শুনতে পেলাম না। মনে হল, আমাকে কেউ যেন ডাকছে! 'বাবাই' বলে ডাকছে কেউ। আমার মা, নাকি, আমার মায়ের মত আমার মেয়ে!......'বাবা, মা বলছিল, দিদা নাকি তোমাকে 'বাবাই' বলে ডাকত! আমি তোমাকে 'বাবা' বলে ডাকব।

আমি তো তোমার ছোট 'মা'।

ছোট করে ডাকব!—চিবুক ধরে, রূপা আরও ছোট ছিল যখন, কতবার একথা বলত!

আমি ভয়ংকর এক উত্তেজনা বোধ করছি ভিতরে। কোনদিকে না তাকিয়ে আমি, কেন যেন, পাড়-মরি করতে করতে বাস-ট্রাম ধরে বাড়ির দিকে এগোলাম।

বাড়ি ফিরে ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখি, রান্নার উনুনের সামনে অশোকা গালে হাত দিয়ে নিঃসাড় বসে আছে। আমার পদশব্দেও পিছন ফিরল না।

আমি ঘরে ঢুকতেই রূপা চেঁচিয়ে উঠল, 'এই তো বাবা, এসে গেছ। আমি তোমার সঙ্গে কিছুতেই কথা বলব না!'

'কেন মা!' আমি মেঝেয় ওর স্কুলের বই ছড়িয়ে রাখা জায়গাটার সামনে বসে পড়লাম। একটু দূরে বাবুল একভাবে ঘুমিয়ে পড়ে আছে।

'তুমি অফিস থেকে এসেই চলে গেলে কেন?' রূপার গলা একটু যেন ভেজা!

'তুমি আমায় দেখেছ?' আমি মেয়ের মুখ খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম।

'দেখিনি! আমি দোতলায় রমাদের ঘরে গিয়েছিলাম। নীচে নেমেই দেখি, তুমি চলে যাচ্ছ। কি তাড়াতাড়ি যাচ্ছিলে! কতবার তোমায় ডাকলাম, তুমি সাড়াই দিলে না! পেছন ফিরে একবার দেখলেও না! আমি তোমার সঙ্গে আর কথাই বলব না!'

'এই তো এসেছি!' আমি রূপাকে কোলের ওপর টেনে নিলাম। 'মা, দেখি তোমার মুখটা।'

'কেন!' রূপা অবাক হয়ে আমার চিবুক ধরে আমার দিকে তাকাল। 'কি দেখছ বাবা! আমি খুব সুন্দর দেখতে কিনা?' বলেই হাসতে লাগল রূপা। 'বাবা তুমি খুব ভাল!'

আমি রূপার মুখের দিকে স্থির তাকিয়ে রইলাম। অনেকদিন পরে রূপাকে এমন খুঁটিয়ে দেখলাম। রূপার মুখের নীচের দিকটা, যত বড় হচ্ছে, আমার মত। চোখ, কপাল একেবারে অশোকার কেটে বসানো! বিয়ের সময় অশোকার যেমন সুন্দর স্বাস্থ্য ছিল, রূপা সেরকম হয়ে উঠছে। রং, লম্বায় আমি। রূপা কেমন সুন্দরভাবে অশোকা-আমি মিলিয়েই হয়ে উঠছে।

আমি আমার শুকনো দু'চোখ আর শূন্য বুক ভরে আমার মেয়ের মুখ ছবির মত স্থির রেখে দেখতে লাগলাম। আমার দুচোখে হঠাৎ জল। বুকেও।
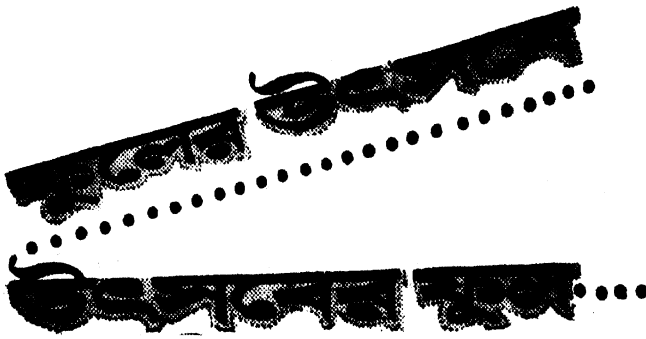
রোববারের সকালে হাতিবাগানের রাস্তাগুলি জমজমাট থাকে। অফিসের ব্যস্ততা নেই। ছুটির দিনের হাল্কা মেজাজ নিয়ে সবাই চলাফেরা করেন। ভেতরে মাছের বাজার। পাশেই তরিতরকারীর দোকান। তবু অনেকের হাতে বাজারের থলে থাকে না। পরনে পাজামা। গায়ে পাঞ্জাবী। কেউবা আসেন, পাখির খোঁজে।

এখানে পাখি পাওয়া যায়। কোকিল, টিয়ে, ময়না, বুলবুলি, পায়রা। এমন কি তিতিরও। কোনো পাখি পোষ মানে। কোন পাখি মানে না। যাঁদের বাড়িতে অ্যাকোরিয়াম আছে, তাঁরা লাল, নীল মাছের খোঁজ করেন। কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে যায় ফুলের দোকানের আনাগোনা।

গ্রে স্ট্রীটের খানিকটা জায়গা জুড়ে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের মুখ পর্যন্ত, দোকানীরা ফুলের টব, ফুলের চারার অস্থায়ী দোকান সাজিয়ে বসেন। ফুলের চারা বিক্রী হয় কুঁড়িসুদ্ধ। বর্ষাশেষে মৌসুমী ফুলের চারায় বাজার ছেয়ে যায়। দামেও সস্তা। তবু চাহিদা বেশী গোলাপ, রজনীগন্ধা, জুঁই, বেল, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা প্রভৃতির।

•

রোববারের এইরকম একেকটি সকালের স্বাদই আলাদা। অভিজ্ঞতাও বিচিত্ররকম।

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

সেদিন দেখা হয়েছিল আমার এক অধ্যাপক বন্ধুর সঙ্গে। চন্দ্রমল্লিকার খোঁজে এসেছিলেন। পান নি। তাই, দুটো গোলাপ আর ডালিয়ার চারা কিনেছিলেন। ওর ছাদ ভর্তি এখন ফুলের টব। বললেন, আসুন না একদিন। চমৎকার দুটো গোলাপ ফুটেছে। দেখাবো। নতুন কয়েকটা ক্যাকটাসও সংগ্রহ করেছি। এমন জিনিস কিন্তু আর কোথাও দেখতে পাবেন না।

আমি তাঁকে জানি।

কয়েক পুরুষ ধরে কলকাতার বাসিন্দা। তবু নিজের বাড়ি নেই। ভাড়াটে বাড়িটাকেই নিজের বাড়ি করে নিয়েছেন। সারাদিনের কাজকর্মের পর, এই নিয়ে তাঁর সময় কাটে। এই তাঁর বিলাস। কোনো গাছে কুঁড়ি দেখা দিলেই বন্ধুবান্ধবদের কাছে খবরটা ছড়িয়ে দেন। ফুল ফুটলে তো আর কথাই নেই।

কলকাতার কয়েক লক্ষ নাগরিকের মধ্যে তিনি সংখ্যালঘিষ্ঠের দলে। কিংবা তাঁর কোনো দল নেই। তিনি নিঃসঙ্গ। যাঁদের বাড়ি আছে, তাঁরা হয়তো ফুলের চারা কেনেন। টবে ফুলও ফোটে। কিন্তু বাসাবদলের নিয়মিত অভ্যাসে যাঁরা অস্থির, তাঁদের জীবনে বাগানের শখ থাকে না। দোকানের ফুলে ফুলদানি সাজাতে হয়।

আমি গাঁয়ে গিয়েছি। গাঁয়ে থেকেছি। অথচ, ফুলের ভালোবাসায় অবসর কাটান, এমন মানুষ বিশেষ দেখিনি। ফুল হয়তো
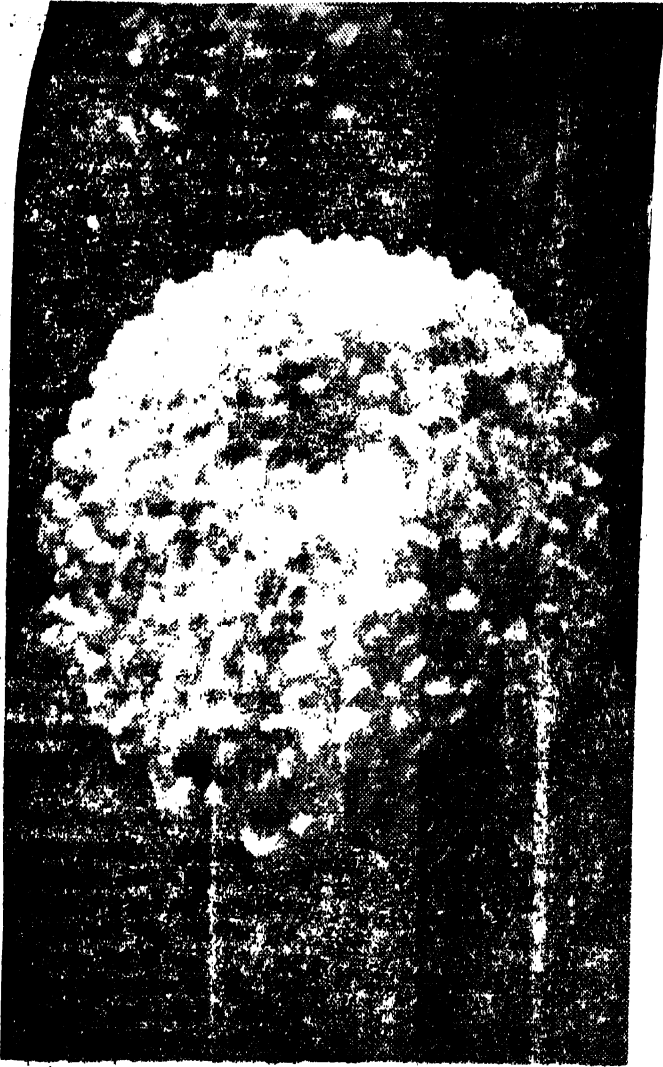
ওখানেও ফোটে। কিন্তু সেই ফুল সাধারণত ফুলদানিতে সাজানো হয় না। কারো বাড়ির উঠোনে দেখেছি স্থলপদ্মের গাছ। সকালবেলায় শাদা ফুলগুলি বিকেলে অন্য রকম হয়ে যায়। তবু কেউ তাদের ছিঁড়ে এনে ফুলের তোড়া বাঁধেন না। কখনো শিউলির গন্ধে সারা বাড়ী ম' ম' করে। সেই ফুলও বেশীর ভাগই উঠোনে ছড়িয়ে যায়।

প্রকৃতপক্ষে, গাঁয়ের মানুষ ফুল সম্পর্কে উদাসীন। শহরেই তার দরকার বেশী।

চৌরঙ্গী কিংবা গড়িয়াহাটের মোড়ে কোনো মহিলা যদি বেল কিংবা রজনীগন্ধার মালা খোপায় জড়িয়ে রাস্তা হাঁটেন, আমরা অবাক হই না। ট্রামে-বাসে এই রকম অনেকের সঙ্গেই দেখা হয়ে যায়। তাদের কাউকে চিনি। কাউকে চিনি না। কিংবা চিনলেও, তাদের জানি, কোনো ভদ্রলোকের বোন কিংবা স্ত্রী হিসেবে। দিদি কিংবা বৌদি হিসেবে। এইরকম অর্ধ পরিচয়ের অস্পষ্টতায় আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কগুলিই রহস্যময়।

কিন্তু গাঁয়ের মানুষ এখনো এতটা অস্পষ্ট হয়ে যায় নি। আইডেনটিটি হারায় নি। সমাজের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলে। শ্বশুরের ভাসুরের সামনে ফুল গোঁজা তো দূরের কথা, ঘোমটা খোলাই যায় না। প্রতিবেশীর সঙ্গেও কাকা, জেঠা, মাসি-পিসির সম্পর্ক।

নগরবাসী মানুষের জীবনে এই অতি-পরিচয়ের সঙ্কোচ নেই। শাসন নেই। এবং নেই বলেই, মেয়েরাও অনেকটা স্বাধীন হবার সুযোগ পায়। সাজসজ্জাকে আর্ট বলে ভাবতে পারে।

এই ভাবনার মূলে নাগরিকতা, একটা বড় কথা।

অন্য কারণও থাকতে পারে। সেটা শিক্ষাগত রুচির দিক। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন, জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার প্রতিক্রিয়া। সেই আদিমকালে মানুষ যখন প্রকৃতি-আশ্রিত ছিল, তখন সৌন্দর্য উপভোগের জন্য বিশেষ আয়োজন করতে হত না। কিন্তু জ্ঞানী মানুষ বন থেকে ফুলের চারা সংগ্রহ করে উদ্যান বানিয়েছে। প্রকৃতি-বিচ্ছিন্ন হয়েছে। তবু নিজেকে তৃপ্তি দিতে পারে নি।

এরই জন্য যা কিছু উদ্যোগ, যা কিছু আয়োজন।

বিভূতি বাড়ুজ্জের উপন্যাসে মাঠ ঘাটের বর্ণনা পেয়েছি। সৌখীন ফুলের বর্ণনা পাই নি। 'আরণ্যকে' দুধলি গাছের ফুলকে চিনেছি, নক্ষত্রের উপমায়।

গাঁয়ের মানুষ ওদের চেনে। মাড়িয়ে যায়। মাঠভর্তি মটর, সর্ষে কিংবা খেসারীর ফুল দেখে। বড়জোর অবন ঠাকুরের হৃদয়ের চোখ দিয়ে, ঐ মাঠকে, সতরঞ্চ খেলার ছক বলে ভাবতে পারে। তার বেশী নয়। তবু কোথাও যদি সৌখীন ফুলের বাগান দেখা যায়, তাহলে বুঝতে হবে, ঐ গাঁয়ে শহুরে রুচির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। কিংবা শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে।

এই তো সেদিনের কথা। কলকাতা থেকে চল্লিশ মাইল দূরের এক গাঁয়ে গিয়েছিলুম। তাজ্জব বনে গিয়েছি, ম্যাগনোলিয়ার ফুল দেখে। যে সে ফুল নয়, গ্র্যান্ডিফ্লোরা। বন্ধুকে বললুম, কোথায় পেলেন? এতো আমাদের দেশী ফুল নয়!

বন্ধু আমাকে বোঝালেন, ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। এই ফুল তিনি সংগ্রহ করেছেন অনেক কষ্ট করে, উত্তর আমেরিকা থেকে। আমাদের দেশেও এখন পাওয়া যায়। উদ্ভিদবিৎ পিয়ারে ম্যাগনলের নাম অনুসারে এই ফুলের নামকরণ হয়েছে ম্যাগনোলিয়া।

বুঝি, তিনি আমাকে পুষ্পরসিক ঠাউরেছিলেন। না হলে, এত কথা বলতেন না। তাঁর মতে, হালকা ছায়ায় ম্যাগনোলিয়া ভালো হয়। সুস্থ বোধ করে। গ্র্যান্ডিফ্লোরা অবশ্য রোদের তাপ সইতে পারে অনেকটা। তবে গাছের গোড়ায় জল জমলে বাঁচে না। ফুল ফোটার মাস দুয়েক আগে, গোবর কিংবা হাড়ের গুঁড়োর সার দিলে ফুল বড় হয়।

এসব তথ্য আমার ত অজানা।

তিনি বললেন, ম্যাগনোলিয়া গ্রুপের আরো অনেক ফুল আছে। যেমন পুমিলা, টেরোকার্পা, মিউটাবিলিস, ফসকাটা প্রভৃতি। সমতল বাংলায় এদের চাষ হয়। কিন্তু এখনো তেমন মর্যাদা পায় নি। গ্র্যান্ডিফ্লোরা এদের রাণী। এবং শ্বেতাঙ্গিনী। পুমিলা আর টেরোকার্পার রং শাদা। মিউটাবিলিস গাঢ় গিয়ে রঙেন।

এইসব আলোচনার পরেও, গাঁয়ের মানুষের সঙ্গে আমি তাঁর কোনো মানসিক সংযোগ আবিষ্কার করতে পারিনি। একালে তিনি কলকাতায় লেখাপড়া করেছেন। এখন পিতৃপুরুষের ভিটের টানে গাঁয়ের বাসিন্দা। চাষাদের সঙ্গে সংযোগ নেই। কলা, মুলোর চাষও করেন না। পাশের বাড়িতেই দোপাটি আর গাঁদা ফুল ফুটেছে বেগুন গাছের ফাঁকে ফাঁকে। ঐ ফুল পুজোর জন্য প্রয়োজন।

মুসলমান পাড়ায় ওসবের বালাই নেই।

কবি জসীমউদ্দিনের মুখে শুনেছি, তাঁর ছেলেবেলার গল্প। সেই বয়সে তাঁর ফুল ভালো লাগত। সেজন্যে হিন্দুপাড়ায় যেতেন ফুলের খোঁজে।

তবু, গাঁয়ের পথে 'ফুল চাই, ফুল' বলে কোন ফেরিওয়ালা চেঁচায় না। দরকারও হয় না। ওখানে নগদ পয়সার খদ্দের নেই। শহর এবং শহরতলিতেই কেবল কাঁচা পয়সার কারবার। চাল, ডাল, তেল, নুন, মাছ, পালং, শাকসব্জী সবই নগদ পয়সায় কিনতে হয়।

প্রকৃতিবিচ্ছিন্ন মধ্যবিত্ত মানসিকতার এই এক ট্রাজেডি।

কলকাতার পাশেই ভাগীরথী। তবু জীবনে নদীর প্রবাহ নেই। কয়েক আনা খরচ করলেই গ্রামে যাওয়া যায়। তবু জীবনে সজীবতার একান্ত অভাব। আউটরাম ঘাটে বসে সিনেমার গল্প, বোনাসের আন্দোলন, চিত্রতারকার কেচ্ছাকাহিনী প্রায়ই আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে।

কিছুকাল আগেও, কলকাতার নিষিদ্ধ পাড়ায় মধ্যরাত্রের অলিগলি ফেরিওয়ালার ডাকে রহস্যময় হয়ে উঠত : 'চাই রজনীগন্ধার মালা, বেলফুল।' কোনো বিত্তবান যুবক হয়তো শান্তির খোঁজে সেখানে যেতেন। হাতে জড়িয়ে নিতেন বেলফুলের মালা। মুখে অ্যালকোহলের গন্ধ। তবু, তার বুকের ফাঁকা জায়গাটা পূর্ণ হত না। হাহাকার জাগত।

সেই অতৃপ্তি তো গোটা নগর-জীবনেরই।

এখন টালা থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত প্রতিটি রাস্তার মোড়ে ফুলের দোকান রয়েছে। জুঁই, বেল, রজনীগন্ধার মালা পাওয়া যায়। এখানে ফুলের উৎসব নেই। তবে উৎসবের ফুলে নিজেরা সাজে কিংবা অন্যকে সাজায়। এটা বিত্তবানের ক্ষেত্রে যেমন বিত্তহীনের ক্ষেত্রেও তেমনি সত্য। আমি এমন মানুষকে দেখেছি, যার বাড়িতে ফুলদানি নেই, সারা বছরেও ফুল ঢোকে না। কিন্তু বড়বাবুর মেয়ের জন্মদিনের খবর রাখে। নির্দিষ্ট তারিখে ফুলের তোড়া পাঠায়।

কলকাতা যতগুলি সরকারী এবং বে-সরকারী অফিস আছে, সেখানে মিস্টার বাসু, মিস্টার দত্ত, মিস্টার লাহিড়ী, মিস্টার ব্যানার্জী কিংবা মুখার্জীরা চাকরী করেন। তাঁদের পদোন্নতি, ট্রান্সফার, জন্মদিন এবং বিদায়সভা আছে। এবং প্রতিটি ব্যাপারেই কিছু রজনীগন্ধা, দু-একটা ফুলের মালা প্রয়োজন। গোলাপ, পদ্ম, সূর্যমুখী, ডালিয়াসহ দেবদারু বাঁধা ফুলের তোড়াও এই উপলক্ষে অনেকে উপহার দেন।

তাছাড়া আছে অফিস ক্লাবের বার্ষিক অনুষ্ঠান।

এ জাতীয় অনুষ্ঠানগুলি সাধারণত হয়ে থাকে কোনো নাট্যমঞ্চ ভাড়া করে, কিংবা

সিনেমা হলে। কেরানীর স্ত্রী থেকে অফিসার গিন্নী পর্যন্ত প্রায় সকলেই সপরিবারে তাতে অংশ নেন। কেউ নিজের স্ত্রীকে অন্যের চোখে ছোট হতে দিতে চান না বলেই হয়তো সাজগোজের বাহারেও টেক্কা দিতে প্রস্তুত। সভাপতির টেবিলে রাখা ফুলের তোড়া থেকে নাট্যমঞ্চের শেষ আসনে বসা মহিলার চুলে জড়ানো ফুলের মালাটি পর্যন্ত সব মিলিয়ে কেমন যেন রোমান্টিক পরিবেশ তৈরী করে। কেউবা অনুষ্ঠান শেষে অফিসার, কিংবা ম্যানেজিং ডিরেক্টর কিংবা কোম্পানী মালিকের সঙ্গে নিজের বউকে পরিচয় করিয়ে দেন, এই আমার স্ত্রী রীনা। ভালো রবীন্দ্রসংগীত গাইতে পারে।

আধুনিক সংগীত এখনকার ফ্যাসান নয়।

কলকাতা এই রকম এক আশ্চর্য শহর। এখানে গানের ইস্কুল আছে নাচের ইস্কুল আছে। এমনকি, ফুল সাজাবার ট্রেনিংও দেওয়া হয়। গাঁয়ের পথে নাচিয়ে মেয়ের সমূহ বিপদ। কারো খোঁপায় ফুল দেখা গেলে তো কানাকানি শুরু হয়ে যায়। মেয়ের মনে রং ধরেছে!

ব্যতিক্রম দেখেছি আমি সাঁওতাল পরগণায়।

আদিবাসী মেয়েরা ফুল ভালোবাসে। কিন্তু ফুলের মালা পরে না। কালো সাঁওতাল যুবতীরা গায়ে ধবধবে শাদা কাপড় আঁটি-সাঁটো করে পরে। চুল বাঁধে টান টান করে। কখনো তাদের চুলে দেখা যায়, কোনো একটি লাল কিংবা সাদা ফুল। অনেক সময় জবা কিংবা ধুতরো ফুলও গুঁজে নেয়। দেখতেও খারাপ লাগে না।

শহরে সাদা ফুলেরই ব্যবহার বেশী। লালের মধ্যে গোলাপ কিছুটা অভিজাত। রজনীগন্ধার মালায় লকেটের মতো কাজ করে। আসল কথা, নাগরিক জীবনে ফুলের ব্যবহার এখন সর্বত্র সম্প্রসারিত।

অনেক কাল আগের কথা বলছি।

ভিক্টর হুগোর 'হ্যানচ ব্যাক অব নোতরদাম' দেখেছিলুম সিনেমার পর্দায়। তাতে কি যেন সব পাপ পুণ্যের কথা ছিল। সমাজদর্শনের ইঙ্গিতও ছিল। সব ঘটনা আজ মনে নেই। তবে, গীর্জা-সংস্কারের আশ্রয়ে বেড়ে ওঠা একজন কুশ্রী মানুষকে অস্পষ্ট-ভাবে মনে পড়ে।

তাকে ভুলতে পারিনি।

কেননা, একজন তরুণীর সান্নিধ্যে তার হৃদয়ের উন্মেষ ঘটেছিল। ভালোবাসার জন্ম হয়েছিল। এবং সেই মুহূর্তে গীর্জার মাথায় ঝোলানো আংটার ফাঁকটি পর্যন্ত ঐ কুশ্রী মানুষটির নজর এড়ায়নি। তার কাছে তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছিল।

ঐ ফুল ছিল তার ভালোবাসার প্রতীক। হৃদয়ের ইঙ্গিতবাহী।

ঠিক ওরকম প্রতীকী অর্থে না হলেও, নগর জীবনে ফুলের ব্যবহার সর্বজনীন। শুধু একালে নয়, সেকালেও। ভিক্টর হুগো নিশ্চয়ই তা জানতেন। না হলে, ফুলের প্রতীকে ভালোবাসার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতেন না। সেইকালে নিশ্চয়ই য়ুরোপের নগর-জীবনে বিচ্ছিন্নতার সূত্রপাত হয়েছিল। নাকি কালিদাসের কালে, কালিদাস ছিলেন অনাগরিক?

আমার তা মনে হয় না।

তাঁর কাব্যে ফুলের ব্যবহার দেখেছি। ফুলের উপমায় মুগ্ধ হয়েছি। তাই বলে, রাজসভায় বসে তিনি নর্তকীর নাচ দেখেন নি, কেবল নূপুরের শব্দই শুনতেন—একথা ভাবতে পারি না। দক্ষিণ ভারতের দেবদাসীরা ফুলের গয়না পরতেন। ফুলের মালা গলায় পরে মন্দিরে নাচ দেখাতেন। রাজ পুরো-হিতের দৃষ্টি তাদের ওপরে কিভাবে পড়ত, সে খবর কোনো ধর্মগ্রন্থে লেখা নেই। তবে তারা যে সমাজবিচ্ছিন্ন ছিল, সে ব্যাপারে সকলেই নিঃসন্দেহ।

জানি না, তাদের জীবনে যন্ত্রণা ছিল কিনা।

তবে, অনুরূপ যন্ত্রণায় আমরা উৎসব প্রিয়। কখনো দেবতার নামে, কখনো মনীষীর জন্মদিনে কিংবা স্মৃতিতর্পণে, কখনোবা সংস্কৃতির নামে। সেই ফুল তৈরি জন্মায় না, গাঁয়ের চাষীরা যোগান দেয়। রেল কোম্পা-নীর কাছেও খবরটি অজানা। না হলে, টাইম টেবিলে উল্লেখ থাকত। টাটা থেকে সাতশো মাইল রাস্তা দৌড়ে কলকাতায় আসে, তার নাম স্টীল এক্সপ্রেস। কিন্তু রাত শেষ হবার আগেই যে ট্রেনটি পাঁশকুড়া থেকে হাওড়ার দিকে ছুটতে থাকে, তার কোনো নাম কেউ দেয়নি।

গাঁয়ের মানুষ তার নাম দিয়েছে, ফুলের ট্রেন।

ঐ ট্রেনে আসে গোলাপ, রজনীগন্ধা, পদ্ম, ডালিয়া, সূর্যমুখী, এমনি আরো অনেক ফুল। আসে অনেক সিজন ফ্লাওয়ার। গাঁদা দোপাটি, বেলপাতা, আমের শাখা, দূর্বা ঘাস প্রভৃতিও। কেননা, ভোর হওয়ার আগেই, ব্রীজের নিচে ফুলের বাজার বসে। ফুল বিক্রী হয়, ওজন দরে, গুনতি হিসেবে, শতকরা গুনতিতেও।

শিয়ালদার তরিতরকারীর বাজারের সঙ্গে এই বাজারের কোনো গুণগত পার্থক্য নেই। পার্থক্য আছে পণ্যের চরিত্রে। শিয়ালদায় ক্যানিংয়ের চাষীরা কলা, মুলোর চাহিদা অনুযায়ী দরদস্তুর করে। হাওড়ায় ফুলের দাম নিয়ে দর কষাকষি করে হাওড়া ও মেদিনীপুরের ফুল চাষীরা। তবে উভয় বাজারের খদ্দের এক রকম নয়।

হাওড়া ব্রীজের নিচে ফুল কিনতে আসেন, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা কিংবা তার আত্মীয়স্বজনেরা, পুজো কমিটির সেক্রেটারী কিংবা উদ্যোক্তাদের প্রতিনিধিগণ, সদ্য-প্রয়াত কোনো কোন ভদ্রলোকের শোকার্ত আত্মীয়-স্বজন। এবং আরো নানাশ্রেণীর দুঃখী, উজ্জ্বল, শোকার্ত, বিষণ্ণ, উৎসবমুখর ও উৎসবহীন মানুষ।

শুধু তাদের ওপরে ব্যবসা নির্ভরশীল নয়।

কলকাতা এবং শহরতলীতে যাঁরা ফুলের ব্যবসা করেন, তাঁরাই মূলত হাওড়া হাটের খদ্দের। সে রকম ছোট বড় ব্যবসায়ীর সংখ্যা প্রায় এক হাজার। নিউ মার্কেটের সৌখীন ফুল ব্যবসায়ী থেকে লেক মার্কেট, কলেজ স্ট্রীট, হাতিবাগান, শোভাবাজারের ফুটপাথের দোকানদাররা পর্যন্ত ঐ জোগানের ওপর নির্ভরশীল।

শোভাবাজারের দোকানীরা কুচো ফুল বেচে বেশী। পুজোয় লাগে। জবার মালা জুঁই, বেল, সূর্যমুখী, অপরাজিতাও পাওয়া যায়। যাঁরা অল্প ফুল কেনেন, তাঁদের চাহিদা এই ফুটপাথের দোকানীরাই মেটাতে পারে। ছেলের জন্মদিন, মেয়ের মুখেভাত, কিংবা বিয়েবাড়ির লক্ষ্মীপুজোকে তো আর উৎসব বলা যায় না।

তবে স্থানীয় স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভা, রবীন্দ্রজয়ন্তী, মেয়ে স্কুলের নৃত্যানু-ষ্ঠান কিংবা বিয়ে, বৌভাতে ফুলের দরকার হলে আগে থেকে অর্ডার দেওয়াই ভালো। বউয়ের পাতাসুদ্ধ গোলাপ, মেবদের পাতার মালা, পদ্ম, সূর্যমুখী, গোলাপের তোড়া মেয়েদের খোঁপায় পরার উপযুক্ত ফুলের অলংকার, ফুলদানির ফুল—সবই ঠিক সময়ে মিলে যাবে। লগ্নসায় বাজার হলে দামের তর তম হতে পারে।

নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠানে ফুল লাগে বেশ। একসঙ্গে বিশ-পঁচিশটি মেয়েকে সাজাতে হয়। একবার আমি একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে জেনেছিলুম, প্রায় তিনশ টাকা খরচ হয়েছিল ফুলের পিছনে।

অর্থাৎ, উৎসব না থাকলে ফুলের চাহিদা বাড়ে না। এবং উৎসব শেষে যখন ফুলদানিতে ফুল থাকে না, চারদিকের আলোগুলি ম্লান হতে থাকে, তখন মাড়িয়ে-যাওয়া দু-একটা ছেঁড়া ফুলের দিকে নজর পড়ে। বুকের শূন্যতা ঢাকা যায় না। বিশেষ করে, সকালবেলায় যখন আস্তাকুড়ের মধ্যে ফুলের মালাগুলিকে পড়ে থাকতে দেখা যায়, তখন উৎসবের নিয়তি ভেবে দুঃখিত না হয়ে পারি না।

তবু এখানে উপলক্ষও অনেক। উৎসবও অজস্র।

কলকাতার যত নাট্যশালা ও সিনেমা হল আছে, তার প্রত্যেকটিতেই প্রতিদিন চলছে, কোনো না কোনো উৎসব। ক্লাবের উদ্বোধন, লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী, কালচারাল ফাংশান, ফ্লাওয়ার্স কর্ণারের পুষ্প প্রদর্শনী, গুণী সম্বর্ধনা, গৃহপ্রবেশ, সংগীত সম্মেলন, ধ্রুপদী গানের আসর, সোলো প্রোগ্রাম, শততম অভিনয়ের উৎসব

রজত জয়ন্তীর সাজসজ্জা—এমনি আরো অনেক অনুষ্ঠানের মধ্যেই কলকাতার চাঞ্চল্যকে অনুভব করি।

নিউ মার্কেটে গেলে টের পাই, ফুলের চাহিদা কিভাবে বাড়ছে। বহু বড়লোকের বাড়িতে ওঁরা ফুল জোগান। সেই ফুল ফুলদানিতে সাজানো হয়। ফুলে মেজাজ প্রসন্ন রাখে।

এই খবর মেচেদার নিমাই মণ্ডলেরও অজানা নয়।

তিনি জানেন, বৈশাখ থেকে শ্রাবণ পর্যন্ত যখন রজনীগন্ধার মরশুম থাকে, তখন ফুলের চাহিদা সত্ত্বেও দাম বাড়ে না। কেবল ফাল্গুন মাসেই সুদে-আসলে কিছুটা উঠে আসে। রজনীগন্ধার শ বিক্রী হয় দশ-বারো টাকা।

তরিতরকারীর চেয়ে এই ফুলের চাষে লাভ বেশী। তবে চন্দ্রমল্লিকার চাষে তেমন লাভ হয় না। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, ঝড়, জল, ফুলের শত্রু। এ সম্পর্কে সতর্ক থেকেও পাশকুড়া, পারেট, মির্টগিরি, বৃন্দাবন চক, কোলাঘাট অঞ্চলের চাষীরা রজনীগন্ধার চাষ করে প্রায় সাড়ে তিন হাজার জমির ওপর।

কলকাতার মানুষ তার খবর রাখেন না।

নৃত্যশিল্পী অমলাশঙ্করের অভিজ্ঞতার কথাই বলছি। কলরোডার এক পার্বত্য এলাকায় তিনি গিয়েছিলেন নাচের দল নিয়ে। সেখানে লোকনৃত্য শিল্পীদের একটা শিক্ষণ-কেন্দ্র আছে। তাঁর ধারণা, ঐ রকম কোনো প্রাকৃতিক পরিবেশে, ফুলের সমারোহে, থাকলে শিল্পীরা যথার্থই জাতীয় ভাবাপন্ন হয়।

এই ঘটনা বর্ণনার সময় অমলাশঙ্কর আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। আমি প্রতিবাদ করিনি। কেননা, তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল আন্তরিক। স্নিগ্ধ। ফুলের ভালোবাসায় তিনি যতটা মুগ্ধ ছিলেন, গ্রামীণ স্বভাবে ততটা একাত্ম ছিলেন।

আমি তাঁর অনুষ্ঠান দেখেছি। কিন্তু যে ভূমিকায় তিনি নাচের অনুষ্ঠান করেছেন, সেই রাধা, সেই পার্বতী কি গ্রামের জীবনে আছে? না, নেই। কিংবা থাকলেও তারা ফুলের সাজে সাজে না। আমি কলকাতার মঞ্চে লৌকিক কাহিনীর নৃত্যরূপ দেখেছি। কিন্তু গাঁয়ে সেই কাহিনীর কোনো চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলেনি। আসল কথা, লোকসাহিত্যে গ্রামের লোক নেই। গ্রামীণ সত্তার পরিচয় আছে। বুড়ী ঠাকুমারা এককালে রূপসী ছিলেন হয়তো। কিন্তু তাঁদের সৃষ্ট রূপকথার গল্পের যে বর্ণময়তা, যে ঐশ্বর্য, তা লৌকিক জীবনের কোথাও নেই। সেই গল্প অতি-লৌকিকতার স্পর্শবাহী।

নির্বাসিত নগর-জীবনে আমরা তারই ছোঁয়া পাই।

কিন্তু পাশকুড়া, কোলাঘাট এলাকার পুকুরে, খালেবিলে, রেলের ঝিলে যে-চাষীরা পদ্মফুলের চাষ করে, তাদের কাছে ফুল-কুমারীর গল্প নেহাৎ-ই রূপকথার কাহিনী। তারা জানে, দুই শ একর জমিতে পদ্মফুলের চাষ করলে, কত লাভ হয়। কলকাতার দোকানদারদের তারা এ ব্যাপারে বিশ্বাস করে না। অনেকে সস্তা দামে পদ্ম কিনে কোল্ড-স্টোরেজে রাখে। তারপর চাহিদা বাড়লেই মওকা মারে। সেই ফুলে অনেক লাভ হয়।

এই লাভের জন্যই হাওড়া, মেদিনীপুরের চাষীরা এখন গোলাপের চাষ করছে। বিঘের পর বিঘে, মাইলের পর মাইল, যতদূর চোখ যায়, গোলাপ, রজনীগন্ধা, অ্যাস্টার, সূর্যমুখী, পদ্ম, ডালিয়া, গাঁদা অপরাজিতা, চন্দ্রমল্লিকার ক্ষেত উজ্জ্বল হয়ে থাকে।

সেই ফুল বিশুদ্ধতার প্রতীক, বিষন্নতার প্রতীক, উৎসবের উপকরণ।

যে-ফুলের স্পেশালের খবর রেল-কোম্পানী রাখেন না, যার উল্লেখ টাইম-টেবিলে নেই, সেই রহস্যময় গাড়ীটিই একদিন হয়তো নিজের প্রয়োজনীয়তাকে সশব্দে জাহির করবে। কেননা, শহর যতটা বাড়ছে, বিচ্ছিন্নতাও ততটাই বাড়ছে। ফুলের চাহিদাও আনুপাতিক হারে ক্রমবর্ধমান। অনেকে এরই মধ্যে সব্জীর চাষ ছেড়ে দিয়ে ফুলের চাষ শুরু করেছেন। ভবিষ্যতে আরও জমির দরকার হবে। খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে ফুলের চাষও চাই।

ফুল আমাদের বিচ্ছিন্নতার আশ্রয়। নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গী। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় এক লক্ষ মানুষ এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। কেবল হাওড়া ব্রীজের বাজারেই ফুল বিক্রী হয়, বার্ষিক প্রায় চার কোটি টাকার।

কুড়ি বছরের পত্রগুচ্ছ

ন্যু ইয়র্কের ম্যানহাটান শহরের এক পাড়ায় থাকতেন উৎসাহী তরুণী টেলিভিশন স্ক্রিপ্ট রাইটার হেলেন হানফ। দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে তিনি লণ্ডনের একটি পুরাতন বই-এর দোকানের সঙ্গে চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করেন। অনেকগুলি পত্র এই কুড়ি বছর ধরে বিনিময় করা হয়েছে আর তার মধ্যে গড়ে উঠেছে একালের এক আশ্চর্য প্রেম কাহিনী।

সম্প্রতি '৮৪, চেয়ারিং ক্রস রোড' নামক গ্রন্থটি এমনই একগুচ্ছ চিঠি দিয়ে গড়া। অত্যন্ত মানবিক স্পর্শ সংযুক্ত এই আনন্দ-বেদনাময় কাহিনী পাঠকচিত্তকে সজল করে তোলে। সেই সঙ্গে মনে প্রশ্ন জাগে কেমন সহজে এবং স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে একটি সাধারণ বিষয়বস্তু কিভাবে একটি মহৎ সাহিত্য গ্রন্থে পরিণত করা যেতে পারে।

'স্যাটার ডে রিভ্যু' পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় যে লণ্ডনের ৮৪ নম্বর চেয়ারিং ক্রস রোডের 'মার্কস অ্যাণ্ড কোং' পুরাতন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলীর ব্যবসা করে থাকেন। কুমারী হেলেন হানফ ন্যুইয়র্কের ১৪ নম্বর ইস্ট ৯৫তম স্ট্রীট থেকে 'মার্কস অ্যাণ্ড কোং' কর্তৃক প্রদত্ত এই বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হয়ে ১৯৪৯-র ৫ই অক্টোবর তারিখে লিখলেন—

'আমি একজন দরিদ্র লেখিকা। পুরাতন গ্রন্থ পাঠের রুচি আছে। আমি যেসব বই চাই তা যেমন দুষ্প্রাপ্য আবার তেমনই দুর্মূল্য। এখানে হয় অতি মনোহর বহুমূল্য রাজসংস্করণ মেলে নয়ত পাওয়া যায় ছেঁড়া-খোঁড়া স্কুল-বালকের হাত ফেরতা বই। আমার অবিলম্বে যা চাই তার একটা তালিকা পাঠাচ্ছি—যদি আপনাদের কাছে সেকেন্ডহ্যান্ড কপি এসব বইয়ের থাকে তাহলে পাঁচ ডলার পাঠাচ্ছি—একেই অর্ডার বিবেচনা করে বই পাঠান।'

সেই বছরেরই ২৫ অকটোবর মার্কস কোম্পানীর তরফে 'এফ পি ডি' নামাঙ্কিত একটি পত্র এল। এই পত্রে বলা হল—

আমরা আপনার সমস্যার ২।৩ অংশ সমাধান করতে পেরেছি। ধুকপোস্টে হ্যাজলিটের প্রবন্ধাবলী ও স্টিভেনসন পাঠাচ্ছি। লে-হান্টের প্রবন্ধাবলী এত সহজে পাওয়া যায় না। লাতিন বাইবেল আমাদের নেই, নিউ টেসটামেন্ট আছে...'

৩ নভেম্বর তারিখে মিস হেলেন জবাব দিলেন—

'বইগুলি নিরাপদে এসেছে—স্টিভেনসন এত ভালো এত নরম একটা বই যে এত আনন্দের সম্পদ হতে পারে জানতাম না। আমি পাউণ্ডের বিনিময় হিসাব জানি না আপনারা অঙ্ক ঠিক করে জানিয়ে দেবেন।'

এরপর চিঠি এল ৯ নভেম্বর। মার্কস কোম্পানীর তরফে 'এফ পি ডি' জানালেন—টাকা এসেছে। নিউ টেসটামেন্ট পাঠান হল। আশা করি আপনার ভালো লাগবে।'

১৮ নভেম্বর এই চিঠির জবাবে হেলেন হানফ লিখলেন—এ আবার কি ব্ল্যাক প্রোটেস্টানট বাইবেল? এ কি করেছে ওরা? এমন গদ্য নষ্ট করেছে? দেখবেন এর জন্য ওরা জ্বলে মরবে। আমি নিজে ইহুদী, আমার কাছে এ কিছু নয়। তবে আমার বউদি ক্যাথলিক। আর এক বউদি মেথডিস্ট, এক লাঁক প্রেসবিটেরিয়ান খুড়তুতো ভাই-বোন (আমার বড় কাকা আব্রাহাম খৃস্টধর্মে দীক্ষা নেন।) আমার এক খুড়ি 'ক্রিশ্চান সায়ান্স নিরাময়কারী', আমি জানি তাঁরা কেউই এই বাইবেল স্পর্শ করবেন না, যদি এর অস্তিত্ব জানতে পারেন। আপনাদের কাছে কি ল্যানডরের 'ইমাজিনারি কনভারসেস্যান' গ্রন্থটি আছে?'

২৬ নভেম্বর ১৯৪৯ তারিখে মার্কস কোম্পানীর তরফে এফ পি ডি লিখলেন—আমরা আপনাকে একখন্ড 'ওয়ার্কস অ্যাণ্ড লাইফ অফ ওয়ালটার স্যাভেজ ল্যানডর' পাঠাচ্ছি। এই গ্রন্থটির ২য় খণ্ডই শুধু আছে। এই গ্রন্থটির অবস্থা তেমন আকর্ষণীয় খণ্ড নয় বটে তবে ভালোভাবে বাঁধান। আপনাকে লাতিন বাইবেল পাঠিয়েছি বলে দুঃখিত, একটি ভলগেট খুঁজে দেখব। লে-হানটের কথা আমরা ভুলিনি।'

১৯৪৯-এর ডিসেম্বরের আট তারিখে হেলেন হানফ লিখলেন—'স্যাভেজ ল্যানডর নিরাপদে এল। আমি সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বই বড় ভালোবাসি, বিশেষতঃ যে পৃষ্ঠাটি পূর্বতন মালিক বার বার পড়েছেন সেই পৃষ্ঠায় চোখ পড়ে। যেদিন হ্যাজলিট এল, আমি খুলে দেখি লেখা আছে 'আই হেট টু রিড নিউ বুকস' উল্লাসে বলে উঠলাম 'কমরেড'—আগে যিনি এই গ্রন্থের মালিক ছিলেন তাঁর উদ্দেশে।

আমি শুনেলাম যে আপনাদের ওখানে মাংস, ডিম প্রভৃতি পাওয়া যায় না। এখানকার একটি ছোট্ট ব্রিটিশ ফার্ম 'ডেনমার্ক' থেকে খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করে আমার পরিচিত বায়ানের মাকে লণ্ডনে পাঠান। আমি মার্কস অ্যাণ্ড কোং-কে তাঁদের মারফৎ একটি ছোট্ট বড়দিনের উপহার পাঠালাম। মনে হয় আমার প্রেরিত টাকায় কুলিয়ে যাবে। আপনার অবধায়কত্বে বস্তুটি যাবে, আপনি অবশ্য যিনি হোন।—'

এর জবাবে ২০ ডিসেম্বর তারিখে ফ্রাংক ডোয়েল এই নাম স্বাক্ষর করে 'মিস হানফ' এই সম্বোধনে পত্র এল—

এই প্রথম বার পরস্পরের নাম উল্লিখিত হল পত্রের মধ্যে। তিনি লিখলেন—

'প্রিয় মিস হানফঃ আপনার উপহার পারসেল আজ নিরাপদে এল। তার ভিতরকার মালপত্র আমরা সবাই ভাগ করে নিয়েছি। আমাদের মালিক মিঃ মার্কস ও মিঃ কোহেন বললেন—এইগুলি কর্মীদের মধ্যে ভাগ করে নিতে মালিকদের বাদ দিতে। আপনাকে জানাচ্ছি যে পার্সেলের অন্তর্ভুক্ত সব দ্রব্যই আমরা চোখে দেখতে পাই না, এ শুধু 'ব্ল্যাক মার্কেটে' পাওয়া যায়। এভাবে আমাদের স্মরণ করা আপনার মহত্ব, আমরা সবাই সবিশেষ কৃতজ্ঞ। ১৯৫০-এর শুভেচ্ছা জানাই।'

১৯৫০-এর মার্চ মাসের একটি পত্রে হেলেন লিখলেনঃ

'আপনারা কি করছেন? কাজ-কর্ম নেই? বসে আছেন চুপচাপ? আমার 'লে-হানট' কই? 'অকসফোর্ড ভার্স'? 'ভলগেট'ই

বা কই? আপনারা আমাকে এখানে লাইব্রেরীর বইগুলির মারজিনে লিখতে বাধ্য করছেন। কোনদিন ধরা পড়ব। ওরা আমার কার্ড কেড়ে নেবে।

আমি ব্যবস্থা করেছি আপনি যাতে ইস্টারের 'এগ' (ডিম) পান—ও হয়ত ওখানে পৌঁছে দেখবে আপনি অসাড় হয়ে মৃত।

দেখুন বসন্ত আসছে—আমি কিছু প্রেমের কবিতা চাই। কীটস বা শেলী নেই? আমাকে এমন কিছু কবির কাব্য পাঠান যাঁরা নাকে না কেঁদে ভালোবাসতে পারেন। ছোট সাইজের বই, স্ল্যাকের পকেটে থাকবে, সেন্ট্রাল পার্কে নিয়ে যেতে পারব। চুপচাপ বসে থাকবেন না, আমার জন্য খুঁজুন! আপনাদের বই-এর দোকান যে কিভাবে চলছে?'

এর জবাবে ৭ এপ্রিল ফ্রাঙ্ক জানালেন ইস্টার পার্সেল পৌঁছেচে। সবাই খুশী—সবাই জানাচ্ছে ধন্যবাদ। বই পাচ্ছি না। চেষ্টা করছি। ইত্যাদি।

ঐ একই তারিখে লিখিত আরও একটি পত্র এল ঐ কোম্পানীর 'সিসিলি ফার' নামক জনৈক কর্মীর কাছ থেকে। সিসিলি লিখছেন—

'মিস হানফ, ফ্রাঙ্ককে জানাবেন না আমি এই চিঠি লিখছি। যখনই আপনার চিঠি পাই তখনই একটা চিঠি দেওয়ার বাসনা হয়, ভাবি ফ্রাঙ্ক কি মনে করবে। আপনার চিঠি আমাদের সকলের ভালো লাগে, ভাবি, না জানি আপনাকে কেমন দেখতে। মনে হয় আপনি তরুণী, অতি স্মার্ট, অতি ফ্যাসন-দুরস্ত। আমাদের মালিক বৃদ্ধ মার্টিন মনে করেন আপনার সরস বক্রোক্তি সত্ত্বেও আপনি হয়ত খুব বেশী পড়াশোনা করা টাইপ। একটা ফটো পাঠান না কেন? আপনার যদি ফ্রাঙ্ক সম্পর্কে কৌতূহল থাকে তাহলে বলি তার বয়স ত্রিশের শেষের দিকে—চমৎকার একটি আইরিশ মেয়েকে বিয়ে করেছেন—মনে হয় এটি ওঁর দ্বিতীয় স্ত্রী। আমার বাচ্চা দুটো (মেয়ে পাঁচ—ছেলে চার) ত' হাতে স্বর্গ পেয়েছে। ডিম আর কিসমিস দিয়ে আমি সত্যি কেক বানিয়ে দিয়েছি। আমার চিঠির জন্য অপরাধ নেবেন না। ফ্রাঙ্ককে জানাবেন না। আপনার যদি লন্ডন থেকে কোনো বস্তুর প্রয়োজন থাকে আমাকে লিখবেন, বাড়ির ঠিকানা চিঠির পিছনে দিলাম।'

এই পত্রের উত্তরে হেলেন জানালেন—

'প্রিয় সিসিলি...বৃদ্ধ মার্টিনের অদৃষ্ট মন্দ। আমি অতি পড়াশোনায় অবহেলা করা মেয়ে। কখনও কলেজ যাইনি। বই পড়ার অদ্ভুত আগ্রহ আছে।...আমি বেচারী ফ্রাঙ্ককে কেবল জ্বালাই—জানি আমার আবদার উনি সিরিয়াস ভঙ্গীতে গ্রহণ করবেন। ব্রিটিশ গাম্ভীর্য ফুটো করার প্রচেষ্টায় আছি। ওঁর যদি আলসার হয় তাহলে আমিই দায়ী। আমাকে লন্ডনের কথা লিখবেন। কবে যে লন্ডনে যাব সেদিনের প্রতীক্ষায় আছি।'

অনেক দিন পরে সেপ্টেম্বরে একটি চিঠি এল ফ্রাঙ্ক ডোয়েলের কাছ থেকে—ফ্রাঙ্ক লিখলেন—

'আমরা আপনার চাহিদা ভুলিনি। এখন একটা অকসফোর্ড বুক অব ভার্স পেয়েছি—ইন্ডিয়া পেপারে ছাপা চমৎকার সেকেন্ডহ্যান্ড বই। দাম দু ডলার। নিউম্যানের 'দি আইডিয়া অব এ ইউনিভার্সিটি' আপনি একবার চেয়েছিলেন। চাই নাকি? প্রথম সংস্করণ এক খন্ড আমরা কিনেছি—দাম ছয় ডলার।'

পত্র প্রাপ্তি মাত্র উত্তর দিলেন হেলেন—বললেন, 'ফার্স্ট এডিশন চাই, সেই সঙ্গে অকসফোর্ড বুক অব ভার্স—টাকা পাঠালাম।'

ইতিমধ্যে হেলেনের দেওয়া উপহার সামগ্রীর জন্য প্রচুর ধন্যবাদ জানিয়ে আরও একজন চিঠি দিলেন। তার নাম বিল হামফ্রিজ, তিনিও মার্কস অ্যান্ড কোং-এর কর্মী। তিনি লিখলেন—'আমার জ্যাঠাইমা আমার সঙ্গে থাকেন, বয়স ৭৫। আমি যখন আপনার পাঠান মাংস ইত্যাদির টিন নিয়ে এলাম তখন তাঁর চোখের আনন্দের ছাপ যদি দেখতেন। সত্যি, এত দূরে থেকেও আমাদের কথা মনে রাখেন, আশ্চর্য! যদি কখনও লন্ডন থেকে কোনো কিছু প্রয়োজন হয় জানাবেন।'

এরপর চিঠি দিলেন ফ্রাঙ্ক ডোয়েল ৯ এপ্রিল তারিখে। তিনি লিখলেন—'আপনি বোধহয় আমাদের নীরবতায় উদ্বিগ্ন। আমি লন্ডনের বিভিন্ন অঞ্চলে ধনীগৃহে পুরাতন বই সংগ্রহের চেষ্টায় ঘুরছি। বাড়িতে ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরিয়ে পড়ি, রাতে গিয়ে শুয়ে পড়ি। স্ত্রী বলেন খাবার কুটুম। কিন্তু আপনার পাঠান জিনিষ পাওয়ার পর আমার বদনাম কেটেছে। তিনি সব দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করেছেন। আপনার করুণার প্রতিবেদনে আমরা সামান্য একটা উপহার পাঠাচ্ছি। মনে হয় আপনার পছন্দ হবে।'

এই সঙ্গে একটি কার্ড—'এলিজাবেথান পোয়েটস' নামক গ্রন্থের সঙ্গে সাঁটা—৮৪, চেয়ারিং ক্রসের সবাই সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদসহ হেলেন হানফকে দিলেন।' বলা বাহুল্য চিঠিগুলির সমগ্র অংশ দেওয়া সম্ভব নয়, সংক্ষেপিত সারাংশ মাত্র পাঠকদের অবগতির জন্য যতটুকু দেওয়া প্রয়োজন তা এই নিবন্ধে দেওয়া হল।

আগামী সংখ্যায় শেষাংশটুকু পরিবেশিত হবে। চিঠিপত্রের মাধ্যমে যে একটি কাহিনী গড়ে উঠতে পারে এবং তার মধ্যে এক আশ্চর্য প্রেমের সম্পর্ক পাওয়া যায়—হেলেন হানফ লিখিত '৮৪, চেয়ারিং ক্রস রোড, নামক গ্রন্থে তার পরিচয় ছড়ানো আছে।

84 CHARING CROSS ROAD: By HELENE HANFF: Published by ANDRE DEUTSCH LONDON — Price 30 Shilling.

—অভয়ঙ্কর

সাহিত্যের খবর

ঢাকায় আন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলা

সম্প্রতি বাংলাদেশের রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলা। বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এই মেলায় উভয় দলের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী অংশ গ্রহণ করেন।

শতবর্ষের আলোয় শশাঙ্কমোহন সেন

গত ২৩ ডিসেম্বর, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে কবি সমালোচক শশাঙ্কমোহন সেনের জন্মশতবার্ষিকী স্মৃতিসভা উদযাপিত হয়। অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তীর অনুপস্থিতিতে সভায় পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক ত্রিদিবনাথ রায়।

প্রধান বক্তা জগদীশ ভট্টাচার্য বলেন, 'শশাঙ্কমোহন সেন সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে একটি প্রায়-বিস্মৃত নাম। তাঁর রচিত কবিতা, পুস্তক, সমালোচনা ও নিবন্ধ গ্রন্থসমূহ বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য।...অথচ রবীন্দ্রযুগেও শশাঙ্কমোহন ছিলেন স্বতন্ত্র যুগের কবি।' অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন শচীন্দ্রনাথ দত্ত, জ্যোতিপ্রসন্ন সেন, সনৎকুমার গুপ্ত। অধ্যাপক মদনমোহন কুমার পরিষদের পক্ষে সকলকে ধন্যবাদ জানান।

ভিয়েতনামে বোমা বর্ষণের প্রতিবাদে

প্যারিসে তৈরি হয়েছিল ভিয়েতনাম শান্তি চুক্তির খসড়া। সই-সাবুদ হবো হবো করেও শেষ পর্যন্ত তা হল না। উল্টে ভিয়েতনামের আকাশে নতুন উদ্যমে শুরু হল বর্তমানকালের প্রচন্ডতম বিমান আক্রমণ। নিকসন প্রশাসন বিশ্বের শান্তিকামী মানুষদের আশা ও যাবতীয় মানবিক আচার ভঙ্গ করে অভূতপূর্ব নৃশংসতার নজির তৈরি করল। তারই প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী ও সাহিত্যিকগণ। গত ২৫ ডিসেম্বর তাঁরা এক ধিক্কার মিছিল নিয়ে যান মার্কিন দূতাবাসের সামনে। মিছিলে যোগদানকারীদের মধ্যে ছিলেন সন্তোষকুমার ঘোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গীতা বন্দোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, তরুণ সান্যাল, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, পবিত্র মুখো-

পাধ্যায়, গণেশ বসু, দীপেন রায়, আশিস সান্যাল, দেবনাথ চক্রবর্তী এবং আরো অনেকে।

এক-আ-জি-র খবর।।

এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত পশ্চিম জার্মানিতে সব গ্রন্থমেলাকেই টেক্কা দিয়ে গেল এবারকার ২৪তম মেলাটি। ফ্রাংকফুর্টে অনুষ্ঠিত এই আন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলায় মোট ৫৮টি দেশের ৩,৬৮৩টি প্রকাশক সংস্থা নেন অংশ। সবশুদ্ধ দেখানো হয় ২৫০,০০০ বই আর তার মধ্যে ৭৮,০০০টি গ্রন্থই একেবারে নতুন প্রকাশিত। বলাই বাহুল্য, ফ্রাংকফুর্ট গ্রন্থমেলা খুচরো বই কেনা-বেচার জায়গা নয়। তবে সব আন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলার মতই ফ্রাংকফুর্ট হয়েছিল ভবিষ্যতের ব্যাপক ব্যবসা-বাণিজ্যের চুক্তিকেন্দ্র।

নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের তিনদিনব্যাপী ৪৫তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল লক্ষ্ণৌ-এ। ২৫ ডিসেম্বর এর উদ্বোধন করেন স্থানীয় মেয়র ডঃ দৌজি গুপ্ত। তিনি বলেন 'বাংলা সাহিত্য জাতির মধ্যে শুধু স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনাই নয়—ধর্ম, দর্শন ও আধ্যাত্মিকতাবোধও সঞ্চারিত করেছে। এবং একজন্যে দেশ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রমুখ মনীষীদের কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছে।' তিনি আরো বলেন, দেশবাসীর বর্তমান চিন্তাধারায় যে বিপ্লব ঘটেছে, তার মূলে রয়েছে মাইকেল মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম প্রমুখ বাঙালী কবি-সাহিত্যিকদের অবদান।'

সম্মেলন সভাপতি দেবেশ দাশ বলেন, 'সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর পরে আবার আমরা সবাই, সব বাঙালি, এপার বাংলা ওপার বাংলার বাঙালি সবাই একসঙ্গে এক সুরে এক সংবেদনে উচ্চারণ করতে পারছি নমো নমো সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি।' তিনি বলেন, 'সাহিত্য হচ্ছে প্রাণের আগুন, ভস্মরাশি নয়।...সাহিত্য ও জীবন সমস্যা নিয়ে। এখানে অর্থনীতি ও রাজনীতিবিদদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ দরকার। সাহিত্য সম্মেলনে এই দুই ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অধিকারীরা কোন কোন বছর আমাদের পুরোধা হয়েছেন। তাঁদের কাছে আমার নিবেদন যে জীবনকে বাদ দিয়ে সাহিত্য বাঁচবে না।'

দ্বিতীয় দিনে অতুলপ্রসাদ জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাহিত্যিক দক্ষিণারঞ্জন বসু। তিনি বলেনঃ 'অতুলপ্রসাদ সত্যি সত্যি অতুলনীয়। রবীন্দ্র সৌরমণ্ডলের

অতুলপ্রসাদ সেন

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

একজন হয়েও রবীন্দ্র সংস্কৃতি সমুদ্রে অবগাহন করেও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সত্তায় অতুলপ্রসাদ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলেন। পুরোপুরি বাঙালি থেকেও অন্যতম সেরা ভারতীয় বলে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। জীবনের বৃহত্তর অংশ বাংলার বাইরে কাটলেও বাঙালিত্বের গৌরবের কোনো সীমা ছিল না তাঁর।' তিনি আরো বলেন, 'স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ একবার অতুলপ্রসাদকে বলেছিলেন, 'অতুল, তোমার গান অতুলনীয়।'

মাত্র তের বছর বয়সে যিনি এমন ভাবসংগীত রচনা করতে পারেন—

'তোমারই উদ্যানে
তোমারই যতনে
উঠিল কুসুম ফুটিয়া।' —তাঁর

প্রতিভাকে কেউ বা না স্বীকার করে পারে। সেই প্রতিভাধর মানুষটি সম্বন্ধে যাতে আমাদের স্মরণে থাকে, বিশেষ করে লক্ষ্ণৌয়ে এবং কলকাতায়, তেমনভাবে তাঁর স্থায়ী স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা আমাদের অবশ্যই করণীয়।'

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের পরবর্তী বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে মেদিনীপুরের তমলুকে। এবং নতুন বছরের জন্যে সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও 'অমৃত' সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ আর সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন শ্রীপরিমল মুখোপাধ্যায়।

অমৃত ও যুগান্তর পুরস্কার

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে এ বছর 'অমৃত' পুরস্কার পান মানসী মুখোপাধ্যায় আর 'যুগান্তর' পুরস্কার লাভ করেন বিশিষ্ট হিন্দী লেখক অমৃতলাল নাগর। প্রতিটি পুরস্কারের নগদ মূল্য এক হাজার টাকা।

হাওড়া জেলা লেখক সম্মেলন

হাওড়ার 'সাহিত্য প্রয়াসী'র উদ্যোগে সামনের ২৬ থেকে ২৮ জানুয়ারি হাওড়া

গার্লস কলেজ প্রাঙ্গণে তিনদিনব্যাপী 'হাওড়া জেলা লেখক সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।—যতদূরে জানা যায়, হাওড়া জেলার অধিকাংশ লেখকই এই সম্মেলনে অংশ নেবেন। বলাইবাহুল্য সাহিত্য-অধিবেশন ছাড়াও চিত্রপ্রদর্শনী, হাওড়া জেলা ও অবশিষ্ট গ্রাম বাংলার পত্র-পত্রিকার একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

যুগোশ্লাভিয়ার খবর

মাত্র কিছুদিন আগে যুগোশ্লাভিয়ার প্রতিষ্ঠিত লেখক রাংকো কোপিক পেলেন নতুন সম্মান। সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় অবদানের জন্যেই তাকে দেওয়া হয় নশেগোজ পুরস্কার। এটি পান তিনি তাঁর ছোট গল্প সংকলন। দা ম্যাজিক গার্ডেন-এর জন্য।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার মাত্র কয়েক বছর আগে থেকে লিখতে শুরু করেন কোপিক। মিত্রবাহিনীর পক্ষে যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতাও রয়েছে তাঁর। শুধু কবি ও লেখক হিসেবেই তিনি জনপ্রিয় নন, শিশু সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান স্মরণীয়। যুগোশ্লাভিয়ার মন্টেনেগ্রো রিপাবলিক দিয়ে থাকেন নশেগোজ পুরস্কারটি। বলাই-বাহুল্য, এই পুরস্কার দেওয়া হয় মন্টেনেগ্রো ও যুগোশ্লাভ কবি পিটার পেট্রোভিক নশেগোজ-এর নামে।

বাংলাদেশের খবর হতে

তিনদিন ব্যাপী এক আলোচনা সভার আয়োজন করেন বাংলাদেশ লেখক শিবির। গত ১৯ ডিসেম্বর এর উদ্বোধন হয় বাংলা একাডেমিতে। প্রথম দিনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ক মন্ত্রী ডঃ মফিজ চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আবদুল জলীল মিয়া। প্রথম দিনটি বার্ট্রাণ্ড রাসেল সম্পর্কিত আলোচনায় ছিল সীমাবদ্ধ। এই অনুষ্ঠানে সরদার ফজলুল করিম, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আবুল কাসেম ফজলুল হক, জনাব আহমদ ছফা প্রমুখ লেখক, অধ্যাপকেরা অংশ গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় দিনে 'সংস্কৃতির সংকট' সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ করেন বদরুদ্দিন উমর ও জনাব সাঈদুর রহমান। আলোচনায় অংশ নেন বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, মাহাবুবউল্লাহ, আহমদ ছফা। এদিনে সভাপতিত্ব করেন ডঃ আহমদ শরীফ।

নতুন বই

আধুনিক কবিতা : বিচ্ছিন্নতা, বিশুদ্ধতা ইত্যাদি প্রসঙ্গ (প্রবন্ধ)। তরুণ সান্যাল। সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬ বিধান সরণী, কলকাতা-৬। আট টাকা।

কবি শ্রীতরুণ সান্যালের আর একটি নতুন পরিচয় পাওয়া গেল তাঁর সদ্য প্রকাশিত প্রবন্ধ গ্রন্থ 'আধুনিক কবিতা : বিচ্ছিন্নতা, বিশুদ্ধতা ইত্যাদি প্রসঙ্গ'এর মধ্যে সার্থক প্রবন্ধকার হিসেবে। ইনি ইতিপূর্বে বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে সমাজ সচেতন ও চিন্তাশীলতার পরিচয় রেখেছেন। বর্তমান গ্রন্থটি সেই সমস্ত প্রবন্ধাবলি ও গ্রন্থ সমালোচনা জাতীয় রচনার উল্লেখযোগ্য সংকলন।

ওদেশে এককালে এলিয়ট, এজরা পাউণ্ড, সেসিল ডে লুইস, এদেশে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাঁর 'কাব্য পরিমিতি' গ্রন্থে কিছু কবিতা, কলা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তরুণবাবু এ সবের অনুসারী, কিন্তু একেবারে আধুনিক কালের জটিল কাল মানসিকতার নানাবিধ সমস্যা ও দিক নিয়ে আলোচনার প্রয়াস তরুণবাবুর রচনায় স্বকীয় বক্তব্যে উজ্জ্বল।

আলোচ্য গ্রন্থে মোট তেরোটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। প্রথম প্রবন্ধ 'গর্কী, আধুনিক বাংলা কবিতা, ঝড়ের পাখি', সর্বশেষ প্রবন্ধ 'মার্ক' দ সাদ ও তাঁর উত্তরপুরুষ'। মধ্যবর্তী প্রবন্ধগুলির মধ্যে ব্যক্তিপ্রসঙ্গ—যেমন রিলকে, গিওর্গ লুকাচ ইত্যাদি স্থান পেয়েছে, তেমনি আছে কবিতার বিভিন্ন আন্দোলনের কথা, তার সমস্যা, প্রতীকত্ব, বিশুদ্ধতা, কাব্যব্যক্তিত্ব, চিত্রকল্প, ডিকশন ইত্যাদি প্রসঙ্গ।

তরুণবাবুর আলোচনা বিশ্লেষণধর্মী ও কমপারেটিভ। সমস্ত প্রবন্ধের শেষে নিজস্ব মত ও ভাবনাকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে কঠিন ভিত্তি যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, তরুণবাবু একজন কবি হয়েও কোথাও কবি, কাব্য, কবিচারিত্র্য বিষয়-ভাবনা, বিচারে সাবজেকটিভ আলোচনায় বাঁধা পড়েন নি। আলোচনায় যুক্তি আগে এবং সে যুক্তি মননিষ্ঠার, বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তিতে নির্ভীক, শাণিত। তাই প্রবন্ধগুলির সমাপ্তি ঘটেছে বোধ ও বোধির অধিক উপলব্ধির কুশলতায়। বোঝা গেছে, যখন তিনি সমালোচনা করতে বসেছেন, তখন তিনি কবি নন, কবি-আত্মার অন্তস্থলে উপবিষ্ট অজস্র প্রশ্নের সম্মুখীন এক জিজ্ঞাসু সমালোচক।

প্রথম প্রবন্ধ প্রমাণ করে, কবি তরুণ সান্যাল সমালোচক হিসেবে কবিতায় কি চান। এ বিষয়ে তাঁর পরিষ্কার বক্তব্য 'কবির সামাজিক দায়িত্ব অনেক বেশী। সে দায়িত্ব বিপ্লবীর দায়িত্ব। রচনার পদ্ধতি হবে, হয় বিপ্লবী রোমান্টিকতা, নইলে বাস্তবতা। এবং সে বাস্তবতাও হবে এ যুগে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা।' তরুণবাবুর এই ভাবনা অন্যান্য প্রবন্ধে চাবি-কাঠির মত সক্রিয়। বোঝা যায়, তরুণবাবু মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী এবং একজন স্বনিষ্ঠ অনুরাগীও। বিরোধীরা তাঁর বক্তব্যের বিরোধিতায় মুখর হতে পারেন, কিন্তু তরুণবাবুর শাণিত যুক্তি ও বিপুল অধ্যয়নজাত সমীকরণের ফলস্বরূপ অভিজ্ঞতার কাছে নীরব হতে বাধ্য। কবিতা ও বিপ্লবের মধ্যেকার সমস্যা সম্বন্ধেও তরুণবাবু বিশেষভাবে চিন্তিত এবং এ চিন্তা স্বভাবী পাঠকরূপেই। বিজ্ঞানের ভাষা ও কবিতার ভাষা সংক্রান্ত মন্তব্যটি স্বভাবিকই গ্রহণযোগ্য। কবি হিসেবে তিনি আধুনিক মানুষ, জীবন, সমাজ ও সভ্যতার মূল কথাই বলেছেন—'বিজ্ঞান ও কবিতা, বিজ্ঞানশিক্ষা ও মানবতত্ত্ব—উভয় বিদ্যার একাময় সামঞ্জস্যের মধ্যেই আছে আগামী কালের মানুষের সংস্কৃতি।' (অমোঘ শর)।

তরুণবাবুর কয়েকটি মন্তব্য তাঁর মতের সামগ্রিকতা স্পষ্ট করে। যেমন—'ভাষাই এক অর্থে কবিতা—কেননা তা চিত্রকল্প, রূপক ও উৎপ্রেক্ষাময়।' 'বিশুদ্ধ কবিতার আমি বিপক্ষে নই, কিন্তু আমি অ-বিশুদ্ধ কবিতার পক্ষে প্রবলভাবে। আসলে কোনো কবিতা আন্দোলনই তো নিরঙ্কুশ নয়।' তরুণবাবুর কোন কোন মন্তব্য 'নেগেশান' থেকে 'আফারমেশানে'র মধ্য দিয়ে তাঁর মূল চিন্তাপদ্ধতি, অন্তত কবিতা সম্পর্কে, স্পষ্ট করায়। যেমন, 'এমন কি নিজেকে বোধগম্য ও বোধ্য করে তোলার প্রয়োজনেও কবিকে কি বিপ্লবীর ভূমিকা গ্রহণ থেকে বিরত করা যায়? 'নৈর্ব্যক্তিকতা, বিচ্ছিন্নতা, ও আধুনিকতা', 'দুরূহ শব্দের দোটানায়', 'কাব্যনাট্য প্রসঙ্গে', 'কবিব্যক্তিত্ব, কবিচারিত্র্য ও কবি' ইত্যাদি প্রবন্ধ লেখকের চিন্তার মৌলিকতার দাবী রাখে। গিওর্গ লুকাচের প্রসঙ্গটি যোগ করে তরুণবাবু আধুনিক পাঠকের বাস্তবতা সম্পর্কিত নতুন ভাবনায় সুস্থ, সবল খাদ্য পরিবেশন করেছেন বলা যায়।

তরুণবাবুর বক্তব্য গঠন, দীর্ঘদিন কাব্য রচনার গভীর-প্রোথিত অভিজ্ঞতা, বিদেশী

সাহিত্যের বিপুল শিক্ষার আশ্চর্য আত্মীকরণের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েই বলি, বেশ কিছু আলোচনায় এদেশীয় কবি-মনীষীর চিন্তা-ভাবনা প্রসঙ্গত আনা উচিত ছিল। শুধু বিদেশী কবি-কাব্য প্রসঙ্গ কোথায় যেন অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের অতৃপ্ত রাখে। দ্বিতীয়ত, আলোচনায় বার বার একটি বাংলা শব্দ আবার 'বা' প্রয়োগ করে তার ইংরাজী প্রতিশব্দ ব্যবহার গদ্যকে ক্লান্তিকর করেছে কোথাও কোথাও।

সবশেষে তরুণবাবুর গদ্য প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে হয়, তিনি আলোচনার গদ্য কোথাও অযথা ভার নিয়ে আসেন নি। সহজ সরল গদ্যে দুরূহ বিষয়ের মধ্যে নিজেকে যুক্ত পেরেছেন ভেবে আনন্দিত হই।

বঙ্কিম স্মারক গ্রন্থ ।। সম্পাদনা কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমলভূষণ গুপ্ত। বারাসত পশ্চিম সম্মিলনী। দাম চার টাকা।

রমেশচন্দ্র দত্ত বঙ্কিমকে বলেছিলেন দি গ্রেটেস্ট ম্যান অব দি নাইন্টিনথ সেঞ্চুরী। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে একটি বিশাল স্তম্ভ—যার মধ্যে এতটুকু ভাঙন ধরে নি আজও। উনিশ শতকের প্রেক্ষিতে বঙ্কিমকে সামনে রেখে গয়টের সম্বর্ধনায় নেপোলিয়নের মূল্যবান উক্তিটি স্মরণ করে বলা যায়—হিয়ার ইজ এ কমপ্লিট ম্যান। এই অসাধারণ প্রতিভার বিশ্লেষণ হয়েছে বাংলা সাহিত্যে নানাভাবে, এখনো চলছে সমানে। এই রকম আলোচনা ধারায় একটি মূল্যবান সংযোজন হল 'বঙ্কিম স্মারক গ্রন্থটি'। সাহিত্যধর্মী সাহিত্যের লেখক নন অথচ রুচিশীল, বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবী কয়েকজনের সার্থক রচনায় সমৃদ্ধ এই স্মারক গ্রন্থটি বঙ্কিম সম্পর্কে এক নূতন রশ্মি নিক্ষেপ করে। অমলভূষণ গুপ্তের 'বিজ্ঞান সাহিত্যে বঙ্কিম' এবং কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আমার বাল্যস্মৃতি ও বঙ্কিম-হৃদয় সন্ধান'—দুটি উল্লেখযোগ্য রচনা। রবীন্দ্রনাথ, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্কিম সম্পর্কিত রচনাংশ উদ্ধৃত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে। কবিতা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ রায় ও প্রণবকুমার মজুমদার। গ্রন্থটি গবেষক, ছাত্র ও সহৃদয় পাঠকদের কাছে অত্যন্ত উপযোগী।

সারস্বত মঠ ও বর্ণাশ্রম ধর্ম। স্বামী প্রেমানন্দ সরস্বতী। মধ্য বাংলা সারস্বত আশ্রম, পূর্বস্থলী, বর্ধমান। দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

স্বামী প্রেমানন্দের 'গুরু-শিষ্য সংবাদ' নামে প্রবন্ধ আর্য দর্পণে প্রকাশিত হয়েছিল তেরশ পঁচিশ ও ছাব্বিশ সালে। সেই প্রবন্ধেরই পরিণতি হিসেবে বর্তমান গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থের কিছু কিছু অংশ এই গ্রন্থে অনূদিত হয়ে গ্রন্থের শোভাবর্ধন করেছে। বস্তুত বর্ণাশ্রম ধর্মে অবস্থিত মোহগ্রস্ত অন্ধ সমাজের চৈতন্যোদয়ের কারণেই এই গ্রন্থটির রচনা-উদ্দেশ্য নিহিত। 'প্রার্থনা' অংশ দিয়ে শুরু ও মোট পনেরোটি অধ্যায়ে গ্রন্থটি শেষ হয়েছে। লেখকের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী সহজ, সরল, মতবাদ বিশ্লেষণ সহনশীলতা সমন্বিত ও সহিষ্ণুতাসাপেক্ষ। ধর্মরস-পিপাসুদের কাছে এ গ্রন্থ আদরণীয়।

অনন্ত মধ্যাহ্নে ফিরি (কাব্য সংকলন)—বাদল ভট্টাচার্য। কবিকণ্ঠ প্রকাশনী, ১০।২, ইব্রাহিমপুর রোড, কলকাতা—৩২। তিন টাকা।

বাদল ভট্টাচার্য তাঁর কবিতায় সহজে কবিপ্রাণতার স্বাক্ষর রেখেছেন। আশা, নিরাশা, ভয় ভাবনা, ভালবাসা, বিষাদ এ সমস্ত কবির অন্তর্লীন হয়ে অনুভূতিকে স্পর্শ করেই কবির উজ্জ্বল কল্পনার পাখা চঞ্চল হয়ে উঠেছে এ গ্রন্থের কবিতাগুলিতে। কবি বলেছেন—কত আশা বুকের অতলে অন্তহীন সাগরের মত বলেছেন কিছুতেই পারি না বুকের ভেতর থেকে সমস্ত স্মৃতি ক্রোধ ক্ষোভ এক লহমায় মুছে ফেলতে। আলোচ্য কবি জীবনকে ভালবাসেন, তাই বলতে পেরেছেন অবলীলায়—'বন্ধু, ওগো তোমার জন্য অনেক আয়োজন'। বাদল ভট্টাচার্য যেমন ছন্দ মিলে কবিতা লিখেছেন, আবার গদ্যকবিতাও বাদ দেননি। এবং ছন্দের প্রত্যেক বিভাগেই কবির কান প্রখর ও সতর্ক উন্মুখ। আধুনিক 'ইমেজ' ব্যবহার কবিকে অনেকটা আত্মীয় মনে করায় স্বভাবী কাব্যপাঠকদের কাছে। নাম কবিতাটি কবিক্ষমতার পরিচায়ক। প্রচ্ছদ সুন্দর।

একনাথী ভাগবত (ধর্মগ্রন্থ)—শ্রীমৎ প্রাণকিশোর গোস্বামী। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির, ১১২।১ ক্যানেল স্ট্রীট, কলকাতা-৪৮। পাঁচ টাকা।

এই গ্রন্থে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রাণকিশোর গোস্বামী একনাথ ব্যাখ্যাত ভাগবতের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন ঐকান্তিক নিষ্ঠা-সহকারে। এবং এ ব্যাপারে তাঁর সাফল্যও উল্লেখযোগ্য। অনুবাদের ভাষা সহজ, সরল। ভূমিকাটিও মূল্যবান। ধর্মপ্রাণ পাঠকের ভালো লাগবে।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

শায়ক : সম্পাদক রণধীর রায়। প্রকাশ স্থান উল্লেখ নেই। দাম এক টাকা।

সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকাটি মুদ্রণ ব্যাপারে কিছুটা প্রথা-বিরোধী। কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ আছে যাত্রা সম্পর্কে। এগুলি প্রকাশিত হয়েছে সাধারণ নাট্যশালার শতবর্ষ উপলক্ষে। সম্পাদকের রুচিশীল বিদগ্ধ মানসিকতার পরিচয় স্পষ্ট।

অম্বিষ্ট (জীবনানন্দ সংখ্যা)—সম্পাদক বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ৯।১।১এ লক্ষ্মী দত্ত লেন, কলকাতা-৩। তিন টাকা।

ত্রৈমাসিক 'অম্বিষ্টে'র বিশেষ সংকলন 'জীবনানন্দ সংখ্যা' সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। ইতিপূর্বে 'এলিয়ট' 'অবনীন্দ্র' ও আরো সংখ্যা প্রকাশ করে 'অম্বিষ্টে'র মত একটি প্রতিষ্ঠিত রুচিশীল ত্রৈমাসিক লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক সহৃদয় পাঠকদের দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছেন। আলোচ্য সংখ্যাটি আমাদের মতে আরও উন্নতমানের এবং এর লেখক, কবি ও সম্পাদকের দুঃসাহসিক পরিশ্রমী সততা ও আন্তরিক এর পরিচয় বহন করছে। সাধারণভাবে কবি জীবনানন্দের উপর সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখেছেন সর্বশ্রী অলোক রায়, সুরেশ ঘোষ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, সুধীন দত্ত। জীবনানন্দের প্রতিটি কাব্যগ্রন্থের পৃথক স্বতন্ত্র আলোচনা করেছেন প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ ও তরুণ কয়েকজন কবি সর্বশ্রী প্রণব চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, বীরেশ্বর ভট্টাচার্য, শিবশম্ভু পাল, বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, মঞ্জুশ্রী মিত্র ও দীননাথ সেন। কবি জীবনানন্দের ছোটগল্প এবং উপন্যাস সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন প্রতিষ্ঠিত তরুণ গল্পকার শ্রাবন্তীন্দ্র দত্ত। জীবনানন্দকে নিবেদিত কয়েকটি কবিতা লিখেছেন সর্বশ্রী সত্যকান্ত গুহ, দীনেন বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি। জীবনানন্দ-জীবনী ও কবি-সম্পর্কিত রচনাপঞ্জী লিখেছেন যথাক্রমে শ্রীপ্রভাতকুমার দাশ ও শ্রীস্বপন দাসাধিকারী। পত্রিকাটির প্রচ্ছদ সুরুচিসম্মত এবং এই বিশেষ সংখ্যাটি সর্বস্তরের গবেষক ও বুদ্ধিজীবীদের সংগ্রহের যোগ্য।

ইতিহাস ও সংস্কৃতি : সম্পাদকমণ্ডলী সম্পাদিত। মেদিনীপুর ইতিহাস ও সংস্কৃতি পরিষদ। ডাকবাংলো রোড, মেদিনীপুর। দু টাকা।

বেসরকারী উদ্যোগে মেদিনীপুরের প্রাচীন ইতিহাস, ভৌগোলিক বিবরণ, ধ্যানধারণা, লৌকিক সংস্কার, দেবদেবী, শিল্প, সাহিত্য, লোকসংগীত প্রভৃতি বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য স্থাপিত হয়েছে মেদিনীপুর জেলা ইতিহাস ও সংস্কৃতি পরিষদ। এই সঙ্কলনের প্রবন্ধগুলি সেই অনুসন্ধানের ফল। লিখেছেন ধীরাজ ভট্টাচার্য, বঙ্গভূষণ সেনাপতি, প্রদীপ চৌধুরী, দুলাল চৌধুরী, সুহৃদকুমার ভৌমিক (মেদিনীপুরের গ্রাম-নাম ও প্রাগৈতিহাসিক জনবসতি), সত্যেন বড়ঙ্গী, সুদর্শন সামন্ত (আঞ্চলিক ইতিহাস : তাম্রলিপ্ত), নিশিকান্ত মাইতি, প্রদ্যোৎ মাইতি, বিনোদশঙ্কর দাস, গোকুলানন্দ মিশ্র, শ্যামাপ্রসাদ বসু (মুসলমান আমলে মেদিনীপুর), প্রণব রায়, তারাশিষ মুখোপাধ্যায়, কাননবিহারী গোস্বামী এবং কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। সংকলনটি কৌতূহলী পাঠকের কাছে মূল্যবান মনে হতে পারে।

বাংলাদেশের গ্রন্থ-মেলায়

লোকনাথ ভট্টাচার্য

বাংলা একাডেমীর প্রাঙ্গণের এক দিকে সামিয়ানা, যেখানে সেমিনার চলছে—অন্য দিকে রাতারাতি গজিয়ে-ওঠা ছোট-বড় শিবিরের মতন সারি-সারি বইয়ের দোকান, যেখানে গ্রন্থ-মেলা বসেছে। আরো একটি প্রাঙ্গণ একাডেমীর সামনেই, মাঝখানে বিরাট বৃক্ষের বেদী, সেখানে কবিগানের আসরের আয়োজন।

তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। সেমিনার থেকে সবে বেরিয়েছি—সেদিন আলোচ্য ছিল পুস্তক-প্রকাশন ও বিতরণের নানা সমস্যা—ইচ্ছে ছিল, প্রাঙ্গণের ওদিকে গ্রন্থ-মেলায় যাব, আমাদের ভারতের স্টলে ভিড় ঠেকানোর নতুন কোনো সমস্যা জাগল কি জাগল না দেখব। এমন সময় দুটি মেয়ে কোত্থেকে হঠাৎ হাজির, বলে 'আপ্পা পাঠিয়ে দিয়েছেন আমাদের — যাবেন জয়নাল আবেদীনের বাড়ী?'

যাব আবার না! জয়নাল আবেদীনের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করছি ঢাকায় পৌঁছানোর প্রথম দিন হতে—অতএব সন্ধ্যার সমস্ত প্রোগ্রাম নিমেষে বাতিল হয়ে গেল, এমনকি কী প্রোগ্রাম আছে-না-আছে আর মনেই পড়ল না, মেয়ে দুটির সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। তার আগে যেটুকু বলবার, তা হল মেয়ে দুটির সঙ্গে প্রথম পরিচয় সেদিনই হয়েছে, সকালে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে, যেখানে গ্রন্থ-মেলা উপলক্ষে আগত ও বাংলাদেশ সরকারের বিশিষ্ট সম্মানিত অতিথি অন্নদাশঙ্কর রায়কে সস্ত্রীক সম্বর্ধনা জানানো হয়। এবং সর্বত্রই যে-প্রাণের স্পর্শ, চোখের চাওয়া, ঠোঁটের হাসি, তার প্রভাবে যেমন আরো অনেকের সঙ্গে এখানে ইতিমধ্যেই হয়েছে, তেমনি ঐ সকালের অতটুকু আলাপেই মেয়ে দুটিকে কেমন-যেন আপন করে নিতে পেরেছি। তার উপর জয়নাল আবেদীনের ম্যাজিক নামটি তাদের মুখে সেই সন্ধ্যায় উচ্চারিত, প্রশ্ন আর কোথায়।

'গাড়ী কিন্তু নেই', চোখ ঘুরিয়ে হেসে মেয়ে দুটির একজন জানালো।

ঢাকায় যানবাহন একটা বিরাট সমস্যা তাই গাড়ী সম্বন্ধে ঐ বিশেষ উক্তিটি। তাছাড়া ওদেরই গাড়ী করে সেদিন সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হোটেলে ফিরেছি—মেয়ে দুটির আপ্পা হলেন মুহম্মদ মনসুরুদ্দিন, বাউল গানের সংকলনে সারা জীবন কাটিয়েছেন, শুধু পণ্ডিতই নন, বিলক্ষণ রসিক ব্যক্তি, নিজেকে ব্রাহ্মণ বলেন।

'মানে রিকসা করে যেতে হবে', একটু যেন লজ্জিতের ভাবে অন্য মেয়েটি জানালো।

আমি তখন জানতে চাইলাম, কত দূর—অর্থাৎ পায়ে হেঁটে সে-দূরত্বটা পাড়ি দেওয়া যায় কিনা। উত্তরে জানলাম দূর যদিও তেমন কিছুই নয় এবং হেঁটে অনায়াসেই যাওয়া চলে, তবু যেহেতু হাজার হলেও আমি অতিথি মানুষ এবং হাতে সময়ও তত নেই—কারণ কে জানে আবেদীন সাহেবের অন্য কোনো প্রোগ্রাম আছে কিনা সন্ধ্যায়—তাই শেষ পর্যন্ত দর-দস্তুর করে দুটি সাইকেল-রিকসাই নেওয়া হল, একটিতে আমি, অন্যটিতে ওরা দুজন। বলা হল আমার রিকসাটি আগে-আগে যাবে, ওদেরটি আসবে পিছন-পিছন। যখন জানতে চাইলাম কেন—যেহেতু আমি রাস্তা চিনি না, আমারই ওদের পিছন-পিছন আসাটা সমীচীন ঠেকেছিল—তখন মেয়ে দুটির আবার সেই প্রাণ-ছোঁওয়া হাসি, বলে 'আপনাকে নজরে রাখার দরকার আছে', এবং পরেই আমার রিকসা-চালকটিকে নির্দেশ দেয় সে যেন হুস-হুস করে পা না চালিয়ে একটু আস্তে-আস্তে যায় এবং জোনাকি সিনেমার সামনে এসে পরের নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করে থাকে।

অতএব আমার বেশ ভার নেওয়া হচ্ছে, দেখা-শোনা করা হচ্ছে, আছি আপনজনেরই হাতে—এই জ্ঞানে পরিতৃপ্ত হওয়ারই অবকাশ। কিন্তু মিনিট দুয়েক আগে আরেকটা ছোট্ট ঘটনাও ঘটেছে।

পারলে যদি কোনো বন্ধু-বান্ধবের গাড়ী পাওয়া যায়, বা যে-কোনো গাড়ী, যা আমাদের নিয়ে যেতে পারে আবেদীন সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত, অর্থাৎ রিকসা নেওয়ার বাধ্যবাধকতাটাকে যদি কোনো রকমে এড়ানো যায়—প্রথমে সেই চেষ্টাই চলছিল। এবং গাড়ী আসছে-যাচ্ছে প্রচুরও, মেলা দেখতে কেউ এলেন, বা মেলায় কাউকে নামিয়ে কোনো গাড়ী অন্যত্র উধাও হল, এরকম আখচারই ঘটছে—দুটো-একটা ভ্যানও এসে থামছে, হয় সেখানে থামতে কিছুক্ষণ, নয়তো একটু দাঁড়িয়ে অন্য পথ নিতে। এবং মেয়ে দুটির তখন কি ছোটাছুটি একটার পর একটা গাড়ীর চালককে জিজ্ঞেস করছে ওদিকে একবার বোঁ করে ঘুরে আসতে পারবে কিনা—আমাদের নামিয়ে বাংলা একাডেমীতে আবার ফিরে আসতে তাদের সকসুদ্ধ পনের মিনিটও লাগবে না, এমন যুক্তিরও অবতারণা করছে। কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক, কোনো গাড়ীর পক্ষেই সম্ভব হল না আমাদের ঐ রাস্তাটা পৌঁছে দিতে—অগত্যা সাইকেল-রিক্সা নেওয়া ছাড়া উপায় রইল না। কিন্তু ঐ যখন ছোটাছুটি করছে ওরা, এ-গাড়ী থেকে ও-গাড়ীর চালককে রাজী করানোর চেষ্টা করছে, তখন প্রতিবারই ওদের যুক্তির একটি কথা উড়ো হাওয়ায় আমার কানে ভেসে আসছে—কথাটি হল 'ফরেনার' অর্থাৎ বিদেশী। আরো স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, যেটা ওরা গাড়ীর চালকদের বোঝাবার চেষ্টা করছে তা হল আমি একজন 'ফরেনার' এবং আমাকে নিয়ে ওরা একটা জায়গায় যেতে চায়, হাতে সময়ও কম, অতএব এই সব নানান-কিছু বিবেচনা করে চালকদের কেউ কি সদয় হয়ে আমাদের সেই জায়গাটায় পৌঁছে দেবেন? এবং আশ্চর্য যেটা, তা হল এই যে, 'ফরেনার' কথাটা উচ্চারণ করছে মেয়ে দুটি, তার মধ্যে কিন্তু আমার প্রতি কোনো অসম্মান বা বিদ্বেষের ভাব এতটুকু নেই, বরং কথাটা স্বতস্ফূর্তই, বেরিয়ে আসছে তেমন কিছু না ভেবেই। যেন এমন একটা সত্য এটা, যেটা সুপ্রতিষ্ঠিত যুগ হতে যুগান্তরে। মুহূর্তের মধ্যে আমার মনে পড়ে যায় আসার পথে দমদম বন্দরে থামার দুঃসহ সময়টুকু, একটার পর একটা ফর্ম ভর্তি করা, এটা-ওটা নিয়ম-কানুন পালনের পিছনে উর্ধ্বশ্বাসে ছোটা—যেন যে-সব দেশ বহুদূরের, যা সত্যিই সর্ব অর্থে বিদেশ, সেখানেও পাড়ি দেওয়া এর চেয়ে সোজা। অবশ্য উল্টোভাবেও জিনিসটা দেখা চলে—ভাবা চলে, ঐ 'ফরেনার' কথাটা যাতে এখানে শুনতে হয় এবং সেটা শুনেও যাতে চমকিত না হতে হয়, তার প্রস্তুতি-পর্ব শুরু হয় সেই দমদম বিমান-বন্দরেই। অর্থাৎ, দমদমে ঢাকার বিমানে পা ফেলবার ছাড়-পত্রটি যখন পাই অত নিয়ম কানুনের মধ্য দিয়ে গিয়েই, তখন 'ফরেন' ভিন্ন এ-দেশটার আর কি কিছু হওয়া সম্ভব?

তবু কেন জানি না, কথাটা সেই সন্ধ্যায় শুনে শুধু চমকিতই হই নি, এক অনির্দেশ্য আঘাতও পাই বুকের কোন গহন কোণে—কথাটা যতবার উচ্চারিত হয়েছে, ততবারই কে হাতুড়ি পিটিয়েছে খুব কোমল এক জায়গায়। যদিও মুখ ফুটে বলি নি কিছুই, মনে-মনে দুয়েকবার আওড়াই এক দুঃখমিশ্রিত কৌতুকের ভাবে, 'আমি যদি তোর ফরেনার হই তো তোর আপনজন কে রে?' ততক্ষণে অবশ্য রিকসায় উঠে বসেছি, চলতে শুরু করেছি।

সংক্ষেপে বলা চলে, এই সামান্য ঘটনার বিবরণে বিধৃত রয়েছে এবারকার ঢাকায় আসার উপলক্ষ এবং সেই উপলক্ষকে কেন্দ্র করে ঢাকায় কয়েকদিন কাটানোর সামগ্রিক অভিজ্ঞতা।

আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ উৎসব উপলক্ষে ঢাকায় একটি গ্রন্থ-মেলার আয়োজন করা হয়েছে, ২০শে থেকে ২৭শে ডিসেম্বর পর্যন্ত। সেই মেলায় যোগদানের জন্য আমি এসেছি ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের প্রতিনিধি হয়ে ও বাংলাদেশের জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে। সস্ত্রীক অন্নদাশঙ্কর রায়ও এসেছেন একই নিমন্ত্রণে

সাড়া দিয়ে—যেখানে তিনি গেছেন, সেমিনারে বা বাংলা একাডেমীতে বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, সর্বত্র যে-আশ্চর্য সম্বর্ধনা পেয়েছেন, তা প্রমাণ করে তাঁর আজীবন সাহিত্য-কীর্তির অন্তর্নিহিত উৎকর্ষ তো বটেই, সেই সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের এক অনস্বীকার্য ঐক্যও। সেই ঐক্যের সুরটি এপার ও ওপারের বাংলার বহু বিভিন্নতাগুলিকে মাঝে-মাঝে কেমন যেন কুয়াশাচ্ছন্ন করে তোলে, খেই ক্রমশই হারিয়ে যায়।

আরো এসেছেন প্রকাশকদের একটি অতি বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল—কেউ বোম্বাই থেকে, কেউ-বা দিল্লী থেকেও। কলকাতা থেকে এসেছেন সুপ্রিয় সরকার—দু দিনের জন্য জয়ন্ত বসুও এসে ফিরে গেছেন। অশোক ভট্টাচার্যকেও কিছুক্ষণের জন্য দেখি। প্রকাশকের এই প্রতিনিধি-দল তাঁদের নিজেদের ও ভারতে অন্যত্র প্রকাশিত কিছু-কিছু বই এনেছেন প্রদর্শনীর জন্য—ভারত ভিন্ন অন্য বিদেশী স্টল যা আছে, তার কোনটি রাশিয়ার, কোনটি আমেরিকার, বা বুলগেরিয়ার বা জাপানের বা বৃটেনের বা পূর্ব জার্মানীর। বাকী স্টলগুলি বাংলাদেশের। মেলা যতদিন চলছে, তার প্রতিদিনই সেমিনারও বসছে একাডেমী প্রাঙ্গণের অন্য পাশে—আলোচ্য বিষয় কোনদিন লেখকের স্বাধীনতা, কোনদিন বা গ্রন্থ-প্রকাশন ও বিতরণ, কোনদিন বা পাঠাভ্যাস উন্নয়ন, ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রধান বক্তাদের মধ্যে রয়েছেন অন্নদাশঙ্কর রায়, মুহম্মদ এনামুল হক, আবুল ফজল, আলাউদ্দিন আল আজাদ, শওকত ওসমান, আবদুল গণি হাজারী, কে এম যাকারিয়া, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, নীলিমা ইব্রাহিম, সরদার জয়েনুদ্দীন — নামের তালিকা অনায়াসে দীর্ঘতর করা চলে। এ-প্রসঙ্গে যেটি উল্লেখ না করলেই নয়, তা হল এই সব আলোচনায় শ্রোতৃবৃন্দের এত ঔৎসুক্য ভারতের কোন প্রদেশেই আয়োজিত অনুরূপ সভা-টিতায় সচরাচর দেখি নি। সেমিনার একটু বেলা তিনটে থেকে, চলত প্রতিদিন পাঁচটা, সাড়ে পাঁচটা, ছ'টা, সাড়ে ছটা পর্যন্ত—এবং প্রতিদিনই অন্তত শ-দেড়েক লোক তো সেমিনারে সব সময়ই রয়েছে। এর কারণ অনুসন্ধানের জন্য চেষ্টা যখন করেছি, আমাদেরই দলের এর-ওর সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলেছি, তখন কেউ-কেউ ভেবেছেন ঢাকা শহরে আমোদ-প্রমোদের অবকাশ নিতান্ত কম বলেই সামান্য কিছুও যদি কোথাও ঘটে, হয়তো সেখানে লোক যাবেই—অর্থাৎ এই গ্রন্থ-মেলাটা শহরের পক্ষে যাকে বলে একটা ঘটনা, এখানে এমন অনেক লোক আসছে যারা আমোদ-প্রমোদের 'সম্পূর্ণ' বিপরীত ধরনের কোনো অবকাশ অন্যত্র পেলে সেখানেও সমান তৎপরতায় ছুটত। আরো সহজে বলতে গেলে, সেমিনারে রোজই যে-ভিড় দেখছি, তার মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁরা হুজুগে দেখতে এসেছেন—অর্থাৎ, কারুর কারুর মতে, তেমন একটা সম্ভাবনা থাকতে পারে।

আমার কিন্তু এটা মনে হয় নি, কারণ সেমিনারে শুধু বক্তৃতাই হচ্ছে না, আলোচনাও চলছে, এবং উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ সেই আলোচনা মন দিয়ে যে শুনছে—এবং তাতে অংশ গ্রহণও করছে—সেটা সহজেই পরিষ্কার ঠেকে।

এরই মধ্যে কখন হচ্ছে ছড়া-পাঠ, কখন বা কাজী সব্যসাচী কিছু আবৃত্তি করে গেলেন—কখন আবার সন্ধ্যার দিকে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের আয়োজনও রয়েছে, সে-সব ছবি দেখাচ্ছেন রাশিয়া বা ভারত বা জাপান বা বৃটেন বা পূর্ব জার্মানী বা অস্ট্রেলিয়া।

অবশ্য ভিড়ের কথা যদি বলি, আসল লোক-সমাগম দেখছি বইয়ের স্টলগুলিতে, বিশেষত ভারতীয় স্টলে যা ভিড় রোজই সামলাতে হচ্ছে, তা আমাদের সকল প্রত্যাশার অতীত। প্রথম দিন যখন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান আবু সাঈদ চৌধুরী মেলাটির উদ্বোধন করলেন, তখন থেকে আজ যখন মেলা শেষ হয়-হয়, ভিড়ের জোয়ার চলেছে সমানই। বিশেষত প্রথম কয়েক দিন আমরা তো রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, শেষে অচিরেই ভারতীয় স্টলে তিনটির জায়গায় ছটি স্বেচ্ছাসেবক মোতায়েনের জন্য বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষের শরণাপন্ন হতে হল—যাতে অঘটন কিছু না ঘটে, তার জন্য দু-একটি অন্য ব্যবস্থাও নিতে হয়। 'অঘটন' কথাটা ইচ্ছে করেই ব্যবহার করলাম, কারণ সত্যিই অন্তত প্রথম দিন আমাদের স্টলটি ভেঙে যাওয়ার ভয় ছিল। শত-শত ছাত্র হুড়মুড় করে একসঙ্গে ঢোকার চেষ্টা করছে, কিছুতেই কোনো লাইন মানবে না, সকলেরই আকুল প্রশ্ন : এ-সব বই বিক্রী হচ্ছে তো? আমরা কিনতে পারব তো? অথচ ভারত থেকে বই এসেছে শুধু প্রদর্শনীর জন্য, বিক্রয়ের জন্য নয়—এবং তা শুনে উষ্মা-প্রকাশে এক বিরাট ছাত্রগোষ্ঠী সোচ্চার হয়ে ওঠে। অনেক করে বোঝাতে হয়, একই কথা বার বার বলতে বলতে মুখের হাড়ে ব্যথা ধরে যায়, শেষে দ্বিতীয় দিন আগে-ভাগে মেলা-প্রাঙ্গণে এসেই আমাদের বক্তব্যটিকে লিখে পোস্টারের আকারে টাঙিয়ে দিই—যেমন, 'এ-সব বই প্রদর্শনীর জন্য, বিক্রী এখানে হচ্ছে না—কাগজপত্র রয়েছে, তাতে আপনার ঈপ্সিত পুস্তকের তালিকা আপনার নাম-ধামসহ লিখুন, বই সরবরাহের যথাসাধ্য চেষ্টা করা হবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীর মাধ্যমে।'

ভারত হতে আগত সকল রকম বই-এর চাহিদা এখানে ভীষণ বললে অত্যুক্তি হবে না—চাহিদা বিশেষত পাঠ্যপুস্তকের, এবং সে-চাহিদার আকার যে কী বিরাট, তার সামান্য আভাস পেয়েই আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় বনে গেছি। কারণ দুই দেশের মধ্যে বই-এর লেনদেন সুষ্ঠুভাবে এখানো চালু হয় নি, পথে বাধা-বিঘ্ন নিতান্ত কম নয়—এবং সেই বাধা-বিঘ্নগুলি দূর করার ক্ষমতা আছে দুই দেশের সরকারেরই, আমাদের মতো অকিঞ্চিৎকর ব্যক্তিবিশেষের নয়। আমাদের খুব ছোটাছুটি চলেছে তাই এখানে-ওখানে আর্জি পেশ করতে বা কখনো স্থানীয় পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক-মহলে ধর্ণা দিতে—এক কথায়, নানান তাগিদে সারা দিন ধরে সারা শহরে চরকি-বাজী খেতে।

আর হ্যাঁ, একটা ছোট্ট জিনিস বলতে ভুলে গেলাম, যেটা শুনে ভারতে অনেকের—বিশেষত কবি-মহলে কারুর-কারুর হয়তো বটেই ভালো লাগা উচিত। সেমিনারে একদিন শামসুর রহমানের সভাপতিত্বে একটি সাহিত্য-সভা হওয়ার কথা ছিল, সেটি হল না। কেননা উদ্যোগে শামসুর বললেন ছোট-বড় অপ্রকাশিত সব কবিই ... কবিতা পড়তে চান, কেউ কেউ নাকি ... পর্যন্ত দেখান যে, তাঁদের পড়ার সুযোগ না দিলে সভা ভণ্ডুল করে দেবেন।

যাই হোক, এই অল্প ক'দিনে ... বিরাট চরকিবাজী খাচ্ছি। ... ভালো লাগে, এরই মধ্যে সময় ... নিবিড় হয়ে বসতে পেয়েছি শামসুর রহমান, আল মাহমুদ ও অন্যান্য কবিদের সান্নিধ্যে, কখনো থিয়েটার পত্রিকার সম্পাদক রামেন্দু মজুমদার এসেছেন নাট্যসংস্থা ... নিয়ে, কখনো ভাস্কর ... মারফৎ ইদানীংকার তরুণদের কিছু সাম্প্রতিক অভিনিবেশ ও নৈরাশ্যের প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়েছি।

অবশ্য গিয়েছি একের-পর-এক সেই দরজাতেও যেখানে কান্না থমকে আছে। গিয়েছি মোফাজ্জল হায়দারের পরিবারে বা মুনীর চৌধুরীর বাড়ীতে। এ এক আরেক তীর্থ, আরেক অভিনিবেশ, আরেক অভিজ্ঞতা। নাঃ, দুই বাংলা আর এক হবে না, কারণ এদের একটা সাংঘাতিক অতীত আছে, যেটা অন্তত মনে-মনে আজও সমানই বর্তমান তাদের পক্ষে—সে-অতীত আমাদের নেই। এবং এরা এখানে যা-ই হোক না বা হতে চান না, একমাত্র সেই অতীতই এদের সকল ভবিষ্যতের পথ বেঁধে দেবে। আমাদের সংলাপ কেটে যায়, কেবলই কেটে যায়—দুই বাংলার মাঝখানে এমন এক পদ্মা আজ, যা আর অতিক্রম করা যাবে না।

তাই মনে হয়, গ্রন্থমেলায় মেয়েটি আমায় 'ফরেনার' বলেছিল, হয়তো ঠিকই বলেছিল।

কুড়ি

তিন-চার মিনিট কিরণ চুপ করে বসে রইল। একটি কথাও বলল না। বেয়ারা এসে দু-কাপ চা, টোস্ট আর ওমলেট টেবিলের উপর রেখে গেল। কিরণকে নীরব এবং চিন্তিত দেখে রীতাবরী চায়ের কাপটা এগিয়ে দিয়ে বলল,—'নাও. ঠাণ্ডা হয়ে যাবে যে।'

কিন্তু কিরণের মুখভাব বদলাল না। সে গম্ভীর এবং অন্যমনস্কের মত চা-পান শুরু করল। কয়েক সেকেণ্ড পরে বলল,—'আমি একবার তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করব ভাবছি।'

—'কি হবে দেখা করে?' রীতাবরী তাকে বোঝাবার চেষ্টা করল। 'তোমাকে বলেছি না? বাবার টনটনে বংশ-গৌরব। আমরা নিমতার বিখ্যাত গোস্বামী বংশের সন্তান, একথা তাঁর মুখে দিনের মধ্যে সাত-বার শুনি। তোমার কাছ থেকে মেয়ের অসবর্ণ বিয়ের প্রস্তাব শুনলে বাবা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠবেন। তারপর একটা বিশ্রী রাগারাগি হবে। হয়তো ভীষণ চটে গিয়ে তোমাকে অপমান করে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলবেন। দাদা-বৌদি, ঝি-চাকর, বাইরের লোকেদের সামনে আমাকে নিয়ে এমন একটা বিশ্রী কেলেংকারী কিছুতেই হতে দিতে পারব না।'

কিরণ বলল,—'শুরুতে আপত্তি করলেও পরে হয়তো তোমার কথা ভেবে উনি রাজি হতে পারেন। আর এমনি তো ঘটে। প্রথম দিকে কারো মা-বাবাই এই ধরনের বিয়েতে রাজি হতে চান না। পরে ছেলে-মেয়েদের কথা চিন্তা করে মত দিতে হয়।'

রীতাবরী অবসন্ন রোদ্দুরের মত ম্লান হাসল। —'তুমি আমার বাবাকে চেন না। ভীষণ জেদী আর গম্ভীর। তাকে আমরা বরাবর দূরের মানুষ বলে জানি। বাবার স্বভাব ঠিক পাহাড়ের মত। অটল, অনড়। তাঁর কথার কিছুতেই নড়চড় হবে না। একবার কোনো বিষয়ে না বললে তাকে আমরা মত বদলাতে দেখিনি।'

কিরণ ভুরু কুঁচকে তাকাল। 'তাহলে উপায় কি হবে? আমাকে বিয়ে করলে বাবা বোধহয় কোনোদিন তোমার মুখদর্শন করবেন না।'

—'তার জন্যে দুঃখ নেই।' রীতাবরী পরিষ্কার বলল। 'আমি পরে চিঠি লিখে তাঁকে সমস্ত কিছু জানিয়ে আশীর্বাদ চাইব। যদি ক্ষমা করে উত্তর দেন, তাহলে তোমার সঙ্গে ফের ও বাড়িতে ঢুকতে পারি না হলে আর প্রয়োজন নেই। আমি জানব বাপের বাড়ির দরজা আমার জন্য চিরদিন বন্ধ হয়ে গেছে।'

কিরণ কোনো কথা বলল না। সে চায়ের কাপে ঠোঁট ডুবিয়ে গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছিল।

রীতাবরী জিজ্ঞাসা করল,—'আমাদের কথা বাড়িতে বলেছ নাকি?'

কিরণ মাথা নাড়ল। 'আগে বলিনি রীতাবরী। কিন্তু জানিয়ে রাখলে বোধহয় ভালো হত। আসলে ঠিক এই মুহূর্তে মা আর বাবার কাছে তোমার কথা বলতে একটু অসুবিধে আছে আমার।'

—'অসুবিধে?' রীতাবরী সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল। কিরণের মুখের উপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করল,—'অসুবিধে কিসের? এ বিয়েতে কি তোমার মা বাবা আপত্তি করবেন?'

—'না, না। আপত্তি করবেন কেন? ওসব কিছু নয়।' কিরণ চায়ের কাপ থেকে মুখ তুলে তাকাল। 'মুশকিল হয়েছে আমার সেই ভাইকে নিয়ে। যার কথা তোমাকে সেদিন বলেছিলাম।'

রীতাবরী ঈষৎ দুশ্চিন্তার ভাব করে বলল,—'কেন, কি হয়েছে তার? তুমি তো বলছিলে হিরু মানে তোমার ছোট ভাই খুব ভালো ছেলে। হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় প্রথম দশজনের মধ্যে তার নাম দেখলে তুমি আশ্চর্য হবে না।'

—'হ্যাঁ। পরীক্ষায় বসলে হয়তো সে রকম কিছু হতে পারত। কিন্তু এখন তার কোনো সম্ভাবনা নেই।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কিরণ বলল, 'হিরু বাড়ি থেকে চলে গেছে রীতাবরী।'

—'চলে গেছে? কোথায়?' বিস্ময়ে তার চোখ দুটি বেশ বড় দেখাল।

—'ঠিক জানি না। ও বাড়িতে একটা চিঠি লিখে গেছে। সে গ্রামে যাচ্ছে... কোথায় কোন গ্রামে তার কোনো ঠিকানা রেখে যায় নি।'

রীতাবরী চুপ করে শুনছিল। টেবিলে আহার্য সব পড়ে। মামলেট কেউ মুখে দেয় নি। কিরণ শুধু একটা টোস্টে কামড় দিয়েছিল মাত্র। কেমন করে খাবে? আড়ালে বসে কে যেন একটা বিষণ্ণ সুরের রাগ বাজিয়ে চলেছে। সেই সুর সমস্ত ঘরময়, এই গ্রীলের ভিতর, বাতাসের মত বার বার তাদের দুজনের কর্ণকুহরে প্রবেশ করছে।

কিরণ মুখ নীচু করে বলল—'মুশকিল হয়েছে তাই। হিরু চলে যাবার পর মা একেবারে ভেঙে পড়েছে। সবই করে...নাওয়া, খাওয়া ঘুমোন কিছুই বাদ নেই। তবু মায়ের মুখের দিকে যেন তাকান যায় না। আমি বুঝতে পারি দেহের ভিতরে রোগ যখন ছড়িয়ে পড়ে, বাইরে থেকে তা ধরবার উপায় নেই। মায়ের অবস্থা ঠিক তাই। মনের ভিতরে ঘুণ ধরেছে। তিলে তিলে মা নিঃশেষ হচ্ছে, অথচ কাউকে একটি কথাও বলবে না। শুধু মাঝে মাঝে দীর্ঘ-শ্বাস ফেলে। কখনও নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দেয়।'

—'আর তোমার বাবা?' রীতাবরী সাগ্রহে প্রশ্ন করল।

—'তাঁর অবস্থাও কিছু ভালো নয়। আগে বাবা বেশ শক্ত মানুষ ছিলেন। কথা-বার্তা কম বলতেন। ছোটখাটো ব্যাপারে আদৌ মাথা গলাতেন না। কিন্তু ইদানীং তিনি বেশ দুর্বল। শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। বুকের মধ্যে প্রায়ই একটা ব্যথা অনুভব করেন। আর মাঝে মাঝে পাগলের মত অর্থ-হীন ভঙ্গিতে বলে ওঠেন, —'ঘণ্টা বাজছে। ঘণ্টা বাজছে কিরণ। শুধু হিরু নয়, আমাদের সকলকেই এবার যেতে হবে।'

রীতাবরীকে রীতিমত হতাশ দেখাল। সে মুখখানা অন্য দিকে ফিরিয়ে রইল।

কিরণ তার বাঁ হাতের আঙুলগুলি নিজের করতলে টেনে নিয়ে বলল—'তুমি বিশ্বাস কর রীতাবরী। এই মুহূর্তে আমার বড় অসহায় অবস্থা। বাড়ির কথা তো শুনলে? হিরু চলে গেছে। সামনের শনিবার সন্ধ্যের প্লেনে দাদা আমেরিকায় উড়বে। আর কিছু দিনের মধ্যে বাবা বাটোয়ার করে দেশে যাবেন। আমাদের অমিয় বারিক লেনের বাড়িতে এখন ভাঙনের সুর শুনতে পাই। মায়ের মলিন মুখ...শ্রীহীন রুক্ষ বেশ। বাবা ভীষণ নিস্তেজ আর মনমরা। ঠিক এই অবস্থায় মা-বাবার কাছে নিজের বিয়ের কথা বলতে আমার খুব লজ্জা আর দ্বিধা বোধ হচ্ছে।'

রীতাবরী খুব আস্তে আস্তে তার হাতের আঙুলগুলি কিরণের মুঠোর মধ্য থেকে বের করে নিল। মৃদু অথচ দৃঢ় গলায় প্রশ্ন করল,—'আমি তাহলে এখন কি করব বল?'

—'তুমি একটু অপেক্ষা কর রীতাবরী। আমাকে কিছু দিন সময় দাও।'

—'সময়?'

—'হ্যাঁ। বেশী দিন নয়। মাত্র দু মাস। এই কটা দিন আমার বড় প্রয়োজন। আমি নিশ্চিত জানি তার মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে। প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে যা দেরি। তারপর মা-বাবা দুজনেই অনেকখানি স্বাভাবিক হবে। আর ইতিমধ্যে আমিও কিছুটা প্রস্তুত হতে পারি।'

—'তুমি বুঝি এখন প্রস্তুত নও কিরণ?' রীতাবরী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

কিরণ ম্লান হেসে বলল,—'প্রস্তুত আছি এই মুহূর্তে সেকথা কেমন করে বলি? তুমি তো সবই জান রীতাবরী। এই বিয়েতে তোমার মা-বাবার সম্পূর্ণ অমত। আর আমাদের বাড়ির পরিস্থিতি তো শুনলে। বিয়ে করে তোমাকে কোথায় তুলব বলতে পার?' একটু থেমে সে আবার বলতে শুরু করল,—'আমার মনের ইচ্ছে তোমাকে কত দিন বলেছি। একটা দু-কামরার ছোট্ট ফ্ল্যাট। সাউথ ক্যালকাটায় কিম্বা কাছাকাছি কোনো স্থানে। আমরা দুজনে মিলে সুন্দর করে বাড়িঘর সাজাব। কিন্তু তার জন্যেও কিছু দিন সময় দরকার। এখনও তো ফ্ল্যাট জোগাড় করা হয় নি।'

রীতাবরী হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল,—'আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। এখন যাই তাহলে।'

কিরণ একটু অবাক হল। সে ভুরু কুঁচকে বলল—'এখনই যাবে? তুমি তো কিছুই খেলে না।'

—'ভালো লাগছে না খেতে।' রীতাবরী আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না। ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে সে দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

তাড়াতাড়ি বিল মিটিয়ে দিয়ে কিরণ ওর পিছু পিছু রাস্তায় এসে নামল। কিন্তু রীতাবরী যেন ধরা বাড়তে। পথের ধারে একটা রিকশা দাঁড়িয়েছিল। সে কিছু না বলে তাতে উঠে বসল। সব বুঝতে পেরেও কিরণ বোকার মত প্রশ্ন করল,—'তুমি বোধ হয় রাগ করলে রীতাবরী, তাই না?'

—'হ্যাঁ। এই তো রাগ করবার সময়।' রীতাবরী ঠোঁট উল্টিয়ে বিচিত্র একটি ভঙ্গি করল। ফের বলল,—'আমি বুঝতে পারছি কিরণ। এখন তোমার অসুবিধে,—খুব অসুবিধে। বোকার মত আমি শুধু নিজের কথা ভেবেছি। তোমার দিকে একবারও তাকিয়ে দেখিনি।'

—'দু মাস খুব বেশী দিন নয়। দেখতে দেখতে কেটে যাবে রীতাবরী।'

—'হ্যাঁ। নিশ্চয় কেটে যাবে।' রীতাবরী প্রায় ফিস ফিস করে বলল। 'দিন কি কারো জন্যে অপেক্ষা করে কিরণ?'

—'আবার কবে দেখা হচ্ছে? তুমি কোথায় অপেক্ষা করবে কিছুই তো বলে গেলে না—'

—'দেখি। একটু ভেবে দেখি কিরণ। আমি কোথায় অপেক্ষা করব এখনই কিছু জানাতে পারছি না।' রীতাবরী ঠিক হেঁয়ালীর মত কথা কইল। ফের কিরণের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল,—'তোমাকে চিঠি লিখব। তাতেই সব জানবে—।'

রিকশা চলতে শুরু করল। চারপাশে লোকজন। তবু রীতাবরী পিছন ফিরে একটু অস্পষ্টভাবে হাত নাড়ছিল। একটা রং-বেরংয়ের সুন্দর ছবির মত দেখাচ্ছিল তাকে। খানিকটা দূরে যেতেই সে আবার সামনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসল।

ট্রাম লাইনের পাশে কিরণ বিমর্ষ মুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তার মনটা এখন সীসের মত ভারী। আজকের অভিজ্ঞতা তাকে বেশ পীড়া দিচ্ছিল। রীতাবরী তাকে স্টেশন পর্যন্ত যেতে বলে নি। অথচ কিরণ সেজন্য তৈরী ছিল। এখন তার হাতে কোনো কাজ নেই। ইচ্ছে করলে সে ওকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসতে পারত। কিরণ আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা গভীরভাবে চিন্তা করছিল। শেষ পর্যন্ত রীতাবরী কি তাকে ভুল বুঝল?

আজ বিন্তির থিয়েটার। ফাংশনে তাদের বাড়িশুদ্ধ সকলের নিমন্ত্রণ। সেই ভদ্রলোকরা বিকেলে গাড়ি পাঠাবেন। কিন্তু কেউ যাবে না। পাশপোর্ট ভিসার ব্যাপার নিয়ে তার দাদা ভীষণ ব্যস্ত। সকাল-বিকেল ছুটোছুটি করছে। আর মা-বাবা? হিরু চলে যাবার পর তাঁদের মুখে হাসি নেই। ফাংশন শুনবার মত কারো মনের অবস্থা নয়।

বিন্তি তাকে আড়ালে বলছিল,—'মেজদা তুমি যেও। সত্যি যাবে কিন্তু। নইলে ওরা কি ভাববে? আমাদের বাড়ি থেকে কেউ না গেলে—'

কিরণের তাই ইচ্ছে ছিল। রীতাবরীকে ট্রেনে তুলে দিয়ে সে নিশ্চয় বিন্তির থিয়েটার দেখতে যাবে। কিন্তু এই মুহূর্তে ভীষণ অবসন্ন লাগছে তার। মনমর্জি সংখ্যা লোহার মত আকাঙ্ক্ষা। এখন ফাংশন কন কোলাহল সংগ ইচ্ছে করছে না। বরং একা একা চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকলে তার ভালো লাগবে। একটা এসপ্ল্যানেডগামী ডবল-ডেকার বাস ক্রশিংএর মুখে দাঁড়িয়ে। মোটামুটি ফাঁকা। কিরণ লম্বা লম্বা পা ফেলে বাসটা ধরবার জন্য এগোল।

* * *

রাত নটায় ফাংশন শেষ হল। বিন্তি যখন গাড়িতে উঠল, তখন সাড়ে নটা বেজে গেছে। রতীশ বলল,—'তবু অনেক তাড়াতাড়ি আরম্ভ হয়েছে। আমি তো ভেবেছিলাম শুরু হতেই সাতটা বেজে যাবে।'

গাড়ির সীটে বসে বিন্তি উসখুস করছিল। তার গালে, মুখে, ঠোঁটের উপর রঙ। কপালে টিপ। ভালো করে মেক-আপ তুলতে গেলে অনেক দেরি। তাই সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েছে। মুখের উপর বার দুই তিন রুমাল ঘষে বিন্তি প্রশ্ন করল,—'থিয়েটার কেমন হল? সবাই কি বলছিল আমাকে বলবে না?'

—'আহা! নিজের প্রশংসা শুনতে বুঝি খুব ইচ্ছে করছে?' রতীশ বাঁকা চোখে তাকাল।

—'ধ্যেৎ! আমি কি তাই বলছি?' বিন্তি লজ্জা পেল।

রতীশ হেসে বলল,—'তোমার নাচের প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ। আগে শুধু আমি ভালো বলতাম। তুমি একদিন বড় শিল্পী হবে। অনেক নাম...যশ...খ্যাতি। এই কলকাতায় তোমার নাচ হবে শুনলে হলে আর লোক ধরবার জায়গা থাকবে না। তুমি আমার কথা গ্রাহ্য করতে না। এখন কত লোক তারিফ করছে। এবার নিশ্চয় তুমি বিশ্বাস করবে।'

—'তোমার কথা কি আগে অবিশ্বাস করেছি?' বিন্তি প্রায় হেলে পড়ে তার মাথাটা রতীশের কাঁধের উপর রাখল। কয়েক সেকেন্ড পরে সে বলল,—'আচ্ছা, তুমি নাকি খুব শীগগির বিলেত যাবে?'

—'কে বলল তোমাকে? মিলি নিশ্চয়?'

—'হ্যাঁ।' বিন্তি স্বীকার করল। 'কিন্তু কথাটা সত্যি কিনা বল?'

—'ঠিক সত্যি বলা চলে না।' রতীশ ঢোক গিলল। ঠোঁটের উপর জিভটা বুলিয়ে ফের সহজ করে নিল। বলল,—'বাবার তাই ইচ্ছে। অনেকদিন থেকেই কথাটা বলছে। আমি এবার লন্ডনে গিয়ে একটা কোর্স কমপ্লিট করি। কিন্তু আমার ভালো লাগে না। কি হবে বিদেশে গিয়ে? ইন্ডিয়াতে কি ডিগ্রী মেলে না?' কথা শেষ করে সে বুড়ো শিয়ালের মত মুচকি হাসল।

বিন্তি আড়চোখে তাকিয়ে বলল,—'আমার কথা মনে রেখ রতীশ। তোমার সংগে অনেকদূর এগিয়েছি। এখন ডবজলে দাঁড়িয়ে রইলাম। তোমার হাত ধরে ভাসতে ভাসতে ওপারে যেতে পারি। কিন্তু হাত ছাড়িয়ে নিলে আর পথ নেই। জলে ডুবে মরতে হবে।'

একটা জনহীন স্বল্পালোকিত জায়গায় রতীশ হঠাৎ গাড়ি থামাল। বিন্তি কিছু বলবার আগেই সে দুই হাত বাড়িয়ে তার গলাটা জড়িয়ে ধরল। তারপর আস্তে আস্তে

প্রায় সাঁড়াশীর মত ভঙ্গিতে তাকে আরো কাছে টেনে আনল।

বিনিত অস্ফুট চিৎকার করে বলল,—'এই ছেড়ে দাও। লাগছে আমার—'

রতীশ কোনো কথা বলল না। সে একটু জোর করে এবং কিছুটা কৌশলে বিনিতকে কোলের উপর আধশোয়া অবস্থায় ফেলে তার মুখে, গালে, ঠোঁটের উপর অনবরত চুমু খেতে শুরু করল।

খানিকটা ধ্বস্তাধ্বস্তির পর বিনিত নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠল,—'কি যে কর। এমন রাগ হয় আমার—'। তারপর রতীশের মুখের দিকে তাকিয়ে সে ফিক করে হেসে ফেলল। বলল,—'কেমন জব্দ! মুখে গালে রঙ লেগে এবার বেশ সঙের মত দেখাচ্ছে।'

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে রতীশ বলল,—'তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি। আমার সেই মাসী কলকাতায় আসছে।'

—তাই নাকি? কোন মাসী বল তো, সেই যিনি খুব ফেমাস? এখান থেকে তেরশ মাইল দূরে থাকেন?'

—হ্যাঁ। সামনের শনিবার মাসী আসছে। মোটে তিনদিন থাকবে। আমাকে রবিবার সকালে দেখা করতে বলেছে। তুমি যাবে নিশ্চয়?'

'কোথায় যেতে হবে?'

—কেন, গ্র্যান্ড হোটেলে। যেখানে মাসী এসে ওঠে।'

বিনিত সন্দিগ্ধ সুরে প্রশ্ন করল—'তোমার মাসী হোটেলে ওঠেন কেন? নিজেদের বাড়ি নেই? তাহলে আত্মীয়-স্বজন কিম্বা জানাশুনো কারো বাড়িতে উঠলেই পারেন।'

—'হুম্। তাহলেই হয়েছে।' রতীশ রহস্য করে বলল। 'মাসীকে ফেরাবার বন্দোবস্ত করে দিতে শ'খানেক পুলিশ ডাকতে হবে।'

—'পুলিশ?' বিনিত একটু ভয় পেল। 'তোমার মাসীকে বেরোবার সময় পুলিশ ডাকতে হয় নাকি?'

—না, না, ডাকতে হবে কেন? প্রয়োজন বুঝলে পুলিশ এমনিই থাকে।' রতীশ হেসে জবাব দিল। সে ফের বলল,—'বেশ তো। রবিবার সকালে মাসীর সঙ্গে আলাপ কর। তাহলেই সব বুঝতে পারবে।'

তাদের বাড়ির লেনের মুখে গাড়ি থেকে নেমে বিনিত তাড়াতাড়ি গলিতে ঢুকল। এত রাত্তির। একা একা হাঁটতে বেশ ভয় ভয় লাগে। তাদের বাড়ি থেকে কেউ থিয়েটার দেখতে যায়নি। বিনিত আশা করেছিল, তার মেজদা হয়তো যাবে। কেন গেল না কে জানে? গলিটা একেবারে ফাঁকা......জনহীন। বিনিত বড় বড় পা ফেলে বাড়ির দিকে হেঁটে চলল।

• • •

সন্ধ্যে সাতটার অনেক আগেই ওরা এয়ারপোর্টে এসে পৌঁছল। আজ দুপুর থেকে মনোরমা আবার চোখের জল ফেলছে। হিরুর নাম করে সে নিঃশব্দে কাঁদছিল। পনের দিন হল ছেলে বাড়ি থেকে নিখোঁজ। এখনও তার কোনো হদিশ পাওয়া যায় নি। অথচ তাই নিয়ে কি কারো দুশ্চিন্তা আছে?

কিরণ একবার বলল,—'মিছিমিছি তুমি কেঁদে কি করবে? হিরু তো তোমাকে জানিয়ে গেছে মা। সে বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছে। গ্রামের কুঁড়েঘরে নিঃসম্বল মানুষগুলির মধ্যে। একদিন সেখান থেকেই দলে দলে আবার শহরে এসে ঢুকবে।'

সান্ত্বনার কথা শুনলে মনোরমার কান্না আরো বাড়ে। গলা বন্ধ হয়ে আসে। চোখ দুটি ছলছলে দেখায়। বড় বড় জলের ফোঁটা টলমল করে। আর কিরণের এসব কথার কোনো মানে আছে? ছেলেটা দু-ছত্র লিখে গেছে বলেই কি বাড়িশুদ্ধ লোক নাকে তেল দিয়ে ঘুমোবে? কোথায় কোন গ্রামে সে পড়ে রইল? সেখানে কি খায়? এই ঠাণ্ডায় লেপ-কম্বল দূরে থাকুক, একটি শীতবস্ত্রও হিরু সঙ্গে নেয় নি। এরপর মনোরমা কেমন করে নিশ্চিন্তে থাকে? শীতের রাত্তিরে লেপ মুড়ি দিয়ে আরামে চোখ বন্ধ করতে পারে?

হিরু চলে যাবার পর বাণীব্রত বড় বেশী অস্থির। চোখেমুখে ভরসা নেই। নিভন্ত মোমবাতির মরা আলোর মত নিস্তেজ দৃষ্টি। মাঝে মাঝে সেই এক বুলি। ঘণ্টা বেজেছে। আর সময় নেই রে। হিরু চলে গেল। এবার আমাদেরও সব দিকে দিকে যেতে হবে। তৈরি হতে শুরু কর। প্লেনের বাঁশী কখন বাজবে বুঝতেই পারবে না।

সকালবেলায় বাণীব্রত খুব সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়েছিলেন। মিলনকে কাছে ডেকে তার মাথায় চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন,—'তোর সঙ্গে বোধহয় আর দেখা হবে না রে খোকা। শরীরের অবস্থা তো বুঝতে পারছি। ভিতরে ঘুণপোকা কুরে কুরে খাচ্ছে। কবে আছি, কবে নেই। আমেরিকায় বসে হয়তো একদিন খবর পাবি বুড়ো বাপ নক্ষত্রের দেশে রওনা হয়েছে।'

মিলন জানে তার বাবার মন ভেঙে গেছে। আর জোড়া লাগবে না। এই কদিনে

যেন বেশ রোগা হয়ে গেছেন বাণীব্রত। কণ্ঠার হাড় দুটো বিশ্রী প্রকট। দৃষ্টি বিষণ্ণ। বাবার হাত ধরে সে বলল,—'তোমার মত অলক্ষুনে চিন্তা, আমি কি চিরকাল বিদেশে থাকতে যাচ্ছি? দু-বছর কিম্বা তিন বছর পরে আবার ফিরে আসব। আর এই কটা দিন দেখতে দেখতে কেটে যাবে।'

অপরেশ প্রায় শেষ সময়ে এসে পৌঁছল। মিলনকে দেখে সোৎসাহে চেঁচিয়ে উঠল, —'বাঃ! নতুন স্যুটটায় গ্র্যান্ড দেখাচ্ছে তোকে।' তারপর কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিসফিস করে বলল,—'দেখিস, এলসী বৌদি আবার না তোর প্রেমে পড়ে যায়।'

—'যাঃ! কি যে বলিস, তোর নিজের বৌদি। মুখের যদি এতটুকু আগল থাকে।'

পরিচয় পেয়ে মনোরমা একগাল হাসল। —'ওমা! তোর সেই বন্ধু? কি সুন্দর চেহারা। ঠিক রূপকথার রাজপুত্তুরের মত।'

মিলন আশা করে নি। কিন্তু অপরেশ তার মা-বাবার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। মনোরমা ওর চিবুক স্পর্শ করে আশীর্বাদ জানাল। মুখে বলল,—'বেঁচে থাক বাবা। তোমার কাছে আমরা বড় ঋণী। মিলুর জন্য তুমি অনেক করেছ। চিরদিন তা মনে থাকবে।'

যাবার বেলায় বিদিশা কাঁদতে লাগল। মিলন তাকে আদর করে বলল,—'এই মুখপুড়ী, কাঁদছিস কেন? তোর জন্যে কি আনব বল? টেপ-রেকর্ডার, ক্যামেরা না টেরিকটনের শাড়ি?'

তবু বিদিশার চোখের জল থামল না।

মিলন আবার বলল,—'বোকা মেয়ে! কাঁদিস নে। মা-বাবাকে দেখিস। তারপর ভালো করে নাচ শিখে তুইও একদিন আমেরিকা যাবি।'

বিদায় নেবার মুহূর্তগুলি বড় মন্থর আর বিষণ্ণ হয়। দুঃখ-কষ্টের যে সমস্ত অনুভূতি এতকাল ভোঁতা ছিল, সেগুলি হঠাৎ স্পর্শকাতর হয়ে ওঠে। গলা বুজে আসতে চায়। নয়ন ছলছল করে।

মনোরমা তাই আঁচলের খুঁটে চোখ মুছল। এতকাল ধাড়ি মুরগীর মত সে ছেলেমেয়েদের আগলে রেখেছিল। এখন তারা বড় হয়েছে। এবার উড়ে যাবে। হিরু পালিয়েছে। মিলন আজ চলল। বাকি শুধু কিরণ আর বিদিশা।

নিয়মমাফিক কাস্টমসের চেকিং ইত্যাদির পর মিলন প্লেনে উঠল। তারপর মস্ত একটা হুমো পাখির মত বিমান আকাশে উড়ল। জ্যোৎস্নায় পৃথিবীর রূপ সুন্দরী নারীর মত। অচেনা, মোহময়। আকাশের বুকে প্লেনটা বারবার লাল আলো, নীল আলো দুলিয়ে ক্রমে দিগন্তে কোথায় অদৃশ্য হল।

* * *

হোটেলের কাছে এসে বিদিশা খুব অবাক হল। আর রতীশ যা বলেছিল সব ঠিক। এত সকালেও দরজার কাছে কি ভিড়। অন্তত আট-দশ জন পুলিশ তাদের সামলাতে হিমসিম খাচ্ছে। নিশ্চয় হোটেল থেকে বেরোবার পথে তাকে এক পলক চোখে দেখার জন্য মানুষগুলো তীর্থের কাকের মত অপেক্ষা করছে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে রতীশ বলল —'তাড়াতাড়ি চল। আটটা বেজে গেছে। এরপর মাসী আবার বেরিয়ে যাবে।'

—'হোটেলের দরজার কাছে এত ভিড় কিসের?' বিদিশা ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল। 'তোমার মাসীকে দেখবার জন্য এরা এসেছে নাকি?'

প্রশ্নটার উত্তর এড়িয়ে যাওয়ার জন্যই যেন রতীশ মুচকি হাসল। পরে বলল,—'আগে মাসীকে দেখবে চল। তখন তোমার সব প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবে।'

স্লিপ পাঠাতেই বেয়ারা এসে তাদের ডেকে নিয়ে গেল। ঘরে ঢুকে বিদিশা প্রায় হতভম্ব। তার সামনে দাঁড়িয়ে ইনি কে? প্রথমটা সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। কেমন যেন ওলটপালট ঠেকছে। তারপর মগজটা ধীরে ধীরে আবার পরিষ্কার হয়ে এল।

এবার সে বুঝতে পারল। রতীশ তাকে মিথ্যে বলে নি। তার মাসীকে কে চেনে না। শুধু সে নয়। এই কলকাতার বহু লোক চিনবে। তার কথা বলা, চলাফেরা, গান গাওয়া, সব বিদিশার পরিচিত। এতবার দেখেছে। কখনও ভুল হতে পারে?

চিত্রতারকা মধুমিতা সেন তাকে দেখে মিষ্টি হাসল। বলল,—'তোমার নাম বিদিশা, তাই না? রতীশ আমাকে চিঠিতে সব লিখেছে। তুমি খুব ভালো নাচতে পার।' ফের চোখের একটি সুন্দর ভঙ্গিমা করে প্রশ্ন করল,—'তারপর বড় হয়ে কি করবে? আমার মত সিনেমায় নামবে নাকি?'

বিদিশা কোনো জবাব দিল না। সে লজ্জায় ঈষৎ রাঙা হয়ে উঠল।

রতীশের মাসীর সময় ছিল না। ব্যস্ত নায়িকা। সকাল নটা থেকে স্যুটিং চলবে। শুধু আবার কাল। দুদিনই মাস বোঝাই লোকোর মত প্রোগ্রামে ভারী। পরশু সকালে আবার বোম্বাই ফিরতে হবে। দু দণ্ড বসে গল্প করবার সময় কোথায়।

মিনিট পাঁচ পরেই মধুমিতা উঠল। বলল,—'ভোর সরি। আজ আর সময় নেই রতীশ। তোর মাকে বলিস এর পরের বার মাসী নিশ্চয় দেখা করবে।'

—'হুঁ, তুমি আবার দেখা করেছ।' রতীশ প্রায় অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে জানাল।

মধুমিতা তাদের দুজনের গাল টিপে আদর করল। চোখ নাচিয়ে বেশ মজা করে বলল,—'বি কেয়ারফুল, দুজনে মিলে আবার যেন একটা সিনেমার স্টোরি তৈরি করে বস না।'

তারপর ডানহাতের তর্জনীটা ঈষৎ কামড়ে জলতরঙ্গের সুমিষ্ট বাজনার মত খিল খিল করে হেসে উঠল।

* * *

আরো কুড়ি পঁচিশ দিন পর। বাড়ির গোছগাছ শুরু হয়েছে। এতদিনের সংসার। তিলে তিলে গড়ে উঠেছে। টুকিটাকি [illegible] জিনিসপত্র। [illegible] সব [illegible] করেছে। সারাদিন [illegible]। সে একাদিনেই মনোরমা সব গুটিয়ে ফেলবে।

ডিসেম্বরের শেষে বাণীব্রত চন্দনপুর যাবেন। চাষীকে চিঠি লেখা হয়েছে। উঠোনের আগাছা, বুনো ঝোপঝাড় কেটে সে যেন ঘরদোর পরিষ্কার করে রাখে।

কদিন ধরে কিরণ খুব চিন্তিত। রীতাবরী তাকে চিঠি লিখবে বলেছিল। কিন্তু মাসখানেক হতে চলল, তার কোনো খবর নেই। কিরণ একদিন ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছিল। খোঁজখবরের আশায়। কিন্তু সে কাউকে চেনে না। কার কাছে রীতাবরীর খবর জানতে চাইবে? তবু [illegible] অফিসের কেরানীবাবুর কাছে খোঁজ নিয়েছে। কিন্তু সে সংবাদও খুব উৎসাহব্যঞ্জক নয়। রীতাবরী নাকি বেশ কিছুদিন হল ক্লাসে আসছে না। প্রায় পনের-কুড়ি দিন? হ্যাঁ, তা হতে পারে। কিম্বা তার দু-পাঁচদিন বেশী। ক্লাসের রোলকল খাতার উপর একনজর বুলিয়ে কেরানী তাকে পরিষ্কার উত্তর দিল।

অঘ্রাণের সকাল। কদিন হল শীত বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে কিরণ চিন্তা করছিল। তার এখন কি করা উচিত? দু-এক দিনের মধ্যে সে রীতাবরীর বাড়ি যাবে নাকি? এ ছাড়া উপায় নেই। যা সেন্টিমেন্টাল মেয়ে। নিশ্চয় তার উপর রাগ করে মনে বসে আছে।

অবশ্য রীতাবরী নিষেধ করেছে। তার বাবা ভীষণ রাগী। সব শুনে হয়তো তেলেবেগুনে জ্বলে উঠবেন। কিরণকে দুটো অপমানের কথা হজম করতে হতে পারে। তবু সে তৈরি। ভীরুর মত লেজ গুটিয়ে বসে থেকে লাভ নেই। যা হয় হবে। কিন্তু রীতাবরী এবং তার পরিচয় ও সম্পর্কের কথা জোর গলায় জানাতে সে দ্বিধা করবে না।

মনোরমা হঠাৎ তার কাছে এসে বসল। —'ও কিরণ! শোন বাবা, তোর সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।'

চোখ তুলে কিরণ অবাক হল। কথা বলতে গিয়ে মায়ের ঠোঁট দুটো অমন থরথর করে কাঁপছে কেন? মা কি আবার কিছু দেখল? হিরুর বিছানার তলায় চকচকে ছোরাটা দেখতে পেয়ে মা ঠিক অমনি কেঁপে উঠেছিল না?

মনোরমা ফিস ফিস করে বলল,—'তুই তো ডাক্তার। বিদিশাকে একটু দেখবি? মানে ওর শরীরটা—'

কিরণ ভুরু কোঁচকাল। মা যেন কি বলতে চাইছে। অথচ স্পষ্ট করে উচ্চারণ করতে পারছে না।

—'কি হয়েছে বিদিশার?' কিরণ প্রশ্ন করল। 'আজ সকালে সে বাথরুমে বসে বমি করছিল দেখলাম। ওর অম্বল-টম্বল হয়েছে নাকি?'

—'নারে বাবা। বোধহয় সর্বনাশ হয়েছে।' মনোরমা দাঁতে কিড়মিড় করে কান্না চাপবার ব্যর্থ চেষ্টা করল। কাঁদতে কাঁদতে বলল,—'পোড়ারমুখী আমাদের সকলের মুখে কলঙ্কের কালি লেপে দিয়েছে।'

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

অর্থনৈতিক সমীক্ষা : টাকার দাম

শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

কোন জিনিস কিনতে যে পরিমাণ টাকা লাগে তা হল সেই জিনিসের দাম। তেমনি টাকার বিনিময়ে যে পরিমাণ জিনিসপত্র পাওয়া যায় তাকেই বলা হয় টাকার দাম। সুতরাং টাকার বিনিময়ে বেশী জিনিসপত্র পাওয়া গেলে টাকার দাম বাড়ে, আর জিনিসপত্র কম পাওয়া গেলে টাকার দাম কমে।

ইতিহাস থেকে

এই অতি সাধারণ তত্ত্ব মোটামুটি সকলেরই জানা। অর্থনীতির ছাত্রেরা এটাও জানে যে টাকার দাম কতটা বাড়ল বা কমল তার হিসাব করা হয় সাধারণ ভোগ্যপণ্যের গড় দাম কতটা কমল বা বাড়ল তা থেকে। কিন্তু এটা হয়ত অনেকেরই জানা নেই যে দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে টাকার দাম বা ক্রয়ক্ষমতা ক্রমাগতই হ্রাস পাচ্ছে। ইংল্যাণ্ডে চোদ্দ শতকে মাত্র কয়েক পেন্সের বিনিময়ে একটি গরু বা ভেড়া পাওয়া যেত। আমাদের দেশে ঐ সময়ে শেখ নাসিরুদ্দিন চিরগের খইরুল মজালিস (১৩৫২-৫৩ সালে লেখা) থেকে জানা যায়, কীমৎ (দাম) এত কম ছিল যে এক তঙ্কায় একটা বিরাট ভোজ দেওয়া যেত। তঙ্কা হল রূপোর টাকা এবং পঞ্চাশটি তাম্র মুদ্রার সমান।

মুঘল আমলেও টাকার দাম প্রায় ঐ রকম ছিল। হুমায়ুননামায় আছে যে আকবরের সময় এক টাকায় চারটে ছাগল পাওয়া যেত। আর সায়েস্তা খাঁর আমলের বাংলাদেশের ত' কথাই নেই, এখনও তা কিংবদন্তী হয়ে আছে। আওরংগজেবের দাক্ষিণাত্য অভিযানের ব্যয়ভার বহন করত সম্রাটের মাতুল সুবেদার সায়েস্তা খাঁর শাসনাধীন বাংলাদেশ: সুবেদার সাহেব বাংলাদেশ থেকে সোনা রুপো সংগ্রহ করে, গালিয়ে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করতেন বলে টাকার পরিমাণ এত কমে গিয়েছিল যে জলের দামে জিনিসপত্র পাওয়া যেত—চালের দাম ছিল টাকায় আট মণ।

এইভাবে এক এক সময় টাকার দাম বেড়ে গেলেও শতাব্দীর ভিত্তিতে বিচার করলে দেখা যায়, এক শতক থেকে আর এক শতকে ঐ দাম কমেই চলেছে। পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির মত এও হল ইতিহাসের অন্যতম লিখন, এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই।

মাথা ঘামাবার প্রয়োজন হয় তখনই যখন টাকার দাম অস্বাভাবিক পরিমাণে এবং দ্রুতগতিতে বেড়ে চলে বা কমতে থাকে।

এই শতকেরই দ্বিতীয় দশকের শেষদিক থেকে অভূতপূর্ব মন্দার জন্যে টাকার দাম অকল্পনীয়ভাবে বেড়ে যাচ্ছিল—অর্থাৎ জিনিসপত্রের দাম অবিশ্বাস্যভাবে হ্রাস পাচ্ছিল। এর দরুন পৃথিবীর সব ধনতান্ত্রিক দেশেই কল্পনাতীতভাবে উৎপাদনের হ্রাস ঘটছিল। যা উৎপন্ন হত তারও ক্রেতা ছিল না। চাহিদার অভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বহু পরিমাণ শস্য সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিয়ে এবং আগুনে পুড়িয়ে নষ্ট করা হয়েছিল। উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার বেকারে সব দেশই ছেয়ে গিয়েছিল এবং দ্রব্যমূল্যে হ্রাসের ফলে অনেক ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে বহু লোকের সারাজীবনের সঞ্চয় নষ্ট হয়েছিল। এই সবের দরুন দাঙ্গা-হাঙ্গামা রাজনৈতিক গোলযোগ লেগেই ছিল। অনেকেরই মনে হয়েছিল যে মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হতে চলেছে—ধনতন্ত্রের আয়ু ফুরিয়ে এসেছে।

আজ অবশ্য এইভাবে টাকার দাম বৃদ্ধির কথা আর কল্পনা করা যায় না। এ যদি ঘটে তবে ঘটবে অতি দীর্ঘকালে—যে দীর্ঘকালে, কেইনসের ভাষায় : উই আর অল ডেড। সুতরাং আজকের সমস্যা নিয়েই মাথা ঘামান যাক।

আজকের দিনের সমস্যা ঠিক বিপরীত প্রকৃতির—টাকার দাম দ্রুত হ্রাসের সমস্যা। এ সমস্যা মোটামুটি সমগ্র সভ্য জগৎকেই প্রপীড়িত করছে। সমস্যাটি যে, আশংকা নয়, আতংকের কারণ হয়ে উঠতে পারে, এ শিক্ষা সভ্যজগৎ লাভ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মানী থেকে। কিরকম শিক্ষা লাভ করেছিল সে সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যাক।

১৯২৩ সালের জার্মানী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আধ দশক আগে শেষ হয়ে গেছে। জার্মানীর স্কন্ধে যুদ্ধের ব্যয়ভারের বিপুল বোঝা, দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ব্যাহত এবং সরকারী আয়-ব্যয় পদ্ধতিতে বিশৃংখলার চূড়ান্ত।

একজন মার্কিন পর্যটক এসেছেন জার্মানী বেড়াতে। ব্যাভেরিয়ার রাজধানী মিউনিকের এক বড় হোটেলে ঢুকে তিনি দেখেন রিসেপশান কাউন্টারে বড় বড় হরফে নোটিশ ঝোলান: মার্কে পেমেন্ট নেওয়া হয় না। মার্ক জার্মানীর নিজস্ব প্রশাসনিক মুদ্রা। সুতরাং এইরকম নোটিশে অবাক হবারই কথা। পর্যটক ভদ্রলোক কিন্তু বিশেষ আশ্চর্য হননি, কারণ ব্যাপারটা তিনি কিছুটা জানতেন। সম্পূর্ণ হতবাক হলেন পরের দিন।

সকালে উঠে তিনি হোটেলের পাশের ডাকঘরে গিয়েছিলেন বার্লিনে এক বন্ধুর কাছে একটা ছোট পার্সেল পাঠাবার জন্যে। ডাক-মাশুল শুনে চক্ষু একেবারে চড়কগাছ। কত কল্পনা করতে পারেন? ইংরেজীতে যাকে বলে একটা অ্যাস্ট্রনমিক্যাল ফিগার—১০০,০০০,০০০,০০০ মার্ক। হতবাক হয়ে ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন দেখে পার্সেল ক্লার্কটিই পথ বাতলে দিল: কোন বৈদেশিক কারেন্সী থাকলে বিনিময়ে করে আনুন না কেন। না হয়, ঐ কারেন্সী আমাকেই দিন, আমিই ব্যবস্থা করছি।

পর্যটক ভদ্রলোক কি করেছিলেন তা লেখেন নি।

এর মাত্র কয়েকদিন আগে একজন ইংরেজ পুস্তক-ব্যবসায়ী লাইপজিগে এসেছিলেন জার্মানীতে প্রকাশিত বই ইংল্যাণ্ডে আমদানির ব্যাপারে ওখানকার এক প্রকাশকের সংগে চুক্তি সম্পাদন করবার জন্যে। চুক্তিপত্রের খসড়া পড়ে ইংরেজ পুস্তক-ব্যবসায়ী দেখেন যে মার্কে নয়, ব্রিটিশ মুদ্রা পাউণ্ডেই টাকা মেটানর কথা লেখা হয়েছে। ভদ্রলোক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইতেই জার্মান প্রকাশক খোলামুখেই বললেন: আজকাল মার্কে কেউ আর চুক্তি সম্পাদন করে না—আভ্যন্তরীণ চুক্তিও নয়, বৈদেশিক বাণিজ্য চুক্তি ত' দূরের কথা। মার্কের দাম যে হারে কমছে তাতে দুদিন পরে লোকে হয়ত মার্ক নিতে সম্পূর্ণ অস্বীকারই করবে।

জার্মান প্রকাশের ভবিষ্যদ্বাণী ফলে গেল কয়েকদিনের মধ্যেই। অপরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রা মার্কের বাজারে কোন দামই রইল না। বেসরকারী ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সবাই মার্ক নিতে অস্বীকার করতে লাগল। বড় বড় হোটেল দোকান ইত্যাদি ত' নোটিশই ঝুলিয়ে দিলে: মার্কে পেমেণ্ট নেওয়া হয় না। আর ডাকঘরের মত সরকারী সংস্থাগুলো মাশুল ইত্যাদির জন্যে মার্কে অযুতলক্ষ নিযুত-কোটির সংখ্যা হাঁকতে লাগল।

এরই কিছুদিন আগে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়ে বেরিয়েছিল। একদিনে নাকি বিশ হাজার কপি বিক্রি হয়েছিল। যা তখনকার দিনে ছিল অকল্পনীয়। কিন্তু ভারতীয় মুদ্রায় যা পাওয়া গিয়েছিল তা সম্পূর্ণ অকিঞ্চিৎকর।

এইরকম অবস্থায় কয়েক দিনের মধ্যেই মার্কভিত্তিক মুদ্রা ব্যবস্থা যে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়বে আর মার্ক বাতিল হয়ে যাবে, তা সহজেই অনুমেয়।

এর পরবর্তী ঘটনা হল রাষ্ট্রবিপ্লব। বহু লোকের সারাজীবনের সঞ্চয় নষ্ট হওয়ায়, বহু চুক্তি অর্থহীন হয়ে পড়ায়—এক কথায় সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসাবে টাকার কোন কাজ না থাকায় জার্মানরা সেই নতুন মুদ্রা ব্যবস্থার প্রবর্তনের দাবিই করতে থাকে যা টাকার এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আবার ফিরিয়ে আনবে। এর জন্যে শাসন ব্যবস্থারও যে পরিবর্তন প্রয়োজন, তাও তারা সুস্পষ্টভাবে অনুভব করেছিল। এবং এর ফলেই নাৎসী দর্শন ও হিটলারের অভ্যুত্থানের পথ সুগম হয়। তাই তৃতীয় দশকের মহামন্দার মত দ্বিতীয় দশকের জার্মানীর এই দৃষ্টান্তও সমগ্র সভ্যজগতের আতংকের কারণ হয়ে আছে।

আমাদের টাকার দাম:

আমাদের টাকার দামও অতি দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে তবে আশংকাজনকভাবে কি? এই প্রশ্নের মীমাংসা করবার জন্যে কিছুটা পরিসংখ্যান এবং কিছুটা তথ্যের সাহায্য নেওয়া অপরিহার্য, কারণ এটা হল পরি-

সংখ্যান ও তথ্যের যুগ—ঠিক তত্ত্বের যুগ নয়।

আমাদের কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী স্বয়ং ঘোষণা করেছেন ১৯৪৯ সালের তুলনায় এই '৭২ সালে টাকার দাম হল মাত্র ৪২.৪ শতাংশ। অর্থাৎ বিগত তেইশ বছরে আমাদের টাকার ক্রয়ক্ষমতা ৫৮ শতাংশের মত হ্রাস পেয়েছে। যদি এইভাবেও চলে—যদি আরও দ্রুত হ্রাস না পায়, তবে আগামী কুড়ি বছরের পর অবস্থা কি দাঁড়াবে তা ভাবতেও পারা যায় না। জার্মান মার্কের মত আমাদের টাকাও কি বাতিল হয়ে যাবে?

আগের কথা ছেড়ে দিলেও ১৯৫০ সাল থেকে টাকার দাম কমেই আসছিল। ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত—অর্থাৎ মোটামুটি প্রথম পরিকল্পনার সময় এই মুদ্রা হ্রাসের হার ছিল বছরে গড়ে এক শতাংশেরও কম। তারপর ঘটতে থাকে অকল্পিত হ্রাস। ১৯৫৬ এবং ১৯৬৬ সাল—এই দশ বছরের মধ্যে টাকার দাম ৪৮ শতাংশের মত কমে যায়। বাকিটুকু ঘটে পরবর্তী বছরগুলোতে। ১৯৭২ সালের জুন মাসে এসে দেখা যায়, দ্রব্যমূল্য পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় ৬ শতাংশ বেশী এবং আগস্ট মাসের হিসেবে ঐ অংক ৮ শতাংশ অতিক্রম করেছে।

তার পরের নির্ভরযোগ্য তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি, তবে টাকার দাম যে আরও কমেছে, এ সকলেরই অনুভূত সত্য। সুতরাং আতংকের আশু কারণ না থাকলেও গতি যে আশংকাজনক তাতে কোন সন্দেহই নেই। তাই সরকার, সংসদ থেকে শুরু করে দায়িত্বসম্পন্ন সকলেই আজ এই গতিরোধের ব্যবস্থা নির্ণয় করতে ব্যস্ত বা ব্যতিব্যস্ত।

মূল্যস্ফীতি :

এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি বা টাকার মূল্য হ্রাসকে 'প্রাইস ইনফ্লেশন বা মূল্যস্ফীতি বলে অভিহিত করা হয়। শুধু 'ইনফ্লেশন' বা মুদ্রাস্ফীতি শব্দটা কিছুটা বিভ্রান্তিজনক, কারণ মুদ্রার পরিমাণে বৃদ্ধি না ঘটেও দাম বৃদ্ধি ঘটতে পারে। লর্ড কেইনস তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ 'জেনারেল থিয়োরী অব এমপ্লয়মেন্ট, ইন্টারেস্ট অ্যান্ড মানি'-তে (১৯৩৬) লিখেছেন: তুলনামূলকভাবে টাকা যখন অপ্রচুর হয়ে পড়ে তখন টাকার কার্যকর যোগান বৃদ্ধি করবার জন্যে বিকল্প বস্তুকে খুঁজে নেওয়া হয় (৩০৭ পৃষ্ঠা)। বর্তমান দিনে এই বস্তু হল ব্যাংক-ঋণ। অতএব কারেন্সীর পরিমাণবৃদ্ধি করা না হলেও—এনতার নোট ছেপে বাজারে না ছাড়লেও অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি ঘটতে—অর্থাৎ টাকার দাম হ্রাস পেতে পারে। তাই একে বলা হয় মূল্যস্ফীতি।

মূল্যস্ফীতির বিশ্বজনীনতা :

আগেই বলেছি, মূল্যস্ফীতি আমাদের দেশের কিছু একক ঘটনা নয়—একরকম সারা পৃথিবী আজ এই সমস্যায় প্রপীড়িত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবছর খাদ্যের গড় দাম গত বছরের তুলনায় ঋতু অনুসারে ১০ থেকে ২০ শতাংশ বেশী। এই মূল্যস্ফীতির জন্যই পনের মাস আগে রাষ্ট্রপতি নিক্সনকে 'ওয়েজ ফ্রীজ'—বা সাময়িকভাবে মজুরিবৃদ্ধি বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে এবং তার কিছুদিন পরে ডলারের বনেদীয়ানা ধুলোয় লুটিয়ে 'ডিভ্যালুয়েশন' বা মুদ্রামান হ্রাসের পথে পদসঞ্চার করতে হয়েছিল। কঠোর নিয়মানুবর্তী দেশ ইসরায়েলেও দ্রব্যমূল্য বছরে ১০—১২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাম্যবাদী দেশ যুগোশ্লাভিয়া ও পোল্যান্ডও এই বিশ্বজনীন ব্যাধির বাইরে থাকতে পারেনি। নব শিল্পসম্রাট পশ্চিম জার্মেনী ও জাপানও এর কবলমুক্ত নয়। আর গত মাসেই এর দরুন ইংল্যাণ্ড জরুরী ব্যবস্থা হিসেবে ৯০ দিনের জন্যে সমস্ত মজুরি দাম ভাড়া এবং লভ্যাংশের যে কোন বৃদ্ধি বন্ধ করেছিল। আরও বলা যায়, গত মাসে অনুষ্ঠিত পশ্চিম জার্মানী ও কানাডার নির্বাচনে অন্যতম প্রধান প্রসঙ্গ ছিল মূল্যস্ফীতি। বলা বাহুল্য কারণ ঐসব শক্তিশালী অর্থব্যবস্থা যা সহ্য করতে পারে আমরাও যে তাই পারব—এরকম আশা করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। সুতরাং ঐ সব দেশের পক্ষে যা সমস্যা আমাদের ক্ষেত্রে তা সংকটেরই নামান্তর। এই সংকটমুক্তির পথই খুঁজতে হবে এবার।

মূল্যস্ফীতির কারণ :

অতীতে, যেমন উল্লিখিত তৃতীয় দশকের গোড়ায় জার্মানীতে যখন মূল্যস্ফীতি ঘটত তখন তাকে মুদ্রাস্ফীতি বলেই বর্ণনা করা যেত। একদিকে যেমন উৎপাদক অপরিপূরিত চাহিদার সংগে তাল রাখতে পারত না, অপরদিকে তেমনি টাকার যোগানও অপ্রয়োজনীয়ভাবে বেড়ে যেত। তত্ত্বের দিক দিয়ে এর ফলে ঘটত ভোগ, উৎপাদন ও টাকার যোগানের মধ্যে ভারসাম্যের বর্ধমান অভাব। এবং ফলে যে অবস্থার উদ্ভব ঘটত অর্থনীতিবিদগণ তাকে 'অত্যধিক টাকা কর্তৃক অত্যল্প দ্রব্যাদির পশ্চাদ্ধাবন' বলে বর্ণনা করেছেন। আমাদের দেশে যুদ্ধের সময় বা যুদ্ধোত্তর যুগে ঠিক এই অবস্থা ঘটলেও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার শুরু (১৯৫১ সালের মার্চ) থেকে মূল্যস্ফীতির কারণ ছিল একটু স্বতন্ত্র। সংক্ষেপে বলা যায়, আমাদের পরিকল্পনা—কর্তৃপক্ষ আধুনিক সম্প্রসারণধর্মী অর্থনীতির এই তত্ত্বে দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন যে, মৃদু বর্ধনশীল মূল্যান্তর ছাড়া সম্প্রসারণ সম্ভব নয়। কারণ কিছুটা বেশী দাম না দিলে নতুন নতুন ক্ষেত্রে উৎপাদনের উপকরণসমূহ আসবেই না, আর বেসরকারী ক্ষেত্রে উৎপাদনবৃদ্ধিতে আগ্রহান্বিত হবে না। এই দামবৃদ্ধিকে 'ফাংকশানাল প্রাইস রাইজ' বা ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত (আংশিক নয়) দাম বৃদ্ধি বলে অভিহিত করা হয়।

এই ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত দাম বৃদ্ধির জন্যেই উন্নত দেশগুলোতে মূল্যস্ফীতি নিয়মিত ঘটে যাচ্ছে। সুতরাং তাদের সমস্যা হল : কি করে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ, পূর্ণ নিয়োগ এবং মূল্যস্ফীতির মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করা যায়।

মোটামুটি আমাদেরও এই সমস্যা, তবে পরিমাণগত দিক দিয়ে হল আকাশ-পাতাল তফাৎ। যেমন আমাদের দেশে ১৯৬৩—৬৭ সালের মধ্যে যে বছরে ১৩ শতাংশ হারে মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছিল তাকে কোন মতেই সম্প্রসারণজনিত দামবৃদ্ধি বলে অভিহিত করা যায় না। আর বিগত তেইশ বৎসরে টাকার দাম যে ৫৮ শতাংশের মত হ্রাস পেয়েছে তাও নিশ্চয়ই সম্প্রসারণের মূল্যে নয়।

আমাদের মূল্যস্ফীতির মৌলিক কারণ :

এই অতিবৃদ্ধির বিবিধ কারণ আছে। এর মধ্যে দুটিকে মৌলিক বলে নির্দেশ করা যায় : ত্রুটিপূর্ণ কৃষি-পরিকল্পনা এবং জনবিস্ফোরণ। কৃষির পুনর্গঠনের জন্যে বিবিধ প্রচেষ্টা এবং বহু পরিমাণ বিনিয়োগ সত্ত্বেও আমরা খাদ্য সমস্যার সমাধান করতে সমর্থ হই নি—বর্তমান বৎসরের মত খরার কবলে পড়লে (যেটা এদেশে অতিস্বাভাবিক ঘটনা) খাদ্যসংকটের সম্মুখীন হয়ে বিদেশের দিকেই তাকিয়ে থাকি। তেমনি জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি রুদ্ধ করতে পারি নি। অপর দিকে পরিকল্পনার বিপুল ব্যয় শুধু কার্যকর চাহিদার পরিমাণই বৃদ্ধি করে চলেছে।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ফসল হিসেবে ঘাটতি ব্যয়ের নীতি এবং কালো টাকার ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে (১৯৫৬—৬৬) ২,০০০ কোটি টাকার বেশী ঘাটতি ব্যয় বা নোট ছাপিয়ে ব্যয় করা হয়েছিল, এবং গত ১৯৭১-৭২ সালেই বাংলাদেশ সম্পর্কিত সমস্যার মোকাবিলার জন্যে ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৭০০ কোটি টাকার মত।

কালো টাকার ব্যাপারে ওয়াংচু কমিটি বলেছে, ৭০০০ কোটি টাকার মত কাজকারবার এই টাকায় চলে এবং এই সূত্রে ৪০০-৫০০ কোটি টাকার মত কর বছরে ফাঁকি দেওয়া হয়। চাহিদার তুলনায় স্বল্প দ্রব্যাদির ওপর এই টাকার চাপ যে টাকার দামকে কমিয়ে দেবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে?

এর ওপর আবার সাম্প্রতিক কারণ হিসেবে আছে প্রতিরক্ষাজনিত ব্যয় বৃদ্ধি এবং অধিক রপ্তানীর প্রয়োজনীয়তা। বলা হয়, মাত্র বাংলাদেশে যুদ্ধ ও বাংলাদেশকে খাদ্য সরবরাহের ব্যয় আমাদের মূল্যান্তরকে বেশ খানিকটা উর্ধ্বে নিয়ে গেছে।

দুরতিক্রম্য চক্র :

এইভাবে টাকার দাম কমলে মজুরীবৃদ্ধির দাবী জোরালো হতে বাধ্য। আবার ঐ দাবী মেনে নিলে মূল্যান্তর আরও বেড়ে যা টাকার দাম আরও কমে যায়। অথচ দাবী মেনে নেওয়া ছাড়া উপায়ও নেই, কারণ দাবী পূরণ না করার জন্যে ধর্মঘট বা অনুরূপ কারণে উৎপাদন ব্যাহত হলে মূল্যস্ফীতির গতি ত্বরান্বিত হতে বাধ্য, নিয়োগ বা শান্তি-শৃঙ্খলার প্রশ্ন না হয় ছেড়েই দিলাম। মজুরিবৃদ্ধির ফলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেলে উৎপাদকেরা মুনাফার হ্রাস

সহ্য করতে চায় না, সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন দ্রব্যের দামও বাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে। এর ফলেই দেখা যায় 'কস্ট-পুস' বা উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি। অপরদিকে লোকের আর্থিক আয় বৃদ্ধির দরুন অপেক্ষাকৃত স্বল্প দ্রব্যাদির ওপর বর্ধিত ব্যয়জনিত চাপ পড়লে যে দামবৃদ্ধি ঘটে তাকে 'ডিম্যান্ড-পুল' বা চাহিদাবৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি বলা হয়। দামবৃদ্ধি উৎপাদন-ব্যয় বা চাহিদা যে দিক থেকেই শুরু হোক না কেন, একটা স্তরের পর উভয় কারণই কার্য করতে থাকে। আমাদের দেশে বর্তমানে তাই ঘটছে—বর্তমান উৎপাদন ব্যয় এবং বর্তমান চাহিদা সমতালে মূল্যস্তরকে ক্রমাগত ওপরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। মজুত-দার, মুনাফা-শিকারী ইত্যাদি এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে পরিস্থিতিকে আরও সঙ্গিন করে তুলেছে। মোট ফল : অর্থ-ব্যবস্থায় একেবারে বেসামাল অবস্থা।

হয়ত অবস্থা এখনও আয়ত্তের বাইরে যায় নি। হয়ত মূল্যস্ফীতিকে এখনও দ্রুত-গতিসম্পন্ন বলে বর্ণনা করা যায় না, কিন্তু দেয়ালের লিখন সত্যই আশংকাজনক। অন্যান্য বিষয় ছেড়ে দিলেও সম্পদ ও আয় বন্টনে যে-পরিবর্তন ঘটেছে এবং ঘটছে তাকে দুর্যোগেরই অগ্রদূত বলে মনে করতে হবে। মূল্যস্ফীতি বা টাকার দাম হ্রাসের ফলে ধনী কৃষিজীবী, ব্যবসায়ী, মজুতদার, চোরা-আমদানীর কারবারী ইত্যাদি মাত্র কয়েক শ্রেণী স্ফীত হয়ে উঠেছে, আর সমাজের বাকী অংশের দৈনন্দিন অভাব মিটানর সমস্যা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। এ অবস্থা অন্তত সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধি-কারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রে বেশী দিন চলতে পারে না। তাই দেয়ালের অস্পষ্ট লিখনের সুস্পষ্ট অর্থ গ্রহণ করতে হবে।

প্রতিবিধান

প্রতিবিধান নিয়ে রথীমহারথীরা মাথা ঘামাচ্ছেন। অনেক সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যাণ্ডের অনুসরণে 'ওয়েজ-ফ্রীজ' বা মজুরী বৃদ্ধি বন্ধ করারও প্রস্তাব করা হচ্ছে। এ প্রস্তাব যে মোটেই বাস্তব নয়, তা ভারতের অর্থ-ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যাবে। হয়ত ভারতে মাত্র সংগঠিত শিল্প ক্ষেত্রে এবং সরকারী ও বেসরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার ক্ষেত্রে মজুরী বৃদ্ধি রহিত করার একটা কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু ছোটখাট শিল্প, স্বয়ং-নিযুক্ত ব্যক্তি, কৃষি শ্রমিক প্রভৃতির ক্ষেত্রে তা কি সম্ভব? উপরন্তু মজুরী বৃদ্ধি রহিত করা হলে খাজনা, ভাড়া, সুদ, মুনাফা ইত্যাদি সূত্রেও আয় বৃদ্ধি রহিত করতে হবে। নচেৎ বিভেদমূলক আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জোরদার হয়ে উঠবে এবং আয়-বন্টন আরও বৈষম্যমূলক হবে। সুতরাং এ পথ গ্রহণীয় নয়। তবে কালো টাকার কাজ-কারবার দমন করতে পারলে অনেকটা সুরাহা হতে পারে। এই ব্যাপারে কিন্তু শুধু বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করলেই চলবে না, সমাজের নৈতিক মান উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করতে হবে। 'অমৃতে'রই অন্য এক সংখ্যায় আলোচনা করেছি যে এর জন্যে থরসটিন ভেবলেস-বর্ণিত বাহ্যাড়ম্বর পূর্ণ ভোগের পথ পরিহার করার জন্যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

তত্ত্বের দিক দিয়ে মূল্যস্ফীতির প্রকৃত প্রতিবিধান উৎপাদন বৃদ্ধি। লর্ড কেইনস অবশ্য পূর্ণ নিয়োগের অবস্থাকেই প্রকৃত মূল্যস্ফীতি বা মুদ্রাস্ফীতি বলেই বর্ণনা করেছেন। পূর্ণ নিয়োগের অবস্থায়—অর্থাৎ উৎপাদনের সকল উপকরণ যখন পূর্ণভাবে নিয়োজিত থাকে তখন আর উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের দেশের মত মূল্যস্ফীতির অবস্থায় যখন সংখ্যাতীত বেকার পথে পথে ঘুরছে এবং বহু পরিমাণ উপকরণ অলস অবস্থায় পড়ে আছে তখন উৎপাদনবৃদ্ধি নিশ্চয়ই সম্ভব। উপরন্তু, কলাকৌশলের ক্ষেত্রে নিত্য-নতুন উদ্ভাবনের ফলে উৎপাদন-সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং প্রয়োজনমত মূলধন গঠন করে সংগঠন-ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু করতে পারলেই উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব।

এর জন্যে প্রয়োজন সুচিন্তিত, শুধু দৃষ্টি-আকর্ষক নয়, পরিকল্পনায়। এই পরি-কল্পনায় থেলাগানের চেয়েও গুরুত্ব দিতে হবে কার্যকারিতার ওপর, আর প্রথমেই কৃষির ভিত্তিকে সুসংগঠিত করতে হবে।

মূল্যস্ফীতির দমন :

যতক্ষণ পর্যন্ত অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে না আসছে ততক্ষণ নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দ ব্যবস্থার মাধ্যমে মূল্যস্ফীতিকে দমন করার সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা করতে হবে। অর্থাৎ সরকারের পক্ষে অন্তত প্রধান প্রধান ভোগ্য-পণ্যের বন্টন-ভার নিতে হবে। একেই অর্থ-নীতিতে মূল্যস্ফীতির 'সাপ্রেশান' বা দমন বলা হয়।

অন্যান্য ব্যবস্থা :

আর্থিক আয় বেশী হলেই দ্রব্যাদির ওপর ক্রয়ক্ষমতার চাপ বেশী পড়বে। তাই আর্থিক আয়কেও কমান দরকার। এ ব্যাপারে হয়ত আয়করের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়ার সীমা আরও কমান যেতে পারে। এই ব্যবস্থা সরকারের জনপ্রিয়তা কিছুটা হ্রাস করলেও মূল্যস্ফীতিরোধের ব্যাপারে যে ফলপ্রসূ হবে তাতে সন্দেহ নেই।

'রাজ কমিটি'র সুপারিশ সম্পূর্ণ কার্যকর করে কৃষি-আয়ের ওপর কর-স্বল্পতা সম্পূর্ণ দূর করতে হবে। স্মরণ রাখতে হবে, কৃষি থেকে আয় দ্রব্যাদির ওপর বিশেষ চাপ দেয়।

'একসাইস ডিউটিস' বা অন্তঃশুল্কের হার দামবৃদ্ধির আর একটা বিশেষ কারণ। প্রতিবারেই কেন্দ্রীয় বাজেটের আগে সাধারণ লোকে ভয়ে ভয়ে থাকে যে, আবার কোন্ কর বাড়ল এবং ফলে দাম আরও চড়ল। বিলাস-দ্রব্য ছাড়া অন্যান্য অন্তঃশুল্কের হার কমাবার চেষ্টা করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য দাম যাতে কমে সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। যেমন, চিনির ক্ষেত্রে অন্তঃ-শুল্ক হ্রাস করে চিনির দাম কিছুটা কমাবার ব্যবস্থা এখনই করা যেতে পারে। আয়করের ক্ষেত্রে উল্লিখিত জনপ্রিয়তা হ্রাস এতে খানিকটা পূরিত হবে।

আরও বলা যায় সরকার যে সমস্ত দ্রব্য ও সেবা সরবরাহ করে তাদের ক্ষেত্রে দাম বাড়াবার আগে বার বার চিন্তা করতে হবে। এতে বাণিজ্যিক নীতি বা উৎপাদন-ব্যয় ও দামের অংগাংগি সম্পর্ক খানিকটা ব্যাহত হলেও ক্ষতি নেই। কারণ অনেক সময় ক্ষতি স্বীকার করেও দ্রব্যাদি সরবরাহ করলে আখেরে সরকারের লাভ হয়—সরকারী আয়ব্যয়-নীতির এ একটা স্বীকৃত সত্য। রেলপথ পরিচালনায় ঘাটতি হলেই যদি মাশুল বৃদ্ধি করা হয়, ডাক-বিভাগ পরি-চালনায় ঘাটতি দেখা দিলেই যদি খাম-পোষ্টকার্ডের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয় তবে বেসরকারী ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বর্ধিত ব্যয় বা মুনাফা হ্রাসের দরুন দাম বাড়ান হলে অন্তত নৈতিক দিক দিয়ে সরকারের বিশেষ কিছু বলবার থাকতে পারে না। সুতরাং দান কার্যের মত দাম বৃদ্ধি রোধের কার্যও সরকারী উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে শুরু হলে ভাল হয়। এর ফলে আর কিছু না হোক অন্তত নৈতিক ক্ষেত্র কিছুটা প্রসারিত হবে — বেসরকারী ক্ষেত্রের স্বাভাবিক মুনাফার ব্যবধান আবার কিছুটা ফিরে আসবার চেষ্টা দেখা দেবে। মোট কথা প্রতি বার দাম বৃদ্ধি ঘোষণার আগে বিষয়টি সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করবে।

পরিশেষে, ঘাটতি করের পথে অতি-সতর্কভাবে চলতে হবে এবং সর্বতোভাবে লোককে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করে ঐ সঞ্চয়ের যথাযোগ্য বিনিয়োগ-ব্যবস্থা করতে হবে।

এইভাবে একদিকে যদি ব্যয়যোগ্য আয়ের পরিমাণ হ্রাস এবং অপরদিকে উৎপাদনবৃদ্ধির ব্যবস্থা করা যায় তবে আজকের দিনের গুঁড়িমেরে চলা মূল্য-স্ফীতি হঠাৎ লম্ফ দিয়ে উঠে অর্থ ও সমাজ-ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করতে সমর্থ হবে না।

অবশ্য এ ব্যাপারে আশাবাদী হতে হবে—মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা সম্ভব নয়, এই রকম নৈরাশ্যবাদ পোষণ করা চলবে না, ব্যক্ত করা ত নয়ই। কারণ এই রকম ধারণা ও উক্তি মজুতদারী ব্যবসায়ী ইত্যাদিরই আশাবাদ সম্প্রসারণে সহায়তা করে। তার বদলে আইন-কানুন, বিরতিহীন প্রচার ইত্যাদির মাধ্যমে মূল্যবৃদ্ধিরোধ সম্বন্ধে সরকারের নিজের এবং সমাজের শোষিত-শ্রেণীর আশাবাদ এবং শোষক-শ্রেণীর মধ্যে দণ্ড ভয় গড়ে তুলতে হবে। এও অবশ্য এক পরিকল্পনার প্রশ্ন, কিন্তু অর্থনৈতিক পরি-কল্পনার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

পশ্চিমবঙ্গে ভ্রমণ
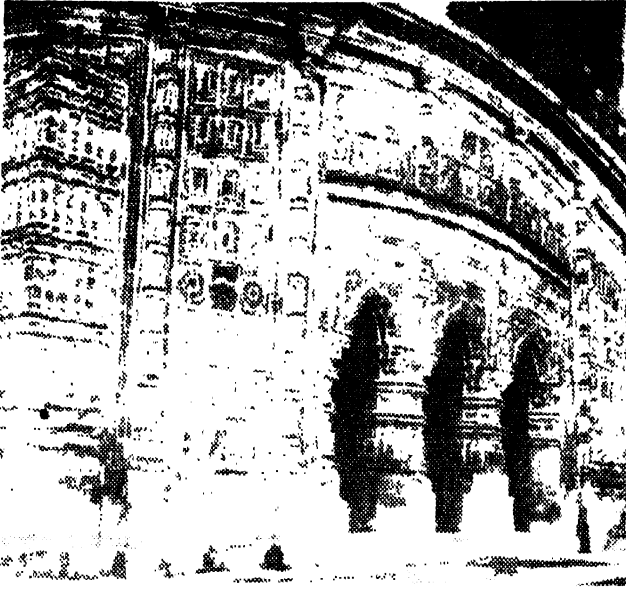
বিষ্ণুপুরের পঞ্চরত্নমন্দিরে পোড়ামাটির অলঙ্করণ

ফিরোজ মিনার, গৌড় (মালদহ)

॥ ১ ॥

পশ্চিমবঙ্গে ভ্রমণের আকর্ষণ আগেকার তুলনায় এখন যে অনেক বেশি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রাস্তাঘাটের অভাবে আগে যেসব দ্রষ্টব্যস্থান ছিল দুরধিগম্য, এখন তা সুগম হয়ে উঠেছে। পাকা সড়ক বিস্তৃত হয়েছে শহর থেকে গ্রাম-গ্রামান্তরে, রেলপথ যেখানে নেই সেখানেও এখন নিত্য যাতায়াত চলেছে বাসের দৌলতে। আগে অনেক জায়গায় বেড়াতে গিয়ে পর্যটকেরা থাকা-খাওয়ার যেসব অসুবিধা ভোগ করতেন, এখন আর সেসব অসুবিধা নেই। সরকারী পর্যটন দপ্তরের কল্যাণে বহু জায়গায় এখন আরামপ্রদ পর্যটক-আবাস বা টুরিস্ট লজ চালু হয়েছে, অনেক জায়গা খোলা হয়েছে যুব-আবাস বা ইউথ হোস্টেল। গাইডেরও ব্যবস্থা আছে বিশেষ বিশেষ পর্যটনক্ষেত্রে।

পশ্চিমবঙ্গে যেমন আছে পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, বন-বনান্তর, তেমনি আছে শ্যামল শস্যপ্রান্তর আর সুনীল সমুদ্র। প্রাকৃতিক শোভামণ্ডিত পার্বত্য অঞ্চলে যাঁরা ঘুরে বেড়াতে চান, তাঁদের জন্যে আছে দার্জিলিং কালিম্পং, কার্শিয়াং। সমুদ্র-সৈকতে যাঁরা অবকাশ যাপন করতে চান, তাঁদের জন্য আছে দীঘা ও বকখালি। প্রাচীনকালের স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক প্রাসাদ, দুর্গ, মঠ, মন্দির, মসজিদ, মিনার, সমাধি প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ যাঁরা প্রত্যক্ষ করতে চান, তাঁদের আকর্ষণ করবে, গৌড়, পাণ্ডুয়া, ধানগড়, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর। তীর্থধর্মের আকর্ষণে যাঁরা পশ্চিমবঙ্গে বেড়াতে চাইবেন তাঁদের হাতছানি দেবে নবদ্বীপ, কালীঘাট, বেলুড়, দক্ষিণেশ্বর, ত্রিবেণী, কালনা, কাটোয়া, তারাপীঠ, জয়রামবাটী, কামারপুকুর। অরণ্যাঞ্চলে যাঁরা ভ্রমণ করতে আগ্রহী তাঁদের জন্য রয়েছে উত্তর-

•

মনোজিৎ বসু

•

বঙ্গের জলদাপাড়া, আলিপুরদুয়ার, জয়ন্তী, আর দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবন এলাকা। শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে নৈকট্য অনুভব করতে হলে ভ্রমণ করতে হবে কলকাতা ও শান্তিনিকেতনে, যোগ দিতে হবে জয়দেব-কেঁদুলি ও গঙ্গাসাগরের মেলায় এবং মালদহের গম্ভীরা আর পুরুলিয়ার ছৌ-নৃত্যের আসরে। তাছাড়া, শিল্প-বাণিজ্য সমৃদ্ধ আধুনিক পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে পরিচিত হ'তে হ'লে ঘুরে বেড়াতে হবে আসানসোল, চিত্তরঞ্জন ও দুর্গাপুর এলাকায়, ময়ূরাক্ষী ও কংসাবতী অঞ্চলে আর কলকাতা-হাওড়া হুগলি-চব্বিশ পরগণার হুগলি নদীর ধারে ধারে।

॥ ২ ॥

পশ্চিমবঙ্গে পার্বত্য অঞ্চল বলতে প্রধানত দার্জিলিং জেলাকেই বোঝায়। ছোটোখাটো পাহাড় অবশ্য বাঁকুড়া-পুরুলিয়া অঞ্চলেও আছে। কিন্তু সেগুলি নেহাতই পাহাড়, পার্বত্য কৌলীন্যের দিক থেকে তাদের আকর্ষণ অকিঞ্চিৎকর। দার্জিলিং হ'লো ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শৈলাবাস। নগাধিরাজ হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্ট এবং কাঞ্চনজঙ্ঘার অনির্বচনীয় শোভা দেশী-বিদেশী সকল শ্রেণীর পর্যটকদের কাছেই বিরাট একটা আকর্ষণ। তা ছাড়া 'টাইগার হিল' থেকে সূর্যোদয় নিরীক্ষণ, পার্বত্য উপজাতিদের নৃত্যগীত উপভোগ, এবং তাদের তৈরী নানারকম হস্তশিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ করার আগ্রহটাও বড়ো কম নয়।

দার্জিলিং শহরকে বলা হয়েছে 'কুইন অব দি হিলস্টেশনস', শৈলনগরীর রাণী। এই উচ্ছ্বসিত উক্তির কারণ বোধহয় এখান থেকে হিমালয়ের তুষারাচ্ছাদিত শৃঙ্গগুলি যে অপূর্ব শোভা নিয়ে চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়, উত্তর ভারতের আর কোনো শৈলা-

বাস থেকে তেমনটা হয় না। শহরের কেন্দ্রবিন্দুতে 'অবজারভেটরি হিল'—তার মাথায় গিয়ে দাঁড়ালেই চোখে পড়বে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও তুষারাচ্ছন্ন অন্যান্য গিরিশৃঙ্গের নৈসর্গিক শোভা। অবশ্য ঘন মেঘ বা কুয়াশা না থাকলে। এই অবজারভেটরি হিলের নিচেই বৃত্তাকারে বিস্তৃত হয়েছে ম্যাল রোড বা প্রধান ভ্রমণ সড়ক। বেড়াতে বেড়াতে ভ্রমণকারীরা চলে যাবেন জলাপাহাড়ে, সেখান থেকে আরও দূরে, ঘুম পর্যন্ত। ভ্রমণপথে উপরে নীচে কত বিচিত্র প্রাকৃতিক দৃশ্য, কতরকমের গাছপালা, রঙবেরঙের কতো ফুলের ও অর্কিডের সৌন্দর্য, জানা-অজানা কত রকমের পাখির কূজন। শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত বিস্তৃত সড়ক পথে বা রেলপথে যাঁরা ঘুরে বেড়াবেন তাঁদের চোখে আরও একটা জিনিস ধরা পড়বে। তা হ'লো পার্বত্য ঝরণাধারা—যেগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হ'লো কবি সত্যেন্দ্রনাথ বর্ণিত 'পাগলাঝোরা'। ম্যালের নিচে ভুটিয়া বস্তি। বৌদ্ধ গোম্ফা। ম্যাল রোডের এক পাশে রাজভবন, বার্চহিল পার্ক। টাইগার হিল থেকে সূর্যোদয়ের শোভায় যাঁরা মুগ্ধ, বার্চহিল থেকে তাঁরা সূর্যাস্তের সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করতেও ভোলেন না। দার্জিলিং শহরের অন্যান্য দ্রষ্টব্যের মধ্যে রয়েছে মিউজিয়ম বোটানিক্যাল গার্ডেন, ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্মৃতিবিজড়িত বাসভবন স্টেপআসাইড ইত্যাদি। দার্জিলিং শহরের আশেপাশে আরও কতো দর্শনীয় স্থান।

কলকাতা থেকে উড়োজাহাজে বাগডোগরা বিমানঘাঁটিতে পৌঁছতে সময় লাগে মাত্র দেড় ঘন্টা। তারপর, সেখান থেকে মোটরগাড়ীতে দার্জিলিং শহরে হাজির হতে ঘন্টা আড়াই লাগলেও পার্বত্য পথে সেই মোটরবিহারের একটা আলাদা আনন্দ আছে। কলকাতা থেকে দার্জিলিং-এর দূরত্ব প্রায় ৬৬৭ কিলোমিটার—ট্রেনে যেতে গোটা একটা দিনই লেগে যায়। শেষ ৮৮ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হয় নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে খেলনা রেলগাড়িতে চেপে, বিস্তীর্ণ লুপ লাইনে। তাড়াহুড়ো যাদের নেই এবং ধৈর্য ধরে পার্বত্য শোভা নিরীক্ষণের ঝোঁকটা যাদের একটু বেশি, তাঁদের কাছে খেলনা রেলগাড়ী কিন্তু আদৌ খেলনা নয়। সময় বেশি লাগলেও তাঁরা ঐ পথটাই বেছে নেন। আর, তাড়াতাড়ি দার্জিলিং শহরে যাঁরা পৌঁছতে চান বা স্পীডের থ্রিলটা যাদের কাছে অধিকতর আকর্ষণীয়, তাঁদের জন্য ট্যাক্সি, বাস ইত্যাদি হাজির থাকে শিলিগুড়িতেই। সাম্প্রতিক কালে রাষ্ট্রীয় পরিবহণের কল্যাণে কলকাতা থেকে বাসেও দার্জিলিং যাওয়া যাচ্ছে। আর তাতে সময়ও যে খুব বেশি লাগে তা নয়। সব ঠিকঠাক থাকলে, মাত্র সাড়ে ষোলো ঘন্টার যাত্রা!

দার্জিলিং-এর পথে কার্শিয়াং আর একটি মনোরম শৈলশহর। শিলিগুড়ি থেকে এর দূরত্ব ৫১ কিলোমিটারের মতো, আর দার্জিলিং থেকে ৩২ কিলোমিটার। কার্শিয়াং থেকে যে-দৃশ্যটি ভ্রমণকারীদের সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ ও বিস্মিত করে, তা হ'লো দক্ষিণাভিমুখী বাংলার সুবিস্তৃত সমতলভূমির সৌন্দর্য। এখানে দার্জিলিং থেকে শীত অপেক্ষাকৃত অনেক কম হ'লেও বৃষ্টিপাত হয় বেশি। শহরের চারদিকে পাহাড়ের গায়ে গায়ে অনেকগুলি চা-বাগান। তার দৃশ্যও চমৎকার।

কালিম্পং হলো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে উজ্জ্বল আর একটি শৈলাবাস। এখান থেকেই হিমালয়ের দৃশ্যাবলী যেন বেশি ক'রে উপভোগ করা যায়। দার্জিলিং শহর থেকে কালিম্পংয়ের দূরত্ব ৫০ কিলোমিটার। এর পশ্চিমে বড় রঙ্গীত নদীর শ্যামল উপত্যকা, দক্ষিণ-পশ্চিমে সিঞ্চল পাহাড় ও বন, পূর্বে রিলি নদীর উপত্যকা, আর দক্ষিণে পশ্চিমবঙ্গের সমতলভূমি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক থেকে এগুলিই কালিম্পং-এর বড়ো আকর্ষণ। তাছাড়া, কালিম্পং থেকে পর্যটকেরা সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকে গিয়েও ঘুরে আসতে পারেন দিনকয়েকের জন্য।

দার্জিলিং অঞ্চলে পর্যটনের সুযোগ-সুবিধা যে আগেকার চেয়ে অনেক বেড়েছে তাতে সন্দেহ নেই। এ-বিষয়ে রাজ্যের পর্যটন বিভাগের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। গত কয়েক বছরের মধ্যে তাঁরা দার্জিলিং ও কালিম্পং-এ মোট পাঁচটি যাত্রীনিবাস স্থাপন করেছেন—তিনটি দার্জিলিংয়ে আর দুটি কালিম্পং-এ। দার্জিলিং টুরিস্ট লজটি বিলাসবহুল এবং আধুনিক যুগের বিভিন্ন উপকরণ সমন্বিত। ম্যাল রোডে অবস্থিত এই লজের দূরত্ব রেল স্টেশন থেকে মাত্র দেড় কিলোমিটার। দুই শয্যাবিশিষ্ট পনেরটি শয়নকক্ষ আছে। তার মধ্যে তিনটি বেশ বড়সড়। ভাড়া শয্যাপিছু তিরিশ টাকা দৈনিক। তবে গোটা ঘর নিলে পঞ্চাশ টাকা। অন্য যে বারোটি ডবল-রুম আছে, সেগুলির প্রত্যেকটির দৈনিক ভাড়া পঁয়তাল্লিশ টাকা বা শয্যাপিছু পঁচিশ টাকা করে। অফ সিজনে বিশেষ রিবেট পাওয়া যায়। ভারতীয় ও ইউরোপীয় সব রকমের খানাপিনার ব্যবস্থা আছে এই লজে। খাওয়া-খরচ বেড-টী থেকে শুরু করে প্রাতরাশ, দ্বিপ্রাহরিক আহার, বৈকালিক চা ও নৈশ-ভোজ সমেত পড়ে পঁচিশ-ছাব্বিশ টাকার মতো। বারো বছরের কমবয়সী ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে পনের-ষোল টাকা। এই হিসেব থেকে স্পষ্টই এটা বোঝা যাবে যে, দার্জিলিংয়ের এই টুরিস্ট-লজ প্রধানত বিত্তবান পর্যটকদের জন্যই। তবে, মধ্যবিত্ত পর্যটকদের জন্যও দার্জিলিংয়ে একটি আরামপ্রদ যাত্রীনিবাস স্থাপন করেছেন, স্টেট টুরিস্ট ডিপার্টমেন্ট। সেটি হলো জলাপাহাড় রোডের 'শৈলাবাস'। রেল স্টেশন থেকে দূরত্ব তিন কিলোমিটার। মোট সতেরটি ঘর আছে এখানে। তার মধ্যে দুই শয্যাবিশিষ্ট ঘর একটি, ভাড়া শয্যাপিছু দৈনিক আট টাকা; পাঁচ ও ছয় শয্যাবিশিষ্ট ঘর যথাক্রমে ছ'টি ও চারটি—ভাড়া শয্যাপিছু ছ' টাকা রোজ। তাছাড়া আট শয্যাবিশিষ্ট ঘর আছে পাঁচটি এবং একটি ঘর আছে নয় শয্যাবিশিষ্ট। এই দুটি ঘরের যে কোনো একটি ঘরে আশ্রয় নিলে শয্যাভাড়া দৈনিক মাত্র পাঁচ টাকা। অন্যান্য ঘরের ক্ষেত্রে লাগোয়া গোসলখানা থাকলেও, শেষোক্ত ক্ষেত্রের বাথরুমটি অবশ্য কমন। শৈলাবাসে থাকলে আমিষ ও নিরামিষ দু'রকম খাবারই আপনি পাবেন; তবে ইউরোপীয় নয়, সম্পূর্ণ দিশী খাবার। প্রাতরাশে খরচ পড়ে পাঁচসিকের মতো, দ্বিপ্রাহরিক ও রাত্রির আহার তিন টাকা করে, বৈকালিক চা পঁচাত্তর পয়সা। আর, ভোরবেলার চা পঁচিশ পঞ্চাশ পয়সা থেকে দু'টাকা। সার্ভিস চার্জ শতকরা পাঁচ টাকা।

সিঞ্চলের রোবহাউস অ্যান্ড চ্যালেট-ও একটি আকর্ষণীয় যাত্রীনিবাস। ঘুম রেলস্টেশন থেকে এর দূরত্ব চার কিলোমিটার। চার শয্যাবিশিষ্ট দুটি ফ্যামিলি স্যুট আছে এখানে। প্রতি স্যুটের ভাড়া দৈনিক তিরিশ টাকা, অর্থাৎ শয্যাপিছু মাত্র সাড়ে সাত

দীঘা সমুদ্র-সৈকত

টাকা। আর একটা সুবিধে এই যে, পরিবারের বাড়তি দু-একজন থাকলে অতিরিক্ত খাটের সুবিধাও পাওয়া যায়। অতিরিক্ত খাট অবশ্য দুটির বেশি এক স্যুটে ঢোকানো যায় না। খাটের ভাড়া পড়ে প্রত্যেকটির জন্য পাঁচ টাকা করে। ছয় শয্যাবিশিষ্ট দুটি ডরমিটরীও আছে এই ক্লাবহাউসে। রেলগাড়ির টু-টায়ার স্লীপার কোচের মতো ওপরকার বিছানা পিছু ভাড়া পাঁচ টাকা, আর নিচেকার প্রতিটি বিছানার ক্ষেত্রে সাত টাকা। ভারতীয় ও ইউরোপীয় দু-রকমের খানাপিনার ব্যবস্থা আছে এখানে। টাইগার হিলের সূর্যোদয় দেখবার জন্য যেসব পর্যটক বিশেষ আগ্রহী তাদের পক্ষে এখানেই রাত্রিযাপন সুবিধাজনক। কেননা, কাছেই টাইগার হিল। পায়ে হেঁটে ধীরে-সুস্থে প্রতীক্ষিত উদয়পর্বের আগেই সেখানে গিয়ে পৌঁছুনো যায়। সূর্যোদয় মিস করবার দুর্ভাবনা থাকে না।

কালিম্পঙের যাত্রীনিবাস দুটির মধ্যে একটি হোটেল ভারতীয় ও ইউরোপীয় আহারের ব্যবস্থা সমন্বিত ট্যুরিস্ট লজ, অন্যটি 'শ্যাংরিলা' পর্যটক-আবাস। শিলিগুড়ি রেল স্টেশন থেকে প্রথমটির দূরত্ব একাশী কিলোমিটার, দ্বিতীয়টির দূরত্ব তার চেয়ে তিন কিলোমিটার কম। প্রথমটিতে এক শয্যাবিশিষ্ট শয়নকক্ষ আছে দুটি এবং তিনটি কামরা আছে দুই শয্যাবিশিষ্ট। এক শয্যাবিশিষ্ট শয়নকক্ষের ভাড়া দৈনিক পঁচিশ টাকা। দুই-শয্যা শয়নকক্ষের মধ্যে একটি বেশ বড়ো। একজন যাত্রী গোটা ঘরটা নিলে ভাড়া পড়বে পঞ্চাশ টাকা দৈনিক। কিন্তু একই দলের দুজন প্রাপ্তবয়স্ক থাকলে ষাট টাকা, অর্থাৎ মাথাপিছু তিরিশ টাকা, আর, তিনজন থাকলে পঁচাত্তর টাকা বা মাথাপিছু পঁচিশ টাকা দক্ষিণা। সাধারণ ডবলবেড আর যে দুটি আছে, সেক্ষেত্রে শয্যাপিছু চব্বিশ টাকা ধার্য হলেও ঘরপিছু তিন টাকা কম। এই ট্যুরিস্ট লজে অর্ডার-মাফিক খাদ্য সরবরাহ করা হয় এবং খাদ্যের পরিমাণ ও শ্রেণী হিসেবে দাম ধার্য হয়ে থাকে। অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রায় অভিজাত হোটেলের মত। 'শ্যাংরিলা' পর্যটক আবাসটি মধ্যবিত্তদের থাকবার উপযোগী। এখানে চার শয্যাবিশিষ্ট ও ছয় শয্যাবিশিষ্ট ঘরে আছে দুটি করে। নিচেকার বিছানার ব্যবস্থা মোট বারোটি, দক্ষিণা বিছানাপিছু দৈনিক আট টাকা। বাঙ্কের মতো ওপরকার বিছানা আছে আটটি—সেক্ষেত্রে প্রতি বিছানার ভাড়া ছয় টাকা দৈনিক। প্রাতঃরাশ ও বৈকালিক চা ছাড়া এখানে আহারাদির কোনো আয়োজন রাখা হয়নি। দুপুরেকার ও রাত্রির খাওয়া-দাওয়াটা তাই ইচ্ছামতো অন্যত্র সেরে আসা যায়।

দার্জিলিং ও কালিম্পঙের পর্যটক-আবাসগুলিতে থাকতে হলে আগে থাকতেই বুকিং করে যাওয়াটা নিরাপদ। কলকাতায় বুকিং হয় রিজিওনাল ট্যুরিস্ট ব্যুরোতে। ঠিকানা—৩।২, বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ, কলকাতা-১ (ফোন : ২৩-৮২৭১)। আর, সরাসরি দার্জিলিং-এর রিজিওনাল ট্যুরিস্ট ব্যুরোতেও বুকিং করা যায়। ঠিকানা—'অজিত ম্যানসন' নেহরু রোড, দার্জিলিং (ফোন : দার্জিলিং-৫০)।

দার্জিলিং এলাকায় ভ্রমণ সমাপ্ত করে সমতলভূমিতে নেমে আসবার পথে কৌতূহলী ভ্রমণকারীরা ইচ্ছে করলে জলপাইগুড়ি জেলার জলদাপাড়া অভয়ারণ্যটিও এবার ঘুরে দেখে আসতে পারেন। অরণ্যে বিচরণশীল বাঘ, হরিণ, ভালুক, গণ্ডার প্রভৃতি বন্যপ্রাণী প্রত্যক্ষ করবার এ একটা চমৎকার সুযোগ। হোলং-এ বন-বিভাগের যে রেস্ট-হাউস আছে, সেখানে অনায়াসে রাত্রিযাপনও করা যায়। সেখানে থাকা-খাওয়ার যে ব্যবস্থা আছে, তা মোটামুটি ভালোই বলতে হবে।

॥ ৩ ॥

এবারে বলা যাক পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্র-সৈকতে ভ্রমণের কথা। ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গই একমাত্র রাজ্য যেখানে তার মাথায় আছে হিমালয়ের তুষারকিরীট, আর পায়ের কাছে আছড়ে পড়ছে ফেনিলোচ্ছল সাগর। শহর থেকে দূরে, কোলাহলের বাইরে সমুদ্রসৈকতে দিনকতক কাটিয়ে আসবার পক্ষে মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত দীঘা একটি উপযুক্ত স্থান। কলকাতা থেকে খড়্গপুর পর্যন্ত ট্রেনে গিয়ে সেখান থেকে বাস ধরে যেমন সেখানে পৌঁছুনো যায়, তেমনি কলকাতা থেকে সরাসরি দীঘা পর্যন্ত আরামপ্রদ বাস-সার্ভিসও আছে। খড়্গপুর থেকে দীঘার মধ্যে সারাদিন অনেক প্রাইভেট বাস এবং ট্যাক্সিও চলাচল করে। সড়কপথে কলকাতা থেকে দীঘার দূরত্ব ২৪৩ কিলোমিটার। বাসে বা মোটরে গেলে সময় লাগে পাঁচ থেকে ছয় ঘণ্টা। কলকাতা থেকে যেমন বাসসার্ভিস আছে, তেমনি আছে বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল, সিউড়ি (শান্তিনিকেতন), বাঁকুড়া আর ঝাড়গ্রাম থেকেও। কখন, কোথা থেকে এই সব বাস ছাড়ে তার খবরাখবর এবং বাসে সীট রিজার্ভের জন্য কলকাতার যাত্রীরা যোগাযোগ করতে পারেন রিজিওনাল ট্যুরিস্ট ব্যুরোতে।

গত কয়েক বছরের মধ্যে ভ্রমণের স্থান হিসেবে দীঘা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এর প্রধান কারণ হলো দীঘার শান্ত ও মনোরম পরিবেশ এবং থাকা-খাওয়ার সহজ ও সুবিধাজনক ব্যবস্থা। তাছাড়া, প্রায় এক মাইল দীর্ঘ শক্ত সমুদ্রসৈকতের আলাদা একটা আকর্ষণও আছে। ঝাউবীথি ও বালিয়াড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে সমুদ্রগর্ভ থেকে পূর্বদিগন্তে সূর্যোদয় এবং সমুদ্রবক্ষে সেই সূর্যের অস্তগমন নিরীক্ষণের মধ্যে বিশেষ একটা পুলকানন্দ অনুভব করা যায় বৈকি। তাছাড়া, সারা বছর ধরে দীঘা সমুদ্র-সৈকতের আবহাওয়াও থাকে মনোরম। সাম্প্রতিককালে দীঘার সমুদ্রে ভাঙন ধরেছে, কিন্তু চেষ্টাও চলেছে সেই ভাঙনের হাত থেকে দীঘাকে রক্ষা করবার।

সমুদ্রসৈকতে ঘুরে বেড়ানো ও সমুদ্র-স্নানের আকর্ষণ ছাড়াও দীঘার আশেপাশে দর্শনীয় স্থান কিছু কিছু আছে। যেমন, চার কিলোমিটার দূরবর্তী একটি প্রাচীন শিবমন্দির। তাছাড়া, কাঁথির কাছে আছে কপালকুণ্ডলা মন্দির, আর আছে দীঘা থেকে চোদ্দ কিলোমিটার দূরবর্তী লঙ্কেশ্বরী বিগ্রহ। দীঘার নুনের কারখানাটিও দেখবার জিনিস। দীঘা থেকে তার দূরত্ব হবে বাইশ কিলোমিটারের মতো। জুনপুট ফিশারীতে গেলে নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়

করবেন পর্যটকেরা। সরকারী মৎস্যবিভাগ থেকে সেখানে কিভাবে নানারকমের মাছের চাষ হচ্ছে এবং নানারকম গবেষণা চলেছে তাও দেখবার মতো। এখানকার সমুদ্রদৃশ্য যেমন মনোরম, তেমনি সুন্দর ঝাউবীথির পরিবেশ।

দীঘাকে পর্যটনের দিক থেকে আকর্ষণীয় করে তোলবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন বিভাগ এখানে থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থার দিকে যে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তা এখানকার ট্যুরিস্ট লজ' আর 'সৈকতাবাস' দেখলেই বোঝা যায়। আধুনিক ও আরামপ্রদ হোটেলের মতই ট্যুরিস্ট লজে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা। ভারতীয় ও ইউরোপীয় দুরকম খাদ্য-পানীয়ই মেলে এখানে। দুই শয্যার বারোটি ঘর আছে এই পর্যটক-ভবনে। ভাড়া ঘরপিছু দৈনিক তিরিশ টাকা এবং শয্যাপিছু পনের টাকা। আহারাদির খরচের হার এইরকম—বেড-টী এক টাকা, প্রাতঃরাশ দু টাকা পঁচিশ পয়সা থেকে তিন টাকা পঁচিশ পয়সা, দ্বিপ্রাহরিক আহার পাঁচ থেকে সাত টাকা, বৈকালিক চা সওয়া টাকা থেকে দু টাকা। আর নৈশভোজ সাড়ে পাঁচ থেকে সাড়ে সাত টাকা। এর ওপর সার্ভিস চার্জ শতকরা পাঁচ টাকা। সৈকতাবাসেও ভারতীয় ও ইউরোপীয় খাদ্য মেলে। কিন্তু সেখানকার খাওয়াথাকার খরচ অপেক্ষাকৃত অনেক কম, প্রায় অর্ধেক। সৈকতাবাসে দুই শয্যার দুটি করে শয়নকক্ষ ও লাগোয়া রান্না-ঘর আর গোসলখানা সমেত স্যুট আছে ছয়টি। একতলার স্যুটের ভাড়া দৈনিক ছাব্বিশ টাকা, আর দোতলার তিরিশ। অর্থাৎ, শয্যাপিছু খরচ ছয় থেকে সাত টাকা মাত্র। দুই শয্যাবিশিষ্ট ঘর আছে আরও তেইশটি। একতলার প্রতি ঘরের ভাড়া তের টাকা দৈনিক, অর্থাৎ শয্যাপিছু সাড়ে ছয় টাকা। আর, দোতলায় ঘরপিছু দু টাকা, আর শয্যাপিছু মাত্র এক টাকা করে বেশি। সৈকতাবাসের খাইখরচের হার —বেড-টী পঞ্চাশ পয়সা, প্রাতঃরাশ আড়াই টাকা, দ্বিপ্রাহরিক আহার পাঁচ টাকা, বৈকালিক চা দেড় টাকা, আর নৈশভোজ সাড়ে পাঁচ। থাকাখাওয়ার মোট খরচের ওপর একটা সার্ভিস চার্জ আছে। তার হার একই রকম, অর্থাৎ ফাইভ পারসেণ্ট।

দীঘায় আর একটি জিনিস আছে। তা হলো পর্যটক-কুটীর বা ট্যুরিস্ট কটেজ। দুই কামরাবিশিষ্ট কটেজ আছে চারটি, আর এক কামরাবিশিষ্ট তিনটি। প্রথম পর্যায়ের প্রতিটি কটেজের দৈনিক ভাড়া সাড়ে ছ' টাকা, আর দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্ষেত্রে সওয়া পাঁচ টাকা। বিদ্যুৎ-সরবরাহ, বিছানার চাদর সরবরাহ ইত্যাদির খরচ অবশ্য আলাদা। এখানে যাঁরা থাকেন তাঁরা হয় সংলগ্ন রান্নাঘরে নিজেদের ইচ্ছামতো নিজেরাই রান্না করে খান, নয়তো রেস্তোরাঁ, ক্যাফেটারিয়া, ক্যানটিন প্রভৃতিতে গিয়ে খেয়ে আসেন কটেজের রান্নাঘরে রাঁধবার বাসনকোসন এবং খাবারের থালাবাটি, গেলাস ইত্যাদি বিনা ভাড়াতেই মেলে। তাছাড়া, আরও মস্ত একটা সুবিধে আছে এই সব কটেজে। এক ঘরের কটেজে একসঙ্গে দুজন পর্যন্ত এবং দু ঘরের কটেজে একসঙ্গে দশজন পর্যন্ত থাকবার অনুমতি পাওয়া যায়। সেদিক থেকে বিচার করলে মাথাপিছু ঘরভাড়া পড়ে যৎসামান্য, অর্থাৎ ৬৫ থেকে ৯০ পয়সা মাত্র।

দীঘাতে কয়েকটি বেসরকারী হোটেল বা যাত্রীনিবাসও আছে। এখানকার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা যেমন সাধারণ ধরনের, খরচও তেমনি কম। যেমন, ক্যাফেটেরিয়া, বোস-লজ, সী ভিউ লজ, নীলাঞ্চল, সাগরিকা, বেলা নিবাস, বিজলী নিবাস, চম্পা সৌধ, সারদা বোর্ডিং হাউস। তাছাড়া দীঘা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি পরিচালিত কয়েকটি রেস্ট-হাউসও আছে। আর আছে রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি চীপ ক্যানটিন। রেস্ট-হাউসগুলোতে বিছানা-পত্তর যেমন আছে তেমনি আছে রান্নার বাসনকোসনসমেত রান্নাঘর। প্রতি রেস্ট-হাউসের দৈনিক ভাড়া সাড়ে পাঁচ টাকা। চীপ ক্যানটিনেও থাকবার ব্যবস্থা আছে। তবে, একঘরে একসঙ্গে অনেককে থাকতে হয়, শয্যাপিছু থাকবার দক্ষিণা দৈনিক মাত্র দেড় টাকা। শয্যা বলতে খাট বা চৌকি, শোবার জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়। ছাত্রদের পক্ষে কম খরচে এই চীপ-ক্যানটিনে থাকাই সুবিধাজনক।

দীঘার ট্যুরিস্ট লজে, সৈকতাবাসে বা ট্যুরিস্ট কটেজে গিয়ে থাকতে হলে আগে থাকতেই বুকিং করে যাওয়া ভালো। এ-বিষয়ে কলকাতার ট্যুরিস্ট ব্যুরোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়। অথবা, ট্যুরিস্ট লজের ক্ষেত্রে ম্যানেজার, ট্যুরিস্ট লজ, পোঃ দীঘা (মেদিনীপুর), আর সৈকতাবাস কিংবা ট্যুরিস্ট কটেজের বেলায় অ্যাডমিনি-স্ট্রেটর দীঘা ডেভেলপমেণ্ট স্কীম, পোঃ দীঘা (মেদিনীপুর) এই ঠিকানায় চিঠিপত্র লিখে ব্যবস্থা করে নেওয়া যেতে পারে। চীপ ক্যানটিনে সাধারণতঃ আগে থাকতে বুকিং করে রাখা যায় না। দীঘায় মৎস্যজীবীদের ভিড় প্রায় সারা বছরই লেগে থাকে, বিশেষ করে সিজনে বা ছুটির মরশুমে। সে সব ক্ষেত্রে মাসখানেক আগে থাকতে বুকিং-এর ব্যবস্থা করে রাখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। জুনপুটের ইন্সপেকশন বাংলোতে থাকতে হলে চিঠি লিখতে হয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব ফিশারীজ, জুনপুট, কাঁথি (মেদিনী-পুর)—এই ঠিকানায়।

খুব সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্রতীর পরিভ্রমণের আর একটি ব্যবস্থা হয়েছে সরকারের সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে। জায়গাটির নাম বকখালি। কলকাতা থেকে দূরত্ব ১৩২ কিলোমিটার। সুন্দরবন এলাকার অকৃত্রিম প্রাকৃতিক পরিবেশে এই যে সমুদ্রসৈকত, এর একটা আলাদা রূপ আছে। সামনে সুনীল সমুদ্রের গর্জন আর তরঙ্গোচ্ছ্বাস আর পেছনে ঝাউবনের শন-শনানি। জনকোলাহল নেই, ভিড় নেই—শান্ত পরিবেশে অবকাশযাপনের মনোরম একটি জায়গা। বকখালিতে একটি ট্যুরিস্ট লজ নির্মিত হয়েছে। সেই লজে আপাতত আঠারোটি সীট আছে। তাছাড়া আছে তাঁবুতে থাকবার ব্যবস্থা। এক-একটি তাঁবুতে আছে চারটি করে খাট। জল ও বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থাও আছে সেখানে। তাঁবুপিছু দৈনিক থাকবার দক্ষিণা মাত্র পঞ্চাশ পয়সা। তবে আগে থাকতে, যাত্রার অন্তত দুদিন আগে, রাজ্য সরকারের ট্যুরিস্ট ব্যুরোর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁবু রিজার্ভ করিয়ে নেওয়াটা একান্তই প্রয়োজন।

বকখালিতে যাওয়ার বিশেষ কোনো ঝামেলা নেই। রাষ্ট্রীয় পরিবহণের এস্-প্ল্যানেড অফিসে গিয়ে বাসের টিকেট কিনে নিয়ে বাসে চড়লেই হলো। এই বাস যাবে নামখানা পর্যন্ত। নামখানায় নদী পার হতে হবে। ওপারে পৌঁছুলেই দেখবেন একস্-

দার্জিলিং শহরের কেন্দ্রস্থল ম্যালে একটি রেস্তোরাঁ

প্রেস রয়েছে দাঁড়িয়ে। সেই বাসে চেপে সোজা ফ্রেজারগঞ্জ। সেখান থেকে বকখালি খুব কাছেই, দু' কিলোমিটারের মধ্যে। সবসুদ্ধ ঘণ্টাপাঁচেকের মতো লাগবে সমুদ্রতীরবর্তী বকখালি পৌঁছুতে। আহারাদির জন্য আছে 'চীপ ক্যানটিন'। মোটামুটি ভালো ব্যবস্থাই। প্রাথমিক একটা চিকিৎসা কেন্দ্রও আছে এখানে। তাছাড়া, পুলিশ-ক্যাম্পের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে বিপদ-আপদের কথা ভেবে।

॥ ৪ ॥

বাঙালী জাতির অতীত ইতিহাসের বহু স্মৃতি এখনও ছড়িয়ে আছে পশ্চিমবঙ্গের নানা জায়গায়। সেগুলির মধ্যে পর্যটকদের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্থান গৌড়-পাণ্ডুয়া আদিনা, মুর্শিদাবাদ, আর বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর। সযত্ন সংরক্ষণের অভাবে বহু জায়গার বহু পুরাকীর্তি আজ লুপ্তপ্রায় হলেও, উল্লিখিত জায়গাগুলিতে এখনও অনেক কিছু দেখবার আছে।

গৌড় - পাণ্ডুয়া - আদিনা—মালদহের তিনটি ঐতিহাসিক স্থান। শহর থেকে দক্ষিণ দিকে সাত-আট মাইল গেলেই আপনার নজরে পড়বে গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ। পিয়াসবাড়ি ছাড়িয়ে আধ মাইলের মধ্যেই পড়বে রামকেলি গ্রাম। বৃন্দাবনের পথে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই স্মৃতি বহন করছে এখানকার তমালতলা। রূপ-সনাতনের স্মৃতিও ছড়িয়ে আছে এখানে। যেমন—রূপসাগরদীঘি, মদনমোহন ঠাকুরবাড়ি, শ্যামকুণ্ড প্রভৃতি। গৌড়ের দ্রষ্টব্যগুলির মধ্যে বিশেষভাবে আকর্ষণীয় সুলতানী আমলের বহু হার্বেলি, মসজিদ, মিনার, দুর্গ বা দুর্গপ্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ, যেমন—বারদুয়ারী বা বড়-সোনামসজিদ, দখল বা দাখিল দরওয়াজা, হার্বেলিখাস, ফিরোজ-মিনার, লুকোচুরি দরওয়াজা, কদমরসুল, চিকা মসজিদ, লোটন মসজিদ, ছোটো-সোনা মসজিদ প্রভৃতি।

বাস্তুবিদ্যার বিস্ময়কর নিদর্শন বারদুয়ারী বা বড় সোনামসজিদ গৌড়ের সবচেয়ে বড়ো আর জমকালো অট্টালিকা। ছোটো ছোটো ইট আর পাথরের খিলান দিয়ে এটি তৈরি হয়েছিল ১৫২৬ খৃঃ অব্দে, সুলতান নসরৎ শাহের আমলে। অনেকের ধারণা, গোড়ার দিকে এটি বাদশাহী দপ্তরখানা হিসেবেই ব্যবহৃত হতো, পরবর্তীকালে মসজিদে পরিণত হয়। এক সময় এর ওপরে কারুকার্যখচিত ৪৪টি অর্ধগোলাকৃতি গম্বুজ ছিল। তার বেশির ভাগই ভেঙে গেছে, টিকে আছে গুটিকয়েক। দখল বা দাখিল দরওয়াজা গৌড়-দুর্গের প্রধান প্রবেশদ্বার, ছোটো ছোটো লাল ইটের তৈরি। এর যতটুকু অংশ আজও টিকে আছে, তার কারুকাজ দেখে অবাক হতে হয়। এর চারকোণে যে চারটি গম্বুজ বা টাওয়ার আছে, সেগুলি পাঁচতলা উঁচু। ঐতিহাসিকদের অনুমান এই তোরণদ্বারটি নির্মিত হয়েছিল ১৫-শ শতকের গোড়ার দিকে। এই দরওয়াজা থেকে মাইলখানেক দক্ষিণে গেলেই নজরে পড়বে ফিরোজ শাহের আদেশে নির্মিত ৮৪ ফুট উঁচু এক বিজয়-স্তম্ভ, ফিরোজ-মিনার নামে যেটি চিহ্নিত। এই স্তম্ভের ভিতরে ৭৩ ধাপ-বিশিষ্ট একটি ঘোরানো সিঁড়ি আছে। আগে এই মিনারের মাথায় একটি গম্বুজ ছিল। এখন আর সেটি নেই। এই মিনারের কাছেই রয়েছে গৌড়দুর্গের পূর্বদ্বার বা লুকোচুরি দরওয়াজার ধ্বংসাবশেষ। তার পাশেই কদমরসুল মসজিদ। ভিতরে গেলে নজরে পড়বে কষ্টিপাথরে খোদিত একজোড়া পদচিহ্ন। লোকে বলে, পয়গম্বর রসুলের পায়ের ছাপ। চিকা মসজিদের দরজায় ও খিলানে একটা অদ্ভুত জিনিস চোখে পড়ে। তা হলো পাথরের কারুকাজের মধ্যে হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি। অনেকের তাই ধারণা, গোড়ায় এটি হিন্দু-মন্দিরই ছিল, পরে মসজিদে রূপান্তরিত হয়। রং-বেরং-এর মিনার কাজকরা ইট দিয়ে তৈরি লোটন মসজিদটিও দেখবার মতো। মসজিদটি তৈরি হয় ১৪৭৫ খৃঃ অব্দে, সুলতান ইউসুফ শাহের আমলে। স্থানীয় কিংবদন্তী এই যে, বাদশাহী দরবারের কোনো এক নর্তকী নাকি এই মসজিদটি তৈরি করিয়েছিলেন।

মালদহ শহর থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরবর্তী পাণ্ডুয়া এক সময় ছিল গৌড়-বঙ্গের আর এক রাজধানী। অনেকে মনে করেন, পাণ্ডুয়া ছিল হিন্দুজন-অধ্যুষিত শহর। কেননা, সেখানকার মসজিদ ও দরগায় হিন্দু-আমলের বহু ইট-পাথরের সন্ধান পাওয়া গেছে। এখানকার সবচেয়ে আকর্ষণীয় পুরাকীর্তি হলো একলাখী মসজিদ। ১৪১২ থেকে ১৪১৫ খৃঃ অব্দের মধ্যে নির্মিত। এই মসজিদের সম্মুখ-দ্বারের খিলানে একটি হিন্দু দেবমূর্তি উৎকীর্ণ রয়েছে দেখা যায়। পাণ্ডুয়ার অন্যান্য পুরাকীর্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সেখানকার বড়-দরগা ও কুতুবশাহী মসজিদ।

সুবিখ্যাত আদিনা মসজিদ আপনি দেখতে পাবেন পাণ্ডুয়ার পূর্ব সীমানায়। মসজিদটি ১৩৬৪—১৩৭৪ খৃঃ অব্দের মধ্যে তৈরি বলে অনেকের অনুমান। অর্থাৎ, প্রায় ছ'শ বছর আগেকার। অংশত বিধ্বস্ত হলেও মসজিদটি মুসলিম স্থাপত্যের অপূর্ব এক নিদর্শন। মালদহ মিউজিয়মে গেলে গৌড়-পাণ্ডুয়া-আদিনার ধ্বংসাবশেষ থেকে সংগৃহীত বহু পাথরের মূর্তি, মুদ্রা, শিলালিপি প্রভৃতি দেখে চমৎকৃত হবে যে-কোনো অনুসন্ধিৎসু পর্যটক।

ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মতো এইসব প্রাচীন কীর্তির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ ছাড়া, মালদহের আরও অনেক আকর্ষণ আছে। তার মধ্যে বিভিন্ন কুটীর-শিল্প, বিশেষ করে তসর, গরদ, মুগা-জাতীয় রেশম-বয়নশিল্প যেমন উল্লেখযোগ্য, তেমনি হলো আমের মরশুমের রকমারি আম, আর এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে অনুষ্ঠিত গম্ভীরা-উৎসব। এই উৎসবের মধ্যে থাকে মেলা, গান ও নাচ। বাংলার লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে গম্ভীরা-গানের বিশেষ একটা ভূমিকা আছে। শিবের গাজনই গম্ভীরা-গানের প্রধান উৎস। শুধু গান দিয়ে গম্ভীরার আসর জমে না বলে অভিনয় ও বাজনার আয়োজনও থাকে।

ফারাক্কায় গঙ্গার ওপরে সড়কসেতু নির্মিত হওয়ায় এখন মালদহে যাওয়া সহজতর হয়েছে। কলকাতা থেকে মালদহ পর্যন্ত ৩৩৮ কিলোমিটারের পাকা সড়ক রাষ্ট্রীয় পরিবহণের বাসে অতিক্রম করতে সময় লাগে আট ঘণ্টার মতো। ট্রেনেও যাওয়া যায়। থাকা-খাওয়া সুবন্দোবস্ত রয়েছে

দার্জিলিং ট্যুরিস্ট লজ

পর্যটন বিভাগের ট্যুরিস্ট লজে। রেল-স্টেশন থেকে তার দূরত্ব মাত্র দু' কিলোমিটার। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত দু' শয্যার দুটি এবং শীতাতপনিয়ন্ত্রণবিহীন দু' শয্যার দুশটি শয়নকক্ষ আছে এই লজে। শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত ঘরে শয্যাপিছু ভাড়া দৈনিক পনের টাকা। আর, দু শয্যার ছটি ঘরের প্রত্যেকটি শয্যার দক্ষিণা বারো টাকা। দু' শয্যাবিশিষ্ট আর যে চারটি শয়নকক্ষ আছে, তাতে ভাড়া অনেক কম, শয্যাপিছু সাড়ে তিন টাকা মাত্র। ভারতীয় ও ইউ-রোপীয় দু'রকমেরই খাবার পাওয়া যায়। খরচ পড়ে এই রকম—বেড-টী পঁচাত্তর পয়সা, প্রাতঃরাশ তিন টাকা, দুপুরের আহার • তিন টাকা থেকে সাত টাকা, বৈকালিক চা পৌনে দু' টাকা, আর নৈশ-ভোজ সাড়ে তিন থেকে সাড়ে সাতটাকার মধ্যে।

মালদহ থেকে ফেরবার পথে, কিম্বা সেখানে যাবার পথে আপনি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদটাও ঘুরে দেখে যেতে পারেন। কলকাতা থেকে দূরত্ব ২১৯ কিলোমিটার। সরকারী বাসে বা ট্রেনে কয়েক ঘণ্টার যাত্রা মাত্র। এখানে ছড়িয়ে আছে সম্রাট ঔরংজীবের অধীন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ান নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ ও বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার স্মৃতিবিজড়িত বিভিন্ন অট্টালিকা, মসজিদ, উদ্যান প্রভৃতি। লাল-বাগের কাটরা মসজিদের অনেকাংশ ভেঙে গেলেও এটি দেখবার মতো। এই মসজিদটি তৈরী করিয়েছিলেন মুর্শিদকুলি খাঁ, মক্কার মসজিদের আদলে। মুর্শিদকুলি খাঁর কবরও আছে এখানে। মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারী প্রাসাদ বর্তমানে একটি জাদুঘর বিশেষ। ১৩৫ বছর আগে মীরজাফরের উত্তরাধিকারী নবাব হুমায়ুন এই প্রাসাদ ভবনটি তৈরী করান। সিরাজদ্দৌলার আমলের বহু অস্ত্র-শস্ত্র, কাপড়-চোপড়, চীনেমাটির বাসন-কোসন, অলঙ্কার, মুদ্রা, পুঁথিপত্র ও বই, তৈলচিত্র প্রভৃতি রক্ষিত আছে হাজারদুয়ারী প্রাসাদে। অন্যান্য দ্রষ্টব্যের মধ্যে 'জাফরগঞ্জ দেউড়ি' অন্যতম। লোকে বলে, বিশ্বাস-ঘাতকের দেউড়ি বা নিমকহারাম ফটক। এক সময় এখানেই ছিল মীরজাফরের বাসভবন। কিংবদন্তী এই যে, এই দেউড়িতেই মীরনের হাতে প্রাণ ত্যাগ করতে হয় হতভাগ্য নবাব সিরাজকে। কাঠগোলা উদ্যানবাটিকাটিও দর্শনীয়। কোন এক ধনী জৈন ব্যবসায়ীর বাগানবাড়ী ছিল এক সময়। পুরনো আমলের একটি জৈন মন্দিরও আছে এখানে। জাফরগঞ্জ সমাধিক্ষেত্র থেকে দু কিলোমিটার দূরে নজরে পড়বে ১৮ শতকের ভারত-বর্ষের সবচেয়ে ধনী ও মহাজনদের অন্যতম ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জগৎ শেঠের প্রাসাদ। নবাব বাহাদুরের প্রাসাদ ভবনের মাইল দেড়েক দক্ষিণ-পূর্বে রয়েছে সুবিখ্যাত মোতিঝিল। আলিবর্দী-কন্যা ঘসেটি বেগম থাকতেন এইখানে। মীরজাফর এটিকে উপঢৌকন দেন ইংরেজদের। লালবাগে ভাগীরথীর অপর পাড়ে রয়েছে আলিবর্দী, সিরাজ আর সিরাজের বেগম লুৎফুন্নেসার কবর।

মুর্শিদাবাদের অন্যান্য দ্রষ্টব্যের তালিকায় পড়বে পোড়ামাটির অলংকরণে সুসজ্জিত বরানগরের রাণীভবানী মন্দির, জাহানকোষা কামান, কাশিমবাজারের প্রাসাদ, কুঞ্জঘাটায় অবস্থিত মহারাজ নন্দকুমারের প্রাসাদ, আর পলাশী। পলাশী বর্তমানে নদীয়া জেলার প্রান্তসীমায় অবস্থিত হলেও আগে ছিল মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত। ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে ক্লাইভের সঙ্গে সিরাজের যুদ্ধ সংঘটিত হয় এই পলাশীর আম্রকুঞ্জসংলগ্ন প্রান্তরে।

পর্যটকদের কাছে মুর্শিদাবাদের আরও একটা আকর্ষণ আছে। তা হলো এখানকার হস্তশিল্প। যেমন—গজদন্তে তৈরী নানা রকমের শিল্পসামগ্রী, রেশম বস্ত্র, খাগড়াই বাসন ইত্যাদি। বহরমপুরে যাঁরা বেড়াতে যান তাঁরা সেখানকার বিখ্যাত মিষ্টদ্রব্য 'ছানাবড়া'র স্বাদ নিতেও ভোলেন না।

রাজ্য সরকারের পর্যটন বিভাগ থেকে এখানেও একটি ট্যুরিস্ট লজ খোলা হয়েছে। রেল স্টেশন থেকে মাত্র দু কিলোমিটার পথ। এই লজে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত দু শয্যার কামরা আছে দুটি, ভাড়া মাথাপিছু দৈনিক পনের টাকা। আর শীতাতপনিয়ন্ত্রণ-বিহীন দু শয্যার কামরা আছে মোট সাতটি। সেক্ষেত্রে শয্যাপিছু দৈনিক ভাড়া বারো টাকা। কিন্তু চার শয্যার যে দুটি শয়নকক্ষ আছে এখানে, তার প্রতি শয্যার দৈনিক ভাড়া মাত্র চার টাকা। ভারতীয় ও ইউরোপীয় দু রকমের খাদ্যবস্তুই মেলে এই লজে। প্রাতঃকালীন চা সমেত চার বেলাকার খাওয়া-দাওয়ার জন্য খরচ পড়ে মাথাপিছু দশ টাকা থেকে আঠারো টাকা। বহরমপুর শহরে কম খরচে থাকবার আরও অনেক জায়গা আছে এবং সস্তা হোটেলেরও অভাব নেই।

পর্যটন তথা শিল্পরসিক ভ্রমণকারীদের কাছে বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের আকর্ষণটা যে অনেকখানি সেকথা বলাই বাহুল্য। কেননা, সারা পশ্চিমবঙ্গে পোড়ামাটির অলংকরণে সজ্জিত এত মন্দির বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর ছাড়া আর কোথাও নেই। মল্লরাজাদের আমলের বহু কীর্তি এখনও ছড়িয়ে রয়েছে বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের এখানে-ওখানে। বিষ্ণুপুরের অধিকাংশ মন্দিরই এদেশের প্রাচীন স্থপতি ও ভাস্করদের অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় বহন করছে। সেগুলির মধ্যে সব-চেয়ে উল্লেখযোগ্য জোড়বাংলা, শ্যাম রায় ও মদনগোপালের মন্দির। জোড়বাংলা মন্দিরের গঠনসৌষ্ঠবের যেন কোন তুলনাই হয় না। মদনগোপাল মন্দিরটিকে 'পঞ্চরত্ন মন্দির'ও বলা হয়। কালো পাথর দিয়ে তৈরী এত বড় পঞ্চরত্ন মন্দির বাংলাদেশে আর নেই। বিষ্ণুপুরের আর একটি দ্রষ্টব্য হলো লাল-বাঁধ। মল্লরাজ দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ এই বাঁধটি তৈরী করান। এই বাঁধের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর ইরানী-সহচরী লালবাঈ-এর স্মৃতি।

বাঁকুড়ার অন্তর্গত ছাতনা গ্রামের কয়েকটি মন্দির ও ধ্বংসস্তূপের মধ্যেও প্রাচীন যুগের স্থাপত্যকলার অনেক নিদর্শন মেলে। শহর থেকে ছাতনার দূরত্ব মাত্র ছ' মাইল। ট্রেনে ও বাসে যাওয়া যায়। বৈষ্ণব কবিকুলতিলক চণ্ডীদাসের স্মৃতিবিজড়িত বাশুলী দেবীর মন্দির এখানকার অন্যতম দ্রষ্টব্যস্থান। বাঁকুড়ার দু মাইল দূরে দ্বারকেশ্বর নদের উত্তর তীরে আছে এক্তেশ্বর শিবের মন্দির। এরকম সুদৃঢ় ও সুন্দর গঠনসৌষ্ঠবযুক্ত মন্দির বাঁকুড়ায় আর চোখে পড়ে না। শুশুনিয়া পাহাড়টিও বাঁকুড়া পর্যটকদের কাছে একটা [illegible] আকর্ষণ। শহর থেকে এর দূরত্ব [illegible]

বারো। বাস পাওয়া যায়, ট্যাকসীও যাতায়াত করে। এই পাহাড়ে সুদৃশ্য দুটি ঝর্ণা আছে। বিষ্ণুপুর শহর থেকে একুশ মাইল দূরবর্তী সোনামুখী শহরে গেলে সেখানেও কয়েকটি প্রাচীন মন্দির নজরে পড়বে পর্যটকদের। সেগুলির মধ্যে গৌরগোবিন্দের মন্দিরটি শিল্পকলার দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া আছে অম্বিকানগরের অম্বিকা মন্দির, বাহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর মন্দির এবং বাঁকুড়া শহরের রঘুনাথদেবের মন্দির। সবগুলিই দর্শনীয়।

বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরে যাঁরা বেড়াতে যাবেন তাঁরা সেখানে ঐতিহ্যবাহী পোড়ামাটি শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভের জন্য পাঁচমুড়াতেও ঘুরে আসবেন একবার। সেখানকার তৈরী বাঁকুড়া হর্স তো আজকাল বিদেশেও চালান যাচ্ছে। পোড়ামাটির তৈরী এই ঘোড়া কুটিরশিল্পের চমৎকার নিদর্শন। আরও নানা রকমের খেলনা, মূর্তি ও পুতুল তৈরী হয় পাঁচমুড়ায়। তাছাড়া বাঁকুড়ার রেশম, পিতল, কাঁসা ও তামার বাসন-কোসনের বিশেষ খ্যাতি আছে। বাঁকুড়া শহর থেকে কংসাবতী প্রকল্পের দিকে নিসর্গশোভামণ্ডিত অতি মনোরম একটি জায়গা আছে। তার নাম ঝিলিমিলি। অবকাশ যাপনের চমৎকার জায়গা সেটি।

কলকাতা থেকে রেলপথে খড়গপুর হয়ে বিষ্ণুপুরের দূরত্ব ১২৫ মাইল। আর সেখান থেকে বাঁকুড়া শহর ২৯ মাইল। কলকাতা থেকে বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরে সরাসরি বাসেও যাওয়া যায় দুর্গাপুর হয়ে। বিষ্ণুপুরেও রাজ্য সরকার একটি টুরিস্ট লজ চালু করেছেন। রেল স্টেশন থেকে তার দূরত্ব মাত্র দু কিলোমিটার। সেখানে থাকবার ব্যবস্থা আছে এই রকম দু শয্যাবিশিষ্ট শীতাতপনিয়ন্ত্রিত শয়নকক্ষ দুটি, শীতাতপনিয়ন্ত্রণবিহীন দু শয্যার কামরা সাতটি, আর আট শয্যার ডরমিটারী একটি। প্রথমটির ক্ষেত্রে দৈনিক ভাড়া শয্যাপিছু পনের টাকা, দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে বারো টাকা, আর তৃতীয়টির ক্ষেত্রে প্রতি শয্যা মাত্র চার টাকা। বেড-টী সমেত চার বেলাকার মোট খাই-খরচ সওয়া এগার টাকা থেকে সওয়া উনিশ টাকা পড়ে। বাঁকুড়া শহরে কোন টুরিস্ট লজ না থাকলেও সেখানে কয়েকটি বাংলো আছে, ছোটখাট বেসরকারী হোটেলও আছে।

॥ ৫ ॥

পশ্চিমবঙ্গে ধর্মস্থান তথা তীর্থস্থানের অভাব নেই। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তীর্থস্থান তো কলকাতার কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর ও বেলুড়, নদীয়া জেলার নবদ্বীপ-শান্তিপুর, বীরভূমের তারাপীঠ-বক্রেশ্বর, বাঁকুড়ার জয়রামবাটি, বর্ধমানের কালনা-কাটোয়া, আর হুগলী জেলার তারকেশ্বর, ত্রিবেণী ও কামারপুকুর। তাছাড়া, আরও অসংখ্য ধর্মপীঠ ছড়িয়ে রয়েছে প্রতিটি জেলায়।

কলকাতায় যেসব হিন্দু তীর্থকামী পর্যটক আসেন তাঁদের কাছে অবশ্য দ্রষ্টব্য দক্ষিণাকালীর পীঠস্থান কালীঘাট, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের স্মৃতিবিজড়িত দক্ষিণেশ্বর-এর কালী মন্দির, আর সাম্প্রতিক কালে নির্মিত আদ্যাপীঠের মন্দির এবং স্বামী বিবেকানন্দের বেলুড়মঠ। জৈনদের কাছে এখানকার পরেশনাথের মন্দিরের আকর্ষণ আছে, বৌদ্ধদের কাছে তেমনি রয়েছে মহাবোধি সোসাইটির উপাসনাভবন, বৌদ্ধধর্মাংকুর আর জাপানী বৌদ্ধমন্দির। মুসলমান তীর্থকামীদের কাছে নাখোদা মসজিদ, শিখদের কাছে কালীঘাটের গুরুদ্বার এবং খৃষ্টানদের কাছে সেন্টপলস ক্যাথিড্রালেরও তেমনি আকর্ষণ।

কলকাতা থেকে নদীয়া জেলার সদর শহর কৃষ্ণনগরের দূরত্ব ৬২ মাইল। সেখান থেকে নবদ্বীপঘাট আরও আট মাইল। ট্রেনে বা বাসে নবদ্বীপঘাটে পৌঁছে সেখান থেকে নবদ্বীপ শহরে যেতে হয় গঙ্গা পেরিয়ে। আর একটি সহজ পথ আছে ব্যাণ্ডেল জংশন থেকে ট্রেনে। ব্যাণ্ডেল থেকে নবদ্বীপ স্টেশনের দূরত্ব ৪১ মাইল। আর, নবদ্বীপ স্টেশন থেকে নবদ্বীপ শহর দু মাইলের মধ্যে। বৈষ্ণবধর্মাবলম্বীদের কাছে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবস্থান তথা লীলাভূমি হিসাবে নবদ্বীপের আকর্ষণ সর্বাধিক। এখানকার দর্শনীয় স্থান—মহাপ্রভু বাড়ী (এখানে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ অধিষ্ঠিত), পোড়া মা তলা (নবদ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী), বুড়ো শিবের মন্দির, সিদ্ধেশ্বরী কালী, আগমেশ্বরীতলা, শ্যামসুন্দর মন্দির, অদ্বৈত প্রভুর ঠাকুর বাড়ী, সোনার গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ মন্দির, ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ মন্দির, প্রভৃতি। পর্যটকদের কাছে মায়াপুর আর একটি আকর্ষণ। নবদ্বীপঘাট থেকে নদী পেরিয়ে যেতে হয় সেখানে। অনেকের মতে মায়াপুরই আসলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান।

এখানে যেসব জায়গা ঘুরে দেখবার মতো তা হলো যোগপীঠ মন্দির বা শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান, শ্রীবাস অঙ্গন, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রিসার্চ ইনস্টিটিউট শ্রীচৈতন্য মঠ, চাঁদ কাজীর সমাধি, বল্লাল ঢিবি প্রভৃতি। শান্তিপুরও বৈষ্ণবদের কাছে একটি তীর্থস্থান। কলকাতা থেকে রেলপথে এর দূরত্ব মাইল। আগাগোড়া কারুকার্যশোভিত শ্যামচাঁদের মন্দির যেমন শান্তিপুরের দর্শনীয় স্থান, তেমনি দ্রষ্টব্য জলেশ্বরের মন্দির। শেষোক্ত এই মন্দিরে পোড়া মাটির যেসব কারুকাজ আছে এককথায় তা অতুলনীয়। যত্নের অভাবে মন্দিরটির এখন ভগ্নদশা। পর্যটকদের কাছে শান্তিপুরের আশানন্দ ঢেঁকির স্মৃতিস্তম্ভটিও দেখবার জিনিস।

নবদ্বীপ-শান্তিপুর যেমন বৈষ্ণব পীঠস্থান, বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমার অন্তর্গত তারাপুর বা তারাপীঠ তেমনি শাক্ত সম্প্রদায়ের তীর্থভূমি। রামপুরহাট শহর থেকে মাইল তিনেক দূরে এই পীঠস্থানটি অবস্থিত। পাশেই দ্বারকানদী। এখানে যে মন্দিরটি আছে, তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে সাধক বামাক্ষ্যাপার বহু স্মৃতি। তারাপীঠে সাধনা করেই বামাক্ষ্যাপা সিদ্ধিলাভ করেন। বীরভূমের আর একটি পীঠস্থান হলো বক্রেশ্বর। রেলপথে কলকাতা থেকে অণ্ডাল-দুবরাজপুর হয়ে এখানকার দূরত্ব ১৩৪ মাইল। শ্মশানের উপর মহাপীঠ অবস্থিত। দেবী মহিষমর্দিনীর মন্দিরের সামনে শ্বেত সরোবর নামে একটি গরম জলের কুণ্ড আছে। সেখানে স্নানাদি সেরে একটি গুহাগহ্বরে গিয়ে বক্রেশ্বরের দেবতা বক্রনাথ শিবকে দর্শন করে আসতে হয়। বক্রেশ্বরে উষ্ণ প্রস্রবণ আছে আরও কয়েকটি। পর্যটকরা সেই আকর্ষণেও বক্রেশ্বরে বেড়াতে যান। তারাপীঠ ও বক্রেশ্বরে মাঝে মাঝে যাওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের পর্যটন-বিভাগ মাঝে মাঝে টুরিস্ট বাসের ব্যবস্থা করে থাকেন। যেমন করেন বাঁকুড়ার তীর্থস্থান জয়রামবাটিতে যাওয়ার ক্ষেত্রে। শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্মিণী পুণ্যবতী শ্রীমা সারদামণির স্মৃতিমন্দির দর্শনই জয়রামবাটিতে যাওয়ার প্রধান আকর্ষণ।

বর্ধমানের অন্তর্গত কালনা ও কাটোয়া বৈষ্ণবদের কাছে তীর্থস্থান হিসেবে পরিগণিত। এ দুটি জায়গায় শুধু যে বৈষ্ণবদের পীঠস্থানই আছে তা নয়, হিন্দুদের অন্যান্য ভক্তিশাখার আকর্ষণও আছে। কালনার দ্রষ্টব্যর মধ্যে পড়ে—বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্রের তৈরি একশ নয়টি শিবমন্দির, আর অম্বিকা গ্রামের গৌরীদাস ঠাকুরের শ্রীপাট। ব্যাণ্ডেল জংশন থেকে বর্ধমান জেলার অন্য মহকুমা-শহর কাটোয়ার দূরত্ব চল্লিশ কিলোমিটারের মতো। কাটোয়াও বৈষ্ণবতীর্থ হিসেবে পরিচিত। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এখানেই কেশব-ভারতীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত-রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্মস্থান ঝামটপুর কাটোয়া থেকে দু মাইল।

পশ্চিমবঙ্গের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য শৈবতীর্থ হলো তারকেশ্বর। হাওড়া থেকে রেলপথে এই স্থানের দূরত্ব ৩৬ মাইল। স্বাধীনতালাভের পর কলকাতা থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত যে পাকা সড়কটি তৈরি হয়েছে বাসে বা মোটরে করে সেই পথেও আজকাল সহজেই যাতায়াত করা চলে। তারকনাথ শিবের মন্দিরই এখানকার প্রধান দর্শনীয় স্থান। তারকনাথ জাগ্রত দেববিগ্রহ বলে কথিত। তাই, চৈত্র সংক্রান্তির গাজনের মেলা ছাড়াও সারা বছর ধরেই তারকেশ্বরে তীর্থযাত্রীদের সমাগম হয়ে থাকে। হুগলী জেলার আর একটি তীর্থস্থান হলো ত্রিবেণী। প্রয়াগে যেমন গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদী তিনটির যুক্তবেণী, হুগলির এই ত্রিবেণীতে তেমনি তারা মুক্তবেণী। ত্রিবেণীর গঙ্গায় স্নানকর্ম তাই পুণ্যকর্ম বলেই অভিহিত হয়ে থাকে। হাওড়া থেকে ব্যাণ্ডেল রেল স্টেশন হয়ে এর দূরত্ব মাইল পঞ্চাশ, ব্যাণ্ডেল থেকে মাত্র পাঁচ মাইল। এখানেও একটি স্টেশন আছে। সড়ক পথে বাসেও যাওয়া যায় ত্রিবেণীতে। দশহরা, বারুণী, মকরসংক্রান্তি প্রভৃতি বিশেষ তিথিতে

তিথিতে বহু যাত্রীর সমাগম হয় এখানে। গঙ্গাস্নানের পুণ্যসঞ্চয় করে তাঁরা বেণীমাধব মন্দিরে গিয়ে বিগ্রহ দর্শন করেন, পুজোও দেন। বর্তমানে কামারপুকুর-ও একটি তীর্থস্থান হয়ে উঠেছে। এই কামারপুকুরেই একদা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেই পবিত্র জন্মকুটীর পরিদর্শনের জন্য সাধারণ পর্যটকেরাও কামারপুকুরে যাবার আকর্ষণ অনুভব করেন। রাজ্য সরকারের পর্যটন বিভাগও মাঝে মাঝে ট্যুরিস্ট বাসে করে কামারপুকুর ঘুরিয়ে আনেন ভ্রমণকারীদের। হুগলি জেলার আর একটি তীর্থস্থান হলো ব্যান্ডেল গির্জা। সাধারণ পর্যটকদের কাছেও এর একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। গির্জাটি বহু পুরোনো। ১৫৫৯ খৃঃ অব্দে পর্তুগীজেরা এটি তৈরি করান। সম্ভবত এটিই পশ্চিমবঙ্গ তথা বাংলাদেশের প্রথম গির্জা। গির্জাটির গঠনপারিপাট্য যেমন দৃষ্টি আকর্ষণকারী, তেমনি মুগ্ধ হতে হয় ভিতরকার দেওয়ালে আঁকা চিত্রাবলী দেখে।

॥ ৬ ॥

পশ্চিমবঙ্গ পরিভ্রমণ করতে এসে বিদেশী পর্যটকেরা যেমন শান্তিনিকেতনে যাবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন, তেমনি আগ্রহ দেখান ভারতের অন্যান্য রাজ্যের পর্যটকেরাও। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি-কেন্দ্র তথা বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ, কবিগুরুর বাসস্থান, কুটীরশিল্পকেন্দ্র শ্রীনিকেতন ইত্যাদি পরিদর্শন করে মুগ্ধ হন দেশ-বিদেশের ভ্রমণকারীরা। শান্তিনিকেতন আশ্রমের সঙ্গে শুধু কবিগুরুর স্মৃতিই বিজড়িত নয়, দেশ-বিদেশের বহু জ্ঞানী, গুণী ও মনীষীর স্মৃতিও জড়িত।

কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনের দূরত্ব দেড়শ কিলোমিটার। রেলপথে বোলপুর স্টেশনে নেমে যেতে হয় শান্তিনিকেতন। ট্রেনে লাগে ঘণ্টা চারেক সময়। সড়কপথেও যাওয়া যায় মোটরে বা ট্যুরিস্ট বাসে। সেক্ষেত্রে সময়টা ঘণ্টাখানেক আরও বেশি লাগে। শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক শোভা, সেখানকার খোয়াই, বিভিন্ন ঋতুতে বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীদের সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠান এবং অন্যান্য উৎসব, পৌষমেলা ইত্যাদি যেমন পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয়, তেমনি কলাভবনে রক্ষিত রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলালের আঁকা চিত্রাবলী, কবিগুরুর বাসভবনে উত্তরায়ণ, শ্যামলী, কোনার্ক, চীনাভবন ও হিন্দীভবন তথা বিরাট গ্রন্থাগার এসব ঘুরে ঘুরে দেখাও একটা অভিজ্ঞতা। ভাস্কর্যের সুন্দর সুন্দর যেসব নিদর্শন ছড়িয়ে আছে আশ্রমের উন্মুক্ত এলাকায় সেগুলিও পর্যটকদের নয়নমনে এনে দেয় সুগভীর একটা তৃপ্তি।

শান্তিনিকেতনকে কেন্দ্র করেই পর্যটন বিভাগের উদ্যোগে যাওয়া চলে বক্রেশ্বরে, ম্যাসাঞ্জোড়ে, বাউলগানের কেন্দ্রভূমি জয়দেব-কেন্দুলিতে, তারাপীঠে এবং বৈষ্ণবকবি চণ্ডীদাসের স্মৃতিবিজড়িত নানুরে।

পর্যটকদের জন্য শান্তিনিকেতনে সরকারী উদ্যোগে নির্মিত হয়েছে দুরকমের যাত্রীনিবাস বা ট্যুরিস্ট লজ। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ট্যুরিস্ট কটেজগুলিতে থাকা-খাওয়ার চমৎকার ব্যবস্থা। এখানে বারোটি এক শয্যাবিশিষ্ট ও পাঁচটি দুই শয্যাবিশিষ্ট ঘর আছে। প্রথম পর্যায়ের ক্ষেত্রে ভাড়া দৈনিক সতের টাকা, আর দ্বিতীয় পর্যায়ের ঘরের ক্ষেত্রে শয্যাপিছু পনের টাকা দৈনিক। কমখরচে থাকার সুবন্দোবস্ত আছে তিনতলাবিশিষ্ট ট্যুরিস্ট লজে। সেখানে এক শয্যার ঘর আছে আটটি, দুই শয্যার দশটি, চার শয্যার দুটি, দশ শয্যার ডরমিটরী একটি আর একুশ শয্যার ডরমিটরী আর একটি। ডরমিটরীতে প্রতি শয্যার দক্ষিণা দৈনিক মাত্র দু টাকা। চার-শয্যার দৈনিক ভাড়া লাগে তিন টাকা করে। তাও বেশি নয়। তবে, দুই শয্যার এবং এক শয্যার ঘরের ক্ষেত্রে শয়নপিছু ভাড়া যথাক্রমে আট টাকা ও নয় টাকা করে। কটেজে ও লজে ভারতীয় ও ইউরোপীয় খাদ্য সরবরাহের দুরকম ব্যবস্থাই আছে। বেড-টী সমেত চারবেলার খাওয়ার খরচ পড়ে সাড়ে সাত টাকা থেকে আঠারো টাকা।

শহর কলকাতার কলকোলাহল থেকে নিজেদের মুক্ত করে যাঁরা কলকাতারই কাছেপিঠে অবকাশ যাপনের জন্য আগ্রহী, তাঁদের পক্ষে ৫১ কিলোমিটার দূরবর্তী ডায়মণ্ড হারবার একটি উপযুক্ত ভ্রমণ কেন্দ্র। সড়ক পথে, বাসে অথবা রেলপথে ট্রেনে যাওয়া খুবই সহজ। এখানে 'সাগরিকা' নামে যে 'ট্যুরিস্ট সেন্টার'-ভবনটি আছে তার বারান্দায় বসে সুবিস্তৃত গঙ্গার অপূর্ব সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে আপনার নজরে পড়বে সমুদ্রগামী জাহাজ নানা রকমের স্টীমার, লঞ্চ, নৌকা। এখানকার অন্যান্য দ্রষ্টব্যের মধ্যে রয়েছে একটি প্রাচীন দুর্গ, লোকে যাকে বলে 'চিংড়িখালি গড়', আর লাইটহাউস। নদীতীরে ভ্রমণ ও পিকনিক করাও ভ্রমণকারীদের পক্ষে কম আনন্দদায়ক নয়।

ডায়মণ্ডহারবারের 'ট্যুরিস্ট সেন্টার'কে কেন্দ্র করেই আরও কয়েকটি জায়গায় বেড়িয়ে আসা যায়। যেমন, নামখানা, কাকদ্বীপ ও গঙ্গাসাগর। তীর্থযাত্রী ও সাধারণ ভ্রমণকারীদের কাছেও মকরসংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত গঙ্গাসাগর মেলা বিশেষ আকর্ষণীয়।

ডায়মণ্ডহারবারের 'সাগরিকা' পর্যটন-আবাসে দুই শয্যাবিশিষ্ট ঘর আছে ছয়টি আর দুই শয্যার স্যুট আছে একটি। শনিবার রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিনে শয্যাপিছু দৈনিক ভাড়ার হার পঁচিশ টাকা, ঘর পঁয়ত্রিশ আর স্যুট পঞ্চাশ। অন্যান্য দিন যথাক্রমে কুড়ি, পঁয়ত্রিশ আর পঁয়তাল্লিশ। কোনো ঘরে বাড়তি শয্যার ব্যবস্থা করতে হলে আরও দশ টাকা খরচ করতে হয়। তাছাড়া, ও ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী ইউথ হোস্টেলের পঞ্চাশ পয়সা। অন্যান্য পর্যটক আবাসের মতো এখানেও শতকরা পাঁচ টাকা সার্ভিস চার্জ দিতে হয়। এখানকার ডাইনিং হল ও পানশালাটি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। খাওয়া খরচের হার—বেড-টি পঞ্চাশ পয়সা, প্রাতঃরাশ সাড়ে তিন টাকা, দ্বিপ্রাহরিক আহার সাড়ে চার টাকা, বৈকালিক চা দেড় টাকা, আর নৈশভোজ সাড়ে পাঁচ।

॥ ৭ ॥

আধুনিক পশ্চিমবঙ্গ কিভাবে শিল্পসমৃদ্ধ হয়ে উঠছে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় পেতে হলে দুর্গাপুরে না গিয়ে উপায় নেই। দুর্গাপুর ও তার পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চল আজ পূর্ব ভারতের 'রুঢ়' নামেই অভিহিত। দুর্গাপুরে দেখবার ও বিস্মিত হবার অনেক কিছু রয়েছে। ভারত সরকার পরিচালিত বিরাট স্টীল প্ল্যান্ট দেখে যেমন পর্যটকরা মুগ্ধ ও বিস্মিত হবেন, তেমনি খুশী হবেন রাজ্য সরকার পরিচালিত দুর্গাপুরে প্রকল্পের বিভিন্ন অংশ দেখে। অন্যান্য দ্রষ্টব্যের মধ্যে রয়েছে ফার্টিলাইজার করপোরেশন, মাইনিং অ্যাণ্ড অ্যালায়েড মেশিনারী করপোরেশন আর অপথ্যালমিক গ্লাস প্রোজেক্টের কারখানাগুলি, দুর্গাপুরে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এবং স্টীল টাউনটি। দুর্গাপুরে ব্যারাজটিও দেখবার, এবং বেড়াবার উপযুক্ত একটি জায়গা। দুর্গাপুরকে কেন্দ্র করেই পর্যটকেরা ঘুরে দেখে আসতে পারেন মাইথন ও পাঞ্চেৎ বাঁধ, আসানসোলের শিল্পাঞ্চল, চিত্তরঞ্জন রেল কারখানা, আর রূপনারায়ণপুরের কেবল্‌ ফ্যাক্টরী।

কলকাতা থেকে দুর্গাপুরের দূরত্ব ১৬৫ কিলোমিটার। ট্রেনে সেখানে পৌঁছুতে সময় লাগে চার ঘণ্টা। মোটরে ও বাসে লাগে আর এক ঘণ্টা বেশি। দুর্গাপুরে থাকবার বহু জায়গা আছে। সরকারী বাংলোগুলি ছাড়াও আছে বেসরকারী হোটেল। তার আছে রাজ্য সরকারের 'ট্যুরিস্ট লজ'। স্টেশন থেকে ট্যুরিস্ট লজের দূরত্ব আড়াই কিলোমিটার। দুইতলাবিশিষ্ট এই পর্যটন-আবাসে ঘর আছে বারোটি। সবই দুই শয্যাবিশিষ্ট। প্রত্যেক তলায় ছখানা করে ঘর। দোতলায় শয্যাপিছু ভাড়া লাগে দৈনিক আঠারো টাকা, আর ঘরপিছু ত্রিশ টাকা। একতলায় সেই রেট, দাঁড়ায় যথাক্রমে পনের আর পঁচিশ। খাওয়ার ব্যবস্থা দুরকমেরই আছে, অর্থাৎ ভারতীয় ও ইউরোপীয়। বেড-টি সমেত চারবেলাকার খাবারের খরচ পড়ে মাথাপিছু আঠারো টাকা পঁচাত্তর পয়সা। তার ওপর শতকরা পাঁচ টাকা সার্ভিস চার্জ।

পশ্চিমবঙ্গে ভ্রমণের ব্যবস্থা ক্রমশ যেমন সম্প্রসারিত হচ্ছে, সেই সঙ্গে যদি ভালোভাবে থাকাখাওয়ার জন্য কমখরচের পর্যটন-আবাসের প্রসার হয় তাহলে ভ্রমণকারীদের সংখ্যা যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যুগপৎ জ্ঞান ও আনন্দ লাভই যখন পর্যটনের প্রধান উদ্দেশ্য, তখন যুব সম্প্রদায় ও ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী ইউথ হোস্টেলের সংখ্যা বাড়ানোরও প্রয়োজন আছে।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিভার চোখ কৌতুকে নেচে উঠল। বলল, 'আপনি মহাভারত পড়েননি?'

'হ্যাঁ পড়েছি, ঠিক মনে নেই। তা ছাড়া কথাটা বিশ্বাসও হচ্ছিল না। ইচ্ছে করে কেউ মরে কিনা, বা মরলেও যে ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু হয়েছিল তার কোন সাক্ষী-সাবুদ নেই—'

কথার মাঝখানেই বিভা অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠল, 'না মরলে মহাভারতে শুধু-শুধু ভীষ্মেরই ইচ্ছামৃত্যুর কথা লেখা হবে কেন। আরও তো অনেকে সেইভাবে মরতে পারতেন, যেমন যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, কিম্বা দুর্যোধন, কিম্বা শ্রীকৃষ্ণ নিজে। শ্রীকৃষ্ণকে তো বাণ মেরেছিল; একটা পাখি ভেবে। এমন সুন্দর লাল টুকটুকে পা ছিল!' বলতে বলতে বিভার চোখ দুটো বুজে এল। ও যেন চোখের সামনে একজোড়া রাঙা চরণ দেখতে পাচ্ছিল।

অনিমেষ নড়ে-চড়ে শুল। অনিমেষ যে ঘুমোয়নি, বোঝা গেল।

বিভা আবার বলল, 'বিশ্বাসে মিলায় হরি, তর্কে বহু দূর। আপনি যদি বিশ্বাস করেন, ভগবান আছেন, তিনি আছেন। যদি বলেন, নেই। কেন নেই, না থাকলে গাছ-পালা পশু-পাখী মানুষ জন্মাচ্ছে কী করে, মানুষ মরছে কেন, কেউ সুখ পাচ্ছে, কেউ কষ্ট পাচ্ছে—নানা প্রশ্ন। তার চেয়ে বিশ্বাস করাটা অনেক সহজ। প্রশ্ন থাকে না। প্রশ্ন না থাকলে অশান্তিও হয় না।'

'প্রশ্ন না থাকলে বুঝি অশান্তি হয় না?'

'হবে কী করে? আপনি যদি ভাবেন, একটা গাছে কী করে ফুল ফোটে আপনি জানবেন, তবেই না আপনাকে সেই গাছটার কাছে ছুটতে হবে। ফুল ছিঁড়তে হবে। টুকরো টুকরো করে চোখে মাইক্রোস্কোপ লাগিয়ে কত কী ভাবতে হবে। কিন্তু যাদের মনে সেই প্রশ্ন নেই, দেখবেন, তারা খুব সুখে আছে। ফুলটা দেখে ভাল লাগল, কেউ খোঁপায় পরলো, কেউ কোটে গুঁজে দিল, কেউ বা বৈঠকখানায় এনে সাজিয়ে রাখলো।' কথা বলে বিভা অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে একসময় বলল, 'সত্যি না!'

ঘাড় হেলিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, খুব সত্যি। তুমি আরও লেখাপড়া শিখলে পারতে। খুব ভাল রেজাল্ট হতো তোমার।'

বিভাকে বিমর্ষ দেখাল। ও বলল, 'দাদা আর পড়তে দিল না। আমি পড়াশুনোয় ভাল ছিলাম।'

অসতর্ক মুহূর্তে কখন স্পর্শকাতর জায়গায় এসে পড়েছি। তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'তার চেয়ে অনেক ভাল করেছো রান্না শিখে। পড়াশুনো করলে মানুষের নিজের হয়তো জ্ঞান বাড়ে, কিন্তু সবাইকে কী এমন আনন্দ দেওয়া যায়! এই ধরো না আজ যেমন খাওয়ালে, কোনদিন ভুলতে পারবো!'

বিভা সলজ্জ হেসে বলল, 'আপনি খুব পেটুক। খেতে ভালবাসেন।'

'আমার পেটে অনেকগুলো তিল আছে। মা বলে, যাদের পেটে তিল থাকে, তারা খুব খেতে ভালবাসে।'

বিভা খুব হাসতে লাগল। সামান্য কথায় বিভা কী সুন্দর হাসতে পারে। ওকে খুব পবিত্র আর সরল দেখাচ্ছিল। এক সময় বললাম, 'যদি কোনদিন কোলকাতায় যাও আমি তোমাকে পেয়ারা পেড়ে খাওয়াব।'

বিভা আনন্দে নেচে উঠল, 'সত্যি, নিজের হাতে পেয়ারা পেড়ে দেবেন?'

'হ্যাঁ গাছে চড়ে নিজে পেড়ে দেব। আমি নীচে ফেলবো, আর তুমি কোঁচড়ে ভরে নেবে।'

হাসতে হাসতে বিভা বলল, 'আপনাকে দেখলে একটুও মনে হয় না যে আপনি গাছে চড়তে পারেন!'

'আমাকে দেখলে কি মনে হয়?'

'মনে হয়, আপনি শুধু খেয়ে-দেয়ে ঘুমোতে পারেন।'

'অথচ সেই তখন থেকে তোমার দাদাই ঘুমোচ্ছে।' বলে অনিমেষের পিঠে সুড়সুড়ি দিতেই অনিমেষ লাফিয়ে উঠে পড়ল।

হাসতে হাসতে বিভা উঠে দাঁড়াল, 'দাঁড়ান, আপনাদের চা নিয়ে আসি, চারটে বেজে গেল।'

জামসেদপুরে আগে কোনদিন আসিনি। কিন্তু অনিমেষ এমন সুন্দরভাবে জায়গার বর্ণনা দিয়ে দিয়েছিল যে স্টেশনে নেমেই মনে হল কতদিনের চেনা জায়গা। প্রথমেই গেলাম আগরওয়ালার কাছে। আগরওয়ালা অফিসেই ছিল। খাতির করে বসাল। একথা সেকথার পর কাজের কথা শুরু হ'ল। আমি বিচক্ষণ ব্যবসাদারের মত সাবধানে কথা বলার চেষ্টা করছিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, 'মার্কেট বুঝি খুব ভাল এখন? আপনি র‍্যাকে দেখছি বহু মোটর স্টক করে রেখে-ছেন?' র‍্যাকে বহু ইলেকট্রিক মোটর সাজান ছিল। সেইদিকে তাকিয়ে আবার বললাম, 'অবিশ্যি আপনারা টাকাওয়ালা লোক, আপনাদের মাল স্টক করতে গায়ে লাগে না।

মিষ্টি কথায় জগৎ তুষ্ট। আগরওয়ালা খুশী মনে বিনয় দেখিয়ে বলল, 'আমি আর কী বড়মানুষ চ্যাটার্জি সাহেব। যা কিছু সবই আপনাদের দৌলতে।'

আগরওয়ালার কথা শুনতে শুনতে উঠে দাঁড়ালাম। হাঁটতে হাঁটতে মোটরগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, 'এ-তো দেখছি বিভিন্ন কোম্পানীর।'

আগরওয়ালা সহজেই ফাঁদে পা দিল। বলল, 'হ্যাঁ। যা যখন সুবিধা হয়, তুলে রাখি।'

'কিন্তু চুক্তি অনুসারে আপনি তা পারেন না।'

'কেন?' আগরওয়ালা কিছুটা বিস্মিত কিছুটা বা বিরক্ত।

'যেহেতু আমাদের কোম্পানীর সঙ্গে আপনার সে রকম একটা চুক্তি হয়েছিল তিন বছর আগে। যদিও সেই চুক্তি কিছুদিন আগে শেষ হয়ে গেছে।'

'তার মানে এই না যে আমি আর কোন ব্যবসা করতে পারবো না।' আগরওয়ালার চোয়াল ক্রমশই শক্ত হয়ে উঠছিল।

'একটা কেন বহু ব্যবসা আপনি করতে পারেন। সে বিষয়ে বাধা দেবার ক্ষমতা আমার নেই, চাইও না। কিন্তু আপনার কোম্পানীগুলোর নাম ভিন্ন ভিন্ন হওয়া দরকার, এবং সবচেয়ে বড় কথা হল গিয়ে একই ধরনের বিভিন্ন ম্যানুফ্যাকচারের জিনিষপত্র আপনি এক নামে কেনাবেচা করতে পারেন না। আইনের চোখে সেটা দূষণীয়, কারণ সেইরকম একটা অঙ্গীকারপত্র আপনি সই করেছিলেন তিন বছর আগে। কপি যদি না থাকে, আমার কপি আপনাকে দেখাতে পারি।' কথাগুলো খুব ধীরে ধীরে স্থির ভাবে বললাম।

কাজ ভাল হল। আগরওয়ালা নরম হল। বলল, 'আইন নিয়ে ঘাটাঘাটি করে কী হবে চ্যাটার্জি সাহাব। যা হয়ে গেছে যেতে দিন। আমার লোকগুলোও হয়েছে তেমন, কোন কিছু দেখবে না শুনবে না শুধু গল্প করবে।' হঠাৎ আগরওয়ালা হাঁক ছেড়ে ডাকতে লাগল, 'ভট্টু, হই ভট্টু।' একটা রোগা রোগা মতন ছেলে এগিয়ে এল। আগরওয়ালা হিন্দীতে বলতে লাগল, 'কত-দিন তোকে বলেছি না অন্য কোম্পানীর মাল তুলবি না ঘরে। কথা শুনিস না কেন তোরা। তোদের জন্যে বুড়ো বয়সে কি জেল খাটবো। যা, জিনিসগুলো সব সস্তা দামে বিক্রি করে দিয়ে আয়, এক্ষুনি।'

ছেলেটা হড়বড় করে চলে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে বললাম, 'কোথায় যাচ্ছো?'

ছেলেটি অম্লান বদনে বলল, 'সস্তায় বিক্রী করে দিয়ে আসতে।'

প্রশ্ন করলাম, 'সঙ্গে সঙ্গে বিক্রী করতে পারবে?'

আগরওয়ালা বলে উঠল, 'পারবে না কেন, মাট্টিকা দামমে দেনেসে যে কেউ লুফে নিয়ে যাবে। আর দেরী করিস না ভট্টু যা।'

ভট্টু বেরিয়ে যেতে বললাম, 'ও আপনার কে হয়?

আগরওয়ালা গর্বিত ভাবে বলল, 'আমার বড় ছেলে। দেখেছেন এইটুকু বয়সেই মাথাটা কীরকম সাফ। বড় হলে ও আমার চেয়েও বড় ব্যবসাদার হবে।'

'আপনার কষ্ট হয় না?'

'কেন চ্যাটার্জি সাহাব?'

'এই যে আপনার বড় ছেলেকে জাহা-ন্নামের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন?'

আগরওয়ালা চোখ কুঁচকে প্রশ্ন করল, 'কেন?'

'আপনি কি বিশ্বাস করেন, ভট্টু সব মোটরগুলো মাটির দামে বিক্রী করে দিয়ে আসবে?'

আগরওয়ালা থতমত খেয়ে আমাকে প্রশ্ন করে বসল, 'বিক্রী না করে মালগুলো কি করবে ভট্টু?'

'পেছনের দরজা দিয়ে গুদোমে তুলে রাখবে।'

আগরওয়ালা সমস্ত দাঁত বের করে হাসতে লাগল। ধরা পড়ে গিয়ে মানুষ যে এরকম নির্লজ্জভাবে হাসতে পারে জানা ছিল না। কিছুক্ষণ হাসার পর আগরওয়ালা আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'আপনার ব্রেণ খুব চমৎকার পরিষ্কার আছে বাবু-সাহেব। এরকম মানুষ সঙ্গে পেলে আমি রাজা বনে যেতে পারি।'

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আমি খুব দুঃখিত আগরওয়ালাবাবু যে আপনাকে রাজা বানাতে পারলাম না। আজ চলি, পরে দেখা হবে। নমস্কার।'

'সে কী কথা বাবুসাহেব। এত কষ্ট করে এলেন। গরীবের চৌকাঠে পা রেখে চলে যাবেন, তা কি হয়। একটু চা-টা খেয়ে যান। আরে ভট্টু।' আগরওয়ালা গলা ফাটিয়ে সমানে চীৎকার করতে লাগল।

বললাম, 'ভট্টু এখন কুলী ডাকতে গেছে, শুনতে পাবে না। আর কোনদিন যদি সুযোগ সুবিধে হয়, এসে চা খেয়ে যাব।' বলে চলে আসছিলাম।

আগরওয়ালা হন্ত-দন্ত হয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। 'চা না খাবেন না খান, কিন্তু ডিলারসীপ আমার চাই-ই মিস্টার চ্যাটার্জি। আমি এর ওপর ভরসা করে বসে আছি।'

'কাজটা আপনি ভাল করেননি।'

'কেন, কেন, চ্যাটার্জি সাহাব। কোন গোলমাল দেখা দিয়েছে কি। যদি কিছু গোলমাল থাকে, আপনি ঘাবড়াবেন না মশাই সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনার ভি পেট ভরবে, আমি ভি ভুখা মরবে না।' আগর-ওয়ালা হাঁস-ফাঁস করতে লাগল।

বললাম, 'দেখা যাক, সবই ভগবানের হাত।'

'ভগবানটান কিছুই না মশাই, সবই মানুষের হাত। মানুষের হাতই বা বলছি কেন, সবই তো আপনার হাত। যাকে রাখেন, যাকে মারেন, দয়া করবেন হুজুর।' আগরওয়ালা মুখ কাঁচুমাচু করে আমার সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

'আমি গিয়ে কোলকাতায় রিপোর্ট পাঠাবো, ডিলারশীপ দেওয়া বা নেওয়া তাদের ইচ্ছে। তবে এতদিন যেভাবে কাজ পেয়ে এসেছেন, সেইভাবে পেতে চেষ্টা করলেন না কেন?'

আগরওয়ালা হঠাৎ দু-হাত দূরে ছিটকে গেল। ওর রুদ্ধ কণ্ঠ কানে এল, 'সেভাবে আর হয় না মশাই। আপনাদের ম্যানেজার এক চামার লোক। দস্তুর এ্যান্ড কোম্পানী নিজের লোক বলে অন্যায়ভাবে তাকে ডিলার-সীপ দিতে চাইছে। কিন্তু চাইলেই তো হবে না। আইন আছে, বিচার আছে, আর আছে টাকা। খেলা দেখিয়ে ছাড়বো না।'

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে আসতে বললাম, 'তবে তাই দেখান।'

আগরওয়ালা আর বাধা দিল না। শেষ-বারের মত শাসাল, 'আমি বাজারে বদনাম ছড়াবো। সময়মত মাল দিতে পারে না যে কোম্পানী, সেই মাল বুক করে ডিলার পথে বসবে। আরও বলবো, আপনাদের মালের চাহিদা শুধু নামের জোরে, আসলে মাল বহুৎ রদ্দি। বুঝলেন মশাই, খুব সাবধান। আমিও—' ওর শেষ কথাগুলো আর শোনা গেল না।

ভাগ্য ভাল দস্তুরকেও অফিসে পাওয়া গেল। বৃদ্ধ ভদ্রলোক, কম কথা বলেন। শনিবার দিন ডিলারসীপ-ফাইল দিয়ে যাবার আগে তেওয়ারী কানের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে চুপি চুপি বলে গিয়েছিলেন, 'লিস্টে একটা নাম দেখবেন, দস্তুর অ্যাণ্ড কোম্পানী। দেশপাণ্ডে সাহেবের খুব বন্ধু লোক।' তেওয়ারী আর অপেক্ষা না করে চলে গিয়েছিলেন। আমাকে বাইরে বসিয়ে রেখে দস্তুর ধীরে ধীরে কাজ সারলেন। কাঁচের ভেতর দিয়ে দস্তুরকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। এমন কিছু দরকারী কাজ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন বলে মনে হল না। কিছুসংখ্যক মানুষ যে এভাবে নিজের পদমর্যাদা বাড়ায় সে অভিজ্ঞতা আমার আছে। কিছুক্ষণ পরে ভেতরে ডাক পড়ল। হাত দিয়ে চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলে দস্তুর একটা কাগজ গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগলেন। অথচ আমি জানি কাগজটা তেমন জরুরী কিছু না। জরুরী কাগজ আগন্তুকের সামনে বসে পড়া যায় না।

এক সময় দস্তুর মুখ তুলে তাকালেন। চশমার আড়ালে বুদ্ধিদীপ্ত চোখদুটি হারিয়ে যায়নি। ছোট চোখ, কিন্তু খুব উজ্জ্বল। বুঝলাম, দস্তুর বুদ্ধিমান মানুষ। বললাম, 'আপনি কি আমাদের মালের ডিলারসীপ নিতে ইচ্ছুক?'

'আপনাদের কী কী মাল?' দস্তুর এমনভাবে বললেন, যেন আমি কোন ছোট-খাট নতুন কোম্পানীর প্রতিনিধি, যে কোম্পানীর নাম এখন পর্যন্ত বাজারে ছড়ায় নি।

বললাম, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল পাম্প, জেনা-রেটিং সেট, মোটর, সুইচ গিয়ার, ট্রান্সফর-মার আরও কিছু কিছু জিনিস।'

দস্তুর বললেন, 'আপনাদের কাছ থেকে যদি সুবিধাজনক সর্ত পাওয়া যায়, আমি ডিলারসীপ নিতে ইচ্ছুক।' উনি এমনভাবে তাকালেন, যাতে আমার কৃতার্থ বোধ করা উচিত।

দস্তুরকে ভাল করে বাজিয়ে দেখার ইচ্ছা তখনও প্রবল। বিনীতভাবে বললাম, 'আপনাদের নামকরা ফার্ম। আপনাদের সঙ্গে কাজ করতে পারলে আমরাও খুশী হব।' কাজ হল, দস্তুরের শীর্ণ মুখ উজ্জ্বল দেখাল।

উনি বললেন, 'কাজ করা না করা নির্ভর করছে অনুকূল ব্যবস্থার ওপর।'

'কি ব্যবস্থা আপনি চান?' যেন একটা সাদা সই করা কাগজ দস্তুরের সামনে ঠেলে দিলাম।

দস্তুর চোখ বুজে কিছুক্ষণ কী ভেবে নিয়ে একটা পেন্সিল দিয়ে কাগজের ওপর লিখতে লিখতে পড়তে লাগলেন, প্রথম, পার্সেন্টেজ অব কমিশন বাড়াতে হবে। দ্বিতীয়, ক্রেডিট ফেসিলিটি। থার্ড পাবলিসিটি। ফোর্থ, মাল স্টক করার মত গোডাউন আমার নেই। একটা গুদামঘর ভাড়া করে দিতে হবে। বলা বাহুল্য সেই ভাড়া আপনারা দেবেন। ফিফথ, আপনাদের সার্ভিস সম্বন্ধে ছোট খাটো কমপ্লেন শুনতে পাই। আমি চাই না ভবিষ্যতে সে জাতীয় কোন কমপ্লেন আমার কানে আসে।'

লেখা এবং পড়া দুই-ই শেষ হল। দস্তুর মুখ তুলে তাকিয়ে রইলেন। হাসি-হাসি মুখে বললাম, 'মিস্টার দেশপান্ডেকে গিয়ে আপনার প্রোপোসাল দেব। ম্যানেজারিয়েল র‍্যাঙ্ক ছাড়া এ সম্বন্ধে মতামত দেওয়া যাবে না। আপনার সর্তগুলি যদি একটা চিঠি আকারে দিয়ে দেন, আমাদের কাজের খুব সুবিধা হয়।'

ধূর্ত মানুষও এক এক সময় ছেলেমানুষের মত কাজ করে ফেলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দস্তুর অসম্ভব সর্তগুলো চিঠির আকারে আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'আশা করি আমাদের ও আপনাদের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন চিরস্থায়ী হবে।'

বললাম, 'আমাদের দিক থেকে সে বিষয়ে কোন ত্রুটি হবে না।' বলে বেরিয়ে এলাম। মাত্র কয়েককটা দিন হল নতুন এই পদে এসেছি। নিজের গুণে নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এক চালে দস্তুরকে কীভাবে মাৎ করে দিয়ে এলাম! প্রথমত আমাদের কোম্পানী ধারে কারবার করে না। অ্যাডভান্স দিয়ে যেখানে মাল পাওয়া যায় না, বাকীতে কারবারের প্রশ্ন সেখানে ওঠে না। দ্বিতীয়ত, ব্যবসার সর্ত আসার কথা আমাদের তরফ থেকে, দস্তুরের কাছ থেকে না। চিঠি পেয়ে কোম্পানীর সম্মানে লাগবে, স্বভাবতই দস্তুর অ্যান্ড কোম্পানী খসে পড়বে, যেটা কিনা আমি আর অনিমেষ চেয়েছিলাম। বাকী রইল, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাকসেসোরিজ প্রাইভেট লিমিটেড। অনিমেষ বলে দিয়েছে, বাঙালীর প্রতিষ্ঠান, যদি সুবিধা হয়, ওদেরই ডিলারসীপ দিতে।'

তখন লাঞ্চের সময়। হোটেলে ফিরে গিয়ে আবার এদিকে আসতে ইচ্ছে করল না। তারচেয়ে একবার দেখাই যাক না, যদি ওদের কাউকে পাওয়া যায়। প্রাথমিক কথাবার্তা সেরে গিয়ে বাকীটা না হয় চিঠিপত্রে শেষ করা যাবে। না হয়, আর একবার আসাও যেতে পারে। ট্রেনে চড়তে আমার তো ভালই লাগে।

ই-ডাস্ট্রিয়াল অ্যাকসেসোরিজের ম্যানেজিং ডাইরেকটর এস কে মুখার্জি চেম্বারেই ছিল। কার্ড ভেতরে পাঠিয়ে দিতেই ডাক পড়ল। উর্দীপরা চাপরাশীর পিছন পিছন যে ঘরে গিয়ে ঢুকলাম, একটা ছোট-খাট কোম্পানীতে এই ধরনের চেম্বার দেখার আশা করিনি। প্রকান্ড ঘর। সমস্ত ঘর জুড়ে মোটা কার্পেট। প্রতি পদক্ষেপে পা ডুবে ডুবে যাচ্ছিল। নরম মিষ্টি আলো ঘরে একটা মোহময় পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে কানে এল, 'প্লীজ কাম ইন।' তারপর হাত দিয়ে চেয়ার দেখিয়ে অল্পবয়সী এক ভদ্রলোক উঠে দাঁড়াল। ভদ্রলোককে ভাল করে দেখার সুযোগ হল। লম্বা ছিপছিপে শরীর। স্যাম্পু করা চুল। কায়দা-দুরস্ত স্যুট পরনে। উন্নত নাসিকা আর প্রকান্ড ললাট, যা কিনা সমস্ত চেহারায় একটা ব্যক্তিত্ব এনে দিয়েছে। ভদ্রলোক একটা দামী সিগারেট কেস আমার সামনে খুলে ধরে বললেন, 'প্লীজ হ্যাভ এ স্মোক।' বলে নিজে একটা গ্লাসে চুমুক দিলেন। মদ না খেলেও মদের গন্ধ আমার অচেনা নয়। বুঝলাম, ভদ্রলোক দিনে-দুপুরে অফিসে বসেই ড্রিঙ্ক করতে অভ্যস্ত। কোন কোন বিরল মুহূর্তে পিছনের একটা অংশ অতর্কিতে কক্ষচ্যুত হয়ে চোখের সামনে এসে পড়ে। তখন সেই অংশটার দিকে না তাকিয়ে উপায় থাকে না। দেখতে দেখতে মন ভারী হয়ে ওঠে, তবু সেইদিকে তাকাবার কী প্রচন্ড স্পৃহা! হঠাৎ করবী যেন সরাসরি আমাকে জিজ্ঞাসা করে বসল, 'আপনি কোনদিন মদ খাননি?' ট্যাক্সিতে যেতে যেতে করবী একদিন আমাকে এই প্রশ্ন করেছিল। অতর্কিতে শব্দের লহরী ভেদ করে সেই কথাটা ছিটকে এসে আমার কানে বাজল। চোখের খুব কাছে মুহূর্তের জন্য করবীকে দেখতেও পেলাম যেন। শুধু করবী না। করবীর পাশে ওর ছেলেও দাঁড়িয়ে রয়েছে। করবীর ছেলে কাঁদছে আর আঙুল দিয়ে একজন লোককে দেখাচ্ছে।

এই সেই লোক। আমার কয়েক হাত দূরে বসে আছে সে। মাঝের ব্যবধান শুধু মাত্র একটা টেবিল। অনেকক্ষণ বসে থাকার পরও কোন কথা বলতে পারলাম না। মুখার্জি মাঝে মাঝে গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে আর সিগারেটে টান মারছে। কথা বলছে না! আমি যেন সহসা অন্য একটা জগতে চলে গিয়েছিলাম। পারিপার্শ্বিকতা ভুলে গিয়ে অন্য একটা জগৎ—আমার পিছনের একটা জগৎ। আবার বাস্তবে ফিরে এলাম। শীততাপনিয়ন্ত্রিত ঘর, ঘরের নীলচে আলো, পায়ের নীচের নরম গালিচা, দু হাত দূরের একজন উদ্ধত মানুষ, আমার চোখে মাদকতার সৃষ্টি করেছিল। সবার ওপরে মৃদু একটা গন্ধ। যে গন্ধের স্বাদ আমার অজানা, কিন্তু গন্ধটা অচেনা নয়। এই লোকটি করবীর স্বামী কিনা জানি না, কিন্তু হঠাৎ আমার মনে হল, এ-ই করবীর স্বামী। করবীর স্বামী মদ খায়।

বললাম, 'আর ইউ এস কে মুখার্জি?'

'দ্যাটস রাইট।' ভদ্রলোকের গলাটা বেশ ভরাট, পুরুষমানুষের গলা যেরকম হওয়া উচিত।

বাংলায় বললাম, 'আমার নাম অংশুমান চট্টোপাধ্যায়।'

মুখার্জি হেসে বলল, 'আপনার কার্ড দেখেই জেনেছি। আমার নাম শশাঙ্ককুমার মুখোপাধ্যায়।'

বললাম, 'আপনি অনিমেষ দত্তকে চেনেন?'

'আমরা একসঙ্গে কলেজে পড়তাম।'

'এজেন্সির ব্যাপারে আপনার ইন্টারেস্ট জেনে আমি অনিমেষের কথামত আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'অনিমেষ আমাকে ভালবাসে। ভালবাসে বলেই উপকার করতে চায়। যদিও আমাদের বন্ধুত্বটা গাঢ়, কিন্তু চারিত্রিক দিক দিয়ে আমরা দুজনে দুই পোলের বাসিন্দা।' বলে হো হো করে হেসে উঠল শশাঙ্ক। ভারী গলায় কেউ যদি উচ্চৈঃস্বরে হাসে আমার রক্তে দোলা লাগে। মনে হয় একটা দুরন্ত ঘোড়া যেন টগবগিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। কথা বলতে বলতেও শশাঙ্ক অনবরত গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিল।

হঠাৎ বলে ফেললাম, 'কিছু যদি মনে না করেন, এ ধরনের কথা বলছি, শুধু মাত্র অনিমেষ আমাদের দুজনেরই বন্ধু বলে, অফিসে বসে ড্রিংক করলে কাজের ক্ষতি হয় না?'

'নাঃ।' শশাঙ্ক যেন হাত নেড়ে একটা মাছি তাড়াল।

'আমি এসেছি আমাদের প্রডাকটের ডিলারশীপ আপনাকে দিতে।'

'আমার ইতিকথা কিছু না জেনেই এতবড় কাজটা করে ফেলবেন? তাছাড়া,

আমি যতদূর জানি আপনি চাইলেও সে কাজ করতে পারবেন কিনা সন্দেহ।' শশাঙ্ক খুব প্রসন্ন সুরে কথাগুলো বলল।

'কেন?'

'আপনাদের ম্যানেজারটি যে কী চিড়িয়া আমার জানা আছে। এখানে, ক্লাবে লোকটিকে কয়েবার মিট করেছি। এতদূরে গাড়ি হাঁকিয়ে আসে কেন জানেন? মদ খেতে। অথচ দু পেগের বেশী কোনদিনই খাবে না। কোনদিন মাতালটাকে আউট হতে দেখলাম না। একটা জঘন্য চরিত্রের লোক মশাই।' শশাঙ্ক এমনভাবে নাক মুখ কোঁচকাল যেন এই মুহূর্তে পরিচ্ছন্ন মেঝেয় থু থু ফেলে বসবে।

'জঘন্য কেন? মাতাল হয় না বলে?' শশাঙ্ককে রাগাতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

'ইয়েস। একশোবার ইয়েস। যে লোক মদ খেয়ে নেশা করে না, সে কেন মদ খায় বলতে পারেন? মেয়েমানুষের কাছে যাবে বলে? স্যরি, প্রথম দিনেই মুখ খুলে ফেললাম। আমরা দুজনেই অনিমেষের বন্ধু। অনিমেষের দোহাই, কিছু মনে করবেন না।' বলে শশাঙ্ক টেবিলের ওপর দিয়ে আমার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল।

ওর হাতটা দুই হাতের মধ্যে নিতে নিতে বললাম, 'না না, কিছু মনে করিনি। তবে আপনাকে এভাবে ড্রিঙ্ক করতে দেখে সত্যি কথা বলতে কী, আমার ঠিক স্বস্তি হচ্ছে না। অবিশ্যি আপনাদের বড়ঘরের ব্যাপার হয়তো আলাদা।'

শশাঙ্ক একটা হাত বাতাসে নেড়ে দিয়ে বলল, 'কিস্সু না মশাই, বড় ঘর ছোট ঘরের ব্যাপার না। মোট কথা, এবং মোদ্দা কথা হচ্ছে, ন একার তালব্য শ আকার। নেশা। নেশা জমানো নিয়ে কথা। নেশা করতে আমার ভাল লাগে, তাই আমি মদ খাই। কার কি।' বলে শশাঙ্ক হঠাৎ বুক টান করে রাজা-রাজা ভাবে বসল।

সামান্য লোভটা সামলাবার চেষ্টা করলাম না। বলে ফেললাম, 'আপনার স্ত্রী কিছু বলেন না?'

'আমার স্ত্রী!' বলে চোখ কুঁচকে শশাঙ্ক আমার মধ্যে যেন ওর স্ত্রীকে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করতে লাগল। বিড় বিড় করে আবার বলল, 'কোথায় আমার স্ত্রী? সি ইজ ডেড। সে মারা গেছে।' শেষের দিকে শশাঙ্কর কথা স্তিমিত হয়ে এল। বুঝলাম ওর নেশা হয়েছে। ওর সমস্ত মুখ ক্রমশই রক্তবর্ণ হয়ে উঠছিল। চোখ বুজে বুজে আসছিল। মাথা বুকের ওপর ঝুঁকে আসতে লাগল।

অফিসের চেম্বারে যে এ ধরনের একজন মত্ত মানুষ দেখব ভাবতে পারি নি। প্রথমটায় কী রকম হকচকিয়ে গেলাম। ভয়ে ভয়ে ডাকলাম, 'শশাঙ্কবাবু, মিস্টার মুখার্জি।'

শশাঙ্ক ফিক করে হেসে ফেলল, 'মাতাল হওয়া আর অজ্ঞান হওয়া এক কথা না বিকাশবাবু।'

ভয়ে ভয়ে বললাম, 'আমার নাম অংশু। অংশু চট্টোপাধ্যায়।'

শশাঙ্ক মুখ বিকৃত করে বলল, 'নামটা খটোমটো, ভাল লাগল না। তার চেয়ে যদি বিকাশ কিম্বা অশোক বা এই ধরনের কিছু হতো অনেক সহজ হতো। পৃথিবীতে সবচেয়ে শক্ত কী জানেন? সবচেয়ে শক্ত হচ্ছে, সহজ হওয়া। বি ইজি। সহজ হয়ে যান; দেখবেন কোন কষ্ট নেই। আমরা কষ্ট পাই, শুধুমাত্র সহজ হতে পারি না বলেই না! এই যে সন্ধ্যে—সন্ধ্যে কেন, কোন কোনদিন গভীর রাত পর্যন্ত আমাকে এই বন্ধ ঘরটায় নিজেকে আটকে রাখতে হয়, কেন? হোয়াই? যেহেতু আমি সহজ হতে পারি না। আত্মঅহঙ্কার আমাকে এই আড়াল থেকে বাইরে আসতে দেয় না। নিজের ইচ্ছায় আজ আমি বন্দী।' বলে দু হাত অসহায়ভাবে তুলে ধরল শশাঙ্ক।

এই অবস্থায় ব্যবসার কথা তোলা না তোলা সমান। উঠবো উঠবো করছিলাম, হঠাৎ শশাঙ্ক বলে উঠল, 'আপনি বিরত বোধ করছেন, বুঝতে পারছি। যদি লাঞ্চের আগে আসতেন আমি স্বাভাবিক অবস্থায় কথা বলতে পারতাম। তা ছাড়া আজ একটা বিশেষ ঘটনা ঘটে গেল। অবিশ্যি এমন ঘটনা প্রতি মাসে একবার দুবার ঘটছেই। তবু আন এ স্পেশাল অকেশন, একটা বিশেষ অনুষ্ঠান করা উচিত। তাই আজ এই যথেচ্ছ মদ্যপান।' বলে এক চুমুকে গ্লাস খালি করে ফেলল শশাঙ্ক।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কি স্পেশাল অকেশন আজ?'

'আজ আমার স্ত্রী কোলকাতায় চলে গেলেন।' বলে মুষ্টিবদ্ধ হাতের ওপর নিজের কপাল চেপে ধরল শশাঙ্ক। মানুষের এই অসহায় অবস্থা দেখতে খুব খারাপ লাগে। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'পরে একদিন আসবো। চিঠি লিখে আসবো। সেদিন ড্রিঙ্ক করবেন না। চেষ্টা করবো লাঞ্চের আগেই আসতে।' বলে তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। সিগারেট আর মদের গন্ধে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। বাইরে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিতে লাগলাম।

কাছ দিয়ে একজন লোক যাচ্ছিল, বললাম, 'আপনাদের আর কোন সাহেব আসেন নি এখনও?'

লোকটি বলল, 'ও'রা সবাই লাঞ্চের পরে আসবেন। আপনি বসবেন?'

'না' বলে বেরিয়ে এলাম। অফিসটা আকারে বিশেষ বড় না। এখন মাধ্যাহ্নিক বিরতি, কিন্তু মনে হল লোকজনের সংখ্যা বা ব্যবসার অবস্থা মোটামুটি ভালই। অথচ এই কোম্পানীর বড়সাহেব একটা বন্ধ কামরায় মত্ত এবং অসহায় অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বাইরের কেউ তা নিয়ে মাথাও ঘামাচ্ছে না। এর জন্য অফিসে কোন কাজের ব্যাঘাতও ঘটে না হয়তো। করবীর কথা আবার মনে পড়ল। ইচ্ছে করলে করবী শশাঙ্ককে বাঁচাতে পারত। একটা অসহায় পঙ্গু জীবনের বিনিময়ে সুস্থ স্বাভাবিক সুন্দর জীবন তাকে দিতে পারত। করবীকে এই মুহূর্তে আমার দারুণ ঘৃণা করতে ইচ্ছে করল। বলতে ইচ্ছে হল, তুমি ভয়ানক নিষ্ঠুর করবী। একজন মুমূর্ষু মানুষকে ইচ্ছা করলে তুমি নিশ্চয়ই বাঁচাতে পারতে। কিন্তু সেই চেষ্টা না করে তুমি কোলকাতায় চলে গেলে।

দ্রুত পায়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। কর্মব্যস্ত শহর। মানুষজন হাঁটছে, গাড়ি চলছে। কর্মমুখর জগতের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে পরম সুখ পেলাম।

ট্রেনে চড়তে চিরদিন আমার ভাল লাগে। আজও লাগল। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ট্রেন ছুটে চলেছে। কলকাতা ছেড়ে যেদিন আসি, সেদিনও অন্ধকারের মধ্যে ট্রেন ছুটে চলেছিল। মার কথা খুব মনে পড়ছিল সেদিন। আজ করবীর কথা মনে পড়তে লাগল। সেদিন করবী ট্যাক্সিতে যেতে যেতে যেসব কথা বলেছিল, সব মনে পড়তে লাগল। অথচ স্মৃতি রোমন্থন করতে আমার ভাল লাগে না। অতীত মানুষকে পিছনে টানে। জীবনের পথে আমি সামনে এগিয়ে যেতে চাই। তাই অতীতের সঙ্গে আমার বড় বিরোধ। কিন্তু কোন কোন অসতর্ক মুহূর্তে পিছনের জানালা দিয়ে ফেলে আসা জীবনের কিছু কিছু অংশ দেখতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে বলেই তাকিয়ে দেখি। দেখি কয়েক মুহূর্ত। কিন্তু করবী আজ একটি জেদী মেয়ের মত বারংবার আমাকে টেনে টেনে পিছনে নিয়ে আসছিল। বারংবার ওর দিকে আমাকে আকৃষ্ট করতে চাইছিল। আমি সিগারেট খেতে ভালবাসি না। কিন্তু যখন হাতে কিছু করার থাকে না কিম্বা অলস কতগুলো চিন্তা এসে মন ভারাক্রান্ত করে দিতে চায়, তখন আমি সিগারেট খাই।

খুব সতর্ক হয়ে আমাকে সিগারেট টানতে হয়। এই সতর্কতার মধ্য দিয়ে আমি একটা একঘেয়ে চিন্তাকে ভুলতে চাই। অথচ আজ আমার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হচ্ছিল। করবীর চিন্তাটা একটা নাছোড়-বান্দা মাছির মতই উড়ে উড়ে আমার মগজে এসে বসছিল। করবী একদিন বলেছিল, তুমি বোকা না, তুমি ভীষণ ছেলেমানুষ। কথাটার মধ্য দিয়ে ও আমার অন্তর স্পর্শ করতে চেয়েছিল। জানি না, ওর সেই চেষ্টা সফল হয়েছে কিনা। আমার ধারণা, হয় নি। কারণ এতগুলো দিনের মধ্যে বিশেষ করে করবীর কথা আমার আর একদিনও মনে পড়ে নি। ব্যর্থতাকে আমি ঘৃণা করি। প্রেম ব্যর্থতা নিয়ে আসে। ঠিক সেই কারণেই আমি করবীর প্রণয়প্রার্থী হতে চেষ্টা করি নি। করবীর প্রণয়ী না হয়েও আজ আমি করবীর কথা ভাবছি, শশাঙ্ককে করবীর স্বামী কল্পনা করে তাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করছি। সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনেই উচ্চারণ করলাম, না। করবীর স্বামীরূপে শশাঙ্ককে কল্পনা করিনি। ওকে সাহায্য করবার চেষ্টা করেছি সে শুধুমাত্র অনিমেষের বন্ধু বলে। সময় সময় নিজের মনকে এক গভীর অরণ্য বলে ভ্রম হয়। মনে হয় অন্ধকারাচ্ছন্ন এক গহন অরণ্য আমার বুকের মধ্যে বাসা বেঁধে রয়েছে, আর আমি সেই অরণ্যের মধ্যে ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র একটি প্রাণী, শুধু চক্রাকারে ঘুরেই মরছি। এ ঘোরার বিরাম নেই, ছেদ নেই, উদ্দেশ্য নেই, শুধু আবহমানকাল ধরে নিজের মধ্যে এই যে ঘুরে মরা, কী বলে একে? আত্মানুসন্ধান বা নিজেকে প্রকাশ করার চেষ্টা? কিন্তু সে ক্ষেত্রটা তো আমার নেই। আমি রক্তমাংসের সামান্য একজন মানুষ। আমি নিজেকে উপলব্ধি করতে চাই না, জগৎ সম্বন্ধে আমার কোন কৌতূহল নেই। আমি শুধু নিজেকে নিয়ে বিব্রত এবং আমার পারি-পার্শ্বিকতা সম্বন্ধে সচেতন থাকি। অথচ এই মুহূর্তে আমার চরিত্রগত দোষ কিম্বা গুণ বা যাই হোক না কেন, একটা কিছু, যেটা কিনা শুধু মাত্র আমারই মত, হারিয়ে ফেলে আমি অন্য একজন মানুষের মত ব্যবহার করতে শুরু করে দিলাম। করবী যে কিনা আমার জীবনে কোনদিন প্রেমিকারূপে আসে নি, বা আসার সম্ভাবনাও নেই, সেই কিনা এক রোমাঞ্চকর গভীর নিশীথে আমার সঙ্গে সন্দেহজনক ব্যবহারে লিপ্ত হয়ে পড়ল। রোমাঞ্চকর নিশীথ বলতে আজকের রাতটাকেই মনে হচ্ছে আমার। বাইরে অন্ধকার, ভিতরেও তাই। এই কামরায় আর যে তিনজন যাত্রী রয়েছে, তারা ঘুমোচ্ছে। বাতাসে একটা ঠান্ডা ভাব। সবকিছু মিলিয়ে এইরকম মুহূর্তগুলো আমার মনে রোমাঞ্চ ছড়িয়ে দেয়। করবী যখন আমার সঙ্গ কিছুতেই ছাড়ল না, আমি করবীকে নিয়ে নতুন খেলায় মেতে উঠলাম, ধরা যাক, সমস্ত দিন পরে শশাঙ্ক ঘরে ফিরে এসেছে। অতিরিক্ত মদ খেয়ে ওর মুখ ফুলে উঠেছে, চোখ অসম্ভব লাল, অসংলগ্ন কথাবার্তা। করবী আজ সুন্দর করে সেজেছে। ওর গা দিয়ে মৃদু মৃদু গন্ধ বেরোচ্ছে। হয়তো কোন পাউডার বা সেন্টের গন্ধ। করবীর রুক্ষ চুলে কোন তেলের আভাষ নেই। সুতরাং করবী যে তেল মাখে না তা নিশ্চিত। করবী যাই মাখুক না কেন, ওর শরীর দিয়ে মৃদু মিষ্টি গন্ধ বেরোচ্ছিল। কিন্তু একটা চড়া গন্ধ সেই গন্ধকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। জল্লাদসদৃশ মত করবীর সামনে এসে দাঁড়াল শশাঙ্ক। নিমেষে করবীর মসৃণ মুখে কতগুলো কুটিল রেখা ফুটে উঠল। কিছুক্ষণ আগেও করবীর মুখে আত্মতৃপ্তির হাসি ফুটে উঠেছিল। সেই হাসিটা হারিয়ে গিয়ে সেখানে ফুটে উঠল, দুঃখ, ক্ষোভ, হতাশা আর গ্লানি। একটা অন্ধ মানুষ যেন দুই হাত দিয়ে শশাঙ্ককে দূরে ঠেলে দিতে চাইল। কিন্তু পাওয়ার নেশায় জল্লাদসদৃশ আজ উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। সেই শক্তিকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা নেই করবীর। করবী উচ্চস্বরে চীৎকার করে নিজের জীবনভিক্ষা চাইতে লাগল। কিন্তু কেউ করবীর কাছে এগিয়ে গেল না। হঠাৎ করবী আমার খুব কাছে এগিয়ে এলো। ওর চোখে মুখে আগুনের শিখা। সেই আগুন দিয়ে করবী আমাকে পুড়িয়ে মারতে চাইল। আমি ভয় পেয়ে পালিয়ে আসতে চাইলাম। কিন্তু আমার সামনে পিছনে শুধু আগুনের শিখা। আমি নতজানু হয়ে করবীর কাছে নিজের জীবন ভিক্ষা চাইলাম। করবী আমাকে করুণা করল। আমাকে ভিক্ষা দিল।

জানি না, এভাবে নিজের সঙ্গে খেলা করে মানুষে সুখ পায় কিনা। আমি গভীর সুখ পেলাম। আমার ভাবাকাঙ্ক্ষিত দৃশ্য খুব পলক হয়ে গেল। করবী আমার পিছন থেকে সরে গেল। যাবার সময় সব জানালাগুলো বন্ধ করে দিয়ে গেল।

ট্রেন ছুটছে। সঙ্গে সঙ্গে দুলছেও। [illegible] রেলের সঙ্গে কাঠের ঠোকাঠুকি হচ্ছে। চাকার খটাখট শব্দ ছাপিয়েও সেই ঠোকাঠুকির শব্দ কানে আসছে। খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে বুঝতে পারছিলাম, অনেকগুলো শব্দের সমষ্টি একটা বিরাট শব্দ হয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। চাকা গড়াচ্ছে। ঘর্ষণের ধাতব শব্দ, সঙ্গে এসে মিশেছে তীব্র গতির রুদ্ধ আক্রোশ। গতি যত বাড়ছে, আক্রোশও তত বাড়ছে। অথচ এই আক্রোশ যে কার, ট্রেনের না গতির, না চারিপাশের বায়ুমন্ডলে প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি হবার ফলে—বলতে পারব না। শুধু মনে হচ্ছিল, যে কোন মুহূর্তে প্রচন্ড হুঙ্কার ছেড়ে মহাকাল ধাবমান ট্রেনটাকে লাইন থেকে তুলে নিয়ে যে কোন একটা দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে। ধীরে ধীরে চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছিল। সেই আক্রোশ বা রুদ্ধ চাপা গর্জন আর আমার কানে আসছে না। শুধু হাওয়া কাটার মিষ্টি শন শন একটা আওয়াজ। মনে হচ্ছিল বিরাট আকাশের নীচে অসংখ্য বড় বড় পাখি ডানা মেলে উড়ে চলেছে। ওরা উড়ছে, ওদের পাখার কম্পনে চারিদিকে একটা শব্দ ছড়িয়ে পড়ছে। সেই শব্দটা খুব মিষ্টি বলে মনে হতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও মনে পড়ল। মনে পড়ল রাজভবনের নীচু পাঁচিলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে রেড রোডের ঠিক ওপরে মাঝে মাঝে আমি একটা নীল আকাশ দেখতে পেতাম। সেই আকাশ দেখতে দেখতে একদিন আমি বলেছিলাম, এমন একটা আকাশ, যার রং গাঢ় নীল, নীচে টিয়া রংয়ের প্রকান্ড বড় মাঠ, আকাশে বড় একটা সাদা পাখি, পাখিটা উড়ছে না, শুধুই ভাসছে।

সুপ্রিয়া খুব মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনেছিল। কথাটা বলে ফেলে আমার মনে হয়েছিল, এই কথা সুপ্রিয়াকে না বললেই ভাল হতো। সুপ্রিয়া হয়তু দারুণ হাসবে। কিন্তু সুপ্রিয়া হাসে নি। চকিতে শুধু একবার রেড রোডের ওপরের আকাশটাকে দেখে নিল, তারপরে যেরকম হাঁটছিল, সেরকমই হাঁটতে লাগল।

করবীর কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সুপ্রিয়ার কথা মনে পড়ে গেল।

(ক্রমশঃ)

কলকাতা ৭১ প্রসঙ্গে

গত বছর দীঘা থেকে ফিরছিলাম একটি বাসে শ্রীমৃণাল সেনের সঙ্গে। আমার ঠিক পেছনের সিটেই বসেছিলেন তিনি। বাসে আরো অনেক যাত্রী। চিনলেনও তাঁকে। স্বভাবতই বহুজনে নানা প্রশ্ন করেছিলেন তাঁকে এবং তিনিও একের পর এক সব জিজ্ঞাসার করেছেন সমাধান, বক্তব্য রেখে ছিলেন বলিষ্ঠভাবেই। তখনই তাঁর মধ্যে যে ঐকান্তিক সমাজচেতনার পরিচয় পাই তার মূর্তপ্রতিচ্ছবি দেখলাম 'কলকাতা ৭১'-এ। একটি প্রশ্নের উত্তরে মনে পড়ে তিনি বলেছিলেন, 'বর্তমান প্রসঙ্গ নিয়ে আমি এমন একটা কিছু গবেষণা করছি যা অদূর ভবিষ্যতে সকলকে ভাবিয়ে তুলবেই।' কথা প্রসঙ্গেই বলেছিলেন ঠিক, তবে 'কলকাতা ৭১' যে এভাবে আমাদের ভাবিয়ে তুলবে তা বোধহয় তিনিও কল্পনা করেননি। এবং এসে সবচেয়ে বেশি ভাবিয়েছে তাঁদেরই, যাঁরা সমালোচনার খড়্গ নিয়ে তাঁর শিল্পভাবনার মর্মমূলে বার বার আঘাত করেও ব্যর্থ হয়েছেন।

বিজন শেঠ
কলকাতা—৬।

॥ ২ ॥

অনেক আলোচনা ও সমালোচনায় মুখরিত কলকাতা ৭১। 'অমৃতে'ও সেই সম্বন্ধীয় কিছু লেখা প্রকাশ হয়েছে। সেইজন্য স্বভাবতই কিছু লিখতে ইচ্ছা করে। ধন্যবাদ জানাই—মৃণাল সেন সহ সমস্ত কলাকুশলীকে। মিথ্যার বোরখা দিয়ে আর কতকাল চলবে? দশকের পর দশক আমরা এগিয়ে এসেছি। বঞ্চনা-দারিদ্র্য-আর শোষণের পরিবর্তন কি কাম্য ভাবে হয়েছে? মৃণাল সেন নিভীকভাবে সোচ্চার হয়ে বলেছেন একথা। হয়ত রাষ্ট্রপতির পুরস্কার জুটবে না এ বইয়ের ভাগ্যে। 'সুবিবেচকের অভাবে (?) ছাড়পত্র পেয়ে বিদেশে ফলাও করে দেখানো হয়েছে বইটা' জনৈক মন্ত্রীর মন্তব্য। কিন্তু এ যে সর্বকালের সত্য। সৌন্দর্য রক্ষায় মিথ্যার আশ্রয়কে সত্যকারের শিল্প বলা যায় না। রঙিন স্বপ্ন আর তার পাশেই নিষ্ঠুর বাস্তবতা যেমন বক্তব্যকে পরিস্ফুট করতে প্রয়াস পায় তেমনি বিবেকহীন আজকের সমাজের কাছে মৃণাল সেনের (কায়েমী সম্প্রদায়ের পক্ষে) কিছু জিজ্ঞাস্যও সুপরিকল্পিতভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

অশ্বিনীকুমার মণ্ডল
কলকাতা—১২।

দেশেই ওঁদের সংস্থান করা হোক

কয়েকদিন আগে লন্ডন থেকে দেশে ফিরে আসা একজন ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ হলো। আলাপের সূত্র অবশ্যই আমার এক ডাক্তার বন্ধু। চিকিৎসক ভদ্রলোক ব্যবহারে যেমন অমায়িক, ডিগ্রীর দিক থেকেও তেমনি উঁচু দরের। ডবল এফ আর সি এস তিনি। লন্ডনের এক হাসপাতালে চাকরি করেন। বাবার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে দেশে এসেছেন। সঙ্গে তার রিটার্ন টিকিট। কাজকর্ম চুকলেই আবার বিদেশে। তাঁর নিজের ভাষায় স্বদেশে ফিরে যাবেন। কিন্তু বাবার শ্রাদ্ধশান্তি মিটে যাবার পরও তিনি বেশ কিছুদিন থেকে গেলেন। একদিন দেখা হতেই জানতে পারলাম যে, কলকাতাতেই তিনি চাকরির চেষ্টা করছেন। মোটামুটি মাইনের একটা কাজ পেলে আর বিদেশে যাবেন না। তাঁর কাছ থেকেই আরো জানতে পারলাম যে সে দেশে অর্থাৎ বিলেতে ভারতীয় ছাত্র যাঁরা ডাক্তারিতে উচ্চতর ডিগ্রির জন্য যান তাঁদের অসহায় অবস্থার কথা।

সেদেশে বেশির ভাগই যান জব-ভাউচার নিয়ে। ফলে সকলকেই চাকরি করতে হয় এবং তাঁদের পোস্টিং হয় সাধারণত লন্ডন থেকে বেশ দূরে অর্থাৎ সুদূর গ্রামাঞ্চলের কোন হাসপাতালে; হাসপাতালে কাজের চাপ এত বেশি যে তাঁরা ঠিক মতো পড়াশোনা করতে পারেন না। তাছাড়া মাইনে যা পান তাতেও চলে না। তাই আয়ের অন্য পথ দেখতে হয়। সকালে-বিকালে কোথাও হয়তো পার্টটাইম করেন। আবার কোন ডাক্তারের অধীনে থেকে 'লোকাল কলে' যেতে হয়। এমনিভাবে সারা দিনই তাঁরা কাজে ব্যস্ত থাকেন। যে জন্য যাওয়া সেই পরীক্ষায় পাশ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একবারে হয় না। কখনো কখনো আবার বছর বছরই অকৃতকার্য হন। এদিকে যাঁরা পাশ করে দেশে ফেরেন তাঁরাও উপযুক্ত চাকরি পান না। অথচ আমাদের দেশে ডাক্তারের যে প্রচণ্ড অভাব সেকথা তো অস্বীকার করা যায় না। একথা শুধু চিকিৎসক নয়, বিজ্ঞানীদের বেলায়ও খাটে। আমি আরো একজনকে জানি যিনি ৭০০।৮০০ টাকা মাইনের চাকরি পেলেও দেশে ফিরে আসতে উৎসুক।

আমাদের দেশের কৃতবিদ্য ডাক্তার, বিজ্ঞানী, অধ্যাপকদের এভাবে বিদেশে থাকতে বাধ্য না করে দেশে ফিরিয়ে আনার একটা সার্বিক উদ্যোগ যদি সরকার গ্রহণ করেন তাহলে কেমন হয়?

অপরাজিতা সেনগুপ্ত
কলকাতা—১৯।

মোহন রাকেশ প্রসঙ্গে

'অমৃত'-এর গত ২২ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বিবিধ সংবাদে' পরলোকগত হিন্দী নাট্যকার মোহন রাকেশের সম্বন্ধে পড়লাম। তাতে জানতে পারলাম শ্রীমোহন রাকেশের বিখ্যাত নাটক 'আধে আধুরে' কলকাতার মঞ্চে হিন্দী এবং ইংরেজীতে অভিনীত হয়েছে। আপনারা জানিয়েছেন এই নাটকের বাংলা অনুবাদও আছে, তবে তা নাকি এখনও মঞ্চস্থ হয়নি। আমি এ সম্বন্ধে আপনাদের জানাচ্ছি, এই নাটকটি গত ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭২ দিল্লীর অন্যতম খ্যাতনামা নাট্য সংস্থা 'যাযাবর গোষ্ঠী' দিল্লীস্থ ফাইন আর্টস হলে সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেছিলেন। আমি যতদূর জানি শ্রীমোহন রাকেশের জীবিত অবস্থায় এইটিই শেষ নাটক যা বাংলায় অভিনীত হয়েছে।

পিন্টু মিত্র
লক্ষ্মীবাঈ নগর, নতুন দিল্লী—১৩।

জীবন শেষ!

শেষ পর্যন্ত বিশ্বখ্যাত মার্কিনী পত্রিকা 'লাইফ' বন্ধ হয়ে গেল। ভাবতেও কেমন অবাক লাগছে! না, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না, বহুরঙা অজস্র চিত্রশোভিত এই কাগজটিকে আর আমরা দেখতে পাবো না।

একথা ঠিক, লাইফ অন্তত সেবক না এসকোয়ার ধাঁচের কাগজ ছিল না। এ ছিল আলাদা জাতের, একেবারে স্বতন্ত্র মানের। কে ভুলতে পারে, লাইফের সেই চোখ-জুড়োনো নানান রঙে ছাপা পাহাড়, সমুদ্র, জীবজন্তুর ছবিগুলি! হ্যাঁ, বহু ঐতিহাসিক ঘটনাকেও বিশ্ববাসীর সম্মুখে প্রথম তুলে ধরার কৃতিত্ব কখনো কখনো ছিল লাইফ পত্রিকার। ১৯৩৬ সালে প্রথম বেরোয় এই কাগজটি; দশ বছরের মধ্যেই এর প্রচার সংখ্যা আড়াই লাখ থেকে পৌঁছয় পঞ্চাশ লাখে। অবশ্য এসবই টেলিভিশন যুগের আগের কথা। আর টি ভি প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে 'লাইফ'এর কদর হল পড়তির দিকে, আয়ও হল নিম্নমুখী। টেলিভিশনের আক্রমণে শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু ঘটল। হায়, উজ্জ্বল লাইফ-এর শেষ নিঃশ্বাস।

পত্রলেখা গঙ্গোপাধ্যায়
কলকাতা-৩৩।

জীবাশ্মবিদ্যা ও প্যালিও ইঞ্জিনিয়ারিং

অয়স্কান্ত

পৃথিবীতে মানুষ এসেছে মাত্র ৫০ লক্ষ বছর আগে। 'মাত্র' বললাম এ-কারণে যে তার আগে প্রায় দু-শো কোটি বছর ধরে এই পৃথিবীতে কোনো-না-কোনো আকারে প্রাণের অস্তিত্ব ছিল। এবং এই সময়ের মধ্যে প্রাণের একটি বিবর্তনও ঘটে গিয়েছে। বিজ্ঞানীরা এখন প্রায় ছবি আঁকার মতো করে বলে দিতে পারেন কি-ভাবে আদিম সমুদ্রের জলে এককোষী একটি জীব থেকে প্রাণের যাত্রা শুরু, কোন পর্বে মেরুদণ্ডী, কোন পর্বে উভচর, কোন পর্বে স্থলচর, কোন পর্বে খেচর, কোন পর্বে সরীসৃপ, কোন পর্বে স্তন্যপায়ী ইত্যাদি। এখনো পর্যন্ত মানুষ হচ্ছে প্রাণের বিবর্তনে উচ্চতম প্রকাশ কিন্তু তাই বলে দু-শো কোটি বছরব্যাপী প্রাণের বিবর্তনের সঙ্গে অ-সম্পর্কিত নয়। যদি কেউ বলেন, আজ থেকে উনিশ কোটি বছর আগে ট্রিয়াসিক কালের ডাইনোসরদের সঙ্গে মানুষও এই পৃথিবীতে বিচরণ করেছে তাহলে কথাটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। তেমনি বলা চলে না যে আজ থেকে পঞ্চাশ কোটি বছর আগে ক্যামব্রিয়ান কালে ট্রাইলোবাইটদের সঙ্গে ডাইনোসরদেরও দেখা যেতে পারত। প্রাণের বিবর্তনে কোন সময়ে কোন জীবের উদ্ভব তা প্রায় ছকবাঁধা। পুরো ছকটি নিখুঁতভাবে জানা গিয়েছে, বিজ্ঞানীরা তা অবশ্য দাবি করেন না। কিন্তু তাই বলে এতটা অসম্পূর্ণও নয় যে অস্বীকার করা চলে। এবারে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে, এতটাই বা জানা গেল কি করে? কোনো মানুষ তো ডাইনোসর বা ট্রাইলোবাইটকে চাক্ষুষ দেখেনি, আজ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে মানুষের কোনো অস্তিত্বই ছিল না, তাহলে ডাইনোসর বা ট্রাইলোবাইট বা এ ধরনের আরো হাজারটা জীব সম্পর্কে মানুষকে কে খবর জানাল? লিখিত ইতিহাস পড়ে বড়োজোর গত পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাস জানা যাচ্ছে—কিন্তু তার আগের? সেই বিবরণ কোন পুঁথির পাতায় লেখা আছে? কি ভাবে? প্রাণের বিবর্তনের বিবরণ সম্পর্কে বলা যায়, বিজ্ঞানীরা তা উদ্ধার করেছেন ফসিলের পাঠ থেকে। অতীতের প্রাণীরা অনেক সময়েই তাদের অস্তিত্বের কিছু একটা নিদর্শন রেখে গিয়েছে—একটা হাড়, একটা দাঁত, পাথরের গায়ে অবয়বগত আকৃতির একটা ছাপ—তারই নাম ফসিল বা জীবাশ্ম। বিজ্ঞানীরা মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে এই সমস্ত ফসিল খুঁজে বার করেন এবং এই ফসিলের মধ্যেই খুঁজে পান পুরো জীবটির বিবরণ। ফসিল থেকে জীবের বিবরণ সংগ্রহ—বিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা হিসেবে তারই নাম প্যালিয়ন্টলজি বা জীবাশ্মবিদ্যা। এই বিদ্যার চর্চা যাঁরা করেন তাঁরা হচ্ছেন প্যালিয়ন্টলজিস্ট বা জীবাশ্ম-বিজ্ঞানী।

জীবাশ্মবিদ্যার শুরু, বলা চলে, আজ থেকে দেড়শো বছরেরও কিছু আগে। এক্ষেত্রে পথিকৃৎ হিসেবে যাঁর নাম স্মরণীয় তিনি হচ্ছেন ফরাসী বিজ্ঞানী জর্জ কুভিএ (১৭৬৯—১৮৩২)। বহু কীর্তির অধিকারী এই বিজ্ঞানীর একটিমাত্র কীর্তি উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে, জীবাশ্ম-বিজ্ঞানীরা কী আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেন।

ফরাসী বিপ্লবের সময়ে কুভিএর বয়স কুড়ি, অর্থাৎ পূর্ণ যুবক, তবুও তিনি এই দুনিয়া-কাঁপানো ঘটনা সম্পর্কে কিছুমাত্র আগ্রহ বোধ করেন নি, নরম্যাণ্ডির উপকূলে ঘুরে ঘুরে সামুদ্রিক জীবের নমুনা সংগ্রহ করতেন। নিজের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তিনি যে কতখানি নিবেদিত ছিলেন, শুধু এটুকু বোঝাবার জন্যেই এই ঘটনার উল্লেখ। তখনো পর্যন্ত এ ধারণা স্পষ্ট ছিল না যে, প্রাণের নানা রূপে প্রকাশের মধ্যে একটা নিয়ম আছে, একটা সম্পর্কের সূত্র। তবে এই ধারণা ছিল যে, পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদকে শ্রেণীবিভক্ত করা চলে। শ্রেণীবিভাগের একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন সুইডেনের বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনীয়াস। এই পদ্ধতিই এখনো পর্যন্ত অনুসৃত। শ্রেণীবিভাগের আসল কথাটি কী? বিভিন্ন প্রজাতির জীবের মধ্যে সাদৃশ্য আছে এবং এই সাদৃশ্য অনুসারে তাদের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। বিষয়টি ব্যাখ্যা করে লিনীয়াস যে বইটি লিখেছিলেন তার প্রকাশকাল ১৭৩৫ সাল। ডারউইনের 'অরিজিন অফ স্পিসিস' আরো একশো পঁচিশ বছর পরের ঘটনা। কুভিএর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে লিনীয়াসের এই বইটিই তাঁকে সঠিক পথে চলতে সাহায্য করেছিল। তারপরে ১৮০২ সালে, কুভিএ যখন ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামের শারীরবিদ্যার অধ্যাপক প্যারিসের জিপসাম খনি-অঞ্চলের কতকগুলো ফসিল তাঁর হাতে এসে যায়। ফসিল বলতে টুকরো টুকরো হাড় ও দাঁত। তখন তিনি উঠেপড়ে লাগলেন এই সামান্য হাড় ও দাঁত থেকে পুরো জীবটির মূর্তি খাড়া করতে। সে সময়ের পক্ষে প্রায় এক অসম্ভব প্রয়াস বলা চলে। দাঁত পাওয়া গিয়েছিল দু ধরনের 'পেষণ ও শ্ব'। পেষণ দাঁতগুলোর মধ্যে গরমিল নেই, কিন্তু শ্ব-দাঁতগুলোর কোনোটা

ডিপ্লোডোকাসের কঙ্কাল। এই জীবটি লম্বায় ছিল ৮৫ ফুট এবং তার ওজন আন্দাজ ছিল ৫০ টন।
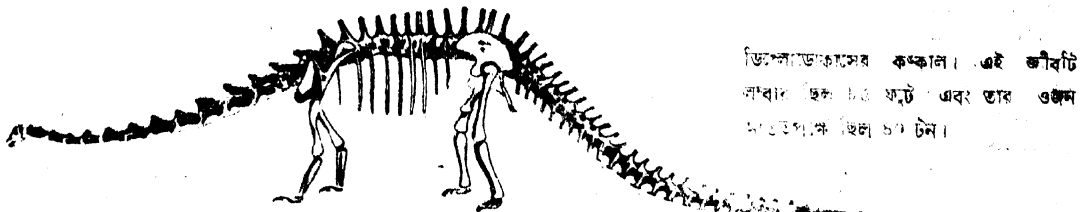
২।। ডিপ্লোডোকাসের শরীরের কাঠামোগত ডিজাইন। ওপরের দিকে আর্চ সেতু, নিচের দিকে সাসপেনশন সেতু। ৩।। মাছের শরীরের ক্রস-সেকশন বা প্রস্থচ্ছেদ। শিরদাঁড়া শরীরের মাঝখানে। অন্য তিনটি ছবি যথাক্রমে হিপোপটেমাসের, হাতির ও ডিপ্লোডোকাসের।
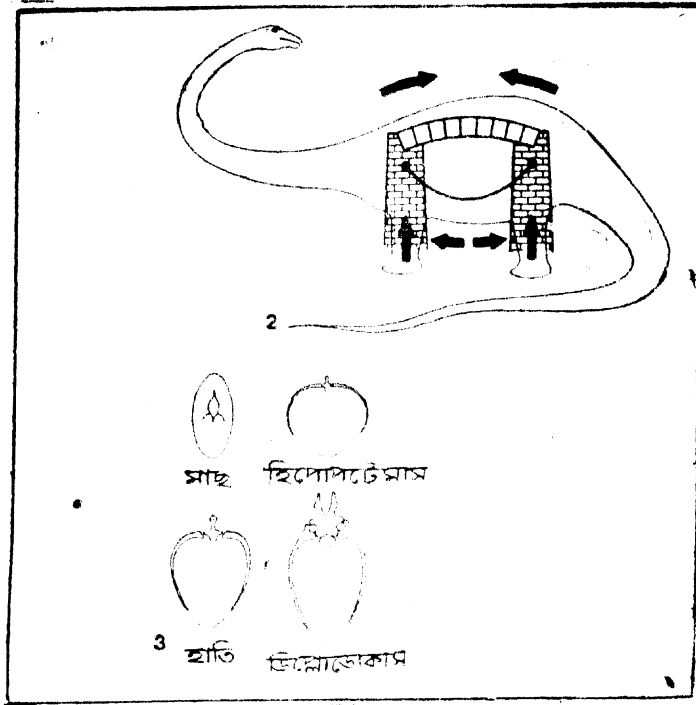
ছোট কোনোটা বড়ো। মাথার খুলির হাড়েও এই অমিল। কুভিএ লক্ষণ মিলিয়ে মিলিয়ে জোড় মেলাতে লাগলেন।

এবং শেষ পর্যন্ত অসাধ্যসাধন করলেন বলা চলে। সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন ঃ পেষণ-দাঁতগুলো একালের গণ্ডারের সঙ্গে তুলনীয় কোনো জীবের। পুরু চামড়াওলা তৃণভোজী জীব। দু ধরনের, কেননা পদাঁত ভিন্ন। একটির নাম দিলেন 'অ্যানোপ্লো-থেরিয়াম' (অস্ত্রহীন বন্য জন্তু), অপরটির 'প্যালিওথেরিয়াম' (প্রাচীন বন্য জন্তু)। শুধু এই সিদ্ধান্ত নয়, সূত্র জোড়া লাগিয়ে লাগিয়ে শেষ পর্যন্ত জন্তুটির সম্পূর্ণ আকৃতি কল্পনা করতে পারলেন এবং কাগজে-কলমে ছবি এঁকে দেখালেন। যে জীব পৃথিবী থেকে পাঁচ কোটি বছর আগে লোপ পেয়েছে সামান্য কয়েকটা হাড় ও দাঁত অবলম্বনে তার পুরো ছবি এমনভাবে কল্পনা করতে পারলেন যেন তিনি চোখের সামনে দেখছেন।

কিছুকালের মধ্যেই এমন প্রমাণ পাওয়া গেল যাতে মনে হতে পারত, তিনি প্রকৃতই চোখের সামনে দেখেছেন। কিছুকাল পরে সেই জিপসাম খনি-অঞ্চল থেকে পাওয়া গেল প্যালিওথেরিয়ামের আস্ত একটি কঙ্কাল। তখন দেখা গেল, সামান্য কিছু খুঁটিনাটির ব্যাপার বাদ দিলে কুভি-এর আঁকা ছবির এবং কঙ্কালের হুবহু মিল। প্যারিসে ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়মে আঁকা ছবি ও কঙ্কালটি পাশাপাশি রাখা আছে। দেখে মনে হয়, কঙ্কাল দেখেই ছবি আঁকা।

এই আশ্চর্য কাণ্ডটি ঘটিয়ে কুভি-এ একটি নতুন বিজ্ঞানের পত্তন করলেন ঃ জীবাশ্মবিদ্যা। তারপর থেকেই ফসিলের নিদর্শন থেকে জীবের সম্পূর্ণ মূর্তিটি খাড়া করার চেষ্টা চলছে। গত একশো বছরে এই বিশেষ বিজ্ঞানীদের কৃতিত্বও অনেকখানি। যেসব জীবের কোনো-না-কোনো ফসিল পাওয়া গিয়েছে তাদের মোটামুটি একটা চেহারা এখন আমরা কল্পনা করতে পারি। আরো একবার বলি, বিজ্ঞানের যে-শাখাটির চর্চায় এ-ব্যাপার ঘটেছে তার নাম প্যালিয়ন্টলজি বা জীবাশ্মবিদ্যা।

প্যালিয়-ইঞ্জিনীয়ারিং

ফসিলের নিদর্শন থেকে জীবের বিবরণ সংগ্রহ—এই হচ্ছে জীবাশ্মবিদ্যা। এই ফসিল হতে পারে একটা দাঁত বা একটা হাড় বা শরীরে একটা ছাপ মাত্র। এই সামান্য সূত্র থেকে সম্পূর্ণ মূর্তিটি কল্পনা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা সাধারণত তুলনামূলক শারীরবিদ্যার সাহায্য নিয়ে থাকেন। আর ফসিলের বয়স নির্ধারণ করতে গিয়ে পদার্থবিদ্যার ও রসায়নবিদ্যার, ভূবিদ্যার তো বটেই। কিন্তু সাম্প্রতিককালে আরো একটি বিদ্যার সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। তা হচ্ছে ইঞ্জিনীয়ারিং। বিজ্ঞানীরা দেখছেন, ইঞ্জিনীয়ারিং-এর সূত্রগুলো (যেমন, সেতু নির্মাণের সূত্র, বিমান নির্মাণের সূত্র ইত্যাদি) যদি জীবাশ্মবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রবর্তন করা যায় তাহলে ফসিল থেকে সংগৃহীত বিবরণের অনেক ফাঁক ভরাট হতে পারে। বলা হচ্ছে, এ এক নতুন বিজ্ঞান ঃ প্যালিয়-ইঞ্জিনীয়ারিং। এই বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে পৃথিবী থেকে লুপ্ত প্রাণীদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে আরো ভালভাবে জানা যেতে পারে। যেমন, দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরা যাক, আজ থেকে চোদ্দ কোটি বছর আগেকার কালের জীব টেরোড্যাকটিল টেরানোডন সম্পর্কে জানার চেষ্টা হচ্ছে। এই জীবটি আকাশে উড়ত, এত বৃহৎ আকারের উড়ন্ত জীব জগতে আর কখনো দেখা যায় নি। এই জীবটি সম্পর্কেই এতদিন পর্যন্ত যা-কিছু জানা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী জানা গিয়েছে প্যালিয়-ইঞ্জিনীয়ারিং-এর সাহায্য নিয়ে—শুধু তার চেহারা সম্পর্কে নয়, বেঁচে থাকার ধরন সম্পর্কেও।

জীবাশ্মবিজ্ঞানীরা এতদিন পর্যন্ত কি করে এসেছেন? ফসিলের বয়স নির্ধারণ করতেন ভূবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যার সাহায্যে, ফসিলের সংরক্ষণ রসায়নবিদ্যার সাহায্যে এবং ফসিল থেকে সম্পূর্ণ জীবটির মূর্তি কল্পনা করতে চেষ্টা করতেন জীবন্ত জীবের শারীরগত কাঠামোর তুলনামূলক বিচার থেকে। ইঞ্জিনীয়ারিংকে মোটামুটি উপেক্ষা করতেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এক্ষেত্রে ইঞ্জিনীয়ারিং-এর সাহায্য অনেক বেশী লাভজনক। কেননা প্রত্যেকটি জীবেরই রয়েছে একটি যান্ত্রিক কাঠামো আর সেই কাঠামোটি হওয়া চাই এমন যাতে তার ওপরে চাপানো ভার বহন করার ক্ষমতা থাকে ও শক্তপোক্ত হয়। প্রত্যেকটি জীবকেই নড়াচড়া করতে হয়, কাজেই মাংসপেশী হওয়া চাই যথেষ্ট বৃহৎ ও সঠিকভাবে স্থাপিত। একমাত্র ইঞ্জিনীয়ারিং-এর সাহায্য নিয়েই এই বিচার হতে পারে।

বিশেষ করে বড় মাপের জীবগুলোর ক্ষেত্রে ইঞ্জিনীয়ারিং-এর সাহায্য বিশেষ ফলপ্রসূ। যেমন, ৮৫ ফুট লম্বা শরীরবিশিষ্ট ডাইনোসর ডিপ্লোডোকাসের কথা ধরা যাক। এই জীবটির পুরো শরীরের ভার বহন করত চারটি পা। তাহলে সেই বিশাল শরীরটি মাঝখান দিয়ে ভেঙে যেত না কেন? ব্যাখ্যা হিসেবে বলা হত, ডিপ্লোডোকাস সাধারণত থাকত জলে এবং জলে থাকার দরুন তার শরীরের ওজন কমে যেত—ফলে পায়ের ওপরে বেশী ভার পড়ত না। কিন্তু ইঞ্জিনীয়ারিং-এর সূত্র প্রয়োগ করে ডিপ্লোডোকাসের শরীরের কাঠামোর দিকে তাকালে বোঝা যাবে, এটির গড়ন এমনই যে, ওপরের দিকটি আর্চ সেতুর মতো আর নীচের দিকটি সাসপেনসন সেতুর মতো। আর লম্বা গলা ও লেজ যেন শরীর থেকে উদ্গত ক্যান্টিলিভার। এক্ষেত্রে কমপ্রেশন মেম্বার হচ্ছে শিরদাঁড়া আর জীবিত অবস্থায় শিরদাঁড়ার উপরে যে পেশীবন্ধ ছিল সেটাই টেনশন মেম্বার। বোঝা যেখানে সবচেয়ে বেশী শিরদাঁড়ার শিরা সেখানে সবচেয়ে লম্বা।

টেরোড্যাক্টিল টেরানোডন, উড়ন্ত জীব হিসাবে এখনও পর্যন্ত আকারে সবচেয়ে বড়ো। ডানার বিস্তার ২৫ ফুট।

খুঁড়ে চলতে। নিরাপত্তামূলক সমস্ত হিসেবের বাইরে গিয়ে কাজটি তাঁরা করলেন। ফলে নভশ্চরদের অকসিজেনের ভাঁড়ার এতই কমে গিয়েছিল যে পরে ফেরার সময়ে যদি রোভার গাড়িটি স্টার্ট না নিত তাহলে আর তাঁদের জীবন্ত অবস্থায় ফিরতে হত না।

এখানেই সেই কথাটি ওঠে। যাঁরা বলেন, চাঁদের দেশে সশরীরে উপস্থিত হয়ে মানুষ যা কিছু করেছে সবই যন্ত্রের সাহায্যে করা যেত, তাঁরা এক্ষেত্রে বেকায়দায় পড়তেন। নির্দিষ্ট প্রোগ্রামের বাইরে যন্ত্রের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়। মানুষই পেরেছে প্রোগ্রামকে অগ্রাহ্য করে মাটি গহ্বরের জমি খুঁড়ে চলতে এবং চাঁদের মাটির সবচেয়ে আশ্চর্য আবিষ্কারটির সন্ধান নিয়ে আসতে।

এ থেকে বোঝা গেল এখনো চাঁদের মাটিতে অনেক কিছু অনুসন্ধান করার আছে। ছটি অভিযানের পরেও চাঁদ সম্পর্কে জানতে অনেক কিছু বাকি। সেজন্যে আরো অভিযান চাই। চাঁদে যাতায়াত করা ও চাঁদে দিন কয়েক কাটিয়ে আসা খুব একটা বিপজ্জনক ব্যাপার নয়, তাও বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু আমেরিকানরা এই শতাব্দীর মধ্যে চাঁদের দিকে আর পা বাড়াচ্ছে না, তাও ঠিক। আরো কয়েকটি অ্যাপোলো অভিযান হলে ভালোই হত। অন্ততপক্ষে চাঁদকে আরো একটু হাতের মুঠোয় পাওয়া যেত। কে জানে হয়তো এই শতাব্দীর মধ্যে চাঁদকে মনুষ্যবাসযোগ্য করে তোলার কাজও শুরু হয়ে যেতে পারত। কিছুই অসম্ভব নয়। ১৯৫৭ সালের প্রথম স্পুৎনিক থেকে ১৯৭২ সালের অ্যাপোলো-১৭ পর্যন্ত সময় পার হয়েছে মাত্র পনেরো বছর। এইটুকু সময়েই এতখানি। আগামী আঠাশ বছরে আরো কী হতে পারে, আরো কী হবে— তা কে বলতে পারে। চাঁদে যাতায়াত যে এমন নির্বিঘ্নে ও এমন নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হতে পারে, অ্যাপোলো-১৭-র আগে তাও কি ভাবা গিয়েছিল। —অমলকান্তি

কৃষিদরদী রাজেশ্বর দাশগুপ্ত

ঊনবিংশ শতাব্দী আমাদের বাংলাদেশের পক্ষে একটা খুবই বিস্ময়কর যুগ। জ্ঞানের সংগে কর্মের নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপন করে রামমোহন যে যুগের সূচনা করেন সেই যুগে অসাধারণ সব মনীষীরা, যেমন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দ—একের পর এক এসে বাঙালীর মানসকে সর্ব দিক থেকে উদ্ভাসিত করেন।

এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে পূর্ববাংলার ঢাকা বিক্রমপুর জেলায় এক বিত্তশালী বৈদ্য পরিবারে রাজেশ্বর দাশগুপ্ত মহাশয়ের জন্ম। পিতার মৃত্যুর পর তাঁদের সাংসারিক সচ্ছলতা হ্রাস পায় এবং কষ্টের ভিতর দিয়েই তাঁদের দিন কাটে। রাজেশ্বর দাশগুপ্ত শিবপুরে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে কৃষি-বিজ্ঞান বিভাগে অধ্যয়ন করেন ও পরে নানা স্থানে কাজ করার পর গভর্নমেন্টের কৃষি বিভাগে নিযুক্ত হন। লর্ড মেয়োর সময় থেকে গভর্নমেন্টের কৃষিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হলেও আমাদের দেশের কৃষকেরা যে কৃষি-বিজ্ঞান আয়ত্ত করে কৃষির উন্নতি সাধন করবে এ বিশ্বাস বিদেশী গভর্নমেন্টের আদবেই ছিল না।

কৃষিবিজ্ঞানী রাজেশ্বর দাশগুপ্ত মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে বাংলাদেশের কৃষকদের ঠিক মতো শিক্ষা দিতে পারলে তারা বৈজ্ঞানিক কৃষিপ্রণালী আয়ত্ত করতে পারবে। তিনিই সর্বপ্রথম ডেমনস্ট্রেটরের পদ সৃষ্টি করে চাষীদের হাতে-কলমে বৈজ্ঞানিক কৃষি-পদ্ধতি শেখাবার ব্যবস্থা করেন। উৎকৃষ্ট বীজভাণ্ডার স্থাপন, কৃষি প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা, চুঁচুড়ায় কৃষি-বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি কৃষি সংক্রান্ত নানা প্রতিষ্ঠান তিনি গড়ে তোলেন। বাংলা ভাষায় কৃষিবিভাগ সম্বন্ধে কোনও বই ছিল না। তিনিই প্রথম দুই খণ্ডে 'কৃষি-বিজ্ঞান' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। উদ্ভিদ সম্বন্ধীয় পারিভাষিক শব্দগুলির স্রষ্টা রাজেশ্বর দাশগুপ্ত। এ ছাড়াও তিনি তাঁর কৃষি-বিজ্ঞান বইটিতে নানা রকমের দেশী ও বিদেশী সবজী ও ফলের চাষ সম্বন্ধে ও কি করে জমি প্রস্তুত করতে হয় ও সার প্রয়োগ করতে হয় সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি বুঝেছিলেন যে আমাদের এই কৃষিপ্রধান দেশে চাষের উন্নতি না হলে দেশের জনসাধারণের কখনও কল্যাণ সাধিত হতে পারে না। বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতিরেকে যে আমাদের দেশে কৃষির উন্নতি সম্ভব নয় সেটা তিনি খুবে ভালো করে জানতেন, কিন্তু দেশের অবস্থার সঙ্গে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলিকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। ছোট ছোট ক্ষেতে বিভক্ত কৃষি জমির পক্ষে ট্রাকটার দিয়ে চাষ যে সম্ভব নয় সেটা তিনি বুঝেছিলেন ও সেই কারণে একটি হাল্কা ধরনের লাঙ্গল তৈরী করেছিলেন। শুধু বাংলাদেশে নয় সারা ভারতবর্ষে তাঁর মতো কৃষক-দরদী কৃষি-বিজ্ঞানী আর একজনও ছিলো না তাঁর সময়।

গভর্নমেন্টের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি নিজে গ্রামে গ্রামে ঘুরে চাষীদের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশে তাদের উন্নতির সন্ধানে অশান্ত চেষ্টা করেছিলেন।

১৯২৬ সালে যখন রয়াল কমিশন অন এগ্রিকালচার ভারতবর্ষের কৃষি অবস্থা তদন্ত করবার জন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন গভর্নমেন্ট তাঁকেই সেই কমিশনের লিয়েঁজো অফিসার নিযুক্ত করেন। কঠিন পরিশ্রমে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে যায় ও ১৯২৬ সালে ২২ নভেম্বর তারিখে মাত্র ৪৮ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। —সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সম্মোহন বৈচিত্র্য

নন্দদুলাল পাল

সম্মোহন কথাটা সবাসরি শুনলে যেন মনে হয় এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে মারণ একটা পদ্ধতি। কপালকুণ্ডলার নবকুমারকে স্মরণে পড়ে। কিন্তু ব্যাপারটা সতি তাই? একটু তলিয়ে দেখলে যে মানুষ মনঃস্থ বুদ্ধির জোরের বড়াই করে থাকেন তাঁরা কি সম্মোহিত অবস্থায় থাকলেও পড়েন নি বলে বুক বাজিয়ে বলতে পারেন?

সম্মোহনের সঙ্গে এদেশের একটা জায়গার নাম বেশ জড়িয়ে আছে। সে স্থানটি কামরূপ-কামাখ্যা বলে খ্যাত। সেখানে গিয়ে খুব আত্মশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিও নিজস্ব সব বিচার-বিবেচনা শক্তি খুইয়ে বসতেন। লোকে একদা বলতো—ওখানে গেলে মানুষ ভেড়া বনে যায়।

সম্মোহনের ক্ষমতার সঙ্গে পুরুষের চেয়ে মহিলাদের নাম বেশী জড়িত। যাকে বলে মোহিনীর মায়া। চলতি কথায় একেও ‘ডাইনীর খপ্পর’।

এই সম্মোহনকে উইচক্র্যাফট ও শয়তান উপাসনা ভেবে নিয়ে তথাকথিত প্রগতির উপাসকদের পাহারাদারীর সময়ে অনেক হামলা নির্যাতনও চলেছে। কসুর কম কিছুতে নেই। কোনও ঘটনার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম না হলেই সেটাকে স্রেফ বুজরুকি বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা চিরকাল বিজ্ঞান ও যুক্তির উপাসকদের কাছেও কম পাওয়া যায়নি।

তবে এটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করে পরখ করে দেখার চেষ্টাও কম হয়নি। ১৮৮২ খৃঃ খাস লন্ডনে গড়ে ওঠে ‘সোসাইটি ফর সাইকিক্যাল রিসার্চ’। সাইকি কথাটা আত্মা বা মন সংক্রান্ত ব্যাপারকে বোঝাবার জন্যেই ব্যবহার হয়ে থাকে। প্যারিসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইন্টারন্যাশনাল মেটাসাইকিক্যাল ইনস্টিটিউট। একজনের মনের ওপর অপরের ইচ্ছাশক্তির প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা ও তার কার্যকারিতা নিয়ে এ’রা অনেক কথা ভেবেছেন ও বলেছেন। এটাকেই বলে হিপ-নটিজম। অপরাপর ইজমের মত বাজারে এরও একটা মরশুম একসময় এসেছিল। আগে একেই বলা হত মাসমেরিজম্। অস্ট্রিয়ার খ্যাতনামা চিকিৎসক ফ্রাঞ্জ অ্যান্টো মেসমারের নাম থেকে ঐ নাম প্রচলিত। মেসমার ভিক্টোরিয়ার বড় চিকিৎসক ছিলেন। অপরাপর রোগেও তিনি হাত লাগাতেন। তাঁর চিকিৎসার মাধ্যম ছিল এই সম্মোহন শক্তি। মেসমারের মতে তাঁর শরীর থেকে একটা শক্তি রোগীর শরীরে গিয়ে প্রভাব বিস্তার করে রোগ সারাত। তিনি তাকে বলতেন ‘এ্যানিম্যাল ম্যাগনেটিজম’. তিনি অস্ট্রিয়া ও প্যারিসে পসার জমিয়ে তুললেও তাঁর গোটা চিকিৎসা বিজ্ঞানকে বুজরুকি বলে হৈচৈ সুরু হয়ে যায়। সরকার তাঁর ঐ ধরনের চিকিৎসা বন্ধ করে দেন। ১৮১৫ খৃঃ পর্যন্ত তিনি বেঁচে ছিলেন।

মেসমার সাহেবের নাম থেকে এই পদ্ধতিকে বিযুক্ত করেন জেমস ব্রেড সাহেব। হিপনটিজম কথাটার প্রচলনের সুরু তখন থেকেই। উনিশ শতক থেকে বিশ শতকের চতুর্থ দশক পর্যন্ত এর বাজার খুব জম-জমাট ছিল।

ডঃ ইউজিন ওস্টির মেটাসাইকিক ইন্টারন্যাশনালের একজন বড় পান্ডা ছিলেন। তিনি সুপার নরম্যাল ফ্যাকলটিজ ইন ম্যান’ নামে একখানা বই লেখেন। এই বইটাতে হিপনটাইজড অবস্থার বিশ্লেষণের সঙ্গে সহ উদাহরণ দিয়ে এই পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর স্থাপনের একটা চেষ্টা চালানো হয়েছে। সাইকোমেট্রির মূল ব্যাপারটা ঠিক স্বাভাবিক নয়। কাজেই অস্বাভাবিক অবস্থা ও ব্যবহার ব্যাখ্যা মানুষের যুক্তিভিত্তিক মানসকে দখল করে উঠতে সমর্থ হয় না।

টাইরেল লিখেছিলেন ‘দি পারসোন্যা-লিটি অব ম্যান’। এতেও যে সব ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে তা লৌকিক জগতে খুব হামেশা পরখ করার সুযোগ কম। কাজেই অলৌকিক ঘটনা বলে ব্যাপারগুলোর ইতি করে অনেকে ভক্তি ও বিস্ময়ে গদগদভাব হতে চায়।

সম্মোহিত বা হিপনটাইজ করে নানা-রকম মানসিক ও শারীরিক ব্যাধি নিরাময় করার ঘটনা খুব বিরল নয়। আবার নানা-রকম প্রবণতা থেকেও হিপনটিজমের সাহায্যে মুক্তি পেতে দেখা গেছে।

কিন্তু আর একটা দিকও আছে। অপেক্ষাকৃত দুর্বল মানসিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে হিপনটাইজ করে অপরাধমূলক কাজও করানো সম্ভব।

হিপনটিজমের গোড়ার কথা হল একজনের ইচ্ছাশক্তিকে অপরের ওপর প্রয়োগ। আর শেষের কথা হল হিপনটিক ট্রান্স সম্মোহিত ব্যক্তি নিজে কি-কি করেছেন সে কথা পরে তাঁর মনে থাকে না। স্বপ্নে অনেক সময় স্মরণে আসে। হিপনটাইজড হবার সময়ে যে কথা মনে ধরিয়ে দেওয়া হয়, তার কথা ঘোর কেটে গেলে ভুলে যায় বটে, কিন্তু নির্ধারিত সময়ে হিপনটিক সাজেসন মত নির্দেশ ঠিক পালন করে যায়।

এরই সঙ্গে যাঁরা মৃত্যুর পরও আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী তাঁদের পরলোকগত আত্মার সঙ্গে সরা-সরি সংযোগ স্থাপনের ব্যাপারটাও এসে পড়ে। স্পিরিচুয়ালিস্টদের আত্মার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য যে বৈঠক তাকে বাংলায় বলে প্রেতচক্র। অনেক সময় এর জন্য মাধ্যম বা মিডিয়াম গ্রহণ করা হয়। মেয়েরাই ভাল মিডিয়াম। ছেলেরাও যে না হয় এমন নয়।

এছাড়া আছে প্ল্যানচেট। কিন্তু সব চক্রেতেই এক মতাবলম্বী বহুজনের সমা-বেশ: একই উদ্দেশ্যে মনোনিবেশ প্রয়োজন। তাতে দেশী কথায় যেমন ‘ভর’ হয় সেরকম অবস্থার মানুষ পড়ে। আর টেবিল ব্যবহার করলে

করে প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকে। মানুষ মিডিয়াম শুধু কথাই বলে না পরন্তু অনেক সময় লিখেও জবাব দেয়। হাতের লেখার ধরণও অনেক সময় পাল্টে যায়।

মিডিয়ামদের ব্যবহার হতে হতে এর বিশ্বাসী মহলে খুব কদর বাড়তো। 'দি গ্রাফিক' পত্রিকাতে ১৯৩১ খৃঃ ১০ অক্টোবর সিলভিয়া টমসন সাহেব এক মহিলার বর্ণনা দিয়েছেন তার জুতো-মোজারই শুধু বিশেষত্ব ছিল না—তিনি বাঘের ছাল পরতেন এবং চুলের একটা রঙীন ওড়না থাকতো। কাল সাটিনের ঢাকনা দেওয়া গদীতে বসতেন। এঁর কাছে সেই যুগের জাঁদরেল রাষ্ট্র-নায়কদের স্বাক্ষরিত তসবীরও ছিল। কিন্তু লেখক তাঁকে একেবারে ডুবিয়ে ছেড়েছেন। তার ভবিষ্যদ্বাণী একটুও ফলেনি।

হাতের গঠন ও চেটোর ওপরকার রেখা নিয়েও এই লাইনের লোকেদের বাগ বিতণ্ডার রসালো জবাব ঐ প্রবন্ধে রয়েছে। দেহের গঠনের ধরণ দেখে মানসিক শক্তির ও মানসের ক্ষমতার কথাও এঁরা ব্যাখ্যা করেছেন। চেহারা ও হাতের গঠন মিলিয়ে ব্যক্তির ওপর গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব এবং তার দ্বারা ব্যক্তির জীবন সম্পর্কে তাঁরা অনেক ভবিষ্যৎ বাণী করে থাকেন।

এইসব ভবিষ্যদ্বক্তা ও মিডিয়ামরা অনেক সময় ছল-চাতুরী চালিয়ে থাকেন। যাদুবিদ্যায় যাদের জ্ঞান আছে তারা এঁদের ছল-চাতুরি অনেক সময় ধরে ফেলেন। ফকিরারীর কেরামতি এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। তাই সেইদিকে যাব না।

জাগতিক দৃষ্টিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না এমন আর একটি ব্যাপার হল ঘুম। ঘুমিয়ে থেকে পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী, সচেতন, অবচেতন-অচেতন মনের বাসনা, চিন্তা, পরিকল্পনা ও ফেলে আসা দিন এবং হালফিলের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের মনের পটে ছবির খেলা দেখে। ঘুমের মধ্যে পাঁচটা ইন্দ্রিয় দিয়ে যে সমস্ত ক্রিয়া-প্রক্রিয়া চলে তারও ছবি চোখে ভাসে।

ঘটনার সঙ্গে একই সময়ে সমঘটনার রেখা মনে চমকে ওঠার কয়েকটি ঘটনা কিছু বইতে আছে। এমন কি উপস্থিতির ঘটনাও উল্লিখিত হয়েছে।

স্বপ্নের মাঝে মানুষের আত্মা সূক্ষ্ম শরীরে অপর জায়গায় ঘুরে আসতে পারে এবং অপর জীবিত কিম্বা মৃত মানুষের আত্মা বা মনের সঙ্গে সংযোগ করতে পারে বলে বলা হয়ে থাকে।

ভুতুড়ে ব্যাপারটাকে এ প্রসঙ্গে ধরা অন্যায় হবে না। ঘরের মধ্যে হঠাৎ ঠাণ্ডা হাওয়া, দমকা বাতাস, গানের সুর ইত্যাদি অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। অতৃপ্ত বাসনা, প্রেম প্রভৃতিকে এক্ষেত্রে ভিত্তি হিসেবে তুলে ধরা হয়।

মনস্তত্ত্ব ও শারীরতত্ত্বের দিক থেকে বা বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তির ভিত্তিতে এসব ব্যাপারের অসম্ভাব্যতা যাই হোক প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে এইগুলি এক নতুন বিস্ময়ের দ্বার উন্মোচিত করে দিয়েছে।

দূষিত পরিবেশ

অলোক সেন

বিজ্ঞানের ক্রমিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মানব সমাজও এক ক্রমিক উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। এ উন্নতি নিঃসন্দেহে আমাদের গর্বের কারণ হতে পারে। দেশে নিত্য নতুন কলকারখানা স্থাপন, যানবাহনের যান্ত্রিকীকরণ, কৃষির উন্নতি, চিকিৎসা-শাস্ত্রে নিত্য নতুন আবিষ্কার এ সবই আমাদের মঙ্গলের দিশারী। কিন্তু সভ্যতার এ অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিচ্ছে নানা সমস্যা। পরিবেশ হয়ে পড়ছে কলুষিত। সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর সমস্ত জীবের স্বাস্থ্যরক্ষা ও জীবন ধারণকে শঙ্কিত করে তুলেছে। এ নিয়ে চিন্তাও তাই বিশ্বব্যাপী। পশ্চিম বাংলাতেও দেশের স্বাস্থ্যরক্ষা ও আবহাওয়া বিশুদ্ধ রাখার জন্য দুটি ক্ষমতাবান কমিটি গঠন করা হয়েছে—কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের যৌথ ব্যবস্থাপনায়।

আবহাওয়া দূষিতকরণ কথাটি এখন বহু মুখে শোনা গেলেও প্রকৃত ব্যাপারটি সম্পর্কে সাধারণ মানুষ ঠিক কতখানি ওয়াকিবহাল একটু হিসেব করে দেখা যাক। আমরা সাধারণত ধরে নিই অতীতের সুন্দর স্বাস্থ্যকর এবং উপভোগ্য পৃথিবী আজকের মতো দূষিত ছিল না—বিষাক্ত ছিল না সেদিনের নিঃশ্বাস-বায়ু। নির্মল বিশুদ্ধ আবহাওয়া ছিল উদ্ভিদ ও প্রাণীর বাসের পক্ষে উপযোগী ও স্বাস্থ্যকর। বাড়ীর বা পাড়ার বহু বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এ ব্যাপারে একেবারে নিঃসংশয় এবং অতীতের সেই স্নেহময় দিনগুলির জন্য তাঁরা অন্তরে অন্তরে যথেষ্ট কাতর। কিন্তু সত্য অন্যরূপ।

মানব সভ্যতার সুদূর অতীতেও মানুষ প্রকৃতিকে দূষিত করেছে নানাভাবে, বিষাক্ত করেছে জল-বাতাস-মাটিকে। এমন কি মানুষ এ ধরাধামে আসার বহু আগেও পৃথিবী কলুষমুক্ত ছিল না। বারে বারে এই জল, এই মাটি দূষিত হয়েছে নানা কারণে। তবে সেদিনের থেকে আজ এর মাত্রা বেড়েছে নানা-ভাবে ও বহু গুণে—আর আগামী দিনগুলিতে মানবসভ্যতা ও কলুষের পরিমাণকে এক ভয়াবহ আকারে বাড়িয়ে তুলবে। সেদিন প্রকৃতির প্রতিশোধ ফিরে আসবে প্রাণী-উদ্ভিদ সমস্ত জীবিত সত্তার উপরে। বিজ্ঞানীরা তাই চিন্তিত বেশ কিছু দিন আগে থেকে। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জনমতকে জাগিয়ে তোলার জন্য তাঁরা নানা-ভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ইদানীং শুভ লক্ষণ দেখা দিয়েছে। নানা দেশের নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে আগ্রহী হয়েছেন। রাষ্ট্রসংঘও বিশেষভাবে ভাবিত ও সক্রিয়। কিছু দিন আগে 'স্টকহোলমে' 'ইউনেসকো' আয়োজিত আলোচনা সভায় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও পরিবেশ বিশুদ্ধ রাখার দিকে বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন।

সৃষ্টির আদিকাল থেকেই প্রকৃতি তার নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে সামঞ্জস্য বিধান করে চলেছিল উদ্ভিদ প্রাণী জল হাওয়া মৃত্তিকা প্রভৃতির মধ্যে। আর এ আত্মনিয়ন্ত্রণের পিছনে ছিল খাদ্যশৃঙ্খল। খাদ্যখাদক সম্পর্ক এদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করেছে। কিন্তু সভ্য মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে নিজের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিয়েছে বহুক্ষেত্রে উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের বিনাশসাধন করে।

উদ্ভিদ শর্করা জাতীয় খাদ্য উৎপন্ন করে যা উদ্ভিদভোজী প্রাণীকে আহার যোগায়। প্রাণীর দেহ ও দেহজাত প্রোটিন চর্বি ইত্যাদি মাংসাশী বা মিশ্র আহারে অভ্যস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদকে বাঁচিয়ে রাখে। প্রকৃতির এ বিন্যাস-ব্যবস্থাকে মানবসভ্যতা বানচাল করেছে নানাভাবে—ফল হয়েছে মারাত্মক। মানুষের বসতিকে নির্বিঘ্ন করার জন্য কোথাও বা সাপ মারতে বেজী আমদানী করা হয়েছে। কিন্তু দেখা গিয়েছে সাপ নির্বংশ হওয়ায় ইঁদুরের উপদ্রব বেড়েছে বহু গুণে। লক্ষ লক্ষ টন খাদ্যশস্য ইঁদুরের পেটে গিয়ে মানুষের আহার্যে ঘাটতি সৃষ্টি করেছে। ফসল নষ্ট করে বলে পাখি তাড়াতে গিয়ে পোকার উপদ্রব বেড়েছে—রাসায়নিক প্রয়োগে পোকা ধ্বংস করতে গিয়ে মাটিতে জমেছে নানা বিষাক্ত উপাদান যা কৃষকের বন্ধু বহু বিচিত্র ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাককে ধ্বংস করেছে—মাটির যৌগিক গঠন পাল্টে গিয়ে জলধারণ ক্ষমতা কমে গেছে। উর্বরতা বাড়াতে ইচ্ছামতো সার প্রয়োগে এ অবস্থাটিকে আরো ঘোরালো করে তুলেছে। একই জমিতে বার বার লাভজনক ফসল বুনে জমিকে অকাল-বন্ধ্যাত্বে বন্দী করা হয়েছে। দীর্ঘ দিনের বন্ধ্যাত্ব ও জলধারণ ক্ষমতার অভাব, বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণে ঘাটতি এনেছে। এখানে-সেখানে বন কেটে ফেলে এ অবস্থাকে আরো ঘনীভূত করেছে। তাই জলভরা মেঘ মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেলেও উপযুক্ত আর্দ্রতার অভাবে তার বুক থেকে পারে না জলধারা ছিনিয়ে নিতে। লক্ষ লক্ষ একর জমি খরার কবলে পড়ে কোটি কোটি লোকের জীবনযাত্রাকে দুর্বিষহ করে তোলে।

দূরদর্শিতার অভাব অনেক সময় আমাদের জীবনযাত্রাকে মারাত্মক বিপাকে নিয়ে যায়। পাকিস্তানের সিন্ধু উপত্যকায় খাল কেটে কৃত্রিমভাবে সেচের ব্যবস্থা করা হয় প্রায় আড়াই কোটি একর জমিতে।

কিন্তু উপযুক্ত নিকাশী ব্যবস্থার অভাবে প্রায় এক কোটি একর নীচু জমি জলবন্দী হয়ে যায় বেশ কিছু দিনের জন্য। ফলে মাটির নীচে জমে থাকা লবণ, জলে গ'লে উঠে আসে জমির ওপরে—ফসল ও জমিকে চিরকালের জন্য নষ্ট করে দেয়। আর এর পরিমাণ নিতান্ত কম না—প্রতি পাঁচ মিনিটের হিসাবে প্রায় এক একর জমি। মাটির গভীর গর্ভ থেকে তুলে আনা খনিজ সম্পদ মানব সভ্যতার চাকা ঘুরিয়েছে। পৃথিবীর মানুষ আজ অনেকাংশেই খনিজ-নির্ভর। কিন্তু প্রকৃতির শক্ত ভিতকে আলগা করে দেওয়ায় শহর নগর বসে গেছে, কৃষি ভূমি বিনষ্ট হয়েছে, নদীর খাত পাল্টে গিয়ে খরা অথবা বন্যা এনেছে। কিম্বা এখানে সেখানে হঠাৎ হঠাৎ ভূমিকম্পের দোলায় শত-সহস্র প্রাণের বলি হয়েছে। আর এরই সঙ্গে রয়েছে বড় বড় বাঁধ প্রকল্পের প্রতিক্রিয়া। কোনো জলাধারে হঠাৎ জমিয়ে তোলা কোটি কোটি ঘনফুট জলের অতিরিক্ত চাপ স্থানীয় ভূ-পৃষ্ঠের বহন ক্ষমতা বানচাল করে দেয়। দক্ষিণ ভারতের কয়না ভূমিকম্পের পিছনে ছিল এমনি একটি কারণ। মানুষ এমনি করে ধরিত্রীকে দুর্বল ও সশঙ্ক করে তুলেছে।

এক কথায় প্রকৃতির সঙ্গে আমরা যেভাবে ব্যবহার করবো, প্রকৃতি ঠিক সেই অনুপাতে আমাদের ফিরিয়ে দেবে তার আচরণ। বড় বড় শহরের জমিকে ইঁট-পাথরে বাঁধিয়ে ফেলে এক দিকে সভ্যতার বিস্তার ঘটানো হচ্ছে। লোকসংখ্যা বাড়ছে। গাছপালা জলাশয় ইত্যাদি কমে যাচ্ছে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ওই অঞ্চলে জলের চাহিদাও বাড়ছে। গাছপালা কমলে এবং একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে ইঁট-পাথরে বাঁধিয়ে দিলে সেখানকার তাপধারণ ও বিকিরণের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় একদিকে স্বাভাবিক বৃষ্টির মাত্রা কমে যাচ্ছে, অন্যদিকে মাটির বাঁধানো অঞ্চলে মাটির তলায় জল যেতে পারছে না। ফলে ভূতলে জলের পরিমাণে ঘাটতি হচ্ছে। বছরের পর বছর এভাবে জলের সঞ্চয় অপেক্ষা খরচের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায়, জলের স্তরগুলি শূন্য হয়ে পড়ছে। মাটির ওপরকার বড় বড় অট্টালিকা প্রভৃতির প্রবল চাপে ঐ শূন্য স্তরগুলি ক্রমশ ভরাট হয়ে যাবে। তখন দেখা যাবে সমগ্র শহরটি বসে যাচ্ছে। এর ফল অত্যন্ত মারাত্মক হতে পারে। কেননা বসে যাওয়ার পরিমাণ সব জায়গায় সমান না হওয়ায় রাস্তাঘাট বড় বড় প্রাসাদ সেতু ইত্যাদির প্রচন্ড ক্ষতি হওয়াই স্বাভাবিক। ওদিকে তীব্র জলাভাবও সমগ্র শহরটিকে ক্রমশ গ্রাস করবে। কালের ব্যবধানে যা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানী মহলে তাই প্রশ্ন জেগেছে : কলকাতা কি সেদিকেই এগিয়ে চলেছে? প্রশ্ন অবশ্য কেবল কলকাতাকে নিয়ে নয়—পৃথিবীর সমস্ত বড় শহরগুলিই আজ বিজ্ঞানীদের ভাবিয়ে তুলেছে।

পরিবেশ-এর আর একটি অঙ্গ হল বায়ুমণ্ডল। বায়ুমণ্ডল কলুষিত হয় কী ভাবে? এর নানাদিক রয়েছে। কলকারখানা, মোটর-বাস ইত্যাদির অর্ধদগ্ধ কার্বন কণিকা, জল তেল এবং নানা ধরনের বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের বাষ্প, ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চলে বহু মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসজাত কার্বন ডাইঅকসাইড প্রভৃতি গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি, আবর্জনা এবং পরিত্যক্ত নানা পদার্থের পচনজনিত বিষাক্ত নানা গ্যাসের উৎপত্তি। এছাড়া তেজস্ক্রিয় ভাসমান পদার্থের সমাবেশও বায়ুমণ্ডলকে কলুষিত করছে। নির্মল নিঃশ্বাস-বায়ু থেকে আমাদের প্রতিনিয়ত বঞ্চিত করছে।

শহর সভ্যতার দুটি বিষ বাণ হল শব্দ ও আলো। দিন-রাতের অবিশ্রান্ত বিরক্তিকর শব্দের ফল অত্যন্ত মারাত্মক। পরীক্ষা করে দেখা গেছে মানুষের স্নায়ু-দুর্বলতাজনিত রোগের প্রাদুর্ভাব গ্রাম অপেক্ষা শহরে বহু গুণে বেশী। অবিরাম শব্দের প্রবাহ মানুষকে এ রোগের মুখে ক্রমাগত ঠেলে দিচ্ছে। বিশেষত যে শহরের মধ্যে বা খুব কাছে রয়েছে বিমানবন্দর, সেখানে এর ফল অত্যন্ত মারাত্মক। বধিরতা, নিদ্রাহীনতা, মস্তিষ্ক বিকৃতি, তীব্র আকারের মাথাধরা, অস্থিরতা প্রভৃতি রোগের পিছনে অবিরাম শব্দ প্রবাহের যোগাযোগ অপরিসীম। পৃথিবীর বহু শহরে শব্দ রোধের নানা চেষ্টা চলেছে। যানবাহন ও অন্যান্য শব্দ সৃষ্টিকারী যন্ত্রে 'শব্দ নিরোধক' লাগানো হচ্ছে। বিমানবন্দরে 'শব্দ শোষক দেওয়াল' গেঁথে শহরবাসীকে বাঁচানোর চেষ্টা চলেছে। শহরের বাড়ী ঘরেও শব্দ শোষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কিন্তু ক্রমবর্ধমান শব্দের জোয়ার কি কোনোদিন মানুষের এ শাসনে বন্দীত্ব গ্রহণ করবে?

পৃথিবীর বড় বড় শহরের আলোক ব্যবস্থাও পরিবেশকে নির্মল থাকতে দিচ্ছে না। নানা রঙের নানা উজ্জ্বলতার আলো প্রতিফলিত হয়ে কেবল শহর বুকেই নয়, বায়ুমণ্ডলের বহু ঊর্ধস্তরেও প্রভাব বিস্তার করে। আবার বায়ুমণ্ডলে ভাসমান ধূলিকণায় পুনঃ প্রতিফলিত হয়ে বায়ুমণ্ডলে যে আলো-আঁধারির সৃষ্টি করে তাতে গগনচুম্বি প্রাসাদের সুউচ্চ কক্ষেও সুখনিদ্রায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। জীবজন্তু কীটপতঙ্গ এমন কি গাছপালাও এর প্রভাবে তাদের জীবনযাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। সমুদ্রে নিঃসঙ্গ বাতিঘরগুলিতে প্রতি বছরে হাজার হাজার নিশাচর পাখি প্রাণ দিচ্ছে—আলোর হাতছানি এড়াতে না পেরে। নগর উপকণ্ঠের মানমন্দিরগুলিও এ আলোর জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে নানাভাবে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাই গভীর রাতে উজ্জ্বল বাতিগুলিকে নিভিয়ে দিতে বলেছেন। আলোর এ দৌরাত্ম্য এড়াতে না পারলে একদিন নগর সভ্যতার বুকে নানা অনর্থও নেমে আসবে। বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকরা তাই বিপদ সংকেত জানাচ্ছেন বহু দিন থেকে।

কিন্তু মনে রাখা দরকার কোনো একটি স্থানের দূষিতকরণের ব্যাপারে দায়িত্ব শুধু সে অঞ্চলেরই নয়। বায়ুপ্রবাহ কিম্বা নদীর জলে বয়ে আনা নানা দূষিত পদার্থ ছড়িয়ে যায় দূর-দূরান্তরে। আবহাওয়া দূষিতকরণ সমস্যা তাই কোনো একটি বিশেষ স্থানের নয়। এ সমস্যা আজ সামগ্রিকভাবে সমস্ত পৃথিবীর। দায়িত্বও তাই পৃথিবীর সমস্ত দেশের। শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে আবহমণ্ডল যেভাবে কলুষিত হয়ে পড়েছে তা দূর করার জন্য, পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করে তোলার জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী ও তৎপর হওয়ার সময় এসেছে।

পরিবেশ আমাদের অস্তিত্ব, বিকাশ ও উন্নতিকে প্রভাবিত করে। বাইরের প্রকৃতির বিভিন্ন অবস্থা এবং পৃথিবীর নানা আভ্যন্তরীণ ঘাত-প্রতিঘাত ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মোট ফলাফল রূপায়িত হচ্ছে পরিবেশের মাধ্যমে। দারিদ্র্য দূর করার জন্য দেশে শিল্প বাড়াতে হবে কিন্তু তার ফলে যাতে আবহাওয়া দূষিত না হয় সেদিকেও সতর্ক থাকতে হবে। আবর্জনা ও ময়লাকে যতদূর সম্ভব অন্য কাজে লাগাতে হবে। কারখানার চিমনি নিঃসৃত ধোঁয়া যাতে বহু উর্ধ্ব বায়ুস্তরে পৌঁছে যায়, তার ব্যবস্থাও করতে হবে। মোটর বাস প্রভৃতির ধোঁয়াকে বাইরে ছড়াতে না দিয়ে শোষণ করার ব্যবস্থা করতে হবে। শহরের পরিত্যক্ত জলকে পরিস্রুত করে পুনরায় ব্যবহারোপযোগী করে তুলতে হবে। নিউইয়র্ক শহর কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে অগ্রণী হয়েছেন। কলকাতাতেও ঐ ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। সমুদ্রের জলকে লবণমুক্ত করে ব্যবহারের চেষ্টাও হয়তো অদূর-ভবিষ্যতে সফল হবে। সেদিন পৃথিবীতে পানীয় জলের সমস্যা অনেক কমে যাবে। কলকারখানায় শ্রমিক কিম্বা ট্রাফিক পুলিশদের অবিরাম ধোঁয়া ও দূষিত বাতাসের মধ্যে কাজ করতে হয় বলে তাদের নিয়মিত অক্সিজেন গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে পথিপার্শ্বে অক্সিজেন সরবরাহের যন্ত্র বসিয়ে। পশ্চিম জার্মানী এ ব্যাপারে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা নিয়েছে। জনসংখ্যার বিকেন্দ্রীকরণেও মন দিতে হবে। এক কথায় প্রকৃতিকে কাজে লাগানোর কাজটি করতে হবে গভীর চিন্তা অভিনিবেশ ও পরিকল্পনা সহকারে। তা না হলে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক টয়েনবীর ভবিষ্যদ্বাণী একদিন সত্য প্রমাণিত হবে : 'প্রকৃতিকে দোহন করে মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যেভাবে বাড়ানো হচ্ছে তার ফলে এমন একদিন আসবে যেদিন প্রকৃতির সব দাক্ষিণ্য ফুরিয়ে যাবে।' সেই দারুণ দুর্যোগে যাতে মানুষকে পড়তে না হয় তার জন্য সতর্ক হওয়া দরকার। উপকরণের প্রয়োজন যতদূর সম্ভব সীমিত না রাখলে প্রকৃতির প্রতিশোধ সভ্যতার মর্মমূলে ধ্বংসের বীজ বুনে দেবে। পৃথিবীর আবর্তন সেদিন হয়তো আমাদের নিয়ে যাবে মানবসভ্যতার মৃত্যুলগ্নে।

প্রতিদ্বন্দ্বী নিজের পোশাকে ॥

কৃষ্ণ ধর

রোজ সেই প্রতিবিম্ব দেখি
প্রতিদ্বন্দ্বীর পোশাকে
বাহবা কুড়োয় দু হাতে।
একদম এক
চুলের ছাঁট, বুকের বোতাম
জামায় চিকণের ফুলকারি
সব ঠিকঠাক মিলে যায়।
হাততালি অবিরল
কান পাতা যায় না
এমন নিখুঁত অভিনয়
সঙ্গে ধ্রাজ্যের গালগল্প।
তার রোমাঞ্চে সবাই
হুমড়ি খেয়ে পড়ে
দেখে অবাক হতে হয়।
তার চোখ ঝলসানো আলোয়
দেখি যেন অন্ধকার বিপন্ন উদ্ধার।
আমাকে সে বিহ্বল করে
বিভ্রান্ত করে
মাতাল করে।
আমি তার অনল-উজ্জ্বল পোশাকের
প্রান্ত চুম্বন করে বলি,
সাবাস্ তুমিই জিতে গেলে।
করমর্দনের জন্য হাত বাড়াতেই
হাতের চেটোতে রক্তের দাগ লুকোতে
আড়াল করি ফুলদানিটা।

স্বয়ংক্রিয় হাসির দমকে
প্রতিবিম্ব বলে ওঠে,
দরকার হবে না,
এই দ্যাখো—
তার পোশাকের আড়ালে
হাহাকারে পুড়ে ছাই হচ্ছে
অবিকল আমি।

চোখ ॥ সামসুল হক

আমাদের নিজস্ব ও একমাত্র কর্ষণযোগ্য ভূমি
চোখ,
ওখানেই গর্ভাধানের দ্রাবিড়-উৎসব জমে ওঠে.
আর শস্য—
সেও আমাদের, মানুষের, ক্রমে চলে যায় আমাদেরই
পৃথিবীর যৌথ গোলায়।

আজকাল উৎসবের আয়োজন থাকে, কর্ষণ হয় না,
প্লাবন কিংবা অনাবৃষ্টি যেন চোখের নিয়তি,
শস্যের নিয়তি—
সেও আমাদের, ক্রমে মানুষের থেকে স'রে যায়
মানুষের যৌথ সভ্যতা।

বিক্ষোভ ॥ আইভি রাহা

সবাই বলে নাকি হতাশা থেকেই হয় এমন;
এই বেপরোয়া ভাব, কিছুকে ভয় না করা,
সব ছড়িয়ে ফেলা, মাড়িয়ে যাওয়া।
রাখতে ইচ্ছে হয় না মনটাকে
কিংবা কোন বিশ্বাস, সযত্নে, সংগোপনে
হৃদয়ের নিভৃত কোন কোণে।
ভালবাসা, প্রেম? বাজে।
একদম বাজে মনে হয় ওসব।
কেমন যেন বোকা বোকা
অর্বাচীন মূঢ়তার মত।
বিশ্রী অসহ্য মনে হয় সব
কৃত্রিম চাপা মাপা হাসি।
মনে হয় ছিঁড়ে ফেলি একটানে
ভদ্রতার নির্মোক—আর ওই
সযত্নে ঢেকে রাখা ফাঁকি।
হয়তো সত্যি এসব—
এই;—হতাশা আর না পাওয়ার জ্বালা থেকে
বিদ্রোহী হয়ে যায় মানুষের সুরুচির
বিনম্র মার্জিত মন।।

গঙ্গা

রেবী আনওয়ার

সারাদিনের ভাবনায় গঙ্গার দেহটা যেন আরও বুড়িয়ে গেছে। বয়সের সীমা আরো কয়েকটা বছর এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে যেন আরো সামনে এনে দিয়েছে। গঙ্গা বারান্দার এক কোণে বাঁশের খুটিতে হেলান দিয়ে বসে ভাবছে। ওধারে চৌকিগুলোর উপর ভীড় করে বসে আছে মক্কেল আর মুহুরী। সামনে চেয়ার-টেবিল নিয়ে বসে রয়েছেন উকিল সাহেব। আর তার পাশের চেয়ারটায় চৌধুরী সাহেব নিজে—মেয়েটার বাবা। দুজনে গম্ভীরভাবে পরামর্শ করছেন।

গঙ্গার কিন্তু কোনদিকে খেয়াল নেই। মাথায় হাত দিয়ে ও বসে আছে। বয়সের সঙ্গে মাথার সব চুল ঝরে পড়ে গেছে। শুধু ঘাড়ে গোটা কয়েক চুল বয়সের প্রান্ত সীমার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। কপালে আঁকাবাঁকা অসংখ্য কুঞ্চিত রেখা। চোখে ঔজ্জ্বল্য নেই, বিবর্ণ দৃষ্টি। বিশৃঙ্খলভাবে গজিয়ে ওঠা শনের মত গোঁফ, দুধারে চিবুক পর্যন্ত এসে ঠেকেছে। আর গোটা মুখের সহস্র কুঞ্চিত আঁকা-বাঁকা ছোট-বড় রেখাসহ চামড়ার নীচের দিকে ঝুলে পড়েছে—বোধহয় বয়সের বোঝা সইতে না পেরে।

গঙ্গা নড়ে চড়ে বসে।

হাঁটুর ঘাটার চারপাশে কয়েকটা মাছি পিনপিন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে এসে ঘাটাকে বৃত্ত করে বসছে, আবার উড়েও যাচ্ছে। কিন্তু ওদের তাড়াবার জন্য কোন চেষ্টা আর আগ্রহ গঙ্গার নেই। ও শুধু ভাবছে ভাবছে, ভাবছে আর ভাবছে। নিশ্চল নিথর প্রস্তর মূর্তির মতই নিশ্চুপ হয়ে বসে শুধুই ভাবছে।

বীনুর বাবা চৌধুরী সাহেব ডাকছেন : 'শোন তো বাবা গঙ্গা, এদিকে এস।'

প্রথম ডাকে সাড়া না পেয়ে দ্বিতীয়বার গলাটা আরো বেশী মোলায়েম করে চৌধুরী সাহেব বলেন : 'কই বাবা গঙ্গা, শোন এদিকে এসোতো একটু—'

গঙ্গা চমকায়। তারপরে সামনে এসে দাঁড়ায়। উকিল সাহেব আর বীনুর বাবার সামনে।

উকিলসাহেব কাগজের ভিড় ঠেলে গম্ভীর মুখখানা আরও বেশী গম্ভীর করে তুলে পুরু লেন্সের চশমার ভিতর দিয়ে গঙ্গার আপাদমস্তক একবার দেখে নেন। ওর জরাগ্রস্ত খড়িপড়া দেহের দিকে তাকিয়ে উকিলসাহেব প্রশ্ন করেন—

: তুমিই গঙ্গা?

: জী, হুজুর, আমিই গঙ্গা জিউ।

: সেদিনের ঘটনাটা তুমি জান?

: জী হুজুর।

: তুমি শুনেছ, না দেখেছ?

: শুনেগা কাহে হুজুর—আপনা এহি আঁখছে দেখা।

: বেশ। বেশ। এবার তবে বলত সেদিন কখন, কোথায় এবং আসলে কি ঘটনা ঘটেছিল। উকিল সাহেব জানতে চান।

মুহূর্তে গঙ্গার চামড়ায় টান পড়ে, কুঁজো মেরুদণ্ডটা সোজা হয়ে যায়। ক্লান্ত ঘোলাটে ছানিপড়া চোখের আড়ালে এক প্রচণ্ড ঘৃণার আগুন জ্বলে উঠে। কুঞ্চিত গালের চামড়া কঠিন হয়ে ওঠে। সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে গঙ্গা। তারপর নিদা-

রূপ ঘৃণায় মুখ বিকৃত করে কপালে হাত জোড় করে বলে : হুজুর, হামি ও পাপ কথা মুখে না আনতে পারবে। এত বড় পাপ। ছিঃ! ছিঃ! রাম, রাম। এয়ছা পাপ হামি জিন্দেগী মে কভি নেহি দেখা, হুজুর।...

উকিল সাহেব মাথা দোলালেন। তারপর হাত নেড়ে বলেন : তুমি বস গঙ্গা।

গঙ্গা ধপ করে আবার মাটিতে বসে পড়ে। সিগারেটটা দেশলাইয়ের বুকে ঠুকে নিয়ে উকিল সাহেব আবার জেরা শুরু করেন : আচ্ছা গঙ্গা, সেদিন কলেজ ছুটির পর তুমি ওদিকে গিয়েছিলে কেন?

: ঘরমে তালা লাগাতে, হুজুর।

: গিয়ে ওদের দেখলে?

: জী হুজুর।

: আর কি দেখলে?

: পাপ, হুজুর পাপ।—কাঁপতে থাকে গঙ্গা : হামি এত বড় পাপ কভি দেখিনি হুজুর। চালিশ সাল হয়ে কলেজে নোকরী কিয়া হুজুর, লেকিন এইসা বড়া পাপ ই-কলেজে ঢোকেনি। প্রফেসর থেকে ছাত্রীর সঙ্গে—ছিঃ ছিঃ রাম! রাম! আপনারাই কন হুজুর—কভি এয়সা পাপের কথা শুনিয়েছেন?

উকিল সাহেব চুপ করেন।

চৌধুরী সাহেব এতক্ষণে মুখ খোলেন। বলেন : গঙ্গা এ কলেজের প্রতিষ্ঠা থেকে আছে। কলেজকে সে প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসে। পুত্রতুল্য ওর সে ভালবাসা এ-কলেজের জন্য।

: হুঁ, উকিল সাহেব একটা শব্দ করলেন। তারপর সিগারেটটা জ্বালিয়ে বলেন : আচ্ছা গঙ্গা, তুমি কি চাও এ পাপের শাস্তি হোক!

হঠাৎ আবার উত্তেজিত হয়ে ওঠে গঙ্গা : শাস্তি হুজুর, জরুর শাস্তি হোতি হবি। এ পাপকে খতম করতি হবি বাবু।

: তা হলে আগামীকাল তোমাকে আদালতে সব খুলে বলতে হবে, গঙ্গা।—গঙ্গার কথার মাঝখানে বলেন উকীল সাহেব।

: আদালতে!—মুহূর্তে ফুটো বেলুনের মতো চুপসে যায় ও।

: হ্যাঁ, হ্যাঁ, গঙ্গা আদালত। ওখানে সব কথা তুমি খুলে বলবে। কোন ভয় নেই তোমার। আমরা তো আছি।

—উকিল সাহেব আশ্বাস দেন।

: কিন্তু।

: না গঙ্গা, এখানে কোন কিন্তু টিন্তু নয়। আদালতে সব খুলে না বললে পাপী যে শাস্তি পাবে না। কলেজেরও কলঙ্ক যাবে না—বীনুর বাবা চৌধুরী সাহেব বলেন।

: পাপী—শাস্তি—কলঙ্ক—অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করে গঙ্গা। তারপর অকস্মাৎ গলায় বেশ জোর দিয়ে বলে উঠে : জরুর বোলেগা হুজুর, জরুর বোলেগা—সব বোলেগা একশবার বোলেগা।

ওর গালে দৃঢ়তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট চেপে ধরে। হ্যাঁ, সেসব বলবে, খুলে বলবে, যা যা দেখেছে সব—স-ব। কেন বলবে না? কদর্যতার, নোংরামীর সঙ্গে ভীরু আপোষ সে করতে যাবে না—পারে না, পারবে না। পাপের উচ্ছেদ করতেই হবে। পাপকে, কলেজের কলঙ্ককে ধ্বংস করতেই হবে।

বিড় বিড় করে গঙ্গা। গঙ্গা জিউ।

সন্ধ্যায় ঝুড়ি থেকে বাইরে এসে বসে গঙ্গা। কলেজ সংলগ্ন গঙ্গার ছোট্ট ঝুপড়ি। ধূসরতায় চারিদিকে ছেয়ে ফেলেছে। —চারিদিকে ভাষাহীন নীরবতা, সামনে দিয়ে সরু রেখার মত বয়ে যাচ্ছে 'রাঙ্গাবিল'। তার উপরেই কলেজ। ধবধবে সাদা দোতলা দালান। ধাপে ধাপে কলেজ উপরের দিকে উঠেছে। বড় হয়েছে। তার ওর খানিকটা করে রক্ত চুষে নিয়ে বার্ধক্যের দিকে ঠেলে দিয়েছে ওকে।

আরো ভালো করে তাকায় গঙ্গা সাদা চুনকাম করা দালানটার দিকে। মনে পড়ে যায় ওর অতীতের কথা। প্রথম এদেশে যখন এসেছিল, তখন চল্লিশ বছরের শক্ত জোয়ান দেহে ভরা যৌবন। শক্ত-সামর্থ্য-সুস্থ পেশী-বহুল দেহটা তার সেকালের কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হক সাহেবের চোখে আটকে গিয়েছিল।

পরদিনই ডেকে বলেছিলেন তিনি—

: তোমার নাম কি?

: গঙ্গা জীউ, হুজুর।

: কি কর?

: কুছ নেহি।

: কুছ নেহী? চাকরী করবে?

: নোকরী! নোকরী পেলে তো সে বর্তে যায়, কেন সে করবে না?

তাই বলে : জরুর করেগা হুজুর। দিজিয়ে না একঠো নোকরী।

: কাল থেকে তবে কলেজের দারোয়ানের চাকরি কর—কেমন?

: জী হুজুর।

সেদিন গঙ্গা জীউ হক সাহেবের এক কথায় রাজি হয়ে গিয়েছিল। সেলাম করে চলে এসেছিল। সে আজ থেকে চল্লিশ বছর আগের পুরানো কথা। তারপর থেকে আজ চল্লিশ বছর পর্যন্ত সে কলেজে চাকুরী করছে। দিনে কলেজ বেয়ারা, রাতে কলেজ পাহারাদারের চাকুরী।

এ চাকুরীকে সে চাকুরী বলে মনে করে নি কোন দিন। এ চাকুরী তাকে আর তার বাল-বাচ্চাদেরকে দু' মুঠো ডালভাত এবং রুটি দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। এতো চাকুরী নয়—কলেজ তো তার বাপ-মা। মা-বাপ তো জন্ম দিয়েই খালাস। কিন্তু এ চাকুরীর দৌলতেই আজ তারা ছয় ছয়টি প্রাণী দু'বেলা দু' মুঠো খেতে পাচ্ছে। তাই সে কলেজ ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদেরকে ভালবেসে এসেছে তার সমস্ত পিতৃস্নেহ উজাড় করে দিয়ে। এ কলেজের গত চল্লিশটি বছরের সব ছাত্রছাত্রী গঙ্গাদা বলতে অজ্ঞান হয়েছে। কলেজের বেয়ারা বা পাহারাদার বলে তারা কস্মিনকালেও ভাবেনি। এ কলেজের অধ্যাপক মহল থেকে ছাত্রছাত্রী-দের উপর তার আধিপত্যই আলাদা। নতুন কোন ছাত্র বা অধ্যাপক তাকে নতুন এসে হেয় নজরে দেখলেও দু'দিনে গঙ্গা তাদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছে। অধ্যাপকরাও তাকে সমীহ করে। ছাত্রছাত্রীরা 'গঙ্গাদা' ছাড়া গঙ্গা বলে কোন দিন ডাকেনা। পুরানো জামাজুতো বা দিনে দু-দশ কাপ চা'এর জন্য তাই গঙ্গাকে কোন দিন অন্যান্য বেয়ারার মত ট্যাকের পয়সা খরচ করতে হয়নি। না চেয়েই পেয়ে এসেছে এতোকাল।

তাকে সবাই ভালোবাসে। আর তাই হয়তো বা এই আশি বছরেও ওর চাকুরীটা ঠিক রয়েছে। আর তাই ছাত্রছাত্রী অধ্যাপক সবার কাছেই সে আজও মনে মনে কৃতজ্ঞ।

আর একবার তাকায় সে কলেজের সাদা দোতলা দালানটার দিকে। কোথাও এতটুকুও দাগ নেই। সাদা বকের পাখার মত ধব্ধব্ করছে।

হঠাৎ গঙ্গার শিরায় শিরায় উত্তেজনার শিহরণ বয়ে যায়। দাগ পড়েছে। সাদা চুন করা কলেজটার গায়ে দাগ পড়েছে—কলঙ্কের দাগ। এ দাগ আর কস্মিনকালেও উঠবে না। সাদা দেওয়াল আর সে দেখতে পায় না। দু'হাতে সজোরে চোখ ঘষে সে। কিন্তু কৈ, কোথায় সাদা দেওয়াল? শুধু পোকা—কাল কাল পোকা—কিলবিল করছে এর দেওয়ালময়। সাদা দেওয়ালটাকে ছেয়ে ফেলেছে। দু'হাতে চোখ চেপে ধরে গঙ্গা। কিন্তু তবুও দেখতে পায়। যেখানেই তাকাচ্ছে সেখানেই দেখতে পাচ্ছে পোকা—কাল কাল পোকা টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ, অফিস সর্বত্র।

চীৎকার করে লাফিয়ে ওঠে গঙ্গা : শান্তি, এই শান্তিয়া মেরা লাঠি দো।

পিছনে কার যেন পদশব্দ শুনে ঘুরে তাকাতেই দেখে প্রফেসরের বিবি নূরজাহান বেগম ছেলে কোলে করে দাঁড়িয়ে আছে।

নূরজাহানের দিকে তাকিয়ে অস্ফুট একটা শব্দ বেরোয় শুধু গঙ্গার মুখ থেকে : মায়ি তু?

প্রফেসরের স্ত্রীর ঠোঁট দুটো বারকয়েক কেঁপে যায়। বলে : গঙ্গা আমার স্বামীকে...

: আমি কি করবে মায়ি?

: তুমি সব করতে পার গঙ্গাদা। আমার স্বামী জেলে গেলে আমাদেরকে যে না খেয়ে মরতে হবে গঙ্গাদা।

: মায়ি ও পাপ করেছে।

: তুমি ওকে ক্ষমা করো গঙ্গাদা।

: না, না মায়ি, হামি মাফ না করতে পারবে। ও পাপ করেছে। ওর জেল হবি, ফাঁসি হবি। তবে না পাপ যাবি। ওকে মাফ করলে ভগবান হামে মাফ না করবি।

: গঙ্গাদা!—ব্যাকুল আর্তনাদ করে ওঠে নূরজাহান বেগম। প্রফেসর জলীলের স্ত্রী। হাটু গেড়ে ওর সামনে বসে কোলের বাচ্চাটাকে এগিয়ে ধরে। বলে : এর দিকে তাকিয়েও কি তুমি ওকে ক্ষমা করতে পার না গঙ্গাদা? নিজেকে আর স্থির রাখতে পারে না গঙ্গা। সমগ্র সত্তা কান্না হয়ে প্রকাশ পায়। দু'হাতে চোখ চেপে ছুটে যায় ও অন্যদিকে। আর্তস্বরে বলে : আমি

পারবে না মায়ি। হামি পারবে না তু চলে যা। বাসায় যা।

এবার শেষ অস্ত্র চালায় নুরজাহান। আঁচলের গিঁট থেকে এক তোড়া কড়কড়ে নোট গংগার দিকে এগিয়ে ধরে বলে : লো গোদা।

: কেয়া ?

নুরজাহানের হাত কাঁপে। তবু বলে : ইয়ে তোমার ছেলেকে দিলাম।

চমকে ওঠে গংগা। রাগে কাঁপতে কাঁপতে শুধু বলে : নেহি মায়ি, তু যা। চলা যা—

রাতে শুতে গিয়েও গংগা মুক্তি পায় না। সমগ্র চিন্তা জাল হয়ে ঘিরে ধরেছে তাকে। অনেক চেষ্টা করেও চিন্তার জাল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারছে না সে।

আদালতের কথা মনে পড়ছে।

চোখের সামনে ভেসে উঠছে আদালতের দৃশ্য। সাক্ষীর কাঠগড়ায় ও দাঁড়িয়ে। সামনে মহামান্য বিচারপতি। আর এদিকে সহস্র জনতা উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে গংগার জবানবন্দী শুনবার জন্য। কলেজের পাপের প্রতিষ্ঠা কেমন করে হচ্ছে শুনবার জন্য। গংগা জবানবন্দী দিয়ে গেল। যা যা দেখেছে সব বলে গেল দিয়ে অকম্পিত গলায়। ওর গলাটা একবারের জন্যও এতটুকুও কাঁপলো না। জনতা উদগ্রীব হয়ে সব শুনলো।

বিচারক ওর কথা শুনে রায় দিলেন : শিক্ষার পবিত্র মন্দিরে শিক্ষক হয়ে একটি ছাত্রীর সংগে এই জঘন্য পাপে লিপ্ত থাকার জন্য শিক্ষককে সারা জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো। কলেজ তার চল্লিশ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম কলংকিত হলো। কলংকিত হলো কলেজ আজ একা গংগার জবানবন্দীতে। এ পাপ চিরদিনের জন্য স্থায়ী হয়ে গেল কলেজের ইতিহাসে। কলেজের সাদা দেওয়ালে যে কলংকের কালিমা লেপন হলো তা কোন দিন উঠবার নয়।

হঠাৎ গংগা আর্তনাদ করে উঠে : নেহী, নেহী—অভি নেহী।

শান্তি চমকে উঠে : কিয়া হুয়াজী ?

গংগা জবাব দেয় না। বোবা চোখ মেলিয়ে শুধু তাকিয়ে থাকে শান্তির দিকে। শান্তি আবার বলে : চিল্লায়া কিউঁ জি ?

: এইসি—

গংগা জবাব দেয়। ছেলেটার দিকে একবার তাকায়। শেষ জীবনের নিধি। ক'দিন ধরে অসুখে ভুগছে। টাকার অভাবে চিকিৎসা চলছে না। বেচারা শান্তির কোলে পড়ে আছে। এক টুকরো কাপড়ের ছেঁড়া ন্যাকড়ার মত। শান্তি অভিযোগের সুরে বলে : আভিতক তুম ইসকা কুছ না করো হো ?

: করেগা রে, জরুর করেগা—কিঁউ নেহী করেগা—ও মেরা মুনিয়া হ্যায় না ?

শান্তি ওকে বলে : মাগার কব ? খুছকা খানার যে ছোর রাহা নেহী।

একটুক্ষণ চুপ মেরে কি যেন ভাবে গংগা। তারপর প্রায় উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে : জানতি শান্তি, চৌধুরী সাবনে কাহা, গংগা তুম আদালতমে সব সাচ্‌ সাচ্‌ কহনেসে হাম তোমে শ' রুপেয়া এনাম দেগা।

: শ' রুপেয়া !

: হ্যাঁরে, হ্যাঁ। ও শ' রুপেয়া মিলনেসে হাম মুনিয়া কো বড়ী ডাগটার অনুলীকুমার হাসান সাবকো পাছ লে জায়েংগে। গংগার কথা শুনে শান্তি মুনিয়াকে আরও নিবিড়ভাবে বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে। আশায় ওর ক্লান্ত চোখের আড়ালে স্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠে। তার মুনিয়া ভাল হয়ে উঠবে। চৌধুরী সাব শ' রুপেয়া এনাম দিবে। বড় ডাগটার আসবে মুনিয়াকে দেখতে— ভাবে সে।

গংগার দিকে তাকিয়ে শান্তি বলে : শোনো জি, আদালত মে তুম সব সাচ্‌ সাচ্‌ বলনা, হ্যাঁ !

: আরে বোলেগা কিঁউ নেহী ? চৌধুরী সাব রুপেয়া নেহী দেনেসে ভী জরুর বোলেগা, সব সাচ্‌ সাচ্‌ বোলেগা—গংগার গলায় দৃঢ়তা ফুটে উঠে।

তারপর ওরা দুজন নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়ে ঘুমের কোলে।

পরদিন।

বেলা দশটা পাঁয়ত্রিশ। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আসামী প্রফেসর জলীল আহমেদ। ত্রিশ-বত্রিশ বছরের সুপুরুষ যুবক অধ্যাপক সাহেব। সুদর্শন স্বাস্থ্যবান ও সদাহাস্য গৌরবর্ণ চেহারা তার এ কদিনেই ম্লান হয়ে গেছে। চোখের নীচে কালি জমে আছে। চুলগুলো এলোমেলো উস্কোখুস্কো। জামা-কাপড় শ্রীহীন। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছেন আসামীর কাঠগড়ায়। নিশ্চুপ নিথর হয়ে। লজ্জায় জড়সড়। মনে মনে হয়তো বা বলেছেন : মা ধরিত্রী তুমি দ্বিধা হও। আমি তোমার কোলে আমার লজ্জাকে লুকোই।

ডানদিকে বসে মহামান্য বিচারপতি। তার বিরাট হলঘর ভর্তি লোক। শহরের ছেলে বুড়ো কৌতুহলী শতশত দর্শক। গংগাকে উকীল জালীলুল ইসলাম সাহেব জেরা করতে থাকেন। দু' হাতে কাঠগড়ার রেলিং দৃঢ়ভাবে চেপে ধরে অকম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিতে থাকে গংগা।—গংগা জমাদারনী। আদালত কক্ষ থমথম করছে।

ওর জবানবন্দী শুনবার জন্য সবাই উন্মুখ। নিঃশ্বাস বন্ধ করে সকলে শুনছে ওর প্রতিটি কথা। জবানবন্দী।

উকীল সাহেব জিজ্ঞেস করেন : তুমি কি প্রতিদিন কলেজের দরজা বন্ধ করতে যাও গংগা ?

: জী হুজুর।

: তুমি কি কলেজ গেট বন্ধ করার পূর্বে গোটা কলেজ ঘুরে দেখে নাও ?

: জী হুজুর।

: তুমি কি গত শনিবার কলেজ গিয়েছিলে ?

: জী হুজুর।

: তুমি সেদিন বিকেল পাঁচটায় কলেজ ছুটির পর প্রফেসর রুমে কেন গিয়েছিলে ?

: তালা লাগাতে হুজুর।

প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দেয় সে ঠিক ঠিক। এতটুকুও গলা কাঁপে না। একবারের জন্যও না।

উকিল সাহেব শেষ ও মোক্ষম প্রশ্ন ছোঁড়েন ওর দিকে। বলেন : তালা লাগাতে গিয়ে প্রফেসর রুমে তুমি কাউকে দেখেছিলে গংগা ?

মুহূর্তে গংগা জনতার দিকে তাকায়। ওদের শত-সহস্র চোখ কান উদগ্রীব হয়ে আছে, কলেজের চল্লিশ বছরের ইতিহাসে প্রথম পাপের প্রতিষ্ঠা দেখার জন্য।

মুহূর্ত।

কি যেন ভেবে নেয় সে শেষবারের জন্য। ওর গলা কেঁপে ওঠে। বলে : জী নেহী হুজুর। হামি কাউকে দেখিনি।

: গংগা !

উকিল সাহেব আকাশ থেকে যেন মর্তে ধপাস করে ছিটকে পড়েন। তার গলা থেকে যেন আর্তনাদ বের হয়। একি বলছ গংগা ?

দর্শকদের মাঝেও বিস্ময়ের গুঞ্জরণ ওঠে। সবাই ফিস-ফিস শুরু করে একোক্ষণে। এ ওর মুখের দিকে তাকায়। এদের মধ্যে কেউবা একটু জোরেই বলে—

: মাথা খারাপ হয়ে গেছে নিশ্চয়ই।

কেউবা তার উত্তরে বলে : না, ও শালা ছাতুখোর, প্রফেসরের কাছ থেকে মোটা টাকা ঘুষ খেয়েছে। নইলে একথা বলবে কেন ?

উকিল সাহেব রুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করেন—

: মিথ্যা কথা বলো না গংগা। তুমি তোমার ভগবানের শপথ খেয়ে বলো : কাউকে দেখেছিলে কিনা ?

কপালে দু' হাত ঠেকিয়ে বিচারকের দিকে তাকিয়ে গংগা বলে : ধর্মাবতার, ভগবানের শপথ করেই আমি বলছি, হামি সাচ্‌ সাচ্‌ কলেজে সেদিন কাউকে দেখিনি হুজুর।

বক্তব্য শেষে গংগা অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে পড়ে যায়।

গংগা কলেজে পাপ প্রতিষ্ঠা হতে দিল না। কোন লোভে নয়—কোন স্বার্থের খাতিরেও নয়। সে বেঁচে থাকতে তার পিতৃতুল্য সন্তানতুল্য কলেজের ইতিহাসে পাপের প্রতিষ্ঠা হতে দেবে না।

উনচাল্লিশ বছর আগেকার কংগ্রেস সভাপতিকে মণ্ডপে নিয়ে আসছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী। সঙ্গে আছেন শ্রীমতী মায়া রায় এম-পি।

অঙ্গনা

মহিলাদের রাজনীতি সচেতনতা

খবরে প্রকাশ, জাতীয় কংগ্রেসের এবারকার অধিবেশনে যোগদানকারী মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। মোট প্রতিনিধির সংখ্যা পঁচিশ হাজারের কাছাকাছি। তুলনামূলক বিচারে খুব একটা উল্লেখযোগ্য না হলেও এ সংখ্যা অনেকখানি আশাব্যঞ্জক। যতদূর জানা যায়, এমন বিপুল সংখ্যক মহিলা প্রতিনিধি ইতিপূর্বে আর কোন কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করেননি। অথচ প্রাক স্বাধীনতা যুগে দেশের রাজনৈতিক জীবনে ভারতীয় মহিলারা এক অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে।

কমলা নেহরু তখন মৃত্যুশয্যায়, জওহরলাল নৈনী জেলে বন্দী। বৃটিশ তরফে জওহরলালের কাছে প্রস্তাব এল যে, তিনি যদি প্রতিশ্রুতি দেন, দণ্ডভোগের যে মেয়াদ এখনো বাকি আছে সে সময়ে তিনি রাজনীতির সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখবেন না তবে অসুস্থ স্ত্রীকে দেখার জন্য তাঁকে মুক্তি দেওয়া হবে। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং আত্মহত্যা করা এ দুয়ের মধ্যে কোন তফাৎ ছিল না পণ্ডিতজীর কাছে। মুহূর্তের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন তিনি। কিন্তু অতি দ্রুত সব সংশয় কাটিয়ে উঠলেন। আর এ শুধু সম্ভব হলো পত্নী কমলারই জন্য। এই ঘটনা প্রসঙ্গে পণ্ডিতজী আত্মজীবনীতে লিখেছেন, সেপ্টেম্বরের পর এলো অকটোবর। তাকে (কমলা নেহরু) দেখার জন্য আমাকে তার কাছে নিয়ে যাওয়া

হলো। সে আচ্ছন্নের মতো শুয়েছিল। গায়ে বিষম জ্বর। সে আমাকে দেখতে চেয়েছিল, আমাকে তার কাছে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু আমার জেলে ফিরে যাবার সময় মৃদু হেসে সে আমাকে নিচু হতে বললো। আমি নিচু হলাম। আমার কানে সে ফিসফিস করে বললো—সরকারকে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার কি হলো? ঐ প্রতিশ্রুতি তুমি দিয়ো না।—এই হচ্ছে কমলা নেহরু।

তাঁর মৃত্যুর পর শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত এক স্মরণ সভায় রবীন্দ্রনাথ কমলা নেহরু সম্পর্কে বলেছিলেন: এই নারীর নিবদ্ধ শক্তির সম্যক প্রতিফলন যে দুঃসহ সংগ্রাম চলেছিল, যে সংগ্রামে তিনি কোনদিন পরাভব স্বীকার করেননি সে আমাদের গৌরবের সঙ্গে স্মরণীয়। স্বামীর সঙ্গে সুদীর্ঘ কঠিন বিচ্ছেদ তিনি অচঞ্চল চিত্তে বহন করেছেন স্বামীর মহৎ ব্রতের প্রতি লক্ষ্য রেখে। দুর্বিষহ দুঃখের দিনেও স্বামীকে তিনি পিছনের দিকে ডাকেননি। নিজের কথা তুলে সংকটের মুখ থেকে স্বামীকে ফিরিয়ে আনার জন্য তাঁকে বেদনা জানাননি। স্বামীর ব্রতরক্ষা তিনি আপন প্রাণরক্ষার চেয়েও বড় করে জেনেছিলেন। এই দুঃখের সাধনার জোরে তিনি মৃত্যুর পরেও স্বামীর নিবিড় সঙ্গিনী হয়ে রইলেন।

এমন যোগ্য স্ত্রী না পেলে জওহরলালের জীবনসাধনা হয়তো অপূর্ণই থেকে যেত। কংগ্রেসের কর্মমুখর জীবনধারায় প্রথম সারির নেতাদের গৃহিণী, মা এবং বোন সকলেরই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভূমিকা ছিল। এবং সে ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বলতে গেলে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং জাতীয় কংগ্রেসের সার্থক রূপায়ণে তাঁরাই ছিলেন মূলে প্রেরণাদাত্রী।

এলাহাবাদের আনন্দ ভবন ছিল জাতীয় কংগ্রেসের এক বিরাট ঘাঁটি। সেদিন অনেক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক এখানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং দেশের পক্ষে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছিল। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ছিলেন তখন জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম কর্ণধার। আর তিনি যাঁর কাছ থেকে নিরন্তর প্রেরণা পেয়েছিলেন তিনি হলেন তাঁর পত্নী স্বরূপা দেবী। স্বামীর রাজনৈতিক জীবনে তিনি এক বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। দেশের স্বাধীনতা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তব রূপায়ণে তিনি প্রতিটি কাজে স্বামীকে আপ্রাণ সাহায্য করেছিলেন।

দেশবন্ধু-জায়া বাসন্তী দেবী স্বামীর দেশানুরাগের প্রতি ছিলেন উৎসর্গিতপ্রাণা। শুধু দেশবন্ধু নয় সেদিন বাংলাদেশের প্রতিটি রাজনৈতিক কর্মীর মনে তিনি বিরাট প্রেরণা জুগিয়েছেন। সুভাষচন্দ্র তো তাঁকে মা বলেই সম্বোধন করতেন। সুভাষচন্দ্রের নেতাজী হওয়ার পিছনে বাসন্তী দেবীর দান অনেকখানি। স্বামীর সকল কাজেই ছিল তাঁর অবিচল আস্থা। তাই দেখা যায় যে, দেশবন্ধু যখন বাড়ি-ঘর সবকিছু দেশকে দান করে রিক্ত হলেন তখনও বাসন্তী দেবী হাসিমুখে স্বামীর হাত ধরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন। দিনের পর দিন দেশবন্ধু কারান্তরালে দিন কাটিয়েছেন আর বাসন্তী দেবী দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের আরো প্রশস্ত ক্ষেত্র গড়ে তোলার কাজে করেছেন আত্মনিয়োগ।

গান্ধীজীর পত্নী কস্তুরবাও খুব একটা স্বামী সান্নিধ্য পাননি। গান্ধীজীর জীবন কেটেছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আর ইংরেজের জেলে। কস্তুরবা সেজন্য কখনো বিন্দুমাত্র কাতরতা প্রকাশ করেননি। গান্ধীজী যখন দেশের কাজে ব্যস্ত তখন তিনি তাঁর কাজ আরো এগিয়ে নিয়ে গেছেন মেয়েদের মধ্যে নানা গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে।

এমনিভাবে দেখা যায় যে, এঁরা সকলে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেননি বটে কিন্তু এঁদের প্রখর ব্যক্তিত্ব এবং আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের পক্ষে কাজ করাই ছিল একরকমের অকল্পনীয়। আবার মহিলাদের প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণও জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জন্ম থেকে শুধু জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে মহিলাদের যোগাযোগ ছিল। ১৯১৭ সালে তাঁরা এগিয়ে এলেন প্রত্যক্ষভাবে। সে বছর কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন বসে এবং সভানেত্রী নির্বাচিত হন শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ত। এই সর্বপ্রথম একজন মহিলা জাতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রী পদে বৃত হন। সেদিন তাঁকে নিয়ে যে শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল দেশবন্ধু-কন্যা অপর্ণা দেবীর স্মৃতিকথা থেকে তার কিছুটা উদ্ধৃতি দেওয়া যাক: বিপুল সমারোহে শ্রীমতী বেসান্তকে স্টেশন থেকে শোভাযাত্রা করে আনা হলো।...জাতীয় পতাকার ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পোশাকে কিশোর-যুবকদের অশ্বচালনা, জাতীয় সেবকদলের [illegible] শোভাযাত্রা ও সর্বশেষ পুষ্পশোভিত গাড়িতে শ্রীমতী বেসান্তের প্রত্যাবর্তন চিত্তাকর্ষক হয়েছিল সন্দেহ নেই। জনাকীর্ণ পথের দু-পাশের বাড়ি লোকে লোকারণ্য। যেখান দিয়ে তাঁর গাড়ি যাচ্ছিল সেখান থেকেই তাঁর উপর পুষ্পবর্ষণ করে সমগ্র দেশ তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। বৃটিশ আইনের প্রতি ঘৃণা এবং আইন-কবলিত সদ্য মুক্তিপ্রাপ্তা দেশ-নায়িকার প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা তাঁকে সম্রাজ্ঞীর মহিমার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

এরপর ১৯৩৩ সালে জাতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রীর মর্যাদা লাভ করেন শ্রীমতী নেলি সেনগুপ্তা। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সহধর্মিণী জাতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন আজ থেকে ৩৯ বছর আগে। দেশপ্রিয়ের প্রতিটি কাজে তিনি ছিলেন স্বামীর বিশ্বস্ত সহচরী। সে বছরও কংগ্রেসের অধিবেশন বসেছিল কলকাতায়। আজ আবার যখন কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন তখন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। আবেগভরে প্রধানমন্ত্রীকে বুকে জড়িয়ে ধরে তিনি বলে ওঠেন, ইন্দিরা [illegible] তোমার কাছে [illegible]। আমার [illegible] ভারতের [illegible]। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীমতী [illegible] সেনগুপ্তা দেশ স্বাধীন [illegible] স্বামীর জন্মভিটা চট্টগ্রামেই ছিলেন। চিকিৎসার জন্য কিছুদিন হলো তিনি কলকাতা এসেছেন। তাঁর [illegible] বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘটে [illegible]।

১৯২৫ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন বসে কানপুরে। সেখানে সভানেত্রী ছিলেন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু। সেকালের যে অল্পসংখ্যক মহিলা ত্যাগ, তিতিক্ষা আর দেশপ্রেমে অনন্যা ছিলেন তাঁদের মধ্যে তিনি শীর্ষস্থানীয়া। গান্ধীজীর বিশ্বস্ত অনুগামীদের তিনি অন্যতম। জাতীয় কংগ্রেসের নানা সংকটপূর্ণ মুহূর্তে তিনি বিশেষ বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেন। বলতে গেলে তিনিই প্রথম বাঙালী মহিলা যিনি কংগ্রেস সভানেত্রীর সম্মান লাভ করেন।

তারপর আর অনেকদিন কংগ্রেস সভানেত্রীর মর্যাদায় কোন মহিলাকে দেখা যায়নি। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে রাজনীতির প্রতি মহিলাদের আগ্রহও অনেকখানি কমে গিয়েছিল। তাই সেসময়ে কংগ্রেস অধিবেশন যোগদানকারী মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যাও তেমনভাবে সাড়া জাগায়নি। দেশ স্বাধীন হবার দীর্ঘদিন পরে ১৯৫৮ এবং ১৯৫৯ সালে কংগ্রেস সভানেত্রীর সম্মান লাভ করেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজকের ভারতের রূপকার। এ দু বছর কংগ্রেস অধিবেশন বসে যথাক্রমে গৌহাটি ও নাগপুরে।

তারপরের ইতিহাস অনেক মোড় নিয়েছে। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ ভারত যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে অত্যন্ত সুদক্ষ এবং সুযোগ্য কাণ্ডারীর মতো তিনি দেশ তরণীর পরিচালনা করছেন। এবারের কংগ্রেস অধিবেশনের তিনিই মধ্যমণি। তিনি আমাদের নারী জাতির গৌরব। তাঁকে কেন্দ্র করে দেশের মহিলাদের মধ্যে ব্যাপক রাজনীতি সচেতনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যার প্রতিফলন ঘটেছে এবারকার কংগ্রেস অধিবেশনে। একে বলা চলে মহিলাদের রাজনীতি-সচেতনতার পুনর্নবীকরণ। এর সবটাই নেহাত সাময়িক না সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ার ইংগিত বহন করছে তা বোঝা যাবে দূর ভবিষ্যতে। সে মূল্যায়নের এখনই অনুকূল সময় নয়।

—[illegible]

রুমা গুহঠাকুরতা

'রুমা গুহঠাকুরতা'—নামটি শুনলেই মনে ভাসে নিটোল একটি মুক্তোর ছবি। আয়তনে বিশাল নয়, কিন্তু তার দীপ্তিতে? টলটলে পূর্ণতায়? মুগ্ধ না হয়ে উপায় আছে?—এ দীপ্তি প্রখর নয় বলেই মনের কোথায় যেন এমন একটা স্নিগ্ধদ্যুতি বিকীরণ করে, যার দাহ নেই কিন্তু আলো আছে। ব্যক্তিত্বের এই স্বয়ংপ্রভ আলোতেই রুমা উদ্ভাসিতা।

রুমাকে দেখেছিলাম অনেক দূর থেকে। কখনও মঞ্চে, কখনও বা পর্দায়। আমাদের অমৃতবাজার পত্রিকার শতবার্ষিকী উৎসবের নানান অনুষ্ঠানে যখন অকৃপণ ঔদার্যে ঢেলে দিয়েছেন নিজেকে তার অতি আদরের ইয়ুথ কয়ারের নৃত্যের জোয়ারে, গানের কলতানে, উৎসবসভায় সহস্রপ্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছেন। উজ্জ্বল করে তুলেছেন সেই পুণ্যমধুর লগ্নকে। সেই আলোতেই শুধু দেখলাম না, নতুন করে চিনলাম রুমাকে। নামেরই মত মধুর যাঁর প্রতিটি সৃষ্টি, শিল্পচিন্তা ও গতির তরঙ্গ।

নাচ, গান, অভিনয়, সংগঠনশক্তি সবকটিতেই তিনি শুধু প্রথম শ্রেণীর নন, যাকে বলে জাত-প্রতিভা তাই। কিন্তু এমন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারিণী হয়েও শিল্পী যেন তাঁর যথাযোগ্য স্বীকৃতির আসনটি পেলেন না। রুমার সম্বন্ধে এইরকম একটা অস্ফুট ক্ষোভ মনের মধ্যে জমা ছিল। বারবার মনে হয়েছে শিল্পজগতের অনেক ঘটনার মধ্যে এটাও একটা আশ্চর্য ঘটনারই সামিল। কিন্তু আরো আশ্চর্য ঘটনা যেটি, সেটি হচ্ছে এই যে তিনি নিজে এর জন্য এতটুকুও ক্ষুব্ধ নন। তাঁর ইয়ুথ কয়ার নিয়েই তিনি ভরপুর রসউচ্ছল'—কি পাইনি সেই হিসাবের ক্ষুদ্রতা এ আনন্দকে ম্লান করতে তিনি রাজী নন।

'অনেস্টলি বলছি—আমার ইয়ুথ কয়ার নিয়ে আমি এত আনন্দে আছি, যে কোন অপূর্ণতার বেদনা আমার এতটুকুও বাজে না। কারো সম্বন্ধে আমার এতটুকু অভিযোগ নেই।'—মাত্র কয়েক দিন আগে নানান আলোচনাপ্রসঙ্গে শিল্পীর এই নির্ভীক দৃঢ় উক্তিতে এক নিখাদ আত্মপ্রত্যয়ের সুর ধ্বনিত হয়েছিল বলেই বোধ হয় তা মনকে এমনভাবে স্পর্শ করল। এই ইয়ুথ কয়ার রুমার সারাজীবনের শিল্প, ধ্যান, স্বপ্ন ও সংস্কৃতির কলশ্রুতি—এ তাঁর প্রাণের চেয়েও বড়।

এই ইয়ুথ কয়ার প্রসঙ্গেই শিল্পী ফিরে গেলেন সুদূর অতীতে। ওঁর সেই সঙ্গে আমারও চোখের সামনে ভেসে উঠল লোকালয় ও তার কলরব থেকে অনেক, অনেক দূরে আলমোড়ায় নৃত্যগুরু উদয়শঙ্করের সাধনপীঠের ছবি। মাত্র সাত বছর বয়সেই উদয়শঙ্করের ধ্যানলোক সেই আলমোড়ায় ছোট্ট রুমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর মা—সেকালকার দিনের প্রখ্যাত গায়িকা সতী দেবী। চেতনা জাগবার আগেই বাড়ীতে মা ও বাবার (সুবিখ্যাত শিল্পরসিক ও সাংবাদিক সত্যেনবাবু) সংগীত ও সংস্কৃতির আওতায় মনের সুকুমার বৃত্তিগুলি জলসিঞ্চিত লতার মতই সতেজ শ্যামল হয়ে উঠেছিল। পাখীর মতই কণ্ঠে স্বতঃস্ফূর্ত গানের গুঞ্জন শুরু হয়েছিল সেই শিশুকাল থেকেই। গানের ঘরে জন্মানো ছাড়াও আবদুল রহমানের কাছে স্বল্পদিনের শিক্ষাতেই সহজাত প্রতিভার শান লেগেছিল। ঠিক এই সময়েই আলমোড়ার পরিবেশ রুমার শিল্পমানস গঠনে মণিকাঞ্চন যোগের মতই ভূমিকা গ্রহণ করে।

আলমোড়াতে মা গান শেখাতেন। সেখানে নাচ ও গানের শিক্ষা চলল একই সঙ্গে। শুধু কি নাচগানের শিক্ষা? কেমন করে চলতে হয়, সুন্দর করে কথা বলতে

ইয়ুথ কয়ারের লোকনৃত্য

হয়, গুরুজন ও শ্রদ্ধেয় সকলের সঙ্গে আচরণে কেমন নম্রনত হতে হয়—সকল মানুষের মর্যাদা রেখে ব্যবহার, শোভনসুন্দর বেশবাস—সেসব শিক্ষা লেখাপড়ার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। এ ছাড়া প্রতি পুজো, বড়দিন, মুসলমানদের পরবে—সবই হয়ে উঠত আমাদের সকলের উৎসব। এ-সবকে কেন্দ্র করে সবাই মিলে সেই হুল্লোড়, আনন্দ কেউ কি কল্পনা করতে পারে? আনন্দের স্রোতেই জাতিগত, ধর্মগত ভেদ-বৈষম্য কোথায় ভেসে যেত। আনন্দের হাটেই সকলের মিলিত সুরের শুভদৃষ্টিতে এই উপলব্ধি জাগত যে আমরা বাঙালী। হিন্দু, মুসলমান সবই সত্য—কিন্তু সবার ওপর বড় সত্য হোল আমরা ভারতীয়। এ এক অভিনব আত্মপরিচয়। এ পরিচয়ে মানুষের শুধু দৃষ্টিভঙ্গীই নয়, গোটা চরিত্রটাই বদলে গিয়ে একটা অপরূপ বিকাশে যেন দল মেলে।

এ সবেরই উৎস ছিলেন দাদা—যেমন অভিনব তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি, তেমনই অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব। এত স্নেহকোমল, এমন কোমল, উদার, কিন্তু কি স্ট্রিকট্ ডিসিপ্লিন! স্টেজের ফ্রেমে সকলের দাঁড়ানো, এক আঙুলের চলার ছন্দে এতটুকু এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই। ট্রেনার হিসাবেও দাদা অতুলনীয়।

'এই শোভমান শিল্পের শিক্ষা অন্তঃপ্রবাহী শক্তির মতই আপনার ইয়ুথ কয়ার গঠনে সাহায্য করেনি কি?'—শিল্পীর উচ্ছ্বাসমুখরতায় বাধা দিয়ে বলি।

'আপনি ঠিকই ধরেছেন। জানেন, আলমোড়ার জীবনের মত অমন সার্থক সুন্দর দিন শিল্পীর জীবনে আসে না। দাদা ত মধ্যমণি হয়ে ছিলেনই, তাঁর চারপাশে যেসব ব্যক্তিত্বের পরিমণ্ডল গড়ে উঠল তাঁদের আকর্ষণই কি কিছু কম? সিমকীজী, জোহরাজী, অমলাদি, শঙ্করম নম্বুদরী, আরও কত গুণী—সৃষ্টিশীল শিল্পী। এঁদের জীবনধারা প্রত্যক্ষ করাটাও একটা মস্তবড় সৌভাগ্য।

দাদা সবাইকে নিয়ে অল ইণ্ডিয়া ট্যুরে বেরোলেন। সে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। যেখানেই যাই ইতিহাসের রাজাবাদশাদের মতই যেন এক একটা রাজ্যজয় হয়ে যায়। এ ট্যুরকে দাদার ট্রুপের দিগ্বিজয় যাত্রা বললেও অত্যুক্তি হয় না। নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে বোম্বে এসে দাদা থেকে গেলেন। এই সময় থেকেই এবং বোম্বেতেই 'কল্পনার' রিহার্স্যাল সুরু হয়েছিল।

এই শোতেই আমার নাচ দেখে আর গান শুনে দেবিকারাণী খুব ইমপ্রেসড্ হয়েছিলেন। উনি মার সঙ্গে দেখা করে আমায় ছবিতে নেবার জন্য অনুরোধ জানালেন। সেই আমার প্রথম ছবিতে কাজ।'

'মা আপত্তি করেননি?'

'একেবারেই না। আমাদের বাড়ীর সবাই বিশেষ করে মা, বাবা শিল্পকে সত্যি করে ভালবেসেছেন বলেই এ বিষয়ে গতানুগতিক সংস্কারমুক্ত হতে পেরেছিলেন।'

ইয়ুথ কয়ারের নাগানৃত্য

'আর একটা কথা—আলমোড়ার অমন স্বর্গের মত পরিবেশের পর চিত্রজগৎ ত বলতে গেলে আশমান জমীন তফাৎ—এর-জন্য মনে কোনো দ্বিধা আসেনি?'

'আসাটাই হয়ত স্বাভাবিক—তবু যে আসেনি তার কারণ দেবিকারাণী ও হিতুমামা (হিতেন চৌধুরী) তখন খুব ছোট ছিলাম বলেই হয়ত এঁরা আমায় এমন স্নেহ দিয়ে ঘিরে রাখতেন যে স্টুডিওটা ঠিক বাড়ী বাড়ী মনে হোতো।'

'কি কি ছবিতে ছিলেন?'

'জোয়ারভাটা' ও 'দিন কা তারা'—এরপর মা পৃথ্বিরাজ কাপুরের থিয়েটারে যোগ দিলেন। আমি তখন সেণ্ট জেভিয়ার্সে ভর্তি হলাম।'

'তখন কি শিল্পীজীবনের সঙ্গে সম্পর্ক একেবারেই ছিন্ন হয়ে গেল?'

'ছিন্ন হয়ে গেল বললে ভুল বলা হয়। এই সময় জোহরাজী ও তাঁর স্বামী কামেশ্বরজী বোম্বেতে নাচের স্কুল করেছিলেন। ওঁদের কোনো অনুষ্ঠান হলেই আমায় যোগ দিতে বলতেন।

এই সময়ই মাত্র ১৩ বছর বয়সে নীতিনদার আমন্ত্রণে বঙ্কিমবাবুর 'রজনী' ছবির নামভূমিকায় হিন্দী বাংলা ডবল ভার্সনেই অভিনয় করলাম। তখন পড়াশোনায় কিছুটা ছেদ পড়ল। 'রজনী' হিট পিকচারই হয়েছিল এবং আমার গান ও অভিনয় শিল্প-রসিকদের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন পেয়েছে।

'রবুদা ডিসকভারি অফ ইণ্ডিয়া সুরু করলেন। ভারতের কত বড় বড় শিল্পীর সঙ্গে কাজ করবার সুযোগ পাওয়া গেল। আশ্চর্য হয়ে দেখতাম তাঁদের কাজের ধারা, ভাবনার ছবি। এই সময় আই পি টি এ গড়ে উঠল। ভারতের সেরা শিল্পীদের মিলনমেলা যেন। আর সকলেই তখন যৌবনপ্রাচুর্য ও সৃষ্টির প্রেরণায় উচ্ছল, উদ্বেল। সেসব আনন্দের দিন জীবনের এক উজ্জ্বল অধ্যায়।

'এর পরই এল জীবনের এক উল্লেখ-যোগ্য পটপরিবর্তন। ছবিতে কাজ করতে করতেই স্টুডিওতে অবসর পেলেই শচীন-দার ঘরে গিয়ে বসতাম। উনি সুর রচনা করতেন, কত আর্টিস্ট আসতেন তাঁদের ছবির গান তোলাতেন। খুব ভাল লাগত। তাছাড়া মানুষটাও ছিলেন বড় মজলিসী।

'এইখানেই দেখলাম কিশোরকে। শিশুর মত চঞ্চল, প্রাণপ্রাচুর্যে যেন টগবগ করছে। আর কি অপূর্ব কণ্ঠ। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে নোটেশন, পর্দা, সরগম কিছুই ও জানেন না। কিন্তু যে কোন সুর এক লহমায় তুলে নিয়ে এমন আকর্ষণীয় ঢঙে

গাইতে পারেন যে শুনে মনে হয় যেন অনেক শিক্ষা ও অনুশীলনীর দ্বারা এই 'গায়কী' উনি আয়ত্ত করেছেন। শুধু ও'র কাছের মানুষেরাই জানেন যে, এ গায়কী ও'র বিধিদত্ত সম্পদ। ও'র কাছে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের মতই সহজ'—

'শুনেছি উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের ক্ষেত্রে মৈজুদ্দিন এইরকম শক্তির অধিকারী ছিলেন'—

'আমিও শুনেছি। গানের ওপর আমার সহজাত আকর্ষণ ছিলই। এই গান শুনতে শুনতেই মানুষটারও কাছাকাছি এসে গেলাম। আমাদের বিবাহের প্রশ্ন উঠল। তারপর একদিন বিয়ে হয়েও গেল। তখন আমার ১৬ বছর বয়স।'

'সুইট-সিকস্‌টিনের প্রেমের মধুরতার ছোঁয়ায় শিল্পজীবন নিশ্চয় মধুরতর পরিণতির দিকে মোড় নিল?' —স-কৌতূহলে জিজ্ঞেস করি।

'একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। বাইরের কর্মজীবনে একটা সাময়িক বিরতির ছেদ পড়ল এটা বললেই বোধ হয় ঠিক বলা হয়।'

'কেন?'

'তখন ঘর-সংসার-গৃহস্থালীর কাজটা এত ভাল লেগে গেল যে তাতেই একেবারে নিজেকে হারিয়ে ফেললাম'—

'বিচিত্র স্বাদ?'

'খানিকটা', বলেই মৃদু হেসে চিন্তিতস্বরে রুমা বললেন— 'তাছাড়া বিবাহিত জীবনটা আমি খানিকটা চ্যালেঞ্জ হিসেবেই নিয়েছিলাম'—

'কেন?'

'কারণ এ বিয়েতে আপত্তি ছিল কিশোরের বাড়ীর সবার। সবার আপত্তি অগ্রাহ্য করে বিয়ে করেছিলাম বলেই জেদ চেপেছিল সবাইকে জয় করতে হবে, আমার বিরোধিতার শক্তি দিয়ে নয়। আমার শ্রদ্ধা ভালবাসা সেবা দিয়ে। আমার প্রতিজ্ঞা বিফল হয়নি। কিশোরের মা থেকে সবার স্নেহ, ভালবাসায় এমনভাবে ভরে উঠেছিলাম যে কর্মজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হবার দুঃখ আমার মনকে স্পর্শও করতে পারেনি। তবু এ বন্ধন রইল না' —ঈষৎ অন্যমনস্কতার ছায়া পড়ল রুমার আয়ত চোখে।

'কেন? ভুল বোঝাবুঝি?'

'একেবারেই নয়। বরং তার উল্টো। বোঝাবুঝিটা খুব স্বচ্ছ, সহজ এবং প্রাণখোলা ছিল বলেই মুক্তমনে পরস্পরের পক্ষে এ জীবন থেকে বিদায় নেওয়াটা সম্ভব হয়েছিলো। প্রথমতঃ ওর অমন কণ্ঠসম্পদ, আমি চাইতাম ও তার অপচয় না করে পূর্ণ সার্থকতায় পৌঁছুক গানেরই পথে। কেন দু-চারটে ছবির গানের জনপ্রিয়তার মধ্যেই ও'র সংগীতপ্রতিভা সীমিত থাকবে? গানেই ও পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করুক, এমন গান গাক যা কৃষ্ণচন্দ্র দে, শচীনদা, সায়গল, পংকজ মল্লিক, কানন দেবীর গানের মতই বাংলা গানের চিরন্তন সম্পদ হয়ে থাকবে। এর জন্য ছবির কাজ যদি একটু কমাতে হয়, তাতেই বা ক্ষতি কি?

'কিন্তু প্রাণোচ্ছল কিশোরের পক্ষে শুধু গান নিয়ে থাকাটা সম্ভব হোলো না। তাছাড়া তখন অত নাম, ডাক, গ্ল্যামার, টাকা, ঐশ্বর্য, বিলাসের বিলোল আকর্ষণ ছাড়াটা কারোর পক্ষেই সহজ নয়। এজন্য আমি ওকে একটুও দোষ দিই না।

'কিন্তু এই ছবির কাজেই ও এমন বিভোর হয়ে গেলো যে কাজ ছাড়া ওর জীবনে আর কিছুই রইল না। তখন বোম্বের ছবির ক্ষেত্রে ওর চাহিদা এত বেড়ে গেল যে অন্য কোনো রিল্যাকসেশন বা গৃহজীবনের ডাকে সাড়া দেওয়ার কোনো অবকাশই ছিলো না।

'আমার কাছে কোনোদিনই টাকাটা বড় ছিল না, আজও নয়। আর সব বাদ দিলে অথবা ধরলেও একথা ত অস্বীকার করা যায় না যে আমি নারী। নীড় বাঁধবার সাধ আমার মজ্জায়। কর্মজীবন আমি ভালবাসি নিশ্চয়, কিন্তু দিনের শেষে সব কাজ সারা হলে মনটা যে পাখীর মত ডানা গুটিয়ে আশ্রয় নিতে চায়—সৌন্দর্য ও শান্তির নিলয়ে।

'যখন স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, এই ঘরমুখী জীবনে জীবন যোগ করা কিশোরের পক্ষে সম্ভব নয়—তখন মনে হোলো তবে আর এ নিরর্থক বন্ধনে জড়িয়ে থাকার বিড়ম্বনা কেন? এও ত এক ধরনের আত্মপ্রতারণা—জীবনের অপচয়। তাছাড়া কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কোনোরকম কটাক্ষ না করেই বলছি—চিত্রজগতের পরিবেশ এখনও সেরকম স্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠেনি।

'যাই হোক, যখন বুঝলাম পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অভাব না থাকলেও স্বধর্মের তফাৎটা বড় বেশী তখনই আমাদের জীবনের পথও আলাদা হয়ে গেল। এর জন্য আমরা কেউ কাউকে দোষারোপ করি না। আমাদের বোঝাপড়া, বন্ধুত্ব-সম্পর্ক আজও অটুট।'

'জীবনের এতবড় একটা ওলট-পালটের পর একাকীত্বের গ্রাস থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যই কি আবার শিল্পজগতে ফিরে এলেন?'

'ঠিক কিছু পরিকল্পনা করে কোনো কাজ করিনি'—বিষণ্ণ হেসে রুমা বললেন— 'সবটাই যোগাযোগের ব্যাপার। এই সময় মানে ১৯৬৬ সালে সলিলদা আমার কাছে এলেন ইউথ কয়ার গড়বার পরিকল্পনা নিয়ে। ও'র আইডিয়া আমার খুব ভাল লাগল—আমি সানন্দে এই গড়ার কাজে যথাসাধ্য সহযোগিতা করবার প্রতিশ্রুতি দিলাম।'

'আইডিয়াটা কি?'

'সলিলদা বললেন, এখনকার যুগে ও শ্রোতাদের প্রবণতা স্টাডি করে দেখলাম, হাল্কা ধরনের ফিল্মি সং ইয়ং জেনারেশনের রুচির মান নামিয়ে দিচ্ছে। বাংলা গানের এমন বিপুল ঐশ্বর্যসম্ভার যা তাদের হেরিডিট্যারি সম্পত্তি তার কোনো খবর এরা জানতে পারছে না, আর না জানালে জানবেই বা কি করে? আমাদের রবীন্দ্র, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্র, রজনীকান্ত, নজরুলের গান, এত রকমের লোকসংগীত—এর মধ্যের রসের অফুরান সম্পদ, রঙের বাহার, ভাবের গভীরতা, আবেগের দোলার কাহিনী ওদের সামনে মেলে ধরার দায়িত্ব ত আমাদেরই। এসব গান শুনলে ওরা গ্রহণ করবে না এ হতেই পারে না।'

—সলিলদার কথায় আমার মনও খুব সায় দিল। নতুন উৎসাহ, উদ্দীপনা নিয়ে গড়বার কাজে নেমে গেলাম—'

'একটা কথা রুমাদি'— শিল্পীর উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে বলি—'মাঝের কটা বছর কি গান বাজনার সঙ্গে একেবারেই কোনো সম্পর্ক ছিল না?'

'আমি নিজে কোনো অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করিনি তবে সবরকম সংগীত সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক আসরে সুযোগ পেলেই যেতাম। ইহুদি মেনুহিনের বাজনা শুনেছি, বিলায়েৎ খাঁ সাহেবও প্রায় আসতেন আমাদের বাড়ী। অন্যান্য সব শিল্পীদেরও আনাগোনা ছিল,—আমি পারফরমিং আর্টিস্ট না থাকলেও শিল্পজগতের থেকে একটুও বিচ্ছিন্ন হইনি।'

'এবার বলুন আপনার ইয়ুথ কয়ারের কাহিনী।'

'সে আমাদের জীবনে তীব্রভাবে বেঁচে ওঠার এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়। বিমল রায় প্রেসিডেন্ট, শৈলেন্দ্র ও আমি হলাম জয়েন্ট সেক্রেটারী। সলিলদা ও আমিই শুধু নয়—কয়ারের প্রত্যেকটি সভ্য যে কি অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন ভাবা যায় না। বোম্বে ত কশমোপলিটান শহর জানেনই। নানারকম জাতি, নানা ভাষাভাষীর সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করতে করতে 'এক জাতি এক প্রাণ একতা' কথাটির সত্যতা যেন নূতন করে উপলব্ধি করলাম। আর এত সব লোক-সংগীত কিভাবে সংগ্রহ করেছি জানেন? গোয়ানীজের কাছে গিয়ে গোয়ার লোক-সংগীত তুলে এনেছি, পাঞ্জাবের শিল্পী খুঁজে পাঞ্জাবী, মাদ্রাজের শিল্পীর কাছে মাদ্রাজী—এইরকম বিভিন্ন দেশের মানুষের কাছ থেকে গান তুলে এনে সবাইকে শিখিয়েছি। কখনও বা সবাইকে নিয়ে গিয়ে

সবচেয়ে সাদা ক'রে কাপড় ধোয়ার পাউডার

সবচেয়ে উজ্জ্বল ক'রে রঙীন কাপড় ধোয়ার পাউডার

কাপড় আর হাতেরও পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ পাউডার

নতুন
তিন ভাবে কার্যকর ডেট

নতুন ডেটে রয়েছে সবচেয়ে সাদা ক'রে কাপড় ধোয়ার জন্যে সাদা করার একটি উৎকৃষ্ট পদার্থ।

নতুন ডেটে রয়েছে সাদা করার বাড়তি শক্তি। এটি কাপড়ের পুরনো ময়লা দূর ক'রে দেয় আর রঙীন কাপড় উজ্জ্বল ক'রে তোলে।

নতুন ডেটে প্রচুর ফেনা হয় আর এই ফেনায় রয়েছে কাপড়-চোপড় নরম করার বিশেষ গুণ। এটি যেমন আপনার জামাকাপড়ের পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ—তেমনি আপনার হাতের পক্ষেও সবচেয়ে নরম।
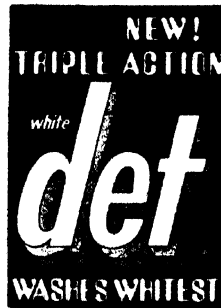
সাদা ডেট

নীল ডেট

নতুন সাইজ : ডেট ২০০, ৪০০, ৬০০, ৮০০, ১০০০ প্যাক

আরেকটি উৎকৃষ্ট ডেট উৎপাদন

ডেট কেক

সাবানের তুলনায় ১½ গুণ বেশী কাপড় ধোয়, আগের তুলনায় অনেক বেশী সাদা করে—তা সে জল যে ধরণেরই হোক।

Shilpi HPMA-40A/72-Ben

ইয়ুথ কয়ারের গরবা নৃত্য

তুলিয়েছি। কি প্রচন্ড পরিশ্রম, কিন্তু কি বিপুল উন্মাদনা আনন্দ। কাজে যে এত আনন্দ আগে বুঝিনি।'

'কেন, আলমোড়ায়?'

'তখন বয়স খুব অল্প। তাছাড়া সেটা ছিল শিক্ষার যুগ। তবে রথীমহারথীদের কাজের ধারা প্রত্যক্ষ করে অজ্ঞাতেই মনের মধ্যে একটা সংগঠন করবার সংস্কার গড়ে উঠেছিল। সেই সংস্কারটা এখন কাজে লাগল। একথা নিশ্চয় বলা যায়।—প্রথম শো—দারুণ সাকসেস। আমাদের সবায়ের মনে হয়েছিল যেন একটা রাজ্য জয় করলাম। সলিলদা বললেন; রুমাদি দেখলেন ত? বলিনি? আমাদের গানের ঐশ্বর্যভান্ডারের দরজা যদি ওদের সামনে খুলে দেওয়া যায়—ওরা অ্যাকসেপ্ট করবেই?

'সলিলদার দূরদৃষ্টিকে আমি শ্রদ্ধা করি। আর একটা জিনিস ইয়ুথ কয়ারে আমরা সবাই খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি, কাজ করেছি, কিন্তু প্রত্যেকে প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্ভ্রমশীল ছিলেন। সলিলদা অত বড় কমপোজার সংগঠক, ইয়ুথ কয়ারের একাধারে পরিকল্পনা, রূপদানকারী কিন্তু তার জন্য এতটুকু সচেতনতা কোনো দিন দেখিনি। আমাকে উনি আজও 'রুমাদি রুমাদি' করে কথা বলেন। সব ব্যাপারে এমনভাবে আলোচনা করতেন, পরামর্শ চাইতেন যেন আমিই সব উনি কিছু নন।'

১৯৬৮তে কলকাতায় এলাম রাজেন-বাবুর অনুরোধে ফিল্মে যোগ দিতে।

'ইয়ুথকয়ার ছেড়ে আসতে কষ্ট হয়নি?'

'শুধু ইয়ুথকয়ার নয়, একটা গোটা জীবন —জীবনের আলোমাখা একটা অংশ ছেড়ে আসার বেদনাও বড় কম নয়। তাছাড়া ইয়ুথকয়ার আমায় যে কিভাবে ধরে রেখেছিলো বলে বোঝাতে পারব না।—বোম্বে ছাড়ার সময় প্লেন ছাড়বার আগে কত দিনের আনন্দ বেদনার স্মৃতি মাখানো শহরটাকে একবার ভাল করে দেখতে চাইলাম কিন্তু চোখের জলে সব ঝাপসা হয়ে গেল। কিছু দেখতে পেলাম না।'—অশ্রু আভাসে ঝিকিয়ে শ্রীমন্তিনীর দুটি বিশাল নয়ন।

এরপরই কলকাতার চিত্রজগতে রুমার আবির্ভাব।

বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনী ছায়াছবিতে রূপ পাচ্ছে শুনে কৌতূহল হয় আবার শঙ্কাও হয়। বাংলা উপন্যাসের স্থপতির সৃষ্টি কি যথাযথ রূপ পাবে? যদি নিরাশ হয়ে ফিরতে হয় তবে নাই বা গেলাম সে ছবি দেখতে? এমনি একটা সংশয় এসেছিল যখন 'রজনী' ছায়াছবি আসে। সেদিন কিন্তু অন্ধ মেয়ের অভিনয় দেখে নিরাশ হইনি। অভিনেত্রীকে বরণ করেছিলাম শ্রদ্ধাপূর্ণ শুভেচ্ছা দিয়ে।

প্রকাশই শিল্পকলা। অভিনেতা বা অভিনেত্রীর প্রকাশভঙ্গী তখনই আমাদের মনকে ছুঁয়ে যায় যখন কাহিনীর চরিত্রের সঙ্গে তিনি নিজেকে আইডেন্টিফাই করতে পারেন। শিল্পী তখন ভুলে যান তাঁর নিজের সত্তা—চলে যান অন্য এক লোকে। সেটা আনন্দলোকও হতে পারে, বেদনালোকও হতে পারে।

রুমা গুহঠাকুরতার কমপাশ বা পরিধি বিস্তীর্ণ। বিভিন্ন ভূমিকায় দেখেছি তাঁর অভিনয়—কিন্তু কখনই মনে হয়নি যে চরিত্রের সঙ্গে তিনি নিজেকে আইডেন্টিফাই করতে পারেননি।

'গঙ্গা'য় তাঁর অভিনয় কি ভোলবার? অথবা 'পলাতকে' ময়নার ভূমিকায় তাঁর অভিনয়? 'পলাতকে' জমিদারের মেয়ে বলে কি তাঁকে মনে হয়নি? 'পি-এ'র রুমা দেবীকেই কি দেখছি 'পলাতকে?' ভাবতে ভালো লাগে যে শিল্প আর্টিফিসিয়াল হয়ে যায়নি। 'পলাতকে'র ময়নার চরিত্র প্রাণবন্ত হয়েছে রুমার সুষ্ঠু

প্রকাশভঙ্গীতে। আধিক্য নেই, আতিশয্য নেই—আবার জড়তাও নেই।

অবসর মুহূর্তে মাঝে মাঝে মনে জেগে ওঠে 'পলাতকে'র শেষের অংশের কয়েকটি ছবি। যেমন গোরুর গাড়িতে নায়কের অসুস্থতায় মরনার উদ্বেগপূর্ণ, চিন্তাক্লিষ্ট মুখ। আজকে নায়ক মরণপথের যাত্রী। ইচ্ছে হয় না তাকে মুহূর্তের জন্য ছেড়ে যেতে। তবু যেতে হবে—গাইতে হবে ঝুমুরদলের গান। গান গাওয়া হয়েছে—সার্থক গান—'চিনিতে পারিনি বঁধু'। এ গান জয় করে নিল শ্রোতাদের মন—রেখে গেল মুছে-না-যাওয়া একটা ছাপ। কবির ভাষায় এ গানকে বলতে হয় এ থ্রো অফ দি হার্ট'।

বেনারসীতে দেখেছি তাঁর অনবদ্য অভিনয়। 'অভিযান', 'সিঁদুরে মেঘ', 'জোড়াদিঘীর চৌধুরী পরিবার', 'নির্জন সৈকতে', '৮০-তে আসিও না', ছবিগুলিতে রুমাকে দেখি বিভিন্ন ভূমিকায়।

'ক্ষণিকের অতিথিতে যে চরিত্রের ভূমিকায় তিনি অভিনয় করেছেন সেটা একটু কঠিন। অতীতের প্রেমাস্পদের কাছে নায়িকাকে আসতে হয়েছে ছেলের চিকিৎসার জন্য। নিরুপায়ের সংকোচ রূপ পেয়েছে তাঁর ভাব, ভঙ্গী ও কথায়। ফেলে-আসা প্রিয়জনের কাছে দেখানো চলবে না আবেগ, আবার স্বার্থপরতার ক্ষুদ্রতাও ফুটে উঠবে না—এইরকম একটা পরিস্থিতিতে অভিনয় করতে হয়েছে রুমাকে। সুন্দর সংযত হয়েছে তাঁর অভিনয়। শেষ দৃশ্যটি কি ভোলবার? বিদায় লগ্ন আসন্ন—ডাক্তার (নির্মলকুমার) জিজ্ঞাসা করছেন, 'খোকন বড় হলে তুমি কি হবে?' আবেগভরা কণ্ঠে মা উত্তর দিচ্ছেন, 'ও বড় হলে ডাক্তার হবে—তোমার মত ডাক্তার হবে।' সজল কৃতজ্ঞতার সুষ্ঠু প্রকাশ হয়েছে রুমাদেবীর বলার ভঙ্গীতে।

রুমাদেবীর অভিনয়ের বৈশিষ্ট্য কি? এই রকম একটা প্রশ্ন করা সহজ—উত্তর দেওয়া কঠিন। তবু যদি...উত্তর দিতে হয় তাহলে বলব সফটনেস। তাঁর অভিনয়ে আছে স্মার্টনেস, সুইটনেস কিন্তু সর্বোপরি আছে একটা সফটনেস।

রুমাদেবীর রেঞ্জ সম্পর্কে কোন সংশয় থাকে না। যখন ভাবি 'পঞ্চতপা' ও 'আরোগ্য নিকেতনে'র কথা। 'পঞ্চতপা'য় নায়িকার ভূমিকায় আছেন রুমাদেবী, নায়কের ভূমিকায় আছেন শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়: এ'রাই আবার 'আরোগ্য নিকেতনে' মা ও ছেলে। 'পঞ্চতপা'য় রুমা স্বচ্ছন্দ, প্রাণবন্ত—আবার 'আরোগ্য নিকেতনে' রুমা ধীর, স্থির সংযত। পুরাতনের সঙ্গে নতুনের মিল হোক—দাদু নাতির সঙ্গে স্নেহ-ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠুক এইটিই ছিল ডাক্তারের মায়ের

বাল্মীকি প্রতিভায় লক্ষ্মীর ভূমিকায়
রুমা গুহঠাকুরতা

আন্তরিক ইচ্ছে। কিন্তু সেটা যখন সম্ভবপর হল না তখন মা ও ছেলের মাঝে নেমে আসে অভিমানের প্রাচীর। অভিমান কিন্তু অশান্তি আনছে না—এই স্পিরিট ফুটে উঠেছে রুমাদেবীর অভিনয়ে। 'আরোগ্য নিকেতন' একসময় শেষ হয়েছে কিন্তু শান্তি-সৌন্দর্যের যে ছবি মনে আঁকা হয়েছে তা আজও ম্লান হয়নি। এই ছবির সুষমা মনকে ভরিয়ে দেয় শান্তরসে।

শুধু অভিনেত্রীই নন রুমাদেবী একজন সঙ্গীতশিল্পী। তাঁর অনেক গানই আমাদের আনন্দ দিয়েছে—যেমন 'রুমঝুম', 'সীমান্তের ঐ সীমন্তে', 'মালিনী মান কোর না', এল পি-র ফোক সঙ-এ তাঁর গান, 'দেখো দেখো দেখো শুকতারা', 'মোরা জলেস্থলে', 'মায়া বনবিহারিণী', 'তোমার গীতি জাগালো স্মৃতি', 'কোথা বাইরে দূরে', বাজে করুণ-সুরে', 'একখানা মেঘ ভেসে আসে', 'তোমার আমার ঠিকানা'।

'গঙ্গা'র মিউজিক রেকর্ডিং-এর সময় সলিলদা কোলকাতায় এলেন। ইয়ুথ কয়ারের কথা বলতে হেসে বললেন, 'আপনি চলে আসার পরই সব বিশৃঙ্খল হয়ে গেল ইয়ুথ কয়ারও ভেঙে গেল। তারপর উনি এখানেও ঠিক ঐ রকমভাবে ইয়ুথ কয়ার গড়বার প্রস্তাব করলেন।

সেই স্বপ্নের ইয়ুথ কয়ার? মনে হতেই আনন্দে প্রাণটা নেচে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও হোল—বাংলার বাইরে মানুষ হলেও আমি বাঙালী। বাংলাদেশের বাইরে কোন প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখা যতখানি সহজ—ঠিক ততখানি শক্ত বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠান, দলা এবং মতামতের ভেদবৈষম্যের মধ্যে তাকে বাঁচিয়ে রাখা। যদি বোম্বের সাফল্য এখানে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়—মনটা বড্ড ভেঙে যাবে না?

'আশাবাদি সলিলদা কিন্তু উল্টো কথাই বললেন, আফটার অল এটা ক্যালকাটা কালচার, শিল্পের প্রতি ভালবাসা—এই নিয়েই এখানের মানুষ হাজার সমস্যাকে উপেক্ষা করে এখানে বেঁচে আছে। একবার চেষ্টা করেই দেখুন না?'

তারপর অনেক ভাবলুম। বোম্বের জীবনযাত্রা সত্যিই খানিকটা যান্ত্রিক। কলকাতার স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছলতা এখানে নেই। গত ১৪ বছর ধরে যে কজন টিঁকে আছেন তাঁরা ত থাকবেন? অতএব 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা'...।

'এই সময় 'গঙ্গা'র কাজ চলছিল। তারই মধ্যে ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ারের উদ্যোগপর্ব চলল।'

'ছবির কাজ করে এতসব শেখানো, রিহার্স্যাল সে ত প্রচণ্ড পরিশ্রমের ব্যাপার। অত সময়ই বা পেতেন কেমন করে? তাছাড়া শরীরের সাধ্যেরও একটা সীমা আছে।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন। শরীরের সাধ্য সত্যিই সীমিত। কিন্তু শরীর ছাড়াও মন বলে একটা জিনিস আছে। তার শক্তি শরীরের শক্তিকে হার মানায়। গঙ্গার কাজ আমার কাছে সস্তা স্ট্রিনিউয়াস মনে হচ্ছিল। কারণ আল-মোড়া ও ইয়ুথ কয়ারের আওতায় কাজ করে আমার মনটা একেবারে টিম-মাইন্ডেড

হয়ে উঠেছিল। চিত্রজগতে হিরো-হিরোইন সবাই নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। হিরোর সবসময় হিরো হিরো ভাব হিরোইনেরও তদ্রূপ। সবাই মিলে জোট বেঁধে বসে হৈ হৈ আনন্দের মধ্যে কাজ করা—পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়সম্বন্ধতেই আমি অভ্যস্ত। তার ব্যতিক্রমটা মনকে পীড়া দেয়, ক্লান্ত ও বিষন্ন করে তোলে।

'তাই ঠিক এই মুহূর্তে নতুন করে ইয়ূথ কয়ার গড়ার কাজ পেয়ে আমি যেন বেঁচে গেলাম। স্যুটিং-এর ফাঁকে ফাঁকে পুরোদমে রিহার্স্যাল চলতে লাগল। নতুন প্রেরণা। খুব শীগগির শো দিয়ে সবাইকে ক্যালকাটা ইয়ূথ কয়ারের এক্জিসটেন্স জানাতে হবে। এই উদ্দীপনাই সব ক্লান্তি ভুলিয়ে দিল।

'কিন্তু প্রথমবারে অকল্পিত সাফল্য সত্ত্বেও একটা অপ্রত্যাশিত আঘাতে আমাদের থমকে দাঁড়াতে হোলো।'

'কি সেটা?'

'আমি চেয়েছিলাম ক্যালকাটা ইয়ূথ কয়ারের ফার্স্ট শো কলকাতাবাসীকে সলিলদাই নিবেদন করুন। একদল আমায় সমর্থন করলেন। আর একদল (এঁদের অধিকাংশই ছিলেন সলিলদার পুরানো ছাত্র) এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। কিন্তু কোনো বারণ শুনব না। স্রষ্টাই তাঁর কল্পনার রূপমূর্তিকে মেলে ধরবেন। যাঁর যা সম্মান প্রাপ্য তাঁকে সেটুকু দিতে হবেই। আমার কথাই রইল। ১৯৫৯ সালে নিউ এম্পায়ারে ক্যালকাটা ইয়ূথ কয়ারের প্রথম অনুষ্ঠানের সে যে কি বিপুল সার্থকতা ভাবা যায় না। হাউসফুল! শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু ১০ মিনিটের জন্য শো দেখতে এসে প্রথম থেকে শেষ অবধি বসে রইলেন—আর শোয়ের পর তাঁর সে কি উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জ্ঞাপন। আমার কথামত সলিলদাই প্রেজেন্ট করেছিলেন।

'কিন্তু আনন্দের এই চরম মুহূর্তেই টিমের অধিকাংশ সভ্যই স্টেজে দাঁড়িয়েই রিজাইন দিলেন। সব আনন্দের হাজারো বাতি যেন এক ফুঁয়ে নিভে গেল। সলিলদাকে বললাম, কি হোলো ত; প্রথমেই বলিনি? সলিলদা হাসলেন। কিন্তু সে হাসি বড় ম্লান।

'আমি কিন্তু দমিনি। অলমোড়াতে দাদার শিক্ষা মনের পরতে পরতে যেন গাঁথা ছিল এনি সর্ট অফ চ্যালেঞ্জ ইউ উইল হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট ইন লাইফ। সেই শিক্ষাই আমায় শক্তি যোগাল।

মাত্র ১০ জন নিয়ে রিহার্স্যাল সুরু করলাম। আর দশদিনের মাথায় হিন্দুস্থান পার্ক ওপেন এয়ার শো দিলাম। উদ্যোক্তা ছিলেন কমল ঘোষ। কয়ার-এর সাধনা সব বাধাকে জয় করল। এই শো-এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল লোকের মুখে মুখে। স্নেহ ও আশীর্বাদ ধন্য হোলো সেই পুণ্যমুহূর্তে।

'তারপরের ইতিহাস ত সবই আপনাদের জানা। আপনাদের সবার ভালবাসায় আমাদের যাত্রাপথ আজ বাধামুক্ত। এই কয়ার নিয়ে ভারতের কত জায়গা গেছি, ঘুরেছি সব জায়গাতেই শো-এর শেষে সকল দর্শকের চোখে খুশীর আলো জ্বলে উঠতে দেখেছি—সে আলো আমায় উদ্দীপিত করেছে আরও, আরও বেশী এগিয়ে যেতে।'

'যদি কয়ার ও ফিল্মের মধ্যে যে কোনো একটিকে আপনাকে বেছে নিতে বলা হয় আপনি কি করবেন?'

অফ কোর্স কয়ার উইল বি মাই ফার্স্ট চয়েস। এখানের মেম্বারেরা সবাই মিলে যেন একটি একান্নবর্তী পরিবারের মতো। কারো যদি সন্তান হয় আমরা সবাই মিলে হৈ-চৈ করি। কারো বিবাহ হলে একসঙ্গে দলবেঁধে হুল্লোড় করি—মৃত্যু হলে সবাই শোকাচ্ছন্ন হই। আমাদের সবার জন্ম, মৃত্যু, বিবাহের আনন্দ দুঃখে আমরা এক হয়ে গেছি।

'যখন ট্যুরে যাই দলবেঁধে থার্ড ক্লাশে যেতে যেতে মাটির ভাঁড়ে চা খেতে যতখানি আনন্দ পাই—ঠিক ততখানিই মজা লাগে নানা জায়গায় খাওয়া-শোওয়া বসার সুবিধা-অসুবিধা উপভোগ করতে। একবার ভারী মজা হয়েছিলো। দিল্লীতে গভর্ণমেন্টের ডেলিগেট হয়ে আমরা গেছি। বিরাট এয়ার কণ্ডিশনড হোটেলে আলাদা আলাদা অ্যাপার্টমেন্টে সকলকে থাকতে দিয়েছে। কিন্তু এত কমফোর্টস পেয়েও কেউ খুশী নয়। বলে রুমাদি বড় অসোয়াস্তি লাগছে। একসঙ্গে বসা, গল্প করা হৈ হৈ ত হচ্ছে না? মহার্ঘ্য ব্রেকফাস্ট ডিনারের চেয়ে সবাই মিলে বসে কাগজ পেতে মুড়ি বাদাম আর কলাপাতায় গড়িয়ে যাওয়া ঝোলভাত খাওয়ার মজাটাই আমাদের কাছে বড়।'

'সংসারজীবনের সঙ্গে বাইরের কর্মজীবনের ভারসাম্য রক্ষা করাটা কঠিন লাগে না—'

'লাগত, যদি না আমার শ্বশুরবাড়ীর সবার এমন সহৃদয় সহযোগিতা পেতাম। আমার স্বামী অরূপ গুহঠাকুরতা ত কয়ারেরই একজন। আর আপনি ত জানেনই এদের বাড়ী সংস্কৃতির একটা কেন্দ্রস্থল বললেও অত্যুক্তি হয় না। কলকাতার অনেক নামকরা সংগীত প্রতিষ্ঠানের জন্ম এবাড়ী থেকেই।'

'মাত্র কয়েকটা আসরে গেয়েই অমিত যথেষ্ট নাম করেছে। ওর কণ্ঠও শিক্ষা-মার্জিত। ও কি কোনো ওস্তাদের কাছে শিখেছে?'

'গুলাম মোস্তাফার কাছে অল্প-দিন শিখেছিল। তবে শুনে শুনেই ও নিজেকে তৈরী করেছে। তাছাড়া কয়ারে ও তালযন্ত্র বাজায়।'

'আপনি ত অনেকবার বাইরে গেছেন ইন্টারন্যাশন্যাল প্রাইজ নেবার উপলক্ষ্য ছাড়াও সাংস্কৃতিক সফরে। ভারতীয় সংগীতের প্রতি ওদের আদর্শটি ঠিক কি ধরনের?'

'মিউজিকের ট্রিমেন্ডাস রেসপন্স আর আমি লক্ষ্য করে দেখেছি ফোক-সঙের ওপরই ওদের ঝোঁক বেশী। ইনডিভিড্যুয়াল আর্টিস্ট হিসেবে গেয়ে ইমপ্রেস করা কঠিন—বিশেষ কয়েকজন ব্যতিক্রমী শিল্পী ছাড়া। আমাদের ভারতীয় সংগীতে লোক-সংগীতের এমন বহুধাবৈচিত্র্য ওদের মুগ্ধ করবে বলেই আমার বিশ্বাস। এদিকে সরকারের নজর দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন।'

'বর্তমান বাংলাসংগীতের ধারা সম্বন্ধে আপনার মতটা জানতে ইচ্ছে করে।'

'এখন সমাজ, শিক্ষা, দেশের সবক্ষেত্রেই একটা অস্থিরতার যুগ। এই অস্থিরতার ছোঁয়া সংগীতেও লেগেছে। তবে একটা কথা। পপ্ সং ভালই হোক আর মন্দই হোক—পপ্ সং বলে এখন যা গাওয়া হচ্ছে তা কিন্তু মোটেই "পপ্ সং" নয়। কথা ও সুর এত কাঁচা সেও বোধহয় সুস্থিরচিত্তের চিন্তাজাত নয় বলেই। তবে কোনো দুর্যোগই স্থায়ী হয় না। বাংলা গানের এ শাপগ্রস্ত মুহূর্তের অবসান নিশ্চয় ঘটবে। এ আশা না রাখতে পারলে আমরা বাঁচব কি নিয়ে?'

'আমাদের পত্রিকার সঙ্গে আপনার আত্মীয়সম্বন্ধ চিরন্তন থাকবে ত?'

'সন্ধ্যাদি শিল্পীরাও ত মানুষ। অন্তরের স্নেহদাক্ষিণ্যের আশ্রয় না পেলে তারাই বা চলবে কি করে? আপনাদের এ স্নেহকে অমর্যাদা করা আমার সাধ্যের অতীত।'

১৯৭২ সালের মুক্তিপ্রাপ্ত বাঙলা ছবির শ্রেণীবিভাগ, মুক্তির তারিখ ও প্রযোজক সংস্থার নামসহ তালিকা

ক্রমিক সংখ্যা	ছবির নাম	প্রযোজক সংস্থা	মুক্তির তারিখ	শ্রেণীবিভাগ
১।	জনতার আদালত	জনতা ফিল্ম কর্পোরেশন	২১-১-৭২	রাজনৈতিক
২।	বিরাজ বৌ	কে. সি. দাস প্রোডকসন্স	১৮-২-৭২	সামাজিক
৩।	আজকের নায়ক	সঞ্চয়িতা ফিল্মস	২৫-২-৭২	সমস্যামূলক
৪।	মা ও মাটি	সংগীতা প্রোডাকসন্স	২৫-২-৭২	সামাজিক
৫।	আলো আমার আলো	চারুচিত্র	১৭-৩-৭২	সামাজিক
৬।	অনিন্দিতা	গীতাঞ্জলি	১৪-৪-৭২	গার্হস্থ্য
৭।	অপর্ণা	সরকার প্রোডাকসন্স	১৪-৪-৭২	বিপ্লবী-জীবনীমূলক
৮।	শপথ নিলাম	রূপ ও বাণী	৫-৫-৭২	গার্হস্থ্য
৯।	জীবন সৈকতে	রাধারাণী পিকচার্স	১২-৫-৭২	গার্হস্থ্য
১০।	শেষ পর্ব	শুভাম্ব পিকচার্স	৫-৭২	গার্হস্থ্য
১১।	নয়া মিছিল	মনমুন ফিল্মস	২-৬-৭২	সামাজিক
১২।	অর্চনা	সাহা ফিল্মস	১৬-৬-৭২	গার্হস্থ্য
১৩।	অন্ধ অতীত	উষা ফিল্মস	৭-৭-৭২	সামাজিক
১৪।	নায়িকার ভূমিকায়	চিত্রযুগ	২১-৭-৭২	গার্হস্থ্য
১৫।	ছায়াতীর	রমেশ সাইগাল প্রোডাকসন্স	২১-৭-৭২	সামাজিক
১৬।	নতুন ফুলের গন্ধ	এটসেট্রা ফিল্মস	২৭-৭-৭২	গার্হস্থ্য
১৭।	বহুরূপী	দীনেশ চিত্রম্	৪-৮-৭২	সামাজিক
১৮।	স্ত্রী	বেবী জুন প্রোডাকসন্স	১৮-৮-৭২	সামাজিক
১৯।	পিকনিক	ইকোল্স ফিল্মস	১-৯-৭২	সামাজিক
২০।	বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা	জাহ্নবী চিত্রম	১৫-৯-৭২	ভ্রমণমূলক
২১।	মেমসাহেব	পম্পি ফিল্মস	১৬-১০-৭২	প্রণয়ধর্মী সামাজিক
২২।	কলকাতা ৭১	ডি এস পিকচার্স	১২-১০-৭২	সমকালীন সামাজিক
২৩।	ছিন্নপত্র	কলামন্দির	২০-১০-৭২	গার্হস্থ্য
২৪।	পাদ পিসীর বর্মী বাক্স	আনন্দা চিত্র	৩-১১-৭২	কিশোরকাহিনীমূলক
২৫।	জবান	শুভ প্রোডাকসন্স	৮-১২-৭২	সমকালীন সামাজিক
২৬।	হার মানা হার	সবাক চিত্রশিল্প	৩০-১২-৭২	গার্হস্থ্য

১৯৭২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বাঙলা ছবির সালতামামি

ওপরের তালিকা থেকে দেখতে পাওয়া যে, বাংলা দেশে তোলা 'নতুন ফুলের গন্ধ' ছবিটি সমেত মোট ২৬টি বাংলা ছবি কলকাতার বিভিন্ন চিত্রগৃহে মুক্তি পেয়েছে সদ্য অতিক্রান্ত ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে। আমরা এর সঙ্গে বাংলা ভাষায় ডাব-করা রুশ ছবি "বাহাদুর ছেলে"কে তালিকাভুক্ত করিনি এই কারণে যে দক্ষিণ ভারতীয়দের মুখের বাংলা সংলাপ ও গানকেই যখন আমরা ভিন্ন ভাবে দেখতে অভ্যস্ত, তখন রুশ অভিনেতা অভিনেত্রীর মুখ-নিঃসৃত বাংলা সংলাপ ছবিটিকে আমাদের কাছে কোনোই বাংলা করে তুলতে পারবে না।

গেল ১৯৭১-এ যেখানে পশ্চিমবঙ্গে মোট ২৮ খানি ছবি মুক্তি পেয়েছিল, সেখানে ১৯৭২-এ মুক্তিলাভ করেছে ২৫ খানি। কারণ অনুসন্ধান করতে বেশী দূর যেতে হবে না। যে ছবিঘরগুলি সাধারণত বাংলা ছবি দেখিয়ে থাকে, তাদের মধ্যে ৮টি একনাগাড়ে বন্ধ ছিল ১২ নভেম্বর থেকে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। পঁচিশ দিন ধরে যদি ছবিঘরগুলি বন্ধ না থাকত, তাহলে নিশ্চয়ই আরও গুটি কয়েক ছবি দর্শকদের মুখ দেখতে পেত। এ-ছাড়া বছরের গোড়ার দিকে অগ্নিকাণ্ডের ফলে 'ভারতী' চিত্রগৃহ বেশ কিছুদিন বন্ধ ছিল।

ছবির তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "বিরাজ বৌ" দ্বিতীয়বার ছবির রূপ পেল মানু সেনের পরিচালনায়। আশাপূর্ণা দেবী ও জরাসন্ধের দু'খানি এবং তারাশঙ্কর, বিমল মিত্র, প্রতিভা বসু, শঙ্কু মহারাজ, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, শৈলেশ দে ও নিমাই ভট্টাচার্যের একখানি করে উপন্যাস চিত্ররূপান্তরিত হয়েছে। পরিচালকদের মধ্যে সত্যজিৎ রায় ও তপন সিংহের কোনো ছবি এ-বছর মুক্তিলাভ করেনি। পুরাতন পরিচালকদের মধ্যে মানু সেন ও চিত্ত বসু একখানি করে ছবি উপহার দিয়েছেন। সলিল সেন, পিনাকী মুখোপাধ্যায়, হীরেন নাগ ও পীযূষ গাঙ্গুলীর দু'খানি করে ছবি মুক্তিলাভ করেছে। নতুন তিন জন পরিচালককে আমার পেয়েছি (১) হেমন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়, (২) মিঠু চট্টোপাধ্যায় এবং (৩) পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে অনিন্দিতা, বহুরূপী ও জবান ছবির মাধ্যমে। এবারে সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে নতুন নাম হচ্ছে বাপী লাহিড়ী (জনতার আদালত) ও সুকুমার মিত্র (শপথ নিলাম)। যশস্বী প্রবীণ সুরশিল্পী পংকজকুমার মল্লিক বহুদিন পরে একখানি ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন (বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা)।

এবারে সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ছবি হচ্ছে মৃণাল সেন পরিচালিত "কলকাতা '৭১"। সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় জীবনজিজ্ঞাসা সম্পর্কে এমন মর্মদাহী ছবি ভারতবর্ষে এই প্রথম। ঠিক বিপরীতভাবে নির্মিত হয়েছে জীবনের আদর্শান্বেষী, ভারতের ঈশ্বরমুখিতার ছবি "বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা" নামক ভ্রমণকাহিনীনির্ভর চিত্র। বর্তমানের যুগযন্ত্রণা ও মানসিকতা রূপ পেতে চেয়েছে 'জনতার আদালত' 'আজকের নায়ক', 'মা ও মাটি', 'শপথ নিলাম', 'নয়া মিছিল', 'বহুরূপী', 'জবান' প্রভৃতি ছবির মাধ্যমে।

দেখা যাচ্ছে, অবিসংবাদীভাবে জনপ্রিয় নায়ক উত্তমকুমার এবারেও অন্তত সাতখানি ছবিতে নায়ক। অবশ্য ওঁর থেকেও একখানি বেশী অর্থাৎ আটখানি ছবিতে অবতীর্ণ হয়েছেন শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়।

সৌমিত্র আছেন মাত্র তিনখানি ছবিতে। নায়িকার ভূমিকায় দেখা গেছে সুচিত্রা সেনকে মাত্র দু'খানি ছবিতে। মাধবী চক্রবর্তী এবং অপর্ণা সেন আছেন যথাক্রমে পাঁচ ও তিনখানি ছবিতে। নায়িকারূপে নতুন মুখের দেখা পাওয়া গেছে ঃ আরতি ভট্টাচার্য, রাধা সালুজা, অর্চনা, সুমিতা মুখোপাধ্যায়, শাঁওলী মিত্র ও মধুছন্দা।

এ-বছরে আমরা হারিয়েছি রাজলক্ষ্মী দেবী, অনুভা ঘোষ, অমর মল্লিক, নীরেন লাহিড়ী ও পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরীকে। এবং আমাদের সাংবাদিকদের মধ্যে মহেন্দ্র সরকার ও বিজন দত্তকে।

চিত্র-সমালোচনা

হারমানা হার

সবাক চিত্রশিল্প প্রাইভেট লিমিটেড নিবেদিত "হারমানা হার",—যা ২৯ ডিসেম্বর থেকে মিনার, বিজলী, ছবিঘর এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত মহাশ্বেতা উপন্যাসের চিত্ররূপ। প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো যে, তারাশঙ্কর রচিত এই উপন্যাসটিতে ঘটনার যত ঘনঘটা আছে, মহৎ উপন্যাসসুলভ সে রকম কোনও অবিস্মরণীয় চরিত্রচিত্রণ নেই, যা রচনাটিকে কালজয়ী করে তুলতে পারে। সম্ভবত তারাশঙ্কর চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হবার দিকে জাগ্রত চক্ষু নিয়েই মহাশ্বেতা উপন্যাসটি রচনা করেন। সেদিক দিয়ে তাঁর ইচ্ছাকে বাস্তবে পরিণত করেছেন সবাক চিত্রশিল্প প্রাইভেট লিমিটেড। কিন্তু মূল কাহিনীটিকে চিত্রনাট্যের মাধ্যমে বিবৃত করবার চেষ্টায় চিত্রনাট্যকার-পরিচালক সলিল সেন যে-সব পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্যে অধিকাংশই কোনো রকম ঔচিত্য ও সম্ভাব্যতার ধার ধারে না এবং সময় সময় তারা এমনই প্রত্যাশার বিপরীত যে, মনে হয়, তিনি চরিত্রগুলির মনস্তত্ত্বের দিকেও যথেষ্ট নজর দেন নি। নীরা এবং বিনো সেনের চারিত্রিক গভীরতা আরও বেশী ক্ষুণ্ণ হয়েছে তাদের মুখে অনাবশ্যকভাবে চটুল গানের সমাবেশ ঘটানোর ফলে। বিনো সেনের জীবন দর্শন কি "এসেছি আলাদীন ছু মন্তর-যন্তর-তন্তর" বা "লেখাপড়া শিকেয় তুলে, কোতো ছিলাম বাউণ্ডুলে" প্রভৃতি হাল্কা গানের মাধ্যমে প্রতিফলিত হওয়া সম্ভব? না, তারাশঙ্কর রচিত "মহাশ্বেতা'র প্রতি আদৌ সুবিচার করেনি সলিল সেন লিখিত চিত্রনাট্যটি। যে-গান যোজনা "মণিহার" ছবিতে এনেছিল সাফল্য, তাদের কথা ও সুর ছিল চরিত্রানুযায়ী। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, বর্তমান ছবিতে তা হয়নি। এখানে গানের কথা ও সুর চরিত্রকে উপেক্ষা করেছে। কিন্তু চিত্রনাট্যের ত্রুটি সত্ত্বেও ভাগ্যতাড়িতা নীরার ভূমিকায় সুচিত্রা সেন যথাসম্ভব অর্থবহ অভিনয়ের দুরূহ চেষ্টা করেছেন এবং বেশ কিছুটা সাফল্যমণ্ডিতও হয়েছেন। ভূমিকার যে-সব স্থানে ব্যক্তিত্বের ও চারিত্রিক গভীরতার পরিচয় আছে, সে-সব জায়গায় তাঁর অভিনয় অন্তরস্পর্শী। অবশ্য কিছু দিন আগে পর্যন্তও পর্দার বুকে তিনি যে মাদকতার সৃষ্টি করতে পারতেন, আজ তার অভাব ঘটেছে বটে, কিন্তু অভিনয়ের সূক্ষ্ম কারুকার্যে তিনি যে আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তার স্বাক্ষর এ-ছবিতেও আছে। সদানন্দ ও পরার্থকামী শিল্পী বিনো সেন বেশে উত্তমকুমার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সুঅভিনয় করেছেন বটে, কিন্তু এ-ছবিতে উচ্চাঙ্গের নাট্যনৈপুণ্য প্রদর্শনের বিশেষ কোনও সুযোগ তিনি পাননি। আত্মভোলা বৃদ্ধ শিল্পী শিবনাথের ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যালের মুখের স্বচ্ছন্দ ও সরস সংলাপ একটি চমৎকার উপভোগ্যতার সৃষ্টি করেছে। অপরাপর ভূমিকায় সুঅভিনয় করেছেন কেতকী দত্ত, কনিকা মজুমদার, অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, ললিতা চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, গীতা দে, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, তরুণ কুমার, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন সেন-শর্মা নিমু ভৌমিক প্রভৃতি।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ সাধারণভাবে প্রশংসনীয়। অনিল গুপ্ত ও জ্যোতি লাহার চিত্রগ্রহণ সর্বত্র সমানভাবে উচ্চাঙ্গের না হওয়ায় কিছুটা বিস্মিত হয়েছি। পূর্বেই বলেছি, কাহিনী ও চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গীত-রচনাও যেমন হয়নি, সুর-যোজনাও তেমনই সঙ্গতিবর্জিত। গানকে যদি বিষয়বস্তুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত করতে না পারা যায়, তাহলে সুর ও গাওয়ার দিক দিয়ে (এখানে উত্তমের মুখের গান গেয়েছেন মান্না দে) তা যতই অনবদ্য হোক না কেন, ছবির প্রকৃতির সঙ্গে সমতা রাখতে না পারায় তা ব্যর্থতা বরণ করতে বাধ্য।

আমাদের মনে হয়, উত্তম-সুচিত্রার যুগ্ম-অভিনয় সবাক চিত্রশিল্প প্রাইভেট লিমিটেড-এর 'হারমানা হার'কে কিছুটা জনপ্রিয়তা দেবে।

স্টুডিও সংবাদ

গৌতম চিত্রমের সংগীত গ্রহণ ঃ গত সপ্তাহে গৌতম চিত্রমের প্রথম ছবি 'জীবন-নাই নাটক'-এর কয়েকটি গান বিজন পালের সংগীত পরিচালনায় মান্না দের কণ্ঠে রেকর্ডিং হয়ে গেছে। মণীষ রায় ছবিখানি পরিচালনা করছেন। কাহিনী ঃ ফণী চক্রবর্তী। শমিত ভঞ্জ ও আরতি ভট্টাচার্য ছবির নায়ক-নায়িকা।

অগ্নিভ্রমর ঃ তানাকা চিত্রমের প্রথম ছবি 'অগ্নিভ্রমর'-এর চিত্রগ্রহণের কাজ দ্রুত তালে এগিয়ে চলেছে। অজিত গাঙ্গুলী এই ছবির পরিচালক কাহিনীকার ও চিত্রনাট্যকার। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এর গান লিখেছেন। নচিকেতা ঘোষ এর সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন। কণ্ঠ সংগীতে আছেন মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও নচিকেতা ঘোষ স্বয়ং। রামানন্দ সেনগুপ্ত চিত্রগ্রহণের দায়িত্বে আছেন। ছবির প্রধান চরিত্রলিপিতে আছেন—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, মলিনা দেবী, পদ্মা দেবী, উৎপল দত্ত, শোভা সেন, বিদ্যা রাও, চিন্ময় রায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নায়ক চরিত্রে আছেন নবাগত কৌশিক বসু।

জীবন রহস্য ঃ তপেশ ঘোষ ও জয়ন্ত দেব প্রযোজিত জাগ্রত পিকচার্সের প্রথম ছবি সলিল রায় পরিচালিত 'জীবন রহস্য'-এর কাজ সমাপ্তির পথে। কাহিনী রচনা করেছেন শ্রীরায় স্বয়ং। চিত্রনাট্য লিখেছেন তপেশ ঘোষ। অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ছবির সুরকার। ছবির বিশেষ আকর্ষণ হিন্দী চিত্রজগতের সর্বজনপ্রিয় চিত্রতারকা প্রাণ। প্রাণ বাংলা ছবিতে এই প্রথম। একটানা দশ দিন স্টুডিও চত্বরে ও কলকাতার বিভিন্ন স্থানে শ্যুটিং শেষ করে প্রাণ ২২ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় বোম্বে রওনা হয়ে গেছেন। ছবির বিভিন্ন চরিত্রে আছেন মাধবী চক্রবর্তী, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, কমল মিত্র, অপর্ণা দেবী, হরিধন, জ্ঞানেশ, মণিকা রায়চৌধুরী, মন্মথ, দিলীপ রায়, কল্যাণী মণ্ডল, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। আশা ভোঁসলে ও মান্না দে ছবিতে গান গেয়েছেন। চিত্রগ্রহণে আছেন পুণা কলেজের বিমান সিনহা। ব্যবস্থাপনায়—প্রশান্ত পাটাদার।

অচেনা অতিথি ঃ সারা প্রডাকসন্সের নতুন ছবি সুখেন দাস রচিত 'অচেনা অতিথি'র কাজ সংগীত পরিচালক অজয়

দাসের পরিচালনায় মান্না দের দুইখানি ও মৃণাল চক্রবর্তীর একখানি—মোট তিনখানি গান রেকর্ডিং-এর মাধ্যমে শুরু হয়। চিত্র-নাট্য রচনা করেছেন কাহিনীকার সুখেন দাস। পরিচালনায় আছেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ও সুখেন দাস। গেল ২২ ডিসেম্বর থেকে ছবির একটানা চিত্রগ্রহণের কাজ নিউ-থিয়েটার্স ২নং স্টুডিওতে শুরু হয়েছে। ভূমিকালিপিতে এখন পর্যন্ত যাঁদের নাম পাওয়া গেছে তাঁরা হলেন—স্বরূপ দত্ত, সুখেন দাস, রবি ঘোষ, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশ সাধু, অজয় ভট্টাচার্য, মেনকা দেবী, রত্না ঘোষাল ও নবাগতা সোমা দে। নর্মদা চিত্র ছবিখানির পরিবেশন স্বত্ব গ্রহণ করেছেন।

উত্তরা, পূরবী ও উজ্জলায় 'নতুন দিনের আলো' : ইংরাজী নতুন বছর শুরুর সংগে সংগেই বাদল পিকচার্সের অজিত গাংগুলী পরিচালিত ও নচিকেতা ঘোষ সুরারোপিত 'নতুন দিনের আলো' ছবি আর পিকচার্সের পরিবেশনায় উত্তরা, পূরবী উজ্জলা ও অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তি পাবে। ছবির প্রধান চরিত্রলিপিতে আছেন—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যারাণী, তরুণ রায়, দীপান্বিতা রায়, বিকাশ রায়, প্রমোদ গাঙ্গুলী, চিন্ময় রায়, বিদ্যু রাও, হাসু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনতা রায়, দেবরাজ, শমিতা বিশ্বাস, পদ্মা দেবী, কল্যাণ রায়, অনুপকুমার ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

মঞ্চাভিনয়

একাডেমী ও রংগনায় বিছুর ঝাব : থিয়েটার কমিউনের সর্বাধুনিক প্রযোজনা 'বিছুর ঝাব' আগামী এগারো জানুয়ারী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় একাডেমী অফ ফাইন আর্টসে এবং চৌদ্দ জানুয়ারী রবিবার সকাল দশটায় রংগনাতে অভিনীত হবে। নাটক ও নির্দেশনায় আছেন নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত।

কোন্নগর আইডিয়াল সোসাইটি : সংস্কৃতি চর্চায় মফঃস্বল যে পিছিয়ে নেই কোন্নগর আইডিয়াল সোসাইটির নাট্য বিভাগ কর্তৃক সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'নহবত' নাটকের অভিনয় তারই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। ১০ ডিসেম্বর, বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে। নাটকের প্রাণোত্তাপ আসে সংঘবদ্ধ অভিনয়ের দক্ষতায়। এদিক দিয়ে সোসাইটির সভ্যরা সার্থকতা লাভ করেছেন। যে ক'জন শিল্পীর চরিত্র চিত্রন প্রথমেই সবার মনকে স্পর্শ করেছে; তাঁরা হলেন শিবানী ভট্টাচার্য (কেয়া), জয়ন্ত গাংগুলী (জ্যাঠামশাই), বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘেঁটু), শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় (হরিবাবু), বলরাম আদক (রাম), বিজয় মুখোপাধ্যায় (অক্ষয়) এই ক'জন শিল্পীর অভিনয় সামগ্রিক প্রয়োজনকে যথেষ্ট পরিমাণে বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছে বলে মনে হয়। ২। ৩টি ছোট ছোট চরিত্র অভিনয়ে নিমাই ঘোষ (সব্যসাচী), অনন্তকুমার মিত্র (কাশীদাদু) অনুশীলনের অভাবে প্রাণহীন মনে হয়েছে। বিনয় খাঁর (অনন্ত) অভিনয় একবারে অচল।

ফেরারী ফৌজ অভিনয় : গত ১১ ডিসেম্বর 'রঙ্গনা' মঞ্চে কমার্শিয়াল রিক্রিয়েশন ক্লাবের দশম নাট্যার্ঘ্য উৎপল দত্তের 'ফেরারী ফৌজ' অভিনীত হয়। শিল্পীদের দলগত অভিনয়ে নাটকটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। সংঘের সভ্য সুহাস ভট্টাচার্যের পরিচালনায় নাটকটি সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হয়। চরিত্রচিত্রণে ছিলেন দাশগুপ্তের মত গুরুহ ভূমিকায় বলরাম রায়, জ্যোতির্ময়ের চরিত্রে নারায়ণ গাঙ্গুলী, যোগেনের ভূমিকায় শৈলেন মজুমদার ও অশোকের চরিত্রে হরিশংকর চক্রবর্তী পেশাদার অভিনেতাকেও ছাপিয়ে যায়। অন্যান্য ভূমিকায় অশ্বিনী ঘোষ, হিরণ্য চ্যাটার্জি, মাখন দত্তচৌধুরী, সরোজ পোদ্দার, সহদাস চক্রবর্তী, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, সন্তোষ সমাজপতি, রবি রা[য়], মৃত্যুঞ্জয় গুপ্ত, দেবু সান্যাল, অধীর কর হরিপদ পাল বলিষ্ঠ অভিনয় করে[ন]। স্ত্রী-চরিত্রে বঙ্গবাসীর ভূমিকায় মলিনাদেবী রাধা নীলিমা দাস ও শচীর ভূমিকায় রু[মা] বড়াল দর্শকদের মনোমুগ্ধ করে রাখে। শিশু শিল্পী মাঃ অংশুমান ও কুমা[রী] ইন্দ্রাণী চক্রবর্তীও অভিনয়ে প্রচুর আনন্দদা[ন] করে।

সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ : এই বৎসর উজ্জয়িনীতে কালিদাস সমারোহে অনু[ষ্ঠি]ত সর্বভারতীয় নাট্য প্রতিযোগিতা[য়] কলকাতার সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ 'অভি[জ্ঞা]ন শকুন্তলম্' নাটক অভিনয় করে প্রথ[ম] পুরস্কার স্বর্ণ-কলস লাভ করেছে। পর[প]র তিন বৎসর এই সর্বভারতীয় নাট্য প্রতি[]যোগিতায় কলকাতার সংস্কৃত সাহি[ত্য] পরিষৎ প্রথম স্থান লাভ করে রেকর্ড স্থাপ[ন] করে। এই নাট্যাভিনয়ে বিশেষ নৈপুণ্যে[র] পরিচয় দেয় শকুন্তলার ভূমিকায় ভাস্বত[ী] সেন, ভরতের ভূমিকায় শান্তনু বন্দ্যো[]পাধ্যায়, দুষ্মন্তের ভূমিকায় দীপক চট্টো[]পাধ্যায়, কণ্বের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচা[র্য] অনুসূয়া গীতা সোম এবং পরিচালক ড[ঃ] সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরি[]চালনা করেন ডঃ হেরম্ব চট্টোপাধ্যায়।

সান্ধ্য আসরের নাট্যার্ঘ 'রং বদলায়'

জ্যোৎস্নাময় বসু বিরচিত 'রং বদলায়' নাটকটি বর্তমান নাট্যনিরীক্ষার ক্ষেত্রে এ[কটি] বলিষ্ঠ প্রয়াস। নাটকের কাহিনীর মূল গড়ে উঠেছে কয়েকটি চরিত্রের আনাগোন[ায়]। সেখানে নাট্যকারের মৌলিক চিন্তাপ্রো[ত] এক আশ্চর্য পরিণতি লাভ করেছে। সম্প্রা[তি] ফারাক্কা ব্যারেজ প্রকল্পের প্রগতিশীল না[ট্য] সংস্থা 'সান্ধ্য আসর' স্থানীয় রিক্রিয়ে[শন] হলে তাদের নাট্যার্ঘ 'রং বদলায়' সাফল্য[ের] সংগে মঞ্চস্থ করেন। জ্যোৎস্নাময় বসু[র] নির্দেশনায় বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন—অণিমা বসু, দত্তা মুখার্জি, বরুণ ঘো[ষ], অরুণকুমার সরকার, অসীম মুখার্জি, স্বদেশরঞ্জন দাশ, অরবিন্দ সেন ও জ্যোৎস্নাময় বসু। আলোকসম্পাত, আবহ সঙ্গীত ও মঞ্চস্থাপত্যের দায়িত্ব পালন করেছেন—পরিমল দত্ত, যাদব মণ্ডল, ইউনিক অর্কেস্ট্রা ও মানব ব্যানার্জি।

একাংক প্রতিযোগিতা : চন্দননগরে 'নাট্যরঙ্গ' আগামী জানুয়ারী মাসের শে[ষ] সপ্তাহে একটি একাংক নাটকের প্রতি[]যোগিতা আহ্বান করেছেন। যে-সব সংস্[থা] এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে চা[ন] তাঁদের রমেন চক্রবর্তী, সম্পাদক 'নাট্যরং' পোঃ গোন্দলপাড়া, চন্দননগর, হুগলী—এ[ই] ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরো[ধ] জানানো হচ্ছে।

জীবন্ত স্ট্যাচু : শৈলেশ গুহ নিয়োগী[র] প্রাণবন্ত নাটক 'জীবন্ত স্ট্যাচু' সম্প্রা[তি] কিশবরপুর মঞ্চে পরিবেশিত হো[ল]

প্রযোজনা করলেন 'হাইকোর্ট কর্মচারী সমিতি'। প্রথমেই বলে রাখি এমন সুষ্ঠু প্রযোজনা অফিস ক্লাবের ক্ষেত্রে খুব কমই দেখা যায়। এই সার্থকতার নেপথ্যে যাঁর শৈল্পিক নিষ্ঠা ও অকৃত্রিম আন্তরিকতা লুকিয়ে আছে, তিনি হলেন নির্দেশক শ্রীবঙ্কিম ঘোষ। নাটকটির প্রতিটি মুহূর্তেই শ্রীঘোষের স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত চিন্তার প্রোজ্জ্বলতাকেই তুলে ধরে।

অভিনয়ের ক্ষেত্রেও শিল্পীদের আন্তরিকতার কোন অভাবই ছিল না। শ্রীবঙ্কিম ঘোষ 'পরিতোষের' ভূমিকায় অভিনয়ও করেন। তাঁর অভিনয় এতো সাবলীল হয় যে দর্শকেরা তাঁকে বারবার স্বীকৃতি জানায়। মনে হয় মঞ্চে 'ব্যাপিকা বিদায়ে'র [illegible]-এর চরিত্রের অসামান্য সাফল্যের পর আর একটি অসাধারণ সৃষ্টি হোল [illegible] ভট্টাচার্যের 'পরিতোষ'।

সুঅভিনীত নাটকটির অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, শশাঙ্ক [illegible], কালীময় মৈত্র, অমিয় মল্লিক, পার্থ মিত্র, কান্তি রায়, রবীন চক্রবর্তী, প্রদীপ মুখোপাধ্যায়, দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, বিমলেন্দু ঘোষ, সন্তোষ বসু, দীপক মজুমদার, নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, তমাল প্রামাণিক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দুলেখা চট্টোপাধ্যায়, আরতি বসু।

সাহেব বিবি গোলাম : বিমল মিত্রের 'সাহেব বিবি গোলামে'র মঞ্চসাফল্য আজ নাট্যানুরাগীদের কাছে অজানা নেই। [illegible] এই নাটকটিকে সেদিন স্টারে পরিবেশন করলেন টেকসম্যাকো স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা। মোটামুটিভাবে নাটকটির মর্মকথাকে মঞ্চের আলোয় পরিস্ফুট করতে পেরেছেন শিল্পীরা। এব্যাপারে নির্দেশক শ্রীতুষার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্বই সবচেয়ে বেশী চোখে পড়েছে। কয়েকটি মুহূর্তে তাঁর পরিচ্ছন্ন শিল্পবোধ [illegible] পেয়েছে।

অভিনয়ের ব্যাপারে বিমান বল (ভূতনাথ [illegible]শী), শ্রীধরদেব মুখার্জি (কৌস্তুভমণি) মন্দিরা রায় (জবা) চরিত্রচিত্রণে নৈপুণ্যের পরিচয় রাখতে পেরেছেন। তবে পটেশ্বরীর ভূমিকায় শমিতা বিশ্বাস আমাদের হতাশ করেছেন। পটেশ্বরীর অন্তর্বেদনা শ্রীমতী বিশ্বাসের অভিনয়ে মনে হয় কোন মুহূর্তেই ধরা পড়েনি। অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায়ের 'চুণীদাসী'ও একটি স্বচ্ছন্দ চরিত্রচিত্রণ হতে পেরেছে।

দুই মহল : বি বি জে (ভি ডবলিউ) স্টাফ ক্লাবের শিল্পীরা সম্প্রতি 'মিনার্ভা' থিয়েটারে মঞ্চস্থ করলেন জোছন দস্তিদারের 'দুই মহল' নাটকটি। নাট্যনির্দেশনার দায়িত্ব নেন অপূর্ব মুখোপাধ্যায়। সামগ্রিক প্রযোজনাটি দর্শকদের কাছে বেশ উপভোগ্যই হয়ে ওঠে।

অভিনয়ের ব্যাপারে যাঁরা বৈশিষ্ট্যের নজীর রাখতে পেরেছেন, তাঁরা হলেন অরবিন্দ

হারানো সুর। সুচিত্রা সেন — পরিচালনাঃ সলিল সেন।

উত্তমকুমার।। ফটো : অমৃত

বসু (লালুয়া), রবীন্দ্র রায়চৌধুরী (রঞ্জন সান্যাল), অপূর্ব মুখোপাধ্যায় (ছোনেরাম), অঞ্জলি ভট্টাচার্য (ওসমানী)। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন জয়দেব মুখোপাধ্যায়, ইরা মিত্র, পারুল বসু, সত্যজিৎ চাটুজ্যে, দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী, ভবতোষ গাঙ্গুলী, শৈলেন কর্মকার, অমিয় রায়, সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, কে সি বারিক, শশাঙ্ক চট্টোপাধ্যায়।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে ওস্তাদ আলি আহমেদ খান

আলাউদ্দিন সংগীতসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণকেন্দ্র ওস্তাদ আলি আহমেদ খাঁ সাহেব তাঁর সংগীত-প্রতিষ্ঠান ও গৃহ ১০৩/বি সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে পরলোকগমন করেন গত ২৭ ডিসেম্বর। ঐ প্রতিষ্ঠানে তিনি শিশু সম্মেলনেরও প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রথম যৌবন থেকে শুরু করে মৃত্যুকাল (৬৮ বছর অবধি) ইনি জাতিধর্মনির্বিশেষে অগণিত শিষ্য-শিষ্যাকে শিক্ষাদানে ব্রতী ছিলেন। গত দু' বছর ধরে পক্ষাঘাত, হাঁপানী ইত্যাদি নানান রোগযন্ত্রণা তাঁর উদ্যমকে স্তিমিত করতে পারেনি। কায়মনোবাক্যে, সর্বপ্রকাশে খ্যাত-অখ্যাত সকল সঙ্গীতানুরাগীকে ইনি প্রয়োজনমত সাহায্য করেছেন।

খাঁ সাহেবের জন্ম অধুনা বাংলাদেশভুক্ত ত্রিপুরা জেলায় ব্রাহ্মণবেড়িয়া মহকুমার শ্রীরামপুর গ্রামে। তাঁর সঙ্গীতগুরু ছিলেন তাঁরই পিতা বিশিষ্ট তন্ত্রসাধক, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ফকির গুলে মহম্মদ খানের কাছে। পরে গুরু আলাউদ্দিনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ওস্তাদ আয়েৎ আলি খানের কা[illegible] *আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের জ্যেষ্ঠ [illegible] বিশিষ্ট সঙ্গীতবিদ ফকির আফতাবু[illegible] খাঁ ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভগ্নীপতি। [illegible] দিন অবধি তিনি সংগীত-সম্মেলন মঞ্চস্থ করার চিন্তায় বিভোর ছিলেন।

তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এক মহান সঙ্গীতপ্রেমিক, উদারহৃদয় শিল্পীর জীব[illegible] বসান ঘটল।

লোকান্তরিত ওস্তাদ হাফেজ আলি খাঁ

প্রখ্যাত সরোদী ওস্তাদ হাফেজ আ[illegible] খাঁ গত ২৮ ডিসেম্বর ৯৫ বছর বয়সে তাঁ[illegible] দিল্লীস্থ বাসগৃহে শেষনিঃশ্বাস তা[illegible] করেন।

সেনী ঘরাণার অন্যতম শিল্পী হাফেজ আলি খাঁ ছিলেন সুরসিদ্ধ। তাঁর সুরেলা হাতের টিপ সঙ্গীতজগতে কিম্বদন্তীরই মত হয়ে আছে।

স্ত্রী ও তিনটি পুত্র রেখে তিনি গেছেন। কনিষ্ঠতম আমজেদ আলি খাঁ—ভারতবিখ্যাত সরোদবাদক। ওস্তাদ হাফেজ আলি খাঁ ওস্তাদ আলাউদ্দিনের গুরুভাই ছিলেন।

পরলোকে প্রখ্যাত চিত্রসাংবাদিক বিজন দত্ত

প্রখ্যাত চলচ্চিত্র সাংবাদিক বিজন দত্ত, ২২ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেছেন। বিজনদা'র—চিত্রসাংবাদিক মহলের ছোট

বড়, সকলেরই তিনি বিজনদা—শরীরটা বেশ কিছুদিন ধরে খারাপই যাচ্ছিল, রক্তচাপ, ডায়াবিটিস প্রভৃতি রোগ তাঁকে পেয়ে বসেছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও তাঁর কলমও যেমন থামেনি, চলাফেরাও তেমনই বন্ধ হয়নি। শেষাশেষি মৃত্যুর মাত্র দিন সাতেক আগে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। এবং শেষ পর্যায়ে ইউরিমিয়া রোগে আক্রান্ত হন।

অধুনা বাংলাদেশভুক্ত খুলনা জেলায় কারাপাড়া গ্রামে ১৯১১ সালে বিজন দত্তের জন্ম হয়। হাওড়া, শিবপুরের বি কে পাল ইনস্টিটিউশন থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পরে তিনি বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে আই এস সি এবং প্রেসিডেন্সী থেকে বি এস-সি পাশ করেন। কিছুদিন তিনি উদ্ভিদবিদ্যায় এম-এস-সিও পড়েছিলেন। চলচ্চিত্র দেখা ও চলচ্চিত্র বিষয়ে পড়াশুনো করার ঝোঁক তাঁর কৈশোর থেকেই। এবং এ-বিষয়ে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'টু আওয়ার ক্যামেরামেন' (ইংরেজী) প্রকাশিত হয় ইংরেজী সাপ্তাহিক দীপালিতে ১৯৩৭ খৃস্টাব্দে। সেই সময় থেকে প্রায় মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি চিত্রসাংবাদিকেরই জীবন যাপন করে গেছেন নিরবচ্ছিন্নভাবে। ইদানীং তাঁর লেখা প্রধানত প্রকাশিত হত উল্টোরথ, সিনেমা জগৎ এবং ইংরাজী স্টার অ্যান্ড স্টাইল পত্রিকায়। তিনি বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে বরাবরই যুক্ত ছিলেন এবং এর সম্পাদক পদও অলংকৃত করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অল্পভাষী ও নিজের মতামত সম্বন্ধে দৃঢ়।

তাঁর পরলোকগমনে আমরা একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে হারালাম। তাঁর নিঃসন্তান স্ত্রীকে সান্ত্বনা জানাবার ভাষা নেই। আমরা তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

যাত্রাভিনেতা তারাপদ সাউ সম্বর্ধিত : বাংলা সাধারণ নাট্যশালার শতবর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষে 'বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন রঙমহল থিয়েটারে গত ৫ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত এক বিশেষ অধিবেশনে সঙ্গীতাচার্য নাট্যশ্রী তারাপদ সাউ মহাশয়কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। সম্মেলন সভাপতি মন্মথ রায়, রত্নমণি চট্টোপাধ্যায়, সুধীরেন ঘোষ, প্রমুখ বিভিন্ন বক্তা 'বাণী সান্ধ্য সমাজ' নামক পারিবারিক যাত্রার দল প্রতিষ্ঠাতা নাট্যশ্রী তারাপদ সাউ কর্তৃক পল্লী অঞ্চলে লোক-শিক্ষামূলক যাত্রাগানের বিনামূল্যে পরিবেশন ব্রতের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সম্বর্ধনা সভার পর বাণী সান্ধ্য সমাজ অবনীনাথ গোস্বামী রচিত 'শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা' নাট্যাভিনয় দ্বারা উপস্থিত সকলের আনন্দ বর্ধন করেন। নাম ভূমিকায় নাট্যশ্রী তারাপদ সাউ-এর অভিনয় দর্শকদের অভিভূত করে।

মিঠু মুখোপাধ্যায়।।

ফটো : অমৃত

রাজা রামমোহন রায় জন্ম দ্বিশত বার্ষিকী উৎসব : গত ৯ই পৌষ (ইং ২৫শে ডিসেম্বর) রবিবার মিত্র সাহিত্য গোষ্ঠীর উদ্যোগে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোডস্থ মিলন মন্দিরে ভারত পথিক রাজা রামমোহন রায়ের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উৎসব প্রতিপালিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ডঃ শিবদাস চক্রবর্তী। তিনি তাঁর ভাষণে রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম, সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারের প্রতি আলোকপাত করে বিস্তৃত আলোচনা করেন। মিত্রর সদস্যরা রামমোহন রায় প্রসঙ্গে রবীন্দ্র প্রশস্তি পাঠ ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন। অবশেষে শ্রীঅরুণ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর সহযোগী শিল্পীরা এদিনের বিশেষ অনুষ্ঠান 'ভারত পথিক রামমোহন' গীতি আলেখ্য পরিবেশন করেন।

সাংস্কৃতিকী হাওড়া : গত ৭ ডিসেম্বর ১৯৭২, সন্ধ্যা ৭টায় 'সাংস্কৃতিকী হাওড়ার' বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় 'বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ পূর্তি উৎসব' উপলক্ষে সংস্থার কার্যালয়ে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক প্রভাতকুমার দত্ত এবং বিশিষ্ট বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাংস্কৃতিক সম্মেলন : সম্প্রতি আগরপাড়া স্বরলিপি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় তাদের দ্বাদশ সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন স্থানীয় যুগবাণী সংঘ প্রাঙ্গনে। বিদ্যালয়ের সম্পাদক রমানন্দ চক্রবর্তীর সম্পাদকীয় ভাষণের পর অনুষ্ঠান সুরু হয়। প্রথমে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এককভাবে যন্ত্রসঙ্গীত, নৃত্য এবং [illegible]

পরিবেশন করেন। অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল নাগা নৃত্য, কৃষাণ-কৃষাণী নৃত্য এবং পৃথিবীর জন্ম (নৃত্যনাট্য)। এককভাবে নাগানৃত্য পরিবেশন করে কুমারী তপতী সিংহ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই অংশে সঙ্গীতে ছিলেন সজল দে। কৃষাণ-কৃষাণী নৃত্যে অংশ গ্রহণ করে, কাকলী নাগ, স্বপ্না বিশ্বাস, ইন্দ্রাণী ঘোষাল, বিজলী দাস, মনীষা সিংহ এবং কাবেরী বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন সজল দে। অনুষ্ঠানের অন্যতম এবং প্রধান আকর্ষণ ছিল পৃথিবীর জন্ম নৃত্য-নাট্য। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সঙ্গীত এবং নৃত্যের মাধ্যমে নৃত্যনাট্যটিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছিল। নৃত্যে এবং সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করে মধুমিতা প্রধান, ইন্দ্রাণী ঘোষাল, প্রদীপ্ত রায়, মনীষা সিংহ, বিজলী দাস, কাকলী নাগ, তপতী সিংহ, স্বপ্না বিশ্বাস, মণিকা ভৌমিক, ডলী চক্রবর্তী, কাবেরী বন্দ্যোপাধ্যায়, সুস্মিতা দত্ত, ভাস্বতী লাহিড়ী, মৌসুমী সুর, বিনীতা দাস, শাস্তা দত্ত, ছন্দা নন্দী, কল্যাণী দত্ত, আশীষ নন্দী, গৌরী ভট্টাচার্য, সুব্রত চন্দ্র, কল্যাণী দত্ত, তপতী সরকার, মহাশ্বেতা দে, শুক্লা চন্দ, সুস্মিতা চক্রবর্তী, গৌরী চক্রবর্তী, গায়ত্রী চক্রবর্তী, শুভ্রা চন্দ। নৃত্য পরিকল্পনা এবং পরিচালনায় ছিলেন রুবী সিংহ। সঙ্গীত পরিচালনা করেন রমানন্দ চক্রবর্তী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন ত্রিদিবরঞ্জন লাহিড়ী এবং রবীন্দ্রনাথ নন্দী।

মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতি বার্ষিকী:

গত ১৭ ডিসেম্বর শিয়ালদহ প্রেম কাউন্ট ইন্সটিটিউটে মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় স্মৃতি সমিতির উদ্যোগে ও কলিকাতা হাই-কোর্টের বিচারপতি মাননীয় শ্রীনিখিলচন্দ্র তালুকদারের সভাপতিত্বে স্বর্গীয় মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ৩৮তম স্মৃতি বার্ষিক অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। তাতে বিভিন্ন বক্তা ও সভাপতি মহোদয় আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজে তবলাচর্চার প্রচলনে মন্মথনাথের স্মরণীয় অবদানের কথা উল্লেখ করেন এবং এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণকারী শিল্পীরা সঙ্গীতের মাধ্যমে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সঙ্গীতাংশের প্রারম্ভে পূরিয়া রাগে আলাপ ও ধ্রুপদ পরিবেশন করেন সঙ্গীতাচার্য শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। বয়সে বেশ প্রবীণ হলেও তাঁর কণ্ঠে যে এখনও বেশ সতেজ ও কমনীয় তার পরিচয় পাওয়া গেল। পূরিয়ার অন্তর্নিহিত ভাবকে পরিস্ফুট করে তিনি পরিণত শিল্পচিন্তার স্বাক্ষর রেখেছেন। এই শিল্পীর গান আমাদের কলকাতা বেতার কেন্দ্রে বা সঙ্গীত সম্মেলনগুলিতে শুনতে পাওয়া যায় না, শ্রোতাদের এজন্য বেদনা বোধ স্বাভাবিক। এঁর সঙ্গে চমৎকার ও উপভোগ্য সঙ্গত করেন সুখ্যাত

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ।। ফটো ঃ অমৃত

মার্দঙ্গিক শ্রীব্রজবিলোচন দে। তৈরী হাতে নানা প্রকার ছন্দের বোলে তবলার ত্রিতালের লহরা বাজিয়ে শ্রোতাদের প্রশংসা পান মন্মথনাথের পৌত্র ও শ্রীহীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র ও শিষ্য শ্রীমান তাপস। সঙ্গে হারমোনিয়ামে ছিলেন রাখেন শ্রীদেবাশিস ভট্টাচার্য। পণ্ডিত রতন ঝনকারের এবং শ্রীমতী গিরিজা দেবীর শিষ্যা বারাণসীর কুমারী মঞ্জু সামন্তের পরিবেশন কল্যাণের খেয়াল গানে তাঁর রাগ রূপায়ণের দক্ষতায়, সাবলীল ও বৈচিত্র্যময় তানে এবং বিশেষ করে তাঁর অনুপম কণ্ঠমাধুর্যের আবেদনে শ্রোতারা মুগ্ধ হয়েছেন। ঠুংরি ও ভজন গানেও তিনি সমান পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। এঁর সঙ্গে প্রাণবন্ত সঙ্গত করেন ওস্তাদ আফাক হোসেন খাঁ। পরিশেষে সেতারে শ্রীমণিলাল নাগ বাজান যোগ রাগ। সঙ্গে তবলা বাজান শ্রীহীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। সর্বভারতীয় খ্যাতিসম্পন্ন এই দুই নবীন ও প্রবীণ শিল্পী তাঁদের স্বরসাধনের সুর ও ছন্দের মাধুর্যে শ্রোতাদের যেভাবে অভিভূত করেছেন তার স্মৃতি তাঁদের মনে দীর্ঘদিন অম্লান থাকবে।

ভারতীয় সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান:

গত ২৮ ডিসেম্বর ৭৭তম নিখিল ভারত কংগ্রেস অধিবেশনের সাংস্কৃতিক মঞ্চে বিকেল সাড়ে চারটায় ভারতীয় সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম' শীর্ষক একটি সঙ্গীত-আলেখ্য পরিবেশন করেন। এই আলেখ্যটি রচনা ও পরিচালনা করেন লোকেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত। তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনায় ছিলেন যথাক্রমে ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী শান্তি রায়। অংশ গ্রহণ করেন মণিলাল ঘোষ, প্রণব চৌধুরী, পার্থসারথী দত্ত, সবিতা দে, শিখা বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণী চট্টোপাধ্যায়, শিখা রায়, মঞ্জুষা রায়, দ্বিজেন্দ্র বিশ্বাস, অমিতা বিশ্বাস ও অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়।

দর্শক

ভারত বনাম ইংল্যাণ্ড

প্রথম টেস্ট খেলা

ফিরোজশা কোটলা মাঠে ভারতের বিপক্ষে ১৯৭২-৭৩ সালের টেস্ট ক্রিকেট সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ড ৬ উইকেটে জয়ী হয়ে নজির সৃষ্টি করেছে। এই নিয়ে এই মাঠে এই দুই দেশের মধ্যে যে চারটে টেস্ট খেলা হল তার ফলাফল ড্র ৩ এবং ইংল্যান্ডের জয় ১। ইংল্যান্ডের অধিনায়ক টনি লুইস নিঃসন্দেহে খুবই ভাগ্যবান এবং ইংল্যান্ডের পয়মন্ত অধিনায়ক এই কারণে যে, তিনি ইতিপূর্বে কোন টেস্ট ম্যাচ না খেলেই বর্তমান ইংল্যান্ড দলের অধিনায়কের পদ লাভ করেছেন এবং তাঁরই নেতৃত্বে ইংল্যান্ড প্রথম টেস্ট খেলাতেই শক্তিশালী ভারতের বিপক্ষে জয়ী হয়েছে। অপরদিকে অজিত ওয়াদেকারের নেতৃত্বে ভারতের পরাজয় এই প্রথম। ইংল্যান্ড বনাম ভারতের বিগত ৪১টি টেস্ট খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে : ভারতের জয় ৬, ইংল্যান্ডের জয় ১৯ এবং খেলা ড্র ১৮।

ভারতবর্ষ টসে জিতে প্রথমেই ব্যাট করার দান নেয়। প্রথম দিনে ভারতবর্ষের ১ম ইনিংসের ৭টা উইকেট পড়ে মাত্র ১৫৬ রান উঠেছিল। প্রথম দিনটা ইংল্যান্ডের সাফল্যেরই দিন ছিল। অধিনায়ক টনি লুইস খেলায় ঠিকমত বোলার বদল করে যথেষ্ট সাফল্য লাভের সূত্রে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের রান ছিল লাঞ্চের সময় ৩ উইকেট পড়ে ৪৩

ফারুক ইঞ্জিনিয়ার

আবিদ আলী

এবং চা-পানের সময় ৬ উইকেট পড়ে ১০৪। চা-পানের বিরতির সময় খেলায় অপরাজিত ছিলেন আবিদ আলি (২৩ রান) এবং সোলকার (৭ রান)। এই ৭ম উইকেট জুটিই ৫৬ মিনিটে দলের ৪৩ রান তুলে ভারতের মুখরক্ষা করেছিলেন। ভারতের ১২৩ রানের মাথায় সোলকার নিজস্ব ২০ রান করে আউট হন।

দ্বিতীয় দিনে ভারতবর্ষের ১ম ইনিংস ১৭৩ রানের মাথায় শেষ হয়। এই দিন তারা মাত্র ৩৭ মিনিট খেলে বাকি ৩টে উইকেটের বিনিময়ে প্রথম দিনের ১৫৬ রানের (৭ উইকেটে) সঙ্গে ১৭ রান যোগ করেছিল। ৮ম উইকেটের জুটিতে ভেংকট

একনাথ সোলকার

টনি গ্রীগ

(১৭ রান) এবং আবিদ আলি ৯৫ মিনিটে দলের ৪৬ রান তুলেছিলেন। তাদের ৮ম উইকেট জুটির এই ৪৬ রানই ভারতের ১ম ইনিংসের খেলায় যে-কোন উইকেট জুটির সর্বোচ্চ রান। ১ম ইনিংসে আবিদ আলির ৫৮ রানই ছিল দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান।

দ্বিতীয় দিনের খেলার বাকি সময়ে ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংসের ৬টা উইকেট পড়ে ১৫১ রান উঠেছিল। চন্দ্রশেখর ৫৬ রানে ৪টে এবং বেদী ৫৯ রানে ২টো উইকেট নিয়ে ভারতের অনুকূলে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। ইংল্যান্ডের অধিনায়ক টনি লুইস তাঁর খেলোয়াড় জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নেমে 'গোল্লা' করে মাঠ থেকে ফিরে যান।

দ্বিতীয় দিনে ইংল্যান্ডের অসমাপ্ত ১ম ইনিংসের খেলায় গ্রীগ (৪৩ রান) এবং আরনল্ড (১২ রান) অপরাজিত ছিলেন। দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের সময় ইংল্যান্ডের রান ছিল ৩৬ (কোন উইকেট না পড়ে)। লাঞ্চের পর তাদের ৬৯ রানের মাথায় সংকট সরূ

বি এস চন্দ্রশেখর

হয়। ৬৯ রানের মাথায় ২য় এবং ৭১ রানের মাথায় ৩য় ও ৪র্থ উইকেট পড়ে যায়। এত কম সময়ের মধ্যে তিনটে উইকেট পড়ে যে, টনি গ্রীগ তাঁর 'অ্যাবডোমেন গার্ড' পরার সময় পাননি, মাঠে খেলতে নেমে সেই ভুল ধরা পড়ে।

তৃতীয় দিনে লাঞ্চের ২০ মিনিট আগে ইংল্যাণ্ডের ১ম ইনিংস ২০০ রানের মাথায় শেষ হলে তারা নামমাত্র ২৭ রানে এগিয়ে যায়। ইংল্যাণ্ড তাদের শেষ ৪ উইকেটে ৪৯ রান যোগ করেছিল। টনি গ্রীগ দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ৬৯ রান করে নটআউট থেকে যান। গ্রীগ ২৭৩ মিনিট খেলে তাঁর নটআউট ৬৯ রানে ৮টা বাউণ্ডারী এবং একটা ওভার-বাউণ্ডারী করেছিলেন। এই নটআউট ৬৯ রান তাঁর টেস্ট খেলার এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান।

ইংল্যাণ্ডের ১ম ইনিংসে চন্দ্রশেখর ৮০ রানে ৮টা উইকেট পান। তাঁর আগে ইংল্যাণ্ড-ভারতবর্ষের টেস্ট খেলায় এক ইনিংসে ৮টা উইকেট পেয়েছেন মাত্র দুজন —ভারতবর্ষের পক্ষে ভিনু মানকাদ (৫৫ রানে ৮টি উইকেট, মাদ্রাজ, ১৯৫১-৫২) এবং ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ফ্রেডী ট্রুম্যান (৩১ রানে ৮টি উইকেট, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৫২)।

তৃতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় ভারতবর্ষ ২য় ইনিংসের ৫টা উইকেট খুইয়ে ১২৩ রান সংগ্রহ করেছিল। খেলায় অপরাজিত ছিলেন সোলকার (৩০ রান) এবং ইঞ্জিনিয়ার (৩ রান)। এইদিন সরদেশাই ১০ রান সংগ্রহ করার সঙ্গে সরকারী টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর ২০০০ রান পূর্ণ করেন। আলোচ্য প্রথম টেস্ট খেলার শেষে তাঁর টেস্ট পরিসংখ্যান দাঁড়ায়ঃ খেলা ৩০, ইনিংস ৫৫, নটআউট ৪ বার, মোট রান ২০০০, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২১২ (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, কিংস্টন, ১৯৭১) এবং সেঞ্চুরী ৫ (দুটি ডাবল সেঞ্চুরীসহ)।

চতুর্থ দিনে লাঞ্চের ১৯ মিনিট পর ভারতবর্ষের ২য় ইনিংস ২৩৩ রানের মাথায় শেষ হয়। ভারতবর্ষ চতুর্থ দিনের খেলায়

বিষেণ সিং বেদী
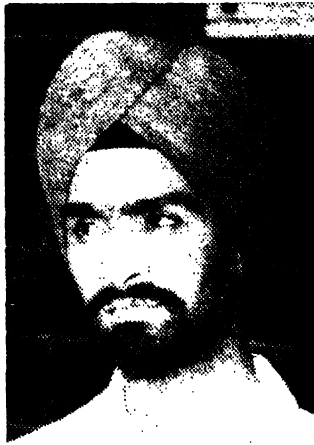
শেষ ৫টা উইকেটে পূর্ব দিনের ১২৩ রানের (৫ উইকেটে) সঙ্গে ১১০ রান যোগ করেছিল। লাঞ্চের সময় ভারতবর্ষের রান ছিল ২০৬ (৫ উইকেটে)। লাঞ্চের পর মাত্র ২০ মিনিটের খেলায় ৩টে উইকেট খুব তাড়াতাড়ি পড়ে রান দাঁড়ায় ২১১ (৮ উইকেটে)। সোলকার এবং ইঞ্জিনিয়ার ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ১০৩ রান তুলে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। সোলকার ২৭৭ মিনিট খেলে তাঁর ৭৫ রানে ১১টি বাউণ্ডারী করেন। অপরদিকে ইঞ্জিনিয়ার ১৭১ মিনিটে তাঁর ৬৩ রানে বাউণ্ডারী করেন ৮টা।

ভারতবর্ষের ২য় ইনিংস ২৩৩ রানের মাথায় শেষ হলে ইংল্যাণ্ড জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২০৭ রান তুলতে ২য় ইনিংস খেলতে নামে এবং ৩ উইকেটের বিনিময়ে ১০৬ রান সংগ্রহ করে। উড (৪৫ রান)

জিওফ আরনল্ড

এবং অধিনায়ক লুইস (১৭ রান) খেলায় অপরাজিত থেকে যান। এইদিন বিষেণ সিং বেদী কিথ ফ্লেচারের উইকেট নেওয়ার সঙ্গে তাঁর সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় জীবনে ১০০ উইকেট পূর্ণ করার গৌরব লাভ করেন। এখানে উল্লেখ্য, তাঁর আগে সরকারী টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের পক্ষে ১০০ উইকেট পূর্ণ করেছেন এই তিনজন —ভিনু মানকড় (১৬২টি উইকেট), সুভাষ গুপ্তে (১৪৯টি উইকেট) এবং এরাপল্লী প্রসন্ন (১২৪টি উইকেট)।

পঞ্চম দিনে খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের সাড়ে তিন ঘণ্টা আগে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায়। ইংল্যাণ্ড ৪ উইকেটের বিনিময়ে ২০৮ রান তুলে ৬ উইকেটে জয়ী হয়। লাঞ্চের ৫ মিনিট পর গ্রীগের ব্যাট থেকেই জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান ওঠে।

সংক্ষিপ্ত ফলাফল

ভারতবর্ষ : ১৭৩ রান (আবিদ আলী ৫৮ রান। আরনল্ড ৪৫ রানে ৬, [illegible] ৬৬ রানে ২ এবং গ্রীগ ২২ রানে ২ উইকেট)।

ও **২৩৩ রান** (সোলকার ৭৫ এবং ইঞ্জিনীয়ার ৬৩ রান। আণ্ডারউড ৫৬ রানে ৪, আরনল্ড ৪৬ রানে ৩ এবং পোকক ৭২ রানে ৩ উইকেট)।

ইংল্যাণ্ডঃ ২০০ রান (গ্রীগ নট আউট ৬৯ এবং অ্যামিস ৪৬ রান। চন্দ্রশেখর ৮০ রানে ৮ এবং বেদী ৫৯ রানে ২ উইকেট)।

ও **২০৮ রান** (৪ উইকেটে। উড ৪৫, লুইস নট আউট ৭০ এবং গ্রীগ নট-আউট ৪০ রান। বেদী ৫০ রানে ৩ উইকেট)।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্য প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতের' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫·০০	টাকা ৩০·০০
ষাণ্মাষিক	টাকা ১২·৫০	টাকা ১৫·৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬·২৫	টাকা ৮·০০

বিঃ দ্রঃ—উৎপাদন শুল্কের হার
(চাঁদার সহিত অবশ্য প্রেরণীয়)

বার্ষিক	টাকা	১·০২
ষাণ্মাষিক	টাকা	০·৫২
ত্রৈমাসিক	টাকা	০·২৬

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২০১ (১৪ লাইন)

১২শ বর্ষ
৩য় খণ্ড

৩৬ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক—২ পয়সা
মোট—৫২ পয়সা

Friday, 12th January, 1973 শুক্রবার, ২৮ পৌষ, ১৩৭৯ **.52 Paise**

এক নজরে

ছুটির হিসাব : মহামানবের সাগরতীর এই ভারত হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন-পারশিক ও মুসলমান-খৃষ্টানের মাতৃভূমি হওয়ার সুফল বোধহয় এদেশের চাকুরিজীবীরাই সর্বাধিক ভোগ করে থাকেন। নতুন বছরের ক্যালেণ্ডারটির দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, মোটামুটিভাবে বাহান্নটি রবিবার বাদে সরকারি ছুটির দিন আছে আরও ২৩টি। নিঃসন্দেহে এটি ভারতের একটি রেকর্ড বিশেষ। ইংলণ্ডে সরকারি ছুটির দিন মাত্র পাঁচটি। এমনকি পয়লা জানুয়ারিও সে দেশে ছুটির দিন নয়। অথচ ঐ ইংরাজরাই এদেশে শাসক থাকাকালে যে একদা খৃষ্ট বর্ষের প্রথম দিনটিকে সরকারি ছুটির দিন বলে চিহ্নিত করেছিলেন তা আমরা আজও অপরিবর্তিত রেখেছি। খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের কথা স্মরণ রেখে, এবং সঙ্গত কারণেই, ভগবান যীশুর আবির্ভাবের শুভ দিন 'ক্রীষ্টমাস ডে' বড়দিনকেও আমরা সরকারি ছুটির দিন বলে ঘোষণা করেছি। ইংলণ্ডেও বড়দিন ছুটির দিন, কিন্তু বৃটেনেরই অপর অংশ স্কটল্যাণ্ডে ঐদিন ছুটি থাকে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধর্মীয় ও লৌকিক মিলিয়ে সারা বছরে মোট সাতদিন সরকারি ছুটি, শুধু ইহুদিদের জন্য আরও একদিন বেশি ছুটি। হিন্দু, মুশলিম, বৌদ্ধ বা শিখ ধর্মের পুণ্যদিনে খৃষ্ট দুনিয়ায় ছুটি দেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। একই কারণে মুশলিম দুনিয়াতেও ছুটির দিন সীমিত। সুতরাং বহু ধর্মাবলম্বী হওয়ার জন্য এটা আমাদের একটা উপরি লাভ বলা যেতে পারে। ছুটির তালিকায় ধীরে ধীরে বুদ্ধ, নানক সকলেই স্থান করে নিচ্ছেন।

তবে এর অন্য একটা দিকও আছে যা মনে রাখলে আমাদের এই বিশেষ সুবিধাটাকে আর তেমন একটা সুবিধা বলে মনে হবে না। পশ্চিম দুনিয়ার প্রায় সব দেশেই এখন ছয়দিন-সপ্তাহের বদলে পাঁচদিন-সপ্তাহ চালু হয়েছে। সুতরাং সপ্তাহে দুদিন ছুটির দৌলতে ঐখানেই ওরা ছুটির ব্যাপারে আমাদের চেয়ে বাহান্ন দিন এগিয়ে গেছে। আমাদের ছয়দিন কাজের সময় ওদের দেশে পাঁচ দিন কাজের সময়ে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। যার ফলে তাদের দৈনিক কাজের ঘণ্টা আমাদের নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে বেশি। কিন্তু সপ্তাহান্তে শনি-রবি দুদিন ছুটির ব্যবস্থা থাকলে ঐ অতিরিক্ত পরিশ্রমটুকু মেনে নিতে বোধহয় কারও আপত্তি হবে না। তখন যাবতীয় পূজাপর্ব উৎসব অনুষ্ঠানে ছুটি পাওয়ার ব্যাপারটাকে এত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হবে না।

অভিযোগ মুক্তি : খবরটি ফ্রান্সের পূর্বাঞ্চলের বেলফোর্ট শহর থেকে প্রচারিত। সেখানকার এক উচ্চ বিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপিকা শ্রীমতী নিকোল মার্সিয়ারের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ আনা হয়েছিল যে, ছাত্রীদের কাছে যৌন প্রচার পত্রিকা পাঠ করে তিনি সমাজজীবনের নৈতিক মান ক্ষুণ্ণ করেছেন। আদালতে শ্রীমতী মার্সিয়ার অভিযুক্ত হওয়ার পর তা নিয়ে এমন হৈচৈ পড়ে যায় যে সমগ্র বিষয়টি নিয়ে একটা জাতীয় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। মামলার বিবরণ নিয়মিতভাবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। শ্রীমতী মার্সিয়ারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এক ছাত্রীর অভিভাবক।

অভিযোগের উত্তরদানকালে শ্রীমতী মার্সিয়ার বিচারপতি সমীপে নিবেদন করেন যে, ক্লাসের ছাত্রীদের অনুরোধেই তিনি 'লেট আস লার্ন টু লাভ এণ্ড এনজয় আওয়ারসেল্‌ভস' পুস্তিকাটির কিছু কিছু অংশ পাঠ করে শোনান ও প্রয়োজনে ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আগে কারও আপত্তি আছে কিনা তাও তিনি ছাত্রীদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন। প্রেমকে কিভাবে সার্থক ও সুন্দর করে তোলা যায়, কিভাবে প্রেম দাম্পত্যজীবনের বন্ধনকে মধুর করে তোলে—তাই ছিল ঐ রচনার আলোচ্য বিষয়।

শ্রীমতী মার্সিয়ারের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়। ঐ কমিটিই আদালতের কাছে অভিযুক্তাকে নির্দোষ বলে অভিমত দেন। শ্রীমতী মার্সিয়ারকে অভিযুক্ত করা নিয়ে বেলফোর্টের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এমন বিক্ষোভ আন্দোলনের সৃষ্টি হয় যে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সেখানকার তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই ডিসেম্বর মাসে পাঁচদিনের জন্য বন্ধ রাখেন।

মুক্ত কারাগার : একদা কারাদণ্ডকে অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থা বলেই মনে করা হত। সেকারণে কারাদণ্ডের সঙ্গে নানা কঠোর শ্রমের ব্যবস্থা ছিল কারার অভ্যন্তরে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সমাজবিজ্ঞানীদের ধারণার পরিবর্তন হতে থাকে এবং কারাদণ্ডকে শাস্তি না ভেবে সংশোধনের কাল বলে মনে করার প্রস্তাব ওঠে। আর সেই প্রস্তাব মত জেলের অভ্যন্তরেও সংস্কার শুরু হয়। জেলে কয়েদিদের শাস্তির বদলে শিক্ষাদান শুরু হয় এবং যাতে তারা মুক্তির পর স্বাভাবিক জীবনযাপনের সুযোগ পায় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। ঐ পরিবর্তিত চিন্তাধারারই পরিণতিরূপে মুক্তকারাঙ্গনের প্রস্তাব ওঠে। ভারতে প্রথম বাঙ্গালোরে একটি মুক্ত কারাগার গঠিত হয় এবং সে কারাগারে ২৫ জন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডিতকে প্রেরণ করা হয়। সেই ২৫ জন বন্দী গত এক বছরে ১২৫ একর জমিতে যে আধুনিক কৃষি খামার গড়ে তুলেছে তা মুগ্ধ করেছে মহীশূর সরকারকে, এবং সেই উৎসাহে মহীশূর সরকার আরও একটি মুক্ত কারাঙ্গন স্থাপনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। বাঙ্গালোর জেলার কোরামঙ্গল গ্রামে কৃষির অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দু'শ' বন্দীকে নিয়ে ঐ মুক্ত কারাঙ্গন শুরু হবে এবং কর্তৃপক্ষের সুনিশ্চিত বিশ্বাস, ঐ পরীক্ষাও ব্যর্থ হবে না।

যারা অভাবের তাড়নায়, বিপথচালিত হয়ে অথবা মুহূর্তের উন্মত্ততায় একটা কঠিন অপরাধ করে বসে তারা যে ক্ষমার অযোগ্য নয় এবং সুযোগ পেলে তারাও যে মানবসমাজের কল্যাণে সাগ্রহে আত্মনিয়োগ করে, মুক্ত কারাগুলির সাফল্য তারই সুনিশ্চিত প্রমাণ। স্নেহ ভালবাসা দিয়ে যা পাওয়া যায়, শাস্তি দিয়ে বা রক্তচক্ষু দেখিয়ে তা পাওয়ার আশা দুরাশা মাত্র।

—প্রত্যক্ষদর্শী

অন্ধ্র ও আসামে অশুভ সংকেত

অন্ধ্র ও আসামে আঞ্চলিকতাবাদী আন্দোলন সারা ভারতে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। উভয় রাজ্যেই পরিস্থিতি অস্বাভাবিক। আসামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিপন্ন, নির্যাতিত এবং ব্যাপকভাবে বিতাড়িত। অন্ধ্রে একই ভাষাভাষী লোক আঞ্চলিকতার নামে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী; অবিশ্বাস ও সংশয় গোটা রাজ্যের ঐক্যবদ্ধ অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছে। দুটি রাজ্যের অবস্থা মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। জাতীয় সংহতি ও সাম্প্রদায়িক ঐক্যের দোহাই দিয়েও অবস্থা আয়ত্তে আনা যাচ্ছে না। বিধাননগরে কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীর রূপায়ণই হল তার মধ্যে মুখ্য। অন্ধ্র কিংবা আসামের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে আমরা এই ভেবে শংকিত না হয়ে পারি না যে, বিভিন্ন অঞ্চল ও ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে স্থায়ী ঐক্য ও সম্প্রীতিবোধের যেখানে অভাব সেখানে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পদে পদে ব্যাহত হতে বাধ্য। কার্যত তাই হচ্ছে। অন্ধ্র ও আসাম নিজেদের নিজেদের পায়েই কুড়ুল মারছে এই আত্মঘাতী বিক্ষোভ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটিয়ে।

আসামের ঘটনার জের চলছে এখনও। কিছুতেই আসাম সরকার তাঁদের ভাষানীতি নমনীয় করতে রাজী হচ্ছেন না। আসামে যে বিপুল সংখ্যক সংখ্যালঘু বাংলাভাষী আছেন এবং অনসমীয়াভাষী খণ্ডজাতি আছেন তাঁদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করে আসাম সরকার, গৌহাটি ও ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের একটি অদূরদর্শী ভাষা-প্রস্তাব মেনে নিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে দলদার্শিতার পরিচয় দিয়েছেন, আমরা আশা করেছিলাম আসাম সরকার তার কাছে আত্মসমর্পণ না করে নিজের রাজ্যের সর্বশ্রেণীর সাধারণের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে সেই ভাষানীতির পরিবর্তন করবেন। দুঃখের বিষয়, আঞ্চলিকতাই আজকাল জাতীয়তার স্থান নিয়েছে; সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থে সংখ্যালঘুদের নির্যাতনই গণতান্ত্রিক অধিকাররূপে পরিচিত হচ্ছে। তার ফলে আজ বহিষ্কৃত বিতাড়িত বাংলাভাষী ছাত্রছাত্রীরা ফিরে যেতে পারছে না ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় তাদের স্কুল-কলেজে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশরৎচন্দ্র সিংহের আশ্বাসও তারা মেনে নিতে পারছে না। কারণ, উগ্রভাষাপন্থীদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করতে আসাম সরকার ব্যর্থ হয়েছেন। কাছাড় জেলার বাংলাভাষীরাও শংকিত। কারণ সেখানে বাংলাভাষীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও আসাম সরকার সেখানে অসমীয়া ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চালু করতে বদ্ধপরিকর। এ এক আশ্চর্য ভাষানীতি। গণতন্ত্রের এমন বিকৃতি দেশের ভাবগত সংহতির মূলে কুঠারাঘাত করছে।

অন্ধ্রের অবস্থা আরও বিচিত্র। এখানে সবাই এক ভাষাভাষী; তেলুগুভাষী অন্ধ্র ও তেলেঙ্গানা সংযুক্ত হয়ে গড়ে উঠেছে অন্ধ্রপ্রদেশ। এখন মুল্কি বিধি রাখা এবং না-রাখার প্রশ্নে এই দুই অঞ্চলের মধ্যে চলেছে এক সাংঘাতিক লড়াই। অন্ধ্র এলাকায় বিক্ষোভ এমন মারাত্মক আকার নিয়েছে যে, সেখানে পুলিশের গুলিতে হতাহত হয়েছে লোক। নন-গেজেটেড সরকারী কর্মচারীরা ধর্মঘট করে সরকারী কাজকর্ম দিয়েছে অচল করে। কর বন্ধ আন্দোলনের হুমকিও দেওয়া হয়েছে। তার ফলে অবস্থা খুবই সাংঘাতিক। কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে মধ্যস্থতা করতে গিয়ে পার্লামেন্টে মুল্কি বিধি সংরক্ষণের জন্য একটি আইন পাশ করিয়েছেন। এর উদ্দেশ্য হল অনগ্রসর তেলেঙ্গানা অঞ্চলের জন্য আরও কিছুকাল চাকুরির সুযোগ-সুবিধা রক্ষা করা। কিন্তু রাজধানী হায়দরাবাদ-সেকেন্দ্রাবাদে এই আইন চালু রাখতে দিতে অন্ধ্রবাসীদের আপত্তি। একটি রাজ্যের রাজধানীতে যদি সকল শ্রেণীর লোক সকল সুযোগ-সুবিধা না পায়, তাহলে আপত্তি হবেই। তাই তাঁরা এখন চাইছেন, সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল; দরকার নেই বিশাল অন্ধ্রের, তেলেঙ্গানা আলাদা হয়ে যাক। ঘটনার গতি দেখে মনে হচ্ছে, অন্ধ্র বিভাগ ছাড়া গতি নেই। অথচ অন্ধ্র-রাজ্য গঠনের দাবিতেই ভারতে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন আন্দোলনের সূত্রপাত। অন্ধ্রবাসীরাই একদিন সাগ্রহে প্রাক্তন নিজামশাহীর অন্তর্গত হায়দরাবাদ রাজ্যকে, যার অন্তর্গত তেলেঙ্গানা, নিজেদের বৃহৎ পরিবারে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন।

আসল ব্যাধি অন্যত্র। শুধু ভাষার পালিশ দিয়ে রাজ্যের বুনিয়াদ শক্ত করা যায় না। ভাষা নিশ্চয়ই ঐক্যস্থাপনের একটি বড় উপাদান। কিন্তু তা একমাত্র উপাদান নয়। অর্থনৈতিক স্বার্থের বিরোধ বাধলে ভাষার স্বর্ণসূত্রও যায় ছিন্ন হয়ে। তেলুগুভাষী অন্ধ্ররাজ্যে তেলেঙ্গানা অঞ্চল অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনগ্রসর। যতদিন এই অঞ্চল রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলের সমান অগ্রসর হতে না পারবে, ততদিন থাকবে এই বিক্ষোভ। সুতরাং তার সমাধান আগে করা দরকার। তাহলেই তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রের প্রকৃত ঐক্য স্থাপিত হবে। আসামের অবস্থা স্বতন্ত্র। সেখানে এক শ্রেণীর উগ্রভাষাপ্রেমী সংকীর্ণ আঞ্চলিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে গোটা রাজ্যে অস্থিরের অশান্তি ডেকে এনেছে। মাতৃভাষার প্রতি আবেগ যখন উৎকট হয়ে ওঠে, তখনি অন্য ভাষাভাষীদের পক্ষে তা হয় বিপজ্জনক। আমাদের গণতান্ত্রিক শিক্ষার অপূর্ণতাই এর জন্য দায়ী। এই অশুভ শক্তি দূর করতে না পারলে জাতীয় সংহতির বুনিয়াদ ভেঙে পড়বে। অন্ধ্র ও আসামে যার সূচনা, তা অন্যত্রও দেখা দেবার আশংকা। সুতরাং এখনি সাবধান হবার সময়।

দেশে বিদেশে

বিধাননগরে কংগ্রেস অধিবেশন হয়ে যাওয়ার পর এখন ঐ অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করার পালা। এই উদ্দেশ্যে কংগ্রেস সভাপতি ডঃ শঙ্করদয়াল শর্মা আগামী ৩১ জানুয়ারি নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রীদের ও প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিগুলির সভাপতিদের এক সম্মেলন আহ্বান করেছেন। তার আগে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন বসছে এবং তার পর জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলির সভাপতি ও সম্পাদকদের বৈঠক। এইসব সম্মেলন ও বৈঠকের একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয় হবে, কংগ্রেসের কি সাংগঠনিক পরিবর্তন আনা যায়। বিধাননগরের কংগ্রেস অধিবেশনে এবার এই কথাটা বিশেষভাবে উঠেছিল। কংগ্রেস সভাপতি বলেছেন, দলের সিদ্ধান্তগুলি রূপায়িত করার ভার শুধু প্রশাসনের উপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। কারণ, আমাদের বর্তমান প্রশাসনের ভিতর যে স্বাভাবিক ঝোঁক রয়েছে সেটা অস্তিবানদের দিকে। সেই কারণে এই বিষয়ে দলের একটা বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। দলকে সেই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হলে একটি কর্মী বাহিনী গড়ে তুলতে হবে।

মুশকিল হচ্ছে এই যে, যদিও কংগ্রেস দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল তাহলেও "কেডার" বলতে যা বোঝা যায় কংগ্রেসের তেমন কিছু নেই। কংগ্রেস একটি গণ-ভিত্তিক পার্টি। এটাই কংগ্রেসের ঐতিহ্য। এই দলের এমন একটা কর্মী বাহিনী নেই যার প্রতিটি সদস্যের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে। কংগ্রেস নেতারা এখন অনুভব করছেন যে, এতদিন যেভাবে চলে আসছে সেভাবে আর চলবে না। কংগ্রেসের কথায় আর কাজে যে ফারাক হয়ে যাচ্ছে তা যদি কমাতে হয় তাহলে দলের একটি "কেডার" তৈরি করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক পরিবর্তনের সুপারিশ করার উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কাজটা অবশ্যই সহজ হবে না। কংগ্রেস এতদিন যেভাবে সদস্য সংগ্রহ করেছে সেই সদস্যতালিকার ভিত্তিতে যেভাবে দলের নেতৃত্ব গড়ে উঠেছে তার কোন কিছুর সঙ্গেই একটি কেডার-ভিত্তিক দলের ধারণার মিল নেই। কেডার তৈরি করতে গিয়ে দলের গণভিত্তি পরিত্যাগ করতে কংগ্রেস নেতারা রাজি হবেন বলে মনে হয় না। অথচ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য করা খুবই কঠিন।

•

বর্তমান রবি খন্দ থেকে খাদ্যশস্যের পাইকারি ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করার যে সিদ্ধান্ত কংগ্রেস অধিবেশনে গৃহীত হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে পরিকল্পনা কমিশন খাদ্যশস্য ও অন্যান্য নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বন্টনের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করার কাজ আরম্ভ করেছেন।

পরিকল্পনা কমিশন মনে করেন যে, কৃষিপণ্যের মূল্য স্থির রেখে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করার জন্য জনসাধারণের কাছে, বিশেষ করে দরিদ্রতর মানুষদের কাছে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস পৌঁছে দেওয়ার জন্য, চাষীরা যে দাম পান ও খরিদ্দাররা যে দাম দেন, এই দুয়ের মধ্যে বিরাট ব্যবধান কমাবার জন্য সারা দেশব্যাপী একটি সুষ্ঠু ও যোগ্য সংগ্রহ ও বন্টনের ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার। রাজ্যগুলিকে এই সর্বভারতীয় নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য করে নিতে হবে, তাদের পৃথক কোন নীতি নিয়ে চলতে দেওয়া হলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না।

এই ধরনের কোন সর্বভারতীয় সংগ্রহ ও বন্টনের পরিকল্পনা তৈরি হলে সেটা অবশ্যই কার্যকরী করতে হবে ফুড করপোরেশন অব ইন্ডিয়ার মারফৎ। কিন্তু এখন পর্যন্ত ফুড করপোরেশনের কার্যকলাপে এমন কোন দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় নি যাতে তাঁরা এই দায়িত্ব পালন করতে পারবেন বলে আশা করা যেতে পারে। ফুড করপোরেশনের পরিচালন ব্যয় দিন দিন বাড়ছে। তার ফলে উৎপাদন ও খরিদ্দারের মধ্যবর্তী পর্যায়ে খরচের ব্যবধান কমার বদলে বরং বাড়তির দিকেই চলেছে। ফুড করপোরেশনের মারফৎ যে খাদ্য বণ্টন করা হচ্ছে তার 'ন্যায্যমূল্য' বজায় রাখা সম্ভবপর হচ্ছে শুধু সরকারি ভর্তুকি দিয়ে। ফুড করপোরেশনের কার্যকলাপ সম্পর্কে নানা-রকম দুর্নীতির অভিযোগ হয়েছে এবং এসব বিষয়ে সি-বি-আই তদন্ত করছেন। সমালোচনার চাপে করপোরেশনের চেয়ারম্যান ইকবাল সিং ইস্তফা দিয়েছেন।

•

বিধাননগর কংগ্রেসের আর একটি নির্দেশ বলতে গেলে জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অকেজো হয়ে গেছে। বলা হয়েছিল যে, কংগ্রেসের কোন লোক সংকীর্ণতাবাদী কোন আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারবেন না। এই অধিবেশন শেষ হওয়ার দুদিনের মধ্যে ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিনে অন্ধ্রের কংগ্রেস নেতা ও কংগ্রেস কর্মীদের একটি বিরাট অংশ মন্দিরশহর তিরুপতিতে এক সম্মেলনে মিলিত হলেন। ঐ সম্মেলনে তাঁরা আওয়াজ তুললেন, অন্ধ্রকে দুভাগ করে অন্ধ্র অঞ্চল ও তেলেঙ্গানা অঞ্চলে দুটি পৃথক রাজ্য গঠন করতে হবে। অন্ধ্র অঞ্চল থেকে নির্বাচিত বিধানসভার ৮৫ জন সদস্য, ১১ জন পার্লামেণ্ট সদস্য জেলা পরিষদগুলির সভাপতি প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন অন্ধ্রের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী বি ভি সুব্বা রেড্ডি। সম্মেলনে তিনি এই বলে কংগ্রেস নেতৃত্বকে সাবধান করে দেন যে, অন্ধ্রের পৃথকীকরণের আওয়াজ তোলার জন্য যদি কংগ্রেসকর্মীদের শাস্তি দেওয়া হয় তাহলে অন্ধ্র থেকে কংগ্রেসের নাম মুছে যাবে।

তিরুপতির এই সিদ্ধান্তের [illegible] তেলেঙ্গানার কংগ্রেসকর্মীদের একাংশ পৃথক তেলেঙ্গানার আওয়াজ তুলেছেন।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী কংগ্রেসের অন্যান্য নেতারা অন্ধ্রকে ভাগ করার বিরোধী। তাঁরা মনে করেন, মুলকি বিধি সংক্রান্ত বিরোধ অবসানের জন্য প্রধানমন্ত্রী যে পাঁচদফা সূত্র দিয়েছেন সেটি যদি সঠিকভাবে কার্যকর করা যায় তাহলে অন্ধ্র ভাগ করার দরকার হবে না। অন্ধ্র ভাগ করলে সমস্যা বাড়বে বই কমবে না। একবার অন্ধ্রে এই ধরনের দাবি মেনে নেওয়া হলে অন্যান্য রাজ্যেও এই ধরনের আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের দাবি উঠবে।

কংগ্রেস হাইকম্যান্ড মনে করেন যে প্রধানমন্ত্রীর সূত্রটির তাৎপর্য অন্ধ্রের কংগ্রেসনেতারা জনসাধারণকে ঠিকভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন নি বলেই এবং তার পরিবর্তে তাঁরা নিজেরাই সেখানকার জনসাধারণের উত্তেজনার শিকার হয়ে যাওয়ায় অবস্থা তাঁদের আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। পরিস্থিতিটা সামলাবার জন্য ও প্রধানমন্ত্রীর সূত্রের ভিত্তিতে অন্ধ্র অখণ্ড রাখার চেষ্টা করার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার রাজনৈতিক ব্যাপার সংক্রান্ত

কমিটির তিনজন সদস্য—শ্রী ওপ্পাই বি চাবন, শ্রীজগজীবন রাম ও জনাব ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ—অন্ধে যাচ্ছেন।

ইতিমধ্যে অন্ধে যে একটা প্রবল স্বাতন্ত্র্যবাদী আন্দোলন গড়ে উঠছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সরকারি কর্মচারী ও ছাত্ররা বিপুলসংখ্যায় এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। 'জয় অন্ধ্র' পতাকা তোলা হচ্ছে।

এই 'জয় অন্ধ্র' আন্দোলন উপলক্ষে গত ২ জানুয়ারি যে বন্ধ পালন করা হল সেই বন্ধ নানাস্থানে প্রচণ্ড সংঘর্ষের আকার ধারণ করে। নেলোরে পুলিশের সঙ্গে এক সংঘর্ষের ফলে তিনজন আন্দোলনকারী মারা গেছেন। রেল স্টেশন, সরকারি অফিসার, গাড়ি ইত্যাদি আক্রমণ করা হয়েছে, জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই বিশৃঙ্খলার মোকাবেলা করার শক্তি অন্ধ্র সরকারের নেই। অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী পি ভি নরসিং রাও এমনিতেই দুর্বল মানুষ। তিনি তেলেঙ্গানার প্রতিনিধি। দলের মধ্যে তাঁর প্রতিপত্তি সামান্য। এদিকে উপমুখ্যমন্ত্রীসহ আটজন মন্ত্রী তাঁর মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী নিজে যাতে পদত্যাগ করেন সেজন্য তাঁর উপর চাপ দেওয়া হচ্ছে।

অন্ধ্রের ১১ জন স্বাতন্ত্র্যবাদী এম-পি প্রধানমন্ত্রীকে একটি চিঠি লিখে বলেছেন, 'প্রশাসন ভেঙে পড়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ও সরকারি অফিসগুলি অনির্দিষ্টকাল যাবৎ বন্ধ হয়ে রয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের নেতৃত্বে অনাস্থার যে সংকট দেখা দিয়েছে তাতে এক অশুভ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। নির্বিচার ও বর্বরোচিত গুলিবর্ষণের ফলে সেই পরিস্থিতি আরও খারাপ হচ্ছে।'

এই পরিস্থিতিতে শ্রীনরসিং রাওয়ের মন্ত্রিসভার ভবিষ্যৎ নিতান্তই অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। দিল্লির খবর হচ্ছে এই যে, শেষ পর্যন্ত হয়ত মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে অন্ধ্রে সাময়িকভাবে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করা হতে পারে।

•

এদিকে ওড়িশায় শ্রীমতী নন্দিনী শতপথীর মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধেও কোটি শত্রু চ্যালেঞ্জ তৈরি হচ্ছে। সেখানে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব ও আরও চারজন বিধানসভা সদস্য কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তাঁরা 'স্বতন্ত্র কংগ্রেস' নামে একটি নতুন দল গঠন করেছেন। সাম্প্রতিক উপনির্বাচনে শ্রীমতী শতপথীর বিরুদ্ধে কাজ করার অভিযোগে ডঃ মহতাবকে এর আগে সাসপেণ্ড করা হয়েছে। আরও একজন সাসপেণ্ডেড সদস্য শ্রীমুরলীধর কোনার ডঃ মহতাবের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন।

এই পাঁচজন দলত্যাগ করায় এখন ওড়িশা বিধানসভার মোট ১৪০ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ৭৯ জন কংগ্রেসে রইলেন। এদিকে খবর এই যে, কংগ্রেস মন্ত্রিসভা উৎখাত করার জন্য ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাবের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন আরও দুজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী—উৎকল কংগ্রেসের শ্রীবিজু পট্টনায়ক ও স্বতন্ত্র পার্টির শ্রীরাধানাথ সিং দেও। শ্রীপট্টনায়ক এক বিবৃতিতে ডঃ মহতাবকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন যে, দলত্যাগ করে তিনি ওড়িশাবাসীদের নববর্ষের উপহার দিলেন। এটা উপহারের প্রথম কিস্তি। পরে আরও আসছে। কংগ্রেসের আরও কিছু সদস্য এখন দল ছেড়ে হয় উৎকল কংগ্রেসে অথবা নবগঠিত স্বতন্ত্র কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার জন্য তৈরি বলে ওড়িশায় এখন জোর গুজব। বিধানসভার আসন্ন বাজেট অধিবেশনেই এর একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে।

•

আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের সান আন্টোনিও শহরের কাছে র‍্যাণ্ডলফ এয়ার ফোর্স বেস নামে মার্কিন বিমানবাহিনীর একটি ঘাঁটি রয়েছে। ঐ বিমানঘাঁটির একটি বিশেষ বিভাগ আছে যাদের দায়িত্ব হচ্ছে, নিহত, আহত অথবা নিখোঁজ আমেরিকান বৈমানিকদের আত্মীয়পরিজনের কাছে দুঃসংবাদ পৌঁছে দেওয়া। সম্প্রতি ঐ বিভাগের অফিসাররা খুব ব্যস্ত ছিলেন। উত্তর ভিয়েতনামের উপর বোমা বর্ষণ করতে গিয়ে অতিকায় বি ৫২ ও অন্যান্য বিমানগুলি যে হারে উত্তর ভিয়েতনামী প্রতিরোধ বাহিনীর হাতে ঘায়েল হচ্ছিল অতীতে আর কখনও সেই হারে আমেরিকাকে দামী বিমান ও বৈমানিকদের খোয়াতে হয় নি।

বিশেষ করে উত্তর ভিয়েতনামের আকাশে আমেরিকা যেভাবে বি ৫২ বিমানগুলি খুইয়েছে তা অভূতপূর্ব। পেন্টাগনের নিজের স্বীকৃতি অনুসারেই পাঁচ দিনে এক ডজন বি ৫২ বিমান নষ্ট হয়েছে। একজন বৈমানিক মারা গেছেন, ৪৩ জন নিখোঁজ। উত্তর ভিয়েতনামের হিসাবে বিধ্বস্ত বি ৫২-এর সংখ্যা দুই ডজন। অথচ এর আগে সাত বছরে আমেরিকার একটি মাত্র বি ৫২ বিমান ইন্দোচীনের আকাশে নষ্ট হয়েছিল।

বি ৫২ বিমানের অন্য নাম হল স্ট্র্যাটোফোর্ট্রেস। এই বিমানগুলির ... করে ইঞ্জিন, ছয়জনের ক্রু নিয়ে সেগুলি চলে। প্রতিপক্ষকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য এগুলিতে খুব উন্নত ধরনের ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা আছে। আসলে এগুলি তৈরি হয়েছিল পারমাণবিক বোমা ফেলার জন্য।

আর এই বি ৫২ বিমানের প্রতিরোধ করার জন্যই তৈরি হয়েছিল সোভিয়েট রাশিয়ার 'এস-এ' পর্যায়ের ক্ষেপণাস্ত্রগুলি। টেলিফোনের থামের আকারের এই বিরাট বিরাট ক্ষেপণাস্ত্রগুলি মাটি থেকে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়। উত্তর ভিয়েতনামের আকাশে এই 'এস-এ' ক্ষেপণাস্ত্রগুলির সঙ্গেই মোকাবেলা হয়েছিল আমেরিকান বি ৫২ বিমানের।

অন্য সময়ে ও অন্য স্থানে ব্যবহারের জন্য তৈরি দুই পক্ষের অস্ত্রের এই সংঘাতের যে ফলাফল দেখা গেল স্পষ্টতই আমেরিকা তার জন্য প্রস্তুত ছিল না। মাটিতে দাঁড়িয়ে লড়াই করার চেয়ে আকাশ থেকে বোমা ছুঁড়ে চলে আসা আমেরিকার দিক থেকে অনেক নিরাপদ, এই গণনা করেই প্রেসিডেন্ট নিকসন বড়দিনের আগে উত্তর ভিয়েতনামে ইতিহাসের প্রচণ্ডতম বোমা বর্ষণের আদেশ দিয়েছিলেন। এই নির্বিচার বোমাবর্ষণ থেকে কেউ বাদ যায় নি, কোন কিছু বাদ যায় নি। হাসপাতাল, মার্কিন যুদ্ধবন্দীদের শিবির, সিনেমা ভবন সবই আক্রান্ত হয়েছে। এই কর্মের বোমাবাজির বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীতে ধিক্কার উঠেছে। কিন্তু সেই ধিক্কারেও
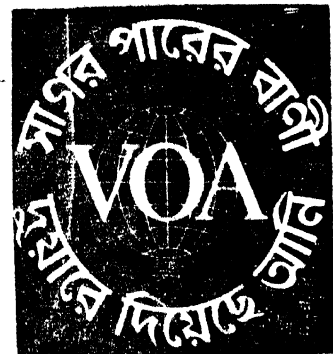
প্রেসিডেণ্ট নিকসন সম্ভবত ততটা বিচলিত হন নি যতটা হয়েছেন বি ৫২ বিমানগুলি খুইয়ে। আমেরিকান সৈনারা যদি হতাহত না হন তাহলে এই যুদ্ধে ভিয়েতনামের কি ক্ষতি হল তা নিয়ে আমেরিকানরা মাথা ঘামাবেন না এবং ঐ যুদ্ধ থামাবার জন্য তাঁর উপর চাপ দেবেন না, এটাই ছিল প্রেসিডেণ্ট নিকসনের হিসাব। কিন্তু ভূপাতিত স্ট্র্যাটোফোর্ট্রেসগুলি তাঁর সব হিসাব ভণ্ডুল করে দিয়েছে। র‍্যান্ডলফ বিমানঘাটি থেকে যতবার মার্কিন বিমান-বন্দরের বার্তাজীবীরা আমেরিকান গৃহস্থের কাছে দুঃসংবাদ নিয়ে গেছেন ততবারই আমেরিকানরা বুঝেছেন, আকাশের বুকে বসে সুইচ টিপে যুদ্ধ চালানও এখন আর আমেরিকার পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়।

অন্যান্য কারণের মধ্যে সম্ভবত এটাও একটা বড় কারণ যেজন্য প্রেসিডেন্ট নিকসন হ্যানয় ও হাইফং এলাকায় বোমা-বর্ষণ স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন এবং আর একবার ইন্দোচীনে যুদ্ধবিরতির সম্ভাবনা পরীক্ষা করে দেখার জন্য প্রেসিডেণ্ট নিকসনের পরামর্শদাতা কিসিঙ্গার প্যারিসে উত্তর ভিয়েতনামের প্রতিনিধিদের সঙ্গে গোপন আলোচনা বৈঠকে মিলিত হচ্ছেন।

৬-১-৭৩ —পুণ্ডরীক

ফাঁদ

সুবন্ধু ভট্টাচার্য

সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে ভীড়ের মধ্যে .ই প্রবীর আর মীরার সঙ্গে দেখা গেল। শতদল ভাবতেই পারেনি যে, .দিন পরে ওদের সঙ্গে এভাবে হঠাৎ া হয়ে যাবে। সে ভীড় ঠেলে ওদের ৎ এগিয়ে গেল। অনেকদিন পর প্রবীরকে ४ শতদলের মনে হল যে ওর চেহারাটা .গের চেয়ে ভালো হয়েছে।

—কী ব্যাপার! হঠাৎ তোকে এখানে খব ভাবতে পারিনি।

—আমিও পারিনি। প্রবীর বলল।

—আপনিও এসেছেন! এবার মীরাকেই ল কথাটা বলল।

মীরা ঈষৎ হেসে বলল, কেন, আপত্তি ছে?

শতদল বলল, নাঃ, আপত্তি থাকবে ?

—তারপর বলুন কেমন আছেন? মীরা ল।

—ভালোই। আপনারা?

—আমরা ভালোই আছি। মীরা কথাটা বলে কি যেন ভাবল। তারপর শুধোল, বিয়ে করেছেন?

—নাঃ, করলে আপনারা নিশ্চয়ই জানতে পারতেন।

—আর কবে করবি? এবার করে ফ্যাল। প্রবীর বলল।

—দেখি—বলে শতদল প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যেতে চাইল।

—না আর দেখি-টেখি না। এবার বিয়ে করে ফেলুন।

মীরা প্রায় আবদারের ভঙ্গিতে কথাটা বলল। তারপর শুধোল, আপনার জন্য মেয়ে দেখব?

শতদল খুব অস্বস্তিতে পড়ল। এ ধরনের প্রশ্নের কী উত্তর দেবে সে? সে চুপ করে রইল।

মীরা তার উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলে যেতে লাগল, আমার একজন কলিগ আছে। এম-এ পাশ। দেখতে শুনতে ভালো। বলেন তো দেখি—

শতদল পরিহাসের সুরে বলল, দেখুন—

মীরা বলল, না ঠাট্টার কথা নয়। সিরিয়াসলি বলছি। আপনারা তো বামুন, ওলকারাও তাই। আপনার আবার গোত্র-টোত্র নিয়ে আপত্তি নেই তো?

শতদল দেখল, মীরাকে থামাতে গেলে এখন তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গে যাওয়া

দরকার। সে বলল, আমরা কি এখানে দাঁড়িয়ে গল্প করব না কোন চায়ের দোকানে গিয়ে বসব?

সিনেমা হলের সামনের ভীড় তখন কমে গেছে। শো ভাঙার পর দর্শকেরা প্রায় সবাই চলে গেছে। পরের শো-এর দর্শকরা একে একে আসতে সুরু করেছে।

—চল, কোথাও গিয়ে বসি। প্রবীর বলল।

কয়েক পা এগোতেই ওরা একটা রেস্টুরেন্ট দেখতে পেল। যদিও বাইরে এখনও বিকেলের আলোটুকু পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি, রেস্টুরেন্টের ভিতরে এর মধ্যেই আলো জ্বলে উঠেছে। রেস্টুরেন্টটির আসবাবপত্র বেশ দামী। দেওয়ালের গায়ে বিচিত্র কারুকার্য সবার আগেই চোখে পড়ে।

ওরা তিনজন ভিতরে গিয়ে ঢুকল।
প্রবীর শুধোল, কী খাবি বল্‌।
—আমি কিছু খাবো না। শুধু চা।
—তা কি হয়। মীরা বলল।
—সত্যি বলছি। আমার খিদে নেই।
—কিছু একটা খা। প্রবীর বলল
—আচ্ছা বল্‌ তোদের যা ইচ্ছে।

প্রবীর বেয়ারাকে ডেকে তিনটে চিকেন রোল আনতে বলল।

মীরা শতদলের ঠিক সামনের সিটে বসায় শতদল মীরার চেহারার পরিবর্তনটা ভালো করে লক্ষ করতে পারল। আগের চেয়ে মীরার চেহারা আরও ভালো হয়েছে। দেখতে আরও সুন্দরী হয়েছে সে। ওদের বিয়ে হয়েছে প্রায় চার বছর। এখনও কোন সন্তান হয়নি। বিয়ের পর মীরাকে সে এক-আধবার দেখেছে। তারপর প্রায় দু বছর মীরার সঙ্গে দেখা হয়নি। এর মধ্যে প্রবীরের সঙ্গে দু-একবার দেখা হলেও মীরার সঙ্গে হয়নি। প্রবীরদের বাসায়ও যাওয়া হয়নি বহু দিন।

—তারপর তুই কী করছিস বল। প্রবীর বলল।

—কী আর করবো? একটা চাকরি করি, ছুটি-ছাটার দিনে আড্ডা দি। না হলে সিনেমা দেখতে যাই।

—আমাদের ওদিকে মাঝে মাঝে গেলেও তো পারেন। মীরা বলল।

—কেন যাবো? প্রবীর কি আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে?

কথাটা বলেই শতদল ভাবল, একটু রূঢ় হয়ে গেল। কিন্তু কথাটা তো মিথ্যে নয়। বিয়ের আগে প্রবীর তাদের আড্ডায় নিয়মিত হাজিরা দিত। বিয়ের পরও দু-এক বছর অনিয়মিত হলেও আড্ডায় আসত। এখন সে তাদের আড্ডায় যাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছে।

—তুই আমার বিরুদ্ধে এত বড় একটা অভিযোগ করলি? প্রবীর হাসতে হাসতে বলল। বোঝা গেল প্রবীর তার কথায় রাগ করেনি।

—কেন করবো না? আমার অভিযোগটা কি মিথ্যে?

—না, মিথ্যে নয়। কিন্তু এখন আমার কি আগের মত আড্ডা দিয়ে বেড়ানো সম্ভব?

—কেন সম্ভব নয় শুনি?

—বিয়ে কর, তবে বুঝবি।

—এটা বুঝবার জন্য বিয়ে করার দরকার হয় না।

—সংসার তো কোনদিন করলি না।

—তোর এই একটা ভুল ধারণা। বিয়ে না করলে কি কেউ সংসার করে না? আমি দোকান-বাজার, রেশন-তোলা, ডিপো থেকে দুধ আনা সবই করি। তুই এর চেয়ে বেশি কী করিস?

—ও'র কথা আর বলবেন না। এবার মীরা বলল—কোনদিন আটটার আগে বিছানা ছেড়ে উঠবে না। একদিন বাজার করতে যেতে বললে যেতে চায় না। সব আমার দেওর করে।

—তবে—বলে শতদল এমনভাবে হাসল যার অর্থ, কি, আমার কথাই ঠিক হল তো?

বেয়ারা এসে খাবারের প্লেটগুলো টেবিলের উপর রেখে গেল।

প্রবীর এবার মীরাকে ধমক দেবার ভঙ্গিতে বলল, আরে দোকান-বাজার করাটাই কি সব? সংসারের একটা দায়িত্ব আছে না? শতদলের আর কি। ওর তো তিন জনের সংসার। দাদা মা আর ও নিজে। আমাদের মত তো আর বিরাট সংসার নয়।

শতদল চিকেন রোল-এ কামড় বসাতে বসাতে বলল, তোর মাথার উপরে দু দাদা আছে। তোর বাবা-মা এখনও বেঁচে আছেন। তোকে কতখানি সংসারের ভাবনা ভাবতে হয় তা আমার জানা আছে।

এবার আর প্রবীর কোন কথা বলল না। সে নিঃশব্দে খেয়ে যেতে লাগল।

মীরা একবার প্রবীরের দিকে তারপর শতদলের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল। প্রবীর যে তর্কে হেরে গেছে তাতে সে খুশীই হয়েছে মনে হল। সে শতদলকে বলল, এরা কিন্তু চিকেন রোলটা বেশ করে, না?

শতদল বলল, ফাইন। আমার এতক্ষণ খিদে ছিল না। কিন্তু এটা খেতে খেতে মনে হচ্ছে বেশ খিদে পেয়েছিল।

প্রবীর এবার হেসে বলল, আমরাও তা জানতুম।

বেয়ারা শূন্য প্লেটগুলো তুলে নিয়ে চা দিয়ে গেল।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে প্রবীর 'আঃ' বলে একটা তৃপ্তির শব্দ করল। তারপর পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে নিজে একটা নিল শতদলকেও একটা দিল।

মীরা আবার পুরোনো প্রসঙ্গে ফিরে গেল।—তাহলে কবে আসছেন আমাদের বাড়ী?

শতদল কী উত্তর দেবে ভেবে পেল না। সিগারেটটা ধরিয়ে নিয়ে একটা লম্বা টান দিল। তারপর বলল, একদিন যাওয়া যাবে।

—না একদিন যাবো বলে এড়িয়ে গেলে চলবে না। কবে যাবেন, ঠিক করে বলুন।

শতদল দেখল মীরাকে একটা যেকোন উত্তর দিয়ে পাশ কাটিয়ে গেলে চলবে না ও যে-রকম নাছোড়বান্দা তাতে ওকে স্পষ্ট কোন উত্তর দিতে হবে।

—আপনাদের বাসায় গেলে তো কোন রবিবার বা ছুটির দিনে যেতে হবে। নাহলে তো দুজনকে পাওয়া যাবে না।

মীরা বলল, আমার স্কুল তো সকালে। অবশ্য আপনার বন্ধু অফিস থেকে সন্ধ্যের আগে বাড়ী ফেরে না।

—সেইজন্যই তো বলছিলাম যে কোন ছুটিছাটার দিনে আপনাদের বাসায় যেতে হবে।

—তাহলে এক কাজ করুন। আসছে রবিবার সকালে আসুন। আমাদের ওখানে খাবেন।

শতদল দিনটা যত পিছিয়ে দেওয়া যায় সেজন্য একবার শেষ চেষ্টা করল। বলল, আসছে রবিবার? আসছে রবিবার তো পারবো না। একটা বিশেষ কাজ আছে।

শতদলের ঐদিন কোন কাজই ছিল না তবু মিথ্যে করে কথাটা বলল।

—তাহলে তার পরের রবিবার আসুন। সেদিন নিশ্চয়ই কোন কাজ নেই।

শতদল মীরার পীড়াপীড়িতে বিস্মিত হল। সচরাচর নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরে বন্ধুপত্নীরা তাদের বাড়ীতে যেতে বলে। তার মধ্যে কোন আন্তরিকতা থাকে না। তাই সে কোন বন্ধুর বাড়ীতে পারতপক্ষে যায় না। কিন্তু মীরার অনুরোধের মধ্যে সত্যিই আন্তরিকতা ছিল। যদিও শতদলের সঙ্গে তার দু-একদিনের বেশি কথা হয়নি তাহলেও মনে হয় সে প্রবীরের মুখে তার সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনেছে। প্রবীরের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব তো কম দিনের নয়। সেই কলেজ-জীবনের সুরু থেকে।

—কি, আসছেন তো?

শতদল দেখল, আর এড়াবার উপায় নেই। সে যেন একটু চিন্তা করে বলল, তার পরের রবিবার? আচ্ছা যাওয়া যাবে। মনে হচ্ছে তো কোন কাজ নেই। নেহাৎ যদি কোন জরুরী কাজ না পড়ে যায়—

—পড়লেও আমরা শুনছি না। আপনাকে আমাদের বাড়ীতে ঐদিন যেতে হবে।

—তাহলে ঐ কথাই ঠিক রইল। এবার প্রবীর বলল।

—দুপুরে কিন্তু আমাদের ওখানে খাবেন। মীরা কথাটা স্মরণ করিয়ে দিল।

—আচ্ছা। তাই হবে। শতদল আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে বলল।

বেয়ারা বিল নিয়ে আসতেই শতদল পকেট থেকে টাকা বার করে দিতে গেল কিন্তু প্রবীর তাকে দিতে দিল না। মীরা

তার ব্যাগ থেকে টাকা বার করে প্রবীরের হাতে দিল।

শতদল বলল, আমার কাছেই তো টাকা আছে। আমি দিয়ে দিচ্ছি।

মীরা বলল, থাক।

প্রবীর বেয়ারার হাতে টাকা দিয়ে দিল।

রাস্তায় নেমে প্রবীর শুধোল, কোন্ দিকে যাবি?

—ভাবছি একটু কলেজ স্ট্রীটে যাবো।

—পুরোনো আড্ডায়।

—তাছাড়া আর কোথায় যাবো?

মীরা বলল, আর দুঃখ করতে হবে না। আপনার যাবার যাতে জায়গা হয়, তার …কটা ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

—তাই নাকি? শতদল শুধোল।

—হ্যাঁ। আমি কালকেই অলকার গোত্র-গোত্র সব জেনে নেবো। রবিবার গেলেই জানতে পারবেন।

শতদল ভাবল মীরা তার সহকর্মিণী-কে তার ঘাড়ে না চাপিয়ে কিছুতেই …বে না মনে হচ্ছে। সে বলল, তাহলে আর আপনাদের বাসায় যাওয়া হল না …খছি।

প্রবীর মীরাকে বলল, কি ছেলেমানুষী …ছ বল দেখি।

তারপর শতদলের দিকে ফিরে বলল, …র কিন্তু অবশ্যই আসা চাই। আমরা …জন্য অপেক্ষা করবো। ফেল করবি না।

মীরা হাসতে হাসতে বলল, আমাদের … অত পেটে খিদে মুখে লাজ নেই। …পেলে আমরা বলি।

শতদল বলল, আপনি আমার খিদের …খাটা জানলেন কী করে? আমি কি …পনাকে বলেছি?

—ও বলতে হয় না। আপনিই টের …ওয়া যায়।

শতদল শুধোল, তাই নাকি?

মীরা চোখ-মুখের একটা মধুর ভঙ্গি …র বলল, হুঁ।

একটু পরে ওরা একটা ডবল-ডেকারে চলে গেল। যাবার আগে মীরা এবং …ীর আর একবার তাকে তাদের বাসায় …য়ার কথা মনে করিয়ে দিতে ভোলেনি। …তদল ভাবল, এখন তো অনেক দেরী। তার মনে থাকলে হয়।

যাবো না যাবো না করেও শেষ পর্যন্ত …ল নির্দিষ্টদিনে প্রবীরদের পাইক-…র বাসায় গিয়ে হাজির হল। অনেকদিন এ বাড়ীতে আসেনি। প্রথমে ভয় ছিল …টটা ঠিক চিনতে পারবে কিনা। শেষ-…র্যন্ত অবশ্য কোন অসুবিধে হল না। …দল প্রবীরের ফ্ল্যাট ঠিকই খুঁজে পেল।

সদর দরজা দিয়ে ঢুকলেই একটা সরু …সজ তার এক পাশে রান্নাঘর। আর …পাশে বসার ঘর। তার পাশে বেড-রুম। মীরা রান্নাঘরে ছিল। আর একজন …বা মহিলা তাকে সাহায্য করছিল।

শতদলকে দেখে মীরা বলল, যাক শেষপর্যন্ত তা হলে এলেন! আমি তো ভাবলাম আপনি ভুলেই গেছেন—

শতদল বলল, কথা যখন দিয়েছি তখন—

মীরা বলল, যান ভিতরে গিয়ে বসুন।

—প্রবীর নেই? শতদল শুধোল।

—একটু বেরিয়েছে।

শতদল বৈঠকখানায় গিয়ে বসল। বৈঠকখানা বলা অবশ্য ভুল। একফালি জায়গা সোফা-কোচে সাজিয়ে বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আসলে এ ঘর এবং বেড-রুম নিয়ে প্রবীরের ফ্ল্যাটটাকে দেড়খানা ঘরের ফ্ল্যাট বলা যায়। প্রবীরের দাদারা কলকাতার বাইরে চাকরি করেন। সেখানেই থাকেন। প্রবীরের মা-বাবা বড় ছেলের কাছে থাকেন। একমাত্র ছোট ভাইটি প্রবীরের কাছে থাকে।

শতদল সোফার উপর বসে সেদিনের খবরের কাগজটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

মীরা রান্নাঘর থেকে বলল, আপনাকে একটু একা বসে থাকতে হবে।

—তাই তো দেখছি।

—চা খাবেন?

—প্রবীর এলেই খাবো।

প্রায় ঘণ্টাখানেক সে একা বসে রইল। মনে মনে সে প্রবীরের উপর একটু বিরক্ত হল। তাকে আসতে বলে প্রবীর কোথায় গেল?

মাঝখানে প্রবীরের ছোট ভাই গৌতম একবার এ ঘরে এসেছিল। অনেক দিন পর তাকে দেখে মনে হল সেই গৌতম আর নেই। শতদল যখন তাকে দেখেছিল তখন সে ছিল বালক, এখন সে যুবক।

গৌতম তাকে দেখে বলল, শতদলদা! আপনি কখন এলেন?

—এই তো মিনিট চল্লিশেক হল।

—দাদার সঙ্গে দেখা হয়নি?

—নাঃ। কোথায় তোমার দাদা।

—বাহ্। দাদা আপনাকে আসতে বলে কোথায় বেরিয়ে গেল!

—তুমি একটু দেখো তো ভাই, পাড়ায় কোথাও আছে নাকি।

—আচ্ছা দেখছি—বলে গৌতম রান্না-ঘরে চলে গেল। তারপর সেখানে তার বৌদির সঙ্গে কী কথা বলে বেরিয়ে গেল। তার পায়ের চটির শব্দ মিলিয়ে যেতে শুনল শতদল।

সে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে সেদিনের খবরের কাগজে মনোনিবেশ করবার চেষ্টা করল।

একটু পরেই প্রবীর এসে হাজির হল।

শতদল বলল, তুই তো আচ্ছা লোক। আমাকে আসতে বলে কোথায় গিয়ে বসে-ছিলি?

—একটা বিশেষ কাজ ছিল। তুই কত-ক্ষণ এসেছিস?

—তা প্রায় এক ঘণ্টা হয়ে গেল।

—চা খেয়েছিস?

—সে ব্যবস্থা হচ্ছে।

—দাঁড়া, আগে চায়ের কথাটা বলেনি। প্রবীর রান্নাঘরের দরজার কাছে গিয়ে বলল, আমাদের দু-কাপ চা পাঠিয়ে দিও তো।

—বলতে হবে না। তোমাকে আসতে দেখেই চায়ের জল চাপিয়ে দিয়েছি।

প্রবীর আরাম করে সোফার উপর বসে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করল। তারপর নিজে একটা ধরিয়ে শতদলের দিকে প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বলল, নে, খা—

শতদল বলল, এই তো খেলাম। চা-টা আসুক। তারপর খাচ্ছি।

প্রবীর শুধোল, তুই দাবা খেলতে পারিস?

—একটু-আধটু পারি।

—গুড্। তাহলে এক হাত দাবা হয়ে যাক।

প্রবীর দাবার সেট বারকরে ঘুঁটি সাজাতে লাগল।

মীরা এসে একটা প্লেটে ওমলেট ও দু-কাপ চা টি-পয়ের উপর রাখল। তারপর শতদলকে লক্ষ্য করে বলল, নিন, খেয়ে ফেলুন।

শতদল বলল, এখন কে ওমলেট খাবে?

—কেন, আপনি।

—এত বেলায় ওমলেট খেয়ে খিদে নষ্ট করার কোন মানে হয়?

—কটা বাজে? মীরা শুধোল।

হাত-ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে শতদল বলল, প্রায় বারোটা—

আপনার খেতে এখনও দু-ঘন্টা দেরী আছে।

শতদল প্রবীরকে দেখিয়ে বলল, ও খাবে না?

—ও খেয়েছে। মীরা রান্নাঘরে চলে গেল?

প্রবীর বলল, আরে বাবা, খেয়ে নে না। ভারি তো একটা ওমলেট।

শতদল চামচ দিয়ে ওমলেটটা দু-টুকরো করল। তারপর নিজে একটা টুকরো তুলে নিয়ে প্লেটটা প্রবীরের দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, নে খা—

প্রবীর বলল, একটা ওমলেট খেতে পারিস না। কি পেট রে তোর!

শতদল বলল, খেতে কি আর পারি না? তবে ভাগ করে খাওয়ার মধ্যে একটা আনন্দ আছে সেটা একা খেলে পাওয়া যায় না।

প্রবীর আর আপত্তি করল না। সে প্লেট থেকে ওমলেটের টুকরোটা তুলে মুখে পুরে দিল।

শতদল চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে একটা পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। অনেকক্ষণ ধরেই তার চায়ের তৃষ্ণা পেয়েছিল।

প্রবীর তার ঘোড়াটা শতদলের রাজার আড়াই ঘর সামনে বসিয়ে বলল, নে, তোকে কিস্তি দিলাম।

শতদল কিস্তি সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

তারপর কতক্ষণ ধরে যে তারা দাবা খেলল তা দুজনেরই খেয়াল ছিল না। শতদল প্রবীরের কাছে দুবার হেরে গেল। প্রবীরকেও অবশ্য সে একবার হারিয়েছে। দু-ঘন্টা কখন যে পার হয়ে গেল তা কারোরই খেয়াল হয়নি। খেয়াল হল তখন যখন মীরা রান্নাঘর থেকে প্রবীরকে বলল, তুমি এবার চান করে এসো। আমার রান্না হয়ে গেছে।

প্রবীরের অবশ্য আর একহাত খেলার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু মীরা বারবার তাগাদা দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত আর খেলা হল না। বাধ্য হয়েই তাকে স্নান করতে যেতে হল।

মীরা এ-ঘরে এসে বলল, দেখুন আপনাকে কথা দিয়েছিলাম দুটোর মধ্যে আমার রান্না হয়ে যাবে। ঠিক তাই হল।

শতদল বলল, একজন এ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়েও এই?

মীরা বলল, গোপালের মার কথা বলছেন? ওকে দিয়ে কোন কাজ হয় না। সব দেখিয়ে দিতে হয়।

মীরা দু-হাত পিছনে নিয়ে তার চুল খুলে দিচ্ছিল। শতদল দেখল, মীরার অনেক চুল আছে। ওর গায়ের রঙও খুব ফরসা। কালো স্লিভলেস ব্লাউজের ফাঁক দিয়ে ওর গলা কাঁধ এবং পেটের কিছুটা অংশ দেখা যাচ্ছিল।

শতদল চোখ নামিয়ে নিল।

প্রবীর স্নান করে এসে শতদলকে বলল, তুই চান করবি না?

—আমি চান করেই এসেছি।

প্রবীর মীরাকে বলল, তুমিও চান করে নাও। তারপর একসঙ্গে খাওয়া যাবে।

মীরা বলল, না আমার অনেক দেরী হবে।

প্রবীর বলল, তা হোক।

মীরা বলল, তোমরা খেয়ে নাও। শতদলকে দেখিয়ে সে বলল, ও'র খুব খিদে পেয়েছে।

শতদল হাসতে হাসতে বলল, আমার খিদে পেলেও আমি আরও আধঘন্টা অপেক্ষা করতে পারবো।

—আমার আধঘন্টায় হবে না। এক ঘন্টা লাগবে।

—বেশ, তাই হবে। শতদল বলল।

অগত্যা মীরাকে নিতান্ত অনিচ্ছায় স্নান করতে যেতে হল।

মীরার স্নান করতে আধঘন্টাও লাগল না। শতদল ঘড়ি দেখল। মীরার আধঘন্টারও কম সময় লেগেছে। বোধহয় শতদলের কথা ভেবেই ও সংক্ষেপে স্নান সেরেছে।

ওরা তিনজনে যখন খেতে বসল তখন আড়াইটে বাজে।

—গৌতম খাবে না? শতদল শুধোল।

—ওর এক বন্ধুর বাড়ীতে পৈতের নেমন্তন্ন আছে।

মীরা অনেক রকম আয়োজন করেছে। ভাতের থালার চার পাশে নানারকম বাটি সাজিয়ে দিয়েছে।

শতদল বলল, এ যে এলাহি ব্যাপার।

মীরা বলল, মোটেই না। আপনার জন্য বিশেষ কিছুই করিনি।

শতদল বলল, এই যদি সাধারণ হয়, তাহলে বিশেষ কিছু হলে না-জানি কী হবে।

মীরা বলল, আপনি কি খুব ঝাল খান? আমি কিন্তু মোটেই ঝাল দিইনি।

—ভালো করেছেন। আমি ঝাল খুব কম খাই।

—আপনাকে একটু মাংস দেবো?

—আরে না না। যা দিয়েছেন এই আগে খেয়ে উঠি।

—কিছু ফেলতে পারবেন না কিন্তু। মীরা যেন আদেশ করল।

খাওয়া-দাওয়া সারতে সারতে অনেক বেলা হয়ে গেল। ছুটির দিনে শতদলেরও দেরী করে খাওয়া অভ্যাস। কিন্তু তা বলে এত দেরীতে নয়। খাওয়া-দাওয়ার পর শ... সোফার উপর দেহটা এলিয়ে দিল। প্রবীর এসে আর একটা সোফার উপর বসল। ... একটা সিগারেট ধরাল। শতদলও প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিল।

মীরা একটা কাগজের ঠোঙায় কতক গুলো পান নিয়ে এ-ঘরে ঢুকল। বলল, পান খাবেন?

—মিষ্টি না জর্দা?

—মিষ্টি।

—দিন একটা।

অবেলায় খেয়ে গা-টা কেমন গুলোচ্ছিল... পানটা খেয়ে ভালোই লাগল।

শতদল ভেবেছিল তিনটে সাড়ে তি... নাগাদ এখান থেকে বেরিয়ে পড়বে। ... দের আর এখন উঠতেই ইচ্ছে করছিল ...

প্রবীর শুধোল, গান শুনবি?

—কে গাইবে?

—রেকর্ডের গান।

—আপত্তি নেই। তবে রবীন্দ্রসং... হলে শুনবো।

—তাই শোনাবো—বলে প্রবীর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একটু পরে সে একটা রেকর্ড-প্লেয়ার নিয়ে এল। তার পিছনে আর একটি ছেলের হাতে কতকগুলো রেকর্ড।

শতদল উঠে বসল। তারপর ছেলে... হাত থেকে রেকর্ডগুলো নিয়ে ব... বসল।

তারপর শতদল একটার পর এক... রেকর্ড বেছে দিতে লাগল। আর প্র... সেগুলো বাজিয়ে চলল।

এক সময় রান্নাঘরের কাজ চুকিয়ে মীরাও এ-ঘরে এসে বসল।

—আপনি সোফাটার উপর শুয়ে পড়ুন না। মীরা বলল।

শতদল বলল, আমার শোয়ার দরকার নেই। বরং আপনি একটু বিশ্রাম করে...

মীরা বলল, আমি দুপুরে ঘুমোই ... ছেলেটি একসময় উঠে চলে গেল ...

ক্রমে বেলা পড়ে এল। শতদল জাফ... কাটা জানলার বাইরের দিকে তাকিয়ে ... পাশের বাড়ীর পুরোনো ইট-বার করা দেয়ালের উপর গাছের উপর বেলা শেষের রোদ এসে পড়েছে। কয়েকটা চড়ুই পাঁচিলের উপর লাফালাফি করছে। শুধু প্রবীরদের বাড়ী আর পাশের বাড়ীটার মধ্যিখানের গলিটার মধ্যে ছায়া নেমে এসেছে

রেকর্ড-প্লেয়ারে একটার পর একটা রবীন্দ্র-সংগীত বেজে যাচ্ছে। সে ভাবল বিয়ে করে প্রবীরের জীবনে যেন একটা পরিপূর্ণতা এসেছে। বিয়ে করার পর প্রবীরের জীবনে যেন একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে। আগে ও ছিল বাউন্ডুলের মত। সারাক্ষণই আড্ডা দিয়ে বেড়াত। এখন প্রবীর শান্ত হয়েছে, স্থির হয়েছে।

কী ভাবছেন? মীরা শুধোল।

না, কিছু ভাবছি না। গানটা শুনছিলাম।

—আর একবার দেব?

—দে।

প্রবীর আর একবার রেকর্ডটা চালিয়ে দিল।

গানের কথাগুলো শতদলের মনটাকে কি রকম বিষণ্ণ করে তুলল। বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা, নিয়ো হে নিয়ো/হৃদয় বিদারী হয়ে গেল ঢালা, পিয়ো হে পিয়ো...

দেখতে দেখতে সন্ধ্যে হয়ে গেল।

প্রবীর মীরাকে বলল, একটু চা খাওয়াবে না?

মীরা বলল, তুমি করো না। তুমি তো সেদিন খুব ভালো চা করে খাইয়েছিলে।

—ঠিক আছে। আমি করছি, বলে প্রবীর উঠে দাঁড়াল।

শতদল ঠাট্টা করল, তুই চা করবি। তাহলে তো মুখে দেওয়া যাবে না।

প্রবীর রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে বলল, একবার খেয়েই দ্যাখ্ না। আমি কি রকম চা করি।

এমন সময় প্যাসেজে যেন কার আসার শব্দ শোনা গেল।

মীরা জানলা দিয়ে প্যাসেজের দিকে তাকিয়ে বলল, এসো, এসো। এত দেরী হল যে?

শতদল জানলার দিকে পিছন ফিরে বসেছিল। সে মুখ ঘুরিয়ে একটি মেয়েকে দেখতে পেল।

মীরার কথা শুনে মনে হল মেয়েটির আসবার কথা ছিল। হঠাৎ এসে পড়েনি।

মেয়েটি কিন্তু প্রথমে মীরাদের ঘরে এল না। সে রান্নাঘরে গিয়ে প্রবীরের সঙ্গে কী-সব কথা বলতে সুরু করল। শতদল একবার শুনতে পেল প্রবীর পরিহাসের সুরে বলছে, আর বলেন কেন? আমি এমনই বিয়ে করেছি যে, বৌকেই চা করে খাওয়াতে হয়।

মেয়েটি উত্তরে কী বলল তা বোঝা গেল না।

একটু পরেই মেয়েটি এ-ঘরে এসে ঢুকল। মীরা তাকে তার পাশে টেনে নিয়ে বসাল। শতদলের মনে হ'ল মেয়েটি একবার তার দিকে তাকিয়েই মুখ নিচু করে নিল।

মীরা বলল, পরিচয় করিয়ে দিই।—এ আমার কলিগ অলকা মুখোপাধ্যায়. আর ইনি শতদল ঘোষাল—ও'র অনেকদিনের বন্ধু—

অলকা নামটা শুনেই শতদলের মনে পড়ে গেল। মীরা সেদিন এর কথাই তার কাছে বলেছিল। কথাটা মনে পড়তেই সে মেয়েটিকে একটু খুঁটিয়ে দেখবার ইচ্ছেটা দমন করতে পারল না। মেয়েটির গায়ের রঙ বেশ কালো। অতি সাধারণ চেহারা। বয়স একেবারে কম নয়। তার ফলে অল্পবয়সী মেয়ের শরীরে যে লাবণ্য লক্ষ্য করা যায় তাও নেই। মুখ-চোখ আকর্ষণ করার মত নয়।

শতদলের মনে হল মেয়েটি আড়চোখে তাকে দেখছে। শতদল তার দিকে তাকাতেই মেয়েটি লজ্জায় মুখ নামিয়ে নিল। সে এ কথা ভেবে খুব বিস্মিত হচ্ছিল যে মীরা সত্যি সত্যিই এই মেয়েটির সঙ্গে তার বিয়ে দেবার ফন্দি এঁটেছে। এই কথা ভাবতেই তার খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। মীরার উপর তার খুব রাগও হচ্ছিল। সেদিন যখন মীরা তার কাছে মেয়েটির কথা বলেছিল তখন সে সেটাকে নিছক ঠাট্টা বলে মনে করেছিল। মীরা যে সত্যি সত্যিই মেয়েটিকে তার সামনে হাজির করবে তা সে ভাবতেও পারেনি।

একটু পরে প্রবীর দু-কাপ চা নিয়ে এ-ঘরে ঢুকল। সে শতদল আর অলকার সামনে কাপ দুটো রাখল।

শতদল অনেকটা অস্বস্তি কাটাবার জন্যই বলল, খাওয়া যাবে তো?

—খেয়ে দ্যাখ্। বলে প্রবীর আবার রান্নাঘরে চলে গেল।

তারপর আরও দু-কাপ চা নিয়ে এল। মীরার সামনে একটি কাপ রেখে বলল, নিন, মহারাণী সেবা করুন।

ওর কথা বলার ভঙ্গিতে মীরা এবং অলকা দুজনেই হেসে উঠল।

শতদল চায়ের কাপে চুমুক দিতেই প্রবীর শুধোল, কি, কেমন হয়েছে?

—ফাইন্।

—আমি চা খারাপ করি?

—মোটেই না।

প্রবীর একটা সিগারেট ধরিয়ে মীরাকে বলল, কি, শুনলে তো? আমি তোমার চেয়ে খারাপ চা করি না।

মীরা মিটি-মিটি হাসছিল। সে বলল, আমিও তো তাই বলেছিলাম।

অলকা ওদের কথা উপভোগ করছিল। সে. শতদলের দিকে স্পষ্টভাবে তাকাতে পারছিল না। মীরা তাকে কী বলেছে কে জানে।

প্রবীর চায়ের কাপে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে শতদলকে বলল, তোর সঙ্গে ওর পরিচয় হয়েছে?

শতদল ঘাড় নাড়ল। বলল, একটু আগেই হয়েছে—

—উনি কিন্তু ভালো গান জানেন। অতুলপ্রসাদী, রবীন্দ্রসংগীত, দ্বিজেন্দ্রগীতি সব—

অলকা লজ্জিতভাবে বলল, ধোৎ, আপনি যে কী—

প্রবীর হেসে বলল, আরে এতে লজ্জা পাবার কী আছে! গান জানেন অথচ সেটা বললেই যত আপত্তি?

প্রবীর যেভাবে মেয়েটির গুণপনা ব্যাখ্যা করে যাচ্ছিল—তাতে শতদলের মনে হল যে অলকাকে এখানে আনার চক্রান্ত একা মীরাই করেনি। প্রবীরও করেছে।

—অলকা কিন্তু লেখাপড়ায়ও খুব ভালো। বি-টি-তে ফার্স্ট ক্লাশ পেয়েছিল। এবার মীরা বলল।

মীরা যত অলকার প্রশংসা করে যাচ্ছিল, শতদল ততই আড়ষ্ট হয়ে পড়ছিল। সে তখনই উঠে পড়তে পারলে বাঁচে। কিন্তু এখন উঠে যাওয়াও এক অস্বস্তিকর ব্যাপার। মীরা-প্রবীর যে তাকে এরকম একটা বেকায়দায় ফেলবে তা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

ওদিকে অলকা নামে মেয়েটিও যে খুব অস্বস্তিতে পড়েছিল তাও বোঝা যাচ্ছিল। সে প্রায় সারাক্ষণ মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। তার কালো মুখটা লজ্জায় ঘেমে উঠেছিল।

প্রবীর এবং মীরা আরও কিছুক্ষণ অলকার গুণপনা ব্যাখ্যা করে তারপর এক সময় চুপ করে গেল। বোধহয় শতদলের উৎসাহহীনতা লক্ষ্য করে তারা আর এ-বিষয়ে কথা বলতে খুব উৎসাহ পেল না।

মীরা এক সময় উঠে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। অলকা তার শাড়ীর আঁচল টেনে ধরে তাকে বসাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে 'তোমরা গল্প কর। আমি আসছি—' বলে এ-ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

প্রবীর অলকাকে লক্ষ্য করে শুধোল, আপনার তো গানের ডিপ্লোমা আছে তাই না?

এটাও যে শতদলকে জানানোর জন্য বলা তা বুঝতে তার অসুবিধে হল না।

অলকা মুখে কিছু বলল না। শুধু ঘাড় নাড়ল।

প্রবীর এবার শতদলকে লক্ষ্য করেই বলল, গান শুনবি?

শতদল খুব অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ল। তার গান শোনার এখন আদৌ ইচ্ছে নেই। কিন্তু গান শুনবো না বলাও যায় না। তাহলে মেয়েটিকে অপমান করা হয়। সে কী বলবে ভেবে পেল না।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য অলকাই তাকে বাঁচাল। সে উঠে দাঁড়াল। বলল, তাহলে আমি চললাম—

প্রবীর বলল, আহা-হা! করেন কী? আচ্ছা বসুন বসুন। আপনাকে গান গাইতে হবে না।

অলকা একটু হেসে বসে পড়ল।

প্রবীর শতদলকে বলল, তুই যে একেবারে বোবা হয়ে গেলি!

—কী বলব বল? শতদল শুধোল।

—একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে তোর আলাপ করিয়ে দিলাম। তুই কিছু বলছিস না?

শতদল বুঝল প্রবীর চাইছে সে-ও মেয়েটিকে কিছু জিগ্যেস করুক। কিন্তু সে সে-দিক দিয়েই গেল না। বলল, আমি আর কী বলবো? তোরাই তো বলছিস।

অলকা পলকের জন্য শতদলের দিকে তাকাল। মনে হ'ল সে কিছু জিগ্যেস না করায় সে তার প্রতি কৃতজ্ঞ।

—এক মিনিট। আমি একটু আসছি— বলে প্রবীর পাশের ঘরে চলে গেল।

এখন এঘরে শুধু শতদল আর অলকা। শতদল লক্ষ্য করল অলকার মুখটা যেন আরও নুয়ে পড়েছে। সে লজ্জায় মুখ তুলতে পারছে না। শতদল দারুণ অস্বস্তিতে পড়ল। প্রবীর তাকে এ কোন বিপদে ফেলল? সে কি ভেবেছে যে তার আড়ালে শতদল অলকার সঙ্গে স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারবে? সে একটা সিগারেট ধরিয়ে নীরবে টানতে লাগল।

মিনিট পাঁচ-সাত পরে প্রবীর যখন এঘরে এল তখন শতদল বলল, আমি এবার উঠবো রে।

—সে কি! এখনই প্রবীর বিস্মিত হল।

—হ্যাঁ। এবার আমায় উঠতে হবে। রাত হয়ে যাচ্ছে—

সে উঠে দাঁড়াল।

রান্নাঘর থেকে মীরা বলল, ও কি! এখন চললেন কোথায়? আমি চা করছি। খেয়ে যাবেন।

শতদল বলল, না, আর চা খাবো না।

সে দরজার দিকে পা বাড়াল। অলকা যেন এতক্ষণে স্বচ্ছন্দে তার দিকে একবার তাকাল মনে হল। শতদল তার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। বলল, চলি—

অলকা ঘাড় নাড়ল। তার মুখে সৌজন্যের হাসি।

মীরা রান্নাঘর থেকে বলল, অলকা তুমি কিন্তু উঠো না। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

শতদল রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে মীরাকে বলল, আসি—

—আবার আসবেন।

—আচ্ছা।

মীরা যেন কি একটা বলতে গিয়ে বলল না। শুধু ওর দৃষ্টির মধ্যে যেন কী একটা প্রশ্ন ফুটে উঠল।

শতদল রাস্তায় বেরিয়ে দেখল প্রবীরও তার সঙ্গে সঙ্গে আসছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটার পর প্রবীর বলতে সুরু করল, অলকার বাবা নেই। ওর দাদা বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেছে। মেয়েটার বিয়ে হচ্ছে না চেষ্টার অভাবে। অথচ বয়েসও তো হয়ে যাচ্ছে। তাই ভাবলাম তোর যদি পছন্দ হয় —অবশ্য দেখতে খুব ভালো না—তবে মেয়েটা খুব ভালো—ওর আয়েই ওদের সংসার চলে—

শতদল কিছু বলল না। সে প্রবীর এবং মীরার উপর খুব রাগ করবে ভেবেছিল। কিন্তু তাও সে পারল না। পারল না অলকার কথা ভেবেই। কী অবস্থায় পড়ে মেয়েটিকে এই অপমান মেনে নিতে হয়েছে তা সে অনুমান করতে পারে। আর এটাও সে বুঝতে পারছিল যে, মেয়েটি খুব দুঃখী। কিন্তু তার জন্য শতদলের কিছু করার নেই। অলকার প্রতি এই মুহূর্তে সে কোন আকর্ষণ অনুভব করছিল না! বরং তার জন্য সে যে কিছু করতে পারছে না সেজন্য তার খুব খারাপ লাগছিল। অলকার যদি কোন উপকার সে করতে পারত তাহলে সে সুখী হত। কিন্তু অলকাকে বিয়ে করা তার পক্ষে অসম্ভব।

শতদলের মনে হল প্রবীরের বাড়ীতে ছুটির দিনটা বেশ ভালোভাবেই কাটছিল। হঠাৎ যেন তাল ভঙ্গ হয়ে গেল।

ভগিনী নিবেদিতার পত্রে শ্রীঅরবিন্দ

শংকরীপ্রসাদ বসু

ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছু সংবাদ এবং কিছু বিতর্ক ইতিমধ্যে আমরা পেয়ে গেছি বিতর্কের শুরু বহু বছর আগে—যখন ঐতিহাসিক গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী 'উদ্বোধন' পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক জীবন সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে লিখেছিলেন। শ্রীমতী লিজেল রেমঁর 'নিবেদিতা-জীবনী (বা তার অনুবাদ) বের হবার পরেও পরিবেশিত তথ্যের সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে এবং শ্রীঅরবিন্দ তাঁর শিষ্য-মারফত সঠিক সংবাদ দিতে চেষ্টা করেন। বর্তমান রচনায় ঐসব বিতর্কের মধ্যে প্রবেশের ইচ্ছা আমার নেই; এমনকি সর্বস্বীকৃত সংবাদগুলিও পুরোপুরি পরিবেশন করতে চাইছি না। বিশেষ প্রয়োজনীয় মাত্র দু' একটি সংবাদের উল্লেখ করব।

প্রথমত শ্রীঅরবিন্দ জানিয়েছেন—নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ধর্মের ক্ষেত্রে নয়—কেবল রাজনীতির ক্ষেত্রেই। শ্রীঅরবিন্দ অবশ্য একই সঙ্গে বলেছেন, যোগে নিবেদিতার সহজ অধিকার ছিল।

এই প্রসঙ্গে একটি কথাই বলা চলে, নিবেদিতার সঙ্গে ধর্মের ক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দের যোগ না থাকলেও নিবেদিতার গুরু বিবেকানন্দের এবং তস্য গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তা ছিল। সেই আধ্যাত্মিক সংযোগের কথা স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দই জানিয়েছেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রতি শ্রীঅরবিন্দের ভক্তি নিশ্চয় নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পথ খুলে দিয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, শ্রীঅরবিন্দ জানিয়েছেন, বাংলাদেশে সংগঠিত প্রথম বিপ্লব-পরিষদের পাঁচ সদস্যের একজন ছিলেন নিবেদিতা।

এই প্রসঙ্গে আমাদের কাছে কিছু অধিক সংবাদ আছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ঐ বিপ্লব-পরিষদ গঠিত হবার আগেই নিবেদিতা ভারতে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন—তা হয়েছিলেন স্বামীজী জীবিত থাকা কালেই। এ ব্যাপারে কাউণ্ট ওকাকুরার বড় ভূমিকা ছিল। নিবেদিতার পত্রাবলী থেকে এবং অন্যান্য সূত্র থেকে অজ্ঞাতপূর্ব সংবাদ সংগ্রহ করে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে প্রকাশিতব্য একটি গ্রন্থে আমি তা বিস্তৃতভাবে উপস্থিত করেছি। নিবেদিতাই অগ্রণী হয়ে বিপ্লবের ব্যাপারে অরবিন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। নিবেদিতা সম্বন্ধে অরবিন্দও উৎসুক ছিলেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত নিবেদিতার 'কালী দি মাদার' গ্রন্থ অরবিন্দের কাছে রাজদ্রোহকর মনে হয়েছিল।

তৃতীয়ত, শ্রীঅরবিন্দ জানিয়েছেন, নিবেদিতার একটি নিজস্ব দল ছিল।

সেকথা সত্য। কিন্তু একথাও সত্য, অরবিন্দের দলের সঙ্গেও নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, এবং অরবিন্দের বাংলা-দেশ-ত্যাগের পিছনে নিবেদিতার যথেষ্ট প্ররোচনা ছিল। ঐ প্রস্থানকে কিছু সময়ের জন্য ঢেকে রাখতে নিবেদিতা অরবিন্দের 'কর্মযোগিন' পত্রিকার কয়েক সংখ্যা বেনামে সম্পাদনা করে বার করেছিলেন।

যেসব সংবাদের উল্লেখ করলাম, সেগুলি মোটামুটি অনুসন্ধিৎসুদের কাছে পরিচিত। কিন্তু জানা নেই—এমন কিছু সংবাদও আমাদের কাছে আছে।

শ্রীমতী লিজেল রেমঁ নিবেদিতা-জীবনী লিখবার সময়ে নিবেদিতার বিপুল পরিমাণ চিঠি ব্যবহার করেছিলেন। এইসব চিঠির অধিকাংশই মিস ম্যাকলাউড্‌কে লেখা। মিস ম্যাকলাউডের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবেও তিনি সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন। ইউরোপ আমেরিকার আরও কিছু ব্যক্তি (নিবেদিতার ভাই ও বোন তাঁদের মধ্যে ছিলেন) তাঁকে মূল্যবান সংবাদ দেন। ভারতবর্ষে এসেও তিনি বহু ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সংবাদ সংগ্রহ করেন। তার পরেই তিনি নিবেদিতা-জীবনী লিখেছিলেন। রেমঁ-লিখিত জীবনীর নানা তথ্য কিন্তু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়—বিশেষত নিবেদিতার রাজনৈতিক কার্যাবলীর বিষয়টি।

নিবেদিতা-বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করে আমি নিবেদিতার বিপুলসংখ্যক চিঠিপত্রের কথা জানতে পারি, এবং শ্রীমতী নারায়ণী দেবীর মারফত সংবাদ পেয়ে শ্রীমৎ অনির্বাণের কাছে হাজির হই। কী অপূর্ব মহাপ্রাণতার সঙ্গে শ্রীমৎ অনির্বাণ আমাকে নিবেদিতা-পত্রাবলী দিয়ে দিয়েছিলেন, তার কাহিনী আমি লিখেছি 'নিবেদিতা লোকমাতা' গ্রন্থের ভূমিকায়। যাইহোক, সেই চিঠিগুলি পরীক্ষা করে নিবেদিতার রাজনৈতিক ধারণা ও কার্যাবলীর বিষয়ে কিছু কিছু সংবাদ পাবার পরেও কিন্তু আমাকে একটি বিষয়ে একেবারে হতাশ হতে হয়েছিল—ঐ চিঠিগুলির মধ্যে অরবিন্দ-প্রসঙ্গ একেবারে নেই! একথা ঠিক ঐ চিঠিগুলির মধ্যে বেশ কয়েকবার নিবেদিতা বলেছেন—গুরুতর কোনো কথা আর চিঠিতে লিখব না, চিঠিপত্রে অবিরত হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে—এবং আমরা জানি, অরবিন্দের সঙ্গে নিবেদিতার গুরুতর বিষয়েই সম্পর্ক ছিল—তবু অরবিন্দের উল্লেখ মাত্র না থাকা বিস্ময়কর। একটি জিনিস অবশ্য আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল—বহু চিঠিই ছেঁড়া, বিশেষ

আপনার প্রসাধনের একান্ত প্রয়োজনীয় আধার

সানসিল্ক
শ্যাম্পু
—চুলের পরিপুষ্ট
সৌন্দর্য্যের জন্যে
Sunsilk
Sunsilk
Tonic
Sunsilk

'প্রয়োজনীয়' অংশে। শ্রীমতী লিজেল রেম'কে এ-বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি জানান—মিস ম্যাকলাউড তাঁর সামনে বসে বহু চিঠি গোটাগুটি বা অংশত ছিঁড়ে-ছিলেন—'খুবই ব্যক্তিগত' এবং 'খুবই রাজনৈতিক' বলে। আমাকে অগত্যা সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল—ছিঁড়ে-ফেলা অংশের মধ্যে অরবিন্দ ছিলেন—এই কথা ভেবে!!

কাহিনীটি কিন্তু এখানেই শেষ হয়নি। শ্রীমতী রেম' পরে আরও একতাড়া চিঠি পাঠিয়ে দেন, যেগুলি লেখা হয়েছিল ইংলণ্ডে অবস্থিত এস কে র‍্যাটক্লিফের কাছে। র‍্যাটক্লিফ স্টেটসম্যানের সম্পাদক ছিলেন, স্বদেশী আন্দোলন সূচনার সময়ে। নিবেদিতার জালে ধরা পড়ে তিনি ভারত-প্রেমিক হয়ে দাঁড়ান। ফলে তাঁকে চাকরি ছেড়ে ইংলণ্ডে চলে যেতে হয়। সেখানে তিনি ইংলণ্ডের অন্যতম প্রধান সাংবাদিক-লেখক হয়ে উঠেছিলেন। উচ্চ রাজনৈতিক মহলে তাঁর গতিবিধি ছিল। নিবেদিতা তাঁকে ভারতীয় অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত করতেন পত্রযোগে। নিবেদিতার ঐসব চিঠি সাধারণ ডাকে যেত কিনা সন্দেহ—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেত এজেন্ট মারফত। এইসব চিঠির মধ্যে স্পষ্ট ভাষায় এবং ইঙ্গিতে তৎকালীন রাজনীতির অতি গুরুত্বপূর্ণ সব সংবাদ দেওয়া হয়েছিল। যাঁরা মনে করেন নিবেদিতা উপর-উপর রাজনীতি করতেন, তাঁদের ধারণা যে কত উপর উপর, তা প্রমাণের মত যথেষ্ট উপাদান এই চিঠিগুলিতে রয়েছে।

এবং এই চিঠিগুলির মধ্যেই অরবিন্দের উল্লেখ পেয়েছি। উল্লেখগুলি সাধারণভাবে খুব বিস্তৃত নয়, কিন্তু মূল্যবান। প্রত্যেকটি উল্লেখের পিছনেই খণ্ড ইতিহাস রয়েছে—যার বিস্তৃত বিশ্লেষণ করা বর্তমানে সম্ভবপর নয়। কেবল এইখানে স্মরণ করিয়ে দেব—নিবেদিতা তাঁর বন্ধুকে সংবাদ দেবার জন্যই এইসব সংবাদ পাঠাতেন না। অন্য উদ্দেশ্যও ছিল ঃ এইসব সংবাদ পেয়ে র‍্যাটক্লিফ যথাস্থানে কলকাঠি নাড়াবেন এবং সম্ভবক্ষেত্রে সংবাদপত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ করবেন।

যেমন ধরা যাক, অরবিন্দের দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার-সম্ভাবনার কথা অনেকগুলি চিঠিতে জানানো হয়েছে। এইসব সংবাদ সংগ্রহের নানা সূত্র নিবেদিতার ছিল, এবং অনেক সময়েই তিনি কথাগুলি বাতাসে ভাসিয়ে দিতেন—এ-বিষয়ে জনসাধারণকে সতর্ক ও সচেতন করবার জন্য।

১৯০৯, ৩০শে জুলাই তারিখে নিবেদিতা মিঃ র‍্যাটক্লিফকে লেখেন—'শুনতে পাচ্ছি, তিনি (বাংলার লেফটন্যান্ট গভর্নর) এখনো বাংলার ম্যাটাসিনিকে ৭ই অগাস্ট তারিখে (বয়কট-দিবসে) চালান দেবার কথা ভাবছেন। পুলিসের কাছ থেকে ঐ-বিষয়ে আবেদন পেলেই ও কাজ তিনি করে ফেলবেন। পূর্ববর্তী গভর্নরের বরাতের কথা, সেইসঙ্গে আসামীর জনপ্রিয়তার কথা ভাবলে, তাঁর এই কাজকে চরম বেপরোয়া আচরণ বিবেচনা করতে হবে।' বাংলার এই নবনিযুক্ত গভর্নর যে খুব শক্ত মানুষ, সেকথাও নিবেদিতা এই চিঠিতে লিখেছিলেন।

একই চিঠিতে সরকার পক্ষে কৌঁসলী নর্টন সম্পর্কে নিবেদিতা যা লিখেছেন, তাকে মোটেই শ্রদ্ধাসূচক বলা চলে না। —'তোমাকে জানাতে চাই, একথা বলাবলি করা হচ্ছে যে, নর্টন একটা পুরো আহাম্মক —আইন সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান খুব অল্প বা একেবারেই নেই। ......মামলা চলাকালে ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়েছিল, (আশুতোষ) বিশ্বাসই সরকার পক্ষের মেরুদন্ড, তিনি সরে গেলেই সব ভেঙে পড়বে।' ১ সেপ্টেম্বর, ১৯০৯ তারিখে একই বিষয়ে নিবেদিতা লিখেছেন—'আপীল-মামলায় চিত্ত দাশ অপূর্ব কাণ্ড করেছেন। আর প্রতিদিন সবাই সবিস্ময়ে ভাবছে, কি করে নর্টনকে কেউ মামলায় ডাকতে পারে! ফরিয়াদী পক্ষে আশুতোষ বিশ্বাসই ছিলেন সত্যকার শক্তিস্তম্ভ। তাঁর 'অপসারণই' দেখা যাচ্ছে, সবচেয়ে কাজের কাজ হয়েছিল।'

এর আগে ৮ অগাস্ট, ১৯০৯-এর চিঠিতে নিবেদিতা, সরকার কেন অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করতে চায়, সে-বিষয়ে লিখে-ছিলেন—'অরবিন্দ ঘোষের নির্বাসনের ক্ষেত্রে অবশ্য তুমি আসল কারণটা বুঝতে পারবে। ৯ জন নেতাকে যখন নির্বাসনে পাঠানো হয়, তখন দেশের উপরে যে হঠাৎ স্তব্ধতা নেমে আসে, তা দেখে সরকার নিজের বিরাট বুদ্ধির কাজের মহিমা বুঝতে পারে। আলিপুর বন্দীদের মুক্তির পরে আবার জাগরণ দেখা দিতে থাকে। সুতরাং সার কথা হল—জাগরণের হোতাকে পাকড়াও করো এবং গারদে পোরো!'

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৯-এর চিঠিতেও 'ন্যাশনালিস্টদের নেতাকে' গ্রেপ্তার করে জামিন না দিয়ে আটকে রাখা হবে—এমন কথা পাচ্ছি।

অরবিন্দের প্রকাশ্য বক্তৃতাদি কিভাবে বিপদের সৃষ্টি করেছিল সে-বিষয়ে নিবেদিতা ২৪শে জুন, ১৯০৯ তারিখে লিখেছেন, '(সংবাদপত্রে) বেরিয়েছে, অরবিন্দ বরিশালে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে অশ্বিনীর (অশ্বিনীকুমার দত্ত) প্রশংসা করেছেন এবং বয়কট করতে প্রণোদিত করেছেন। পুলিশ তার নোট নিয়েছে।' এইসব বক্তৃতা সম্বন্ধে নিবেদিতা নিশ্চয় অরবিন্দকে সতর্ক করে-ছিলেন। অরবিন্দর নির্বাসনে আন্দোলনের বিশেষ ক্ষতি হবে তিনি মনে করতেন। অরবিন্দ এইসব সতর্কবাণীতে বিশেষ কান দেননি, এবং সব কিছুই 'প্রেরণা বশে করছেন—এইরকম কৈফিয়ত দিয়েছিলেন। নিবেদিতা অবশ্যই প্রেরণায় বিশ্বাস করতেন, তবে বাস্তববুদ্ধির বিষ দিয়ে দিলে সন্দেহ থাকে না'—এই ধরনের ভলটেয়ারী ধারণাও তাঁর ছিল। রাজনীতিকে তিনি নৈকষ্য আধ্যাত্মিক ব্যাপার মনে করতেন না। সুতরাং কিছুটা হতাশা ও বিদ্রূপ মিশিয়ে তিনি ২১শে জুলাই, ১৯০৯ তারিখে (ইউরোপ থেকে ফেরার পরেই) লিখেছেন ঃ 'অরবিন্দ চতুর্দিকে বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছেন, এবং আমার বিবেচনায় এটা বিশেষ অবিবেচ-চিত কাজ হচ্ছে। কিন্তু তিনি নিজেকে ঈশ্বর-প্রণোদিত মনে করছেন, সুতরাং গ্রেপ্তার হতে পারেন না। আমরা অবশ্য অনেকেই অনেক অদ্ভুত কাজ করে থাকি, তার হেতু কেবল আমাদেরই জানা থাকে, 'আমরা কারো পরোয়া করি না' ইত্যাদি। কিন্তু ঈশ্বর অবশ্যই আমাদের 'বাঁচানোর' প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাখেননি! জোয়ান অব আর্কের ঘটনা একটি স্থায়ী বিরোধী দৃষ্টান্ত। ......যাইহোক, ধর্মীয় অভিজ্ঞতা এবং যুদ্ধনীতি কোনোমতেই এক বস্তু নয় এবং উভয় বস্তুকে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়।'

অরবিন্দ অবশ্য শেষ পর্যন্ত গ্রেপ্তার হননি। তার পিছনে নিবেদিতার সুযোগ-সন্ধানী রাজনৈতিক বুদ্ধি এবং ঈশ্বরেচ্ছা—কার ভূমিকা পরিমাণে বেশী, তা নিয়ে তর্ক থামবে না। শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং এ-ব্যাপারে নিবেদিতা এবং দিব্যবাণী উভয়ের ভূমিকার কথা জানিয়েছেন। এই সঙ্গে আমরা নিবেদিতার পত্রাবলী থেকে বুঝতে পারি, ঈশ্বরের কিছু কাজ ঈশ্বরনন্দিনী হিসাবে নিবেদিতা গ্রহণ করেছিলেন, এবং অরবিন্দ যাতে শেষ পর্যন্ত গ্রেপ্তার না হন, সর্বাত্মকভাবে তার চেষ্টা চালিয়ে ছিলেন। সরকারী মহলেও নিবেদিতার বন্ধুবান্ধব ছিল। অরবিন্দর গ্রেপ্তার না হওয়া সম্বন্ধে একটি মূল্যবান সংবাদ পাচ্ছি নিবেদিতার ১ সেপ্টেম্বর, ১৯০৯-এর চিঠিতে ঃ 'অবস্থা শান্ত মনে হচ্ছে। অরবিন্দকে যদি নির্বাসনে পাঠানো না হয়, তা সম্পূর্ণত ম্যাককার-নেসের এবং ইংলণ্ডে তোমার (মিঃ র‍্যাটক্লিফের) প্রয়াসের জন্যই।'

অরবিন্দর 'কর্মযোগিন' পত্রিকার বিষয়ে উল্লেখ নিবেদিতার কয়েকটি চিঠিতে পাই। ২১ জুলাই, ১৯০৯ তারিখে লিখেছেন, 'বন্দেমাতরমের জায়গায় একটি নতুন সংবাদপত্র কর্মযোগিন, বেরিয়েছে।' ৫ অগাস্ট তারিখে লিখেছেন ঃ 'আমার বিশ্বাস, এই সপ্তাহে তোমার কাছে কর্মযোগিন পৌঁছবে। এর মধ্যে যে 'খোলা চিঠি' রয়েছে তা ও-মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। আমার বিশ্বাস, মর্লি এবং সকল সাংবাদিককে এর কপি পাঠানো হয়েছে। তবে সেগুলি পৌঁছতে নাও পারে।' নিবেদিতা অ্যালবার্টাকে (লেডী স্যাণ্ডউইচ) কর্মযোগিন পাঠিয়েছিলেন গোপনে। পাঠাবার কারণ 'আগামী দিন-দুয়েকের মধ্যে যদি খোলা চিঠির লেখককে নির্বাসনে পাঠানো হয়—তাহলে ও'রা যেন যথাকর্তব্য পালন করেন। র‍্যাটক্লিফকে তিনি ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য আর এক কপি কর্মযোগিন পাঠাচ্ছেন—তাও লিখেছেন।

নিবেদিতা জীবনের সর্বক্ষেত্রে মহা-ত্যাগী, কেবল সাহিত্যক্ষেত্রে প্রশংসা বিতরণে বদান্য নন। না হতে পারেন, কারণ তিনি স্বয়ং উচ্চাঙ্গের লেখিকা। এই নিবেদিতা, আমরা দেখতে পাই, অরবিন্দের

রচনার সবিশেষ অনুরাগী। ২০ জানুয়ারী, ১৯০৯ তারিখে তিনি সোচ্ছ্বাসে লিখেছেন : 'তুমি প্রতি সপ্তাহে যাতে কর্মযোগিন পাও তা কিভাবে যে চাইছি, কি বলব! আমার মতে, কর্মযোগিন চিন্তা ও স্টাইলের বিজয়বাদ্য। অরবিন্দ অসাধারণ। অপরপক্ষে অবশ্য এ-কথাও সত্যি হবে, যিনি দল চালান তাঁকে আদর্শকে কিছু তরল করার ঝুঁকি নিতেই হয়।' অরবিন্দের প্রস্থানের পরে নিবেদিতা ১৩ অগস্ট, ১৯১০ তারিখে জানিয়েছিলেন, কারো কাছে কর্মযোগিনের কোনো কপি পেলেই তাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। তার আগে ৪ জুলাই, ১৯১০ তারিখে লিখেছিলেন, অরবিন্দ এখনো গ্রেপ্তার হননি, যদিও তাঁকে ধরবার জন্য ৫০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

এবং তারও আগে, ৭ এপ্রিল, ১৯১০-এর চিঠিতে পাচ্ছি : 'এই সপ্তাহে কর্মযোগিনকে আক্রমণ করা হয়েছে। একই অফিস থেকে 'ধর্ম' নামে একটি বাংলা সাপ্তাহিক বেরুত। ২০০০ টাকা জমা না দেওয়ায় সেটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অরবিন্দ ঘোষ ও কর্মযোগিনের মুদ্রাকরকে গ্রেপ্তার করা হবে—কর্মযোগিনে প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য। প্রবন্ধটি এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। আমার বিশ্বাস প্রবন্ধটিকে ইংলন্ডে তুমি প্রচারিত করতে পারবে। প্রবন্ধটি কি রাজদ্রোহকর? অরবিন্দ ঘোষ উধাও। ১৮ই মামলার দিন স্থির হয়েছে। মুদ্রাকরের মামলাটা যদি জেতা যায় তাহলে অন্য ওয়ারেন্টগুলি বরবাদ হয়ে যাবে।'

অতঃপর নিবেদিতা বিস্তৃতভাবে লিখেছিলেন—সরকারের এই কণ্ঠরোধ-ব্যবস্থা বলবৎ থাকলে হত্যার পক্ষে প্রচার এবং গোপন সংবাদপত্র প্রচার ছাড়া আর কোনো উপায় অবশিষ্ট থাকে না।

এই চিঠিতেই নিবেদিতা লিখেছিলেন, যে কোনো ক্ষেত্রেই হোক, কর্মযোগিনের আরও দুটি সংখ্যা বেরুবে।

কর্মযোগিনের শেষের কয়েকটি সংখ্যা নিবেদিতা প্রকাশ করেছিলেন—অরবিন্দের প্রস্থানকে ঢেকে রাখবার জন্য—এ ইতিহাস আমরা জানি। কিন্তু জানি কত সামান্য! কিছু নূতন সংবাদ নিবেদিতার পত্রগুলি থেকে উপরে উপস্থিত করলাম, এবং তার থেকেই কিছুটা অনুমান করতে পারা যায়—বিবেকানন্দ-প্রদত্ত 'নিবেদিতা' নামটি সার্থক করবার জন্য, এবং 'ভারতের সেবিকা বান্ধবী গুরু হবার' আশীর্বাদ সফল করবার জন্য, রাজনীতিতেও ভারতের জন্য নিবেদিতাকে কতখানি করতে হয়েছিল।

অরবিন্দের প্রতি নিবেদিতার সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা ধর্মের ক্ষেত্রে নয়—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের 'নিবেদিতা' ধর্মক্ষেত্রে নরনারায়ণকে পেয়ে আছেন। তা জাতীয়তার প্রবক্তা অরবিন্দ সম্বন্ধেই। এমনকি একথাও বলা যায়, 'রাজনৈতিক' অরবিন্দ সম্বন্ধে নিবেদিতা বিশেষ মুগ্ধ নাও হতে পারেন। নিবেদিতা রাজনীতির যে গহন, জটিল ও বিস্তৃত ক্ষেত্রে বিচরণ করছেন—সেখানে তিনি— অনেক সময়েই বাস্তব রাজনীতির ছিলেন: অরবিন্দকে অনায়াসে মনে করেছেন—অন্তত আমার তাই ধারণা। অরবিন্দের প্রতি নিবেদিতার সমাদর উচ্চতর ক্ষেত্রে—জাতীয়তার শ্রেষ্ঠ উন্মোচকের প্রতি সেই নমস্কার। অরবিন্দের জাতীয়তা-বিষয়ক রচনাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশের বাসনা ছিল নিবেদিতার, এবং তিনি চেয়েছিলেন বইটি ইংলন্ড থেকে প্রকাশিত হোক। ২৬ জুন, ১৯০৯ তারিখে তিনি র‍্যাটক্লিফকে লিখেছিলেন : 'সম্ভব হলে আমরা মামলাকালে উপস্থাপিত অরবিন্দের রচনাগুলি এবং অন্যান্য বস্তু নিয়ে একটি বই তৈরী করতে চাই। বইটির শেষে থাকবে যথার্থ হিন্দুধর্মের অসাধারণ নমুনা— 'To the Sea'। ভূমিকায় থাকবে মামলার বিবরণ, স্বপক্ষে বিপক্ষে বক্তৃতাদি এবং বিচারক-কৃত সকল কিছু সারসংক্ষেপে, মডার্ন রিভিউ-এ প্রকাশিত ছবিটিও। বইটি ইংলন্ডে প্রকাশ করা ভালো, তাতে যদি খরচ দিতে হয় তাও সই। ক্রপটকিনের সহযোগিতায় তুমি কি একজন প্রকাশক জোগাড় করতে পারো—হেইনম্যান বা অন্য কাউকে! ইংলন্ড থেকে প্রকাশের সুবিধা তুমি দেখতে পাবে, এবং মনে হয়, বইটি প্রস্তুত হলে তোমার 'সাজেশন' জানাতে পারবে। মনে হয় না ফেবিয়ান সোসাইটি এটিকে প্রকাশ করতে বা পক্ষপুটের আশ্রয় দিতে চাইবে—'ইন্ডিয়া' পত্রিকা কর্তৃপক্ষও তাই।'

নিবেদিতার কাছে 'জাতীয়তা জননী আমার'—অরবিন্দ সেই জাতীয়তার প্রবক্তা—সুতরাং অরবিন্দ 'বরণীয়'। এই মনোভাব নিবেদিতা প্রকাশ করেছেন ১৮ অগস্ট, ১৯১০-এর চিঠিতে। অরবিন্দের পন্ডিচেরীতে প্রস্থানের পরে এই চিঠি লেখা হয়। এই চিঠির মধ্যে নিবেদিতা কিছু বিস্তৃতভাবে একটি বিষয়ে আলোচনা করেন—র‍্যাটক্লিফকে বিষয়টি সম্বন্ধে সচেতন ও অবহিত করে দেবার জন্যে—এবং সেই প্রসঙ্গেই অরবিন্দ সম্বন্ধে তাঁর চরম কথাটি বলেছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে সরকারপক্ষ এবং সরকারের তাঁবেদার লোকেরা বলেছিলেন—এই আন্দোলন ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণাধিক্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন। এই কথাটি ইংলন্ডে বহুল প্রচারিত হয়। এই উদ্ভট ধারণার বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ করে নিবেদিতা বলেন—এই আন্দোলন 'জাতীয় আন্দোলন'—যা তথাকথিত জাতিভেদকে নষ্ট করে ভারতবর্ষে বৈষম্যরহিত অখণ্ড সমাজের পত্তন করবে। নিবেদিতা তিক্তভাবে বলেছিলেন—ইউরোপীয়রা কোনো আন্দোলন করবার সময়ে আগে 'ষড়যন্ত্রের' কথা ভাবে—ভারতবর্ষে তা কিন্তু হয় না। 'স্বদেশী আন্দোলন একটা দিব্য জাগরণ—যা মাতৃসমাজের দিকে ধাবিত দেশপ্রেমতরঙ্গিণী'। নিবেদিতা আরও বলেছিলেন—এই আন্দোলনের মূলে স্রষ্টারা ব্রাহ্মণ নন—কায়স্থ। 'গোটা জিনিসটিকে সৃষ্টি করেছে বিবেকানন্দের হৃদয়'—যিনি কায়স্থ বা ক্ষত্রিয়। এবং ভারতীয়গণের মধ্যে 'কায়স্থ অরবিন্দের' মনীষাই একমাত্র জাতীয়তাকে যথার্থ সৃষ্টিশীলরূপে ধরতে পেরেছে। জগদীশচন্দ্র বসুও তা পেরেছেন, কিন্তু নিষ্ক্রিয়ভাবে। নিবেদিতা আরও কয়েকজন কায়স্থ/ক্ষত্রিয়ের নাম করেছিলেন ঐ প্রসঙ্গে, যাঁরা ঠিক পরের থাকে রয়েছেন—গিরিশ ঘোষ, ভুপেন্দ্রনাথ বসু, রমেশ দত্ত ইত্যাদি। নিবেদিতার এই কায়স্থ-প্রীতির মূলে ছিল গুরুভক্তি, এই সমালোচনা উঠতে পারে, এবং জাতিভেদবিরোধী জাতীয় আন্দোলনের কথা বলবার পরে তিনি একটি বিশেষ জাতির নেতৃত্বের উপরে জোর দিয়েছেন, সে কথাও বলা যায়—কিন্তু নিবেদিতা সংকীর্ণ কোনো মনোভাব নিয়ে ঐ কথাগুলি বলেননি—সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেই তা বলেছিলেন। তাঁর বক্তব্য—ক্ষত্রিয়রা চিরদিন নূতন ভাব আত্মসাৎ করে তার পক্ষে লড়াই করেছে—ক্ষত্রিয় জাতিই জাতি ভেঙেছে সর্বাধিক—তার চরম দৃষ্টান্ত বুদ্ধ। নিবেদিতা নিজেকে 'অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়ের' অন্তর্ভুক্ত মনে করতেন এবং ক্ষত্রিয় জাতিকে জাতি-বোধহীন জাতি ভাবতেন।

অরবিন্দ সম্বন্ধে নিবেদিতার উক্ত শ্রেষ্ঠ প্রশংসাবাণী ছিল এই—

> 'Arabindo Ghosh, may be said to be the one Indian mind that has really grasped nationality in a creative sense.'

নিবেদিতার কাছে নিখিল সত্যের দ্বার উন্মোচন করেছিলেন বিবেকানন্দ। তারপর সেই বিবেকানন্দই একদা নিখিল সত্যকে সাময়িক সুনির্দিষ্ট নদীখাতে প্রবাহিত করার নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন—'আগামী পঞ্চাশৎ বৎসর এই পরম জননী মাতৃভূমিই তোমার আরাধ্য দেবী হউক।'

নিবেদিতা সেই সুর তুলে নিয়ে জাতীয়তার মন্ত্র রচনা করেছিলেন :

'আমি বিশ্বাস করি—ভারতবর্ষ এক, অখণ্ড, অবিভাজ্য।

'সম আবাস, সম স্বার্থ এবং সম প্রেমের উপর নির্মিত হয় জাতীয় ঐক্য।

'আমি বিশ্বাস করি—যে-শক্তি ব্যক্ত হয়েছে বেদ ও উপনিষদের মধ্যে, ধর্মসমূহ ও সাম্রাজ্যের সংগঠনে, বিদ্বানের বিদ্যায়, ঋষির ধ্যানে—সেই শক্তিই পুনর্বার আবির্ভূত হয়েছে আমাদের মধ্যে—আজ তার নাম জাতীয়তা।

'আমি বিশ্বাস করি—বর্তমান ভারত অতীতের মধ্যে গভীর-প্রোথিত এবং তার সামনে রয়েছে জ্যোতির্ময় ভবিষ্যৎ।

'হে জাতীয়তা! আমার কাছে আবির্ভূত হও আনন্দ ও বেদনারূপে; হে জাতীয়তা, তোমারি করে নাও আমাকে।'

এই 'জাতীয়তাকে' অরবিন্দ ভাষা দিয়েছিলেন—তাই তাঁর প্রতি নিবেদিতার অসীম কৃতজ্ঞতা।

—একুশ—

মনোরমা পড়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ মাথাটা কেমন ঘুরে যেতেই চোখের সামনে অন্ধকার মনে হ'ল, হাত বাড়িয়ে সে শূন্যে একটা কিছু আশ্রয় খুঁজছিল।

চেয়ার থেকে উঠে কিরণ তাড়াতাড়ি মাকে ধরে ফেলল। বিছানার উপর একটা বালিশে হেলান দিয়ে তাকে ভালো করে বসাল। বলল, 'এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন মা? বিন্তির কি হয়েছে আগে শুনি।'

মনোরমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জবাব দিল,—'আর কি শুনবি বাবা? ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কাজ নেই। কালামুখী আমার কাছে সব স্বীকার করেছে। কিছু গোপন করেনি।' আঁচলের কোণে চোখের জল মুছতে মুছতে ফের বলল,—'সেই বড়মানুষের ছেলে। সেই রতীশ আমার মেয়ের এই সর্বনাশ করল।'

সব শুনে কিরণ প্রায় নিঃসন্দেহ হ'ল। মায়ের নির্ণয় বোধহয় অভ্রান্ত। প্রকৃতির নিয়ম-টিয়ম হিসেব করলে ঠিক এরকম একটা কিছু ধরে নিতে হয়। কিন্তু কি সাংঘাতিক অবস্থা। খুব শীগগীর একটা বিহিত করা প্রয়োজন। কথাটা বাড়ির ঝি কিম্বা বাইরের কোনো লোকের কানে গেলে আর রক্ষে নেই। পাড়ায় একটা ঢি-ঢি পড়ে যাবে। তারপর দশজনের কাছে মুখ দেখানো লজ্জার ব্যাপার হবে না?

একটু আগে সকালের সোনা-রোদ জানালা ডিঙিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকেছে। এতক্ষণ চাদর জড়িয়ে চুপ করে বসে থাকতে কি সুন্দর লাগছিল। রোদ্দুরে পিঠ রেখে বীতাবরীর কথা ভাবছিল কিরণ। তার নিজের সমস্যা। এরপর সে কি করবে? বীতাবরীর বাবার সঙ্গে দেখা করবে কি-না। চুপ করে ভাবতে ভাবতে কখন অবচেতন মনে সে নানারকম স্বপ্নের জাল বুনছিল।

মায়ের কথা শুনে কিরণ যেন ঘেমে উঠল। এখন তার একটুও শীত করছে না। টান মেরে গায়ের চাদরটা বিছানার উপর ছুঁড়ে ফেলে সে আলনা থেকে হ্যাঙগারে টাঙানো জামাটা টেনে নিল।

মনোরমা ব্যস্ত হয়ে শুধোল,—'যাবি কোথায়?'

—'সেই ভদ্রবেশী শয়তানটার কাছে।' কিরণ দাঁতে দাঁত ঘষল। তারপর নীচের ঠোঁটটা ঈষৎ কামড়ে একটা শপথের ভঙ্গি করে জানাল, —'ওর সঙ্গে ফয়সালা করব আমি। বিন্তির এই অবস্থার জন্য সে দায়ী। সুতরাং তাকে বিয়ে করতে হবে।'

দুঃখ করে মনোরমা বলল,—'বিয়ের কথা আমি অনেক দিন ধরে তুলেছি কিরণ। তোর কাছে, মিণুর কাছে। তোর বাবাকেও জানিয়েছি। কিন্তু কেউ গা করিস নি। সবাই মিলে আমাকে শুধু বুঝিয়ে দিলি, বিন্তি ছেলেমানুষ, ওর এখনও বিয়ের বয়স হয় নি।' একটু থেমে সে ফের যোগ করল,—'এখন বুঝতে পারছিস তো? তোর বোনের বয়স না হলে কখনও এমনি সব লজ্জার ব্যাপার ঘটে?'

উত্তরে কিরণ অনেক কিছু বলতে পারত। কিন্তু সে চুপ করে রইল। তার মাথায় অনেক দায়িত্ব। এখন কত কাজ। মায়ের সঙ্গে মিছিমিছি তর্ক করে লাভ নেই। আজ সকালে প্রথমে সেই ছেলেটার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে। কিন্তু রতীশ যদি দায়িত্ব অস্বীকার করে? তার বোনকে এখন বিয়ে করতে রাজি না হয়? তাহলে কি করবে কিরণ? একটা হৈ-চৈ, চেঁচামেচি করে পাড়ার ছেলেদের সাহায্য চাইবে? কিম্বা থানা-পুলিশের দ্বারস্থ হবে?

দরজার কাছে এসে মনোরমা চুপি চুপি জানাল,—'শোন বাবা। এসব কলঙ্কের কথা। বেশী চেঁচামেচি, রাগ-রোষ করিসনে যেন। হিতে বিপরীত হতে পারে। তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলল,—'তোর বাবা কিন্তু এখনও কিছু জানেন না। রোগা মানুষ, আর এই তো মনের অবস্থা। শুনলে এখনই অস্থির হয়ে উঠবেন। তখন মেয়েকে সামলাব না তোর বাবাকে দেখব বলতে পারিস?'

—'বিন্তি কোথায় মা?' কিরণ এতক্ষণ পরে বোনের খোঁজ করল।

ওর পড়ার ঘরে। বিন্তিকে দেখলে তোর মায়া হবে কিরণ। মুখখানা ভয়ে কালি। হিঁদুর খাটে চুপ করে শুয়ে আছে।'

আমহার্স্ট স্ট্রীটে কিরণ ট্যাক্সি নিল। অবশ্য ফাঁকা বাস ছিল। কিন্তু এসপ্ল্যানেডে গিয়ে আবার বদল করবার ঝামেলা। মিছি-মিছি খানিকটা সময় যাবে। সাদার্ন অ্যাভেনিউ অবশ্য অনেকখানি পথ। পাঁচ-ছ টাকা নির্ঘাত গচ্চা। কিন্তু এই দুঃসময়ে পয়সা-কড়ির হিসেব করলে চলবে না। যেমন করে হোক রতীশকে রাজি করাতে হবে। সে যদি বিন্তিকে না বিয়ে করে তাহলে সামনে গাঢ় অন্ধকার। কি করবে কিরণ ভেবে পাচ্ছে না।

সাদার্ন অ্যাভেনিউয়ে বাড়ির নম্বর সে খুঁজে বের করল। কি সুন্দর শান্ত নির্জনতা। বাগানে কত রকম মরশুমী ফুল। এক-একটা বড় জাতের গোলাপের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

কলিং বেল টিপতেই ধুতি আর হাফ সার্ট-পরা একজন বাজার সরকার গোছের লোক বেরিয়ে এল। ছেলেবেলায় ওর বসন্ত হয়েছিল। মুখে অল্প-বিস্তর সেই ক্ষতের চিহ্ন।

—'রতীশবাবু আছেন? তাঁকে একটু ডেকে দিন—'

—'আপনি দাদাবাবুকে খুঁজছেন?' লোকটি তার মুখের দিকে ঈষৎ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল। 'তিনি তো এখানে নেই।'

—'নেই মানে?' কিরণের বুকের ভিতরটা ধক করে উঠল। 'কোথায় গেছেন?'

—'কেন, আপনি জানেন না? দাদাবাবু তো গত বুধবার বিলেত গেলেন।'

—'বিলেত গেলেন?' কিরণ যেন আকাশ থেকে পড়ল। ঘাড়ের উপর কে তুলে চেপে

বলল,—'তার বাবা-মা কাউকে ডেকে দিন না।'

—কেউ নেই বাড়িতে। তারা সবাই দিল্লীতে আছেন। এক মাস পরে কলকাতায় ফিরবেন।—'

কিরণ অনেকক্ষণ মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। তার পায়ের তলায় ভূমিকম্পের মত মাটি কাঁপছে। সে পা শক্ত করে দাঁড়াবার চেষ্টা করেও পারছে না। একটা শীতল ভয়ের স্রোত পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে ক্রমাগত উপরে উঠছে আবার নীচে নামছে। এখন কি করবে কিরণ? কেমন করে বিনিতা কলঙ্কমুক্ত হবে? তার মাকে, বাবাকে লোক হাসি আর অপমানের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে?

প্রায় টলতে টলতে সে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। এই মুহূর্তে তার একজনের কথা মনে পড়ছে। ইচ্ছে করলে সে তাকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে। তার বন্ধু পরিতোষ। বিনিতা বুঝতে পারেনি। ভুল করে সে আঘাটায় নেমে পড়েছিল। তাই পায়ে-হাঁটুতে নোংরা কাদা। সকলের অলক্ষ্যে সেটুকু ধুয়ে-মুছে দূর করলেই হয়। পরিতোষ বলে, আমাদের দেশের মেয়েরা পানকৌড়ি নয়। ওরা হাঁসের মত, —ডাঙায় উঠলেই পালক থেকে জল ঝরে পড়ে। তখন আর অন্যায়ের ছিটে-ফোঁটাটি গায়ে লেগে থাকে না।

হাসপাতালে গিয়ে সে পরিতোষকে খুঁজে বার করল। প্রায় টানতে টানতে মাঠের এক কোণে তাকে নিয়ে গেল। জায়গাটা বেশ নির্জন। ডাক্তার-নার্স কিম্বা হাসপাতালের অন্য কর্মচারীদের আনাগোনা কম। তার চিন্তিত মুখ, শুকনো ঠোঁট, প্রায় অবিন্যস্ত চুল এবং উদভ্রান্ত দৃষ্টি দেখে পরিতোষ রীতিমত অবাক হল।

ভুরু কুঁচকে সে প্রশ্ন করল,—'কি হয়েছে তোর?'

—'ভীষণ বিপদে পড়েছি। তুই যদি আমার একটা উপকার করিস।'

—বেশ তো, কি করতে হবে তাই বল।'

কিরণ একটা ঢোক গিলল। কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে অবশেষে বলল,—'ইয়ে, মানে একটি মেয়ের খুব বিপদ। আমার বিশেষ জানাশুনো। কি হয়েছে বুঝতে পারছিস? শী ইজ আনম্যারেড। তুই যদি একটা ডি এন সি করবার ব্যবস্থা করে দিস। মানে যেখানে হোক, আমি সমস্ত খরচ দিতে প্রস্তুত।'

—'ছি, ছি'' পরিতোষ বিরক্তিতে মুখখানা শক্ত করল। বন্ধুকে তিরস্কার করে বলল,—'তোর গালে একটা থাপ্পড় মারতে ইচ্ছে করছে। এমন অসভ্য গবেট। নিজে ডাক্তার হয়ে রীতাবরীর এই সর্বনাশটি করলি। আজকাল বাজারে কত রকম জিনিস বেরিয়েছে, তার একটাও খুঁজে পেলিনে?'

লজ্জায়, দুঃখে কিরণের দু চোখে জলের ফোঁটা টলমল করছিল। চোখের কোল বেয়ে অবাধ্য অশ্রুর ফোঁটা এখনই গড়িয়ে পড়বে। 'রীতাবরী নয়। পকেট থেকে রুমাল বের করে সে চোখ মুছল। 'তোকে যার কথা বলছি সে আমার বোন,—'আপন ছোট বোন পরিতোষ।'

—'মাই গড। বলিস কি তুই?' পরিতোষ বিস্ফারিত চোখে তাকাল।

—'হ্যাঁ। আমি সকালে উঠে সেই স্কাউন্ড্রেলটার বাড়ি ছুটেছিলাম। কিন্তু সে ভীষণ চালাক। গত বুধবার ইংল্যাণ্ড চলে গেছে, এমন কি বাড়িতে তার মা, বাবা কেউ নেই। সবাই এখন দিল্লীতে।' পরিতোষের হাত দুখানা ধরে কিরণ মিনতি করল, —'আমাদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার কর তুই।'

—'নিশ্চয়।' পরিতোষ আশ্বাস দিল। একটু ভেবে বলল,—'তুই কাল ওকে নিয়ে আয়। বেলা বারোটা নাগাদ। আমার এক বন্ধুর ছোটখাটো একটা নার্সিং হোমের মত আছে, ওখানেই সব ব্যবস্থা হবে। দাঁড়া, তোকে কার্ডটা দিচ্ছি।'

কিরণকে নিরুত্তর দেখে সে ফের বলল,—'ভয় নেই তোর। এটা আর্লি স্টেজ, —সুতরাং রিস্ক নামমাত্র। তাছাড়া জায়গাটা খুব সেফ। আর মোটে দেড় দিনের ব্যাপার। কোথায় কি হল কাকের বাবাও টের পাবে না।'

* * *

বেলা দুটো নাগাদ কিরণ বাড়িতে ফিরল। ঘরে এখন শুধু মা আর বিনিতা।

আশাপূর্ণা দেবীর

অনন্য সমাজচিত্র

কথনো দিন কথনো রাত

আগামী সংখ্যা থেকে
ধারাবাহিক বেরোবে।

বাণীব্রত অফিসে তাই কথা কইবার সুবিধে। সব শুনে মনোরমা কপালে করাঘাত করে বলল,—'আমার অদৃষ্ট বাবা। নইলে ইস্কুলে-পড়া কুমারী মেয়ের এমন কলঙ্ক হয়? কি কুক্ষণেই আমি ওকে থিয়েটার করতে পাঠিয়েছিলাম। আর এখন পাপপুণ্য, ভালো-মন্দ বিচার করবার অবসর নেই। যেমন করে হোক এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে হবে।'

বিনিতার ঘরে ঢুকে সে প্রায় চিৎকার করে বলল,—'দ্যাখ, হতচ্ছাড়ি। কেমন ছেলের সঙ্গে পিরীত করেছিলি। কেষ্টঠাকুর এখন বিলেতে গিয়ে মেমসাহেবদের নিয়ে হাওয়া খাচ্ছে। তোর কথা তার মনেও নেই।'

কিন্তু বিনিতা চুপ। আজ সকাল থেকে সে বোবা। ঠিক পাষাণ প্রতিমার মত। একটি কথাও বলছে না।

মনোরমা ছেলেকে কাছে ডাকল। গলা খাটো করে বলল,—'দোহাই কিরণ। তোর বাবাকে যেন একটি কথাও বলিস নি। কেমন মানুষ জানিস তো? এই সব অনাছিষ্টি খবর শুনলে হুলস্থুল কাণ্ড বাধিয়ে বসবেন। কাল তাকে অফিসে পাঠিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ব। আর মোটে একটা রাত্তির। বলব, বিনিতা ওর এক বন্ধুর জন্মদিনে গেছে। রাত্তিরে সেখানেই থাকবে। তাহলে আর কোন চেঁচামেচি করবে না।'

খাওয়া-দাওয়ার পর চাদর মুড়ি দিয়ে কিরণ বিছানায় শুয়েছিল। আজ সকাল থেকে সে বোনের সঙ্গে একটি কথাও বলে নি। তার কাছে যায় নি। আর বিনিতা কি অসম্ভব ঠাণ্ডা। ঠিক মরা মাছের মত কাঠ-কাঠ....আড়ষ্ট। এখন কথা বলতে গেলে সে তাকাতেই পারবে না। লজ্জায় বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে থাকবে।

কি প্রয়োজনে মনোরমা এ-ঘরে ঢুকেছিলেন। হঠাৎ তার দিকে তাকিয়ে বলল,—'এই যাঃ। তোকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। সকালের ডাকে তোর নামে একখানা চিঠি এসেছে কিরণ।'

—'চিঠি'! সে তড়াক করে বিছানার উপর উঠে বসল।

মনোরমা কোথা থেকে খামটা এনে দিতে কিরণ বুঝতে পারল। মেয়েলি হস্তাক্ষরে তার নাম পরিষ্কার লেখা। নিশ্চয় রীতাবরীর চিঠি। খামটা না খুলেও কিরণ নির্ভুল বলে দিতে পারে।

মা ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় গেলে সে আপন মনে মুচকি হাসল। আশ্চর্য! এতদিন বাদে রীতাবরীর তাকে মনে পড়ল। প্রায় এক মাস পরে মেয়ের ভাঙল রাগ পড়েছে?

এদিক-ওদিক তাকিয়ে কিরণ খামটা ছিঁড়ল। যা ভেবেছিল তাই। রীতাবরীর চিঠি। সে লিখেছে—

আমার ভালবাসার কিরণ,

তুমি যখন এই চিঠি পাবে তখন আমি অনেকদূরে চলে যাচ্ছি। আর একজনের সঙ্গে, যার কথা স্বপ্নেও ভাবিনি। আমার কুমারী মনের লজ্জা-অনুরাগ মেশানো নরম রাঙা মাটিতে কোনোদিন তার ছায়া পড়েনি। তবু সেই অচেনা মানুষটির হাত ধরে তালগাছের বুকে চিরে বানানো জোড়া ডিঙির মত আমরা দুজনে সংসার সমুদ্রে ভেসে পড়লাম। নিশ্চয় অদৃষ্টে তাই লেখা ছিল। নইলে যাকে চিনলাম, জানলাম সে আমার কেউ হল না। আর যাকে কোনোদিন দেখিনি, সেই মানুষ কেমন করে আমার জীবনতরীর হাল ধরবার অধিকার পেল?

সেদিন কলেজ পার্টি থেকে রাগ করে চলে এসেছিলাম। তুমি নিশ্চয় তা বুঝতে পেরেছ? সমস্ত পথ আমি শুধু চিন্তা করেছি, তুমি কেমন করে আমাকে দুমাস অপেক্ষা করতে বলতে পারলে? তোমার কাছে আমার অবস্থার কথা একটুও গোপন করিনি। আমাদের রক্ষণশীল বাড়ি। বাবা বংশ গৌরবকে চোখের মণির মত সযত্নে রক্ষা করতে চান। তার কাছে অসবর্ণ বিয়ের

অনুমতি চাওয়া অথবা পাথরে মাথা ঠুকে মরা প্রায় এক কথা।

তুমি কত সহজে আমার কাছে সময় চেয়ে নিলে। আরো দুটি মাস আমাকে অপেক্ষা করতে বললে। কিন্তু আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দেবে কিরণ? মা-বাবা, বাড়ির লোকে আরো দু'মাস অপেক্ষা করবে কিনা, একথা তো তুমি একবারও জিজ্ঞাসা করলে না? আমার সৌভাগ্য কিম্বা দুর্ভাগ্য যাই বল। যাঁরা আমাকে পছন্দ করেছেন, তাঁরা বাবার কাছে এসে বিয়ের দিন স্থির করতে চাইবেন একথা কি তোমার মনে ভেসে উঠল না?

আমি বুঝতে পেরেছি কিরণ। তোমার অনেক দায়িত্ব, নানা সমস্যা। বাড়ির কথা তোমাকে বেশ ভাবতে হয়। তোমার ছোট-ভাই গ্রামে চলে গেছে। তাই মায়ের মনে সুখ নেই। দাদা আমেরিকায় যাবেন। বাবা অবসর নিয়ে জীবনের বাকি দিনগুলি দেশের বাড়িতে কাটাবেন বলে স্থির করেছেন। এই মুহূর্তে তোমার কারো দিকে তাকাবার অবসর নেই। বলতে গেলে দায়িত্ব এখন একার। বাড়ির ভাবনা শুধু তোমার কিরণ। আর দু-মাস মিছে বলা, অন্ততঃ আরো কিছু-দিন না গেলে দুই কাঁধে তুমি কিছুতেই শক্তি পাবে না।

বিশ্বাস কর, তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মায়া হল। এত সমস্যা, তার ভারে তুমি জর্জর। বোঝার উপর শাকের আঁটির মত নিজের ভাবনায় কথা বলে

তোমাকে বিব্রত করা আমার উচিত হয়নি। তাই আমি বিদায় নিচ্ছি কিরণ। লক্ষ্মীটি, আমাকে ভুল বুঝে তুমি দুঃখ পেও না।

অনেক ভেবে-চিন্তে এই বিয়েতে মত দিলাম। মা আমাকে বারবার বলেছেন, বোকা মেয়ে, তোর ভালো-মন্দ আমরা অনেক বেশী বুঝব। নিজের ভাবনা-চিন্তা আমাদের উপর ছেড়ে দে। দেখবি তুই জীবনে কত সুখী হয়েছিস।

নিজের সুখের জন্য নয়। তোমার কথা ভেবে বিদায় নিচ্ছি কিরণ। আমি চলে গেলে হয়তো তুমি একটু হাল্কা বোধ করবে। ভালো করে বাড়ির কথা ভাবতে পারবে। তোমার দুঃখিনী মায়ের কথা, বাবার কথা। ছোট বোন বিন্তি, যার বিয়ের জন্য তোমাকেই এবার কোমর বেঁধে তৈরি হতে হবে।

আমার মা বলেন, এসব কাঁচা রঙ। বিয়ের জল পড়লেই সব ধুয়ে মুছে যাবে। আমি একথা মানি না কিরণ। ভালোবাসার রঙ কোনোদিন কাঁচা হয় না। দূরে সরে যাচ্ছি বলেই কি মন থেকে তোমাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারব?

আবার কোনোদিন দেখা হবে কিনা জানি না। কিন্তু কলকাতায় গঙ্গার ধারে এসে দাঁড়ালে তোমার কথা বড় বেশী মনে পড়বে। এই মাঠে-ময়দানে, শনশনে হাওয়ায় সবুজ ঘাসের উপর বসে দুজনে কত গল্প করেছি। আমার সেই স্বপ্নের বাড়িটার ছবি মনের আয়নায় কতবার ভেসে উঠবে।

কোনোদিন অনেক রাত্তিরে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলে পুরোন দিনের হাজার স্মৃতি মনের বন্ধ দরজার মুখে ভিড় করবে, আমি চোখ বুজে আয়নায় প্রতিবিম্ব দেখার মতো তোমার কথা চিন্তা করব কিরণ। আমাদের ভালোবাসার কথা। সেই ঝমঝমে বর্ষায় কলেজ স্ট্রীটে দুজনে দুদিক থেকে ছুটে এসে একই ট্যাক্সি ধরতে চেষ্টা করলাম। আবার কোনোদিন শ্রাবণের আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে যাবে। ঘন ঘোর বর্ষা নামলে তোমার কথা সর্বাগ্রে মনে হবে।

ভালোবাসার দিনগুলি বড় ছোট। শীতের বেলার চেয়েও স্বল্প পরিসর। কিন্তু তারা স্থায়ী। কোনোদিন মন থেকে মুছে যায় না। আর আমার কুমারী জীবনে তুমি প্রেমের প্রথম কিরণ। তোমার কথা কি কখনও ভুলতে পারি?

বিদায়——

ইতি

রীতাবরী

চিঠিখানা পকেটে রেখে কিরণ আবার চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। তার মনে রাগ বা অভিমান নয়। কেমন একটা বিচিত্র দুঃখের অনুভূতি ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছিল। অন্তরের কোন নিভৃত প্রদেশে বিষণ্ণ মেঘের ছায়া ক্রমেই ঘন হচ্ছে। অনেক দিন আগের একটা কথা মনে পড়ল তার। কলেজে এক বন্ধু ভীষণ তর্ক করে বলেছিল,—'মেয়েরা আদৌ ভাবপ্রবণ নয়। ওরা খুব প্র্যাকটিকাল।' এতদিন পরে সেই মন্তব্যটা কেবল মাথায় ঘুরছে। আর সত্যি কথা, রীতাবরী তাকে ঠিক নিক্তির ওজনে বিচার করেছে। তার মাথায় এখন অনেক দায়িত্ব। দাদা আমেরিকায়, হিরু বাড়িঘরের সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়েছে। সুতরাং তার মাকে-বাবাকে কে দেখবে? আর বিন্তি? এই মুহূর্তে তাকে নিয়ে কি ভাবনার শেষ আছে? আরো কতদিন এই দুর্ভাবনা চলবে তাই বা কে বলতে পারে? দু মাস কেন, ছ মাস কিম্বা এক বছর হয়তো কিরণকে বাড়ির কথা ভাবতে হবে।

কিছুক্ষণ পরে সে বিছানা থেকে উঠে পড়ল। বাইরে কোথাও ঘুরে এলে ভালো লাগবে? দেহে-মনে কেমন বিশ্রী অবসাদ। একটা তিক্ত কটুগন্ধ ওষুধ খাওয়ার পর মুখের যা দশা হয়, কিরণের মনের অবস্থাও তাই। সে ভাবছিল এসপ্ল্যানেডে গিয়ে কিছুক্ষণ বসবে কি না? কিম্বা কলেজ স্ট্রীটের কফি-হাউসে। সন্ধ্যের সময় সেখানে হয়তো পুরোনো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা হতে পারে।

জামাটা মাথায় গলিয়ে কিরণ বেরোবার জন্য তৈরি হল। এই ফ্ল্যাটে এখন সে ছাড়া আরো দুটি প্রাণী। তার মা ও বিন্তি। তবু সমস্ত বাড়িটা কি অদ্ভুত নিস্তব্ধ আর চুপচাপ। যেন সব মৃত। প্রাণহীন এক প্রেতপুরীর মধ্যে কিরণ আটকা পড়েছে। কিন্তু বিন্তি? অমন প্রাণচঞ্চল ছটফটে মেয়েটা। কলঙ্কের কথা রটবার পর সে কি বোবা হয়ে গেছে?

সমস্ত রাত্তির কিরণের ঘুম হয়নি। রীতাবরীর চিঠিখানা তার পকেটে। চোখ বুজলেই পুরনো দিনের কথা কেবল মনে হয়। সেই গঙ্গার তীর। সূর্য ওপারে শিবপুরের কল-কারখানাগুলির মাথায় হেলে পড়েছে। রাজহংসীর মত একটা শাদা মোটর লঞ্চ তরতর করে জল কেটে দ্রুত ভেসে যাচ্ছে। সেই ছায়াঢাকা বিকেলে সবুজ ঘাসের উপর বসে তারা দুজনে শুধু স্বপ্নের জাল বুনত। কতদিন শিয়ালদ স্টেশনে নেমে রীতাবরী তার জন্য অপেক্ষা করেছে। হাসপাতালের উল্টোদিকে খানিকটা দূরে সিনেমা হলটার কাছে দাঁড়িয়ে। এই কলকাতার পথে পথে তারা দুপুরে-বিকেলে ঘুরে বেড়িয়েছে। অমন সোনার দিনগুলি পাখির মত ডানা মেলে কোথায় হারিয়ে গেল।

কিন্তু এখন বিছানায় শুয়ে রীতাবরীর কথা ভেবে তার মন খারাপ করলে চলে না। কাল অনেক কাজ। বিন্তির জন্য সে খুব দুর্ভাবনায় আছে। পরিতোষ অবশ্য তাকে আশ্বাস দিয়েছে। ব্যাপারটা খুব সামান্য। আর্লি স্টেজে গেলে বিপদের কোনো সম্ভাবনা নেই। তবু একটা কিন্তু থেকে যায়। সে নিজে চিকিৎসক। আর ডাক্তার তো ঈশ্বর নয়। সুতরাং ভুলচুক অ্যাকসিডেন্ট সবই ঘটতে পারে। কিছুই বিচিত্র নয়।

খুব সকালে তার ঘুম ভেঙে গেল। মনোরমা যেন তাকে ব্যাকুলভাবে ডাকছেন। কিরণের মনে হল কথা বলতে গিয়ে মায়ের গলা কান্নায় বুজে আসছে। এই শীতের সকালে তার মস্তিষ্কের ভিতর বিদ্যুৎতরঙ্গের মত একটা চিন্তার প্রবাহ শুরু হল। কি হয়েছে মায়ের? দুশ্চিন্তায় আতঙ্কে সে ধড়মড় করে বিছানার উপর উঠে বসল।

—'ও কিরণ, তুই একটু ওঠ বাবা।' মনোরমা তেমনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'একবার দেখবি চল। বিন্তি কেন জেগে উঠছে না? এত ডাকাডাকি, ঠেলাঠেলি করলাম। তবু ওর ঘুম আর কিছুতেই ভাঙ্গে না।'

—'তাই নাকি?' কিরণ বেশ অবাক হ'ল। তারপর বিছানা থেকে নেমে প্রায় দৌড়ে মায়ের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

মেঝের উপর বিন্তি নিশ্চিন্তে শুয়ে। এখন তার মুখখানি ঠিক নিশীথ রাতের জ্যোৎস্নার মত। বড় শান্ত, বড় সুন্দর। চিন্তা নেই। ভাবনা নেই। বিন্তি যেন পরম সুখে নিদ্রা যাচ্ছে। তার বাবা বিছানার পাশে বসে গালে করতল চেপে গম্ভীরভাবে চিন্তা করছে।

ঘুম চোখে প্রথমটা সে ধরতে পারেনি। কিন্তু ভালো করে তাকিয়ে কিরণ চমকে উঠল। মাথার বালিশের কাছে পরিতোষের দেওয়া সেই নীল শিশিটা খালি পড়ে আছে। বিন্তি একটিও রাখেনি। তার বাবা মাঝে-মধ্যে দু-একটা ব্যবহার করে থাকবেন। বাকিগুলি বিন্তি খেয়ে ঘুমিয়েছে। ফলে

গাঢ় নিদ্রা। তারপর ঘুমের দেশ পেরিয়ে আর এক অজানা দেশের মাটিতে সে পা দিয়েছে। সেখান থেকে আর কেউ ফিরে আসে না।

একটু খুঁজতেই বালিশের নীচে একটা ছোট্ট কাগজ পাওয়া গেল। তার শেষ চিঠি। কিরণ যা ভেবেছিল তাই। বিন্তি আত্মহত্যা করেছে। চিঠিতে স্পষ্ট স্বীকারোক্তি। আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।

কাগজটা মনোরমার হাতে দিয়ে কিরণ মাথা নীচু করে দাঁড়াল। 'একটু শক্ত হও মা। বিন্তিকে ডাকাডাকি ক'র না। ওকে ঘুমোতে দাও। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় সে ফের বলল, 'ওর ঘুম আর কখনও ভাঙবে না।'

মনোরমা ডুকরে কেঁদে উঠল। মেয়ের মৃতদেহটা আঁকড়ে ধরে চিৎকার করে বলতে লাগল,—'তুই অভিমান করে চলে গেলি মা। তোকে কলঙ্কিনী বলেছি, তাই—।' মনোরমা আর কথা বলতে পারল না। সে বিছানার উপর মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

বাণীব্রত আশ্চর্য মানুষ। সমস্ত ঘটনা শুনে তিনি গুম হয়ে বসে রইলেন। এমন একটা দুর্ঘটনা। তবু চোখে এক ফোঁটা জল গড়াল না। ভাবলেশহীন দৃষ্টি। বাপের এমন শুকনো গম্ভীর মূর্তি কিরণ জন্মে দেখেনি।'

তবু সে একবার ভয়ে ভয়ে বলল,—'তুমি অমন চুপ ক'রে বসে থাকবে বাবা? এখনও তো অনেক কাজ। আমার বুঝি মন খারাপ হয়নি?'

বাণীব্রত ঠোঁট ফাঁক করে একটু হাসলেন। কেমন পাগলের মত হাসি। চোখ দুটো বড় বড় করে ছেলের মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগলেন। —'আমি তোকে বলিনি? ঘন্টা বেজেছে কিরণ। এবার ঘন্টা বেজেছে। আর দেরি করিস নে বাবা। তাড়াতাড়ি আমাদের চন্দনপুরে পাঠিয়ে দে—।'

মা-বাবাকে প্রায় জোর করে বারান্দায় এনে কিরণ আর একবার ঘরের ভিতরে ঢুকল। একটা শাদা চাদরে মৃতদেহটা ঢাকতে গিয়ে সে কতক্ষণ ছোট বোনের মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর নিজের মনে বিড়বিড় করে বলতে লাগল,—'তুই ভুল করলি বিন্তি। অকারণে মা-বাবাকে এত দুঃখ দিলি। আমি সব ব্যবস্থা পাকা করেছিলাম রে। এই কলঙ্কের কথা কাকপক্ষীতেও টের পেত না। মিছিমিছি সব ভেস্তে দিয়ে অকালে চলে গেলি।—'

শুধু পাড়ার ছেলেরা নয়। পরিতোষ তাকে যথেষ্ট সাহায্য করল। সমস্ত দিন ছুটোছুটি। কাটা-ছেঁড়া, পোস্টমর্টেমের হাঙ্গামা। সমস্ত কাজ চুকিয়ে কিরণ যখন বাড়িতে ফিরল, তখন অনেক রাত্তির। প্রায় ঘুমন্ত শহর। এগারোটা কখন বেজে গেছে।

পরের দিন সকাল হতেই বাণীব্রত অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি আজই চন্দনপুরে যাবেন। কলকাতায় আর এক মুহূর্তও নয়। অবসর নেবার কয়েকটা দিন বাকি ছিল। বাণীব্রত তাই কোম্পানীকে চিঠি লিখলেন। আজ থেকেই তিনি রিটায়ার করতে চান। এই শহরে আর একটি দিনও থাকবার অভিরুচি নেই। সাহেব যেন তার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন।

চন্দনপুরে যেতে মনোরমার এখন আপত্তি নেই। কি হবে কলকাতায় থেকে? অমিয় বারিক লেনের এই ফ্ল্যাটটা তাকে হাঁ করে গিলতে আসছে। সমস্ত ঘরে হিরু আর বিন্তির হাজার স্মৃতি। মনোরমা কোনদিকে তাকাবেন? কেবল তার কান্না পাচ্ছে। এখানে থাকলে সে নির্ঘাত পাগল হয়ে যাবে।

স্টেশনে অনেকে এল। অফিসের আদিনাথবাবু আরো দু-তিনজন সহকর্মী। পাড়ার কটি ছেলে, এবং পরিতোষ। কিরণ তাদের সঙ্গে দু-একদিনের জন্য চন্দনপুরে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু বাণীব্রত রাজি হননি। এক রাত্তিরেই তিনি সম্পূর্ণ বদলে গেছেন। কত বুড়ো। চুলগুলি উস্কোখুস্কো, নিষ্প্রাণ দৃষ্টি। যেন অন্য মানুষ। ভীষণ খটমটে, শক্ত মেজাজ। স্টেশনেও বললেন—'তোর যাবার প্রয়োজন নেই। আমরা বুড়োবুড়ি দিব্যি যেতে পারব। আর বিদেশ তো নয়। নিজের গাঁয়ে ফিরে যাচ্ছি। অত চিন্তা-ভাবনার কি আছে?' একটু থেমে ছেলেকে সাবধান করে বললেন—'তুমি কলকাতায় বেশীদিন থেক না। পারলে অন্য কোথাও চাকরি নিয়ে চলে যেও, বুঝলে?'

পরিতোষ শুনতে পেয়ে বলল—'হ্যাঁ মেসোমশায় আমি ওর জন্যে একটা চাকরি জোগাড় করেছি। দার্জিলিঙের কাছে, বেশ বড় চা-বাগানের হাসপাতালে। ভালো মাইনে। তাছাড়া ফ্রি কোয়ার্টার্স। কিরণ রাজি আছে।'

মনোরমা গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল, —'তুই চাকরি নিয়ে চলে যাচ্ছিস কিরণ? কই আমাকে তো কিছু বলিসনি?—'

—'পরে তোমাকে চিঠি লিখতাম মা', কিরণ মৃদু হেসে জানাল।

মনোরমা চুপ করে রইল। ছেলের মুখখানা যেন বড় সরু। আর কি রকম রোগা হয়ে গেছে। চোয়ালের হাড়গুলি স্পষ্ট। কে জানে ওর মনে কিসের দুঃখ। যা চাপা ছেলে। মুখ ফুটে তো বলবে না। নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে, নইলে হঠাৎ চাকরি নিয়ে বাইরে চলে যেতে চাইবে কেন?

ট্রেন ছাড়ল। বাণীব্রত দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। ওরা সবাই হাত নাড়ছে। এতদিন পরে কলকাতা ছেড়ে তিনি সত্যি চললেন। ভেবেছিলেন কত আনন্দ করে ছেলেমেয়েদের নিয়ে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে উঠবেন। এমন দীনহীন নিরানন্দ হৃদয়ে তাকে বিদায় নিতে হবে, একথা কোনোদিন স্বপ্নেও মনে হয়নি।

*   *   *

শীতের সকাল। অল্প অল্প রোদ্দুর উঠেছে। ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করে গোরুর গাড়ি চলছিল। এদিকে ধান কাটা শেষ। দুপাশে ন্যাড়া মাঠ। কোথাও মোরাম মাটির অনুর্বর প্রান্তর। ছোট একটা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গাড়ি ধীরে ধীরে পেরিয়ে এল। পথের ধারে খেজুর গাছ। রোগা, ডিগডিগে ছেলের গলায় বড় একটা মাদুলির মত গাছের মাথায় খেজুর রসের হাঁড়ি টাঙানো। তার বাবার এক পিসী ছিল। বয়সে সামান্য বড়। ছেলেবেলায় বাণীব্রতকে সে বলত,—'খেজুর গুড় পুজোয় লাগে না, জান তো ভাই?'

বাণীব্রত প্রশ্ন করতেন,—'কেন ঠাকমা?'

—'কেন আবার? খেজুর গাছের গলা কেটে দিলে তবে তো রস পড়ে। সেই রস থেকে গুড়। তাতে কি কখনও ঠাকুরের পুজো হয়?'

কতদিনের কথা। কুয়াশাভরা শীতের সকালের মত যেন আবছা দেখা যায়।

মনোরমা চারপাশে তাকিয়ে দেখছিল। অনেকদিন সে গ্রামে আসেনি। কি গাঢ় নীল আকাশটা। কত গাছপালা, উন্মুক্ত প্রান্তর। দূরে হাতীর পিঠের মত শুশুনিয়া পাহাড়ের খানিকটা অংশ চোখে পড়ে। বিন্তি থাকলে এতক্ষণ গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ত। হয়তো আহ্লাদে গান করত। প্রজাপতির মত এমন সুন্দর মেয়েটা। মনোরমা মুখ ফিরিয়ে আঁচলের কোণে চোখের জল মুছতে লাগল।

শিবতলায় হীরালাল সেন সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। গরুর গাড়িতে নতুন মানুষ দেখে সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল। কাছে এসে চিনতে পেরে বলল—'তাহলে গ্রামে বাস করতে চলে এলেন?' তারপর ছইয়ের মধ্যে একবার উঁকি দিয়ে জিজ্ঞাসা করল,—'তা আপনারা দুজনে? ছেলেমেয়েরা কই?'

বাণীব্রত গম্ভীর মুখে জবাব দিলেন,—'তুমি পরে এস হীরালাল। সব কথা এক সময় বলব।'

কেমন বিষণ্ণ দৃষ্টি। কপালে চিন্তার রেখা। হীরালাল তাই আর কোনো প্রশ্ন করল না। সে সাইকেলে চেপে অন্যদিকে রওনা হল।

উঠোনে পা দিয়ে মনোরমা কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বাড়িটা তার চোখে নতুন লাগছে। দোতলাটা হবার পর মনোরমা আর আসেননি। তাছাড়া পুজোর পরেই বাণীব্রত এসে ঘরদোর সারিয়ে চুনকাম আর রং করিয়ে গেছেন। দেওয়ালে ফিকে হলদে রং,...কার্ণিশের একটু নীচে পর্যন্ত খয়েরী বর্ডার। তার শ্বশুরের আমলে এসব কিছুই ছিল না। একতলা বাড়ি। বৃষ্টিতে, জলের ঝাপটায় বিবর্ণ মূর্তি। তার বিয়ের সময়েও বাইরের দেওয়ালে রং হয়নি।

মনোরমার মনে পড়ল এ বাড়িতে নববধূর সাজে সে উঠোনের ওইখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। শাশুড়ি তাকে বরণ করলেন। পাথরের থালায় দুধ আর আলতা গোলা। মনোরমা তার উপর উঠে দাঁড়াল। একতলার

ওই কোণের ঘরটায় তাদের ফুলশয্যে হয়েছিল। তারপরও এই বাড়িতে অনেকদিন কাটিয়েছে মনোরমা। বাণীব্রত অনেকেও ব্যাপা করেননি। ওই ঘোড়ানিমের গাছটি খুব ছোট ছিল। ঝাঁকড়া চুলওলা দৈত্যের মত এমন প্রকাণ্ড হয়ে ওঠেনি।

সমস্ত দিন একটা অবসন্নতার মধ্যে কাটল। আগাছার জঙ্গল সম্পূর্ণ নির্মূল হয়নি। এদিকে সেদিকে যথেষ্ট রয়েছে। কিন্তু বাণীব্রতর কোনো উৎসাহ নেই। হাতে পায়ে জোর কোথায়? আগে হলে সকালেই লোকজন ডাকতেন। সূর্যি মাথায় উঠতে না উঠতেই সব পরিষ্কার। উঠোনের একটি ঝোপও বাকি থাকত না।

সন্ধ্যের পর মনোরমা অল্প অল্প গোছ-গাছ শুরু করল। বিছানাটা খুলতে হয়। জিনিসপত্র এবার সরিয়ে তুলে রাখা দরকার। আরো কত কাজ। কতকাল বাদে শ্বশুরের ভিটেয় আজ সন্ধ্যেপ্রদীপ জ্বালিয়েছে মনোরমা।

বাণীব্রত চুপ করে দাওয়ায় বসেছিলেন। হঠাৎ স্ত্রীর কান্না শুনে চমকে উঠে শুধোলেন—'কি হ'ল? ওগো কি হ'ল তোমার?'।

ঘরের মধ্যে ঢুকে বাণীব্রত ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। একটা বাঁধানো ছবির দিকে তাকিয়ে ঝরঝর করে কাঁদছে মনোরমা। স্থির, আর বিস্তি। পাশাপাশি দুই ভাই-বোন দাঁড়িয়ে। বাণীব্রতর মনে আছে, পাঁচ-ছ বছর আগে মিলনের এক বন্ধু ছবিটা তুলে দিয়েছিল।

স্ত্রীর হাত থেকে সেটি কেড়ে নিলেন বাণীব্রত। সস্নেহে বললেন—কেন ওসব দেখছ? মিছিমিছি মন খারাপ হবে।'

মনোরমা তার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল,—'ওগো, কার জন্যে তুমি এই বাড়ি করেছ? এখানে কারা থাকবে? শুধু তুমি আর আমি? তোমার ছেলেরা কেউ এ বাড়িতে আসবে না? আমি কি এখানে একলা পড়ে থাকব?'

বাণীব্রত অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। ধীরে ধীরে বললেন—'আমি বুঝতে পারিনি মনোরমা। যখন ওরা ছোট ছিল, তখন আমরা সবাই এক বাড়ির কথা ভাবতাম। তারপর কখন ছেলেরা বড় হয়ে উঠল। ওদের মনের মাটিতে নতুন নতুন রংএ বাড়ি তৈরি হ'ল। আমি তার খোঁজ রাখিনি, বুঝতে পারিনি। আমার চন্দনপুরের বাড়িতে ওরা কেউ বাস করবে না। একথা কোনোদিন ভাবতে পেরেছিলাম?'

অন্ধকার রাত্রি। কলকাতার চেয়ে ঠাণ্ডা অনেক বেশী। মাথার উপর গ্রহ-উপগ্রহ, নির্বাক তারার দল। বিস্তীর্ণ ছায়াপথ আকাশের এক কোণ থেকে অন্য কোণে প্রসারিত। বাণীব্রত ভাবছিলেন, এই বাড়িতে তার পূর্বপুরুষেরা বাস করে গেছেন। তার বাবা এখানে জন্মেছেন। এই উঠোনের মাটিতে খেলাধুলো করে বড় হয়েছেন। ওই অনন্ত আকাশ, নীহারিকাপুঞ্জ, গ্রহ-নক্ষত্র সূর্য-তারার দল। ওরই আড়ালে দাঁড়িয়ে তার পূর্বপুরুষেরা অঙ্গুলি সঙ্কেত করে বলছেন—'তুমি আমাদের বংশধর। তোমাকে ভালবাসি। সময় পূর্ণ হলে একদিন আমাদের মধ্যে তুমিও এসে দাঁড়াবে। আমরা অপেক্ষায় আছি।'

রান্নাঘরের চালার পাশে সজনে গাছটার দিকে তাকিয়ে বাণীব্রত মৃদু হাসলেন। আর কয়েকদিন পরে শাদা শাদা ফুলে ভরে উঠবে গাছটা। মায়ের হাতের রান্না সজনে ফুলের চচ্চড়ির স্বাদ মনে হল তার। কতদিন আগের কথা। তার মা জিজ্ঞাসা করত—'আর একটু চচ্চড়ি নিবি খোকা? তুই তো খেতে ভালবাসিস।' পৌষের স্তব্ধ রাতে মায়ের কণ্ঠস্বর কানের কাছে স্পষ্ট মনে হল।

কখন মনোরমা এসে নিঃশব্দে পাশে দাঁড়িয়েছে। বাণীব্রত প্রায় ফিসফিস করে বললেন—'জানো, ওই সজনে গাছটা আমার মায়ের হাতে লাগানো। এখন কত বড় হয়েছে।'

মনোরমা স্বামীর কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল। অন্ধকারে তার একটু ভয় ভয় করছিল।

বাণীব্রত স্বগতোক্তির মত বললেন,—'এস, আমরাও একটা গাছ লাগিয়ে যাই। কোনোদিন ছেলেরা নিশ্চয় এই বাড়িতে আসবে। ততদিনে সেই ছোট্ট গাছটা অনেক বড় হবে। আমরা হয়তো বেঁচে থাকব না। কিন্তু তার নীচে দাঁড়িয়ে ওরা ঠিক বলবে,—'এই গাছটা আমাদের মা আর বাবার হাতে লাগানো। ছায়ায় বসে আমাদের স্নেহ-ভালবাসার কথা ওরা অন্ততঃ একবার স্মরণ করবে।

কোথায় দূরে একটা রাতজাগা পাখি কর্কশ শব্দে ডেকে উঠল। বাণীব্রত স্ত্রীকে আর একটু কাছে টেনে নিলেন। নক্ষত্রের আকাশ। মৌন রাত্রি ধীরে ধীরে গভীর হতে লাগল। নিস্তব্ধ, ঘুমন্ত গ্রাম। আর সেই অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে দুটি নারী-পুরুষ তাদের সন্তানদের শুভ কামনায় ঈশ্বরের কাছে বারবার প্রার্থনা জানাল।

(শেষ)

নেবুতলার সেই দুঃসাহসী নায়ক

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার

নারায়ণ দত্ত

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ। ব্যারাকপুরের বেশ কয়েকটা সেনাবিদ্রোহ হয়ে গেছে, কিন্তু ভারতজোড়া সিপাহী-বিদ্রোহ তখনও বিরাট অগ্ন্যুৎপাতে ফেটে পড়ে নি। পাইকপাড়ার সিংহরা, কলকাতার মতিলাল শীল, ইয়ং বেঙ্গলের বেশ কয়েকজন মাতব্বররা মিলে মাত্র কয়েকটা বছর আগে মেডিকেল কলেজ বসিয়েছে। মধুসূদন গুপ্ত রাজকৃষ্ণ দে প্রমুখেরা মড়া কেটে বাঙলাদেশে শল্যবিদ্যার নবযুগের সূচনা করেছেন, ডাক্তার ভোলানাথ বসু, 'টাগোর স্কলার' হয়ে বিলেত ঘুরে এসে সুকিয়া লেনের ডিস্পেন্সারী আর হাসপাতালের সারজেন্ট-সুপারিন্টেন্ডেন্ট হয়ে বসেছেন—সেও কয়েক বছর হয়ে গেল। সারা দেশ থেকেই ছেলেরা গুটি গুটি এগিয়ে আসছে মেডিকেল কলেজে পড়বে বলে।

সেই সময়ের ঘটনা। সেদিন হয়েছে কি, আউটডোর ডিসপেনসারীতে ডাক্তার আরচার ক্লাস নিচ্ছিলেন। ফিফথ ইয়ার ক্লাস। ছাত্ররাও অধ্যাপকের সঙ্গে রোগীদের পরীক্ষা করছিলেন। এমন সময় আরচার তাদের চোখ ও আলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে বেমক্কা কয়েকটা প্রশ্ন করে বসলেন। ছাত্ররা ত থ। এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। কিন্তু জবাবের কোন কিনারা করতে পারলে না। প্রশ্নটা ভার হয়ে যেন সারা ক্লাসটার বুকে বসে রইল।

এহেন অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি দিলে এক নাটকীয় ঘটনা। অপেক্ষমান রুগীদের ভিড়ে সেদিন একটা রোগাপানা ছোকরা বসেছিল। এসেছে কলকাতার নেবুতলা থেকে। এসেছে তার এক দুস্থ আত্মীয়কে সঙ্গে করে, তার চোখ দেখিয়ে দেবে বলে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে সেই বেপরোয়া ছেলেটি বলে উঠল, সার যদি অনুমতি করেন, আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি। ইংরাজ অধ্যাপক আর বিমূঢ় ছাত্রদের চোখগুলো সব একসঙ্গে গিয়ে পড়ল নেবুতলার সেই সাহসী ছেলেটির দিকে। কিছু-বা তাচ্ছিল্যের হাসি ভেসে উঠে থাকবে ডাক্তার আরচারের মুখে। বললেন, ইয়েস, গো অন। অপেক্ষমান রোগী, ছাত্র সবাই নতুন করে তাকাল অচেনা ছেলেটির দিকে। কারও চোখে কৌতূহল—সেটাই বেশী, কারও বা বিদ্রূপ, কারও শব্দে বিস্ময়!

আউটডোরের বিশাল হলঘরের বিপুল জনসমষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে ছেলেটি বিনা দ্বিধায় আলোকবিজ্ঞানের সেই কঠিন প্রশ্নের সঠিক সরল জবাব দিয়ে দিলে। বিস্ময় থেকে এবার কৌতূহলের পালা। কে এই ছেলেটি? কিন্তু কেষ্টনগরের এককালের সিভিল সার্জন ডাক্তার আরচার ছেলেটিকে আরও বাজিয়ে নিতে চাইলেন। তাকে আরও প্রশ্ন করলেন তিনি। আলোকতত্ত্বের দুরূহ থেকে দুরূহতর প্রশ্ন। আর অবলীলায় সেগুলির নির্ভুল জবাব দিতে লাগল নেবুতলার সেই প্রত্যুৎপন্নমতি তরুণ। এবং শেষাবধি অধ্যাপকের অনুরোধে ফিফথ ইয়ার ছাত্রদের সামনে চক্ষু ও আলোকতত্ত্বের ওপর একটা লেকচারও দিয়ে ফেলল সে সেদিন বিপ্রহরে।

অচিরেই অবশ্য চিনা গেল, নেবুতলার ছেলেটি আর কেউ নয় মহেন্দ্রলাল সরকার। মেডিকেল কলেজের ছাত্র। তবে মাত্র দ্বিতীয় বর্ষের। আদি বাড়ী পাইকপাড়া। পাঁচ বছর বয়সে বাবা মারা গেলে মায়ের হাত ধরে এসে ওঠেন মামার বাড়ী নেবুতলায়। মাও এককালে গত হলেন। কিন্তু মমতার অভাব হল না। মাতুল গরীব কিন্তু আটকাল না লেখাপড়া। হেয়ার স্কুল পিছনে ফেলে সগৌরবে পদক্ষেপে ঢুকলেন হিন্দু কলেজের মস্ত নাম আর গৌরব খেতাবের জোরে দিয়ে। কিন্তু সেখানেও কেমন যেন মন বসল না। মহেন্দ্রলাল তাঁর ঈপ্সিত স্ফূর্তি পাচ্ছিলেন না। এলেন মেডিকেল কলেজের চত্বরে। আঠারশ পঞ্চান্ন সাল।

রামগোপাল মল্লিকের সিঁদুরে পটীর বাড়ীতে 'বিধবা বিবাহ' নাটক অভিনীত হয়ে গেছে। দিকে দিকে নীল বিদ্রোহের লাল আগুন জ্বলে জ্বলে উঠেছে। হরিশ মুখুজ্যে তাঁর কাগজে চুটিয়ে সাহেবদের সেনায় বাঙলা ছারখার করার খবর ছাপছেন, 'বেঙ্গলী'তে কলম ধরেছেন গিরিশ ঘোষ, মহেন্দ্রলাল সরকার মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তার হয়ে বেরোলেন—এল-এম-এস। আঠার'শ ষাট। বছর তিনেকের মধ্যেই এম-ডি। কলকাতার দ্বিতীয় এম-ডি। প্রথম চন্দ্রকুমার দে।

এবং মহেন্দ্রলাল ডাক্তার হয়ে বসতে যা দেরী। দেখতে দেখতে জোর প্রসার। একেবারে এলাম, দেখলাম ও জয় করলাম। নাইবার খাবার সময় নেই—এত নামডাক। হাতে যেন জাদু আছে। দিকে দিকে নাম-যশ ছড়িয়ে পড়ল। মহেন্দ্র সরকার ত নয়, দ্বিতীয় ধন্বন্তরী। নাম শুনেই যেন রোগীর অর্ধেক রোগ নিরাময় হয়ে যায়, ওষুধ পরের কথা। এমনি সুনাম।

এহেন সময়ে ডাক্তার সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী এগিয়ে এসে ব্রিটিশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের শাখা খুললেন বাংলাদেশে শহর কলকাতায়। কিন্তু মহেন্দ্র সরকার ছাড়া কি কোন মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন হয় এদেশে? কাজেই মহেন্দ্রলালও এলেন এই সংস্থায়। এবং সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দারুণ এক বক্তৃতা দিলেন। সারগর্ভ ভাষণ। তাতে অ্যালোপ্যাথি সায়েন্সের তারস্বরে গুণকীর্তন আর অবৈজ্ঞানিক ও হাতুড়ে বলে হোমিওপ্যাথির নিদারুণ নিন্দা! সদ্য এম-ডি হয়ে বেরিয়েই অ্যালোপ্যাথির ঋণ যেন এমনি করেই শোধ করতে চাইলেন মহেন্দ্রলাল।

আর ● তাই নিয়ে লাগ-লাগ ভেল্কি, নাটকের সুরু। সেই অনুষ্ঠানের রিপোর্ট চোখে পড়ে থাকবে বৌবাজারের সেকালের বিখ্যাত মানুষ রাজেন্দ্র দত্তর। অক্রুর দত্তের বংশের ছেলে তিনি। ছোটবেলা থেকে নানা স্কুলে পড়ে, হিন্দু কলেজ মায় মেডিকেল কলেজে পাঠ নিয়ে, বোধকরি সাঙ্গ না করে, তখন মনেপ্রাণে হোমিওপ্যাথি করছেন। মহেন্দ্রলালকে চিনতেন তিনি। তাঁর বক্তৃতার রিপোর্ট পড়েই আর থাকতে পারলেন না:

মহেন্দ্রলালের সঙ্গে দেখা করলেন। বললেন, 'একি বলেছেন আপনি?' বর্ক্তিতর্কের দীর্ঘ চাপান-উতোর। এই সময়ে আর একটা ঘটনা ব্যাপারটাকে বেশ ঘোরালো করে তুললে। 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড' কাগজের মস্ত ইংরিজিনবিশ সম্পাদক কিশোরীচাঁদ মিত্র একদিন পালকী চেপে এসে হাজির মহেন্দ্র সরকারের বাড়ী। হাতে একখানা ইংরিজি বই, মরগান সাহেবের লেখা—'ফিলজফি অফ হোমিওপ্যাথি'। সরকার মশায়কে বললেন কিশোরীচাঁদ—একটা কাজ করতে হবে মহেন্দ্রবাবু। বইটার একটা কড়া 'রিভিউ' করে দিতে হবে আমার কাগজের জন্যে।

সেদিন ডাক্তার মহেন্দ্র সরকারের কথা নিয়েই ফিরলেন কিশোরীচাঁদ। কিন্তু কি যে বিপদের মধ্যে ফেলে গেলেন অ্যালোপ্যাথ ডাক্তার মহেন্দ্রলালকে তা যদি জানতেন! তাঁর চিন্তাধারায় সব ওলট-পালট হয়ে গেল। 'হোমিওপ্যাথি দর্শনের' সঠিক সমালোচনা করতে হলে তাঁকে হোমিওপ্যাথি বিশদভাবে জানতে হবে। ভালো করে জানতে হলে তার প্রয়োগের-ফলাফল-লক্ষ্য করতে হবে। নান্য পন্থাঃ। যেই ভাবা, সেই কাজ। বাড়ীর কাছেই রাজেন্দ্র দত্ত। তাঁরই শরণাপন্ন হলেন। হোমিওপ্যাথিতে কি কি রোগ কেমন সারে তা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন বিজ্ঞানী মহেন্দ্রলাল। এবং একসময় হ্যানিম্যানের হোমিওপ্যাথির ওপর তাঁর বিশ্বাস জন্মে গেল। মহেন্দ্রলালের নিজের ভাষায় : 'আই সিজড টু থিঙ্ক হোমিওপ্যাথি ওয়াজ দি গ্রেট হামবাগ দ্যাট ইট ওয়াজ রিপ্রেজেন্টেড।' শিবনাথ শাস্ত্রীও একই কথা বলেছেন : 'হ্যানিম্যানের অবলম্বিত প্রণালী যে যুক্তিসঙ্গত তাহা প্রতীতি হইল।'

এই ব্যাপারে আবার অনেকে বিদ্যাসাগর মশায়কে টেনে আনেন। বিহারীলাল সরকার মশায়ের গল্প এটা। জজ দ্বারকানাথ মিত্রের তখন ভারী অসুখ। মহেন্দ্র-ডাক্তার গিয়েছিলেন 'কলে'। গিয়ে দেখেন বিদ্যাসাগর মশায়ও এসেছেন। দ্বারকানাথ বন্ধুলোক। কাজেই অসুখের খবর পেয়েই কালবিলম্ব না করে দৌড়ে আসবেন, এ আর আশ্চর্য কি? মহেন্দ্রলাল রোগী দেখলেন। ওষুধপথ্যের ব্যবস্থা করলেন। তারপর ফেরবার উদ্যোগ। তাঁর নিজের ঘোড়ার গাড়ী। বিদ্যাসাগরকে বললেন, যাবেন নাকি? বিদ্যাসাগরও অনেকক্ষণ এসেছেন। ফিরবেন ভাবছিলেন। বললেন, চল। দুজনেই গাড়ীতে এসে চাপলেন। গাড়ী ছেড়ে দিল।

আর সেদিন সেই গাড়ীর মধ্যে বাইরের ঘোড়ার ক্ষুরের একটানা টগবগ টগবগ শব্দের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই বুঝি একচোট জোর তর্কের ঝড় বয়ে গেল। এবং তারই ফলশ্রুতি হিসেবে নেওয়া হল এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। অ্যালোপ্যাথির মস্ত ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার হোমিওপ্যাথিকে বাজিয়ে দেখতে রাজী হয়ে গেলেন। মহেন্দ্রলালের বৈজ্ঞানিক মন না স্বীকার করে পারেনি কার্যকারণে যদি মেলে হোমিওপ্যাথির গুণ তিনি মেনে নেবেন। বিহারীলাল লিখেছেন : 'গাড়ীতে বিদ্যাসাগর ও মহেন্দ্রলাল সরকারের মধ্যে হয় তুমুল বাদানুবাদ। বিদ্যাসাগর বলেন যে, হোমিওপ্যাথিও যথেষ্ট উন্নত চিকিৎসা। এবং মহেন্দ্রলালের উচিত সে বিদ্যা শিক্ষা করা।' মহেন্দ্রলাল প্রথমে রাজী হননি। কিন্তু বিদ্যাসাগর ছাড়বার পাত্র নন। অবশ্য তার কারণ ছিল। একসময় বিদ্যাসাগর নিজেই মাথার যন্ত্রণায় বিষম ভুগেছিলেন। কিছুতেই ভালো হয় না। এ ডাক্তার, সে ডাক্তার, মায় কবিরাজী। সব বিফল। রোগের যখন কোনক্রমেই সুরাহা হল না, রাজেন্দ্র দত্তর কাছে হাজির হলেন বিদ্যাসাগর। শিশির পর শিশি ওষুধ খেয়ে যা হয়নি, এক ডোজ হোমিওপ্যাথি পুরিয়ায় তাই সম্ভব হয়। বিদ্যাসাগর সেই থেকেই হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস করতে সুরু করেন।

শুধু নিজের ব্যাপারেই নয়। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের পুরোনো বন্ধু। তিনি একবার দারুণ 'পাইলস'এ ভুগেছিলেন। ওষুধে ডাক্তারে মেলা বসে গেল। কিন্তু নিরাময় দূরঅস্ত! অবশেষে সেই অগতির গতি হোমিওপ্যাথি। রাজকৃষ্ণ দিব্যি ভালো হয়ে গেলেন। বিদ্যাসাগরের আস্থা বেড়ে গেল। তারপরও বিদ্যাসাগর স্বয়ং বাক্স-বই নিয়ে বসে পড়েন। সে গল্প অজানা নেই। তবে এই বিদ্যা প্রচার করতে হলে কোন দিকপাল প্রতিভার ডাক্তারের মদত চাই। 'প্র্যাকটিক্যাল' মানুষ বিদ্যাসাগরের সেটা বুঝতে কষ্ট হয়নি। আর ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, এম-ডির মধ্যে সেই ঈপ্সিত মানুষটিকে পেয়ে থাকবেন তিনি। এবং সেদিনের সেই আলোচনার সূত্রে তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে নিলেন তিনি!

অবশ্য, মহেন্দ্রলাল ছাড়াও সেকালের তাবড় ডাক্তার – বিহারীলাল ভাদুড়ী, অন্নদাচরণ খাস্তগীর—অনেককেই তিনি হোমিওপ্যাথি করতে উৎসাহিত করেন। এবং এটা শুধু বিহারীলাল সরকার বা চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা নয়। ক্ষুদিরাম বসুও বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে বলেছেন, 'মহেন্দ্র ডাক্তারকে ত তিনিই একরকম হোমিওপ্যাথিতে হাতেখড়ি দেন।'

রামগোপাল সান্যালের কেতাবে রয়েছে মহেন্দ্র সরকার নিজেও এ ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের প্রভাব স্বীকার করেছেন। আরও একটা ঘটনার কথা বলেছেন তিনি। বিখ্যাত শব্দকল্পদ্রুম রচয়িতা সেকালের রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের মাথা, রাজা রাধাকান্ত দেবও নাকি একদা হোমিওপ্যাথিতে খুবই উপকার পেয়েছিলেন। মহেন্দ্রলাল লিখেছেন : 'দি কেস অফ রাজা রাধাকান্ত, দি কনভারসন অফ বিদ্যাসাগর এণ্ড দি পারসিসটেন্ট এ্যাপীলস অফ বাবু রাজেন্দ্র ফর এ ফেয়ার হিয়ারিং এণ্ড এ্যাবভ অল এ ফেয়ার ট্রায়াল, ফোরসড হোমিওপ্যাথি আপন মাই এ্যাটেনসন।'—অস্যার্থ, 'রাজা রাধাকান্ত
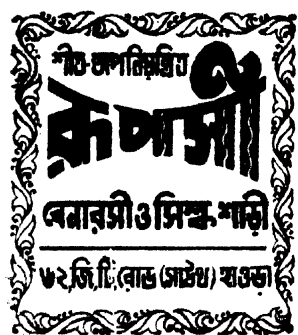
দেবের কেস বিদ্যাসাগরের আস্থাপ্রকাশ এবং বাবু রাজেন্দ্র দত্তর ব্যাপারটাকে ভেবে দেখবার এবং সর্বোপরি পরখ করে দেখার জন্যে বারংবার অনুরোধ হোমিওপ্যাথির প্রতি আমাদের মনোযোগ দিতে বাধ্য করে।

তবে কোন্ প্রভাবটি বেশী জোরালো—রাজা রাধাকান্ত দেবের কেস, বিদ্যাসাগর না রাজেন্দ্র দত্তর অনুরোধ-উপরোধ না সব-কয়টি প্রভাবই একই সংগে মহেন্দ্র সরকারকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, বা মহেন্দ্র সরকার নিজেরই অজান্তে অন্য কোন যুগপ্রভাবে পড়েছিলেন সেকথা হলফ করে বলা শক্ত। তবে এই সব সত্যাসত্য কুয়াশার মধ্যে একটা ঘটনা কিন্তু দিবালোকের মত স্পষ্ট। বহু পয়সার অ্যালোপ্যাথি প্র্যাকটিস ছেড়ে ডাক্তার সরকার একদা হোমিওপ্যাথি সুরু করে দিলেন। এবং কোন ঢাক ঢাক গুড় গুড় নয়। লুকিয়ে চুরিয়েও নয়। যেই হোমিও-প্যাথির বৈজ্ঞানিক সারবত্তায় তাঁর বিশ্বাস উৎপন্ন হল, তিনি একেবারে ডঙ্কা বাজিয়ে সাড়ম্বরে সেকথা ঘোষণা করলেন। এবং সে কাজ করলেন খাস অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারদেরই এক বিরাট সভায়। সেটা সেই ব্রিটিশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের বাংলা শাখার চতুর্থ বার্ষিকী সভা। আঠারশ সাতষট্টি। ষোলই ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায়। স্থান, মেডিকেল কলেজের থিয়েটার। অদূরে গোলদিঘীর আসন্ন শীতের রাত্রির অন্ধকার ধীরে ধীরে জমতে সুরু করেছে। পটল-ডাঙার বাড়ীবাড়ীতে শাঁখ বাজছে। কোথাও বা কাঁসরঘন্টা। তখনও বেলগেছিয়া ভিলাতে হিন্দুমেলার অধিবেশন বসেনি। তবে বেশ তোড়জোর চলেছে। বাঙালী মৌজ করে জগৎসিংহ-তিলোত্তমার 'রোমান্স' পড়তে সুরু করেছে। সেই অবকাশে সেদিনের সভায় মহেন্দ্রলাল কয়েকটা মোক্ষম কথা বলে বসলেন। তিনি অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালীর সর্বজনাবনিন্দিত কতক-গুলি দোষকীর্তন করিয়া হ্যানিম্যানের আবিষ্কৃত প্রণালীর যুক্তিযুক্ততা প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হইলেন। দুরারোগ্য কলেরা রোগে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ 'আরসেনিক' ও ভেরাট্রামের সফল প্রয়োগের প্রমাণ দিলেন তিনি।

আর যায় কোথা? কেউটে সাপের লেজে পা। মহেন্দ্র সরকার বক্তৃতা শেষ করতে না দেবী—ক্ষিপ্ত ভুজঙ্গের মত সাহেব ডাক্তাররা সব ফোঁসফোঁস করতে লাগল। লালমুখ আরও লাল হয়ে উঠল। তার মধ্যে সবচেয়ে দাপট ডাক্তার ওয়েলারের। ক্ষেপে গিয়ে একেবারে যা নয় তাই বলতে লাগলেন মহেন্দ্র সরকারকে। তবে নেবুতলার সেই দুঃসাহসী নায়ক ত দমবার পাত্র নন। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে দ্বিতীয় দফা যুক্তি দেখাতে উঠলেন তিনি। আর যাই না ওঠা, 'হিন্দু প্যাট্রিয়টের' রিপোর্টার তাঁর প্রতিবেদনে লিখছেন: ওয়েলার টেবল চাপড়ে অসভ্যের মত চিৎকার করে উঠলেন, 'স্টপ ডক্টর সরকার, ইফ ইউ আটার এ ওয়ার্ড মোর, আই উইল ড্রাইভ ইউ আউট অফ দিস রুম'—'থামুন ডাক্তার সরকার আপনি যদি আর একটা কথা বলেন, আপনাকে আমি এই ঘর থেকে বার করে দেব।' সভায় দাঁড়িয়ে তিনি আরও শাসাতে লাগলেন, মহেন্দ্রলাল যদি এই অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকেন তিনি এই সভা বর্জন করবেন। তবে সব ডাক্তারই যে ওয়েলারের মত বেহুদ্দ পাগলামি করেছিল, তা নয়। অন্যরাও ছিলেন। আর এক ইংরেজ ডাক্তার কর্নেস বললেন, তা কি করে হয়। এ সভায় মহেন্দ্রলাল সরকারকে তাঁর সমালোচনার জবাব দেবার অধিকার দিতেই হবে। ডাক্তার ইউ য়ার্ট সূর্যকুমার চক্রবর্তী প্রমুখেরা কিন্তু ডাক্তার ওয়েলারের কথায় সায় দিলেন। ডাক্তার শ্যামাচরণ মুখুজ্জে করলেন মহেন্দ্রলালকে সমর্থন।

এমনি করে রাতের নাটক জমে উঠল মন্দ নয়। কিন্তু নেবুতলার নায়ক ত মাথা হেঁট করার বান্দা নন। তর্কবিতর্কের চাপানউতোরের মাঝে অনেক রাতে সভা যখন ভাঙল, শীতের কলকাতা তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন। কেবল সভা-ফেরৎ ডাক্তার-বাবুদের কারও পাল্কী বেয়ারাদের চাপা টানা সুর, কারও ফীটনের চাকার শব্দ, ঘোড়ার কদমের আওয়াজ পটলডাঙার পাতলা-ঘুম বাবু-বিবিদের কারও কারও ঘুমের ব্যাঘাত করে থাকবে। তবে সেই সভা থেকে মহেন্দ্রলাল যখন ফিরলেন, সসম্মানেই ফিরলেন। কেননা, তখনও তাঁর বিরুদ্ধে হোমিওপ্যাথি সমর্থনের জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি। তবে সেটা মাত্র কয়েক দিনের জন্যে। অনতিকাল পরেই তাঁকে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের বাংলা শাখা থেকে বের করে দেওয়া হয়।

আর সেই সংগেই সুরু হল মহেন্দ্র-সরকারের ওপর জঘন্য অত্যাচার! একেবারে একঘরে করার ব্যবস্থা। মহেন্দ্র সরকার নিজেই যাকে বলেছেন, 'প্রফেশন্যাল এক্সকমিউনিকেশন'। শহর কলকাতা সেকি তোলপাড়। কাগজে কাগজে উত্তপ্ত আলোচনা। সাহেব অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারর মহেন্দ্র-লাল সরকারের বাতুলতা নিয়ে বক্তৃতা দিতে লাগলেন মেডিকেল মিশনারি ডাক্তার রবসন গরম গরম নানা যুক্তির বন্যা বইয়ে দিলেন। তাঁর পোঁ ধরে কাগজে লিখতে লাগলেন ডাক্তার ইউআর্ট। কিন্তু মহেন্দ্র সরকারের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। নতুন চিকিৎসায় সহজেই নিরাময় হচ্ছে রোগীরা। রোগ সারছে অনেক অল্প খরচে। হোমিওপ্যাথী গরীবের চিকিৎসা। তাতেই তিনি খুশি। মশগুল। সেই আনন্দেই তিনি বিভোর। সকল বাধাবন্ধ হেলায় তুচ্ছ করে সেই দুঃসাহসী মানুষটি স্থির বিশ্বাসে স্বাধীন বিবেক নিয়ে এগোতে লাগলেন। একটুও টললেন না।

টললেন না শত অত্যাচারেও। উনিশ শতকের বাংলাদেশের দ্বিতীয় ধন্বন্তরী মহেন্দ্র সরকারকে একঘরে করা হল যাতে তাঁর কাছে রোগী না যায়। তাঁর ভাতভিক্ষে বন্ধ হয়ে যায়। মহেন্দ্রলাল নিজেই বলেছেন, 'প্রফেশনাল কম্বিনেশন ইজ স্ট্রং এগেনস্ট মি। এন্ড ইজ লাইকলি টু বি স্ট্রংগার। এভরি ওয়ানস আর্মস সীমস টু বি এগেনস্ট মি।' অর্থাৎ 'আমার বিরুদ্ধে একই জীবিকার জোট বেশ জবর। কালক্রমে এই জোট আরও জোরদার হবার আশঙ্কা। আমার বিরুদ্ধে প্রত্যেকেই দেখি খড়্গহস্ত।' অবস্থা এমনি সঙ্গীন হয়ে উঠেছিল যে, মহেন্দ্র সরকারের কাছে একদম রোগী আসত না। সেদিনের দুঃসহ অবস্থার কথা লিখে শিবনাথ শাস্ত্রীমশায় জানিয়েছেন, 'ছয় মাসের মধ্যে তিনি একটিও রোগী পাইলেন না।' বন্ধুবান্ধবরা স্বভাবতঃই খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। কেউ কেউ হয়ত বা ব্যাপারটা মিটিয়ে নেবার পরামর্শ দিয়ে থাকবেন। জিগ্যেস করে থাকবেন, এমনি চললে খাবে কি? শিবনাথ শাস্ত্রী মশায় লিখেছেন, মুকটান করে জবাব দিয়েছিলেন মহেন্দ্র সরকার, 'আমি চাষীর ছেলে, না হয় সামান্য কাজ করে খাব, তাতে কি? কিন্তু সত্য যা তা ত বলতেই আর করতেই হবে।' করেও ছিলেন তাই। শেষ পর্যন্ত এই কঠিন লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন এবং বলা-বাহুল্য, সে লড়াই ফতে করেছিলেন। তাঁর আদর্শ, তাঁর বিবেককে একটুও ছোট, সামান্যতম খর্ব করেননি তিনি। এবং এক-সময়ে দেখা গেল, সারা দেশের মানুষ তাঁর হিমাচলের মত ব্যক্তিত্বকে, তাঁর দুঃসাহসী মনকে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। নবযুগের মানুষ মাথা হেঁট করে তাঁকে সেলাম বাজাচ্ছে!

আরও দেখা গেল, যত দিন যেতে লাগল, নেবুতলার সেই অসমসাহসী নায়কের চারিধারে বাঙালীরা ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা'—ইন্ডি-য়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করলেন তাঁর চিকিৎসা-বিষয়ক কাগজ—'ক্যালকাটা জারনাল অফ মেডিসিনে'। এই সভার 'প্রসপেকটাস' বেরোল হিন্দু প্যাট্রিয়টের পাতায়। বঙ্কিমের নজর পড়ল এই গুরুত্বের বিষয়ে। তিনি এর বাঙলা করে সেটার

সঙ্গে এদেশে বিজ্ঞান চর্চার প্রয়োজনীয়তার ওপর একটা প্রবন্ধই লিখে ফেললেন। বিদ্যাসাগর এগিয়ে এলেন তাঁর দয়ার ভান্ডার নিয়ে এই জাতীয় সৃষ্টিযজ্ঞে। কলকাতার বাঙালী বলতে যাঁরা—তাবৎ সবাই এলেন এগিয়ে। 'ডোনারদের লিস্টিতে' বেঙ্গলী কাগজের পাতা ভরে যেতে লাগল। পাথুরেঘাটার রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা কমলকৃষ্ণ দেব, জজ রমেশ মিত্তির, মৌলভী আবদুল লতিফ খান, বিদ্যাসাগর সবাই 'ট্রাস্টী' হয়ে এলেন 'বিজ্ঞানসভার' মহেন্দ্র সরকারের পাশে। ছোট লাট সার রিচার্ড টেম্পল হলেন সভাপতি। তিনিই বিপুল সমারোহে বৌবাজারের বিজ্ঞানসভা ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করলেন আনুষ্ঠানিকভাবে। মহেন্দ্রলাল নিজে সারগর্ভ ভাষণ দিলেন ছবি দেখিয়ে। পরোজ রাগিণীতে সবাই মিলে গান গাইলে: 'বিজ্ঞান সাধনে হও আগুয়ান, উৎসাহ যতনে প্রিয় ভারত সন্তান।...

হিন্দু-যশ-সৌরভে ধরা আমোদিত হবে, ভারত-জননী পুনঃ পাইবেন মান।।' আঠারশ' ছিয়াত্তর। উনত্রিশে জুলাই। সারা দেশ তখন সাহেবদের অচ্ছুৎ এই মানুষটিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। তাঁর হোমিওপ্যাথির প্রতি আস্থা তখন সারা জাতির। নবযুগের মানুষের মনে নব ভাব।

আর এই ভাব নিয়েই নতুন ভাবনা। ভাবনা এই যে নবযুগের এই নবভাব—'হিউম্যানিজম'ও কি মহেন্দ্র ডাক্তারকে হোমিওপ্যাথিতে আকৃষ্ট করেছিল? যুগের হাওয়ার কি কিছু ভূমিকা ছিল এ্যালোপ্যাথি থেকে হোমিওপ্যাথিতে উত্তরণে? উনবিংশ শতকের সেই মানবিকতার ঢেউ যা' বাংলা সাহিত্যকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, চিন্তায়, সাধনায় প্লাবন এনেছিল, তা' কি মহেন্দ্রলালকেও অভিভূত করেছিল, রেহাই দেয়নি? দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'সুরধনী কাব্য' প্রথম খন্ড উৎসর্গ করেন মহেন্দ্রলালকে। উৎসর্গ পত্রে দীনবন্ধু একটি ঘটনার উল্লেখ করেন:

'কতিপয় দিবস অতীত হইল আমি একদিন উষার সমীরণ সেবন করিতে করিতে তোমার ভবনে উপনীত হইয়াছিলাম। দেখিলাম তুমি চেয়ারে উপবিষ্ট, তোমাকে বেষ্টন করিয়া অনেকগুলি লোক,—বাঙ্গালি, হিন্দুস্থানী, উৎকল, সাহেব, বিবি—দণ্ডায়মান রহিয়াছে: তুমি তাহাদিগের পীড়া নির্ণয় করিয়া ঔষধ বিতরণ করিতেছ। আমি কতক্ষণ একপার্শ্বে বসিয়া রহিলাম, জনতা নিবন্ধন তুমি আমাকে দেখিতে পাইলে না। এই দৃশ্যটি অতীব মনোরম—ইচ্ছা হইল আলেখ্য লিখিয়া জনসমাজে প্রদর্শন করাই।' বলাবাহুল্য, 'সুরধনী কাব্যে' সেকাজ করেছিলেন দীনবন্ধু। 'ভিষক্-কুল-পঙ্কজ-সবিতা' মহেন্দ্রলাল সরকার সম্বন্ধে লিখেছিলেন—

'নানা বিদ্যা বিশারদ মহেন্দ্রপ্রবর,
নয়ন-রোগের শান্তি, দয়ারসাগর,
উষায় বসিয়া ঘরে করে বিতরণ
অকাতরে দীনবন্ধু ঔষধ-রতন'।

এই যে দীনজনে দয়ার সাগরের ঔষধ বিতরণ—এই যে মানবিকতা, যার কথা মহেন্দ্রলাল তাঁর জবানবন্দীতে একদা বলেওছিলেন যে তাঁর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় রোগীদের যে কল্যাণ হয়েছিল, আর্তের যন্ত্রণায় যে শান্তি দিয়েছিল তার তুলনায় তাঁর উপর বিরোধীদের অত্যাচার কিছুই নয়—'নাথিং কমপেয়ারড্ টু দি বেনিফিটস মাই পেসেন্টস এনজয়েড'—এটাও বোধ করি তাঁর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বেছে নেওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ!

বাংলাদেশে হোমিওপ্যাথি প্রচারের আদ্যকালে রাজেন্দ্র দত্তর পাশে ছিলেন ডাক্তার বেরিনি। অন্যান্য বিদেশী ডাক্তারদের মতো দেশে ফেরার সময় মোটা টাকার ছাঁদা বেঁধে নিয়ে যেতে পারেননি এই ডাক্তার সাহেবটি। তাঁর বিদায়-সংবর্ধনা সভায় দুঃখ করে' বলেছিলেন রাজেন্দ্র দত্ত মশায়, কত সাহেব কত বড় বড় টাকার আন্ডিল নিয়ে গেল, আর তুমি যাচ্ছ শুধুহাতে। জবাবে বেরিনি নাকি হেসে বলেছিলেন, 'কে বলে? আমার পকেটে পাঁচ হাজার টাকার চেক। রাজেন্দ্রবাবু ত অবাক। বললেন, কি রকম? বেরিনি বুঝিয়ে বললেন, মহেন্দ্র যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করছে—তার দামই ত পাঁচ হাজার টাকা! তাঁর সেই বিদায় সভায় বেরিনি নাকি আরও বলেছিলেন, সূর্য উঠলে চাঁদের আর দরকার হয় না। মহেন্দ্র সরকার হোমিওপ্যাথির সূর্য!

বেরিনি সাহেবের উপমা মোটেই অত্যুক্তি নয়। তবে এটা ঠিক এই সূর্যকে কোন সুন্দর সহাস্য প্রভাত সাদর অভ্যর্থনা জানায়নি। এলোপ্যাথ সাহেব ডাক্তারদের চক্রান্তের ঘন কালো মেঘ, তাদের সংঘবদ্ধ আক্রমণের দৃষ্টিরোধকারী কুয়াশা—এই সূর্যের অভ্যুদয়কে ব্যাহত করতে চেষ্টা করেছিল। তবে ধন্বন্তরি পাপঘ্ন সূর্য বলেই না তাকে আটকান যায়নি। রোগী বন্ধ করেও না। কেশব সেনের বক্তৃতা, দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণের' অভিনয়, বঙ্কিমের উপন্যাস বা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'সোম প্রকাশে'র আবির্ভাবের মতই মহেন্দ্রলাল সরকারের হোমিওপ্যাথ আন্দোলন বাংলাদেশের নবযুগকেই দ্রুত সম্ভব করে তুলেছিল, সন্দেহ নেই।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

বিশ বছরের পত্রগুচ্ছ—(২)

গত সপ্তাহে এই বিভাগে এক বিচিত্র পত্র-সাহিত্যের আংশিক বিবরণ দেওয়া হয়েছে—এই সংখ্যায় তার পরবর্তী অংশ পরিবেশিত হচ্ছে।

৯ এপ্রিলের চিঠির শেষে মার্কস্ অ্যান্ড কোম্পানীর কর্মচারীদের প্রেরিত উপহার 'এলিজাবেথান পোয়েটস' পেয়ে হেলেন লিখলেন ১৬ এপ্রিল সবাইকে সম্বোধন করে—

"ধন্যবাদ, কি সুন্দর বই। আগে এমন সোনার জল দিয়ে মোড়া বই বখনও হাতে করিনি। বিশ্বাস করবেন না হয়ত, বইটি আমার জন্মদিনেই হাতে এসে পৌঁছেচে। আপনারা বইটির পৃষ্ঠাতেই উপহার-বাক্য উৎকীর্ণ না করে আলাদা কার্ডে লিখেছেন কেন? পুস্তক-ব্যবসায়ীর মনোভংগী একেবারে ফুটে উঠেছে। ভেবেছেন হয়ত সেভাবে লিখলে বইটার মূল্য হ্রাস পাবে। কিন্তু বর্তমান মালিকের কাছে এর দাম বাড়ত! আপনারা নাম সই করেন নি কেন, সবাই মিলে? বোধহয় ফ্রাঙ্ক আপনাদের লিখতে দিত না। ও হয়ত চায় না আর কাউকে আমি প্রেমপত্র দিই।"

সেপ্টেম্বর মাসে বন্ধু ম্যাকসিনে লিখলেন হেলেনকে ডিয়ার হার্ট সম্বোধন করে :

"আমাদের চমৎকার পুরানো বই-এর এই দোকানটি চমৎকার। একেবারে ডিকেন্সের বই-এর পাতা থেকে বেরিয়ে এসেছে। দোকানটি দেখে একেবারে মুগ্ধ হবেন।

ভিতরটা অন্ধকার। দোকানটি চোখে পড়ার পূর্বে এর গন্ধ পাবেন। চমৎকার গন্ধ। ঠিক যে কি বলা সহজ নয়, তবে এতে আছে ধূলি আর ধূসরতা। বই একেবারে ছাদ ছুঁয়েচে, দেওয়াল আর মেঝে সবই কাঠের। আর বই-এর সেলফ্ যেন শেষ হতে চায় না। তার ওপর অনেক বছরের ধুলো।

একটা লম্বা টেবলে আছে চমৎকার ইংলিশ ব্যঙ্গচিত্র, এই সব চিত্রকর সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না—আর কিছু সচিত্র পুরাতন পত্রিকা আছে। আমি আধ ঘণ্টা ঘোরাঘুরি করেও আপনার ফ্রাঙ্ক বা অন্য কাউকে দেখতে পাইনি। তবে তখন একটা বাজে—সবাই বোধহয় টিফিনে গিয়েছিলেন। আমি অপেক্ষা করতে পারিনি।..."

১৫ সেপ্টেম্বর তারিখে হেলেন ম্যাকসিনেকে লিখলেন : "তোমার মঙ্গল হোক। ক অপূর্ব বর্ণনা। আমি তিক্ততার আমেজ এনে বলতে চাই, কোন পুণ্যবলে ঈশ্বর মাকে আমার বই-এর দোকানে পাঠিয়ে- া এদিকে আমি ৯৫তম স্ট্রীটে টি, ভি-র া অ্যাডভেঞ্চার্স অব এলেরী কুইনের রূপট্ তৈরী করছি।"

সামুয়েল পেপীস-এর ডায়েরী সম্ভবত লেন চেয়েছিলেন এবং ফ্রাঙ্ক হয়ত কোনো ক সংস্করণ (সংক্ষেপিত) পাঠিয়ে করেন—সেই গ্রন্থ পেয়ে হেলেন লিখল :

"ফ্রাঙ্ক : এটা পেপিসের ডায়েরী কি! এ কোনো মাতব্বর সম্পাদক কর্তৃক 'পেপিস ডায়েরী'র সংক্ষিপ্তসার সংগ্রহ। এ বইটিতে থুতু ফেলা যায়।

১২ জানুয়ারী ১৬৬৯-এর পৃষ্ঠা কই? যেখানে তাঁর স্ত্রী একটি জ্বলন্ত শিক নিয়ে বিছানা থেকে উঠিয়ে তাড়া করেছিলেন সেই বিবরণ দেওয়া আছে? আপনি আমাকে আসল পেপিস পাঠান, টাকা পাঠালাম, তারপর এই বাজে বইটা পাতার পর পাতা ছিঁড়ে তাই দিয়ে জিনিষপত্র মুড়ব।"

এই সংগে আবার সহৃদয় প্রশ্ন আছে, বড়দিনের জন্য টাটকা ডিম ডেনমার্ক থেকে পাঠাব না পাউডার করা ডিম? ভোট নিয়ে মতামত জানাবার অনুরোধও আছে।

এই চিঠি পেয়ে ফ্রাঙ্ক মিস হানফকে ত্রুটি স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করে চিঠি দিলেন। তিনি বললেন—বিশ্বাস করুন আমি ভেবেছিলাম এইটাই একেবারে নির্ভেজাল পেপিস! আমি একটা উপযুক্ত মূল্যের ভালো কপি পেলেই আপনাকে পাঠাব।

এই সূত্রে তিনি জানালেন যে একটি ব্যক্তিগত লাইব্রেরী সংগ্রহ থেকে লে হান্ট সংগ্রহ করা হয়েছে। সেই সংগে ভলগেট ও নিউ টেসটামেন্ট।

আর ডিম সম্পর্কে মন্তব্য—এখনকার সকলের মত টাটকা ডিমই ভালো হবে।

বই পেয়ে ভারী খুসী মিস হানফ্। তিনি লিখলেন—আপনি আমার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছেন। লে হান্ট, ভলগেট আর নিউ টেসটামেন্ট সব এক সংগে একেবারে। আপনার হয়ত স্মরণে নেই, প্রায় দু বছর পূর্বে আমি এসব বইগুলির অর্ডার দিয়েছিলাম। ...সত্যি আমার জন্য যা করছেন তার জন্য আমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, তা না করে আমি কেবল খোঁচা দিই। চিঠিটার ওপরে একটু কফি চলকে পড়েছে তার জন্য দুঃখিত।"

এরপর ফ্রাঙ্ক একটি বড় চিঠি লিখে জানালেন যে ডিম যথাসময়ে এসেছে। তার সিংহভাগ দেওয়া হয়েছে জর্জ মার্টিন নামক একজন বয়স্ক কর্মচারীকে, কারণ তিনি অনেক দিন ধরে অসুস্থ। এরপর দোকানের কর্মচারীরা সকলে মিলে একটা ছোট্ট ক্রিসমাস উপহার পাঠালেন বড়দিনের জন্য। একটি হাতে কাজ করা টেবলক্লথ। ক্রিসমাস গ্রিটিংস এবং নববর্ষের শুভেচ্ছাসহ সেই উপহারের সংগে মার্কস অ্যান্ড কোম্পানীর নাম লেখা।

এর পরের চিঠিটি লিখলেন ফ্রাঙ্কের স্ত্রী নোরা ডোয়েন ২০শে জানুয়ারী ১৯৫২ তারিখে, তিনি জানালেন—

"অনেক দিন ধরে আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো মনে করি আমাদের সংসারে আপনার প্রেরিত উপহারের অংশের জন্য—এখন একটা সুযোগ এসেছে, আপনি নাকি জানতে চেয়েছেন যে ভদ্রমহিলা টেবলক্লথের লিনেনটিতে সূচিকর্ম করেছেন তাঁর নাম? কাজটি চমৎকার—তাই না? তাঁর

নাম মিসেস বুলেটন—তিনি পাশের বাড়ি ৩৬ নম্বরে থাকেন। তাঁর হার্টের কাজ এটলাণ্টিক পার হয়ে যাবে শুনে তিনি আনন্দিত হয়েছেন খুব। আমাদের সুখী পরিবারের একটা ফটো আপনাকে শীঘ্রই পাঠাব। আমাদের বড় মেয়ে শীলা গত আগস্ট মাসে বারোয় পড়েছে, সে আমার রেডি-মেড কন্যা; ফ্রাঙ্কের প্রথমা স্ত্রী যুদ্ধের সময় গত হয়েছেন। আমাদের কনিষ্ঠা কন্যা মেরী গত বসন্তকালে চার বছরে পড়েছে। শীলা যে কনভেন্টে পড়ে সেখানকার নান-রা বিস্মিত হয়েছিলেন শীলা যখন আমাদের বিবাহ বার্ষিকীতে শুভেচ্ছা কার্ড পাঠালো। শীলা বলেছিল ড্যাডি আর মামির মাত্র চার বছর বিয়ে হয়েছে। পরে অনেক করে তাঁদের সব বোঝাতে হয়।

আপনি আমাদের নববর্ষের শুভেচ্ছা নিন। আপনাকে ইংলণ্ডের মাটিতে দেখবার বাসনা আছে।...

এরপর হানফ তাঁর লণ্ডনস্থ বন্ধু ম্যাকসিনেকে চিঠি লিখে অনুরোধ জানালেন—তোমার মার কাছে শুনলাম তুমি নাকি দু ডজন নাইলনের জোড়া নিয়ে গেছ লণ্ডনে। আমার জন্য চারজোড়া বুকসপে নিয়ে গিয়ে ফ্রাঙ্ককে দেবে। বলবে, তাঁর তিন কন্যা এবং স্ত্রীর জন্য এই উপহার। ওঁরা আমাকে হাতে কাজ করা আইরিশ লিনেনের টেবলক্লথ দিয়েছেন। আমার কাজের জন্য এলেরী কুইন স্ক্রিপটু ২৫০ ডলার বাড়িয়েছেন। যদি জুন পর্যন্ত চলে তাহলে আমি ইংলণ্ডে যাব এবং নিজের চোখে বুকসপ দেখব...তাদের জানাবো না আমার পরিচয়—"

এই নাইলন উপহার পেয়ে ফ্রাঙ্ক মহা খুসী। লিখলেন—"কি করে পাঠালেন! অবাক করে দিয়েছেন। আমার মেয়েরা আপনাকে চিঠি দেবে স্থির করেছে। আপনার অজস্র উপহার পাচ্ছি। কি ধন্যবাদ দেব। যদি কখনও ইংলণ্ডে আসেন তাহলে যতদিন থাকবেন, আমাদের বাড়িতে আপনার জন্য একটি বিছানা পাবেন।'

এইভাবে আরো অনেক চিঠি চলল। অনেক বই সংগ্রহ করল হেলেন হানফ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার ইংলণ্ডে যাওয়া হল না। যে বাসায় তারা থাকত সেই বাসাটি সরকার ভেঙে দিচ্ছেন রাস্তা উন্নয়নের জন্য। ফলে নতুন বাড়িতে যেতে হল। সেখানে নতুন আসবাব ইত্যাদি কিনতেই ইংলণ্ড যাওয়ার জমানো টাকা খরচ হয়ে গেল।

১৯৬৯ খৃস্টাব্দের ৮ জানুয়ারী তারিখে মার্কস অ্যাণ্ড কোম্পানীর তরফে তাঁদের সেক্রেটারি মিসেস জোয়ান টড হেলেনকে একটি চিঠিতে লিখলেন :

...৩০ সেপ্টেম্বর তারিখে লেখা ফ্রাঙ্কের নামে পাঠান চিঠি এই মাত্র দেখলাম। দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি ২২ ডিসেম্বর রবিবার দিন ফ্রাঙ্ক পরলোক গমন করেছেন। তাঁর অ্যাপেনডিকস ফেটে যাওয়ায় অপারেশন করতে হয়। দুঃখের বিষয় পেরিটোন্যাইটিস আক্রমণ করল এবং সাতদিন পরে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি এই দোকানে চল্লিশ বছর কাজ করেছেন, তাই এই মৃত্যু মিঃ কোহেনের কাছে বিশেষ বেদনাদায়ক হয়েছে। বিশেষ করে মিঃ মার্কসের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই এই ঘটনা ঘটল। আপনার জন্য 'অস্টেনস' সংগ্রহ করব কি?'

জানুয়ারী মাসে নোরা একটি চিঠি পাঠালেন হেলেনকে..."আমি চারদিক থেকে ওঁর জন্য চিঠি পাচ্ছি। বই ব্যবসায়ে যাঁরা আছেন তাঁরা সবাই প্রশস্তি জানিয়েছেন। বই-এর ব্যাপারে উনি অনেক জানতেন এবং সকলকে সাহায্য করতেন। যদি চান আপনাকে সেসব পাঠিয়ে দেব। আপনাকে বলতে বাধা নেই আপনার ওপর মাঝে মাঝে ঈর্ষা হত—আপনার চিঠি ফ্রাঙ্কের ভালো লাগত, বিশেষ করে আপনার রসিকতার সঙ্গে তাঁর মনোভঙ্গীর মিল ছিল। আপনার লিপিকুশলতার আমি হিংসা করতাম। আমরা স্বামী-স্ত্রীতে পরস্পর-বিরোধী চরিত্র। উনি ভদ্র এবং সহৃদয় আর আমি সংগ্রামী। সর্বদাই অধিকার আদায়ের চেষ্টায় লড়ছি। উনি আমাকে বই বিষয়ে জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা করতেন। আমার মেয়েরা ভালো। ওদের জন্য আমি খুসী। ভাবি পৃথিবীতে আরো অনেকেই ত আমার মত নিঃসঙ্গ।"

সেই বছর ১১ এপ্রিল তারিখে নোরা চিঠি লিখলেন তাঁর এক বান্ধবী ক্যাথারিনকে—

—জানো, রায়ান আমাকে প্রশ্ন করেছিল—তোমার যদি ইংলণ্ডে যাওয়ার ভাড়া থাকত, সত্যি যেতে?

এ-কথায় আমি প্রায় কেঁদে ফেলেছিলাম। আমি জানি না, তবে কোনো দিনই ওখানে না যাওয়াই শ্রেয়। কতদিন স্বপ্ন দেখেছি। আমি বিলাতী ছায়াছবি দেখতাম, ইংলণ্ডের পথঘাট কেমন তা দেখার জন্য।

যে ভদ্রলোক আমাকে সব বই বিক্রী করতেন তিনি কয়েক মাস পূর্বে গত হয়েছেন। দোকানের মালিক মিঃ মার্কসও নেই। তবে মার্কস অ্যাণ্ড কোম্পানী আজো আছে। তুমি যদি ৮৪, চেয়ারিং ক্রসে যাও তাহলে আমার হয়ে সেই বাড়িটি চুম্বন করবে। আমি ওর কাছে অনেক ঋণী।"...

এইখানেই পত্রগুচ্ছের সমাপ্তি। দুঃখের বিষয় এই চিঠি লিখিত হওয়ার কুড়ি মাস পরে মার্কস অ্যাণ্ড কোম্পানীর ব্যবসা উঠে যায়, আর ৮৪ নম্বর চেয়ারিং ক্রসের বাড়িটাও নেই, উন্নয়ন ব্যবস্থায় সে বাড়ি ভাঙা হয়েছে।

এই পত্রগুচ্ছগুলির সংক্ষিপ্ত যে পরিচয় দেওয়া হল তার মাধ্যে মানবমনের এক সুগভীর সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়। এই ধরনের গ্রন্থও সচরাচর চোখে পড়ে না।

—অভয়ঙ্কর

* 84, CHARING CROSS ROAD — By HELEN HANFF Publishers: ANDRE DEUTSCH · LONDON: Price 40 Shillings only.

সাহিত্যের খবর

শিরোনাম : সন্তোষকুমার ঘোষ

প্রায় দু' যুগ আগের কথা। সবে বেরিয়েছে একটি উপন্যাস। সঙ্গে সঙ্গে হৈ-চৈ পড়ে গেল। দারুণ সাড়া জাগাল পাঠকমহলে। বইটির নাম 'কিনু গোয়ালার গলি'। লেখক সন্তোষকুমার ঘোষ। আর ঐ আলোড়নকারী উপন্যাসটি হল লেখকের প্রথম উপন্যাস। সেই আপন সৃষ্টির স্বয়ং নায়ক সন্তোষকুমার ঘোষ পেলেন এবারের সাহিত্য আকাদমির পুরস্কার। ১৯৭২ সালের শ্রেষ্ঠ বাংলা গ্রন্থের জন্য এই সর্বভারতীয় সাহিত্য পুরস্কার।

'শেষ নমস্কার : শ্রীচরণেষু মা-কে' হল তাঁর আকাদমি সম্মানিত উপন্যাস। অননুকরণীয় রীতিতে লেখা বাংলাভাষার অনন্য নজির এই উপন্যাসটি লেখকের নিজস্ব জীবনের এক আশ্চর্য অশ্রুলিপি। একজন পরিণত বয়স্ক মানুষ নিজেকে যেন দেখলেন ফালা ফালা করে। নিজের স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যতকে ঘিরে গাঁথলেন শব্দমালা, চিত্রলিপি। ঘরোয়াভাবেই মাকে শোনালেন নির্মম নিষ্ঠুর নিজের কথা। কখনো স্বীকারোক্তি করছেন কখনো লিখছেন যেন চিঠি, করছেন স্মৃতিরোমন্থন। মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস। আন্তরিক হাঁ মানবিক অনুভূতিতে বড়ো বেশি আন্তরিক এক পরিণত বয়সের মানুষ আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরলেন সত্যের স্বরূপ। বড় নির্মম সত্যকে শেখালেন চিনতে।

সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই রয়েছে তাঁর বলিষ্ঠ স্বাক্ষর। ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, নাটক, ভ্রমণকাহিনী, এমনকি কবিতাও তিনি লিখেছেন। এখনো লিখছেন। বিষয়বস্তুর নতুনত্ব, আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য, ভাষার কারুকার্য, বুদ্ধির দীপ্তি, চিন্তার মৌলিকত্ব সর্বোপরি মানবিক অনুভূতির প্রকাশে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাসাহিত্যে সন্তোষকুমার ঘোষ একটি স্মরণীয় নাম। তাঁর কিনু গোয়ালার গলি, নানা রঙের দিন, মোমের পুতুল, সুখের রেখা, জল দাও, স্বয়ং নায়ক, শ্রেণু, তোমার মন, ত্রিনয়ন, শেষ নমস্কার : শ্রীচরণেষু মা-কে, সময়, আমার মম প্রভৃতি উপন্যাস; অজাত, অপার্থিব নাটক প্রবন্ধ সংকলন 'সোজাসুজি', কুসুমের মাস, চীনে মাটি, শ্রেষ্ঠ গল্প, কাড়ির ঝাঁপি প্রভৃতি ছোটগল্পের সংকলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আকাদমি পুরস্কৃত আরো কয়েকজন

বাংলাভাষাকে বাদ দিলে আরো বারোটি ভাষায় বিভিন্ন গ্রন্থের লেখক পেয়েছেন

১৯৭২-এর আকাদামি পুরস্কার। ইংরেজি, গুজরাতি, সোমিলা, সংস্কৃত, উর্দু ভাষার কোন বই এবার পুরস্কার পায়নি। অসমীয়া সাহিত্যের পুরস্কার পেয়েছেন অঘারি আত্মার কাহিনী, উপন্যাস, সৈয়দ আব্দুল মালিক; হিন্দি : বাণী হোই রস্সি, কাব্যগ্রন্থ, ভবানীপ্রসাদ মিশ্র; কানাড়া : শুনকাসম্পাদনের পরামর্শে, ভাষা, এস এস শুশনুরমথ; কাশ্মীরী : শুইয়া, নাটক, আলি মহম্মদ লোন; মালয়ালম : ওরু দসাথিনতে কথা, উপন্যাস, এম কে পোট্টেক্কাট; মারাঠি : জেভা মানুষ জাগা হতো, আত্মকথা, গোদাবরীর পারুলেকার; ওড়িয়া : মনোজ দাসঙ্ক কথা ও কাহিনী, ছোটগল্প সংকলন, মনোজ দাস। এছাড়া পাঞ্জাবী, সিন্ধি, তামিল, তেলেগু ভাষার লেখকগণ পুরস্কার লাভ করেন।

পশ্চিম বার্লিন থেকে

অনেকের হয়তো মনে আছে সে-কথা। কয়েক মাস আগেরই ঘটনা। নোবেল পুরস্কার পেলেন তখন জার্মান লেখক হাইনরিশ বোয়ল। এবং তাঁর কথা বলতে গিয়ে অমৃতে প্রকাশিত হয়েছিল একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠীর কাহিনী। বোয়ল ছিলেন তাঁদেরই একজন। সেই সাহিত্যগোষ্ঠীর নাম 'গ্রুপ ৪৭'।

ঠিক পঁচিশ বছর আগের এক সেপ্টেম্বর। হানস ভেরনার রিশটার আমন্ত্রণ করলেন পনেরোজন তরুণ লেখককে। বাভারিয়ার ফাুশেনের কাছে অবস্থিত ইলশে স্নাইডার লেঁগেলের ঘরে বসল আসর। জমজমাটি আদল পেল কবি-সাহিত্যিকদের আড্ডাটি। যে যাঁর নিজের লেখা কবিতা পড়লেন, পাঠ করলেন রচিত ছোটগল্প। কেউ কেউ পড়ে শোনালেন নিজের লেখা অপ্রকাশিত উপন্যাসের অংশবিশেষ। তারপর চলল আলোচনা। ঝাঁঝালো সুরেই একে অপরের দোষ-গুণ ধরিয়ে দিলেন খোলাখুলি। এই আসরটিই জন্ম দিল একটি গোষ্ঠীর। সাহিত্যজগতে তাঁরা পরিচিত হন 'গ্রুপ ৪৭' নামে। যুদ্ধোত্তর জার্মান সাহিত্যে, বিশেষ করে ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানির সাহিত্য-আন্দোলনে এই গোষ্ঠীর লেখকদের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আজো এই গ্রুপের ভাবনা পশ্চিম জার্মানির তরুণতর লেখকদের মধ্যে বেশ জোরালো।

হানস ভেরনার রিশটার এক সময় এই গ্রুপের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলে-ছিলেন, এটা নিছক কিছু লেখককে পাদ-প্রদীপের সামনে নিয়ে আসার জন্য তৈরি নয়। বরং রাজনৈতিক চিন্তার দিক থেকে কমিটেড অথচ সাহিত্যিক হবার জন্য যাঁদের বালাই নেই, তাঁদেরই চোখের মণি 'গ্রুপ ৪৭'। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর সময়ের সেদিককার ঝোড়ো আবহাওয়ার কথা মনে রাখলেই এই গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য সহজে বোঝা পড়বে।

প্রাণকেন্দ্র এই গ্রুপের সদস্য ছিলেন সাহিত্য-সমালোচক ওয়াল্টার্শম কাইজার। তিনি বলেছিলেন, এই গ্রুপের সদস্যদের সাফল্য যেমন দলগতভাবে ঘটেছে তেমনি হয়েছে ব্যক্তিগতভাবেও। এর সত্যতা যাচাই হয়েছে সময়ের কাছ থেকেই। তাই গ্রাস, ভালসার, বোয়ল, বাখমান, এনসেনবার্গার, আইখ, হাইসেনব্যুটেল, আইসিংগার, হিল্ডে-সাইমার, হ্যোলেরার, র‍্যামকর্ফ এবং আরো অনেক লেখকই ইতিমধ্যে যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন।

মাঝখানে সাহিত্যিকদের এই স্বর্গ গিয়েছিল ভেঙে। কেউ কেউ খেয়েছিলেন নিষিদ্ধ ফল। ব্যক্তিগত কুন্ধুত্বে ধরেছিল চিড়, কাজকর্মের তাগিদেও কেউ কেউ এদিক-ওদিক ছিটকে গিয়েছিলেন। অব-শেষে আবার তাঁরা মিললেন। মিলেছিলেন ঐতিহাসিক মে দিবসে। নানান দেশের শ্রমিকরা যখন পালন করছেন মে-দিবসের উৎসব, তখন পশ্চিম বার্লিনের হানস ভেরনার রিশটারের বাড়িতে বসল মজলিস। পুরনো দিনের লেখকবন্ধুরা হলেন জড়ো, বয়সের বাঁধ গেল ভেঙে, ফিরে পেলেন যৌবনের দিনগুলি, রাত গুলি। গ্রাস, জনসন, ক্রুগে, ভাই, হ্যোলেরার, ভোমান, সালুক, শনুরে, বাউম-গার্ট কাঁপিয়ে তুললেন আসর। হাল্কা চালের কথাবার্তার মাঝখানে কেউ কেউ বেশ তত্ত্বকথা জুড়লেন। কখনো বোয়লের কথা, কখনো আবার বাখমান, আইসিঙ্গার, হিল্ডেসাইমার, ভালসারের কথা বারবার ঘুরেফিরে এল। চলল স্মৃতিরোমন্থন, ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখের কথাও।

সকলেই বললেন, সাহিত্যে অনেক এলোমেলো হাওয়া বইলেও আজো 'গ্রুপ ৪৭'-এর প্রভাব সক্রিয়। তাঁদের সমাজ-সচেতনতা পশ্চিম জার্মানির সাহিত্যিকদের মধ্যে আজো স্পষ্ট।

যুগোশ্লাভিয়ার হৃদয় হতে

যাঁরা দেশ-বিদেশের সাহিত্যের খবরা-খবর রাখেন তাঁদের কাছে যুগোশ্লাভিয়ার লেখক ইভো আন্দ্রিক মোটেই অপরিচিত নন। ১৯৬১ সালে তিনি পেয়েছিলেন নোবেল পুরস্কার। সম্প্রতি তাঁর ৮০তম জন্মদিন যুগোশ্লাভিয়ায় পালন করা হলো বেশ উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে। এই উপলক্ষে নানান রকমের সম্মানও দেখানো

হয় তাঁকে। পেলেন কয়েকটি রাষ্ট্রীয় পদক। জনসাধারণের অফুরন্ত ভালোবাসারই স্মারকচিহ্ন রাষ্ট্রীয় পদক।

রাষ্ট্রপতি টিটো দিলেন অর্ডার অব হিরোজ অব সোস্যালিস্ট লেবার। বোসনিয়া এবং হের্জেগোভিনার রাজধানী সারজেভোয় এক অনুষ্ঠানে তাঁকে জানানো হয় বিশেষ সম্বর্ধনা। তাঁর জন্মস্থান ত্রাভনিকের প্রথম নাগরিক হিসেবেও পান তিনি বিশেষ সম্মান।

মুক্তির সন্ধানে ভারত—কংগ্রেস পূর্ব যুগ (প্রবন্ধ সংকলন) যোগেশচন্দ্র বাগল। প্রকাশক ঃ দি মডার্ণ পাবলিশার্স, ৮-এ, কলেজ রো। দাম ১৭ টাকা।

কংগ্রেস গঠিত হয় ১৮৮৫ সালে। তারপরই জাতীয় সংগঠনের নেতৃত্বে যে স্বাধীনতার সংগ্রাম আরম্ভ হয় ছয় দশক পরে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে তার সফল পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু ঐ আরম্ভের আগে আর এক আরম্ভের ইতিহাস আছে, কবির ভাষায় যাকে বলা যায়, সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ জ্বালার আগে সকাল বেলায় সলতে পাকানোর কাহিনী। প্রখ্যাত গবেষক লেখক যোগেশচন্দ্র বাগলের 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' গ্রন্থটিতে ঐ 'সকাল বেলায় সলতে পাকানোর কাহিনী' পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

পরলোকগত লেখকের উল্লেখিত গ্রন্থটি অবশ্য কোন সাম্প্রতিক কালের রচনা নয়। ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে, অর্থাৎ তেত্রিশ বছর আগে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় এবং তখন তার ভূমিকা লেখেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে ঐ ভূমিকাতে বলা হয়—'যে একশত বৎসরের ইতিহাস এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হয়েছে তাহা ভারতের নব-জাগরণের বা রেনেসাঁর ইতিহাস।'

যোগেশবাবুও তাঁর ভূমিকায় লেখেন, ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পরেই ভারতে রেনেসাঁ বা নবজাগরণের সূচনা হয়। ঐ সময় থেকে সাহিত্য বিজ্ঞান সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস ললিত-কলা প্রভৃতির ক্ষেত্রে নতুন জীবনস্পন্দন অনুভূত হয়। দীর্ঘ পঁচাশী বছর যাবৎ ভারতবাসী, বিশেষ করে বাঙালী, যে একনিষ্ঠ ও ঐকান্তিক সাধনা করেছিল তার একদিক দিয়ে প্রকাশ কংগ্রেসে রূপ পেল। প্রকৃতপক্ষে ভারতবাসীর, বিশেষ করে বাঙালির ঐ কংগ্রেস পূর্ব পঁচাশি বছরের জাগরণ ও সংগঠন [illegible] এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। তবে প্রথম মুদ্রণকালে গ্রন্থটিতে যোগেশবাবুর লেখা 'হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত'টি ছিল না। আলোচ্য সংস্করণে ঐ অধ্যায়টি সংযুক্ত হওয়ায় গ্রন্থটির একটি বড় ফাঁক পূরণ হয়েছে।

মোগল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার পর দেশে যে অরাজকতা ও বিশৃংখলা দেখা দেয় ইংরেজ শাসনকালে তার অবসান ঘটে এবং সেদিনের শান্ত ও সুশৃংখল পরিবেশে, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে ভারতে নব যুগের সূচনা হয়। ঐ যুগে যাঁরা আবির্ভূত হন মোটামুটিভাবে তাঁরা সকলেই ইংরেজ শাসনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম কেউ তার ব্যতিক্রম নন। সিপাহি-বিদ্রোহের সময় সারা দেশ জুড়ে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিরাট এক অভ্যুত্থান ঘটলেও দেশের ইংরেজি শিক্ষিত মহল ঐ অভ্যুত্থান থেকে অনেক দূরে ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যেসব রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠে তার সবগুলির সঙ্গেই ইংরেজদের প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল এবং কংগ্রেসও তার ব্যতিক্রম ছিল না।

১৮৩৮ সালে গঠিত হয় জমিদার সভা—বেঙ্গল ল্যান্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েশন যার সদস্যদের মধ্যে ছিলেন থিওডর ডিকেন্স, জর্জ প্রিন্সেপ, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিগণ। ঐ সভার সভাপতি ছিলেন রাধাকান্ত দেব ও দুজন সম্পাদক হন—প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও 'ইংলিশম্যান' সম্পাদক উইলিয়াম কব হ্যারি। ১৮৩৯ সালের জুলাই মাসে বিলাতে গঠিত হয়—বৃটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি। ১৮৫১ সালে ঐ দুই প্রতিষ্ঠান মিলিত হয়ে গঠিত হয় 'বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' যাকে ইংরেজ শাসিত ভারতের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন বলা যায়। ১৮৬৭ সালের চৈত্র সংক্রান্তি থেকে শুরু হয় বাৎসরিক অনুষ্ঠান 'হিন্দু মেলা' তার উদ্দেশ্য 'হিন্দু জাতিকে একত্রিত করা' হলেও জাতীয় চেতনার উন্মেষে তার ভূমিকা সামান্য ছিল না। তারপর ১৮৭৬ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসুর উদ্যোগে গঠিত হয় 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' বা ভারত-সভা। এই সবকটি সংগঠনই ছিল জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রদূত। তবে ১৮৮৩ সালে ইলবার্ট বিলকে কেন্দ্র করেই ইংরেজ কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে ভারতের সদ্য জাগ্রত জাতীয় চেতনার প্রথম সংঘর্ষ হয়, দু বছর পরে গঠিত হয় জাতীয় কংগ্রেস।

উল্লেখিত সংগঠন ও আন্দোলনগুলির ইতিহাস অতি নিষ্ঠা ও যোগ্যতার সঙ্গে যোগেশবাবু তাঁর 'মুক্তির সন্ধানে ভারত কংগ্রেস পূর্ব যুগ' গ্রন্থটিতে আলোচনা করেছেন। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, এ গ্রন্থ ইতিহাস রাজনীতি ও সাহিত্যের অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের কাছে একটি অপরিহার্য আকরগ্রন্থ বলে বিবেচিত হবে। বইটির ছাপা প্রায় নির্ভুল, প্রচ্ছদপটটিও সুকল্পিত। তবে দাম একটু কম হলেই ভাল হত।

জলের গভীর (কাব্য সংকলন)—শরৎসুনীল নন্দী। অর্ণব প্রকাশনী ১, ছাতুবাবু লেন, কলকাতা—১৪। তিন টাকা।

'বিষণ্ন স্বভাবে। অশ্রুময় নক্ষত্রেরা ক্লান্ত হয়ে ঝরে তার জলে', 'বুকের মধ্যে আর একটা বুক হাতছানি দেয়', 'অথচ স্মৃতির কাছে ফিরে যেতে হয় বারবার'—এই সমস্ত পংক্তি রচনা করে 'জলের গভীর' কাব্যগ্রন্থের কবি শ্রীশরৎসুনীল নন্দী নিজ কবিক্ষমতার পরিচয় রেখেছেন। আলোচ্য কবি রোমান্টিক বিষাদ নিয়ে কবিতাগুলির বিষয়, শব্দ ও ইমেজে ভ্রমণ করেছেন। ভালবাসা, দুঃখ, স্মৃতি, নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তির আর্তি প্রত্যাশাপ্রত্যাশাহীনতা, নিজেকে দেখার দর্পণ-অন্বেষা—এই সমস্ত বিবিধ বিচিত্র বিষয়কে কাব্যের সার্থক শব্দ, চিত্র, ছন্দ, বন্ধের সূক্ষ্মতায় সুষমামণ্ডিত করেছেন। কোমল আন্তরিক কবিকণ্ঠ স্বভাবী পাঠকের সঙ্গে সহজেই আত্মীয়তা স্থাপনে সক্ষম। কিন্তু কয়েকটি শব্দ, শব্দগুচ্ছ চিত্র ও চিত্রকল্পের একাধিক ও পৌনঃপুনিক প্রয়োগে অত্যন্ত ক্লান্তিকর লাগে, যেমন—'জল হয়' 'জলের গভীর', 'বুক', 'জলাশয়' 'বুকের গভীর' 'নক্ষত্র' ইত্যাদি। ভালোবাসা, 'ফোকাস' শব্দে শব্দগুচ্ছের অন্তর্নিহিত ধ্বনিমাধুর্য ও সূক্ষ্ম চিত্রের কল্পনা সৌন্দর্য সুষম কাব্যিকতা পায় নি।

যা দেখেছি যা বুঝেছি (প্রবন্ধ)—জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। আলফা-বিটা পাবলিকেশনস ৫৫-১, কলেজ স্ট্রীট দোতলা, কলিকাতা-১২। দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

ডায়েরীর পাতায় বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন যে সমস্ত চিন্তার উদ্ভব লেখা ছিল, সেগুলিকে লেখক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সেইভাবেই গ্রন্থাকারে সংকলিত করেছেন, তাঁর সদ্য প্রকাশিত 'যা দেখেছি যা বুঝেছি' গ্রন্থে। রচনাগুলি লেখকের নিজস্ব চিন্তাভঙ্গি ও ব্যবহারিক জীবনের উপলব্ধ জ্ঞানেরই লেখ্য রূপ। জীবন কর্মমুখর, কর্মের সূত্রে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়—বাইরের এবং ভিতরের—দুই-ই। প্রতিটি মানুষের সাধ, সাধ্য, সাধনা ভিন্নধর্মী জীবন, জগৎ, সমাজ, বাসনা—কামনা, দুঃখবোধ, সুখ-ভাবনা সবই অভিজ্ঞতার আলোয় ব্যক্তিচিহ্নিত বৈশিষ্ট্য পায়। এইরকম ব্যক্তি চিহ্নিত কয়েকটি স্মৃতি-অনুভবজাত জগৎ ও জীবন সমীক্ষার কথা বর্তমান গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। লেখকের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিটি স্বচ্ছ। প্রকাশভঙ্গির সহজতা সাবলীলতায় গ্রন্থটি মননধর্মী হয়েও সুখপাঠ্য।

...এবং অন্যান্য কবিতা। অশোক চট্টোপাধ্যায়। বিশ্বজ্ঞান। ৯।৩ টেমার লেন, কলকাতা-৯। দাম ঃ তিন টাকা।

অশোক চট্টোপাধ্যায় তাঁর কবিগ্রন্থের বইটির নাম পরিকল্পনাতেও নিরীক্ষার লোভ সম্বরণ করতে পারেন নি। বইটির নাম হবে সম্ভবতঃ নক্ষত্র এবং অন্যান্য কবিতা। কবিতার রূপরীতি নিয়ে কা

বিস্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মগ্ন, কবির বর্তমান রচনাগুলি তাই প্রমাণ করে। কবিতা, পোস্টার কবিতা (কবিতার সচিত্র হ্যান্ড-বিল?) গ্রাফ ইত্যাদি দুরূহ পরীক্ষামূলক কবিতার জটিলতা পেরিয়ে অশোক চট্টোপাধ্যায়ের মূলে কবিসত্তাটি আবিষ্কার করতে হয় তাঁর কবিতার মধ্যে, যেখানে কবি অনুভূতির গভীরে পৌঁছে বেদনাবোধে পীড়িত, বিষণ্ণ। —'পরিতাপে পরিতাপে মুখর সারাটি বেলা ধরে/একটি রঙীন পাখি পাতার আড়ালে বসে থাকে।' (পাতার আড়ালে)। ...'কেন সব দৃশ্য উড়ে যাবে, কেন' স্মৃতি, নাম দিলে/সেদিন প্রদোষে অমন সভয় হাতে ফুল দিলে কেন—/তোমার সাম্রাজ্য চাই, অবরোধী বিশাল নীলিমা/ভেদ করি এনে দিতে হবে ফুলগুলি।'...(চিঠি)।

কমল সাহা অঙ্কিত প্রচ্ছদটি তাৎপর্য-মণ্ডিত।

আজ ও আগামীকাল (উপন্যাস)। দেবদত্ত রায়। গ্রন্থ-পরিচয়; কলিকাতা-৩০, মূল্য ঃ ছয় টাকা।

'আজ ও আগামীকাল' কোন সাধারণ প্রেমকাহিনী নয়; একটি ভিন্ন জাতের ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস। পশ্চিমবঙ্গের গত নির্বাচনে একটি রাজনৈতিক জোটের পরাজয় এবং অন্য একটি রাজনৈতিক দলের ক্ষমতায় আসীন হওয়ার ঘটনার পূর্বে ও পরবর্তী কয়েক মাসকাল মোটামুটিভাবে এই উপন্যাসের পটভূমি। একশ্রেণীর সমাজ-বিরোধী, সন্ত্রাসবাদী উগ্রপন্থীদের নাশকতামূলক কাজকর্মের ফলে দেশে এমন একটা সময় এসেছিল যখন সাধারণ মানুষের জীবনে নিরাপত্তার অভাব ঘটেছিল, শিল্প প্রতিষ্ঠানে শিক্ষায়তনে—সর্বত্র অশান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। সমাজের সেই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আদর্শবাদী কিছু যুবক জীবনের স্বাভাবিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অবহেলা করে দেশে স্থায়ী মঙ্গল প্রতিষ্ঠার আদর্শ নিয়ে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে—এই হল উপন্যাসের বিষয়। এই ধরনের উপন্যাস রচনায় সার্থকতা-লাভের জন্য লেখকের যে ধরনের বলিষ্ঠতা থাকা দরকার—চরিত্র পরিকল্পনায়, ঘটনা নির্বাচনে, বর্ণনায়, বিশ্লেষণে, ভাষায়—বর্তমান গ্রন্থের লেখকের মধ্যে তার প্রতিশ্রুতি লক্ষ্য করা গেছে এবং বর্তমান উপন্যাসটি সেই পরিমাণেই সার্থক।

এতো আলো অন্ধকার (কাব্য সঙ্কলন)। কালীপদ কোঙার। সখী সংবাদ প্রকাশনী, ৪৬।৪, ব্রাহ্মসমাজ রোড, কলকাতা-৩৪। তিন টাকা।

কাব্যগ্রন্থের সর্বশেষ কবিতাটিতে কবি-ভাবনার সিদ্ধান্তে এসে তরুণ কবি কালীপদ কোঙার একজন শুভানুধ্যায়ীর থাকেই নিজের মত করে বলেছেন, 'সোনার হরিণের মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে যদি মুক্তি চাও/পৃথিবীতে কোনো কিছু আশা কোরো না।' কিন্তু এই কবি তাঁর 'এতো আলো অন্ধকার' গ্রন্থের প্রথম কবিতাতেই অত্যন্ত সক্রিয় থেকে পাঠকদের বলেছেন — 'বন্ধু, জেগে ওঠো, দেখ কি রকম/পায়ের তলার থেকে সরে যাচ্ছে মাটি/ঘুমোবার এখন সময়?' আশা-নিরাশায় কবিমন দ্বিধান্বিত। কবি বাঁচতে চান। কবির কাছে—'তাই মৃত্যু শেষ নয়/এবং দুঃখ অশেষ।' একেবারে সাম্প্রতিক কালের আধুনিক কবিদের মধ্যে কালীপদ কোঙার প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন কবি নিঃসন্দেহে। কাব্যের 'ডিকশন', চিত্র কল্প ও ছন্দে তিনি সতর্ক, সচেতন কবি।

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা (১৬শ খণ্ড)—শ্রীঅনিলবরণ রায়। গীতা প্রচার কার্যালয়, ১০৮।১১, মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা—২৬। এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার সঠিক ব্যাখ্যাসহ বিভিন্ন প্রকাশন সংস্থা একাধিক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। বড় বড় টীকাকার ও সাধু-মনীষী গীতার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সুনিপুণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বর্তমান গ্রন্থটি সেই পরিচয় বহন করে। শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যা অবলম্বনে বর্তমান গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন। এই খণ্ডে গীতার সপ্তম অধ্যায়টি বিস্তারিত আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই ব্যাখ্যার প্রথমাংশ ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত রায় পূর্ববর্তী পনেরোটি খণ্ডে প্রকাশ করেছেন। বর্তমান খণ্ডটি পূর্ববর্তী খণ্ডগুলির সুনাম রক্ষায় যথেষ্ট সমর্থ।

গঙ্গাপদ বসু স্মারকগ্রন্থ—অন্বেষা। ১।২এ, বলরাম স্ট্রীট, কলকাতা—৪। দাম ঃ ছ'টাকা।

'শিল্পীর স্মৃতিরক্ষার্থে, শিল্পরসিক মানুষদের জ্ঞাতার্থে একজন আত্মনিবেদিত শিল্পীর কর্মময় জীবনকে প্রতিফলিত করবার চেষ্টা করা হয়েছে এই গ্রন্থে।'

শিল্পরসিক মহলে গঙ্গাপদ বসু সুপরিচিত নাম। নাট্যকার, সাংবাদিক, সংগঠক এবং অভিনেতা হিসাবে আধুনিক বাংলা শিল্প সংস্কৃতির জগতে গঙ্গাপদ বসুর বিশিষ্ট ভূমিকাটি কোনদিনই বিস্মৃত হওয়ার নয়। 'ছিন্নমূল'-এর বিশু চক্রবর্তী', 'জলসাঘর'-এর 'মহিম গাঙ্গুলী', 'পরশপাথর'-এর কৃপারাম কাচালু' 'অযান্ত্রিক'-এর 'মামাবাবু' এবং 'শাপমোচন', 'বিষকন্যা' থেকে সাম্প্রতিক কালের 'এখানে পিঞ্জর' 'নিশিপদ্ম' ইত্যাদি বহু ছায়াছবির বিভিন্ন চরিত্র শ্রীবসুর অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করবে সুদীর্ঘকাল; যদিও চলচ্চিত্রে গঙ্গাপদ বসুর অভিনয় ক্ষমতার সর্বাঙ্গীণ প্রকাশ ঘটতে পারেনি। ব্যবসায়িক চলচ্চিত্র দরবারে শিল্পীর স্বাধীনতা অন্ততঃ কিছুটা ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য।

গঙ্গাপদ বসুর প্রতিভার পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে—যে নাট্যগোষ্ঠীর প্রাণপুরুষ ছিলেন তিনি, সেই 'বহুরূপী'র বিভিন্ন প্রযোজনায়। 'ছেঁড়া তার'-এর 'হাকিমুদ্দি', 'রক্তকরবী'র 'অধ্যাপক', 'ডাকঘর'-এর মাধব দত্ত, রাজা অয়দিপাউস'-এর 'মেষপালক'-এর ভূমিকায় তাঁর অভিনয় বাংলার নাট্যানুরাগীদের হৃদয়ে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। চির-স্মরণীয় হয়ে থাকবে ঐতিহাসিক বাংলা নবনাট্য আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ গঙ্গাপদ বসু—'জবানবন্দী'র 'পরাণ মণ্ডল', 'নবান্ন'-এর 'হারু দত্ত'।

শিল্পে নিবেদিতপ্রাণ এই মহৎ শিল্পীর ব্যক্তি-জীবনের বহু দিকেও আলোকপাত করেছেন বর্তমান বাংলা সাংস্কৃতিক জগতের পুরোধা কয়েকজন গুণী। গুণীবৃন্দের মধ্যে আছেন—সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, মন্মথ রায় বিজন ভট্টাচার্য,, উৎপল দত্ত, উত্তমকুমার, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, এন কে জি, সমরেশ বসু, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ প্রমুখ।

স্বদেশ বসুর ভূমিকা গ্রন্থের একটি মূল্যবান অধ্যায়। সুসম্পাদিত গ্রন্থটির বহিরঙ্গ সৌষ্ঠবেও সুরুচির স্বাক্ষর বর্তমান।

ঊনচত্তরিশ তিরিশের গান (কাব্যগ্রন্থ)—অভিজিৎ সেনগুপ্ত। প্রাইমা পাবলিকেশনস, ৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৭। আড়াই টাকা।

রহস্যময় এক মায়াবী যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন লেখক। অন্তত এ-বইয়ের কবিতাগুলি পড়ে সেরকম একটা ধারণাই তৈরী হয়। 'সন্ধ্যা' 'কাকের ডাক' 'শতাব্দীর শিয়র' প্রভৃতি শব্দ ও শব্দচিত্রের অনুষঙ্গে যে-জগৎ উন্মোচিত হয়, তার সঙ্গে কবিতা-পাঠকের পরিচয় অত্যন্ত অস্পষ্ট।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

কালি ও কলম (চতুর্থ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা) ঃ শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। ১৫ বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম দু'টাকা।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা কালি ও কলমের বর্তমান সংখ্যাটি কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত স্মরণ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে। আধুনিক কবিতা পাঠের প্রতি অনীহা যে সমাজে প্রকট, সেখানে একজন দুঃশ্রেষ্ঠ কবির স্মরণে বিশেষ গ্রন্থ প্রকাশ নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিক প্রয়াস। ম্যাকসিম গোর্কির ওপর লেখা সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি প্রথমেই পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। জগন্নাথ চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শামসুর রহমান আবদুল মান্নান সৈয়দ এবং আরো কয়েকজন সুধীন্দ্রনাথের প্রতিভার মূল্যায়ন করেছেন। সুধীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত রচনাপঞ্জী ও জীবনীপঞ্জী রচনা করেছেন শুভ মুখোপাধ্যায়।

যে যাত্রা এককালে আমাদের সংস্কৃতির অন্যতম অংগ হিসাবে গ্রামে-ঘরে, পূজা পার্বণে সাধারণের মধ্যে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিল, জনসাধারণ যা থেকে প্রভূত আনন্দ পেয়েছিল, স্থায়ী রঙ্গালয়গুলির প্রবর্তনে তা প্রায় লোপপ্রাপ্তির অবস্থায় পরিণত হয়। কিন্তু খুবই আশার কথা যে, সাম্প্রতিককালে সেই যাত্রাই সম্পূর্ণ নূতন রূপ ধারণ করেছে এবং তার হৃত মর্যাদা আবার ফিরে পেয়েছে। পালাগুলির মধ্যে, সাজসজ্জা ও চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে এসেছে সমকালীন মনোভাবের পরিচয়। এ যুগে যাত্রা যে আবার এত জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে, তা অনেকের কাছেই ছিল অবিশ্বাসের বিষয়। কেবলমাত্র গ্রামাঞ্চলেই নয়, শহরের বুকেও এই যাত্রার নব-যাত্রা আজ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে।

পুরাতনের মহিমা সর্বত্র আমরা বর্জন করতে পারি না। নতুন আঙ্গিকে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে পুরাতন কাহিনী বা স্মরণীয় চরিত্রের উপর রচিত নাটকগুলি বিদ্বজ্জন-সমাজে যে অসামান্য সমাদর লাভ করেছে এবং সাফল্যের সঙ্গে দীর্ঘ দিন অভিনীত হয়ে চলেছে, তার নিদর্শন হিসাবে 'ব্যাপিকা বিদায়', 'নটী বিনোদিনী', 'সুবর্ণ গোলক', 'জামাই বারিক' 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য', 'শের আফগান" প্রভৃতিগুলির নাম করা যায়।

কিন্তু এবার আমার কথা হচ্ছে যাত্রা বা থিয়েটার নিয়ে নয়। আমি বলতে চাইছি 'পাঁচালী'র কথা — যাত্রার মত পাঁচালীর পুনরুজ্জীবনের কথা। অধুনা অবহেলিত হলেও এবং এ সম্বন্ধে কারু আগ্রহ দেখা না দিলেও, এই পাঁচালী একদিন বঙ্গ সংস্কৃতির একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল। প্রকৃতপক্ষে পাঁচালী বলতে কি বোঝায়, তা হয়ত গবেষকদের গবেষণার অঙ্গীভূত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই পাঁচালী সম্বন্ধে প্রাচীন 'জন্মভূমি' (১৩০৩, মাঘ) পত্রিকার একটি সংখ্যায় যে মূল্যবান প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল, তা এখানে আংশিকভাবে প্রকাশ করছি। প্রবন্ধটির যথেষ্ট গুরুত্ব থাকলেও লেখক বহু ক্ষেত্রেই পাঠকগণের সঙ্গে রহস্য করেছেন এবং নিজের নাম ব্যবহার করেন নি।

পাঁচালী

'সুরুচির সেবকগণ রাগ করিবেন না, আমি পাঁচালীর কথা বলিব। সুশিক্ষিতা সোহাগিনীগণ শিহরিয়া উঠিবেন না, আমি দাশরথি রায়ের কিঞ্চিৎ ছড়া কাটিব। আপনারা তো শিক্ষিত, ধৈর্য অবলম্বন করুন। ধীরতাই শিক্ষার সোপান।

পাঁচালী কি, তাহা অনেকেই জানেন না। কারণ, পাঁচালী এখন এক রকম উঠিয়া গিয়াছে। লোকের সেরূপ আমোদ-উৎসব-স্ফূর্তি নাই, সেরূপ সুখ-স্বচ্ছন্দতা নাই, সেরূপ অর্থের সঙ্গতি নাই,—পল্লীগ্রামে বারোয়ারীর ধুমও সেরূপ নাই,—পাঁচালী বা কবির গান টিঁকিবে কেমন করিয়া? দুঃখ এই—খাঁটি বাঙ্গালীর খাঁটি বাঙ্গালা গান,—সঙ্গে সঙ্গে খাঁটি কবিত্ব, লোপ পাইতেছে।

কাহারও ধারণা, পাঁচালী ভদ্রলোকের শুনিবার নহে; শিক্ষিত লোকের পাতে দিবার নহে। নিরক্ষর লোক এবং ইতর লোকই পাঁচালী শুনিবার উপযুক্ত পাত্র! সভা-সমাজে উহার স্থান হইবার নহে। কাজেই, বঙ্গসমাজ যত সভ্য হইতেছে এবং বঙ্গ-মহিলাগণ যত সভ্য হইতেছে পাঁচালী প্রভৃতি ততই উঠিয়া যাইতেছে এবং ভবিষ্যতে এমনও আশা আছে, বঙ্গভূমি যখন পূর্ণ সভ্য হইবে তখন যাত্রা, কীর্তন পর্যন্ত উঠিয়া যাইবে। মধুর হরিনাম বুঝি আর থাকিবে না! তা পাঁচালী ত কোন্ সামান্য কথা!!

পাঁচালী প্রভৃতির যাঁহারা নিন্দা করেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই না পড়িয়া নিন্দা করেন। একবার আমি একজন শিক্ষিত ভদ্রলোককে বলিয়াছিলাম, 'এবার আপনাদের পৈতৃক দুর্গোৎসব উপলক্ষে পাঁচালী হল না কেন?' তিনি অমনি কর্ণদ্বয় হস্ত দ্বারা আবৃত করিলেন; বলিলেন, 'এ কি কথা! আপনি বলেন কি? পাঁচালীতে অশ্লীলতা আছে; খেউড় আছে; অশ্রাব্য কটূক্তি আছে! সেই পাঁচালী আমার বাটীতে মহিলাগণের সম্মুখে কেমন করিয়া দিব?'

আমি একটু নীরব থাকিয়া উত্তর দিলাম, 'আপনার উদরাভ্যন্তরে মল আছে; আপনি তবে ভদ্রসমাজে, ভদ্রলোকের নিকট বসিয়াছেন কিরূপে?'

শিক্ষিত ব্যক্তি এরূপ শুনিয়া বলিলেন, 'তুলনা ত ঠিক হইল না; কিসের সহিত কিসের তুলনা হইল, তাহা ত বুঝিতে পারিলাম না।'

আমি। আপনি পাঁচালী কখন পড়িয়াছিলেন?

শিক্ষিত ব্যক্তি। না।

আমি। তবে পাঁচালী যে আগাগোড়া অশ্লীল এরূপ ধারণা হইল কেন?

শিক্ষিত ব্যক্তি। ঐ লোকে বলে, পাঁচালী বড় খারাপ। তাহাই ছেলেবেলা অবধি শুনিয়া আসিতেছি।

আমি বলিলাম, 'তোমরা শিক্ষিত ব্যক্তি; না পড়িয়া পুস্তক-সমালোচনা করো; ডিক্রী-ডিস্মিস করো! ইহাই দুঃখ।'

প্রকৃত কথা এই, পাঁচালীর বিষয় না পড়িয়াই, পাঁচালীর গান না শুনিয়াই অনেকে পাঁচালীর উপর বীতশ্রদ্ধ। ইহা অপেক্ষা আর অধিক বিড়ম্বনা কি আছে?

পাঁচালী মধুর বোম্বাই আম। উপরি-ভাগ কালো; কিন্তু কাটিয়া দেখ, ভিতরে লাল টুকটুকে! আস্বাদনও সুধাবৎ; তবে সময়ে সময়ে খোলা পুরু হয় এই যা দোষ।

হে শিক্ষিত বাঙ্গালী! একবার ভাবুক হও! পাঁচালীর ভাব বুঝ! সব বুঝিতেছ, আর পাঁচালীর ভাবটি বুঝিতে পারিবে না কেন? সেক্সপিয়র বুঝ, মিল্টন বুঝ, বায়রন বুঝ, দান্তে বুঝ, হোমর বুঝ ভার্জিল বুঝ—আর পাঁচালীর বেলায় অবুঝ হইয়া থাকিবে কেন? তবে বলিতে পার, অধুনা এই অন্নকষ্টের কালে, এই অচল সংসারের কালে, ভাব আসে কই; জমেই বা কই?

ভাব আসুক আর নাই আসুক পাঁচালী কি, তাহা জানা ভাল। 'বিশ সঙ্গীত'* নামক গ্রন্থে পাঁচালী সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা এই,—

'পাঁচালী শব্দের প অক্ষরে যে চন্দ্রবিন্দুর যোগ দৃষ্ট হয়, উহা মূল শব্দে ছিল না। মূল শব্দটি পাচালী। কবিকঙ্কণ, কাশীদাস, কৃত্তিবাস ও ভারতচন্দ্রের রচিত পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দ সকলের নাম পাচালী। যথা,—

'পাঁচালী প্রবন্ধে কবিকঙ্কনেতে ভণে।'

উল্লিখিত চারিজন বিখ্যাত পাচালী রচয়িতাদের মধ্যে কবিকঙ্কণ সর্ব্বপ্রথমে পাচালী অর্থাৎ শ্রব্য পাচালীর অঙ্গ পুষ্ট করেন। ইনি চৈতন্যদেবের সমকালীন লোক। ইঁহার বহুকাল পূর্ব্বে বঙ্গের লক্ষ্মণ সেনের সমকালবর্তী জয়দেব কৃত 'গীতগোবিন্দ' পাচালীর ... পাত বলিতে হইবে। গীতগোবিন্দে কৃষ্ণলীলার ব্যাখ্যা ও তদ্বিষয়ক সঙ্গীত উভয় আছে। এই দূরবর্ত্তী কাল হইতে কবিকঙ্কণের সময় পর্যন্ত পাচালী, নাচাড়ি, বৈঠকী ও দাঁড়াকবি, এই কয়েকটি বিভিন্ন আকারে সঙ্গীতের সৃষ্টি হইয়া বিভিন্ন সঙ্গীত সম্প্রদায় গঠিত হয়। পা-চালন অর্থাৎ পদ-চালন,—ইহাতে সম্প্রদায়ের কর্তা পদচালনপূর্বক কখন যথাক্রমে আসরে চতুর্দিকস্থ হইয়া কখন বসিয়া কখন দাঁড়াইয়া বর্ণনীয় বিষয় ব্যাখ্যা বা করেন। এই পাচালী হইতে (১) না... অর্থাৎ নৃত্যের উদয় হইয়াছে। গায়ক ব্যাখ্যাকর্ত্তা ছন্দবিশেষ বর্ণনাকালে ন... দ্বারা প্রকৃত ভাবকে উজ্জ্বল ও তেজ... করেন। কবিকঙ্কণের বা তাঁহার অনুগ...

---

* কলিকাতা ১২৭, মসজিদ বাড়ী স... হইতে বসাক এণ্ড সন্স কর্তৃক সম্পাদি... মূল্য দেড় টাকা।

কাব্য-রচয়িতাদিগের পয়ার ও ত্রিপদী পাচালীর অঙ্গ। ধুয়াগুলি ইহার সঙ্গীতের অঙ্গ এবং মালঝাঁপ প্রভৃতি ছন্দ সকল নাচাড়ির অঙ্গ। যথা—'কুরঙ্গ বদলে তুরঙ্গ পেলাম' ইত্যাদি। (২) বৈঠকী গান,—ইহা সঙ্গীতশাস্ত্র বিশারদদিগের দ্বারা বিশেষ আদৃত হইয়া থাকে। সভা বা মজলিসের মধ্যে বসিয়া বসিয়া গীত হয় বলিয়া ইহার নাম বৈঠকী। ইহা পাচালীর অঙ্গবিশেষ মাত্র। (৩) দাঁড়াকবি — অর্থাৎ ইহাতে সম্প্রদায়ভুক্ত সমস্ত ব্যক্তি দাঁড়াইয়া সমস্বরে সঙ্গীত করিয়া থাকে। ইহাও পাঁচালীর এক অঙ্গ। যে সঙ্গীত-সম্প্রদায় বর্ত্তমান কালে পাঁচালী নামে বিখ্যাত আছে, ইহার প্রথম গানকর্ত্তা গঙ্গারাম নস্কর, পরে গুরুদম্ব নামক ব্যক্তি ইহার কিছু সংস্কার করেন, কিন্তু দাশরথি রায় হইতেই পাঁচালীর পুষ্টোপ্ত হয়। ইঁহার সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী পাঁচালী কর্ত্তাদিগের নাম— সন্ন্যাসী চক্রবর্ত্তী, নবীন চক্রবর্ত্তী, রসিক রায় ও ঠাকুরদাস দত্ত।

আজকাল পাঁচালী বড় একটা প্রচলিত নাই। কিন্তু ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা নগরীতে ও গ্রামে গ্রামে ইহা অতি প্রচলিত ছিল। সেই সময় দাশরথি প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ পাঁচালী রচয়িতা বঙ্গদেশকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। হাফ্ আখড়াই ও দাঁড়াকবির ন্যায় পাঁচালীতেও দুই দলে সঙ্গীত-সংগ্রাম চলিত, কিন্তু তাহাদের মত যে উত্তর-প্রত্যুত্তর দিতে হইত, এরূপ নহে। ইহাতে একপক্ষ আসর লইয়া পূর্ব্বাভ্যস্ত ছড়া কাটাইত ও গান গাহিত; পরে অপর পক্ষ সেই বিষয়েই (অর্থাৎ মাথুর প্রভৃতি বিষয়ে) ছড়া কাটাইত ও গান গাহিত;—হাফ-আখড়াইও দাঁড়াকবির মত পূর্ব্বপক্ষের উত্তর দান করিতে হইবে এরূপ নহে। কিন্তু যে দল উত্তম ছড়া কাটাইতে পারিত কিংবা ভাল গান করিতে পারিত, সেই দলই জয়লাভ করিয়া নিশানপ্রাপ্ত হইত।

পাঁচালীর প্রত্যেক দল আসরে নামিয়া ঢোল, বেহালা মন্দিরাদি যন্ত্রসহকারে বাদ্য-বিদ্যা প্রকাশ করিত—সেই বাজনার নাম সাজ বাজানো। তাহার পর সমবেত স্বরে 'শ্যামা-বিষয়ক' বা ঠাকরুণ-বিষয়ক' গান গাওয়া হইত। তৎপরে ঐ বিষয়ে এক উপযুক্ত ব্যক্তি অঙ্গভঙ্গী বা গদ্য-পদ্যের সাহায্যে যথোপযুক্ত সুরে ছড়া কাটাইত। প্রত্যেক দলের শ্যামা-বিষয়ক' গান বা ছড়া শেষ হইলে, 'সখীসংবাদ' ও 'বিরহ' সম্বন্ধে গান ছড়ার অবতারণা করা হইত। কখন কখন ... তাক বিষয়ের আবার ২।৩টি ছড়া ও ... ন হইত, যথা, 'সখী-সংবাদের' প্রথম ছড়ায় মাথুর, দ্বিতীয় ছড়ায় মান, তৃতীয় ছড়ায় দান, এইরূপ।'

'মনোমোহন গীতাবলী'* গ্রন্থে পাঁচালী সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

'এখন যেমন নাটক ও গীতাভিনয়ের ছড়াছড়ি, পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এই রঙ্গভরা বঙ্গদেশে তেমনি পাঁচালীর অত্যন্ত বাড়াবাড়ি ছিল। এমন কি, প্রায় প্রত্যেক ভদ্র-পল্লীতে — অতি ক্ষুদ্র গ্রামেও — আর কিছু থাকুক না থাকুক, বারোয়ারী ও পাঁচালীর দল পাওয়া যাইতই যাইত।

নব্য সম্প্রদায়ের গোচরার্থ 'পাঁচালী' বস্তুটা কি একটু বুঝাইয়া বলা আবশ্যক। যদিও হাফ্-আখড়াই ও দাঁড়াকবির ন্যায় পাঁচালীতেও দুই দলে সঙ্গীত-সংগ্রাম হইত, কিন্তু উহাদের ন্যায় ইহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিত না। অর্থাৎ কবিতে যেমন এক দল পূর্ব্বপক্ষরূপে আসরী গান গাইলে, অপর দল উত্তরপক্ষ-রূপে তৎক্ষণাৎ তাহার জবাব বাঁধিয়া গান করেন, পাঁচালীতে তৎপরিবর্ত্তে পূর্ব্বাভ্যস্ত ছড়া কাটাইতে ও গান গাহিতে পারিতেন, সেই দলের ভাগ্যেই জয়শ্রী দীপ্তিমতী হইয়া নিশান লাভ ঘটিত।

পাঁচালীর প্রণালী এইরূপ,—হাফ-আখড়াইয়ের ন্যায় তানপুরা, বেহালা, ঢোল, মন্দিরা, মোচং প্রভৃতি ইহার বাদ্যযন্ত্র—ইদানীং ঐক্যতান বাদ্যের ফ্লুটাদি উপকরণও তৎসঙ্গে থাকিত। হাফ-আখড়াইয়ের ন্যায় বাদ্যেরও লড়াই হইত—সে বাদ্যের নাম 'সাজ বাজানো'। সাজ বাজনার পর 'ঠাকরুণ-বিষয়' বা 'শ্যামা-বিষয়'। প্রথমেই শ্যামা-বিষয়ক একটি গান সকলে মিলিয়া গাহিবার পর, কাটানদার উক্ত বিষয়ের উত্তর কাটাইতেন—অর্থাৎ ঐ কার্য্যের উপযুক্ত কোন কাটান-উক্তি উপযুক্ত অঙ্গভঙ্গীর সহিত, কখন-বা সহজ কথায়, কখন-বা এক প্রকার সুরের সাহায্যে, কখন-বা পদ্যে, কখন-বা গদ্যের ছুট কথায় উচ্চ স্বরে ছড়া বিন্যাস করিতেন—কাটাইতে জানিলে তাহা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গের লোমাঞ্চ হইত। ফলতঃ সুকবির রচনা ও সু-কাটানদার কর্ত্তৃক যোজনা হইলে নানা রস উদ্দীপনার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ছড়া কাটানো হইলে সকলে মিলিয়া আবার গান। কোন কোন দলে এই গান এমন মিলনসম্বন্ধ ও তান-লয়-বিশুদ্ধ-ভাবে গাওয়া হইত যে, শ্রোতাগণ মোহিত হইয়া অজ্ঞাতসারে 'আহা আহা' না বলিয়া থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই গোঁড়া-দল যোগ্যাযোগ্য সকল অবস্থাতেই বহুবার চিৎকারে আসর ফাটাইয়া দিত; তাহাতে কখন-বা জ্বালাতন করিত, কখন-বা হাসাইত!

শ্যামা-বিষয় প্রায় এক ছড়াতেই সমাপ্ত হইত, কিন্তু অনেক দলে দুই-তিনটি ছড়া, সুতরাং তিন-চারটী গানও হইত। সে যাহা হউক, ঐ দল শ্যামা-বিষয় গাইয়া আপনাদের যন্ত্রাদি সহিত উঠিয়া যাইতেন, প্রতিদ্বন্দ্বী দল আসরে নামিতেন। তাঁহারাও ঐরূপে শ্যামা-বিষয় শেষ করিয়া উঠিয়া গেলে পুনর্ব্বার পূর্ব্ব দল আসিয়া সাজ বাজাইয়া সখী-সংবাদের মহড়া-গানটি গাইয়া ছড়া কাটাইতেন। প্রথম ছড়ার পর গান, আবার দ্বিতীয় ছড়া ও তৃতীয় গান; আবার তৃতীয় ছড়া ও চতুর্থ গান—এইরূপে কয়েকটী ছড়া ও কয়েকটী গানের পর তাঁহাদের প্রস্থান ও অপর দলের প্রবেশ এবং ঐরূপে ছড়া গান হইয়া সখী-সংবাদ মিটিয়া যাইত। পরে বিরহের বেলাও ঐ প্রণালী অবলম্বিত হইত।

একটি কথা বলিতে অবশিষ্ট :—যখন যে দল প্রসঙ্গের বিন্যাসহেতু আসরে নামিতেন, তখন তাঁহারা যে কয়টী ছড়া ও গান করিতেন, তাহার সমুদয়েতেই সেই একই বিষয়ের আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা থাকিত—বিভিন্ন ছড়ার যে বিভিন্ন বিষয়, তাহা নয়। অর্থাৎ এক দল সখী-সংবাদের সময় প্রথম ছড়ায় মাথুর, দ্বিতীয় ছড়ায় মান, তৃতীয় ছড়ায় দান গাহিবেন তাহা হইবার যো নাই—সব ছড়াতে সেই একই প্রসঙ্গ বিবৃত করিতেন।'*

* কলিকাতা, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, মনোমোহন লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য দশ আনা।

* কলিকাতা, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, মনোমোহন লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য দশ আনা।

* উদ্ধৃত অংশের বানান অপরিবর্ত্তিত রাখা হয়েছে।

—ক্রমশঃ

চিঠিপত্র

দেশেই ও'দের সংস্থান করা হোক

একুশে পৌষের সংখ্যায় অপরাজিতা সেনগুপ্তের চিঠিটি পড়লাম। তিনি বহু আলোচিত বিষয়কেই আবার নতুন করে তুলে ধরলেন। কিছুদিন আগে আমার বিদেশ যাবার সুযোগ ঘটেছিল। গিয়েও ছিলাম। সেখানে কয়েকজন বাঙালির সঙ্গে পরিচয় হয়। সকলেই চাকরি করছেন। ব্যবহারিক জীবনে রয়েছেন বহাল-তবিয়তেই। যাকে বলে হাতের মুঠোয় স্বর্গসুখ ধরে রাখা ঠিক তাই ঘটেছে। তবু তাঁরা ঠিক তৃপ্তি পাচ্ছেন না। যা শিখলেন, দেশের কাজে লাগাতে পারছেন না বলে দারুণ আক্ষেপ। আর কাঁহাতকই বা পরদেশী ভাষায় কথা বলা যায়? মনের যে ভারতীয় পরিবেশ তাঁদের পছন্দ, তাও মেলে না। ফলে দেশে আসতে চান, দেশে ফিরে কাজ করতে চান। কিন্তু কে তাঁদের চাকরি দেবে? সরকার এ ব্যাপারে সক্রিয় পরিকল্পনা নিয়ে যদি না এগোন তাহলে দুঃসময় ঘনিয়ে আসতে আর বাকি থাকবে না।

সুনীল রায়, নতুন দিল্লি

তারাপীঠ প্রসঙ্গে সঠিক তথ্য

গত ৭ই পৌষ, (১৩৭৯) শুক্রবারের সংখ্যায় প্রকাশিত প্রতুল দত্তের লেখা 'কিংবদন্তীর বীরভূম' পড়লাম। বীরভূমের শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান 'তারাপীঠ মন্দির প্রতিষ্ঠায় কিংবদন্তীর তথ্য প্রতুলবাবু ঠিকমত সংগ্রহ করতে পারেন নি। এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন নাটোরেশ্বরী রাণী ভবানী নয়। মল্লারপুরের বাসিন্দা 'জগন্নাথ রায়। মন্দিরের গায়ে এখনও তাঁর নামধাম এবং সন তারিখ লেখা আছে। 'তারা মার পূজায় (শারদীয়া শুক্লা চতুর্দশীতে) এখনও মল্লারপুর রায়বাড়ী হতে পূজোর সামগ্রী এবং বলিদানের পাঁঠা ইত্যাদি যায়। পূজো-বলিদান দিয়ে প্রসাদ বিতরণ হয়ে থাকে। তারাপীঠের বাসিন্দা 'যতীন্দ্র-নাথ পান্ডা মহাশয়ের তারাপীঠ মাহাত্ম্য বইতে জগন্নাথ রায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা লেখা আছে। তারাপীঠ সেবা সংস্থার সম্পাদক শ্রীশরৎচন্দ্র প্রামাণিক (জ্ঞানবাবু) মহাশয়ও এ বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞাত আছেন। কিছুদিন পূর্বে কলকাতার কোনও এক ভক্ত মায়ের মন্দিরে চুনকাম করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে জ্ঞানবাবু অনুমতি নেওয়ার জন্য আমাদের বাড়ী অর্থাৎ মল্লারপুর রায়বাড়ী গিয়েছিলেন। অনুমতি না দিয়ে রায়বাড়ী থেকেই চুন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। বীরভূমের কিংবদন্তী নিয়ে বীরভদ্র যে গৈরিক কন্যা বই লিখেছেন, তাতে দেখা যায় এক বণিক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই বণিকই হচ্ছেন জগন্নাথ রায়। আমি এই বংশের মেয়ে। আমরা শুনেছি এই জগন্নাথ রায় মস্ত চালের ব্যবসায়ী ছিলেন। বেনারস থেকে কাটোয়া পর্যন্ত তাঁর চালের ব্যবসা ছিল। গরুর পিঠে বস্তা বোঝাই করে তিনি চালের সওদা করে বেড়াতেন। তখনকার দিনে এতবড় চালের ব্যবসায়ী আর কেউ ছিল না। তাই তিনি 'চেলো জগন্নাথ' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি খুব ধনবান এবং মহাপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন অপুত্রক। তাই তাঁর দুঃখ ছিল—তাঁর অর্জিত ধন কে ভোগ করবে? কেই বা তাঁর বংশ রক্ষা করবে? একদিন গরুর পিঠে বস্তা বোঝাই করে চন্ডীপুর গ্রামে (তারাপীঠ) নদীতীরে জঙ্গলে রাত্রিতে বিশ্রাম করছিলেন। স্বপ্নে মায়ের আদেশ পেলেন বশিষ্ঠারাধিতা তারা দেবী আমি এইখানে অবস্থান করছি, এইখানে আমার মন্দির প্রতিষ্ঠা কর এবং মল্লারপুর বিশ্বাস বংশে বিবাহ কর। তোমার বংশ রক্ষা হবে। পরদিন জগন্নাথ রায় তারাদেবীর অনুসন্ধান করে মায়ের শিলামূর্তি দেখতে পেলেন, এবং সন্নিকটে এক সন্ন্যাসীকে দেখতে পেলেন। তাঁর কাছে গত রাত্রির স্বপ্নের কথা এবং মন্দির তৈরীর ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সন্ন্যাসী রুষ্ট হয়ে বললেন, এই মন্দির আমিই ভিক্ষা করে তৈরি করব স্থির করেছি। জগন্নাথ রায় ক্ষুণ্ণ হলেন। নিজের কর্তব্য স্থির করতে না পেরে দুঃখিত মনে চলে গেলেন। নদীতীরে গিয়ে দেখতে পেলেন সেই সন্ন্যাসী হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন। জগন্নাথ রায়কে তিনি আশীর্বাদ করে মন্দির তৈরির অনুমতি দিলেন। জগন্নাথ রায় মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন এবং মল্লারপুর বিশ্বাস বংশে বিবাহ করার পর বংশ রক্ষা হলো। তারপর তিনি মল্লারপুরেই বসতি করলেন। আজও বিশ্বাস বাড়ী এবং রায় বাড়ী পাশাপাশি আছে। তারাপীঠে বশিষ্ঠদেবের যজ্ঞকুন্ড যা জীবৎকুন্ড নামে প্রসিদ্ধ তার আকার ছিলো ছোট। জগন্নাথ রায় তার আয়তন বৃদ্ধি করে পুষ্করিণীর আকার দিয়েছিলেন। মন্দির সংলগ্ন ভোগ ঘরগুলিও তাঁরই নির্মিত। তিনি খুব খ্যাতিমান পুরুষ ছিলেন। বহু দেব-দেবী উনি স্থাপনা করে গেছেন। এবং সেবার ব্যবস্থাও করে গেছেন। মল্লারপুরে মল্লেশ্বর শিবের দেওয়ান ছিলেন তিনি। এই শিবের পায়সান্ন ভোগের ব্যবস্থাও তিনিই করে গেছেন। দুধ, মিষ্টি, জ্বালানির জন্য জমির ব্যবস্থা আছে। আধসের করে আতপ চাল এখনও প্রত্যহ রায়বাড়ী হতে যায়। মল্লেশ্বর শিবের সম্মুখে পঞ্চ মন্দির তিনি স্থাপনা করে গেছেন। নিজের বাড়ীতে গণেশজননী দেবী মূর্তি স্থাপন করে নিজের কুলগুরুকে সেবাইত নিযুক্ত করেছিলেন। তার জন্য গুরুদেবকে ১৮ বিঘা নিষ্কর জমি, পুকুর এবং বাস্তুভিটা দান করে-ছিলেন তা আজও তাঁর বংশধরেরা ভোগ করছেন। দুর্গোৎসব, সরস্বতী পূজা ইত্যাদি আরও বহু কীর্তি তিনি রেখে গেছেন যা এখনও তাঁর বংশধরদের চালাতে হয়। মল্লারপুরে বহু ভূসম্পত্তি তিনি করেছিলেন যার পরিমাণ ছিল ১৬ শত বিঘা। মল্লারপুরে মল্লরাজার বাড়ীর দুই পাশে যে দুটি সুবৃহৎ দীঘি ছিল তার ভোগী ছিলেন তিনি। এখনও সেই দুই দীঘি রায়দেরই আছে।

আশারাণী রায়,
মালকেরা, ধানবাদ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কত লোক মারা যান?

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে একরকম গোটা শান্তিকামী মানুষই দাঁড়িয়ে ছিলেন জার্মান ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে। প্রথম মহাযুদ্ধে যেমন ১ কোটি লোক মারা যান, তেমনি অনেকের মতে সাড়ে ৫ কোটি মানুষ নিহত হন দ্বিতীয় মহাসমরে। একথা জানা আছে যে, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যেখানে ৩৩টি দেশ সোজাসুজি যুদ্ধের কথা ঘোষণা করে, সেখানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ৭২টি দেশ খোলাখুলিই স্বীকার করেছিল যুদ্ধের অস্তিত্ব।

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সত্যি সত্যিই কত লোক মারা যান, আহত ও পঙ্গু হন, তার সঠিক সংখ্যা আজ পর্যন্ত জানা গেল না। 'হিস্টরিক মেমোরিয়াল অব দ্য পটসডাম এগ্রিমেন্ট : সোসালিনহোফ' পুস্তিকায় স্পষ্টভাবেই এক জায়গায় উল্লেখ করেছে ফ্যাসিস্ট মিলিটারিস্ট আক্রমণে প্রায় ৫৫ মিলিয়ন মানুষ মারা যান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে। এই গ্রন্থেই দেশ-ভিত্তিক যে হিসেব দেওয়া হয়েছে তা হল : সোভিয়েত ইউনিয়ন ২০,০০০,০০০; পোলান্ড ৬,০০০,০০০; জার্মানি ৮,০০০,০০০; যুগোশ্লাভিয়া ১,৭০০,০০০; রুমানিয়া ৭৭০,০০০; গ্রেট ব্রিটেন ও কমনওয়েলথ ৬৬৫,০০০; ফ্রান্স ৬২০০০০ ইতালি ৬৭০,০০০; গ্রীস ৫৭০,০০০ চেকোশ্লোভাকিয়া ৮৫০,০০০; অস্ট্রিয়া ৩৪৭,০০০; হাঙ্গারি ৭৯০,০০০; আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ৩৬৭,০০০; হল্যান্ড ২৫৫,০০০; বেলজিয়াম ১৬০,০০০; ফিনল্যান্ড ৯৭,০০০; বালগেরিয়া ৩২,০০০; আলবানিয়া ২৬,০০০; নরওয়ে ৯,০০০; ডেনমার্ক ৩,০০০ জন। অর্থাৎ ৪১,৯৩১,০০০ জন মারা যান। অবশ্য ৮ কোটির মতো লোক আহত বা পঙ্গু হয়। আবার অধ্যাপক ডঃ স্তেফান ডোয়েন-বের্গের ভূমিকাসম্বলিত গ্রন্থ 'দ্য পটসডাম এগ্রিমেন্ট'-এ ৫ পৃষ্ঠায় লেখা আছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রায় ৫ কোটি লোক মারা যান। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন মুনী আলাদা আলাদা পরিসংখ্যান দিচ্ছেন। এবং এদের মধ্যে তারতম্য ঘটেছে প্রায় পঞ্চাশ লাখের মতো। কোন্ পরিসংখ্যানটি সঠিক ও তথ্যনির্ভর তা যদি কোন ঐতিহাসিক জানান বাধিত হবো।

পারমিতা সেন মজুমদার
ধানবাদ, বিহার।

সেদিন সমস্ত রাত ট্রেনে বসে আবোল-তাবোল কত কী চিন্তা করে গেলাম। অথচ সেইসব চিন্তা আমার মনে হওয়াটা মোটেই স্বাভাবিক ছিল না। যদি এমন কোন ব্রেক জাতীয় জিনিস মাথায় ফিট করা থাকতো, যা চাপলেই চিন্তা থেমে যেত—'

অনিমেষ গম্ভীর মুখে বলল, 'মানুষ চিন্তা করতে ভালবাসে বলেই চিন্তা করে। সে যদি চিন্তা করতে না চাইতো, পথ খুঁজে পেত ঠিকই।'

'কি ভাবে?'

'ধরো সেদিন যে সমস্ত রাত তুমি ট্রেনে চিন্তা করতে করতে এলে, ইচ্ছে করলে ঘুমের অষুধ খেয়ে শুয়ে পড়তে পারতে। অবিশ্যি ঘুমের অষুধেও যে মানুষ সব সময় ঘুমোয় না, তার প্রমাণ বিভা। কিন্তু সেই চিন্তা না করার ইচ্ছাটা তোমার মধ্যে ছিল না। ট্রেনের সময়টা তুমি চিন্তা করে কাটাতে চেয়েছিলে, ওপরের মন নীচের মনের সেই খবরটা রাখে নি পর্যন্ত।'

কয়েক দিন অনিমেষদের বাড়ি যাওয়া হয় নি। বিভার কথা উঠতেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'বিভা কেমন আছে?'

অনিমেষ বলল, 'বিভা মাঝামাঝিভাবে বাঁচতে পারে না। যখন ভাল থাকে খুব বেশী ভাল থাকে। সব সময় হাসে, আনন্দ করে, যখন খারাপ থাকে, তখন ও খুব কষ্ট পায়, কাঁদে, চিৎকার করে।'

বললাম, 'ওকে একবার কোলকাতায় নিয়ে গেলে হয় না?'

'কিছুদিন আগে সুপ্রিয়া এসে নিয়ে গিয়েছিল, চিকিৎসা করিয়েছিল, কিন্তু বিশেষ উপকার হয় নি।'

অনেক দিন পর সুপ্রিয়ার নাম শুনলাম। যেন কত যুগ-যুগান্তর পর।

'সুপ্রিয়া তোমাদের কী রকম আত্মীয়?'
'শুনেছি মার দূর সম্পর্কের বোন।'
'তা হলে তো তোমার মাসী সম্পর্ক।'
'হ্যাঁ।' বলে অনিমেষ চুপ করে রইল।

সুপ্রিয়া সম্বন্ধে কথা উঠলে অনিমেষ চুপ করে যায়। অথচ অনিমেষের মুখে সুপ্রিয়ার কথা শুনতে আমার ভাল লাগে। বললাম, 'সুপ্রিয়া কী অফিসের কাজে এসেছিল?'

'হ্যাঁ'

'কিন্তু আমি জানতে পারি নি।' কথাটা অনেকটা নিজেকে শুনিয়ে বলার মত করেই বলেছিলাম।

অনিমেষ শুনতে পেল। বলল, 'ও কি সব কাজ তোমাকে জানিয়ে করে?'

'ঠিক তা না। তবে এক অফিসে কাজ করি, কেউ কোথাও এলে-গেলে জানা যায়।'

'কাপুরও এসেছিল।'
'তাই নাকি?'

অনিমেষ হেসে ফেলল, 'বড় অফিসে কেউ কোথাও এলে-গেলে বোঝার উপায় থাকে না। ছোট অফিসের কথা আলাদা। তুমি যে জামসেদপুরে ঘুরে এসেছো, হয়ত সমস্ত পাটনা শহরের লোকই সেই কথা জানে।'

আমার মনে তখন সুপ্রিয়ার কথা ঘুরছিল। সুপ্রিয়া যে পাটনায় এসেছিল কথাটা স্রেফ আমাকে চেপে গিয়েছিল। কিন্তু চাপা কেন? সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল উচ্চ পদস্থ কর্মচারী নিম্নস্থ কর্মচারীকে কাজের কৈফিয়ৎ দেয় না। পদমর্যাদায় বা ক্ষমতায় সুপ্রিয়া আমার চেয়ে অনেক বড়। সেই সুবাদে ওর গতিবিধি আমার জানার কথা না। কিন্তু অফিসের সম্পর্ক ছাড়াও সুপ্রিয়ার সঙ্গে আমার আর একটা সম্পর্ক একদা গড়ে উঠেছিল। ইদানীং সে সম্পর্কটা হয়ত ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, কিন্তু একদিন সম্পর্কটা খুব মধুর ছিল। হঠাৎ বলে ফেললাম, 'সুপ্রিয়া খুব তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে।' কথাটা বলে ফেলেই লজ্জা পেলাম। আমি যে এতক্ষণ ধরে সুপ্রিয়ার কথা নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করছি, এটা যেন চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যাবার মতন।

অনিমেষ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, 'বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তো মানুষমাত্রেই বদলায়।'

'কিন্তু কয়েকমাসের মধ্যে সুপ্রিয়া এমন কিছু বড় হয়ে যায় নি।'

অনিমেষ হাসল। হেসে বলল, 'মানুষ একদিনেই অনেক বড় হয়ে যেতে পারে।' একটুক্ষণ থেমে থেকে আবার বলল, 'আমার বাবার মাথায় একটা চুলও আগে পাকা ছিল না। যে রাতে বিভা পাগল হল, তার পর-দিন সকালেই বাবার মাথায় অনেকগুলো পাকা চুল নজরে পড়েছিল।'

অনিমেষের যুক্তির অকাট্যতা খণ্ডন করা গেল না। কিন্তু মুখে সেকথা স্বীকার না করে বললাম, 'তোমার বাবার চুল পেকেছিল দুশ্চিন্তায়, কিন্তু সুপ্রিয়ার সে ধরনের কোন চিন্তা আছে বলে মনে হয় না।'

'বাইরে থেকে মানুষের অনেক কিছুই বোঝা যায় না। একটা বড় সংসারের সমস্ত দায়িত্ব যে ওর ঘাড়ে, সেকথা কি বাইরে থেকে বোঝা যায়?

অনিমেষ বুঝতে পারে নি, যে সুপ্রিয়ার সংসারের কিছু কিছু কথা আমার জানা আছে। বলে ফেললাম, শুভেন্দু তো এখন চাকরি করছে, সুপ্রিয়ার ভার অনেকটা লাঘব হওয়া উচিত। মনে হল চকিতের জন্য অনিমেষের ভ্রূ দুটো ঈষৎ কুঞ্চিত হল। নাকি দেখার ভুল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাব কাটিয়ে ফেলে বলল অনিমেষ, 'হ্যাঁ, ওর ভার অনেকটা লাঘব হয়েছে। বোন দুটোর বিয়ে হলেই আর চিন্তা নেই।'

হেসে বললাম, 'চিন্তা শেষ পর্যন্ত মানুষের থেকেই যায়। নিজের বিয়ের ব্যাপার নিয়েও তো চিন্তা করতে হবে ওকে। আফটার অল সী ইজ এ উওম্যান। মেয়েদের বিয়েটা অপশন না, নিতান্তই প্রয়োজন।' ভেবেছিলাম, আমার কথার ধরনে অনিমেষ হেসে উঠবে। অনিমেষ হাসল না, গম্ভীর মুখে শুধু বলল, 'তা বটে'। বুঝলাম অনিমেষ সুপ্রিয়া-প্রসঙ্গের ওপর যবনিকা টানতে চাইছে।

আমার ঘরে বসে কথা হচ্ছিল। ঘরে ঢুকল জয়ন্ত দেশাই। জয়ন্তকে খুব প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। ঢুকেই জয়ন্ত আনন্দে ফেটে পড়ল। অনিমেষের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার লেডী-লাভ এসে গেছে।'

অনিমেষ উত্তর দিল, 'কিন্তু উচ্ছ্বাসটা তোমারই বেশী।'

জয়ন্ত কী বলতে গিয়ে হঠাৎ থমকে গেল। অনিমেষের দিকে আরও দু-পা এগিয়ে এসে বলল, 'কিন্তু খবরটা তুমি জানলে কী করে?'

অনিমেষ মুচকি হেসে জবাব দিল, 'স্টেশন থেকে আমাকে ফোন করেছিল।'

'আর তুমি এখানে বসে আছ?' উত্তেজনার মাথায় জয়ন্ত একটা পা অনিমেষের চেয়ারে তুলে দিল।

আমি একবার অনিমেষ, একবার জয়ন্তর মুখের দিকে তাকাচ্ছিলাম। অনিমেষ আমার অবস্থা বুঝতে পেরে বলল, 'লীলাবতী দেশপাণ্ডে আজ পাটনায় এলেন।'

'সেই লীলাবতী, যাঁর কোমল বাহুতে শরীর ছেড়ে দিয়ে কাপুর সাহেব গাড়িতে এসে উঠেছিলেন?'

আমার প্রশ্নের উত্তরে অনিমেষ কথা বলল না। শুধু মুখ লম্বা করে ওপরে নীচে মাথা দোলাতে লাগল।

জয়ন্ত বলল, 'দ্যাখো ডাট, তোমার আত্মসংযম ভাল। এক-এক সময় তোমার সংযমকে আমার আত্মপীড়া বলে মনে হয়।'

জয়ন্তর মুখে এ-ধরনের কথা মানায় না। শরতের মেঘের মত হাল্কা আর দ্রুত ওর গতি। কোন ভারী কথা ওর মুখে শুনলে কেমন যেন বে-সুরো লাগে। মনে হয় জয়ন্তর বেশ ধরে অন্য কেউ এসে আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছে। জয়ন্তর পা টনার লোভ সামলাতে না পেরে বললাম, 'অনিমেষ তখন ব্যস্ত ছিল, কিন্তু আপনি গাড়ি নিয়ে স্টেশনে যেতে পারতেন।'

জয়ন্ত মুখ ঝুলিয়ে বলল, 'লী গাড়ির জন্যে অনিমেষকে ফোন করেনি। ওর বাবার গাড়ি খুব ভোর থেকেই স্টেশনে পড়ে আছে।'

'দেশপাণ্ডে বাঁঝি মেয়েকে খুব ভাল বাসেন?'

আমার প্রশ্নের উত্তরে অনিমেষ বলল, 'প্রত্যেক বাবাই তার মেয়েকে ভালবাসে, কিন্তু লীলাবতী দেশপাণ্ডের মেয়ের চেয়েও অনেক বেশী। বললে গেলে দেশপাণ্ডের জগৎই হচ্ছে লীলা।'

'আর সেই লীলাবতীকে অগ্রাহ্য করার স্পর্ধা রাখে এই মানুষটি' বলে একটা আঙুল দিয়ে অনিমেষকে চিহ্নিত করল জয়ন্ত।

'লীলাবতী দেখতে কেমন?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'সী ইজ এ রিয়্যাল বিউটি।' বলে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আর তর্জনী একত্রিত করল জয়ন্ত।

জয়ন্তের কথা শেষ হতে না হতেই আমার ঘরের দরজা ফাঁক হয়ে গেল। সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা মুখের কিঞ্চিৎ অংশ সেখানে স্থির হয়ে রয়েছে। আমি দরজার দিকে মুখ করে বসেছিলাম। অনিমেষ বসেছিল আমার দিকে মুখ করে। জয়ন্ত অনিমেষের পাশে দাঁড়িয়েছিল। ওরা কেউই দরজার ফাঁকে আটকে-পড়া মুখ দেখতে পায়নি। আমি বললাম 'কাম ইন প্লীজ।'

অনিমেষ আর জয়ন্ত একই সঙ্গে পিছন ফিরে তাকাল। তাকিয়েই অনিমেষ উঠে দাঁড়াল। জয়ন্ত কী করবে ভেবে না পেয়ে ফিস ফিস করে বলে উঠল, 'সী ইজ লীলাবতী।'

উঠে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বললাম, 'এইমাত্র অনিমেষ বলছিল আজ আপনি এসেছেন।'

লীলাবতী ততক্ষণে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখ ভার করে বলল, 'তবু ভাল, অনিমেষবাবু আমার কথা বলেন।' লীলাবতী পরিষ্কার বাংলায় কথা বলল। কথা বলতে বলতে লীলাবতী বারকয়েক অনিমেষের দিকে তাকিয়েছিল। সেই ফাঁকে ওকে দেখেছিলাম। মানুষের এত রূপ আগে কোথাও দেখেছি কিনা স্মরণ করতে পারলাম না। ও একটা গোলাপী শাড়ি পরেছিল। মনে হচ্ছিল শাড়ির রংয়ের সঙ্গে ওর গায়ের রং মিশে গিয়েছে। লীলাবতী লম্বা। স্বাস্থ্যবতী। লীলাবতী জয়ন্তের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছিল। হাসির সঙ্গে সঙ্গে ওর সুন্দর দাঁতের সারি নজরে পড়ল। মনে হচ্ছিল, কোন সুদক্ষ কারিগর যত্ন নিয়ে ওর দাঁত সাজিয়ে দিয়েছে। ঠোঁটে খুব হাল্কা করে লিপস্টিক লাগিয়েছে কিনা বোঝা গেল না। না লাগানোই স্বাভাবিক। এই সব মানুষের ঠোঁট এই ধরনের গোলাপী আভা ছড়ায় বলেই আমার ধারণা। ওর টিকলো নাক, আয়ত চোখ, ধনুকে ভ্রূ, এমনকি চোখের পাতার লম্বা লোমগুলো ওকে শিল্পীর আঁকা নিখুঁত একটি ছবি করে তুলেছিল। লীলাবতীকে দেখতে দেখতে এমন তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম যে, ও যখন আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'গ্ল্যাড টু মিট ইউ', তখন আমি বিষম চমকে উঠলাম।

জয়ন্ত শব্দ করে হেসে উঠল, 'আপনার সম্বন্ধে এমন বিশদ বর্ণনা দিয়েছিলাম যে, মিস্টার চ্যাটার্জি হয়ত সেইসব মিলিয়ে নিচ্ছিলেন।'

জয়ন্তের কথায় লীলাবতীও হেসে উঠল। ভগবান যাকে দেন, সব দেন। লীলাবতীর হাসিটা পর্যন্ত কী দারুণ মিষ্টি। হাসিতে মুক্তো ছড়ানোর কথাটা হয়ত ছেলেভুলনো গল্প, কিন্তু লীলার হাসিতে যেন কানে জলতরঙ্গ বাজল। লীলা একটা চেয়ারে বসতে বসতে বলল, 'আপনারা বসুন। আমি এলাম, আপনাদের সঙ্গে জমিয়ে গল্প করতে, আর আপনারা কী রকম সংকুচিত হয়ে পড়লেন। মনে হচ্ছে আমি অবাঞ্ছিত কেউ। আমি হয়ত আপনাদের কাজে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছি---' বলে লীলাবতী উঠতে যাচ্ছিল।

ওকে বারণ করলাম, 'আরে আপনি উঠছেন কেন, বসুন বসুন। অনিমেষ বসো, জয়ন্ত বসুন,' আমি নিজেও চেয়ারে বসে পড়লাম।

জয়ন্ত বসল না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বলল, 'আমার একটু জরুরী কাজ আছে।'

অনিমেষ ওকে ধমক দিল, 'তোমার কোন কাজ নেই। কিছুক্ষণ আগেই তো কাজ না থাকার কথা নিয়ে অনুযোগ করছিলে।'

জয়ন্ত যেন আকাশ থেকে পড়ল, 'আমি কমপ্লেন করছিলাম?'

অনিমেষ হাসিয়ে রসিয়ে ঘাড় দোলাতে লাগল। জয়ন্ত আরও জোরে প্রতিবাদ করল, 'আমি যে কাজ করতে ভালবাসি না, একথা এখানকার চাপরাশী থেকে শুরু করে বড় সাহেব পর্যন্ত সবাই জানে। আবার দেখা হবে মিস দেশপাণ্ডে' বলে জয়ন্ত তাড়াহুড়ো করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। জয়ন্তের এই ব্যবহারে আমি বিস্মিত হলাম। কিন্তু লীলাবতীর সামনে অনিমেষকে এ-বিষয়ে প্রশ্ন করা যায় না।

আমাদের চুপ করে থাকতে দেখে লীলাবতী বলল, 'জয়ন্ত অনেক পাল্টে গেছে বলে মনে হল। ওর যশোদার খবর কি?' লীলাবতী আমার দিকে তাকিয়ে যদিও কথাক'টা বলল, প্রশ্নটা যে অনিমেষকে করা হয়েছে তা বুঝতে বাকি রইল না। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর হচ্ছে অনিমেষের ব্যবহার। অনিমেষ প্রচণ্ড মনোযোগ দিয়ে একটা দেশলাইয়ের বাক্স লোফালুফি করছিল। বাধ্য হয়ে আমাকেই লীলার প্রশ্নের জবাব দিতে হল, 'যতদূর জানি, যশোদা ভাল আছে।'

অনিমেষ ধীরে ধীরে বলল, 'না, ভাল নেই। যশোদার শিগ্গিরই বিয়ে।'

'কার সঙ্গে?'

আমার প্রশ্নের উত্তরে অনিমেষ বলল, 'নিশ্চয়ই জয়ন্তের সঙ্গে না। কোন এক বিরাট বিজনেসম্যানের ছেলের সঙ্গে।'

'কিন্তু তুমি কিম্বা জয়ন্ত কেউ এ-কথা তো আমাকে বলোনি অনিমেষ।' অনুযোগের সুরটা নিজের কানেই বাজল।

অনিমেষ উত্তর দিল না। শুধু ওর দেশলাই নিয়ে খেলাটা বন্ধ হয়ে গেল।

আমি আবার বললাম, 'যতদূর শুনেছি যশোদার সঙ্গে জয়ন্তের বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে গিয়েছিল।'

অনিমেষ আমার দিকে তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিল, বলল, 'পাকা কথা কাঁচা হতে বেশী সময় লাগে না। তাছাড়াএ-বিয়েতে যশোদার মত নেই।'

'কী আশ্চর্য!' সত্যি সত্যি আমার বিষম অবাক লাগছিল। এই কয়েকদিনের মধ্যেই যশোদার কথা জয়ন্তের মুখে এত শুনেছি যে, ওদের আলাদা করে ভাবতে আমার কষ্ট হচ্ছিল। অনিমেষকে অবার প্রশ্ন করলাম, 'জয়ন্ত খবরটা জানতে পেরেছে কবে?'

'আজ সকালেই যশোদার চিঠি এসেছে। সে-ই লিখে জানিয়েছে।'

এতক্ষণে লীলাবতী কথা বলল, 'তাই জয়ন্ত পালিয়ে গেল। অথচ এই বিষয়ে ওকে সান্ত্বনা দিতে যাবারও কোন অর্থ হয় না। ব্যাপারটা ওর নিতান্তই ব্যক্তিগত। ওর মত ফূর্তিবাজ লোকের দুঃখ দেখলে সত্যি সত্যি ভারী কষ্ট হয়।' লীলাবতীর মুখে বাথা ফুটে উঠল। ওর আয়ত চোখে দুঃখের ছায়া ঘন হয়ে এল।

অনিমেষ সিগারেট টানছিল। ছোট সিগারেটের শেষ অংশে নতুন সিগারেট চেপে ধরে আগুন লাগিয়ে নিচ্ছিল। বললাম, 'অনিমেষ বড্ড বেশী সিগারেট খাচ্ছো আজকাল।'

'অথচ ডাক্তার অনিমেষবাবুকে এত বেশী সিগারেট খেতে বারণ করেছিল।' লীলাবতী কথা বলতে বলতে ঘন ঘন অনিমেষের দিকে তাকাতে লাগল।

অনিমেষ নির্বিকারভাবে সিগারেট টানতেই লাগল। যেন এইসব কথাবার্তা কিছুই ওকে স্পর্শ করছে না। অনিমেষ এক এক সময় কী ভয়ানক বিশ্রী পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে! ও যে কোন কথা না বলে নির্বিকার চিত্তে ধোঁয়া ছেড়ে যাচ্ছে, এ যেন লীলাবতীকে অগ্রাহ্য করার একটা চেষ্টাকৃত প্রয়াস। অথচ এ-ধরনের ব্যবহার করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। অনিমেষের এই ব্যবহারের জন্য আমি ভেতরে ভেতরে লীলাবতী দেশপাণ্ডের কাছে যেন নিজেকে অপরাধী বলে ভাবতে শুরু করলাম। লীলাবতীকে লক্ষ্য করে বললাম, 'অনেকটা

পথ ট্রেনে করে এলেন, নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত, দুপুরে ঘুমোলেই পারতেন।'

লীলাবতী বিমর্ষভাবে হেসে বলল, 'দুপুরে ঘুম হয় না। তাছাড়া মনের মধ্যে একটা লোভও ছিল, ভেবেছিলাম, আমাকে দেখে আপনারা সবাই খুশী হবেন।

কী আশ্চর্য! এখনও অনিমেষ কথা বলল না। বাধ্য হয়ে আমাকেই বলতে হল, 'বিশ্বাস করুন, আমরা সবাই খুব খুশী হয়েছি।'

লীলাবতী খুব জোরে হেসে উঠল, 'মিস্টার চ্যাটার্জি দেখছি খুব ভদ্র আর অমায়িক লোক। মানুষকে কষ্ট দিতে কষ্ট পান।'

লীলাবতীর এই হাসিতে সত্যি সত্যি ভয়ানক বিরক্ত বোধ করলাম। জোর গলায় বলে উঠলাম, 'জয়ন্তর মুখে আপনার কথা শুনে আপনাকে দেখার শুধু ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু ইচ্ছেটা যে এত তাড়াতাড়ি ফলে যাবে বুঝতে পারি নি।'

'খেয়াল?' লীলাবতী যেন আনন্দে নেচে উঠল।'

'সত্যি বিশ্বাস করুন।'

লীলা চেয়ারের উপরে নিজেকে ছেড়ে দিতে দিতে বলল, 'বিশ্বাস করলাম। শুধু যে বিশ্বাস করলাম তা-ই না, ভীষণ খুশীও হলাম।

নিজেকেই নিজের আদর করতে ইচ্ছা করল। সামান্য দুটো মিষ্টি কথা দিয়ে একজন মানুষকে খুশী করতে পারলে কার না আনন্দ হয়। তাছাড়া লীলাবতীর মত সুন্দরী মেয়েকে বিরস বদনে বসে থাকতে দেখলে কার কি লাগে জানি না, আমার খুব খারাপ লাগে। মনে হয় সমস্ত ছন্দপতনের জন্য আমিই যেন দায়ী।

অনিমেষ সিগারেট শেষ করে উঠে দাঁড়াল। বললাম, 'কোথায় চললে?'

অনিমেষ বলল, 'একটা ব্রেক-ডাউন কল আছে, দেখে আসি।'

'আর একটু পরেই তো ছুটি হয়ে যাচ্ছে। কাল ভোরেই না হয় যেও।'

'নাঃ, কাজটা সেরেই আসি।' বলে অনিমেষ দরজার দিকে পা বাড়াতে যাচ্ছিল, হঠাৎ লীলাবতী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার জন্যে আপনাকে যেতে হবে না অনিমেষবাবু। আমিই চলে যাচ্ছি।'

আমি উঠে এসে লীলাবতীর সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আর একটু পরে সবাই একসঙ্গে উঠবো। আপনাকে বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে আমি আর অনিমেষ চলে যাব। তুমিও একটু বসে যাও অনিমেষ। তোমরা দুজনে গল্প কর, আমি একটা চিঠি ড্রাফট করছি।' বলে কাগজ-কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসে গেলাম। অথচ লিখবার মত কোন চিঠি আমার ছিল না। চিঠি লেখার অবকাশে আমি ওদের ভাল করে বুঝতে চেয়েছিলাম। ওদের রহস্যজনক ব্যবহার আমাকে অসম্ভব বিস্মিত করেছিল। কিন্তু অনিমেষ আর লীলাবতী একটাও কথা বলল না। মুখ না তুলেও বুঝতে পারছিলাম, অনিমেষ স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। যদিও টেবিলের উল্টো দিক থেকে আমার চিঠি পড়া অনিমেষের পক্ষে মোটেই সম্ভবপর নয়, তবু আমাকে যথাসাধ্য সতর্ক হয়ে চিঠির খসড়া করতে হচ্ছিল ।

হঠাৎ লীলাবতী কথা বলে উঠল, 'কাজের সময় এসে পড়ে আপনাদের ক্ষতি করলাম বলে মনে কিছু করলেন না তো মিষ্টার চ্যাটার্জি।'

হাসি মুখে ঘাড় নেড়ে বললাম, 'আপনি এসে নিশ্চয়ই আমাদের কাজ করতে দেখেন নি।'

লীলাবতীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'আপনারা ভীষণ ফাঁকিবাজ।'

'যা বলেছেন।' বলে মুখ তুলে তাকাতেই অনিমেষের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। অনিমেষের চোখে মুখে কোথাও কৌতুক ছিল না। হঠাৎ বলে ফেললাম, 'ডাক্তার তোমাকে সিগারেট খেতে বারণ করেছেন, তবু এত সিগারেট খাও কেন?'

অনিমেষের চোখে নীরব হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'আমি এখন সিগারেট খাচ্ছি না।'

অপ্রস্তুত না হওয়ার ভান করে বললাম, 'কিছুক্ষণ আগেই অসম্ভব সিগারেট খাচ্ছিলে।'

'তোমার কাজ শেষ হয়ে গেছে, এবার ওঠ।' বলে অনিমেষ উঠে দাঁড়াল। চোখের সামনে কাগজের দিকে চোখ গেল। সেখানে কয়েকটা কাটাকুটি ছাড়া একটাও অক্ষত লাইন নেই। অপ্রস্তুত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

একসঙ্গে এসে অফিসের গাড়িতে উঠলাম। লীলাবতী মাঝখানে বসল। আমি আর অনিমেষ দু পাশে।

গাড়ি চলেছে। তিনজন পাশাপাশি বসে রয়েছি। কারও মুখে কথা নেই। হঠাৎ লীলাবতী বলে উঠল, রোববার কোন এন-গেজমেন্ট আছে?'

বললাম, 'আমার তো একটাই এনগেজ-মেন্ট। প্রতি রবিবার অনিমেষের বাড়িতে খাওয়া। ওর বোন বিভা খুব ভাল রাঁধে।'

'আমি ওর রান্না খেয়েছি। নেমন্তন্ন করে কেউ খাওয়ায় নি অবশ্য। জোর করে একদিন খেয়ে এসেছি।' লীলাবতীর দিকে না তাকিয়েও বুঝলাম, ও চোখের ফাঁক দিয়ে অনিমেষকে দেখে নিল। অনিমেষ উত্তর দিল না। যেমন বসে ছিল, তেমনভাবেই বসে রইল।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে রাস্তার আলো এসে গাড়ির মধ্যে পড়ছিল। অনিমেষকে দেখে মনে হচ্ছিল, ও যেন গভীর কোন চিন্তায় ডুবে রয়েছে। এখানেই অনিমেষকে আমি বুঝতে পারি না। যখন সবার মধ্যে থেকেও অনিমেষ এক গভীর নিঃসঙ্গতায় তলিয়ে যায়, তখন আমার ভয় করে। মনে হয়, একজন অতিপরিচিত মানুষ যেন কুয়াশার গাঢ় পর্দার আড়ালে চিরদিনের মত হারিয়ে গেল।

'আপনাকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াবার কোন উপায় আমার নেই লীলাবতী। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।' হঠাৎ অনিমেষ যে এভাবে কথা বলে উঠবে বুঝতে পারি নি। আমি আর লীলাবতী একসঙ্গেই প্রশ্ন করে উঠলাম, 'কেন?'

অনিমেষ নিজের মনেই যেন উচ্চারণ করল, 'কেন? এই কেনর উত্তর আমি দিতে পারব না। তবে এটুকু জেনে রাখুন, সে উপায় যদি আমার থাকতো, আমি খুব খুশী হতাম। আমরা এখানে নামবো। এসো অংশু।' গাড়ি দাঁড়াতেই হুড়মুড় করে অনিমেষ নেমে গেল। বাধ্য হয়ে আমাকেও নামতে হল। গাড়ির জানালা দিয়ে লীলা-বতীর মুখ দেখা যাচ্ছিল। লীলা হাত তুলে আমাকে নমস্কার করল। রাস্তার আলো এসে লীলাবতীর মুখে পড়েছে। ওকে একজন নরম আর দুঃখী মানুষ বলে মনে হচ্ছিল।

রাস্তায় নেমে অনিমেষ ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল। ফুরফুরে হাওয়ায় শরীর ও মনের ক্লান্তি কিছুক্ষণের মধ্যেই দূর হয়ে গেল। এক সময় বললাম, 'মেয়েদের সম্বন্ধে অতিমাত্রায় প্রীতি যেমন বিপদজনক হয়ে দাঁড়ায়, সময় সময় প্রচণ্ড বিরাগও কিন্তু খুব সুখকর হয় না।'

অনিমেষ উত্তর না দিয়ে হাঁটতে লাগল। এতক্ষণ হয়ে গেল, অনিমেষ একটা সিগারেটও ধরাল না। এমন কী ভাবছে অনিমেষ যে সিগারেট খেতেও ভুলে গেছে। বললাম, 'তোমার কোন কাজ নেই, তা সত্ত্বেও নেমে পড়লে কেন? বাড়ি তো এখনও অনেক দূরে।'

অনিমেষ নীচু স্বরে বলতে লাগল, 'কিজানি কেন নেমে পড়লাম। অথচ না নেমেও আমার উপায় ছিল না। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল, মনে হচ্ছিল আমি যেন ক্রমশই একটা অন্ধকার গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছি। জানি না, আমি কি করবো। কি করতে পারি আমি।' বলতে বলতে আবেগে অনিমেষের গলা কাঁপতে লাগল।

অনিমেষের অসহায়তা আমাকে স্পর্শ করল। বললাম, 'যদি আপত্তি না থাকে, তোমার কথা আমাকে বলতে পার। সাহায্য করতে পারবো কিনা জানি না, কিন্তু বললে তোমার মনের ভার লাঘব হবে অনিমেষ।'

অনিমেষ আমার একটা হাত চেপে ধরল, ওর হাত ঘামে ভিজে উঠেছে। অনিমেষ যেন নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছে। কিছুক্ষণ পরে অনিমেষ বলে উঠল, 'কী বলবো, কেমন করে বলবো! যাকে কাছে পেতে মন চায়, সে কাছে এলে কেন দূরে সরে যেতে চাই। সেকথা আমি কেমন করে বোঝাবো। কে আমার কথা বুঝবে!' এদিকটায় রাস্তা একটু ফাঁকা। আলোগুলো অনেকটা দূরে দূরে। অনিমেষের মুখ দেখা যাচ্ছিল না। দু হাত দিয়ে অনিমেষের হাত জড়িয়ে ধরে বললাম, 'তুমি বলো অনিমেষ। আমি তোমার কথা বোঝার চেষ্টা করবো।'

অন্ধকারের মধ্যে অনিমেষের কথা কানে আসতে লাগল। অনিমেষ যেন অনেক দূর থেকে কথা বলছে। ওর কথা অস্পষ্ট শোনাচ্ছিল। 'লীলা আমাদের বাড়িতে সে দিন গিয়েছিল—বিভার রান্না খেয়েছিল, সেদিন বিভা সমস্ত রাত ঘুমোয় নি। শুধু চেঁচিয়েছে, আর ঘরময় দাপাদাপি করে বেড়িয়েছে। শেষ পর্যন্ত লীলা মনে করে নিজের গলাই টিপে ধরেছিল বিভা। আমি গিয়ে না পড়লে নিজেকেই নিজে খুন করে ফেলতো।' অনিমেষ থামল। কিন্তু অনিমেষের কথাগুলো যেন অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গিয়ে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। অনিমেষ গিয়ে না পড়লে বিভা নিজেকেই নিজে খুন করে ফেলতো! কেন নিজেকে খুন করে ফেলতো বিভা!

অনিমেষ আবার বলতে লাগল, 'অথচ লীলাকে একথা বলা যায় না। লীলা বুঝবে না। মনে মনে বিস্মিত হবে, আমাকে পাগল ভাববে।'

'কিন্তু এ বিষয়ে কি তুমি নিশ্চিত, বিভা শুধুমাত্র লীলাকে দেখলেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে?'

'শুধু লীলাই না। সুপ্রিয়াকে দেখেও একবার এ রকম হয়েছিল ওর। অথচ যখন সুস্থ হয়, তখন কিছুই মনে থাকে না। ডাক্তাররা বলে, এ এক ধরনের পরনির্ভরশীলতা। বিভা আমার ওপর নির্ভর করে, আমাকে ভালবাসে। ও চায় না, এই ভালবাসার অংশীদার আর কেউ হয়। ভাবতে পারো, এমন কি মাও ওর সামনে আমার সঙ্গে বেশী অন্তরঙ্গ হয়ে কথা বলতে পারে না! বিভা সন্দেহের চোখে তখন মার দিকে তাকায়!' কথা বলতে বলতে অনিমেষের গলা ভারী হয়ে এল। অনিমেষ চুপ করল।

বললাম, 'আমার মনে হয়, লীলাকে এ বিষয়ে জানানো উচিত।'

'ও বুঝবে না। বুঝলেও মানতে চাইবে না। তার চেয়ে ও যদি বুঝতে পারে, আমি ওকে এড়িয়ে যেতে চাই, একদিন হয়তো দূরে সরে যাবে ও।'

হাঁটতে হাঁটতে অনিমেষের বাড়ির কাছে চলে এলাম। অনিমেষদের বারান্দার আলো জ্বলছে। বারান্দায় একটা ছায়া ছায়া মূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে। অনিমেষ বলল, 'একটা ভালবাসার বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে বিভা। এ যে ওর কী শাস্তি, আর কেউ না বুঝুক, আমি বুঝতে পারি। যতক্ষণ না ফিরবো, ও ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে। খাবে না, বসবে না, কারও সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলবে না।'

'একটা কথা বলবো অনিমেষ?'
অনিমেষ বলল, 'বলো।'

'বিভার বিয়ে দাও। চেষ্টা করলে এমন ছেলে পাওয়া অসম্ভব না, যে অন্তত কিছু টাকা পণ নিয়েও—'

কথা শেষ হবার আগেই অনিমেষ চাপা গলায় চিৎকার করে উঠল, 'ছিঃ, এ কী বলছো তুমি!'

হঠাৎ নিজের কাছে নিজেই যেন খুব ছোট হয়ে গেলাম। খুব ছোট একজন মানুষ। আর অনিমেষকে খুব বড় কেউ বলে মনে হতে লাগল।

গেটের মুখে দাঁড়িয়ে অনিমেষ ডাকল, 'এসো।'

বিভা তাড়াতাড়ি সামনে এগিয়ে এসে অনুযোগের সুরে বলল, 'এত দেরী যে আজ। কথা ছিল না, সকাল সকাল এসে বেড়াতে নিয়ে যাবে।' আমাকে যেন বিভা এইমাত্র দেখল। দেখে অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'একী, আপনি বাইরে কেন? আসুন, আজ ক্ষীরের চপ করেছি, ভাল হয় নি তেমন, তবু খেয়ে দেখবেন, আসুন।'

'আজ না, আর একদিন।' বলে তাড়া-খাওয়া কুকুরের মত রাস্তা দিয়ে ছুটে চললাম। বিভার সামনে গিয়ে দাঁড়াবার মত শক্তি আমি যেন হারিয়ে ফেলেছিলাম।

আরও কিছুক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে হোটেলে ফিরে এলাম। এসে শুনলাম, এক ভদ্রলোক আমার খোঁজে দুবার এসে ফিরে গেছেন। বলে গেছেন, আবার আসবেন। ঘরে এসে কাপড়-জামা ছাড়তে না ছাড়তেই দরজায় শব্দ উঠল। দরজা খুলতেই চোখের সামনে যাকে দেখতে পেলাম, তাকে দেখার কল্পনা এই মুহূর্তে ছিল না। চোখের সামনে রতন ব্রহ্মচারীর বিভ্রান্ত মূর্তি আমাকে বিস্মিত করল। বললাম, 'এই অসময়ে?'

ব্রহ্মচারী হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে ফেটে পড়লেন, 'আমিও ব্রাহ্মণ-সন্তান। আমার বাপ-ঠাকুর্দা সন্ধ্যা-আহ্নিক না করে কোনদিন জলস্পর্শ করেননি। সেই বংশের সন্তান আমি। অভিশাপ দিলে ফলবেই ফলবে।' সার্টের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ব্রহ্মচারী বোধ করি উপবীতের সন্ধান করতে লাগলেন।

বললাম, 'ব্যাপার কি ব্রহ্মচারী মশাই? এত উত্তেজিত হবেন না। বসুন।'

ব্রহ্মচারী না বসে দাঁড়িয়েই রইলেন। বড় বড় নিশ্বাসে ওঁর ভারী বুক ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। মনে হচ্ছিল যে-কোন মুহূর্তে প্রচণ্ড আবেগে ব্রহ্মচারী খণ্ড খণ্ড হয়ে ঘরময় ছড়িয়ে পড়বেন। এক সময় উনি বলে উঠলেন, 'জানেন স্যার স্কাউন্ড্রেলটা কী করেছে!' ব্রহ্মচারীর শরীর আবার থর থর করে কাঁপতে লাগল। অত্যধিক উত্তেজনায় মানুষের হৃদপিণ্ড সময় সময় বিকল হয়ে যেতে পারে, এমন একটা ধারণা থাকায় ভয় পেয়ে গেলাম।

ব্রহ্মচারীকে ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিতেই উনি দুই হাতের আড়ালে মুখ ঢেকে ফেললেন। কিছুক্ষণ সেইভাবে বসে থেকে ব্রহ্মচারী মুখ তুললেন। অস্বাভাবিক লাল আর ফোলা ফোলা চোখ দুটো। সমস্ত মুখে যেন কালি মাখানো। সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'প্রত্যেকের জীবনেই এক সময় বিপদ আসে, কিন্তু তাতে মুষড়ে পড়লে তো চলে না।'

কথায় দারুণ কাজ হল। ব্রহ্মচারী বুক টান করে বসলেন। মাথা উঁচু করে বললেন, 'ব্রহ্মচারিরা একমাত্র ভগবান আর বাপ-ঠাকুর্দা ছাড়া কাউকে ভয় পায় না। আমিও দেশপাণ্ডেকে দেখে নেবো স্যার।' দেশপাণ্ডের নাম বলে ফেলেই যেন ব্রহ্মচারী বিব্রত বোধ করলেন। নিমেষের মধ্যে সেই ভাব কাটিয়ে বলে উঠলেন, 'বেইমানী দ্বারা আর যাই হোক, কোন মহৎ কাজ হয় না। আপনিই বলুন, হয় কি?'

ভালমন্দ উত্তর না দিয়ে ব্রহ্মচারীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। ব্রহ্মচারী ক্রমশই সংকুচিত হয়ে পড়তে লাগলেন। উনি যেন কথা হারিয়ে ফেলছেন, 'বিশ্বাস করুন স্যার, খাওয়া-দাওয়ার পর সবেমাত্র চোখ দুটো বুজে এসেছে, অমনি ফাদার্স কমান্ড, রতন, এক্ষুনি চ্যাটার্জি সাহেবের বাড়ি যা। সৎ ব্রাহ্মণ-সন্তান, তাঁকে দুটো মিষ্টিমুখ করিয়ে আয়। দেখুন স্যার, বলতে বলতে লোম কী রকম দাঁড়িয়ে গেছে। দেখুন—' বলে লোমশ একটা হাত আমার চোখের খুব সামনে তুলে ধরলেন ব্রহ্মচারী।

বলার মত কথা খুঁজে না পেয়ে চুপ করে ছিলাম। ব্রহ্মচারী হঠাৎ আমার একটা হাত টেনে নিয়ে একগোছা নোট সেই হাতে গুঁজে দিতে দিতে বললেন, 'ব্রাহ্মণ-সন্তান স্যার, ফাদার্স কমান্ড না মেনে উপায় নেই। ছুটতে ছুটতে চলে এলাম। মিষ্টি কিনে খাবেন স্যার। আগরওয়ালা ব্যাটা কী কম শয়তান স্যার। উপায় খুঁজে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত বাবার শরণাপন্ন হল।'

'আগরওয়ালা আপনার বাবার সন্ধান পেল কি করে?' বলতে বলতে সমস্ত রহস্য হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে গেল। হাত সরিয়ে নিতে নিতে বললাম, 'একটু ভুল করেছেন, রতনবাবু, টাকাটা যথাস্থানে দিন, কাজ হবে। আমার ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ। তাছাড়া এ-বিষয়ে সিদ্ধান্ত কোলকাতা অফিসই নেবে। আপনি এখন আসুন।' বলে উঠতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ ব্রহ্মচারী আমার পা দু হাত দিয়ে চেপে ধরতে গেলেন। সরে গিয়ে বললাম, 'করছেন কী।' ব্রহ্মচারী শুনলেন না, পা চেপে ধরে শব্দ করে কেঁদে উঠলেন। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ যে এভাবে কাঁদতে পারে জানা ছিল না। বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম।

বাধ্য হয়েই ব্রহ্মচারীকে জোরে ধমক দিতে হল, 'আপনি যদি এভাবে নাটক করেন, বাধ্য হয়ে আমাকেই ঘর ছেড়ে চলে যেতে হবে।'

ধমকে কাজ হল। ব্রহ্মচারী উঠে দাঁড়ালেন। চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন, 'আপনি কোনদিন বয়স্ক কোন মানুষকে কাঁদতে দেখেছেন স্যার? দেখেননি। আমিও কাঁদি না। আজ হঠাৎ কী যে হল! হয়ত দয়ালু মানুষ দেখলেই মানুষের কান্না পায়।'

শান্তভাবে বললাম, 'আমি দয়ালু মানুষ না। তাছাড়া আমার কাছ থেকে দয়া বা করুণা আপনি নেবেনই বা কেন? ও দুটোই মানুষকে ছোট করে দেয়।'

'আপনার কাছে আমার ছোট হতে আপত্তি নেই স্যার। আগরওয়ালা যদি ডিলারশিপ না পায়, আমি মুখ দেখাতে পারবো না।' একটু থেমে ব্রহ্মচারী আবার বললেন, শুধু মুখ দেখানো না, আমাকে দেশছাড়া হতে হবে।'

আমার বিস্ময় ক্রমশই চরমে উঠছিল। 'আপনাকে দেশ ছাড়তে হবে কেন?'

ব্রহ্মচারী কিছুক্ষণ কী ভেবে নিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'আপনার কাছে মিথ্যে বলবো না স্যার, আগরওয়ালা কিছু টাকা খরচা করেছে।'

'আপনি টাকা খেয়ে বসে আছেন? অথচ সমস্ত ব্যাপারটার সঙ্গে আপনার কোন সম্পর্ক থাকা উচিত না।'

ব্রহ্মচারী একটুও দমলেন না। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'কার যে কোথায় কী সম্পর্ক গড়ে উঠছে কে বলতে পারে স্যার। আপনিই কি ভেবেছিলেন, জামসেদপুরে কে আপনাদের কোম্পানীর মাল বেচবে না বেচবে তার জন্যে আপনাকে সেখানে যেতে হবে। শুধু যে যেতে হবে তাই না, একটা নোংরা কাজ আপনার হাত দিয়ে করিয়ে নেওয়া হবে।'

আবার গোলক-ধাঁধার মধ্যে পাক খেতে শুরু করলাম। বললাম, 'নোংরা কাজ?'

'নোংরা কাজ ছাড়া কী বলবেন একে। দস্তুর কোম্পানী কি সত্যি সত্যি ডিলার হওয়ার উপযোগী?'

'কে আপনাকে বলেছে যে, দস্তুর কোম্পানী আমাদের ডিলার অ্যাপয়েণ্টেড হয়েছে। আমার রিপোর্ট এখন পর্যন্ত কোলকাতায় পৌঁছেছে কিনা সন্দেহ, পৌঁছলেও ডিসিসন হয়তো এখনও নেওয়া হয়নি।'

আমার কথা শুনে ব্রহ্মচারীর মুখে হাসি ফুটে উঠল। 'আমাকে লুকোচ্ছেন কেন স্যার। আমি আপনার বন্ধু লোক, বিদেশে বাঙালী, বলতে গেলে আমরা তো এক ফেমিলিরই মেম্বার, তাই কিনা স্যার, বলুন। আপনি যা করেছেন বেশ করেছেন। দস্তুর ডিলারশিপ পাক আমার আপত্তি নেই। আগরওয়ালাকেও আর একজন ডিলার করে দিন, স্যার। গরীবের এই কথাটা রাখুন, না হলে ধনে-প্রাণে মারা যাব।'

ব্রহ্মচারী আমার হাত ধরার জন্যে এগিয়ে আসছিলেন। দূরে সরে গিয়ে বললাম, 'আপনি যদি না বসেন, আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাব। কে আপনাকে বলেছে যে, দস্তুর ডিলার অ্যাপয়েণ্টেড হয়েছে?'

ব্রহ্মচারী কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে বললেন, 'সত্যি আপনি জানেন না? কী আশ্চর্য! আমি নিজের চোখে চিঠি দেখে এসেছি। আজকের ডাকেই চলে গেল।'

'কে আপনাকে চিঠি দেখিয়েছে?'

'কেউ না।' ব্রহ্মচারী অম্লানবদনে বলে ফেললেন।

'কেউ না দেখালে চিঠি উড়ে এসে আপনার হাতে পড়তে পারে না। চিঠি দেখানোর প্রশ্নটা বড় না। প্রশ্ন হচ্ছে আমার সাজেসন না নিয়ে হঠাৎ এই কাজ করা হল কেন?'

ব্রহ্মচারীর মুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'তবেই বুঝুন স্যার কী সব হচ্ছে এখানে। দুদিন পরে এখানে ফ্যাক্টরী হবে, লাখ লাখ টাকার লেনদেন হবে, তখন যে কী হবে!'

আমার মাথা ক্রমশই গরম হয়ে উঠছিল। দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, 'কিছুই হবে না। কিছুই হতে দেব না।'

'কিন্তু সবার বিরুদ্ধে একা লড়াই করার মত শক্তি কি আপনার হবে স্যার?' কথা বলে সাগ্রহে ব্রহ্মচারী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

নিজেকে সামলে নিয়ে হেসে বললাম, 'একা কেন, সেদিন কি আপনাকে সঙ্গে পাব না?'

'নিশ্চয়ই পাবেন স্যার। ন্যায় যেদিকে, আমি সেই দিকে। বাবা বেঁচে থাকতে বলতেন, দ্যাখ রতন—'

অসহিষ্ণু গলায় বলে উঠলাম, 'বাবার কথা থাক। একটা কথা শুধু আমাকে বলে যান, এই অফিসে বন্ধু বলে আমি কাকে বিশ্বাস করতে পারি?'

ব্রহ্মচারী কিছুক্ষণ চোখ বুজে রইলেন। আপন মনে ঘাড় নেড়ে নেড়ে কী সব বিড় বিড় করলেন। তারপর চোখ খুলে বললেন, 'যদিও লোকটাকে আমি কোনদিন ভাল চোখে দেখি না, তবু মিথ্যে কেন বলবো স্যার, আপনার বন্ধু হবার উপযুক্ত লোক এখানে একজনই আছে, অনিমেষ দত্ত।'

'অনিমেষ দত্ত লোক কেমন?' অনিমেষ সম্বন্ধে আরও পরিষ্কার করে জানতে ইচ্ছে করল, বিশেষ করে ওর সঙ্গে লীলাবতীর সম্পর্ক আমাকে কৌতূহলী করে তুলেছিল।

ব্রহ্মচারী বললেন, 'লোকটি সম্বন্ধে ভাল বা মন্দ এক কথায় কিছু বলা যায় না। ও দারুণ ভাল, আবার দারুণ খারাপ। ভাল বলতে পয়সা-কড়ি ছোঁয় না। মেয়েমানুষের দিকে ঝোঁক নেই। কাজেও নাম আছে। খারাপ বলতে অসম্ভব অহংকারী। মানুষের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখে না পর্যন্ত। আজ পর্যন্ত আমার সঙ্গে ক'টা কথা হয়েছে গুনে বলা যায়।'

'ওর সঙ্গে তো দেশপাণ্ডে সাহেবের মেয়ের খুব ভাব বলে মনে হল।'

'আপনি কি করে জানলেন স্যার?' ব্রহ্মচারী পাল্টা প্রশ্ন করে বললেন।

'যে করেই হোক, জানি, কথাটা সত্যি কিনা বলুন।'

'হ্যাঁ সত্যি!'

"এ নিয়ে দেশপাণ্ডে কিছু বলেন না?'

'বলে না আবার! প্রচণ্ড গর্জায় স্যার! যেন শেকল-বাঁধা সিংহ। সেবারে তো আর একটু হলে আমার মুখেই একটা ঘুঁষি জমিয়ে দিতে যাচ্ছিল। দেশপাণ্ডের দোষের মধ্যে আমি বলেছিলাম, ফরগিভ অ্যাণ্ড ফরগেট। লীলা আর অনিমেষকে নাকি বাজারে দাঁড়িয়ে গল্প করতে দেখেছিল কে, এই নিয়ে কী হুলুস্থূল কাণ্ড। অথচ লোকটা এমন কাওয়ার্ড স্যার, নিজের মেয়েকে একটা কথা বলতেও সাহস করে না। অনিমেষকে দেখলে তো সাত হাত দূরে থেকে পালায়।'

'কেন?'

ব্রহ্মচারী কী বলতে গিয়েও যেন বললেন না। শুধু বললেন, 'বড়লোকের ব্যাপারে মাথা গলিয়ে শুধু মাথার বোঝা বাড়ে বৈ তো নয়। আমি গরীব। গেরস্থ মানুষ, সেইভাবেই থাকি। আর দেরী করবো না স্যার। আজ উঠি। বড় আশা করে এসেছিলাম। ভেবেছিলাম, আপনি শক্তিমান লোক, কিন্তু এভাবে ল্যাং খেয়ে যে পড়ে যাবেন, বুঝতে পারিনি।'

ব্রহ্মচারী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। যাবার আগে আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে ফিস ফিস করে বলে গেলেন, 'বাবা একটা কথা খুব বলতেন। বলতেন শয়তানের সঙ্গে শয়তানি না করলে শয়তান জব্দ হয় না। কথাটা খুব দামী। আজ চলি স্যার।' ব্রহ্মচারী দু হাত কপালে ছুঁইয়ে দেখে পিছু হটতে হটতে দরজা পর্যন্ত গিয়ে আবার বললেন, 'আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান স্যার। বয়সেও আপনার চেয়ে অনেক বড়, আমি বলে যাচ্ছি, ন্যায়ের পথ ধরে এগিয়ে চলুন, একদিন না একদিন আপনি জয়ী হবেনই।'

(ক্রমশঃ)

অর্থনৈতিক সমীক্ষা : বেকার সমস্যা

শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

কারা বেকার?

যারা কাজ খোঁজে অথচ কাজ পায় না তাদেরই বলা হয় বেকার। ধরুন, আমার স্ত্রী—মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের বধূ—হঠাৎ ঠিক করলেন যে চাকরি করবেন। কারণ হতে পারে, বর্তমান স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের যুগে স্বামীর ওপর নির্ভরশীল থাকা তিনি আর যুক্তিযুক্ত মনে করেন না, কিংবা ছেলে-মেয়ে দুটি বড় হয়ে স্কুলে যেতে শুরু করছে যার ফলে দুপুরে তাঁর কোন কাজই নেই, কিংবা হয়ত মনে মনে ভেবেছেন ভদ্রলোকের মত(!) থাকতে হলে এই দুর্মূল্যের বাজারে আরও কিছুটা আয় বৃদ্ধি করা দরকার যা ওঁর অর্ধ-অকর্মা স্বামীর সামর্থ্যে কুলোবে না, কিংবা ঐ রকম আর কিছু। তা কারণ যাই হোক, এতদিন তিনি ছিলেন 'নিরাকার', হঠাৎ হয়ে গেলেন বেকার (স্ত্রীলিঙ্গে ঠিক কী হয় জানি না)। ফলে দেশের বেকারের সংখ্যায় এক যোগ হল। এতদিন কোন ফরম পূরণ করতে হলে পেশার ঘরে তিনি হয়ত লিখতেন 'গৃহস্থালি' বা ইংরেজীতে 'হাউস-হোল্ড ডিউটিজ' এখন থেকে হয়ত লিখবেন 'কর্মপ্রার্থী' (প্রার্থিনী) বা 'জব-সিকার'।

চব্বিশ পরগণার এক গ্রামের স্কুলে পড়ত সাধন কর্মকারের ছেলে রতন, হাপরশালে বাপকে সাহায্যও করত। কিন্তু জাতব্যবসা আর চলে না, গ্রামীণ কর্মকারের তৈরী কাটারি-কাস্তে এমনকি লাঙলের ফলারও আর বিশেষ চাহিদা নেই। আর পড়াশুনোও রতনের ভাল লাগে না। সাধন তার ভাই পরাণকে বলে কয়ে রতনকে পরাণের কাছে নৈহাটীতে পাঠিয়ে দিলে—যদি একটা কাজ-চাকরি পাওয়া যায়। পরাণ সেখানে এক চট কলে চাকরি করে।

বিহারের আরা জেলা থেকে এসে শহরতলীতে খাটাল খুলেছিল রামবেয়াস রাই। দুধের ব্যবসা আর ভাল চলে না, পশুখাদ্যের দাম যেহারে বাড়ছে, সেই অনুপাতে দুধের দাম বাড়ালে হলে খদ্দের থাকে না। তাছাড়া খাটালের জমি নিয়েও নিয়ত ঝামেলা লেগে আছে। এর চেয়েও আশপাশের কলকারখানায় যদি একটা চাকরি পাওয়া যায়!

শেষপর্যন্ত রামবেয়াস খাটাল একরকম তুলেই দিল বা তুলে দিতে বাধ্য হল। কিন্তু সে আর আরা জেলায় ফিরে গেল না। ফলে নগরাঞ্চলে বেকারের অলিখিত তালিকায় অদৃশ্য কালিতে আর একটা সংখ্যা যোগ হল।

কয়েক মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্নাতক পরীক্ষার ফল বেরুলে (আজকাল আর একসঙ্গে, এমনকি কাছাকাছিও বেরোয় না)। সফল ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৫০ হাজারের মত। এর মধ্যে স্নাতকোত্তর শিক্ষার সুযোগ পেল বা ঐ শিক্ষায় গেল ১০ হাজারের মত (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদের সহ-সভাপতি ডাঃ অজিতকুমার বসু প্রদত্ত পরিসংখ্যান)। বাকি ৪০ হাজার রাতারাতি হয়ে গেল বেকার—যাদের বোধহয় একটু সম্মান করেই বলা হয় 'শিক্ষিত বেকার।'

স্নাতকোত্তর শিক্ষায় যে ১০ হাজারের মত ছাত্রছাত্রী ঢুকল তাদের অধিকাংশই পাস করে বা ফেল করে বা মাঝপথে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে এই পর্যায়ভুক্ত হবে। সুতরাং এই অধিকাংশও সম্ভাব্য বেকার। অবশ্য ছাত্রীদের অনেকে বরমাল্যের দৌলতে এই আশংকা থেকে আপাতত মুক্ত থাকবে, এবং পরে আমার স্ত্রীর মত কর্মপ্রার্থিনীর তালিকা পূর্ণ করবে।

আমার স্ত্রী, চব্বিশ পরগণার গ্রাম থেকে আগত রতন, পূর্বতন খাটালওয়ালা রাম-বেয়াস এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা পর্ষদের ছাপ মারা শিক্ষিত বেকার ছাড়া আরও এক-রকম কর্মপ্রার্থী আছে যা প্রচ্ছন্ন বা অর্ধ-বেকারত্বের কবলে পতিত। এরাও নিয়োগ-হীন, তবে পুরোপুরি নয়—মাত্র আংশিক-ভাবে। সুতরাং সমস্যা হল উভয় শ্রেণীকে নিয়েই, এবং সমস্যাকে ব্যাপক অর্থে নিয়োগ-হীনতার সমস্যা বলা হয়।

নিয়োগহীনতা ও লাভজনক নিয়োগ :

অর্থনীতিতে উৎপাদনের যে কোন উপাদান—জমি শ্রম মূলধন সংগঠন—অলস অবস্থায় থাকলেই তাকে নিয়োগহীনতা বলে অভিহিত করা হয়। শ্রমের ক্ষেত্রে এই নিয়োগহীনতার ফলে ঘটে সম্পূর্ণ অপচয়, কারণ শ্রমই সর্বাপেক্ষা ধ্বংসশীল উপাদান। একটি শ্রমহীন দিন চলে গেলে তা আর ফিরে আসবে না, শ্রম দপ্তরের খাতায় হয়ত লেখা পড়বে : ওয়ান ম্যান-ডে লস্ট। জমি বা প্রাকৃতিক সম্পদ। মূলধন-দ্রব্য বা যন্ত্রপাতি এভাবে অব্যবহারের দরুণ সম্পূর্ণ অপচিত হয় না, বেশীদিন অব্যবহারে থাকলে কিছুটা অকেজো হয়ে পড়তে পারে মাত্র।

শ্রমিক যদি পুরোপুরি বেকার থাকে অপচয় হল সম্পূর্ণ, আর নিয়োগহীন হয়ে থাকলে অপচয়কে আংশিক বলে ধরা হয়। যারা এইভাবে আংশিক নিয়োগহীন তারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও অপচয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। অর্থনীতির ভাষায় তাদের বলা যায় : লাভ-জনকভাবে নিযুক্ত নয় নট গেনফুলি এম-প্লয়েড। অর্থাৎ তারা দেশের উৎপাদন কার্যে সত্যিই সহায়তা করে উপার্জন বৃদ্ধি করতে পারত তা বর্তমান অর্থব্যবস্থায় তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। ১৯৭১ সালের জনগণনা অনুসারে ভারতের মোট জনসংখ্যার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ লাভজনকভাবে নিযুক্ত। এই দেশে শ্রমের অপচয়ের পরিমাণ সম্বন্ধে ধারণা করার জন্যে বোধহয় আর কোন তথ্য বা পরিসংখ্যানের প্রয়োজন নেই।

বেকার-সমস্যার গুরুত্ব :

চূড়ান্ত বিশ্লেষণে উৎপাদনের উপাদান হল সংখ্যায় দুই : প্রকৃতি ও মানুষ। অর্থাৎ প্রকৃতির দানকে কাজে লাগিয়ে—প্রাকৃতিক পরিবেশকে উপযোগী করে তুলে মানুষ তার মৌল অর্থনৈতিক সমস্যা—অভাব মোচনের সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হয়। সুতরাং অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রমের অপচয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। যে সমাজ-ব্যবস্থা এই অপচয় হতে দেয়, তাকে অন্তত অপারগতার অভিযোগে অভিযুক্ত না করে উপায় নেই। এই কারণে শ্রমের অপচয়ের সমস্যা বা চলতি ভাষায় যাকে বলে বেকার-সমস্যা আর তত্ত্বগত আলোচনার জন্যে পাঠ্য-পুস্তকে নিবদ্ধ নেই—তা আজ রাজনৈতিক আন্দোলনের উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং ক্ষেত্রবিশেষে সমাজবিপ্লবের পূর্বাভাষ হতে পারে।

বলা হয়, সরকারের অর্থনৈতিক কাজ-কর্মের মৌল উদ্দেশ্য হল জনসাধারণকে অভাব থেকে আগামী দিনের ভাবনা থেকে মুক্ত করা। কিন্তু জনসংখ্যার একাংশ যদি সম্পূর্ণ বেকার এবং আর এক অংশ আংশিক নিয়োগহীন অবস্থায় থাকে তবে সামাজিক মূল্যায়নে সরকারী অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টাকে

ব্যর্থ' ছাড়া আর কি বলে অভিহিত করা যায়? তাই বেকার-সমস্যার সমাধান সকল দেশেরই অর্থনৈতিক কর্যক্রমের লক্ষ্য—অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

বিশ্বজনীন সমস্যা :

অবশ্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগোষ্ঠীর বাইরে অত্যুন্নত, উন্নত বা স্বল্পোন্নত কোন দেশই স্থায়ী পূর্ণনিয়োগাবস্থার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়নি। তাই দেখা যায়, তারা প্রায়ই নিয়োগহীনতার সমস্যার সম্মুখীন হয়ে সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত। গত নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত কানাডার সাধারণ নির্বাচনে অন্যতম 'ইস্যু' ছিল এই বেকার-সমস্যা। বিপুল প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য, বিরাট মূলধন-সম্পদ সমন্বিত কিন্তু জনবিরল দেশ কানাডায় বেকারত্বের পরিমাণ হল ৭ শতাংশের ওপর। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, উগান্ডা থেকে এশিয়ানদের বিতাড়নের মূলেও এই সমস্যা—উগান্ডাবাসীদের মধ্যে ব্যাপক খোলা এবং প্রচ্ছন্ন নিয়োগহীনতা।

প্রকার ভেদ :

তবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ইংল্যান্ড, জাপান, জার্মেনী, ফ্রান্স, ইতালী প্রভৃতি অত্যুন্নত বা উন্নত দেশ এবং ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশের বেকার-সমস্যার মধ্যে বিশেষ প্রকার ভেদ আছে। অত্যুন্নত ও উন্নত দেশের বেকার-সমস্যা প্রধানত দু' ধরনের : ঋতুগত বেকারত্ব এবং সাইক্লিক্যাল বা মন্দা বাজারজনিত বেকারত্ব। বছরের কোন কোন সময় বিশেষ বিশেষ জিনিসপত্রের চাহিদা কমে গেলে ঐ সব জিনিসপত্রের উৎপাদন হ্রাসের দরুণ যে নিয়োগ হ্রাস ঘটে তাকেই ঋতুগত বেকারত্ব বলা হয়। যেমন, শীতকালে আইসক্রীমের চাহিদা কমে গেলে যে বেকারত্বের সৃষ্টি হয় তা' হল ঋতুগত বেকারত্ব। অপর দিকে ব্যবসাবাণিজ্যে তেজী ভাবের পর মন্দা দেখা দিলে সব জিনিসপত্রের চাহিদাই কমে যায়। ফলে বহু লোক বেকার হয়ে পড়ে। এই ধরনের বেকারত্বই মন্দা বাজারজনিত বেকারত্ব বলে অভিহিত।

ভারতের বেকার-সমস্যা :

কৃষিপ্রধান এবং ঋতুবৈচিত্র্যের দেশ ভারতে ঋতুগত বেকারত্ব ব্যাপক হলেও যাকে মন্দাবাজারজনিত বেকারত্ব বলে তার সাক্ষাৎ বর্তমানে ঠিক পাওয়া যায় না। এর জায়গায় দেখা যায় যাকে বলে টেকনোলজিক্যাল বা কলাকৌশলের পরিবর্তনজনিত এবং স্ট্রাকচারাল বা সংগঠনজনিত বেকারত্ব। এর ওপর অবশ্যই আছে কৃষিগত বেকার-সমস্যা এবং শিক্ষিত বেকারদের সমস্যা। শেষোক্ত সমস্যাই বোধহয় জটিল। কারণ, এই সব শিক্ষিত বেকাররা শুধু নিয়োগহীন নয়, তাদের অধিকাংশ নিয়োগযোগ্যতাহীনও বটে। অপর দিকে তারাই কিন্তু আবার বেকারদের মধ্যে সবচেয়ে সোচ্চার শ্রেণী।

কলাকৌশলের পরিবর্তনের ফলে কি পরিমাণ বেকারত্বের সৃষ্টি হচ্ছে তা চারদিকে তাকালে সহজেই বোঝা যায়। ইলেকট্রিক ট্রেণ চালু হবার সংগে সংগে ফায়ারম্যানদের আর কোন প্রয়োজন রইল না; এই সাইকেল রিকসার যুগে ঘোড়ার গাড়ী অচল হয়ে গেছে; যন্ত্রচালিত তাঁত অনেকক্ষেত্রে হস্তচালিত তাঁতে নিযুক্ত শ্রমিকের অন্ন মেরেছে। এমনকি কৃষিক্ষেত্রেও আধুনিক পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতি কৃষি-শ্রমিকদের কর্মচ্যুত করে চলেছে। এই সব কৃষি-শ্রমিক বেকার নয়, ভিখারী হয়ে শহরের রাস্তায় ফুটপাতে রেল-স্টেশনে আশ্রয় নিচ্ছে। এরা উদ্বাস্তু নয়, জীবিকা থেকে উৎখাত নাগরিকগোষ্ঠী। এরা কিন্তু নিয়োগকেন্দ্রে নাম লেখাতে পারে না, মিছিল করে বেরোতেও শেখেনি বা প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব পায় নি। তাই তারা নিয়োগহীন হয়েও ঠিক বেকার নয়—ভিখারী।

কমিউনিষ্ট ম্যানিফেস্টো (১৮৪৮) থেকে দেখা যায়, মার্কস ও এঙ্গেলস্ ধনতন্ত্রের কলাকৌশলের পরিবর্তনের অপরিমেয় সম্ভাবনা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করেছিলেন। মার্কসের বিশ্বাস ছিল, ফলে যেমন ফোটার পর শুকোতে শুরু করে, তেমনি কলাকৌশলের উন্নতি অবশ্যম্ভাবীরূপে শ্রমিকদের কর্মচ্যুত করে নিয়োগহীনতার পরিমাণ বাড়িয়েই চলবে। এবং ফলে ধনতন্ত্রের সংকট ঘনীভূত হবে।

শিল্পোন্নত দেশগুলিতে এখনও ঠিক তাই হয়নি। কর্মচ্যুত শ্রমিকদের নতুন শিক্ষাদান ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যবস্থার মাধ্যমে ঐ সব দেশ কলাকৌশলের পরিবর্তনজনিত বেকারত্বকে সাময়িক বেকারত্বে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আজকের দিনের সুইডেনের উল্লেখ করা যেতে পারে। সুইডেনে একরকম জনহিতকর সেবা সংস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে যার কাজ হ'ল কলাকৌশলের পরিবর্তন ঘটলেই শিল্পগুলিকে ঐ ব্যাপারে সাহায্য করা এবং কর্মচ্যুত শ্রমিকদের পুনঃশিল্প দিয়ে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অন্যস্থানে নিয়োগের ব্যবস্থা করা। ফলে ঐ দেশে কলাকৌশলের পরিবর্তনজনিত বেকারত্ব নেই বললেই হয়। আমাদের দেশে কিন্তু পরিবর্তনের সংগে তাল না রাখতে পারার জন্যে এই শ্রেণীর বেকারের সংখ্যাই বিরাট।

সংগঠনজনিত বেকারত্ব বলতে বোঝায় শ্রমের তুলনায় উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের অপ্রতুলতাজনিত বেকারত্ব। ভারতে এই ধরনের বেকারত্বের মূল কারণ একদিকে জনসংখ্যার বিপুল বৃদ্ধি এবং অপরদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মন্থর গতি। বলা হয়, শিশু পৃথিবীতে শুধু উদর নিয়েই আসে না, উদর পূর্তির জন্যে কাজ করবার দুটো হাত নিয়েও আসে। কিন্তু বর্তমান দিনে দুটো হাতই যথেষ্ট নয়, অন্যান্য উপকরণ এবং প্রয়োজনীয় সংগঠন থাকলে তবেই হাত দুটো কাজে লাগে। যতজোড়া হাত কাজ করবার সুযোগ খুঁজছে তত পরিমাণ উপকরণ সরবরাহ করা যাচ্ছে না। তাই অসংখ্য কাজের হাত অকেজো হয়েই আছে।

আমাদের দেশে কৃষিগত বেকার-সমস্যা ঋতুগত হলেও মূলত সংগঠনজনিত, পাশ্চাত্য দেশের মত চাহিদার সাময়িক হ্রাসজনিত নয়। এদেশে কৃষি এখনও বহুলাংশে বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভরশীল বলে দেশের বিভিন্ন স্থানে কৃষিজীবীরা ৩ থেকে ৬ মাস বসে থাকতে বাধ্য হয়। সুতরাং তারা সম্পূর্ণ না হলেও অর্ধ-বেকার বা প্রচ্ছন্ন বেকার। তা' ছাড়া বিকল্প নিয়োগের অভাবে কৃষিতে যত লোক ভিড় জমিয়েছে তত লোকের দরকারই নেই—এদের একটা মোটা অংশকে কৃষি থেকে সরিয়ে আনলে উৎপাদন হ্রাস পায় না। সুতরাং কৃষিতে বেকার-সমস্যা সংগঠনজনিত বেকার-সমস্যারই একটা দিক—বর্ধমান জনসংখ্যাপ্রসূত বর্ধমান শ্রমের যোগানের সংগে তাল রেখে প্রয়োজনীয় উপকরণের যোগানের সক্ষমতাই এর কারণ।

গ্রামাঞ্চলে এই প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব ছাড়াও ওপন্ বা খোলা বেকারত্বও আছে, তবে তা হ'ল প্রধানত কৃষি-শ্রমিকদের মধ্যে, কলাকৌশলের পরিবর্তনের দরুণ কৃষিক্ষেত্রে যারা সম্পূর্ণ উদ্বৃত্ত হয়ে পড়েছে। এদের অধিকাংশই উদারান্নের জন্য শহরে গিয়ে ভিড় জমাচ্ছে। অবশ্য যারা অর্ধ বা প্রচ্ছন্ন বেকার তাদের অনেকেও শহরে গিয়ে ঠিক ভিড় না জমালেও ভিড়ের কাছে উঁকিঝুঁকি মারছে।

তারপর আছে শিক্ষিত বেকারদের সমস্যা। এর মূলে আছে ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা-পরিকল্পনা বা আধুনিক অর্থনীতির ভাষায় ত্রুটিপূর্ণ ম্যানপাওয়ার বা মানবশক্তি পরিকল্পনা। এর জন্যে অবশ্য আমাদের পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ ততটা দায়ী নন, যতটা দায়ী হলো প্রথম যুগের গ্রোথ্ অর্থনীতিবিদরা। এই সব অর্থনীতিবিদের ধারণা ছিল যে শিল্প প্রসারের ওপর যতটা ব্যয় করা হবে মোট জাতীয় আয় ততই বৃদ্ধি পাবে। এই ধারণা ধ্রুব সত্য বলে মনে করে নিয়ে এশিয়ার অনেক দেশের মত ভারতও শিল্পসম্প্রসারণের জন্যে 'ক্র্যাশ প্রোগ্রামের' পথ বেছে নিয়েছিল। ফল হয়েছে ভয়াবহ—শিক্ষার মানের অবনতি, শিক্ষা-জগতে নৈরাজ্য উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে নৈরাশ্য, শিক্ষিত বেকারের অকল্পিত সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অধিকাংশের ক্ষেত্রে নিয়োগযোগ্যতাহীনতা।

পরিসংখ্যানের মূল্যহীনতা :

ভারতে বিভিন্ন ধরনের বেকারত্বের পরিমাণের পরিসংখ্যান না দেখাই ভাল, কারণ বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত পরিসংখ্যানের মধ্যে কোনটি নির্ভরযোগ্য তা নির্ণয় করা কঠিন। যেমন, পশ্চিমবংগেই পূর্ণ বেকারের সংখ্যা ধরা হয়েছে ২৩ লক্ষ থেকে ৪৫ লক্ষ—অর্থাৎ রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৫ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশ; এই ধরনের পরিসংখ্যানের মূল্য কি? তাই বেকারত্বের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি (দান্তওয়ালা কমিটি) পরিসংখ্যানের পদ্ধতি পরিবর্তনের সুপারিশ করেছে।

সমস্যার প্রকৃতি-বিশ্লেষণ :

যাই হোক, আমাদের দেশে জনসংখ্যার মত বেকারত্বেরও বিস্ফোরণ ঘটছে। এর চাপ গ্রামাঞ্চলের চেয়ে নগরাঞ্চলেই বেশী পড়ছে। কারণ, আধুনিক মজুরীভিত্তিক অর্থ-ব্যবস্থার আকর্ষণ। নগদ মজুরির আকর্ষণে লোকে গ্রামাঞ্চলের অলাভজনক বৃত্তি ছেড়ে নগরাঞ্চলে এসে কর্মপ্রার্থী হচ্ছে আর যারা কাজকর্মের অভাবে শহরে আসছে তারা ত আছেই।

দ্বিতীয়ত, কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা বয়স্কদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত স্বল্প-বয়স্কদের মধ্যেই বেশী—যারা তাদের রুজিরোজগারের ধান্দায় প্রথম বাজারে বেরিয়েছে। সুদূর নয়, অদূর ভবিষ্যতেই এই দ্বিতীয় শ্রেণীর বেকারদের সমস্যার মোকাবিলার জন্যে বিশেষভাবে চিন্তা করে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। না হলে, এই দুর্ভাগা দেশের ভাগ্যে আরও কি লেখা আছে জানি না।

মোকাবিলায় সরকারী প্রচেষ্টা :

কর্তৃপক্ষ অবশ্য বেকার-সমস্যার গুরুত্ব সম্বন্ধে সুরু থেকেই সচেতন এবং বলা হয় যে অন্যান্যের মধ্যে পূর্ণ নিয়োগব্যবস্থা সৃষ্টি করা আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার লক্ষ্য। গ্রাম পরিকল্পনার খসড়ায় বলা হয়েছিল : উন্নয়ন পরিকল্পনা পূর্ণ নিয়োগের উপযোগী অবস্থা সৃষ্টির জন্য প্রচেষ্টা ছাড়া কিছুই নয়। ঐ পরিকল্পনায় এক ১১-দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে নিয়োগ সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হয়।

তারপর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং তৃতীয় ও চতুর্থের মধ্যের তিন বৎসরে তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনার প্রত্যেকটিতে নিয়োগ সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও দেখা যায় যে, দ্রব্যমূল্যের মত, জনসংখ্যার মত কর্মপ্রার্থীর সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এখানেও পরিসংখ্যানকে পরিহার করা ভাল। এমনকি পরিকল্পনা কমিশনও এই পথে চলেছেন—চূড়ান্ত চতুর্থ পরিকল্পনায় কর্মসংস্থানের লক্ষ্য নির্দিষ্ট না-করাই কমিশন যুক্তিযুক্ত মনে করেছেন। এই চূড়ান্ত পরিকল্পনায় শুধু বলা হয়েছে : যে সকল উন্নয়ন-কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে সেগুলি কার্যকর করা হলে বেশী পরিমাণে নতুন কাজ সৃষ্টি হবে।

মূল্যায়ন :

নতুন কাজ সৃষ্টির মাধ্যমে সম্প্রসারিত নিয়োগ দু রকমের : উৎপাদনশীল নিয়োগ এবং রিলিফ বা ত্রাণমূলক নিয়োগ। সম্প্রতি এই ত্রাণমূলক নিয়োগের ওপরই বেশী ঝোঁক পড়েছে দেখা যায়। এতে হয়ত অনিদ্রার ওষুধের মত কিছুটা আশু উপকার হতে পারে। কিন্তু নিরাময়ের পথ এ নয়—এক-শিক্ষক বিদ্যালয় ইত্যাদির দীর্ঘকালীন উপযোগিতা বিশেষ নেই। তাই আশু ফল-প্রদায়ী বটিকা সেবনের মত ত্রাণমূলক নিয়োগের ব্যবস্থা অপরিহার্য হলেও এর ওপর নির্ভরশীলতা দিন দিন কমাতে হবে। তা ছাড়া কর প্রদানকারীদের অর্থ সাময়িক ত্রাণকার্যেই নিয়োজিত হতে পারে, বর্তমান হারে চিরন্তন ত্রাণকার্য নয়। এর ফলে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণও ব্যাহত হতে বাধ্য।

কিভাবে মোকাবিলা করা যেতে পারে :

মৌল সমস্যা হল কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা এবং উৎপাদনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপ-করণের মধ্যে সুষ্ঠু সামঞ্জস্যবিধান করা। অধিকাংশ স্বল্পোন্নত দেশের মত ভারতও তা করতে সমর্থ হয়নি। একদিকে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ কর্মপ্রার্থীর তালিকায় অচিন্তনীয় ভাবে সংখ্যা বৃদ্ধি করে চলেছে, অপরদিকে সাড়া বিনিয়োগ ব্যবস্থা প্রয়োজনীয়ভাবে সংগঠিত ও পরিচালিত হচ্ছে না। সুতরাং জনসংখ্যার বৃদ্ধি রোধের প্রচেষ্টার সংগে সংগে সাড়া বিনিয়োগ ব্যবস্থাকে দৃঢ় ভিত্তিশীল ও সম্প্রসারণাভিমুখী করে তুলতে হবে। এই উদ্দেশ্যে সরকারী করনীতি, শিল্পনীতি প্রভৃতির প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করতে হবে যাতে লোক সঞ্চয়ে আগ্রহী এবং বিনিয়োগে উৎসাহী হয়। উৎপাদন ও নিয়োগের জন্যে এখনও যখন আমরা বেসরকারী উদ্যোগের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল তখন ঐ উদ্যোগকে সন্ত্রস্থ করে রাখা ভুল—যে-কোন শিল্পের মাথার ওপর অযথা জাতীয়করণের খাঁড়া ঝুলিয়ে রাখা চলবে না।

বিনিয়োগের এক অর্থ মূলধন গঠন—উৎপাদনের উদ্দেশ্যে যন্ত্রপাতি ইত্যাদি মূলধন-দ্রব্যের পরিমাণ বাড়ানো। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রনীতি ও কূটনীতির সংগে সংগতি বজায় রেখে বৈদেশিক মূলধন আনয়ন এবং বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও করতে হবে। এর জন্যেও প্রয়োজন সুস্পষ্ট শিল্পনীতির—এবং সুস্পষ্ট শ্রমনীতিরও। মোট কথা, পেটের জ্বালায় যে দুটো হাত কাজ খুঁজছে তাদের কাজে লাগাবার জন্যে অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক ব্যবস্থার পথে চলতে হবে। ঘন জনবসতিসম্পন্ন কিন্তু কাঁচামালের দুষ্প্রাপ্যতা নিয়ে যদি অনেক দেশ শিল্পোন্নত হতে পারে, মোটামুটি পূর্ণ নিয়োগব্যবস্থার সৃষ্টি করতে পারে, জীবনযাত্রার মানে উত্তরোত্তর বেকার সমস্যায় ভুগব কেন, আর উত্তরোত্তর উন্নয়নসাধন করতে পারে, তবে প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ আমরাই বা বেকার সমস্যায় ভুগব কেন, আর জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশই বা দারিদ্র্য-রেখার নীচে থাকবে কেন? কারণ নিশ্চয়ই আছে। কারণ হল ত্রুটিপূর্ণ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পদ্ধতি এবং ত্রুটিপূর্ণ সাংগঠনিক ব্যবস্থা। আর বোধহয় সামাজিক উৎসাহের অভাব। অন্যান্য পরিপূরক করণীয়ের মধ্যে আছে কৃষিকার্য ও গ্রামাঞ্চলের আকর্ষণ বৃদ্ধি করা। এদিকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সবুজ বিপ্লব এবং গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যে শ্বেত-বিপ্লব (দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি), নগরীকরণ প্রভৃতি বেশ কিছুটা কার্য সম্পাদন করেছে। কিন্তু আরও অনেক কিছু করতে হবে—অন্তত নগদ মজুরির আকর্ষণ কমাতে হবে এবং কৃষি ও অনুরূপ কাজ-কর্মকে আরও লাভজনক করে তুলতে হবে : এই ব্যাপারে রাজনীতি বা কোন ভাবাদর্শকে নাক গলাতে দিলে ভুল হবে।

শিক্ষিত বেকারদের সমস্যা একটু স্বতন্ত্র ধরনের। শান্তনু-পত্নী গংগাদেবীর মত মাতৃকল্প বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা-পর্ষদগুলি যাদের নিয়োগহীনতার নদীজলে ইতিমধ্যেই ভাসিয়ে দিয়েছেন তাদের তুলে নিয়ে পালনের ব্যবস্থা করতে হবে। তবে ভবিষ্যতে ঐ সব সংস্থা বিপুল হারে প্রসব করে আর যেন ভাসিয়ে না দেন সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। এও হল এক পরিকল্পনার প্রশ্ন—মানবশক্তি পরিকল্পনার প্রশ্ন। এই পরি-কল্পনাকে সর্বাত্মক পরিকল্পনার অংগীভূত করতে হবে। সাইমন কুজনেটস-এর মত আধুনিক সম্প্রসারণধর্মী অর্থনীতিবিদদের এই হল সুচিন্তিত অভিমত।

গৌড়-লক্ষ্মণাবতী-লখ্নৌতি

গৌড়!

ঠিক চারশো বছর আগে ধ্বংস হয়ে গেছে এই মহানগরী।

আজ আমি আবার এসেছি গৌড়ে। এই নিয়ে কতবার হলো? কেন এলাম আবার! সংখ্যাতত্ত্বপ্রিয় বন্ধুজনের উপহাস, আত্মীয়-স্বজনের বিরক্তি ও সন্দিগ্ধ কৌতূহল এবং নিস্পৃহতা, প্রত্নতাত্ত্বিক পরিচিত জনের উদাসীনতাকে কখনো রহস্যময় নীরবতায় কখনো সূক্ষ্ম আঘাতে আগ্রহী করে তোলার চেষ্টায় কখনো সমীহ করে— আমাকে নিবৃত্ত করার সব উদ্যমকেই পরাস্ত করেছি. কিন্তু হার স্বীকার করেছি নিজের কাছেই। গৌড়ের দুর্বার আকর্ষণী শক্তির কাছে ধরা দিয়ে এই নিয়ে প্রায় পঁচিশ বারের মতো আমি এলাম এখানে!

গৌড় আমাকে 'হন্ট' করে। আমি জাতিস্মরের মতো ঘুরে বেড়াই গৌড়ের মাটিতে! আমি জানি, বাঙালীমাত্রকেই এই নামটি স্মৃতিচারী করে তোলে।

সে তো আজকে নয়, বহুকাল আগে থেকেই এই বিশেষ শব্দটি একটি বিশেষ দেশের, একটি জাতির, একটি বিশেষ সংস্কৃতির পরিচয় বহন করছে।

মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কর সময়ে যে গৌড়ের উদ্ভব, পরবর্তী একশ' বছরব্যাপী ভয়াবহ মাৎস্যন্যায়ে যার ক্ষণিক অবলুপ্তি এবং তারপর পালবংশের অভ্যুদয়ে যার পুনর্জাগরণ পরবর্তী সেনবংশ, খিলজী, পাঠান, হাবশী বা বাঙালী সম্রাটদের আমলে যার চূড়ান্ত স্ফূর্তি এবং আজো অসংখ্য কবির কাব্যে, লৌকিক জীবনের নানা আচরণে যার স্মৃতি ছায়া ফেলে—সেই সুপ্রাচীন ভূখণ্ডে এসে নিজেকে অভিভূত বোধ করি!

এই কি সেই গৌড়, পালবংশের রাজধানী বাণগড়ের পর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত নবদ্বীপের নবনৃপতি বংশ সেনদের রাজধানী গৌড়—যার নাম পরিবর্তন করে সম্রাট লক্ষ্মণ সেন রেখেছিলেন লক্ষ্মণাবতী! এই লক্ষ্মণাবতীই কি পরবর্তী মুসলমান শাসকদের রাজধানী লখ্নৌতি—গৌড়!

আমি ফিরে তাকাই এর প্রাচীন ইতিহাসের দিকে। গৌড় নামের উদ্ভব সম্ভবত 'গুড়' থেকে। এককালে এখানে ইক্ষুর চাষ হতো অধিক পরিমাণে। গুড় উৎপন্ন হতো। সম্ভবত সেই থেকেই এই নামের উৎপত্তি—কোন সঠিক সিদ্ধান্তের কথা আমার জানা নেই। শুধু জানি, সুপ্রাচীন পাণিনি সূত্রে 'গৌড়পুর' নামে এক জনপদের উল্লেখ আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গৌড়, পুণ্ড্র, বঙ্গ আর কামরূপের শিল্প ও কৃষিপ্রসঙ্গ আছে। পাণিনির টীকাকার পতঞ্জলি পরিচিত ছিলেন গৌড়দেশের সঙ্গে। বাৎস্যায়নও কামসূত্রে গৌড় নাগরিকদের বিলাসব্যসন গৌড়-নারীদের মৃদুবাক্য ও মৃদু অঙ্গের বর্ণনা দিয়েছেন।

*

*

উৎপল চক্রবর্তী

রামকেলির তমালতলার মন্দির। এখানে শ্রীগৌরাঙ্গের পদচিহ্ন আছে।

মৎস্যপুরাণে উল্লেখ আছে গৌড়-দেশের। বরাহমিহির গৌড়ক পুণ্ড্র বঙ্গ সমতট বর্ধমান ও তাম্রলিপ্তক নামে ছয়টি জনপদের উল্লেখ করেছেন। গৌড়ের উল্লেখ আছে দণ্ডীর কাব্যাদর্শে, রাজশেখরের কাব্যমীমাংসায়, মুরারির অনর্ঘরাঘবে, কৃষ্ণ মিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে, কহ্লনের রাজতরঙ্গিণীতে এবং অসংখ্য জৈন বৌদ্ধ হিন্দু ধর্মগ্রন্থে, অজস্র শিলালিপি আর তাম্রলেখে। তবু এত উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও সেই সংশয় রয়েই গেছে। বিভিন্ন যুগে গৌড় বলতে কি একটি বিশেষ ভূখণ্ডকেই বোঝাতো?

কখনো মনে হয়, মুর্শিদাবাদ-বীরভূম-পশ্চিম বর্ধমান ছিল গৌড়ের সীমারেখা, যার রাজধানী ছিল চম্পানগর। সেই চম্পাই কি এখন বর্ধমান শহরের উত্তর-পশ্চিমে দামোদর নদের তীরে চাঁপা গ্রাম!

ভবিষ্যপুরাণ বলে, গৌড়ের উত্তরে পদ্মা, দক্ষিণে বর্ধমান। জৈন গ্রন্থ সাক্ষ্য দেয়, মালদহ জেলার লক্ষ্মণাবতীই সেই গৌড়। ঈশান বর্মন মৌখরীর হড়াহালিপি জানায়, 'গৌড়ান্ সমুদ্রাশ্রয়ান'। অর্থাৎ গৌড়ের সীমা সমুদ্র থেকে দূরে ছিল না। এই লিপি ষষ্ঠ শতকের। সপ্তম শতকে মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত 'গৌড়-তন্ত্র' সমগ্র ভারতবর্ষে নামটিকে ছড়িয়ে দিল। এই একটি শব্দের আড়ালে বাংলা ও বাঙালীর পরিচয় বিধৃত হয়ে রইল।

শশাঙ্কের গৌড় নিশ্চিতই মুর্শিদাবাদ অঞ্চল, কর্ণসুবর্ণ তাঁর রাজধানীর নাম, যা আজ রাঙ্গামাটি কানসোনা নামের এক বিবর্ণ গ্রাম হয়ে ঐ জেলারই নিভৃতে অন্তিম মুহূর্তের অপেক্ষায় আছে।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড়ের ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা। দীর্ঘ একশ' বছরব্যাপী অরাজকতার অশুভ তাণ্ডব। রাঢ় বঙ্গ সমতট তাম্রলিপ্ত স্বাতন্ত্র্যলাভের হিংস্র সংঘর্ষে বিশৃঙ্খল! অবশেষে একদিন সেই অন্ধযুগের অবসান ঘটিয়ে আবির্ভূত হলেন গোপাল দেব, নিপীড়িত জনগণের মনোনীত প্রতিনিধি—বাংলার প্রথম গণ-নেতা! প্রতিষ্ঠিত হলো পালবংশ। রাজ-ধানী স্থানান্তরিত হলো তাঁর জনকভূমি বরেন্দ্রভূমিতে—বাণগড়ে।

গৌড় নামটি আবার রাজ-উপাধিতে স্থান পেলো। পাল-সম্রাটরা গৌড়াধিপ বা গৌড়েন্দ্র বা গৌড়েশ্বর নামে পরিচিত হলেন।

দুশো বছর রাজত্বের পর পালবংশ কর্ণাটকীর সেনবংশের হাতে দেশশাসনের ভার তুলে দিতে বাধ্য হলেন। রাজধানী স্থানান্তরিত হলো বাণগড় থেকে গৌড়ে। বরেন্দ্রভূমি থেকে মালদহে। সম্রাট লক্ষ্মণ সেনের নামে নামান্তরিত হলো—লক্ষ্মণা-বতী।

সেই লক্ষ্মণাবতীই কি এই গৌড়?

এখন যে রাস্তা মালদহ শহর থেকে বেরিয়ে রাজমহলের দিকে গিয়েছে, ঐ পথে কিছুদূর এগোলে বাগবাড়ী নামে এক জায়গায় এসে অনুসন্ধিৎসু চোখ চমকে ওঠে। দেখা যায়, ডানদিকে বিশাল গড়ের ভগ্নাবশেষ, নীচে মৃত পরিখা। আর কিছু নেই, তবু লোকে বলে, এই হলো বল্লাল-বাড়ী যা এখন বাগবাড়ী নাম নিয়েছে আর এইখানেই ছিল বল্লালসেনের উদ্যান-বাড়ী—রাজপ্রাসাদ। কিছুদূরে অমৃতি গ্রামের কাছে পিছলি-গঙ্গারামপুর নামে এক জায়গায় ছড়ানো অসংখ্য প্রত্নচিহ্ন দেখিয়ে অনেকে বলেন, এইখানেই ছিল সম্রাট লক্ষ্মণ-সেনের শেষজীবনের বাসভূমি। বল্লালবাড়ী, রামভিটা, চণ্ডীপুর, পটলচণ্ডী, লোহাগড়, অমৃতি, কমলাবাড়ী ইত্যাদি গ্রামের নাম প্রাচীন হিন্দু যুগের সাক্ষ্য বহন করে আজো এবং ঐ কমলাবাড়ী গ্রামের কাছে সাগরদীঘির উত্তর-পশ্চিমে এক মাইল দূরে কানিংহামের সময়ও গৌড়ের অন্যতম প্রধানা দেবী গৌড়েশ্বরী পূজিতা হতেন।

গঙ্গার তীরে গড়ে উঠেছিল গৌড়-নগরী। মালদহের কালিন্দ্রী নদী দিয়েই জলধারা প্রবাহিত হতো বেশী পরিমাণে। পরে গঙ্গা খাত পরিবর্তন করে। ফলে হিন্দুযুগের সেনযুগের লক্ষ্মণাবতীও স্থানান্তরিত হয়। শুধু গড়ের ভগ্নাবশেষ, পরিখার নিষ্প্রাণ দেহ, কয়েকটি গ্রামের নাম, কিছু প্রত্নচিহ্নের বুকে তার লুপ্ত-প্রায় অস্তিত্ব নিয়ে সে তার অতীতকে মুখর করে তুলতে চায়। ঐ বাগবাড়ীর কাছেই যে রাজনগর গ্রাম, ওখানে কি বল্লালসেনের কোন স্মৃতিচিহ্ন আছে? এখন বোধহয় কিছুই পাবার আর উপায় নেই।

বাণগড়ের পর যে গৌড়-লক্ষ্মণাবতী তার চতুঃসীমা, কোন সৌধ, কোন মন্দির আজ আর নেই। রাজধানী পরিক্রমা করতে এসে বিভিন্ন সংগ্রহশালায় রক্ষিত প্রস্তরমূর্তি কোন প্রত্নরত্ন, কয়েকটি স্থান, কয়েকটি গড়ের কংকাল আর সম্রাট লক্ষ্মণসেনের আমলে খনিত, মালদা শহর থেকে মাইল সাতেক দূরে সাদুল্লাপুর মহাশ্মশানে যাবার পথের পাশের বড় সাগরদীঘি দেখে লক্ষ্মণাবতীর অতীত ঐশ্বর্য অনুমান করে নিতে হয়। একাদশ শতাব্দীতে দুর্ধর্ষ বখ্‌তার-ইয়ারের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য যখন অসহায় সম্রাট লক্ষ্মণসেন গঙ্গাতীরস্থ তাঁর অপর রাজধানী নদিয়া ছেড়ে সংকনাট বা বঙ্গের দিকে চলে যেতে বাধ্য হলেন, তখন সেই নদিয়াও ধ্বংস হয়ে গেল বখ্‌তার-ইয়ার-এরই হাতে।

তার চিহ্নও আজ কোথাও নেই। শুধু এখনকার নবদ্বীপ শহরের কাছে এক উঁচু ভূখণ্ড দেখিয়ে স্থানীয় মানুষেরা বলেন, ঐ হলো বল্লাল ঢিবি। ঐখানেই ছিল ধর্মানুরাগী সম্রাট বল্লালসেন লক্ষ্মণসেনের রাজবাড়ী। হতে পারে। ভূখণ্ডটির উচ্চতা এবং অসংখ্য ছোট ছোট প্রাচীন ইঁটের সাক্ষ্য দেখে অনুমান হয়, এইখানে সেন-বংশীয় সম্রাটদের কোন স্মৃতিচিহ্ন মাটির গভীর গোপনে হয়ত লুকিয়ে আছে। এখনও পর্যন্ত প্রত্নতত্ত্ববিভাগ এটি খুঁড়ে দেখার কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। কোন ব্যক্তিগত উদ্যমও অনুপ-স্থিত বলে, বাংলার ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের ইতিহাস আজো সঠিকভাবে জানা যায়নি।

বড় বিস্ময় লাগে, বাংলায় সেনবংশের রাজত্বের ইতিহাস কিছু কম দিনের নয়, এবং এ-বংশের দুজন সম্রাট বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের নাম আজও বাঙালীর স্মৃতিতে, লৌকিক ক্রিয়াকর্মে, প্রবাদে, জীবন্ত হয়ে আছে, অথচ তাঁদের রাজধানী, তাঁদের কোন স্মারকচিহ্ন সংরক্ষণের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। কোথায় ছিল সম্রাট বল্লাল সেনের সেই প্রাসাদ, যেখান থেকে একদিন তিনি স্বেচ্ছায় লক্ষ্মণসেনের হাতে রাজ্যভার তুলে দিয়ে কর্ণাট-চালুক্যরাজ দ্বিতীয় ভাগদেকমল্লের মেয়ে রাম দেবীকে নিয়ে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে নিরঞ্জনপুরে চলে যান। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'অদ্ভুতসাগর' রচনা করছিলেন তিনি তখন। সেই গ্রন্থ অসমাপ্তই থেকে যায়।

কোথায় ছিল মহাকবি উমাপতি ধর, মহাপণ্ডিত হলায়ুধ মিশ্র, ধোয়ী শরণ ইত্যাদি 'নবরত্ন' পরিবৃত সম্রাট লক্ষ্মণ-সেনের রাজসভা। সে কোথাকার গঙ্গার তীর, যেখানে দাঁড়িয়ে একদিন লক্ষ্মণসেন আর হলায়ুধ প্রত্যক্ষ করেছিলেন এক অসাধারণ দৃশ্য। দেখছিলেন তাঁরা, এক ফকির যেন অলৌকিক পায়ে হেঁটে আসছেন গঙ্গার ওপর দিয়ে। পার হয়ে এসে থমকে দাঁড়িয়ে সেই ফকির জিজ্ঞাসা করেন সম্রাটকে—

—আপনি কে?

—আমি পৃথিবীপালক সম্রাট লক্ষ্মণ-সেন। উত্তর দেন বিস্মিত সম্রাট। হাসেন সেই ফকির। বলেন,

—আপনি যদি পৃথিবী-পালকই হন, তবে ঐ যে বকটি মাছ ধরছে, ওকে মাছ ছেড়ে উড়ে যেতে আদেশ করুন।

বিস্মিত সম্রাট এবার ক্রোধান্বিত হন।

—ওই বক তির্যগ্‌যোনি। ও আমার কথা শুনবে কেন?

—আমার কথা শুনবে।

বলেন, আর বককে উড়ে যেতে আদেশ করেন ফকির। সম্রাটের বিস্ময়কে চমকে দিয়ে উড়ে যায় বকটি। এবার ফকিরের ক্ষমতায় অভিভূত বোধ করেন সম্রাট। তাঁকে রাজসভায় আমন্ত্রণ জানান। আর মুগ্ধতার মূল্য হিসেবে পাণ্ডুয়ায় কিছু ভূখণ্ড দান করেন ফকিরকে মসজিদ তৈরীর জন্য। সেই মসজিদ আজো আছে মালদহের পাণ্ডুয়ায়। পীর শেখ জালালুদ্দীন তাবরেজী নির্মিত সেই মসজিদ। যার ভিত খুঁড়তে গিয়ে বহুমূল্য রত্ন পেয়ে যান পীর এবং তা দান করেন লক্ষ্মণসেনেরই পারিষদবর্গকে।

কোথায় সেই প্রাসাদ, যার কক্ষে একদিন অনুতাপ অনুশোচনার তীব্র অনলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছিলেন মহাসান্ধিবিগ্রহিক মহামন্ত্রী হলায়ুধ মিশ্র' রাজ্যের প্রজা-বর্গকে রক্ষা করার দায়িত্ব যাঁর, সুনীতি রক্ষক এবং সচ্চরিত্রের খ্যাতিতে যিনি গৌড়ের সর্বত্র সম্মানিত, তিনি গত রাত্রে গৌড়েরই এক ছলনাময়ী নটীর মায়ায়

ক্ষণিকের জন্য মুগ্ধ হয়ে নিজের শরীরী পবিত্রতা নষ্ট করেছেন! সুদেহী সুদর্শন হলায়ুধকে মোহের কাছে পরাস্ত হতে দেখে সম্ভোগ-ক্লান্ত বারবধূ হেসে উঠেছে বিজয়িনীর মতো! আর নিজের স্ত্রী ভেবে বিলাস-মত্ত হয়ে পরে ভুল বুঝতে পেরেছেন যখন হলায়ুধ তখন তীব্র আত্মধিক্কারে নিজেকে হত্যা করার সংকল্প দৃঢ় করার জন্য অস্থির পদচারণা শুরু করেছেন প্রাসাদ কক্ষে! অবশেষে সেই চরমলগ্ন! দৃঢ় অথচ গ্লানিতে বিষণ্ণ পায়ে রাজসভায় প্রবেশ করলেন হলায়ুধ! উদ্বিগ্ন সম্রাট আর পারিষদবর্গকে অকপটে জানালেন তাঁর ক্ষণিক মোহের ভুলের কথা! আর জানালেন, গৌড় রক্ষার জন্য তিনি তুষানলে প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। এ আদেশ দেশের আইনরক্ষক হিসেবে, মহাসান্ধিবিগ্রহিক হিসেবে নিজেই নিজের প্রতি জারী করেছেন। শঙ্কিত হলেন লক্ষ্মণ সেন! জানালেন, পিতার আমল থেকে যিনি সুপরামর্শ আর সুশাসনের দণ্ড হাতে রাজ্য রক্ষা করছেন তাঁকে বিসর্জন দিতে তিনি আদৌ প্রস্তুত নন। কিন্তু হলায়ুধ তাঁর সংকল্পে অটল! শেষে সকলের অনুরোধ, আদেশ শঙ্কাকে উপেক্ষা করে জ্বলন্ত তুষের আগুনে একটি পাবক শিখার মতোই জ্বলে উঠলেন মহাপণ্ডিত হলায়ুধ মিশ্র! গৌড় রক্ষার জন্য, সুনীতি রক্ষার জন্য একটি আদর্শ স্থাপন করলেন!

কিন্তু বোধ হয় ভুলই করেছিলেন হলায়ুধ! তিনি জানতেন না, গৌড়ে তখন ব্যভিচারের অন্যায়ের দুর্নীতির কি প্রাবল্য!

ধর্মানুরাগী, কাব্যপ্রিয়, জ্যোতিষী-নির্ভর সম্রাট লক্ষ্মণ সেনের সদ্ব্যবহারের সুযোগ নিয়ে রাজ্যব্যাপী এক ষড়যন্ত্র আর বিলাস-ব্যসনের শিথিল উল্লাস দানা বেঁধে উঠেছে। প্রকাশ্য রাজপথে গণিকারা প্রলুব্ধ করছে পথিকদের, সর্বত্রই অনাচার আর এরই সুযোগে এক শ্রেণীর লোক বিদেশী শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে সম্রাটের পতন ঘটাবার আয়োজনে তৎপর হয়ে উঠেছে! ঐ পীরেরই কাছে দীক্ষা নিয়েছেন অনেকে! পাণ্ডুয়ার গোপ কালু ঘোষ নাম নিয়েছেন কালী পীর এবং হিন্দু রাজত্বের অবসান ঘটানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। বৃদ্ধ রাজা নদীয়ার প্রাসাদে বসে অশুভ সঙ্কেত শুনতে পাচ্ছেন। কিন্তু কিছুই করার নেই আর! এবং এরই মধ্যে শোনা গেছে দূরাগত এক তুর্কী লুণ্ঠকের দর্পিত অশ্বক্ষুর ধ্বনি! উত্তর ভারত, বিহার ধ্বংস করে গৌড়ের দিকে এগিয়ে আসছেন মহাপরাক্রমী বখত-ইয়ার খিলজী! রাজ জ্যোতিষীরাও জানিয়েছেন এক দীর্ঘবাহু কদাকার যবনের হাতে এদেশ বিনষ্ট হবে এমন কথা শাস্ত্রেই আছে! সংবাদ এনেছেন গোপন দূত, সেই দুর্ধর্ষ তুর্কী সেনানায়কের সঙ্গে শাস্ত্রের বর্ণনার সত্যিই মিল আছে। ত্রাসে-উত্তেজনায় গৌড় ছেড়ে চলে গেছেন বণিক ও নাগরিকেরা! নদীয়ার প্রাসাদে একা অসহায় সম্রাট লক্ষ্মণ সেন। না, রাজ্য ছেড়ে ভয়ে তিনি পালান নি। প্রজানুরঞ্জক, সুশাসক সম্রাটের নীতিতে এমন কোন নির্দেশ নেই!

অবশেষে ১২০১ সালের এক মধ্যাহ্ন! প্রাসাদে দ্বিপ্রাহরিক আহারে বসেছেন সম্রাট। সোনার থালায় পরিবেশিত হয়েছে ভোজ্যবস্তু! আর সেই সময় প্রাসাদ দ্বারে উঠল তুমুল কোলাহল। ১৮ জন অশ্বারোহীর ছদ্মবেশে তোরণ দ্বার অতিক্রম করে প্রাসাদের দিকে এগিয়ে আসছেন নিষ্ঠুর বখত-ইয়ার! হত্যার বীভৎসায় মেতে উঠেছে তার অনুচরেরা! আর দেরী নয়! আসন ছেড়ে উঠে দ্রুত পায়ে পশ্চাৎ দ্বার দিয়ে গঙ্গা তীরে এলেন বৃদ্ধ সম্রাট! নৌকা প্রস্তুত ছিল ঘাটে! তাঁকে নিয়ে সেই নৌকো এবার এগিয়ে চলল বঙ্গ বা সংকনাটের দিকে!

শেষ হয়ে গেল গৌড়ে হিন্দুদের আধিপত্য!

এর পর দীর্ঘ সাড়ে তিনশ বছর-ব্যাপী তুর্কী পাঠান হাবশী আর বাঙালী মুসলমানদের রাজত্বকাল।

সেনানায়ক বখত-ইয়ার শাসন কাজের সুবিধার্থে রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন সেই প্রাচীন বরেন্দ্রভূমিতে, তাঁদের ভাষায় বারিন্দ-এ, পাল সম্রাটদের রাজধানী বাণগড়ের কাছে দেবকোট বা দেবীকোট-এ। কিন্তু সে ছিল অস্থায়ী সেনানিবাস মাত্র, রাজধানী ফিরে এল লক্ষ্মণাবতীতেই। কিন্তু এবার নাম পরিবর্তন করে রাখা হলো লখনৌতি। গৌড়- লক্ষ্মণাবতী এবার হলো লখনৌতি-গৌড়। হিন্দু যুগের মন্দির-গুলির শীর্ষ লুটিয়ে পড়ল ধুলোয়। নতুন যুগের নতুন স্থাপত্যে শোভিত হলো গৌড়-নগরী। গড়ে উঠল অসংখ্য মসজিদ, মিনার। জেগে উঠল নতুন গৌড়। এই সেই লখনৌতি! সেই গৌড়।

বল্লালসেনের নয়, লক্ষ্মণসেনের নয় মুসলমান যুগের গৌড়। হিন্দুযুগের গৌড়কে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না কোথাও। তবু, এই লখনৌতির আড়ালেই যে রয়ে গেছে লক্ষ্মণাবতীর স্মৃতি, এখনকার অজস্র মসজিদের গায়ে যে প্রোথিত আছে হিন্দুধর্মের দেব-দেবীর মূর্তি বা তার আভাস, পোড়া মাটির অসংখ্য কাজে যে রয়েছে হিন্দু শিল্পকলার ঐতিহ্যের রেখাচিত্র, লক্ষ্মণাবতীর শরীরই যে লখনৌতির সজ্জায় আজ আমার সম্মুখে উদ্ভাসিত—এ সত্য ভুলতে পারি না মুহূর্তের জন্যও। তাই বাণগড়ের পর লক্ষ্মণাবতী পরিক্রমা করতে এসে লখনৌতি-তেই আসতে হয়। কৈশোর থেকে যৌবনের প্রারম্ভকাল পর্যন্ত যখন মালদায় ছিলাম তখন থেকে আজ অবধি এত দূরে চলে এসেও বার বার এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে ছুটে যেতে হয় গৌড়ে—আমি জানি, গৌড় বাংলার ইতিহাসের এক-একটি যুগান্তকারী ঘটনার সাক্ষী গৌড় ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক স্থানগুলির মধ্যে দিল্লীর মতোই গুরুত্বপূর্ণ।

ঘটনার ঘনঘটায়, রাজনীতিতে-কৌশলে চমকে, শিল্পসাহিত্য ও দর্শনে জগতে এক-একজন যুগন্ধর প্রতিভার আবির্ভাবে ভারতের ইতিহাসে গৌড় এক অনন্য-রূপে, বিস্ময়কর অধ্যায়ের জনক হয়ে উঠেছে।

অথচ আজ তার সীমাহীন, শ্রীহীন মূর্তি! ১৫৭২ সাল। সম্রাট আকবর গৌড়-মণ্ডলের নাম পরিবর্তন করে 'সুবা-বাংলা' রাখেন। সেনাধ্যক্ষ মুনিম খাঁকে পাঠান গৌড়ের শেষ স্বাধীন সুলতান দায়ুদ খাঁর স্বাতন্ত্র্য লাভের বাসনাকে চূর্ণ করে দিতে। পরাস্ত হয়েছিলেন দায়ুদ, আর তাঁর রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই চিরকালের মতো হারিয়ে গেল গৌড় নামটি! এর পর শুরু হয় বঙ্গ বা বাংলার রাজত্ব! আর এই ভূখণ্ড? এত দিনের এত স্মৃতি-বিজড়িত এই নামটি হারিয়ে যাবার দুঃখ বোধ হয় গৌড় সহ্য করতে পারল না। এক কাল ব্যাধি গ্রাস করল গৌড়কে। গঙ্গা আবার খাত পরিবর্তন করলো। ভয়ংকর প্লেগে মারা গেলেন স্বয়ং মুনিম খাঁ। সন্ত্রস্ত নাগরিকেরা ধন-সম্পদ পরিত্যাগ করে চলে গেলেন অন্যত্র। ঘন অরণ্য আবৃত করল গৌড়ের লজ্জা! যেভাবে হারিয়ে গেছে গৌড় কর্ণসুবর্ণ বাণগড় আর লক্ষ্মণাবতী—সেভাবেই হারিয়ে গেল লখনৌতি-গৌড়!

সে এক বেদনাময়, পীড়াদায়ক নির্মম ইতিহাস। লোভী লুণ্ঠক দস্যুদল পরে এক এক করে অপহরণ করল গৌড়ের পরিত্যক্ত সম্পদ, সুদৃশ্য অট্টালিকাগুলির অলংকৃত পাঁজর খসিয়ে সম্রাট হুমায়ুনের 'জিন্নাতাবাদ' বা স্বর্গপুরী গৌড়কে শ্মশানের ভয়ানক শূন্যতায় পরিণত করল পরবর্তীকালের মানুষেরা। রাজধানী তাণ্ডা থেকে রাজমহল, রাজমহল থেকে ঢাকা, ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদ, মুর্শিদাবাদ থেকে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ কি বাংলা এই নামের আড়ালে আত্মগোপন করল বাঙালীর চিরন্তন স্মৃতিবিজড়িত 'গৌড়' নামটি! হারিয়ে গেল বিস্মৃতির অতলে।

কিন্তু সত্যই কি হারিয়ে গেল?

আজ আবার ঠিক চারশো বছর পর এই ১৯৭২ সালে যখন পশ্চিম বাংলার নাম পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল তখন পণ্ডিতজনের প্রস্তাবে সেই 'গৌড়' নামটিই আবার উচ্চারিত হলো। এখনো বহু প্রতিষ্ঠানের নামের সঙ্গে অসংখ্য কবির রচনায় এই নামটি ছড়িয়ে থেকে দেখতে পাই। স্বীকার করতেই হবে গৌড় নামটির প্রতি বাঙালীমনেরই একটি প্রচ্ছন্ন দুর্বলতা আছে।

বাঙালী আমি তাই স্মৃতিতর্পণ করার চারশো বছর পর আর একবার পা রেখেছি গৌড়ের মাটিতে—চারশো বছর আগেকার রূপ কেমন ছিল তা স্মৃতির চোখে দেখব বলে!

সম্ভব হয় না কি? ... বিস্তৃত, বারো ক্রোশ লম্বা ... মাত্র বারো ... কোন সুবৃহৎ বিশাল এই মহানগরীর সীমা যে কোথায়

থেকে শুরু আর কোথায় বা তার শেষ এতবার এসেও তার কোন স্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পাই না।

একাধিক সুউচ্চ বাঁধ আর গড় দিয়ে এ নগরী রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন গৌড়-সুলতানেরা, মণিময় প্রাসাদ আর সুরম্য অট্টালিকায় শোভিত করেছিলেন এই মহানগরীকে—প্রকৃতি আর মানুষের নির্মম অত্যাচারে আজ তার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভগ্নাংশ মাত্র আছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে গড়ের মাথা লুটিয়ে পড়েছে ধুলোয়, পরিত্যক্ত সম্পদের লোভে গৌড়ের বুক খুঁড়ে ক্ষতবিক্ষত করেছে নির্বিবেক লুণ্ঠকেরা, সুদৃশ্য রাজপ্রাসাদ ভেঙে গড়ে উঠেছে মুর্শিদাবাদের হীরাঝিল প্রাসাদ, বাসগৃহের ইঁট পাঁচ টাকায় পাঁচশো গাড়ি কিনে উত্তরাধিকারীরা গড়ে তুলেছে মালদহ ও মুর্শিদাবাদ শহর! অর্থগৃধ্নু মানুষের হাত এড়াতে পেরেছে শুধু কয়েকটি মসজিদ—তাও ধর্মীয় কারণে। আর ধর্মকে যাঁরা প্রয়োজনমত ব্যবহার করেন তাঁদের শাবলের আঘাতে ঝরে গেছে অনেক মসজিদের মীনাকরা রঙীন কারুকার্য!

আজো ঝরে যায়। গৌড়কে শ্রীহীন করার হীন প্রয়াসে আজও মত্ত আছেন এমন অসংখ্য দর্শনার্থী যাঁরা দেশ-বিদেশ থেকে পিকনিক করতে বা বেড়াতে আসেন এখানে, সীমাহীন অজ্ঞতা নিয়ে যাঁরা রামকেলীর মন্দির, বারোদুয়ারী, দখল দরওয়াজা, ফিরোজ মিনার, লুকোচুরি দরওয়াজা, কদম রসুল, চিকা মসজিদ, গুমটি দরওয়াজা, লোটন মসজিদ, চামকাটি মসজিদ, তাঁতিপাড়া মসজিদ দেখে ফিরে যান এবং যাবার সময় স্মারকচিহ্ন হিসেবে সংগ্রহ করেন অমূল্য প্রত্নতত্ত্ব—সে যেভাবেই হোক!

কেউ নেই আর অসহায় গৌড়কে রক্ষা করার। রাজপ্রহরীর অস্তিত্ব তো কবে ধুলায় হয়েছে ধুলি, একালেরও কোন প্রহরী নেই, একজন গাইডও নেই যিনি অন্তত একটা মমতার আবেশ তৈরী করতে পারেন! ফলে পর্যটকের তৃষ্ণা মেটে শুধু দণ্ডায়মান ঐ কটি মসজিদ, মিনার, মন্দির দেখে আর তার সামনে নীল এনামেল প্লেটে লেখা সরকারী পরিচয়জ্ঞাপক কিছু শব্দসমষ্টি পাঠ করে। একজন কর্মচারী আছেন গৌড় মিউজিয়ামে, আছেন একজন খাদেম যাঁর কাছে হজরত মহম্মদের পদচিহ্ন সযত্নে রক্ষিত আছে, কিন্তু তাঁরাও বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষের সব পরিচয় জানাতে পারেন না। চিকা মসজিদ থেকে কিছু দূরে ঐ বিশাল বাইশগজী প্রাচীরের আড়ালে যে গৌড় সুলতানদের রাজপ্রাসাদ ছিল ফিরোজ মিনারের পাশে বাঁশবনের অন্ধকারে আজো যে নিভৃতে জেগে আছেন গৌড়ের প্রধান আরাধ্যা গৌড়েশ্বরী দেবী—সে সংবাদ কেউই পান না!!

আর, মালদহ শহর থেকে গৌড়ে যাবার পথে ডানহাতি সাদুল্লাপুর মহাশ্মশানে যাবার রাস্তার ধারে যে বিশাল বড় সাগর দীঘি—প্রকৃতপক্ষে ওখান থেকেই যে গৌড়ের দ্রষ্টব্য স্থান শুরু হলো, তার খবরই বা কজন রাখেন! এই সেই বড় সাগরদীঘি যেটি খনন করিয়েছিলেন সম্রাট লক্ষ্মণ সেন। এবং এরই মাটি দিয়ে তৈরী হয়েছিল গৌড়ের নিটকবর্তী বিখ্যাত কাদামাটির দুর্গ একডালা। সেই একডালা যে কোথায় আজও তা সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নি।

এক মাইল দীর্ঘ ও এক মাইল চওড়া এই দীঘিরই উত্তরে যে উঁচু জায়গা সেটি ছিল গৌড়ের বাণিজ্য কেন্দ্র। কাছে পীরাণ-পীরের মসজিদে যাবার পথে যে পুরনো সাঁকো আছে, তার তলা দিয়ে নৌকো করে গৌড় শহরে ভেতরে মাল সরবরাহ করা হতো।

এরই কাছে দ্বারবাসিনী দেবীর মন্দির। গৌড়ের অন্যতম প্রধানা উপাস্য দেবী। হিন্দু যুগের আর এক স্মৃতি চিহ্ন পিরান-ই-পীরের মসজিদ বা আখি সিরাজুদ্দীনের সমাধিস্থান এবং ঝনঝনিয়া মসজিদ নিকটবর্তী আর দুটি দ্রষ্টব্যস্থান, মুসলমান যুগের। সাগর দীঘির উত্তর পশ্চিম কোণে আখি সিরাজুদ্দীনের সমাধিস্থান। ইনি একজন বিখ্যাত পীর ছিলেন এবং পাণ্ডুয়ার নূর-কুতুব-উল আলমের ধর্মীয় পিতামহ হিসেবে অত্যন্ত সম্মানিত ছিলেন। শোনা যায়, নূর-কুতুবের পিতা শেখ আলাউল হক এঁর শিষ্য ছিলেন এবং আজো যখন ঈদ্-উল-ফিতর এবং বকর্-ঈদ উপলক্ষে এখানে বিরাট মেলা বসে তখন পাণ্ডুয়া থেকে ঝাণ্ডা, নূর-কুতুবের পাঞ্জা ইত্যাদি এখানে আনা হয়। পীরের সমাধিস্থানের সম্মুখের দেয়ালের দুদিকে যে শিলালেখ আছে তা থেকে জানা যায় সুলতান হুসেন শাহ এবং তাঁর পুত্র নসরৎ শাহের সময় এখানকার প্রবেশ দ্বার ও সমাধিস্থান তৈরী হয়েছিল। প্রবেশ দ্বারগুলি এখন আর অক্ষত নেই। কিন্তু পোড়া ইঁটের কারুকার্য মণ্ডিত শোভা আজও ধ্বংস প্রাপ্ত দ্বারের শোভা বুকে ধরে রেখেছে। সমাধি যেখানে দেয়া হয়েছে সে জায়গাটি বেশ বড়। কথিত আছে, পীরের সঙ্গে তাঁর নিত্য-ব্যবহার্য কোরান-ই-শরীফ, তরবীহ, এবং বই রাখার স্ট্যাণ্ডটিও তাঁর শিয়রের কাছে রাখা হয়েছে।

এরই কিছু দূরে ১৫৩৮ সালে সুলতান গিয়াসুদ্দীন মহম্মদ শাহের তৈরী ঝনঝনিয়া মসজিদ, যাকে র্যাভেনশ জান-জান মিঞার মসজিদ বলে উল্লেখ করেছেন তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে। মসজিদে প্রোথিত শিলালিপি থেকে জানা যায় মালতী নামে একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা এই মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। এবং নির্মাণ-সময়ের উল্লেখ থেকে মনে হয় সম্ভবত এইটিই গৌড়ে তৈরী সর্বশেষ মসজিদ। এর কিছুকাল আগে বা পরে লুকোচুরি দরওয়াজা তৈরী হয়। কে ছিলেন এই মসজিদ নির্মাণকারিণী মালতী আজ আর তা জানা যায় না। শুধু নীরব পাথরের অক্ষর তাঁর স্মৃতিকে অক্ষয় করে রেখেছে। আমি যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছুলাম, তখন বিশেষ পরব উপলক্ষে সেই মসজিদের ভেতর থেকে বিংশ শতাব্দীর ধর্মপ্রাণ মানুষের প্রার্থনার স্বর ভেসে আসছিল। তাঁদের আন্তরিক আকুল আহ্বান, মনে হচ্ছিল, যেন এক-একটি যুগের সীমা অতিক্রম করে সেই পুরনো দিনগুলোকে স্পর্শ করতে চাইছে।

ফিরে আসতে হয় পুরনো পথেই। এবার মালদা-গৌড় সড়ক। এই পথেরই দুধারে ছড়ানো আছে গৌড়নগরীর অন্যান্য স্মারকচিহ্ন। কিছুদূরে এগোলে আগ্রহী চোখ থমকে দাঁড়ায় বাঁহাতি দুটো বড় পাথরের স্তম্ভ দেখে। লোকে বলে, এ-দুটো নাকি হাতি বাঁধা থাম। রাজার হাতি বাঁধা থাকত এখানে। ইতিহাস জানায়, আসলে এ-দুটি কোন রাজকর্মচারীর বাসগৃহের তোরণদ্বার। সেই বাসগৃহ কবে ধুলোয় একাকার হয়ে গিয়েছে, সেখানে আধুনিক মানুষ মাটির ঘর বেঁধেছেন—শুধু নিতান্ত বিসদৃশ ঐ দুটি পাথরের সাক্ষী অতীতের বৈভব আর বিত্তের কথা সদর্পে জানাতে গিয়ে যেন কেমন বিব্রত বিমূঢ় হয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে!

আর কিছু দূরেই সেই বিখ্যাত পিয়াসবাড়ী দীঘি! গৌড়ের বন্দীশালা-সংলগ্ন বিশাল জলাশয়। শোনা যায়, এর জল আগে দূষিত ছিল এবং বন্দীদের এরই জল ছাড়া আর কিছুই পান করতে দেওয়া হতো না! আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই-আকবরী'তে বলেছেন, সম্রাট আকবর নাকি এই নিয়মটি বন্ধ করে দেন। মেজর ফ্রাঙ্কলিন অবশ্য পরবর্তীকালে এই মত খণ্ডন করে লিখেছেন, আসলে এর জল সুপেয় ছিল। বন্দীদের চোখের সামনে এই তৃষ্ণার শান্তি থাকা সত্ত্বেও তাদের তা স্পর্শও করতে দেওয়া হতো না, ফলে আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে তারা মারা যেত। সেই থেকেই এর নাম পিয়াসবাড়ী—অতীতের পিপাসার্ত কতকগুলো মানুষের তীব্র হাহাকারকে যেন আজো জাগিয়ে রেখেছে। এই দীঘির জলেরই তিন ফুট নীচে বাঁধানো ঘাটের কাছে দুটো পাথরের হাতি বাঁধা আছে। কে বেঁধেছে, কেন ওভাবে রাখা হয়েছে সে কেউ আজ আর বলতে পারেন না। শুধু যখন এখানে ডাকবাংলো তৈরি হচ্ছিল, তখন অসংখ্য দীর্ঘদেহী মানুষের নরকংকাল পাওয়া গেছে মাটির গভীর থেকে। স্থানীয় মানুষেরা বলেন এগুলোই সেই হতভাগ্য তৃষ্ণার্ত কয়েদীদের অসহায় অস্তিত্ব! বিষণ্ণতা অনুভব করেন পর্যটক। কিন্তু সেই বিষণ্ণতার বাধা মুছে যায় আর একটু এগোলে, ডানহাতি কাঁচা মাটির রাস্তা ধরে রামকেলির দিকে এগোলে।

রামকেলি! সেই রামকেলি গ্রাম, পাঁচশো বছর আগে নীলাচলে যাবার পথে শ্রীচৈতন্য যেখানে এসে মিলিত হয়েছিলেন পরমবৈষ্ণব সাকর মল্লিক ও দবীর খাস সনাতন ও রূপ গোস্বামীর সঙ্গে। এইখানেই ছিল তাঁদের বাড়ী। সুলতান হুসেন শাহের বিশ্বস্ত মন্ত্রী ছিলেন তাঁরা। ঐ রূপসাগর

আর সনাতন সাগরের তীরে আজো তাঁদের স্মৃতির যেন চিহ্ন পড়ে আছে। এই সেই পথ, যে পথের ধূলিকণা পবিত্র হয়ে গিয়েছিল মহাপ্রভুর পূত চরণস্পর্শে, ঐ সেই তমালতলা যেখানে এসে উপবেশন করেছিলেন তিনি বিশ্রামার্থে। ঐ তো সেই আসন যেখানে নিত্যানন্দ প্রভু আসন গ্রহণ করেছিলেন। এই সেই মন্দির যেখানে আজো রূপ সনাতনের পূজিত বিগ্রহ নিত্যসেবা লাভ করেন। তমালতলায় এখন একটি মন্দির তৈরী হয়েছে, যার ভেতর শ্রীচৈতন্যদেবের পদচিহ্ন সযত্নে রেখে দেওয়া হয়েছে। তার পাশে আজো রাধাকুণ্ড আর শ্যামকুণ্ডের জল অজস্র ঢেউয়ের হাতে মৃদুসুরে নামগানের সংগে যেন খঞ্জনী বাজিয়ে চলেছে।

তেমন উত্তাল হরিনামধ্বনিতে আর মুখর হয়ে ওঠে না রামকেলির বাতাস, যেমন পাঁচশো বছর আগে হয়েছিল। ঐ রূপসাগর আর সনাতনসাগরের জলও তেমন কোন পূত দেহের আনন্দসঞ্চরণে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে না। তবু সারা দেশের বৈষ্ণবজনের কাছে আজো রামকেলি এক পবিত্র তীর্থ, তাঁদের 'গুপ্ত-বৃন্দাবন'। এখন জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তির দিন থেকে দশ দিনের জন্য এক মেলা বসে এখানে। ঐদিন মহাপ্রভু পদার্পণ করেছিলেন এই গাঁয়ে, তাঁর স্মরণে। দেশ-বিদেশ থেকে ভক্তজন আসেন, দোকানপসরা, ম্যাজিক সার্কাস আর নামগানে আবার অতীতের রামকেলি যেন কয়েক দিনের জন্য জেগে ওঠে!

তমালতলার সম্মুখের পথ ধরে কিছু দূর এগোলেই সম্মুখে বিশাল বারদুয়ারী মসজিদ এবার দৃষ্টিকে বিস্মিত করাবে। যাঁরা কিংবদন্তীর গল্প জানেন, তাঁরা রোমাঞ্চিত বোধ করবেন, এক ভয়ংকর ঝড়-বাদলের রাতে এই পথ ধরেই একদিন সাদা ঘোড়ার চেপে সুলতান হুসেন শাহের আদেশে প্রাসাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন রাজকর্মচারী সনাতন গোস্বামী! জনমানব নেই পথে! একটা বিদ্যুৎ রেখার মতো সেই ঘোড়া অন্ধকারে এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ শুনতে পেলেন সনাতন, পথের ধারের এক বাড়ী থেকে কে যেন বলছে,—এই দুর্যোগে কুকুর বেড়ালও বেরোয় না, এক রাজভৃত্য ছাড়া! কোথাও কি বজ্রপাত হয়েছিল সে সময়! থমকে দাঁড়িয়েছিল সেই অস্থির বিজুলীর মতো সাদা ঘোড়া। নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়ে ঘরে ফিরে এসেছিলেন সনাতন! অসহ্য জীবনযাপন আর রাজকর্মের বন্ধনের পীড়নে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। অবশেষে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব! সেই তৃষ্ণার শান্তি, সুন্দর-কান্তির চরণস্পর্শ লাভ!

সে এক বিচিত্র কাহিনী! এই গৌড়েরই বাতাসের বুকে আজো তা ভেসে আছে যেন।

সম্মুখের ঐ বারোদুয়ারী ১৫২৬ খৃঃ সুলতান নসরৎ শাহের তৈরী ইঁট আর পাথরে গাঁথা সবচেয়ে বড় মসজিদ। বড় সোনা মসজিদ! সোনার চিহ্ন কোথাও নেই, নেই এই মসজিদের স্বর্ণাভ দিনের গরিমা! অনেক জায়গাই ভেঙে পড়েছে এখন। এককালে এর গম্বুজগুলো স্বর্ণাভ ছিল সম্ভবত, যেমন বেশ কিছু দূরে এখন বাংলাদেশের অন্তর্গত ছোটো সোনা মসজিদের গম্বুজেও দেখা যায়। কিন্তু এগারো দুয়ার সম্বলিত এ মসজিদের নাম বারদুয়ারী কেন পর্যটকের এ প্রশ্নের উত্তর বোধ হয় এই যে, মসজিদ সংলগ্ন অঙ্গন ও পার্শ্ববর্তী জেনানা মহল বা বসার গ্যালারী প্রমাণ করে এটির অর্থ 'অডিয়েন্স হল' বা সমবেত মিলন কেন্দ্র ছিল। কোন কোন সুলতান নাকি একে কাছারী হিসেবেও ব্যবহার করতেন। মসজিদেরই আশে-পাশে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পাথরের টুকরো ইঙ্গিত দেয় হয়ত মাদ্রাসা এবং বিশ্রামশালা ছিল এ সব জায়গায়। অন্তত গৌড়ের বিবরণী-প্রণেতা আবিদ আলীর তাই-ই অনুমান। একটি সরকারী বাসভবন এখন তৈরী হয়েছে বারদুয়ারীর পাশে। সেখানে মিউজিয়াম-রক্ষক থাকেন। অতীত ঐশ্বর্যের বিপুল সম্ভারের পাশে হাল্কা ইঁটের বাড়ীটি কেমন দুর্বল মনে হয়। আর একটু এগোলেই এবার গৌড় দুর্গে ঢোকার উত্তর প্রান্তিক প্রধান তোরণ দাখিল দরওয়াজা! এর আর এক নাম সেলামী দরওয়াজা! এইখানেই সুলতানদের প্রবেশের সময় তোপধ্বনি করা হতো!

কান পাতলে শুধু বিষণ্ণ ঘুঘুর ডাক ছাড়া কিছুই কানে আসে না আর। ভিতরে প্রহরীদের থাকার ঘরে শুধু বাতাসের হাহাকার, দু পাশে সুউচ্চ গড়ের উপর যেখানে আগে সেনানীদের ছাউনী ছিল সেখানে ঘন অরণ্য জটিল অন্ধকার রচনা করেছে, কোথাও-বা তাদেরও নির্মূল করে আধুনিক মানুষ ফসল ফলাবার প্রচেষ্টা করেছেন। সম্মুখে শুষ্ক-প্রায় পরিখা। গল্প জানায়, ঐ দরওয়াজা থেকে নাকি লোহার পাত ফেলে গমনাগমন হতো তারপর তা তুলে রাখা হতো—যাতে শত্রু সৈন্য পরিখা অতিক্রম না করতে পারে। এই পরিখার জলেই কি ডুবে মরেছিলেন শের-শাহের সেনাপতি খওয়াস খাঁ?

কে উত্তর দেবে আর! আমি তোরণ পেরিয়ে পিছনের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলার পথ ধরে এগিয়ে বাঁহাতি ফিরোজ মিনারের কাছাকাছি এক বাঁশঝাড়ের নীচে মাটিতে শুয়ে থাকা গৌড়েশ্বরী দেবীর মূর্তির সামনে এসে দাঁড়াই। এখানে-ওখানে ছড়ান রয়েছে ইঁট-পাথরের টুকরো। একটু দূরে পাথরের স্তম্ভ চারটি। এখানেই কি ছিল তাঁর মন্দির, একদা যেখানে নিয়মিত পুজো দিতে আসতেন গৌড়-নাগরিকেরা! এখন বছরের বিশেষ দিন ছাড়া কেউ আসেন না আর। অনাদরে অবহেলায় পড়ে আছেন এই নিভৃত অরণ্যের আড়ালে, যেন আত্মগোপন করে আছেন বেদনায়—শ্রীহীন গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ যেন আর দেখতে চান না তিনি! আমি প্রণাম করি তাঁকে। চারশো বছর আগেকার মানুষের প্রগাঢ় প্রেমের ধারাকে বহমান করার চেষ্টা করি! পিছন ফিরতেই চোখে পড়ে বাইশগজী প্রাচীরের রেখা। বাইশগজ উঁচু এবং পনেরো ফুট চওড়া এই সুবিশাল প্রাচীরের আড়ালেই ছিল গৌড় সুলতানদের প্রাসাদ। আজ তার কোন চিহ্ন নাই। ভেঙে গেছে প্রাচীরের পুরু দেয়াল, দরবার, রাজকক্ষ এবং হারেমে বিভক্ত বিশাল প্রাসাদের অস্তিত্ব রেণু রেণু হয়ে মিশে গেছে মাটিতে। অজস্র মীনা-করা ইঁট, চীনে-মাটির বাসনের টুকরো, খিলানের ভগ্নাংশ, কার্ণিশের কারুকাজ এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে আছে। বাইরে দীর্ঘশ্বাসের মতো হাওয়া এসে আঘাত করছে প্রাচীরে, ভিতরে টাকশাল দীঘির জল ছলছল করছে বেদনায়! বুনো ঝোপ আর বনফুলের গাছও [illegible] দাঁড়িয়ে আছে!

আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে চারশো বছর আগেকার এক থমকে দাঁড়িয়ে-থাকা মানুষের ছবি! গৌড় রাজপ্রাসাদের সম্মুখে এসে দ্বিধান্বিত পায়ে অপেক্ষা করছেন কবি কৃত্তিবাস। ফুলিয়ার কবি কৃত্তিবাস। তোরণদ্বারে প্রশস্তি লেখা আছে : 'তার তোরণ আশ্রয় দান করে আমাকে সুগন্ধি ওষুধির মতো বন্ধাদের। . একটি অনির্বচনীয় তোরণ তৃপ্তিদায়ক, স্ফূর্তিজনক...জীবন আশা এবং বিশ্রামের আবাস।'

বিশ্বাস করেন কৃত্তিবাস এই প্রশস্তির ভাষা। শুনেছেন তিনি সুলতান বারবক শাহ কাব্যানুরাগী সহৃদয়। তিনি মহা-পণ্ডিত বৃহস্পতি মিশ্রকে 'রায়মুকুট' উপাধি দিয়েছেন, মালাধর বসুকে দিয়েছেন 'গুনরাজ খাঁ' উপাধি। তিনি তাই সাতটি শ্লোক লিখে এনেছেন সুলতানকে শোনাবেন বলে। ভিতরে সুলতানকে ঘিরে বসে ছিলেন জগদানন্দ সুনন্দ, কেদার খাঁ, গান্ধর্ব রায়, তরণী, সুন্দর, শ্রীবৎস ও মুকুন্দ! সসংকোচে সেখানে প্রবেশ করে বিনম্র সুললিত কণ্ঠে তিনি পাঠ করেছিলেন শ্লোকমালা! এবং অভিভূতও হয়েছিলেন সুলতান। চন্দনের ছড়ায় অভিষিক্ত করলেন তাঁকে। রামায়ণ রচনার অনুপ্রেরণা পেলেন কবি কৃত্তিবাস। রাজসভার বাইরে অপেক্ষমান বিশাল জনতা অভিবাদন জানাল কবিকে!

কোথায় কেউ নেই এখন। আমার সঙ্গী ডাঃ জিতেন চক্রবর্তী উচ্চকণ্ঠে আমার নাম ধরে ডাকছিলেন। 'প্রাচীরে প্রতিধ্বনিত হয়ে তা হাহাকারের মতো লাগছিল। ভাবতেও কেমন বিস্ময় লাগে, কত ঘটনার কথা লুকিয়ে আছে এখানকার বাতাসে। ঐ প্রাচীরের আড়ালে বসেই একদিন দূর রামকেলি গ্রাম থেকে ভেসে-আসা হরিনাম ধ্বনি শুনে চমকে উঠেছিলেন সুলতান হুসেন শাহ। ঐ প্রাসাদেরই কোন এক কক্ষে পথানামতিষ্ঠী একদিন পরামর্শ দিয়েছিলেন তাঁকে তাঁর প্রাক্তন প্রভু [illegible] শায়ের জ্ঞাতিনাশ করার! ঐ প্রাসাদেই কোনদিন [illegible] সুলতান [illegible] হত্যা করে সিংহাসনে [illegible] মেঝেতে এক লক্ষ টাকা ঢেলে [illegible]

পরিমাণ দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন অনুচরেরা! সুলতান উল্টো বুঝে বলেছিলেন এত কম টাকায় কি হবে! কোথায় সেই রত্নভাণ্ডার! খাজাঞ্চিখানার গহ্বরে এখন শুধু রিক্ততা! এই প্রাসাদেই বিষ দিয়ে সনাতনকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। তা আগে থেকে অনুমান করে গোপন পেটিকায় কাঁচা তেঁতুল নিয়ে ভোজনে বসেছিলেন সনাতন। বিষক্রিয়া নষ্ট হয় তাতে। সুলতান পরে তাঁর এই অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার স্বীকৃতিস্বরূপ গৌড়ের ঘরে ঘরে তেঁতুল গাছ রোপনের আদেশ জারী করেন। হয়ত কিংবদন্তীরই এক গল্প, কিন্তু অসংখ্য তেঁতুল গাছ দেখে এ সব গল্প মনের ভেতর আশ্চর্য আমেজ ছড়ায়!

এখান থেকেই তো দেখা যায় চিকা মসজিদ যার ভেতর একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্ত সনাতনকে বন্দী করেছিলেন সুলতান হুসেন শাহ। হরিনামমুগ্ধ মুক্তিপাগল সেই বন্দীর কোন জলরেখা তার অন্ধকার বিবর্ণ দেয়াল থেকে কবে মুছে গেছে! নেই সেই প্রহরী হাবু শেখের পদচারণা, যাকে উৎকোচে বশীভূত করে গঙ্গা সাঁতরে মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন সনাতন গোস্বামী। চিকা মসজিদের ডান পাশে তারে ঘেরা জায়গায় যে পাথরের খিলান-চাপা গর্তগুলো আছে, লোকে বলে ওগুলো নাকি ফাঁসির মঞ্চের জন্য তৈরী! সম্মুখে ঐ গুমটি দরওয়াজা গৌড় দুর্গে প্রবেশের পূর্বপ্রান্তিক গোপন পথ। এখন ওখানে একটি সংগ্রহশালা হয়েছে! এবং অমূল্য কিছু প্রত্নসম্পদ লোভী মানুষের হাত না এড়াতে পেরে হারিয়ে গেছে চিরকালের মতো! এরই বাঁপাশে লুকোচুরি দরওয়াজা—শাহ সুজার তৈরী গৌড় দুর্গে প্রবেশের আর এক তোরণ! উপরে নহবৎখানা! কল্পনার গল্প বলে, এখানে নাকি বাদশা বেগমরা লুকোচুরি খেলতেন! তারই বাঁপাশে কদম রসুল, যেখানে হজরৎ মহম্মদের পদচিহ্ন রাখা হয়েছিল। এখন সেটি নিকটবর্তী মহদীপুর গ্রামের খাদেমের কাছে আছে! তার কাছেই ফতে খাঁর সমাধি—যার গঠনকৌশল মনে করিয়ে দেয় এটি কোন হিন্দু মন্দির ছিল। ইতিহাস বলে, রাজা গণেশ নাকি এটি তৈরী করিয়েছিলেন!

কদম রসুলে রক্ষিত মহম্মদের পদচিহ্ন নবাব সিরাজদৌল্লা একবার মুর্শিদাবাদে নিয়ে যান, পরে মীরজাফর আবার তা গৌড়ে ফেরৎ পাঠান। এটি আরব দেশ থেকে প্রথম আনেন একজন পীর, সঙ্গে একটি নিশানও আনেন। সেটি এখন পাণ্ডুয়াতে আছে। কদম রসুলের ভিতরে একটি কাঠের ভাঙা বাকস দেখা যায়! কথিত আছে, ঐটির ভিতরে করেই নাকি এগুলি আনা হয়েছিল। প্রাঙ্গনের বাইরে আজো বিশাল বিশ্রামশালার কংকাল দাঁড়িয়ে।

কে আসবেন আর এখানে বিশ্রাম করতে! যেমন কেউ আসেন না আর ঐ দূরের 'চিরাগদানী'র মাথায় আলো জেলে কোন সংকেত জানাতে! ঐ চিরাগদানীরই অপর নাম 'পীর আসা মন্দির' বা 'ফিরোজ মেশর'! এটি তৈরী করেছিলেন সেই মালিক আন্দিল! খেয়ালী দানবীর পরাক্রমী এক গৌড় সুলতান। আমি ঐ মিনারের দিকে তাকালে এখনও এক ভয়ানক দৃশ্য যেন স্পষ্ট দেখতে পাই! মিনার তৈরী শেষ হলে সম্রাট ফিরোজ শাহ, যাঁরই অপর নাম মালিক আন্দিল, রাজমিস্ত্রীসহ উঠেছেন মিনারশীর্ষে! গর্বিত মিস্ত্রী বলে, আরো মালমশলা পেলে আরো ভালো আর উঁচু করে গড়তে পারতাম এই মিনার। আনন্দিত ফিরোজ শাহর কানে কথাটি তীব্র এক ব্যঙ্গের আঘাতের মতো বাজে! ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন অমিতব্যয়ী সুলতান! সামান্য মিস্ত্রীর এই স্পর্ধার উক্তিকে মুহূর্তমাত্রও সহ্য না করে তাকে নীচে ফেলে দেবার আদেশ দেন তিনি। তারপর এক মর্মান্তিক আর্তনাদ ভেসে ওঠে গৌড়ের বাতাসে!

ক্ষিপ্ত সুলতান নীচে নেমেই আদেশ করেন ভৃত্য হিঙ্গাকে—তুই এখনই মোরগাঁয়ে যা! বিমূঢ় হিঙ্গা যাবার কারণ না জেনেই চলে যায়। সেখানে তাকে চিন্তিত দেখে এক তীক্ষ্ণধী ব্রাহ্মণ বলেন, এখানে রাজমিস্ত্রীর বাস, তুমি তাদের একজনকে নিয়ে যাও!

হিঙ্গা ফিরলে চমকে ওঠেন সুলতান। তৎক্ষণাৎ সেই ব্রাহ্মণকে ডেকে উচ্চ রাজপদে সম্মানিত করেন। এই ব্রাহ্মণই সেই সনাতন। সনাতন গোস্বামী! হয়ত এও কল্পনার গল্প। লুকোচুরি দরজা পেরিয়ে মহদীপুরের দিকে যেতে যে সুন্দরতম লোটন মসজিদ তাকে ঘিরেও এমন গল্প, ঐ চামকাটি মসজিদ যেখানে আগে গৌড়ের চর্মকারদের পাড়া ছিল বা তাঁতিদের পাড়ায় তাঁতিপাড়া মসজিদ বা লোটনের সামনের কাঁচা রাস্তা ধরে এগোলে পাঁচখিলানের সাঁকোর কাছে গুণমন্ত মসজিদ—এসবকে ঘিরেই তো নানা কাহিনীর মায়াজাল। ঐ লোটন বিবির কাছে নাকি প্রতি সন্ধ্যায় সম্ভ্রান্ত বুদ্ধিজীবী গৌড় নাগরিকেরা সমবেত হতেন। ঐ পাঁচখিলানের পাথরের সাঁকোর নীচ থেকে গুপ্তধন পাওয়া গিয়েছে নাকি অনেকবার!

অনুরূপ আর একটি পাথরের সাঁকো আছে কোতয়ালী দরওয়াজা যাবার রাস্তায়। কোতয়ালী দরওয়াজা গৌড় দুর্গে প্রবেশের দক্ষিণ প্রান্তিক তোরণদ্বার! এইখানেই আগে প্রধান সামরিক ঘাঁটি ছিল। এখনও আছে। না সেই সুলতানদের নয়, এ যুগের সীমান্তরক্ষী বাহিনী! ওপারেই যে বাংলাদেশ। আগে ছিল যা পাকিস্তান নামে চিহ্নিত এক অগম্য স্থান!

এখন অনুমতি নিয়ে ওপারে গেলে চোখে পড়বে ছোটসোনা মসজিদ। তার পাশে সাম্প্রতিক মুক্তিযুদ্ধে নিহত এক সেনানীর সমাধিস্থান। একই মাটি দুইটি যুগের দীর্ঘ ব্যবধানকে এক সূত্রে বেঁধে রেখেছে যেন। যেতে পথে পড়বে তহখানা। নির্জন প্রান্তরে এক বিশাল আবাস-গৃহ আর সংলগ্ন এক মসজিদ। গৌড়ে সম্ভবত এইটিই এখন একমাত্র আবাস-গৃহ যা কালের এবং অত্যাচারী মানুষের হাত এড়াতে পেরেছে।

এখানে বাস করতেন গৌড়ের বিখ্যাত পরিব্রাজক শাহ নিয়ামতুল্লা। এখন তাঁরই এক বংশধর বাস করেন। অন্তত, আমার বিস্ময়কে চমকে দিয়ে সেই নির্জন অট্টালিকা থেকে যে বৃদ্ধ মানুষটি বেরিয়ে এলেন, তিনি তাই জানালেন।

আমি বিস্মিত চোখে সেই বাড়ীটি এবং এই মানুষটিকে দেখছিলাম। গৌড়ের সুলতানদের অনেক পরিচয় নানা গ্রন্থে শিলালিপি পুঁথি তাম্রলেখতে আছে, কিন্তু তখনকার সাধারণ মানুষ কিভাবে জীবনযাপন করতেন তার নজির বড় একটা কোথাও পাওয়া যায় না। পার্শ্ববর্তী মহদীপুর গ্রামের হাইস্কুলের শিক্ষকমশায় শ্রীসোমেন পাণ্ডের প্রযত্নে এখন একটি মূল্যবান সংগ্রহশালা স্থাপিত হয়েছে। সেখানে গৌড় নাগরিকদের ব্যবহৃত পাথরের একটি আশ্চর্য ট্রাঙ্ক বা স্যুটকেশ, বিভিন্ন তৈজসপত্র, গৃহস্থের মঙ্গল শঙ্খ, পুরনারীর গলার মালা, জলপাত্র ইত্যাদি দুর্লভ সামগ্রী আছে। এসব জিনিস অন্য কোন সংগ্রহশালায় আছে বলে আমার জানা নেই। যাঁরা অনুসন্ধিৎসু গবেষক, গৌড়ের প্রাচীন জীবনযাত্রার অনেক মূল্যবান সাক্ষ্য সেখানে গেলে তাঁরা দেখতে পাবেন। ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয়দের কাছে জাতি হিসেবেই আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা কর্তব্য। একবার টেস্ট রিলিফের কাজের সময় মাটির গর্ভ থেকে সংগৃহীত এক মাটির হাঁড়িতে এক জোড়া সোনার খড়ম, মসলিন, কয়েক জোড়া শাঁখা এবং কড়ি মধ্য থেকে একটি শাঁখা সংগ্রহ করি। আজো সেটির দিকে তাকালে বহু যুগ আগের এক গৌড়নারীর শঙ্খশুভ্র হাত যেন স্পষ্ট দেখতে পাই!

মহদীপুর থেকে গড়ের চিহ্ন দেখা যায়, অনুমান করি, গৌড় শহরের একটি দক্ষিণ প্রান্তিক সীমারেখা! এর উপরে এককালে সেনাবাহিনীর ছাউনী ছিল, কামান গর্জে উঠত। বহুকাল পর, প্রায় চারশো বছর পেরিয়ে সেই বজ্রনির্ঘোষ এবার আবার বেজে উঠেছিল পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের সময় ঠিক সেইখান থেকেই।

কিছু দিন আগে ওখান থেকে প্রাচীন যুগের একটি নরকঙ্কাল পাওয়া গেছে। এবং এই গড় কেটে যে রাস্তা তৈরী হয়েছে তা ধরে এগোলে যেখানে গুণমন্ত মসজিদ আছে তার পাশেও এবার যুদ্ধের সময় সাময়িকভাবে আস্তানা বানানোর সময় শরণার্থীরা একজন সুলতানের কবর

আবিষ্কার করেন। কিছুই ছিল না ভিতরে. অথবা কিছু ছিল—জানার কোন উপায় নেই আর! শুধু সেই শূন্যেগর্ভ ইঁটে বাঁধানো সমাধিভূমি এক রহস্যময় অন্ধকারে ঢেকে রেখেছে নিজেকে।

এমন সমাধিভূমি অনেক আবিষ্কার করেছেন এর আগে অনুসন্ধিৎসু বা রত্ন লোভী মানুষেরা! ফলে সুলতানদের সমাধিভূমি ক্ষতিগ্রস্তও হয়েছে। বাইশ-গাজীর কাছে খাজাঞ্চীখানার উত্তর-পূর্বে বাংলাকোট নামে জায়গায় আগে যেখানে তাঁদের সমাধিস্থান ছিল ১৮৪৬ সাল নাগাদ তা ধ্বংস করে ফেলেন সম্পদলিপ্সু মানুষ। এমনভাবেই হারিয়ে গেছে পিঠাওয়ালী মসজিদ এবং নিম দরওয়াজা যা দেখতে অনেকটা দাখিল দরওয়াজার মতো ছিল। বাঙলাদেশের অন্তর্গত হওয়াতে এখন অনেক মসজিদই এপারের পর্যটকদের চোখে পড়ে না। বাংলার মতো গৌড়ও দ্বিধা-বিভক্ত হয়েছে!

লোটন মসজিদের সামনে দিয়ে ফিরে আসার সময় আবার থমকে দাঁড়াতে হলো। চাষের জন্য জমিতে কোদাল চালাচ্ছিলেন এক কৃষক। ঠিকরে উঠছিল ছোট ছোট প্রাচীন কালের ইঁট। হঠাৎই সেখানে বেরিয়ে পড়ল এক গৃহস্থ বাড়ীর ভিত। দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। সম্ভবত কুমোর বাড়ী ছিল এটা। সারি সারি সাজানো মাটির হাঁড়ি, নানা ধরনের পাত্র, মৃৎপ্রদীপ। হাঁড়ির

ভিতরে কিছু আছে ভেবে উত্তেজিত হাতে কয়েকটি ভাঙাও হলো। না, কিছু নেই। সেই শূন্যতা। আমি কয়েকটি পাত্র আর মৃৎপ্রদীপ সংগ্রহ করলাম। তাঁতিপাড়ার পাশে এটা কি তবে গৌড়ের কুমোরপাড়া ছিল?

তাঁতিপাড়ার কাছে ঐ যে ছোট সাগর দীঘি, তার পাড়ে যে বড় একটি অট্টালিকার ভিত সেটা কি চাঁদ সওদাগরের ভিটে?

কদম রসুলের কাছে যে কুম্ভীর পীর দীঘি আর তার জলে যে বড় কুমীরটি ছিল, সে-ই কি লোকশ্রুতির সেই পীর-সাহেব? নিছক কল্পনার গল্প হয়তো এ'ও।

তবু আজো যখন গৌড়ের সেই শিখা-হীন মৃৎপ্রদীপের দিকে তাকিয়ে থাকি, এখন ইতিহাস, কিংবদন্তী, বিশ্বাস আর কল্পনার আলো চোখের সামনে অতীতের গৌড় - লক্ষ্মণাবতী - লখণৌতির ছবি ফুটিয়ে তোলে।

১৭৮৬ ও ১৮০৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে মিস্টার ক্রাইটন সর্বপ্রথম গৌড় খনন করেন। তারপর ১৮০৮ সালে ডঃ বুকানন হ্যামিল্টন, ১৮১০-১১তে মেজর ফ্র্যাঙ্কলিন এবং পরে র‍্যাভেনশ, রজনীকান্ত চক্রবর্তী, আবিদ আলি, অক্ষয় মৈত্র ইত্যাদি গৌড়-ভক্ত ঐতিহাসিক পরিব্রাজক গবেষকদের প্রচেষ্টায় অতীতের গৌড়ের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় এবং বিলুপ্তপ্রায় স্মারকচিহ্নের পরিচয় আমরা পেয়েছি। বিভিন্ন যুগে দেশীবিদেশী বহু পরিব্রাজক এসেছেন গৌড়ে। ষোড়শ শতকে পর্তুগীজ পরিব্রাজক জো-আ-দে-বারোস গৌড়ের রাজপথের বর্ণনা করছেন, '...রাস্তাগুলি খুব চওড়া আর সোজা। প্রধান প্রধান রাস্তাগুলিতে দেওয়াল বরাবর সারে সারে গাছ লাগানো। এখানকার লোকের সংখ্যা খুবই বেশী এবং যানবাহনের ভীড়ে রাজপথগুলি সমাকীর্ণ। যারা রাজসভায় যেতে চায় তাদের ভীড় এত বেশী যে তাদের একজন আর একজনকে অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে পারে না। এই শহরের একটা বড় অংশ সুরম্য ও সুনির্মিত প্রাসাদে ভর্তি।'

ইবনে বতুতা, ওয়াংতা-ইউয়ান, মা হোয়ান, ফে-ই শিন, নিকলো কন্তি বারবোসা, ভারথেমো প্রভৃতি বিদেশী পর্যটক, বৃহস্পতি মিশ্র, কৃত্তিবাস, সনাতন, বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, জয়ানন্দ ইত্যাদি কবি মনীষীদের রচনায় অতীতের গৌড় বহুবার স্বপরিচয়ে ফুটে উঠেছে।

এখন সবই কেমন অবিশ্বাস্য মনে হয়। স্থানীয় মানুষেরা এইসব অতিকায় মিনার মসজিদ দেখিয়ে বলেন এসবই নাকি জিন পরীদের তৈরী! যুক্তিনিষ্ঠ মন হাসতে গিয়ে যেন এক অলৌকিক বিশ্বাসের মায়ায় জড়িয়ে পড়ে। নির্জন এই শ্মশানভূমির শূন্যতার ভেতর ঐসব বিশালাকার সৌধগুলো মনে হয় না যেন কোন মানুষের তৈরী—এখানে কখনো কোনদিন জনবসতি ছিল। এখন অবশ্য গৌড়ের ভেতরে অনেক জায়গায় চাষ-আবাদ শুরু হয়েছে, জনবসতিও গড়ে উঠেছে। আশেপাশের কদমতলা, খিড়কি, মহদীপুর গ্রামের লোকসংখ্যাও কিছু কম নয়। রাখাল বালকের বাঁশীর সুর, কৃষকের উচ্চকণ্ঠ আলাপ, হালের বলদের লেজ ঝাপটানো, আমবাগানে প্রহরারত মানুষের হাঁকডাক এখন গৌড়ের বাতাসকে চঞ্চল করে তোলে। শীতের সময় আসেন অসংখ্য দর্শনার্থী আর পিকনিক পার্টি।

কাজের শেষে সবাই ফিরে যান। বিষণ্ণ সন্ধ্যা নামে গৌড়ের বুকে। কোটি কোটি জোনাকি গৌড়ের অসংখ্য পলাতক অতৃপ্ত আত্মার মতো তাঁদের ফেলে যাওয়া সম্পদ খুঁজতে পাগলের মতো ছোটাছুটি করে, তেঁতুলগাছের পাতা লোটন বিবির পায়ের নূপুরের মতো বাজে, তীব্র যন্ত্রণার আকুতির মতো ফিরোজ মিনারের নীচে দিল্লীর একটানা সুর শোনা যায়, বন্দী জীবনের চাপা দীর্ঘশ্বাসের মতো ডুকরে ওঠে চিকা মসজিদের ভেতরের বাতাস, দাখিল দরওয়াজার কাছ থেকে প্রহর ঘোষণা করে শিয়ালেরা, বাইশগজী প্রাচীর ম্লান ছায়া ফেলে দীঘির জলে, পিয়াসবাড়ী দীঘির জল আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে জেগে থাকে -- এমন কতকাল তাদের আর অপেক্ষা করে থাকতে হবে কে জানে! শুনেছিলাম, নেতাজী সুভাষচন্দ্র নাকি একবার গৌড়কে স্বাধীন বাংলার রাজধানী করবেন বলে ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মহাবিদ্যালয়ের নামের সঙ্গেও জড়িত করেছিলেন গৌড় শব্দটিকে!

কিন্তু তারপর তেমন ব্যক্তিগত ভালো-লাগা বা সরকারী উদ্যোগের কোন উল্লেখ-যোগ্য কিছুই আর চোখে পড়ে না। গৌড় দেখাবার জন্য কোন গাইড নেই। কোন পুস্তিকাও নেই। গৌড়ে থাকবার জন্য তেমন সুব্যবস্থাও নেই। অথচ বাংলার সবচেয়ে রূপময় এই ঐতিহাসিক স্থানটি নাকি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের আওতায়! কলকাতা থেকে বাসে বা ট্রেনে মালদায় গিয়ে ট্যুরিস্ট লজ বা হোটেলে থেকে প্রায় এগারো মাইল দূরবর্তী গৌড় দেখতে যেতে হয় ট্যাকসি বা ঘোড়ার গাড়ী চড়ে। আর গিয়ে শুধু রাস্তার দুধারে যে মসজিদ মিনার আছে তাই দেখেই ফিরে আসতে হয়। সমগ্র গৌড়ের কোন ছবিই তাতে ফুটে ওঠে না।

সম্রাট লক্ষ্মণ সেনের লক্ষ্মণাবতীর চিহ্ন আজকের গৌড়ে আর নেই। মালদ শহর থেকে কিছু দূরের ঐ বাগবাড় অমৃতিগ্রাম, সাদুল্লাপুরের মহাশ্মশান বড়সাগরদীঘি আর মহদীপুরে বা গৌড় মালদার সংগ্রহশালায় রক্ষিত কয়েকটি নিদর্শন থেকে তার আংশিক পরিচ পাওয়া যায়।

এখন শুধু বখতিয়ারের লখণৌতি বা পরবর্তীকালের পাঠান হাবশী ও বাঙালী সুলতানদের গৌড় শেষ পরিচয় বুকে ধরে অন্তিম মুহূর্ত প্রতীক্ষা করছে।

আত্মবিস্মৃত বাঙালী আপাত কলকাতা বাঁচাতে ব্যস্ত। বৈজ্ঞানিক কল কৌশলের এই প্রয়োগ আমাকে আশান্বিত করে। তবু এখনো মাঝে মাঝে প্রশ্ন কলকাতা কি সত্যিই একদিন কর্মো তিলোত্তমা হবে?

এর উত্তর আমি জানি না। জানি, আধুনিক বিজ্ঞান যদি বহু আগের এক মহানগরী, এক বিলুপ্ত রাজধানীকে রক্ষা না করে, তবে ইতিহাসে অভিশাপে গৌড় তার সঙ্গী হিসেবে বেছে নেবে কলকাতাকে। বাংলার ইতিহাসে বারবার এই ঘটনাই ঘটেছে গাঙ্গে থেকে পুণ্ড্রবর্ধন, তারপর একে কর্ণসুবর্ণ, বাণগড়, লক্ষ্মণাবতী দেবীকোট, লখণৌতি, পান্ডুয়া, তান্ডা, রাজমহল, ঢাকা, মুর্শিদাবা রাজধানী বিলুপ্তির এই স্রোতে সব ভেসে যাবে কলকাতা।

আবহমান বাংলা ও বাঙা ইতিহাসকে যাঁরা ভালোবাসেন তাঁদের কাছে কোন মুহূর্তেই এটি আকাঙ্ক্ষিত নয়।

প্রদর্শনী

কলকাতায় সাংবাৎসরিক কলা অনুষ্ঠান ও একজন প্রতিশ্রুতিপূর্ণ শিল্পী

ভারতবর্ষের অধিকাংশ তথাকথিত শিল্পকলোন্নয়নমূলক অতিকায় সংস্থাগুলি বার্ষিক সংকলনধর্মী প্রদর্শনী সারাৎসারশূন্য রীতিতে পরিণত হয়েছে। যে সব শিল্পী সৎ এবং সক্রিয়ভাবে বছরের পর বছর ধরে প্রতিবছর তিনশো পঁয়ষট্টি দিন শিল্পকর্মে বা শিল্পধ্যানে নিয়োজিত আছেন তাঁদের দশ শতাংশও আজকাল আর এইসব সাংবাৎসরিক শিল্পমেলায় পসরা সাজিয়ে বসেন না। ফলে তথাকথিত শিল্পকলাদরদীদের (শিল্পীদের নয়) এই শিল্পোন্নয়নমূলক সংস্থাগুলির বৎসরান্তিক প্রদর্শনীগুলি অপরিণত এবং অবসরপ্রাপ্ত চিত্রকর আর ভাস্করদের না-হলেও-কিছু-এসে-যেত-না গোছের কাজের মেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দিল্লীর অল ইণ্ডিয়া ফাইন আর্টস এণ্ড ক্রাফ্‌ট্‌স সোসাইটির কর্তৃপক্ষ এ-ব্যাপারটির প্রতিকারের আশা নিয়ে ১৯৭২--এর সাংবাৎসরিক প্রদর্শনীতে পেশাদারদক্ষতাসম্পন্ন চিত্রকর এবং ভাস্করদের অংশ গ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য শুধু যে জনে জনে নিমন্ত্রণ করেছিলেন তা নয়, প্রতিটি এক-হাজার টাকা মূল্যের ছটি পুরস্কারের ব্যবস্থাও করেছিলেন। কিন্তু তাতেও যে প্রদর্শনীর মানের খুব একটা হেরফের হয়েছিল তা মনে হয় না।

কলকাতার একাডেমি অফ ফাইন আর্টস এর বাৎসরিক শিল্প-প্রদর্শনীতেও আজ বেশ কয়েক বছর যাবৎ পশ্চিমবাংলার অধিকাংশ সৎ, সক্রিয়, প্রতিভাশালী এবং প্রতিশ্রুতিময় চিত্রকর, ভাস্কর ও ছাপের ছবি নির্মাতারা অংশগ্রহণ করছেন না। ভারতবর্ষের শিল্পকলা জগতে পশ্চিমবঙ্গের যে-কয়জন অংগুলিমেয় শিল্পী স্বীয় ক্ষমতা-বলে জায়গা করে নিয়েছেন, তাঁদের দু-একজন ছাড়া আর কারও কাজ বেশ কয়েকবছর ধরে একাডেমির প্রদর্শনীতে দেখা যাচ্ছে না। একাডেমি অফ ফাইন আর্টসের অধুনা-অনুষ্ঠিত ত্রিসপ্তত্রিংশ বাৎসরিক প্রদর্শনীও তার ব্যতিক্রম নয়। পশ্চিম বাংলার প্রথম সারির সক্রিয় শিল্পীদের মধ্যে একমাত্র নীরদ মজুমদার এবং অন্যান্যদের মধ্যে গোপাল ঘোষ ও গণেশ হালুয়ের কাজের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য জায়গা থেকে যে বৃহৎ সংখ্যক শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে আরনাওয়াজ ড্রাইভার (মাদ্রাজ), বিদ্যাভূষণ (হায়দরাবাদ), পি ভি জানকীরাম (মাদ্রাজ), জয়ন্ত পারিখ (বরোদা) সূর্যপ্রকাশ (হায়দরাবাদ), পি টি রেড্ডি এবং এস জি বাসুদেব (মাদ্রাজ) শিল্পী হিসাবে কথঞ্চিৎ পরিচিত এবং বাংলাদেশের শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন উল্লেখযোগ্য। দিল্লী, বোম্বাই, বরোদা, হায়দরাবাদ, আহমেদাবাদ এবং মাদ্রাজের অধিকাংশ খ্যাতনামা শিল্পীর কাজ এই প্রদর্শনীতে অনুপস্থিত। এমতাবস্থায় এই প্রদর্শনীকে কি পশ্চিম-বাংলা তথা ভারতবর্ষের শিল্পকলার প্রতিনিধিত্বমূলক প্রদর্শনী বলে অভিহিত করা যায়?

ভারতবর্ষের চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও ছাপের ছবিতে গত দশ পনেরো বছরে যে-সব দিক সমৃদ্ধ হয়েছে এবং প্রধানত যাঁদের কাজের মধ্য দিয়ে সে-স-ব সমৃদ্ধি প্রকাশ পেয়েছে, সেসব দিক্‌পালদের কাজের অনুপস্থিতির কারণে ভারতবর্ষের আধুনিক চিত্রকলা ভাস্কর্য এবং ছাপার ছবির প্রধান প্রধান গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে এ প্রদর্শনী থেকে কোন ধারণাই প্রায় জন্মায় না। ব্যতিক্রম শুধুমাত্র নীরদ মজুমদারের ছবি এবং জানকীরামের একটি ভাস্কর্য নিদর্শন। জানকীরামের ভাস্কর্য থেকে হিন্দু-পৌত্তলিকতার নবীকরণ এবং নীরদ মজুমদারের ছবি থেকে তন্ত্রালঙ্কারিক বিমূর্ত চিত্রকলা সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ ধারণা লাভ করা যায়। এ-দুই ধারাই সাম্প্রতিক ভারতীয় শিল্পকলার অন্যতম দুই প্রধান ধারা এবং এই দুজন দুই প্রধান পুরুষ।

অনেকে বলতে পারেন যে নামী শিল্পীদের উপস্থিতিই কোন প্রদর্শনীর মান উন্নয়নকারক নাও হতে পারে; কারণ নামী এবং প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা যে সব সময়ে ভাল কাজ করেন, তা নয়। কোন প্রদর্শনীর উদ্যোক্তারা যদি নামী শিল্পীদের কাজের চেয়েও অখ্যাতনামা প্রতিশ্রুতিপূর্ণ তরুণ শিল্পীদের শিল্পকর্ম প্রদর্শনের প্রতি বেশী মনোযোগ দেন তবে তা সাতিশয় আনন্দজনক কাজ বলে অবশ্যই পরিগণিত হবে। কিন্তু একাডেমি অফ ফাইন আর্টস এর প্রদর্শনী দেখে এবম্বিধ শিল্পোন্নয়ন-মনস্কতার কোন পরিচয় পাওয়া গেল না।

প্রথমেই ধরা যাক নামী শিল্পীদের কাজগুলি। নীরদ মজুমদারের ছবিতে নকশার এবং রঙের নতুনত্ব কিছুই পরিলক্ষিত হল না। উপরন্তু, আজ যখন নীরদবাবুর ছবিতে নকশার জায়গায় ড্রইং প্রধান হয়ে উঠেছে তখন ড্রইং সম্বন্ধে তাঁর আরও বেশী যত্নবান হওয়া উচিত ছিল। সুনীল-মাধব সেনের ছবি ধনীগৃহের শোভাবর্ধক নকশামাত্র। রথীন মিত্রের কাজ দেখে মনে হয় যে, তিনি ড্রইং এবং রঙের ব্যাপারে শিথিল হয়ে গেছেন। নির্মল দত্ত[illegible]

শিল্পী : রাজুল ধারিওয়াল

রিনার ছবিতে এদগার দেগার অক্ষম অনুকৃতি পীড়াদায়ক। অমরেন্দুলাল চৌধুরীর জল-রঙের দুটি ছবি যদিও অমল চাকলাদারের বছর দু-তিনেক আগের ছবির বর্তুলাকার রেখাছন্দের নকশাগুলিকে স্মরণ করিয়ে দেয় তবু তা ছন্দোগুণসমৃদ্ধ নকশা বলে গ্রহণ করতে আমাদের কোন দ্বিধা থাকে না। তাঁর ছবির অন্যতম প্রধান দুর্বলতা চিত্রক্ষেত্রের অসুচারু ব্যবহার। পশ্চিমবঙ্গের নামী শিল্পীদের যে স্বল্প-সংখ্যক এ-প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে একমাত্র গণেশ হালুয়ের দুটি কাজ উল্লেখযোগ্য। দুটি নিসর্গদৃশ্যে বর্ণান্তরের ব্যবহার দিয়ে শূন্য চিত্রক্ষেত্রকে তিনি যেভাবে অসীম দেশে পরিণত করেছেন এবং পরস্পর অসংলগ্ন খোঁচা (stroke) গুলিকে এ-ভাবে বিন্যস্ত করেছেন যে, তাঁর নিসর্গদৃশ্য একটি আপাতঃ-শান্ত চঞ্চল অভিব্যক্তি সৃষ্টি করে। সুবল পাল মশাইয়ের বিমূর্ত রচনান্বয়ে রঙ কোন ভূমিকা গ্রহণ করে না। পশ্চিমবঙ্গের বহু নামী শিল্পী যাঁরা প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেননি, তাঁদের কয়েকজনের ছবির স্বাদ তাঁদের অনুকারকদের ছবির মধ্য দিয়ে পাওয়া যায়। এ অনেকটা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতন।

পৃথ্বীশ শিকদারের কোলাজটিকে তো এ-সমালোচক বিকাশ ভট্টাচার্যের বলে ভুল করেছিলেন। সরলকুমার দাশের 'দি কিংমেকার' ছবিটিতে বিকাশের অক্ষম

অনুকরণ লক্ষণীয়। মৃন্ময় মুখোপাধ্যায়ের ছবি দুটিকে যে কেউ সঙ্গত কারণে সুনীল দাশের বলে ভুল করতে পারেন। অসিত মণ্ডলের ছবি দুটিতে গণেশ-পাইনের বহিরঙ্গ রীতির অক্ষম অনুকরণ লক্ষণীয়। কাঞ্চন দাশগুপ্ত তাঁর দুটি ছবির ভাবকল্পনায় বিকাশকে এবং রূপায়ণ রীতিতে গণেশ পাইনকে অনুসরণ করেছেন। মৈনাকশঙ্কর রায়ের এচিং-এর রূপকল্পনায় এবং রূপায়ন রীতিতে লালুপ্রসাদ সাউ এবং সুহাস রায়ের প্রভাব সুস্পষ্ট। নির্মলেন্দু দাশের কাঠের-ছাপের কাজকে কেউ যদি সোমনাথ হোড়ের বলে মনে করেন তবে তাঁকে সে-কারণে ফিলিস্তাইন বলা যাবে না। ইন্দেরা মনজিতের পুরস্কারপ্রাপ্ত তেল-রঙের ছবিটি একটি বিমূর্ত রচনা, কিন্তু বিশুদ্ধ বিমূর্ত রচনার জন্য রঙ, রেখা এবং চিত্রক্ষেত্র সম্বন্ধে যে সম্যক উপলব্ধি প্রয়োজন শিল্পীর এখনও তা অনায়ত্ত। ডবলু আর কাপুরের তেলরঙের বাস্তবধর্মী রচনাটি ড্রইং এবং বর্ণান্তর প্রয়োগের গুণে দৃষ্টিনন্দন হয়ে উঠেছে। বিশ্বপতি মাইতির কাজ দুটির বিন্যাসপদ্ধতি এবং বর্ণকাভঙ্গ ভালো। প্রদর্শনীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি সূর্যপ্রকাশের। হায়দরাবাদের এই শিল্পী তেলরঙ ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত। প্রায় একরঙা এই ছবিটির বিন্যাস এবং বর্ণান্তর অভিব্যক্তিমূলক; ছবিটি একটি বিমূর্ত রচনা। সূর্যপ্রকাশের গুরু বিদ্যাভূষণের ছবিতে শিষ্যের দক্ষতার ছাপ অনুপস্থিত। বরোদার অরুণকুমার জয়সওয়াল অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সমান-ওজনের রঙের পুঞ্জের সাহায্যে চিত্রক্ষেত্র বিভাজিত করে একমাত্রিক রচনা গড়ে তুলেছেন; কিন্তু তাঁর কাজে তাঁর গুরু মণি সুব্রহ্মণ্যমের উপস্থিতি সোচ্চার। বরোদার মনু জে পারিখ (কলকাতার মনু পারেখ নন) দক্ষতার সঙ্গে স্নিগ্ধ এবং শৈত্য বর্ণ ও বর্ণান্তরের সাহায্যে হোকুসাইয়ের ধরনের আবহাওয়া গড়ে তুলতে চেয়েছেন; কিন্তু ছবির উর্ধ্বাংশের তলবিভাজন রীতি এবং রঙ তাতে বাদ সেধেছে।

প্রদর্শনীর ছাপের ছবি বিভাগটি একান্তই দুর্বল। ভারতবর্ষে ছাপের ছবি সাম্প্রতিকালে যে উৎকর্ষ লাভ করেছে তার কোন পরিচয়ই এ বিভাগটিতে পাওয়া যায় না। এরই মধ্যে শান্তিনিকেতন থেকে আসা সোমনাথ হোড়ের কিছু ছাত্রের এবং বরোদা থেকে আসা জ্যোতি ভাটের কিছু ছাত্রের কাজের মধ্যে কথঞ্চিৎ মাধ্যম-সচেতনতা দেখা যায়। কিন্তু তাঁদের কাজের মধ্যে সোমনাথ হোড় এবং জ্যোতি ভাটের প্রভাব এতই সুস্পষ্টভাবে দেখা যায় যে এখনও তাঁদের ব্যক্তিশিল্পী বলে ধরতে দ্বিধা বোধহয়। এই বিভাগে মাধ্যম ব্যবহারের দক্ষতা দেখিয়েছেন নির্মলেন্দু দাশ (একটি লিথোগ্রাফ ও একটি কাঠের ছাপ), পার্থপ্রতিম দেব (দুটি লিনোকাট), প্রয়াগ ঝা (দুটি এচিং-ও-একোয়াটিন্ট), অমিত রায় (দুটি সেরিগ্রাফ) ও হরেকৃষ্ণ বাগ (সেরী নিতাগ্রিও)।

ভাস্কর্য বিভাগটিও দুর্বল। জানকী রামের ধাতু নির্মিত 'ভবানী মা' মূর্তিটি দেখে কিন্তু এই প্রতিমা গড়ার উদ্দেশ্য অনুধাবন করা গেল না। শিল্পী নিশ্চয়ই পূজোর উদ্দেশ্যে এই প্রতিমা গড়েননি। উদ্দেশ্য যদি তা না হয়ে থাকে তবে আশা করা যেতে পারে যে শিল্পী এই দেবী সম্পর্কে কোন ব্যক্তিগত ধ্যানকে অভিব্যক্তিদানের উদ্দেশ্যে এই প্রতিমা গড়েছেন। কিন্তু প্রতিমালক্ষণের দিক থেকে এই প্রতিমা এতই ঐতিহ্যানুসারী এবং অন্যথায় এতই আলঙ্কারিক এর রূপে যে প্রতিমাশরীরে কোন ব্যক্তিগত ধ্যান মূর্ত হয়ে ওঠে না। এর চেয়ে মাদ্রাজেরই অন্য আরেকজন ভাস্কর, এস নন্দগোপালের ধাতু নির্মিত 'পশু' নির্মাণ কৌশলে, গঠনে, অলঙ্কারে এবং অভিব্যক্তির রূপায়ণে অনেক সার্থক। এটি প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠতম ভাস্কর্য নিদর্শন। পি চন্দ্রবিনোদের লৌহনির্মিত ভাস্কর্যটির গঠনে কৌশল এবং কারিগরি দক্ষতার ছাপ সুস্পষ্ট কিন্তু রচনাটি একেবারেই অর্থবাহী নয়। এ ধরনের ভাস্কর্য নির্মাণ না করে ধাতু-নির্মিত যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ বানালেও তো হয়; সেগুলো অন্তত মানুষের কাজে লাগে।

প্রদর্শনীটি দেখে সাধারণভাবে যা মনে হয়, তা হল প্রদর্শনীটি পেশাদার শিল্পীদের নয়, ছাত্রশিল্পীদের।

—প্রণবরঞ্জন রায়

সকালের চনমনে রোদটা জানালা গলিয়ে একেবারে উপচে এসে পড়ে সুকান্তর বিছানায়। প্রথমটা কোনাবুনি, তারপর পাশ ফিরে শুতে না শুতেই তক্তপোশের অর্ধেকটা জুড়ে সুকান্তর কোমরের নীচ থেকে পায়ের বুড়ো আঙ্গুল পর্যন্ত পোড়াতে থাকে। ঘুম ভাঙ্গার অনেকক্ষণ পরেও সুকান্ত মড়ার মত কাঠ হয়ে পড়ে থাকে। রোদ্দুরের তেজটা শেষ পর্যন্ত অসহ্য হয়ে উঠলে ক্ষীণ কোমরটা এক অদ্ভুত প্রক্রিয়ায় 'দ'-এর মত ভেঙ্গে তক্তপোশের আরেক কোণে সরে গিয়ে আত্মরক্ষা করে। যেন একটা বড় সাইজের গিরগিটি আহত হয়ে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছে।

এইভাবেই পড়ে থাকতে হবে অনেকক্ষণ। অর্থাৎ যতক্ষণ না পর্যন্ত বাড়ীর মেজাজী ঠিকে-ঝি এসে উনুনে আঁচ দিচ্ছে বা জলের কলে ছর ছর আর বাসন-কোসনের কর্কশ ধাতব আওয়াজ তুলে কাজ আরম্ভ করছে। সুকান্ত একদিন মিনমিনে গলায় বলেছিল, আরও একটু সকাল করে আসতে পার না বুঁচির মা! এক কাপ চা-এর জন্য সেই কখন থেকে হা-পিত্যেশ করে বসে থাকি! বুঁচির মা খনখনে গলায় হাত-পা নাচিয়ে জবাব দিয়েছিল, অমন যদি ভোর সকালে চা খাবার লালচ হয় দা'বাবু তবে আর পাঁচটা টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিও। দশ বাড়ীর কাজ থাকলে কোন দিকটা আগে সামলাই বইলবে তো! সত্যিই তের টাকা মাইনের ঠিক্ক ঝি'র কাছ থেকে এর থেকে ভালো সার্ভিস আর কি আশা করা যায়!

সারাটা বিছানা জুড়ে রোদ্দুর যখন দাপাদাপি আরম্ভ করে, ছায়া খুঁজে খুঁজে সুকান্ত যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, বাসী মুখে অম্বলের চোঁয়া ঢেকুর যখন নোনা জল কেটে সারা মুখ বিস্বাদ করে তোলে, তখন সুকান্তর ভোর সকালের চা এসে পৌঁছয়। হিড়হিড় করে চেয়ারটা তক্তপোশের কাছে টেনে এনে ঠকাশ করে চা-এর কাপ, সিগারেটের বাকস, দেশলাই ও অ্যাশট্রেটা নামিয়ে কপালের উপর হাত রেখে আড় হয়ে শুয়ে-থাকা সুকান্তকে তীক্ষ্ণ গলায় ডাক দিয়ে জাগিয়ে যায় বুঁচির মা।

সকালের দিকে শরীরটা দুর্বল লাগে। রোজকার মত আজও চমকে জেগে উঠে বালিশে কনুই ভেঙ্গে সম্মোহিতের মত

ঝুঁকে পড়ে চা-এর কাপে চুমুক দিল সুকান্ত। তিক্ত বিস্বাদ চা। বোধ হয় পাড়ার মুদী দোকানের সেই চামড়ার গুঁড়ো চলছে আবার। অলসভাবে বাঁহাতে প্যাকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরিয়ে একটা দীর্ঘ টান দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়ল সুকান্ত। আরও মিনিট পনের এমন চলবে। আশপাশের বাড়ীর সবাই যখন একজন-দুজন করে অফিসে বেরুতে আরম্ভ করবে, সুকান্ত ফোলা ফোলা চোখে, উসকো-খুশকো চুলে, পা'জামার দড়ি সামলাতে সামলাতে থলি হাতে বাজারে বেরুবে। কোনও রকমে বাজার সেরে ফিরে থলিটা ঘরে ছুঁড়ে দিয়ে গিয়ে দড়াম করে বাথ-রুমের দরজা বন্ধ করবে। পাঁচ মিনিট। তারপরেই বাইরে এসে হাঁক-ডাক আরম্ভ করবে, কইরে, মালা, তাড়াতাড়ি ভাত দে। অফিসের দেরি হয়ে গ্যালো!

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে জ্বলন্ত টুকরোটা ঘরের কোণে ছুঁড়ে দিয়ে সুকান্ত বালিশে মুখ থুবড়ে পড়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর অর্থহীন চোখে মেঝেতে একটা আরশোলার চরকীবাজি দেখতে লাগল। ছোট বোন মালা স্নান সেরে উঠে এ'ঘরে এল একবার। জানালার পর্দাগুলো টেনে-টুনে ঠিক করে ঘরের মাঝখানে দাঁড়াল মালা। তারপর তেলচিটে চার-দেওয়াল একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে ঘেন্নায় মুখ কোঁচকাল, তোর ঘরটার কি অবস্থা রে ছোড়দা? কোনও ভদ্রলোকের মেয়ে এসে এই ঘরে থাকতে পারবে? কবে থেকে বলছি তোকে ঘরটা একবার চুনকাম করা, অই দাগড়া দাগড়া গর্তগুলো মিস্ত্রী ডাকিয়ে ঠিকঠাক করা। তোর মত লোকের বিয়ে করাই উচিত নয়। যা নোংরা আর আলসে তুই না—।

এতদিনে সুকান্তর বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে। আজ বিকেলে মেয়ে দেখতে যাবার কথা। কোনও জবাব না দিয়ে উবু হয়ে শুয়ে সুকান্ত বিস্ফারিত চোখে আরশোলাটার কান্ডকারখানা দেখছিল। মালার বয়স উনিশ আর সুকান্তর পঁয়ত্রিশ। সুকান্তর প্রথম যৌবনে মালা নেহাৎই শিশু ছিল। মালার অলক্ষ্যে সে একবার দেওয়ালে টাঙ্গান ছবিটার দিকে তাকাল। বাইশ-তেইশ বছর

বয়সে তোলা ছবি। স্বাস্থ্য আর লাবণ্যে ভরপুর একটি উজ্জ্বল মুখ সবিস্ময়ে বিছানায় শোওয়া গিরগিটিটাকে নিরীক্ষণ করছে। কয়েক বছর আগে ইউনিভার্সিটিতে ওর সাবজেকটে সন্ধ্যার দিকে ক্লাশের একটা পার্ট-টাইম লেকচারশিপের জন্য ঘোরাফেরা করেছিল কিছুদিন সুকান্ত। পায় নি অবশ্য। তখন ক্যাম্পাসের দেওয়ালের গায়ে বড় বড় করে লেখা একটা ছড়া বেশ মনো-যোগ দিয়ে পড়েছিল। কবির নামটাও দেওয়া ছিল, মনে নেই। কি যেন বলে এগুলোকে? ডগেরেল—

> 'উল্টে দিন, উল্টে দিন
> নামগুলো সব উল্টে দিন।
> সংখ্যাগুলো উল্টে দিন,
> আরশোলাকে দুপুর রোদে
> উল্টে দিন, উল্টে দিন।।'

সুকান্ত মনে মনে কবিতাটা আওড়াল কয়েকবার। নিজেকে একটা উল্টে যাওয়া আরশোলার মতই মনে হচ্ছিল। একটানা চৌদ্দ-পনের বছর কেরাণীগিরি, মাষ্টারী, ক্যানভাসারী আর তেল-সাবান-দাদের মলমের বিজ্ঞাপন লেখবার চাকরির পর আর কি বাকী থাকে? বাবা হঠাৎ মারা যাবার পরই চাকরিতে ঢুকতে হয়েছিল। চারটি অবিবাহিত বোন, অসুস্থ মা। বায়োস্কোপের রীলের মত গত পনের বছরের ইতিহাস সুকান্তর চোখের সামনে সারা-রা-রা করতে করতে হোলীর নাচ আরম্ভ করে দিল।

মালা নিঃসাড়ে বিছানায় পড়ে-থাকা সুকান্তর দিকে বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর কঠিন গলায় বলল, তুই কিন্তু ঠিক চারটের মধ্যে অফিস থেকে চলে আসবি ছোড়দা, দেরি করবি না। যেতে হবে সেই গিরিশ এভেনিউ। ওখান থেকে ফিরে এসে আমাকে আবার যেতে হবে আরেক জায়গায়।

সুকান্ত এতক্ষণে মুখ তুলে মালাকে একনজর দেখল। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাবি? মালা অধৈর্য গলায় বলল, আছে এক-জায়গায়। আমার বন্ধু বাসন্তীর সঙ্গে যাব। সুকান্ত একটা প্রচন্ড ধমকে মালাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে গেল। কিন্তু থমকে একবার পূর্ণ দৃষ্টিতে মালাকে দেখল, তারপর নরম গলায় বলল, ও সব বাসন্তী-ফাসন্তী ছাড়ো। পরীক্ষা এসে গেছে। এইবার একটু পড়াশোনার দিকে নজর দাও। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে ধীরে-সুস্থে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল।

মালা উদ্ধত ফণিনীর মত ঘাড় বেঁকিয়ে কি একটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু সুকান্তর ঠান্ডা নিস্পৃহ চোখে কি দেখল সেই জানে। মিইয়ে গিয়ে গজরাতে গজরাতে পাশের ঘরে ঢুকে গেল। ছোড়দার উপর যতই তুচ্ছতা অবজ্ঞা দেখাক, এ বাড়ীতে একমাত্র সুকান্তকেই যা একটু ভয় করে মালা।

রোজকার মত আজও অফিসে পৌঁছতে দেরি হল সুকান্তর। একঘর লোকের সামনে ফোলিও ব্যাগ হাতে ট্যাং ট্যাং করে ঢুকতে মাঝে মাঝে বেশ অস্বস্তি হয় বই কি! কিন্তু উপায় কি? অই ভিড়ে বাসে-ট্রামে ছোট-লোকের মত মারপিট করে সুকান্ত কোনও দিন উঠতে পারবে না। সেকশন অফিসার বিরস মুখে একবার ওর দিকে তাকিয়ে কোনও কথা না বলে আবার দু পাশের ফাইলের স্তূপের মধ্যে ডুবে গেলেন। সুকান্ত বুঝলো আজ কপালে গেরো আছে। অথচ সকাল সকাল যেতে বলেছে মালা। পাখাটা ফুল স্পীডে খুলে দিয়ে শার্টের বোতাম আলগা করে ঘেমো জামাটা কাঁধের দু পাশে সরিয়ে নিরাসক্ত ভঙ্গীতে সুকান্ত বসে রইল কিছুক্ষণ নিজের সীটে। অফিসের বেয়ারাটা কোথায় গেছে। এক গ্লাস জল এনে যে টেবিলে ঢাকা দিয়ে রেখে যাবে—হাজার বার বললেও তার কানে যায় না। তেল তেল ঘামে সারা মুখ চটচট করছে। পাশের সীটের বিকাশ এতক্ষণ ঘাড় গুঁজে বসে কাজ করছিল। মুখ তুলে সুকান্তকে দেখতে পেয়ে ব্যস্ত-সমস্তভাবে উঠে এসে চাপা গলায় বলল, এই যে তুই এসে গেছিস। আমি একটু বাইরে চললাম, একটু ম্যানেজ করে নিস। তারপর হনহন করে বেরিয়ে গেল। বন্ধুবান্ধব দিয়ে ম্যানেজ করা পদ্ধতিটি বিকাশের অনেক দিনের। নানা রকম ব্যবসার দালালি করে বিকাশ অফিসের চাকরিটা হাতের-পাঁচ। অনেক রকম লোক আসে বিকাশের খোঁজে। প্রত্যেকের নাম-ধাম জেনে রাখতে হয়। ওপরওয়ালা সাহেবের ঘরে ডাক পড়লে নির্জলা মিথ্যে কথা বলতে হয়। বাড়ী থেকে খেয়ে আসে নি, বোধহয় খেতে গেছে। এমন কি পেটটা বলছিল ভালো নেই ল্যাভাটরি গেছে বোধ হয়। এমনি সব। মাঝে মাঝে মেয়েরাও আসে। দিব্যি সাজগোজ করা রজনীগন্ধার ডাঁটার মতো সতেজ চেহারা অফিসের আর পাঁচটা মরা মাছের মত চাউনীওয়ালা মেয়ে নয় তারা।

একটু ধাতস্থ হয়ে সুকান্ত জামার হাতা গুটিয়ে ফাইল খুলে বসল। ইমার্জেন্সী কেস আছে কতগুলো। আজকেই ছাড়তে হবে। কিন্তু ঝুঁকে পড়ে ফাইলের প্রপোজালটা ভালো করে পড়বার আগেই বেয়ারা গোকুল এক গাদা নতুন ফাইল ঘাড়ে করে এনে সুকান্তর টেবিলে আছড়ে ফেলল। কলম গুটিয়ে সুকান্ত ক্ষিপ্ত গোকুলের দিকে তাকাল। বেয়ারাটা কোনও ভ্রূক্ষেপ না করে পাশের টেবিলের কাঁচের গ্লাস তুলে নিয়ে ঠান্ডা জল আনতে চলে গেল। এবার একটা তীব্র ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে সামনে তাকাল সুকান্ত। গভীর মনোযোগ দিয়ে কাজ করছে সেকশন অফিসার সুকান্তর স্বাস্থ্য, সুখ ও শান্তি অপহরণের মূলে এর অবদান কম নয়। একটা শীর্ণ বন-বেড়ালের মত চেয়ারের এক কোণে বসে রাগে ফুঁসতে লাগল সুকান্ত।

আশপাশের ছোকরা কেরানীগুলোর রাজনৈতিক হত্যা, বাংলাদেশ, মুক্তিফৌজ, ইয়ান ফ্লেমিং ইত্যাদি নিয়ে উত্তপ্ত আলোচনা ততক্ষণ থিতিয়ে এসেছে। সবাই অল্প-বিস্তর কাজে মন দিয়েছে। নিজের টেবিলের দিকে তাকিয়ে রীতিমত চিন্তিত বোধ করল সুকান্ত। জরুরী পলিসি ডিভিশনের ফাইল সব। সুকান্ত সিনিয়র গ্রেড ক্লার্ক। কাজেই প্রতিবাদ করবার উপায় নেই। এদিকে মালা শাসিয়ে রেখেছে চারটের মধ্যে বাড়ী ফিরতে হবে। আজ পাত্রী দেখতে যাওয়ার কথা। তাহলে সত্যি সত্যিই সুকান্তর বিয়ের চেষ্টা হচ্ছে! একটুকরো মত হাসি ওর ঠোঁটের কোণে ফুটল। গত সাত-আট বছর ধরে বন্ধু-বান্ধবের বিয়েতে নিয়মিত হাজিরা দিয়ে দিয়ে নিজেকে ইদানীং কেমন যেন বিপত্নীক বা সদা টি বি মুক্ত কেউ বলে মনে হয় সুকান্তর। একটু অনামনস্কভাবে চিন্তা করল সুকান্ত।

...সিল্কের পাঞ্জাবির সংগে পায়ের কাছে লোটান চওড়া জড়িপাড় ধুতি, কোলাপুরী শুঁড় তোলা চটি। ছিপছিপে একহারা চেহারায় ভারী সুন্দর মানিয়েছিল কিন্তু। ইউনিভার্সিটির গন্ধটা তখনও গা থেকে যায়নি। এক মাথা কোঁকড়া চুল, উন্নত নাক আর টানাটানা চোখ। উত্তর কলকাতার বিয়ে বাড়ীতে কুমারী মেয়ে মহলে একটা চাপা কৌতূহল খেলা করছিল। বরের বিশেষ বন্ধু। তাই আলাদা খাতির। একেবারে অন্দর মহলে টেনে নিয়ে গিয়েছিল ওরা। ফাল্গুনের সন্ধ্যায় ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে। সানাই-এর করুণ অথচ ভারী মিষ্টি সুর মীড়ের মাথায় এসে আছড়ে পড়ছে কানে। আলোয় আলোময়—রমরম গমগম করছে সারা বাড়ী। অদ্ভুত ভালো লাগছিল সুকান্তর। কারণে-অকারণে সুন্দরী মেয়েদের সংগে মুগ্ধ দৃষ্টি বিনিময়ের মাদকতা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সুকান্তর সমস্ত অস্তিত্বকে। দীর্ঘদিন ভুলে যাওয়া কোন স্বপ্নের আবছা স্মৃতির মত সেই রঙীন মুহূর্তটা সুকান্তর চোখের সামনে ফুটে উঠছিল একটু একটু করে।...

অফিসে আসার পর থেকেই পেটে একটা ছোট্ট মোচড় অনুভব করছিল সুকান্ত। একবার টয়লেট-রুমে যেতেই হবে। প্রায় প্রতিদিনই এমন হয়। খোলা ফাইলের উপর পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। এমন সময় পাশের সেকশনের ভূপেন্দ্রমোহন এসে দাঁড়ালেন কয়েকটা টাইপ করা কাগজ হাতে। এই যে সুকান্তবাবু, আপনি তো ইংলিশে অথরিটি। শেলীর 'দি ক্লাউডস'-এর উপর একটা নোট করেছি। হেঁ-হেঁ আপনারা ইনটেলেকচুয়েল লোক, একটু দেখিয়ে নিলে সাহস পাই আর কি!

সুকান্ত কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে ভূপেন্দ্রমোহনকে দেখল। বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। দিব্য টুসটুসে গৌর-বর্ণ চেহারা। নিখুঁতভাবে কামান দাড়ি-গোঁফ। পরনে ফর্সা কাঁচি-ধুতির উপর দামী আদ্দির পাঞ্জাবি। টুাশানী করেন ভদ্রলোক। মেয়েদের পড়ান। অল্পবয়েসী বনেদী ঘরের মেয়ে সব। বয়ঃসন্ধিকালে নারী রজঃস্বলা হয়।...ভূপেনবাবুকে দেখে কথাটার মানে সুকান্ত যেন কিছুটা বুঝতে পারল। সুকান্তর দৃষ্টি ধীরে ধীরে অস্বচ্ছ হয়ে উঠতে লাগল চেয়ারে বসে।

...এই সুকুদা, তোমার বাঁদিকে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হাতটা আরেকটু বাড়াও। আঃ, ঐ তো পাতাগুলোর আড়ালে। ঈশ, তুমি দেখতে পাচ্ছ না? অধৈর্য গলায় পাশের বাড়ীর চৌদ্দ বছরের মিঠু আতাফল গাছটার ঠিক নীচে দাঁড়িয়ে সুকান্তকে পাকা আতাফল দেখিয়ে দিচ্ছিল।

সুকান্ত ঊর্ধ্বমুখী হয়ে বিভ্রান্তভাবে এক হাতে গাছের ডাল চেপে ধরে আরেক হাতে মিঠুর দেখান পাকা আতা খুঁজছে। হদিস না পেয়ে আরেকটা ডাল বেয়ে সুকান্ত টলমল করতে করতে উপরে উঠল। নীচে থেকে মিঠু তীক্ষ্ম গলায় সাবধান করে দিল, এই সুকুদা আর উঠো না পড়ে যাবে। ঠিক তখনি মড়-মড় করে ডাল ভেঙে পড়ে গেল সুকান্ত নীচে শুকনো বন-তুলসীর ঘন ঝোপের উপর। মিঠুকে সুদ্ধু নিয়ে। ভাগিস বেশী উঁচু থেকে পড়ে নি। আর স্প্রীং-এর গদীর মত ঝোপটা ছিল। ষোল-সতের বছর বয়েসের সুকান্তর সমস্ত শরীরটা মিঠুর নরম তুলতুলে দেহের উপর। সুকান্তর কনুইটা চেপে বসেছে মিঠুর উদ্ভিন্ন বুকের ওপর। হাঁসফাঁস নিঃশ্বাসের মধ্যে কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে কাটল। নরম আবছা গলায় মিঠু কানের কাছে বলল, এই ছাড়ো, কেউ এসে পড়বে। সম্বিত ফিরে পেয়ে সুকান্ত ধড়মড় করে উঠে বসে তাকাল চারদিকে। মফঃস্বল শহরের নির্জন দুপুর। কেউ নেই কোথাও। মিঠু তেমনি অসহায়ভাবে হাঁটু ভেঙে ঝোপের উপর শোওয়া। দুর্ঘটনা এড়ানোর উত্তেজনা আর ঘামে ওর সারা মুখ রক্তাভ। রেশমী চুল উড়ে এসে কপালের সঙ্গে লেপ্টে আছে। অদ্ভুত দৃষ্টিতে মিঠুর শোওয়া দেহটার দিকে তাকিয়ে রইল সুকান্ত কিছুক্ষণ। হাঁটুর উপর থেকে ফ্রকটা সরে গেছে। শঙ্খের মতো সাদা সুডৌল আর মসৃণ জঙ্ঘার অনেকটা অনাবৃত হয়ে আছে। চোখ সরিয়ে নিয়ে সুকান্ত আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। কান দুটো ঝাঁ-ঝাঁ করছে। সমস্ত শরীরে যেন বিপ্লব আরম্ভ হয়ে গেল তার।

ফ্রক ঝেড়েঝুড়ে ঠিকঠাক করে মিঠুও উঠে দাঁড়াল। চুলগুলো গোছা করে পিঠের পাশে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে এসে চাপা গলায় বলল, তুমি একটা হাঁদারাম। তারপর দৌড়ে গিয়ে বাড়ীর ভিতর ঢুকে গেল।...

দুপুরে টিফিনের সময় ক্যান্টিনে বসে কথা হচ্ছিল। অফিসের সুকান্ত, বিকাশ, চাকলাদারবাবু আর মিঃ ধিংড়া। অর্ডার সাপ্লাই-এর কন্ট্রাক্টার মধ্যবয়সী মিঃ ধিংড়া। সুকান্তদের আধা-সরকারী অফিসে ওদের একচেটিয়া বিজনেস। অফিস স্টাফের কাছ থেকে কি করে কাজ আদায় করতে হয় মিঃ ধিংড়া জানে। সুন্দর বাংলা বলে। বিকাশ আর চাকলাদারবাবু অনেক দিন আগেই ওর অনুগত হয়ে পড়েছে। সুকান্তকে প্রায়ই অনুযোগ করে মিঃ ধিংড়া, মিঃ সান্যাল, শরীরের দিকে একদম নজর দিচ্ছেন না। ইয়ংম্যান, এটা ভালো নয়। আমার সঙ্গে কিছুদিন আসুন, লাইফ কাকে বলে দেখবেন। রোজকার মত আজকেও কথাটা বলল ধিংড়া।

বিকাশ ফ্যাসফেসে গলায় হেসে বলল, সুকান্ত লাইফ দেখবে? তাহলেই হয়েছে। ওতো এক পেগ ড্রিংকস-এই কাত। তার উপর আরও কিছু হট স্টাফ দিলে সব্বার আগে বাথরুমে ছুটবে! সবাই হা-হা করে হেসে উঠল বিকাশের বলার ভঙ্গী দেখে।

এর আগে দু-একবার গেছে সুকান্ত ওদের সঙ্গে। শেড দেওয়া নীয়ন আলোর আবছা অন্ধকারে নরম গদীমোড়া চেয়ারে গা এলিয়ে বসে ঠাণ্ডা বীয়ারে চুমুক দিতে ভালই লাগে। ধিংড়ার চেনা মেয়েও দু-এক জন আসে। দিব্যি মাজাঘষা সপ্রতিভ চেহারা। বেশ ঘনিষ্ঠভাবে কাঁধে হাত রেখে গল্প করে। বিকাশ ঘু-ঘু ছেলে। দিব্যি উশুল করে নেয়। সুকান্তর প্রথম দিকে আগ্রহ ছিল। আজকাল মিইয়ে গেছে। আসলে মদটা ওর পেটে সহ্য হয় না। তবুও কৃষ্ণা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে একদিন এগিয়েছিল শেষ পর্যন্ত। কালোর উপর সুন্দর মসৃণ চেহারা। ওদের আলাপের সুবিধের জন্য পাশের ফাঁকা কেবিনে জোর-জার ঢুকিয়ে দিয়েছিল বিকাশ। কেবিন মানে একটা ছোট ঘর। খাট-পালঙ্ক আয়না সবই আছে। কুঁজোতে খাবার জল পর্যন্ত।

মিঃ ধিংড়া অমায়িকভাবে উদার গলায় বলল, আজকেই চলুন না সন্ধ্যায়? আমার নতুন বান্ধবী মীনা জহুরীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। সী নোজ হাউ টু এনটার-টেইন। সুকান্তকে ধিংড়ার দরকার। পাবলি-সিটি বাজেট ওর হাতে।

সুকান্ত কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখল। সোয়া তিনটে বাজে। কিছুক্ষণ উশখুশ করে তারপর উঠে দাঁড়াল, 'আজ মাপ করতে হবে মিঃ ধিংড়া, বাড়ীতে একটা খুব জরুরী কাজ আছে চারটের সময়।'

ওদের সকলের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে সুকান্ত ব্যস্ত-সমস্তভাবে দোতলায় উঠে গেল। সেকশন অফিসারকে বলে টেবিল গুছিয়ে রেখে ফোলিও ব্যাগ বগলে চেপে বেরিয়ে পড়তে-পড়তে সাড়ে তিনটে বেজে গেল।

রোদটা তামাটে হয়ে এলেও তেজ কমে নি। রাস্তার বাসস্টপে লোকগুলো নির্বিকার শান্তভাবে ঐ গনগনে রোদের তাপে দাঁড়িয়ে আছে খাঁচায় বাঁধা গৃহপালিত জন্তুর মত। পোড়া তামাটে মুখ সব। সুকান্তর হঠাৎ জার্মান কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের কথা মনে পড়ল। অৎসউইচ, বেল-সেন কিংবা লুবিস্কার ঘেটো। সার বেঁধে দাঁড় করান মৃত্যুপথযাত্রী ইহুদী নারী-পুরুষ।...ডায়েরী অফ অ্যানি ফ্রাংক! এক-একটা ভাঙা নড়বড়ে বাস ঘড়াং ঘড়াং করতে করতে এসে ক্যাঁচ করে থামছে কি থামছে না, লোকগুলো সব হুমড়ী খেয়ে পড়ছে গেটের উপর। দু-চারজন বলবান ঠেলে-গুঁতিয়ে উঠতে পারল। বাকী সবাই ছিটকে পড়ল এদিক-ওদিক। আর অমনি ডিজেলের কালো ধোঁয়ার কটু গন্ধ ছেড়ে বাসটা ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে বেরিয়ে যাচ্ছে। নাঃ কোনও আশা নেই! একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে ফোলিও ব্যাগটা বগলে চেপে ধরে সুকান্ত এক পাশে সরে দাঁড়াল।

সুকান্তর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছিল, এই ভিড় ছেড়ে একটু ফাঁকায় সরে দাঁড়ালে একটা সুরাহা হতে পারে। হলও তাই। হুশ করে একটা ট্যাকসী এসে দাঁড়াল। ভাড়া চুকিয়ে আরোহী নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুকান্ত টপ করে উঠে বসল ট্যাকসীতে। প্রশান্ত গলায় বলল, চলুন সাউথের দিকে। তার-পর একটা সিগারেট ধরিয়ে সীটে গা এলিয়ে বসল। মদে আর ট্যাকসীতে পয়সা ওড়াতে সুকান্তর ভারী মায়া লাগে। কিন্তু এই আভিজাত্যটুকু না থাকলে বিয়ে-থার কথা যেন চিন্তা করা যায় না।

ট্যাকসীতে বসে অন্যমনস্ক হয়ে পড়-ছিল সুকান্ত। কেমন দেখতে-শুনতে মেয়েটা কে জানে! ছবিতে তো বেশ ভালই লেগেছে। পুরীর সমুদ্রের ধারে তোলা। হাওয়ায় আঁচল উড়ছে, লীলায়িত ভঙ্গীতে দাঁড়ান। বি-এ, বি-টি স্কুল টিচার। এর বেশী আর কি আশা করে সুকান্ত!... আশা-ভরসা...! ঠাণ্ডা ফেনায়িত বীয়ারে প্রথম চুমুক দেবার মত কৌতুকটা ঠোঁটের কোণে আর জিভের ডগায় অনুভব করল সুকান্ত। রেস-কোর্সের ধার দিয়ে ট্যাকসীটা ছুটে চলছিল। বেশ মিল আছে পুরোনো অনুভূতিটার সঙ্গে। মাদ্রাজ মেলের শ্লীপার কামরায় ওরা এগারজন। ছটি মেয়ে, পাঁচটি ছেলে। ইউনিভার্সিটি থেকে স্টাডি-ট্যুরে বেরিয়েছিল। অনেক রাত তখন। ঘুম আসছিল না। জানালায় মাথা রেখে একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছিল সুকান্ত। হু-হু করে ট্রেন ছুটে চলেছে অন্ধ্রপ্রদেশের রুক্ষ প্রান্তরের মধ্য দিয়ে। সুকান্ত বুঝতে পারছিল একটু দূরে আব্ছা-অন্ধকারে শোওয়া নন্দিতাও ঘুমোয় নি। নিউম্যাটিক বালিশটার কোণে মাথা রেখে অপলক চোখে সুকান্তর দিকে তাকিয়ে আছে। ভরসা পায় নি তন্বী শ্যামা...স্তোক-নম্রা স্তনাভ্যাং নন্দিতা বোস। বাপ-মায়ের একমাত্র মেয়ে। পয়সা আছে ওদের। সুকান্তর বাড়ীর অবস্থা জানবার পর কিছু দিন আকুলি-বিকুলি করেছে। তারপর ছেড়ে চলে গেছে। ভালো বিয়ে হয়েছে কোন এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে। স্বামী-পুত্র-কন্যা নিয়ে এখন সুখে ঘর-সংসার করছে।

অনেকক্ষণ এক নাগাড়ে বাঁ হাতটা সীটের উপর তুলে রাখার জন্য কাঁধটা টন-টন করছিল। ট্যাকসী একটা ঝাঁকুনী দিয়ে বাড়ীর রাস্তায় ঢুকতে সচকিতভাবে সুকান্ত সোজা হয়ে বসল। কাঁটায় কাঁটায় চারটে। এত নিখুঁত সময়জ্ঞান দেখে মালাটা আবার কি ভাববে কে জানে?

ট্যাকসী দাঁড় করিয়ে রেখে ব্যস্ত-সমস্ত-ভাবে বাড়ী ঢুকল সুকান্ত। মালা তন্ময়ভাবে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধছে। খুশী গলায় সুকান্ত তাড়া দিল, নে-নে জলদি কর। ট্যাকসী দাঁড়িয়ে আছে। নিজের ঘরে ঢুকে ঘেমো শার্ট-প্যান্ট খুলে ফেলে আন্ডারওয়্যার পরা অবস্থায় ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করল। সাদা প্যান্টের উপর হাল্কা স্ট্রাইপ দেওয়া নীল বুশ সার্ট আর হরিণের চামড়ার স্যান্ডালটা পরে গেলে কেমন হয়? বেশ কম বয়স মনে হবে। দাড়ি কামান আয়নায় মুখ দেখল সুকান্ত একবার। জুলফির কাছে অনেক চুলপেকে উঠেছে। নাঃ বড্ড বেশী চ্যাংড়া আর রোগা দেখাবে। ধুতি-পাঞ্জাবি? উঁহু, বড্ড কেরানী কেরানী দেখায়। রিস্ক নিতে ভরসা পেল না সুকান্ত। তাড়াতাড়ি একটা ব্যবহৃত নেভীব্লু টেরিলিন প্যান্টের উপর ধোপদুরস্ত ফুলসার্ট চাপিয়ে পকেটে মনি-ব্যাগ গুঁজে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। পেটটা সামান্য মোচড় দিচ্ছে। আরেক বার বাথরুমে যেতে পারলে ভালো হত। ওদিকে ট্যাকসী-ওয়ালা বাইরে অধৈর্য হর্ন দিচ্ছে।

বাড়ী চিনে ওরা পৌঁছল প্রায় পাঁ নাগাদ। মেয়ের দিদির বাড়ী। কোনও র সজীবতার লক্ষণ চোখে পড়ল না। খবর কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে বিয়ের সম্বন্ধে ব্যাপার প্রথমটা এই রকমই হয়। সাধা মধ্যবিত্ত বাড়ী, কিন্তু খুব সাজান-গোছান। হাসিমুখেই অভ্যর্থনা করে দিদি ঘরে বসালেন। প্রথম দর্শনে সুকান্তকে এখনও মোটামুটি ভালই দেখায়। ধীরে ধী অবক্ষয়ের চিহ্নগুলি সজাগ দৃষ্টিতে ধ পড়ে। এই বয়সেই রগের কাছে জুলফি বরাবর অনেক চুল পেকে গেছে। গালে হনুর হাড় দুটো অস্বাভাবিক রক উঁচু হয়ে উঠেছে। কথা বলার সময় ঢলঢলে সার্টের কলার ডিঙিয়ে গলার অ্যাডাম অ্যাপলটো বিশ্রীভাবে ওঠানামা করে। বে বোঝা যায়, ঐ ধোপদুরস্ত জামাকাপড়ে আড়ালে একটি রস নিংড়ে বার করে নেওয়া শীর্ণ বোলকুঁজো মানুষ সাগ্রহে অপেক্ষা করছে কোনও সঞ্জীবনী স্পর্শের জন্য। পাত্রীর দিদি সোজাসুজিই সুকান্তকে দেখলেন। মুখের উজ্জ্বল হাসিটা মিলিয়ে গেছে।

একটু পরেই ঘরের পর্দা সরি পাত্রী সহজ ও সপ্রতিভ ভঙ্গীতে ঘ ঢুকল এবং হাত তুলে নমস্কার করে স্মিত মুখে চেয়ারে বসল। নাম বলল, শ্রীমতী ব্যানার্জি, সুকান্তর বুকের ভিতর হৃৎ-পিণ্ডটা একবার ধ্বক করে উঠেই দাপাদাপি আরম্ভ করে দিল। রীতিমত গৌরবর্ণ সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী একটি হাস্যোজ্জ্বল মেয়ে। সাতাশ আঠাশ বছর বয়েস। অথচ কোন জড়তা ও মালিন্যের চিহ্ন নেই।

সুকান্ত আড়চোখে দেখল মালার দাম্ভিক মুখও নরম হয়ে এসেছে।

প্রাথমিক আলাপ পরিচয়ের পর্ব শেষ হবার পর সামান্য জল-খাবার এল। শ্রীমতী ব্যানার্জি নিজেই উঠে গেল খাবার আনতে। সুকান্ত মুগ্ধ চোখে দেখল একটি শুভ্র রাজহংসীর লীলায়িত গতিভঙ্গী। অনেক দিন পর আবার উত্তর কলকাতার সেই বিয়ে বাড়ীর শানাই-এর করুণ অথচ মিষ্টি সুর সুকান্তর কানের কাছে বাজতে লাগল।

...পার্কস্ট্রীটের সন্ধ্যাটা মনে মনে কল্পনা করল সুকান্ত। ফুর ফুরে হাওয়া দিচ্ছে। পাশাপাশি হাটতে হাটতে ওর লেমন রঙ-এর সিল্কের শাড়ী প্রায়ই খসে পড়ছে উন্নত সুডৌল বুকের উপর থেকে। শ্যাম্পু-করা চুল উড়ে এসে পড়ছে কপালে বার বার। বিব্রত অথচ খুশীভাবে ও তাকাচ্ছে চারদিক। সামনের বড় রেস্টুরেন্টে ঢুকবে ওরা। একটু এগিয়েই দেখা হবে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডভারটাইজিং-এর কুশল গুপ্তর সঙ্গে। আমেরিকান ঢং-এ চটকদার ইংরেজী বলে ও লেখে। মাইনে পায় নাকি দু হাজারের উপর। চেহারাটা অবশ্য চোখে পড়বার মত। সুকান্তকে বরাবরই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে এসেছে কুশল গুপ্ত। এবার কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে হ্যালো মিঃ সান্যাল, গুড ইভনিং, বলে হাসিমুখে তাকাল। সুকান্তও সহাস্য মুখে শুভ সন্ধ্যা জানিয়ে দাঁড়াল। তারপর একটু ইতস্ততঃ করে বলল, ওয়েল মিঃ গুপ্ত, মিট মাই ওয়াইফ। গুপ্ত স্মিত মুখে ওর দিকে তাকিয়ে হাত তুলে নমস্কার করবে। কিন্তু বুকের ভিতরটা হিংসায় জ্বলে যাবে। গুপ্তর স্ত্রীকে সুকান্ত দেখেছে আগে। বড়লোকের মেয়ে, কিন্তু লম্বা সিঁড়িঙ্গে অ্যানিমিক চেহারা। ঠিক সময় বুঝে সুকান্ত, ওকে সী ইউ, বলে এগিয়ে যাবে ওর কাঁধে হাত রেখে। সুকান্ত জানে গুপ্ত পিছন ফিরে তাকাবে। সুকান্ত তাচ্ছিল্য ভরে সিগারেটের শেষাংশ রাস্তায় ছুঁড়ে দিয়ে ওর কোমরে হাত রেখে রেস্টুরেন্টের ভিতরে ঢুকবে দারোয়ানের সেলাম কুড়োতে কুড়োতে।...

কথাটা উঠল খাওয়া নিয়ে। মিষ্টি বেশী খেতে পারে না সুকান্ত। কয়েকটা দাঁতের এনামেল উঠে গেছে। মিষ্টি খেলেই ধরে। দিদির মুখভাব এবার বেশ গম্ভীর মনে হল। একটু প্রখর দৃষ্টিতে সুকান্তকে দেখে হালকা গলাতেই বললেন, খেতে পারেন না কেন? অম্বল আছে নাকি? সুকান্ত চোখ তুলে দেখল শ্রীমতী ব্যানার্জি কোচের চেয়ারে বসে আছে—নিবাত নিষ্কম্প বত্তিচেল্লীর ভেনাস। মৃদু হেসে কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছিল সুকান্ত। অল্প-বিস্তর অম্বল অ্যামিবায়োসিস নেই, কটা তার বয়েসী বাঙালী ছেলে আছে কলকাতায়। দিদি আবার কৌতূহলী অথচ দৃঢ় গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, কি খেতে পারেন না কেন, অম্বল আছে নাকি?

কি জবাব দেবে সুকান্ত? বত্তিচেল্লীর ভেনাস উৎকীর্ণভাবে অপেক্ষা করছে উত্তর শোনবার জন্য। নিজেকে থানায় ধরে নিয়ে আসা একটা ছিঁচকে চোর বা পকেটমারের মত মনে হতে লাগল সুকান্তর। ওঁদের মত দিদির পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলবে নাকি, মাইরী বলছি দিদি, অম্বল-ফম্বল কিছু নেই আমার। বেরিয়াম মীল করিয়েছিলাম, আলসার-ফালসার কিছু পায়নি ডাক্তার। সেই সকাল ন'টায় বাড়ী থেকে বেরোই, ফিরি রাত দশটার পর। এই রেস্টুরেন্ট-ফেন্ট-এ খাই। মাঝে-মধ্যে চোঁয়া ঢেকুর কি বুকগলা জ্বালা করে। আ—আমাকে আসলে মেরে দিয়েছে অ্যামি—এই পর্যন্ত মনে মনে বলেই তেমনিভাবে নিঃশব্দে জিভ কাটল সুকান্ত। এর উপর যদি শোনে আরও কদর্য পেটের রোগ আছে—।

নিজেকে সামলে নিয়ে সুকান্ত ইনটেলেকচুয়াল হবার চেষ্টা করল। পালিশকরা হাসির সঙ্গে একটু চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, দেখুন, ম্যান ইজ মরটাল। হু নোজ ফর হুম দি বেল টোলস্। অসুখ বা রোগ নেই এটা কি কেউ জোর দিয়ে বলতে পারে? এই তো দেখুন না কয়েকদিন আগেই আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক মারা গেলেন হঠাৎ। দিব্বি স্বাস্থ্যবান বলিষ্ঠ চেহারা। পরে শোনা গেল লিভার ক্যানসার হয়েছিল। এই পর্যন্ত বলে সুকান্ত একটু হেঁ-হেঁ করে হাসল। সামনে বসা পাত্রীর দিদি যেন একটু চমকে উঠলেন। অতিরিক্ত সিগারেট খায় সুকান্ত, কালো কালো ক্ষয়-যাওয়া দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে।

এর পর আলাপটা আর বিশেষ জমল না। দু-চারটে মামুলী কথাবার্তার পর সুকান্ত সবিনয়ে উঠে দাঁড়াল, আজ চলি। মালা বুদ্ধিমতী। ব্যাপারটা আগেই আঁচ করেছিল। সেও নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল। দরজার কাছে শ্রীমতী ব্যানার্জি হাত তুলে নমস্কার করল। ঠাণ্ডা নিরাসক্ত চাউনি। সুকান্তর নিরাশ্রয় দৃষ্টি মুগ্ধ হতে গিয়ে বিষন্ন হল। বিউটি অফ মেডুসা!

বাইরে জোরে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। তিরতির বৃষ্টি পড়ছে এখনও। সামনের দোতলা বাড়ীটার ছাদে তারের উপর মেলা একটা ভেজা রঙীন শাড়ীর উপর বসে একটা রুগ্ন রোঁওয়া ওঠা কাক মুখ ঘসছে আর থেকে থেকে কা কা করে উঠছে। সুকান্ত একদৃষ্টে কাকটাকে কিছুক্ষণ দেখল। তারপর একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে পাশে দাঁড়ান মালাকে বলল, চল ঐ সামনে বাস-স্টপ।

কলেজ স্ট্রীট ধরে, ইউনিভার্সিটি পেরিয়ে মেডিক্যাল কলেজের কাছাকাছি বাসটা আসতেই সুকান্ত হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। তারপর ভিড় ঠেলে টাল-মাটাল করতে করতে এগিয়ে গিয়ে লেডিস সীটে বসা মালার হাতে টিকিটটা গুঁজে দিয়ে বলল, তুই বাড়ী চলে যা। আমার একটু কাজ আছে এদিকে। ফিরতে রাত হবে। তারপর ঝাঁকুনী দিয়ে বাসটা থামতেই টুপ করে নেমে ভিড়ের স্রোতে মিশে গেল।

সিগারেট ধরিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে লাগল সুকান্ত। এতক্ষণের এলোমেলো চিন্তাগুলো তালগোল পাকিয়ে মগজে পাক খাচ্ছিল নরম মাটি ফুঁড়ে ওঠা এক ডাঁই কেঁচোর মত। মাথাটা বিলকুল সাফ আর হাল্কা লাগছে এখন। মোড়ের পানের দোকান থেকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনল সুকান্ত। তারপর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ লোকের মতো আধ-বোজা চোখে চারদিক এক নজর দেখে নিয়ে বাঁ দিকের মার্কা-মারা গলিতে ঢুকে গেল।

তখন অনেক রাত। ট্রামের ঘড় ঘড়, ডবল-ডেকার বাসের গর্জন স্তিমিত হয়ে আসতে আসতে থেমে গেছে। মাঝে মধ্যে একটা ট্যাকসী হুশ করে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যাচ্ছে। একটা খালি রিকসা ঠং ঠং করে ঘণ্টি বাজাতে বাজাতে ঠকাশ্ ঠকাশ্ শব্দ তুলে খানা-খোন্দলের উপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে মাতালের মত।

দিশী মদের তীব্র ঝাঁঝাল উত্তেজনাটা কেটে গেছে। একটা সুখকর অবসাদের প্রলেপ জড়িয়ে আছে সর্বাঙ্গে। স্খলিত পায়ে ঘুম ঘুম চোখে রাস্তা পার হল সুকান্ত। সামনে হাসপাতালের বড় গেটটা তখনও খোলা। কিছু বিকলাঙ্গ ভিখিরী আশ্রয় নিয়েছে ভিতরের শেডটার নিচে। ভিতরে ঢুকে প্রশান্ত মনে সুকান্ত দেখতে লাগল ইতস্ততঃ শোওয়া অন্ধ-আতুর মানুষকে। এ পাশে একটি বৃদ্ধ কুষ্ঠ রোগী পায়ের উপর থেকে ব্যাণ্ডেজ সরিয়ে হাঁটু তুলে বসে হাত দিয়ে ভন-ভনে মাছি তাড়াচ্ছে আর হাক্ হাক্ করে থু-থু ছেটাচ্ছে চারদিক। আরেক পাশে একটা পাগলী টিনের ভাঙ্গা থালাটা মাথায় গুঁজে শোবার চেষ্টা করছে আর থালাটা বার বার পিছলে সরে যাচ্ছে দেখে আঁউ-আঁউ করে মুখ দিয়ে একটা বিজাতীয় শব্দ করে উঠছে। নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে গিয়ে ওদের মাঝখানে একটু ফাঁকা জায়গা বেছে নিয়ে সুকান্ত টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল।

কপালের উপর হাত রেখে আধো-ঘুম আধো-জাগরণে আচ্ছন্ন অবস্থায় চিন্তা করতে চেষ্টা করছিল সুকান্ত। দেহহীন অস্তিত্বের অনুভূতিটা ঘুমের অতল সমুদ্রে তলিয়ে যেতে যেতে আবার ভেসে উঠছে হাল্কা সোলার মত। দিগন্ত বিস্তারী সমুদ্র জল-কল্লোলের অস্পষ্ট গর্জন কানের কাছে আছড়ে পড়ছে বার বার। সুকান্তর ইচ্ছা হল যেন সে ডুবে মরে যায় সেই অতলান্ত সমুদ্রে। মুহূর্তের মৃত্যু-যন্ত্রণা। তারপরই ওর নিষ্প্রাণ দেহ ঢেউ-

করোজ্জ্বল বিশাল জল-রাশির চঞ্চল ঢেউ-এর তালে তালে নাচতে নাচতে যুগ-যুগান্তর ধরে ভেসে বেড়াবে। সামুদ্রিক পাখীগুলি ওর চোখ দুটো ঠুকরে ঠুকরে খাবে। সূর্যের তীব্র তাপ বুক-পিঠ পোড়াতে থাকবে। মাছগুলো অন্ত্র-নালীর অংশ নিয়ে মহা ভোজের উল্লাসে মেতে উঠবে। তারপর আস্তে আস্তে মাথাটা নিচে ঝুঁকিয়ে টুপ্ করে সুকান্ত ডুবে যাবে নীল সমুদ্রের গভীর তল-দেশের বালুকাস্তীর্ণ বুকে জেগে-থাকা পাহাড় - পর্বত - কন্দরে শ্যাওলা আর অজস্র প্রাগৈতিহাসিক জলজ উদ্ভিদের মধ্যে। বরফের মতো ঠান্ডা নীল জলস্রোত টেনে নিয়ে যাবে ওর দেহ এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত। সেই লোনা-জলে তার দেহ থেকে মাংসের তন্তুগুলো ক্ষয়ে যেতে যেতে নরম রোঁওয়ার মত আস্তে আস্তে খসে পড়ে যাবে নিচে। সুকান্তর মেরুদন্ড, করোটি, পর্সুকা অবিশ্রান্ত জল-স্রোতে মেজে ঘসে ঝক্ ঝকে হয়ে উঠবে। তারপর এক সময় ঢেউ-এর ধাক্কায় একটি শ্বেত শুভ্র কঙ্কাল ভেসে উঠে কোনও বালুকাস্তীর্ণ সমুদ্র সৈকতে আছড়ে পড়বে মসৃণ দেহ শংখ বা ঝিনুকের মত। তারপর হয়তো কোনও কিশোরী পথচারিণীর পায়ের চাপে সুকান্ত সান্যালের জীর্ণ কঙ্কাল গুঁড়ো হয়ে শেষ পর্যন্ত বালিতে রেণু রেণু হয়ে মিশে যাবে। এমনি এক বিষণ্ণ-মধুর অনুভূতির আশ্লেষে নিজেকে জড়াতে জড়াতে সুকান্ত এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল

চল্লিশের দোরগোড়ায় এসে ॥

কায়সুল হক

কিশোর কালে
এক আশ্চর্য খেয়াল
আমার মাথায় বড়ো বেশি খেলা করতো
সারা দুপুর বিকেল এমনকি সন্ধ্যা
আমি টোঁ টোঁ করে ঘুরেছি শহর
বন্ধুদের নিয়ে বন্ধু খুঁজে চলেছি;
আমাদের হৈ হুল্লোড়ে
সারা শহরটা
আশ্চর্য উজ্জ্বল রোদ হয়ে যেত শীতের বিকেলে।
খুশির ধারায় স্নান সেরে
আমরা সকলে পবিত্র দেবশিশু হয়ে যেতাম।

আজ চল্লিশের কাছাকাছি এসে দেখছি
কিছু কিছু অদ্ভুত খেয়াল
এখনো মাথায় বাসা বাঁধে;
(হয়তো পুরনো সেই অভ্যাসের জের)
শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে নিজেকে খোঁজার চেষ্টা
নিজের সঙ্গে নিজের কথোপকথন,—
ঈসবের জন্য
ই শব্দই এখন তার পিছনে আমাকে ঘুরে বেড়ানোর
অবাধ লাইসেন্স দিয়ে বসে আছে।

জানি না কতটা শব্দ সচেতন হতে পেরেছি।
ভিতরের মানুষকে খুঁজে নিতে
আমার নিজের ভিতরের মানুষকে খুঁজে পেতে
অনেক অনেক সময়ের প্রয়োজন
মনে হচ্ছে, মানুষের ভিতরে মানুষ
এবং যথাযথ সব শব্দ
পেতে হলে
আমাকে কিশোর কালে ফিরে যেতে হবে
ফিরে পেতে হবে
সেই উদ্দাম দিনগুলোকে
এবং এই চল্লিশের পর আর যতদিন বাঁচবো
শুধু এবং মানুষ খুঁজে খুঁজে
অবিরাম পরিশ্রমে আমাকে কেবল ক্লান্ত হতে হবে,
আমার সময় একনিষ্ঠ সেবকের মতন একাগ্র
ঠিক ঠিক শব্দ বাছাইয়ের কাজে।।

তিনটি কবিতা ॥ প্রতিমা সেনগুপ্ত

তাই হোক

তোমাকে বুকে নিয়ে অগ্নিযুগ পার হয়ে এলাম;
এখন মৃত্যুকে ভয় কি?
মৃত্যু কি আগুনের চেয়েও শীতল?
তবে সেই শীতলতা এসেই আমাকে দীক্ষা দিক না হয়।

কি চাই?

আমার পরমেশ্বরকে চাইছি না;
কিন্তু
তোমায় দিয়ে কি আমার সব চাহিদা পূরণ হবে?
তবে কেন তোমার চোখের পাড়ে পাড়ে আমি
জল ফেরি করে ফিরছি?

শিল্প

মন কখনও তৈরী হয়?
কেমন করে তবে মূর্তি গড়বে বলত?
কাদায় ছাঁচ পরা পায়ের যন্ত্রণায় তুমি
অস্থির উন্মাদ,
তারই প্রকাশ্য নিঃশ্বাস এই সৃষ্টি!

নির্জনতা ॥

অমল রাহা

পুরনো কবরের হাড়গোড়ে পা রেখে
উঠে এলো একউঠোন নির্জনতা—
নির্জনতা কি শূন্য?
আমি ভীষণ নির্জনতায় ভুগছি আজকাল শূন্যতায় ক্রমশ
লাটাই-ছেঁড়া ঘুড়ি
ছেদচিহ্নের মতো প্রাত্যহিক বশংবদ অভ্যাসে
বেঁচে থেকেও বেঁচে আছি তেমন মনে হয় না।

আমার জানালার কাছে জামরুল গাছে প্রত্যহ
শিশির পতনের শব্দ হয়—
নির্জনতা কি অমন অমল শব্দে বেজে উঠতে পারে?
আমার পিতা, পিতামহরা ওই সব শব্দের স্ফটিকে
প্রতিমা গড়েছিলেন একদিন ঈশ্বরীর, মানবীর এবং
বিখ্যাত হয়েছিলেন মানবসমাজে;
আমার প্রতিভা ততদূর না হলেও ইদানীং
ওই সব শব্দ হাতে তুলে নিয়েছি
জামরুল গাছের শিশিরের নির্জনতার থেকে
কিন্তু কোন ঈশ্বরীর প্রতিমা গড়তে পারিনি মানবীর না
বরং ওই সব শব্দকে নিয়ে খেলতে খেলতে
ওই সব শব্দ দিয়ে ইস্পাতের ফলা বানিয়ে বানিয়ে
নিজেদের হত্যা করেছি...
এখন আমাদের কবরের হাড়গোড়ে পা রেখে
উঠে এসেছে একউঠোন নির্জনতা।

অঙ্গনা

সার্কাস শিল্পী

সার্কাস ম্যাজিক নয়। দর্শকের চোখকে ফাঁকি দেওয়ার কোন উপায় নেই রিং-এর চারপাশে হাজার হাজার দর্শকের উৎসুক চোখের সামনে গুরুর কাছে শেখা বিদ্যার প্রমাণ দিতে হয়। দিনের পর দিন সুকঠোর সাধনায় এই বিদ্যা আমরা লাভ করি। ট্রাপিজ থেকে শুরু করে নানা খেলায় আমরা অংশগ্রহণ করি। সাইকেল চালনা, ব্যালান্সের খেলা, জীপ জাম্পিং এবং আরো কতোরকম খেলা। মোটামুটি ভাবে সব খেলায় আমাদের ট্রেনিং নিতে হয়। তারপর যোগ্যতানুযায়ী এক একজনের উপর এক একটি খেলা দেখানোর দায়িত্ব পড়ে। তবে জন্তু জানোয়ারের খেলায় আমাদের তেমন কোন ভূমিকা নেই। সে দায়িত্ব পালন করেন মুখ্যতঃ পুরুষ শিল্পীরা।

সার্কাস দলের সংস্পর্শে আমরা আসি খুব ছেলেবেলায়। আমরা প্রায় সবাই কেরালার মেয়ে। অন্য রাজ্যের মেয়েদের সার্কাসে কদাচিৎ দেখা যায়। এর পেছনে অনেকখানি অর্থনৈতিক কারণ আছে। কেরালার তেল্লিচেরীতে অধিকাংশ সার্কাস মালিকের বাস। সেখানকার অধি-বাসীরা খুবই গরীব। ছেলেমেয়েকে মানুষ করার সঙ্গতি তাঁদের নেই। তাই তাঁরা সার্কাস মালিকদের কাছে নিজের ছেলে মেয়েদের খেলা শেখাতে দেন। আর আশা করেন, ভবিষ্যতে খেলা শিখে ছেলেমেয়েরা তাঁদের অভাব মোচন করবে।

আমার কথাই ধরুন না কেন। আমি সাত বছর বয়স থেকে সার্কাসে আছি। এখন বয়স উনিশ। সুদীর্ঘ বার বছর ধরে আমি কত না খেলায় অংশ নিয়েছি, নানা খেলায় পারদর্শিতা অর্জন করেছি। এখন বেশ দুটি কঠিন খেলার দায়িত্ব আমার ওপর। জীপ জাম্পিং এবং একটি ব্যালান্সের খেলা। এই দুটি খেলা আমাদের সার্কাসের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর এতে ঝুঁকিও কম নয়। কোনদিন এক চুল এদিক সেদিক হলে যেমন জীপ জাম্পিং-এ জীবননাশের আশঙ্কা তেমনি ব্যালান্সের খেলায় সামান্য ত্রুটি হলে আমার সার্কাস-জীবনের আকস্মিক পরিসমাপ্তি ঘটবে। তাই এখনো আমাকে নিয়মিত ট্রেনিং নিতে হয় এবং অন্য সবাইকেও।

এই সার্কাসে আছি আমরা ১২০ জন মেয়ে। সবাইকে অবশ্য একসঙ্গে রোজ খেলায় অংশ নিতে হয় না। ঘুরে ফিরে সকলের ডাক আসে। তবে তৈরি থাকতে হয়। একজন যদি কোন কারণে খেলা দেখাতে না পারে তবে আর একজনকে এগিয়ে আসতে হয়। অর্থাৎ পারস্পরিক সহযোগিতা এবং নির্ভরতার ভিত্তিতেই আমাদের শিল্পীজীবন গড়ে ওঠে। সার্কাসে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই শিক্ষা লাভ করি। আর শিক্ষার কোন ত্রুটি থাকারও কথা নয়। যে বয়সে সবাই

বইপত্তর বগলদাবা করে স্কুলে ছোটে তখন থেকেই আমরা সার্কাসে জীবিকার্জনের শিক্ষায় লেগে যাই। তাই শিল্পীজীবনের পাঠক্রমে আমাদের খুব একটা ভুল হয় না।

তবে আমাদের লেখাপড়া শেখা তেমন হয় না। আমরা খেলা শিখি, লিখতে পড়তে জানি না অনেকেই। সার্কাসে তার সুযোগও নেই। খেলাই এখানে সব। আমরাও তাই মনে করি। ভাল করে যদি খেলা শিখতে পারি তবে আর কোন কিছু দরকার নেই। আমাদের মধ্যে এমনও অনেকে আছেন যাঁরা নিজের মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় কথা বলতে পারে না। এজন্য অবশ্য আমাদের অনেক অসুবিধা হয়। কোন জায়গায় তাঁবু পড়লে আমরা সহসা বাইরে যেতে পারি না মূলতঃ এজন্যই। তারপর রাস্তাঘাট না চলতে পারার অসুবিধা তো আছেই। ফলে দেশের সর্বত্র খেলা দেখিয়ে বেড়ালেও দর্শ দেখার সুযোগ আমাদের তেমন ঘটে না। তাঁবুতে তাঁবুতেই প্রায় সারাজীবন কেটে যায়। বেড়ানোর সুযোগ পাই কখনো সখনো। হয়তো একদিন দর্শনীয় স্থান ঘুরতে একসঙ্গে কয়েকজন দল বেঁধে যাই। সঙ্গে গাইড থাকে। আমাদের সার্কাসেরই। এমনিভাবে আমরা সিনেমাও দেখি।

অশোকবনে বন্দিনী সীতার কথা শুনেছিলাম। আর আমরাও প্রায় সার্কাসের তাঁবুতে একরকম বন্দিনী। তবে আমাদের কর্তৃপক্ষ এসম্বন্ধে খুব সজাগ। তাই আমাদের প্রায়ই সুযোগ করে দেন। এবার কলকাতা এসে বেশ কয়েক জায়গায় বেড়াতে গিয়েছি। সিনেমাও দেখেছি দু'একটি। কলকাতায় প্রথম এসেই আমাদের খুব ভাল লেগেছে। আমরা বারবার এই শহরে খেলা দেখাতে আসতে চাই।

হ্যাঁ, আমাদের এই সার্কাসের খ্যাতি এখন ভারতজোড়া। এজন্য আমাদের এবং আর সব শিল্পীর কৌশল যতখানি প্রশংসনীয় তার চেয়েও বেশি প্রশংসার দাবি রাখে রামু হাতী। 'হাতী মেরে সাথী' ছবিতে অভিনয় রামুর জীবনের এক স্মরণীয় ঘটনা। এই ছবিতে রামু প্রায় আড়াই বছর ধরে কাজ করে। কাজ শেষে রামু যখন আবার ফিরে আসে তখন সে প্রায় চারদিন উপোস করেছিল। প্রিয় নায়কের কাছ থেকে বিচ্ছেদই এর কারণ। তারপর অনেক বুঝিয়েসুঝিয়ে তাকে আবার খাওয়ানো হয়। এখনও কয়েকটি ছবিতে সে অভিনয় করছে। রামুর গণেশপুজো আমাদের সার্কাসের বিরাট সম্পদ। আমার তো মনে হয় তার ক্রীড়া-কৌশলের কাছে আমরা ম্লান হয়ে যাচ্ছি। একথা ভেবে আমরা খুব আনন্দ পাই। আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জেদ চেপে যায় আরো ভাল করে খেলা দেখানোর। আমাদের বাঘ-সিংহরাও খেলায় খুব পটু। একটা কথা শুনলে সবাই অবাক হয়ে যাবেন যে, আমাদের সার্কাসের ৪৫টি বাঘ এবং ৩৫টি সিংহের জন্ম এখানেই। আমরা যেমন ছেলেবেলা থেকে এখানে আছি তেমনি ওরাও জন্ম থেকেই এখানে আছে। তাই আমাদের সম্পর্ক প্রায় আত্মপরিজনের মতো।

সামাজিক জীবন থেকে আমরা যেমন নির্বাসিত তেমনি বাড়িঘরের সঙ্গে আমাদের খুব একটা সম্পর্ক নেই। মাঝে মাঝে ছুটিছাটা পেলে বাড়ি যাই। তখনই মা-বাবার সঙ্গে দেখা হয়। এছাড়া আর কোন যোগাযোগ থাকে না। মা-বাবা অবশ্য প্রতি মাসে টাকা পান। আমার মাইনের টাকার একটা অংশ প্রতি মাসে সার্কাস কর্তৃপক্ষই ওঁদের কাছে পাঠিয়ে দেন। এমনিভাবে ঘরবাড়ির কথা আমরা প্রায় ভুলেই যাই। সার্কাসের তাঁবুই আমাদের স্বাভাবিক জীবন। আমাদের অনেকে বিয়ে-থা করে এখানেই ঘর-সংসার পেতেছেন। বিয়ে করেছেন শিল্পীদের কাউকে। ছেলেপুলেও হয়েছে। তবে দু'তিনটি ছেলেপুলে হয়ে গেলে কাউকে আর খেলা দেখাতে দেওয়া হয় না। তখন তিনি সার্কাসেই অন্য কাজে নিযুক্ত হন।

চাকরি আমাদের বড়ো একটা কারো যায় না। অন্ততঃ আমার তো সেরকম কোন ঘটনা মনে পড়ে না। মাইনেও আমাদের খুব একটা খারাপ নয়। সেই যখন প্রথম খেলা শিখতে আসি তখনই সার্কাস কর্তৃপক্ষ একটা মাসোহারা দিতেন; অবশ্য মা-বাবাকে। তারপর খেলা শিখে মাইনে পাচ্ছি। হাতে খুব কম টাকা পাই। কারণ খরচ করার কোন সুযোগ নেই। মাইনের একটা অংশ মা-বাবা পান আর বাদবাকি টাকা জমা থাকে। প্রয়োজন মতো সবকিছু আমরা পাই। জামাকাপড়, ঘড়ি, গয়না সব। এছাড়া বোনাস পাই। গ্র্যাচুইটি আছে। ছুটির কথা তো আগেই বলেছি। তবে সবচেয়ে বড়ো কথা যে, চাকরি যাওয়ার ভয় নেই। আর এই চাকরি চলে গেলে আমাদের বাঁচার পথও বন্ধ হয়ে যাবে।

আমরা সবাই প্রায় এক জায়গার মেয়ে। শুধু একটি চীনা পরিবার আমাদের মধ্যে আছেন। এঁরা খেলা দেখান আমাদের সঙ্গেই। আমাদের তাঁবুতে অনেক নতুন মেয়ে ট্রেনিং নিচ্ছে। এমনি হয় সব সার্কাস তাঁবুতেই। আমি যে বয়সে এসেছিলাম তার চেয়েও কম বয়সের মেয়েও আছে। সবাই খেলা শিখেছে। তেল্লিচেরীতেও খেলা শেখার একটা স্কুল অবশ্য আছে তবে সার্কাস দলই খেলা শেখার পক্ষে ভাল। সার্কাসই আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুরু।

হ্যাঁ গ্রেট ওরিয়েন্টাল সার্কাস সারা দেশেরই গৌরব। আমি এ দলের শিল্পী বলেই একথা বলছি না। ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শনে আমাদের শিল্পীদের দক্ষতা সবিশেষ প্রশংসনীয়। রুশ দলও প্রশংসা করেছেন। আমাদের ছয়জন ট্রেনার প্রতি মুহূর্তে নতুন ক্রীড়াশৈলী প্রদর্শনের চিন্তায় মগ্ন। তাঁরা শুধু ভাবেন, দর্শকদের কিভাবে আরো বেশি আনন্দ দান করা যায়। তাঁদের ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে এবং শিক্ষা গ্রহণ করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নানা কসরত আমরা দেখাই। আমাদের সাফল্যের জন্য আমরা শিক্ষাগুরুর কাছে যেমন কৃতজ্ঞ তেমনি ভগবানের অপার করুণাপাশেও আবদ্ধ। ভগবদ্-কৃপা ছাড়া আমাদের এই সাফল্য কোনক্রমেই সম্ভব হতো না। শিবরাত্রির দিনে আমরা সব মেয়েরা ভগবান শিবের আরাধনা করি অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে। পুজো শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেদিন আমরা রিং-এ খেলা দেখাতেও আসি না। এই দিনটা আমাদের প্রকৃত উৎসবের দিন। সকলের সব উৎসবে আমরা আনন্দের জোগান দিই খেলা দেখিয়ে, কিন্তু আমাদের উৎসব শুধু পালন করি আমরাই। নিভৃতে। মাত্র ১২০ জনের কলহাস্য মুখরিত পরিবেশে। কথা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন সুনীতি। গ্রেট ওরিয়েন্টাল সার্কাসের অন্যতম সেরা শিল্পী। খেলা দেখাতে এক্ষুণি তিনি রিং-এ যাবেন। আর ক্রীড়া প্রদর্শনাতে অজস্র দর্শকের হাততালিতে অভিনন্দিত হবেন। কিন্তু এই আনন্দের পাশাপাশি তাঁর বেদনা যে জীবনে তিনি আর কোনদিন ফিরে যাবেন না। সেই জীবন যা আর পাঁচজন মেয়ের পক্ষে স্বাভাবিক। সার্কাসের উজ্জ্বল আলোয় তাই তাঁকে অতিরিক্ত হাসিখুশি মনে হলো। হারানোর বেদনা ভুলে বর্তমানের আনন্দে মসগুল হয়ে থাকতে চান সুনীতি। তাই কথায় কথায় তিনি হাসেন আর হাসিতে যেন মুক্তো ঝরে।

—প্রমীলা

উল্লেখযোগ্য খবর

শহীদ ভগৎ সিং-এর বৃদ্ধা জননী ৮৫ বয়স্কা শ্রীমতী বিদ্যাবতী 'পাঞ্জাব মাতা' উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। এক বিশেষ অনুষ্ঠানে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী গিয়ানী জৈল সিং তাঁকে এই উপাধি প্রদান করেন। তাঁকে একটি মোটর গাড়ি উপহার দেওয়া হয় এবং মাসিক হাজার টাকা পেনসন দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্য অনেকের সঙ্গে শহীদ ভগৎ সিং-এর কয়েকজন সহকর্মীও উপস্থিত ছিলেন।

* * *

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেসের মহিলা কর্মীদের এক সভায়

এরূপ মত প্রকাশ করেন যে, জিনিসপত্রের দাম বাড়লে সংসারে গৃহিণীদের উপর প্রথম আঘাত আসে। তাই তিনি তাঁদের পরামর্শ দেন, তাঁরা যেন প্রতিটি রাজ্যের অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখেন এবং জিনিসপত্রের দাম কেন বাড়ছে আর সরকারী তরফে সে ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তা জনগণকে, বিশেষ মহিলাদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। প্রয়োজনবোধে তাঁরা এসম্পর্কে বিতর্ক সভার আয়োজনও করতে পারেন।

* * *

প্রথম মহিলা নভশ্চর শ্রীমতী ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা মহাকাশ পরিভ্রমণ করেন ১৯৬৩ সালে। তারপর অনেক দিন কেটে গেছে। মহাকাশ পরিক্রমায় মহিলাদের সম্বন্ধে কেউ উচ্চবাচ্য করেনি। তবে আমেরিকা যে এব্যাপারে প্রায় মনস্থির করে ফেলেছে সম্প্রতি তা জানা গেছে। শিগগিরই কোন মার্কিন রমণ[ী] আমরা মহাকাশে দেখতে পাবো। এবছ[র] গোড়ার দিকে আমেরিকা মহাকাশে স[র্ব]প্রথম স্টেশন বসানোর চেষ্টা করবে। ত[ারপর] এ দশকের শেষাশেষি ১২ জন অভিযা[ত্রী] সহ আর একটি স্টেশন বসানো হ[বে] মহাকাশে এবং এই অভিযানে মহিলাদে[র] স্থান হবে। নারী-পুরুষের স্বাভাবি[ক] জীবনযাত্রা এবং সন্তানধারণ সংক্রা[ন্ত] বিভিন্ন গবেষণার ভিত্তিতে এই অভিয[ান] পরিচালিত হবে।

যাঁদের কথা কেউ জানে না

সেদিন হাঁটতে হাঁটতে রাজভবনের সামনে এসে দাঁড়ালাম। বাসে উঠতে হবে। অফিসপাড়ায় সময়টা বেশ সুবিধের নয়, অন্তত ট্রামে বাসে ওঠার পক্ষে।

৫টা বাজে। অফিস কর্মচারীদের ভিড়ে বাস স্টপে রাস্তা বেশ ভরে উঠেছে। শীতকাল। সুতরাং সূর্যিদেবেরও ছুটি হয়ে গেছে। আর অন্ধকার নামতেও বেশি দেরি নেই।

একটার পর একটা বাস আনাজপত্তরের মতো লোককে ঠাসাঠাসি হয়ে চলেছে। কোনটা দয়াবশত থামছে আবার কোন কোনটা থামার লক্ষণই প্রকাশ করছে না।

আমিও দাঁড়িয়ে আছি তীর্থের কাকের মত বাস ধরার তাগিদে। একটি বছর আঠারো উনিশের মেয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল—জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা শ্যামবাজারে কত নম্বর বাস যাবে বলতে পারেন?

বলে দিলাম। কিছুক্ষণ বাদেই মেয়েটি আবার প্রশ্ন করল—আচ্ছা এখান থেকে বরাহনগরে কোন বাস যায় না?

—হ্যাঁ। বলবে তো। একটু আগেই ৪নং বাসটা চলে গেল। ওটাই তো বরাহনগর যাবে। মেয়েটির মুখটা করুণ হয়ে উঠল। একটু থেমে বলল—কোনদিন বেরোয়নি তো, রাস্তাঘাট একদম চিনি না।

এবার ভালো করে মেয়েটিকে দেখলাম। চেহারাটা যথেষ্ট ভদ্রঘরের। বুদ্ধিরও যথেষ্ট ছাপ আছে। তবে বোঝা যায় একটা অসহায়ের ভাব চোখেমুখে।

কি জানি কৌতূহল পেয়ে বসল আমায়। প্রশ্ন করলাম—কি কর? এখানে কেন এসেছো?

—কিছু করি না। এত চেষ্টা করছি, কোথাও একটা চাকরী পাচ্ছি না। তাই এখানে রিজিওনাল এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে এসেছিলাম।

মনে মনে ভাবলাম, হায় এখনো ও জানে না এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে সত্যিকারের চাকরি খুব বেশি জোটে না। শুধু বেকারদের নাম ভরানোই এখানকার অন্যতম প্রধান কাজ।

—কত অবধি পড়াশুনো করেছো?

—হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করেছি। কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তিও হয়েছিলাম। তবে আর পড়াশুনো হবে না।

—বাড়ীতে কে কে আছেন?

—একটা ছোট ভাই। বয়স ন' বছর। ওকে নিয়েই তো ভাবনা। সব সময় কান্নাকাটি করে।

—বাবা নেই?

—বাবা দেড় বছর নিরুদ্দেশ। মা পাগল।

বাবা নিরুদ্দেশ হওয়ার পরই মা পাগল হয়ে যান। তারপর মামারা নিয়ে চলে যায় মাকে। কোথায় আছেন তাও জানি না।

—তা তোমাদের কোন খোঁজখবর নেন না তাঁরা?

এবার একটু বিষণ্ন হাসি ফুটিয়ে তুলল মেয়েটি ঠোঁটের কোণে। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, একদিন আমাদের বাড়ীর এমনি অবস্থা ছিল না। দুবেলা খাওয়ার অভাব অন্তত ছিল না। সবাই আসতো তখন। দাদা কাজ করতো একটা ফ্যাক্টরীতে। ফ্যাক্টরী হোল লক-আউট। আর তারই ফলে আমাদের এই অবস্থা। দুদিন বাদে দাদাও কোথায় চলে গেল জানি না।'

আমি নিস্তব্ধ হয়ে শুনছিলাম ওদের হতভাগ্য জীবনের কথা।

ইতিমধ্যে বাস এসে গেল।

বাসে যেতে যেতে চোখের ওপর ভেসে উঠলো অসহায় দুটি চোখ। অনুভব করতে পারছিলাম ওর অবস্থা। কিন্তু প্রশ্ন হোল এদের কথা ভাববে কে?

ও তো অল্পশিক্ষিত। সুতরাং ওদের কথা পরে। আগে শিক্ষিতদের কথাই ভাবো। একথা বলবেন অনেকে। অথচ শিক্ষিত আর অল্পশিক্ষিত—ক্ষুধা সকলেরই সমান। আহারের সংস্থানের জন্য কর্মসংস্থান উভয় সম্প্রদায়ের মেয়েরই প্রয়োজন তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী। কিন্তু পাচ্ছে কই?

কত অসংখ্য পরিবার আজ এ-সংকটের মুখে। যে পরিবারের দায়িত্ব আজ একটি শিক্ষিত কিংবা অল্পশিক্ষিত মেয়ের উপর তাদের যদি কোন কর্মসংস্থান না হয়, তবে তাঁরা বাঁচবে কি করে?

যে পরিবারের পিতা অবসরপ্রাপ্ত তাঁর শিক্ষিত কন্যাটি যদি একটি কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি না পায়, তবে সে পরিবারের উপায় কি হতে পারে।

কিংবা যদি ঐ অসহায় মেয়েটির ম[ত] যার কেউ নেই, আছে শুধু বাঁচবার অধিকার, সে বাঁচবে কাদের ভরসায়? এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর কেউ দিতে পারবে না। অথচ এ দুর্মূল্যের বাজারে কারো কারো চাকরি হচ্ছে। তার জন্য চাই লোকের জোর। এ তো মামুলি কথা।

ব্যক্তিগত ভাবে চাকরির প্রয়োজন প্রত্যেক মেয়েরই, একথা অস্বীকার [করি] না। কিন্তু যখন দেখি প্রকৃত অর্থ[বান] বাড়ীর মেয়েরা চাকরী করে আর [সেই] চাকরীর পয়সা ফ্যাশানের খাতে কি[ংবা] বিলাসিতার জন্য ব্যয় করে, তখন প্রকৃ[ত] অভাবগ্রস্তদের কথা ভাবলে শিহরণ হয়।

তাই ভাবছিলাম, এরকম প্রকৃত দুঃস্থ পরিবারের চাকরির উপযোগী মেয়েদের কথা কে ভাববে? যাঁরা ভয়ংকর অর্থনৈতিক সংকটে একটু বাঁচবার জন্য একটি চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, শিকার হচ্ছেন মানসিক যন্ত্রণার, তাঁরা সত্যি সত্যিই কি আলো দেখতে পাবেন না? আর না পেলে হয়তো একদিন তাঁরা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে বাধ্য হবেন তাঁরা উপার্জনের চোরাগোপ্তা পথ ধরতে। এছাড়া উপায়ই বা কি তাঁদের? বাঁচবার অধিকার তো সকলেরই আছে। বাঁচতে সকলেই চায়।

অথচ সুদূরপ্রসারী ঐ অন্ধকার পরিণতির কথা ভাবলেই সবচেয়ে ভয় হয়। এভাবে যদি অধিক সংখ্যক মেয়েরা অন্ধকারের চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তবে সে-সমাজের পরিণতি হবে ভয়ংকর। মেয়েদের নৈতিক চরিত্রের অবনতি জন্ম দেবে অসুস্থ অস্বাভাবিক অসহায় সমাজ-জীবনের, যার থেকে মুক্তির পথ খুঁজে বের করা হবে অসম্ভব। তাই এ-ব্যাপারে মেয়েদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। কারণ, সে-যুগে মেয়েদের পক্ষে অর্থ উপার্জনের জন্য ঘরের বাইরে বেরোতে হয়, পরিবারের ভরণপোষণের সরাসরি দায়িত্ব নিতে হয় সে-যুগে মেয়েদের প্রতি অনেক নজর দেওয়া দরকার।

অরুন্ধতী সেনগুপ্ত

ফ্যাসান স্থায়ী নয়

ট্রামে-বাসে, ট্রেনে চলতে ফিরতে ... সব কথা আমাদের কানে আসে। ...নীতি, কালোবাজার, বাজারদর, খেলা-... সেরে যখন পোষাক-আসাকের ...লোচনায় সকলে মত্ত হয়ে ওঠেন তখন ...র তা সহজে বন্ধ হতে চায় না। এ ...লোচনার বোধহয় অন্যরকম মাদকতা ...ছে যার কাছে জটিল রাজনৈতিক ...রিস্থিতিও পিছু হটে যায়। আলোচনার ... হয়তো উপস্থিত কোন মেয়ে বা ছেলে, ...শঃ সেটা মহামারির মত কোথায়, কবে, ...ন কাকে কে কি ভাবে, কি সাজে ...যছেন তার বিশ্লেষণ চলে। মাঝে মাঝে ...হৃষ্ণ লাগে আবার সবদিক দেখেশুনে ...নক কিছুই মুখ বুজে হজম করতে ...।

এমনি একদিন ট্রেনের কামরায় বর্তমান ...ষাকের হালচালের খোশ গল্পের মাঝে ...ব শ্রোতা হিসেবে অনেক কথা শুনতে ...ছিল। অবশ্য পোষাকের রং-ঢং-এ ...দর মত কাঁদুনী সুর আমার গলা দিয়ে ... না কারণ পোষাক নানা ধরনের ...নর আমদানী করে অথচ কোন ...ই দীর্ঘস্থায়ী নয়। তাই আজকের ...ত পোষাক কালকেই হয়তো অন্য ... দেখা দেবে। সেটা একদিকে যেমন ...রুচির বাহক, তেমনি শোভনতার ...রূপ।

মুখ পালটাতে মানুষ চিরকাল ভাল-...। একঘেয়ে খাবারে কারও রুচি থাকে ... তেমনি ফ্যাসান বদলাতে সকলেই ...ন আগ্রহী। অনেকে স্টাইল ও ফ্যাসানকে ...ই অর্থে ব্যবহার করেন। স্টাইল হচ্ছে ...গত অভিরুচির ফল। তাই আমরা কথায় ...ওর কথাবলার স্টাইল অপূর্ব, অপূর্ব ...হাঁটার স্টাইল। সুতরাং ব্যক্তিগত ইচ্ছা ...রুচির ওপর স্টাইল নির্ভরশীল। কিন্তু ...সান হচ্ছে প্রচলিত পোষাকের ছাটকাট। ...তরাং স্টাইল আর ফ্যাসানের মধ্যে ...ছে একটা ফারাক। প্রচলিত ছাটকাটের ...না দিতেই ফ্যাসানের জন্ম, আবার ...সানই পাল্টে দিচ্ছে প্রচলিত ছাটকাটকে। ...তি কোন ফ্যাসানের আয়ুই স্বল্প। এই ...স্পায়ুকে নিয়ে মানুষের চিন্তা ভাবনার ...ত নেই। নতুন কি চলতে পারে বা ...গলে বাজারে চালু হয় এই চিন্তায় একদল অস্থির। যেমন ধরুন আজকাল আমরা সবাই বলি 'ঠিক আছে জামাটাতে মাপের চেয়ে কাপড় কম হয়েছে ওতে একটু অন্য কাপড় জুড়ে দাও। তোমার জামাটাও সম্পূর্ণ হবে আবার ফ্যাসানে ফ্যাসান হবে।' অথচ আজ থেকে বছর কয়েক আগে জোড়া-তালির জামা তৈরীর কথা ভাবলে আতঙ্ক হতো। তখন সেটা ফ্যাসান না হয়ে কেমন গেঁয়ো গেঁয়ো ঠেকতো। উপরন্তু হীনতার প্রকাশ হিসেবেও লোকে ভাবতো।

আসলে যুগটা ফ্যাসানের। জোড়াতালি হোক আর যাইহোক নতুন জিনিষই বাজারে ফ্যাসানের আমদানী করে।

সেই ছোটবেলায় গল্প শুনেছিলাম কান ঢেকে চুল আঁচড়ানোর। এক মেমসাহেবের যে কোন কারণেই হোক একটা কান কাটা গিয়েছিল। অথচ সেই মেমসাহেবকে বড় একটা পার্টিতে নাচতে হবে। কান কাটা মেমসাহেব কান নিয়ে মহা চিন্তায় পড়লো। আহার-নিদ্রা সব বন্ধ হবার উপক্রম। অনেক ভেবেচিন্তে সে এক উপায় বের করল। পরদিন কান ঢেকে চুল আঁচড়ে বাজার মাত করলো। চালু হল কান ঢেকে চুল আঁচড়াবার প্রথা। রাতারাতি মোটামুটি সবই কান ঢেকে চুল আঁচড়ে নতুন ফ্যাসান হিসেবে সেটা চালু করলো।

একদল সমাজসেবী গেল গেল রবে মাঝে মাঝেই আতকে ওঠেন। বর্তমান যুগের ছেলেমেয়েদের সাজগোজই তাঁদের আতঙ্কের প্রধান কারণ। আতঙ্ক তো আছে নিশ্চয়ই। ফ্যাসান হবে সুরুচি অনুযায়ী, পোষাক হবে শ্রী আর সৌন্দর্যের সহায়ক। তাই যদি না হয়ে ফ্যাসানটাই অশোভন রুচির পরিচয় দেয় তখন অনেকেই গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসবেন। ভাববেন, দেশের কি হাল হল। এটা প্রকৃতই কলিকাল, ঘোর কলি। আক্ষেপে মাথার চুল ছিড়তে চাইবেন, কিন্তু সেই ফ্যাসানকে রুখবে কার সাধ্য। যা উঠেছে তা অন্ততঃ কিছুদিন চলা চাই। একসময় হাত-কাটা, পেট-কাটা ব্লাউজে ভারতবর্ষে প্রধান প্রধান শহরগুলো ছেয়ে গেল। প্রধান শহর ছাড়া আধা শহর বা গ্রামেও তার জের চললো কিছুদিন। পোষাক পরা হল সত্যি, কিন্তু তাতে লজ্জা নিবারণের যৎসামান্য চেষ্টাই হয়েছিল। অনেকে তো লজ্জায় মেয়েদের দিকে চাইতেই পারতেন না। তারপর দেখা গেল হাত-কাটা জামা কোথায় গেল পেট-কাটা রইল সামান্য—সেখানে এলো ঠাকুমা, দিদিমাদের আমলের লম্বা ঝুলের থ্রি কোয়ার্টার হাতার ব্লাউজ। শুভাকাঙ্ক্ষীরা তখন আশ্বস্ত হলেন, দেশ বোধহয় এযাত্রা অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা পেল।

কিন্তু সে স্বল্পমেয়াদী থ্রি-কোয়ার্টার বেশীদিন টিঁকলো না। চালু হল মিনি স্কার্ট। অবশ্য মিনি স্কার্টের চলন তত ব্যাপক হয় নি। মিনি স্কার্টের সমালোচনায় জনসাধারণ থেকে শুরু করে পত্র-পত্রিকায় ও ব্যঙ্গবিদ্রুপ চলেছিল, সত্যিই সকলের মুখরোচক আলোচনার বিষয়: যেটা শুধু অশোভন নয় বিকৃত রুচির পরিচায়ক সেটা সবাইকে ভাবিয়ে তোলাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই মিনি স্কার্টই বা টিঁকলো কতদিন? না টেকাই স্বাভাবিক—ফ্যাসানের রদবদল তো অত্যাবশ্যক। সেই সুবাদে মিনি স্কার্টও প্রায় রঙ্গমঞ্চ থেকে অপসারিত হল।

এল লুঙ্গির যুগ। ছোট-বড় সকলেই মানান বেমানানের চিন্তাকে উপেক্ষা করে লুঙ্গি ধারণ করলো। ছোটদের বোধহয় সবরকম পোষাক মানিয়ে যায়, কিন্তু বড়দের ক্ষেত্রে ভাবনা-চিন্তার অনেক কিছুই আছে। বড়দের ব্যবহারের জন্য আমাদের জাতীয় পোষাক শাড়ীর কাছে আর বোধহয় কিছু ঘেঁষতে পারে না।

ভাল-মন্দ সব মিলিয়েই আমাদের ফ্যাসান। মন্দের পাশাপাশি সুন্দর, শোভন পোষাকের চলন আমরা প্রায়শই দেখি। সুতরাং 'ত্রাহি', 'ত্রাহি' ডাক ছাড়ার মত কিছু নেই। কোন জিনিষ দীর্ঘস্থায়ী নয় ফ্যাসানের ক্ষেত্রে। মিনি স্কার্ট, হাত-কাটা, পেট-কাটা সব ছাপিয়ে গলা থেকে পা পর্যন্ত ঝুলের ম্যাক্সিই এখন আধুনিক ফ্যাসানের বাজার সরগরম করে রেখেছে। খারাপ ফ্যাসানের সমালোচনা হোক আপত্তি নেই, কিন্তু ট্রামে, বাসে, ট্রেনে অন্ততঃ সমালোচনার ভাষাটা নগ্ন না হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়।
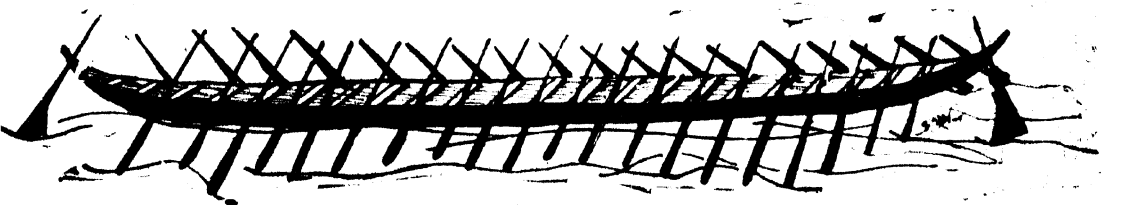
—অঞ্জলি চৌধুরী

যাত্রা দলের খোলস বদল

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

বছর দু-তিন আগের কথা। গ্রাম ছোট-দীঘাড়ির বনবাদাড় বুলডোজার আর ল্যান্ডমোভার চালিয়ে শিল্পনগরীর কর্তা-ব্যক্তিরা নিউ টাউনের পত্তন করেছেন। ভোরবেলা এমন জায়গায় এসে কে না মাঠে ঘাটে ঘুরতে চায়! বিশেষতঃ চাকরীর ধান্দা যার নেই,—কটা দিনের ছুটীর অবকাশকে আস্বাদনই যার হাতের স্বর্গ। এমনি এক ভোরবেলা কুয়াশার মধ্যে দিয়ে টাউনশিপের শেষ বসতি ডানদিকে ফেলে যেখানে বাঁ-দিকে 'পুজোমণ্ডপ' সেখানে একটি বাস দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। আশপাশে জনা-কয়েক পুরুষ আর মহিলা। প্রথমে অবাক হলেও, মনে পড়ল এটি সেই বহু-আলো-চিত যাত্রাদল। তারপর ক'দিন এই দলের চলাফেরা থেকে শুরু করে অভিনয়—সব কিছুই দেখতে হয়েছে। ছোট টাউনু, তদু-পরি আমি বেকার। সকালেই দেখা গেল নকল জরি বসানো পোশাকগুলি মাঠের রোদে শুকোচ্ছে। চলতে চলতে কানে গেল —হীরুদা, আপনি বাজারে যাচ্ছেন, বিন্দুদির জন্যে দুশো গ্রাম মাংস আনতে হবে—ভুলে যাবেন না, তা'লে আমায় ছিঁড়ে খাবে কিন্তু!' বিকেলে ওদের দলের বাবাড়ি-চুলো কিকেফুটে একটা বাচ্চা ছেলের সঙ্গে আলাপ জমে গেল। বিড়ি-সিগ্রেট, না, ওসব শুনলে তার ছাড় গুঁড়ো করে দেবে 'মাখালকাকা!' তার কাছে পাকা খবর 'ফিমেল রোলে সব ফিমেল! না, না, অত ফিমেল কোথায়। বড় বড় পার্ট অবিশ্যি মেয়েরা করে। ছোটখাটোর বেলায় আমরা আছি।' আবার রাত্তিরে যাত্রার আসর আলোয় আলোয় জমজমাট। মাঝখানে অভিনয় মঞ্চ। বেশ খানিকটা উঁচু জায়গায় স্টেজেরই মতো করা হয়েছে, ওপরে ঝুলছে ছোট ছোট মাইকের মাউথপীস। চাঁদ সুলতানার ভূমিকা দীর্ঘ ওজস্বিনী বক্তৃতায় ঠাসা। অভিনয় করতে করতে বীরাঙ্গনা দু-হাত দিয়ে 'আলোর পোকা' তাড়াচ্ছেন। কিন্তু তার মধ্যেই কয়েকটি গাঁদি পোকা তাঁর গলায় চলে গেল। 'থু-থু' করেও গলা পরিষ্কার হল না।... মহিলাটি অভিনয় ভালোই করেন কিন্তু এই বিপত্তির ফলে গুরুগম্ভীর পরিবেশ অকস্মাৎ হাস্যরোল তুলে কৌতুকময় দৃশ্যের অবতারণা করল। অবশ্য ব্যাপারটা নেহাতই সাময়িক। যাত্রায় যা-যা থাকার কথা সবই ছিল—যতদূর মনে পড়ে ছিল না কেবল 'নিয়তি'।

আজকের দিনের যাত্রাপার্টির সঙ্গে স্থানীয় সমাজের সাধারণ মানুষের যোগ-সূত্র যে আমাদের মত নিকট হয় না। তারা বাইরের মানুষ, নিজেদের কাজ করে আবার অন্যত্র চলে যায়। কিন্তু আগে তা ছিল না। বাংলাদেশে যন্ত্রযুগের সূচনার আগে, মোটামুটি এই শতকের গোড়ার দিকে কবি, তরজা যাত্রাকে ঘিরে জনজীবনের বিশেষ একটি মধুর সম্পর্ক লক্ষ করা যায়। আর তা সাহিত্যেও প্রতিফলিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে 'পথের পাঁচালী'র উল্লেখ করা চলে। অপুর, শুধু অপু কেন নিশ্চিন্দি-পুরের ছেলে-বুড়ো সকলেরই মন চড়ক-তলায়—নীলমণি হাজরার যাত্রাদলকে কেন্দ্র করে আলোচনা, উৎসাহ-উদ্দীপনার অন্ত ছিল না।...কুমারপাড়ার মোড়ে দুপুরের পর হইতেই সকল ছেলের সঙ্গে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর দূরে একখানা গরুর গাড়ি তাহার চোখে পড়িল। সাজের বাকস বোঝাই গাড়ি এক, দুই, তিন, চার পাঁচখানা!... সাজের গাড়ীগুলোর পিছনে দলের লোকেরা যাইতেছে, সকলের মাথায় টেরিকাটা, অনেকের জুতো হাতে। পটু একজনকে দেখাইয়া কহিল—এ বোধহয় রাজা সাজে, না অপুদা?

'আকাশের রং একেবারে বদলাইয়া গেল।...' '...প্রথম যখন জরির সাজ-পোশাক পরিয়া টাঙানো ঝাড় ও কড়ির ডুমের আলোসজ্জিত আসরে 'রাজার মন্ত্রীর দল আসিতে আরম্ভ করে, অপু ভাবে এমন সব জিনিস তাহার বাবা দেখিল না! সবাই তো আসরে আসিয়াছে গ্রামের, তাহাদের পাড়ার কোনও লোক ত বাকী নাই! বাবা কেন এখনো...?...'

সেনাপতি বিচিত্রকেতুকে আসরের বাইরে সাজ-পোশাক পরে বার্ডসাই টানতে দেখে অপু খুব অবাক হয়েছিল। তারপর যখন রাজকুমার অজয় এসে 'কিশোরীদা' বলে বিচিত্রকেতুর কাছে বিড়ি চাইল তখন বালক অপুর বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। অজয়ের সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ করা, তারপর নিজেদের বাড়িতে ঢোলক-ওয়ালার বদলে অজয়ের খাওয়ার বন্দোবস্ত করা—এ সবই তাৎকালিক সমাজচিত্রের অংশ। তখন গাঁয়ে যাত্রাদল এলে গরীব-বড়লোক নির্বিশেষে এক-এক বাড়িতে পালা করে দলের লোকেদের খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্ত হত।

১৮৭১-এ ন্যাশানাল থিয়েটারের পত্তন হলেও তখনও বাংলাদেশে শহুরে হাওয়া ওঠেনি। লোকের কাছে কীর্তন, যাত্রা বা গীতিনাট্য, কবির লড়াই, তর্জা, রাইবেশে এইসবই ছিল সামাজিক মানস-রসোপভোগের ক্ষেত্র।

[illegible] অর্থাৎ ১৯৩০-৩২ খৃষ্টাব্দে শহর বাজার বহরমপুর কথাই বলি, ঘাটবন্দরে শশীবাবুর বি বাড়ির বাঁধানো উঠোনে রাসের সময়ে যা আসরে চাদর মুড়ি দিয়ে যাত্রা দেখার নেশ জন্যে দাদার কাছে বেদম প্রহার জুটে কিন্তু পুজোর সময়ে উমেশবাবুর প্রাঙ্গ স্টেজ-বাঁধা হত—সেখানে ইংরেজী লে আমেচার থিয়েটার দেখতে গেলে তে অপরাধ হত না। অবশ্য কোনো সুযো ফস্কাতে দিতাম না। যাত্রার আসরের ল লম্বা বক্তৃতা, তলোয়ার, গদা নিয়ে লড়াই এসবই পরবর্তী সময়ে ছোটদের খেল ধুলোয় প্রতিফলিত হত। গালাগালি 'হিরণ্য কসিপু'ই ছিল সবচেয়ে ধিক্কারে ভাষা। যাত্রা হত কাশিমবাজারের বড় রা বাড়িতে—তবে অতদূর মানে আড়াই-তি মাইল পথ বন-বাদাড় ভেঙে যাওয়ার সাহ ছিল না তাই দেখা হয়নি। যাত্রার আ জুড়ির গান চলত—'নে-নে-নে' বেহাল ছড়ের সঙ্গে কানে হাতচাপা দিয়ে ঝাঁকড় চুলো মাথা দুলিয়ে গাঁজা খাওয়া চা গলার আওয়াজ এখনো যেন চোখ বুজে শুনতে পাই। মুকুন্দ দাসের যাত্রার না তখন খুব শোনা যেত কিন্তু আমার দেখা সৌভাগ্য হয়নি। তবে তার গল্পই মু করেছিল। আমাদের পাড়ার চক্রবর্তীবাড়ি স্বদেশী যাত্রা হয়েছিল সেবার। প্রচার ক হয়েছিল 'শ্রীকৃষ্ণলীলা' হবে। বড় লোহার গুল বসানো বিরাট দরজা ে থেকে বন্ধ! আসরে জমায়েৎ দর্শকমণ্ড অনুরোধ 'কর্মক্ষেত্র' কিংবা 'পথ' প গান হোক। ও দুটোই ইংরেজ সরকা নিষিদ্ধ। অবশেষে কোন পালা হয়েছিল আজ কেউ বলতে পারবেন কিনা জানি না তবে

'বন্দেমাতরম গানে নাচরে সকলে
কৃপাণ লইয়া হাতে
দেখুক বিদেশী হাস অট্টহাসি,
কাঁপুক মেদিনী ভীম পদাঘাতে।

এই গানটি যখন গাইছেন তিনি তখন আশ্চর্যজনকভাবে পুলিশের আবির্ভা হল আসরে এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল

মুকুন্দ দাসের প্রভাব একদা শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল মহলেই যেন জোয়ার বইয়ে দিয়েছিল নিষিদ্ধ দেশপ্রেমের। অর্থাৎ পুরান ইতিহাস আর কল্পনার খাঁচা ভেঙে যাত্রাগান চলে এল বাস্তবের প্রত্যক্ষ সমস্যাসমর-ভূমিতে

তিরিশ চাল্লিশ দশককে মোটামুটিভাবে সন্ধিক্ষণ বলা চলে। শহর বাজারে আধুনিক, শিক্ষিত বাবুমহলে যাত্রার আদর কমেছে তাঁরা কলকাতাই থিয়েটারী হাওয়াতে উল্লসিত। পুজো-পার্বণে স্টেজ বেঁধে মাইকেল, ডি এল রায়, গিরীশবাবুর নাটক মঞ্চস্থ করেন। জমি-দারবাবু বা ধনীর বৈঠকখানায় অ্যামেচার ক্লাবগুলো গজিয়ে উঠল। যাত্রা, কবিগান, তর্জা, রাইবেশের দলকে গঞ্জ আর গ্রামের বৃহত্তর জনসাধারণের উপরই নির্ভর করতে হল। শহরে তারা কল্কে পেতো কেবল হাটে, বাজারে, যারা মেহনৎ করে আর অল্পশিক্ষিত ব্যবসায়ী মহলে। তবে তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। অতএব শহুরে থিয়েটার [illegible] পেশাদার যাত্রা

দুটিতে পাশাপাশি চলতে থাকল—উভয়ে আনন্দ অবকাশের ভাগীদার হয়ে উঠল।

আমি ওসব বড় বড় বা সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের অধিকারী নই। সাধারণ আর পাঁচজনের মতোই কালে-কস্মিনে যাত্রা, থিয়েটার দেখেছি। তাই যুগ নির্ণয়ে ভুল হওয়া স্বাভাবিক। তবে এটা লক্ষ্য করেছি যে, সিনেমা আর পেশাদার ভ্রাম্যমাণ থিয়েটারের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যাত্রার রেওয়াজ একদা শহরাঞ্চলে লুপ্ত হতে বসেছিল। উন্নত, আধুনিক আলোকসজ্জা আর পট, সেইসঙ্গে জটিল মনস্তত্ত্বের প্রতি আকর্ষণ—সবটা জুড়িয়ে নূতনের প্রতি মোহ যাত্রাকে বোল আনা পল্লী অঞ্চলেই ঠেলে দিয়েছিল অর্থাৎ যেখানে সিনেমা নেই, যানবাহনের অসুবিধার জন্য এবং পেশাদার নাটুকে দলের আশানুরূপ দক্ষিণা প্রাপ্তির দুরাশা সেইসব স্থানেই যাত্রা ইত্যাদি সনাতন রমণীয় শিল্প টিঁকে রইল—আর শহরে দু-একটি বড় বড় দল এবং সেই সঙ্গে 'হাওড়া সমাজের' মতো শখের দল।

কবে কিভাবে যাত্রার পুনরুজ্জীবন হল এটা নিরূপণ করা সহজ নয়। মনে পড়ে, আমরা একদা বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্মেলনে যেমন আউল-বাউল, রাইবেশে, ছৌ, ঝুমুর, গম্ভীরা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করি তার কাছাকাছি সময়েই শোভাবাজারের রাজবাড়িতে যাত্রা-উৎসবের মহাসমারোহ ঘটে। বোধকরি সেটিই যাত্রার পুনরুজ্জীবনের পটভূমি। এক নাগাড়ে পর পর কয়েকদিন ধরে অনেকগুলি দলের পালা অভিনীত হয়। দর্শকদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা ঘটেছিল সেই অনুষ্ঠানে অসামান্য তার প্রমাণ ট্যাঁকের কড়ি দিয়ে দস্তুরমত টিকিট কেটেই দেখতে গিয়েছিলেন তাঁরা। হাউস ফুল।

বাঁধা স্টেজে থিয়েটার দেখার অভিজ্ঞতা-বোধ দর্শকের মনে থিতিয়ে আছে।। পরন্তু দীর্ঘকাল পরে দেখার ফলে 'যাত্রা'ই যেন নতুন বস্তু হয়ে ধরা দিল। কারণ যাই হোক বাংলার পুরনো একটি প্রধান কলাবিদ্যার প্রতি মানুষের অনুরাগ অল্পকালেই আপন গৌরবে অধিষ্ঠিত হল।

শোভাবাজার রাজবাড়ির কথাই যখন উঠল তখন রাজা নবকৃষ্ণ দেবের আমলের একটি কাহিনী শুনুন। অবশ্য সে-আমলে চিৎপুরে 'অপেরা পার্টি'র ঢালাও আখড়া গড়ে ওঠে নি। নদীয়া, বর্ধমান, ঢাকা, বীরভূমের সুদূর পল্লী অঞ্চলই ছিল সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। সে-কথা যাক। লোচন অধিকারী মশাই 'নিমাই সন্যাস' পালা অভিনয়ের চমৎকারিত্ব দিয়ে রাজা নবকৃষ্ণকে এমনই অভিভূত করলেন যে, পারলে শোভাবাজারের যাবতীয় সম্পত্তিই প্রায় অধিকারী মশাইকে দিয়ে দ্যান রাজা। অতোটা না হলেও বিস্তর টাকা লোচন অধিকারী পেয়েছিলেন শোভাবাজারের এই সংস্কৃতিগতপ্রাণ ব্যক্তিটির কাছে। ঠিক একই কাণ্ড ঘটে ছিল কুমোরটুলীর বনমালী সরকারের বাড়িতে। নিখুঁত অভিনয় যে কী পর্যন্ত মনকে দখল করতে পারে তার প্রমাণ দিয়েছিল লোচন অধিকারীর দল। তখনকার আমলে নাম-ফাটানোর জন্যে দান-খয়রাত করা

নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরার কলঙ্কিনী রাই-এর দৃশ্য

বা ঐশ্বর্যের ঘটাপটা দেখানোই ছিল প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র। তবু এই কাণ্ড দেখে কলকাতার 'টকুকর-টেকুকা দেনেওয়ালা' তাঁরা—জাঁহাবাজ জমিদার আর যৌতুক রাজা-গজারা লোচন অধিকারীকে বায়না দিতে ভরসা পেতেন না। পাছে লোকটা ভুলিয়ে যথাসর্বস্ব নিয়ে নেয়। মুখে অবশ্য বলতেন তাঁরা লোকটা বড্ড কাঁদায়। এত করুণ রস পয়সা দিয়ে কেনার কোনো মানে হয় না।

আজকে যেমন পেশাদার 'অপেরা' নামধেয় যাত্রা দলগুলি প্রধানত কলকাতায় হেড অফিস বানিয়ে কাজ কারবার করেন প্রথম যুগে সে-সব কিছু ছিল না। এমন কি পেশাই ছিল না, ছিল নেশা। লোকের মুখে মুখে প্রচার হল ত ভাল কথা নতুবা দলটি জনবসতিতে হাজির হয়ে শ্রীকৃষ্ণ যাত্রা অনুষ্ঠান করতেন। তাঁইই ছিল মূল দ্যোতনা। প্রথম যুগে শ্রীকৃষ্ণ যাত্রা বা কালীয়দমনই ছিল এক এবং অদ্বিতীয় বিষয়বস্তু। আর পরবর্তী কালে বর্ধমানের কাছে পাতাইহাটের প্রেমচাঁদ, আনন্দ, জয়চাঁদ 'রামযাত্রা' করে খ্যাতি পেয়েছিলেন। গোপালচন্দ্র দাস বা গোপাল উড়ের গান এখনো রসিকসমাজে সমাদর পেয়ে থাকে। বীরভূমের পরমানন্দ অধিকারী, জাঙ্গীপাড়া কৃষ্ণনগরের গোবিন্দ, কাটোয়ার পীতাম্বর, ফরাসডাঙ্গার গুরুপ্রসাদ বল্লভ (ইনি চণ্ডীযাত্রার জনক), বর্ধমানের লাউসেন বড়াল (ইনি মনসার ভাসান গানের প্রবর্তক), বিক্রমপুরের কালাচাঁদ পাল গীতিনাট্য জগতের এক এক দিকপাল।

তবে কৃষ্ণকমল গোস্বামীর খ্যাতি পূর্ব-পশ্চিম সকল বঙ্গেই ছিল সমান। কৃষ্ণকমলের পিতা ভজনঘাটে বসতি করেন, সেখানেই অসাধারণ রূপবান এই পুত্রের জন্ম। স্থানীয় জমিদার কৃষ্ণকমলের অপরূপ কান্তি দেখে এমনই মুগ্ধ হন যে, শিশুটিকে দত্তক চেয়ে বসলেন। ব্যাপার বেগতিক দেখে ভয়ের চোটে কৃষ্ণকমলকে নিয়ে তাঁর বাবা পালিয়ে গেলেন। বছর ছয়েক গা-ঢাকা দিয়ে থাকার পর কৃষ্ণকমল আবার তাঁর মায়ের মুখ দেখতে পান। বোধকরি বাল্যের এই প্রবাসী বিচ্ছিন্ন জীবনের কাতরতাই তাঁর মনে অনুপ্রেরণার

খ্যাতি অর্জন করেছিল। তাই, পরে তাঁর 'নিমাই সন্ন্যাস' পালা অভিনয়ে অকৃত্রিম দরদ ফুটে উঠত। কৃষ্ণকমল অনুগত সাগরেদদের উৎসাহে শেষে ঢাকায় এলেন। বিভিন্ন প্রতিযোগী দলকে পরাস্ত করে তিনি সকলের মনে এমনই আসন পেয়ে গেলেন যে, তাঁর আর ঢাকা ত্যাগ করা হল না। তাঁর রচিত 'স্বপ্নবিলাস' 'রাই উন্মাদিনী' 'বিচিত্র বিলাস' সেকালে যথার্থই জনপ্রিয় হয়—তার প্রমাণ অল্পদিনের মধ্যে 'স্বপ্নবিলাস'-এর ২০০০০ কপি বই বিক্রী। কৃষ্ণকমল ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে লোকান্তরিত হন। যাত্রার ইতিহাস সম্পর্কে যাঁরা বিশেষ আগ্রহী তাঁরা নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ইংরাজি বইখানি যোগাড় করে পড়তে পারেন।

আজকের দিনে যাত্রায় ছন্দোবদ্ধ পরিবেশন লুপ্ত। বিমূর্ত প্রসঙ্গ অতিক্রম করে বাস্তবের উপরেই কাহিনী রচনা করা হয়। তা ছাড়া রাজনীতির পটভূমিও বিষয়বস্তুর অঙ্গীভূত হয়েছে। ইদানীং লেনিন, হিটলার, নেতাজীর জীবন নিয়ে গঠিত যাত্রার পালা জনসমাজে সমাদর পায় অর্থাৎ লোক-সংস্কৃতি এখন দেশের গন্ডী ছাড়িয়ে গেছে। অনেক আধুনিক উপন্যাসকেও যাত্রার বিষয়বস্তু রূপে গ্রহণের হাওয়া এসেছে।

এখন বিদেশেও কলকাতার যাত্রাদল আমন্ত্রিত হয়ে সফর করে বাংলার স্বীয় সংস্কৃতির পরিচয় দিয়ে আসেন। একথা অস্বীকার করা চলে না যে, বর্তমান কাঠামোয় যাত্রার পরিবেশন বাঁধা স্টেজের অনেক কাছাকাছি পৌঁছেছে। অনেকের মনে হয় যেন আগের সেই সুর আর রস যাত্রায় পাওয়া যায় না। সেই বীর রস, বা ভক্তি অথবা করুণ রসের প্লাবন এখন যেন উবে গেছে—কল্পনার অবকাশ শ্রোতা-দর্শকের অনেক কমেছে। হয়ত এ সবই সত্যি। তবু আজকের দিনে পেশাদার থিয়েটারের চেয়ে পেশাদার যাত্রাদলকে সাধারণ জন বেশি পছন্দ করেন। পুজোর সময় ত বটেই অন্যান্য স্থানীয় উৎসবের সময়ে এ'দের 'বাস' শহরে, শিল্পাঞ্চলে বা কৃষিজীবন যেখানে উন্নত সেখানে হাজির হয় এবং পর পর কয়েক দিন ধরে' বিভিন্ন পালা অভিনয় করে এ'রা অন্যত্র যাত্রা করেন।

জীবন যে রকম/ওয়াহিদা রহমান। পরিচালনা : স্বদেশ সরকার।

ভারতীয় চলচ্চিত্রে সবুজ আলোর পদধ্বনি

শ্যামল চক্রবর্তী

আমরা দৈনন্দিন জীবনে সাধারণতঃ কারু কারু সম্পর্কে বলে থাকি—'বয়েস হলেও বুদ্ধি পাকেনি'। অর্থাৎ সেই ব্যক্তি হয়তো গুণ থাকা সত্ত্বেও বোকার মত কাজ করেন কিম্বা নিজেকে বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলে উপস্থিত করতে পারেন না। আমাদের এদেশের চলচ্চিত্র সম্পর্কেও একথা বলা চলে। ভারতীয় চলচ্চিত্রের বয়েস প্রায় পঁচাত্তর হয়ে গেল এবং সবাক চিত্রের বয়েসও চল্লিশ পার হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও এদেশের চলচ্চিত্র নানারকম শাসন-বিধির অন্তরালে, এখনও প্রকৃত প্রস্তাবে বয়স্ক হতে পারল না। জন্মক্ষণ থেকে এই দশক পর্যন্ত পরিক্রমায় হয়তো বিভিন্ন দিকে উন্নতি করেছে, ফল প্রাপ্তিও ঘটেছে; তথাপি বাধানিষেধের গন্ডী থেকে মুক্ত হয়ে সবুজ প্রাণের বন্যায় এগিয়ে যেতে পারেনি এদেশের চলচ্চিত্র।

চলচ্চিত্র—প্রথম সৃষ্টির কালে ছিল শুধুমাত্র ছবি। কালক্রমে ছবিতে এল বিন্যাস, এল গতি। নির্বাকযুগে সেইসব ছবি দর্শককে আকৃষ্ট করার মানসে নানারকম কান্ডকারখানা করতো। তারপর নির্বাক যুগে ছবিতে গল্প বলা শুরু হল, বেশীর ভাগই কাল্পনিক ও উদ্ভট ঘটনায় পরিপূর্ণ থাকতো। দর্শকের মন ভরতো না, শুরু হল পরীক্ষা-নিরীক্ষা। চলচ্চিত্র বিজ্ঞান-সম্মত শিল্প—তাই গবেষণা ও মানুষের চেষ্টা সফলতা নিয়ে এল। এল সবাক যুগ। ছবিতে কথা যোগ হল। এক কথায় বিরাট পরিবর্তন, দর্শক চমকিত। প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যত নির্ধারিত হয়ে গেল। অর্থাৎ চলচ্চিত্র সমগ্র বিশ্বে, অসাধারণ প্রমোদ মাধ্যমরূপে উপস্থিত হল। পৃথিবীর অন্য দেশের সঙ্গে সমতা রেখে এদেশের চলচ্চিত্র শিল্পও এগিয়ে চলল—এর পরিধি বিস্তৃত রূপ নিল, বহু মানুষের মুখ এই ছবির জগতে প্রতিবিম্বিত হল। পত্রে পুষ্পে শোভিত হয়ে চলচ্চিত্র নামক বৃক্ষটি ক্রমেই বৃহত্তর রূপ পরিগ্রহ করতে লাগল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বোম্বাইতে ভারতীয় চলচ্চিত্র সমিতির সভাপতি স্যার ফিরোজ শোধনা ১৯৩৭ খৃঃ জানালেন—এদেশে বর্তমানে চলচ্চিত্র শিল্পে ১২ কোটি টাকা খাটছে, ২০ হাজার লোক যুক্ত এবং প্রায় সাড়ে ছশো চিত্রগৃহ রয়েছে। সেই সঙ্গে এও জানান যে, একটি চিত্র নির্মাণে বর্তমানে এক লক্ষ টাকার মত খরচ করতে হয়। অর্থাৎ ১৯৩৭ খৃঃ সবাক চিত্র নির্মাণের মাত্র সাত বছরে এদেশের চলচ্চিত্রের এই দুর্বার গতি। সেকালে একটি শিল্পের প্রতি এই আকর্ষণ নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য।

চলচ্চিত্র থেমে থাকেনি—ঐ পরিসংখ্যানের পর ক্রমে আরো এগিয়ে গেছে। এদেশে চলচ্চিত্র জনপ্রিয়তায় যে কোন শিল্পকে পিছনে রেখে এগিয়েছে লগ্নী বৃদ্ধি পেয়েছে মানুষের মিলিত শক্তি ও চেষ্টা বিরাট রূপ নিয়েছে। এই সত্তর দশকে এসে ভারতীয় চলচ্চিত্রে বছরে সাড়ে তিনশো কোটি টাকা খাটছে, লক্ষাধিক লোক এই শিল্পে যুক্ত এবং সমগ্র দেশে তিন থেকে চার হাজারের কাছাকাছি চিত্রগৃহ। বর্তমানে একটি ছবিতে কোটি টাকাও খরচ হয়ে থাকে এবং ভারতীয় ছবির দ্বারা বিদেশ থেকে সরকারের বেশ কয়েকশো কোটি টাকা মুদ্রাও আয় হয়।

তেমনি সবাক যুগের প্রথমে এদেশের ছবিতে এল কাহিনী এবং সুষমা। ক্রমে এই শিল্প মাধ্যমটির উন্নতি হতে থাকল। আস্তে আস্তে সেট সেটিং দৃশ্য পরিকল্পনা, অভিনয়, ধ্বনি প্রক্ষেপণের

যথার্থতা, সঙ্গীতের ব্যবহার যোগ হল। ছবি এগিয়ে চলল। ভাল ভাল ছবি সৃষ্টি হল, কৃতী পরিচালক ও শিল্পীকুলের চেষ্টায়। ১৯৩৯ সনের মধ্যে চলচ্চিত্র পেল প্রমথেশ বড়ুয়ার 'দেবদাস', ভি শান্তারামের 'আদমি', দেবকীকুমার বসুর 'চণ্ডীদাস' এবং নীতিন বসুর 'ভাগ্যচক্র' ছবিগুলি। দর্শক ছবির উন্নতিতে পরিতৃপ্ত, ছায়াছবিও সেই পরিতৃপ্তিকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টায় মগ্ন হল। সেই পরিক্রমায় চলচ্চিত্র এসে উপস্থিত হল 'পথের পাঁচালী' ছবির মাধ্যমে ১৯৫৫ সালে। ভারতীয় চলচ্চিত্রে নবভাবের উন্মেষ ঘটল এই ১৯৫৫ সালে এবং এক দুর্বার সাড়া জাগল চলচ্চিত্র শিল্পে। 'পথের পাঁচালী' ছবি নিয়ে এল চলচ্চিত্রে নতুন চিন্তা, নতুন ভাবনা। স্রষ্টা সত্যজিৎ রায় ভারতীয় চিত্রশিল্পের প্রচলিত রীতি ভেঙে নিয়ে এলেন প্রকৃত জীবনের স্পর্শ ছবির জগতে। এত দীর্ঘ বছর ধরে ছবি কথা বলছিল, কিন্তু ঠিক এমনটি নয়। রিয়্যালিটি বা বাস্তববোধ এল ছবিতে, যা নাকি ইতিপূর্বে উপস্থিত ছিল না। ভারতীয় চলচ্চিত্র নতুন দিকে মোড় নিল, এবার চলচ্চিত্র জীবনের কথা আরো গভীরভাবে বলতে শুরু করল, ছবি আর আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা পরস্পর একাত্ম হয়ে উঠল। শুধু তাই নয়, ভারতীয় চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ প্রদর্শিত পথে এগিয়ে এলেন আরো কয়েকজন, যাঁরা চলচ্চিত্রকে আরো গভীরভাবে দর্শকের নিকট আন্তরিকভাবে উপস্থিত করলেন। এঁদের সবার মিলিত প্রচেষ্টায় ভারতীয় চলচ্চিত্র পেল শিল্পসুষমা, আঙ্গিকগত উৎকর্ষতা, বাস্তবনিষ্ঠ কাহিনীর চিত্ররূপ ও বিশ্বের সম্মান। সত্তর দশকে এসে ভারতীয় চলচ্চিত্র এই পটভূমিতে বিরাজ করছে।

কিন্তু এরপরেও চলচ্চিত্রের বক্তব্য শেষ হয়নি। যেহেতু চলচ্চিত্র, আজ জীবনের কথা নির্মমভাবে উপস্থিত করছে, প্রচলিত রীতিনীতিকে ভেঙে গুঁড়িয়ে এগিয়ে আসছে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে চিত্রপটে তুলে ধরতে চাইছে সেজন্যই চলচ্চিত্র এই মুহূর্তে আরো কিছু বন্ধ দরজা খুলে দিয়ে অন্ধকার থেকে আলোয় যেতে উদগ্রীব। তার জন্যই চলেছে সংগ্রাম, দুঃসাহসিক মনোভাব এবং প্রচেষ্টায় কিছু করার তাড়না। আমাদের দেশের চলচ্চিত্রের প্রথম যুগ থেকেই যে অনুশাসন রয়েছে, যেসব সামাজিক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে উঠেছে বাধানিষেধের গণ্ডী, তাকে চাইছে দূরে সরিয়ে দিতে। এই নিয়েই আজকের চলচ্চিত্রের জগতে ঝড় উঠেছে। এই ঝড় হল চলচ্চিত্রে যৌন আবেদন বা অশ্লীলতা দেখানো হবে, কি হবে না। এবং একেই বলা যেতে পারে চলচ্চিত্রে সবুজের পদধ্বনি।

এখন প্রশ্ন চলচ্চিত্রে শ্লীল ও অশ্লীল বলতে কী বোঝায়। বিদেশের চলচ্চিত্রে এসবের কোন বাধানিষেধ নেই। কারণ ওদের সমাজব্যবস্থা বা দৈনন্দিন জীবনের মাপকাঠি আমাদের দেশের তুল্য নয়। ওদেশে যা সম্ভব হয়, এখানে আমাদের জীবনে তা ঘটে না। তেমনি ওদের চলচ্চিত্রে যা দেখানো সম্ভব, আমাদের দেশে সেই-রকম কোন কিছু উপস্থিত করায় অসুবিধা রয়েছে। অথচ সমগ্র বিশ্বে চলচ্চিত্র শিল্পের একটা নিজস্ব পথ রয়েছে, যে পথে সবাই একইভাবে চলছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে জীবনের সব কথাই তুলে ধরা হচ্ছে, সেখানে কোন বাধা-নিষেধের ডোরে চলচ্চিত্র থেমে যায় নি। নরনারীর জীবনকে নিয়ে যে কাহিনী চিত্রায়িত হচ্ছে, সেই কাহিনীর একান্ত গোপনীয় ও আন্তরিক কথা থেকে দূরে গিয়ে প্রতীকের আশ্রয়ে চিত্ররূপ উপস্থিত হচ্ছে না। কিন্তু এদেশে নরনারীর গোপনীয় কথা বা মুহূর্ত প্রতীকের মাধ্যমেই উপস্থিত করা হচ্ছে। গোল বেঁধেছে এখানেই।

চলচ্চিত্র যদি জীবনের সব কথাই তুলে ধরতে চায় তাহলে প্রতীকের আশ্রয়ে কোন কোন ঘটনা উপস্থিত হবে কেন। রিয়্যালিটির প্রশ্নে সব কিছুই উপস্থিত করতে হবে এই হল আজকের মূল দাবী। আমাদের দেশের রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থায় সামাজিক অনুশাসনের গণ্ডীর দ্বারা চলচ্চিত্র শিল্পকে চালিত করা হচ্ছে দীর্ঘ দিন ধরে। সময়ের পরিবর্তনে চিন্তায় ভিন্ন সুর আসে—বক্তব্যও নতুনভাবে উপস্থিত হয়। চলমান জীবনে যদি সর্বত্র নবজাগরণের ভাব এসে থাকে, তাহলে চলচ্চিত্র তার থেকে দূরে সরে থাকতে পারে না। আজকের ভারতীয় চলচ্চিত্রে এই মতাদর্শের বশবর্তী হয়ে কিছু স্রষ্টা এসেছেন যাঁরা জীবনের সব কথা তুলে ধরতে চান। এই চাওয়ায় অশ্লীলতার অনুপ্রবেশ ঘটছে এই বক্তব্য একপক্ষের। অপরপক্ষ বলছেন—না, অশ্লীলতা নেই কোথাও। জীবন যদি চলচ্চিত্রের একমাত্র মুখ্য বাহক হয় তাহলে এই জীবনের সব-দিকই এর সঙ্গে যুক্ত হবে। নরনারীর জীবনের একান্ত মুহূর্ত উপস্থিত করতে গিয়ে যদি বিছানার দৃশ্য বা চুম্বন-দৃশ্য উপস্থিত করতে হয় তাহলে সেই মুহূর্ত থেকে ফিরে আসা যাবে না। কিন্তু দর্শক, তাঁরা কি পারবেন সহ্য করতে? কেন পারবেন না—যদি বিদেশী চিত্রের সময় তাঁরা কিছু মনে না করেন, তাহলে দেশীয় চিত্রের সময় অন্য মত পোষণ ঠিক নয়। কিন্তু ভারতীয় জীবনযাত্রায় আমরা এমন ভাবে প্রস্তুত যে বিদেশী নিরাত্মীয় নর-নারীর নিরাভরণ দেহদৃশ্য দেখতে আঁতকে উঠি না—কিন্তু এদেশের আপনার জনের এই দৃশ্য সহ্য করা সম্ভবপর হয় না।

সেজন্যই আজ সোরগোল—'চেতনা', 'জরুরত', 'অনুভব' ইত্যাদি আরো অনেক ছবি নিয়ে। মনে পড়ছে কোন এক সাংবাদিক সম্মেলনে সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন, 'বিছানার দৃশ্য' দেখাতে গিয়ে আমি প্রতীকের আশ্রয়কেই উপযুক্ত মনে করি। যেমন 'বালিস, চাদর দুমড়ে মুচড়ে দেখিয়ে এবং নরনারীকে বিস্রস্তভাবে উপস্থিত করলেই বোঝা যাবে কিছু একটা হয়ে গিয়েছে।' কিন্তু সত্যজিৎ পরবর্তী যাঁরা এসেছেন তাঁরা আরো বেশী সাহসী, ওঁরা আরো এগতো চান। চলচ্চিত্র সেন্সার কমিটি এখনও এই বিষয়ে সবুজ নিশানা দেখান নি, কিন্তু চলচ্চিত্রের দ্বারে সেই সবুজের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এই তরঙ্গ রোধা কি সম্ভব হবে? অতি সম্প্রতি বাংলা-দেশের ঢাকায় একটি চিত্রে চুম্বনদৃশ্য গ্রহণ করা হয়েছে বলে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে দুয়ারেই সেই পদধ্বনি এসে গেছে।

এখন প্রশ্ন চলচ্চিত্রে শ্লীল অশ্লীল, বা যৌন আবেদনের মাপকাঠি কি হবে? অর্থাৎ কিভাবে এই দৃশ্য চিত্রায়িত হতে পারে। এই প্রসঙ্গে বলা ভাল, বর্তমানে ভারতীয় চলচ্চিত্র বিশেষ করে হিন্দী ছবিতে যৌন আবেদন যেভাবে প্রকট করে তুলে ধরা হচ্ছে সেটা অনেকক্ষেত্রেই অতি উত্তেজনার খোরাক জোগাচ্ছে। এরও কারণ হল যেহেতু নগ্নদৃশ্য বা চুম্বন ছবিতে দেখানো সম্ভব হচ্ছে না সেজন্যই নানারকমের যৌন আবেদনের মাধ্যমে চিত্রকে দর্শকের নিকট আকর্ষণীয় করা। অথচ শিল্পসম্মতভাবে প্রেমিক-প্রেমিকার চুম্বনদৃশ্য বা বিছানার দৃশ্য অনেক কম উত্তেজক রূপে উপস্থিত করা সম্ভব। যদিও একথা সত্য যে, চুম্বন দৃশ্য বা বিছানার দৃশ্য মাত্রাতিরিক্তভাবে উপস্থিত হলে রসহানি ঘটবে এবং দর্শকের নৈতিক চিন্তায় আঘাত হানতে পারে। চলচ্চিত্র সেন্সার কমিটি এই বিষয়ে নীতি নির্ধারণ করে দিলে হয়তো অতিরিক্ত ওঠার মতো কিছু ঘটবে না। অথচ বর্তমানে আমাদের চলচ্চিত্র এইদিকে পদক্ষেপের অভাবে থেমে যাবার মুখে। কেননা, দর্শকরা কিছু দুঃসাহসিক পরিবর্তন বা নতুনের জন্য উন্মুখ। দীর্ঘদিন একঘেয়ে রক্ষণশীল মনোভাবের বাধানিষেধের ডোরে আবদ্ধ থেকে ভারতীয় চলচ্চিত্র দর্শক নানোন্মোচনের পথ খুঁজে পাচ্ছে না। চিত্রস্রষ্টারাও অসফল চিত্রনির্মাণে চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে বা শিল্পকে অন্ধকারে নিয়ে চলেছেন। সারা পৃথিবীর দর্শকদের যদি চুম্বন দৃশ্য বা নরনারীর একান্ত মুহূর্তের দৃশ্য চিত্রায়িত দেখে নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন না ঘটে থাকে তাহলে আমাদের দেশের দর্শকদেরও ঘটবে না। প্রথম প্রথম হয়তো গ্রহণে অস্বস্তি বা বিতর্কের ঝড় আসবে, কিন্তু পরবর্তী সময়ে সব কিছুই সহজভাবে গ্রহণীয় হয়ে উঠবে। চলচ্চিত্র যখন তার নিজস্ব শিল্প-মাধ্যমে জীবননির্ভর হয়ে উঠছে সে সময় অযথা তার চলার পথকে গোঁড়ামির মানসিকতায় রুদ্ধ করে রেখে এই শিল্পের সংকট ও ভবিষ্যত সফল জয়যাত্রাকে একটা নির্দিষ্ট সীমারেখায় আটকে কোন শুভ ফল প্রাপ্তি ঘটবে না। কোন শিল্পকেই বাধা-নিষেধের ডোরে বেঁধে রাখা যায় না। স্বকীয় সৃষ্টিতে এগিয়ে যেতে দিলেই অনাস্বাদিত রূপ প্রকাশিত হয়। চলচ্চিত্র তা থেকে স্বতন্ত্র নয়। তাই এই পদধ্বনিকে স্বাগত জানানো নীতিবিগর্হিত কাজ হবে না।

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা

রক্তভূমি/পরিচালক পীযূষ গঙ্গোপাধ্যায় নায়িকা সোমা দেকে নির্দেশ দিচ্ছেন। কাহিনী : প্রফুল্ল রায়। ফটো : অমৃত

নতুন দিনের আলো

ইউনাইটেড নেশনস্-এর পরিসংখ্যানে প্রকাশ, পৃথিবীতে এমন কোনও দেশ নেই, যেখানে সমগ্র উপার্জনক্ষম জনসংখ্যার শতকরা ষোল ভাগের বেশী লোককে কর্মচারী ও কেরানীর চাকরীর সংস্থান করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। বাকী উপার্জনক্ষম লোকের মধ্যে কেউ কৃষিজীবী, কেউ বা ব্যবসায়ী, আবার কেউ বা উকিল, ব্যারিস্টার, ডাক্তার, শিক্ষক বা ঐ-রকম আর-কিছু। কাজেই আমাদের শিক্ষিত বেকারদের উচিত, চাকরীর জন্যে হা-পিত্যেশ করে বসে না থেকে স্বাধীনভাবে কোনো-না-কোনো রকমে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করা এবং এ-ব্যাপারে সৎভাবে জীবিকা অর্জনের কোনো উপায় বা পন্থাকেই সম্মানহানিকর, ছোটো জ্ঞান না করা।—এই অত্যন্ত খাঁটি, সত্য কথাটি বলতে চেয়েছে ১৯৭৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত প্রথম বাংলা ছবি বাদল পিকচার্সের অষ্টম নিবেদন "নতুন দিনের আলো"। এবং এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাণীটি আমাদের কর্ণকুহরে ধ্বনিত করবার জন্যে আমরা অনায়াসেই এই ছবির প্রযোজক রাখালচন্দ্র সাহা এবং কাহিনীকার-চিত্রনাট্যকার-পরিচালক অজিত গাঙ্গুলীকে অকুণ্ঠভাবে অভিনন্দিত করতে পারি। ফুচকাওলা, চানাচুরওলা, পান-ওয়ালা, 'বেচো-বাবু-চারআনা, যা নেবে ভাই চারআনা', 'ইণ্ডিয়া সুইটস্', 'তাজমহল সুইটস্', 'সাগর রেস্তোঁরা', 'মানসরোবর', ঝুনঝুনওয়ালা, গম্ভীরমল ঝলমল, নাগর-দাস মনোহরদাস প্রভৃতি লাখো লাখো অ-বাঙালী যখন এই পশ্চিমবঙ্গের বুকে বসে ছোট-বড়, হরেক রকম ব্যবসায়ের মাধ্যমে 'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী :' প্রবচনটিকে সার্থক করে তুলছে, মিষ্টান্নের দোকান, মুদীর দোকান, কুমোরের কারবার প্রভৃতিও যখন ধীরে ধীরে বাঙালীর হাত থেকে অবাঙালীর কুক্ষিগত হয়ে চলেছে, তখন "নতুন দিনের আলো"র বক্তব্যটি যে অত্যন্ত সময়োচিত হয়েছে, সে-কথা বলাই বাহুল্য। ধান ভানতে শিবের গীতের মতো শোনালেও এই স্বীকারোক্তি-টুকুর প্রয়োজন ছিল।

"নতুন দিনের আলো"র কাহিনীতে দেখতে পাই, গিরিশচন্দ্রের প্রফুল্ল নাটকের অনুসরণে পরিবারস্থ তিন ভাইয়ের মধ্যে

কমলিকা ফিল্মস্ পরিবেশিত হাতীর দাঁত চিত্রে রাকেশ পাণ্ডে এবং আশা সচ্চদেব

মেজোভাই মৃত্যুঞ্জয় হচ্ছে উকিল এবং খল, স্বার্থপর। ছোটো ভাই সঞ্জয় বি-এ পাশ করবার পরে পাঁচ বছর ধরে বেকার হয়ে আছে বলে মৃত্যুঞ্জয়ের বিরক্তির সীমা নেই। কিন্তু কিছু করে মাসোহারা পাঠিয়ে কর্তব্যের দায় এড়ানোর পরামর্শকে উপেক্ষা করে যখন পরলোকগত পিসতুতো ভাইয়ের মেয়ে মিনুকে বাড়ীতে এনে হাজির করল সঞ্জয় এবং জানল এতে সমর্থন আছে বড়ো বৌদির, তখন রোজ-গেরে উকিল মৃত্যুঞ্জয় রীতিমত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এবং ঘোষণা করল, একান্নবর্তী পরিবার থেকে সে তার স্ত্রী ও বি-এ পাঠরতা পলিকে নিয়ে পৃথক হয়ে যাবে। সাধারণ কেরানী, বড়ো ভাই ধনঞ্জয় পড়ল [illegible] স্ত্রী কিশোর সন্তান, ভাই সঞ্জয়, মিনু এবং নিজে—এই পাঁচটি মুখের অন্ন জোগানো তার একার রোজগারে প্রায় অসম্ভব। চাকরীর চেষ্টায় মরিয়া হয়ে ঘুরেও যখন কিছুই হল না, তখন একজন শিক্ষিত যুবকের চায়ের দোকানের বিক্রি দেখে সে যেন বাঁচবার পথ খুঁজে পেল এবং স্নেহময়ী বৌদির হাতের চার গাছি সোনার চুড়ী বিক্রি করে পাওয়া তিনশো টাকা মূলধন নিয়ে পারঘাটায় খুলে বসল মিনু কাফে—চা এবং টুকিটাকির দোকান। মেজো ভাই মৃত্যুঞ্জয় আবার তৎপর হয়ে উঠল—চায়ের দোকানী হয়ে সঞ্জয় তার প্রেস্টিজ পাংচার করে দিচ্ছে। কিন্তু তার জঘন্য বিরোধিতা সঞ্জয়কে দমাতে পারল না, তার চায়ের দোকান, তার দোকানের 'মিনু পীজ' ঘুঘনি তাকে শেষ পর্যন্ত করল জয়যুক্ত।

অযথা আত্মসম্মানজ্ঞান মানুষকে সময় সময় মরিয়া করে তোলে। তবু মনে হয়, ছোটো ভাই সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে মৃত্যুঞ্জয়ের অভিযানের মধ্যে কিছুটা বাড়াবাড়ি রয়েছে, যেমন রয়েছে পলির প্রণয়ীর প্রৌঢ় মা-বাপের কথা কাটাকাটির মধ্যে অশোভনতার আতিশয্য। চিত্রকাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রগুলির অঙ্কনে বিশেষ কোনো সূক্ষ্ম তুলির কাজ না থাকলেও সেগুলি রক্ত-মাংসের অবয়ববিশিষ্ট আমাদের নিত্য-কালের চেনাজানা মানুষ; তাই তাদের দুঃখে আমাদের চক্ষু যেমন আর্দ্র হয়েছে, তাদের আনন্দেরও তেমনই অংশীদার হতে কোনও রকম অসুবিধা হয় নি।

সু-অভিনয় ছবিটির অন্যতম আকর্ষণ। ছোটো-বড়ো প্রতিটি ভূমিকাই সুঅভিনীত। সঞ্জয়ের ভূমিকায় সার্থক অভিনয় করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তাঁর নীরব অভিব্যক্তিগুলি অত্যন্ত ব্যঞ্জনাসূচক। স্নেহময়ী বৌদির চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে সন্ধ্যারাণীর অভিনয়নৈপুণ্যে, যদিও বলব, যুগোপযোগিতার দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁর সামগ্রিক অভিনয়ে আবেগের প্রকাশকে বেশ কিছুটা পরিমিত করবার

নতুন দিনের আলো/সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

বিজয়িনী চিত্রের মিউজিক টেকের পূর্বে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে নির্দেশ দিচ্ছেন সংগীত পরিচালক অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুযোগ ছিল। সঞ্জয়ের প্রণয়িনী ও প্রেরণা-দাত্রী নমিতা বেশে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সু-অভিনয় করেছেন। কিন্তু বি-এ পাশকরা সামান্য স্কুলমাস্টারের সাজ-পোশাক অপেক্ষাকৃত সাধাসিধা হওয়া উচিত ছিল। বড়ো ভাই ধনঞ্জয়ের ভূমিকায় প্রমোদ গাঙ্গুলী অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সহজ অভিনয় করেছেন। একদা তিনি অল্প কয়েকটি ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বহুদিন অদর্শনের পরে প্রৌঢ় বয়সে তাঁর এই চরিত্রাভিনয় রীতিমত চিত্তাকর্ষক। প্রথমে ভেক-গণৎকার ও পরে চায়ের দোকানে সঞ্জয়ের দোসর গণেশের ভূমিকায় অনুপকুমার তাঁর অভিনয়চাতুর্যকে উপভোগ্যতার পর্যায়ভুক্ত করতে সমর্থ হয়েছেন। পর্দায় এই প্রথম দেখলুম তরুণ রায় ও দীপান্বিতা রায়কে। থিয়েটার সেন্টারের প্রথিতযশা এই শিল্পী দম্পতি আলোচ্য চিত্রে স্বার্থপরায়ণ উকিল মৃত্যুঞ্জয় ও তার সহধর্মিণী হেনার ভূমিকায় সার্থক অভিনয়ের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁদেরই সন্তান শ্রীমান দেবরাজ রায় সেজেছেন মৃত্যুঞ্জয়-কন্যা মলির প্রণয়ী। যতক্ষণ তিনি ছবিতে আছেন, ততক্ষণই ভালো লাগে এবং এই সাফল্য নিশ্চয়ই প্রশংসার যোগ্য। এ-ছাড়া উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন হাসু বন্দ্যোপাধ্যায় (মিনু), বিদ্যা রাও (পলি), বিকাশ রায়, বিনতা রায়, শমিতা বিশ্বাস, অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় রায়, বঙ্কিম ঘোষ প্রভৃতি।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ মোটের উপর প্রশংসনীয়। অনিল গুপ্ত ও জ্যোতি লাহা, দুজন চিত্রশিল্পী পরিস্থিতি অনুযায়ী বহির্দৃশ্য গ্রহণে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু উজ্জ্বলা সিনেমায় প্রক্ষেপক যন্ত্র-প্রোজেক্টার দুটি ভিন্ন ঔজ্জ্বল্যের সৃষ্টি করেছিল বলে এবং একটি লেন্স সম্ভবত ঈষৎ স্থানচ্যুত ছিল বলে ছবির ঔজ্জ্বল্যেও তারতম্য ঘটেছিল এবং সময় সময় ছবির অংশকে আউট অব ফোকাস বোধ হয়েছিল। বিজয় বসু ও সুবোধ দাসের শিল্পনির্দেশনা কাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাস্তব-ধর্মী। সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনা ছবির টেম্পোকে এমন সুন্দরভাবে বজায় রেখেছে যে, মনে করবার উপায় নেই, এই ছবিতেই তিনি প্রথম স্বাধীনভাবে সম্পাদনা করবার সুযোগ পেলেন। ছবির গান তিনটি রচনা করেছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। কিন্তু তাঁর মতো অভিজ্ঞ গীতিকারের কাছ থেকে 'মার দিয়া হ্যায় কেল্লা'র সঙ্গে 'পরেছি বাদশাহী আল-খাল্লা'র মতো মিল আশা করা যায় না। ঠিক সমানভাবেই অভিযোগ করব সংগীত-পরিচালক নচিকেতা ঘোষের বিরুদ্ধে; ছবির গানে অযথা সুর নিয়ে কসরত করলে গান হৃদয়স্পর্শী হয়ে ওঠে না এবং সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রিয়তা লাভের সুযোগও হারায়। কাজেই ছবির তিনখানি গানই হয়েছে, ছবির অচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠতে পায় নি।

বর্তমানের নৈরাশ্যের রাজ্যে আশার নববাণী বহনকারী, অভিনয়সাফল্যমণ্ডিত, বাদল পিকচার্স-এর নিবেদন, অজিত গাঙ্গুলী রচিত ও পরিচালিত "নতুন দিনের আলো" দর্শকমাত্রকেই খুশীতে ভরিয়ে দেবে।

স্টুডিও সংবাদ

রূপশ্রী পিকচার্স-এর 'চতুরঙ্গ'-এ সুচিত্রা সেন

১৯৬০ সালে প্রযোজক হেমেন গাঙ্গুলী চিত্রপ্রযোজনার কাজে ব্রতী হয়ে প্রথমেই নির্মাণ করেন রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' অবলম্বনে তপন সিংহ পরিচালিত শিল্প-সমৃদ্ধ ও জনপ্রিয় চিত্র। ঐ সময় থেকেই শ্রীগাঙ্গুলীর আন্তরিক অভিলাষ ছিল কবির 'চতুরঙ্গ' অবলম্বনে একখানি ছবি তৈরী করা এবং তার নায়িকা দামিনীর ভূমিকাটি সুচিত্রা সেনকে দিয়ে রূপায়িত করা। বছর তিনেক আগে বাঙলা 'সাগিনা মাহাতো'র প্রযোজনা শেষ করেই শ্রীগাঙ্গুলী 'চতুরঙ্গ" করবার কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু নানা কারণে ঐ সময়ে ছবিটির কাজে হাত দেওয়া সম্ভব হয়নি। সম্প্রতি পূর্ণেন্দু পত্রী পরিচালিত 'স্ত্রীর পত্র' ছবিখানিকে একটি বিশেষ প্রদর্শনীতে দেখে শ্রীগাঙ্গুলী ও শ্রীমতী সেন দুজনেই একমত হন যে, শ্রীপত্রীকেই 'চতুরঙ্গ' ছবির পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হোক। বলা বাহুল্য, ঐ সঙ্গে চিত্রনাট্য রচনা করবার ভারও শ্রীপত্রীর ওপরই অর্পিত হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, হেমেন গাঙ্গুলীর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান রূপশ্রী পিকচার্স-এর পতাকাতলে 'চতুরঙ্গ'-এর শুটিং শুরু হবে এপ্রিল থেকে।

কালিকা ফিল্মস্ প্রাইভেট লিমিটেডের পরিবেশনায় প্রথম হিন্দী ছবি "হাতীকে দাঁত"

রবীন খেরা প্রযোজিত এবং বহু আলোচিত পরিচালক বি-আর-ইশারা লিখিত ও পরিচালিত রঙীন ছবি "হাতীকে দাঁত-"এর পূর্বাঞ্চল পরিবেশন স্বত্ব গ্রহণ করেছেন কালিকা ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেড। ছবিটির নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় আছেন রাকেশ পান্ডে এবং আশা সচদেব। সংগীত-পরিচালনা করেছেন রবীন্দ্র জৈন।

এম-এস-এম প্রোডাকসন্স-এর 'অভিনয়'

পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে, এম-এস-এম প্রোডাকসন্স-এর ইস্টম্যান কলারে তোলা ছবি "অভিনয়"-এর মহরৎ হয়েছিল গেল স্বাধীনতা দিবসে টালিগঞ্জের টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে। হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের সুযোগ্য সহকারী অনিল ঘোষ পরিচালিত এই ছবির দশদিন ধরে টানা শুটিং হয়েছিল অকটোবর মাসে ঐ টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতেই। এরপরে প্রযোজকরা দলবল নিয়ে বোম্বাই শহরে আসেন এবং ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত বোম্বাই শহর ও শহরতলীতে বহির্দৃশ্য গ্রহণ করেন।

ছবিটির বিভিন্ন চরিত্রে আছেন রাখী সান্যাল, সামত ভঞ্জ, রবি ঘোষ, উৎপল দত্ত ও শেখর চট্টোপাধ্যায়। 'অভিনয়'-এর চিত্র-গ্রহণ, সুরযোজনা ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মদন-মোহন এবং হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়।

পরিচালক-প্রযোজক রাজেন ভাটিয়ার দুখানি ছবি

প্রযোজক-পরিচালক রাজেন ভাটিয়া তাঁর কিরণ প্রোডাকসন্স-এর নতুন ছবি "আজকী তাজা খবর"-এর মহরৎ করেন ইংরাজী নববর্ষের প্রথম দিনে বোম্বে

সাউণ্ড স্টুডিওতে ছবিটির প্রথম গান রেকর্ড করে। হসরৎ জয়পুরী রচিত গানে সুরযোজনা করেছেন শঙ্কর জয়কিষেণ এবং গেয়েছেন কিশোরকুমার।

ঐদিনই তিনি ৪০দিনব্যাপী একটানা শুটিংও শুরু করেন। জনপ্রিয় গুজরাটি নাটক "চাকডোল" অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন এস, আলল। ছবির চিত্রশিল্পী ও শিল্পনির্দেশক হচ্ছেন যথাক্রমে কৃষ্ণ সাইগল ও বংশী চন্দ্রগুপ্ত। বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন কিরণ-কুমার, রাধা সালুজা, পদ্মা খান্না, আই-এস-জোহর, আসরাণী, পেন্টাল, অপর্ণা চৌধুরী ও নরেন্দ্রনাথ।

রাজেন ভাটিয়া তাঁর দ্বিতীয় ছবি 'জ্যোতিষী' শুরু করবেন ২০ ফেব্রুয়ারী থেকে। বেদ রাহী লিখিত কাহিনী অবলম্বনে এই ছবিটি পরিচালনা করবেন বি-আর ঈশারা।

কিরণ প্রোডাকসন্স-এর ইস্টম্যান কলারে তোলা ছবি "জংগলমে মংগল" মুক্তির দিন গুনছে। মালায়লম লেখক জোপ কোট্টারাকারা লিখিত "রেস্ট হাউস"-এর কাহিনী অবলম্বনে রচিত ছবিটিতে আছেন দ্বৈত-ভূমিকায় প্রাণ, কিরণকুমার, রীনা রায়, সোনিয়া সাহনী প্রভৃতি।

মোহন ফিল্মস্-এর 'অনজান রাহে'

মোহন ফিল্মস্-এর নবতম নিবেদন 'অনজান রাহে'র এক নাগাড়ে কুড়ি দিন শুটিং হয়ে গেল পার্কসার্কাসের আঞ্জুমান-এ-ইসলাম হাই স্কুলে। মোহন রচিত, প্রযোজিত ও পরিচালিত এই ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন আশা পারেখ, ফিরোজ খাঁ, আকবর খাঁ, জহীরা, জালাল আগা, মনমোহন, জগদীশ রাজ, অসিত সেন প্রভৃতি। অতিথি শিল্পী রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন কিরণকুমার এবং অচলা সচদেব। ছবির চিত্রনাট্য রচনা, সংগীতপরিচালনা, সংলাপরচনা, চিত্রগ্রহণ, শিল্পনির্দেশনা ও সম্পাদনা করেছেন যথাক্রমে নবেন্দু ঘোষ, কল্যাণজী আনন্দজী, সাগর সহ্যাদি, এম-জাবল্লু মুকাদাম, এ আর কাক্কাড় এবং এস, আর, সায়ন্ত।

অম্বিকা চিত্রের 'মঞ্জিল'

আশিস বর্মন লিখিত কাহিনী অবলম্বনে পরিচালক বাসু চট্টোপাধ্যায় নিজেই চিত্রনাট্য রচনা করেছেন অম্বিকা চিত্রের 'মঞ্জিল' ছবির জন্যে। রাজপ্রকাশ, জয় পাওয়ার ও রাজীব সুরি প্রযোজিত এই ছবির চারদিনব্যাপী শুটিং হয়ে গেল সম্প্রতি জুহুর একটি বাংলোতে। এই শুটিংয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন অমিতাভ বচ্চন, মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়, ঊর্মিলা ভাট ও সত্যেন কাপ্পু। ছবিটির চিত্রগ্রহণ ও সংগীত পরিচালনা করেছেন কে, কে, মহাজন ও রাহুল দেববর্মণ।

'নয়না'র চিত্রগ্রহণ পর্ব সমাপ্ত

শক্তি ইন্টারন্যাশানাল-এর 'নয়না' ছবির চিত্রগ্রহণ পর্ব সমাপ্ত হল আটদিন ধরে ফিল্মিস্থান ও ফেমাস সিনে স্টুডিওতে শুটিং হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। কনক মিশ্রের পরিচালনাধীনে এ-ছবিতে অংশগ্রহণ করেছেন শশী কাপুর, মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়, রেহমান, ডেভিড, পদ্মা খান্না, ফরিদা জোলাল এবং গজানন জাগীরদার। বুলাভাই শাহ্ প্রযোজিত ছবিটির চিত্রগ্রহণ, সঙ্গীত-পরিচালনা ও সম্পাদনা করেছেন যথাক্রমে কে-এইচ কাপাডিয়া, শঙ্কর জয়কিষেণ ও পি-জি সুপারে।

বিবিধ সংবাদ

দক্ষিণ কলিকাতায় নব নাট্যমঞ্চ

অনুমান বছর আঠাশ আগে দক্ষিণ কলিকাতার নাট্যামোদীদের জন্যে স্থাপিত হয়েছিল কালিকা থিয়েটার। কিন্তু কয়েক বছর চলবার পরে যখন এই থিয়েটারটি সিনেমায় রূপান্তরিত হয়, তখন লোকের মনে ধারণা জন্মেছিল, দক্ষিণ কলিকাতায় স্থায়ী থিয়েটার চলা সম্ভব নয়। এই ধারণাকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করেছে শ্যামা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায় রোড ও রাসবিহারী অ্যাভেনিউ-এর সংযোগস্থলের কিছুটা দক্ষিণে অবস্থিত মুক্ত-অঙ্গন রঙ্গালয়টি। প্রথমে এই মঞ্চে এককভাবে অভিনয় করতেন শৌভনিক নাট্যগোষ্ঠী। কিন্তু বর্তমানে শৌভনিক সম্প্রদায় ছাড়াও বহু নাট্যগোষ্ঠী এই মঞ্চে তাঁদের নাট্যক্রিয়া প্রদর্শন করছেন। ফলে সপ্তাহের সব কটি দিনই মুক্ত-অঙ্গন নাট্যরসিক দর্শকদের কাছে মুক্ত। কিন্তু মুক্ত-অঙ্গন কোনোক্রমেই পরিপূর্ণ রঙ্গালয় পদবাচ্য হতে পারে না। এতে না আছে একটি সুপ্রশস্ত ও সুগভীর নাট্য-পীঠ, না আছে একটি আরামদায়ক আসন-সমন্বিত সুবৃহৎ পূর্ণাঙ্গ প্রেক্ষাগৃহ। কাজেই দক্ষিণ কলিকাতায় একটি সর্বাঙ্গ-সুন্দর রঙ্গালয় গড়ে তোলবার স্বপ্ন দেখ-ছিলেন শৌভনিক নাট্যগোষ্ঠীর পরিচালক-বৃন্দ বেশ কিছুদিন ধরে। সম্প্রতি তাঁরা ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট-এর কাছ থেকে

সমাধি/আশা পারেখ

১৯ বছরের ইজারায় কমবেশী ১২ কাঠা পরিমিত জমি সংগ্রহ করে তার ওপর নটনায়ক শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নামানুসারে 'শিশিরমঞ্চ' স্থাপনের জন্যে উদ্যোগী হয়েছেন। তাঁদের ইচ্ছা আছে, এই মঞ্চের সংগে তাঁরা নাটক এবং অভিনয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পঠন-পাঠন প্রভৃতি চালানোর জন্যে উপযুক্ত কেন্দ্রও স্থাপন করবেন। রংগালয়ের ইতিবৃত্তের প্রদর্শনী, নাট্য পাঠাগার, নাট্য বিদ্যালয়, পরীক্ষামূলক নাট্যাভিনয়মঞ্চ প্রভৃতিও এর অংগীভূত। এই বিরাট পরিকল্পনাকে রূপদানের জন্যে যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন। এবং তারই জন্যে তাঁরা বর্তমানে একটি নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছেন 'রবীন্দ্র সদন' মঞ্চে। আমরা তাঁদের এই শুভ প্রচেষ্টার সর্বাংগীণ সাফল্য কামনা করি।

মারীচ সংবাদ

চেতনা নাট্যসংস্থা কলামন্দিরে ১৬ জানুয়ারী '৭৩ সন্ধ্যা ৬।৩০টায় 'মারীচ সংবাদ' মঞ্চস্থ করবে। রচনা ও নির্দেশনা : অরুণ মুখোপাধ্যায়।

সাংবাদিক সম্মেলনে আলি আকবর খাঁ

পাঁচ মাস আগে ওস্তাদ আলি আকবর খাঁর সঙ্গে সাংবাদিক মহলের সাক্ষাৎ ঘটেছিল পার্ক হোটেলে। তার পাঁচ মাস পরে আবার আমরা তাঁর দেখা পেলাম—বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে সুবিখ্যাত আইনজীবী শ্রীসুব্রত রায়চৌধুরী আহূত সাংবাদিক সম্মেলনে। প্রথমবার তিনি এসেছিলেন অসুস্থ পিতার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার তদারক করতে। আর এবার—

'এবার বেশীর ভাগ সময়ই কাটবে মাইহারে। কারণ আমি এসেছি বাবার সমাধি-মন্দির সম্পূর্ণ করতে'—

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে খাঁ সাহেব এই কথাই জানালেন।

কিন্তু শিল্পরসিকদের হাত থেকে শিল্পী কোনোদিন রেহাই পান না। খাঁ সাহেবও পাননি।

গত ২২শে ডিসেম্বর অরূপ শিল্পী-গোষ্ঠীর অন্যতম কর্মসচিব শ্রীজ্যোতিষ গাংগুলী ও সুব্রত ঘোষের যুগ্ম নেতৃত্বে রবীন্দ্র সদনে ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ সাহেবের একটি একক সরোদ বাদনের আসরের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানের আহৃত অর্থ দুঃস্থ পুলিশ কর্মচারীদের পরিবারবর্গ, বিপ্লবী নিকেতন ও আলি আকবর কলেজ অফ মিউজিকের তহবিলে দেওয়া হয়। উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের হাতে চেক অর্পণ করেন শ্রীসুব্রত রায়চৌধুরী। মানপত্র পাঠ ও প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন শ্রীমতী অরুন্ধতী দেবী এবং অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শংকরপ্রসাদ মিত্র।

সাংবাদিক সম্মেলনে আলি আকবর খাঁ সাহেবকে প্রশ্ন করা হয়—দেশবাসীকে বঞ্চিত করে বিদেশে সংগীত শিক্ষাদানের কারণ কি?

'এদেশে ভারতীয় উচ্চাংগসংগীত শিক্ষা ও প্রচারের জন্য অনেক গুণী শিল্পী ও সংগীতজ্ঞ আছেন। আমার বাবার ইচ্ছে ছিল আমাদের দেবদত্ত সংগীতের নাদ সাগর-পারেও যেন পৌঁছয়। প্রধানতঃ সেইজন্যই আমরা এই কাজে ব্রতী হয়েছি। তাছাড়া অর্থনৈতিক কারণেও এদেশে মনের মত শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়নি। আর ওখানে আলি আকবর কলেজ অফ মিউজিক কলকাতার ঐ নামের শিক্ষায়তনেরই একটি শাখা। যাঁরা শিক্ষায় আছেন—আশিস, সস্ত্রীক শংকর ঘোষ, চিত্রেশ দাস, জাকির হোসেন—এঁরা সবাই বাঙালী এবং ভারতীয়। সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রথায় এবং ভারতীয় শিক্ষার্থীদের মতই গুরুর প্রতি শ্রদ্ধানম্রচিত্তে ওদেশের শিক্ষার্থীরা শিক্ষাগ্রহণ করেন।'

খাঁ সাহেবের সংগীত প্রচারের ব্রত যে ব্যর্থ হয়নি, একাধারে ওদেশের শিক্ষার্থী, সমালোচক ও সাংবাদিকদের দৃষ্টিকোণ প্রত্যক্ষ করলেই সে সত্য স্পষ্ট হয়।

ওদেশের ছাত্র-ছাত্রীদের বাজানো অর্কেস্ট্রার টেপ রেকর্ড সাংবাদিকদের বাজিয়ে শোনান হয়। 'আড়ানা' রাগের ওপর প্রায় আধ ঘণ্টা বাজনা। সেতার, সরোদ, চেলো, গীটার, তবলা আরো নানারকম বাদ্যযন্ত্রে এই রাগভিত্তিক অর্কেস্ট্রা শুনে কে বলবে—এ বাজনা বেজেছে অ-ভারতীয় শিষ্য-শিষ্যাদের হাতে। খাঁ সাহেব এই অর্কেস্ট্রা পার্টির নাম দিয়েছেন 'সেকেন্ড মাইহার ব্যান্ড।'

দি নিউ ইয়র্কের জনৈক সাংবাদিকের সংগে সাক্ষাৎকারে পাশ্চাত্য সংগীতের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা প্রসংগে আলি আকবর বলেন, 'বিটোভেন ও মোজার্ট আমার অতি প্রিয় শিল্পী। এঁদের রচিত সংগীতধারা আমি সরোদে বাজিয়ে থাকি, ওনলি দি মেলডিজ অফ কোর্স। ভায়োলিন এবং চেলো বাজাতেও আমার ভাল লাগে। আমার বাবা যে চাইতেন দেশী-বিদেশী সবরকম উচ্চাংগ-সংগীতই আমি শিখি। তাঁর মত হোলো এই যে পৃথিবীর সকল রকম ক্ল্যাসিক্যাল

তের জ্ঞানই আমার সঙ্গীত-সাধনাকে ন্য করবে।

আমার পরিবারের মানুষ হিসাবে তু আমার আত্মার ও জীবনের পরম । কেন আমি সঙ্গীতকে ভালবাসি তা করে বোঝানো আমার পক্ষে সম্ভব আমার ধর্ম—একে ভাল না বেসে উপায় নেই।'

ীন্দ্র সদনে ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ

২২ ডিসেম্বর। রবীন্দ্র সদনের পূর্ণ গৃহের প্রতিটি শ্রোতা রুদ্ধশ্বাসে ক্ষা করছেন বহুদিন বাদে যন্ত্রসঙ্গীতের প্রখ্যাত শিল্পী ওস্তাদ আলি বের বাজনা শোনার জন্যে। শিল্পী এসে বসতে তাঁদের হর্ষধ্বনি চায় না। অনুষ্ঠান পরিবেশক গাঙ্গুলি জানালেন—সেদিনের সন্ধ্যা গুরু আলাউদ্দিনের প্রতি লিরূপে নিবেদিত হচ্ছে। স্বর্গত শ্রীযুক্তা মদনমঞ্জরী দেবী (৯০ বয়স্কা) ঠিক এই কারণেই উপস্থিত সামনের সারিতে বসা—ছোটখাট মানুষটিকে দেখে অতীতের অনেক মনে পড়ে গেল, মনে পড়ল গুরু জীবনের সুকঠোর সঙ্গীত সাধনার একনিষ্ঠ সঙ্গী ছিলেন ইনি। হয়ত দীর্ঘকাল সংসার সম্বন্ধে চিন্তা- সেই মহাসাধক তাঁর সঙ্গীত- আত্মনিয়োগ করতে পেরেছিলেন।

ও গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনান্তেই আকবর বাজনা সুরু করলেন খাঁ সৃষ্ট 'হেমন্তেশ্বর' রাগ। রাগের অন্তর্নিহিত ভাবগাম্ভীর্য ছাড়ি পরতে না পড়তেই শিল্পীর হয় যন্ত্রের অসামঞ্জস্যতায় সর্বাবিচ্যুতিতে, সর্বোপরি নতুন লাগানো সরোদের অবাধ্যতায়। এত- পারে বাজাবার মেজাজ পাওয়াটা শিল্পীর পক্ষেই অসম্ভব। কিন্তু ওপর অসাধারণ কর্তৃত্ব ও দীর্ঘ সাধনা-লব্ধ শক্তির বলে সব কাটি অনায়াসলব্ধ দক্ষতায় অতিক্রম করে আলি আকবর আবার ফিরে আপন অবিচলিত মানে। লক্ষণীয় এই যে, যন্ত্রের বিরোধিতার কারণে হোক শিল্পী অলংকার, তেহাই তানকে সম্পূর্ণভাবেই এড়িয়ে ছোট্ট তান ও ধ্রুপদী মেজাজের দিয়ে রাগের মর্যাদা-গম্ভীর ছবিটি গেলেন কয়েকটি আঁচড়ের সীমিত । কিন্তু তার মধ্যে থেকে গেল যে বাঞ্জনা তা রসিকচিত্তকে অভিভূত পারে?

ধরলেন 'মাঝ খাম্বাজে'—জ্যোৎস্না- রাতে কাজভোলা মাঝির উদাস ভিজে মাটির গন্ধ সব মিলিয়ে তের মূল রূপটি অনাহত রেখেও ধাঁচে পরিস্ফুট করে অলি তাঁর অতুলনীয় বাদনশৈলীকে স্মরণ দিলেন।

কিন্তু আলি আকবরীয় ভাব ও কল্পনার পূর্ণরূপ পাওয়া গেল দ্বিতীয়ার্ধের দরবারী কানাড়া-র আলাপে। এই রাজকীয় রাগের সংহত বেদনার মর্যাদাব্যঞ্জক ভাবটি ত্রি-সপ্তক মীড়ের একটি অনুরণনেই মূর্ত হয়ে ওঠে। এরপর স্ব-সৃষ্ট একটি রাগের গুরু পিতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হোল। 'সাহানা' ও 'শাশ্বতী'র মিলন-সৃষ্ট এই রাগে ভাব-কারুণ্যের সঙ্গে ছন্দের বিদ্যুৎগতি যুক্ত হয়ে জীবনের বেদনা ও আনন্দভরা পলাতক মুহূর্তের ক্ষণিক মাধুর্যলোকে যেন মনকে পৌঁছে দেয়।

অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয় রসঘন 'পিলু' রাগাশ্রিত ঠুংরি দিয়ে, যেখানে নানারঙা পুষ্পস্তবকের মত আনন্দসুন্দর রাগ-মালা সঙ্গীত লক্ষ্মীর চরণে অর্পণ করলেন তাঁর বরধন্য ভক্ত। আলি আকবরীয় রীতিতেই তাঁর সঙ্গে শীর্ষস্থানীয় তবলিয়ার পরিবর্তে সঙ্গত করেছেন তরুণ এবং উদীয়মান জাকির হোসেন। ইনি সুখ্যাত আল্লারাখার পুত্র। খাঁ সাহেব এঁকে প্রশস্ত অবকাশ দিয়েছেন সকল কলাকৌশলে বিশদ-ভাবে প্রদর্শনের। জাকিরের ঠেকা সুস্পষ্ট সুন্দর, সাথসঙ্গতও আনন্দদায়ক। তবে সওয়াল জবাবে তাঁকে আরো তৈরী হতে হবে। আর একটি কথা—আমোদপ্রিয় অনভিজ্ঞ শ্রোতাদের হাততালি মিললেও এ ধরণের বাজনা অন্তর্মুখী সঙ্গীত-চিন্তার প্রতিকূল। আলি আকবরের মত সিদ্ধযোগী বাজের সঙ্গে এ ঠেকা চলতে পারে এবং তাঁর মত উদার-হৃদয় সকলরকম চাপল্য সস্নেহে মেনে নেবার মত শক্তি রাখে। কিন্তু অন্যান্য শিল্পীদের সঙ্গে সঙ্গত করতে হলে তাঁকে আরো বিবেচক ও সংযত হতে হবে।

নৃত্যনাট্যে আশা পারেখ ও গোপীকিষণঃ সম্প্রতি কলামন্দির আয়োজিত এক নৃত্যনাট্য কোলকাতার কলারসিক মহলে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। নৃত্যনাট্যের বিষয়বস্তু ছিল দক্ষিণ ভারতের এক পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে 'চোলা দেবী'। নাট্যরূপ দিয়েছেন শ্রীকানাই- লাল মুন্সী ও ... নৃত্যরচনাকারী সর্বশ্রী গোপীকিষণ, মারুতী পাণ্ডে, কেদার বাল, প্রমুখ ভারতের প্রায় ১২ জন উচ্চাঙ্গ নৃত্যশিল্পী।

নৃত্যনাট্যের নায়ক নটরাজ গোপীকিষণ, নায়িকা শ্রীমতী আশা পারেখ। জনতার উল্লেখ বাহুল্য। মন্দির প্রাঙ্গণে নৃত্যকুশলা, রূপান্বিতা দেবদাসী চোলার রূপলাবণ্য ও লীলায়িত ছন্দে মুগ্ধ রাজা ও তার পারি-বারিক দ্বন্দ্বের সূত্রেতেই শত্রুআক্রান্ত নগররক্ষার্থে তাঁর যুদ্ধযাত্রা, বিজয়, প্রত্যা-বর্তন ও রাজ্যের কল্যাণার্থে দেবদাসীর আত্মত্যাগ। এই ত্যাগই তাকে দেবীত্বে পৌঁছে দেয়।

কাহিনী রূপায়ণে যেটুকু ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল তার ক্ষতিপূরণ ঘটেছে শ্রীমতী আশা পারেখ, গোপীকিষণ ও অন্যান্য সকলের নৃত্যাভিনয়ে। এঁরা সবাই শুধু নৃত্য-শিল্পীই নন, নৃত্যদক্ষ। ... নৃত্যে রীতিমত সুশিক্ষা ও অনুশীলনের অধি-কারী।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হোল নৃত্যরচনায় কোন মিশ্রন নেই। বিষয়বস্তুর তাগিদানু-সারেই ভারতনাট্যম, কথক, কথাকলি ও লোক-নৃত্যের অবতারণা করা হয়েছে। এবং প্রতিটি নৃত্য তার যথাযথ শুদ্ধতায় পরিবেশিত।

মন্দিরের নৃত্যগুলি আশা পারেখ পরি-বেশন করেছেন ভারতনাট্যম অঙ্গে। রাজার সঙ্গে প্রণয় বিষয়ক কথকে, আবার সমবেত নৃত্যে লোকনৃত্যের ছাঁদে। বর্ণম ও পদমের সঙ্গে তাঁর পুষ্পকলির মত বিকশিত হিল্লোল অনিন্দনীয়। কিন্তু তারচেয়েও ভাল লেগেছে লাস্যবিলসিত কথকের উদ্দামতা। মধুরেভাবের নায়িকা আশা পারেখকে ভোলা যায় না শুধু নৃত্যমুখরতার জন্য নয় অভিনয় কুশলতার কারণেও। প্রেমিক হৃদয়ের উদ্বেলতা জীবন্ত হয়ে উঠেছে গোপী-কিষণের উচ্ছল নৃত্যে। হৃদয়ের চাঞ্চল্য ও বিনম্রতার চিত্তগ্রাহী রূপ তাঁর প্রতিটি ভঙ্গিতে।

পরিচয়-লিপি না থাকায় সকলের নাম জানি না। কিন্তু কাপালিক, রাণী ও খল প্রণয়ীর ভূমিকাকারীদের নৃত্যমান দেখে স্তম্ভিত হয়ে ভেবেছি নৃত্যের ক্ষেত্রে বাংগালী শিল্পীরা আজও কত পিছনে।

সংগীতপরিচালক অবিনাশ যোগী পট-ভূমিকায় চন্দ্রকোষ, নাটভৈরব ও অন্যান্য রাগে রাজসভার দরবারী মেজাজ ও মন্দিরের ভক্তি-ভাবকে উদ্ভাসিত করেছেন। সজ্জা পরি-কল্পনা আরো উন্নতমানের হওয়া উচিত। এই উপভোগ্য সন্ধ্যার জন্য কলামন্দির কর্তৃপক্ষ ধন্যবাদার্হ।

সাংস্কৃতিকী হাওড়াঃ গত ৩ ডিসেম্বর ১৯৭২, সন্ধ্যায় 'সাংস্কৃতিকী হাওড়ার' ১৫তম মাসিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় সংস্থার কার্যালয় ১।১, চৌধুরীপাড়া লেনে। অনুষ্ঠানে 'পুরাতনী গান' পরি-বেশন করেন শিল্পী চণ্ডীদাস মাল। শিল্পী শ্রীমানের গাওয়া 'সে কেনরে করে অপ্রণয়', 'ওমিয়াসে যানেওয়ালে (শোরি মিয়া)' এবং 'কেন কর অভিমান' গানগুলো সত্যই প্রসংশনীয়। সংস্থা এই উপলক্ষে সুন্দর একটি ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করেন।

—চিত্রাঙ্গদা

NATIONAL CRICKET CLUB

BATSMEN	C	B	RUNS
BARRY WOOD		8	1
KEITH FLETCHER	LBW	9	5
D. AMISS	5	9	1
TONY LEWIS	7	9	3
TONY GREIG	LBW	10	67
ALAN KNOTT	6	10	2
MIKE DENNESS	LBW	10	32
PAT POCOCK	9	9	5
DEREK UNDERWOOD	1	9	4
R.COTTAM	LBW	10	13

ENGLAND 2ND INNINGS		
10 FOR		163
R.COTTAM		13
CHRIS OLD		17
EXTRAS		13
INDIA	1ST	210
ENGLAND	1ST	174
INDIA	2ND	155
OVERS		90

Pls	FIELDSMEN	RUNS	Wkts
1	A.WADEKAR		
2	SUNIL GAVASKAR		
3	R.D.PARKAR		
4	G.VISHWANATH		
5	F.M.ENGINEER		
6	SELIM DURANI	14	
7	E.SOLKER		
8	ABID ALI	12	1
9	B.S.BEDI	63	5
10	B.CHANDRASEKHAR	42	4
11	E.A.S.PRASANNA	19	

রঞ্জি স্টেডিয়ামে ভারত বনাম ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় টেস্ট খেলার শেষে স্কোর বোর্ডের অবস্থা

দর্শক

ভারত বনাম ইংল্যাণ্ড

দ্বিতীয় টেস্ট খেলা

কলকাতার ইডেন উদ্যানের রঞ্জি স্টেডিয়ামে ভারত বনাম ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ভারত ২৮ রানে জিতে ইংল্যাণ্ডের অগ্রগতি ধরে ফেলেছে। বর্তমানে দুই দেশেরই একটা করে খেলায় জয়।

বি এস চন্দ্রশেখর

ইংল্যাণ্ড নয়াদিল্লীর প্রথম টেস্টে ৬ উইকেটে জিতে ১—০ খেলায় এগিয়েছিল। এই দুই দেশের ১৯৭২-৭৩ সালের টেস্ট সিরিজের এখনও তিনটে টেস্ট খেলা বাকি।

সদ্য সমাপ্ত ভারত-ইংল্যাণ্ডের এই দ্বিতীয় টেস্ট খেলাটি 'বেদী এবং চন্দ্রশেখরের ম্যাচ' নামে ইংল্যাণ্ড-ভারতের টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ভারতের জয়লাভের ব্যাপারে ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় বেদী এবং চন্দ্রশেখরের ব্যক্তিগত কৃতিত্ব ছিল সব থেকে বেশী। বেদী ৬৮ রানে ৫টি এবং চন্দ্রশেখর ৪২ রানে ৪টি উইকেট পেয়েছিলেন। এই দ্বিতীয় টেস্ট খেলার ৪র্থ দিনে লাঞ্চের ২৬ মিনিট আগে ভারতের ২য় ইনিংস মাত্র ১৫৫ রানের মাথায় শেষ হলে ইংল্যাণ্ডের অনুকূলে খেলার হাওয়া ঘুরে যায়। এই অবস্থায় খেলার বাকি ৫৫৫ মিনিটে জয়লাভের জন্যে যেখানে ইংল্যাণ্ডের ২য় ইনিংসে ১৯২ রানের প্রয়োজন ছিল সেখানে ঐ সময়েরই মধ্যে ভারতবর্ষের জয়লাভের জন্যে প্রয়োজন ছিল ইংল্যাণ্ডের ১০ জন খেলোয়াড়কে আউট করা। অর্থাৎ খেলার এই শেষ পর্যায়ে জয়লাভের ব্যাপারে ইংল্যাণ্ডের ব্যাটসম্যান এবং ভারতের বোলারদের ভূমিকাই ছিল মুখ্য। ইংল্যাণ্ডের ব্যাটসম্যানরা ভারতের বোলারদের তুলনায় তাদের সহজ দায়িত্ব যথাযথ পালন করতে পারেননি। অপরদিকে ভারতের বোলাররা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের ১০টি উইকেট নিয়ে খেলায় জয়লাভের ব্যাপারে বোলারদের ভূমিকার বিরাটত্ব প্রমাণ করে দিয়েছেন। শেষ দু'দিনে নাটকীয়ভাবে খেলার গতি পরিবর্তনের দরুণ ক্রিকেট অনুরাগী মহলে যে উত্তেজনা, উদ্বেগ এবং আনন্দের ঝড় বয়ে গেছে তার বিরল।

চতুর্থ দিনে ইংল্যাণ্ডের ২য় ইনি ১৭ রানের মাথায় তাদের ৪র্থ উই পতনের পর ৫ম উইকেটের জুটি গ্রীগ (৬০ রান) এবং মাইক ডেনেস রান) ৪৮ রান তুলে ইংল্যাণ্ডের অনু খেলার গতি ফিরিয়ে আনেন।

পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে ইংল্যা পূর্ব দিনের অপরাজিত ব্যাটসম্যান এবং ডেনেস যখন ২য় ইনিংসে পুনরায় আরম্ভ করেন, তখন ইংল জয়লাভের জন্য আরও ৮৭ রানের জন ছিল, অপরদিকে ভারতের জয়

বিষেণ সিং বেদী

৫৩ রানে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। তাঁর এই ৫৩ রানে ছিল ৭টা বাউণ্ডারী এবং ১টা ওভার-বাউণ্ডারী। এখানে উল্লেখ্য, ১ম টেস্টে তিনি দলভুক্ত হননি। ইন্দোরে এম সি সি-র বিপক্ষে তিনি নট-আউট ৮১ রান করার সূত্রে কলকাতার দ্বিতীয় টেস্টে দলভুক্ত হন; কিন্তু ২য় টেস্টের ১ম ইনিংসে মাত্র ৪ রান করে দর্শকদের হতাশ করেছিলেন। এখানে আরও উল্লেখ্য, কলকাতার এই ২য় টেস্টের ২য় ইনিংসে তিনি তাঁর ৩৬ রানের মাথায় পোকোকের বল বাউণ্ডারীতে পাঠালে তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে এক হাজার রান পূর্ণ হয়ে ১০০৩ রান দাঁড়ায়।

চতুর্থ দিনে ভারতবর্ষের ২য় ইনিংস মাত্র ১৫৫ রানের মাথায় শেষ হয়। এই দিন তারা ৯৪ মিনিট খেলে ২য় ইনিংসের বাকি ৬টা উইকেটে মাত্র ৩৪ রান যোগ করেছিল। ভারতবর্ষের ২য় ইনিংস ৩২৮ মিনিট স্থায়ী ছিল।

বাকি ৫৫৫ মিনিটের খেলায় জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৯২ রান তুলতে ইংল্যাণ্ড ২য় ইনিংস খেলতে নামে এবং ৪র্থ দিনেই ৪ উইকেটের বিনিময়ে ১০৫ রান তুলে নেয়। ইংল্যাণ্ডের ২য় ইনিংসের খেলার ভিত খুবই আলগা হয়েছিল। মাত্র ১৭ রানের মাথায় তাদের ৪র্থ উইকেট পড়ে যায়। বেদী ৩৮ রানে ৩টে এবং আবিদ আলি ১২ রানে ১টা উইকেট পান। খেলার এক সময় বেদীর বোলিং পরিসংখ্যান ছিল : ওভার ৬-৭, মেডেন ৪, রান ৭ এবং উইকেট ৩। চতুর্থ দিনের খেলার শেষে হিসাব নিয়ে দেখা গেল, খেলায় জয়লাভ করতে ইংল্যাণ্ডের আর মাত্র ৮৭ রান দরকার। তাদের হাতে তখনও ৬টা উইকেট এবং একদিনের খেলার সময় জমা আছে।

পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে লাঞ্চের ৬ মিনিট পর ইংল্যাণ্ডের ২য় ইনিংস ১৬৩ রানের মাথায় শেষ হলে ভারতবর্ষ ২৮ রানে জিতে যায়। ইংল্যাণ্ড জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৯২ রানের থেকে ২৯ রান কম সংগ্রহ করেছিল। পঞ্চম দিনে খেলা আরম্ভের সময় তাদের জয়লাভের জন্যে যেখানে ৮৭ রানের প্রয়োজন ছিল, সেখানে তারা বাকি ৬টা উইকেটের বিনিময়ে ৫৮ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারতবর্ষ : ২১০ রান (ওয়াদেকার ৪৪ এবং ইঞ্জিনীয়ার ৭৫ রান। কোট্রাম ৪৫ রানে ৩, ওল্ড ৭২ রানে ২ এবং আণ্ডারউড ৪৩ রানে ২ উইকেট)

ও ১৫৫ রান (দুরানী ৫৩ রান। ওল্ড ৪৩ রানে ৪ এবং গ্রিগ ২৪ রানে ৩ উইকেট)

ইংল্যাণ্ড : ১৭৪ রান (নট ৩৫ এবং গ্রিগ নট আউট ৩৩। চন্দ্রশেখর ৬৫ রানে ৫, প্রসন্ন ৩৩ রানে ৩ এবং বেদী ৫৯ রানে ২ উইকেট)

ও ১৬৩ রান (গ্রিগ ৬৭ এবং ডেনেস ৩২ রান। বেদী ৬৩ রানে ৫ এবং চন্দ্রশেখর ৪২ রানে ৪ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া বনাম পাকিস্থান

প্রথম টেস্ট খেলা

এডিলেডে অস্ট্রেলিয়া বনাম পাকিস্তানের প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলায় অস্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ১১৪ রানে জয়ী হয়েছে।

প্রথম দিনে পাকিস্তান ১ম ইনিংসের ৭ উইকেট খুইয়ে ২৫৫ রান সংগ্রহ করেছিল। ৭ম উইকেটের জুটিতে অধিনায়ক ইন্তিখাব আলম এবং উইকেট-রক্ষক ওয়াসিম বারি দলের ১০৪ রান তুলেছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে পাকিস্তানের ১ম ইনিংস ২৫৭ রানের মাথায় শেষ হলে খেলার বাকি সময়ে অস্ট্রেলিয়া ১ম ইনিংসের ৪ উইকেট খুইয়ে ৩৬৩ রান সংগ্রহ করে ১০৬ রানে এগিয়ে যায়। অস্ট্রেলিয়ার আয়ান চ্যাপেল যে ১৯৬ রান করেন তা তাঁর টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনে এক ইনিংসের খেলায় সর্বোচ্চ রান। এই নিয়ে তিনি টেস্ট খেলায় ৮টি সেঞ্চুরী করলেন।

তৃতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংস ৫৮৫ রানের মাথায় শেষ হলে তারা পাকিস্তানের ১ম ইনিংসের ২৫৭ রানের থেকে ৩২৮ রানে এগিয়ে যায়। এই দিন অস্ট্রেলিয়া তাদের ১ম ইনিংসের বাকি ৬টা উইকেটের বিনিময়ে ২২২ রান যোগ করেছিল। অস্ট্রেলিয়ার উইকেটকিপার রডনি মার্শ ১১৮ রান করেন। এখানে উল্লেখ্য, টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে অস্ট্রেলিয়ার উইকেটকিপারের পক্ষে সেঞ্চুরী করার নজির প্রথম।

তৃতীয় দিনের বাকি সময়ে পাকিস্তান ২য় ইনিংসের ৩টি উইকেট খুইয়ে ১১১ রান সংগ্রহ করেছিল।

চতুর্থ দিনে পাকিস্তানের ২য় ইনিংসের রান দাঁড়ায় ২১৮ (৯ উইকেটে)। এইদিন তারা ৬ উইকেটের বিনিময়ে ... দিনের ১১১ রানের (৩ উইকেটে) ... ১০৭ রান যোগ করেছিল।

পঞ্চম দিনে পাকিস্তানের ২য় ইনিংস ২১৪ রানের মাথায় অর্থাৎ ... রান-সংখ্যার মাথায় শেষ হলে অস্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ১১৪ রানে জিতে যায়। ... দিনে মাত্র ৯ মিনিট খেলা হয়েছিল।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পাকিস্তান : ২৫৫ রান (ইন্তিখাব ... নট আউট ৬৪ এবং ওয়াসিম বারি ... রান। ম্যাসী ৬৯ রানে ৪ উইকেট)

ও ২১৪ রান (সাদিক মহম্মদ ৮১ ... ম্যালেট ৫৯ রানে ৪ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া : ৫৮৫ রান (আয়ান ১৯৬, রডনি মার্শ ১১৮ এবং এডওয়ার্ডস ৮৯ রান। মুস্তাক ... ৬৭ রানে ৩ উইকেট)

দ্বিতীয় টেস্ট খেলা

মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়া বনাম পাকিস্তানের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া ৯২ রানে জয়ী হয়ে পাকিস্তানের বিপক্ষে ১৯৭২-৭৩ সালের টেস্ট সিরিজে ... জয়ী হয়েছে। এডিলেডের প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়া ১১৪ রানে জয়ী হয়েছিল। তাদের ১৯৭২-৭৩ সালের টেস্ট সিরিজে আর একটা খেলা বাকি।

খেলার পঞ্চম দিনে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস ৪২৫ রানের মাথায় ... হলে পাকিস্তান জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২৯৩ রান তুলতে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে। তাদের হাতে খেলার সময় ৩২৫ মিনিট। পাকিস্তানের ২য় ইনিংস ২০০ রানের মাথায় শেষ হলে অস্ট্রেলিয়া ৯২ রানে জিতে যায়।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণি-অর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫.০০	টাকা ৩০.০০
ষাণ্মাষিক	টাকা ১২.৫০	টাকা ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬.২৫	টাকা ৮.০০

বিঃ দ্রঃ—উৎপাদন শুল্কের হার
(চাঁদার সহিত অবশ্য প্রেরণীয়)

বার্ষিক	টাকা ১.০২
ষাণ্মাষিক	টাকা ০.৫২
ত্রৈমাসিক	টাকা ০.২৬

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১২শ বর্ষ
৩য় খণ্ড

৩৭ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক—২ পয়সা
মোট—৫২ পয়সা

Friday, 19th January, 1973 শুক্রবার, ৫ মাঘ, ১৩৭৯ **.52 Paise**

'এক নজরে'

প্রেমিক সৈনিক :

তুষারাচ্ছন্ন প্রান্তরের নীচে হিমশীতল পরিখার অভ্যন্তরে যে দুর্ধর্ষ সৈনিক ক্লান্ত বিষণ্ণ মুহূর্তে প্রেয়সী জীবনসঙ্গিনীর প্রেমসুন্দর মুখখানি কল্পনা করে উদ্দীপ্ত হতে পারে, রণে প্রেমে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সেই ব্যক্তি যে অসাধারণ তাতে সন্দেহ কি? আর অসাধারণ বলেই না স্যার উইনস্টন চার্চিল ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় পুরুষ! সম্প্রতি লন্ডনের 'টাইমস' পত্রিকায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম নায়ক, বৃটেনের তিমির রাত্রির অতন্দ্র প্রহরী উইনস্টন চার্চিলের প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে ফ্রান্সের রণক্ষেত্রের এক পরিখা থেকে পত্নী শ্রীমতী ক্লেমেণ্টাইনকে লেখা যে পত্র ক'খানি প্রকাশিত হয়েছে তাতে ঐ যোদ্ধা রাষ্ট্রনায়কের চরিত্রের আর একটি দিক উদ্ভাসিত করেছে।

যুদ্ধের তখন এক ভাঁটার সময়। শীতার্ত ফ্রান্সের এক অজ্ঞাত প্রান্তরে কর্দমাক্ত পরিখার অভ্যন্তরে শত্রুর প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করছেন তরুণ সৈনিক উইনস্টন চার্চিল। নজর শত্রুর আশঙ্কিত আগমনের পথের দিকে নিবদ্ধ থাকলেও মন পড়ে আছে প্রিয়তমা অর্ধাঙ্গিনী ক্লেমেণ্টাইনের কাছে। তিনি লিখছেন : প্রিয়তমাসু, নারীর হৃদয় যে কত কোমল ও প্রেমময় হতে পারে তা তোমার সংস্পর্শে এসেই জেনেছি। তুমি আমাকে ভালবাসতে শিখিয়েছ, তাই আজ এত সুখী আমি।

প্রেমিক সৈনিক অকপটে জানাচ্ছেন : প্রতি রাতে তোমার ছবি আমি চুম্বন করি, আর প্রাণাধিকাসু, তার পরেই ভাবি যদি তুমি কাছে থাকতে তবে চুমোয় চুমোয় তোমার মিষ্টি মুখখানি ভরিয়ে দিতাম।

অভিযোগও আছে অনেক চিঠিতে, সে অভিযোগ ভুলে থাকার, চিঠি না দেওয়ার। অভিমানক্ষুব্ধ প্রেমিক সৈনিকের জিজ্ঞাসা—পরিখায় বন্দী স্বামীকে রোজ শত শত চিঠি না লিখে তুমি কেমন করে থাকতে পারো? তারই মধ্যে, ১৯১৬ সালের মার্চ মাসে ক্লেমেণ্টাইন (দয়াবতী) যখন লিখলেন—সময় চলে যায় আর প্রেমের সবটুকু চুরি হয়ে যায় সেই সঙ্গে, পড়ে থাকে শুধু বন্ধুত্ব—তখন অভিমানাহত স্বামীর সে কী আর্ত প্রতিবাদ : ওগো প্রিয়তমা, তুমি বন্ধুত্বের কথা লিখোনা, আমি তোমার 'বন্ধুত্ব' চাই না। তুমি সম্পূর্ণরূপে শুধু আমার। তোমার আমার প্রেম সময় চুরি করে নিয়ে যেতে পারবে না। যতদিন যাবে সে প্রেম ততই হবে গভীর ও ঘনীভূত।

পরিণত বয়সে, পূর্ণ মর্যাদায় স্যার উইনস্টন চার্চিল ১৯৬৫ সালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কিন্তু সেই ইতিহাস-পুরুষের স্মৃতিতে বিভোর হয়ে তাঁর প্রিয়তমা ক্লেমি—লেডি স্পেন্সার চার্চিল আজও জীবিত আছেন। তাঁরই অনুমোদনক্রমে 'টাইমস' পত্রিকায় চার্চিলের পত্রগুচ্ছটি প্রকাশিত হয়।

করুণাময়ী :

মৃত সন্তান যীশুর ক্লান্ত এলায়িত দেহ কোলে নিয়ে সাশ্রু নয়নে, নতনম্র মুখে বসে আছেন করুণাময়ী জননী মেরী।—ভ্যাটিকান প্রাসাদে সংরক্ষিত মাইকেল এঞ্জেলোর সেই অমর সৃষ্টি 'পিয়েতা' কিছুদিন আগে এক উন্মাদের কঠিন আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ভেঙে পড়েছিল। সে উন্মাদের ধারণা ছিল সেই যীশু, সুতরাং করুণাময়ী (পিয়েতা) জননীর কোলে স্থানলাভের অধিকার তারই। তাই সে অভিমানক্ষুব্ধ হয়ে এমন আঘাত হেনেছিল যাকে যে বিশ্ববন্দিত ঐ মূর্তিটি হয়ত চিরকালের জন্য মানবজাতির রত্নভাণ্ডার থেকে অপসৃত হল বলে আশংকা হয়েছিল সেদিন।

কিন্তু কদিন আগে ভ্যাটিকান প্রাসাদ থেকে এক সুসমাচার প্রচারিত হয়েছে। সংবাদ শুনে মনে হচ্ছে, ঐ উন্মাদটি বোধহয় ভাল কাজই করেছিল সেদিন। ভ্যাটিকান প্রাসাদের সংরক্ষক জানিয়েছেন, মূর্তিটি শুধু যে ত্রুটিহীনভাবে সারানো হয়েছে তাই নয়, কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানে মূর্তিটির আরও যেসব ত্রুটিবিচ্যুতি প্রকট হয়ে উঠেছিল সেগুলিও এবার ভাল করে সংশোধিত করা হয়েছে। ফলে মূর্তিটি যাঁরা আগে দেখেছেন তাঁদের পরিমার্জিত মূর্তিটি বোধহয় আরও ভাল লাগবে এবং যাঁরা দেখেননি তাঁদের শাশ্বত ভাস্করের শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টি প্রথম দর্শনের মুগ্ধ চমক হয়ত আরও বেশি হবে। তবে ভবিষ্যতে আবার যাতে কোন অঘটন ঘটতে না পারে তার জন্য এবার উনিশ মিলিমিটার পুরু বুলেট-অভেদ্য কাঁচের আড়ালে মূর্তিটিকে রাখা হবে।

আবার মৃত্যুদন্ড : জীবনের বদলে জীবন—এই পুরানো তত্ত্ব অত্যন্ত প্রতিশোধাত্মক ও অমানবিক বিবেচিত হওয়ায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নিছক হত্যাকান্ডের জন্য মৃত্যুদন্ড ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছিল। কিন্তু সভ্যতা ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপরাধেরও চরিত্র বদল হতে থাকায় মৃত্যুদন্ড সম্পূর্ণ লোপ সম্ভব কিনা— এ নিয়ে মত বিরোধ ঘটে সমাজতাত্ত্বিক মহলে। এমন অনেক অপরাধ ইদানিং প্রায়ই ঘটছে যা সাধারণ হত্যাকান্ডের চেয়ে অনেক বেশি ভয়ংকর ও গুরুত্বপূর্ণ, এবং যাকে কোনমতেই ক্ষমা করা যায় না। এইসব অপরাধের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হল বিমান ছিনতাই। মুখ্যত রাজনৈতিক কারণে যারা বিমান ছেনতাই-র মতো ভয়ংকর কাজে লিপ্ত হয় তারা অবশ্য প্রাণের মায়া না রেখেই সে কাজ করে। কিন্তু যদি মৃত্যুদন্ড রদের ঢালাও বিধানের মধ্যে বিমান ছিনতাইকারীদের অপরাধকেও গণনা করা হয় তাহলে বিমান-পথে চলাচল অসম্ভব হয়ে পড়বে, যা এখনই প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এই কারণে সোভিয়েট ইউনিয়নে সম্প্রতি বিমান ছিনতাইকে মৃত্যুদন্ডযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করার কথা সরকারিভাবে চিন্তা করা হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট গত জুন মাসে মৃত্যুদন্ডকে সংবিধান-বিরোধী বলে ঘোষণা করে। তারপর বিভিন্ন জেলে আটক মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত তিন শতাধিক ব্যক্তির দন্ডদান স্থগিত রাখা হয়। কিন্তু গত নভেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় কালিফোর্ণিয়া প্রমুখ কয়েকটি রাজ্যে মৃত্যুদন্ড সম্পর্কে জনমত গ্রহণের ব্যবস্থা করা হলে দেখা যায় যে, সাধারণ মানুষের বেশিভাগই এখনও মৃত্যুদন্ড বহাল রাখার পক্ষে। যুক্তরাষ্ট্রের এটর্নি জেনারেল কদিন আগে ঘোষণা করেছেন, মানুষ অপহরণ, সরকারি ভবনে বোমা নিক্ষেপ, বিমানছিনতাই ও কারারক্ষী হত্যাকে মৃত্যুদন্ডযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করে শীঘ্রই যুক্তরাষ্ট্রে একটি আইন প্রণীত হবে।

—প্রত্যক্ষদর্শী

বিজ্ঞান গবেষণায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গি

বিজ্ঞানের অসামান্য অগ্রগতি সমাজজীবনে বৈপ্লবিক রূপান্তরের সূচনা করেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রযুক্তিবিদ্যার সার্থক প্রয়োগ বহুযুগের পশ্চাদগামিতা দূর করে বিজ্ঞানের আশীর্বাদ এনে দিয়েছে। পশ্চিমী জগতে বিজ্ঞানীরা নিতানতুন জিনিস আবিষ্কার করে জনকল্যাণের জন্য তার প্রয়োগ করছেন। তার খানিকটা সুফল অনুন্নত দেশগুলোতেও পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু অপরের মুখাপেক্ষী হয়ে না থেকে নিজস্ব পরিবেশে প্রত্যেক দেশের বিজ্ঞানীরা যদি তাঁদের গবেষণার ফল দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতে পারেন তাহলে সামাজিক অগ্রগতির পথ সুগম হয়।

আমাদের দেশে আধুনিক বিজ্ঞান চর্চা নিতান্ত কম দিনের নয়। আমাদের বিজ্ঞানীরা পরাধীনতার যুগেও স্বীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন নানাক্ষেত্রে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডাঃ মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ডাঃ চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরামণ, ডাঃ হোমি ভাবা, বিক্রম সরাভাই, প্রশান্ত মহলানবিশ প্রমুখ বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষণা দুনিয়ার বিজ্ঞানীসভায় মহৎ স্বীকৃতি লাভ করেছে। আমাদের দেশ দারিদ্র। তার প্রয়োজন যতটা আর্থিক সাধ্য তার চেয়ে কম। তার ফলে বিজ্ঞান গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ আমরা ব্যয় করতে পারি না। জওহরলাল নেহরুর সময়ে বিজ্ঞান গবেষণার জন্য সরকার অগ্রণী হয়ে দেশের নানা জায়গায় বিজ্ঞান গবেষণাগার গড়ে তোলেন। সি এস আই আর এ-র মারফৎ তরুণ বিজ্ঞানীদের উৎসাহ দেওয়া হতে থাকে নিতানতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও তার প্রয়োগের জন্য। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় অর্থব্যয় করতে না পারায় বিজ্ঞান গবেষণায় যথেষ্ট অগ্রগতি এখনও হয়নি। অনেক তরুণ বিজ্ঞানকর্মী স্বদেশে ভাল সুযোগ না পেয়ে বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন। বিদেশে যাঁরা গবেষণারত তাঁদের আমরা স্বদেশে আনতে পারছি না। অবশ্য জয়ন্তবিষ্ণু নারলিকারের মতো খ্যাতনামা তরুণ বিজ্ঞানী স্বদেশ সেবার জন্য ভারতে ফিরে এসেছেন, এটা খুবই আশার কথা। এঁদের মতো বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে দেশ অনেক আশা করে। তাঁদের কাজের জন্য চাই অবাধ সুযোগ এবং প্রয়োজনীয় অর্থ।

কেন্দ্রীয় সরকার পঞ্চম যোজনায় বিজ্ঞান গবেষণার জন্য জাতীয় আয়ের অন্তত এক-শতাংশ ব্যয়ের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা খুবই সময়োপযোগী এবং আশাব্যঞ্জক। এতকাল সরকারী ভাণ্ডার থেকেই বিজ্ঞান গবেষণার জন্য ব্যয় করা হত। বেসরকারী সংস্থার ব্যয় ছিল সামান্য। বিজ্ঞান বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীসি সুব্রমণ্যম জানিয়েছেন, পঞ্চম যোজনায় বিজ্ঞান গবেষণার জন্য বড় বড় ব্যবসায় সংস্থাগুলোর উপর গবেষণা ও উন্নয়ন কর বসাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী সমস্ত বৃহৎ ব্যবসার সংস্থাগুলোকেই এই উন্নয়ন কর দিতে হবে। এতে সরকারী রাজস্ব বাড়বে আনুমানিক তিনশো কোটি টাকা। এই অর্থ একটি কেন্দ্রীয় ভাণ্ডারে জমা হবে। যে সমস্ত কোম্পানির গবেষণা ও উন্নয়নকর্ম সরকার কর্তৃক অনুমোদিত তারা এই অর্থের ভাগ পাবেন তাঁদের কাজ চালিয়ে যাবার জন্য। শিল্পোন্নয়ন ও বৈজ্ঞানিক প্রয়োগনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় আয়ের এই অর্থ ব্যয় করা হবে। সমাজের প্রয়োজনের দিকে নজর রেখে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগই হবে কাম্য। ভারতবর্ষের সমাজের উপযোগী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনাকে যুগোপযোগী তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতে পারে। এ সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের সচেতন থাকতে হবে।

বাস্তব অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হলে গবেষণা হবে অর্থহীন। আমাদের শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গির বৈপ্লবিক পরিবর্তন ছাড়া বৈজ্ঞানিক প্রতিভাকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো যাবে না। সম্প্রতি চণ্ডীগড়ে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি ডাঃ এস ভগবন্তম দুঃখ করে বলেছেন যে, উদ্বোধনের দিনে চার হাজার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকলেও পরে মাত্র ১৫০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার সময়। বিজ্ঞান কংগ্রেসকে যদি নিছক মেলার মতো ব্যবহার করা হয় এবং প্রতিনিধিরা একে বেড়াবার সুযোগ হিসাবে গণ্য করেন তাহলে দেশবাসী এ ধরনের সম্মেলন থেকে কী আশা করতে পারে। আরও আক্ষেপের বিষয় এই যে, সম্মেলনে যে-সমস্ত গবেষণাপত্র পড়া হয়েছিল তার অধিকাংশই ছিল নিচু মানের এবং দেশের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য। বিজ্ঞানীদের কাছে দেশের মানুষের প্রত্যাশার অন্ত নেই। পশ্চিমী দুনিয়ার বিজ্ঞানীদের মতো মৌলিক বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারের প্রত্যাশা আমাদের বিজ্ঞানীদের কাছে নিশ্চয়ই দেশবাসী করতে পারে। তা ছাড়াও বিজ্ঞানের প্রয়োগ কীভাবে সমাজ উন্নয়নে ও দারিদ্র্য দূরীকরণে করা যায় তার নির্দেশ দেশবাসী চায় বিজ্ঞানীদের কাছে। কেতাবী বিদ্যা বা গবেষণার চেয়ে ফলিত বিজ্ঞানের গবেষণাই আমাদের দেশে বেশি জরুরি। সবেমাত্র বৃহৎ শিল্পযুগে আমরা পা দিতে যাচ্ছি। কোথায় কোন শিল্পের সম্ভাবনা বেশি সে তথ্য আমরা চাই বিজ্ঞানীদের কাছে। যন্ত্রের পাশাপাশি জনবল কীভাবে ব্যবহার করা যায় তাও বিজ্ঞানীরা আমাদের বলে দিতে পারেন। কারণ পশ্চিমী দেশগুলোর মতো স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক উৎপাদনের চেয়ে আমাদের জনশক্তিকে কাজে লাগানো সামাজিক অবস্থা বিচারে খুবই প্রয়োজন।

বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় আমাদের নিজস্বতা বিকাশের সময় এসেছে। পাশ্চাত্য দেশ থেকে ধার-করে-আনা যান্ত্রিক বা কারিগরীজ্ঞান দিয়ে দীর্ঘদিন আমাদের কাজ চলতে পারে না। প্রযুক্তিবিদ্যায় ভারতকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে যাতে আমাদের সামাজিক বাস্তবতা ও প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তা আমরা প্রয়োগ করতে পারি সামাজিক কল্যাণে। এই দৃষ্টিভঙ্গিই আজ কাম্য।

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ তিরোভাব মহোৎসব উপলক্ষে পত্রিকা ভবনে আয়োজিত বৈষ্ণব সম্মেলন ও স্মৃতিসভায় (ডান-দিক থেকে) উদ্বোধক প্রভুপাদ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, কবি পান্না মাইতি, সভাপতি ডঃ কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী, প্রধান অতিথি ডঃ রমা চৌধুরী ও শ্রীতুষারকান্তি ঘোষকে দেখা যাচ্ছে।

দেশ বিদেশ

মহারাষ্ট্রের মারাঠাওয়াড়া অঞ্চলে ১৯৬৯ সালে খুব ভাল ফসল হয়েছিল। ভারতের ফুড কর্পোরেশন আশা করেছিলেন, সে বছর ঐ অঞ্চল থেকে দু লাখ টন খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে পারবেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা সেখান থেকে যে খাদ্যশস্য পেয়েছিলেন তার পরিমাণ আট লাখ টন, অর্থাৎ প্রত্যাশার চারগুণ।

আশ্চর্যের কিছু নেই যে, মনমাদ শহরে ফুড কর্পোরেশন তৈরি করেছিলেন সারা ভারতবর্ষের মধ্যে তাঁদের বৃহত্তম গুদাম।

আজ যদি কেউ সেই মনমাদ শহরে যান তাহলে তিনি কি দেখতে পাবেন! সন্দেহ নেই, তিনি দেখতে পাবেন একটা ভয়ংকর আকালের ছায়া। মনমাদের সেই গুদামে আজ কি পরিমাণ খাদ্যশস্যের সঞ্চয় রয়েছে তা জানা নেই, তবে মাত্র তিন বছর আগে যেখানকার মানুষ মাঠভরা ফসলের হাসি দেখেছিলেন সেখানে আজ অন্নের জন্য হাহাকার উঠেছে। কোথাও দু'বছর, কোথাও তিন বছর আকাশে বৃষ্টি নেই, মাটিতে রস নেই, গ্রামের মানুষের ঘরে খাবার নেই, কাজ নেই, পানীয় জল নেই হাজার হাজার গরু জল ও খাবারে সন্ধানে অসহায়ভাবে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে।, কাজের খাদ্যের সন্ধানে শহরে চলে আসছে গ্রামের মানুষ।

শুধু মহারাষ্ট্রই নয়, গুজরাট রাজস্থান, মহীশূর প্রভৃতি রাজ্যেও অন্নে জন্য এই হাহাকার উঠেছে। সরকারিভাবে কোথাও 'দুর্ভিক্ষ' কথাটা যদিও

রা হচ্ছে না তাহলেও অবস্থাটা যে খুবই ঠিন সেটা অস্বীকার করা হচ্ছে না।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এক ক্ষকালের মধ্যে সাতটি রাজ্যে ঝটিকা ফর করে এই ভয়ংকর আকালের চিত্র খে এসেছেন। সফর থেকে ফিরে এসে পালিশ বেতারের প্রতিনিধির সঙ্গে এক ক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, দেশের দুই-তীয়াংশ জুড়ে খরার প্রকোপ চলছে। তিনি হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন যে, সামনে বই দুর্দিন আসছে। এবারকার খরার শকার হয়েছে গোটা এশিয়া। তাই অন্য দশ থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা ভারতের ক্ষে কঠিন হচ্ছে—একথা শ্রীমতী গান্ধী নে করিয়ে দিয়েছেন।

মহারাষ্ট্রের প্রায় দুই কোটি মানুষ এই রোর কবলে পড়েছেন বলে প্রকাশ। কারও রও মতে স্মরণকালের মধ্যে মহারাষ্ট্রে তে ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ আর দেখা যায় নি। সরকারি হিসাবে, রাজ্যের ২৬টি জেলার ধ্যে ২১টি অর্থাৎ ৩৫,৬০০ গ্রামের মধ্যে ২৭০০০ গ্রামে 'দারুণ অন্নকষ্ট' দেখা দিয়েছে।

মহারাষ্ট্রের যেসব জেলা আকালের শিকার হয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম হল আমেদনগর। কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী আন্নাসাহেব সিন্ধে এই আমেদনগরের অধিবাসী। তিনি যখন সারা দেশের মানুষকে এই বলে অভয় দিচ্ছেন যে, যথেষ্ট খাদ্যশস্য আছে, বিদেশ থেকে আরও আনানো হচ্ছে এবং রবি ফসলের সম্ভাবনাও খুব উজ্জ্বল তখন তাঁর নিজের জেলার সাতটি তালুকের মানুষ অন্নকষ্ঠে পীড়িত হচ্ছেন—এটা ঘটনার পরিহাস।

ওসমানবাদ জেলার ২৮ বছর বয়স্ক তরুণ কেশবরাও সিন্ধে এখন বোম্বাইয়ের এক বস্তির বাসিন্দা। শহরের নরিম্যান পয়েণ্টে তিনি ইমারতি মালমশলা নামান-ওঠানর কাজ করছেন। অথচ, সম্পন্ন চাষী বলতে যা বোঝায় কেশবরাও তাই। কেননা, গ্রামে তাঁর জমির পরিমাণ ১৫০ বিঘা।

৬০ একর জমির মালিক অমরচাঁদ সানাপের তিনটে কুয়োর (তার মধ্যে দুটিতে বৈদ্যুতিক মোটর লাগান আছে) কোনটিতেই এক ফোঁটা জল নেই। এখন তাঁর পরিবারের ১৯ জনের মধ্যে ছয়জন সরকারি ত্রাণ প্রকল্পে পাথর ভাঙার কাজ করছেন।

দুর্ভিক্ষপীড়িতদের জন্য মহারাষ্ট্র সরকার যেসব ত্রাণ প্রকল্প চালু করেছেন সেগুলির মধ্যে প্রধান হল এই পাথর ভাঙার কাজ।

একজন সাংবাদিক মহারাষ্ট্রের দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলগুলিতে সফর করে এসে তাঁর রিপোর্টের এক জায়গায় লিখেছেন, 'পাথর ভাঙার কেন্দ্রগুলিতে আমরা যা দেখে এসেছি সেটাই এই সফরের সবচেয়ে বেদনাময় স্মৃতি। দুর্ভিক্ষপীড়িত-দের কাজ পাওয়ার প্রধান সূত্র হল এই পাথর ভাঙার কেন্দ্রগুলি। জেলায় জেলায় জিপ গাড়িতে ঘুরে বেড়িয়ে আমরা এই ধরনের অসংখ্য কেন্দ্র দেখেছি। ......মাদিতে ঢালু পাহাড়ের গায়ে দু মাইল জুড়ে রয়েছে পাথরকুচির চৌকাগুলি। ১৩৫০ জন চাষী চার মাস ধরে পরিশ্রম করে এই চৌকাগুলি তৈরি করেছেন। হাতুড়ির এলোপাথাড়ি ঠুকঠাক আওয়াজে এখানকার স্থির বাতাস চঞ্চল হয়ে উঠছে। ...যেসব বুড়ো মানুষের ছেলেদের হাল ধরার আর তাঁদের নিজেদের গল্পগুজব করে সময় কাটাবার কথা তাঁরা পাথর ভাঙছেন, যদিও কাঁধের উপর হাতুড়ি তোলার মত শক্তি তাঁদের নেই। ৭০ পার হয়ে যাওয়া এক বুড়ি দানবের মত ফুঁসতে ফুঁসতে হাতুড়ি ঠুকছেন। আর একজনের কাছে গেলে তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলছেন 'দিনে আমি এক টাকার বেশি কামাতে পারছি না। সেই টাকাও আমি গত তিন সপ্তাহ যাবৎ পাই নি। এই করতেই কি আমার জন্ম হয়েছিল?'

আলোক চিত্র : বিশ্বনাথ ঘোষ

ঐ সাংবাদিক আরও লিখেছেন, 'সানতানাতে...পাঁচশ মানুষ কাজ করছেন। ...হলিউডে রোমান যুগের যেসব ছবি তোলা হয় সেগুলির দৃশ্য যেন চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। এই দৃশ্যের সঙ্গে রোমান প্রভুদের জন্য কর্মরত দাসদের দৃশ্যের লক্ষণীয় সাদৃশ্য রয়েছে।'

পাথরভাঙার মত নিরর্থক কাজ না করিয়ে যেসব ছোটখাট ধরনের সেচের কাজ করালে স্থায়ী উপকার হতে পারে তা করান হচ্ছে না কেন, এই প্রশ্নের উত্তরে জেলা কর্তৃপক্ষরা বলছেন, ঐ ধরনের কাজ করাবার জন্য যন্ত্রপাতি, ও কারিগরি শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের অভাব রয়েছে।

অবশ্য পাথরভাঙা ছাড়া অন্য ধরনের কাজও যে হচ্ছে না তা নয়। যেমন আওরঙ্গাবাদ জেলায় ত্রাণ প্রকল্পে ৩৬৫০ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করান হয়েছে।

কিন্তু সপ্তাহের পর সপ্তাহ কর্মহীন, জীবিকাহীন মানুষকে কাজ ও খাদ্য যোগাবার সমস্যা বেড়েই চলেছে। দুর্গত মানুষের চাহিদা যে হারে বাড়ছে, সেই হারে কর্মসংস্থান করতে গিয়ে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জেলার কর্তৃপক্ষ হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন। আওরঙ্গাবাদ জেলায় ১৯৮১ সাল পর্যন্ত রাস্তা তৈরির যে প্রোগ্রাম ছিল সেই প্রোগ্রাম সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। অথচ কাজের চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে ত্রাণ প্রকল্পগুলিতে কাজ করছিলেন ১,৭৬,০০০ মানুষ। জানুয়ারি মাসের গোড়ায় সেই সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেছে। আর, ফেব্রুয়ারিতে পাঁচ লাখ গ্রামবাসীর কাজ যোগাতে হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলগুলিতে অনেক ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলা হয়েছে: কিন্তু সেগুলিতে খাদ্যশস্যের যোগান খুবই অনিয়মিত। ফলে দুর্গত মানুষে বেসরকারি মুনাফাখোর খাদ্যব্যবসায়ীদের শিকার হচ্ছেন।

আর একটি বড় ভাবনা গরুর ভাবনা। গরু যেভাবে নষ্ট হচ্ছে তাতে এর পর যদি বৃষ্টি নামেও তাহলেও গরুর অভাবেই চাষ মার খাবে।

* * *

বিলাতের টাইমস পত্রিকায় লুই হেরেন সম্প্রতি লিখেছেন, 'মিঃ লে ডুক থো প্যারিসে যা করতে চাইছেন সেটা ভিয়েতনামে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আলোচনার অতিরিক্ত একটা কিছু হতে পারে। মনে হচ্ছে, তিনি ও তাঁর সরকার যেমন ১৯৬৮ সালে প্রেসিডেণ্ট জনসনকে পথে বসিয়েছিলেন সেভাবে তাঁরা যেন প্রেসিডেণ্ট নিকসনকেও খতম করতে চাইছেন।'

লুই হেরেন আরও লিখেছেন, 'ফরাসীরা প্যারিসেই পরাজিত হয়েছিল দিয়েনবিয়েন ফুতে নয়। আর সেই ঘটনায় ফ্রান্সের ইতিহাসই বদলে গিয়েছিল।...... আর একদফা প্রচন্ড বোমাবর্ষণের ঝুঁকি নিয়েও উত্তর ভিয়েতনামীরা যেভাবে প্রেসিডেণ্ট নিকসনের সর্তগুলি নিয়ে আলোচনা করতে অস্বীকার করছে তাতে মনে হয় যেন তারা আমেরিকার ইতিহাসও বদলাতে চাইছে।'

যে পরিপ্রেক্ষিতে এই কথাগুলি লেখা হয়েছে সেটা হল এই যে, ভিয়েতনাম যুদ্ধকে কেন্দ্র করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস অর্থাৎ আইনসভার সঙ্গে প্রেসিডেণ্ট নিকসনের প্রচণ্ড বিরোধ বাধছে। এই বিরোধের ফলাফল ভবিষ্যতে আমেরিকার বৈদেশিক ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত নীতির পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান বলে, সরকার যেমন রাষ্ট্রের একটি শাখা আইনসভাও তেমনি একটি শাখা এবং গুরুত্বে দুইই তুলমূল্য। কিন্তু কিছুকাল যাবৎ এই তত্ত্বটা কার্যত কোনভাবেই মানা হচ্ছিল না। প্রেসিডেণ্টই সর্বশক্তিমান হয়ে উঠছিলেন। এই নিয়ে মার্কিন সিনেট ও প্রতিনিধিসভার সদস্যদের ক্ষোভ চরমে ওঠে গত বছরের শেষের দিকে। প্রেসিডেণ্ট কারও সঙ্গে কোনরকম পরামর্শ না করে কংগ্রেসকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে উত্তর ভিয়েতনামে প্রচণ্ডতম বোমা বর্ষণের হুকুম দিয়েছেন সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে। যদি সম্ভব হয় তাহলে সরকার ও আইনসভার সমমর্যাদার কথাটা সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়ে। এই অসংগতির প্রতিকার করার জন্য এবার কংগ্রেস বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছেন। তাঁদের সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে ভিয়েতনাম যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য তাঁরা যেভাবে উঠেপড়ে লেগেছেন অতীতে আর কখনও তেমন হয় নি।

ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে, এবার মার্কিন কংগ্রেসে প্রাধান্য রয়েছে ডেমোক্র্যাটিক দলের, আর প্রেসিডেণ্ট নিকসন হচ্ছেন রিপাব্লিকান দলের নেতা। উভয়ের মধ্যে বিরোধ বাধলে কতদূর গড়াবে বলা শক্ত।

ইতিমধ্যে দুটি ব্যাপারে এই বিরোধ বেশ জোর পাকিয়ে উঠেছে। সিনেটের বৈদেশিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটি ভিয়েতনাম যুদ্ধ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য পররাষ্ট্রসচিব উইলিয়াম রজার্স ও প্রেসিডেণ্টের বিশেষ পরামর্শদাতা হেনরি কিসিঞ্জারকে তলব করা হয়েছিল। তাঁরা দুজনেই সেই তলব মানতে অস্বীকার করেছেন প্রেসিডেণ্ট নিকসনের হুকুমে।

পালটা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মার্কিন কংগ্রেস বলছেন, রাষ্ট্রদূত ও অন্যান্য উচ্চ পদে যাঁদের মনোনয়ন করা হয়েছে তাঁদের নিয়োগ তাঁরা অনুমোদন করবেন না। মার্কিণ সংবিধানের নিয়ম এই যে কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া এইসব নিয়োগ কার্যকর হয় না।

১৩-১-৭৩ —পুণ্ডরীক

রতন ও স্বপ্নের মানুষ

তুলসী সেনগুপ্ত

...দে চোখে একরাশ বিস্ময় নিয়ে রতন ...য়ে দেখতে লাগল বংশীলালের খেলা। ...উ ছেলে যে কাছে এগবে এমন ক্ষমতা ...নের নেই। ছেলের দল ওকে দেখলেই ...লাগে ; 'ন্যলো রতন হ্যাংলা' বলে ...করে মারে। কিন্তু আজ অনেকদিন ...মনে হ'ল রতনের, পাড়ার ছেলেরা নতুন ...মজেছে। মোহনপুরো অনেকদিন পরে ...নতুন কিছু পেয়ে চনমনে হয়ে উঠেছে। কিন্তু ছেলেগুলো কেউ-ই ওর দিকে চেয়েও ...ছে না, এটা ভাবতেই রতনের বুকটা ...হালকা হয়ে যায়। আবার নজরে ...পাঁপাত্তি জ্বলতে থাকে। 'শালা রতন ...কারো খায় না পরে? যে ন্যলো রতন ...বলে ওর পেছনে লাগবে। 'মনে মনে ...রতন, আসলে ছেলেগুলো এক-একটা ...এর বাচ্চা। নইলে কার পাকা ধানে ...দিয়েছে রতন যে, ওকে অমন করে ...। এসব ভাবনা বংশীলালের খেলা ...ফাঁকে কেন যে এল ভেবে পায় না ...। এসব ভাবনা না ভেবে পিচুটি-ভরা ...চোখজোড়ায় বিস্ময় জাগিয়ে তুলে ...ঘাড় উঁচু করে দেখতে থাকে বংশী-...লের খেলা। বংশীলালের শুতনির কাছে ...এসেছে জুলপি, চামড়া-সার রোগা ...চেহারা, লাল চোখ, দেখলে ভয় ...এই মানুষটাই এতগুলো ছেলেকে, শুধু ...কেন, ছেলেদের বাপ-মায়েদেরও অভি-...করে দিয়েছে খেলা দেখিয়ে। আর ...সঙ্গে নিজের ওপর একধরনের ঘৃণা ...চিয়ে ধরতে লাগল রতনকে। মনে মনে ...জেকেই গাল পাড়ল সে। আর সে ...টা নিজের কানেই কীরকম বেখাপ্পা ...কল। ভাল লাগল না রতনের নিজেরই।

অনেক কষ্টে একটা উঁচুমতন ঢিবির ...উঠে দাঁড়িয়ে বংশীলালের খেলা দেখায় ...দিল রতন। হারু মাষ্টার পাশ দিয়ে ...যেতে বলল, 'রতন, তোর তো বেশ ...[illegible]

গুন্তি করছে, আর তুই...বেশ, বেশ রতনা, বুদ্ধিই হচ্ছে সব ; বুদ্ধি নেই তো কিচ্ছু নেই।' আপন মনেই যেন কথাগুলো বলে হারু মাস্টার পাশ কেটে চলে যায়। খেলা দেখা ভুলে গিয়ে হলদেটে দাঁত বের করে হাসে রতন। মনে পড়ে তার গোপালও ঠিক এই কথাই বলেছিল ওকে একদিন। কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যেতে লাগল রতনের। মাটির ঢিবিটা থেকে অতি সন্তর্পণে নেমে রতন ধীর পায়ে এগুতে লাগল বাড়ির দিকে। মাথার ওপরের আকাশটা ঝকঝক করছে। ঘাড় কাত করে আকাশটাকে দেখবার চেষ্টা করল। বিরাটাকার একটা আয়না যেন কেউ বসিয়ে রেখেছে আকাশটার গায়। ফলে চোখদুটো কেমন যেন ঝলসে গেল। ভাল করে আকাশটা দেখতে পেল না। পেছন থেকে বংশীলালের দলের ঢোল বাজনার শব্দ কানে এল। ডুম-ডুম-ডুম...আর ভেসে আসছে বংশীলালের রুক্ষ কর্কশ কণ্ঠ... 'কলকাত্তাকা বংশীলাল দেখায় দুনিয়ার হালচাল, আও বাবু দেখো, ভানুমতীকা খেল'। বংশীলালের খেলা দেখায় মন দিলেও কেন যেন মনটা উড়ু-উড়ু করতে লাগল। মাথার ভেতরে হারু মাস্টারের কথাগুলো বড় বেশী তোলপাড় শুরু করে দিল। আর মনে পড়ল গোপালকে। ছেলেবেলায় বসন্তে [illegible]

সমস্ত মুখ জুড়ে চাকা-চাকা দাগ। সেই গোপাল একদিন ওকে বলেছিল, 'বুঝলি রতনা, স্রেফ বুদ্ধি ; বুদ্ধিই হচ্ছে সব। এই যে ভগবান আমার চোখ নিল, মুখটা এমন খাবলে খুবলে ছেড়ে দিল, আমি কী শালা তোর মতন পরের পাত চাটি'।

ন্যলো রতন রাগ করতে পারেনি সে কথায়। কেননা, গোপালের কথাটা শুনতে যতই খারাপ হোক, আসলে কথাটা খুব খাঁটি। এমন একটা দিন নেই, যেদিন ওর বাড়ির লোক ওকে গালাগাল না দিয়ে ভাত মুখে দেয়। গত রাতের কথাই মনে পড়ে গেল রতনের। কে বলবে বীরু আর সমু ওর আপন মায়ের পেটের ভাই। রতনের সঙ্গে কোন মিলই নেই ওদের। লেখাপড়া শিখেছে, দামী জামা গায় দেয়, ফর্সা ধবধবে জামা প্যান্ট ময়লা হতে না হতেই বগলদাবা করে নিয়ে চলে যায় লন্ড্রীতে, সিগারেট ফোঁকে। পথ চলতি রতনের সামনে পড়ে গেলেও যেন দেখতে পায় না, কিংবা এমন চোখ কুঁচকে দেখে যার অর্থ, রতন বুঝতে পারে। বুকের ভেতরটা অসম্ভব গুমোট একটা অস্বস্তিতে ভরে যেতে থাকে। বীরু আর সমুর সঙ্গে কখনো খেতে বসে না রতন। অথচ, ভীষণ ইচ্ছে করে ওদের পাশে [illegible]

করতো। অনেক বলে করে বামুন-দিদিকে রাজীও করেছিল রতন একদিন। কিন্তু রতনকে আগে থাকতেই পিঁড়িতে বসে থাকেত দেখেই বীরু আর সমু কী-রকম যেন মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গিয়ে বামুন-দিদিকে বলেছিল, 'রাজপুত্তুরের খাওয়া হোক, তারপর আমাদের ডেকো'। অন্যদিন রতন যা হোক কিছু খায়; কিন্তু সেদিন ওর গলা দিয়ে কোন কিছুই যেন নামছিল না।—অনেক কষ্টে ভয়ে ভয়ে চোরের মত নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করে উঠে পড়েছিল রতন। সকলের ওই ধরনের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য অবজ্ঞা রতন মুখ বুজে সহ্য করতো। দু-চোখ ফেটে জল গড়িয়ে আসতো। অনেক কষ্টে সকলের থেকে দূরে সরে গিয়ে, নদীর পাড়ের ওই বুড়ো বট-গাছটার নিচে নিজেকে আড়াল করে চোখের জল ফেলেছে। যখনই বুকের ভেতরটায় চাপ ব্যথা অনুভব করে তখনই দেখেছে রতন 'মা-মাগো' এই কটি কথা বেরিয়ে এসেছে মুখ দিয়ে। প্রচণ্ড দুঃখের মুহূর্তেই ও দেখেছে, মা যেন ওর পাশে ছায়া-মূর্তি ধরে হাজির হয়ে যায়। ও বেশ পরিষ্কার অনুভব করে তখন, মা যেন ওর মাথায় শরীরে হাত বুলিয়ে দেয়। আর বিড়-বিড় করে কী যে বলে মা, তা ঠিক ধরতে পারে না, বুঝতে পারে না রতন। ব্যথায় টস্‌টস্ করে তার গলা বুক। চোখ-দুটো জ্বালা করতে থাকে। সবকিছু তখন তার কাছে স্পষ্ট ভেসে ওঠে।

রতন খুব করুণ গলায় জিজ্ঞেস করেছিল গোপালকে, 'তা আমি কী করবো বল গুপীদা? ভগবান তোমায় গলা দিয়েছে, সেই গলায় তুমি গান গাও, লোকে শোনে, ভাল বলে, পয়সা দেয়। আমার তো তেমন কোন গুণ নাই।'

সেকথা শুনে এক চোখেই যেন আগুন জ্বলে উঠেছিল গোপালের। রাগে সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছিল তার। বলেছিল, 'যারা বলে জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি', তারা আমার মতে মেয়ে-মানুষেরও অধম। বলেই হাঁফাতে থাকে গোপাল।

রতন দ্বিতীয় কোন কথা না বলে চুপ করে বসেছিল।

হঠাৎ কী হ'ল, গোপাল ওর হাতটা শক্ত করে ধরে বলেছিল, 'থেটার দেখেছিস কখনও থেটার'?

ঘাড় কাত করে উত্তর দিয়েছিল রতন, 'হ্যাঁ'।

শুনে মুখ হাসিতে ভেসে যাচ্ছিল যেন গোপাল। বলেছিল, 'থেটারের রাজারাণী'... কথাটা না শেষ করেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করে গিয়েছিল মুহূর্তের জন্য। তারপর এক সময় আপন মনেই যেন বলতে থাকে, 'জানিস রতনা এই কানা চোখ দিয়ে যখন জল গড়িয়ে পড়ে তা দেখে লোকে ভাবে, রাধা-কেষ্টর গান গাই, তাই ভাবের ঘোরে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে আমার। কিন্তু কেউ-ই জানে না, আর জানবেই বা কী করে, মনের ব্যথা চোখে উঠে আসে, জল কাটে। তোকে বললাম এসব, তোকে বড্ড ভালবাসিরে রতনা।'

শুনে রতন বলেছিল, 'তুমি আমাকে সঙ্গে নেবে গুপীদা?'

ওর দিকে কঠোর রুক্ষ দৃষ্টি হেনে বলেছিল গোপাল, 'যাও দুটো খেতে দিচ্ছে বীরু আর সমু, তাও বন্ধ হয়ে যাবে। এমন সব্বনেশে কথা কখনো বলিসনি'।

বোকার মত অনেকক্ষণ চেয়েছিল গোপালের দিকে রতন। তারপর কী ভেবে বলেছিল, 'তাহলে সারাজীবন আমি ওদের পাত চেটেই যাবো বলছো?'

সেকথার কোন উত্তর দেয়নি গোপাল।

এর দিনকয়েক পর ফের একদিন রতন গোপালকে বলেছিল, 'কিছুই তো বললে না। আমি কী করবো বলো?'

ধীর শান্ত গলায় গোপাল বলেছিল, 'যেমনটা বলবো, তেমন তেমন পারবি করতে?'

'কী?'

উত্তরে গোপাল হেসে বলেছিল, 'ওই যা বলেছিলাম, থেটার, থেটার করতে হবে। মেয়েছেলেদের দেখেই কাঁদো কাঁদো গলায় বলতে হবে, 'মা, মা জননী, তিনদিন খাইনি মা, বড় জ্বালা মা, ঘরে ছোট ছোট ভাই-বোন...পারবি বলতে?'

সব শুনে চুপসে গিয়েছিল রতন। করুণ গলায় উত্তর দিয়েছিল, 'তার চেয়ে তুমি আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল'—কেন যে ওরকম কথা বলেছিল রতন, তা এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। গোপালের সামনে এলেই কেমন যেন সম্মোহিত হয়ে যায়। এক-চোখো গোপালের মুখে যে কী আছে, তা সঠিক না জানলেও, গোপালকে তার বড় আপন বলে মনে হয়।

অনেক দূরে থেকে ভেসে আসছে বংশীলালের গলা। অদ্ভুত এক রহস্যময় জগতে দুয়ার খুলে যায় রতনের কাছে। কী রক সকলকে বেকুব বানিয়ে বংশীলাল রুমাল বাঁধা আংটি সকলের চোখের সাম থেকে উধাও করে দেয়। বা বাচ্চা ছেলেদের হাত ধরে না দেয় বংশীলাল আর অমনি ঝিলিপ ঝরে পড়তে থাকে। যারা রতনকে 'নুলো রতন হ্যাংলা' বলে জ্বালায় তারা চুপসে যায়। মুখ চোখ ফ্যাকাশে হয়ে য তা দেখে আর সকলে হো-হো ক'রে হা আর অমনি দে-দৌড়, দে-দৌড়। পা যায় সকলে। রতনের মনটা সে সব দে খুশীর প্রজাপতি হয়ে ওঠে। ভাবে, বংশ লালের মত যদি কোন কৌশল সেও আ করতে পারতো তবে সেও ওই খচ্চর টিট করতে পারতো। একটু এগোতেই ও করল রতন, দূরে দুটো নেড়ীকুত্তা কী ওপর যেন হুমড়ি খেয়ে রয়েছে। আর তারই ওপর বৃত্তাকারে উড়ে উড়ে ঘরে ঘ ডানা ঝাপটাচ্ছে কাক-শকুনের দল। ব বুঝতে পারে, পচা-গলা কিছু একটা র সেখানে, নুলো হাতটাকে অনেক উপরে তুলে নাক চাপা দিল। রোদ্দুরের আস্তে আস্তে বেড়েই চলেছে। অনেক আগে থেকেই চোখদুটো জ্বালা করছ এখন পচা গন্ধের সঙ্গে কাক-শকুনের দৃশ্য চোখে পড়তে, আরও যেন জ্বালা উঠল। মনে হ'ল রতনের, ওর দু-চো শাদা জমিতে কেউ বুঝিবা শুকনো ল গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়েছে। বংশীলালের হাড় জিরজিরে চেহারাটা স্পষ্ট ভেসে আর একবার। বংশীলালের রুক্ষজবা চো দিকে চেয়ে কে ন মনে হয়েছিল রত লোকটা যতই ভেল্কী দেখাক না

আসলে বংশীলাল একরকম রতনের মতই নলো, কিংবা ভাগারের গলিত কোন মৃতদেহ, যার ওপর হুমড়ি খেয়ে রয়েছে ছেলে-বুড়ো মেয়েরা, কুত্তা আর কাক-শকুনের দলের মত। মনে মনে একটা খারাপ কথা উচ্চারণ করল। রতনের মাংস খেয়ে খেয়ে ওদের অরুচি ধরেছে, আজ তাই বংশীলালের শরীরটাকে ভুক্করের দল চেটে-পুটে খাচ্ছে।

* * *

রোজকার মত ও একা একা নিরিবিলিতে নদীর পাড়ে বসে সময় কাটায়। দেখে, পাড়ে বক-শালিকের দল খুঁটে খুঁটে খায় কত কী। উপরের আকাশে বেগুনি শাদা মেঘ মন্থর গতিতে একপাশ থেকে আর এক পাশে সরে যায়। সময় যে কীভাবে কেটে যায় রতন জানে না, বুকের মাঝে একরাশ ব্যথার চাপ সে সময় টের পায় না রতন। এভাবে সারারাত যদি এমনি নদীর পাড়ে বসে থাকে, বাড়ি না-ও ফেরে, তবে কেউ-ই তার খোঁজে আসবে না। 'মা-মাগো'—! একটা দীর্ঘশ্বাস ঠেলে বেরোয় মুখ দিয়ে। চোখদুটো জল-ঝাপসা হয়ে আসে। ভাবনার অদৃশ্য ভেলায় চড়ে ভাসতে থাকে রতন। মনের মাঝে গোপালের কথাগুলো আবার যেন শুনতে পায় ও। 'থেটার করতে হবে, থেটার'। হাসি পায় রতনের। আবার কষ্টও হয়। ওখান থেকে উঠে পড়তে গিয়েই নজরে পড়ে কাউকে হাতকুড়ি দূরে ওরই মত নিঃশব্দে বসে রয়েছে। দীর্ঘদিনের মধ্যে আর কাউকে এই নদীর পাড়ে বসে থাকতে দেখেনি। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন গাঢ় হয়নি। হালকা এক ধরনের আলো তখনও ছড়িয়ে রয়েছে চতুর্দিকে। একটু এগিয়ে গেল রতন। বুঝি বা অকারণেই মুখ ঘোরাল লোকটা। অমনি রতনের বুকের মাঝে মাদলের দ্রিম দ্রিম উঠল। সকলের চোখের রহস্যময়মানুষ বংশীলাল বসে রয়েছে সেখানে। অতি উৎসাহে দ্রুত পা বাড়াল রতন।

বংশীলাল ওকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিল। ও বংশীলালের সামনে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ অপলকে চেয়ে রইল।

বংশীলাল ধমক দেবার সুরে বলে উঠল, যা ভাগ'।

রতন একটু সরে গিয়ে ফের দাঁড়িয়ে রইল। কী মনে করে অস্ফুট স্বরে প্রশ্ন করল, 'তুমি আমাকে ম্যাজিক শেখাবে'?

সেকথায় বংশীলাল হেসে ফেলল। বলে, ম্যাজিক! হাঃ হাঃ হাঃ'!

সেই শব্দে চতুর্দিকের নিস্তব্ধতা চুরমার হয়ে গেল। পরে হাতের ইশারায় কাছে ডাকল রতনকে। কোন সংকোচ বা দ্বিধা কিছুই ছিল না রতনের। সে একরকম বংশীলালের গা ঘেঁষে বসে ওর গায়ের স্পর্শ গন্ধ নেবার চেষ্টা করল।

ডান হাতটা রতনের ঘাড়ে তুলে দিয়ে ধীর গলায় বংশীলাল বলে, 'তু লিখাপড়া করিস না'?

রতন ম্লান হাসল সে কথায়। বংশীলালের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, 'ভানুমতী তোমাকে খেলা শিখিয়েছে?'

খুব যেন একটা হাসির কথা বলল রতন। হাসতে হাসতে বলল, 'হাঁ হাঁ ভানুমতী'! ভানুমতীর নামটা অদ্ভুত ভাবে উচ্চারণ করল বংশীলাল।

রতন জিগ্যেস করল, 'ভানুমতীকে তুমি চেনো? আমাকে চিনিয়ে দেবে?'

বংশীলাল গম্ভীর হয়ে গেল সে কথায়। বলল, 'কোই চিনে না ভানুমতীকে। কুনোদিন পারবে ভি না'।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল বংশীলাল। রতনের পিঠে সস্নেহে হাত রেখে ওর নাম জিগ্যেস করে বলল, 'যা বাড়ি যা'। বলেই খঞ্জু পায়ে এগিয়ে গেল বংশীলাল।

রতন বেশ স্পষ্ট দেখতে পেল, রহস্যময় এই মানুষটা ফিকে অন্ধকারের মধ্যে ক্রমশই

মিশে যেতে যেতে একেবারেই হারিয়ে গেল। এক সময় নিজেও উঠে পড়ল রতন।

আজকে হাটবার। অনেক চেনা-অচেনা মানুষের ভিড়ে গমগম করছে মোহনপুরার হাট। হাটে যাবার জন্য অদ্ভুত অদৃশ্য একটা টান অনুভব করল রতন। ধীর পায়ে এগিয়ে যেতে লাগল হাটের দিকে। দূর থেকে পথের পাশে বংশীলালের তাঁবু নজরে পড়ল। আর অমনি বুকের ভেতরটা গুড়গুড় করে উঠল রতনের। মনে পড়ে গেল বংশীলালের খেলা দেখাবার সময়কার কথাগুলো, 'কলকাত্তাকা বংশীলাল, দেখায় দুনিয়ার হালচাল'। আর মানুষজন পরিবেষ্টিত বংশীলালের খেলা দেখাবার সময়কার বিশেষ ভংগীটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। যেন এ-জগতের কেউ নয়, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে একজন বিশেষ রহস্যময় মানুষ ও। বাজনার তালে তালে লাল চোখের মণিদুটো থেকে যেন আগুন ঠিকরে বেরোয়। বিশেষ করে বছর আটেকের ছেলেকে একটা চুবড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে শানিত ছুরির ফলা বের করে উদভ্রান্তের মত যখন বিড়-বিড় করে বংশীলাল, তখন লোকটাকে ভীষণ নিষ্ঠুর মনে হয়। কথা বলতে বলতে অদ্ভুত হাসে বংশীলাল, আর সেই হাসি আরও রহস্যঘন হয় ঢোলের ডুম ডুম ডুম বাজনার মধ্যে। এসব ভাবনা ভাবতে ভাবতে পথ চলে রতন—অকারণেই বুকের মাঝখানটা হিম হয়ে আসে। সমস্ত শরীর তখন থির-থির করে কাঁপে। পাদুটোকে ভীষণ ভারী মনে হয়। পা-দুটো অসম্ভব ভারী ঠেকলে কী ভেবে রতন বসে পড়ে কিছুক্ষণের জন্য সেখানে। আস্তে আস্তে ভয়ের মেঘ কেটে যায়। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে শরীর-মন শক্ত হয়ে গেলে পর তাঁবুর দিকে এগোয় রতন। দেখে তাঁবুর চার পাশে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রয়েছে পোড়া কাঠের টুকরো, কয়েকটা ভাঙা মাটির হাঁড়ি, শুকনো কলাপাতা, আরও কত কী। কয়েকটা রোঁয়া ওঠা কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। হঠাৎ নজরে পড়ে রতনের, তাঁবুর একটু দূরে দড়ির ওপর ঝুলছে রঙিন জামা-কাপড়, এমন কী কয়েকখানা শাড়ীও। তাঁবুর ভেতরে কী কেউ আছে? থাকলে নিশ্চয়ই ওদের কথাবার্তা কানে আসতো। তবুও ভরসা পেল না ভেতরে ঢুকতে। পর্দা সরিয়ে উঁকি মারতেই 'কওন, কওন হ্যায়'—বাজ পড়ার মত গলায় কে যেন বলে উঠল কথাগুলো। মুহূর্তে শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেল রতনের। গলা শুকিয়ে গেল। ফ্যাসফেসে গলায় উত্তর দেয়, 'আমি রতন দাস'।

—'আ, ভিতর আ'!

ভিতরে গিয়ে দেখল লোকটা বংশীলাল নয়। জবরদস্ত এক বিশাল পুরুষ, আর তার গা ঘেঁষে বসে রয়েছে এক সুন্দরী মেয়ে। দু-চোখ ভরে দেখতে গিয়ে, সংকোচ হল ভীষণ, রতনের। ওকে অমন করে চেয়ে থাকতে দেখে মেয়েটা হেসে উঠল। ফলে মেয়েটার মুখের দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে কিছুক্ষণের জন্য তাকিয়ে রইল সেই জবরদস্ত লোকটা। এমন মধুর সুরেলা হাসি কী মানুষ হাসতে পারে? রিণ্-রিণ্ করে আওয়াজ উঠছে। মানুষটা ওর সামনেই মেয়েটাকে আদর করল। ঠোঁটের ওপর ঠোঁট বোলাল। সেই লোকটা মেয়েটার দিকে একবার রতনের দিকে আর একবার চেয়ে নিয়ে বলল 'আঃ তু হামার সব দুঃখ দূর করিয়ে দিলি, তু হাসলে হামার -নেশা হোয়', পরক্ষণেই রতনের দিকে চেয়ে বলল, 'তু রোজ আসিস ইখানে, আমার পাখিকে তু হাসালি, তু বড় ভাল ছেলে রে...'। বলেই প্রচণ্ড শব্দ করে সমস্ত নিস্তব্ধতাকে চুরমার করে হাসতে লাগল সেই লোকটা।

ভয়ে বিস্ময়ে রতনের বুকটা শুকিয়ে যেতে লাগল। অস্ফুট কণ্ঠে সে শুধোয় 'বংশীলাল যে খেলা দেখায়, সেই ভানুমতী কী তুমি'?

মেয়েটা সে কথায় হাসতে পারল না। রতন দেখলো, সেই আধো-আলো আধো অন্ধকারের মধ্যে মেয়েটা কেমন করে যেন মুখটাকে লুকোল।

আর সঙ্গে সঙ্গে সেই জবরদস্ত মানুষটা শব্দ করে হেসে উঠল। বলল, 'হাঁ-হাঁ-ই হচ্ছে ভানুমতী...হামার পাখি'! কথা-কটি বলেই উঠে বসল লোকটা। কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কয়েক সেকেণ্ড। তারপর হঠাৎ কী হলো, প্রাণখোলা হাসি হাসল লোকটা। মেয়েটার দিকে নজর যেতেই দেখতে পেল মেয়েটার মুখ অসম্ভব রক্তহীন, সমস্ত কপাল জুড়ে বিজবিজ করছে ঘাম।

ভীষণ রকমের এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করল রতন। শুধোল, 'কিন্তু বংশীলাল যে বলে ভানুমতীকে কেউ-ই চিনতে পারে না'?

'ঠিক, ঠিক বলেছে বংশীলাল'। কথা-কটি বলেই কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে গেল লোকটা। পরে মেঘ ডেকে উঠল গলায় তার, 'এ শালা হারামখোর বংশী ইধার আ...'।

কথা শেষ হতে না হতেই বংশীলাল মাথা গোঁজ করে এসে হাজির হল।

'এই শালা গোরদাবা'? লোকটা হুকুম জারী করল বংশীলালের দিকে চেয়ে।

আর অমনি দেখলো রতন সকালের তেজস্বী বংশীলাল অনুগত ভৃত্যের মত লোকটার পায়ের কাছে বসে, পা টিপতে লেগে গেল।

রতন উঠে দাঁড়াল। ওকে উঠতে দেখে ওরা কেউ-ই কোন কথা বলল না। তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল রতন। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। ভুষোকালির মত চতুর্দিকটা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। উপরের আকাশে দু-চারটে পাখি পূব থেকে পশ্চিমে উড়ে যাচ্ছে:

বাইরে দাঁড়িয়ে একবারের জন্য চমকে পেছন ফিরে দেখল রতন। তাঁবুর ভেতর থেকে সেই আগেকার মত চুনুচুনু করা হাসির শব্দ কানে এল। গোপালের কথাটা মনে পড়ল ঠিক সেই সময় রতনের। 'থেটার থেটার করতে হবে তোকে।' ভাবল, বংশীলাল পাকা থেটারের লোক। এখন কেমন পোষমানা সাপের মত জবরদস্ত লোকটার পা টিপে দিচ্ছে। চোখদুটো জ্বালা করে উঠল। নুলো হাতটাকে অনেক কষ্টে, চোখের কাছে টেনে তুলে চোখের ওপর রাখল। কেন যেন অকারণেই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে নামছে রতনের।

মহীশূরের হালেবিড় মন্দির

শ্রবণ বেল গোলা

সবিতা সেনগুপ্ত
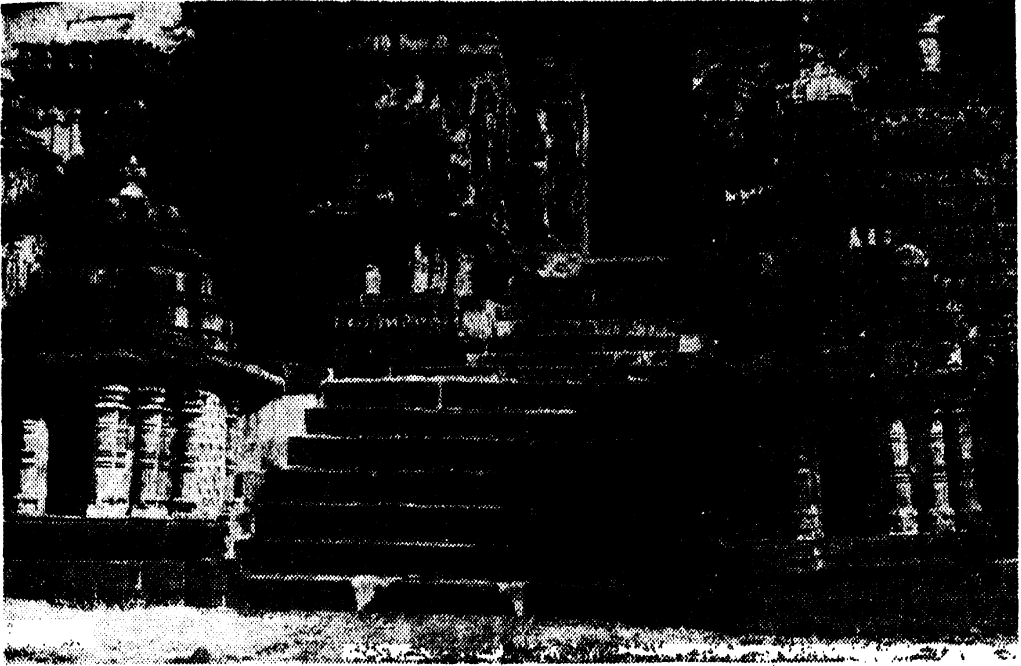
শেষ বর্ষার মেঘে আকাশ সেদিন মেদুর। ধারাবর্ষণ হয়ে গেছে দুপুরে আর বিকেলে।

সন্ধ্যার পরও টুপ টুপ করে বৃষ্টি ঝরে পড়ছিল উঠানে পেয়ারা পাতার ফাঁক দিয়ে, কাঁঠাল পাতার ফাঁক দিয়ে।

মোটঘাট বেঁধে রওনা হলাম স্টেশনে, রাত দশটায় ট্রেন। মাইশোরের মানে মহীশূরের কয়েকটা জায়গা দেখবার ইচ্ছে। অ্যাসফল্টের চওড়া রাস্তা বর্ষণসিক্ত, এলোমেলো সজল হাওয়া ট্যাক্সির কাচের ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকছে, সুন্দর কাচের অবগুণ্ঠনে ঢাকা আলোগুলি ল্যাম্পপোস্টের মাথায় স্তব্ধ দাঁড়িয়ে আছে, অপার রহস্যময় লাগছে রাত্রির ব্যাঙ্গালোরের পথ। পথের পাশের গথিক ধাঁচের বাড়ীঘর, ফুলবাগান, মাঠ-ময়দান আর নিবিড় পত্রপল্লবে ঢাকা গাছপালা।

স্টেশনে দাঁড়ানো গাড়ি মোটর ট্যাক্সিগুলোর গায়ে বৃষ্টির ফোঁটা ফোঁটা জল লেগে রয়েছে, চক চক করছে বাতির আলোয়। বৃষ্টির মধ্যেও লোক চলাচলের বিরাম নেই। অহর্নিশি মানুষের গতি অব্যাহত।

ট্রেন আসতে তখনো কিছু সময় বাকি। তাকিয়ে দেখছিলাম স্টেশনের লোকজন। দাক্ষিণীদের সংগে বাঙালীর চেহারার খুবই সাদৃশ্য। ময়লা রঙ, শীর্ণ দেহ দাক্ষিণ ভারতীয় নরনারীর দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল বুঝি বাংলারই কোন স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি। ট্রেন আসতে আমরা ছোট একটি ক্যুপেতে উঠলাম।

জন-কোলাহলমুখর স্টেশন পেছনে পড়ে রইল। গাড়ি সবেগে ছুটে চলল কোন অজানার দিকে।

ঘুম ভাঙল খুব ভোরে।

ট্রেন ছুটে চলেছে নিবিড় পাহাড়ী বনজঙ্গলের ভেতর দিয়ে। দূরে সবুজ পাহাড় শ্রেণী, নীচের উপত্যকায় বিস্তীর্ণ ধান ক্ষেত, তার ওপারে দূরে দূরে ইলেকট্রিকের থাম দেখা যাচ্ছে, ওই দিকেই আমাদের গন্তব্য যোগ-জলপ্রপাতের দিকে। ওখান থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়েছে। ভারতে এই একমাত্র প্রদেশ মহীশূর যেখানে স্বাধীনতার আগেই গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছে।

দূরে সুন্দর বাড়ীঘর, অনেক ফ্যাক্টরি দেখা যাচ্ছে। অসংখ্য চিমনী দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। কোন বর্ধিষ্ণু জনপদ নিশ্চয়।

স্টেশন এল। স্টেশনের পাশ দিয়ে চলে গেছে পাকা সড়ক, বস্তি, ঘরের দেয়াল, টালির ছাদ। অদূরে নদী, মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।

ভদ্রাবতী! মস্ত বড় স্টেশন। বিরাট কারখানা অদূরে। অনেক ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে।

ভদ্রাবতী একটি শিল্পনগরী। লোহা-স্টীল ওয়ার্কস, সিমেন্টের ফ্যাক্টরি, পেপার মিল কত কিছু এখানে। মহীশূরের জামসেদপুর।

আবার ধানক্ষেত। মেঘ-ভারে অবনত আকাশের নীচে আদিগন্ত প্রসারিত ধানক্ষেতের শোভা দেখে পূব বাংলার কথা মনে পড়ল।

বেলা এগারোটায় সাগর স্টেশনে নামলাম। রিফ্রেসমেন্ট রুমে ঘন্টা দুয়েক থাকতে হবে।

মধ্যাহ্নভোজন হল ওখানকার ফরেস্ট অফিসার মিঃ ওয়েলেসলির গৃহে।

মস্তবড় কম্পাউন্ড, আর চারদিকে যে কি নিরালা নির্জন। মিসেস ওয়েলেসলি বললেন, অভ্যেস হয়ে গেছে নিরালায় জঙ্গলে একা থাকতে থাকতে। এখন জনতা-পূর্ণ বড় শহরই বরং ভাল লাগে না। বন-জঙ্গলের গাছপালা এমন কি পশুপাখী

পর্যন্ত যে কি চমৎকার সঙ্গ দিতে পারে, আপনাকে আর কি বলবো।

বেলা প্রায় তিনটে নাগাদ দুখানা গাড়ি বোঝাই হয়ে আমরা যোগ জলপ্রপাতের দিকে চললাম। মিঃ ওয়েলেসলি সপরিবারে এবং মিঃ ভাস্কর বলে আর একজন ভদ্রলোক এসেছিলেন ব্যাঙ্গালোর থেকে, তিনি এবং তাঁর স্ত্রী।

মিসেস ওয়েলেসলি বললেন, তাঁর বাড়ী থেকে যে কেউ যোগে যান তিনিও সঙ্গে থাকেন। যোগ জলপ্রপাত তাঁর কাছে কখনো পুরনো হয় না।

পথ কখনো ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে। কখনো নিবিড় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ক্রমে নীচের দিকে ঘন নিবিড় পাহাড়শ্রেণীর মধ্যে এসে পড়ল। তারপর নীচের দিকে আরো নেমে আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথে ঘুরতে ঘুরতে এসে গন্তব্যস্থানে পেঁাছালাম।

দূরে থেকে জলপ্রপাতের শব্দ শোনা যাচ্ছে। মেঘমন্দ্রধ্বনি ভেসে আসছে যেন কোন দূরের আকাশ থেকে।

আরো এগিয়ে গেলাম।

একেবারে কাছাকাছি এসে দেখি তত-ক্ষণে ঘন কুয়াশায় সামনে দিকদিগন্ত আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। দৃষ্টি চলে না সেই কুয়াশা ভেদ করে, আর ভীমগর্জন শোনা যাচ্ছে সেই কুয়াশার পরপার থেকে।

এই যোগ ফলস্।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম আমরা সবাই! কাছে এগিয়ে ডাকবাংলোর বারান্দায় দাঁড়ালাম। আবহাওয়া ঠান্ডা, বেশ শীত-শীত করছিল।

ডাকবাংলোর বারান্দাতে একেবারে সামনেই জলপ্রপাত। ভাবলাম মেঘাচ্ছন্ন দিন বলেই কি মেঘে ঢেকে গেল ধারাগুলি? শুধু শব্দ শোনা যাচ্ছে দূরাগত মেঘ গর্জনের মত!

আশ্বিনে যদিও দিন ছোট হয়ে আসছে, তবু মোটে ত বিকেল পাঁচটা, এখনি ত আঁধার নেমে আসার সময় হয় নি।

আশ্চর্য! কিছুক্ষণ পরেই কুয়াশা সরে গেল, স্পষ্ট দেখতে পেলাম জলপ্রপাতগুলি।

শীতের কুয়াশাও নয়, বর্ষার মেঘও নয়। ভীমবেগে যে জলধারা ওপর থেকে নীচে পড়ছে, চতুর্দিকে উৎক্ষিপ্ত সেই জলকণাগুলিই ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, পেছনে বহুদূর ব্যাপ্ত করে নিবিড় কুয়াশার সৃষ্টি করছে, আর বিন্দু বিন্দু জলকণা বৃষ্টির গুঁড়োর মত চারদিকে ঝরে ঝরে পড়ছে!

আবার চতুর্দিকে উৎক্ষিপ্ত জলকণার তৈরী কুয়াশায় দিক-দিগন্ত ছেয়ে গেল। আমরা তাকিয়ে রইলাম ঘন নিবিড় কুহেলির দিকে, আবার কিছুক্ষণ বাদে বাতাস উড়িয়ে নিয়ে গেল কুয়াশার আবরণ। দৃষ্টিগোচর হল পরিষ্কারভাবে যোগ জলপ্রপাতের চারটি ধারা, রাজা, রোরা, রকেট, রানী।

এই সময় আকাশও একটু পরিষ্কার হল কিছুক্ষণের জন্য।

কবিগুরুর কবিতার পঙ্‌ক্তি মনে পড়ল।

'কুহেলি গেল আকাশে আলো দিল

যে পরকাশি

ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি।'

এমনিই হতে লাগল সারা বিকেল।

ডাকবাংলোর বারান্দার সামনে বাঁধানো চত্বর। ওপরে ছাদ রয়েছে অবশ্য। এই চত্বর জলপ্রপাতের একেবারে মুখোমুখি। সেই চত্বরে সারি সারি চেয়ার পাতা।

যার খুশি সে বসে বসে দেখছে। যাত্রীর ভীড় যথেষ্ট ছিল।

আমরা এর মধ্যে কফি পেয়ে গেছি। কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে বসে গেলাম চেয়ারে।

ডাকবাংলোর সব কয়টি ঘর ভর্তি। আমাদের সঙ্গীরা চলে যাবেন, আমাদের থাকবার ইচ্ছে সে রাতটা।

অনেকক্ষণ পর ডাকবাংলোর প্রধান বিল্ডিং-এর পাশের বিল্ডিং-এ একটা ঘর খালি আছে জানা গেল। আমরা ওটাই দখল করলাম। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এল।

ঘুমের মধ্যেও সমস্ত রাত সেই জল-প্রপাতের বজ্রগর্জন সমস্ত চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে ছিল। একটানা ঘুম হয়নি, থেকে থেকে গায়ের আচ্ছাদন ফেলে উঠে বসেছি আর অন্ধকারের মধ্যে জানালা দিয়ে জল-প্রপাত দেখার চেষ্টা করেছি।

দেখতে বিশেষ পাইনি আঁধারে, কিন্তু শ্রবণ ভরে গেছে প্রপাতধারার মেঘমন্দ্র ধ্বনিতে!

এই কি শব্দব্রহ্ম? 'বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে কে বাজাবে সেই বাজনা? উঠিবে চিত্ত করিয়া নৃত্য বিস্মৃত হয়ে আপনা!' এই বিপুল জলদমন্দ্রধ্বনি শুনে সত্যিই চিত্ত আপন-বিস্মৃত হয়ে যায়। পৃথিবীতে যেন আর কিছু নেই আছে এই নির্জন পার্বত্য পটভূমিকা আর অন্ধআবেগে জলোচ্ছ্বাসের বিপুল গর্জন!

শেষ রাতে আমরা বারান্দায় বেরিয়ে দেখলাম ডাকবাংলোর কম্পাউন্ডে এখানে-সেখানে বাতি জ্বলছে। সামনের জটাজটিল ঘনপল্লব প্রশাখা বহুলে বৃক্ষ দুটি অপূর্ব রহস্যময় লাগছে। অদূরের জলধারা কুয়াশায় দুর্নিরীক্ষ্য, প্রাঙ্গণের সম্মুখ ভাগ জলাসিক্ত।

সামনে প্রপাতের নিকট থেকে কুয়াশা এগিয়ে আসতে আসতে কাছে আমাদের একেবারে কাছে এল, সামনে বহু দূরে পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল জলকণাসৃষ্ট মেঘের আবরণ।

আবার কিছুক্ষণ বাদেই কুয়াশা সরে গিয়ে সামনেটা পরিষ্কার হয়ে গেল। রাত্রি শেষের স্বচ্ছ আঁধারে জলপ্রপাতের ধারা-গুলি কিছুটা আবার দৃষ্টিগোচর হল।

সকালে আবার ওইরকম।

মুহূর্তে কুয়াশা সৃষ্টি হচ্ছে, কুয়াশা স্বচ্ছ হয়ে যাবার পর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওপারের সবুজ পাহাড়ের গা বেয়ে অনেক-গুলি ধারা এসে সবেগে নীচের গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে।

কাল বিকেলে প্রধানত চারটে ধারা পাশাপাশি দেখেছিলাম। সকালে দেখলাম শীকরকণা সৃষ্ট কুয়াশা যখন সরে গেল ওই চারটে ধারার পাশাপাশি আরো কতগুলি ধারা পাহাড়ের গা বেয়ে এসে সগর্জনে নীচে পড়ছে।

একটি ধারা খুবই বড় আর কি বিরাট উঁচু পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। যোগের ধারা এখানে সবচেয়ে প্রশস্ত।

রাজা, রোরা, রকেট রানী।

চারটে মূল ধারা।

নামগুলি বোধ হয় এদের ধ্বনি-গাম্ভীর্য আর ঠাট-ঠমকের জন্যই রাখা হয়েছে। আটশ পঞ্চাশ ফুট ওপর থেকে ধারাগুলি নীচে গভীর কালো গহ্বরের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে।

আকাশ এখন বেশ পরিষ্কার নীল। জলকণার তৈরী মেঘ যখন সরে যাচ্ছে, তখন দেখতে পাচ্ছি সূর্যের আলোয় প্রপাতের ধারাগুলি রজতশুভ্র ফেনপুঞ্জসহ ভৈরব-রবে নেমে আসছে।

বিরাট পশ্চিমঘাট পর্বতমালা দিগন্ত ব্যেপে চলে গেছে দৃষ্টি-সীমা পেরিয়ে। ওপারে পাহাড়ের কতদূরে থেকে জলপ্রপাতের ধারাগুলি গড়িয়ে আসছে কে জানে তার ঠিকানা।

প্রপাত থেকে বিদ্যুতের জেনারেটর তের মাইল দূরে, তিন মাইল দূরে হেড-ওয়ার্কস। এটির নাম হল মহাত্মা গান্ধী হাইড্রো ইলেকট্রিকস ওয়ার্কস।

এখানে যাত্রীসমাগম প্রচুর।

ডাকবাংলোতে 'ভিজিটার্স বুক' আছে, ভারি চিত্তাকর্ষক সেটি। দেশের নানা প্রান্ত থেকে কত লোক প্রতিবছর আসে দাক্ষি-ণাত্যের এই জলপ্রপাত দেখতে, আর কত রকমের মন্তব্য যে লিখে রেখেছে খাতাটার মধ্যে তার ঠিক নেই।

কেউ বা চাঁদের আলোয় এই ধারা দেখে প্রিয়া বলে একে সম্বোধন করে কবিতা লিখেছে, কেউবা এসেছে প্রখর গ্রীষ্মে যখন ধারার জল বিশুষ্কপ্রায় হয়ে যায় তখন। সে আবার হতাশ হয়ে বিরূপ মন্তব্যও করেছে। এমনি নানারকম মন্তব্যের মধ্যে একটি মন্তব্য হল what a waste, —মন্তব্যটি মহীশূরের বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার বিশ্বেশ্বরাইয়ার।

যোগ ফলস্ দেখতে এসে শরাবতী নদীর বেগবতী ধারা দেখে তিনি এই নদীর বিপুল সম্পদ-সম্ভাবনার কথা বুঝতে পারেন।

তাঁর মন্তব্য মহীশূরের মহারাজার কর্ণ-গোচর হল। মহারাজা তাঁকে ডেকে পাঠান এবং এ কথার অর্থ কি জিজ্ঞেস করেন।

তখনো বৃটিশ শাসন অপগত হয়নি। দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে মহীশূর এবং ত্রিবাঙ্কুর এই দুইটি রাজ্যই সবচেয়ে অগ্রসর ছিল। প্রজাহিতকর কার্যে মহীশূররাজ কখনো কৃপণ ছিলেন না। তিনি জানতে

চাইলেন যোগ জলপ্রপাতের যে বারিধারা যুগ যুগ ধরে পড়ে যাচ্ছে আজ সহসা স্যার এম বিশ্বেশ্বরাইয়া তাকে অপচয় বলে মনে করলেন কেন, এবং এই অপচয় নিবারিত হতে পারে কি ভাবে এবং কি উদ্দেশ্যে।

জন্ম নিল হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্ট স্যার এম বিশ্বেশ্বরাইয়ারই তত্ত্বাবধানে। এ'রই জন্য মহীশূরের গ্রামে গ্রামে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলেছিল দেশ স্বাধীন হবার আগেই।

বস্তুতঃ স্যার এম বিশ্বেশ্বরাইয়া নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান। এই ব্যক্তিটির সম্পর্কে কিছু না বললে মহীশূরের যে কোন বর্ণনাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

ঊনশততম বৎসরেও এ'র দেহ ও মন ছিল আশ্চর্য সচল। আজ কজন ভারতীয় জানেন যে স্যার এম বিশ্বেশ্বরাইয়ার কর্মজীবন শুরু হয়েছিল বম্বের পূর্ত বিভাগের একজন এঞ্জিনীয়ার হিসাবে। সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি হায়দ্রাবাদে নিজামের অধীনে কর্ম গ্রহণ করেন এবং অবশেষে তাঁর নিজের প্রদেশ মহীশূরে দেওয়ান বা প্রধানমন্ত্রীর কর্মভার গ্রহণ করেন। মহীশূরের দেওয়ান তিনি বেশিদিন ছিলেন না। মাত্র বছর ছয়েক। এরই মধ্যে এই দেশীয় রাজ্যের এমন দ্রুত শিল্পোন্নয়ন সাধন করেন যা প্রায় অবিশ্বাস্য।

এই ভারতরত্নের শিল্প-প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি নাকি ছিল এই যে সমস্ত বিদেশী বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ভদ্রাবতীতে লোহ ও ইস্পাতের কারখানা স্থাপন করেন এবং ইস্পাত আমেরিকায় রপ্তানি করে সেখানকার তৈরী ইস্পাতের চেয়ে কম দামে বিক্রী করে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করেন।

মহীশূরে শহর থেকে এগারো মাইল দূরে কৃষ্ণরাজ সাগর বাঁধটি, যার নীচে বিখ্যাত বৃন্দাবন উদ্যান রয়েছে শ্রীবিশ্বেশ্বরাইয়ারই কীর্তি। পৌনে দু মাইল এই বাঁধটি দক্ষিণ ভারতের বৃহত্তম বাঁধগুলির অন্যতম। বাঁধটির প্রবেশপথেই একটি বৃহৎ গেট দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কিছুদূর এগিয়ে গিয়েই পাওয়া যায় নয়নাভিরাম বৃন্দাবন উদ্যান। এই উদ্যানের পুষ্পবিতানের বর্ণ ও সংখ্যা বৈচিত্র্যে এবং তাদের পরিকল্পনায় দিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবনের মোগল উদ্যানের সঙ্গে বা কাশ্মীরের শালিমার উদ্যানের সঙ্গে তুলনা চলে।

দেশী ও বিদেশী দর্শনার্থীকে যা বিশেষভাবে আকর্ষণ করে তা হল সপ্তাহান্তে এবং বিশেষ বিশেষ উৎসবের রাত্রিতে বৈদ্যুতিক আলোকমালা অসংখ্য ফোয়ারার উৎক্ষিপ্ত জলকণায় যে ইন্দ্রধনুচ্ছটার সৃষ্টি করে সেই অপার্থিব দৃশ্য।

উদ্যানে বসে সমস্ত পরিবেশটিকে উপভোগ করতে বিশেষ সহায়তা করে ওখানকার হোটেলটি। ওদিকে কেবল কফি খেয়ে খেয়ে মনে আছে ওখানে ভাল চা পেয়ে অবাক ও তৃপ্ত দুই-ই হয়েছিলাম।

যে নদী থেকে যোগ জলপ্রপাতের সৃষ্টি সেই নদীর নাম শরাবতী।

কিংবদন্তী এই যে ত্রেতা যুগে শ্রীরামচন্দ্র একবার এসেছিলেন এখানে। তিনি তৃষ্ণার্ত হয়ে এখানে একটুও জল পেলেন না। তখন তিনি শরবিদ্ধ করে ধরিত্রীবক্ষ থেকে ধারাজল বার করলেন, আর তাই থেকে বেরিয়ে এল তৃষাহরা প্রাণদায়িনী ধারা নদী, নাম হল শরাবতী। শরাবতীর তীরের গ্রামের নাম তীর্থহল্লি।

সিমোগা জেলায় এটি। সমুদ্রসমতা থেকে ১৯৬০ ফিট উঁচু।

এই শরাবতী নদীতে বাঁধ দিয়ে বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করা হয়েছে। তখন শুনেছিলাম নতুন শরাবতী ভ্যালি হাইডেল প্রজেকটের উদ্বোধন করা হয়েছে কিছুদিন আগে। চল্লিশ কোটির মত টাকা খরচ হবে এতে। মহাত্মা গান্ধী হাইডেল ওয়ার্কস-এ যে বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হয় তার আটগুণ বেশি শক্তি এই নতুন পরিকল্পনায় উৎপন্ন হবে, আর এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হলে মহীশূর সর্বাগ্রগণ্য রাজ্য হয়ে দাঁড়াবে। এক ইউনিট বিদ্যুৎশক্তির দাম মাত্র তিন-চতুর্থাংশ পয়সা হবে। তখন শুধু মহীশূরে নয়, বোম্বে মাদ্রাজ অন্ধ্র কেরালা প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকেও বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করতে সক্ষম হবে। এসব শুনে বেশ ভাল লেগেছিল।

বেলা একটা দেড়টার সময় ফিরে চললাম বাসে। শরাবতী ড্যাম পেরিয়ে।

পথ একই রকম। দু পাশে পাহাড় মাঝে লাল সুড়কির পথ। পাহাড়ের ওপর একটানা ঘন নিবিড় সবুজ আবরণ।

কাল যখন আসছিলাম মিঃ ভাস্কর বল-

গোমতেশ্বর—অতি কায় জৈনমূর্তি

ছিলেন, রাস্তাটা বড় খারাপ, বাঁধানো পীচের রাস্তা হওয়া উচিত। মাইশোর গভর্নমেন্টের দৃষ্টি দেওয়া উচিত একটু এদিকে। ব্যাঙ্গালোরে বিধানসৌধের পেছনে অত টাকা ব্যয় না করে কিছুটা এই রাস্তার পেছনে দিলেও পারতো।

ব্যাঙ্গালোরের বিধানসৌধ দেখবার মত। কিন্তু এই তাক লাগানো গোছের বিরাট সৌধটির পেছনে বিপুল অর্থ ব্যয় করা নিয়ে তখনকার মুখ্যমন্ত্রী হনমন্তাইয়ার বিরুদ্ধে সর্বত্র কঠোর সমালোচনা চলছিল।

বিকেল প্রায় চারটের সময় এলাম সাগর শহরে। এ অঞ্চলটি চন্দনের বন ও চন্দন-কাঠের কাজের জন্য বিখ্যাত।

আমরা বাজারে চন্দন কাঠের দোকান ও তার লাগোয়া কারখানা দেখতে গেলাম। চন্দন কাঠের তৈরী ছোট ছোট দেবদেবীর মূর্তি, বাকস, তার ডালার ওপর হস্তীযূথ খোদাই করা; নানারকম কৌটো, চন্দনকাঠের গুঁড়ো দিয়ে তৈরী মালা ও ছোট ছোট পাখী, জীবজন্তু অনেক দেখলাম।

ছোট ছোট কয়েকটি জিনিস কেনা হল। শুনলাম দোকানের জিনিসপত্র অধিকাংশই চলে গেছে মহীশূরে, সামনেই দশহরার উৎসব উপলক্ষে যে মেলা হবে তাতে বিক্রীর জন্য। সেই জন্য বেশি জিনিস দেখাতে পারছে না।

মহীশূরের দশহরা পরবাটের গণেশ চতুর্থী বা মাদ্রাজের বিনায়ক উৎসবের সমগোত্রীয়, কিন্তু এদের ঠিক সমশ্রেণীর নয়। বস্তুত এর এত জাঁকজমক এবং আড়ম্বর দেখে বোঝা যায় না উৎসবটি জাতীয় না রাজকীয়। আর এ দুয়ের একটি যে আর একটিতে মিশে যায় মাঝে কোন সীমারেখা না রেখে সেইটেই লক্ষ্য করবার মত।

আদিতে যখন বিজয়নগর রাজবংশ থেকে এই উৎসবটি প্রবর্তিত হয় তখন হয়ত যা ছিল রাজার ব্যসন, কিন্তু এখন এটি নিঃসন্দেহে জনতার আনন্দ প্রমোদে পরিণত হয়েছে। বহু পুরাতন এই উৎসবটিকে জনতা নিজেদের বলে ভাবতে শিখেছে। এখন ত সিংহগড়ের সিংহ গিয়েছে পড়ে আছে শুধু গড়। তবু সেই গড়কেই পুরো এক সপ্তাহ আলোকমালায় সজ্জিত করা হয় এবং উৎসবের সারা অনুষ্ঠানের সব খুঁটিনাটি বজায় রেখে সুসজ্জিত হাতীর ওপর স্বর্ণ সিংহাসনে বসে বর্তমান রাজ্যহীন রাজা শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন।

চন্দন কাঠের কারুশিল্প দেখা শেষ করে সন্ধ্যায় সাগর ছাড়লাম।

রাত সাড়ে নটা! সিমোগা স্টেশনে গাড়ি থামলো। আমাদের নামিয়ে নিতে গাড়িসহ লোক ছিল স্টেশনে, রওনা হলাম সার্কিট হাউসের দিকে।

ক্রিম্বিক জেলার সদর শহর হল সিমোগা, বড় শহর, প্রকাণ্ড প্রশস্ত পীচের রাস্তা! বোধ হয় কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে, জলসিক্ত রাস্তার ওপর আলোর ডোমগুলো ভিজছে, জনশূন্য রাজপথ। মফস্বল শহরে যেমন হয়ে থাকে, রাত দশটা না বাজতেই ঘুমিয়ে পড়েছে যেন সারা শহরটি।

শহরের রাস্তা শেষ হয়ে বাইরের সড়ক সুরু হল। সুরকির পথ, দু পাশে বড় বড় গাছ, রাতের অন্ধকারে কেমন রহস্যময় লাগছে।

এক সময় গাড়ি এসে সার্কিট হাউসের বিরাট কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢুকলো।

রাতটাই শুধু থাকবো সেখানে। সার্কিট-হাউসে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা বেশ ভালই ছিল।

খুব ভোরে উঠে দেখি চারদিকে অবারিত মাঠ, দূরে পর্বতশ্রেণীর নীলাভ রেখা। মেঘমুক্ত আকাশে আসন্ন সূর্যোদয়ের রঙ্গীন বর্ণাভাস। শীত শীত হাওয়া। আটটার মধ্যেই বাসে উঠলাম।

প্রথমে যাবো চিকমাগালুর! তারপর বেলুড় ও হালেবিডে।

বাস এগিয়ে চলেছে।

পাহাড়ের উপত্যকায় মাঝে মাঝে কফি বাগান দেখা যাচ্ছে। অজস্র কফির চাষ ও ফলন এ অঞ্চলে হয়।

কফিপ্রিয় দাক্ষিণাত্যবাসী।

এক এক জায়গায় কফিক্ষেত বড় মনোরম লাগছে। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে কফির চাষ করেছে, মাঝে মাঝেই আবার দীর্ঘশীর্ষ ইউক্যালিপটাস গাছের অরণ্য। তারই ফাঁকে ফাঁকে কফি বাগান। দূরে উপত্যকায় যেন সবুজ মখমল পেতে

দিয়েছে, এমনিই সবুজের সমারোহ। আর দূরে বাবা বুড়ন গিরিশ্রেণী আরো দূরে কোথায় যেন চলে গেছে।

আজ আর মেঘমলিন দিন নয় গিরি-সানুদেশে শুভ্র মেঘের চুম্বন।

এক পাহাড়ের মধ্য দিয়ে একটা মোড়ের পর কি রহস্য আছে আর একটা মোড়ে, দেখার জন্য তাকিয়ে আছি উন্মুখ হয়ে। তারপর...তারপর আশ্চর্য সবুজ [illegible] দূরে, চোখ ভরে গেল, মন ভরে গেল একটি অপরূপ দৃশ্য দেখে। দূরে লাল টালির ছাদ ছোট ছোট বাড়ী দেখা যাচ্ছে, গরু, ভেড়া, ছাগল, চরছে রূপে ভরা মধ্যাহ্নের রৌদ্রোদ্ভাসিত প্রান্তরের মধ্যে সবটা মিলিয়ে আশ্চর্য সুষম সুন্দর এক ছবি।

চিকমাগালুর।

বাস শহরের মধ্যে এসে থামলো।

[illegible] জানা গেল যে বেলুড়ের [illegible] একটা আর চারটেতে [illegible] এখন একটা প্রায় [illegible] থাকলে [illegible]

[illegible] আমাদের [illegible] নামিয়ে দিয়ে গেল। [illegible]

[illegible] বিরাট মাঠ, [illegible] মাঝের এক [illegible]

[illegible] নদীটির [illegible] মহীশূরের [illegible]

[illegible] উঁচু [illegible] দিয়ে চলে [illegible] দাক্ষিণাত্যের সর্বোচ্চ [illegible] অন্যতম।

এই [illegible] উপত্যকায় মক্কা থেকে [illegible] বাবা বুড়ন [illegible] চারা লাগিয়েছিলেন।

সে প্রায় [illegible] বছরের কথা।

এই হল এ অঞ্চলের কফির আবাদের প্রথম [illegible]।

বাবা বুড়নের নামানুসারেই নাকি এই পাহাড়ের নাম বাবা বুড়ন হয়েছে।

ওখানে মধ্যাহ্ন ভোজন কোনমতে সারা গেল।

ওখান থেকে বাসে বেলুড়ে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই পৌঁছানো গেল।

গাছপালার মধ্যে মধ্যে শহরের লাল টালির ছাদের ঘরবাড়ি, চমৎকার ল্যান্ডস্কেপ।

ঘোলা জলের ছোট্ট একটি পাহাড়ী স্রোতস্বিনীর ওপর দিয়ে বেলুড় শহরে ঢোকা গেল।

বাজারের মধ্য দিয়ে চললাম।

সরস্বতী (মহীশূরে)

একটু নোংরা আর ঘিঞ্জি বটে কিন্তু তেমন অপরিচ্ছন্ন নয়।

এখানকার গেস্ট হাউসের নাম প্রবাসী মন্দির।

সামনে পেছনে এখানেও অবারিত মাঠ।

দূরে সুউচ্চ পর্বতমালা।

খোলা মাঠের মধ্যে এখানে সেখানে দুচারখানা বাড়ি, এই হল শহর।

দু এক মাইলের মধ্যেই শহর শেষ। বলতে গেলে সমস্ত মহীশূরেই বিরল বসতির দেশ। ঘন বসতি কোন শহরেই নেই।

পশ্চিমবঙ্গ আর কেরালা ভারতবর্ষে সবচেয়ে ঘন বসতিপূর্ণ রাজ্য। পূর্ব-বাংলার শরণার্থীদের নিয়ে সেই দেশ-বিভাগের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার হিমসিম খেয়েছেন।

এখানেও কি তাঁদের পুনর্বাসন সম্ভব ছিল না?

দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে বাংলার নানাদিকে মিল। লোকজনের আকৃতি প্রকৃতি, আবহাওয়া অনেক দিকে মিল। অন্নের ভক্ত দুই-ই। অন্ন ছাড়া অন্য রুচি নেই। ধান্যলক্ষ্মীর অকৃপণ প্রসন্নতা এখানকার মাঠে মাঠে। বাংলারই মত অজস্র বারিপাত।

নানা দিকেই বাঙালীর বসবাসের অনুকূল পরিবেশ।

তাই মনে হয় পূর্ববাংলার দুঃখী উদ্বাস্তুরা এখানেও কেউ কেউ ঠাঁই পেতে পারতেন।

সন্ধ্যার আগেই বেরুলাম বেলুড়ের বিষ্ণু মন্দির দেখতে।

কাছেই বিষ্ণু মন্দির।

যাত্রী নিবাসের পাশের রাস্তা দিয়ে সোজা চলে গেলেই দূর থেকে দেখা যায় বিষ্ণু মন্দিরের প্রকান্ড গোপুরম। একজন গাইডও মিলে গেল।

রমা রাও নাম। জাতিতে ব্রাহ্মণ। এঁর বিরাশী বছরের বৃদ্ধ পিতা মন্দিরের পুরোহিতদের অন্যতম।

এঁদের দেশ মহারাষ্ট্রে, কিন্তু দীর্ঘকাল এদিকে থাকতে থাকতে মারাঠী ভাষাও প্রায় ভুলে গেছেন।

গোপুরমের প্রবেশপথে প্রশস্ত সিঁড়ির এক পাশে জুতো খুলে রাখলাম।

গোপুরমের দুপাশে দুটি সিংহ মূর্তি।

ভিতরে ঢুকে মন্দিরের বিশাল পাথরে বাঁধানো চত্বরের মধ্যে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেলে মূল মন্দির, তার ওপাশেও দুটি ছোট মন্দির আছে।

মূল মন্দিরে ঢুকতে বাঁ পাশে প্রস্তর-খোদিত সিংহ মূর্তি। তার গলদেশ বেষ্টন করে আছে একটি বালক। কোন হয়শালা রাজার কিশোর বয়সের বীরত্ব কাহিনীকে রূপ দেওয়া হয়েছে।

ডান পাশেও তাই।

বেলুড় ও হালেবিড়ের মন্দির দুটি মহীশূরের বিখ্যাত হয়শালা রাজবংশের কীর্তি।

মন্দিরের ওপরে নীচে, পাশে, দরজায়, প্রাচীরে, খিলানে, তোরণে সর্বদিকে প্রস্তর-খোদিত দেবদেবীর মূর্তি, বিষ্ণুর নানা অবতারের নানা লীলার।

ভেতরে মস্ত বড় মন্দির গৃহের মধ্যে বহু কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তর স্তম্ভ রয়েছে।

মোট আটচল্লিশটি স্তম্ভ এবং প্রতিটি স্তম্ভ আলাদা কারুকার্যমন্ডিত, কোনটার সঙ্গে কোনটার মিল নেই। অজানা শিল্পীরা কোন বিস্মৃতিতে মিলিয়ে গেছেন। কালের প্রহার এড়িয়ে সজীব রয়েছে প্রস্তরের মধ্যে তাদের অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি।

চেন্না কেশব অর্থাৎ কেশবসুন্দরের প্রতি উৎসর্গীকৃত এই মন্দির দর্শন করে ১৪৩৩ খৃঃ অব্দে ইরাণী পরিব্রাজক আবদুর রেজাক বলেছেন যে তিনি এই অদ্ভুত মন্দিরের বর্ণনা দিতে সাহসই করেন না পাছে কেউ বলে যে লোকটা অত্যুক্তি করছে।

বিগ্রহের দিকে আরো সামনে এগিয়ে দেখলাম একটি গোল চত্বর।

রাজা বিষ্ণুবর্ধনের রাণী শান্তলা নাকি নৃত্য করতেন এখানে দেববিগ্রহের সামনে।

দ্বাদশ শতকে (১১৭১ খৃষ্টাব্দে) *হয়শালা রাজবংশের রাজা বিষ্ণু বর্ধন এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।*

মন্দির ভবনের তিন দিকে তিন দরজা, পূবে উত্তরে আর দক্ষিণে। শিল্পীর চরম কল্পনা মূর্ত হয়ে আছে বিশাল দরজা-গুলির গায়ে।

মন্দির অভ্যন্তরে প্রস্তর স্তম্ভের গায়ে যেসব চিত্র আছে তার মধ্যে একটি দেখলাম শত্রুর সঙ্গে মেঘনাদের যুদ্ধ। মেঘের আড়ালে পুষ্পক রথে মেঘনাদ যুদ্ধ করছে তাঁর ধনুক নিয়ে, সারথি রথ চালাচ্ছে, রথের আকৃতিটি অনেকটা রকেট বা বোমার মত দেখতে।

মন্দির গৃহের বহিরঙ্গে কারুকার্য অনেক আছে কিন্তু মন্দিরের একান্ত অভ্যন্তরে স্তম্ভে দেয়ালে সিলিঙে, ব্রাকেট ফিগারে এমন অতুলনীয় কারুকার্য ভারত-বর্ষের অপর কোন হিন্দু মন্দিরে নেই এই দাক্ষিণাত্যের মন্দিরে ছাড়া।

গোল চত্বরের সামনেই বিষ্ণুর মূর্তি। দুয়ারে দ্বারী জয়া বিজয়া, ভিতরে সিংহাসনে ছোট বিষ্ণু মূর্তি, একপাশে শ্রীদেবী, একপাশে ভূদেবী, তার পেছনে মস্ত বড় বিষ্ণুমূর্তি, পরনে গরদের ধুতি, লাল পাড় বাসন্তী রঙ, নীল জামা গায়ে।

পীতবসন বনমালীর মাথার ওপরে রৌপ্যনির্মিত চালচিত্র।

শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্তি।

একটু পরে বিগ্রহের সামনে পর্দা টেনে ঢেকে দিলেন পুরোহিত।

সুরু হল কাড়া নাকাড়া নানা বাদ্যের গম্ভীর গম্ গম্ ধ্বনি।

বিশাল মন্দির গৃহের অভ্যন্তরে সেই মহানাদ ধ্বনিত হতে লাগল। হাত জোড় করে সবাই (স্থানীয় লোকও কিছু ছিল) দাঁড়ালেন দরজার দুপাশে।

একটু পরে পর্দা সরে গেল, ঝলমল করে শোভা পেতে লাগলেন চতুর্ভুজ দেবতা।

আবার সুরু হল আরতির বাজনা, প্রদীপ হাতে পুরোহিত আরতি করলেন। তারপর মন্দির মধ্যে দন্ডায়মান আর একজন পুরোহিতের হাতে প্রদীপ এগিয়ে দিলেন, তিনি সামনের দুপাশে শ্রীদেবী, ভূদেবীসহ নারায়ণ মূর্তির সামনে আরতি করে দুপাশে দ্বারী জয়া বিজয়ার সামনে আরতি করে সামনে এগিয়ে এসে প্রদীপ তুলে ধরলেন। সবাই ভক্তিভরে স্পর্শ করল শিখার আগুন, ছোঁয়ালো কপালে মাথায়। এরপর পুরোহিত আরতি সুরু করলেন পঞ্চপ্রদীপের ঝাড় দিয়ে, তেমনি করে ভূদেবী শ্রীদেবীসহ নারায়ণ মূর্তির সামনে আরতি করলেন, তারপর আরতি করলেন দ্বারী জয়া বিজয়ার মূর্তির সামনে।

আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন রমা রাও-এর বৃদ্ধ পিতা। তাঁর অঙ্গুলি নির্দেশে এক সময় থেমে গেল আরতির বাজনা। তার রেশ রয়ে গেল বাজনা থামবার পরও অনেকক্ষণ। সমবেত জনতা মুদিত চক্ষে হাতজোড় করে রয়েছে তখনো।

এক সময় বেরিয়ে এলাম।

ভেতরে স্তম্ভগাত্রে, বাইরে প্রাচীরগাত্রে খোদিত অসংখ্য মূর্তি, অসংখ্য চিত্র!

কোন স্তম্ভ বেষ্টন করে আছে কারু-কাজকরা প্রস্তরবলয়। মন্দিরের ভেতরে ঢুকতে ওপরে মাঙ্কি ক্যাপ পরা মূর্তি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, তখনকার দিনে কেমন আধুনিক টুপি ছিল ভাবতে আশ্চর্য লাগল।

বাইরে প্রস্তর চত্বরের ওপর একটা স্তম্ভ দেখলাম। স্তম্ভটির বিশেষত্ব এই যে এটা বাইরে থেকে তৈরি করে এখানে এনে স্থাপন করা হয়েছে। এমন কি স্তম্ভের পাদমূলকে ভিত্তির সঙ্গে গেঁথেও দেওয়া হয়নি। এটা যে ভিত্তির সঙ্গে গাঁথা নেই সেইটে পরখ করার জন্য আমরা টর্চের আলো ফেলে দেখলাম স্তম্ভটির পায়ের নীচের দিকে আলোর রেখা একদিক থেকে অন্যদিকে বেরিয়ে আসছে।

স্তম্ভটি অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আজ থেকে নয়, সেই সুদূর দ্বাদশ শতাব্দী থেকে।

রাতের বয়স বাড়তে লাগল দাক্ষিণাত্যের সেই সুদূর নির্জন গ্রামে।

মন্দির থেকে বেরিয়ে বিশাল গোপুরমকে পেছনে রেখে রাস্তায় নামলাম আমরা।

ডাকবাংলোয় ফিরতে হবে।

ডাকবাংলোতে রাতের আহার সেদিন অত্যন্ত উপাদেয় হয়েছিল মনে আছে; বাবুর্চিটি অত্যন্ত কীরিৎকর্মা ও চটপটে ছিল।

পরদিন সুপ্রভাত জানালো চারদিকের সবুজ মাঠ, দূরের নীলাভ পাহাড়।

এবার যাবো হালেবিডে!

মাত্র দশ মাইলের পথ। দূরদূরান্ত পরিব্যাপ্ত দাক্ষিণাত্যের মালভূমি যতদূর দৃষ্টি যায় অপূর্ব অপরূপ।

গাড়ি এসে দাঁড়ালো হালেবিডের বিখ্যাত শিবমন্দিরের সামনে।

হালেবিডে হয়শালা রাজবংশের রাজধানী ছিল। এর স্থাপত্যকলার অনেক কিছুই মুসলমান আমলে বিধ্বস্ত হয়েছে ১৩১০ খৃঃ অব্দে।

কিন্তু এই শিবমন্দিরটি আজও অক্ষত আছে।

বেলুড়ের বিষ্ণু মন্দির নির্মাণের দশ বছর পর রাজা বিষ্ণুবর্ধন এই মন্দির নির্মাণ শুরু করেন। দীর্ঘ আশি বছর প্রায় দুই পুরুষের অনলস অবিরাম শিল্প-সাধনার পরও এটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

মন্দির অভ্যন্তরে বিরাট শিবলিঙ্গ দর্শন করলাম। ইনি বিষ্ণুবর্ধন হয়শালেশ্বর।

এই মন্দিরের দুটি গর্ভ গৃহ, দুটিরই পৃথক দরজা আছে, একটি প্রশস্ত বারান্দা দ্বারা সংযুক্ত দুটি গর্ভগৃহ।

অপর গর্ভগৃহেও বিপুলাকৃতি শিব-লিঙ্গ রয়েছেন, ইনি শান্তলেশ্বর।

(আগামীবারে সমাপ্য)

(১)

বারান্দা থেকে দেখা যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে পর পর দুটো ঠ্যালাগাড়ি চলেছে কোনো একটা সংসারকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় বয়ে নিয়ে। অবশ্য যদি ওই মালপত্রগুলোকে সংসার বলতে হয়।

দেখতে অদ্ভুত লাগে। যে সব জিনিস-পত্র একটা পুরো বাড়িতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হয়েছিল, সেগুলোকে একত্র ডাঁই করে তুলে দেওয়া হয়েছে ওই ঠ্যালা দুটোয়।

মলিন বিবর্ণ চৌকী আলমারি দেরাজ আয়না আলনা টেবিলের সঙ্গে ঠাসাঠাসি চলেছে অপেক্ষাকৃত শৌখিন নতুন একটা সোফা চেয়ার বুককেস। আর ওদেরই খাঁজে খাঁজে কৌশলে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে ভাঁড়ার ঘরের চাল গম ডাল মশলার শিশি বোতল, টিন জার ড্রাম।

সবই কেমন শ্রীহীন বিবর্ণ।

যার সংসার, সে লোকটা যে বিশেষ মেকদারের লোক নয়, তা বোঝা যাচ্ছে। আর তা হলে তো তার সংসারটা লরীর ওপর চড়ে বসতো। বোঝাই হতো চকচকে ঝকঝকে মালপত্রে। লোকটা এযাবৎ নেহাৎই ওই ঠ্যালাগাড়িটার মতই ঠেলে ঠেলে সংসার চালিয়ে এসেছে নড়বড় করতে করতে।

এটা মালুম হচ্ছে ওই জিনিসগুলোর চেহারা থেকে।

ওগুলো যখন একটা বসবাসের মতো বাড়ির মধ্যে সাজানো থাকতো, তখন হয়তো ওদের ওই জীর্ণ বিবর্ণ পুরনো চেহারাগুলোর মধ্যেও একটা শ্রী ছিল, শোভা ছিল, কাছাকাছি গেলে হয়তো দেখা যাবে, ওই টিন কৌটোর গায়ে গোছালো গৃহিনীর হাতের মার্কা টিকিট মারা—'বেসন' 'কালোজিরে' 'হিং' 'মরিচ গুঁড়ো'।

আর হয়তো ওই কুৎসিৎ রংচটা ট্রাংক বাক্সগুলোর ওয়ার আচ্ছাদনও খুঁজে পাওয়া যাবে এধারে ওধারে। শাড়ির পাড় জুড়ে জুড়ে অথবা সস্তা ছিট দিয়ে তৈরী যেগুলো।

হয়তো পুরনো রঙিন শাড়ি থেকে বানানো পর্দায় দরজা জানলা ঢেকে, আর তুলো বেরোনো ছেঁড়া তোষককে নতুন সুজনি ঢেকে সৌষ্ঠব বজায় রেখে চলা হচ্ছিল, সেই শোভা সৌষ্ঠব ধূলিসাৎ হয়ে গেল, সংসারকে টেনে হিঁচড়ে ঠাঁই-বদল করতে গিয়ে।

পিছনের ঠ্যালাটা আরও কুদৃশ্য।

সংসারের অন্ত্যজ জিনিসগুলোর সদগতি করা হয়েছে তার ওপর দিয়ে। বালতি মগ তোলা উনুন, কাপড়কাচা গামলা, ঝাঁড়ু চুপড়িতে ভাঙা কয়লা, কাটা কাঠ, কয়লা ভাঙা হাতুড়ি, মরচেপড়া শূন্য পাখির খাঁচা।

তার মানে লোকটা সংসারই ওঠাচ্ছে নিজে উঁচুতে উঠছে না। উঠলে এই জঞ্জাল-গুলোও বয়ে নিয়ে যেত না, ফেলে দিয়ে যেত।

বলতো, 'আ ছি ছি, এগুলো কখনো সে বাড়িতে মানায়?'

ভাগ্যের ওঠাপড়াতেই 'সংসার ওঠানো'র দরকার পড়ে। ভাগ্যের প্রসন্ন প্রসারিত হাত যখন গলি থেকে বড় রাস্তায় বার করে নিয়ে যায়, একতলার স্যাঁৎসেঁতে ঘর থেকে তিনতলার মোজাইক মেজেয়, তখন ওই দরকারটা আসে, আবার যদি সেই ভাগ্যের রূঢ় হাত তিনতলা থেকে ঠেলে ফেলে দেয় নীচের তলায়, জীবনের সুরেলা ছন্দ থেকে ছন্দপতনের বিশৃংখলার মধ্যে তখনও আসে দরকার।

শুধু শুধুই সংসার ওঠানো, এটা দৈবাৎই ঘটে।

যেমন আমাদের ছেলেবেলায় ওই ঘটনাটা ঘটতে দেখতাম।

কিন্তু ওইগুলোই কি 'সংসার?'

ওই শিশি কৌটো টিন ড্রাম বালতি মগ খাট আলমারি, কয়লা ভাঙা হাতুড়ি মশলা বাটা শিল?

তাই হবে হয়তো, তা নইলে মা কেন বলতেন, 'সংসার ওঠাতে ওঠাতেই আমার জীবন গেল।'

ওইগুলোকেই তো 'সংসার' বলতেন মা।

বাবাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে জোরে জোরে বলতেন, 'জীবনে কখনো স্থস্থিত করে সংসার করতে দিলে না তুমি আমায়। বেদের টোলের মত পাতছি আর তুলছি।'

বাবা যে এতে খুব একটা বিচলিত হতেন তা নয়, তখনকার মতো সরে পড়তেন।

আমাদের কাছে কিন্তু ওই সংসার ওঠানোটা রীতিমত একটি আহ্লাদের ব্যাপার ছিল। এক বাসা থেকে অন্য বাসায়, এক পাড়া বদলে অন্য পাড়ায়, সে এক উত্তেজনাময় রোমাঞ্চ।

বাড়ি ওঠা মানেই তো সংসারের নিত্য ছন্দ তছনছ হয়ে গিয়ে একটা বিশৃংখল অবস্থা। আর ছেলেবেলার মনে তো বিশৃংখলাতেই উল্লাস। যেদিন বাড়ি বদল হবে, তার দুচার দিন আগে থেকেই ওই ছন্দে হাত পড়তো, ভারী জিনিসগুলো নড়িয়ে সরিয়ে একত্রে জমা করা হতো, কাঁচের বাসনপত্র, মায় খেলনা পুতুলের আলমারির সব জিনিস সাবধানে সন্তর্পণে আলাদা আলাদাভাবে বেঁধে একধারে রাখা হতো, দেয়ালের ছবিটবি নামিয়ে ফেলা হতো, আমাদের ক'ভাইবোনের বইখাতা শেলেট পেন্সিল দোয়াত কলম প্রায় সবই প্যাক করে ফেলা হতো। অতএব অবস্থাটা মনোরম তাতে আর সন্দেহ কী?

ওই প্যাক করার ব্যাপারে আমাদের মেজদাই ছিল সবচেয়ে উৎসাহী। কোথা থেকে যেন ভাল ভাল ব্রাউন পেপার সংগ্রহ করে এনে ফেলতো, আর পরিপাটি করে মুড়ে ফেলে দড়িটড়ি বেঁধে রেডি করে রাখতো।

বাবার চোখে পড়লে বাবা হয়তো বলতেন, 'তা সবই বা বেঁধে ফেলছিস কেন? এই দুদিনও তো পড়বি?'

মা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠতেন, 'হ্যাঁ এই দুদিন যা পড়বে, তা জানাই আছে, মিথ্যে ছড়িয়ে রেখে হারিয়ে টারিয়ে যাক।'

ছেলেমেয়েদের মানে মেয়েদের কথাতো চুলোয় যাক ছেলেদের পড়া নিয়েও মা বড় মাথা ঘামাতেন না। হয়তো তখনকার

কালের অধিকাংশ মা-ই নয়। একালের মতো, ছেলেমেয়ের পরীক্ষা মারই পরীক্ষা এমন অবস্থা কারুরেই ছিল না। ওটা ছিল ছেলেদের নিজেদের এবং পুরুষ অভিভাবকদের ব্যাপার। বড় জোর নিয়মমাফিক সময় 'পড়তে বসার' জন্যে তাড়াটা লাগানো পর্যন্ত মায়ের এলাকা ছিল।

আমাদের মাও দাদা মেজদাকে সকাল সন্ধ্যে ওই তাড়াটি লাগাতেন, 'এতখানি বেলা অবধি বিছানায় পড়ে আছিস যে? পড়তে বসতে হবে না?' অথবা, 'এই সন্ধ্যে অবধি হুটোপাটি করছিস যে? লেখাপড়া নেই?'

বাস ওই পর্যন্তই।

কেউ বেড়াতে এলে টেলে যদি জিগ্যেস করতো 'ছেলেদের কার কোন ক্লাশ হলো?' মা তখন ওই ছেলেদেরই জিগ্যেস করতেন, 'কোন ক্লাশ হলো রে তোর?'

এতে মাতৃকর্তব্যের ত্রুটি হচ্ছে, বা মাতৃগৌরবের হানি হচ্ছে এমন কথা ভাবতেন না মা। অথবা কোনো মায়েরাই। তবে ব্যতিক্রম যে ছিল না তা নয়, আমার সেজমামীকে দেখেছি 'পড়া পড়া' করে ছেলেদের উৎখাত করে মারতেন।

অজ্ঞানে বিজ্ঞানে মাঝে মাঝে বলতো, 'বাবা বাবা, তুমি এমন করো! মরে যেতে ইচ্ছে হয়। বাড়িতে বিয়ে লেগেছে তাও পড়তে হবে! কই পিসি তো এমন করে না, এই তো ওরা সাতদিন ধরে এসে বিয়ে বাড়িতে আমোদ করছে, বই খাতা আনেই নি।'

মা বলতেন, 'বই খাতা আনলেই যেন পড়তো!'

সেজমামী রেগে রেগে বলতেন, 'আমাদের পিসির ছেলেরা যেমন মাথাওলা, তোমরা তেমন? ওরা না পড়েও ভালো করে পাশ করে। তোমরা পারবে তা? ফেল করে মা বাপের মুখে চুনকালি দেবে।'

মা বলতেন, 'সেজবৌয়ের যেমন কথা। অমুদর লোকের ছেলে আবার ইস্কুলে ফেল করবে কী? সেজদার ছেলে নয়? সেজদা বরাবর ফার্স্ট হতো না? সমানে জলপানি পেতো না? বাপের মাথার এক ছটাক পেলেও নিশ্চিন্দি।'

সেজমামী খুব রেগে যেতেন।

—সেজমামার বিদ্যাবুদ্ধির প্রশংসা করলে, কেনই যে রেগে উঠতেন সেজমামী তা বুঝতাম না।

মা বলতেন, 'ওটা পাগল।'

দাদার স্ত্রী হলেও মায়ের থেকে বয়েসে বেশ কিছু ছোট ছিলেন সেজমামী।

সে যাক্, ওই বালকদের ছুতোয় মায়ের 'মাথাওয়ালা' ছেলেরাও মনের আনন্দে বেশ কয়েকদিন 'স্বরাজ' পেয়ে নিতো। নতুন বাসায় গিয়েও তো পাকা খালে 'গোছগাছ' করতে কিছু কিঞ্চিৎ সময় লাগবে? দেখতে হবে তো কোন ঘরটা পড়াশুনোর পক্ষে সুবিধে, কোন জানলা দিয়ে ভালো আলো আসে। হয়তো এক-আধবার পাড়া ছেড়ে দূরে চলে আসার জন্যে ইস্কুলও বদল করতে হতো। অতএব বেশ কিছুদিন মজা!

এখন এ কথাটা ঘোরতর অবিশ্বাস্য হলেও, তখন খুব একটা অসম্ভব ছিল না। বাড়ি বদল, ইস্কুল বদল, এটা কিছু শক্ত ব্যাপার ছিল না। দূরে চলে গেলে ইস্কুল বদলাতে হবে, এতো স্বাভাবিক। হেডমাস্টারমশাই সেটা বুঝতেন, এবং ট্রান্সফার সার্টিফিকেটও লিখে দিতেন।

কিন্তু সত্যি বলতে—এতৎসত্ত্বেও আমার দাদাদের ফেলটেল করতে দেখিনি কখনো। হয়তো—সেজমামীর কথাই সত্যি!

আর আমাদের?

মানে মার মেয়েদের? সে দুঃখের কথা না তোলাই ভালো। মনে পড়লেই বেদনায় হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়। দিদির 'বড়ো হয়ে' যাওয়ার ভয়ংকর কারণে, দিদির আর আমার একসঙ্গেই ইস্কুলে যাওয়া খতম হয়ে গেল। মা বললেন, 'ছ ক্লাশ তো পড়া হলো সুনীর, আর কেন? এবার ঘর সংসারের কাজ শিখুক! পরের ঘরে যেতে হবে না?'

আর আমার ব্যাপারে?

সেও সোজা হিসেব।

'দুই বোনে একসঙ্গে যেতো, সে একরকম ছিল। একলা আর কী যাবে? তাছাড়া—আর দু' বছর পরে তো ছাড়িয়ে নিতে হতোই। দু' বছর কি, বুচির যা বাড়ন্ত গড়ন, হয়তো দু' বছরও রাখা যেত না।'

দিদির নাম সুনীতি, আমার নাম সুরুচি।

এই নাম দুটো কে রেখেছিল আমাদের জানা নেই। তবে ছেলেবেলায় নিজের নিজের নামের জন্যে খুব দুঃখ অনুভব করতুম।

সুনীতি সুরুচি বললেই তো ধ্রুবর কাহিনী মনে পড়ে যাবে।

ধ্রুবর সেই হিংসুটে অহংকারী সৎমার নামটাই বা মেয়ের জন্যে রাখতে ইচ্ছে হয়েছিল কেন ওঁদের, আর সেটাই আমার ভাগে পড়লো কেন, এই ছিল আমার আক্ষেপ আর অভিযোগ।

তবে এমনিই বোকা ছিলাম, নামটাকে যে চেষ্টার জোরে বা আবদারের জোরে পালটে নেওয়া সম্ভব এমন কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না। জানতাম নামটা জন্মমৃত্যুর মতই অমোঘ অলঙ্ঘ্য। একবার যে নাম ঘড়ে এসে জেঁকে বসেছে, তাকে আর নড়ানো চড়ানো যায় না।

অথচ এখনকার চালাক চালাক মেয়েগুলো? কেমন সব অপছন্দের নামটা পালটে নিয়ে নিজেরাই নিজেদের নামকরণ করে নিচ্ছে।

এই তো উমাদিদির মেয়ে?

নাম ছিল বীণা, ও তাকে বদল করে [illegible] ছোটো থেকে স্কুল ফাইনাল দেবার পর কলেজে ভর্তি হবার সময় কী কৌশলে কে জানে শোভনা থেকে শুচিনা হয়ে বসলো।

আর আমি আজও সেই অমোঘের চরণে আত্মসমর্পণ করে বসে আছি। বাবা আমার অভিযোগের উত্তরে বলতেন, 'ধ্রুবর সৎমার কথা ভুলে যাওনা, কথাটার মানেটাই ধরো না।'

তখন অবশ্য তাতে প্রবোধ মানতাম না, এখন বাবার উপদেশটাই মনে রাখতে চেষ্টা করি।

কিন্তু সে কতো যুগ আগের কথা?

যখন দিদি আর আমি বাসাবদলের উত্তেজনায় অন্ধকার থাকতে ঘুম থেকে জেগে পড়তাম, আর বিছানায় শুয়ে শুয়েই তখন আলোচনা করতাম আগামী বাড়িটা কেমন হবে।

কোনো কোনোবার অবশ্য বাবা ওই সংসার ওঠানোর আগে মহোৎসাহে আমাদের সবাইকে নিয়ে বাড়ি দেখাতে নিয়ে যেতেন।

একটা সেকেন্ড ক্লাশ ঘোড়ার গাড়িতে চেপে বাবা মা দাদা মেজদা আর দিদি আমি বাড়ি দেখতে যেতাম। সে কী উল্লাস! একখানা সেকেন্ড ক্লাশ গাড়িতে মাত্র ছ'জন, এ প্রায় বিলাসিতার সামিল ছিল। দেওঘরের পেঁড়া এবং পুরীর জাল নিয়ে সর্বসাকুল্যে দশ বারোজনকে চড়তে দেখেছি আমরা।

আমাদেরই বড়পিসিমা আসতেন তাঁর দশ ছেলেমেয়েকে নিয়ে। পিসেমশাই আর বড় তিন ছেলে গাড়ির ছাতে উঠতেন, বাকিদের নিয়ে বড় পিসিমা গাড়ির গহ্বরে।

তাও থার্ডক্লাশ গাড়ি।

বাবা ওটা দুচক্ষে দেখতে পারতেন না, 'থার্ডক্লাশ' ঘোড়ার গাড়িকে তিনি 'ছ্যাকড়া গাড়ি' আখ্যা দিতেন, এবং বেশ নীচু চোখে দেখতেন। ওতে যেন প্রেস্টিজের হানি হয়।

বেশ ক্ষুব্ধ হয়েই বলতেন, 'বড়দি যে কেন ওই ছ্যাকড়া গাড়িগুলোয় আসেন!'

ছেলেবয়সের চোখে কিন্তু ওই থার্ড-ক্লাশ সেকেন্ড ক্লাশের তারতম্য ধরা পড়তো না। দুটোই তো বাবা ঘোড়ায় টানা, দুটোই তো দরজাওলা ছোট্ট ঘরের মতো? দুটোতেই 'কচুয়ান' ছপটি উঁচিয়ে উঁচিয়ে 'রোকখে' 'রোকখে' করে চেঁচাতে চেঁচাতে যায়। তবে?

তবেটার মানে পরে বুঝেছি!

তখন বুঝতাম না।

মনের আনন্দ ওই গাড়িটানা ঘোড়াদের মতই টগবগ (অবশ্য মনে মনে। মেয়েদের টগবগ করা নিষেধ ছিল)। করতে করতে গাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়তাম। গাড়ির একদিকের জানলা খোলা থাকতো, সেদিকে বাবা আর দাদারা বসতেন, অন্যদিকের জানলা বন্ধ থাকতো, সেইদিকে মা আর আমরা বসতাম। দিদি মাঝে মাঝে জানলার পাখি তুলে আঁখি পাখিকে বাইরের জগতে প্রেরণ করতে চাইতো, কিন্তু মার চাপা ধমকে নিবৃত্ত হতে হতো তাকে।

মা বলতেন, 'কী হচ্ছে কী? রাস্তার লোক কী বলবে?'

'কী বলবে' সে প্রশ্নের উত্তর চাইবার সাহস ফাহস ছিল না আমাদের। আর থাকলেই বা, মারই কি জানা ছিল উত্তরটা?

'লোকে কি বলবে?'

এই প্রশ্নটাই ছিল একমাত্র সত্য।

বাড়ি দেখে কখনোই কিন্তু হতাশ হতাম না আমরা. দিদি আর আমি দুজনেই বোধকরি নতুনের ভক্ত ছিলাম। তাই তখুনি চুপি চুপি ঠিক করে ফেলতাম কোনখানে আমাদের জিনিসপত্তর রাখবো. কোনখানে আমাদের 'খেলাঘর' পাতবো।

হ্যাঁ খেলাঘর একটা থাকতো বৈকি। শুধু আমাদের নয়, আমাদের কালের সব মেয়েরই। একটা খেলাঘর থাকবে না, এমন নিঃস্ব দুঃস্থ অবস্থা কেউ কল্পনাই করতে পারতো না।

আমরা বেশীর ভাগই ছাতে ওঠার সিঁড়ির মধ্যবর্তী বড় সিঁড়িটাকে নির্বাচন করতাম। ওই জায়গাটাই বাড়ির মধ্যে সব থেকে নিরিবিলি, আর অন্যের পদপাতের আশঙ্কা কম।

ছাতে আর কে কত ওঠে?

দৈনিক কাপড়চোপড় শুকোনো তো বারান্দাতেই হয়ে যায়, ছোটখাটো বিছানা পত্রও। ঘটা করে বিছানা রোদ্দুরে দেওয়ার থাকলে আলাদা কথা। আর শীতকালে মা মাঝে মাঝে উঠতেন বড়ি দিতে।

মার বড়ি দেওয়ার দিন ঝি সক্কালবেলা

গিয়ে ছাতে ঝাঁটা বুলিয়ে মার ভাষায় 'ঝাঁটা মেরে' আসতো, তারপর মা গিয়ে খানিকটা গঙ্গাজল ছিটিয়ে দু' তিনটে কুলো কি ডালায় তেল মাখিয়ে রোদে রেখে আসতেন, অতঃপর ডাল বাটার গামলা নিয়ে উঠে যেতেন দীর্ঘসময়ের জন্য।

মা যখন নেমে আসতেন, তখন মার ফর্সা মুখটা লাল লাল হয়ে উঠতো, আর ওই শীতকালেও ঘাম গড়াতো কপালে গালে।

দাদা বলতো, 'আচ্ছা এই বড়ি ব্যাপারটা কি অনিবার্য? না হলে চলে না?'

মা অবাক হয়ে বলতেন, 'ওমা! ছেলের কথা শোনো! বড়ি না হলে গেরস্তবাড়িতে চলে?'

'কিনতে টিনতে পাওয়া যায় না?'

মা অবলীলায় বলে উঠতেন, 'তা হয়তো যায়। কলকাতার শহরে কড়ি ফেললে বাঘের দুধ মেলে তো বড়ি! কিন্তু কেনা বড়ি? গলায় দড়ি আমার!'

গলায় দড়ির পর তো আর কথা চলে না! অতএব দাদা বলতো, 'যাও মুখটা ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে একটু ছায়ায় বোসো গে।'

মার ওপর দাদার একটু বেশী মায়া ছিল। যেন মা একটা বাচ্চা মেয়ে, আর দাদা তার অভিভাবক। এটা আমাদের কাছে বেশ মজার লাগতো।

অথচ মেজদা ঠিক বিপরীত ছিল! মেজদাকে বরং মার শাসনকর্তা বলা চলতো।

মা কোনো কিছু নিয়ে আক্ষেপ জুড়লেই মেজদা কাছে গিয়ে বলতো, 'বকবক করলেই তোমার সব দুঃখ নিবারণ হয়ে যাবে?' বলতো, 'ছোটখাটো সব ব্যাপার নিয়েই আক্ষেপ করলে, বড় ব্যাপারগুলোর আর গুরুত্ব থাকে না মা! ঝি আসতে দেরী করলে তুমি এমন করো যেন তোমার ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে গেছে।'

মা রেগে উঠে বলতেন, 'দেরী করে এলে কতোটা অসুবিধে তোরা বুঝিস?'

মেজদা বলতো, 'বুঝবো না কেন? তবে এটাও বুঝি তোমার বাক্যবাণে তাকে তার বাড়ি থেকে নিয়ে এসে তোমার চরণে এনে ফেলতে পারবে না।'

মেজদা সব সময় একসঙ্গে অনেকটা কথা বলতো। দাদার কথার অভ্যাস ছিল ছোট ছোট টুকরো টুকরো। দুজনে দু'রকম।

জীবনের পথেও দুজনে দু'পথে এগিয়েছে। দাদা বেছে নিয়েছিল অধ্যাপনার পথ, আর মেজদা 'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীর' নীতি অনুসরণ করে অনেক ওঠাপড়ার পর অবশেষে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

কিন্তু সে তো মেজদা।

বাবা চিরদিনই একাসনে অবিচল ছিলেন। কোনো এক সাহেব কোম্পানীর বড়বাবু।

আমাদের যে অনবরত সংসার ওঠানো হতো, সেটা ভাগ্যের উত্থান পতনে নয়, স্রেফ বাবার বাতিকে।

বাড়ি বদল, বাবার একটা বাতিক ছিল। সেকালে 'হবি' কথাটা চালু ছিল না তাই বাতিকই বলা হতো। এ যুগের চালু ভাষায় বলতে পারা যায় ওটাই বাবার 'হবি' ছিল।

আর সেই স্বর্ণযুগে সে হবিতে অসুবিধেও বিশেষ ছিল না। বাড়ি বদলাতে ইচ্ছে হলে, উপযুক্ত ভাড়া দিতে চাইলে বাড়ি পাওয়া যাবে না, এমন অ্জগুবি কথা কেউ ভাবতেই পারতো না।

তবে আর 'ভাড়াটে বাড়ি' বলেছে কেন?

আমাদের জ্যাঠা কাকারা যে বাড়িতে থাকতেন, সেটা নাকি আমাদের ঠাকুদ্দার তৈরী। অতএব বাবার পৈত্রিক বাড়ি। তবু বাবা স্বেচ্ছায় তার সব দাবিদাওয়া ত্যাগ করে চলে এসেছিলেন, শুধু 'একঘেয়ে পচা পাড়ায় আর থাকা যায় না বাবা' বলে। এটা আমরা একটু বড় হয়ে শুনেছি।

মার অসন্তোষ বাণীর মধ্যে থেকেই উদ্ধার করেছিলাম আর কি!

মা বলতেন, 'নিজের ভাল লাগেনি লাগেনি, বাহাদুরী করে দাবিদাওয়া ত্যাগ করলাম বলে লেখাপড়া করে দিয়ে আসার কী ছিল? আমার ছেলে দুটোতো বঞ্চিত হলো?'

বাবা হেসে উঠে বলতেন, 'সিঁড়ি ভাঙা অঙ্কের নিয়মে তোমার দুটো ছেলের ভাগে তো একটা ঘর জুটতো, কী করতো নিয়ে? মশারির পার্টিশান দিয়ে দুই ভাই বৌ নিয়ে শুতো?'

মা এরকম ব্যঙ্গবাণীতে দারুণ চটে যেতেন, আর বাবার ছিল ওই রকমই কথার ধরন। মা চটেমটে বলতেন, 'নাই শুতো, চাবি দিয়ে দখল রেখে আসতো।'

বাবা বলতেন, 'চমৎকার! তুমি কেন উকিল হওনি তাই ভাবি!'

'বেশ তা না হয় নাই হলো, ও'রা তো তোমার অংশের জন্যে কিছু টাকাকড়িও ধরে দিতে পারতেন!'

বাবা এক্ষেত্রে গম্ভীর হয়ে যেতেন।

গম্ভীর হলেও হেসেই বলতেন, 'ও বাবা, এ যে দেখি উকিল টুকিল নয়, একেবারে এ্যাটর্নি! তা টাকাকড়িটা কে দেবে?'

'কেন, বটঠাকুর ঠাকুরপোরা?'

'কোন দায়ে? তাঁরা কি আমায় তাড়িয়ে দিয়েছেন? বলেছেন, 'তুই এ বাড়ি থেকে চলে যা?' তাই খেসারৎ দেবেন? ওসব তুচ্ছ কথা নিয়ে মাথা ঘামিও না বুঝলে?' মা চুপ করে যেতেন। লজ্জায় কি রাগে কে জানে। আমরা অবশ্যই বাবার পক্ষে ছিলাম।

কারণ আমরা বাবার সেই পৈত্রিক বাড়িতে যখনি বেড়াতে বা কাজেকর্মে গেছি, আমাদের দম আটকে আসতো যেন। কেমন একটা বুকচাপা ভাব, সারা বাড়িটা জিনিসে বোঝাই, কতো যে লোক তাদের ঠিক করতে পারতাম না। মনে হতো কতোক্ষণে পালাবো। অতএব বাবাকে মনে মনে ধন্যবাদ না দিয়ে পারতাম না।

মাও কি আর তা না দিতেন?

মারই কি আমাদের ওই কাকিমা জ্যাঠিমাদের মতো কাট করে থাকতে ইচ্ছে করতো? তবু—বাবাকে দোষ দেওয়ার একটা উপলক্ষ পাওয়া গেলে ছাড়বেন কেন? ও জিনিসটা আদৌ ছাড়তে রাজী হতেন না মা।

দিদি আর আমি আড়ালে কানাকানি করতাম, 'ইস! ভাগ্যিস বাবা তখন মার কথা শোনেন নি! শুনলে আমাদের কী দশাই হতো!'

আমরাও যেন ধরে নিয়েছিলাম একটানা অনেকদিন একটা বাড়িতে থাকা খুব কষ্টকর।

এমনও হয়েছে কখনো কখনো, একই পাড়ার মধ্যেই অন্য বাড়িতে উঠে যাওয়া হতো। আসলে 'টু-লেট' দেখলেই বাবার মন নিসপিশ করে উঠতো। আর সেটা তো সচরাচরই দেখা যেতো।

অনেক দেখে শুনে, অনেক বুঝে সুঝে একটা বাড়িতে আসা হতো, বাবা বলতেন, বাস! এইবার স্থিতি বুঝলে নবৌ, এবার তোমার সংসারকে যতো পারো গুছিয়ে নিয়ে বোসো। এ বাড়ির তুলনা হয় না।'

কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই বাবার চোখে বাড়িটার নানান খুঁৎ ধরা পড়তে শুরু করতো।

তখন মার সঙ্গে কথা কাটাকাটি চলতো।

বাবা বলতেন, 'এ বাড়ির বারান্দাটা বড় হলে কি হবে, দক্ষিণে নয়।'

মা বাবার মতলব বুঝে ফেলে রেগে গিয়ে বলতেন, 'কেন পুবেই কি খারাপ?'

'দক্ষিণের মতন তো নয়।'
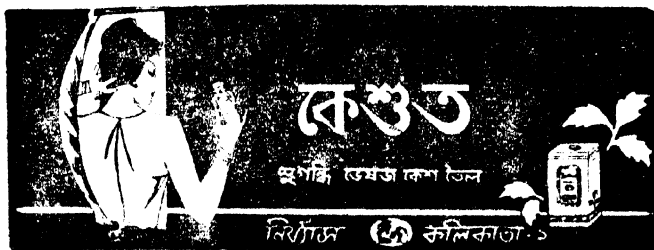
'আসার সময় তো খুব পছন্দ করে ঢুকলে।'

'তখন বর্ষাকাল, অতোটা বুঝিনি।'

'ঋতুতে ঋতুতে বাড়ি বদলাবে নাকি তুমি? নবাব না বাদশা?'

'তা' সামান্য চেষ্টায় যদি নবাব বাদশার সুখটা পাই মন্দ কী?'

'এ বাড়ির মতন গোছানো রান্নাঘর ভাঁড়ারঘর আর জোটাতে পারবে তুমি?'

'এর থেকে ভালও জোটাতে পারি। এ বাড়িতে রান্নাঘরে কল নেই, এবার সে রকম বাড়ি দেখবো।'

'এ বাড়ির ঘরগুলো কতো বড় বড়—'

'এর থেকে অনেক বড় ঘরওলা বাড়ি কলকাতা শহরে আছে।'

'থাকবে না কেন, রাজপ্রাসাদও আছে। গুড় ঢাললেই মিস্টি।'

'তবে সাধ্য মতন গুড়টা ঢালাই তো ভাল।'

'কেবল ওই ভালটাই দেখবে তুমি?' মা বেশ জোরে জোরেই বলতেন, কেবল ভাল বাড়িতে আরাম করে থাকা এই সার লক্ষ্য হবে মানুষের? আখের ভাববে না?'

বাবা হেসে উঠতেন 'আখের? ওটা কেউ ভেবে কিছু করতে পারে তোমার বিশ্বাস? আখের নিজের নির্দিষ্ট পথে চলে।'

'সংসারী মানুষে মেয়ের বিয়ে, ছেলের পড়া, এসব ভাবে।'

'আমি যে ভাবছি না, তা কে বললে? মেয়ের বিয়ের সময় অসুক দেখো—।'

না একই ঘরের মধ্যে থাকতাম না আমরা, আমাদের আলাদা ঘর, দাদাদের আলাদা ঘর, মা বাবার আলাদা। বরং আরো বাড়তি ঘর থাকতো বাড়িতে।

বাবা বলতেন ভেড়ার গোয়ালের মত সবাই মিলে একই সঙ্গে ঠাসাঠাসি করে থাকলে বুদ্ধি সুদ্ধিও ভেড়ার মতন হয়ে যায়, মনের বাড়বাড়ন্ত হয় না।'

তা মনের বাড়বাড়ন্ত কি না বুঝলেও দিদির আর আমার যে নিজস্ব একটা ঘর ছিল, এতেই আমরা বর্তে যেতাম।

নিজস্ব ঘর মানেই তো নিজস্ব জগৎ।

যে জিনিসটার স্বাদ আমাদের কোনো-দিকের কোনো 'তুতো' বোনকেই পেতে দেখিনি। দেখবোই বা কী? সব বাড়িতেই তো দশ-বারোটা করে ভাইবোন। আমাদের মেজপিসিমার চোদ্দজন ছেলেমেয়ে।

ওদের আবার নিজস্ব জগৎ জুটবে কোথা থেকে?

তবে মার কণ্ঠধ্বনি দেয়াল ভেদ করে এ-ঘরে এসেও পৌঁছতো।

'মেয়ের বিয়ে' শব্দটা শুনেই আমরা লজ্জায় সরে গিয়ে দুজনে ঠেলাঠেলি করে হাসি চাপতে বসতাম। যেন তখুনি কে আমাদের বিয়ের সম্বন্ধ করছে।

'বিয়ে' শব্দটার মধ্যেই লজ্জার ব্যাপার আছে এটা ছিল সংস্কারের একেবারে মর্ম-মূলে। অথচ তখনও রীতিমত উৎসাহ আর আসক্তির সঙ্গে সংসার ওঠানোর ছড়ানো-ছিটানো ফেলে দেওয়া জঞ্জাল থেকে দরকারী জিনিস খুঁজে খুঁজে পুতুলের বাক্স বোঝাই করতাম।

এটাও তো বাড়ি বদলের একটা প্রধান আকর্ষণ।

কতো কতো জিনিসই কুড়িয়ে পাওয়া যেতো। ভাঙা হাত-আয়না, বাহারী শিশি সিগারেটের রাংতা, ক্যালেন্ডারের মেমের ছবি, দু-চারটে ডবল পয়সা, সমুদ্রের ঝিনুক, মরচে-পড়া চাবির রিং, বাতিল তাসের কয়েকখানা, পুরনো দাবাবোড়ের 'সেট'-এর দু-চারটে দলছুট বোড়ে, এমনি কতো কিছু।

মনে হতো কী যেন নিধি পেলাম।

কোনটা কোনটা আমাদের পুতুলের সংসারের শোভা বর্ধন করবে, আর কোনটা কোনটা 'খেলাঘরে'র কাজে লাগবে, তখনই চিন্তা করতে শুরু করে দিতাম।

দিদি বলতো 'এই এখন কিছু করিস না, নতুন বাড়িতে গিয়ে সব সাজাবো।'

'রাংতা দিয়ে মুড়ে ডবল পয়সাগুলো টাকা করে নিয়ে যাই না দিদি?'

দিদি একটু চিন্তা করে পারমিশন দিতো, 'আচ্ছা তা না হয় কর। বাড়ির কর্তার বাকসয় থাকবে।'

বাড়ির কর্তা বলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, দিদির পুতুল-বাকসে কর্তা গিন্নী ছেলে বৌ নাতিন নাতনী মেয়েজামাই, কোনো কিছুরই ঘাটতি ছিল না। এমনকি ঝি-ও ছিল একটা, মাটির বেনে পুতুল।

এই সংসারের আদর্শ ছিল আমাদের মামার বাড়ি। কাজে কাজেই দিদির পুতুলের গিন্নী আমাদের দিদিমার ভাষায় কথা বলতো, কর্তা দাদামশাইয়ের স্টাইলে এবং অধস্তনরা প্রায় যথাযথ ভঙ্গীতে। পুতুলের ঘরের বৌমাও ছেলেকে 'পড়া-পড়া' করে উৎখাত করতো।

আসল খেলাটা দিদিই খেলতো, আমি খিদমদগার মাত্র। দিদিতে আমাতে মোটে দু' বছরের ছোট-বড়, বাড়ন্ত গড়নের জন্যে আমাকেই বরং বড় দেখাতো, কিন্তু দিদিকে আমি রীতিমত 'গুরুজন' বলেই মনে করতাম। দিদি মরতে বললে মরতে পারতাম।

পুতুল খেলাটা ছিল বাকসের মধ্যে, সবই কাল্পনিক প্রথায়। শুধু কথার মাধ্যমে দিদি ওই পুতুলবাহিনীকে নিয়ে সংসারলীলা করতো। এবং সেই কথাবার্তায় মধ্যে অপারিপক্কতা কিছু ছিল না।

দিদি গিন্নীর ভূমিকায় বৌকে বকে ভূত ছাড়িয়ে দিতো, বৌয়ের ভূমিকায় আড়ালে গজ গজ করতো, কর্তার ভূমিকায় 'বাজার খরচ' বেশী হতো বলে রাগারাগি করতো ছেলের ভূমিকায় তাস খেলতে, মাছ ধরতে চলে যেতো।

একা সকলের ভূমিকা অভিনয় করে যেতো দিদি, অনর্গল কথা কয়ে কয়ে।

খেলাঘরের ব্যাপারটা আলাদা।

সেখানে শুধু কথার চাষেই সব ফসল ফলতো না। হাতে-পায়ে কাজও করতে হতো।

যেদিন খেলাঘরে মন যেত, সেদিন ছোট্ট ছোট্ট কয়লার কুচি দিয়ে খুদে তোলা উনুনকে ধরানোর ভান করতো, পিজ-বোর্ডে তৈরী এতটুকু পাখা দিয়ে জোর জোর বাতাস চালিয়ে উনুনে 'ধরানো' হলে ভাত চড়িয়ে দিতো এতোটুকু হাঁড়িতে। তারপর বঁটি-কাটারি শিল-নোড়া বাসনপত্র হাতা-খুন্তি নিয়ে লেগে যেত কোমর বেঁধে।

এসব সেট বেশীর ভাগই মাটির। কেউ কালীঘাটে গেলেই এক সেট হাঁড়ি-কুড়ি থালা-গেলাশ শিল-নোড়া চাকি-বেলুন এসে যেত। এমনকি ঝি কি তার মা গেলেও এনে দিত।

মার কাঁচের আলমারির মধ্যে বহুবিধ লোভনীয় খেলনার সেট ছিল, কাশীর পেতলের খেলনা, বদ্যিনাথের লোহার খেলনা, গয়ার পাথরের খেলনা।

এতোটুকু কুচি কুচি! সাঁড়াশী দেখলে হাসি পায়, হাতা-খুন্তি দেখলে মন মোহিত হয়ে যায়।

কাঁচের বাইরে থেকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সেগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতাম আমরা, 'মা একটা বার করে দাও' এমন কথা বলার কথা ভাবতেই পারতাম না।

মার আজন্ম সঞ্চয় ওই খেলনাগুলোর প্রতি মার যেন অপত্যস্নেহ ছিল। বাঘিনীর মতো আগলে রাখতেন।

বাবা মাঝে মাঝে হাসতেন। বলতেন, 'ওগুলো তোদের মা অমন করে আগলায় কেন জানিস? স্বর্গে গিয়ে সংসার পাতাবে বলে। হালকা তো? আঁচলে বেঁধে নিয়ে যাওয়ার সুবিধে।'

মা চটে যেতেন, তাই বলে রেগেমেগে বার করে দিতেন না।

দিদি চুপি চুপি বলতো, 'ওর অনেক খেলনাই আমাদের, জানিস? লোকেরা যখন তীর্থটির্থ করে এসে ওসব এনে দেয়, ছোটদেরই দেয়। ওই একদম ছোট্ট লোহার খেলনাগুলো ছোটপিসি দেওঘর থেকে এনে কাকে দিয়েছিল? মাকে বুঝি?...আর ওই কাশীর খুদে জাঁতি, পানের ডাবর, মশলার সাজ, ওই সব? মেজমাসী দেননি কাশী থেকে এনে? এমন চটপট আলমারিতে ঢুকিয়ে ফেল্লেন মা দেখতেই দেন না।'

তা এসব তো চুপি চুপি।

জোরে জোরে বলবে এমন সাধ্যি কার?

(ক্রমশঃ)

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

সব আগুন নেভে, সব বৃষ্টি থামে

'কল্লোল যুগের' যে সব অগ্রণী লেখক আজো সক্রিয়ভাবে সাহিত্যসাধনা করে চলেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁদের অন্যতম। গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও জীবনী সাহিত্যের এই চারটি শাখা তাঁর নিরলস সাহিত্য-সাধনার পরিপুষ্ট। অচিন্ত্যকুমারের ছোটগল্প ও উপন্যাস বাঙালী সাহিত্যপাঠকদের প্রায় অর্ধ-শতাব্দীকাল আনন্দ ও প্রেরণা জুগিয়েছে। সাহসিক এবং সাময়িক বিষয়বস্তু তাঁর উপন্যাস ও গল্পের উপজীব্য তাই তাঁর রচনার মধ্যে সর্ব সময়েই একটা 'টপিক্যাল ইনটারেস্ট' থাকে—তাঁর অতি সাম্প্রতিক সুবৃহৎ উপন্যাস 'বন্যা-কান্না'ও সেই সাময়িক সমাজ চিত্র। এই বিশাল উপন্যাসের পরিচয় সূত্রে কাহিনী অংশ বিধৃত করা প্রয়োজন তাই সংক্ষেপে কাহিনীটির কাঠামো পরিবেশিত হল।

বনছায়া একালের মেয়ে। ধনীকন্যা। তবু চাকরী করে, সাহিত্য-চর্চা করে। মনে মনে ভাবে একদিন সে সাহিত্যের জগতে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হবে। যা হয়ে থাকে এই সবক্ষেত্রে বনছায়ার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নেই। সে সাংবাদিক, সাহিত্যিক, সম্পাদক ইত্যাদি মহলে অন্তরঙ্গ হওয়ার জন্য সদা সচেষ্ট। এই সব সাহিত্যিক সংসর্গের ফলে প্রায় একই সঙ্গে দুজন মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাদের একজন সুবীর আধুনিক কবি অন্যজন সন্দীপ একজন উপন্যাস-লেখক। এরা দুজনেই দুঃস্থ কিন্তু আদর্শে অবিচল। ধনীকন্যা হয়েও বনছায়া এদের একজনকেই স্বামীত্বে বরণ করতে চায়। ধনী পিতা সরসিজ মনে মনে এঁটে আছেন ধনী শিল্পতিপুত্র হিমাংশুকে সুপাত্র হিসাবে কন্যাদান করতে। বনছায়া যেখানে চাকরী করে তার কর্তা দেবজ্যোতিও বনছায়ার প্রতি নজর রেখেছে। সরসিজ একদিন হিমাংশুকে আমন্ত্রণ করলেন বাড়িতে সেখানে বনছায়াকে পছন্দ হল হিমাংশুর, বনছায়া একটা চাকরী প্রার্থনা করল সুবীরের জন্য এবং হিমাংশু রাজী হয়ে গেল। ছলনা করে বনছায়া সুবীরকে বিয়ে করল রেজেস্ট্রি করে। বিয়ে হয়ে গেল, পিতার প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ায় তিনি রেগে আগুন হলেন তাই একদিন সুবীরের কাছে গিয়ে উঠল বনছায়া পিতার আশ্রয় ত্যাগ করে। বৌদির সিঁদুর কৌটো থেকে বেশ করে সিঁদুর নিয়ে পরল, সে আজ পরস্ত্রী।

যেন বিশ্বজয় হয়েছে, সুবীরের কবি সতীর্থগণ একটা ছোট-খাটো পার্টির ব্যবস্থা করল প্রবাহ সম্পাদক পীযূষ দত্তের বাড়ির ছাদে। হিমাংশু জ্বলে উঠল। তার তখন একমাত্র ধ্যানজ্ঞান কি ভাবে মেয়েটাকে জব্দ করা যায়। সে বনছায়ার "বস" দেবজ্যোতিকে চাপ দেয় বনছায়াকে তাড়াবার জন্য, দেবজ্যোতি বলে সুবীরকে তাড়াও। কিন্তু কারো চাকরী গেল না। হিমাংশু কৌশলে জেনে নেয় ওদের জীবন কেমন চলছে।

জ্বালা ধরে তার অন্তরে—ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধের বীজ বপন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হিমাংশু। শত্রুতাই তার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান।

হিমাংশু কৌশল করে সুবীরকে ওভারটাইম দিয়ে আটকায়। একটা কোয়ার্টারের ব্যবস্থা করে দেয়, বনছায়াও একটা কোয়ার্টার পেয়েছিল। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর সুবীরের কোয়ার্টারে এসে উঠল বনছায়া। কিন্তু নিঃসঙ্গ সন্ধ্যাগুলি আর কাটে না। সন্দীপের কাছে গেল, সে তখন লিখছে, বনছায়াকে বেশী আমল দেয় না। বনছায়া কিন্তু রোজ সন্ধ্যায় বেরিয়ে পড়ে।

সুবীরের এই সব ভালো লাগে না, বনছায়াকে হিমাংশুর বাড়ি নিয়ে যেতে চায়, কিন্তু বনছায়া রাজী নয়।

এদিকে সুবীর নানা প্রভাবে মদ ধরল, বনছায়াকেও শেখালো মদ খাওয়া, বনছায়া স্বামীর কথায় বিশ্বাস করে রাজী হয়েছিল বটে, কিন্তু দুজনের মধ্যে ব্যবধান ক্রমে বেড়ে চলে। এদিকে একদিন বনছায়া আবিষ্কার করে সে সন্তানসম্ভবা। দৃঢ়চিত্ত বনছায়া এ সহ্য করতে পারে না, অনেক কৌশলে সে সন্তান নষ্ট করে এল ডাক্তারকে হাত করে। একদিন সুবীর মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরল, সঙ্গে তার এক চটুল রমণী। নাম তার লাবণী। বনছায়া বোঝে সুবীর কত নীচে নেমেছে। এটাও হিমাংশুর আর এক কৌশল। এদিকে সেই সময় সন্দীপকে বনছায়া তার উপন্যাস পড়ে শোনাচ্ছিল। দৃশ্য ভালো লাগে না সুদীপ্তের।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা সাময়িক বিরতি ঘটল। ক্ষমা চাইল, সুদীপ্তকে আমন্ত্রণ করে আনতে বলল। এদিকে সুদীপ্তকে আমন্ত্রণ জানাতে গিয়ে তার কাছে আত্মসমর্পণ করল বনছায়া। ঘনিষ্ঠ হল দুজনে। সুদীপ্ত ভাবে কি করবে, শিল্পীর দায়িত্ব অনেক, এমন কিছু সে করবে না যাতে তার শিল্পীসত্তা ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু আকর্ষণ কি কাটে। একদিন এল বনছায়ার বাড়ি বাকী উপন্যাসের অংশ-টুকু শুনতে। ঈর্ষায় দগ্ধ হয় সুবীর। সে উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপি টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দেয়।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ বাড়লো। এক ঘরে সুবীর দলবল নিয়ে হৈ-হল্লা সুরু করে। অপর ঘরে বনছায়ার সাহিত্য-সাধনা বিঘ্নিত হয়। সে সন্দীপের বাড়ি গিয়ে দেখে সন্দীপ অতি কষ্টে তার সেই ছিন্ন পাণ্ডুলিপিকে জুড়ছে।

সেইখানে বসেই উপন্যাসটি নকল করল বনছায়া। তারপর 'প্রবাহ' সম্পাদক পীযূষ দত্তকে একদিন মদের আসরে আমন্ত্রণ করে 'আমন্ত্রণা' উপন্যাসটি

প্রকাশের ব্যবস্থা পাকা করল। উপন্যাসটির প্রথম কিস্তিতেই বাজার মাৎ। সুবীর আবার চটল। সে জানতে চায় কিভাবে উপন্যাস উদ্ধার হলো, আর কিভাবে পীযূষ দত্তকে হাত করলো বনছায়া। হিমাংশুও চটল। সে সুবীরকে বলে এসব অশ্লীল লেখা বন্ধ করুন, আপনার স্ত্রীকে শাসন করুন। সুবীর চেষ্টা করেছিল পীযূষ দত্তকে পত্রাবিদ্ধ করে উপন্যাসের প্রকাশ বন্ধ করতে কিন্তু পারে নি। কারণ পীযূষ দত্ত সাহিত্য বোঝে তাই রাজী হয় না "অবন্ধনা" উপন্যাস প্রকাশ বন্ধ করতে। হাসপাতালে যখন ছিল বনছায়া তখন সুবীর তাকে দেখতেও গেল না ফলে বিচ্ছেদ পাকা হল। হাসপাতাল থেকে ফিরে সুদীপ্তের বাড়ি গিয়ে উঠল বনছায়া। হিমাংশু আবার উত্তেজিত হয়ে সুবীরকে ওসকানি দেয় বিবাহ-বিচ্ছেদের. সুবীরও উকীল ঘর সুরু করে এবং বিচ্ছেদের মামলা রুজু করে। অভিরাম অফিসের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী। তাকে সাক্ষী দিতে নির্দেশ দেয় বনছায়ার বিরুদ্ধে. সে রাজী হয় না। অভিরামের চাকরী গেল. আবার হল বনছায়ার আগ্রহে।

এদিকে মামলা এগোয় না, দুপক্ষের কোনো আগ্রহ নেই। একদিকে যে 'অবন্ধনা'র ফিল্মরাইট কিনেছিল হিমাংশু সেই 'অবন্ধনা'কে ফিল্ম করা হবে এ সংবাদ নিয়ে এল লাবণী। এদিকে সন্দীপও একদিন বনছায়ার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে বলল তুমি হাহাকার মরুভূমি. কি হবে তোমাকে নিয়ে। সে তাকে প্রত্যাখ্যান করল। এদিকে লাবণী জানায় সুবীরের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেছে। এটাও আরেক চক্রান্ত। বনছায়া আবার সন্দীপের বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র উঠে এল. এবার সেই অভিরাম তার বাড়ির কাজকর্ম করবে স্থির হল। লাবণী-সুবীরের সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের প্লান আঁটে। ব্যাভিচারের অভিযোগ আনে। বিবাহের ছলনা করে ব্যভিচার। ফৌজদারি আসামী করে পুলিশ অফিসে এসে সুবীরকে ধরে নিয়ে গেল। বনছায়া এ সংবাদে ক্ষেপে গেল। সে সুবীরের স্বপক্ষে সাক্ষী দেবে স্থির করল। হিমাংশু আবার কৌশল খাটায়, বলে পনের হাজার টাকা খেসারৎ দাও, লাবণী মামলা তুলে নেবে। সুবীর কোথায় টাকা পাবে—হিমাংশু পরামর্শ দেয় অফিসের ক্যাস থেকে নিতে. পরে না হয় পূরণ করা যাবে। পীযূষ সব শুনে সুবীরকে বলল কাজটা ভুল হল, কারণ বনছায়া সুবীরের সপক্ষে সাক্ষ্য দিত এবং মামলা ফেঁসে যেত। সুবীর জানল বনছায়ার এই সংকল্প এবং একদিন তার বাড়ি গিয়ে উঠল। সুবীরকে বাঁচানোর জন্য বনছায়া দৃঢ়সংকল্প। সে বেশ বুঝেছে এর পিছনেও সেই হিমাংশু, সেই মিথ্যা ফৌজদারীতে জড়িয়েছে সুবীরকে। অনেকের কাছে ঘুরল বনছায়া, পিতার কাছে গেল কিছু পেল না, সেখানে ভাই এসে রুখে দাঁড়ায়, সন্দীপের কাছে হাত পাতে—সেও বিয়ে করবে এখবর পাওয়া গেল। সুতরাং সেখানেও বিফল বনছায়া।

কেউই বুঝতে পারছে না বনছায়া এমন জীবনপণ করে সুবীরকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে কেন। হিমাংশুর সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ। বনছায়া বুঝেছে সুবীরকে অন্যায়-ভাবে লাঞ্ছনা করা হচ্ছে এবং সেই লাঞ্ছনার হেতু সে নিজে। বনছায়াকে জব্দ করার জন্য, বনছায়াকে পাওয়ার জন্যই হিমাংশুর এই সব প্রচেষ্টা এই সব জঘন্য কৌশল। শেষ পর্যন্ত একদিন হিমাংশুর কাছে ধরা দেয় বনছায়া। কিন্তু এই আত্ম-সমর্পণ সর্তহীন নয়।

হিমাংশু অবশেষে পরাজিত। বনছায়া বিজয়িনী।

বলা বাহুল্য প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ উপন্যাসের এই সংক্ষিপ্তসার কোনো পরিচয় নয়। শুধুমাত্র গল্পাংশ দেওয়া হল। উপন্যাসের মধ্যে বনছায়ার চারিত্রিক দৃঢ়তা, মত্ততা যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন অভিজ্ঞ লেখক তা প্রশংসনীয়। সুবীর যেন এ যুগের নিষ্ক্রিয় নিবীর্য পুরুষের প্রতীক। সে শুধু ভাগ্যের শিকার নয়, সে নিজেই নিজের অদৃষ্টের মাকড়সার জালে জড়িয়ে পড়েছে। সন্দীপ হিসাবী। তার প্রতিটি পদক্ষেপ পরিমিত এবং নিক্তির ওজনে নির্ধারিত। পীযূষ দত্ত থ্যাটার অফ ফ্যাকট সম্পাদক। পিতা সরসিজ ব্লাডপ্রেসার ও স্ট্রোক ইত্যাদির শিকার এক জরদগব ধনীবৃদ্ধ। ভ্রাতা যথেষ্ট বিষয়ী এবং বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন। আর হিমাংশু—একালের সভ্যতা, যার ভিত্তি হল অর্থ আর সামর্থ্য তারই প্রতীক। হিমালয় সদৃশ অহংকার আর জেদ তাকে শয়তানে পরিণত করেছে—কিন্তু তবু তার ওপর একটু সমবেদনা জাগে, হয়ত সে বনছায়াকে সত্যই আপন করে পেতে চেয়েছিল। আর ক্ষুদ্র চরিত্র হলেও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী অভিরাম তার চারিত্রিক সততার পরিচয় দিয়েছে।

এই বিস্তীর্ণ ক্যানভাসে আঁকা মানুষগুলি লেখকের রচনা কৌশলে জীবন্ত হয়ে উঠেছে—একটু এদিক-ওদিক তাকালেই দেখা যাবে এই সব মানুষ আমাদের অতি পরিচিত। এবং আমাদের আশেপাশেই আছে। আর সবচেয়ে যা পাঠকচিত্তকে আকুল করে তা এই উপন্যাসের চমকপ্রদ নাটকীয় সংলাপ।

এই নিবন্ধের শিরোনাম এই উপন্যাস থেকেই সংগৃহীত।

—অভয়ঙ্কর

বন্যা কান্না (উপন্যাস) অচিন্ত্যকুমার সেন-গুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক—শঙ্খ প্রকাশন। ৭৯।১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। দাম—১৯-০০ টাকা মাত্র।

সাহিত্যের খবর

কলকাতায় শ্রীপ্লাতোন ভোরোংকো

প্রখ্যাত ইউক্রেনীয় কবি শ্রীপ্লাতোন ভোরোংকো গত পাঁচই জানুয়ারি, দুজন সদস্যবিশিষ্ট একটি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি-দলের নেতা হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন। তিনি মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য পার্টিজান নেতা ছিলেন। ইউক্রেনের একটি অংশ যখন নাৎসীবাহিনী দখল করে, শত্রু-বাহিনীর পেছন থেকে তিনি তখন পার্টি-জানবাহিনী সংগঠন করেন এবং বিশিষ্ট নেতৃত্ব দেন। তিনি পার্টিজান নেতা কোভাক-এর সহকর্মী ছিলেন। একাধিকবার তিনি আহত হন। যুদ্ধক্ষেত্রে গেরিলাবাহিনীর জন্য তিনি যে গানগুলি রচনা করেন, রণ-ক্ষেত্রেই সেগুলির সুর দেওয়া হয়, এবং পার্টিজানদের কাছে সেগুলি অতি প্রিয় গান হয়ে ওঠে। শ্রীভোরোংকো জন্মেছিলেন অতি দরিদ্র কর্মকার পরিবারে। অল্প বয়সেই তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। নিরক্ষর জননী ইউক্রেনের জাতীয় কবি তারাস শেভচেংকোর কাব্যগ্রন্থ কিনে এনে, সাক্ষর পড়শীদের কাছে কবিতা পাঠ শুনতেন। ভোরোংকোর কাছে শেভচেংকোই আদি কবি —যিনি তাঁর উপরে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেন। শ্রীপ্লাতোন ভোরোংকো অল্প বয়সেই কবিতা লিখতে শুরু করেন। শিশু-সাহিত্যিক হিসাবেও তাঁর প্রসিদ্ধি আছে। তাঁর কাব্যগ্রন্থ ইত্যাদি অন্ততঃ এক কোটি কপি বিক্রি হয়েছে।

গত ৮ই জানুয়ারি সন্ধ্যা ছটায় ভারত-গণতান্ত্রিক জার্মানী মৈত্রী সমিতির মৈত্রী হলে, ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতি কর্তৃক আহূত কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের সভায় শ্রীভোরোংকোকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন, ইউক্রেনীয় জাতীয় কবি শেভচেংকোর কবিতার অনুবাদক কবি গোলাম কুদ্দুস। শ্রীভোরোংকোকে স্বাগত জানিয়ে সমিতির সাধারণ সম্পাদক তরুণ সান্যাল বলেন, ইউক্রেনীয় সোভিয়েত-ভারত-মৈত্রী সমিতির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের শহরে কবি ভোরোংকোকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করতে পেরে তিনি গৌরব বোধ করছেন। প্রত্যুত্তরে শ্রীভোরোংকো পশ্চিম-বঙ্গের সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে বলেন, তিনি এ শহরে পদার্পণ করে ধন্য হয়েছেন। ১৯৬০ সালে একবার তিনি কলকাতা এসেছিলেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের

কবিদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার হয়নি। সভায় উপস্থিত তরুণ কবিদের সম্বোধন করে তিনি বলেন, ইউক্রেনেও তরুণ কবির সংখ্যা বৃদ্ধি লক্ষ্যণীয়। তাঁদের অনেকে বাংলাও শিখছেন, প্রত্যক্ষভাবে বাংলাভাষা থেকে কবিতা অনুবাদও তাঁরা করছেন। শীঘ্রই তাঁদের উদ্যোগে প্রাচীন বাংলা কবিতার একটি মোটা সংকলন প্রকাশিত হবে। দু-দেশের কবিরা পরস্পরের ভাষার কবিতা অনুবাদের মধ্য দিয়ে দু-দেশের সাংস্কৃতিক মৈত্রী গড়ে তুলতে উদ্যোগ নিতে পারেন। সভাস্থ কবিদের অনুরোধে তিনি একাধিক কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। সভাপতি কবি গোলাম কুদ্দুস শেভচেঙ্কোর কয়েকটি কবিতার বঙ্গানুবাদ পাঠ করেন এবং ভোরোভেকোর জীবনকাহিনী ব্যাখ্যা করেন।

অনুবাদে শীর্ষস্থান

ভাষার পাঁচিল ভাঙতে হলে চাই অনুবাদকর্ম। আর তারই ভিতর দিয়ে পাঠকের হাতের মুঠোয় চলে আসে বিশ্বসাহিত্য। আসে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নানান জাতের সৃজনশীল রচনাও।

এতদিন পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নই ছিল অনুবাদকর্মে বিশ্বের সেরা। এ দেশের অন্তর্ভুক্ত নানান প্রজাতন্ত্রের ভাষায় অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যাই ছিল সবচেয়ে বেশি। কিন্তু সম্প্রতি বিশ্বসাহিত্যের সমীক্ষা-সংক্রান্ত ১৯৭০ সালের যে হিসেব বেরিয়েছে তাতে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীর মধ্যে হয়ে গিয়েছে জায়গা বদল। জার্মান ভাষাতে অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যাই এখন সবচেয়ে বেশি। অবশ্য ফেডারেল রিপাবলিক ও গণতান্ত্রিক জার্মানি দুটো ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত জার্মান ভাষায় অনুবাদকর্মের মিলিত সংখ্যাই এই শীর্ষস্থান অধিকারের মূলে। এই দুই দেশ থেকে প্রকাশিত মোট অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা হল ৫,৯৩২। ঠিক পরের জায়গা হল সোভিয়েত ইউনিয়নের দখলে। এই দেশ থেকে প্রকাশিত অনূদিত বইয়ের সংখ্যা হচ্ছে ৩,৫৮০। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ফ্রান্স যথাক্রমে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠস্থান অধিকার করে। এদের গ্রন্থসংখ্যা হল যথাক্রমে ২,৯৪৮; ২,৫৬৯; ২,০৬০; ১,৯১৩। এদের অনুসরণ করছে নেদারল্যান্ডস ১,৬৫১; ইতালি ১,৫৮৭; সুইডেন ১,৫৩৯ এবং চেকোশ্লোভাকিয়া ১,৩৪০। আর ভারতবর্ষ? অনেক, অনেক নিচে।

এই আন্তর্জাতিক সমীক্ষা থেকেই জানা যায় লেনিন রচনাই সবচেয়ে বেশি অনূদিত হয়েছে। আগের বছর যেখানে ছিল ২০২, সেখানে ১৯৭০-এ লেনিন শতবার্ষে তার সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি হয় অর্থাৎ ৪৫০। এরপর সবচেয়ে বেশি অনূদিত লেখক হিসেবে স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে যথাক্রমে শেকসপীয়র ১৪১, জুলে ভার্ন ১২৮, সীমান ১১৯, আগাথা ক্রিস্টি ৯৫, দস্তয়ভস্কি ৭৮, বালজাক ৭৫, মার্ক টোয়েন ৭১, হেমিংওয়ে ৬৬, পার্ল এস বাক ৬৫, স্টাইনবেক ৬১।

স্বপ্ন হলেও বাস্তব

ঠিক 'তারকা' বললে ভুল হবে। বরং তার চেয়ে আরো কিছু বড়ো। আরো কয়েকটি বিশেষণ ঐ 'তারকা'র আগে বসালেই ভালো হয়। মার্কিনী দুনিয়ার এ-রকমই দশ গুণ সুপার স্টারকে নিয়ে একটি বই বেরিয়েছিল আমেরিকায়, ১৯৭০ সালে। ঠিক দু বছরের মাথায় তারই ভারতীয় সংস্করণ বেরুলো দিল্লি থেকে। বইটির নাম দ্য পসিবল ড্রিম।

বিশ্বখ্যাত নিগ্রো টেনিস খেলোয়াড় আর্থার আস; অটোমোবাইল সেফটি ল' বদলানোর জন্যে আইনের লড়াই চালিয়ে যে তরুণ আইনজ্ঞ বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন সেই রালফ ন্যাডার; প্লাজা স্যুট, বেয়ারফুট ইন দ্য পার্ক, দ্য অড কাপল, দ্য লাস্ট অব দ্য রেড হট লাভারস প্রভৃতি আলোড়নকারী গ্রন্থের লেখক নাট্যকার নেইল সিমন; নিউইয়র্ক সিটি ব্যালে, ব্রডওয়ে এবং টেলিভিশনের জনচিত্তজয়ী নায়ক এডওয়ার্ড ভিলেল্লা; ক্লিভল্যান্ডের কৃষ্ণাঙ্গ পৌরপ্রধান কার্ল স্টোকস; অলিম্পিকের স্বর্ণপদকজয়ী আইস স্কেটার; ঝকমকে উচ্ছল উজ্জ্বল তরুণী পেগি ফ্লেমিং; নামজাদা সাংবাদিক বিল ময়ারস; যুবক-যুবতীর বুক চনমনকারী নিগ্রো গায়িকা শার্লি ভেরেট; নোবেল পুরস্কারবিজয়ী জেমস ওয়াটসন প্রমুখ সুপার স্টারদের জীবনের বিচিত্র কথা, কেমন করে তাঁরা অনেক ঝড়-ঝাপটা সহ্য করে শেষ পর্যন্ত খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছলেন যে যাঁর নিজের ক্ষেত্রে, সে কথাই তুলে ধরেছেন লেখিকা মার্থে গ্রস তাঁর 'দ্য পসিবল ড্রিম' গ্রন্থে। লিখেছেন তিনি কখনো নাটকীয় ভঙ্গিতে আবার কখনো আলাপচারিতার ঢঙে। ফলে গোটা সংকলনে এসেছে বেশ ঘরোয়া আমেজ। সাংবাদিক মার্থে গ্রস জন্মেছিলেন মিসৌরির সেন্ট লুইস এ।

নতুন বই

নক্ষত্রলোকে প্রত্যাবর্তন—এরিক ফন দানিকেন। অজিত দত্ত অনূদিত। লোকায়ত প্রকাশন। পরিবেশক : দেবশ্রী সাহিত্য সমিধ, ৫৭-সি কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দশ টাকা

এরিক ফন দানিকেন-এর এটি দ্বিতীয় বই, প্রথমটি—'দেবতা কি গ্রহান্তরের মানুষ'—আগেই বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে। দুটি বইতেই দানিকেন উপস্থিত করেছেন মানুষ কি করে মানুষ হয়েছে সে সম্পর্কে তাঁর একটি সিদ্ধান্ত, তথ্য ও প্রমাণ সহযোগে। সিদ্ধান্তটি এই রকম : আজ থেকে হাজার চল্লিশ বছর আগে একদল বুদ্ধিমান জীব আমাদের এই পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং পৃথিবীর মানুষের করোটিতে মগজ ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর থেকেই মানুষ বুদ্ধিমান জীব এবং তার এত দ্রুত উন্নতি। গ্রহান্তরের এই বুদ্ধিমান জীবরাই পৃথিবীর মানুষের কাছে 'দেবতা'। তাদের দানেই মানুষ মানুষ। সিদ্ধান্তটি চাপানো নয়। এ জন্যে তিনি জীববিদ্যা, প্রত্নবিদ্যা, জীবকর্মবিদ্যা, পুরাতত্ত্ব ইত্যাদি প্রায় যাবতীয় জ্ঞানের ভাণ্ডার তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করে দেখিয়েছেন, গোটা দুনিয়া ঘুরে প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শনের সাক্ষ্য উপস্থিত করেছেন, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত শাস্ত্র ও পুরাণের হদিশ খুঁজে করেছেন। তারপরেই এই সিদ্ধান্ত; এবং জোরগলায় এই ঘোষণা যে একমাত্র এই সিদ্ধান্তের আলোকেই মানুষের মানুষ হওয়ার ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব। বিজ্ঞানীরা যতোই তত্ত্ব খাড়া করুন না কেন। তাঁর মতে, মানুষ নামক জীব আচমকা মগজবান হয়েছে, জীবনের বিবর্তনে এ ধরনের ঘটনাটি অবধারিত ছিল না। প্রাগৈতিহাসিক-কালের বহু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, তাঁর মতে, গ্রহান্তর থেকে 'দেবতাদের' আগমনেরই সাক্ষ্য। শাস্ত্র ও পুরাণে এই দেবতাদেরই বহু স্মৃতি। এমনকি, দানিকেন বলছেন, 'দেবতাদের' দানে মগজসমৃদ্ধ হবার পরেও মানুষ যা কিছু জ্ঞান অর্জন করেছে তাও 'দেবতাদের' কল্যাণেই। তিনি বলছেন, 'এটা খুবই সম্ভব যে যে জ্ঞান আজ আমরা অর্জন করতে চলেছি সেই জ্ঞান সেই অজানা নক্ষত্রচরেরা সঙ্গে করে এনেছিলেন এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের জেনেটিক কোডের সামঞ্জস্য বিধান করে তাঁদের প্রবুদ্ধ করে তুলেছিলেন।' বিজ্ঞানীদের বহু আবিষ্কারের মূলেও যে আকস্মিকতা রয়েছে তার মূলেও রয়েছে এই 'দেবতাদেরই' আরোপণ, ইত্যাদি ইত্যাদি।

নক্ষত্রলোকে প্রত্যাবর্তন কেন? ভূমিকায় দানিকেন বলছেন, 'প্রত্যাবর্তন? কেন? আমরা কি নক্ষত্রের রাজ্য থেকেই এসেছিলুম? চিরশান্তির আকাঙ্ক্ষা, অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা, স্বর্গের কামনা—এসবই মানবচেতনার গভীরে শেকড় ছড়িয়ে দিয়েছে। সে কামনা, সে-আকাঙ্ক্ষার বাস্তব রূপায়ণের চেষ্টা চলেছে কোন সেই বিস্মৃতপূর্ব কাল থেকে। মানুষের রক্তের সঙ্গে মিশে আছে

যে-বাস্তব-রূপায়ণের তাগিদ, তা থেকে কিছু অনুমান করা সম্ভব? এ কি শুধুই 'আকাঙ্ক্ষা' না কি, সে-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবার আকাঙ্ক্ষা? নক্ষত্রলোকের জন্যে এই আকুলতার মধ্যে কি লুকিয়ে রয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্নতরো কিছু? আমার বিশ্বাস, নক্ষত্র-লোকে ফেরার এই আকুলতাকে জীইয়ে রেখেছে 'দেবতাদেরই' রেখে যাওয়া কোন উত্তরাধিকার। আমাদের পার্থিব পূর্বপুরুষ-দের স্মৃতি আর মহাকাশ থেকে আসা উপ-দেষ্টাদের স্মৃতি, দুই-ই আমাদের মানস-পটে চির-সমুজ্জ্বল। মানব মস্তিষ্কে বুদ্ধির বিকাশকে বিবর্তনের ক্লেশসাধ্য, দীর্ঘ পথ পরিক্রমার পরিণতি বলে আমার মনে হয় না। বিবর্তনের দীর্ঘসূত্রতার চলনায় এ ঘটনা ঘটেছে তড়িৎগতিতে, অকস্মাৎ। আমার ধারণা, 'দেবতারাই' আমাদের পূর্বপুরুষের মস্তিষ্কে বুদ্ধি 'বপন' করেছিলেন। আর সে দেবতাদের নিশ্চয়ই জানা ছিল বিবর্তনকে ত্বরান্বিত করা কৌশল।'

বইয়ের **প্রথম প্রবন্ধ—'নক্ষত্রলোকে** বিহার'। নভশ্চরণার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত যা কিছু সম্ভব করে তুলেছে ও তুলতে পারে তার সাহায্য নিয়ে দানিকেন দেখিয়েছেন যে বহু আলোকবর্ষ দূরের নক্ষত্রলোকে বিহার করাটাও পৃথিবীর এই স্বল্পায়ু মানুষের পক্ষে অসম্ভব নয়। তারপরেই প্রশ্ন তুলছেন, তাই যদি হয় তাহলে মহাবিশ্বে এমন কোন জীবের অস্তিত্ব কেন থাকবে না যাঁরা 'হাজার হাজার বছর আগেই গ্রহান্তর গমনের ব্যাপারে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ছিলেন, তথা আমাদের এ-গ্রহে পদার্পণও করেছিলেন।'

দ্বিতীয় প্রবন্ধ—'জীবনের সন্ধানে'। দানিকেন এখানে প্রকৃত বিজ্ঞানীর মতোই পৃথিবীর আদিম সমুদ্রে জীবনের উদ্ভবের কাহিনী শুনিয়েছেন, তারপর কোটি কোটি বছর ধরে জীবনের বিবর্তন। কিন্তু মানুষ কেমন করে? দানিকেন বলছেন, 'প্রাক-মানব জীব, যাদের চেহারা তখনো বাঁদরের মত, তাদের থেকে নিয়ানথোপিডদের, অর্থাৎ যে-মানবগোষ্ঠী আমাদের পূর্বপুরুষ, তাদের অতি দ্রুত পৃথকীভবন দেখে প্রত্নতাত্ত্বিক-কুল বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েন। আলো এ ঘটনার মোটামুটি যে-ব্যাখ্যা তাঁরা দেন, তা হল স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন। আমাদের প্রথম পূর্বপুরুষদের সেই নাটকীয় পরি-বর্তনের ক্ষেত্রে প্রাক-নৃতাত্ত্বিক কালকে যদি মেনে নিই তাহলে আমার প্রকল্প অনুযায়ী, অর্থাৎ অজানা বুদ্ধিমান জীবদের দ্বারা সুপরিকল্পিতভাবে আদিম মানুষের কৃত্রিম পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল, তাহলে 'দেব-তারা জেনেটিক কোডকে কাজে লাগিয়ে প্রথম কৃত্রিম-পরিব্যাপ্তি ঘটিয়েছিলেন খৃষ্ট-পূর্ব ৪০,০০০ থেকে ২০,০০০ বছর আগে। এবং দ্বিতীয় পরিব্যাপ্তি ঘটিয়েছিলেন আরো কাছাকাছি কোন সময়ে সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব ৭,০০০ থেকে ৩,৫০০ বছর নাগাদ।' এর মধ্যে একটা কাল-প্রসারণের ব্যাপার আছে, নৃতাত্ত্বিকরা যদি তা মেনে নেন 'তাহলে কেমন করে আমাদের পূর্বপুরুষদের উৎপত্তি ঘটলো, কেমন করেই বা তাঁরা বুদ্ধিমান হলেন, এসব প্রশ্নের জবাব তো পলকে মিলে যাবে।'

পরের প্রবন্ধ—'শখের পুরাতাত্ত্বিকের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা'। এই প্রবন্ধে দানিকেন হাজারটা প্রশ্ন তুলেছেন এবং দেখিয়েছেন যে বিজ্ঞানের সূত্র দিয়ে কোনো প্রশ্নেরই জবাব দেওয়া যায় না, সবকিছুরই অমোঘ নির্দেশ গ্রহান্তর থেকে অতিমাত্রায় বুদ্ধি-মান, বিজ্ঞানে ও প্রযুক্তিবিদ্যায় অতিমাত্রায় অগ্রসর একদল জীবের পৃথিবীতে আগমনের দিকে। তাঁরা ছিলেন 'রক্ত-মাংসে গড়া বাস্তব জীব'—তাঁরাই সম্পাদন করেছিলেন বিরাট সব প্রাযুক্তিক কর্ম, বিশাল সব প্রত্নতাত্ত্বিক কান্ডকারখানা। তাঁরাই আমাদের কাছে 'দেবতা', তাঁরাই যুগ যুগ ধরে প্রভাবিত করেছেন মানুষের আদর্শ, মানুষের ধর্ম। শাস্ত্রে ও পুরাণে এই 'দেবতাদেরই' স্তুতি।

এমনি আরো আটটি প্রবন্ধ আছে এই বইয়ে। 'স্মৃতির মণিকোঠা' প্রবন্ধে জোরালো যুক্তিসহ এই বক্তব্য উপস্থিত করেছেন যে গ্রহান্তর থেকে আগত বুদ্ধি-মান জীবরা আমাদের জীবনের কাজে প্রচুর তথ্য 'পাচার করে দিয়ে গিয়েছিলেন'—তারই নির্দেশে পরবর্তী কালের সমস্ত আবিষ্কার ও উদ্ভাবনা। 'পবিত্র-পুঁথি সন্ধানে ভারত ভূমিতে' প্রবন্ধে আছে বেদ ও মহাকাব্য নিয়ে আলোচনা, অন্যত্র পৃথিবীর আরও বহু ধর্মশাস্ত্র নিয়ে। ঋগ্বেদ ও মহাভারত সমেত বহু প্রাচীন গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি খাড়া করেছেন।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে দানিকেনের বই চাঞ্চল্যকর নিঃসন্দেহে। তবে কথাটি এই যে বিজ্ঞানীরাও দাবি করেন তাঁরা সবকিছু জেনে বসে আছেন, সবকিছু ব্যাখ্যা করতে পেরে-ছেন। বরং যতো বেশি জানছেন, না-জানার পরিধিও ততোই বাড়ছে। কিন্তু যতোটুকু জেনেছেন ও ব্যাখ্যা করেছেন তার মধ্যে মিসিং লিংক থাকতে পারে, ফাঁকি নেই। নরবানর থেকে মানুষের বিবর্তনে, বিজ্ঞানী-দের ব্যাখ্যায়, কোথাও কোনো গোঁজামিল দিতে হয়নি। ভূতের অস্তিত্ব মেনে নিলে যেমন সবকিছুর চমৎকার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এক্ষেত্রেও তাই—'দেবতাদের' মর্ত্যে আগমন। এই দেবতারা রক্তমাংসের জীব ছিলেন বটে কিন্তু একআধটাও ফসিল রেখে যাননি। শুধু আছে শাস্ত্রে ও পুরাণে তাঁদের স্মৃতি, আর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মনগড়া ব্যাখ্যায় তাঁদের কৃতকার্যের সাক্ষ্য। আর এই 'দেবতাদের' কল্পনা অবশ্যই রোমা-ঞ্চকর, ভূতের কল্পনার মতো। এবং সম্ভবত বিভ্রান্তিকরও—এ-কারণে যে মানুষের কিছু করার নেই, সবই পূর্বনির্দিষ্ট ও পূর্ব-নির্ধারিত, 'দেবতাদের' দানের ফল ইত্যাদি।

অজিত দত্তর অনুবাদ, এককথায় চমৎ-কার। বইয়ে ৭৭টি ছবি আছে, তার মধ্যে অনেকগুলো আর্টপ্লেট—প্রত্নতাত্ত্বিক নিদ-র্শনের, যেগুলো দানিকেন 'দেবতাদের' সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করতে চান।

কবিমানস (প্রবন্ধ)—বারীন্দ্র বসু। রাধাকৃষ্ণ প্রকাশন, ২৪, বাগুইআটি রোড, কলিকাতা-২৮। সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

'নিবেদন' অংশে লেখক শ্রীবারীন্দ্র বসু জানিয়েছেন, 'আমি চেষ্টা করেছি নিরপেক্ষ যুক্তির মানদণ্ডটিকে সব সময় সক্রিয় রাখতে।' শ্রীবারীন্দ্র বসু যে সমস্ত বিষয় অবলম্বন করে বর্তমান গ্রন্থটি রচনা করে-ছেন, সেই সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, বিহারীলাল, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও রবীন্দ্রনাথের কাব্য-

ভাবনা ও কাব্যবিচার প্রসঙ্গ আলোচনায় সকলের পক্ষে নিরপেক্ষ মতামত দেওয়া সম্ভব হয় না। কারণ ইতিপূর্বে এঁরা ছাত্রপাঠ্য হওয়ায় ও নানাভাবে বুদ্ধিজীবী শিক্ষাবিদদের কাছে আলোচিত হওয়ায় এঁদের একটি প্রায় স্থায়ী আলোচিত রূপ নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। সেখানে বারীন্দ্রবাবু যে সত্যই একটি নিরপেক্ষ দৃষ্টির পরিচয় দিয়ে আলোচনাগুলিতে সৎ সমালোচকের সৎ সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, তা প্রশংসার যোগ্য। 'সত্যেন্দ্রনাথের কবিচেতনা', 'কবি বিহারীলাল প্রসঙ্গে', 'অ-দুঃখবাদী কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত' ও 'বলাকাঃ কবি, কাব্য ও তত্ত্ব'—এই চারটি দীর্ঘ প্রবন্ধের সংকলন হল 'কবিমানস' গ্রন্থটি। বারীন্দ্রবাবুর আলোচনা কোথাও আবেগে যুক্তিহীন হয়নি, আবার যুক্তিতর্কে পড়ে এতটুকুও সাহিত্যরস বর্জিত হয়ে ওঠেনি। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী দিয়ে বারীন্দ্রবাবু সমালোচনা করে গেছেন। কোথাও কোথাও মতবিরোধ হতে পারে, কিন্তু বারীন্দ্রবাবু যা বলেছেন, তাকে যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর স্থায়ী সিদ্ধান্তগুলিতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম অনুভূতির পরিচয় মেলে। বারীন্দ্রবাবুর এ গ্রন্থের প্রধান আকর্ষণ এর সহজ, সরল ভাষা ও সাবলীল প্রকাশভংগী। স্বভাবী ছাত্রপাঠক ও সর্বস্তরের বুদ্ধিজীবীর কাছে এ গ্রন্থ নিশ্চয়ই অভিনন্দনযোগ্য।

তাঁর নাম (কবিতা-পুস্তিকা): ডকটর ভবেশচন্দ্র চৌধুরী; অনুবাদ ডকটর সুকুমার বসু ও শ্রীসুহৃদগোপাল দত্ত; সম্পাদনা ডকটর সরদ। জ্ঞানসাগর পাবলিশিং হাউস, বাবুপাড়া, জলপাইগুড়ি। মূল্য এক টাকা।

ভারততত্ত্ববিদ হিসেবে দর্শনাচার্য ডকটর ভবেশচন্দ্র চৌধুরী হলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী। মাত্র কিছুকাল আগে তিনি লেখেন একটি কবিতা পুস্তিকা His Name! নব্য বেদান্তের আলোয় রচিত এই মূল্যবান কাব্য-অর্ঘ্যে তুলে ধরলেন ভারতীয় পুরাণের এক মূল্যবান দিক। লিখলেন বিষ্ণু পুরাণের প্রহ্লাদ-হিরণ্যকশিপুর কাহিনীর সারমর্ম। কীর্তিত হল ভগবানের প্রতি অবিচল আস্থার শুভ পরিণাম।

সম্প্রতি এই ইংরিজি কবিতা-পুস্তিকার অনবদ্য কথানুবাদ করেছেন ডকটর সুকুমার বসু ও সুহৃদগোপাল দত্ত। এবং এই অনুবাদ এমনই ঝরঝরে ও প্রাণবন্ত যে ভাষান্তর বলেই মনে হয় না। ফলে শুধু ভক্তের কাছেই নয়, কাব্যানুরাগীদের কাছেও এই অনূদিত কবিতা-পুস্তিকাটি সমাদৃত হবে।

কাছিম।। জীবন সরকার। অন্যদিন। ৫৮।১২৮ লেক গার্ডেন্স। কলকাতা-৪৫। দাম : চার টাকা।

লেখকের প্রথম গ্রন্থ এটি—নির্বাচিত ছোটগল্পের সংকলন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৬-'৭১-এ লেখা এই গল্পগুলি।

জীবন সরকার খ্যাতনামা লেখক নন, কিন্তু সৎ লেখক এবং স্বতন্ত্র জাতের লেখক। আধুনিকতার কৃত্রিমতা নেই তাঁর রচনায়; যেমন সরল বক্তব্য তেমনি সহজ অনাড়ম্বর তাঁর ভাষা।

সহৃদয়তা জীবন সরকারের রচনার একটি মহৎ গুণ। এই গুণেই তাঁর প্রায় প্রতিটি রচনাই হয়ে উঠেছে সজীব। 'কালো হাঁস'এর 'মণ্ডলি'র ব্যর্থ জীবন নদীর জলে তলিয়ে যাবার আগে পাঠকের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। 'কাছিমটাকে মারতে লেখকের সংগে দরদী পাঠককেও যেতে হয় ধলেশ্বরী নদীতে।

সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী—সম্পাদক অশোক কুণ্ডু। অশোক নিলয়, বোড়হল, জাঙ্গিপাড়া, হুগলী। দশ টাকা।

শ্রীঅশোক কুণ্ডু তেরশ আঠাত্তর সাল থেকে এই সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী' প্রকাশের প্রারম্ভ কাল বলে 'উৎসর্গ' অংশে উল্লেখ করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থটি তেরশ উনআশি সালে পরিবর্ধিত ও সংশোধিত আকারে প্রকাশিত। শ্রীকুণ্ডুর এই প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য। লেখকের উদ্দেশ্য—এমন একটি বই সংকলিত করা যা থেকে 'বাংলা সাহিত্যের নাড়ী-নক্ষত্র জানা যাবে'। উদ্দেশ্য সাধু নিঃসন্দেহে, কিন্তু সফল করা যে সহজসাধ্য নয়, বর্তমান গ্রন্থে তার প্রমাণ আছে। একটি বিশেষ বছরের বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্পর্কে যদি বর্ষপঞ্জী হয়, তবে এ গ্রন্থ তা পূরণ করে না। সম্পাদক বহু বিষয় বাদ দিয়েছেন, বা নিজের আয়ত্তে নেই বলে এড়িয়ে গেছেন।

বস্তুত মাত্র একক সম্পাদনায় 'সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী প্রকাশ সম্ভব নয়। 'নতুন পত্রিকার প্রকাশ তালিকা' যিনি তৈরী করছেন, সেখানে যে পরিশ্রম, নিষ্ঠা, সততা থাকবে, তাকে সমভাবে রেখে আবার তিনিই সম্পাদনার অন্যান্য কাজগুলি করবেন সমান দক্ষতায়—তার প্রমাণ এ গ্রন্থে নেই। এককভাবে হতে পারে, কিন্তু তার জন্য যে অভিনিবেশ, অনুসন্ধান প্রয়োজন, তা সম্পাদক দিতে পারেননি। ইতিপূর্বে 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা দেখেছি, অধুনা 'বাগর্থ' প্রকাশন সংস্থা 'জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী'র গ্রন্থমালায় এক-একজন সাহিত্যিক ধরে গ্রন্থ প্রকাশ করছেন। সে সমস্ত গ্রন্থে, পরিকল্পনার স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও যে পরিশ্রম ও নিষ্ঠা এবং অনুসন্ধিৎসার পরিচয় রেখেছেন, বর্তমান সম্পাদক সেক্ষেত্রে হতাশ করেছেন। কতকগুলি বিষয় প্রবন্ধকারে রাখার কি যুক্তি, বোঝা গেল না—তাতে আকৃতি অকারণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ছদ্মনামের তালিকায় বহু ছদ্মনাম বাদ পড়েছে, অনেক ছদ্মনামের সঙ্গে আসল নাম ঠিক নয় বলে মনে হয়েছে। সম্পাদকের তরফ থেকে এ বিষয়ে আরও তৎপর এবং সঠিক হওয়া উচিত ছিল। গ্রন্থটি আরও সুপরিকল্পনা ও সমবেত প্রয়াসের ভিত্তিতে রচিত হওয়া উচিত।

নীল আলোর হরিণ (কাব্য সংকলন)—বেণু দত্তরায়। এম সি সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জো স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। তিন টাকা।

শ্রীবেণু দত্তরায় তরুণ কবি। সম্ভবত এঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নীল আলোর হরিণ'। মোট সাইত্রিশটি গীতিকবিতার সংকলন হল আলোচ্য গ্রন্থটি। কবি সচেতনভাবেই ছন্দ সম্পর্কে পরীক্ষার কাজে নেমেছেন কয়েকটি কবিতায়। চরণকে ভাবের সংগে স্বাভাবিক করে চরণভাঙা ও ভাবের ওঠা-নামায় স্তবক গঠন করেছেন বিচিত্রভাবে। কবি রোমান্টিক। তাই গীতি-কবিতাগুলিতে লিরিক মূর্ছনা যেন-বা স্বতঃস্ফূর্ত। কয়েকটি কবিতায় কবি রোমান্টিক কল্পনার সুস্থ পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর চিত্র-রচনার মধ্যে অনুভূতির গভীর অভিজ্ঞতা ব্যঞ্জনা পেয়েছে।

খুনের আরেক নাম রাজনীতি (উপন্যাস): প্রশান্ত রায়চৌধুরী। রাইটার্স ওন পাবলিকেশন, ৭-এ, অন্নদা নিয়োগী লেন, কলকাতা-৪। দশ টাকা।

যে রাজনৈতিক পটভূমিকায় আলোচ্য উপন্যাসটি রচিত, সে পটভূমিটিকে লেখক নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে উপস্থিত করেছেন। উপন্যাসের নায়ক বিপ্লব বসু রাজনীতি করে। এ উপন্যাসের আরম্ভ উনিশ শ বিয়াল্লিশ সালে, শেষ ১৯৭০-এ। বিপ্লব বসুর জন্ম ৯ আগস্ট, উনিশ শ বিয়াল্লিশ। তাই তার পথপ্রদর্শক, তার রাজনীতির গুরু দাদু, যার কাছে সে বাবা মারা যাবার পর মানুষ হয়, নাম রাখেন বিপ্লব। বিপ্লবের কৈশোর-যৌবনের বান্ধবী লালী, সে বিপ্লবের রাজনৈতিক জীবনের প্রেরণাদাত্রী। বিবাহ করে ছাত্রী মনীষাকে, কিন্তু শ্যালিকা মণিকা তার রাজনৈতিক জীবনের সূত্রে ঘনিষ্ঠ হওয়ায় মনীষা প্রচণ্ড অভিমানে মৃত্যু বরণ করে ও মণিকাকে বিবাহ করার জন্য সুপারিশ করে যায়। মণিকা-বিপ্লবের বিবাহিত জীবনে আসে 'শান্তি'—একটি সন্তান। উপন্যাসের শেষে লালীর স্বামী-হত্যার মিথ্যা দায়ে বিপ্লব ধরা পড়ে জেলে যায়, আর ফেরেনি। বিপ্লবের জীবনের গতিতে রাজনীতি কিভাবে খুনকেই সত্য করে, রাজনীতির অর্থ বদলে দেয়, এ উপন্যাসে তাই অন্তরঙ্গতার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। প্রত্যেকটি চরিত্র সুঅংকিত। গ্রন্থটি রুদ্ধশ্বাসে পড়ার মত। লেখকের বিষয়-ভাবনা নিরপেক্ষ কিন্তু রূঢ় বাস্তব সত্যে উজ্জ্বল।

প্রতি বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা পুণ্যশ্লোক, বৈষ্ণবকুলতিলক মহাত্মা শিশিরকুমারের মৃত্যুবার্ষিকী প্রতিপালিত হল গত ১০ই জানুয়ারী। স্বর্গীয় মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ যে সত্যই ক্ষণজন্মা মহাপ্রাণ মনীষী ছিলেন, তা তাঁর জীবনের অসামান্য কর্মদক্ষতা থেকে সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তিনি একাধারে যেমন ছিলেন স্বদেশপ্রাণ, দেশহিতব্রতী ও পরোপকারী; তেমনি একনিষ্ঠ সাংবাদিক, বহুবিধ গ্রন্থের প্রখ্যাত গ্রন্থকার ও বদান্যশীল ব্যক্তি। বহু দুর্লভ গুণের সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর চরিত্রে।

যশোহর জেলার মাগুরা গ্রামে তাঁর আবির্ভাব হয় ১৮৪২ সালে এবং আজ থেকে ৬২ বৎসর পূর্বে ১৯১১ সালের ১০ই জানুয়ারী অপরাহ্নে ২ ঘটিকায় তাঁর তিরোধান ঘটে। শিশিরকুমারের পরলোকগমনের সংবাদ তৎকালীন ভারতের তথা বাংলাদেশের দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক সকল শ্রেণীর পত্রিকাতেই বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হয় এবং শোকসভার আয়োজনও হয় বহু স্থানে। বর্তমানে তাঁর চিত্রসহ তিরোধান দিবসের সংবাদ বিভিন্ন মহাপুরুষ ও সাধুসন্তদের সঙ্গে বিশদ্ধ সিদ্ধান্ত পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়ে থাকে।

মহাত্মা শিশিরকুমার পরম বৈষ্ণব হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা তাঁকে যে কি পরিমাণ শ্রদ্ধা ভক্তি করতেন, তৎকালীন নবভাবে ভাবিত, সর্বধর্মের সমন্বয় সাধনের মুখপত্র মাসিক 'দেবালয়' নামক পত্রিকায়, ১৩১৭ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় শিশিরকুমারের তিরোধান সম্পর্কে যে বিশেষ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল, এখানে সেটি আমরা সম্পূর্ণ তুলে দিলাম। এ থেকে তাঁর প্রতি এই পত্রিকাগোষ্ঠীর অনন্যসাধারণ ভক্তি ও মূল্যায়নের যাথার্থ্য সম্যকভাবে অনুভাবিত হবে। রচনাকারের নাম কুলদাপ্রসাদ মল্লিক।

স্বর্গীয় মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ

"নব্যভারতের ইতিহাসে এমন একটা দিন আসিয়াছিল, যখন শিক্ষিত ভারতবাসী অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিকদের ন্যায় মনে করিত যে, আমরা আমাদের অতীতকে একেবারে উপেক্ষা ও অমান্য করিয়া, প্রতীচ্য সভ্যতা ও সাধনা হইতে উপকরণ সংগ্রহ পূর্বক নিজেদের দেশ ও জাতিকে গৌরবান্বিত ও মহীয়ান্ করিব। সভ্যতার ইতিহাসে সমাজ-জীবনে এপ্রকারে একটা সন্দেহ ও সমালোচনার যুগ আসিয়া থাকে—ইহা অভিব্যক্তির সনাতন ব্যবস্থা, সুতরাং সেই অতীত যুগের নেতৃবৃন্দও আমাদের ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করুন।

এই যুগের অবসানে যখন অন্য একটা যুগের,— একটা সমন্বয়ের যুগের আবির্ভাব হইল—যখন 'কুষ্মাণ্ড' বুঝিল 'চন্দ্র সূর্য কেহ নয় মাটী তার খাঁটি'—আমরা আমাদের অতীতকে ছাড়িয়া বড় হইব না, প্রাচীনকে তাহার যাহা প্রাপ্য তাহা যথাযথ দান করিয়া, নবীনের সহিত তাহার যথার্থ সমন্বয় সাধনই আমাদের মঙ্গলের পথ— এই যে নবযুগ ইহার প্রভাতে আমরা যে সমস্ত মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাই শিশিরকুমার তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

জাতীয় ভাবই শিশিরকুমারের যথার্থ ভাব—ইহাই তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ, এই ভাবের মধ্য দিয়াই তাঁহাকে বুঝিতে হইবে। তাঁহার স্বদেশপ্রেমের ভাষা বৈদেশিক স্বদেশপ্রেমের অনুবাদ নহে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে বসিয়া স্বদেশপ্রেমের বাক্যগুলি আয়ত্ত করেন নাই—ইহা তিনি তাঁহার পল্লীভবনে বসিয়া অতি শৈশবে সহস্র সহস্র উৎপীড়িত কৃষকের কাতর আর্তনাদের মধ্য হইতে পাইয়াছিলেন। এই স্বদেশপ্রেমের প্রেরণা ও আদর্শের জন্যও তিনি পাশ্চাত্য জগতের মুখাপেক্ষী হয়েন নাই—বঙ্গের শ্রেষ্ঠ গৌরব শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবের জীবনী ও শিক্ষা তাঁহাকে সে উন্মাদনা ও সে শক্তি দান করিয়াছিল।

স্বর্গীয় কবি নবীনচন্দ্র সেন জাতীয় ভাবের আদি ও সর্বপ্রধান কবি—তিনি ভারতের জাতীয় একতার মনোমুগ্ধকর ছবি একটা যথার্থ ভিত্তির উপর রাখিয়া ভারতের অতীত ইতিহাসের মধ্য দিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। নবীনবাবুর আত্মজীবনীতে যখন পড়ি যে, তাঁহার স্বদেশ প্রেম যশোহরে অবস্থিতিকালে শিশিরবাবুর সংস্পর্শে আসিয়া দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তখন বুঝিতে পারি প্রত্যক্ষভাবে কার্য করা ব্যতীত সাধারণের অগোচরে শিশিরবাবুর জীবনী ও শিক্ষা কত বড় কার্যসাধন করিয়াছে।

ভারত-বন্ধু কেইন্ সাহেব শিশিরকুমারের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, এই দেশের অধিবাসীগণের অবস্থা সম্বন্ধে শিশিরকুমারের যে জ্ঞান ছিল তা বড়ই দুর্লভ। এই কথাটি যে একটি কত বড় সত্য তাহা আমরা অনেক সময়েই ভাবিয়া দেখি না। তৎপ্রণীত Indian Sketches নামক গ্রন্থ পাঠ করিলে বাঙালী মাত্রের অনেক চিত্তগত অবসাদ ও নিরাশা দূরীভূত হইবে। আমাদের অতীত ইতিহাস ভীরুতা, অজ্ঞানতা বা স্বার্থপরতার কাহিনী নহে, আমরা বৈদেশিকগণের কথাকেই বেদবাক্যবৎ অভ্রান্ত ধরিয়া তাহারই পুনরা-

বৃত্তি করিয়া চলিয়াছি—প্রধানত এই জন্যই আমাদের মধ্যে এত গৃহকলহ, এত খণ্ডতা। আমাদের অতীত একটি নিন্দার কথা নহে, ইহা শিশিরকুমার অতি কৃতকার্যতার সহিত দেখাইয়া গিয়াছেন। বিহারী সর্দারের একজন দস্যু হইলেও সে আমলের বাঙালী নিজ্জীব ও মনুষ্যত্বহীন ছিল না, আমাদের প্রপিতামহগণ যথার্থভাবেই স্বায়ত্ব শাসনের শক্তির অধিকারী ছিলেন, আমাদের বৃদ্ধা পিতামহী মাতামহীগণ জ্বলন্ত চিতায় যখন স্বেচ্ছায় ও আনন্দের সহিত সহমরণে যাইতেন, তখন আমরা কেবল বর্বরতা ও কুসংস্কারই দেখিতে পাই—কিন্তু ইহার মধ্যে যে বিশ্বাস, যে ভক্তি, যে আধ্যাত্মিকতা নিহিত রহিয়াছে তাহা কেবল ভারতবাসী হিন্দুকে নহে জগতের সমস্ত জাতিকেই উন্নত ও মহীয়ান করিতে সক্ষম। বঙ্গের শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেনের মধ্যে আমরা কেবল ভীরুতাই দেখিয়াছি, কিন্তু সেই সময়ের সভ্যতা যে একটা উন্নততর ও মহত্তর পদার্থ তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই সেই জন্যই আমাদের এই দুর্দ্দশা।

জাতিকে যথার্থভাবে জানিতে চেষ্টা করিতে হইবে, অতীতের সমক্ষে দাম্ভিক সমালোচকের মত দাঁড়াইলে হইবে না, জিজ্ঞাসু শিষ্যের মত বিনীতভাবে জানু পাতিয়া বসিতে হইবে, তবেই আমরা স্বদেশের প্রেমসাধনায় শিক্ষালাভ করিতে পারিব—ইহাই শিশিরকুমারের জীবনের একটি প্রধান শিক্ষা।

ভারতবর্ষের যাহা অন্তর্প্রকৃতি, যাহা উপনিষদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতির মধ্যে পরিস্ফুট হয়, সেই উচ্চ আধ্যাত্মিকতাই শিশিরকুমারের মাথার মুকুট এবং তাহাই যথার্থভাবে শিশির-কুমারকে তাঁহার কৃতজ্ঞ স্বদেশবাসীগণের মাথার মুকুট করিয়াছে। আজকাল সংশয়-বাদ বা অজ্ঞেয়তাবাদ একই হুজুক হইয়া পড়িয়াছে, এখন হয়ত সে ফেউ একটু কমিতেছে, কিন্তু মাঝে ইহা একটা খুব গর্ব্ব করিবার বস্তু হইয়াছিল। সেই যুগে শিশিরকুমারের উন্নত আধ্যাত্মিকতা নব্য ভাবতকে অনেক পরিমাণে যে প্রকৃতিস্থ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একজন বাঙালী দার্শনিক সভ্য জগতের মনীষিগণের সমক্ষে দাঁড়াইয়া বলিলেন যে, বাংলাদেশে আবির্ভূত শ্রীশ্রীমহাপ্রভু কৃষ্ণ চৈতন্যদেব কর্তৃক প্রচারিত ধর্ম্ম কেবল বর্তমান ভারতকেই গৌরবযুক্ত করিবে না বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সাধনা এমন স্থানে আসিয়া সমাগত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, মহাধর্ম্মের প্রেরণাই তাহাকে এখন আরও উন্নতস্থানে লইয়া যাইতে পারে। দরিদ্র বাঙ্গালী ইহা অপেক্ষা গৌরবের কথা আর কিছুই বলে নাই। এই যে উক্তি এ উক্তির মূলেও শিশিরকুমারের সাধনা ও শিক্ষা বিদ্যমান।

শিশিরকুমার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, শিক্ষিত বাঙালী ও ভারতবাসীকে এবং সমগ্র সভ্য জগতকে তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা, যাহা জীবনের উচ্চতম অধিকার, তাহা প্রদান করিবেন, সে কার্য্য তিনি অনেক করিয়া গিয়াছেন, পার্থিব দেহে যতদূর সম্ভব ততদূরই তিনি করিয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কারণ তিনি তাঁহার তিরোভাবের দিন প্রাতঃকালে তৎপ্রণীত সুপ্রসিদ্ধ 'অমিয় নিমাই চরিত' গ্রন্থের শেষ ফর্মার প্রুফ স্বয়ং দেখিয়া গিয়াছেন। এখনও তিনি অশরীরী রহিয়াছেন, উপযুক্ত পাত্রে শক্তি সঞ্চার করিতেছেন।

ধর্ম্মশীলতা ও লোকহিতৈষণা পরস্পর-বিরোধী নহে, গভীর ভগবৎ প্রেমের সহিত, দেশের জন্য সাধারণের জন্য অকাতর পরিশ্রমই জীবনের আদর্শ। আর এই আদর্শের জন্য বৈদেশিক গুরুর শরণাপন্ন হইতে হইবে না, দেশেই যে মহান আদর্শ রহিয়াছে ইহা শিশিরবাবুর জীবনের আর একটি খুব বড় শিক্ষা।

শিশিরকুমারের জীবনের একটি শিক্ষা এই দরিদ্র দেশের সর্ব্বত্র সুবর্ণ অক্ষরে লিখিয়া রাখা প্রয়োজন। যিনি খেলাইতে জানেন, তিনি কাণাকড়ি লইয়াও খেলিতে পারেন। দেশের সেবা করিবার, স্বজাতির ও স্বদেশের মঙ্গল করিবার ইচ্ছা সত্যই যাহার মনে জাগিতেছে, তাঁহার নিরাশ হইবার কারণ নাই;—শিশিরকুমার কত বিঘ্ন কত বিপদ ও কত অভাবের মধ্যে দিয়ে জীবনের ব্রত উদযাপন করিয়াছেন তাহা চিন্তা করিলে নিতান্ত শক্তিশালীর প্রাণেও আশা ও আনন্দের উদয় হইবে।

এখন শিশিরকুমার নিত্য বৃন্দাবনের অনন্ত আনন্দমধ্যে বিদ্যমান হইলেও, দেশের দুঃখে তাঁহার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত—দেশ তাঁহাকে বরণ করিয়াছিল, তিনিও দেশকে ধন্য করিয়াছেন—তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে পারিলে আমরাও ধন্য হইব।'

•

প্রমথনাথ সান্যাল সম্পাদিত 'সাহিত্য-সংবাদ' পত্রিকার ১৩১৯ সালের মাঘ-সংখ্যায় শিশিরকুমারের বার্ষিক স্মৃতি-সভার অনুষ্ঠানের একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। ৫৪ বৎসর পূর্বের এই স্মৃতিসভার সংবাদটি থেকেও তাঁর প্রতি তৎকালীন সংবাদপত্র সমূহের শ্রদ্ধার একটি প্রকৃষ্ট ছবি ফুটে ওঠে। সংবাদটি হচ্ছে—

স্মৃতি-সভা

"বাঙ্গালার সেই ক্ষণজন্মা পুরুষ শিশিরকুমারের স্বর্গারোহণের দিন স্মরণ করিয়া বিগত ৪ঠা মাঘ শুক্রবার তাঁহার পার্থিব কর্ম্মক্ষেত্রে উৎসব-সমারোহের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। তাঁহার ভক্ত, অনুরক্ত, সুহৃদ, আত্মজন অনেকেই সে অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।

শিশিরকুমার বাঙ্গালীর কি ছিলেন, বাঙ্গালীর তিনি কি উপকার করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালী হয়তো এখনও তাহা বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু যতই দিন যাইবে, আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, ততই তাঁহার স্মৃতি উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

তিনি কর্ম্মী ছিলেন, তিনি জ্ঞানী ছিলেন, তিনি ভক্ত ছিলেন। একাধারে তাঁহাতে তিন ভাবেরই বিকাশ পাইয়াছিল। তিনি যখন স্বদেশের সেবায় প্রাণমন ঢালিয়া দিয়া রাজনীতির আন্দোলনে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহার কর্ম্ম-জীবনের সেই মধ্যাহ্নালোকে দিক-দিগন্ত উজ্জ্বল হইয়াছিল। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র অতীত ইতিহাস যাঁহারা অবগত আছেন, এদেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের মূলসূত্র যাঁহারা লক্ষ্য করিতে পারিয়াছেন, শিশিরকুমারের কর্ম্ম-জীবন তাঁহাদের স্মৃতিপটে চিরঅঙ্কিত হইয়া থাকিবে। তাঁহাকে এ-দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের একজন গুরু বলিলেও বলা যাইতে পারে।

অন্যদিকে, তাঁহার 'অমিয়-নিমাই চরিত' তাঁহার জ্ঞানভক্তির মন্দাকিনী ধারা। তিনি কিরূপ জ্ঞানী, কিরূপ ভক্তিপরায়ণ ছিলেন, একমাত্র 'অমিয়-নিমাই চরিতের' উল্লেখ করিলেই সে দৃষ্টান্ত প্রকটিত হয়। বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব লোপ পাইবার উপক্রম হইতেছিল; শিশিরকুমার তাহাতে নব-জীবনের সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন। যতদিন বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব বিদ্যমান থাকিবে, বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-প্রবর্তক সাধু মহাত্মাগণের সঙ্গে সঙ্গে শিশিরকুমারের নামও কীর্ত্তিত হইতে থাকিবে। তাঁহার ন্যায় ভাব-বিভোর ভক্ত অধুনা বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি যখন নামগানে মাতোয়ারা হইয়া আত্মহারা হইতেন, তাঁহাতে শ্রীভগবানের আবির্ভাব হইত বলিয়া ভক্তগণ বিশ্বাস করেন। তেমন সরল শান্ত ভগবদ্‌ভক্ত আর কি আমরা দেখিতে পাইব।

যাহা যায় তাহা আর ফিরিয়া আসে না। শিশিরকুমার গিয়াছেন, তিনি আর ফিরিয়া আসিবেন না। তবে তাঁহার প্রভাব বাঙ্গালী জাতির মধ্যে চিরজাগরূক রহিবে, ইহা আমরা বিশ্বাস করি। তাঁহার ন্যায় মহাত্মার বিষয় যত আলোচনা হয়, তাঁহার ন্যায় মহাত্মার কর্মকাহিনী যতই স্মরণ করা যায়, ততই মঙ্গল। শিশিরকুমারের ন্যায় মহতের স্মৃতি-সভায়, তাঁহাদের কর্ম্মকাহিনীর আলোচনায়, প্রাণে উচ্চ ভাবের সঞ্চার করে। তাঁহার ন্যায় মহতের কথা স্মরণে, মন মহত্ত্বের দিকেই প্রধাবিত হয়।"

—কৃপণক

নালান্দার ধ্বংসস্তূপে

ইতিহাসের সাক্ষী ॥১

শ্যামল পাঠক

কিছুই ঠিক ছিল না আগে হঠাতই এবার বেরিয়ে পড়েছিলাম। প্রতিবেশী শংকর আমার ভাইয়ের মতো. মোগলসরাই-এ কাজ করে। ছুটিতে ও বাড়ী এসেছিল। শুনলাম পাটনাতে ওদের একটি শাখা অফিসে কাজ শেষ করে ও মোগলসরাই ফিরবে। শুনেই আমি সংগী হলাম। চলার পথে দেখে এলাম ইতিহাসের সাক্ষীদের। প্রাচীন ভারতের গৌরব ও ঐতিহ্যের চিহ্ন নিয়ে আজো তারা অনেকেই দাঁড়িয়ে। কিন্তু তাদের সে প্রাণ-প্রাচুর্য আর নেই। নেই অনেক কিছুই। মহাকাল তাদের গ্রাস করেছে। তবু যেটুকু ভগ্নাংশ অবশিষ্ট আছে, প্রতি মুহূর্তেই যেন স্মরণ করিয়ে দেয় ভারতের অতীতের সমৃদ্ধি ও আদর্শের কথা। তাই ইতিহাসের পটে বার বার মিলিয়ে দেখতে চেয়েছি বর্তমানকে। যতই দেখছি মুগ্ধ হয়ে ভেবেছি। ফিরে এসেও তাদের কথা ভুলতে পারিনি। আমার সমস্ত মনকে জুড়ে রয়েছে ইতিহাসের সেই সকল ক্ষত-বিক্ষত প্রহরী। সেই সংগে ভালোবেসেছি চলার পথে ক্ষণিকের বন্ধুদের। তাদের কথাই কি ভোলা যায়?

পঁচিশে অক্টোবর, বুধবার রাত্রে মাত্র দুখানা কম্বলের বিছানা সম্বল করে আর সামান্য পোষাক সংগে নিয়ে যাত্রা করলাম পাটনার পথে। হাওড়া স্টেশনে টিকিট কেটে জনতা এক্সপ্রেসে উঠে জায়গা করে বসলাম। আমাদের সামনের বেঞ্চে এক মধ্যবয়স্কা ভদ্র-মহিলা। তাঁর সংগে বারচৌদ্দ বছরের একটি ছেলে ও সাত-আট বছরের মেয়ে। কিছুক্ষণ পরে ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন আমরা কোথায় যাব। শুনে বললেন উনিও পাটনায় থাকেন। স্বামী ইঞ্জিনীয়ার। এর আগে ও'রা দিল্লী ছিলেন। বহু বছর পরে কলকাতায় এসেছিলেন। অনেক কথা হল। কথাবার্তার মাধ্যমে অল্প সময়েই বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। কখন যেন মাসিমা বলতে সুরু করেছিলাম। মনেই হচ্ছিল না কয়েক ঘণ্টা আগে ও'কে চিনতামই না। নানা গল্পে সময়টা বেশ কেটে যাচ্ছিল। এক সময় উনি আমাকে কিছু মিষ্টি খাওয়াতে চাইলেন। আমি অস্বীকার করায় বোধহয় ক্ষুণ্ণ হলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। পরে আবার ঘনিষ্ঠ হয়ে বললেন জান, তোমার মতো বয়সেরই আমার একটা ছেলে ছিল। আমার স্বামীর কাছে অনেক ছেলেই চাকরীর খোঁজে আসত। একবার একটি ছেলে এল। সে আমার সেই ছেলেকে নিয়ে বেড়াতে গেল বেনারস। সেখানে গংগায় ওরা স্নান করতে গিয়েছিল। হঠাৎ আমার খোকা পা পিছলে পড়ে যায় ঘাটে। মাথায় নাকে আঘাত লাগল। অজ্ঞান অবস্থায় ওকে হাস-পাতালে পাঠান হল। খবর পেয়ে আমরাও ছুটে এলাম। কিন্তু খোকার আর জ্ঞান ফিরল না। কোনদিন সে আর আমাকে মা বলে ডাকবে না। মাসিমার চোখ সজল হয়ে উঠল। আঁচলে চোখ মুছে চুপ করলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, অনেক রাত হল আজ থাক। উনি ঘুমোবার চেষ্টায় রইলেন। শংকর তখন ঘুমে অচেতন। আমি চুপচাপ তাকিয়ে রইলাম বাইরের দিকে। চাঁদের অস্পষ্ট আলোর সংগে অন্ধকারের স্রোত তখন বাইরে মাতামাতি করছে।

ট্রেনে আমার ঘুম হয় না। চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম। সমস্ত বগি ঘুমে ঢলে পড়েছে। ততক্ষণে বেশ শীত পড়েছে। ব্যাগের ভিতর থেকে কম্বলটা বের করে গায়ে জড়িয়ে নিলাম। পাশের দিকে বেঞ্চে নজর পড়তে দেখলাম এক ভদ্রলোক একা জেগে। পাশে স্ত্রী ও শিশু পুত্র ঘুমিয়ে। আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। বললেন, আমিও এভাবে ঘুমোতে পারি না।

উনি কালীঘাট থেকে এসেছেন। কয়েক-দিনের জন্য রাজগীরে বেড়াতে যাবেন। ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করতে করতে আর স্টেশন পেলেই চা খেয়ে রাতটা কাটিয়ে দিলাম। ধীরে ধীরে সূর্যের আলো ফুটে উঠল। গৈরিক মাঠের মধ্যে সূর্যের আলো পড়ে এক অপরূপ মাধুর্যের সৃষ্টি করল। পাহাড়ী মাটিতে সূর্যের লাল আলো পড়ে যেন রঙের খেলায় মেতে উঠেছে। শংকর তখনও ঘুমোচ্ছে। ওকে টেনে তুলে সেই দৃশ্য দেখালাম।

গাড়ী দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলল। একের পর এক স্টেশন পিছনে ফেলে সকাল সাড়ে দশটায় পাটনা স্টেশনে এসে থামল। সকলকে বিদায় জানিয়ে ট্রেন থেকে নেমে স্টেশনের বাইরে এলাম। স্টেশনটি বেশ বড়। বাইরেও অনেকটা খোলা জায়গা। একটা রিক্সা নিলাম। দুদিকের বাড়ী-ঘর দেখতে দেখতে গান্ধীময়দান পেরিয়ে বেশ কিছুক্ষণ পরে, শংকরদের অফিসে এসে পৌঁছালাম।

অফিসে বসেছিলেন গ্রুপ-ম্যানেজার কালী ব্যানার্জি। শংকর পরিচয় করিয়ে দিল। আমি মাঝে মাঝে কাগজে লিখি শুনে উনি তো খুব খুশী। ওখানেই পরিচয় হল প্রশান্ত ভট্টাচার্য ও বাবলু ঘোষের সঙ্গে। দুজনেই ওখানে কাজ করেন। কিছু ক্ষণের মধ্যেই ওরা আমাকে আপন করে নিলেন। কালীবাবু চা-য়ে আপ্যায়িত করলেন। অনেক সময় ধরে গল্প-গুজব করে সময় কাটালাম। তারপর একটি হোটেলে খেয়ে ফিরে এসে প্রশান্তবাবুর বিছানাতেই শুয়ে পড়লাম। সন্ধ্যাবেলায় ঘুরে বেড়ালাম সকলে মিলে। তখন শহর আলোয় ঝলমল করছে। শহরের পাশ দিয়েই বয়ে গিয়েছে গঙ্গা। গঙ্গার ধারে গিয়ে বসলাম। অনেকক্ষণ গল্প করে রাত্রে হোটেলেই আহারপর্ব শেষ করলাম।

পাটনার হোটেলে খেতে বেশ খরচ হয়। সবকিছুই, এমন কি ডাল-তরকারীও আলাদা দামে কিনতে হয়। আর তরকা নামে ডাল-সর্বস্ব যে তরকারী তা আমাকে খুবই নিরাশ করল। দামের ব্যাপারেও পাটনায় আমি খুশী হতে পারলাম না। যাই হোক রাত্রে ফিরে এলাম। অফিসঘরেই মেঝেতে ঘুমানোর আয়োজন করা গেল। আয়োজনই বটে। আগেই বলেছি দুটি মাত্র কম্বলই আমার ভরসা। একটি কম্বল বিছিয়ে অপরটি গায়ে দিলাম। আমার অবশিষ্ট জামা-প্যান্ট ভাঁজ করে তোয়ালে মুড়ে বালিশ বানালাম। পরিশ্রান্ত দেহে বেশ সুখশয্যাই মনে হল। কিন্তু ইতিমধ্যে অসংখ্য মশা আমাদের আক্রমণ করেছে; বোধহয় ওদের রাজ্যে অনধিকার প্রবেশের অপরাধে। সঙ্গে মশারি নেই, অতএব যুদ্ধ একতরফা। এদিকে শীতও পড়েছে বেশ। শেষে নিরুপায় হয়ে শীতের মধ্যেই পুরোদমে পাখা চালিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! এই অবস্থাতেও বেশ কিছুটা ঘুমিয়েছিলাম।

পরদিন ভোরে রাজগীর যাবার কথা। রাত সাড়ে তিনটের সময়েই আমার ঘুম ভেঙে গেছে, বোধহয় মশারই এ্যালার্মে। ঘুম থেকে উঠে আলো জেবলে দেখলাম কম্বলের বাইরে থাকা আমার হাত ও মুখ ফুলে গেছে---শংকরেরও। উঠেই হৈ-চৈ করে সকলকে টেনে তুললাম। আমার সঙ্গে শংকরের যাবার কথা। কিন্তু একটু পরে প্রশান্তবাবু ও বাবলুবাবুকেও ব্যস্ত হয়ে তৈরী হতে দেখা গেল। ও'রা বললেন, আমরাও কিন্তু যাচ্ছি। অথচ আগেরদিন রাত্রেও যেতে চাননি।

খুব ভোরেই আমরা রওনা হলাম। বাস-স্ট্যান্ডেই চা-পর্ব শেষ করে ভোরের বাসে যাত্রা করলাম। বাসে দেখলাম অধিকাংশ যাত্রীই বাঙালী। অনেকের সঙ্গেই আলাপ করলাম। ইতিমধ্যে বাস ছেড়ে দিল। খুব দ্রুতবেগে এগিয়ে চলল রাজগীরের দিকে। জানালা দিয়ে দেখলাম সবুজ ক্ষেত, গাছের ছায়ায় ছোট ছোট গ্রাম, কখন বা আঁকা-বাঁকা নদী। মনে হল শিল্পীর ক্যানভাসে ধরা পড়েছে কতগুলি নিখুঁত রঙিন ছবি। প্রকৃতি দেবীর সৌন্দর্য দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম। পাটনা থেকে রাজগীর চৌষট্টি মাইল পথ। এতটা পথ, কিন্তু মনে হল বেশ তাড়াতাড়িই পৌঁছে গেলাম।

অনেক দূর থেকেই রাজগীরের পাহাড়-শ্রেণী দেখা যাচ্ছিল। উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে-ছিলাম। বাস থামতেই নেমে পড়লাম। দু-চোখ ভরে দেখলাম পঞ্চপাহাড় বেষ্টিত মুক্ত প্রকৃতির লীলাভূমি--প্রাচীন মগধের রাজধানী এবং হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ ও মুসলমানদের তীর্থস্থান রাজগীর বা রাজ-গৃহকে। রাজগৃহ ছিল প্রাচীন ভারতের এক সমৃদ্ধিশালী নগরী। এই ঐতিহাসিক ভূমিতে ভারতের ইতিহাসের • অনেক পট পরিবর্তন হয়েছে। এই ভূমিতেই বুদ্ধদেব বুদ্ধত্ব লাভের আগে একসময়ে পাঁচ বছর তপস্যা করেছিলেন এবং বুদ্ধত্ব লাভের পরেও মগধ সম্রাট বিম্বিসারের সময়ে এই স্থানটি ছিল ভগবান বুদ্ধের অত্যন্ত প্রিয়। বিম্বিসারের শাসনকালেই রাজগৃহ উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল। এই সময়েই অজাতশত্রু পিতাকে বন্দী করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহাবীরও রাজগীর এবং নালন্দায় কিছুকাল অতিবাহিত করেছিলেন। বুদ্ধদেব ও মহা-বীর দুজনেই ছিলেন অজাতশত্রুর সম-সাময়িক। অজাতশত্রুর পর উদায়ীভদ্র সিংহাসনে বসেন। তাঁর রাজত্বকালেই পাটলীপুত্র নির্মিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে রাজ-গৃহের গৌরবও হ্রাস পেতে থাকে। অবশ্য হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও পর্যটকদের দৃষ্টিতে রাজগীরের মাহাত্ম্য আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। কিন্তু আজ আর সেই রাজগৃহ নেই, নেই তার রাজমহিমা। শুধু দেখা যায় চারদিকে ছড়িয়ে আছে ধ্বংসস্তূপ। মুগ্ধ হয়ে দেখছি আর ভাবছি।

একটু পরেই কিছুটা এগিয়ে আমরা একটা চায়ের দোকানে পেট ভরে জলখাবার ও চা পান করলাম। তারপর একটা টাঙ্গা ভাড়া করে ঘুরতে আরম্ভ করলাম। দেখলাম বিপুল গিরি, রত্নগিরি, উদয়গিরি ও বৈভার গিরি। প্রতিটি পাহাড়েই হিন্দু, বৌদ্ধ বা জৈনদের মন্দির আছে। পাহাড়গুলির দৃশ্য অতি মনোহর। টাঙ্গা ছেড়ে বৈভার গিরিতে উঠলাম। প্রথমে দেখলাম ব্রহ্মকুণ্ড, সপ্তধারা ও কাশীধারা কুণ্ড। পুলের উপর দিয়ে সরস্বতী নদী পার হয়ে এখানে আসতে হয়। সরস্বতী মন্দির এবং অন্যান্য মন্দিরও দেখা হল। বহু তীর্থযাত্রী ও পর্যটকদের কুণ্ডে স্নান করতে দেখলাম। সপ্তধারার গরম জল নাকি নানা রোগ নিরাময় করে।

ব্রহ্মকুণ্ডের পশ্চিম দিক দিয়ে পথ বৈভার গিরির উপরে উঠে গেছে। এই পথে উপরে উঠে পিপ্পল গুহা দেখলাম। এটিকে নিরীক্ষণ মিনার এবং জরাসন্ধের বৈঠকও বলা হয়। বৌদ্ধ-সাহিত্যেও এর উল্লেখ আছে। বুদ্ধদেব নাকি এখানে প্রায়ই আসতেন। এটি বড় বড় পাথরে নির্মিত কৃত্রিম গুহা। এখান থেকে আরো উপরে আধুনিক জৈন মন্দির দেখে সেখান থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে সপ্তপর্ণী গুহায় পৌঁছালাম। এখানে পর পর কতগুলি ক্ষোদিত গুহার শ্রেণী আছে। শুনলাম বুদ্ধদেবের নির্বাণলাভের পরে প্রথম বৌদ্ধ-সংগীতি ও ভিক্ষু সম্মেলন এখানেই হয়েছিল।

পাহাড়ে উঠে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। এক জায়গায় আমরা বসে পড়লাম কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্য। অদূরে দেখলাম একটি বাঙালী মেয়ে তার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে গল্প করছে। আমাদের দেখে হেসে বলল, শিবমন্দির না দেখে কিন্তু ফিরবেন না। তাহলে মনোবাসনা পূর্ণ হবে না। তপনবাবু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, সেইজন্যই তো আসা। এতটুকু সংকোচ নেই মেয়েটির। এর পরই সে ভাইয়ের সঙ্গে ছুটে পাহাড় থেকে নামতে লাগল। একটু বেচাল হলেই গড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। বোধকরি প্রকৃতির রূপ দেখে ও বেড়াতে আসার আনন্দে ও নিজের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। অদ্ভুত মেয়েটি।

তখন আমরা বসে রয়েছি অনেক উঁচুতে। এখান থেকে উপত্যকা ও অন্যান্য পাহাড়গুলিকে দেখে তার অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মোহিত হতে হয়। কয়েকটা ছবি তুললাম। তারপর এগোলাম শিবমন্দিরের রাস্তার দিকে। রাস্তার উপরেই দেখলাম প্রাচীন জৈন মন্দিরের অবশেষ। মধ্যে ঋষভদেব, পার্শ্বনাথ ও মহাবীরের মূর্তি আছে। মূর্তিগুলি সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর। এখান থেকে কিছু দক্ষিণে এগিয়েই দেখা পেলাম সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীর একটি ভগ্ন শিবমন্দিরের। মন্দিরের বাইরের মণ্ডপের কেবল স্তম্ভ-গুলিই বিরাজ করছে। মন্দিরগর্ভে রয়েছে শিবলিঙ্গ ও মুণ্ডহীন নন্দীর মূর্তি। এবার আমরা নেমে এলাম বৈভার গিরিকে বিদায় জানিয়ে। শরীর রোমাঞ্চিত হচ্ছিল এই ভেবে যে, একদিন বুদ্ধদেব, মহাবীর এইসব পথে ভ্রমণ করতেন। প্রাচীন ভারতের কত ইতিহাসই রচিত হয়েছে এই ভূমিতে।

পাহাড় থেকে নামতে কিন্তু কষ্ট হচ্ছিল না। নামতে নামতে বাবলুবাবু বলছিলেন, এত কাছে আমরা আছি কিন্তু এতদিন আসা হয়নি। আপনি না এলে হয়তো এসব দেখাই হতো না। বললাম, সেইজন্যই তো কথায় বলে, গাঁয়ের যোগী ভিখ পায় না। ওঁরাও একমত।

বৈভারগিরি থেকে নেমে টাঙ্গায় চড়ে উপত্যকা অঞ্চলে একে একে দেখলাম মনিয়ার মঠ, স্বর্ণভান্ডার, বিম্বিসার বন্দীগৃহ প্রভৃতি। মনিয়ার মঠ থেকে পশ্চিম দিকে স্বর্ণভান্ডার অবস্থিত। জনশ্রুতি যে এখানেই রাজা বিম্বিসারের কোষাগার ছিল। আর মণিয়ার মঠের দক্ষিণে পাটনা-গয়া রাজপথে এগিয়ে এক জায়গায় চওড়া দেওয়ালে ঘেরা জায়গার নাম বিম্বিসার বন্দীগৃহ। শুনলাম, এখানেই অজাতশত্রু পিতাকে বন্দী করে রেখেছিলেন। টাঙ্গা এগিয়ে চলল বানগঙ্গার দিকে। উদয়গিরি ও সোনাগিরির মধ্যবর্তী উপত্যকায় বয়ে চলেছে বানগঙ্গার ধারা। এখানকার প্রাকৃতিক মনোহর দৃশ্য দেখে আমরা সকলেই মোহিত হয়ে গেলাম। কাছেই দক্ষিণ দিকে দেখলাম বিরাট বিরাট পাথরে নির্মিত প্রাকার। প্রাচীন নগরের এটিই ছিল সুরক্ষাত্মক দেওয়াল। এই প্রাকারটি নাকি পাহাড়গুলির শিখর অতিক্রম করে পঁচিশ থেকে ত্রিশ মাইল বিস্তৃত। ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় যে, এই প্রাকারটি কোন মাল-মশলার সাহায্য ছাড়াই তৈরী হয়েছিল সেই প্রাচীনকালে। অথচ আজও সে তার অস্তিত্ব অনেকাংশেই বজায় রেখেছে। এখান থেকে চললাম রত্নগিরির দিকে। এখানে টাঙ্গায় চড়তে কিন্তু বেশ লাগছিল। প্রাচীন ঐতিহাসিক নগরীর অবশেষের মধ্যে ঘোড়ার খুরের শব্দ আর টাঙ্গার দোলানীতে মনে হচ্ছিল, একদিন তো এখানে এইভাবেই পথের ধুলো উড়িয়ে ঘোড়া ছুটতো রথ নিয়ে! অবশ্য সেই দিন এখন স্বপ্নমাত্র। শুধু পড়ে আছে তার স্মৃতিগুলি।

এলাম রত্নগিরিতে। এখানেও অনেক মন্দির আছে। রত্নগিরির দ্বিতীয় শিখরে জাপান বৌদ্ধ সংঘের অক্লান্ত উদ্যমের ফলে কুড়ি লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিশ্বশান্তি স্তূপ নির্মিত হয়েছে। বিশ্ব-শান্তি স্তূপ দর্শনের জন্য রত্নগিরির উপর রজ্জুপথ আছে। বিশ্ব-শান্তি স্তূপ দর্শন করে গৃধ্রকূটে বুদ্ধদেবের বহু স্মৃতি বিজড়িত গুহা দুটি দেখলাম। এই শৃঙ্গটি রত্নগিরিরই একটি অংশ। ফেরার পথে বেনুবন ও রাজগীর গ্রাম দেখে একটি বাঙালী হোটেলে এলাম। তখন ক্ষিধেয় আমরা সকলেই অস্থির। হোটেলে তাড়াতাড়ি খেয়ে আবার রওনা হলাম। স্নান করা আর হল না। কুণ্ডে প্রচণ্ড ভীড় দেখে স্নান করতে ভরসা পাইনি।

বাস স্টপে এসে শুনলাম নালন্দার বাস আসতে দেরী হবে। কিন্তু সময় আমাদের সীমিত। তাই ওখানেই এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করে ভাগে একটি ট্যাক্সি নিলাম। ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও দুটি ছোট মেয়ে। মেয়ে দুটি খুবই চঞ্চল। স্কুলে পড়ে। নালন্দা সম্পর্কে ওদের খুবই উৎসাহ। ট্যাক্সিতে ভদ্রমহিলা বলছিলেন, ভালই হল আপনারা সঙ্গে থেকে। অনেকেই এই সময় আসতে নিষেধ করেছিলেন। কালই বাড়ী ফিরে যাবো। আজ না গেলে নালন্দা দেখা হবে না, তাই চলে এলাম। বললাম, ভালই করেছেন। কিন্তু নালন্দা নির্জন স্থান। এখানে থাকার ব্যবস্থা নেই। আর বাস রাস্তাও অনেকটা দূরে। তাই অনেকেই বিকেলে যেতে চান না। ভদ্রলোক বললেন, ঠিক আছে তাড়াতাড়ি ফিরে যাবো। রাজগীর থেকে নালন্দা সাত মাইল উত্তরে। কথায় কথায় আমরা এসে পড়লাম।

সেদিন শুক্রবার, তাই টিকিট কাটতে হল না। ভিতরে প্রবেশ করতেই সামনে নজর পড়ল মুখ্য স্তূপটির দিকে। চারিদিকে বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে ধ্বংসাবশেষ। আশ্চর্য নীরবতা। যেন প্রাচীন কাল থেকে ধ্যানে মগ্ন হয়ে আছে কোন ঋষি। অথচ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার পীঠস্থান এই নালন্দাই একদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-কেন্দ্ররূপে খ্যাতি লাভ করেছিল। আজ আমরা দেশ-বিদেশে যাচ্ছি উচ্চশিক্ষার জন্য। কিন্তু সেদিন দেশ-বিদেশের বহু পণ্ডিত এখানে আসতেন অধ্যয়নের জন্য।

পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্ত শাসক কুমার গুপ্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রথম থেকেই নালন্দা ছিল বৌদ্ধদের প্রধান কেন্দ্র এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যই বিখ্যাত হয়েছিল। গুপ্ত বংশের শাসন কালেই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় উন্নতির চরম সীমায় ওঠে। মহারাজ হর্ষবর্ধন ও পাল বংশের রাজারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এছাড়া আরো অনেক রাজার দানে নালন্দা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। প্রখ্যাত চীনা পণ্ডিত ও পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ যখন জ্ঞান-চর্চার জন্য এখানে আসেন তখন মহাপণ্ডিত শীলভদ্র নালন্দার প্রধান আচার্য ছিলেন। সেই সময়ে দশ হাজার ছাত্র ও দেড় হাজার অধ্যাপক এখানে বাস করতেন। নালন্দা ছিল আবাসিক বিশ্ব-বিদ্যালয়। কিন্তু এখানে ছাত্রদের অধ্যয়ন ও খাওয়ার জন্য কোন খরচ লাগত না। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আচার্যগণ যেমন জ্ঞানদানে

নালন্দার মধ্য ধ্বংসস্তূপ

আগ্রহী ছিলেন শিষ্যরাও তেমনি জ্ঞানার্জনের জন্য সর্বদাই সচেষ্ট হতেন। নালন্দার প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের মধ্যে আচার্য নাগার্জুন আর্যদেব, জিনমিত্র, ধর্মপাল, চন্দ্রপাল, গুণমতি শীলভদ্র প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গের নাম উল্লেখযোগ্য। ভারতে বৌদ্ধধর্মের পতনের সূত্র থেকে নালন্দারও অবনতি আসন্ন হল। ১১৯৭—১২০৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বক্তিয়ার খিলজী নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়টি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন। এই সময় ভিক্ষুদের হত্যা করে পুস্তকালয়টিও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অগ্নিকাণ্ডের ফলে চৈত্য, বিহার, মন্দির সবই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল।

ঘুরে ঘুরে বহু স্তূপ ও বিহার দেখলাম। মধ্য স্তূপের সিঁড়ি বেয়ে স্তূপের শীর্ষে উঠলাম। এখান থেকে সমস্ত ধ্বংস ক্ষেত্রটিই দেখা যাচ্ছিল। মাটি খনন করে এসব উদ্ধার করা হয়েছে। মধ্য স্তূপটি কতগুলি ক্ষুদ্র স্তূপ দ্বারা পরিবেষ্টিত চতুষ্কোণ বৌদ্ধ মন্দির। দেওয়ালের উপর বুদ্ধমূর্তি নির্মিত। বিভিন্ন বিহারের অঙ্গনে দেখলাম অষ্টকোণ কূপ, উনুন প্রভৃতি।

নালন্দার ধ্বংসাবশেষ দেখে ফিরে এলাম বাইরে। একটা ছোট্ট চায়ের দোকানে বসলাম সবাই। চা-পান শেষ করে অদূরেই ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের সংগ্রহশালায় গেলাম। এখানে নালন্দার ধ্বংসস্তূপে উদ্ধারপ্রাপ্ত প্রচুর মূর্তি, শীলমোহর খেলনা, বাসন, শিলালেখ, দগ্ধ চাউল প্রভৃতি রাখা হয়েছে। এই মিউজিয়ামটি খুবই সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন।

মিউজিয়ম থেকে বেরিয়ে একটা টাঙ্গা নিয়ে বাস। রাস্তায় চললাম। আমাদের চালকটি কিন্তু নিতান্তই কিশোর। চলতে চলতে ওর সঙ্গে আমরা যেন মিশে গেলাম। ছেলেটি ছোট হলেও বেশ আলাপী। ওর বাবা অসুস্থ, কাজ করতে পারে না। তাই ওদের ছোট্ট সংসারের হাল ওকে এই বয়সেই ধরতে হয়েছে। শুনে খুবই কষ্ট হচ্ছিল আমাদের। বাস স্টাণ্ডে এসে ওর ভাড়া মিটিয়ে বিদায় জানালাম। বিষণ্ণ মুখে মিষ্টি হাসি ফুটিয়ে গাড়ী নিয়ে ও ধীরে ধীরে চলে গেল।

ফেরার পথে যেতে হবে পাওয়াপুরী। বিহারশরীফ থেকে আট মাইল দক্ষিণে। শুনলাম বিহার-শরীফের বাস অনেক দেরীতে আসে। কাছেই একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল। জিজ্ঞেস করতেই অস্বাভাবিক ভাড়া চেয়ে বসল। বিরক্ত হয়ে আমরা পিছিয়ে এলাম। ওখানে ট্যাক্সিতে মিটার নেই। যে যা নিতে পারে। ইতিমধ্যে এক ভদ্রলোক এলেন, সঙ্গে তাঁর স্ত্রী। বোধহয় বেশীদিন বিয়ে হয়নি। ভদ্রলোক ঐ ট্যাক্সিতে আমাদের শেয়ারে যাবার জন্য বললেন। কিন্তু আমরা রাজি হলাম না। দেখলাম ভদ্রমহিলার মুখ ভার, চোখ ফোলা। বারবার তিনি চাপা স্বরে বলছেন, এই তো সন্ধ্যা হয়ে এল। এখন বাস না পেলে? তবু রাজগীর, নালন্দা একদিনে দেখতে হবে। ভদ্রলোককেও কিছুটা বিব্রত মনে হল। এমন সময় একটা শেয়ারের ট্যাক্সি এল, ভেতরে অনেক লোক। ভদ্রলোক কোনরকমে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে উঠলেন। এতক্ষণে ভদ্রমহিলার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মুখে হাসি দেখা দিল। আমাদের দিকে তাকিয়ে দুষ্টু হাসি হাসলেন। যেন আমাদের হারিয়ে দিলেন। তারপর হাত নেড়ে বিদায় জানালেন। আমরাও হাত নাড়লাম।

তখন আমরা বেশ জমিয়ে গল্প করছিলাম কয়েকজন স্থানীয় চাষীর সঙ্গে। মাঠ থেকে ওরা ঘরে ফিরছিল। আমরাই ডেকে কথা বললাম। কী সরল ওরা। কলকাতা সম্পর্কে ওদের তো খুবই উৎসাহ। একজন বলেই ফেলল যে, ভাগ্যে থাকলে একবার কলকাতা দেখে যাবে। দেখলাম ওরা বেশ গরীব। কিন্তু দারিদ্র্য ওদের ঔদার্যকে গ্রাস করতে পারেনি। একটু পরেই আমরাও শেয়ারের ট্যাক্সি পেলাম। ছুটলাম পাওয়াপুরীতে। ওখানে পৌঁছাতে রাত হয়ে গেল।

পাওয়াপুরীতে জৈনদের চব্বিশতম তীর্থঙ্কর মহাবীর মহাপরিনির্বাণ লাভ করেছিলেন। এখানে দুটি মন্দির আছে। যেখানে মহাবীর দেহত্যাগ করেন একটি মন্দির সেখানে। এটি গ্রামে অবস্থিত। আর যেখানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছিল, সেখানে পরবর্তীকালে পদ্মদীঘির মাঝখানে সুন্দর শ্বেতপাথরের মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে। চমৎকার মন্দিরটি! রাত্রে জ্যোৎস্নার আলোকে যেন স্বপ্নময় হয়ে উঠেছে। চেয়ে থাকলাম অনেকক্ষণ। শংকর বলল এবার ফেরা যাক। ফিরলাম বিহার শরীফ। ওখান থেকে পাটনার বাস ধরলাম।

শীতের ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, শীত লাগছে বেশ। ফাঁকা রাস্তায় ঝড়ের বেগে বাস ছুটল। বাসের সমস্ত জানালা বন্ধ, তবুও ঠাণ্ডা লাগছে। রাত প্রায় এগারোটায় বাস পাটনা এসে থামল। বাস থেকে নেমে আমরা সোজা হোটেলের দিকে চললাম খাবার জন্য। শরীর তখন ক্লান্ত। অবসন্ন দেহে হোটেল থেকে ফিরে এলাম আস্তানায়। শুয়ে পড়তেই ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে গেলাম।

পরদিন ঘুম ভাঙল সকাল সাতটায়। ঘুম থেকে উঠে প্রস্তুত হলাম পাটনা শহরটা ভাল করে দেখবার জন্য। তখন শংকর বলল, সকালে একটু কালীদার বাসায় যেতে হবে। বৌদি আপনাকেও যেতে বলেছেন। অফিসের কাছেই কালীবাবুর বাসা। যেতেই বৌদি শংকরকে বলে উঠলেন, এতক্ষণে আসা হল! আমি তো ভাবলাম ভুলেই গেছ আমাকে। বসতে বললেন আমাদের। অনেক গল্প করলেন। সকালের চা-পর্বও এখানেই সমাধা হল। ফেরার আগে বললেন, রাত্রে কিন্তু এখানেই আপনারা খাবেন। পাটনার হোটেলে খেতে আমার উৎসাহ নেই। সুতরাং খুশীই হলাম।

রাস্তায় নেমে একটা রিকসা ভাড়া করলাম। একে একে দেখলাম বিভিন্ন কলেজ, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়, সেক্রেটারিয়েট ভবন, বিধানসভা ভবন, মিউজিয়াম ও গোলঘর। গোলঘরটি ইংরেজ আমলের গম্বুজাকৃতি বিরাট গুদামখানা। বাইরের দিকে সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। উপরে উঠে দেখলাম, এখান থেকে গঙ্গা ও সমস্ত শহরটাই প্রায় দেখা যায়। শহরের প্রান্তে দেখলাম ছোট্ট বিমানঘাটি। সবশেষে কুমরাহার গ্রামে অশোকের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখলাম। কালের ধ্বংসশীল প্রভাবে তার সামান্যই অবশিষ্ট আছে। পাটনারই প্রাচীন নাম ছিল পাটলিপুত্র। পাটলিপুত্র ছিল অশোকের রাজধানী। অশোকের সময়েই এই রাজপ্রাসাদটি নির্মিত হয়েছিল।

যাই হোক পাটনা আমার কাছে খুব আকর্ষণীয় মনে হল না। এখানকার বিধানসভা ভবন ও হাইকোর্টের বাড়ীগুলিতে ছাদ নেই, উপরে টালি বা খোলা দিয়ে বাংলো কায়দায় ছাওয়া। মিউজিয়ামটি অবশ্য খুবই সুন্দর। এখানে মাঝে মাঝেই পথে রিক্সা, সাইকেল ও অন্যান্য গাড়িতে জট বেঁধে যায়। ট্রাফিক আইনেরও অনেকেই ধার ধারে না। যে যেখান দিয়ে পারে চালিয়ে দেয়। চলার পথে এখানে বেশ কয়েকজন বাঙালীর সংগে আলাপ হল। শুনলাম প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে এখানে অনেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত। বাঙালীর সংখ্যাও অনেক। একটি বাঙালী সাংস্কৃতিক সংস্থার পাকা পুজো মণ্ডপ ও ব্যায়ামাগার দেখলাম। এখানে নাকি বাঙালীদের আরো কয়েকটি সাংস্কৃতিক সমিতি আছে। তাঁরাও প্রতি বছর দুর্গাপুজো, কালীপুজো ও নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকেন। পাটনায় এসে এখানকার একটি বাংলা সাময়িকপত্রও চোখে পড়েছিল। পথে এক বাঙালী ভদ্রলোকের সংগে কথা বলছিলাম। কিছুদিন হল তিনি চাকরী নিয়ে এখানে এসেছেন। কথায় কথায় বললেন, যাই বলুন এখানকার প্রবাসী বাঙালীরা কিন্তু খুবই আত্মকেন্দ্রিক। আন্তরিকতা বড় একটা নেই। জানি না ভদ্রলোক কোথাও আঘাত পেয়েছেন কিনা।

ফিরতে অনেক দেরী হল। রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে, আগের দিন স্নান করা হয়নি, বেশ অস্বস্তি লাগছে। এদিকে প্রচণ্ড ক্ষিধেও পেয়েছে। ফেরার পথে তাই আগেই খেয়ে নিলাম। ফিরে এসে একটু বিশ্রাম করে মাথায় কয়েক বালতি জল ঢালতেই শরীর ঠাণ্ডা।

দুপুরে ঘুম দিয়ে সন্ধ্যায় উঠলাম। [illegible]কর ওর এক বন্ধুর বাড়ী গেল। আমি [illegible]র গেলাম না। সকালে অনেক ঘুরেছি, [illegible]চাপ বসে থাকতেই তখন ভাল লাগল।

সন্ধ্যার পরে একটা চায়ের দোকানে বসে [illegible] পান করছি, দেখলাম কয়েকজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক বসে গল্প করছেন। ও'দের মধ্যে একজন প্রশান্তবাবু ও বাবলুবাবুর সংগে আমাকে দেখেছেন। জিজ্ঞেস করলেন, ক'দিন আছেন? বললাম, আজ পর্যন্তই। ওখান থেকে ফিরে এসে চুপ-চাপ ও, হেনরীর গল্পের বইটা নিয়ে বসলাম। রাত নটার সময় কালীবাবু এলেন, বললেন, মনে আছে তো? শংকরের খোঁজ করলেন। বললাম বন্ধুর বাড়ী গিয়েছে, এখনো ফেরেনি। উনি বললেন, ও এলেই কিন্তু আপনারা চলে যাবেন, ডাকতে হয় না যেন। রাত সাড়ে দশটায়ও শংকরের পাত্তা নেই। কালীবাবু আবার এলেন। শুনে বললেন, ও ঐ-রকমই পাগল। কিছুই খেয়াল থাকে না। ওখান থেকেই হয়তো খেয়ে ফিরবে। চলুন আপনি খেয়ে নেবেন। একাই আমি খেয়ে এলাম। বৌদি বললেন, শংকরের কাণ্ডটা দেখলেন? খেয়ে না এলে যত রাতই হোক ওকে পাঠিয়ে দেবেন।

রাত বারোটায় শংকর এলো। আসতেই আমি গম্ভীর স্বরে বললাম, কী ব্যাপার, এতক্ষণ কোথায় ছিলে? ও বলল, বন্ধু না খেয়ে কিছুতেই আসতে দিল না। অনেক বার বলেছিলাম, শুনলো না। আপনি খেয়েছেন তো? বললাম, আমার জন্য দেখছি তোমার খুবই চিন্তা! এরপর কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। পরদিন মোগলসরাই যেতে হবে। সেই কথা ভাবতে ভাবতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছি।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙ্গল মিছিলের চিৎকারে। পাটনায় এসে এই ব্যাপারটা নতুন দেখলাম। যে কদিন ছিলাম প্রায় প্রতিদিনই ভোরবেলা মিছিলের চিৎকার শুনেছি, অবশ্য বেশী লোকের নয়। প্রথম দিন তো বুঝতে না পেরে বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। সকালবেলায় স্নান সেরে, জিনিস-পত্র গুছিয়ে তৈরী হয়ে নিলাম। সাড়ে আটটা নাগাদ আমরা রিকসায় উঠলাম স্টেশনে যাবার জন্য। কালীবাবু সকালেই এসেছিলেন, প্রশান্তবাবু এবং বাবলুবাবুও রাস্তা পর্যন্ত এলেন। ও'রা বললেন, আবার আসবেন কিন্তু। বললাম, না এলেও আপনাদের ভুলবো না। রিকসা এগিয়ে চলল, হাত নেড়ে ও'দের বিদায় জানালাম।

স্টেশনে পৌঁছে কিছু জলখাবার খেয়ে নিলাম। শংকর টিকিট কাটতে গেল। টিকিট কেটে আমরা প্লাটফরম-এ এলাম। ইতিমধ্যে ট্রেন এসে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে আমরা একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসলাম। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম আকাশে মেঘ জমতে সুরু করেছে। বোধ হয় বৃষ্টি হবে। একটু পরেই ট্রেন ছাড়ল। ট্রেনের গতি দ্রুত হল। সেই সংগে মন হল উন্মনা। নানা স্মৃতি মনে গেঁথে পাটনা থেকে বিদায় নিলাম। কিন্তু মনে হল, কারা যেন তখনও আমাকে পিছন থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

(আলোকচিত্রগুলি লেখক কর্তৃক গৃহীত)

মধ্যপথে ॥ গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

ওদিকে পড়ন্ত বেলার রক্তিম আলপনা-আঁকা পথ,
সেখানে নিজেকে ছেড়ে দাও তুমি খুশীর খেয়ালে
এদিকে ধূসর ধূসরতর অববাহিকা,
তোমার স্মৃতিগন্ধে সুরভিত।
মধ্যপথে থেমে থাকা অসম্ভব,
অদৃশ্য নিষাদ সুতীক্ষ্ম শর হাতে ওৎ পেতে আছে অদূরে।
পিছনের পথের মায়া টানছে,
সামনের আলোকিত পথ হাতছানি দিচ্ছে,
নিরালা ঝর্ণার মতো আপন মনে উচ্ছ্বসিত তুমি,
বুকের মধ্যে পাখির কাকলি:
নিজেকে উন্মথিত করে, উৎক্ষিপ্ত করে,
হাউই-এর মতো ঊর্ধ্ব আকাশে উঠে,
দেখার ইচ্ছা হয়—
নিবিড় নীলিমার পটভূমিকায়
উদ্ভিন্ন উৎসের অনাবৃত বুকের মতো তোমার রূপ
শুনতে ইচ্ছা হয়—
বসন্ত বনে কোকিলের স্বরের মতো তোমার আলাপ।

ঐশ্বর্যের খোলো পোষাক, বুদ্ধির চুলচেরা ছিবড়ে,
ফেলে দিয়ে, নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করে, ধন্য হতে চায় দেহমন
আত্মা
সার্থক প্রেমের সমুদ্রে সাঁতার কেটে, নাকি দুঃসহ ঘৃণার
লাভাস্রোতে দগ্ধ হতে!

ওদিকে পড়ন্ত বেলার রক্তিম আলপনা-আঁকা পথ,
এদিকে ধূসর ধূসরতর অববাহিকা।

রৌদ্রে অনালোয় ॥ শুভ মুখোপাধ্যায়

তুই যেন মা চৌপহরে পাগলপারা,
চারভিতে তোর ছড়িয়ে যেন কপাল সিঁদুর
তুমি তখন বিপুল হেঁকে বলছ শুধু
আমার প্রতিচ্ছায়,
খেয়াল রেখো অবরোহী
যুদ্ধ এখন বসত জুড়ে প্রাকৃত ইচ্ছায়!

ঝিঁঝি এখন পাগল ছেলের
ভাজছে ধানের খই
মাগো এমন উন্মীলনে
কপাল সিঁদুর কই।

নিষ্ঠুর রাবণ, তুমি ॥

রঞ্জিতকুমার সরকার

তোমার নিরাভরণ ঘুড়ি নেমে এসেছিলো
আমার শব্দবহুল বিছানায়,
উদ্‌ভ্রান্ত সুড়ঙ্গের মধ্যে একটি সন্ধানী মাছি
নীলাভ ডানা দিয়ে ঢেকে রেখেছে
আমার দ্রুতগামী স্বপ্ন,
চিত্রপরম্পরার মধ্যে সটান চলে যাচ্ছে
আমার রুক্ষ দুহাত—
এই দায়িত্বশীল ঋতু-আলেখ্য
এবং তার আপ্লুত আবহসংগীত
আমাকে নির্বাসিত চেয়ারে বসিয়ে দ্যায়,
চেয়ে দ্যাখো, হে কিন্নর—
তোমার বীভৎস তালাচাবি
আমাকে বন্দী করে তরিতরকারীময় গন্ধে:
নিষ্ঠুর রাবণ, তুমি গন্ডী ছিঁড়ে নিয়ে চলো
উচ্ছৃংখল অশোককাননে।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পরদিন অফিসে সোজা দেশপাণ্ডের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। দেশপাণ্ডে একটা ফাইল গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ছিলেন। আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বললাম, 'একটা জরুরী দরকার ছিল।'

দেশপাণ্ডে চোখ না তুলেই হাতের ইসারায় চেয়ারে বসতে বললেন। কিছুক্ষণ বসে থাকার পরেও যখন মুখ তুললেন না, আমাকে বাধ্য হয়েই বলতে হল, 'জামসেদপুরের ডিলার অ্যাপয়েন্ট করার ব্যাপার নিয়ে—'

আমার কথা শেষ হবার আগেই দেশপাণ্ডে বলে উঠলেন, 'আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। কাল হেড অফিস থেকে ডিলার অ্যাপয়েন্ট করে চিঠি দিয়েছে।'

'হেড অফিস কেন? ইস্টার্ন জোন তো কোলকাতার আণ্ডারে।'

দেশপাণ্ডে ঘাড় তুলেই নামিয়ে নিলেন। বললেন, 'হেড অফিস হয়ত মনে করেছে, ইণ্ডিয়ার সমস্ত জোনই তাদের আণ্ডারে। যাকগে, যে-কথা বলছিলাম, ওরা দস্তুর অ্যাণ্ড কোম্পানীকে মাল বেচার ভার দিয়েছে।'

'আমাকে জামসেদপুরে পাঠানো হল কেন?' নিজের কানেই নিজের গলা বিষম কর্কশ শোনাল।

দেশপাণ্ডে চশমা খুলে নিয়ে রুমাল দিয়ে কাচ পরিষ্কার করতে করতে বললেন, 'আপনাকে জামসেদপুরে পাঠিয়েছিলাম আমি। দস্তুর কোম্পানীকে অ্যাপয়েন্ট করেছে হেড অফিস, বুঝতেই পারছেন, এই ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ অসহায়।'

উত্তর দেবার মত কথা খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। দেশপাণ্ডে বলে উঠলেন, 'কাল আমার মেয়ে এসেছে। ও একা একা এখানে বোর ফিল করে। সময় করে যদি ওকে সঙ্গ দিতে পারেন ও খুশী হবে।'

'আমার সাধ্যমত চেষ্টা করবো' বলে উঠে পড়লাম। একটা গ্লানি যেন আমার অন্তরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। শশাঙ্ক মুখার্জিকে একরকম কথাই দিয়ে এসেছিলাম। লোকটা হয়ত আমার ওপর বিশ্বাস করে বসে থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে ভাববার চেষ্টা করলাম, ও একজন মাতাল। মাতাল হলে মানুষ মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলে। মনুষ্যত্ব না হারালে নিজের স্ত্রী কিম্বা ছেলেকে মারে না মানুষ। শশাঙ্ক যে একজন দুশ্চরিত্র মাতাল এ-কথা ভাবতে পেরে উপরে উপরে আমি আবার স্বাভাবিক হয়ে এলাম। মনে মনে এই বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে চাইলাম, জামসেদপুরে নিশ্চয়ই বেশ কয়েকজন বাঙালী ব্যবসাদার আছে। তাদের মধ্যে একজনের বেশী কেউ মদ খায় নিশ্চয়। সুতরাং শশাঙ্ক মুখার্জিই যে করবীর স্বামী তার কোন মানে নেই। হলেও, করবীর স্বামীকে সাহায্য করার নৈতিক দায়িত্ব আমার থাকবার কথা না। করবী ইচ্ছে করলে আমাকে ওদের জামসেদপুরের বাড়ির ঠিকানা দিতে পারত। কিন্তু দেয়নি। তার মানে, করবী আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চায় না। যদি চাইত, করবী অন্ততঃ আমাকে একটা চিঠি দিতে পারতো। এখন করবী কোথায় আছে? ও-ছেলে লালাশিস কি করবীকে আমার কথা বলেছিল? শুনে করবী কি ভেবেছিল কে জানে। হয়ত ভেবেছিল, লোকটা অত্যন্ত লোভী। পুরনো সম্পর্ক ধরে আবার নতুন করে কাছে আসতে চায়। হয়ত করবী মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েছিল! কিম্বা কে জানে, সুখীই হয়েছিল বা। ভেবেছিল, আমি এখনও ওকে মনে করে রেখেছি।

অফিসে বসে এই সব আবোল-তাবোল কথা ভাবা উচিত না। এতে কাজের ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু করবী আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলা শুরু করে দিল। যত মন থেকে ওকে তাড়াতে চাইছিলাম, ততই ও ঘুরে ঘুরে আমার সামনে এসে দাঁড়াতে লাগল। এক এক সময় করবীকে যেন খুব স্পষ্টভাবে দেখতেও পাচ্ছিলাম। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে করবীর ওপরের ঠোঁট একটু ফুলে ওঠে। সেই ফোলা ফোলা ভাবটাও তখন দেখতে পাচ্ছিলাম। করবীর গা দিয়ে একটা মৃদু সৌরভ আসতো। সেই গন্ধ যেন আমাকে স্পর্শ করতে লাগল। করবীকে নিয়ে যখন এভাবে খেলা করছিলাম, ঘরে এসে ঢুকলেন তেওয়ারীজী। একটা চিঠি আমার টেবিলে রেখে দিতে দিতে বললেন, 'চিঠিটা গোপনীয়, তাই নিজে দিয়ে গেলাম। আপনার পড়া হয়ে গেলে রেখে দেবেন এসে নিয়ে যাব।' সেটা হেড অফিসের চিঠিটা, যার কথা কিছুক্ষণ আগেই দেশপাণ্ডে বলেছেন।

চিঠি দিয়েই তেওয়ারী বেরিয়ে গেলেন না। অন্যান্য দিন হলে ভদ্রলোকের সঙ্গে দুই-একটা কথা বলতাম। আজ পরাজয়ের গ্লানি মন ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল। মানুষ ভাল লাগছে না। বললাম, 'আমি একটা জরুরী কাজ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছি। আপনার কি কোন দরকার আছে?' •

তেওয়ারী দাঁড়িয়ে থেকেই বললেন, 'তেমন বিশেষ কিছু না। অফিসের গাড়ি সব সময়ই থাকবে, আপনার যেখানে যাবার যেতে পারেন।'

'ধন্যবাদ। দরকার হলে নিয়ে যাব।' খোলা ফাইলের ওপর মাথা আরও ঝুঁকিয়ে দিলাম।

'আর একটা কথা। মিস দেশপাণ্ডে যদি আসেন আপনি কি ডিস্টার্বড ফিল করবেন?'

চোখ না তুলেই বললাম, 'সেরকম করাটাই তো স্বাভাবিক। অফিস টাইমে অফিস সংক্রান্ত কাজ এবং কথাবার্তাই হওয়া উচিত।'

তেওয়ারী তবু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, 'মিস দেশপাণ্ডে এখন কিছুদিন এখানে থাকবেন। অথচ সঙ্গী সাথী ওঁর কেউ নেই।'

'কেউ নেই বললে ভুল হবে। দু-একজন আছে নিশ্চয়।' ইচ্ছে করেই অনিমেষের নাম উচ্চারণ করলাম না।

'যারা আছে, তাদের সঙ্গে ওঁর মেলামেশা করা উচিত হবে কি!'

হঠাৎ তেওয়ারীর ওপর বিষম রাগ ধরে গেল। বলে ফেললাম, 'অফিসে বসে আমি অফিস সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া অন্য কথা বলতে ইচ্ছুক না। সে অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে। আর একটা কথা, মিস দেশপাণ্ডে যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান, লাঞ্চটাইম কিম্বা অফিসের পরে আসতে পারেন।'

'বেশ।' বলে তেওয়ারী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। একটা অস্থিরতা ক্রমশই আমাকে ঘিরে ধরছিল। মনে হতে লাগল, এইভাবে চেয়ারে বসে থাকলে আমার দম বন্ধ হয়ে যাবে, অনিমেষকে ফোন করলাম। অনিমেষ বেরিয়ে গেছে। জয়ন্তকে ফোন করে জানলাম, জয়ন্ত আজ অফিসে আসেনি। অথচ চুপ করে বসে থাকতে অসহ্য লাগছিল। কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে পায়চারি করলাম। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। একখণ্ড আকাশ চোখের সামনে যেন স্থির হয়ে রয়েছে, না, স্থির হয় নেই। নীল আকাশের নীচ দিয়ে হাল্কা মেঘ দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে। শরতের আকাশ দেখতে আমার ভাল লাগে। অথচ কতদিন আকাশ দেখি না। কতদিন হল কলকাতা ছেড়ে এসেছি। কতদিন মাকে দেখি না। বড়মামাকে দেখি না। মেজমামা, ছোটমামা, মামীদের, তাপস, মীরা, অজয় ওদের দেখি না। কতদিন দমদমের বাড়িতে যাই না। পাড়ার ছেলে বিলাসকে দেখি না। আরও অনেকের কথা মনে পড়ল। ওদের কতদিন দেখি না। সবশেষে সুপ্রিয়ার কথা মনে পড়ল। সুপ্রিয়ার চেহারা একবারে ভুলে গেছি। কিছুক্ষণ আগে চেষ্টা না করেও করবীর মুখ খুব স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছিলাম, এমনকি কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে যে ওর ওপরের ঠোঁট ফুলে ফুলে ওঠে তা-ও দেখতে পেয়েছিলাম, কিন্তু বারবার চেষ্টা করতে সুপ্রিয়ার মুখ মনে করতে পারলাম না। সুপ্রিয়ার চোখ চেরা-চেরা মতন ছিল, কিন্তু বারংবার দুটো টানা টানা চোখ দেখতে পাচ্ছি কেন? অথচ এ-ধরনের চোখ আমার জানাশোনা কোন মানুষের নেই। চোখদুটো অসম্ভব বড়, আর কান পর্যন্ত টানা। কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না, কার চোখ, কোথায় দেখেছি।

আকাশের ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা গুরু গুরু আওয়াজ কানে আসতে লাগল। যেন কত শত যোজন পেরিয়ে সেই শব্দ আমার বুকে এসে বাজছে। আমি কান পেতে সেই শব্দ শুনতে লাগলাম। সঙ্গে সঙ্গে সেই বড় চোখদুটো আমাকে এক অপূর্ব রোমাঞ্চের জগতের মধ্যে নিয়ে গেল। বড় বড় ঢাক বাজছে, ধুপধুনো জ্বলছে, পায়ে ঘুঙুর বেঁধে কে যেন নাচছে। আমার চোখের খুব সামনে কান পর্যন্ত টানা সেই চোখ, মাথায় চূড়া, হাতে খড়্গ, ত্রিশূল, পায়ের নীচে অসুর, ওর বুক দিয়ে রক্ত ঝরছে। নিমেষের মধ্যে সমস্ত ছবিটা আমার চোখের খুব সামনে ভেসে উঠল। ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, আর মাত্র সাতদিন পরে পুজো।

ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। দেশপাণ্ডে তখনও ঝুঁকে পড়ে একটা ফাইল দেখছিলেন। ঘরে ঢুকেই বললাম, 'আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। আমার দিন কয়েকের ছুটি চাই। পুজোয় কোলকাতায় যাব।' ছুটে আসার দরুণ তখনও হাঁপাচ্ছিলাম।

দেশপাণ্ডে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেশ ঘুরে আসুন।'

'আমি কবে যাব?'

দেশপাণ্ডে হাসলেন। 'যেদিন আপনার ইচ্ছে হবে। এখানকার অফিস নিয়ে ভাববেন না। আমরা চালিয়ে নেব। তাছাড়া আপনার ডিপার্টমেণ্টে তো লোকও রয়েছে। কয়েকদিন তারাও চালিয়ে নিতে পারবে।'

মনে হল দেশপাণ্ডেকে শুকনো ধন্যবাদ দেওয়ার চেয়েও আমার বিশেষ কিছু বলা দরকার। অথচ কী বলবো ভেবে পেলাম না। উনি যেন আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন, বললেন, 'আমি যখন এখানে এসেছিলাম, একটুও ভাল লাগতো না, কিন্তু এখন ভালবাসা জন্মে গেছে। আপনিও হয়তো একদিন পাটনার প্রেমে পড়বেন।'

'এ-জায়গা আমার একটুও ভাল লাগছে না।' কথাটা নিজের কানেই বাজলো। একজন দুর্বল মানুষের কথা বলে মনে হল।

'কোলকাতায় গিয়ে মিস্টার কাপুরকে এ-বিষয়ে বলতে পারেন। তবে আমার মনে হয়, কিছুদিন থাকার পর আপনার আর খারাপ লাগবে না। আমার মেয়েরও এক অভিযোগ, জায়গাটা অসম্ভব একঘেয়ে। অথচ ছুটিতে না এসেও পারে না।'

'আপনি আছেন বলেই মিস দেশপাণ্ডেকে এখানে আসতে হয়।'

'অথচ কয়েকদিনের মধ্যেই আমাকে বম্বে যেতে হবে। সেখান থেকে দিল্লী হয়ে ফিরবো।'

'আপনি কবে যবেন?'

'আপনি ফিরে এলে। দুজনে একসঙ্গে বাইরে থাকা চলে না।' দেশপাণ্ডে এমন ভাবে বললেন যেন উনি পদমর্যাদায় আমার সমান কেউ। কথাটা শুনে ভাল লাগল। মনটা অনেক হাল্কা হয়ে গেল।

ছুটির পরও অফিসে বসে রইলাম। সেলস লেজার খুলে মাল বিক্রির হিসাব দেখছিলাম। অথচ ডিপার্টমেণ্টের কাউকে বললে তারা খুশী মনে একটা স্টেটমেণ্ট তৈরী করে দিতে পারত। নিজেকে যতীনবাবু যতীনবাবু মনে হতে লাগল। আগে ভাবতাম, ভদ্রলোক ছুটির পরে অহেতুক অফিসে পড়ে থাকেন কেন। এখন মনে হতে লাগল যতীনবাবু একজন দারুণ দুঃখী মানুষ। দুঃখী না হলে কেউ অফিসের মত নীরস একটা জায়গায় ছুটির পরেও বসে থাকতে পারে না। একবার মনে হল অনিমেষদের বাড়ি যাই। পরক্ষণেই মনে হল, অনিমেষ আজ একবারও আমার সঙ্গে দেখা করেনি। হয়ত ওদের পারিবারিক ব্যাপারে নাকগলানো ভাল চোখে দেখেনি অনিমেষ। অনিমেষ যদিও বিভার বিয়ের বিষয় নিয়ে আদর্শবাদী মানুষের মত কথা বলেছিল, আমার মনে হল, হয় অনিমেষ একজন স্বার্থপর মানুষ, না হয় হৃদয় বলে কোন পদার্থ ঈশ্বর ওর মধ্যে দেননি। হৃদয়বান মানুষ লীলাবতীর মত সরল এবং সুন্দরী মহিলার সঙ্গে এমন বিশ্রী ব্যবহার করতে পারে না। যদিও অনিমেষ একটা যুক্তি দাঁড় করিয়েছিল, বিভা লীলাবতীকে দেখলেই মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে, কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই অনিমেষ বুঝতে পারতো, কথাটার মধ্যে আর যাই থাক যুক্তি নেই। ইচ্ছে করলে অনিমেষ লীলাকে সব কথা খুলে বলতে পারত, লীলার তাহলে ওদের বাড়িতে যাওয়ার প্রশ্নই উঠতো না। পৃথিবীর অনেক মানুষই সরল হতে পারে না। সরল হতে পারে না বলেই এই মানুষগুলো পৃথিবীকে ক্রমশ জটিলতার দিকে টেনে নিয়ে চলেছে।

নিজেকে একজন সরল মানুষ বলে মনে হতে লাগল আমার। সরল না হলে আমার আগে সুপ্রিয়ার সঙ্গে দেখা করে আসতে পারতাম। ইচ্ছার বিরুদ্ধে দুটো মন-রাখা কথা বলে ওকে খুশী করে আসা চলতো। আমার ভাগ্যের অনেকখানি নির্ভর করছে সুপ্রিয়ার ওপর। ও চাইলে আমার ভাল করতে পারে, ইচ্ছা করলে আমাকে অন্ধকারে তলিয়ে দিতে পারে। আমি নিজের ভাল চাই। আমি কেন, জগৎ-সুদ্ধ মানুষ তাই চায়। মনে পড়ল, এখানে এসে সুপ্রিয়াকে চিঠি দিয়েছিলাম। সুপ্রিয়া সে-চিঠির উত্তর দেয়নি। মা, বড়মামা সবার চিঠি পেয়েছি। মা খুব সংযতভাবে চিঠি লিখেছে। মা যে এত সুন্দর করে চিঠি লিখতে পারে, কোনদিন জানতাম না। দূরে সরে না গেলে মানুষের আসল মূর্তি দেখা যায় না। বড়মামা আমাকে ভালবাসেন সে-কথা আমার অজানা নয়। কিন্তু এত গভীরভাবে যে ভালবাসেন আগে কি বুঝতে পেরেছিলাম। বড়মামা লিখেছেন, মার জন্যে কোন চিন্তা নেই। হট্টগোলের সংসারে মা সুখেই আছে। আমার জন্যে চিন্তা-ভাবনা করার সময়টুকুও নাকি মা হারিয়ে ফেলেছে। লেবু (বড়মামার ছোট ছেলে) মার খুব নেওটা হয়ে গেছে। সব সময়ই পিসী পিসী করে মার পেছন পেছন ঘুরে বেড়াচ্ছে। সব শেষে বড়মামা লিখেছেন, নিতু এসেছিল, অনেকক্ষণ বসে থেকে চলে গেল। তোর বিয়ের সম্বন্ধে যদিও কোন কথা বলেনি, ওকে দেখে মায়া লাগল। মনে হল সংসারের চাপে নিতু যেন ক্রমশই বুড়িয়ে যাচ্ছে। অথচ বয়স তো

খুব একটা হয়নি। তোর চেয়ে বছর পাঁচেকের বড় মাত্র। তোর ওদিককার খবর কি। বড় পোস্টে পাকা হলে, আর দেরী করে লাভ নেই। বাড়ি করে খুকীকে নিয়ে যা। তারপর ভাল একটা দিন দেখে তোর বিয়ে দি-ই। সুষমা খুব ভাল মেয়ে। সব-দিক বিবেচনা না করে আমি কখনও সুষমাকে বিয়ে করতে বলতাম না। কত অন্তরঙ্গভাবে চিঠি লিখলেন বড়মামা। ভাবতেও আনন্দ হয়, এত দূরে থেকেও কয়েকজন মানুষ আমার কত কাছে কাছে রয়েছে। মা, বড়মামা, বড়মামী। আর সব মামা-মামীরাও নিশ্চয় আমার মঙ্গল চিন্তা করছেন। পুজোর পরে একটা বাড়ি ঠিক করে মাকে নিয়ে আসবো, কাঁহাতক আর হোটেলে থাকা যায়। তাছাড়া সেই যে প্রশ্নটা, মানুষ বাঁচে কেন? শুধু কি নিজের জন্য? মা কেন বেঁচে আছে তাহলে? নিজের ভবিষ্যৎ বলতে কী আছে মার? সবই তো আমাকে নিয়ে। আমার যাতে সুখ হয়, আনন্দ হয়, স্ত্রী পুত্র সংসার—এই সব নিয়েই তো মার আশা-আকাঙ্ক্ষা।

প্রকাণ্ড লেজারের খোলা পৃষ্ঠার সামনে বসে আমি যেন নিজের জীবনের একটা হিসাব মিলিয়ে নিচ্ছিলাম। পুরোনো পৃষ্ঠার পাতায় পাতায় অসংখ্য অঙ্কের আঁকিবুকি। নতুন পাতায় কী লেখা হবে কে জানে। নিজের জীবনের শূন্য পাতার কথা ভাবতে ভাবতে কখন টেলিফোন তুলে নিয়েছি খেয়াল করিনি।

'হ্যালো, কাকে চান?'

'মিস দেশপাণ্ডে আছেন?'

'কথা বলছি, আপনি কে? মিস্টার চ্যাটার্জি?'

'আপনি তো বেশ গলা চিনতে পারেন। অথচ আপনার আওয়াজ অন্যরকম শোনাচ্ছিল।'

মনে হল লীলাবতী হাসল। উত্তর দিল না। বললাম, 'শুনেলাম, আপনার খুব একা একা লাগে। সময় কাটাবার জন্যে মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছেন।'

'কে বলেছে?' লীলাবতীর গলার স্বর খুব শান্ত।

'যেই বলুক, কথাটা তো সত্যি।'

'হ্যাঁ, সত্যি। ভাবছি দু-একদিনের মধ্যেই বাইরে কোথাও যাব। এখানে আর ভাল লাগছে না। শুধু আপনাদের বিরক্ত করি, কাজের সময় ডিস্টার্ব করি—'

'আমাকে মাপ করবেন। নানা কারণে মন ভাল ছিল না। হঠাৎ যদি কিছু বলে থাকি, সেটা মনের কথা না।'

মনে হল লীলাবতীর অভিমান ভাঙল। ও বলল, 'আপনাদের আবার মন খারাপ হয় নাকি?'

জানি না আপনি সম্মানার্থে বহুবচন ব্যবহার করলেন কেন। আমি শুধু নিজের কথাই বলতে পারি। সময় সময় আমার মনও খারাপ হয়। যদিও মন নিয়ে বেশী নাড়াচাড়া করা আমার স্বভাব না।'

লীলাবতী খিল খিল করে হেসে উঠল, 'আপনি তো বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারেন।'

'আগে পারতাম না, এখানে এসে শিখেছি। এখানে এসে আরও দু-একটা কথা শিখেছি, মানুষ নিজের চেয়ে, নিজের—কী বলবো, ভ্যানিটিকেই বেশী প্রশ্রয় দেয়।'

'কার কথা বলছেন?' কৌতূহলের চেয়ে লীলাবতীর বিস্ময়টাই কানে বেশী করে বাজল।

নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, 'এখানে এসে ব্রহ্মচারী বলে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। লোকটি এক অদ্ভুত মানুষ, নিজের চেয়ে নিজের—' লীলাবতীর প্রশ্নের উত্তরে হঠাৎ ব্রহ্মচারীর নামটাই মনে পড়ে গেল। অথচ ব্রহ্মচারীর দোষটাকে ভ্যানিটি বলে কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না। মনে মনে যখন কথা খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম, লীলার লঘু গলা কানে এল, 'আপনি কি এখন ফ্রি?'

'আমি সব সময়ই ফ্রি। যখন ইচ্ছা হয় আসবেন, না হয় ডেকে পাঠাবেন।'

লীলাবতী খুশী হল। বলল, 'এখানে এসে বড় একা একা মনে হয়। অথচ বম্বেতেও যে খুব লোকজনের মধ্যে থাকি তা না। কেন যে এরকম হয়!'

মনে মনে বললাম, 'তুমি মরেছো।' মুখে বললাম, 'যদি বলেন, আপনাদের বাড়িতে যেতে পারি।'

লীলাবতী আনন্দে লাফিয়ে উঠল, 'খুব ভাল হয় তাহলে।'

লীলাবতী গেটের সামনে দাঁড়িয়েছিল। ওদের বাড়িটা প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডের মধ্যে। দেশপাণ্ডের খুব গাছগাছড়ার সখ। দিনের অনেকটা সময়ই বাগানে কাটান তিনি। নিজের হাতে গাছের পরিচর্যা করেন। লীলাবতী হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাল। 'কী ভাগ্য, নিজের থেকে এলেন।'

'আপনাদের বাড়িতে আসতে পারা তো ভাগ্যের কথা। অনেকদিন ধরেই শুনেছি, আজ চোখে দেখলাম।'

'কী দেখলেন!'

'দেখলাম, যে আপনারা অতিথিদের খুব যত্ন করেন।'

লীলা খিলখিল করে হেসে উঠল। তখনও দিনের শেষ আলোটুকু নিভে যায় নি। আকাশের পশ্চিম দিকে তখনও কিছু আলো অবশিষ্ট রয়েছে। সেই আলো যেন ওর মুখে ছড়িয়ে পড়েছে।

লীলাবতী বলল, 'চলুন, পেছনের বাগানে গিয়ে বসি, আপনার ভাল লাগবে।'

সত্যি সত্যি বাগানে এসে বিস্মিত হয়ে গেলাম। প্রকাণ্ড বড় বাগান। মাঝখানে রংবেরং-এর বিরাট একটা ছাতা পোঁতা রয়েছে, নীচে গুটিকয়েক চেয়ার। মাঝে ছোট্ট একটা টেবিল। টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম। বললাম, 'সব ব্যবস্থাই করে রেখেছেন দেখছি।'

লীলাবতী কথা বলল না, শুধু হাসল। বললাম, 'চলুন আগে আপনাকে বাগানটা ঘুরে দেখি, তারপর চা খাবো।'

লীলাবতীর সঙ্গে ওদের বাগান দেখতে লাগলাম। লীলা আমাকে ফুল চেনাতে লাগল, 'এটা চেরী গাছ। বাবা কালিম্পং থেকে আনিয়েছেন। খুব কষ্ট করে গাছটাকে বাঁচানো হয়েছে। আর দুই মাস পরে গাছে ফুল ধরবে, তখন দেখবেন সমস্ত গাছটাকেই গোলাপী দেখাবে।' তাকাতে লীলাবতীর মুখের ওপর দৃষ্টি পড়ল। আকাশের লাল রং এসে ওর মুখে পড়েছে। লীলাবতী যেন জ্বলছে।

হঠাৎ বলে ফেললাম, 'তখন গাছটার যে কী চেহারা হবে, আমি বুঝতে পারছি।'

লীলা বুঝল না। প্রশ্ন করল, 'কী চেহারা হবে?'

'ও তখন জ্বলবে, ঠিক আপনার মত।'

কথা শুনে লীলাবতীর মুখ গাঢ় লাল হয়ে উঠল। বললাম, 'নতুন আলাপেই একটা রসিকতা করে ফেললাম, কিছু মনে করবেন না।'

লীলাবতী ঘাড় নেড়ে বলল, না, কিছু মনে করি নি, আসুন।'

লীলাবতী একটা বোগেনভেলিয়া ঝাড়ের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'এই গাছটা আমি নিজের হাতে পুঁতেছিলাম। গাছটা এতটুকু ছিল। ভেবেছিলাম মরেই যাবে। দেখুন কত ফুল ধরেছে এখন। ওকে আমি খুব ভালবাসি।'

কথা বলতে বলতে লীলাবতী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। বলতে লাগল, 'মানুষ যাকে ভালবাসে তাকে সার্থক করতে চায়, অথচ এ নিয়ে কত ভুলে বোঝা-বুঝির পালা। মানুষ সব ব্যাপারেই স্বার্থ খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু এতে স্বার্থের কী আছে বলুন তো। এই যে গাছটায় এত ফুল ফুটেছে, ওকে সুন্দর দেখাচ্ছে, ও যে সফল হয়েছে, এতে কার বেশী আনন্দ, কার বেশী স্বার্থ।'

বললাম, 'আপনার। যেহেতু গাছের সমস্ত মালিকানা আপনার। গাছটা যদি রাস্তায় পড়ে, কিম্বা অপর কোন বাগানে জন্মাত, কিম্বা ঈশ্বর না করুন, বাগানটা যদি অপর কোন লোকের হাতে চলে যায়, সেদিন কিন্তু এই গাছের সামনে দাঁড়িয়ে আপনি এত আনন্দিত হবেন না।'

লীলা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'হয়ত আপনার কথা ঠিক। কিন্তু গাছের কী যায় এসে তাতে। কোন্ বাগানে সে জন্মাল, গাছের তাতে তো কিছুই এসে যায় না। কী ফুল ফোটালো সেটাই তো বড় কথা।'

লীলাবতীর মুখে ঠিক এ ধরনের কথা শোনার জন্যে তৈরী ছিলাম না। ওর সম্বন্ধে একটা বিরূপ ধারণা মনে পোষণ করে আসছিলাম। কাপুর একদিন মত্ত অবস্থায় লীলাবতীর বাহুর মধ্যে আশ্রয় পেয়েছিলেন। লীলাবতী ওঁকে গাড়িতে এনে বসিয়েছিল। লীলাবতী আমার কাছে ঘন হয়ে এল। ওর শাড়ির স্পর্শ এসে আমার গায়ে লাগল। লীলাবতী বলল, 'কি ভাবছেন?'

অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। কথা বলতে বলতে হঠাৎ অনেক দূরে চলে গিয়েছিলাম। বললাম, 'কিছু না।'

'আমি জানি, আপনি কি ভাবছিলেন।' লীলার চোখে মুখে কৌতুক। 'আপনি ভাবছিলেন, আমরা খুব বড়লোক। বড়লোক হলে মানুষ চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলে, তাই না?'

'না, না তা কেন? ভাবছিলাম, আপনি কত সুন্দর কথা বলতে পারেন।'

লীলাবতী শব্দ করে হেসে উঠল, আমরা একটা ঝোপের নীচ দিয়ে যাচ্ছিলাম। ওর হাসির শব্দে কয়েকটা ছোট পাখি কিচিরমিচির করে উড়ে গেল। লীলার হাসি আরও বেড়ে গেল। হাসতে হাসতে ওর চোখে জল এসে গিয়েছিল। এক সময় হাসি থামিয়ে লীলাবতী বলল, 'হাসতে আমার খুব ভাল লাগে। অথচ ইচ্ছে করে না। মনে হয় কোথায় যেন একটা বাধা রয়েছে।'

'কিন্তু আপনার তো কোন বাধা নেই। অভাব, অভিযোগ মানুষকে হাসতে ভোলায়। আপনার সেই ধরনের কোন বাধা নেই।'

লীলাবতী হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। আমার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর চাপা স্বরে বলে উঠল, কে বলেছে, আমার অভিযোগ নেই, অভাব নেই। আমার তীব্র অভিযোগ আছে। প্রচণ্ড অভাব রয়েছে। কথা বলতে বলতে লীলাবতী যেন শিরশির করে কাঁপতে লাগল। কে বলবে এই লীলাবতীই কিছুক্ষণ আগে বাঁধভাঙা নদীর মত আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠেছিল, ওর হাসির শব্দে গুটিকয়েক পাখি গাছ ছেড়ে আকাশে উড়তে শুরু করেছিল। 'একজন মানুষ যদি অপর একজন মানুষকে অকারণে অপমান করে, তাকে অবহেলা করে তখন কী মনে হয় আপনার। মনে হয় না, আপনি একজন শক্তিহীন অসহায় মানুষ!'

'প্রত্যেক মানুষই তো অসহায় মিস দেশপাণ্ডে।'

'আমি বিশ্বাস করি না। স্বাভাবিকভাবে মানুষ খুব সরল। এই যেমন ধরুন, আপনি, আপনার তো কোন অভাব অভিযোগ নেই, থাকার কথা না।' লীলাবতী এমনভাবে কথা বলল, যেন সত্যি সত্যি একজন পরিপূর্ণ সার্থক মানুষ বলতে যা বোঝায় আমি তাই। সহসা আমার মনে হতে লাগল, একজন পুরুষ মানুষ জীবনে যা চায়, আমি তা-ই পেয়েছি। সুখ, শান্তি, ধনদৌলত, ঐশ্বর্য এবং ভালবাসা। লীলাবতী আমাকে দেখে নিয়ে আবার বলতে লাগল, 'জানি না, মানুষ মানুষকে এত কষ্ট দেয় কেন। কিসের আনন্দে একে অপরকে এমন ক্ষতবিক্ষত করে!' লীলাবতী চুপ করল। ছোট ছোট ফুল গাছের ওপর দিয়ে রংবেরংএর প্রজাপতিরা উড়ে বেড়াচ্ছে। ওদের রঙীন পাখা, আর ফুলের রং দেখতে দেখতে হঠাৎ আমার মনে সেই প্রশ্নটা জেগে উঠল, মানুষ বাঁচে কেন? মানুষ কি শুধু মরতে পারে না বলেই বেঁচে থাকে, নাকি বাঁচার যে একটা সুখ আছে, আনন্দ আছে, সার্থকতা আছে, তাকে উপভোগ করবার জন্যেই এই বেঁচে থাকা।

এক সময় ধীরে ধীরে বললাম, 'আপনার দুঃখ দেখে আমার ছেলেবেলার একটা কথা মনে পড়ে গেল। বাবা আমাকে রাজপুত্র সিদ্ধার্থের গল্প বলছিলেন। সিদ্ধার্থ কী করে বুদ্ধদেব হলেন সেইসব। শুনতে শুনতে একসময় আমি প্রশ্ন করেছিলাম, টাকা পয়সা থাকা সত্ত্বেও মানুষ দুঃখকষ্ট পায় কেন? বাবা সেদিন কোন উত্তর দেন নি। হয়ত ভেবেছিলেন, সেই বয়সে এই প্রশ্নের উত্তর বুঝতে পারবো না। আজও যে সম্পূর্ণ বুঝতে পারি তা না, তবু এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে, আপনার দুঃখ আমি বুঝতে পারছি লীলাদেবী।'

হঠাৎ লীলাবতী আমার একটা হাত চেপে ধরে বলল, 'বুঝতে পেরেছেন আপনি?' ওর এই আকুলতা আমাকে স্পর্শ করল। নরম গলায় বললাম, 'মানুষ এক জায়গায় সবাই সমান। দুঃখে সবাই এক ভাবেই কাঁদে।' একটুক্ষণ থেমে থেকে আবার বললাম, 'সবচেয়ে বিস্ময়কর কী জানেন, মানুষ কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না যে অন্য একজনও ঠিক তার মতই কাঁদছে। তার বেদনা, তার কষ্ট বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও, সেটা যে রয়েছে তা তো অস্বীকার করা যায় না।'

লীলাবতী আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, 'আপনি কার কথা বলছেন?'

'অনিমেষের।' ভেবেছিলাম অনিমেষের কথা লীলাবতীকে পরিষ্কার ভাবে বলব না, কিন্তু বলে ফেললাম।

'অনিমেষের? অনিমেষের দুঃখ রয়েছে? বেদনা রয়েছে? আমার মত বেদনা?'

'হ্যাঁ। বিশ্বাস করুন। একদিন অনিমেষ নিজের মুখে স্বীকার করেছে। কী বলেছে জানেন। বলেছে, যাকে কাছে পেতে মন চায়, সে এলে কেন দূরে সরে যেতে চাই, সে কথা কেমন করে বোঝাবো।'

'অনিমেষ বলেছে, একথা!' বলতে বলতে লীলাবতী যেন অন্যরকম হয়ে গেল। তখনও প্রজাপতিগুলো পাখনা মেলে ফুলের ওপর দিয়ে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, লীলাবতী যে কোন মুহূর্তে ওদের সঙ্গে মিলেমিশে ফুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়তে থাকবে। 'আপনাকে যে কী বলে ধন্যবাদ জানাবো অংশুবাবু, আপনি আমার সত্যিকারের একজন বন্ধু।' লীলাবতী গভীর সুখে আমার একটা হাত দুহাতের মধ্যে চেপে ধরল।

মানুষের কী বিচিত্র রূপ! যে লীলাবতীকে কয়েক মুহূর্ত আগে পর্যন্ত নিজের দুঃখে ভেঙে পড়তে দেখেছিলাম সেই লীলাবতীই কিনা অনিমেষের কাল্পনিক দুঃখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। মানুষের বিচার করতে গিয়ে বার বার একটা কথাই মনে জেগে ওঠে, সে যদি জানতো সে কী চায়!

হাঁটতে হাঁটতে আমরা বাগানের শেষ সীমানায় এসে পড়েছি। লীলাবতী এখনও আমার হাত ধরে রেখেছে। আবেগ মেশানো সুরে ও বলতে লাগল, 'এক একজন মানুষকে বন্ধু বলে ভাবতে ভাল লাগে। প্রথম দিন দেখেই আপনাকে আমার খুব কাছের মানুষ বলে মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল, আপনাকে সব কথা বলতে পারলে আমি খুব শান্তি পাবো। দেখলাম যে আমার ধারণা ভুল হয় নি।'

'অনিমেষকে প্রথম যেদিন দেখেন, আপনার কী মনে হয়েছিল?' হঠাৎ প্রশ্নটা করে ফেললাম।

'অনিমেষকে দেখে আমার খুব খারাপ লেগেছিল। আমি তখন বাবার অফিসে বসেছিলাম। অনিমেষ এসে ঘরে ঢুকলো, ওর সার্টপ্যান্টে কালির দাগ। হাতে একটা বিরাট নকসা। ও সেটা বাবার টেবিলের ওপর বিছিয়ে রেখে অনেকক্ষণ ধরে কী সব বললো। আমি যে একজন মেয়ে, মেয়ে শুধু না সুন্দরী মেয়ে, ওর সামনে বসে রয়েছি, তাকিয়ে দেখলো না পর্যন্ত। আমার ভীষণ রাগ হল। মনে হল লোকটা যে শুধু দাম্ভিক তাই না, বেজায় অভদ্রও। ও বাবার সঙ্গেও কর্কশভাবে কথা বলছিল। সময় সময় বাবার মুখ লাল হয়ে উঠছিল। সেইদিন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম। কী প্রতিজ্ঞা করলাম, শুনবেন?' লীলাবতী চোখ তুলেই নামিয়ে নিল, বলল, 'প্রতিজ্ঞা করলাম, এই লোকটাকে এমন শিক্ষা দেব যা ও জীবনে ভুলতে পারবে না।' লীলাবতী চুপ করলো।

প্রশ্ন করলাম, 'তারপর?'

লীলা চোখ তুলে তাকাল। ওর চোখে ঘনিয়ে আসা সন্ধ্যার বিষণ্ণতা। 'তারপর আর কি। সবই তো বুঝে ফেলেছেন। চলুন, চা খাবেন।'

চায়ের টেবিলে এসে বসলাম। তখন চারিদিকের অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠেছে। লীলাবতীর মুখ অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল। ও নীচু হয়ে চা ঢালতে লাগল। সেভাবেই বলল, 'একটা অনুরোধ করবো আপনাকে। অনিমেষকে আজকের কথা বলবেন না।'

'কেন?'

'মানুষ এক জায়গায় অন্তত মাথা উঁচু করে থাকতে চায়। ও যেন আমার দুঃখের কথা জানতে না পারে। তা ছাড়া, আমার দুঃখ হয়ত তেমন কিছু না। আবেগের মুহূর্তে কী বলতে কী বলে ফেলেছি।'

বুঝলাম, লীলাবতী নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করছে। নিজের দৈন্য ঢাকতে চাইছে। বললাম, 'কথা দিচ্ছি, অনিমেষকে এ বিষয়ে কিছু বলবো না।'

দেশপাণ্ডে আমাকে দেখে খুশী হলেন। বললেন, 'আমার ফিরতে একটু দেরী হয়ে গেল। গোটা কয়েক কাজ ছিল, সেরে আসতে হল।' কথাগুলো আমার দিকে তাকিয়ে বললেও, মনে হল লীলাবতীকে শুনিয়েই বললেন তিনি। লীলা ভালমন্দ উত্তর দিল না। চুপ করে বসে রইল।

আরও কিছুক্ষণ বসে থেকে উঠে পড়লাম। আমরা তখন ড্রইংরুমে বসে-ছিলাম। দেশপাণ্ডে একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। লক্ষ্য করে দেখলাম, দেশপাণ্ডে আসার পর থেকে লীলাবতীর কথা যেন বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

গেটের মুখে এসে বললাম, 'কয়েকটা দিন আপনার হয়ত একটু একা একা লাগবে। আমি কোলকাতায় যাচ্ছি। আজ আপনার বাবার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে নিলাম।'

'তাই নাকি! আমিও কোলকাতায় যাব। আমার এক কাকা আছেন। অনেকদিন তাঁদের দেখি না।' লীলাবতী যেন আনন্দে নেচে উঠল।

'কিন্তু আপনার বাবার হয়ত এখন যাওয়া সম্ভব হবে না। আমরা দুজনে একসঙ্গে বাইরে যেতে পারি না।'

'আমি তো আপনার সঙ্গে যাব। ভয় নেই, আমি একটা বোঝা না। দস্তুরমত লেখাপড়া জানা আপ-টু-ডেট মেয়ে। জানেন, আমি এখন সিক্থ ইয়ারের ছাত্রী। একা একা ট্রাভেল করার অভ্যেস আছে আমার। তবে আপনি যাচ্ছেন, সঙ্গে গল্প করতে করতে যাব, এই আর কি। আপনি যাবার দিন ঠিক জানাবেন, আমিও টিকিট কাটবো।'

উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে আসছিলাম। লীলাবতী আবার বলল, 'আমি কিছুদিন এখানে থাকবো। আপনাকে খুব জ্বালাতন করবো।' বলে উছল হাসিতে ভেঙে পড়ল।

বললাম, 'আপনার পরীক্ষা?'

'পরীক্ষা দেব না।' ও এমনভাবে বলল, যেন সেটা কোন সমস্যাই না।

বললাম, 'আপনাকে দেখে একটা কথা মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, আপনি খুব সেণ্টিমেণ্টাল।'

'মানুষ মাত্রেই সেণ্টিমেণ্টাল। যে বলে আমি সেণ্টিমেণ্টাল না, সে ভেতরে ভেতরে কষ্ট পায়। যেমন, আপনার বন্ধু।'

কথা না বলে বেরিয়ে এলাম। শরতের শিরশিরে হাওয়া গায়ে এসে লাগছে। বেরিয়ে কাঁপুনি ধরাচ্ছে। মনে নেশা ছড়াচ্ছে। হঠাৎ সুপ্রিয়ার কথা মনে পড়ল। আমাকে দেখে সুপ্রিয়া নিশ্চয় খুব অবাক হবে। এত তাড়াতাড়ি ছুটি নিয়ে কলকাতায় যাবার জন্যে বিরক্তও হবে বোধ হয়। নির্ঘাৎ দু দশটা উপদেশও দিয়ে দেবে। উপদেশ দেওয়া যার স্বভাব, সে কিছুতেই স্বভাব বদলাতে পারবে না।

ট্রেন একঘণ্টা লেট ছিল। দেশপাণ্ডে আমাদের তুলে দিতে স্টেশনে এসেছিলেন। ট্রেন ছাড়ার আগের মুহূর্তে আমাকে আবার মনে করিয়ে দিলেন, 'আপনি ফিরে এলেই আমি কিন্তু বেরোবো।' ভদ্রলোক বেশ বুদ্ধিমান। কী রকম কায়দা করে আমাকে ঠিক সময় মত ফিরে আসতে বললেন। দেশপাণ্ডে যতক্ষণ ছিলেন লীলাবতী একটাও কথা বলে নি, জানালা দিয়ে প্ল্যাটফর্ম দেখছিল। দেশপাণ্ডেও লীলাবতীকে উদ্দেশ্য করে একটা কথা বলেন নি।

ট্রেন ছাড়তেই লীলাবতী আমার দিকে ফিরে বসল। কামরায় আরও দুজন লোক ছিল। আগে থেকেই তারা আসছিল। ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা আবার শুয়ে পড়ল। লীলাবতী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আমি যে কেন হঠাৎ চলে এলাম, নিজেই বুঝতে পারলাম না।' আমি কথা বললাম না দেখে ও আবার বলল, 'আপনার এরকম হয় না কখনও। এই হঠাৎ কিছু করে বসা।'

'সাধারণ মানুষের হঠাৎ কিছু করে বসা শোভা পায় না।'

আমার কথা শুনে লীলাবতী আধো-গলায় বলল, 'সাধারণ অসাধারণের প্রশ্ন না। আপনার এরকম হয় কিনা?'

মনে মনে ওর কথায় বিরক্ত হলাম। মুখে সে ভাব না দেখিয়ে বললাম, 'এখন পর্যন্ত হয় নি। জানি না ভবিষ্যতে কী হবে।'

লীলাবতী সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে বলল, 'একদিন না একদিন হবেই হবে দেখবেন।'

উত্তর না দিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। লীলাবতী বলল, 'কিছু বললেন না যে?'

'আপনি তো প্রশ্ন করেন নি। যা বললেন, শুনে গেলাম।'

'আমার কী মনে হয় জানেন, এক এক অবস্থায় মানুষ এক এক রকম ব্যবহার করে। এই যেমন আমি। পার্টিতে গেলে আমি অসম্ভব ড্রিংক করি। ভীষণ নাচি। পিকনিকে গেলে বেজায় চেঁচাই, লাফাই, গান গাই। পাটনায় এলে বেশীর ভাগ সময় কিছুই করতে ভাল লাগে না। কিছু-দিন থাকার পরেই পাটনা থেকে পালিয়ে যাই। আবার কিছুদিন পরেই পাটনায় আসার জন্য ছটফট করি।'

হেসে বললাম, 'পাটনা আপনাকে পাগল করে দেবে দেখছি।'

লীলাবতী মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, 'সত্যি এক এক সময় মনে হয়, আমি বুঝি পাগল হয়ে যাব। আচ্ছা, এক একজন মানুষ এত নিষ্ঠুর হয় কেন বলতে পারেন?'

লীলাবতীর গলায় একটা আকুলতা ফুটে উঠল। নরম ভাবে বললাম, 'যাকে নিষ্ঠুরতা বলে ভাবছেন, আসলে হয়তো সেটা মোটেই নিষ্ঠুরতা না। এমনও তো হতে পারে, উপায় থাকে না বলেই মানুষকে নিষ্ঠুরতার ভান করতে হয়।' বলি বলি করেও অনিমেষের আসল বাধার কথা লীলাবতীকে বলতে পারলাম না। লীলাবতী যদি একদিন অনিমেষের কাছ থেকে দূরে সরে যায়, ওরা দুজনেই হয়ত শান্তি পাবে।

লীলাবতী খুব ধীরে ধীরে বলতে লাগল, 'উপায় মানুষকে খুঁজে বার করতে হয়। নিষ্ঠুরতার মধ্যে আর যাই থাক, কোন বাহাদুরী নেই।'

হঠাৎ প্রশ্ন করে ফেললাম, 'এত লোক থাকতে আপনিই বা অনিমেষকে ভালবাসতে গেলেন কেন? ওর মধ্যে কী এমন দেখলেন!' প্রশ্নটা নিজের কানেই কীরকম বিশ্রী শোনাল। আবার বললাম, 'আপনার সামাজিক প্রতিষ্ঠা, আর অনিমেষের প্রতিষ্ঠা এক না, এবং মানসিক দিক দিয়েও দুজনে ঠিক বিপরীত ধরনের। আপনি চঞ্চল, অনিমেষ ধীর স্থির মানুষ। আপনি কথা বলতে ভালবাসেন, অনিমেষ কথা শোনে। আপনি হাসেন, অনিমেষ খুব কম হাসে। আপনি দেখতে এত সুন্দরী, আর অনিমেষ তো খুব সাধারণ একজন মানুষ। অনিমেষ সম্বন্ধে এভাবে কথা বলছি বলে মনে কিছু করবেন না। অনিমেশ আমার বন্ধু। বন্ধু বলেই ওর সম্বন্ধে এ ধরনের কথা বলতে পারলাম।'

(ক্রমশঃ)

প্রদর্শনী

চিত্রকর অলোক ভট্টাচার্যের ড্রইং-এর একটি প্রদর্শনী হয়ে গেল বিড়লা একাডেমি অফ আর্ট এন্ড কালচারের প্রদর্শনী কক্ষে। প্রদর্শনীতে এই তরুণ চিত্রকর তাঁর গত দেড় বছরে আঁকা ২৩টি ড্রইং দেখালেন। শিল্পী ড্রইং বলতে সত্যি সত্যিই রেখাঙ্কন বোঝেন। আজকাল যেমন অনেকে ড্রইং বলে কাগজে আঁকা তেল রঙ এবং জল রঙের ছবিও চালিয়ে দেন, অলোক তা করেন না। চিরাচরিত ধারণানুযায়ী অলোক মনে করেন, চিত্রক্ষেত্রে বর্ণ প্রলেপিত হলেই তা খানিকটা ক্ষেত্রদখলকারী পুঞ্জের রূপ পায়, রেখা থাকে না। এবং রঙ তার নিজস্ব ভূমিকা নিয়ে চিত্রতলে আবির্ভূত হয়। অলোক তাই তাঁর রেখাঙ্কনগুলিতে রঙের ব্যবহার করেন নি। এ-গুলি শাদা কাগজের উপরে কালো অথবা নীল-কালো কালিতে আঁকা ড্রইং। টোন বা কালোর অথবা নীল-কালোর নানান বর্ণান্তর, যথা ঘন কালো থেকে মাঝারি কালো আবার তার থেকে হাল্কা কালো, অবশ্যই ঘটেছে এ-সব ড্রইংয়ে, কিন্তু ছবি মূলত একরঙা থেকে গেছে। বর্ণান্তরের কথা যখনই বলেছি, তখন আশা করি বোঝা গেছে যে অলোকের ড্রইংয়ে রেখা প্রধান উপজীব্য হলেও, রূপায়ণের একমাত্র হাতিয়ার নয়। কালোর পুঞ্জও ছবির-জমির অনেকখানি জায়গা জুড়ে বিরাজ করে। তা না করলে বর্ণান্তর ঘটবে কেমন করে?

মনুষ্যাবয়বই অলোকের প্রধান উপজীব্য। অলোকের ছবির বিষয়বস্তু মানুষের বর্তমান অবস্থা। মানুষের শ্রম, মানুষের কর্ম, মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের অত্যাচার হিংসা, দ্বেষ, রিরংসা ও তজ্জনিত যন্ত্রণা, বঞ্চনা, ভীতি, মৃত্যু, অপমৃত্যু ও মানবিকতা থেকে পতন ইত্যাদি অলোকের ড্রইং-এর বিষয় বস্তু। এইসব বিষয় বস্তুর রূপায়ণের জন্য অলোক যন্ত্রণা কাতর, যুযুধান, নিপীড়িত অসম বলশালী সুদেহী কর্মী মানুষের ছবি এঁকেছেন। এঁকেছেন অত্যাচারীর ছবি, বিচারালয়ের ছবি, মরলোকের নরকের ছবি, সেই সব দুঃস্থ বাজনদার-সঙ্গীতকারদের ছবি যারা শুধুমাত্র গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ফিলিস্থিনদের চিত্তবিনোদনের জন্য নৈর্ব্যক্তিকভাবে নির্লিপ্ত থেকে 'শিল্প' উৎপাদন করে যায়।

অলোকের ড্রইং-এ নানান রীতির রূপায়ণ দেখা যায়। মনে হয় তিনি এখনও প্রত্যয়ের শৈলীতে উপনীত হতে পারেন নি। প্রদর্শনীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি 'কনভিকট'; এটি এবং 'ক্রেস্টফলেন' এক রীতির ছবি। সরু এবং ভাঙ্গা সীমারেখা দিয়ে মনুষ্যাকার গঠন করে টোন এবং শেডের সাহায্যে আলো-ছায়া সৃষ্টি করে শরীরে ঘনত্ব এবং ডোল বোঝান হয়েছে। প্রতিমা-লক্ষণের দিক থেকে এই ড্রইং-এর মানুষেরা প্রকৃতিবাদী রীতিতে অঙ্কিত। কিন্তু চিত্রতলে রূপবন্ধ বিন্যাসের ক্ষেত্রে প্রকৃতিবাদী রীতি অনুসৃত হয়নি। 'কনভিকট' ছবিটিতে পক্ষী-চক্ষু জাতীয় দৃষ্টি-কোণের ব্যবহারের ফলে একটি কৌণিক প্রেক্ষিত তৈরী হয়েছে এবং ফলতঃ ছবিটি একটি আশ্চর্য নাটকীয়তা পেয়েছে। 'ক্রেস্টফলেন' ছবিটিতে কিন্তু শাদা এবং কালোর সমানুপাতিক বিতরণ ছবির রূপবন্ধগুলির গতিময়তা ক্ষুন্ন করেছে। দ্বিতীয় জাতের শৈলীর সাক্ষাৎ মেলে 'মাইটি পুল', 'ম্যান এন্ড নেচার' এবং 'গ্রোপিং' নামের ছবিগুলিতে, 'রিপ্রেসড ভিসিবিলিটি' ছবিটি প্রথম এবং দ্বিতীয় জাতের শৈলীর সংমিশ্রণে সৃষ্ট। দ্বিতীয় জাতের ছবির মধ্যে 'সলিচিউড' ছবিটি স্মরণীয়। মুখের অভিব্যক্তি এবং বর্ণান্তর ও রেখা যে ভাবে শূন্যক্ষেত্রকে বাঙময় দেশের ব্যাপ্তি দিয়েছে তা সত্যিই বিস্ময়কর। বাজনদারদের ছবিগুলিকে তৃতীয় জাতের বলে ধরা যেতে পারে। এদের বিন্যাসে সহজ-চক্ষুমাত্রিক দৃষ্টিকোণকেই ব্যবহার করা হয়েছে এবং চিত্রতলে বহির্জাগতিক পারম্পারিকতাকেই মেনে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যেও দুটি পৃথক ভাগ করা যেতে পারে। 'টু মিউজিশিয়ানস' পুঞ্জপ্রধান ছবি কিন্তু এই সিরিজের অন্যগুলি রেখাপ্রধান। রেখাপ্রধানই হোক বা পুঞ্জপ্রধানই হোক, রেখার শ্লথগতিতে বা কালো রঙের পুঞ্জে শিল্পী যে সব বাজনদারদের চিত্রিত করেছেন তাদের অবয়বের ভঙ্গিতে রেখা ও রঙের চরিত্রের গুণে এক অদ্ভুত বিষাদ আরোপ করতে পেরেছেন। 'ক্লাইম্বারস' ছবিটি চতুর্থ জাতের ছবির উদাহরণ। এই ছবিটিতে বর্ণান্তরের বদলে একই ভারের কালোর পুঞ্জের আবয়বিক চেহারাকে অলঙ্করণের বিভিন্নতায় বদলিয়ে শিল্পী চিত্রদেশকে বিভাজিত করেছেন। অনেকগুলি মনুষ্যাবয়বকে আনয়ন করে তাদের শারীরিক ভঙ্গিকে কাজে লাগিয়ে একটা নাটকীয়তা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। মনুষ্যাকারকে বর্তুলময় অবয়বের সমাহার রূপে রূপায়িত করেছেন। সমস্ত রূপকল্পটিতে মিকালাঞ্জেলো থেকে রুবেনস পর্যন্ত বারোক শৈলীর প্রভাব। 'পেইনড' ছবিটি প্রথম এবং চতুর্থ রীতির সমাহারে রূপায়িত। রাস্তার ধারে মা ও ছেলের ছবিটি রেখার চরিত্র বৈগুণ্যে এবং বিন্যাসে একটি দুর্বল গল্প-বলা ছবি এবং প্রতীকটিও অতি ব্যবহারে জীর্ণ। এ জাতের ছবি প্রদর্শনীতে ঐ একটিই ছিল। না থাকলেও ক্ষতি বৃদ্ধি হত না। 'টার্গেট' ছবিটি ষষ্ঠ জাতের ছবির অন্যতম নিদর্শন ও অতিনাটকীয়তা দোষে দুষ্ট। এবং 'ড্রইং থ' ছবিটি সপ্তম জাতের ছবির নিদর্শন।

অলোক নানান জাতের রেখা ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত এবং তাঁর রেখা ঋজু ও বলিষ্ঠ ছন্দোময়। পেলব ও সূক্ষ্মছন্দের রেখা তাঁর হাতে তেমন খোলে না। অবশ্য তিনি যে সব বিষয় নিয়ে মগ্ন তাতে ও-জাতের রেখার প্রয়োজন কম। চিত্রক্ষেত্রে পুঞ্জের এবং পুঞ্জের ও বর্ণান্তরের সাহায্যে ঘনত্ব প্রদর্শনেও তিনি কম পারদর্শী নন। কিন্তু অনেক সময়ে তাঁর বর্ণান্তর ঘনত্ব জ্ঞাপক হয় না, চিত্রক্ষেত্রকে দেশ করে তোলে না। শাদা কালোর বিতরণ সম্পর্কে তাঁর আরও বেশী সচেতন হওয়া প্রয়োজন। শাদা-কালোর সামানুপাতিক বিতরণ অনেক সময়ে তার ছবি রেখার গতিকে এবং মনুষ্যাবয়বের গতিকে ব্যাহত করে। তাঁর ছবির বিষয়বস্তু অনেক সময়ে বিপরীতমুখী দ্বান্দ্বিক গতি ও ছন্দ চায়—সে সম্বন্ধেও অলোককে সচেতন হতে হবে। তাঁকে সচেতন হতে হবে হাত, মুখ, চোখ ইত্যাদি অবয়বের কয়েকটি প্রতীকী ব্যবহারের সম্বন্ধে। এর অনেকগুলি অতি ব্যবহারে জীর্ণ। বারোক থেকে রোমান্টিক এবং পরবর্তীকালে জর্মন একসপ্রেসনিস্ট শিল্পীরা এই সব প্রতীককে এত বেশী ব্যবহার করেছেন যে এগুলি কতকগুলি নির্দিষ্ট অর্থে মণ্ডিত হয়ে গেছে। শঙ্কাপূর্ণ দৃষ্টি, নেতিবাচক হস্তমুদ্রা বা হাতের আঁকড়ানোর ভঙ্গি, বঙ্কিম গ্রীবা, পলায়নপর পদমুদ্রা, ঊর্ধ্বাকাশ দর্শনমূলক মস্তক ভঙ্গি, চিত্রক্ষেত্রে কালোর প্রাধান্য, চিত্রক্ষেত্রে অবয়বাংশের অনির্দিষ্ট সংস্থাপন ইত্যাদি বারোক, রোমান্টিক এবং জর্মন

এক্সপ্রেসনিস্ট শিল্পীদের কল্যাণে অনির্দিষ্ট মৃত্যু কারক অন্ধকার নিয়তির বিরুদ্ধে আতঙ্কিত ভীত সন্ত্রস্ত শান্তিধর একক মানুষের হতাশ যুদ্ধের দ্যোতক হয়ে গেছে। জানি না অলোক নিজে এই জীবন-দর্শন স্বীকার করেন কিনা? কিন্তু মানুষের জীবন যুদ্ধজনিত ট্র্যাজেডি নিয়ে যেসব শিল্পীরা ভেবে থাকেন তাঁরা সহজেই নিজেদের এই বিরাট শিল্প-ঐতিহ্যের অনুগামী করে ফেলেন। অলোক অত্যন্ত দক্ষ, শক্তিমান এবং ভাবুক শিল্পী, তাই আমি তাঁকে এই সহজ সমাধান সম্পর্কে সচেতন করে তুলবার উদ্দেশ্যে এত কথা বললাম।

এক মহিলার একক ও একটি যৌথ প্রদর্শনী

চিত্রশিল্পী সুলতান আলীর কন্যা মুমতাজ সুলতান আলী বয়সে নবীনা। কিন্তু এই অল্প বয়সেই তিনি তাঁর কাজের প্রতি রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। দিল্লী আর্ট কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্তা মাদ্রাজনিবাসী এই তরুণী সম্প্রতি কলকাতাবাসী হয়েছেন। কলকাতায় তাঁর কাজের প্রথম প্রদর্শনী হয়ে গেল ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিসের প্রদর্শনী কক্ষে। মুমতাজ ছাপের-ছবি নির্মাত্রী। এই প্রদর্শনীতে তিনি তাঁর ১৯৭১-৭২ সালে রচিত কুড়িটি ছাপের ছবি দেখান। ছাপের ছবির কোন প্রথাসিদ্ধ মাধ্যমে এ-ছবিগুলি রচিত হয় নি। যদিও তিনি তাঁর প্রদর্শনী তালিকাটিতে তাঁর কোন কোন ছবিকে এচিং এবং অধিকাংশ ছবিকে রঙিন ইনতাল্লিও বলে বর্ণনা করেছেন, তবু সন্দেহ থেকে যায় ওঁর ছবির মাধ্যমকে ঐ সব নামে অভিষিক্ত করা যায় কিনা। কারণ, একটি বাদে তাঁর কোন ছবিই ধাতু-নির্মিত পাতের উপর বুরিন বা নরুন অথবা এসিড বা অম্লজানের সাহায্যে রচিত হয় নি। দিল্লীর ছাপের-ছবি নির্মাতা জগমোহন চোপরার প্রাক্তন শিষ্যা মুমতাজ, জগমোহনের মতনই 'কোলোগ্রাফ' নামে আঠা-জাতীয় দ্রব্যের সাহায্যে বোর্ডের উপর প্রাথমিক রচনা তৈরী করে, পরে তার উপর রোলারের সাহায্যে রঙ লাগিয়ে, তার থেকে কাগজের উপর ছাপ নিয়েছেন। এই মাধ্যমকে এচিং বা ইনতাল্লিও নামে অভিহিত করা যায় কিনা বিবেচ্য।

মুমতাজের ছবির কয়েকটি সহজ আকর্ষণীয় ক্ষমতা আছে। মুমতাজ নিয়মিতভাবে কাজ করেন এবং অনেক কাজ করেন; ফলে মাধ্যম ব্যবহারে এক ধরনের অনায়াস দক্ষতা লক্ষণীয়। এবং যেহেতু বহুদিন ধরে তিনি এক ধরনের কাজ করছেন তাই কাজে দ্বিধা বা পরীক্ষা-নিরীক্ষাজনিত অস্থিরতা দেখা যায় না। প্রতিটি রেখা, বুনটের কাজ, অলংকরণ, রঙ লাগানো বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গে করা হয়েছে। অর্থাৎ মুমতাজ বেশ সহজ প্রত্যয়ে এক অনায়াস দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছেন। এটাই মুমতাজের প্রধান গুণ। মুমতাজের ছবির অপর যে দিকটি দর্শকের দৃষ্টিকে সহজেই আকৃষ্ট করে—সেটিকে গুণ বলে ধরা হবে কিনা সে বিষয়ে বর্তমান সমালোচকের সন্দেহ আছে। মুমতাজের প্রতিটি ছবি এক, দুই বা তিনটি প্রধান মোটিফ বা রূপবন্ধ কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এই রূপবন্ধগুলি মনুষ্য অথবা জীবায়ব ভিত্তিক। এই মনুষ্য অথবা জীবায়ব ভিত্তিক রূপবন্ধগুলি পরিচিত কোন দেবতা অথবা দেবী অথবা তাদের বাহনের রূপকল্পনানুসারে গঠিত অথবা একাধিক দেব অথবা দেবীর রূপকল্পের সমাহারে গঠিত। বর্তুলাকার, বক্রাকৃতি ও সমান্তরিত্রের রেখার অলংকরণে মুমতাজের প্রতিমারা ছবিতে স্বপ্রকাশ। দেবপ্রতিমা এবং তাদের আলঙ্কারিক প্রকাশ মুমতাজের ছবিকে একপ্রকার আকর্ষণীয়তায় মণ্ডিত করেছে। এই আকর্ষণ নান্দনিক নয়। এটা মুমতাজের ছবির কোন বিশিষ্ট লক্ষণও নয়। ভারতীয় শিল্পের ভাগ্যে মাদ্রাজের আধুনিক চিত্রশিল্পীরা নব্য-হিন্দু হয়ে হয়েশাল যুগের প্রস্তর নির্মিত এবং ধাতু-নির্মিত ভাস্কর্যের যে রৈখিক এবং দ্বিমাত্রিক অনুবাদ কর্মে নিবিষ্ট, মুমতাজের এবং মুমতাজের পিতা সুলতান আলীর চিত্রকলায় তারই এক বিশিষ্ট প্রকাশ দেখা যায়। এটা যে বিশ্বাস প্রসূত নয়, তা মুমতাজের ছবি থেকেই বোঝা যায়। মুমতাজের ছবির দেবদেবীরা কোথাও অভিব্যক্তিমূলক নয়, অর্থাৎ ছবির এই দেবী বা দেবমূর্তিরা দর্শকের মনে তাদের ক্ষমতা বা কার্যকলাপ সম্বন্ধে কোন ধ্যানরূপ সৃষ্টি করে ভয়, ভক্তি বা শ্রদ্ধার উদ্রেক করে না। ছবির এই সব দেব-দেবীরা তাঁদের অলঙ্কার সর্বস্বরূপ নিয়ে ছবির জমিতেই সদা বিরাজমান। তারা নেহাৎ-ই রূপবন্ধ। এ-তো গেল প্রতিমালক্ষণ নিয়ে বক্তব্য, যাকে প্রখ্যাত মূর্তিতত্ত্ববিদ এরউইন প্যানোফস্কি বলেছেন শিল্পের বিষয় নিয়ে আলোচনা।

আঙ্গিকগত দুর্বলতাও [illegible]। বিষয় এবং বিষয়ীর একাত্মীকরণ না হলে আঙ্গিকগত দুর্বলতা অবশ্যম্ভাবী। দ্বি-মাত্রিক চিত্রক্ষেত্রে কোন প্রতিভাসিক রূপবন্ধ স্থাপন করলেই চিত্রক্ষেত্র ত্রি-মাত্রিক দেশ হয়ে উঠতে চায়। যাঁরা দ্বি-মাত্রিক চিত্রক্ষেত্রকে ত্রি-মাত্রিকতা দান করতে চান তাঁরা পারস্পেকটিভ বা প্রেক্ষিত রচনার কোন-না-কোন নিয়ম মেনে নেন। আর যাঁরা দ্বি-মাত্রিকতার বাঁধন মেনে নিয়েই চিত্র রচনা করেন—তাঁরা হয় বিমূর্ত শিল্প করেন, না হয় রূপবন্ধ সমূহকে এমনভাবে সংস্থাপন করেন বা বর্ণান্তর (tonal gradation) এবং বর্ণভেদ (colour composition) এমনভাবে ঘটান বা রেখার পারস্পরিকতাকে এমনভাবে সাজান যাতে দর্শনেন্দ্রিয়তে বোধ জন্মায় যে ঘনশরীরবিশিষ্ট রূপবন্ধগুলি বহুস্তর-বিশিষ্ট চিত্রদেশে অবস্থান করছে। কিন্তু মুমতাজের ছবির মোটা-ভারি রেখার [illegible] রূপবন্ধগুলি একান্তভাবে একতল মাত্রিক। রৈখিক অলংকার-বাহুল্যের কারণে রূপবন্ধগুলি আরও বেশী একতল-মাত্রিক হয়ে পড়েছে। অথচ রেখাচ্ছায়ার (shading) ব্যবহারে ঘনত্ব আরোপের প্রচেষ্টা ধরা পড়ে। বর্ণান্তর ঘটানোর মধ্যেও চিত্রতলকে দেশ করে তোলার প্রচেষ্টা লক্ষ্যণীয়। কিন্তু রেখাছন্দের পৌনঃপুনিকতা, রূপবন্ধাংশের পৌনঃপুনিক সংস্থাপন, সব ধরনের রূপবন্ধের একজাতের শৈলীকরণ এবং শূন্যক্ষেত্রের সামানুপাতিক বিন্যাস ছবিতে এমন একটি অলঙ্করণ সৃষ্টি করেছে যাতে চিত্র দ্বিতলমাত্রিক নকশা হয়ে উঠেছে। মুমতাজের চিত্রের আরেকটি দুর্বল দিক তাঁর জমির বুনটের সঙ্গে নকশার অসহযোগিতা। ছবির বুনটের রেখার স্পর্শগ্রাহ্যতা ও জৈব অস্থিরতা নকশায় সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। বৈপরীত্য এতই প্রকট যে তারা কোন স্পন্দনমূলক নাটকীয়তা সৃষ্টি করে না।

আঙ্গিকগত দুর্বলতা ছাড়াও, কারু-কৌশলের দুর্বলতাও মুমতাজের ছবিতে [illegible] নয়। ছাপের স্পষ্টতা, চাপের সাম্য ইত্যাদি যে গুণগুলি ছাপের ছবির কারু-কৌশলগত গুণ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে, তা অনেক সময়ে রঙিন ছবিতে ধরা পড়ে না। সাদা-কালো ছবিতে অথবা চাপের ছবিতে (embossed) সে দোষগুলি বেশ ভাল ধরা পড়ে। মুমতাজ তাঁর যেসব ছবিতে চাপের (embossing) কাজ করেছেন সেখানে তাঁর ছাঁচ (matrix) তৈরীর দুর্বলতা ধরা পড়েছে, চাপের সাম্যের অভাব নকশার অস্পষ্টতা ইত্যাদি দোষগুলি ঐ ছবিগুলিতে প্রকট হয়ে উঠেছে। আসলে এ দোষ মুমতাজেরও নয়, দোষ তাঁর মাধ্যমের। ধাতুপাত্রে খোদাই করা না শিখলে ছাপের ছবিতে রেখা ব্যবহার শেখা হয়ে ওঠে না, লিথোগ্রাফ না করলে ছাপের ছবির [illegible] ভরাট করার কায়দা রপ্ত হয় না।

একই সপ্তাহে কলকাতা তথ্যকেন্দ্রের প্রদর্শনী কক্ষে 'ক্যানভাস' শিল্পীচক্রের সভ্যদের বাৎসরিক চিত্র ও ভাস্কর্যের একটি প্রদর্শনী হয়ে গেল। প্রদর্শনীতে এগারোজন চিত্রকরের এগারোটি বিভিন্ন মাধ্যমে রচিত চিত্র এবং দুজন ভাস্করের প্লাস্টার অব প্যারিস এবং পোড়ামাটিতে গড়া চারটি ভাস্কর্য প্রদর্শিত হয়। শিল্পীরা সকলেই চারুকলাবিদ্যায় নিয়মিত শিক্ষাপ্রাপ্ত। বয়সে তরুণ হলেও, এঁরা সবাই বেশ কয়েক বছর ধরে নিয়মিতভাবে কাজ করে যাচ্ছেন এবং প্রদর্শনীতে দেখাচ্ছেন। কিন্তু সে অনুপাতে প্রদর্শনীর মান আশানুরূপ নয়। তাছাড়া কলকাতা তথ্যকেন্দ্রের প্রদর্শনী কক্ষটি যে কোন প্রকার প্রদর্শনীর পক্ষে অনুপযুক্ত। যে কোন শিল্পীকে বসিয়ে দিতে হলে তাঁর ছবি কলকাতা তথ্যকেন্দ্রের নোংরা ধূলি-কালি লাঞ্ছিত, বিসমভাবে আলোকিত, মোটে হয়ে যাওয়া সোনালীরঙের এবড়ো-খেবড়ো কাঠের বোর্ডে ঝোলানো যথেষ্ট। শিল্প-বস্তুকে ভালোভাবে জনসমক্ষে উপস্থাপিত করার প্রয়োজনটি বড় কম নয়।

—প্রণবরঞ্জন রায়

বাংলাদেশের মেয়ে

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

চন্দ্রাবতীর প্রেম

অদূরে ফুলেশ্বরী নদী। নদীর পারে পাতুয়ার গ্রাম। যেন একটি ছবি। চারিদিকে তার ফুলের বাগান। সেখানে হাজার রকমের ফুল।

রোজ ভোরবেলা একটি মেয়ে ও এক তরুণ যুবক একই বাগানে ফুল তুলতে আসে।

একদিন তরুণী ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করল, 'কে তুমি? তুমি তো আমাদের গাঁয়ের লোক নও!'

মেয়েটির নাম চন্দ্রাবতী। সেই গ্রামের শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ বংশীদাসের মা-হারা একমাত্র সন্তান।

ছেলেটির নাম জয়চন্দ্র। সে বললে, 'আমি তোমাদের গাঁয়ে থাকি না। কিন্তু আমি দূরের মানুষ নই। তোমার গ্রাম আর আমার গ্রাম এই নদীর দুই পারে।'

দুজনের আলাপ ক্রমে ঘনিষ্ঠ হল। দুজনের মধ্যে যেন অলক্ষ্যেই এক নিবিড় মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠল। একদিন চন্দ্রাবতী একটি মালতীর মালা জয়চন্দ্রকে উপহার দিল। সেদিন দুজনেরই মনে এক নতুন ভাবের স্ফুরণ।

কয়েকদিন পরে চন্দ্রাবতী জয়চন্দ্রের কাছ থেকে এক পত্র পেলো। জয়চন্দ্র লিখেছে, 'আমি তোমার রূপে গুণে মুগ্ধ। তোমার সঙ্গ পাবো বলেই রোজ ভোরবেলা ফুল তুলতে যাই। তোমার দেওয়া মালা নিয়ে আমি সারাদিন কেঁদে কাটিয়েছি। আমার মা-বাবা নেই, মামার বাড়িতে থাকি। যদি তোমার সদয় উত্তর পাই তবেই এ অঞ্চলে থাকবো, নয়তো চিরকালের মত তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দূর দেশে চলে যাব।'

• • •

চন্দ্রাবতীর বাবা বংশীদাস শিবের ভক্ত। প্রত্যহই চন্দ্রাবতীর আনা ফুল দিয়ে শিব-পূজা করতেন। সেদিনও তিনি যথারীতি শিবের পূজা করলেন এবং পূজার শেষে প্রার্থনা জানালেন, 'হে দেবাদিদেব! আমি সংগতিহীন ব্রাহ্মণ, তুমি আমার কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা করে দাও। শিগগিরই যেন ভাল বরের প্রস্তাব নিয়ে ঘটক আমার বাড়ি আসে।'

সেদিন পিতার পূজার আয়োজন করে দিয়ে চন্দ্রাবতী নিজের ঘরে গিয়ে আরবার জয়চন্দ্রের পত্রটি পড়ল। তারপর মহাদেবের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে অন্তরের আকূতি জানালো, জয়চন্দ্রকে সে যেন স্বামীরূপে পায়। জয়চন্দ্র ভিন্ন অন্য কাউকে সে পতিত্বে বরণ করতে পারবে না।

জয়চন্দ্রের চিঠি পাবার পরে থেকে চন্দ্রাবতীর মনে একটা দারুণ লজ্জার ভাব এসেছে। সংক্ষেপে সে তার পত্রের জবাব দিয়েছে, লিখেছে, আমি কি বলব, বল! আমার বাবা আছেন। তাঁকে তো বলা দরকার। আমি বড় লজ্জা বোধ করছি। কিন্তু তুমি দূর দেশে চলে গেলে আমার খুব কষ্ট হবে।

কী এক মধুর লজ্জায় চন্দ্রাবতী জয়চন্দ্রের সামনে আসতে পারে না। সে ভোর রাত্রে, জয়চন্দ্র বাগানে আসবার আগেই, ফুল তুলে নিয়ে আসে, যাতে জয়চন্দ্রের সঙ্গে তার দেখা না হয়। কিন্তু তার মন জয়চন্দ্রের প্রতি প্রেমে প্লাবিত হোয়ে রইল।

পরদিন বংশীদাসের কাছে এক ঘটক এসে একটি সুপাত্রের সন্ধান দিল। পাত্রের নাম জয়চন্দ্র চক্রবর্তী। ফুলেশ্বরীর অপর পারে সুন্দর গ্রামে তার বাস। নানা শাস্ত্রে সে সুপণ্ডিত এবং বিশেষ রূপবান।

দরকার। 'জনগণের বিরাট একটি অংশ অপুষ্টিতে ভুগে মারা যাচ্ছে। তাদের যথেষ্ট খাবার জোটে না, যাওবা জোটে তার খাদ্য-মূল্য নামমাত্র।' পরিশেষে তিনি বলেছেন, বিজ্ঞানের ওপরে আমলাশাহীর খবরদারিতে এই অবস্থার প্রতিকার হবে না।

জাতীয় বিজ্ঞান আকাদেমির রজত-জয়ন্তী অনুষ্ঠান

জাতীয় বিজ্ঞান আকাদেমির রজত-জয়ন্তী স্মারক পুরস্কারটি পেয়েছেন ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের (আই সি এ আর) অধিকর্তা ডঃ এম এস স্বামীনাথন। তিনি সম্মানিত হলেন শস্যের প্রজনন-শক্তির উন্নয়নে এবং কৃষি গবেষণা ও শিক্ষার অগ্রগতিতে তাঁর অবদানের জন্যে। ভারতে উচ্চফলনশীল বীজ ব্যবহারে তাঁর সাহায্য অনেকখানি। মেকসিকোর গম ভারতের মাটিতে ফলিয়ে সবুজ বিপ্লব ঘটানোর ব্যাপারে তাঁরও হাত ছিল।

চন্ডীগড়ে জাতীয় বিজ্ঞান আকাদেমির রজত-জয়ন্তী অনুষ্ঠানে তিনি যে রজত-জয়ন্তী স্মারক ভাষণটি দিয়েছেন তা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করার মতো। ১৯৮১ সালে ভারতে প্রয়োজন হবে, তাঁর হিসেব অনুযায়ী, ১৮৫ মিলিয়ন বা সাড়ে আঠারো কোটি টন গম। সঙ্গে সঙ্গে আরো বলেছেন, এই হিসেব শুনে আতঙ্কগ্রস্ত হবার কোনো কারণ নেই, কেননা আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ করলে ভারতের মাটিতেই এই বর্ধিত মাত্রার উৎপাদন সম্ভব।

তাই তিনি জোরের সঙ্গে বলেছেন, এখন চাই বর্ধিত মাত্রার ফলন, বিরাট আকারের ফলন। টিঁকে থাকবার জন্যে চাই আরো বেশি সংখ্যক উদ্ভিদ, আরো বেশি সংখ্যক জীব। আগাছা আছে, মারী ও মড়ক আছে—উদ্ভিদ ও জীবের এখন এমন বিশেষ ক্ষমতা চাই যেন টিকে থাকতে পারে। জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে খাদ্য-সরবরাহের সমতা আনতে হলে অবশ্যই চাই উদ্ভিদের সংখ্যাবৃদ্ধি। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে তা অসাধ্য নয়। ভারতে কৃষি-ব্যবস্থা প্রায় একটা অচল অবস্থায়, কাজেই আগামী দিনের সমস্যার মোকাবিলা করতে হলে বড়ো রকমের কিছু করা দরকার।

বিকীরণজনিত রোগে প্রতিরোধ-ক্ষমতা

ট্রম্বের ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের জৈবরসায়ন ও খাদ্য টেকনোলজি বিভাগের প্রধান ডঃ এ শ্রীনিবাসন চন্ডীগড়ে একটি আশার কথা শুনিয়েছেন। কথাটি বিকীরণজনিত রোগে প্রতিরোধ-ক্ষমতা সৃষ্টি সম্পর্কিত।

সকলেই জানেন, আধুনিক জগতে যে-কেউ যে-কোনো সময়ে পারমানবিক বিকীরণের শিকার হতে পারেন। যুদ্ধেই হোক (যেমন হিরোশিমায় ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে হয়েছিল) বা কোনো দুর্ঘটনাতেই হোক, পারমাণবিক বিকীরণের সংস্পর্শে এলে মানুষের আর রক্ষে নেই, এমন কি কয়েক মিনিটের মধ্যে মারাত্মক রোগগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে।

ডঃ শ্রীনিবাসন বলেছেন, তাঁর সহকর্মীরা স্তন্যপায়ী জন্তুদের ওপরে পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে, মারাত্মক মাত্রার কম পরিমাণ (অর্থাৎ খুবই অল্প পরিমাণ) বিকীরণ ঘটলে তার প্রভাব দূর করা সম্ভব।

এখানে একটা কথা জেনে রাখা দরকার। বিকীরণ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া মানুষের পক্ষে যতোটা দুরূহ, জন্তু-জানোয়ারের ততোটা নয়। গোটা পৃথিবী যদি পারমাণবিক বোমায় ধ্বংস হয়ে যায় তখনো সম্ভবত আরশোলারা বেঁচে থাকবে—তার মানে তীব্র মাত্রার বিকীরণও আরশোলার পক্ষে ক্ষতিকর নয়। কিন্তু মানুষের বেলায় অতি সামান্য মাত্রার বিকীরণও প্রাণঘাতী।

ট্রম্বের বিজ্ঞানীদের গবেষণায় আশার বাণী এই যে—মানুষ না হোক, স্তন্যপায়ী জন্তুরা অল্প মাত্রার বিকীরণ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে। এই প্রতিরোধ-ক্ষমতা সৃষ্টি করা সম্ভব। আর স্তন্যপায়ী জন্তুর বেলায় যা সম্ভব, মানুষের বেলায় তা চিরকালই অসম্ভব থাকবে এমন কথা বিজ্ঞানীরা কখনো বলেন না।

দুরারোগ্য টাইফয়েড

ভেষজ বিজ্ঞানীরা অনেকদিন ধরেই যা আশঙ্কা করছিলেন, অবশেষে তাই ঘটেছে। টাইফয়েড রোগ এমন আকার ধারণ করেছে—বা, সঠিকভাবে বলতে হলে, টাইফয়েডের ব্যাসিলাই এমন কায়দা শিখেছে—যে অ্যান্টি-বায়োটিক ওষুধেও রোগ সারে না বা ব্যাসিলাই ধ্বংস হয় না। অর্থাৎ টাইফয়েড হয়ে উঠেছে দুরারোধ্য। অ্যান্টিবায়োটিকেও এখন আর কাজ হচ্ছে না।

এখনো পর্যন্ত পৃথিবীর দুটি জায়গা থেকে এ-ধরনের দুরারোগ্য টাইফয়েডের খবর পাওয়া গিয়েছে। মেকসিকো ও কেরল। শেষোক্ত স্থান থেকে এই রোগের বিবরণ দিয়েছেন কালিকট মেডিকেল কলেজের ডাঃ সি কে জে পাণিকর ও ডাঃ কে এন বিমলা। তাঁরা জানাচ্ছেন, ১৯৭২ সালের মে মাসে তাঁদের হাতে এমন কয়েকটি টাইফয়েড রোগী এসেছিল, ক্লোরামফেনিকল প্রয়োগ করেও যাদের সারানো যায় নি। না ক্লোরাম-ফেনিকলে, না টেট্রাসাইক্লিনে, না স্ট্রেপটো-মাইসিনে। টাইফয়েডের চিকিৎসায় এতকাল ক্লোরামফেনিকলই ছিল অব্যর্থ ওষুধ। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এটি তো বটেই, এখন এ-জাতীয় অন্যান্য ওষুধও ব্যর্থ হচ্ছে। তার মানে কী? টাইফয়েডের ব্যাসিলাই—বা, যাকে বলা হয় স্যালমোনেলা টাইফি—এমন প্রতিরোধ-ক্ষমতা লাভ করেছে যার ফলে ক্লোরামফেনিকলকেও ঠেকাতে পারে ও দিব্যি টিকে থাকে। মেকসিকোতে যে দুরারোগ্য টাইফয়েড দেখা দিয়েছে তার ব্যাসিলাই এই প্রতিরোধ-ক্ষমতা বিশিষ্ট। কেরলেও তাই। অথচ এই দুটি স্থানেই টাইফয়েডের দাপট যথেষ্ট।

ব্যাপারটি ঘটেছে এ-কারণে যে ক্লোরাম-ফেনিকলের প্রয়োগ—বা, সাধারণভাবে বলতে গেলে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োগ—যততত্র হতে শুরু করেছে, অতি সামান্য সব কারণেও, এমন কি বিনা কারণেও। মোক্ষম অস্ত্র অনবরত ব্যবহার করে চললে তার মোক্ষমত্ব আর থাকে না। যাকে বিনাশ করার জন্য সেই মোক্ষম অস্ত্র প্রয়োগ করার কথা, আগে থেকেই অভ্যস্ত হতে হতে সে একটা প্রতিরোধ-ক্ষমতা অর্জন করে বসে। তারপরে তাকে বিনাশ করা সেই মোক্ষম অস্ত্রের পক্ষেও সম্পূর্ণ অসাধ্য হয়ে পড়ে।

ভেষজ বিজ্ঞানীরা তাই আবেদন জানিয়েছেন, ক্লোরামফেনিকল বা এ-জাতীয় অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করে রোগ সারানো হবে, এই যদি উদ্দেশ্য হয় তবে সেগুলোর প্রয়োগ একমাত্র এই রোগের ক্ষেত্রে ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে বন্ধ করা হোক।

কেরল এই ভারতেরই একটি রাজ্য। কেরল থেকে এই কলকাতায় ও অন্যত্র অনবরত লোক যাতায়াত করে থাকে। কাজেই এই বিশেষ ধরনের টাইফয়েড রোগটি ছড়িয়ে পড়া অসম্ভব নয়। তবে ভেষজ বিজ্ঞানীরা বলছেন, মোটামুটি স্বাস্থ্যবিধি গুলো মেনে চললে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম। সকলেই হয়তো স্বীকার করবেন, আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি যেটা অমান্য করা হয় তা হচ্ছে স্বাস্থ্য-বিধি, সবচেয়ে বেশি যেটা অগ্রাহ্য করা হয় তা হচ্ছে শহরের স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা। ফলে রোগ অনায়াসেই ছড়িয়ে পড়তে পারে। এ-অবস্থায় সমাজের অগ্রসর ও শিক্ষিত অংশ চিকিৎসকদের কাছে এটুকু আশা করা যেতে পারে যে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার তাঁরা যেন নিতান্ত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখেন, যত্রতত্র প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকেন। রোগীরাও সচেতন থাকতে পারেন। দু-একটা হাঁচি-কাশি হলেই ডাক্তারের কাছে ছুটে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, ছোট-খাটো রোগ সারিয়ে তোলার ব্যবস্থা শরীরের ভিতরেই আছে। আর যদি ছুটতেই হয় তো এমন ডাক্তারের কাছে কদাচ নয় যিনি হাঁচি-কাশির চিকিৎসাতেও অ্যান্টিবায়োটিক বরাদ্দ

করেন। কথাটা মনে রাখা ভালো—টাইফয়েড বা এ-ধরনের মারাত্মক অসুখ না হলে অ্যান্টিবায়োটিক কিছুতেই নয়। মারাত্মক অসুখের ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিককে ফলপ্রসূ রাখার এইটেই উপায়।

ঠান্ডা-লাগা থেকে বাঁচতে হলে ভিটামিন-সি

বিশ্ববিখ্যাত রসায়ন বিজ্ঞানী লাইনাস পলিং জোরের সঙ্গে এই মত প্রচার করেছিলেন যে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন-সি খেয়ে গেলে ঠান্ডা-লাগার জন্যে যে-সব অসুখ সাধারণত হয়ে থাকে তার হাত থেকে বাঁচা যায়। এই মতের পক্ষে তিনি কিছু পরীক্ষালব্ধ তথ্যও উপস্থিত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর উচ্চ কণ্ঠ প্রচার সত্ত্বেও চিকিৎসা জগতে এই মতের পক্ষে বড়ো রকমের সমর্থন ছিল না। সম্প্রতি কানাডার কয়েকজন বিজ্ঞানীর গবেষণায় পলিং-এর মত সমর্থন লাভ করেছে।

পলিং বলেছিলেন— ভিটামিন-সি প্রত্যেকেরই প্রয়োজন, কারও কম কারও বেশি মাত্রায়। পশ্চিমী দেশগুলিতে এই মাত্রা কমপক্ষে দৈনিক কুড়ি থেকে ৭৫ মিলিগ্রামের মধ্যে। বেশির দিকে কখনো কখনো এই মাত্রা দুই থেকে তিন গ্রাম পর্যন্ত। তাঁর মতে, যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন-সি খেয়ে গেলে ঠান্ডা লাগার জন্যে অসুখে ভোগার সম্ভাবনা কম। এই মতের প্রমাণ হিসেবে সুইজারল্যান্ডের একটি স্কি-বিদ্যালয়ে পরীক্ষালব্ধ কিছু তথ্য উপস্থিত করেছিলেন। তথ্যগুলো এই রকমের : স্কি-বিদ্যালয়ের প্রত্যেককে দৈনিক এক গ্রাম করে ভিটামিন-সি খেতে দেওয়া হয়। ফলে দেখা যায়, ঠান্ডা-লাগা থেকে বেঁচে গিয়েছে শতকরা ৪৫ জন, বিছানা-নেওয়া অসুখ থেকে শতকরা ষাটজন। সম্প্রতি অন্য একটি স্থানেও দৈনিক এক গ্রাম করে ভিটামিন-সি খেয়ে যাওয়ার ফল প্রায় অনুরূপ—ঠান্ডা-লাগা থেকে বেঁচে যাওয়ার হার এক্ষেত্রে শতকরা ৪৯ জন। তবে, এই উভয় ক্ষেত্রেই পরীক্ষা চলেছিল অল্প কয়েকজন লোকের উপরে। যে-কারণে পরীক্ষার ফল সাধারণভাবে গ্রাহ্য কিনা তা জোর গলায় বলা চলত না। সম্প্রতি কানাডার কয়েকজন বিজ্ঞানী হাজারখানেক মানুষ নিয়ে ব্যাপকভাবে এই একই পরীক্ষা চালিয়েছেন। ঠান্ডা-লাগার বিরুদ্ধে লড়াই চালাবার জন্যে ভিটামিন-সি যে বিশেষ ফলপ্রদ, এই সিদ্ধান্ত শেষতম পরীক্ষাতেও আরো জোর পেয়েছে।

তবে পলিং-এর পরীক্ষার ফল সিদ্ধান্তের দিকে যতোখানি ঝুঁকেছে, এক্ষেত্রে ততোখানি নয়। পরীক্ষার পাত্র-পাত্রীদের বাছাই করা হয়েছিল বিভিন্ন বয়সের ও বিভিন্ন পেশার মানুষদের মধ্যে থেকে। এবারে দেখা যায়, ভিটামিন-সি খাওয়ার ফলে রোগমুক্তদের সংখ্যা বেড়েছে এবং শয্যাশায়ী হয়ে থাকার ফলে কাজে কামাই হওয়ার দিন শতকরা ত্রিশ ভাগ কমেছে। কানাডার বিজ্ঞানীরা এতটা ফল লাভ আশা করেন নি। তবে এই ফললাভ করার পরেও তাঁরা অবশ্য পলিং-এর মতের পক্ষে নন। শুধু বলেছেন, এই ফললাভ 'তাৎপর্যপূর্ণ'।

বিজ্ঞানীরা যাই বলুন, তাঁদের পরীক্ষা কার্য থেকে এই সিদ্ধান্তটিই জোরদার হচ্ছে যে ভিটামিন-সি মানুষের শরীরের পক্ষে খুবই উপকারী। ঠান্ডা-লাগার জন্যে যে-সব অসুখে পড়তে হয়—শীতের শুরুতে ও শেষে অনেকেই পড়ে—অন্ততপক্ষে তার হাত থেকে একটি সহজ ও সুলভ পথ হচ্ছে প্রতিদিন নিয়ম করে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন-সি খেয়ে যাওয়া। আমাদের দেশে বছরের এই সময়ে কমলালেবু ও আমলকি পাওয়া যায়। এই দুটিতেই প্রচুর ভিটামিন-সি, বিশেষ করে লেবুটিতে। সকালবেলা অল্প গরম জলে একটি পাতিলেবুর রস খেয়ে যাওয়া খুব একটা খরচের ব্যাপার নয়; যে-কেউ খেয়ে দেখতে পারেন (অবশ্য যদি-না শরীরে এমন কোনো ব্যাধি থাকে যাতে পাতিলেবুর রস বিপত্তি ঘটাতে পারে), ফল পাবেন-ই। শরীর সুস্থ রাখা ও কর্মঠ রাখা যতোটা শক্ত মনে হয় ততোটা নয়।

তেজ ও শক্তির জন্য মধু

নয়াদিল্লী থেকে সি এস আই আর কর্তৃক প্রকাশিত 'সায়েন্স রিপোর্টার' (জানুয়ারী ১৯৭৩) পত্রিকার একটি প্রবন্ধ থেকে মধু সম্পর্কে কিছু তথ্য উপস্থিত করছি।

মৌমাছির একটি চাকে শ্রমিক মৌমাছি থাকে ২০,০০০ থেকে ৩০,০০০ পর্যন্ত। প্রত্যেকটি মৌমাছি ২২ বার করে মধু সংগ্রহের জন্যে বাগানে পাড়ি দেয়, সারা জীবনে ৮৮,০০০ থেকে ১,৭৬,২০০ বার, মধু সংগ্রহ করে প্রায় ৬০৬৮ লক্ষ ফুল থেকে। প্রতি পাড়িতে দূরত্ব অতিক্রম করে দেড় থেকে আড়াই কিলোমিটার পর্যন্ত। তার মানে, এক কিলোগ্রাম মধু সংগ্রহ করতে এক-একটি মৌমাছি যে দূরত্ব অতিক্রম করে তা পৃথিবীকে চার বার পাক দিয়ে আসার সমান।

শতাংশের হিসেবে মধুর উপাদান : লেভুলোজ ৩৮·১৯, ডেকসট্রোজ ৩১·২৮, মলটোজ ও অন্যান্য শর্করা ৮·৮১, এনজাইমস ইত্যাদি ২·২১; সুক্রোজ ১·৩১; অ্যাসিড ও প্রোটিন ইত্যাদি ১·০০; জল ১৭·২০।

২০০ গ্রাম ওজনের বা টেবিল চামচের দশ চামচ পরিমাণ মধুতে আছে ১·১৫ লিটার দুধ বা ১·৬০ কেজি ক্রীম পনীর বা ৩৩০ গ্রাম মাংস বা আটটি কমলালেবু বা দশটি ডিমের সমান পুষ্টি। ২১ গ্রাম বা এক টেবিল চামচ মধু থেকে শক্তি পাওয়া যায় ৬৭ ক্যালরি। মধু সহজেই শরীরে গৃহীত হয়—সুস্থ শরীরেও, অসুস্থ শরীরেও। সব বয়সে খাওয়া চলে, সব ঋতুতে, সব সময়ে।

মধু খেলে রক্তের হিমোগ্লোবিন বাড়ে, ঠান্ডা-লাগার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-ক্ষমতা পাওয়া যায়, রক্ত পরিষ্কার হয়। হার্টের অসুখে, বদহজমে, আন্ত্রিক ক্ষতে মধু উপকারী।

ভিয়েৎনামে মার্কিনী বোমাবর্ষণের প্রতিবাদে নয়জন বিশিষ্ট আমেরিকান বিজ্ঞানী

তিনজন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী সমেত নয়জন বিশিষ্ট আমেরিকান বিজ্ঞানী একটি স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে দাবি তুলেছেন, উত্তর ভিয়েৎনামে মার্কিনী বোমাবর্ষণ অবিলম্বে বন্ধ হোক। তাঁরা বলেছেন, বিজ্ঞানের বর্বর অপব্যবহার করা হচ্ছে ধ্বংস ও মৃত্যু ঘটাবার জন্যে—এর বিরুদ্ধে আমেরিকান হিসেবে ও বিজ্ঞানী হিসেবে তাঁদের অবশ্যই প্রতিবাদ করতে হবে। বিবৃতিটি প্রচার করা হয়েছে বিজ্ঞানের অগ্রগতির উদ্দেশ্যে গঠিত আমেরিকান সমিতির পক্ষ থেকে। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে আছেন হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ জর্জ ওয়াল্ড, মাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির ডঃ স্যালভাডর লুরিয়া ও উড্স হোল মেরিন বায়োলজি ল্যাবরেটরির ডঃ আলবার্ট ঝেনজর্জি।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতির পদে শ্রীমতী অসীমা চট্টোপাধ্যায়

কলকাতার ইউনিভার্সিটি কলেজেস অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির রসায়ন বিভাগের প্রধান ও বিজ্ঞান ফ্যাকালটির ডীন শ্রীমতী অসীমা চট্টোপাধ্যায় ১৯৭৩-৭৪ সালের জন্য ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছেন। এই পদে একজন মহিলা এই প্রথম।

এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে, তিনশো বছরের প্রাচীন রয়েল গ্রীণউইচ অবজারভেটরির অধ্যক্ষ হয়েছেন এই প্রথম একজন মহিলা—জ্যোতির্বিজ্ঞানী মার্গারেট বারবিজ এফ-আর-এস।

অয়স্কান্ত

শীতের চিড়িয়াখানায়

শুভংকর পাঠক

এইখানে আকাশ অনেকটা পরিচ্ছন্ন, উদাসীন ও রোম্যান্টিক মনে হয়। এর আকর্ষণই আলাদা। আলজিরিয়ার রৌদ্রালোকিত উপকূলে ভ্রাম্যমাণ আলবোর কাম্যু যেমন আকাশ-মাটির যৌথ ডাক শুনতে পেতেন, ঠিক সেইভাবে এখানে কেউ আচ্ছন্ন হতে আসেন না। তবু সকালে, সন্ধ্যায় কুয়াশা জমে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়। বাচ্চাদের কোলাহল আর মানুষের ভীড় বাড়ে। পাখির শিস, বাঘের ডাক, সিংহের গর্জন শোনা যায়।

সব মিলিয়ে শীতের চিড়িয়াখানায়, একেকটি দুপুর, একেকটি বিকেল যেন অলৌকিকতার রহস্য মাখা।

যে-কোনো ছুটির দিন, অফিসের সব চাইতে ব্যস্ত মানুষটিকে যদি হালকা মেজাজে দেখতে চান, তাহলে চিড়িয়াখানায় আসুন। হয়তো দেখতে পাবেন, খবরের কাগজ বিছিয়ে তিনি শুয়ে আছেন মিষ্টি রোদ্দুরে। কিংবা সতরঞ্চি বিছিয়ে তাস-পাশা খেলছেন। ডাইনে বাঁয়ে ছড়ানো কমলালেবুর খোসা। গোটা তিনেক টিফিন ক্যারিয়ার। এবং স্ত্রীর সঙ্গে রসিকতার ফাঁকে ফাঁকে তিনি ক্রিকেটের ধারা বিবরণী কিংবা হিন্দী সিনেমার গান শুনছেন ট্রানজিস্টারে।

অর্থাৎ এখন তিনি খোলা-মেলা। একান্তভাবেই বাঙালী।

উত্তরায়ণের সূর্য হেলে পড়েছে দক্ষিণে। দিনের আয়তন কমেছে। মৌসুমী হাওয়ার বিলাপ নেই। পাহাড়ের দীর্ঘশ্বাস ঘন হয়ে নেমে এসেছে সমতলের মাঠে, জনপদে এবং চিড়িয়াখানায়। ভদ্রলোকও নিশ্চয়ই তা জানেন। তাঁর গায়ে এখন একটা কমলারঙের সোয়েটার। ছেলে-মেয়েরা কাছে নেই। ওরা ঘুরে বেড়াচ্ছে জলের ধারে।

কি যেন দেখছে?

—কি? পানকৌড়ি?

পরিচয়-আমেজ
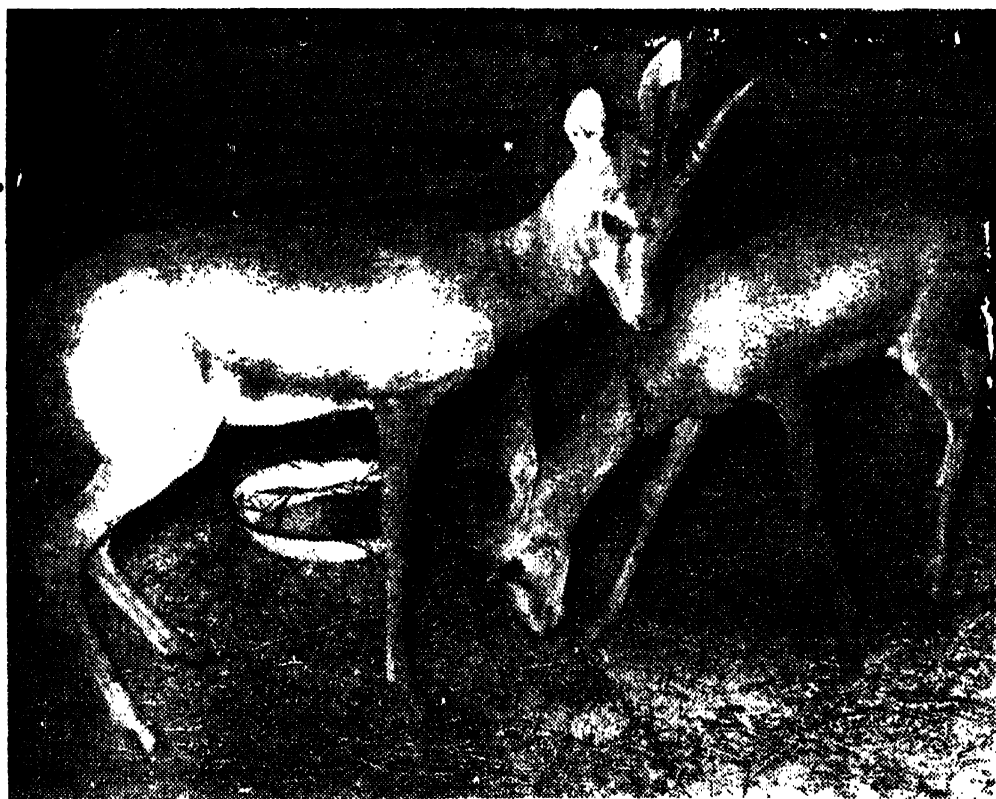
—না। কয়েকটা নীল রঙের ডানাওয়ালা পাখি। গার্গানি। ওদের চোখ শাদা। ডানায় সামান্য সবুজের ছোঁয়া মেশানো। আর বুকের দিকে খানিকটা ধূসর রঙের আভাস। এই পাখিগুলি ফি-বছর সুদূর সাইবেরিয়া সীমান্ত থেকে আসে আলিপুরে চিড়িয়াখানায়।

এরা শীতের অতিথি। শীত ফুরোলেই চলে যাবে।

আমি পাখিবিশারদ নই। সব পাখির নাম জানি না। রেড ইন্ডিয়ানরা জানে, কোন পাখি কোন মাসে হ্রদের জলে সাঁতার কাটে। গাছের ডালে শিস দেয়। পাখিদের চলাচল আর পর্যটন-রীতি অনুসারে ওরা দিনের হিসেব করে। ক্যালেন্ডার মাসের নাম রাখে।

আমরা নক্ষত্রে বিশ্বাস রেখেছি। তাই পাখিদের নামে সময়কে চিহ্নিত করি নি।

পাখিতত্ত্ববিদদের মধ্যে হুলডেন, হুইসলার, জুলিয়ান হাক্সলে ও সেলিম আলির অনুসন্ধান থেকে জেনেছি, হাওয়া বদলের সঙ্গে সঙ্গে আকাশের রঙ পাল্টায়। পাখিরাও তাদের বাসস্থান বদল করে। শীতের শুরুতে উত্তরাঞ্চলের পাখিরা উড়ে আসে দক্ষিণের উষ্ণ সমতলে।

কেননা, উত্তর মেরু এখন অন্ধকার।

সেখানে দিনের সূর্য প্রায়শ নির্বাসিত। নক্ষত্রের আলোয় পাখিরা দেখতে পায়, তুষারপাতের দৃশ্য। কোথাও তৃণগুল্মের চিহ্ন নেই। গাছগাছালিও অদৃশ্য। এই দুঃসময়ে ওরা এগারো শ মাইল পাড়ি জমায় আকাশ পথে। খাদ্য ও আশ্রয়ের সন্ধানে। শীত শেষ হলেই ওরা আবার ফিরে যাবে নিজের রাজ্যে। অর্থাৎ ফিরতি পথে আবার এগারো শ মাইলের জার্নি। যাওয়া-আসা, দুইয়ে মিলে, বাইশ শ মাইলের পথ-পরিক্রমা।
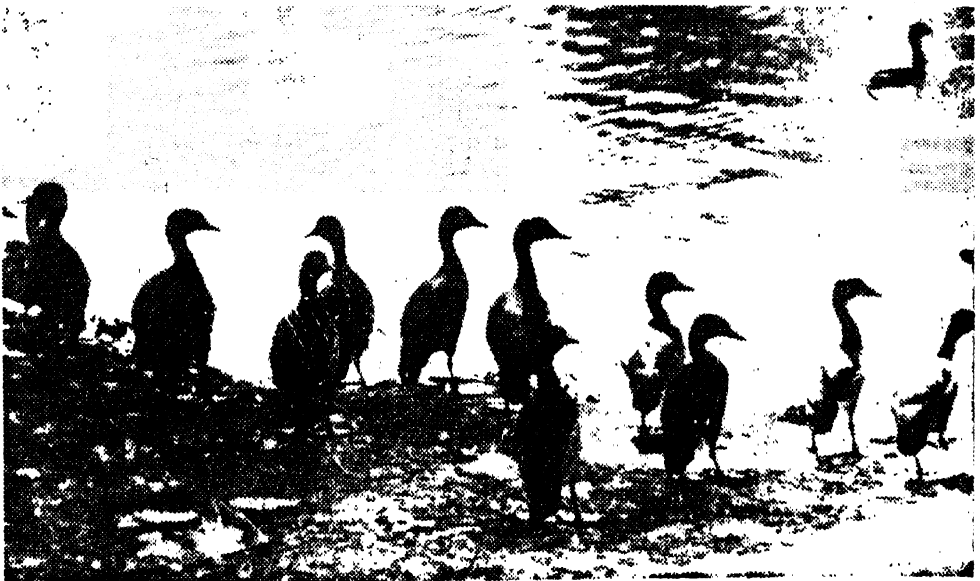
আলিপুরের চিড়িয়াখানায় যে-পাখিরা আসে, তারা মূলত লাদাক, তিব্বত ও সাইবেরিয়ার বাসিন্দা। এ খবর অনেকের জানা নেই। জানা থাকলে ভুল তথ্য পরিবেশন করতেন না।

একটা ঘটনার কথা বলছি।

সেদিন স্কুলের ইউনিফর্ম-পরা অনেকগুলি ছেলেকে দেখলুম, চিড়িয়াখানার হ্রদের ধারে। কমলা রঙের এক ঝাঁক হাঁসের দিকে তাকিয়ে তারা চোখ ফেরাতে পারছিল না। হাঁসগুলির ডানায় শাদা, কালো আর গাঢ় সবুজের সমারোহ। তাদের সঙ্গে ছিলেন জন দুই বয়স্ক ভদ্রলোক। বোধহয়, স্কুলের মাস্টারমশাই হবেন। তাঁরা ছেলেদের বোঝাচ্ছিলেন যে, এই পাখিগুলি বাংলাদেশের নদীনালায়, বিশেষ করে সুন্দরবন অঞ্চলে দেখা যায়। শীতের মরশুমে চিড়িয়াখানায় এসে গেছে, অন্যান্য পাখিদের সঙ্গে।

আসলে, ঐ ভদ্রলোকেরা পাখিগুলির নাম জানেন না।

ইংরেজীতে ওদের নাম রাডি শেলড্রেক। বাংলায় চখাচখি বলা যায়। দক্ষিণ য়ুরোপের সর্বত্র, উত্তর আফ্রিকা, লাদাক ও তিব্বত অঞ্চলে ওদের দেখা যায়। পিনটেল বা দিকহংসজাতীয় সরাল বাংলাদেশে কমই আসে। তবু চিড়িয়াখানার মহোৎসবে ওরা সাধারণত অনুপস্থিত থাকে না। ওদের মাথায় ত্রিশূল-চিহ্নের মতো বাদামী রঙের একটা চিহ্ন দেখা যায়।

তাছাড়া, এই শীতে চিড়িয়াখানায় এসেছে আরো অনেক নতুন পাখি।

যেমন ম্যালার্ড, স্পটেডবিল, গ্যাডওয়েল, শভেলার, কমনটিল, গ্রেটার ও লেসার হুইসলিংটিল উইজেন, পচার্ড, কোম্বডাক প্রভৃতি। লেসার হুইসলিংটিল আকারে পাতিহাঁসের চেয়েও ছোট। ওড়ার সময়ে ওরা বিদ্যুৎগতিতে শব্দ করে ওড়ে। প্রয়োজনে গাছে আশ্রয় নেয়। সেজন্যে অনেকে ওদের গেছো পাখি আখ্যা দিয়ে থাকে। শ্যাম, কোচিন, মালয়, সুমাত্রা, জাভা বোর্ণিও, ভারত, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে ওদের দেখা যায়।

তাই বলে, এই পাখিরা চিড়িয়াখানার প্রধান আকর্ষণ নয়। বাড়তি আকর্ষণহিসেবে দর্শনীয়। চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষ তাদের স্থায়ী আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছেন, গাছগাছালির আবরণ বানিয়ে, জলাশয় তৈরী করে ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিয়ে।

এখানে কেউ পাখি শিকার করতে পারেন না। কিন্তু হাতির পিঠে চড়তে পারেন।

ঐ যে ভদ্রলোক এখন দাঁড়িয়ে আছেন বাঘের খাঁচাটার সামনে। তাঁকে আমি চিনি না। আপনিও চেনেন না। যে-কোনোদিন চিড়িয়াখানায় গেলে, তাঁকে না হোক, তাঁর মতো কাউকে নিশ্চয়ই অনুরূপভাবে দেখা যাবে। চেহারা থেকে অনুমান হয়, উনি কোনো বেসরকারী ফার্মের কনিষ্ঠ কেরানী। অর্থাৎ সবচেয়ে ভীরু, নিরীহ এবং গোবেচারা মানুষ। বড়ো সাহেবের ধমক খেতে খেতে জীবনের তিন-চতুর্থাংশ কেটে গেছে। অথচ, এখন তিনি ঘুমন্ত চিতাবাঘটার দিকে তাকিয়ে যথেষ্ট সাহস দেখাচ্ছেন। যেন ইচ্ছে করলে, ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়তে পারেন। তাঁর সঙ্গে কয়েকটি ছেলেমেয়ে। তাদের তিনি বোঝাচ্ছেন, যৌবনে তাঁর কেমন সাহস ছিল। চেষ্টা করলে, ভালো শিকারীও হতে পারতেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে হন নি। অফিসের কাজে এমন ব্যস্ত থাকেন যে, বন্দুক চালাবার ফুরসৎ-ই হয় না।

চিতা বাঘটার ঘুম ভেঙেছে। হাই তুলছে। আড়মোড় ভাঙছে। ভদ্রলোক বাচ্চাদের নিয়ে দ্রুততার সঙ্গে, সামনের খাঁচাটার দিকে এগোচ্ছেন। বাচ্চারা এই ব্যস্ততার কোনো মানে খুঁজে পাচ্ছে না।

অন্যদিকে কয়েকটি তরুণ-তরুণী কি যেন কৌতূহলী হয়ে দেখছে, শীতের পোষাক পরে।

স্কুল-পড়ুয়া ছেলে-মেয়েদের এখন ছুটি। তাদের পরীক্ষা শেষ হয়েছে, রুকলিস্ট বেরিয়েছে। কিন্তু পড়াশোনার তাড়া নেই। শীতের চিড়িয়াখানায় তাদেরই উপস্থিতি বেশী। গরমের ছুটিতেও তারা আসে বা আসতে পারে। তাদের বাদ দিলে চিড়িয়াখানার গোটা আনন্দটাই নিষ্প্রাণ হয়ে যায়।

এখন অভিভাবকরা নিশ্চিন্ত। ছেলেরাও মুক্ত। পরীক্ষার ফল যা হবার হয়েছে। এখন তাদের বিশ্রামের কাল। ঘুরে বেড়াবার সময়। রেওয়ার জঙ্গল থেকে যে-বাঘটিকে চিড়িয়াখানায় আনা হয়েছে, তাকে দেখার জন্য ছেলেমেয়েদের কী ভীড়! সুন্দরবনের অরণ্য থেকে রয়েল বেঙ্গলের যে-বাচ্চাটিকে পাঠানো হয়েছিল বৃটেনের রাজকীয় চিড়িয়াখানায়, তাকে দেখার জন্য কি লন্ডনের ছেলে-মেয়েরা অনুরূপ ভীড় জমিয়েছিল।

১৯১১ সালে ছাপা একটি পাঠ্যবইতে পড়েছি, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নাবিকেরা যখন সমুদ্রপথে লন্ডনে যাচ্ছিলেন, তখন সেই বাঘের বাচ্চাটি ছিল নিরামিষাশী। জাহাজের একজন মিস্ত্রীর সঙ্গে তার ভাব হয়েছিল। দশ বছর পরে যখন ঐ বাঘের বাচ্চাটির সঙ্গে মিস্ত্রীর দেখা হয়, তখনও সে পুরনো বন্ধুত্বের স্মৃতি ভোলেনি।

আলিপুরের চিড়িয়াখানায় যে-সব বাঘ, সিংহ, হাতি, গন্ডার, ভালুক, জেব্রা, বনমানুষ, গেরিলা প্রভৃতি আছে, তারাও নানাভাবে পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে সংগৃহীত। নানা রকম পরিবেশ ও আবহাওয়ায় বেড়ে উঠেছিল। সে খবর সাধারণ দর্শকের জানা নেই। তবু আশ্চর্যজনকভাবে তারা বেঁচে আছে। দর্শনীয় হয়ে উঠেছে। মেছোকুমীরগুলি রোজ অনেকগুলি ল্যাটা মাছ খায়। বালতির ক্যানক্যানে শব্দ করলে পাড়ের কাছে ছুটে আসে।

জল-হাতিরা এই রকম শব্দ করলে ভ্রূক্ষেপ করে না। ওরা কি খায়, কে জানে?

রোদ পোহাতে পোহাতে সবাই দূরে থেকে দেখে পাহাড়ী মতো জায়গাটায় পাং-শুটে রঙের একটা সিংহ। এই শীতে সিংহরাও রোদ পোহায়?

তাহলে সিংহীটা নেই কেন?

নিশ্চয়ই মরে গেছে। সিংহটা এখন একা, নিঃসঙ্গ। সেদিন খবরের কাগজে বেরিয়েছিল, একটা সিংহের সঙ্গে কোথায় যেন একটা বাঘিনীর মিলন ঘটেছে। প্রকৃতির রাজ্যে এ রকম অসম মিলন হয় না। চিড়িয়াখানায় হয়। শীতের বিকেল গাঢ় হয়ে এলে, চিড়িয়াখানার লেকের ধারে, দু' একজন তরুণ যুবক বান্ধবীদের সঙ্গে গল্প-গুজব করে খবরের কাগজ বিছিয়ে। দিনের সংবাদ তাদের পায়ের তলায় পিষ্ট হতে হতে নতুন খবর তৈরী হয়।

চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই তার খোঁজ রাখেন না।

নানা বয়সী মানুষের গায়ে এখন নানা রকমের সোয়েটার, কোট, আলোয়ান, শাল, কমফোর্টার। অধিকাংশই উজ্জ্বল রঙের। লাল, নীল, আকাশী, ভায়োলেট, ব্রাউন, কমলা, গোলাপী। য়ুরোপের মানুষ গ্রীষ্মের শুরুতে ছাড়া এত রঙের পোষাক সাধারণত পরে না। চিড়িয়াখানার আলো-ছায়ায় নানা কণ্ঠের সঙ্গে নানা বর্ণের এই আনাগোনা যেন রহস্যময় পরিবেশ তৈরী করে।

হে শীত! হে শীতের সূর্য! চিড়িয়াখানায় তুমি আরো দীর্ঘস্থায়ী হও।

কলকাতায় অন্তর্বাস্তিমুক্ত জায়গা আর বিশেষ নেই। গড়ের মাঠের খারো আনাই চলে গেছে খেলোয়াড়, ক্রীড়া-রসিক আর প্রেমিক-প্রেমিকাদের দখলে। কিন্তু এখানে নির্জনতা আছে, ফিসফিস করে কথা বলা যায়। স্বজনে এসেও কেউ জনতা তৈরী করেন না।

সব মিলিয়ে, সবাই এখানে স্বচ্ছন্দ। মাথার ওপরে ওড়ে, ইংরেজী 'ভি' অক্ষরের মতো, বালিহাঁসের ঝাঁক। ভোর চারটে নাগাদ ওরা আলিপুরের চিড়িয়াখানায় আসে। আবার, সন্ধ্যেবেলা, আকাশের রঙ বদল হলে নোনা অঞ্চলে ফিরে যায়।

কিন্তু জ্যোৎস্না রাতে যায় না।

সেই রকম একেকটি রাতে চিড়িয়াখানার খালবিল আশ্চর্য অলৌকিকতায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। হাঁসের ডাক, ডানার ঝটপট শব্দ, ওপরের জ্যোৎস্না এবং প্রকৃতির নির্জনতায় প্রায় দশ সহস্র পাখির উপস্থিতি কি চিড়িয়াখানার কোনো দর্শক কোনোদিন দেখতে পাবে?

সে বড় আশ্চর্য সময়! সে বড় আশ্চর্য রাত!

এক জনমের নয়

গোষ্ঠ শেঠ

—আমি যাচ্ছি সুধা, স্কুলের সময় হয়ে এসেছে—বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডেকে বললাম সুধাকে।

—দাঁড়াও. আমি হাত ধুয়ে এখনই আসছি—ঘরের ভেতর থেকে সুধা একটু অপেক্ষা করতে বলল আমাকে।

বারান্দায় এসে আমার হাতে পান দিয়ে মাথায় আঁচল টেনে প্রণাম করে সুধা বলল, ফিরতে দেরি করো না কিন্তু। আজকে তোমার জন্মদিন।

—তোমার দিনক্ষণ খুব মনে থাকে ত? হেসে বললাম [illegible]।

—তোমার জন্মদিনের কথা আমার মনে থাকবে না ত, কি মনে থাকবে [illegible]? মা বেঁচে থাকলে সকাল থেকেই ঘটা পড়ে যেত তোমার জন্মদিনের।

সুধার মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিলাম। কি অপরূপ মানিয়েছে তাকে ডুরে শাড়ীতে। মঙ্গলবারের হাট থেকে একখানা শাড়ী কিনে এনেছিলাম তার জন্যে। স্নান করে ডুরে শাড়ী পরে, পায়ে আলতা, কপালে সিঁদুরের টিপ পরে মঙ্গলময়ীর সাজে সেজেছে সে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে সুধা হেসে বলল—অমন করে কি দেখছ?

—তোমাকে।

—আমাকে কি আজ নতুন দেখলে?

—যতই দিন যাচ্ছে ততই যেন তোমাকে নুতন করে দেখছি। তোমার ভেতর নিত্য নুতন মানুষের দেখা পাই আমি।

—আহা, তুমি যেন কি? দিনে দিনে তোমার নুতন ভাবের উদয় হয়।

—সত্যি তাই। যৌবনকে আমি ধরে রাখতে চাই; বিদায় জানাতে চাই না।

—আমার বয়েস বাড়ছে না?

—বাড়ছে বইকি!

—তা হলে?

—তোমার বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, তোমাকে আমি নুতন করে পেয়েছি।

—সত্যি?

—খুব সত্যি।

যৌবনের উন্মাদনায় যখন ভাটার টান ধরে তখনই স্বামীস্ত্রীর অচ্ছেদ্য বন্ধন নুতন করে ধরা পড়ে। ভাবের আবেশ কাটিয়ে চোখে ভাসে তাদের সত্যিকারের রূপ।

—চোখও বদলে যায় বল? তাই তুমি অমন করে আমাকে নুতন সাজে সাজাতে ভালবাস, নুতন করে দেখতে পাও।

—হয়ত তাই। তোমাকে আজকাল আমার কি মনে হয় জান?

—কি গো?

—জন্ম জন্ম ধরে যেন তোমাকে পেয়েছি আমার কাছে—তুমি আমারই।

সত্যি তাই। তোমার কথা ভাবলে আমারও মনে হয় যেন কত যুগ যুগ ধরে তোমার আমার পরিচয়।

—পরিচয়ের সে সূত্র ধরেই নিত্য নতুন করে খুঁজে পাই তোমাকে। শুধু এক জন্মের নয়, কত জন্মের পরিচয় এক সাথে ভিড় করে জমে ওঠে তোমাকে ঘিরে।

●

—তুমি ঘরের বাইরে গেলে আমার নিজেকে খুব একা মনে হয়, কেন বলত? কখন তুমি ফিরবে, কখন তোমাকে দেখব, সেই আশায় বিকেল হলেই ঘরবার করতে থাকি।

—প্রাণের টানের জন্য। তুমি আমার অভাব বোধ কর বলেই আমাকে দেখতে চাও। কাছে পেলে তোমার বুক ভরে ওঠে পাওয়ার আনন্দে। নিজের কথা ভুলে তোমার সত্তা তুমি বিলিয়ে দাও আমার ভেতর। তাই তোমার ভেতর এই অভাব-বোধ।

—কত বয়েস হল আমাদের, সংসারে ছেলেমেয়ের দায় দায়িত্ব এসে গেছে, তা সত্ত্বেও আমরা কি বদলাই নি?

—না, এক-একটা বছর পার হয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে উপলব্ধি করতে শিখেছি, তোমাকে বুঝতে পারছি, জানতে পারছি নতুন করে। সে কারণে বয়স বাড়লেও আমরা বদলাই নি। আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে এগিয়ে এসেছি নিজেদের দিকে।

—প্রেমের মাধুর্য আমরা মন-প্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছি তাহলে? তাকেই কি নূতন করে পাওয়া বলছ?

—ঠিক তাই। তুমি আমার কথার অন্তরে লুকানো অর্থ বুঝতে পেরেছ।

শরতের আকাশে জলহীন মেঘ হাওয়ায় ভর করে দূরে দেশ থেকে ভেসে আসছে। শিউলির গন্ধ প্রাণে জাগিয়েছে যৌবনের উন্মাদনা। সোনালী রোদে সারা সংসার হাসছে। আমার কথায় সুধা মৃদু মৃদু হাসছিল আমার চোখে চোখ রেখে। তার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছিলাম না আমি। সে যেন আমাকে বেঁধে রেখেছে তার অধরের মৃদু হাসিতে, তার চোখের চাউনির শক্ত বাঁধনে।

বেলা বেড়ে চলেছে। স্কুলের দেরি হচ্ছে, তা জেনেও সুধার না বলা কথাকে উপেক্ষা করে তাকে ছেড়ে চলার ক্ষমতা আমার নেই। তাকে আদর জানাতে আমার হাত বাড়িয়ে দিলাম তার দিকে। তার একখানি হাতে মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম—'আসি'।

এসো, ফিরতে দেরি করো না।

* * *

খাটের মাথায় হাত লেগে ঘুম ভেঙে গেল আমার। মনে হল, এতক্ষণ জেগেই কথা বলছিলাম সুধার সঙ্গে। তার চোখ, মুখ আমার চোখে ভাসছে। এমন কি তার গলার স্বর পর্যন্ত তখনও আমার কানে বাজছে। বিছানায় বসে ভাবলাম, সুধা কে? কোনদিন তাকে দেখেছি মনে পড়ে না ত? এমন মিষ্টি মুখ, মধুর হাসি কখনও আমার নজরেও পড়ে নি। তবে কি ঘুমের ঘোরে স্বপ্নের আবেশে আমার জন্মান্তরের প্রিয়া এইমাত্র কথা বলে গেল আমার সঙ্গে, আমার বিক্ষুব্ধ মনে শান্তির প্রলেপ দিতে? ভাবতে চেষ্টা করলাম কোথায়, কোন জন্মে দেখা পেয়েছিলাম সুধার, স্মৃতির রুদ্ধ দুয়ার খুলে দেখতে চেষ্টা করলাম, কোথায় কতকাল আগে হারিয়ে এসেছি তাকে।

মফঃস্বল শহরে আমার বদলী হয়েছে কিছু দিন আগে। গড়কমলপুরে হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুল ইন্সপেকসন করতে এসেছি অজ পাড়াগাঁয়ে। পাহাড়ী নদীর ধারে, ইন্সপেকসন বাংলোতে উঠেছি দুদিনের মতন। বাংলোতে দুটো শোয়ার ঘর, একটা ড্রয়িং রুম—সামনে বারান্দা। ছিমছাম করে সাজানো ঘরগুলো। বাংলোর সামনে ফুলের বাগান। বড় বড় গাছ তার চারধারে। ছায়াঘেরা সমস্ত জায়গাটা। বাংলোটি আমার পছন্দসই। বিকেলের ট্রেন ধরে সন্ধ্যার আগে এসে উঠেছি বলে, আবছা অন্ধকারে জায়গাটা ভাল করে দেখবার সুযোগ হয়নি।

বিছানায় বসে কানে এল একটানা ঝিঁঝির ডাক, নদীর কলধ্বনি। গভীর রাত—চারদিক ছমছম্ করছে। আলো না জেলে অন্ধকারে বসে ভাবতে লাগলাম স্বপ্নে দেখা সুধার কথা। বারবার তার কথা আমার মনে পড়ল—আজ তোমার জন্মদিন, ফিরতে দেরি করো না।

সত্যিই ত, আজ তে'সরা অগ্রহায়ণ আমার জন্মদিন। কেমন করে সুধা জানল সে কথা। আমার মনেই ছিল না, আজকে আমার জন্মদিন। স্বপ্নের ভেতর দিয়ে সুধাই আমাকে জানিয়ে গেল সে কথা। ভাবতে ভাবতে কখন আবার ঘুমিয়ে পড়েছি।

* * *

স্কুল থেকে ফিরে দেখতে পেলাম সুধার মুখ ভার। ঘরে ফিরতে দেরি করেছি বলে হয়ত তার অভিমান হয়েছে আমার উপর। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে বললাম, ইচ্ছে করে দেরি করিনি। আজ স্কুলে একটা মজার ব্যাপার ঘটে গেছে।

গম্ভীর মুখে সুধা বললে, 'থাক, তোমার মজার কথা, শোনার সময় নেই আমার। হাত-মুখ ধুয়ে এস শিগ্গির! হা-পিত্যেস করে আমি বসে আছি কখন থেকে।

শান্ত ছেলের মত ঘাটে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে ফিরে আসতে, ঠাঁই করে গালিচার আসনে বসতে বলল সে আমাকে। প্রদীপ জেলে আরতি করে, থালা ভরে নানা রকমের খাবার দিল খেতে। মুখ গুঁজে এক-এক করে সব খেয়ে ফেললাম। সুধার মুখে তৃপ্তির হাসি। ঘরের ভিতর গিয়ে সে আর এক প্রস্থ পিঠে পুলি এনে ধরল আমার সামনে।

বাধা দিয়ে বললাম--আর খেতে পারব না। তুমি উপোস করে আছ সারাদিন! কিছু মুখে দাও।

—সে হবে এখন, আমার কাজ এখনও বাকী।

ঘরের ভিতর উঠে গিয়ে আলমারি খুলে একখানা মুগার নতুন চাদর এনে আমার গায়ে জড়িয়ে বলল—ফেরিওয়ালার কাছ থেকে কিনেছি আজকে, তোমার জন্মদিনে উপহার দেব বলে। তোমার পছন্দ হয়েছে?

—খুব সুন্দর, শীতের সময় গায়ে দিয়ে স্কুলে যাব রোজ।

গায়ে দিও লক্ষ্মীটি। পোশাক আসাকে তোমার আজকাল মোটেই খেয়াল নেই। এক জামা-কাপড়ে চার পাঁচ দিন কাটিয়ে দাও।

—কি হবে আমার সাজগোজ করে? যার জন্য সাজ করব সে ত আমারই চিন্তায় বিভোর।

—বারে! বাইরের লোকের কাছে বুঝি তোমার কোন মর্যাদা নেই। তোমার সাধারণ পোশাক দেখে তারা কি ভাবে বলত?

—ভাবলই বা, কি যায়-আসে তাতে। নিজের ভেতর নিজেই বন্দ হয়ে আছি। ঠাকুরের মুখে গান শোননি—'আপনাতে আপনি থেকো মন, যেও না কো মন পরের ঘরে।'

—তুমি আজকাল ভারী দুষ্টু হয়েছ। যতই তোমার সাহিত্য চর্চা বাড়ছে, ততই তুমি উদাসীন হয়ে যাচ্ছ। শেষটায় একদিন না আমাকেই ভুলে বস।

সুধার কথা শুনে হেসে বললাম—শক্তিকে বাদ দিয়ে কি শিবের অস্তিত্ব থাকতে পারে? তুমি আমার শক্তির উৎস। তোমার জোরেই আমি সাহিত্য চর্চা করি।

—রাখ, তোমার ওসব মনরাখা কথা। তুমি আজকাল এত বেশী ভাবুক হচ্ছ যে আমার ভয় করে মাঝে মাঝে। হয়ত তুমি সব ছেড়ে দেবে একদিন।

—কি দেখে তুমি তা বুঝলে?

—তোমার চালচলন দেখে বেশ বোঝা যায়, সংসারে টান তোমার কমে এসেছে। নিজের শক্তির উপর আস্থা তোমার অটুট।

—অনাসক্ত থেকে কর্তব্য করে যাওয়াকে আমি সংসারধর্ম ভাবি বলে হয়ত, তোমার তা মনে হয়। আমার সব কিছুর উপরে তুমি।

—তা বুঝি। তা জেনেই ত আমার যত ভাবনা। তুমি কখন কি করে বস। তোমার মত সরল মানুষকে ভুল বোঝা সহজ।

—তা বুঝুক, সংসারের উপর আমার যতটা টান আছে, তার অর্ধেকও নেই চাকরীর উপর। মানুষকে মানবিকতার শিক্ষা কি দিতে পেরেছি বল? সে ভেবেই কলম ধরেছি মানুষের কথা সবার কাছে বলতে।

—সাহিত্যের সেবা সহজ নয়। অনাদর, বক্রোক্তি, বিরুদ্ধ-সমালোচনা লেখকের ভাগ্যে লেখাজোখা। তাকে এড়িয়ে যাবার জন্যে বরাতের জোর দরকার।

শুক্লা একাদশীর চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে বাগানের গাছপালায়। চাঁদের দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে সুধা বলল—চল একটু ঘুরে আসি বাগানে। সারাদিন খুব খালি খালি লেগেছে তোমাকে কাছে না পেয়ে।

সুধাকে সঙ্গে করে পায়চারি করতে লাগলাম বাগানে। কোন গাছে কেমন ফল হয়, কখন ফুল ফোটে সে ঘুরে ঘুরে বলছিল আমাকে। বাগানের গাছপালা সব যেন তার চেনাজানা—একান্ত পরিচিতের মত। বাড়ীর লোকেরা কে কবে কোন চারা পুঁতেছিল তাও তার কণ্ঠস্থ। সুধার গৃহিণীপনার খুঁটিনাটি খবর রাখিনি কোন দিন। তাই আশ্চর্য হচ্ছিলাম তার পরিচয় পেয়ে।

একটা দোলন চাঁপার গাছে থোকায় থোকায় ফুল ফুটে থাকতে দেখে, তাকিয়ে ছিলাম গাছের দিকে। ফুলের গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে সুধাকে কাছে টানতে গিয়ে দেখলাম সে নেই সেখানে। চোখের পলকে কোথায় উধাও হয়ে গেল সে? ভাবলাম কাকজোছনায় লুকোচুরি খেলছে সে আমার সঙ্গে। গাছতলায় ঘুরে ঘুরে দেখলাম সুধা নেই। বাগানে কোথাও দেখলাম না তাকে। জলজ্যান্ত মানুষটা কোথায় উবে গেল ভেবে ডাকলাম—সুধা, সুধা।

দীঘির জলে প্রতিধ্বনিত হয়ে আমার ডাক ভেসে গেল মাঠের বুকে। আমার পা টলে উঠল, পায়ের নীচের মাটি কেঁপে উঠল, ঘর দালান নড়তে লাগল, গাছপালা উপড়ে পড়ল, ভয় পেয়ে চীৎকার করে ডাকলাম—সুধা, ভূকম্পন হচ্ছে, কোথায় তুমি?

সুধার জবাব পেলাম না। চোখের সামনে ঘরবাড়ী, ঠাকুরমন্দির, বাগান-বাগিচা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। কাউকে খুঁজে পেলাম না। ভগ্নস্তূপের উপর বসে কাঁদতে গিয়েও কাঁদতে পারলাম না। আমার গলা থেকে স্বর ফুটে বেরুল না। সুধার শেষ কথা মনে হল—সাহিত্যিকের জীবন বেদনায় ভরা অনাদর, অবহেলা তার সঙ্গের সাথী।

খোলা জানালা দিয়ে এক ঝলক রোদ চোখে পড়তে ধড়ফড় করে উঠে বসলাম। বিষাদে ভরে গেল আমার মন। স্বপ্নের কথা মনে করে এক ঠাঁই চুপ করে বসে রইলাম। বুঝতে পারলাম, কোথায় কি ভাবে সুধাকে হারিয়ে এসেছি আমি।

স্নান করে, খাওয়া দাওয়া সেরে স্কুল ইন্সপেকসনে যাওয়ার জন্য তৈরী হলাম। স্কুলের সেক্রেটারী আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে যেতে এলেন ইন্সপেকসন বাংলোতে। বাংলো থেকে স্কুলের দূরত্ব দশ মিনিটের পথ। নদীর পাড় ধরে স্কুলে যাওয়ার রাস্তা। তার সঙ্গে হেঁটে যেতে যেতে রাস্তার ধারে চোখে পড়ল মজাদীঘি ভর্তি লাল পদ্মফুল, পোড়ো বাগান, প্রাচীন ইমারতের ভগ্নাবশেষ।

দীঘির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় রাতের দেখা স্বপ্ন আমার মনে উঁকি দিয়ে গেল। জোর করে মন থেকে স্বপ্নে দেখা ঘটনাকে দূরে সরিয়ে এগিয়ে চললাম স্কুলের দিকে। স্কুলের গেটে ঢুকতে গিয়ে আমার মনে হল এ জায়গা যেন আমার কত চেনা জানা। বিস্তৃত ময়দানের বুকে স্কুলের বাড়ী, ছাত্রদের হোস্টেল, খেলার মাঠ, সুইমিং পুল, সবকিছু নতুন করে গড়া।

অফিস ঘরে বসে সেক্রেটারীর সঙ্গে স্কুলের প্রতিষ্ঠার কথা হচ্ছিল। কথায় কথায় তিনি জানালেন সত্তর বছর আগে গড়কমলপুর গ্রামের দানশীল জমিদার কৃষ্ণমোহন চৌধুরী এ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। অঞ্চলের সর্বপ্রথম স্কুল এটি। তাঁর ছেলে সাহিত্যিক পরিমল চৌধুরীর প্রাণপাত চেষ্টার ফলে স্কুলের সুনাম হয়েছিল এককালে। কত ছাত্র বৃত্তি পেয়েছে এ স্কুল থেকে পরিমলবাবু ছিলেন স্কুলের হেডমাস্টার।

ঊনিশ শ' চৌত্রিশের ভূমিকম্পে এ-গ্রামের বেশীর ভাগ বাড়ী ভেঙেচুরে যায়। স্কুলবাড়ীরও অস্তিত্ব লোপ পায়। চৌধুরীবাবুদের দালান ভেঙ্গে পড়ে, পরিমলবাবু সপরিবারে মারা যান। তারপর স্কুলের দুর্দিন নেমে আসে। ঢিমে তালে চলতে চলতে স্কুল বন্ধের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। আশপাশের গাঁয়ের লোকের দাক্ষিণ্যে, সরকারী সাহায্যে এর বাড়-বাড়ন্ত। নতুন করে মাল্টিপারপাস স্কুল গড়ে উঠেছে—'কৃষ্ণমোহন বাণী বিতান'।

চৌধুরীবাড়ীর ইতিবৃত্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানলাম সেক্রেটারীবাবুর কাছ থেকে। পরিমলবাবু আর তাঁর স্ত্রী সুধার নামে স্কুলের একটা নতুন ব্লক তৈরী হয়েছে তিনি জানালেন আমাকে। অফিসের নথিপত্র দেখে, স্কুলের ব্লকগুলি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। তিনতলার দক্ষিণ দিকের ব্লকে মার্বেল পাথরের একটি ফলকের উপর আমার দৃষ্টি আটকে গেল—'সাহিত্যিক পরিমল চৌধুরী, তাঁর সহধর্মিণী সুধারানী চৌধুরীর স্মৃতি-রক্ষার্থে'।

মার্বেল ফলকে আমার চোখ আটকে রইল। রাতের দেখা সুধা জীবন্ত হয়ে যেন আমাকে বলতে চাইল—'এই ত আমি, কোথায় তুমি খুঁজেছিলে আমাকে?'

বুক গুমরে উঠল। আগামীকাল ক্লাস পরিদর্শন করার আশ্বাস দিয়ে নেমে এলাম অফিস রুমে। হেডমাষ্টারকে জিজ্ঞেস করলাম—পরিমলবাবুর লেখা কোন বই লাইব্রেরীতে আছে কিনা? বেছে বেছে দু খানি বই তিনি দিলেন আমাকে। নতুন সংস্করণ—শিক্ষার পদ্ধতি সম্বন্ধে লেখা। বই দু' খানি হাতে নিয়ে ফিরে এলাম বাংলোতে। ফেরার পথে পোড়ো ভিটে, মজা দীঘি দেখিয়ে সেক্রেটারী বাবু জানালেন—এখানেই ছিল পরিমলবাবুদের ভদ্রাসন।

জিজ্ঞেস করলাম—তাদের বংশের কেউ বুঝি থাকে না এখানে?

—তারা কেউ বেঁচে নেই। দূর সম্পর্কের এক ভাগনে থাকেন কলকাতায়। দেশে তিনি আসেন না বড় একটা। জমি-জমা সব বিক্রী করে দিয়েছেন। পোড়ো ভিটে, মজা দীঘি চৌধুরী বংশের ঐতিহ্য বুকে ধরে আজও দাঁড়িয়ে আছে।

দীঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম পদ্মের শোভা, শুনছিলাম ভ্রমরের গুঞ্জন। আমাকে এক দৃষ্টিতে ফুলের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে সেক্রেটারীবাবু মালিকে বললেন—সাহেবের জন্য কিছু ফুল তুলে বাংলোতে নিয়ে এস।

আনমনা হয়ে পথ চলতে চলতে ভাবতে লাগলাম সুধার কথা। বাংলোতে ফিরে অশান্তি অনুভব করতে লাগলাম। বসার ঘরে ফুলদানিতে সাজানো পদ্মগুলি যেন আমার দিকে চেয়ে হাসছে। বিকেলে চা খাওয়ার পর সেক্রেটারী বিদায় নিলে, বাংলোর চৌকিদারকে সঙ্গে নিয়ে বেড়ানোর নাম করে নদীর পাড় ধরে চলতে লাগলাম চৌধুরী বাড়ীর পোড়ো ভিটে লক্ষ্য করে।

সন্ধ্যার তখনও বাকী। চৌধুরীদের বাগানে ঘুরে দেখবার ইচ্ছে প্রকাশ করলে চৌকিদার বাধা দিয়ে বলল—ওখানে সাপ খোপের বাসা হুজুর। দিনেও লোকে ঢোকে না ও বাগানে। সাহস দিয়ে তাকে বললাম—তোমার হাতে বাঁশের লাঠি আছে, ভয় কি? জঙ্গলে লাঠির ঘা মেরে সাপ তাড়িয়ে আমরা ঢুকি চল।

জংলা আগাছায় ভরা সারাটা বাগান। বড় বড় গাছগুলোর ডালপালা ছাঁটা শ্রীহীন। দীঘির ভাঙ্গা ঘাটে বসে চোখে পড়ল একটি প্রাচীন দোলন চাঁপার গাছ। পা-পা করে এগোতে লাগলাম গাছটার দিকে। তার গোড়ায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম উঁচু ডালে দুটো চাঁপাফুল ফুটে আছে। চৌকিদারকে বললাম—ডাল সমেত ফুল দুটো পেড়ে আনতে পারবে?

—কেন পারব না হুজুর! গাছে চড়ে ফুল এনে আমার হাতে দিল সে। মনে পড়ল এই ফুলেরই ঘ্রাণ আমি পেয়েছিলাম গত রাতে। মনে হল, সুধা হারিয়ে গেছে এই দোলন চাঁপার তলা থেকে। আঁধার নেমে আসছিল। রাতে জঙ্গলের ভেতর থাকা নিরাপদ নয় জানিয়ে চৌকিদার বার বার আমাকে হুঁসিয়ার করে দিল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে ফিরে আসতে হল চৌধুরী বাড়ীর পোড়ো ভিটে ছেড়ে।

পরিমল বাবুর বই দু খানা রাত জেগে পড়লাম। আমারই মনের কথা যেন লিখে গেছেন তিনি। শেষ রাতে তন্দ্রায় চোখ জুড়ে আসতে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম—সঙ্গে সঙ্গে ঘুম নেমে এল আমার দু' চোখ জুড়ে।

* * *

ডুরে শাড়ি পরা সুধা হাসতে হাসতে বলল—কেমন মজা করেছিলাম বলত কাল রাতে? আমি তোমার পেছনেই ছিলাম। তুমি দেখতে পাওনি আমাকে। তোমার স্কুলের মজার ব্যাপারের চেয়ে ভাল মজা হয়নি? মনে পড়ল, সত্যি ত সামনে খুঁজেছিলাম সুধাকে, পেছন ফিরে তাকাইনি একবারও।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সুধা বলল—কি ভাবছ এত?

—ভাবছি, গতকাল যে দেখলাম ভূকম্পন, ঘর দালান ভেঙ্গে পড়ছে, সে সব কি মিথ্যা?

—ও তোমার মনের ভ্রম। তুমি দেশের ভাঙ্গা গড়ার কথা, নতুন শিক্ষা পদ্ধতির কথা অনবরত ভাব কিনা, তাই বুঝি ও রকম দেখছ। এই দেখ আমাদের দালান, বাগান বাগিচা সব ঠিক আছে।

চেয়ে দেখলাম, সুধার কথাই ঠিক, সব আগের মতই আছে। তাকে বললাম, ঘুরে ঘুরে ক্লান্তি লাগছে, দীঘির ঘাটে বসি চল। আমি এগিয়ে চললাম—সুধা আমার পিছু পিছু আসতে লাগল। আমাকে ঘুরে ক্লান্তি লাগছে, দীঘির ঘাটে বসি এখানে, তোমার জন্য এক গ্লাস দুধ গরম করে আনি।

—তাড়াতাড়ি এস। তোমাকে না দেখে কি অস্বস্তি লাগছিল আমার, ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করছে না আর।

—না গো না, দেরি করব না মোটেও। ঘুম দেরি করে ফেরার জন্য আমার যে কষ্ট হচ্ছিল, সে কথা বুঝিয়ে দেবার জন্য তোমার সঙ্গে মজা করছিলাম আমি।

সুধা তার কথা রেখেছিল—এক গ্লাস গরম দুধ হাতে নিয়ে ফিরে এসে আমার পাশে বসে গলা জড়িয়ে আদর করে বলল—সবটুকু খেয়ে ফেলতে হবে।

—তা হবে না, ফিরে ফিরে চুমুক দিয়ে দুজনে ও গ্লাসের দুধ খাব।

—বেশ, তাই হবে, তবে তুমি প্রথমে চুমুক দিয়ে প্রসাদ করে দাও, আমি পরে খাব।

জোছনা ঢলে পড়ছিল, পশ্চিম আকাশের গায়। রাত বেড়ে চলছে জানিয়ে সুধা বলল—টুটু, গোপাকে খেতে দিয়ে আসি। বসে বসে গল্প করব তোমার সঙ্গে।

—বেশ তাই যাও, শীঘ্র এস, দেরি করো না।

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সে আর বলতে।

সুধা যাওয়ার সময় আমাকে আদর করে গেল দু' হাতে গলা জড়িয়ে ধরে। তার পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে তাকেও আদর জানালাম আমি। সুধা চলে গেল।

ঘাটে বসে বসে ফুরফুরে হাওয়ায় কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভেঙ্গে দেখি ভোর হয়ে এসেছে। পূবে আকাশে অরুণোদয়ের লালিমা, গাছে গাছে পাখীর কাকলী। চোখ মুছে ভাবলাম সারা রাত এক ঘাটেই ঘুমিয়েছিলাম আমি? সুধা ফিরে আসে নি আমার কাছে?

• • •

জেগে দেখি বাংলোর ঘরে খাটে শুয়ে আছি। তাড়াতাড়ি উঠে হাত মুখ ধুয়ে একাই বেরিয়ে পড়লাম চৌধুরীবাবুদের ভিটে লক্ষ্য করে। সুধা আমাকে টানছে সেখানে। বনবাদাড় ভেঙ্গে ঘাটে এসে বসলাম যেখানটিতে বসে সুধা আমাকে আদর জানিয়েছিল কাল রাতে। সুধার কথা ভাবতে ভাবতে আমার বুক ভরে এল অজানা বেদনায়। ভাবলাম, ভালবাসার কি শেষ নেই। জন্ম হতে জন্মান্তরে সে পিছু পিছু ফেরে?

চৌধুরীবাড়ী কি আমারই গতজন্মের খেলাঘর? সুধা কি আমারই পেছনে বন্ধনে বাঁধা প্রিয়তমা? ভাঙ্গা ঘাটে বসে ভাবতে লাগলাম একা একা। প্রত্যূষে সেক্রেটারি বাবুর নদীতীরে বেড়ানোর অভ্যেস। আমাকে দেখতে পেয়ে হন্ত-দন্ত হয়ে ছুটে এসে বললেন—এখানে একা একা বসে কেন স্যার?

ইচ্ছে করল মুখ ফুটে বলি—পরিমল চৌধুরী, প্রসন্ন রায়চৌধুরীর নূতন পরিচয়ে খুঁজতে বেরিয়েছে তার জন্মান্তরের প্রিয়াকে দেখতে এসেছে তার আবাল্যের খেলাঘর জন্মভিটেকে।

মনের কথা চেপে গিয়ে বললাম—ভাবছিলাম, চৌধুরীবাবুরা স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। স্কুলের উন্নতিকল্পে পরিমলবাবুর অবদান যথেষ্ট। তাদের পোড়ো ভিটে সরকারের পক্ষ থেকে রিকুইজিসন করে সুধাদেবীর নামে একটি মেয়েদের স্কুল গড়ে তুললে তাদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এ অঞ্চলের মেয়েদের লেখাপড়ার সুবিধে নেই। সে কথা জানিয়ে আমি সরকারের তরফ থেকে সকল প্রকার সাহায্যের ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করব।

মনের আনন্দে সেক্রেটারিবাবু আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেদিনই ম্যানেজিং কমিটির জরুরী মিটিং ডাকার ব্যবস্থা করলেন। রিজোলিউশনের কপি আমার সঙ্গে দিলেন। বিকেলের ট্রেনে উঠাতে স্টেশনে ছাত্র, শিক্ষক, বৃদ্ধ লোকেরা এলেন, স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের জন্য আমার প্রচেষ্টাকে শতমুখে অভিনন্দিত করলেন তাঁরা। মনে মনে বললাম, সুধার স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্যই আমার এ প্রচেষ্টা। তাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াবে আজ থেকে।

ট্রেন ছেড়ে দিল—হু হু করে বাতাস বয়ে গেল, ট্রেনের গায়ে ধাক্কা খেয়ে। তার ভেতর আমি শুনতে পেলাম সুধার ডাক—ফিরতে দেরী কোরো না কিন্তু।

সদরে ফিরে প্রথমেই সুধারাণী গার্লস স্কুলের জন্য উঠে-পড়ে লাগলাম। ল্যান্ড একুইজিশন করিয়ে, বিল্ডিং গ্র্যান্ট স্যাংশন করে তিন মাসের ভেতর সকল ব্যবস্থা সেরে ফিরে এলাম গড়কমলপুরে। বনজঙ্গল সাফ করে, প্ল্যান তৈরী করে বিল্ডিংয়ের কাজ সুরু হয়ে গেল। আমার স্বপ্নে দেখা গাছপালা, ঘাট, দীঘি সব নূতন করে তৈরী হল। বছর না ঘুরতে সুধারানী গার্লস স্কুলের উদ্বোধনী সভায় সভাপতিত্ব করার ডাক পড়ল আমার।

বক্তৃতা দিতে উঠে বারবার আমার কণ্ঠ রোধ হয়ে এল। শুধু একটা কথাই বললাম—যে মহিয়সী নারীর প্রেরণা পরিমলবাবুর শক্তির উৎস ছিল এককালে, তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আমার দেশের মা-বোনেরা একদিন তাদের স্বামী-সন্তানকে অনুপ্রাণিত করবে দেশের সেবায়, এই আমার কামনা।

আমার অক্লান্ত চেষ্টায় স্কুলের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে জানিয়ে গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আমার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। উত্তরে তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, পরিমলবাবু ও তাঁর স্ত্রীর অবদান স্মরণ করেই তাদের প্রতি দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা জানাতে আমি সাহায্য করেছি সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে। সাহিত্যিকের যোগ্য মর্যাদা দিতে এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হল—যেখানে দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক, জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধাররা গড়ে উঠবে কালে কালে।

দু' মাসের ভেতর আমার বদলীর আদেশ এল। গড়কমলপুর স্কুলের সঙ্গে সম্পর্ক কাটিয়ে যেতে হবে ভেবে ব্যথা অনুভব করলাম। সুধাকে দেওয়া কথা হয়ত আর রাখতে পারব না। আমার বদলীর সংবাদ শুনে হেডমাস্টার, সেক্রেটারী সবাই শহরে ছুটে এলেন। মেয়েদের আয়োজিত বিদায় সম্বর্ধনায় যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানালেন আমাকে।

শেষবারের মত গড়কমলপুরে এলাম সুধার কাছ থেকে বিদায় নিতে। ছাত্র, শিক্ষক, গ্রামবাসীদের অকুণ্ঠ প্রশংসা ছাপিয়ে আমার কানে ভাসতে লাগল সুধার কথা—আমার ভয় হয়, একদিন হয়ত তুমি আমাকেও ভুলে যাবে।

মানপত্রের উত্তর দিতে উঠে বললাম—স্বর্গত পরিমল চৌধুরী ও সুধা দেবীর মহান উদ্দেশ্য যেন দেশবাসী চিরদিন মনে রাখেন, তাতেই আমার কাজের স্বীকৃতি দেওয়া হবে।

সুধারানী গার্লস স্কুলের নূতন বিল্ডিং বাগান বাগিচা সংস্কার করা দীঘি, দীঘির ঘাট, সব ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। আমার স্বপ্নে দেখা দালান বাড়ী, বাগান, বাগিচা দীঘির ঘাটের সঙ্গে তাদের অদ্ভুত মিল খুঁজে পেলাম। আমার মনের ভাব বুঝে সেক্রেটারী বললেন, 'চৌধুরীবাবুদের গড়ের অনুকরণে আমরা তৈরী করেছি সবকিছু।'

সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাদের শুভেচ্ছা নিয়ে বিদায় নিলাম। সঙ্গে নিয়ে এলাম পরিমলবাবুর লেখা বই দুখানি। কথা দিয়ে এলাম নূতন সংস্করণ বর্তমানকালের উপযোগী করে লিখে পাঠাব। বই-দুখানির স্বত্ব সংরক্ষিত থাকবে স্কুলের—লেখকের নাম থাকবে 'পরিমল চৌধুরীর পরিবর্ধক হিসেবে থাকবে আমার নাম।

মাঠ, ঘাট, পথ, প্রান্তর পার হয়ে ছুটে চলল শহরের পানে। আমার চো ভাসতে লাগল স্বপ্নে দেখা সুধার হ হাসি মুখ, তার কথা—ফিরতে দেরী ক না। তাকে বলে এলাম—তোমাকে ছে চলার ক্ষমতা আমার নেই। তুমি আমা শক্তির উৎস। যেখানেই থাকি না কেন, তোমার শত স্মৃতি দিয়ে ঘেরা গড়কমলপুরে আমি ফিরে আসবোই।

বাতাসের শন্ শন্ শব্দ, ইঞ্জিনের গর্জন—দুয়ে মিলে আমার মনে হল, সুধা যেন আমাকে বলতে চাইছে—কথা দাও, ফিরে আসবে তুমি?

বুঝলাম, সুধা আমাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাতে চাইছে। তাকে বললাম, কথা দিলাম, নিশ্চয় ফিরে আসবো তোমার কাছে।

*পরিমল চৌধুরী আর প্রসন্ন রায়চৌধুরী যে একই আমার ভিন্ন প্রকাশ।

অঙ্গনা

সৌন্দর্য সাধনা

আর সবকিছুর মতো সৌন্দর্যও সাধনার বস্তু। পরীক্ষায় পাশের জন্য যেমন পড়তে হয়, তেমনি সুন্দর হবার জন্যও ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা প্রয়োজন। আমরা সবাই যে জন্মসূত্রেই সুন্দর এমন নয়। কেউ কেউ রূপের ডালি হয়ে জন্মগ্রহণ করেন, কেউ কেউ চলনসই আর বাদবাকি সব সাদামাটা। যে রকমই হোক না কেন সকলেরই প্রয়োজন দেহচর্চা অর্থাৎ সৌন্দর্যের সাধনা—যার গোড়ার কথা হলো ত্বক পরিচর্যা।

শিশুর ত্বক নয়নলোভন। সুন্দর টানটান নিটোল। কিন্তু বয়স বাড়লে সেই ত্বক হয়ে যায় শিথিল। তখন তা আমাদের আকর্ষণ করা তো দূরের কথা বরং বিকর্ষণ করে। ত্বকের উপর দেহ-সৌন্দর্য অনেকখানি নির্ভর করে। সেকথা মনে রেখে ত্বকের পরিচর্যায় আমাদের একান্ত
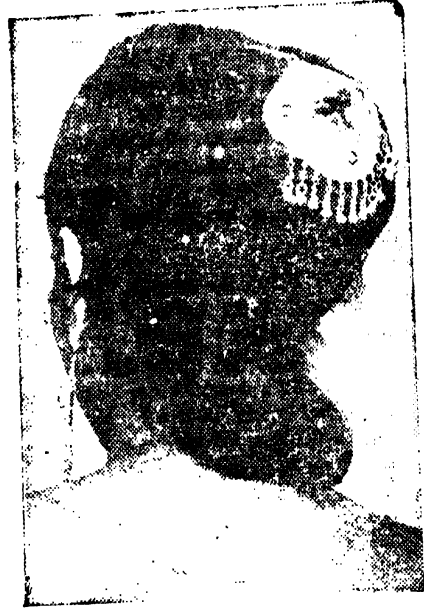
মনোযোগী হওয়া দরকার। ত্বকের স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য রক্ষায় রক্তের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রক্তের শুদ্ধতায় ত্বকের পরিপোষণ হয়। উপযুক্ত মাত্রায় এবং বিশুদ্ধ রক্ত সঞ্চালনে দেহবর্ণ উজ্জ্বল হয়। এজন্য ব্যায়াম করা দরকার। একথায় অনেক মেয়ে ঘাবড়ে যায়। তাঁরা এই ভেবে শংকিত হন যে, ব্যায়াম করলে তাঁদের শরীর পুরুষালি পেশীমণ্ডিত হবে এবং রমণীসুলভ কমনীয়তা হারিয়ে যাবে। কিন্তু এই আশংকা একেবারেই অমূলক। ব্যায়ামে পুরুষের মতো মেয়েদের পেশী পরিস্ফুট হবে না।

বরং একটি বিরাট উপকার হবে এবং তা হলো ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা বজায় থাকবে। এই গুণ হারালে ত্বকে ভাঁজ পড়ে আর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। খুব একটা ভারি ব্যায়াম এজন্য দরকার হয় না। নিয়-

মিত যোগাসন করলেই ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখা সম্ভব। আর রক্ত সঞ্চালন তো বটেই। ব্যায়ামের সঙ্গে সঙ্গে নির্মল বায়ুসেবনও প্রয়োজন।

নিরোগ ত্বক ভাগ্যের ব্যাপার। সুন্দরী রমণীও ত্বকের কমনীয়তা হারাতে পারেন যদি না গোড়া থেকে এ সম্বন্ধে সতর্ক হন। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, ত্বক সংক্রান্ত নানা জটিলতার উদ্ভব হয় কৈশোরাবস্থা থেকে। আমাদের ত্বকের নিচে অনেক ছোট ছোট গ্রন্থি আছে। এসব গ্রন্থি থেকে তেল উৎপন্ন হয়। ত্বকের স্বাভাবিকতা বজায় রাখার জন্য। কোন কারণবশতঃ এই গ্রন্থিগুলি অনেক সময় বিগড়ে যায়। এ থেকে এতো বেশি পরিমাণে তেল উৎপন্ন হয় যে ত্বকের পক্ষে তা খুবই প্রয়োজনাতিরিক্ত। এর ফলে ত্বকের তেল নির্গমনের পথও বন্ধ হয়ে যায়। তখন স্বাভাবিকভাবেই ত্বকের উপর তার নানারকম প্রভাব পড়ে। ব্রণ আর ফুস্কুড়ির উৎপাত শুরু হয়। চেহারাও খারাপ হয়ে যায়। এ সম্বন্ধে ডাক্তারদের অভিমত হলো যে, ব্রণ এবং ফুস্কুড়ির আক্রমণ নেহাতই সাময়িক এবং তা আপনা থেকেই সেরে যায়। কিন্তু ডাক্তারের কথা শুনে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা ঠিক হবে না। ত্বক সংক্রান্ত কোনকিছু উপেক্ষা করা উচিত নয় এবং যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করা চলবে না।

ত্বকের রোগে খাওয়া-দাওয়ার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া বাঞ্ছনীয়। এসময় খাওয়া-দাওয়া যথাসম্ভব সাদাসিধে হবে। খাদ্যবস্তুতে চিনি এবং কার্বোহাইড্রেট-এর মাত্রা যেন কম হয়। শাকসব্জি এবং ফলমূলের উপর মূলতঃ নির্ভর করতে হবে। যদি খুব তেল চকচকে ত্বকে ব্রণ-ফুস্কুড়ি হয় তবে একটি ঘরোয়া চিকিৎসাও চলতে পারে। প্রথমে সাবান দিয়ে ভাল করে মুখ ধুয়ে নিতে হবে। তারপর এক বাটি গরম জলে পরিষ্কার নেকড়ায় সামান্য চা বেঁধে ছেড়ে দিতে হবে। কিছুক্ষণ পরে সেই জলে মুখ ধুয়ে ফেললে তেল চকচকে ভাবও কমবে আর ব্রণ-ফুস্কুড়িও সারবে। তবে ম্যাজিকের মতো একদিনেই এতে ফল পাওয়া যাবে এমন নয়—কয়েক দিন লাগবে।

আমাদের মানসিক অবস্থার সঙ্গে ত্বকের সম্পর্ক খুব নিবিড়। মনের অবস্থা যদি ভাল না থাকে সঙ্গে সঙ্গে দেহবর্ণে তার প্রভাব পড়বে। এমনও দেখা যায় যে, কেউ কেউ মনের কষ্ট মনেই চেপে রাখেন। কাউকে কোনকিছু বুঝতে দেন না। এমনি লোক দেখানো হাসিখুশি থাকেন। কিন্তু দেহবর্ণে তার প্রতিফলন ঘটে। ত্বকের কাছে কোন কিছু লুকানো যায় না। এ যেন মনের দর্পণ। মানসিক অবস্থার ছায়াপাত এখানে ঘটবেই। ত্বক অত্যন্ত সংবেদনশীল। স্নায়ুর উপর যে চাপ পড়ে তা ত্বকে ফুটে ওঠে। রং ফিকে হয়। ইতিমধ্যে যদি কোন আনন্দ সংবাদ আসে আর মনে উল্লাসের জোয়ার খেলে যায় তবে ত্বকে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ত্বকে যেন ঝিলিক খেলে।

ত্বক সুস্থ রাখতে হলে মনকে স্বাভাবিক রাখতে হবে। সব সময় হাসিখুশি। তাই সারাদিনের কার্যক্রমকে এমনভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে নিতে হবে যে, কোন কিছুতেই মন যেন বিগড়ে না বসে। সারা দিন শান্ত থাকা যায়। প্রচুর জলে স্নান এজন্য খুব দরকার এবং অনেকক্ষণ ধরে। চান করতে করতে গুনগুন করে দু-এক কলি গান ভাঁজলে মন আরো প্রসন্ন থাকে। চান করতে গিয়ে গান গাওয়া নিয়ে আমরা ঠাট্টা করি। মস্করা করে বলি, বাথরুম সঙ। কিন্তু স্বাস্থ্যের সঙ্গে এর যোগাযোগ খুবই নিবিড়। আর সেই সঙ্গে যে ব্যায়ামের কথা প্রথমেই বলেছি সেদিকেও নজর দিতে হবে। যোগাসনে মন প্রশস্ত থাকে।

অপুষ্টি ত্বকের আর একটি মারাত্মক ব্যাধি। আমাদের অনেকেই ত্বকের উপযোগী খাদ্যবস্তু সম্বন্ধে মাথা ঘামাই না। তাই শরীর ঠিক করতে গিয়ে আরো বেঠিক হয়ে যায়। ইদানিং, একটা ঝোঁক দেখা দিয়েছে শরীর স্লিম রাখার ব্যাপার নিয়ে। এ সম্বন্ধেই সকলেই কমবেশি কৌতূহলী। শরীরের অযথা মেদ বাদ দিতে হবে। এতো অতি উত্তম প্রস্তাব। তাই সবাই ডায়েট করতে শুরু করেছেন। নিয়ম করে খাওয়া-দাওয়া করেন। তার বাইরে কিছু নয়। চর্বি তো একদম নয়। কিন্তু আমাদের শরীরের পক্ষে চর্বিরও প্রয়োজনীয়তা আছে। চর্বির অভাবে ত্বক অপুষ্ট হয়। আবার স্নায়ুপোষক ভিটামিন বি-র অভাবে ত্বকের স্বাস্থ্যে গুরুতর অবনতি ঘটে। দেহত্বক বিবর্ণ হয় এবং ফাটতে শুরু করে। এতো খাদ্যবস্তুজনিত অপুষ্টির কথা। আবার বাইরে থেকেও ত্বকের পরিচর্যা প্রয়োজন। নাহলে ত্বক শুষ্ক হবে এবং নানারকম প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। এক্ষেত্রে ভাল ক্রীম ব্যবহার করলে অনেক উপকার পাওয়া যায়। তবে ক্রীম ব্যবহার করতে হবে নরম আর গরম হাতে। এজন্য কিছুক্ষণ হাত গরম জলে ডুবিয়ে রাখতে হবে। তারপর ক্রীম ব্যবহারে ত্বক গরম হবে। এলার্জির ভাব থাকলে প্রসাধন ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

সৌন্দর্য-সাধনায় শুধু ত্বকের পরিচর্যা করে নিবৃত্ত হলেই চলবে না। সমস্ত শরীরই হলো সৌন্দর্যের আধার। তাই সবদিকেই লক্ষ্য রাখতে হবে। তবে ত্বকের পরই চুলের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। নারীর কেশরাজি তার সৌন্দর্যের একটি প্রধান অঙ্গ। এক সময়ে সবাই পছন্দ করতেন আজানুলম্বিত কেশ। এখন আর সবাই একমত নন। অনেকে সুন্দর ববড্ হেয়ার পছন্দ করেন। আবার কেউ বা কাঁধ পর্যন্ত। ববড্ অথবা কাঁধ পর্যন্ত যাঁরা চুল রাখেন তাঁদের খোঁপা বাঁধার কোন প্রয়োজন হয় না। তবে যাঁরা আজো আজানুলম্বিত কেশের অনুরাগী খোঁপা তাঁদের বাঁধতে এবং পরিচর্যার দায়িত্বও পালন করতে হয়। খোঁপা হবে চেহারা অনুযায়ী। গলা যাঁদের কম লম্বা তাঁদের উঁচু খোঁপায় সুন্দর দেখাবে। আর যাঁদের গলা লম্বা তাঁরা ঢিলেঢালা বড় খোঁপা বাঁধুন কাঁধ পর্যন্ত নামিয়ে। অবশ্য খোঁপা বাঁধার মেহনত এখন আর অনেকে করেন না। বাজার থেকে তৈরি করা খোঁপা কিনে তাঁরা কাজ চালান।

চুলের সঙ্গে সঙ্গে এসে যায় চোখের কথা। মৃগনয়না রমণী কাব্যের বিষয়বস্তু। তবে সবাই তো আর এ ধনে ধনী নয়। কিন্তু তা বলে আপশোস করে কোন লাভ নেই। চোখ হলো ব্যক্তিত্বের মুখ্য অঙ্গ। তাই এদিকে সবিশেষ নজর দিতে হবে। চোখের দৃষ্টিকে করে তুলতে হবে আকর্ষণীয়। এজন্য আই-ব্রো পেন্সিল, আই লাইনার আর আই শেডের সাহায্য প্রয়োজন। চোখের উপরের পালকে আই শেডের নিপুণ টান দিতে হবে। এর পর আই লাইনার প্রয়োগ করতে হবে। আর চোখ যদি খুব ছোট হয় তবে চোখের নিচেও আই লাইনার ব্যবহার করতে হবে। এতে যে শুধু চোখের সৌন্দর্য খুলবে তাই নয় ব্যক্তিত্বও অনেকখানি বাড়বে। এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা দরকার, আই শেড রাতের নিরুত্তাপ মুহূর্তে ব্যবহার করাই ভাল।

এমন অনেকে আছেন যাঁরা মুখশ্রীর যত্ন নেন কিন্তু সংলগ্ন গ্রীবাদেশকে অবহেলা করেন। গ্রীবার সযত্ন পরিচর্যা সৌন্দর্য-বোধের উত্তম নিদর্শন। মুখের রঙের সঙ্গে গ্রীবার রঙ অভেদ হওয়া চাই। দুয়ের ত্বক প্রসাধন প্রায় একইরকম। সুন্দর গ্রীবা সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ব্লাউজ অথবা চোলী যাই হোক না কেন গ্রীবা অনুযায়ী গলার ডিজাইন হবে। যদি গ্রীবা ছোট হয় তবে জামার গলা হবে বড়। আর গ্রীবা লম্বা হলে বন্ধ গলা কামিজ খুব ভাল মানাবে। এরপর গলায় ঝুলিয়ে নিন একটি লকেট।

কালিদাসের কাব্য অনুসারে পীনপয়োধরা রমণী হচ্ছে সর্বাপেক্ষা সুন্দর। সুগঠিত বক্ষ নারীর সৌন্দর্যের পরম সম্পদ। উত্তম বক্ষের জন্য উপযুক্ত যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। কারো কারো বক্ষ অপরিপুষ্ট থাকে। এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। বক্ষ সুগঠিত রাখার জন্যও ব্যায়াম আবশ্যক।

এমনিভাবে শরীরের প্রতিটি অঙ্গের যত্ন নিতে হবে। শুধু ভাত রাঁধতে পারলেই যেমন রান্না জানা হয় না তেমনি মুখের যত্ন নিলেই সৌন্দর্যবোধ স্পষ্ট হয় না। ত্বক থেকে মুখ আর মুখ থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে হবে। তবেই সৌন্দর্য-সাধনা হবে সফল।

—প্রমীলা।

আজকাল জীবনটা এতবেশী বাস্তবের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে যে রাতে শুয়ে অনেকেই ঘড়া ঘড়া মোহরের টুং টাং আওয়াজ শোনার চেয়ে থলে ভর্তি টাকা বা ব্যাগপূর্ণ অর্থ কল্পনা করতে ভালবাসে।

শুধু কি ব্যাগই প্রাক-বিবাহে বিরাট সমস্যার কারণ। বিবাহোত্তর জীবনে সবার অলক্ষ্যে একে ঘিরে রয়েছে কত সুখ-দুঃখ, প্রেম-প্রীতি তার কতটুকু খবর কে রাখে? কর্তা যদি ব্যাগ ভর্তি বাজার এনে গিন্নীর সামনে একটু কায়দা করে ঢালতে পারেন—রুই-এর বড় মুড়ো, গঙ্গার ইলিশ, টাটকা সব্জি—কোন্ গিন্নী না একটু মুচকে হেসে গদগদ ভাষায় কর্তার সুনজরের প্রশংসা করবেন! দ্বিপ্রহরের সুখনিদ্রা বাদ দিয়ে পাশের বাড়ীর পুটির মাকে পান চিবোতে চিবোতে কর্তার গুণগান করবেন না এমন গিন্নীও কি আছে! অবশ্য এ ব্যাপারে কর্তাকে একটু বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে। সপ্তাহের মাঝে ভরা ব্যাগ দেখালে চাকুরীজীবী গিন্নীর রক্তচক্ষুর সামনে তাঁকে বোকা বোকা হেসে একটু ছলছুতোয় বলতে হবে, 'এটা সস্তা, ওটা টাটকা, বাকীগুলো কালকের।'

এই থলেই আবার বেদনার বোঝা বয়ে বেড়াতে ইন্ধন জুগিয়ে দেয়। কোনদিন গিন্নী হয়তো রসালো কোন খাবারের কথা ভাষা দিয়ে হাত নেড়ে কর্তাকে বুঝিয়ে দিলেন। কর্তার হয়তো সেদিন বুকের বাগ গড়ের মাঠ, গিন্নীর ভয়ে ঘাড় কাত করে বাজারে গেলেন, ফিরে এলেন প্রায় শূন্য ব্যাগই। বুঝতেই তো পারছেন স্বামী-ভদ্রলোকটির অবস্থা। গিন্নী বাজারের থলিটা হ্যাঁচকা টানে ছুঁড়েও ফেলতে পারেন। সপ্তাহখানেক স্বামী ভদ্রলোকটি কি অসহ্য কষ্ট'ত ভুগবেন। শখের একটা জিনিস গিন্নীকে না দিতে পারার কষ্ট ও ভাবনা কি কম? শুধু কষ্ট আর ভাবনার কথাই বা বলি কি করে। ব্যাগ ছিনতাই-এর ভয়াবহতার কথা কে না জানে।

নির্দিষ্ট দিনটিতে রেশন ব্যাগের দিকে তাকিয়ে বুক ঢিপঢিপ, দাঁত শিরশির চোখ টনটন কার না করে—করতে বাধ্য। রেশনের একগুচ্ছ টাকা জোগানে কৃষ্ণকেশকে শুভ্র করার পথ সুগম নয়। তারপর টাকা জোগান হ'লে তো দুশ্চিন্তা ভাত চিবোতে কাঁকরের ঠেলায় দাঁতের কি হাল হবে। কাঁকর বাছতে চশমার পাওয়ারেরই বা কত হের-ফের হবে।

এত ভয়-ভাবনা সত্ত্বেও নারীর সৌন্দর্য বাড়াতে ব্যাগের অবদান অনেকখানি। এবার ব্যাগটা একটু বৃহৎ অর্থে ব্যবহার করছি। লেডিস ব্যাগ বা ভ্যানিটি ব্যাগ। সেক্ষেত্রে ব্যাগকে আমরা বাজারের বা রেশনের থলে বা ব্যাগের সমগোত্র ভাবতে পারি না। এর কত ডিগনিটি। পুরো সাজসজ্জার ভোল পালটে দেয়, চেহারা খোলতাই করে। শুনেছি লেডিস ব্যাগকে নিয়ে অল্পবয়েসী ছেলেদের নানা জল্পনাকল্পনা। বয়স্ক ভদ্রলোকেরা তো হামেসাই একটা প্রশ্ন তোলেন, এতবড় ব্যাগগুলোতে থাকে কি?

যাই থাকুক সেটা তো আর বড় কথা নয়। প্রয়োজন, অপ্রয়োজনের বিবিধ সামগ্রীতে এই ব্যাগগুলো ভরপুর। দরকারী অদরকারী হরেকরকমের জিনিস যেমন খাটে বিছানো তোষকের তলা বোঝাই—এও অনেকটা সেই ধরনের। জানি না অত্যাধুনিকারা হয়তো চটে উঠবেন। তাঁরা হয়তো অপ্রয়োজনীয় কিছু দিয়ে ব্যাগ বোঝাই-এ নারাজ। আসলে মাথায় ব্যাগটাই ঘুরছে—কারও মন রাখার কথা ভাবছি না।

এই ব্যাগ ব্যবহারের কৌশল নিয়েও চিন্তা-ভাবনার অন্ত নেই। নিত্য ব্যবহার্য ব্যাগ থেকে শুরু করে জন্মদিন, অন্নপ্রাশন, বিয়ে প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন উৎসবে ব্যাগের ধরন-ধারণও আলাদা। শাড়ী, চাদর, চটি এদের সঙ্গে মিলিয়ে যদি ব্যাগ না নেওয়া গেল তবে সাজটাই অসম্পূর্ণ।

নতুন করে ব্যাগে ফ্যাশানের আমদানী এটা মেয়েদের এক বিশেষ উদ্ভাবন শক্তি। চামড়া, ফোম এগুলো বাদ দিয়ে বাড়ীতে হাতে তৈরী ব্যাগও এক বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে ফ্যাশানের বাজারে।

একসময়ে শান্তিনিকেতনী ব্যাগ ব্যবহারে মেয়েরা উতলা হয়ে উঠেছিল। এ-ব্যাগ ব্যবহারে নাকি কেমন ইনটেলেকচুয়েলের ছাপ আছে। আসলে ব্যবহারকারিণীর গতি প্রকৃতি বোঝাতে ব্যাগের একটা বিশেষ মূল্য আছে।

শান্তিনিকেতনী ব্যাগকে পিছনের সারিতে ফেলে ফোম এসে দাঁড়ালো সামনে। স্রোতের মতো দ্রুতগতিতে সকলের হাতে ফোমের ব্যাগ শোভাবর্ধন করতে অগ্র[illegible] হ'ল। হালে দেখছি হাত থেকে ক[illegible] ঝোলানো ব্যাগে একদলের আগ্রহ বেশ। এতে ফ্যাশান কতটা হয় জানি না ত[illegible] স্বাধীনভাবে হাত দুটো নাড়াবার সুযোগ[illegible] ভীড় রাস্তায় একটা সুখ আছে নিশ্চয়।

কাপড়ে তৈরী ব্যাগের দিকে অসম্ভব ঝোঁক এখন দেখা যাচ্ছে। শুধু কাপড় নয় চটও এ ব্যাপারে অনেকখানি অগ্রণী। রঙ্গীন চটের ব্যাগের শোভা কোন অংশেই কম নয়।

আসলে ব্যাগ সে ব্যাগই। নারীপুরুষ উভয়ের জীবনের সঙ্গে এক গভীর যোগ। ফ্যাশান করতে যেমন ব্যাগের প্রয়োজন, জীবন বাঁচাতেও কি তার মূল্য কম?

—অঞ্জলি চৌধুরী

ফটো : স্নেহাংশু দে

চোখের সামনে বিস্ময়ের কম্পন ও উপলব্ধির জগতে আলোড়ন যদি এক নতুনতর ইতিহাসের দিগন্ত উন্মোচনের ইঙ্গিত দেয়, তাহলে হয়তো বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে বিবর্তনের স্রোত বাংলা থিয়েটারকে আজ অনেক উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতিতে সম্ভাবনাময় করে তুলেছে। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে সরে মিলিয়ে এসেছে আজকের নতুনতর চিন্তার আলোয় আলোকিত থিয়েটার। আজকের নাটক পুরনো ভাবনার জীর্ণতায় ক্লান্ত নয়, আজকের প্রয়োজনা গতানুগতিক অভিনয় রীতির মর্মান্তিক পুনরাবৃত্তি নয়। যে থিয়েটার আগে ছিল, যে প্রয়োজনার ধারা আগের শতকে চলতো, তার প্রতি কোন অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে নয়, বিবর্তনের ইতিহাসকে স্বীকৃতি জানিয়ে এটা স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে যে গত পঁচিশ বছরের বাংলা থিয়েটার এক চিরন্তন শৈল্পিক মহিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। জীবন থেকে দূরে যে থিয়েটারের অস্তিত্ব ছিল, তাকে জীবনাভিমুখী করে তারই মধ্যেই শিল্পের দীপ্ত আবিষ্কার, এ এক অসাধারণ ঘটনা। বাংলা রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ পূর্তির মুহূর্তে এই ঐতিহাসিক সত্যটিকে আরো প্রসারিত আলোয় তুলে ধরা উচিত নয় কি?

এই ধরনের থিয়েটারের স্বরূপ কি, তা বলতে পারবেন তাঁরাই যাঁরা স্বীকৃতি জানিয়েছেন আজকের নাট্যপ্রয়োজনাকে। হয়তো প্রশ্ন থেকে যায় এ সব দর্শক কারা! কোন্ বিশেষ শ্রেণীভুক্ত, না সাধারণ জনমানসের অংশীদার। এই অন্য ধরনের থিয়েটারই কি এই বিশেষ ধরনের দর্শক তৈরি করেছে, না বিবর্তনের স্রোতে স্বাভাবিকভাবেই ভেসে এসে দর্শকদের চাহিদাতেই সৃষ্টি হয়েছে এই থিয়েটার! এই মৌল প্রশ্নগুলোর মুখোমুখি হয়ে একটি কথাই আমাদের আনন্দের সঙ্গে মেনে নিতে গর্ব বোধ হয় যে বাংলা থিয়েটার আজ নাট্যামোদীর মনে সিরিয়াস চিন্তার আলোড়ন তুলেছে। আগে নাটকের অস্তিত্ব হয়তো নাট্যপ্রয়োজনার কয়েকটি ঘণ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো, আর এখন আসল নাটকের প্রাণধর্ম আলোচিত হয় নাটক শেষ হওয়ার পর। আজ মঞ্চ থেকে ঘটনা, সংলাপ ও সংঘাত নেমে এসেছে জীবনের নানা উপলব্ধি ও মননের আবর্তে।

বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক পরিকল্পনায় বাংলা নাটক এনেছে আজ বিস্ময়কর এক পরিবর্তন। যে ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক জগতের অস্বাভাবিক ঘটনাগুলো নিয়ে বাংলা নাটক মুখর হয়ে উঠেছিল, তা থেকে সরে এসে আজ যুগ-প্রয়োজনেই জীবনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, জীবনকে নাড়া দিয়েছে, তাকে দুমড়ে মুচড়ে চলমান করেছে এক নতুন আবেগে আর স্পন্দনে। আজকের সমাজজীবন, আজকের যুগযন্ত্রণা—তার মধ্য থেকেই উঠে আসছে চরিত্র, তাদের কথাই তৈরী করছে সংলাপ, তাদের সমস্যাই ভাষা দিচ্ছে সংঘাতকে। প্রতাপাদিত্য, সাজাহান, নাদির শাহ, অর্জুন প্রভৃতির জীবন, সংঘাত আজ আর ভালো লাগছে না। ভালো না লাগার কারণ এইসব চরিত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা নয়, শুধু যে অসম্ভব রকমের চলমান জীবনের সামনে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি তার গভীরেই আজ স্পন্দিত হয়ে চলেছি, আর এর আস্বাদনেই হয়তো নাট্যশিল্পের পূর্ণতম সিদ্ধির ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে। আমরা অবশ্য এ কথা নির্দ্বিধায় বলবো যে আমাদের আগেকার নাট্যপ্রয়োজনা নিঃসন্দেহে একটা যুগের ইতিহাস বহন করেছে। আর তাই রঙ্গমঞ্চ শতবর্ষপূর্তির উৎসবে আজ বহু পুরনো ক্লাসিক নাটক অভিনীত হচ্ছে।

নতুনতর নাটক অর্থাৎ যা 'অন্য ধরনের থিয়েটার' বলে খ্যাত, তা গড়ে উঠেছে ফর্ম বা কনটেন্টকে কেন্দ্র করেই। অ্যাবসার্ড নাটক, প্রতীকধর্মী নাটক—আজকের এই সব বলিষ্ঠ প্রয়োজনার মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে সাম্প্রতিক নাট্য ভাবনার, চিন্তার বিভিন্ন স্তর। যে সব বিষয়কে আমরা মঞ্চের আলোয় প্রকাশের অনুপযুক্ত ভাবতাম, তাও বেশ দৃঢ়তা ও সুস্পষ্টতার সঙ্গে মঞ্চে তুলে ধরা হচ্ছে। যৌনজীবনের সংঘাত আর যন্ত্রণাও ভাষা পাচ্ছে নাটকের গতিবেগে, আবার তা শুধু 'সেকস'-এর প্রচার হিসেবেই হারিয়ে যায় না, যথার্থ নাট্যপ্রয়োজনার প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবেই চিহ্ন রাখে। অ্যাবসার্ড নাটকের মধ্যে যে আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভাব্যতা, তার মধ্যেও লুকিয়ে আছে নতুন এক জীবন রস-সিক্ত বিদ্রোহের সুর, যে সুর জীবনের অতল পর্যন্ত তুলেছে তীব্রতম আন্দোলন। বিদেশী নাটকের ভাবানুসারে রচিত নাটকও ওপারের নাট্যনিরীক্ষার সঙ্গে আমাদের চিন্তার সেতুবন্ধন করছে। কোন বিশেষ নাট্যপ্রয়োজনার নাম উল্লেখ না করে একটা কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে বাংলা নাটকে এই পরিবর্তনের ইঙ্গিত বাংলা নাট্যপ্রয়োজনার ধারাকে বিশ্বের নাট্যআন্দোলনের এক অন্যতম শরিক করে তুলেছে নিশ্চয়ই।

তবে একটা কথা। এই যে আলোড়ন, এই যে বিস্ময়ের সুগভীর আন্দোলন, এর সবটাই কিন্তু অপেশাদারী সৌখীন নাট্যগোষ্ঠীদের নিবিড়, নিষ্ঠাজড়ানো প্রয়াসের রক্তিম এক ফসল। এঁরাই বাংলা নাটককে শিল্পের মর্যাদা দিয়েছে, এঁদেরই ভাবনায় গড়ে উঠেছে ভাবীকালের বাংলা নাটকের এক বিশেষ গৌরবদীপ্ত চেহারা। কিন্তু দুঃখের বিষয় ব্যবসায়িক থিয়েটারে আজো সেই পুরনো চিন্তাবিবর্জিত ধারার মর্মান্তিক পুনরাবৃত্তি, সেখানে হয়তো লাগেনি কোন পরিবর্তনের দোলা। এই ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর কর্তৃপক্ষের কাছে প্রশ্ন রাখলে তাঁরা বলেন— দর্শক যা চায় তাই তাঁদের দিতে হয়। এই কর্তৃপক্ষের কাছে একটি অনুরোধ— তাঁরা দয়া করে সৌখীন নাট্যগোষ্ঠী বিশেষ করে বহুরূপী, নান্দীকার, থিয়েটার ওয়ার্কশপ প্রভৃতি সংস্থার প্রয়োজনা দেখুন, তা হলেই তাঁরা বুঝতে পারবেন যে তাঁদের নাটক দেখার উৎসাহ দর্শকদের উৎসাহ কম আছে কি না। সত্যিকারের নাটকের প্রাণধর্ম বাদ দিয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না ক্যাবারে নর্তকীর উত্তেজক নাভিভঙ্গিমা দেখিয়ে যেখানে দর্শকদের মোহাবিষ্ট করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করা হয়, সেখানে ভালো নাটক খুঁজতে যাওয়া বোকামি ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু এ কথা খুব সত্যি যে দর্শকদের এভাবে আকর্ষণ করার অর্থ হল, শিল্প-ভাবনার গভীরতম স্তর থেকে তাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসা। যথার্থ নাট্যশিল্পের বিচারে এটা নিঃসন্দেহে একটি অপরাধ। অথচ এদিকে অনেকের দৃষ্টিই উদাসীন। অথচ নাটক নিয়ে যখন নতুনতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে তখন সবারই উচিত সেই ধারাকে একটি সুষ্ঠুরূপে প্রবাহিত করে

দেওয়া। এ ব্যাপারে ব্যবসায়িক থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ ও দর্শকদের কি কোন ভূমিকা বা কর্তব্যবোধ নেই?

প্রশ্নটা ভাবতে হবে যেমন সেখানকার নাট্যপ্রযোজককে, তেমনি ভেবে দেখতে হবে দর্শকদের। থিয়েটার নিয়ে যেখানে ব্যবসা সেখানে চলবে এক রকমের প্রযোজনা, আর থিয়েটারকে ভালোবেসে যারা থিয়েটার করে তাঁদের প্রযোজিত নাটকের চেহারা হবে অন্য রকম—এই ব্যবধান চলতে দেওয়া কি ঠিক? আর যদি নাই ঠিক হয়, তবে কেন এই ব্যবধান, কেন সব মিলিয়ে একটি অখণ্ড নাট্যআন্দোলনের ইতিহাস তৈরী হবে না, কেন সবার প্রচেষ্টা একটি আলোকিত ঐক্যে এসে মিলবে না! ভালো থিয়েটার, অর্থাৎ 'অন্য ধরনের' থিয়েটার কি দর্শক পয়সা দিয়ে দেখেন না? নিশ্চয়ই দেখেন। তার বহু প্রমাণ আছে। হয়তো কিছুটা লাভের পরিমান কম হবে প্রথমে, তবে শিল্পের খাতিরে কিছুটা ব্যবসায়িক দৃষ্টি প্রথমে ছেড়ে দেওয়া নিশ্চয়ই উচিত।

আজকের দর্শকই এর বিচারক। কি করে সর্বত্র যেখানে বাংলা নাটক অভিনীত হয় সেখানে শিল্পমূল্যের থিয়েটার যাতে হয়, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে তাঁদেরই। আজ শহর থেকে মফঃস্বল পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে যে নাট্যআন্দোলনের ঢেউ তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করলেই তো চোখে পড়বে নিশ্চয়ই যে কি ধরনের নাটক দর্শক আজ চাইছেন, দর্শকের মন-প্রাণ আন্দোলিত হয়ে উঠছে কোন্ প্রযোজনার গভীরে ডুব দিয়ে।

স্বীকার করি অন্য স্বাদের থিয়েটারের রস উপভোগ করতে হলে দর্শকের মানসিকতা ও উপলব্ধির ক্যানভাসটিকেও বড়ো করতে হয়। এই ব্যাপারটার যেখানে অভাব হয়, সেখানেই 'আমার কণ্ঠনালীতে সূর্যটা আটকে গেছে' উচ্চারণ করে যে যন্ত্রণাদগ্ধ নায়ক, তাঁর চরিত্র বুঝতে অসুবিধা হয়। কিন্তু তাই বলে অনুভবের এই ফাঁকটুকু পূরণ করা হবে না কোনদিনও—এ ধারণাও ঠিক নয়। দর্শকদের তো তৈরী করতে হবে প্রযোজকদের। পথের পাঁচালীর পর বাংলা চলচ্চিত্রজগতে যেমন নতুন দর্শক তৈরী হয়েছে, তেমনি 'রক্তকরবী' নাটক প্রভৃতি প্রযোজনার মধ্য দিয়ে বাংলা থিয়েটার নতুন নাট্যানুরাগী পেয়েছে—এই ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করে লাভ নেই।

শিল্পসম্মত থিয়েটারের ওপরেই একটি দেশের চিরন্তন নাট্যশিল্পের ঐতিহ্য নির্ভর করে। এ ব্যাপারে দর্শক ও প্রযোজকদের চিন্তার মেলবন্ধন প্রয়োজন। বাংলা রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষপূর্তির এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমরা নিশ্চয়ই আশা করবো বাংলা থিয়েটারের শৈল্পিক স্বভাব আরো অর্থময় হবে, ঘুচে যাবে প্রযোজনার সব রকম ব্যবধান।

বাঙালী মনিষীর নাট্যাভিনয়

শৈলেনকুমার দত্ত

সংস্কৃতির একটি দিক যেমন অভিনয়, চিত্তবিনোদনের একটি প্রকৃষ্ট উপায়ও তেমনি অভিনয়-দর্শন। তাই সাধারণ অসাধারণ সব ব্যক্তি অভিনয় দেখে আনন্দ পান। বুদ্ধিজীবী অভিনয় দেখেন মানসিক চিন্তাযুক্তির জন্যে, শ্রমজীবী দেখেন দেহমনের শ্রান্তিবিনোদনের জন্যে।

বাঙালী মনীষীদের মধ্যে অনেকেই অভিনয় দেখতে ভালবাসতেন। বিদ্যাসাগর-রামগোপাল ঘোষ - প্যারীচাঁদ মিত্র - মধুসূদন - রামকৃষ্ণদেব - বিবেকানন্দ - শ্রীঅরবিন্দ - চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি সকলেই অভিনয় দেখে প্রভূত আনন্দ পেতেন। 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় দেখে বিচলিত দর্শক বিদ্যাসাগরের চটিজুতো ছুঁড়ে মারার প্রচলিত রটনা অভিনয় জগতে আজও একটি স্মরণীয় দৃষ্টান্ত। হেমচন্দ্র - নবীনচন্দ্র - রমেশচন্দ্র এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনও অভিনয় দেখতে ভালবাসতেন। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের নামও এদিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। তিনি যেমন নাট্যাভিনয়ে আগ্রহী ছিলেন তেমনি নিজেও ছিলেন একজন সুঅভিনেতা। বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে অভিনীত বেণীসংহার নাটকে অভিনয় করে তিনি যশোলাভ করেন। নিজে অভিনয় না করলেও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র মঞ্চাধ্যক্ষ হিসেবে দক্ষ ছিলেন। মেট্রোপলিটন থিয়েটারে বিধবা বিবাহ প্রভৃতি নাটক প্রধানত তাঁরই তত্ত্বাবধানে অভিনীত হয়। ব্রাহ্ম সমাজের আর এক ঋত্বিক প্রতাপচন্দ্র মজুমদারও একজন সুঅভিনেতা ছিলেন।

এঁদের মধ্যে বিদ্যাসাগর - মধুসূদন এবং বঙ্কিমচন্দ্র অভিনয়ে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। পাথুরেঘাটার ঠাকুর বাড়িতে থিয়েটারের জন্যে যে-কমিটি গঠিত ছিল, বিদ্যাসাগর এবং মধুসূদন তার কার্যকরী সদস্য ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার শুধু অভিনয় দেখেই আনন্দ লাভ করতেন না নাট্যাভিনয়ে তাঁদের উদ্যোগও কম ছিল না। ১৮৭২ সালের ৩০ মার্চ চুঁচুড়ায় দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী' নাটকের অভিনয় হয় প্রধানত এঁদেরই উদ্যোগে।

মনীষীদের মধ্যে ভোলানাথ চন্দ, গৌরদাস বসাক, রমানাথ লাহা প্রভৃতিরা সুঅভিনয় করতেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রও ছিলেন একজন কুশলী অভিনেতা। বিখ্যাত চিকিৎসক রাধাগোবিন্দ কর তাঁর ভ্রাতা রাধামাধব করের মত সুঅভিনয় করতেন।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ডবলিউ সি বোনার্জী ওরফে উমেশচন্দ্রের অভিনয়ে খুব আগ্রহ ছিল। মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা নাটকাভিনয়ে তিনি শর্মিষ্ঠার ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেন। দর্শকরূপে উপস্থিত মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরও উমেশচন্দ্রের অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন। 'রেইস এন্ড রেইত' পত্রিকা-সম্পাদক সাংবাদিক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও সুঅভিনয় করতেন।

নাট্যকারদের মধ্যে প্রায় সকলেই অভিনয়ে পারদর্শী ছিলেন। তবে বিশেষভাবে উল্লেখনীয় হলেন গিরিশচন্দ্র এবং রসরাজ অমৃতলাল বসু। গিরিশচন্দ্রের অভিনয় দেখে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বলেছিলেন—'বিলেতে জন্মালে গিরিশবাবু স্যার উপাধি পেতেন।' গিরিশচন্দ্র অভিনয় করে যে সব চরিত্রগুলি অমর করে রেখেছেন সেগুলি হল—সধবার একাদশীতে নিমচাঁদ, লীলাবতীতে ললিতমোহন, কৃষ্ণকুমারীতে ভীম সিংহ, পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইভ, পাণ্ডব গৌরবে কঞ্চুকী, নীলদর্পণে উড সাহেব, প্রফুল্লে যোগেশ, ম্যাকবেথে ম্যাকবেথ, বিষবৃক্ষে নগেন্দ্র, জনায় বিদূষক, সিরাজদ্দৌলায় করিম চাচা এবং বিল্বমঙ্গলে সাধক। সধবার একাদশীতে নিমচাঁদের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রের অভিনয় দেখে নাট্যকার দীনবন্ধু বলেছিলেন—মনে হচ্ছে নিমচাঁদ যেন তোমারই জন্যে লেখা। কৃষ্ণকুমারী নাটকে গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে নাটোরের মহারাজা চন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রকে নিজের রাজবেশ ও তলোয়ার পরিয়ে দিয়েছিলেন। গিরিশ-শিষ্য রসরাজ অমৃতলাল বসুর অভিনয়ে অমরচরিত্র হল—'বিল্বমঙ্গলে' নামভূমিকা, 'নীলদর্পণে' সৈরিন্ধ্রী প্রভৃতি।

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর পরিবারবর্গের অনেকে অভিনয়ে অসাধারণ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের অভিনয় বাংলা সংস্কৃতির আর এক গৌরবময় অধ্যায়। সীতা দেবীর ভাষায় বলতে গেলে—'রবীন্দ্রনাথের অভিনয় আর কি বর্ণনা দিব! তাঁহার সর্বাঙ্গের তুলনা একমাত্র তাঁহাতেই মিলিত।......তিনি অতি উৎকৃষ্ট প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা ছিলেন।' নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়িও একস্থানে বলেছেন—'রবীন্দ্রনাথই দেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা।'

বিদ্বজ্জন সমাগমের প্রযোজনায় অনুষ্ঠিত 'বাল্মীকি প্রতিভা'র প্রথম অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকির ভূমিকায় অভিনয় করেন। এই অভিনয় দেখতে উপস্থিত ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ মনীষীরা। রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য অভিনয় দেখে সকলে আনন্দে অভিভূত হন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এত আনন্দিত হয়েছিলেন যে তার

উত্তেজনায় তিনি একটি কবি-প্রশস্তি রচনা করে ফেলেন—

উঠ বঙ্গভূমি মাতঃ ঘুমায়ে থেকো না আর,
অজ্ঞান তিমিরে তব সুপ্রভাত হল হেরো।
উঠেছে নবীন রবি, নব জগতের ছবি,
নব বাল্মীকি প্রতিভা দেখাইতে পুনর্বার।

বিদ্বজ্জন সমাগমের উৎসাহে রবীন্দ্রনাথ রচিত 'কালমৃগয়া' নাটিকারও অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। এ নাটিকার প্রথম অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ অন্ধমুনির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নেমেছিলেন দশরথের ভূমিকায়। অন্যান্য ভূমিকাতেও ঠাকুর পরিবারের অনেকে অভিনয় করেন।

'রাজা ও রাণী' নাটকটি নতুন করে লিখে রবীন্দ্রনাথ নামকরণ করেন 'তপতী', তারপর কোলকাতায় মহাসমারোহে তার অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। সত্তর বছর বয়সেও কবি স্বয়ং রাজার ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন। সকলে বিস্ময় প্রকাশ করেন যে কেমন করে ওই বয়সে প্রেমের অভিনয় করবেন এবং তাঁর প্রলম্বিত শ্বেতশ্মশ্রু সেখানে বা কী হবে! কিন্তু কার্যত কি ঘটেছিল সেটি একজন প্রত্যক্ষদর্শী কবি জসীম উদ্দীনের লেখায় সুস্পষ্ট—'অভিনয়ের সময় দেখা গেল, দাড়িতে কালো রং মাখাইয়া মুখের দুই পাশে গালপাট্টা ঝুলাইয়া দিয়া কবি এক তরুণ যুবকের বেশে মঞ্চে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তপতী নাটকে রাজার ব্যর্থ প্রেমের সেই মর্মান্তিক হাহাকার কবির কণ্ঠমাধুর্যে আর আন্তরিক অভিনয়-নৈপুণ্যে মঞ্চের উপর জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল।'

রবীন্দ্রনাথ সত্যিই যে একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা ছিলেন, সেকথা সর্বজনবিদিত। তাঁর অভিনয়ের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা হল—রাজা নাটকের ঠাকুরদাদা', নটীর পূজা নাটকের 'ভিক্ষু', বিসর্জন নাটকের জয়সিংহ, ফাল্গুনী নাটকের অন্ধ বাউল, অচলায়তন নাটকের আচার্য অদীনপুণ্য, শারদোৎসব নাটকের সন্ন্যাসী প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও ঠাকুরবাড়ির অনেক মনীষী অভিনয়ে পারদর্শী ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ এবং স্বর্ণকুমারী, শরৎকুমারী, ইন্দিরা দেবী ও প্রতিভা দেবীও অভিনয়ে পারদর্শী ছিলেন। শিল্পী গগনেন্দ্রনাথও অভিনয় শিল্পে পারদর্শী ছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শুধু সুদর্শনই ছিলেন না, সু-অভিনেতাও ছিলেন। তাঁকে স্ত্রী-ভূমিকায় অনবদ্য মানাতো। নটীর ভূমিকায় তাঁর অভিনয় দেখে কেউ ধরতেই পারতো না যে, তিনি মহিলা নন। কৃষ্ণকুমারী নাটকে কৃষ্ণকুমারীর মাতার ভূমিকায়ও তিনি অনবদ্য অভিনয় করেন।

১৮৭৭ সালে অনুষ্ঠিত 'এমন কর্ম করব না' (অলীকবাবু নাটকের পূর্বনাম) নাটকে 'সত্যসিন্ধুর' ভূমিকায় অভিনয় করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। অলীকবাবুর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ এবং 'হেমাঙ্গিনী' ও 'পিসনির' ভূমিকায় অভিনয় করেন যথাক্রমে শরৎকুমারী ও স্বর্ণকুমারী।

সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী এবং রবীন্দ্রনাথের পত্নী মৃণালিনী দেবীও অভিনয় করেছিলেন। ১৮৮৯ সালে কোলকাতার সেন্ট পলস ক্যাথিড্রালে অনুষ্ঠিত 'রাজা ও রাণী' নাটকের অভিনয়ে পাত্রপাত্রী ছিলেন—

বিক্রম—রবীন্দ্রনাথ, সুমিত্রা—জ্ঞানদানন্দিনী দেবদত্ত—সত্যেন্দ্রনাথ, নারায়ণী—মৃণালিনী।

সেযুগে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে মৃণালিনী দেবীর একত্রে অভিনয় করা নিয়ে যে প্রচণ্ড সমালোচনা হয়েছিল, সেকথা বলাই বাহুল্য। তবু তাঁরা অভিনয়কে এত ভালবাসতেন যে, এসব সমালোচনাকে কোন আমলই দেন নি।

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথও একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা ছিলেন। প্রতিমা দেবী তাঁর 'স্মৃতিচিত্র'র একস্থানে অবনীন্দ্রনাথের অভিনয় সম্পর্কে লিখেছেন—'কৌতুক নাট্যের পার্টে অবনীন্দ্রনাথের ক্ষমতা প্রকাশ পায়। শোনা যায় কবিগুরু বৈকুণ্ঠের খাতায় তিনকড়ি চরিত্রটি বিশেষ করে তাঁর কথা মনে করে লিখেছিলেন। এই পার্টে তাঁর অভিনয় হয়েছিল অতুলনীয়। ...ফাল্গুনী এবং ডাকঘরের মোড়লের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় যাঁরা দেখেছেন আজও তাঁদের স্মৃতিপটে সে ছবি উজ্জ্বল হয়ে আছে।' বিখ্যাত নাট্যকার ও অভিনেতা গিরিশচন্দ্র একবার তাঁর তিনকড়ির পার্ট দেখে বলেছিলেন—'এরকম সব অ্যাক্টর যদি আমার হাতে পেতুম, তবে আগুন ছুটিয়ে দিতে পারতুম।'

ঠাকুরবাড়ির সংস্পর্শে এসে কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীও অভিনয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন। তাঁর অভিনয়ে একটা বিশেষত্ব এই ছিল যে, তিনি অনেক কথা উপস্থিত মত বানিয়ে বলতে পারতেন। মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী নাটকে তাঁর অভিনয় অনেকের প্রশংসা অর্জন করে।

কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় খুব বেশি অভিনয় না করলেও তিনি একজন সুঅভিনেতা ছিলেন। কোলকাতার সঙ্গীত সমাজে একবার তাঁর 'সীতা' নাটকের অভিনয় হয়; সেই অভিনয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল বাল্মীকির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। 'প্রতাপ সিংহ' নাটকে শক্ত সিংহের ভূমিকাতেও তিনি অনবদ্য অভিনয় করেন।

কান্তকবি রজনীকান্ত সেনও অভিনয়ে খুব পারদর্শী ছিলেন। তিনি 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে পাগলিনীর ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেন। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকে অভিনয় করেও তিনি প্রভূত সম্মান অর্জন করেন।

বাংলা শিশু-সাহিত্যের অমর স্রষ্টা সুকুমার রায়ও একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ননসেন্স ক্লাবে অভিনয় অনুষ্ঠান প্রায়ই হত এবং সেসব অভিনয়ে তিনিই হতেন মুখ্য অভিনেতা। তাঁর অভিনয় দক্ষতা সম্পর্কে অনুজা পুণ্যলতা চক্রবর্তী তাঁর স্মৃতি-কথায় লিখেছেন 'ননসেন্স ক্লাবের অভিনয় এমন চমৎকার হত, যারা নিজের চোখে দেখেছে তারাই জানে। মুখে বর্ণনা করে তার বিশেষত্ব ঠিক বোঝানো যায় না। বাঁধা স্টেজ নেই, সীন নেই, সাজসজ্জা ও মেক আপ বিশেষ কিছুই নেই, শুধু কথার সুরে ভাবে ভঙ্গীতে তাদের অভিনয় বাহাদুরি ফুটত। দাদা নাটক লিখত, অভিনয় শেখাত আর প্রধান পার্টটা সাধারণত সে নিজেই নিত। প্রধান মানে সবচেয়ে বোকা আনাড়ির পার্ট' হাঁদারামের অভিনয় করতে দাদার জুড়ি কেউ ছিল না।' স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও সুকুমার রায়ের অভিনয় প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ঔপন্যাসিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রথম জীবনে অভিনয় করতেন। পরবর্তীকালে 'কৈশোর স্মৃতি'তে তিনি নিজেই লিখেছেন—'...অভিনয় করেছি, অভিনয়ের জন্য সুখ্যাতিও পেয়েছি। নিজের রোগা চেহারার জন্য রঙ্গমঞ্চে নামতে আজ লজ্জা পাই, নইলে হয়তো রঙ্গমঞ্চে অন্তত এখানকার সখের অভিনয়ে অভিনয় করতাম।'

শান্তি নিকেতনে অভিনয় পর্বের যে আয়োজন হত তাতে বাংলাদেশের বহু গুণী শিল্পী অভিনয় করতেন। এঁদের মধ্যে দিনেন্দ্রনাথ, অজিতকুমার চক্রবর্তী, অসিতকুমার হালদার, ক্ষিতিমোহন সেন, জগদানন্দ রায় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৩২১ বঙ্গাব্দে শান্তিনিকেতনে অচলায়তন নাটকের যে অভিনয় হয়, তাতে পিয়ার্সন সাহেব পর্যন্ত অভিনয় করেছিলেন।

বর্তমানে আমাদের দেশে সৌখিন নাট্যাভিনয় বেশ প্রসার এবং জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। নাট্যাভিনয় সম্পর্কে গবেষণা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত নেই। সেই সঙ্গে বাঙালি মনীষীদের নাট্যাভিনয় স্মরণ করলে তাঁদের যথোচিত সম্মান জানানোর সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও কল্যাণ হবে।

চিঠিপত্র

'স্বদেশের ইতিহাস' : লেখকের উত্তর

'অমৃতে' প্রকাশিত সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'স্বদেশের ইতিহাস' নামে চিঠিটি পড়ি কিছুদিন আগে। এই প্রসঙ্গে তাঁকে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে এই পত্রিকায় প্রকাশিত আমার 'বঙ্গনবাব : রঙ্গনায়িকা' নামে ধারাবাহিক রচনাটির আসল বিষয়বস্তু হচ্ছে নবাবী শাসনের অন্তরালে বাংলার বেগমদের সক্রিয় ভূমিকার কাহিনী। সেদিন পর্দার পেছনে দাঁড়িয়ে তাঁরা নবাবদের শাসনকাজের ওপরই শুধু প্রভাব বিস্তার করেন নি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, সন্ধিস্থাপন ইত্যাদি ব্যাপারেও এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়েছিলেন। আর তাঁদের এই কাহিনী আলোচনা করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই নবাবদের জীবনের অনেক ঘটনা এসে পড়েছে। শুধুমাত্র কোনো নবাবের জীবন-কাহিনী লেখা এই রচনার উদ্দেশ্য নয়।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ আমার 'ছোটি বেগম' লেখাটির ভূমিকা থেকে দুটি লাইন উদ্ধৃত করেছেন। তা হচ্ছে : 'তাঁর (ঘসিটি বেগমের) জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত কয়েকটি ঘটনা ইংলিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এবং নবাব সিরাজউদ্দৌলার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়। এই বিচ্ছেদ চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে পলাশীর যুদ্ধে।' শ্রী সিরাজ আমার এই উক্তিটিকে 'অমনোযোগী, অসতর্ক এবং বাস্তবতা-বিরোধী' বলে উল্লেখ করেছেন। আমি তাঁকে সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই যে 'অমৃতে' চারপৃষ্ঠাব্যাপী ছাপানো 'ছোটি বেগম' লেখাটিতে এই উক্তির সমর্থনে অজস্র তথ্য পরিবেশন করেছি। তিনি লেখাটি মনোযোগ দিয়ে পড়লেই দেখতে পেতেন যে সিরাজের সঙ্গে বিবাদ-বিসম্বাদের পর ঘসিটি বেগম ক্ষমতা ঐশ্বর্য সব কিছুই হারিয়ে কিভাবে চারদিক থেকে তাঁর বিরুদ্ধে এক চক্রান্তের জাল বিস্তার করেছিলেন। সিরাজের বিপক্ষ দল এই ঘসিটি বেগমকে কেন্দ্র করেই বেড়ে উঠেছিলো। এই দলে ছিলেন জগৎ শেঠ, মীর জাফর, রাজবল্লভ, রায় দুর্লভরাম প্রমুখ নামকরা ব্যক্তি। কিন্তু নবাবের বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ করার মতো সাহস এঁদের ছিলো না। তাই তাঁরা গোপনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি অর্থাৎ ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে হাত মেলালেন। এই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এদেশের বাজার দখল করতে চাইছিলো অনেকদিন থেকেই। এবার তারা পেয়ে গেলো সেই সুবর্ণ সুযোগ। এভাবে একদিকে ঘসিটি বেগম ও তাঁর প্রধান অনুচরবর্গ এবং অন্যদিকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসককুল—এই দুই প্রধান বিপক্ষ শক্তির মিলিত চক্রান্তে এলো সেই পলাশীর যুদ্ধ। পতন ঘটলো একটা স্বাধীন দেশের এবং ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হোলো প্রতিষ্ঠা।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বলেছেন, আজকাল এ ধরনের রচনা লিখতে গিয়ে আমরা অনেকেই নাকি 'সোজা তৎকালীন ইংরেজের কাটছাঁটিত কলমের শরণাপন্ন' হই। অন্য কারো কথা এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে চাই না। শুধু নিজের বক্তব্যটুকুই তুলে ধরছি। কোনো অন্ধ নীতি, কোনো ভ্রান্ত ধারণা, কিংবা আমাদের দেশের ইতিহাস নিয়ে কোনো বিদেশীর একপেশে রচনা—এগুলোর কোনোটাই আমার মনের ওপর এতটুকু প্রভাব বিস্তার করে নি। অবশ্য সব বিদেশী লেখকের বই-ই যে মন্দ তা কখনো বলব না। এঁদের মধ্যে দু'-একজন সেকালের ঘটনারাজিকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে উপস্থিত করেছেন, যুক্তি দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। এঁদের লেখার সঙ্গে নবাবী আমলের সমকালীন ঐতিহাসিকদের রচনার অনেক সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। নবাবী আমলের সরকারী ভাষা ছিলো ফারসী। সে-সময়কার সমস্ত ঘটনা ঐ ভাষায় লিপিবদ্ধ। আমি 'বঙ্গ নবাব : রঙ্গনায়িকা' নামে এই ধারাবাহিক রচনাটি লিখতে গিয়ে সমকালীন ঐতিহাসিকদের লেখা ফারসী গ্রন্থ, দলিল ইত্যাদির সাহায্য নিয়েছি। অবশ্য এগুলোর বেশিরভাগই ইংরেজীতে অনুবাদ হয়ে গেছে। আর যেসব এখনো অনুবাদ হয়নি, সেগুলো ফারসী-জানা পণ্ডিতদের সাহায্যে উদ্ধার করার চেষ্টা করেছি। এ প্রসঙ্গে তৎকালীন ঐতিহাসিক করম আলির 'মুজফ্‌ফরনামা', গোলাম হোসেন খাঁ তবাতবাই-য়ের 'সিয়র-উল-মুতাখ্‌খরীন', সালিমউল্লার 'তারিখ-ই-বাঙ্গালা', গোলাম হোসেন সালিমের 'রিয়াজ-উস্‌-সালাতিন' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এভাবে অশেষ পরিশ্রমে এইসব গ্রন্থ এবং অন্যান্য দলিল থেকে প্রকৃত তথ্য খুঁজে বার করে তা আমার রচনায় পরিবেশন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। সুতরাং তৎকালীন ইংরেজের কাটছাঁটিত কলমের শরণাপন্ন হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না আমার ক্ষেত্রে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ মশায়কে আমি শেষে এটুকু বলতে চাই যে সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত এবং সত্যনিষ্ঠ মন নিয়েই আমার ধারাবাহিক রচনাগুলি লিখেছি। এগুলোর কোথাও ঘটে নি সত্যের কোনো অপলাপ, ঘটে নি ঐতিহাসিক তথ্যের কোনোরকম বিকৃতি। গভীর বাস্তবতার পটে ফেলে বিচার করেছি এই আমলের ইতিহাস। নবাবদের সমকালীন এদেশ লেখকদের পরিবেশিত তথ্যগুলির ওপ নির্ভর করে আমি কোনো কাল্পনি উপাখ্যান লিখি নি, বরং ঐতিহাসি সত্যকেই প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছি আর সেই সত্যকে প্রকাশ করতে গি কোনো সেণ্টিমেণ্ট বা ভাবপ্রবণতা আমা মনকে আচ্ছন্ন করে নি। সেণ্টিমে উপন্যাসে চলে, কিন্তু ইতিহাস রচনায় ত একেবারে অচল।

—অংশুরঞ্জন সেন,
নিউ আলিপুর, কলকাতা—৫৩

ঊনিশ শতকের নবজাগরণ : একটি সমীক্ষা

গত ১৫ই ডিসেম্বর, '৭২ সংখ্যা অমৃতে শ্রীঅমিতাভ দাশগুপ্তের 'ঊনিশ শতকের নবজাগরণ : একটি সমীক্ষা' নিবন্ধটি পড়লাম। লেখক প্রথম অনুচ্ছেদে শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষের উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর যে সমালোচনা করার প্রয়াস পেয়েছেন তা সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না। কোন রচনা থেকে বিশেষ ক্ষুদ্রাংশ উদ্ধৃত করলে অনেক সময়েই তাতে উদ্ধৃত অংশটিকে ভুল বোঝার অবকাশ থেকে যায়। 'গৌরব গণবিদ্রোহ ও ভগবান' নিবন্ধ থেকে উদ্ধৃত অংশটির নিবন্ধটিতে এই 'তখন' হচ্ছে এমন একটি সময় যখন দরিদ্র শ্রমজীবী অন্ত্যজ সাঁওতালরা তাদের অশিক্ষিত মনে ইংরেজ ও মহাজনদের শোষণের বিরু সোচ্চার হচ্ছে, বিদ্রোহ সংগঠিত করা শিক্ষিত বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা শ্রেণীটিকে আইনস্টাইন প্রায় স শিরোভূষণ বলতে চেয়েছেন) সে কত লঘু বিষয় নিয়েই না মেতে তখন। দুটি শ্রেণীকে পাশাপাশি বিচার করলে ধরা পড়ে এই বুদ্ধিজ চিন্তাভাবনার গতি তুলনায় কত শ্লথ। এবং কার্যক্রমের প্রয়াস কত শ্রীযুক্ত ঘোষ এ দুটি ভয়ংকর তফা কথাই উল্লেখ করেছেন। এ ক্ষেত্রে অবশ্য নবজাগরণকে অস্বীকার করার তত্ত্ব অনুপস্থিত বলে আমার ধারণা, বরং তিনি তাকে পরোক্ষভাবে স্বীকারই করেছেন। শুধু বলতে চেয়েছেন অশিক্ষিত সাঁওতালদের নবজাগরণের তুলনায় এ নবজাগরণ অনেকটা লঘু ধাঁচের।

'বাঙালী বিদ্বৎসমাজের সমস্যা' নিবন্ধ থেকে উদ্ধৃত অংশটুকুও উত্তরসূরী বুদ্ধিজীবীদের সমরূপ সমস্যার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার্য বলেই আমার মনে হয়। প্রাসঙ্গিকভাবে এগুলি দীর্ঘ আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

—সুনীল কোনার,
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

খেলাঘর চিত্রে কবরী এবং আবদুল জব্বার খান
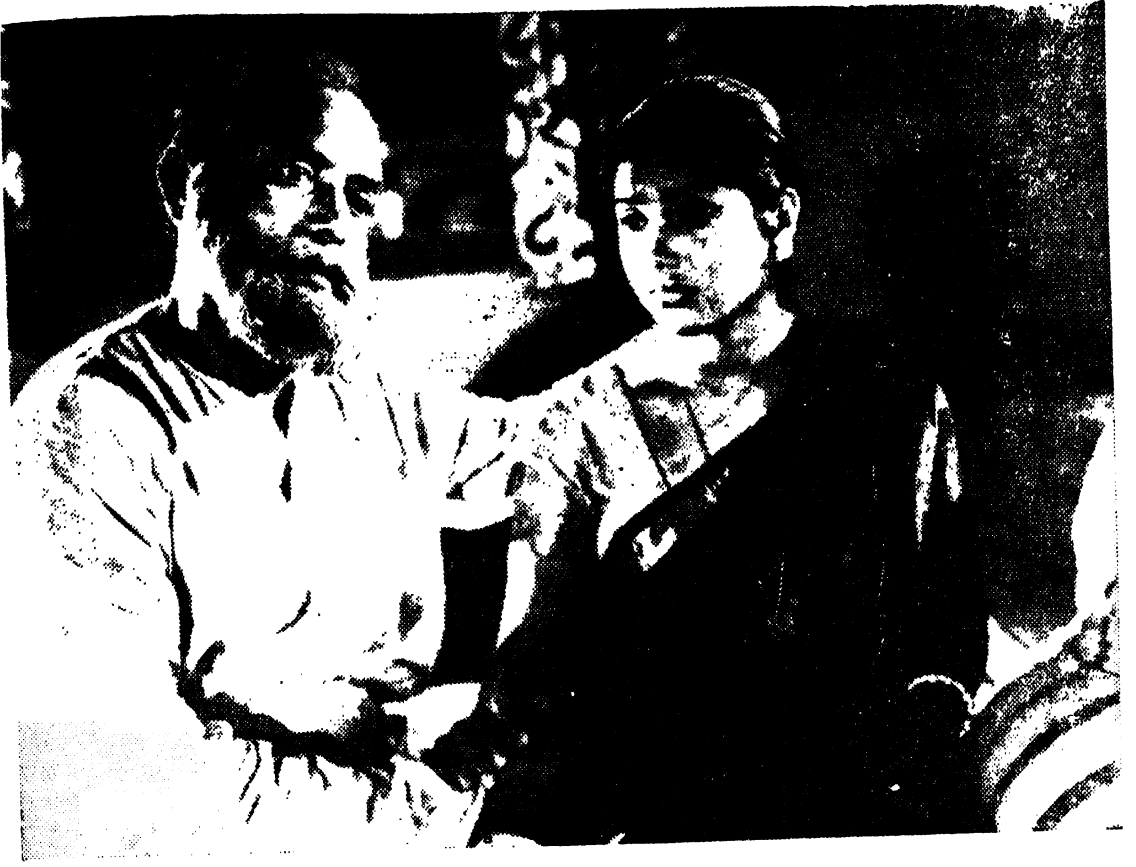
ঢাকার ছায়াছবি

বাবুল চৌধুরী পরিচালিত সত্য সাহা সুরারোপিত আহা বাঁশিয়ে সত্য বাঁশির চিত্রে রাজ্জাক ও সুস্মিতা

তেজগাঁও ঢাকার এফ ডি সি একটা জায়গাই বটে! এমুখ থেকে সেমুখ পর্যন্ত ব্যস্ততার তরঙ্গ ছড়িয়ে রয়েছে। রোববার, শনিবার বলে কোন কথা নেই। এখন অবশ্য এফ ডি সির নাম—বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা।

'এখানে ছবির কাজ তৈরি শেষ হলেই মুক্তির জন্যে খুব বেশি দিন লাইন দিয়ে অপেক্ষা করতে হয় না। ছবির মুক্তির দিন ঠিক করেই সাধারণত ছবি তৈরি হয়ে থাকে।'

একথা জানালেন ওপার বাংলার প্রতিষ্ঠিত সংগীত পরিচালক সত্য সাহা।

'ঢাকা ছাড়া ঢাকার চলচ্চিত্র কর্মীদের গতি নেই',— এমন কথা এখন আর বলা ঠিক নয়। তার উদাহরণ ত ববিতা, কবরী, সুচন্দা।

সুচন্দা কোন খবর না দিয়েই কলকাতায় চলে যাওয়ায় এখানকার পরিচালক প্রযোজকরা মাথায় হাত রেখেছেন। জহির রায়হানের লেখা উপন্যাস 'বরফ গলা নদী'র চিত্ররূপ দেবার জন্যে সুচন্দা নাকি উঠে পড়ে লেগেছেন, একথা ঢাকার চলচ্চিত্র মহলের গমগমে বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুচন্দার আগামী ছবি হচ্ছে— [illegible] নাম, জীবন তৃষ্ণা, দাতা হরিশচন্দ্র, ডাক পিয়ন, গোপাল ভাঁড় প্রভৃতি।

সুচন্দার যোন ববিতার জনপ্রিয়তা দিন দিন যে বেড়ে যাচ্ছে, এখবর চিত্ররসিক মাত্রেই খোঁজ রাখেন। ইদানীং ভীষণ ব্যস্ত। তার একটা উদাহরণ হচ্ছে, ইংরেজী পয়লা তারিখেই তিনি এফ ডি সিতে আসার পরিবর্তে নবাবগঞ্জে শুটিং করতে ছুটেছেন। ববিতার ছবির তালিকা এই রকম—আজও ভুলিনি, রাতের পর দিন, জীবন তৃষ্ণা, ইয়ে করে বিয়ে প্রভৃতি।

প্রবীণ পরিচালক করেজ চৌধুরী মালকা বানুর প্রথম পর্যায়ের শুটিং শেষ হয়ে গেছে বলে জানালেন।

সামনের ঈদের দিনই জীবন তৃষ্ণা মুক্তি পাচ্ছে। ছবিটি নাকি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। পরিচালনা করেছেন এইচ আকবর, বইটি বোল রিলে সম্পূর্ণ। চৌদ্দ হাজার ফিট দৈর্ঘ্য। আকবর সাহেবের পরের ছবির নাম ছেঁড়া তার। এটিই বাংলাদেশের প্রথম রঙীন ছবি হবে। নায়ক-নায়িকার নাম এখনও চূড়ান্ত করেননি তিনি।

তিতাস কথাচিত্রের প্রথম নিবেদন সিরিয়াস ধর্মী ছবি ভোলানাথ অপেরা পার্টি। ছবির প্রাথমিক কাজ শুরু হয়ে গেছে। নায়িকার নাম শাবানা শোনা যাচ্ছে। নায়ক নতুন কাউকে করা হতে পারে। ছবির শিল্প নির্দেশনা—মাহবুবুর রশিদের। ক্যামেরায় রয়েছেন লতিফ। কাহিনী-চিত্রনাট্য পরিচালনা সাহাজাদা-রফিকের।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিকায় রচিত শেখ লতিফ পরিচালিত দেবর

ভারত-বাংলাদেশ যৌথ ছবি পালঙ্কে আনোয়ার হোসেন (বাংলাদেশ) এবং উৎপল দত্ত (কলকাতা)। ছবির নায়িকা সন্ধ্যা রায়

ছবি অতি সত্বর মুক্তি পাচ্ছে। এ ছবিতে রোজী, রাজু, সাঈদা, কবিতা, আনোয়ার হোসেন প্রমুখরা অভিনয় করছেন।

অভিনেতা উজ্জ্বল ডেট নিয়ে ভীষণ মুশকিলে পড়েছেন সম্প্রতি। ওঁকে একই সঙ্গে আঁধারে আলো, বধূমাতা কন্যা, ভাড়াটে বাড়ী, বলাকা মন প্রভৃতি ছবির শুটিং সমানতালে চালিয়ে যেতে হচ্ছে।

গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবী আর কালো রংয়ের ফুল প্যান্ট পরে পয়লা জানুয়ারী দুপুর রোদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরিচালকদের সঙ্গে ওঁকে তারিখের হেরফের করতে দেখলাম কেবলই। উজ্জ্বল নাকি ওখানকার মেয়েমহলে বেশ প্রিয়।

ঠিক এ মুহূর্তে আমার মনে হল ওখানকার ছায়াছবিতে নতুন মুখ আসা একান্ত দরকার। তাহলে ওখানকার দর্শকরা টায়ার্ড হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পান। এ ব্যাপারে প্রতিভাবান তরুণ-তরুণীদের খুঁজে বার করে দর্শকদের সামনে দাঁড় করানর মত দুঃসাহসিক কাজ কি বাংলাদেশের পরিচালকরা করতে পারেন না?

শাবানার সঙ্গে ক' মিনিট

ভাল অভিনয় করছেন, এমন অনেক ছবির যোড়শী সুদর্শনা নায়িকা হচ্ছে শাবানা। মেক-আপ রুমের এক ফালি ' আয়না হাতে সাজগোজের ত্রুটি ঠিক ক কেবলই ব্যস্ত থাকতে হয় ওকে। রোজ তিনটে ছায়াছবির শুটিং ত লেগেই র

কপালে কালো কুচকুচে বড় করে আঁকা। লাল টকটকে গাল দুটো। গায়ে হাতা কালো ব্লাউজ। পরনে লাল জমিনের শাড়ির ওপর কালো রংয়ের ছাপা। গলায় সরু হার। লকেট জুড়ে প্রস্ত এক পাথর।

এহেন নায়িকা একটু অপ্রস্তুত হয়ে উঠলেন যখন সরকার লজ্জা লাজা আমাকে নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন ওঁর সামনাসামনি। খুব সহজ করে উনি বলে ফেললেন—

—সকাল সাতটায় আসি। রাত দশটায় প্রায় দিন বাড়ি যাই। দু ঘন্টাও বিশ্রাম নিতে পারি না।

চকরী, ছোটে সাব, চাঁদ আউর চাঁদনী, পায়েল, নুমা আউর বিজলী প্রভৃতি সুবর্ণ

অজিত পরিবেশিত খসরু নোমান পরিচালিত দুই পর্ব চিত্রে শাহানা চৌধুরী

জয়ন্তী অতিক্রান্ত বহু উর্দু ছবির অভিনেত্রীর কাছে প্রশ্ন রাখলাম।

—কলকাতার কোনও ছবি দেখেন নি?

—জী, দেখেছি। অনেক আগে। তখন আমি অনেক ছোট। ফিল্ম লাইনে আসিনি। ফিল্ম লাইন ত দূরের কথা, তখনকার কথা আমার কিছুই মনে নেই। তখন ত খুউব ছোট ছিলাম।

—আপনার মতে এপার বাংলার সবচেয়ে প্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রী কে?

—আমার কাছে সবাই ভাল। সবাই কো-অপারেশন করে। আমিও করি। আসল কথা আমার ওয়েল উয়িশর অনেকেই রয়েছেন।

এবার ও'কে একটা প্রশ্ন করলাম হাসতে হাসতে।

—আগে যখন ছবি করতেন তখন যতটা না খুশি হতেন, এখন স্বাধীন বাংলায় ছবি করে তার চেয়ে বেশি খুশি নন?

—সেটা ত বটেই। এখন অভিনয় করে আনন্দ পাই বেশি। এ পর্যন্ত বলেই কথা সামলে নিয়ে তাড়াতাড়ি করে বলল :

—তবে যুগ বলে কোন কথা নেই। শিল্পী হিসাবে যখনই আমি অভিনয় করি, তখনই সেই মুহূর্তে নিজেকে স্যাক্রিফাইস করার চেষ্টা করি।

শাবানার প্রথম আত্মপ্রকাশ ১৯৬৬ সালে নতুন সুর ছায়াছবির নায়ক রহমানের ছোট বোনের ভূমিকায়। তখন ও'র বয়স সবে মাত্র নয়।

কথায় কথায় এক সময় শাবানা বললেন :

—মা আমি কোনদিন অভিনয় শেখার সুযোগ পাইনি। অভিনয় করতে করতে নিজেকে তৈরি করেছি মাত্র। আপনাদের পুণে ফিল্ম ইনস্টিটিউটের মত এখানেও সিনেমা শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে ওঠা নিশ্চয়ই উচিত। তাতে অভিনয়ের মান আরো উন্নত হবে।

শাবানার অভিনীত ছবিগুলির নাম হল—দুটি মন দুটি আশা, ঝড়ের পাখি, দস্যু রাণী, অবুঝ মন, জনতার আদালত, আঁধারে আলো, বধূমাতা কন্যা এবং আরো অনেক।

সত্যি, 'সি ইজ ওনলি একসেপশন্যাল।' এটা আমার কথা নয়। ওপার বাংলার কাহিনী-গীত-রচয়িতা গাজী মাজাহারুল আনোয়ারেরই কথা।

জীবনসংগীত / পরিচালনা : মুস্তাফা মেহমুদ। আনোয়ার হোসেন, রোজী, সুচন্দা ও রাজ্জাক।

বনানী কথাচিত্রের গৃহীত চিত্রে নায়িকা শাবানা এবং হাসান ইমাম। পরিচালনা : আজিজুর রহমান। সংগীত : সত্য সাহা

প্রেক্ষাগৃহ

আমাদের নাট্য আন্দোলন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমল পর্যন্ত সাধারণ রঙ্গালয়ের বাইরে নাটক ও নাট্যাভিনয় নিয়ে যা-কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, তা করেছেন একমাত্র রবীন্দ্রনাথ। তিনি সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতি দৃক্‌পাত না করেই নিজের অন্তরের তাগিদে নাটকের পরে নাটক লিখে গেছেন এবং মাঝে মাঝে তাদের অভিনয়ও করেছেন। প্রথমে তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়ীর দোতলায় ও বেথুন কলেজে, পার্ক স্ট্রীটে সত্যেন ঠাকুরের বাড়ীতে, পরে নানা উৎসব উপলক্ষে শান্তি-নিকেতনে এবং এরও পরে কলকাতায় এম্পায়ার থিয়েটারে (বর্তমান রক্সী), নিজের জোড়াসাঁকোর বাড়ীর (মহর্ষিভবনের) উঠানে, নিউ এম্পায়ার, ছায়া সিনেমা ও কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে (বর্তমানে শ্রীসিনেমা) তাঁর অভিনয়ের আসর বসতে দেখেছি। রঙ্গমঞ্চের গঠনে তাঁকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে দেখা গেছে জোড়াসাঁকোর বাড়ীর উঠানে: কখনও বাংলার পল্লীগ্রামের চন্ডীমন্ডপ আবার কখনও সাঁচীর তোরণ ও প্রাচীর সম্মুখস্থ চত্বর হয়ে উঠেছে তাঁর রঙ্গপীঠ। একটি প্রতীকধর্মী পটভূমিকার সামনে সমগ্র নাটক বা নৃত্যনাট্যটিকে মঞ্চস্থ করাই ছিল তাঁর রীতি। নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে যুগরুচির প্রতি কবির তীক্ষ্ন লক্ষ্য ছিল। তাই দেখি, প্রথমে যা ছিল 'রাজা রাণী', কুড়ি-পঁচিশ বছর পরে তাই সামান্য পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়াল 'ভৈরবের বলি' এবং বোধ করি, ১৯২৮ সালে মাত্র মূল কাহিনী বজায় রেখে ওরই নতুন রূপ হল 'তপতী'। তেমনই দেখা যায়, 'রাজা'র পরিবর্তিত রূপ 'অরূপ রতন' এবং সম্পূর্ণ নৃত্যনাট্য রূপ 'শাপমোচন'। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথ সাধারণ রঙ্গমঞ্চকে উপেক্ষা করলেও সাধারণ রঙ্গমঞ্চ কবিকে তথা তাঁর রচনাকে দর্শকসম্মুখে পেশ করেছেন ১৯১৪ সালের অক্টোবর মাসে তাঁর 'দিদি' গল্পটিকে 'অকলঙ্ক শশী' নামে মঞ্চস্থ করে। এর পরে ১৯২৫ থেকে পরপর চিরকুমার সভা (প্রজাপতির নির্বন্ধ), গৃহপ্রবেশ, বিসর্জন, শোধবোধ, পরিত্রাণ, শেষরক্ষা (গোড়ায় গলদ), যোগাযোগ প্রভৃতি রবীন্দ্র-রচনাকে বাংলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চ থেকে দর্শক-সমক্ষে উপস্থাপিত করা হয়।

কিন্তু ১৮৭২-এর ৭ ডিসেম্বরে বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্মকাল থেকে শুরু করে ১৯৪৪-এ ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বঙ্গীয় শাখা কর্তৃক বিজন ভট্টাচার্য প্রণীত 'নবান্ন' অভিনীত হবার আগে পর্যন্ত বাংলা নাটক এবং তার অভিনয় নিয়ে আর যা-কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যা-কিছু অগ্রগতি সমস্তই হয়েছে সাধারণ রঙ্গালয়েই, তার বাইরে নয়। নাটক-পাগল বাঙালী শুধু যে নাট্যাভিনয় দেখতেই ভালোবাসে, তাই নয়, তারা নিজেরাও সুযোগ-সুবিধা পেলেই অভিনয় করতে মেতে ওঠে। জন্মাবধিই দেখে আসছি কলকাতা শহরের পাড়ায় পাড়ায় অলিতে গলিতে সৌখীন নাট্যসমাজ, ড্রামাটিক ক্লাব, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও দেখেছি, প্রতিটি ক্লাবই বিশেষ কোনো মঞ্চসফল নাটক নিয়ে অভিনয় করতে উদ্যোগী হতেন এবং তাঁরা অভিনয় করতেন হয় কোনও সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ভাড়া করে, আর নয়ত প্রশস্ত বাড়ীর উঠানে বা কোনও খোলা জায়গায় ভাড়া-করা স্টেজ খাটিয়ে। ঘরের অভ্যন্তর, রাজ-দরবার, রাজ-পথ, নদীর ধার, গ্রাম্যপথ, জঙ্গল প্রভৃতি সকল দৃশ্যই থাকত পর্দায় অংকিত এবং সেই সব পর্দা প্রয়োজনানুসারে কপিকলের সাহায্যে ফেলা বা গোটানো হত। আমরা সৌখীন সম্প্রদায় দ্বারা কি শহরে, কি পল্লী-গ্রামে অভিনীত হতে দেখতুম 'প্রফুল্ল', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'সরলা', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'জনা', সাজাহান, আলিবাবা, জয়দেব, বিবাহ-বিভ্রাট, আবু হোসেন প্রভৃতি নাটক ও নাটিকা। এবং নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না যে, সৌখীন অভিনয়ে স্ত্রী-ভূমিকাগুলি অলঙ্কৃত করতেন পুরুষেরাই। আজ অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে, নারীচরিত্রে আমরা এমন কয়েকজন পুরুষকে আশ্চর্য সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করতে দেখেছি, যাঁরা কি সৌন্দর্যে, কি অভিনয়-

আঁধার পেরিয়ে/শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় এবং সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়। পরিচালনা : তপন সিংহ। ফটো : অমৃত

কুশলতায় সাধারণ মঞ্চের নামকরা অভিনেত্রী-দের অনায়াসেই পরাস্ত করতে পারতেন।

সাধারণ রংগমঞ্চের বাইরে নতুন কোনো অভিনয়ধারার প্রবর্তন বা দৃশ্য-সংস্থাপনায় লক্ষ্য করবার মতো কোনো নতুন পথনির্দেশ আমাদের নজরে না পড়লেও নতুন নাটক মঞ্চস্থ করবার ব্যাপারে কলকাতার দুটি নাট্যসংস্থাকে আমরা মাঝে মাঝে উদ্যোগী হতে দেখেছি। এক, বৌবাজারের 'আনন্দ পরিষদ' এবং দুই, বাগবাজারের শিশির ইনস্টিটিউট। মনে পড়ে, প্রথম সম্প্রদায় শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ'কে নাট্যাকারে মঞ্চস্থ করেছিলেন এবং দ্বিতীয় গোষ্ঠী বিধায়ক ভট্টাচার্যকে নাট্যকার রূপে নাট্যামোদীদের সামনে উপস্থাপিত করেন।

কিন্তু 'নবান্ন'-এর অভিনয়ই প্রথম দেখাল, নতুন নাটক নিয়ে নতুন অপরিচিত অভিনেতা-অভিনেত্রী নতুন আঙ্গিকে নাটককে মঞ্চস্থ করে অসামান্য জনপ্রিয়তা এবং আর্থিক সাফল্য লাভ করতে পারে। আমরা প্রথম দেখলুম, সাধারণ রঙ্গমঞ্চের বাইরেও অভিনেত্রী নিয়ে অভিনয় করা সম্ভব। অবশ্য এর আগে মধু বসু তাঁর 'ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্স'-এর বিভিন্ন অভিনয়ে স্ত্রী-ভূমিকাগুলি নারীদের দিয়েই অভিনয় করিয়েছিলেন। কিন্তু তথাকথিত 'ইঙ্গবঙ্গ সমাজের' নারীদের এম্পায়ার মঞ্চে অবতরণকে সাধারণ নাট্যামোদীরা ততটা গুরুত্ব দেননি। কিন্তু তৃপ্তি ভাদুড়ী বা শোভা সেনের মতো মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে যখন নাট্যনৈপুণ্য প্রদর্শন করে 'নবান্ন'-এর সামগ্রিক সাফল্যের অংশীদার হল, তখন আমাদের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মেয়েদের সামনে উপার্জনের একটি নতুন পথ খুলে গেল।

কলকাতার তিনটি বা চারটি সাধারণ রঙ্গালয় যখন তাদের নাটক অভিনয়ের জন্যে মাত্র বারবনিতাকুল থেকেই অভিনেত্রী সংগ্রহ করায় অভ্যস্ত, এক-দুই-তিন করে বহুরূপী, লিটল থিয়েটার, শৌভনিক প্রভৃতি নাট্য-সংস্থা জন্মগ্রহণ করল আমাদের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় থেকেই নটীনপুণা অভিনেত্রীদের দলস্থ করে। লিটল থিয়েটার উৎপল দত্তের নেতৃত্বে মিনার্ভা মঞ্চ ভাড়া নিয়ে সৌখীনতা পরিহার করে পেশাদারী বৃত্তি গ্রহণ করল। বহুরূপী মাঝে মাঝে নিউ এম্পায়ার মঞ্চ ভাড়া করে সাধারণের কাছে টিকিট বিক্রী করতে লাগলেন তাঁদের নাট্যা-ভিনয় দেখবার জন্যে। এবং শৌভনিক তাঁদের নিয়মিত নাট্যপ্রদর্শনী শুরু করলেন দক্ষিণ কলকাতায় নবগঠিত 'মুক্ত অঙ্গন' মঞ্চে। উৎপল দত্ত তাঁর সম্প্রদায়ের জন্যে নিজেই নাটক রচনা করতে লাগলেন। নাট্যরসিক দর্শকরা দেখল 'অংগার', 'ফেরারী ফৌজ', 'কল্লোল', 'তীর' প্রভৃতি নাটকের সার্থক অভিনয় এবং এই অভিনয়গুলির মাধ্যমে দেখতে পেল, নতুন নতুন মঞ্চআঙ্গিক ও দলগত অভিনয়ের—গ্রুপ অ্যাকটিংয়ের অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন। বহুরূপী মঞ্চস্থ করলেন রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' ও 'রাজা', ইবসেনের 'পুতুল খেলা', 'দশচক্র', গ্রীক নাটক 'রাজা ঈডিপাউস', বাদল সরকারের 'বাকী ইতিহাস' প্রভৃতি। এঁদের মঞ্চআঙ্গিক পরিচ্ছন্ন হলেও বিশেষ কোনো নবদিগন্তের ইঙ্গিত বহন করেনি। 'মুক্ত-অঙ্গন'-এর অপরিসর মঞ্চে এক-একটি প্রতীকধর্মী দৃশ্যের পটভূমিকাকে আশ্রয় করে শৌভনিক সম্প্রদায় তাঁদের নাটকগুলিকে মঞ্চস্থ করতে থাকলেন।

এঁদের দেখাদেখি আরও দল গড়ে উঠতে লাগল। উদ্দেশ্য একই—রথ দেখা এবং কলা বেচা। স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, নাটক করার শখ মেটানোর সঙ্গে সঙ্গে কিছু অর্থ উপার্জনের চেষ্টা রয়েছে প্রতিটি গোষ্ঠীরই। প্রত্যেকেরই কাছে নাট্যাভিনয় হচ্ছে পথ এবং পাথেয়। আগে যা ছিল 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর সামিল', আজ তাই হয়ে উঠেছে বেশীর ভাগ নাট্যআন্দোলনকারীর কাছেই রুজি-রোজগারের একমাত্র পথ। রাজ-নৈতিক চেতনা যে কারুকে কারুকে নাটক রচনায় ও তাকে মঞ্চস্থ করায় উদ্বুদ্ধ করে না, এমন কথা বলি না। কিন্তু 'ক্যালকাটা থিয়েটার'এর প্রতিষ্ঠান, নট-নাট্যকার-নাট্য-প্রযোজক বিজন ভট্টাচার্যের মতো আদর্শ-বাদীদের এক আঙুলে গোনা যায়। কিন্তু বেশীরভাগই তাঁদের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রেখেছেন টিকিটঘরের দিকে; তাঁদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থোপার্জন। এবং এর জন্যে তারা 'ছেড়ে দিলুম পথটা, বদলে ফেললুম মতটা' করতেও পিছপা নন। তাই দেখি, বহু একাঙ্ক ও পূর্ণাঙ্গ নাটকের মধ্যে নাটকের মতো নাটক 'কোটিকে গোটিক' এবং তাদের অভিনয়ে না দেখি কোনো নতুন ধারা, না মেলে কোনো নতুন দিগন্তের ইঙ্গিত।

নান্দীকর

চাঁদনী/পরিচালক তরুণ মজুমদার ও সন্ধ্যা রায়। ফটো : অমৃত

চিত্রসমালোচনা

তথ্যচিত্র 'নেতাজী'

নেতাজীর জন্মদিন বাঙালীর কাছে একটি অত্যন্ত পুণ্যদিন। তাই তাঁর জন্ম-সপ্তাহের আগেই ২০ জানুয়ারীতে ফিল্মস ডিভিসন (পূর্বাঞ্চল) তরুণ চৌধুরী পরিচালিত দু' রীলের তথ্যচিত্র 'নেতাজী'র শুভ মুক্তির ব্যবস্থা ক'রে একটি আনন্দ-দায়ক কাজ করেছেন। শ্রীচৌধুরী কৃত ছবিটি নেতাজীর জীবনের বহু স্মরণীয় ঘটনা সম্পর্কিত স্থিরচিত্র ও চলচ্চিত্রখণ্ডের সমন্বয়ে গঠিত। তারই সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে নতুন তোলা নেতাজীর কয়েকটি স্ট্যাচুর চলচ্চিত্র, আই-এন-এর পূর্বভারতীয় রণাঙ্গন কোহিমা অঞ্চলের চলচ্চিত্র প্রভৃতি। 'কংগ্রেস ছাড়বার পরে আমি কি করব', নেতাজীর এই স্মরণীয় উক্তি দিয়ে ছবিটির শুরু। পরে আসে টাইটেল এবং তার পরে নেতাজীর জন্ম থেকে আরম্ভ করে তাঁর আই-সি-এস পরীক্ষা দেওয়া, দেশজননীর ডাকে দেশবন্ধুর নির্দেশে স্বাধীনতা ব্রতে আত্মবিসর্জন করা, ১৯৪১-এর সেই স্মরণীয় রাত্রে বাসভবন ত্যাগ ক'রে কাবুলের পথে পাড়ি দেওয়া, জার্মানী পৌঁছে হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর আই-এন-এ সৈন্যদল গঠন, সাবমেরিণে ক'রে জাপানে পাড়ি দেওয়া, রাসবিহারী বসু কর্তৃক সুভাষচন্দ্রকে ইণ্ডিয়ান ইনডিপেণ্ডেন্স লীগের সর্বময় কর্তৃত্ব দান, তাঁর স্বাধীন ভারত-সরকার গঠন ও 'দিল্লী চলো' অভিযান, প্রকৃতির নির্মম বিরুদ্ধতায় সঙ্কল্প সিদ্ধির পথে বাধা ইত্যাদি বহু উত্তেজক প্রকৃত তথ্যসম্ভারে ছবিটি সমৃদ্ধ। প্রথমে ডঃ শিশির বসুর ও পরে বিখ্যাত ভাষ্যকার প্রতাপচন্দ্রের নেপথ্য ভাষণ ছবিটিকে একটি বিশেষ মর্যাদামণ্ডিত করেছে। এই তথ্য-বহুল 'নেতাজী' ছবিটির প্রতি আমরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বিবিধ সংবাদ

নকল সোনা : হিমাংশু চক্রবর্তী প্রযোজিত নবজাত প্রোডাকসন্সের নতুন আঙ্গিকের ছবি 'নকল সোনা' খুব শীগগিরই (এ মাসের মাঝামাঝি) বসুশ্রী, বীণা ও শহরতলীর অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তি লাভ করবে। বাংলার চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্পী, গীতিকার, সুরকার, সংগীত শিল্পী, প্রযোজক ও অন্যান্য কলা-কুশলীদের জীবনের প্রতিদিনের হাসিকান্না, ব্যথা বেদনাকে কেন্দ্র করে ছবিটির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন—বহু সফল ছবির পরিচালক অরবিন্দ মুখার্জী। সুর সৃষ্টি করেছেন নচিকেতা ঘোষ। নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন—হেমন্ত মুখার্জি, সন্ধ্যা মুখার্জি, শ্যামল মিত্র ও স্বপ্না দাশগুপ্তা। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে বিজয় ঘোষ ও অমিয় মুখার্জী।

চরিত্র চিত্রণে আছেন—বাংলাদেশের শিল্পী ও কলাকুশলীদের প্রায় সকলেই। ছবিটিতে কলাকুশলী, শিল্পী, প্রচারসচিব, সম্পাদক ইত্যাদি প্রতিটি বিভাগের কর্মীরা স্বনামে এবং স্বীয় চরিত্রে রূপদান করেছেন। বহু বিশিষ্ট শিল্পীদের সঙ্গে এ-ছবিতে যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে —কল্যাণী, পিনাকী সেনগুপ্ত (অপুর সংসার খ্যাত), নবাগতা রূপা চৌধুরী সাবিত্রী চ্যাটার্জি, সর্বেন্দ্র, জহর রায় রবীন মজুমদার, চিন্ময় রায়, কৃষ্ণা বসু, জগদীশ মণ্ডল, কাজল মজুমদার, শ্রীকান্ত গুহঠাকুরতা, পারিজাত বসু, মনীশ দাশগুপ্ত, শ্যামসুন্দর ঘোষ, নচিকেতা ঘোষ, শ্রীপঞ্চানন, শ্যামল মিত্র, হেমন্ত মুখার্জি, হিমাংশু চক্রবর্তী, পরিচালক পিনাকী মুখার্জি, পরিচালক অরবিন্দ মুখার্জি, চিত্রগ্রাহক বিজয় ঘোষ, সম্পাদক অমিয় মুখার্জি, তপতী দেবী, বাসন্তী চ্যাটার্জি, মৃণাল মুখার্জি, নবেন্দু চ্যাটার্জি, পার্থ মুখার্জি ইত্যাদি সব মিলে প্রায় ১০৮ জনকে দেখা যাবে। মিলি পিকচার্স ছবিটির পরিবেশক।

সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান—পদাবলী সংস্থা আসছে ২৪ জানুয়ারী সন্ধ্যা ৭টায় রবীন্দ্র সদনে প্রখ্যাত মূকাভিনেতা যোগেশ দত্তের সফল ইউরোপ সফরের জন্য এক বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ও পরে তাঁরই মূকাভিনয়ের আয়োজন করেছেন। এই অনুষ্ঠানে নেপথ্যে অংশ গ্রহণ করবেন তাপস সেন (আলো), সুরেশ দত্ত (মঞ্চ), খালেদ চৌধুরী (পোশাক), দীপক চৌধুরী (সংগীত) এবং অনন্ত দাস (রূপসজ্জা)। শ্রীদত্ত এবার কয়েকটি নতুন মূকাভিনয় দেখাবেন।

মল্লিকা : বীরেশ্বর বসু পরিচালিত রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' ছবির চিত্রগ্রহণ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। শ্রীবসু তাঁর পরবর্তী ছবির জন্য জরাসন্ধের 'মল্লিকা'র চিত্রস্বত্ব কিনেছেন। সবিতা চিত্রমের পতাকাতলে ছবিটির চিত্রগ্রহণ শীগগিরই সুরু হচ্ছে।

বিধাননগরে ইন্দ্রজাল : গত ২৯ ডিসেম্বর ৭৪তম কংগ্রেস অধিবেশনের শেষ দিন। এই বিশেষ দিনটির সাংস্কৃতিক মঞ্চে অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ ছিল যাদুকর মদন কুণ্ডুর ইন্দ্রজাল। হাজার হাজার দর্শক ও প্রতিনিধিদের সামনে শ্রীকুণ্ডু তাঁর দল-বলসহ এক আকর্ষণীয় ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করেন। মদন কুণ্ডু সর্বপ্রথমে যে খেলাটি দেখান সেটি হচ্ছে একটি লেখা থেকে। লেখাটি হঠাৎ একটি পতাকায় পরিণত হবার পর মুহূর্তে ইন্দিরা গান্ধীর সহাস্য [illegible] দেখা যায়।

এই খেলাটি দেখে দর্শকগণ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। এরপর মদন কুণ্ডু যে সমস্ত খেলাগুলি দেখান সেগুলিও কম বিস্ময়কর নয়, যেমন স্পুটনিক মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে তুচ্ছ করে উড়ে যাচ্ছে জীবন্ত একটি মেয়ে হাওয়াতে ভেসে দর্শকদের নমস্কার জানাচ্ছেন ইত্যাদি।

অনুষ্ঠানের শেষে ২২ বছরের যুবক মদন কুণ্ডুর আশ্চর্যজনক ইন্দ্রজালে মুগ্ধ হয়ে হাজার হাজার দর্শক করতালি দিয়ে যাদুকরকে অভিনন্দন জানান।

তাছাড়া গত ২রা জানুয়ারী মদন কুণ্ডু কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে একটি অনুষ্ঠানে ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করেন। এখানেও তিনি তাঁর অদ্ভুত ধরনের বিস্ময়কর খেলাগুলি দেখিয়ে সাংবাদিকদের বিস্মিত করে দেন।

বিদেশে যোগেশ দত্তের মূকাভিনয় : ভারতীয় মূকাভিনয়ের পথিকৃত শ্রীযোগেশ দত্ত সম্প্রতি বার্লিন, ফ্রান্স, লণ্ডন ও ইউ-রোপের অন্যান্য কয়েকটি স্থানে মূকাভিনয় পরিবেশন করে ভারতীয় মূকাভিনয়ের

ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায় সংযোজিত করেছেন। বিদেশী সংবাদপত্র ভারতীয় মূকাভিনয়ের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষ সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে। এক সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীদত্ত ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রের অভিনয় অধ্যায় এবং কথাকলি ও ভারতনাট্যম নৃত্যকে ভারতীয় মূকাভিনয়ের ব্যাকরণ বলে আখ্যা দেন। পাশ্চাত্যের কোন প্রভাবই এর ওপর নাই।

শ্রীদত্তের মূকাভিনয়ের বেশীরভাগ বিষয়-বস্তু ভারতীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাব-ধারার উপর ভিত্তি করে রচিত ও পরিবেশিত। বিদেশী সংবাদপত্রগুলির মতে শ্রীদত্তের মূকাভিনয়ের মান ফ্রান্সের তথা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মূকাভিনেতা মার্শেল মার্সের মূকাভিনয়ের সমতুল্য। একটি বিদেশী সংবাদপত্রের উক্তি : 'সমগ্র বিশ্বে মূকাভিনয় শিল্প হিসাবে বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং তার উৎকর্ষে শ্রীদত্তের অবদান অনস্বীকার্য।'

পরলোকে শিল্পনির্দেশক অনুপ কাকোড়

থান্ডালাতে একটি ছবির কাজ করতে করতে শিল্পনির্দেশক অনুপ. আর. কাকোড় হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ২৫ ডিসেম্বরে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৫২ বছর।

মঞ্চাভিনয়

দুটি সুঅভিনীত একাংকিকা :

কিছুদিন আগে দুটি একাংকিকা বেশ সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হোল থিয়েটার সেন্টারে। একাংক নাটক দুটি হোল 'ওই ওরা আসে' ও 'পাতা ঝরে যায়'। প্রযোজনা করলেন 'ঋতচোরা' গোষ্ঠীর শিল্পীরা।

গতিবেগসমৃদ্ধ প্রথম নাটকটির সংঘাত দুর্বার হয়ে উঠেছে গ্রাম্য পটভূমিকায় এক চাষী, তার স্ত্রী, সুদখোর মহাজন আর কালেক্টারকে কেন্দ্র করে। ঘটনার মধ্যে যথেষ্ট জীবন থাকায় নাটকীয় গতিও তীব্রতর হোতে পেরেছে প্রায় প্রতিটি মুহূর্তেই। নাটকটির সংলাপও গভীরতম শিল্পবোধের পরিচয় বহন করে। অভিনয়েও শিল্পীরা অনেক ক্ষেত্রেই বৈশিষ্ট্যের নজীর রাখতে পেরেছেন। সুদখোর মহাজন 'পঞ্চা ডোাই' চরিত্রে চুণীলাল দাশগুপ্ত সুন্দর সপ্রতিভ অভিনয় করেছেন। আর একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্রচিত্রণ হোল অমল দত্তের 'রাজু'। নাটকটির অন্য দুটি বিশিষ্ট চরিত্রে ছিলেন চুনী ভট্টাচার্য ও আরতি ঘোষ।

পরের নাটক 'পাতা ঝরে যায়' মনস্তত্ত্বের আলোকে লেখা। মূলত তিনটি চরিত্রশিল্পীই এই নাটকের গতিবেগে প্রাণ দিয়েছে। এই তিনটি চরিত্রে প্রাণবন্ত অভিনয় করেন রঞ্জিত মন্ডল, শম্ভুনাথ সাহা, উৎপল দত্ত। নাটকের অন্যান্য শিল্পীতালিকায় ছিলেন শুভ লাহিড়ী, অধীর ভট্টাচার্য, অঞ্জন বড়ুয়া, ভোলানাথ বিশ্বাস, প্রশান্ত রায়চৌধুরী, মনোরঞ্জন মুখার্জি, আশিস বসু, বুলা ভৌমিক।

ভিক্ষুক : নীতিহীনতা, প্রচন্ড লোভ ও মানবিক মূল্যবোধের চরম বিপর্যয় আমাদের সমাজজীবনকে একদিকে যেমন আচ্ছন্ন করে ফেলতে চাইছে, তেমনি অন্যদিকে আমরা চাইছি এই অন্ধকার থেকে আলোর পৃথিবীতে উত্তরণ, যেখানে আমরা আমাদের স্বকীয় মূল্যবোধে গড়ে উঠতে পারবো। রাজদূত রচিত 'ভিক্ষুক' নাটকটি বোধ হয় এই দিকেই ইংগিত দিয়েছে। নাটকটি সমস্যা তুলেই শেষ হয়ে যায়নি, সমাধানের বেশ কিছু আভাসও আছে এই নাটকে। জীবনরস সম্বন্ধে এই নাটকটি কিছুদিন আগে 'বালীগঞ্জ শিক্ষাসদন' মঞ্চে পরিবেশন করলেন 'সাউন্ড অফ মিউজিক' গোষ্ঠীর শিল্পীরা। প্রয়োগপরিকল্পনায় বেশ কিছু নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন সত্যরঞ্জন বসু।

সুপ্রযোজিত এই নাটকটির বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন গোপাল রায়, বিশ্বনাথ ঘোষ, শঙ্কর নাগ, দিলীপ সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব গুহ, কমল সাহা, রঞ্জিত বোস, জ্যোতিষ ভৌমিক, কল্যাণী দেব, অসীম চ্যাটার্জি, বিজন মুখার্জি।

ফেরারী ফৌজ : গত ১১ ডিসেম্বর, '৭২ কমার্শিয়াল রিক্রিয়েশন ক্লাব (ইস্টার্ন রেলওয়ে, চিৎপুর) তাদের দশম নাট্যার্ঘ্য উপলক্ষে উৎপল দত্তের মঞ্চসফল 'ফেরারী ফৌজ' নাটকটি সুহাস ভট্টাচার্যের দক্ষ পরিচালনায় সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। এদের দলগত সংহতি প্রশংসনীয়। অভিনয়ের বিচারের দিক থেকে হিতেন দাশগুপ্তের চরিত্র-চিত্রণে বলরাম রায় সর্বোত্তম। শ্রীরায়ের ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারায় ও বলিষ্ঠ কন্ঠের অভিনয় মাধ্যমে চরিত্রটি হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। তাকে মানিয়েছেও চরিত্রানুগ। এর পরই উচ্চমানের অভিনয় করেন নারায়ণ গাঙ্গুলী (জ্যোতির্ময়), শৈলেন মজুমদার (যোগীন) ও হরিশঙ্কর চক্রবর্তী (অশোক)। যথাক্রমে বঙ্গবাসী ও রাধা চরিত্রে চিত্র ও মঞ্চখ্যাতা মলিনা দেবী ও নীলিমা দাস স্মরণীয় অভিনয়ে তাদের পূর্ব যশ অক্ষুন্ন রাখেন। অন্যান্য চরিত্রে প্রশংসার দাবী রাখেন—সুহাস চক্রবর্তী, অশ্বিনী ঘোষ, হিরণ্য চ্যাটার্জি, মাখন দত্তচৌধুরী, সরোজ পোদ্দার, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, সন্তোষ সমাজপতি, রবি রায়, মৃত্যুঞ্জয় গুপ্ত, দেবু সান্যাল, হরিপদ পাল ও অধীর কর। রুণু বড়াল স্ত্রী-চরিত্রে শচীর ভূমিকায় তার সম্ভাবনাময় প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। শ্রীমতী বড়ালের সৃষ্ট শচী, বহুদিন মনে রাখার মত। গোপা চরিত্রে শিশু-শিল্পী ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী সুঅভিনয় করে। মুকুন্দ দাস এর চরিত্রে অলোক বাগচী তার কন্ঠসংগীতে দর্শকচিত্ত জয় করতে সক্ষম হন। আলোর কাজ যথাযথ। ধ্বনি ও আবহসংগীত সুপ্রযুক্ত।

সাহাজান অভিনয়

অ্যালায়েন্স অ্যাসিওরেন্স গ্রুপ এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সভ্যবৃন্দ সম্প্রতি বিশ্বরূপা মঞ্চে অভিনয় করেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ঐতিহাসিক নাটক 'সাজাহান'। বাংলা নাটকের ইতিহাসে 'সাজাহান'-এর অভিনয় প্রবাদ বাক্যের মতো প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তাই এ সম্পর্কে অতিরিক্ত কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। যা বলার দাবি রাখে তা হলো এ'দের অভিনয়। অফিস দলে এরকম শক্তি-শালী নাট্য-প্রযোজনা খুব একটা চোখে পড়ে না। সেদিনের অভিনয়ে নাটকের চরিত্রের অন্তর্লীন নির্যাস প্রতিটি দর্শকের অন্তর স্পর্শ করেছে। প্রথমেই উল্লেখ করতে

ও সাজাহান চরিত্রাভিনেতা শ্রীহেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। পুত্র স্নেহান্ধ সম্রাটের চরিত্রের এটি একটি সার্থক রূপায়ণ। তাঁর হাঁটা, চলা, কথা বলার ভঙ্গি উচ্চ প্রশংসার দাবি রাখে। তারপরেই যার কথা আসে তিনি হলেন শ্রীবিমল বন্দ্যোপাধ্যায়। ঔরংজেব চরিত্রে তাঁর অভিনয় সহজ সুন্দর এবং স্বাভাবিক। জয়সিংহ চরিত্রে রাধারমণ ভট্টাচার্যকে ভাল লাগে। কিন্তু নাটকের অন্যতম মুখ্য চরিত্র দিলদারের ভূমিকায় শ্রীসন্তোষকুমার দাস অত্যন্ত খেলো অভিনয় করেছেন। অন্যান্য চরিত্র যখন অভিনয় কুশলতায় রীতিমত সাড়া জাগিয়েছে তখন এই এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতান্ত নিস্প্রভ মনে হয়েছে। এই ত্রুটি বাদ দিলে সাজাহান নাট্য প্রযোজনা নিঃসন্দেহে সার্থক হয়েছে। অন্যান্য চরিত্রে সুঅভিনয়ে উল্লেখের দাবি রাখেন সর্বশ্রী অলোক মিত্র, সমীরকুমার হালদার, শ্যামল ঘোষ প্রমুখ।

পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেন চলচ্চিত্র-খ্যাত শ্রীহারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রফুল্ল অভিনয় :

সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিকস এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাব বাংলা সাধারণ নাট্যশালার শতবর্ষ পূর্তি ও কর্মীদের ত্রয়োদশ বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে রঙ্গনায় প্রফুল্ল নাটক অভিনয় করেন ২৭ ডিসেম্বর। পরিচালনা করেন সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য। যোগেশের ভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রমেশের ভূমিকায় হীরেন্দ্রকুমার বসু সুন্দর অভিনয় করেন। অজিত ঘোষ, দেবাশিষ সেন, হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাবল্লভ দাশ, সত্যেন রায়চৌধুরী, জয়দেব সাহা, চিত্রিতা মণ্ডল, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, ইরা মিত্র, মেনকা দাসের অভিনয়ও উল্লেখ করবার মত।

২৯ ডিসেম্বর 'পথের দাবী' পরিচালনা করেন সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য। হীরেন্দ্রকুমার বসু, রবীন্দ্রনাথ রায়, অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত ঘোষ, জয়দেব সাহা, হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জিত দাশ, সত্যেন চৌধুরী, রাধাবল্লভ দাশ, বিজয় চক্রবর্তী, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, শিপ্রা সাহা, ইরা মিত্র, মেনকা দাশের অভিনয় বিশেষ দাগ কেটে যায় দর্শকদের ওপর।

স্টুডেন্টস থিয়েটার গ্রুপ : বাংলা সাধারণ নাট্যশালার শতবর্ষ পূর্তি উৎসবে হালিশহর স্টুডেন্টস থিয়েটার গ্রুপ সম্প্রতি মঞ্চস্থ করলেন দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ'। পরদিন যুগপূর্তি উৎসবে এই সংস্থার শিল্পীরা আরও মঞ্চস্থ করেন সৌরীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'নবান্ন', অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নানা রংয়ের দিন'। এদিন নৈহাটীর সপ্তর্ষি নাট্যসংস্থা মঞ্চস্থ করেন রতনকুমার ঘোষের 'সমুদ্র সন্ধানে'। উভয় দিনের অনুষ্ঠান স্থানীয় দর্শকদের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়। স্টুডেন্টস থিয়েটার গ্রুপের তরফে নাটকগুলি পরিচালনা করেন প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়। উক্ত সংস্থার আয়োজনায় অষ্টম বার্ষিক একাংক নাট্য প্রতিযোগিতাও এবার যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হল। স্থানীয় দর্শকরা প্রত্যেকেই একবাক্যে স্বীকার করলেন এ-ধরনের অনুষ্ঠান হালিশহরে কোনদিন হয়নি। প্রতিযোগিতার ফলাফল নিম্নরূপ : সামগ্রিক প্রযোজনায় (১ম) দক্ষিণেশ্বরের 'সৌভিক' এঁরা মঞ্চস্থ করেছিলেন অমল রায়ের 'কেন না মানুষ'। এছাড়া এই সংস্থা আরও যে যে পুরস্কার পান তা হল : শ্রেষ্ঠ অভিনেতা গৌতম মুখোপাধ্যায়, দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা মনোরঞ্জন ঘড়া, দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ পরিচালক গৌতম মুখোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুলিপির নাট্যকার অমল রায়। এই প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন যথাক্রমে শিল্পীলোক (ভাটপাড়া) এবং যুগ্মভাবে আদি মৈত্রী সংঘ (নৈহাটী) ও শ্বেতকরবী (কলিকাতা)।

নহবত : সত্য ব্যানার্জির প্রাণচঞ্চল নাটক 'নহবত' সম্প্রতি গ্রীভস কটন রিক্রিয়েশন ক্লাব পরিবেশন করলেন 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে। হীরালাল ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় সুঅভিনীত এই নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন প্রকৃতি সাহু, অতীশ চক্রবর্তী, হীরালাল ভট্টাচার্য সীতানাথ পাল অরুণ চক্রবর্তী, সত্যেন দত্ত, দীপক বসু, দীপেন সরকার, প্রণব ঘোষ, রত্না ঘোষাল গীতা নাগ, অনল সরকার, মানিক ভট্টাচার্য যুগল পাইন, পরেশ ব্যানার্জি, কানাই পাত্র, তড়িৎ চ্যাটার্জি, সমর পাল, কবিতা সুর।

নীলদর্পণ : দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রামাটিক ক্লাব সম্প্রতি 'নীল-দর্পণ' নাটকটির অভিনয় করলেন 'রবীন্দ্রসদনে'। নাটকটির নির্দেশনায় বীরু মুখার্জি অসামান্য শিল্পবোধের পরিচয় রাখতে পেরেছেন। প্রধান চরিত্রগুলোতে যাঁরা ছিলেন তাঁরা হোলেন বিভূতি ঘোষ গৌর শ্রীমানি, সুকুমার মাইতি, পি কে মণ্ডল, কল্যাণী অধিকারী, অনুরাধা গুপ্তা, প্রভাত ভট্টাচার্য হরিনারায়ণ চক্রবর্তী, শাশ্বতী রায়, গীতা কর্মকার।

অন্যান্য কয়েকটি ভূমিকায় ছিলেন হরদেব মুখার্জি, নিরঞ্জন দত্ত, দিলীপ রায়চৌধুরী, চিত্তরঞ্জন দাস, দেবু রায়-চৌধুরী, রমেশ বসুচৌধুরী, শিবু মুখার্জি, মঞ্জুশ্রী বসু, অমর ঘোষ, ধ্রুব বিশ্বাস।

পাথরের চোখ : শচীন ভট্টাচার্যের 'পাথরের চোখ' নাটকটি সম্প্রতি 'প্রতাপ' মঞ্চে অভিনীত হোল। অভিনয়ের আয়োজন করেন 'রঙ্গশিল্পী নাট্যগোষ্ঠী'র শিল্পী সদস্যরা। নাটকটি যে পরিবেশনায় সুন্দর হয়ে ওঠে, তার জন্য প্রশংসা যেমন নির্দেশক রবীন কুমার দাবী করতে পারেন, তেমনই তার একই রকম কৃতিত্বের অধিকারী শিল্পীরা।

বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন বন্দনা বিশ্বাস, প্রভাত মুখার্জি, গণেশ ঘোষ, অমিতাভ মুখার্জি, রবীন কুমার, রাধাকান্ত করণ, দুলাল দে, প্রভাত সরকার, বীরেন দাস, লাহা দাস, অশোক মজুমদার, খোকন মুখার্জি।

যুগলবন্দী—রবিশঙ্কর এবং আলি আকবর খাঁ

অবিস্মরণীয় যুগলবন্দী

সিংহী পার্কে চলন্তিকা আয়োজিত আলি আকবর ও রবিশঙ্করের যুগলবন্দী সঙ্গীতজগতে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। [illegible]

প্রথমতঃ বহুদিন বাদে এঁদের যুগলবন্দী। দ্বিতীয়তঃ বহুদিন বাদে সেই প্যাণ্ডেলে এই ধরনের অনুষ্ঠান শোনা গেল, যে প্যাণ্ডেলের অব্যবস্থা সঙ্গীতের পরিবেশ বিশৃঙ্খল করবার পক্ষে যথেষ্ট। প্রবেশপত্র ক্রেতারা শীতের সন্ধ্যায় পশ্চাৎপটে কোনোরকম ছাউনির অভাবে এবং নম্বরহীন সীটের অবন্দোবস্তে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। প্রায় চার হাজার দর্শকের প্রবেশের একটিই দ্বার, যা আধহাত করে খুলে এক একজনকে প্রবেশ করানো হয়েছে।

কিন্তু বাংলাদেশের সঙ্গীতানুরাগীদের পূজোর মত নিষ্ঠাকে আর একবার বিস্মিত শ্রদ্ধায় প্রত্যক্ষ করলাম। আর দেখলাম কি অপরিসীম শ্রদ্ধা তাদের আলি আকবর ও রবিশঙ্করের ওপর। তাই এখনকার এই অস্থিরতার যুগেই এই আয়াসসাধ্য পরিবেশকেও এঁরা নীরবে, অবিচলিতচিত্তে মানিয়ে নিয়ে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছেন তাঁদের বড় আদরের শিল্পীযুগলের বাজনা শোনবার জন্য। শিল্পীরাও অগণিত ভক্তবৃন্দের যথোচিত মর্যাদা রেখেছেন। অনুপ্রেরিত শিল্পীদের বাজনা মধ্যরাতের সীমাকেও অতিক্রম করেছে, আর শ্রোতারা উপভোগ করেছে প্রতিটি মুহূর্তের রোমাঞ্চ। কখনও সমুদ্রের ঢেউএর মত কত ছন্দের, লয়ের ওঠাপড়া—দুই মহাশিল্পীর নানারঙা রাগের ভাষায় কথা বলাবলি। এখনকার সঙ্গীতাসরের শ্রোতাদের জীবনে এমন মুহূর্ত বড় একটা আসে না।

শুরু হোলো 'মারবা' রাগের আলাপ দিয়ে। পরিমিত পরিসরে সীমিত আধারে এঁরা মেলে ধরলেন অসীমের ব্যঞ্জনা। বিলম্বিত অংশের সুরবিস্তারে কখনও একটি কখনও দুটি স্বরের ক্রম-উন্মীলনে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শ্রুতির কখনও অস্ফুট মৃদু অনুরণনে কখনও মন্দ্ররবে রাগরূপ আভাসিত হোলো ভারতীয় ধ্রুপদী ঐতিহ্যের শুদ্ধতায়। জোড়ের অংশে ছন্দ ও সুরের বিন্যাসে উভয়ের কল্পনার বিপুল বিস্তারের ইন্দ্রধনু ঘেরা অভ্রমিনার যেন মূর্ত হয়ে ওঠে। ক্ল্যাসিক্যাল মর্যাদার সঙ্গে রংবাহারের অভিনব সমাবেশে দুই সৃষ্টিধর্মী শিল্পী তাঁদের সঙ্গীতভাবনার মুঠো মুঠো ঐশ্বর্য ছড়িয়ে দিলেন।

ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। বছরের পর বছর বিদেশী পরিবেশে বিদেশী শ্রোতাদের মাঝে থেকেও ভারতীয় সঙ্গীতের অন্তর্মুখীন ধ্যানলোকে এক লহমায় পৌঁছে গেলেন কেমন করে? গুরুর আশীর্বাদ? দীর্ঘদিনের অনলস সাধনা? না, বিধিদত্ত অলোকসম্ভব প্রতিভা? হয়ত এতগুলি সম্পদের এই বিরল সমন্বয়েই সঙ্গীতজগতে এঁরা এমন আশ্চর্য অঘটন ঘটাতে পারেন।

জোড়ের অংশে বিদ্যুৎঝলকের মত আলি আকবরের সাপটের উত্তরে রবিশঙ্করের জুড়ির তারের গমক, রবিশঙ্করের মুক্তোর মত নিটোল জমজমার নূপুরেশের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আলি আকবরের আবেগের প্রকাশকুণ্ঠ লাজুক বেদনায় রসসিক্ত চাপা আবেগ যে বৈপরীত্যের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে তা যেন রঙিন ধ্বনিরেখার একটি কবিতা। আর নানা পর্দার রূপমাধুর্য সৃষ্টি করেও 'মারবা' রাগের আধ্যাত্মিক মর্যাদা যেন কেন্দ্রীভূত রসের মতই সকল সৌন্দর্যকে এক সংহত গাম্ভীর্যে ভূষিত করেছে। বিশেষ করে যেখানে ধৈবতের প্রাপ্য মিটিয়েও 'সা'এর সাসপেন্স বজায় রাখা? আর সকলকে চমকে দিয়ে আকস্মিকতায় শ্রোতাদের চিত্তকে দুলিয়ে দিয়ে আলতোভাবে 'সা'-য় ফেরার সঙ্গে সঙ্গে দুজনের হাসি বিনিময়ের মুহূর্তে ওঁদের মনে হয়েছে গন্ধর্বলোকের বাসিন্দা, স্বচ্ছ-বিহারেই যাঁরা বেঁচে থাকেন।

দ্বিতীয় রাগ 'দেশ'। এ রাগে বিরহ-বেদনা আছে কিন্তু সেটা যেন দয়িতের জন্য দয়িতার নয়, বন্ধুর জন্য বন্ধুর। আবেগমধুর আকুলতার তীব্র দুই শিল্পী-বন্ধু যেন এসে পৌঁছলেন, বহু যুগ বাদে। আর দীর্ঘদিনের অদর্শনের উদ্বেল আর্তি কখনও রেখাব পঞ্চমের গমকে মীড়ের সূক্ষ্ম কল্পনায় যে রসরূপে পৌঁছেছিল তা কি কল্পনাতে আনতে পারতাম যদি না সে কল্পলোক সৃষ্টি করে মেলে ধরতেন স্বয়ং আলিবাব? আলি আকবরের এক

একটি 'বাজ' যেন গুহার ভেতর থেকে গমগম করে উঠছিল, সেই নাদধ্বনিকে নানান অলঙ্কারে সাজিয়ে দিলেন রবিশঙ্কর। চোখের সামনে যে রূপ ভেসে উঠল তা শুধু 'দেশ' রাগেরই রূপ নয়,—এ হোলো আলি আকবর রবিশঙ্করের মিলিত শিল্পরূপ, যা সঙ্গীতভাবনার যুগচিহ্নিত বরেণ্য মূর্তি। এর পরেই এলেন 'মিশ্র পিলু'-তে ভালবাসার মধুরতম অধ্যায়ে। এখানে প্রেমিক-প্রেমিকার নানা উচ্ছ্বাসের কত না রংবাহার। কখনও ভাটিয়ালির ধ্যানে বিভোর, কখনও ছায়ানটের নৃত্য-উচ্ছল, কখনও শিবরঞ্জনীর রোমান্স আবার বাহারের নূপুরধ্বনিতে দুই শিল্পী রং ও রসের অফুরণে উৎসবের সীমায় উঠে বিশেষ অনুরোধে সমাপ্ত করলেন 'সিন্ধু ভৈরবী'র সিন্ধু প্রার্থনায়।

আর আল্লা রাখা? দুই শিল্পীর রাঙা হৃদয়কে ছন্দের মেল-বাঁধনে বেঁধে আনন্দযজ্ঞকে পূর্ণ করলেন। তাই বলছিলাম, এমন সার্থক মুহূর্ত শ্রোতাদের জীবনে দুর্লভ।

গাঙ্গুলি কলেজ অফ মিউজিকের বার্ষিক অনুষ্ঠান: ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে জমে উঠেছিল গাঙ্গুলি কলেজ অফ মিউজিকের বার্ষিক সঙ্গীত সম্মেলনের মুখর সুর ও ছন্দে। স্থানীয় শিল্পীদের নিয়েই অনুষ্ঠান। রস উপভোগ ছাড়াও সঙ্গীতমত্ত কলকাতায় শিল্পীরা তাঁদের শিক্ষা ও সাধনায় কতটা এগিয়ে চলেছেন তারও একটা হিসেবনিকেশ পাওয়া গেল।

প্রথম সন্ধ্যার আকর্ষণীয় শিল্পী ছিলেন মণিলাল নাগ। ইনি বাজালেন হেমন্ত। বর্তমান তরুণের গোষ্ঠীর যন্ত্রবাদকদের মধ্যে মণিলাল এর মধ্যেই একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন—শুধু প্রতিভার কারণেই নয়—অনুশীলন ও অধ্যবসায়ের প্রসাদে ইনি এগিয়ে চলেছেন এক বিশেষ [illegible] নি। এ'র সম্বন্ধে এইটিই হল পরিবেশনযোগ্য সংবাদ।

সেদিন ইনি বাজান হেমন্ত'। গুরু আলাউদ্দিন সাহেবের এই রাগ আলাউদ্দিন ঘরানার সকল বৈশিষ্ট্যেই পরিবেশিত হয়েছে। রাগের ভাবের প্রতি সতর্ক প্রহরা রেখেছেন। এই পরিমিতিবোধেই যথার্থ শিল্পীমনের পরিচয় মুদ্রিত ছিল। আর এই শিল্পবোধকে যথাযোগ্য পথে পরিচালিত করেছে ওস্তাদ কেরামৎ খাঁর তবলাসঙ্গত। আসর সুরু হয় তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধ্রুপদ দিয়ে। রাগ 'শিবরঞ্জনী'।

'কোশী-কানাড়া' রাগে খেয়াল পরিবেশন করেন শ্রীলা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ'র বিস্তার অঙ্গ ভাল, তানও তৈরী। তবে মন্দ্র ও মধ্যসপ্তকে কণ্ঠের যতটা ওজন আছে ওপরের দিকের কণ্ঠবিহারে সে ভারসাম্য ছিল না। এদিকে লক্ষ্য রাখলে যথাযোগ্য মানে পৌঁছতে এ'র দেরী হবে না।

পূরবী মুখোপাধ্যায় পরিবেশিত 'কেদারা' রাগের খেয়ালে আমীর খাঁর গায়নশৈলীর বিশ্বস্ত নজীর বিদ্যমান ছিল। তবে আর একটু যদি বিস্তারে অনুপ্রবেশ ঘটত এ'র সম্বন্ধে কিছুই বলার থাকত না।

ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য ছিলেন এ রাতের প্রতীক্ষিত শিল্পী। কোশী-কানাড়ার আলাপ, জোড়, ঝালা ও গতের প্রতিটি পর্বে গুরু আলাউদ্দিনের বাদনশৈলীর পূর্ণাঙ্গ এবং অনুশীলিত পরিচয় ছাড়াও যে বস্তুটি শ্রোতাদের মন কেড়েছে তা হল শিল্পীর রঙিন মনের আবেগ। অমর দের তবলাসঙ্গতও সুন্দর।

শেষ দিনে কণ্ঠসঙ্গীতে ছিলেন রুকমাবাঈ সেনগুপ্ত। রাগ 'নন্দ'। এ'র রাগ বিশ্লেষণ স্বচ্ছ। কণ্ঠও সুরেলা। শুধু উচ্চগ্রামে আর একটু যদি খোলা আওয়াজ হত। এ'র সঙ্গে তবলাসঙ্গতে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন সাধেন্দু কর্মকার'।

শেষ অনুষ্ঠান মায়া চট্টোপাধ্যায়ের কথক নৃত্য শিল্পীর উচ্চমান বজায় ছিল। অমর দের তবলাসঙ্গতে যতীন ভট্টাচার্যর সরোদে 'কোশী-কানাড়া' বেশ জমে উঠেছিল। মৃণাম্বর খাঁ মালকোশ পরিবেশনে তাঁর স্ব-মানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বেহালায় রবীন ঘোষের 'নটভৈরব' আনন্দ দিয়েছে রাগ-জ্ঞান ও যন্ত্র মুন্সিয়ানার যুগ্ম আকর্ষণে। রবীনবাবুর শান্ত মেজাজটি সকল তরুণ শিল্পীর অনুকরণীয়।

শেষ রাতে প্রাজ্ঞ শিল্পী এ কাননের 'ভাটিয়াল' রাগে সঙ্গীত চিন্তা ও পরিবেশনের এক সুষ্ঠু রূপ মেলে।

আসরের সর্বশেষ এবং সবচেয়ে আকর্ষণীয় শিল্পী শ্রীশ্যাম গঙ্গোপাধ্যায়। তবলায় কেরামতুল্লা খাঁ। রাগ বসন্ত মুখারী। পরিণত মানের চিন্তা, দৃপ্ত-গম্ভীর বোল কল্পন, সমৃদ্ধ বিস্তার ও তানে শ্যামবাবুর সঙ্গীত সাধনার উজ্জ্বল আলো বিকীরিত হয়েছে।

কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যাঁরা কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন তাঁরা হলেন মনোজ পাল (সরোদ) মীরা মেহতো (সেতার), নির্মলেন্দু গাঙ্গুলি (বেহালা-সহরা), প্রবীর ভট্টাচার্য চঞ্চল ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (তবলা)।

সৌরভের জন্মদিন :

দক্ষিণ কলকাতার সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান সৌরভের প্রতিষ্ঠাদিবস পালনোৎসবের উন্মোচন করে শ্রীসমরকান্তি ঘোষ বলেন, 'মাত্র চার বছরেই সৌরভ' সঙ্গীতমহলে নিজেকে শুধু সুপ্রতিষ্ঠিতই নয়, আদরণীয় করে তুলতে পেরেছে। এর মূলে আছে প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপা শ্রীমতী নমিতা চট্টোপাধ্যায়ের একনিষ্ঠ পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও অন্তরের বিরাট স্বপ্ন। এ'র সাধনা সফলতর পরিণতির পথে এগিয়ে চলুক, এ'র ধ্যান-ধারণার সম্পূর্ণতায় পৌঁছাক—আজকের দিনে এই আমার প্রার্থনা।'

শ্রীপাহাড়ী সান্যাল তাঁর আনন্দোচ্ছল ভাষণে সভায় যেন প্রাণের জোয়ার প্রবাহিত করেন।

সঙ্গীতানুষ্ঠান সুরু হয় ললিতা ঘোষের গান দিয়ে। গানে কোন বিশেষ ম্যানারিজম ছিল না। ছিল না সাধ্যের অতীত কোন অসম্ভব কঠিন কারিগরী দেখাবার স্থূল ওস্তাদিয়ানা। সহজ, সুন্দর পরিচ্ছন্ন ভঙ্গিতে পরিবেশিত ভজন, গীত ও দাদরা সুরেলা কণ্ঠের অনুরণনে এক মনোহর পরিবেশ রচনা করে। শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের তবলাসঙ্গত ছিল এ অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ।

পরের অনুষ্ঠান যন্ত্রসঙ্গীতের। শিল্পী কল্যাণী রায়।

ঠিক এই সময়েই আসরে প্রবেশ করেন জাপানের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিরা। টেপরেকর্ডের আধুনিকতম মডেল নিয়ে হেডফোন কানে দিয়ে একাধারে এ'দের অনুষ্ঠান রেকর্ড করা ও তারিফ করা দেখবার মত।

কল্যাণী রায় সুরু করেন 'কাফি-কানাড়া' দিয়ে। কাফির রঙিন মাধুর্য কানাড়ার গাম্ভীর্যের স্পর্শে যে সংযত রূপলোকে পৌঁছেছিল তার মধ্যে শুধু শিল্পীর হাতের কারুকৃতিই নয় গভীর-বোধের ছাপটিও ছিল বলেই সকলের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন পেয়েছে।

দ্বিতীয় রাগ 'পিলু'। এনায়েৎ খাঁর ঘরানার সেই পুরাতন বন্দেজ অতীতের পর্দা টেনে মজলিসী আসরের ছবিখানি যেন দর্শকের চোখের সামনে মেলে ধরে।

বিশেষ অনুরোধে ইনি একটি লোক-সঙ্গীতের মিষ্টি ধুন বাজিয়ে আসর সমাপ্ত করেন।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল জ্ঞানবাবুর সুযোগ্য শিষ্য তরুণ তবলাবাদক অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়কে এই প্রথম নামী শিল্পীর সঙ্গে বাজাবার সুযোগ দেওয়া আর অনিন্দ্য এ সুযোগের অপব্যবহার করেনি এইটেই পরিবেশনযোগ্য সংবাদ। আগের চেয়ে তার বোল আরো সুস্পষ্ট। কানীর কাজে সুরের ছোঁয়াও লক্ষণীয়।

দ্বিতীয় দিনে ছিল প্রধানতঃ শিশু উৎসব। নমিতা চট্টোপাধ্যায় ও দীপালি রায়ের [illegible] শিশুদের ... গুলি বড়দের চিত্তও আনন্দে নাচিয়ে দিয়েছে। নৃত্যের বিষয় ছিল সুকুমার রায়ের আবোল-তাবোলের 'গন্ধবিচার, 'নেড়া বেলতলায় যায় কবার' ... 'ফেরিওয়ালা'। শিশুরা প্রকৃতির সবচেয়ে কাছের। তাই আনন্দ হাসি উল্লাসে তাদের সাড়া দেওয়ায় সহজ সুন্দর রূপটি প্রকাশ পায়। প্রায় প্রতিটি শিশুশিল্পীর ভঙ্গীর সাবলীলতা আনন্দ ছড়িয়েছে।

উপরি পাওনা হিসাবে শোনা গেছে, শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের কণ্ঠের ছড়াগান।

জ্ঞানবাবু শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের নানান ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শকস্থানীয়। কিন্তু ছড়াগান ও কৌতুকগীতিতেও তাঁর শিশুসুলভ অভিব্যক্তি এমন মনোরম এ খবর অজ্ঞাতই থেকে যেত যদি না সেদিনের অনুষ্ঠানে তাঁর গান শোনার সুযোগ ঘটত। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার এই দিকটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য সৌরভের কর্তৃপক্ষ ধন্যবাদার্হ।

—চিত্রাঙ্গদা

স্বাধীন ভারতের খেলাধুলা

কমল গঙ্গোপাধ্যায়

স্বাধীনতা অর্জনের পর পঁচিশ বছর পূর্তির লগ্নে ক্রীড়ামোদী জনগণের মনে স্বাভাবিকভাবে যে প্রশ্নটি জাগে, তা হলো এই পঁচিশ বছরে খেলাধুলোর আসরে ভারত কতখানি এগিয়ে যেতে পেরেছে ? অস্বীকার করবার উপায় নেই, খেলাধুলোর জগতে এই পঁচিশ বছরে আমাদের অগ্রগতির ক্ষেত্র সীমিত; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা পিছু হটে আসতে বাধ্য হয়েছি। আমাদের স্বাধীনতা উত্তর পঁচিশ বছরের খেলাধুলোর ইতিহাসের অনেকখানিই নৈরাশ্যব্যঞ্জক। উত্থানের ক্ষেত্র সীমিত, পতনের ক্ষেত্র সেই তুলনায় ব্যাপক। পঁচিশ বছর আগে বিভিন্ন ক্রীড়াঙ্গনে যে সব দেশ ছিল পিছনের সারিতে, দ্রুত উন্নতির সোপান বেয়ে তারা আজ আমাদের নাগালের বাইরে এগিয়ে গিয়েছে। এই সব দেশের চোখ-ধাঁধানো অগ্রগতির আলোকে ভারতের ক্ষীণ অগ্রগতি চোখেই পড়ে না।

ভারতে অন্যতম জনপ্রিয় খেলা ফুটবল। ১৯৪৮ সালে ভারতীয় দল সর্বপ্রথম অলিম্পিক আসরে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ লাভ করে। দুর্ভাগ্যবশতঃ দু' দুটি পেনাল্টীর সুযোগ অপচয়ের ফলে ফ্রান্সের কাছে ১—২ গোলে পরাজিত হলেও ভারতীয় ফুটবলের মান সম্বন্ধে অনেকেই আশাবাদী ছিলেন। ...৫২ সালে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে ...লাভিয়ার কাছে ভারত শোচনীয়-... হয়। কিন্তু ১৯৫৬ সালে ...র্ণ অলিম্পিকে অল্পের জন্য ...দক আমাদের হাতছাড়া হয়। ...শেষ পর্যন্ত চতুর্থ স্থান পায়। ... সালে ভারত প্রথম রাউন্ডেই ...ত হয়। এবং পরবর্তী তিনটি ...পিক ফুটবল প্রতিযোগিতার মূল ...য়ই উঠতে পারেনি।

এশিয়ান গেমসের ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারত ১৯৫১ এবং ১৯৬২ সালে বিজয়ী হয়েছিল। ১৯৬২ সালে প্রতিকূল পরিবেশে ভারতের জয় নিঃসন্দেহে কৃতিত্বপূর্ণ। কিন্তু ১৯৬৬ সালের পর থেকে ব্রহ্মদেশের সঙ্গে ভারত কোন ক্রমেই এঁটে উঠতে পারেনি। ব্রহ্মদেশ বিগত দুটি এশিয়ান গেমসের ফুটবল চ্যাম্পিয়ন। এই ব্রহ্মদেশের কাছে ০—৯ গোলে ভারতের শোচনীয় পরাজয়ের ফলে ফুটবলের আন্তর্জাতিক আসরে ভারতের মাথা কাটা গেছে।

পূর্বে এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ফুটবলে যথেষ্ট উন্নতি করেছে। উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রহ্মদেশ, তাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, ইরাণ, ইস্রায়েল যেখানে অনেক এগিয়ে গিয়েছে, সেখানে আমরা এসে দাঁড়িয়েছি পিছনের সারিতে। অথচ ফুটবল নিয়ে কী মাতামাতি এবং হৈ-হুল্লোড়-ই না হয় আমাদের দেশে।

আন্তর্জাতিক নিয়মানুযায়ী ৯০ মিনিটের খেলা, বুট পরা আবশ্যিক করার ফলে আমাদের নিজস্ব ক্রীড়ারীতি পাল্টাতে হয়েছে, এ-কথা সত্যি। কিন্তু পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে চলাই প্রত্যাশিত। সেই সূত্রেই চার ব্যাক প্রথা এবং অন্যান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কিন্তু টেকনিকই তো সব নয়। দলগত সংহতি এবং গোলে শট নেওয়ার ব্যাপারে দুর্বলতার সংক্রামক ব্যাধি থেকে কি আমাদের পরিত্রাণ নেই ?

বিশ্ব হকিতে ভারতের দীর্ঘ বত্রিশ বছরের একাধিপত্য খর্ব হয়েছে। স্বাধীনতার পরবর্তী পঁচিশ বছরে, পশ্চিম জার্মানী, হল্যান্ড, স্পেন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যান্ড, ইংল্যান্ড, কেনিয়া, উগান্ডা, পোল্যান্ড—প্রতিটি দেশ অক্লান্ত অনুশীলন ও অধ্যবসায়ের মূলধন নিয়ে হকিতে প্রভূত উন্নতি করেছে। তাছাড়া ভারত-দেহের বিচ্ছিন্ন অংশ পাকিস্তান হকিতে ভারতের শক্তিশালী প্রতিপক্ষ।

১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিকের ফাইনালে পাকিস্তানের কাছে (০—১) ভারতের পরাজয়ের ফলে হকির স্বর্ণ পদক প্রথম হাত ছাড়া হয়। ১৯৬৪ সালে টোকিও অলিম্পিকে গ্রুপের খেলায় জার্মাণী ও স্পেনের সঙ্গে ড্র করলেও চূড়ান্ত পর্যায়ে পাকিস্তানকে ১—০ গোলে পরাজিত করে ভারত হকির হৃত সম্মান পুনরুদ্ধার করেছিল। ১৯৬৮ সালে মেক্সিকো অলিম্পিকে গ্রুপের খেলায় নিউজীল্যান্ডের কাছে পরাজিত এবং স্পেনের সঙ্গে খেলা অমীমাংসিত রাখলেও ভারত সেমি-ফাইনালে উন্নীত হয়। কিন্তু সেমি-ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে (১—২) পরাজিত হওয়ায় সোনা বা রূপো কোনোটাই ভারতের ভাগ্যে জোটে নি। তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক খেলায় পশ্চিম জার্মানীকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ পদক নিয়েই ভারতকে ফিরে আসতে হয়।

১৯৭১ সালে স্পেনে বার্সিলোনা শহরে প্রথম বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতার আসরেও সেমি-ফাইনালে পাকিস্তানের কাছে পরাজয়ের ফলে ভারত তৃতীয় স্থান লাভ করে।

১৯৭২ সালে মিউনিক অলিম্পিকে গ্রুপ খেলায় হল্যান্ড, পোল্যান্ড এবং কেনিয়ার সঙ্গে খেলা অমীমাংসিত হলেও ভারত সেমিফাইনালে উঠেছিল। কিন্তু এবারেও পাকিস্তানের কাছে পরাজয়ের ফলে ভারতের স্বর্ণ জয়ের স্বপ্নভঙ্গ হয়। আর পাকিস্তানকে পরাজিত করে সর্বপ্রথম ইউরোপীয় দেশ পশ্চিম জার্মানী হকির স্বর্ণ পদক বিজয়ী হয়। হল্যান্ডকে পরাজিত করে ভারত তৃতীয় স্থান লাভ করে। অর্থাৎ, সোনা গেলো, রূপো গেলো, আমরা আজ ব্রোঞ্জে এসে ঠেকেছি। অদূর ভবিষ্যতে তা-ও বুঝি যায়-যায়। আর আমাদের তুলনায় অন্যান্য দেশ কতখানি এগিয়ে এসেছে, একবার চিন্তা করুন।

খেলাধুলোর অন্যান্য ক্ষেত্রেও আমাদের ফলাফল আশাপ্রদ নয়। হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে কুস্তির আসরে ভারতীয় মল্লবীর কে ডি যাদব সর্বপ্রথম ব্রোঞ্জ পদক বিজয়ী হন। অলিম্পিকে হকির বাইরে সেই আমাদের প্রথম পদক প্রাপ্তি।

১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিকে অ্যাথলেট মিলখা সিং, 'উড়ন্ত শিখ' নামে যাঁর পরিচিতি, ৪০০ মিটার দৌড়ে রেকর্ড করলেও, তাঁর স্থান ছিলো চতুর্থ। টোকিও অলিম্পিকে গুরবচন ১১০ মিটার হার্ডলস রেসে পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। অ্যাথলেটিকসে ভারতের উল্লেখ করার মত আর কোনো নজীর নেই।

অলিম্পিক মুষ্টিযুদ্ধে ১৯৪৮, ১৯৫২ এবং ১৯৭২ এই তিনবার ভারত অংশ গ্রহণ করে। মিউনিকে মুনাস্বামী ভেনু, যিনি ১৯৭০ সালে এশিয়ান গেমসে রৌপ্য পদক জয় করেছিলেন, কোয়ার্টার ফাইনালে পয়েন্টে পরাজিত হন। ভারতীয় হিসেবে তিনিই সর্বপ্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত উঠেছিলেন। তেহরাণে অনুষ্ঠিত পঞ্চম এশীয় মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় (১৯৭১) স্বর্ণ পদকের অধিকারী নারায়ণান এবং মেহতাব সিং-ও পয়েন্টে পরাজিত হয়ে ফিরে আসেন।

এশিয়ান ও কমনওয়েলথ গেমস মিলিয়ে ভারত এপর্যন্ত ৯২টি পদক (৩২টি স্বর্ণ, ২৭টি রৌপ্য এবং ৩৩টি

ব্রোঞ্জ) বিজয়ী হয়েছে। ১৯৫৪ সাল থেকে আজ পর্যন্ত মল্লবীরদের অর্জিত পদকের সংখ্যা ৫৪ (১৩টি স্বর্ণ, ১৬টি রৌপ্য এবং ২৫টি ব্রোঞ্জ) এবং মুষ্টিযোদ্ধারা এনেছেন ১১টি পদক (৫টি স্বর্ণ, ৪টি রৌপ্য এবং দুটি ব্রোঞ্জ)। যদিও এশিয়ান গেমসের অ্যাথলেটিকসে আমাদের স্থান জাপানের পরে, কিন্তু পদক বিজয়ের হিসেব খতিয়ে দেখলে দেখতে পাবেন, জাপানের থেকে আমাদের পদক সংখ্যা অনেক কম।

মাটি যতই উর্বর হোক না কেন, ঠিকমত চাষ না করলে প্রত্যাশিত ফসলের আশা করা বৃথা। আমাদের বিশাল দেশে তরুণ প্রতিভার অভাব নেই। অক্লান্ত পরিশ্রম করে, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা নিয়ে, ব্যর্থতায় ভগ্নোদ্যম না হয়ে, আগামী দিনের সারথিদের তৈরী করতে হবে। এতদিন কাগজে-কলমে পরিকল্পনা হয়েছে ঝুড়ি ঝুড়ি: টাকাও খরচ হয়েছে, কিন্তু কাজের কাজ হয় নি কিছুই। স্কুল কলেজে ছাত্রদের মধ্যে খেলাধুলোয় আন্তরিক আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে; অনধিক সতের বছরের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের দিকে চোখ রেখে গড়ে তুলতে হবে। আন্তর্জাতিক খেলার অভিজ্ঞতা আরো বাড়াতে হবে। জাপান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড প্রভৃতি ছোট ছোট রাষ্ট্রে যেখানে প্রতি বছর একাধিক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে থাকে, সেখানে আমাদের দেশে ১৯৫১ সালের এশিয়ান গেমস এবং ১৯৬৭র বিশ্ব মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কোন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান সম্ভব হয় নি। বিষয়টি শুধু দুঃখেরই নয়, লজ্জারও। টোকিও-তে অলিম্পিকের মহামেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে, আমাদের পক্ষে যা স্বপ্নেরও অতীত। এই সমস্ত প্রতিযোগিতার সূত্রে তাদের দেশে স্টেডিয়াম, সুইমিং পুল, জিমন্যাসিয়াম গড়ে উঠেছে এবং খেলাধুলোর মানও উন্নত হয়েছে।

এই পঁচিশ বছরে আন্তর্জাতিক আসরে ভারতীয় টেনিস স্বীকৃতি লাভ করেছে। ব্রিটিশ শাসিত ভারতের কোন খেলোয়াড় উইম্বলডনের সেমি ফাইনালে উঠতে পারেন নি। একবার মাত্র কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিলেন গউস মহম্মদ। ১৯৫০ সালে উইম্বলডন প্রতিযোগিতার খেলোয়াড়দের ক্রম-তালিকায় পঞ্চদশ স্থানে ছিলেন দিলীপ বসু। কিন্তু স্বাধীনতার পর রমানাথন কৃষ্ণান পরপর দুবার উইম্বলডনের সেমি ফাইনালে খেলেছেন। কৃষ্ণান ভারতীয় টেনিসের গৌরবোজ্জ্বল যুগের স্রষ্টা। তিনিই আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপের আসরে ভারতীয় টেনিস শক্তির বার্তাবহ। ১৯৬০ এবং ১৯৬১ সালে ডেভিস কাপের সেমিফাইনালে পরাজিত হলেও ১৯৬৬ সালে ব্রাজিলকে পরাজিত করে মেলবোর্ণে সর্বপ্রথম ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ভারত রানার্স আপ হয়েছিল। টেনিসে জয়দীপ মুখার্জী, প্রেমজিৎ লাল, আখতার আলিও যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছেন। কৃষ্ণান-জয়দীপের যুগ শেষ হয়েছে; এখন নবীনদের পালা। এখনো পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সাফল্য অর্জন না করলেও এঁদের ঘিরে আমাদের প্রত্যাশা অসংগত নয়।

ব্যাডমিন্টনে ত্রিলোকনাথ শেঠ, নন্দু নাটেকার, সুরেশ গোয়েল, পঞ্চাশ দশকের শেষ দিকে খ্যাতি অর্জন করেছেন, টমাস কাপে সংগ্রামী মনোভাবের পরিচয় রেখেছেন। কিন্তু বর্তমানে আমরা ব্যাডমিন্টনে আবার পিছিয়ে পড়েছি। জাপান অনেক দেরীতে ব্যাডমিন্টনের আসরে অনুপ্রবেশ করে আমাদের পেছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছে।

বিলিয়ার্ডের আন্তর্জাতিক আসরে ভারতের মর্যাদা বাড়িয়েছেন উইলসন জোনস। ১৯৫৮ এবং ১৯৬৪ সালে তিনি বিলিয়ার্ডের বিশ্ব খেতাব বিজয়ী। সাম্প্রতিককালে মাইকেল ফেরেরা, শ্যাম সরোফ এবং সতীশ মোহন বিলিয়ার্ডে বিশ্ব মানে পৌঁছতে পেরেছেন।

রাইফেল স্যুটিং-এর বিশ্ব আসরে ভারতের গৌরব প্রতিষ্ঠা করেছেন কর্ণি সিং।

বাস্কেটবল, সাইক্লিং, ভলিবল, জিম্ন্যাসটিকস, সাঁতার, টেবিল টেনিসে আমরা এখনো পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোনো কীর্তির অধিকারী হতে পারিনি।

স্বাধীনতার পরবর্তী পঁচিশ বছর ক্রিকেটে ভারতের অগ্রগতি বিশেষভাবে স্মরণীয়। ১৯৭১ সালে ভারতীয় ক্রিকেটে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

স্বাধীনতা লাভের আগে (১৯৩২-৪৬) সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসরে ভারতবর্ষ তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ইংল্যান্ডের বিপক্ষে চারটি সরকারী টেস্ট ক্রিকেট সিরিজ খেলে প্রতিটি সিরিজে হেরেছিল। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এই চার টেস্ট সিরিজের দশটি খেলায় ভারতবর্ষের পক্ষে খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছিল : জয় ০, হার ৬ এবং ড্র চার।

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষ বিগত পঁচিশ বছরে (১৯৪৭—৭১) ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, পাকিস্তান এবং নিউজিল্যান্ড—এই পাঁচটি দেশের বিপক্ষে মোট যে ছাব্বিশটি টেস্ট সিরিজ খেলেছে তার ফলাফল দাঁড়িয়েছে ভারতবর্ষের 'রাবার' জয় সাত, হার তের এবং ড্র ছয়। এই ২৬টি সরকারী টেস্ট সিরিজের ১১৪টি টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের পক্ষে খেলার ফলাফল জয় ১৭, হার ৪৩ এবং ড্র ৫৪।

স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী কালে ভারতবর্ষের সাতটি 'রাবার' জয় : ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দুই, নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিন, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বি[illegible] এক এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে [illegible] অপরদিকে ভারতবর্ষের সতেরটি খেলায় জয় : ইংল্যান্ডের বিপক্ষে [illegible] অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিন, ওয়েস্ট ই[illegible] বিপক্ষে এক, নিউজিল্যান্ডের [illegible] সাত এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে দু[illegible]

হয়েছে। এই তৃতীয় অর্থাৎ শেষ টেস্ট খেলার চতুর্থ দিনে পাকিস্তানেরই জয়লাভের সম্ভাবনা ষোল আনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় চরম ব্যর্থতার জন্য তারা জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করতে পারেনি। এখানে উল্লেখ্য অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় পাকিস্তান মাত্র একবার জিতেছে (১৯৫৬-৫৭ সালে করাচিতে ৯ উইকেটে)।

পাকিস্তানের অধিনায়ক ইন্তিখাব আলাম টসে জিতে অস্ট্রেলিয়াকে প্রথমেই ব্যাট করতে পাঠিয়ে বিশেষ লাভবান হননি। পাকিস্তানী বোলাররা অনুকূলে উইকেট পেয়েও অস্ট্রেলিয়াকে কাবু করতে পারেননি। প্রথম দিনের খেলায় অস্ট্রেলিয়া হেসে-খেলে পাঁচ উইকেটের বিনিময়ে ৩০৬ রান সংগ্রহ করেছিল। উল্লেখযোগ্য রান—আয়ান রেডপাথের ৭১ এবং রস এডওয়ার্ডসের নটআউট ৬৯।

দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংস ৩৩৪ রানের মাথায় শেষ হয়। এই দিন অস্ট্রেলিয়া তাদের ১ম ইনিংসের বাকি পাঁচটা উইকেট খুইয়ে পূর্বদিনের ৩০৬ রানের (৫ উইকেটে) সঙ্গে মাত্র ২৮ রান যোগ করেছিল। দ্বিতীয় দিনের খেলার বাকি সময়ে পাকিস্তান তাদের ১ম ইনিংসের ৪ উইকেট খুইয়ে ২৫০ রান সংগ্রহ করে—অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংসের ৩৩৪ রানের থেকে ৮৪ রান কম। লাঞ্চের পরই পাকিস্তানের খেলায় ভাঙন ধরে—৭৫ রানের মধ্যে ৪টে উইকেট পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত দলের এই ভাঙন ঠেকিয়ে রাখেন ৫ম উইকেট জুটি মুস্তাক মহম্মদ এবং আসিফ ইকবাল। এই ৫ম উইকেট জুটি এই দিন দলের অতি মূল্যবান ১১০ রান তুলে অপরাজিত থাকেন—মুস্তাক নট-আউট ৬৯ রান এবং ইকবাল নট-আউট ৪৭ রান।

তৃতীয় দিনে পাকিস্তানের ১ম ইনিংস ৩৬০ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ২৬ রানে এগিয়ে যায়। এই দিনের খেলায় পাকিস্তান তাদের শেষ ৬টা উইকেটের বিনিময়ে পূর্বদিনের ২৫০ রানের (৪ উইকেটে) সঙ্গে ১১০ রান যোগ করেছিল। বাত্রিতে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে তৃতীয় দিনে লাঞ্চের আগে খেলা আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি। মুস্তাক মহম্মদ ১২১ রান করেন—টেস্ট ক্রিকেট খেলায় তাঁর এটি চতুর্থ সেঞ্চুরী এবং অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম। এখানে উল্লেখ্য, তাঁরা চার ভাই মিলে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় এইভাবে ১৯টি সেঞ্চুরী করেছেন: হানিফ ১২টি মুস্তাক ৪টি, উজীর ২টি এবং সাদিক ১টি। সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে একই পরিবারের চার ভাই একত্রে ১৯টি সেঞ্চুরী করেছে এমন দ্বিতীয় নজির নেই।

তৃতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়া ২য় ইনিংসের খেলায় চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেয়—তাদের ৭টা উইকেট পড়ে মাত্র ৯৪ রান উঠেছিল। খেলার এই অবস্থায় পাকিস্তানের জয়লাভের সম্ভাবনাই খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তৃতীয় দিনের খেলার শেষে হিসাব নিয়ে দেখা গেল অস্ট্রেলিয়া ২য় ইনিংসের তিনটে উইকেট হাতে জমা রেখে মাত্র ৬৮ রানে এগিয়েছে। অপরদিকে পাকিস্তানের হাতে আছে ২য় ইনিংসের পুরো খেলা এবং খেলার দু'দিন সময়। সুতরাং খেলার গতি তখন পাকিস্তানেরই অনুকূলে।

চতুর্থ দিনে অস্ট্রেলিয়ার ২য় ইনিংস ১৮৪ রানের মাথায় শেষ হয়। চতুর্থ দিনে মাত্র ৭ রান যোগ হলে অর্থাৎ দলের ১০১ রানের মাথায় ৮ম উইকেট পড়ে যায়। অস্ট্রেলিয়ার এই অন্তিমকালে ৯ম উইকেট জুটি দুই বোলার বব ম্যাসী এবং জন ... ক্রিজে খেলতে নেমে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন। তাঁরা ১৫০ মিনিটে ৯ম উইকেট জুটিতে মূল্যবান ৮৩ রান যোগ করে... অস্ট্রেলিয়ার ২য় ইনিংসের ১৮৪ রানের মাথায় শেষ দুটো উইকেট (৯ম ও ...) পড়ে যায়। ম্যাসী ৪২ রান করে ... হন। এর আগে টেস্ট খেলার এক ... তাঁর সর্বোচ্চ রান ছিল ১৮।

পাকিস্তান খেলায় জয়লাভের ... জনীয় ১৫৯ রান তুলতে ২য় ... খেলতে নামে এবং ২টো উইকেট ... ৪৮ রান সংগ্রহ করে।

পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে পাকি... যখন অসমাপ্ত ২য় ইনিংস খেলতে... তখন তাদের জয়লাভের জন্য আর ... রানের দরকার ছিল। হাতে জমা ছিল ... উইকেট। পাকিস্তান কিন্তু জয়ের এরকম একটা সুন্দর সুযোগ ... করে। অস্ট্রেলিয়ার কড়া বোলিং ... ফিল্ডিংয়ের দুর্গ ভেদ করে পাকি... বিজয়-মঞ্চে পেশছতে পারেনি। ... স্তানের ২য় ইনিংস ১০৬ রানের ... শেষ হলে তারা অস্ট্রেলিয়ার কাছে ... রানে হেরে যায়। তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের ... এই ১০৬ রান অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ... ইনিংসের খেলায় সর্বনিম্ন রানের ...

অস্ট্রেলিয়ার এই অপ্রত্যাশিত জয়লাভের সমস্ত কৃতিত্ব তাদের দুই বোলার ওয়াকার এবং লিলির। ও... ১৫ রানে ৬টা এবং লিলি ৬৮ রানে ... উইকেট পান। ওয়াকার তাঁর শেষ ... উইকেট পান ৩০টা বল দিয়ে মা... রানের বিনিময়ে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

অস্ট্রেলিয়া: ৩৩৪ রান (রেডপাথ ... এডওয়ার্ডস ৬৯ রান ... তাফ ৭১ রানে ৩ এবং ... নওয়াজ ৫৩ রানে ৪ উই...)

ও ১৮৪ রান (বব ম্যাসী ... সেলিম আলতাফ ৬০ রা... সরফরাজ নওয়াজ ৫৬ রানে ... কেট)

পাকিস্তান: ৩৬০ রান (মুস্তাক ১২১, নাসিমুল গনি ৬৪ এবং ইকবাল ৬৫ রান। ম্যাসী ১২৩ ... ৩ এবং গ্রেগ চ্যাপেল ৬১ ... উইকেট)

ও ১০৬ রান (জাহির আব্বাস ৪... ওয়াকার ১৫ রানে ৬ এবং লি... রানে ৩ উইকেট)

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

আমাকে বিয়ে দেবার জন্য বাবাকে বাড়ী বন্ধক রাখতে হয়েছিল; এখনও সেই সুদের কড়ি গুণতে হচ্ছে।

আমি আমার রেখার বিয়ের জন্যে 'বিবাহ মেয়াদী পলিসি' নিয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত আছি।

"আমার মেয়ের রেখার জন্মের পরেই আমি ওর জন্য ১০,০০০ টাকার ২২ বছর মেয়াদের একটি পলিসি নিয়ে নিই। আমার বয়স তখন ২৬ বছর। সেই থেকে এর জন্য মাসে মাসে প্রিমিয়াম দিচ্ছি মাত্র ৩১ টাকা ক'রে। রেখা যখন ২২ বছরের হবে আমি হাতে মোট ১০,০০০ টাকা পাবো, আর এই টাকায় আমি সহজেই রেখার বিয়ে দিতে পারবো। এমনকি, আমার অবর্তমানেও রেখা সেই টাকা পেয়ে যাবে (সেই ক্ষেত্রে প্রিমিয়াম দিতে হবে না)"।

আপনার মেয়ের বিয়ে

আপনিও লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশনের পলিসি নিয়ে আপনার মেয়ের বিয়ের খরচের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন। এর প্রিমিয়াম—আপনার বয়স, বীমার শ্রেণী আর পলিসির মেয়াদের ওপর নির্ভর করবে। আপনার মেয়ের জীবন ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা থেকে রক্ষা করার জন্য বীমা-ই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উপায়। আপনার সব রকমের প্রয়োজন মেটাবার জন্য লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশনের অন্য আরও অনেক রকমের পলিসি রয়েছে।

আজই লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশনের এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

জীবন বীমা ক'রে ওদের জীবন নিরাপদ ক'রে তুলুন।

না কখনো ছিল, না পাবেন—এমন
সাদা
সাবানের তুলনায়
১½ গুণ
বেশী কাপড় ধোয়
সাবানের তুলনায় অর্ধেক
মেহনত—দু'গুণ পরিষ্কার—
তা সে জল যে ধরণেরই হোক।
NEW!
det
detergent washing cake
ডেট কেক

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া অবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণি-অর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫·০০	টাকা ৩০·০০
ষাণ্মাষিক	টাকা ১২·৫০	টাকা ১৫·৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬·২৫	টাকা ৮·০০

বিঃ দ্রঃ—উৎপাদন শুল্কের হার
(চাঁদার সহিত অবশ্য প্রেরণীয়)

বার্ষিক	টাকা ১·০২
ষাণ্মাষিক	টাকা ০·৫২
ত্রৈমাসিক	টাকা ০·২৬

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১২শ বর্ষ
৩য় খণ্ড

৩৮ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক—২ পয়সা
মোট—৫২ পয়সা

Friday 26th January, 1973 শুক্রবার, ১২ মাঘ, ১৩৭৯ **.52 Paise**

পৃষ্ঠা বিষয় লেখক

প্রচ্ছদ : শ্রীঅমলানন্দ মুখোপাধ্যায়

চিঠিপত্র

পশ্চিমবঙ্গে ভ্রমণ

২১শে পৌষ সংখ্যা অমৃতে 'পশ্চিমবঙ্গে ভ্রমণ' শীর্ষক নিবন্ধটি পড়াছিলাম। নিবন্ধটি তথ্যমূলক এবং ভ্রমণেচ্ছুদের যথেষ্ট সাহায্য করবে। এই লেখাটির কাছে এই আশা রয়েছে বলেই এর সামান্যতম ঘাটতিও আমাকে বেদনা দিয়েছে।

সরকারী চাকরী নিয়ে আমি প্রায় তিন বছর দার্জিলিঙে কাটিয়েছি। তাই এর সঙ্গে সম্যক পরিচিত হবার সুযোগ আমার হয়েছিল। লেখক যথাযথভাবে দার্জিলিঙ কালিম্পঙ, কার্সিয়াং প্রভৃতি শৈলনিবাসের পরিচয় সেখানে যাওয়া এবং থাকার বিভিন্ন সুযোগ সুবিধের কথা সযত্নে তুলে ধরেছেন। এটা বুঝতে অসুবিধে হয় না যে ভ্রমণকারীদের উৎসাহিত করার উদ্দেশ্য নিয়েই নিবন্ধটি লেখা হয়েছে। অথচ দুঃখের বিষয়, এই নিবন্ধে টঙলু, সন্ধকফু ও ফালুট-এর নাম একবারও উল্লেখিত হয়নি।

অথচ এই তিনটে জায়গা সাধারণ ভ্রমণকারীদের কাছে নিঃসন্দেহে নতুন! এবং ট্যুরিস্টদের কাছে এর গুরুত্বও অপরিসীম। দার্জিলিঙ থেকে রওনা হয়ে সুখিয়াপোখরি পেরিয়ে মানেভঞ্জং চেকপোস্টে দাঁড়িয়ে টঙলুর দিকে তাকালে আপনার বুকটা হয়ত কাঁপবে, মাথাটা ঝিমঝিম করবে (যদি আপনি নতুন পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে থাকেন). খাড়া পাহাড়ের গায়ে সাপের মত অঁকাবাঁকা সরু রাস্তার উপর চলমান পিঁপড়ের মত ছোট ল্যান্ড-রোভারগুলোকে দেখে আপনমনেই হয়ত বলে উঠবেন, গাড়ীগুলো এক্ষুনি পড়ে যাবে না তো! পরিশেষে হবেন রোমাঞ্চিত! কিন্তু সমস্ত আশকাংকাকে নিমেষে উপেক্ষা করে আপনি যখন স্বচ্ছন্দে টঙলু গিয়ে পৌঁছুবেন, তখন আপনার আনন্দ দেখে কে! পি-ডবলু-ডি ইন্সপেকশন বাংলো বা ইয়ুথ হোস্টেলে আশ্রয় নিতে পারেন! অবশ্য ইয়ুথ হোস্টেলকে আরো আধুনিকীকরণের প্রয়োজন রয়েছে। বাংলোর বাইরে এসে দেখুন, মেঘের তলায় ডুবে রয়েছে অপেক্ষাকৃত নীচু পাহাড়িয়া অঞ্চলগুলো। এক নিমেষে ভুল হবে অবাধ জলরাশির শান্ত সমুদ্র বলে। ঐ অদূরে দার্জিলিঙ শহর একটা দ্বীপের মত ভেসে রয়েছে। ওদিকে তাকান, পান্দিম, কাঞ্চনজঙ্ঘা, থ্রি-সিস্টারস, এভারেস্ট যেন রুপোর পাতের মত জ্বলজ্বল করছে। এ কি বিস্ময়।

আবার চড়াই-উৎরাই রাস্তা। মুহূর্তে মুহূর্তে মনে হবে কোনো দুর্ঘটনা হবে না তো। অথচ বিশ্বাস করুন দুর্ঘটনার কোনো নজীর আমার জানা নেই। বরঞ্চ প্রতি পদেহ সেই ভয়কে জয় করার পর প্রতি মুহূর্তে সে কি দুর্মদ আনন্দ! পথেই পাবেন, কালপুকুরি। এক টুকরো পাথর ছুঁড়ে মারুন। কোন মতেই ডুবে যাবে না। আসলে জলের উপরিভাগ বরফ হয়ে গেছে; নীচে রয়েছে জল। তারপরও বেশ খানিকটা রোমাঞ্চকর অভিযানের পর সন্ধকফু। বাংলো, ইয়ুথ হোস্টেল—সবই রয়েছে।

সেবার সন্ধকফু গিয়ে পৌঁছুলে সেই ঠাণ্ডাতেও ভীষণ জলের তেষ্টা পেয়েছিল। বাংলোর বেয়ারার কাছে জল চাইলে সে ঝুড়ি করে এক টুকরো বরফ নিয়ে এলো। তারপর রসিকতা করে বললো বাবু, আপনারা জল আনতে যান কলসী করে; আর আমরা জল আনি ঝুড়ি করে। এ এক আজব জায়গা। সত্যি, গিয়ে দেখি, পাহাড়িয়া ঝরণা দুরন্তবেগে জলপ্রপাতের ভঙ্গীতে নীচে নামতে গিয়ে একটুকরো বিরাট বরফের থামের মত ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। জলের ঢেউয়ের প্রতিটি ভাঁজ বরফের টুকরোর গায়ে গায়ে আঁকা। এ যেন কোনো মহৎ শিল্পীর সৃষ্টি। এ কি রোমাঞ্চ! এ কি কখনো ভোলা যায়!

বাইরের দিকে একটিবার তাকিয়ে দেখুন, দিগন্ত অবধি বিস্তীর্ণ সমস্ত জায়গাটাতে কে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। রডোডেন্ড্রনের আমন্ত্রণ সমস্ত পর্বতমালা জুড়ে। বিকেলবেলা তাই দেখে দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে পায়চারী করছিলাম। পেছন থেকে শব্দ শুনতে পেলাম, ডকটর, ওভাবে ফুলগুলোকে মাড়িয়ে যাবেন না। থমকে গিয়ে পায়ের দিকে তাকাতেই দেখি, অসংখ্য নাম-না-জানা ফুল পায়ের নীচে লুটোপুটি খাচ্ছে। আমি অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কিন্তু একি, পা রাখবো কোথায়! চারিদিকে যে ফুলের চাদর পাতা। অনেকদিন আগে পড়া ওয়ার্ডসওয়র্থের একটি লাইন মনে পড়লো। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, বর্ডার পুলিশের সেই লোকটা আমার অবস্থা দেখে হাসছে।

সানরাইজ! সন্ধকফু থেকে সূর্যোদয় দেখা! তার বর্ণনা দেবো, এমন ধৃষ্টতা আমার নেই। সে শুধু দেখা যায়, বোঝা যায়, আনন্দরসে ডুবিয়ে স্মৃতির খাঁচায় তুলে রাখা যায়—জীবনের এক অবর্ণনীয় স্মৃতিসুধা হিসেবে। শুধু এটুকু বলতে পারি—যারা সন্ধকফু থেকে সূর্যোদয় দেখেছে তারা টাইগার হিল বা ঈগলস্ ক্রিগ নিয়ে লাফালাফি করবে না।

আর ফালুট! তখনো আমি ফালুট যাইনি। আমার এক বন্ধু জিজ্ঞেস করলো, ডক্টর, তুমি কখনো ষোড়শী তন্বীকে চুমু খেয়েছ? বললাম, না। কিন্তু কেন? সে বললো, তাহলে তোমাকে কি করে বোঝাই বলতো? শুক্লপক্ষের রাতের ফালুট জীবনের সেই প্রথম চুমু খাওয়ার অনুভূতি—যা মানুষ জীবনে শুধু একবারই পায়। সম্পাদক মহাশয়, একে অশ্লীল বলে বাতিল করে দেবেন কিনা জানি না। কিন্তু আমি আমার অ-কবি বন্ধুর উক্তিটি হুবহু তুলে দিলাম ফালুট ভ্রমণের সেই অনির্বচনীয় রোমাঞ্চকর অনুভূতিকে বোঝাবার জন্যে।

এরও পরে আমি ফালুট গেছি। বি
এ কি বিস্ময় একি রোমাঞ্চ! যেন কাঞ্চনজঙ্ঘা থেকে এভারেস্ট—চিরতুষারাবৃত সমস্ত শৈলশিখরগুলো আমার সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাত বাড়ালেই বুঝি হাতে লাগবে। কিন্তু হায়......!

ম্যানেভঞ্জং চেকপোস্টে বসে বসে অফিসার-ইন-চার্জ বন্ধুটির সাথে গল্প করছিলাম। জার্মান ট্যুরিস্ট ভদ্রলো নিজের ছাড়পত্র মেলে ধরে ক জানেন, সমস্ত ইউরোপ আ বেড়িয়েছি। কিন্তু এত সুন্দর পর্বত জীবনে দেখিনি। এ যে অবিস্মরণ ইউরোপ, আমেরিকা থেকে আগত অসং ট্যুরিস্টদের সন্ধকফু, ফালুট যে দেখেছি, তাদের উচ্ছসিত প্রশংসা করতে শুনেছি। অথচ কোলকাতায় বসে আমর এদের খবর রাখি না। যারা ট্যুর এবং ট্যুরিস্টদের উৎসাহিত করতে চান তাঁরাও যেন এ ব্যাপারে ওয়াকিবহাল নন।

সম্পাদক মহাশয়, আমাদের দেশের এসব অনন্যসাধারণ অথচ অবহেলিত জায়গাগুলোকে ভ্রমণোৎসাহীদের কাছে তুলে ধরবার জন্যে আপনার বহুল প্রচারিত সাময়িকীর কলমে একটু জায়গা ছেড়ে দেবেন না?

ডাঃ নীলকৃষ্ণ পাল,
গড়িয়া, ২৪ পরগণা।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র, স্বাধীনতা ও সাধারণতন্ত্র

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মজয়ন্তী এবং ভারতের সাধারণতন্ত্র দিবস আমরা একই সপ্তাহে উদ্‌যাপন করছি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রে তার রূপান্তরের ইতিহাসের সঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের দীপ্ত জীবনেতিহাস ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। সুভাষচন্দ্র আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক নির্ভীক সেনানায়ক। জাতীয় কংগ্রেসের একজন সাধারণ কর্মীরূপে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কংগ্রেসের সর্বশ্রেষ্ঠ পদ তিনি অলংকৃত করেছিলেন দুবার। তাঁর সময়েই জাতীয় কংগ্রেস তৎকালীন বৃটিশ রাজশক্তির সঙ্গে চরম মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে যা পরবর্তীকালে গান্ধীজীর নির্দেশে ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে পরিণতি লাভ করে।

সুভাষচন্দ্রের আমলেই ভবিষ্যৎ ভারতের অর্থনৈতিক কর্মসূচীর রূপরেখা প্রণয়নের জন্য গঠিত হয় পরিকল্পনা কমিটি। ...হরলাল নেহরুকে তার সভাপতি মনোনয়ন করেন তিনি। ডঃ মেঘনাদ সাহার মতো বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীদের তিনি দেশ গঠনের ...নিয়াদী কর্মোদ্যোগের সঙ্গে সংযুক্ত করতে পেরেছিলেন। স্বাধীন ভারতবর্ষকে সমাজতান্ত্রিক ছাঁচে গড়ে তোলার স্বপ্ন তিনি ...ছলেন। জওহরলাল নেহরু সেই স্বপ্নকে দেন বাস্তব রূপ। সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের সুনিশ্চিত কর্মযজ্ঞ এখনও চলছে। ...হরলালের উত্তরাধিকার বহন করে নিয়ে চলেছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

সুভাষচন্দ্রের অন্যতম, তাঁর জীবনের মহত্তম কীর্তি, বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের নেতৃত্ব দান। শিক্ষিত, ...ধ্যবিত্ত বাঙালী তিনি। সামরিক শিক্ষা তাঁর ছিল না। অসাধারণ আত্মপ্রত্যয়ে এবং স্বাধীনতালাভের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায় তিনি শ্রমে, নিষ্ঠায় এবং অক্লান্ত অনুশীলনে প্রথম ভারতীয় মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হয়েছিলেন। এ এক ইতিহাসের পরম বিস্ময়। ...আজাদ হিন্দ সরকার এবং আজাদ হিন্দ বাহিনীর সার্থকতা হল তার বিপ্লবী চরিত্র। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি চিরতরে বিসর্জন দিয়ে এই মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী প্রকৃত অর্থে একটি জাতীয় বাহিনীতে রূপান্তরিত হয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, তাঁর স্বদেশপ্রেম এবং অভ্রান্ত নেতৃত্বই তা সম্ভব করেছিল। সুভাষচন্দ্রই এশিয়ায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে চরম আঘাত হানেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের ...তেই ভারতে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি যায় ধ্বসে। তারা তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে যেতে বাধ্য ...। ওই মহান মুক্তিযোদ্ধা, জননায়ক এবং ভারতবর্ষের মহান বিপ্লবীর প্রতি জানাই আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম।

২৬ জানুয়ারী সাধারণতন্ত্রী ভারতের ত্রয়োবিংশতি বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছে। আমাদের স্বাধীনতার রজত-জয়ন্তী ...এটা। স্বাধীনতা লাভের তিন বৎসর পর ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারী ভারতবর্ষ নিজস্ব সংবিধান প্রবর্তন করে ধর্মনিরপেক্ষ ...ধারণতন্ত্র ঘোষণা করে। এত অল্প সময়ের মধ্যে সংবিধান প্রবর্তন করা ভারতের জনগণের গণতান্ত্রিক বিশ্বাস ও সংকল্পেরই ...জ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এশিয়া ও আফ্রিকায় নবজাগ্রত দেশগুলোতে এর তুলনা মেলা ভার। সংবিধানই জনগণের অধিকার এবং তার ...মাজিক আশা-আকাঙ্ক্ষার রক্ষাকবচ। গণতান্ত্রিক আদর্শ রক্ষায় জনগণ যে সংকল্প ও শক্তির পরিচয় দিয়েছেন সংবিধানের বিভিন্ন ...ায় তা প্রতিফলিত। একটা কথা ঠিক সংবিধানে ঘোষিত বহু লক্ষ্য এখন অপূর্ণ। শিক্ষার অগ্রগতি ও প্রসার হওয়া সত্ত্বেও এখনও আমাদের দেশে নিরক্ষরতা ব্যাপক। তাহলে গণতান্ত্রিক সংবিধান চলছে কিসের জোরে? জনগণই বা তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করছেন কিভাবে? এর উত্তর হল, অক্ষরজ্ঞান সীমাবদ্ধ হলেও ভারতের সাধারণ মানুষ, গ্রামবাসী, শ্রমিক ও কৃষক তাঁদের পারিপার্শ্বিকতায় এবং সহজ বুদ্ধিতে গণতন্ত্রের আদর্শ ও শক্তি সম্পর্কে সচেতন শিক্ষা লাভ করেছে নিজেদের জীবন থেকে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকেই গণসংগঠন ও সামাজিক কর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের বিচার-বুদ্ধি হয়েছে প্রখর, গণতন্ত্রের কল্যাণকর্ম সম্পর্কে তারা অবহিত। দেশোন্নয়নের বিভিন্ন পরিকল্পনায় যত ব্যর্থতা বা ত্রুটিই থাক না কেন, নিম্নতম স্তর পর্যন্ত তার কিছুটা ফল গিয়ে পৌঁছেছে গত পঁচিশ বছরে। হয়তো তা আশানুরূপ হয় নি, কিন্তু সাধারণ মানুষ তার বাস্তববুদ্ধিতে এ সত্য হৃদয়ঙ্গম করেছে যে, হিংসার পথে নয়, সংঘর্ষের পথে নয়, শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পথেই আমাদের দেশের পর্বতপ্রমাণ সমস্যা সমাধান করতে হবে। সাধারণতন্ত্র দিবসে আমরা যেন এ সত্য না ভুলি। শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে যে বিরাট কাজে হাত দেওয়া হয়েছে—জনজীবন থেকে দারিদ্র্য মোচন—তা যেন সার্থক হয়। সাধারণতন্ত্র দিবসে এটাই হল সবচেয়ে বড় সংকল্প। এর জন্য চাই অতুলনীয় নিষ্ঠা, কঠোর শ্রম এবং আত্মত্যাগ। জনগণের স্বার্থেই সামাজিক উন্নয়নসূচী রচিত হয়েছে, সর্বসাধারণের জন্যই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র। এই সংকল্প ও আদর্শ জয়ী হোক। আজ দেশবাসী এই প্রার্থনাই উচ্চারণ করছে।

নেতাজী ভবন

(কার্যকরী পরিচালক, নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো, ডাঃ শিশিরকুমার বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।)

আমার মা, বিভাবতী বসু, ছিলেন নেতাজীর মেজবৌদি। তাঁর সঙ্গে নেতাজীর সম্পর্কও ছিল অত্যন্ত গভীর এবং অন্তরঙ্গ। তিনি তাঁকে স্নেহের চোখে দেখতেন। এবং মা যেমন করে ছেলের মেজাজমর্জির খবরাখবর রাখেন, অনেকটা তেমনিভাবেই, তিনিও নেতাজীর মানসিক পরিবর্তনের আভাস পূর্বাহ্নেই টের পেয়ে যেতেন। নেতাজীও অকারণে কোনো কথা তাঁর মেজবৌদির কাছে গোপন করতেন না।

১৯৪১ সালের কথা বলছি।

সেদিন মধ্যরাত। ইংরেজী ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী ১৭ই জানুয়ারী। ৩৮।২ এলগিন রোডের বাড়ী থেকে নেতাজী যখন ছদ্মবেশে ইতিহাসের পথে পাড়ি জমালেন, তখন অনেকের কাছেই ব্যাপারটা রহস্যজনক মনে হয়েছিল। কিন্তু আমার মায়ের কাছে তা মনে হয়নি। দেখা গেল, সেই মুহূর্তে তিনি আর অনেকের মতো বিচলিত না হয়ে, নেতাজীর স্মৃতি সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। বোধহয়, বুঝতে পেরেছিলেন যে ভারতবর্ষের মানুষ একদিন তাঁর ফেলে যাওয়া স্মৃতিকে পরম শ্রদ্ধায় গ্রহণ ক[illegible] মূল্যবান মনে করবে।

ঘটনাটা উল্লেখ করলুম এইজন্যে [illegible] ১৯৪৬ সালে যখন আমার বাবা শরৎ[illegible] বসু, আমার ঠাকুরদার তৈরী এলগিন রোডে বাড়ীটিকে নেতাজী ভবনে রূপান্তরি[illegible] করেন, তখন মায়ের উৎসাহ কম ছিল না। ১৯৪৭ সালের ২৩ জানুয়ারী, শরৎচন্দ্র এ-বাড়ীটিকে জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করে[illegible] আনুষ্ঠানিকভাবে। এবং নেতাজী-চর্চা[illegible] জাতীয় আন্দোলন ও স্বাদেশিকতাবোধের উৎসহিসেবে গড়ে তোলার সঙ্কল্প নেন।

এই প্রসঙ্গে কিছুটা পেছনের [illegible] বলা দরকার।

নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো তখ[illegible] হয়নি। আজাদ হিন্দ বাহিনীর কর্ম[illegible] নেতাজীর অনুরাগীরা প্রথম এই বাড়[illegible] ১৯৪৬ সালে মিলিত হয়েছিলেন, স্বদেশে[illegible] কাজে আত্মনিয়োগের সঙ্কল্প নিয়ে। ত[illegible] তাঁরা জনসেবামূলক কাজই করতেন। আজ[illegible] হিন্দ অ্যাম্বুলেন্সের কর্মীরা ছিলেন না[illegible] রকম পাবলিক অ্যাকটিভিটির সঙ্গে জড়িত।

কিন্তু আমার বাবা এবং আজাদ হিন্দ অ্যাম্বুলেন্সের কর্মীরা, কেউই এত অল্পে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁদের সামনে কত কাজ! নেতাজীর জীবন ও দর্শনকে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে।

ঐ উদ্দেশ্য নিয়ে, ১৯৫৭ সালে, শরৎচন্দ্র বসুর উদ্যোগে অ্যাম্বুলেন্সের কর্মীরা গঠন করেন, বর্তমান সংস্থাঃ নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো।

সম্বল সামান্য। হাতে তথ্য নেই। তথ্য কোথায়? আমার মা এগিয়ে এলেন, আলোকবর্তিকার মতো। নেতাজীর পোশাক-আষাক,

চিঠিপত্র, সবই তিনি স্মৃতি হিসেবে রক্ষা করতেন। নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর প্রথম সংগ্রহ ছিল, তাঁর দেওয়া ঐ স্মৃতিচিহ্নগুলি।

কিন্তু ভারতবর্ষীয়রা বড়ো ইতিহাস-বিমুখ জাতি। ইতিহাসের নির্দেশ সম্পর্কে উদাসীন।

তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে, এ সত্য উপলব্ধি করেছি, বারবার। নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো কাজে হাত দিয়ে স্বদেশী ঐতিহাসিকের প্রত্যক্ষ সাহায্য পেয়েছি ঠিকই, কবি-সাহিত্যিক রাজনীতিকদের সহযোগিতাও কম পাইনি, কিন্তু তথ্যের জন্য তাঁদের নির্ভর করতে হয়েছে বিদেশী সাহায্যের ওপরেই বেশী করে।

উদাহরণ হিসেবে স্মরণ করা যায়, ষ্টাউ ফেতারের নাম।

ভিয়েনাবাসিনী ঐ ভদ্রমহিলা, স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। নেতাজীর চিঠিপত্র, এমন কি অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের কাটিং পর্যন্ত পেয়েছিলুম, তাঁরই মারফতে।

এইসব কথা ভাবতে গেলে বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। এইভাবে আমরা সাহায্য পেয়েছি জাপান থেকে, জার্মানি থেকে। এমন কি আমেরিকা থেকে।

এই তো সেদিনের কথা।

১৯৬৯ সালের ২৩শে জানুয়ারী, ডক্টর আলেকজান্ডার ওয়ার্থ এসেছিলেন নেতাজী ভবনে, নেতাজী সম্পর্কে ভাষণ দেওয়ার জন্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, তিনি

নেতাজী ভবনের অভ্যান্তরে
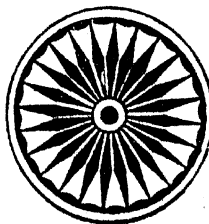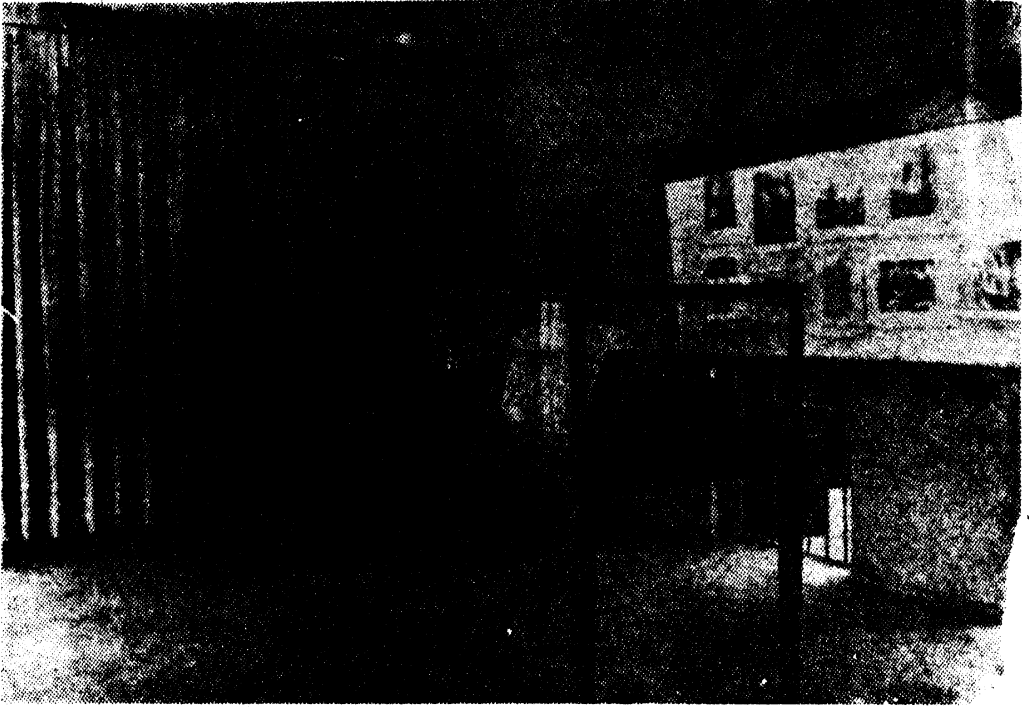
ছিলেন জার্মান ফরেন অফিসের বিশেষ ভারতীয় বিভাগের অফিসার। হিটলারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে অভিযুক্ত অ্যাডাম ভন ট্রট জু সল্জের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল।

কিছুকাল আগে, তিনি জার্মান ভাষায় নেতাজী সম্পর্কে একটি বই লিখেছেন।

তাঁর কাছ থেকে আমরা পেয়েছি, বহু অজ্ঞাত তথ্য। বহু ডিপ্লোম্যাটিক ডকুমেন্ট এবং দুষ্প্রাপ্য দলিল। যুদ্ধকালীন অবস্থার কিছু ছবি এবং ফিল্ম পর্যন্ত তিনি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন।

এইভাবেই আমরা এগিয়েছি, দিনের পর দিন। তথ্যের পর তথ্য সংগ্রহ করেছি। কখনো নিজেদের চেষ্টায়, কখনো-বা বৈদেশিক সাহায্যের সূত্র থেকে। তাঁদের মধ্যে কেউ বা ছিলেন, নেতাজীর সঙ্গে পরিচিত কিংবা অনুগামী। আবার এমন মানুষ আছেন, যাঁরা নেতাজীকে দেখেননি কখনো, কিন্তু নেতাজী সম্পর্কে দীর্ঘকাল গবেষণায়রত।

যেমন, ইয়োচি ইয়োকোবরি।

জাপানের এই তরুণ গবেষক নেতাজীকে কখনো দেখেননি। কিন্তু নেতাজী সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা অপরিসীম। ন্যাশনাল লিবারেশান মুভমেন্ট ডিউরিং দি ওয়ার—এই বিষয়ে তিনি গবেষণা করে যাচ্ছেন গত দশ বছর ধরে। তবু তাঁর কৌতূহলের শেষ নেই।

নেতাজীর অনেক ছবি, নেতাজী সংক্রান্ত ডকুমেন্ট, কাগজপত্রে প্রকাশিত সংবাদের কাটিং, ফিল্ম তিনি আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন একে একে। এখনো পাঠানোর বিরাম নেই। এবং এইসব নথিপত্রের ভিত্তিতে তৈরী একটা অল্প দৈর্ঘের ছবি এবার দেখানো হবে, সারা ভারতবর্ষে।

ইতিহাসের পথ এমনি নির্মম। এবং সত্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত।

নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো এই ঐতিহাসিক সত্যকেই প্রতিষ্ঠা দেওয়ার প্রয়োজনে এবং নেতাজী সম্পর্কিত গবেষণায় আলোকস্তম্ভ-স্বরূপ। ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নেতাজী মিউজিয়াম। নেতাজী এবং জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে যাঁরা গবেষণা করতে চান, তাঁদের সাহায্য করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো বের করেছেন নেতাজীর লেখা ও নেতাজী-সম্পর্কিত কুড়িটিরও বেশী বই।

ইচ্ছে আছে, আমরা গোটা নেতাজী ভবনটাকেই নেতাজী মিউজিয়াম হিসেবে গড়ে তুলব। সেজন্যে বাড়ীটার আধুনিকী-করণের প্রয়োজন হবে। ঐতিহাসিক দলিল-পত্র ও নিদর্শনগুলি রক্ষার জন্য এয়ার কণ্ডিশাণ্ড ঘরেরও দরকার। একটা আধুনিক অডিটরিয়ামসহ নেতাজী সম্পর্কিত চলচ্চিত্র তৈরী, ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী ও রিসার্চ স্কলারশিপের ব্যবস্থা করার জন্য পনের লক্ষ টাকার একটা পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে।

তাছাড়া, আমরা নিয়েছি, আরেকটি আধুনিক বহুতল বিশিষ্ট বাড়ী তৈরীর পরিকল্পনা। তাতে ভারতীয় মুক্তি-সংগ্রামের (১৮৫৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত) ওপর যাতে গবেষণা করা যায়, তার উপযুক্ত একটি লাইব্রেরী থাকবে। সেই সঙ্গে আলোচনা কক্ষ, একজিবিশন হল, ল্যাবরে... সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সেন্টার এবং অ... র্জাতিক অতিথিশালা।

এই বছর ইন্টার ন্যাশনাল নেতা... সেমিনার হচ্ছে নেতাজী ভবনে। দে... বিদেশী বহু গবেষক ও অনুসন্ধি... নেতাজী সম্পর্কে ভাষণ দেবেন।

তবু জিজ্ঞাসার শেষ নেই। ... বলেন, নেতাজীকে চীনে, না, রাশিয়া... দেখা গেছে। কেউবা প্রশ্ন ... মারীর সন্ন্যাসী কি নেতাজী নন...

আমি জানি না, নেতাজী ... আছেন। আমার মনে হয়, ঐগুলি স... গুজব। এবং গুজবের মধ্যেও একটা স... আছে। সেই সত্যটা হলো, নেতাজীর ... বাসী বিশ্বাস করতে চায় না যে, তি... নেই।

আমার ধারণা, নেতাজী একটা ডিফিকাল্ট সাবজেক্ট। অল্প সময়ে তাঁর সম্পর্কে কিছুই বলা যায় না। এ সম্পর্কে গবেষণা করতে হবে, বছরের পর বছর। নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোকে, সেইজন্যেই গড়ে তোলা হচ্ছে লাইট হাউসের মতো, আমাদের জাতীয় সংগ্রাম, নেতাজীর জীবন ও দর্শন আলো-চনার প্রাণকেন্দ্র রূপে।

এ ব্যাপারে ভারত সরকার খুব সাহায্য করছেন।*

---

* সাক্ষাৎকার: গৌরাঙ্গ ভৌমিক।

উন্নতির পথে পশ্চিমবঙ্গ

পূর্বাঞ্চলের জন্য পারমাণবিক বিদ্যুৎ

কথাটা প্রথম উঠেছিল গত বছর নভেম্বর মাসে। পাটনাতে পূর্বাঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রী একটা বৈঠকে বসেছিলেন। তাঁদের আলোচ্য বিষয় ছিল :—বিদ্যুতের ঘাটতি। সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ কে এল রাও ঐ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

...ঠকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ...শঙ্কর রায় ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ...কেদার পাণ্ডে এক জোট হয়ে দাবী করেন ... পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে বিদ্যুতের ...তি মেটাবার জন্য এখানে পারমাণবিক ...দ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি ...তে হবে।

শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ঐ সম্মেলনে বিশেষ জোর দিয়ে বলেন যে, বিদ্যুৎ পরিকল্পনার ব্যাপারে পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির প্রতি অবিচার করা হয়েছে। ভারতে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাবদ মোট যে চারশ কোটি টাকা লগ্নী করা হয়েছে তার মাত্র দশ শতাংশ লগ্নী করা হয়েছে পূর্বাঞ্চলের রাজ্য-

গুলিতে। অথচ এই রাজ্যগুলিতে ভারতের জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ বাস করেন এবং এখানকার অধিবাসীদের শতকরা ৭০ জনই দরিদ্র।

মন্ত্রী ডঃ রাও নাকি নভেম্বর মাসের ঐ সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রীদের যুক্তিগুলি মনোযোগসহকারে শুনেছেন এবং বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করার আশ্বাস দিয়েছেন।

ডঃ রাও যে আশ্বাসই দিন না কেন, প্রকৃত ঘটনা হল এই যে, কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির একটা বড় রকমের বদল না হওয়া পর্যন্ত পূর্বাঞ্চলে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র দেখতে পাওয়ার কোন আশা নেই। এবিষয়ে দিল্লী এখন পর্যন্ত যে নীতি নিয়ে চলছে তা হল এই যে, যেসব রাজ্যের হাতের কাছে কয়লা নেই শুধু সেই সব রাজ্যেই পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে। পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে যেহেতু যথেষ্ট কয়লা রয়েছে সেহেতু সেখানে কয়লার অপকৃষ্টকেই বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হবে —এটাই হচ্ছে সরকারী নীতি। আর এই কারণেই ভারতবর্ষে এখন পর্যন্ত যে চারটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে বা হচ্ছে তাদের একটির ঠিকানা মহারাষ্ট্র, একটির রাজস্থানে একটির তামিলনাড়ুতে এবং চতুর্থটির উত্তরপ্রদেশে অর্থাৎ দেশের উত্তরে, পশ্চিমে ও দক্ষিণে, পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রগুলি ছড়ান আছে, শুধু পূর্ব ভারতের কোঠাতেই শূন্য।

পূর্ব ভারতকে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের মানচিত্রের বাইরে রাখার এই নীতি কি কেন্দ্রীয় সরকার পুনর্বিবেচনা করতে প্রস্তুত আছেন? এই প্রশ্নের কি উত্তর পাওয়া যাবে তারই উপর নির্ভর করছে পাটনা বৈঠকে উত্থাপিত দাবীর ভবিষ্যৎ।

এ বিষয়ে এখন কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যগুলির আলাপ-আলোচনা চলছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত যেটুকু ইঙ্গিত পাওয়া গেছে তাতে একথা মনে করা যাচ্ছে না যে, দিল্লীকে তার নীতি বদল করতে রাজি করান খুব সহজ হবে। পাটনা বৈঠকের অব্যবহিত পরেই কলকাতায় এক বিবৃতি দিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সি সুব্রহ্মণ্যম মুখ্যমন্ত্রীদের দাবী নাকচ করে দিয়েছেন।

এই বিষয়ে নয়াদিল্লীর মনোভাবের আর একটি ইঙ্গিত সম্প্রতি পাওয়া গেল। উত্তর বিহারে একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপন করার জন্য বিহার সরকার একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ভারত সরকারের পারমাণবিক শক্তি দপ্তরের পরামর্শদাতা কমিটি এই প্রস্তাব নামঞ্জুর করে দিয়েছেন।

অথচ, নয়াদিল্লীকে একথা বোঝান হয়েছে, সারা ভারতে কয়লার দাম এক করে দেওয়ার পর এখন পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি কয়লার সহজলভ্যতার দরুন বিশেষ কোন সুবিধা পাচ্ছে না। তাছাড়া, তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রগুলিকে যে নিরেস জাতের কয়লা ব্যবহার করতে হচ্ছে তাতে বয়লারগুলির ক্ষতি হচ্ছে ও সেগুলির আয়ুক্ষয় হচ্ছে। বিহারে ন্যাচারাল ইউ-

নিরঞ্জন সেনগুপ্ত

রেনিয়ামের যে সঞ্চয় আছে সেটা এই অঞ্চলে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে লাগান যায়, এই যুক্তি মেনে নেওয়ার জন্যও নয়াদিল্লী এখন পর্যন্ত বিশেষ আগ্রহ দেখায় নি।

ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারও মেদিনীপুরের উপকূলবর্তী অঞ্চলের কাছে একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের প্রাথমিক পরিকল্পনা নয়াদিল্লীতে পাঠিয়েছেন। ১২০ কোটি টাকার এই পরিকল্পনায় ৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা বলা হয়েছে। রাজ্য যোজনা পর্ষৎ এখন এই বিষয়ে বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরী করছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সংক্রান্ত দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী অতীশ সিংহ কয়েক দিন আগে কলকাতায় এক আলোচনা-সভায় বলেছেন, 'পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই।' রাজ্য যোজনা পর্ষদের সদস্য ডঃ সন্তোশ চক্রবর্তী ঐ আলোচনা-সভায় বলেছেন, সমুদ্রের কাছে সুবর্ণরেখার উপত্যকায় কোথাও এই পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্র স্থাপন করলে ভাল হবে।

পশ্চিমবঙ্গে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা যাঁরা করছেন তাঁদের একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হচ্ছে। সেটা হচ্ছে এই যে, পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের এককালীন খরচ খুব বেশী বলে আপত্তি উঠতে পারে। এই আপত্তি কাটাবার জন্য পরিকল্পনাকারীরা যে প্রস্তাব বিবেচনা করছেন সেটা হল এই যে, হলদিয়ার কাছাকাছি কোন জায়গায় যদি এই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনা করা যায় তাহলে ঐ অঞ্চলে শিল্প ও কৃষির একটা বৃহৎ আয়োজন গড়ে তুলে তার প্রয়োজনে ঐ বিদ্যুৎকে কাজে লাগান যায়। হিসেব করে দেখা গেছে, এই ধরনের একটি বৃহৎ শিল্প ও কৃষি উন্নয়নের পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত করে যদি ৬০০ থেকে ১০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার পারমাণবিক বি[illegible] উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপন করা যায়, [illegible] সেখানে উৎপন্ন বিদ্যুতের খরচ পড়বে ইউনিট প্রতি ২·৮ থেকে ৩ পয়সা। হলদিয়া বিদ্যুতের যে খরচ এখন ধরা হয়েছে তার তুলনায় এই অঙ্কটা অনে[illegible] কম। এখন যে হিসাব আছে তা হল, হ[illegible] দিয়ায় বিদ্যুতের খরচ পড়বে ইউনিট প্র[illegible] ৯ পয়সা।

একজন বিশেষজ্ঞ হিসাব করে দেখি[illegible] ছেন, এই ধরনের একটি শিল্প ও[illegible] উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে যু[illegible] মাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপ[illegible] যায় ও সেখানে যদি ৫০০ কোটি [illegible] বিনিয়োগ করা যায় তাহলে দিনে ৬[illegible] টন সার ও ৫ লাখ টন অ্যালুমিনি[illegible] তৈরি করা যেতে পারে। যে বিদ্যুৎ উৎ[illegible] হবে ১২ হাজার অগভীর নলকূপে ও [illegible] হাজার গভীর নলকূপে বিদ্যুৎ সঞ্চার [illegible] যাবে।
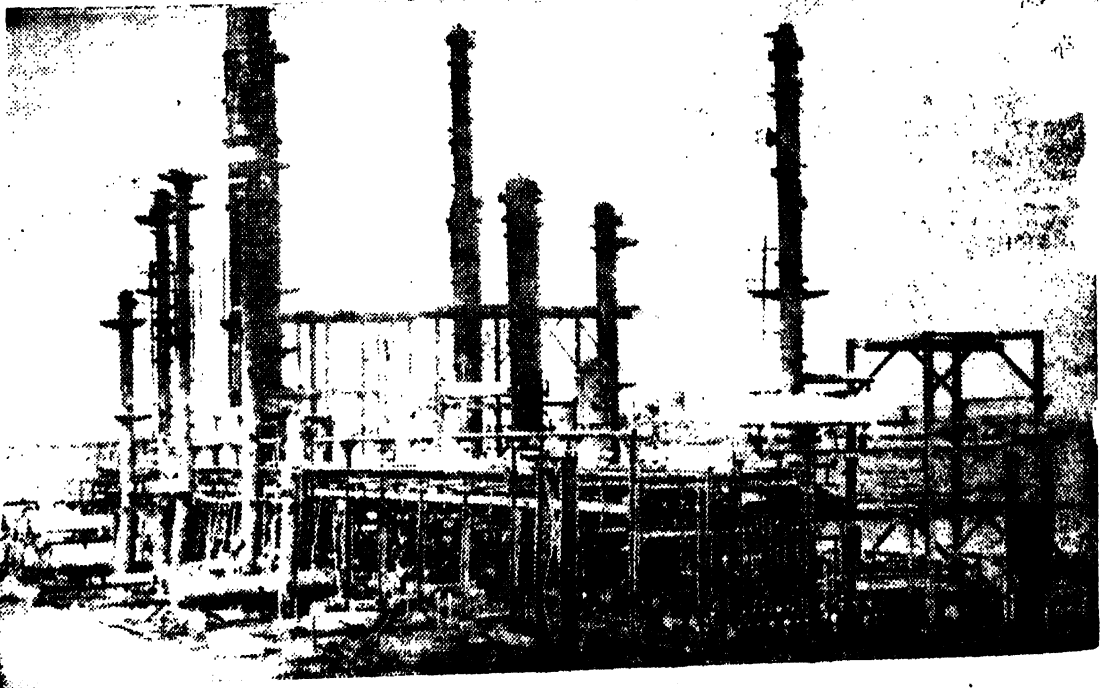
পরিকল্পনাটি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ-শঙ্কর রায়ের সঙ্গে ডঃ কে এল রাও-এর এক দফা আলোচনা হয়েছে বলে প্রকাশ।

তবে এখন পর্যন্ত দিল্লীর যে মনোভাব দেখা যাচ্ছে তাতে না আঁচালে বিশ্বাস নেই।

কলকাতার জন্য পাতাল রেল

বিশ্বাস করা যাচ্ছে এখন কলকাতার পাতাল রেল সম্পর্কে। গত ২৯ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন এবং এর মধ্যে প্রকল্পের জন্য মাটি খোঁড়া-খুঁড়ির কাজ শুরু হয়েছে। যানবাহন সমস্যায় বিড়ম্বিত কলকাতার মানুষ এখন আশা করতে পারেন যে মাটির তলার রেল অদূর ভবিষ্যতে তাঁদের সমস্যার অন্তত কতকটা সুরাহা করবে।

এই প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে দমদম থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত রেল চালু করা হবে। তাতে খরচ পড়বে ১৪০ কোটি টাকা। রেল-লাইনটির দৈর্ঘ্য হবে ১৬·৪৩ কিলোমিটার। দমদম জংশন স্টেশনের কাছেই ঐ স্টেশনের নামে পাতাল রেলের স্টেশন তৈরী হবে। থেকে বেলগাছিয়া রোডের মুখ পাতাল রেলের লাইন সুবার্বন রেল নের সমান্তরালে মাটির উপর দিয়ে। বেলগাছিয়া রোডের মুখ থেকে কী সবটুকু রাস্তা এই পাতাল রেললাইন টির তলা দিয়ে যাবে। পাতাল রেলের মোট ১৭টি স্টেশন থাকবে। তার মধ্যে দমদম স্টেশন ছাড়া অন্য সব স্টেশনই থাকবে মাটির তলায়। দুই স্টেশনের মধ্যে গড় হবে ১·০৩ কিলোমিটার।
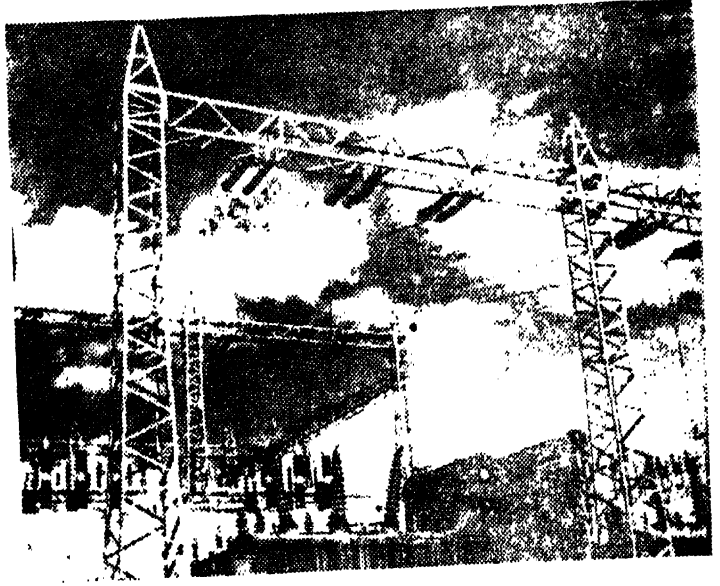
২৯ ডিসেম্বরের ঐ অনুষ্ঠানে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ১৯৭৫ সালের শেষে যাতে পাতাল রেললাইনে পরীক্ষামূলকভাবে গাড়ী চালান যায় সেভাবে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

এই পাতাল রেল তৈরী করতে গিয়ে যেসব অসুবিধা দেখা দিতে পারে তা নিয়ে ইতিমধ্যে ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়ে গেছে। মাটি খোঁড়ার কাজ শুরু করার আগে মাটির তলার জলের পাইপ, পয়ঃপ্রণালী, গ্যাসের মেইন, ইলেকট্রিক ও টেলিফোনের তার প্রভৃতি সরাতে হবে। জায়গায় জায়গায় যানবাহন চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ করতে হতে পারে। কোথাও কোথাও রাস্তাও চওড়া করার দরকার হতে পারে। এই সব অসুবিধা কাটিয়ে ওঠার জন্য যেমন কলকাতার নাগরিকদের সহযোগিতার দরকার হবে তেমনি বিভিন্ন সরকারী কর্তৃপক্ষ, পৌর প্রশাসন, ইলেকট্রিক গ্যাস ইত্যাদি সংস্থা প্রভৃতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় রাখতে হবে। তার জন্য বিরাট প্রস্তুতির দরকার।

দ্বিতীয় হুগলী সেতু

কলকাতার উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রেখে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার কাজও ইতিমধ্যে শুরু করা হয়েছে। সেটি হচ্ছে দ্বিতীয় হুগলী সেতু, যেটা সম্পূর্ণ হলে নেতাজীর নামে চিহ্নিত করা হবে বলে ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সিদ্ধান্ত করেছেন।

গত বছর ২০ মে তারিখে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই সেতুর ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করে গেছেন।

কলকাতার দিকে প্রিন্সেপ ঘাট আর হাওড়ার দিকে দীনবন্ধু কলেজের উত্তরে মিউনিসিপাল পার্ক — এই দুই বিন্দুকে যুক্ত করবে এই নতুন সেতু। সেতুটির দৈর্ঘ্য হবে ২৭০০ ফুট এবং জোয়ারের সময় নদীর জলরেখা থেকে সেতুটির মধ্যবর্তী অংশের উচ্চতা হবে ১১৩ ফুট। এই ধরনের ইস্পাতের তার দিয়ে ঝোলান রিভেট-করা সেতু আমাদের দেশে এই প্রথম তৈরী হচ্ছে। নির্মাণকার্য সমাপ্ত হতে সময় লাগবে আনুমানিক পাঁচ বছর এবং ব্যয় হবে জমি সংক্রান্ত ও আনুষঙ্গিক খরচসহ মোট ৩৩ কোটি টাকা।

এই সেতু তৈরী হলে বর্তমান হাওড়া ব্রিজের উপর যানবাহনের চাপ অনেকটা কমবে। সেতুটি হাওড়া শহরের উন্নতিরও সহায়ক হবে।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

পশ্চিমবঙ্গ

রাজনৈতিক দল

দিলীপ মালাকার

বৃটিশ আমলে পরাধীনতার যুগে বহু আদর্শবান তরুণ ও যুবক এগিয়ে এসেছিলেন ছোট-বড় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে পরাধীনতার নাগপাশ কাটতে। স্বদেশী করাই ছিল তাঁদের জীবন-ব্রত। বৃটিশ আমলেই বড় পার্টির কার্যকলাপে আস্থা হারিয়ে তাঁদের অনেকে ছোটখাটো রাজনৈতিক দল ও বিপ্লবী গোষ্ঠী গড়ে তোলেন। তখন কিন্তু সবারই উদ্দেশ্য ছিল একটিই—দেশকে স্বাধীন করা।

দেশ স্বাধীন হবার পর সেদিনের বহু ছোট দল, বিপ্লবী দল বিলুপ্তির পথে এগিয়ে গেল। তাদের দু-একটা দল এখনও কোনো রকমে টিমটিম করে টিকে আছে।

দেশ স্বাধীন হল, কংগ্রেস সরকার গঠিত হল। রাজনৈতিক মতবাদে বিরোধ দেখা দিল নেতাদের মধ্যে। তাঁদের কেউ কেউ বেরিয়ে এসে নতুন দল গড়লেন। এবার উদ্দেশ্য এক রইল না। শাসনযন্ত্র দখল করে নিজেদের রাজনৈতিক আদর্শ অনুযায়ী জনগণের সেবা করাই হল তাঁদের উদ্দেশ্য। বহু আদর্শবান তরুণ ও যুবক বড় দল ভেঙে ছোটখাটো দল গড়লেন। এঁদের অনেকেই বিপ্লবী। কিন্তু কেউই গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রথার বিরুদ্ধে গেলেন না। নির্বাচনের সময় এলে সবাই জোড়-জোড়ে ব্যস্ত হলেন। সবার আশা তাঁরা নির্বাচনে জিতে সরকার গঠন করবেন। দেশকে নতুনভাবে সাজাবেন। কিন্তু প্রথম বিশ বছর ছোটখাটো দলগুলো শুধু বিধানসভায় বিরোধী আসনে গরম বক্তৃতাই করে গেলেন। শাসন ক্ষমতায় এসে নতুন কিছু করার সুযোগও পেলেন না।

আদর্শবান রাজনৈতিক নেতারা যে-যাই বলুন না কেন, ছোট-বড় সব রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য একটিই এবং সেটি হল নির্বাচনে জিতে শাসন ক্ষমতা দখল করা। সব দলের ভাগ্যে তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সোজা কথা নয়। পাঁচ-দশ কিম্বা পনেরটি আসন নিয়ে সরকার গঠন করা যায় না। তাই ছোটখাটো দলগুলো কোনো একটি বৃহৎ দলের সঙ্গে ভিড়ে যায় মন্ত্রিসভা গঠন করতে। যে জোটে তারা যোগদান ক'রে সেই জোটের পরামর্শে তাদের চলতে হয়। জোটের উত্থান-পতনের সঙ্গে তাদের ভাগ্য জড়িত তাই জোটের পতন হলে তাদেরও পত[illegible] ঘটে। এই ধারাই আমরা দেখে আস[illegible] পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে ক[illegible] যুগ ধরে। এ-দৃশ্য শুধু পশ্চিমবঙ্গের রা[illegible]নৈতিক পটেই দেখা যায় না, বিশ্বের [illegible] সব দেশেই এক চিত্র। একটি ছো[illegible] হঠাৎ বড়তে পরিণত হয়েছে তেমন [illegible] কোথাও দেখা যায় না। বড় কোনো [illegible] বিপর্যয় হলে সর্বত্রই ছোট মাঝারি[illegible] নিয়ে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হ[illegible] বলেই আমরা জানি।

নির্বাচনে কোন ছোটখাটো [illegible] স্বাধীনভাবে প্রতিযোগিতা চালিয়ে সু[illegible] করতে পেরেছে বলেও আমরা দেখতে পা[illegible] না—পশ্চিমবঙ্গ তার দৃষ্টান্ত। কয়েক[illegible] ছোটখাটো দল স্বাধীনভাবে নি[illegible] প্রতিযোগিতা চালিয়ে একবারে [illegible] হয়ে গেছে। তেমন নজীর আ[illegible] ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭২ সালে[illegible] নির্বাচনে, এই পশ্চিমবঙ্গে। সে[illegible] বিস্তৃত আলোচনা আমরা পরে করা[illegible]

১৯৭২ সালের নির্বাচনের পর দক্ষিণ ও আধা দক্ষিণপন্থী দলগুলো প্রা[illegible] বিলুপ্ত হয়েছে। মধ্যপন্থীদের অবস্থা[illegible] তথৈবচ। কেবলমাত্র বামপন্থী ছোটখা[illegible] দলগুলো এখনও টিকে আছে। কি[illegible] তাদের কার্যকলাপ এখন খুবই সীমিত।

পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতিতে গত দশ বছর ধরে সি পি এম দল একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল হিসেবেই চিহ্নিত ছিল। বিধানসভায় এদের আসন সংখ্যা ছিল প্রচুর। ১৯৭১ সালের নির্বাচনে সি, পি, এম দল আসন লাভ করেছিল ১১১টি। ১৯৭২ সালে পেল মাত্র ১৪টি। আসন সংখ্যা হিসেবে একটি বিরাট দল হয়ে গেল ছোটখাটো দল।

সি, পি, আই দল হিসেবে বড় কিন্তু আসন সংখ্যা মাঝারি। ১৯৭১ সালের নির্বাচনে এরা পেয়েছিল ১৩টি আসন।

১৯৭২ সালে পেল ৩৫টি। কিন্তু তার নিজের একার ক্ষমতায় নয়। কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাঁধার জন্যেই এতগুলো আসন লাভ তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় কটাক্ষ করে বলেছিলেন, সি, পি, এম এখন ছোট দল-গুলোর মধ্যে একটি।

দল হিসেবে এখনও সি, পি, এম বড় দল। যে দল এককালে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলেছিল, সে দল গত এক বছর ধরে অর্থাৎ ১৯৭২ সালের নির্বাচনের পর একেবারেই নীরব। তাদের অ্যাকটিভিটিও তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

সি, পি, এম জোটে ছোটখাটো দল আর, এস, পি; এস, ইউ, সি; ওয়ার্কার্স পার্টি, ফরোয়ার্ড ব্লক, মার্কসিস্ট ফরোয়ার্ড ব্লক, আর, সি, পি,আই ইত্যাদিরা ১৯৭২ সালের ৪ঠা অকটোবর একবার জনসভা ডেকে সামান্য হৈচৈ করেছিলেন। তারপর দেখা গেল ১৯৭৩ সালের ৯ই জানুয়ারী আরেকটি জনসভা। বাস এই পর্যন্তই তাদের গতিবিধি। এই জোটের মধ্যে ফরোয়ার্ড ব্লক ও আর, সি, পি, আই ৭২ সালের নির্বাচনে একটিও আসন [illegible] করতে পারেনি। এদের বাদ দিয়ে সি, পি, এম এবং তার জোটের কয়েকটি দল গত এক বছর ধরে বিধানসভা বয়কট করে চলেছে। কিছুকাল যাবৎ আর, এস, পি দল আবার নতুন কথা বলছে। তাঁরা ভাবছেন বিধানসভায় যোগদান করবেন। সম্প্রতি তাঁদের দলের সম্মেলনে পৃথক আন্দোলনের কথাও বলা হয়েছে। তাঁরা গণবিক্ষোভ আন্দোলন শুরু করবেন বলেও ঘোষণা করেছেন।

মূল বাঙলা কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্য কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। মূল কংগ্রেস থেকে সরে এসে সুশীল [illegible] এবং তাঁর অনুরাগীরা যে বাংলা কংগ্রেস গঠন করেছেন তাঁরা ১৯৭২ সালের নির্বাচনে একটিও আসন লাভ করতে পারেননি। দল হিসেবে এখনও টিকে আছে বটে। কিন্তু গত এক বছরে তাদের কোনো অ্যাকটিভিটি দেখা যায় নি। কেবলমাত্র ৭৩ এর জানুয়ারীতে তাঁদের সাধারণ সম্মেলন বসল। এই পর্যন্ত। বিপ্লবী বাঙলা কংগ্রেস তার অফিসেই সীমাবদ্ধ। তার বেশী কিছু নয়। এই দলটিও সি, পি, এম ছায়ায় রয়েছে।

পি, এস, পি ; এস, পি ইত্যাদি মিলে সোস্যালিস্ট দল। সেই সোস্যালিস্ট দল পশ্চিমবঙ্গে নীরব। সর্বভারতীয় রাজ-নীতিতে তাদের মধ্যে চলেছে অনৈক্য। তার জের দেখা যাবে পশ্চিমবঙ্গে।

দল হিসেবে সি, পি, আই বড় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু ১৯৭২ সালের নির্বাচনের পর এ পর্যন্ত তার কার্যকলাপ বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। তার গতিবিধি ছোট দলের মতন। গণতান্ত্রিক মোর্চার সমর্থক হিসেবে সি, পি, আই কংগ্রেসের সঙ্গে কাজ করে চলেছেন এবং তাঁরা ভবিষ্যতেও করবেন বলে জানিয়েছেন। ভবিষ্যতে যদি সি পি আইএর কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে তাকেও ছোট দলের মধ্যে নাম লেখাতে হবে।

স্বাধীনতার আগে ও পরে বহুবার কংগ্রেস দল থেকে বেরিয়ে এসে অনেকে ছোটখাটো দল গড়েছিলেন। তাঁদের কোনো কোনো দল এখন বিলুপ্ত। কোনো কোনো দল এখনও কোনো রকমে টিকে রয়েছে শুধু নামে। কাজে নয়। ১৯৬৯ সালে কংগ্রেসে যে বিভেদ শুরু হল তার পরিণতি দেখা গেল ১৯৭০ সালে। আদি ও নব কংগ্রেস হিসেবে বিভক্ত হল। ১৯৭২ সালের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে নবকংগ্রেস বিধান-সভার ২৮০টি আসনের ২১৬টি আসন লাভ করল। আর আদি কংগ্রেস কেবলমাত্র ২টো আসন। এই হিসেবে আদি কংগ্রেস এখন ছোটখাটো দল। তার অ্যাকটিভিটিও ছোটখাটো দলের মতন। চার বছর পরে যখন আবার নির্বাচন হবে তখন তাঁরা কোথায় গিয়ে ঠেকবেন তা কে জানে?

বর্তমান শাসক দল এখন কংগ্রেস এবং তার দলেও চলছে দলাদলি। ইতিমধ্যে কংগ্রেসের বিধানসভা সদস্যদের নিয়ে ইয়ং লেজিসলেটিভ ফোরাম গঠিত হয়েছে। ওদিকে দিল্লীতে গঠিত কংগ্রেস সোস্যালিস্ট ফোরাম-এর কর্তারাও পশ্চিমবঙ্গে তাঁদের উপদল গড়বেন। শাসক কংগ্রেসের দলাদলির ফলে উপদল অথবা ছোট দল হলে ভবিষ্যতে আবার একটি ছোট দলের আবির্ভাব হবে কিনা কে বলতে পারে।

এ পর্যন্ত দেখা গেছে যে ছোট দলের ভবিষ্যত খুব উজ্জ্বল নয়। কারণ বড় দলই শাসন ক্ষমতা হাতে পায়। তারাই রাজ্য চালায়। ছোটখাটো দল থাকার প্রয়ো-জনীয়তাও রয়েছে। কারণ ছোট দলগুলো গণতন্ত্রের ছোট ছোট স্তম্ভ। ছোটখাটো স্তম্ভ ভেঙে গেলে গণতন্ত্র জখম হতে বাধ্য। কিন্তু ছোটখাটো দলগুলোর বাঁচা-মরার ভার তো সেই সব দলের নেতা ও জন-সাধারণের হাতে। সেখানে বড় দলের কোনো হাত আছে বলে মনে হয় না। বিগত চারটি নির্বাচনে ছোটখাটো দল কেমন করে ক্রমবিলুপ্তির পথে অগ্রসর হয়েছে তার বিচার-বিশ্লেষণ করা যাক।

১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭২ সালের মধ্যে চারটি নির্বাচনে পনরটি মরসুমী দল পশ্চিমবঙ্গ রাজনৈতিক পট থেকে বিলুপ্তির পথে এগিয়েছে। নির্বাচনের আগে প্রায় সব দেশেই কিছু মরসুমী দল গজিয়ে ওঠে এবং নির্বাচনের হারজিতের ওপর তাদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে থাকে। যেসব দলের কোনো সঠিক রাজনৈতিক মতবাদ, শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্র সংগঠনের কোনো ভূমিকা থাকে না, তাদের অবলুপ্তি ঘটে সবার আগে।

১৯৬৭ সালের পর থেকে আমরা এই রাজ্যে কিছু মরসুমী দলের আবির্ভাব ও অপমৃত্যু ঘটতে দেখেছি। তারা শুধু নির্বাচনে জিতে শাসন ক্ষমতা চেয়েছিল। তাদের কোনো সাংগঠনিক সংস্থা ছিল না। এই দলগুলোর অধিকাংশই কংগ্রেস দলত্যাগীদের দ্বারা গঠিত।

১৯৬৬ সালে বাংলা কংগ্রেস গড়লেন অজয় মুখার্জি ও সুশীল ধাড়া। সেই 'বাংলা কংগ্রেস' ভেঙে হুমায়ুন কবীর গড়লেন ১৯৬৯ সালে লোক দল। জাহাঙ্গীর কবীর গড়লেন ওই বছরে জাতীয় দল। কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে আশু ঘোষ গড়লেন ১৯৬৯ সালে আই, এন, ডি, এফ দল।

১৯৬৯ সালে কংগ্রেসে বিরাট ভাঙন ধরল, জন্ম হল নব ও আদি কংগ্রেসের। নব এখন আসল কংগ্রেসরূপেই পরিচিত। আদি কংগ্রেস মরসুমী দলে পৌঁছেছে।

১৯৭০ সালে বাংলা কংগ্রেস থেকে গড়ে উঠল বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস। ১৯৭১ সালে আবার বাংলা কংগ্রেসে ভাঙন ধরল। সুশীল ধাড়ার নেতৃত্বে গঠিত হল আর একটি বাংলা কংগ্রেস। গত পাঁচ বছরে চারটি নির্বাচনে উপরোক্ত প্রায় সব কটি দলই অবলুপ্ত হয়েছে। কেবলমাত্র আদি কংগ্রেস দুটি আসন নিয়ে কোনো রকমে টিকে আছে। আগামী নির্বাচনে তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে যথেষ্ট আশংকা রয়েছে।

বাংলা কংগ্রেস ১৯৬৭ সালে প্রার্থী দেয় ৩৫ জন এবং আসন লাভ করে ৩৪টি, ১৯৬৯ সালে প্রার্থী দেয় ৪৯ জন আসন লাভ করে ৩৩টি। ১৯৭১ সালে প্রার্থী দেয় ১৩৭ জন কিন্তু আসন পায় ৫টি। ১৯৭২ সালে সুশীল ধাড়া পন্থী বাংলা কংগ্রেস প্রার্থী দেয় ১৯ জন, আসন পায় শূন্য।

১৯৬৯ সালে লোকদল প্রার্থী দেয় ৫১ জন, জাতীয় দল দেয় ১৯ জন প্রার্থী, আই, এন, ডি, এফ দেয় ৯৮ জন প্রার্থী। তার মধ্যে কেবলমাত্র আই, এন, ডি এফ পায় একটি আসন, বাকী দুটো দল একটিও আসন পায়নি।

১৯৭১ সালে বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস তিনজন প্রার্থী দিয়ে ২টি আসন পায়, ১৯৭২ সালে ২ জন প্রার্থী দিয়ে একটিও আসন পায়নি।

আদি কংগ্রেস ১৯৭১ সালে ১৫৪ জন প্রার্থী দিয়ে পেয়েছিল ২টি আসন ১৯৭২ সালে ৬৪ জন প্রার্থী দিয়ে ২টি আসন পায়। প্রার্থী সংখ্যানুপাতে তাদের আসন লাভ ব্যর্থতারই পরিচয় দেয় এবং এইভাবেই মরসুমী দলগুলোর অপমৃত্যু ঘটছে।

বিশ বছরে কংগ্রেস ভেঙে বহু উপদলের সৃষ্টি হয়েছে। তাদের মধ্যে সমাজতন্ত্রবাদের সংমিশ্রণে কয়েকটি মধ্য-বামপন্থী দল গড়ে ওঠে ও ভেঙে যায়। যেমন কে, এম, পি; পি, এস, পি; এস, এস, পি ইত্যাদি। এইসব ছোট দলগুলোর মধ্যে ভাঙন ধরে আরও কয়েকটি উপদলের সৃষ্টি হয়। সেই সব মরসুমী দলগুলো বিগত কয়েকটি নির্বাচনে সুবিধে করতে

না পেয়ে এখন তারা বিলুপ্ত অথবা তাদের কর্মীরা অন্য দলে যোগদান করেছে।

পুরুলিয়া লোকসেবক সংঘও কংগ্রেসের কিছু দলভাঙ্গা লোক নিয়ে গঠিত হয়েছিল। ১৯৬৭ সালে লোকসেবক সংঘ ৫ জন প্রার্থী দিয়ে ৫টি আসন লাভ করে, ১৯৬৯ সালে ৬ জন প্রার্থী দিয়ে ৪টি আসন লাভ করে, ১৯৭১ সালে ৯ জন প্রার্থী দিয়ে শূন্য আসন আর ১৯৭২ সালের নির্বাচনে সম্পূর্ণ অবসর গ্রহণ।

একদালে লোকসেবক সংঘের প্রতিপত্তি ছিল পুরুলিয়া জেলায়। এখন তাদের রাজনৈতিক প্রভাব নেই বললেই চলে। সেখানে কংগ্রেস জাঁকিয়ে বসেছে। কংগ্রেস থেকে ভেঙ্গে এসে যে সব ছোট দল গঠিত হয়েছিল, ১৯৭২ সালের নির্বাচনে তাদের ব্যর্থতায় বহু আসন কংগ্রেস আবার ফিরে পেয়েছে।

মরসুমী দল ছাড়া অনেক ছোট দল গত পাঁচ বছরের নির্বাচন লড়াইয়ে যখন তারা কোনো বৃহৎ জোটের সঙ্গে থেকেছে তখন সেই জোটের ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তার ওপর নির্ভর করেছে তাদের আসন লাভ। যখন ইউ. এল. এফ জোট ক্ষমতাশালী ছিল তখন তাদের জোরে বহু দল নির্বাচনে উৎরে গেছে, আবার ইউ. এল. এফের বিপর্যয়ে তাদেরও বিপর্যয় ঘটেছে।

একদালের কংগ্রেস থেকে ভেঙে আসা পি. এস. পি এবং এস. এস. পি যখন বৃহৎ জোটে ছিল তখন তারা মন্দ আসন পায়নি। কিন্তু তাদের দলে ভাঙন ও এবারকার সোস্যালিস্ট দলের একা নির্বাচনী লড়াই-এ তাদের ব্যর্থতাই ঘোষণা করে। ১৯৬৭ সালে পি. এস. পি ২৬ জন প্রার্থী দিয়ে ৭টি আসন পেয়েছিল, এস এস পি দিয়েছিল ২৬ জন প্রার্থী এবং পেয়েছিল ৭টি আসন। ১৯৬৯ সালে পি. এস. পি ২৪ জন প্রার্থী দিয়ে ৫টি আসন পায়, এস. এস. পি দল ১৪ জন প্রার্থী দিয়ে ১টি আসন পায়। ১৯৭১ সালে পি. এস. পি দল ১৭ জন প্রার্থী দিয়ে ৩টি আসন ও এস. এস. পি দল ২৫ জন প্রার্থী দিয়ে ১টি আসন লাভ করে। এরপর তাদের দুটি দলে ভাঙনে ও মিলনে সোস্যালিস্ট দলের আবির্ভাব। ১৯৭২ সালে সোস্যালিস্ট দল কোনো জোটে যোগদান না করে ২৬ জন প্রার্থী দিয়ে একটিও আসন পায়নি।

গোর্খা লীগ ও ঝাড়খণ্ড দল ধর্মীয় নয় কিন্তু বিশেষ জাতিসত্তার দল। এই দুই দলের মধ্যে গোর্খা লীগ একইভাবে রয়েছে কয়েক বছর ধরে। তবে ঝাড়খণ্ড দলের বেলায় তা ঘটেনি। গোর্খা লীগ ১৯৬৭ সালে ২ জন প্রার্থী দিয়ে ২টি আসন পেয়েছিল, ১৯৬৯ সালে ৪ জন প্রার্থী দিয়ে ৪টি আসন লাভ করে, ১৯৭১ সালে ৪ জন প্রার্থী দিয়ে ২টি আসন ও ১৯৭২ সালে ৩ জন প্রার্থী দিয়ে ২টি আসন লাভ করে। ঝাড়খণ্ড দল ১৯৬৯ সালে ৫ জন প্রার্থী দিয়ে শূন্য আসন, ১৯৭১ সালে ৪ জন প্রার্থী দিয়ে ২টি আসন, ১৯৭২ সালে ২৩ জন প্রার্থী দিয়ে শূন্য আসন পেয়েছে।

সাম্প্রদায়িক, আধা-সাম্প্রদায়িক ও চরম দক্ষিণপন্থী দলগুলো পশ্চিমবঙ্গে গত চারটি নির্বাচনে অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। এই দলগুলো সর্বভারতীয় দল বলে টিকে আছে কিন্তু বিধানসভার তাদের কোনো ভূমিকা নেই। এইসব দল-গুলোর শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র ইত্যাদি কোনো সংগঠনে প্রভাব নেই বলে তারা বেশী ভোটও তুলতে পারেনি। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের জামানত জব্দ হয়েছে।

১৯৬৭ সালে জনসংঘ প্রার্থী দেয় ৫১ জন আর আসন পায় মাত্র একটি, স্বতন্ত্র দল প্রার্থী দেয় ২০ জন আসন পায় একটি। ১৯৬৯ সালে জনসংঘ প্রার্থী দেয় ৪৭ জন আসন পায় শূন্য, স্বতন্ত্র দেয় ৫জন প্রার্থী আসন পায় শূন্য। প্রোগ্রেসিভ মুসলিম লীগ দেয় ৪০ জন প্রার্থী আসন লাভ করে ৩টি। প্রাউটিস্ট দল প্রার্থী দেয় ৪ জন আসন পায় শূন্য। হিন্দু মহাসভা প্রার্থী দেয় ৪ জন আসন পায় শূন্য। রিপাবলিকান পার্টি দেয় ৪ জন প্রার্থী আসন পায় শূন্য। ১৯৭১ সালে জনসংঘ প্রার্থী দেয় ২৫ জন আসন পায় একটি। হিন্দু মহাসভা দুজন প্রার্থী দিয়ে শূন্য আসন লাভ করে। মুসলিম লীগ ৫৫ জন প্রার্থী দিয়ে পায় ৭টি আসন। ১৯৭২ সালে জনসংঘ ১৬ জন প্রার্থী দিয়ে শূন্য আসন পায়। প্রাউটিস্ট দল ৬ জন প্রার্থী দিয়ে শূন্য আসন লাভ করে। হিন্দু মহাসভা ২ জন প্রার্থী দিয়ে শূন্য আসন, মুসলিম লীগ ২৯ জন প্রার্থী দিয়ে ১টি আসন পায়। আওয়ামী লীগ ১ জন প্রার্থী দিয়ে শূন্য আসন লাভ করে। এই হিসেব থেকে সাম্প্রদায়িক ও দক্ষিণপন্থী দল-গুলোর ভূমিকা পরিষ্কার করে দেয়। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এদের অস্তিত্ব মোটেই পরিষ্কার নয়। তাদের বিলুপ্তি না ঘটলেও দল হিসেবে গুরুত্ব খুবই কম।

ছোট ছোট বামপন্থী দলগুলোর অবস্থা নির্ভর করেছে ইউ. এল. এফ জোটের শক্তির ওপর। যখন ইউ. এল. এফ জোট শক্তিমান ছিল তখন তারা আশানুরূপ আসন লাভ করত। ১৯৭১ ও ১৯৭২ সালে বামপন্থী মোর্চার শক্তি কমতে থাকলে তারা অধিকসংখ্যক প্রার্থী দিয়ে কম আসন লাভ করেছে। তবে এইসব ছোট-খাটো বামপন্থী দলগুলো একেবারে বিলুপ্ত হবে না এইজন্যে যে, এদের প্রত্যেকেরই শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র মহলে নিজস্ব সংগঠন রয়েছে। ট্রেড ইউনিয়নে এদের এখনও ব্যক্তিগত প্রভাব রয়েছে। সেই জোরেই এঁরা টিকে থাকবেন। বিধান-সভায় যদিও এঁদের প্রতিপত্তি থাকছে না।

একদালের শক্তিশালী ফরোয়ার্ড ব্লক ১৯৬৭ সালে ৪২ জন প্রার্থী দিয়ে পেয়েছিল ১৩টি আসন, ১৯৬৯ সালে ২৮ জন প্রার্থী দিয়ে ২১টি আসন, ১৯৭১ সালে ৫৩ জন প্রার্থী দিয়ে আসন পায় মাত্র ৩টি আর ১৯৭২ সালে ১৮ জন প্রার্থী দিয়ে পেয়েছে শূন্য আসন। বিধান-সভায় নিশ্চিহ্ন হবার পর দল হিসেবে কোনো রকমে টিকে আছে। ইতিমধ্যে এই দল থেকে কিছু সদস্য পদত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে।

আর, এস, পি দল কখনই খুব বেশী প্রার্থী দেয়নি। অল্পসংখ্যক প্রার্থী দিয়ে যথার্থ সংখ্যায় আসন লাভ করেছে। যেমন ১৯৬৭ সালে ৭ জন প্রার্থী দিয়ে ৬টি আসন, ১৯৬৯ সালে ১৭ জন প্রার্থী দিয়ে ১২টি আসন, ১৯৭১ সালে ৪১ জন প্রার্থী দিয়ে ৩টি আসন ও ১৯৭২ সালে ১৭ জন প্রার্থী দিয়ে ৩টি আসন লাভ করে সমতা বজায় রেখেছে।

বামপন্থী জোটের মধ্যে আর, সি, পি, আই ১৯৬৭ সালে ২ জন প্রার্থী দিয়ে ১টি আসন, ১৯৬৯ সালে ২ জন প্রার্থী দিয়ে ২টি আসন, ১৯৭১ সালে ৭ জন প্রার্থী দিয়ে ৩টি আসন এবং ১৯৭২ সালে ৩ জন প্রার্থী দিয়ে শূন্য আসন পেয়েছে।

এস, ইউ, সি দল কখনই খুব বেশী প্রার্থী দেয়নি। বাছাই করা কয়েকটি কেন্দ্রে তারা যথার্থভাবে লড়ে আসন লাভ করেছে। কেবলমাত্র ব্যতিক্রম দেখা গেছে ১৯৭২ সালের নির্বাচনে। ১৯৬৭ সালে ৬ জন প্রার্থী দিয়ে ৪টি আসন লাভ করে, ১৯৬৯ সালে ৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ৭টি আসন লাভ, ১৯৭১ সালে ২০ জন প্রার্থী দিয়ে ৭টি আসন আর ১৯৭২ সালে ১০ জন প্রার্থী দিয়ে মাত্র ১টি আসন লাভ করে।

দুটো বামপন্থী দল ওয়ার্কার্স পার্টি ও বলশেভিক দল অবলুপ্তির পথে এগিয়েছে। ওয়ার্কার্স পার্টি ১৯৬৭ সালে প্রার্থী দেয় ২ জন আসন পায় ২টি, ১৯৬৯ সালে ২ জন প্রার্থী দিয়ে ২টি আসন, ১৯৭১ সালে ২ জন প্রার্থীর [illegible] আসন লাভ, ১৯৭২ সালে ৩ জন [illegible] দিয়ে ১টি আসন লাভ করে। বলশেভিক দল ১৯৬৭ সালে ১ জন প্রার্থী দিয়ে শূন্য আসন, ১৯৭১ ও ১৯৭২ সালে একজন করে প্রার্থী দিয়ে একটি আসনও লাভ করতে সমর্থ হয়নি।

বরাবর দেখা যাচ্ছে, যে জোট শক্তিশালী সেই জোটের অন্তর্ভুক্ত ছোট-বড় দলকে ভোটদাতারা ভোট দিয়ে তাদের নির্বাচিত করে। যখন জোট দুর্বল হয় বা জনপ্রিয়তা হারায় তখন তার ছাউনির ছোট দলগুলো সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

রাজনীতি সনাতন নয়। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে তার ব্যতিক্রম নেই। পাঁচ বছর আগে যে ধরনের রাজনৈতিক আবহাওয়া ছিল এখন তা নেই। নেই বলেই ছোটখাটো দলগুলো বদলাচ্ছে। তাই কিছু কিছু দল এগিয়ে চলেছে অবলুপ্তির পথে। কিছু দল যাবে। হয়ত ভবিষ্যতে আরও নতুন ছোটখাটো দলের আবির্ভাব হবে। গণতান্ত্রিক দেশে তার সম্ভাবনাই বেশী।

সম্প্রসারণ ও সামাজিক পরিবর্তন

কার ভাগে কত

শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

শাস্ত্র হিসেবে অর্থনীতির বয়স দুশ' বছরও নয়। রামায়ণ-মহাভারত প্লেটো-আরিস্টটল থেকে শুরু করে দেশবিদেশের প্রাচীন লেখকদের রচনায় অর্থনৈতিক ধ্যানধারণা তত্ত্ব ও তথ্য ছড়ানো থাকলেও, অর্থনীতির ওপর প্রথম প্রামাণ্য বা আদর্শ-রূপে গ্রন্থ রচিত হয় মাত্র ১৭৭৬ সালে। (প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' ঠিক অর্থনীতির ওপর রচনা নয়—প্রশাসন বা রাজধর্ম-সংক্রান্ত গ্রন্থ।) সকলেই জানেন, এই প্রামাণ্য গ্রন্থের রচয়িতা হলেন অর্থনীতির জনক নামে অভিহিত অ্যাডাম স্মিথ (১৭২৩—১৭৭৮) এবং গ্রন্থখানির নাম 'অ্যান এন্ এনকোয়ারি ইনটু দি নেচার অ্যান্ড কজেস অফ দি ওয়েলথ অফ নেশানস্'—অর্থাৎ জাতিসমূহের সম্পদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ ও কারণানুসন্ধানের প্রয়াস। জাতির সম্পদের উদ্দেশ্য হল সামগ্রিকভাবে জাতির এবং জাতির অন্তর্ভুক্ত জনগণের অভাব মোচন করা। বস্তুত, অভাবমোচনের সমস্যাই অর্থনীতির বিষয়বস্তু।

সম্প্রসারণ সংক্রান্ত অর্থনীতি :

অ্যাডাম স্মিথ 'সম্পদ' শব্দটি আয়ের অর্থে ব্যবহার করেছিলেন কিনা তা নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও, এ-বিষয়ে আধুনিক লেখকগণ একমত যে ব্যক্তির মত, পরিবারের মত জাতিরও অভাবমোচনের পরিমাণ নির্ভর করে আয়ের ওপর—সম্পদের ওপর নয়। আরও সুস্পষ্টভাবে বলতে গেলে, কোন দেশ বা জাতি অভাবমোচনের পথে কতটা অগ্রসর হতে সমর্থ তা তার সম্পদ বা মজুত মালপত্রের ওপর ততটা নির্ভর করে না যতটা নির্ভর করে ভোগ্যদ্রব্যাদির প্রবাহের ওপর—অর্থাৎ কি পরিমাণ দ্রব্যাদি উৎপন্ন হচ্ছে তার ওপর। জাতির ক্ষেত্রে ভোগ্যদ্রব্যাদির এই প্রবাহকেই বলা হয় জাতির আয় বা জাতীয় আয়। এই কারণে আধুনিক অর্থনীতিতে জাতীয় আয় কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় তারই আলোচনা বিশেষভাবে করা হয়ে থাকে। আধুনিক অর্থনীতির এই দিকটা সম্প্রসারণ সংক্রান্ত অর্থনীতি বা গ্রোথ ইকনমিকস্ নামে অভিহিত।

গ্রোথ বা সম্প্রসারণের ফলে—অর্থাৎ জাতীয় আয় বৃদ্ধির ফলে দেশের লোকের গড় বা মাথাপিছু আয়ও বাড়ে, যদি না অবশ্য জনসংখ্যা আনুপাতিকের চেয়ে বেশী হারে বৃদ্ধি পায়। যেমন, আমাদের দেশে অনেক বছরই এমন হয়েছে যে, জাতীয় আয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও মাথাপিছু আয় বাড়েনি, কারণ, জনসংখ্যাবৃদ্ধি বর্ধিত জাতীয় আয়কে গড় বা মাথাপিছু আয়ে প্রতিফলিত হতে দেয়নি। দরিদ্র পরিবারে সামান্য আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি একটি নতুন অতিথির আগমন ঘটে, তাহলে ব্যাপারটা যেরকম দাঁড়ায় সেরকম আর কি। কিন্তু মাথাপিছু আয়বৃদ্ধিই হল গ্রোথ ইকনমিকসের লক্ষ্য, (এবং বলা যায় গ্রোথের লক্ষণ), মোট জাতীয় আয়বৃদ্ধি নয়। কারণ, মাথাপিছু আয় বাড়লে তবেই বেশী অভাব মোচন সম্ভব হবে—সুখস্বাচ্ছন্দ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন :

সম্প্রসারণের ফলে নানারকম অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য। এই পরিবর্তন যদি কাম্য গতি-প্রকৃতির হয়, তবে তাকে ডেভেলপমেণ্ট বা উন্নয়ন আখ্যা দেওয়া হয়, আর পরিবর্তন অকাম্য হলে তা হল পশ্চাদগতিরই সূচক। যেমন, অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ অর্থাৎ জাতীয় বা মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির ফলে দেশের নগরাঞ্চলের উন্নতি ঘটতে কিন্তু গ্রামাঞ্চল সম্পূর্ণ অবহেলিত হতে পারে, ধনবৈষম্য বৃদ্ধির ফলে বিলাস-দ্রব্যের উৎপাদন বাড়তে এবং জীবনধারণোপযোগী অপরিহার্য দ্রব্যাদির উৎপাদন হ্রাস পেতে পারে, ইত্যাদি। এইরকম ক্ষেত্রে মোট উৎপাদনের পরিমাণ—অর্থাৎ কি পরিমাণ রাস্তাঘাট বাড়ী-ঘর নির্মিত এবং জিনিসপত্র উৎপন্ন হল—দিয়ে বিষয়টির বিচার করলে ভুল হবে; দেখতে হবে ঐ উৎপাদন বৃদ্ধি কাদের জন্য—প্রচলিত অর্থে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফল কে কতটা পাচ্ছে?

উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচার :

সুতরাং অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ এবং তথাকথিত উন্নয়নই যথেষ্ট নয়, এদের সঙ্গে জড়িত আছে আরও একটি বিশেষ প্রশ্ন—সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্ন; এবং এই বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই প্রশ্নের গুরুত্ব ও তাৎপর্যের ব্যাখ্যার বিশেষ প্রয়োজন নেই। সংক্ষেপে বলা যায়, সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার যখন দুই গোলার্ধে বৃহত্তর অংশে অন্যতম স্বীকৃত রাজনৈতিক আদর্শ, সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তনে রক্তাক্ত বিপ্লবের পক্ষপাতী যখন অধিকাংশই নন তখন সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্নকে পরিহার করা কর্কট রোগের ন্যায় কঠিন ব্যাধিকে শুরুতে উপেক্ষা করার মতই সর্বনাশকে ডেকে আনা। এই উপলব্ধি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে রচিত অনেক সংবিধানের নীতি হিসেবে ঘোষিত হয়েছে—যেমন আমাদের সংবিধানে বলা হয়েছে : ভারতের সকল নাগরিকই যাতে অন্যায়ের মধ্যে 'সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক' ন্যায়বিচার পেতে পারে তার জন্যেই এই সংবিধান গ্রহণ করা হল। (সংবিধানের প্রস্তাবনা)।

ন্যায়বিচার ও আর্থিক বৈষম্য :

সংবিধানে ঘোষিত ন্যায়বিচার-ব্যবস্থা কার্যকর করা বিশেষে দুরূহ ব্যাপার, কারণ এর জন্যে প্রাথমিক করণীয় হল আর্থিক বৈষম্য বা ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান হ্রাস, বর্তমানে যে আদর্শ শ্রীমতী গান্ধীর 'গরীবী হটাও'-শ্লোগানের রূপ নিয়েছে। ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে—যেখানে মাথাপিছু আয় অকিঞ্চিৎকর সেখানে গরীবী হটাতে হলে মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি বা সম্প্রসারণকেই প্রথম ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করতে হয় নচেৎ দারিদ্র্যকে বণ্টন করে সবাইকে টেনে এক পর্যায়ে নামিয়ে আনা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না। অথচ আমাদের দেশের মত অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সম্প্রসারণের ফলে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে বা বৃদ্ধি পাচ্ছে; সামাজিক ন্যায়বিচারের আদর্শ কার্যকর করা ঠিক সম্ভব হচ্ছে না। এই উভয় সংকট থেকে পরিত্রাণের পথ কি তাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের ফলে আর্থিক বৈষম্য কি বৃদ্ধিও পেতে পারে, না আমাদের সম্প্রসারণ পদ্ধতিতেই বড় কোন গলদ আছে?—এই হল আজকের দিনের বিশেষ প্রশ্ন।

গুন্নার মিরডালের (এবং আরো অনেকের) মতে, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, দারিদ্র্য ও বৈষম্যের মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ও বৈষম্যের গতি একই দিকে—অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যে দেশ যত অনগ্রসর সেই দেশে বৈষম্য তত প্রকট। কারণ খুবই সহজবোধ্য।

এই সব অনগ্রসর দেশকে বর্তমানে মোলায়েম করে বলা হয় স্বল্পোন্নত দেশ বা আন্ডারডেভেলপড কান্ট্রি। লক্ষণ-বিচারে স্বল্পোন্নত দেশ হল সেই দেশ যার বর্তমান মাথাপিছু আয় অতি সামান্য, কিন্তু যার অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

স্বল্পোন্নত দেশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল জনবহুলতা ও জনবিস্ফোরণ। এর সুযোগ নিয়ে বদ্ধ অর্থ-ব্যবস্থার কতিপয় ব্যক্তি ও শ্রেণী সহজেই সমাজের অপরাংশকে শোষণ করে বিত্তশালী হয়ে ওঠে। যেমন, যারা জমির মালিক তারা জমির বর্তমান চাহিদার দরুন সহজেই বেশী খাজনা, ফসলের ভাগ ইত্যাদি আদায় করতে সমর্থ হয়। (অর্থনীতিশাস্ত্রের শৈশব অবস্থাতেই ডেভিড রিকার্ডো এইদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।) অনুরূপভাবে যাদের নগদ টাকা আছে তাদের পক্ষে বিত্তহীন খাতকদের কাছ থেকে বেশী সুদ আদায় করা সম্ভব হয়। এই অবস্থায় সামান্য যে কটি শিল্প গড়ে ওঠে তাদের মালিকরা শ্রমের প্রয়োজনাতিরিক্ত যোগানের ফলে মজুরির স্বল্পতা এবং মালিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার অভাবের দরুন মুনাফার অঙ্কও বাড়িয়ে তুলতে পারে। এইভাবে বণ্টনযোগ্য জাতীয় আয়ে খাজনা, সুদ ও মুনাফার অঙ্ক বাড়তে থাকলে মজুরির অংশ কমতে বাধ্য। ফলে খাজনা, সুদ ও মুনাফা ভোগকারী এবং মজুরিজীবী শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান দিন দিন সম্প্রসারিত হতে থাকে—অর্থাৎ বৈষম্য বৃদ্ধি পেতে থাকে।

তাই বলা হয়, আর্থিক বৈষম্যহ্রাসের জন্য প্রথম করণীয় হ'ল অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপযোগী অবস্থার সৃষ্টি করা।

কিন্তু অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ বা উন্নয়ন সত্ত্বেও বৈষম্য যদি অপরিবর্তিত থাকে, অথবা উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বৈষম্য যদি আরও বৃদ্ধি পায়, তবে কি করা যেতে পারে? এই প্রশ্নটাই আজকের দিনে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের নিজেদের অবস্থার দিকেই দৃষ্টিপাত করা যাক।

ভারতে বৈষম্যের প্রকৃতি ও পরিমাণ:

আর্থিক বৈষম্যের মোটামুটি তিনটি দিক আছে: ধনবৈষম্য, আয়বৈষম্য এবং আর্থিক মর্যাদায় বৈষম্য এবং যেহেতু আর্থিক মর্যাদা ও সামাজিক মর্যাদা পরস্পরের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কে সম্পর্কিত সেই হেতু আর্থিক মর্যাদায় বৈষম্যের ফলে সামাজিক মর্যাদাতেও বৈষম্য দেখা দিতে বাধ্য। যেমন, গ্রামীণ পরিবেশে সামান্য জমির মালিকের যে মর্যাদা ও কর্তৃত্ব ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিক তা কল্পনাও করতে পারে না। ঐ জমি থেকে আয় যাই হোক না কেন, জমির মালিক গ্রামীণ সমাজের ওপরের তলার লোক। এই দিক দিয়ে আয়বৈষম্য অনেকটা তাৎপর্যহীন। তবে আয়বৈষম্যের ফলে যে ভোগবৈষম্য দেখা যায় তা আমাদের মত জনবহুল দেশে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এ সম্পর্কে আলোচনা পরে করব। এখন সংক্ষেপে আয়-বৈষম্যের পরিমাণ সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যাক।

ভারতের মোট জাতীয় আয়ের পরিমাণ বিশেষ কম নয়— প্রাথমিক হিসেব অনুসারে ১৯৭০-৭১ সালে তা ছিল ৩৪,০০০ কোটি টাকার কাছাকাছি। মোটের মাপকাঠিতে জাতীয় আয়ের বিচারে পৃথিবীতে ভারতের স্থান দশের মধ্যে। আবার মোট দ্রব্যাদি উৎপাদনের পরিমাণ ধরলে—অর্থাৎ যেসব জিনিসপত্র হাটে-বাজারে বিক্রির জন্যে আসে না এবং জাতীয় আয় গণনায় যার হিসেব পাওয়া যায় না তাদের ধরে বিচার করলে ভারতের স্থান বা র‍্যাংকিং হল চতুর্থ বা পঞ্চম। ভারতের জাতীয় আয়ের পরিমাণ অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন পর্তুগাল ও সুইজারল্যান্ডের জাতীয় আয়ের সমষ্টির চেয়ে বেশী, দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় আয়ের পাঁচগুণ অস্ট্রেলিয়ার তিনগুণ এবং ইংলন্ডের জাতীয় আয়ের অর্ধেক। মোট পরিমাণের দিক দিয়ে বিচার করলে ভারতের স্থান জাপান ও কানাডার সঙ্গে একই পর্যায়ে। অথচ এইসব দেশ হল অত্যুন্নত বা উন্নত আর ভারত হল অনগ্রসর দেশ—যদিও খাতির করে বলা হয় স্বল্পোন্নত।

জাতীয় আয়ের পরিমাণ যেমন বিশেষ কম নয়, অপরদিকে জনসংখ্যাও তেমনি বিপুল—১৯৭১ সালের জনগণনার হিসেব অনুসারে ৫৪ কোটি ৭০ লক্ষ। ফলে গড় বা মাথাপিছু আয় মাত্র ছশ টাকা— অর্থাৎ মাসিক ৫০ টাকা। এই হিসেব আবার বর্তমান বা ১৯৭০-৭১ সালের দামের ভিত্তিতে—যে সালে কুড়ি বছর আগের তুলনায় টাকার দাম অর্ধেকেরও বেশী কমে গেছে। সুতরাং আজকের মাসিক ৫০ টাকা হল ১৯৫০-৫১ সালে ২৫ টাকারও কম। ১৯৫০-৫১ সালে মাসিক ২৫ টাকায় বা তারও কমে, অথবা আজকে মাসিক ৫০ টাকায় খেয়েপরে বেঁচে থাকা যায় কিনা, সে সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে কি?

তবুও যদি জাতীয় আয় বণ্টন মোটামুটি বৈষম্যহীন হত, তাহলে এই বিপুল জনসংখ্যার দরুন সামান্য মাথাপিছু আয়েও দারিদ্র্য বা গরীবীর প্রশ্ন আমাদের ততটা প্রপীড়িত করত না। কিন্তু তা হয়নি।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দশ বছর অতিক্রান্ত হবার পর পরিকল্পনা কমিশন স্বীকার করেছিল যে (জানুয়ারী, ১৯৬৩) ওপরের দিকে ১০ শতাংশ লোক মোট জাতীয় আয়ের এক-তৃতীয়াংশ এবং নীচের দিকের ওই ১০ শতাংশ জাতীয় আয়ের মাত্র ২.৫—৩ শতাংশ পেয়ে থাকে। এবং নীচের এই ১০ শতাংশের মাসিক আয় ৭ টাকারও কম। এর কিছুদিন পরে (১৯৬৪) অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহালানবীশের নেতৃত্বে জাতীয় আয় ও সম্পদ বণ্টনের ওপর কমিটি' পরিকল্পনা কমিশনের উক্ত অভিমতকেই সমর্থন করে। কমিটি ঘোষণা করে: পরিকল্পনাধীন প্রথম দশ বৎসরে (১৯৫১-৬১) জাতীয় আয়ের বণ্টনে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়নি।

আজকেও—অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিশ বছর পরেও যে এই বণ্টন-ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন ঘটেনি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বরং দেখা যায়, বৈষম্য বৃদ্ধিই পেয়েছে। মোটামুটি হিসেব অনুসারে বর্তমানে ওপরের দিকে ৫ শতাংশ লোক মোট জাতীয় আয়ের এক-পঞ্চমাংশ পেয়ে থাকে, আর নীচের দিকে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ লোকের ভাগ্যে জোটে জাতীয় মোট আয়ের ২০ শতাংশেরও কম। এই হিসেব মেনে নিলে ওপরের পরিসংখ্যান থেকেই দেখা যাবে যে বিগত দশকের শুরুতে আয়-বৈষম্য এত প্রকট ছিল না।

জাতীয় সম্পদের বণ্টনে কি পরিমাণ পরিবর্তন ঘটছে তার নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। তবে কৃষির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ভূমিহীন কৃষিজীবীদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং এই বৃদ্ধির হার বিগত ২০ বছরে ছিল ৮-১০ শতাংশ। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে কৃষি-বহির্ভূত ক্ষেত্রে অনুরূপ ঘটছে—সমাজের নীচের স্তরের সম্পদ ক্রমাগতই হস্তান্তরিত হচ্ছে ওপরের স্তরের দিকে। এর ফলে যে আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদার ব্যবধান বৃদ্ধি পাচ্ছে তা সহজেই অনুমেয়।

বৈষম্যের আরও দুটি দিক:

ভারতে আর্থিক বৈষম্যের আরও দিক নির্দেশ করা যায়: নগরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য এবং আঞ্চলিক বৈষম্য। নগরাঞ্চলের চেয়ে গ্রামাঞ্চলে গরীবীর পরিমাণ বেশী তা সকলেরই অনুভূত সত্য।

প্রত্যেক দেশেই অর্থনৈতিক ও অন্যান্য দিক থেকে গ্রামাঞ্চল অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর হয়ে থাকে, কিন্তু সকল সভ্য দেশেই গ্রামাঞ্চলে একটা ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান—থাকে 'ন্যূনতম স্বাস্থ্য ও শালীনতার মান' বলে অভিহিত করা হয়—লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশে এই মান প্রবর্তন করা এখনও যে সম্ভব হয়নি তা শিক্ষা স্বাস্থ্য রাস্তাঘাট পরিবহণ-ব্যবস্থা বিদ্যুৎসরবরাহ, এমনকি পানীয় জল সরবরাহের দিক দিয়ে বিচার করলে সহজে বোঝা যায়।

অনুরূপভাবে আঞ্চলিক বৈষম্য আমাদের দেশে বিশেষ প্রকট। ধরা হয় যে ভারতের জনসংখ্যার মোট অর্ধেক দারিদ্র্য-রেখার নীচে বা কাছাকাছি বাস করে কিন্তু উড়িষ্যায় এই পরিমাণ হল ৭০ শতাংশের মত।

উড়িষ্যার চেয়েও দরিদ্র এবং দুর্দশাগ্রস্ত অঞ্চল আছে।

বিশ্বজনীন গতি :

এইভাবে আর্থিক বৈষম্যের অস্তিত্ব এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বৃদ্ধি সকল সম্প্রসারণশীল দেশের ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। বেঞ্জামিন হিগিনস দেখিয়েছেন, এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ প্রভাবাধীন ফিলিপাইনেও (যে দেশের ৫১ তম অঙ্গরাজ্য হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হবার কথা শোনা যাচ্ছে) আপাতদৃষ্টিতে মাথাপিছু আয়ের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি সত্ত্বেও জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানে কোন পরিবর্তনই ঘটেনি, কারণ 'যুদ্ধোত্তর যুগের সম্পদ ও আয় বৃদ্ধি ওপরের তলাতেই কেন্দ্রীভূত হয়েছে'। এই ব্যাপারে বোধহয় শ্রীলঙ্কাই (সিংহল) একমাত্র ব্যতিক্রম--একমাত্র ঐ দেশেই জাতীয় মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৈষম্য হ্রাস পেয়েছে এবং পাচ্ছে। সুতরাং সমাজকল্যাণ ও ন্যায়বিচার ব্রতী রাষ্ট্র হিসেবে শ্রীলঙ্কা সকল স্বল্পোন্নত দেশের ঊর্ধ্বে। অতএব ক্ষুদ্র যাহা ক্ষুদ্র তাহা নয়...।'

বৈষম্যের প্রতিফলিত রূপ :

আর্থিক বৈষম্য যে সরাসরি ভোগবৈষম্যে প্রতিফলিত হয় তার উল্লেখ শুরুতেই [illegible]া হয়েছে। নমুনাজরিপ বা স্যাম্পেল [illegible]ের ভিত্তিতে দেখা যায় যে ওপরের [illegible] ১০ শতাংশ লোকের ভোগের পরিমাণ [illegible] জাতীয় ভোগের ৩০ শতাংশ, অপর[illegible]ক নীচের দিকে ৪০ শতাংশ মোটের ২০ [illegible]াংশ ভোগ করতে সমর্থ হয় না। খাদ্য[illegible]ষ্টির দিক দিয়ে দেশের মোট জনসংখ্যার [illegible]০ শতাংশকে অতি দরিদ্র বলেই ধরতে [illegible]। বাসস্থানের ব্যবস্থাও শোচনীয়। সেনসাস বিভাগের হিসেবে এই শিল্পসমৃদ্ধ পশ্চিমবঙ্গেও ৬৫ শতাংশ পরিবার মাত্র একটি করে ঘরে বাস করে এবং অপরদিকে [illegible] শতাংশ পরিবারের ঘরের সংখ্যা ৩ বা [illegible]ধিক। আগেই উল্লেখ করেছি যে, মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক দারিদ্র্যরেখার নীচে বা কাছাকাছি থেকে কোনরকমে দিন গুজরান করে।

বৈষম্যের মৌল কারণ :

সাধারণত ধরে নেওয়া হয় যে পশ্চিম ইয়োরোপে শিল্পোন্নয়নের প্রথম পর্যায়ে আয়-বন্টন উত্তরোত্তর বৈষম্যমূলকই হচ্ছিল, এবং মাত্র দ্বিতীয় পর্যায়ে 'স্প্রেড এফেক্ট' বা বিস্তার প্রচেষ্টার (প্রয়োগবিদ্যা সম্পর্কিত জ্ঞান ছড়িয়ে পড়া) কার্যকারিতা এবং উৎপাদন বৃদ্ধির পর সমাজকল্যাণমূলক আইন প্রণয়নের ফলে আয় বন্টনের গতি বিপরীতমুখী হতে থাকে। একটা উদাহরণ নিয়ে বিষয়টির ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

আমাদের দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি কলাকৌশল ও শিল্পজ্ঞান সম্পন্ন লোকের সংখ্যা চাহিদার তুলনায় কম ছিল বলে জাতীয় আয়ে ঐ সব ব্যক্তির ভাগও ছিল বেশী। তারপর, ধরা যাক, এই ধরণের লোকের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে তাদের প্রাপ্যও কমে গেল এবং ন্যূনতম মজুরি আইন ইত্যাদির ফলে মজুরি বৃদ্ধি পেয়ে বৈষম্যও হ্রাস পেল। (আমাদের দেশে অবশ্য তা ঘটেনি)।

এইদিক দিয়ে দেখলে আর্থিক বৈষম্য-বৃদ্ধি অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ও গতিশীলতারই দ্যোতক। ভারতে কিন্তু সম্প্রসারণ বা উন্নয়ন কোনটাই চমকপ্রদ নয়। অতএব ভারতে বর্তমান আর্থিক বৈষম্যের বৃদ্ধি-বিচারে পশ্চিম ইউরোপের মত অতীত উদাহরণের সাহায্য নেওয়া সম্পূর্ণ অর্থহীন। বলা যায় নগরীকরণের ক্ষেত্রের মতই বর্ধমান আর্থিক বৈষম্য সম্প্রসারণের হাত ধরাধরি করে চলেনি—নগরীকরণের মতই আর্থিক বৈষম্যের বৃদ্ধির কারণ হল পর্যাপ্ত উন্নয়নের অভাব।

ভারতের উন্নয়নপদ্ধতিও পশ্চিম ইয়োরোপের সঙ্গে তুলনীয় নয়। গোড়া থেকেই ভারত উন্নয়নের জন্যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে, এবং অন্ততঃ দ্বিতীয় পরিকল্পনা (১৯৫৬—৬১) থেকে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করতে থাকে যে বৈষম্য অপসারণ উন্নয়ন-পরিকল্পনার অন্যতম মূল লক্ষ্য। ঘোষণাটির অনুমান ছিল মোটামুটি এইরকম অনুমানভিত্তিক : যতই আমরা বৈষম্য হ্রাস করতে সমর্থ হব, অর্থনৈতিক সম্প্রসারণও তত দ্রুততর হবে।

এখানেই রয়েছে আমাদের উন্নয়নপদ্ধতিতে লক্ষ্যের সংঘর্ষ : আগে সম্প্রসারণ, না আগে বৈষম্য অপসারণের ব্যবস্থা। অনেকের মতে, আগে সম্প্রসারণের পথে অগ্রসর হলেই বোধ হয় পদ্ধতিতে যৌক্তিকতা থাকত, কারণ অনগ্রসর অর্থব্যবস্থাই বৈষম্যপ্রসূত দারিদ্র্যের জন্মভূমি। অপরদিকে অবশ্য বলা যায় যে বৈষম্য-হ্রাস ছাড়া সামাজিক উৎসাহের সৃষ্টি সম্ভব নয়, এবং আমাদের দেশের মত গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার সফলতা এই সামাজিক উৎসাহের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। কিন্তু দেখা যায় যে, বৈষম্যহ্রাসের জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহে বিশেষ কার্যকর হয়নি, তাই সামাজিক উৎসাহসৃষ্টির অপারগতা পরোক্ষভাবে বৈষম্যবৃদ্ধিতে সহায়তা করে ঐ বৃদ্ধির অন্যতম গৌণ কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গৌণ কারণ :

বৈষম্যহ্রাসের জন্যে প্রস্তাবিত ও অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহের পর্যালোচনা করলেই বৈষম্যবৃদ্ধির অন্যান্য গৌণ কারণের সন্ধান পাওয়া যায়।

১৯৩১ সালের করাচী অধিবেশন থেকেই কংগ্রেস ঘোষণা করে আসছে যে আয়ের ঊর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। মোটামুটি এর সপক্ষে পরিকল্পনা কমিশন, কর অনুসন্ধান কমিশন অভিমত প্রকাশ করলেও এ বিষয়ে কোন কিছুই করা সম্ভব হয়নি, কারণ ভয় ছিল যে, এর ফলে উদ্যোগ ব্যাহত হবে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে জমির ঊর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণেরও বিরোধিতা করে আসা হয়েছে। এই যুক্তিতে যে, যখন অন্যান্য আয় ও সম্পত্তির ঊর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ করা হয়নি তখন শুধু জমির ক্ষেত্রে ঐ ব্যবস্থা কি ন্যায়বিচারের দ্যোতক হবে?

করব্যবস্থা সংস্কারের মাধ্যমে বৈষম্য অপসারণের বেশ কিছুটা প্রচেষ্টা করা হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রশাসনিক ত্রুটির জন্যে এই প্রচেষ্টা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নি—কর প্রবর্তনের আধিক্যের দরুন বরং ফল বিপরীতই হয়েছে।

অপরদিকে কিন্তু অকল্পিত মূল্যস্ফীতি অনেককে দারিদ্র্যরেখার নীচে টেনে নিয়ে গিয়েছে এবং পরিকল্পনার বিপুল ব্যয় ও সরকারী নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা সম্পদ ও আয়কে কেন্দ্রীভূত হতে সাহায্য করেছে।

এই পরিস্থিতিতে কয়েক ধরণের আশু উপশমকারী ব্যবস্থার সাহায্যে অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটানর যে চেষ্টা করা হয়েছে তার সুফল ভোগ জনসাধারণ করেনি, করেছে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী। যেমন ভূমি-সংস্কার ব্যবস্থার ফলে দরিদ্র কৃষিজীবীর পরিবর্তে উপকৃত হয়েছে মধ্যবিত্ত কৃষক। আবার সমষ্টি-উন্নয়ন প্রচেষ্টা, কৃষিসম্প্রসারণব্যবস্থা প্রভৃতি প্রশাসনিক ত্রুটির জন্যে দরিদ্র কৃষিজীবীকে ততটা স্পর্শ করেনি যতটা লাভবান করেছে সংগতিপন্ন কৃষককে।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ প্রভৃতির প্রেরণায় ভারতে বিভিন্ন শ্রমকল্যাণ ও মজুরি বৃদ্ধি সংক্রান্ত আইন পাশ করা হয়েছে সত্যি এবং এর ফলে সংগঠিত বৃহদায়তন শিল্প-ব্যবস্থায় শ্রমিকদের অবস্থার বেশ কিছুটা উন্নতিও হয়েছে। কিন্তু ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখলে এই শ্রমিকরা একরকম বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণী—এ প্রিভিলেজড ক্লাস। সংখ্যাতেও তারা বিপুলসংখ্যক গ্রামবাসীর কাছে কিছু নয়। এই শতকরা ৮০ ভাগ গ্রামবাসীর জন্যে এইরকম কোন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা সম্ভব হয়নি।

অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশের মতই ভারতে সেই সেই ক্ষেত্রেই বিনিয়োগ প্রবণতা দেখা যায় যা ওপরের দিকের জনসংখ্যাকেই সাহায্য করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সরকারী কর্মচারীদের জন্যে গৃহনির্মাণের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই কাজ আপাত চমকপ্রদ হলেও সত্যিই কি অধিক প্রয়োজনীয়? অন্যভাবে বলতে গেলে, গৃহহীনদের জন্যে গৃহের ব্যবস্থা করার চেয়ে সরকারী কর্মচারীদের জন্যে বাসস্থানের সুব্যবস্থা করা বেশী দরকার? এই ধরনের চমকপ্রদ নির্মাণকার্যকে 'সাধারণের বাহ্যাড়ম্বর পূর্ণ ভোগ' বলে অভিহিত করা হয়।

দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা বৈষম্য দূরীকরণে সহায়তা করে। এক্ষেত্রেও সরকারী ব্যয়ের অতি সামান্য অংশ জনসংখ্যার নীচের দিকের ভাগে এসেছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির অবস্থা পর্যালোচনা করলেই

বোঝা যায় যে উচ্চ মধ্যবিত্ত ও বিত্তশালী লোকেরাই বেশী ভোগ করেছে।

অর্থনৈতিক দ্বৈত-ব্যবস্থা :

আর্থিক বৈষম্য হ্রাসের জন্যে প্রথম করণীয় হল যাকে বলা হয় অর্থনৈতিক দ্বৈত-ব্যবস্থাকে দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা। অর্থনৈতিক দ্বৈত-ব্যবস্থা বলতে বোঝায় বৃহদায়তন ও ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থার পাশাপাশি অস্তিত্ব। বর্তমান অবস্থায় বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানগুলোই উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণ এবং বৈদেশিক মুদ্রা, পরিবহণব্যবস্থা প্রভৃতির বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে। এর ফলে তাদের আয়তন দিন দিন বৃহত্তরই হতে থাকে আর ক্ষুদ্রায়ত প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমাগত এগিয়ে যেতে থাকে সংকটের দিকে। আমাদের দেশে আধুনিক শিল্পব্যবস্থার প্রতি সরকারী মোহ এই অবস্থাকে আরও ঘনীভূত বা সংকটীভূত করে তুলেছে। আর্থিক বৈষম্য বৃদ্ধির এও একটা প্রধান কারণ।

'গরীবী হটাও'-এর তাৎপর্য :

বৈষম্যের উক্ত মৌল ও গৌণ কারণের পরিপ্রেক্ষিতেই 'গরীবী হটাও'-এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে হবে। আগেই বলেছি, শ্লোগানের রূপ নিলেও গরীবী হটাও আসলে হল বৈষম্যহ্রাসের দর্শন এবং বর্তমান অবস্থায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র-দর্শন। অনুমান করা যেতে পারে যে এই রাষ্ট্রদর্শন নিম্নলিখিতভাবে ভবিষ্যৎ সরকারী অর্থনৈতিক নীতিতে প্রতিফলিত হবে:

(১) দারিদ্র্য দূরীকরণ বা গরীবী হটান সম্ভব হলে মোট (গ্রোস) জাতীয় আয় আপনা থেকেই বৃদ্ধি পাবে, এই পরোক্ষ অনুমানের ভিত্তিতে প্রকট দারিদ্র্যের কয়েকটি নির্বাচিত ক্ষেত্রে বিশেষভাবে আক্রমণ চালান হবে।

(২) উৎপাদন-পরিকল্পনার চেয়ে ভোগ-পরিকল্পনার ওপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হবে। বস্তুত, উৎপাদন-পরিকল্পনা হবে ভোগ-পরিকল্পনার সহায়ক।

(৩) ভোগ-পরিকল্পনা টাকার অঙ্কে না করে জীবনযাত্রার মানের পরিপ্রেক্ষিতেই করা হবে—অর্থাৎ দেখা হবে যে সাধারণের জন্যে ন্যূনতম দ্রব্য ও সেবা যোগান দেওয়া যেন সম্ভব হয়। এক কথায়, বণ্টনের ওপরেই বেশী দৃষ্টি দেওয়া হবে।

(৪) অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনবৃদ্ধির প্রতিও লক্ষ্য রাখা হবে, কারণ উৎপাদন-বৃদ্ধি ব্যতিরেকে আমাদের মত দেশে দারিদ্র্য দূরীকরণ কোন মতেই সম্ভব নয়।

(৫) নিয়োগ হবে পরিকল্পনার প্রাথমিক লক্ষ্য, আগের মত গৌণ বা দ্বিতীয় পর্যায়ের লক্ষ্য নয়।

(৬) যারাই আয়ের স্তরে একটা ন্যূনতমের নীচে তাদেরই জন্য রাষ্ট্র থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তার পরিপূরক ব্যবস্থা করা হবে।

(৭) দেশের অনগ্রসর অঞ্চলগুলোর উন্নয়নের দিকে আগে দৃষ্টি দেওয়া হবে যাতে এই সব অঞ্চল শিক্ষা, চিকিৎসা, পানীয় জল ইত্যাদি ব্যাপারে ন্যূনতম জাতীয় পর্যায়ে অন্যতম হতে পারে। এই উদ্দেশ্যে সমাজসেবামূলক কার্যাদির রূপান্তর ঘটাতে হবে।

বলা যায় গরীবী হটাও কার্যক্রমের শ্লোগান সম্প্রসারণধর্মী অর্থনীতিতে অন্তত তত্ত্বের দিক দিয়ে নতুন যুগের সূচনা করবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই কার্যক্রম কতটা সফল হবে তা নির্ভর করবে অন্যান্য ব্যবস্থার ওপর।

অন্যান্য ব্যবস্থা :

এই অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে আছে অর্থনৈতিক দ্বৈত-ব্যবস্থার পুনর্গঠন, জন্ম-নিয়ন্ত্রণ কর্ম, কর-সংস্কার, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কাম্য ভূমিসংস্কার, একচেটিয়া অর্থনৈতিক অধিকারের অপসারণ এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভবনের বিরুদ্ধে বিরতিহীন সংগ্রাম।

অর্থনৈতিক দ্বৈত-ব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্যে প্রথমেই 'আধুনিক' শিল্প-ব্যবস্থার প্রতি আকর্ষণ বেশ কিছুটা কমাতে হবে। এখানে আধুনিক শিল্পব্যবস্থা বলতে বৃহদায়তন শিল্প-ব্যবস্থাকেই নির্দেশ করা হচ্ছে, আধুনিক প্রযুক্তির শিল্প-ব্যবস্থাকে নয়। জাপানে ক্ষুদ্রশিল্প-ব্যবস্থাকে এমন-ভাবে সংগঠিত করা হয়েছে যাতে ক্ষুদ্রশিল্প-গুলো বৃহদায়তন শিল্পের সঙ্গে সার্থক-ভাবে প্রতিযোগিতা করতে পারে, এমনকি ওভারহেড কস্ট বা খরচ বায় কম বলে বৃহদায়তন শিল্পগুলোর চেয়ে কম দামে বাজারে মাল ছাড়তে পারে। ঋণ-সংগ্রহ, বিক্রয়-ব্যবস্থা ইত্যাদি ব্যাপারে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলোর অসুবিধা দূর করে আমাদের দেশেও তা করা সম্ভব নয় কি? এর জন্যে প্রয়োজন যন্ত্রচালিত শিল্পনীতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন। যেমন, সাধারণের ব্যবহার্য ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারী শিল্প-গুলোকে কর, ঋণ, বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ ইত্যাদি ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব দেখান যেতে পারে, এবং অপরদিকে যেসব যন্ত্রশিল্প, বিলাসদ্রব্যের জন্যে উৎপাদনে নিয়োজিত তাদের ক্ষেত্রে প্রভেদাত্মক ব্যবহারের নীতি অবলম্বন করা যেতে পারে।

এর জন্যে প্রয়োজন কর-ব্যবস্থার সংস্কারেরও। কালো টাকার উদ্ধার ও অপসারণ, আয়কর ব্যবস্থায় রদ-বদল ছাড়াও অতিরিক্ত মুনাফা করের কথা ভাবা যেতে পারে। অবশ্য বিলাস-দ্রব্যের ওপর যে উচ্চহারে কর ধার্য করতে হবে সে বিষয়ে কোন মতভেদের নেই। প্রশ্ন উঠতে পারে যে এইভাবে কর-সংস্কারের ফলে সম্প্রসারণ ব্যাহত হবে কিনা। এর উত্তরে বলা যায় যে পরিসংখ্যানগতভাবে মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি সম্প্রসারণের লক্ষ্য নয়, আসলে লক্ষ্য হল সম্প্রসারণের দ্বারা দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের উন্নতিসাধন করে অর্থ-নৈতিক কল্যাণকে সম্প্রসারিত করা। আরও বলা যায় যে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চল ও নগরাঞ্চলের মধ্যে আর্থিক বৈষম্য হ্রাস পেলে আভ্যন্তরীণ বাজারও সম্প্রসারিত হবে এবং এই সম্প্রসারণ অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের প্রক্রিয়াকে সহায়তা করবে।

ভূমিসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা হল ভূমিস্বত্ব ব্যাপারে কৃষিজীবীকে নিশ্চয়তা দান করবার জন্যে। এই সংস্কারসাধনে সরকার ও কৃষিজীবীর মধ্যে সমস্ত মধ্য-স্বত্বভোগী স্বার্থদের অপসারণ করতে হবে। কাজটা খুব সহজ নয়। এর জন্যে দরকার এই মধ্যবর্তী স্বার্থসমূহের প্রতিযোগীর সৃষ্টি করা। সরকারী সংস্থা বা সমবায় সমিতিই এই প্রতিযোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে।

এটা সর্ববাদিস্বীকৃত সত্য যে ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রের ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব হয়েছে। এর মূলে আছে দুটি কারণ : বাজারের সংকীর্ণতা এবং শিল্প-উদ্যোগের দুষ্প্রাপ্যতা। এর দরুণই ঘটেছে আর্থিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন এবং অধিকতর আর্থিক বৈষম্য। ... এর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

উপসংহার :

বণ্টনের কথা চিন্তা করা হচ্ছে এবং 'গরীবী হটাও'-এর সঙ্গে এই সব ব্যবস্থাও যে সংযুক্ত হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সবই নির্ভর করবে কিভাবে গৃহীত নীতি কার্যকর করা হবে তার ওপর।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। আমাদের সমাজ বিশেষভাবে বৈষম্যদুষ্ট রূপ নিয়েছে। ... পূর্ণ ও চমকপ্রদ বাক্যের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই নীতিকে বিপরীতমুখী না করতে পারলে বৈষম্যজনিত ঈর্ষার প্রশমন তবেই সম্ভব হবে না ... সমাজ-ব্যবস্থাকে প্রপীড়িত করবে, রাষ্ট্র ... ন্যায় বিচার অভিযোগ। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে অ্যারিস্টটল সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে বিপ্লবের কারণ হল ন্যায়ের অভাব বিচার। এই দিক দিয়েই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রবর্তনের সময় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ঘোষণা করেছিলেন : বিবর্তনের মাধ্যমে আমরা যদি প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন না করতে পারি তবে বিপ্লব ঠেকাতে পারব না, কারণ পরিবর্তন ঘটবেই।

সবক্ষেত্রে অনুভূত না হলেও পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামা, আঞ্চলিকতা, অপরাধ-প্রবণতার বৃদ্ধি ইত্যাদি হল এই পরিবর্তন-আকাঙ্খারই লক্ষণ। পুলিশ - জেল - আদালত-সৈন্য-সামন্তের মাধ্যমে এই গতিকে বাধা সম্ভব হবে না। দেখা যায়, এ ব্যাপারে ধনীশ্রেষ্ঠ দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চিন্তা একই ধারাতে প্রবাহিত হচ্ছে। সেখানে কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত এক অভিমত-গণনায় প্রকাশ পেয়েছে যে অভিমতপ্রদানকারীদের ৮৮ শতাংশ অপরাধ-প্রবণতা হ্রাসের জন্যে দশ আর্থিক বৈষম্যহ্রাসেরই পক্ষপাতী, পুলিশী ব্যবস্থার নয়। বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ ভোগ বা ব্যয় দৃশ্য আর্থিক বৈষম্যের দ্যোতক। তাই বৈষম্যহ্রাসের পরিকল্পনায় এই কার্যক্রমকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

স্টেশনে ঢোকার মুখেই দেখা যায় ট্রেন থেকে। হলুদ রঙের দেয়াল-ঘেরা বাড়ি। ... সেই কুমারী কালের অভ্যেস মতই ... দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তাকায়। কলেজে পড়ার সময় ও ডেইলী প্যাসেঞ্জারী করত। কতদিন মনে মনে গুনেছে এক দুই তিন করে। ওঁদের বাড়ির সীমানা থেকে স্টেশনে এসে ট্রেন থামতে বরাবর ওর চল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশ গোনা শেষ হত। আজকে আর গুনল না। ট্রেন যাত্রার ধকলে শরীর ক্লান্ত। দেখতে দেখতে গাড়ি স্টেশনে এসে দাঁড়াল। নটবহর হাতের কাছে নিয়ে সুব্রত তৈরীই ছিল। বেতের মোড়া, পাখা, ফ্লাস্ক এসব টুকিটাকি জিনিসগুলো উমাই নিল। কুলীর পেছনে যেতে যেতে সুব্রত হাত বাড়িয়ে বলল—কয়েকটা জিনিস আমাকে দাও না?

—আমিই নিতে পারবো। সুব্রত এবার চাপাস্বরে বলল

—তাহলে আমাকেও নাও না।

—এ্যাই! উমা সলজ্জ হাসল।

রিকসায় যেতে যেতে সুব্রত বলল—ট্রেন থেকে কী দেখলে? অল কোয়ায়েট—

—তাই তো মনে হল। ফটিককে দেখলাম ঝাকড়া চুল দুলিয়ে বাগানে দৌড়ুচ্ছে। বাবা নতুন রং করিয়েছেন বাড়িটা। বাইরের গেটের অপরাজিতা গাছটায় ফুল ফুটেছে। দরজা জানালায় নতুন পর্দা লাগানো হয়েছে।

তাহলে এখানে আসার জন্য এত মরিয়া হয়ে—

বাবাঃ বিপদ-আপদ না ঘটলে বুঝি আসতে নেই।

—তা কেন—অসময়-সময়—

—এক বছরেরও বেশী তোমার ঐ হিজলপাতার জঙ্গলে পড়েছিলাম—মানুষের মুখ তো দেখতে ইচ্ছে করে—

—অ!

রিকসাটা বাড়ির গেটের কাছে এসে দাঁড়াতেই ফটিক, তপু ছুটে এল। মাও দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল। বাবা বোধহয় বাড়ি নেই। মালপত্র নামানো হল। ঘরে আসতেই সুব্রতকে মার কিছু অনুযোগ শুনতে হল। সেই যে দ্বিরাগমনে এসেছিল উমা তারপর আর ওকে এখানে আনাই হল না। সুব্রত সুবোধ বালকের মত মাথা নীচু করে বার বার ঘুরে-ফিরে একটা কথাই বলতে লাগল—ছুটিছাটা নেই মানে।

সুব্রতর অসহায় চেহারাটা দেখে উমা হাসি চাপতে পারল না। মাও হয়তো কিছু একটা আন্দাজ করে থাকবে। ... মুখ ... ... খাও—' বলে বাঁধুনিকে বোধহয় তাড়া দিতে গেল। বাবা বাড়ি ফিরেই আবার ছুটলেন বাজারে। বাড়িতে বেশ একটা শোরগোল পড়ে গেল।

খাওয়া-দাওয়ার পর উমা পান চিবুতে চিবুতে ঘরে ঢুকে দেখল সুব্রত চোখ বুজে সিগারেট টানছে। পোড়া ছাইটা নির্ঘাৎ বিছানায় পড়বে। উমা তাড়াতাড়ি ছাইদানিটা এগিয়ে দিল কোনদিন বিছানাটা পোড়াবে।

—ও। সুব্রত চোখ খুলে ছাইদানিটা বুকের ওপর রেখে ছাই ঝাড়ল। বলল—পান পেয়েছ?

—হুঁ, মা বলল তাই। উমা ঘরটার চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। ড্রেসিং টেবিল, খাট, ছোট আলমারী কোন কিছুই সরানো হয় নি। সেই আগের জায়গাতেই আছে সব।

—জানো—এই ঘরটা আমার ছিল।

—ও।

—আমার একার।

—একা একা ভালো লাগত?

—ভেবে দেখি নি।

উমা ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। সেই পরিচিত দৃশ্য। পুকুর ঘাটে পদ্মের নকসা-আঁকা ঘাটের চাতাল। শুধু আয়নায় প্রতিবিম্বিত খাটটা আজ আর শূন্য নয়। সুব্রত শুয়ে আছে। একার ঘরটা আর একার নেই।

উমার যখন ঘুম ভাঙল তখন বিকেল। ঘুমিয়ে শরীরটা এখন অনেক [illegible] লাগছে। সুব্রত ঘরে নেই। [illegible] ঘরে ওর গলা শোনা যাচ্ছে। [illegible] কথা বলছে। বিষয়—চাকরীর উন্নতি, বদলী, পেন অফিসের কলকাঠি ইত্যাদি। গা ধুয়ে উমা ড্রেসিং টেবিলটার সামনে এসে দাঁড়াল। সুব্রত ঘরে ঢুকল। বলল—চলো না একটু বেড়িয়ে আসি।

—দূর—কোথায় যাবো?

—নদীটা তো কাছেই নাকি।

—ও তো ছোটবেলা থেকেই দেখছি।

—একবার দেখ—অন্য রকম লাগবে।

—তাই বুঝি।

—কেন এখানে এসে একবার কিছু কিছু অন্য রকম দেখছো না?

উমা হাসল। সুব্রত হতাশার ভঙ্গী করল—যাই অনু ফুটকি ওদের নিয়ে আমিই ঘুরে আসি। বন-জঙ্গল না দেখলে আমার আবার ভালো হজম হয় না।' সুব্রত চলে গেল।

সত্যি অনেক কিছুরই পরিবর্তন হয়েছে—যতটা না বাইরে তার চেয়ে বেশী উমার নিজের মধ্যে। মুখে চেনা ঘষতে-ঘষতে জানালা দিয়ে তাকাল উমা। চার-পাশের ঝুঁকে-পড়া গাছগাছালির ঘন ছায়া পড়েছে পুকুরের জলে। বাঁধানো ঘাটলার চত্বরটা। মাঝখানে সেই পদ্মফুলের বড় নকসাটা। উমা মুহূর্তের জন্য বর্তমানকে বিস্মৃত হল। ওর মনে হল—সেই কুমারী-কালের মতই ও যেন কোথাও বেড়াতে যাবে অথবা সিনেমা দেখতে যাবে। সাজ-গোজ হয়ে গেলেই টেবিলের [illegible] থেকে ব্যাগটা তুলে নিয়ে সিঁড়িতে চটির আওয়াজ তুলে ও বেরিয়ে যাবে। অথবা বেড়াতে নয়, সিনেমা দেখতেও নয়। পুকুরের চাতালে গিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়ায় বসবে। বরুণও বসতো ওখানে। উমা যতক্ষণ না আসছে ততক্ষণ বরুণ দাঁড়িয়ে থাকতো নয়তো পদ্মের নকসা-আঁকা চাতালটায় ওপর পায়চারি করত। অপেক্ষা করত কখন উমা আসবে। উমা ইচ্ছে করে দেরী করত। বরুণের অসহিষ্ণু ভঙ্গীতে পায়চারি করা দেখত আর আপন মনেই হাসত। সেই দিনের কথাগুলো মনে পড়ল উমার। বরুণ শেষ পর্যন্ত যাত্রার দলে ঢুকে পড়েছিল। উত্তর বাংলার দিকে, আসামে, বিহারের কয়লাখনির এলাকায়—কত জায়গায় ঘুরে বেড়াত দলের সঙ্গে। বরুণ বলতে গেলে পাড়ারই ছেলে। অবাধ গতি ছিল এ বাড়িতে। সুন্দর গলা। গান গাইত বরুণ। আবার যখন যাত্রার দলে ঢুকেছিল তখন অ্যাকটিং নিয়ে পাগলামি শুরু হয়েছিল। সিরাজ-দ্দৌলা, ঔরংজেবের পার্ট বলত। পুকুরের চাতাল হত ওর ষ্টেজ, দর্শক উমা, অনু, ফুটকি কখনও কখনও মাও এসে বসত। এই পাগলামির জন্যেই বরুণকে উমার ভাল লাগত। উমা তখন সবে কলেজে ঢুকেছে। বেশ কিছু দিন পরে বরুণ ওর সফরের ফাঁকে কয়েকদিনের জন্যে এসেছিল। উমাকে দেখে ও কেমন যেন অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। উমার চোখমুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল। ও মাথা নীচু করে বসেছিল। মনে মনে একটা বিচিত্র আনন্দের শিহরণকে অনুভব করছিল। বরুণ কিন্তু সেদিন আলাপে গল্পে উচ্ছল হয়ে উঠতে পারে নি। উমাও না। মাঝে মাঝেই বরুণ অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। কেমন এক বেদনা-বিদ্ধ দৃষ্টিতে উমার দিকে তাকিয়ে থাকছিল। এক সময় খুব আস্তে যেন আপন মনে বলেছিল—'জানো উমা—যেখানেই যাই এই জায়গাটার কথা বড্ড মনে পড়ে—এই পুকুরটা—পদ্মের নকসাটা। আর—তোমার কথা।' উমা নতমুখে বসে-ছিল। কোন কথা বলে নি। সেদিন থেকে ওদের সম্পর্কটা যেন আর আগের মত রইল না। দুজনেই ক্ষণে ক্ষণে গম্ভীর হয়ে যেত। সেই আগের মত গল্প হাসি ঠাট্টা করতে ইচ্ছে করত কিন্তু পারত না। দুজনেই যেন কাছাকাছি হতে ভয় পেত। তখনই একদিন বরুণ কী একটা কথা বলতে গিয়ে উমার হাতটা ধরেছিল। উমার শরীরের ভেতরটা থর থর করে কেঁপে উঠেছিল। বরুণ তখনও কথা বলে যাচ্ছিল—এত দ্রুত বলে যাচ্ছিল যেন কেউ ওকে এক্ষুনি থামিয়ে দেবে। বরুণ কী বলছিল উমার কিছুই কানে যাচ্ছিল না। বরুণ যখন চলে গেল তখনই সোনার থালার মত চাঁদটা আকাশে উঠেছিল। চারদিকের অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছিল। মৃদু হাওয়ায় পুকুরের জলে শির শির ঢেউ উঠেছিল। উমা সমস্ত দেহমন দিয়ে এক বিচিত্র সুখকে, আনন্দকে অনেকক্ষণ ধরে আস্বাদন করেছিল।

ব্যাপারটা বোধহয় মার নজর এড়ায় নি। তারপর থেকে বরুণ আর ওদের বাড়ি আসে নি। মা-ই বোধহয় উমার আড়ালে বরুণকে কিছু বলে থাকবে। পরের বেশ কিছু দিন উমার খুব খারাপ লেগেছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কোন কোন বিকেলে অন্যমনস্কভাবেই জানালা দিয়ে পুকুরের চাতালের দিকে তাকিয়েছে। যদি বরুণ এসে থাকে। কিন্তু বরুণ আসে নি আর। তারপর কলেজের নতুন পরিবেশ, নতুন নতুন বান্ধবী, সিনেমা জলসা—বরুণের স্মৃতি ম্লান হয়ে গেল। বিয়ের পর আরো পরিবর্তন। নতুন একটা মানুষ—তার স্বপ্ন, তার ভালো-লাগা, মন্দ-লাগা, তার অভ্যেস—সব কিছুর মধ্যে বরুণ কোথায় হারিয়ে গেল। আজকেও হয়তো বরুণকে মনে পড়ত না। কিন্তু মনে পড়িয়ে দিল এই [illegible] ড্রেসিং টেবিলের আয়না, জানালা দিয়ে [illegible]-পড়া পুকুর, পদ্মের নকসা-আঁকা চাতাল।

অনু এসে ঘরে ঢুকল—বড়দি'—চুলটা [illegible] চুল বাঁধতে বাঁধতে উমা জিজ্ঞেস করল—[illegible]র বরুণদা আর আসে না?

—সে কি তুমি জানো না?

—কী?

—বরুণদা তো মারা গেছে।

চুল বাঁধতে থাকা অনুর হাত [illegible] থেমে গেল।

—[illegible] [illegible] করে। [illegible] হলে জামাইবাবু আমাকে [illegible] না [illegible] বেড়াতে চলে যাবে। [illegible]

—কই আমাকে [illegible] জানাস নি।

মা বারণ করেছিল। একটু [illegible] বলল—জানো বড়দি—বরুণদা [illegible] ছেড়ে দিয়েছিল। শুধু গান গাইতো এখানে ওখানে সব জায়গাতেই বরুণদা [illegible] খুব নাম হয়েছিল বরুণদার। [illegible] চান্স পেয়েছিল।

—ও।

—টিটেনাস না কী যেন [illegible] করে ছিল। ফুলে মালা [illegible] সাজিয়ে শ্মশানে নিয়ে গিয়েছিল। আমাদের বাড়ির সামনে দিয়েই প্রসেশনটা গিয়েছিল। বেশ লোকজন হয়েছিল। — কী, হচ্ছে — তাড়াতাড়ি করো।'

পুকুরের চাতালটায় উমা যখন এসে দাঁড়াল তখন ফুটফুটে চাঁদের আলোয় সব কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—পুকুরের জল, সিঁড়ি, পদ্মের নকসা। উমা চুপ করে বসে রইল। হঠাৎ যেন মনে হল বরুণ ওর পাশেই বসে আছে যেমন বরাবর বসত। এক্ষুনি হয়তো উঠে গিয়ে চাতালটায় দাঁড়িয়ে একটু কুঁজো হয়ে ঔরংজেবের পার্ট বলতে শুরু করবে নয়তো গান গেয়ে উঠবে—'আমায় কী দিয়ে সাজাবি মা আমি হব যে গো গৃহবাসিনী।' কিন্তু বরুণ তো বেঁচে নেই। উমা স্পষ্ট ভীত হল। চারদিক জ্যোৎস্নার আলোয় ভেসে

যাচ্ছে অথচ উমা কোনদিকে তাকাতে সাহস পাচ্ছে না। বরুণ যেন পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো এক্ষুনি ডাকবে—'কী হল বাউলদের নাচ দেখবে না?' অথবা 'আসামের বিহু গান শুনবে?' উমার সমস্ত শরীর যেন অবশ হয়ে এল। ও নড়তে পারছে না। বরুণ হয়তো হঠাৎ এগিয়ে এসে ওর হাত ধরবে—সেদিন যেমন ধরেছিল। হঠাৎ উমার মনে হল—কে যেন ওকে পেছন থেকে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতে চাইছে। দুটো পুরুষ হাত কাঁধের দিকে উঠে আসছে। বরুণ? ঘাড়ে উষ্ণ নিঃশ্বাস। এ কী করে সম্ভব? উমার সমস্ত শরীর থর থর করে কেঁপে উঠল। একটা অব্যক্ত চীৎকার করে ও উঠে দাঁড়াল—কে?

—কী হল? সুব্রতর কণ্ঠস্বরে বিস্ময়—ভূত দেখলে নাকি?

উমা দৃঢ় হাতে সুব্রতকে জড়িয়ে ধরল। সুব্রতর বুকে মুখ লুকোল। ওর চোখ দুটো জলে ভিজে উঠল। তখনও ওর শরীরটা কাঁপছে। এবার ভয়ে নয়—স্বস্তিতে, সুখে।

সোনার থালার মত চাঁদটা তখন মাঝ-আকাশের দিকে উঠে এসেছে। মৃদু হাওয়ায় পুকুরের জলে শির শির ঢেউ উঠছে। পদ্মের নকশা-আঁকা চাতালটা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

শ্রবণ বেলগোলা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রাণী শান্তলার নাম অনুসারে এই নাম হয়েছে। শান্তলেশ্বরকে প্রণাম করে নাড়া দিলাম বিশাল ঘণ্টা, গম্ভীর ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল মন্দিরের স্তব্ধ বিশাল অভ্যন্তর ভাগ।

মন্দির মধ্যে ঢুকতে দুই পাশে দুই বিরাট কৃষ্ণমূর্তি। পূবে সূর্য নারায়ণের মন্দির।

সপ্ত অশ্বের ওপর সারথি অরুণ।

মূল মন্দিরের পাশে চাঁদোয়া তলে মস্ত বড় নন্দী মূর্তি রয়েছে, আর রয়েছে অনেক স্তম্ভ। তারও অদূরে অনতিপ্রশস্ত স্রোতস্বিনী প্রবহমানা। দূরে-সমুদ্রম্ নাম।

কবে বুঝি রাষ্ট্রকূটবংশীয়রা কোন সুদূর নবম শতাব্দীতে হ্রদ তৈরি করেছিল। দূরে-সমুদ্রম্। মন্দিরের উত্তর দিকে প্রান্তদেশে কিছু ঘর বাড়ি, লাল টালির ছাদ, সাদা দেয়াল, সব মিলিয়ে অপূর্ব চিত্র।

এই মন্দিরের প্রধান দ্রষ্টব্য হল এর বাইরের প্রাচীর যার প্রতিটি অংশ সীমা-হীন বৈচিত্র্যময় মূর্তিতে পূর্ণ।

হস্তীযূথ, সৈন্যদল, নানা জন্তু-জানোয়ার, নানারকম পাখি, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদির নানা উপাখ্যান, বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি অতুলনীয় সুষমা নিয়ে প্রস্তরগাত্রে শিল্পীর নিপুণ হাতের সূক্ষ্ম কারুকাজে ফুটে উঠেছে। চতুর্দশ ভুবনের সর্ব চিত্র এঁকেও শিল্পীর তৃপ্তি হয়নি, রামায়ণ মহাভারতের সর্ব উপাখ্যান খোদিত করে রেখেছেন।

প্রবেশ দ্বারের ওপরে প্রভাবলীতে নটরাজের মূর্তিটি বড় চমৎকার।

এর সিলিঙের স্তম্ভের ওপর যে অপূর্ব ব্রাকেট মূর্তি ছিল সে সব ইংরেজরা এদেশের অন্য অনেক বস্তুর মত নিয়ে গেছে নিজেদের দেশে। এখন বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

আমরা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম।

বেলুড় মন্দিরের মতই প্রাচীর চিত্র অষ্ট সারিতে গ্রথিত।

সমস্ত দক্ষিণভারতীয় মন্দিরের এই এক বিশেষত্ব।

প্রাচীর চিত্র আটটি সারিতে গ্রথিত থাকে।

এখানকার ধর্মনিরপেক্ষ চিত্রগুলিও উল্লেখযোগ্য। কোথাও হংসমিথুন, কোথাও শার্দূল, অশ্বারোহী মূর্তি কোথাও। মা শিশুকে স্তন্যপান করাচ্ছে, একজন একজনকে জল ঢেলে দিচ্ছে; সে জল খাচ্ছে। শৃঙ্গাররত নরনারীও রয়েছে।

বাঁদর নারীর বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করছে, নারী যষ্ঠি উদ্যত করছে বাঁদরের প্রতি, এই দৃশ্য দেখে বেশ কৌতুক বোধ করলাম।

পুরাণের অসংখ্য কাহিনী।

দশ অবতার, প্রহ্লাদ চরিত্র। হর-পার্বতীর বিবাহ। রাম রাবণের যুদ্ধ। অশোকবনে বিষন্নবদনা সীতা। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভা।

কর্ণার্জুনের যুদ্ধ।

অর্জুনের হংসধ্বজা, কর্ণের কাক ধ্বজা, এত স্পষ্ট যে চিনতে কোন অসুবিধে হয়নি।

হতভাগ্য কর্ণের রথের চাকা কাদায় বসে গেছে, পর্যুদস্ত অশ্বর হাঁটু ভেঙে পড়েছে, যুদ্ধক্ষেত্রের এই মহা করুণ দৃশ্য কি যে চমৎকার ফুটে উঠেছে পাথরের গায়ে। দেখে চোখ ফেরান যায় না, এত জীবন্ত, মন বেদনায় ভরে ওঠে।

কানাড়া ভাষায় শিল্পীর নাম লেখা রয়েছে 'মাচা'। কে এই শিল্পী এই দুটি মাত্র অক্ষরে নিজের পরিচয় লিখে রেখে গেছেন?

এই শিল্পী হয়ত তৎকালীন পরি-চিতির ওপর নির্ভর করেই এই দুটি অক্ষর লিখে রেখেছেন, ভবিষ্যতের অন্তহীন কালের কথা চিন্তা করেন নি।

সবিতা সেনগুপ্ত

অপেক্ষাকৃত বড় বড় মূর্তির মধ্যে বীণা হাতে সরস্বতী মূর্তি উল্লেখযোগ্য।

মদনিকা মূর্তি নয়নমনোহর।

বেণু হাতে শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ মূর্তিতে কদম্ব গাছের নীচে দণ্ডায়মান। গোপ ও গোপীগণ উন্মুখ দৃষ্টিতে তাঁর মোহন মূর্তির দিকে তাকিয়ে রয়েছে। গরুগুলি এমনভাবে মাথা তুলে গলা উঁচু করে তাকিয়ে আছে, মনে হল যেন জীবন্ত। সেই দূর বৃন্দাবনের এই মধুর দৃশ্য প্রস্তর রেখায় শিল্পী শাশ্বতকালের জন্য বিধৃত করে রেখেছে। আমরা বিভোর হয়ে দেখতে লাগলাম, শিশু দুটি পর্যন্ত চঞ্চলতা ভুলে তাকিয়ে দেখতে লাগল। চোখ সত্যিই ফেরান যায় না। সেই বৈষ্ণব কবির পদ, 'জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল।' সত্যিই দেখে দেখে নয়নের আশ মেটে না। দাক্ষিণাত্যের এক বিস্তৃত জনশূন্য প্রান্তরে কি অপরূপ মন্দির কত কাল ধরে নীরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোথায় গেছে পরাক্রান্ত সেই রাজ-বংশ, কোথায় হারিয়ে গেছে সেদিনকার জম-জমাট রাজ্যপাট আর জনপদ। কিন্তু কালজয়ী হয়ে রয়েছে অপূর্ব সেই ভাস্কর্য। যার তুলনা মেলা সত্যিই কঠিন।

হালেবিডের মন্দির দেখে শিল্প-সমালোচক ফার্গুসন বলেছেন হালেবিডের মূর্তিগুলির গড়নে ও বিন্যাসে এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তবের প্রতিফলন রয়েছে যা কেবল ফোটোচিত্রেই দেখা যায়। প্রস্তর রেখায় খুঁটিনাটি ফুটিয়ে তোলার অসীম ধৈর্য ও অধ্যবসায় প্রাচ্যের বৈশিষ্ট্য, কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও আবার হালেবিডের শিল্পীরা বিশিষ্টতা দেখিয়েছেন।

ফার্গুসনের মতে জ্যামিতিক জ্ঞানেরও চরম পরিচয় হালেবিডের শিল্পীরা দেখিয়েছেন। পাশ্চাত্যে মধ্যযুগীয় গথিক-শিল্প যেখানে পরম নৈপুণ্যে ফুটে উঠেছে সেখানেও তারা হালেবিডের শিল্পীদের মত এমন সৌন্দর্য ও জ্যামিতিক পরি-মিতিবোধের পরিচয় দিতে পারেননি।

মূর্তিগুলির বহিরেখা ও আলোচ্য পরিকল্পনাতেও গথিক শিল্পীদের হালেবিডের শিল্পীরা উচ্চস্তরের পরিচয় দিয়েছেন।

প্রাচীর চিত্রে বেলুড়ের মন্দিরের ভূমির সমান্তরালবর্তী পর পর আটের খোদাই মূর্তি।

ওপরের চার সারিতে মনুষ্য মূর্তি নীচের চার সারিতে পশু মূর্তি ও লতা পাতা। নিম্নতম সারিতে রয়েছে ছ চুয়াল্লিশটি হাতী। কোন দুটিই এক রকম নয়।

তার ওপরের সারিতে কীর্তিমুখ সিংহমুখ। তৃতীয় সারিটি মণ্ডনশিল্পের একটি সুন্দর উদাহরণ। মাঝে মাঝে রয়েছে মন্দিরবহির্ভূত সমাজ-জীবনের চিত্র নন মিথুনও বাদ যায়নি।

তার ওপরের সারিতে ফুলের মালা।

ষষ্ঠ সারিতে সমস্ত নৃত্যরতা নারী।

আলারিপ্পু, জাতিস্বরম, বর্ণম্, তিল্লানা, ভারতনাট্যমের এই চারটি মুখ্য নৃত্যাংশের বিভিন্ন মুদ্রা তথা হস্ত-লক্ষণ ও অঙ্গভঙ্গী প্রস্তর-রেখায় অপরূপ লীলাময় হয়ে উঠেছে।

অষ্টম সারিতে রামায়ণ ও মহাভারতের নানা কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

এই সারিগুলির ব্যাখ্যাটা বোধহয় এইরকম—

গোড়াতে পশুজীবন নিয়ে শুরু। প্রথম শ্রেণীতে শুধু হস্তীযূথ।

তৃতীয় সারিতে ভোগী মানুষের জীবনালেখ্য। বৌদ্ধদর্শনে বলে কামলোক যেখানে শেষ হয়, সেখানে রূপলোকের আরম্ভ।

এখানেও তাই।

চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ফলের মালা এবং নৃত্যছন্দের রূপলোকের আভাস। রূপলোকের পর দেবলোক। সকলের ওপরের সারিতে দেবোপম মনুষ্যের কাহিনী।

এবার ফেরার পালা। এত স্বল্প সময়ে দেখে আশ মেটে না। কিন্তু হাতে সময় বেশি নেই। গাড়ি আমাদের নিয়ে এল ট্রাভেলার্স বাংলোয়।

হালেবিড থেকে ফিরে আমরা আর একবার গেলাম বেলুড়ের মন্দিরে।

বেলুড়ের প্রাচীর-চিত্র দিনের আলোয় ভাল করে দেখার চেষ্টা করলাম।

পাথরে খোদাই করা কৃষ্ণলীলা দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গেছি। আরো কত বিচিত্র রকমের ছবি প্রস্তর-রেখায় ছন্দময় করে ফুটিয়ে তুলেছে শিল্পী। শুধু দেবতার লীলাখেলা নয়, সাধারণ মানব-মানবীর জীবনচিত্রও রয়েছে।

ব্র্যাকেট-চিত্র অনবদ্য।

কোথাও রুদ্রবীণাধারিণী নারী। কোথাও পদ্মহস্তে দর্পণবিধৃতা নারী দর্পণে আপন মুখপদ্মের প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করছে, কোথাও তীরধনু হাতে নারী পলায়মান শিকারের পশ্চাতে ধাবমানা। কোথাও শিকার কাঁধে নারী হরিণ নিয়ে ফিরছে। কোন প্রমদার পায়ে বিঁধেছে কাঁটা, অপরা তা অতি সন্তর্পণে বের করে দিচ্ছে। এমনি কত সুখচিত্র।

নারী যাচ্ছে মৃগয়াতে। এই চিত্র দেখে মনে হয় ওই সময়ে দাক্ষিণাপথে পর্দাপ্রথার চলন ছিল না।

বস্তুত খৃস্টজন্মের পর প্রথম সহস্র বছরের ভাস্কর্য ও চিত্রকলার মধ্যে মেয়েদের মুখের ওপর কোন আবরণ দেখা যায় না।

সাচীর ভাস্কর্যে দেখা যায় অলিন্দ থেকে কামিনীরা শোভাযাত্রা নিরীক্ষণ করছে।

মুখ তাদের অনবগুণ্ঠিতাই।

সাচীর ভাস্কর্যও খৃস্টপূর্ব ২য় শতকের।

অজন্তার কয়েকটি চিত্র থেকেও বোঝা যায় খৃস্টীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতকে দাক্ষিণাত্যে মেয়েরা অবগুণ্ঠনের আড়ালে থাকত না।

কিন্তু তবু মনে হল শিকাররতা নারীর সাক্ষ্য কি কেবল নঞর্থক, শুধুই কি বলে যে পর্দা-প্রথা তখন অজানা ছিল?

আর যা ছিল—নারীর নির্বাধ বাস্তব স্বাধীনতার নিঃসংশয় প্রমাণও কি বহন করছে না? আধুনিক পাশ্চাত্য নারীর মত শিকারে পুরুষের সঙ্গে যাওয়া নয়, সহচরী সঙ্গে নিজের হাতে শিকার করতে যেতেন প্রাক-মুসলমান যুগের হিন্দুনারী।

মূল মন্দিরের অদূরে একটি জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি রয়েছে। তার নিকটেই চব্বিশজন তীর্থঙ্করের ছোট ছোট মূর্তি দৃষ্টিগোচর হল।

হিন্দু মন্দির প্রাঙ্গণে জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি লক্ষ্য করবার মত। বস্তুত এই দুই মন্দিরেই পরধর্মসহিষ্ণুতার কেবল নয়, পরধর্মের প্রতি কার্যকর শ্রদ্ধা প্রদর্শনের আরো দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করে চমৎকৃত হয়েছি।

এখানে বিষ্ণু-মন্দিরে গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বারের পাশেই হরপার্বতীর মূর্তি।

হালেবিডে শিবমন্দিরের প্রবেশদ্বারের দুই পাশে দুইটি বিরাট কৃষ্ণমূর্তি।

জৈনধর্ম এক সময়ে দাক্ষিণাত্যে প্রভূত পরিমাণে বিস্তারলাভ করেছিল।

জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বর্ধমান মহাবীর বুদ্ধদেবের সমসাময়িক হলেও তাঁর পূর্বজ। তিনি বিদেহর কোন এক রাজবংশের ছেলে ছিলেন।

জৈনমতে মহাবীরের কাল খৃস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতক। তিনিও ভগবান বুদ্ধের মত সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ত্রিশ বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করে দীর্ঘ বার বছর সাধনার পর তিনি কৈবল্য লাভ করেন। তারপর তিশ বৎসর ধর্ম প্রচারের পর বাহাত্তর বছর বয়সে পাটনার অন্তর্গত পাভাতে দেহরক্ষা করেন।

জৈনরা মহাবীরকেই জৈনধর্মের প্রবর্তক বলে মনে করে না। জৈন প্রবাদ মতে মহাবীরের আগে এই ধর্মের আরো তেইশ জন মহাপুরুষ বা তীর্থঙ্কর ছিলেন। মহাবীর শেষ তীর্থঙ্কর।

বৌদ্ধ নির্বাণ আর জৈন কৈবল্য একই বস্তু। জৈনদের মতে যোগই হচ্ছে কৈবল্যলাভের একমাত্র পথ।

জৈনধর্মের অনুশাসনগুলির মধ্যে অহিংসা প্রধান কথা।

কঠোরভাবে অহিংসা পালন এবং কৃচ্ছ্রসাধন এই দুইটি বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে জৈনধর্মের প্রধান তফাৎ। কৃষি কাজে জীবহত্যা করতে হয় বলে জৈনরা এই কাজটি কখনো করে না।

তবে বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে এঁরা অত্যন্ত অগ্রসর।

মহাবীর বুদ্ধদেবের মত গৃহত্যাগে জোর দেন এবং সন্ন্যাসী সংঘ গড়ে তোলেন।

মনে হয়, ভগবান তথাগতের মত মহাবীর তাঁর ধর্মমত আপামর জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেননি।

যদিও এই ধর্ম প্রেমের ধর্ম, তবু বৃহত্তর জনতার কাছে তাঁর ধর্মের অনুশাসন পৌঁছায়নি।

রাজা-রাজড়া এবং কতক বুদ্ধিজীবীর মধ্যে এই ধর্মের আবেদন পৌঁছেছিল এবং গুপ্তযুগেতে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে বিস্তার লাভ করেছিল। অবশ্য গৌড় বাংলার উপরও জৈনধর্মের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত-মৌর্য শেষ বয়সে জৈনধর্ম গ্রহণ করেন এবং মহীশূরের শ্রবণবেলগোলায় তাঁর গুরু ভদ্রবাহুর সঙ্গে আসেন এবং সেখানেই প্রাণত্যাগ করেন।

এবার আমাদের যাত্রা জৈনদের পরম-তীর্থ শ্রবণবেলগোলাতেই।

জৈন ধর্ম-পুস্তককে সিদ্ধান্ত বা আগম বলা হয়। মূলে জৈনমত চৌদ্দ পূর্বে (পূর্বে—প্রাচীন গ্রন্থে) সন্নিবেশিত ছিল।

মহাবীরের প্রধান শিষ্যদের নাকি এই সব পুস্তকের জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে ছিল।

মহাবীরের মৃত্যুর পর দুশ বছর কেটে গেছে। মগধে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল। এই সময়ে দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ হল। দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরকাল এই দুর্ভিক্ষ দেশের বুক জুড়ে ছিল।

দুর্ভিক্ষের সূচনাতে জৈন সংঘের প্রধান অধ্যক্ষ ভদ্রবাহু দেশত্যাগ করতে সংকল্প করলেন। বিপুল সংখ্যক ভিক্ষু সঙ্গে নিয়ে তিনি দাক্ষিণাত্যে কর্ণাটকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সম্রাট চন্দ্রগুপ্তও গুরুর অনুগমন করেন।

হালেবিত মন্দিরের গায়ে অপূর্ব শিল্পনিদর্শন

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রীর মতে এই ভদ্রবাহু বাঙালী ছিলেন আর তিনি ছিলেন মহাজ্ঞানী। শ্রুতকেবলী।

বহুদূরে পন্থ। যেন অন্তবিহীন। পথে যেতে যেতে শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহু বুঝলেন তাঁর অন্তকাল আসন্ন। তিনি শ্রবণবেল-গোলায় থেকে গেলেন। বিশাখাচার্যকে সংঘের ভার দিয়ে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন।

বিশাখাচার্য ভিক্ষুদের নিয়ে অগ্রসর হলেন। আর যে সম্রাট সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করে গুরুর পদানুসরণ করে এসেছেন, দূর দুর্গম পথে তিনি কি করলেন? তিনি যে সার জেনেছেন, গুরোরঙ্ঘ্রি পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং ততঃ কিম ততঃ কিম।

তিনি শ্রবণবেলগোলাতেই থেকে গেলেন গুরুর সেবার জন্য।

শ্রবণবেলগোলায় ভদ্রবাহুর সমাধি আজও বর্তমান।

মহাজ্ঞানী ভদ্রবাহু ত দাক্ষিণাত্যে চলে গেলেন। এদিকে তাঁর অনুপস্থিতিতে জৈনশাস্ত্রের জ্ঞান লোপ পাবার উপক্রম হল।

জৈনসংঘের অধ্যক্ষ স্থূলভদ্র তখন পাটলিপুত্রে জৈনদের সভা আহ্বান করলেন এবং জৈনধর্মের চতুর্দশ পূর্ব্ব দ্বাদশ অঙ্গে লিপিবদ্ধ হল।

কিন্তু দাক্ষিণাত্যে যেসব ভিক্ষু গিয়েছিলেন, তাঁরা যখন ফিরে এলেন স্থূলভদ্রের অনুরক্ত শিষ্যদের সঙ্গে তাঁদের বনল না।

কারণ এঁরা বস্ত্র পরিধান করতে শুরু করেছেন আর ভদ্রবাহুর শিষ্যরা উলঙ্গ থাকাই জৈনধর্মের প্রধান অঙ্গ মনে করে নগ্ন থাকতেন। শ্বেত বস্ত্র পরিধান করতেন বলে একদল শ্বেতাম্বর আর বিবস্ত্র থাকতেন বলে অপর দল দিগম্বর নামে পরিচিত হলেন।

এই বিচ্ছেদটি সুরু হয় খৃঃ পূর্ব তৃতীয়-চতুর্থ শতকে আর খৃষ্টীয় প্রথম শতকে জৈনরা একেবারে ভালমত দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যান।

এঁদের মতবাদেও প্রভেদ প্রচুর ছিল।

আমরা যখন হালেবিতে গিয়েছিলাম, আমাদের সঙ্গে ছিলেন ব্যাঙ্গালোর আকাশবাণীর কয়েকজন ইঞ্জিনীয়ার। স্থানীয় লোকসঙ্গীত রেকর্ড করে আনতে ও'রা গিয়েছিলেন।

শিল্পীদের গানের ভাষা কিছু বুঝলাম না, কিন্তু তাঁদের হতশ্রী রুগ্ন স্বাস্থ্যহীন চেহারায় ওদিককার গ্রামীণ অর্থনীতির শোচনীয় অবস্থাই প্রত্যক্ষ হল যেন।

লোকসঙ্গীতের আনন্দ-উচ্ছ্বাস বিন্দুমাত্রও যেন ছিল না তাঁদের কণ্ঠে।

শিল্পীদের বেশির ভাগই নারী।

দু-তিনখানা গানের পরে কয়েকটি মেয়ে সমবেত কণ্ঠে একটি গান গাইল। বেশ সুরেলা গলা এবার মনে হল।

আবার লোকসঙ্গীত শুনেছিলাম বেলুড়ে গিয়ে। সেখানেও ইঞ্জিনীয়াররা কিছু লোকসঙ্গীত রেকর্ড করে নিয়েছিলেন।

বেলুড়ের শিল্পীরা বেশির ভাগই হলো ছেলে। মেয়ে শুধু অল্পবয়স্ক কয়েকজন। তাদের চেহারা হালেবিডের মেয়েদের মত অমন তারুণ্যবর্জিত নয়। গাইলও ভাল।

যদিও ভাষার জন্য আমরা তেমন উপভোগ করতে পারলাম না।

বিকেল চারটের সময় শ্রবণবেলগোলার বাসে উঠলাম। আবার মালভূমির উঁচু-নীচু পথ পার হতে হতে বাস থামল এসে এক সময় হাসান শহরে। জেলা শহর।

ফুলেতে গাছেতে মসৃণ সুন্দর রাজপথ দেখতে বড় সুন্দর।

কলাগাছের ঝাড়। নারকেলবীথি।

—কি সুন্দর দেখতে শহরটা!

আকাশবাণীর মিঃ ভাস্কর বললেন, হ্যাঁ, সত্যিই সুন্দর। এটাকে বলে পুওর-ম্যানস উটি। অর্থাৎ দরিদ্রের উটকামণ্ড।

এখানকার আবহাওয়া ও স্বাস্থ্য ভাল, প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর।

এই জেলার দক্ষিণদিকেই উত্তর-পশ্চিম কুর্গ। পশ্চিম ভারতের পর্বতশ্রেণী উত্তর-পশ্চিমে দেখা যায়, ক্রমে এই পাহাড়শ্রেণী ঢালু হয়ে এসে পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে উর্বরা সমভূমিতে মিলে গেছে। পাহাড়ে-প্রান্তরে অরণ্যভূমিতে নয়নাভিরাম দৃশ্য-পটের সৃষ্টি করেছে এ-অঞ্চলে।

কাজেই যারা উটকামণ্ডের শৈলনিবাসে যেতে পারে না, তারা এই সুন্দর হাসান শহরে এসে খুশি হয় সন্দেহ নেই।

বাস-স্ট্যাণ্ডের কাছে পুলিশ স্টেশন। তার উল্টোদিকে দোতলায় লেখা পিকচার প্যালেস। বোধহয় সিনেমাগৃহ।

ড্রাইভার যখন স্ট্যাণ্ডে এসে বাস থামালে, জিজ্ঞেস করলাম, কোন খাবার জিনিস সস্তা বলো ত। ছোকরা হেসে বলল, সব সস্তা। এ তো আর ব্যাঙ্গালোর বা মাদ্রাস নয়। এ হল হাসান। বাস-স্ট্যাণ্ডের প্রাঙ্গণেই দোকান রয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল বেশ দাম—কলামূলো সবকিছুরই।

এদিকে মিঃ ভাস্কর এসে বললেন, তাঁর আত্মীয় একজন জুটে গেছেন। রাতের মত তিনি হাসানে থেকে যাবেন। কাল ভোরে আমাদের সঙ্গে এসে শ্রবণবেলগোলায় যোগ দেবেন।

এই সদাহাস্যময় মানুষটি সঙ্গে রইলেন না জেনে মনটা ভাল লাগছিল না।

খাওয়া হল। কফি কিনে নেওয়া হল। হাসান পেরিয়ে আবার নির্জন স্তব্ধ অরণ্যের মধ্য দিয়ে গাড়ি চলল।

আকাশ এখন মেঘমেদুর। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচে আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি সামনে ডাইনে বাঁয়ে বিস্তৃত প্রসারিত যতদূর দৃষ্টি যায়।

কোথাও ধান ক্ষেত, কোথাও জলাশয়। মাঝে মাঝে গ্রাম আসছে।

নাম কি? শান্তিনগর।

দু'একজন যাত্রী উঠল, দু'একজন নেমে মেঠো পথ ধরে কোথায় চলে গেল।

বাস এগিয়ে চলছে।

বেলা শেষে বিষণ্ণ বিস্তীর্ণ প্রান্তরের বুকে আলো নিভেই আসছিল, এবার মেঘ-করুণ আকাশ সেই মৃদিত আলোর কোমল কলিটিকে নিজের আঁধার পর্ণপুটে একেবারে ঢেকে ফেলল।

বৃষ্টি নামল। আঁধার নিবিড় হলো রাতও নামল। অসমতল সঙ্কীর্ণ আঁধার পথে হেডলাইট জেলে গাড়ি সামনে এগিয়ে যেতে লাগল।

কয়েকটা স্টেশন এল গেল।

ড্রাইভার এক সময় দেখাল ওই দূরে আলো দেখা যাচ্ছে পাহাড়ে, ওই পাহাড়েরই সন্নিকটে আমাদের গন্তব্য-স্থল।

বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা জলো হাওয়া হু হু করে বইছে. বৃষ্টির ছাট আসছে। গাড়ির ছাদ চুঁইয়ে দু এক ফোঁটা পড়ছে। খোকাকে চাদর জড়িয়ে নেওয়া গেল।

গাড়ি এল চিকমগপেটে।

আকাশবাণীর সহযাত্রীরা লোক-সংগীতের শিল্পীদের খোঁজে ব্যস্ত। গাড়ির ক্লোকাইটোর মাঞ্জাপ্পার তত্ত্বাবধানে লোক গেল শিল্পীদের খোঁজে।

গাড়ি দাঁড়িয়ে রইল।

বর্ষণমুখর রাত্রিকালে পাওয়া গেল না কাউকে। আবার গাড়ি ছাড়ল।

এক সময়ে মাঞ্জাপ্পার 'মাসিবাড়ি' স্থান এল।

নিবিড় অন্ধকারে ঝুমঝুম বর্ষণের মধ্যে গাড়ি থেকে নেমে হাতের ছাতি খুলে মাঞ্জাপ্পা যে কোথায় মিলিয়ে গেলেন ভাবলে আজও আমার বিস্ময় বোধ হয়।

সংকীর্ণ বন্ধুর পথ। ঝকর-ঝকর শব্দ করতে করতে বর্ষায় রাস্তার জমা জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে গাড়ি চলতে লাগল।

প্রায় এসে গেল শ্রবণবেলগোলা।

চড়াই পাহাড়ের গায়ে গায়ে ওপরে ওঠার রাস্তায় বৈদ্যুতিক আলো দেখা যাচ্ছে, চূড়ায় আলোকিত গোমতেশ্বরের বিশাল মূর্তি।

শ্রবণবেলগোলা।

যেখানে শ্রুত শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহুর সঙ্গে গৃহীত ভিক্ষুব্রত চন্দ্রগুপ্ত এসেছিলেন। তাঁর নাম তখন প্রভাচন্দ্র।

এক সময় পাহাড়ের পাদদেশে এসে গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভার বলল, ট্রাভেলার্স বাংলো।

রাত্রি তখন সাড়ে দশটা।

এই বাংলোর ছোট ছোট খান কয়েক ঘরের ব্যবস্থা ভালই। যদিচ আহারের ব্যবস্থা ভালো বলা চলে না। এই নির্জন প্রদেশে আবহমানকাল থেকেই বোধহয় খাদ্যদ্রব্য বিরল।

ভদ্রবাহু যখন এদেশে এলেন, আপন অন্তিমকাল আসন্ন জেনে রয়ে গেলেন এখানেই. চন্দ্রগুপ্ত রইলেন গুরুকে সেবা করার জন্য।

বিশাখাচার্য গুরুর আদেশে গমন করলেন মহীশূরে। দেশে প্রত্যাগমন করার কালে পুনরায় এলেন শ্রবণবেলগোলায়।

চন্দ্রগুপ্ত সাধ্যমত অতিথি সেবা করলেন। কিন্তু বিশাখাচার্যের মনে সন্দেহ হয়েছিল এই নির্জন প্রদেশে গৃহস্থ ত একজনও নেই। তবে এমন আতিথ্য সম্ভব হল কি ভাবে?

তিনি নাকি প্রথমে চন্দ্রগুপ্তকে বন্দনাও করেন নি। পরে অবশ্য তাঁর ভুল ভেঙেছিল। চন্দ্রগুপ্ত কত পবিত্রচিত্ত তা বুঝতে পেরেছিলেন।

আমাদের অবশ্য সেদিন ট্রাভেলার্স বাংলোতে অতি কদন্ন খেয়েই থাকতে হয়েছিল। ঘরজামাই পুণ্ডরিকাক্ষকে কদন্ন খাইয়ে গৃহ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল, আমরা পালালাম না। পাহাড়ের ওপর আলোকিত গোমতেশ্বরের পাদদেশে পৌঁছনের জন্য রাত্রিবাস করতেই হল।

রাত্রি তিনটের সময় আমরা জেগে গেলাম। পাহাড়ে এখনই যাব, হাতে ত সময় বেশি নেই। আয়া যে ভাবে ঘুমুচ্ছে তাতে যে সে সহজে জাগবে এবং আমাদের সহ-যাত্রিনী হবে তা মনে হল না।

শিশুরাও ঘুমোচ্ছে।

ও থাক তাহলে ওদের নিয়ে।

বারান্দায় বেরিয়ে দেখি নিশান্তের আঁধারে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ে ওঠার আলো-গুলো। চূড়ায় আলোকিত গোমতেশ্বরের মূর্তি সারাটি রাত অতন্দ্র প্রহরী রয়েছেন তারাখচিত বিশাল আকাশের নীচে।

পার্বত্য প্রকৃতির বিরাট আরণ্যক পট-ভূমিকায় এক অপূর্ব মহান দৃশ্য।

আমরা রওনা দিলাম, যাতে প্রত্যুষের আগেই গোমতেশ্বরের পায়ের নীচে গিয়ে পৌঁছাতে পারি।

আঁধার জনহীন পথ তারার আলোয় স্বচ্ছ দেখাচ্ছে, আমরা পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। চন্দ্রগিরি আর ইন্দ্রগিরি।

দুই পাহাড়ের মধ্যে শ্রবণবেলগোলার তীর্থ। পাহাড়ের পাদমূলে এসে প্রশস্ত সিঁড়ি ভেঙে আমরা ওপরে উঠতে আরম্ভ করলাম।

পাঁচশো পঞ্চাশটা সিঁড়ি ডিঙিয়ে প্রথম চত্বরে আসা গেল। প্রথম দরজা পেরিয়ে।

চারদিক ঘেরা পাথরের খাড়া দেয়াল, দুর্গ প্রাকারের মত।

বিরাট প্রাঙ্গণ পাথরে বাঁধানো, মাঝ-খানে প্রধান মন্দির।

ভেতরে তিনটি প্রধান তীর্থঙ্কর রয়েছেন উত্তর-পশ্চিম আর পূর্বমুখী তিনটি পৃথক মন্দিরাংশে।

প্রথম তীর্থংকর আদিনাথ, চতুর্দশ তীর্থঙ্কর শান্তিনাথ আর দ্বাবিংশতিতম তীর্থঙ্কর নেমিনাথ। কিম্বদন্তী এই যে আদিনাথের ছিল একশত তিনজন সন্তান।

এঁদের ছোট ছোট মূর্তি খোদাই করা রয়েছে। বাইরের প্রাঙ্গণে উঠে এলাম আরো কটা সিঁড়ি বেয়ে।

এই বহিপ্রাঙ্গণের প্রাচীর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরে তৈরী।

প্রাঙ্গণ প্রাচীরে নানা চিত্র খোদিত রয়েছে। তার মধ্যে রামলক্ষ্মণ সীতা ও হনুমানের চিত্র, বালগোপাল কালীয় দমন ইত্যাদির চিত্র দেখে বিস্মিত হলাম।

সন্দেহ নেই এগুলি জৈনতীর্থে সনাতন হিন্দু-ধর্মের প্রতি সহিষ্ণু শ্রদ্ধারই পরিচয় দিচ্ছে।

গল্প শুনলাম সুপ্রাচীন যুগে রাম-লক্ষ্মণ এসেছিলেন লঙ্কা যাবার পথে।

এখন যেখানে গোমতেশ্বরের মূর্তি দণ্ডায়মান রয়েছেন, তখন সেখানে ছিল অখণ্ড পাহাড়। শ্রীরামচন্দ্র এই ইন্দ্রগিরির পাহাড়ের গায়ে গোমতেশ্বরের মূর্তির একটি স্কেচ তীরফলাকা দিয়ে এঁকে রেখে যান।

তারপর নিরবধি কাল বইতেই লাগল। একদা মহীশূরের চামুণ্ডরাজের দৃষ্টি-গোচর হল সেই তীক্ষ্ণ-ফলাকাগ্রে অঙ্কিত রেখাচিত্রটি।

চামুণ্ডরাজা মহীশূরের বিখ্যাত গঙ্গা বংশের রাজা রাচমাল্লার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

এক হাজার খৃষ্টাব্দে এই গঙ্গা বংশের আনুকূল্যে মহীশূরে জৈন ধর্ম বিশেষ প্রসার লাভ করেছিল। চামুণ্ডরাজ পাশের

পাহাড় চন্দ্রগিরিতে শিবির সংস্থাপন করেছিলেন।

রাত্রে নরপতি স্বপ্নে আদেশ পেলেন, পশ্চিম দিক মুখ করে তীর নিক্ষেপ করো। সেই তীর যেখানে পড়বে সেখানে গিয়ে দেখবে শ্রীরামচন্দ্র এক মূর্তির বহিরেখা এঁকে গেছেন। এই মূর্তিকে তুমি রূপ দাও। ইনিই গোমতেশ্বর।

চামুণ্ডরাজ তীর ছুঁড়লেন।

পবনবেগে তীর অদৃশ্য হয়ে গেল পলকে হাওয়ায় ঝলক তুলে।

তারপর বেরিয়ে পড়লেন তিনি নিজেরই নিক্ষিপ্ত শরের সন্ধানে।

বনে পর্বতে জটিল অরণ্যের দুর্গম পথে বিপথে অনেক ঘুরলেন, অনেক খুঁজলেন। যে শর তিনি নিজেই নিক্ষেপ করেছেন সে শর কোথায় আত্মগোপন করল?

শেষে খুঁজে খুঁজে এসে দেখেন ইন্দ্র-গিরি পাহাড়ের চূড়ায় সেই শায়ক শ্রীরামচন্দ্রের অংকিত বহিরেখার কাছে নিশ্চিন্তে শুয়ে রয়েছে।

চামুণ্ডরাজ তখন পাথর কেটে কেটে এই বিশাল মূর্তি গড়লেন।

মনে হয় সারা বিশ্বে এর চেয়ে বৃহত্তর মূর্তি আর নেই।

এই বিপুল মূর্তি পা থেকে মাথা পর্যন্ত ৫৬½ ফিট উঁচু।

৯৮৩ খৃস্টাব্দে এই বিরাট নগ্ন মূর্তির নির্মাণকার্য সমাধা হয়।

আসলে এ হল বাহুবলীর মূর্তি।

বাহুবলী আর গোমতেশ্বর এক।

বাহুবলী প্রথম তীর্থংকর আদিনাথের পুত্র। আদিনাথের দুই স্ত্রী। যশস্বতী ও সুনন্দা। যশস্বতী একশত এক পুত্র, সুনন্দার একটি পুত্র ও একটি কন্যা।

পুত্রের নাম বাহুবলী।

যশস্বতীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরত দিগ্বিজয় করে ফিরে আসছিলেন। আগে আগে আসছিল তার চক্র, যেমন আসে অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব। হঠাৎ সেই চক্রের গতি স্তব্ধ হল। কেন? কার এমন দুঃসাহস হল যে দিগ্বিজয়ীর চক্রের গতি রোধ করতে চায়?

ভরত এগিয়ে এলেন।

ভাই বাহুবলী তার অধীনতা মানতে রাজি নয়।

ভাইয়ে ভাইয়ে ঘোর যুদ্ধ সুরু হল।

কিন্তু সে যুদ্ধ অহিংসার।

সে আবার কেমন?

দৃষ্টি যুদ্ধ, জলযুদ্ধ ও মল্লযুদ্ধ।

জলযুদ্ধ হল পরস্পরের গায়ে পাল্লা দিয়ে জল ছেটানো।

তিনটিতেই বাহুবলী জয়ী হলেন।

অপমানিত বড় ভাই অহিংসা ভুলে চক্র ছুঁড়ে মারলেন ছোট ভাইয়ের দিকে।

চক্র কিছুই করতে পারল না বাহুবলীর।

বাহুবলী চক্র লুফে নিয়ে ভরতের দিকে ছুঁড়ে মারতে পারতেন।

কিন্তু তাঁর তখন বৈরাগ্য এসেছে।

করুণ উদাস বৈরাগ্য। এসেছে সুদুর্লভ অন্তর্দৃষ্টি।

মুহূর্তের মধ্যে তাঁর কাছে মিথ্যে মনে হল সব কিছু।

তিনি অরণ্যে প্রবেশ করলেন তপস্যার জন্য।

অনেক অনেক বছর তপস্যা করলেন। দেহের চারদিকে জমল বল্মীক, দেহ ঘিরে দেহের চারদিকে গজালো নানা লতাপাতা। সেই লতা খোদিত রয়েছে গোমতেশ্বরের বিশাল উন্নত দণ্ডায়মান মূর্তিকে ঘিরে।

হাঁটুর নীচ থেকে দুদিক বেয়ে দুটি লতা বাহুমূল পর্যন্ত উঠে গেছে।

উদাস করুণ ভাব ফুটে উঠেছে মুখে চোখে সর্ব অবয়বে।

অবিস্মরণীয় এই মূর্তি।

দুরকম আসন তপস্যার।

এক, পর্যঙ্কাসন আসন, বাবু হয়ে উপবিষ্ট হয়ে; দুই কায়োৎসর্গ আসন, উন্নতদেহে দণ্ডায়মান হয়ে। নাসাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ। দেহের প্রতি পরিপূর্ণ বীতরাগ পরিস্ফুট।

কায়োৎসর্গ আসনেই বাহুবলী তপস্যা করেছিলেন।

গোমতেশ্বরের মূর্তির পাদদেশে লেখা আছে, চামুণ্ডরাজকৃত ইত্যাদি।

মিঃ ভাস্কর বললেন, ভাষাটা মালয়ালম ভাষার সঙ্গে মারাঠি ভাষার সংমিশ্রণ।

নীচে ছোট একটি ব্রোঞ্জ মূর্তি আছে। মূল বিম্বের প্রতিবিম্ব পূজোর্চনার জন্য।

তৈরি হবার পর সুরু হল মূর্তির অভিষেক।

কলসি কলসি দুগ্ধ, ঘৃত, থরে থরে আরো নানা পূজো উপচার নিয়ে এসেছেন ভক্তজন। কিন্তু সবই সামান্য হল। মূর্তিকে বিধৌত করা গেল না।

ম্লান মুখে বসে রইলেন সবাই মূর্তির পায়ের কাছে—কি করা যায়, কি করা যায়? একি হল?

এমনি সময়ে এলেন এক বৃদ্ধা। নাম পদ্মাবতী। ন্যুব্জ দেহ, কিন্তু তপস্যায় করুণ তাঁর প্রশান্ত মুখশ্রী।

পদ্মাবতী এনেছিলেন বিলিগুল্লা অর্থাৎ শাদা গোল বেগুনের মত দেখতে ছোট একটি বাটিতে করে পঞ্চগব্য।

কানাড়া ভাষায় বিলি মানে শাদা গুল্লা মানে বেগুন, একরকম শাদা গোল বেগুন ওদিকে হয়। সবাই ভাবল, এ দুধে-ঘিতে কিছুই হল না, তবে পদ্মাবতী এই তুচ্ছ উপচারে?

কিন্তু তাই হল।

এ যেন অনেকটা সেই বৌদ্ধ নগরী প্রভুর জন্য ভিক্ষা আহরণের মতই।

নগরীর শ্রেষ্ঠী বণিক সব হার গেল, ধনরত্ন মণিমাণিক্য মহার্ঘ্য বস্ত্র কত কিছু পথের ধূলির উপর জমা গেল, কিন্তু সন্ন্যাসীর ঝুলি শূন্যই ভিক্ষু শ্রেষ্ঠের যোগ্য ভিক্ষা মিললই না।

রাজা আর শ্রেষ্ঠী ব্যর্থকাম হয়ে ফি গেলেন সব। বিশাল নগরী লজ্জা অধোবদন হয়ে রইল, সন্ন্যাসী নগর ছাড়িয়ে প্রবেশ করলেন কাননে।

সেখানে এক দীনা নারী আড়ালে কোনমতে আত্মগোপন নিজের একটি মাত্র ছিন্ন বসন শরীর থে টেনে নিয়ে প্রভুর উদ্দেশ্যে ফেলে দিল আর তাতেই খুশি হয়ে জয়ধ্বনি করে উঠলেন সন্ন্যাসী।

সামান্য অথচ সাংঘাতিক এই ত্যাগে মুহূর্তে পূর্ণ হল মহাভিক্ষুকের সাধ।

এখানেও দারিদ্র্য, নগণ্য, কিন্তু ভক্তি-মতী নারী পদ্মাবতীর এই অতি সামান্য নিবেদন অসামান্য হল গোমতেশ্বরের অসীম করুণায়।

সবাই দেখল ভক্তির কাছে সব তুচ্ছ।

পদ্মাবতীর ওই একটুখানি পরিমাণ পঞ্চগব্য অশেষ হয়ে লাগল মূর্তির মাথায়, গায়ে, সারা শরীরে। তিনি প্লাবিত হয়ে গেলেন ভক্তির অর্ঘ্য ধারায়।

বিলিগুল্লা থেকে জায়গাটির নাম হল বেলগোলা।

ফেরার পথে আমরা একটি একটি করে সিঁড়ি ভেঙে নামতে লাগলাম।

—শেষ—

শ্রদ্ধার সঙ্গে, সম্মানের সঙ্গে, প্রচলিত প্রয়োগ হিসাবে নামের পর 'বাবু' শব্দের ব্যবহার দীর্ঘকাল হইতেই বাংলাদেশে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ঠিক কবে, কোন সময় থেকে নামের অন্তে 'বাবু' শব্দের প্রচলন হয়েছে সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিকরা কেউই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি। অনেকে বলেছেন, ইংরেজ আমলের গোড়া থেকেই ইংরাজদের দ্বারাই এই 'বাবু' শব্দের চলন হয়। আবার অনেকে তাঁর পূর্বে মুসলমান আমলের সময় থেকেই বাঁধাধরা হিন্দু জমিদার শ্রেণীর বিত্তশালী ব্যক্তিদের নামের সঙ্গে যোজ্য উপাধি হিসাবে এই 'বাবু' শব্দ ব্যবহৃত হতে আরম্ভ করে বলে অভিমত দিয়েছেন। পরবর্তীকালে অফিসের বড়-বাবু, পরিবারের বড়কর্তাকে বড়বাবু, [illegible] শৌখিন, বিলাসী লোককেও 'বাবু' প্রভৃতি আখ্যা দেওয়ার রেওয়াজ [illegible] হয়। এই 'বাবু' শব্দ থেকেই বাবুয়ানা, বাবুগিরির চল বিশেষভাবে দেশের সর্বত্র প্রচলিত হতে থাকে এবং ও তার প্রাধান্য প্রশমিত হয় নি।

কিন্তু এককালে, ষাট-বাষট্টি বৎসর পূর্বে, এই 'বাবু' শব্দ বর্জনের বিষয় নিয়ে বাংলায় এক আন্দোলনের সৃষ্টি হয় এবং এ নিয়ে কাগজে লেখালিখিও চলে। সেই সময় 'ভারত-মহিলা' (১৩১৭, আশ্বিন) পত্রিকায় 'বাবু বয়কট' নামাঙ্কিত একটি সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধের রচয়িতা শ্রীজগদীশ্বরী দেবী নামক জনৈক মহিলা।

'বাবু' বয়কট

ছোট বেলায় দেখিয়াছি, গ্রামের জমিদার ভিন্ন কেহই 'বাবু' নামের অধিকারী হইতেন না। অন্য ভদ্রলোকের কথা দূরে থাকুক, জমিদারের বাড়ীতেও যিনি পাল্কীতে চড়িয়া, পাল্কীর আগে-পাছে ধাবিত অসিহস্ত দারওয়ানের দ্বারা নিজের ক্ষমতা সাধারণকে বুঝাইয়া দিতেন, সেই লম্বোদর মাংসপিণ্ড, বর্দ্ধিষ্ণু জাহাজ, প্রবল প্রতাপান্বিত দেওয়ান মহাশয়ও 'বাবু' নামের যোগ্যপাত্র ছিলেন না; তিনি ছিলেন দেওয়ান মহাশয়। অন্যান্য ভদ্রলোক মুখুয্যে মহাশয়, সান্যাল মহাশয়, সেন মহাশয়, ঘোষ মহাশয় নামে আমন্ত্রিত হইতেন। গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারীরা চাকুরীর খেতাবেই পরিচিত, সঙ্গে 'বাবু'র বড় নামগন্ধ ছিল না। যেমন আলা সদরামীন, সদরামীন মুন্সেফ, ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, সেরেস্তাদার, পেশকার, দারোগা, জমাদার, মুন্সি, বক্সি প্রভৃতি। [illegible] হইতে 'মহাশয়' গিয়া সেই সেই খেতাবের ডাইনে ধারে গা-ঘেঁষিয়া বসিত।

মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন 'বাবু' নাম লাভ করিলেও, উপাধি লাভের পূর্বে রাজা রামমোহন রায়ের 'বাবু' সম্মানে সম্মানিত হইবার সৌভাগ্য হয় নাই। তিনি রায় মহাশয়, হদ্দ দেওয়ানজী নামে সম্বোধিত হইতেন।* ভাগ্য-বিধাতা উকীলদিগেরও আর অতিরিক্ত ভাগ্যবিধান করেন নাই। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের ভিতরেও গুরুঠাকুর মহাশয়, পুরোহিত, পুরুৎঠাকুর, ভটচায্যি ভট্টাচার্য্য মহাশয় বা চক্রবর্ত্তী মহাশয় ছিলেন। যাঁহারা নবদ্বীপে গিয়া ১০।১৫ বৎসর থাকিয়া 'পোড়ামা তলায়' ঘটা করিয়া পূজা দিতে পারিতেন, তাঁহাদিগের শিখা বর্দ্ধনের মত নামেরও খানিকটা বর্দ্ধন হইত। যেমন তর্কালঙ্কার, ন্যায়ালঙ্কার বা বিদ্যারত্ন, বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি। দেওয়ানের সঙ্গে গা-ঘেঁষিয়া বসিয়া 'মহাশয়ের' তৃপ্তি হইল না, তর্কালঙ্কারের, বিদ্যারত্নেরও একাসনে গা-ঘেঁষিয়া বসিতে প্রবৃত্তি হইল। এই ত' গেল, সেকালের কথা।

মধ্যযুগে বঙ্কিমবাবুর মত সকলেই 'বাবু' হইলেন। কেবল বেচারা দীনবন্ধু মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, প্যারীমোহন সরকার আসর বজায় রাখিলেন। কলিকাতার লাটুবাবু, ছাতুবাবুর মসনদে বসিতে কালীপ্রসাদ ঘোষ, খেলাত ঘোষ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি ঠাকুর বংশীয়েরা, দত্ত বংশীয়েরা বা ধনকুবের মল্লিকেরা কেহই সাহস করিলেন না। মফঃস্বলে কিন্তু জমিদারের সে মর্য্যাদা রহিল না। সেই জমিদারের চোখের সামনে, সেই জমিদারেরই ভুক্তাবশিষ্ট রোটিতে যাহারা পুষ্ট দেহ—সেই দেওয়ান, পেশকার, জমানবীশ, মুমারনবীশ, মুন্সি, বক্সি সকলেই 'বাবু' হইলেন। আর যাঁহারা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের মিষ্টি সম্বোধনে গৃহে ও খোলা জায়গায় কখনও কখনও সম্মানিত, তাঁহারা যে 'বাবু' হইবেন সে বিষয়ে ত দ্বিধা করিবার কিছুই নাই। মফঃস্বলের কোন রাস্তায় কিঞ্চিৎ জল ছিল বলিয়া—র বুট ভিজিতে পারে, আশঙ্কায় যিনি তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া অপর পারে অতি সন্তর্পণে নামাইয়া দিলেন বা নামাইয়া না দিলেও ন্যায় শাস্ত্রানুসারে যাঁহার এইরূপ যোগ্যতা আছে, ইঁহারা উভয়েই যে 'বাবু' নামের যোগ্য সে বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত।

কলিকাতায় ময়রা, সেকরা একজনে রসগোল্লাকে রসাক্ত করে, অপরে গিনি সোনার একটি লাঙ্গল প্রস্তুত করিয়া ঘড়ির সঙ্গে গলায় ঝুলাইয়া দেয়; সুতরাং স্বতঃসিদ্ধ বাবু। দেখিতে দেখিতে

* ইংরেজ-রাজত্বের প্রথম অবস্থায় কালেক্টারীর একজন করিয়া দেওয়ান থাকিতেন। রাজা রামমোহন রায় রঙ্গপুরে এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

পণ্ডিতের নামের সঙ্গেও 'বাবু' নামের সংযোগ হইল। কখন কখনও লেখিকার কর্ণ তাহার শ্রবণ প্রত্যক্ষ করিয়াছে। আবার কলিকাতায় ঝি মহলে কোন কোন বড় ঘরের মেয়েরাও 'দিদিবাবু' বলিয়া পরিচিত হইলেন! আমি কিন্তু ব্যাকরণের মায়া ত্যাগ করিতে না পারিয়া, কোন বৈয়াকরণকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বাবু শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে কিরূপ প্রয়োগ হইবে, মহাশয়?' তিনি বলিলেন, 'বাবু শব্দ যখন অকারান্ত বা আকারান্ত নয়, তখন 'বাব্বী' হইবে। [illegible] তোমার সংশয় হইবার কারণ [illegible]' আমি বুঝিলাম, শিক্ষিতা ভগিনীগণ ইংরেজির হিড়িকে পড়িয়া ইংরেজি চালচলনের অনুকরণে 'ঘোষা' না হইয়া 'ঘোষ' হইয়াছেন, 'সেনা' না হইয়া 'সেন' হইয়াছেন, 'উপাধ্যায়ী' না হইয়া 'উপাধ্যায়' হইয়াছেন। এখানেও সেইরূপ দেশী ব্যাকরণ ও বৈয়াকরণদিগকে নমস্কার করিয়া বিদায় দিয়াছেন।

পুরুষদিগের ধৃষ্টতা যেমন সহ্য হয় না, স্ত্রীদিগের একান্ত পৌরুষভাবে কেমন পুরুষভাব আসিয়া দুঃখিত করে। এইটি প্রচলন হইবার সম্বন্ধে আর একটি কারণ আছে। ব্রাহ্মণভিন্ন জাতির স্ত্রীলোকের উপাধি ছিল 'দাসী'। এই অসম্মানের উপাধি ধারণে ভগিনীদিগের একান্ত আপত্তি; কিন্তু উৎকল ব্রাহ্মণদিগের ভিতরে অনেকের 'দাস' উপাধি আছে, তাঁহারা আভিজাত্য ও স্বশ্রেণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কোন কোন সন্ন্যাসীর 'দাস'—কোন কোন শ্রমণার 'দাসী' উপাধি ছিল। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভিতরে অধিকাংশ পুরুষের দাস, অধিকাংশ মহিলার দাসী উপাধি অতীত যুগ হইতে রহিয়াছে। যখন কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির দাস বলা যায় না, তখন বলিতে হইবে এ দাস-দাসী জগতের। জগতের দাস-দাসী হইবার সৌভাগ্য ক'জনের আছে! জগতের দাস-দাসী হইলেই ত' জগন্নাথের দাস-দাসী হওয়া যায়। [illegible] সেবকের অর্থে কোন প্রভেদ নাই। এখন [illegible] শিক্ষিত যুবকরা সেবক (যেমন স্বেচ্ছাসেবক) সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া তাহার অন্তর্নিবিষ্ট হইতে [illegible] লজ্জিত না হইলে, দাস হইতে লজ্জিত হইবার কারণ কি?

[illegible] ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র [illegible] ম। বর্ম্মা, গুপ্ত, দাস এই [illegible] উপাধির সৃষ্টি করিয়া স্ত্রী সাধারণের জন্য 'দেবী' উপাধির সৃষ্টি করিয়াছেন। স্ত্রী জাতির মধ্যে আর জাতিগত পার্থক্য রাখেন নাই। আমার বোধহয়, পূর্ব্বে সর্ব্ববর্ণের মহিলারা অবলীলাক্রমে এই দেবী উপাধি গ্রহণ সমর্থা ছিলেন। এখনও কোচবিহার ও পাঙ্গার * রাণীরা 'দেবী' উপাধিতে অলঙ্কৃতা রহিয়াছেন। অধমযুগে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের একটি ভুলে শূদ্রা-মহিলাদিগের 'দাসী' উপাধি হইয়াছে। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, রঘুনন্দন এই ব্যবস্থা স্থির করিতে যাইয়া অনেক টানাহেঁচড়া করিয়াও সামঞ্জস্য করিতে পারেন নাই। আমি শিক্ষিতা ভগিনীদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা সকলে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র নির্ব্বিশেষে ঋষিকল্পিত এই 'দেবী' উপাধি গ্রহণ করিয়া জাতীয়তা রক্ষা করুন, ঋষিদিগের উপরে সম্মান প্রদর্শন করুন ও এবিষয়ে ইংরেজি অনুকরণের বর্জ্জন করুন।...এক কথা বলিতে যাইয়া অন্য কথা অনেক বলিয়া ফেলিলাম। সকলের নিকট সে জন্য আমার ক্ষমা প্রার্থনা।

সে সময়ের বিলাত-ফেরতরা যেমন বাঙ্গালা ভাষা, দেশীয় আচার ও দেশীয় পরিচ্ছদের উপরে ঘৃণা প্রকাশ করিতেন, সেইরূপ 'বাবু' উপাধির উপরেও তাঁহাদিগের বিজাতীয় ঘৃণা ছিল। তাঁহারা ছিলেন 'মিস্টার', আর পত্নীকে গাউন পরাইয়া 'মেম সাহেব' না বলাইয়া ছাড়িতেন না। এক্ষণে সে হাওয়া বদলিয়াছে। এক্ষণে বিলাত-প্রত্যাগতদের ভিতরে আর সে প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি এই হিড়িক না পড়িত তবে এতদিনে বিলাত-প্রত্যাগতদিগের ভিতরে আর সে প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি এই হিড়িক না পড়িত তবে বিলাত-প্রত্যাগতরাও 'বাবু' উপাধি গ্রহণ করিতেন। বর্ত্তমানে কিসের জন্য যে 'বাবু' উপাধিটি উবিয়া গেল, ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায় না। বাঙ্গালী বাবুরা ফস্ করিয়া বেচারা 'বাবু'টিকে বয়কট করিলেন। আসামের সহিত পূর্ব্ববঙ্গকে গভর্ণমেণ্ট এক করিয়াছেন (স্বাধীনতা পূর্ব্বের কথা) বলিয়া বাঙ্গালীরা ত' ঘোর নারাজ; অথচ তাঁহারা আসামীয় উপাধি 'শ্রীযুক্ত', 'শ্রীমান' সাদরে গ্রহণ করিয়া নামের সঙ্গে যে 'বাবু'র একটুকু সম্বন্ধ ছিল তাহাও ঘুচাইয়া দিতেছেন। 'বাবু' বেচারা এমন কি দোষ করিয়াছে যে, তাহাকে এমনভাবে একঘরে করিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন, 'বাবু' শব্দের কোন মূল পাওয়া যায় না; শব্দটি সাহেবদিগের সৃষ্টি, তাঁহারা আমাদিগকে তাচ্ছিল্যার্থে ঐ শব্দ ব্যবহার করেন। আমার বিশ্বাস ইউরোপীয়ান-দিগের ভিতরে যাঁহারা প্রথমে ভারতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা এদেশবাসী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি জাতি 'আর্য্য' নামে পরিচিত জানিয়া ভারতবাসী সকলকেই আর্য্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। সাহেবেরা এ দেশী পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলেন, স্ত্রীলোকেরা 'আর্য্যা' সুতরাং 'আয়া'; এই 'আয়া' হইতে তাঁহারা তাঁহাদিগের নিকৃষ্ট জাতীয়তা পরিচারিকাকে 'আয়া' বলিতে আরম্ভ করেন। সাহেবরা সেইরূপ নিকৃষ্ট অর্থে ব্যবহার করেন বলিয়া কি আমরা আর্য্য জাতীয় বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিব না? না, আর্য্য, আর্য্যা হইব না? সাহেবেরা আজও সেরূপ নিকৃষ্ট অর্থে 'বাবু' শব্দের ব্যবহার করে না।

'বাবু' শব্দটি আজগবি সৃষ্টি হয় নাই। সংস্কৃতে 'ভাব' শব্দের অর্থ পণ্ডিত; 'ভাবুক' শব্দের অর্থ কল্যাণ। ইহার কোন একটি শব্দ হইতে 'বাবু' শব্দের উৎপত্তি অসম্ভব নয়। বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদে মাননীয় ব্যক্তির সম্বোধনে অনেক স্থলেই 'বাব' শব্দের * ব্যবহার আছে। এই 'ভাব' শব্দের সহিত 'বাবু' শব্দের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

—ক্ষপণক

* রঙ্গপুরের অন্তর্গত একটি বিখ্যাত পরগণা।

* বৃহদারণ্যক, ৬ অধ্যায়

উপন্যাস

কখনো দিন কখনো রাত

আশাপূর্ণা দেবী

(২)

রাংতা, ডবল পয়সা কুড়নোর দিন ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসছিল।

হয়তো পড়ে থাকতে দেখলে কুড়িয়ে রাখতাম, কিন্তু তেমন নিধি প্যাওয়ার আগ্রহে নয়। এক সময় যে ওদের জন্যে আগ্রহ ছিল, এই মমতায়।

আজও কি তেমন হয় না কখনো 'নো?

বর্তমানের শিশুদের বস্তুর প্রতি সক্তি, তুচ্ছের প্রতি ঔদাসীন্য দেখে কি া কেমন একটা মনকেমনের বিষণ্ণতায় া যায় না? যে জিনিসটা আমার তনীর কুড়িয়ে তুলে দেখবার কথা, সেটা কে মাড়িয়ে যেতে দেখে ব্যথায় মনটা নটন করে ওঠে নিজেই ধুলো ঝেড়ে তুলে াখি। সেদিন একটা পারা ভেঙে যাওয়া ার্মোমিটার তুলে রাখলাম চুপি চুপি, াতনীর চোখের আড়ালে।

ব্যাপারটা হাস্যকর, তবু ওটার সঙ্গে যন আমাদের সেই প্রাচুর্যহীন স্বল্প সম্বল শশবটা যেন কোথা থেকে কুণ্ঠিত হাসি-মুখে উঁকি মারলো। মেজদার সংগ্রহশালায় এই বস্তু ছিল একটা, মেজদা সেটাকে ছোট ছোট লাইন টানবার 'রুল কাঠ' হিসেবে ব্যবহার করতো; আমরা সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে দেখতাম। আমাদের পতুলের সংসারে কারো প্রবল জ্বর এসে গেলে, কতো বাস্তবভাবে ডাক্তার সাজা যেতো ওরকম একটা পেলে।

ভগবানের কাছে রীতিমত প্রার্থনাই করেছি বাড়িতে কারুর জ্বর হোক, আর থার্মোমিটারটা ঝাড়তে গিয়ে ধাক্কা লাগুক। কিন্তু ভগবান আর কোন কথাটাই বা কান পেতে শোনেন? জ্বর যদিও বা কারো হয়ে থাকে জ্বরকাঠি অক্ষতই থেকেছে।

কিন্তু এখনকার শিশুরা অমন নিজেদের তৈরী করা 'বাস্তবের' দিকে ফিরে তাকাবে কেন? তাদের জন্যে তো নিখুঁৎ 'ডক্টরস সেট' বাজারে মিলছে। প্লাস্টিকের দৌলতে ওদের হাতে এসে পড়ছে সংসার জগতের যাবতীয় সরঞ্জাম। ওদের ঘরে ছড়াছড়ি যাচ্ছে—ড্রইংরুম সেট বেডরুম সেট স্টোর-রুম সেট কীচেন সেট ডাইনিং টেবল সেট। গড়াগড়ি খাচ্ছে টেলিফোন গ্রামোফোন রেডিও, সেলাই কল, আরো কত কিছু। গাড়ী পালকী তো থাকবেই।

এই সব ক্ষুদে ক্ষুদে অবিকল সত্যি-কার মত খেলনাগুলো দেখলে হঠাৎ হঠাৎ মার জন্যে মন কেমন করে যায়। কে জানে মার সেই প্রাণতুল্য কাঁচের আলমারিটার কী গতি হয়েছে এখন। হয়তো দাদা-মেজদার ছেলেমেয়েরা সেই অকিঞ্চিৎকর জিনিস-গুলো আছড়ে ভেঙে পায়ে মাড়িয়ে শেষ করেছে আর আলমারিটা নেহাৎ সেকেলে বলে ভাঁড়ার ঘরে স্থান পেয়েছে, অথবা স্থানই জোটেনি কোথাও, ছাতের কোণে নির্বাসিত হয়ে পড়ে থেকে রোদে পুড়ে জলে ভিজে জগতের নশ্বরতার বিষয় চিন্তা করে দার্শনিকের হাসি হাসছে।

যেদিন আমরা অবিনাশ ডাক্তার রোডের সেই মস্ত ছাতওয়ালা সুন্দর বাড়িটায় গেলাম, সেদিন ওই বাড়ি-ঝাড়া ফেলে দেওয়া ধুলো-জঞ্জালের মধ্য থেকে একটা আশ্চর্য জিনিস পেয়েছিলাম। আশ্চর্য, আর ভয় ধরানো।

সেবারের স্মৃতিটা একেবারে যেন ফটোর মতো মনের দেয়ালে ঝুলছে। তখন বোধহয় দিদির বয়েস বারো আমার দশ। মানে আমরা বড় হয়ে গেছি। আমার আকৃতি-প্রকৃতি [illegible] প্রায় বছর দুই এগোনো ছিলো, তাই দিদিকে আর আমাকে একই [illegible] করা হতো।

সকাল থেকে [illegible] চলছে, প্রায় সব জিনিসই [illegible] 'ওবাড়িতে' পাঠানো হয়ে গেছে, [illegible] গেছে, রান্না-খাওয়ার [illegible]। তাও থালার বদলে কলাপাতার আর বাটিগেলাসের বদলে মাটির খুরি গেলাশ মজুত রাখা হয়েছে। তবু রান্নার বাসনপত্র তাড়াতাড়ি মেজে দেওয়ার জন্যে বাসনমাজা ঝি খুদুর মাকে বসিয়ে রাখা হয়েছে। চলে যাবেন বলে মা খুদুর মাকে দুটো পুরনো শাড়ি দিয়েছেন আর কিছু কিছু ঘুঁটে কয়লা দিয়ে দিয়েছেন। কারণ মা ওই জিনিস-গুলোকে 'অযাত্রা'র কোঠায় ফেলেন। অবশ্য বাবা ইতিমধ্যেই মহোৎসাহে নতুন বাড়িতে কয়লাটয়লা আনিয়ে রেখে দিয়েছেন, অসুবিধের প্রশ্ন নেই।

এতোটা প্রাপ্তিযোগ সত্ত্বেও খুদুর মা চোখ মুছছিল, বলছিল, 'এমন মনিব আর পাবো না মা!' মাও মলিন গলায় বলছিলেন, 'কী করবো মা, তোর বাবুর এই একবাতিক। কী মন্দ ছিল বল এ বাড়িটা?'

বাসা বদলের মধ্যে সেই প্রথম একটা বিষণ্ণতার সুর অনুভব করলাম। আগে এসব তাকিয়ে দেখিনি। জানতাম না কোনো জায়গা থেকে ছেড়ে চলে গেলে কোথাও না কোথাও টান পড়ে, ব্যথা লাগে।

খুদুর মার দুঃখটা যেন আমার মনেও সঞ্চারিত হলো। আহা বেচারী! নগদ সাত টাকা মাইনের চাকরী চট করে ও এখন কোথায় পাবে? মা নিজে বেশী খাটতে পারতেন না বলে, অনেক কাজই করতো খুদুর মা, তাই মাইনে বেশী পেতো। অন্য বাড়িতে শুধু বাসন মাজা, মশলা বাটা, আড়াই টাকা তিন টাকা মাইনে। বড়জোর চার টাকা, তাহলে হয়তো আবার ঘর মোছার শর্ত থাকতো।

নীচের তলা থেকে দোতলায় চলে এলাম, সব ঘর খাঁ খাঁ করছে, দেয়ালে ছবি টাঙানোর দাগগুলো ফুটে রয়েছে। ময়লা হয়ে যাওয়া দেয়ালে সেই খানিকটা খানিকটা চৌকো লম্বা শাদা অংশ কেমন যেন দুঃখিত চোখের মতো তাকিয়ে রয়েছে। মনটা হু হু করে উঠলো।

মনে হলো, সত্যি এ বাড়িতে কী এমন মন্দ ছিলাম। এই প্রথম বাবার বিপক্ষে রায় পড়লো আমাদের। সত্যি বাবার যে কী বাতিক!

তখনো অবিনাশ ডাক্তার রোডের সেই বাড়িটা আমরা দেখিনি। এবারে আর বাড়ি দেখাতে নিয়ে যাননি বাবা। হয়তো ভেবেছিলেন ও বাড়ির আর পছন্দ অপছন্দের প্রশ্ন কী!

বললো, 'এই হচ্ছে তোদের রান্নাঘর, এই ভাঁড়ারঘর, এই পুজোরঘর, এই খাবার-ঘর, এই বসবার ঘর। নে চটপট সব এনে সাজিয়ে ফেল।'

খেলাঘরে শোবার ঘর থাকতো না।

দিদিতে আমাতে আমাদের সংসারের টুকিটাকি নিয়ে এসে হাজির করলাম, মেজদাই বেশ পরিপাটি করে সাজিয়ে নিয়ে বললো, 'মার কাছ থেকে কিছু চাল ডাল এনে আমি একটা মুদির দোকান দেব, তোরা আমার দোকান থেকে কিনতে আসবি। বাবার সিগারেটের কৌটোর দুটো ঢাকনি দিয়ে একটা ওজন দাঁড়ি বানিয়ে ফেলি দাঁড়া।'

মেজদার যে কথা সেই কাজ।

তৎক্ষণাৎ!

আর দাদা? দাদা আজ তিন মাস থেকে আমাদের খাতায় নাম কেটে দিয়েছে।

মেজদা যখন একটা দাঁড়িপাল্লা বানিয়ে হাসি হাসি মুখে বললো, 'এই একটু করলা আনতো, বাটখারা করি—' তখন কে বলতে পারে এই মেজদাই দাদার সঙ্গে দেশের কথা, সমাজের কথা, রাজনীতির কথা, পরাধীনতার কথা নিয়ে বড় বড় কথা বলে।

কিন্তু বলে তো।

রাতে শুয়ে শুয়ে গল্প করে ওরা পাশাপাশি দুটো চৌকী থেকে, আমরা পাশের ঘর থেকে শুনতে পাই দুই বোনে এক চৌকীতে শুয়ে।

দাদার গলা মৃদু, কী বলে বোঝা যায় না, মেজদার গলা জোরালো, শোনা যায়, 'ও তুমি যাই বলো দাদা চরকা কেটে সমস্যার সমাধান হবে না। আসলে চাই ইন্ডাস্ট্রি। পি সি রায় ঠিক পথ দেখিয়েছেন। ব্যবসা ব্যতীত বাঁচার কোনো রাস্তা নেই। প্রতিটি জিনিসে আমরা পরনির্ভর। একটা ছুঁচ পর্যন্ত আমাদের দেশে জন্মায় না। শিল্পে স্বনির্ভর হতে হবে।'

আবার কোনোদিন কোনোদিন শুনতে পেতাম 'কৃচ্ছ্রসাধনের কোনো মানে হয় না। বিবেকানন্দ বলেছেন—শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। দৈহিক শক্তিরও প্রয়োজন আছে। মাংসটাংস না খেলে বলবৃদ্ধি হবে কিসের জোরে?'

মাঝে মাঝে কী সব বই থেকে পড়ে শোনাতো দাদাকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে। বলতো 'কর্মযোগটা একবার পোড়ো দাদা—'

আবার এদিকে কোন এক বন্ধুর বাড়ি থেকে এন্তার 'মিস্টার ব্লেক' এনেও পড়তো। আর পড়া হয়ে গেলে আমাদের দিকে দাক্ষিণ্যের হাত প্রসারিত করে বলতো, 'এই নে পড়। ছিঁড়িস ফিঁড়িস না।'

মা দেখতে পেলে অসন্তোষের গলায় বলতেন, 'দাদা হয়ে বেশ করছিস তো? গুচ্ছের ডিটেকটিভ বই এনে জোগান দিচ্ছিস? বাচ্চাটা সন্ধে গোগ্রাসে গেলে। এই বয়সে ওসব পড়া ভাল?'

মেজদা বেপরোয়া গলায় বলতো 'কেন কী হয় এ বয়সে পড়লে? জাত যায়? তোমাদের সর্বদা ওই শুচিবাইপনা দেখলে আমার মাথা জ্বালা করে। এই করিস না, ওই করিস না, ওই শুনিস না, সেই বলিস না। উঃ! বই পড়লে কারুর কিছু অনিষ্ট হয় না মা, এই তোমায় বলে দিলাম।'

'তা হলে এখন থেকেই নাটক নভেল গিলবে?'

'গিলবেই তো। আর কবে গেলবার সময় পাবে? এরপর তো শ্বশুরবাড়িই ওদের গিলে ফেলবে।'

এ হেন মুহূর্তে অবশ্য মেজদাকে 'দেবদূত' বলেই মনে হতো।

সত্যিই—মেজদা আমাদের 'নাটক নভেল' নামক নিষিদ্ধ বস্তু এনে জোগান দিতো। দ্বিজেন্দ্রলালের সব বই মেজদার বন্ধুর বাড়িতে ছিল, তাছাড়া শরৎচন্দ্রের বই কিনতো সে যেই বার হতো। সেসব চলে আসতো আমাদের বাড়িতে।

হয়তো সেই সূত্রেই আমাদের এমন অকালপক্কতা।

বিশেষ করে আমার।

নইলে ওবাড়িতে পুরনো পাঁজি আর ছেঁড়া কাগজের মধ্যে থেকে পাওয়া সেই রোমাঞ্চকর বস্তুটার রহস্য বুঝে ফেলি? বোঝবার বয়েস তো নয়।

অথচ বুঝে ফেলেছি।

মেজদা নেমে গেল।

দিদিকে বললাম, 'দিদি ওটা নিয়ে কী করবি ভেবেছিস?'

দিদি একটু দুষ্টু হাসি হেসে বললো, 'ভেবেছি।'

'কী?'

'এই ঘরে নিয়ে এসে সবটা দেখে নিয়ে, কোনো একসময় মার ঘরের আলমারীর মাথায় গুঁজে রেখে দেব।

মার ঘরের ওই উঁচু কার্নিশদার সেকেলে আলমারিটার মাথার প্রায় চৌবাচ্চার মত একটা খোল ছিল, সেখানে বালিশ তোষক রাখলেও নীচে থেকে সহজে চোখে পড়ে না। অতএব নিশ্চিন্ত।

ভয়ে ভয়ে বললাম, 'দেখবি?'

দিদি বললো, 'কী হয়েছে? মা যখন দুপুরে ঘুমোবেন, তখন নিয়ে আসবো।'

ওই এতটুকু লুকোচুরিও করবো না, এমন নির্জলা খাঁটি হতে পারা যায় না। যে বই-গুলো মা নিজে পড়তেন, আর আমাদের বারণ করতেন, সেগুলো তো সবই মার ওই দুপুরের ঘুমের অবকাশে শেষ করে ফেলতাম আমরা।

ওই ঘুমটি বড় প্রিয় ছিল মার।

যেদিন ওটায় ব্যাঘাত ঘটতো, সেদিনই, বিকেলে মার মেজাজ তিরিক্ষী।

ব্যাঘাত অথচ নিজে থেকেই ঘটিয়ে বসতেন।

হয়তো ভরদুপুরে ঘুঁটেওলি ডাকতেন, হয়তো বাসনওলি ডাকতেন, আর তাদের সঙ্গে দরকষাকষি এবং লেনদেনে ঘণ্টা কাটিয়ে বসতেন। ঘুঁটেওলির সঙ্গে চার পয়সা শ' থেকে তিন পয়সা শ'য়ে নামাতে একশো কথা কইতেন, এদিকে সেই নিরক্ষর মহিলারা কেবলমাত্র হাতের কারচুপিতে কত শত ঘুঁটে এদিক-ওদিক করে ফেলতো টেরও পেতেন না।

আর বাসনওলি?

সে তো মিষ্টি কথার বৃষ্টি করে পাঁচ-খানা কাপড় আর তিনটে শার্ট দিয়ে এক-খানা মোটা চিরুনি গছিয়ে দিয়ে যেত।

দাদার চোখে কোনোদিন পড়ে গেলে দাদা বলতো, 'আচ্ছা কেন মিথ্যে এতো ঠকো মা? এর থেকে পুরোনো কাপড়জামা গরীব দুঃখীকে দিয়ে দেওয়া ভালো।'

মা রেগে বলতেন, বাড়ি বসে অ[illegible] গরীব দুঃখী পাচ্ছি কোথায় রে?'

দাদা হেসে উঠতো, 'গরীব দ[illegible] অভাব? তোমার বাড়িতে যে বাসন [illegible] সেও তো গরীব। আর বস্তিতেও [illegible] দুঃখী আছে।'

মা এই সমস্ত মানবিকতাবোধকে [illegible] দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে বলতেন, 'দায়ে পড়ো [illegible] আমার। চিরুনিটা ভেঙে গিয়েছিল, চিরু[illegible] হলো। কিনতে গেলেই তো এখন পাঁচ [illegible] আনা লাগতো।'

বিকেলবেলা জলখাবার খাবার সময় হাঁক পাড়লেন 'তোরা কি আজ ছাতে থাকবি নাকি?'

দুড়দুড়িয়ে নেমে এলাম।

দেখি বাবা রাশিকৃত কেনা খাবার নিয়ে এসেছেন। মাকে বললেন, 'বেশী করে করে খাও সবাই, সেইতো কোন কালে তাড়াতাড়ি খেয়ে আসা হয়েছে।'

মা বললেন, 'তাই বলে এতো? এতো হিংয়ের কচুরী, এতো আলুর দম, এতো সিঙাড়া মিষ্টি—'

বাবা প্রসন্ন হাসি হেসে বললেন, 'ভাবছো কেন উঠে যাবে। সবাই মিলে হাত লাগালেই উঠে যাবে।'

তা গেলও অবিশ্যি।

সকলেরই দুর্দান্ত খিদে।

তাছাড়া—'বাজারের খাবার' খেলে অসুখ করবে, এভাবনাটা ছিল না আমাদের বাড়িতে।

বাবা এনতার আনতেন, আমরাও ফিনিস করে ফেলতাম। অবশ্য প্রধান বোদ্ধা হচ্ছেন বাবা। ভাতটাত বেশী খেতে পারতেন না বাবা, কিন্তু খাবার? তা বেশ চালাতেন।

প্লেট রেকাবির প্রশ্ন নেই, কেউতো আর কুটুম নয়?

মা সেই ঠোঙার শালপাতাগুলোই ছড়িয়ে মেলে ধরে, ছটা ভাগ করে ফেলে (যথাযথ মাপে অবশ্য) এগিয়ে এগিয়ে দিলেন, আর নিজেরটা নিয়ে একটু সরে পিছন ফিরে বসলেন।

স্বামীর সামনে খাওয়া নাকি অসভ্যতা।

বাবা হাসতেন।

বলতেন, 'তা নয়, স্বামীকে বোঝানো যে আমি শুধু বাতাস খেয়ে তোমার সংসার ঠেলছি।'

'নিয়মটা বুঝি আমি করেছি?'

'তুমি করবে কেন? যাঁরা করেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যের কথাই বলছি। এ নিয়ম পালনের কোনো মানে হয় না।'

বললে কি হবে?

মা সেই হাস্যকর ভাবেই ওই অর্থহীন নিয়মটা পালন করে চলতেন।

ঠিক হয়েছিল পরদিন সকাল থেকে ভিওলাদের ঝি আমাদেরও কাজ করবে। কিন্তু সে তো কাল সকালে।

মা বললেন, 'আজ কে কয়লা ভেঙে উনুন ধরিয়ে দেবে তাই ভাবছি।'

বাবা উদার গলায় বললেন, 'আজকে আর তোমার রাঁধতে হবে না। আমি খাবার-ওলাকে বলে এসেছি কিছু পুরী ভেজে দেবে, আর সেরটাক রাবড়ি দিয়ে যাবে। পুরীর সঙ্গে ভাজি আর চাটনী দিয়ে দেবে।...এই তো রাস্তায় নেমেই দোকান। লোকটা খুব ভাল। আগে কোথায় ছিলাম, এবাড়িতেই এখন পাকাপাকি থাকবো কিনা, এই সব জিজ্ঞেসা করলো। বললো, আমার দোকানের ছোকরাটা দিয়ে পাঠিয়ে দেব। আপনাকে কষ্ট করে আসতে হবে না।'

'তা আর দেবে না কেন।'

মা নিজস্ব ভঙ্গীতে বললেন, 'বুঝেছে এক তালেবর বাবু এলেন পাড়ায়। এতো বড়ো ঠোঙার খাবার আর কটা বাবু কেনে বল? এতো কিনলে, আবার রাত্তিরের বায়না—'

উনুন ধরিয়ে রাঁধতে হবে না ভেবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন, তবু বলাটি চাই।

এখন দুদিন তোলা উনুনে রাঁধতে হবে। উনুন পাতবার জন্যে নাকি দিনক্ষণ দেখতে হয়। শনিবার মঙ্গলবার তো অচল, আবার মেয়ের জন্মবারেও নাকি উনুন পাতা নিষেধ।

এক যদি ঝি পেতে দেয়।

'ওবাড়ির অমন খাসা উনুন দুটো ভেঙে দিয়ে আসতে হলো!'

মা আক্ষেপ করে বললেন, 'এখন ঝি কেমন করে দেবে কে জানে!'

বাড়ি ছেড়ে চলে আসার সময় নাকি উনুন ভেঙে দিয়ে আসতে হয়। কেনই যে এমন অদ্ভুত নিয়ম। নিজের হাতে গড়া জিনিস নিজে হাতে ভাঙতে ভাল লাগে?

তা ভাল না লাগলেই বা কী?

নিয়ম যখন।

মা বলতেন, 'ভগবানও নিজের হাতে গড়া জিনিস নিজে ভাঙেন। এখন আমি ভগবান হলাম।'

তবে বুদ্ধি করে মা উনুনের ভিতরের লোহার শিকগুলো নিয়ে আসেন বাড়ি বদলের সময়।

না আনলেই তো আবার তিন চার পয়সা খরচ করে নতুন শিক কিনতে হবে।

এবেলা ঝি না আসায় আমরা খুব আহ্লাদ অনুভব করলাম। এলেই তো উনুন ধরাতো, আর এই সব আবিলির মধ্যে মাকে রাঁধতে হতো।

অতএব কোন না একশোবার শুনতে হতো আমাদের, 'আমার যেমন কপাল। ধাড়ি ধাড়ি মেয়েরা একটাবেলা চালিয়ে দিতে পারে না। বাপ অমনি হাঁহাঁ করে পড়বেন, 'আগুনের ধারে তোরা কেন?' আমি যেন আর বারো বছরে হেঁসেলে ঢুকিনি।'

আমাদের তখন ভয়ে আড়ষ্ট অবস্থা হতো।

তবে বাবা শুনতে পেলেই বলে উঠতেন, 'তা তোমার বাবা যদি তেমন হন, আমি নাচার।'

'আমার বাবা?'

মা অবশ্যই ছিটকে উঠবেন, 'বাপের বাড়িতে কস্মিন কখনো এক গেলাশ জল গড়িয়ে খেতে হয়েছে?'

বাবা এমনিতে জোরে হাসতেন না, কিন্তু এরকম কথায় ঠিক হাহা করে হেসে উঠবেন, 'তবেই দেখো! ওদেরও এটা বাপের বাড়ি। তবু তো কত কী করছে।'

কতো কী মানে বাবার অফিস যাবার আগে একডিবে পান সেজে দেওয়া, আর বাড়ির যতো কাপড়চোপড় শুকোয়, সেগুলো তুলে গুছিয়ে রাখা।

এই আমাদের দুই বোনের কাজ!

অবশ্য দাদাদের ফাই-ফরমাশ খাটাটা ছিল।

পরদিন সেই মহৎ কর্তব্যগুলো সমাধা করে, যাকে বলে দুরুদুরু বক্ষে দুপুরের অপেক্ষা করতে লাগলাম। তারপর দাদারা যখন স্কুলে কলেজে, মা দিবা-নিদ্রায়, তখন সেই জিনিসটা নিয়ে দিদি আর আমি ছাতের ঘরে উঠলাম।

এখানে আমাদের খেলাঘর, অতএব সন্দেহের কিছু থাকতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

হুজুকে কলকাতার আজগুবি কাণ্ড

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

কলকাতা মানেই হুজুক। আর হুজুক মানেই আজগুবি ব্যাপার নিয়ে হৈ-চৈ।

কলকাতার ধুলোভরা রাস্তায় তখন পালকি চলে। বেহারার দল রাস্তা কাঁপিয়ে হুর করে বয়ে নিয়ে চলে পালকি। এদিকে ঘোড়ার গাড়িও এসে গেছে। টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটছে নানা ধরনের গাড়ি নিয়ে। আপিসে কাছারিতে তখন টানাপাখা!

মাঝে মাঝে পেল্লায় পেল্লায় বাড়ি। সেসব বাড়িতে রাজা-রাজড়ার মত কলকাতার বড়-লোকেরা থাকেন। তাঁদের কাছাকাছি ঘোরেন মো-সাহেব, উমেদার আর তোষামোদকারী প্রার্থীর দল। এঁদের ঘোড়াশালায় ঘোড়া, দেউড়ীতে দারোয়ান। নায়েব গোমস্তারা কাছারী সরগরম করে রেখেছেন।

হাটখোলা, শোভাবাজার, ঠনঠনিয়া, চিৎপুর, কুমারটুলি থেকে শ্যামবাজার, পাইকপাড়া সবই জমজমাট। তবে মাঝে মাঝে কোনো জমিও পড়ে আছে। আছে এঁদো-পুকুর ও ঝোপজঙ্গল। সন্ধ্যা হলেই সেখানে শিয়াল ডাকে। ছেলেপুলেরা বিছানায় শুয়ে শুয়ে শিয়ালের ডাক শোনে। দেয়ালগিরির আলো-ছায়ায় কিসের যেন ছবি ফুটে ওঠে। কলকাতার ছেলেমেয়েরা বিছানায় শুয়ে শুয়ে নানারকম রহস্যময় গল্প শোনে। শোনে অলৌকিক কাহিনী।

দেওয়ালে যখন কেঁপে কেঁপে বেড়াচ্ছে কালো ছায়া, শেয়াল ডাকছে থেকে থেকে, দমকা বাতাসে দেওয়ালের বাতি যখন নিবু নিবু হয়ে আসছে, এইরকম এক সন্ধ্যায় ঠাকুরমার আঁচলের তলায় শুয়ে শুয়ে সিঙ্গি-বাড়ির ছেলে একটি অলৌকিক মহাপুরুষের গল্প শুনেছিল। মহাপুরুষ মানে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন এক আশ্চর্য মানুষ। তাঁকে মুনি-ঋষিও বলা যায়, আবার এক ম্যাজিশিয়ানও বলা চলে। এই অভিনব অত্যাশ্চর্য মানুষটিকে যিনি স্বচক্ষে চাক্ষুষ করেছিলেন, তিনি সিংগিবাড়িরই আত্মীয় এবং পুরোনো কলকাতার বিখ্যাত ব্যক্তি বারাণসী ঘোষ।

সেবার কাশী যাচ্ছিলেন বারাণসী ঘোষ। তখন রেললাইন হয়নি। আর হাঁটাপথে পালকি করে বা হাতি-ঘোড়ায় যাবার তেমন চল ছিল না। তাই বারাণসী তাঁর অভিপ্সিত তীর্থ বারাণসীতে চলেছিলেন নৌকো করে। অর্থাৎ জলপথে। নৌকো করে পথ চলতে চলতে হঠাৎ এক জঙ্গলের ভেতর এসে হাজির হলেন তীর্থযাত্রীর দল। আর সেই জঙ্গলের ভেতরেই ঐ অত্যাশ্চর্য মানুষটির দেখা মিলল। মহাপুরুষ তখন ধ্যানে মগ্ন। ইয়া বড়ো বড়ো দাড়ি গোঁফ। গায়ে যেন শেওলা জমে গেছে। কত দিন ধরে তিনি যে তপস্যা করছেন, তা কে জানে?—বারাণসী তাঁর ধ্যান ভাঙ্গানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু ধ্যান ভাঙল না। শেষপর্যন্ত মাঝিদের সাহায্য নিয়ে ঐ অচৈতন্য মহাপুরুষকে নৌকোয় তুলে নিলেন ঘোষমশাই।

তারপর? তারপর আর কী! দিনের পর দিন কেটে যায়, রাতের পর রাত। নৌকো পেরিয়ে চলে গ্রামের পর গ্রাম। জনপদের পর জনপদ। ছাপঘাটীর মোহনায় জল ছিল না বলে বারাণসীকে ঢুকতে হল সেবার বাদা-বনের ভেতর। তখন ভাটা। জোয়ার আসতে দেরী। ঠিক হল গুণ টেনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে নৌকোকে। কেননা, জোয়ারের আশায় নৌকো দাঁড় করিয়ে রাখা এই জঙ্গলের ভেতর ঠিক নয়। নৌকোর গলুয়ের কাছে বসে আছেন মহাপুরুষ। গম্ভীর ধ্যান-নিমগ্ন। আর সবাই নিজের কাজে ব্যস্ত। অন্যমনস্ক। এ সময় হঠাৎ এক অঘটন ঘটে গেল। জলের ধারে নদীর পাড়ে হঠাৎ এক-মহাপুরুষ এসে দাঁড়ালেন। ঠিক একরকম দেখতে। অবিকল এক। এদিকে ডাঙ্গার ঐ মহাপুরুষ এবার ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন নৌকোর দিকে জলের ওপর দিয়ে হেঁটে। এসে তিনি নৌকোর মহা-পুরুষকে হাত ধরে তুললেন এবং তারপর দুজনেই জলের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সোজা ঢুকে গেলেন জঙ্গলের ভেতর।

এতদ্রুত ব্যাপারটি ঘটে গেল যে কেউ কিছু বলবারই ফুরসৎ পেলেন না। কী ব্যাপারটি যে ঘটে গেল তাও অনেকে ঠাহর করতে পারলেন না। পরে একসঙ্গে সকলে হাঁ হাঁ করে উঠল। মাঝি মাল্লারা সকলে হৈ-হৈ করে খুঁজতে বেরোলেন। কিন্তু কোথায় কী। ওনারা কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন তা কেউই ঠাহর করতে পারলেন না।

বারাণসী ঘোষ হায় হায় ক'রে উঠলেন। বার বার তিনি কপাল চাপড়ালেন। অমন মহাপুরুষকে হাতে পেয়েও তিনি ধরে রাখতে পারলেন না! সারা জীবন তিনি এই আক্ষেপই করে গেলেন।

ঠিক এইরকম এবং অনুরূপ এক মহা-পুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন ঝিলি-পুরের দত্তরা। সোঁদরবনে জমিদারী ছিল ঐ দত্তদের। অনেক চাষের জমিও ছিল। একবার কুয়ো খুঁড়তে খুঁড়তে তিরিশ হাত গর্ত করতে হয়েছিল তাঁদের। সেই হাত তিরিশেক গর্তের নীচে ঝিলিপুরের দত্তবাবুরা এক ধ্যানস্থ মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পেলেন। এনার শরীর শুকনো চ্যালাকাঠের মতন। গায়ে বড়ো বড়ো অশ্বত্থ গাছের শেকড় গেছে জমে।

দত্তবাবু মহাপুরুষকে ছাড়লেন না। বারাণসী ঘোষ মহাপুরুষকে বাড়ি আনতে পারেন নি, ইনি কিন্তু আনলেন ঝিলিপুরে। হৈ-চৈ পড়ে গেল চারদিকে। পুরো এক মাস ধরে রাখলেন। তারপর? তারপর হঠাৎ এক-দিন অঘটন ঘটে গেল। এক অন্ধকার রাত্তিরে সবাই যখন অন্যমনস্ক, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ঠাকুরমার আঁচলের তলায় শুয়ে শুয়ে নানারকম অলৌকিক গল্প শুনছে, দেওয়ালে ছায়া কাঁপছে থিরথির করে, হাঁ ঠিক সেই সময় মহাপুরুষ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সারা ঝিলিপুরে আর তাঁকে কখনো দেখা যায় নি। কখনো না।

শহর কলকাতায় এইরকম মহাপুরুষদের নানান আখ্যান শুনতে শুনতে এককালের ছোট ছোট ছেলেরা ঘুমের কোলে ঢলে পড়ত। ঘুমের ঘোরে তারা এই মহা-পুরুষেরই স্বপ্ন দেখত। আর যত বড়ো হত, ততই তাদের মনে এ ধারণা দৃঢ় হত যে তারা নির্ঘাত একদিন ঐরকম এক অলৌকিক মহা-পুরুষের দেখা পাবে। আর নিশ্চয় সেদিন মহাপুরুষকে তারা বাড়িতে ধরে নিয়ে আসবে। বারাণসী ঘোষের মত জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসবে না বা ঝিলিপুরের দত্তদের মত আলগা করে ধরে রাখবে না।

ঠাকুরমার কোল ছেড়ে ছেলেরা যখন স্কুল যারায়াত আরম্ভ করল, তখন রহস্য-ময় আরো বিচিত্র মানুষদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হতে থাকল। কলকাতায় তখন পাড়ায় পাড়ায় আজব লোকের দেখা পাওয়া যেত। এই আজব লোকগুলির কথাবার্তা যেমন অদ্ভুত, আচার-আচরণ ছিল তার থেকেও রহস্যময়। হরিভদ্দর খুড়ো সেই-রকম এক আশ্চর্য মানুষ। জাতিতে ইনি ছিলেন কায়স্থ, তাতে মুখুখী কুলীন। বেজায় গাঁজাখোর। দেড়শ ছিলিম গাঁজা খেয়ে ইনি প্রত্যহ জলযোগ করতেন। মাথা গোঁজবার কোনো নির্দিষ্ট ঠাঁই ছিল না। আর ভোজন?—যত্রতত্র। এই হরিভদ্দর খুড়োর অগম্য জায়গা কোথাও ছিল না। ইনি নানান জায়গা ঘুরে নানারকম আজ-গুবি খবর সংগ্রহ করে নিয়ে আসতেন। ঠাকুরমার মুখে শোনা অলৌকিক গল্পের থেকেও তা রহস্যঘন এবং জীবন্ত। কে মন্ত্রগুণে সোনা তৈরী করতে পারেন, লোকের মনের কথা গুণে বলবার অধি-কারী কে এবং পারাভস্ম খাইয়ে গঙ্গাতীরে পচা মরা বাঁচিয়ে দেবার আজগুবি কাহিনী বলে হরিভদ্দর খুড়ো অনায়াসেই আসর জমিয়ে দিতে পারতেন। তবে শেষকালে মাথা ঝাড়া দিয়ে বলতেন, 'সব বুজরুকি—সব মিথ্যে—'

কিন্তু ছেলেদের কাছে সব বুজরুকি হয় কী করে! সবকিছু অবিশ্বাস্য বলে ছোট ছেলেরা কী উড়িয়ে দিতে পারে? কেননা, চোখের সামনেই একদিন শহর কলকাতাকে উত্তেজনায় উদ্বেলিত করে হাজির হয় সাতপেয়ে গোরু এবং দরিয়াই ঘোড়া। একটি গোরুর চারটি পা, না হয় বাড়িয়ে পাঁচ করা গেল, কিন্তু সাত পা দিয়ে গোরু দেখা দেবে, সেও কী সম্ভব? আর পক্ষীরাজ ঘোড়ার গল্প না হয় শোনা গেছে—আকাশ দিয়ে উড়ে চলে, কিন্তু সে যে আবার নদীর বুকে টগবগিয়ে সাঁতার কাটে, তাকে দেখার দুর্লভ সৌভাগ্য কল-কাতার লোক ছাড়া আর কার হবে?

এই কলকাতার বুকেই একদিন রটনা শোনা গেল যে, দশ বছরের ভেতর যাঁরা মারা গেছেন, সেই মড়ারা পরমেরোই কার্তিক

রবিবার সকালে ফিরে আসবেন। উঃ সে কী হুজুগ! নিমতলা আর কাশী মিত্তিরের ঘাটে সে কী ভিড়! লোক উপচিয়ে পড়ছে শ্মশানে। মৃত আত্মীয়স্বজনকে স্বাগত জানাবে বলে রাত দশটা পর্যন্ত সকলে বসে রইলো অধীর প্রতীক্ষায়। কিন্তু না, কিছুই হল না। মরারা ফিরলেন না।

তবু লোকে দমে না। নতুন হুজুগে মেতে উঠতে দেরী হয় না। একটা ব্যাপারে না হয় ঠকা গেল, আরেকটা ব্যাপারে যে সত্যি সত্যিই সফলতা পাওয়া যাবে না, একথা হলফ করে কে বলতে পারে?

আরো অন্যবারের মত এবারেও হরিভন্দর খুড়ো এক জমকালো খবর নিয়ে এলেন। ঝিলিপুরের দত্তবাড়ি নয়, হাটখোলা-ঠনঠনিয়াও নয়, অতি কাছে সিমলেতে 'নাক-কাটা বঙ্ক'র বাড়িতে নাকি সত্যি সত্যি এক মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে।

'নাক-কাটা বঙ্ক' নামটি শুনলে অনেকে হয়ত একটু চমকে উঠবেন। না, ওটা চমকাবার মতন কিছু নয়। বঙ্কবেহারিবাবু এমনিতে নিখুঁত লোক। ছেলেবেলায় একবার মামার বাড়িতে পাতকোর ভেতর পড়ে গিয়ে নাক কেটে ফেলেছিলেন, এই ... । বন্ধু-বান্ধবেরা আদর করে সেই ... 'নাক-কাটা বঙ্ক' বলে ডাকত। আর বান্ধবদের নামেই বেচারি বিখ্যাত হয়ে ... ।

... বাবু খুব ধুরন্ধর লোক ছিলেন। ...কিল। উকিলবাবুর হেড কেরানী ...লন। তাঁর মতন তুখোড় আইনবাজ খুব কমই ছিল। জাল-জালিয়াতির ..., ইকুটির খোঁচ, সমন ল'য়ের প্যাঁচে ... ছিলেন দ্বিতীয় শুভঙ্কর। যাঁরা সামান্য ভদ্রলোক তাঁরা এঁর নাম ...ল আঁতকে উঠতেন। অনেকের ধারণা যে, ইনি আকাশে ফাঁদ পেতে চাঁদ ...ত পারেন। সকলে আড়ালে বলাবলি ...ত, বঙ্ক কী আমাদের যে সে লোক!

সেই বঙ্কর বাড়িতে যে মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটবে তাতে আর আশ্চর্য কী!

যাই হোক, চারদিকে হৈ-চৈ করে খবর খবর রটে গেল। ছড়িয়ে পড়ল নানা রকম অলৌকিক ঘটনার বিবরণ। কেউ বলল, উনি মন্ত্রবলে লোহাকে সোনা বানাতে পারেন, করতে পারেন অসাধ্যসাধন। আবার কেউ বলল, উনি মদকে দুধের মতন সাদা করে দেন। মোট কথা, চারদিকে খুব সোরগোল পড়ে গেল। দলে দলে লোক চলল বঙ্কর বাড়ি।

বারাণসী ঘোষ বা ঝিলিপুরের দত্তদের দেখা অলৌকিক মহাপুরুষের কাহিনী শোনা ছিল যে সিঙ্গিবাড়ির ছেলেটির, সে ব্যাকুল হয়ে উঠল তার মনে-আঁকা মহাপুরুষের সঙ্গে এই সিদ্ধপুরুষের ছবিটি মিলিয়ে নিতে। সুতরাং সেও চলল।

নাক-কাটা বঙ্কর বাড়িতে সেদিন বেজায় ভিড়। কেউ এসেছেন পালকিতে, কেউবা ঘোড়ার গাড়ি করে। মহাপ্রভুর করুণার যদি এক ফোঁটা পাওয়া যায়, এই আশাতে যত মামলাবাজ আর মতলববাজেরা ভক্ত সেজেছেন। বঙ্কর বৈঠকখানা ঘরের লাগাও একটি বড়ো ঘরে মহাপুরুষ বসে ছিলেন। চৌকোনা ঘর। ঘরের মাঝে বাঘছাল বিছিয়ে মহাপুরুষ সমাসীন। সামনে একটি ত্রিশূল পোঁতা। ত্রিশূলের কোলে পেতলের একটি শিবমূর্তি। বাঘের ওপর চড়ে আছেন মহাদেব। আর তারই পাশে পাথরের বাণলিঙ্গ শিব।

এদিকে মহাপুরুষের পাশে গাঁজার হুঁকো, সিদ্ধির ঝুলি এবং আগুনের মালসা। পিছনে মহাপুরুষের দুই চ্যালা বসে বসে গাঁজা খাচ্ছে। আর তাদের পাশে একটি হাপর, জাঁতা, হাতুড়ি এবং হামামদিস্তে। কে যেন ফিস ফিস করে বলল, 'এখানে সোনা তৈরী হয়।'

মহাপ্রভুর করুণায় যাঁরা আগ্রহী ছিলেন, লোভে তাদের চোখ চক্‌চক্ করে উঠল। শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে গদগদ হয়ে লুটিয়ে পড়লেন কেউ কেউ প্রভুর পায়ের তলায়।

নাক-কাটা বঙ্কবাবুর এদিকে বেজায় সাজের ঘটা। কাটা নাকের জন্য তখন আর তাঁকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা যায় না। মাথায় তাঁর একটি জরীর কাবুলী তাজ। গায়ে লাল গাজের পিরাণ, চওড়া কালো পাড়ের শান্তিপুরী ধুতি। ভুরে উড়নি। হাতে লাল রঙের রুমাল। রুমালের ডগায় চাবির রিং বাঁধা। বঙ্কবাবুর বাড়িতে যেন উৎসব চলেছে, অতিথি-অভ্যাগতরা আসছেন, তাই তাঁর মুখে একটি মিষ্টি হাসি-হাসি ভাব। সকলের সঙ্গে বঙ্কবাবুও ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন মহাপ্রভুকে।

অতিথিদের ভেতর কেউ কেউ বঙ্কবাবুর কানে ফিস ফিস করে কী যেন বললেন। বঙ্কবাবু সে-কথা শুনে প্রভুকে কিছু অলৌকিক খেলা দেখাতে অনুরোধ করলেন।

মহাপ্রভু কিছুতেই রাজি হলেন না। তবে—

শেষকালে অনেক কাকুতি-মিনতিতে রাজি না হয়েও পারলেন না।

বঙ্কবাবুই এগিয়ে এসে ঠিক করে দিলেন কী অলৌকিক বিভূতি প্রভু দেখাবেন। সকলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকলেন। সকলের মনের ভেতরেই থির থির করে কাঁপতে থাকল কৌতূহল। কী হয়-কী হয় ভাব!

এদিকে অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেল।

প্রভুর হাত-দুয়েক দূরেই ছিল পুজোর ঘট। সেই ঘটের ওপর ছিল একটি পঞ্চমুখী জবা। লাল টকটকে তার রং। তাজা জবা।

সেই জবা ফুলটি হঠাৎ ব্যাঙের মত থপ্ করে লাফিয়ে উঠে সামনে ধপ্ করে পড়ল। ঘরসুদ্ধ লোক থ। প্রভুর মুখে রাজাজয়ের গৌরব।

এর পরে প্রভুর এক চ্যালা এক বোতল মদ এনে হাজির করল। পাছে সেটি অন্য কোনো জিনিস বলে ভ্রম হয়, তাই মহাপুরুষ সেই মদ সমেত বোতলটি একটি সরার ওপর উবুর করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মদের গন্ধে ঘর ম ম করে উঠল। ব্যাঃ, আর কারো সন্দেহ থাকল না যে সেটি মদ। সরা জুড়ে সেটি টলটল করতে থাকল।

প্রভু এবার একটি হুহুঙ্কার ছাড়লেন। আকস্মিক এ-হুঙ্কারে সকলে চমকে উঠল। ছোটছেলেরা প্রায় কাঁদতে ওঠার দাখিল। একজন চ্যালা ভয়ে ভয়ে কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল: 'প্রভু, এ কটোরেমে ক্যা হ্যায়?'

প্রভু হা-হা করে অট্টহাসি হেসে বললেন: 'এ কোটেরেমে দুধ হো ব্যেটা!'

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই মদের সরায় এক কুশি জল ঢেলে দিলেন। বাস, সঙ্গে সঙ্গে সরার মদ দুধের মত সাদা হয়ে গেল।

সকলে আবার থ। এইভাবে রাত এগারোটা পর্যন্ত নানা অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম চলল। এই ছাগল কেটে ফেললেন, আবার সেই ছাগলই ডাকামাত্র পাশের ঘর থেকে ভ্যা ভ্যা করে বেরিয়ে এলো।

মোট কথা, প্রভু মহাপুরুষ না ম্যাজিশিয়ান ঠিক চেনা গেল না। মহাপুরুষের আদলে যে জ্যোতির্ময় ছবিটি মনের ভেতর আঁকা ছিল, তার সঙ্গে একদমই মিলল না। তাই ক্ষুণ্ণ মনেই সিঙ্গিবাড়ির ছেলেটি বাড়ি ফিরে এলো।

কিন্তু কে জানত আরো বিস্ময় অপেক্ষা করেছিল মহাপুরুষকে ঘিরে। কে জানত স্বপন আর বাস্তব এক নয়। ঝিলিপুরের দত্তবাড়ির থেকে মাসখানেক বাদে মহাপুরুষ যেমন অদৃশ্য হয়েছিলেন, ইনিও প্রায় সেরকম হলেন। পালাবার পথ খুঁজে পেলেন না। কেননা, যেসব বিভূতির খেলা তিনি দেখাচ্ছিলেন, কয়েকটি নাস্তিক অর্বাচীন ছোকরা তার রহস্য উন্মোচন করে দিল। প্রভু যখন জবা ফুল নিয়ে লাফানোর খেলা দেখাচ্ছিলেন, মেডিকেল কলেজের বাংলা ক্লাসের এক বাঙাল ছাত্র লাফিয়ে গিয়ে প্রভুর হাত চেপে ধরল। এবং দেখা গেল, জবা ফুলটি বালাম্চি দিয়ে প্রভুর নখের সঙ্গে বাঁধা। প্রভু হাত নাড়লেই জবা ফুল লাফায়।

মদ কী করে দুধ হয়, সে রহস্যও উন্মোচন করে দিলেন এক সাব-অ্যাসিস্টান্ট সার্জন। তিনি দেখালেন, আমেরিকান রম (মার্কিন আনীস) নামে যে মদ রয়েছে, তাতে জল দিলে সঙ্গে সঙ্গে সাদা হয়ে যায়।

প্রভুকে ঘিরে জোর খানাতল্লাসি চলল। ঘরের কোনের থেকে কাটা ছাগল বের হল। চালান করতে না পেরে ঘরের মেঝেতেই পোঁতা হয়েছিল সেটি। অবশ্য মেঝেটি মাটির ছিল বলেই তা সম্ভব হয়েছিল। এবং দেখতে দেখতে বেরোল আরো কত কী। সুতরাং চারদিকে হৈ-চৈ পড়ে গেল। সেই গণ্ডগোলের ভেতর হরিভন্দর খুড়ো গিয়ে প্রভুর বাঘবাহন পেতলের শিবটি কেড়ে নিয়ে এলেন।

অাঁধারে, গভীরে ॥ বটকৃষ্ণ দে

দেবদারু বনে সন্ধ্যা নেমে এলে সব একাকার...
চিন্তার নীরব, প্রেম, অনুভব, শান্তি ও সংযোম
নিত্যের নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব, দর্শনের বিদগ্ধ বিচার,—
সব এক হয়ে গিয়ে জন্ম নেয় সহজিয়া নাম :
'তুমি'।

তুমি ছিলে মন যতদূরে যেতে পারে তার
সীমানায়, দিগন্তের স্মৃতি-চারু সৌর-তারকার
দ্যুতি নিয়ে।

তুমি আছ এই আমি জীবনের বাঁকে
যেখানে পা' ফেলি'। স্মৃতি যেথায় উতল সংসারের
একাকীত্বে, নির্জন নিবিড়ে, ঘুমে। মগ্ন অস্তিত্বের
স্তরে স্তরে।

সন্ধ্যা এলে দেবদারু বনে অন্ধকার...
দূরের পাহাড়, আর অরণ্য-আদিম কাছে ডাকে :
সৃষ্টির বিচিত্রে তুমি উন্মারিত, খোলা বন্ধ দ্বার।

হাতখানি ॥ বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

ঠাণ্ডা ও কঠিন এক অচেনা শহর ভিড়ের কুয়াশা
এসে গেলো; এইবার তোমার টমটমে তুমি কোচে নিশ্চয়
জেগে উঠে, হয়তো শুনেছো, আজ গঙ্গাসাগরে এক চাষা
ডুবে গেছে, সূর্যকে ডুবতে দেখে সেও ডুবে গেলো অসময়......
এবং দেখছো কি, ঠিক নজর চলে না, তবু হঠাৎ চত্বরে
ঘোলাটে আলোর ড্রম, ধূসর লোকজন, আর তারই মধ্যে তুমি
বাড়িয়ে দিয়েছো হাত, নামবে যদি নামো ঐ হাতখানি ধ'রে।
তুমি নাও তোমার সস্নেহ হাত, হাতগুলি; বুকে নেবে—
কেমন ঝুমঝুমি।

নেমে এসে, হয়তো ডাকছো; ডেকে পালটে নিয়েছো ফের নাম।
কেননা তুমিই বহু প্রতিলিপি করেছো উদ্ধার, আর স্মৃতি—
খইয়ের মতন লুপ্ত ন্যাসপাতির ফুলের মতন করে ওড়াউড়ি।
উড়তে শিখবে কি? তবে এসো; তুমি জেনে রাখো কেমন বিশ্রাম
কোচে রয়েছে, যদি ডালা খুলে নিরন্তর গর্তের প্রকৃতি
ফুটে ওঠে, তবেই না জীবন! —আজ তোমারই হাতখানি করো চুরি।

এই তো সময় ॥ যুগল সেন

এখন হাত বাড়িয়ে
'হাতে হাতে
উৎসব বাঁধবার সময়;
প্রত্যেক ঘরে
ঘর সাজাবার এই তো সময়!

ভালবাসা ছাড়া পৃথিবীতে কোন
ঈশ্বর থাকতে পারে?

দেয়ালে কার ছায়া? ঘাতকের নয়,
আমাদের ঈশ্বর।
এখন সকল কলুষিত পাপ, অন্ধকার ধুয়ে
ঈশ্বরের কাছে নতজানু হওয়ার স্বপ্ন।

এবং

জননী যেমন সন্তান কোলে তুলে নেয়
ঠিক তেমনি
সমস্ত হাত হাতে নিয়ে
সকল হৃদয় হাতে নিয়ে
স্বর্গ গড়ার এই তো সময়।

॥১॥

দিনের শেষ গাড়ি মরা বিকেলের হলুদ অন্ধকারে একটু আগে চলে গেছে।

এখন প্ল্যাটফর্মটা ফাঁকা।

এখানে ওখানে দু একজন ওঁরাও মেয়ে-পুরুষ ছড়িয়ে আছে। কার্নি মেমসাহেবের চায়ের দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে গেছে। শেষ সন্ধ্যার অস্তমিত আলোয় প্ল্যাটফর্মের ধারের শালবনকে এক অদ্ভুত রহস্যময় রাঙিয়ে দিয়েছে। চারদিক থেকে ...সেষের গান শোনা যাচ্ছে।

স্টেশনের মাস্টারমশাই বললেন, চলুন আপনাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আমি।

আমি বললাম, কি দরকার?

আরে তাতে কি? আপনি এখানের বাসিন্দা ত' নন, এখানে নতুন এসেছেন—জঙ্গলের পথঘাট ভাল জানা নেই। চলুন, চলুন, আমার কোনো কষ্ট হবে না, তাছাড়া আমি ত হাঁটতে বেরোতামই,—এ বয়সে একটু হাঁটা দরকার।

বললাম, বেশ, চলুন তাহলে।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে, শেঠ মুন্সোরামের দোকান পেরিয়ে হালুইকরের দোকানের সামনে দিয়ে এসে পোস্টাফিসের গা ঘেঁষে পেছনের মাঠটায় এসে পড়লাম আমরা।

মাঠের ওপারে দীপচাঁদের দোকানের আলো জ্বলে উঠেছে—।

বেশ অনেকখানি হাঁটতে হবে।

মাস্টারমশাই বললেন, শরীর কেমন বোধ করছেন আজকাল? এইসব পাকদণ্ডী পথ দিয়ে যাওয়া আসা করা কি আপনার উচিত হচ্ছে?

আমি হাসলাম, বললাম, মান্দারের হাসপাতালের সাহেব ডাক্তার ত বললেন, যতখানি পারি হেঁটে বেড়াতে, শরীর যে খারাপ হয়েছিল, কখনো বড় অসুখে পড়েছিলাম, এসব কথা একেবারে ভুলে যেতে।

—ও—। তাই বুঝি। তাহলে ভাল। তারপর আবার বললেন, এখানে সব উঁচু নীচু পাহাড়ি রাস্তা ত, তাই-ই বলছিলাম।

দেখতে দেখতে আমরা দীপচাঁদের দোকানের সামনে এসে পড়লাম, তারপর একটা ছোট বস্তী পেরিয়ে মোড়ের পোড়ো বাড়ির পাশ কাটিয়ে গ্রামের পাকদণ্ডীতে এলাম।

সামনে একটা বড় ঝাঁকরা মহুয়া গাছ। মাঝে মাঝে পিটিস্ এবং ঝাঁটি জঙ্গল।

পশ্চিমের পাহাড়ের কাঁধ বরাবর সন্ধ্যাতারাটা উঠেছে। সমস্ত আকাশ সেই একটি তারার আলোয় উজ্জ্বল।

হাতের লাঠি ঠকঠক করতে করতে আগে আগে চলতে চলতে মাস্টারমশাই বললেন, আপনি তখন নিশ্চয়ই কিছু মনে করলেন ঃ না? কি বলেন?

আমি অবাক হয়ে বলাম, কই? কখন?

ঐ যখন ঘোষকে ধমক লাগাইলাম আমি।

আমি বললাম, ঘোষ মানে? শৈলেন ঘোষ?

উনি বললেন, হাঁ হাঁ।

আমি বললাম, না, না, মনে করব কেন? তাছাড়া আপনাদের নিজেদের মধ্যের কথায় আমার মনে করার কি আছে?

মাস্টারমশাই উত্তপ্ত গলায় বললেন, নাঃ এ ছাওয়াল-পাওয়ালগুলোকে শুধরানো যাইব না—যা মাইনা পাইতাছে তা এই জাগায় খাইয়া পইড়্যা থাকার পক্ষে যথেষ্ট। অথচ এই ঠেকাদারদের দেইখ্যা দেইখ্যা ওদেরও কম্পিটিশনে নামন লাগব। জব্বর জব্বর জামা-কাপড়, লটর-পটর জুতো, কানঝালাপালা ট্রানজিস্টর, সবই ওদেরও চাই। কিছুই না অইলে নয়। নাই, নাই কইরাই পরানডা গেল।

আমি জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকলাম। মাস্টারমশাই ফরিদপুরের লোক। কালীভক্ত, হোমিওপ্যাথী করেন, ব্যাচেলর। ঠেকাদারদের উপর ওঁর খুব রাগ। এখানের এই নির্লিপ্ত খাঁটি জীবনে, ঠেকাদাররা এসে চাহিদার জ্বালা জ্বালিয়ে যায়। একথা তিনি প্রায়ই বলেন।

এবার সামনে সেই নালাটা এসে গেল। নালাটা পেরিয়ে অনেকখানি খাড়া উৎরাই। ও জায়গাটাতে এসে এখনও বুকে বেশ হাঁপ ধরে। এখানে এলে বুঝতে পাই যে, এখনো পুরোপুরি ভাল হইনি আমি, এখনও রাজরোগের রেশ ছাড়েনি আমাকে।

চড়াইটা উঠে এসেই সেই সাদা পোড়ো বাড়িটা। সন্ধ্যার অন্ধকারে দারুণ দেখায়। এখানের অনেকে বলেন যে, এটা ভূতের বাড়ি। মাস্টারমশায় হাতের লাঠিটা উঁচু করে ওদিকে দেখিয়ে বললেন, এই যে সেই বাড়ি।

মাস্টারমশাইকে শুধোলাম, এখান দিয়ে রাতে একা যেতে আপনার ভয় করে না মাস্টারমশাই?

মাস্টারমশাই সায়ন্ধকারে কাঁচা-পাকা চুলেভরা প্রকাণ্ড মাথাটা আমার দিকে ঘুরিয়ে জোরে হেসে উঠলেন, বললেন, বুঝলেন কিনা ভাই, আমি হইলাম গিয়া কালীভক্ত লোক—মায়ের পূজা করি—ভূত-পেত্নী লইয়াই আমাগো কারবার।

সাদা পোড়োবাড়ি পেরুনোর পর পথটা সোজা চলে গেছে খোয়াই-ভরা মাঠের মধ্যে দিয়ে। বাঁদিকে অনেকগুলো বড় বড় মহুয়া গাছ। সামনেতে এখন শর্ষে বুনেছে ওঁরাওরা। এখন অন্ধকারে সব সমান মাঠ বলে মনে হচ্ছে।

পথের ডানদিকে চার-পাঁচ ঘর লোকের বাস। ওরাও সকলে ওঁরাও। ওদের পোষা শুয়োর বাড়ির সামনের গোবর-লেপা উঠোনে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফরিমা কুকুরের বাচ্চা হয়েছে, বারান্দার খড়ের মধ্যে শুয়ে বাচ্চাগুলো কুঁই কুঁই করে ডাকছে। অন্ধকারে শর্ষে ক্ষেতের গন্ধ আর এই টুকরো টুকরো শব্দসমষ্টি বেশ লাগছে।

শর্ষে ক্ষেত পেরিয়ে, অন্ধ জারু ওঁরাও-এর ঘরের পাশ দিয়ে আবার ঝাঁটি জঙ্গল ভেদ করে বাড়ির পেছনের গেট দিয়ে এসে উঠলাম। মাস্টারমশাই চা না খেয়েই ফিরে যাচ্ছিলেন আমি জোর করে ধরে আনলাম, বললাম চা না খেয়ে যাওয়া চলবে না। [illegible] গল্পগুজব করে মাস্টারমশাই উঠে পড়লেন।

লাঠি ঠকঠকিয়ে জঙ্গলের পথে মিলিয়ে গেলেন। চলতে চলতে, মাঝে মাঝে বলতে লাগলেন, জয় মা, তোর জয়।

এখানে সন্ধ্যে হয়ে গেলে আর কিছুই করার নেই। আমার প্রতিবেশী যাঁরা তাঁরা সকলেই বেশী বয়সী। মানে নিকট প্রতিবেশীরা। তাঁরা প্রায় সকলেই হয় এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, নয় বিদেশী। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে সাপার খেয়ে শুয়ে পড়েন তাঁরা।

মালি রেঁধেবেড়ে দেয়। আমিও সকাল সকাল খেয়েদেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ি। বই-পত্র এখানে পাওয়ার উপায় নেই। কর্ণেল ম্যাকফারসনের লাইব্রেরী আছে, খুবই ভাল। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আলাপ এমন ঘনিষ্ঠ হয়নি যে বই চেয়ে পড়ি। কলকাতা থেকে যেগুলো এনেছিলাম সেগুলো বহুবার পড়া হয়ে গেছে। এখন সন্ধ্যে হলেই নিজেকে অভিশপ্ত বলে মনে হয়। যার শরীর অসুস্থ, অসুস্থ মানে বহু দিন ধরে অসুস্থ, যার মনে কোনো আনন্দের আভাস মাত্র অবশিষ্ট নেই, তার পক্ষে এরকম নির্জন জায়গায় একা একা সন্ধ্যে কাটানো শাস্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

মাঝে মাঝে ভাবি, ভাল হয়ে গিয়েই বা কি করব। ভাল হয়ে কোলকাতায় ফিরে আবার ত সেই জীবনেত প্রবেশ করব। যাদের সঙ্গে আমার কোনো আত্মিক যোগ নেই, কোনো সত্যিকারের সখ্যতা নেই, তাদের মধ্যে থেকে, তাদের জন্যে আবার সেই চাকরী করব, করব রোজগার, রোজগার দস্তুরের দাগা বুলোব। সেও ত আরেক মৃত্যু। আমার সামনে বোধ হয় শুধু বহু মৃত্যুর দ্বারই খোলা আছে। আমার শুধু এখন বেছে নিতে হবে কোন্ মৃত্যু আমার পক্ষে সহনীয় এবং বরণীয়।

॥ ২ ॥

এ জায়গাটায় সকাল হয় না, সকাল আসে। অনেক শিশির-ঝরানো ঘাসে ভেজা পাহাড়ি পথ মাড়িয়ে অনেক শাখানদী পেরিয়ে সোনা-গলানো পোশাক পরে সকাল আসে এখানে।

কম্বলের নীচে শুয়ে আমার ঘরের টালির ছাদের ফাঁকে ফাঁকে আলোর আভাস দেখা যায়। চতুর্দিক থেকে পাখি ডেকে ওঠে। বাড়ির পেছনের পিটিস্ ঝোপে ভরা মাড়ে তিতিরের আড্ডা। ঝগড়াটে তিতিরগুলোর গলা সবচে আগে শোনা যায়। তারপর টিয়া, ঘুঘু, বুলবুলি, টুনটুনি, মৌটুসী, আরো কত রকম পাখি এসে পেয়ারাগাছে, আতাগাছে, ফলসা গাছে, চেরী গাছে এমন কি বাবুর্চিখানার পাশের কারিপাতায় বসেও ঝাঁপাঝাঁপি করে।

সেই প্রচণ্ড সুন্দর ও আনন্দিত প্রাণ-তরঙ্গের মধ্যে, দিগ্বিদিকে শিহরিত ও আলোকিত শব্দলহরীর মধ্যে এই অসুস্থ আমি চোখ মেলি। শাল গায়ে দিয়ে বেরিয়ে এসে রোদে দাঁড়াই।

ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জের প্রতিটি সকাল আমার জন্যে যেন কি এক আনন্দের পসরা সাজিয়ে আনে। প্রতিদিন এই ভোরের আলোয় দাঁড়িয়ে পুবের ও পশ্চিমের পাহাড়ের রোঁয়া-রোঁয়া সবুজের দিকে তাকিয়ে আমি-বারে বারে নিজেকে ভুলে যাই।

রোজ প্রাতঃকৃত্য সেরে এসে পেয়ারা-তলায় বেতের চেয়ারে বসি। মালি এখানেই চা এনে দেয়। রোদে পিঠ দিয়ে বসে থাকি। রোদটা একটু চড়লে, গ্রীবায় রোদ পড়লে আরামে চোখ বুঁজে আসে —তখন ইচ্ছে করে আরেকবার ঘুমাই।

মালু মালির সঙ্গে ঘুরে ঘুরে গাছ-গাছালির তদারকি করি। বাড়ির সবুজ হাতার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে মনে হয় পৃথিবীতে এই একমাত্র জায়গা। এই গাছগুলি, এই পুরোনো, ধসে-পড়া টালির ছাদের ভাঙা বাড়ি, এই পাখিদের জমিদারী এইটুকুই একান্ত করে আমার। আমার ক্ষণকালের একার। এছাড়া আমার জীবনে নিজের বলতে কিছুই নেই; না কোনো জিনিস, না কোনো জন।

আমগাছগুলোর তলায় একটা দোলনা টাঙানো আছে। কখনো সখনো সেখানে গিয়ে বসি একা একা। এই দোলনায় যে যা যারা এসে বসলে আমি ভীষণ খুশি হতাম তারা কেউ আসে নি এখানে। হয়ত আসবেও না। তাদের ভাল লাগে না, জঙ্গল। ভালো লাগে না এই জংলী পরিবেশ, আরো বেশী করে ভালো লাগে না হয়ত আমার সঙ্গ।

দোলনায় বসে হল্যান্ড সাহেবের কাছ থেকে চেয়ে-আনা বাসি খবরের কাগজ পড়ছি, এমন সময় কুয়োতলার দিক থেকে কাদের যেন একটা গরু ঢুকলো হাতার মধ্যে।

ওদিকে মালু বেগুন আর টোমাটো লাগিয়েছিল। মালুকে ডাকতেই, মালু দৌড়ে গিয়ে তাড়িয়ে দিল গরুটাকে।

গরুটা কাঁটাতারের বেড়া পেরুনোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তারের পাশে একটি ছোট ছেলে এসে দাঁড়াল।

মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, চিরুনি ও তেল পড়েনি বহু বছর প্রায়—পরনে ছেঁড়া জামা—কোনো প্রমাণ সাইজের কালেপাশ্চি গুটিয়ে পরেছে। সমস্ত চেহারার মধ্যে এমন একটা রুক্ষতা যে কি বলব।

মালুকে শুধোলাম এ ছেলেটি কে?

মালু বলল, লাবু বাবু।

—লাবু বাবু কে?

লাবু বাবু ডাবু বাবুর ভাই।

মালুর উত্তরে কিছুই পরিষ্কার হলো না, বললাম, ডাকো ত লাবুবাবুকে।

প্রথমে লাবুবাবু আসতে চাইল না, শেষকালে যখন এসে আমার সামনে দাঁড়াল তখন দেখলাম তার দু চোখে ভয়ের ছায়া।

বয়স দশ-এগারো হবে, হাতে গরু তাড়াবার ছোট একটি লাঠি। নীচের ঠোঁটটি কেটে দু-ফাঁক হয়ে গেছে। রক্তাক্ত দেখাচ্ছে ঠোঁটটা। চোখ দুটো কটা কটা। সমস্ত শরীর এখানের প্রচণ্ড শীতে শীতার্ত।

শুধোলাম, তোমার নাম কি?

লাবু।

কোথায় থাক?

ঐখানে। কর্ণেল সাহেবের বাড়ির পাশে।

বাড়িতে কে কে আছেন?

মা, আর দাদা।

বাবা নেই?

না। বাবা অনেক দিন আগে মারা গেছেন।

লাবু ভাঙা ভাঙা বাংলা বলছিল। বাংলা শুনে মনে হয় না যে বাঙালি। লাবু বলল, ওর ভার গরু চরানো, গরমের সময় মহুয়াও কুড়োয়। ওদের অনেক জমি আছে। নিজেরা লাঙল দেয়, নিজেরাই গরু দোয়ায় চাষ করে। লাবুর দাদা ডাবু খিলারির স্কুলে পড়ে। লাবু চুরি করে একদিন আচার খেয়েছিল তাই তার দাদা তাকে শানবাঁধানো বারান্দায় আছাড় দিয়েছে ত তার ঠোঁট কেটে যায়। সেজন্যই তাই ঠোঁটখানির অমন বীভৎস অবস্থা।

লাবুকে শুধোলাম তুমি আসছিলে না কেন? তোমাকে যখন ডাকছিলাম?

লাবু স্বীকারোক্তি করল, গরু চুরি করে বলে আমি যদি মারধোর করি সেই ভয়ে ও আসতে চাইছিল না। গরুগুলো [illegible] খেয়ে দিলেও বিপদ হত।

লাবুকে বিস্কিট খাওয়ালাম। বললাম, তুমি কি কি খেতে ভালবাস?

ও বলল কিছু না। তারপর অনেক পীড়াপীড়ি করাতে বলল, ছোলার ডাল আর রসগোল্লা।

আমি হেসে বললাম, আচ্ছা তোমাকে আমি ছোলার ডাল আর রসগোল্লা খাওয়াব। লাবুকে বললাম, আমি তোমার দাদার মত। যখন ইচ্ছে করে চলে এসো, তোমার সঙ্গে গল্প করব, আমাকে ভয় পেও না বুঝলে?

লাবুর কথাটা বিশ্বাস হলো না। দুই ছেঁড়া পকেটে দু' হাত গুঁজে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, আসি, কেমন?

লাবু চলে যাওয়ার পর দুখনা মাহাতো কাকা বস্তী থেকে মাটির হাঁড়িতে দুধ নিয়ে এল। কার্নি মেমসাহেবের লোক এলো টিনের বাক্স মাথায় করে পাঁউরুটি আর খাস্তা বিস্কুট দিয়ে গেল। কসাই হানিফ; সব্জীওয়ালা রহমান এল। রহমান পাকদণ্ডী পথে এগারো মাইল পায়ে হেঁটে প্রতি সোমবার সংসের হাটে যায়, সেখান থেকে সব্জি কিনে বাঁকে করে ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জের বাড়ি বাড়ি সব্জী বিক্রী করে। ম্যাকক্লাস্কিতেও হাট বসে—শুক্রবারে, হেসালঙে।

হেসালঙ, লাপরা এবং কুক্কা এই তিনটি বস্তী নিয়ে ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ। আমি যে অঞ্চলে বাড়ি ভাড়া নিয়েছি সে অঞ্চলের নাম কুক্কা।

স্টেশান, বেশীর ভাগ দোকানপাট যেখানে সেদিকটার নাম লাপরা। আর খিলাড়ির দিকের রাস্তার গাঁয়ের নাম হেসালঙ।

হেসালঙের দিকটা ফাঁকা ফাঁকা—জঙ্গল ওদিকে গভীর নয়। লাপরার দিকে ত জঙ্গল নেই বললেই চলে।

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে লালমাটি ও পাথর ভরা যে অসমান পথটা চামার দিকে চলে গেছে সেই রাস্তার দু-পাশে লাল টালির ছাদওয়ালা সব বাংলো। এ বাড়িতে আসতে সেই কাঁচা রাস্তা ছেড়ে আরো ভিতরে ঢুকতে হয়।

চতুর্দিকে শাল সেগুনের জঙ্গল। আর পিটিস এবং নানারকম জংলী ফুল। এখানে এখন একরকম জংলী হলুদ ফুল হয়, সানফ্লাওয়ারের মত। বাড়ির পেছন-দিকটা সেই ফুলে ছেয়ে গেছে এখন। হাজার হাজার ফুল পাকদণ্ডী পথটার দু' পাশে ভরে আছে। চোখ চাইলে চোখে হলুদ নেশা ধরে।

পৃথিবীতে এখনো যে এমন জায়গা আছে, যেখানে স্টেশানে নেমে, নিজের হাতে করে যার যার বাড়ি হেঁটে যেতে হয়—সে ছ' মাইলই হোক কি চার মাইলই হোক, তা ভাবা যায় না। এখানে সে জন্যে কোনো ট্যাক্সি, রিকসা, গাড়ি অথবা ঘোড়া গাড়িও নেই।

লালি পেয়ারাতলায় বেতের চেয়ার-টেবল পেতে নাস্তা লাগিয়ে দিয়েছিল। নাস্তা শেষ করে বাড়ির পিছনটা ঘুরে দেখছি—ধনেপাতা আর কাঁচা লংকা লাগানো হয়েছে এদিকে—আদাও আছে—কুয়োতলার পাশে পাশে পুদিনার ঝাড় লেগেছে। ধান লাগাতে দেরী হয়ে গেছিল নীচু জমিতে—তাই ধান ভাল হয়নি এবার। বৃষ্টিও এবারে খুব কম হয়েছে। ধান কাটার সময়ও হয়ে এল।

কুয়োতলার পাশ দিয়ে পাহাড়ি নালাটা গেছে এঁকেবেঁকে। বাড়ির এই-ই সীমানা। বাড়ির তিন পাশ দিয়ে নালাটা ঘুরে গেছে।

আজ থেকে দশ বছর আগে এ নালা দিয়ে প্রতিরাতে বড় বাঘ যাওয়া-আসা করত।

এখনো হায়না যায়, গরমের দিনে মহুয়া-লোভী একলা ভালুক। আর চুপি চুপি আসে লমবীরা। পা টিপে টিপে আসে, পা টিপে টিপে শুকনো পাতা মচমচিয়ে পালিয়ে যায়। রাতে শুয়ে শুয়ে তাদের আসা-যাওয়ার শব্দ শুনি। কখনো কখনো নেকড়ে বাঘ আসে মুরগী ও ছাগল ধরতে। দেহাতীরা বলে 'রাতের বেলা এই নালা দিয়ে ভূতেরাও যাওয়া-আসা করে। নানারকম ভূত।

মাঝে লালির অসুখ করেছিল; একটি ছেলেকে পেয়েছিলাম রান্না করার জন্যে। তাকে শুতে বলা হয়েছিল রান্নাঘরে;—শীতের রাতে উনুনের গরমে আরামে শোবে বলে।

প্রথম দিন কাজ করল, তারপর প্রথম রাত পোয়ালে দেখি সে আর ওঠে না। সকাল আটটা বাজল, চা দেওয়ার নাম নেই। দরজা ধাক্কিয়ে তাকে জাগাতেই, সে কাঁদতে আরম্ভ করল, বলল, আমাকে এক্ষুনি ছুটি দিন বাবু, আমি এখানে এই জঙ্গলে কাজ করতে পারব না।

কি হয়েছে শুধোতে, সে বলল, সারা রাত ভূতেরা এই নালায় ধমর-ধামর করে শুকনো পাতায় নেচেছে, নানা রকম আওয়াজ করেছে, একশ টাকা মাইনে দিলেও সে এখানে চাকরী করবে না।

অতএব তাকে তক্ষুনি ছুটি দিতে হয়েছিল।

কুয়োর পাশে পাশে অনেকগুলো জংলী জাম এবং আমলকি গাছ গজিয়েছে। এক দল টিয়া এসে তাতে ঝাঁপাঝাঁপি করছে। আমলকির ডালে-বসা টিয়ার ঝাঁকের দিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় মালু বলল, বাবু খত্ আয়া।

মালু পোস্টাফিসে গেছিল খত আনতে। এখানে ডাক পিওন নেই। সকাল এগারোটায় যখন গাড়ি আসে আপ-ডাউনের, তখন প্রত্যেককে যেতে হয় পোস্টাফিসে।

পোস্টমাস্টার একে একে নাম পড়ে যান—যে যার চিঠি নিয়ে বাড়ি ফেরে। এখানের হাট এবং পোস্টাফিস হচ্ছে ক্লাবের মত—সকলের দেখা-হওয়ার জায়গা।

খামের চিঠি, হাতের লেখাটা দেখেই অবাক হলাম। অবাক নয়, বলা উচিত, উত্তেজিত হলাম। এ চিঠি এমন একজন লিখেছে যার কাছ থেকে চিঠি এলে আমার স্বাভাবিক কারণেই উত্তেজিত হবার কথা।

চেয়ারে বসে চিঠিটা খুললাম।

ছুটি লিখেছে। রাঁচী থেকে।

কাঁকে রোড, রাঁচী
১০।১২।৭২

সুকুদা,

আপনি নিশ্চয়ই আমার চিঠি পেয়ে অবাক হয়ে যাবেন, কিন্তু অবাক হওয়ার মত কিছু আছে বলে আমি ত জানি না।

বহু দিন হল আপনার কোনো চিঠি পাই না।

কিছু দিন আগে কোলকাতায় গেছিলাম।

অনেকদিন আপনাকে দেখিনি—তাই খুব দেখতে ইচ্ছে হওয়ায় সমস্ত ঝুঁকি নিয়েই আপনাদের কেয়াতলার বাড়িতে গেছিলাম। বৌদি ছিলেন না।

অবশ্য না-দেখা হয়ে ভালই হয়েছে, দেখা হলে আমি খুবই এমবারাসড্ ফিল করতাম। যে দোষে আমি দোষী নই, দোষী ছিলাম না কোনো দিনও, সেই দোষের জন্যে মনে মনে উনি আমাকে অনেক শাস্তি দিয়েছেন। অবশ্য একথাও জানি, যে সেই শাস্তির বোঝা বইতে হয়েছে আপনাকে, কখনো প্রতিবাদের সঙ্গে, কখনো বিনা প্রতিবাদে।

এমন অসুখ কি করে বাধিয়েছিলেন জানি না।

ভগবানের দয়ায় আপনার কোনো কিছুরই অভাব ছিলো না, নিজেকে সুখী করার সমস্ত রকম উপাদান আপনার মধ্যে ছিল, একজন পুরুষ মানুষ জীবনে যা চাইতে পারে তার সব কিছুই আপনি পেয়ে-ছিলেন, অথচ তবু সব জেনে-শুনে আপনি এমন নিজেকে নির্দয়ভাবে নিপীড়নের পথ বেছে নিলেন।

কার উপর অভিমানে আপনি এমন করে নিজের প্রতি অযত্ন করে এই অসুখ বাধালেন?

আপনার সঙ্গে দেখা হলে খুব ঝগড়া করব বলে দিলাম।

আপনাদের বাড়িতে শুনলাম আপনি আরো মাস ছয়েক ওখানে থাকবেন।

আপনার উপর কতখানি রাগ করে আছি তা আমার সঙ্গে দেখা হলে বুঝবেন।

পড়েছে। আজ আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবার পরই ঠাণ্ডার প্রকোপ বেড়েছে। কনকনে একটা হাওয়া বইছে উত্তর থেকে।

মান্দারের সাহেব ডাক্তার সকাল-বিকেল দুবেলা নিয়ম করে হাঁটতে বলেছেন। এখনো ওষুধ খাওয়ার বিরাম নেই। ঘড়ি ধরে এখনো নানা রকম ক্যাপসুল খেতে হচ্ছে। তার সঙ্গে একাধিক টনিক।

লোকে বলে, আজকাল যক্ষ্মা হলে কেউ মরে না। কথাটা হয়ত সত্যি, সময় মত ধরা পড়লে কেউ মরে না। কিন্তু প্রাণে না মরলেও যে প্রাণান্তকর পরিস্থিতিতে রোগীতে পড়তে হয় তা এ রোগের রোগী মাত্রই জানেন।

একটা লাংস আমার চিরদিনের মত অকেজো হয়ে গেছে। অন্যটা নিয়ে যতদিন বাঁচি ততদিন সাবধানে বাঁচতে হবে। এ ভাবে বাঁচার কোনো মানে নেই। আমি এমন কোনো লোক নই যে আমার বেঁচে থাকার জন্যে যে কোনো মূল্য দিয়ে বাঁচতে হবে। এমন কিছু মহৎ কর্ম আমার করণীয় নেই, আমি মরলে কোলকাতার ময়দানে আমার স্ট্যাচু হবে না, কেউই আমাকে মিস করবে না—তাই যেমনভাবে বাঁচতে চেয়েছিলাম তেমনভাবে বাঁচতে না পারলে আমার কাছে বেঁচে থাকাটা সম্পূর্ণ নিরর্থক।

বিকেলে ফুলস্লিভস সোয়েটার চাপিয়ে মাথায় গরম টুপী দিয়ে হাঁটতে বেরোচ্ছি, এমন সময় দেখি দূর থেকে প্যাট আসছে।

প্যাটের একটা পা নেই। থাইয়ের কাছ থেকে কাটা ডান পাটা। ও যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সিংগাপুরে ছিল তখন বোমার টুকরায় ওর পা জখম হয়েছিল।

প্যাটের বয়স হবে পঁয়তাল্লিশ। আমার চেয়ে অনেক বড়। কিন্তু দেখলে পঁয়ত্রিশ বলে মনে হয়। ক্রাচে ভর করে ও সারা ম্যাকলাস্কিক ঘুরে বেড়ায়। সমস্ত সময় মুখে হাসি লেগে আছে। প্যাট বিয়ে-থা করেনি। মিসেস ডাগানের বাড়ি ও দেখা-শোনা করে মাসে একশ টাকার বিনিময়ে।

ছোট শোবার ঘরটার দেওয়ালময় পিন-আপ ছবিতে মুড়ে রেখেছে। ও হেসে বলে, 'ইউ সী, আই ফিল ভেরী লোনলি ইন উইনটার নাইটস, দ্যাটস হোয়াই দে কীপ মি কোম্পানী, দে গিভ মি আ লিটল ওয়ার্মথ।'

প্যাট দূরে থেকে বলল, গুড আফটার-নুন মিঃ বোস।

আমি হেসে বললাম, গুড আফটার-নুন।

ও আবার আসতে আসতে বলল, গোয়িং ফর আ স্ট্রল?

আমি বললাম ইয়া।

ও বলল, 'কাম, আই উইল এ্যাকম্পানি ইউ।'

লালি এসে শুধোলো এখন দুধ খাব কিনা, না ল্যাংড়া লার্সকিনের সঙ্গে বেড়িয়ে এসে খাব।

আমি বললাম, বেড়িয়ে এসে খাব।

এখানের দেহাতীরা লোকের নাম-করণে বড় পটু কিন্তু বড় রূড। প্যাট লার্সকিনের যেহেতু একটি পা নেই ওকে এখানের সকলে বলে ল্যাংড়া লার্সকিন। হল্যান্ড সাহেব এদের উচ্চারণে হলান্ডুয়া।

এখানে যে সব বাঙালী আছেন স্থায়ী বাসিন্দা, তাঁদের মধ্যে একজন এক সময় মুরগী পোষার বৃথা চেষ্টা করেছিলেন। তাই তাঁর নাম মুরগী চ্যাটার্জি। চ্যাটার্জি এখানে অনেক। তাই বোধ হয় চ্যাটার্জিদের সনাক্তকরণের সুবিধার জন্যে এরা মুর্গী চ্যাটার্জি, আন্ডা চ্যাটার্জি (অপরাধ উনি ওঁর পোলট্রির ডিম বিক্রী করেন), শুয়োর চ্যাটার্জি (এঁর অপরাধ এঁর পিগারি ছিল) এবং ছাগল চ্যাটার্জি (এককালে নাতিকে দুধ খাওয়াবার জন্যে এক জোড়া ছাগল পুষেছিলেন তিনি) নামে এঁদের অভিহিত করে।

মুর্গীর খাঁচা বহু দিন শূন্য হয়ে গেছে, ছাগল নিয়ে গেছে হায়নাতে, শুয়োরের ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে বহুকাল, তবু ওঁদের এই বিকৃত নামগুলো থেকেই গেছে।

পথে কোনো দেহাতীকে শুধোলে কারো পুরো নাম বললে তার বাড়ি কেউ খুঁজে পাবেন না। যে নামে ওরা এঁদের প্রত্যেককে ডাকে সেই নামে না বললে ওরা বুঝতেই পারবে না কাকে আপনি খুঁজছেন।

জানি না, বেশী দিন থাকলে আমাকে ওরা কি বলবে।

এখানের লোকজন, অদ্ভুত প্রাগৈতি-হাসিক সব প্রথা, মধ্যযুগীয় আবহাওয়া এবং নীরব নিরবচ্ছিন্ন শান্তি সব মিলিয়ে বড় ভালোবেসে ফেলেছি এ জায়গাটা। এখানের সব কিছু আমার মনোমত। এই শান্ত ঢিলে-ঢালা জীবন, যেখানে একশ টাকা মাইনে-পাওয়া লোককে সবাই মিলিয়নীয়ার ভাবে, যেখানে জীবন ধারণের জন্যে প্রতি মুহূর্তে দৌড়াদৌড়ি নেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই, কনফারেন্স নেই, যেখানে পথ চলতে ডিজেলের ধোঁয়া বুকের মধ্যে অবধি নিষ্পাপ শিশুদের বিষাক্ত করে না, সেখানে চাওয়া অল্প, প্রাপ্তির আনন্দ অনেক এমনি জায়গায় কার না ভালো লাগে?

দুঃখের বিষয় এই যে এখানে চিরদিন থাকা যায় না। যে পরিবেশে, যেভাবে আমরা মানুষ, খ্যাতি, টাকা-পয়সা, প্রতিপত্তির ম্যারাথন দৌড়ে যাদের ছোটবেলা থেকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তাদের উঁচুগ্রামে বাঁধা মন ও শরীরের তার এখানে এলে ঢিলে হয়ে পড়ে। ভয় হয়, মরচে ধরে যাবে। আতঙ্ক হয়, এখানে বেশী দিন থাকলে কোলকাতায় ফিরে প্রতিদ্বন্দ্বীদের আর জয় করতে পারব না। তারা শিরস্ত্রাণ ছাড়াই তাদের তরোয়ালের এক এক কোপে আমাকে ক্ষত-বিক্ষত করে শেষ করে দেবে। তাই সুপ্রাচীন সভ্যতার অভিশাপে অভিশপ্ত আমি আবার এক সময় ফিরে যাব সেই ধূলিমলিন নোংরা আবহাওয়ায়, চোগা-চাপকান পরে কোর্টে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সওয়াল করব, মোটা অঙ্কের চেক পুরবো পকেটে এবং সলিসিটার এবং মক্কেলদের সঙ্গে বাঁধা বেড়ালের মত হেসে হেসে কথা বলব।

ইচ্ছে করুক কি না করুক।

আমার বাড়ির গেট ছাড়িয়ে পাদ্রী মুখার্জির বাড়ি ছাড়িয়ে হল্যান্ড সাহেবের বাড়ির সামনে দিয়ে এসে নালা পেরোলাম—তারপর মিস্টার রোজারিওর বাড়ি। সে বাড়ি পেরুতেই চামার দিকের লাল মা[illegible] অসমান, পাথর-ছড়ানো ধূলি-ধূ[illegible] রাস্তা।

একটু এগিয়ে যেতেই বাড়ি[illegible] পেছনে পড়ে রইল। বাঁদিকে শেষ [illegible] এ্যালেনের। ডানদিকে শেষ বা[illegible] কিং-এর। তারপর কোনো বা[illegible] সোজা ঘন জঙ্গলের মধ্যে [illegible] পথটা চলে গেছে ডুলির দি[illegible] একটি ফরেস্ট বাংলো আছে। [illegible] আরো মাইল দুয়েক গিয়ে রাম[illegible] এই কাঁচা রাস্তাটা চামা অবধি[illegible] মাইল মত—রাস্তা খুবই খা[illegible] হেঁটে যেতেও কষ্ট—এত পাথর [illegible] অসমান।

দু দিক থেকে তিতির [illegible] ক্রমাগত চিঁহা চিঁহা চিঁহা করে। [illegible] পাহাড়ের আড়ালে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। লাল বিধুর আভা ছড়িয়ে ছিল আকাশময়। একটা শুকনো ঠাণ্ডা ভাব উঠছিল চার-দিক থেকে। পিটিস ঝোপ থেকে ভেজা উগ্র গন্ধ বেরুচ্ছিল।

মাঝে মাঝে চষা জমি। কিন্তারি লাগিয়েছে, মকাই লাগিয়েছে, কোথাও বা মিষ্টি আলু। ঢালে ঢালে সর্ষে লেগেছে। হলুদ আঁচলে শেষ বেলার লাল লেগেছে।

তিতিরের চিৎকার ও দূরের কনী[illegible] ঘরে-ফেরা পাখির ক্ষীণ স্বর ছাড়া [illegible] কোনো শব্দ নেই কোথাও। প্যাটের ক্রা[illegible] শব্দ হচ্ছে শুধু পাথুরে পাটিতে। দূরে ঝোপে একদল ছাতারে ভীষণ চেঁচামেচি শুরু করেছে। একটু এগিয়ে যেতেই সে আওয়াজ মিলিয়ে গেল।

মনে হচ্ছে ঘাড়ের কাছে কার দুখানি ঠাণ্ডা হাত এসে চেপে বসেছে। রোদ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডাটা ঝুপ করে নেমে আসে, যেন মন্ত্রবলে। একটা পাহাড়ি বাজ উঁচু শিশুগাছের মগডালে বসে ডানা ঝাপটিয়ে দিনশেষের খবর জানালো।

প্যাট আস্তে আস্তে বলল, সেদিন রিডারস ডাইজেস্ট পড়ছিলাম একটা লেখা।

আমি বললাম, কি লেখা?

—সন্ধ্যে কেমন করে আসে। আমাদের সকলের সামনেই সন্ধ্যে হয় রোজ কিন্তু আমরা ক'জন সেদিকে চোখ তুলে তাকাই। দিনের শেষ এবং রাত্রের শুরুর মধ্যে এই যে গোধূলি লগন এই লগনকে আমরা ক'জন উপলব্ধি করি?

প্যাটের কথায় একটা চমক লাগল মনে। আর কেউ করুক আর না করুক, ভগবানের দিব্যি, আমি করি। জঙ্গল পাহাড়ের পরিবেশে সন্ধ্যালগ্নে দাঁড়িয়ে নাক ভরে আসন্ন হিমের রাত্রের গন্ধ নিতে নিতে, পশ্চিমাকাশের শেষ ফিকে গোলাপি রঙের আভার দিকে চোখ মেলে আমার বারে বার মনে হয় যে আমি যেন এখানেই জন্মে-ছিলুম কোনো কালে। মনে হয় প্রকৃতিই ...ার আসল মা, আমার আসল, প্রথম ...° সর্বশেষ প্রেমিকা। হয়ত অনেক নারী ...ছে চলে গেছে, অথবা আছে এখনো ...ার জীবনে, কিন্তু তারা সকলেই ...ংলী হলুদে সানফ্লাওয়ারের মত, বেগনে-রঙা ...পাতির মত, ঘুঘুর কবোষ্ণ বুকের ...। ...তারা এই প্রকৃতিরই টুকরো ...হাইনরি খণ্ড এবং প্রকৃতি তাদের ...সমেই মহৎ অবিভাজ্য।"

...মার্কসেরও আগে হাঁটছিল।

...সময় প্রথম প্যাটের সঙ্গে আলাপ ...মাদের ওর জন্যে সহানুভূতি হত, ...তেমন হত, কিন্তু আলাপ ঘনিষ্ঠ হবার ...ণের ...হ ও কারো সহানুভূতির অপেক্ষা ...নিক ইংরিজী চরিত্রের এই পুরুষালি ...ষণ ...ও পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে ...মা... পেয়েছে। ও শুঁড়িখানা থেকে ...টাকা বোতলের পচানী মদ কেনে, তারপর তাকে ওর স্পেশাল ট্রিটমেন্ট ট্রিট করে নেয়। একটি টিনের কৌটোয় এক চামচ চিনি ও দু দানা লবঙ্গ দিয়ে পুড়িয়ে নিয়ে চিনিটুকু তারপর বোতলে ঢেলে মিশিয়ে নিয়ে ঝাঁকিয়ে নেয় — তখন সেই সাদা তরলিমার রঙ বদলে গিয়ে ঘন বাদামী হয়ে যায়। দেখতে রামের মত মনে হয়। সেই নিজে-বানানো 'রাম' খায় মাঝে মধ্যে, হয়ত কখনো-সখনো একা একা গান গায় কোনো দেহাতী মেয়ের।

...ফিরতে ফিরতে অন্ধকার হয়ে গেল।

...শীতকালে জোনাকি জ্বলে না, সন্ধ্যা-তারাটা দপদপ করে দিগন্তে কোনো সুন্দরী মেয়ের কপালের নীল টিপের মত।

এখন আমরা কেউ কথা বলছি না।

অন্ধকারে প্যাটের কাচের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে শুধু। চারিদিকে শিশিরের ফিসফিসে স্তব্ধতায় ঝিঁঝিঁদের ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

ফেরার সময় প্যাট ওর বাড়িতে একটু বসে যেতে বলল। বাড়ি ওর নয়, মিসেস ডাগানের, কিন্তু এমন করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রেখেছে ও বাড়িটা, যে বোঝা যায় না এটা ওর বাড়ি নয়।

বাইরে এখন বসা যায় না, ভীষণ ঠাণ্ডা। আমরা ভিতরের ড্রইংরুমে এসে বসলাম।

প্যাট কফি খাওয়ার কথা বলল, আমি মানা করলাম। কারণ বাড়ি ফিরে আমায় দুধ খেতে হবে।

প্যাট নিজের জন্যে এক কাপ কফি বানিয়ে নিয়ে এল। কফি খেতে খেতে নানা রকম গল্প হতে লাগল।

হঠাৎ প্যাট বলল, আপনি ভূতে বিশ্বাস করেন মিস্টার বোস?

আমি বললাম, না। তুমি কর?

ও বলল, হাঁ। আমি করি।

আমি বললাম তুমি কি এখানের ভূতের কথা বলছ?

প্যাট বলল, এখানের ভূত আমি দেখি নি, তবে অন্য অনেকে দেখেছেন যাঁদের অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই আমার। তবে আমি নিজেই ভূত দেখেছি, নিজের জ্ঞানে, তাই বিশ্বাস করি।

আমি বললাম, কোথায় দেখেছ? বলো ত শুনি সে গল্প?

প্যাট একটু চুপ করে থাকল, তারপর যেন চোখের সামনে সেই ঘটনা দেখতে পাচ্ছে এমনভাবে বলতে আরম্ভ করল।

আমি তখন মেজর স্টার্লিং এর পার্সোনাল ড্রাইভার। সিঙ্গাপুর শহরের কাছেই একটা মিশনের বাড়ি রিকুইজিশান করে আমরা আছি। অফিসারদের কোয়ার্টার্স দোতলায়, আমরা অফিসারদের পার্সোনাল স্টাফ নীচে থাকি।

মনে আছে, গরমের দিন। আমি, মেজর সাহেবের অর্ডারলি এবং আরো তিন-চারজন বসে আমাদের ঘরে তাস খেলছি।

রাত আটটা হবে। সারা দিন গরমে জীপ চালিয়েছি, তাই চানটান করে বেশ আরাম লাগছে। আমি বসেছিলাম আমার ঘরের দেওয়ালের দিকে মুখ করে। কিন্তু মেজর সাহেবের অর্ডারলি আমার মুখো-মুখি বসেছিল। ওর মুখ খোলা বারান্দার দিকে।

বড় বড় থামওয়ালা খোলা বারান্দা। বারান্দার পর সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে নেমে মস্ত বাগান, গোলাপের ঝাড়, নানা রকম ফুলের ঝাড়।

খেলতে খেলতে হঠাৎ দেখলাম, আমার সঙ্গী তাসের দিকে চোখ না দিয়ে বারান্দায় চেয়ে কি যেন দেখছে। প্রথমে নজর করি নি। পরক্ষণেই আবার দেখলাম, ও বাইরে কি দেখছে।

আমি ওকে ধমক দিলাম, বললাম, খেলার ইচ্ছা না থাকলে খেলো না, এরকম করে খেলার কোনো মানে হয় না।

দেখলাম ওর মুখে রাজ্যের চিন্তা। একটু পর তাস নামিয়ে রেখে ও বলল, এখানে কোনো নান আছে?

আমি ওকে একটা ফৌজী গালাগালি দিয়ে বললাম, তুমি কি খোওয়াব দেখছ?

ও বলল, সত্যি বলছি, আমি দু-দুবার দেখলাম সাদা পোশাক-পরা একজন নান বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে।

আমি খুব হো হো করে হেসে উঠলাম, বললাম, চলো তোমার চাকরী খাচ্ছি। আর্মিতে কাজ করে ভূত দেখছ?

দেখলাম রসিকতা করায় ও আরো ঘাবড়ে গেলো। ও বলল, আমি তার থেকেও না যদি না আমাকে তোমার জায়গায় বসতে দাও।

আমি সঙ্গে সঙ্গে জায়গা বদল করলাম।

আবার খেলা শুরু হল। বেশ খেলছি। এক সিগারেটের প্যাকেট—হাতে জোকার তোলা পাড়ছি, হঠাৎ আমার কেমন গা ছম-ছম করে উঠল। আমার মনে হল কেউ আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তাসের কোণা থেকে চোখ উঠিয়ে বাইরে তাকাতেই দেখি থামের আড়ালে সাদা পোশাক-পরা একজন নান আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

খুব চেষ্টা করে আমি তাসে চোখ নামালাম। যেন কিছুই দেখি নি।

একটুক্ষণ পর আবার আমার ওরকম গা ছমছম করতে লাগল।

আবার চোখ তুলতেই দেখি সেই নান, তবে এবারে সামনের থামের কাছে, আমাদের বেশ কাছে।

আমি ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম। চিৎকার করার সঙ্গে সঙ্গে সেই মূর্তি মিলিয়ে গেল হাওয়ায়।

আমরা দুজনে পড়ি-কি-মরি করে মেজর সাহেবের দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিলাম।

মেজর সাহেব পাইপ মুখে দিয়ে চিঠি পড়ছিলেন, বেরিয়ে আসতেই আমরা দুজনে একসঙ্গে যা দেখেছি তা বললাম।

উনি কথা না বলে ঘরে ঢুকে ওঁর রিভলভার নিয়ে এসে আমাদের দেখলেন। বললেন আবার যদি এরকম কথা বল ত তোমাদের দুজনকেই আমি গ্রেপ্তার করব। আর যদি কখনো এমন বাজে কথা বল, তাহলে তোমাদের কোর্টমার্শাল করা হবে। এই বলে সার্জেন্ট মেজরকে ডেকে

সকালেও আমরা ঠিকঠাক করেছি কিনা পরীক্ষা করে দেখতে।

মেজর সাহেব মাইই বললেন, আমরা সকলে ড্রাইভার ও অর্ডারলি মিলে সেদিন এক ঘরে শুলাম।

তারপর তিন-চার দিন কোনো ঘটনা ঘটল না।

একদিন রাতে সার্জেণ্ট মেজর এক বিল্ডিং থেকে অন্য বিল্ডিং-এ যাচ্ছেন, উনি হঠাৎ সেই সাদা পোশাকের নানকে দেখতে পেলেন। বাকী পথটা দৌড়ে এসে উনি আমার ঘরে ঢুকে হাঁপাতে লাগলেন, নানকে কেমন দেখতে, কি পোশাকে আমি দেখেছিলাম জিগগেস করলেন। জিগগেস করলেন আমি যাকে দেখেছি সে লম্বা না বেঁটে। আমি বললাম খুব লম্বা, আমি তাকে খুব কাছ থেকে দেখেছি, তার মুখ চোখ সব স্পষ্ট দেখেছি—চমৎকার চোখ মুখ।

সার্জেণ্ট মেজর অনেকক্ষণ আমার বিছানায় বসে রইলেন। তার পর বললেন, তোমার বর্ণনার সংগে হুবহু মিলে যাচ্ছে।

এ ঘটনার কিছু দিন পর, এক শনিবার সিংগাপুরের কয়েকজন চাইনীজ মেয়েকে অফিসাররা নাচে নেমন্তন্ন করলেন। অনেক রাত অবধি নাচ, গান, হুইস্কি খাওয়া হল। তারপর মেয়েরা ঠিক করল তারা ভাগাভাগি করে অফিসারদের সংগে রাত কাটাবে। অত রাতে আর যাবে না।

আমার মেজর সাহেবের ভাগে দুজন মেয়ে পড়লো।

খেয়ে-দেয়ে আমরা সবাই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। আমার উপর ভার পড়লো শেষ রাতে ঐ দুজন মেয়েকে নিয়ে জীপে করে সিংগাপুরে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে।

চারটের সময় উঠে আমি মেজর সাহেবের ঘরে ধাক্কা দিলাম। ঐ ঘরে যারা ছিল তারা এবং অন্যান্যরা সকলে বেরিয়ে এল। আমি সকলকে নিয়ে ক্যাম্প থেকে সিংগাপুরের দিকে রওনা হয়ে গেলাম। তখনো প্রায় এক ঘণ্টা রাত ছিল।

আমি যাওয়ার পর মেজর সাহেব আবার শুয়েছেন এমন সময় তাঁর মনে হল, তাঁর কাঁধ ধরে কে যেন নাড়া দিল। তাঁর ঘরের মধ্যে। ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। উনি ধড়মড়িয়ে উঠে দেখেন তাঁর বিছানার পাশে একজন নান দাঁড়িয়ে।

মেজর সাহেব তাড়াতাড়ি তাঁর রিভলভার এবং টর্চের দিকে হাত বাড়ালেন। রিভলভারের ট্রিগারে হাত রেখে উনি শুধোলেন, তুমি কে, তুমি কি চাও?

নান কোনো কথা না বলে দরজার দিকে আঙুল দিয়ে দেখালেন।

মেজর সাহেব দরজার ছিটকিনি খুললেন, ডান হাতে রিভলভার ধরে।

ঘরের বাইরে এসে নান ইসারায় মেজর সাহেবকে তার পেছনে আসতে বললেন। মেজর সাহেব টর্চ জ্বালিয়ে তাঁর পেছন পেছন বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে বাগানে নামলেন। বাগানের এক কোণায় এসে নান দাঁড়িয়ে পড়লেন, পড়ে একটা কাঁটা ঝোপের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালেন।

মেজর সাহেব শুধোলেন কি আছে? ওখানে কি আছে?

নান উত্তর না দিয়ে আবার ঐ দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে হঠাৎ অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন।

আমি সিঙ্গাপুর থেকে ফিরে এসে দেখি ক্যাম্পে হুলুস্থুল ব্যাপার। চার ট্রাক বোঝাই করে সোলজার নিয়ে মেজর সাহেব সিংগাপুর শহরের অন্য সীমানায় চলেছেন মিশনের নতুন বাড়িতে, যেখানে এই রিকুইজিশান করা বাড়ির সব নানরা এখন থাকেন।

মেজর সাহেবের গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলাম আমি। নানের চেহারার বর্ণনা আমার এবং মেজর সাহেবের দেখা নানের সঙ্গে হুবহু মিলে গেল। সেই নানের বাঁ গালে একটা বড় বিউটি স্পট ছিল।

ঐ বাড়িতে পৌঁছে সমস্ত বাড়ি সোলজাররা ঘিরে ফেলল।

মেজর সাহেব মাদার সুপিরিয়রের সংগে দেখা করে জিগেস করলেন এই মিশনের কোনো নান কাল রাতে বাইরে গেছিলেন কিনা?

মাদার সুপিরিয়র ভুরু কুঁচকে বললেন, হাউ ডু উ মীন?

তারপর মেজর সাহেব বললেন, এখানের সমস্ত নানকে ডেকে লাইন করে দাঁড় করান, আমরা সকলকে দেখতে চাই, কেউ যেন বাকী না থাকে।

সমস্ত নান জড়ো হতে প্রায় আধ ঘণ্টা লাগল, কেউ বাথরুমে ছিলেন, কেউ অন্য কাজ করছিলেন।

সকলে জড়ো হলে মেজর সাহেব, সার্জেণ্ট মেজর, কর্ণেল সাহেবের অর্ডারলি এবং আমি প্রত্যেককে কাছ থেকে ভাল করে দেখলাম। কারো চেহারার সংগেই আমরা যাকে দেখেছি, তার চেহারা মিলল না।

তারপর মেজর সাহেব বললেন, আমরা বাড়ি সার্চ করব।

মাদার বিরক্ত হয়ে রাজী হলেন।

বারান্দা পেরিয়ে আমরা যেই বড় হলঘরে ঢুকেছি অমনি আমরা সকলে একসঙ্গে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেওয়ালের মাঝখানে টাঙানো ছিল একজন নানের বড় ফোটো—যাঁকে আমরা সকলে এ কদিন ধরে দেখছি।

মেজর সাহেব ঘুরে দাঁড়িয়ে মাদার সুপিরিয়রকে শুধোলেন, ইনি কোথায়? এঁকেত দেখলাম না।

মাদার সুপিরিয়র বললেন যে, যে মিশনের বাড়িতে আমরা এখন আছি সেই বাড়ির মাদার সুপিরিয়র ছিলেন উনি। আজ তিন বছর হলো মারা গেছেন।

আমরা সকলে মুখ চাওয়া চায়ি করবার পর মেজর সাহেব মাদার সুপিরিয়রকে সব কথা খুলে বললেন। সব শুনে উনি বললেন, যে-কাঁটা-ঝোপের দিকে উনি আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিলেন সেখানে আমাকে আপনাদের সঙ্গে নিয়ে চলুন। ওখানে মাটি খুঁড়লে নিশ্চয় কিছু পাওয়া যাবে।

ওঁকে নিয়ে মেজর সাহেব এবং অন্যান্য সকলে তখুনি ফিরে গেলাম আমাদের ক্যাম্পে। পৌঁছন মাত্রই জায়গাটা সাবধানে খোঁড়া আরম্ভ হল। অনেকখানি খোঁড়ার পর দেখা গেল মাদার মেরীর এক পাথরের মূর্তি উল্টো করে মাটিতে পোঁতা আছে। মুখ নীচের দিকে, পা উপরে।

মেজর সাহেব তক্ষুনি সেই মূর্তি মাদারের হাতে দিয়ে দিলেন।

সেদিন থেকে আমাদের [illegible] আর কখনো সেই নানকে [illegible] যতদিন আমরা সিংগাপুরে [illegible]

এই অবধি বলে, এক[illegible] দাঁড়িয়ে প্যাট বলল, আপনি নিজের বলবেন যে আমি ভূত দেখিনি[illegible]

আমি কিছু বললাম না। [illegible] প্যাটকে অবিশ্বাস করার কো[illegible] খুঁজে পেলাম না।

একটু পরে উঠে বললাম [illegible] আমার অনেক ভুয়াইপুর যেতে হবে।

প্যাটের বাড়ি থেকে বেরিয়েই [illegible] কতখানি অন্ধকার তা ঠাহর হল।

পঞ্চমীর বেঁকা চাঁদ উঠেছে। চতুর্দিকের অন্ধকার বন পাহাড়ে ঝিঁঝিঁরা ঝুমঝুম করে বাজছে।

প্যাট বলল, তোমাকে কি টর্চ দিয়ে এগিয়ে দেব মিস্টার বোস?

আমি বললাম, না। ঠিক আছে তোমাকে আবার একা ফিরে আসতে হবে।

প্যাটের বাড়ি থেকে রাস্তায় নামলাম অন্ধকার হলেও কাঁচা মাটির পথ দেখা যায়।

ঠাণ্ডায় হাত সেঁধিয়ে যাচ্ছে। প্যান্টের দু' পকেটে দু' হাত ঢুকিয়ে আস্তে আস্তে আমার বাড়ির দিকে এগোতে লাগলাম অন্ধকারে। কাছেই কোনো পিপুল গাছের মগডাল থেকে একটা হুতুম পেঁচা ডেকে উঠল, দুরগুম, দুরগুম, দুরগুম—।

বুকের মধ্যেটা কেমন বিনা কারণে ছমছম করে উঠল।

(ক্রমশঃ)

জার্মান মনীষা

বাংলা ভাষায় আজ পর্যন্ত কার্ল মার্কসের একখানি প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থ পাওয়া যায় না। অথচ একালের শিক্ষিত বাঙালীমাত্রেই কার্ল মার্কসের সঙ্গে কোনো না কোনো সূত্রে পরিচিত।

সম্প্রতি জার্মান লেখক হাইনরিখ গেমকোভ মূল জার্মান ভাষায় 'কার্ল মার্কস—আইনে বিওগ্রাফী' নামে কার্ল মার্কসের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনকথা রচনা করেন। গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন জার্মান সোস্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মার্কসবাদ - লেনিনবাদ ইনস্টিট্যুট। এই গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ থেকে বঙ্গ-ভাষায় রূপান্তরিত করেছেন অমল দাশগুপ্ত।

হাইনরিখ গেমকোভ এই গ্রন্থের ভূমিকায় যথার্থই মন্তব্য করেছেন 'কার্ল মার্কস অবিভাজ্য।" জার্মানীতে জন্মগ্রহণ করলেও মার্কসের দর্শনের সুমহান উত্তরাধিকারে সমগ্র বিশ্ব সমৃদ্ধ। মার্কসের জন্মভূমির মানুষের কাছে তিনি যেমন গর্বের, তেমনই বিস্ময়ের বস্তু তিনি পৃথিবীর মানুষের কাছে। মার্কস ও এঙ্গেলসের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আজো শেষ হয়নি।

মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের এই তত্ত্ব রচনায় যে ভিত্তিতে দাঁড়িয়েছিলেন এই গ্রন্থলেখকের মতে 'তা হচ্ছে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানের সর্বশেষ অনুসন্ধান'। অবশ্য এই মন্তব্যের সঙ্গে একমত হওয়া কঠিন, কারণ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বশেষ অনুসন্ধান বলে কোনোরকম চূড়ান্ত রিপোর্ট দেওয়া সম্ভব নয়। বিজ্ঞান নিত্যনূতন উদ্ভাবনী দ্বারা চমক সৃষ্টি করে, তবে একথা সত্য যে মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের অনন্যসাধারণ প্রতিভার প্রভাবে যে ধ্যান-ধারণার বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করেছেন আজো তা অপরিবর্তিত। নূতন সূত্র সংযোজিত হয়নি, নতুন কোনো চিন্তায় তাকে অতিক্রম করার মত তত্ত্ব আজো রচিত হয়নি। অবশ্য মার্কসবাদের বিশ্লেষণসূত্রে কোনো কোনো তাত্ত্বিক নূতন কথা বলেছেন বা নতুন চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন।

গেমকোভ ভূমিকায় বলেছেন : 'মার্কসবাদ বিশ্বজনীন—কেননা মার্কসবাদই প্রথম স্বীকার করেছিল যে উন্নত দেশগুলির বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলন ও ঔপনিবেশগুলির জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের একই স্বার্থ ও একই শত্রু—বুর্জোয়ারা।'

মার্কসবাদ বিশ্বজনীন, কারণ পুঁজিবাদকে উৎখাত করতে ও সমাজতন্ত্রকে কায়েম করতে হবে বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীকে এবং তাদের সেই দায়িত্বপালনে সহায়ক হল মার্কসীয় দর্শনের সূত্রগুলি। পৃথিবীর সর্বত্র বুভুক্ষার আকৃতি একই রকমের তাই লক্ষ্যভেদ করতে প্রয়োজন আন্তর্জাতিক সংহতির। গেমকোভ আরও বলেছেন :

'মার্কস তাঁর জীবনের মধ্যে দিয়ে এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ সত্যটি তুলে ধরেছিলেন যে প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদ এবং প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক দেশপ্রেম পরস্পর-বিরোধী নয় বরং একই মুদ্রার দুই বিপরীত দিক—'

মার্কসের জীবন তাই একটি ইতিহাস। তাঁর 'টিচিংস' বা উপদেশাবলী বিশ্বজনীন ও আন্তর্জাতিক যেমন বিশ্বজনীন তাঁর সমগ্র জীবনের কর্মকান্ড। এইসব কারণে মার্কসের জীবনকথা এক অবিস্মরণীয় দলিল।

মার্কস ও তাঁর বন্ধু এঙ্গেলস যে তত্ত্ব রচনা করেছেন তার ব্যবহারিক প্রয়োগ করে পরীক্ষা করেছেন ভ্লাদিমির লেনিন। পৃথিবীর রূপান্তর ঘটিয়েছে মার্কসীয় দর্শন। তাই মার্কস এ কালের এক মহান মনীষী। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিকশিত হয়ে উঠেছে এবং বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ তা থেকে প্রেরণা গ্রহণ করছে। আলোচ্য গ্রন্থ থেকে মার্কসের জীবন ও কর্ম বিষয়ে অনেক তথ্য পাওয়া যাবে এবং হয়ত একথা বলা অন্যায় হবে না যে মার্কসবাদ বিচারে এই গ্রন্থ সহায়ক হবে।

এই গ্রন্থ শুরু হয়েছে মার্কসের শৈশবের আলয় থেকে। তারপর ছাত্রজীবন, চব্বিশ বছর বয়সেই বিতর্কের মুখে পড়ে শেষপর্যন্ত পত্রিকার মুখ্য সম্পাদক পদলাভ। প্যারিসে বিপ্লবের কেন্দ্র নতুন বন্ধু লাভ এবং কমিউনিস্ট লীগ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ঘটনাবহুল কাহিনীগুলি চিত্তাকর্ষক। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে মার্কসের জন্মকাল থেকে চব্বিশ বছর বয়সের বৃত্তান্ত নিয়ে প্রথম অধ্যায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে প্যারিস আর বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের উদ্ভব এবং সেই অধ্যায় শেষ হয়েছে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে। তৃতীয় অধ্যায় ও চতুর্থ অধ্যায় মার্কসের ঘটনাবহুল জীবনের স্মরণীয় পরিচ্ছেদ।

ব্যক্তিগত জীবনে মার্কস অনেক দুঃখ পেয়েছেন। অনেকগুলি সন্তানের অকালে মৃত্যু হয়েছে এবং তাঁর দেহাবসানের মাত্র দুই মাস আগে তাঁর প্রিয়কন্যার মৃত্যু হয়। ইংলন্ডে প্রায় নির্বাসিতের মত অতিকষ্টে তাঁকে দিনযাপন করতে হয়েছে তথাপি তিনি তাঁর দুর্দমনীয় মতবাদ বিষয়ে কাজ করেছেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী শ্রমিক পার্টির তত্ত্বগত ভূমিকার সূত্র রচনা করেছেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি বিভিন্ন দেশে পর্যটন করেছেন নিজের মতবাদের প্রচারের প্রয়োজনে।

এই গ্রন্থটির স্বচ্ছন্দ বাংলা অনুবাদ করেছেন অমল দাশগুপ্ত অতিশয় কৃতিত্বের সঙ্গে। এই জাতীয় গ্রন্থ অনুবাদ করা সহজ ব্যাপার নয়। প্রচুর পরিশ্রম ও পান্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন অমল দাশগুপ্ত এই অনুবাদকর্মে।

পরিশেষে প্রদত্ত ঘটনাপঞ্জী ও উল্লিখিত রচনাবলী নামক দুটি অধ্যায় মূল্যবান।

গ্রন্থটির মুদ্রণ পারিপাট্য বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। চিত্রগুলি সুমুদ্রিত!

জার্মান মনীষার সঙ্গে ভারতবর্ষের পরিচয় দীর্ঘদিনের। জার্মান সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালী পাঠক সমাজের পরিচয় অল্পবিস্তর আছে, কিন্তু 'জার্মান সাহিত্যের দূরায়ত পাঠ' নামক গ্রন্থে যেভাবে মধ্যযুগে জার্মান সাহিত্যের গোড়া থেকে শুরু করে একেবারে বর্তমান কাল অর্থাৎ বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সাহিত্য ও সাহিত্যিকের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে তার সঙ্গে পূর্বে সামান্য বাঙালী পাঠকের পরিচয় আছে। 'ক্ল্যাসিক্যাল রিডিংস ফ্রম জার্মান লিটারেচার' নামক গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করেছেন ডঃ সুনীল রায়। এই গ্রন্থটির মূল সংকলনের সংকলক—উলফগ্যাং ল্যাঙেনবুখার।

এই গ্রন্থের মুখবন্ধ রচনা করেছেন লেখক ডাউস্যেনবাখ। তিনি পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন—

গত দেড় হাজার বছর ধরে জার্মান চিন্তাধারায় ও সৃজনশীল রচনার যে প্রসার ঘটেছে এই গ্রন্থে তার পরিপূর্ণভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এ বই সাহিত্যের তথ্যগত ইতিহাস নয়। পাঠকেরা যাতে মূল রচনার মাধুর্যের স্বাদ কিংবা উপলব্ধি অনুবাদের মধ্য দিয়ে জার্মান সাহিত্যের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হতে পারেন তার চেষ্টাই এখানে করা হয়েছে।'

এই গ্রন্থের প্রথম অংশে ৭০০ থেকে ১৭০০ খৃষ্টাব্দের জার্মান সাহিত্যের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে সংস্কারমুক্তি বিষয়ক সাহিত্যের আলোচনা আছে। এই জাতীয় সাহিত্য চিরায়ত সাহিত্যের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তৃতীয় ভাগ গ্যয়টের যুগ, এইভাগে ক্ল্যাসিসিজম ও রোমান্টিসিজম প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা আছে। চতুর্থ ও পঞ্চম ভাগে আছে উনিশ ও বিশ শতকের সাহিত্যালোচনা। এই উভয় দশকের কাব্যের গতিপ্রকৃতির পার্থক্য ও প্রকাশভঙ্গির পরিবর্তন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রত্যেক যুগের কথা শুরু করার পূর্বে সেই বিশেষ যুগটির বৈশিষ্ট্য যথাযথভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য উপক্রমণিকায় সমগ্র বিষয়টি বিস্তারিত করে বলা হয়েছে। লেখক এবং তাঁদের রচনা বিষয়ে বিশ্লেষণী বিবরণ দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থটিতে জার্মান সাহিত্যের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস পাওয়া যাবে।

৭০০—১৭০০ খৃষ্টাব্দের অধ্যায়টিতে মার্টিন লুথার হানস যেকব ক্রিস্টোফেল ফন গ্রিমেলসহাউসেন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। ১৭০০—১৭৯০ খৃষ্টাব্দে গটথোলড ইফ্রাইম লেসিং, জর্জ ক্রিসটফ লিসটেনবের্গ খৃষ্টীয় ফ্রিডরিখ, এ্যাডলফ ফ্রেইহের হন ক্নিগ, জোহান গটফ্রায়েড হারডার ও ইমানুয়েল কান্ট বিষয়ে আলোচনা আছে। ১৭৭০-১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ফ্রিডরিখ ম্যাকসিমিলিয়ান ক্লিংগার, হাইনরিখ লিওপোল্ড ভাগনার, জোহান ভলফগ্যাং ফন গ্যয়টে, শীলার, জর্জ ফরস্টার, জোহান পাউল, নোভালিস, হাইনরিখ ফন ক্লাইসট, মরিটৎস, জোসেফ ফন আইকেন ডরফ ও লুডভিগ উলবেট বিষয়ে আলোচনা আছে। উনবিংশ শতক ও বিংশ শতক দুটি জার্মান সাহিত্যের ইতিহাসের দুটি গৌরবময় অধ্যায়। এই কালে জার্মান সাহিত্যের বহু মনীষী লেখকের উদ্ভব হয়েছে এবং জার্মান সাহিত্য বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। সেই পর্বের বিস্তারিত বিবরণ এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

এই গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য এই যে প্রতিটি লেখকের উল্লেখযোগ্য রচনার নমুনা দেওয়া হয়েছে। এই নমুনা অংশ বাংলায় অনুবাদ করা সহজ কর্ম নয়, মূলের ভাব অক্ষুন্ন রেখে অনুবাদক ডঃ সুশীল রায় সে দায়িত্ব কৃতিত্বের সঙ্গে পালন করেছেন। কবিতাংশ গুলির বঙ্গানুবাদ রসোত্তীর্ণ। পাঁচশতাধিক পৃষ্ঠার এই সুবৃহৎ গ্রন্থটি সমৃদ্ধিত এবং চিত্রশোভিত। —অভয়ংকর

---

(১) কার্ল মার্কস (জীবনী) রচনা : হাইনরিখ গেমকোভ। অনুবাদ : অমল দাশগুপ্ত। প্রকাশক : লেখাপড়া। কলকাতা-১২। দাম : বারো টাকা মাত্র।

(২) জার্মান সাহিত্যের চিরায়ত পাঠ— রচনা : ভলফগ্যাঙভাগেনবুচার। অনুবাদ : ডঃ সুশীল রায়। প্রকাশক : এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিমিটেড। কলিকাতা-১২। দাম : বারো টাকা মাত্র।

সাহিত্যের খবর

এবার সাংবাদিকের ভূমিকা

মাত্র একটি নাম। আর তা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ভেসে ওঠে প্রজ্ঞার আকাশ ভাবের গভীরতা। নানা চিন্তাভাবনার সোনালি ফসল। হ্যাঁ, মাত্র একটি নাম। বিতর্কিত, অথচ এড়িয়ে যাবার নয়। এ নাম এক দার্শনিকের, সাহিত্যিকের। এক নিঃসঙ্গ বিবেকের, রাজনীতিকের। আর সে নাম হল জাঁ পল সার্ত্রে।

এবার তাঁকে দেখা যাবে এক নূতন ভূমিকায়। পাদপ্রদীপের আলোয় আসছেন এবার সাংবাদিক হিসেবে। বের করছেন একটি দৈনিক পত্রিকা। বাংলায় তর্জমা করলে নাম দাঁড়ায় 'স্বাধীনতা'। প্রথম সংখ্যাটি বেরুচ্ছে ৫ ফেব্রুয়ারী।

এবং এ উপলক্ষ প্যারিসে বসেছিল সাংবাদিক সম্মেলন। সেখানেই জানালেন কেমন হবে তাঁর পত্রিকার চরিত্রটি। বললেন, পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলীতে থাকছেন শুধু বামপন্থীরাই। তবে বামমার্গী কোন গোষ্ঠীচক্রের মুখপত্র হচ্ছে না 'স্বাধীনতা'। বললেন তিনি 'আমি থাকবো একজন সাধারণ কর্মী হিসেবেই। তবে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে নতুনভাবে কিছু দেওয়ার জন্যে আমাদের এই প্রচেষ্টা।' তাঁর মতে সাংবাদিকতা ও প্রকাশনীর ক্ষেত্রে চলছে এখন দারুণ সংকট। নিঃসন্দেহেই দুর্দিন।

এক প্রশ্নের উত্তরে এই বিতর্কিত সাহিত্যিক - দার্শনিক জানান, 'স্বাধীনতা? হ্যাঁ ঐ শব্দটার মানে বলতে শুধু সাংবাদিকদের অধিকারই বোঝায় না, পাঠকদের স্বাধীনতাই হলো প্রচার-মাধ্যমের আসল স্বাধীনতা। জনগণের সাহায্যেই সাধারণ মানুষের কাছে বিভিন্ন তথ্য পৌঁছে দিতে হবে।' অন্য এক জিজ্ঞাসার জবাবে বলেন যে জনগণের সাহায্যেই পরিচালিত হবে তাঁর পত্রিকা। তাঁর মতে জনগণ তাদের টাকা-পয়সা দেবেন, খবর সরবরাহ করবেন, এবং তদারক করবেন তাঁদের কাজকর্মও।

নিঃসঙ্গ বিদায়

মানুষটি মারা গেলেন। ভোরবেলার নিঃশব্দ শিশির ঝরার মতোই চলে গেলেন তিনি। নব্বুই বছর পূর্ণ হওয়ার ঠিক এক মাস আগেই নিলেন বিদায়। পৃথিবীকে শেষ নমস্কার জানালেন সমকালীন ইংরেজি সাহিত্যের এক স্মরণীয় কন্ঠস্বর। স্যার কম্পটন ম্যাকেঞ্জির মৃত্যু ঘটেছে সম্প্রতি।

না, শুধু ঔপন্যাসিক হিসেবেই তাঁর খ্যাতি বিশ্বজোড়া ছিল না। এযাবৎ প্রকাশিত যাঁর প্রায় একশো বইয়ের মধ্যে রয়েছে উপন্যাস ছাড়াও কবিতা, নাটক, গল্প, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, জীবনীগ্রন্থ, ইতিহাসবিষয়ক আলোচনা, বেতার ও টেলিভিশন থেকে প্রচারিত কথিকা। তিনি ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের একজন দক্ষ সমালোচক।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে ম্যাকেঞ্জির আবির্ভাব প্রথম নাট্যকার হিসাবে। সেটা ১৯০৬ সাল। বেরুলো 'দ্য জেন্টলম্যান ইন গ্রে'। এর ঠিক এক বছরের মাথায় বেরুলো একটি কাব্যগ্রন্থ। কিন্তু কারো নজরে পড়লেন না তিনি কোন সমালোচকই তাঁকে তেমনভাবে তুলে ধরলেন না লোকচক্ষুর সামনে। শেষপর্যন্ত কিছুটা ক্ষোভ, কিছুটা বেদনায় ভাবলেন তিনি পথ বদলাবেন। পরিবর্তনও করলেন। কয়েক বছরের মধ্যেই বেরুলো 'দ্য প্যাশোনেট ইলোপমেন্ট'। এবার নজর কড়লেন বিদগ্ধ পাঠক ও সাহিত্য-সমালোচকদের। কিন্তু এই উপন্যাসের পান্ডুলিপিটিও চোদ্দটি প্রকাশকের টেবিল থেকে এসেছিল ঘুরে। তবে ব্রিটেনের অন্যতম জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক হিসেবে খ্যাতি পান দ্বিতীয় উপন্যাস প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। বেরুলো 'কার্নিভ্যাল'। সাধু, সাধু রব পড়ে গেল। বিক্রি হল লক্ষ লক্ষ কপি। এরপরই বেরুলো 'সিনিস্টার স্ট্রিট'। অনেকটা আত্মচরিতমূলক উপন্যাস। হেনরী জেমস-ই হলেন সেই খ্যাতিমান পুরুষ যাঁর সাহায্যে এই উপন্যাসটি শেষ পর্যন্ত ছাপার অক্ষরের মুখ দেখে। বলাই বাহুল্য, এই রচনাটি সেকালে পাঠকমহলে তোলে দারুণ ঝড়। এর কয়েক বছরের মধ্যেই যুদ্ধের হাওয়া লাগল ইউরোপে। স্যার কম্পটন ম্যাকেঞ্জি রাজকীয় নৌবাহিনীতে যোগ দিলেন। ১৯১৫-তে পেলেন কমিশন। এই সময়কার অভিজ্ঞতার ফসল 'গ্যালিপোলি মেমোরিজ'। তাঁর 'দ্য ফোর উইন্ডস অব লাভ' হলো উঁচুদরের আত্মজীবনীমূলক সাহিত্যোপন্টি। অবশ্য স্যার কম্পটন ম্যাকেঞ্জির সত্যিকারের আত্মচরিত 'মাই লাইফ অ্যান্ড টাইমস'-এর প্রথম খন্ড বেরোয় এই তো সেদিন, ১৯৬৩-তে। আর সর্বশেষ খন্ড প্রকাশিত হয় ১৯৭১-এ। ম্যাকেঞ্জির অন্যান্য বিখ্যাত রচনার মধ্যে 'রকেটস গ্যালোর', 'অন মর‍্যাল কারেজ', 'হুইস্কি গ্যালোর' উল্লেখযোগ্য। শেষ রচনাটি রুপালি পর্দায় একসময় চিত্রায়িত হয়। খ্যাতকীর্তি এই মানুষটির মৃত্যুসংবাদ ছাপতে গিয়ে দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ লেখেন, 'আমাদের বর্তমান সময়ের সবচেয়ে উজ্জ্বল, বহুমুখী ও সুপ্রতিষ্ঠিতসম্পন্ন লেখকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।'

দিনেশ দাসের শ্রেষ্ঠ কবিতা। ভারবি। ...টাকা।

১৯৩৭-৩৮ সালে শ্রীযুক্ত দিনেশ দাস ...ংলা কবিতার আসরে কখনো প্রকৃতির ...ন্দর্যচেতনা, কখনো বা নিপীড়িত ...নুষের যন্ত্রণাবোধ পরিবেশন করে ...রন। 'সবুজ দ্বীপ', 'প্রথম চুম্বন', ...ৌমাছি', 'কপোতাক্ষ' প্রভৃতি সেই পর্বের ...না। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়-সংবেদনের ভাষারূপ ...িটতে তাঁর কবিমনের উৎসাহ ছিল সেই ...পর্বেই,—সে উৎসাহ তাঁর কবি-...নের পরবর্তী অধ্যায়গুলির মধ্য দিয়ে ...া বিচিত্র বিষয়বস্তুতে স্পন্দিত হয়েছে। ...ত জীবনের অভিজ্ঞতাগুণে তিনি ...মনের অন্তর্দৃষ্টির প্রসঙ্গে তাঁর 'কবি-...ীষী', 'অদৃশ্য কবিতার পাখি' ইত্যাদি ...বিতায় যেভাবে দেখাতে চেয়েছেন তাতে ...ার প্রতি শ্রদ্ধা এবং জীবনের অমেয় ...। সম্বন্ধে বিষণ্ণতা দুইই বিদ্যমান।

...ট 'ভূমিকায়' তিনি এই সংকলনে তাঁর ...ক্ষিপ্ত আত্মজীবনী দিয়েছেন এবং তারই ...র উপলব্ধির একটি সূত্র স্পষ্টভাবে ...য়েছে—'পৃথিবীর অর্থ নেই, মূল্য ...আত্মা নেই। সমাজের শরীর অতৃপ্ত, অশান্ত, বিবেক সন্দিগ্ধ, মনে হয় ...দনা ও কান্না আকাশে-বাতাসে সর্বত্র ...।'

...ে অশান্তি সত্ত্বেও,—জীবনের বহু-...-অসুখে ভুগতে-ভুগতেও, তাঁর কবি-...ন জীবনানন্দের মতন ভাষায় এক ...য়গায় ('অসুখে') বলেছে—

> তবু একদিন শুনি ভোরের পাখির ডাকঃ
> সবুজ তারার গুঁড়ো ঝুরঝুর ঝরে পড়ে
> বিস্ময়ে অবাক,
> দেখি দূরে, উন্মাদ পায়ের গোছ টকটকে
> লাল—
> জীবন্ত হ্রদের মত টলটলে আশ্চর্য
> সকাল।

> অদৃশ্য জলের শাখা হতে জল ঝরে
> জীবনের সোনার নির্ঝরে,
> মানুষ জীবন্মৃত বিবর্ণ মৃন্ময় ঃ
> আকাশের উপরে আকাশ, সময়ের উপরে
> সময়।

'কাস্তে' কবিতাটি যখন প্রথম বেরোয়, তিরিশের দশকের সেই শেষ প্রহর থেকেই দিনেশ দাসের প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত ঘটেছিল, কিন্তু তাঁর নিজস্ব বোধ কোনো রাজনৈতিক মতবাদে বা আন্দোলনের উত্তেজনার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত নয়। তিনি জীবন-সত্য নামক সেই দুর্জ্ঞেয় ধারণার আশ্রয় খুঁজেছেন—যা ছড়িয়ে আছে নানা শব্দে, নানা ঘটনায়, জীবনব্যাপী অনুভূতির স্তরে স্তরে। 'কাব্যচিন্তা'র অন্তর্ভুক্ত 'জীবনের মানে' নামে চার ছত্রের একটি উক্তিতে তিনি জানিয়েছেন—

> জীবনের নীতি খোঁজে শিক্ষকেরা ঠিক,
> তত্ত্ব খুঁজে বের করে প্রৌঢ় দার্শনিক।
> জীবনের মানে কিছু আছে কি না আছে
> কবি, শিল্পী খোঁজ করে দিশা
> পায় না যে।

তিনি মূলতঃ বিষাদের পথিক, কিন্তু তাঁর লক্ষ্য আনন্দের দিকে এবং মাঝে মাঝে কবি দিনেশ দাসের এই আত্মকথা বেশ আবেদনময় হয়ে ওঠে, যেমন 'কাচের মানুষ', 'মেয়েটি' ইত্যাদিতে, আরো নির্দ্বন্দ্ব আনন্দের স্বাদ পাওয়া যায় কোথাও কোথাও, যেমন 'ঘুঘু ডাকে' কবিতায়,—আবার উপমা রূপক ইত্যাদি অলঙ্কারের অভিনবত্ব ঘটাবার সপ্রয়াস দৃষ্টান্তও তিনি দেখিয়েছেন, যেমন 'নব-বর্ষ' কবিতায়—'চৈত্রের চিনি-বৃষ্টিতে বাতাস মধুময়',—চিনিবৃষ্টি কথাটা তাঁর নিজের ভাল লেগেছে ভাবতে অবাক লাগে; 'তবু' কবিতায় মিলের ঝোঁক কেমন যেন তরল মনে হয়, বিশেষতঃ এইসব ছত্রে—

> শেষ করে মিছে ছন্দমিলের গরমিল
> চলো যাই চলো সাগর যেখানে উর্মিল,
> গুঁড়োনো গিনির মতই যেখানে গুঁড়ো
> গুঁড়ো বালি উড়ছে
> সোনা বালুচর পড়ে আছে কাঁচা রোদের
> হলুদে মুছে...

'মুছে' কথাটা দুর্বল নয় কি?—নিতান্তই মিলের খাতিরে ওটিকে আনতে হয়েছে বলে মনে হয় না কি? অর্থাৎ এই শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলনে এমন অনেক লক্ষণ থেকে গেছে যেগুলিতে তাঁর কবিতার শ্রেষ্ঠ অংশের মধ্যে গৌণ অংশের অনু-প্রবেশ ঘটেছে—এবং বোধহয় বাংলা কবিতার বিভিন্ন শ্রেষ্ঠ সংগ্রহেরই এ এক সাধারণ অপ্রতিরোধ্য নিয়তি। তবে তিনি কবি হিসেবে যতোরকম মানসিকতার মানুষ, এ-সংগ্রহে তার সামগ্রিক পরিচয়ই স্বীকৃত। 'বোম্বাই', 'কলকাতা', 'পনেরই আগস্ট ১৯৪৭', 'কোরিয়া ১৯৫০,' 'সবরমতীর একটি উপ-নদী', 'শিক্ষক আন্দোলন ১৯৫৪,' 'ছোরা', রক্ত, আগুন (১৯৬৪)' ইত্যাদিও তাঁর সেই সামগ্রিক মনোভূমির অন্তর্ভুক্ত। আবার নিগূঢ় ব্যক্তি অনুভূতির ইশারা ধ্বনিত হয় 'সেই ছায়াটা', 'চোর কাঁটা' প্রভৃতি শ্রেষ্ঠতর কবিতায়। শ্রেষ্ঠতারও 'তর'-'তম' আছে,—এই তারতম্যবোধ অমপনেয়। এই বিচিত্রতাই কবিমন,—দিনেশ দাস আমাদের শক্তিমান প্রিয় কবিদের অন্যতম।

হরপ্রসাদ মিত্র

কবিতা কল্পনালতা (প্রবন্ধ)ঃ সরোজ বন্দ্যো-পাধ্যায়। এসেম পাবলিকেশনস, ৬৭।২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। নয় টাকা।

শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা উপন্যাসে কালান্তর'-এর মত একটি স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত গ্রন্থ রচনা করে সহৃদয় বুদ্ধিজীবী পাঠকমহলে নিজস্ব স্থান করে নিয়েছেন। বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক যুক্তিনিষ্ঠা ও নিরপেক্ষ মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির আকর্ষণে সরোজবাবুর সদ্য প্রকাশিত 'কবিতা কল্পনা-লতা' হাতে পেয়ে আমরা যথার্থ অর্থে উপকৃত বোধ করছি, 'উপকৃত' কারণ, বাংলা কবিতার 'আঙ্গিকের ওপর স্বতন্ত্র, বিস্তৃত বাংলা আলোচনা-গ্রন্থ খুবই কম। সরোজ-বাবুর গ্রন্থ সেই অভাব পূরণের পথে অন্যতম এক সংযোজন।

আলোচ্য গ্রন্থে মোট বারোটি ছোট-বড় প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। সরোজবাবু বিগত বারো বছর ধরে বাংলা কবিতা বিষয়ে যে সমস্ত ভাবনায় দীপিত হয়ে নিজস্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, বর্তমান প্রবন্ধ-গুলি তারই লেখ্যরূপ। প্রবন্ধগুলি আমরা কয়েকটি বিখ্যাত পত্রিকায় পত্রস্থ হতে দেখেছি ইতিপূর্বে এবং তখনি এগুলি যথেষ্ট নিঃশব্দে আলোড়ন তুলেছিল পাঠকমহলে। গ্রন্থভুক্ত হওয়ায় কবিতার পাঠক ও সমা-লোচক সরোজবাবুকে সামগ্রিকভাবে দেখার সুযোগ পাওয়া গেল।

প্রবন্ধগুলির বেশির ভাগ আলোচনা আধুনিক কবিতার চিত্রকল্প বিষয়ক। রবীন্দ্র-কবিতার ফর্ম ও বিষয় নিয়ে দুটি দীর্ঘ

আলোচনা, রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী পঁচিশ বছরের কাব্যভাবনা, জীবনানন্দ, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে এবং সম্প্রতি গঠিত ওপার বাংলার কবি আল মাহমুদ, ও শামসের আনওয়ার—এ'দের সম্পর্কে সরোজবাবুর চিন্তা-ভাবনা প্রবন্ধগুলিকে উজ্জ্বল করেছে।

সেসিল ডে লুই ওদেশের কবিতার চিত্র ও চিত্রকল্প নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনি নিজে ছিলেন একাধারে কবি অন্যদিকে সমালোচক। মার্জোরি বুলটন বলেছেন, কবির হাতে একটি 'ইমেজ' জন্মানো মূলত কবির একান্ত নিজস্ব চিন্তাভাবনার আশ্রয় হিসেবেই। এই 'ইমেজ'-এর সঙ্গে কবির যোগ, পাঠকের সম্পর্ক, কাব্যের পরিণামী লক্ষ্য কি—এসব বিষয় নিয়ে বিদেশে বহু আলোচনা হয়েছে, সরোজবাবু বাংলা সাহিত্যে সে সবের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন আলোচ্য গ্রন্থের কয়েকটি প্রবন্ধে।

কিন্তু আলোচনাগুলি একান্তভাবে মন্ময়। কবিতার বিষয় আর বিষয়ী—এই দুয়ের খুব ঘনিষ্ঠ না হতে পারলে, আমার মনে হয়, কাব্য সমালোচকের সাবজেকটিভিটি পরিপূর্ণ সত্যের ভিত্তি পায় না, আর সেই সঙ্গে কবিতার ডিকশন, চিত্রকল্পের সুষমা, ছন্দের মনোরম হৃদয়ানুগ প্রবাহ প্রভৃতি দিক কাব্যরসপিপাসুদের বোঝানো সহজসাধ্য হয় না। সরোজবাবুর আলোচনা নিশ্চয়ই আন্তরিক এবং মন্ময় হয়েও পাঠকের সঙ্গে কবিতার, তাঁর আলোচনার রক্তসম্বন্ধ নির্ণয়ে অবধারিত।

এক কথায়, সরোজবাবু সমগ্র গ্রন্থে তাঁর কাব্য ভাবনার মৌলিকতার আশ্চর্য দিকগুলি স্পষ্ট করেছেন। 'কবিতার ভাষা', 'কবিতায় প্রাবাকল্প ও তার অনুষঙ্গ', 'দীর্ঘ কবিতা ও চিত্রকল্পের সংলগ্নতা' ইত্যাদি আলোচিত অংশগুলি কবিতা সম্পর্কিত আলোচনা বা সমালোচনা নয়, এক ধরণের সৃষ্টি হয়ে উঠেছে। কবিতার শব্দ, ভাষা, প্রতীক, চিত্রকল্প ইত্যাদির আলোচনা এমন উপলব্ধি ও নিষ্ঠার সঙ্গে ও মৌলিক সিদ্ধান্ত ঘোষণার ইতিপূর্বে কেউ করেছেন বলে মনে পড়ে না।

বুদ্ধদেব বসু একবার কোথায় যেন বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কোন কবিতার নিজস্ব মন্তব্য দিয়ে তাঁর সেই বিশেষ কবিতার বিচার বা আলোচনার স্থির সিদ্ধান্তে আসা ঠিক নয়। অর্থাৎ কথাটা হল এই—কবিরা সব সময়ে তাঁদের কবিতার যথার্থ সমালোচক হতে পারেন না। অন্যদিকে বিদেশী এজরা পাউন্ডের কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে আমাদের দেশের কবি জীবনানন্দ দাশের কথা—যিনি প্রকারান্তরে অভিমত দিয়েছেন—কবিই কবিতার যোগ্য সমালোচক। কিন্তু কবি বা অ-কবি, সহৃদয় পাঠক যেই হোন না কেন, যদি তিনি কবিতার আলোচনা বা সমালোচনার সূক্ষ্ম হৃদয়ের স্পর্শ ছড়াতে পারেন, তবে তিনি নিঃসন্দেহে যথার্থ সমালোচকের কাজে পারদর্শী। আলোচ্য গ্রন্থের সমালোচক নিজেকে একই সঙ্গে কবি ও কবিতা-সমালোচকরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন, কারণ তাঁর সমালোচনার দৃষ্টি সমালোচনার শাসনদণ্ডে শানিত নয়, রসগ্রাহী ও বোদ্ধা অনুভূতিপ্রবণ পাঠক-হৃদয় সংবাদে প্রাণিত।

এই সব কারণেই আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল্প ও প্রতীক এবং প্রেমভাবনা নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে, সরোজবাবুর আলোচনা নিশ্চয়ই নতুনত্বে ও নিষ্ঠার আন্তরিকতায় বিশিষ্টতার দাবী রাখে। জীবনানন্দ, অমিয় চক্রবর্তী ও বিষ্ণু দে সম্পর্কিত আলোচনাগুলি সমালোচকের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। আল মাহমুদ ও শামসের আনোয়ার সংক্রান্ত আলোচনা সময়োপযোগী।

সরোজবাবু নিজস্ব যুক্তি থেকে কখনো সরে যাননি, বা উপযুক্ত উদ্ধৃতি ও তথ্য দিয়ে বিশ্লেষণ করার কথাও বিস্মৃত হননি। তবে যেহেতু প্রবন্ধকারের ভাষায় 'গবেষণা-গ্রন্থ নয়, রসভোক্তারাই আমার লক্ষ্য' তাই গভীরতম উপলব্ধির কথা প্রবন্ধগুলির অন্তস্তলে থাকায় এ গ্রন্থের পাঠককুল সর্বকালের সহৃদয়।

কি ফল লভিনু (উপন্যাস)। সরোজ বসাক। সান্যাল এণ্ড কোং, ১-১এ, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা-১২, সাত টাকা।

শ্রীসরোজ বসাক রচিত 'কি ফল লভিনু' উপন্যাসটি বিষাদান্তক। দুই ভাই প্রভাকর ও দিবাকর। দিবাকরকে মানুষ করে বিয়ে দেয় বড় ভাই প্রভাকর, সরযু নামে একটি স্বভাব-সরল মেয়ের সঙ্গে। সরযু সংসারের সকলকে মানিয়ে নিতে পেরেছে, পারেনি স্বামী দিবাকরকে। দিবাকর পদ্য লেখে, অল্প মাইনের চাকরী করে। এই অবস্থায় দিবাকরের শ্বশুর-শাশুড়ীর চক্রান্তে ওদের সংসারে ভাঙ্গন ধরে, দুই ভাই আলাদা হয়ে যায়। সরযুর অভিমানে অকাল মৃত্যু ঘটে। পুত্র-কন্যা মামার বাড়ি মানুষ হতে থাকলে দিবাকর পথে পথে ঘোরে, ছদ্মনামে পদ্য লেখে। শেষে সেও পিতার কর্তব্য পালন করতে না পেরে আত্মহত্যা করে। সরযু-দিবাকরের মৃত্যু চরিত্র-ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রভাকর, দিবাকর, সরযু, সরযুর মা-বাবা—প্রতিটি চরিত্র সুঅংকিত। যাঁরা গল্প পড়তে ভালবাসেন, দুঃখময় জীবনের কথা পড়ে দুঃখে অশ্রুসিক্ত হন, তাঁদের কাছে এ গ্রন্থ ভাল লাগবে। ভাষা সুখপাঠ্য।

জ্যোৎস্নার ভিতরে গর্জন (কাব্যসংকলন)—গৌতম গুহ। অনির্বাণ প্রকাশনী, ৩এ গঙ্গাধরবাবু লেন, কলিকাতা—১২। দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

কবি গৌতম গুহের জীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হল—'হাত ভরে ফুল দেবে যারা/তারাই এনেছে দেখি করাতের কর্কশ শব্দ!' 'জ্যোৎস্নার ভিতরে গর্জন' কাব্যগ্রন্থের অন্য একটি কবিতায় কবি অভিজ্ঞতার আর এক রূপ—'ছেঁড়া পকেট থেকে, নিঃশব্দে/বাড়ি ফেরার পয়সা পড়ে যায়।' 'জ্যোৎস্না' সম্পর্কে কবির বাস্তব প্রচলিত অনুভূতি থেকে ভিন্নস্বাদী। কবি 'জ্যোৎস্নার ভিতরে যেতে ভয়' এবং এই ভয় অমূলক নয়। নাম কবিতায় কবির স্পষ্ট ঘোষণা—'শান্ত বাধ্য পেটের ছেলেকে উঠোনের মিষ্টি ছড়া ভুলিয়ে রেখেছে জ্যোৎস্নার ভিতরে তাই উড়ন্ত গজ রাবণের দাউ দাউ চিতা।' বস্তুত তরুণ আধুনিক কবি গৌতম গুহ জীবন, জগৎ ও অভিজ্ঞতাকে এনেছেন প্রত্যক্ষ সত্যের আলোয় যাচাই করতে। তাই কবি কোথাও শ্লেষ-ব্যঙ্গে-তীক্ষ্ণ, কোথাও অসহায়তা, হতাশায় দুঃখিত, বিষণ্ণ। বি কবি আশা, বাঁচার বাণীকে অস্বীকার করে এবং সাধারণ লোককণ্ঠের সঙ্গে মিলিয়ে বলেছেন, 'সুরেলা গান শ জীবনের মুখে নিশিশেষে/আজ ধরে।' কবির ছন্দ, শব্দ, অভিজ্ঞতা চিত্রকল্প যথেষ্ট কাব্যিক, আন্তরিক।

সাহিত্যে সমাজবাস্তববাদ : নগেন পরিবেশক : শিক্ষাভারতী। ৯ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা ৯। আট টাকা।

ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন—'তিরিশ দশকের সাহিত্য-আন্দোলনের সমাজবাস্তবতা ইন্ধন যেখানে পেয়েছি তারই খানিকটা অংশমাত্র চনা করেছি। বিভূতিভূষণের পাঁচালী' এবং মানিক বন্দ্যোপ 'পদ্মানদীর মাঝি' এই দুটি ধারার আলোচনা করা সম্ভব হল না।' না হলেও এ আলোচনার একরকম আবেদন আছে। তিনি লিখেছেন—'সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নানা মত থা পারে। কিন্তু আমরা মনে করি সমা বিপ্লব বর্তমানে সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য

এই চিন্তা ধরে 'চতুষ্কোণ' মাসিকপ তাঁর কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ধারা বাহিকভাবে,—সেই সঙ্গে আরো কিছু সংযোজিত হয়ে বর্তমান বইখানি দাঁ য়েছে। 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'প্রগতি পত্রিকাগুলির লেখকরা সেকালের সামাজি রাজনৈতিক পরিস্থিতির ফসল;—সে পথে বাংলা কথাসাহিত্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'শ কেরানী' গল্পের মূলে দেশের সেই বি সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প স্থিতির বৈশিষ্ট্য ধর্তব্য। তার আগে প্র চৌধুরীর 'রায়তের কথা'য় জমিদারে প্রতি মমতা বর্জন না করে প্রজার প্রতি কিঞ্চিৎ ঔদার্য প্রদর্শনের নজীর পাওয়া গেছে। শিক্ষিত সমাজে, বিপ্লবের উ চিন্তার প্রতি অনীহা ছিল। গান্ধীজী অসহযোগ ও আইন-অমান্য আন্দোলন ঘটেছে,—এবং তাতেই 'জাতীয় অর্থনীতির বুনিয়াদ সৃষ্টির' আন্দোলন পাওয়া গেল

তারপর তাঁর নিজের কথায়—'বাঘা দত্তদের জমিদারীর এক রোখা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পর যে এক নতুন ধরনের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সমাজে ফুটে ওঠে তার পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করে যৌথ কারবারের মধ্য দিয়ে।' স্বল্পবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির গল্পে। গ্রাম থেকে শহরে সরে এসেছে আমাদের কথাসাহিত্যের নায়ক-নায়িকারা। দেশী বণিকদের স্বাদেশিকতার আন্দোলনের ফলে সমাজ - বিচ্ছিন্নতাবাদের সৃষ্টি হয়েছে। আর এই সমাজ-বিচ্ছিন্নতা-বাদ থেকেই সাহিত্যে 'আমি' তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে।'—এইভাবে শ্রীযুক্ত দত্ত অনেক ভাববার কথা লিখেছেন, যা আর একটু গুছিয়ে লিখলে পাঠকের সুবিধা হোতো। অনেক গল্প-উপন্যাসের ও সমালোচনার প্রসঙ্গ এই আলোচনায় জায়গা পেয়েছে। কিন্তু বিশ্লেষণে ও বিন্যাসে,—সেই সঙ্গে ভাষাগত বন্ধুরতার ফলে বক্তব্য সম্বন্ধে লেখকের আন্তরিক প্রযত্ন অনুভব করা গেলেও কেমন যেন অগোছালো মনে হয়। এই অগোছালো ভাবটিই এই চিন্তাভূয়িষ্ঠ রচনার সর্বাধিক বাধা। 'উন্নয়' শব্দটি তিনি অনেকবার ব্যবহার করেছেন,—বোধ হয় উন্নয়ন-অর্থে। অনেক ছাপার ভুল আছে। সাহিত্যের আলোচনায় সমাজবাস্তববাদ মূলক তত্ত্বচিন্তার গুরুভার ঘটেছে বলে মনে হয়। বইয়ের ১১৭ পৃষ্ঠায় তাঁর মূল [illegible]টি পুনরায় দেখানো হয়েছে—যার মূল-[illegible] হোলো—'সমাজের একটি বিশেষ [illegible]শশীল উন্নত স্তরে—বস্তু উৎপাদনের [illegible] নিহিত যে সৃষ্টিশীলতা রয়েছে, সেটা [illegible]মণ্ডিত হয়ে এক সময়ে বিরোধের [illegible] গ্রহণ করে। দুইয়ের দ্বন্দ্ব থেকে একটি নোতুন সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি [illegible]

—হরপ্রসাদ মিত্র

এরিস্টটলের পোয়েটিক্স : অনুবাদ। শীতল ঘোষ। মূল্য চার টাকা।
ট্রাজেডী তত্ত্ব ও নাটক : শীতল ঘোষ। জে এন ঘোষ এণ্ড সন্স, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি স্ট্রীট, কলি-১২।

সর্বশাস্ত্রজ্ঞ মহাপণ্ডিত এরিস্টটল প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে তাঁর 'পোয়েটিকস' গ্রন্থে ট্রাজেডী ও মহাকাব্যের যে রূপপ্রকৃতি নির্দিষ্ট করেছেন নাট্যশাস্ত্রের বিচারে আজও তা সর্বাধিক প্রামাণ্য ও সমালোচনার আদর্শমানরূপে স্বীকৃত হয়ে থাকে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নাট্য-শাস্ত্রের অগণিত পণ্ডিত তার পক্ষে ও বিপক্ষে নানা যুক্তির অবতারণা করেছেন, কিন্তু এরিস্টটলকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই কাব্যশাস্ত্রের পাঠকদের কাছে এরিস্টটলের পোয়েটিক্স অপরিহার্য এবং শ্রীযুক্ত ঘোষ যথেষ্ট দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে ঐ গ্রন্থটির যথাযথ অনুবাদ করে কাব্যের ছাত্রছাত্রী ও আগ্রহী পাঠকদের একটি বড় অভাব পূরণ করেছেন।

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ডঃ অজিতকুমার ঘোষের একটি তথ্যসমৃদ্ধ সুন্দর ভূমিকায় গ্রন্থটির মূল্য ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

'ট্রাজেডী তত্ত্ব ও নাটক' প্রকৃতপক্ষে প্রথম গ্রন্থটিরই পরিপূরক। কারণ এই গ্রন্থটিতে পোয়েটিকস-এর ভিত্তিতে গ্রন্থ-কার নাট্যতত্ত্বের আলোচনা করেছেন। তবে পোয়েটিক্স গ্রন্থে কমেডি প্রভৃতি কাব্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা থাকলেও উল্লেখিত গ্রন্থে লেখক শুধু ট্রাজেডীতত্ত্ব নিয়েই আলোচনা করেছেন।

মানবপ্রেমিক কবি ও সাহিত্যিক দেশ-বন্ধু চিত্তরঞ্জন। শিশির দাস। প্রকাশক —সমীর ভট্টশালী, ৩৫, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৫। পাঁচ টাকা।

শ্রীশিশির দাস ইতিপূর্বে 'মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র' গ্রন্থ রচনা করে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। এঁর 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন' সংক্রান্ত সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থটি তাঁর প্রবন্ধকার হিসেবে আর এক-দিকের ক্ষমতার পরিচয় তুলে ধরে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মূলত দেশপ্রেমিক, রাজনীতি-বিদ, দাতা হিসেবেই সর্বসাধারণ্যে পরি-চিত। কিন্তু তিনি যে এই সমস্ত দুরূহ কর্মপ্রয়াসের মধ্যে নিরলস সূক্ষ্ম সাহিত্য-চর্চাও করে গেছেন এবং সেক্ষেত্রে যে যথেষ্ট মৌলিক কবিক্ষমতার পরিচয় রেখেছেন, বর্তমান গ্রন্থে তার পরিচয় বিস্তৃতভাবে দেওয়া হয়েছে। শ্রীদাস কবি ও সনেট রচয়িতা চিত্তরঞ্জনের কাব্য-বিচারক সম্পাদক ও দেশদরদী চিত্তরঞ্জনের সম্যক পরিচয় স্পষ্ট করার জন্য 'মালঞ্চ', 'মালা', 'সাগর-সঙ্গীত', 'অন্তর্যামী', 'কিশোর-কিশোরী' —এই পাঁচখানি কাব্যগ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কাব্যগ্রন্থগুলির বিস্তৃত ও সুচিন্তিত আলোচনা বেশী হয়নি। বর্তমান গ্রন্থটি সেই অভাব অনেকাংশে পূরণ করবে।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

নহবৎ—সম্পাদকমণ্ডলী সম্পাদিত। অরুণ ইন্দু। ২নং হরিহরপুর। বারাসাত। ২৪ পরগণা। দাম দু'টাকা।

সমকালীন যুগভাবনার স্বাক্ষরবহ সাহিত্য পত্রিকা নহবৎ। রচনা নির্বাচনে সম্পাদকমণ্ডলীর প্রগতিশীল মানসিকতা এবং সুস্থ জীবনবোধের পরিচয় পাওয়া গেল। গল্প লিখেছেন কালীকুমার চক্রবর্তী সুজিত মুখোপাধ্যায়, তাপস আঢ্য, সুবোধ ভট্টাচার্য, সমীরকান্তি বিশ্বাস, তুষারাভ রায় চৌধুরী, সজল দাশগুপ্ত, কল্যাণ চক্রবর্তী, ভবানী মুখোপাধ্যায়—এবং অরুণ [illegible]। জগন্নাথ ঘোষ এবং বীরেন্দু [illegible] প্রবন্ধ দুটি মননিনির্ভর। কবিতা লিখেছেন —তারাপদ রায়, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, [illegible] হাজরা, রবীন সুর, তুলসী মুখোপাধ্যায়, হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়, গৌরীশঙ্কর [illegible], তপন গঙ্গোপাধ্যায়, নির্মল [illegible], অর্ধেন্দুশেখর দেব, দীনেশ [illegible], [illegible] ভট্টাচার্য, সত্য গুহ এবং আরো অনেকে।

[illegible] (আশ্বিন-কার্তিক)—প্রধান সম্পাদক বিমল সেন। ৪ ঝিলপাড় রোড। নববারাকপুর। ২৪ পরগণা। দাম— এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

পত্রিকাটি পরিচ্ছন্ন। [illegible] বিশ্বাসী। বেরুচ্ছে অতি সাম্প্রতিক সাহিত্য সংস্থার নবীন প্রতিভার সঙ্গে প্রবীণের সংযোগ-সূত্র আবিষ্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে। এ সংখ্যায় লিখেছেন ভবানী মুখোপাধ্যায় যোগেশচন্দ্র বাগল, কানাই-লাল দত্ত, বিমলচন্দ্র ঘোষ, শামসুর রহমান এবং আরো অনেকে। পত্রিকাটি সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের ভালো লাগবে।

সংলাপ : সম্পাদক অরুণ রায় সরস্বতী। ৭৯ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট কলকাতা— ৯। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'ত্রিপুরার জনজীবন ও লোকসংস্কৃতি' শীর্ষক রচনাটি আকর্ষণীয়। তাছাড়া উল্লেখযোগ্য কয়েকটি লেখা লিখেছেন দক্ষিণারঞ্জন বসু, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, ফণিভূষণ আচার্য, আর্য চট্টোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণ ধর। পত্রিকাটি সমকালীন সমাজের উত্তাপ-উত্তেজনা সম্পর্কে উদাসীন নয়। অনেকের কাছে সংগ্রহযোগ্য মনে হবে।

ইতিহাসের সাক্ষী ॥২

আনন্দভবন।। এলাহাবাদ

শ্যামল পাঠক

(২)

ট্রেন ছুটে চলেছে, সেই সঙ্গে আমরাও এগিয়ে চললাম মোগলসরাইএর পথে। আমাদের কামরার অধিকাংশ যাত্রীই অবাঙালী। শংকর তাদের সঙ্গে গল্প সুরু করল। ইতিমধ্যে পাটনা ছাড়িয়ে অনেক দূরে এগিয়ে ট্রেন একটি স্টেশনে এসে দাঁড়াল। জানালার পাশ দিয়ে একজন চা-ওয়ালা হেঁকে যাচ্ছিল, আমি ডেকে চা নিলাম। সেই সময় কামরার মধ্যে এক ফেরিওয়ালা উঠল। তার হাতে ও ঝোলায় কতগুলি কলম, ছোট টর্চ, ছুরি ও চিরুনি। অবশ্য একটু পরেই বুঝলাম সে ফেরিওয়ালা নয়, নিলামওয়ালা। লোকটি বলল, কলমগুলি খুব দামী। নিলামের ডাকে যিনি প্রথম হবেন তাঁকে সেই দামে কলমটি ও সঙ্গে একটি ছোট টর্চ উপহার দেওয়া হবে। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় হবেন যাঁরা তাঁদের বিনামূল্যে একটি করে ছুরি ও চিরুনি দেওয়া হবে। তখন বেশ কয়েকজন মহাউৎসাহে নিলাম ডাকতে সুরু করলেন। দুটাকা থেকে ছটাকা পর্যন্ত দাম উঠল। যিনি প্রথম হলেন তিনি সেই দামে কলমটা কিনে নিয়ে সঙ্গে একটি টর্চ পেলেন। অন্য দুজন একটা করে ছুরি ও চিরুনি পেলেন। এইভাবে কয়েক দফা ডাক হয়ে নিলাম শেষ হল। তখন নিলামওয়ালা ট্রেন থেকে নেমে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকজন নামলেন যাঁরা নিলামে দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছেন। এক ভদ্রলোক বললেন, এরা সকলেই নিলামওয়ালার লোক। যাত্রী সেজে ট্রেনে উঠে নিলামে ডাক দিয়ে সাধারণ যাত্রীদের কাছে বেশী দামে ও উপহারের নামে সস্তা দামের কলম ও টর্চ বিক্রি করে। জিনিস বিক্রির এই নতুন কৌশল দেখে অবাক হলাম।

ট্রেন আবার এগিয়ে চলল। অনেক আগে থেকেই আকাশে মেঘ জমেছিল, এবার সুরু হল বৃষ্টি। প্রথমে দূরে যব ও জোয়ার ক্ষেতের ভিতর কুয়াশার ঝাপসা আবরণের মতো মনে হচ্ছিল, এবার কাছে এল বৃষ্টির ধারা হয়ে। জানালা বন্ধ করে দিলাম। কাঁচের গা বেয়ে বৃষ্টির জল তখন গড়িয়ে পড়তে লাগল।

সেদিন রবিবার। দুপুর পোনে দুটোয় আমরা মোগলসরাই স্টেশনের প্লাটফরমে পা রাখলাম। তখনো বৃষ্টি থামে নি, থামবার সম্ভাবনাও নেই। সমস্ত আকাশটাই মেঘে ঢেকে আছে। সুতরাং স্টেশনে অপেক্ষা করা অর্থহীন। শংকর ও আমি আমাদের ব্যাগগুলি কাঁধে নিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে স্টেশনের বাইরে এলাম। পাটনা থেকে এখানে শীত অনেক বেশী। তার উপর বৃষ্টি হওয়ায় ঠান্ডা যেন কাঁটার মত বিঁধছে। এখান থেকে একটা রিকসা নিয়ে শংকরদের অফিসের দিকে চললাম। স্টেশন থেকে কিছুদূরে গোল্লামুণ্ডিতে ওদের অফিস। একটু পরেই বড় একটা দোতলা বাড়ীর সামনে শংকর রিকসা থামাতে বলল। রিকসা থেকে নেমে আমরা দোতলায় উঠে গেলাম। শংকর এখানেই থাকে। পাশাপাশি দুটি ঘরই ওর ব্যবহারের জন্য। ওপাশের ঘর দুটিতে থাকেন ওখানকার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার প্রফুল্ল চক্রবর্তী। নীচের তলায় শংকরদের অফিস। আমরা যেতেই হাসিমুখে প্রফুল্লবাবু বেরিয়ে এলেন। ওঁর সঙ্গে পরিচয় হল। বেশ সাদাসিধে মানুষ। বাড়ী বর্ধমান, এখানে অনেকদিন হল চাকরী করছেন।

পরের দিন সকালে কাছাকাছি কিছুটা জায়গা ঘুরে এলাম। চায়ের দোকানে আলাপ হল মহম্মদ সৈইদ ও মহম্মদ ইজরাইলের সঙ্গে। সৈইদ এলাহাবাদের লোক, এখানে চাকরী করেন। ইজরাইলের বাড়ী বিহারে। ওঁর বাবা রেলে চাকরী করতেন, তাই ছোটবেলা থেকেই এখানে বসবাস। ইজরাইল চাকরী করেন না, ব্যবসার দিকেই ওঁর ঝোঁক। দুজনেই বেশ খোশমেজাজী। সকালে আমরা একসঙ্গেই গল্প করতে করতে চা ও জলখাবার খেলাম। ওঁদের মধ্যে এতটুকু গোঁড়ামী দেখলাম না। খুব কাছের মানুষের মতোই ওঁরা আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন। এরপর দেখা হল সন্তোষ চ্যাটার্জির সঙ্গে। চমৎকার হিন্দীতে কথা বলেন। প্রথমে আমি বুঝতেই পারি নি উনি বাঙালী। বহু বছর ধরে ওঁরা উত্তরপ্রদেশে বসবাস করছেন। সন্তোষবাবু একটি প্রেক্ষাগৃহে অপারেটরের কাজ করতেন, বর্তমানে বেকার। ভদ্রলোক এখানকার বহুলোকের সঙ্গেই পরিচিত।

সেদিন আমাদের বেনারস ও সারনাথ যাওয়ার কথা। শংকর সন্তোষবাবুকে বলল, তুমিও আমাদের সঙ্গে চল। তোমার তো ওখানে বেশ জানা শোনা আছে। উনি আপত্তি করলেন না। ক্যামেরা সঙ্গেই ছিল, তিনজনে উঠে বসলাম বেনারসের বাসে। মোগলসরাই থেকে বেনারস বেশী দূরের পথ নয়। বোধহয় ঘন্টা দেড়েকের মধ্যেই এসে গেলাম।

খুবই প্রাচীন এই বেনারস। খৃস্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতবর্ষে ষোলটি রাজ্য ছিল। রাজ্যগুলির মধ্যে বোধহয় কাশী ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। কাশীর রাজধানী ছিল বারাণসীতে। সে যুগে বারাণসী এমন সমৃদ্ধ ছিল যে তাকে প্রতিবেশী রাজন্যবর্গের ঈর্ষার কারণ হতে হয়েছিল। সেই সঙ্গে বারাণসীর উপর তাদের লোলুপ দৃষ্টিও পড়েছিল। কাশীর সেই সমৃদ্ধি কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। ক্রমশঃ কোশলরাজ্য প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। পরবর্তীকালে মগধরাজ অজাতশত্রু কোশলরাজ প্রসেনজিতের কন্যাকে বিবাহ করে উপঢৌকন স্বরূপ কাশী গ্রাম লাভ করেন। প্রাচীনকাল থেকে বহু পৌরাণিক কাহিনীও সৃষ্টি হয়েছে এই বারাণসীকে কেন্দ্র করে।

নির্জন ও শান্ত পরিবেশ। পাহাড়ের কোলে মুনি-ঋষিদের আশ্রম। সাধনভজনের উপযুক্ত স্থানই বটে।

ট্রেন এগিয়ে চলল। আমরা দুজনে গল্প করছি, একসময় হঠাৎ অমলবাবু লাফ দিয়ে উঠে পড়লেন। বললেন, উঠুন আমরা এসে গেছি। দেখলাম, সত্যিই ট্রেন এলাহাবাদ স্টেশনে ঢুকছে। ট্রেন থেকে নেমে দেখলাম, স্টেশনটি খুবই সুন্দর আর পরিষ্কার।

প্রথমেই গেলাম পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর বাড়ী আনন্দভবনে। চমৎকার বাড়ী। চারিদিকে সাজান বাগান। বাড়ীটি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ভারত সরকারকে দান করেছেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বহু স্মৃতি এই বাড়ীটির সঙ্গে বিজড়িত হয়ে আছে। আনন্দভবনের বিভিন্ন ঘরগুলি দেখলাম। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর ব্যবহৃত জিনিস-পত্র, হাতে লেখা চিঠিপত্র ও বই বিভিন্ন ঘরে সাজান রয়েছে। একটি ঘর দেখলাম, গান্ধীজী আনন্দভবনে গেলে ওই ঘরে থাকতেন। পাশেই আর একটি ঘরে কংগ্রেসের উচ্চতর পরিষদের গোপন বৈঠক হত। একতলায় বারান্দার একধারে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর যে স্থানে বিবাহ হয়েছিল, সেই জায়গাটিও দেখলাম।

আনন্দভবন পরিদর্শন করে একটা টাঙ্গা নিয়ে চললাম প্রয়াগের পথে। এলাহাবাদের রাস্তাগুলি কিন্তু বেশ চওড়া আর পরিষ্কার। প্রয়াগ থেকে মাইলখানেক দূরে কয়েকজন মাঝি আমাদের পেছনে ছুটল। ওদের নৌকায় চড়বার জন্য বলল। একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম ভাড়া কত? সে এগারো টাকা চাইল। বললাম থাক, এখন তোমরা এসো। নৌকায় আমাদের কাজ নেই। কয়েকজন পিছিয়ে গেল, কিন্তু একজন কিছুতেই ছাড়বে না। সমানে দৌড়াচ্ছে। আমরাও জিদ ধরলাম নৌকায় উঠব না। মাঝিটি কিন্তু নাছোড়বান্দা। বোধহয় নেশা করেছিল। শেষে পুলিশের ভয় দেখাতে সরে পড়ল।

প্রয়াগে এসে গঙ্গা ও যমুনার মিলনস্থলটি দেখলাম। গঙ্গা ও যমুনা দুদিক থেকে এসে এখানে মিলিত হয়েছে। এই স্থানটি হিন্দুদের কাছে পরম তীর্থস্থান। এখানে কুম্ভমেলার সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীদের সমাগম হয়। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে কনৌজের ধর্মসভার পরে প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনার এই মিলনস্থলে একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তারপর থেকে প্রতি পাঁচ-বছর অন্তর এই মেলা অনুষ্ঠিত হত। মেলায় রাজা হর্ষবর্ধন গরিব-দুঃখী ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধার্মিক লোকদের প্রচুর ধনরত্ন দান করতেন।

প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনার মিলন স্থলের পাশেই আকবর নির্মিত একটি বিরাট দুর্গ আছে। দুর্গের ভিতরে আমরা প্রবেশ করলাম। দুর্গটির একাংশ সংরক্ষিত। এখানে নাকি কারখানা হয়েছে। এছাড়া সেনা-বাহিনীর ক্যাম্পও আছে। এই দুর্গটির ভিতরেও এক জায়গায় কয়েকটি গুপ্ত পথ দেখলাম। সেখানে মোটা মোটা লোহার রডে তৈরী দরজায় তালা লাগানো।

কিছুটা এগিয়ে গিয়েই ভূগর্ভের সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে ভূগর্ভস্থ ঘরে অনেকগুলি দেবতার মূর্তি দেখলাম। এর নাম আচ্ছন্ন মন্দির। আর মন্দিরের প্রবেশ পথকে বলা হয় নিকাশদ্বার। এরকম আকবরের কোনো হিন্দু মহিষীর অনুরোধে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। সম্রাট আকবর ভারতীয় ও পারস্য কৃষ্টির সমন্বয়ে যে নতুন ভারতীয় কৃষ্টির বিকাশ সাধন করেছিলেন এই দুর্গটি তার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। কালের অমোঘ নিয়মে আকবরের সাম্রাজ্য লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর স্থাপত্য কীর্তি কালজয়ী হয়ে আজও আমাদের বিস্ময়ে অভিভূত করছে। আকবর-নির্মিত দিল্লী ও আগ্রা দুর্গের মত এলাহাবাদ দুর্গটিও বিখ্যাত হয়ে আছে। এলাহাবাদ দুর্গটির মধ্যেও আকবর ইন্দো পারসিক শিল্পরীতিতে সুন্দর সুন্দর সৌধ গড়ে শিল্পজগতে অমরত্ব লাভ করেছেন।

এলাহাবাদ দুর্গ দেখে ফেরার পথে ভরদ্বাজ মুনির মন্দিরে গেলাম। মন্দিরটি বেশ সুন্দর। প্রাচীনকালে এখানেই নাকি ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম ছিল। তখন আশ্রমের পাশ দিয়ে গঙ্গা বয়ে যেত। রামচন্দ্র যখন বনবাসে গেলেন তখন সেই আশ্রমে ভরদ্বাজ মুনির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। মন্দির দেখে উপস্থিত হলাম এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়টি খুব সুন্দর। মন্দির ধরনের বড় বড় বাড়ীগুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর পরিবেশও শান্ত।

ফেরার পথে যমুনা নদী পার হয়ে গেলাম নৈনি বলে একটা জায়গায়। যমুনার নীলজল বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। উঁচু-নীচু পথের দুদিকে মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ-পালার জঙ্গল আর ফসলের ক্ষেত। অনেকটা পথ ঘুরলাম তারপর এলাম খসরুবাগে। সুন্দর বাগান, ভিতরে কয়েকটি কবর আছে। এই স্থানটির সঙ্গে বিজড়িত হয়ে আছে মোগলযুগের ইতিহাসের একটি করুণ অধ্যায়।

শেষ জীবনে আকবর পুত্র সেলিমের (জাহাঙ্গীর) উপর তেমন সন্তুষ্ট ছিলেন না। সেলিমের পুত্র খসরু ছিলেন তাঁর প্রিয় পাত্র। মানসিংহ ও অন্যান্য অভিজাতবর্গও সেলিমের পরিবর্তে খসরুকে সিংহাসনে স্থাপন করার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আকবর সেলিমকেই উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের সূচনায় খসরু সিংহাসন লাভের জন্য বিদ্রোহী হন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তাঁকে এলাহাবাদের এই স্থানেই নাকি বন্দী করে রাখা হয়। বন্দী অবস্থায় তিনি ভ্রাতা খুররম (শাহজাহান) কর্তৃক নিহত হন। শিখ সম্প্রদায়ের পঞ্চম গুরু অর্জুন খসরুকে সাহায্য করার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। এখানে সকলে [illegible] দাঁড়িয়ে রইল নিস্তব্ধ[illegible]।

[illegible] এলাহা-বাদে। [illegible] উঁচু। আমাদের [illegible] উৎসব, সমস্ত [illegible] উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। [illegible] ট্রেন এলো [illegible] উঠলাম। [illegible] উঠেছে। [illegible] তখন ঘুমোচ্ছে [illegible] দিল। তাড়াতাড়ি [illegible] পড়লাম।

পরদিন ঘুম থেকে অনেক দেরীতে উঠলাম। [illegible] বললাম, আজ বাড়ী ফিরতে হবে। একটু পরে অমলবাবু [illegible] এলেন। [illegible] বললেন, [illegible] আপনাকে ছেড়ে দেব না। বললাম, উপায় নেই। দেখলাম ওঁদের মুখ মলিন হয়ে [illegible] আমাদের মধ্যে কী নিবিড় সখ্য গড়ে উঠেছে, পরস্পর তা উপলব্ধি করলাম। [illegible] মনে আমার পড়েছে, সেই সঙ্গে বাড়ীর টানও।

[illegible] আমরা সকলে মিলে স্টেশনে গেলাম। তারপর টিকিট কেটে প্লাটফরমের ভিতরে এলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেন এসে গেল, ট্রেনে উঠে বসলাম। তখন ওদের সকলের মুখেই কেমন বিষাদের ছায়া।

(আলোকচিত্রগুলি লেখক কর্তৃক গৃহীত)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গাড়ি তখন খুব জোরে ছুটে চলছিল। দমকা হাওয়া লীলাবতীর চুল, কাপড় এলোমেলো করে দিচ্ছিল। কামরায় নীল বাতি জ্বলছে। সেই নীল আলোয় লীলাবতীকে মোমে গড়া পুতুল বলে মনে হচ্ছিল। লীলাবতী আর আমি একই বার্থে বসেছিলাম। রাত গভীর। সহযাত্রী দুজন প্রচণ্ডভাবে ঘুমোচ্ছে। শুধু যে ওরাই ঘুমোচ্ছে তাই না। মনে হচ্ছিল ওদের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের প্রতিটি মানুষ, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ সবাই ঘুমোচ্ছে। শুধু আমি আর লীলাবতী জেগে রয়েছি। জেগে পাশাপাশি বসে আছি।

হঠাৎ লীলাবতী কথা বলে উঠল। ওর কথা আমার কানে আসতে লাগল। মনে হল কেউ যেন ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে চলেছে, আর মৃদুস্বরে কথা বলছে, 'জ্ঞান হওয়ার পর থেকে শুধু ভাল কথা শুনে এসেছি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাল কথা মিষ্টি কথা হয়ে কানে আসতে লাগল। সবাই বলতো, খুব সুন্দরী আমি। আরও বয়স বাড়ল। নিজেও বুঝতে শিখলাম, আমি সত্যিকারের রূপসী। পুরুষেরা আমার দিকে যে দৃষ্টি নিয়ে তাকাতে শুরু করল, সেই দৃষ্টির ভাষা আমি বুঝতে শিখলাম। প্রথম প্রথম অস্বস্তি হতো। বিরক্ত বোধ করতাম। নিজেকে লুকোতে চাইতাম। তারপর একদিন সে ভাবটা কেটে গেল। খুব স্বাভাবিক হয়ে গেলাম। আমি যে সবার কামনার বস্তু, সেই কথাটা বুঝতে শিখলাম। আমার গর্ব হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত এমন হল, রাস্তায় যদি কেউ আমার দিকে না তাকাতো, সেই লোকটার ওপর বিরক্ত হতাম। মনে মনে অসভ্য বর্বর বলে তাকে গালাগাল দিতাম।' মনে হল লীলাবতী হাসল। 'তখন আমি সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ি। সেবারেই প্রথম পাটনায় এলাম। মা মারা যাবার পর বম্বেতে মাসীর কাছে মানুষ হয়েছি আমি। মাসীরা আমাকে খুব ভালবাসে। আমিও ওদের খুব ভালবাসি। পাটনায় এসেছিলাম বেড়াতে। অনিমেষের সঙ্গে দেখা বাবার অফিসে। সে কথা আপনাকে বলেছি। অনিমেষ আমাকে অপমান করলো। সেদিন সে কথাই মনে হয়েছিলো আমার। ও যে আমার দিকে তাকালো না, আমাকে বিশেষ করে সম্মান দেখালো না, তাকেই আমার অপমান বলে মনে হয়েছিল। প্রতিজ্ঞা করলাম, অনিমেষকে শিক্ষা দেব। কেন যে অনিমেষের ওপর এত রেগে গেলাম জানি না।

ও কিন্তু আমাকে কোন অপমান করতে চায় নি। আমিই একদিন গায়ে পড়ে ওকে অপমান করলাম। অফিসের করিডর দিয়ে অনিমেষ আসছিল। আমি ইচ্ছে করে ওকে ধাক্কা মেরে ওকেই ধমকে উঠলাম, 'দেখে পথ চলতে শেখেন নি।' অনিমেষ কী বললো জানেন। বললো, দেখে পথ চলি বলেই পা পিছলে যায় না। মনে মনে কী যে রেগেছিলাম! মনে হয়েছিল, ওকে মারি, কিম্বা এমন অপমান করি যা ও জীবনে ভুলতে না পারে। শেষ পর্যন্ত এমন হল, অনিমেষের কথা ছাড়া আর কিছুই মনে হতো না, ও যে আমাকে দেখেও দেখল না, আমাকে অগ্রাহ্য করলো, হয়ত সেই কারণেই আমি ওর দিকে আকৃষ্ট হতে লাগলাম। আমি যত ওর দিকে যাবার জন্যে হাত বাড়াচ্ছি, অনিমেষ তত দূরে সরে যাচ্ছে। ঈশ্বর জানেন, অনিমেষ আর কতদূরে সরে যেতে পারে!'

গাড়ি তখন একটা পোলের ওপর দিয়ে যাচ্ছে। গমগমে শব্দ লীলাবতীর কণ্ঠস্বর ডুবিয়ে দিল। কিছুক্ষণ আগেও মনে হয়েছিল, নিস্তব্ধ জগতের মাঝে আমি আর লীলাবতী শুধু জেগে রয়েছি। এই মুহূর্তে মনে হতে লাগল, লীলাবতীও ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধুমাত্র আমিই জেগে রয়েছি। কিন্তু আমারও ঘুমনো দরকার। ঘুম না হোক, এই মুহূর্তে মনে হতে লাগল, আমি একজন পরিশ্রান্ত মানুষ, আমার বিশ্রাম প্রয়োজন। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আপনি শুয়ে পড়ুন, রাত শেষ হতে বেশী দেরী নেই। সমস্ত রাত জাগলে শরীর খারাপ হবে।'

লীলাবতী উত্তর দিল না। আমি ওপরের বার্থে উঠে গেলাম।

ভেবেছিলাম, মা খুব অবাক হবে। মা একটুও অবাক হল না। শুধু বলল, 'আয়।' ঠাকুরের ঘরে বসে মা মালা জপছিল। বললাম, 'এত বেলায় পুজো করছো।'

মা নীরস গলায় বলল, 'পুজো হয়ে গেছে, মালা জপছি।'

'আগে তো পুজোর আসনে বসেই মালা জপ করতে মা।'

'এখানে জায়গা বাসা ছোট। ছেলে-মেয়েরা পড়াশুনো করে। ওরা পড়তে বসেছে।'

বললাম, 'তোমার অসুবিধা হচ্ছে, না?'

মা বলল, 'অসুবিধা কি। সুখেই তো আছি।' যদিও মা মুখে বলল, সুখে আছি, মাকে দেখে মনে হল মা একটুও সুখে নেই। নিজেকে কীরকম অপরাধী মনে হতে লাগল। মনে হল, মার অসুখী হবার কারণ শুধুমাত্র আমিই। মালা কপালে ছুঁইয়ে থলিতে ভরে রাখতে রাখতে মা বলল, 'তোর চা জলখাবার দিতে বলি।'

বললাম, 'এখন থাক। তোমাদের খবর বলো, সবাই কেমন আছে। বড়মামা, মামীমা, ছেলেমেয়েরা কে কেমন আছে?'

মা বলল, সবাই ভাল আছে। ওষুধ খেয়ে দাদার শরীরটা একটু ভাল হয়েছে। তোকে ওষুধ পাঠাতে লিখেছিলাম। চিঠি পেয়েছিলি?'

'না তো, কবে চিঠি লিখেছিলে?'

'পরশু।'

'চিঠি পেতে মাঝে মাঝে দেরী হয়। সব দিকেই তো বিশৃঙ্খলা।'

'আমরা তো শুনি, এখানেই শুধু গণ্ডগোল। কোলকাতার বাইরে নাকি আবহাওয়া খুব শান্ত।'

তক্তপোষের ওপর শুয়ে পড়তে পড়তে বললাম, 'শান্ত হলে কী হবে। মানুষ বড্ড অলস হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। কেউ কাজ করতে চায় না। সবাই ফাঁকি দিতে চায়। কাজে এত অনিচ্ছা থাকলে দেশ চলে কখনও?'

'জামা জুতো নিয়েই শুয়ে পড়লি! নে, ওঠ। হাতমুখ ধুয়ে চা খেয়ে নে। সমস্ত রাত জেগে জেগে এসেছিস।'

হেসে বললাম, 'রাত জাগবো কেন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এলাম। সঙ্গে ম্যানেজারের মেয়ে এল, না হলে থার্ড ক্লাসেই আসতাম। শুধু শুধু গচ্ছের টাকা খরচা হয়ে গেল।'

মাও হেসে ফেলল, 'তুই এখনও এত হিসেবী আছিস। বড় চাকরি করছিস আজকাল, থার্ড ক্লাশে চড়লে মানায় না। লোকে যা তা বলবে।'

মাকে স্বাভাবিক হতে দেখে ভাল লাগল। বললাম, 'এবার ফিরে গিয়ে বাসা ঠিক করবো একটা। তোমাকে নিয়ে যাব। এর মধ্যেই নিয়ে যেতাম। কিন্তু চাকরির ব্যাপারটা এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না। ওরা মাইনে বাড়িয়েছে, বলছে এটাই নাকি বিরাট উন্নতি। কিন্তু ক্ষমতা দিচ্ছে না। কী যে হবে বোঝা যাচ্ছে না।'

মা সান্ত্বনা দেবার মত করে বলল, 'সব হবে। এত অধৈর্য হলে কি চলে। কত বয়স তোর যে এর মধ্যেই কেউকেটা হতে চাস। দাদা তো সেদিন বলছিল, তুই এ বয়সে যা উন্নতি করলি, অনেকের ভাগ্যেই তো ঘটে না।' হঠাৎ মার কী মনে হতেই উঠে দাঁড়াল। বলল, 'কাল তোর এক বন্ধু এসেছিল, একটা চিঠি রেখে গেছে। দাঁড়া নিয়ে আসি।'

মা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। মা চলে যেতেই মার কথা ভাবতে বসলাম। মা যেন একটু রোগা হয়েছে। নাকি স্নান করে নি বলে মাকে রুক্ষ দেখাচ্ছে। মা তো আগে সকালে উঠেই স্নান করতো। আজকাল সকালে স্নান করে না কেন মা? তোমার কি শরীর খারাপ হয়েছে? একটু ঠান্ডা লাগলেই মার জ্বর হতো। মার কি ঠান্ডা লাগল আবার?

মা ঘরে ঢুকতেই বললাম, 'তোমার কি শরীর খারাপ?'

মা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল, 'শরীর খারাপ হতে যাবে কেন?'

'আগে তুমি সকালে উঠে স্নান করতে।'

'ওমা, তোর সবদিকে নজর হয়েছে আজকাল। আগে কি করতাম না করতাম সব মনে করে বসে আছিস।' মা এসে আমার পাশে বসল। পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, 'তুই অনেক রোগা হয়ে গেছিস।'

'তোমার বাতিক। কই, চিঠিটা দাও তো দেখি।'

মা চিঠি দিল। ঘোতনের চিঠি। কতদিন আগেকার ঘোতন! ঘোতন যে আবার ফিরে আসবে, আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইবে, ভাবতেও পারি নি। ঘোতন লিখেছে, মাস তিনেকের ছুটি নিয়ে এসেছি। মা মারা গেছে। বড় কষ্ট পেয়েছে জীবনে, মরে গিয়ে বাঁচল মা। দুঃখ সে জন্যে নয়; দুঃখ, মরবার সময় মা নাকি আমার নাম করে খুব কান্নাকাটি করেছিল। থাক, যা হয়ে গেছে তা নিয়ে ভেবে লাভ নেই, শ্রাদ্ধ চুকে গেছে। চলে যাবার আগে যদি পারিস, দেখা করিস, বলে ঘোতন নীচে একটা ঠিকানা দিয়েছে। মা বলল, 'ওকে তোর ঠিকানা দিতে চেয়েছিলাম, বলল, চিঠিটা খামে ভরে আপনারাই পাঠিয়ে দেবেন। ভেবেছিলাম, আজই দুপুরে চিঠি পোস্ট করবো, এর মধ্যে তুই এসে গেলি।' মা আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। হঠাৎ ঘোতনের মাকে মনে পড়ে গেল। সেই যে ঘোতনের মা আলুথালু বেশে চীৎকার করে কাঁদছিল, ঘোতন, ঘোতন রে—। এক একজন মানুষ শুধু কাঁদতেই জন্মায়। আমার মাকে বিশেষ কোনদিন কাঁদতে দেখি নি। এমনকি বাবা মারা যাবার পরেও মা কাঁদে নি। যদিও কেঁদে থাকে লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদেছে। কান্না দেখলে আমার খুব খারাপ লাগে এ কথা মা জানে বলেই আমার সামনে কাঁদে না।

আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে মা বলল, 'কি লিখেছে রে তোর বন্ধু?'

'ওর মা মারা গেছে। শেষ সময় ঘোতনকে দেখবে দেখবে করে খুব নাকি কান্নাকাটি করেছিল।'

মা যেন শিউরে উঠল, আমার একটা হাত চেপে ধরে বলল, 'হয় তুই আমাকে পাটনায় নিয়ে চল, না হয় বদলি হয়ে আবার কোলকাতায় ফিরে আয়। কী হবে এত টাকা পয়সা দিয়ে। তার চেয়ে যেরকম ছিলাম, সে রকমই থাকবো। তবু বাড়িটার দেখাশুনো হবে। তোর বাবার খুব সখের বাড়ি ছিল। কে জানে অযত্নে কী হয়েছে বাড়িটার।'

মাকে অভয় দিয়ে বললাম, 'কদিনে কী আবার হবে বাড়ির। তা ছাড়া বলাই ভাল ছেলে, ও তো বলেছে, রোজ রাত্রে শোবে, ভালভাবে দেখাশোনা করবে। আমি গিয়ে না হয় দেখে আসবো একদিন। দরকার হয় বলাইকে কয়েকটা টাকা দিয়ে আসবো। জঙ্গল টঙ্গল পরিষ্কার করিয়ে নেবে।'

বড়মামা এসে ঘরে ঢুকলেন। মামার হাতে বাজারের থলি। আমাকে দেখে খুশী হলেন বড়মামা, 'পুজোয় এলি! বেশ, বেশ! আমার মন বলছিলো, তুই আসবি। এক এক সময় মনে যা ডাক দেয়, ঠিক ফলে। ওকে চা টা দিয়েছিস খুকী?'

মা উঠতে উঠতে বলল, 'খেতে দিতে চাইছি, ও তো না না করছে।'

'না বড়মামা, মা একটুও চা দিতে চায় নি, শুধুই গল্প করছে।'

মা রাগের ভান দেখিয়ে বলল, 'দেখেছেন দাদা, ও কিরকম মিথ্যুক হয়েছে পাটনায় গিয়ে।'

মার কথা বলার ভঙ্গীতে বড়মামা হেসে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমিও অট্টহাসিতে ভেঙে পড়লাম। এমন প্রাণখোলা হাসি কতদিন হাসতে পারি নি।

চা খেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। মা বলল, 'আবার কোথায় চললি?'

'একটু ঘুরে আসি। এক্ষুনি ফিরে আসবো।' বলে বাইরে বেরিয়ে এলাম। কোথাও যাবার স্থিরতা নিয়ে বেরোই নি। মনে হচ্ছিল, কতদিন পরে কলকাতায় এলাম, রাস্তায় রাস্তায় একটু ঘুরে আসি। রাস্তায় নেমেই মনে হল, ঘোতনের সঙ্গে দেখা করে আসি। চিঠিটা পকেটেই ছিল, ঠিকানা দেখে নিয়ে একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে পড়লাম।

ট্যাক্সি থেকে নেমে নম্বর মিলিয়ে কলিং বেল টিপতেই একটি ছেলে বেরিয়ে এল। বললাম, 'ঘোতন আছে?'

'ঘোতন কে?' ছেলেটি পাল্টা প্রশ্ন করল।

মুস্কিলে পড়লাম। ঘোতনের ভাল নাম আমার মনে নেই। ওকে চিরদিন ঘোতন বলেই জানি। বললাম, 'যার মা কিছুদিন হল মারা গেছেন।'

'ও, দেবেশদা। আপনি বসুন, আমি ডেকে দিচ্ছি।' বলে ছেলেটি ভেতরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর ও আবার এসে ঘরে ঢুকল। পেছন পেছন ঘোতন। ঘোতন এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। ঘোতনকে দেখে আমি তো হতবাক। ঘোতনের পরনে নিখুঁত সাহেবী পোশাক; কী সুন্দর হয়েছে ঘোতন। আগেও ফর্সা ছিল। কিন্তু অসম্ভব রোগা থাকায় রং খুলতো না। এখন ঘোতনকে পাক্কা সাহেবের মত দেখাচ্ছিল।

আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ঘোতন হেসে ফেলল। বলল, 'অবাক হয়ে দেখছিস। ভাবছিস হিন্দুধর্ম ছেড়ে কোন ধর্ম নিয়েছি কিনা। না, সে সব কিছু না। এদেশে এসে পৌঁছাতে পৌঁছাতে তেরো দিন কেটে গেল। কালীঘাটে গিয়ে শ্রাদ্ধ করে এলাম। কিন্তু চুলটুল আর কামালাম না। কী হবে শুধু শুধু ন্যাড়া হয়ে। মা বেঁচে থাকতেই তো মাথা মুড়িয়ে সন্ন্যাসী হয়েছিলাম, আর কী হবে!' বলে ঘোতন হাসতে লাগল।

আমার দৃষ্টির ঘোর তখনও কাটে নি। বললাম, 'বাইরে কোথায় থাকিস?'

ঘোতন খুব কায়দা করে বলল, 'স্টেটস-এ। স্টেটস মানে বুঝিস তো। আমেরিকা। আমি এখন সেখানকার সিটিজেন। সাবধানে কথা বলিস আমার সঙ্গে।' বলে ঘোতন সমানে হাসতে লাগল।

বললাম, 'কি করিস?'

'চাকরি। কিন্তু সে সব দেশে চাকরি মানে চাকর না। বস আর নীচের কর্মচারী সবাই এক। সবাইকে সবাই নাম ধরে ডাকে।'

'কবে ফিরবি?'

'ভেবেছি, একেবারে বিয়ে করেই ফিরবো।'

আঁৎকে উঠলাম, 'সে কী, এক বছর পর্যন্ত তো কাল-অশৌচ।'

ঘোতন হো হো করে হেসে উঠল, 'যে লোক মা মরে যাবার সময় কাছে থাকল

বেঁচে থাকতে ডেকে জিজ্ঞেস পর্যন্ত ল না, মরার পরে এক বছর ধরে একটা কর চিহ্ন বয়ে নিয়ে বেড়াবে! ভয়ানক ন্যকর, বেজায় গরমিল ব্যাপার।'

ঘোতনকে ভীষণ অস্বাভাবিক বলে ন হতে লাগল। বললাম, 'বিয়েটা সেই শে সেরে ফেললেই পারতিস।'

ঘোতন খুব বুদ্ধিমানের মত মুখ-ভগী করে বললে, 'সেটি হচ্ছে না বাবা। শটা ভালো হলে কী হবে, মানুষগুলো, বিশেষ করে মেয়েগুলো, এক একটা ফার্নেস। দাউ দাউ করে জ্বলছে। যা পাচ্ছে জ্বলন্ত জঠরে নিয়ে পুড়ছে। বউ হিসেবে বাঙালী মেয়েরাই আইডিয়াল। ঘর সংসারও সামলাবে, খরচাও কম। ওসব দেশে ঝি চাকর রাখা অসম্ভব। অথচ কাজ করতেও আমার ভীষণ আলস্য। ভাবছি লেখাপড়া জানা কোন মেয়ে বিয়ে করে নিয়ে যাব। একটা জুৎসই চাকরি জুটিয়ে নিতে পারলে, তার ভাগ্যেও মাসিক পাঁচ সাত হাজার জুটে যাবে।'

আমার চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। বললাম, 'পাঁচ সাত হাজার টাকা?'

'ইয়েস মাই বয়, ইয়েস। পাঁচ সাত হাজার টাকা ওখানে কিসসু না। চলে আয় না। তোফা থাকবি।'

'ধুর!'

'ধুর কি, আয় না। আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো। তুই শুধু গোটা কয়েক ফর্ম-এ

সই করে দিস। এক্ষুনি কথা দিতে হবে না। ভেবে দ্যাখ। আমি আরও কিছুদিন আছি।'

'তুই কি কোথাও বেরোবি ঘোতন?'

'ইচ্ছে ছিল, রিজার্ভ ব্যাঙ্কে যাব। কিছু টাকা আসার কথা আছে। মার নামে কোন আশ্রম টাশ্রমে দান করে দিয়ে যাব।' কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ঘোতন আবার বলল, পাপের প্রায়শ্চিত্ত আর কী।'

বললাম, 'বিকেলের দিকে যাস না আমাদের বাড়ি। চাটা খাবি। তারপর ন'টার শোতে সিনেমায় নিয়ে যাব। বাংলা বই তো দেখিস না অনেকদিন। কতদিন ওখানে আছিস রে?'

ঘোতন হিসেব করে বলল, 'বছর পাঁচেক।'

'কোথায় থাকিস।'

'পিটসবার্গ। ভাবছি নিউঅর্কে চলে আসবো। তুই এলে কিন্তু ভারী মজা হবে। আমার সংসারে পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকবি। তারপর ঝোপ বুঝে কোপ মেরে তুইও একদিন বাঙালী একটা মেয়েকে বউ করে নিয়ে যাবি। দিব্যি আরামে পায়ের ওপর পা দিয়ে খাবি। এখানকার মত ঝুটঝামেলা পোয়াতে হবে না।' বলে ঘোতন বিকট শব্দ করে হাসতে লাগল।

ওকে থামিয়ে দেবার জন্যে বললাম, 'এখানে আমারও কোন ঝুটঝামেলা নেই। হাত পা ছড়িয়ে দিব্যি আরামে থাকি। হুকুম করবার আগেই কাজ হয়ে যায়।'

ঘোতন আমার কথায় সায় দিয়ে বলল, 'যা বলেছিস। দেশটা কিন্তু ছিল মন্দ না। যত সব হুজুককে দলগুলো সব নষ্ট করে দিলে মাইরি।'

গম্ভীরভাবে বললাম, 'এই এক্সপ্লয়টেশন তো আর চিরদিন চলতে পারে না। ধীরে ধীরে, লোকের চোখ খুলছে।'

ঘোতন খুব হালকাভাবে বলল, 'তোরা লোকের চোখ ফোটা বসে বসে। আমার ওসব নিয়ে মাথা ব্যথা নেই। আমি এখন আর এখানকার নেটিভ না, দস্তুরমত একজন ইয়াংকি। তোদের প্রবলেমকে আর নিজের প্রবলেম বলে ভাবি না।' খুব কায়দা করে ঘোতন কথাগুলো বলল।

বললাম, 'তুই অনেক পাল্টে গেছিস।'

'দশচক্রে ভগবান ভূত হন মাই ডিয়ার বয়, ঘোতন কোন ছাড়। একদিন বেকার ছিলাম, পরে সন্ন্যাসী হলাম, এখন সাহেব বনেছি, একদিন হয়তো দেখবি সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে পুনঃ মূষিক ভব। হয় বেকার, না হয় ভবঘুরে সন্ন্যাসী। আসল কথাটা কি জানিস ভোল পাল্টে পাল্টে মাঝে মাঝে নিজেকে দেখতে ভাল লাগে। শুধু যে নিজেকে তা না, সঙ্গে সঙ্গে আশে-পাশের সবাইকে। এই দ্যাখ না, এ বাড়িটা আমার এক জ্যাঠতুতো বোনের শ্বশুর-বাড়ি। আমার যে কোন বোন ছিল, আগে জানতামই না। হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে কোন গজিয়ে উঠল। কী তোয়াজ মাইরি! যেন রাজা ভাই এসেছে। ফাঁকতালে থাকা-খাওয়ার জায়গাটা বেঁচে গেল।' বলে ঘোতন আবার সেই বিকট হাসি শুরু করতে যাচ্ছিল।

ওকে ধমক দিবে বললাম, 'তুই এখনও আউট অ্যান্ড আউট কুচুটে বাঙালী রয়ে গেছিস ঘোতন, যেখানে হাত পাতছিস, সেখানেই থুথু ফেলছিস।'

ঘোতন একটুও দমল না। গলা ছেড়ে সমানে চেঁচাতে লাগল, 'বাঙালী বলে না, সব জাতের দস্তুরই তাই। ওখানে আমার বাড়ির ঠিক পাশেই একটা মাতাল থাকে। লোকটা রোজ আমার কাছ থেকে মদ চেয়ে নেবে, আর নেশা চড়লে আমাকেই ডার্টি নিগার বলে গালাগাল দেবে। একদিন ব্যাটাকে অ্যাইসা ধোলাই দিলাম, যে নাক ফেটে গল গল করে সে কী রক্ত! ওদেশের লোকেদের রক্ত কী লাল মাইরি! আমাদের মত ফিকে ফিকে রং না।'

ঘড়ির দিকে নজর যেতেই লাফিয়ে উঠলাম। বারোটা বাজতে চলল, অথচ নাওয়া খাওয়া হয় নি। ঘোতন বলল, 'কী হলো, চিড়িং বিড়িং করে লাফাচ্ছিস কেন?'

বললাম, 'নাওয়া খাওয়া হয় নি এখনও।'

'খাই খাই করেই মরলি তোরা।'

বললাম, 'বিকেলে কিন্তু ঠিক যাস। তোর জন্যে অপেক্ষা করবো।'

'যাব।' বলে ঘোতন আমার সঙ্গেই বেরিয়ে পড়ল। একটা ট্যাকসি যাচ্ছিল, চিৎকার করে ডাকল, ট্যাকসিতে উঠে বসে ঘোতন আমাকেও ডেকে তুলল, তারপর ড্রাইভারকে বলল, 'ডালহাউসী। জলদি।'

আমি আপত্তি জানাতে যাচ্ছিলাম, হাতের ইসারায় আমাকে থামিয়ে দিয়ে ঘোতন বলল, 'চেঁচাস নি গাঁক গাঁক করে, আমাকে নামিয়ে দিয়ে তুই বাড়ি চলে যা।'

ঘোতনের কথা শুনে আমি থ। বললাম, 'বাড়ি মানে?'

ঘোতন গম্ভীর মুখে বলল, 'মানেটা খুব সহজ ভায়া। আমাকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সামনে ছেড়ে দিয়ে তুই সোজা বাড়ি চলে যা। তোদের ঠিকানাটা দিয়ে যা, বিকেলে যাব। নে, তাড়াতাড়ি কর। এমনভাবে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছিস, যেন শিশু এইমাত্র ভূমিষ্ঠ হল রে।' বলে ঘোতন আমার চিবুক নেড়ে দিতে দিতে হঠাৎ অট্ট-হাসিতে নুয়ে পড়ল।

আমার বিষম রাগ ধরে গেল, 'তুই আগের মতই ফাজিল আছিস।'

হাসতে হাসতে ঘোতনের দম বন্ধ হয়ে আসছিল। কোনমতে এক ফাঁকে বলল, 'আর তুই ঠিক আগের মত, গাধা—' ঘোতনের হাসি আরও জোরে শুরু হল। ড্রাইভার পর্যন্ত একবার পেছন ফিরে তাকাল। ঘোতনের কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, সমানেই হাসতে লাগল। ঘোতনকে দেখতে দেখতে এক সময় আমারও দারুন হাসি পেয়ে গেল। আমিও ওর সঙ্গে সঙ্গে হাসতে লাগলাম। রাজভবনের পাশ দিয়ে গাড়ি তখন ডাল-হৌসীর দিকে চলেছে। আর একটু পরেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কে পেঁাছে যাব। আমার মনে হতে লাগল, এই মুহূর্তে যদি গাড়ি টায়ার ফেটে যায়, কিম্বা হঠাৎ কোন কার' গাড়িটা বন্ধ হয়ে যায়, আমাদের পেঁৗছ অনেক দেরী হয়ে যাবে। আর এই অব আমিও ঘোতনের সঙ্গে প্রাণভরে হে নিতে পারবো। আমার মনে হচ্ছিল, আ যেন কত বছর হাসতে পারি নি। না হে হেসে আমার বুকটা কী অসম্ভব ভারী হ গিয়েছিল।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সামনে ঘোতন নে পড়ল। ঘোতন তখনও একটু এ হাসছিল। ঘোতন বেশ ফর্সা। হাসতে হা ওর মুখ লাল হয়ে উঠেছে। ওকে সুন্দর দেখাচ্ছে। ঘোতন আমাকে নেড়ে বলল, 'এখন যাও, গুনে গুনে ভ মাশুল দাও গে। আমার সঙ্গে ট্যাকি ওঠাই তোর ভুল হয়েছিল।' বলে ঘে আবার নতুন করে হাসতে লাগল।

বাড়ি ফিরেও হাসির রেশটা রয়ে গে মা বলল, 'কী রে, কোথায় গিয়েছি তোদের ম্যানেজারের মেয়েটি বসে থেকে চলে গেল। কী চমৎকার দেখতে মেয়েটি। সুপ্রিয়ার চেয়েও সুন্দরী। সুপ্রিয়ার মত অত অমায়িক না. এ দেমাকী বলে মনে হল।'

কী রকম সন্দেহ হল, জিজ্ঞেস করলা 'সুপ্রিয়া সুপ্রিয়া করছো কেন? ও ঘন-ঘন আসা-যাওয়া করে নাকি?

মা যেন আকাশ থেকে পড়ল, 'অ না! মানুষের বাড়ি মানুষ আসে না! ম মাঝে দাদার ছোট ছেলেটার জন্যে এটা- নিয়েও আসে।'

মার কথা শেষ হবার সঙ্গে স উঠলাম, 'তোমরা তা-ই হাত পেতে ·

মা ভীষণ অবাক হয়ে বলল, না? কেউ ভালবেসে কিছু দিলে দেব! তুই কী হয়ে যাচ্ছিস রে দিনে মা এমনভাবে আমার দিকে তাকাল, সত্যি সত্যি আমি কী হয়ে গেছি।

আর কথা না বাড়িয়ে বলল। 'ম্যানেজারের মেয়ে কী বলে গেল?'

মা বিরস মুখে বলল, 'বলল বিকে নাকি আবার আসবে. এত করে বস বললাম, কিছুতেই বসলো না। অ সুপ্রিয়া যেখানে-সেখানে বসে পড়ে। রান্না ঘরে বউদি রাঁধছে কি তরকারি কুটছে, গি বসে পড়ল। সেদিন তো জোর করে প তরকারি দিয়ে একটা ঘণ্ট রাঁধলো, খে দাদা কী মুগ্ধ! দাদাও মেয়েটিকে খ ভালবাসে কিনা।'

বিস্মিত হয়ে মার মুখের দি তাকিয়ে রইলাম, সুপ্রিয়া যে এত ধুর জানা ছিল না। ও যে এই পরিবারের ম ধীরে ধীরে নিজেকে বিস্তার করে নিয়ে এর মধ্যে একটা চাপা স্বার্থের গন্ধ ছা আমি অন্য কোন গন্ধই পেলাম না। আ যাতে ওর কথার অবাধ্য হতে না পা ভৃত্যের মত আজীবন ওর সাথে সাথে চ সুপ্রিয়া সেটা পাকাপাকি করে নিতে চা আমি চুপ করে আছি দেখে মা মুচ হেসে বলল, 'বয়স কম হয় নি আমা চুলও অমনি অমনি পাকে নি। মানু

চিনতে ভুল হয় না আমার। তাছাড়া শুধু আমার চোখই না। দাদার চোখ তো আর কম পাকা না। খুব ভালো মেয়ে সুপ্রিয়া।'

মনে মনে গর্জে উঠলাম, ছাই ভাল। ওষুধ খেয়ে খেয়ে বড়মামার ঘিলু একেবারে শুকিয়ে গেছে, না হলে সুপ্রিয়ার মত মেয়ের গুণেও মুগ্ধ হয় মানুষ।'

মা বলল, 'তুই যে কী নজরে দেখলি মেয়েটাকে! কথায় কথায় ও তো বলেই ফেললো সেদিন, তুই নাকি ওর কথা শুনলেই রেগে যাস, তোর কিছু ভাল করতে গেলেই নাকি তার মধ্যে ওর স্বার্থ খুঁজে বেড়াস। অথচ আমরা তো জানি, এ সবের মধ্যে সুপ্রিয়ার কোন স্বার্থ নেই।'

'তোমরা বলতে?' খুব শান্তভাবে মাকে প্রশ্ন করলাম।

মা অবলীলাক্রমে বলল, 'এই আমি, দাদা, বৌদি—সবাই।'

মার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলাম। মা বলল, 'নে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর ঢং করতে হবে না। চল, খেতে চল। ভাল কথা, সুপ্রিয়াকে জানিয়েছিস যে, তুই এসেছিস?' ঘাড় নাড়তেই মা ফেটে পড়ল, 'কী হচ্ছিস রে দিনকে-দিন। ওকে তোর ভাল না লাগে, না লাগুক। কিন্তু কৃতজ্ঞতা বলেও তো একটা জিনিস আছে। এই যে তোর জন্যে এত করছে, মুঠো মুঠো টাকা হাতে পাচ্ছিস, কার জন্যে? বল্, কার জন্যে এত সব হচ্ছে? অথচ সামান্য দুটো মিষ্টি কথা তা-ও বলবি না। একটা খবরা-খবর দিবি না! তুই তো আগে এরকম ছিলি না রে!' বলতে বলতে মা আমার একটা হাত চেপে ধরল। শরীরটা কী রকম শির শির করে উঠল। মাকে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বললাম, 'ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছে মা। চলো, খেতে দেবে।'

বড়মামীমা খেতে দিচ্ছিলেন। মা সামনে বসে ছিল। চুপচাপ করে খাচ্ছিলাম। হঠাৎ বড়মামীমা প্রশ্ন করলেন, 'সকালে যে মেয়েটি এসেছিল, সে কী করে?'

বললাম, 'এম-এ পড়ে।'

বড়মামীমা আর কথা বললেন না। প্রশ্ন করলাম, 'কেন?'

বড়মামীমা ভাত দিতে দিতে বললেন, 'একটু দেমাকী বলে মনে হল। একটু কেন, বেশ দেমাকী।'

খেতে খেতে বললাম, 'মাও বলছিল।'

বড়মামীমা সঙ্গে সঙ্গে বললেন,, 'মা কেন, সবাই বলবে।'

হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। বলে ফেললাম, 'ওর বিয়ের ঠিক হয়েছে, তাই কোলকাতায় এল। মার্কেটিং করতে। ওর বাবা আমার ঘাড়েই চাপিয়ে দিল। ম্যানেজার, মুখের ওপর তো না বলতে পারি না।'

মা বলল, 'না বলে ভালই করেছিস। ওপরওয়ালার অবাধ্য হলে চাকরির ক্ষতি হয়।'

হেসে ফেললাম। 'তোমার তো চাকরি-বাকরি সম্বন্ধে আজকাল বেশ জ্ঞান হয়েছে।'

বড়মামীমা মার পক্ষ নিয়ে বললেন, 'শুধু ওর হবে কেন, আমরা সবাই অনেক কিছু শিখে গেছি আজকাল।'

'সুপ্রিয়াই শিখিয়েছে বোধ হয়।' আমার কথার সুরে শ্লেষ ছিল। মা বুঝতে পেরে বলল, হ্যাঁ, ও-ই শিখিয়েছে। শুধু যে শিখিয়েছে, তাই না। কত উপকার করছে আমাদের। দাদাকে কতগুলো অষুধ এনে দিয়ে গেল। দাদা অবিশ্যি নিতে চায় নি। ও কী বললো জানিস। বললো, আপনার যদি একটি মেয়ে থাকতো, এভাবে না করতে পারতেন। শেষ পর্যন্ত দাদাকে নিতেই হল। গায়ে পড়ে নিজেই বলেছে, তাপস বি-এ পাশ করলেই তোদের অফিসে ঢুকিয়ে দেবে। আজকাল নিজের আত্মীয়রাই ফিরে তাকায় না, আর এ তো পরস্য পর।'

মাত্র এক দেড় মাস কোলকাতা ছেড়ে রয়েছি, এর মধ্যেই এ কী বিরাট পরিবর্তন। মাকে লোভী মানুষ বলে কোনদিন কল্পনা করতে পারি নি। হঠাৎ মাকে অন্য রকম ভাবতে হল বলে নিজের ওপরই প্রথমে রাগ ধরল। শেষ পর্যন্ত রাগটা গিয়ে পড়ল সুপ্রিয়ার ওপর। সুপ্রিয়ার সঙ্গে দেখা হলে সুদে আসলে রাগের ঝাল মিটিয়ে নেওয়া যেত। কিন্তু সে সুযোগ আসবে না। কারণ ওকে কোনমতেই ফোন করে জানাতে পারবো না যে আমি কোলকাতায় এসেছি।

খাওয়া-দাওয়া সেরে সামনের ঘরে এসে শুলাম। মাও এসে আমার পাশে শুল। একথা-সেকথার পর মা আমার বিয়ের কথা পাড়ল। 'দাদা বলছিলো, নিতু আর অপেক্ষা করতে চাইছে না। সুষমার বয়স হয়েছে, এর পরে, যদি কোন কারণে তোর সঙ্গে বিয়ে না হয়, বিয়ে দিতে বেগ পেতে হবে। অথচ এক্ষুনি কথা পাকাপাকি করারও কোন মানে হয় না। কী যে করি। ভেবে ভেবে কূল কিনারা পাই না।' কথা বলতে বলতে এক সময় মা ঘুমিয়ে পড়ল। আমার ঘুম আসছিল না। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম, এই ক'দিনের মধ্যে মা অনেক বদলে গেছে। মা যে একটা দারুণ সংশয়ের মধ্যে রয়েছে, বুঝতে পারলাম। কিন্তু সংশয়টা কী নিয়ে? আমার সঙ্গে সুষমার বিয়ে নিয়ে, না শুধুমাত্র আমার বিয়ের ব্যাপারেই সংশয়। আমার মনে হতে লাগল, আমি যদি সুষমাকে বিয়ে না-ও করি, মার খুব একটা আপত্তি নেই। যদি সুপ্রিয়া আমার বউ হয়, যদিও জানি সেটা কিছুতেই সম্ভব না; একটা উদ্ভট চিন্তা ছাড়া যার কোন মূল্যই নেই, এবং এ ধরনের চিন্তা মানুষের মাথায় আসে তখনই, যখন সে অতিরিক্ত বেশী মাত্রায় খেয়ে বিছানায় গড়াতে থাকে। আমার মনে হতে লাগল, মা কিম্বা বড়মামা, কিম্বা বড়মামী কেউ-ই এই বিয়েতে আপত্তি করবেন না। বরং সকলেই খুশী হবেন। শুধু খুশী হবেন না, খুব-খুব খুশী হবেন। এবং এই খুশী হওয়ার মূলে রয়েছে সুপ্রিয়ার দুরভিসন্ধি এবং কু-চিন্তা। আর রয়েছে, যদিও ভাবতে ভাল লাগছিল না, তবু পারিপার্শ্বিক সংসার যারা আমাকে এই বিষয়ে গভীর সচেতন করে তুলছিল, আর রয়েছে, মধ্যবিত্ত পরিবারের হতাশা, ক্ষোভ, গ্লানি, অনীহা এবং লাভ। দেখতে দেখতে সমস্ত মনে একটা তিক্ত অনুভূতি ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ঘুমের মধ্যে মা

আমার দিকে পাশ ফিরে শুলে। মার একটা হাত এসে আমার বুকে পড়েছে। মার হাতটা অসম্ভব ভারী বলে মনে হতে লাগল। মনে হল, মাকে জাগিয়ে তুলি। বলি, তোমার হাতটা সরাও মা, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। কিন্তু সেকথা বলা খুব অন্যায় হবে। মা ভয় পাবে। ভয় পেয়ে নানা কথা ভাববে। ভাববে, বাইরে থেকে থেকে আমার শরীর খুব খারাপ হয়ে গেছে। না হলে আমার বুকে হাত রেখে শোয়া মার পক্ষে নতুন না। আগে আমার দম বন্ধ হয় নি কোনদিন।

চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি। আজ দুপুরে ঘুমোতে পারলে ভাল হতো। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছিল না, নাক মুখ চোখ গরম হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত রাগটা গিয়ে পড়ল নিজের ওপর। আমি যদি দুর্বল না হতাম, অন্তত মাকে একটা বিরাট পতনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারতাম। সুপ্রিয়ার ব্যাপারে মার দুর্বলতাকে আমি একটা বিরাট পতন বলে মনে করি।

শুয়ে শুয়ে ঠিক সময়ের আন্দাজ করতে পারা যাচ্ছিল না। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ থাকায় একটা অন্ধকার অন্ধকার মতন ভাব। অথচ উঠে যে ঘড়ি দেখবো, তাও ইচ্ছে করছিল না। মার ঘুম ভেঙে যাবে। হঠাৎ মা ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসল। বলল, 'ইস্, একেবারে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঐ মেয়েটি তো বলে গেছে বিকেলে আসবে। বসাবার মত ঘর তো এই একটিই। কখন না কখন এসে পড়বে। তুই-ও ওঠ, ঘরটা পরিষ্কার করে ফেলি।'

'ঘর পরিষ্কার করতে হবে না। ওরা জানে যে আমরা গরীব গেরস্থ মানুষ। ঘোতনও আসবে। ও যদিও বাইরে খুব সাহেব-সাহেব ভাব দেখাতে চেষ্টা করছে, ওতো জানে না, আমি ওকে কত ভাল করে চিনি। ও ঠিক আগের মতই আছে। অনর্থক এত হাসতে পারে, মনে হয় ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

মা ঘোতনের কথা খুব অনামনস্কভাবে শুনছিল। মার এটা একটা প্রকাণ্ড দোষ। নিজেদের মানুষ ছাড়া অপরের ব্যাপারে কোন আগ্রহ নেই। মা উঠে গিয়ে জানালা খুলে দিল। একঝলক রোদ এসে ঘরে ঢুকল। মা বলল, চারটে বেজে গেল, এবারে ওঠ, ওরা হয়তো এসে পড়বে।'

বিরক্ত হয়ে বললাম, 'আসে আসুক। আমি শুয়ে থাকবো।'

মা আমার পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, 'আজকাল সব কথায় এত রাগ করিস কেন রে! আগে তোর মেজাজ কত ভাল ছিল। আজকাল একটুকুতেই বিরক্ত হোস, ধৈর্য হারিয়ে ফেলিস। কী হয়েছে তোর?'

উল্টোদিকে পাশ ফিরে শুতে শুতে বললাম, 'কিছুই হয় নি। শুধু রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি বলে ঘুম পাচ্ছে।'

মা কথা বলল না। যেমন মাথায় হাত বুলোচ্ছিল, সে ভাবেই হাত বুলোতে লাগল। মা-ই যে শুধু আমার পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে তা না, আমি নিজেও একটা বিরাট পরিবর্তন অনুভব করছিলাম। প্রচণ্ড বিদ্রোহ যেন আমার মধ্যে মাথা উঁচু করতে শুরু করেছে। কার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানি না। হয়ত জগৎশুদ্ধ সবার বিরুদ্ধে। কিম্বা বাইরের কারও বিরুদ্ধে না, শুধুমাত্র নিজেরই বিরুদ্ধে। মানুষ যখন পরাজিত হতে থাকে, তখন সে সবচেয়ে বেশী ক্ষুব্ধ হয় নিজের ওপর। কতগুলো গুপ্ত নখ আর হিংস্র দাঁত দিয়ে সে নিজেকেই ক্ষতবিক্ষত করতে চায়। আর যত ভেতরে ভেতরে রক্তাক্ত হতে থাকে, তত বেশী হিংস্র হয়ে ওঠে সে। তখন সব কিছু ভুলে গিয়ে মরণ খেলায় মেতে ওঠে সেই বিক্ষুব্ধ মানুষ। ধ্বংসের মন্ত্র তার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তোলে। আমি নিজের মধ্যে সেই বিক্ষুব্ধ মানুষকে আবিষ্কার করলাম। করে শিউরে উঠলাম। নিজেকে এভাবে কোনদিন দেখিনি। দেখবো বলে ভাবি নি।

আমি নিজেকে একজন পরাজিত মানুষ বলে ভাবতে লাগলাম।

কতক্ষণ এভাবে শুয়েছিলাম জানি না। হঠাৎ দরজায় শব্দ উঠল। মা উঠতে উঠতে বলল, 'সেই কখন থেকে বলছি, ওঠ, ওরা এসে পড়বে। এখন কী করবি।'

শান্ত গলায় বললাম, 'দরজা খুলে দাও, আমি আর একটু শুয়ে থাকবো।'

'তোদের ম্যানেজারের মেয়েও তো হতে পারে।'

'হোক, তুমি দরজা খুলে দাও।'

দরজা খুলে দিতেই ঘরে ঢুকল ঘোতন। ঘোতনের স্বভাব চীৎকার করে কথা বলা। ও সে ভাবেই বলল, 'ইস, ঘরটাকে যে একেবারে অন্ধকূপ করে রেখেছিস রে। আলো থেকে এসে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।' মা আলো জ্বালতেই ঘোতন মাকে দেখতে পেল। মাকে প্রণাম করতে গেল ঘোতন। মা সরে গিয়ে বলল, 'থাক, সুখে থাকো।' আমি জানি, মা যদি মনে মনে কারও ওপর বিরক্ত হয়, তার প্রণাম নেয় না। মার বিরক্তির কারণ বুঝতে পারলাম। ঘোতন ওর মাকে অবহেলা করেছে, মা মারা যাবার সময় একমাত্র ছেলে হয়েও কাছে ছিল না, এটা মার কাছে বিরাট একটা অপরাধ।

ঘোতন খাটের এক কোণায় বসে পড়ে বলল, 'তোরা যে কী ঘুমোতে পারিস। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে একটা জাত সাবাড় হয়ে গেল, আর ও দেশের মানুষ না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কত এগিয়ে গেল।'

মা নীরস গলায় বলল, 'গরমের দেশের মানুষেরা একটু বেশী ঘুমোয়।'

ঘোতন মার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিল, 'আমেরিকার একটা দিক বেশ গরম মাসীমা। সেখানকার লোকেরাও খুব কম ঘুমোয়। দিনের বেলায় ঘুমের কথা ওরা ভাবতেই পারে না।'

'রাত্রে ট্রেনে করে না ঘুমিয়ে এলে ওদের দেশের মানুষও দিনের বেলা ঘুমোয়।' মা এমনভাবে বলল, যে ওখানকার মানুষ সম্বন্ধে মার ব্যক্তিগ অভিজ্ঞতাও কিছু কম না।

ঘোতন হঠাৎ খুব শান্ত ছেলের ম হার স্বীকার করে নিল। বলল, 'রাত্রে ঘুমোলে অবিশ্যি দিনে ঘুমোনোটা অন্য না। তুই কি এখন ঘুমোবি? আমি তা আর একদিন আসবো।' বলে ঘোতন উঠে যাচ্ছিল, ধড়মড় করে উঠে বসলাম। সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি গিয়ে পড়ল দরজার ওপর আমার সঙ্গে সঙ্গে মা আর ঘোতনও সেইদিকে তাকাল।

দরজার ওপিঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে নমস্কার করছে লীলাবতী।

উঠে দাঁড়িয়ে লীলাবতীকে অভ্যর্থ জানিয়ে ভেতরে এনে বসালাম। মা আমার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'তুই হাত মুখ ধুয়ে আয়। আমি ততক্ষণ সংগে কথা বলি। তা ছাড়া, ঘো রয়েছে।' মা লীলাবতীর দিকে তা বলল, 'ও আমার ছেলের বন্ধু। অনেক ধরে আমেরিকায় রয়েছে। দিন কয়েক এসেছে, আবার চলে যাবে।' মা যেন হ সামনে ঘোতনকে পেয়ে বেঁচে গেল। কিছুক্ষণ আগে মা ঘোতনের সঙ্গে কী বিশ্রী ব্যবহার করছিল। মনে মনে সংকল্প করে ফেললাম, একবারে পাটনায় গিয়ে আর দেরী না। যত তাড়াতাড়ি হয় বাড়ি ঠিক করে মাকে নিয়ে যাব। এখানে থাকলে মার যে কী দশা হবে কে জানে। যার তার কাছে নিজেকে বড় করতে গিয়ে যে কী ছোট হয়ে যাচ্ছে মা! মার বিচারবুদ্ধি কী করে যে লোপ পেয়ে গেল!

আমি উঠছি না দেখে মা আবার বলল, 'যা, তোর মামীকে খবরটা দিয়ে আয়।'

মার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'মামীমা ঘুমোচ্ছেন। তাঁকে জাগিয়ে কী হবে তারচেয়ে আমরা সবাই গল্প করি। তুমি বোস।'

মা শেষ পর্যন্ত আমার গা ঘেঁষে বসে পড়ল। হাত দিয়ে এলোমেলো চুল পিছনে সরাতে সরাতে লীলাবতীকে বললাম, 'দুপুরে ঘুমিয়েছিলেন তো!'

লীলাবতী হেসে ঘাড় নাড়ল। বলল, 'দিনে আমার ঘুম হয় না। বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে ছিলাম, কতক্ষণে রোদ একটু পড়ে আসবে।' লীলাবতী আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল।
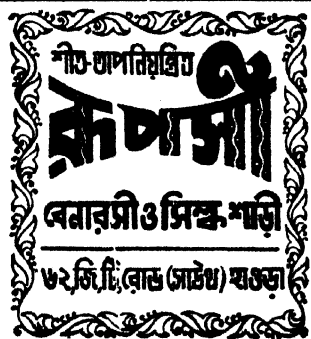
লীলাবতী আজ খুব সেজেছে। টেশায় ওকে এভাবে সাজতে দেখি নি। ক কোনো রাজরাজড়ার ঘরের মেয়ে বলে ন হচ্ছিল। লক্ষ্য করে দেখছিলাম মা র ঘোতনও খুব ঘন ঘন লীলাবতীর কে তাকাচ্ছে। ঘোতন এমনিতে অসম্ভব থা বলে। ও যেন কথা ভুলে গিয়ে লাবতীকেই দেখতে লাগল। বড়মামীমা ম থেকে উঠে এসে আমাদের সঙ্গে লেন কিছুক্ষণের মধ্যে। বড়মামীমা মেই অনুযোগ করলেন, তাঁকে ঘুম ক না জাগানোর জন্যে। লীলাবতী হাত া নমস্কার করল। ঘোতন প্রণাম করতে ছল বড়মামীমা বাধা দিয়ে বললেন, া তোমরা। প্রণাম করতে হবে না বাবা, খ থাকো। কি নাম তোমার মা?' াবতী নাম বলতে বড়মামীমা বললেন: । সুন্দর নাম। আমার ছেলেবেলার ছিল লীলা। দাদু এ নামে ডাকতেন। পর অবিশ্যি নাম হলো কুসুম। কুসুম-ী।' বলে বড়মামীমা ছেলেমানুষের খিল খিল করে হেসে উঠলেন। বড় মীমার হাসির সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভারী ওয়াটা হালকা হয়ে গেল।

ঘোতন হঠাৎ বেজায় শব্দ করে হেসে ল। ওর হাসিটা কেমনমান হলেও ও বার স্বাভাবিক হতে পেরেছে ভেবে মার ভাল লাগল। আমার অস্বস্তি ল মাকে নিয়ে। মার চোখে তখনও াস লুকিয়ে ছিল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে খদের চোখে যে আতঙ্ক জেগে ওঠে, াখের মধ্যে আমি তার ছোঁয়া দেখতে াম। কিন্তু মার পক্ষে এই ভয় ত অশোভন। লীলাবতী বড়লোকের ওর বাবা ম্যানেজার বলে ওদের আর ার না। তা ছাড়া ম্যানেজার মানে ানুষের ভাগ্য নিয়ন্তা হতে পারে না। ব দিন যে কবে চলে গিয়েছে, মা খবর রাখে না। প্রথমটা রাগ ধরলেও ীরে ধীরে মার ওপর মায়া হতে লাগল। কটা অভাবগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে এসে ড়ে মা কত অল্প সময়ের মধ্যে কত বেশী স্তবাদী হয়ে উঠেছে। কত ভীত স্ত হয়ে গেছে। অথচ না কিছুদিন গেও কত সাহসী ছিল। সমস্ত নির্জন ড়তে দিনের বেশীর ভাগ সময়, শুধু ন কেন সন্ধ্যা পেরিয়ে গেলেও, একা একা াসত। এ নিয়ে কোন অভিযোগ তো রেনি মা। যদিও করেছে, আমার দেরী রে ফেরা নিয়ে করেছে। একা একা ভয় গে বলে করে নি।

আমি যতক্ষণ এসব কথা ভাবছিলাম, ড়মামীমা ঘোতন আর লীলাবতীর সঙ্গে থা বলে যাচ্ছিলেন। সমস্ত পরিবারের ধ্যে এই মানুষটিকেই আমার খুব াভাবিক আর সরল প্রকৃতির মানুষ বলে নে হয়। মানুষ পারিপার্শ্বিকতার দাস, কথা হয়তো সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার রা যায় না। কিন্তু এই পারিপার্শ্বিকতাই ীবনের ' সবটা যে না, বড়মামীমা তারই কটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দারিদ্র্য নিয়ে া-হুতাশ কিংবা অর্থ থাকাটাই যে খুব এক গর্বের বস্তু, এ নিয়ে কথা বলতে বড়মামীকে কোনদিন শুনেছি বলে মনে পড়ে না। হাসিমুখে একভাবে সংসার চালিয়ে গেলেন ভদ্রমহিলা। কোন অভাব অভিযোগ আজ পর্যন্ত শুনি নি। সেই তুলনায় মাকে খুব অসহায় বলে মনে হতে লাগল। মা যে লীলাবতীর সামনে এইভাবে মুষড়ে পড়ল, আমাকে অযথা হাত মুখ ধুয়ে আসার জন্য পীড়াপীড়ি করল, এ তো নিজের মনেরই জটিলতার এক নিদর্শন। অবিশ্যি শুধু মা কেন, অনেকেই এ জটিলতার আবর্তে বন্দী। আমি নিজেও হয়ত। নিজের সম্বন্ধে হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠলাম। মা বলা সত্ত্বেও এই যে বসে রইলাম, হাত মুখ ধুয়ে এলাম না, এটাও তো এক ধরনের মনোবিকার। জোর করে মানুষকে অগ্রাহ্য করার এই যে স্পৃহা, এটা তো স্বাভাবিক মানুষের কাজ না। মনে হতেই উঠে দাঁড়ালাম। মা বলল, 'কিরে, উঠলি যে?'

বললাম, 'হাত মুখ ধুয়ে আসি। জামা কাপড়ও ছেড়ে আসবো। ঘোতনের সঙ্গে বেরোবো একটু।'

লীলাবতী উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল। 'আমি উঠি আজ।'

বড়মামীমা বললেন, 'তা কি হয় মা। নতুন এলে, একটু মিষ্টিমুখ করে যাও। আমাদের এটাই রীতি। মানুষ—বিশেষ করে নতুন মানুষ এলে মিষ্টিমুখ করিয়ে দিতে হয়, যাতে সে মিষ্টি ছাড়া কোনদিন কটু কথা বলতে না পারে। তুমিও বসো বাবা, আমি আসছি।'

বড়মামীমা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। মামীমার পিছন পিছন আমিও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। তার আগেই বড়মামার গলা শোনা গেল। বড়মামা খুব খুশী মনে গলা ছেড়ে চীৎকার করছেন, 'বড়বৌ, দেখে যা কাকে নিয়ে এসেছি।'

মা ঘরছেড়ে বাইরে যাবার আগেই ঘরে ঢুকলেন, বড়মামা। পেছনে সুপ্রিয়া। হঠাৎ নিজেকে নিয়ে ভিষণ বিব্রত হয়ে পড়লাম। আমার পরনে একটা গেঞ্জি, আর আধ-ময়লা ধুতি। নিমেষের জন্য মার কথা মনে পড়ে গেল। মা বারবার আমাকে হাত মুখ ধুয়ে আসতে বলেছিল। হাত মুখ ধুতে গেলে নিশ্চয়ই একটা সার্ট কিম্বা পাঞ্জাবি পরতাম আর ময়লা কাপড়টাও বদলে আসতাম। বড়মামা ঘরে ঢুকেই শব্দ করে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। উনি যেন বিরাট একটা যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরেছেন। ও'র মুখের ভাব, বসার ভংগি, সেই কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। বড়মামার পাশে আর একটা খালি চেয়ার ছিল। সেটাকে নিজের কাছে আরও সরিয়ে এনে বললেন, 'বসো'। সুপ্রিয়া এসে চেয়ারে বসল।

আমি ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলাম। বড়মামা বললেন, 'কী রে, তুই স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইলি কেন।' ভয় ছিল বড়মামার কথায় ঘোতনটা না আবার ঘর-ফাটানো হাসিতে ভেঙে পড়ে। ঘোতন সে রকম কিছু করল না। ও আমার দিকে তাকিয়ে ছিল, ওর চোখে কৌতুক নাচছিল।

ঘরের ভেতর যেতে যেতে বললাম, 'বেরোচ্ছিলাম। হাত মুখ ধুতে যাচ্ছি।'

হঠাৎ বড়মামার লীলাবতী আর ঘোতনের দিকে নজর পড়তেই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এদের তো চিনতে পারছি না।'

'এ ঘোতন, আমার বাল্যবন্ধু। আর ইনি—লীলাবতী, মিস্টার দেশপাণ্ডের মেয়ে।' বড়মামা তখনও সংশয় নিয়ে তাকিয়ে আছেন দেখে আবার বলতে হল, 'পাটনা ব্রাঞ্চের ম্যানেজার।'

লীলাবতী আর ঘোতন একসঙ্গে হাত তুলে নমস্কার করল। উচিত ছিল সুপ্রিয়ার সঙ্গেও ওদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া, কিন্তু কোন কোন সময় মানুষ উচিত কাজ করতে ভুলে যায়। সুপ্রিয়ার সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার চেয়েও আমার পক্ষে ভেতরে যাওয়ার তাগিদ বেশী ছিল। মনে হচ্ছিল, এই মুহূর্তে খুব করে ঠাণ্ডা জল দিয়ে মুখ চোখ না ধুলে আমার অস্বস্তি বজায় থাকবে। তাড়াতাড়ি চলে এলাম। বাইরের মনে হচ্ছিল একটা শক্ত দৃষ্টি আমার পিঠের সঙ্গে লেগে লেগে ভেতর পর্যন্ত চলে এল। একরকম দৌড়েই বাথ-রুমে ঢুকে গেলাম। কলের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। আয়না দিয়ে হঠাৎ নিজেকে দেখার একটা বাসনা খুব তীব্র হয়ে উঠল। কিন্তু এইসব বাথরুমে আয়না থাকে না। থাকার কথাও না। ক্রমশঃ

আর্ট কলেজ প্রদর্শনী

সরকারী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রদের বাৎসরিক প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে বর্তমান সমালোচক বরাবরই সাম্প্রতিক কালের পশ্চিমবাংলার চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের দৈন্যদশার জন্য কলাশিক্ষা পদ্ধতিকে দায়ী না করে থাকতে পারেন নি। কলকাতার গভর্ণমেণ্ট কলেজ অফ আর্টের ছাত্রদের ১৯৭২ সালের বাৎসরিক প্রদর্শনী দেখে আবার মনে হল, আমাদের কলাশিক্ষা ব্যবস্থায় গোড়ায় গলদ রয়েছে।

পুরোন ধরনের কলাশিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল শিল্পী তৈরী করা। কিন্তু বহুকালের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়েছে যে শিল্পী তৈরী করা যায় না, শিল্পী হয়। এই জ্ঞান থেকে জার্মানীর বাউহাউস আন্দোলনের প্রবক্তা বললেন, কলা শিক্ষায়তনের উদ্দেশ্য হবে কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে কারুকুশলী তৈরী করা: যে কারিগররা কারুকৌশল আয়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে শিখবে তাদের মনকে সক্রিয় করতে এবং জ্ঞানের দিগন্তকে বিস্তৃত করতে। ফলে কলাশিক্ষার সঙ্গে জ্ঞানের এবং মননের ফলে যিনি মেলাতে পারবেন তিনি শিল্পী হয়ে শিল্পসৃষ্টি করবেন। আর যে অধিকাংশ সংখ্যক শিক্ষার্থী সাযুজ্য সাধনে সক্ষম হবেন না তাঁরা অন্তত দক্ষ কারিগর হয়ে সমাজকে নিত্য নতুন রুচিসম্মত ভোগ্যপণ্য দিয়ে তৃপ্ত করবেন। কারো শিক্ষা ব্যর্থ হবে না, কোন ব্যয়ই অহেতুক হবে না। পুরোন ধরনের শিল্পীসৃষ্টি মূলক কলাশিক্ষায় সামাজিক ধনের অপচয় ঘটে। শতে একজন শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পী হয় কিনা সন্দেহ, অথচ নিরানব্বই জনের শিক্ষার জন্য ব্যক্তিগত ও সামাজিক ধন ব্যয়িত হয়। আর শিক্ষান্তে নব্বই জনের জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে লব্ধ শিক্ষার কোন প্রয়োগ ঘটেনা। এমন শিক্ষার প্রয়োজন কি?

যে কলাশিক্ষায় কারিগরির জ্ঞান ও কলাকৌশল আয়ত্ত করার উপর জোর নেই, যে কলাশিক্ষায় মননের গভীরতা ও জ্ঞানের পরিধি বাড়ানোর ব্যবস্থা নেই, যে কলাশিক্ষা শুধুমাত্র 'কেমন করে করতে হয়' শেখায় 'কেন করা হয়' শেখায়না, যে কলাশিক্ষা গুরুমুখী ভাষায় অনুকরণ করতে শেখায় সেই কলাশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সত্যিকারের মননশীল উদ্ভাবক শিল্পী হওয়া শক্ত। বাউ হাউস প্রবর্তিত নতুন ধরনের কারিগরি শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তা পুরোন ধরনের কারিগরি শিক্ষার মতন শুধু 'কেমন করে করতে হয়' শেখায় না, 'কেন করা হয়'-ও শেখায়। এই 'কেন করা হয়'-এর জ্ঞান থেকেই শিল্পী জন্মায়।

দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের অধিকাংশ কলাশিক্ষায়তনেই ঐ পুরোন পদ্ধতিতেই শিক্ষাদান ঘটে থাকে: ঐ পুরোন পদ্ধতিতেই ছাত্ররা গুরুমুখী ভাষায় 'মডার্ণ আর্ট' করে থাকেন। সম্প্রতিকালে বরোদার মহারাজ সয়াজীরাও বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে এবং বিশ্বভারতীর কলাভবনে এ পুরোন পদ্ধতির কলাশিক্ষা পরিত্যাগ করে শিক্ষাদান পদ্ধতিকে ঢেলে সাজানোর ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাচীন কলাবিদ্যা শিক্ষায়তন—কলকাতার সরকারী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় এখনও কিন্তু রক্ষণশীলের মতন পুরোন শিক্ষা পদ্ধতিকেই আঁকড়ে ধরে বসে আছে। তারই প্রকাশ দেখা যায় ঐ কলেজের ছাত্রদের সংবাৎসরিক প্রদর্শনীগুলিতে।

চারু ও কারুকলার শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কেউ পরিণত শিল্পকর্ম প্রত্যাশা করেন না। যা করেন তা হল মাধ্যম ব্যবহারের দক্ষতা এবং খানিকটা কারিগরী দক্ষতা ও শিল্পের ভাষায় স্বকীয় বক্তব্য পেশ করার প্রচেষ্টা এবং খানিকটা সতেজ সজীবতা। এর কোনটি সম্পর্কে অবহিতি সাধারণ ভাবে এই প্রদর্শনীর প্রদর্শিত কাজগুলিতে দেখা গেল না। তার দায়ভাগ অবশ্যই শিক্ষার্থীদের নয়।

তেলরঙের ছবির বিভাগটি আমাদের হতাশ করেছে। শুধু যে ভাল প্রতিকৃতি বা ভাল নিসর্গচিত্রের অভাবেই বিভাগটি হতাশা-ব্যঞ্জক, তা নয়। বর্ণপ্রলেপন, বর্ণবিন্যাস, রূপাংশ বিন্যাস, বহির্জাগতিক দৃশ্যবস্তু শৈলীকরণ, উদ্দেশ্যমূলক শৈলীকরণ ইত্যাদি যেসব গুণাগুণের সমাহারে ছবি ছবি হয়ে ওঠে, ভাস্কর্য শিল্প হয়, তার সম্বন্ধে সচেতনতা এবং দক্ষতা অধিকাংশ কাজে অনুপস্থিত। এর উপর আছে শিক্ষকদের কাজের অযৌক্তিক প্রভাব। অনেক সময়ে মনে হয় শিক্ষক মশাইরা তাঁদের নিজস্ব রীতিপদ্ধতি ছাত্রদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। এরই মধ্যে নীলকমল সিংহ বর্ণপ্রলেপন ও রূপাংশ বিন্যাস, রামলাল ধরের আলো-ছায়ার ব্যবহার ও নকশাসৃজন ক্ষমতা এবং রীতা খান্নার বিন্যাস জ্ঞান আমাদের আকৃষ্ট করে। জলরঙের কাজ বিভাগটি দুর্বলতর। এ বিভাগে রবীন্দ্রনাথ দাশের রঙের ব্যবহার, সুচরিত বসুর বিন্যাসক্ষমতা এবং দেবাশীষ বসুর আলোছায়ার ব্যবহার কথঞ্চিৎ উল্লেখযোগ্য।

তুলনায় তথাকথিত ভারতীয় রীতিতে অঙ্কিত কাজের বিভাগটি সমৃদ্ধ। এ বিভাগে বেশ কয়েকটি দৃষ্টিনন্দন কাজের দেখা পাওয়া গেল। এ বিভাগে তুষারকান্তি দাশ, পার্থসারথী ঘোষ এবং ধর্মপাল তাঁদের কাজে বহিরঙ্গ দৃশ্যবস্তুর শৈলীকরণ, বর্ণপ্রলেপন, বর্ণান্তর সংঘটন এবং বিন্যাসে দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। বলা বাহুল্য, সব কয়টি কাজই জলরঙে বা জলরঙ টেম্পেরায় করা। এ বিভাগে সবাই দশমহাবিদ্যা দেবী মাহাত্ম্য বর্ণনাকারী কোন একটি শাক্ত-তান্ত্রিক শাস্ত্রের বর্ণনাকে ভিত্তি করে কাজ করেছেন। দেখা যাচ্ছে, যে একটি ভাবনার ভিত্তিতে যদি কোন নির্দিষ্ট বর্ণনা বা ধ্যান থাকে তাহলে তাকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের কাজ সহজে স্ফূর্তি পায়।

ভাস্কর্য বিভাগটি দুর্বলতম এবং এ বিভাগে কাজের সংখ্যাও বেশ কম। এ বিভাগে একটি মাত্র উল্লেখযোগ্য কাজ দেখা গেল। সেটি বিপন জৈন নির্মিত একটি প্লাস্টারের প্রতিকৃতি।

ভিত্তিচিত্র বা মুরাল বিভাগটি প্রদর্শনীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিভাগ। এ বিভাগে বিভিন্ন মাধ্যমে রচিত বেশ কয়েকটি কাজে মাধ্যম মনস্কতা, শৈলীকরণ, বর্ণ প্রলেপন সম্বন্ধে খানিকটা সচেতনতা প্রকাশ ও খানিকটা দক্ষতা দেখা গেল। তবে মোজাইক টাইল সহযোগে যাঁরা করেছেন তাঁদের টালি সংস্থাপনের সঙ্গে রূপাংশের সম্বন্ধ, টালির বিন্যাসের সঙ্গে সমগ্র রচনার ছন্দের সম্পর্কে আরও অনেক বেশী সজাগ হওয়া প্রয়োজন। এই বিভাগে তথা প্রদর্শনীর সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ নিখিলেশ দাশগুপ্তের টেম্পেরায় রচিত ভিত্তিচিত্রটি রঙের বিন্যাসে, বর্ণপুঞ্জের ছন্দে স্মরণীয়। তা ছাড়া সিমেন্ট প্লাস্টার দিয়ে ভাল কাজ করেছেন সুহৃদ তরফদার, মোজাইক দিয়ে দেবাশীষ ভট্টাচার্য ও জ্যোৎস্না অরোরা এবং টেম্পেরায় সজল দে।

কলকাতার সরকারী কারু ও চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের বাণিজ্যিক শিল্প বিভাগটি একদা সর্বভারতীয় খ্যাতির শীর্ষে ছিল। আর বুঝি সে পুরাতন খ্যাতিকে ধরে রাখা সম্ভব নয়। সেই লুপ্ত গৌরবকে ফিরে পেতে হলে প্রেসের কাজ, বিশেষ করে বর্ণলিখনের কাজ, আলোকচিত্র গ্রহণ ও পরিস্ফুটনের কাজ ও কোলাজের কাজ শেখানোর দিকে নজর দিতেই হবে। ত্রি-মাত্রিক ও দ্বিমাত্রিক জ্যামিতি ও নকশা সংগঠনের নিয়মাবলী আয়ত্ত করতে হবে, নতুবা উপায় নাই। কারুকলা বিভাগটির কাজগুলিতে নতুনত্ব কিছুই পরিলক্ষিত হলনা: সবই গতানুগতিক।

—প্রণবরঞ্জন রায়

ভেড়ার নাম পক্ষিরাজ

রুন ঘোষ

সাঁকো পার হয়ে গেলে ওপারে সেই মাঠ। মাঠের মাঝে এক মেষপালক জেগে আছে। সঙ্গে তার ভেড়ার পাল। ওরা যেন কেমন করে জানতে পারে! বুঝি ঘাসের গন্ধ বাতাসে ভেসে বেড়ায়। সেই গন্ধ ওরা ঘ্রাণে টের পেয়ে গেলে বাতাস ভাঙতে ভাঙতে ক্রমশ মাঠের পর মাঠ পরিক্রমা করে যায়। পালের গোদা যে ভেড়া—সে হাঁটে দলের আগে আগে। মাটির ওপর থেকে ঘাস ছিঁড়ে নিতে নিতে এগিয়ে যায়। আর মাঝে মাঝে আকাশের ওপর মুখ তুলে ঘেসোবাতাস ঘ্রাণের মধ্যে পেড়ে নেয়। তখন তার গতি লক্ষ্য করে মেষপালক ডাক ছাড়ে—হরর-র-র—হউ-উ-উ—হর্-র-র—সেই অবলাজীবগুলো এই ডাক কেমন করে যেন চিনে ফেলেছে। তারা ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় সেদিকে। মালু দিনের-বেলা, যখন গাছে-পালায় রোদ খেলছিল, মাঠে-ঘাটে মানুষজন ছিল, সেই আলোয় আলোয় এসব দেখে এসেছে।

কিন্তু এই রাত্তিরবেলা পথে বেরুতে কেমন যেন গা-ছম-ছম করছে তার। দিনের-বেলা মাথার ওপর সূর্যিমামা সঙ্গে সঙ্গে থাকে। ওদের কোনো ভয়ডর করে না তখন। মামা-গো মামা রাঙামামা-গো—মালু আর আঙুর খেয়াল হলে ছড়া কাটতে কাটতে বলে, তোমায় আমি লালশাড়ি কিনে দেবো-গো—। সেই সূর্যিঠাকুর এই রাত্তির-বেলা এখন আর মাথার ওপর নেই। কেমন একটা চাপা-ভয় যেন সেই কারণেই চার দিকে ছড়িয়ে রয়েছে।

মালু ডাকে, আঙুর?

উঁ।

তোর ভয় করছে?

না।

তা হোক। … … তুই রাত্তিরবেলা … এমন করে যেতে নেই। … … কামড়ে দিই। তারপর, মালু আরও ফিসফিস করে বললে, জানিস, … রাত্তিরবেলা মা-কালী … যাচ্ছে। তাই।

আঙুর বললে, হ্যাঁ, জানিস তুই। মা আমায় শিখিয়ে দিয়েছে। মেঘমানুষের এলোচুলে কোথাও বেরুতে নেই। এই দেখ, চুলে আমি … দিয়েছি।

তবুও মালুর, আঙুরের জন্যেই ভারী দুঃখু মনে। আঙুরকে কাছে ডেকে নিয়ে বললে, আয় আমার হাত ধরে চ দিকিনি তুই। আঙুর ওর হাতটা ধরে পিছু পিছু হাঁটে।

কেমন অন্ধকার। না?

হুঁ।

ওরা সরু একটা আলের মাথায় উঠে এসেছে। পায়ের তলায় দলে যাচ্ছে কিছু ঘাস।

রাত গভীর হলে কে যে বাঁশী বাজায়? গভীর রাতে অন্ধকার যেন কাউ-কাউ করে। ঘরের বাইরে, পুকুর পাড়ে, বনে-মাঠে-আকাশে সর্বত্র সেই সুর ছড়িয়ে থাকে। সেই সুর বড় চেনা মনে হচ্ছিল। যেন বহুদূরে থেকে ভেসে আসছে সেই সুর। বহুদূরে। সে যে কতদূরে থেকে ভেসে ভেসে আসছে! মালুর হঠাৎ মনে হলো যেন সেই মেষপালক তেমনি করে ডাক দিয়ে যাচ্ছে—হুদুর-র-র-র হুউ-উ-উ-উ—

মালু তার কানের মধ্যে থেকে মেষ-পালকের সেই ডাকটা পেড়ে এই আলের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেটা মিলিয়ে নিচ্ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক। ঠিকই তো। সেই ডাক। ঠিক মিলে যাচ্ছে।

আঙুরের তখন হঠাৎ কি মনে পড়ে গেছে।

ওমা! কি ভুলো মনরে আমার। তুই গরড়ে পেন্নাম করিচিস?

গরড়-গো ঠাকুর—লতাপাতা রাত্রি আঁধার— গরড়-গো ঠাকুর—পেন্নাম পেন্নাম পেন্নাম।—এই বীজমন্ত্রটা ওরা তিন-বার উচ্চারণ করল। এসব কাজে আঙুরের ভারি নিষ্ঠা। এতে কোনো ফাঁকি নেই তার। তবু মালু যেন আঙুরের নিষ্ঠাকেও টেক্কা দিয়ে গেল।

বললে, থাম আঙুর। তোর বুকে একটু আব লাগেে দিই। আঙুর দাঁড়ালে, মালু তখন নিজের মুখের লালা আঙুলে করে ওর কপালে বুকে ছুঁইয়ে দিলে। আঙুরের এই সময় মনে পড়ছিল তার মণিপিসীর কথা। মালুটার বুদ্ধি আছে। বড় মানুষের মতন তার মাথা খেলে। ঠিক এমনি করে মুখের আব লাগিয়ে মণিপিসী সন্ধে-রাত্তিরে গা ধুতে যায়। আঙুর ভারি অবাক হয়ে গেছিল প্রথমটা। কেন যে অমন করে পিসী? মুখের আব লাগালে কি হয় মণি-পিসী? মণিপিসী বলেছিল, রাতবিরেতের বাতাসে ঠাকুর-দেবতার নিশ্বেস থাকে। মানুষের গায়ে ঐ বাতাস লাগলে সে বেড়াল হয়ে যায়। সারাক্ষণ ম্যাও ম্যাও করে মরে। মুখের আব লাগালে ঐ খারাপ বাতাস আর গায়ে লাগতে পারে না। তখন বেড়াল হয়েও মরতে হয় না। বুঝলি হতভাগী। মণিপিসী তার নরম গাল আলগোছে ঠুকরে দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠেছিল। বলেছিল, দাঁড়া তোর বুকে একটু ছুঁইয়ে দিই।

মালু ঠিক মণিপিসীর মতো করে তার কপালে বুকে আব পরিয়ে দিলে।

আঙুরের কি যে ভাল লাগে এই মালুকে।

এই ছেলের সঙ্গে খেলায় কতো যে মজা! কতো যে কান্ড করতে পারে মালু। ওর তো ভয়ডর নেই। আঙুর ওর ভারি ভক্ত বলে, সে ভাবে, মালুর সঙ্গে ও সারা-জীবন এমনি করে খেলে-খেলে কাটিয়ে দেবে। বড় হয়ে একসঙ্গে শহরে পড়তে যাবে। একসঙ্গে বৃষ্টিতে ভিজবে—ওঃ! কি যে মজা হবে! মালুর যদি একটা ঘোড়া থাকত— বেশ হতো। সেই ঘোড়ার পিঠে চড়ে মালু ঠিক ঝড়ের মতন মাঠ-ঘাট ভেঙে ছুটে বেড়াত। সেই ঘোড়ার পাছায় চাপড় মারলেই সে পক্ষিরাজ হয়ে যেত। তখন ভয়ে সিঁটিয়ে মালুকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে সে বসে থাকত সেই পক্ষিরাজের পিঠে।—কেন যে মালুর তেমন একটা ঘোড়া নেই!

আলপথ ছেড়ে ওরা আমবাগানের আরও অন্ধকারে উঠে এলো। আঙুর দেখল, আকাশে এবং তার চারপাশে অন্ধকারটা কেমন কাঁপছে। ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাক জ্বলছে। নিভছে। যেন এক কালকুট্টি গাছে থোবা-থোবা হলুদ-হলুদ ফুল ফুটছে। আর সেই ফুল ফুটছে বলেই অন্ধকারটা যেন ঢিপ-ঢিপ করে কাঁপছে। বাগানের গাছ থেকে দু-একটা পাতা খসে পড়ছে অন্ধকারে। ঝিঁঝি আর কটকটে ব্যাঙ কচি ছেলের মতন কাঁদছে। পায়ের তলায় খসমস ভাঙছে শুকনো পাতা। আঙুর সেই গাছ-আগাছায় ভরা আমবাগানের সরু রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে অন্ধকারে কেমন যেন একটা থম-থমানি টের পেল। মালুর একটা হাত হাতের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে আঙুর বললে, আমার ভয় করছে মালু। যদি ধরা পড়ে যাই। যদি ধরে ফেলে আমাদের?

উঁ! ধরলেই হলো কিনা? ধরা দিলে তো।

না ভাই। আমার ভয় করছে।—মালু—?

উঁ।

চ। ঘরে ফিরে যাই।

না। তুই যা। মালু হাতের ওপর থেকে আঙুরের হাতখানা এক ঝটকায় খসিয়ে দিয়ে বললে, মরতে তবে এয়েচিস কেন আমার সঙ্গে, কচি খুকী মায়ের কোলে শুয়ে থাকতিস। যেতে হয় তুই একা ফিরে যা।

কথার ধরন শুনে আঙুরের রাগ হলো। আমি বুঝি কচি খুকী, মায়ের আঁচল ধরে পড়ে থাকবো। মালুটা এমন গোঁয়ার! সে শুধুমুধু তাকে কষ্ট দেয়। যেমন মুখ চলে মালুর, তেমনি হাত চলে ওর। রেগে গেলে চণ্ডাল হয়ে য[illegible] মালু ওর পিঠে কিল মেরে-মেরে এ[illegible] ওকে তক্তা বানাবে বলে আঙুর আর বে[illegible] কিছু বলতে সাহস পেল না। শুধু ত[illegible] বুজে-আসা ভারি গলায় বললে, আমি বুঝি তাই বললু?

মালু কিছু উত্তর করল না। সে আম বাগানের আগাছা-মোড়া সরুপথে অন্ধকার কাটতে কাটতে হাঁটছিল। তার দু-চে[illegible] ভাসছে এক মেষপালক। বিরাট এ[illegible] ভেড়ার পাল নিয়ে এই মাঠের মধ্যে স[illegible] জেগে আছে যে মেষপালক। যার ত[illegible] এক ডাক শুনে মালুর মনে হয়েছে রাতের আঁধারে এই আমবাগানের থম[illegible] হাওয়ায় কালো কালো গাছে, জোনা[illegible] টিপটিপে আলোয় এবং মাটিতে—[illegible] সেই মেষপালকের ডাক সারাক্ষণ রয়েছে। মালুরও বুকের মধ্যেটা [illegible] ঢিপঢিপ করছিল। ভেড়ার পালের [illegible] দুটো কালো কুকুর রয়েছে। কি [illegible] চেহারা তাদের। পালের চারপাশে ঘু[illegible] ঘুরে তারা পাহারা দেয়। মালু দিনের বেল[illegible] দেখে এসেছে, সেই কুকুরদুটোর লাল টকটকে জিভ দিয়ে টপ-টপ করে [illegible] পড়ছে। হাঁ-করা মুখে তাদের বড় দাঁত। কুকুর দুটো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চনচ[illegible] চোখে তাকাচ্ছে চারদিকে। আর দাঁতের ফাঁক দিয়ে মস্তো একখানা জিভ বার করে হ্যাঁক হ্যাঁক করছে।

এসব কথা আঙুরকে এখনো ব[illegible] মালু। আঙুরটা যা ভীতু!

অবশ্য কুকুরদুটোর জন্যে [illegible] মালুরও কম নয়। তবে কুকুর বশ করবার মন্ত্র সে শিখে ফেলেছে। সেই মন্ত্র মালু আজ প্যান্টের দু-পকেটে ভরে নিয়ে এসেছে। মালু জানে। হাজার পা-টিপে পা-টিপে গেলেও, সেই ভেড়ার পালের মধ্যে ঢুকতে গেলেই কালো দত্যির মতো সেই কুকুর দুটো তাদের দিকে তেড়ে আসবে। আসবেই। তখন মালুও চট করে পকেটে হাত ঢুকিয়ে সেই মন্ত্র বার ক[illegible] কুকুর দুটোর সামনে ছড়িয়ে দেবে। বিশু কাকাদের বাড়ি যে-টাইগার আছে, মা[illegible] তার ওপর ইতিমধ্যে মন্ত্রটা পরখ ক[illegible] দেখে নিয়েছে। সে দেখেছে, তখন টাইগার সেই মন্ত্রের টুকরোগুলো নিঃশব্দে ঘাড় হেঁট করে মাটি থেকে খুঁটে খুঁটে মুখে তুলছে।

মালু পকেটের ওপর হাত রেখে সেই মন্ত্রের মালুম নিল। দু-পকেট ঠাসা আছে মন্ত্রে। সুতরাং মালুর আর তেমন ভয় করছে না। আর ভয়ই বা কিসের? মালু

ভাবে, মেষপালক তো আর ছেলেধরা না। কিন্তু লোকটা যেন কি রকম। মালু দেখেছে, দিনের বেলা সেই গরমের মধ্যেও খালি গায়ের ওপর একটা ভুটকম্বল চাপিয়ে রেখেছিল। মুখময় দাড়ি। মাথার ওপর কাপড়ের মস্ত এক পাগড়ি বাঁধা। হাতে পাকা বাঁশের একটা লাঠি। আর লোকটার পায়ে কেমন এক ধরনের হাড়-মড়মড়ে-চিমসে—সে এক ধরনের জুতো। তেমন জুতো মালু কখনও চোখে দেখেনি। আঙুরের বাবার সঙ্গে মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে তখন কথা বলছিল লোকটা। মালু সেই লোকটার কথা কিছু বুঝতে পারেনি। কি যে ভাষা লোকটার! সে যে কোন্ উর্দু-ভাষায় কথা বলছে জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে। মালু লোকটার মুখের ওপর নজর আটকে রেখেও একবর্ণ বুঝতে পারেনি। সে কেবল দেখেছে, কথা বলবার সময় লোকটার মুখ বেয়ে দু-পাশে ফেনা গড়িয়ে নামছে। কি যে নোংরা লোকটা! যেন সাতজন্মে জল ছোঁয়নি কখনো! মালুর কেমন গা-গুলিয়ে তখন ওক্ উঠে আসছিল।

মালু সেই সময় আরও তাজ্জব হয়ে দেখেছে, কি আজব কাণ্ড, কাকীমার বয়সী একটা মেয়েমানুষ সে আলের ওপর বসে বসে তামাক টানছে।

মেয়েমানুষে আবার তামাক খায় নাকি। ভারি মজা পেয়েছিল মালু।

সে তাকিয়ে তাকিয়ে ব্যাপারটা অনেক-ক্ষণ দেখেছিল।

পরে জ্যাঠামশাইকে জিগেস করে মালু জেনেছে, মেয়েমানুষটা মেষপালকের বউ। শুধু এই কথাটা বলবার জন্যে চাপা গলায় ডাকে—আঙুরে?

আঙুরে ভাবছিল অন্য কথা। সে নতুন নাক বিঁধিয়েছে। নাকের ওপর একটা হলুদ-ছোপানো-সুতো বাঁধা। আর সেই কারণে ছোট্ট একটা গাঁজ বেরিয়েছে নাকে। ভেতর থেকে ঘা-এর রসটা মরে আসছিল বলে জায়গাটা কেমন সুড়সুড় করছিল। আঙুরে তাই নাকের ওপরকার সেই হলুদ সুতোটা মাঝে মাঝেই নাড়াচাড়া করছিল। আর ভাবছিল তার মার কথা। সে বড় হয়ে গেছে। মা তাকে কতো গালমন্দ করে। ধিঙি মেয়েমানুষ তোর খেয়াল নেই না, এখনো আয়ে-বায়ে ঘুরে বেড়ানো! ঘরের কুটোটা ভাঙলেও যে আমার উপকার হয়—সেসব চিন্তা আছে মাগীর! কবি—মরবি, আর দু'দিন বাদে যখন পরের ঘরে যাবি তখন বুঝবি। ধাড়ি হয়ে এই ঘুরে বেড়ানো তখন বেরিয়ে যাবে।

আঙুরের ভারি বয়েই গেছে পরের ঘরে যেতে। তার যেন বড় দায় পড়ে গেছে। পরের ঘরে কোন দুঃখে সে মরতে যাবে? বয়ে গেছে তার। আঙুর মার মুখের ওপর কলা দেখিয়ে খিলখিল করে পালিয়ে যায়।

মা বঁটি পেড়ে বসে আনাজ কুটতে কুটতে তখনও সমানে কতো কি যে বলে যায় তাকে! সেসব খবর কি রাখে মালু?

আঙুরে পিসীর ডুরে শাড়িখানা একদিন পরেছিল। শাড়ি পরলে তাকে যে কতো বড় দেখায়! সে আয়নার সামনে এসে দাঁড়িয়ে-ছিল। তারপর ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিজেকে সে বুঝি দেখেনি সেদিন? কতক্ষণ ধরে দেখেছে। অথচ মালুটা যেন কি!

মালু হাত বাড়িয়ে আঙুরের একটা হাত টেনে নেয়,—আঙুরে কথা ক?

কি কথা কইবে আঙুরে, সে মালুর মুখের ওপর অন্ধকারে শুধু চোখ ভাসিয়ে রাখে।

মালু আর আঙুরে তখন খালের বাঁধে উঠে এসেছে। দক্ষিণ থেকে একটা নরম বাতাস টানছে ফুরফুর করে। খালের জলে তারা ফুটে আছে। আর বাঁধের ওপরে সারি সারি খেজুরের বনে, বাবলার ঝোপের ভেতরে অন্ধকার চেপে রয়েছে। এই অন্ধকারটা চোখ সইয়ে নিয়েছে বলে চার-পাশটা নজরে আসছে মালুর। মালু বুঝতে পেরেছে আঙুরের এখন কষ্ট রয়েছে বুকের মধ্যে। এসময় গলা কেমন ভারি হয়ে যায়। আঙুরে কথা বলতে পারে না। আর খানিক পরে আঙুরে কেঁদে ফেলবে।

আঙুরেটা বড় ভীতু।

মালু বলে এখানে একটু বোস আঙুরে।

বাঁধের ওপর ঘাসের চটের মধ্যে ওরা বসে পড়ে।

সামনেই সাঁকো। সাঁকোটা পার হলেই সেই মাঠ। মালু সেই মাঠের দিকে হাত বাড়িয়ে বলে, ঐ যে দেখছিস তেলের একটা কুপি জ্বলছে মাঠে, ঐখানে মেষপালক তাঁবু ফেলেছে। আর বেশি দূর নেই।

মালু আরও একটু সরে আসে আঙুরের কাছে।

জানিস আঙুরে, জ্যাঠামশাই যখন মেষ-পালকের সঙ্গে কথা বলছিল সেইসময় একে আমি কোলে তুলে নিয়েছিলুম। কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, কি যে কচি-কচি গা। এমন নরম! তুই দেখিস আমি ঠিক একে হাতের বার করব। ঠিক তোকে এনে দেব আমি। ওকে কোলে করলে দেখবি সব কষ্ট তখন ভাল হয়ে যাবে আঙুরে। দেখিস।

আঙুরে তবুও কিছুই বলছিল না।

মাঠের মাঝ থেকে অন্ধকার মাড়িয়ে যে কুপির আলোটা তার দিকে তেড়ে আসছিল আঙুরে দুচোখ দিয়ে তাকে ঠেকিয়ে রাখছিল। তার ভয় করছিল। খালের জলে কাঁপিয়ে রয়েছে ঠাণ্ডা অগণিত তারা। দখনো বাতাসে হালকা হাতের ছোঁয়া। সেই অন্ধকার খেজুরগাছে আর বাবলার ঝোপঝাড়ে কারা যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের চোখে দেখা যায় না। পায়ে শব্দ হয় না। তারা বাতাসে বাতাসে হাঁটে। ঘুরে বেড়ায়। আঙুরের মনে হলো, তার চারপাশে কেমন এক বাতাস ভেসে বেড়াচ্ছে। সেই ছায়া-ছায়া-শরীরগুলো তাকে ঘিরে রয়েছে।

ভয়-ভয়-চোখে কোনো রকমে চারপাশটায় চোখ রাখছিল আঙুরে। হঠাৎ চোখে পড়ল

তার সামনেকার ঝোপের অন্ধকারে কালো কালো খেজুরের সারির মধ্যে কারা যেন কামড়াকামড়ি করছে। আঙুরে যেন দেখতে পেল ওরা দুজন। ওদের কালো কালো শরীর। মণিপিসীকে সেদিন যেমন দেখেছিল আঙুরে সন্ধের আঁধারে! তেমনি কি?

আঙুরকে সঙ্গে নিয়ে অন্ধকারে গা-ধতে এসেছিল মণিপিসী। বাঁশবনের তলায় অন্ধকারে তাকে চুপ কোরে বসিয়ে রেখে মণিপিসী ঘাটে বসতে যাচ্ছিল। আঙুরে বসে বসে দেখেছিল, তাকে একলাটি বসিয়ে রেখে বাঁশবনের জমাট অন্ধকারের ভেতর তার মণিপিসী চলে যাচ্ছে।

সেই বাঁশতলায় আঙুরকে তখন একা পেয়ে অন্ধকার ঝেঁপে এসেছিল। ঝাড়ে ঝাড়ে কটকট করে বাতাস ভাঙ্গছিল। হঠাৎ হঠাৎ ঝটপট শব্দ উঠছিল বাঁশবনে। আর কারা যেন শুকনো পাতা গুঁড়িয়ে শব্দ তুলছিল ক্রমাগত। আঙুরের বুকের মধ্যেটা কেমন ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছিল তখন। মণিপিসী ঘাটে বসবার নাম করে কেন যে অমন অন্ধকারে চলে গেল!

আঙুরে আর বসে থাকতে পারছিল না। মণিপিসী যে-পথে গেছে সেই পথে অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে সেও যাচ্ছিল! আঙুরের মনে হচ্ছিল কে যেন তার গলার স্বর ভেতর থেকে টেনে রেখেছে। সে মণিপিসীকে ডাকতে পারছিল না, মণিপিসী মণিপিসী-গো—! সে কাঁদতে পারছিল না ডাক ছেড়ে! কি যে অবস্থা আঙুরের!

আঙুরে সেই অন্ধকারে খানিকটা এগিয়ে গেলে সে দেখেছিল দুটো মানুষকে। কালো কালো শরীর তাদের। বাঁশবনের তলায় মাটির ওপর কামড়াকামড়ি করছে। সেই অন্ধকারের ভেতর সে যেন তার মণিপিসীকে চিনতে পেরেছিল। তবুও তার গলা দিয়ে কোনো স্বর বেরোয়নি। আঙুরে দু-হাতে চোখ চাপা দিয়ে সেইখানে বসে পড়েছিল মাটিতে।

তার কতক্ষণ পরে মণিপিসী বেরিয়ে এসেছিল। আঙুরের মনে নেই। মণিপিসীকে ফিরে পেয়ে যেন বেঁচে গেছিল আঙুরে।

কি করছিলে মণিপিসী? আমার কেমন ভয় করছিল। তোমাকে যদি মেরে ফেলতো ও!

আঙুরে কেঁদে ফেলেছিল।

পিসী তখন ভাইঝিকে আদরে-চুমোয় ভুলিয়ে দিচ্ছিল। দূর বোকা মেয়ে কাঁদতে নেই। পিসীকে তোর ভূতে ধরেছিল। এ ভূত পোষা ভূত রে। এ ভূত সবাইকে ধরে। তুই যখন বড় হবি—তোকেও ধরবে। তখন তোরও পোষা হয়ে যাবে, দেখিস।

এই খালের বাঁধের ওপর বসে অন্ধকারে খেজুর বনের দিকে তাকিয়ে আঙুরের এখন মনে হচ্ছিল তাকে সেই ভূতে ধরেছে। আঙুরে ফিসফিস করে বললে, মালু দেখ—ঐ যে ঐখানে!

ভাল করে দেখে নিয়ে মালু বললে, ধ্যাৎ! ওতো গাছের গুঁড়ি রে। মুড়ো খেজুরগাছ দুটো দাঁড়িয়ে আছে।

তবুও চারপাশে সেই ভয়। জোনাক পিটপিট করছে। ঝিঁঝিঁ ডাকছে। আর সব মিলিয়ে রাত গভীরের সেই ডাক—আঁধিকাল সেই মেষপালকের ডাক সর্বত্র যেন জেগে রয়েছে। মালু আঙুরকে বললো, আমরা কালীপুজো করি নে, মা-কালী আমাদের শক্তি দেবে।

কথাটা আঙুরেরও মনে ধরেছে। এই মুহূর্তে সেও যেন ঠিক এই কথাটাকেই খুঁজছিল। আহা! মালু, মালু যে কি-ভাল।

অথবা, আঙুরকে তখন সত্যিই ভূতে পেয়েছে।

সে যেন নিজের মধ্যে নিজে আর নেই। চারদিক থমথম করছে—এমন এই রাত্তিরবেলা আঙুরে বুঝি অবিকল এক দেবতা হয়ে গেছে। ঠিক শ্মশান-কালীকে যেমন দেখায়। হাত তার উর্ধ্বে তোলা। জিভ কাটা। আর বাঁ-পা সামনে বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে আঙুরে।

হে মা-কালী—গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো মালুর।

আঙুরের অঙ্গে কোনো বসন নেই।

মালু ভয়ে ভয়ে আঙুরের পায়ের ওপর দৃষ্টি জড়ো করে রাখছিল। আঙুরের সারা পায়ে কি যে এক-আলো ফুটে রয়েছে। নরম নীলচে সেই আলোয় মালু যেন স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে মা-কালীর গলায়, তার বুকের দু-পাশে ওকি দুই মুণ্ডুমালা গাঁথা রয়েছে!

এতো নরম আলো তবু মালু সেখানে চোখ রাখতে পারছিল না। তার মনে হচ্ছিল, ওখানে চোখ পড়লে তার চোখ অন্ধ হয়ে যাবে। তার ভিতর থেকে মা-কালীর মুখের পাশাপাশি আরও কিছু যেন একটা উঠে আসতে চাইছিল। মনে পড়ছিল, সেই যাত্রা-তলার কথা। বিষ্টুকাকার বন্ধু পাতরকাকা সেই যাত্রায় একবার মেয়ে সেজেছিল। তার বুকে কেমন বল বাঁধছিল বিষ্টুকাকা। আর—আর—তখন বিষ্টুকাকা সেই বলের ওপর মুখ ঘসছিল—

মালুর এখন মনের ইচ্ছে—খুব ইচ্ছে—সে একবার একবারটি এখন বিষ্টুকাকা হয়ে যায়। কিন্তু আঙুরে! আঙুরে যে মা-কালী হয়ে গেছে! তার গায়ের ওপর নীলচে আলো! সেই আলো সে সহ্য করতে পারছে না।

মালুর কেমন অস্বাভাবিক এক নজর। সে যেন সেই সাঁকোর ওপর উঠে এসেছে। এই সাঁকোর ওপর যারা উঠে আসে, তারা যদি মানুষ হয় তাদের সবার দৃষ্টি তখন মালুর মতন হয়ে যায়। মালু সাঁকোয়-ওঠা দৃষ্টি নিয়ে তেমনি পিটপিট করে তাকিয়েছিল আঙুরের পায়ের দিকে।

এই সময় মালু একটা কাণ্ড করে ফেলল।

পাশেই পড়েছিল আঙুরের জামা। এক খাবলায় তুলে নিয়ে জামাটা আঙুরের গায়ের ওপর ছুঁড়ে মেরেছে সে।

আর তখন—ঠিক তখনই পেছন থেকে বাঘের মতন গর্জে উঠেছে এক কুকুর। আচমকা ভয়ে আঙুরে তখন সমস্ত শরীর দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে মালুকে। আর মালুর শরীরের মুখোমুখি দেবতার মতন আর এক শরীর শরীরে নিয়ে সেও হঠাৎ কখন যেন সেই সাঁকোটা পার হয়ে গেছে। সাঁকোটা পার হলেই মাঠ।

সুতরাং মালু দেখল, সেই মাঠের মধ্যে মেষপালকের বউ। কোমরে কলস। জল ভরতে এসেছিল। সেই মেয়েমানুষটা অদ্ভুত চুকচুক শব্দে তার কুকুরটাকে ডেকে নিচ্ছে।

সেই মাঠের মধ্যে মালু আর আঙুর আর এক অন্ধকারে পথ হেঁটেছে। তেলের কুপিটাও কখন নিভে গেছে।

কালীমার বয়সী যে মেয়েমানুষ—কোমরে তার জল-ভরা কলস। সঙ্গে রয়েছে এক ভয়ংকর কালো কুকুর। এই মাঠের মধ্যে দিয়ে এমন অন্ধকারে তারা যে কোথায় চলেছে!

এই মাঠের জগতে নক্ষত্রের মতো ফিনফিনে এক মায়াবী আলো। সোনালী অন্ধকার। সেই আলোয় এবং অন্ধকারে কোনো কিছুই ঠিক চেনা যায় না। কেমন যেন অচেনা লাগে এখানকার সমস্ত শরীর। ভেড়া আর ঘোড়া এ রাজ্যে মন-যাই-মতো হয়ে যায়। হয়ে যায় পক্ষিরাজ। এই অন্ধকারে মাঠের মধ্যে মালু আর আঙুরে কিসের পিছু পিছু যেন দৌড়চ্ছে। ওরা যাকে ধরবেই।

শুধু এক মেষপালক সেই অন্ধকারে দুটি মানবসন্তানের দৌড় লক্ষ্য করে—আমি নিশ্চিত জানি—সে হাসছে। কিন্তু কিসের হাসি সে। অভিনন্দনের?

না আর কিছুর?

মেষপালকের সেই রহস্যময় মুখের দিকে তাকিয়ে আমি এখনও তা বুঝতে পারিনি।

অঙ্গনা

গৃহিণীর পার্টটাইম কাজ

ইদানিং সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্রের
া ওল্টালেই একটি বিজ্ঞাপন বিশেষ-
ব নজর কাড়ে। বিজ্ঞাপনটির হেড
ইন হলো, মহিলাদের জন্য একটি নতুন
াগ। এর থেকে সহজেই ধরে নেওয়া
যে, সুযোগটি চাকরি-সংক্রান্ত এবং
র্থিক সমস্যা সমাধানের ইংগিত বহন
রছে। আর বাস্তবেও তাই। অনুমানের
ঙ্গে বিজ্ঞাপনের ভাষা প্রায় মিলে যায়।
জ্ঞাপনটির সারার্থ হলো, জাতীয় সঞ্চয়
মিশনার সম্প্রতি মহিলা নেতৃত্বে আঞ্চ-
লক সঞ্চয় প্রকল্পের এক নতুন
র্মসূচী গ্রহণ করেছেন। এবং মহিলাদেরই
ন্য। এলাকার গৃহিণীদের সঙ্গে যোগা-
াগ করে নিয়মিত এবং সাধ্যমত টাকা
নায় তাঁদের উৎসাহিত করাই হবে
নেত্রীর কাজ। এর ফলে এ
নিযুক্ত প্রতিটি মহিলা নানাদিক
থ লাভবান হবেন। অবসর সময় কাজে
নো যাবে। পাড়াপড়শীর সঙ্গে
যোগ বাড়বে। এবং পরিকল্পনা
নুযায়ী কাজ করতে পারলে সংসারে আয়
ও বাড়বে সে কথা তো বলাই বাহুল্য।
মার আয়ের দিকে লক্ষ্য রেখেই তো কাজ
রতে যাওয়া। তবে উপরি লাভও খুব
একটা ফেলনার নয়। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী
ইন্দিরা গান্ধী গত বছরের প্রথম দিকে এই
পরিকল্পনার উদ্বোধন করেন। আশা করা
যায় এটি জনপ্রিয় হবে।

আমাদের দেশে কাজের বড়ো অভাব। মেয়েদের কাজের অভাব আরো বেশি। সেক্ষেত্রে পার্ট টাইম কাজের তো কোন প্রশ্নই আসে না। বিদেশে অবিশ্যি এরকম ব্যবস্থা আছে। তবে সেসব দেশে কাজের কোন অভাব নেই। ইচ্ছেমতো যে কেউ চাকরি ছাড়তে বা ধরতে পারেন। এবং যখন খুশি। কিন্তু আমাদের দেশে তেমন সুযোগ নেই। চাকরি একবার ছাড়লে আবার পাওয়ার সম্ভাবনা অতি অল্পই। নেহাত বরাতজোর না হলে তা সম্ভব নয়। আর যাঁরা চাকরির জন্য হা-পিত্যেশ করছেন তাঁরাই চাকরি পাচ্ছেন না যেখানে সেখানে স্বল্প সময়ের চাকরির কথা তেমন গুরুত্ব দিয়ে ভাবাও সম্ভব নয়।

আমরা যে সামাজিক কাঠামোয় বাস করি সেখানে বিয়ের পর অধিকাংশ মেয়েই ঘর-সংসারের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। চাকরি করার সুযোগ তাঁরা পান না। আর যাঁরা পেয়েও করেন না তাঁদের সংখ্যা খুবই অল্প। কারণ, আমাদের দেশে এখনো অনেকেই চান যে মেয়েরা ঘর-সংসার নিয়ে থাকুক আর লেখাপড়া শিখলে তা ছেলেপুলে মানুষ করায় সাহায্য করবে। এই সনাতন পদ্ধতি হাজার পরিবর্তনের মধ্যেও নিজেকে অনেকখানি বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে। আমাদের মেয়েদের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষাও ঘরকেই টানে। কেউ কেউ বাধ্য হয়ে চাকরি করছেন বটে তবে তাঁদের অনেকেরই হয়তো এতে অন্তরের সায় নেই। কিন্তু এক একটা সময়ে অলস মুহূর্ত খুব ভারি হয়ে ওঠে। সময় আর কাটতে চায় না। সে সময় টুকটাক একটা কাজ পেলে সময়ও কাটে আর দু' পয়সা সংসারেও আসে। এ কারণেই আমাদের দেশে গৃহিণীদের জন্য পার্ট টাইম কাজের ব্যবস্থা থাকা বড়ো দরকার।

সংসারে নানারকম টানাপোড়েন চলে। আর্থিক টানাপোড়েন তার অন্যতম এবং প্রধানতমও বটে। খরচের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আয়ের সামঞ্জস্যবিধান করা যাচ্ছে না। এজন্যও গৃহিণীদের একটা আয়ের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এবং তা সংসার বাঁচিয়ে। সংসারের কাজকর্ম করে যে অবসরটুকু পাওয়া যাবে তা ব্যয় করে স্বচ্ছলতার সুবন্দোবস্ত করতে পারলে সবদিক থেকেই সুবিধা। এই আয় থেকে হয়তো ছেলে-মেয়ের লেখাপড়ার খরচটা উঠে আসবে অথবা বাচ্চার দুধের খরচ। যাই আসুক সেটাই সংসারের পক্ষে এক মস্তো সহায়ক।

নিশ্চুপ গিন্নিপনা করার দিন এখন শেষ হয়ে গেছে। সংসার চালানোর চিন্তাও করতে হয়। গৃহিণীদের জন্য পার্ট টাইম কাজের বন্দোবস্ত না থাকলেও অনেকে নিজের চেষ্টায় তা করে নিয়েছেন। এবং এজন্য অকসর সময়টুকু হাতে নিয়ে তাঁরা অনেক দূরে যাতায়াত করেন। একাধিক হ্যান্ডিক্রাফট সেন্টার অনেক মেয়েকে অবসর মুহূর্তে কাজের সুযোগ করে দিয়েছে। আবার কেউ কেউ রেডিমেড জামাকাপড়ের অর্ডার বাড়িতে এনে সেলাই করেন। মোদ্দা কথা, চেষ্টা একটা রাখতে হচ্ছে। সংসারের দু' পয়সা আয় বাড়াতেই হবে। নাহলে আর্থিক টানাপোড়েনে জীবন বিষময় হয়ে যাবে। অধিকাংশ পরিবারেই আজ এই চিন্তা।

মেয়েদের জন্য স্বল্প সময়ের কাজ যে একেবারে নেই তা নয়। কলেজের পড়ুয়া মেয়েদের জন্য একটি কাজ অবশ্য আছে। দুধের ডিপোতে পরিবেশিকার কাজ। প্রতি ডিপোতে এ কাজে মেয়েরা নিযুক্ত আছেন। প্রয়োজনের তুলনায় সুযোগ খুব কম। তাছাড়া এখানে কাজের অসুবিধাও অনেক। ছুটিছাটার বিশেষ সুবিধা নেই। অসুখ-বিসুখে ছুটি নিলে এক ডিপো থেকে আর এক ডিপোতে ডিউটির বদল হয়। তবু এখানে যাঁরা কাজ করার সুযোগ পান

তাঁরা নিজেদের পড়াশোনার খরচ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারেন। প্রাইমারী স্কুলের মর্নিং সেকশনে শিক্ষকতাও এরকমই একটি সুযোগ। তবে প্রয়োজনের তুলনায় সুযোগ তেমন নয়। এই চাকরিতে গৃহিণীদের সুযোগও কিছুটা আছে। অর্থাৎ এই চাকরি করে ঘরসংসারের প্রতি দায়িত্ব পালন খুব একটা ব্যাহত হয় না। আর যাঁরা সকাল সন্ধ্যে অফিস করেন সংসার করার সাধ তাঁদের অনেকখানি অপূর্ণ থেকে যায়। আর্থিক ভাবনা তাঁদের জীবনের রস শুষে নেয়।

এই আর্থিক ভাবনাই আজকের বড়ো ভাবনা। আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এর ফলে প্রচণ্ডভাবে ব্যাহত হচ্ছে। তাই ঘরসংসারের কথা আর ছেলেপুলে মানুষ করার দায়দায়িত্ব জলাঞ্জলি দিয়ে এখন চাকরি করতে বেরুতে হচ্ছে। কিন্তু চাকরি করতে হলেও নির্দিষ্ট মানের লেখাপড়া জানা দরকার। স্ত্রী শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার সত্ত্বেও গৃহিণীদের লেখাপড়ার মান যে খুব বেশি তা নয়। তা বলে আলাপ-সালাপে মেয়েরা খাটো এমন কথা বলা যায় না। বরং সে ব্যাপারে তাঁরা পুরুষের তুলনায় বেশি দক্ষ। এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে যে, পাশাপাশি দুই বাড়ির কর্তার মধ্যে তেমন জানাশোনা নেই অথচ দুই গিন্নির মধ্যে রীতিমত অন্তরঙ্গতা। এটি মেয়েদের একটি বিশেষ গুণ। আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ নিয়ে চাকরি করার সম্ভাবনা যে কখনো কখনো আসে হাতে-নাতে তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই নতুন পরিকল্পনায়। অবসর মুহূর্তে পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা আর গাল-গল্পের মাধ্যমে চাকরি করা। ট্রামে-বাসে ছুটোছুটি নেই। বড়োবাবুর চোখ রাঙানি নেই। নিজের ইচ্ছেমতো শুধু গল্প করা এবং প্রতিবেশীদের সঞ্চয় অভ্যাস গড়ে তোলা।

এরকম পরিকল্পনা আমাদের দেশে আরো বেশি চালু করা দরকার যাতে গৃহিণীরা সুযোগ পাবেন। একাজের আরো সুবিধা যে, খুব একটা নিজের গণ্ডির বাইরে যেতে হবে না। এলাকা-ভিত্তিক দায়িত্ব। পাড়া-পড়শীদের সঙ্গে পরিচয় আরো নিবিড় হবে। এখন দিনকাল যা পড়েছে তাতে খুব একটা বেশি লোকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা আর সম্ভব হচ্ছে না। দূরের তো নয় বটেই, কাছেরও নয়। এরকম চাকরির দৌলতে অপরিচয়ের বন্ধন যেমন কাটবে তেমনি যোগাযোগ আরো নিবিড় হবে। কিন্তু শুধুমাত্র একটি পরিকল্পনায় তো আর সকলের সংস্থান সম্ভব নয়। তাই আমরা আশা করবো, এ ধরনের আরো প্রকল্পের ব্যবস্থা করা হবে।
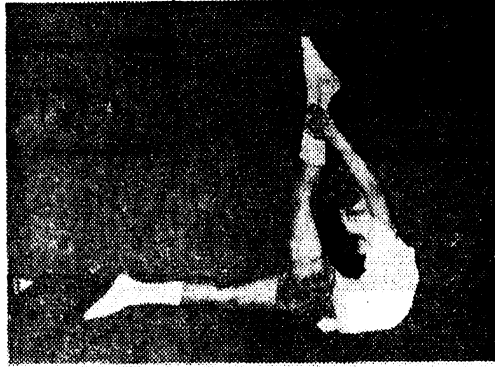
মেয়েদের শরীর গঠনের পক্ষে যোগ-ব্যায়ামের ভূমিকা অসামান্য। অল্প বয়স থেকে উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থায় নিরোগ স্বাস্থ্যলাভ সম্ভব।

গৃহিণীদের সঙ্গে সঙ্গে মহিলাদের সার্বিক কর্মসংস্থানের কথাও মনে রাখতে হবে। কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী লোক-সভায় জানান যে, চাকরির ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সব বৈষম্য দূর করা হবে। মেয়েদের পক্ষে এটি পরম আশার কথা। তবে সেই সঙ্গে চাকরির ব্যবস্থাও চাই। এ ব্যাপারেও কিছু কিছু ব্যবস্থা হচ্ছে। সম্প্রতি কৃষ্ণনগরে মেয়েদের জন্য বিশেষ কর্মসংস্থান কর্মসূচীর উদ্বোধন হলো। নদীয়া মহিলা সংঘ এর উদ্যোক্তা। তবে পরবর্তী যে তথ্যটি এখান থেকে জানা গেল তা খুব একটা উৎসাহব্যঞ্জক নয়। সেই তথ্যটি হলো যে, এ ধরনের কর্মসূচীর উদ্বোধন শুধু নদীয়া নয়, পশ্চিমবাংলায় প্রথম। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, মেয়েদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে এতোদিন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। তবু ত্রুটি যে সংশোধন করা হচ্ছে সেটা সুখের কথা।

সংসার মেয়েদের প্রথম কামনা। আর্থিক প্রয়োজনে চাকরিও তাঁরা চান। অধিকাংশ মেয়ের চাকরি হলো সংসারের ন্যূনতম স্বচ্ছলতা বিধান। তার বেশি কিছু নয়। আসল কথা হলো, সংসারের প্রতি যথাকর্তব্য পালন করে চাকরি করা—যাতে কোনদিকেই অবহেলা না প্রকাশ পায়। এঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাই কর্ম-সংস্থান প্রকল্পে এঁদের আকাঙ্ক্ষা যথোপযুক্ত মর্যাদা পাবে এটাই স্বাভাবিক। নতুন পরিকল্পনায় যেমন তাঁরা সুযোগ পাবেন তেমনি হ্যাণ্ডিক্রাফট সেণ্টারগুলি তাঁদের সেই সুযোগ দিচ্ছে। তবু সুযোগের আরো প্রসার দরকার। আরো বেশি গৃহিণীর কাছে আয়ের এই পথ খুলে দিতে হবে। সংসারের স্বচ্ছলতা বিধানে তাঁদের ভূমিকায় যাতে কোন ত্রুটি না থাকে এবং আর্থিক দুশ্চিন্তায় ডুবে তাঁরা যেন জীবনের মাধুর্যমণ্ডিত দিক বিস্মৃত না হন সেজন্যই এই ব্যবস্থার আশু প্রয়োজন। কারণ, গৃহিণীরা প্রায়ই আক্ষেপ করেন যে, তাঁরা কোন কাজেই এলেন না একমাত্র ঘরকন্না ছাড়া। আজকের আর্থিক টানা-পোড়েনের দিনে এরকম খেদোক্তি খুবই স্বাভাবিক। প্রচণ্ড টানাটানিতেও তাঁরা কোন আর্থিক জোগান দিতে পারছেন না। তারপর কেউ কেউ আরো দুঃখ করেন, লেখাপড়া জানলে চাকরি করে এই অভাবের অবসান করতেন। কিন্তু তাঁরা জানেন না যে, লেখাপড়া জানলেই আর এখন চাকরি পাওয়া যায় না। তাই তাঁদের চাকরির সুযোগ অর্থাৎ সংসারের আয় বাড়াবার আরো ব্যবস্থা যাতে করা যায় সে সম্পর্কে সরকারী উদ্যোগ গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। যা হবে কিনা অবসর সময়ের কাজ। সংসার নির্বিঘ্ন হবে অথচ আয় বাড়বে।

—প্রমীলা

মায়ের কাছে লেখাপড়া

বাসে বসে জনাতিনেক মহিলা। তিনজনই নিজেদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুলে পৌঁছে দিয়ে বাড়ী ফিরছেন। স্কুল থেকে বাড়ীর দূরত্ব হয়তো গোটা চারেক স্টপেজ। কিন্তু সেই চারটি স্টপেজ পার হয়ে ছোটদের স্কুলে পৌঁছে দিতে তাঁরা নাজেহাল। তাঁদের বিব্রত ও চিন্তিত আলোচনা থেকে বাস্তব জীবনের বিরাট এক সমস্যার সম্মুখীন হওয়া গেল' যে সমস্যা শুধুমাত্র আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মায়েরাও কমবেশী সম্মুখীন হচ্ছেন।

বাস যাত্রিনীত্রয়ের একজন পাংশু মুখে বললেন, 'কি যে করি ছেলেটাকে নিয়ে, মোটেই স্কুলে আসতে চায় না।' অন্যজন তৎপর হয়ে বললেন, 'বড় একগুঁয়ে আমার ছেলেটা। স্কুলে আসতে অবশ্য কোন বিরক্তি প্রকাশ করে না, কিন্তু স্নান করাতে, খাওয়াতে আমি হিমশিম।' দীর্ঘাঙ্গী এক মহিলা এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। ওদের কথা শুনে নিজের অসহায়তার কথাটা মুখ ফুটে বলে ফেললেন। 'আমার ছেলে যেমন ডানপিটে, তেমনি গোঁয়ার। ওকে নিয়ে অস্থির হয়ে যাই। সকালে ওকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আমাকে রান্নার কাজটা কোন রকমে সমাপ্ত করে ঠিক দশটায় অফিসের বাস ধরতে হয়। অথচ ছেলেটা এত জেদি যে কিছুতেই ওকে বাগে আনতে পারছি না। ঘরবার দুটোই করতে হয়, কিন্তু ছেলেটার পেছনে এত সময় দিয়ে চোখে মুখে আমি সরষে ফুল দেখছি।'

বলা বাহুল্য মহিলাত্রয় নিজেদের ছোট ছোট ছেলেদের সামলাতে নাজেহাল তার ওপর রয়েছে ব্যক্তিগত হাজার রকমের কাজ। সুতরাং তাঁদের সমস্যা মোটেই উপেক্ষনীয় নয়। কারণ এক সময় এই দুরন্ত, জেদি সন্তানেরাই জাতির পিতা হয়ে সমাজে বাস করবে।

ওদের নানারকম বিব্রত উক্তি শুনে আমার সেই প্রবাদটা মনে হল 'মাদার ইজ দা বেস্ট টিচার এন্ড হোম ইজ দা বেস্ট স্কুল।' মায়েরাই যদি সন্তান পালনে গলদঘর্ম হন তবে সেই সন্তানদের স্কুলে শিক্ষা দেওয়া কতটা সম্ভব? প্রবাদটাকে সত্যে রূপায়িত করতে কোন শিশু স্কুল বাদ দিয়ে বাড়ীতেই পড়াশুনা করবে একথা মোটেই বলছি না। জন্ম হতেই কয়েকটা বছর শিশুরা পুরোপুরি বাড়ীর পরিবেশেই বড় হয়। বাড়ীর আনন্দোজ্জ্বল সুন্দর পরিবেশ এবং মায়ের সহৃদয় শিক্ষা শিশুদের মনে যে রেখাপাত করে তা কি কোন শিক্ষক বা স্কুল দিতে পারে? হয়তো সম্ভব নয়, কারণ শিশুরা একটি দিনের অতি অল্প সময়ের জন্য বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকার সামনে উপস্থিত হবার সুযোগ পায়। কিন্তু শিশু মাত্রই মায়ের ও বাড়ীর সকলের স্নেহচ্ছায়ায় মানুষ। সুতরাং—শিশুদের ওপর মায়ের প্রভাব যতটা অন্য কারুর প্রভাব ততটা হওয়া বোধহয় সম্ভব নয়।

শিশুদের বাল্যকাল সুন্দর এবং সুষ্ঠু পরিবেশে সুকৌশল পরিচালনায় অতিবাহিত হলে ভবিষ্যতে সেই শিশু বড় হয়ে একজন আদর্শ মানুষে রূপায়িত হতে পারবে এটাই আমরা আশা করবো। সুতরাং শিশুকে লালন-পালন করার সঙ্গে মায়ের এবং আরও সকলের দায়িত্ব থাকবে শিশু কি করে তাঁদের কথা এবং চিন্তা মত কাজ করে কোন রকম ভুল পথে অগ্রসর না হয়।

পারিবারিক এবং পারিপার্শ্বিক প্রভৃতি নানা কারণে আমরা দিনকে দিন বেশী জটিলতায় পাক খাচ্ছি। খুব স্বাভাবিকভাবেই শিশুদের প্রতি যথাযথ কর্তব্য সাধন করা সম্ভব হচ্ছে না। এরই পরিণতিতে পিতা-মাতা ও সন্তানের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান গড়ে উঠছে। জন্ম হতেই কোন শিশু অত্যধিক একগুঁয়ে বা জেদি হয় না। সে ক্ষেত্রে শিশুটি বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে কেন যে সে জেদি হয়ে উঠছে সেদিকে লক্ষ্য দিতে হবে। শিশুটির কোন অভিযোগ থাকলে দরদের সঙ্গে তা শুনতে হবে এবং পরে অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে তাকে ভালমন্দ বুঝিয়ে বলতে হবে।

উদাসীন পিতা-মাতার সঙ্গে শিশুদের সম্পর্ক ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। শিশুরা কখনই তার পিতা-মাতাকে আপনার বলে ভাবতে পারে না। সেহেতু তারা ধ্যানঘেনে, অত্যধিক জেদি ও অবাধ্য হয়ে ওঠে। শিশুদের সঙ্গে পিতা-মাতার এমনভাবে মিশতে হবে বা ব্যবহার করতে হবে যেন তাঁরা শিশুর পক্ষেই।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় পিতা-মাতা নানান কাজে অত্যধিক ব্যস্ত থাকেন। ফলে সন্তানদের দিকে ভাল করে নজর দেবারও ফুরসৎ পান না। অনেক সময় তারা সে সময় তাঁদের সন্তানেরা ঘরের চেয়ে বাইরে কাটাতে বেশী ভালবাসে। বাইরে কাটাবার অভ্যাসটাই কালক্রমে নেশায় পরিণত হয় এবং অল্পকালের মধ্যেই সংসর্গদোষে নানা রকম কুঅভ্যাসের শিকার হয়।

এছাড়া পিতা-মাতারা অনেক সময়ই সন্তানদের আনন্দ বা গোমরা মুখের চেহারার দিকে নজর দিতেই ভুলে যান। কেন সন্তান এত উচ্ছল বা গোমরা মুখো, কেন খুশীতে জামা-কাপড় ধুলোবালি মেখে ময়লা করে রেখেছে অথবা গভীর মনোকষ্টে ক্লাসে পড়া বলতে পারে নি তার কোন কারণ জিজ্ঞাসাবাদ না করে দুমদাম পিঠে, গালে খানকতক হয়তো বসিয়ে দিলেন বাপ-মা। কিন্তু অভিভাবকদের এই অসহিষ্ণুতার পরিণাম হয় বড় ভয়ঙ্কর। শিশুদের ফরিয়াদ বা মনোবেদনা যাই থাক সহানুভূতির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে হয়তো তার একটা সদুত্তর মিলতো, কিন্তু মারধোর করেই সন্তানদের মুখের রা কেড়ে নিলেন। তারা অতি সাবধানে নিজেদের সুখ দুঃখের কথা গোপন করতে শিখলো।

সপ্তাহের একটি ছুটির দিন বাবা মায়েরা অনেক সময়েই উপভোগ করতে তৎপর। খেয়াল খুশী মতো সন্তানটিকে কাজের লোক কিংবা আশেপাশের কারুর কাছে রেখে বেরিয়ে পড়েন বেড়াবার উদ্দেশে। এর ফলে শিশুটি মনে মনে অসহায় বোধ করে ও পিতা-মাতার ওপর অসন্তুষ্ট হয়।

চাকুরিজীবী মায়েদের ক্ষেত্রেও অগণিত সমস্যা। সব ক্ষেত্রেই প্রায় একটা অভিযোগ শোনা যায় 'ছেলেটা দুষ্ট, একগুঁয়ে, পড়াশুনা করে না ইত্যাদি ইত্যাদি।' চাকুরিজীবী মায়েরা নিজেদের বেরুবার প্রস্তুতি পর্ব সমাধা করতে এত ব্যস্ত থাকেন যে এরই ফাঁকে কোনও রকমে ছেলেমেয়েদের স্নান, খাওয়া, খুব সম্ভবত স্কুলে পৌঁছে দেবার কাজটাও সেরে নেন। তাঁদের সেই স্বল্প সময়ে সন্তানের দিকে নজর দেবার ফুরসৎ কোথায়?

কিন্তু ছুটির সোনালী দিনটির প্রতিটি মুহূর্ত যদি সন্তানদের আদর ভালবাসার সঙ্গে সকল অভাব অভিযোগ জেনে নিয়ে তা সুবিবেচনার সঙ্গে দূর করতে পারেন তবে বোধহয় একগুঁয়ে আর দুষ্টু ছেলেরা বাড়ীর সকলের একান্ত অনুগত আর প্রিয়পাত্র হতে পারে।

—অঞ্জলি চৌধুরী

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা

রবি ঘোষ ও মিঠু মুখোপাধ্যায়:আবদাল্লা মরজিনা পরিচালনা : দীনেন গুপ্ত।
ফটো : অমৃত

নকল সোনা—

'যা-কিছু চক্‌চক্‌ করে, তাই সোনা নয়, এই ইংরিজী প্রবচনটির সত্যতা পশ্চিম-বঙ্গের চলচ্চিত্র প্রযোজনা শিল্প সম্পর্কে ষোলোর জায়গায় আঠারো আনা খাটে। এবং এই পরম দুঃখদায়ক তথ্যটিকে অত্যন্ত নগ্নভাবে উদ্ঘাটিত করেছে নব-জাত প্রোডাকসন্স-এর প্রথম চিত্রার্ঘ্য 'নকল সোনা'। অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় প্রথমে সহকারী পরিচালক ও পরে পরি-চালক রূপে এই শিল্পটির সংগে অন্যূন কুড়ি বছর ধরে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি হৃদয়বানের দৃষ্টি দিয়ে এই শিল্পের প্রতিটি স্তরের কলাকুশলী, কর্মী, অভি-নেতা, অভিনেত্রীকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লক্ষ্য করেছেন এবং বাহ্য চাকচিক্যের অন্তরালে যে বেদনাদায়ক, রোদনভরা অন্ধকার রাজ্যটি বিরাজ করছে, তারই কথা তাঁর মরমী কলমের মুখে ব্যক্ত করেছেন 'নকল সোনা'র কাহিনীর মাধ্যমে। নামকরা সৌখীন অভিনেতা ভ্যাবলা ওরফে মদন চট্টোপাধ্যায় স্টুডিওর সুপার বা একস্ট্রার (খুচরো, চুটকী অভিনেতা) খাতায় নিজের নাম লিখিয়ে-ছিল অরূপ চ্যাটার্জি হিসেবে। তার স্বপ্ন ছিল, সে একদিন হয়ত উত্তমকুমারকে টেক্কা দিয়ে দর্শকদের চোখ ধাঁধিয়ে দেবে। কিন্তু ছবির নায়ক চম্পককুমারের হয়ে দ্বিতীয় থেকে ঝম্পপ্রদান করতে গিয়ে তার বাম হাতটি কনুই থেকে কাটা গেল—এবং সংগে সংগে শেষ হল তার চলচ্চিত্র নায়ক হবার স্বপ্ন। অথচ ভ্যাবলারই সুপারিশে ঢুকে তারই প্রতি-বেশিনী লতা শেষ পর্যন্ত প্লেব্যাকআর্টিস্ট হিসেবে বেশ ভালোই নাম করল এবং পেল পয়সা ও প্রতিপত্তি। একেই বলে কপাল! ভ্যাবলার সংগে সংগে দর্শকও তার সেই চিরঈপ্সিত রাজ্য—স্টুডিও অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং বিস্ময়-পুলকিত দৃষ্টি দিয়ে প্রত্যক্ষ করে স্টুডিওর চত্বর, ফ্লোর (আভ্যন্তরীণ কৃত্রিম দৃশ্য গ্রহণের স্থান), ক্যামেরা-ম্যানের নির্দেশে ইলেকট্রিক আলোর সঠিক সংস্থাপন, মেক-আপ বা রূপ-সজ্জার কক্ষ, রসায়নাগার, সম্পাদনার কক্ষ ও যন্ত্রাদি, দেখে ছবির শুটিং, গানের রেকর্ডিং (নচিকেতা ঘোষ, পবিত্র চট্টো-পাধ্যায় ইত্যাদি সংগীত পরিচালকের পরিচালনাধীনে) এবং ওরই ফাঁকে ফাঁকে দেখতে পায় উত্তমকুমার, সৌমিত্র, বিকাশ রায়, কমল মিত্র, চিন্ময় রায়, জহর রায়, অপর্ণা সেন প্রভৃতি জনপ্রিয় শিল্পীকে বিভিন্ন পরিবেশে। এই সংগে দর্শকের সামনে নিউ থিয়েটার্সের অতীত জম-জমাট দিনের কিছু স্মৃতিও রোমন্থন করা হয়; শোনানো হয়, বিখ্যাত গোলঘরের ঐতিহ্য, যেখানে সরকার সাহেব (বীরেন্দ্র-নাথ সরকার) ঐ প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচী রূপায়ণ করতেন, যেখানে ওঁর সংগে মিলিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি মনীষী। দর্শককে দেখানো হয়, 'মুক্তি' চিত্রের শিল্পীরূপে বড়ুয়া সাহেবকে ও পংকজ মল্লিককে এবং শোনানো হয়, পঙ্কজ মল্লিকের মুখ-নিঃসৃত গান : 'দিনের শেষে, ঘুমের দেশে, ঘোমটাপরা ঐ ছায়া'। কিন্তু এত গেল চিত্ররাজ্যের উজ্জ্বল দিক। এর অন্ধ-কারময় বিষণ্ণ দিকটি?—হ্যাঁ, তাও দর্শকের সামনে উদ্ঘাটিত করা হয়েছে এবং মনে হয়, অত্যন্ত কঠিন রূঢ়ভাবে। চীফ ইলেকট্রিসিয়ান সতীশ মাস্টার (হালদার) বলেছেন, 'এমন দিন গেছে, যখন পয়সার অভাবে সামান্য কেরোসিন তেলের লম্প জ্বালানোও সম্ভব হয়নি।' দেখা যায়, পরিচালক নবীন সেনের আক-স্মিক মৃত্যুর পরে তার ছেলেকে ছুটে আসতে হয়েছে স্টুডিওতে—বাপের দাহ-খরচার জন্যে অর্থভিক্ষা করবার অভি-প্রায়ে। ছোটোখাটো 'এক দু-লাইন' কথা বলার ভূমিকা পাবার আশায় দলে দলে নারী-পুরুষের উমেদারী; অনিশ্চিত ভবি-ষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকা পরিচালক কলাকুশলীর দল। দেখে দেখে মনে হয়,

আজ যারা হাসছে বেপরোয়া হয়ে, কাল তাদেরই হয়ত কান্নায় ভেঙে পড়তে হবে। এবং এও মনে হয়, বাংলা চলচ্চিত্র-জগতের অন্ধকারের দিকটা পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত কঠিন বাস্তবভাবে তুলে ধরবার প্রয়াসে তাঁর কাহিনীর চাহিদাকে উপেক্ষা করে তার অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছেন, অনেকটা অপ্রাসঙ্গিকভাবেই এই অংশটি দ্বারা তাঁর ছবিকে অযথা ভারাক্রান্ত করেছেন এবং দর্শককে আনন্দ দেবার পরিবর্তে তার মনকে করেছেন পীড়িত। আমাদের ধারণা, তিনি যদি তাঁর কাহিনীর রূপায়ণে 'চ্যাপলিয়ান' পদ্ধতি অনুসরণ করতেন, তাহলে তাঁর উদ্দেশ্য ঢের ভালোভাবে সিদ্ধ হত।

ছবির নায়ক 'ভাবলা'র ভূমিকায় পিনাকী সেনগুপ্ত ('অপরাজিত'র অপু) বাস্তবধর্মী অভিনয়ের মাধ্যমে চরিত্রটিকে প্রাণবন্ত করেছেন। লতার ভূমিকায় কল্যাণী মণ্ডলের অভিনয় খুবই সাবলীল। সুনীল দাশগুপ্ত (কাহিনীকার জগাই রায়), পারিজাত বসু (অতীন), রথীন বসু (নবীন সেন), সর্বেন্দর (চম্পককুমার), কৃষ্ণা বসু (চম্পা), কাজল মজুমদার (সমর), অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায় (বিক্রম), জগদীশ মণ্ডল (জগন), রূপা চৌধুরী (মিনতি), জহর রায়, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায় এবং স্ব স্ব নামে উত্তমকুমার প্রভৃতি শিল্পী, শ্যামসুন্দর ঘোষ প্রভৃতি কলাকুশলী ছবির সৌষ্ঠব বর্ধনে যথাসাধ্য সহায়তা করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ সাধারণভাবে প্রশংসনীয়। ছবিতে চারটি গান আছে। তাদের মধ্যে চলচ্চিত্রজগতের চমৎকারিত্বকে বিশ্লেষণ করে 'বাঃ, চমৎকার এই দুনিয়াটা' গানটি গেয়েছেন শ্যামল মিত্র। ছবির গোড়ার দিকেই হেমন্তকুমার শুনিয়েছেন 'একদিনেতেই হইনি আমি তোমাদের এই হেমন্ত'। এবং একটি শ্যুটিংয়ের দৃশ্যে একজোড়া নায়ক-নায়িকা গেয়েছেন : 'উত্তম হিরো হলে সুচিত্রা হিরোইন........ আবার জন্ম নেবো—সুচিত্রা সেন হবো, উত্তমকুমার হবো।' বাকী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠের গানখানি 'কতদূরে—এই পথ আমায় নিয়ে যাবে জানি না' সুর ও গাওয়ার দিক দিয়ে চিত্তস্পর্শী। আবহ-সংগীত রচনায় নচিকেতা ঘোষ অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন নিম্নকণ্ঠে সমবেত 'আ - আ - আ' সুরগানকে ছবির মর্মকথা রূপে মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করে।

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় রচিত ও পরিচালিত এবং নবজাত প্রোডাকসন্স নিবেদিত 'নকল সোনা' পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র প্রযোজনা জগতের একটি বাস্তব চিত্ররূপে অভিনন্দন লাভের যোগ্য।

শাঁওলী মিত্র/যুক্তি তক্কো গপ্পো। পরিচালনা : ঋত্বিক ঘটক।　　ফটো : অমৃত

স্টুডিও সংবাদ

ভারত বাংলাদেশ যৌথ প্রচেষ্টায় নির্মিত হচ্ছে 'পালঙ্ক' রাজেন তরফদারের পরিচালনায় ও দয়াশঙ্কর সুলতানিয়ার প্রযোজনায়। নরেন্দ্র মিত্র রচিত একটি কাহিনী অবলম্বনে গঠিত এই ছবিতে থাকছেন সন্ধ্যা রায়, উৎপল দত্ত, আনওয়ার হোসেন, সুপ্রিয়া গুপ্ত, সোফিয়া জামান, ফরিদা আমেদ, অমল দত্ত, নজরুল ইসলাম প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের শিল্পী। আলোকচিত্র গ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্প নির্দেশনায় আছেন যথাক্রমে শৈলজা চট্টোপাধ্যায়, অরবিন্দ ভট্টাচার্য ও ফারুক আহমেদ (বাংলা দেশ)। ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করছেন সুধীন দাশগুপ্ত। বাংলাদেশের এফ-ডি-সি স্টুডিও এবং কলকাতা উভয় স্থানেই ছবির শ্যুটিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। তার ওপর আছে বাংলাদেশের খাল, বিল, মাঠঘাট-এর প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী।

অগ্রদূত পরিচালিত 'সেদিন দুজনে'—চলচ্চিত্র ভারতীর পরবর্তী প্রচেষ্টা অগ্রদূত পরিচালিত 'সেদিন দুজনে' ছবির চিত্রগ্রহণ স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ স্টুডিওতে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। ইতিপূর্বে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ছবির তিনদিনের বহির্দৃশ্য গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া সুধীন দাশগুপ্তের সুরারোপে ছবির দুখানি গান রেকর্ড করা হয়ে গেছে—গেয়েছেন আরতি মুখোপাধ্যায়। সিদ্ধার্থ দত্ত রচিত ও চিত্রনাট্যায়িত ছবির প্রধান দুটি চরিত্রে আছেন—সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় ও দেবরাজ রায়।

হারায়ে খুঁজি—পূরবী ফিল্মস-এর প্রথম প্রচেষ্টা সুভাষ চক্রবর্তীর 'অনেক দিনের চেনা' অবলম্বনে 'হারায়ে খুঁজি'র শুভ সূচনা সংগীত গ্রহণের মাধ্যমে শুরু হয়েছে। অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরারোপে নেপথ্যে কণ্ঠ পরিবেশন করেছেন—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্ত, সবিতা চৌধুরী ও অনুপ ঘোষাল।

কুণাল মুখোপাধ্যায়ের চিত্রনাট্যে ছবিটি পরিচালনা করছেন—স্বদেশ সরকার।

বিভিন্ন চরিত্রে এপর্যন্ত যাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে মাধবী চক্রবর্তী, সোমা দে, অসিতবরণ, শিপ্রা মিত্র, মৃণাল মুখোপাধ্যায় শিবানী বসু এবং নায়ক চরিত্রে নবাগত দীপংকর দের নাম উল্লেখযোগ্য।

'রাতের রজনীগন্ধা'—অরুণ রায়চৌধুরী প্রযোজিত ও পরিবেশিত এ-আর-সি প্রোডাকসন্সের ছবি 'রাতের রজনীগন্ধা'র চিত্র গ্রহণের কাজ শেষ হয়ে গেছে। জানা গেল ছবিখানি সম্প্রতি সম্পাদকের টেবিলে গেছে। কাহিনী : ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত। চিত্রনাট্য : প্রশান্ত দেব। সুর : সুধীন দাশগুপ্ত। পরিচালনা : অজিত গাঙ্গুলী। নায়ক-নায়িকা চরিত্রে আছেন, আজকের সেরা জুটি উত্তমকুমার ও অপর্ণা সেন। অন্যান্য চরিত্রে আছেন, পাহাড়ী সান্যাল, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, তরুণকুমার শ্যামল ঘোষাল বঙ্কিম ঘোষ, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিতা মুখোপাধ্যায়, অনিতা গুপ্ত, নিভাননী প্রভৃতি।

চিত্রগ্রহণে অনিল গুপ্ত ও জ্যোতি লাহা। সম্পাদনায় কমল গাঙ্গুলী। পরিবেশনায় এন-এ ফিল্মস।

শরৎচন্দ্রের 'আলো ও ছায়া' দ্রুত প্রস্তুতি পথে : অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের 'আলো ও ছায়া' কাহিনীর চিত্ররূপ দিচ্ছেন এইচ এম ফিল্ম। ক্যালকাটা মুভীটোন স্টুডিওতে এই ছবির চিত্রগ্রহণ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে এবং আশা করা যায় আসছে মাসেই ছবিটি প্রদর্শনের জন্য তৈরী হয়ে যাবে।

ছবিটির চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক হলেন গুরু বাগচী। প্রধান তিনটি চরিত্রে দিলীপ রায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় ও যুঁই বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয় করেছেন। অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবানী বসু, আশা দেবী, পদ্মা দেবী ও অমরজিৎকে দেখা যাবে।

বিজন পাল ছবিটির সুরকার। মোট ছয়খানি গানে কণ্ঠ দিয়েছেন যথাক্রমে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় মানবেন্দ্র ও মীনা মুখোপাধ্যায়।

'রাণুর প্রথমভাগ' মুক্তি প্রতীক্ষায় : বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'রাণুর প্রথম ভাগ'-এর চিত্ররূপ এখন সেন্সরের ছাড়পত্র পেয়ে মুক্তির দিন গুনছে। নবেন্দু চট্টোপাধ্যায় তার স্বরচিত চিত্রনাট্যের উপর এই ছবিটির পরিচালনা করেছেন। ছবিটির বিভিন্ন চরিত্রে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, কণিকা মজুমদার, বঙ্কিম ঘোষ, রবি ঘোষ, অসীম চক্রবর্তী প্রভৃতি অভিনয় করেছেন। রাণুর ভূমিকায় কুমারী নীরা মল্লিক। ছবিটির সংগীত পরিচালক—নিখিল চট্টোপাধ্যায়। ইপ্সী ফিল্মস পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

সলিল চৌধুরীর—'এই ঋতুর একদিন'

প্রখ্যাত সংগীত পরিচালক সলিল চৌধুরী নিজস্ব পরিচালনাধীনে প্রথম বাঙলা ছবি স্ব-রচিত কাহিনী ও চিত্রনাট্য অবলম্বনে 'এই ঋতুর একদিন'-এর চিত্রগ্রহণ শুরু ১৭ জানুয়ারী থেকে ক্যালকাটা মুভীটোন স্টুডিওতে শুরু করেছেন এবং এ পর্যায়ের স্যুটিং চলেছে একটানা পাঁচদিন।

শ্রীমতী অঞ্জু গোস্বামী প্রযোজিত অঞ্জু পিকচার্স এন্টারপ্রাইজের পতাকাতলে নির্মিত এই ছবির বিভিন্ন চরিত্রে আছেন মাধবী চক্রবর্তী, অনিল চট্টোপাধ্যায় শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার, রবি ঘোষ, চিন্ময় রায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

অছাড়া গেল ১৬ জানুয়ারী ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীর স্কোরিং থিয়েটারে ছবির তিনটি গান শ্রীচৌধুরীর সুরারোপে রেকর্ড করা হয়েছে—গেয়েছেন—মান্না দে ও অনুপ ঘোষাল।

বসন্ত বিলাপ/চিত্রে রবি ঘোষ, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং চিন্ময় রায়।

বিবিধ সংবাদ

বার্ষিক উৎসব

আওয়ার অর্কেস্ট্রা'র স্মরগুরু পূজা ও

৩১ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় উত্তর কলকাতার প্রখ্যাত সৌখিন সংগীত-সংস্থা 'আওয়ার অর্কেস্ট্রা'র সভ্য-সভ্যারা চট্টগ্রামের অগ্নেয়-সন্তান বিপ্লবী ও সুর-পাগল সংগীতাচার্য সুরেন্দ্রলাল দাসের ঊনবিংশ বার্ষিক স্মৃতি-পূজা ও সংস্থার চতুস্ত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠানে কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে উপস্থিত দর্শকসাধারণের চিত্ত সংগীতে ভরিয়ে দিয়েছিলেন বিরল সার্থকতায়।

ঠিক ছটায় অনুষ্ঠান শুরু হয় স্মরগুরুর অভিনব স্মৃতিপূজা দিয়ে। সুরেন্দ্রলাল পরিকল্পিত ও রচিত 'মেল দশকম' রাগ-বিচিত্রা সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে পরিবেশন করেন সংস্থার চল্লিশজন সদস্য-সদস্যা। সেদিনের অন্যতম আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য অনুষ্ঠান হল 'বাংলার গান'। বাংলার কয়েকটি সংগীত বিশুদ্ধ প্রাচীন ধারাতে নিখুঁতভাবে পরিবেশন করেন সর্বশ্রী বাণী দাশগুপ্ত শ্রীলেখা চক্রবর্তী, রথীন ভট্টাচার্য, বীথি দাশ, সুস্মিতা বসু ও অরুণা মজুমদার। এছাড়া একক কণ্ঠে সাধু মণ্ডল ও শ্যামল দাশগুপ্তের গজল গান, শুভ্রা দত্তের মালকোশ রাগে সেতার,

পাশ্চাত্য সুরে শ্যামল গুপ্ত ও সৌরেন দের গীটার শ্রোতাদের বিশেষভাবে আনন্দ দেয়। সবশেষে হাসির হিল্লোল বইয়ে দিলেন সুখ্যাত 'চিকিৎসক ও হাসির গানের স্বনাম-ধন্য গায়ক ডাঃ সারদা গুপ্ত।

সরসভার সংগীত সম্মেলন: সরসভার তিনদিনব্যাপী এক সঙ্গীত সম্মেলন গত ২৪ ডিসেম্বর থেকে ২৬ ডিসেম্বর রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে সম্পন্ন হয়েছে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে গৌর বসাক মালকোষ রাগে খেয়াল ও পরে ঠুংরি গেয়ে শোনান। অপর শিল্পী কান্তি মৈত্র 'বাগেশ্রী' রাগে খেয়াল পরিবেশন করেন। অমৃতলাল রায় বাঁশীতে ধুন বাজিয়ে শোনান। এ'দের প্রত্যেকের অনুষ্ঠানই উপভোগ্য হয়েছিল। রবীন্দ্র ও অন্যান্য লঘু সংগীত পরিবেশনায় ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু চৌধুরী, সমরেশ রায়, পূর্বা দাস, অনুপ ঘোষাল, রবীন মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত সিংহ, বাঁশি দাস, শ্যামলী বসু, স্নিগ্ধা গুহ, দীপ্তি রায়, মণিদীপা শ্যাম, অসীমা ভট্টাচার্য, লক্ষ্মী গুপ্ত, সর্বাণী শ্যাম, মঞ্জুশ্রী গাঙ্গুলী, সুষমা ঘোষ, সুজাতা সেন, শান্তা বসুরায় ও শকুন্তলা বসুরায়। যন্ত্রসংগীতে ও সঙ্গতে সহযোগিতা করেন স্বপন মুখোপাধ্যায়, শৈলেন দাস, অমৃতলাল রায়, চাঁদু বন্দ্যোপাধ্যায়, ভোলানাথ সাহা, দুলাল ভট্টাচার্য ও শৈলেন মুখোপাধ্যায়। সম্মেলনটি পরিচালনা করেন রথীন চৌধুরী।

প্রথম কোরীয়ান চলচ্চিত্র উৎসব

সিনে সেন্ট্রাল ক্যালকাটার উদ্যোগে কলকাতার প্রথম কোরীয়ান চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে ২৬ জানুয়ারী থেকে ১ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত জনতা প্রেক্ষাগৃহে। এই উৎসবে উত্তর কোরিয়ার সাতটি কাহিনী-চিত্র 'মেরী স্টেজ', 'ইন আন এনিমি অকুপায়েড টাউন', 'উই হ্যাভ নাথিং টু এনভি ইনদি ওয়ার্ল্ড', 'অ্যামঙ্ দি ভিলেজার্স', 'এ ওয়াইফস ওয়ার্কিং প্লেস', 'এ মেডেন অফ মাউন্ট কুমগান সান' ও 'এ ফ্লাওয়ার গার্ল' দেখানো হবে।

রবীন্দ্রনাথ ও লোকসঙ্গীত : ১৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় বিবেকানন্দ হলে তরুণ সঙ্ঘ পাঠাগারের রজত জয়ন্তী উৎসবে উদীচী শিল্প গোষ্ঠী 'রবীন্দ্রনাথ ও লোক-সঙ্গীত' শীর্ষক গীতি আলেখ্য সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশন করেন।
পরিবেশন করেন।

রবীন্দ্রনাথের আগে লোকসঙ্গীত ছিল অবহেলিত। তথাকথিত ভদ্র সমাজে এর প্রচলন ছিল না। গ্রামের অশিক্ষিত মানুষ-দের সঙ্গেই ছিল তার প্রাণের টান। বাউল ভাটিয়ালি, কীর্তন, কথকথা, রামপ্রসাদী সুর গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে ছিল আদৃত। রবীন্দ্রনাথই প্রথম এই গানকে শিক্ষিত সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নিজেও বহু গান রচনা করেন এই সুরে। তারই কয়েকটি গান, বিভিন্ন লোকসঙ্গীতের সুরে রচিত, পরিবেশিত হয় শৈলেশ ভড়ের পরি-চালনায়। সঙ্গীতাংশে ছিলেন গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়, সুস্মিতা পাল, অনিমা ভড়, ভারতী মৈত্র, তপন সিংহ, তপন ভট্টাচার্য, বাদল চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ দাস ও জ্যোতি-ব্রত চট্টোপাধ্যায়। গীটারে সহযোগিতা করেন রথীন রায় ও স্বপ্না মাইতি।

ধ্রুপদ সঙ্গীত : গত ১৩ জানুয়ারী সঙ্গীত সম্মিলনীর (৩৬ এ বি প্রতাপাদিত্য রোড) মাসিক অধিবেশনে, কালিশঙ্কর মিত্র,মৃদঙ্গে চৌতাল, লছরা বাজান। পরে বিপ্রদাস নন্দী, সঙ্গীত-তত্ত্ব-বিশারদ, দরবারী রাগে, আলাপ, রাসতালে ধ্রুপদ, ধামার ও সুরফাক্তা তালে তাড়ানা পরিবেশন করেন। এ'র সঙ্গে মৃদঙ্গে পাণ্ডিত্যপূর্ণ সঙ্গত করেন প্রতাপনারায়ণ মিত্র। শ্রোতারা গীত ও বাদ্যে যথেষ্ট আনন্দ পায়।

বিচিত্রানুষ্ঠান : অ্যালুকয়েন স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল ইউনিটের তৃতীয় বার্ষিকী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২৭ জানু-য়ারী সন্ধ্যা ৫টায় শ্রীশিক্ষায়তন মঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে। সুনীল মুখার্জির পরি-চালনায় ক্লাব সভ্যরা 'অভিনয়' নাটক মঞ্চস্থ করবেন। তাছাড়া পি অর্ণব, পাপিয়া সরকার ও স্নিগ্ধা চৌধুরীর সঙ্গীত এবং যাদুকর এ সি সরকারের ম্যাজিক অন্যতম আকর্ষণ।

সুভাষ মঞ্চের পুরস্কার বিতরণী উৎসব

গত সপ্তাহে ব্যারাকপুরের নোনা জাফরপুরের বিধান সংগ্রহ শালার সুভাষ

বনগাঁ মহকুমা এস ডি ও অফিসকর্মীদের অভিনীত সম্রাট নাটকের একটি দৃশ্য।

মঞ্চের ৬ষ্ঠ **বার্ষিক অধিবেশন** উপলক্ষে শিশিরকুমার একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতার গত বছরের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে পরিসমাপ্তি ঘটে। অনুষ্ঠানের সভানেত্রী ছিলেন নাট্য-সম্রাজ্ঞী সরযূবালা দেবী ও প্রধান অতিথি ডঃ চারু দত্ত। পুরস্কার বিতরণ করেন চিত্র ও মঞ্চ শিল্পী শ্রীমতী আরতি ভট্টাচার্য। স্থানীয় নাট্য প্রতিষ্ঠান শ্রীনাট্যম কর্তৃক গিরিশচন্দ্রের অমর সৃষ্টি 'প্রফুল্ল' অভিনীত হয় শ্রীচিত্ত দত্তের সুষ্ঠু পরিচালনায়। অনুষ্ঠানে অতিথিদের আপ্যায়ন করেন তরুণ কর্মী শ্রীঅমিতাভ মুখার্জি।

মঞ্চাভিনয়

বনগাঁয় মঞ্চাভিনয় : বনগাঁ মহকুমা শাসক শ্রীশচীন সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে এবং শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় বনগাঁ এস ডি ও অফিসের কর্মীরা নাট্যকার শৈলেশ গুহ নিয়োগীর 'জীবন্ত স্ট্যাচু' এবং রতনকুমার ঘোষের 'সম্রাট' নাটক দুটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন।

নাট্য নির্দেশকের বিচক্ষণতা ও উপস্থাপনার কৌশল এবং দলগত অভিনয় নৈপুণ্য নাটক দুটিকে আকর্ষণীয় করে তোলে। রূপসজ্জা, আলোক সম্পাত ও আবহসংগীতের সুষ্ঠু প্রয়োগ নাটক দুটিকে সাফল্যের দ্বারে পৌঁছে দিতে যথেষ্ট সাহায্য করে।

পরিতোষ ও সুরপ্রিয়ের ভূমিকায় পরিচালক শ্রীচট্টোপাধ্যায় অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। তাছাড়া মিঃ চৌধুরী, বিপিনবাবু, হরিহর, রঘুরাম ডাকু ও পুলকের ভূমিকায় যথাক্রমে শচীন সেন, বুদ্ধদেব চক্রবর্তী, জীবন মজুমদার, সনৎ মণ্ডল, ও আর্য চ্যাটার্জির প্রাণবন্ত অভিনয় দর্শকদের মনে গভীর ছাপ রাখতে সক্ষম হয়। নাটক দুটির অন্যান্য চরিত্র রূপায়ণে রেবতীরমণ দাস, জয়গোপাল পালিত ও তারাপদ ভট্টাচার্য-এর সংযত ও সাবলীল অভিনয় দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। স্ত্রী চরিত্রে মায়া মৈত্র ও গীতা দে প্রশংসার দাবী রাখেন। ব্যবস্থাপনায় সংস্থার সভাপতি শ্রীঅমল গুপ্ত কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

আদর্শ হিন্দু হোটেল : আজকাল অফিস স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের নাট্যপ্রযোজনার মধ্যেও যে প্রাণবন্ত অভিনয়ের নজীর মেলে তার প্রমাণ আর একবার পাওয়া গেল সম্প্রতি রুদি স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' প্রযোজনায়। রঙমহলে অনুষ্ঠিত এই নাট্যাভিনয় দর্শকদের প্রায় প্রতিটি মুহূর্তেই মুগ্ধ করেছে। প্রতিটি শিল্পীই অভিনয়ে নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। বিশেষ করে 'হাজারি ঠাকুর' ও 'মতি' ও 'পদ্ম ঝি'র ভূমিকায় ভবতারণ মুখার্জি, সুশীল রায়, তৃপ্তি দাসের অভিনয় সত্যি মনে রাখার মতো হয়েছে। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন রবি বন্দ্যোপাধ্যায়, বরেন হালদার, শিবচন্দ্র রায়, সমীর সান্যাল, কমলেন্দু মুখার্জি, চঞ্চল মিত্র, প্রবোধ চৌধুরী, পার্বতী ব্যানার্জি, শেলী মজুমদার, মিহির মুখার্জি।

বাঁশের কেল্লা : কলকাতার বিশিষ্ট সৌখীন নাট্য সংস্থা গিরিশ নাট্য সংসদ ৩১ ডিসেম্বর চুঁচুড়ার পিপুল পার্টিতে স্থানীয় বিচিত্রা সংস্থার রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে বাঁশের কেল্লা নাটকটি অভিনয় করে সহস্রাধিক দর্শককে মুগ্ধ করেন। নাট্য পরিবেশনায় সংসদের যে স্বকীয়তা ও বিশেষ দক্ষতা রয়েছে এই অভিনয় তার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রেখেছে।

প্রথম থেকে শেষ অবধি সংঘাতময় এই নাটক শিল্পীদের সামগ্রিক প্রচেষ্টায় ও নিষ্ঠায় দর্শক চিত্তে সাড়া জাগিয়েছে। ইতিঃপূর্বে এ নাটকটি কলকাতা ও মফঃস্বলের বহু আসরে যেমন প্রশংসা পেয়েছে এবারও তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি, বরং একথা বলা যায় যে, নতুন একটা বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামী তিতুমীরের বৈচিত্র্যময় জীবন ও ইংরেজ রাজশক্তির সঙ্গে আপোষহীন সংগ্রাম এ নাটকের মূল বিষয়।

অভিনয়ে সকলেরই চরিত্র সম্বন্ধে সচেতনতা ও তাকে সঠিকরূপে দেওয়ার ঐকান্তিকতা বিশেষ লক্ষণীয়। ধীরেন চক্রবর্তী, পুরেন পাল, সমীর ব্যানার্জি শশাঙ্ক চ্যাটার্জি, কেষ্ট সিংহ, তারাপ্রসাদ ভট্টাচার্য, গৌরচন্দ্র পাল, গৌরহরি অধিকারী, প্রদীপ ব্যানার্জি, সুরেশ ঘোষ ইতু মুখার্জি, সুলেখা ব্যানার্জি, রঞ্জনা চ্যাটার্জি, ঝর্ণা ঘোষ, সুধা সরকার, নিমাই দে শিল্পীরা যথাক্রমে বিশু মোড়ল, অনাদি তিতুমীর, বংশীধর, কালীপ্রসন্ন, হীরালাল, দীনবন্ধু, মিস্কিন, খাজা খাঁ, রুস্তম, সুবেদার, বাদশা, পিয়ারা, ডলি, সীমা, ফুলজান ও সদানন্দ চরিত্রে সার্থক রূপায়ণ করে এ নাটকের প্রকৃত রূপটি প্রকাশ করেছেন।

টাকার রং কালো : কৃষ্ণনগরের কুশীলব নাট্যসংস্থার শিল্পীরা সম্প্রতি কৃষ্ণনগর রবীন্দ্রভবনে সাফল্যের সঙ্গে সুনীল চক্রবর্তীর 'টাকার রং কালো' নাটকটি অভিনয় করেন। বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নেন দিলীপ হাজরা, পার্থ পাণ্ডা, নির্মলশ্যাম রায় চৌধুরী, অসীম সরকার, মানিক দাস চন্দ্রকান্ত সরকার, জ্যোতির্ময় অধিকারী, তপন নন্দী, সমর সাধুখাঁ, মাধবী বোস, শম্পা সিংহ, কল্পনা সাহা, উত্তম মুখার্জি।

ফাঁস : উত্তর কলকাতার সাংস্কৃতিক সংস্থা 'মজার'এর শিল্পীরা বিশ্বরূপার মঞ্চে পরিবেশন করেন শৈলেশ গুহ-নিয়োগীর 'ফাঁস' নাটকটি। প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে এই প্রযোজনাটি মোটামুটি সার্থক হয়েছে বলতে হয়। বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন প্রতিমা কর, স্বপন মিত্র, অনিত তালুকদার তপন মিত্র, সোমনাথ দাস, সুব্রত সেন, স্বপন দেব, গৌতম চক্রবর্তী, দীপক গুপ্ত, নীলিমা দাস, দিলীপ ঘোষ, নিতাই দাস, মোহন মিত্র, ব্রজকিশোর পাল।

নাট্য প্রতিযোগিতা

চুঁচুড়া কল্লোল আয়োজিত নবমবর্ষ একাংক নাট্যপ্রতিযোগিতায় যোগদানের শেষ তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ১৮ ফেব্রুয়ারী। যোগাযোগের ঠিকানা : সম্পাদক, কল্লোল, পালগালি (ষণ্ডেশ্বরতলা), চুঁচুড়া, হুগলী।

৩নং কয়লাঘাট স্ট্রীট কলকাতা-১-স্থিত ইস্টার্ণ রেলওয়ে রিক্রিয়েশন ক্লাবের পরিচালনায় ৪র্থ বার্ষিক আন্তঃ রেল বাংলা একাংক নাট্যপ্রতিযোগিতা আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে শুরু হবে। যোগাযোগের শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারী।

নিকটেই ফাঁদ : অগ্নিমিত্রের 'নিকটেই ফাঁদ' নাটকটি সম্প্রতি রবীন্দ্রসরোবর মঞ্চে পরিবেশিত হয়। প্রযোজনা করলেন ইউ-নাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার (ঢাকুরিয়া শাখা) কর্মচারী সমিতির শিল্পীরা। নাটকটি পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেন তরুণ মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন প্রবীর বর্ধন রায়, সুশান্ত বসু, দিলীপ পাল, স্বপন দাস, সুধাংশু দাশগুপ্ত, মানিক দে, পাপিয়া চ্যাটার্জি, শ্রীমতী পাইন, সুবিমল সিনহা, হারাধন দেবনাথ, বিপ্লব চন্দ, চিন্ময় নন্দী, প্রশান্ত ভৌমিক, ননীগোপাল দাস, অমল কর।

কেদার রায় : সম্প্রতি রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে রমেশ গোস্বামীর 'কেদার রায়' নাটকটি অভিনয় করেন সান্ধ্য মজলিস গোষ্ঠী।

অভিনয়ের দিক থেকে প্রথমেই যাদের নাম করতে হয় তাঁরা হলেন হরি মুখোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন ঘোষাল, নন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী পাইন ও মঞ্জু ভৌমিক। এ ছাড়া ভাস্কর মিত্র, সুশীল নাথ, বরুণ বসু, অনিল ঘোষ, জীবন ঘটক প্রভৃতি সুঅভিনয় করেন।

বোম্বাই-এ বাঙলা নাটকের অভিনয় : বোম্বাইর প্রখ্যাত সংস্থা ইন্ডিয়া কালচার লীগ 'বাংলা সাধারণ নাট্যশালা শতবার্ষিকী পূর্তি' উৎসব সমিতির আহ্বানে ২৮ জানুয়ারী '৭৩ ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে সোমেন্দ্র নন্দী লিখিত 'পিরানদেল্লোর মতো' একাঙ্কটি মঞ্চস্থ করছেন। তাছাড়া ইউ টি সি আয়োজিত সারা ভারত বাংলা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায়ও অংশ গ্রহণ করছেন।

নিখিল বঙ্গ একাঙ্ক নাটক, অভিনয়, আবৃত্তি এবং রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রতিযোগিতা :

বাঁড়িষা আসর পরিচালিত নিখিল বঙ্গ একাঙ্ক নাটক, অভিনয় আবৃত্তি এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রতিযোগিতা ৪ ফেব্রুয়ারী থেকে আরম্ভ হবে। যোগদানের শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারী। বিস্তারিত বিবরণ এবং আবেদনপত্র বাঁড়িষা আসর ৩০নং বসপাড়া বাঁড়িষা, কলিকাতা-৮ এই ঠিকানায় পাওয়া যাবে।

অভিনেতৃ সংঘ-এর 'বিদেহী'

দক্ষিণ কলিকাতায় নব-নাট্যগৃহ 'শিশির মঞ্চ' প্রতিষ্ঠাকল্পে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে শৌভনিক ট্রাস্ট রবীন্দ্রসদনে সম্প্রতি যে পাঁচদিন ব্যাপী নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছিলেন, তার সমাপ্তি দিবসে (১২ জানুয়ারী) অভিনেতৃ সংঘ মঞ্চস্থ করেছিলেন হেনরিক ইবসেন-এর 'গোস্টস' অনুসরণে রচিত 'বিদেহী' নাটকটি।

'গোস্টস' অবলম্বনে লিখিত বাঙলা নাটকের অন্তত একটি অভিনয় আমরা কয়েক বছর আগে এই কলকাতা শহরে দেখেছিলাম এবং মনে পড়ে অভিনয়ের দিক দিয়ে সেটি মনে রেখাপাত করতেও সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু অভিনেতৃ সংঘ-এর 'বিদেহী' মূলে নাটকের মর্মকথাকে যে আশ্চর্য প্রাঞ্জল ভাবে প্রকাশ করেছে, আগে-দেখা নাটকটি সে-পরিমাণ স্পষ্ট প্রাঞ্জলতা দাবি করতে পারেনা। জানি না, 'বিদেহী' নাটকটি কার লেখনীপ্রসূত; কিন্তু তিনি যিনিই হোন, তাঁকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এমন একটি রচনা উপহার দেওয়ার জন্যে। পরিস্থিতি ও চরিত্র অনুযায়ী সাবলীল সংলাপ এই রচনাটির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। নাটকের প্রধান চরিত্র মিসেস হেলেন আলভিংয়ের জীবনযন্ত্রণা ও জীবন-জিজ্ঞাসাকে সম্পূর্ণভাবে মূর্ত ক'রে তুলেছে এই সংলাপ। মাত্র মধ্যান্তর বা বিরাম নির্দেশক যবনিকার আগে মিসেস আলভিংয়ের মুখে 'ভূত! ভূত!' না দিয়ে 'বিদেহী আত্মা, সেই বিদেহী আত্মার আবির্ভাব!' গোছের দিলে অধিকতর শোভন হত।

নাটকের ঘটনাস্থল করা হয়েছে মিসেস আলভিংয়ের বসবার ঘর। অত্যন্ত সুপরিকল্পিত এই কক্ষটিতে উপযোগী আসবাবপত্র সুবিন্যস্ত। মৃত ক্যাপ্টেন আলভিংয়ের রঙিন ছবিটি পর্যন্ত সেখানে স্থান পেয়েছে। চরিত্রোচিত রূপসজ্জা এই নাট্যাভিনয়ের সর্বাঙ্গীণ সাফল্যে সহায়তা করেছে। শব্দপ্রক্ষেপণে কিছুটা ত্রুটি থেকে গেছে। ডানদিকের খাবার-ঘর থেকে ওসওয়াল্ড (না, অসওয়াল্ড?) ও রেজিনার ভেসে-আসা কণ্ঠস্বর শোনা গেছে প্রেক্ষাগৃহের বাঁ দিকের লাউডস্পীকারের মাধ্যমে। এবং তাপস সেনের আলো অত বেশী চোখ-ধাঁধানো না হয়ে কিছুটা স্বাভাবিক হলে খুব বেশী ক্ষতি হ'ত কি?

'বিদেহী' অভিনয়ের বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে এর সামগ্রিক অভিনয় পারিপাট্য। প্রতিটি চরিত্রই আশ্চর্য নৈপুণ্যের সংগে চিত্রিত হয়েছে। বিবেকের সংগে সামাজিক আদর্শের যে সংঘাত দ্বারা মিসেস হেলেন আলভিং প্রতিনিয়ত জর্জরিত, তাকে জীবন্ত ভাবে পরিস্ফুট ক'রে তুলেছেন নীলিমা দাস তাঁর দীপ্ত অভিনয়ের মাধ্যমে। তাঁর বহু স্মরণীয় চরিত্রাভিনয়ের মধ্যে এই মিসেস আলভিংয়ের ভূমিকাটি প্রোজ্জ্বল হয়ে থাকবে। পিতার উচ্ছৃংখল চরিত্রের উত্তরাধিকারী ওসওয়াল্ড অনবদ্যভাবে রূপায়িত হয়েছে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারা। আপাত উচ্ছলতার মাঝে দুঃসাধ্য দুরন্ত রোগ যে তার নিজেরই অবিমৃষ্যকারিতার ফল, এই চিন্তা যে তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে, এই অবস্থাটি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে। শেষ পর্যন্ত জ্ঞান,

বুদ্ধি, মানসিক ক্ষমতা লোপের চক্ষুবাহী অভিব্যক্তি সহ তাঁর প্রলাপোক্তি 'আমায় সূর্যটা এনে দাও, আমায় সূর্যটা এনে দাও' দর্শকচিত্তে অবর্ণনীয় বিষণ্ণতার সৃষ্টি করেছিল। সেই মাতাল, খোঁড়া সুবিধাবাদী, 'ছোটো' মানুষ ইংস্ট্রান্ডয়ের ভূমিকাটি বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছিল নির্মল ঘোষের অভিনয়ের মাঝে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বন্ধুর পথে কোনোক্রমে খুঁড়িয়ে চলতে পারলেই হ'ল—এই চিন্তাধারার মানুষ ইংস্ট্রান্ড নাটকের অন্য সব চরিত্র থেকে আলাদা পথের পথিক, এ-সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে তাঁর বাস্তবধর্মী অভিনয় মারফত। ধর্মভীরু, সমাজের শৃঙ্খলাবোধ দ্বারা অকুণ্ঠ বন্ধনে বদ্ধ পাদ্রী ম্যান্ডার্স-এর ভূমিকাটি পরম নিষ্ঠার সঙ্গে অত্যন্ত সংবেদনশীলভাবে চিত্রিত করেছেন অশোক মিত্র। আবার যেখানে তাঁরই অসতর্কতার ফলে অনাথ-আশ্রমটি অগ্নিদগ্ধ হয়েছে ব'লে ইংস্ট্রান্ড ম্যান্ডার্সের ওপর দোষারোপ করছে, সেখানে সেই অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পাবার ছটফটানি ম্যান্ডার্সের চরিত্রকে কিছুটা ভণ্ড ব'লেও চিহ্নিত করে। এবং এখানেও অশোক মিত্র সার্থক নাট-নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। পরিচারিকারূপে মিসেস আলভিং দ্বারা স্নেহের সঙ্গে পালিতা রেজিনার চরিত্রটি পরিচ্ছন্নভাবে রূপায়িত করেছেন আরতি ভট্টাচার্য। ওসওয়াল্ডের আগমনে তার ভাবান্তর এবং শেষ পর্যন্ত তার জন্ম-বৃত্তান্ত শ্রবণে সমস্ত সংসারের প্রতি তার বিরক্তি—সবই অভিব্যক্ত হয়েছে তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে।

অভিনেতৃ সংঘ-এর 'বিদেহী' একটি স্মরণীয় নাট্যাভিনয়।

অনামিকার 'হয়-বদন'

বর্তমানে ভারতীয় নাট্যজগতে গিরীশ কার্ণাড একটি প্রতিষ্ঠিত নাম। এই মালয়লি নাট্যকারের 'তুঘলক', 'সংস্কারা' প্রভৃতি রচনা নাট্যক্ষেত্রে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সূচনা করেছে। শ্রীকার্ণাডের নতুন নাটক 'হয়-বদন'-এর বক্তব্য হচ্ছে, মানুষ সর্বদাই পূর্ণতার জন্যে ব্যগ্র এবং এই পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষাই মানুষের জীবনে আনে অস্থিরতা। এই সঙ্গে আর একটি বক্তব্যকেও শ্রীকার্ণাড উপস্থাপিত করেছেন : মানুষের মস্তিষ্কই

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ফটো : অমৃত

তার প্রকৃত সত্তা, মস্তিষ্কই তাকে দেয় ব্যক্তিত্ব, বিশেষত্ব। তাই দেবদত্ত ও কপিলের মধ্যে যখন মস্তকের পরিবর্তন ঘটল দৈব ইচ্ছায়, তখন ধীরে ধীরে ওদের পরিবর্তন দেখা দিল এবং শেষ পর্যন্ত কপিল হয়ে উঠল দেবদত্ত ও দেবদত্ত হয়ে পড়ল কপিল। এবং যে হয়-বদনের মস্তক সমেত সম্মুখভাগ ছিল হয় বা অশ্ব এবং পশ্চাদভাগ ছিল মানুষ, সেও হয়ে উঠল পুরোপুরি হয় বা ঘোড়া। শ্রীকার্ণাডের মতে নারীরা বরাবরই বীর্যের বা দেহশক্তির উপাসক। তাই দেখি, নারী স্বয়ংবরা হয়ে অশ্বের কণ্ঠে দেয় বরমালা, নায়িকা পদ্মিনী কপিলের শরীর বিশিষ্ট দেবদত্তকে (দেবদত্তের মুখমণ্ডলকে) পেয়ে খুশীতে নেচে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত যখন দেবদত্তের মুখমণ্ডল তার দেহকেও আগেকার মতো দেবদত্তুল্য করে নেয়, তখন সে বিষণ্ণ হয়ে পড়ে এবং কপিলের ঘরণী হতে এগিয়ে যায়। অবশ্য দ্বন্দ্বযুদ্ধে দুজনেই যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে সে তার কামনার আগুনকে পুড়িয়ে মাঝে।

এই রূপক নাটকটি—যার মধ্যে কালী মূর্তি জীবন্তভাবে আবির্ভূত হয়ে অভিশাপ দেয় এবং একের ধড়ের সঙ্গে অন্যের মুণ্ড যোজনা হতে দেখে মজা উপভোগ করে, পুতুলরা সজীব হয়ে স্বামী ও স্ত্রীর মনোজগতের বিশ্লেষণে মেতে ওঠে—সাধারণ দর্শকের চক্ষে একটি পরম উপভোগ্য রূপকথারই সামিল হলেও আসলে যে একটি মনস্তত্ত্বঘটিত নাটক, তা প্রথম প্যারাগ্রাফ থেকে পাঠকরা সহজেই বুঝতে পারছেন। এবং রসিক দর্শক অভিনয় যতই অগ্রসর হবে, ততই উপলব্ধি করতে পারবেন।

শৌভনিক ট্রাস্টের উদ্যোগে সম্প্রতি রবীন্দ্রসদনে যে পাঁচ দিনব্যাপী নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হল, তারই চতুর্থ দিনে (১১ জানুয়ারী) অনামিকা নাট্যগোষ্ঠী গিরীশ কার্ণাড রচিত এবং ইউ ও কারন্ত দ্বারা হিন্দীতে অনূদিত 'হয়-বদন' নাটকটিকে মঞ্চস্থ করেন। নির্দেশক রাজেন্দ্রনাথ নাটকটিকে ব্রেখ্‌টীয় ঢংয়ে উপস্থাপিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন। কয়েকটি চতুষ্কোণ স্তম্ভ ও বসবার জন্যে একটি কাঠের বেদীকে দৃশ্য-সজ্জা হিসেবে এখানে - ওখানে স্থাপিত করে এক-একটি দৃশ্যে গঠন করা হয়েছে। মঞ্চের দক্ষিণ-সম্মুখ ভাগের একটি ছোটো ঘেরা জায়গায় আসন গ্রহণ করেন ভাগবত, যিনি সূত্রধারের কাজ করেন নাট্যক্রিয়ার ভূমিকা ভাষণ ও বিভিন্ন নাট্যাংশের মাঝে ব্যাখ্যামূলক সংযোগসাধন করে। আর বাম-সম্মুখ ভাগের ঘেরা অংশে বসেন গায়ক-গায়িকা ও বাদ্যকারবৃন্দ। এ'রা নাট্যক্রিয়ার মাঝেই বিভিন্ন চরিত্রের ভাবনাচিন্তাকে গানের মাধ্যমে প্রকাশ করে দর্শকদের জানিয়ে দেয় যে, তাঁরা আসল কোনো ঘটনা দেখছেন না, মাত্র অভিনয় দেখছেন। অনেকটা বিগত যুগে আমাদের যাত্রায় অনুসৃত রীতির সামিল।

সুন্দর বাচনভঙ্গী সূত্রধাররূপী ভাগবতের ভূমিকায় আদিত্য বিক্রমের। অভিনয় ব্যাপারে তিনি যে সুদক্ষ, তার প্রকাশ তাঁর প্রতিটি ভঙ্গীতে, চলনে, বলনে। দেবদত্ত যে একজন কবি ও শিল্পী তার প্রত্যয়িত স্বাক্ষর রেখেছেন শিবকুমার ঝুনঝুনওয়ালা। দেহে বলে বলীয়ান, সরল প্রাণ, বন্ধুর একান্ত অনুগত কপিলের ভূমিকাটিকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন শরৎ শেঠ। কপিলের মুখ যখন দেবদত্তের দেহের সংগে মিলিত হল, তখন তার মনে স্পষ্ট হয়ে উঠল পদ্মিনীকে পাবার বাসনা, যে-বাসনা এতদিন সুপ্তভাবে বাসা বেঁধেছিল তার অন্তরের অন্তরতম স্থলে। এই ভাবান্তরকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন শ্রীশেঠ। স্বেচ্ছা নির্বাসনের পরে কপিল আবার যখন পুরোপুরি কপিল, তখন তার পদ্মিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার থেকে শেষ পর্যন্ত অভিনয়টুকু আরও ব্যঞ্জনাপূর্ণ হওয়ার প্রয়োজন ছিল। নায়িকা পদ্মিনী বেশে বীণা দীক্ষিত চরিত্রটিকে সুষ্ঠুভাবে চিত্রিত করেছেন। এ-ছাড়া রবি ওয়াংচু (হয়-বদন), সুশীল মিশ্র (মহাকালী), রামগোপাল বাগলা (১ম নট), মোতিশঙ্কর পাণ্ডোলী (২য় নট) প্রভৃতি স্ব স্ব ভূমিকায় যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রকাশ করেছেন।

অনামিকা প্রযোজিত 'হয়-বদন' একটি সর্বাংশে উপভোগ্য নাট্যাভিনয়।

ঢাকার ছায়াছবি

কবরী চৌধুরী

ফ্লোরের চারপাশে অন্ধকারের ভেতর ডুবে রয়েছে। সোফার ওপর যেমন খুশি হয়ে ছড়িয়ে বসে আছেন অনেকে। সকলেরই অন্ধকার অন্ধকার মুখ। এই মুখের ছায়ার ভেতরই পরিচালক সুভাষ দত্ত। সুভাষবাবুও সোফায় বসে। ও'র চোখে-মুখে চিন্তার ছাপ স্পষ্ট। অন্যমনস্ক হয়ে এক সময় তিনি বলছেন।

—ওরা কি কাজ শুরু করবে না?

—ওদেরকে ত নিষেধ করছে কাজ করতে। সেটের পারমিশন এখন দেয় নাই। সোফায় বসে-থাকা সুভাষবাবুর দিকে কয়েকজন লোক এগিয়ে এলেন। অমনি চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল।

—এই লাইট অন। লাইট অন।

দু নম্বর ফ্লোরের সমস্ত আলো জ্বলতে শুরু করল। একজন বলে উঠলেন।

—আরে, ওইগুলা জ্বালাইয়া লাভ নাই! লাস্টে যেটা নিভাইলা, ওইটাই জ্বালাইয়া রাখ।

জনৈক ভদ্রলোক আক্ষেপ করে বললেন।

—কালকেও শট নেয়া হল না।

—ওই সেটের ত প্রস্তুতি ছিল না কালকা।

বেশ বোঝা যাচ্ছে পরিচালক সুভাষ দত্ত তাঁর ছবি বলাকা মন নিয়ে দারুণ চিন্তিত এবং ব্যস্ত। বলাকা মন সুদর্শনা নায়িকা কবরী চৌধুরীই প্রযোজনা করেছেন।

এক টাকা—কনট্রাকট্‌

এফ ডি সি-র রেকর্ডিং ফ্লোরের দরজা ছুঁয়ে একান্তে গল্প করছিলেন ও'রা দুজনে। এক টাকার একখানা নোট ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে প্রখ্যাত সংগীত-পরিচালক সত্য সাহা বলে ফেললেন।

—এই যে বছরের প্রথম দিনের আয়। তার মানে এক টাকায় কনট্রাকট্‌ হল কুণ্ডুবাবু। বাকিটা পরে।

যিনি এ-টাকা দিলেন সত্যবাবুর হাতে, তিনি হচ্ছেন প্রযোজক-পরিচালক মহম্মদ ইয়াসিন। ইয়াসিন সাহেব অবশ্য ছবির নাম এখনও ঠিক করে উঠতে পারেননি।

সত্য সাহা সুরারোপিত ছবিগুলোর নাম হল—দাতা হরিশ্চন্দ্র, যাহা বলিব সত্য

বাঁদিব, মধুমিতা, অশান্ত পৃথিবী, অপরাধ, জনতার আদালত, নবজন্ম, অন্ধ অতীত, অভাগিনী, বলাকা মন, অন্তরালে। তাছাড়া আরো অনেক।

রাজ্জাক

রাজ্জাক যে ওপার বাংলার সেরা নায়কদের একজন, সেকথা নতুন করে জানিয়ে লাভ নেই। স্টুডিওর এক নির্জনে কজন ভদ্রলোক কথা বলাবলি করছেন। তা থেকে বুঝলাম, রাজ্জাক চিত্র-পরিবেশক হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করছেন। ও'র নিজস্ব চিত্র-পরিবেশন সংস্থার নাম হল রাজলক্ষ্মী প্রডাকশনস। রংবাজ এই প্রডাকশনেরই ছবি।

রংবাজ ছবিতে রাজ্জাক-কবরীকে জুটি হিসেবে দেখা যাবে অনেকদিন পর। ও'রা নাকি এ-ছবিতে দুটো সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের চরিত্রে রূপ দিয়েছেন। রংবাজ পরিচালনা করছেন জাহিরুল হক। হক সাহেব পরিচালকরূপে এই প্রথম আত্মপ্রকাশ করছেন। সংগীতের দায়িত্ব আনোয়ার পারভেজের। রাণী সরকার শিউলী, রোজী, নারায়ণ চক্রবর্তী, সুমিতা, আনোয়ার হোসেন প্রভৃতিরা রয়েছেন বিভিন্ন চরিত্রচিত্রণে।

স্টুডিও পরিসংখ্যান

ঢাকার স্টুডিও সংখ্যা হল তিন। সে-কথা এখানকার চলচ্চিত্রকুশলীরা জানালেন। এই তিনের ভেতর এফ ডি সি-ই আয়তনে নাকি সবচেয়ে বড়। সব ঘুরে ঘুরে মনে হল এতে ফ্লোর রয়েছে চারটে। অনেক সময় অবশ্য এক-একটা দেয়াল দাঁড় করিয়ে এসব ফ্লোরকে টুকরো টুকরো করে ফেলতে হয় প্রয়োজনে।

অন্য দুটো স্টুডিওর নাম হচ্ছে বেঙ্গল স্টুডিও, পপুলার স্টুডিও।

গেল যুদ্ধের পর স্বাধীনভাবে ছায়াছবি পরিচালনা করার কাজে নতুনরা এগিয়ে এসেছেন অনেক সংখ্যায়। এতেই নাকি স্টুডিওতে ভিড়, মানে 'গ্যাঞ্জাম' সৃষ্টি হয়েছে বেশি। ফলে ছবি তৈরির কাঁচামালের বাজারে আগুন ভাব।

জীবনতৃষ্ণা

জীবনতৃষ্ণা ছবির কথা আগে একবার (গত সংখ্যায়) সামান্য বলেছি। এবার ওই ছবির কিছু নেপথ্য কাহিনী আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

ব্যাক গ্রাউন্ড মিউজিক টেকিং-এর জোর মহড়া শুরু হয়ে গেছে রেকর্ডিং ফ্লোরে।

ওয়ান-টু-থ্রী-ফোর।

সা—সারে—গা—

বেহালার করুণ স্বর, তারপর সরোদ, সেতার, বাঁশির টানা সুর, অর্গান, খানিক দূরে দূরে বিরাট দুটো পিয়ানো বাজছে। সব মিলিয়ে সুরের ধ্বনি ছিটকে পড়ছে ফ্লোরের চারপাশে। জীবনতৃষ্ণা ছবির খানিক অংশ প্রদর্শন-ঘরের পর্দার গায়ে ভাসতে দেখা গেল। অমনি ফাইন্যাল মিউজিক টেকিংও শুরু হল।

'অনেক দুঃখের মধ্যে কষ্ট করে বেঁচে থাকতে হয় মানুষকে', এ-ছবিতে এই ব্যথাকেই পরিচালক এইচ আকবর ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। তাই মিউজিক গ্রহণে করুণ ভাবকেই বেশি প্রাধান্য দেয়া হল।

জীবনতৃষ্ণায় ববিতা সুচন্দা দুজনেই কাজ করছেন। ববিতা হচ্ছে রোমান্টিক নায়িকার চরিত্রে, আর সুচন্দা ট্র্যাজিডি রোলে। নায়ক হলেন রাজ্জাক। প্রবীর মিত্রও রয়েছেন।

'প্রবীর মিত্র দারুণ অভিনয় করেছে।'—ছবি দেখতে দেখতে একথা বলে ফেললেন পরিচালক এইচ আকবর নিজেই।

আরও বললেন তিনি।

—'এ-ছবির সুটিং যখন চলছিল, তখন কলকাতা থেকে ঋত্বিক ঘটক মহাশয় এসেছিলেন ঢাকার এই স্টুডিওতে। প্রবীরের অভিনয় দেখে ঋত্বিকবাবু এতে খুশি হয়েছিলেন যে, তিতাস একটি নদীর নাম-এর নায়ক হিসাবে ঠিক করে ফেললেন ওকেই।

প্রবীর মিত্র প্রমিনেন্ট আর্টিস্ট হবে এ-ধারণা আমিও করতে পারি।

ভাঙানি প্রসঙ্গ

জনৈক চলচ্চিত্রকুশলী একশ' টাকার একখানা নোট বয়-গোছের ছেলের হাতে দিয়ে বললেন—

—ভাঙাইয়া আন ত।

টাকা হাতে নিয়ে ছেলেটা তবু বিস্ময়বোধক চিহ্নের মত দাঁড়িয়েই রইল। বল

—এক টাকার ভাঙানিই পাওয়া না ঢাকায়। আর আপনি স্টুডিওর ছে একশ' টাকা ভাঙাইতে দিতাছেন। খু পয়সা শুদ্ধ ভারতে চইলা যাইত ভারতীয়রা নাকি আমগ খুজেরা ? ওখানে নিব তৈরি করতাছে।

ভদ্রলোক ছেলেটাকে ধমকের ... বললেন।

—কিছু না পাওয়া গেলেই তোম কও ভারতীয়রা লইয়া গেল, তাঁরা যে করল আমগ জন্য, সেই কথা ত একবার কওনা মিঞা।

শুভেচ্ছা ভারতের চলচ্চিত্রের জন্য

স্টুডিওর গেট ঘেঁষে বেরিয়ে আস এমন সময় নায়িকা শাবানা সাদা রং গাড়ি থামিয়ে মুখখানা সামান্য বার ক বললেন।

—নতুন বছরের শুভেচ্ছা আপনার ওখানকার সমস্ত চলচ্চিত্র কলাকুশলীদে জানিয়ে দেবেন।

শাবানার বাবা ফয়েজ চৌধুরীও ব উঠলেন একই সঙ্গে।

—শুভেচ্ছার কথা মনে রাখবেন কিন্
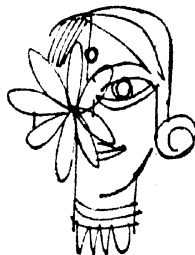
—গিরিধারী কুণ্ডু

গত ৩৭ সংখ্যা অমৃতে প্রকাশিত ঢাক ছায়াছবি নিবন্ধটি গিরিধারী কুণ্ডু-র লেখ ভুলক্রমে ওই সংখ্যায় লেখকের নাম ব পড়ে গেছে। —সম্পাদক, অম

কিথ ফ্লেচার মাদ্রাজের তৃতীয় টেস্টের ৪র্থ দিনের খেলায় বেদীর বলে ক্যাচ তুলে তাঁর ২১ রানের মাথায় চৌহানের হাতে ধরা পড়েছেন।

খেলাধুলা

দর্শক

ভারত বনাম ইংল্যাণ্ড

তৃতীয় টেস্ট খেলা

মাদ্রাজে ভারত বনাম ইংল্যাণ্ডের তৃতীয় টেস্ট খেলায় ভারত ৪ উইকেটে জয়ী হয়ে বর্তমানে ২—১ খেলায় এগিয়ে আছে। মাদ্রাজে এই নিয়ে ভারত-ইংল্যাণ্ডের মধ্যে যে ৫টা টেস্ট খেলা হল তার ফলাফল ভারতের জয় ৩, ইংল্যাণ্ডের জয় ১ এবং ড্র ১। মাদ্রাজে ভারতের জয় ১৯৫১-৫২ সালে এক ইনিংস ও ৮ রানে, ১৯৬১-৬২ সালে ১২৮ রানে এবং ১৯৭২-৭৩ সালে ৪ উইকেটে। অপরদিকে ইংল্যাণ্ডের জয় ১৯৩৩-৩৪ সালে ২০২ রানে। ১৯৬৩-৬৪ সালের খেলাটি ড্র যায়।

কলকাতার দ্বিতীয় টেস্টের মত মাদ্রাজের তৃতীয় টেস্টেও ভারত শেষ পর্যন্ত তার বোলারদের কাঁধে চড়ে বিজয় রথে উঠেছিল। ভারতের জয়লাভের ব্যাপারে শেষ দিকে বোলারদের ভূমিকা প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মাদ্রাজের তৃতীয় টেস্টের চতুর্থ দিনে ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস ১৫৯ রানে শেষ হলে ভারতের জয়লাভের জন্য মাত্র ৮৬ রানের দরকার হয়। হাতে ছিল পর্যাপ্ত সময়—চতুর্থ দিনের ৫২ মিনিট এবং পঞ্চম দিনের পুরো খেলার সময়। ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় প্রসন্ন ১৬ রানে ৪টে এবং বেদী ৩৮ রানে ৪টে উইকেট নিয়ে ভারতের জয়লাভের পথ সহজ করেছিলেন।

ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক টসে জিতে ব্যাটিংয়ের দান প্রথম নিয়ে বিশেষ কোন সুবিধা করতে পারেননি। প্রথম দিনেই ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ২৪২ রানের মাথায় শেষ হয়। লাঞ্চের সময় ইংল্যাণ্ডের ৬টা উইকেট পড়ে ৭৫ রান উঠেছিল। চা-পানের আগে ১৯০ রানের মাথায় তাদের ৭ম উইকেট পড়ে গেলে অনেকেই ভেবেছিলেন চা-পানের আগেই ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হবে। কিন্তু তা ঘটতে দেননি ফ্লেচার, আরনল্ড এবং গিফোর্ড। চা-পানের সময় দেখা গেল রান বেশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭৩ (৮ উইকেটে)। ৯ম উইকেট জুটিতে গিফোর্ড (১৭ রান) এবং ফ্লেচার ৮৪ মিনিটে অতি মূল্যবান ৪৩ রান তুলে দলের কাহিল অবস্থার অনেক উন্নতি করেন। ফ্লেচার শেষ পর্যন্ত ৯৭ রান করে অপরাজিত থেকে যান। তাঁর খুবই দুর্ভাগ্য যে, মাত্র তিন রানের জন্যে তিনি সেঞ্চুরী করার গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তাঁর এই নট-আউট ৯৭ রানই টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় তাঁর সর্বোচ্চ রান। ফ্লেচার ২৩০ মিনিট খেলে তাঁর নট-আউট ৯৭ রানে ১০টা বাউণ্ডারী এবং ৪টে ওভার-বাউণ্ডারী করেছিলেন। চন্দ্রশেখর ৯০ রানে ৬টা উইকেট নিয়ে বোলিংয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

প্রথম দিনের বাকি ৬ মিনিটের খেলায় ভারত তাদের ১০টা উইকেট হাতে জমা রেখে ৪ রান সংগ্রহ করেছিল।

দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে ভারতের প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ১৭৫ (৪ উইকেটে)। লাঞ্চের সময় রান ছিল ৫২ (২ উইকেটে) এবং চা-পানের সময় ১৩৪ (৩ উইকেটে)। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে দুরানী (৩৮ রান) এবং মনসুর আলি ৬৬ রান সংগ্রহ করেছিলেন। দ্বিতীয় দিনের খেলায় অপরাজিত ছিলেন মনসুর আলি (৫৩ রান) এবং বিশ্বনাথ (৯ রান)।

তৃতীয় দিনে চা-পানের আগে ভারতের প্রথম ইনিংস ৩১৬ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের ২৪২ রানের থেকে ৭৪ রানে এগিয়ে যায়। তৃতীয় দিনে ভারত প্রথম ইনিংসের বাকি ৬টা উইকেটে ১৪১ রান সংগ্রহ করেছিল। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৭২-৭৩ সালের টেস্ট সিরিজে ভারতই এক ইনিংসের খেলায় ৩০০ রান প্রথম সংগ্রহ করেছে। ৫ম উইকেটের জুটিতে মনসুর আলি এবং বিশ্বনাথ ৬৫ রান তুলেছিলেন। মনসুর আলি ২৩২ মিনিট খেলে তাঁর ৭৩ রানে ১০টা বাউণ্ডারী এবং ২টো ওভার-বাউণ্ডারী মেরেছিলেন। দীর্ঘদিন পর মনসুর আলি ভারতীয় টেস্ট দলে নির্বাচিত হয়ে শেষ পর্যন্ত নিজের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখেন।

তৃতীয় দিনের চা-পানের ৩২ মিনিট আগে ইংল্যাণ্ড তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে এবং বাকি সময়ের খেলায় ৩টে উইকেট খুইয়ে মাত্র ৫২ রান সংগ্রহ করেছিল। অ্যামিস এই দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় চন্দ্রশেখরের বলে ক্যাচ তুলে ইঞ্জিনীয়ারের হাতে ধরা পড়লে চন্দ্রশেখর তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে

১০০টি উইকেট পাওয়ার গৌরব লাভ করেন। এখানে উল্লেখ্য, চন্দ্রশেখরকে নিয়ে এপর্যন্ত ৫ জন ভারতীয় খেলোয়াড় টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ১০০ বা তার বেশী উইকেট পেয়েছেন। চন্দ্রশেখর বাদে অপর চারজন হলেন ভিনু মানকাদ (১৬২ উইকেট), সুভাষ গুপ্তে (১৪৯ উইকেট), এরাপল্লী প্রসন্ন (১৩৩ উইকেট) এবং বিষেণসিং বেদী (১১৪ উইকেট)। চন্দ্রশেখর তাঁর ২২তম টেস্ট খেলার মাথায় তাঁর ১০০তম উইকেটটি পান। এখানে উল্লেখ্য, টেস্ট খেলায় চন্দ্রশেখরের প্রথম শিকার ছিলেন ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক মাইক স্মিথ (বোম্বাইয়ের ২য় টেস্ট, ১৯৬৪)।

চতুর্থ দিনে ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস ১৫৯ রানের মাথায় শেষ হলে খেলার গতি সম্পূর্ণভাবে ভারতের অনুকূলে চলে যায়। মাদ্রাজের মাটিতে ইংল্যাণ্ডের এই ১৫৯ রান এক ইনিংসের খেলায় তাদের পক্ষে সর্বনিম্ন রানের রেকর্ডে পরিণত হয়েছে। চতুর্থ দিনে ইংল্যাণ্ডের রান ছিল লাঞ্চের সময় ৫ উইকেটে ১১৫ (ডেনেশ নট-আউট ৫৫) এবং চা-পানের সময় ১৫৪ (৮ উইকেটে)। ইংল্যাণ্ডের ১৫৯ রানের মাথায় ৯ম উইকেট (ডেনেশ) এবং ১০ম উইকেট পড়ে। দলের সহ-অধিনায়ক মাইক ডেনেশ ৭৬ রান করেন। এই ৭৬ রানই তাঁর টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় সর্বোচ্চ রান। ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে প্রসন্ন ১৬ রানে ৪টি এবং বেদী ৩৮ রানে ৪টে উইকেট নিয়ে ভারতের জয়লাভের পথ সুগম করেছিলেন। খেলায় এক সময় প্রসন্নর বোলিং পরিসংখ্যান ছিল ১০ রানে ৪টে উইকেট। তিনি তাঁর শেষ ওভারে ইংল্যাণ্ডের ১৫৯ রানের মাথায় ডেনেশ এবং পোককের উইকেট পান।

জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৮৬ রান তুলতে ভারতবর্ষ দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে

বিষেণ সিং বেদী

এবং দুটো উইকেট খুইয়ে ৩২ রান সংগ্রহ করে। ক্রিস ওল্ড ভারতের ১১ রানের মাথায় ইঞ্জিনীয়ার এবং ওয়াদেকারের উইকেট নিয়ে দারুণ উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিলেন। চতুর্থ দিনের খেলায় অপরাজিত ছিলেন চৌহান (৭ রান) এবং দুরানী (১৩ রান)।

পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে ভারতবর্ষ যখন অসমাপ্ত দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে তখন জয়লাভের জন্যে মাত্র ৫৪ রানের প্রয়োজন ছিল। অপর দিকে হাতে জমা ছিল ৮টা উইকেট এবং পুরো এক-দিনের খেলা। এই দিন জয়লাভের প্রয়োজনীয় বাকী ৫৪ রান তুলতে ভারতের আরও ৪টে উইকেট হারাতে হয়েছিল। লাঞ্চের আগেই জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায়। দলের ৮৫ রানের মাথায় গাভাস্কারের উইকেট লক্ষ্য করে গিফোর্ড যে বলটি

এরাপল্লী প্রসন্ন

ছাড়েন তা 'নো-বল' ঘোষিত হয় এ 'নো-বল' থেকেই জয়লাভের প্রয়ো এক রান হাতে এসে যায়। এখানে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় 'নো-বল' থেকে সূচক রান পাওয়ার নজির টেস্ট খেলার ইতিহাসে এই প্রথম।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ইংল্যাণ্ড : ২৪২ রান (ফ্লেচার নট ৯৭ রান। চন্দ্রশেখর ৯০ রা বেদী ৬৬ রানে ২ এবং প্রস রানে ২ উইকেট)।

ও ১৫৯ রান (ডেনেস ৭৬ রান। বে রানে ৪ এবং প্রসন্ন ১৬ র উইকেট)।

ভারতবর্ষ : ৩১৬ রান (মনসুর আলি ওয়াদেকার ৪৪, দুরানী ৩৮, নাথ ৩৭, প্রসন্ন ৩৭ এবং ইঞ্জি ৩১ রান। আরনল্ড ৩৪ গিফোর্ড ৬৪ রানে ৩ এবং ১১৪ রানে ৪ উইকেট)।

ও ৮৬ রান (৬ উইকেটে। দুরানী ৩৮ পোকক ২৮ রানে ৪ এবং ওল রানে ২ উইকেট)।

রোহিনটন বারিয়া ট্রফি

১৯৭২-৭৩ সালের আন্তঃ বিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফ মাদ্রাজ প্রথম ইনিংসে ২৭ রান বেশী সুবাদে দিল্লীকে পরাজিত করে এই দ্বিতীয়বার রোহিনটন বারিয়া ট্রফি হয়েছে। প্রথম জয়ী হয় ১৯৭০-৭১ ফাইনালে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

মাদ্রাজ : ১৮০ রান ও ৩৫০ র উইকেটে। বিজয়কুমার ৫৮)

দিল্লী : ১৫৩ ও ১৮৭ রান (৫ উ হরি গিদোয়ানি ৬৫ এবং এস নট আউট ৪২ রান)

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণি-অর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫.০০	টাকা ৩০.০০
ষাণ্মাষিক	টাকা ১২.৫০	টাকা ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬.২৫	টাকা ৮.০০

বিঃ দ্রঃ—উৎপাদন শুল্কের হার
(চাঁদার সহিত অবশ্য প্রেরণীয়)

বার্ষিক	টাকা ১.০২
ষাণ্মাষিক	টাকা ০.৫২
ত্রৈমাসিক	টাকা ০.২৬

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১২শ বর্ষ
৩য় খণ্ড

৩৯ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক—২ পয়সা
মোট—৫২ পয়সা

Friday, 2nd February, 1973 শুক্রবার, ১৯ মাঘ, ১৩৭৯ **.52 Paise**

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক

শহীদ স্মৃতি-বাসরে উপেক্ষিত প্রফুল্লচন্দ্র

৭ই পৌষ '৭৯ বঙ্গাব্দের সংখ্যায় শ্রীপুলকেশ দে সরকারের 'শহীদ স্মৃতি-বাসরে উপেক্ষিত—প্রফুল্লচন্দ্র' প্রবন্ধটিতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে। লেখক একটু সতর্ক এবং যত্নবান হলে মারাত্মক ত্রুটিগুলি হয়তো এড়াতে পারতেন। তিনি মজঃফরপুরে দুইটি বোমা বিস্ফোরণের খবর কোথা থেকে পেলেন? ৪ঠা মে, ১৯০৮, সোমবারের 'অমৃতবাজার পত্রিকা' থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরছি ঃ

"....they had in their possession three revolvers and one bomb."

কাজেই একটি বোমাই ফেটেছিল এবং বোমাটি যে ক্ষুদিরাম ছুঁড়েছিলেন তা তাঁর প্রথম বিবৃতিতেই পাওয়া গিয়েছিল। পুলকেশবাবু প্রফুল্লচন্দ্রের 'গঙ্গা-স্নানও নির্বিঘ্নে হল' কোথা থেকে জানলেন? এ খবরতো কেউ পরিবেশন করেন নি। বারীন্দ্রকুমার প্রমুখের স্বীকারোক্তির আগেই প্রফুল্ল চাকীর (দীনেশ রায় নয়) নাম আমরা জানতে পারি ১৯০৮ এর ১৪ই মে 'সঞ্জীবনী' সাময়িক পত্রিকায়। কাজেই পুলকেশবাবুর 'বারীন্দ্রকুমার প্রমুখ স্বীকারোক্তিতে নামোল্লেখ না করলে মিথ্যা নামই সত্য হয়ে থাকত' এই উক্তি অযৌক্তিক। প্রফুল্ল চাকীর মাথা ধড় থেকে ছিন্ন করে যে লোকটি লালবাজার নিয়ে এসেছিলো তার কথা পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীকে লেখা বিপ্লবী জি, পি, স্বামীর চিঠিতে জানা যায়। '......বর্তমানে লালবাজারে পুলিশের দারোগা পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ীর ভাই হেমচন্দ্র লাহিড়ী এই কাজটি করেছিলেন। বাবু হেমচন্দ্র লাহিড়ী এণ্টালী অঞ্চলে বাস করেন। কলিকাতার সর্বজনপরিচিত পেন্সনভোগী পুলিশ।' এই সেই পুলিশ। কিন্তু স্বাধীন ভারতের নাগরিক কি এদের চিহ্নিত করে রাখতে পেরেছে? পুলকেশবাবু যে অভিযোগ তুলে ধরেছেন 'প্রফুল্লচন্দ্রের ছবি নেই, মূর্তি নেই, তাঁর নামাঙ্কিত সেতু নেই, রাস্তা নেই', তা যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ। এ ব্যাপারে বর্তমান সরকারও সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। অবশ্য লেখক প্রফুল্লচন্দ্রকে বড় করে দেখাতে গিয়ে ক্ষুদিরামকে 'কাজের পুতুল' করে ছেড়েছেন। প্রফুল্লচন্দ্র সিনিয়র কর্মীর মত রিভালবারটি তাগ করে আত্মদান করেছিলেন। ক্ষুদিরামও তা করতেন, কিন্তু তিনি পিস্তল চালাতে জানতেন না। এ সম্পর্কে 'বেঙ্গলী' পত্রিকার উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত লিখেছেন—'ক্ষুদিরাম আমাদের বলেছিল......সে নিজে পিস্তল চালাতে জানিত না, যদিও সঙ্গে বেশ বড় একটি পিস্তল ছিল।' (শনিবারের চিঠি, আশ্বিন, ১৩৫৪, পৃঃ—৫২৩)। অগ্নিযুগের প্রথম শহীদ প্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্তী, দ্বিতীয় শহীদ প্রফুল্ল চাকী ও তৃতীয় ক্ষুদিরাম। ফাঁসীর মঞ্চে উৎসর্গকারী প্রথম শহীদ ক্ষুদিরাম। আধুনিক বাংলার প্রথম শহীদ প্রফুল্লচন্দ্র চাকী লেখকের এই যুক্তিও ভিত্তিহীন।

স্বপনকুমার ঘোষ,
বারুইপুর পুরাতনবাজার, বারুইপুর,
২৪ পরগণা।

নতুন উৎপাত

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হয়ে আইন শৃংখলার উন্নতি হয়েছে এবং নতুন শিল্প স্থাপনের ফলে বহু বেকারকে চাকরি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দু-এক মাস থেকে বাসে, ট্রেনে চুরি, ডাকাতি, পকেটমার ইত্যাদি ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে আর আজকাল অনেক সময় বাসে মেয়েদের হাত কেটে রক্ত বের করে দেওয়া হয়। এর জন্য সরকারের উচিত পুলিশ ও ভলেন্টিয়ারের সাহায্যে দোষী লোকদের ধরে শাস্তি দেওয়া। জনসাধারণেরও কর্তব্য যে এই সব অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। শুধু একা পুলিশের পক্ষে এইসব জঘন্য অপরাধ আটকানো সম্ভব নয়।

এই বাংলা নেতাজী ও আশুতোষের মত বীরের। বাঙ্গালীদের এইসব অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করা ও শিক্ষাক্ষেত্রে হামলা থেকে বাঁচানোর ক্ষমতা যথেষ্টই আছে।

আমি আশা করি সরকার ও জনগণ এইসব অপরাধ আটকাতে পারবেন।

গৌতম ভট্টাচার্য
রুড়কী (ইউ পি)

'যাত্রাদলের যাত্রা বদল' প্রসঙ্গে

অমৃত, ১২ বর্ষ, ৩ খণ্ড, ৩৬ সংখ্যা পড়লাম 'যাত্রাদলের যাত্রাবদল'। লেখক শ্রীগৌরীশংকর ভট্টাচার্যের এই লেখাটিতে প্রবন্ধের তথ্য সম্পদ তেমন নেই। লেখার অন্যান্য দোষ-ত্রুটি বাদ দিয়ে আমি একটি বহুজন জ্ঞাত ঐতিহাসিক তথ্যের ভুল পরিবেশনার দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। লেখক ৮৫২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—'১৮৭১-এ ন্যাশানাল থিয়েটারের পত্তন হলেও...' গত বৎসর অর্থাৎ ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী উৎসব সম্পন্ন হল—তা হলে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কি করে ন্যাশনাল থিয়েটারের পত্তন হয়? আজ শিক্ষিত এবং সংস্কৃতবান যে কোন বাঙ্গালীই আশা করি জানেন যে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ৭ই ডিসেম্বর 'নীলদর্পণে'র অভিনয়ের দ্বারা 'ন্যাশনাল থিয়েটারের' দ্বার উন্মোচিত হয়।

এই প্রথম অভিনয়ের স্থান ছিল চিৎপুরে 'ঘাড়িওয়ালা বাড়ী' নামে খ্যাত মধুসূদন সান্যালের বাড়ী। এর বহির্বাটী চল্লিশ টাকায় ভাড়া নিয়ে প্রথম রঙ্গালয় স্থাপিত হয়। এই ঐতিহাসিক সত্য সম্পর্কে যদি কারও সন্দেহ হয় তবে তিনি শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' অথবা ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য রচিত 'বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস' কিংবা এই ধরনের বাংলা নাট্যশালার ইতিহাস সম্বলিত যে কোন একখানি বই খুললেই তার নিরসন করতে পারবেন।

১৯৭২ খৃঃ ৭ই ডিসেম্বর 'অমৃত' সাপ্তাহিক পত্রিকায় শ্রদ্ধেয় সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ মহাশয় স্বয়ংই বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের শতবার্ষিকী উদযাপন করবার জন্য পূর্বকথিত মধুসূদন সান্যালের বাড়ীর প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিলেন বলেও আমরা জানি।

জীবনকৃষ্ণ রায়চৌধুরী
কলকাতা—২০

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে কত লোক মারা যান?

অমৃতের ৩৬ সংখ্যায় পারমিতা সেন মজুমদারের চিঠিটি পড়লুম। তাতে তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত মানুষের যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন, সেই পরিসংখ্যানের সূত্র যদিও তিনি গোপন করেন নি, তবুও সংশয় জাগে, এই রকম গোলাগুলি হিসেবে, রাউণ্ড ফিগার মিলিয়ে কি মানুষগুলি মরেছিল?

আমার তা মনে হয় না। তাহলে, ঐ যুদ্ধে নিহত প্রথম এবং শেষতম ব্যক্তির নামোল্লেখে বাধা কোথায়?

এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথা উল্লেখ না করে পারছি না। যুদ্ধের সময়, সব মানুষই যে কেবল কামান-বন্দুকের মুখে মরে তা কিন্তু নয়। কেউ মরে দুর্ভিক্ষে, কেউ-বা মরে যুদ্ধের আনুষঙ্গিক প্রতিক্রিয়ায়। পত্রলেখিকা কি সেই মৃত্যুর সংখ্যাটা জানেন? আমার কিন্তু তা জানতে ইচ্ছে করছে।

আমি পঞ্চাশের মন্বন্তর দেখেছি। শুধু কলকাতায় নয়, বাংলাদেশের গ্রামে গঞ্জে কত মানুষ যে মরেছে না খেতে পেয়ে, কিংবা অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে মহামারীতে, তার ইয়ত্তা নেই!

তাদের সংখ্যা কত?

বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামের সময়, এই তো সেদিন, সংবাদপত্রের পাতায় খবর বেরিয়েছিল যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মৃত্যুর হারকে নাকি বাঙ্গালী মৃত্যুর সংখ্যা লজ্জা দিয়েছে। বুঝতে পারছি, আবেগের তাড়নায় ঐ রকম অতিশয়োক্তি প্রশ্রয় পায়। কিন্তু ইতিহাস তো আবেগের পথে চলে না, যুক্তির পথে এগিয়ে থাকে, তথ্যনির্ভর হয়!

আমি সঠিক সংখ্যাটি জানতে চাই। আপনারা যদি, উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণ-সহযোগে তা জানান, তাহলে বাধিত হব।

মোজাম্মেল হক কলকাতা—১৭

এবার শান্তি আসুক

কত দিন আর মানুষ প্রতীক্ষা করবে, শান্তি তার চাই। বুকের রক্ত দিয়ে ভিয়েতনামের মানুষ গত পঁচিশ বছর ধরে এই শান্তির জন্যই অপেক্ষমান। শেষ পর্যন্ত মহাশক্তিশালী রাষ্ট্র আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিকসন ঘোষণা করেছেন, ভিয়েতনাম থেকে তিনি সৈন্য ফিরিয়ে আনছেন। ইন্দোচীনে স্থায়ী শান্তি আসুক, এই তিনি চান। ভিয়েতনাম নিজেরা তাদের মধ্যে আলোচনা করে বাকী বিরোধ সব নিষ্পত্তি করুক, এই তাঁর কাম্য। প্যারিসে স্বাক্ষরিত হয়েছে শান্তিচুক্তি। আমেরিকা, উত্তর ভিয়েতনাম, দক্ষিণ ভিয়েতনাম, অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের প্রতিনিধি সবাই এই যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে জানিয়েছে সম্মতি। ২৮ জানুয়ারী থেকে ভিয়েতনামে হয়েছে অস্ত্রসংবরণ এবং গোলাগুলি বর্ষণের বিরতি। আমরা আশা করব, এই চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করবে সকল পক্ষ। শুধু ভিয়েতনামে নয় গোটা ইন্দোচীনে, লাওস, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড সর্বত্রই শান্তি রক্ষিত হবে। কোথাও শক্তির সাহায্যে বিরোধ নিষ্পত্তির চেষ্টা হবে না।

চুক্তি কার্যকর হবার দু' মাসের মধ্যে দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে অবশিষ্ট আমেরিকান সৈন্য সরিয়ে নিয়ে যাবেন নিকসন। উত্তর ভিয়েতনাম মুক্তি দেবে সমস্ত আমেরিকান যুদ্ধবন্দী। দক্ষিণ ভিয়েতনামের থিউ সরকারকেই একমাত্র বৈধ সরকার বলে আমেরিকা স্বীকার করে, কিন্তু জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের হাতে যে-সমস্ত এলাকা রয়েছে তা অস্ত্রের সাহায্যে দখল করার কোনো চেষ্টা হবে না, একথাও বলা হয়েছে চুক্তিতে। কী ভাবে সমঝোতা হবে তা সায়গন সরকার ও জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট পরস্পরের মধ্যে আলোচনা দ্বারা নিষ্পত্তি করবে। উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যে যে সীমারেখা আছে সপ্তদশ সমান্তরাল রেখা বরাবর তা কোনো স্থায়ী রাষ্ট্রীয় সীমান্ত নয়। অর্থাৎ ১৯৫৪ সালে জেনিভা চুক্তির সময়ে একে যেমন যুদ্ধবিরতি সীমারেখা রূপে চিহ্নিত করা হয়েছিল তাই থাকল। তবে উত্তর বা দক্ষিণ কোনো ভিয়েতনামই জোর করে এই সীমারেখা বদলের চেষ্টা করবে না।

উভয় পক্ষই যদি এই চুক্তি আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করে তাহলে ইন্দোচীনে শান্তির নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে পারে। যুদ্ধবিরতি তদারকীর জন্য নতুন আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশন গঠিত হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া, কানাডা, পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরীকে নিয়ে। এর সঙ্গে সামরিক কমিশন থাকবে আমেরিকা, উত্তর ভিয়েতনাম, দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও ভিয়েতকং প্রতিনিধিদের নিয়ে। তারা সকলই কড়া ও নিরপেক্ষ নজর রাখবে যাতে চুক্তির কোনো শর্ত লঙ্ঘিত না হয়। উভয় পক্ষই অনেক মূল্য দিয়ে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। সামরিক ক্ষেত্রে জয়পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি। জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করতে পারে নি সায়গন সরকারকে। আমেরিকা তার বোমারু বিমান দিয়ে নতজানু করতে পারেনি হানয়কে। তাই রাজনৈতিক সমাধানের দিকেই আজ সকল পক্ষ এগিয়ে এসেছে।

আমেরিকা অবশ্য বলেছে যে, সায়গন সরকারকে তারা সাহায্য দিয়ে যাবে। যদি তারা রণসম্ভার দিয়ে সাহায্য করে তাহলে শান্তিচুক্তির আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। কারণ, তাহলে চীন ও রাশিয়া চুপ করে থাকবে না। শান্তিচুক্তির আড়ালে চলবে প্রহরণ সজ্জা। এর পরিণাম কি হতে পারে তা আমেরিকার চেয়ে ভাল আর কে জানে। সুতরাং আমরা আশা করব আমেরিকা সেই ভুল আর করবে না। সমরাস্ত্র উৎপাদনকারী শিল্পপতি এবং পেন্টাগনের প্ররোচনায় আর ফাঁদে পা দেবেন না মার্কিন প্রেসিডেন্ট। আমেরিকা বলেছে, উত্তর ভিয়েতনামের যুদ্ধক্ষত নিরাময় করার জন্য তারা সাহায্য দিতে প্রস্তুত। এই সাহায্য কী ভাবে দেওয়া হবে এবং উত্তর ভিয়েতনাম কখন কী শর্তে তা গ্রহণ করবে তা পৃথিবীর মানুষ সাগ্রহে লক্ষ করবে। কিন্তু তা হবে স্থায়ী শান্তির একটি উজ্জ্বল সোপান।

হো চি মিন বলতেন, আমেরিকার মানুষের প্রতি আমাদের কোনো বিদ্বেষ নেই। আমেরিকা যদি ভিয়েতনাম থেকে তার সৈন্য সরিয়ে নিয়ে যায় আমরা পুষ্পস্তবক নিয়ে তাদের বিদায় সম্ভাষণ জানাব। হো চি মিন আজ নেই। দুই ভিয়েতনামের সংযুক্তি এবং যুদ্ধাবসান তিনি দেখে যেতে পারেন নি। আজ যদি তা সার্থক হয় তাহলে তার স্বপ্ন সার্থক হবে। কিন্তু যতদূর মনে হচ্ছে দুই ভিয়েতনামের একীকরণের সম্ভাবনা এখন নেই। কার্যত ভিয়েতনামে এখন তিনটি সরকার—উত্তর ভিয়েতনাম, সায়গন এবং অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার। কিছুদিন আগে চীনা প্রধানমন্ত্রী চু এন লাই একজন জাপানী নেতার কাছে বলেছিলেন, ভিয়েতনামে তিনটি সরকারই স্থায়ী হতে চলেছে। তিনি কেন এই কথা বলেছিলেন, শান্তিচুক্তির বয়ান দেখে তা খানিকটা আন্দাজ করা যায়। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে অনেক দেশই বিভক্ত হয়েছে। কোনো দেশই জোড়া লাগেনি। ভিয়েতনামীরা ভাবতেই পারে না এক দেশ, এক জাতি এইভাবে বিভক্ত থাকবে। আমেরিকা হস্তক্ষেপ না করলে দেশ ঐক্যবদ্ধ হত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। দেশের ঐক্যের জন্য এমন দীর্ঘসংগ্রাম, এত আত্মত্যাগ, এত সহিষ্ণুতা আর কোনো দেশ বা জাতি দেখায় নি। জার্মান জাতি বিভাগ মেনে নিয়েছে, কোরিয়ানরাও। ভিয়েতনাম ব্যতিক্রম, উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। জানি না তাদের স্বপ্ন সফল হবে কিনা। তবু এই যুদ্ধবিরতি তাদের ক্ষতবিক্ষত দেশে শান্তি আনুক, এই আশাই আমরা করি।

অবশেষে সেই ঘোষণা শোনা গেল, যে ঘোষণা শোনার জন্য সারা পৃথিবীর মানুষ অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করেছিলেন।

"আজ ১৯৭৩ সালের ২৩ জানুয়ারি প্যারিস সময়ের বেলা সাড়ে বারটায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফে ডক্টর হেনরি কিসিঞ্জার ও ভিয়েতনাম গণ প্রজাতন্ত্রের পক্ষে বিশেষ উপদেষ্টা লে ডুক থো ভিয়েতনামে যুদ্ধাবসান ও শান্তি পুনঃ-প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন।...মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভিয়েতনাম গণ প্রজাতন্ত্র এই আশা প্রকাশ করছে যে, এই চুক্তি ভিয়েতনামে স্থায়ী শান্তি সুনিশ্চিত করবে এবং ইন্দোচীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় স্থায়ী শান্তি সুরক্ষিত করতে সাহায্য করবে।"

যুগপৎ ওয়াশিংটন ও হ্যানয় থেকে এই ঐতিহাসিক ঘোষণা একটি নতুন

লে ডাকথো

কিসিংগার

হে যুদ্ধ বিদায়!

দক্ষিণ ভিয়েৎনাম অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্যারিস শান্তি আলোচনায় প্রতিনিধি দলের নেত্রী নগুয়েন থি বিন (বামে) ভিয়েৎনাম থেকে ওরলি বিমানবন্দরে পৌঁছে জনতার প্রতি হাত নাড়িয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। হ্যানয় শান্তি প্রতিনিধিদলের নেতা জুয়ান থুই (ডাইনে) তাঁকে সম্বর্ধনা জানান।

দিকচিহ্ন রেখে গেল। বলতে গেলে ২৮ বছর ধরে যে যুদ্ধ চলেছে, প্যারিসে চার বছর ধরে শান্তি বৈঠক করেও যে যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসার পথ পাওয়া যায় নি, প্রেসিডেন্ট নিকসনের পরামর্শদাতা অধ্যাপক ডঃ হেনরি কিসিঞ্জারের সঙ্গে উত্তর ভিয়েতনামের প্রতিনিধি লে ডুক থোর সুদীর্ঘ তিন বছরব্যাপী গোপন আলোচনার পর যে যুদ্ধবিরতির চুক্তি সম্ভব হল, যে যুদ্ধ ও যে শান্তির মধ্যে ব্যবধান রচনা করেছে দশ লাখ মানুষের শব, অপরিমেয় ধ্বংসে পরিকীর্ণ একটি ক্ষুদ্র দেশের মাটি সেই যুদ্ধ ও সেই শান্তি ইতিমধ্যে অনিবার্যভাবেই বহু জটিলতা, বহু সংশয়ের দ্বারা সমাচ্ছন্ন হয়ে গেছে। প্যারিসে স্বাক্ষরিত যুদ্ধবিরতি চুক্তি কি অন্ধকার সুড়ঙ্গের শেষে আলোকের নিশানা দেখাল অথবা এক অন্ধকার সুড়ঙ্গ থেকে অন্য সুড়ঙ্গে নিয়ে গেল? এই সংশয়িত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া অবশ্য এখনও বাকি আছে। আপাতত শুধু এই সামান্য স্বস্তি যে, যে নিষ্ঠুর যুদ্ধ ও ক্ষমাহীন ধ্বংস সারা পৃথিবীর বিবেকের উপর একটা দুঃসহ বোঝা হয়ে চেপে ছিল তার অবসান হল।

দুই প্রস্থ মূল চুক্তি (এক প্রস্থ আমেরিকা ও উত্তর ভিয়েতনামের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক, আর এক প্রস্থ আমেরিকা, উত্তর ভিয়েতনাম, সায়গন সরকার ও অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের মধ্যে চার পাক্ষিক। চারটি প্রোটোকল তাদের মধ্যে তিনটি দুই প্রস্থ করে। সব মিলে মোট ৪২টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত এই যুদ্ধবিরতির দলিল একটি বৃহৎ নথি। সংক্ষেপে বলতে গেলে চুক্তির মূল বক্তব্যগুলি হচ্ছে।

(১) ভিয়েতনাম সংক্রান্ত ১৯৫৪ সালের জেনেভা চুক্তির দ্বারা স্বীকৃত ভিয়েতনামের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য সব দেশ মর্যাদা দেয়।

(২) ২৭ জানুয়ারি গ্রীনউইচ মীন টাইমের রাত্রি বারটার সময় থেকে যুদ্ধবিরতি পালিত হবে। ঐ সময় থেকে ভিয়েতনাম গণ প্রজাতন্ত্রে আমেরিকার সর্বপ্রকার তৎপরতা বন্ধ করা হবে এবং উত্তর ভিয়েতনামের সমুদ্রপথে ও জলপথে পাতা সমস্ত মার্কিন মাইন নষ্ট করে ফেলা হবে।

(৩) সৈন্যাপসারণ সংক্রান্ত চুক্তি কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত সৈন্য যে যার জায়গায় থাকবে।

(৪) দক্ষিণ ভিয়েতনামের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সামরিক শক্তিকে জড়াবে না এবং সেদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সে হস্তক্ষেপ করবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

গুয়াম—একখানা মার্কিন বি-৫২ বোমারু বিমান উত্তর ভিয়েৎনামে বোমা বর্ষণে যাওয়ার আগে তাতে এখানে একটি ৫০০ পাউন্ডের বোমা তোলার দৃশ্য।

(৫) চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর ষাট দিনের মধ্যে দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এবং সায়গন সরকারের বন্ধুস্থানীয় অন্যান্য সব দেশের সৈন্যবাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। লক্ষণীয় এই যে, দক্ষিণ ভিয়েতনামে অবস্থিত উত্তর ভিয়েতনামী সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে এই ধরনের কোন শর্ত নেই। অর্থাৎ দক্ষিণ ভিয়েতনামে উত্তর ভিয়েতনামী সৈন্যবাহিনীর অবস্থানের অধিকার মেনে নেওয়া হয়েছে।

(৬) এই চুক্তি কার্যকর হওয়ার পর থেকে নির্বাচনের দ্বারা নতুন সরকার গঠিত হওয়া পর্যন্ত দক্ষিণ ভিয়েতনামের দুই পক্ষ (সায়গন সরকার অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার) দক্ষিণ ভিয়েতনামে বাইরে থেকে নতুন সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র প্রবেশ করতে দেবেন না।

(৭) যেসব সামরিক ও বিদেশী অসামরিক ব্যক্তি দক্ষিণ ভিয়েতনামের দুই পক্ষের হাতে বন্দী হয়ে আছে তাদের ৬০ দিনের মধ্যে মুক্তি দেওয়া হবে।

(৮) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর ভিয়েতনাম সরকার মেনে নিচ্ছেন যে, (ক) দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনগণের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার পবিত্র, অবিচ্ছেদ্য ও সকল দেশের স্বীকার্য, (খ) আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানে যথার্থ অবাধ ও গণতান্ত্রিক সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনগণ তাদের দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ স্থির করবে।

(৯) দক্ষিণ ভিয়েতনামের দুই পক্ষ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তাঁরা দক্ষিণ ভিয়েতনামে যুদ্ধবিরতি মেনে চলবেন, শান্তিরক্ষা করবেন এবং সর্বপ্রকার সশস্ত্র সংঘর্ষ বর্জন করে যাবতীয় বিরোধের বিষয় আলাপ-আলোচনার দ্বারা নিষ্পত্তি করবেন।

(১০) যুদ্ধবিরতির পর দক্ষিণ ভিয়েতনামের দুই পক্ষ জাতীয় আপোষ

রাজধানী সায়গন থেকে ১৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে চুচুতের মধ্যে মুক্তিবাহিনী ১নং সড়ক বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার পর যানবাহন ও লোকজন আটকে পড়ে।

মীমাংসা গড়ে তুলবেন, বিদ্বেষ ও শত্রুতার অবসান ঘটাবেন, যাঁরা এ পক্ষ বা ও পক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা ও বৈষম্য নিষিদ্ধ করবেন। উভয় পক্ষ জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষিত করবেন।

(১১) যুদ্ধবিরতির অব্যবহিত পরে দক্ষিণ ভিয়েতনামের দুই পক্ষ জাতীয় আপোষমীমাংসা সংক্রান্ত একটি জাতীয় পরিষদ স্থাপন করবেন। এই জাতীয় পরিষদের কাজ হবে দক্ষিণ ভিয়েতনামের দুই পক্ষ যাতে চুক্তি কার্যকর করেন সেদিকে লক্ষ্য রাখা, জাতীয় আপোষ-মীমাংসা গড়ে তোলা ও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার অধিকারগুলিকে সুরক্ষিত করা হবে। অবাধ ও গণতান্ত্রিক সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করার দায়িত্বও এই জাতীয় পরিষদের থাকবে।

(১২) দক্ষিণ ভিয়েতনামে অবস্থিত ভিয়েতনামী সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা হ্রাস ও তাদের নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্নটি দক্ষিণ ভিয়েতনামের দুই পক্ষ জাতীয় আপোষ-মীমাংসার ভিত্তিতে নির্ণয় করবেন।

(১৩) উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যে আলোচনা ও চুক্তির ভিত্তিতে ধাপে ধাপে ভিয়েতনামের একীকরণ সম্পন্ন হবে। সপ্তদশ অক্ষরেখার দ্বারা চিহ্নিত সামরিক সীমান্ত রেখাটি সাময়িক এবং এটা কোন রাজনৈতিক বা আঞ্চলিক সীমানা নয়। (ঐ শর্তের দ্বারা দুই ভিয়েতনামকে কার্যত একই দেশের দুই অংশ বলে স্বীকার করে নেওয়া হল।)

(১৪) প্যারি সম্মেলনে যোগদানকারী চার পক্ষের প্রতিনিধিরা একটি চারপক্ষীয় যুক্ত সামরিক কমিশন গঠন করবেন। দক্ষিণ ভিয়েতনামে যুদ্ধবিরতি চুক্তি যাতে কার্যকর হয়, মার্কিন ও অন্য সৈন্যবাহিনী যাতে চুক্তি মত সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, মার্কিন ও তার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য দেশের সামরিক ঘাঁটিগুলি যাতে ভেঙে দেওয়া হয় ও বন্দীদের যাতে ছেড়ে দেওয়া হয় সেদিকে এই কমিশন নজর রাখবেন। সৈন্যাপসারণ ও যুদ্ধবন্দীদের প্রত্যার্পণের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই চারপক্ষীয় যুক্ত সামরিক কমিশনের কাজ শেষ হয়ে যাবে।

(১৫) এছাড়া দক্ষিণ ভিয়েতনামের দুই পক্ষ একটি দ্বিপাক্ষিক সামরিক কমিশন গঠন করবেন। চারপক্ষীয় সামরিক কমিশনের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও এই দ্বিপাক্ষিক কমিশন চালু থাকবে।

(১৬) কানাডা, হাঙ্গারি, ইন্দোনেশিয়া ও পোল্যাণ্ডের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হবে একটি আন্তর্জাতিক তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ কমিশন। এই কমিশন চুক্তি কার্যকর করা হচ্ছে কিনা সেদিকে নজর রাখবেন।

(১৭) এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার ত্রিশ দিনের মধ্যে চুক্তিটিকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য, যুদ্ধাবসান সুনিশ্চিত করার জন্য, ভিয়েতনামে শান্তিরক্ষার জন্য, ভিয়েতনামের জনগণের মৌলিক অধিকার ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনগণের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার সুরক্ষিত করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করা হবে। এই সম্মেলনে থাকবেন ভিয়েতনাম প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত চার পক্ষ (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, উত্তর ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের দুই সরকার), চীন, ফ্রান্স, সোভিয়েট রাশিয়া, ব্রিটেন, ক্যানাডা, হাঙ্গারি, ইন্দোনেশিয়া ও পোল্যাণ্ডের

বিশেষ ফিচার

কালকের দিনটা

কাল, অর্থাৎ গতকাল যা ঘটেছে, কিম্বা ঘটার কথা ছিল অথচ ঘটেনি, অথবা অনেক দিন আগে ঘটেছিল যা কাল মনে পড়েছে, হয়তো কাউকে দেখে অথবা কারো পুরনো কোনো চিঠি বা অভিজ্ঞান চোখে পড়ে—তারই ওপর এক পৃষ্ঠার লেখা। আকারে ছিমছাম হলেও প্রবীণ ও নবীন লেখকদের কলমে এই ফিচার বর্ণচ্ছটায় দীপ্তিতে আর হৃদয়-বৃত্তির গভীরতায় লক্ষ্যভেদ করবে তাতে সন্দেহ নেই। শুরু হচ্ছে পরের সংখ্যা থেকে।

মার্কিন বোমাবর্ষণের ফলে বিধ্বস্ত বাক মাই হাসপাতাল
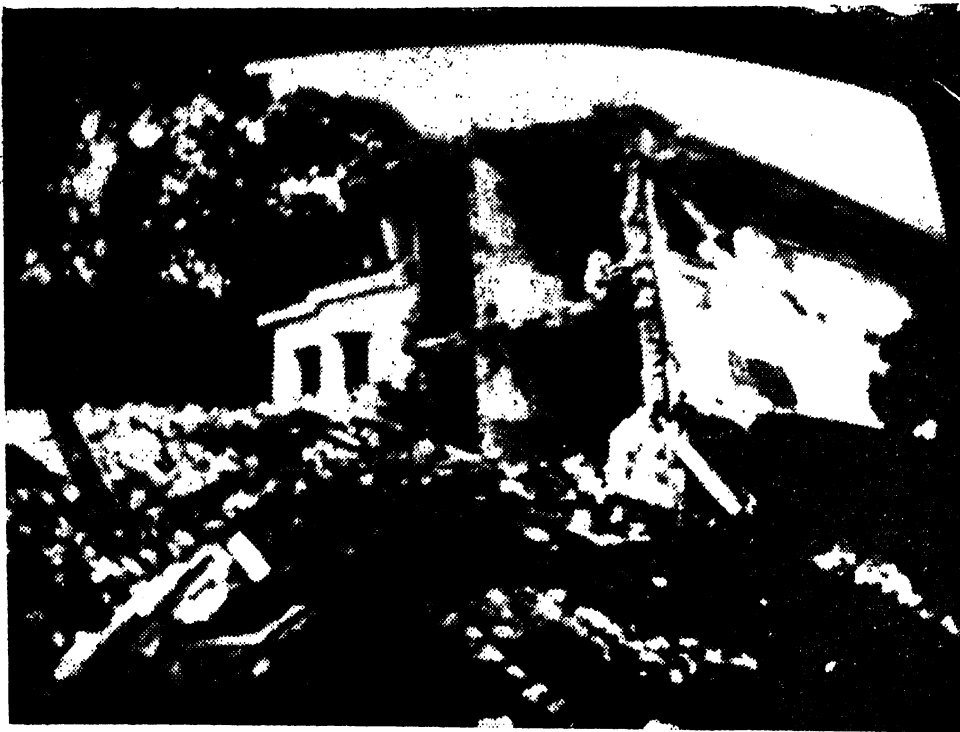
প্রতিনিধিবৃন্দ এবং রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারি-জেনারেল।

(১৮) কাম্বোডিয়া ও লাওস থেকে সমস্ত বিদেশী সৈন্য সরিয়ে নিয়ে আসা হবে এবং বাইরে থেকে ঐ দুই দেশে সৈন্য, সামরিক উপদেষ্টা, অস্ত্রশস্ত্র ও সমরোপকরণ পাঠান হবে না। কাম্বোডিয়া ও লাওসের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারের মীমাংসা বিদেশের হস্তক্ষেপ বাদ দিয়ে সংশ্লিষ্ট দেশের জনসাধারণ নিজেরাই করবেন।

এইসব শর্তের মূল কথা হল, ইন্দোচীনের দেশগুলিকে ১৯৫৪ সালের জেনেভা চুক্তির পরবর্তী অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। মূলত ভিয়েতনামের ভিতরকার যে দুই প্রতিপক্ষ শক্তি সেখানকার সংঘর্ষের আগুন জ্বালিয়েছিল সেই দুই শক্তিকে রণাঙ্গন ছেড়ে এখন রাজনৈতিক মোকাবেলার পথে আসতে বাধ্য করা হল। কারণ, দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, যুদ্ধক্ষেত্রে ভিয়েতনামের প্রশ্নের মীমাংসা হবে না। এমন ধ্বংসকর নিষ্ঠুর যুদ্ধ যেমন পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনও হয় নি তেমনি এমন অ-ফলপ্রসূ যুদ্ধও আর কখনও হয় নি। এই একটি যুদ্ধ আমেরিকার ঘরের রাজনীতিকে বিদীর্ণ করেছে, প্রবলতম শক্তির বিরুদ্ধে দুর্জয় প্রতিজ্ঞার অপরাজেয় প্রতিরোধক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছে, ক্ষুদ্র শক্তিগুলির বকলমে বৃহৎ শক্তিগুলির লড়াইয়ের প্রকাশতা তুলে ধরেছে, কিন্তু যা হয় নি তাহল চূড়ান্ত জয়পরাজয়ের মীমাংসা। আমেরিকার মানুষ এখন তাদের মনের শান্তি ফিরে পাবে, বিশ্বের বিবেক পাবে স্বস্তি। কিন্তু দুই ভিয়েতনামের যে প্রায় চার কোটি মানুষ তাদের বর্তমান প্রজন্মে শুধু যুদ্ধ, ধ্বংস, অনাচার ছাড়া আর কিছুই দেখেন নি তাঁদের জন্য নতুন সুদিন ফিরে এল কিনা কে বলবে?

কারণ, দক্ষিণ ভিয়েতনামের দুই পক্ষ যখন আর কোন বান্ধব পাশে না নিয়ে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়াবেন তখন মহান ভিয়েতনামী একজাতীয়তা বোধের উচ্ছ্বাস অতীতের সব বিরোধকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, একথার প্রমাণ হতে এখনও বাকি আছে। আর যদি বাস্তবে তার বিপরীতটাই প্রমাণিত হয় তাহলে ভিয়েতনামের যুদ্ধ অধিকতর যথার্থভাবেই গৃহযুদ্ধে পরিণত হতে চলেছে বলে অনুমান করা যেতে পারে।

২৮-১-৭৩　　পুণ্ডরীক

ভ্রম সংশোধন

গত ৩৭ সংখ্যায় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগে আলোচিত শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের গ্রন্থটির নাম পড়তে হবে 'অন্যা কন্যা'।

যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতি

বার বর্ষব্যাপী ভিয়েৎনাম যুদ্ধে সামরিক ও বেসামরিক মিলিয়ে দশ লক্ষেরও বেশী প্রাণবলি হয়েছে। মার্কিন সিনেটের উদ্বাস্তু বিষয়ক সাব-কমিটির হিসাব মত কেবল দক্ষিণ ভিয়েৎনামেই বেসামরিক জীবনহানির সংখ্যা (১৯৬৫ থেকে ১৯৭২-এর ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত) ১৩,০,০০০।

অন্যান্য ক্ষয়-ক্ষতির পরিসংখ্যান নিম্নরূপ—১৯৬১-র ১লা জানুয়ারী থেকে ১৯৭৩-এর ১৩ই জানুয়ারী প্রতিরক্ষা দপ্তরের হিসাবমত—মার্কিন সেনা যুদ্ধে নিহত ৪৫,৯৩১; অন্যান্য কারণে নিহত ১০,২৯৮; মোট হতের সংখ্যা ৫৬,২২৯ (কোরীয় যুদ্ধে মোট ৩৩.৬২৯ মার্কিন সেনা নিহত)। আহত ৩০৩,৬০৫; যুদ্ধে নিখোঁজ ১৩৩৫; বন্দী ৫৮৯। দক্ষিণ ভিয়েৎনামী সেনা বাহিনীর (১৯৬০ থেকে) ক্ষয়-ক্ষতি—নিহত ১৮৪,০০০, আহত—৪৩০.০০০ এবং মিত্র বাহিনীর (দঃ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, থাইল্যান্ড সেনা হতাহত—৩০ ডিসেম্বর ১৯৭২ অবধি নিহত ৫.২১১; মার্কিন হিসাবমত উত্তর ভিয়েৎনাম ও এন এল এফ-এর হতাহতের পরিমাণ ৯২৪.০০০ নিহত।

এই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ১৩,৫০০ কোটি ডলার (৯৮.৫৫০ কোটি টাকা)।

১৯৬৬ সাল থেকে ইন্দোচীনে মার্কিন বিমান ৭০ লক্ষ টন বোমা ফেলেছে।

ইন্দিরা যুগের সাত বছর

প্রফুল্লরতন গঙ্গোপাধ্যায়

বর্তমান ভারতকে আমরা ইন্দিরা যুগ বা প্রগতির যুগ বলে বর্ণনা করতে পারি। কারণ, গত সাত বছরে দল নেত্রী হিসাবে বা ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এক নতুন বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছেন ভারতবাসীর অন্তরে। এই বিশ্বাস হোল বেঁচে থাকার বিশ্বাস, নতুন সমাজ ও জীবন প্রতিষ্ঠার বিশ্বাস। এই বিশ্বাস হোল দেশ গঠনের বিশ্বাস। এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার আশা। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বাইরের চাপ সব লক্ষ্য করলে দেখা যাবে শ্রীমতী ইন্দিরা প্রথম দিন থেকে বিপদ বা বাধার সম্মুখীন হয়ে চলায় যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রতিটি চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় বিস্ময়কর সাফল্য এনেছেন। তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্ব কালে, সাত বছরে প্রধান কাজগুলি আমরা সর্বাগ্রে স্মরণ করতে পারি :

(১) ১৪টি ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ,

(২) কংগ্রেসের পুনরুজ্জীবন ;

(৩) নতুন কংগ্রেসের অধিকাংশ রাজ্যে ও কেন্দ্রে বিরাট নির্বাচনী সাফল্য এনে '৬৭ সালের গ্লানি দূর ;

(৪) বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে সাহায্য দান, পাকিস্থানী কবল থেকে উদ্ধার, বঙ্গবন্ধুর মুক্তি এবং লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর সেবার দ্বারা নতুন ইতিহাস সৃষ্টি ;

(৫) পাকিস্থানের সঙ্গে যুদ্ধে ভারতের সাফল্য ও বাংলাদেশে পাক সৈন্যের আত্মসমর্পণ ;

(৬) ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী চুক্তি ;

(৭) ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি ;

(৮) ভারত-পাকিস্থান শান্তি চুক্তি ও দখলীকৃত এলাকা থেকে সৈন্য অপসারণ, সীমান্তের সীমানার পুনর্বিন্যাস ;

(৯) রাজন্যভাতার বিলোপ ও সংবিধান সংশোধনের দ্বারা সমাজবাদী অর্থনৈতিক কার্যক্রম রূপায়ণের সূচনা ;

(১০) দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য সারা ভারতে উন্নয়নসূচী রূপায়ণ, অর্থ বরাদ্দ, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রতিষ্ঠা।

ইন্দিরাজী একক এক উজ্জ্বল ইতিহাস। নতুন কংগ্রেসের দলনেত্রী হিসাবে কংগ্রেসের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছেন। তিনি ঐতিহাসিক প্রয়োজন পূরণ করেছেন। তিনি আদর্শ সংগঠক। তেমনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীরূপে ভারতের উন্নয়নমুখী নতুন জয়যাত্রার সূচনা করেছেন। তাঁর বিস্ময়কর নেতৃত্ব ও অপূর্ব ব্যক্তিত্ব, বাস্তবধর্মী অনন্যসাধারণ কর্মশক্তি ভারতকে পদে পদে সাফল্যের পথে নিয়ে চলেছে। তিনি দুঃসাহসিক অভিযাত্রী। গত ৭ বছর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে শ্রীমতী গান্ধী যে কর্মনিষ্ঠা, দৃঢ়তা, বাস্তবধর্মী চিন্তা ও সৃজনধর্মী বিপ্লবীর ভূমিকা পালন করেছিলেন তা ঐতিহাসিক। তিনি যা ভাবেন তাই করেন। কথায় ও কাজে তাঁর অপূর্ব মিল। তাঁর অসাধারণ ইচ্ছাশক্তি তাঁকে নতুন দায়িত্ব পালনে সর্বদাই বিজয়িনী করেছে।

১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭৩ সাল—এই সাতটি বছরের রাজনৈতিক ইতিহাস, উন্নয়নশীল কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন করলে আমরা দেখতে পাবো নিজের প্রতি, দেশের প্রতি, দেশবাসীর প্রতি তাঁর কি গভীর বিশ্বাস। যে বিরাট চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছিলেন, সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে তিনি একের পর এক সাফল্য এনেছেন। এখন তাঁর সংগ্রাম হোল দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, ক্ষুধার বিরুদ্ধে, একমাত্র চিন্তা হোল কোটি কোটি দুঃস্থ গরীব মানুষের জীবনযাত্রার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি।

শ্রীমতী গান্ধী দেশে ও বিদেশে তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্বের জন্য আজ বন্দিত। তিনি বাংলাদেশের মুক্তি, শরণার্থীর সেবার মধ্য দিয়ে যে নতুন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা ইতিহাসে বিরল। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের তিনি যখন প্রথম প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন তখন দেশজোড়া বিক্ষোভ, অশান্তি, খাদ্যাভাব, বিবিধ অশুভ প্রতিক্রিয়ার ঘটনায় তিনি হিমসিম খাচ্ছিলেন। আজও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও বিবিধ বিক্ষোভের মোকাবিলা তাঁকে করতে হচ্ছে। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায়। নানা সংকটে উত্তরাঞ্চল ভারতের কতগুলো রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতা হারালো। কিন্তু তাঁর কর্মনিষ্ঠা, দৃঢ়তা ও বিস্ময়কর নেতৃত্বে নতুন কংগ্রেস গড়ে উঠেছে। একটি রাজ্য বাদে প্রায় সকল রাজ্যেই কংগ্রেস ৭১ ও ৭২ সালের নির্বাচনে বিরাট সাফল্য এনেছে। সাংগঠনিক ক্ষেত্রে যেমন অপূর্ব নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তেমনি ভারতকে উন্নতির পথে পরিচালনায় বিরাট ব্যক্তিত্ব ও কর্মক্ষমতার পরিচয় দিচ্ছেন। শ্রীমতী গান্ধীর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে এই ঘটনাবহুল জীবনের কিছু

তথ্য নীচে উল্লেখ করা হোল।

১৯৬৬

২৪ জানুয়ারী—ভারতের নতুন প্রধানমন্ত্রী রূপে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী শপথ গ্রহণ করেন। ১৯শে জানুয়ারী তিনি শ্রীমোরারজী দেশাইকে পরাজিত করে সংসদীয় দলের নেত্রী নির্বাচিত হন।

২৩ অকটোবর—দিল্লীতে টিটো, নাসের ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ত্রিশীর্ষ সম্মেলন।

১৯৬৭

জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী—সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে প্রচার অভিযান।

১২ মার্চ—পুনরায় কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেত্রী নির্বাচিত।

১৩ মার্চ—দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণ।

১৯৬৮

১৪ অকটোবর—রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে ভাষণ।

১৯৬৯

১৯ জুলাই—ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ সিদ্ধান্ত কার্যকর।

২০ আগষ্ট—প্রধানমন্ত্রীর সমর্থনে নির্দল প্রার্থী শ্রীভি ভি গিরির রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। নির্বাচনে শ্রীগিরির জয় শ্রীমতী গান্ধীরই জয় হলো। তাঁর নীতির জয়যাত্রা সূচিত হোল।

১২ নভেম্বর—দিল্লীতে জাতীয় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ আনলেন। সংসদীয় দলের নতুন নেতা নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিলেন। অপরদিকে ওয়ার্কিং কমিটির ১০ জন সদস্য ঐ সিদ্ধান্তকে অবৈধ বলে ঘোষণা করলেন। সংসদীয় দলের ২৮২জন সদস্যের মধ্যে ২২০ জন প্রধানমন্ত্রীকে সমর্থন করলেন এবং নতুন করে আস্থা ঘোষণা করলেন। কংগ্রেস দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেলো।

২২ নভেম্বর—নয়াদিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর সমর্থকগণ নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির

এক বিশেষ অধিবেশন ডাকলেন। এই বৈঠকে তাঁরা দাবী করলেন ৭০৫ জন নির্বাচিত প্রতিনিধির মধ্যে ৪৩২ জন ঐ অধিবেশনে যোগ দিয়েছেন।

২৭—২৯ ডিসেম্বর—নতুন কংগ্রেসের জন্ম ও জয়যাত্রা। শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বাধীন শাসক কংগ্রেসের সম্মেলন হোল—শ্রীজগজীবন রাম ইন্দিরাপন্থী কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও দলনেত্রী হিসাবে শ্রীমতী গান্ধী এক বলিষ্ঠ অর্থনৈতিক কর্মসূচীর ভিত্তিতে নতুন ভারত গড়ার সংকল্প ঘোষণা করলেন।

১৯৭০

২৭ ডিসেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী লোকসভা বাতিলের কথা ঘোষণা করেন। ১৪ মাস আগে কেন লোকসভার নির্বাচন চান তাঁর কারণ উল্লেখ করে জাতির উদ্দেশে বেতার ভাষণ দেন।

১৯৭১

৫ই মার্চ—পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী অভিযানের শেষ পর্ব সমাপ্ত করেন। ৪৩ দিনব্যাপী নির্বাচনী অভিযানে শ্রীমতী গান্ধী ৩৬ হাজার মাইল সফর করেন, তিন শতাধিক সভায় ভাষণ দেন। তাঁর এই সভাগুলোতে মোট প্রায় দুই কোটি শ্রোতা যোগ দিয়েছিলো।

১১ মার্চ—শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত সরকারী দল কংগ্রেস নির্বাচনে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। মোট ৫১৫টি আসনের মধ্যে ৩৫০টিই তাঁর দল দখল করে। নির্বাচনী ফল ঘোষিত হওয়ার পর তিনি তাঁর বাসভবনে সাংবাদিকদের কাছে ঘোষণা করেন যে, এখন দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামই তাঁর মুখ্য লক্ষ্য।

১৭ মার্চ—নবনির্বাচিত কংগ্রেস পরিষদীয় দলের সভায় শ্রীমতী গান্ধী পুনরায় নেত্রী পদে নির্বাচিত হন। তাঁর নাম প্রস্তাব করেন শ্রীজগজীবন রাম ও সমর্থন করেন শ্রীওয়াই বি চ্যবন।

১৮ মার্চ—শ্রীমতী গান্ধী প্রধানমন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করেন।

৩১ মার্চ—বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন জানিয়ে সংসদে শ্রীমতী গান্ধী প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

২৪ এপ্রিল—পরিকল্পনা কমিশন নতুন করে গঠন করেন এবং শ্রীসুব্রহ্মনিয়ামকে পরিকল্পনা দপ্তরের ভার দেন।

২ মে—প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ করেন।

২৪ মে—লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের ব্যাপারে মর্মস্পর্শী ভাষণ দেন। বিশ্ববাসী ও রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্দেশে তিনি বাংলাদেশের ব্যাপারে সক্রিয় মীমাংসার জন্য তৎপর হওয়ার আহ্বান জানান।

১ জুন—ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়ন পূর্ব বাংলা থেকে উদ্বাস্তুর আগমন বন্ধের ব্যাপারে সকলের উদ্দেশ্যে দাবী জানান।

১৮ জুন—পূর্ব বাংলার সমস্যা ভারতের সমস্যা বলে তিনি বর্ণনা করেন। এবং প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন—যেকোন আক্রমণকে প্রতিহত করতে ভারত প্রস্তুত।

২৮ জুলাই—প্রধানমন্ত্রী লোকসভায় সংবিধানের ২৪ ও ২৫ সংশোধন বিল পেশ করেন এবং মৌলিক অধিকারের আংশিক সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন।

৯ আগষ্ট—প্রধানমন্ত্রী সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে ২০ বছরব্যাপী 'শান্তি ও মৈত্রী' চুক্তি সম্পাদন করেন।

১০ আগষ্ট—প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের গোপন বিচার সম্পর্কে বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট তারবার্তা প্রেরণ করেন।

২৫ আগষ্ট—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী চীনের প্রধানমন্ত্রী শ্রীচৌ-এন-লাইর কাছে একটি পত্র পাঠান।

২৭ সেপ্টেম্বর—প্রধানমন্ত্রী মস্কো সফরে যান।

২৮ অকটোবর—বিশ্ব সফরের প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। বিশদিন সফরে তিনি ইউরোপ ও আমেরিকা পরিভ্রমণ করেন। এই সফরের সময় বাংলাদেশের ঘটনাবলীর বাস্তব অবস্থা, ভারতীয় উপমহাদেশে আশঙ্কার কথা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেন। ৪ঠা নভেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্টকে বাংলাদেশের প্রতি সুবিবেচনার জন্য আহ্বান জানান।

২৪ নভেম্বর—সীমান্তের পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী সংসদে ভাষণ দেন।

২৭ নভেম্বর—বাংলাদেশের সমস্যার সমাধান ও মুজিবর রহমানের মুক্তির জন্য প্রধানমন্ত্রী পাকিস্থানের প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানান।

৩০ নভেম্বর—প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের মাটি থেকে পাকিস্থানকে সৈন্য অপসারণের আহ্বান জানান।

২ ডিসেম্বর—সংবিধানের ২৬ সংশোধন বিলের ওপর লোকসভায় ভাষণ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী রাজন্যভাতা ও সুযোগ সুবিধা লোপ বিলের আবশ্যকতা উল্লেখ করেন। বিলটি গৃহীত হয়।

৩ ডিসেম্বর—কলকাতা বিগ্রেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে বিশাল সমাবেশে ভাষণ দেন। ঠিক সেইদিনেই ভারতের পশ্চিম সীমান্তে পাকিস্থান সশস্ত্র আক্রমণ সুরু করে। রাজধানীতে ফিরে গিয়ে তিনি পাকিস্থানী আক্রমণের মোকাবিলার নির্দেশ দেন। ঐ রাত্রেই জাতির উদ্দেশে বেতারে তিনি পাকিস্থানের এই আক্রমণের মোকাবিলার সর্বাত্মক ব্যবস্থা ঘোষণা করেন।

৪ ডিসেম্বর—সংসদে তিনি জানান : পাকিস্থান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। ভারতীয় বাহিনীর বাংলাদেশে প্রবেশের খবরও তিনি জানান। ভারতের নৌ ও বিমানবাহিনীর সক্রিয় ভূমিকার কথাও বলেন।

৬ ডিসেম্বর—প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশকে ভারতের স্বীকৃতি দানের কথা ঘোষণা করেন। পাকিস্থান ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদ করে।

১৬ ডিসেম্বর—প্রধানমন্ত্রী সংসদে ঘোষণা করেন বাংলাদেশে পাক সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করেছে। পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করায় বেতারে প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। পশ্চিম রণাঙ্গনে ভারতের একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেন।

৩১ ডিসেম্বর—সাংবাদিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা : তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা ব্যতীতই পাক-ভারত সমস্যার মীমাংসা সম্ভব।

১৯৭২

২ জানুয়ারী—দিল্লীতে নাগরিকদের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে সংবর্ধনা।

১০ জানুয়ারী—দিল্লীতে শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে সদ্যমুক্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রথম সাক্ষাৎকার ও সংবর্ধনা।

২০ জানুয়ারী—প্রধানমন্ত্রীর মেঘালয় ও অরুণাচল নতুন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা উদ্বোধন।

২১ জানুয়ারী—প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পুনর্গঠিত মণিপুর, ত্রিপুরা ও মিজোরাম রাজ্যের উদ্বোধন।

৬—৮ ফেব্রুয়ারী—বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের কলকাতা সফর ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শ্রীমতী গান্ধীর যোগদান।

১৫ মার্চ—রাজ্যে রাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের প্রতি আস্থা ও রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরাট সাফল্য।

১৭ মার্চ—শ্রীমতী গান্ধীর বাংলাদেশ সফর ও বিপুল সংবর্ধনা লাভ।

১৯ মার্চ—ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত।

২৮ জুন—২ জুলাই—সিমলায় ভারত-পাকিস্থান চুক্তি সম্পাদিত হোল। আলোচনার মারফত উভয়ের সমস্যা সহজ হোল। দখলীকৃত এলাকা বিনিময়ের সূত্র রচিত হোল। বলপ্রয়োগের পরিবর্তে আলাপ-আলোচনার মারফত উভয়ের সমস্যা সমাধানের আগ্রহ বিশেষ বর্দ্ধিত হোল। ইন্দিরার শান্তিনীতির জয়যাত্রা আবার সূচিত হোল।

প্রেমের তিনটি ॥ অভিজিৎ দাশগুপ্ত

১

এই চিঠি
ডোবা-জলে ঢিল।
স্মৃতির মিছিল ভেঙে
উঠে এল ঘন কালো তিল—
গাঁথা চলচলে মুখে বহুকাল দূরে যাওয়া নারী—
হৃদয়ে শোণিত ছোটে,
মুখ নয়, ওকি তরবারি?

২

তেরখাই স্রোতে ছুটে চলে আশাবরী
ঘাসে ঘাসে কাঁপে প্রথম ভোরের জরি
এমন সকালে সোনালি শিলপার খুলে
মিশি-চুল মেলে জোয়ারে দেহ ভাসালে
আমি থিতুবট বসে থাকি খেয়াঘাটে
ঘন দুরাশার বিপুল সন্ধ্যা কাটে
ঠোঁটে বয়ে এনে চুলের রুপোলি কাঁটা
কোনো মাছ ফিরে ছোঁবে কি ঘাটের পাটা?

৩

কে যেন বলল : আমি যাবো।

পাহাড়ের খিল খুলে গিয়ে
রাশি রাশি ছড়াল পাথর
অপার যৌবন ঝরে যাবে
আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালে
আঁচলে আড়াল দিয়ে বুক
কে যেন বলল : আমি যাবো।

স্তোক ॥ অশোককুমার চট্টোপাধ্যায়

আমাকে বলা হয়েছিল—
পৃথিবীতে নাকি অনেক আলো আছে
অনেক উষসী মুহূর্তে পৃথিবী নাকি
আশ্চর্য সুন্দর এবং কোমল
ভিজে বাতাসের সুঘ্রাণে নাকি
কোন সুকান্ত যুবক একান্ত ক্ষমাশীল।

আমাকে বলা হয়েছিল—
জীবনে জীবন যোগ করা হলে
পৃথিবীকে এক সুতোয় গাঁথা যায়—
এবং জ্যোৎস্নায় সুস্নাত কোন নদীর মতই
পৃথিবী বয়ে যেতে পারে অন্তরে,
আমাকে বলা হয়েছিল—
পৃথিবীর মুখ চোখে দেখলে
অনৈসর্গিক অনুধ্যানে—মানুষ উদার।

আমাকে আরও বড় কথা
বলা হয়েছিল—
জীবনেও নাকি এই আশ্চর্য পৃথিবী
প্রতিফলিত করা যায়।
অথচ, আমি তো পৃথিবীর রং দেখিনি কোনদিন
আমি তো ভিজে বাতাসে ভেজা
মানুষ সন্ধান করেছি বহুকাল
আমি আদিগন্ত তল্লাস করেছি
কোথায় সব আলো তাঁলপ বাঁধা আছে
কোন তারে ঘা দিলে
শুধু সুবাণী শ্রুত হয়।

আমাকে যা বলা হয়েছিল—
ধূসর পৃথিবীর উষর মুহূর্তে
তা একটা স্তোক বলেই মনে হয়।

যখন যুবতী এসেছিল ॥

শুভশঙ্কর ভট্টাচার্য

বসে বসে ক্লান্ত হয়ে ব্যর্থ প্রতীক্ষার পর
যুবক যখন বিছানাতে শুয়েছে একাকী,
ভাবছিল—যুবতী কি তবে ঘুমিয়ে পড়েছে!

ঠিক তখনই এলম—

চোখে চোখে কথা বলতে এসেছে যুবতী,
শায়িতকে নিদ্রিত বলে সে ভ্রম করে,
চলে যেতে যেতে ভেবেছিল, আহা একটু ঘুমোক
বেচারা!

চিলের ডাক

গোপাল সামন্ত

রবিবারের দুপুর। ছুই-ছুই বেলা। বিনয়বাবুর সংগে গল্প হচ্ছিল এক বন্ধুর বাড়িতে বসে। একথা সে কথায় ঘুরতে ঘুরতে শেষে শব্দ আর স্মৃতির প্রসঙ্গ চলে আসে। কথাটা উঠতেই আমি বলে উঠি—আচ্ছা, বলুন তো, হঠাৎ দুপুরে একটা চিলের ডাকই কী মানুষকে কতোকাল আগেকার একটা সময়ে ফিরিয়ে নিয়ে যায় না?

ঠিকই বলেছেন—তিনি বলে উঠলেন, একটা চিলের ডাক শুনেই আমি হয়তো তিরিশ বছর আগেকার এক হোস্টেলের ঘরের মধ্যে ফিরে যাবো।

যেমন আচমকা আমি চিলের কথা বলেছি, তেমনি দ্রুত এক স্মৃতি-ঝলকানো উত্তর।

আরও কিছু কথার পরে আমি উঠে পড়লাম। দুপুরের খাওয়ার সময় হয়ে গেছে, এবারে বাড়ি ফিরতে হবে, ওকেও যেতে হবে অনেক দূরে সেই মানিকতলায়। কিন্তু, চিলের কথাটা কেন আমি বললাম—ভাবছিলাম বাড়ি ফেরার সময়— চিলের ডাক তো আমি কতোকাল শুনিনি।

তারপরে বাড়ি ফিরেছি। খাওয়ার পাট চুকিয়ে জানালার কাছে বসেছি, তখনই মনে পড়ল আবার সেই কথাটা। এখানে বসেই তো আগে আমি চিলের ডাক শুনতে পেতাম! কিংবা বিছানায় শুয়ে কোন কোন ছুটির দুপুরে। আমার সামনে যে আকাশটা আজ ভাদ্রের রোদে জ্বলজ্বল করছে ওখানে আগে সামনের বাড়ির একটা নারকেল গাছ পাতা নাড়িয়ে দুলাতো, দীর্ঘ সেই গাছটায় মাথায় দুটো চিল বাসা বেঁধে অনেকদিন ছিলো—এই বালিগঞ্জে, কলকাতায় অতীব বেমানান, নিতান্ত অসভ্য—কাঁটাহাড় কাঠকুটো ফেলে তারা এ-বাড়ি ও-বাড়ির ছাদ-উঠোন নোংরা করে নিতো; আর মাঝে মাঝে দুপুরে তাদের তীক্ষ্ন শব্দ ভেদ করে চলে যেতো এ-পাড়ার শান্ত আমেজ।

কিন্তু আমার ভালো লাগতো। ডাকটা আমাকে অনেক দূরের ফেলেআসা আর একটা দুপুরের মধ্যে নিয়ে যেতো।

সেই শব্দটা কী এখনও হচ্ছে কোথাও—কতো দূরের এক অতীতের মধ্যে থেকে—সেই দুপুর—আকাশ—চিলের ডাক...আমি কলকাতা থেকে গ্রীষ্মের ছুটিতে গ্রামে গিয়েছি। বাড়ির সামনে আমাদেরই জমিতে সাঁওতাল-পাড়া। সেখানে আমাদের ভাগ-চাষী বীরু-সাঁওতাল আমার জন্য বাঁশের ছিলা-লাগানো একটা ধনুক তৈরি করে দিয়েছে। তীর করেছে তিনটে—একটার মাথায় লোহার ফলা লাগানো, বাকি দুটোতে শিংয়ের তৈরি মাথা। পিছনের দিকে তিন সারি চেরা-পালক সুতো আর আঠা দিয়ে সুন্দরভাবে লাগানো, তবু আমার পছন্দ নয়—ওগুলো সবই শরকাঠি দিয়ে তৈরি—মোটা, সোজা, হাল্কাও; কিন্তু বড্ডো নরম। একটু জোর লাগলে নিশ্চয়ই ভেঙে যাবে।

বীরেন আমাকে বোঝায়—ই অনেক দিন চলবেক, তুরা তো শোহোরকে থাকিস্, তীর ধনুক আর কতো ছুঁড়বি।

না, না আমি অনেক ছুঁড়বো! তুমি জানো না, আমাদের বাড়ির সামনে একটা বড়ো মাঠ আছে, সেখানেই ছুঁড়বো, কোনো একটা শক্ত জিনিস দিয়ে করে দাও।

বীরেন ভাবতে থাকে।

আচ্ছা, কঞ্চি দিয়ে করলে কী হয়?

সী কী ই গাঁয়ের কঞ্চিতে হবেক! কিন্তুক আরেক রকম বাঁশ ছিলো—সীটা ই দেশে তো মিলবেক নাই!

আমাদের কথায় কাছাকাছি আরও দু-জন সাঁওতালপাড়ার পুরুষ। মেয়েরা নিজেদের কাজে ব্যস্ত। বীরেনের বৌ একটু দূরে খেজুরপাতার তৈরি চাটাইয়ে সিদ্ধ ধান শুকোতে দিচ্ছে, তার কিশোরী মেয়েটা একটু দূরে দাঁড়িয়ে আমার ধনুকে তীর লাগিয়ে ছিলে টানা দেখছে; আমাদের কথাও সে শুনছিল নিশ্চয়—এগিয়ে এসে বীরেনকে কী যেন বলল। সাঁওতালী ভাষা আমার জানা নেই, তবু কথার ভাবে মনে হল সে যেন এই তীরের বিষয়েই কিছু বলছে।

ও কী বলছে রে? —আমি প্রশ্ন করি বীরেনকে।

বলছে যী আছেক একটা, উ দেখেই এসেছেক, কিন্তু সী তো ই গাঁয়ে লয়, অনেক দূরে, কে আনবেক?

ঠিক তখনই কী, তীর কেমন হয়েছে দেখি—বলতে বলতে আর একজন মানুষ সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে—সে আমারই একরকম কাকা-পানুকাকা। আমারই বয়সী বলে আমাদের মধ্যে তুমি ডাকের সম্পর্ক, গ্রামেই সে বরাবর থাকে; কাল আমি এখানে পৌঁছোনোর পর থেকে সারাদিন প্রায় তারই সঙ্গে কেটেছে—বলতে গেলে আমার এ-গাঁয়ের গাইডই এখন সে।

সমস্ত ব্যাপারটা শুনে সে বীরেনকে বলে—তা তোরা কেউ গিয়ে কেটে এনে দে না!

কিন্তুক ই গাঁয়ে তো লয়! যার ঝাড় সী যদি—

ভিন্-গাঁয়ে অচেনা লোকের ঝাড়ে কঞ্চি সত্যিই ওরা কাটতে পারে না। সেকথা বুঝে পানুকাকা একটু চুপ করে যায়, তারপর আমার দিকে ফিরে বলে—চলো, আমরাই গিয়ে কেটে নিয়ে আসবো, কিন্তু দুপুরের খাওয়া হলেই বেরিয়ে পড়তে হবে, দূরে তো কম নয়—যেতে আসতে চারক্রোশ—পারবে তো অতোটা হাঁটতে।

পারবো না মানে? —আমি প্রতিবাদ করে উঠি।

কথা আর না বাড়িয়ে সে ঘুরে বীরেনের মেয়েকে প্রশ্ন করে—ঠিক কোন্ জায়গায় বল্‌তো ঝাড়টা?

বাঁকা পার হয়ে পশ্চিমে গাংপুরের কাছাকাছি একটা গ্রামের দক্ষিণে এক জঙ্গলের মতো জায়গায় একটা বড়ো আমগাছের কাছাকাছি সেই ঝাড়টা—সে নিশানা দেয়। পানুকাকার পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু আমি একটু অবাক হয়ে ভাবি—এতে সে কী করে খুঁজে বের করবে? তবে ওটা আমার চিন্তার বিষয় নয়! আমার শুধু একটু তাড়াতাড়ি সেখানে পৌঁছোনো দরকার। বলে উঠি—দুপুরে তো প্রায় হয়েই এল, এখনই খেয়ে বেরুলে হয় না?

ও একটু হাসে—আমরা কি তোমাদের মতো শহরের লোক যে সকাল দশটায় সব খাওয়া দাওয়া শেষ? তবে দেখি, আজ বৌদিকে তোমার নাম করে বললে কী হয়!

তাড়াতাড়ি রান্নার কথাটা বলতেই হয়তো সে বাড়ি চলে যায়, আমি তীরধনুক নিয়ে হাঁটা দিই বড়ো-পুকুরের দিকে। আমাদেরই বংশের কোন এক বড়বাবুর কাটানো—তাঁরই নামের ওই বিশাল পুকুরটা যেন দীঘির মতো বড়ো। পাড়গুলোও তেমনি চওড়া। আর অনেক কালের পতিত হওয়ায় ওদিকে মানুষের আসা-যাওয়া খুবই কম। তীর ছোঁড়ার পক্ষে সবচেয়ে ভালো জায়গা ওটাই এ গাঁয়ের মধ্যে।

পাড়ের ওপরে সারি সারি বাবলাগাছের মধ্যে কোন একটাকে বেছে নিয়ে তার গুঁড়ির এক জায়গার ওপরে নিচে দুটো কাল্পনিক রেখার মাঝখানে লক্ষ্য করে আমি তীরগুলোকে ছুঁড়তে থাকি। সবগুলো তীরই ছোঁড়ার পরে সেদিকে হেঁটে গিয়ে তীর কুড়িয়ে আবার অন্যদিকে ছুঁড়ে দিই—এমনিই চলতে থাকে অনেকক্ষণ ধরে। তারপর এক সময় খাওয়ার ডাক এল।

দুপুরের খাওয়া শেষ করে দু-জনে দুটো কাটারি নিয়ে আমরা সেই তলতা-বাঁশের ঝাড়ের জন্য চলেছি। আমাদের খামারবাড়ির পিছন-দরজা দিয়ে বের হলেই আর একটা পুকুর—তালবনা। তার নিচে গ্রামের দক্ষিণ মাঠ। মাঠের ওপারে মাইল-খানেক দূরে বাঁকা-নদী। সেটা পার হয়ে কোথায় যেন সেই অজানা জায়গা যেখানে আমাদের অভিযান।

তালবনা একটা সুন্দর নাম। পুকুরটার চারদিকে সীমানার ধারে সারি সারি তালগাছ—সেজনাই হয়তো এই নামকরণ; কিন্তু এটার পাড়ের ওপর বাবলাগাছও কিছু কম নেই। তার কাঁটাগুলোও সব জায়গায় এমন ছড়িয়ে আছে যে খুব সাবধানে পা ফেলে চলতে হয়—কাল বিকেলেই তো এখানে আমার পায়ে একটা কাঁটা ফুটে গেছে। সেই কথা মনে পড়ায় মাটির দিকে তাকিয়ে আমি হাঁটছি, তখনই দুপুরটা যেন চমকে উঠল হঠাৎ—

তীক্ষ্ম এক কান্নার মতো শব্দ আকাশ থেকে নামছে, মাঠের ওপর দিয়ে, আকাশের মধ্যে দিয়ে বাতাসে ভেসে ভেসে দুপুরের মর্মভেদ করে চলেছে দূরে—চলেছেই।

আমি থমকে দাঁড়াই—ওটা কিসের ডাক?

—ও একটা চিল—পানুকাকা বলে।

আমি অবাক হয়ে যাই। চিল, চিলের ডাক! সেই যে কলকাতার আকাশে কাকের মতো, কিন্তু অনেক বড়ো একরকম পাখিকে আমি কতো উড়তে দেখেছি এইরকম তার ডাক? ডাকটা থামলো কেন? আবার ডেকে উঠুক চিলটা, আমি আর একবার শুনবো।

পানুকাকা কথা শেষ করে সামনে এগিয়ে গিয়েছে। কিছুটা দূরে গিয়ে সে বুঝল যে আমি তার সঙ্গে চলছি না, থেমে দাঁড়িয়ে বলল—কী, কাঁটা ফুটলো নাকি?

কাঁটা নয়। এ অন্য কিছু। ডাকটার রেশ আমার মনের মধ্যে চলেছে—যে কোনো স্বপ্নের দেশ থেকে ভেসে ভেসে আসছে—খুব করুণ সুরে কে যেন তাকেই কেঁদে কেঁদে ডাকছে যে দূরে থেকে শোনে, কাছে আসতে চায়, তবু পারে না কিছুতেই—

কিন্তু এমনি একটা কথা ওকে বলা যায় না। বলে উঠি—এই পুকুরটা একটু দেখছি।

ওটায় তোমাদের দু-আনা ভাগ আছে। এখন চলে এসো তো; কতো দূরে যেতে হবে জানো?

সত্যি, তীরের বিষয়টা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম—সেটাও কম জরুরী নয়। চিলটাও আর ডাকছে না। দ্রুত পা চালিয়ে আমি ওর কাছে চলে যাই যেখানে পাড়ের সীমানায় সেই তালগাছের সারি। দুটো গাছের মাঝখানে আমরা হাঁটছি, তখনই আবার সেই চিলটা ডেকে উঠেছে তেমনি আগেকার মতো সুর—শুধু আরও একটু করুণ—যেন যাকে ডেকেছিল সে সাড়া দেয় নি, দিতে পারে নি। পারবে না তাও যেন জানা—তাই আরও করুণ সুরে শুধু ডেকে ডেকে যাওয়া—

আমি মুখ তুলে খুঁজছি কোন্ গাছটা থেকে সে ডাকছে, কোন্ পাতার মধ্যে বসে আছে, কিন্তু দেখা যায় না—শুধু সবুজ পাতাগুলো এক রোদ-জ্বলজ্বলে আকাশের নিচে অল্প অল্প কাঁপছে, তালগাছের কালো গুঁড়িগুলো যেন মোটা মোটা গোল থামের

মস্তো আকাশ পর্যন্ত উঠে তাদের সবুজ হাতগুলো দিয়ে আকাশটাকে তুলে ধরে রেখেছে—এগুলো সরে গেলেই ওটা যেন মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়বে।

চমকে উঠি পনুকাকার গলার শব্দে —আবার তুমি থামছো? এখানে এতো দেরি করলে দেখো শেষে হয়তো কণি না নিয়েই ফিরে আসতে হবে।

আমি দ্রুত পা চালিয়ে দিই ওর দিকে। মাঠের মাঝখানে কোণাকুণি ও হেঁটে চলেছে; কিন্তু আমার শহুরে পায়ে এই ফাটা ফাটা গরম মাটিটা যেন কাঁকরের মতো ফুটছে; আর কাটা ধানের শক্ত গোড়ায় পা লাগলে যেন শিরিষ কাগজেই আঙুলগুলো ঘষে ঘষে যাচ্ছে। সামনের আলের উপর উঠতেই আমি বলে উঠি—এবারে আলের ওপর দিয়ে চলো, উঃ মাটিটা যা শক্ত!

হুঁ, বাব্বা! এ হলো এঁটেলমাটি—খাঁটি এঁটেল! শুকোলে পাথরের চেয়ে একটুও কম নয়!

খুবই খারাপ মাটি তো?

বলো কী? এঁটেলের মতো ধান আর কোন্ মাটিতে হয় বলতে পারো?

আমার কাছে নিশ্চয়ই সে কোন উত্তর চায়নি। ও যখন বলছে মেনেই নিই আমি—তবু মাটির দিকে তাকিয়ে দেখি—এখন সত্যিই পাথরের মতো—তেমনিই কালচে হলুদ রং শুধু উৎকট ইকড়ি বিকড়ি ফাটলগুলো। সমস্ত মাঠটা যেন টুকরো টুকরো কেটে গিয়েছে—তার মধ্যে ওই কাটা ধানের গোড়াগুলো একদিনের সবুজের স্মৃতি নিয়ে এখনও রয়ে গেছে। কিন্তু ওইসব ফাটল আবার একদিন বৃষ্টিতে ভিজে বন্ধ হয়ে যাবে, এই মাঠ সবুজ হয়ে উঠবে, অনেক ধান ফলাবে—আজ দেখে তা যেন বিশ্বাসও করা যায় না। এবারে একবার বর্ষাকালে আসব গ্রামে মনে মনে ভাবি।

পনুকাকা আমার কথায় এখন আলের ওপর দিয়ে হাঁটছে। সে এবারে এই মাঠের সব জমি আমাকে চেনাতে সুরু করেছে—এইটে তোমাদের জমি, তিন বিঘে দু ছটাক—খুব ভালো জমি, বৃষ্টি ঠিক হলে বিঘেয় ষোল মণের বেশি ধান হয়। আর, এইটে হলো কোঙারদের—দু বিঘে ন'ছটাক। ওটাও খুব ভালো কিন্তু তোমাদেরটার মতো নয়।

কথা শুনতে শুনতে আলের ওপর দিয়ে শুকনো ঘাস মাড়িয়ে, ধুলো ছিটিয়ে কখনও ডাইনে কখনও বাঁয়ে পনুকাকার পিছনে ঘুরে ঘুরে আমি চলেছি। দূরে কোন্ একটি জমির দিকে আঙুলে দেখিয়ে সে বলে—ওই যে দেখছো, একটা উঁচুমতো আল, তার দক্ষিণের জমিটাও তোমাদের—আড়াই বিঘে—একটু নাবাল, কম বৃষ্টিতে খুব ভালো ধান হয়—

আমি অনেকক্ষণ ধরে একটা কথাই ভাবছি—এই বিশাল প্রান্তরের মতো মাঠের অগণনহীত ওইসব আলে ঘেরা ছোট ছোট জমি যা আমার কাছে সব একই রকম লাগছে—তারই মধ্যে ও কি করে সব জমি চিনে নিতে পারছে? আর এগুলোর কতো খবরই ওর জানা! আমি তো সারা জীবন এখানে থাকলেও একরকম পারতাম না।

পনুকাকা আরও কী যেন বলছে, কিন্তু আমার সামনে এই মৃত মাঠের ওপারে অনেকক্ষণ আগেকার নদীর চিহ্ন সেই শীর্ণ সবুজ রেখাটা ক্রমে স্ফীত হয়ে উঠে এবারে তার মধ্যে থেকে গাছ বেরিয়ে এসেছে। আরও কাছে নদীটা। খুব কাছে নদীর বন! এখনই আমি একটা নদী দেখতে পাবো—সত্যিকারের নদীর মতন। বাঁকা-নদীর যে দিকটা আমি গ্রামের পথে আসার সময় পুলের ওপর থেকে দেখেছি সেখানে শুধু ধানের আড়ৎ, ধানকল—তার বাইরে জমাকরা পাহাড়ের মতো ছাইয়ের গাদা, আর শুধু মানুষের বাড়ি-ঘর। অমনি এক ঘিঞ্জি জায়গার মধ্যে নদীটাকে কিছুতেই নদীর মতো লাগে না।

—দ্যাখো এখানে কিন্তু আর এঁটেল নেই, সবই শুনো জমি—আলু, আখ কলাই এইসব হয়। তোমরা কিন্তু শুনোর ফসল কিছুই পাও না জেতে গেলে। অতো যে শুনো জমি তোমাদের—

বলে একটু থামে সে, তারপর বলে—ভাগে কী আর শুনোর চাষ হয়!

শুনো নামটা কেমন যেন সুন্দর লাগছে, কিন্তু আমি জানি যে দোঁয়াশ মাটিকেই ও শুনো বলছে, ভাবলাম সে কথা ওকে বলি, কিন্তু নদীর দিকে একবার তাকিয়ে হঠাৎ ওকে অবাক করে একটা ছুট দিয়ে আমি তার পাড়ের ওপর গিয়ে উঠি।

এক মুহূর্তে একটা বনই আমার চোখের সামনে—কতো রকমের গাছ গুল্ম লতা। সব এক জায়গায় ভিড় করে নিচে ওপরে এখানকার সমস্ত জায়গা সবটা মাটি ওরা এখানকার সমস্ত জায়গা সবটা মাটি ওরা দখল করে নিয়েছে—ওদের মধ্যে ঘেঁষাঘেঁষি দিকে যারা এগিয়ে গিয়েছিল তাদের ঝোলা ডালগুলোকে কেটে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু নদীর দিকে অন্যরকম—ওখানে সবাই যেন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে—ডাল বাড়িয়ে নদীটার জলই যেন ছুঁতে চাইছে তারা। ঘন গাছের পাতায় পাতায় ওখানটা ছায়া ছায়া অন্ধকার—তার আড়ালে জলটা চোখে পড়ে না ওখান থেকে—গাছের ফাঁকে ফাঁকে চোখ ঘুরিয়ে আমি জলটা দেখতে চাইছি, তখনই চোখ পড়ে—আরে! এ কী! ওখানে বনের মধ্যে সেই আশ্চর্য লতায় ফুলটা একটা গাছের মাথায় কতো অজস্র ফুটে আছে!—সেই যে নীল কমলো কমলো পাপড়ির মাঝে ছোট একটু হলদে ছিট-এর ফুল—যে লতাটা আমি কলকাতায় আমাদের পাড়ার একটা বাড়ির গেট-এর মাথায় কতো যত্ন করে তুলতে দেখেছি, শুনেছি অনেক দাম, কী-যেন একটা গালভারি নাম, কিন্তু এখানে এই বনের মধ্যে সে নামহীন সে নিজেই একটা গাছের মাথায় বিছিয়ে এ-রকম ফুলে ফুটিয়ে রেখেছে!

ওই লতাটার কোন চারাও হয়তো ওর কাছাকাছি আছে। আমি সামনে এগিয়ে গেলাম। এক ডাল সরিয়ে জায়গা করে আর একটু ভিতরে গিয়ে আরও একটা ডাল সরাতে যাচ্ছি, চমকে উঠলাম—সাপ!

পনুকাকা সাবধান করছে—আরে সাপ! যাচ্ছো কোথায়? ওখানে দারুণ সাপ!

আমি থেমে দাঁড়িয়ে পড়েছি। সাপ দেখা যায় না, শুধু পায়ের নিচে মাটি—আড়াল করা ঝোপ আর শুকনো ডালপাতা। ওখানেই কী সাপ যা পনুকাকা বলছে?

পনুকাকা বলে উঠে—চলে এসো, এখন নদীর ধার তায় আবার গ্রীষ্মকাল, বনের মধ্যে ও-রকম কখনও ঢুকবে না।

আমি বাইরে বেরিয়ে এসেছি। শুধু মনটা খারাপ হয়ে গেছে—সাপের কথায় ভয় পেয়ে লতাটার একটা চারা খুঁজে দেখা হলো না।

—চলো এবারে, পুলটা পার হতে হবে—বলে ও বাঁ-দিকে ঘোরে। একটু এগিয়ে
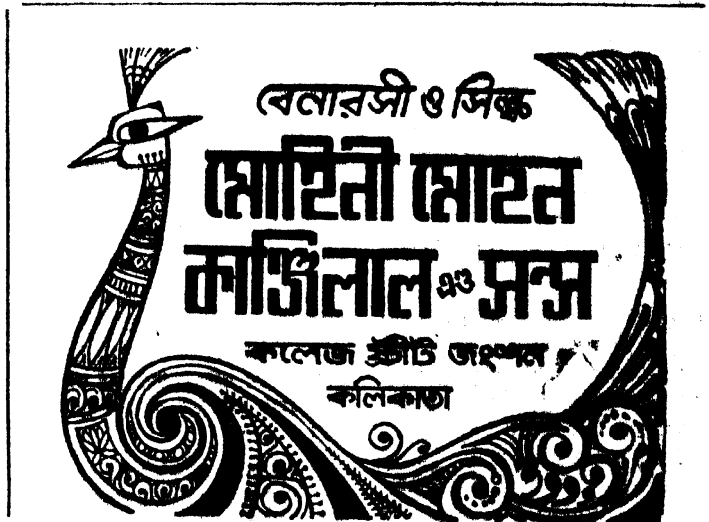
দ্-পাশে ছোট ছোট গাছের মধ্যে দিয়ে মানুষের হাঁটা-পথ দিয়ে এগিয়ে চলে। এখানে গাছ অন্যরকম—আমি দেখি। মানুষের চলার পথটা সব সময়ই অন্যরকম হয়।

সামান্য একটু হাঁটার পরেই আমরা এক আশ্চর্য সাঁকোর সামনে চলে এসেছি। আমি অবাক হয়ে দেখছি, শুধুই বাঁশ দিয়ে তৈরি এই অদ্ভুত সাঁকোটাকে—নদীর এপারে ওপারে বাঁশের খুঁটি মাঝখানেও কীভাবে যেন বাঁশ পুঁতে, তার গায়ে বাঁশ বেঁধে এক সেতু তৈরি হয়েছে যার ওপরে ধরে চলার জন্য বাঁশের একটা হাতলও করা আছে।

পনুকাকা সাঁকো দিকে এগিয়ে যায়। আমিও ওর পিছন পিছন তার ওপরে উঠছি, ও বলে ওঠে—না, দুজনে একসঙ্গে নয় আগে আমি পার হই, তারপর তুমি উঠবে! না হলে দুলে উঠে একেবারে নিচে ছিটকে পড়তে হবে।

সাঁকোটা পার হয়ে গিয়ে ওপারে দাঁড়িয়ে সে বলছে—দেখো, খুব সাবধানে কিন্তু, না দুলে যায়, দেখো—

আমি আস্তে আস্তে সাঁকোর ওপরে উঠে সাবধানে পা ফেলি। বাঁশগুলো সবশুদ্ধ দুলতে শুরু করেছে, আমার একটু ভয় ভয় লাগছে, কিন্তু সাঁকোটা আমি পারও হয়ে গেলাম। ওপারে পৌঁছোতেই পনুকাকা বলে ওঠে—বেশ তো পেরিয়ে এলে; তুমি ঠিক শহরের ছেলের মতো নও!

—কেন; শহরের ছেলে কী রকম?

উদাহরণের গল্পটা শুরু করেছে সে—আমাদের গ্রামেরই এক বাড়ির আত্মীয় এক-জন কলেজে পড়া ছেলে সাঁকো পার হতে গিয়ে কি-রকম জলে ছিটকে পড়েছিল তারই কাহিনী।

গল্প শুনতে শুনতে চলেছি, এ-কথা সে-কথা বলছি আমিও। গল্প বদল হয়ে যাচ্ছে, কখনও বা স্তব্ধতায় শুধু পথ পেরিয়ে যাওয়া মাঠের মধ্যে দিয়ে, কাশবনের ফাঁকে ফাঁকে হাঁটা-পথ দিয়ে, রেল-লাইনের ওপরে উঠে স্লীপার পায়ে পায়ে, কিছুটা পরে নেমে আবার মাঠের ওপর, দক্ষিণ-পশ্চিমে আমার অচেনার মধ্যে দিয়ে অনেক পথ; একটু সন্ধান শেষটায়, তার পরেই হঠাৎ এক বিস্ময়ের বাঁশ-ঝাড় একটু বনের মতো জায়গায়।

দ্যাখো, দ্যাখো, এই যে!—আমি প্রায় চিৎকার করে উঠলাম।

এ একেবারে অন্যরকম বাঁশ। একেবারে সোজা লম্বা লম্বা গাঁট। কঞ্চি নিচের দিকে প্রায় নেই বললেই হয়। পাতাও খুব কম। ঠাসা ঘন ঝাড়টা যেন বিশাল এক আখের বোঝার মতো খাড়া দাঁড়িয়ে আছে।

ঝাড়ের দিকে কাটারি নিয়ে এগোতে গিয়ে হঠাৎ থেমে আমি বলি—একটু দেখলে হয় না কাদের ঝাড় তাদের না বলে—

আরে, কে কী বলবে! এ তো গাঁয়ের বাইরে। আর শুধু কঞ্চিই তো কাটতে এসেছি আমরা—বাঁশ হলে না হয় কথা ছিলো।

কিন্তু যদি—ধরো—

কেউ কিছু বলবে না, আর তোমার বাবার নাম শুনলে তো—

বাবার নাম! বাবাকে ওরা কী করে চিনবে?

বাঃ চেনে না! এখানে সবাই সবাইকে চেনে—অমুক গাঁয়ের অমুক, অমুকের ছেলে অমুক—তা সে এখানে থাকুক বা শহরেই চলে যাক—

আমি কিছুটা আশ্বস্ত হই। পনুকাকা এসব বিষয়ে ভুল কিছু বলবে না। কঞ্চি কাটতে এগিয়ে যাই—একটু অস্বস্তি তবুও মনের মধ্যে, তারপর ভুলে যাই। নিচের দিকের সব কঞ্চি শেষও হয়ে গেছে।

এতো অনেক কঞ্চি হলো— পনুকাকা বলে ওঠে।

তখন আমি বাঁশ বেয়ে ওপরে উঠতে যাচ্ছি। বলে উঠি—দেখেছো, ওপরের দিকে কতো ভালো ভালো কঞ্চি।

আরে, আরে, করছো কী? পড়ে যাবে! এই নরম বাঁশে কখনও ওঠা যায়?

সত্যিই বাঁশগুলো নরম। একসঙ্গে দু-তিনটে বাঁশের ওপর ভর দিয়ে তবেই উঠতে পারা যায়। আমি উঠে যাই কোনমতে। ঘন ঝাড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ি বাইরের বাঁশ ঠেলে সরিয়ে। তারপরে কঞ্চি। এ-বাঁশ ও-বাঁশ টেনে, ফাঁকে ফাঁকে গলে, এদিকে ওদিকে ঘুরে নাগালের মধ্যে সমস্ত কঞ্চি এক সময় কাটাও হয়ে গেল। আমি নিচে নেমে এলাম।

পনুকাকা তখন সেগুলোকে জড়ো করছে এক জায়গায়। আমার দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি একটা গেছো বটে! কিন্তু এতো কঞ্চি এখন নিয়ে যেতে পারলে হয়।

কঞ্চিগুলোর দিকে তাকাই। সত্যি, মন্দ হয়নি। ওগুলো কাটার উত্তেজনা কমে এসেছে, হাত পা জ্বালা করছে এবারে। তাকিয়ে দেখি—ওই ঝাড়ের মধ্যে কিসে কখন লেগে হাত পা সবই ছড়ে আঁচড়ে গিয়েছে অনেক জায়গায়, শুধু ডান হাতের কব্জির ওপরে কিছুটা রক্ত ফুটে বেরিয়েছে। সার্টের কোনাটা তুলে নিয়ে আমি সেটাকে মুছে নিচ্ছি, তখনই চোখ পড়ে গিয়েছে ওর।

দেখি, দেখি কতোটা কাটলো? —বলে এগিয়ে এসে আমার হাতটা ধরতে যায়—তখনই বললাম যে উঠো না!

সার্টটা ছেড়ে দিয়ে হাত সরিয়ে নিয়ে বলি—ও কিছু নয়, একটু ছড়ে গিয়েছে।

আমার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত অবাক চোখে তাকিয়ে সে আবার কঞ্চির কাছে ফিরে যায়। সেগুলো গোছাতে গোছাতে বলে ওঠে—তোমার আর কলকাতায় ফিরে গিয়ে কাজ নেই, এখানেই তুমি থেকে যাও।

কঞ্চিগুলোকে গুছিয়ে দুটো সমান ভাগ করে বাঁধার জন্য সে লতা খুঁজতে চলে যায়। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারপাশের জায়গাটা দেখছি, একটা প্রশ্নও মনের মধ্যে এসে গেছে—আচ্ছা, এই রকম একটা জায়গায় আমাদের গ্রাম থেকে এতো দূরে এই বাঁশ-ঝাড়টার কথা বীরুনের মেয়েটা কী করে জানল?

পনুকাকা ফিরে আসতেই তাকে প্রশ্নটা করি। ও উত্তর দেয়—কে জানে! হয়তো জ্বালানি-টাল্লানি কাটতেই এদিকে এসেছিল, কিংবা অন্য কিছুও হতে পারে! ওরা তো সাঁওতাল, গ্রামে এসে চাষ করলেও বন-জঙ্গল কোনদিন ভোলে না।

জ্বালানি কাটতে? এতো দূরে?

আমার প্রশ্নের সুরটা হয়তো ওকে অবাক করেছে, আমার মুখের দিকে সে আবার তাকিয়ে আছে, তারপর চোখ সরিয়ে নিয়ে বলে—কী করবে, যাদের কয়লা কেনার পয়সা নেই, নিজেদের গাছ নেই, তাদেরও তো রাঁধতে হয়।

আমি চুপ করে যাই। মনটা কেমন যেন লাগে।

লতা দিয়ে বেঁধে সত্যিই দুটো চমৎকার বোঝা তৈরি হয়েছে। দুজনে সে-দুটোকে তুলে নিয়ে আবার হাঁটতে হাঁটতে বলতে বলতে এসে পৌঁছে যাই বাঁকা নদীর সেই সাঁকোটার কাছে। এবারে আমি প্রথমেই ওতে উঠেছি, ভয় করছে না, হিসাবটা জানা হয়ে গেছে—হাঁটলে সাঁকো দুললেই, শুধু সেই দোলানির তালে তালে পা ফেলে চলতে হয়।

•

তালবনের পাড়ের কাছে এসে আমি থমকে দাঁড়াই। এখানেই সেই চিলটা ডেকে উঠেছিল, অনেকক্ষণ থেকে আবার সেটা শুনতে চেয়েছি কিন্তু এখনও ডাকেনি। পনুকাকার দিকে ফিরে বলি—এখানে একটু বসে গেলে হয় না?

খুব এলিয়ে গিয়েছো, না? উঃ বা বোঝাটা মাথার ওপর দিয়ে গেল।

বলতে বলতে সে বোঝাটা পাড়ের ওপর ছুঁড়ে ফেলেছে। আমিও আমার বোঝা নামিয়ে দিই। কঞ্চির ওপরে আমরা দুজনেই বসে পড়ি। কোঁচার খুঁটটা আলগা করে ঘাড় গলা মুছতে মুছতে সে বলে—বলো তো আজ তাতটা কী রকম? তোমা-দের কলকাতায় শুনেছি এতো গরম পড়ে না—

কথাটা ও হয়তো ঠিকই বলেছে, কিন্তু আমি চিলের কথাই ভাবছিলাম। বলে উঠি—আচ্ছা, চিলটা আর ডাকছে না কেন বলতে পারো?

চিলটা? কোন্ চিলটা?

সেই যে যাবার সময় এখানেই ডাকছিল যেটা? কেন তুমি শোনোনি?

ও তো রোজই ডাকে দুপুরে। আজ কিন্তু আর ডাকবে না।

কেন?

চিল দুপুরে ছাড়া ডাকে না—বলে আমার দিকে তাকিয়ে নিজের প্রশ্নটা করে—চিলের কথা নিয়ে এতো ভাবছো কেন বলো তো?

এমনিই—আমি বলি ওর মুখের দিকে চেয়ে। আমারও মনে একটি প্রশ্ন—রোজ শুনলেই কি চিলের ডাকের সেই করুণ সুরটা মানুষের কাছে হারিয়ে যায়? না কি আর কিছু?

কিছুক্ষণ পরে আমরা আবার যখন সাঁওতালপাড়ায় এসে ঢুকলাম, তখন রোদ চলে গিয়েছে, তবু দুপুরের রোদে-তাড়ানো মানুষগুলো তখনও ঘরের মধ্যে থেকে বের হয়ে আসেনি। শুধু বীরুনের সেই মেয়েটা একটা মুরগীর পিছন ছুটে একটা ঘরের আড়ালে চলে যাচ্ছে দেখলাম।

পনুকাকা ডাক দিল—বীরুন আছিস্।

সে উত্তর দিয়ে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। আমাদের দুজনের হাতে কঞ্চির বোঝার দিকে একটু বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে—ই যে অনেক কাণ্ড এনেছিস্।

বলতে বলতে সে এগিয়ে আসছিল, তারপরে যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেছে—দাঁড়া, তুদের বসার উটা নিয়ে আসি।

তাড়াতাড়ি সে আবার ঘরের মধ্যে ঢুকে যায়। বেরিয়ে আসে ছোট্ট একটা বাঁশের খাটিয়া নিয়ে—পায়া, ঘেরা সবই বাঁশ দিয়ে তৈরি, তাতে কী এক রকম ঘাস বা ঘাসের মতো দেখতে কিছু একটা দিয়ে পাকানো দড়িতে সুন্দরভাবে বোনা—এটাতেই সে আমাকে কাল এবং আজ সকালেও বসতে দিয়েছিল।

বসা আমার দরকারও ছিল। সারাটা দুপুর রোদ মাথার ওপর দিয়ে গেছে, পথও কম হাঁটিনি আমরা। বসে পড়ে পনুকাকাকেও বসতে বলি। কিন্তু ও এখন বসবে না। চায়ের কথা বলতে বাড়িতে যাবে।

সে বাড়ি চলে গেছে। কঞ্চির দুটো বোঝাই খুলে ফেলা হয়েছে। খাটিয়ায় বসে বসেই আমি কঞ্চি বাছাই করছি, বীরুনকে বুঝিয়ে দিচ্ছি আমার হিসাবটা—এটাতে দুটো তীর হবে। আর, এইটায় মোটা দিকটা কেটে ফেলে শুধু একটা তীরের মতো রাখবে—এমনিই সব হিসাব।

এতক্ষণে আমাদের আশেপাশে সাঁওতালপাড়ার আরও কয়েকজন এসে দাঁড়িয়েছে—সবারই চোখেমুখে একটু কৌতূহল—যেন এরকম একটা ব্যাপার তারা আগে কখনো দ্যাখেনি। বীরুন আমার হিসাবটা বুঝেছে, কঞ্চিগুলো ভাগ ভাগ করে রাখছে, তার পিছনে কয়েকজন পুরুষ, বাঁদিকে তাদের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে তিনজন নারী—বীরুনের মেয়েটাও তাদের মধ্যে আছে। ওরা সবাই আমাদের কঞ্চির দিকে দেখছে আর নিজেদের ভাষায় কী যেন বলাবলি করছে। ভাষাটা না জেনেও বেশ বোঝা যায় যে, এই কঞ্চি অথবা তীরের বিষয়েই কিছু বলছে ওরা।

কঞ্চি ভাগ হচ্ছে, গোনা চলছে, আরেকজন সাঁওতাল বীরুনের পাশে এসে আমাদের কাজে হাত লাগিয়েছে, মেয়েদের কথার গুঞ্জন আসছে, সেতারের মতো টুং-টাং সাঁওতালী ভাষায়—তারই মধ্যে হঠাৎ একটা হাসির শব্দ উঠেছে। কী নিয়ে হাসছে দেখতে আমি তাদের দিকে তাকাই।

আর, ঠিক তখনই যেন কথা বলতে বলতে থেমে গেছে বীরুনের মেয়েটাই। সে হাসছিল—হাসিটা মুখে লেগে রয়েছে এখনও। কিন্তু কেন? কী বলছিল ও? ওর চোখে চোখ রেখে বলি—কী বলছিলি রে?

হঠাৎ যেন ধরা পড়ে গিয়েছে সে—চোখেমুখে এক লজ্জা-মাখা অন্যায়ের ভাব। আমার কথার উত্তর না দিয়ে সে একটু পিছিয়ে যায়। খুবই আশ্চর্য ব্যাপার তো! কী বলছিল যে—আরেকটু জোরে আমি বলে উঠি—বল্ না, কী বলছিলি?

তবু ও উত্তর দেবে না। মুখের চেহারাটা যেন অনেক বদলে গেছে। শুধু ওরই নয়, সবাইকার। আর স্তব্ধতা।

আমার বিস্ময় বেড়ে বেড়ে উঠছে—কী এমন কথা ও বলছিল যে হঠাৎ এরকম—অন্য মেয়েদের দিকে চোখ ফিরিয়ে আমি বলি—এই, তোরা বল্ না, ও কী বলছিল রে?

একটু সময় তারাও চুপ করে আছে। শেষে উত্তর দেয় একটি বয়স্কা মেয়ে—শম্ভু সাঁওতালের বৌ—উ বলছিল যী মুনিবটা যেন ঠিক সামুতাল!

একটা কালো মেঘ সরে গিয়ে যেন হঠাৎ খলবল করে রোদ বেরিয়ে এসেছে—আমি হেসে উঠে বলি—তাহলেই তো সবচেয়ে ভাল হতো!

বলে বীরুনের মেয়ের দিকে তাকাই। কিশোরী। পাউডার মতো শ্যামলা—সতেজ। কালো চকচকে চামড়া। গলায় রঙিন পুঁতির মালা, খোঁপায় কী একরকম নাম-না-জানা ফুল। মুখ ঘুরিয়ে সে এবার ঘরের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে।
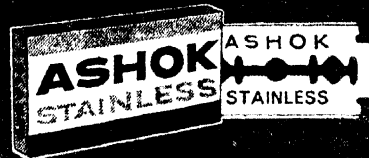
উদিত সূর্যের দেশে

কমলা মুখোপাধ্যায়

বর্তমানের 'অরুণাচল'—যাকে কিছুকাল আগেও নেফা বলা হোত, সেই উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল হয়তো আমাদের কাছে অগোচরেই থেকে যেত যদি না ১৯৬২-র ঐ অঞ্চলে ভারত-চীন সংঘর্ষ ঘটত। আজ থেকে ৭০০—৮০০ বৎসর কাল ধরে এখানকার পার্বত্য অঞ্চলে গিরিকন্দরে, গহ্বরে, নদী উপত্যকায় যে সব পার্বত্য উপজাতি ও গোষ্ঠী বাস করছে, তাদের বিষয় আমরা কতটুকুই বা খবর রাখি? অথচ এই অঞ্চলের আন্তর্জাতিক সীমারেখার ও প্রতিরক্ষার গুরুত্ব বিচার করলে বলা যায় এই সব পার্বত্য উপজাতিগুলিই এক হিসাবে আমাদের সীমান্ত প্রহরীর কাজ করছে!

ভৌগোলিক দিক দিয়ে বিচার করলে এর অবস্থিতি এতখানি গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা কোনমতেই একে উপেক্ষা করতে পারি না। ভুটান, তিব্বত, ব্রহ্মদেশের সঙ্গে তিনদিক দিয়ে এ অঞ্চল ভারতের সীমা নির্দেশ করছে। উচ্চ হিমালয় গিরিশ্রেণী ধীরে ধীরে পূর্বদিকে ঢালু হয়ে লোহিত জেলায় শেষ হয়েছে তারপর সুরু হয়েছে দক্ষিণ পূর্বাভিমুখী পাতকোই পর্বত শ্রেণী— যার অপর দিকে ব্রহ্মদেশ। ভুটান সীমান্ত থেকে সুবর্নসিরির লংজু অবধি পর্বতের উচ্চতা ১৮০০০—২১০০০ ফুট তারপর গেলিং সীমান্তে কারবোর কাছে, যেখানে সানপো নদী ভারতে প্রবেশ করেছে, সেখানে এর উচ্চতা ১৬০০০—১৫০০০ ফিট। ডিহাং ও লোহিত নদীর মাঝে গিরিশৃঙ্গগুলির উচ্চতা ৯০০০ থেকে ১৯০০০ ফুট। এর লোহিত জেলায় প্রকৃতির রূপ ভয়ংকর, কোথাও গভীর গিরিখাদ, কোথাও সুউচ্চ পর্বত খাড়াভাবে উঁচে উঠেছে। এক পর্বত শ্রেণী থেকে অন্য পর্বত শ্রেণী বা উপত্যকায় যাবার কোনও সোজা রাস্তা নেই তাছাড়া মাঝে মাঝে রয়েছে অসংখ্য পার্বত্য নদী—যোজনা বিচ্ছিন্ন উপজাতিগুলির মধ্যে মেলামেশা ও সৌহার্দ্য কম। তিরাপ জেলায় এই উচ্চতা এসে ৬০০০ ফুটে নেমেছে। এই অঞ্চলের পার্বত্য প্রাচীর, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাকে অশ্বখুরাকৃতি আকারে বেষ্টন করে রেখেছে। এই উচ্চ পর্বত শ্রেণী, গভীর গিরিখাত, ঘন অরণ্যাবৃত পর্বত কন্দর - এসবের পটভূমিকায় জীবনযাত্রা কঠোর ও রুক্ষ হলেও বিভিন্ন সময়ে, পার্বত্য নদী ও তার শাখাগুলি ধরে মঙ্গোলীয় জাতি গোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখা বহুদিন ধরে, বিভিন্ন সময়ে উত্তর ও পূর্ব দিক দিয়ে এ অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। কিন্তু পার্বত্য প্রকৃতি, ঘন বৃষ্টিপাত, (২০০ গড় ইঞ্চি) গভীর জঙ্গল, বন্য পশুর উপস্থিতি এদের পরস্পরের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে বাধার সৃষ্টি তো করেছেই, উপরন্তু সমতলবাসীদের সঙ্গেও এদের বেশী সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারেনি। তাছাড়া ব্রহ্মপুত্র নদ উত্তর ও পূর্ব থেকে আগত অধিবাসীদের আরও দক্ষিণে আসাম প্রদেশে যাবার পথ রুদ্ধ করে রেখেছে, ফলে এসব তিব্বতী ব্রহ্ম গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ও সামাজিক দিক থেকে এক বিশেষ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। এখানকার অধিবাসীদের চেহারায় বেশ কিছু সাদৃশ্য আছে—এদের দেহের গঠন মজবুত ও মোটামুটি সুশ্রী, নাক চ্যাপটা, গালের হাড় উঁচু, চক্ষু তির্যক ভাবে চেরা, মুখ ও দেহ রোমহীন, গায়ের রং বাদামী। এদের মধ্যে দাফলা, আপাতানী, ডিগারু, মিশমীদের মেয়েরা তো রীতিমতো সুশ্রী। প্রধান গোষ্ঠী হল ২০টি, শাখা-প্রশাখা সমেত উপগোষ্ঠীদের সংখ্যা ৭০টি। ১.১ লক্ষ কিলোমিটার বিস্তৃত অঞ্চলে বাস করে মাত্র ৫ লক্ষ লোক, যাদের মধ্যে কম পক্ষে ৩০ ভাষা ও উপভাষা প্রচলিত—যা তিব্বত-বর্মা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। কোনও কোনও উপজাতি ব্রহ্মপুত্র নদী পার না হয়ে পাহাড়েও পশ্চিমে সিকিম ভুটান, কোচবিহার পর্যন্ত চলে গিয়েছিল—কোচ, মেচ, মগ জাতি এই দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সব উপজাতি গোষ্ঠী সীমান্তের উত্তর অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে ব্যবসা-

বাণিজ্যের মাধ্যমে সমতলের অহমদের ও সমতলবাসীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল—সেই দিক থেকে আসামের সঙ্গে এদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ।

এই অঞ্চলের কয়েক শত বৎসরের ইতিহাস অনেকটাই কিম্বদন্তী—প্রাচীনকালের ইতিহাসের মধ্যে মহাভারতে এদের 'কিরাত' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ভারতের পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য জনগোষ্ঠী ও রাজবংশের সঙ্গে এখানকার দক্ষিণাঞ্চলের জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ বহুদিন ধরেই হয়েছে তার বহু প্রমাণ ও তথ্য পাওয়া গেছে। পূর্বাঞ্চলের রাজন্যবৃন্দ, এমনকি দিল্লীর সম্রাটরাও যে এখানে তাদের সভ্যতা বিস্তার বা রাজ্য জয় করতে এসেছিলেন তার নিদর্শন বহু পাওয়া গেছে। যে সব প্রাচীন প্রাসাদ, মন্দির ও প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে তাতে সমতলবাসীদের সঙ্গে পার্বত্য গোষ্ঠীগুলির সংঘর্ষ ও সম্পর্কের বেশ কিছুটা ধারণা করা যায়—বিশেষ করে মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে এখানকার কাহিনী, নগরগুলির নাম ও তাদের রাজবংশের নাম জড়িত। কামেঙ জিলার ভরেলী বা কামেঙ নদীর দক্ষিণ তীরে ভালুকপঙে যে দুর্গের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে, সেখানকার আকা উপজাতিরা দাবী করে যে ঐ দুর্গ তাদের পূর্বপুরুষ ভালুকের (মহাভারতের জাম্ববান—যার সঙ্গে স্যমন্তক মণি ও জাম্ববতীর কাহিনী জড়িত)। এর দুর্গ। এই ভালুক বা জাম্ববান ছিলেন বাণরাজার নাতি। বাণরাজা রাজত্ব করতেন শোণিতপুরে বর্তমান তেজপুরে। তিনি ছিলেন বলি-রাজার বংশধর। লোহিত জেলায় সদিয়ার কিছুটা উত্তর-পূর্বে কুণ্ডিল নদীর তীরে যে সব প্রাসাদ ও প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে, তাতে প্রমাণিত হয়েছে এর নাম ছিল ভীষ্মকনগর বা কুণ্ডিলনগর। রাজা ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণীকে হরণ করতে আসেন শ্রীকৃষ্ণ এবং তিনি রুক্মিণীকে হরণ করে এখান থেকে দ্বারকায় নিয়ে যান। কিছুটা উত্তর-পশ্চিমে পথে যেখানে তাঁরা বিশ্রাম করেন তাকে এখন বলা হয় মালিনী-থান। এখানে পার্বতী মালিনী বেশে তাঁদের অভ্যর্থনা করেন। এখানকার মন্দির প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ, পোড়ামাটির মূর্তি ও বাসনপত্র এখন প্রত্নতত্ত্ববিদদের গবেষণার বিষয়। ভীষ্মকনগরের কয়েক মাইলের মধ্যে বিখ্যাত তাম্রেশ্বরী মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে যার কিছু দূরে শিবলিঙ্গ ও গৌরীর প্রতীক বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। বর্তমানে লোহিতের প্রধান শহর তেজুতে শিব মন্দির গড়ে এই সব দেবতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। সুবনসিরি জেলার দইমুখের নিকট মায়াপুরে (বর্তমানের ইটা) জিতারী বংশের পলাতক রাজা রামচন্দ্রের রাজত্বের চিহ্ন পাওয়া গেছে দাফলা উপজাতিদের এলাকায়। আর লোহিতের তীরে ব্রহ্মকুণ্ড বা পরশুরামকুণ্ড তো আজও ভারতীয় জনগণের তথা স্থানীয় মিশমীদের এক প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান বলে পরিগণিত। এখানে নাকি পরশুরাম কুঠার দিয়ে আঘাত করে লোহিত নদীর গতিকে উন্মুক্ত করে দেন। এই সব চিহ্ন ও প্রমাণাদি দেখলে বোঝা যায় সুবনসিরির দাফলা, লোহিতের মিশমী, তিরাপ-এর আদি প্রভৃতি উপজাতি বিভিন্ন সময়ে বহিরাগত রাজবংশদের সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে, না হলে বিদেশীদের পক্ষে বহুকাল ধরে ঐ সব অঞ্চলে টিকে থাকা সম্ভব হোত না। এই সব সময়েই তারা আর্য ও ভারতের অন্যান্য রাজবংশের সান্নিধ্যে এসে তাদের কাহিনী ও সংস্কৃতি কিছুটা গ্রহণ করেছে। লোহিত জেলার মিশমীদের একটি শাখাকে 'চুলিকাটা' বলা হয়, এদেরকে 'ইদু' মিশমীও বলা হয়। তারা বলে রুক্মিণী হরণের সময়ে শ্রীকৃষ্ণ, রুক্মিণীর ভাই রুক্মকে যুদ্ধে পরাজিত করেন কিন্তু প্রাণে না মেরে চুল কেটে দিয়ে অপমানিত করেন। মিশমীরা সেই রুক্মের বংশধর। তা সত্ত্বেও বলা যায় আর্য বা অন্যান্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি এদের খুব বেশী প্রভাবিত করে না।

বৌদ্ধদের ধর্মীয় রথ

আসাম বুরঞ্জি ছাড়াও পরবর্তী কালে মীরজুমলার সঙ্গে আগত ঐতিহাসিক সাহাবুদ্দিনের লেখায়ও এ অঞ্চলের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ১২২৮ সালে অহম রাজা সুকাফা পাটকাই পর্বতের পথ দিয়ে ভারতের এই অঞ্চলে প্রবেশ করেন। তাঁর আগেও বোরো, কাছাড়ী, বরাহী, চুটিয়া, মোরান প্রভৃতি গোষ্ঠী এখানে প্রবেশ করে রাজত্ব করেছেন—তাদের সময়েও এই সব পার্বত্য গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে সংঘর্ষে আসতে হয়েছে। তবে অহম রাজারা একটানা ৭০০ বছর রাজত্ব করেন। সুতরাং বিভিন্ন উপজাতি সম্পর্কে একটা নীতি তাঁদের নিতে হয়েছিল প্রয়োজনের খাতিরেই তবে সমসময়েই যে সমতলবাসীদের সঙ্গে পার্বত্য উপজাতিদের মারামারি লেগে থাকতো তা নয়। এটা ঠিক, এরা সমতলে এসে হানা দিয়ে বলিদানের জন্য মানুষ চুরি করেছে, বিক্রী করেছে। জিনিসপত্র গরু লুণ্ঠন করেছে, তেমনি আবার সমতলবাসীদের সঙ্গে ব্যবসাও করেছে। অহম রাজবংশের অনেকের সঙ্গেই এদের মেয়েদের বিবাহ হয়েছে। পরবর্তী যুগে সুদূর পূর্বাঞ্চলে আবরদের বা খামতিদের যখন শাসনকার্যের বিভিন্ন স্তরে নিয়োগ করা হয়েছে, তাদের সঙ্গে অহমরাজারা নিজেদের মেয়েদেরও বিয়ে দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও একথা বলা যায় যে তাঁদের মোট নীতি ছিল এই সব উপজাতিদের

লাগিয়েছে। বিভিন্ন গছ-গাছড়া থেকে রং তৈরী করে ব্যবহার করেছে। সবচাইতে আশ্চর্য হতে হয় এদের বিভিন্ন নমুনা বা নক্সাগুলি দেখলে। বেশীর ভাগই জ্যামিতিক রেখায় অঙ্কিত, বিভিন্ন রকম রং-এর ব্যবহারে এরা অতুলনীয়। বস্ত্রগুলিতে ধর্মীয় প্রতীকও আছে যেমন ড্রাগন, হাঁস, কীট-পতঙ্গ। প্রত্যেক জেলায় আছে কারু-শিল্প কেন্দ্র, তাতে প্রত্যেক জেলার অধিবাসীদের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে তাঁত, কাঠের কাজ, ধাতুর কাজ ও অলঙ্করণ শেখান হচ্ছে। স্থানীয় লোকরাই কর্মী। এই রকম একটি কেন্দ্রে শান্তিনিকেতনে শিক্ষা-প্রাপ্ত শিল্পী সত্যেন বরদলই মশায়ের সঙ্গে আলাপ হয়। ইনি বিভিন্ন নক্সা সংগ্রহ করে ফ্রেমে বাঁধিয়ে রেখেছেন। সামান্য একটা ডিজাইন বা রং বদল করে, নিত্য নতুন শিল্পকর্ম সৃষ্টি করাচ্ছেন। তবে এখানে এগুলির চাহিদা এত বেশী যে আমাদের পক্ষে কেনা সম্ভবই হল না। না হলে মিশমী কোটগুলির কারুকার্য এত সুন্দর ও এত প্রচলিত যে না কিনতে পেরে দুঃখ হোল। মিশমীরা কোমরে স্বল্পবাস ব্যবহার করে ও উপরে এই কোট ব্যবহার করে। তবে টাণ্ডাতেও এদের খালি গায়ে থাকতে দেখা যায়। যুদ্ধবিগ্রহ, শান্তি, পাল-পার্বণে তারা এই কোট ব্যবহার করে—ফলে এগুলি সহজে নষ্ট হয় না বা ছেঁড়ে না—একটি দুটি কোটেই জীবন কেটে যায়।

পশ্চিম থেকে পূর্বে ৫টি জেলার নাম কামেঙ, সুবনসিরি, সিয়াঙ, লোহিত, ও তিরাপ। কামেঙ জেলা ভুটানের পাশে। কামেঙ বা ভরেলী নদী তিব্বত থেকে এসে ব্রহ্মপুত্রতে মিশেছে—তার নামেই এ জেলা। রাজধানী বমডিলা—এখান থেকে ১২২ মাইল উত্তরে তাওয়াঙ মঠ যে রাস্তা দিয়ে দালাই লামা ভারতে পালিয়ে এসেছিলেন। সামরিক দিক দিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তেজপুর থেকে যেতে হয়। এখানকার গড় উচ্চতা বেশী—স্থানীয় উপজাতিদের মধ্যে উত্তরে মনপা উপত্যকায় শেরদুকপেন ও আরও দক্ষিণে আকো গোষ্ঠীর বাস। মনপা ও শেরদুকপেনরা বৌদ্ধ—এখানে থাকার সময়ে গ্রন্থপূজা বলে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল—ভুটানের পুরোহিতরা অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। এরা তাওয়াঙ মঠের নিয়ন্ত্রণে আছে। মনপাদের ব্যবসা-বাণিজ্য চলে ভুটানের সঙ্গে। সমভূমির সঙ্গে বেশী সম্বন্ধ শেরদুকপেন ও আকাদের। আকারা সম্ভবতঃ সমভূমি থেকেই এসেছে। অহম রাজাদের পূর্বে তেজপুরের কাছে প্রতাপগড়ের কাছ থেকে উত্তর-পশ্চিম অবধি এদের রাজত্ব বিস্তৃত ছিল। অহম রাজাদের সময় এদের প্রতিপত্তি হ্রাস পায়, তখন মাঝে মাঝে সমতলে এসে লুটপাট করে উত্তরে পালিয়ে যেত। কিছুটা বৈষ্ণবধর্ম দ্বারা প্রভাবিত, মিসামারীতে কিরঙ দেবালয় দর্শনে মাঝে মাঝে যায়। অহম রাজারা এদের শান্তিপূর্ণ উপায়ে বসবাস করার জন্য মোলানপুকুরী গ্রামে ১৪৪ বিঘা জমি দান করেন।

এখানকার অন্যতম উপজাতি মিজি—তারা সংখ্যায় কম, তার পরের জেলা সুবনসিরি, ঐ নদীর নামের জেলা। রাজধানী জিরো। সমস্ত অরুণাচলের কেন্দ্রীয় রাজধানী এখানে উঠিয়ে আনবার কথা এরই কাছাকাছি কোনও জায়গায়। এই অঞ্চলের সবচেয়ে বেশী সংগঠিত ও উন্নত গোষ্ঠী হোল আপাতানী। এরা কৃষিকার্য করে জীবন যাপন করে। শান্ত সুসংগঠিত, পর্বতঘেরা উপত্যকাগুলিতে চাষ করে। বেশ সমৃদ্ধ, নিজেদের সম্পত্তি বিষয়ে বেশ সচেতন। যার যত বেশী জমি—সে তত ধনী। এরা মিলে মিশে থাকতেই ভালবাসে—এবং এদের গোষ্ঠী-জীবন খুবই সুসংগঠিত। জিরোর কাছাকাছি থাকাতে, আধুনিক সভ্য জগতের সংস্পর্শে সব চাইতে বেশী এসেছে। উপজাতিদের মধ্যে এদের ধনতান্ত্রিক সমাজ বলা যেতে পারে। এদের ঠিক বিপরীত হোল দাফলা—এরা হিংস্র ও দুর্ধর্ষ—গোষ্ঠী জীবন একেবারেই সংগঠিত নয়, পরিবারই এদের সমাজ-জীবনের কেন্দ্র। একটি লম্বা ধরনের বিস্তৃত গৃহতে ৪০।৫০জন পরিবার থাকে, প্রায়ই নিজেদের মধ্যে মারামারি লেগে থাকে। আপাতানীদের এরা ঠেলে নীচে পাঠিয়েছে—তাদের নীচের অঞ্চল থেকে বেরোতে দেয় না। কারণ এদের অঞ্চল দিয়েই আপাতানীদের বার হতে হয় বহু স্থানে।

কমলা ও খ্রু নদীর সঙ্গমস্থলের পূর্বে দিকে থাকে মিরি উপজাতি। পর্বতের ঢালে থাকে বলে সেচ চাষ করে না—জুম চাষ করে। এদের গ্রামগুলি ছোট। শীতকালে সমতলে নেমে আসে চামড়া, রং ও রবারের বিনিময়ে লবণ কাপড়, ছোরা, দা প্রভৃতি কিনতে। এ-ছাড়া সুলুং, গেলঙ ও তাগিনরা থাকে কিছু উত্তরে। এদের মধ্যে তাগিনরা খুবই অশান্ত উপজাতি। এখনও সম্পূর্ণভাবে শাসনের আওতায় আসেনি। ১৯৫৩-৫৪ সাল অবধি এরা বিদ্রোহ করেছে। ঐ সময়ে আসাম রাইফেল দলের বিশ্রামরত এক সৈনাদলকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেয়। থাকেও এরা বন্য, রুক্ষ, অনুর্বর মৃত্তিকা-যুক্ত পর্বত অঞ্চলে। বাসুদেব বসুর 'নেফা সুন্দরী নেফা' বইটিতে এদের সুন্দর বর্ণনা আছে। এদের জীবনযাত্রা কঠোর, চর্মরোগের প্রাদুর্ভাব, পুষ্টিকর খাদ্য নেই, রাস্তাঘাট নেই, তাই প্রকৃতি মানুষ সকলের বিরুদ্ধেই এদের সংগ্রাম। তবু এদের অঞ্চলে এখন ডাক্তার ও কৃষি-বিশেষজ্ঞরা গেছেন এবং এদের কাছাকাছি থাকার জন্য উত্তরে ডাপোরিজোকে সার্বডিভিশনের শাসন কেন্দ্র করা হয়েছে।

তৃতীয় জেলা হোল সিয়াঙ। রাজধানী আলঙ এইখানে সানপো নদী ভারত সীমান্ত গেলিং-এর নিকট দিয়ে প্রবেশ করে দক্ষিণাভিমুখী হয়েছে ডিহাং নাম নিয়ে। সদিয়ার কাছ থেকে নদীর নাম ব্রহ্মপুত্র। বৃটিশ আমল থেকে এখানে শাসনকার্যের কেন্দ্র পাশীঘাট, যা বেশ উন্নত ও যাতায়াতের দিক দিয়ে সুবিধাজনক। কলেজ, ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য শহরের সুবিধাগুলি এখানে আছে। উত্তরে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী খাম্বা ও গরীব মেম্বা উপজাতি বাস করে। মধ্যভাগে বাস করে আবর বা আদি। সমতলবাসীদের দেওয়া নাম আবর (মানে অবাধ্য) এরা পছন্দ করে না। এখন তাই এদের বলা হয় আদি। এরা বেশ আত্মমর্যাদাসম্পন্ন গর্বিত ও যোদ্ধাজাত। এদের চেহারা ও গঠন বেশ শক্ত ও মজবুত, খুবই স্বাধীনতাপ্রিয়—উপজাতিদের মধ্যে সবচেয়ে শেষে বশ্যতা স্বীকার করেছে। এদের বিভিন্ন শাখাগুলির মধ্যে পদম, মিনিয়ঙ শীমেঙ গিলিয়াঙ গোষ্ঠী উল্লেখযোগ্য। একমাত্র এই শেষোক্ত উপজাতিদের মধ্যেই সম্ভবতঃ তিব্বত সীমান্তে বসবাস করার জন্য বহুপতি প্রথা চালু আছে। লোহিত জেলাতেও এদের দেখা যায় সাধারণতঃ এরা সদিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। আবররা পুলিশের কাজও করে—এবং দোভাষীর কাজে বেশ দক্ষ। আবর বা আদিদের বেশ ঐতিহাসিক বোধও আছে, ভবিষ্যতের ধারণাও আছে। দাস প্রথা এ অঞ্চলে কমবেশী সর্বত্র প্রচলিত ছিল—তবে এদের মধ্যেই বেশী ছিল—এ কারণেই ইংরাজ শাসকদের সঙ্গে শেষ অবধি লড়াই চলেছিল এদের এই অধিকারে হাত দেওয়াতে। এরা ব্যবসা-বাণিজ্যেও বেশ দক্ষ ও দরাদরি করতে বেশ ওস্তাদ। এরা তামাকসেবী ও আফিং প্রিয়।

এর পরে আসে লোহিত জেলা—উত্তর-পূর্ব দিক থেকে লোহিত নদী এসে সদিয়ার কাছে ব্রহ্মপুত্রতে মিশেছে, এই নদীর নামানুসারেই জেলার নাম। সমস্ত জেলার মধ্যে এই জেলাই মনকে নানা বৈচিত্র্যে আকর্ষণ করে। সব চাইতে পূর্ব সীমান্তের এই অঞ্চলটি, প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক, নৃতাত্ত্বিক, উদ্ভিদ প্রভৃতির দিক দিয়ে বিজ্ঞানীদের কাছে খুব প্রয়োজনীয়। অসংখ্য গিরিশিরা উত্তুঙ্গ পর্বত গিরিখাদ, পার্বত্য নদী, প্রবল বর্ষা এখানকার অধিবাসী মিশমীদের কখনই সুস্থির হয়ে বসতে দেয়নি। এইসব প্রাকৃতিক কারণে এখানকার অধিবাসীরা বিভিন্ন বিবদমান গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে, গোষ্ঠীগত জীবনযাত্রা কম। আর্য বা উন্নততর সভ্যতার বেশীর ভাগ নিদর্শন—যথা পরশুরাম কুণ্ড, ভীষ্মনগর, তাম্রেশ্বরী মন্দিরের ব্যাঘ্রবাহিনী দুর্গামূর্তি ও শিবলিঙ্গ সবই এই জেলায় পাওয়া গেছে—এগুলি নিয়ে এখন গবেষণা চলছে। লোহিত নদীকে মিশমীরা বলতো টি-লাও (টি মানে জল) যার থেকে খুব সম্ভব লোহিত নামটি হয়েছে—পরবর্তী কালে সংস্কৃতীকরণ করে লৌহিত্য নাম দেবার চেষ্টা হয়েছে। এ-নদী ধরেই মিশমীরা এই অঞ্চলে প্রবেশ করে। এদের মধ্যে তিনটি প্রধান গোষ্ঠী আছে ১। ইদু বা চুলিকাটা মিশমী, এরাই সবচাইতে বেশী উল্লেখনীয়। এরা জুম চাষ করতো, আবার সদিয়াতে এসে কেনা-বেচা করতেও খুব উৎসাহী ছিল। ১৮৪৩ খৃঃ ও ১৯৫০ খৃঃ-র ভূমিকম্পে পাহাড়ের উপর দিকে গ্রামগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়—তখন এদের বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। এরা আগে লোহিতের পশ্চিমে দিবং নদীর উপত্যকায় বসবাস

করতো। এদের চুলিকাটা মিশমীও বলা হয়। (কারণ আগেই বলা হয়েছে) এদের এখানকার কয়েকটি ১৬০০০—১৭০০০' গিরিশৃঙ্গের নামগুলিও খুব মজার—তাতুথেয়া, টিয়ো-থেয়া, ত্রিগর্তথেয়া ইত্যাদি। ইদু মিশমীদের চেহারা সম্পূর্ণ মঙ্গোলীয় নয়—এরা বেশ সুশ্রী। ২। দিগারু বা তারাওন মিশমী—ছোট পার্বত্য নদী দিগারুর তীরে বসবাস করে ও তৃতীয় ভাগ হোল মিজি মিশমী বা কামান—পূর্ব দিক ঘেঁষে বাস করে—এসেছে কাচীন দেশ থেকে। শেষোক্ত দুই গোষ্ঠী লম্বা চুল রাখে ও ঝুঁটি করে চুল বেঁধে একটা গোঁজ দিয়ে দেয় মাঝখানে দিয়ে। মেয়েরা মাথায় রুপোর গয়না পরে। এদের ভগবান ইত্যাদি সম্পর্কে খুব বেশী কল্পনা নাই—ধর্ম মানে হোল কতকগুলি আচার ব্যবহার, কিভাবে অমঙ্গলকে, ব্যাধিকে বা প্রক্রিয়া দ্বারা দূরে রাখা যায়। এদের মধ্যে সংঘর্ষ লেগেই থাকতো, ছাড়া আবর, সিঙফো, খামটি এদের সঙ্গেও অনবরত সংঘর্ষ লাগতো। আবররা এদের চোর, ঠগ প্রভৃতি নামে ভূষিত করেছে। এরা পরশুরাম কুণ্ডেও মাঘমেলার সময় স্নান করে—মাছগুলিকে মনে করে মৃতদের আত্মা।

এর পর উল্লেখযোগ্য হোল খামটি উপজাতি—সমগ্র অঞ্চলে বোধহয় এরাই অতীতকাল থেকেই সব চাইতে বেশী উন্নত। এরা ব্রহ্মদেশের সান প্রদেশ থেকে এসেছে—লোহিত নদীর দক্ষিণে বাস করে। আসামের ইতিহাসে এদের বেশ কিছু ভূমিকা আছে। ধর্মে বৌদ্ধ, 'তাই' 'খাই' হোল এদের ভাষা। এদের পূর্বপুরুষেরা এক সময়ে মণিপুর ত্রিপুরা, ইয়েনান, ও শ্যাম দেশের বিরাট ভূখণ্ডে রাজত্ব করতো। অহমদের আক্রমণে ১২২৮ সাল থেকে এদের প্রভাব ও রাজত্ব কমতে থাকে। ইরাবতীর উৎসমুখ থেকে এরা প্রায় ৩০০ বছর আগে বিভিন্ন সময়ে আসে ও তেঙাপানী নদীর ধারে বসবাস সুরু করে। অহম (অর্থ তুলনা-হীন-অসম)দের রাজত্বগুলি যখন দুর্বল হয় পড়ে এরা সদিয়ার কাছে নেমে আসে ও সদিয়ার শাসনকর্তা 'খোয়া গোহাইনকে' হটিয়ে নিজেদের শাসক বসায়—পরবর্তী-কালে এদের প্রভাব অহম রাজারা ও ইংরেজরা মেনে নেন। এই অঞ্চলে এদের রাজা বলা হয়। এদের বংশের চৌখামন বড় গোহাই বহুদিন পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন —এখন এঁর ছোট ভাই সদস্য। বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল ও জমির মালিক এঁরা কাঠের ও অন্যান্য নানাবিধ ব্যবসা আছে—এ অঞ্চলে এরাই প্রধানতঃ শাসনকার্যকে প্রভাবিত করেছেন। চৌখাম প্রদেশেই এঁদের প্রভাব এখন সীমাবদ্ধ। ডাঃ মহেশ্বর নেওগ (গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অসমীয়া ভাষার প্রধান) এর লোহিতের প্রাচীন কাহিনী প্রবন্ধে ও 'সীমান্তের শিখা' বইটিতে এদের বিষয় নিয়ে বিস্তৃত কাহিনী লেখা হয়েছে। এরা বেশ শিক্ষিত, ধাতু ও তাঁতের কার্যে নিপুণ, কাঠের ও অন্যান্য কারুশিল্পের কাজও সুন্দর। খামটি 'দা' অতীতকাল থেকেই বিখ্যাত। চেহারা তত সুন্দর নয়—রং শ্যামবর্ণ—। অহম সরকারের রাজ-কর্মচারী হিসাবে কাজ করার সময়ে এরা অসমীয়া মেয়েদের বিয়ে করেছে। বর্ত-খামটিরা এখন তাদের পুরাকালের ধরনেই গৃহনির্মাণ করে। ভাল ব্যবসা বোঝে পরিশ্রমী। এরাই উৎকৃষ্ট চাল ও আলু চাষের প্রবর্তন করেছে। শ্রেণী-বিভাগ থাকলেও সমবায়িক ভিত্তিতে চাষ করে। অল্পদিন পূর্বেও দাসপ্রথার খুব প্রচলন ছিল।

এর পর আছে সিঙফো—এরা এসেছে উত্তর ব্রহ্মদেশ থেকে—কাচিন বংশ থেকে উদ্ভূত এরা। বর্তমানে নোয়া ডিহং নদী থেকে আরও দক্ষিণ অঞ্চলে এদের বাস। (অহম রাজ ছুকুপার আমলেই অসম নাম চালু হয় ও এঁরা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন ও সিংহ উপাধি গ্রহণ করেন) অহমদের শেষ স্বাধীন রাজা গৌরীনাথ সিংহের রাজত্বকালে মোয়া মারীয়া বিদ্রোহের সময়ে এরা আসামে প্রবেশ করে ও খামটিদের তাড়িয়ে তেঙ্গা-পানী নদী ও বুড়ী ডিহং-এর কাছে নামরূপে বসবাস সুরু করে। ইংরাজ-ব্রহ্ম যুদ্ধে এরা বর্মীদের পক্ষে যোগ দেয়। পরে ইংরাজরা খামটি ও আবরদের সাহায্যে অগ্রসর হলে আত্মসমর্পণ করে। দাস প্রথা এদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল চাষ-বাসের কাজ প্রধানতঃ দাসরাই করতো। এদের যৌথ সমাজ-ব্যবস্থা নেই, এক-একজন প্রধানের অধীনে কয়েকটি গ্রাম থাকে। বর্মা-যুদ্ধের সময় এরা খুব গুরুত্বপূর্ণ গিরি-পথগুলির নিকট থাকতো বলে এদের সঙ্গে বোঝাপড়া করা হয়। কিন্তু ঐ দাসপ্রথা নিয়েই কোনও মীমাংসায় আসতে বেশ দেরী হয়েছে। এদের আচার-ব্যবহার বিবাহ-পদ্ধতি সবই ভিন্ন। এদের ভাষা কারেনদের মত। মণি-পুরী, কুকি, নাগা ও আবরদের সঙ্গেও কিছুটা সাদৃশ্য আছে। বৌদ্ধধর্মের কিছুটা প্রভাব থাকলেও এরা বিভিন্ন অশুভ শক্তিকে পূজো করে। খামটিদের মত অত নিপুণ না হলেও ধাতু গলাবার কাজ জানে—নিজেদের কাপড় বোনে, গাছ-গাছড়া থেকে রং তৈরী করে। বৃটিশ অভিযাত্রীদের এরা চা-এর বীজ ও চা উপহার দিত, তাতে মনে হয় এ অঞ্চলে চায়ের চাষ প্রচলিত ছিল। আফিঙে আসক্তি এদের কর্মোদ্যমের পক্ষে প্রধান বাধা।

এর পর সর্বদক্ষিণ-পূর্বের জেলা তিরাপ —যার প্রধান শহর খোনসা। এই অঞ্চলটি ৫০০ থেকে ১৫০০০ ফিট উঁচু। তিরাপ নদী দঃ-পূর্ব থেকে প্রবাহিত হয়ে সদিয়ার দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিশেছে। লোহিতের রাজধানী তেজুতে যেতে হলে ও তিরাপে আসতে হলে তিনসুকিয়া দিয়ে আসাই সুবিধাজনক। এখানে বাস করে তাঙসা, ওয়াঙ-চু ও নকটে উপজাতি। তাংসাদের লুঙচুঙ, মকচুঙ, হাবী প্রভৃতি কয়েকটা উপজাতি ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তের কাছে বাস করে। বর্মীদের মত স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে লুঙি পরে। ছেলেরা সার্ট ও পাগড়ী, মেয়েরা ব্লাউজ ব্যবহার করে। প্রবল অহিফেনসেবী। এরা ভারত-বর্মী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

ওয়াঙচুরা বেশ চটপটে ও বুদ্ধিমান জাত। বৈষ্ণব ধর্মের কিছুটা প্রভাব থাকলেও প্রকৃতি পূজাই প্রধান। ধনী ও দরিদ্র শ্রেণী বিভাগ আছে। কিন্তু দাস-প্রথা নেই। গ্রাম-প্রধানরাই গ্রামের হর্তাকর্তা। এদের বাড়ী-গুলি খুব বড় বড় হয়। পাথরের বড় খণ্ড ও কাঠের বিরাট অংশ নিয়ে ভয়াবহ মূর্তি তৈরী করতো। অতীতে অন্যান্য অনেক গোষ্ঠীর মতই এরা ছিল নৃমুণ্ড শিকারী। এখন নৃমুণ্ডের পরিবর্তে কাঠের নৃমুণ্ড গলায় পরে ও বিভিন্ন কাঠের দ্রব্য ব্যবহার করে (যথা—কাঠের পাইপে)। নৃমুণ্ডের নানাবিধ নিদর্শন এদের গৃহে পাওয়া যাবে। কাপড়-চোপড়ের চাইতে হাতীর দাঁতের, শিঙ-এর ও শঙ্খের গয়না পরতে বেশী ভালবাসে। ফুলের গয়না ও পাখীর পালকও এদের অলঙ্কৃত করে। অবিবাহিত ছেলে-মেয়েদের জন্য মোরাঙ বা যৌথ শয়নগৃহ আছে। শিকারই প্রধান জীবিকা। এরা নাগাদের প্রতিবেশী।

তৃতীয় উপজাতি নকটে—বেশ খানিকটা বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব আছে এদের ওপর। সম্ভবতঃ সমভূমির কাছ থেকেই তা এসেছে। বোরহাট ও নামসাঙের মাঝে ২১টি লবণের কুয়া আছে, তাছাড়া শীত-কালে নদীর জল থেকে লবণ তৈরী করে। অতীতকাল থেকেই শিবসাগর ও এইসব অঞ্চলে যৌথ প্রথায় লবণ তৈরী ও বিক্রী হয়।

সাংস্কৃতিক দিক থেকে এইসব উপ-জাতিদের তিন ভাগ করা যায়—উত্তর সীমান্তের ও পূর্ব সীমান্তের অধি-বাসীরা মনপা, খামটি, সিঙফো—প্রধানতঃ বৌদ্ধ বা বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত। এদের কাছাকাছি যেসব গোষ্ঠী থাকে যথা—শেরদুকপেন, তারাও এদের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত। এরা সামাজিক দিক থেকে বেশ উন্নত, চাষবাস ও কুটিরশিল্পে দক্ষ, পশু-পালন করে ও ব্যবসা-বাণিজ্যও করে। দ্বিতীয় গোষ্ঠী যারা মধ্যবর্তী অঞ্চলে দুর্গম পার্বত্য ও অরণ্যময় অঞ্চলে থাকে, যেমন দাফলা, তাগিন, গেলঙ, হিলমীরি, আপাতানী, মিশমী-আবর—এরা প্রকৃতির সঙ্গে তথা মানুষের সঙ্গে লড়াই করে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। তবে সিয়াঙ জেলার উপজাতিরাই পথঘাট ভাল

মিশমী বালিকা

থাকার জনাই বোধহয় সবচাইতে বেশী উন্নত। প্রধানতঃ প্রকৃতির ও অমঙ্গল শক্তির উপাসক এরা। তৃতীয় গোষ্ঠী দক্ষিণাঞ্চলে থাকে, যেখানে সমভূমির জনসাধারণের সঙ্গে মেশবার সুযোগ ঘটেছে। এদের মধ্যে অনেকেই বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছে পুরোপুরি না হলেও আংশিকভাবে।

খুঁটিনাটিতে অনেক প্রভেদ থাকলেও এদের মধ্যে কয়েকটি সাদৃশ্য আছে। ধনী-দরিদ্র শ্রেণী-বিভাগ থাকলেও কিন্তু জাতি-ভেদ নেই। বিবাহ করে নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে কিন্তু স্ববংশে নয়। সমাজ পিতৃ-প্রধান, ছেলেদের বহু-বিবাহ প্রচলিত বিবাহ-পূর্বে মেলামেশার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু বিবাহের পর বিশ্বস্ত ও সতীত্ব রক্ষা করতে হয়। বহুপতি প্রথা খুবই কম। বিবাহ বিচ্ছেদ সমাজে অনুমোদিত। কম-বেশী সব উপজাতিদের মধ্যে দাস প্রথা প্রচলিত। তবে খামটি সিঙফো ও আপা-তানীদের মধ্যেই বেশী। দাসদের সঙ্গে বিবাহ ও সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপন করা ভিন্ন তাদের সঙ্গে পরিবারভুক্ত আত্মীয়ের মত ব্যবহার করা হয়। মৃতদেহগুলিকে হয় কবর দেওয়া হয় অথবা পাখী ও পশুদের খাবার জন্য দেওয়া হয়। শোক প্রকাশের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। যেসব উপগোষ্ঠী বেশী উন্নত, তাদের মধ্যে যৌথ সমাজ-ব্যবস্থা মোরাঙ প্রভৃতির চল আছে—অনেক ক্ষেত্রে যৌথ কৃষি ও উৎপাদন পদ্ধতিও আছে—কিন্তু যেখানে জীবন-সংগ্রাম তীব্র সেখানে পরিবারই প্রধান (দাফলা, তাগিন, মিশমী)। যেখানে যৌথ সমাজ-ব্যবস্থার প্রচলন ছিল সেগুলিকে আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থায় আনা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছে কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক গোষ্ঠীগুলি এখনও পশ্চাৎপদ। প্রাকৃতিক শক্তির বা দুষ্টশক্তি-গুলিকেই যারা প্রধানতঃ পুজো করে তাদের মধ্যে বলিদান প্রথাও প্রচলিত। পূর্বে নর-বলিও হোত। সমস্ত উপজাতিগুলি তামাকসেবী ও পাইপধারী।

ধীরে ধীরে নতুন পরিবেশকে গ্রহণ করছে এরা। কিন্তু অতীতে বিশ্বাস ও প্রথাগুলি এদের মজ্জায় মজ্জায় জড়িত—সেগুলি সহসা যাবে না। কয়েকটি উপ-জাতির ধর্মীয় অনুষ্ঠান দেখার পর মনে হয়েছে এরা বেশ আত্মসচেতন—সুতরাং দ্রুত পরিবর্তনে খুব লাভ হবে না। তাছাড়া এই অঞ্চলগুলি অনুর্বর ও পার্বতা-ময় খাদ্যদ্রব্য প্রায় কিছুই হয় না—যদিও বেশ কিছু মূল্যবান খনিজ সম্পদ আছে। এখানকার রাজ-কর্মচারীরা এ-বিষয়ে বেশ সচেতন। তবে এ-দেশের ভিতরে প্রবেশ করা দুরূহ—একে তো প্রাকৃতিক বাধা আসামের ডিব্রুগড় থেকে পাশীঘাট, লখিমপুর থেকে জিরো, তেজপুর থেকে বমডিলা যেতে হয়, তাছাড়া এসব অঞ্চলে যেতে হলে অনুমতি দরকার। হঠাৎ বেশী লোক গেলে খাদ্য-বাসস্থানের অভাব হবে। খাদ্যদ্রব্য সবই বাইরে থেকে নিয়ে যেতে হয়। স্থানীয়ভাবে বার্লি, যব, আলু, আপেল, ওষধিবৃক্ষ প্রভৃতি উৎপাদন করার চেষ্টা হচ্ছে। মিশনারী প্রভাব এখানে একেবারে ছিল না—সেটা কতকটা সুবিধার ব্যাপার হয়েছে—তবে বাইরে থেকে নানাবিধ প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টাও চলে। তবে অনেক ছেলেমেয়ে এখন দার্জিলিং, গৌহাটি পুরুলিয়া, দেরাদুন অবধি পড়তে যাচ্ছে ভারতবাসীদের সঙ্গে পরিচয়ের পরিধিও বেড়ে চলেছে—অনেকে এত সব বাধানিষেধ রাখার বিরোধী।

যাই হোক—যে কঠিন প্রাকৃতিক পরিবেশ ও কঠোরতার মধ্যে এরা জীবনযাত্রা নির্বাহ করেছে, হার মেনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি—তাছাড়া প্রকৃতির কৃপণ হস্তে দান থেকে পাওয়া সবকিছুকেই জীবনযাত্রার কাজে নিপুণভাবে লাগিয়ে সৌন্দর্য সৃষ্টিও করেছে, তা বিশ্লেষণ করলে মুগ্ধ হতে হয়। গত কয়েক শতাব্দী ধরে যে বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের মধ্যে এরা ছিল পারস্পরিক ও বিদেশীদের প্রতি অবিশ্বাস যৌথ সামাজিক জীবন, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, সবগুলিরই হঠাৎ পরিবর্তন করা সম্ভবও নয়, উচিতও নয়। নিজেদের বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রেখে ভারতীয় জন-গণের সুখ-দুঃখের অংশীদার হোক, এই আমাদের আশা ও ইচ্ছা—জাতীয় সংহতির দিক থেকে এদের সঙ্গে ব্যবহার ও আচরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে রুক্ষ ও কঠিন প্রাকৃতিক আবহাওয়াতে যেভাবে এরা জীবনযাত্রা নির্বাহ করেছে, সেই অদম্য প্রাণশক্তি যা অতীতে উদ্দামতা, চঞ্চলতা অস্থির জীবনযাত্রার প্রকাশ পেয়েছে, এবার নিজেদের শ্রেয় কি তা ঠিকভাবে বুঝলে ঐ শক্তিই তাদের সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনকে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার অংশীদার করে তুলবে আশা করি।

আচ্ছা সেকালে কি ফটোগ্রাফারের দোকানে গিয়ে ছবি তোলার রেওয়াজ ছিল? বোধহয় ছিল না। হয়তো কোনো অন্তরঙ্গ কথচেধরের তোলা ছবি। যার সামনে বৌকে মুখ খুলে বার করা যায়। ছবিটা এই—নবীনা বধূ একখানি কারুকার্যখচিত চেয়ারে উপবিষ্ট, তার মাথার ঘোমটা খোলা, এলো চুলের রাশি পিঠে কাঁধে সামনে ছড়ানো। গায়ে কুচকালো লেস ঝোলানো একটি থ্রি-কোয়ার্টার হাতা জ্যাকেট, পরণে বোধকরি পার্শী শাড়ি। বরের শ্রীঅঙ্গে অবশ্য ধুতি পাঞ্জাবিই, তবে কাঁধ থেকে খুব কায়দা করে ঝোলানো রয়েছে একটা কল্কাদার চওড়া-পাড়ের শাল। সেই কারুকার্যময় চেয়ারের হাতার উপর বসে থাকা বরের একটা হাত নিচের হাঁটুর উপর, আর একটা হাত বৌয়ের পিঠ বেষ্টন করে বৌয়ের কাঁধের ওপর আলতো ভাবে রাখা।

এ-যুগে এ ছবির ভঙ্গী দেখলে নিশ্চয়ই নবীন-দম্পতিরা 'কী গাইয়া বাবা,' বলে হেসে উঠবে কিন্তু সেকালে যে এটা একটা দুঃসাহসিক প্রগতিসুলভ কাজ হয়েছিল তাতে আর সন্দেহ কী!

ছবিটা হাতেই রয়েছে তাই বর-বধূর মুখ চোখ দেখা যাচ্ছে দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। এতো সুন্দর মুখ-চোখ নাকি চারুহাসিনী দেবীর আর রমেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের? আর এতো চুল ওঁদের মাথায়?

মার যে 'ন-বৌ' ছাড়া আরও আর কোনো একটা নাম আছে, খেয়ালই ছিল না। মামার বাড়িতে আমাদের যাওয়াটা ছিল দৈবাতের ঘটনা, সেই দৈবাৎটা ঘটলে, অথবা মামারা কেউ এলে মার একটা ডাক-নাম শুনতে পেতাম, 'হাসি।'

গঙ্গোপাধ্যায় গুষ্ঠিতে শুধুই ন-বৌ।

'বৌদি'ও বলতো না কেউ। কাকারাও বলতেন ন-বৌ, পিসিমারাও বলতেন ন-বৌ। জেঠিমারা তো বলবেনই। আর বাবার মুখে ওই 'ন-বৌ' ছাড়া আর কিছু শুনিনি।

ওই ন-বৌয়ের মধ্যে কোথায় ছিল এই নববধূ?

দিদি অনেকক্ষণ ছবিখানার দিকে তাকিয়ে একটা নিশ্বাস ফেলে আস্তে পাতা ওলটালো।

প্রথম পৃষ্ঠায় মাত্র দুটি ছত্র—

'কী মোহিনী জানো বন্ধু,
কী মোহিনী জানো—
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন।'

চমকে গেলাম!

মার গানের খাতা, এই তো যথেষ্ট, তার ওপর আবার শ্যামাসঙ্গীত নয়, রামপ্রসাদী নয়, একেবারে প্রেম-সঙ্গীত! ধারণা-কল্পনার সীমা ছাড়ানো একটা আঘাত যেন।

ওলটাতে ওলটাতে দেখা গেল আগাগোড়াই তাই। শুধুই ভালবাসার গান। ধরে ধরে ছাপার অক্ষরের মতো করে লেখা। আর সেই সব গানের তলায় তলায় গীতিকারেরও নাম লেখা। কোনোটার নীচে লেখা গিরিশ ঘোষ, কোনোটার নীচে ক্ষীরোদপ্রসাদ, কোনোটায় বা নিধুবাবু, কয়েকটির নীচে রবিঠাকুর।

রবীন্দ্রনাথ বলার অভ্যাসটা তখনো আসেনি, কেউ বলতো রবিবাবু, কেউ বলতো রবিঠাকুর। মা শেষেরটাই পছন্দ করেছিলেন দেখা যাচ্ছে। কিন্তু গানের সংগ্রহশালায় গীতিকারের নামটিও লিখে রাখা, এ-তো রীতিমতো রুচি আর নিষ্ঠার ব্যাপার। চারুহাসিনী দেবীর মধ্যে এই রুচি এই নিষ্ঠা তাহলে ছিল একদা!

কিন্তু অবাক হতে তখনো অনেক বাকি।

অনেকগুলো পাতা ওলটাতে ওলটাতে চোখ আটকে গেল। একটি শাদা পৃষ্ঠায় লেখা—নিজের লেখা গান।'

শ্রীমতী চারুহাসিনী দেবী।

'দিদি!'

আমি প্রায় আর্তনাদ করে উঠি।

'মা আবার গান লিখতেনও?'

দিদি স্থির চোখে ওই লেখাটার দিকে তাকিয়ে বললো, 'তাই দেখছি।'

তারপর আবেগ-আবেগ গলায় বলে উঠলো, 'মার এখনকার হাতের লেখা দেখিস তো?'

একদা আমরা মাদের কালকে 'সেকাল' বলেছি, ওঁদের আচার আচরণকে 'সেকেলে'। এখন মাঝে মাঝেই অবাক হয়ে দেখি নিজেদেরই নিজেদের কালকে 'সেকাল' বলে বুঝতে পারি, নিজেদের সেই সেকালের আচার আচরণগুলো হাস্যকর রকমের সেকেলে লাগে। এতো অল্পে উদ্বেলিত হতাম আমরা। বিজয়াদশমীর দিন 'দুর্গানাম' লেখার আগে ভুলে সিদ্ধি খেয়ে ফেললে মনে হতো সর্বস্ব হারালাম বুঝি। সরস্বতী পূজোর দিন খুব সকাল সকাল অঞ্জলি হয়ে গেলে উপোসটা না লাগলে মনে হতো পুরো পূণ্য হল না। আর ওই শ্রীপঞ্চমীর আগে কোপাকুল খেয়ে ফেলা? সে তো ভাবাই যায় না। তাছাড়া—ভাইবোনের মধ্যে সেদিন ভুল করে কেউ বই পড়ে ফেললে তাকে ধিক্কারের শরে বিঁধে প্রায় শুইয়ে দেওয়া হতো। দাদা তো শ্রীপঞ্চমীর আগের রাত্রে টেবিলের সব বই-খাতার ওপর একটা চাদর চাপা দিয়ে রাখতো আর দেয়ালের ক্যালেণ্ডারগুলো উল্টে রেখে দিতো।

তা সত্ত্বেও হয়তো ঘটে যেতো কোনো দুর্ঘটনা; হয়তো চোখে পড়ে যেতো একটা পুরোনো চিঠি, বা ওইরকম অন্য কিছু, দুঃখে ভেঙে পড়ে যেতাম। আমারই হয়তো একটু বেশী ছিল এটা, এদিকে 'দস্যি' ডাকাবুকো 'মেয়ে ডাকাত' ইত্যাদি সুমধুর বিশেষণে ভূষিত হলেও, ভিতরে এই অল্পে বিচলিত, উত্তেজিত, অল্পে বিগলিত ভাবটা আমারই বেশী ছিল।

না চাইতেই বাবা কোনো খেলনা পুতুল, বা দাদারা একটা পেন্সিল কলম দিলে আমার চোখে জল এসে যেতো। জ্বর অসুখ হলে দৈবাৎ যদি মা কাছে এসে মাথায় একটু হাত রাখতেন, আমার ডুকরে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করতো। ওই হাতটা অবশ্য খুবই দুর্লভ ছিল আমাদের কাছে। জ্বর অসুখ হলে, মা সাবু-বার্লি খাওয়াবার জন্যে তাড়না করতেন, সময় মাফিক ওষুধ নিয়ে

যেতো বিতিকিচ্ছিরিই হোক, বিনা মমতায় সতেজে গলায় ঢেলে দিতেন, চুলে জট পড়ে গেলে প্রবল আকর্ষণে হিঁচড়ে হিঁচড়ে আঁচড়ে দিয়ে জটমুক্ত করতেন, এবং অসুখটা যে সম্পূর্ণ নিজের দোষে ঘটেছে এবিষয়ে অবহিত করিয়ে দিয়ে ভবিষ্যতে সাবধান হবার নির্দেশ দিতেন। কিন্তু কপালে হাত যাকে বলে জননীর স্নেহ-করস্পর্শ? সেটা আমাদের কাছে দৈবাতের ঘটনা, দৈবদুর্লভ পাওয়া।

অথচ এতোটুকু অসুখেই 'ডাক্তার আ ডাক্তার আনো' করে বাবাকে ব্যস্ত কর ছাড়তেন না মা এবং একটু বেশীর দি গড়ালেই মা কালীর কাছে দুম-দুম ক মানত করে বসতেও পটু ছিলেন।

মার এই মূর্তিই দেখতে অভ্যস্ত আমরা। যদিও মার বয়েস মাত্র তখন ত্রিশোর্ধ মানে আমার সম্পূর্ণ স্মৃতির জগতে রয়েছে, হয়তো বা ত্রিশের নীচেই।

কিন্তু এতে তো আমরা দুঃখি ছিলাম। মামার বাড়িতে দেখেছি মামা মেয়েদের 'মা' বলে গায়ে পিঠে লেপ বসতে গলা ধরে ঘুমোতে সে সব আমরা কল্পনাই করতে পারতাম?

মনে যেন হতো, আমাদের মা এ শুকনো খটখটে কেন? অথচ আজ এ ভাঙা ফসিল দিয়ে মাকে তার বিপরীত দেখে এমন কান্না-কান্না আবেগ উথলে উঠ গেল?

হয়তো আসল কথা আমরা যাকে যে দেখতে অভ্যস্ত, যার সম্বন্ধে যা ধার বদ্ধমূল, তাকে তা থেকে অন্যরকম দেখার বিচলিত না হয়ে পারি না। কারণ সে ওই ধারণার মূলে নাড়া দেয়।

তাই দিদি যখন বললো, 'মার এখনকার হাতের লেখা দেখিস তো?' আমি মনে করলাম। দেখি বৈকি, মাঝে মা মাসিদের চিঠি দেন, পোস্টকার্ডে। এক পয় দামের পোস্টকার্ড, তাও মা ধৈর্য সবটা ভরিয়ে তুলে উঠতে পারেন না দু-চার লাইনে সেরে দেন এবং বাঁকাচো অক্ষরে ধরা পড়ে অযত্নের ছাপ।

আর হাতের লেখা দেখা যায়, ধো খাতায় বা কদাচ কখনো কোনো বা দোকানের ফর্দ'য়। সে লেখার আখরের না তোলাই ভাল।

চারুহাসিনী দেবীর সেই নিজের দীর্ঘ দীর্ঘ গানের দু-চার লাইন এ মনে আছে,— যেমন—

'কতো ছল জানো, হে-পরাণবঁধু,
আমি অতো বুঝি না যে—
অবলাবালার হৃদয়েতে তাই
সদাই বেদনা বাজে।'

অথবা—

'ভালবেসে মিলিল না, প্রাণের তিয়াষ
ও তব চরণতলে প্রাণ দিই আশা।'

একটা গান তো প্রায় সবটাই মনে আ

'নিশিদিন আমি পথপানে রেখে আঁ
তোমারই আসার আশায় হে নাথ,
উতলা হইয়া থাকি

থাকে (পথে) দেখা দাও ওহে প্রাণনাথ,
উথলায় থাক. কাঁপে পদ হাত,
বাসনা হয় যে জানালার পথে—
উড়ে যাই হয়ে পাখী।'

আরো সাংঘাতিক সাংঘাতিক কিছু লাইন আছে, কিন্তু থাক। গুরুজনের প্রসঙ্গে আর বেশী না বলাই সংগত।

বয়েস মাত্র দশ?

তা হোক, সাহিত্য বিচারে একেবারে অক্ষম ছিলাম না, গানগুলো যে লেখার দিক থেকে বিশেষ উচ্চমানের নয়, তা বুঝে ফেলতে দেরী হয়নি। কিন্তু বিষয়বস্তু? সেটাও বুঝে ফেলেছি যে! তা' না, বুকের মধ্যে অতো আলোড়ন উঠছিল।

তার সঙ্গে অপরাধবোধ।

বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করছে, মনে হচ্ছে খুব একটা অন্যায় কাজ করছি। তাই বুকটাকে শান্ত করতে সময় লাগলো।

কী অদ্ভুত আশ্চর্য কথা!

চারুহাসিনী দেবীর মধ্যেও এসব ছিল! প্রেম, ব্যাকুলতা, বিরহবেদনার আর সেই অনুভূতিগুলি সম্পর্কে বোধ ছিল, এবং সেটা প্রকাশের চেষ্টা ছিল!

এ কী বিশ্বাস করা যায়?

কল্পনাই করা যায় না যে।

তাছাড়া—ওই প্রেমপত্রগুলো [illegible] [illegible] সদা সর্বদা থাকে সঙ্গে খিটখিটে, যার জন্যে মেজদা আড়ালে বলে ওঠে, 'ওই বোধ গেল সাপে নেউলে! নারদ! নারদ!' সেই শ্রীরমেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্যে?

দিদির দিকে তাকিয়ে কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ থেমে থেমে গেলাম। দেখি দিদি মুখটা নীচু করে বসে আছে, দিদির চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে।

এটা কী?

এতোক্ষণ তো দিদিই সাহসের পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছিল।

এখন আবার আমার মতো ভয় খাচ্ছে! ভয়ে ভয়ে বলি, এই কাঁদছিস কেন?

দিদি বুবা গলায় বলে, 'মানুষ এতো বদলে যায় কেন রে?'

ওমা! এই জন্যে দিদি কাঁদছে!

আমার তো কান্না পাচ্ছিল একটা দোষ বা দোষ করা ভয়ে। ভিতর থেকে কে বলছিল, গুরুজনের জীবন সম্পর্কে কী ছেলে খেলা অন্যায় কৌতূহল পাপ!

কিন্তু দিদি যে অন্য কথা বললো।

অবাক হয়ে বললাম, 'অন্য কেউ বদলে গেলে তোর কী?'

'কী জানি! বড্ড কষ্ট হচ্ছে। মনে হচ্ছে হয়তো আমিও একদিন এই রকম বদলে যাবো। তখন আমাকে আর আমি বলে চেনা যাবে না।'

হঠাৎ মনে হলো, এখন দিদিকে আর ঠিক দিদি বলে চিনতে পারছি না! দিদি যেন আমার নাগালের অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। দিদির দুঃখের বিষয়বস্তুর সঙ্গে আমার দুঃখের অনুভূতিকে মেলাতে পারছি না।

এতোদিন এযাবৎ দিদির আর আমার সুখদুঃখ ছিল এক, দুজনে দুজনের একেবারে কাছাকাছি ছিলাম, এখন কী হতে চলেছে? দিদি দূরে সরে যাবে? দিদি আমার থেকে বড় হয়ে যাবে?

কোথা থেকে একরাশ অভিমান এসে জুটলো। দিদির ওপর রাগ এসে গেল। বললাম, 'টেনে দুঃখু আনছিস তুই। সবাই বুঝি বদলায় — কক্ষনো বদলাব না আমি বলে মনের জোর করে থাকলেই হয়।'

তারপর বয়েসের অনুরূপ বুদ্ধিতে বলে ফেললাম, 'তাছাড়া ভালো তেল মাখলে টাকও পড়ে না, নিয়মিত ব্যায়াম করলে ভুঁড়িও হয় না। আর ফিটফাট সেজে থাকলে বুড়োও দেখায় না।'

দিদি আমার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললো।

জলভরা চোখেই কৌতুকের ছায়া ফুটে উঠলো, বললো, 'দূর বোকা, আমি কি ওই বদলের কথা বলছি?'

আস্তে আস্তে দিন যাচ্ছিল।

অন্যের বদল দেখে দিদির চোখ দিয়ে জল পড়েছিলো, অথচ আমি দেখতে পাচ্ছি, দিদি নিজেই আস্তে আস্তে বদলে যাচ্ছে।

দিদির খেলাঘরে ধুলো জমছে, দিদির পুতুলের বাকস প্রায়ই বন্ধ পড়ে থাকছে।

আমি প্রলুব্ধ করতে ডাক দিই, 'দিদি, এই সময় মা ঘুমোচ্ছেন, আয় না পুতুল খেলি।'

দিদি বলে, 'এখন ইচ্ছে করছে না রে, পরে খেলবো।'

সেই পরটা আর বড় একটা আসে না।

অথচ দিদিরই পুতুল খেলায় মন ছিল বেশী। আমার অনেক ডানপিটেমি খেলা ছিল। আমি দাদাদের ক্যারমবোর্ড নিয়ে ক্যারম খেলতাম, ছাতে পাম্বু খাটিয়ে চুপিচুপি দুপুরবেলা দাদাদের ড্রয়ার থেকে মার্বেল সরিয়ে এনে গুলি খেলতাম থ্রি সিক্স নাইন টুয়েলভ করে, আমি খালি দেশলাইয়ের বাক্স দিয়ে রেলগাড়ি বানাতাম, উনুনে ধরাবার কাঠ থেকে বেছে বেছে পাতলা কাঠ নিয়ে খেলাঘরের উনুনের জন্যে সরু সরু কুচি করে জড়ো করতাম ভাঙা ছুরি দিয়ে আর মাটি দেখলেই তাতে জল ঢেলে মাটির পুতুল খেলনা বানাতে বসতাম।

দিদির এগুলোয় আদৌ আকর্ষণ ছিল না।

দিদিই তখন আমায় ডাক দিতো, 'এই রুচি, কী দস্যিবৃত্তি হচ্ছে, আয় না পুতুল খেলি। গিন্নীর মেজবৌ তো আজ নাচতে নাচতে বাপের বাড়ি বেড়াতে গেল ভাইয়ের সঙ্গে, এখন ওর পালার রান্নাটা কে রাঁধে তার ঠিক নেই। ছোটবৌ তো আঁতুড়ে। এদিকে বড়বৌয়ের ছেলের জ্বর। ঝিটাও পর্যন্ত কামাই করেছে আজ, যতো জ্বালা গিন্নীর।'

এরকম কথা দিদি অনর্গল বলতো, হঠাৎ দিদির এই পুতুলের সংসারের কথায় অর্গল পড়ে যাচ্ছে কেন।

অভ্যাসের বশে যদিও বা কোনো কোনো দিন খেলে, তার মধ্যে যে প্রাণের একান্তই অভাব, তা আমি প্রাণে প্রাণে টের পাই।

আমার চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, 'দিদি, তুই তো এখন থেকেই বদলাতে শুরু করেছিস।'

কিন্তু দিদি দুঃখ পাবে ভেবে বলি না।

অগত্যাই ছাতে উঠে পাঁচিলে বুক ঝুঁকিয়ে সেই ধানকল দেখি, সেই অনেকখানি উন্মুক্ত আকাশের নীচে বিরাট চাতাল, চকচকে সিমেন্ট বাঁধানো, তার উপর ধান ঢেলে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, মজুরনীরা ঝাঁটা দিয়ে দিয়ে ঠেলছে।

এক এক সময় ধানের আড়ালে ছেলে নিয়ে শুয়ে পড়ে, গায়ে রোদ লাগে খেয়াল করে না।

আমার রোজই নতুন লাগে।

দিদি ঘরে শুয়ে গল্পের বই পড়ে।

তবে আজকাল প্রায়ই দারুণ বকাবকি করছেন মা দিদিকে।

দিদি নাকি বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছে, ভুলোর রাজা হয়ে যাচ্ছে, কাজকর্মে 'এ্যালাকাঁড়ি' দিচ্ছে।

'এ্যালাকাঁড়ি' শব্দটার মূলগত অর্থ কি আজও জানি না, অর্থগত অর্থ অবশ্যই 'অবহেলা'।

মার চেঁচামেচি শুনলেই দুড়দুড়িয়ে নীচে নেমে আসতাম। তখন মা আমাকেও একহাত নিতে শুরু করতেন, 'এই যে আর এক রাজকন্যে তৈরী হচ্ছেন! ধিঙ্গী অবতার। সমস্তক্ষণ ছাতে তোর কী এতো

রে? কেবল ধেই ধেই করে ছাতে ওঠা! এদিকে ইনি তো রাতদিন নাটক-নভেল নিয়ে পড়ে আছেন। যতো চোরদায়ে ধরা পড়েছি, এই আমি! বেলা গড়িয়ে গেল, এখনো শুকনো কাপড়গুলো দড়িতে ঝুলছে গো। তোলার নাম নেই। ... দিদির না হয় 'বয়েস হয়েছে', মা-বাপের ঘরে আর মন বসছে না, তুমি, তুমি পারো না বুড়ো ধাড়ি মেয়ে এটুকু করতে?'

আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতাম।

ততক্ষণে দিদিও অবশ্য কর্তব্যকর্মে হাত দিয়েছে।

দাদারা বাড়িতে থাকলে কিন্তু মা ঠিক এভাবে কথা বলতেন না, বিশেষ করে মেজদাকে মা রীতিমত ভয়ই করতেন। আর দাদাকে যেন সমীহ।

মেজদার এরকম কথার একটুও কানে গেলে মেজদা মাকেই বকে দিতো।

বলতো, 'আচ্ছা মা, শ্বশুরবাড়ি গিয়ে তো খেটে মরবেই, আর অন্য কিছু খেতে পাক না পাক, বকুনিটা ঠিকই খেতে পাবে। এখানে যে কদিন আছে একটু স্বস্তিতে থাকুক না।'

মা তখন কাঁদো কাঁদো হতেন, 'আর যখন শ্বশুড়-শাশুড়ী আমায় গঞ্জনা দিয়ে যাবে, 'মেয়েকে কিছু শেখাওনি' তখন?

'ওঃ গঞ্জনা? তার হাত এড়াতে পারবে তুমি? তোমার যখন মেয়ে, তোমায় ওটা খেতেই হবে মা। তত্ত্ব ভাল না হলেও খেতে হবে, মেয়েকে বাপের বাড়িতে আনতে চাইলেও খেতে হবে। কী, হবে না?'

তখনকার মতো মা ব্যাজার মুখে বলতেন, 'বাপ-দাদার আস্কারায় আস্কারায়ই গোল্লায় যাচ্ছে মেয়েরা। তবে থাক, কিছু শেখাবো না। আদর করে নাটক-নভেল এনে দাও, বোনেরা বিছানায় অঙ্গ ঢেলে পড়ুক তাই।'

কিন্তু তারপরে আর টুঁ শব্দটি করতেন না।

মেজদা কিন্তু এঘরে এসে বলতো, 'মার ওই কাজটাজগুলো সময়ে করে আসিস না কেন বাবা! সামান্য নিয়ে যখন বকবক করেন।'

আর বাবা?

বাবার কানে অবশ্য হরদমই যেতো।

বাবা বাড়িতে থাকলে তো মার একমাত্র ওই প্রসঙ্গই ছিল। ছেলেমেয়ের নামে নালিশ।

এখন বুঝতে পারি, ওটা আর কিছু নয়, 'আমার সন্তান 'পারফেক্ট' হোক এই রকম একটা বাসনা তাঁর মনের মধ্যে বদ্ধমূল ছিল। কিন্তু সেটা হওয়াবার জন্যে কী পদ্ধতি আবশ্যক সে সম্পর্কে জ্ঞান ছিল না। তাই অহরহ উপদেশ, বকুনি, আর আদালতে নিয়ে গিয়ে ফেলা, এই পথেই চলতেন।

বাবা আবার আর এক কথা বলে মাকে ক্ষেপিয়ে দিতেন, 'তা কিই বা এমন কাজ? ওটা তো তুমিই করে নিতে পারো। এখন তো আর তোমায় রান্না করতে হয় না।'

হ্যাঁ, কথাটা ঠিক।

ওই অবিনাশ ডাক্তার রোডে আমার বছর খানেক পর থেকে আমাদের বাড়িতে এক 'বামুনদির' আবির্ভাব ঘটেছিল। প্রথমে এসেছিল, মার একবার 'পানবসন্ত' হওয়ায়। বুড়ো বয়সে কচি ছেলেদের রোগ দেখে সবাই (মানে আমাদের সেই পুরনো বাড়ির জেঠিমা পিসিমারা। মাঝে মাঝেই তো বেড়াতে আসতেন ও'রা।) 'ছি ছি' করেছিলেন। তবে ও'রাই বিধান দিয়েছিলেন, একুশ দিন ঘরে আটকে থাকতে হবে, রান্না বান্না ছোঁওয়া চলবে না, বাড়িতে মাছ ঢুকবে না, পান খেয়ে মার ঘরে কারো ঢোকা চলবে না। আর লালপাড় শাড়ি পরে তো নয়ই। মা-শীতলার ব্যাপার তো! মাছ পান আর লালপাড় শাড়ী দেখলেই উনি চটে যান।

তা সেই সময় কোথা থেকে যেন ওই বামুনদিকে জুটিয়ে আনা হলো। দু বেলা রান্না করে দিয়ে চলে যেতে, খেতো না। ঠিকে লোক থাকে বলে। তা সেটাই পরম লাভ।

তারপর মা সেরে ওঠার পর বাবা বললেন, 'বেশ তো চলছে, বামুনমেয়ে থেকেই যাক।'

মা যে পুলকিত হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নাস্তি, তবু বলতে ছাড়েন নি, 'মাস মাস করকরে আটটা করে টাকা! শুধু দুটি রেঁধে দিয়ে যাওয়ার জন্যে? টাকা কি খোলামকুচি?'

কিন্তু থেকেও গেল বামুনদি।

বাবার বেশ একটা নিঃশব্দ জেদ ছিল।

বাবা বেশী কথা বললেন না, শুধু বললেন, 'গরীব-গেরস্ত মানুষ, একটা চাকরী পেয়ে গেছে, ওর অন্নটা মারাটা ঠিক হবে?'

'মনোরমাদির বাড়িতে আড়াই টাকায় বামুনদি আছে।'

'আহা সে নিশ্চয় খাওয়া-পরা।'

মা ঠোঁট উল্টে বললেন, 'একটা মানুষের খেতে পরতে আবার কত লাগে?'

সেকালে অবশ্য তাই বলতো লোকে।

তা সে যাই হোক মাকে আর রান্না করতে হতো না। কিন্তু সেকথার উল্লেখ হলে খুব রেগে যেতেন। বলতেন, 'রোসো কালই ছাড়াচ্ছি ওকে। আমি কেন তোমার সংসারে বসে খাবো। দাসীবাঁদী আছি, তাই থাকবো।'

আর তখনই হঠাৎ হঠাৎ সেই মখমল বাঁধানো খাতাটা মনে পড়ে যেতো আমার।

তবে মা বলতেনই, ছাড়তেন না।

কিন্তু ওই 'বয়েস ধরা' কথাটা মা-বাবার সামনেও বলতেন না এটা লক্ষ্য করেছি। দিদি একা থাকলেই বলতেন চাপা রাগের গলায়। আমার কানে অবিশ্যি যেতো।

একদিন দিদিকে জিগ্যেস করে বসলাম, 'আচ্ছা দিদি, মা ওই কি একটা কথা বলেন, 'বয়েস ধরা' ওর মানে কী রে?'

দিদি কড়া গলায় বললো, 'জানি না। আর কাউকে জিগ্যেস করতে যাবি না, খবরদার।'

না, জিগ্যেস কাউকে করিনি, তবু কেমন করে যেন ওর একটা অর্থ আবিষ্কার করেও ফেললাম।

দিদি যে মাঝে মাঝে গুনগুন করে গান গাইতো 'দিবস রজনী আমি যেন কার আসার আশায় থাকি, তাই চঞ্চল মন চকিত নয়ন তৃষিত আকুল আঁখি—' অথবা 'বাতাস আসিয়া কহে গেছে কানে প্রিয়তম তুমি আসিবে—' এসব যেন শুধু মুখস্থ গানই নয়, যেন গানের ছদ্মবেশে গভীর কোনো অর্থবাহী কথায় আত্মপ্রকাশ। ওর মধ্যেই ওই কথাটার মানে।

যদিও কুমারী মেয়ের মুখে 'প্রিয়তম শব্দটা উচ্চারিত হওয়া যে খুবই গর্হিত এ জ্ঞান টনটনে ছিল আমার, তবু দিদিকে তখন কেমন অদ্ভুত সুন্দর দেখতে লাগতো তাই 'ছি ছি'ক্কার দিতে পারতাম না।

দিদির গলা বেশ মিষ্টিও ছিল।

ওই মিষ্টি গলার সূত্রেই একদিন এক সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড ঘটে গেল আমাদের বাড়িতে। মেজদার বন্ধু দিলীপ, যে এতাবৎকাল মেজদার মারফত আমাদের যতো পত্র-পত্রিকা আর বই জুগিয়ে আসছে, সে একদিন হঠাৎ নিজেই একগাদা বই হাতে নিয়ে এসে বললো, 'তোদের বাড়িতে কে গান গায় রে অমন? সেদিন শুনতে পেলাম, ঠিক কলের গানের মত'—

মেজদা হো হো করে হেসে উঠে বললো, 'আমাদের বাড়িতে গান? স্বপ্ন দেখেছিস নাকি? তাও আবার কলের গানের মত! বাড়িওলার বাড়ির কলের গানই শুনেছিস বোধহয়।'

দিলীপদা বললো, 'না রে। তোদের বাড়িরই ছাত থেকে সুরটা ভেসে আসছিল।'

এসব কথা অবশ্য দালান থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম। ওঘরে ঢুকে নয়। দাদাদের বন্ধুদের সামনে বেরোনোর 'পারমিশান' আর ছিল না আমাদের। অনেকদিনই ঘুচে গিয়েছিল।

তবে মেজদার গলা তো চড়াই, দিলীপদাও বেশ খোলা গলায় কথা বলছিল, কারণ সেদিন মা আর বাবা বাড়ি ছিলেন না তখন। জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন ঠাকুর্দার বাৎসরিক কাজে, অথবা কারো অসুখে শুনে ঠিক মনে নেই। মোট কথা আমাদের সেখানে যাবার দরকার ছিল না।

তাছাড়া—বামুনদিকে রাখার পর থেকে মার এই একটা কাজে কিছু কিঞ্চিৎ ছুটি হয়েছিল।

মেয়ে আগলানো!

আমার আট, আর দিদির দশ, তখন থেকেই মাকে বলতে শুনেছি, 'যেখানেই যাবো মেয়ে গলায় গেঁথে যেতে হবে। মেয়ে বড় হওয়ার এই জ্বালা। সাধে কি আর মেয়েতে ছেলেতে এতো তফাৎ করে লোকে। ছেলে বড়ো হওয়া ভরসা, মেয়ে বড়ো হওয়া ভয়।'

এখন মাঝে মাঝে বাবার সঙ্গে থিয়েটার দেখতে গেলে মা বামুনদিকে বলেন 'বামুনমেয়ে, তোমায় বাছা দু-আনা পয়সা

জল খেতে দেব, তুমি একটু বসে থেকো। যতোক্ষণ না আসি দিদিদের দেখো।'

মা চলে গেলে দিদি রাগে দাঁত পিষে বলতো, 'দিদিদের দেখো! রাঁধুনী-বামুনদির কাছে কী মান-সম্মানটাই বাড়লো। দিদিরা যেন ঘর ভেঙে চলে যাবে। ঠিক জব্দ হন, একদিন সত্যি তাই করলো।'

দিদি আজকাল বড্ড মেজাজী হয়ে যাচ্ছিল সত্যি। মেয়েদের একা বাড়িতে রেখে যেতে নেই। এ তো অবধারিত ব্যাপার, সবাইদের সংসারেই আছে। তবে?

তা যাক সেদিন বামুনদির উপ-স্থিতিতেও সেই অঘটন ঘটলো!

মেজদা বললো, 'সুরেটা ভেসে আস-ছিল? ছাত থেকে? সন্ধ্যেবেলা বোধহয়?'

'তাই মনে হচ্ছে?'

মেজদা আবার ছাত ফাটিয়ে হেসে ওঠে, 'তবে আর দেখতে হবে না, ছাতের অধি-ষ্ঠাত্রী দেবী কোনো 'শাঁখচুন্নী'র গান শুনেছিস।'

আমার মনে পড়লো, ক'দিন আগে মারা যেদিন থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলেন, দিদি ছাতে উঠে বেশ গলা ছেড়ে গান গাইছিল।

শুনে আমারই ভয় ভয় করছিল। এতো গলা তুলছে কেন বাবা! হতে পারে ওদিকটা ধানকল, কিন্তু এদিকটায় তো বাড়িটাড়ি আছে? যদি কেউ বুঝে ফেলে রমেশবাবুর বাড়ি থেকে গান ভেসে আসছে। বলেওছিলাম বোধহয় একবার, কিন্তু দিদি গ্রাহ্য করেনি। হাত নেড়ে আমায় চুপ করতে বলেছিল।

সেদিন কিছু মনে হয়নি, কিন্তু আজ হঠাৎ মনে হলো, দিদি কী ইচ্ছে করে গলা তুলেছিল? দিদি কি জানতে পেরেছিল কেউ তার গান কান পেতে শুনছে।

দিলীপদা বললো, 'ধ্যেৎ'

'আচ্ছা তুই ছিলি কোথায়?'

'আরে আমি তো তোর কাছেই আস-ছিলাম। সিঁড়ির সামনের দরজা খুলে দিয়ে তোদের ওই বামুনদি না কে বললো, 'দাদা-বাবুরা বাড়ি নেই, শুনে চলে গেলাম, তখনই শুনলাম—'

আমরা দোতলার বাসিন্দা, সিঁড়ির সামনের দরজাটাই আমাদের সদর দরজা। অতএব এটা অবিশ্বাস্য নয়, ছাতের গান সেখানে ভেসে এসেছে। একইতো সিঁড়ি উঠে গেছে।

মেজদা হঠাৎ হাঁক পাড়লো, 'এই রুচি তোরা ছাতে গান গাস?'

মা-বাবা বাড়ি না থাকায়, মেজদাও যেন স্বরাজ পেয়েছিল। নইলে বন্ধুর সামনে বড়ো হয়ে যাওয়া বোনকে ডাকে? আমিই কি তখন কম না কি? এগারো বছর পার করি করি না?

আমি এসে দাঁড়াতেই মেজদা বললো, দিলীপ বলছিল এবাড়িতে নাকি—কলের গানের মতন গান হয়। গাস বুঝি?'

আমিই বরাবর একটু দুঃসাহসী বলেই বোধহয় মেজদা আমাকেই সন্দেহ করলো, কিন্তু জানে না তো তলে তলে দিদি কতো দুঃসাহসী হয়ে উঠছে। দিদি নির্ঘাৎ দিলীপদাকে আসতে দেখে গলা তুলে গেয়েছে। তবে গেয়েছিল সত্যিই খুব ভালো।

আমি ফট করে সেটাই বলে বসলাম, 'আহারে! আমি গান গাইনে তো ধোপারা ছুটে আসতো। গান দিদি গায়। কতো গান জানে। খুব ভালো গায়।'

মেজদা যেন চমৎকৃত হয়ে বলে উঠলো, 'তাই না কি? কোথা থেকে শিখলো?'

'এমনি। বাড়িওলাদের কলের গান শুনেটুনে।'

রেডিওর নামও শুনিনি তখন আমরা। কাজেই তার প্রশ্ন নেই।

মেজদা ডাকলো, এই সুনী, তুই নাকি একটা ওস্তাদ গায়িকা হয়ে উঠেছিস? কই গা দিকিন শুনি, কেমন কলের গানের মতন!'

দিদি অবশ্য প্রথমটা 'ধ্যেৎ বলে চলে গেল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গাইল। মেজদা অভয় দিয়ে বললো, 'গা না বাবা, শাসন-কর্তারা তো বাড়ি নেই। দাদাও নেই।'

দিদি গাইল।

যদিও ঘরের মধ্যে সামনে বসে নয়, দালানের জানালার কাছে বসে।

গাইলো

'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলোর তলে।'

বুঝলাম বেশ সাবধানে বেছেগুছেই গেয়েছে। তবু আমার অকালপক্ব মনের মনে হলো, এর মধ্যেও যেন কিছু অর্থ লুকনো আছে।

দিদির সুরের আবেগেই কি?

দিদির গলা কাঁপছিল।

কাঁপতেই পারে। এতোবড়ো একটা বৈপ্লবিক কান্ড ঘটছে!

মেজদা বললো, 'আরে সত্যিই তো। ঠিক ঠিক সুরেই তো গাইলি মনে হচ্ছে। আহা শিখতে টিখতে পেলে তোর উন্নতি হতো! তা যা আমাদের একখানি বাড়ি! অচলায়তন!...গা, আর একটা গা—।

দিদি আস্তে ধরলো—

...আমার কাঙাল বলিয়া করিও না হেলা

আমি পথের ভিখারী নহি গো—

আর ঠিক সেই সময় বজ্রপাতের মত, দরজার শেকল নড়ে উঠলো।

কে জানতো যে মা-বাবা এতো তাড়া-তাড়ি ফিরবেন! তারপর? বজ্রপাতের পর যা হয় তাই।

সেদিন প্রথম বাবাকেও বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখলাম।

দিলীপদা অবিশ্যি তখন চলে গেছে।

বাবা মেজদাকে বললেন, [illegible] যখন [illegible] সাইজ বলা ঠিক নয় [illegible] তোমার [illegible] হবে [illegible]

[illegible] দিদি [illegible] বললেন, মেজদা [illegible] বললো। বলেই তুমি একজন [illegible] সামনে গান গাইবে? তোমার [illegible] নেই? কই, আমরা তো [illegible] গান গাইতে পারো।'

—বাবার মুখে 'তুমি।'

এরপরেও দিদি শতধারে ভেঙে পড়বে না?

বললে তো বলতে পারতো 'তোমরা কবে আমাদের সম্পর্কে এতোটুকু কৌতূহল প্রকাশ করেছো যে শুনবে? আমাদের অসুখ খাওয়াতে হয় তাই জানো। ভালো পরাতে হয় তাই জানো। আমাদের মধ্যেও যে একটা মন আছে, জানো সেটা?'

একালে হলে হয়তো বলতো।

আরো কতো কী বলতো হয়তো।

কিন্তু সেকালে মেয়েরা কে কবে ভাবতে পেরেছে গুরুজনের মুখের ওপর উচিত কথা শুনিয়ে দেওয়া যায়?

বেচারী দিদি! কিছুটি বলেনি, তবু মা তার ওপর বাক্যবাণ বর্ষণ করেই চলেছেন। দিদি যা করেছে তা যে প্রায় 'খারাপ' হয়ে যাওয়ার মত, সেটাই বুঝিয়ে ছাড়ছেন ওকে। মা। 'তেরো বছরের ধাড়ি মেয়ে, ভাল-মন্দবোধ নেই তোম্যর?'

অনেক বলার পর আবারও যখন নতুন বেগে শুরু করলেন, যতো ভাবছি, ততোই নতুন করে আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি আমি। আমার মেয়ে হয়ে, এতো শিক্ষাদীক্ষা পেয়ে তুই কিনা একদণ্ড আমি চোখের আড়াল হতেই পরপুরুষকে গান শোনাতে বসলি? তাহলে তো দুদিনের জন্যে বিশেষ দরকারে কোথাও যেতে হলে তোকে ঘরে চাবি দিয়ে রেখে যেতে হবে। না হলেই হয়তো—'

তখন ওই হয়তোটা আর উচ্চারণ করতে দিল না মেজদা। হঠাৎ এসে হাতজোড় করে বলে উঠলো, 'মা তোমার পায়ে পড়ছি এবার ওকে রেহাই দাও। বলছি তো সব দোষ আমার। আশ্চর্য! তোমাদের থিয়েটারে গিয়ে নাচ-গান দেখায় দোষ হয় না, অথচ ছেলে-মানুষ মেয়েটা একটা গান গেয়েছে বলে একেবারে মহাপাতক হয়ে গেছে!'

কী জানি কী ভেবে মা হঠাৎ চুপ করে গেলেন।

কিন্তু সত্যিই কি শুধু আমাদের মাই এতো নিষ্ঠুর ছিলেন?

না, তা বলা যায় না।

সেকালে মায়েরা জানতেন এটাই মাত্র কর্তব্য। আমাদের তো তবু শুধু বকেই ছাড়তে দিলেন, আমার বড় পিসিমার মত মা হয়তো এতোবড়ো গর্হিত পাপে মেরেই পাট করে ফেলতেন।

(ক্রমশঃ)

আজকের এই সুগম যাতায়াতের যুগে দেশভ্রমণ দুঃসাধ্য নয়, কিন্তু ঘুরে বেড়ালেই বা একটা দেশকে কতোটুকু চেনা যায়? চিনতে হলে শুধু ভূগোল নয় জানা দরকার তার ইতিহাস, এবং তার বাস্তব জীবনের কর্মকাণ্ডের দিক, আর ভবিষ্যতের ভাবনা। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলার কথা তাই চার দিক থেকে আলোচনা করা হবে—আমাদের এই দেশটিকে হয়তো তাহলে আরেকটু ভালো করে চিনতে পারব আমরা।

কোচবিহার

প্রাক্তন দেশীয় রাজ্য ও বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলের অন্যতম জেলা কোচবিহারের কাছে এই রাজ্যের সাংস্কৃতিক ঋণ সীমাহীন। বাংলাভাষা যেদিন অন্ত্যজ ও ইতরজনের ভাষা বলে উপেক্ষিত ছিল সেদিন কোচবিহারে সে-ভাষা রাজমর্যাদা লাভ করে। অর্ধ সহস্র বর্ষ আগে, যখন বাংলাভাষা সম্পূর্ণরূপে জড়তামুক্ত হয়নি তখনও কোচবিহারের যাবতীয় রাজকার্য বাংলাভাষায় সম্পন্ন হত। ভূটান, আহোম, এমনকি পরবর্তীকালে ইংরেজ সরকারের কাছেও কোচবিহার রাজের সব চিঠি লিখিত হত বাংলা ভাষায়। ১৫৫৫ খৃস্টাব্দে কোচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণ কর্তৃক আহোম রাজাকে লিখিত যে চিঠিখানির সন্ধান পাওয়া গেছে, এখনও পর্যন্ত সেইটিই বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শন।

অসমিয়া ভাষার উন্নয়নেও কোচবিহার রাজদরবারের অবদান সামান্য নয়। আসামের শ্রেষ্ঠ কবি ও নব্য বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রবক্তা শঙ্করদেব সম্ভবত আহোমদের উৎপীড়নে আসাম ত্যাগে বাধ্য হয়ে রাজা নরনারায়ণের শাসনকালে (১৫৫৫—৮৭) কোচবিহারে আসেন। কোচবিহারে অবস্থানকালে শঙ্করদেব 'রামবিজয় নাটক' লেখেন এবং রাজ আনুকূল্যে সে নাটক অভিনয়েরও ব্যবস্থা হয়। মধুপুর গ্রামে ছিল শঙ্করদেবের আশ্রম। সেখানে অবস্থানকালে ভাগবতেরও অনুবাদ করেন এবং মধুপুরেই শঙ্করদেবের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।

পরবর্তীকালে শঙ্করদেবের প্রধান শিষ্য মাধবদেব, সম্ভবত একই কারণে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের শাসনকালে (১৫৮৭—১৬২৫) কোচবিহারে আশ্রয় নেন ও রাজসভায় অবস্থানকালে বাংলা ও অসমিয়া ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করেন। কোচবিহার রাজদরবারের পোষকতায় মূল সংস্কৃত থেকে রামায়ণ ও মহাভারত বাংলায় অনূদিত হয়।

'স্ট্যাটিসটিকাল একাউন্টস অফ কুচবিহার' গ্রন্থে হান্টার 'কোচবিহার' নামের উৎপত্তি আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, 'বিহার' শব্দটি বৌদ্ধবিহার থেকে আসে। এ মন্তব্য হয়ত ভুল নয়, কারণ 'বিহার' শব্দের অর্থ মিলনক্ষেত্র, আবাসস্থল। তবে পূর্ব ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হওয়ার পরেও দীর্ঘ সাড়ে চারশ বছর ঐ রাজ্যটি কামরূপ নামক একটি বৃহৎ রাজ্যের অংশ ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর সূচনায় কোচ রাজারা বর্তমান কোচবিহার অঞ্চলে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর রাজ্যের নাম রাখেন 'কোচবিহার' অর্থাৎ কোচদের বাসস্থান।

স্বতন্ত্র কোচবিহার রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকাল সম্ভবত ১৫১০ খৃঃ। তার প্রতিষ্ঠাতা রাজার নাম চন্দন। তিনি কামরূপ রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ঐ রাজ্যের পশ্চিমাংশ বিচ্ছিন্ন করে একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তের বছর রাজত্ব করার পর অল্প বয়সেই চন্দনের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর ১৫২৩ খৃঃ বিশ্বসিংহ রাজা হন ও তাঁর ভাই শিষ্যসিংহ ঐ রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী-রায়কৎ। এই রায়কৎ পদ ক্রমে বংশানুক্রমিক হয় এবং বাসুদেবপুর হয় রায়কৎদের স্থায়ী বাসভূমি ও কর্মকেন্দ্র। ১৫৫৪ খৃঃ বিশ্বসিংহ স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করলে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র নরসিংহ রাজা হন। কিন্তু অল্পকাল পরে তিনিও তাঁর ভ্রাতার অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করলে ১৫৫৫ খৃঃ নরনারায়ণ কোচবিহারের রাজা হন।

মহারাজা নরনারায়ণের পরাক্রমে সমগ্র উত্তরবঙ্গ, ভূটান, আসাম, কাছাড়, জয়ন্তিয়া, মণিপুর ও ত্রিপুরা কোচবিহারের বশ্যতা স্বীকার করে। রাজা নরনারায়ণের নামাঙ্কিত যে স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত হয় তা নারায়ণী মুদ্রা নামে পরিচিতি লাভ করে এবং একদা সমগ্র পূর্ব ভারতে সে মুদ্রা গ্রাহ্য ছিল। কালাপাহাড় কর্তৃক বিধ্বস্ত প্রাগজ্যোতিষ শহরের (বর্তমান গৌহাটি) কামাখ্যা মন্দিরটি নরনারায়ণের পোষকতায় পুনর্নির্মিত হয়। স্বাধীন সার্বভৌম কোচবিহারের নৃপতিদের মধ্যে মহারাজা নরনারায়ণই ছিলেন সর্বাধিক পরাক্রমশালী। আবার রাজ্য শাসনেও তিনি ধর্মনিরপেক্ষতার উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করেন। তাঁর উদ্যোগেই বাংলাভাষা কোচবিহারের রাজভাষার মর্যাদা লাভ করে। তাঁর রাজত্বকালে পরিব্রাজক র‍্যালফ ফিচ কোচবিহার পরিদর্শন করেন (১৫৮৬) এবং তাঁর ভ্রমণ লিপিতে কোচবিহার রাজ্যের বিশালতা বর্ণনাকালে লেখেন, ঐ রাজ্য তখন প্রায় চীনের সীমা স্পর্শ করে এবং চীনের সঙ্গে তার বাণিজ্যিক লেনদেন ছিল। রাজ্যের অধিবাসীরা ছিল অতি ভদ্র এবং সম্পূর্ণ অহিংস। সে সময় কোচবিহার রাজ্যে ভেড়া, গরু, কুকুর, বিড়াল, পাখি প্রভৃতির জন্যও হাসপাতাল ও পিঁজরাপোল ছিল।

মহারাজা নরনারায়ণের সব অভিযানের প্রধান সহায়ক ছিলেন তাঁর অনুজ শুক্লধ্বজ, যিনি চিলা রায় নামে পরিচিত ছিলেন। পরবর্তীকালে বিশাল রাজ্য সুশাসনের জন্য রাজা নরনারায়ণ ও চিলা রায় সংকোষ নদী বরাবর রাজ্য ভাগ করে নেন। চিলা রায় হন পূর্ব অঞ্চলের রাজা এবং তাঁর রাজধানী হয় বর্তমান কোচবিহারের পূর্ব প্রান্তে তুফানগঞ্জ পরগণার [illegible] তালুক। সেখানে ভগ্ন দুর্গ ও [illegible] চিলা রায়ের [illegible] পুষ্করিণী আজও চিলা রায়ের একদা সমৃদ্ধ রাজধানীর সাক্ষ্য ও স্মৃতি বহন করে। শুক্লধ্বজ চিলা রায় নামে খ্যাত হওয়ার কারণ, তাঁর আক্রমণরীতি ছিল চিলের মত তীক্ষ্ণ ও তীব্র।

তেত্রিশ বছর রাজত্বের পর ১৫৮৭ খৃঃ নরনারায়ণ পরলোকগমন করলে তাঁর একমাত্র পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ রাজা হন। লক্ষ্মীনারায়ণ দুর্বল প্রকৃতির শাসক ছিলেন। মোগল সেনাপতি শের আফগানের আক্রমণে তাঁর রাজ্য বিপন্ন হলে তিনি ১৫৯৬ খৃঃ সম্রাট আকবরের প্রতিনিধি রাজা মানসিংহের সঙ্গে দেখা করে কোচবিহারকে মোগল সাম্রাজ্যের সামন্ত রাজ্যরূপে স্বীকৃতিদানের প্রস্তাব দেন। রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের ঐ আচরণে কোচবিহারের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা বিক্ষুব্ধ হলে তিনি মোগল দুর্গে আশ্রয় নেন ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য মোগলের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তখন জেহাজ খাঁর নেতৃত্বে মোগল সেনারা কোচবিহারে প্রবেশ করে বিদ্রোহ দমন করে ও
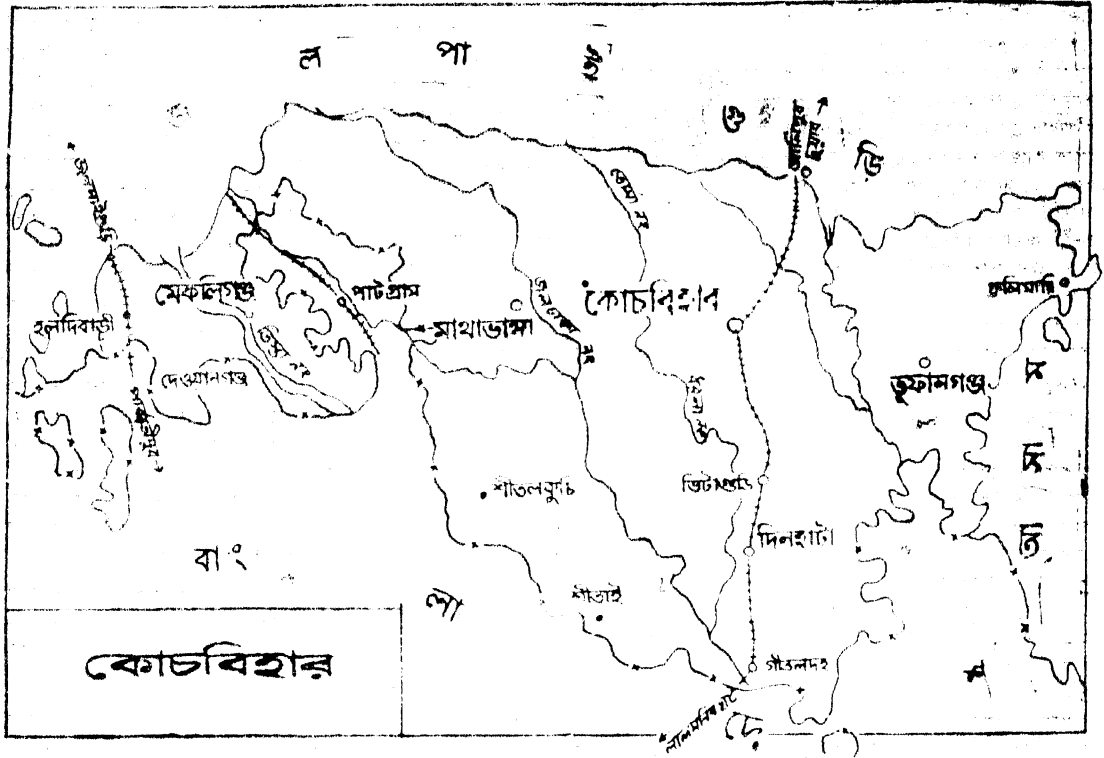
প্রচুর ধনসম্পদ লুঠ করে স্বস্থানে ফিরে আসে। পরবর্তীকালে সম্রাট জাহাঙ্গীর যখন দিল্লীর বাদশাহ, গৌড়ের মোগল শাসক আবার কোচবিহার আক্রমণ করে। তখন রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ দিল্লীতে গিয়ে বাদশাহের সঙ্গে দেখা করে একটা আপসে আসেন। স্থির হয় যে মোগল বাহিনী আর কখনও কোচবিহারে প্রবেশ করবে না আর কোচবিহারও মোগল সাম্রাজ্যের কোন অংশ আক্রমণ করবে না। নারায়ণী মুদ্রার প্রচলনও ঐ চুক্তি অনুসারে কোচবিহার রাজ্যের অভ্যন্তরে সীমিত হয়। পঁয়ত্রিশ বছর রাজত্বের পর ১৬২১ খৃঃ লক্ষ্মীনারায়ণের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র বীরনারায়ণ রাজা হন।

বীরনারায়ণও দুর্বল রাজা ছিলেন. সেকারণে ভুটান ও আরও কয়েকটি রাজ্য তাঁর শাসনকালে কোচবিহার রাজের সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করে এবং সেই সঙ্গে কর দেওয়াও বন্ধ করে। তবে বীরনারায়ণ বিদ্যোৎসাহী রাজা ছিলেন। তাঁর শাসনকালেই কোচবিহার রাজ্যের রাজধানী আঠারোকোঠায় স্থানান্তরিত হয়। পাঁচ বছর রাজত্বের পর ১৬২৫ খৃঃ তাঁর মৃত্যু হলে পুত্র প্রাণনারায়ণ রাজা হন ও ১৬৬৫ খৃঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

প্রাণনারায়ণের শাসনকালে প্রথমে, ১৬৩৮ খৃঃ চট্টগ্রামের (তখন নাম ছিল ইসলামাবাদ) শাসক ইসলাম খাঁ কোচবিহার আক্রমণ করেন। তবে সে আক্রমণের পরিণতি সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। তারপর ১৬৬১ খৃঃ বাঙলার শাসক মিরজুমলা কামরূপ অভিযানের পথে কোচবিহারে প্রবেশ করেন ও সব হিন্দু মন্দির ধ্বংসের নির্দেশ দেন। রাজা প্রাণনারায়ণ প্রাণরক্ষা করতে বনে গিয়ে আশ্রয় নেন। মিরজুমলা তখন ইসফন্দিয়ার বেগকে কোচবিহারের শাসক নিযুক্ত করে আসাম অভিযানে অগ্রসর হন। কোচবিহার বাংলার শাসককে দশ লক্ষ নারায়ণী মুদ্রা দানে স্বীকৃত হয়। কিন্তু কোচবিহারে অবস্থানরত মিরজুমলার সেনাবাহিনী এমন পীড়ন শুরু করে যে কোচবিহারের জনগণ শেষ পর্যন্ত বেপরোয়া হয়ে সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয় ও আত্মগোপনকারী রাজাকে বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য আহ্বান জানায়। প্রাণনারায়ণ সে আহ্বানে সাড়া দেন এবং কোচবিহারের বিদ্রোহী জনগণের আক্রমণে মিরজুমলার সেনারা গৌহাটিতে পশ্চাদপসরণ করে। এতে ক্রুদ্ধ মিরজুমলা আবার কোচবিহার দখলে অগ্রসর হন। কিন্তু পথেই অসুস্থ হয়ে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। রাজা প্রাণনারায়ণ সুপণ্ডিত, কবি ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পোষকতায় জল্পেশ, বাণেশ্বর ও ষণ্ডেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর পরিকল্পনায় রাজ্যে অনেক সড়ক সেতু নির্মিত হয়।

১৬৬৫ খৃঃ রাজা প্রাণনারায়ণের মৃত্যু হলে কোচবিহার রাজ্যে কিছু দিন বিশৃঙ্খলা চলে এবং রাজা প্রাণনারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র মদননারায়ণকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্যের প্রধান নাজির মহীনারায়ণ সর্বেসর্বা হয়ে বসেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মদননারায়ণ নাজির মহীনারায়ণকে রাজ্য ত্যাগে বাধ্য করেন এবং বৈকুণ্ঠপুরে অবস্থানকালে মহীনারায়ণ নিহত হন। ঐ সময় মহীনারায়ণের পুত্রেরা ভুটানের রাজার সহায়তায় কোচবিহারের সিংহাসন দখলে তৎপর হন। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তবে ১৬৮০ খৃঃ অপুত্রক অবস্থায় মদননারায়ণের মৃত্যু হলে মহীনারায়ণের পুত্রদের আবার তৎপরতা শুরু হয়। তারা রাজ্য দখলে সহায়তার অজুহাতে ভুটানী সেনাদল কোচবিহার রাজ্যে প্রবেশ করে ব্যাপক লুঠতরাজ শুরু করে। বিদ্রোহ ও বহিরাক্রমে সমগ্র কোচবিহার রাজ্য হতশ্রী হয়। সেই সময় রাজ্যকে রক্ষার উদ্দেশ্যে কোচবিহারের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ১৬৮২ খৃঃ প্রাণনারায়ণের পাঁচ বছর বয়স্ক প্রপৌত্র মহীন্দ্রনারায়ণকে কোচবিহারের রাজা বলে ঘোষণা করেন। তারপর ১৬৮৭ খৃঃ ইবাদৎ খাঁর নেতৃত্বে এক মোগল বাহিনী ঘোড়াঘাট থেকে কোচবিহার রাজ্য আক্রমণ করে ও বহু এলাকা দখল করে নেয়। ঐ সময় বালক রাজার পক্ষে নাজির জগনারায়ণ মোগল আক্রমণ প্রতিরোধে তৎপর হন। কিন্তু তাঁর প্রয়াস বিশেষ সফল হয় না এবং ১৬৯১ খৃঃ তাঁর মৃত্যু হয়। তার দু বছর পরে, মাত্র ষোল বছর বয়সে মহীন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হলে রাজ্যে আবার অনিশ্চিত অবস্থা দেখা দেয়। মহীন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুতে কোচবিহারে মেচ রাজবংশের শাসনের অবসান হয় এবং রাজ্যের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অনুমোদনক্রমে

পরলোকগত নাজির জগনারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রূপনারায়ণ ১৬৯৩ খঃ কোচবিহারের রাজা হন। রূপনারায়ণের শাসনকালে মুশ্লিম আক্রমণের ফলে কোচবিহারের বহু অংশ বিচ্ছিন্ন এবং কোচবিহার রাজ্য মোটামুটিভাবে বর্তমান কোচবিহার জেলায় সীমাবদ্ধ হয়। রূপনারায়ণ আঠারোকোটা থেকে রাজ্যের রাজধানী তোর্ষা নদীর পূর্ব পারে গুড়িয়াহাটিতে স্থানান্তরিত করেন। স্থানটি বর্তমান কোচবিহার শহরের সমীপবর্তী অঞ্চল। ১৭১৪ খঃ রূপনারায়ণের মৃত্যু হলে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র উপেন্দ্রনারায়ণ রাজা হন এবং সে সময় কোচবিহারের অস্তিত্ব আবার বিপন্ন হয়। একদিকে ভুটান, অপরদিকে রংপুরের মুসলমান ফৌজদারের আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয় উপেন্দ্রনারায়ণকে। তিস্তা নদীর পশ্চিম পারে সিংহেশ্বর ঝারের যুদ্ধে তিনি মুশ্লিম আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যর্থ হন। তখন চতুর রাজা উপেন্দ্রনারায়ণ ভুটানীদের সঙ্গে সন্ধি করেন এবং ১৭৩৭-৩৮ খঃ ভুটানীদের সাহায্যে মুশ্লিম আক্রমণ প্রতিহত করেন। উপেন্দ্রনারায়ণ ধুলিয়াবাড়ীতে একটি নতুন রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন এবং ৪৯ বছর রাজত্বের শেষে ১৭৬৩ খঃ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর প্রথমা মহিষী তাঁর সঙ্গে সহমরণে যান এবং প্রথম মহিষীর ইচ্ছানুসারে দ্বিতীয়া মহিষীর পুত্র দেবেন্দ্রনারায়ণকে রাজা করা হয়। দেবেন্দ্রনারায়ণের বয়স তখন মাত্র চার বছর।

শিশু দেবেন্দ্রনারায়ণের শাসনকালে রাজ্যে আবার একটা অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হলে ভুটানীরা মহারাজা উপেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তিবলে কোচবিহারের শাসন কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ করায়ত্তে আনতে তৎপর হয়। রাজধানীতে ভুটানের একজন রেসিডেন্ট ও ভুটানের এক বাহিনী সৈন্য রাখার ব্যবস্থা হয় এবং ঐ রেসিডেন্টই কোচবিহারের সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। ওদিকে রাজগুরু গোঁসাই রামানন্দর প্ররোচনায় রতিশর্মা নামক এক ব্রাহ্মণের হাতে শিশুরাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ মাত্র ছয় বছর বয়সে নিহত হন। কিন্তু রাজদরবারের কঠোর মনোভাবের জন্য কোন অনধিকারীকে সিংহাসনে বসানোর চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণকে কোচবিহারের রাজা বলে ঘোষণা করা হয়। ভুটানরাজের চেষ্টায় রাজগুরু গোঁসাই রামানন্দ ধৃত ও নিহত হন।

এদিকে কোচবিহারের অভ্যান্তরীণ ব্যাপারে ভুটানের হস্তক্ষেপ দিনে দিনে বাড়তে থাকে। ১৭৭০ খঃ ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ বন্দী হন ও তাঁর অনুগত নাজির দেও খগেন্দ্রনারায়ণ পলায়ন করে প্রাণরক্ষা করেন। ভুটানের ইচ্ছা অনুসারে ধৈর্যেন্দ্রর ছোট ভাই রাজেন্দ্রনারায়ণ সিংহাসনে বসেন কিন্তু তিনি দু বছর নামেমাত্র রাজা থাকার পর ১৭৭২ খঃ মারা যান। রাজেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে খগেন্দ্রনারায়ণ দ্রুত রাজধানীতে ফিরে আসেন এবং ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণের পুত্র ধরেন্দ্রনারায়ণকে রাজা বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু ভুটানের অনুগত দেওয়ান দেও রামনারায়ণ তাতে আপত্তি জানান এবং রামনারায়ণের সমর্থনে ভুটানের সৈন্যবাহিনী এগিয়ে আসে। তখন বালক রাজা ও রাজপরিবারের সকলকে নিয়ে খগেন্দ্রনারায়ণ বলরামপুরে আশ্রয় নেন। আর অরক্ষিত কোচবিহারে প্রায় বিশ হাজার ভুটানী সৈন্য প্রবেশ করে রাজধানীসহ প্রায় সমগ্র রাজ্য দখল করে নেয়। ভুটানের আদেশক্রমে দেওয়ান দেও রামনারায়ণের পুত্র বিজেন্দ্রনারায়ণকে কোচবিহারের রাজা বলে ঘোষণা করা হয়।

এই পরিস্থিতিতে খগেন্দ্রনারায়ণ কোচবিহারকে ভুটানের অধিকারমুক্ত করার উদ্দেশ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শরণ নেন। কোম্পানিও তৎক্ষণাৎ সে-ডাকে সাড়া দেয়। বালক রাজা ধরেন্দ্রনারায়ণের পক্ষে কোম্পানির সঙ্গে কথা বলেন খগেন্দ্রনারায়ণ এবং ১৭৭৩ খঃ ৫ এপ্রিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও কোচবিহারের রাজা ধরেন্দ্রনারায়ণের মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তার শর্ত অনুসারে শত্রুর বিরুদ্ধে কোচবিহারের রাজা ও রাজ্যকে রক্ষা করতে কোম্পানি ক্যাপ্টেন জোন্সের নেতৃত্বে চার কোম্পানি সৈন্য ও দুটি ফিল্ড-গান রংপুর থেকে কোচবিহারে পাঠায়। আর ঐ বাহিনী ঝড়ের গতিতে কোচবিহারে প্রবেশ করে সমগ্র রাজ্য থেকে ভুটানী সৈন্যদের বিতাড়িত করে। তারপর কোম্পানির সৈন্যরা ভুটানে প্রবেশের উদ্যোগ করলে ভুটান-রাজ নিরুপায় হয়ে তিব্বত সরকারের শরণ নেন। তখন তিব্বতের সার্বভৌম তিসু লামার মধ্যস্থতায় ভুটানের সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ১৭৭৪ খঃ ২৫ এপ্রিল একটি সন্ধি হয়, যে-সন্ধির অন্যতম শর্ত অনুসারে কোচবিহারের মহারাজা ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ ও তাঁর ভাই দেওয়ান দেও সুরেন্দ্রনারায়ণ ভুটানের হেফাজত থেকে মুক্তিলাভ করেন।

মুক্তিলাভের পর রাজা ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ প্রথম যেখানে ভাত খান পশ্চিম ডুয়ার্সের সেই স্থানটি ঐ ঘটনার পর থেকে রাজাভাত-খাওয়া নামে পরিচিত হয়।

দীর্ঘকাল বন্দী থাকার জন্য স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেও রাজার মনের বিষণ্ণ ভাব দূর হয় না। সেকারণে রাজার পুত্র ধরেন্দ্রনারায়ণই রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকেন এবং রাজ্যের শাসনকার্য চালাতে থাকেন নাজির দেও খগেন্দ্রনারায়ণ। সে-সময় শাসনকার্য নিয়ে নাজির দেওর সঙ্গে মহারানী ও তাঁর গুরু গোঁসাই সর্বানন্দর প্রায়ই বিবাদ হতে থাকে। ইতিমধ্যে ১৭৭৫ সালে ধরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হলে ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণের সিংহাসনারোহণ ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। তারপর ১৭৮০ সালে রাজা ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণের একটি পুত্রের
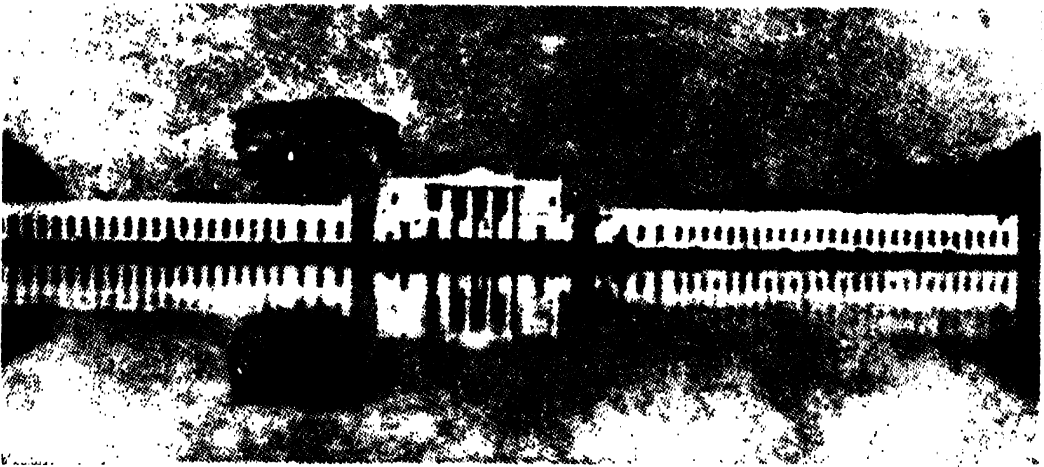
কোচবিহারের পূর্বতন রাজকীয় দপ্তর আজকের সরকারী অফিস ভবন।

কোচবিহারের রাস্তায় হাতীর শোভাযাত্রা

জন্ম হয় এবং তার নাম রাখা হয় হরেন্দ্রনারায়ণ। ১৭৮৩ সালে ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হলে মাত্র তিন বছরের শিশুপুত্র হরেন্দ্রনারায়ণকে রাজা বলে ঘোষণা করা হয়।

ঐ সময় কোচবিহারের প্রভাবশালী মহল মহারাণী ও নাজির দেও খগেন্দ্রনারায়ণের সমর্থনে দ্বিধাবিভক্ত হয়। আর খগেন্দ্রনারায়ণ ইংরেজ অফিসারদের সমর্থনের জোরে মহারাণী, শিশুরাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ও তাঁদের সমর্থকদের বন্দী করে নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করেন। মহারাজার অগণিত সমর্থক খগেন্দ্রনারায়ণের হাতে নিহত হন এবং খগেন্দ্রনারায়ণ নিজের নামে নতুন মুদ্রা প্রচলন করেন। ইতিমধ্যে খগেন্দ্রনারায়ণের সমর্থক ইংরেজ অফিসাররা বদলি হলে খগেন্দ্রনারায়ণ দুর্বল হয়ে পড়েন ও মহারাণী সেই সুযোগে ইংরেজের কাছে সাহায্যের আবেদন পাঠান। ইংরেজরা রাণীর সমর্থনে এগিয়ে এসে খগেন্দ্রনারায়ণকে গদিচ্যুত করেন এবং খগেন্দ্রনারায়ণ রাজ্য ত্যাগ করে আসামে চলে যান। পরে তাঁর একটি অভ্যুত্থান সাময়িকভাবে সফল হলেও ইংরেজের হস্তক্ষেপে ব্যর্থ হয়। হরেন্দ্রনারায়ণ ৫৬ বছর রাজত্ব করার পর ১৮৩৯ সালে পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর একে একে রাজা হন শিবেন্দ্রনারায়ণ (১৮৩৯-৪৭), নরেন্দ্রনারায়ণ (১৮৪৭-১৮৬৩), নৃপেন্দ্রনারায়ণ (১৮৬৩-১৯১১), রাজ-রাজেন্দ্রনারায়ণ (১৯১১—১৩), জিতেন্দ্রনারায়ণ (১৯১৩-২১) ও জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ। ১৯৪৯ সালের ১২ সেপ্টেম্বর কোচবিহার যখন ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয় তখন জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ কোচবিহারের রাজা ছিলেন।

১৭৭৩ খৃঃ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর থেকে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানের মধ্যবর্তী সময়ে কোচবিহার ছিল করদ রাজ্য। ঐ সময় ইংরেজ সরকারের সহযোগিতায় ও হরেন্দ্রনারায়ণ, নরেন্দ্রনারায়ণ, নৃপেন্দ্রনারায়ণ প্রমুখ নৃপতিগণের তৎপরতায় কোচবিহারের মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণ ঘটে। ১৮৫৯ সালে রেভিনিউ সার্ভেয়র জে জে পেমবার্টন কোচবিহারের যে মানচিত্র প্রস্তুত করেন তাই বর্তমান কোচবিহার জেলার প্রথম সরকারি মানচিত্র। ১৮৬২ সালে (অর্থাৎ সিপাহিবিদ্রোহের পর) ভারত সরকার কোচবিহারের রাজ-সরকারকে যে সনন্দ দেন তাতে কোচবিহারের রাজার 'মহারাজা বাহাদুর' উপাধিকে স্বীকৃতি জানানো হয় এবং তাঁদের পুত্রের অভাবে দত্তকপুত্র গ্রহণের অধিকার দেওয়া হয়।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রসেনের জামাতা মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের শাসনকালে ১৮৭২ খৃঃ কোচবিহারে প্রথম লোকগণনা হয়। তিনি ছিলেন দক্ষ প্রশাসক ও জনপ্রিয় নৃপতি। সুপরিকল্পিত সুরম্য কোচবিহার শহরটি তাঁরই নির্দেশনায় নির্মিত হয়।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৪৯ সালের ২৮ আগস্ট ভারত ও কোচবিহারের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুসারে ১৯৪৯ সালের ১২ সেপ্টেম্বর রাজ্যটি ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। ঐ সময় থেকে ঐ বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কোচবিহার ছিল ভারতের একটি চিফ কমিশনার শাসিত প্রদেশ। তারপর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক আইনানুসারে ১৯৫০ সালের ১ জানুয়ারি কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলায় পরিণত হয়।

(২)

কোচবিহার জেলার আয়তন-সার্ভেয়র জেনারেল অফ ইণ্ডিয়ার হিসাব অনুসারে ১৩৩৪·১ বর্গমাইল, আর পশ্চিমবঙ্গের ডাইরেকটর অফ ল্যাণ্ড রেকর্ডস এণ্ড সার্ভেজ-এর হিসাবে ১৩২২·৬ বর্গমাইল।

হিমালয়ের তরাই অঞ্চলের অংশ, ত্রিভুজাকৃতির এই জেলাটি সম্পূর্ণ সমতল, তবে দক্ষিণ বরাবর কিছুটা ঢালু। ঢলের পরিমাণ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সর্বোচ্চ ১৮০ ফুট ও সর্বনিম্নে ১৫০ ফুট। কোচবিহারের সমগ্র উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম জুড়ে আছে জলপাইগুড়ি জেলা, পূর্বে আসাম,

আর দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে বাংলাদেশ। পূর্ব-পশ্চিমে জেলার সর্বাধিক দৈর্ঘ্য ৬৪ মাইল ও উত্তর-দক্ষিণে সর্বাধিক প্রস্থ ৩৩ মাইল।

অগণিত নদী, উপনদী, শাখানদী আর ঝিল বিল ও জলায় পূর্ণ হয়ে আছে সমগ্র কোচবিহার জেলা। সারা জেলায় মাটির ধরনও একই রকম; ওপরের স্তরে আছে সহজে ভঙ্গুর, ছয় থেকে তিন ইঞ্চি পুরু দো-আঁশ মাটি, আর তার নীচে গভীর বালির স্তর। মাটি নরম বলে অল্প আয়াসে চাষ হয় এবং উর্বরা বলে ফসলও ভাল হয়। কিন্তু বর্ষায় প্রমত্তা নদীগুলি যখন ধেয়ে আসে তখন দুর্বল মৃত্তিকাস্তর কোন বাধাই তাদের দিতে পারে না। আর পারভাঙা দুর্নিবার নদীগুলি প্রতি বছরেই অগণিত নরনারীর অশেষ দুর্দশার কারণ হয়।

কোচবিহারের আর এক দুর্ভাগ্য, আজ পর্যন্ত তার মাটির নীচে কোন খনিজ পদার্থের সন্ধান মেলে নি।

কোচবিহারে বনভূমি খুব বেশি নেই। সারা জেলায় দুটি বড় ও চারটি ছোট সংরক্ষিত বনভূমি আছে। বড় সংরক্ষিত বনভূমি দুটি হল—পাতলা-খাওয়া ও গারোদহাট বনভূমি। পাতলা-খাওয়া বনভূমির আয়তন প্রায় সাড়ে চার হাজার একর ও গারোদহাট বনভূমির আয়তন প্রায় দশ হাজার একর। ছোট চারটি সংরক্ষিত বনভূমির নাম—কোচবিহার (২০৪ একর), গোসাইমারি (৫২ একর), মহিষমুড়ি (৩৬ একর) ও গরাতি তেলধার বনভূমি।

কোচবিহার জেলার নদীগুলির বৈশিষ্ট্য প্রায় সব কটি নদী হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়ে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে জেলার উত্তর-পূর্ব কোণ দিয়ে প্রবেশ করে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে। গ্রীষ্মকালে প্রায় সব নদীই ক্ষীণ ও অগভীর কিন্তু বর্ষায় প্রচণ্ড ও কূলপ্লাবী। পশ্চিম দিক থেকে পর পর উল্লেখযোগ্য নদীগুলি হল—তিস্তা, ধরলা, জলঢাকা, তোর্ষা, কালজানি, রাইডাক অথবা সঙ্কোষ ও গদাধর।

এদের মধ্যে তিস্তা বৃহত্তম ও সর্বাধিক বেগবতী। জেলার উত্তর পশ্চিম কোণ দিয়ে প্রবেশ করে তিস্তা দক্ষিণ-পূর্ব কোণ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। জেলার অভ্যন্তরে মাত্র কুড়ি মাইল নদীটি প্রবাহিত এবং তার মধ্যে কোন উপনদী এসে তিস্তায় পড়েনি বা কোন শাখা নদীও তিস্তা থেকে নির্গত হয় নি। তিস্তার তীরে আছে মহকুমা শহর মেকলিগঞ্জ।

জলঢাকা নদী জেলার বিভিন্ন স্থানে মাসাই, সিঙ্গিমারি, ধরলা ইত্যাদি নামে পরিচিত। জেলার অভ্যন্তরে ৬০ মাইল অগ্রগতির পথে জলঢাকার দুধারে অনেকগুলি নদী এসে পড়েছে। তার ডানদিকে এসে পড়েছে সুতুঙ্গা, ধরলা, ধুটামারা বা গিরদরি আর বাঁদিকে কুমলাই, গিয়াদ্দি, দুদুয়া মুঝাই ও দোলং নদী।

তোর্ষা নদীর প্রকৃত নাম হল তোয়ারোষা, অর্থাৎ ক্রুদ্ধ নদী এবং ঐ নামেই নদীটির প্রকৃত পরিচয় মেলে। উত্তর দিক দিয়ে জেলায় প্রবেশ করে প্রায় ষাট মাইল প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। এমন খেয়ালি, সর্বনাশা নদী উত্তরবঙ্গে আর একটিও নেই। গত দেড়শ বছরে এই নদী যে কতবার গতি পরিবর্তন করেছে তার কোন হিসাব নেই, আর প্রতিবারই সে ধ্বংস করেছে কত জনপদ, মরুভূমিতে পরিণত করেছে কত শ্যামল প্রান্তর। সারা কোচবিহার ছড়িয়ে আছে মড়া তোর্ষা, বুড়া তোর্ষা অথবা চড়া তোর্ষ নামের বদ্ধ জলা অথবা শুষ্ক নদী খাতে আর সেগুলির ধারে কাছে পড়ে আছে একদা গড়ে ওঠা বাজার গঞ্জ জনপদের জীর্ণ স্মৃতি। কোচবিহারের অভ্যন্তরে তোর্ষা নদীতে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে শুধু ঘরঘরিয়া নদী এসে পড়েছে।

কোচবিহার জেলার মোট মৌজার সংখ্যা ১৩২৯, তার মধ্যে ১৩১টি জনহীন। গ্রামের সংখ্যা ১১৯৮ ও শহর ৬টি। তবে একমাত্র কোচবিহার শহর ছাড়া কোনটিতে মিউনিসিপ্যালিটি নেই। অন্য শহরগুলির পৌর দায়িত্ব টাউন কমিটির উপর ন্যস্ত আছে।

জেলায় মহকুমা পাঁচটি—সদর (২৮৪·৮ বর্গমাইল), তুফানগঞ্জ (২২৪ বর্গমাইল), দিনহাটা (২৭১·৯ বর্গমাইল) মাথাভাঙা (৩৪৩ বর্গমাইল) ও মেকলিগঞ্জ (১৯৮·১ বর্গমাইল)। প্রতি মহকুমার প্রধান শহর মহকুমার নামেই পরিচিত। শুধু তুফানগঞ্জ মহকুমার সদর শহরের নাম ফলবাড়ি।

•

জেলার সদর কোচবিহার শহরের আয়তন ২·২৪ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা '৭১ সালের হিসাব অনুসারে ৫৩,৭৩৪। শহরে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার কম। কোচবিহার শহরটি কোচবিহার জেলার বিশেষ সম্পদ। তোর্ষা নদীর তীরবর্তী এই শহর মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরের নির্দেশনায় একটি সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা অনুসারে নির্মিত হয়। দুধারে তরুশ্রেণীযুক্ত ঋজু প্রশস্ত পথ, পথের দধারে তৃণাচ্ছাদিত শ্যামল মসৃণ অঞ্চল, ইতস্তত পুষ্পময় উদ্যান ও কুঞ্জবন, স্বচ্ছসুন্দর দীঘি ও সরোবর সারা শহরটিকে মনোরম করে তুলেছে। শহরের অন্যতম আকর্ষণ, সাগরদীঘির পশ্চিম পারে অবস্থিত ৭৯ ফুট মিনারযুক্ত ল্যান্সডাউন হলটি ১৮৯২ সালে নির্মিত হয়। এমন একটি চিত্তাকর্ষক শহর এ রাজ্যে কমই আছে। কোচবিহারের বহিরাগতদের মধ্যে একটি বড় অংশ হল মধ্যবিত্ত বাঙালী, যাঁরা সেখানে গিয়ে ঘর বাঁধেন কোচবিহার শহরের পরিচ্ছন্নতা ও সেখানকার রাজ পরিবারের বাঙালিয়ানার আকর্ষণে।

অর্ধ বর্গমাইল আয়তনের দিনহাটা শহরটি কোচবিহার শহরের ষোল মাইল দক্ষিণে রংপুর রোডের দুধারে গড়ে উঠেছে। শহরটির লোকসংখ্যা প্রায় বারো হাজার। দিনহাটা শহর কোচবিহার জেলার কৃষিপণ্যের একটি বড় বাজার।

মাথাভাঙা গুরুত্বের দিক দিয়ে কোচবিহার জেলার দ্বিতীয় শহর। জলঢাকা নদীর ডান পারে অবস্থিত, অর্ধ বর্গমাইলেরও কম আয়তনের এই শহরটির লোকসংখ্যা সাত হাজার। তামাকের অন্যতম বাণিজ্য কেন্দ্র।

তিস্তা নদীর তীরে অবস্থিত মেকলিগঞ্জ খুবই ছোট শহর এবং লোকসংখ্যা হাজার দুয়েকের বেশি নয়। কিন্তু তামাকের বড় বাজার হিসাবে শহরটি গুরুত্বপূর্ণ। একদা বর্মার তামাক ব্যবসায়ীদের আনাগোনা ছিল এই শহরে। এখান থেকে তামাক কিনে নৌকায় করে রংপুরের কালিগঞ্জে পাঠিয়ে দেওয়া হত। তারপর সেখান থেকে ঝাড়াই-বাছাই হয়ে তামাক চলে যেত বর্মায়। শরৎবাবুর শ্রীকান্ত-দ্বিতীয় পর্বে রংপুর থেকে বর্মায় তামাক কিনে নিয়ে যাওয়ার উল্লেখ আছে। সেই যে বাঙালী ছোকরাটি যখন তার সরল-বিশ্বাসী বর্মী স্ত্রীকে ফাঁকি দিয়ে দাদার সঙ্গে কলকাতায় পালিয়ে আসছিল তখন সে বলে আসে যে, রংপুর থেকে তামাক কিনে এক মাসের মধ্যে রেঙ্গুনে ফিরে আসবে।

তুফানগঞ্জ মহকুমার প্রধান শহর ফলবাড়ির লোক সংখ্যা তিন হাজারের বেশি নয়। হলদিবাড়ি মহকুমা শহর না হলেও উল্লেখযোগ্য। অর্ধ বর্গমাইলের কিছু বেশি আয়তনের ঐ শহরটির লোকসংখ্যা চার হাজার। হলদিবাড়ি পাটের বড় বাজার।

(পরবর্তী সংখ্যায় কোচবিহারের মানুষ)

—যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

মনের খবর

শরীরের অসুখে আমরা ব্যস্ত হই,
কিন্তু মন?
মনের অসুখও তো সমানই অক্ষম করে
দিতে পারে, বিশেষ করে আজকের এই তীব্র
তীক্ষ্ম জটিলতার যুগে, অভিজ্ঞ
চিকিৎসক 'মনের খবরে' সেই সব মনোব্যাধি
ও তার প্রতিকারের কথা আলোচনা
করবেন ধারাবাহিক নিবন্ধে।

আমাদের দেশে মানসিক রোগীদের যে নানাবিধ সমস্যা আজও প্রায় অনড় হয়ে বসে আছে সেই সম্বন্ধে সামান্য কিছু উল্লেখ করব।

শরীর থাকলেই শরীরের ব্যাধি কম-বেশী হবে বা হতে পারে এই সত্য আমরা যত সহজে নিজেরা স্বীকার করে নিয়েছি মানসিক ব্যাধির ক্ষেত্রে আমরা সেইভাবে সেটা স্বীকার করে নিতে আজ পারি নি। মানসিক রোগ যে মনের রোগ এবং তাকে রোগ মনে করেই যে তার চিকিৎসা করান সঙ্গত আজও আমরা তা সহজভাবে মেনে নিতে পারি নি। শরীরের রোগ হলে আমরা প্রথম থেকেই কিছু-না-কিছু ওষুধ-পথ্য ইত্যাদির আশ্রয় নিই। কিন্তু মনের রোগের বেলায় কোন যে সেই রকম ব্যবস্থা করা হয় না তাই নয় অনেক ক্ষেত্রে রোগীকে রোগের জন্য শাসনও করা হয়। কখনো বা রোগীকে উপেক্ষা বা অবহেলা করা হয়। আবার কখনো তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এমন কি তাড়না পর্যন্ত করা হয়। কয়েক দিন আগে একটি তেরো-চোদ্দ বছরের যুবক ছাত্রকে দেখাতে আনা হয়। তার কাছে ও তার সঙ্গীয় আত্মীয়দের কাছে জানা যায় যে ছেলেটি ছয় মাস আগে থেকে হঠাৎ অল্প অল্প তোতলামি শুরু করেছে এবং ক্রমে তা বেড়ে যাচ্ছে। প্রথম অবস্থায় বাড়ীর অভিভাবকগণ তাকে বকাবকি করতে আরম্ভ করেন। তাতে রোগীর উন্নতি না হয়ে বরং তার বিপরীত ফল দেখা দেয়। সে ক্রমে বড়দের এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে। যখনই তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে বাধ্য হত তখনই তোতলামি বেড়ে যেত। ক্রমে এমনই অবস্থা হয় যে সে বড়দের সঙ্গে প্রায় কথাই বলতে পারত না। অপরিচিতদের সঙ্গে ভয় না পেলে তবু সে মোটামুটি কথা বলতে পারত। স্কুলে শিক্ষকদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তার পক্ষে অসাধ্য হয়ে পড়ে। এর ফলে বাড়ীতে ও ইস্কুলে যেমন শাসনের মাত্রা বেড়ে চলে অন্য দিকে ইস্কুলের সহপাঠীদের এবং বাড়ীর অন্যদের তরফ থেকে তাকে নকল করে ব্যঙ্গ করার মাত্রাও বেড়ে যায়। ফলে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয় যে ঘরে-বাইরে কোথাও সে শান্তিতে থাকতে পারে না। ক্রমে তার স্বাভাবিক শান্ত মেজাজও উগ্র হতে থাকে। যখন তাকে আমার নিকট আনা হয় তার আগে সে বেশ কয়েকবার ইস্কুলে ও পাড়ার অন্য ছেলেদের সঙ্গে মারামারি করে আরও জটিল অবস্থার সৃষ্টি করে তুলেছে। এই রকম ঘটনা যে কেবল তোতলাদের ভাগ্যেই হয় তা নয়। এই কলকাতা শহরেই রাস্তায় যে সব মানসিক রোগী ঘুরে বেড়ায়, অনেক সময় পাড়ার ছোট ছেলেরা তাদের নানাভাবে উত্যক্ত করে ক্ষেপিয়ে তোলে। যখন রোগী ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের তাড়া করে, তারা তখন দৌড়ে দূরে সরে যায় বটে কিন্তু অবিলম্বে আবার রোগীর পিছু পিছু চলে নানা মন্তব্য করে এমন কি সময় সময় তাকে ঢিল মেরেও মজা উপভোগ করতে থাকে। আমরা এই সম্বন্ধে এতই উদাসীন যে ছেলেদের আমরা কিছু না বলে অতি স্বাভাবিকভাবে পাশ কাটিয়ে চলে যাই। কখনও বা বয়স্ক লোকদেরও এই বিষয় মজা উপভোগ করতে দেখেছি। আরও বহু উদাহরণ দেওয়া যায় কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। এই রকম আচরণের মূলে আমাদের মানসিক রোগ ও ঐ রোগীর মানসিক অবস্থার সঙ্গে পরিচয় না-থাকা এবং রোগকে রোগ বলে না জানার ফলে রোগীর অস্বাভাবিক আচরণকে বহুরূপীর আচরণ-এর মত কৌতুকপ্রদ বলে মনে করা সম্ভব হয়। রোগকে যদি রোগ বলে চেনা-জানা না হয় তবে তা সহজেই বিদ্রূপের বিষয়ও হতে পারে। মানসিক রোগী নানা রকম অঙ্গভঙ্গী বা নানা অস্বাভাবিক কথা বলে যা ঐ একই কারণে অর্থাৎ তাকে রোগের লক্ষণ বলে না চিনতে পারায় কৌতুকপ্রদ বলে মনে হয় এবং আমরা সেই অনুসারেই ঐ রোগীদের প্রতি ব্যবহার করে থাকি। মানসিক ব্যাধিও যে ব্যাধিই এই জ্ঞান আমাদের আজও তেমন নিবিড় হয়ে উঠতে পারে নি। এটা যে কত প্রয়োজন তা আরও বিশদভাবে বোঝানোর প্রয়োজন হয়ত সকলের পক্ষে নেই কিন্তু জনসাধারণের জন্য এরও প্রয়োজন আছে। এই বিষয় ভারতীয় মনঃসমীক্ষণ সমিতি নানা উপায়ে শারীরিক ব্যাধির চিকিৎসা ও অন্যান্য শিক্ষিত জন-সাধারণের মধ্যে মনের রোগ সম্বন্ধে নানা উপায়ে সচেতনতা আনার চেষ্টা করে চলেছেন। তাঁদের প্রকাশিত বাংলা ত্রৈমাসিক 'চিত্ত' পত্রিকায় মন সম্বন্ধে নানা বিষয় সহজবোধ্য আলোচনার মাধ্যমে মানসিক রোগ, তার প্রতিকার, উপযুক্ত শিশুপালন ও শিশুশিক্ষাপদ্ধতি প্রভৃতি নানা বিষয়ের সঙ্গে জনসাধারণকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। সামাজিক অবস্থার, বিশেষ করে মানুষের জ্ঞান বিশ্বাসের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটানো কঠিন কাজ। তবু সেই চেষ্টা থেকে বিরত থাকলে এই মৃতকল্প সমাজের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনা অসাধ্য হবে। সুতরাং যাঁর পক্ষে যতটুকুই হোক এই চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আর অন্য পথ নেই। উপযুক্ত শিক্ষা অবশ্যই প্রয়োজন।

এতক্ষণ কেবল এক রকম সমস্যার কথাই বলেছি। কিন্তু এটাই সবটুকু নয়—অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। সমগ্র সমস্যাটি আরও অনেক বিস্তৃত ও জটিল। যেমন, যে পরি-বারে কোনও মানসিক রোগী থাকে, যদি সেই রোগ এমন হয় যে পরিবারের সুখ-শান্তি বিঘ্নিত হয় তবে পরিবারের অন্যান্য সকলে খুব বেশী দিন সেই রোগীকে আবশ্যক সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করতে, তার সঙ্গে রোগীর প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার করতেও আর পারেন না। তখন রোগী রোগের প্রকোপে যে সকল লক্ষণের তাড়নায় অন্যদের বিরক্তিভাজন হয় সেই রোগের উপযুক্ত চিকিৎসা না পেয়ে শাসন, অবহেলা, তাচ্ছিল্য ইত্যাদি অন্যায় এবং আরও পীড়াদায়ক অবস্থায় পড়ে যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকে। একদিকে রোগের যন্ত্রণা অন্যদিকে প্রিয়জনের নিকট থেকে উপেক্ষা, শাসন ও অবহেলা কুড়িয়ে যন্ত্রণা বৃদ্ধির ফলে তার জীবনকেও দুঃসহ করে তোলে। আমরা নিজেদের নিকটতরদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বার্থের জালে এমন আবদ্ধ থাকি যে অপরের, বিশেষ করে মানসিক রোগীর দুঃখ কষ্টের দিকে ক্রমে অবহেলা করতে থাকি।

এর ফলে রোগীর অবস্থা ক্রমে অধিক-তর খারাপ হতে পারে। কেবলমাত্র ওষুধে দিয়ে বা অন্য কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিলেই মানসিক রোগীর মনের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনা অনেক সময়ই সম্ভব হয় না—রোগীর প্রতি সহানুভূতি থাকা একান্তই প্রয়োজন। আমরা সেই অতি-প্রয়োজনীয় সহানুভূতি থেকেই তাদের বঞ্চিত করি। যে মনের রোগ সারাবার জন্য একদিকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় অন্য

দিকে এই মনকেই যদি আঘাত করতে থাকা হয় তাহলে চিকিৎসার ফল যে আশাপ্রদ হতে পারে না তা সহজেই বোঝা যাবে। রোগীর কল্যাণের জন্যই যে আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ কিছু ত্যাগ করতে হবে এও আমাদের কাছে স্পষ্ট থাকা দরকার। শারীরিক রোগের ক্ষেত্রে আমরা এই বিষয় তবু অনেক পরিমাণে সজাগ থাকি। রোগীর রোগ যন্ত্রণা লাঘব করবার জন্য নানা রকমে প্রয়াসীও হই। শারীরিক রোগগ্রস্তদের সঙ্গে অর্থাৎ তাদের যন্ত্রণা কষ্ট ইত্যাদির সঙ্গে আমরা অপেক্ষাকৃত সহজে একাত্মতা বোধ করি। মানসিক রোগীর ক্ষেত্রে আমাদের সেই একাত্মতা তেমন সহজে হয় না। তাই এই দু শ্রেণীর রোগীর প্রতি আমাদের আচরণের বৈষম্য দেখা দেয়। মানসিক রোগীও যে এক প্রকার রোগে আক্রান্ত হয়ে দুঃখকষ্ট ভোগ করে এই সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট সচেতন নই। মানসিক রোগীর যে আমাদের মতই সুখ-দুঃখ অনুভব করার ক্ষমতা [illegible] [illegible] সমাজ থেকে [illegible] এই রকম এক ভ্রান্ত ধারণা আমরা অনেকেই আজও পোষণ করে চলি। [illegible] মানসিক রোগ থেকে সেরে ওঠে তাও তার সম্বন্ধে আশঙ্কাবোধ আমাদের যেন আর ফিরে আসতে চায় না। মনে [illegible] থেকেই যায়। [illegible] মানসিক রোগ হয়েছে, সুস্থ হয়ে উঠলেও আবার যে কোনও সময় সে গোলমাল [illegible] দিতে পারে। শরীরের রোগ সম্বন্ধে সহজে আমরা এমন আস্থাহীন হই না। শরীরের রোগ হলে তা কিছু দিনেই সেরে উঠবে অথবা কোনও স্থায়ী ক্ষতি হলেও সে তার সাধ্যমত কাজ চালাতে পারে এই আশা ও বিশ্বাস আমাদের মনে থাকে। কিন্তু মনের রোগের বেলায় আমাদের এই আস্থাটাই ভেঙে যায়। অতীতে যখন চিকিৎসার তেমন উন্নতি হয় নি তখন মানসিক রোগ সারানো কঠিন ছিল এটা সত্য। বর্তমানে এই মানসিক রোগের চিকিৎসার অনেক উন্নতি হয়েছে যার ফলে অনেক রোগ নির্মূল করাও সম্ভব হতে পারে। অবশ্য কি শারীরিক কি মানসিক কোনও ব্যাধিরই সব রোগ সারানো বা সব রোগীকে পূর্ণ সুস্থ করে তোলা আজও সম্ভব হয় না। তবুও মনের রোগ হলে সেই রোগীর সম্বন্ধে ভবিষ্যতের কার্যকলাপ সম্বন্ধে কেমন যেন সন্দেহ সাধারণের মনে থেকে যায়। তার ফলেই তেমন রোগী সুস্থ হয়ে উঠলেও অনেক সময় সহজ স্বাভাবিক জীবন যাপনে বাধা দেখা দেয়। এক ভদ্রলোকের কথা মনে পড়ছে। ৩৫।৩৬ বছর বয়সে তিনি কলকাতার এক বড় ব্যাঙ্কে কাজ করতেন। কলেজের পড়া শেষ করে ব্যাঙ্কের কাজে যোগ দেন। নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে অল্প দিনেই ভাল পদে উন্নীত হন। পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল হওয়ায় পরিবারের দায়-দায়িত্ব তাঁকেই পোয়াতে হত। হঠাৎ মানসিক রোগ দেখা দেওয়ায় এবং রোগ তীব্র হয়ে ওঠায় চাকুরী থেকে ছুটি নিতে হয়। চিকিৎসা প্রায় এক বৎসর হওয়ার পরে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। এতদিন আয় বন্ধ থাকায় ও চিকিৎসা ও পরিবারের ব্যয়নির্বাহ করতে সঞ্চিত টাকা খরচ হয়ে যায়। যখন রোগ সারল তখন আর্থিক সমস্যা তীব্র হয়ে ওঠে। তিনি ব্যাঙ্কের আগের চাকুরীতে যোগ দিতে গিয়ে নানান [illegible] হন। কর্তৃপক্ষ তাঁকে তাঁর পূর্বপদে কাজে নিতে রাজি না হওয়ায় সেই চাকুরী চলে যায়। ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ তাঁকে সেই ব্যাঙ্কের এক অতি-সাধারণ কাজে বহাল করে নিতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে ঐ পদে কাজ করা সম্ভব নয় মনে করে সে চাকুরী তিনি গ্রহণ করেন নি। অনেক [illegible] চেষ্টায় [illegible] কোথাও সফল হতে পারেন নি। ক্রমে আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যায়। একদিন তিনি নিরুপায় হয়ে হতাশভাবে আমাকে এসে বললেন, "ডাক্তারবাবু, আপনারা আমাকে ভাল করে তুললেন কেন? পাগল হয়েছিলাম সেই তো ভাল ছিল। এখন ভাল হয়ে উঠে সমাজে, পরিবারে আর ঠাঁই পাই না। আমাকে কেউ বিশ্বাস করে না। চাকুরী দেয় না। আমি আগের মতই এখন কাজ করতে পারি, কিন্তু ওরা আমাকে কাজ দেয় না। রোগে মরলাম না কিন্তু এখন না-খেয়ে মরবো, পরিবারের আর সকলকেও মরতে বাধ্য করব। কেন আমাকে ভাল করলেন ডাক্তারবাবু, পাগল থাকলে তো এ দুঃখ আমার সইতে হত না। ভাল হতে চেয়েছিলাম ভাল করে বাস করবো মনে করে, কিন্তু এখন?"

এই সামাজিক সমস্যার সমাধান আমরা না করলে আর কে করবে? খুব ঠিক কথা বলেছিলেন সেই ভদ্রলোক। ভাল করে সমাজে বাস করতেই যদি না পারলেন, অতীত রোগের ছাপ সুস্থ হওয়ার পরেও যদি ভবিষ্যৎ জীবনের পথরোধ করে দাঁড়ায়—তবে তেমন সুস্থ জীবন পেয়ে বেঁচে থাকবার প্রয়োজন কি?

দেশের নেতাদের, সমাজকল্যাণকামীদের, সমাজসেবীদের ও জনসাধারণের কাছে এই প্রশ্নের উত্তর মানসিক রোগীরাও যেমন দাবী করতে পারেন, আমরাও তেমনি এই প্রশ্ন তাঁদের ও নিজেদের জিজ্ঞাসা করতে পারি। কেবল প্রশ্ন করলেই কাজ শেষ হল না—এর প্রতিকার চাই। আমরা নিজেদের দেশকে জনকল্যাণকামী দেশ বলে মনে করে থাকি। তাই এই কল্যাণটুকু আমরা

দাবী করতে পারি। মনে রাখতে হবে উল্লিখিত ভদ্রলোক একাই মাত্র এই সমস্যায় পড়েন নি, অনেকেরই এই মানসিক রোগ এক সময় হয়েছিল বলে জীবনের নানা সময় নানা পথে অলঙ্ঘনীয় বাধার সৃষ্টি করে। শরীরের এমন অনেক রোগ আছে যার ফলে আরোগ্য লাভের পরেও রোগী আর রোগপূর্বের কার্যক্ষমতা সম্পূর্ণ ফিরে পায় না। তবুও, বিশেষ ক্ষেত্র ভিন্ন, তাদের কাজ পেতে এমন কি তার আগের কাজে ফিরে যেতে তেমন কোনও বাধা দেখা দেয় না। কিম্বা তা নিয়ে ভবিষ্যতের সন্দেহও কাউকে বিচলিত করে না। কিন্তু মনের রোগের বেলায় এমন ভিন্ন বিচার-বিবেচনার কারণ আমাদের আস্থার অভাব, মনের রোগ সেরে যাওয়ার পরেও আমরা যেন রোগের সম্পূর্ণ বা কাজ চালাবার মত সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দিহান থেকে যাই। কেবল তাই নয়, ভবিষ্যতে যে কোনও সময় যেন নোটিশ না-দিয়েই কখন আবার সেই মনের রোগ চেপে বসবে এমন একটা বিশ্বাসও যেন সাধারণের মনে থাকে। এক কথায় মনের রোগীর উপর ভরসা যেন আর থাকে না। একবার মনের রোগ হলেই সে যেন সমাজচ্যুত হয়ে অস্পৃশ্য হয়ে যায়। এরকম ধারণার মূলে আছে আমাদের অজ্ঞতা ও দীর্ঘদিনের সংস্কার। উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা এই অন্ধ বিশ্বাসের কবল থেকে সমাজকে মুক্ত করতেই হবে। তা না হলে এই সমাজে মানসিক রোগী সম্মানের সঙ্গে বসবাস করতে পারবে না।

একটু ভেবে দেখলে সহজেই ধরা পড়বে আমরা যাদের নিয়ে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন গড়ে তুলেছি তাদের মধ্যে অনেকেই দৈহিক ও মানসিক বিচারে সম্পূর্ণ সুস্থতার পর্যায়ে পড়েন না। শরীরের কথা নাই বা তুললাম। মনের দিক দিয়ে বিচার করলেও পরিচিত আত্মীয় বন্ধুবান্ধব অনেকের মধ্যেই কি রোগের মাত্রাধিক্য, স্বার্থপরতা, নীচতা, হিংস্রতা, খুঁতখুঁতে স্বভাব, শুচিবায়ু, সন্দেহবাতিকতা, অতিমাত্রায় অযৌক্তিক ভয়, দায়িত্ববোধ-হীনতা ইত্যাদি বহু মানসিক রোগ লক্ষণ দেখতে পাই না? তাদের সম্বন্ধে আমরা কি বিশেষ কোনও বাধা-নিষেধ আরোপ করে চলি? এই লক্ষণগুলির কোনওটা যদি অতি-মাত্রায় প্রকট হয়ে ওঠে, তখন বাধ্য হয়ে আমরা সতর্ক হই। মানসিক রোগী যখন সুস্থ হয়ে ওঠে তখন তারা কি এদের চেয়ে বেশি অকর্মণ্য বিবেচিত হবে? অনেক রোগের পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা থাকতে পারে সত্যি। কিন্তু আবার যে আগের মতোই বাড়াবাড়ি রোগ দেখা দেবেই এমন কথা তো বলা যায় না! তাছাড়া যদিই বা পুনরাক্রমণ হয় তবে তখন আবার চিকিৎসা করে সুস্থ করে তোলাও ত সম্ভব। তবে মানসিক রোগীদের বেলায় এই চিরবর্জনের মনোভাব কেন থাকবে?

আমাদের দেশে বড় বড় কয়েকটি শহরে ছাড়া এত বড় দেশের কোনো জায়গাতেই মানসিক রোগ নিয়মিত চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রায় নেই বললেই চলে। গ্রামের ও ছোট শহরের রোগীদের চিকিৎসা আজও বেশীর ভাগই ঝাড়ফুঁক, মানত, মুষ্টি-যোগ, কবচ, পূজোর বালা ইত্যাদিতেই আবদ্ধ থাকে। খুব কম রোগীই আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার সুযোগ পায়। গ্রাম্য কবিরাজ, হাতুড়ে বৈদ্য প্রভৃতিরাও নিজেদের বিদ্যানুযায়ী কিছু চিকিৎসা করেন। তাতে একেবারেই যে কোনও ফল পাওয়া যায় না এমন নয়। তবে বহু রোগীই অচিকিৎসায় বা বিনা চিকিৎসায় ভুগে পরিবারের ও নিজের বহু কষ্টের কারণ হয়। পরিবারে একজন মানসিক রোগী থাকলে সে-পরিবারের সুখ-শান্তি বিঘ্নিত হয়, আর্থিক জটিলতা বৃদ্ধি পায়। সর্বা-পেক্ষা ক্ষতিকর হয় শিশু ও বালক-বালিকাদের মানসিক স্বাস্থ্যের। বাড়িতে মানসিক রোগী থাকলে সেই সব রোগীর বিকারগ্রস্ত অবস্থায় তাদের চলা-বলা ব্যবহারাদির বিশৃঙ্খলতা, অশিষ্টতা, অশালীনতা ইত্যাদি শিশু-মনের উপর বিষ-ক্রিয়ার কার্য করে। মনের সুস্থ গঠনের জন্য যে পরিবেশ দরকার মানসিক রোগী থাকায় তার অভাব ঘটায়, শিশু-মন বিকৃত হতে থাকে। পরবর্তী জীবনে এর ক্ষতি-কর প্রভাব লক্ষিত হয়। সমাজের দিক দিয়ে এটা একটা অতি বড় ক্ষতি। যে-শিশু সমাজের ও দেশের ভবিষ্যৎ, তারা জীবনের সূচনাতেই যদি এইরকম মানস-রোগের অপক্রিয়ার প্রভাব পড়ে তবে বড় হয়ে সে সুস্থ জীবন সহজে যাপন করতে পারে না। সেইজন্য সমাজ-জীবনেও নানা সমস্যা দেখা দেয়। প্রথম থেকেই সেই সম্ভাবনার মূলোচ্ছেদ করা প্রয়োজন। কিন্তু আজও আমাদের সেই সচেতনতা দেখা যায় না। আমাদের দেশের প্রায় সব মানুষই গ্রামে বাস করে। শহরবাসীর সংখ্যা তাদের তুলনায় অতি সামান্য। তবু সাধারণ মানুষের জন্য মানসিক রোগ চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা নেই। শারীরিক রোগ চিকিৎসার জন্যও উপযুক্ত ব্যবস্থা তাদের জন্য নেই সত্য, তবু, সে-ব্যবস্থা যাওবা কিছু আছে, মানসিক রোগীর জন্য প্রায় কোনো ব্যবস্থাই নেই। অথচ নানা সমস্যার বেড়াজালে পড়ে দেশে মানসিক রোগীর সংখ্যা ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। কি পরিমাণ এই রোগ বেড়েছে তাও সঠিক করে বলার উপায় নেই। লোকগণনার সময় মানসিক রোগীর পরিসংখ্যানের ভাল ব্যবস্থা কিছু নেই। অথচ সমাজকল্যাণ সম্বন্ধে কিছু করতে হলে এই সকল তথ্য একান্ত প্রয়োজন। আমরা এই সব বিষয়ে কত পিছনে পড়ে আছি তা একটু নজর দিলেই বুঝতে পারা যায়।

মনের রোগ চিকিৎসার বিষয়ে যে সমস্যা ও অবস্থা চলছে, সেই সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলে এই প্রসঙ্গ শেষ করব। পরে ক্রমে মনের সম্বন্ধে কিছু পরিচয়, মনের রোগ কেন হয়, তার প্রতিকার ও রোগ নিরূপণের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করার ইচ্ছে রইল।

বলেছি, বড় বড় কয়েকটি শহরে কিছু কিছু চিকিৎসক মানসিক রোগ-বিশেষজ্ঞ হিসাবে কাজ করেন। সরকার পরিচালিত মানসিক হাসপাতাল ভারতের প্রায় প্রতি রাজ্যেই একটি আছে। কিন্তু তাদের মোট শয্যা-সংখ্যা এতই কম যে প্রয়োজনের এক-শতাংশও তা দিয়ে মেটে না। বে-সরকারী কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বড় শহরের আওতায় গড়ে উঠেছে এবং মোটামুটি লাভজনক ব্যবসায় হিসাবেই চলছে। অবশ্য এই প্রতিষ্ঠানগুলিতেও কিছু রোগী, যেমনই হোক, কিছু চিকিৎসা পাচ্ছে। আমাদের দেশে ১৯১২ সালে যে আইন Indian Lunacy Act নামে প্রচলিত হয়, আজও সেই আইন মানসিক রোগীর চিকিৎসার বিষয়ের অনেক বড় বাধা হয়ে

আছে। সেই যুগে 'পাগল' ছাড়া মানসিক ব্যাধি সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠানে রেখে চিকিৎসার বিষয় ভাববার কোনও অবসর ছিল না। সেই সময় মানসিক রোগীকে (বাতুল শ্রেণীদের) কয়েদখানার মত ব্যবস্থায় আটক করে রেখে অন্যদের ক্ষয়ক্ষতি নিবারণের দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই পাগলা গারদ বা মানসিক হাসপাতালের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। তখন ঐ রোগের চিকিৎসার কোনও ভাল ওষুধ ইত্যাদি জানা ছিল না। কাকেও আটক করে রাখতে হলে জেলা-শাসক বা ভারপ্রাপ্ত কোনও সরকারী মহকুমা-শাসকের আদেশ প্রয়োজন হয়। এই জন্য মানসিক রোগীকে হাসপাতালে আটক করে রাখতে হলেও উক্ত আদেশ-নামার প্রয়োজন হয়। সকলের পক্ষে, বিশেষ করে গ্রামের লোকের পক্ষে বহু মাইল দূরে রোগী নিয়ে গিয়ে আদালতে হাজির করিয়ে বহু টাকা দিয়ে ডাক্তারের সার্টিফিকেট নিয়ে আরজি পেশ করে আদেশ-পত্র নিয়ে পরে হাসপাতালে রোগী ভর্তি করা যে কত কঠিন ও ব্যয়সাধ্য তা সহজেই অনুমেয়। এছাড়াও আদালতের ছাপযুক্ত পাগল আখ্যা পেতে অনেকেরই প্রবল আপত্তি, সামাজিক কারণে থাকে। অনেক আক্ষেপ-আলোচনা ও সভা-সমিতি এজন্য হয়েছে। কিন্তু আজও এর প্রতিকার কিছু করা হল না। সরকার অনড়। রোগ হলে চিকিৎসার সুবিধার জন্যও যদি আদালতের দ্বারস্থ হতে হয় তবে এর চেয়ে আদিম দুরবস্থা আর কি হতে পারে! উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য যদি রোগীকে প্রতিষ্ঠানে আবদ্ধ করে রাখতে হয় তা রাখতে হবে। শরীরের রোগের চিকিৎসার জন্য রোগীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কি অস্ত্রোপচারের পরে খাটের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয় না! রোগীর কল্যাণের জন্য চিকিৎসকের নির্দেশমত ব্যবস্থা করার জন্যে আদালতের নির্দেশ দরকার হবে কেন? মানসিক রোগও রোগ। এই রোগের জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন তা মেনে নিতেই হবে। আপত্তি উঠতে পারে, এমন সহজ ব্যবস্থার সুযোগ করে দিলে স্বার্থপর ব্যক্তি তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একজনকে রোগী সাজিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে নিজের বৈষয়িক বা অন্য কোনও উদ্দেশ্য পূরণ করে নিতে পারে। এর প্রতিকারের অন্য বহু উপায় উদ্ভাবন সম্ভব। কিন্তু সেই ভয়ে রোগীর চিকিৎসা বন্ধ থাকতে পারে না। যত নিখুঁত আইন প্রণয়ন করা হোক না কেন মানুষ নিজের স্বার্থের তাগিদে এক সময় তার মধ্যেও ফাঁক খুঁজে বের করে বা আইনের নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে আবার নতুন জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে। ইতিহাস এর প্রমাণ দেবে। সে-যুগে চিকিৎসা তেমন ভাল ছিল না। বর্তমান সময়ে মানসিক রোগের বহু নতুন ওষুধ বাজারে প্রায় প্রতি মাসেই আমদানী হচ্ছে। বহু গবেষণা চলছে—যার ফলে নতুন তথ্য জানা যাচ্ছে এবং এই রোগের চিকিৎসার সুফলও দেখা যাচ্ছে। এই পরিবর্তিত অবস্থায় রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে আটকিয়ে রাখার প্রশ্ন আর নেই। আগে বলেছি সব রোগীকে সুস্থ করা সম্ভব হয় না। সেই রকম রোগীদের জন্য ভিন্ন রকমের আবাসিক ব্যবস্থা করতে হবে। যাদের চিকিৎসায় উপকার পাবার সম্ভাবনা আছে আইনের কবলে পড়ে তাদের যদি সময়মত উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে না পারা যায় এবং দেরি হয়ে যাওয়ায় রোগ যদি দুরারোগ্য হয়ে ওঠে তা অতি দুঃখের কারণ হয়। আইন বাঁচাতে গিয়ে যদি একটিও জীবন নষ্ট হয়, তবে সেজন্য দায়ী কে হবে? রোগের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শমত ব্যবস্থার প্রচলন করতে হবে। জজ, ম্যাজিস্ট্রেটের এ-বিষয়ে কোনও এক্তিয়ার থাকতে পারে না। বর্তমান আইন ব্যবস্থা এ-বিষয়ে অচল।

শুধু এই নয়। চিকিৎসকের অভাবও এক বড় সমস্যা। উপযুক্ত শিক্ষিত চিকিৎসক খুব কমই আছেন। অনেক দৈহিক রোগচিকিৎসকও আজকাল ওষুধের বিজ্ঞাপন পড়ে মানসিক রোগ চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র দিতে থাকেন। অর্থলিপ্সার উপরেও চিকিৎসকের বিবেক উন্নত ও প্রবল থাকা দরকার। যে রোগ চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞের সাহায্য পাওয়া সম্ভব সেই রোগীকে যত সত্বর সম্ভব বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠানোই কর্তব্য। তা সম্ভব না হলে সাধারণ চিকিৎসক যতটুকু চিকিৎসা করতে পারেন তাই করবেন। তাছাড়া আর উপায় কি? মনে রাখা উচিত যে, বর্তমানকালে মানসিক চিকিৎসা এক বিশেষ চিকিৎসা-পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে এবং এই জন্য বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। সাধারণ চিকিৎসাবিদ্যায় শিক্ষা-কালীনকালে মনের রোগ সম্বন্ধে যতটুকু শেখানো হয় তা নিতান্তই প্রাথমিক স্তরের। সুতরাং কলেজ থেকে পাশ করে যাঁরা সাধারণ ডাক্তার হয়ে বের হন, তাঁদের পক্ষে বিশেষভাবে মানসিক রোগ সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা না নিয়ে এই রোগীর চিকিৎসা করা সঙ্গত নয়।

মানসিক রোগীর প্রতি আত্মীয়স্বজনের সঙ্গত ব্যবহার এবং রোগীর সেবাযত্নের জন্য শুশ্রূষাকারীর বিশেষ শিক্ষা অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন। জনসাধারণকে এ বিষয় প্রচারের দ্বারা অবহিত করাতে হবে। এই রোগীর শুশ্রূষার জন্যও বিশেষ শিক্ষা-ব্যবস্থার দরকার। তা না হলে চিকিৎসার সুফল ব্যাহত হতে পারে। চিকিৎসার জন্য যে ওষুধ দরকার, অনেক সময় তা বাজারে পাওয়া যায় না। বিদেশী ওষুধের আমদানি নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় এই সমস্যা কোনো কোনো সময় গুরুতর হয়ে ওঠে। তাছাড়া বিশেষ শিক্ষার মধ্যে দিয়ে না গিয়ে অর্থ বা নামের নেশায় কিছুসংখ্যক দুর্নীতিক নিজেদের বিশেষজ্ঞ বলে প্রচার করেন। এতে রোগীদের দুর্ভোগ বাড়ে ও অর্থনাশ হয়।

রোগ হলে তার নিদানের ব্যবস্থা করা যেমন প্রয়োজন, যাতে রোগ না হয়, সেই ব্যবস্থা করা আরও বেশী প্রয়োজন। মানসিক রোগ কি প্রকারে প্রতিরোধ করা যায়, সে সম্বন্ধে ভবিষ্যতে কিছু বলবার ইচ্ছে রইল।

—তরুণচন্দ্র সিংহ

আপনি কেমন আছেন?
—উত্তর খুবই প্রাঞ্জল—'প্রাণ রাখতেই প্রাণান্ত।'...কিন্তু প্রাণ রাখার চেষ্টায় যে ওষুধপত্র ডাক্তার না দেখিয়ে নিজেরাই কিনে ব্যবহার করি, আর খাদ্যের নামে যেসব অখাদ্য আমরা খাই, তাতেও কম প্রাণান্ত ঘটে না। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তাই অসুখবিসুখ, পুষ্টি ও পরিবেশের বিষয়ে ওয়াকিবহাল করবেন এই বিভাগে।

বসন্ত উচ্ছেদ

এক যুগ—হ্যাঁ এক যুগেরও আগে বিশ্বস্বাস্থ্য সংসদ ও সোভিয়েট ইউনিয়নের সহযোগিতায় এদেশ থেকে বসন্ত উচ্ছেদের যে বিস্তৃত কর্মসূচী আমরা নিয়েছিলাম, আজ স্বীকার করতে হচ্ছে, পূর্ণ সাফল্য তাতে আসে নি। এ বছর আবার নতুন করে ঘোষণা করতে হচ্ছে, বসন্ত মহামারীর আশঙ্কা প্রবল, শহর কলকাতায় বসন্তে গড়ে মৃত্যু হচ্ছে সপ্তাহে ১০, সবাই টীকা নিন। ২৪-পরগণা, হাওড়া, হুগলী, কুচবিহারও আক্রান্ত।

অথচ পাশ্চাত্য দেশগুলিতে, এমন কি, সোভিয়েট ইউনিয়নের এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত অঙ্গরাজ্যগুলিতেও বসন্ত রোগ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়েছে অনেক আগেই। আরও আশ্চর্যের কথা, আমাদের দেশে সাধারণত যে সব রোগে আমরা বেশী ভুগি এবং অকালমৃত্যু বরণ করি, তার মধ্যে সম্ভবত বসন্তই হচ্ছে সবচেয়ে সহজ প্রতিরোধ্য। শারীরিক কষ্ট নগণ্য, টেকনিক্যাল ও সাংগঠনিক হাঙ্গামা কম, এমন কি খরচও।

কেন এমনটা হয়! ওরা যা পারে, আমরা তা পারি না কেন! এবার শীত পড়ে নি বলে? কিন্তু প্রকৃতির উপরেই যদি নির্ভর করতে হয়, তাহলে বিজ্ঞানের স্থান কোথায়? জনসংখ্যা কমান যাচ্ছে না তাই? কিন্তু সে সব মনে রেখে, জেনে-শুনেই তো উচ্ছেদের কর্মসূচী নেওয়া হয়েছিল। কারণ যাই হোক, আলোচনাটা একসপার্ট মহলে সীমাবদ্ধ না রেখে খোলাখুলি হওয়াই ভাল। এমন কি মত-দ্বৈধতা যদি থাকে, তবুও। কারণ এত বড় একটা বিশাল জনবহুল দেশে কোন গণ-কর্মসূচীকে উপরতলায় চুপি চুপি সম্পন্ন করা যায় না, একাধিক ক্ষেত্রে তা আমরা চোখের উপর দেখছি।

একথা ঠিক যে, অতীতে গ্লিসারিনে মেশান বসন্তের যে টীকা ব্যবহার করা হত, নিয়ম মত ঠাণ্ডায় (৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে) তা রাখা হত না বলে তার পোটেন্সী কমে বা নষ্ট হয়ে যেত, অনেক সময় তা 'উঠত না—অর্থাৎ রক্তে বসন্ত বিরোধী শক্তি বা অনাক্রম্যতা সঠিকভাবে জাগত না। ফলে হয় টীকা দিয়ে কোন ফল হত না, অথবা একই লোককে বছর বছর টীকা দেওয়ার প্রয়োজন হত। অথচ সে-ধরনের বিস্তৃত ও সুশৃঙ্খল সংগঠন আমাদের ছিল না। সোভিয়েট ইউনিয়নে তৈরী ঠাণ্ডায় শুখানো টীকা (ফ্রীজ ড্রায়েড ভ্যাকসিন) বিনামূল্যে পাওয়ার পর এই টেকনিক্যাল অসুবিধা দূর হয়েছে। এখন আমরা এই উন্নত ধরনের শুকনো টীকা ভারতেও তৈরী করছি। অবশ্য মনে রাখা দরকার, মাদ্রাজে তৈরী এই শুকনো টীকাও চার সপ্তাহের বেশী ৩৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে বা এদেশের স্বাভাবিক তাপমাত্রার আবহাওয়ায় রাখা উচিত নয়, রাখলে পোটেন্সী নষ্ট হতে পারে, টীকা বিফল হতে পারে। কাজেই প্রাইমারী বা জীবনে প্রথম টীকা দেওয়ার পর টীকা যদি না 'ওঠে', সন্দেহ করা যেতে পারে যে, হয়ত কোন টেকনিক্যাল ত্রুটির জন্যে দেহে অনাক্রম্যতা সৃষ্টি হয় নি। সেক্ষেত্রে বিশেষ করে শিশুদের বেলায় অভিজ্ঞ ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে আর একবার টীকা দেওয়াই উচিত। মনে রাখা দরকার, বসন্তে শিশুমৃত্যুর হার খুব বেশী —কখনো কখনো শতকরা প্রায় ৭০—৮০ পর্যন্ত।

আগে ধারণা ছিল, একবার টীকা নিলে অনাক্রম্যতা বা রক্তে ঐ বিশেষ রোগ বিরোধী শক্তি থাকে সাত বছর। এখন বলা হচ্ছে, না তা নয়, ওটা থাকে বছর তিনেক। তবে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে যেসব দেশে বা যে সব অঞ্চলে বসন্ত প্রায়ই দেখা দেয়, সেখানকার অধিবাসীদের বছর বছর টীকা দেওয়াই নিরাপদ। কারণ অনাক্রম্যতা সকলের দেহে সমান পর্যায়ে থাকে না। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, দীর্ঘকাল অপুষ্টিতে ভুগলে, বিশেষ করে যারা প্রোটিন কম খায় তাদের দেহে অনাক্রম্যতা বেশী দিন রোগ-জীবাণুদের প্রতিহত করার মত উঁচু পর্দায় থাকে না, কমে যায়। আমাদের দেশে শাকান্নভোজী দরিদ্রদের ক্ষেত্রে একথাটা মনে রাখা উচিত। নইলে টীকার সুফল বা আত্মনিরাপত্তা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা থেকে যেতে পারে।

অনেক মা মনে করেন, আমি তো আমার শিশুকে বাইরে যেতে বা অন্য ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে মিশতে দিই না — আমার শিশুর বসন্ত হবে কেন! কিন্তু আমরা জানি, বিশেষ বিশেষ রোগ-জীবাণু বিশেষ বিশেষ ঋতুতে সক্রিয় ও প্রজননশীল হয়ে ওঠে, তাদের সংক্রমণ ক্ষমতাও বেড়ে যায়। বসন্ত-জীবাণুর দাপট বাড়ে শীতের শেষে শুকনো নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায়, মিঠে হলেও মলয় বাতাস তাদের অলক্ষ্যে ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করে, মানুষের শরীরে ওরা ঢোকে শ্বাসপথে। কাজেই ঘরের মধ্যে বা কোলের মধ্যে রেখে পার পাওয়ার উপায় নেই। আগে দেখা যেত, রোগের প্রকোপ বাড়লে কিম্বা প্রচলিত আইনমত সপ্তাহে বিশ-ত্রিশটা রোগীর মৃত্যু ঘটলে তবেই আমাদের টনক নড়ত, বিপদ সংকেত ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা নেওয়া হত তারপর। অফিসার মহলে একটা চেষ্টাও চলত বিপদকে ধামাচাপা দেওয়ার। এবার শীত আসতে দেরী হওয়ায় বসন্তের আগমনী একটু আগেই আশঙ্কা করে কর্তৃপক্ষ সঠিকভাবেই আগে থাকতে ঢোল সহরৎ দিচ্ছেন। টীকা নেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগতে পারে, এই যে সাবধানতা ও প্রস্তুতি, এর দ্বারা মহামারীকে প্রতিহত করা যাবে তো? বসন্ত উচ্ছেদের কর্মসূচী সাফল্যের পথে এগোবে

তা? এগোলে কতটা এগোবে? বসন্তকে চিরবিদায় দেওয়া যাবে কত দিনে?

প্রশ্নটা কঠিন। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে জটিল সব সামাজিক প্রশ্ন—যা নিয়তই প্রতিরোধ করছে বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ সাফল্যগুলির সামাজিক প্রয়োগকে। আসলে অশিক্ষা এবং কুসংস্কার আমাদের দেশে এত ব্যাপক এবং এত গভীর যে বসন্তে ভুগে ছেলেমেয়েগুলো অন্ধ হয়ে যাচ্ছে কিম্বা হাসপাতাল থেকে ঘরে ফিরছে না দেখেও বহু লোক টীকা নিতে চান না বা দিতে দেন না। টীকা নিলে বসন্ত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় জেনেও দেন না। এমনও দেখা গিয়েছে, বহু সাধ্য-সাধনার পর মা শেষ পর্যন্ত নিজের হাতখানা বাড়িয়ে দিয়েছেন, কিন্তু কোলের শিশুকে টীকা দিতে দেন নি। যখন বলা হয়েছে, শিশুরা দুর্বল, তাদের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ শক্তি কম বলে শিশুদের পক্ষে বসন্ত অতি মারাত্মক, মা প্রচণ্ড রেগে গিয়েছেন ওরকম অলুক্ষণে কথা উচ্চারণ করার জন্যে। এই বেদনাদায়ক কুসংস্কার বাঙালী মায়েদের মধ্যে যেমন আছে তারচেয়ে বেশী আছে অবাঙালী বস্তীবাসিনীদের মধ্যে।

অবশ্য সঙ্গে কিছু বাস্তব সমস্যাও আছে। প্রাথমিক টীকা দেওয়ার পর যে প্রতিক্রিয়া এবং সাময়িক অসুস্থতা দেখা দেয়, টীকাদাররা তার কোন দায়দায়িত্ব নেন না। ফলে চাকরীজীবী দরিদ্র মায়েরা সুখে থাকতে ভূতে কিলোন এবং আনুষঙ্গিক চিকিৎসার দায়ভার — কোনটাই পছন্দ করেন না।

অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে, সুস্থ ও মানুষের দেহে খুব কম পরিমাণ রোগ-জীবাণু ধীরে ধীরে প্রবেশ করলে কখনো কখনো একটা স্বাভাবিক অনাক্রম্যতা জাগে। সেই কারণে মহামারী পীড়িত এলাকায় বসবাস করেও কেউ কেউ আশ্চর্য-ভাবে রেহাই পেয়ে যান। এটা কোন অলৌকিক ব্যাপার নয়, বিরল ঘটনা মাত্র। এই ঝুঁকি নিতে যাওয়া খুবই বিপজ্জনক এবং চূড়ান্ত বোকামী।

আবার এও দেখা গিয়েছে, যারা কোন দিন বসন্ত-পীড়িত এলাকায় বাস করে নি বা যাদের শরীরে বসন্ত-জীবাণু কখনো প্রবেশ করে নি, টীকা না নিয়ে মহামারী অঞ্চলে এলে অনাক্রম্যতা বা প্রতিরোধ শক্তির অভাবে তারা রোগের সহজ শিকার হয়ে পড়ে। অপর দিকে বসন্ত-জীবাণু শরীরে প্রবেশ করার পর দেহের স্বাভাবিক প্রতিরোধ শক্তিকে পরাস্ত করে রোগ লক্ষণ প্রকাশ পেতে সময় লাগে সাধারণত ১৪ দিন। সুতরাং জীবাণুবাহী কোন ব্যক্তি যদি এমন কোন গ্রামাঞ্চলে বা অন্য কোন রাজ্যে যান সেখানকার অধিবাসীদের টীকা দেওয়া হয়নি তবে সেই ব্যক্তি পীড়িত হওয়ার পর সেখানে বসন্ত দেখা দেওয়ার বাস্তব সম্ভাবনা থাকে।

পশ্চিম বাংলায় প্রায় প্রতিদিনই বেশ কিছু অবাঙালী আসছেন কর্মসংস্থানের আশায়। আবার এই রাজ্যের গ্রাম থেকে বা অঞ্চলান্তর থেকে শহরে আসা-যাওয়া করছেন অনেকে। কখন এঁরা আসেন, কোথায় ডেরা বাঁধেন, কেউ বা তার খবর রাখে। তাঁদের খুঁজে বের করে টীকা দেওয়া খুবই কঠিন। যেহেতু এই সব আগন্তুকদের মধ্যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন নিরক্ষরের সংখ্যা কিছু কম নয়, সুতরাং একদিকে রেডিও মারফৎ বিভিন্ন ভাষায় নিরন্তর প্রচার এবং সঙ্গে সঙ্গে এক একটি এলাকা কর্ডন করে বাধ্যতামূলক টীকা দেওয়া ছাড়া বসন্ত উচ্ছেদের আর কোন সহজ পথ দেখা যাচ্ছে না। এবং এই কাজ চালিয়ে যেতে হবে বেশ কয়েক বছর ধরে—যত দিন না রোগের প্রকোপ হার (মৃত্যুহার নয়) শূন্যেতে এসে পৌঁছায়। বলা বাহুল্য, এত বড় একটা বিশাল জনবহুল দেশের বর্তমান ও আগামী দিনের প্রত্যেকটি মানুষকে বছর বছর টীকা দেওয়া সহজ কাজ নয়। কাজেই সাময়িক সাফল্যে আত্মতুষ্টির নেশাটি ছাড়তেই হবে।

প্রসঙ্গত আইন পাশ করে বসন্তের টীকা দেওয়া বাধ্যতামূলক করার কথা এসে পড়ে। বর্তমান মহামারী-বিরোধী আইনটি সংশোধন করে নতুন আইন যদি করতেই হয়, তবে হাসপাতাল ও নার্সিংহোম থেকে মা ও শিশুকে ছেড়ে দেওয়ার আগে এবং ডাক্তার, নার্স ও ধাত্রীদের পক্ষে শিশুকে টীকা দেওয়া অবশ্যকরণীয় হিসাবে গণ্য করা উচিত। কিন্তু গণশিক্ষা ও গণউদ্যোগ ছাড়া শুধু আইন পাশ করে বা ভয় দেখিয়ে সমাজ সংস্কার যে সম্ভব নয়, তা আমরা সবাই জানি। সুতরাং অন্যান্য ব্যবস্থার সঙ্গে এই পূর্বশর্তগুলি যদি পালন করা যায়, তবে ভারতবর্ষের মাটি থেকে মারী গুটিকাকে নির্মূল করা নিশ্চয়ই সম্ভব। বসন্ত উচ্ছেদের ব্রত পালনে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ভূমিকাটি পালন করলে নিরাশ হওয়ার কারণ নেই।

—অশ্বিনী সামন্ত

আমরা গড়ে তুলি

লোকে বলে—অবক্ষয়ের যুগ, ভেঙে পড়ার দিন,
কিন্তু সত্যিই কি তাই?
আমরা কি গড়েও তুলছি না?
অন্তত ক্লাব আর লাইব্রেরীগুলোর দিকে
যদি তাকাই তাহলে কিন্তু অন্য চেহারাই
দেখি। হাজার অসুবিধের মধ্যেও পুরনো
ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা
করছি, নতুন ভবিষ্যৎ গড়ে তুলছি।
আমাদের নবযুগের যুবসমাজের সেই
অক্লান্ত সাংস্কৃতিক প্রয়াসকে তুলে
ধরা হবে এই বিভাগে।

শিশিরকুমার ইনস্টিটিউট

...ধূসর লাল রঙের বাড়ীটা বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে পুরাতনের জীর্ণতার ক্লান্ত পরিশ্রান্তি। আনাচে-কানাচে, এখানে-ওখানে যেন মন্থর অতীতের নিঃশ্বাস ঝরছে। কিন্তু না। চোখের আবছা আকাশটা সরে গেল মনের অতলে ডুবে গিয়ে। ভিতরে এসে অনুভব করলাম, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যেন একটি ধ্যানমৌন সমুদ্রে মুখর হয়ে উঠতে চাইছে। কলতান এখানে ভাষা পেয়েছে যেন এক আশ্চর্য সুন্দর নীরবতায়।...

...কলকাতার বাগবাজারের রাস্তা ধরে সোজা এগিয়ে আসুন। অমৃত পত্রিকার অফিসে ঢুকতে গিয়ে যে ছোট্ট গলিটা, তার উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে আছে বাড়ীটা। দেখবেন লেখা আছে 'শিশিরকুমার ইনস্টিটিউট'। মহাত্মা শিশিরকুমারের নামে গড়ে-ওঠা এই প্রতিষ্ঠানটির ইতিহাসের গভীরে যেতে পারলে নিশ্চয়ই সেখান থেকে খুঁজে পাওয়া যাবে আমাদের দেশের শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য, সমাজনীতির কিছু প্রদীপ্ত সংকেত।...

...যে চেহারায়, যে নামে আজকের 'শিশিরকুমার ইনস্টিটিউট' দাঁড়িয়ে আছে অনেক ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে, যাত্রাশুরুর প্রথম কম্পিত মুহূর্তে তা ছিল কিন্তু অন্য রঙে, অন্য ঋতুর কুয়াশায় ঢাকা। আজকের আলপনাকে চোখ ভরে দেখতে গেলে, মন ভরে তার সৌন্দর্য অনুভব করতে গেলে ফিরে তাকাতে হবে সেই দিনগুলোর দিকে যে সময়ে কিছু উদ্দীপনার মেলবন্ধনে, কিছু আবেগ আর কিছু সম্প্রীতির ছোঁয়ায় গড়ে উঠেছিল একটি সম্ভাবনাময় প্রতিষ্ঠান।

সময়টা ছিল ১৯২০। জায়গার নাম শ্যামবাজারের 'কাঁটাপুকুর'। কিছু বই সংগ্রহ করে 'একটা লাইব্রেরী করলে মন্দ হয় না', ভাবলো সাভ-আর্টজন স্কুলের উদ্যমী ছেলে। তাদের সে ভাবনা শুধু মনের কোণেই নিঃশেষিত হয়ে গেল না, বাস্তব রূপ নিতে উন্মুখ হয়ে উঠলো। সহযোগিতা এবং সাহায্যও কিছু আসতে [illegible] করলো। চাঁদা দিয়ে অথবা অল্প কয়েকটি বই দিয়ে একটি গ্রন্থাগার অর্থাৎ লাইব্রেরী গড়ে উঠলো। এই সব ছেলেদের উৎসাহ, উদ্দীপনা খেলাধুলোর মধ্যেও সোচ্চার ছিল বলেই বই পড়াকে আর খেলাধুলোকে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে নেওয়া হোল। একটি নাম তৈরী হোল 'কাঁটাপুকুর স্পোর্টিং ক্লাব এবং লাইব্রেরী'। প্রতিষ্ঠিত হোল ৫।১ কাঁটাপুকুর লেনে স্বর্গীয় নীরববরণ গুহর বাড়ীতে।

ক্লাবটি গড়ে উঠলেই কয়েক দিনের মধ্যেই প্রাণময়তা অনুভব করা গেল। নতুন নতুন সভ্য এলো কতো উদ্যমের জোয়ার নিয়ে। বইয়ের সংখ্যা যেখানে ছিল প্রথমে ২০, সেটা এসে দাঁড়ালো ২৪০এ। জনপ্রিয়তাও সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে লাগলো। স্বাভাবিকভাবেই দেখা দিল স্থানাভাব। তাই আবার ক্লাব সরে গেল ১৯২৩এ ৪১, কোসপাড়া লেনে স্বর্গীয় নরেশ নাগচৌধুরী বাড়ীতে। এর পর থেকে ক্লাবের সব শাখার কাজই মোটামুটি পূর্ণোদ্যমে চলতে লাগলো। কয়েকটি বছর গড়িয়ে গেল মাঝখানে। ক্লাবের পরিচিতও হোল সুদূরপ্রসারী।

সময়ের সঙ্গে তাল রেখে এলো ১৯৩১। ২৮শে জুন উত্তর কলকাতার বিশ্বকোষ হলে বসলো ক্লাবের মিটিং। এই মিটিংয়ে বিরাট একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হোল। ক্লাব এবং লাইব্রেরীর নাম পরিবর্তন করে মহাত্মা শিশিরকুমারের পুণ্য নামে একটি নতুন নামকরণ করতে হবে। এবং ক্লাবের চলতি শাখার সঙ্গে আনতে হবে শিল্পচর্চার শাখা, অর্থাৎ সেখানে থাকবে সঙ্গীত, নাটক এবং অন্যান্য শিল্পের অনুশীলন। নাম পেলো 'শিশিরকুমার ইনস্টিটিউট'। স্বাভাবিকভাবেই জায়গারও বদল হোল। প্রতিষ্ঠানটি নতুন করে, নতুন চেহারায় গড়ে উঠলো আজকের জায়গায় অর্থাৎ ৭১।১ বাগবাজার স্ট্রীটে।

লাইব্রেরীতে ততদিনে বইয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৪২৩ এবং একটি বিনা পয়সায় পড়ার ঘরও তখন তৈরী হয়েছে। ন'টি দৈনিক সংবাদপত্র ও বাইশটি ছোট ছোট ম্যাগাজিনও [illegible] বছরের ইতিহাস মিলিয়ে দেখতে গেলে ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরী নানাভাবে বিকশিত হতে শুরু করে ১৯৩২ ও ১৯৩৩ থেকেই। ১৯৩২-এ লাইব্রেরী কলকাতা কর্পোরেশনের কাছ থেকে ৩০০ টাকা গ্র্যান্ট পায় এবং ১৯৩৩-এ তার পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০০ টাকা। বই এবং সভ্য সংখ্যাও বাড়তে থাকে প্রচুর পরিমাণে। এই সময়ে এই লাইব্রেরী থেকেই কিছু বক্তৃতা এবং রচনা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। সে সময়ে বক্তৃতায় অংশ নেন ডাঃ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ ডি এন মৈত্র, অধ্যাপক রাজা প্রমুখ বিদগ্ধ ব্যক্তিরা। এই সময়েতে 'বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের সঙ্গে এই লাইব্রেরীর নাম যুক্ত হোল। ১৯৩৬-এ লাইব্রেরীতে বইয়ের সংখ্যা হোল ৭০৯৫ আর সভ্যসংখ্যা এসে দাঁড়ালো ৪১০এ। এই সময়ে ইনস্টিটিউটের সভ্যরা 'ক্যালকাটা লাইব্রেরী এসোসিয়েশন' গড়ে তোলা ব্যাপারে নেতৃত্ব নেন। সেই থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত শিশিরকুমার ইনস্টিটিউট লাইব্রেরী তার আকার বাড়িয়েছে অনেক প্রভাব প্রসারিত করেছে অনেক দূর পর্যন্ত অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী ছাড়া সভ্যসংখ্যা এখন দাঁড়িয়েছে ৫০০। গ্রন্থাগারের সংগ্রহশালা জমা হয়েছে ২৫০০০ বই, তার মধ্যে [illegible] হাজার বাংলায় লেখা, ৯ হাজার ভা রতবর্ষের বিভিন্ন ভাষা ও ইউরোপীয় ভাষা লেখা বই। ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন সভাপতি শ্রীমৎ গঙ্গাকান্তি ঘোষের নামানুসারে যে [illegible] রিডিং রুম এখানে আছে তাতে প্রায় প্রতিদিন ১২৫ জন পাঠক-পাঠিকা জ্ঞানার্জনে ব্যাপৃত থাকেন। এই রিডিং রুমে কলকাতা থেকে প্রকাশিত সবকটি সাপ্তাহিক, দৈনিক ও মাসিক পত্রিকা টেবিলে সাজানো থাকে। ...

প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি গোলাপলাল ঘোষের নামানুসারে এখানে গড়ে উঠেছে অনেকদিন আগে একটি শিশুবিভাগ ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের আকৃষ্ট করা জন্য নানান স্বাদের বই এসে পা জমিয়েছে এই বিভাগে। বইয়ের সংখ ৩... হাজারের ওপরে। পাঠক পাঠিকা সংখ্যাও অনেক। কচি কচি ছেলে-মেয়েদে

মুখরতায় একটি প্রাণবন্ত আসর যেন জমে ওঠে এই শিশুবিভাগে।

ইনস্টিটিউটের সভ্যরা প্রায় প্রথম থেকেই এটা উপলব্ধি করেছিলেন যে লোককে সংস্কৃতিসম্পন্ন ও শিল্পচেতনায় সমৃদ্ধ করে তুলতে গেলে, আরো অন্যান্য বিষয়ের ওপর যথাযোগ্য আলোকসম্পাত করতে হবে। তাই লাইব্রেরীর সঙ্গে সঙ্গেই এসেছে সাহিত্য বিভাগ, খেলাধুলো বিভাগ, সামাজিক বিভাগ, সঙ্গীত ও নাটক বিভাগ, এ্যাম্বুলেন্স বিভাগ। এই দিক দিয়ে ভেবে দেখতে গেলে ইনস্টিটিউট যেন বৃহত্তর জীবনসাধনার একটি ইতিহাসই মেলে ধরেছে বলে মনে হবে।

মননশীলতার সমৃদ্ধির জন্য ইনস্টিটিউটের কর্তৃপক্ষ যে সাহিত্য বিভাগের প্রবর্তন করেছিলেন অনেক আগে, আজ তা ফলে ফুলে নানাভাবে, নানা উজ্জ্বল সম্ভাবনায় বিকশিত হয়ে উঠেছে। সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা ও বিতর্কের ব্যবস্থা করা হয়েছে আগে এবং এখনো পূর্ণোদ্যমে চলছে। রচনা প্রতিযোগিতাও এই বিভাগের একটি অন্যতম আকর্ষণ। এই ধরনের নানান তথ্য নিয়ে প্রকাশিত হোত 'সংবাদিকা' নামে একটি প্রচার পত্র। আন্তঃস্কুল আবৃত্তি প্রতিযোগিতাও সংগঠিত হয় এই বিভাগের মাধ্যমে। এতে স্থানীয় স্কুলের ছেলেরা ছাড়াও বাইরের স্কুলের অনেকেই অংশ নিয়ে থাকে।

ইনস্টিটিউটের খেলাধুলো বিভাগ একটি সমৃদ্ধতর বিভাগ। আউটডোর এবং ইনডোর দু-রকমের খেলারই ব্যবস্থা আছে এখানে। খেলার প্রাণচাঞ্চল্য ইনস্টিটিউটের ঘরে ঢুকলেই বোঝা যায়। তাস, ক্যারাম, ... চলছে একটি ঘরে এবং তাকে ঘিরেই ...চ্চার হয়ে উঠছে অনেক কণ্ঠ, সে... ...ঠে ছড়ানো আছে মুঠো মুঠো উন্মাদনা। ...গল রোড রেস এসোসিয়েশনের সহায়...য় ইনস্টিটিউট প্রতি বছর দশ মাইল-...পী দৌড়ের ব্যবস্থা করে থাকেন। ইন...টিউটের সভ্যরা অনেক বছর থেকেই ...ভন্ন জায়গায় ফুটবল, ব্রিজ, ক্যারাম এবং ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে আসছেন। অতীতেও অনেক সাক্ষ্য আছে এঁরা জয়ের মালা গলায় ধারণ করে এনেছেন। এতে গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছে ইনস্টিটিউটের। ১৯৬৭ থেকে সর্বসাধারণের জন্য অকশান ব্রিজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। প্রায় দুশো গোষ্ঠী এই প্রতিযোগিতায় প্রতি বছর অংশ নেয়।

সমাজজীবনে যখনই নেমে এসেছে বিপর্যয়ের কালো ছায়া, নিরাশার ঘন অন্ধকারে যখনই বিপর্যস্ত হয়েছে মানুষের মূল্যবোধ, তখনই ইনস্টিটিউটের সভ্যরা সাধ্যমতো এগিয়ে গিয়েছেন সমাজের ধ্বংসকতা দূর করে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে শান্তি ফিরিয়ে আনতে। সুস্থ সবল এক নতুন সমাজ কল্যাণ ও শান্তির মধ্যে গড়ে উঠুক, এই হোল তাঁদের প্রয়াসের লক্ষ্য। ১৯৩৪ সালে যখন ভূমিকম্পে বিহারের নানা জায়গায় অসাধারণ ক্ষতি হয়, তখন ছিল ইনস্টিটিউট আয়োজিত সরস্বতী পুজোর মুহূর্ত। স্বাভাবিকভাবেই এই মুহূর্তে প্রতি বছরই প্রাণময় আনন্দের জোয়ার বয়ে যেত, কিন্তু সেই সময়ে সভ্যরা আমোদ-প্রমোদের সবরকম আবেগ ত্যাগ করে সরস্বতী পুজোর জন্য সংগৃহীত সব অর্থ বিহারের তখনকার ক্ষতিপূরণ ও ত্রাণকার্যের জন্য দিয়ে দিয়েছিলেন। সেদিনকার সব সংবাদপত্রে এ-মহৎ কাজের যথেষ্ট স্বীকৃতি মুখর হয়ে উঠেছিল।

এরকম আরো অনেক কাজের নজীর আছে। সমাজসেবাই এসবের মূল লক্ষ্য। কিছু কিছু লোক যাঁরা সত্যি দারিদ্র্যের তীব্র কশাঘাতে পঙ্গু হয়ে পড়ছেন, তাঁদের নিয়মিত সাহায্য দেওয়া হয় এই বিভাগ থেকে। ভালো কিছু ছাত্র যারা যথার্থ গরীব, তারা তাদের স্কুল-কলেজের বেতনও পায় এখান থেকে। পুজোর সময়ে গরীব-দুঃখীদের নানারকম কাপড়-জামাও বিতরণ করা হয়ে থাকে।

মনের অতলে যেসব আবেগের আন্দোলন, তার প্রকাশেই তো শিল্পের প্রাণ প্রতিষ্ঠা। সভ্যরা এই সত্য সম্পর্কে গভীরভাবে সচেতন। তাই ইনস্টিটিউটের প্রায় প্রারম্ভিক লগ্ন থেকেই এর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। ১৯৩৫ থেকে।

শুরু করে আজ পর্যন্ত অনেক ভালো ভালো উল্লেখযোগ্য নাটক সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। প্রায় পঞ্চাশ রাত্রির ওপর যাত্রার আকারে পরিবেশিত হয়েছে মহাত্মা শিশিরকুমারের ভক্তিমূলক সৃষ্টি 'শ্রীনিমাই সন্ন্যাস'। এছাড়া যে সব উল্লেখযোগ্য নাটক অভিনীত হয়েছে সেগুলো হোল অনিল ভট্টাচার্যের 'অকল্যাণীয়া', অনিল ভট্টাচার্য, বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত 'পশ্চিমে হাওয়া', 'পুনর্মূষিক ভব', 'অতি আধুনিক', বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মেঘমুক্তি', 'তবে অতনু' (মাটির ঘর), শরৎচন্দ্রের 'বামুনের মেয়ে', রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা', 'চিরকুমার সভা', 'বশীকরণ', শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বন্ধু', 'চুয়া চন্দন', ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'সৈনিক', জরাসন্ধের 'এ বাড়ী ও বাড়ী', শম্ভু মিত্রের 'কাঞ্চনরঙ্গ', রবীন্দ্র মৈত্রের 'মানময়ী গার্লস স্কুল' এবং আরো অনেক।

অভিনয় ছাড়াও বাৎসরিক সঙ্গীত প্রতিযোগিতার আয়োজন সভ্যরা করে থাকেন। এতে বহু প্রতিযোগীর সমাবেশ হয়। এবং সেই সময়গুলো প্রাণের গুঞ্জনেই ভরে থাকে।

ইনস্টিটিউটের সভ্যদের সমাজসেবার আর একটি নিদর্শন হোল অ্যাম্বুলেন্স, নার্সিং ও ক্যাডেট ডিভিসন। ১৯৪০-এ যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের করাল ছায়া চারদিকে মর্মান্তিক করুণ এক অন্ধকার নিয়ে এসেছিল, তখনই সৃষ্টি হয় শিশিরকুমার ইনস্টিটিউট অ্যাম্বুলেন্স ডিভিসন। এই ডিভিসনের কর্মীরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে রোগীর সেবা করে থাকেন। যখন বসন্ত ও কলেরায় সারা অঞ্চল ছেয়ে গিয়েছিল তখন এই বিভাগের কর্মীরা দূর বস্তিতে গিয়েও রোগীদের সেবা শুশ্রূষা করতেন। নিয়মিতভাবে এখনো ইনস্টিটিউটের ঘরে রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়ে থাকে।

গত ১৯৭০-এ শিশিরকুমার ইনস্টিটিউটের সুবর্ণজয়ন্তী হয়ে গেল। ১৯২০ থেকে ১৯৭৩—এই ৫৩ বছরে ইনস্টিটিউটের সভ্যরা যে নানা বিষয়ে অগ্রগতির এক বলিষ্ঠ ও ব্যাপকতর ইতিহাসের সন্ধান দিতে পেরেছেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

শিশিরকুমার ইনস্টিটিউট

ছয় মাস বয়সের ওজন নিয়েছিলেন। এই ২৬১টি শিশুর মধ্যে মাত্র ২১টি পুরো-পুরি মায়ের দুধ খেয়ে মানুষ হচ্ছিল। এই দলে মাত্র ৪টির ওজন ছিল মাত্রাতিরিক্ত। তুলনায় কৃত্রিম দুধ খেয়ে যারা মানুষ হচ্ছিল সেই দলে মাত্রাতিরিক্ত ওজনের শিশু ছিল শতকরা ৫৯-৬ ভাগ।

৪০টি শিশুর খাদ্যতালিকা খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল। তা থেকে সবচেয়ে আশঙ্কার কথা যা জানা গিয়েছিল তা এই যে ৪০টি শিশুকেই খেতে দেওয়া হচ্ছিল কঠিন খাদ্য এবং অধিকাংশকে এক সপ্তাহ বয়স না হতেই চামচে করে খাওয়ানো হচ্ছিল। লেখক বলছেন, এই ফ্যাশনটা হালে শুরু হয়েছে এবং এজন্যে তিনি দায়ী করছেন বেবিফুডের উৎপাদনকারীদের। তিনি বলছেন, শিশুকে কী ও কতখানি খাওয়ানো উচিত সে সম্পর্কে বেবিফুডের উৎপাদনকারীরা পরামর্শ দিয়ে থাকেন এবং এই সমস্ত পরামর্শ শুনে মায়েরা এমনভাবে চলতে শুরু করেন যার ফলে শিশুকে অত্যধিক খাওয়ানোর ঝোঁক বেড়ে যায়।

তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য কৃত্রিম দুধ সম্পর্কে। সম্প্রতিকালে বিষয়টি নিয়ে তিনি আরো গবেষণা করেছেন। এই গবেষণা থেকে জানা যায়, মায়েরা শিশুর ...্য কৃত্রিম দুধ তৈরি করে বড়ো বেশি ... করে। তার ফলে সেই কৃত্রিম দুধে ...রি, অ্যামিনো অ্যাসিড ও সোডিয়ামের ...সম-পরিমাণ গরুর দুধে যতোখানি ... উচিত তার চেয়ে বেশি হয়ে যায়। অতিরিক্ত ঘন দুধ খাবার দরুন শিশুর ...নিতে চাপ পড়ে এবং বেচারা শিশু ...র চেঁচাতে শুরু করে। শিশুকে যে খাওয়ানো দরকার এই বোধ অধিকাংশ ... নেই, এমনকি শিশুকে শুধু জল ...তে অধিকাংশ মায়েরই আপত্তি। ... তখন কী করে? শিশু চেঁচাতে ... করলেই খাওয়ার সময় না হওয়া ... সেই অতিরিক্ত ঘন দুধ আরো এক...াইয়ে দেয়। তাতে বিপত্তি বাড়ে বই ...।

...মায়েরা যাতে এই ভুল না করেন ...জন্যে আজকাল অনেক ডাক্তার শিশুকে স্বাভাবিক গরুর দুধ খাওয়াবার পক্ষপাতী। এক্ষেত্রেও একটা সমস্যা এসে পড়ে। হাসপাতালগুলোতে গরুর দুধ বড়ো একটা চলে না, কেননা গরুর দুধের যোগান বজায় রাখা ও মজুত করা—দুই-ই সমস্যা। আর হাসপাতালগুলোতে না চলা পর্যন্ত মায়েদের গরুর দুধের দিকে টানা শক্ত ব্যাপার। মায়েরা কী করেন? প্রসূতি ওয়ার্ডে শিশুকে যে ব্র্যান্ডের গুঁড়োদুধ খাওয়ানো হচ্ছিল সেই ব্র্যান্ডটাই চালিয়ে যান।

মায়ের দুধ খেয়ে যে-সব শিশু বড়ো হয় তাদের ওজন কখনো মাত্রাতিরিক্ত হয় না। এটা সর্বক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা গিয়েছে। তবে একটা 'যদি' আছে। যদি-না শিশুকে অনেক আগে থেকেই কঠিন খাদ্য খাওয়ানো শুরু হয়। কাজেই এমন দুধ যদি তৈরি করা যায় যা সমস্ত দিক থেকেই মায়ের দুধের মতো তাহলে আর শিশুর ওজন মাত্রাতিরিক্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। ইংলন্ডের একটি হাসপাতালে এমনি মায়ের দুধ তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে এবং সম্ভবত অচিরেই তৈরি হতে শুরু করবে।

শিশুর খাওয়া যে অতিরিক্ত হতে পারে, এটা গবেষণার বিষয় হয়েছে সম্প্রতিকালে। আগেকার কালে মায়েরা বলতেন, শিশুকে কখনো বেশি খাওয়ানো যায় না। কথাটা ঠিক নয়, কিন্তু দেখা যাচ্ছে এমনকি আজকের দিনেও কোনো কোনো বেবি-ক্লিনিকে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে শিশুকে খাওয়াবার ব্যবস্থা। অবশ্য একথা ঠিক, শিশুকে পুরোমাত্রার মিশ্র খাদ্য খাওয়ানো শুরু করার পরে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় শিশুর ওজন শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি নয়। এখানেও কথা আছে। হালের গবেষণায় প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, পরবর্তী জীবনে মোটা হয়ে পড়ার সঙ্গে শিশুজীবনে বাড়তি ওজন হওয়ার একটা সম্পর্ক আছে। এই সূত্র অনুসরণ করে ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে আজকের দিনে যে-সব শিশুকে মাত্রাতিরিক্ত খাওয়ানো হচ্ছে, একবিংশ শতাব্দীতে তাদের সবাইকে মেদবহুল বপুর বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে।

শিশুস্বাস্থ্যের গবেষক একজন বিজ্ঞানীর একটি আবিষ্কারের উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। তাঁর নাম ডঃ চার্লস ব্রুক, তাঁর দুজন সহযোগী হচ্ছেন জুন লয়েড ও ও এইচ উলফ। তাঁরা দেখেছেন, যে-সব শিশুর ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি তাদের শরীরে এক বছর বয়স হবার আগেই মেদকোষের (অ্যাডিপোজ সেল) সংখ্যা বেড়ে যায়। তাঁরা বলছেন, 'মনে হয় শরীরের মেদকোষের সংখ্যা মোট কত দাঁড়াবে তা পাকাপাকিভাবে নির্ধারিত হয়ে যায় শৈশবকালের মধ্যেই। যে-সব শিশুর ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি তাদের নিয়ে আমাদের গবেষণা থেকে জানতে পেরেছি, বেশি খাওয়ার ফলে শরীরে মেদকোষের সংখ্যা বৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি ঘটে থাকে এক বছর বয়সের মধ্যে।' তাঁদের মতে, একজন মানুষের শরীরে মেদকোষের সংখ্যাগত গড়ন কেমন হবে তা ঠিক হয়ে যায় এই এক বছর বয়সের মধ্যেই, যখন শরীরের ওপরে খাদ্য-প্রতিঘাত সবচেয়ে বেশি। পরবর্তী কালে কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি স্বাভাবিকই থেকে যায়, খাওয়ার ব্যাপারটা যেমনই চলুক না কেন। পরিবর্তন ঘটে শুধু মেদকোষের আকারে।

কী সাংঘাতিক কথা! জন্মের পর থেকে এক বছর বয়স পর্যন্ত কোনো শিশুকে যদি বেশি-বেশি খাইয়ে মোটা করে তোলা হয় তাহলে সেই শিশুটিকে কিনা তার জের টানতে হবে গোটা জীবন ধরে, হ্যাঁ তাই, একাধিক বিজ্ঞানী নির্বিধায় এই মত প্রকাশ করছেন। হাতে কলমে পরীক্ষা করে তাঁরা দেখিয়েছেন, খাওয়ার হেরফের ঘটিয়ে মেদকোষের সংখ্যা কমানো যায় না। একজন নন, নানা বিজ্ঞানী নানা সময়ে নানা ভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন ব্যাপারটা তাই বটে। জীবনের প্রথম বছরে মাত্রাতিরিক্ত খাওয়ার ফল হিসেবে শতকরা অন্তত আশিটি ক্ষেত্রে মেদবহুলতায় ভুগতেই হয়।

ডঃ ব্রুক মনে করেন, ডাক্তাররাও অনেকখানি দোষী। শিশুকে প্রতিদিন কতখানি খাদ্য দিতে হবে সে-বিষয়ে তাঁরা কড়া নির্দেশ দিয়ে থাকেন। তাঁর মতে শিশুকে প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য যে খেতেই হবে এ-ব্যাপারে কোনো কড়াকড়ি থাকা উচিত নয়। শিশুর ওজন একটানা বাড়ছে কিনা সেটাই আরো জরুরি বিষয়। শিশুকে বড়ো তাড়াতাড়ি দানা-শস্য ও কঠিন খাদ্য দেওয়া হয়ে থাকে। তিনি বলছেন, দানাশস্য ও কঠিন খাদ্য দেওয়ার বয়স হচ্ছে তিন থেকে ছয় মাস, কদাচ তিন থেকে ছয় দিন নয়। ডঃ ব্রুক তাঁর গবেষণার এলাকায় লক্ষ্য করেছেন, অনেক মা-ই শিশুকে তিন থেকে ছয় দিন বয়সের মধ্যে দানাশস্য ও কঠিন খাদ্য দিতে শুরু করেন।

ডঃ ব্রুক মায়েদের পরামর্শ দিয়েছেন, বেবিফুড তাঁরা যেন বাড়িতেই তৈরি করেন, তৈরী বেবিফুড যেন না কেনেন। তৈরি বেবিফুডে প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলো অবশ্যই থাকে, উপরন্তু থাকে শিশুকে মোটা করার জন্য অনেকগুলো বাড়তি

উপাদান। বাড়িতে বেবিফুড তৈরি করলে শেষোক্ত উপাদানগুলো বাদ পড়ে।

ব্রিটিশ বিজ্ঞানীদের এই গবেষণা থেকে আমাদের দেশের মায়েদেরও শিক্ষা নেবার আছে। সবচেয়ে বড়ো শিক্ষা—শিশু কেঁদে উঠলেই শিশুর মুখে বোতল ধরিয়ে না দেওয়া। শিশুকে খাওয়াতে হবে নির্দিষ্ট সময়—সাধারণ তিন থেকে চার ঘণ্টা—পরে পরে। দ্বিতীয়ত, শিশুকে কোনো সময়েই জবরদস্তি না খাওয়ানো—চামচে বা ঝিনুকে জোর করে গেলানো তো কদাচ নয়। শিশু নিজের থেকে যতোটা খাবে ততোটুকুতেই তার খাওয়া শেষ করতে হবে। শিশুর পেট ফাঁপা, রাত্তিরে জেগে থাকা ইত্যাদি অনেক কিছুরই মূলে রয়েছে এই জবরদস্তি বা বেনিয়ম খাওয়ানো। তৃতীয়ত, শিশুকে দুই খাওয়ার মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে যতোটা পারা যায় জল খাওয়ানো।

প্রত্যেক মায়ের মনে রাখা উচিত, জন্মের পরে এক বছর বয়স পর্যন্ত শিশুকে তিনি কী ও কি-ভাবে খাওয়াচ্ছেন তারই ওপরে অনেকখানি নির্ভর করছে সেই শিশুর পরবর্তী কালের গোটা জীবন।

প্রত্যেক মায়ের মনে রাখা উচিত, এ ফ্যাট বেবি ইজ নট এ ফিট বেবি। কথাটি নেওয়া হয়েছে ইংলন্ডের এক বেবিফুড-প্রস্তুতকারকের বিজ্ঞাপনের ভাষা থেকে। আমাদের দেশে অবশ্য বিজ্ঞাপনের ভাষা উল্টো। আর সে-কারণেই মায়েদের দায়িত্ব আরো বেশি।

দীর্ঘায়ু লাভে কোন চমক নেই

মানুষের গড় আয়ু কত বছর হওয়া উচিত—৭০? ১০০? ২০০? ৩০০? মানুষ কি অমরত্ব লাভ করতে পারে? মানুষের যৌবনকে কি চিরস্থায়ী করা যায়?

এসব প্রশ্নের জবাব বিভিন্ন ঐতিহাসিক কালে বিভিন্নভাবে দেওয়া হয়েছে। কোনোটা বিজ্ঞানসম্মত, কোনোটা উদ্ভট। তারপরেও প্রশ্নগুলো এখনো উঠছে। এখনো জবাব দেবার চেষ্টা হচ্ছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কিয়েভ-এ অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে বিশ্বের ৪৩টি দেশের ৩,০০০ বিজ্ঞানী মিলিত হয়ে দীর্ঘায়ু লাভের সমস্যা নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করেছিলেন। এবং এই প্রশ্নগুলোর জবাব তাঁরা দিয়েছেন—উদ্ভট নয় — বিজ্ঞানসম্মত।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, যৌবনকে চিরস্থায়ী করার কোনো উপায়ের সন্ধান করতে যাওয়াটা আপাতত নিষ্ফল হতে বাধ্য। কিন্তু আধি-ব্যাধিতে না ভুগে দীর্ঘ জীবন লাভ করা কিছু একটা অসম্ভব ব্যাপার নয়। বিজ্ঞানীরা স্পষ্ট ভাষায় বলছেন, মানুষ অবশ্যই ৯০ বা ১০০ বছর বয়স পর্যন্ত সুস্থ-সবল জীবন কাটাতে পারে। রুশ দেশের এক শারীর-বিজ্ঞানী একবার বলেছিলেন, 'আমাদের সুনিশ্চিত বিশ্বাস, এমন এক সময় আসবে যখন মানুষের পক্ষে একশো বছর বয়স হবার আগে মারা যাওয়াটা হয়ে দাঁড়াবে লজ্জার ব্যাপার।' কিয়েভের সম্মেলনে বিজ্ঞানীদের উক্তিতে এই কথারই প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল।

জীবনের পরমায়ু বাড়িয়ে তোলার বাস্তবসম্মত পথ আছে দুটি। প্রথমটি হচ্ছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন সাধন এবং আধিব্যাধি ও পরিবেশের প্রতিকূলতা দূরীকরণ। এই পথে ফল লাভের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন, যেখানে গড় পরমায়ু সোভিয়েত আমলের আগে ছিল ৩২ এখন ৭০।

দ্বিতীয় পথ—সুসংগঠিত সুসমন্বিত শ্রম। একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো—যারা একশো বছর বা তারও বেশি কাল বেঁচে গিয়েছেন তাঁরা সকলেই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ছিলেন কর্মঠ। অন্যদিকে যারা কোনো শারীরিক শ্রম করে না, কোনো রকম খেলাধুলো বা শরীর চর্চাও নয়—তারা তিরিশেই বুড়িয়ে যেতে শুরু করে। যাঁরা কর্ম-তৎপর জীবন যাপন করেন, কখনো কখনো তাঁরা এমন কি নব্বুই বছর বয়সেও তারুণ্য বজায় রাখতে পারেন।

মনকে সজীব রাখা দীর্ঘ জীবন লাভের আরেকটি উপায়। দেখা গিয়েছে দীর্ঘায়ুরা সাধারণত হয়ে থাকেন অত্যন্ত কর্মতৎপর, উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ভরপুর ও সদা উৎফুল্ল। কখনো তাঁরা বিমর্ষ হয়ে থাকেন না, বড়ো রকমের আঘাত পেলেও সঙ্গে সঙ্গে সামলে উঠতে পারেন।

দীর্ঘ জীবন লাভের অপর একটি উপায়ের সন্ধানও এই সম্মেলনে বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন। তা হচ্ছে, যে সব জৈব প্রক্রিয়া ঘটার দরুন মানুষ বুড়ো হয় সেই প্রক্রিয়াগুলোই প্রতিহত করা ও ঘুরিয়ে দেওয়া। এটি ঘটানো কোনো দূরের ব্যাপার নয়, এখনই হতে পারে ও কিছুটা হচ্ছেও।

মানুষ বুড়ো হয় কখন? জৈব শরীরের বিভিন্ন জৈব-রাসায়নিক সংযোগগুলোর মধ্যে যে সামঞ্জস্য আছে তা ব্যাহত হলে। যদি বিশেষ ভেষজ বা বাস্তব প্রভাব প্রয়োগ করে এই ব্যাহত হওয়ার ব্যাপারটি ঠেকানো যায় তাহলে মানুষের পরমায়ুও অনেকখানি বাড়িয়ে তোলা সম্ভব।

বিজ্ঞানীরা আরো একটি কথা বলছেন মানুষের বুড়ো হওয়া শুধু কতকগুলো প্রক্রিয়ার কমজোরী হওয়া নয়—মানিয়ে নেওয়ার নতুন প্রক্রিয়ার আবির্ভাব। এ-ব্যাপারটি জীবনের সকল পর্যায়ে লক্ষ করা যেতে পারে। কাজেই, জৈব প্রক্রিয়া কমজোরী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা পূরণ করে নতুন প্রক্রিয়া কতখানি জোরদার হচ্ছে, ওপরেও মানুষের দীর্ঘ জীবন লাভ নির্ভর করছে। মানিয়ে চলার এই প্রক্রিয়াগুলি আয়ত্ত করতে পারলে অবশ্যই পরমায়ু বৃদ্ধি হতে পারে।

—অয়স্কান্ত

একটু উষ্ণতার জন্যে

বুদ্ধদেব গুহ

উপন্যাস

॥ ৫ ॥

দেখতে দেখতে শনিবার এসে গেল।

কাল হেমালঙের হাট ছিল। হাট থেকে মুরগী কিনে মুরগীর ঘরে রেখেছিলাম। আনাজও কিনেছিলাম। মিসেস কিংএর কাছে বলে পাঠিয়েছিলাম এক ডজন কেকের জন্যে। আগে অর্ডার না দিলে কেক পাওয়া যায় না।

কার্নি মেমসাহেব রুটি ত রোজ দিচ্ছেনই, কাল যাতে ছুটির জন্যে বান দেন সে কথা বলে পাঠালাম। ভোরবেলা হানিফ এসে দিয়ে যাবে যাতে ব্রেকফাস্টে ও খেতে পারে।

লালিকে বলে হাসানকে খবর দিয়ে পাঠালাম। হাসান বাবুর্চি। এ বাড়িতে সম্মানিত অতিথিরা কখনো কেউ এলেই হাসানের ডাক পড়ে।

ভাবতেই যে কি ভালো লাগছে। আজ ছুটি আসছে আমার কাছে। বিনা নিমন্ত্রণে, নিজে যেচে, নিজের সঙ্গত অধিকারে সে আসছে আজকে। অধিকার আমাদের অনেকেরই অনেক ব্যাপারে থাকে হয়ত অনেকের কাছে, কিন্তু সে অধিকারের তাৎপর্য ও তার সীমা আমরা অনেকেই সঠিক বুঝতে পারি না।

এতদিনে, এতদিনে যে ছুটি আমার এই ভাড়া-নেওয়া পর্ণকুটিরে, আমার এই শূন্য জীবনে তার নিজের ভূমিকা এবং অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে এ কথা মনে করেই মন খুশীতে ভরে যাচ্ছে।

আমি বাইরের দিকের একটা ছোট ঘরে থাকি, সেখানেই আমার লেখার টেবল, টানা সব। তার পাশে একটা বড় ঘর— অন্য পাশেও বড় ঘর আছে। ছুটি কোন্ ঘর পছন্দ করবে, কোন্ ঘরে সে থাকবে জানি না। তাই দু' ঘরেই বিছানা পাতিয়ে রাখলাম বিকেলে। ঘরে ধূপ জ্বালিয়ে রাখলাম।

ছুটি স্যুপ খেতে ভালবাসে। হাসানকে স্যুপ, চিকেন রোস্ট, পুডিং সব বানাতে বলে দিলাম।

পত্রাতু থেকে ম্যাকলাস্কির বিজলী আসে। মাঝে মাঝে হঠাৎ আলো নিভে যায়। নিভিয়ে দেওয়া হয় সেখান থেকে। হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেলে ছুটি ভয় পেতে পারে, তাই সব ঘরে ঘরে বড় মোমবাতি লাগিয়ে দিলাম, তার পাশে রাখলাম দেশলাই।

গঙ্গা বাস চামার রাস্তা দিয়ে যখন প্রতিদিন যায় তখন সন্ধ্যে হয়ে যায়। চারধারে গাঢ় অন্ধকার নেমে আসে।

সব বন্দোবস্ত শেষ করে, লণ্ঠন হাতে মালুকে নিয়ে, ভাল করে গরম জামা-কাপড় পরে আমি বড় রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম।

এখানে এই নিয়ম। যে যখন ফেরে, তার বাড়ির মালি (সাহেবরা বলে, কুলি) বাড়ির সামনে আলো নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

গিরধারী ড্রাইভার বাস থামায়। যার যার বাড়ির পথের সামনে সে সে নেমে যায়, মালি মাল বয়ে নিয়ে বাড়ি যায়।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরই দূর থেকে এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় গোঙানি তুলে ফার্স্ট গীয়ার সেকেণ্ড গীয়ারে আসতে শোনা গেল গিরধারী ড্রাইভারের গঙ্গা বাসকে।

দেখতে দেখতে হেড-লাইটের আলো দেখা যেতে লাগল। হেলতে দুলতে এগিয়ে আসতে লাগল বাসটা।

আমি একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

মালু এগিয়ে গিয়ে পথের পাশে দাঁড়িয়ে লণ্ঠন উঁচু করে ধরলো। বাসটা থামলো। ভিতর থেকে মেয়েলি গলায় কে যেন হিন্দীতে বলল, মুঝকো হিঁয়াই উতারনা?

গিরধারী বলল, জী, মাইজী।

বাসটা দাঁড়িয়ে একটা অতিকায় জানোয়ারের মত ঘড় ঘড় করে নিঃশ্বাস নিতে লাগল। একজস্ট পাইপের ধুঁয়োর গন্ধে পিটিস ফুলের গন্ধ মুছে গেল। পেছনের দরজা দিয়ে ছুটি নামল।

কতদিন পরে ছুটিকে দেখলাম। ক—ত—দি—ন পরে।

একটা হালকা সবুজ সিল্কের শাড়ি পরেছে, গায়ে সাদা বুটিতোলা সাল, পায়ে চটি।

কনডাকটর একটা ছোট স্যুটকেস হাতে বাড়িয়ে দিল—মালু সেটাকে নিয়ে নিতেই ছুটি বলল, তুমি কে?

বাংলায় বলাতে, মালু বুঝলো না, মালু আঙুল তুলে বলল, বাবু হুঁইয়েপর হ্যায়।

ছুটি অবাক গলায় ওকে বলল, বাবু হিঁয়া তক্ আয়া?

তারপর ওরা দুজন তাড়াতাড়ি আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

বাসটা চলে গেছিল।

লণ্ঠনের আলোয় চারিদিকের অন্ধকার আরো ভারী হয়ে ছিল। ছুটি আমার কাছে এসে, একেবারে আমার সামনে দাঁড়াল— অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে সেই লালচে অন্ধকারে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, প্রায় ফিস ফিস করে ওর বুকের মধ্যে থেকে বলল, কেমন আছেন? আপনি এখন কেমন আছেন?

কাউকে দেখলেই যে কারো এত ভাল লাগতে পারে, সমস্ত সত্তা হাওয়া লাগা সজনে ফুলের ডালের মত দুলে উঠতে পারে, তা ছুটিকে দেখতে পেয়েই নতুন করে মনে হল।

ছুটির গলা শুনলে, ওর চোখে তাকালে, ওর কাছে দাঁড়ালে কেন আমি এতখানি খুশী হই? কেন হই আমি কিছুতে বুঝতে পারিনি কোনোদিনও।

আজকে আমি কত যে খুশী কী যে সুখী, আমি কাউকে বোঝাতে পারবো না। আমার স্বপ্নের, আমার দুঃখের, আমার আনন্দের আমার দুখজাগানীয়া, ঘুমভাঙানীয়া ছুটি আজ কতদিন পরে আবার আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

মালুকে বললাম—লণ্ঠনটা আমার হাতে দিয়ে এগিয়ে যেতে, গিয়ে লালিকে কফির জল চড়াতে বলতে।

মালু এগিয়ে গেলে, আমি বললাম, তুমি কেমন আছ? তুমি কেমন আছ বলবে

ছুটি হঠাৎ আমার হাতথেকে লণ্ঠনটা নিয়ে আমার মুখের কাছে তুলে ধরল, বলল, কতদিন আপনাকে ভাল করে দেখি নি, কই টুপীটা খুলুন একটু, খুলুন না।

টুপীটা খুলতে খুলতে আমি বললাম, তোমার স্বভাব একটুও বদলায়নি কলেজের লোকচারায় হয়েও।

ছুটি অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, আপনি কিন্তু অনেক বদলে গেছেন।

টুপীটা পরতে পরতে আমি বললাম, তাত বাবই। তোমার চেয়ে বয়সে আমি অনেক বড়, বদলে যাওয়াই ত স্বাভাবিক। বয়সে এবং চেহারায়ও।

বয়সের জন্যে বদলাননি। নিজেকে বদলে ফেলতে চেয়েছিলেন তাই বদলে গেছেন। কিন্তু এভাবে নিজেকে...লাভ কি?

আমি বললাম, ছাত্রী পড়ানোর জন্যে তোমার বক্তৃতা দেওয়া অভ্যেস হয়ে গেছে। এখন চলো। বাড়ি পৌঁছে—তারপর যা বলার আছে শোনা যাবে।

বাড়ি কি অনেকদূর? বলে সালটাকে ভাল করে টেনেটুনে নিল ছুটি।

বললাম, এই এক ফার্লং মত। তোমার খুব শীত করছে, না?

মুখ ফিরিয়ে ছুটি বলল, এখানে বেশ শীত বাবা, রাঁচীর চেয়ে বেশী শীত—হাত দুটো শীতে কুঁকড়ে গেছে।

চলতে চলতে আমি আমার ডান হাতটা ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, আমার হাতে তোমার হাত রাখ, হাত গরম হয়ে যাবে।

ছুটি গ্রীবা ঘুরিয়ে এক চমক তাকাল। তারপর বলল, না।

একটু পরে আস্তে আস্তে বলল, সবুদা, আমার সমস্ত শীতের দিনে আপনিই আমার দিকে আপনার উষ্ণতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, চিরদিন। আপনাকে নানাভাবে, নানা জনের মারফৎ দুঃখী করা ছাড়া আর কিছু আপনার জন্যে করতে পারিনি। এখন বোধহয় আপনার ঠাণ্ডা হাতের দিকে আমার হাত বাড়ানোর সময় এসেছে—আমার হাতে, আপনি হাত রাখুন, বলে ছুটি ওর হাতটা বাড়িয়ে দিল আমার দিকে।

বাঁ-হাতে লণ্ঠন নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ছুটির বাঁ হাতে আমার ডান হাত রাখলাম। অনেক অনেকদিন পরে ছুটির হাতে হাত রাখলাম।

ভালোবাসা বলতে কি বোঝায় আমি জানি না, উষ্ণতা কথাটার মানে কি আমি জানতে চাইনি, কিন্তু বহুদিন পরে একজনের হাতে হাত রাখতেই আমার সমস্ত শরীর কেন যে এমন করে ভালো লাগায় শিউরে উঠল তাও কি আমি জানি? এই উষ্ণতা, এই আশ্লেষ, এই ভরন্ত ভালোলাগা, এর কি কোনো নাম নেই?

ছুটি আমার হাতখানি ওর সুন্দর নরম আঙুলে ও তালুতে দৃঢ় অথচ হালকা করে ধরে রইল। আমাদের দুজনের হাতের উষ্ণতা দুজনের হাতে ছড়িয়ে গেল। কারো হাতই আর ঠাণ্ডা রইল না। আমার হঠাৎ মনে হল, আমি কোনো বিরহী ঘুঘুর বুকে হাত রেখেছি।

বাড়ির কাছাকাছি এসে ছুটি বলল, আপনার বাড়ির চারপাশটা কেমন তা দেখা হল না। বিজুপাড়া পেরুতে না পেরুতেই ত অন্ধকার হয়ে গেল চারপাশ। রাঁচীতে আমার এক বন্ধু বলছিল, জায়গাটা সুন্দর, সত্যিই সুন্দর না?

বললাম, সকলের সৌন্দর্যজ্ঞান ত সমান নয়, তবে তোমার চোখে হয়ত অসুন্দর লাগবে না। কাল তোমাকে সব দেখাব।

দূর থেকে বাড়ির আলো দেখা যাচ্ছিল। ছুটি বলল, ওমা, এই জঙ্গলে ইলেক-ট্রিসিটি আছে? ভাবা যায় না, এমন পাণ্ডববর্জিত জায়গায় ছবির মত ছোট ছোট টালির বাংলোয় ইলেকট্রিক আলো জ্বলবে। তাই না?

জবাব দিলাম না কোনো। আমার সদ্য-রোগমুক্ত শরীরাশ্রিত ক্লান্ত মনটা এমন ভালোলাগার আমেজে বুঁদ হয়ে ছিল যে কোনো তুচ্ছ কথা বলেই সে আমেজ আমি নষ্ট করতে রাজী ছিলাম না।

বাড়িতে ঢুকে ছুটি সব ঘুরে ঘুরে দেখল—ওর চোখ বারবার দেওয়ালের বড় বড় ফাটল ও মেঝের লম্বা লম্বা ফাটার দাগ দেখতে লাগল। একটু পরে ও বলল, বাড়িটা এমন কেন? চতুর্দিক ফাটা, জরাজীর্ণ?

বললাম, বাড়িতে যে-থাকে তার মতই ত বাড়ি হবে? বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক যে-দামে এ বাড়ি কিনেছিলেন তাতে একটা মোটর সাইকেলও কেনা যায় না। সাহেব চলে যাচ্ছিলেন অস্ট্রেলিয়া। সুবিধামত দাম পেয়ে কিনে নিয়েছিলেন। কাল সকালে তোমার একটা খারাপ লাগবে না, দেখো। ও বাড়িটা বাড়ি হিসেবে ভাল নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু বাড়ির পরিবেশটা ভাল। পরিবেশের জন্যেই শুধু ভাল লাগে।

ছুটি এসে ভিতরের বসবার ঘরের বেতের চেয়ারে বসল।

লালি এসে বলল, বাথরুমে গরম জল দেওয়া হয়েছে।

ছুটি উঠে হাত মুখ ধুতে বাথরুমে গেল।

ও আমার পাশের ঘরেই থাকবে বলেছে —বলেছে ওর ভয় করবে ওপাশের দূরের ঘরে শুতে।

বাথরুম থেকে ঘরে এসে ছুটি কফি ঢালতে লাগল, বলল, আপনি ত এক চামচ চিনি খেতেন, এখন কি বেশী খান?

আমি হাসলাম, বললাম, আমি কফি খাবো না ছুটি, আমার খাওয়া দাওয়া এখনো নিয়মমত করতে হয়। বাড়তি কোনো কিছু খাওয়া বারণ।

ছুটি কফি ঢালা বন্ধ করে কফির ছোট পটটা শূন্যে ধরেই বলল, কে এসব বলেছে? কোন্ ডাক্তার?

মান্দারের সাহেব ডাক্তার। যিনি এখন আমাকে দেখছেন।

ছুটি চোখ নামিয়ে আমার জন্যে একটি কাপে কফি ঢালতে ঢালতে বলল, তাঁকে বলবেন যে রাঁচীর লেডি ডাক্তার অন্যরকম প্রেসক্রিপশান করেছেন। কফি আপনার খেতেই হবে।

আমি যে দুদিন থাকব, আমি যা খাব, যা রাঁধব, সবই আপনার খেতে হবে। তারপর একটু থেমে বলল, আজকালকার ডাক্তাররা খালি শরীরের চিকিৎসা করেন, যেন শরীর একটা লোহার জিনিস—তার সঙ্গে মনের কোনো সম্পর্ক নেই।

কফির কাপটা এগিয়ে দিতে দিতে খুব অভিমানী গলায় বলল, সত্যি। অত এতবড় একটা অসুখ হল, আমাকে একবার মনে পড়লো না আপনার, আমাকে একটা খবরও পাঠালেন না। আপনাকে কিছু বলার নেই আমার।

কফির কাপটা তুলতে তুলতে আমি বললাম, কেন খবর পাঠাব? তোমার মনে আছে? তুমি রাঁচী আসার আগে আমার একবার ভীষণ চোখের অসুখ হয়েছিল। আমি দিন-রাত চোখের কাজ করি, তাই যখন সাতদিন চোখ বুজে পড়ে থাকতে হয়েছিল তখন কি যে অবিশ্বাস্য অসহায়তা আর যন্ত্রণা ভোগ করেছি, তা-কি বলব। চোখ বুজলেই একজনের মুখ দেখতে পেতাম। সত্যিই বলছি, একজনের চোখ দেখতে পেতাম।

প্রায় পাঁচ দিনের দিনে তোমাকে নিজে ডায়াল হাতড়ে-হাতড়ে ফোন করেছিলাম, বলেছিলাম, একবার এসো, তুমি দেখতে এলে আমার ভাল লাগবে।

তুমি বিদ্রূপের গলায় বলেছিলে, আপনার কি দেখার লোকের অভাব? তারপর, মনে আছে কি-না জানি না, আরো অনেক কথা বলেছিলে।

আমার মনে সেদিন সত্যিই সন্দেহ হয়েছিল, সে আমার প্রতি তোমার ভাল ব্যবহারটুকু কতখানি দেখানো এবং কতখানি সত্যি। তোমার উপর আমার জোর কিছু

আমার আছে কি নেই, সেদিন ফোন ছেড়ে দেওয়ার পর অপমানিত মনে বসে বসে শুধু তাই ভেবেছিলাম।

আসলে আমার এ অসুখের কথা তাই জানাইনি।

ভালই করেছেন। আমি ভাবছি, কাল ভোরের বাসেই রাঁচী চলে যাব। যে ভদ্রলোকের নিজের অধিকার এবং নিজের সঙ্গে অন্যের সম্পর্ক সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই, তাঁর সঙ্গে ফাঁকা বাড়িতে একজন অবিবাহিতা মেয়ের থাকাটাও ভাল দেখায় না। আমাদের দুজনের মধ্যে সম্পর্ক যদি এতই পলকা হয় যে অভিমানের বশে কেউ কাউকে কোনো কথা বললে তাতেই সম্পর্ক শেষ হয়ে যেতে বসে, তাহলে জানতে হবে সম্পর্কটা এখনো যথেষ্ট পাকা হয়নি।

জবাব দিলাম না আমি, পেয়ালা-ধরা ওর হাতের উপর আমার হাত রাখলাম।

ও কোনো কথা বলল না, দুঃখিত মুখে বন্ধ দরজার দিকে চেয়ে রইল।

কফি খাওয়া শেষ করে ছুটি বলল, ও ভুলেই গেছিলাম, আপনার জন্যে একটা জিনিষ এনেছি, বলে ও ঘরে গেল।

ফিরে এল একটি পলিথিনের ব্যাগ নিয়ে, ব্যাগের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে বলল, দেখুন ত, এই পুলোভারটা আপনার গায়ে হয় কিনা।

একটা সুন্দর ফুল-স্লিভস পুলোভার বানিয়েছে ছুটি। ছাই রঙা। বুকের ও হাতের কাছে সাদায় কাজ করা। আর দুটো ছাই-রঙা বড় মোজা।

ভাবলাম এই ঠান্ডায় আপনার কাজে লাগবে। অনেক দিন আপনাকে কিছু দিই নি। পছন্দ হয়েছে আপনার?

আমি চুপ করে রইলাম। চুপ করে ওর দিকে চেয়ে রইলাম।

মাঝে মাঝে আমাদের চোখ এত কথা বলে, চুপ করে কারো দিকে চেয়ে থাকলে চোখ অনর্গল এত কথা বলে যে সে সময়ে মুখে কিছু বলতে ইচ্ছা হয় না।

আমাদের কলমের বা মুখের ভাষা কোনো দিনও বোধহয় চোখের ভাষার সমকক্ষ হতে পারবে না। আমার ছুটির চোখের দিকে চেয়ে আমি বছরের পর বছর কাটিয়ে দিতে পারি, হাজার বছর—।

চোখে কিছু বললে, বলার কিছু বাকি থাকে যা অন্য জনে কল্পনা দিয়ে ভরিয়ে নিতে পারে। মুখে বা লিখে বললে সব নিঃশেষে বলা হয়ে যায়, নিজের হৃদয়ে গোপন ও অব্যক্ত কথার আনন্দময় বেদনা তখন হারিয়ে যায়। সে এক দারুণ নিঃস্বতা।

আমার ফুসফুস হয়ত ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, কিন্তু আমার হৃদয় এখনো তেমনি আছে, আমার হৃদয় যেমন যেমন ছিল। আমার ছুটি আমার চোখের সামনে থাকলে আমার হৃদয় এখনো তেমন ঝমঝমিয়ে বাজে। তখন আমার একটুও মরতে ইচ্ছে করে না।

যেদিন নিশ্চিতভাবে জানব, ও আমার কাছে নেই, এমন কি আমার হৃদয়ের কাছেও নেই, এবং থাকবে না, জানব ও অন্য-কারো হয়ে গেছে অথবা অন্য কারোরই না হয়ে ও কেবল ওর নিজেরই হয়ে গেছে, সেদিন আমার বাঁচার আর কোনো তাগিদ থাকবে না।

হঠাৎ ছুটি বলল, এখনো আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। আমি সত্যিই ভাবতে পারছি না যে আপনি আমাকে একটা খবর দিলেন না কেন?

কি লাভ হত বল জানিয়ে? আমি বললাম, সকলের সব অশান্তি দূর করতে তুমি নিজেকে কোলকাতা থেকে দূরে নির্বাসিত করলে। তোমার কাছে আমি কত ছোট হয়ে আছি, ছোট হয়ে থাকি, তা তুমি জানো না। তাছাড়া এ এমন একটা অসুখ, যে অসুখে তোমার নিজের করার কিছুই নেই। হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলাম, ডাক্তার ছিলেন, নার্সরা ছিলেন। রুগীকে ত একরকমভাবেই থাকতে হয়। তুমি এলে তোমারই কষ্ট হত শুধু।

চিকিৎসা নাই-ই বা করলাম, সেবা নাই-ই বা করলাম, আপনার কাছে ত থাকতে পারতাম।

—তোমার কি ধারণা তুমি কখনও আমার থেকে দূরে থাকো? আমার সঙ্গে তুমি ত সব সময়েই থাকো। সমস্ত সময়। এ কয়েকটা বছরে মনে পড়ে না কখনো যে তোমার কথা একবার না ভেবে একদিনও ঘুম এসেছে আমার অথবা তোমার মুখ না মনে পড়ে ঘুম ভেঙেছে। তুমি কি কখনোও জানোনি যে, তুমি সব সময়েই আমার সঙ্গেই থাক।

ছুটি ওর বড় বড় বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটি তুলে আমার দিকে চাইল। কোনো জবাব দিল না কথার।

লালি খাবার লাগিয়ে দিয়েছিল।

খাওয়ার ঘরে যেতে যেতে বললাম, তুমি কিন্তু খাওয়ার সময় দূরে বসে খাবে। আমার গ্লাস, আমার কাপ সব আলাদা করে রাখবে—আমার ঘরেও মোটে ঢুকবে না। তুমি তাল করেই জান, এ রোগের বিশ্বাস নেই। যতখানি পারো আমার ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলবে।

ছুটি অবাক হয়ে আমার দিকে চাইল, বলল, বুঝেছি আপনি যেমন সব সময় আমায় ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলছেন?

আমরা গিয়ে খাওয়ার টেবিলে বসলাম।

সস্তা লোহার ফোল্ডিং টেবল, ফোল্ডিং চেয়ার, কাঠের দেওয়াল, কাঠের মেঝে।

এ ঘরে প্রচন্ড ঠান্ডা। খাওয়ার ঘরের পাশে রান্নাঘর—মধ্যে এক ফালি ঢাকা বারান্দা—কিন্তু দু' পাশ খোলা। রান্নাঘরটা উত্তরে। এমন হাওয়া আসে যে বলার নয়। হাওয়া আসুক আর নাইই আসুক এ ঘরটা নড়ই ঠান্ডা হয়ে থাকে সব সময়। দিনের কোনো সময়েই এ ঘরে রোদ ঢোকে না।

শালটা ভাল করে মুড়ে বসল ছুটি। ঠান্ডায় ওর ঠোঁট শুকিয়ে গেছে। কিন্তু ছুটি আমার ...

বসছে এই কাঠ-ফাটো ঘর, এই সামান্য আসবাবের দৈন্য, সবকিছুই ছুটি এসেছে বলে অসামান্য হয়ে উঠেছে।

হাসান এসে খুব গরম সুপ দিয়ে গেল।

আমি বললাম, শীগগির খাও, নইলে দু' মিনিটের মধ্যে ঠান্ডা হয়ে যাবে।

ছুটি বলল, আমার ভীষণ শীত করছে, বলে টেবলের নীচ দিয়ে হাত বাড়িয়ে আমার হাঁটুতে রাখল। আমার হাত ওর হাতে নিয়ে ওর হাত গরম করে দিলাম।

লালি ভাঁড়ার থেকে আচারের টিনটা বের করে আনল।

ছুটি দেখে প্রায় চীৎকার করে উঠল, বলল, এ কি? এ আচার আপনি এখানে কোথায় পেলেন? আশ্চর্য। কবে কোলকাতায় বলেছিলাম, ভালবাসি, আর আপনি সে কথা মনে করে রেখেছেন? বলুন না কোথায় পেলেন?

আমি হাসলাম, বললাম, খিদিরপুর থেকে আনিয়েছি।

—ছুটি অবাক গলায় বলল, আপনার মনেও থাকে আশ্চর্য। সব খুঁটিনাটি কথা।

—বললাম, থাকে, সবই মনে থাকে, সমস্ত খুঁটিনাটি কথা মনে থাকে। যা মনে রাখতে ইচ্ছা হয় সেগুলো সবই মনে থাকে।

—এ আচার তবে রাঁচীতেও নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। আশ্চর্য। এত ভালোবাসি অথচ আমার নিজের একবারও মনে হয় নি যে রাঁচীতে খোঁজ করি।

—তাত হল। এখন আচার খাবে কি দিয়ে? আজ ত তোমার জন্যে একেবারে সাহেবী রান্না হয়েছে।

—কাল খাব। কাল আর কিছুই খাব না, শুধু আচার দিয়ে এক থালা ভাত খাব।

—বললাম, পাগলি।

খাওয়া দাওয়ার পর মধ্যের ছোট ড্রইং রুমে চেয়ারের উপর পা তুলে শাল মুড়ে শাড়ি টেনে বসল ছুটি। বলল, মশলা খাবেন? বলে ওর ব্যাগ থেকে একটি কৌটো বের করে একটা মশলা দিল। তারপর বলল, কটা বাজে?

—দশটা। আজ আর গল্প নয়। এতখানি বাসে এসেছ। আজ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ো। আজকাল ভোরে কখন ওঠো তুমি? নটা না দশটা?

ও হাসল। বলল, আজে না স্যার। নিজের অনেক কাজ করতে হয় ভোরে উঠে। আমি কি আর সেই আদুরী, আদরের কৌটোটি আছি? এখন অনেক শক্ত হয়েছি আমি, অনেক কিছু করতে হয় আমাকে নিজের জন্যে। কাল দেখতেই পাবেন, কখন উঠি।

—বললাম, কাল কোন্ সময় কি খাবে এখনি বলে রাখ। হাসানকে আমি সব বুঝিয়ে রাখছি।

—ছুটি চটে গেল, বলল দেখুন, আপনার বাড়িটা আমার ভাল লাগতে হয়ত পারে কিন্তু আমার ... নেই কোনো।

কালকে আমিই সব রাঁধব—আমি আমার যা-খুশী আপনাকে রেঁধে খাওয়াব।

—তাতে আমি খুশী যে হব তাতে সন্দেহ নেই—কিন্তু, চারদিকে এত সুন্দর জায়গা আছে তোমাকে দেখাবার, তোমাকে নিয়ে যাবার যে তুমি একদিনের জন্যে এসে হেঁসেলে ঢুকবে এটা মোটেই ভাল হবে না।

—আহা। যে রাঁধে সে যেন চুল বাঁধে না।

—তা হয়ত বাঁধে, কিন্তু তুমি এমনিতেই রোজ অনেক কষ্ট করো—আমার কাছে যখনি আসবে, যখনি থাকবে তখন অন্তত তোমাকে একটু আরামে রাখতে দিও। তুমি এখানে সুন্দর করে সাজবে, সকাল বিকেলে চারিদিকে ঘুরিয়ে বেড়াবে, ক্ষিদের সময় এসে খাবে—ব্যস—এখানে তোমাকে আর কিছুই করতে হবে না।

—না। তা বললে হবে না। জেদী মেয়ের মত বলল, ছন্দটি।

—তাহলে একটা রফা হোক। হাসানই রাঁধবে, কিন্তু তুমি শুধু একটি পদ রেঁধো। কেমন?

—কি ভাবল যেন ও। তারপর বলল, বেশ, তাইই হবে।

একটু পরে ও বলল, চলুন শুয়ে পড়া যাক।

ওর সঙ্গে আমি ওর ঘরে গেলাম। বললাম, রাতে ভয় পাবে না ত? ভয় পেলে আমাকে ডেকো। আমি পাশেই থাকব। তোমার বালিশের নীচে টর্চ রইল, জ্যোৎস্নে

খাবার জল রইল গ্লাস রইল। বাথরুমের আলোটা জ্বালিয়ে রাখতে পারো, ভয় করলে।

ভোরে আমার জন্যে তোমার তাড়াতাড়ি ওঠার দরকার নেই। ওদিকের ঘরের বাথরুম ব্যবহার করব আমি। যতক্ষণ ভাল লাগে, ঘুমিও। আমার ও তোমার ঘরের মধ্যের দরজাটা ভেজিয়ে রেখো। ভয় নেই, কোনো।

ছুটি এতক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে ছিল, এবার বলল, বুঝলাম।

তারপর বলল, আপনার ঘরে চলুন দেখি।

—আমার ঘরে এসে ও বলল, শুয়ে পড়ুন, আপনার মশারী গুঁজে দিচ্ছি।

—বললাম, তুমি আগে শোও। আমার এখন অনেক কাজ বাকি। সব ঘরের দরজা বন্ধ করতে হবে, বাতি নেবাতে হবে। তুমি আগে শুয়ে পড়ো।

—ও বলল, তাহলে মশারীটা ফেলে গুঁজে দিয়ে যাই অন্ততঃ—। বলেই মশারীটা ফেলে গুঁজতে লাগল।

টেবলের উপর লেখার কাগজগুলো ছিল, ও শুধোল এখন কি লিখছেন?

—বললাম, এই মানুষের ... পটভূমিতে একটা উপন্যাস আরম্ভ করেছি। কি লিখছি তা জেনে তোমার লাভ কি? তোমার কি আমার লেখা পড়ার অবকাশ হয় এখন?

—চোখে খুব রাগ ঝরিয়ে ছুটি বলল, তাত বলবেনই, আপনি ত আর বলেন না কোথায় লিখছেন—কি করে যে এখানে আপনার সব লেখা খুঁজে বের করি তা আমিই জানি। এটুকু বলেই, ওর চোখ দুটি বড় নরম হয়ে এল, ও স্বগতোক্তির মত বলল, খুব ভাল লাগে জানেন...। বলেই থেমে গেল।

আমি বললাম, কি ভাল লাগে?

খুব ভাল লাগে, যখন কেউ আপনার লেখার প্রশংসা করে। বলেই আমার দিকে তাকাল।

আমি ওর চোখে চাইলাম।

ও কথা না বলে মশারী গুঁজতে লাগল।

মশারী গোঁজা শেষ হলে ও বলল, শুতে যাচ্ছি। পরক্ষণেই বলল, এই রে। একদম ভুলে গেছিলাম, বিজয়ার পরে দেখা, আপনাকে প্রণাম করতেই মনে ছিল না। বলেই নীচু হয়ে আমাকে প্রণাম করল।

আমি ওকে দু'হাত ধরে তুলে তুললাম, টেনে তুলে ওর চওড়া সাদা পরিচ্ছন্ন সিঁথিতে একটা চুমু খেলাম। ও ভালোলাগায় কেঁপে উঠল। তারপর ওর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেল।

আমি দুষ্টুমী করে বললাম, তোমাকে একবার আদর করতে খুব ইচ্ছা করছে। কিন্তু আমার ঠোঁটে এখন রাজরোগের বীজাণু। তোমার মুখের কাছে মুখ নেওয়াও সম্ভব নয়।

ও আদুরে গলায় বলল, থাক্ অত আদর করে কাজ নেই।

ছুটি গিয়ে শুয়ে পড়ল। ওর দরজা বন্ধ করার আওয়াজ শুনলাম।

আমি একে একে খাওয়ার ঘর, বাইরের ঘর সব ঘরের দরজা বন্ধ করে, আলো নিবিয়ে ভিতরের বসবার ঘরে এলাম।

বৃষ্টির সময় ফায়ারপ্লেসের চুল্লী দিয়ে জল গড়িয়ে এসেছে ভিতরে। দেওয়ালে তার দাগ হয়ে গেছে। কিছু নোংরাও এসে জমেছে ভিতরে জলের সঙ্গে। কাল এগুলো পরিষ্কার করে, ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালাবার বন্দোবস্ত করতে হবে, ছুটিটার নইলে বড় কষ্ট হচ্ছে ঠান্ডায়।

ফায়ারপ্লেসের কাছ থেকে সরে এসে আলো নিভাতে যাব বসবার ঘরের, এমন সময় ছুটির ঘরের দরজা খুলে গেল খুট করে। দেখি, ছুটি দাঁড়িয়ে আছে, একটা ফুলেলা রঙ কটস্উলের নাইটি পরে। মুখে ক্রীম লাগিয়েছে। দু' বিনুনী করে চুল বেঁধেছে। ওকে ভীষণ বাচ্চা বাচ্চা লাগছে—ওর লালচে ফর্সা রঙে ওকে মনে হচ্ছে কোনো রেড-ইন্ডিয়ান মেয়ে।
—শুধোলাম, কি হল? ঘুমোওনি?

ও দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, না।

—ওর চোখ দেখে মনে হল, ও চাইছে, ভীষণ চাইছে, এই দারুণ শীতের কুঁকড়ে যাওয়া রাতে আমি একটু ওর কাছে যাই।

—ওর সঙ্গে আমি ওর ঘরে গেলাম। ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলাম। নাইটিতে ঢাকা ওর বুকে আমার মুখ রাখলাম।

ও ভাল লাগায় শিউরে শিউরে উঠতে লাগল, আর মুখে বলতে লাগল অসভ্য; আপনি একটা অসভ্য।

আমি ওকে ডাকলাম, ছুটি, আমার সোনা।

ছুটি যেন কোন ঘোরের মধ্যে, কত দূরের জঙ্গল পাহাড় পেরিয়ে কত শিশির-ভেজা উপত্যকার ওপাশ থেকে আমার ডাকে সাড়া দিল, অস্ফুটে বলল, উঁ, আরামে বলল উঁ—উষ্ণতার আবেশে বলল, উঁ......।

আর কোনো কথা হলো না। ও আমাকে আশ্রয় করে, আমাতে নির্ভর করে, আমার শক্ত বুকে ওর নরম, লাজুক, উষ্ণ বুকের ভার লাঘব করে আমার সারা গায়ের সঙ্গে লেপ্টে রইল।

আমি ওর পিঠে হাত বুলিয়ে বললাম, সোনা, আমার ছুটি, এবার ঘুমোতে যাও।

ছুটি অস্ফুটে বলল, না।

বললাম, ছুটি, তুমি এরকম করলে আমি নিজেকে সামলাতে পারব না। আমার খুব খারাপ অসুখ ছুটি, এমন করে না।

ছুটি তবুও বলল, না।

তারপর বলল, আপনাকে যদি আর কখনো এমন করে না পাই। এতবছর ত সকলে মিথ্যামিথ্যি দোষী করল আমাকে; আপনাকে। অপবাদ যখন মাথা পেতে সইই করব তবে নিজেদের ঠকাব কেন? কার জন্যে ঠকাব? আমাদের সকলে ঠকাবে আর আমরা কেন অন্যদের ঠকাবার আগে এতবার ভাবব?

আমি ওকে বিছানায় বসিয়ে দিয়ে বললাম, আমাকে তোমাকে ঠকায় এমন কোনো শক্তি ত নেই পৃথিবীতে। তোমার শরীরটাকে এই মুহূর্তে পেলেই কি ওদের উপর আমার জয় হবে ছুটি? এই যে তুমি আমার সামনে বসে আছ, এই তোমার সমস্ত তুমি, তোমার মন, তোমার সুগন্ধি শরীরের তুমি, এই সমস্ত তুমিই ত আমার, আমার চিরদিনের। যে চিরদিনের, যা বরাবরের তাকে অত তাড়াতাড়ি পেতে নেই। তোমার শরীর ত আমারই—যখনই আমি পেতে চাইব তখনি পাব—এর জন্যে এত অধীরতা কেন তোমার? আমি ত এই মুহূর্তে তোমাকে বুকে জড়িয়েই খুশী—। তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন আমার অসুখ এখনো সারেনি। আমি ত জেনেশুনে তোমার প্রতি অবিচার করতে পারি না।—

ছুটি অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, সুকদা, আমার মন হয়ত আপনার, কিন্তু শরীরটা সম্বন্ধে অত নিঃসন্দেহ হবেন না। আমার শরীর আমারই, আমার একার, এ শরীর অন্য কারো নয়। আমি জানি, আমার মন আপনার ডাকে চিরদিন সাড়া দেবে, ভয় হবে যদি শরীর না দেয়। আমার ভারী ভয় হয় যদি কখনো এমন হয় যে, আপনি কিছু চাইলেন আমার কাছে কিন্তু আমি দিতে পারলাম না।

তারপর একটু থেমে বলল, জানিনা, আবার কবে কতদিন পরে আপনাকে এমন ভাবে, এমন নির্জনতায় এরকম আপনার নিজের কাছে পাব। পরে আমাকে কিন্তু দোষ দেবেন না। বলতে পারবেন না, আপনার ছুটির কিছুমাত্র অদেয় ছিল আপনাকে।

আমি ওর গালের সঙ্গে গাল ছুঁইয়ে বললাম, কখনো বলব না ছুটি, এ কথা কখনো বলবো না। তুমি দেখো, কোনোদিনও বলব না।

(ক্রমশঃ)
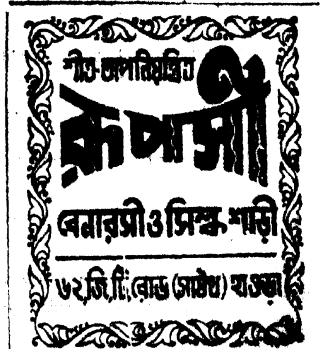
অভিনেত্রী জীবনের অভিশাপ

হিন্দী ছায়াছবির একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রী ছিলেন মীনাকুমারী। অনেকগুলি সার্থকনামা ছায়াছবিতে তিনি যে অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তা স্মরণযোগ্য। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে 'বৈজু-বাওরারা' নামক চিত্রে গৌরীর ভূমিকায় অভিনয় করে মীনাকুমারী খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর শেষ ছবি 'পাকীজা'। এই ছবিটি সম্পূর্ণ হতে লেগেছে প্রায় ষোলো বছর এবং এই ষোলো বছরই চিত্রাভিনেত্রীর জীবনের ঘটনাবহুল বিয়োগান্ত অধ্যায়।

বিদেশে অভিনেত্রীদের জীবন-কথা অনেক আছে। গ্রেটা গার্বো নিজেই লিখেছিলেন তাঁর আত্মজীবনী। গ্রেটা ছিলেন সেকালের রহস্যময়ী চিত্রাভি-নেত্রী। 'আই উইল ক্রাই টুমরো' অভি-নেত্রীর জীবনী হলেও তা সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে। বাংলা ভাষায় একটি বিখ্যাত উপন্যাস 'আই উইল ক্রাই টুমরো'র কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এ উপন্যাসের চিত্ররূপও সার্থক হয়েছে। সুতরাং ছায়া-চিত্র অভিনেত্রীর জীবনেতিহাস পরম আকর্ষণীয় ও রোমাঞ্চকর কাহিনী। তার মধ্যে আছে বিরহ-মিলনের আনন্দ বেদনা এবং সাধারণ মানবিক সুখ-দুঃখের বাস্তব স্পর্শ।

বিনোদ মেহতা কর্তৃক লিখিত 'মীনা-কুমারী' নামক জীবনীগ্রন্থ সম্প্রতি ইংরাজী ভাষায় বোম্বাই শহর থেকে প্রকাশিত হয়েছে এবং বলা বাহুল্য তা নিয়ে যথারীতি একটি আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান নিবন্ধে এই জনপ্রিয় জীবন কথার আলোচনা পরিবেশিত হল।

মীনাকুমারীদের দেশ ভুট্টো সাহেবের দেশ, সেই গ্রামটির নাম ভেরা। মীনার পিতা আলি বকস্ ছিলেন একজন হারমোনিয়ম-বাদক, এবং জীবিকার সন্ধানে এসেছিলেন বোম্বাই শহরে। সেখানে দাদারে কৃষ্ণা কোম্পানীতে বাদকের কাজ পেলেন আলি বকস্, আর পেলেন তাঁর জীবন সঙ্গিনী প্রভাবতীকে। প্রভাবতী নাকি জনৈকা বাঙালী খৃষ্টান নর্তকী এবং লেখকের মতে প্রভাবতীর জননী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতার কন্যা। বাল্যে বিধবা হয়ে-ছিলেন, তার পর খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে মীরাটে যাত্রা করেন এবং সেইখানে জনৈক উর্দু কবি প্যায়রেলাল 'সাকীর' মীরাঠীকে বিবাহ করেন। এঁদের দুটি কন্যার অন্যতমা হলেন এই প্রভাবতী—তিনি পরে আলি বকস্‌কে বিবাহ করে ইকবাল বেগম হয়ে ছিলেন এবং মীনাকুমারীর মতে ছিলেন পরমাসুন্দরী। এইখানে এ কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোনো কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন না। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোনো পুত্রের কন্যা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে আমাদের জানা নেই। অতএব এই তথ্য ভুল। বাংলার বাইরে অনেক সময় যে কোনো বাঙালী রমণী ঠাকুর-বংশের রমণী এই পরিচয় দিয়ে থাকেন। প্রভাবতীর জননী হয়ত এই ধরনের কেউ হবেন কিংবা ঠাকুরবংশের দূর সম্পর্কের কেউ হবেন। রবীন্দ্রনাথের কেউ নন। তবে আমরা যাঁরা বাঙালী তাঁরা সবাই ত' রবীন্দ্রনাথের স্বজন, সেই হিসাবে প্রভাবতীর জননীকেও আমাদের আপন জন এই স্বীকৃতি দিতে হবে।

আলি বক্‌সের তিন কন্যা, খুরসীদ, মাহজবীন (মীনাকুমারী) এবং মালিকা। আলি বক্‌স বেচারী পুত্র সন্তানের আশা করেছিলেন তাই মাহজবীনের জন্মের সময় তিনি ক্ষুণ্ন হন। তবে শেষ পর্যন্ত খুশী হয়ে চাঁদের মত মুখ এই মেয়ের নামকরণ করেন মাহজবীন। চন্দ্রমুখী হওয়ায় চাঁদের নামে এই মেয়েটির নামকরণ করা হয়।

অতি অল্পবয়সে মীনাকুমারীকে তাঁর পিতা আলি বক্‌স একদিন প্রকাশ স্টুডিয়োতে নিয়ে গিয়ে শিশুর ভূমিকায় অভিনয়ের কাজে লাগিয়ে দেন। স্টুডিয়োর কর্তা বিজয় ভাট এই শিশুঅভিনেত্রীকে নগদ পঁচিশ টাকা দেন। সেদিন থেকেই সুরু হল মীনাকুমারীর অভিনেত্রীজীবন।

মীনাকুমারী নিজেই বলেছেন—

'আমি প্রথম যেদিন কাজে গিছলাম আমি ভাবিনি যে, বাল্যজীবনের মধুরতার অবসান ঘট্‌ল। ভেবেছিলাম দু'চারদিন স্টুডিয়ো যাব তার পর আবার সেই স্কুলে ফিরে যাব। অন্য সবার মত কিছু শিখব, কিছু খেলাধুলা করব। কিন্তু তা আর হোল না।'

একটা স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন মীনা-কুমারী, কিন্তু কিছুই হল না। সিনেমার কাজে পড়াশোনা হল না। যেটুকু শিখে-ছিলেন তা 'প্রাইভেট' পড়াশোনার ফল।

মীনা উর্দু ভালো জানতেন, এ ছাড়া ইংরাজী ও হিন্দিতেও তাঁর দক্ষতা ছিল। উর্দু ভাষায় লেখা মীনাকুমারীর অনেকগুলি কবিতার ইংরাজী অনুবাদ হয়েছে।

যা কিছু বন্ধুবান্ধব (শৈশব দিনের) তাঁরা স্কুলের সহপাঠী নন, এঁরা সবাই স্টুডিয়োর-চত্বরে একসূত্রে মিলিত হয়েছিলেন। বিখ্যাত নর্তক সুরেশ এবং বেবী মুমতাজ (পরে মধুবালা) এই দুজন মীনাকুমারীর বাল্যজীবনের সাথী।

তাঁর জীবনে যে মানুষটির ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেই কামাল আমরোহীর সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটে ১৯৩৮-এ। তখন বয়স তাঁর ছিল ছ'বছর। কামাল এসেছিলেন সোরাব মোদীর 'জেলার' ছবির জন্য একটা ছোট্ট ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য আলি বক্সের কাছে। পিতার আহ্বানে সেদিন কলা খেতে খেতে মীনাকুমারী দৌড়ে এসেছিলেন আগন্তুকের সামনে। মাহজবীন (মীনা) কিন্তু সেই যাত্রা নির্বাচিত হলেন না। তিনি বিজয় ভাটের 'এক হি দিল' ছবিতে ছোট ভূমিকায় অভিনয় করতে লাগলেন আর এই বিজয় ভাটই মাহজবীন নামটির বদলে 'বেবী মীনা' নামকরণ করেন।

যখন আঠারো বছর বয়স তখন কামাল আমরোহীর একটি ছবি এক ইংরাজী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তখন বাজারে গুজব 'মহল' ছায়াছবির চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক হিসাবে কামাল এক লাখ টাকা পেয়েছেন। অভিনেতা, খা চিত্র-পরিচালক কামাল মীনার চিত্ত জয় করেন নি। মীনা আকৃষ্ট হল কামাল আমরোহীর লেখক সত্তার প্রতি। যে মানুষটি তাঁর হৃদয় হরণ করবেন, তার একটা সুস্পষ্ট ছবি ছিল মীনার মনে। তিনি চতুর হবেন, বুদ্ধিমান হবেন। তিনি হবেন কবি, লেখক। মানুষের বাহ্যিক আকৃতিটা কিছু নয়—তার সচেতন সংবেদনশীল মনটাই সব কিছু। মীনার চেয়ে কামাল ছিলেন পনের বছর বেশী বয়সের, তিনি তখনই বিবাহিত। তথাপি মীনা গভীরভাবে আকৃষ্ট হলেন এই কামাল আমরোহীর প্রতি।

কামাল আমরোহীর ফটোগ্রাফের দিকে তাকিয়ে মীনাকুমারীর চিত্তে বিদ্যুৎচমক খেলে গেল, তিনি বলেছেন :

> I had a lightning flash before my eyes, bringing realisation with stunning shock which left me trembling sick with a strange apprehension. This was the man of my dreams, the ideal enshrined in my heart. I did not want to believe it. I tried to deceive myself—"

রোমান্টিক মন মীনাকুমারীর। সে কেবল চিন্তা করে, এ কি স্বপ্ন! না মায়া! না মতিভ্রম! অন্তর থেকে কে গেয়ে ওঠে—সেই আমি এই আমি। তুমি যাকে খুঁজে বেড়াও আমি সেই জন।

এই কালে কামাল আমরোহী 'আনার কলি' ছবির কাজে ব্যস্ত। মধুবালা নামভূমিকায় অভিনয় করবেন সব ঠিকঠাক, এমন সময় খবর এল মধুবালা শেষ মুহূর্তে সরে দাঁড়িয়েছেন। তিনি রাজী নন।

কামাল সেই সময় মনে মনে ভাবছেন কাকে নায়িকার ভূমিকায় নেবেন। সেই রাতেই বানদ্রায় লোক পাঠালেন আলি বখসের বাড়ি। যদি মেজ মেয়েকে কোনো মতে এই ভূমিকা গ্রহণে রাজী করানো যায়।

আলি বক্সের কাছে প্রস্তাব পৌঁছাতে তিনি সহজেই রাজী হলেন। কামাল তখনই একজন প্রসিদ্ধ পরিচালকের খ্যাতি অর্জন করেছেন। মীনাকুমারীও খুশী।

'আনার কলি'র কাজে যখন কামাল ব্যস্ত হয়ে ঘুরছেন আগরা-দিল্লী তখন সংবাদ পাওয়া গেল মোটর দুর্ঘটনায় মীনাকুমারী আহত হয়েছেন। মীনাকুমারী হাসপাতালে গভীর হতাশায় আচ্ছন্ন। সিনেমা অভিনেত্রীর স্বপ্ন বুঝি সফল হল না। কি জানি কি আছে কপালে?

তারপর একদিন চোখ খুলেই মীনাকুমারী দেখলে হাসপাতালের বিছানার পাশে কামাল আমরোহী দাঁড়িয়ে। মধুর কণ্ঠে কামাল জানতে চাইলো—কেমন আছো এখন?

মীনাকুমারী বলছেন—আমি তখন আমার নিজের গড়া স্বর্গে। কে কি বলছে জানার প্রয়োজন নেই—কামাল আমরোহী দাঁড়িয়ে আছেন সামনে আমি তাতেই খুশী। যার জন্য আমি আকুল হয়ে আছি, তিনি স্বয়ং এসেছেন আমাকে দেখতে।

এর পরই সুরু হল প্রেমলীলা। বাজারে কানাকানি ছড়ালো। কামাল আমরোহীর বয়স বেশী এবং বিবাহিত। মীনা কি 'দুসরীর বিবি' হবেন? এদিকে কামাল এবং মীনার দুজনের মধ্যে নিজেদের বিবাহের প্রসঙ্গে কোনো আলোচনা নেই। সবাই বলছে বিয়ে হোক। তারপর একদিন বন্ধুজনদের চেষ্টায় ও আগ্রহে স্থির হল বিয়ে হবে দুজনের।

১৯৫২-র ১৪ই ফেব্রুয়ারী আলি বক্স মেয়েদের নিয়ে ডাঃ জুসোওলার ক্লিনিকে গেছেন। তিনি এ্যাকসিডেন্টের পর মীনাকে তার আহত হাতটির চিকিৎসার জন্য প্রতিদিনই এমন নিয়ে যান ডাক্তারের কাছে। সেদিন মেয়েদের রেখে আলি বক্স তাঁর মোটর ঘোরাতেই মেয়েরা আর ক্লিনিকে গেল না। কাছাকাছি ছিলেন কামাল আমরোহী আর তাঁর সেক্রেটারি। চারজনে মিলিত হয়ে একটি প্রকাণ্ড বুইকে উঠলেন, তারপর মাহজবীন ও সইয়দ আমীন হায়দার (কামাল আমরোহীর আসল নাম) দুজনের সিয়া এবং সুন্নী উভয় মতেই সাদি হয়ে গেল।

দুই বোন আবার ক্লিনিকে ফিরে এলেন। একটু পরেই আলি বক্স গাড়ি নিয়ে ফিরলেন, মেয়েদের তুলে নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে চললেন,—তখন কিন্তু তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি যে, তার একটি কন্যার বিয়ে হয়ে গেল এই মাত্র। সদ্য বিবাহিতাকে নিয়ে তিনি ঘরে ফিরছেন। এই জীবন নাটকের বাকী অংশ আগামী সপ্তাহে পরিবেশিত হবে।

—অভয়ঙ্কর

MEENA KUMARI — (BIOGRAPHY): By VINOD MEHTA. Published by JAICO PUBLISHING HOUSE :: BOMBAY PRICE Rs. 5 only.

উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব

ডক্টর শিশির চট্টোপাধ্যায় চলে গেলেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধান হিসেবেই নয়, বাংলাদেশের মানুষ তাঁকে চিনেছিল, কবিতার অনুবাদক ও সমালোচক হিসেবে। তাঁর শ্যামলা রঙ, দীর্ঘ শরীর এবং উজ্জ্বল কণ্ঠস্বর, সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করত।

এককালে রবীন্দ্রনাথের 'পত্রপুট' কাব্যের কবিতাগুলি ইংরেজীতে অনুবাদ করে, তিনি অনেকের প্রশংসাভাজন হয়েছিলেন। তরুণ কবিদের কবিতাও পড়তেন মনোযোগ দিয়ে। এবং যখনই যাঁর কবিতা ভালো লাগত, তখনই অনুবাদ করে অন্যভাষীদের কাছে, তাঁর কবিতা পৌঁছে দিতেন। এই সেদিনও, সুকান্তর কয়েকটি কবিতার ইংরেজী অনুবাদ করেছেন তিনি, মূলের ধ্বনি ও অর্থগৌরবকে অব্যাহত রেখে।

ডক্টর চট্টোপাধ্যায় ছাত্রছাত্রীদের কাছেও ছিলেন জনপ্রিয় অধ্যাপক। পড়াশোনা করেছেন মিত্র ইনস্টিটিউশান, সেন্ট পলস কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৫৫ সালে লণ্ডন য়ুনিভার্সিটিতে যোগ দেন, আধুনিক ইংরেজী উপন্যাসের টেকনিক নিয়ে গবেষণার জন্য। দু বছর পরে পি-এইচ-ডি হয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন।

তাঁর সাহিত্যকীর্তির পরিচয় এত অল্প পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়। কেবল, যে-বইগুলি ইংরেজী সমালোচনা সাহিত্যের নিদর্শন বলে বিবেচিত হয়ে থাকে, সে-বইগুলির নামই উল্লেখ করছি : (১) অলডাস হাকসলি—এ স্টাডি; (২) দি নভেল আজ দি মডার্ন এপিক; (৩) জেমস জয়েস—এ স্টাডি ইন টেকনিক; (৪) দি টেকনিক অব দি মডার্ন ইংলিশ নভেল; (৫) প্রোবলেমস ইন মডার্ন ইংলিশ ফিকশান, এবং (৬) ভার্জিনিয়া উলফ। বাংলাদেশ সম্পর্কে, তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ

'বাংলাদেশ : দি বার্থ অব এ নেশন'-এর নামও স্মরণীয়। 'ফোরাম' 'বিহার হেরাল্ড' 'স্যাটারডে রিভিউ'র পাতায় তাঁর বহু প্রবন্ধ এখন ছড়িয়ে আছে।

কলকাতায় শ্রীমতী রুথ ক্রাফট

আমন্ত্রণ জানান তাঁকে ভারত সরকার। এলেন তিনি দুই রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক বিনিময়ের কর্মসূচী অনুসারে। প্রথমেই উঠলেন দিল্লি। তারপর ঘুরলেন জয়পুর, আগ্রা, বারাণসী, বোম্বে, ভুবনেশ্বর। কলকাতায়ও এসেছিলেন তিনি। জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অন্যতম জনপ্রিয় লেখিকা ফ্রাউ রুথ ক্রাফট।

১৯২০ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি জন্মেছিলেন তিনি। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে তার দু বছর আগেই। অর্থনৈতিক মন্দা আর মুদ্রাস্ফীতিতে ভুগছিল তখন জার্মানি। সেই সময়েই রুথের বাবা কেনেন একটি ছোট্ট দোকান। যা লাভ হত তাতে কোন রকমে চালানো সম্ভব হয়েছিল রুথ আর তাঁর বোনের মাধ্যমিক শিক্ষা। স্কুলের গণ্ডি শেষ হবার পর রুথের বাবা যখন মেয়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তিত সে সময়েই রুথ নিলেন এক অদ্ভুত সিদ্ধান্ত।

এক বছর প্রাইভেট হাউসহোল্ডে কাটিয়ে ম্যাথমেটিক্যাল ও ফিজিক্যাল কাজ নিলেন সেনাবাহিনীর পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক স্টেশন পীনেমিউন্ডে-তে। তখন থেকেই জাগে লেখার ইচ্ছে, লিখেও ফেলেন কিছু কিছু, কিন্তু ছাপান নি।

গার্হস্থ্যবিজ্ঞান নিয়েও পড়াশোনা করেন একদা জার্মান-জাপানীজ ইউনিভার্সিটি টিচার্স হোমে। সে সময়েই জাপানী পদার্থবিদ সিন-ইটাচিরো তোমোনাগার সংস্পর্শে আসেন। কয়েক বছর বাদে ইনি পেয়েছিলেন নোবেল পুরস্কার। নোবেল পুরস্কৃত এই বিজ্ঞানীর প্রভাব পড়েছিল রুথ ক্রাফটের উপর। তারই স্বীকৃতি হল ১৯৬৫তে প্রকাশিত লেখিকার 'মেনশেন ইম গেগেনলিখ্ট' উপন্যাসটি।

রুথ ক্রাফট পীনেমিউন্ডেতে বেশ কঠিন গাণিতিক হিসেব-নিকেশের কাজে ছিলেন মগ্ন। নাৎসী বাহিনীর সেই ভয়ংকর অস্ত্র 'এ-৪' প্রোজেক্টের জন্য এয়ারোডায়নামিক হিসেব-নিকেশ করতেন তিনি। এই সময়কার অভিজ্ঞতা নিয়েই লেখেন 'ইনজেল ওনে লয়েশ্টফয়ার'। বেরোয় ১৯৫৯-এ। আমি ফ্যাসিবিরোধী প্রতিরোধের কোনো মানে আর লক্ষ্য বুঝতে পারিনি আগে। জানান মিসেস ক্রাফট। পরে অবশ্য বুঝেছিলেন তিনি। তবু ব্যক্তিজীবনে সবসময়েই আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে ছিলেন দোদুল্যমান। মানসিকতার দিক থেকে একসময় ছিলেন নাৎসীদের একান্ত কাছের। সময়ের পট-পরিবর্তনে ক্ষত-বিক্ষতও কম হননি। স্বপ্নভঙ্গের ছিল বেদনাও। এক সময় রেড আর্মিরও মুখোমুখি পড়েছিলেন রুথ। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ও নিতান্তই ব্যক্তিগত মূল্যবোধ তাঁর কোন কোন গল্পের হল বিষয়বস্তু। আত্মার স্বাধীনতার কথাও ফেলেছে কখনো-সখনো ছাপ। একই বিষয় নিয়ে ১৯৭০-এ লেখেন 'গেস্টুনডেটে লিবে' উপন্যাস। ১৯৪৫-এ ছিলেন প্রথম ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চলে। পরে পার হলেন সীমানা। এলেন সোভিয়েত অঞ্চলে। ১৯৪৬ সাল থেকেই ফ্রীলান্স লেখিকা। লিখতে শুরু করেন বিশেষভাবে বেতার নাটিকা। মানবতাবাদী দৃষ্টিই ছিল এসব রচনার মূলে। শুধু উপন্যাস নয়, গল্প, কবিতা, শিশুসাহিত্য সবদিকেই রয়েছে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর।

এই জনপ্রিয় জার্মান লেখিকাকে গত ২০শে জানুয়ারি সম্বর্ধনা জানালেন ভারত-গণতান্ত্রিক জার্মান সাহিত্য সমিতি। 'পরিচয়' পত্রিকার দপ্তরে সেদিন উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের তরুণ ও অনতি-তরুণ কবি-ঔপন্যাসিক বুদ্ধিজীবীরা। রুথ ক্রাফটের প্রাথমিক পরিচয় তুলে ধরেন কলকাতাস্থ জি ডি আর দূতাবাসের ভাইস-কনসাল মিঃ এইচ ডি ৎসিমার। লেখিকাও বললেন তাঁর নিজের কথা। মেলে ধরলেন সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর ভাবনাচিন্তা। জানালেন ভারতবর্ষ সম্পর্কে অসীম শ্রদ্ধার কাহিনী। একে একে উত্তর দিলেন উপস্থিত সাহিত্যিকদের প্রশ্নগুলি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কবি তরুণ সান্যাল।

গণতান্ত্রিক জার্মানির এই লেখিকাকে আরেকটি অনুষ্ঠানে সম্বর্ধনা জানান সর্বভারতীয় কবি-সম্মেলন। ১০ হিন্দুস্থান রোডে আয়োজিত ২৪ জানুয়ারির এই সভায় পৌরোহিত্য করেন সতীকান্ত গুহ।

দুদিনের এই ভিন্ন ভিন্ন আলোচনায় যাঁরা অংশ নেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন অন্নদাশংকর রায়, মণীন্দ্র রায়, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণেন্দু দাশগুপ্ত, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, শান্তিকুমার ঘোষ, আশিস সান্যাল, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ সেনগুপ্ত, লীলা রায়, হরেন চট্টোপাধ্যায়, গণেশ বসু, ধনঞ্জয় দাশ প্রমুখ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে

কয়েকদিন আগে ভারত ঘুরে গেলেন কবি উইলিয়ম স্ট্যাফোর্ড। এসেছিলেন তিনি রবীন্দ্রনাথের দেশ দেখতে, ভারতীয় কবি-সাহিত্যিকদের সাম্প্রতিক ভাবনা-চিন্তার পরিচয় নিতে। উইলিয়ম স্ট্যাফোর্ড ভ্রমণ করলেন দিল্লি, কলকাতা, বোম্বে, মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গালোর।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অত্যন্ত সম্মানিত লেখক স্ট্যাফোর্ড এ পর্যন্ত পেয়েছেন একাধিক পুরস্কার। ১৯৬২-তেই পান তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'ট্রাভেলিং থ্রু দ্য ডার্ক'-এর জন্য ন্যাশনাল বুক অ্যাওয়ার্ড। অন্যান্য কয়েকজন আমেরিকান কবির সঙ্গে মিলে একসময় অনুবাদ করেন গালিবের গজল, উর্দু থেকে। মিঃ স্ট্যাফোর্ড জন্মেছিলেন ১৯১৪ সালে কানসাসে। বর্তমানে তিনি পোর্টল্যান্ডের লুইস অ্যান্ড ক্লার্ক কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের আবাসিক অধ্যাপক।

শ্লোভাকের খবর

বয়সের তুলনায় নিঃসন্দেহেই কাজটি গুরুত্বপূর্ণ। অন্তত, একজন তরুণ লেখকের পক্ষে এমনতরো দায়িত্ব পালন হেলাফেলার নয়। কেননা, এই জানুয়ারির ২৫ তারিখেই পা দিলেন তিনি সবে তিরিশে। অথচ এরই মধ্যে এক ডাকে তাঁর নাম আজ পরিচিত চেকোশ্লোভাকিয়ার মানুষজনের কাছে।

লেখকের নাম পিটার জারোস। মাত্র কিছুকাল আগেই ব্রাতিশ্লাভায় শেষ হয়েছে তাঁর ফিলজফিক্যাল ফ্যাকাল্টির পড়াশোনা। এখন কাজ করছেন সম্পাদক হিসেবে চেকোশ্লোভাকিয়ার বেতারে।

পিটার জারোস হলেন, শ্লোভাকের তরুণ গল্প-লেখকদের মধ্যে অন্যতম শক্তিশালী এবং জনপ্রিয়। বয়স যখন তাঁর মাত্র তেইশ তখনই বেরোয় তাঁর আলোড়নকারী ছোট গল্প 'সড়কে বিকেল'। গল্পটিতে তরুণ মানসিকতার এক সমস্যাকেই তুলে ধরেছেন লেখক। যুব-মনের নানামুখী ভাবনা-চিন্তার জাল বিস্তার করেছেন অপরূপ গীতল গদ্যে। ভয়ংকর টেনসনে ভরা মননশীল এই গল্প প্রকাশের পরই সাড়া পড়ে যায় পিটার জারোসকে নিয়ে। সেই থেকে প্রায় প্রতি বছরই বেরুচ্ছে একটি করে তাঁর গল্প-সংকলন কিংবা উপন্যাস। ১৯৬৪-তে বেরুলো 'নিজেকে বাঁচাও মহাসাগর'। পরের বছরই প্রকাশিত হল 'হুয়ারা'। এই উপন্যাসটি শুধু পাঠকদেরই নয় সমালোচকদেরও চমকে দেয়। ১৯৬৬-৬৭তে বেরোয় যথাক্রমে 'সেকেলস' এবং 'আর্নিং টি ইমমোভাবিলিটি'। পরের বছর বেরুলো 'মিনিট'। এই গ্রন্থে উন্মোচিত হল লেখকের প্রতিভার নতুন দিগন্ত। জন্মভূমির কথা, সেখানকার মানুষের ছেলেবেলার দিনগুলি রাতগুলি আর কিংবদন্তীর কাহিনী সব কিছু মিশেল দিয়ে গল্পে আনলেন নতুন স্বাদ। একই বছরে প্রকাশিত হয় 'মূর্তি' নিয়ে ফিরে আসা'। ১৯৭০-এ বেরুলো 'রক্তের দাগ'। এই গল্প-সংকলন লেখককে এনে দিল নতুন সম্মান। পেলেন পুরস্কার। দিলেন শ্লোভাক রাইটার্স পাবলিশিং হাউস।

নতুন বই

রবীন্দ্র-সাহিত্যের নরনারী (প্রথম খণ্ড : উপন্যাস) : গোপীমোহন সিংহরায়, ভারবি : ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। আঠারো টাকা।

পাঁচ খণ্ডে রবীন্দ্র-সাহিত্যের চরিত্রাভিধান ও বিচার-বিশ্লেষণ প্রকাশের সংকল্প নিয়ে শ্রীযুক্ত গোপীমোহন সিংহরায় এই প্রথম খণ্ডে গ্রন্থানুক্রমিক সূচি-সমেত মোট ৩৪৪ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির চরিত্র-পরিচিতি দিয়েছেন বিশদভাবে। অবশ্য বিচার-বিশ্লেষণ অংশ পঞ্চম

খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হবে, বইখানির 'পূর্বাভাষ'-অংশে একথা জানানো হয়েছে। লেখকের নিজের কথা—'আমার প্রযত্ন আভিধানিক হলেও যেন তারা (চরিত্রগুলি) একেবারে নির্জীব নিরক্ত না হয়ে পড়ে'—সেদিকে তিনি নজর রেখেছেন। তিনি আরো জানিয়েছেন—'প্রায় দু হাজারের মতো চরিত্র সৃষ্টি করেছেন রবীন্দ্রনাথ, তাদের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য ও রূপবৈচিত্র্যের কথা চিন্তা করলে তাঁকে মনুষ্যচরিত্রের মহাকবি বলাই সমীচীন হয়।'

বইখানির ছাপা, কাগজ, বাঁধাই পরিচ্ছন্ন—বিশেষভাবে এই ধরনের বইয়ের (যা বহুদিন বহু পাঠক-লেখক-গবেষকের নিত্য-ব্যবহারের সামগ্রী হয়ে থাকবে—) পক্ষে যে আদর্শ রক্ষা করা উচিত, এতে তা আছে। তবে চরিতাভিধানে চরিত্রগুলির পরিচিতি অনেক ক্ষেত্রেই একটু বেশি বিস্তৃত হয়েছে বলে মনে হতে পারে। মূল বইয়ে বর্ণিত কাহিনীর মধ্যে বিশেষ চরিত্রের অবস্থানসূত্রটুকু ধরিয়ে দেবার চেষ্টাটুকুই যথেষ্ট, শ্রীযুক্ত সিংহরায় কিন্তু সেই সীমারেখাতে নিজের 'প্রযত্ন' আবদ্ধ রাখেননি। নৌকাডুবির অক্ষয়, প্রজাপতির নির্বন্ধের অক্ষয় মুখুজ্জে, চার অধ্যায়ের অতীন্দ্র, চতুরঙ্গের দামিনী, যোগাযোগ-এর বিপ্রদাস চাটুজ্জে, চোখের বালির বিনোদিনী, 'মহেন্দ্র' এবং এইরকম বিভিন্ন চরিত্রের প্রসঙ্গে প্রায় পুরো কাহিনীটি তাঁকে সংক্ষেপিত করতে হয়েছে। এরকম দুটো অস্বাভাবিক নয়,—গোরার 'মনোরঞ্জন' একটি নাম মাত্র,—এক ছত্রেই তার পরিচিতি পরিবেশনযোগ্য, কিন্তু নায়ক স্বয়ং 'গোরা' তো স্বভাবতই বেশি জায়গা দাবি করবে। তবে সেজন্য অভিনয় পত্রের আতিশয্য [illegible] নয় কি।

লেখকের অধ্যবসায় অপরিসীম। রবীন্দ্র-গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর এই কাজটি যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তাতে সন্দেহ নেই।

হরপ্রসাদ মিত্র

স্বামিজীর পদপ্রান্তে (জীবনী) : স্বামী অব্জজানন্দ। রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, বেলুড় মঠ। দশ টাকা।

ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্যের জীবনী রচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেমন তাঁর অনুসারী প্রধান ভক্তদেরও জীবনী রচিত হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে সেই জীবনী-সাহিত্যধারার অনুসরণ দেখা যায়, ঊনিশ শতকে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনচরিত লিখিত হওয়ার পর তাঁর ঘনিষ্ঠ কয়েকজন শিষ্যের জীবন ও বিরাট সত্তার বিস্তৃত পরিচয় দিয়ে বর্তমান সংকলনটি বিবেকানন্দ জন্মশতবর্ষপূর্তি স্মারকগ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থটি দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রায় বছর তিনেক আগে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বর্তমান সংস্করণের বৈশিষ্ট্য হল—এই সংকলনের প্রতিটি জীবনী লেখক কর্তৃক পুনঃসম্পাদিত ও অধিকতর তথ্যসমৃদ্ধ করা হয়েছে। মোট তেরোজন শিষ্যের জীবনকথা বর্ণিত হয়েছে। স্বামী শুদ্ধানন্দ, বিরজানন্দ, বিমলানন্দ, স্বরূপানন্দ, আত্মানন্দ, শুভানন্দ, পরমানন্দ ইত্যাদির জীবন-ভাবনাগুলি লেখক সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে রচনা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী-লিখিত ভূমিকা অংশটি অত্যন্ত মূল্যবান। কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য ফটো এ গ্রন্থের অন্যতম সম্পদ। স্বামিজীর বহু শিষ্য এবং সকলেই প্রণম্য। প্রকাশের তারতম্য থাকলেও তাঁদের প্রত্যেকের চরিত্রেই স্বামিজীর দিব্যস্পর্শ আছে। বর্তমান সংকলনে যাঁদের নির্বাচন করেছেন আলোচ্য হিসেবে—তাঁরা প্রত্যেকে প্রত্যক্ষভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাই ঊনিশ শতকের বলিষ্ঠ ভূমিতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে নিয়ে যে বিরাট ধর্মান্দোলন দেখা দেয়, তার গবেষকরা বর্তমান গ্রন্থে অনেক নতুন তথ্য, তত্ত্ব ও অন্যান্য বিষয়ের সংবাদ পাবেন। এ গ্রন্থ শুধুমাত্র বিশেষ ভক্তদের কাছেই প্রিয় নয়, সাধারণ ধর্মজিজ্ঞাসু পাঠকদের কাছেও এ গ্রন্থের সমান আকর্ষণ আছে। সর্বোপরি লেখক স্বামী অব্জজানন্দের ভাষা, গদ্য ও আলোচনাভঙ্গি অত্যন্ত সরস ও সাবলীল হওয়ায় পাঠকদের পাঠ সহজসাধ্য হবে।

জলের আলপনা (কাব্য সংকলন)—বিজয়কুমার দত্ত। কবিতা পরিষদ, ৬০।১।৮, লেক রোড কলকাতা-৯। তিন টাকা।

বিজয়কুমার দত্তে 'জলের আলপনা'র কবিতাগুলিতে প্রেমের কথায় অকপট, স্মৃতির সূক্ষ্ম চেতনায় অন্তর্লেশায়ী। ভালবাসার অনুভবে কবি বলেন—'চিরন্তনী প্রতিমার পায়ে মাথা রেখে / সকাল সন্ধ্যায় শান্ত দুপুরের গভীর অবসরে / আমি এক চিরহীন সৌন্দর্য মাস্টার।' (বয়স)। আবার স্মৃতি-অনুষঙ্গে সূক্ষ্মতায় বলে উঠেছেন—'কি যেন কখনো ছিল / আজ নেই, এমন ভাবনার / পায়ে পায়ে ধ্বনিত নূপুরে শেষ সম্বল। / স্মৃতির সঙ্গে স্বগতভাষণে কবির হৃদয়-অনুভব পবিত্র, আলোয়-ধোয়া পরিচ্ছন্ন—'মনে পড়ে, কার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংলাপে / সমস্ত পৃথিবীময়, হাজার সূর্যের আলো / জ্বলেছিল চোখের শিরায়।' (মনে পড়ে)। আলোচ্য কবির কবিতা রোমান্টিক অনুভাবনায় মাদকস্বাদী, চিত্রকল্পগুলি চার-পাঁচ-এর দশকের বহু কবির শব্দ অভিজ্ঞতা স্মরণ করায়। তবু কবির প্রেম-অনুভবে স্বাতন্ত্র্য আছে। কবিতাগুলির অধিকাংশই গদ্যাত্মক, তাই কোন কোন কবিতায় অন্তর্মিল শ্রুতিসুখকর হয়নি। কবি ছন্দের ব্যাপারে সতর্ক। কবি-ভাবনা যেহেতু সমসময়োচিত আত্মমুখীন, তাই শব্দ, ছন্দ, চিত্রকল্প-ব্যবহার ব্যঞ্জনাত্মক।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-লীলামৃত (পূর্বার্ধ)—সুরেন্দ্রমোহন শাস্ত্রী। প্রাপ্তিস্থান : মহেশ লাইব্রেরী, ২।১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ১২। দাম : আট টাকা।

নৈতিক শক্তির উদ্বোধনে, মধ্যযুগের বাংলাদেশ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যকে পেয়েছিল, বিশ্বাস ও ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে। তিনি ছিলেন মানবতাবোধ ও আধ্যাত্মিকতারও একমাত্র প্রেরণাস্থল।

তাঁর মহাপ্রয়াণের পর, তাঁর জীবনকে কেন্দ্র করে, অনেকে অনেক কাব্য রচনা করেছেন এবং ভক্তের আকুলতা নিয়ে বৈষ্ণবীয় ভাবাদর্শ ও অধ্যাত্মদর্শনের পুনর্মূল্যায়ন করেছেন। দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানেও সেইসব আশ্চর্য গ্রন্থের এতটুকু অবমূল্যায়ণ ঘটেনি।

এই গ্রন্থের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন শাস্ত্রী, মহাসাগরের মতো বিশাল ও গম্ভীর, শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অপার লীলারাশি বর্ণনা করেছেন, মিত্র ও অমিত্র পয়ারে। প্রকাশভঙ্গি সহজ ও সরল। আমাদের বিশ্বাস, এই গ্রন্থটি প্রত্যেক ভক্ত ও রসপিপাসু পাঠকের কাছে, সংগ্রহযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

কণ্ঠস্বর। বিশেষ শারদ সংখ্যা। ৫ম বর্ষ। সম্পাদক—সত্যরঞ্জন বিশ্বাস। ১১।২, টেমার লেন, কলিকাতা—৯। দাম—১ টাকা।

আধুনিক কবিতা নিয়ে যেসব পত্র-পত্রিকা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে কণ্ঠস্বর তাদের মধ্যে একটি। এ পত্রিকাটি শুধু তরুণ কবিদের মুখপত্রই নয়, আধুনিক কবিতা আন্দোলনেরও একটি বিশেষ দলিল। এ সংখ্যায় প্রায় পঞ্চাশজন তরুণ কবি কবিতা লিখেছেন এবং এসব কবিতার স্বাদও নতুন। এছাড়া আছে কয়েকটি প্রবন্ধ।

কবিতায় নতুন ছন্দ, আঙ্গিক, বিষয়বস্তু নিয়েও কয়েকটি কবিতা কিছুটা রীতি ভাঙার রীতিতে লেখা হয়েছে। বিশেষ করে ইন্দ্রনীল, ভট্টাচার্য [illegible]ন, স্বাতী লাহিড়ী, সত্যরঞ্জন বিশ্বাস ও গণেশ সেনের কবিতা উল্লেখযোগ্য।

চাষবাস। প্রথম সংখ্যা। প্রথম বর্ষ। সম্পাদক—সত্যরঞ্জন বিশ্বাস। ১১।২ টেমার লেন, কলিকাতা—৯। দাম—৫০ পয়সা।

চাষবাসের ভাল পত্রিকার খুবই অভাব। অধিক ফসল পাওয়ার জন্য চাষীরা আগ্রহী। কিন্তু মাটি, সার প্রয়োগ, বীজের ব্যবহার, কীটনাশক প্রয়োগ ইত্যাদি ব্যাপারে চাষীদের নানা প্রশ্ন। এ পত্রিকাটি চাষীদের সে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেছে অতি সহজ বাংলায় সহজ ভাবে। চাষীরা কিভাবে ঋণ পাবেন, কোথায় দরখাস্ত করতে হবে, কীটনাশক, সার প্রয়োগের উপর কয়েকটি ভাল লেখা ছাড়াও আছে এ মাসের কৃষি পঞ্জী, অধিক ফলনশীল ধান চাষ, বোরো ধান চাষ, আলু ও শাকসব্জি চাষের উপর ভাল প্রবন্ধ। উৎসাহী চাষীদের এ পত্রিকাটি খুবই কাজে আসবে। পত্রিকাটি বেশ পরিচ্ছন্ন ও সুপরিকল্পিত। মলাটে প্রধানমন্ত্রীর চাষ করার ছবিটি চমৎকার।

দেখছি সাহেবদের সঙ্গে লড়ার মতলব! এখনও চিন্তা করার সময় আছে!

করিম এবার হেসে ফেলল।

মোরা কি আর মানুষ দা-ঠাকুর!

দু'হাত চিৎ করে বলল—দ্যাখো না—দাঠাকুর! আঙুলগুলোর গাঁটে গাঁটে কড়া পড়েছে—শক্ত চামড়া—টিপলে ব্যথা বিষ। লড়ার কথা বলছ—লড়ার লোক আছে!

—এই জেলায়—এই বারাসতে!

—না গো-না!

করিমের চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

—লড়বে যশোরের শিশির ঘোষ। সাহেবদের সাত ঘাটের জল খাইয়ে দেবে!

বনমালির মুখে একটু হাসি ফুটলো—তাচ্ছিল্যভরে বলল—ওঃ, শিশির ঘোষ! এক ফুঁ—ঠোঁটদুটো উঁচু করে বনমালি একটা ফুঁ দিল। তারপর একটু গম্ভীর হয়ে বলল—ওসব মতলব টতলব ছাড়ো—যেমন চলছে সেই ভাবে চলো—নইলে বিপদ, মহা বিপদ!

—ঝিকরগাছার কোন খবর রাখো দা-ঠাকুর!

ভেংচি কেটে বনমালি বলল—রাখি-রাখি—সব রাখি! বশটা ছোঁড়া নিয়ে শিশির ঘোষ মিটিং করল—মেকেঞ্জি সাহেবের লেঠেলরা যেমনি এলো অমনি দৌড়।

—দাঠাকুর! তুমি তালে জানো না—ভুল শুনেছো! মুই সেখানে ছিলুমে আরে লোক—খালি মাথার সমুদ্দুর—হাজারে হাজারে লাখে লাখে! সাহেবের লোকেরা তির সীমানায় এলো না—সাহসই করল না! শিশিরবাবু বলল—ভাইসব! নীল তো তোমরা বুনবেই না—দাদনও নেবে না। মোরা হৈ হৈ করে উঠলুম—নীল মোরা বোনবো না—দাদন নেবোই না—জান থাকতে না। দাঠাকুর! তুমি ঐ সাহেবটার কথা বললে—ও বেটা এক মহা শয়তান। চাষীর ভাল ভাল অল্পবয়সের মেয়েগুলোরে কুঠিতে এনে বাঁদী করে রেখেছে! কেউ বলে পঁচিশটা—কেউ বলে পাঁচশো! কথাটা উঠতেই সব লাঠি নিয়ে ছুটল। কুঠির সামনে ঠকাঠক লাঠি! একটা পেয়াদা এল—বলল সাহেব তো নেই!

করিম হেসে উঠল।

—দাঠাকুর! সাহেব তখন যশোরে—পলাতক!

বনমালি কিছুক্ষণ চুপ করে রইল—তারপর কোঁচকানো মুখখানায় কালো কালো শিরগুলো মোটা মোটা হয়ে উঠেছে—করিমের দিক থেকে মুখখানা সরিয়ে নিয়ে গাম্ভীর্যের ভাব দেখিয়ে চুপ করে রইল—তার লম্বা লম্বা হাটদুটো নাচাতে সুরু করে দিল।

চাটুজ্যে-গিন্নীর সুর নরম, বললেন—বাপু, আদার ব্যাপারীর আবার জাহাজের খবর কেন? হাঙ্গামা-হুজ্জুতের দিকে যেও না, করিম—ওসব কাজে মাথা না দেওয়াই ভাল! তোমাকে ছেলের মতো দেখি! দাঠাকুর তো তোমার কোন অভাব রাখেননি!

—ঠিক, খুব ঠিক মাঠান! কিন্তু ফেরার তো আর পথ নেই! সেদিন শুক্কুরবার—জুম্মার নামাজ হলো—কসম নিলুম, নীল আর বোনবো না—জান গেলেও না!

বেঙ্গল ইন্ডিগো কনসার্ণ! সারা বাংলার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। চব্বিশ পরগণার উত্তরে একটা নাতি-বৃহৎ জেলা—বারাসত। কলকাতার কাছে। বিলেতের দুষ্টু ছেলেদের ধরে এনে এখানে মিলিটারী ট্রেনিং দেওয়ার জন্যে ইংরেজরা ক্যাডেট কোর কলেজ করল—স্যান্ড হার্স্ট অফ বেঙ্গল পার্কীতে বা নৌকোপথে কলকাতা ছিল সহজগম্য, যোগা-যোগের সুযোগ ছিল প্রচুর। স্যার এব্রাহাম রবার্টস্ • লর্ড রবার্টসের বাবা। তিনি ক্যাডেট কলেজের প্রিন্সিপাল, কিন্তু ছেলে-গুলো ছিল আয়ত্তের বাহিরে। ভারত সরকার উঠিয়ে দিলেন কলেজ। সারা ইউরোপে তখন নীল চাষের সাড়া পড়ে গেছে। বাংলা হচ্ছে উপযুক্ত ক্ষেত্র। বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামে নীল কুঠি উঠলো। সাহেবরা নবাবী কেতায় বাস করার সুযোগ করে নিল। বারাসত জেলার গুরুত্ব তখন বেড়ে গেছে। সাহেব সিভিলিয়ান জেলার কর্তা—ভাগলপুরে আর বরিশালের মতো বারাসতের ম্যাজিষ্ট্রেটের বাৎসরিক বারো হাজার টাকার বদলে আঠার হাজার টাকার মাইনে ঠিক করা হল। বারাসতের ম্যাজিষ্ট্রেট হবার জন্যে বড়লাটের দরবারেও তদ্বির চলল। বারাসত ছিল প্লাম্প স্টেশন। বারাসতের ম্যাজিষ্ট্রেটরা নীলকর সাহেবদের সঙ্গে হৃদ্যতা রেখেই চলতেন। চলত খানাপিনা, চলত অনেক রাত পর্যন্ত বাঈজীর নাচ আর বিলিতি সরাব। অল্পবয়সী অবিবাহিত ম্যাজিষ্ট্রেটরা নীল-কুঠিতে সুখেই রাত কাটাতো। এর দক্ষিণা? কনসার্ণের দুষ্টু লোকদের অপরাধ মাপ করা! বেঙ্গল ইন্ডিগো কনসার্ণের প্রধান আফিস নদীয়ায় মুল্লনাথে। দ্বিতীয় আপিস বারাসতে। জেনারেল ম্যানেজার লারমুর বারাসতটাকে বেশী পছন্দ করত। মুল্লনাথের চাষীগুলো আদব-কায়দা জানতো না—যেন খাজা-খাজা! কলকাতার কাছেই বারাসতে লোকগুলোও ভাল। নিতান্ত কাজের গতিক ছাড়া লারমুর বারাসত ছেড়ে থাকতো না। নীলকর সাহেবদের বারাসতের বাড়ী প্রকাণ্ড—গথিক স্টাইলের। চারপাশে প্রচুর জমি, ফুলের বাগান, দিশী বিলিতী ফুলের মেলা। ডলির কথায় সাহেব গোটা-শতক জবা গাছ বসিয়েছে। রোজ সকালে বেয়ারা ডলির মার জন্যে ফুলগুলো পৌঁছে দেয়। তিতুমীরের উপদ্রব একসময়ে খুব ছিল। কুঠির পিছনটা সুরক্ষিত করার জন্যে লম্বা বেড়বাঁশের সারি বসানো। নারকেল-বেড়ের বাঁশের কেল্লা লর্ড বেন্টিঙ্ক ধ্বংস করে দেন। নিষ্ঠুর ওয়াহাবিরা ছত্রভঙ্গ তবুও তাদের মধ্যে দু-চারজন লুকিয়ে লুকিয়ে দল পাকায়—সুবিধামত নীলকুঠি লুঠ করে—অসহায় পথিকদের সর্বস্ব কেড়ে নেয়। যমুনা নদীর ওপর তাদের উপদ্রবটা ছিল বেশি রকমের। নতুন রোগ ম্যালেরিয়ায় বাংলার স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হতে চলেছে—সম্পদ অলক্ষ্যে উঠে যাচ্ছে তবু বাঙালী-বাঙালী—সে তার মর্যাদা হারায়নি। বোশেখে মনসন। চাষের সুযোগ এসে গেল। চাষীরা জোড়-জোড়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। সে বছর বোশেখের গোড়াতেই বর্ষণ শুরু হয়ে গেল। কালো জমাট মেঘের সংঘর্ষে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটিয়ে দিল। প্রচণ্ড ঝড় সঙ্গে প্রবল বর্ষণ একযোগে ধরার বক্ষটাকে যেন ভেঙে চুরমার করে দিল। লোকজন বার হচ্ছে না—মেটে রাস্তার হাঁটুভর কাদায় শুধু প্রয়োজনের তাগিদে দু'একজনকে বেরুতে হয়েছে। লারমুর দোতলার দক্ষিণ বারান্দায় এলো। একটা ইজিচেয়ারে দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে তাকিয়ে রইল চঞ্চল মেঘের দিকে—ধূসর বরণ মেঘগুলো কেমন একের পর এক ছুটে চলেছে দৃষ্টির বাহিরে—আবার ক্ষণেকের সংঘর্ষে দামিনীর হুঙ্কারে কাঁপিয়ে দিচ্ছে ধরিত্রীর বুকখানা। লারমুরের বেশ ভাল লাগছিল। সামনের ঝাউগাছ-গুলোর মাথা ঝড়ো হাওয়ার নুইয়ে পড়ছে—বাবুই পাখীর বাসাগুলো দুলছে দোলকের মতো। প্রাকৃতিক মাধুর্যে সে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।

—ডলি!

ডলি লারমুরের খুব প্রিয়। বাঈজী হলেও তাকে সে একেবারে আপনজন করে নিয়েছিল। ডলি এসে দাঁড়ালো সাহেবের পিছনে—সাহেবের কাঁধটা ছুঁয়ে। হুঁকো-বরদার গড়গড়া রেখে গেছে—অম্বুরী তামাকের গন্ধে জায়গাটা ভরপুর হয়ে উঠেছে। আমেজে বিভোর সাহেবের উৎফুল্ল নয়নদুটো ভরিয়ে তুলল স্বদেশের ছবিগুলো।

ডলি! ইউ সি! এটা ঠিক যেন হোম ওয়েদার! স্কটল্যাণ্ডের কোলে টিলার পরে টিলা ধোঁয়াটে মেঘের আবরণ নিয়ে মিশে গেছে দৃষ্টির অন্তরালে। কি সুন্দর! লারমুর চোখের পাতাদুটো বন্ধ করলো।

—ডলি! মাই ডার্লিং!

ডলি সামনে এসে মেঝেতে বসে পড়ল—তার মাথাটা সাহেবের কোলে ডুবিয়ে দিয়ে সে নিশ্চুপ—আবেশে তার দেহ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

—ডলি! যাবে আমার সঙ্গে বিলেতে?

ডলি উঠে বসল। লারমুরের মুখের ওপর দৃষ্টি রেখে বলল—মা কি আর যেতে দেবে!

—তোমার মাকে বুঝিয়ে বলব—তিন-চার মাসের ভেতরই তো আবার ফিরছি!

—মা কিছুতেই ছাড়বে না! ওখানে গেলে নাকি অখাদ্য খেতে হয়।

লারমুর জোরে হেসে উঠলো।

—হুজুর!

লারমুর তাকালে বিরক্তিতে, তার মুখ-খানা কঠোর হয়ে উঠেছে—শক্ত গলায় বলল, কি! এখন এখানে! ইডিয়ট!

নবীন লারমুরের খাস আর্দালী! সাহেবের মেজাজ—তার গতিক, নবীন ভাল রকমেই জানতো। বিশ্রামের সময় এত্তালা দিতে সে প্রথমে মোটেই রাজী হয়নি: ওয়ারনারের শুকনো মুখ, তার ভয় তরাসে

আপদটো দেখে অনুকম্পার স্বরে উঠলো [illegible]। সে খুশী হল।

—দেখো! হাবড়ায় ওয়ারনার সাহেব। বড় বিপদ।

[illegible] হাঁপাতে হাঁপাতে চলে গেল।

—গুড ইভনিং মিঃ লারমুর।

—গুড ইভনিং।

—ডিস্ট্রিক্টের লোকেরা সরকার পাক্কার কুঠি লুট করেছে।

লারমুর খেঁকিয়ে উঠলো—সোজা হয়ে উঠে বসে চীৎকার করে বলল—কেন? বরকন্দাজ—লাঠি বন্দুক কুঠিতে ছিল না! ফুল!

ওয়ারনার চুপ করে রইল।

—ওয়ার্থলেস! প্রেসট উইচ তোমার চেয়ে ঢের বেশী কমপিটেন্ট। তাকে দেবো হাবড়ায় —তোমায় যেতে হবে মুলনাথে।

—স্যর!

—কোন কথা শুনতে চাই না—যাও!

নীচে ছিল বনমালি। এই দুর্যোগ ঘাড়ে নিয়ে তাকে আসতে হয়েছে। ঠাকুর-দেবতাদের পুজো দিয়ে বশ করা যায়, কিন্তু এই সাহেবরা? তাদের চেনা বড় শক্ত। কি জানি ওয়ারনার হয়তো একদিন জেনারেল ম্যানেজার হবে—এখন থেকেই তাকে একটু একটু তোয়াজে রাখা ভাল। ওয়ারনার নীচে নামতেই বনমালী এগিয়ে এল।

—কি হল! বড় সাহেবের সঙ্গে কথা হলো?

—হুঁ—আমাকে মুলনাথে যেতে হবে!

ওয়ারনারের গলার স্বর ভার—অতি গম্ভীর।

—ভীষণ দুর্যোগ—এ অবস্থায় তো হাবড়ায় যাওয়া যাবে না।

বনমালির মুখের দিকে ওয়ারনার তাকালো—তার দৃষ্টি অপমানের ব্যথায় ভরে উঠছে।

—মিঃ লারমুর তো থাকার কথা বললেন না।

বনমালি অতি আপ্যায়নে বললো—

—না-না! এই দুর্যোগে তোমায় ছাড়তে পারি না—কিছুতেই না। সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে এদেশে এসেছো—এই বিপদে! কক্ষনো না। আমার বাড়ী চলো।

রাতে দুর্যোগের মাত্রা খুব বেড়ে গেল।

—ভাল! তুমি আর এ-রাতে বাড়ী যেও না।

—কিন্তু মাকে তো একটা খবর দিতে হয়।

—হাঁ-হাঁ হবে—বেয়ারা!

সকালে বৃষ্টি থেমে গেছে। ভেজা পাতার ফাঁক দিয়ে রুগ্ন সূর্য ধরার বুকে তার ক্ষীণ আলোর রেখা ছিটিয়ে দিচ্ছে। বনমালি ওয়ারনারকে ডেকে তুললো।

—সাহেব! এখনও আবছা আছে। ঘোড়াটা এনে রেখেছি—রওনা হও। বড় সাহেব জেনে ফেলে আমাদের দুজনের কাউকে আর আস্ত রাখবে না। শিগ্‌গীর—শিগ্‌গীর—আর দেরী নয়!

সময় ধরা। বনমালি এলো কুঠিতে এত্তালা দিতে।

লারমুর নীচের একটা ছোট ঘরে কোম্পানীর মাসের হিসেব দেখছে। নীলগঞ্জ থেকে এবারের রপ্তানি খুব কম—অর্ধেকও না! অফিসারগুলো অকেজো—সব দিকে নজর রাখা তার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। মনটা বিরক্তিতে বিষিয়ে উঠলো!

—হুজুর! সেলাম।

সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে বনমালি।

এক চোখে বনমালিকে দেখে লারমুর যেন ক্ষেপে উঠলো।

—ওয়ার্থলেস্! ফুল! নীলগঞ্জে রপ্তানি কত—জান?

—হুজুর!

—আজ থেকে তোমার দেওয়ানী ঘুচে গেল। যাও—

বনমালি জানতো লারমুর তাকে ছাড়তে পারবে না। এমন কলাও কারবার আর কেউ করাতে পারবে না—দাদনের অর্ধেক টাকাটা বনমালির কারচুপিতে লারমুরের পকেটে যেতো।

বনমালি লারমুরের দিকে তাকিয়ে বলল—রপ্তানীটা কম হয়েছে ঠিকই তার একটা কারণও আছে। চারিদিকে আগুন—আগুন বলে আগুন! চাষীরা ক্ষেপে গেছে—নীল তারা বুনবে না—শিশির ঘোষ ইন্ধন যোগাচ্ছে। লোকটি বোধহয় যাদুটোনা কিছু জানে নইলে চাষাগুলো জানে তারা ধ্বংস হবে তবু তারা তার পিছন পিছন ঘুরছে—তার হুকুম মেনে চলছে! চেষ্টাতো করছি হুজুর। কিন্তু সুফল হচ্ছে না।

লারমুরের মনটা নরম হয়ে গেল।

—শুনেছি ঝড়ে চাষীদের ঘরগুলো অনেক পড়ে গেছে—কিছু দাদন দিলে তো পার!

—হুজুর! তারা সব পাগল! বলে কি—ভাঙা ঘরে থাকবো—বউঝি নিয়ে গাছতলায় বাস করবো তবুও দাদনের খাতায় টিপ দেবো না। লারমুরের মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠলো।

—কে? কে এখানে জোট পাকাচ্ছে।

—সে আর বলার কথা না হুজুর। ভিক্ষের ঝুলি ছাড়িয়ে যাকে মানুষ করলাম—সেই এখন ছুরি মারছে! নেমকহারাম করমে খোড়াটাই এই হুজুগের মূল।

—ক্যারিম! সে তো আমাদেরই লোক।

—এখন বিগড়ে গেছে। বিকরগাছায় শিশির ঘোষের মিটিং থেকে ঘুরে এসে তার মাথাটা যেন কেমন-কেমন হয়ে গেছে। কি যে বলে তার ঠিক ঠিকানা নেই।

লারমুর গম্ভীর হয়ে বললো—

—বুঝিয়ে দেও, সাহেবরা দুর্বল নয়। কথা না শোনে শেষ পর্যন্ত শেষ ব্যবস্থা করা হবে।

সাহেবের হুকুম—বনমালি চলে গেল করিমের বাড়ী। সদর রাস্তার ধারে করিমের বাড়ী। সামনে এক লম্বা আটচালা—সেটা সদর। বাইরের লোকজন বসে—সময় সময় গাঁয়ের মজলিস হয়।

বনমালি রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখলো আটচালায় লোক গিজগিজ করছে।

—করিম! করিম মিঞা!

সাড়া পেয়ে করিম ছুটে এলো।

দা'ঠাকুর! এ আবার কি ডাক? মুই তোমার কাছে আবার মিঞা হলাম কবে? তোমার কোলে মানুষ—তোমার জন্যি জানটা দিতি পারি!

—হুঃ! আটচালায় কারা?

—সব গাঁয়ের মানুষ!

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি!

—তিন গাঁয়ের দুচারজন মোড়লরাও এয়েছে। মোদের কথা হচ্ছে নীল বোনা হবে কিনা!

বনমালি মুখখানা গম্ভীর করে বলল—করিম! এসব কুমন্ত্রণা কে দিয়েছে? ওপথ ছাড়ো—যেমন চলছিল—চলো! সাহেবদের সঙ্গে লড়াই অত সোজা নয়! শুধু শুধু জানটা কেন খোয়াবে!

—সাহেবদের সঙ্গে পারবো না—জানি। কিন্তু জানটাতো দিতে পারবো! মাটি ধরে উঠেছি আবার মাটির নিচেই না হয় চলে যাবো।

—এ কথা তোমার কাছে শুনতে আসিনি, করিম! এখনও বলছি—ও পথ ছাড়ো!

—দা'ঠাকুর! তোমার ঋণ কি শোধবার মতো? কিন্তু কে বড়—মুই না মোর দেশ। চাষীরা—তারা তো তাদের খুন দিয়ে নীলের সার জোগায়! বল! দা'ঠাকুর! এটা ঠিক কি না?

—করিম! কেন অযথা একটা অমঙ্গল ডেকে আনছো! এখনও বলি—সাবধান!

বনমালি চলে গেল।

হৈ-চৈ চীৎকারের মধ্যে মজলিস তখনও চলছে।

হাতের গুলো ফুলিয়ে রহিম এগিয়ে এল—মোরা জান দেবো তবু নীল বোনবো না! গুলি কোরবে—করুক! তবুও না।

রহিম বড়ার মুরুব্বী ইমানের ছেলে।

ইমান ধমক দিল, বলল—থাম—থাম, আর বাহাদুরী দেখাতে হবে না!

ইমান করিমের দিকে ফিরে বলল—দা'ঠাকুরকে বুঝিয়ে সুজিয়ে দাদনটা একটু হাল্কা করলে হতো না?

—না, না! ওকথা বোলো না—মোড়ল। মোরা নীল বোনবো না—মোরা একজোট!

জোট ভাঙলে সাহেবরা পেয়ে বসবে। ঝিকরগাছায় মোরা হলপ্ নিছি—মোরা জোট ভাংগবো না—কিছুতেই না!

মাতব্বররা সাহেবদের সঙ্গে গোলমাল করতে নারাজ। সাহেবরা তো আর অমনি ছাড়বে না—হাড়গোড় গঁড়ো করে দেবে—শুধু শুধু কতকগুলো জান যাবে।

ছোঁড়ার দল বলল—ইস! মোরা পাঁচুর সাকরেদ—মোরা লাঠি ধরতি জানি!

বুড়ো ইমান লম্বা দাড়িটা চুমরে নিয়ে বলল, লাঠি! লাঠিতে কি গুলি আটকায়?

—না পারি জান দেবো!

ইমান ছেলের হাত ধরে টান দিল—চ—আর বাহাদুরীতে কাজ নেই! এক লহমা তাঁধার হল—বোটা একা। চ—চ বাড়ী চ!

তখনও খুব হৈচৈ। করিম চেঁচিয়ে বলল, মোর জবান এক। মুই বলিছি বোনবো না তো বোনবো না—জান থাক [illegible] যাক! কাজীপাড়ায় গেলুম। মাথা [illegible]ড়ে নেড়ে কাজীসাহেবরা বললো—ঘাড়ে দেখছি জিন চেপেছে—এ পাগলামি কেন? সাহেবরা কি মানুষ বে—ওরা হচ্ছে হুরীর পোলা। এক লহমে উড়িয়ে দেবে!

বনমালি আবার এলো।

—করিম! তোমায় ভালই বলছি গোলযোগ করো না—ভাল হবে না!

করিম একটু হাসলো—ভাল হবে না জানি। দা'ঠাকুর! মুই তার তোয়াক্কাও রাখি নে! মরণ তো আছে। জ্যান্তে মরার [চে]য়ে একেবারে মরাই ভাল! সাহেবেরা ইচ্ছে [ম]ত গরু বাছুর ধরে নিয়ে যাবে—সোমখ সোমখ মেয়েদের ঘরে রাখা যাবে না! এ অবস্থায় আর বেঁচে থেকে লাভ কি দা'ঠাকুর? তুমিই বলো না!

—তুমি তো সাহেবদের পেয়ারের লোক! তারা তোমার সব কিছুই তো ভাল করেছে!

গম্ভীর হয়ে করিম বলল, এ দুনিয়ায় মুই একা নই দা'ঠাকুর! আজ এবাড়ী কাল ওবাড়ী শেষে মোর বাড়ী! সাহেবদের আর চিন্তে বাকি নেই দা'ঠাকুর! ঝিকরগাছায় হলপ্ নিচ্ছি, নীল মোরা বোনবো না! এ কথার আর নড়চড় নেই।

বনমালি মুখ ফিরিয়ে নিল।

—মরার জন্যে পিঁপড়ের পাখা ওঠে! দেখছি—তোমারও পাখা উঠেছে! করিম একটু হাসলো।

—দা'ঠাকুর! ভয় দেখিও না মোরে—মুই ভয় পাবার মানুষ না!

বনমালি ফিরলো সোজা কুঠিতে।

—বন্!

—হুজুর!

—কি হলো! কি করলে?

—হুজুর। করমেটা বড্ড নিমকহারাম! কত বললাম, কত বোঝালাম সেই এক গোঁ—নীল বুনবো না! শুধু তাই না—আশপাশের গাঁ থেকে লোক জড় করে জোর জোট বেঁধেছে, বলে শিশির ঘোষ নাকি বলে দিয়েছে!

—ওকে দাদন দিয়েছো?

—দাদন! বোধহয় না—ওর জমিগুলো তো কোম্পানীর খাস। টাকাটা হুজুরের তাঁবলে জমা হয়। বলে কি— কালই মাঠে লাঙ্গল দেবো।

—লোকজন সব ঠিক আছে? বিশেনরু! দরকার বুঝলে চক্করঘাটার পাইকদের খবর দিও!

—হুজুর!

পরদিন সকালে আকাশে মেঘের ভাঁজ নেই। সূর্যের নিস্তেজ আলো বাঁশ বনের ফাঁকে ফাঁকে মাঠের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। উলুখড়ের মাথাগুলো তখনও ভিজে। রাস্তার খানাখন্দের অল্প জলে ছোট ছোট মাছের ঝাঁকগুলো ঘুরেফিরে খেলা করছে।

করিম লাঙ্গলটা কাঁধে নিল।

করিমের স্ত্রী বাইরের উঠোনে গোবরের ছড়া দিচ্ছিল—স্বামীর কাছে এগিয়ে এলো।

—বনমালিপুরের মাঠে চাষটা দিয়ে আসি?

—আজ না হয় থাক না! মোর দিনটায় ভাল ঠেকছে না।

—ধ্যাৎ! যেমন কথা? মেয়ে লোকের আঁচল ধরে বসে থাকবো—লোকে কি বলবে!

—আজ বিষ্যুদ বার—আজ না হয় থাক না!

করিম একটু হাসল!

—চাষ দেবো এতে আবার বিষ্যুদ—শুক্কুর কি!

—কি জানি! মোর দিলটা যেন কেমনতর ধক ধক করছে।

দৃঢ়কণ্ঠে করিম বলল—

—কথা দিচ্ছি—লাঙ্গল দেবো। তা দেবোই—নইলে মোরে মানবে কেন?

ভবিষ্যতের এক অমঙ্গল আশংকা করিমের স্ত্রীর মনটাকে যেন আচ্ছন্ন করে তুলল।

—তা হলে মুইও যাবো।

—ধ্যাৎ! মেয়ে লোকে কি মাঠে যায়! সাহেবরা জানলে মসকরা করবে—হাসাহাসি করবে!

—করুক গে—মুই যাবই!

মুখটা কাঁচুমাচু করে করিমের স্ত্রী বলল—

—মোর দিলটা যেন কেমন কেমন কোরছে।

করিমের স্ত্রীও পাছু পাছু চলল।

বনমালিপুরের মাঠ যেন দিগন্তে মিশে গেছে। পূর্বদিকের তিন বিঘের বন্দ—সার মাটি লাগে না—চাষের ভাল জমি। লাবঘরেক্কে বলে বনমালি করিমকে জোগাড় করে দিয়েছে। করিমের দখল পাঁচ বছর। এবছরে আর এ জমিতে সে নীল বুনেছে না—ধুলাগ্র নিয়েছে। কয়েকদিন আগে বৃষ্টিটা হলো বটে কিন্তু জলটা টেনে গেছে মাটিটা খটখটে। চাষের জো হয়নি তবু করিমকে লাঙ্গল দিতে হবে—সববার সামনে যে সে কথা দিয়েছে—এখন আর ফেরার উপায় নেই! আলের পাশে শুকনো একটা খেজুর গাছ—তার তলায় গরু দুটো ছেড়ে দিল। লাঙ্গলটাও রাখলো।

করিমের স্ত্রী ভয়ে ভয়ে স্বামীর আরও নিকটে এল।

—দেখছো না—ঐ তো ঐ তো সাহেবের লোক দল বেঁধে আসছে!

করিম তাকালো।

—মোর জমিতে মুই চাষ দেবো তাতে কার কি!

ভয়ে করিমের স্ত্রীর গলাটা যেন শুকিয়ে আসছে।

—ওরে বাবা! কত লোক—সববার হাতে লাঠি-সড়কি।

করিমের স্ত্রী একটু এগিয়ে এলো।

—দা'ঠাকুর! এত লোক কেন?

—কেন? ন্যাকা! কার জমিতে। করমে জানে না—এটা কোম্পানীর খাস জমি!

—মোরা এক্ষণি যাচ্ছি!

করিমের কাছে এলো।

—লাঙ্গল দিতে হবে না—বাড়ী যাই চলো!

গলার স্বর চড়িয়ে করিম বলল—মোর ভুঁই—মুই চোষবো—বারণ করার কে?

বনমালি এগিয়ে এলো।

—কার ভুঁই—কার ভুঁইরে?

দৃঢ়স্বরে করিম বলল—

—মোর!

বনমালি আঙুল নেড়ে বলল—এখনও বলছি বেরিয়ে যা!

স্বর তার কঠোর।

—নইলে—

—নইলে? কি হবে দা'ঠাকুর!

বনমালির ইংগিতে করিমের ওপর লাঠি পড়ল।

করিমের স্ত্রী দৌড়ে বনমালির দুটো পা জড়িয়ে ধরলো—

—দা'ঠাকুর! আর মেরো না—কাল রাতে এতটুকু ঘুমুই নি—মেরো না—দা'ঠাকুর!

করিমের স্ত্রী জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

করিম তখন মাটিতে—তার ক্ষতবিক্ষত দেহের আঘাত থেকে রক্ত ঝরছে।

বনমালি বলল—দেখতোরে এখনও নিঃশেস পড়ছে নাকি!

রাম পাইক নাকের কাছে হাত দিয়ে বনমালির দিকে তাকালো—।

—নাঃ।

দিনকাল কেমন চলছে, তার হিসেব আমরা সকলেই রাখি। কিন্তু হিসেবের আড়ালেও অন্য হিসেব আছে। আর্থিক দুনিয়ার সেই আঁতের খবর মেলে ধরা হবে এই বিভাগে, যাতে আমরা আরো একটু সচেতন হতে পারি।

শর্করা-সংকট

যত গুড় (বা চিনি) ঢালা যাবে নিশ্চয় তত মিষ্টি হবে, কিন্তু গুড় চিনি স্যাকারিন বা অন্য কোন সুইটেনিং সাবস-ট্যান্স না দিয়ে অন্তত চা-এ কি প্রয়োজনীয় পরিমাণে মিষ্টি স্বাদ আনা যায় না? এক কাপ চা চেয়ে গৃহকর্ত্রীর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে ফেরি-ওয়ালার কাছ থেকে জিনজার-গ্রুপের এক ভাঁড় চা পান করতে করতে এই কথাটি বারবার ভাবছিলাম। হঠাৎ মনে পড়ে গেল রবীন্দ্রনাথ-বর্ণিত সেই অনবদ্য পরিহাসের কথা : "...সেদিন ল্যান্ডলেডীর মেয়ে(পাঠকের সুবিধের জন্যে বাংলা অক্ষর ব্যবহার করলাম) মেয়ে তাঁকে এক পেয়ালা চা এনে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, চায়ে কি চিনি দিতে হবে? তিনি হেসে বললেন, না নেলি, তুমি যখন ছুঁয়ে দিয়েছ, তখন আর চিনি দেবার আবশ্যক দেখছিনে।" (য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র)

তখন ভাবলাম, ঠাট্টা যদি সত্যি হত আহা! —যদি আমাদের প্রত্যেকের নেলির স্পর্শে চিনিবিহীন চা মিষ্টতায় ভরে উঠেছে বলে মনে করতে পারতাম তবে আজকের এই শর্করা-সংকটে আমাদের আর ভুগতে হত না—আমি অন্তত প্রত্যাখ্যানের জ্বালা আর মৃৎপাত্রে জিনজার গ্রুপের আস্বাদন এড়াতে পারতাম।

অর্থনীতিবিদ স্টিগলারের আক্ষেপও মনে পড়ে গেল : যদি আমাদের প্রত্যেকের একটা করে আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ থাকত...।

স্টিগলারের আক্ষেপ কিন্তু এক দিক দিয়ে ভুল। আমাদের প্রত্যেকের একটা করে আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ থাকলে অর্থনীতি বলে কোন শাস্ত্রের চর্চা কখনই হত না, আর ফলে স্টিগলারের নামও কেউ জানত না।

ব্যাপারটা তাহলে খুলেই বলি।

কোন কিছু লিখতে বসে এক পেয়ালা চায়ের অর্ডার করা আমার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। অর্থনৈতিক সমীক্ষা লিখতে বসে সেদিন তাই করেছিলাম, কিন্তু রান্নাঘর থেকে সংক্ষিপ্ত জবাব পেলাম : চিনি নেই। লেখা মাথায় উঠল। কিছুক্ষণ বসে থেকে বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। মোড়ের মাথায় একজন ফেরিওয়ালা অনির্বাণ চুল্লীতে পেতলের কলসী বসিয়ে সর্বদা গরম চা বেচে জানি। সেই দিকেই অগ্রসর হলাম। দেখলাম ফেরিওয়ালা ঠিকই তার জায়গায় বসে। এক ভাঁড় চা নিয়ে আস্বাদন শুরু করতেই জাতবিদের দেরী হল না—জিনজার-গ্রুপের চা।

'জিনজার-গ্রুপ' নামটা দেওয়া এক সরকারী কলেজের অধ্যাপকের। সেদিন ঐ কলেজে গিয়েছিলাম এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। কলেজের ক্যানটিন থেকেই চা এল। এক চুমুক দিয়েই বন্ধুর পাশে বসা তাঁর এক সহকর্মী মন্তব্য করলেন : জিনজার-গ্রুপের বলে মনে হচ্ছে,—তারপর একটু থেমে আবার, অন্য লোকে ডুবা দেয় ভাগো আমি তারে চিনি।

প্রথম চুমুকে নয় দ্বিতীয় চুমুকে আমিও বুঝলাম যে চাটা অফিসিয়াল গ্রুপ বা চিনির চা নয়—চিনির পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে ইক্ষুগুড়, আর গন্ধনাশের প্রচেষ্টা করা হয়েছে জিনজার বা আদা দিয়ে। জিনজার-গ্রুপের এই চা বহু পুরোন হলেও সম্প্রতি এর প্রচলন বৃদ্ধি পেয়েছে শর্করা-সংকটের দরুন।

প্রথমে সমীক্ষাটির নাম দেব ঠিক করেছিলাম 'চিনি-সংকট', কিন্তু এক বন্ধু (বাংলা ব্যাকরণবিদ) বললেন : ঠিক হবে না, অনেকে গুরুচণ্ডালী দোষ ধরবে। তারপর তিনিই নির্দেশ দিলেন : নাম দাও শর্করা-সংকট। এতে গুরুচণ্ডালী দোষ কাটবে, আর অনুপ্রাসের দরুন শোনাবেও ভাল।

শেষ পর্যন্ত বন্ধুর পরামর্শই গ্রহণ করলাম, যদিও বা ইংরেজ মহাকবির সেই প্রশ্নটি বারবার খোঁচা দিয়েছিল : হোয়াটস ইন এ নেম?

সংকটের প্রকৃতি-পরিচয় :

শুধু গৃহকর্ত্রী বা আমার মত চা-খোরেরা না, শর্করা-সংকটের কবলে আজ কে-না পতিত? সাধারণ রেস্তোরাঁ, চায়ের স্টল, মিষ্টির দোকান, বেকারী, লজেন্সের কারখানা, আইসক্রীম বা সফট্ ড্রিংকের ব্যবসা, এমনকি ওষুধের ল্যাবোরেটারীও শর্করা-সংকটের দরুন আর অল্পবিস্তর সংকুচিত।

রেস্তোরাঁ ও চায়ের দোকানের মালিকের অভিযোগ, চিনির আগুন দামের জন্যে চায়ের দাম বাড়াতে হয়েছে, আর তার দরুন চায়ের বিক্রি কমে গেছে। অনুরূপ-ভাবে মিষ্টির দোকানের মালিকও বলে থাকেন, তিনি সাইজ ছোট করতে ... ওজনের হিসেবে দাম বাড়াতে হয়েছেন। কিন্তু সাইজ ছোট বলে খদ্দেরে মনে ধরে না, আর ওজনের হিসেবে দাম বেশী বলে কিনলেও কম কেনে।

কারও যুক্তিতে ভুল নেই। উপকরণ বা ইনপুটের দাম বাড়লেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে চাহিদার পরিমাণ কমে যায়—অর্থনীতির এ অতি সাধারণ তত্ত্ব। কিন্তু এই অবস্থার ফল যে তৃতীয় পর্যায়ী, চতুর্থ পর্যায়ী অর্থাৎ সুদূরপ্রসারী হতে পারে, সে সম্বন্ধে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চিন্তা করা হয় না।

ধরুন, চিনির দাম বৃদ্ধির ফলে রেস্তোরাঁ, চা-এর স্টল, মিষ্টির দোকান ইত্যাদিতে বিক্রি কমে গেল। পরবর্তী পর্যায়ী ফল উৎপাদন হ্রাস এবং তার দরুন নিয়োগ হ্রাস—হয়ত রেস্তোরাঁ বা চায়ের দোকানে দু'একজন শিশু-পরিবেশক বা কারিগর ছাঁটাই হল। এই তো সেদিন এক ছোট বেকারীর মালিক বললেন : কি করব মশাই, পেস্ট্রী তৈরী বন্ধ করে দিয়েছি, দু'জন কারিগরকেও জবাব দিলাম।

দু'জন কারিগরকে জবাব দেওয়া অর্থ হয়ত এই নিয়োগহীনতার দিনে দুটি পরিবারকে অনশনের মুখে ঠেলে দেওয়া।

এইভাবে চিনি যেখানে উৎপাদনের অন্যতম প্রধান উপকরণ সেখানেই ঘটছে অল্পবিস্তর উৎপাদন হ্রাস। উৎপাদন হ্রাসের ফলে নিয়োগ-হ্রাস, নিয়োগহ্রাসের দরুন আয় হ্রাস এবং তার ফল বেকারত্ব ও ধনবৈষম্যের পরিমাণ বৃদ্ধি। এ ছাড়া কনজাম্পসান বা ভোগ হ্রাস তো আছেই—বাড়ীতে বরান্দের বাইরে এক পেয়ালা চা চেয়ে পাওয়া যায় না, পৌষপার্বণের দিনে গৃহকর্ত্রী পুলিপিঠের প্রকারভেদ ও পরিমাণ কমিয়ে দিতে বাধ্য হন, জল-খাবারের ক্ষেত্রে চিনি ছাড়াই কাজ চালাবার চেষ্টা করা হয়, শর্করাপ্রিয় বাচ্চাদের সতর্ক

করে দেওয়া হয় যে দ্বিতীয় দফা চিনি চাইলে পাওয়া যাবে না, ইত্যাদি। কারণ হিসেবে বলা হয়, বাজারে চিনি নেই।

বাজারে কিন্তু চিনি আছে—খোলা বাজারেই আছে তবে তার যা দাম তাতে প্রয়োজনমত কেনা অধিকাংশ কনজিউমার বা ক্রেতার সামর্থ্যের বাইরে। অর্থনৈতিক তত্ত্বের দিক থেকে দেখলে ঐ দামে প্রয়োজনমত চিনি কেনা পরিবারের পারচেজ-প্ল্যান বা ব্যয়বণ্টন-নীতি দ্বারা কোনমতেই সমর্থিত হতে পারে না। অর্থাৎ চিনির জন্যে ঐ পরিমাণ ব্যয় করলে অন্যান্য দ্রব্যাদির ভোগ এত কমে যাবে যে পরিবার কিছুতেই সর্বাধিক পরিতৃপ্তি বা ভারসাম্যের অবস্থায় পৌঁছুতে পারবে না। [illegible] দামে চিনি কেনার জন্যে পরিবারকে অতিরিক্ত বা [illegible] খরচ কমাতে [illegible]

[illegible]

সংকটের কারণ :

[illegible] ভারতের মত দেশে এ ধরনের শর্করা-সংকট অস্বাভাবিক বলেই মনে হয়। কারণ, [illegible] দশকের [illegible] চিনি উৎপাদনকারী দেশ (এই দিক দিয়ে ভারত বর্তমানে পৃথিবীতে সপ্তম স্থান অধিকারী যদিও এক দশক বছর আগে স্থান ছিল চতুর্থ) এবং গত দশ বছরে ৫০ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধিতে (১৯৬১-৬২ সালে ২৭ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ১৯৬৯-৭০ সালে ৪২.৫ লক্ষ মেট্রিক টন) সক্ষম হয়ে রপ্তানি বৃদ্ধির পরিকল্পনাও করেছে।

একটু তলিয়ে দেখলে কিন্তু সংকটের কারণগুলো সহজেই ধরা পড়ে। মোটামুটিভাবে দেখলে সংকটের কারণ দ্বিবিধ বা দ্বিমুখী : উৎপাদন হ্রাস ও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি (অর্থনীতির ভাষায় ঠিক চাহিদা বৃদ্ধি হয়ত বলা যায় না)। উৎপাদন হ্রাসের মৌল কারণ প্রতিকূল আবহাওয়া বা কোন স্থানে অতিবৃষ্টি এবং কোন স্থানে অনাবৃষ্টির দরুন ১৯৭১-৭২ সালে আখ যোগানে ঘাটতি। কৃষিজাত দ্রব্য যে শিল্পের প্রধান ইনপুট, বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভরশীল কৃষিপ্রধান দেশে তার উৎপাদন হ্রাস যে কোন বছর ঘটতে পারে। এ ছাড়া অবশ্য তলে তলে অন্য কারণও নানা বাঁধছিল।

দেখা যায়, অনেক ফ্যাকটরী জোনে আখ চাষের জমি অন্য চাষে স্থানান্তরিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, আগের চেয়ে বেশী পরিমাণে আখ চিনির কলে না গিয়ে বিভিন্ন প্রকার গুড় ও দিশি চিনি উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে। তৃতীয়ত, চিনি শিল্পের—বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশের চিনি শিল্পের ওপর [illegible] খাঁড়া ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

এইসব মুখ্য ও গৌণ কারণের জন্যে ১৯৭১-৭২ সালে উৎপাদন ১৯৬৯-৭০ সালের ৪২.৫ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৩১ লক্ষ মেট্রিক টনে।

অপরদিকে প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধির মূলে আছে জনবিস্ফোরণ ও জনগণের ভোগ-পছন্দের পরিবর্তন। বিগত দশ বছরে (১৯৬১-৭১) জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটেছে ২৪.৬ শতাংশ বা মোট ১০.৪৮ কোটি। শিশুর খাদ্যে বেশ চিনি লাগে এবং অনেক ক্ষেত্রে বেশীই লাগে, তা ভুললে চলবে না। আর ভোগ-পছন্দের দিক দিয়ে সমস্যাটির বিচার করলে দেখা যায় যে, আগে যারা গুড় ইত্যাদি ব্যবহার করত তাদের অনেকেই চিনির দিকে ঝুঁকেছে।

এর ওপর কিছুটা অপচয়ের সম্ভাবনাও আছে। মোট কথা, দশ বছরে চিনির প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে ৮ লক্ষ মেট্রিক টন অর্থাৎ ৩২ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ৪০ লক্ষ মেট্রিক টন। অথচ ১৯৭১-৭২ সালে উৎপাদন হয়েছে মাত্র ৩১ লক্ষ মেট্রিক টন। এই অবস্থায় বর্তমান বছরে (১৯৭২-৭৩) যে শর্করা সংকট দেখা দেবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে?

আগামী বছরে প্রত্যাশা কি রকম?

আগামী বছরে (১৯৭৩-৭৪) সংকট আরও ঘনীভূত হবে বলে যে আশংকা করা হচ্ছে তার মূলে আছে বর্তমান বছরে নিদারুণ খরা বা অনাবৃষ্টি।

ভারতে ২২০টির মত চিনির কল আছে। এর মধ্যে ৯৪টি বিহার ও উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত এবং এই দুইটি রাজ্যেই মোট এক-তৃতীয়াংশের ওপর চিনি উৎপাদন হয়। চিনি উৎপাদনে অপর গণ্য রাজ্য অন্ধ্র ও মহারাষ্ট্রও খরায় সমান প্রপীড়িত। এই খরার দরুন অনুমান করা হচ্ছে যে বর্তমান বছরে উৎপাদন গত বছরের অংক ৩১ লক্ষ মেট্রিক টনেও পৌঁছুবে না। তার ওপর আবার বছরের শেষে মজুতও কিছু থাকবে না (যা প্রতি বছরই থাকে)।

অপরদিকে ১৯৭০-৭১ সালের ভিত্তিতেই আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনীয়তার পরিমাণ অন্তত ৪০ লক্ষ মেট্রিক টন হবে বলে ধরে নিলে এবং এর সঙ্গে পূর্বপ্রতিশ্রুতি মূলক কোটার ভিত্তিতে ১ লক্ষ মেট্রিক টন রপ্তানির ব্যবস্থা করতে হলে মোট ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা দাঁড়াবে ৪১ লক্ষ মেট্রিক টনে।

অতএব, আগামী বছরে মোট ১০-১১ লক্ষ মেট্রিক টন চিনি-ঘাটতির আশংকা রয়েছে। এর ফলে চিনির বরাদ্দ ব্যবস্থা আর দাম যে কোথায় দাঁড়াবে বলা কঠিন।

অথচ আগামী বছরই চতুর্থ পরিকল্পনার শেষ বছর, যে বছরে চিনির উৎপাদন ৫০ লক্ষ মেট্রিক টনও ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হয়েছিল।

প্রতিবিধানে সরকারী প্রচেষ্টা :

চিনি একাধারে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভোগ্যপণ্য ও উৎপাদনের উপকরণ বলে শর্করা-সমস্যা বা সংকটে সরকারের পক্ষে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা কল্পনাও করা যায় না। এবারও নিশ্চিন্ত থাকতে পারে নি। খোলা বাজারে দাম চড়তে শুরু করা মাত্রই সরকার বিক্রি ও বিলিবণ্টন ব্যবস্থার ওপর নানারকম নতুন বাধানিষেধ আরোপ করে। লেভি চিনির অনুপাত (যে চিনি রেশনিং ও ন্যায্য মূল্য দোকানের মাধ্যমে দেওয়া হয়) ৬০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৭০ শতাংশে নিয়ে যায়। ফলে খোলা বাজারে বিক্রির জন্যে থাকে ৩০ শতাংশ। এক্সাইজ ডিউটি বা অন্তঃশুল্ক বাদ দিয়ে লেভি চিনির দাম ধার্য করা হয় কুইন্টাল প্রতি ১৪৭.১৯ টাকায় এবং এই ব্যবস্থা কার্যকর করা হয় ১৯৭২ সালের জুলাই মাস থেকে।

শর্করা শিল্পের অভিযোগ হল, এই দাম উৎপাদন-ব্যয়ের সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্কবিহীন বা অবাস্তব, এবং এর অর্থ শিল্পকে বাকী ৩০ শতাংশ চিনি খোলা বাজারে বেশী দামে বেচে লেভি চিনির দরুন ক্ষতিপূরণ করতে অনুমতি দেওয়া। ১৯৭১ সালের মে মাসে যখন চিনির নিয়ন্ত্রণ করা হয় তখন উদ্দেশ্য ছিল ঐ একই, এবার লেভির শতাংশ বৃদ্ধির (৬০ থেকে ৭০) দরুন ক্ষতিপূরণের পরিমাণ যে বৃদ্ধি পাবে তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে? অর্থাৎ খোলা বাজারের চিনির দাম ত বাড়বে—এতে অবাক হচ্ছেন কেন?

জাতীয়করণের দাবি :

এই সোজা যুক্তি সত্ত্বেও শিল্প কিন্তু অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পায়নি। খোলা বাজারে চিনির দাম বৃদ্ধির দায়িত্ব অনেকাংশেই চাপানো হয়েছে শিল্পের ওপর এবং চিনির কলের মালিকরা 'শর্করা-শ্রেষ্ঠী' (সুগার ব্যারন) আখ্যা পেয়েছেন যাঁরা আখচাষী ও জনসাধারণ উভয়কেই শোষণ করে নিজেদের উদর স্ফীত করছেন।

সমবায়িক চিনির কলগুলোর মালিকদেরও নতুন 'ধনতন্ত্রী গোষ্ঠী' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

এই অবস্থায় শর্করা-শিল্পের জাতীয়করণের দাবি জোরালো হওয়াই স্বাভাবিক, এবং তাই হয়েছে। উত্তরপ্রদেশে তো এই দাবি নিয়ে বেশ কয়েক বছর ধরে সোরগোল।

দাবির পর্যালোচনা :

জাতীয়করণের ফলেই কি সমস্যার সমাধান হবে? এই সোজা প্রশ্নের উত্তরে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে দেখা যায়। সরকারও এ ব্যাপারে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। না হলে এতদিন জাতীয়করণের পথই বেছে নেওয়া হত। তার পরিবর্তে সরকার একটু অনুসন্ধান কমিটি (শর্করা-শিল্প অনুসন্ধান কমিটি) নিয়োগ করেই বসে আছে এবং উত্তরপ্রদেশে এই নিয়ে রাজনীতির খেলা চলছে।

আমাদের দেশের মত অর্থ-ব্যবস্থায় কোন বিশেষ শিল্পের সমস্যার সমাধান হিসেবে জাতীয়করণের পথ মরিয়া হয়েই গ্রহণ করতে হয়, এবং বেশ কয়েক ক্ষেত্রে তা করা হয়েছে। কিন্তু শর্করা শিল্পে তা এখনই করা কি যুক্তিযুক্ত হবে? এর ফলে কি তপ্ত খোলা থেকে সোজা আগুনে গিয়ে পড়বার আশংকা থাকবে না?

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলোর কার্যসম্পাদন থেকে দেখা যায় যে, অবস্থা কোন ক্ষেত্রেই অনুকূলের দিকে আসে নি, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলো চূড়ান্ত অকর্মণ্যতার পরিচয় দিয়েছে। হয়ত প্রথম প্রথম এই রকম অসুবিধাই হয়, কিন্তু শর্করা শিল্পের বেলায় এই প্রাথমিক অসুবিধার ফল হবে ভয়াবহ। উৎপাদন যদি আরও হ্রাস পায় তবে অবস্থা যে কি দাঁড়াবে তা কল্পনাও করা যায় না। মোট-কথা, এই গুরুত্বপূর্ণ ভোগাপণ্য এবং উপকরণ সরবরাহকারী শিল্পকে নিয়ে হঠাৎ কিছু করা যুক্তিযুক্ত হবে না।

সমবায়ই কি পথ?

ভারতের মোট ২২০টি চিনির কলের মধ্যে ৭৪টি সমবায়িক ভিত্তিতে গঠিত। অনেকে বলেন, বাকিগুলোকে সমবায়ের আওতায় নিয়ে আসলেই সব সমস্যার সমাধান হবে—সংকট দূরীভূত হবে। কিন্তু দেখা যায়, একমাত্র মহারাষ্ট্র ছাড়া কোন রাজ্যেই সমবায়িক চিনির কলের কার্যসম্পাদন আশাপ্রদ নয়। উপরন্তু, সমবায়িক প্রতিষ্ঠানের কার্যপদ্ধতিকে সকল সময়ই বাঞ্ছিত করে লক্ষ্যের সংঘাত: অর্থনৈতিক না সামাজিক উদ্দেশ্য সাধন? অর্থনৈতিক লক্ষ্য হল যথাসম্ভব অধিক মুনাফা লাভ করা। এর জন্য উৎপাদনের পরিমাণ বা দাম যা হয় হোক। এ-লক্ষ্যে পৌঁছুতে হলে সামাজিক লক্ষ্যের দিকে চোখ বুঁজে থাকতে হয়। অপরদিকে বেশী উৎপাদন আর কম দামের দিকে দৃষ্টি দিলে অর্থনৈতিক লক্ষ্য ব্যাহত হয়।

অতএব, সমবায় শর্করা শিল্পের সংকট মোচনের পথ বলে মনে হয় না।

প্রকৃত প্রতিবিধান কি?

মনে হয় বর্তমানের 'আংশিক বিনিয়ন্ত্রণ' নীতিই প্রকৃত পন্থা, তবে এই নীতির বেশ কিছুটা পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন।

শর্করা-সংকটের মৌল কারণ হল পরিমাণে আখের যোগানের অপ্রতুলতা—অর্থাৎ এই শিল্প পর্যাপ্ত পরিমাণে কাঁচা-মাল পাচ্ছে না। প্রতিকূল আবহাওয়ায় আখের যোগান কমে গেলে তার বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু করবার নেই, কারণ তা হল বৃহত্তর কৃষি-সংগঠনের প্রশ্ন। কিন্তু আখ চাষের জমি যাতে অন্য চাষে স্থানান্তরিত না হয় এবং যে পরিমাণ ফল জন্মায়, তা যাতে ঐ জোনের কলগুলোতে গিয়ে পৌঁছোয় তার জন্যে ব্যবস্থা অবশ্যই গ্রহণ করা যেতে পারে। এই উদ্দেশ্যে করণীয় হল আখের দাম বৃদ্ধি করা। প্রতি-বিধানটি নিয়ে সরকারও ভাবছে এবং শোনা যাচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে উত্তর ভারতে আখের দাম কুইন্টাল-প্রতি ১২ থেকে ১৩ টাকায় ধার্য করা হবে। (বর্তমানে ন্যূনতম দাম ৭-৩৭ টাকা।) দাম এতটা বাড়ালে বরাদ্দ চিনি কিলোগ্রাম-প্রতি বর্তমান ২ টাকার পরিবর্তে অন্তত ২-৫০ টাকা হতে বাধ্য এবং খোলা-বাজারেও দাম ৫ টাকা ছাড়িয়ে যাবে বলে ভারতীয় চিনিকল সংঘের ধারণা। অপর-দিকে যদি আবার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থায় ফিরে গিয়ে লেভি-চিনির দাম অপরিবর্তিত রাখা হয়, তবে অনেক মিলই দরজা বন্ধ করতে বাধ্য হবে।

তাহলে যা করতে হবে তা হল: আখের দাম বাড়ানো কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের জন্যে আলাদা আলাদা দাম ধার্য করা। অবশ্য ন্যূনতম দাম ৯/১০ টাকা করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, উৎপাদনের সময়-কাল (সময়-কাল বা ক্রাসিং-সীজন বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম ৩ থেকে ৫ মাস), উৎপাদনের ক্ষমতা, নিষ্কাশন-ক্ষমতা (রিকভারী) ইত্যাদি বিচার করে জোন-গুলোর পুনর্বিন্যাস করতে হবে। তৃতীয়ত বিভিন্ন প্রকার গুড় ইত্যাদির উৎপাদন এবং চিনি উৎপাদনের মধ্যে সংহতিসাধন করতে হবে। চতুর্থত, উৎপাদনের পরিমাণ যতদিন প্রয়োজনীয়তার চেয়ে কম থাকবে, ততদিন বর্তমান বছরের মত অন্তত অংশতঃ লেভি থেকে রেহাই দেওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তিত রাখতে হবে। পঞ্চমত, দুঃস্থ কলগুলির পুনর্বাসনের ব্যবস্থা অবিলম্বেই অবলম্বন করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে পারিশচা কমিটির সুপারিশগুলো বিশেষভাবে অনু-ধাবন করা যেতে পারে। ষষ্ঠত, ভারতে চিনির কল মাত্র কয়েকটি অঞ্চলেই কেন্দ্রী-ভূত, আখের চাষ কিন্তু বিস্তৃতি লাভ করেছে। সুতরাং প্রয়োজন হল আরও চিনির কল স্থাপন করা। এ-ব্যাপারেও মনে হয়, অন্তত প্রাথমিক পর্যায়ে সমবায়িকতার পথে না গিয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগের ওপরই নির্ভর করা উচিত। তবে কৃষকের স্বার্থরক্ষায় আখের দাম বেঁধে দিতে হবে। সপ্তমত, নিষ্কাশন বা রিকভারী বৃদ্ধির জন্যে উত্তর ভারতের কলগুলোর আধুনিকী-করণের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে (দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের কলগুলো মোটামুটি আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত) আর অধিকাংশ-ক্ষেত্রেই অধিক উৎপাদনে উৎসাহিত করবার জন্যে আবশ্যকতা রয়েছে উপজাত দ্রব্য উৎপাদনের সুব্যবস্থার। চিনি ও আখ থেকে উপজাত দ্রব্য হিসেবে যে শক্তি-সুরাসার, কার্ডবোর্ড ইত্যাদি তৈরী করা যে সহজেই সম্ভব তা সকলেই জানেন। পরিশেষে, শর্করা-নীতি সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতেই গৃহীত ও কার্যকর হওয়া উচিত। এ-ব্যাপারে প্রাদেশিকতাকে—আঞ্চলিকতাকে প্রশ্রয় দিলে ভুল হবে।

উপসংহার :

নির্দেশিত প্রতিবিধানগুলো নতুন কিছু নয়, তবে এপর্যন্ত কালক্ষ বাস্তবের দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বাঙ্গীণ দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা গ্রহণ করে কার্যকর করবার প্রচেষ্টা করা হয়নি। দেখা যায়, সকল সময়ই অবস্থা বুঝে আশু উপশমের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। ফলে শর্করা শিল্প সকল সময়ই নির্ভর করেছে দেবের ওপর। যে-বছর বরুণ দেবতার কৃপায় প্রয়োজনমত বা প্রয়োজনাতিরিক্ত আখ উৎপন্ন হয়েছে, সে বছর চিনির অপ্রতুলতা-জনিত কোন সমস্যাই দেখা দেয়নি। কিন্তু সে-বছর ফসল একটু বা কিছুটা কম হয়েছে সেই বছরই মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে সমস্যা, যা বর্তমান বছরের মত কখনও কখনও সংকটে রূপান্তরিত হয়েছে। এই রকম গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকে দৈব-নির্ভরশীল করে রাখা উচিত নয়। সুতরাং আখের যোগান বাড়াতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখতে হবে ঐ যোগানের যাতে চাহিদাও থাকে। এই জন্যেই প্রয়োজন সামগ্রিক শর্করা-নীতির, যে-নীতি অবশ্যই দীর্ঘকালীন লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে রচিত হবে।

আশা করা যায়, উপরি-বর্ণিত প্রতি-বিধানগুলো সংগতিভূত করে এই দীর্ঘ-কালীন শর্করা-নীতি পঞ্চম পরিকল্পনা চূড়ান্ত রূপ নেওয়ার আগেই ঘোষিত হবে। এই রকম আশার কারণ, নির্দেশিত প্রতি-বিধানগুলো মোটেই নতুন নয় (অন্তত আমার মাথা থেকে বেরোয়নি)—মোটামুটি সরকারী সূত্র থেকেই বিভিন্ন সময়ে এগুলো ঘোষিত হয়েছে। তবে এদের মধ্যে সংগতি-সাধন করে পূর্ণাঙ্গ দীর্ঘকালীন নীতি কখনও বোধহয় ঘোষিত হয়নি। এই প্রয়োজনই আজ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বলা যায়, এটা জনতাব-র্গের (সংসদীয় বা সংসদের বাইরে) দাবি।

—শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অনেকক্ষণ ধরে হাত পা মুখ ধুলাম। ...ত জল নিয়ে ঘাড় ভেজালাম। হঠাৎ ...খ কান গলা যে কেন এত গরম হয়ে উঠলো! এক এক সময় নিজের শরীরের মধ্যে কী যে হয় মানুষ নিজেই বোঝে না। সব মানুষই বোঝে না, না আমি-ই বুঝি না। বা এমনও হতে পারে, সব মানুষের শরীরের মধ্যে সেরকম কোন অস্থিরতা জাগে না। সব অবস্থাতেই তারা শান্ত থাকে, আর এই শান্ত থাকাটা নির্ভর করে তাদের মানসিক সুস্থতার ওপর।

ইচ্ছে করে অনেকটা সময় নষ্ট করে বাইরে এলাম। আমি মানসিক সুস্থতা ফিরে পাবার চেষ্টা করছিলাম এতক্ষণ ধরে। শুধু যে মানসিক সুস্থতা, তা না। আমার শরীরকেও নিজের বশে আনতে সচেষ্ট ছিলাম। বাইরে এসে দেখলাম, ঘোতন আর লীলাবতী গল্প করছে। মা, সুপ্রিয়া আর বড়মামা আলাদা ভাবে কথা বলছেন। আমাকে দেখে বড়মামা বললেন, 'শুনলাম তুই নাকি বেরোবি?'

বললাম, 'ঘোতনের সঙ্গে একটু বেরোবো। জরুরী কাজ আছে।'

বড়মামা সাবধান করে দিলেন। 'তাড়াতাড়ি ফিরে আসিস। দিনকাল ক্রমশই খারাপের দিকে যাচ্ছে। চতুর্দিকে বোমা, গোলাগুলি। কলেজ স্ট্রীটের দিকে আজও গুলি চলেছে।'

বললাম, 'আমি কলেজ স্ট্রীটের দিকে যাব না।'

বড়মামা যেন নাছোড়বান্দা। বললেন, 'কোনদিকে যাবি?'

হঠাৎ বলে ফেললাম, 'কলুটোলার দিকে।'

বড়মামা আঁৎকে উঠলেন, 'এই সন্ধ্যার সময় কলুটোলায় যাবি?'

উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ আমাকে হতভম্ব করে দিয়ে সুপ্রিয়া বলে উঠল, 'ও ঠিক জানে না বড়মামা। আমাকে একবার কসবায় যেতে হবে। একা একা ঐ পথে যাওয়া ঠিক হবে না বলে ওকে সঙ্গে নিয়ে যাব ভেবেছি।'

বড়মামা খুব খুশী হলেন না। বললেন, 'কসবাও ভাল জায়গা না। ওদিকে গোলমাল তো লেগেই আছে, সাবধানে যেও।'

সুপ্রিয়া ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে পড়ল। 'সাতটা বেজে গেল, ওঠা যাক।' বলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

ঘোতনও উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আমিও যাব এখন।'

লীলাবতী ঘোতনকে বলল, 'আমাকে ক্যামাক স্ট্রীটে নামিয়ে দিয়ে যাবেন?'

আমার মনে হচ্ছিল লীলাবতীকে লিফট দেবার কথা বলি। সুপ্রিয়ার সঙ্গে নিশ্চয়ই গাড়ি রয়েছে। সুপ্রিয়া একটা কথাও বলল না। লীলাবতীর ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিতেই সুপ্রিয়ার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। সুপ্রিয়া আমার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে।

ঘোতন আর লীলাবতী বেরিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ লীলাবতী পিছন ফিরে আমাকে উদ্দেশ করে বলল, 'কাল সকালে আসবো।' বলে মা আর বড়মামাকে হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে গেল। ঘোতন একটা কথাও বলল না। কিন্তু ওর চোখ দেখে বুঝলাম, ঘোতন দারুন জোরে নিজের মনে মনে হাসছে।

ওরা বেরিয়ে যেতে ঘরে রইলাম আমরা চারজন। বড়মামা একটা চেয়ারে বসে আছেন। বড়মামার মুখোমুখি তক্তপোষে বসে রয়েছে মা। আমি আর সুপ্রিয়া দাঁড়ানো। বড়মামা বললেন, 'কাল সকালে কি তোর কাজ আছে?'

বললাম, 'কেন?'

'একবার দমদমে যাস। তোদের বাড়িটা দেখে আসিস। আর পেয়ারা যদি থাকে, নিয়ে আসিস গোটা কতক। কতদিন পেয়ারা খাই না।'

'আপনি অনেকদিন পেয়ারা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন, দাঁত তোলার পর থেকে শক্ত জিনিস চিবোতে পারেন না বলে।' কথাগুলো নিজের কানেই কর্কশ শোনাল।

বড়মামা একটুও বিরক্ত হলেন না। বরং খুব মজার কথা শুনলেন যেন। সুপ্রিয়ার দিকে তাকিয়ে হেসে হেসে বলতে লাগলেন, 'ছেলেবয়সে খুব পেয়ারা খেতে ভালবাসতাম। বুড়োবয়সে ছেলেবয়সের ভাল লাগাটা আবার ফিরে আসে। লক্ষ্য করে দেখো, যারা ছেলেবেলায় মিষ্টি ভালবাসে, তারা বৃদ্ধবয়সে আবার মিষ্টির দিকে আকৃষ্ট হয়।'

বড়মামা এমনভাবে বললেন, যেন দীর্ঘ গবেষণার পর এই মুহূর্তে চরম তথ্যটি আবিষ্কার করে ফেলেছেন।

সুপ্রিয়া অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়েছিল। ও যেন কথা বলতেও ভুলে গেল। বড়মামা আমাকে তাড়া দিয়ে বললেন, 'আর দেরী করিস না। তাড়াতাড়ি গিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসিস। তুই না ফেরা পর্যন্ত চিন্তায় থাকবো।' এর পরে আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। বাধ্য হয়েই সুপ্রিয়ার পিছন পিছন বাইরে বেরিয়ে আসতে হল। বাইরে একটা নতুন ঝকঝকে গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমরা গাড়ির সামনে যেতেই উর্দিপরা ড্রাইভার তাড়াতাড়ি দরজা খুলে ধরে পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল।

আমি আর সুপ্রিয়া পিছনে বসলাম। দুইজন দুই কোনায়। মাঝে একমানুষ সমান ব্যবধান। আমি এদিক দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিলাম। সুপ্রিয়া ওদিকের জানালা দিয়ে রাস্তা দেখছিল। বড় রাস্তায় পড়ে ড্রাইভার গন্তব্যস্থান জানতে চাইল। সুপ্রিয়া বলল, 'লেক।' অথচ কিছুক্ষণ আগে ও বলেছিল, কসবা। ক্রমশই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ছিলাম। সুপ্রিয়া যে মনে মনে একটা ষড়যন্ত্র করছে, সে সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। অথচ কী সেই ষড়যন্ত্র, এবং তার প্রকাশ কোন পথ ধরে হবে, তা নির্ণয় করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। একবার মনে হল দরজা খুলে নেমে পড়ি। কিন্তু গাড়ি তখন দ্রুতগতিতে লেকের দিকে ছুটে চলেছে।

জলের দিকে মুখ করে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল। নামতে যাচ্ছিলাম, সুপ্রিয়া বাধা দিয়ে বলল, 'একটু বসবো, পরে হাঁটবো।' তারপর ড্রাইভারকে উদ্দেশ করে বলল, 'ইচ্ছে করলে তুমি একটু বেড়িয়ে আসতে পার। লোকটা নেমে গেল।

সুপ্রিয়া আমার দিকে কাত হয়ে বসল। এদিকে আলো বিশেষ নেই। সুপ্রিয়া নিশ্চয়ই আমার মুখ স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছে না। কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে স্বাভাবিক গলায় সুপ্রিয়া বলল, 'হঠাৎ চলে এলে যে?'

আমিও যথাসম্ভব স্বাভাবিকভাবে উত্তর দেবার চেষ্টা করলাম, 'পুজোয় কোলকাতার বাইরে থাকতে ভাল লাগে না।'

সুপ্রিয়া উত্তর দিল না। চুপ করে বসে রইল। অনেকক্ষণ দুজনে চুপ করে বসে রইলাম। হঠাৎ সুপ্রিয়া বলে উঠল, 'প্রত্যেক মানুষ যদি নিজের অবস্থার সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারতো।'

হেসে বললাম, 'মাসীর যদি গোঁফ হতো, মাসী তা হলে মামা হতো।'

'অবাক লাগে, তখনই যখন মানুষ আবোল তাবোল কথা দিয়ে নিজের দোষ ঢাকতে চায়।'

খুব হাল্কাভাবে বললাম, 'কিন্তু যে দোষ করে নি, দোষ ঢাকার প্রশ্ন তার ওঠে না।'

সুপ্রিয়া হঠাৎ আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে তীব্র অথচ চাপা গলায় চীৎকার করে উঠল, 'একশোবার দোষ করেছো। লীলাবতী ভাল মেয়ে না।'

'ও অসম্ভব ড্রিংক করে। সে কথা নিজের মুখেই স্বীকার করেছে।'

'শুধু যে ড্রিংক করে তা না, মিস্টার কাপুরের সঙ্গে ওর একটা সম্পর্কও রয়েছে।' সুপ্রিয়া ক্রমশই অধৈর্য হয়ে পড়ছিল।

শান্তভাবে উত্তর দিলাম, 'একদা এক মিস্টার কাপুর এক মিস দেশপাণ্ডের কণ্ঠলগ্ন হয়ে মত্ত অবস্থায় গাড়িতে এসে বসেছিল। বসেছিল ঠিক না, তাকে এনে বসানো হয়েছিল।'

'এত কথা তুমি জানলে কি করে?'

'সেই প্রশ্নটা আমারও।'

'আমি শুনেছি।'

'কার মুখে?' হঠাৎ আমি যেন সুপ্রিয়ার চেয়ে সবল একজন মানুষ হয়ে গেলাম।

সুপ্রিয়া জেদী মেয়ের মত বলল, 'যার মুখেই শুনি না কেন, কথাগুলো সত্যি।'

'আরও গোটা কয়েক সত্যি কথা তোমার জানা উচিত।'

সুপ্রিয়া উত্তর দিল না। আবছা আলোয় দেখলাম ও আমার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। বললাম, 'লীলাবতী সরল, মিশুক। ওর দম্ভ নেই। ও মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে। আর নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অপরকে ক্ষুধার্ত নেকড়ের সামনে ঠেলে দেয় না।' বলতে বলতে হঠাৎ আমার গলায় দারুন কাঁপুনী ধরে গেল।

সুপ্রিয়া বলল, 'আমি তোমাকে ক্ষুধার্ত নেকড়ের সামনে ঠেলে দিয়েছি?'

হাসবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু গলা দিয়ে কান্নার মত শব্দ বার হল, 'সব চেয়ে বিস্ময়কর কি জানো। মানুষ যখন নিজের চরম দুরভিসন্ধি সরলতা দিয়ে ঢাকতে চেষ্টা করে।'

সুপ্রিয়া কঠিনভাবে বলল, 'কী বলতে চাও?'

'বক্তব্য খুব সহজ, এত সহজ যে বলাটা খুব কঠিন হয়ে দেখা দিচ্ছে। প্রথম প্রশ্ন, আমাকে পাটনায় পাঠিয়েছিলে কেন?'

'প্রশ্নের জবাব দিতে আমি বাধ্য না। অফিসের কাজেই তুমি পাটনায় গেছ। কোন ব্যক্তির প্রশ্ন এখানে ওঠে না।'

'দ্বিতীয় প্রশ্ন, যদিও প্রশ্নের উত্তর দিতে তুমি বাধ্য না, কিন্তু প্রশ্নগুলো তোমার শোনা দরকার। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, আমাকে জামসেদপুরে পাঠানো হয়েছিল কেন, আগে থেকেই ডিনার অ্যাপয়েন্ট করা হয়ে গিয়ে থাকলে, এই তামাশার কী দরকার ছিল? তৃতীয় প্রশ্ন—'

হঠাৎ সুপ্রিয়া অসাংস্কৃ ভাবে বলে উঠলো, অন্য কথা বলো।'

'কী কথা বলবো। কী কথা বলা যায় তোমার সঙ্গে?'

সুপ্রিয়া অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে বসে রইল। ও আর আমার দিকে তাকিয়ে নেই এখন। এতক্ষণ ও আমার দিকে ঝুঁকে বসেছিল। ধীরে ধীরে ওপাশে সরে বসল। ওদিকের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে মুখ করে বসল। লেকের এদিকটা অন্ধকার। কিন্তু আকাশে একফালি চাঁদ উঠেছে। সেই আলোতে লেকের জলের কিছুটা অংশ চিক চিক করছে। ওপারের গাছগুলো এক একটা জমাটবাঁধা অন্ধকার। সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় মনে হতে লাগল, সুপ্রিয়া যে শুধুমাত্র আমার ওপর অবিচার করেছে তা না, ও আমাকে ভয়ানক দূরের মানুষ বলে ভেবেছে। দূরের মানুষ বলে না ভাবলে মানুষে মানুষকে এত অপমান করতে পারে না। একটা চিঠি লিখেছিলাম পাটনায় পৌঁছে, সে চিঠির জবাব পর্যন্ত দেয়নি সুপ্রিয়া।

সুপ্রিয়া ধীরে ধীরে বলল, 'ফেরা যাক।'

ড্রাইভারকে কাছে পিঠে দেখা গেল না। দরজা খুলে বাইরে বেরোতে যাচ্ছিলাম, সুপ্রিয়া আবার বলল, 'আমার ওপর রাগই করো বা আমার সঙ্গে বলার মত কথা খুঁজে নাই পাও, ক্ষতি নেই। নিজেকে সামলে চলো। দেশপাণ্ডে ভাল লোক না। আজ সকালেই মিস্টার কাপুরকে ফোন করে জানিয়েছে, তুমি তার মেয়েকে পৌঁছে দিতে কোলকাতায় এসেছো। চাকরি করতে গেলে সুনাম নিয়ে চাকরি করা দরকার।'

ওর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলাম, 'সুনাম দুর্নামে মানুষের কিছু এসে যায় না। মিথ্যে কথা যার যা ইচ্ছা রটাতে পারে।'

'এত লোক থাকতে সবাই তোমার নামেই বা এত মিথ্যা কথা রটায় কেন?'

'আর কি কথা?'

'তুমি ঘন ঘন দেশপাণ্ডের বাড়ি যাও। লীলাবতীর সঙ্গে পেছনের বাগানে বেড়াও। পাটনায় অনেক বেড়াবার জায়গা আছে।'

কর্কশ গলায় বলে উঠলাম, 'তোমার যতীনবাবু দেখছি সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে।'

আর এক মুহূর্তও বসে থাকতে ইচ্ছে করল না। দরজা খুলে বাইরে এসে গলা ছেড়ে ড্রাইভারকে ডাকতে লাগলাম।

গাড়ি সাদার্ণ অ্যাভিনিউ দিয়ে গড়িয়াহাটার দিকে চলেছে। বাইরের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে ছিলাম। যদিও চুপ করে ছিলাম, মন শান্ত ছিল না। বারবার মনে হতে লাগল ঘোতনদের সঙ্গে আমারও বেরিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। আমি জানতাম সুপ্রিয়া আজ কসবা যাবে না। জেনেশুনেও ওর ফাঁদে পা দিলাম। শুধু আজ না, বরাবরই দিয়ে আসছি। একটা পাপের বোঝা যেন আমার মাথায় চাপানো আছে। একটা অভিশপ্ত মানুষের মত সেই [illegible] বয়ে বেড়াতে হচ্ছে আমাকে। গড্ডালিকা প্রবাহ থেকে আমি কি কোনদিনই মুক্তি পাব না? শুধুই কি অন্যের মত অন্য একটা ইচ্ছার তাড়নায় ছুটে চলবো, যে ইচ্ছা কোন দিনই আমার নিজের ইচ্ছা হতে পারবে না!

হঠাৎ সুপ্রিয়ার কথা কানে এলো, 'সত্য অপ্রিয় হলেও সত্য।'

একটা চাবুক যেন এসে পিঠে পড়ল। ঝাঁঝালো গলায় বললাম, 'যা অপ্রিয়, তাই সত্য না।'

সুপ্রিয়া কিছুক্ষণ চুপ থেকে ধীরে ধীরে আবার বলল, 'রাগারাগির কথা না। কথা হচ্ছে নিজের ভাল মন্দ বিচার করার ক্ষমতা প্রত্যেক পূর্ণ বয়স্ক মানুষেরই থাকা উচিত।'

'সে উচিত বোধ যদি থাকতো, তাহলে সবচেয়ে বিপদগ্রস্ত হতে তুমি।' বলে সুপ্রিয়ার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম।

সুপ্রিয়া বিস্মিত হল। 'আমার বিপদ হতো?'

'হ্যাঁ তোমার।' একটা ক্ষুব্ধ মানুষ যেন আমার ভেতর থেকে চেঁচাতে লাগল, 'কারণ নিজের স্বার্থ অপরের বিনিময়ে চরিতার্থ করতে বাধাপ্ত হতো তোমার।'

সুপ্রিয়া ছোট্ট ধমক দিয়ে বলল, 'লীলাবতীকে দেখে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। অথচ অনিমেষ ওকে দস্তুর মত অবহেলা করে।'

'না, অনিমেষ তা করে না, উপায় নেই বলেই অনিমেষকে দূরে দূরে থাকতে হয়।'

'কেন? উপায় নেই কেন?' সুপ্রিয়া একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। ও আবার স্বাভাবিক হয়ে এলো।

'উপায় নেই কারণ বিভা আর কোন স্ত্রীলোককে সহ্য করতে পারে না। আর কেউ যে অনিমেষকে ভালবাসবে, তার কাছে

কাছে থাকবে বিভা তা চায় না। চায় না বলেই পাটনায় গিয়ে তোমাকে হোটেলে থাকতে হয়।'

মনে হল সুপ্রিয়া কিছুক্ষণ দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে রইল। ও যেন কথা হারিয়ে ফেলল। ওর এই বিকল্প অবস্থা দেখে হঠাৎ উল্লসিত হয়ে উঠলাম। ওকে ক্ষত-বিক্ষত করার নেশা আমাকে পেয়ে বসল। 'লীলাবতীকে তুমি হিংসে করো।'

'লীলাবতীকে আমি হিংসে করতে যাব কেন? ও তো চাকরির ক্ষেত্রে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী না।'

'চাকরির ছাড়াও মানুষের অন্য ক্ষেত্র থাকে।' ভেতরে ভেতরে একটা উত্তেজনা আমাকে ক্রমশই আচ্ছন্ন করতে শুরু করেছিল।

'এই ক' দিনের মধ্যেই অনেক জ্ঞান বেড়েছে বলে মনে হচ্ছে।'

সুপ্রিয়ার বিদ্রূপ গায়ে না মেখে উত্তর দিলাম, 'স্বাভাবিক মানুষ আ-জীবন অন্ধ সেজে থাকতে পারে না।'

সুপ্রিয়া যেন চাপাস্বরে গর্জে উঠল, 'তুমি স্বাভাবিক না। একটা বিশ্রী কমপ্লেক্সে ভুগছো তুমি।'

'সে জন্যে যদি কেউ দায়ী হয়, সে তুমি।'

'আমি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ তুমি। একশোবার তুমি। তুমি আমাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছো। আমাকে লোভী করেছো, মানুষের চরম অধঃপতন—বিশ্বাসঘাতকতা, তুমি আমাকে দিয়ে তাই করিয়েছো। এক-এক ধাপ করে আজ কত নীচে নেমে গেছি আমি।' অন্ধকারের মধে যেন আমি ডুকরে কেঁদে উঠলাম।

ভেবেছিলাম, আমার এই অসহায় অবস্থায় সুপ্রিয়া দুঃখিত হবে। ও আরও রেগে গেল। বিরক্তভাবে বলল, 'যা বলতে চাও সোজা ভাষায় বলো। কী বিশ্বাসঘাতকতা করেছো তুমি? কার সংগে করেছো?'

সুপ্রিয়ার নিষ্ঠুরতায় আমার অন্তরাত্মা হাহাকার করে উঠল, 'তুমি জানো না, কী করেছি আমি! অফিস ইউনিয়নের সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি? ওরা যখন সংগ্রাম করার জন্যে জীবন-মরণ পণ করেছিলো, তখন আমি চোরের মত পালিয়ে গিয়ে বড় পোস্টে জয়েন করিনি? আমার কলিগদের সংগে বিশ্বাসঘাতকতা নয় এটা?'

সুপ্রিয়া যেন আমাকে সান্ত্বনা দিতে চাইল, 'তুমি থাকলে ওদের এর চেয়ে বেশী কিছুই ভাল হতো না, বরং তোমার ক্ষতি হয়ে যেত। ওদের দাবী পুরোপুরিভাবে মিটেছে।'

'না, মেটে নি। ওদের আসল দাবী ছিল কোম্পানীতে ওদের একটা পাকাপোক্ত স্থান দিতে হবে। ম্যানেজমেন্টে ওদের কোন রিপ্রেজেন্টেটিভ নেই।'

সুপ্রিয়া ধৈর্য হারিয়ে ফেলল, 'অবান্তর কথা তুলে সবাইকে বিব্রত করো না। তাতে কারও শান্তি হয় না।'

'যে প্রশ্ন তোমাদের বিব্রত করে, তাকেই তোমরা অবান্তর প্রশ্ন বলো। আমার প্রশ্ন ছিল, আমরা কারা। তোমার কাপুর সে প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেয় নি।'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সুপ্রিয়া বলল, 'যেহেতু সে প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায় না। অফিস আর যাই হোক, নাটকের আসর না। তোমরা কারা, এ প্রশ্নের জবাব তোমাদেরই দিতে হবে। বাইরের কেউ সে উত্তর দিতে পারে না, দিলেও সেটা তোমাদের মনের মত হবে না। আমি যদি বলি, তোমরা একদল মেরুদণ্ডহীন মানুষ, যারা নিজেদের ভাল-মন্দ বুঝতে না পেরে অকারণে শুধুই চেঁচাও।'

'তা হলে বলবো, যাদের কাছে এই প্রশ্ন করা হয়েছে, তারা একদল হৃদয়হীন যন্ত্র। মানুষের সুখ দুঃখ, হাসি-কান্না তাদের হৃদয় স্পর্শ করে না। কিন্তু একদিন আমার এবং আমি বিশ্বাস করি, সেদিন খুব দূরে না, যেদিন এই প্রশ্নের উত্তর তোমাদের দিতেই হবে।'

সুপ্রিয়া তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মত ঝলকিয়ে উঠল: 'সেদিন যদি আসেই, আমিও বলে রাখছি, আমি তোমাদের সকলের সামনে দাঁড়িয়ে একই কথা বারবার বলে যাব, শুধু চীৎকার চেঁচামেচি করে মানুষ ক্ষমতা অর্জন করতে পারে না, মানুষ ক্ষমতা পায় নিজের কাজ দিয়ে, পরিশ্রম দিয়ে, ঐকান্তিক চেষ্টা দিয়ে।'

হাসির মধ্য দিয়ে বিষ ছড়াতে ছড়াতে বললাম, 'কিছুক্ষণ আগে বলেছিলে, এটা নাটকের আসর না। তোমার কথা দিয়ে তোমাকেই সাবধান করে দিচ্ছি।'

সুপ্রিয়া যেন আমার কথা শুনতেই পেল না। জেদী মানুষের মত বলেই চলল, 'আমি একদিন খুব সামান্য চাকরি নিয়ে এই কোম্পানীতে যোগ দিয়েছিলাম। আজ আমি যে উঁচু জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি, তার জন্যে বাইরের থেকে কোন সাহায্য আসে নি। আমাকেই নিজের চেষ্টায় উঠতে হয়েছে।'

'নিজের চেষ্টায় বলো না। তোমার রূপ আছে, বয়স আছে, আর কাপুরের মত পুরুষ মানুষ আছে, তোমাকে কে বাধা দেয়।'

সুপ্রিয়া হঠাৎ চুপ করে গেল। কী বলতে গিয়েও বলল না। গাড়ি তখন গড়িয়াহাটার রেডলাইটের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এদিকটায় বেশ আলো, সেই আলোয় সুপ্রিয়াকে দেখতে চাইলাম। সুপ্রিয়া মুখ ঘুরিয়ে বসেছে। ওর মুখের একটা অংশ আর ঘাড় দেখা যাচ্ছে শুধু। সুপ্রিয়ার এই অংশ দেখে ওকে সুপ্রিয়া বলে মনে হচ্ছিল না। সুপ্রিয়া গলায় একটা হার পরেছে। আলো পড়ে সেই হার চিকচিক করছে।

হঠাৎ মনে হল, আমার এখানে নেমে পড়া দরকার। ঘোতনের সংগে আজ রাতেই আমাকে দেখা করতে হবে। দরজা খুলে নেমে পড়লাম। ভেবেছিলাম, সুপ্রিয়া বাধা দেবে। কিন্তু সুপ্রিয়া একটা কথাও বলল না। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল না পর্যন্ত। যে-রকম বসেছিল সে রকমই বসে রইল। গাড়ি ছেড়ে দিল। মনে হল সুপ্রিয়া ঠিক সেই-ভাবেই বসে আছে। মুখ ফিরিয়ে রাস্তাই দেখছে।

ঘোতন বাড়িতেই ছিল। বলল, 'কি ব্যাপার। মান অভিমান পর্ব শেষ হল।'

'মান-অভিমান আবার কি। অফিসের উঁচু পদে রয়েছে, একটু খাতির টাতির করতে হয়।'

ঘোতন হেসে ফেলল, 'ভেরী ভেরী গুড। তোমার বাস্তব বুদ্ধি সত্যি সত্যি প্রশংসনীয়।'

অন্যপথ ধরলাম, 'তারপর তোর খবর কি। আমাকে অন্তত একটা ধন্যবাদ দেওয়া উচিত ছিল।'

ঘোতন বিস্মিত হল, 'কেন?'

'একজন সুন্দরী মেয়ের সঙ্গ পাওয়া যে-কোন পুরুষের পক্ষে লোভনীয়।'

ঘোতন তাড়াতাড়ি বলে উঠল, '[illegible] হয়, নিশ্চয়। বিশেষ করে যে মেয়ে [illegible]ীন পানীয়ের সঙ্গিনী হতে পারে।'

'তুই লীলাবতীকে মদ খাইয়েছি[illegible] ঘোতন?'

ঘোতন নিজের মুখের সামনে হাত নাড়িয়ে বলল, 'মদ মদ বলিস না, ছোটলোকের মত শোনায়। ড্রিংকস বল, বেশ মজোঁয়া গন্ধ। বেশ টানতে পারে রে মেয়েটি।'

'ভাল করিস নি ঘোতন।'

ঘোতনের চোখ বেশ লাল দেখাচ্ছিল। সেই লাল চোখ ছোট করে ও বলল, 'আর যাই করিস, উপদেশ দিতে আসিস না। ইচ্ছে করলে এই ধরনের বস্তা-পচা বাণী আমিও বহুৎ বহুৎ ছাড়তে পারি। সন্ন্যেসী থাকার সময় এসব খুব কপচাতাম। তারপর, এত রাতে এলি কেন, তাই বল?'

'আমাকে আমেরিকায় নিয়ে চ[illegible] ঘোতন।' বলতে বলতে ঘোতনের [illegible] হাত চেপে ধরলাম।

'এই কথা। দেখিস শেষ পর্যন্ত বাছুর প্রেমের ঠেলায় আমার জীবন ওষ্ঠাগত করে তুলিস না যেন।' বলে ঘোতন পা ফাঁক করে দাঁড়াল।

ফিক করে হেসে ফেললাম, 'তোকে একটা জলদস্যুর মত দেখাচ্ছে।'

ঘোতন বিরক্ত হয়ে বলল, 'মদ না খেয়ে তোরা—বাংগালীরা যা নেশা করতে পারিস, দেখার মত। আর বক-বক করতে হবে না, বাড়ি যা। আমি এখন ঘুমবো। কাল সকালে দেখা হবে। একসংগে বেরোবো তখন। তোর ভিসা, পাসপোর্ট আরও যা-যা লাগে সব ব্যবস্থা করতে হবে। তার আগে ওখানে তোর একটা চাকরির জোগাড় করা দরকার। গুডনাইট।'

ঘোতন একরকম আমাকে তাড়িয়েই দিল।

—এগারো—

সকাল নটার সময় লীলাবতী এল। সংগে এল ঘোতন। ঘোতন আ[illegible] মুখ রক্ষা হল। প্রথম দিনেই বুঝতে পেরেছিলাম, এ বাড়িতে সুপ্রিয়াকে যে নজরে

দেখেছে সবাই, লীলাবতী সে দৃষ্টি-দাক্ষিণ্য পায় নি। লীলাবতীর চেহারা যে সে জন্যে কিছুটা দায়ী, আমার তা মনে হয়েছিল। এক একটা রূপ নিজের প্রখরতায় অপরকে পীড়া দেয়। লীলাবতীর রূপ সে-রকম। আগুনের শিখায় যেমন দাহন থাকে, ওর সমস্ত শরীর ঘিরে রয়েছে সেই দাহিকাশক্তি। পতঙ্গ নিজেকে পুড়িয়ে মারতে সেই শিখার দিকে ধেয়ে চলে। বড়-মামা, মাসীমা, মা সবার চোখে আমি একটা ঘনিয়ে-আসা আতঙ্ক দেখতে পেয়েছিলাম। আমি যাতে আগুনের শিখায় না পুড়ে মরি, তাই নিয়ে ও'দের উদ্বেগ।

বড়মামা তখনও অফিসে বেরোন নি। বাইরের ঘরে এসে প্রথমেই উনি লীলাবতীকে দেখলেন। দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে তাকালেন। বড়মামার চোখে যেন ভর্ৎসনার দৃষ্টি। ঘোতনের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তো[illegible]লি ভালই হল; বাড়িতে একা-একা [illegible]লে লাগছিল না।' কথাটা বলার [illegible] দরকার ছিল না। বলতে হল বড় [illegible]কে শুনিয়ে। মামা যাতে বুঝতে পারেন ঘোতন আর লীলাবতী এক সঙ্গেই এসেছে। লীলাবতীর সঙ্গে সৌহার্দ্য যদি কারও গড়ে উঠে থাকে, সে ঘোতনের সঙ্গেই, আমার সঙ্গে না। বড়মামা সবাইকে দেখে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। কোন কথা বললেন না।

ঘোতন হঠাৎ বলে উঠল, 'এক-একজন মানুষ নিজেকে নিয়ে ভীষণ ভাবে। তোর মামাটি সেই ধাতের মানুষ।'

ঘোতনের কথায় অবাক হলাম, 'কি করে বুঝলি?'

সরাসরি কথার উত্তর না দিয়ে ঘোতন ঘুরিয়ে বলল, 'এইসব মানুষেরা শুধু যে নিজে কষ্ট পায় তা না, অকারণে অনেককেই দুঃখ দেয়। বাড়িতে বসতে ভাল লাগছে না। চল, বাইরে যাই কোথাও।'

'কোথায় যাবি?'

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ঘোতন বলল, 'যাবার জায়গার অভাব। নে, ওঠ।'

যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বল-লাম, 'তোরা দুজনে একসঙ্গে এলি কি করে রে!'

ঘোতন উত্তর দেবার আগেই লীলাবতী হেসে উঠে বলল, 'টেলিপ্যাথি মারফৎ যোগাযোগ করে।'

পার্ক স্ট্রীটের একটা 'বার'-এ এসে ঢুকল ঘোতন। আমি আপত্তি তুলেছিলাম, 'এই সাত সকালে মদ খাবি ঘোতন?'

ঘোতন উত্তর দিল না। শুধু ঠোঁটের একটা পাশ একটু বেঁকাল, যার মানে হল, মদ খাওয়ার আবার সময় অ-সময়।

ঘোতন খুব রসিয়ে রসিয়ে গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিল। আর মাঝে মাঝে লীলা-বতীকে দেখছিল। লীলাবতী একটা আগুন রংয়ের শাড়ি পড়েছে। ও যেন জ্বলছে। ওর দিকে বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকতে চোখ খরখর করছিল। মদের একটা গ্লাস আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে ঘোতন বলল, 'মনে হচ্ছে জীবনে মদ ছুঁস নি। খেয়ে দ্যাখ, নে।' হাত গুটোতে যাচ্ছিলাম, ও আবার বলল, 'ভয় পেয়ে কী হবে। ভয় পেতে পেতে দেখবি, ভয়টাই এক সময় তোকে নিয়ে পিংপং খেলছে। পড়িস নি সেই কবিতাটা, কাওয়ার্ডস ডাই মেনি টাইমস বিফোর ডেথ। বেশী লেখাপড়া শিখিনি, কিন্তু যে-টুকু শিখেছি, একেবারে সাচ্চা। ঘিলু কাটিয়ে ফেললেও ভুলবো না।' বলে ঘোতন হঠাৎ দমকা হাসিতে ফেটে পড়ল।

তখনও ইতস্তত করছিলাম, খাব কি খাব না। আমার অবস্থা বুঝে নিয়েই যেন ঘোতন বলে উঠল, 'তোর দুটো সাথি তোকে নিয়ে খেলা করছে। একটা চাইছে তোকে পেছনে টানতে, আর একটা চাইছে পেছন থেকে ঠেলে সামনে এগিয়ে দিতে।'

কাতর কণ্ঠে বলে উঠলাম, 'আমি কী করবো ঘোতন?'

ঘোতন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'পিছনে হটার চেয়ে সামনে এগোনোর মধ্যে অনেক বেশী থ্রিল রয়েছে। আর চিন্তা না করে দুর্গা বলে দে গলায় ঢেলে।'

ঘোতনের কথা মত সবটাই এক সঙ্গে গিলে ফেললাম। সঙ্গে সঙ্গে গলাটা জ্বলে উঠল। একটা বিকৃত স্বাদ জিভটাকে আড়ষ্ট করে দিল। আমার দিকে তাকিয়ে ঘোতন আর লীলাবতী এক সঙ্গে হেসে উঠল। লীলাবতী ঘোতনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মদ খাচ্ছিল। ওর সমস্ত মুখ টুস-টুসে হয়ে উঠেছে, চোখ দুটো জোনাকীর মত জ্বলছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর ঘোতন প্রশ্ন করল, 'কিরে, কেমন লাগছে?'

হিক করে হেসে ফেললাম, 'মন্দ না, কানদুটো বেজায় গরম হয়ে উঠেছে। মাথাটা খুব হাল্কা লাগছে।'

ঘোতন মুখ সরু করে বলল, 'আরও কত কি লাগবে। তখন রোজ খেতে চাইবি।'

ভয়ে ভয়ে বললাম 'কিন্তু সবাই যে বলে মদ খাওয়া খুব খারাপ।'

ঘোতন বলে উঠল, 'বোকারা বলে, আর যাদের পয়সা নেই তারা বলে। আর কারা বলে জানিস, সেই সব লোকেরা যারা মরবার আগে বহুবার মরছে, তারা। আমি যেদিন আমেরিকায় গিয়ে পেঁছলাম, পকেটে কি ছিল জানিস? একটা ডলারের নোট, গোটা কয়েক সেন্ট, আর ছোট্ট একটা কাগজে ছোট্ট একটা কবিতা।' ঘোতন সুর করে বলতে লাগল, 'অদৃষ্টেরে শুধালেম চির দিন পিছে/অমোঘ নিষ্ঠুর বলে কে মোরে ঠেলিছে।/সে কহিল, ফিরে দেখো, দেখিলাম আমি/সম্মুখে ঠেলিছে মোরে পশ্চাতের আমি। সেই আমিটাকে তোর টেনে বার করে আনতে হবে যে কিনা তোকে সামনের দিকে ঠেলবে।'

বিভ্রান্তভাবে বললাম, 'কিন্তু সেই আমিটা যদি ঠেলতে ঠেলতে আমাকে পাতালের অন্ধকারে নিয়ে যায়।'

ঘোতন দুই হাত দুই দিকে প্রসারিত করে বলল, 'যায় যদি যাক। সেই অন্ধকারের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে তুই বলবি, হে ঈশ্বর আমাকে আলো দাও। জগৎ আলোময় করে তোলো। দেখবি সত্যি সত্যি আলোর সন্ধান পাবি।'

হেসে ফেললাম, 'যাঃ, এ যেন বাইবেলের গল্প!'

ঘোতন প্রতিবাদ করল না। চেয়ারের পিঠে হেলান দিতে দিতে শুধু বলল, 'যা বললাম, বয়স হলে বুঝবি।'

'তুই যেন বয়সে আমার চেয়ে কত বড়!'

'বয়সে না হোক, জ্ঞানে তোর ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা।'

ঘোতনের কথা বলার ধরণে লীলাবতী খিল খিল করে হেসে উঠল। লীলাবতীর হাসিটা খুব মিষ্টি। শুধু যে মিষ্টি তা না, প্রাণবন্তও। হাসি থামিয়ে লীলাবতী আমাকে বলল, 'আপনার বন্ধুটি রিয়াল জেম।'

বুঝতে না পেরে ঘোতন বলল, 'কার কথা বলছেন মিস দেশপাণ্ডে?'

'আপনার'। বলে লীলাবতী মিটমিট করে হাসতে লাগল।

ঘোতন কায়দা করে মাথা নুইয়ে বলল, 'থ্যাংকস য়্যু।' তারপর গলা ছেড়ে ঘোতন ডাকল, 'বেয়ারা।' ও কাছে আসতেই হুকুম করল, 'আউর দো পেগ।'

লীলাবতী বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

আমি বলে উঠলাম, 'আর খাস নে ঘোতন। তোর নেশা হবে। আপনিও আর খাবেন না মিস দেশপাণ্ডে। অপরের বাড়ীতে থাকতে হয় আপনাকে। ও'রা কী না কী ভাববেন।'

লীলাবতী কথা বলল না। ঘোতন বলল, 'নেশা করার জন্যেই তো খাই। নেশা হলে খুব মজা লাগে না?' ঘোতন যে আমাকে প্রশ্ন করেছে বুঝতে পারি নি। চুপ করে আছি দেখে ও আবার ধমকের সুরে বলল, 'এমন কিছু শক্ত প্রশ্ন না যে এ নিয়ে তোকে ভাবতে হবে। ইয়েস, অথবা নো, যা হয় বলে দে একটা।'

'তা তো বটেই। নেশা না হলে মানুষ শুধু শুধু পয়সা খরচা করবে কেন?'

আমার কথা শুনে ঘোতন বলল, 'দ্যাটস রাইট, তোর হবে। চল তোর পাসপোর্ট ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দি-ই।'

'আজ থাক ঘোতন।'

ঘোতন স্নেহের হাসি হেসে বলল, 'নট টুমরো। কাল কাল করে যে কাল বয়ে যায় বন্ধু। যা করবে আজ। শুধু আজ, শুধু আজ। নট টুমরো।' বলতে বলতে ঘোতন উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল। টাল খেয়ে বসে পড়ল।

হেসে বললাম, 'কী হল?'

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় এবং শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

সম্পাদকের সঙ্গে

অমৃতের লেখক ও পাঠকেরা

স্বদেশে বাঙালী, এবং বিদেশে ফরাসী-দের, সম্পর্কে নানারকম গল্পগুজব ছড়িয়ে আছে, আড্ডাবাজ বলে। হেমিংওয়ে আড্ডার স্মৃতি থেকেই লিখেছিলেন 'মুভেবল ফিস্ট'-এর টুকরো টুকরো লেখাগুলি। অনুরূপ আড্ডার গল্প বাংলা সাহিত্যেও বিরল নয়। যেমন ছিল ঠাকুর বাড়ীর আড্ডা, পরিচয়ের আড্ডা, শনিবারের চিঠির আড্ডা, প্রবাসীর আড্ডা—এমনি আরো বহু আড্ডার আসর।

সেদিন বাইশে জানুয়ারী। আড্ডা দিতে নয়, অমৃতের লেখক ও পাঠকেরা সম্পা-দকের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, [illegible]২।১ বাগবাজার স্ট্রীটের বাড়ীতে। উপলক্ষ যেটা ছিল তার কথা পরে বলছি। ছাতের ওপরে প্যাণ্ডেল বাঁধা থেকে শুরু করে মাইকের গমগমে শব্দ—সবই ছিল। সভাপতি অন্নদা-শঙ্কর রায়। মঞ্চের মাঝখানে বসেছিলেন, কিংবদন্তীর নায়কের মতো অমৃত-সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, বৈঠকী মেজাজে।

শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ এবার নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। সেজন্যেই, এই সম্বর্ধনা সভার আয়োজন। চুয়াত্তর বছরের প্রবীণ সাহিত্যিক বনফুল, আগের মতো, ছোটা-ছুটি করতে পারেন না। চলতে ফিরতে কষ্ট হয়। তিনিও এসেছিলেন, অমৃতের লেখক-হিসেবে, সম্পাদককে অভিনন্দন জানাতে।

বললেন, নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের একটা গৌরবময় অতীত ছিল, যখন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুলপ্রসাদ সেনের মতো মানুষেরা এই সম্মেলনের সভাপতি হতেন। কিন্তু অনেকদিনের অব-হেলায়, এই সম্মেলন গুরুত্ব হারাতে বসে-ছিল। আমি আশা করব, তুষারবাবু, সেই গৌরব ফিরিয়ে আনতে পারবেন। কেননা, তিনি যোগ্য ব্যক্তি।

খুবই সংক্ষিপ্ত ভাষণ।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ধ্বনিঝঙ্কারে আশ্চর্য আবহ তৈরী করতে পারেন। শব্দ নির্বাচনেও তাঁর জুড়ি নেই। কিছুকাল আগেও, তিনি স্মরণ করতেন যে, নোয়া-খালির বাঙাল শিশুকে সাউথ সুবারবান স্কুলের ছেলেরা ক্ষেপিয়ে মারত, পূর্ব-বঙ্গীয় উচ্চারণের জন্য। এইবার পূর্ববঙ্গ বাংলাদেশ নামে স্বাধীন হয়েছে। যেন বলতে চান, দ্যাখো, বাঙাল ভাষার কী তেজ! কী মহিমা!

কিন্তু এমন একটা তৃপ্ত-পরিবেশে বুঝি কেউ আক্ষেপের ভাষা খুঁজে পান না?

অচিন্ত্যবাবু বললেন, তুষারবাবু এমন মানুষ, আসন যাঁর অলঙ্কার নয়। আসনেরই তিনি অলঙ্কার। সাহিত্যকেই তিনি ভাল-বাসেন না, সাহিত্যিকদেরও ভালোবাসেন। তাঁর সংস্পর্শে এলে, নির্মল সরোবরে স্নান করার পুণ্য অর্জিত হয়। নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি হয়ে, তিনি আসরকে সম্মানিত করেছেন।

তখন শীত ও শীতের কুয়াশা নেমেছে ঘন হয়ে। মাথার ওপরে খোলা আকাশ। মঞ্চের সামনে হলুদ রঙের প্লাইউ[illegible] চেয়ারগুলিতে বসে ছিলেন নানাবয়সী ক[illegible] সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীর গরিষ্ঠ অ[illegible] প্রমথনাথ বিশী গল্প করছিলেন শচীন্দ্র[illegible] মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। কৃষ্ণ ধরের [illegible] প্রসন্নতার আমেজ। রাম বসু এক[illegible] অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন। এবং [illegible] সান্যালকে দেখে মনে হচ্ছিল, ছোটোখ[illegible] একটা ভাষণ দিতে তিনি অনিচ্ছুক নন[illegible]

খুব লাজুক চেহারার কবিসাহিত্যি[illegible]রাও সেই মুহূর্তে সঙ্কোচমুক্ত [illegible] গিয়েছিলেন।

অর্থাৎ, উপলক্ষের সীমা ছাড়ি[illegible] সকলেই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি[illegible] দ্রুত। লক্ষ্যটা কি? সম্পাদকের সঙ্গে প[illegible] মিলনের সুযোগে সেতু নির্মাণের চে[illegible] তাই হবে হয়তো। আড্ডা ও আনুষ্ঠা[illegible] ভাষণের যুগ্মস্রোত বইছিল তখন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র বললেন : নিখিল ভ[illegible] বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের আগে ছিল, প্রব[illegible] বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন। বাংলা সাহি[illegible] দিকপাল পুরুষেরাই তার সভাপতি হতে[illegible] সম্মেলনের দিনগুলি ছিল, আমাদের ক[illegible] দুর্নিবার, কিংবদন্তীর গল্পের মা[illegible] আকর্ষণীয়।

কিন্তু ক্রমে ঐ সম্মেলন, তার গু[illegible] হারায়। প্রকৃত সাহিত্য-সাধকের পরিব[illegible] জনপ্রিয় লিখিয়েরা, সভাপতির আ[illegible] বসতে থাকেন। তরুণেরাও বর্জিত।

পরিস্থিতিতেই, তুষারবাবু, একটি আ[illegible]

কাজ করেছেন, বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের শরীরে নতুন রক্ত সঞ্চালনের মতো। সেটি হলো, যখন যে-রাজ্যে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হবে, সেই রাজ্যের ও আঞ্চলিক ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা, তিনি করেছেন। এর ফলে, ভাষার পরিধি বাড়বে। চিন্তার মুক্তি ঘটবে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র, এই ভেবে আশান্বিত যে, তুষারবাবু যোগ্য লোক। তাঁর মতো মানুষ যদি তরুণদের উৎসাহিত করেন, এবং প্রবীণদের জন্য দরজা বন্ধ না হয়, তাহলে নিশ্চয়ই নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের লুপ্ত গৌরব ফিরে আসবে।

মনোজ বসু, তুষারবাবুকে বলেন 'তুষারদা।' তাঁর কণ্ঠস্বরে আনুষ্ঠানিকতার লেশমাত্র ছিল না। যেন ঘরোয়া আসরে বসে আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত।

বললেন, তুষারদা, এবার যে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন, এর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারতো না। তিনি দেশে এবং বিদেশে খ্যাতিমান পুরুষ। আমি বাংলাদেশে গিয়েছি। সেখানকার মানুষ তাঁকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করে। ভারতবর্ষেও তিনি পরিচিত। সারা পৃথিবীর মানুষ তাঁকে জানে।

বললেন, বাংলা অন্যান্য রিজিওন্যাল ল্যাঙ্গয়েজের মতো নয়। হিন্দীর চেয়েও বড়ো। একথা যেন কখনো ভুলে না যাই। তুষারদার কাছে আবেদন, ঢাকা কিংবা চট্টগ্রামে, নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অনুষ্ঠান করতে হবে।

মনোজ বসু আরো বললেন, আমরা ন্যাশনাল ইনটিগ্রেশানের কথা বলে চেঁচিয়ে মরছি। কিন্তু বাস্তবে তার প্রমাণ দিচ্ছি না। তুষারদা সেই প্রমাণ দিয়েছেন। হিন্দীকে, দক্ষিণীভাষাকে, তিনি মর্যাদা দিয়েছেন, পুরস্কার দিয়ে। আমার বিশ্বাস, তাঁর নেতৃত্বে আমরা আবার মালিন্যমুক্ত হতে পারব।

এরপর সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। তিনি স্মৃতিচারণার আবেগ নিয়ে কথা বলছিলেন। মাইকে তাঁর কণ্ঠস্বর সুস্পষ্ট আন্তরিকতায় ছড়িয়ে যাচ্ছিল।

বললেন, কিংবদন্তী-শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা আমার সামনে, চারদিকে, বসে আছেন। এই পরিবেশে, আমি কিংবদন্তী-শ্রেষ্ঠ মানুষকে শ্রদ্ধা জানিয়ে, নিজেকে ধন্য মনে করছি। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের নায়ক বললেও তাঁকে, অত্যুক্তি হয় না। তাঁর পরিবারের সাহিত্যপ্রীতিও আজ জনশ্রুতির বিষয়। আমার মনে হয়, শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ মানেই একটা বিরাট ইনস্টিটিউশান। তাঁর কাছে আমাদের দাবীও অনেক। তরুণ কবিসাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে আমি দাবী করছি তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে, যাঁদের শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সাহিত্য জড়িয়ে আছে, নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে, তাঁদের যেন স্থান হয়।

কথা বলতে বলতে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ যেন, দশ বছর আগেকার দিনগুলিতে ফিরে গিয়েছিলেন। নাকি গত-প্রাত্যহিকের সমকালে দাঁড়িয়ে শোনাচ্ছিলেন, অতীতের কথা?

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বললেন, আমি তখনো লেখক হইনি। সবে লেখা শুরু করেছি। প্রথমে একটি গল্প পাঠিয়েছিলুম অমৃত পত্রিকায়। ছাপা হয়নি। আবার পাঠালুম। ছাপা হল। তারপর থেকে যত লেখা পাঠিয়েছি, কোনোটাই ফেরত যায়নি। আজ অসঙ্কোচে স্বীকার করছি, অমৃতের মধ্য দিয়েই আমি প্রথম জনস্বীকৃতি পাই। এবং সেই কাগজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ। আমার উপন্যাসও প্রথম ধারাবাহিকভাবে বেরোয়, তাঁরই সম্পাদিত অমৃতে।

মাইকের সামনে দাঁড়ালে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় কি রকম যেন অগোছালো হয়ে যান। ভালো কথাগুলিও গুছিয়ে বলতে পারেন না।

বললেন, বাগবাজারের ঐতিহ্যমণ্ডিত ঘোষ-পরিবারের কথা সুবিদিত। শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষকে দেখলে আমার সেকথা বারবার মনে হয়। আমি কথায়, আচার-আচরণে বাঙালী। কিন্তু তুষারবাবু বাঙালী কালচারের সার্থক প্রতিভূহিসেবে, আমাদের মধ্যে যে-রকম পরিচ্ছন্নতায় উপস্থিত, সেই-ভাবেই নিজেকে আমি বিশুদ্ধ রাখতে পারিনি। তাঁরই সম্পাদিত অমৃতে আমি একটা সুদীর্ঘ উপন্যাস লিখেছি, প্রায় এক বছর ধরে। এজন্যে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এরপর এলেন প্রমথনাথ বিশী। তিনি বললেন, তুষারবাবু, সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক। জাতীয় কর্মকাণ্ডের দক্ষ ও কৃতি ব্যক্তি। বহু আগেই, তাঁর এই পদে নির্বাচিত হওয়া উচিত ছিল।

কিন্তু তাঁর বলার ভঙ্গিতে পরিহাসের সুরটি প্রচ্ছন্ন ছিল না। বললেন, তুষারবাবু, আপনাকে মানচিত্র নিয়ে বসতে হবে। ভবিষ্যতে যখন সম্মেলন করবেন, তখন এমন জায়গাই নির্বাচন করতে হবে, যেখানে দর্শনীয় কোনো কিছুই থাকবে না। কেননা, এই উপলক্ষে কেউ সাহিত্য করতে যান না, এলিফ্যান্টা গুহা, কি অন্য কিছু দেখতে যান।

আরেকটি কথা। কোনো প্রকাশককে যেন ভবিষ্যতে এই সম্মেলনের, সভাপতির আসনে বসানো না হয়। কেননা, নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন ট্যুরিস্ট আর ব্যবসায়ীদের জন্য নয়।

কথাটা খাঁটি। এবং আরো খাঁটি কথা বলেছেন বিমল মিত্র। তাঁর ভাষায়: 'আমি লেখার কাজে রিহার্সাল দিয়েছি। বলার কাজে দিইনি। কাজেই...'

সম্বর্ধনা সভায় বনফুল, মনোজ বসু, অন্নদাশঙ্কর রায়, তুষারকান্তি ঘোষ এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র

কেন স্মার্টলি তিনি বললেন, তুষারবাবু সভাপতি হয়েছেন এজন্যে আমি আনন্দিত। তবে, সম্মেলন করে যে সাহিত্য হয়, একথা আমার মনে হয় না। এবার বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের খবর কেবল যুগান্তরে বেরিয়েছে, অন্য কাগজে বেরোয়নি। কেন? সাহিত্য যদি বড় লক্ষ্য হয়, তাহলে কি এটা ঘটত. না, ঘটতে পারত? আশা করি, তুষারবাবু এই অনাচার রোধ করতে পারবেন।

সুমথনাথ ঘোষ মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি গদ্যে কিছু বলব না। কবিতা লিখে এনেছি। তাই পড়ে শোনাব। কবিতাটির নাম 'তুষারভারতী'।

বঙ্গ সাহিত্যের চূড়া
সাহিত্য সাধক
ভারতীর একনিষ্ঠ
নিত্য আরাধক,
হে তুষার, তব কান্তি
নিষ্কলঙ্ক দ্যুতি
গড়ে পাঠকের চিত্তে
নবীন প্রস্তুতি
প্রভাতের; মর্ত্যে তুমি
আনিলে অমৃত,
সগরের সন্তানেরা
হল সঞ্জীবিত
নতুন জীবনে; তব
প্রতিভা স্বাক্ষর
ঘটাইল বঙ্গদেশে
নব যুগান্তর।
মহাত্মা পিতার রচা
অমৃতবাজার
ষড়ৈশ্বর্যে করে পূর্ণ
সাধনা তোমার।
স্বয়ং ভারতী তার
বীণাখানি তুলে
সমর্পিল তব হস্তে
সর্ব দুঃখ ভুলে।
জানি তুমি সুরক্ষিতে
মর্যাদা তাহার।
তারুণ্যের প্রতিমূর্তি,
লহ নমস্কার।

কর্মফল ত্যাগী তুমি
পরম বৈষ্ণব
সাফল্যে মণ্ডিত হোক
আজি মহোৎসব।

ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় তুষারবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অসুস্থতার জন্য উপস্থিত হতে পারেননি। কিন্তু লিখে পাঠিয়েছেন, 'নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিরূপে নির্বাচিত হওয়ায়, অমৃত-বাজার ও অমৃত পত্রিকার সুবিখ্যাত সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করতে, আজ যে আয়োজন হয়েছে, শারীরিক অসুস্থতার জন্য আমি সেই অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারলাম না। আমার এ অক্ষমতা, আশা করি, আপনারা মার্জনা করবেন। এ অক্ষমতা যে কতখানি মর্মান্তিক, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারা যায় না। কারণ, শ্রীমান তুষারকান্তি আমার আত্মার আত্মীয়, আমার একান্ত আপনার জন।'

দক্ষিণারঞ্জন বসু মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে যেন পূর্ববর্তী বক্তাদের প্রসংগ টেনে কথা বলছিলেন। সবাই সতর্ক। মনোযোগী।

দক্ষিণাবাবু বললেন, তুষারবাবু কেবল বাংলা সাহিত্যের কথা ভাবেননি, ভারত-ভাবনায় প্রাণিত হয়ে দুটি পুরস্কার দিয়ে আসছেন ১৯৬৬ সাল থেকে। আজ যদি আসামে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন হত এবং কোনো অসমীয়া সাহিত্যিক পুরস্কৃত হতেন, তাহলে হয়তো তার ফলাফল ভালোই হত।

এরপর ভাষণ দিলেন বুদ্ধদেব গুহ। তিনি বললেন আগে তিনি শিকার কাহিনী লিখতেন, কিন্তু তাতে তেমন সাড়া পাননি। এলেন উপন্যাস ও গল্প রচনার ক্ষেত্রে। অমৃতে আমি উপন্যাস লিখেছি, এবার শুরু করছি নতুন উপন্যাস। তুষারবাবুর কাগজে এ সুযোগ পেয়ে আমি কৃতজ্ঞ।

সম্বর্ধনার উত্তরে তুষারবাবু, অন্নদাশংকরের দিকে তাকিয়ে বললেন, বক্তৃতা বড় ক্লান্তিকর। যাঁরা শোনেন, তাঁদেরও পরিশ্রম কম হয় না।

ঠিক সেই আড্ডার মেজাজে ধীরে ধীরে কথা বলছিলেন তিনি। খুব আস্তে আস্তে বললেন, সুধীর সরকারের দোকানে তার আড্ডা জমত।

হ্যাঁ। কি বলছিলেন যেন? ঢাকায় সম্মেলন করলে কি হয়? হোক না।

অন্নদাশংকর আপত্তি জানিয়ে বললেন, তা কি করে হবে? বাংলাদেশ এখন আলাদা রাষ্ট্র। ভিন্নদেশ। ওখানে সম্মেলন করতে হলে আলাদা নাম নিতে হবে। ভারত-বাংলাদেশ সাহিত্য সম্মেলন বা ঐ রকম অন্য কিছু। না হলে আপত্তি উঠবে, ভেবে দেখেছেন?

শ্রোতাদের কাছে বেশ উপভোগ্য মনে হচ্ছিল। আড্ডা? হ্যাঁ, আড্ডাই বটে। তাঁরা অমৃত-সম্পাদকের সংগে গল্প করতে এসেছেন। লেখক ও পাঠকের সঙ্গে যিনি যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন, নেপথ্যে থেকে, তাঁর সংগে সরাসরি যোগাযোগের এই-ই তো উপায়। সম্বর্ধনা যেন তারই উপলক্ষ।

তুষারবাবু বললেন, আপনারা আমাকে সম্মান দিয়েছেন, সেজন্যে আনন্দিত। এই যে আপনাদের সংগে মেলামেশা করছি—তার মূল্য কি কম? আপনাদের আমি আত্মীয় বলে ভাবি। আমার বিশ্বাস, ভবিষ্যতে আমাদের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হবে। এবং নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের মারফতেই হবে।

কে যেন বললেন, যৌবনে তুষারবাবুকে মনে হত রাজার কুমার। আজ মনে হচ্ছে, তিনি রাজা। সম্রাট। এই সম্রাটই এখন নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি।

এরপর সভাপতি অন্নদাশংকর বললেন, আমার পরম হিতৈষী ও বন্ধু তুষারকান্তি ঘোষকে সম্বর্ধনা জানিয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

—শুভংকর পাঠক

সুস্বাগতম—মহাকাশচারিণী

বিশ্বের প্রথম এবং অদ্বিতীয়া মহাকাশচারিণী ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা আবার এসেছিলেন কলকাতায়। এসেছিলেন ২৮ জানুয়ারী। দীর্ঘ ১০ বছর আগে ঠিক মহাকাশ জয়ের পরই ভারতবর্ষ তথা কলকাতায় ভ্যালেন্টিনা এসেছিলেন। সেটা ছিল এক ঐতিহাসিক সফর। এবার তিনি এক মহিলা প্রতিনিধিদল নিয়ে ভারত সরকারের অতিথি হিসাবেই এসেছেন ভারতের প্রজাতন্ত্র অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। সঙ্গের সাথীরা হলেন—সোভিয়েত মহিলা সমিতির সহ-সভানেত্রী শ্রীমতী জেনিয়া পুসকুরানকোভা (একদা বলশোই ব্যালে গ্রুপের শিল্পী ছিলেন) এবং সদস্যা গ্যালিনা কোলাডা। শ্রীমতী তেরেসকোভা নিজেও ঐ মহিলা সমিতির সভানেত্রী।

বিমানঘাটিতে তাঁকে সম্বর্ধনা জানাতে এসেছিলেন রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ, ভারতের মহিলা ফেডারেশন, পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি, ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতি, প্রদেশ কংগ্রেস মহিলা শাখা এবং কয়েকটি মহিলা সংস্থা। ভি আই পি লাউঞ্জ থেকে শুরু করে রানওয়ের সর্বত্রই ছিল আবালবৃদ্ধ-বণিতায় ভর্তি। পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির তরুণ সদস্যারা তাঁকে 'গার্ড অফ অনার'-এ সম্মানিত করেন। তারপর চন্দনের টিপ, মালা এবং ফুলের তোড়ায় সম্মানিত করা হয় অতিথিবৃন্দকে। 'ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী জিন্দাবাদ' 'ভ্যালেন্টিনা তেরেসকোভা যুগ যুগ জিও' ধ্বনিতে বিমানঘাটি মুখরিত হয়ে ওঠে। এরপর অতিথিদের আনা হয় ভি আই পি রুমে। সাংবাদিকদের প্রশ্নে জর্জরিত হয়ে ওঠেন শ্রীমতী তেরেসকোভা। প্রাথমিক পরিচয়াদির পর শুরু হয় কলকাতা পরিক্রমা। গত '৬৩-র কলকাতা তাঁকে বড়ই আকৃষ্ট করেছিল। তাই দুর্বার গতিতে ছুটে এসেছেন রাজধানী দিল্লি থেকে কলকাতায়। দমদম বিমানঘাটি থেকে সোজা হোটেলে জিনিসপত্র রেখেই কলকাতা দেখতে বেরিয়ে পড়লেন শ্রীমতী তেরেসকোভা ও তাঁর সংগীরা। সংগ দিয়েছিলেন কলকাতাস্থ সোভিয়েত দূতাবাসের পদস্থ কর্মচারিবৃন্দ। মহামতি লেনিনের স্ট্যাচুতে

দমদম বিমানঘাটিতে সোভিয়েট মহাকাশচারিণী ভ্যালেণ্টিনা তেরেসকোভা। পশ্চিমবাংলার শিল্প বাণিজ্য ও পর্যটনমন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ (সর্ব বামে) মাদাম তেরেসকোভাকে স্বাগত জানান। ছবিতে বাম দিক থেকে দ্বিতীয় প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীনুরুল ইসলামকে দেখা যাচ্ছে।

শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু হোল কলকাতা ভ্রমণ: ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল হয়ে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সম্মেলনের অনুষ্ঠান প্রাঙ্গন। সময় খুবই কম। এরই মধ্যে চুকিয়ে ফেলেন দুপুরের খাওয়া। যোগ দিলেন পর পর দু-দুটো সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে। মাত্র একদিনের ছোট্ট সফর এবারের এই কলকাতা পরিক্রমা। আরো আশা ছিল তাঁর মনে কিন্তু তা আর ফলবতী হলো না। হ্যাঁ, ১০ বছর আগের কলকাতা আর আজকের কলকাতায় অনেক গরমিলই খুঁজে পাচ্ছিলেন শ্রীমতী তেরেসকোভা পর্যটকের দৃষ্টিতে। তবু বারবারই কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে পড়ছিলেন কলকাতার জনগণের কাছে। সোভিয়েত মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে তাই তিনিও সবাইকে অভিনন্দন জানান। তিনি উচ্ছ্বাসের সঙ্গে আরো জানান যে ভারতের যেখানেই তিনি গেছেন, সেখানেই ভারত-সোভিয়েত বন্ধুত্ব তিনি লক্ষ্য করেছেন। সে-বন্ধুত্ব শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্তরেই সীমাবদ্ধ নয়, শিল্প-বিজ্ঞান-কারিগরী, এমনকি সামাজিক স্তরেও প্রসারিত হয়েছে। তিনি আশা করেন, ভবিষ্যতে এই বন্ধুত্বের বাঁধন আরো মজবুত হবে।

শ্রীমতী তেরেসকোভার চাঁদে যাওয়া পৃথিবীর কাছে বিস্ময়কর হলেও সমগ্র নারীসমাজের কাছে এ এক গর্বের বস্তু। ভারতীয় মহিলারা কোনদিন চাঁদে যেতে পারবে কি? এমন প্রশ্ন অনেকেই শ্রীমতী তেরেসকোভাকে করছিলেন। তিনি হেসে একটাই জবাব দিচ্ছিলেন, শুধু ভারত কেন যে-কোন দেশের মেয়েরাই যেতে পারে। তবে তাকে হাতে-কলমে শিক্ষা নিতে হবে। খুব কঠিন অধ্যবসায় ছাড়া কি আর এসব সম্ভব হয়? তার আগে সে-দেশকে বিজ্ঞান ও কারিগরী ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নত হতে হবে।

তেরেসকোভার বাবা ছিলেন ট্রাকটর-ড্রাইভার, আর মা সুতাকলের শ্রমিক। এ পরিবারের কেউ কি সেদিন ভাবতে পেরেছিল যে, এই মেয়েই এমন এক মারাত্মক কাণ্ড ঘটিয়ে বসবে যার ফলে ইতিহাসে তার নাম চিরদিন জ্বলজ্বল করবে? একাগ্রতা আর অধ্যবসায়ের ফলেই তো সেই রবার ফ্যাকটরির সাধারণ কর্মীটি ভ্যালেন্টিনা ক্রমে ক্রমে সুতাকল কর্মী থেকে সত্যো প্রযুক্তিবিদ্যা আয়ত্ত করেন। দিনে করতেন কারখানায় কাজ, আর রাতে পড়াশুনা। এয়ার ফোর্স ইঞ্জিনীয়ারিং আকাদেমীর স্নাতক হয়ে একেবারে মহাকাশযাত্রী। এসবই সামান্য কটা বছরের কথা। কিন্তু কঠোর পরিশ্রম আর অধ্যবসায় না থাকলে আজকের সফলতা সম্ভব হত কি?

আর পাঁচজন মেয়ের মতই পারিবারিক জীবনেও তিনি সুখী মহিলা। স্বামী আর কন্যা নিয়ে সুখের সংসার। চাঁদে যাওয়া এবং ঘরকন্নার কাজ করা দুটোই তাঁর কাছে সমান সম্মানজনক। তিনি আবার মহাকাশে যেতে চান এবং যথাযথ তোড়-জোর চলছে। কবে যাচ্ছেন—এমন প্রশ্ন করায় তিনি সহাস্যে বললেন, দিনটা এখনও ঠিক হয়নি, সেটা আমার দেশ ঠিক করবে। আজ আপনি তো মেয়ে, একজন মেয়ের চোখ দিয়ে আপনার কাছে মহাকাশ কেমন লেগেছিল, এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, এসব ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ের কোন প্রভেদ নেই। আমি একজন বৈমানিক। আমি বৈমানিকের চোখেই সেদিন মহাকাশ দেখেছিলাম। হ্যাঁ, মহাকাশে গেছি। আবার যাবো। এবং সেটাই আমার কাজ।

—সিপ্রা আদিত্য

জলসা

মায়া সেন　　সুমিত্রা সেন

বাণী ঠাকুর　　সাগর সেন

সাহিত্য ও সঙ্গীতে তুষারকান্তি ঘোষের সম্বর্ধনা

গত ২২শে জানুয়ারী যুগান্তর অফিসের ঘরোয়া উৎসব-সন্ধ্যা আড়ম্বরহীন, বাহুল্যবর্জিত। কিন্তু বিদগ্ধ রসিকের শ্রদ্ধায় স্নেহে আন্তরিকতায় সমৃদ্ধ। টলটলে পূর্ণতায় চিত্তহারী। উপলক্ষ—নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে এ বছর সভাপতি রূপে নির্বাচিত শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষের প্রতি তাঁর অনুরাগী অমৃতের লেখক, পাঠক ও কর্মীদের উদ্যোগে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয় ২২ জানুয়ারী দৈনিক যুগান্তর অফিসে।

সাহিত্যিকদের রঙিন মনের উচ্ছ্বাসের সংগে সমান্তরাল ছন্দে চলেছিল রবীন্দ্র-সংগীত শিল্পীদের সুরের দীপারতি।

অনুষ্ঠান সুরু হয় শ্রীমতী মায়া সেনের নিষ্ঠাগভীর কন্ঠের 'আজি এ আনন্দ সন্ধ্যা' দিয়ে। ধ্রুপদাঙ্গের উদাত্ত সুরে রচিত হয় এক শুচিসুন্দর পরিবেশ। তারপরই 'আনন্দ সন্ধ্যা'র এক নির্মল আনন্দকে শিল্পী অলংকৃত করেন টপ্পার মীড় ও জমজমার অপূর্ব কারুকৃতিতে 'হৃদয়বাসনা আজ' দিয়ে। সংস্কৃতিমান তুষারবাবুর রুচিকে এই সাবেকী ঢংয়ের গান দিয়ে যেন শিল্পী অভিনন্দিত করেন।

বাণী ঠাকুর পরিবেশন করেন 'দুঃখ রাতে হে নাথ'— সুন্দর সুমার্জিত কন্ঠের শিষ্টাচারী পরিবেশনা শ্রোতাদের মন অনাবিল খুশীতে ভরিয়ে তোলে।

সুমিত্রা সেন তাঁর আপন পরিবেশন-শৈলীর আধারেই সুরু করেন 'আজি এ আনন্দ সন্ধ্যা' দিয়ে। তারপর 'ফুল বলে

যাদুকর মদন কুণ্ডু

তুষারকান্তি ঘোষ সম্বর্ধনা সভায় অপূর্ব মায়াজাল বিস্তার করে দর্শকমন্ডলীকে অভিভূত করেন।

ধন্য আমি'-র পথ বেয়ে এসে থামল 'মোর সন্ধ্যায়' এর সান্ধ্য ছায়াথ। গানের নির্বাচন সুরের আবেদন এবং শিল্পীর স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশভংগীর উজ্জ্বল ছাপ ছিল প্রতিটি গানে।

সর্বশেষ শিল্পী সাগর সেনের সুগম্ভীর ভরাট কন্ঠে সূচিত হোলো মর্যাদাদীপ্ত উপসংহার 'আজি শুভদিনে পিতার ভবনে', 'একি সত্য' এবং বিশেষ অনুরোধে পরিবেশন করেন আরো তিনটি গান। বিপুল জনপ্রিয়তার অধিকারী শিল্পী তার স্বমানে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলেই তার ভক্ত শ্রোতারা শেষ অবধি তাঁদের আসনে অবিচলিত ছিলেন।

শিল্পীদের মেজাজকে সুসংগতে উদ্দীপ্ত করেছেন সর্বশ্রী গোবিন্দ বসু, স্বপন অধিকারী, চঞ্চল খান ও ননী উপাধ্যায়।

সেদিনের উত্তাল সংগীত-সন্ধ্যা যেন সাহিত্য ও সঙ্গীতের প্রবীণ সমঝদার ও পৃষ্ঠপোষকের প্রতি নবীন যুগের একটি মধুর প্রণাম।

বন্ধুদলে কানন দেবী সম্বর্ধিতা

সূর্যনগরে তরুণ প্রাণের সবুজ স্বপ্ন দিয়ে গড়ে ওঠা এক অব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান 'বন্ধুদল' তাদের বাৎসরিক উৎসব উন্মোচন করেন শ্রীমতী কানন দেবী ও শ্রীসন্তে কুমার ঘোষকে সম্বর্ধনা জানিয়ে।

সম্বর্ধনার উত্তরে বিনম্র ভাষণে কানন দেবী বলেন, 'সম্বর্ধিত হবার মত এতটুকু কিছু যদি আমার মধ্যে থেকে থাকে আমার প্রতি সহৃদয় স্নেহশীল দেশবাসী সৃষ্টি। এই সুযোগে তাদের প্রতি আম কৃতজ্ঞতা জানাই।

সম্বর্ধনা আজকাল বহু জায়গায় পা সুযোগ ঘটছে—তবু আজকের এই সম্বধ আমার কাছে বড় মধুর। কারণ আ সন্তানতুল্য প্রতিবেশী তরুণ দল এই স ধনা সভার উদ্যোক্তা। সংস্থা প্রসঙ্গে বলে 'বন্ধুদল' সংস্থা নূতন। কিন্তু নূতন এর অন্তরের সৌন্দর্য-পিপাসা, দুঃখ, দ সমস্যা-জর্জরিত জীবনের তিক্ততাকে উ করে আকাশের দিকে মনকে মেলে ঃ স্বপ্ন। সকল বাধাকে জয় করে এই আ বরণের প্রতি যেন এরা অবিচলিত থাকে

কানন দেবীর হাতে মানপত্র ও অর্ঘ করেন অমিতাভ গুপ্ত ও পলি গুপ্ত।

দু-দিনের উৎসব সভার এক একটি জনালিয়ে দিলেন যে সব শিল্পীবৃন্দ,

হলেন সর্বশ্রী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, ইলা বসু, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, পিন্টু বসু, শক্তিপদ বসুরায়, বটুক নন্দী, গৌরাঙ্গ দেব। সংগীতের মাঝে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেন পদ্মশ্রী দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ললিত কণ্ঠের আবৃত্তি দিয়ে। যোগেশ দত্তর মূকাভিনয়ও খুব উপভোগ্য হয়।

সংগীতে সবাই লব্ধপ্রতিষ্ঠিত শিল্পী। এ'দের সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলার নেই। তরুণ শিল্পী গৌরাঙ্গ দেব উদীয়মান। কিন্তু পরিণতির সুস্পষ্ট আভাস তাঁর সরোদ হাত ও ছন্দ প্রকরণে। স্থানীয় শিল্পী শক্তিপদ বসুরায়ের কণ্ঠও মধুর।

অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবার কৃতিত্ব প্রাপ্য স্বপন ভট্টাচার্য ও তপন ভট্টাচার্যের।

তানসেন সংগীত সম্মেলনের রজত-জয়ন্তী উৎসব : এ বছর মহাজাতি সদনে তানসেন সংগীত সম্মেলন রজত জয়ন্তী বর্ষপূর্তি উৎসব উদ্‌যাপন করেন। সংগীত সম্মেলনের রজতজয়ন্তী উৎসব ভারতে এই প্রথম। এই সঙ্গে এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত আর দুটি প্রতিষ্ঠান অল বেংগল মিউজিক কম্পিটিশন এবং তানসেন মিউজিক কলেজেরও রজতজয়ন্তী পালিত হয়েছিল। এই দুটি প্রতিষ্ঠানের সভ্য ও শিষ্যবৃন্দ প্রতিষ্ঠানত্রয়ের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি বিশেষ সম্বর্ধনা সভা আহ্বান করে সম্মান জ্ঞাপন করেন। এ সভার প্রধান অতিথি ছিলেন তানসেন সংগীত সম্মেলনের প্রথম সভাপতি কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। শ্রীরায়চৌধুরী সেনী ঘরাণার সংগীতধারার একনিষ্ঠ প্রচারক বলে তাঁকে অভিনন্দিত করেন।

এবারের দীর্ঘ দশদিনব্যাপী অধিবেশনে যন্ত্রসংগীতের তুলনায় কণ্ঠসংগীত নিষ্প্রভ।

কণ্ঠসংগীতে মনে রাখবার মত অনুষ্ঠান করেছেন ওস্তাদ আমীর খাঁ ও জিতেন্দ্র অভিষেকী।

আমীর খাঁর সাত্ত্বিকভাবের সংযত গাম্ভীর্য অন্য সব ত্রুটিকে ভুলিয়ে দিয়েছে। সুর লাগাবার সঙ্গে সঙ্গে মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর শুদ্ধকল্যাণ, চন্দ্রকেদার ও চন্দ্রমধু। এ-শক্তি দুর্লভ বলেই আজও আমীর খাঁ অজেয়।

জিতেন্দ্র অভিষেকী তাঁর দু' দিনের অনুষ্ঠানে গাইলেন ভূপালী, সোহিনী, রামকেলী। কণ্ঠের পরিসর, মাধুর্য ও আবেগ মিলে অত্যন্ত চিত্তগ্রাহী হয় শ্রীঅভিষেকীর অনুষ্ঠান।

বহুদিন বাদে শোনা গেল শ্রীমতী পদ্মাবতী শালিগ্রামের গান।

মুণাব্বর খাঁর গানে অনুভবের চেয়ে আঙ্গিকশৈলীর কৌশল প্রদর্শনের অধীরতাই বেশী।

ভাল লাগলো শিবকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'বাগেশ্রী পঞ্চম'। আগেকার চাঞ্চল্য—আঙ্গিক প্রদর্শনের ব্যগ্রতা—সুরের মোহানায় সংহত। ধ্রুপদানুষ্ঠানে শ্রীশিশির গুহ তাঁর পাণ্ডিত্য ও শান্তভাবের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছেন।

বারিদ দেব বর্মণের আলাপ উচ্চ মানের—সেই তুলনায় ধামার কিছু ম্লান।

যন্ত্রসংগীতে নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাগেশ্রী'র আলাপে গুরু আলাউদ্দিনের সরলতা ও শুচিতা—আবার গতের অঙ্গে আলি আকবর খাঁর কল্পনার রং লেগে এক আশ্চর্য শ্রী ফুটে ওঠে। এর ওপর শিল্পীর অবিষয় চিত্তের অনুধাবন ত আছেই।

প্রবীণ শিল্পীদ্বয় শ্যাম গঙ্গোপাধ্যায়ের সরোদ ও বিমল মুখোপাধ্যায়ের সেতার—শোনবার মত।

ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্যের 'কৌশিকী কানাড়া' ও মণিলাল নাগের 'মারু বেহাগে' দুটি যৌবনদৃপ্ত মনের গতিবৈচিত্র্যের দুটি পথরেখা মেলে ধরেছে।

যতীন ভট্টাচার্যের ব্যঞ্জনায় সুরের চেয়ে লয়কারীর প্রাধান্যই বেশী।

আমজেদ আলি খাঁর সরোদ শিল্পীর সকল আকর্ষণই ছিল। কুমার রাজেন্দ্র সিং-এর বেহালায় 'গুর্জরী টোড়ি' আর হিমনে ছড়ের শক্তিশালী স্বর ছাড়াও যে বস্তুটি মন আকর্ষণ করে সে হোলো তাঁর উত্তর ভারতীয় বাদনশৈলির সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় স্বরকম্পনের সুসংগতি।

গৌর গোস্বামীর বাঁশের বাঁশীতে বাজানো 'চাঁদনীকেদারা' আসরে যেন এক্কাশ চাঁদের আলো ছড়িয়ে দিয়েছিল। ইমরাৎ খাঁর 'দেশ' তানে লয়ে আঙ্গিক দক্ষতায় অনবদ্য।

ওস্তাদ বিসমিল্লা খাঁর সানাই-এ 'বৈরাগী ভৈরব' রাত্রিশেষের যবনিকায় ফুটিয়ে তুলল প্রভাতী আলোর শুদ্ধ, শান্ত পূজারত-আত্মমগ্নতা।

কানাই দত্তর তবলা লহরায়, বোলের ঠেকা ও কায়দা তার আনন্দ ও দক্ষতার স্বাক্ষরবাহী।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হোলো কৌশিক বসাকের সেতার, শচীন বসুর কণ্ঠসংগীত এবং সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের তবলা লহরায় প্রচুর প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়।

—চিত্রাঙ্গদা

বসন্ত বিলাপ/ অপর্ণা সেন

চিত্র-সমালোচনা

৫ দুশমন

জানা গেল যে, একই ধরনের (বোর-এর) গুলি দিয়ে কয়েকটি হত্যা সংঘটিত হয়েছে এবং অনুসন্ধান করতে করতে আরও জানা গেল যে, বিরজু নামে কোনও এক দুর্বৃত্ত এই হত্যালীলার জন্যে দায়ী। প্রথম নিহত ব্যক্তি রাজুর দাদা সুনীল এই দুর্বৃত্তকে ধরতে বদ্ধপরিকর। এবং তার প্রণয়িনীর সহায়তায় ও বন্ধুরূপী মেহমুদের পরামর্শে সে একসঙ্গে পাঁচজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করল একটি এস্টেটের রাণীরূপিণী প্রণয়িনীর জন্মোৎসবে। পাঁচ দুশমন একসঙ্গে মন্ত্রণা করল কি উপায়ে রাণীর পনেরো লক্ষ টাকা দামের হীরের গহনা হস্তগত করা যায়। বহু বুদ্ধির লড়াইয়ের পরে পাঁচ দুশমনের একজন 'মনোমোহন' সুনীলকে এবং অপর দুশমন 'শত্রুঘ্ন সিংহ' তার রাণীরূপিণী প্রণয়িনীকে নিয়ে পৃথক পৃথক মোটরে রওনা হল। বাকী তিন দুশমন—বিনোদ খান্না, প্রেম চোপড়া ও প্রাণ অপর তিনখানি গাড়ী চেপে ওদের সঙ্গে যোগ দিল। পথে বহু ধ্বস্তাধ্বস্তি ও জুডো-যুদ্ধের পরে সুনীল মনোমোহনের মৃত্যু ঘটাতে সমর্থ হল। পরে তারই মোটরে চেপে সে শত্রুঘ্ন সিংহের সম্মুখীন হল। দুই মোটরের সংঘর্ষ যখন চরমে উঠল, তখন জ্ঞানহারা রাণীকে মোটর থেকে ফেলে দিয়ে শত্রুঘ্ন সুনীলবেশী মনু নারাংয়ের সম্মুখীন হল। প্রচণ্ড দ্বন্দ্বযুদ্ধের পরে যখন প্রমাণিত হল দুজনেই সমান সমান, তখন অকুস্থল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অপর তিন দুশমনও হাজির এবং বিনোদ খান্না ও প্রেম চোপড়া খতম হবার পরে যখন রণক্ষেত্রে রইল দুই দুশমন, তখন হঠাৎ দেখা গেল মা দুর্গা খোটের সামনে উপস্থিত হয়েছে দুই সুনীল। কে নকল, কে আসল, তা আবিষ্কার করল এক দুশমন প্রাণ। এবং এও আবিষ্কৃত হল শত্রুঘ্ন সিংহ—যে নকল সুনীল সেজেছিল, সেই হচ্ছে ঘাতক 'বিরজু'। এর পরে শেষ দ্বন্দ্বযুদ্ধে যখন শত্রুঘ্ন সিংহ হত, তখন সাঙ্গোপাঙ্গসহ পুলিশ অফিসার গোপাল আবির্ভূত হয়ে সুনীলের অসমসাহসিকতার তারিফ করলেন। অবশ্য প্রাণ সত্যিই দুশমন কিনা, তার উত্তর পাওয়া যাবে ছবি দেখবার পরে।

মনু নারাং প্রযোজিত '৫ দুশমন' ছবির এই হচ্ছে কাহিনীসারাংশ। ছবির নাম যদিও '৫ দুশমন' আসলে তা হওয়া উচিত ছিল 'পাঁচ দুশমন বনাম সুনীল' বা আরও ভালো, শুধু 'সুনীল'। কারণ ছবির নায়ক সুনীল-এর বীরত্ব ও প্রেম ভালোবাসা দেখাবার জন্যেই এই ছবি এবং প্রোডিউসার মনু নারাং নিজেই এর কাহিনীকার ও নায়ক সুনীলের ভূমিকায় অভিনয়কারী শিল্পী। তা ছাড়া পাঁচ দুশমনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ছবির প্রায় মাঝামাঝি পৌঁছুবার পরে। তার আগে পর্যন্ত তার ছোট ভাই, বিপথগামী রাজুর প্রায় তার চোখের সামনেই নিহত হওয়া, ওদের মা ও পুলিস-কর্তা গোপালের সুনীলকেই রাজুর হত্যাকারী বলে সন্দেহ করা এবং নিজের দোষস্খালনের চেষ্টায় সুনীলের প্রকৃত হত্যাকারীর সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত ঐ পাঁচ দুশমন এর সম্মুখীন হওয়ার ঘটনাগুলিকেই দর্শকেরা প্রত্যক্ষ করেন। ছবির দ্বিতীয় অংশে যখন দর্শক মনোমোহন, বিনোদ খান্না, প্রেম চোপড়া, শত্রুঘ্ন সিংহ ও প্রাণ এই পাঁচ দুশমনের কার্যকলাপ দেখবার জন্যে উদ্‌গ্রীব, তখন এঁদের মধ্যে কাউকে বা ক্লোরোফর্মের শিশি নিয়ে, কাউকে বা ছ' চেম্বার রিভলভার নিয়ে নিজ নিজ অভিসন্ধি সম্পর্কে এঁদের মনোভাব ব্যক্ত করতে দেখেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দর্শক কি দেখেন? দেখেন যে, প্রত্যেকেরই বিরুদ্ধে সুনীল লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত এবং ছবির কাহিনী অনুযায়ী প্রতি লড়াইয়ে সেই জয়লাভ করবে, এও জানা কথা। সাসপেন্স যেটুকু, সেটি হচ্ছে, ঐ পাঁচ দুশমনের মধ্যে কে সেই হত্যাকারী 'বিরজু'! শত্রুঘ্ন সিংহই যে বিরজু, এটা জানবার পরেও দর্শকদের একটি উপরি লাভ হয়, যখন তাঁরা জানতে পারেন যে, প্রাণ আসলে দুশমন নয়, সে হচ্ছে একজন গোয়েন্দা।

'৫ দুশমন' এমন একটি ছবি, যা সর্বাংশে ঘটনাপ্রধান এবং সেইজন্যেই যে-ছবিতে কোনো শিল্পীরই নাট্যনৈপুণ্য প্রদর্শনের তেমন কোনো সুযোগ থাকতে

পারে না। কাজেই প্রাণ, শত্রুঘ্ন সিংহ, নাজির হোসেন, অরুণা ইরাণী, মনোমোহন, বিনোদ খান্না, প্রেম চোপড়া, হেলেন প্রভৃতি সকলেই প্রাপ্ত সুযোগের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করেও দর্শকমনে তেমন কোনো দাগ কাটতে পারেন না।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ সাধারণভাবে প্রশংসনীয়। ...দেববর্মণের সুরযোজনাতেও তেমন ... বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া গেল না।

মনু নারাং প্রযোজিত এবং অভিনীত '৫ দুশমন' একটি সাধারণ সাসপেন্সধর্মী ছবি।

—নান্দীকর

স্টুডিও সংবাদ

সোনালী প্রোডাকসন্স-এর 'বসন্ত বিলাপ'

আজ শুক্রবার, ২ ফেব্রুয়ারী উত্তরা, পূরবী, উজ্জলা এবং শহরতলীর অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করছে সোনালী প্রোডাকসন্স নিবেদিত মজার ছবি 'বসন্ত বিলাপ'। বিমল কর রচিত কাহিনী অবলম্বনে শেখর চট্টোপাধ্যায় লিখিত চিত্রনাট্যটিকে পর্দায় রূপায়িত করেছেন দীনেন গুপ্ত। এই হাস্য, কৌতুক ও রোমান্সে ভরা ছবিটির বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন অপর্ণা সেন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, অনুপকুমার, রবি ঘোষ, চিন্ময় রায়, কাজল গুপ্ত, শিপ্রানী বসু, কণিকা মজুমদার, অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, তরুণকুমার, বঙ্কিম ঘোষ, হরিধন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। সুধীন দাশগুপ্ত সুরারোপিত গানগুলি গেয়েছেন মান্না দে, আরতি মুখোপাধ্যায়, রবি ঘোষ ও চিন্ময় রায়। ছবির সম্পাদনা ও শিল্পনির্দেশনায় আছেন যথাক্রমে রমেশ যোশী ও সুখেন চট্টোপাধ্যায়।

শিল্পী সংসদ-এর 'বনপলাশীর পদাবলী'

রমাপদ চৌধুরী রচিত 'বনপলাশীর পদাবলী' একটি বহুপ্রশংসিত উপন্যাস। বিরাট এর পটভূমিকা, অগণন চরিত্রের ভীড়। এর থেকে একটি ঋজু চলচ্চিত্র গড়ে তোলা যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচায়ক। বাঙলা চলচ্চিত্র জগতের অবিসংবাদী নায়করূপে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে উত্তমকুমার নিজে এই কাহিনী অবলম্বনে একটি চিত্রনাট্য রচনা করেছেন ও পরিচালনার গুরুদায়িত্বও পালন করেছেন অক্লান্ত পরিশ্রম করে। শিল্পী সংসদের হয়ে তিনি এই বিরাট চিত্রটি নির্মাণ করেছেন এই আশায় যে, এই ছবিটির আয় দুঃস্থ শিল্পীদের সাহায্যের জন্যে ব্যয় করা হবে। এই হিতকাজে সাহায্য হস্ত প্রসারিত করেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ছবিটিকে প্রমোদকর মুক্ত করে। সকলেরই জানা আছে যে, এই ছবিতে বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণকারী অভিনেতা অভিনেত্রী ও কলাকুশলীরা কোনোরকম পারিশ্রমিক নেননি এবং উত্তমকুমার নিজেই এর উদ্যোক্তা।

রাজগীরে—অচেনা অতিথি

সারা প্রোডাকসন্সের প্রথম ছবি 'অচেনা অতিথি'র এক সপ্তাহব্যাপী বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য শিল্পীসহ চল্লিশজন বয়েজ স্কাউট-এর ছেলেমেয়ে নিয়ে প্রযোজক রাজগীর যাত্রা করেছেন। অচেনা অতিথির কাহিনী রচনা করেছেন সুখেন দাস। জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ও সুখেন দাস ছবিখানির পরিচালনার দায়িত্বে আছেন। সুর দিচ্ছেন অজয় দাস। নেপথ্য কণ্ঠে আছেন—মান্না দে ও মৃণাল চক্রবর্তী। ছবির প্রধান চরিত্রলিপিতে এখন পর্যন্ত যাঁদের দেখা গেছে তাঁরা হলেন—স্বরূপ দত্ত, সুখেন দাস, রবি ঘোষ, অজয় গাঙ্গুলী, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, যোগেন সাধু, অজয় ভট্টাচার্য, জয়শ্রী রায়, মেনকা দেবী, রত্না ঘোষাল, প্রিয়া চট্টোপাধ্যায়, প্রেমাংশু বসু প্রভৃতি। ছবিখানির চিত্রগ্রহণ কাজ বেশ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। নর্মদা চিত্র ছবিখানির পরিবেশন দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

বিবিধ সংবাদ

সি এল টি'তে তুষারকান্তি ঘোষ : কোলকাতা শহরের অজস্র প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শহরের প্রান্তে, যেন একান্তে দাঁড়িয়ে আছে সি এল টি'র অবনমহল আপন স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যে। 'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে'—জাতির ভাবী জনক সেই শিশুদের শরীরের সঙ্গে- সঙ্গে মানসিক সৌন্দর্য, সূক্ষ্ম শিল্পবোধ ও গঠনমূলক কর্মক্ষমতা গড়ে তোলবার এমন অভিনব প্রয়াস ও আয়োজনে সি এল টি অনন্য, অপরাজেয়। নানান বাধা-বিপত্তি, অনটনের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করেও সি এল টি এবার অবনমহলে তাঁদের পক্ষকালব্যাপী উৎসব সমাধা করলেন শিশু শিল্পীদের দিয়ে।

১৪ জানুয়ারীর সন্ধ্যা স্মরণীয় হয়ে উঠেছিলো সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পরসিক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের আনন্দময় ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে। সেদিনের পুরস্কার বিতরণীসভায় প্রতিভাচিহ্নিত প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষায় কৃতিত্বের অধিকারী শিক্ষার্থীদের ডিপ্লোমা ও পুরস্কার বিতরণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন স্বয়ং তুষারবাবু। চার কিংবা পাঁচ বছরের শিশুকাল থেকে সুরু করে পনের বছরের কিশোর কিশোরীদের নিষ্ঠা ও শ্রমভরে শিক্ষাগ্রহণ ও যোগ্যতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার বিবরণ শুনলেন এই প্রবীণ শিশু বিস্ময়ে, কৌতূহলে, আনন্দে, আগ্রহে। তারপর তাঁর সরল, সুন্দর স্নেহঝরা ভাষণে অভিনন্দন জানালেন প্রতিষ্ঠানের প্রাণকেন্দ্র শ্রীসমর চট্টোপাধ্যায়কে।

তিনি বললেন, শিশুদের এই বিচিত্র মেলায় আমি সমরবাবুর কল্পনার আকাশকে যেন দেখতে পেলাম। সব দুর্যোগের অবসানে এই প্রতিষ্ঠান তার লক্ষ্যে যেন পৌঁছয় ঈশ্বরের কাছে আজ এই আমার প্রার্থনা।

দীর্ঘ আঠারো দিনের অনুষ্ঠানের সব-গুলিতে উপস্থিত থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি কিন্তু মিঠুয়ার বিনিদ্র-রজনীতে প্রকৃতির সঙ্গে খেলা, মায়া চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত কথক নৃত্যের আঙ্গিকে 'রূপলেখা' নৃত্যাভিনয়ের আসরের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হইনি।

সংস্থার অন্যতম কর্মী শ্রীঅসিত [illegible] কাছে জানা গেল এবারের উৎসবে বাইরের শিল্পীর অনুষ্ঠানের চেয়ে প্রতিষ্ঠানের শিল্পীদের অনুষ্ঠানের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে বেশী।

এবারের জোরালো অনুষ্ঠান তালিকায় ছিল 'সং অফ ইণ্ডিয়া', 'ছড়া গান' 'হু-য-ব-র-ল' 'ডান্সিং ডোজা', ছড়ার শ্রীঅরবিন্দ, চণ্ডালিকা, মীরাবাঈ, রামায়ণ, ডিপ্লোমা গ্রুপের 'মধুর অংশ'। এছাড়া নৃত্যমের 'রূপকথা' নৃত্যনাট্য লোকরঞ্জনের 'স্বর্ণকাঞ্চন' ও 'মৌমাছিরা এল' বনেও দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দেয়।

অনামিকা কলাসংগম-এর 'লোকমঞ্চ'-এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান

গেল রবিবার, ২৮ জানুয়ারী, সকাল ১০টায় রবীন্দ্রসদন-এ অনামিকা কলা-সংগম-এর 'লোকমঞ্চ'-এর শুভ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন সুসম্পন্ন হয়েছে। সংস্থা সভাপতি শ্যামসুন্দর কানোরিয়ার স্বাগত ভাষণের পরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী তরুণকান্তি ঘোষ উদ্বোধনী ভাষণে বলেন : 'অনামিকা কলাসংগম সংস্থা বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক ও কর্মীদের মধ্যে একটি মধুর সম্পর্ক গড়ে তোলবার উপায়স্বরূপে এই যে নৃত্য, নাটক, সংগীতানুষ্ঠানের প্রদর্শনীতে মালিকের অর্থে কর্মীদের প্রবেশাধিকারের ব্যবস্থা করেছেন, এই অভিনব প্রচেষ্টাকে আমি সর্বান্তঃকরণে স্বাগত জানাচ্ছি।' উন্নত-ধরনের নাটকাভিনয়, নৃত্যনাট্য, ব্যালে প্রভৃতি প্রচুর ব্যয়সাধ্য অনুষ্ঠান। অনামিকা সংস্থা শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক সহায়তায় একদিকে যেমন তাদের কর্মীদের এইগুলি দেখবার সুযোগ করে দিচ্ছেন, অন্যদিকে তেমনই এই সকল দৃশ্যশিল্পের (পারফর্মিং আর্ট-এর) অনুষ্ঠাতাদেরও যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য করতে সক্ষম হবেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পরে বোম্বাই-এর [illegible]নিশঙ্কর সম্প্রদায়ের 'দি ট্রেন' এবং [illegible] ব্যালে প্রদর্শিত হয়। ('লোকমঞ্চ' [illegible]কে [illegible]ন্যত্র আলোচনা দ্রষ্টব্য)

আমরা শুনে সুখী হলুম, 'অনামিকা' গোষ্ঠীর সুযোগ্য নাট্যপরিচালক শ্যামানন্দ জালান এ-বছরে ভারতীয় সংগীত-নাটক আকাদেমী পুরস্কার লাভ করেছেন। অত্যন্ত যোগ্য ব্যক্তিকেই এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে বলে আমরা অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করছি।

ঢাকুরিয়া সান্ধ্য মজলিসের বার্ষিক অনুষ্ঠান : ঢাকুরিয়া সান্ধ্য মজলিসের সভাবৃন্দ [illegible] ১৪ জানুয়ারী রবীন্দ্র সরোবর [illegible] রঙ্গমঞ্চে স্থানীয় বার্ষিক প্রীতি অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করেন. এই উপলক্ষে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও তাঁরা যে নাটকটি মঞ্চস্থ করেন তা ছিল স্বর্গত [illegible] গোস্বামীর রচনা অভিনীত নাটক [illegible]। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে মজলিস সভাপতি [illegible] নাথ উপস্থিত দর্শক-দের স্বাগত সম্ভাষণ জানান ও তাঁর [illegible] বাংলা রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে জাতীয় নাট্যশিল্পের অগ্রগতিতে প্রাক্তন ও বর্তমান শিল্পীদের অবদান গভীর শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ করেন।

তারপর সভ্যরা অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ 'কেদার রায়' নাটকটি অভিনয় করেন। [illegible] বিশিষ্ট শিল্পীসমন্বয়ে [illegible] এই প্রখ্যাত নাটকটির সার্থক অভিনয়ে মজলিস সভ্যরা এবারও প্রমাণ করেন যে তাঁরা নাট্য পরিবেশনায় সত্যই দক্ষতার দাবী করতে পারেন। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত এই নাটকের সামাজিক চিত্রটিকেই বিশেষ-ভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয় ও এই ব্যাপারে যথাযথ কৃতিত্বের পরিচয় দেন নাটকটির যুগ্ম নির্দেশক—দক্ষিণা ঘোষাল ও প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশিষ্ট চরিত্র রূপায়ণে অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয় দেন—প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (কেদার রায়), হরিগোপাল মুখোপাধ্যায় (চাঁদ রায়), দক্ষিণা ঘোষাল (কার্ভালো), নন্দ মুখোপাধ্যায় (শ্রীমন্ত), সুশীল দত্ত (ঈশা খাঁ), মন্মথ বন্দ্যোপাধ্যায় (মানসিংহ), সুশীল নাগ (কাল্লু), অনিল চট্টোপাধ্যায় (মুকুট), শ্রীমতী পাইন (সোনা) ও কুমারী মঞ্জু ভৌমিক (রত্না)। অন্যান্য ভূমিকায় প্রশংসাযোগ্য অভিনয় করেন সর্বশ্রী জীবন ঘটক (রত্নগর্ভ), শচী-প্রসাদ মুখোপাধ্যায় (বিশ্বনাথ), ভাস্কর মিত্র (নোরান রায়), বরুণ বসু ও অনিল ঘোষ। এঁদের সকলের দলগত অভিনয় ও

ষ্ঠানটির সংবন্দোবস্ত উপস্থিত দর্শক-দের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে।
জাতীয় সংগীত পরিবেশনার মাধ্যমে ষ্ঠানের সুসমাপ্তি ঘটে।

ামিকা কলাসংগমের নতুন পরিকল্পনা

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পাঁচ বছর আগে ষ্ঠিত কলকাতার 'অনামিকা কলাসঙ্গম' কর্মধারার সঙ্গে যাঁরা সুপরিচিত, রা এ'দের প্রশংসা না করে পারবেন না। ৎকী রামলীলা, কাওয়ালী এবং সংগীত গানের আসরের ভক্তদের চোখের সামনে রা পরপর তুলে ধরেছেন প্রকৃত শিল্প-রুচ্য অভিনয় কলা, লোকসঙ্গীত ও ৃ নৃত্যনাট্য এবং এর অবশ্যম্ভাবী স্বরূপ তাঁদের ঘটেছে, রুচিপরিবর্তন। ুই তাই নয়, 'অনামিকা' শিল্পীগোষ্ঠী মানন্দ জালানের দক্ষ নির্দেশনায় হিন্দী ভিনয়ের ক্ষেত্রে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা উন্নত মানের এমন একটি আদর্শ র হিন্দী ভাষাভাষীদের সামনে পিত করছেন, যাকে অনুসরণ করে মধ্যেই বেশ কয়েকটি নাট্যসংস্থা এই রীতে গড়ে উঠেছে। মঞ্চাভিনয় এবং রপর ক্রিয়াশীল শিল্পের (পারফর্মিং -এর) ক্ষেত্রে এত অল্প সময়ের মধ্যে বিরাট রুচির বিবর্তন ঘটানো অল্প রের পরিচয় নয়।

সম্প্রতি শ্যামসুন্দর কানোরিয়ার নেতৃত্বে মিকা কলাসংগম দেশ-বিদেশের উচ্চ-ীর অভিনয়, নৃত্য, সঙ্গীতাদি বেশনের জন্যে আর একটি নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। বড়ো বড়ো সায়িক ও শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠানের শিক্ষিত ী ও নির্বাহিকদের (এক্সিকিউটিভদের) ৃ এইসব অভিনয়াদি দেখতে মালিক-ষ্ঠী সাহায্য করেন এবং ফলে মালিক-ী সম্পর্ক উন্নত হয়, তার জন্যে এ'রা ষ্ঠানগুলিকে এ'দের পরিকল্পিত ্রকমঞ্চ' বিভাগের সদস্যপদ গ্রহণের ম্মান জানাচ্ছেন। এ'দের আয়োজিত টি প্রদর্শনীর বারোখানি আমন্ত্রণ-পত্র খানি নির্বাহিতদের জন্যে ও দশখানি র শিক্ষিত কর্মীদের জন্যে—এ'রা টি প্রতিষ্ঠানকে দেবেন বার্ষিক এক জার টাকা চাঁদার পরিবর্তে। ন্যূনকল্পে রে বারোটি কিংবা তারও বেশী গের প্রদর্শনীর আয়োজন করবেন বলে রা অঙ্গীকারাবদ্ধ। আমরা শুনলুম, ই মধ্যে অন্তত পঞ্চাশটি প্রতিষ্ঠান কমঞ্চ'-এর সভ্যপদ গ্রহণ করেছেন। জেই আমরা স্থিরনিশ্চয়, অনামিকা কলাসংগম-এর এই অভিনব প্রচেষ্টা সর্বাঙ্গীন কল্যমণ্ডিত হবেই হবে।

মহলে—নতুন নাটক 'তথাস্তু' :

অনর্থ-খ্যাত নাট্যকার অধ্যাপক সুশীল খোপাধ্যায়ের আর একখানি আলোড়ন-ষ্টিকারী নাটক 'তথাস্তু' গেল প্রজাতন্ত্র বস থেকে রঙমহলে শুরু হয়েছে। পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন সলিল সেন। টকের প্রধান চরিত্রলিপিতে আছেন—হরিধন মুখোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, অমরনাথ, মিন্টু চক্রবর্তী, তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভু ভট্টাচার্য, দিলীপ মৌলিক, ছন্দা দেবী, গীতা মিত্র, মন্দিরা রায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সীমা, ছন্দা চট্টোপাধ্যায় এবং সরযূ দেবী। এখন থেকে নিয়মিতভাবে প্রতি বৃহস্পতি, শনি, রবি ও ছুটির দিন 'তথাস্তু' রঙমহলের দর্শকদের তৃপ্তিদানে পূর্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখবে, এ বিশ্বাস আমাদের আছে। নাটকের গানগুলি লিখেছেন শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুরযোজনা করেছেন শৈলেশ রায়।

সারা বাংলা একাংক নাটক প্রতিযোগিতা, দ্বিতীয় বর্ষ :

গরিফা সেণ্ট্রাল ক্লাবের পরিচালনায় সারা বাংলা একাংক নাটক প্রতিযোগিতা শুরু হবে ৭ মার্চ, ১৯৭৩ থেকে। সর্বশ্রেষ্ঠ প্রযোজনায় থাকবে তিনটি অর্থিক পুরস্কার যথাক্রমে ১০১ টাকা, ৭৫ টাকা ও ৫১ টাকা। যোগাযোগের ঠিকানা : গরিফা সেণ্ট্রাল ক্লাব (তালতলা), গোঃ গরিফা, ২৪ পরগণা।

নিহত সূর্যের ও-পিঠে : গত ১৯ জানুয়ারী 'আয়না' নাট্যদলেরা অলোক সেনগুপ্তের 'নিহত সূর্যের ও-পিঠে' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে কয়েক গুনু মঞ্চস্থ করেন।

এই রূপকধর্মী নাটকটির সুন্দর সংলাপ এবং কাহিনীর বিস্তার খুবই চমকপ্রদ। আজ দৈনন্দিন মনুষ্যজীবনের উপর কটাক্ষপাত করেই এই নাটকটির মূল বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে। নাট্যকার অতি সুন্দরভাবেই মহামানব, যুবক, মাতাল, কবি ও ডাক্তারকে বেছে নিয়েছেন তার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সমাজের বাস্তব রূপকে দেখাবার। আবার এর মাঝে স্তাবক ও প্রতীক এই দুটি চরিত্রের উপস্থাপনা প্রশংসনীয়। পরিচালনার গুণে (অলোক সেনগুপ্ত) নাটকটি খুবই উপভোগ্য হয়। কিন্তু প্রথম সূত্রপাতটি বড় একঘেয়ে

লাগলো। কিছু অদলবদল করে নিলে প্রথম দিকটা আরও আকর্ষণীয় করা যায় বলে মনে হয়। আলোকসম্পাতের কাজ প্রশংসনীয়। বিশেষভাবে আলোর বৃত্তটা যেখানে ঘুরে ঘুরে প্রতিটি চরিত্রের ওপর পড়ছে, সেখানে আলোর কাজ খুবই উচ্চমানের হয়। সাদাবুড়ো যেখানে আগুন নিয়ে প্রতিটি চরিত্রের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছেন, সেখানকার ফ্রিজটি খুবই ভালো এবং অর্থপূর্ণ হয়।

সকলের অভিনয়ের মধ্যে কিছু ত্রুটি ধরা পড়ে। অবশ্য আরও কয়েকবার অভিনয় করলে এ-ত্রুটিগুলো সংশোধনীয়। তবুও এর মধ্যে মহামানব চরিত্রাভিনেতা সোমনাথ ভট্টাচার্যের অতি অভিনয়ের ঝোঁক অবশ্যই সংশোধন করা প্রয়োজন। শ্রীভট্টাচার্যের চলা-বলার মধ্যেও কৃত্রিম ভাব লক্ষ্য করা গেছে। অন্যান্য চরিত্রে অংশগ্রহণ করেন : সঞ্জয় চক্রবর্তী, মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু, পীযূষ সরকার, প্রশান্ত কাঞ্জিলাল, প্রবীর ভট্টাচার্য, কৃষ্ণমোহন চ্যাটার্জি ও অলোক সেনগুপ্ত।

মঞ্চসফল নাটকের চিত্ররূপ : স্টারে অভিনীত মঞ্চসফল নাটক 'শর্মিলার' চিত্ররূপের কাজ দ্রুত সমাপ্তির পথে। প্রধান সহযোগী জয়ন্ত চ্যাটার্জি এক সাক্ষাৎকারে জানান : গত ২২ জানুয়ারী পার্ক হোটেলে কলকাতার এক বিখ্যাত হোটেলের নিয়মিত ক্যাবারে নাচ...[illegible] অংশগ্রহণ করার পর ছবির শেষ পর্যায়ের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। আশা করা যাচ্ছে আগামী মার্চেই ছবির কাজ শেষ হয়ে যাবে।

তিনি আরও জানান, এ-ছবিতে বিভিন্ন চরিত্রে অংশগ্রহণ করছেন : হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন মুখার্জি, অসিতবরণ, বাসন্তী চ্যাটার্জি, দীপ্তি রায়, কণিকা মজুমদার, সুলতা চৌধুরী, চিন্ময় রায়, রাজশ্রী বসু ও শুভেন্দু চ্যাটার্জি।

সুধীন দাশগুপ্তের সুরে কণ্ঠ দি[illegible]ছেন মান্না দে ও আরতি মুখার্জি। অন্যান্য বিভাগীয় দায়িত্বে আছেন সুনীল ঘোষ (পরিচালক), সুনীল চক্রবর্তী (ক্যামেরায়), অনিল সরকার (সম্পাদনা)। চিত্রটি সিনে কোয়ালিটির পতাকাতলে নির্মিত হচ্ছে।

জব্বলপুরে একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা : স্থানীয় দেবেন্দ্র বেঙ্গলী ক্লাবে সভাপতি সুবোধ রায় ও সম্পাদক মোহিত কুমারের সুযোগ্য ব্যবস্থাপনায় একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা গত ১৩ জানুয়ারী থেকে ১৭ জানুয়ারী পর্যন্ত বিশেষ উদ্দীপনার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত নাট্যকার ও পরিচালক শ্রীকিরণ মৈত্র বিশিষ্ট অতিথি ও বিচারক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতার ফলাফল নিম্নরূপ :—

শ্রেষ্ঠ নাটক—"আসামী হাজির", প্রবাসী বঙ্গীয় সংসদ প্রযোজিত। ২য় শ্রেষ্ঠ নাটক—"এক যে ছিল রাজা"—অশনি প্রযোজিত। শ্রেষ্ঠ পরিচালক—তুষাররঞ্জন বসু (আসামী হাজির), শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—রঞ্জিত ঘোষ (আসামী হাজির), ২য় শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—তপন ব্যানার্জি (এক যে ছিল রাজা), শ্রেষ্ঠ পার্শ্বাভিনেতা—গোবিন্দ দে (এক যে ছিল রাজা), ২য় শ্রেষ্ঠ পার্শ্বাভিনেতা—তারাপ্রসাদ বসু (বিষের রেখা), বিশেষ পুরস্কার—মাঃ দেবাশীষ শ্যামরায় (কোথায় আলো)।

'কবি চন্দ্রাবতী' যাত্রাভিনয় : কলকাতার প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা গিরিশ নাট্য সংসদ গত ২৫ জানুয়ারী মহাজাতি সদন নেতাজী জন্মোৎসব কমিটির আমন্ত্রণে মহাজাতি সদনে শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত 'কবি চন্দ্রাবতী' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। যাত্রাভিনয়ে সৌখীন শিল্পীসংস্থাগুলির মধ্যে এই সংসদ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিয়েছেন, তাই এ'দের পরিবেশিত নাটকের মধ্যে যে দলগত সংহতি ও অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় তা সত্যই বিরলদৃষ্ট। জয়চন্দ্র ও চন্দ্রাবতীর মধুর কাহিনী বিষয়বস্তু। দ্বন্দ্ব সংঘাত, প্রেম সমন্বয়ে এ নাটকটির আ[illegible]র সকলকেই আনন্দদানে সক্ষম দক্ষতার সঙ্গে অভিনয়ে চরিত্রে প্রাণ সঞ্চার করেছেন। কাহিনী ও শিল্পীদের প্রাণময়তা যে[illegible]ছে। বংশীদাস, জয়চন্দ্র, হা[illegible] [illegible]ম আলি, সিপার, শিবচন্দ্র [illegible]পায়ধ, কেনারাম, রহিম, [illegible] প্রভৃতি চরিত্রে রূপদান করেছেন [illegible] চক্রবর্তী, নিখিল দাস, প্রদীপ [illegible] সুরেশ ঘোষ, ইতু মুখার্জি, গৌর [illegible] অসিত ঘোষ, দিলীপকুমার বাগচি, শশাঙ্ক চ্যাটার্জি, [illegible] ভট্টাচার্য, স্বর্ণা বসু, সুলেখা বুলবুল দে, রীতা মুখার্জি অধিকারী প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ। পরিচালনা করেন শ্রীঅজিত সু[illegible] নাটকের ব্যবস্থাপনায় ছিলেন সুলেখা ব্যানার্জি।

'কবি' ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু

সমগ্র সাহিত্য জীবনে [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় যে ক'খানি [illegible] লিখেছেন, 'কবি' তার মধ্যে [illegible] শক্তিশালী। কাহিনীর বলিষ্ঠ বক্ত[illegible] প্রকাশকালে সমসাময়িক সমাজে [illegible] নাড়া দেয়নি, আজও তার আবেদন আছে। এই সঙ্গীতপ্রধান রোমান্টিক কাহিনীটি যখন চলচ্চিত্রে রূপায়িত [illegible] আজ থেকে চব্বিশ পঁচিশ বছ[illegible] তখন তার জনপ্রিয়তার কথা ভুলিনি। আমাদের চোখের সামনে চরিত্র যেন আজও জীবন্ত—সেই [illegible] ঠাকুরঝি, বসন, রাজন, মাসি ই[illegible]

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরি[illegible] মাতালিয়া প্রোডাকসন্স কবির চিত্ররূপ আবার আমাদের উপহার [illegible] চলেছেন। বসন আর কবিয়ালের আবার নতুন করে আমাদের মনে স্থানটিকে নাড়া দিয়ে যাবে।

কলকাতায় মিঃ টমাস জে বাটা

মিঃ টমাস জে বাটা ২৪ জা[illegible] দিল্লী থেকে কলকাতায় আসেন। [illegible]সালে দূরপ্রাচ্য সফর কর্মসূচীতে অবস্থানকালে মিঃ বাটা ভারতে প[illegible] শিল্পের কারিগরী উন্নয়ন পর্য[illegible] করেন এবং ভারতীয় কোম্পানির কার্য[illegible] কোম্পানির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা স[illegible] পর্যালোচনা করে সর্বাধুনিক উৎ[illegible] পদ্ধতি বাণিজ্যিক কর্মকৌশল, ফ্যা[illegible] প্রবণতা বিষয়ে পরামর্শ দেন।

মিঃ বাটা ২৮ জানুয়ারী ক[illegible] ত্যাগ করেন।

খেলা ধুলা

দর্শক

ভারত বনাম ইংল্যান্ড

চতুর্থ টেস্ট খেলা

কানপুরে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের ৪র্থ টেস্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। বর্তমানে ভারত ২—১ খেলায় ১৯৭২-৭৩ সালের টেস্ট সিরিজে এগিয়ে আছে। সুতরাং ভারত বোম্বাইয়ের ৫ম ও শেষ টেস্ট খেলাটি ড্র রাখতে পারলেই 'রাবার' জয়ী হবে। এখানে উল্লেখ্য, কানপুরে এই নিয়ে এই দুই দেশের মধ্যে যে ৪টে টেস্ট খেলা হল : ফলাফল : ইংল্যান্ডের জয় ১ এবং খেলা ড্র। ইংল্যান্ড এখানে ১৯৫১-৫২ সালের টেস্টে ভারতকে ৮ উইকেটে হারিয়েছিল।

ভারতবর্ষ টসে জিতে প্রথম ব্যাট করার সুযোগ নিয়ে মোটেই সুবিধা করতে পারে নি। প্রথম দিনের ৩৫০ মিনিটের খেলায় তারা ৩টে উইকেট খুইয়ে মাত্র ১৬৮ রান তুলেছিল। গদাই লস্করি চালে ভারতীয় খেলোয়াড়দের রান তোলার বহর দেখে ক্রিকেট খেলায় লোকের বিতৃষ্ণা ধরে গিয়েছিল। স্কোর বোর্ডে লাঞ্চের সময় কোন উইকেট না-পড়ে ৫১ রান এবং চা-পানের সময় দুটো উইকেট পড়ে ১১৩ রান দাঁড়িয়েছিল। সুনীল গাভাস্কার ২৩১ মিনিটে ৬৯ রান করে আউট হন। আবার তাঁকে স্বমহিমায় ফিরে আসতে দেখে

অজিত ওয়াদেকার

সকলেই খুশী। বিগত তিনটি টেস্টে তাঁর খেলা খুবই খারাপ হয়েছিল—৬ ইনিংসে মোট রান ৬০ এবং এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২০। এখানে উল্লেখ্য, তাঁর কানপুর টেস্টে এই ৬৯ রানই ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এক ইনিংসের খেলায় তাঁর দিক থেকে সর্বোচ্চ রান। আরও উল্লেখ্য কানপুরের এই চতুর্থ টেস্টে তিনি তাঁর ৬৯ রানের মধ্যে ২২ রান সংগ্রহ করলে তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে ১০০০ রান পূর্ণ হয়। ভারতীয় টেস্ট খেলোয়াড়দের মধ্যে গাভাস্কারই তুলনায় কম টেস্ট ম্যাচ খেলে ১০০০ রান

টনি লুইস

পূর্ণ করেছেন। তাঁর হাজার রান পূর্ণ হয়েছে ১১তম টেস্টের ২১তম ইনিংসে।

প্রথম দিনের খেলায় অপরাজিত ছিলেন ওয়াদেকার (৪১ রান) এবং বিশ্বনাথ (২৮ রান)।

দ্বিতীয় দিনে ভারতের ১ম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৩৩২ (৭ উইকেটে)। এইদিন তারা আরও ৫ উইকেট খুইয়ে পূর্বদিনের ১৬৮ রানের (২ উইকেটে) সঙ্গে মাত্র ১৬৪ রান যোগ করেছিল। ভারতের রান ছিল লাঞ্চের সময় ২৫২ (৩ উইকেটে) এবং চা-পানের সময় ২৯১ (৪ উইকেটে)। অধিনায়ক ওয়াদেকারের দুর্ভাগ্য তিনি মাত্র ১০ রানের জন্যে স্বদেশের মাটিতে তাঁর প্রথম সেঞ্চুরী করার গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। ওয়াদেকার ৩২২ মিনিট খেলে তাঁর ৯০ রানে ৯টা বাউন্ডারী এবং ১টা ওভার বাউন্ডারী করেন। চতুর্থ উইকেটের জুটিতে ওয়াদেকার এবং মনসুর আলী

ফারুক ইঞ্জিনিয়ার

জি আর বিশ্বনাথ

জ্যাক বার্কেনস

কিথ ফ্লেচার

দলের ৮৬ রান সংগ্রহ করেছিলেন। মনসুর আলী আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে ২৩০ মিনিট খেলে তাঁর ৫৪ রানে ৭টা বাউণ্ডারী এবং ২টা ওভার-বাউণ্ডারী করেছিলেন। কি মন্থরগতিতেই না ভারতবর্ষ রান করেছিল—১০ ঘণ্টায় তাদের ৩০০ রান পূর্ণ হয়।

ফারুক ইঞ্জিনিয়ার তাঁর ১ম ইনিংসের ১৫ রানের মধ্যে ১১ রান তুলে তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে ২০০০ রান পূর্ণ করেন। ফারুকের এই ২০০০ রান পূর্ণ হয়েছে তাঁর ৩৭তম টেস্ট খেলার ৬৯তম ইনিংসে। তাঁকে নিয়ে ১০জন ভারতীয় খেলোয়াড় সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে ২০০০ রান পূর্ণ করেছেন।

তৃতীয় দিনে ভারতবর্ষের ১ম ইনিংস ৩৫৭ রানের মাথায় শেষ হয়। এইদিন তাঁরা মাত্র ৪০ মিনিট খেলে শেষ ৩টে উইকেটের বিনিময়ে মাত্র ২৫ রান যোগ করেছিল। ক্রিস ওল্ড মারাত্মক বোলিংয়ে মাত্র ১৭ রানের বিনিময়ে ভারতের শেষ তিনটে উইকেট নিয়েছিলেন। আবিদ আলির ৪১ রান উল্লেখযোগ্য। তিনি আক্রমণাত্মক খেলায় ইংল্যাণ্ডের বোলিংয়ের ধার ভোঁতা করে দিয়েছিলেন।

তৃতীয় দিনের বাকি ২৭৯ মিনিটের খেলায় ইংল্যাণ্ড ১ম ইনিংসের ৩টে উইকেট খুইয়ে ১৯৮ রান সংগ্রহ করেছিল। খেলায় অপরাজিত থাকেন অধিনায়ক লুইস (... রান) এবং ফ্লেচার (২৮ রান)। লুইস এবং ফ্লেচারের অসমাপ্ত ৪র্থ উইকেটের জুটিতে এইদিন ৮০ রান উঠেছিল। আবিদ আলি এবং লুইসের আক্রমণাত্মক ব্যাটিং দর্শকদের এইদিন যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছিল।

চতুর্থ দিনে ইংল্যাণ্ডের ১ম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৩৯০ (৭ উইকেটে)। এইদিন তারা আরও ৪টে উইকেট খুইয়ে পূর্বদিনের ১৯৮ রানের (৩ উইকেটে) সঙ্গে ১৯২ রান যোগ করেছিল। ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক টনি লুইস ১২৫ রান করে আউট হন। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় তাঁর এই প্রথম সেঞ্চুরী। তাছাড়া ইংল্যাণ্ড-ভারতের ১৯৭২-৭৩ সালের টেস্ট সিরিজেও এটি প্রথম সেঞ্চুরী। এখানে উল্লেখ্য, কানপুরে ইংল্যাণ্ড-ভারতের টেস্ট খেলায় এই নিয়ে ৮টা সেঞ্চুরী হল—ইংল্যাণ্ডের ৬টা এবং ভারতের দুটো। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে টেস্ট সেঞ্চুরী করেছেন ব্যারিংটন (১৭২ রান), ডেক্সটার (নটআউট ১২৬ রান), পার্ফিট (১১৯ রান), বেরী নাইট (১২৭ রান) এবং পিটার পারফিট (১২১ রান)। অপরদিকে ভারতের পক্ষে সেঞ্চুরী করেছেন পলি উমরীগড় (নটআউট ১৪৭ রান) এবং বাপু নাদকার্ণী (নটআউট ১২২ রান)।

লুইস তাঁর ১২৫ রানে ১৬টা বাউণ্ডারী এবং ১টা ওভার-বাউণ্ডারী করেছিলেন। অপরদিকে তাঁর ৪র্থ উইকেটের জুটি কিথ ফ্লেচার তাঁর ৫৮ রানে করেছিলেন ৮টা বাউণ্ডারী। টনি লুইস এবং কিথ ফ্লেচার তাঁদের ৪র্থ উইকেটের জুটিতে যেমন দলের অতি মূল্যবান ১৪৪ রান তুলেছিলেন তেমনি দর্শকদের আনন্দও দিয়েছিলেন। চা-পানের সময় ইংল্যাণ্ডের রান দাঁড়ায় ৩৩৬ (... —ভারতের ১ম ইনিংসের ৩৫৭ ... মাত্র ২১ রান কম।

চতুর্থ দিনের খেলার শেষে ... রান দাঁড়ায় ৩৯০ (৭ উইকেটে) ১ম ইনিংসের থেকে ৩৩ রান ... খেলায় অপরাজিত থাকেন বা... (... রান) এবং আরনল্ড (৪৫ রান) ... এবং আরনল্ডের অসমাপ্ত ৮... জুটিতে এইদিন ৮৯ রান ... ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়রা ম... ভারতীয় বোলারদের নির্মমভ... খেলেছিলেন।

পঞ্চম অর্থাৎ খেলার ... ইংল্যাণ্ডের ১ম ইনিংস ৩৯৭ র... শেষ হলে তারা ... ভারতবর্ষের ১... ৩৫৭ রানের থেকে ৪০ রা... যায়। এই দিন ইংল্যাণ্ড আরও ... কেট খুইয়ে পূর্বদিনের ... উইকেটে) সঙ্গে ৭ রান ... আঙুলে আঘাত থাকায় ... করতে নামেননি।

ভারতের ২য় ইনিংসের মাথায় ৪র্থ উইকেট পড়ে গেলে ... অনুকূলে খেলার হাওয়া ঘুরে ... সোলকার (২৬ রান), আবিদ আ... রান) এবং বিশ্বনাথ (নট আউট ...) দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে ভারতকে ... করেন। সোলকার ও বিশ্বনাথ ৫ম ... জুটিতে দলের ৬৯ রান এবং ... ও বিশ্বনাথ ৬ষ্ঠ উইকেটের ... ৫৮ রান তুলেছিলেন। বিশ্ব... করে শেষ পর্যন্ত অপরাজিত ... তিনি ২৬২ মিনিট খেলে তাঁর ... ১০টা বাউণ্ডারী করেন।

ভারতের ২য় ইনিংসের ১... (৬ উইকেটে) মাথায় ৫ম টেস্ট ... হয়। দুটি বিরতির সময় ভারতের ... মধ্যাহ্ন ভোজের সময় ৩৬ ... উইকেটে) এবং চা পানের সময় ১... (৫ উইকেটে)।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারতবর্ষ ঃ ৩৫৭ রান (গোভা... ওয়াদেকার ৯০, মনসুর আলি ... আবিদ আলি ৪১ রান। ও... ৪ এবং আণ্ডারউড ৯০ রা... কেট)

ও ১৮৬ রান (৬ উইকেটে। বিশ্ব... আউট ৭৫, আবিদ আলি ... সোলকার ২৬ রান। আণ্ডার... রানে ২ এবং আর্কেনল ৬... উইকেট)

ইংল্যাণ্ড ঃ ৩৯৭ রান (লুইস ১... ৫৮ আর্কেনল ৬৪ এবং আ... রান। চন্দ্রশেখর ৮৬ রানে ... ১৩৬ রানে ৩ উইকেট)

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কালকাতা হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।